



৩৮-এম বস]

৩৩৬ সালের বৈশাখ সংখ্যা হহতে আগ্রহ সংখ্যা পর্যন্ত

৩৮-এম বস]

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
যুগবাণী—	১, ১৮৫, ৩৩৬, ৫৫৩, ৭৪৫, ৯১১		১৫। শিক্ষা ও শিক্ষায়তন	অবিনাশচন্দ্র রায়	১১৩
প্রবন্ধ—			১৬। সাহিত্য ও শিল্পে চিত্রনৃত্য	জ্যোতির্ময় রায়	১৬১
১। আমাদের সৌন্দর্যবুদ্ধি	সেবেস্টিয়ান মিত্র	২১৫	১৭। স্ট্যান্ডার্ড ইয়ার্ড বনাম		
২। আফ্রিকার সূচ	পি. সি. সরকার	৪০৩	কলকাতা পুলিশ	পঞ্চানন ঘোষাল	৫৫৫
৩। আলোচনা নিষ্পত্তি করার			১৮। সনাতন গোষ্ঠীর		
আলোচনা	তরুণ চট্টোপাধ্যায়	৫৭২	গৃহতাপ	উমাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত	৩৭২
৪। ইন্টারমিডিয়েটে অগ্রাণ			বিবিধ রচনা—		
পাঠ্যপুস্তক	স্বধাকর চট্টোপাধ্যায়	৮	১। না-জানা-কাহিনী	তাল বেতাগ	৩১৬, ৩১৭, ৩১৮
৫। কালীদেবী ও কালীপূজার			২। বিপ্লবের সঙ্কালে	নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১২৬, ২৩৬, ৫১১, ৫৭০, ৮৫৬, ৯০১৫
ইতিহাস	শশিভূষণ দাশগুপ্ত	৭৬৪	৩। ভেবা ফিগনার	অমল সেন	৩৩৭
৬। চিত্র-চরিত্রে বর্ণবোধ ও			৪। শিকার কাহিনী	কমলেশ ভাটজী	৩৭১
সামান্য	গোবিন্দ আশ	৪০১	উপভাস—		
৭। জাতিগত প্রথম			১। আনন্দ	সাত্যিক	৩১৭
ভারতের মুক্তিকামী	অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য	১৮৩	২। অশ্বত্থ পৃথিবী	পঞ্চানন ঘোষাল	১৪৪, ১৪৫, ১৪৬
৮। জম্মান্তর কি সম্ভব?	ব্রজচাঁদ মেধাচৈতন্য	৩২৮, ৪৫০	৩। ইন্দ্রাণীর প্রেম	নীতিমা দাশগুপ্ত	৫৫৩, ৫৫৪, ৫৫৫
৯। জননী জগদ্ধাত্রী ও			৪। চন্দ্রা তার নাম	মহাশক্তি ভট্টাচার্য	২৪৫, ৪১৪, ৪১৫, ৪১৬
শ্রীশ্রীসারদামণি	যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী	৫৬২	৫। পাগলা হত্যার মামলা	পঞ্চানন ঘোষাল	৪১৬, ৪১৭, ৪১৮
১০। জীবন-সীতা	সৌভম সেন	১৩৩	৬। বন কেটে বসন্ত	মনোজ বসু	১৩০, ১৩১, ১৩২
১১। জাতি	পি. সি. সরকার	৩৩	৭। বর্ণালী	সুলেখা দাশগুপ্ত	১৪২, ১৪৩, ১৪৪
১২। নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের			৮। বাতিঘর	বারি দেবী	১৪৬, ১৪৭, ১৪৮
সঙ্গে কিছুক্ষণ	অমিরকুমার মুখোপাধ্যায়	৩৮০	৯। বিশেষনী	নীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত	১৪৯, ১৫০, ১৫১
১৩। প্রাচীন ভারতে পদিকা	বৈজনাথ ভট্টাচার্য	৫৬৪	১০। ভাবি এক ছয় আর	দিলীপকুমার রায়	৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০০
১৪। বন্ধুত্বের ধর্ম-জিজ্ঞাসা	স্বশীলকুমার গুপ্ত	১২	জন্ম-কাহিনী—		
১৫। বেলুচী আইনের চোখে	শঙ্করনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১১০	১। ভূগর্ভ পরিভ্রম	শিবপ্রসাদ নাগ	১০০
১৬। বৈশাখী	নৃপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী	৪০৫	২। লগনের পাড়ার পাড়ার	হিমালীশ গোহাটী	১০১, ১০২, ১০৩
১৭। বৌদ্ধ দেবী	শশিভূষণ দাশগুপ্ত	৫৫৪	আলোকচিত্র—		
১৮। বাঙলা অভিধান সংকলন	শৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ	৫৬১, ৭৭৬, ১০৬২	৩২ক, ১৬৬ক; ২১৬ক, ২৪৫ক, ২৪৬ক, ২৪৭ক, ২৪৮ক, ২৪৯ক, ২৫০ক, ২৫১ক, ২৫২ক, ২৫৩ক, ২৫৪ক, ২৫৫ক, ২৫৬ক, ২৫৭ক, ২৫৮ক, ২৫৯ক, ২৬০ক, ২৬১ক, ২৬২ক, ২৬৩ক, ২৬৪ক, ২৬৫ক, ২৬৬ক, ২৬৭ক, ২৬৮ক, ২৬৯ক, ২৭০ক, ২৭১ক, ২৭২ক, ২৭৩ক, ২৭৪ক, ২৭৫ক, ২৭৬ক, ২৭৭ক, ২৭৮ক, ২৭৯ক, ২৮০ক, ২৮১ক, ২৮২ক, ২৮৩ক, ২৮৪ক, ২৮৫ক, ২৮৬ক, ২৮৭ক, ২৮৮ক, ২৮৯ক, ২৯০ক, ২৯১ক, ২৯২ক, ২৯৩ক, ২৯৪ক, ২৯৫ক, ২৯৬ক, ২৯৭ক, ২৯৮ক, ২৯৯ক, ৩০০ক		
১৯। বঙ্গবন্ধুর মৌনবিক্রম	নিখিলচন্দ্র চৌধুরী	৭৪২			
২০। বাঙালী কেরালীর বৃদ্ধ					
পরিচালনা	নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য	৭৪৬			
২১। বাঙলা শাস্ত্র পদাবলী ও					
বৈষ্ণব পদাবলী	শশিভূষণ দাশগুপ্ত	১২২			
২২। মিঃ লোমেন হত্যার					
নায়ক বিনয় বসু	শ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ	১৩১			
২৩। স্বদেশের না স্বদেশবাসী	তরুণ চট্টোপাধ্যায়	১৬			
২৪। স্বদেশবাসী বিজ্ঞান ও					
বিজ্ঞানপদ্ধতি	পুলিনবিহারী বসু	৩৭০			

মুচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
কবিতা—		
১। অধরা	তপতী চট্টোপাধ্যায়	১৩১
২। অভিসারিকা	অনিল চক্রবর্তী	২৩১
৩। অথচ	সন্তোষকুমার অধিকারী	১১২
৪। অজয়নদীর চর	আইভি রাগ	১২৪
৫। অপারণ	মারা মুখোপাধ্যায়	৮৩৬
৬। অস্ত্রাশ্রয়ের রং	রথীন্দ্রনাথ সেন	১৬০
৭। আশ্বিনের ভোর	পার্বীকুমার চট্টোপাধ্যায়	১০০
৮। আকাশ : মাটি	কৃত্তী সোম	২৭৩
৯। এক মুঠো ভিক্ষে পাবো না	ধীরেন বসু	১০০৫
১০। উন্নয়ন মেয়ে	শেফালি সেনগুপ্তা	৫৪৬
১১। একটি কবিতা	অবন্তী সান্তাল	৫৬১
১২। এসো নববর্ষ	মধুসূদনা দাশগুপ্তা	১১০
১৩। কাজী নজরুলকে	গৌরাঙ্গ ভৌমিক	১৬০
১৪। ক্লাস্ত বীণার	কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩২৬
১৫। কোন একজনকে	জগৎকুমার বিশ্বাস	৭৫২
১৬। খেয়ালী	মাধবী ভট্টাচার্য	১১
১৭। স্বর ঝোঁড়ে বলসিত	সত্যধন বোমাল	৪৩
১৮। গ্রামে	কেশব চক্রবর্তী	১৬১
১৯। গরীব	অশোক দেবী	২২৫
২০। গীতাশাঠ	শিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৫৩
২১। গৃহশালিতের কথা	মহিমরঞ্জন মুখোপাধ্যায়	১১৭০
২২। ছুটি	অমিতা বসু	১৫
২৩। ছবি	সঞ্জিতকুমার চট্টোপাধ্যায়	৫৭৬
২৪। জীবন-ছড়া	চণ্ডী সেনগুপ্ত	৫২
২৫। জলছবি	মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত	৭৮১
২৬। টিরাপাখি রঙ	রমেন্দ্রনাথ মল্লিক	১০৫৭
২৭। জরী	বিমলচন্দ্র ঘোষ	৩৮১
২৮। তুমি আছ	প্রীতিবুবা বন্দ্যোপাধ্যায়	৩১৫
২৯। তৃতীয় নয়ন	দেবব্রত চক্রবর্তী	৭৭০
৩০। তুমি এসো	সুমিতা মিত্র	৮২১
৩১। দামোদর	অধীর সরকার	৫১৬
৩২। নীল পাখি	জয়ন্তী সেন	৩১৩
৩৩। না তুমি যেহে না চলে	গোপাল ভৌমিক	১০৩
৩৪। প্রভু শিবা সমাচার	বিমলচন্দ্র ঘোষ	৫৩৮
৩৫। প্রতীক্ষা	সুধীন চট্টোপাধ্যায়	৫৮৩
৩৬। পরাজিত	সন্তোষকুমার দাশগুপ্ত	৬৩৬
৩৭। পুবীর ঝাউবনে	অমলেন্দু দত্ত	৭৭৫
৩৮। ফুল ফোটানোর গান	অশোক ভট্টাচার্য	৩৪৪
৩৯। ব্যর্থ সাধনা	বেলা বন্দ্যোপাধ্যায়	২৪
৪০। বিদায়	তরুলতা ঘোষ	১৫০
৪১। বারবরষা আঘাতে	কাকলী চট্টোপাধ্যায়	২৬৭
৪২। বৈদ্যুত	সঞ্জয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৩২১
৪৩। বেকুশ	বীধি বসু	৩২৬
৪৪। বঙ্গাবল	দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	৫২৫

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
৪৫। বোটানিকেল গার্ডেন-এ	অশোক ভট্টাচার্য	৬৬৮
৪৬। বেশ লাগে	বকুল বসু	৮৩৬
৪৭। বহুরূপী	তরুলতা ঘোষ	৮৮১
৪৮। বাসবো ভালো	সাধনা বসু	১০৮৭
৪৯। তুল	কাকলী চট্টোপাধ্যায়	১৩৭
৫০। তুল	বকুল বসু	৬৪৬
৫১। ভালোবাসা	অঞ্জলি দাশগুপ্তা	৭২১
৫২। ভোরাই	সজনীকান্ত দাস	৭৫৮
৫৩। মেমোরিয়ালের মাঠের		
সেই মেয়েটি	বিমলচন্দ্র সরকার	৩০
৫৪। মানসতীর্থে	বাণী পাল চৌধুরী	১৫৬
৫৫। মনের আকাশে	সুপ্রিয়া	১১২
৫৬। মন	নীহাররঞ্জন হালদার	২০১
৫৭। মহাপ্রস্থানের পথে	প্রভাবতী বিশ্বাস	৩৩১
৫৮। মন	বীরেশ্বর বসু	৭৮২
৫৯। মৃত্যুর অখণ্ড প্রেম	জয়ন্তী রায়	৮১২
৬০। স্নান দৃশ্য নয়	শিবশঙ্কু পাল	১১৪
৬১। যে পাখী ফেরে না আর	উমাপদ রায়চৌধুরী	৮৮
৬২। রাজধানীর পথে পথে	উমা দেবী	১১৮, ১১৮৮, ১১৩, ১৬৩, ১৪৩
৬৩। রমণী	তৃপ্তিসোম	৬০৮
৬৪। রত্নহারিণ	জয়ন্তী সেন	৭৭০
৬৫। শিশিরকুমার	করঞ্জাক বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৪১
৬৬। শুধু রাতটুকু পার হলে	কৃষ্ণ ধর	৩১৫
৬৭। সানাতোরিয়াম	শক্তি মুখোপাধ্যায়	৭
৬৮। সূর্য কাব	আবদুল মজিদ	২২৫
৬৯। সেই প্রাগৈতিহাসিক মেয়ে	বিমলচন্দ্র সরকার	৫৩১
৭০। সকলই কবিতা	নন্দলাল বেরা	৬০৩
জীবনী—		
১। অখণ্ড অমির জীগৌরাজ	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	২৫, ২০৬, ৩৮৮, ৫৮৪, ৭৫৩, ১৫৩
২। বীর রমণী জুড়িখ	অমল সেন	১১
৩। শ	ভবানী মুখোপাধ্যায়	১০০, ৩১৬, ৪৬২, ৭০২, ৮১৮, ১০৮৮
৪। শিশির-সান্নিধ্যে	রবি মিত্র ও দেবকুমার বসু	৩৭৭, ৫৮৮, ৭৫১, ১৪৪
৫। সাধী অঘোরকামিনী	সুখীর ব্রহ্ম	৩৬
সংগ্রহ—		
১। পুষ্পভূমিভারত		৩৭৬
২। হে শ্রমিকবৃন্দ		২১৬
সাহিত্য-পরিচয়—	১৫৭, ৩৪৫, ৫৩২, ৭২৫, ১০৩, ১০১৪	
দেশে-বিদেশে—	১৭১, ৩৫৪, ৫৩৬, ৭৩০, ১১০, ১০১৭	
পত্রসংগ্রহ—	৮১, ২০২, ৩৮৪, ৬৩৭, ৭৫৬, ১০২৬	

সূচীপত্র

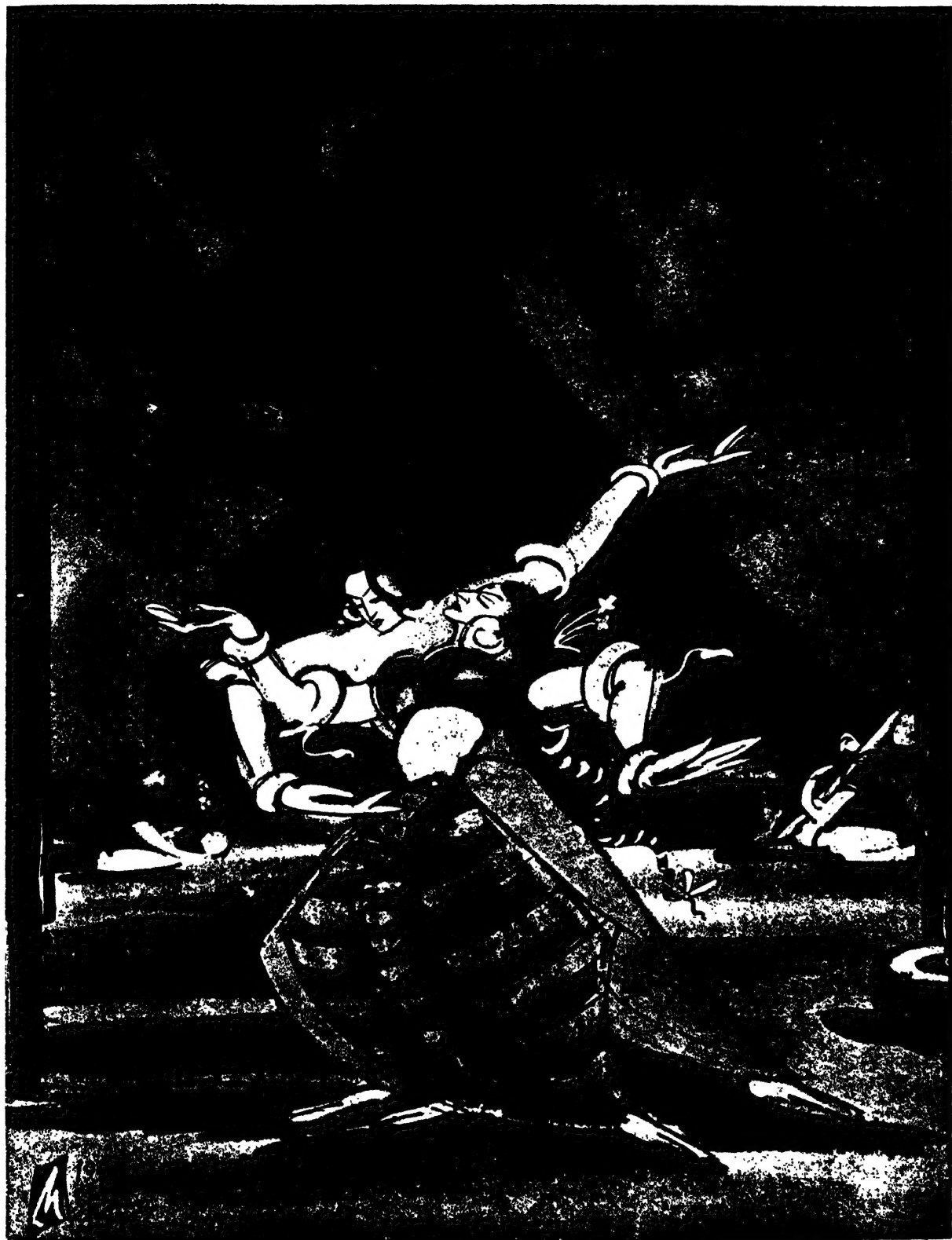
বিবরণ	লেখক	পৃষ্ঠা	বিবরণ	লেখক	পৃষ্ঠা
ছোটদের আলস—			অজল ও প্রাণ—		
উপভাস—			প্রবন্ধ—		
১। দিন আগত ঐ	ধনঞ্জয় বৈরাগী	৬৪৮, ৮৪৮, ১০৭৪	১। উচ্চশিক্ষার মাধ্যম	শান্তি ভট্টাচার্য	১৬১
২। সোনালি বয়স	শৈল চক্রবর্তী	৩২, ২৫৬, ৪৩৬	২। কবিতা ও তার জনপ্রীতি	ইন্দুমতী ভট্টাচার্য	৮৭
গল্প ও কাহিনী—			৩। ববাহিতা স্ত্রী পাকতী সখা	অমিরহাণী দাস	১৩৩
১। স্বধি বিশ্বামিত্রের শিক্ষা	মূলতা কর	৬৪	৪। মেয়েদের ক্যাম্পে থাক	ইন্দুমতী ভট্টাচার্য	৪৮
২। চেকোশ্লোভাকিয়ার রূপকথা		৮৫৩	শরৎচন্দ্রের সমাজ-চেতনা	অরুণিমা মুখোপাধ্যায়	৬৬
৩। দুই বোন	পুষ্পদল ভট্টাচার্য	৬৫৪	ভ্রমণ-কাহিনী—		
৪। নাইটিংগেল (অনুবাদ)	বকুল ঘোষ	৬৭	১। একটি নির্জলা		
নায়ের শক্তি	সদানন্দ ভট্টাচার্য	৪৪৩	ভ্রমণ কাহিনী	ইন্দুমতী ভট্টাচার্য	১৩৬
প্রান্তরের সুর	অশোককুমার চৌধুরী	১৬২	২। জলযাত্রা	রুমা দেবী	২৩
হৈমবতী উঃ	অমিতাকুমারী বসু	১০৭১	৩। পথে পথে	সুনীতা দত্ত	২৮
প্রবন্ধ—			জীবনী—		
১। অভিশপ্ত সুর বার্কারোল	দেবব্রত ঘোষ	৪৪১	১। ভক্তকবি জয়দেব ও		
২। আকাশপারের দেশে	সুধান্ত ঘোষ	২৫৮	ভাগ্যবতী পদ্মাবতী	পূরবী পাণ্ডা	২১১
৩। কিশোর-সাহিত্যে রোমাঞ্চ	ছায়া দেবী	৬৫৫	২। মহিলা কবি চন্দ্রাবতী	বল্লি চক্রবর্তী	২৮৮
৪। কাউ	বিনয় চক্রবর্তী	৬৭	গল্প ও কাহিনী—		
ভ্রমণ—			১। কলাগী	অপরাজিতা ঘোষ	৮৩৬, ১০৬৮
১। আধুনিক আফ্রিকাতে			২। বাউদারের বৌ	অমিতাকুমারী বসু	৪৭৮
পাঁচ মাস	পি. সি. সরকার	১০৭৬	মুবারিকা বিবি	শিবানী ঘোষ	২৮৫
জীবনী—			মাতৃচাক বেগম	শিবানী ঘোষ	৬৭০
১। গিবনের আত্মজীবনী	সুনীলকুমার নাগ	২৬৪	৫। মাষ্টার মশায়	আশা দেবী	১০৩৮
২। ভক্ত কবীর	বাহুবল্লভ পাল	২৬২	৬। রক্তগোলাপ	গীতা চক্রবর্তী	৬৭৬
৩। বাহুবল্লভ সরকার	বীণাদেবী সেন	৬৫২	৭। সুন্দরীপ্রভা হেলেন	প্রাণোপাধ্যায়	৪৭৪
৪। স্বর্ণগায় ধারা	কবি কর্ণপুর	১০৮	৮। স্বর্গসন্তবা	পূরবী চক্রবর্তী	১০৪০
কবিতা—			কবিতা—		
১। ছোট গিন্নী	বুদ্ধদেব বাগচী	৮৫২	অব্যক্ত	প্রতিমা চট্টোপাধ্যায়	৬৭১
২। পত ও পাখী	বর্ণজিৎকুমার দত্ত	৮৫৪	এককালি রোদ্দুর	সুপ্রা গুপ্তা	ঐ
যাত্ৰতথ্য—			ছুটি	বীণা মিত্র	ঐ
১। কালি থেকে সন্দেশ	এ. সি. সরকার	১০৭১	দিন-রাত্রির কাব্য	সন্ধ্যামিত্রা রায়	ঐ
২। গ্রাস অদৃষ্ট করার বাহু	" "	৪৪১	মৃত্যুর পরে	বিশাখা ঘোষ রায়	ঐ
৩। নয়া পরসার নয়া বাহু	" "	২৬০	চারুজল (বাঙালী-পরিচিতি)—		
৪। বোঝামের বাহুকুল	" "	৬৫২	১। সুবালিনী সেন, অরবিন্দনাথ মুখোপাধ্যায়,		
৫। ক্রমাল আর পেলিলের ভেতী	" "	৮৫২	বিনায়কনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নীহারকুমার হুদী		১৭০
রঙিন চিত্র—			২। হরিন্দাস ভট্টাচার্য, শিবপ্রসন্ন মিশ্র,		
১। নৃত্যমঞ্চ (জলরঙ)	দেবব্রত মুখোপাধ্যায়	বৈশাখ	বতীন্দ্রনাথ সরকার, শৈলেন্দ্রনাথ মল্ল		২১১
২। জননী (ফেচ)	মহীতোষ বিশ্বাস	জ্যৈষ্ঠ	৩। বোগেশচন্দ্র গুপ্ত, বিকুচরণ বাগচী,		
৩। পুষ্পবিচিত্রা (তেলরঙ)	সুচাক দেবী	আষাঢ়	বতীন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, আবহুস সান্তার		৩১৪
৪। ভক্তিপরীক্ষা (ফেচ)	অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রাবণ	৪। হরিন্দ্র ভট্টাচার্য, প্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়,		
৫। রঙ বাহার (জলরঙ)	বিশ্বপতি চৌধুরী	ভাদ্র	শরৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসাদকুমার বসু		৬০৪
৬। হাট বাজার (ফেচ)	অরবিন্দ দত্ত	আশ্বিন	৫। সরোজ আচার্য, অরুণ গঙ্গোপাধ্যায়,		
খেলাধুলা—			নির্যাপদ মুখোপাধ্যায়, কল্পনা বোশ্চ		১১১
সাময়িক প্রসঙ্গ—			৬। রাজেন্দ্রলাল আচার্য, চাকচন্দ্র ভট্টাচার্য,		
	১৩০, ২৪৪, ৫২৬, ৭১৪, ১০১, ১০১৩		অমিরকুমার সেন, বিজয়বিনোদ সিংহ-রায়		১৪৮
	১৮১, ৩৩৪, ৫৪৭, ৭৪২, ১১৪, ১১০৮				

২২

বিবি

বিবি	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১	গল্প—		
১।	১। একটু অশ্রু জলে	শচীন বিশ্বাস	২৩৮
২।	২। একটি আদিম কান্নার	আবদুল আজীজ আল আমান	৮৮৬
৩।	ইতিকথা	রাণু ভৌমিক	১১৬
৪।	৩। কুমারী শুক্লা মিত্র	বাসন্তী বন্দ্যোপাধ্যায়	৭০
৫।	৪। দৃষ্টিবাণ	মণীন্দ্রনাথ রায়	৩০১
৬।	৫। মর্শন	শচীন্দ্রনাথ অধিকার	২
৭।	৬। পদ্মাগাঙের খেয়া	রজত সেন	৫০৮
৮।	৭। প্রেতলিপি	সুশীল রায়	১১০
৯।	৮। মমতাময়ী	বিসেকরজ্ঞন ভট্টাচার্য	৫১৪
১০।	৯। বেলা	প্রমুদ রায়	১০০০
১১।	১০। মরুময়ী	স্পেনসার সুরত দত্ত	৩২৩
১২।	১১। বাত্মা	রাধবী ভট্টাচার্য	৩০২
১৩।	১২। জীভের পড়ন্ত বেলায়	অরবিন্দ দাশগুপ্ত	৬৮৭
১৪।	১৩। শ্রেষ্ঠ উপদেশ	হারেশচন্দ্র শর্মাচার্য	১৮৬
১৫।	১৪। শাপমুক্তি	অরুণ সেনগুপ্ত	৬১৪
১৬।	১৫। সত্য	সন্তোষকুমার ভট্টাচার্য	২৮০
১৭।	১৬। হাউড পক্ষ কপার		
১৮।	অনুবাদ—		
১৯।	উপন্যাস—		
২০।	১। অন্তঃগামী স্বর্ঘ্য	ওসামু দোজী : কল্পনা রায়	৮২, ১২৬, ৪৩২, ৬৩০, ৮০০, ১৭৮
২১।	২।		
২২।	৩।		
২৩।	৪।		
২৪।	৫।		
২৫।	৬।		
২৬।	৭।		
২৭।	৮।		
২৮।	৯।		
২৯।	১০।		
৩০।	১১।		
৩১।	১২।		
৩২।	১৩।		
৩৩।	১৪।		
৩৪।	১৫।		
৩৫।	১৬।		
৩৬।	১৭।		
৩৭।	১৮।		
৩৮।	১৯।		
৩৯।	২০।		
৪০।	২১।		
৪১।	২২।		
৪২।	২৩।		
৪৩।	২৪।		
৪৪।	২৫।		
৪৫।	২৬।		
৪৬।	২৭।		
৪৭।	২৮।		
৪৮।	২৯।		
৪৯।	৩০।		
৫০।	৩১।		
৫১।	৩২।		
৫২।	৩৩।		
৫৩।	৩৪।		
৫৪।	৩৫।		
৫৫।	৩৬।		
৫৬।	৩৭।		
৫৭।	৩৮।		
৫৮।	৩৯।		
৫৯।	৪০।		
৬০।	৪১।		
৬১।	৪২।		
৬২।	৪৩।		
৬৩।	৪৪।		
৬৪।	৪৫।		
৬৫।	৪৬।		
৬৬।	৪৭।		
৬৭।	৪৮।		
৬৮।	৪৯।		
৬৯।	৫০।		
৭০।	৫১।		
৭১।	৫২।		
৭২।	৫৩।		
৭৩।	৫৪।		
৭৪।	৫৫।		
৭৫।	৫৬।		
৭৬।	৫৭।		
৭৭।	৫৮।		
৭৮।	৫৯।		
৭৯।	৬০।		
৮০।	৬১।		
৮১।	৬২।		
৮২।	৬৩।		
৮৩।	৬৪।		
৮৪।	৬৫।		
৮৫।	৬৬।		
৮৬।	৬৭।		
৮৭।	৬৮।		
৮৮।	৬৯।		
৮৯।	৭০।		
৯০।	৭১।		
৯১।	৭২।		
৯২।	৭৩।		
৯৩।	৭৪।		
৯৪।	৭৫।		
৯৫।	৭৬।		
৯৬।	৭৭।		
৯৭।	৭৮।		
৯৮।	৭৯।		
৯৯।	৮০।		
১০০।	৮১।		

বিবি	লেখক	পৃষ্ঠা
নাচ-গান-বাজনা—		
প্রবন্ধ—		
১। কবিগানের সাংস্কৃতিক ভূমিকা	দিলীপ চট্টোপাধ্যায়	১১৬
২। কবি ও গীতিকার নজরুল ইসলাম	কালীপদ দাহিতী	৩৪১
৩। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে স্বরসাধনা	নিমাইচাঁদ বড়াল	৫২৮
৪। বাউল পদ্যলোচন	জয়দেব রায়	৮১০
৫। বাত্রাগানের ইতিকথা	দিলীপ চট্টোপাধ্যায়	৭২০
৬। সঙ্গীতশিল্পী শরৎচন্দ্র বলাইচন্দ্র সবকার		১০৫৮
বেকর্ড-পরিচয়—	৩৫২, ৫২৯, ৮৮১	
আমাব কথা—(শিল্প-পরিচিতি)		
১। ইলা বসু	১০৬০ ২। কালীনাথ চট্টোপাধ্যায়	৩৫২
৩। কুসুম গোস্বামী	৫৩০ ৪। প্রমুদকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	১৬৮
৫। পরেশ দেব	৮৮১ ৬। বাগদাশী দেবী	৭২২
রঙ্গপট—		
শাস্ত্রস্বতী—		
১। শ্রুতির টুকরো	সাধনা বসু	১৭৫, ৩৬১, ৫৪৭
অনুবাদ : কল্যাণাঙ্ক বন্দ্যোপাধ্যায়	৭৬৮, ১০৭, ১১০৪	
রঙ্গপট প্রসঙ্গে—	১০১, ১১০৭	
বিবিধ—		
১। চসতি ছবির বিবরণী		৭৪০
২। জেনিফার জোল	দেবব্রত ঘোষ	১০৬
৩। নটগুরু দেহরক্ষা		৫৩১
৪। নটম আজিকে মিনাভার পুনরুজ্জীবন		৭৩১
৫। নকল আকাশপাতাল ভাল খেলাঘর		৭৪০
৬। বজ্রাঘাতের সাহায্যকরে রঙমহলের প্রবেশ		১১০৮
৭। ও চিত্র-সমালোচনা—		
১। অপূর সংসার		৩৬১
২। ইন্দুনাথ, শ্রীকান্ত ও অন্নদা		১১০৫
৩। ইন্দুজাল	১০১ ৪। একমুঠো আকাশ	১৭৭
৫। কুখা	৩৬৩ ৬। ডাকবাংলো	১৭৬
৭। দীপ জেলে ঘাই	১৭৮ ৮। সোনার হরিণ	১১০৮
৯। জেডমাষ্টার, নৃত্যরই তালে তালে ও অগ্নিসমুদ্র		১০৫
প্রবন্ধ—		
১। অলকনন্দা	বিভাস মিত্র	বৈশাখ
২। কাশ্মীর	বিভাস মিত্র	জৈ
৩। শিশিরকুমার	পরিমল গোস্বামী	আষা
৪। পাঠরতা	বিত্ত চক্রবর্তী	শ্রাব
৫। বাঙালী মেয়ে	সত্য পাল	ভাদ্র
৬। দুই বোন	রামকিশোর সিং	আশ্বিন
বিজ্ঞান-বর্তী—	৪৪, ২৩৬, ৭০৮, ৮১৮, ১০৪	
কেনাকাটা—	১৩২, ৩২২, ৫১৭, ৭১৬, ৮৮৩, ১০৪	



মাসিক বসুমতী
। বৈশাখ, ১৩৬৬ ॥

(জলরঙ)

নৃত্যমঞ্চ
—ঐদেবব্রত মুখোপাধ্যায় অঙ্কিত



সামিক বসুমতি

৩৮শ বর্ষ—বৈশাখ, ১৩৬৬]

॥ স্থাপিত ১৩২২ ॥

[প্রথম খণ্ড, ১ম সংখ্যা

কথামৃত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। 'আমার চৌদ্দপুরুষের কেহ শিবকেও কখন দেখেনি, বিষ্ণুকেও কখন দেখেনি; অতএব কে বড় কে ছোট, তা কেমন ক'রে বোলবো? তবে শাস্ত্রের কথা শুনে চাও তো এই বলতে হয় যে, শৈবশাস্ত্রে শিবকে বড় করেছে ও বৈষ্ণবশাস্ত্রে বিষ্ণুকে বাড়িয়েছে; অতএব হার যে ইষ্ট, তার কাছে সেই দেবতাই অস্ত সকল দেবতা অপেক্ষা বড়।'

"পদ্মলোচন অত বড় পণ্ডিত হ'রেও এখানে (আমাত্রে) এতটা বিশ্বাস ভক্তি কোরত! বলেছিল—'আমি সেরে উঠে সব পণ্ডিতদের ডাকিয়ে, সভা ক'রে সকলকে বোলবো, তুমি ঈশ্বরবতার; আমার কথা কে কাটতে পারে দেখবো।' মথুর (এক সময়ে অস্ত কারণে) বত পণ্ডিতদের ডাকিয়ে দক্ষিণেশ্বরে এক সভার বোঁগাড় করছিল। পদ্মলোচন নিলোভ অশ্রুপ্রতিগ্রাহী নিষ্ঠাচারী ভ্রমণ; সভায় আসবে না ভেবে আসবার ভয় অহরোধ করতে বলেছিল। মথুরের কথায় তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—'হ্যাঁগা, তুমি দক্ষিণেশ্বরের বাসে না?' তাইতে বলেছিল—'তোমার সঙ্গে হাড়ির বাড়ীতে গিয়ে খেয়ে শুসতে পারি। কৈবর্তের বাড়ীতে সভায় যাব, এ আর কি বড় কথা?'

'কেউ ডাক্তারি করে, কেউ খিয়েটারের ম্যানেজারি করে, এখানে এসে অবতার বললেন। ওরা মনে করে 'অবতার' ব'লে আমাকে খুব বাড়ালে—বড় করলে। কিন্তু ওরা অবতার কাকে বলে, তার বোঝে কি? ওদের এখানে আসবার ও অবতার বলবার চের আগে পদ্মলোচনের মত লোকে—যারা সারা জীবন ঐ বিষয়ের চর্চায় কাল কাটিয়েচে—কেউ হয়টা দর্শনে পণ্ডিত, কেউ তিনটা দর্শনে পণ্ডিত—কত সব এখানে এসে অবতার ব'লে গেছে। অবতার বলার তুচ্ছজ্ঞান হ'রে গেছে। ওরা অবতার ব'লে এখানকার (আমার) আর কি বাড়াবে বল?'

"ভটি সব খর খুরে তবে চিকে উঠে; মেথর থেকে রাজা অবধি সংসারে বত। রকম অবস্থা আছে সে সমুদ্র দেখে, শুনে, ভোগ ক'রে, তুচ্ছ ব'লে ঠিক ঠিক ধারণা হ'লে তবে পরমহংস অবস্থা হয়, বখাৰ্ণ জানী হয়।" এ ত গেল সাধকের নিজের চরমজ্ঞানে উপনীত হইবার কথা। আবার লোকশিক্ষা বা জনসাধারণের বখাৰ্ণ শিক্ষক হইতে হইলে কিরণ হওয়া আবশ্যক তৎসম্বন্ধে বলিতেন—'আত্মহত্যা একটা নফন দিবে করা বার; কিন্তু পরকে মারতে হ'লে (শত্রু জয়ের জন্ত)

পদ্মা গাঙের খেয়া

শতীন্দ্রনাথ অধিকারী

কথার বলে 'এক নদী বিশ কোশ', বিশেষ করে পদ্মা গাঙের খেয়াঘাটে।

এপারে কালোয়ার চর থেকে ওপারে বাজিতপুরের ঘাট অবধি পৌঁছুতে লাগবে বাড়া এক দশটা, যদি নদী শান্ত থাকে। এপারে শিলাইনহ ওপারে পাবনা সহর। বাজিতপুর পাবনা সহরের বন্দর। উলান তাটি আড়াইতলা। জীমারগুলো ঢেউএর প্রচণ্ড আলোড়ন তুলে খেয়াঘাটটা পদ্মার বুকের মধ্যে মধ্যে পাশ কাটিয়ে পাবনা গোয়ালন্দ বাতায়ত করে। কাঁচি চর চিক্ চিক্ করে। সময় সময় খেোনাত সে চরগুলিকে সাবধানে অতিক্রম ক'রে পারাপার করে। বর্ষাকালে যখন এই চরগুলো ডুবে যায়, তখন পদ্মা সন্মুখ বিশেষ।

ভোর হয়েছে। প্রথম খেয়া ছাড়বার সময় হয়েছে কালোয়া ঘাট থেকে। শীতের শেষ। প্রভাতে মিঠে মিঠে রোন, সঙ্গে শিরশিরে পদ্মার হাওয়া। পারের বাজীরা বেশ আনামেই প্রথম খেয়ার অপেক্ষার গল্প-গুজব করছে, তামাক খায় খেয়া মাঝির কুঁড়ে ঘরের সামনে, কেউ ঝাঁড়িয়ে, কেউ বা বসে। মাছ, তরিতরকারী, দুধ, মটর কলাই, পায়াল, গুড়ের হাঁড়ি, শাকসবজী, গরু, ছাগল, ঘোষ, বুয়গী, পারের আশায় খেয়া মাঝির ঘরের সামনে ছোটখাটো একটা বাজার বসিয়েছে, কিন্তু প্রথম খেয়া ছাড়তে দেরী হবে।

বাজীদের প্রস্নের পর প্রস্নে জানা গেল, জমির ভাই অল্পপহিত বলেই প্রথম নাও ছাড়তে দেরী হবে। বেলা বাড়ছে। খোদাবজ নিকারী হাঁক ছাড়লো এনায়েং চাচা, লাও ছাড়ো, বেলা হল, ইলিশ মাছ বেশীকণ রাখা বাবে না।

এনায়েং বুড়ো মাহুর। এই খেয়াঘাটের মাঝি ও মালিক। অনেক টাকার সে ঠাকুর বাবুর কাছারী থেকে এই ঘাট বন্দোবস্ত নিয়েছে। নিজে খাটতে পারে না। এনায়েতের দুই ছেলে জমির আর জহিম পারঘাটের খবরদারী করে, পারাপারের ব্যবসায় বন্দোবস্ত করে দুই জন মাইনে করা মুসলমান মাঝির সাহায্যে। বুড়ো এনায়েং ঘাট খুব ভালই চালাচ্ছে, সবাই তার উপরে খুশী। বড় ছেলে জমিরই খেয়ার কর্তা। পারঘাটের কারদা কাছন, ধরণ ধারণ, নদীর অবস্থা, খেয়ার অঙ্ক-সঙ্কি তার নখদর্পণে। জমির নতুন বিয়ে করেছে আজ হাসখানেক হল। রবিবারে সেই যে নতুন খণ্ডরবাড়ি গিয়েছে, আজ বার দিন হল ফেরে নাই। তাইতেই খেয়া পারাপারের কিছু অব্যবস্থা হবে। একারণে বাপ এনায়েং অত্যন্ত চিন্তিত ও বিরক্ত। খেয়া-ঘাটের এতদিনকার সুনাম নষ্ট হবে, সে কথা সে ভাবতেও পারে না।

খেয়াবাজীদের সোরগোল শ্রুত হল। দীর্ঘ শীকনারের পাবনা ফুলেকী কোর্টে মোকদ্দমা আছে। শিকনার মশাই বসলেন এনাং ভাই, পোড়োতদের দিয়েই লাও ছাড়ো। বেলা বাড়ছে। ওদিকে গয়লারা চাঁচাচ্ছে পাবনা বাজার ঘরতে হবে এনাং ভাই! সহরের বাজার। সে ভো শিগেদের হাট নয়।

এনায়েতের বকাবকির ঠালায় ছোট ছেলে জহিম গজর গজর করতে করতে বড় নাওখানার লগি খুলে ফেল ডাকলো—আর রে

তামিজ ভাই, ঝাঁড় ঘর। তোমরা সব উঠে পড়ো ভাই সব। লাও ছাড়লাম।

পারের বাজী অধিকাংশই আগে ভাগেই মালপত্র নিয়ে বড় নৌকোর উঠে বসেছে, নৌকোর গলুই পর্যন্ত বোঝাই। বারা ভীয়ে ঝাঁড়িয়েছিল তারাও তাড়াতাড়ি এক হাঁটু জল ভেঙে নৌকায় উঠে পড়ল। নৌকা ছাড়ল।

নৌকা ছাড়ামাত্র এপারের হারিগাঁয়ের পাড়ির উপর থেকে ছাতামাখার দু-তিন জন লোক চাঁচাতে লাগলো—আমাদের লিয়ে বাও মাঝিভাই, জমির, জমির ভাই ঝাঁড়াও।

আর 'মাঝিভাই ঝাঁড়াও।' ততক্ষণ হালের দুই তিন বাইতে নৌকাখানা আধরশি এগিয়েছে, তীরের জলপ্রোতে কল কল ধ্বনি তুলে বাজীদের কলগুজনের মধ্যে বাজা শ্রুত করেছে। কেউ কেউ মন্তব্য করছে—আরে বাবা, সারাপথ ছুটোছুটি খেয়াঘাটে গড়াগড়ি। পারের লাওএ আইসো গো—পারের লাও ছাড়ছে।

প্রভাতে পর পর দুখানা নৌকা ছাড়বার নিরম। তাই পাঁচসাত মিনিটের মধ্যে আবার অনেক বাজী জড় হল। তিনটে গাইবাছুর এলো ওপারে সাদিপূর বাধানে বাবে। নৌকা ফার একখানা না ছাড়লেই নয়। বুড়ো এনায়েং তামাক খেতে খেতে পড়েং জমারথকে বলল, দেখতো জমারং, হারামজাদা জমিরের আক্কেলখানা দেখ। বেটার তিন তিনটে দিন খণ্ডরবাড়ী মধুর হাঁড়ি খেয়েও আশ মিটলো না। এতবড় পদ্মাগাঙের খেয়া। বেঠা শাউড়ি দেখে ভুলেছে। আহম্মকটাকে পেলে হয়, আমি ওকে পায়জার পেঠা করব। আমার কিসে ভাগোং আছে রে বাবা! বাক্ চল, আমিই হাল ধরছি। মাজার গামছা বেঁধে চট করে চলে আর জমারং।

বুড়ো এনায়েং সা করে গিয়ে আর একখানা খেয়ানৌকার হাল ধরে ফেলল। ধবধবে সাদা গৌকদাড়ি, বুকে সাদা গৌক সত্তর বছরের বুড়ো, গামছাটা মাখায় বেঁধে শীর্ণ দুখানা হাতে হাল ধরে ফেলল। বান্ধিক্যে চিমড়ে শুকনা দেহখানা বেন হঠাৎ বীরবর্মে বিগত বৌবনের স্মৃতিতে কঁপে উঠলো। সবাই অবাক। আজ চার-পাঁচ বছর এনায়েং খেয়া নাওএর হাল ছোঁয় না। বৃদ্ধ বাজীরা বলল একী এনায়েং চাচা, তুমিই যে হাল ধরলে?

আর বোলো না বাহু, সে হারামজাদা গেছে খণ্ডরবাড়ি হাসিমপুরে। তার কথা আর বোলো না। আমার নসিব। ছেলোটা একবারে বেহাঙেলে নাংলা চাষা। আজ তিন দিন হল সেছে। এতবড় একটা খেয়াঘাটের তার তারি উপরে। হারামজাদা নিমকহারাম। কথার বলে চাষা বৃদ্ধিনাশা—ঘরে আগুন বাইরে বাসা। আমার সেই মশা এই বুড়ো কালে। নে ভাই সব উঠে পড়। ওরে গরুহুজো হটকট করছে, নাও ফুলছে—ওদের মুখের কাছে থড় মেনা যে ভাই। জমারং, ঝাঁড় ঘর। দেখো ভাই সব, লাও কাং না হয় বেন। ওরে ছাগল করটারে বাঁধ। আরে বেশ বাতাস উঠছে রে। পাল পাবে-পাল পাবে। পালের ছালা বাঁধ। তামিজ

ভাই, ছালায় দড়িটা ধরা না—এখানে বাঁধো। পাল খাটাই।
কেমন চমৎকার হাওয়া পেয়েছে! এইতো রেলগাড়ির মত
দৌড়োবে লাও।

বাড়ী তমিজ সেখ এনারেত্তের বিশেষ পরিচিত ও অহুগত।
সে পালটা ঠিক করে ফেলল। একে পূবাল হাওয়া, তার পর
শান্ত নদীর তরতরে শ্রোত। সমস্ত পালখানাকে অর্ধবৃত্তাকারে
ফুলিয়ে বোঁবো শব্দে গাঙের অঙ্গে জলে কলকল শব্দ তুলে নৌকাখানা
পদ্মার বুকে ছুটে চলল। অনেক দিন পরে পাকা বহনশী মাঝির হাত
পড়েছে খেরা নৌকোর।

ডানহাতে একাণ্ড হালখানা ধরে বুড় এনায়েৎ দাঁড়ালো
চোখে মুখে তার বে বিরক্তি ও অসহায় ভাব ছিল, তা কোথায়
উড়ে গেল। মনে হল যেন চব্বিশ বছরের বুকে এনায়েৎ মাঝি আজ
বহুকাল পরে পদ্মা গাং পাড়ি দেবার জন্ত খেরানৌকার হাল ধরছে।
বোকার নৌকা চলছে—সাঁ সাঁ করে পদ্মার বুকে নিবিড় কলরোল তুলে।
এনায়েৎ বেশ প্রকৃত্ত চিত্তে গল্প জুড়ে দিল। মেজাজ ভাল থাকলে
এনায়েৎ গল্প বলে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিত। আজও নির্ভাবনার
কিসের যেন কুস্তিতে সে গল্প জুড়ে দিল—তার ঘোঁষনের ইতিহাস।

বুকে তমিজ ভাই! তুমিও তো ঠাকুর বাবুর শিল্পা কাছারীতে
বরকন্দাজী করেছ। তোমরা আর কী দেখেছ ঠাকুর বাবুর দাপেট।
সে সব দিন কি আছে যে ভাই? সে সব দিন কি আর ফিরবে?
শোনো, সে সব কাণ্ডকারখানা। স্বদেশীর টেউ লেগেছে সারা ভাশে।
ইংরাজরাও বাবুদের ধরে ধরে জেল দিচ্ছে। তবু তাশময় হৈ-চৈ।
ঐ যে কী বলে বাবুরা—বন্ধে মাতরঃ নাকি—ঐ বুলি সবার মুহে মুহে,
কত গান, কত কেসন। বাবুশাই আসেন জমিদারীতে—হেঁ হেঁ
কাণ্ড, গায়ে গায়ে সাজা পড়ে গেল। কী চেহারা বাবুশায়ের।
আঃ! দুখে-আলতায় গায়ের বরণ, সোনার বরণ দাড়ি, মাথায়
বাবির চুল, পদ্মকুলের মত ছুটো চোখ। বাঁশির মত গলার সুর।
বাবুশাই গান গাইতেন—কত গান। সে সব ভুলে গেছি। না না;
হ্যাঁ—হ্যাঁ—মনে আছে—ঐ যে 'তোমরা গাঙে বাবু এসেছে,
জয় মা বলে ভাসা তরী।' ডেউ নারে বসে বাবু গাইতেন,—পেরজারা
হৈ-চৈ করে গাঁ ছেড়ে তাঁকে ঘিরে ধরতো। কত ভদ্রলোক বাবু
আসতো—নানান ভাশ থেকে। স্বদেশী বাবুরা গান গাইতো আর
বাবু মশাইয়ের হাতে লাল মৃত্তো বেঁধে দিত,—সবার হাতে ঐ
রাজা মৃত্তো, ঐ 'জাঁখি বন্ধন' না কি যে বলে, ভাই বাঁধা। সব
বাড়িতে বাঁধাবাড়া বন্ধ। বিলেতী কাপড়, পালা ছুপ রাজার কলে
দিতো, পুড়িয়ে দিতো। সবাই পদ্মা গাঙে চান করতো সাঁতার
খেলত। আর বাবু মশাই কথা বলতেন—কী মিঠে গলার সুর—
বুক ঠাণ্ডা হয়ে যেতো—আঃ—সে দিনের কথা কী বলব।

তমিজ বলল—আমরা শুনেছি। চোখে দেখিনি। আচ্ছা,
তুমি তো আগে ডাকাতি করতে? তুমি ডাকাতি ছেড়ে ঠাকুর বাবুর
বরকন্দাজীতে বহাল হলে কেমন করে, সেই গল্প কর চাচাভী।

এনায়েৎ একটু কেশে হেসে আবার আনন্দ করল তার ডাকাতি-
জীবনের ইতিহাস। শোন—তবে শোন। আমি ডাকাতি করতে
কনিষুদ্ধী সর্দারের দলে। সে বারে খুৎখুৎ করে কড়ি বসাকের বাড়ীতে
বে ডাকাতি হ'ল—তাতে আমিও ছিলুম একজন আসামী। আরে
আমি কনিষুদ্ধির দলের লোক হলে কি হয়—জানি নে, তুমিও—

আমাকেও লাল পাগড়ী পুসিয়ে ধরে নিয়ে আলো। কত ভয়ঙ্কর হল,
দারোগা এলো, কনিষ্টবল এলো দলে দলে। কনিষুদ্ধী ধরা পড়লো।
মামলা হল কুঠের আদালতে। আমি ঐ ডাকাতিতে সত্যিই ছিলার
না—তার পেরমাণ হয়ে গেল। আমি খালস পেলাম। সাতবেকের
সারদের বাড়ীর ডাকাতিতে এক বছর জেল খেটেছিলাম। কেউনগরের
জেলে, যানি টানিছি, খোয়া জাতিছি—ওঃ বড় বড়! তাই খালস
পেরেই একেবারে শিলিমা বোটে বাবু মশায়কে ধরলাম সেলাম কুকে।
তখন এমিগরের সেরা ওস্তাদ লেটেল মেহের সর্দার বাবু মশায়ের সর্দার
বরকন্দাজ হয়েছ। আর কালোয়ার মধু মাল, একাত্তাদি, হেঁউজের
হারধর সর্দার রহিম বক্স, কোটপাড়ার এসমাইল, জোলাবালি, শিলিমা
তারণ সিং, কেতু ঢালী—এরা সব অনেকে ডাকাতি ছেড়ে বরকন্দাজীতে
ভরতি হয়েছ। বাবুশাই সব গায়ের ছেলেদের নিয়ে স্বদেশী দল
গড়লেন। তাদের সবাইকে লাঠিখেলা আর কুস্তী শেখাতে হবে।
কুস্তীবাড়ীতে লাঠিখেলা চল। আমি বাবু মশাইকে সেলাম করে
করেক হাত লাঠি খেললাম। বাবুশাই ভারি খুশী হলেন।
আমি বরকন্দাজী চাকরীতে বহাল হলাম। সে সব কি দিন
গেছে যে বাবা!

তার পরে শোনো, মস্ত বড় তাঁতের ইঞ্চুল হল। ঠাকঠক
ঠাকঠক তাঁত বসল শিলিমহ কাছারীর মাঠে তিনের ছাপড়ার।
দিন-রাত ভানির ভ্যানির চরকা চল। কুঠে কুস্তীবাড়ীতেও
তাঁত বসল। কত সভাসমিতি হল—কত গান। কাপড়,
গামছা, চাদর তৈরী হল। জমিদারীর ওস্তাদ জোলা
কারিকররা গায়ের লোকদের আর ছাত্তোরদের তাঁতের কাজ
শেখাতে লাগল। আবার খোলকর্ভাল নিয়ে সাঁকের বেলা
লগরসুকীর্জন বেরোতো গায়ে গায়ে। কী সব গান—আমার
মনে আছে, ভুলিনি—'সোনার' বাংলা, তোমার ভালবাসি।
আবার আগে চল ভাই'—ওঃ সে কত রকমের গান। আর একবার
কী হল জানো? বাবু মশাই বোটে চড়ে পাবনা সহরে গেলেন।
সেখানে মস্ত বড় সভা। শিলিমহ কুঠীর হাট থেকে বন্ধুবান্ধব নিয়ে
বাবুশাই বোট ছাড়লেন। উঃ! কীসে বিষ্টি! মুলধারে বিষ্টি।
ম্যানেজার বাবু মাখার হাত দিয়ে ভাবতে লাগলেন। পদ্মাগাঙে
বাবু মশার কী বিপদ হবে। তাঁর হুকুমে আমরা চরমহালের
পেরজারা সব ডিকী-লাও নিয়ে রওনা হলাম। পঞ্চাশখানা লাও
তিন চাওশো দাড়ি। উঃ ঐ কমান্ডমেন্ট বৃষ্টি মাখার করে বাজিতপুর্বে
দল বেঁধে ঘেরে দেখি, বাবু মশাই হাসছেন—পৌছে গেছেন ঐ হুজু
পদ্মা পাড়ি দিয়ে। আজ্ঞার কুদরত। তারি কুস্তি। যোদ্ধার
উঠলো কলমল করে। উঃ পাবনা সহর তোলপাড়। বাবু মশাই
গান করলেন, ঝাড়া তিন ঘণ্টা বজিয়ে দিলেন। লোকে লোকারণ্য।
আমরা মুখা মুখ, কী বা বুঝি। কতো রাজা মহারাজা আমীর
ওমরাও এসেছিলেন। গাড়ি-বাড়া লোকলব্ধরে পাবনা সহর
গুলজার। ফিটিন গাড়িতে বাবু মশাইকে চড়িয়ে পাবনার উকিল
বাবুরা বন্ধে মাতরঃ শব্দে সহর কাঁপায়ে দিলো।

যেরা নৌকো তীরবেগে চলছে। এনায়েৎ তখন গল্পে মজে
গিয়েছে। ভরা নৌকোর সবাই হাঁ করে তনছে। এনায়েৎ
বলতে লাগলো—

তারপর শোনো এক মজার কাণ্ড! আমি বরকন্দাজী করি

তখন ঠাকুর বাবুর ঘোষপুরে। তৈরব পাড়ার সীমানা নিয়ে নাটোরের ছোট তরক রাজার সঙ্গে ঠাকুর জমিদারের বিবাদ। মামলা বোর্ডখানা, দেওয়ানী কোর্টখানা, অনেক হল। শেষে নাটোরের ছোট তরকের নারেব করল এক মজার কারসাজী। বলা নেই কওয়া নেই, ঠাকুর বাবুর সীমানা প্রায় তিন রসি চর জবর দখল করে ঐ মাদারতলার ছামে প্রায় দুই তিন কুড়ি নাড়ার কুড়ের বানিয়ে তাদের পেরজা বসিয়ে দিল। তাদের গরু মোষ ছাগল চরতে থাকে। পেরায় একশো দেড়শো বাসিন্দা। নারেব মশাই বললেন—এনারেং, আর তো ওদের সঙ্গে কোর্টখানা করতে পারি না। ওরাই কোর্টখানা ককক, আমরা হব আসামী। কী উপায় করা যায় বল। আমি বললাম—হুজুর চূপ করে বুকে ধাবা দিয়ে বসে থাকুন। বেন কিছুই হয় নি। হেঁটে করতে বারণ করুন। আমি কোর্টখানার আসামী হয়ে কাজ সাবাড় করে দি। নারেব মশাই নিশ্চিন্ত। কোন হেঁটে নাই, আমরা বেন কিছুই জানি না। একদিন ঠিক দুপুর। খাঁ খাঁ করছে চরের আগুনের মত রোদ। আমি চূপ করে ওদের পাড়ার কাছে খাট হাতে করে ঐ কাশবনে পারখানা করতে গিয়েছিলাম এক মজার কাণ্ড করে। আর যায় কোথায়? পেরায় কাণ্ড। ঐ দুপুরে একেবারে লজ্জাকাণ্ড। সব নাড়ার কুঁড়ে ধুধু করে জল উঠল। যেয়ে গাছের চানে, মিনসেরা সব মাঠে, গরু-বাছুর সব চরছে কাউবোনাজে। কেউ পরাণে মরল না—হেঁটে কাণ্ড, গরু বাছুর গা গা করে ছুটতে লাগলো, যেয়েছেলো হাউ-মাউ কেঁদে চর কাটিয়ে দিল। কী ভয়ঙ্কর আগুন। শেষে হায় হায় সব ছেড়ে আমরাই আগুন নিবিয়ে দিলাম। সব পালিয়ে প্রাণ বাঁচালো। তার পরের দিন আমরা সেখানে পেরায় ত্রিশ-চল্লিশ জন লাঙল লাগিয়ে চলে কলাই ছিটিয়ে দিলাম। দশ-বারোজন আমাদের পক্ষের পেরজা মোতাইন করে দিলাম একদিনের মধ্যে। নাটোর রাজার নারেব ভাবাচাকা খেয়ে চূপ করে গেল। কিল খারে কিল চুরি করল,—কোর্টখানাতে মোটেই গেল না। ঐ মাদারতলার ছাম আমাদের দখল হয়ে গেল। তারপরে চলল দেওয়ানী মামলা। পাবনা কোর্ট, হাইকোর্ট। যেমন ঠাকুর জমিদার তেমনি নাটোরের রাজা। কেউ কম নয়। বাবুমশাই চার মহাল তদন্ত করলেন, কাগজপত্র চিঠি খতেন লকসা কত দেখলেন। জেদের মামলা চলল বছরের পর বছর। তারপর আমাদের গাঁয়ে লাগল কতেরা। অনেক লোক মরল, গাঁ সাক হয়ে গেল। আমার বিবি সেই কলেরাতেই মারা যায়। ছুতো চ্যাঙা ছাওরাল নিয়ে আমি বড় বিপদে পড়লাম। সবাই বলল—নিকে করো। আমি পাগলের মত ঘুরে বেড়াইতাম। কোন ছোটলোকের মাইরা আনবো, ছাওরাল হুড়ার বস্তন হবে না—সংসারে অশান্তি হবে। নিকে পুথতে মন সরল না। জহিরদ্দিন মোল্লা বলল—নিকে করো। হুসিম মোল্লা বিধবে ম্যারাজারে নিকে কর, বড় ভাল মারে, তোমার ছাওরালদের অংক হবে না। পারলাম না। দিনরাত বোঁএর মরা মুখ চোখের উপর ভাসতো, তার কথাগুলো কানের মধ্যে বাজতো। তার জন্তে পরাণভা সারাদিন আহুতি-বিহুতি করত। তার ডাগর ডাগর চোখ দুডো—আহা, মিষ্ট কথাগুলো—

জীর স্মৃতি জেপে উঠলো ঘোঁবনের স্মৃতিকথার। তাই লজ্জা

পেয়ে এনারেং সে প্রসন্ন ছেড়ে দিল। এদিকে পালের জোরে নৌকা পদ্মাশাড়ি দিয়ে ঐ অন্ন সময়ের মধ্যেই বাজিৎপুরের ঘাটে এসেছে।

মাস ছয়েক কেটে গেল। বড় ছেলে জমির এসে ঘাটের ভার নিয়ে বখারীতি খেয়ার কাজ চালাচ্ছে।

খেয়াঘাটের উপরেই ঘাটখারির দোচালা ঘর। ঘরের সামনে বাঁশের বাখারির তৈরী 'চরটি' শুভ্রাপোষের মত সবাব বসবার জন্তে, আতিথ্য দেবার জন্ত। সারাদিন হকা কলকে তামাক চলে। একটা চারপায়ার উপর বসে এনারেং সবাব সঙ্গে কথাবার্তা বলে। ঘরখানার পিছনে একখানা ছোট চালার রান্নাঘর। এনারেং রান্নাবান্না করে কখনো কখনো। আবার অনেক সময়ই হুড়ি চিড়ে ছাতু খেয়ে দিন কাটায়। আলত ও অবহেলার খাওয়া দাওয়ার অনুবিধার এনারেংয়ের বার্তা বৈশী প্রকট হয়েছিল।

ছেলে-অন্ত প্রাণ এনারেং জমিরের খণ্ডরবাড়ির উপরে অস্বাভাবিক চান কোন কারণে, তা অনেক দিন আগেই বুকেছে। তাই তার নিজের বাড়িখানা যা একেবারে লক্ষীছাড়া হয়ে গিয়েছিল, মেরামত করে নিয়েছে প্রায় দুশো টাকা খরচ করে। শুধু তাই নয়, গরু ছাগল পুথছে দুবগী পুথছে। বেটার বোঁকে এনে সংসারে পরম স্নেহে প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছে। লাউ কুমড়োর মাচা, মরিচ বেগুনের ক্ষেত তৈরী করে বেটার বোঁ-এর সাথআছাদ মোটাবার সমস্ত ব্যবস্থাই করে দিয়েছে। ছোট ছেলের বিয়েও প্রায় ঠিকঠাক করে ফেলেছে। দুই ছেলেকে সংসারে ছিছু করতে পারলেই এনারেং নিজের কর্তব্য শেষ করতে পারে। নিমন্তলামার্থে হোসেন সদ্দারের ষোঁতটা নিলাম খরিদ করে সতেরো বিধে খানজমিও ছেলেদের জন্ত করে দিয়েছে। খেয়া-ঘাটের উত্তরোত্তর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তার সাংসারিক উন্নতিও অব্যাহত আছে। ছেলে-অন্ত প্রাণ এনারেং অন্ধরে অন্ধরে তার পিতৃকর্তব্য পালন করে চলেছে। এ বেন তার পিতৃ-দায়িত্ব, কঠোর বর্তব্য সম্পাদন মাত্র। এত করেও এনারেং খেয়াঘাটতে থাকতো, রাত কাটাতে, খাওয়া-দাওয়া করত। বলত, ছেলেদের ঘর-দুয়ার শুদ্ধিয়ে দিলাম। আর কি, আমি তো এখন খালাস। ওরা মাহুব হোক, সুখে থাক, খেয়াঘাট চালাক, আর কি করব আমার কাজ খতম। এখন আচ্ছা কবে তাঁর পায়ের তলায় ডেকে নেবেন তারই আশার আঁহি বাবু। আমার কাজ আমি করেছি।

খেয়াঘাটে ভাঙা দোচালা ঘরে চূপচাপ বসে থাকে এনারেং। খেয়াঘাটের ঘরই বেন তার বাড়ি-ঘর সব। নিজের তৈরী সোমার সংসার বেখানে, সে বাড়িতে সে অন্নই খায়, সেও বেন নিভান্ত কর্তব্যবাঁধে। বেটার বোঁদের ব্যবহার কথাবার্তা চাচাচালনে সে আনন্দ পায় না। তার পরের মেয়ে, এসেছে সোমারী-সংসার নিয়ে সুখে ঘর-সংসার করতে। খণ্ডর লাউড়ী বা আর কেউ যে সংসারের ভাগিদার থাকবে, তাদের সুখের ভাগ বসাবে সে বকম দিকা তারা পায় নাই। এনারেং স্নেহপ্রবণ স্বভাবে দারুণ আঘাত পেল। ছটি ছেলে তার নয়নের মণি, তাদের পুথই তার পুথ। বোঁমারা খণ্ডরকে খেতে বলত, ছুটো ভাত বেড়ে দিত, তামাক সঙ্গে খণ্ডর অল্পোখ করলে কলকের একটু আগুন দিত, দাওয়ার বসবার জন্ত চাটাই দিতো, এইমাত্র। এর বৈশী যে স্নেহময়তা আদর-বহু বৃদ্ধ পুত্রগত প্রাণ খণ্ডর আশা করে, তারা তা বুঝতো না। বাড়িতে এলে এনারেংয়ের পরলোকবাসিনী জীর স্মৃতি

এইজুতেই তাকে বেশী কষ্ট দিত। তার সোনার সংসার ভেঙে নর তার সবই পর হয়ে গেছে।

কিছুদিন স্নান করবার পর এনারেৎ এ সব আর গারে মাখতো না। খেয়ার কুঁড়ে ঘরে বেশ আরামে সে থাকে। অসুবিধার মধ্যে সে রান্না করে খাওয়াটা একটা হাংগাম মনে করে। হু-তিনখানা গাঁয়ের দ্রানের ঘাট এই খেয়াঘাটেরই পেছনে। একটা বাউ বোনাঙ্গের প্রাচীরের ধার দিয়ে সেই একপেয়ে রাস্তাটা জলে নেমেছে। গ্রামের পুরুষ রমণী ছেলেমেয়েরা সেই ঘাটে আনাগোণা করে। তারা বুঝতে পারে যে এনাৎ মাঝি বাড়িতেও যায় না, রান্না করেও খায় না।

ঘর-সংসারওয়ারা বুড়ো মাছুষটা এভাবে বাঁচে কি করে? চিড়ে-মুড়ি ছাতু খেয়ে একটা সমর্থ বুড়ো মাছুষ বাঁচতে পারে? ছেলে জমিরের কাছে অনেককই অল্পবোগ করে, কড়া কথা শোনার—তার গারে কি মাছুষের চামড়া নেই? সত্যি কি সে বুজিনাশা চাষা? এমন রেহাওরণ বাপের উপর সমস্ত মায়ামমতা কি তারা সুলভ্য বৌ পেয়ে একেবারে ভুলে গেছে? জমির আর জহিম এই নিয়ে তাদের জীবনের সাধে ঝগড়া বাধার, ছোটলোক চাষার ঘরের মেয়ে বলে গালাগাল পাড়ে। বাপের কাছে এসে অল্পবোগ জানার দুই বেলা বাড়ি গিয়ে খেয়ে আসবার জন্তে। বাপ সবই শোনে, ছেলেদের মনের ভাব বেশ বোঝে, কিন্তু যে পাখানের আঘাতে বুড়ের বুক ভেঙেছে, সে আঘাতকে এড়িয়ে চলতে চায়। হা হা করে হেসে ছেলেদের অল্পবোগ উড়িয়ে দিয়ে সে বলে এই পদ্মাগাঙের অক্ষুণ্ণ জল আর হাওয়ার প্রায় বিশ বছর মাছুষ হয়েছে। এই আমার ভালো। এই খেয়াপারের বাজীদের আনাগোণা মেশামিশি সারা দিনমান আমাকে বাঁচিয়ে রাখে, কাজে ভুবিয়ে রাখে। আমার সেই স্নেহের পথে তোরা বাদী হ'সনে বাপজান্। আমি বেশ আছি, স্নেহে আছি।

বুড়ো এনারেত্তের মনের মধ্যকার গভীর ক্ষতের প্রকৃত সন্ধান পায় অনেককই। বিশেষ করে একটি অনাথা দ্রালোক। সেও জীবনে কারো রেহা পায় নাই, বামিপ্রেমের স্বাদও সে পায় নাই, কারণ সে বাল-বিধবা। কারও ঘরনীও সে হতে পারে নাই, কারণ সে রকম চোঁটা করবার মত দয়দ তার ভাইদের নাই। তার ভাইবোরাও এই অবীরা বিধবা বাঁদীর মনের খোঁজ তো রাখেই না বরং উঠতে বসতে তাকে খোঁটা দেয় গরীব ভাইদের বাড়ি বসে সে ভাত গেলে, আর পাড়ার পাড়ার ঘোরে। বাপ হলিম মোল্লা শেষ বয়সে ভিক্ষা করে খেতো—আর কষ্ট সহ্য করতে না পেয়ে একদিন কোঁথার বেন নিক্কেশ হল। নছিরণ হ'মাসও স্বাধীর ঘর করে নাই। যোর বর্ষার পদ্মার মাছ ধরতে গিয়ে তার স্বামী ঝড়ের মধ্যে মারা যায়। বাপ মা ভায়ের রেহা স্বামীর আদর পোষণ বিধাতা তার কপালে লেখেন নাই। সারা পাড়ার হতভাগিনী টো-টো করে ঘোরে—বেখানে পায় সেখানেই হু'মুঠো খেয়ে বেঁচে আছে। কিন্তু ক'দিন কে কা'কে খেতে দেয়। তাকে পাড়ার চাহিদামত গভীর খাটের পেটের ভাত জোপাড় করতে হয়। উপাসীন এনারেৎকে হু'বেলা দেখে খেয়াঘাটে।

বুড়ো এনারেৎ খেয়াঘরে বসে বসে হুপ করে দেখে নছিরণ কারো বাড়ির জল টানছে কাঁখে কলসী নিয়ে, কারো খায়ে কাপড় কেটে

দিয়ে সারা হুপুয়ের রোজি মাখার করে। একদিন নছিরণ এনারেৎকে ঘাটে একা পেয়ে বলল—মাঝি গো, তুমি এরকম উপোস কর, ক'দিন বাঁচবে? আমি তোমার দুবেলার বেঁধে খাওরানো। ঐ রান্নার ঢালার রাখবো—বুঝলে? একটা বুকফাটা কান্না তার গলার ঘরে।

এনারেৎ সবই বুঝেছে, কারণ স্বচক্ষে হতভাগিনীর এই দুঃখ সে দিনের পর দিন দেখে আসছে—ছুটো ভাতের জন্ত তার কী হানডা। খুব ফুটে কিছু বলতেও পারছে না—সইতেও পারছে না। সে বলল—বেশ, তুই দুবেলা আমার বেঁধে খাওরাস। আমি সব বন্দোবস্ত করে রাখবো।

সেই থেকে এনারেৎ দুবেলা রান্নাভাত খাচ্ছে, নছিরণের সেবাস্বপ্ন পাচ্ছে। হাটের দিনে একখানা সাড়ি আর গামছা কিনে বলল—নছিরণ, এই নে, সাড়িখানা পরিস। নছিরণ হাসিমুখে সাড়িখানা হাতে নিলো—চোখ দিয়ে কয়েক কৌটা জল পড়ল। তা কিন্তু এনারেত্তের দৃষ্টি এড়ায় নাই। গভীর সমবেদনার তার মনের মধ্যকার বৃক্ষ ভালবাসা জেগে উঠল।

জ্যৈষ্ঠ মাস। বর্ষার আগমনী স্রু হরয়েছে দুকুলদ্রাবী উম্মাশিনী নবমের্বনা পদ্মার জলে। পদ্মার বৃকে অছারী চরগুলো পদ্মার বিশাল বৃকে আশ্রয় নিয়েছে। কালবৈশাখীর উচ্চায় নৃত্যে বৌবন-চকলা পদ্মার নৃত্য স্রু করেছে।

শিলেদহ সদর কাছারী থেকে বরকন্দাজ মোহন সিং পুরোয়ানো এনে দেখালো খেয়ামাঝি এনারেৎকে। আগামী ত্রানবাজ্রা মেলায় যে বিপুল স্বাক্ষরমাগম হবে পোগীনাথের ত্রানবাজ্রার উৎসব দেখতে, তাদের পারাপারের উপযুক্ত স্ববন্দোবস্ত করবার জন্ত ম্যানেজারবাবুর হুকুম সে শোনালো। এবছরে খেয়া পারাপারের নতুন ব্যবস্থা করতে হবে। গত বৎসর ঐ প্রকাণ্ড মেলায় পরদিন সাদিপূর খেয়াঘাটের ওপারে চরের মধ্যে একটা নারীধর্ষণ হয়েছিল, অনেক কষ্টে সেই অপরাধী শুভাকে পুলিশ পকড়াও করে। মামলা-মোকদ্দমা হয়ে সেই শুভার জীবন বাস শান্তি হয়। মেলায় কয়েক দিন পদ্মার চরের নিকটেই গভীর রাতে নির্জনতার সুযোগে শুভারা এই রকম অত্যাচার করায় ঠাকুরবাবুদের হু'মাস রটেছে, মেলায় ক্ষতি হয়েছে, জনসাধারণের মনে ভয়ের সঞ্চার হয়েছে। তাই ম্যানেজারবাবুর কড়া হুকুম, ত্রানবাজ্রার মেলায় তিন দিন তিন রাত্রি পারাপারের অতিরিক্ত বিশেষ ব্যবস্থা রাখতে হবে, আর সূর্য্য অস্ত বাবার পর পরই এপার ওপার দুপারের খেয়া নৌকা বাজীবহন করতে পারবে না। পুলিশ আর গ্রামের খেজাসেবকেরা এই সব তথ্যের ভাপালা করবে।

ত্রানবাজ্রার মেলা উপলক্ষে প্রতি বৎসরই খেয়া পারাপারের অতিরিক্ত বন্দোবস্ত করতে হয়। এতে যেমন খরচ হয় আরও খুব বেশী হয়ে থাকে। এবারেও সেই সমস্ত মাছুসী ব্যবস্থা করবার জন্ত জমির জহিম দুই ভাই উঠে পড়ে লাগলো। এদিকে ঢোলসহরৎ দিয়ে কাছারী থেকে প্রচার করে দেওয়া হয়েছে—মেলায় তিন দিন তিন রাত সূর্য্যাস্তের পর সমস্ত খেয়াঘাট বন্ধ। কোন বাজী বেন পারাপারের চোঁটা না করে এক খেয়ার ঘাটমাঝি বেন সতর্ক হয়।

এনারেত্তের খেয়াঘাটে মেলায় প্রথম দিন থেকেই বাজী-বাজিনীর

অসম্ভব ভিড়। পুরুষ-বাহিনীর বিগল মেয়েবাহিনী। মেয়েদের বিরাট হলুদখনির মধ্যে খেঁচার নাও ছাড়ে। আবার নতুন বাজী-পরিপূর্ণ নৌকা ঘাটে ভিড়লেও অল্পকাল বসবাস। কয়েকজন বাজী খেঁচাঘাটে বসেই রান্না-খাওয়া করে নেয়। অপক্লান্ত চোঁচের নানা দেশের বাজী-বাজিনীর বৈচিত্র্যে খেঁচাঘাটের একধারে চোঁচাটা বদলে গেছে।

বুধবার মেলার শেষ দিন। তিন দিন তিন বাজী অবিরত পরিভ্রমে খেঁচার মাঝিরা সবাই ক্লান্ত। স্বয়ং এনায়েৎকেও কয়েক বার হাল ধরে বাজী-পারাপার করতে হয়েছে। সারা দিন রাত খেঁচাঘাট লোকসমাগমে সরগরম। বৈকল্য-বৈকল্যীদের কীর্জন আর বাউল-কবিরদের গানে বুড়ো এনায়েতের মনটা খুশিতে ভরপুর।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে। পূর্ণিমার জ্যোৎস্নার রূপালী চরণান। পদ্মার বিশাল বুকখানা বকমক করছে। পূর্ণ্য অস্ত্র বেতে বেতেই খেঁচা পারাপার বন্ধ হয়ে গেছে, লোকের আনাগোনা নাই। নীরব নির্জন পদ্মাবক্ষ, খেঁচাঘাট পদ্মার চর, তীরভূমির প্রামাণ্য। খেঁচাঘাটে কেউ নাই—একা এনায়েৎ চরের উপর বসে তামাক খাচ্ছে। অনেক দিন থেকেই সে অভিমাত্রার বেশী গভীর। নছিরণ, রান্নার চালায় রান্না করছে। এনায়েৎ আজ বেশ খুশি। নছিরণকে বেশ খোসমেজাজে ডাকল—নছির, মেলার গিয়েছিলি? মেলা দেখবি না? নছিরণ কোন জবাব দিল না। খুব চাপা মেয়ে নছিরণ। সে জানে এনায়েৎ তার জন্তে মেলা থেকে রসগোল্লা পানভুয়া এনেছে, একখানা ভাতের সাড়ি এনেছে। সে জানে, এনায়েৎ তাকে খুব ভালবাসে। এনায়েতের মনটা এই কারণেই খুশী আশ্রিত। নছিরণ আজ আর নিরাশ্রয় নয়।

এমন সময় হঠাৎ একজন স্ত্রীলোক একা এসে হাজির খেঁচাঘাটে। তার সঙ্গে না আছে কোন মেয়ে বা পুরুষ-সঙ্গী। রাত কম হয় নাই। এমন সময়ে একাধিনী স্ত্রীলোকটি খেঁচাঘাটে হাজির হল কেন? এনায়েৎ ভাবতে লাগলো, মেয়েটির সাহস তো বড় কম নয়। খেঁচাঘাটে এই চরে সে কেন মরতে এলো? -

মেয়েটি এনায়েতের কাছে এসেই এনায়েতের পা জড়িয়ে ধরল। কান্নার ভাঙা গলায় বলল—মাঝি, তুমি আমার বাপ। আমার বাঁচাও তুমি। আমার জাত বায় ধন্য বায়। আমি তোমার মেয়ে। এনায়েৎ আশ্চর্য করল, কোন শুভা বদমায়ের এসে পেছু নিয়েছে। সে বলল—ব্যাপার কি গো? কি হয়েছে বল তো?

সে বলল—এই চরের একটা লোক আমার ভুলিয়ে এনেছে। আমার গাঁয়ের সাখীরা গোপীনাথের মন্দিরের ভিতরে ছিল, আমি বাইরে মেলার মধ্যে কাচের চুড়ি কিনছিলাম। সে লোকটা এসে বলল, তোমার বাড়ি তো সাতবেড়ে? তোমার সখীরা তোমার খুঁজে না পেয়ে বাড়ী রওনা হয়ে গিয়েছে। আমার বলে গেছে তোমার খেঁচা পার করে কাজীপাড়ার নিয়ে যেতে। কাজীপাড়ার তারা তোমার অপেক্ষা করবে। আমি বিদ্বাস করতে পারলাম না। বললাম আমি হেঁথার থাকবো, তারা ঠাকুর দেখে আমার নিয়ে যাবে, কথা আছে। লোকটা তা শুনে না। তার সঙ্গে আরো তিনজন মুসলমান ছিল। শেষে তারা ভয় দেখালো, নানারকম ধারণা কথা বলল, সে সব কথা বলতে

লজ্জা করে। তখন মনে করলাম, ওদের কথামত খেঁচাঘাট অবধি বাই। সেখানে গেলে হয়তো বাঁচতে পারবো।

এনায়েৎ আগুন হয়ে উঠল, বলল, তুমি এসো বাছা, আমার এই ঘরের মধ্যে গিয়ে বসে থাকো। তোমার কোন ভয় নেই। বা করবার আমি করছি।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই চার জন বণ্ডামার্ক যুবক এসেই বলল, মাঝি, আমরা পারে যাবো। আমাদের বাড়ির একটা মেয়ে এখানে এসেছে। তার মায়ের বড় অসুখ। তাকে নিয়ে এই রাস্তায়েই বাড়ি যেতে হবে। সে মেয়েটা তোমার ঘরে আছে বোধ হয়, তাকে আসতে বলো। নাও ছাড়ো, না হয় বল, আমরাই ছোট নাওখানা নিয়ে পার হই।

এনায়েৎ বলল এখন কেউ পারাপার হবে না। এখন বাও, কাল ভোরে এসো, পার করে দেব। সন্ধ্যা থেকে পারাপার বন্ধ, তা জানো না?

তারা ক'জনই অনেক কড়া কড়া কথা শুনালো, তর্ক করল। শেষটার ওরা ছোট নৌকাখানা খুলে নিয়ে পার হবে জানিয়ে বলল, মেয়েটি কোথায়? তাকে ছেড়ে দাও। নইলে তোমার মাঝিসিঁরি শিখিয়ে দেবো। চালাকী করো না।

এনায়েৎ বুঝলো এরা দলে ভারী। খেঁচাঘাটে সে সন্ত্রাসীরা একা। তার পক্ষে দ্বিতীয় পুরুষ নেই। তাইতো এরা সাহস পেয়ে গেছে। সে অসুযোগ করল—এখন খেঁচা ছাড়া বেআইনী। তারা নৌকায় হাত দিলে তাদের বিপদ হবে। কিন্তু তারা কিছুতেই শুনবে না। একজন বলল—মার শালাকে। আর দুজন খেঁচার কুঁড়ের দিকে অগ্রসর হল।

এনায়েতের মাথা গম্ভ হয়ে উঠলো; বলল—শোনো, আমি এনায়েৎ লেঠেল, এনায়েৎ ডাকাত, আমার গাঁয়ে হাত দিলে তোমাদের ভাল হবে না। আমার ঘরের মধ্যে কেউ গেলে মারা পড়বে। সাবধান। তোমাদের চিনি। বুড়ো মাস্তুরের কথাটা শোনো।

লোক কয়টির হাতে লাঠি ছিল। তারা গালাগাল দিয়ে উঠলো। এনায়েৎ এক লাফ দিয়ে কুঁড়ে থেকে তার বড় আড়ালী খানা নিয়ে এগিয়ে এলো, আর বনমাশরা আর আমার সামনে। নছিরণকে বলল নছির, মেয়েটাকে নিয়ে সরে পড়। লীগগির পালা।

বাথলো মারামারি। এনায়েতের লাঠির . ঘায়ে একজন ঘরাশারী হল, তখন আর তিন জন তাকে একসঙ্গে আক্রমণ করল। নছিরণ হঠাৎ মাস্তুরের বঁটি নিয়ে ধরে এলো গাছকোমর বেঁবে। তার তখন চাখুণ্ড-মূর্তি। সে বাকে পাচ্ছে তাকেই বঁটির কোপ দিচ্ছে আর প্রাণপণে চীৎকার করছে তোমরা এগোও, এগোও, ডাকাত পড়ছে ডাকাত পড়ছে।

সেই চীৎকারে বহু লোক ছুটে এল। তিন জন জোয়ান মর্দন সঙ্গে একা লাঠি চালিয়ে বহু এনায়েৎ ক্লান্ত হয়ে পড়ছে কিন্তু শুভা ক'জনও বেশ জখম হয়েছে। বহু লোক এবং সঙ্গে সঙ্গে মেলার পুলিশ ছুটে এল। শুভাদের প্রেক্ষতার করতে বিশেষ অসুবিধা হল না। চারিদিকে হৈ-ঠেঁপে পড়ে গেল। এই রাজ্যেও কাছাকাছি ক'খানা গাঁয়ের লোক সেখানে জমা হল। জমির আর জহিম এসে

পড়েছে। বুদ্ধ এনায়েতকে ধরাধরি করে চড়াটীর উপর ওঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এনায়েতের জ্ঞান নাই, বুদ্ধের ডান পাশে ভয়ানক জখম, নয়দরধারে রক্ত পড়ছে। এ তো লাঠির ঘা নয়। নছিরণ বলল—গুপ্তাদের হাতে ধারালো অস্ত্রও ছিল। মনে হল তারা আত্মরক্ষার জন্য ছোরা ব্যবহার করেছে। এনায়েতের ঐ অবস্থা দেখে সবাই ভয়ানক উদ্ভিষ্ট হয়ে উঠলো। নছিরণ জল ঢেলে এনায়েতের জ্ঞান স্কার করতে না পেরে তার বুদ্ধের উপর কঁদে আছড়ে পড়ল—ওহে আল্লা, এ কি করলে? মাঝিকে বাঁচাও আল্লা। তার বুদ্ধকাটা অবিরাম কান্নায় সবাই বেনী বিব্রত হয়ে পড়লো, সরকারী ডাক্তার ডাকা হল।

ডাক্তার সব দেখে-শুনে বললেন, গুপ্তারা ছোরা মেরেছে বুদ্ধের বাঁ দিকে, রক্ত বন্ধ করা প্রায় দুঃসাধ্য। সবাই হতাশায় ভেঙে পড়ল। কুঠে থেকে বড় ডাক্তার আনবার সময় পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ। জমির ও জছিমের মুখ শুকিয়ে গেল, বাপজান বাপজান চীৎকারে তাদের হুঁভায়ের কান্না, উপস্থিত জনতার চোখেও জল। সবার কান্না ছাপিয়ে উঠল নছিরণের কান্নার রোল—মাঝি গো মাঝি—আমার ছেড়ে বেগ না মাঝি—হা আল্লা, আমার মাঝিকে বাঁচাও। আমার রক্ত নাও।

সরকারী ডাক্তার রক্ত বন্ধ করার জন্য কোন ক্রটি করছেন না। নছিরণ পাগলিনীর মত একবার জল ঢালছে—এদিকে ওদিকে ছুটে ডাক্তারের ওপর এগিয়ে দিচ্ছে আর ডাকছে বুদ্ধকাটা কান্নায় জেদে পড়ে—মাঝি গো মাঝি—একবার তাকাও মাঝি। ঐ যে তোমার জমির জছিম ঝাঁড়িয়ে কঁাদছে। একবার চোখ মেলে চাও। আমি এই যে ডাকছি একবার কথা কও মাঝি, ওঠো কথা কও।

হঠাৎ এনায়েতের বেন জ্ঞান হল। চারিদিকে চেয়ে যন্ত্রণার কাতর শব্দ করে ডাকলো—নছির, আর, আমার কাছে আর। উঃ আমার পরাণ যে বেরিয়ে যায় নছিম, নছিরণ আর আর আমার কাছে আর শুকে গাঙের জলে ভাসিয়ে দিয়ে গেলাম যে—

নছিরণ তখন উম্মাদিনী। এনায়েতের বুদ্ধে লুটিয়ে পড়ে কঁাদছে মাঝি গো, আমার নিরে বাও, আমিও বাবো তোমার সঙ্গে মাঝি গো—উম্মাদিনী নছিরণের বুদ্ধকাটা ক্রন্দন, সমবেত জনতার অশ্রুধারা—সব শেষ করে দিয়ে এনায়েৎ হুঁতিনবার মাথাটা কাঁকানি দিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ফেললো। খোয়াবাট ক্রন্দনরোলে মুখরিত, অভাগিনী উম্মাদিনী নছিরণ বালির মধ্যে পড়াচ্ছে আর বুদ্ধকাটা চীৎকার করছে মাঝি গো—মাঝি গো! পদ্মার কলরোল ছাপিয়ে উঠছে তার রোদনধ্বনি।

স্থানাটোরিয়ম

শক্তি মুখোপাধ্যায়

এখানে বেশ আছি। সবুজ পাহাড়ের গায়
অনিপুণ শিল্পীর হাতে—জাঁকা ছবির মতন
প্রকৃতির বুক থেকে জেগে-ওঠা নতুন জীবনে
আলোর সন্ধান। স্থানাটোরিয়ম।

এখানে বেশ আছি। স্যাৎসোতে বস্তির গলি-বুঁজি ঘরে
আর নয় খুক খুক কান্না।
মুখ দিয়ে রক্ত নেমে বুক ভেঙে অবিরত
আর নয় তিলে তিলে বিদগ্ধ জীবন।

এখানে বেশ আছি। তপতী ডুমি আজও
নির্ভরে নিশ্চিন্ত হয়ে বাতায়ন খুলে
বসে আছে এলোচুলে। আমার বারতাপানি
তোমার স্মৃতির ধারে স্বপ্ন নিয়ে নামে।

এখানে বেশ আছি। প্রশস্ত ঘরের কোণে
আমার বেডের ওপর কোন এক হতাশ প্রেমিক
রোমাঞ্চ কাহিনী নিয়ে অভিশপ্ত জীবন মাঝখানে
বিশীর্ণ দেহ তার তন্ত্রালু চোখ মেলে জাগে।

এখানে বেশ আছি। সকলেই বলে,
রাজরোগ সেয়ে বাবে অস্থ হবো আগের মতন
জীবনকে ফিরে পাবো
আগামী কালের কোন দিনে।

এখানে বেশ আছি। এ শুধু আশ্বাস বাণী
মন আমার আশাহত, ভয় হয় প্রতি পদক্ষেপে
প্রেমের ও জীবনের
মৃত্যু এসে এই বুকি শিহরে ঝাঁড়াল।

পৃথিবীর আলো যদি কয়ে কয়ে
চোখ দিয়ে অন্ধকার নামে
আমার হতাশ প্রেম মৃত্যুর মুখোমুখি এসে
প্রিয়ার অক্ষরলে হবে তার জীবন-সমাধি।

ইন্টারমিডিয়েটে অশ্লীল পাঠ্যপুস্তক

ডক্টর শ্রীমুখার চট্টোপাধ্যায়

[কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওড়িয়া ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার একটি কবিতা পাঠ্য করেছেন। তার বিষয়বস্তু আর বাই হোক, স্কুলসময়টি বালক-বালিকার নিকট পরিবেশনযোগ্য নয়। এই প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে কর্তৃপক্ষের এবং জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে। - স]

কিছুদিন আগে ভার পড়েছিল ইন্টারমিডিয়েট ওড়িয়ার একটি ছাত্রকে কিছুটা সাহায্য করার। বাংলা-হিন্দীর মতই ওড়িয়াতেও টেক্সটবুক বা পাঠ্যপুস্তকের চাপ বেশী, নম্বর কম। চল্লিশ নম্বর বইয়ে, বাট নম্বর বাইরে। কলেজ-এ অধ্যাপনা করতে করতে বিরক্ত হয়েছি এ কথা ভেবে যে, দুবছর ধরে ছাত্রদের যে ইন্টার বাংলার টেক্সট পড়ান হয় তাতে মাত্র চল্লিশ নম্বরের বিশদ আলোচনা করা হয়। আর বাকী বাট নম্বর যে-কলেজে ভাল টিউটোরিয়ালের ব্যবস্থা আছে সেখানে কোন রকমে বুড়ী-ছোঁয়ার মত শেষ করা। অর্থাৎ অধ্যাপকরা 'টাই এণ্ড গো' না অম্লসরণ করে 'টাই এণ্ড গো' পদ্ধতি অম্লসরণ করেন। পরীক্ষা সেই ধরণের হয়। ওড়িয়া পড়তে গিয়েও সেই ব্যাপার লক্ষ্য করলাম। দুটি গল্পগ্রন্থ। দুটি কাব্যগ্রন্থের দীর্ঘ কবিতা। রাধানাথ গ্রন্থাবলী পূর্বই নাড়াচাড়া করেছে। ওড়িয়া সাহিত্যের উপর বাংলার প্রভাব নিয়ে 'বসুমতী'তে 'কলসাহিত্য ও বহির্বিদ্য' নামে আলোচনাও করেছে ১৯৪৬ সালে। প্রথম ভেবেছিলাম ঐ বিষয়ে খীসিস দেব। পরে হিন্দী-সাহিত্যের উপর বাংলার প্রভাব নিয়ে খীসিস দিই। পুরোনো বই হাতে আসতে অধীর আগ্রহের সাথে পুনর্বিচিনের আনন্দ অম্লসরণ করলাম। 'রাধানাথ গ্রন্থাবলী'র সব কবিতা পূর্বে পড়া হয়নি। তের বছর আগে গ্রন্থাবলীর ভূমিকা এবং 'মহাবাতা' কবিতা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। তের বছর বাদে 'গ্রন্থাবলী'র অপর একটি কবিতা পড়তে বসার আগে পড়তে বসলাম। ইন্টারমিডিয়েট ওড়িয়ার পাঠ্য কবিতা 'পার্বতী'। ওড়িয়া সাহিত্যের একটি বিরাট স্তম্ভ রাধানাথ রায়। ভূসেব-নবীনের সমসাময়িক...ভূসেব-নবীনের ঐতিহ্যবাহী। বাংলা সাহিত্যে ভূসেব-নবীনের যে স্থান, ওড়িয়া সাহিত্যে রাধানাথের স্থান তার চেয়ে কম নয়। "কবির ৮রাধানাথ আধুনিক উৎকল সাহিত্যিক সম্প্রদায় এবং গুণগ্রাহী বিদ্বৎশ্রী-কর্তৃক সাহিত্যসম্রাটের সুবর্ণ সিংহাসনের অভিলিখিত হোই অম্লস্রুতি। বক্তব্যঃ ৮রাধানাথ আধুনিক উৎকল সাহিত্য মন্দিরের সর্বপ্রধান নির্ধাতা।" "কবির রাধানাথ" সত্যি একজন শক্তিশালী কবি। বাংলা সাহিত্যে মধুসূদনের অম্লগামী হিসেবে হেম-নবীন যে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন, ওড়িয়া সাহিত্যে মধুসূদনের অম্লগামী অম্লজ্ঞাক্ষের কবি হিসাবে রাধানাথের স্থান তার চাইতে উঁচুতে বলেই আমার মনে হয়। অজ্ঞ হেমচন্দ্র সযুদ্ধে একথা বলা বোধ হয় অসম্ভব হবে না। মধুসূদনের কবি-প্রতিভা হেমচন্দ্রের ছিল না, তাই বর্ষ অম্লকৃতি হিসেবে হেমচন্দ্রের কবিতার ঐতিহাসিক মূল্য আছে, চিরন্তন মূল্য নেই। রাধানাথ কবি। তাঁর সযুদ্ধে একথা বলা

যায় না। ভারতের যে কটি সাহিত্য পড়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছে তাতে বিগত শতাব্দীর ভারতীয় কাব্যসাহিত্যে রাধানাথের যে বিশিষ্ট স্থান আছে সে-বিষয়ে সন্দেহের কোনও কারণ নেই। এই রাধানাথের 'পার্বতী' কবিতা ইন্টারমিডিয়েট-এ পাঠ্য। পরম আগ্রহের সঙ্গে কবিতাটি পড়তে শুরু করেছিলাম।

কবিতা পড়তে পড়তে মাথাটা বেন কেমন এক রকম হয়ে গেল। ব্যাপারটা ঠিক বুঝি ত? কেমন বেন গোলমালে ঠেকছে কবিতাটা। নিঃসন্দেহে কবিতাটি ভাল, কিন্তু বিষয়বস্তু ইন্টার-মিডিয়েটের, যারা পনেরো বোনের পা দিয়েছে তাদের পক্ষে, একেবারেই অপাঠ্য বলে মনে হচ্ছে। ইন্ডিপাসের ট্রাজেডির ভীষণতা এবং অতলান্ত হাহাকার বরষ পাঠকের বোধগম্য...এবং গ্রীক সাহিত্যপিপাসুর পাঠ্য। বালক-বালিকাদের অপাঠ্য বিষয়বস্তু—মাতা পুত্রের বিষম পরিণতি। তবু সেখানে নিয়তির বিভ্রমনার বিভ্রিত মনুষ্যপ্রেমের অভিশপ্ত আশ্রয়। এখানে ব্যাশার আরও গভীর...এখানে পিতা-পুত্রের মধ্যে ব্যাশার, তাও উভয়ের মধ্যে পরিচয়ের অভ্যস্ততা নেই। এ ধরণের কাহিনী সাহিত্যে অপ্রচলিত নয় পিতার অস্ত্র উন্নত কস্তার কাহিনী ওড়িদের 'মোঁরায়ফসেস'-এ রয়েছে (Cinyras and Myrrha)। কস্তার অস্ত্র উন্নত পিতা শিবঠাকুর বাংলা পদ্যপুথানে দেখা দিয়েছেন। ঋগ্বেদে এবিধ কাহিনী আছে। Cenciর ঘটনাও অজানা নয়। তবে 'এনসাইক্লোপিডিয়া রিট্রানিকা' বলে যে পিতা Francesco Cenci যে কস্তা Beatrice Cenci সঙ্গ ঐ ধরণের অস্ত্রায় 'কিছু করেছিলেন তা প্রমাণিত নয় ("but there is no evidence that he tried to commit incest with her, as has been alleged")। এবিধ ঘটনা সাহিত্যে আলোচিত হ'লেও ইন্টারমিডিয়েটের ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে আলোচিতব্য একেবারেই নয়। তাই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওড়িয়া-ইন্টারমিডিয়েট-এ যারা বিষয়বস্তু নির্বাচন করেছেন তাঁরা হয় কবিতাটি (পার্বতী) না পড়ে নির্বাচিত করেছেন, বা না ভেবে নির্বাচিত করেছেন। আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ভালও বাসি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে। তবুও একথা বলব যে না-পড়ে প্রশ্ন করার ঘটনা বিরল নয়। আমার পাঠ্যজীবনেই ঘটেছে। ১৯৪৫-এ এম-এ-তে আমার প্রাথমিক ভাবা 'ওড়িয়া' ছিল। একটি ওড়িয়া কাব্যগ্রন্থে 'নববর্ষ ভাবনা' কবিতা পাঠ্য ছিল। কবিতাটি নতুন বর্ষাকাল সযুদ্ধীয়। বিনি প্রশ্ন করেছিলেন তিনি বইটি পড়েন নি। দ্রুতবেগে 'নবকিশোর বল' এর 'নির্বিরলী' কাব্যগ্রন্থ উন্টোতে গিয়ে 'নববর্ষ ভাবনা' পড়েছিলেন; এবং ইংরাজীতে প্রশ্ন করেছিলেন যে "advent of new year" সযুদ্ধে কবি কি লিখেছেন বল? প্রশ্ন করেছিলেন কে জানি না, তবে শুনেছি খুব সম্ভব পণ্ডিত গোদাবরীশ মিশ্র। পরীক্ষা দেবার পর আমরা দল বেঁধে কন্ট্রোলারের কাছে অভিযোগ জানিয়েছিলাম এবং তদন্তের পর ঐ প্রশ্নটির স্তম্ভ সবাইকে কত নম্বর দেবার ব্যবস্থা হয়েছিল শুনেছি। বলা বাহুল্য, ঐ 'ডিস গ্রেস' নম্বর না পেলেও হরষ ওড়িয়াতে আমি প্রথম হ'তাম।

এখানেও অম্লরূপ ব্যাপার ঘটেছে বলে আমার বিশ্বাস, এবং বিষয় নির্বাচন যারাই করে থাকুন আমার এই প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ বিশেষ করে ডাইস চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত, ভারতীয় সাহিত্য বিষয়ক রায়চন্দ্র সাহিত্য

অবাগক আমার প্রবেশের ওপর উত্তর শ্রীশ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রসহ এবং তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের বহু প্রকল্পের উত্তর শ্রীশ্রীকৃষ্ণার সেন মতামতের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আর হাইবের বীরা আছেন তাঁদের মধ্যে আমার ওপর এক চিন্তা বিষয়ে গবেষণাপ্রবন্ধের নির্দেশক উত্তর শ্রীশ্রীকৃষ্ণার চট্টোপাধ্যায়, পৃষ্ঠনীর অবাগক শ্রীশ্রীকৃষ্ণার সেন এবং প্রবন্ধের সাংবাদিক শ্রীশ্রীকৃষ্ণার বীর মতামতকে আমার প্রবন্ধের বৈজ্ঞানিকতা বিষয়ে এবং ইন্টার হাইড্রোজেনের পক্ষে পাঠ্য হিসাবে নির্ধারিত না করার জন্য আমি যে অভিযোগ জানাচ্ছি তা কতখানি গ্রহণযোগ্য তা বিচার করতে বলি।

অল্লীলতা বিষয়গতও হতে পারে, বর্ণনামতও হতে পারে। দ্বিতীয় শ্রেণীর উদাহরণ স্তম্ভ বজ্রবর্ষে, জেমস জয়েসের ইউলিসিস গ্রন্থে। প্রথম শ্রেণীর অল্লীলতা 'পার্কী'তে বিশেষ করে বর্ণনামত আদরা চিত্রা করি যে নির্ধারিতকল্পগুলি পনের বোলার কচি কাঁচা ছেলে-মেয়েদের জন্য বিষয়বস্তুটি অপ্রযোজ্য করেছেন।

কবির বাবানাথ বীর 'পার্কী'র দুটি সর্গ কবিতার লিখে যেতে পেরেছেন। বাকী অংশের প্রট গল্পে লেখা রয়েছে তা তিনি কবিতার রূপান্তরিত করার পূর্বে দেহভাগ করেছেন। 'পার্কী'র ঘটনা এইরূপ—

সমস্ত টুকরো দিগন্তের সেরে বীরসিংহ গজেন্দ্র রত্নপুর গুর্গ অববোধ করান লজ্জা তৎপর। পঞ্চবর্ষবাপী কত যুদ্ধ হয়ে গেছে, কত মহাপ্রাণী হত হবোঁতে কিন্তু রত্নপুরগতির মস্তক অবনত হয়নি এখনও। তাই রাজা গজেন্দ্রর সমস্ত বিজিত রাজ্য ও রাজসৈন্যসহ আপন সৈন্যবাহিনীর অধিগতি হ'ল সেখানে গুর্গ অববোধ করে রয়েছেন দীর্ঘ দিন। সেই সেনাবাহিনীর মধ্যে রাজা নিজ কস্তাকে নিয়ে গেছেন। কস্তা কৌশল্যা "একমাত্র পুষ্প অস্ত্রময় সেহি শিবির-কটকবনে" কাঁটার মধ্যে শুল্কর ফুলের মত ছুঁটে রয়েছেন। এ কস্তা "রূপে গুণে বালা অতুলা ভগতে"। কিন্তু এই কস্তা—

"গুপ্ত প্রেমে পড়ি সন্ধ্যা কৌশল্যা
হেলা সে সেনা-নিবেশে,
জলে তৈলবিন্দু পরা এ কলঙ্ক
ব্যাধি গলা দেশে দেশে।"

চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে রাজকস্তার কলঙ্ক। কুমারী রাজকস্তা 'সন্ধ্যা'। রাজা রয়েছেন সৈন্য ও কস্তাকে নিয়ে অববোধ কেন্দ্রে, সেখানে এ ছবিটানাটিক করে ঘটল। রাণী রয়েছেন দেশে, তাঁর অন্তর এই সংবাদে "গুটপাক" প্রায় নিরন্তর অলঙ্ঘিত। মনে তাঁর শান্তি নেই। কেবল কৌশল্যার হুঁতোরের চিহ্ন। হঠাৎ রাণীর কর্ণকূহরে এক অশ্রুধারী বাকী প্রবীষ্ট হল—"কৌশল্যার কথা কহিব সে আসি"। মাকে উঠলেন রাণী। কেউ কোথাও নেই।

এদিকে প্রাসাদ-লিথরে বসে রয়েছে পর্যবেক্ষণ-নিরত কক্ষী। সে পাহাড়ের পর পাহাড় চলে গেছে কত ঘুরে রত্নপুর অবধি। প্রতি পাহাড়ের মাথার আগুন আলোবার ব্যবস্থা রয়েছে। রত্নপুর বিজয়ের সংবাদ অগ্নিযুগে পাহাড়ের পর পাহাড় অভিভ্রম করে ক্রতবেগে ছুটে আসবে গজেন্দ্রের দেশে তারই ব্যবস্থা রয়েছে। প্রতি রাতে অন্ধকারের মাঝে ডুবে বাওয়া ঝলজলধীর দিকে তাকিয়ে থাকে কক্ষী। আগুন লল কি? বিজয় সংবাদ কি আগুনের অন্ধরে ঝলজলধীরে বসলে

উঠল? প্রতীকার দাঁসের পর দাঁস বার। হঠাৎ একদিন জলে উঠল পাহাড়ের আগুন...এ পাহাড় হতে সে পাহাড়ে অগ্নিসংকেত। আনন্দ সংবাদ। কক্ষী রাণীর কাছে ছুটল সেই আনন্দ সংবাদ নিয়ে। কিন্তু কেবল আনন্দ সংবাদ। অন্ধকারের মধ্যে কেবল বিজয়ের অগ্নি সংকেতই লক্ষ্য করেনি কক্ষী, আরও কিছু লক্ষ্য করেছে। অশ্রুধারী রাজকস্তা মূর্তি সে স্পষ্ট লক্ষ্য করেছে...সেই অন্ধকারে। অবিকল সেই আকৃতি, সেই বেশভূষা কিন্তু "সে অশ্রুধারী নাই" সে বদনে কেবল বিষাদ রেখা। "সংবাদ শুনে রাণী ভুজিত। চতুর্দিকে আনন্দ সঙ্গীত ধ্বনিত হয়ে উঠল, 'জয় গজেন্দ্র', 'কেবল রাণীর মনে দুঃখ নেই, শান্তি নেই। প্রভাতে অশ্রুধারী মৃত এক গজেন্দ্রের বিজয় সংবাদ নিয়ে—

"বৃহৎ রত্নপুর পতি হেলে বহা—
রাজ্য হতে নিধন,
রত্নপুর জেমা অল্পপূর্ণা এবং
সেবিবে দেবী চরণ।
পূর্ণমাসী দিনে বীর গজেন্দ্র
বিজিত করিবে ডবনে,
বিজিত বাবত সামন্ত ভূপাল
আসিবে মুগ-গহনে।"

রাজা গজেন্দ্রর রত্নপুর রাজকস্তা (রাজসেনা) অল্পপূর্ণা সৈন্য ও ও সঙ্গী রাজাদের নিয়ে পূর্ণিমা তিথিতে ফিরবেন। আহ্বাজন চলল অভ্যর্থনার। সমস্ত পূর্ণিমা আনন্দপূর্ণ কেবল রাণীর মনে দুঃখ নেই। কস্তা কৌশল্যার কি হ'ল? রাতে নিশ্চয় নিশীথে বদন সমস্ত পূর্ণিমা নিজামগত তখন বহুদূর হতে কল্লনকলি ভেসে এল। রাণী সেই ধ্বনি লক্ষ্য করে সাহসে উঠে ক'রে এগিয়ে গেলেন। দেখলেন কস্তার আকৃতি। বিলাপ করছে সে মূর্তি। ভুজিত হয়ে গেলেন রাণী, পার্কী। কিছুক্ষণ কথা বেকল না দুঃখ দিয়ে তার পর ঘিরে ঘিরে প্রায় করলেন, কে তুমি? আমার কস্তার আকৃতি নিয়েই বা তুমি এই ভাবে বৃহৎ কেন? মূর্তি পরিচয় দিল—

"হুঃখিনী কৌশল্যা জননী লো, তোর
অছি কি আউ জীবনে?
ব্রহ্ম বশে মাতা এ হুঃখিনী বৃথা
পোষু তুহি কি কারণে?
স্নেহের পালিতা তনয়া তোহার
মার্তি এ মর্ত্য সঙ্গারে
আর্ন্তে ভ্রমু অছি অশ্রুগিনি এবং
ভব বনিকা পারে।"

হুঃখিনী কৌশল্যা এই লম্বার কারণ নিবেদন করবে রাণীর কাছে, তাই সে এসেছে। কতদিন ধরে সে মাকে ডেকেছে যা ত তার ডাকে সাড়া দেয়নি। আজ যা এসেছে, মাকে জানাবে সে সব কথা। বলতে লাগল কৌশল্যা আপন কথা :—

লোকে যে বলে রাজকুলে জন্ম হওয়া ভাগ্যের কথা সে কথার বিক। বিক আমার জন্ম। বিক রাজকুলে, বিক সে লোকসম্মানে। "রাজ্যে আসে মহাহর্ষভরে বাইখিল যুদ্ধস্থলে, পিতৃসেবা, রাজ সেবারে মোহর দিন বাউখিলা ভলে।" একদিন শিতা সমস্ত বীর

বরিবার কালে, সখি, প্রাণ-পীড়নে
কাতর প্রবাহ, টালে, জীর অতিক্রমি,
বারিঝাশি ছুই পাশে ; ভেঁমতি যে মন !
হৃদিত, হৃৎধের কথা কহে সে অনয়ে ।

বখন বাধানাথের কবিতা পড়া হবে—

দেবি গো, প্রাণুটে তটিনী বেসনে
ন পারে বাসি সজালি,
অসজালে লুহু পূব প্রবাহকু
বেনি ফুলে দিএ ঢালি
হুঃখী সেহি পবি, স্তবে বেবে তার
বলি পড়ে লুহ বাখা,
সম হুঃখি জনে লুহর কিটাই
কহে নিজ-হুঃখ কথা।

এ অংশটি আরও অনেক স্থলে মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যের তরঙ্গ অলুসুতি। সে-প্রসঙ্গ এখন আলোচনা করব না। এই অংশে অন্নপূর্ণা আপন হুঃখ কাহিনী এবং রত্নপুর পরাজয়ের কল্প কাহিনী বসে সর্গ শেষ করলেন। বাকী অংশ গড়ে লেখা ঘটনা কবি সেটিঃ কবিতায় রূপ দিয়ে বেতে পারেননি। অন্নপূর্ণা রাজপুত্র-প্রেমিকা, এদিকে রাজা নিজে তাকে গ্রহণ করতে চায়। রাণী বখন শুনলেন যে পুত্রবধু সমা অন্নপূর্ণাকে রাজা গ্রহণ করতে চান, আপন কন্ডার বাপাণের পরেও তখন রাণী ভাবলেন, “এ মোহ পুরাণে মন সমর্পণ করি খিবাক মোহর বধু, সুতরাং কন্ডা হানীরা হোই-অহুস্তি। এহাক উপরে পুণি অত্যাচার! হে বিধাতা! কেউ পাপরে এ ভলি দুামী পাইলি? এ পরি নরবাকসহু পৃথিবী খীর পতি বোলি সহি পারন্তি, মাত্র হুঁ পারিবি নাহি।”

রাণীর গর্ভের আঘাতে মারা গেলেন রাজা। রাণী পুত্রকে বললেন, “এ বাকস নিজর যোপিত বুকঃছদনর প্রতিজ্ঞা করিখিলা। শুনি বিস্তিত হ অ নাহি, এহি বাকস কৌশল্যাকু জ্ঞা করি সেহি অনাখা বালিকাকু সঙ্গতান নিহত করাইলা। কুমার, তুস্তর সেহি প্রাণতগিনী ও মোহর সেহি প্রাণর হুহিতা কৌশল্যা আজ জীবনরে

নাহি। এ পায়র নিজর যোপিত বুক বোলি মোহ কন্ডার সতীষ নই কলা।” রাজার মৃত্যু ঘটাব পর, অন্নপূর্ণার মৃত্যু ও রাণীর নিজক্ষেপে পার্শ্বতীর গতাংশ সমাপ্ত। এই গতাংশ কাব্যের কাঠাম কিত্ত কবিতা নয়। এই দুই সর্গের পার্শ্বতী কাব্য ইন্টারমিডিয়েট ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্য। এখন আপনারা বিচার করুন পাঠ্য কবিতাটি ইন্টার ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে অপাঠ্য কি না?

এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের ‘মাসিক বহুসভার’ ১৩৬৩ সালে ভাষণার্থ্য ‘সজ্ঞানসমুদ্র’ প্রবন্ধটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এহুটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দীতে বি-এ অনার্স এ পাঠ্য ছিল। ‘সজ্ঞান-সমুদ্র’ এহুটি মৌলিক নয়, এবং এতে অল্পবাক্যে বাঙ্গালীদের প্রতি কটাক্ষপাত করা হয়েছে কিনা বালা কথাই সাহায্যে তা বিবেচনা করার জন্য ‘আমার আধুনিক হিন্দী সাহিত্যে বাংলার স্থান’ এহুটি দেখতে বলি। অথবা এ ব্যাপারে ডক্টর ঐন্দ্রনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কি বলেন, তা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানার চেষ্টা করতে পারেন।

পরিশেষে, ওড়িয়া সাহিত্যাহুসাগীরা যেন আমাকে তুল না বোঝেন তার জন্য বলছি যে পার্শ্বতী কবিতার কাব্যমূল্য সবক্ষে আমি অচেতন ঘোটেই নই। বইটি ইন্টারমিডিয়েট স্তরে নিরীক্ষাচিত করাতেই আমার আশঙ্কি। প্রজ্ঞা রাখি আমি ওড়িয়া সাহিত্যের প্রতি এবং কবিবর বাধানাথকে আমি বিনম্রাত্ম ছোট করার চেষ্টা করিনি। বাধানাথের অনেক আগেকার পূর্বপুরুষ বাঙ্গালী কার্য ছিলেন এটা বাংলার পক্ষেও গৌরবের কথা। আর বিশ্ববিদ্যালয় এবং তার কর্তৃপক্ষ সবক্ষে বিরূপ সমালোচনার প্ররই ওঠে না, আমার সমালোচনার লক্ষ্য ইন্টারমিডিয়েট সিলেবাসে কবিতাটির অন্তর্ভুক্তি না হওয়া বিষয়ে। এ ছাড়া আমার আর কোন উদ্দেশ্য নাই।

খেয়ালী

মাধবী ভট্টাচার্য

ঘন রাজির কজলমাখা উজ্জল চোখ হু’টি
থমকে বেদিন পাঁড়াবে আমার শয্যার পাশে এসে,
নীল আশমানে বসীন চাঁদ হানিবে কুটিল ক্রকুটি
বগ্ন-কুহেলি বিছাবো আমার নিবিড় শয্যা-প্রদেশে।

ভোবের হাওয়ার সত্তা আমার খেয়ালী বগ্ন বোসে
নীল নীল হু’টি চোখে
গভীরের মাঝে কান পাতি কোন্ অমরার বাণী শোনে।

ঘন রাজির অকলতলে সরমেতে হুখ ঢাকি’
আত্মা ফুকারি হংকারি বলে ভালবাসা কোথা রাখি?

রাজির কালো চোখে ইংগিত ভেসে ওঠে

খেয়ালের ভরী ভেসে চলে ধীরে খেয়ালী তটিনী বাহি’
খেয়ালী সে কোন্ কল-ভরসার খেয়ালের গলি পাশি’।

বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম-জিজ্ঞাসা

ডক্টর সুনীলকুমার গুপ্ত

বাংলা দেশে ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজী শিক্ষা-বিস্তার

ও খৃষ্টধর্ম-প্রচারের চেষ্টা এবং ব্রাহ্মধর্মালোকনের প্রতিক্রিয়া-
স্বরূপ তিনু সমাজের মধ্যে প্রবল চাকলা দেখা দেয় এবং সমাজের
স্বতন্ত্র ধর্মের সনাতন আদর্শকে রক্ষা করতে সচেষ্ট হন। বা কিছু
প্রাচীন তার মহিম্মা-কীর্তন করে তাঁরা সমাজের ভাঙনকে রোধ
করতে চেষ্টা করেন। ক্রমে যুগের প্রয়োজনে হিন্দুধর্মের সংস্কার
আরম্ভ হয়। এই সংস্কার-আন্দোলনের অন্তর্গত প্রথম নাস্তিক
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪)।

জীবনের মধ্যাহ্নকাল পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্র কোন বিশেষ ধর্মমতের
প্রতি প্রবণতা দেখান নি। সাধারণ ভাবে তিনি নিজেকে
'কৌশলমুখী' বা 'পলিটিজিট' বলে পরিচয় দিতেন। তবে তিনি যে
হিন্দুধর্ম সংস্কার আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়
নয়। ত্রৈমাসিক 'দি ক্যালকট্টা রিভিউ' পত্রের ১০৬ সংখ্যার
১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে 'Buddhism and the Sankhya
Philosophy' বঙ্কিমচন্দ্রের বেনারসে প্রকাশিত হয়েছিল।
শুক্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'The Mukherjee's Magazine' এর
১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে বঙ্কিমচন্দ্র 'The study of Hindu
Philosophy' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের
শেষের দিকে শোভাবাজার-রাজবাড়ীতে এক প্রাচীর ব্যাপারে
পাত্রী তেজী ও বেতারগুপ্ত কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দুধর্মকে
অক্রমণ করলে বঙ্কিমচন্দ্র 'বায়চন্দ্র' এই ছদ্মনামে তাকে প্রতিরোধ
করার সময়ে হিন্দুধর্মের মূলতত্ত্বগুলি সম্পর্কে বিশেষভাবে জিজ্ঞাস্ত
হয়ে ওঠেন। এই সময় তিনি পলিটিজিট বোগেশচন্দ্র বোসকে
Letters on Hinduism নামে কতকগুলি পত্র লেখেন।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর বিতরণাধর্ম
এ দেশে 'পলিটিজিট' প্রবল টেডে উঠেছিল। তালভলার
নীলমণি কুমারের এক আত্মীয়ের বাড়িতে একটি 'পলিটিজিট' ক্লাব
ছিল। এই ক্লাবের সভ্যদের মধ্যে ছিলেন বোগেশচন্দ্র বোস,
টমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলকণ্ঠ মজুমদার, কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায়,
নীলমণি কুমার প্রভৃতি। এঁরা সকলেই পুরোপুরি কৌতের
শিষ্য না হ'লেও 'হিউম্যানিটি' (humanity) এর সেবার জীবন
উৎসর্গ করাকে মহত্তম কাজ বলে মনে করতেন। বোগেশচন্দ্র
কৌতের মতবাদকে এদেশের লোকের উপযোগী করার ক্ষেত্রে এর
অংশবিশেষের পরিবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন। 'হিউম্যানিটি'
এর মূর্তি বীণাধারী জননী ম্যাডোনার প্রতিকৃতির অল্পরূপ করাই
কৌতের অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু বোগেশচন্দ্র ম্যাডোনার মূর্তির
পরিবর্তে কস্তাপেড়ে শাড়ীপর ও কপালে সিঁহর দেওয়া একটি
নারী শিশুকে স্তম্ভপান করছেন—এই রকম মূর্তি তৈরী করে
তার নাম দিয়েছিলেন 'নারায়ণী'। এই ব্যাপারে কৃষ্ণকমল এক
জন বড় 'পলিটিজিট' ছিলেন। স্মৃতিস্বপ্ন তিনি বলেছেন,
'আমি positivist : আমি নাস্তিক।'১ বোগেশচন্দ্রের কৌতের
হিন্দুধর্মী সংস্কার কটন, কৃষ্ণকমল প্রভৃতি 'পলিটিজিট'র সমর্থন
করতেন।

উঠেছিলেন এবং 'জবাবুদদুল্লাহ' প্রভৃতি ধর্মের ভাব পর্যন্ত
'পলিটিজিট'এর মধ্যে চালাতে চেষ্টা করেছিলেন। বোগেশচন্দ্রের
মৃত্যুতে এই আন্দোলনের উদ্ভবনা হয়ে আসে। বোগেশচন্দ্রের
সম্পর্কেই বঙ্কিমচন্দ্র যে কৌতের 'হিউম্যানিটি'র ভাবে রিলের ভাবে
উৎসাহ হয়েছিলেন—এ কথা অস্বীকার করা যায় না।

বঙ্কিমচন্দ্র নবযুগের প্রেরণা, উৎকর্ষ ও প্রয়োজনকে অল্পতব
করতে পেরেছিলেন। তিনি এ কথা স্পষ্ট করেই বুঝিয়েছেন যে,
পাশ্চাত্য শিক্ষার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রথম যুক্তিবাদের কাছে
পুরাতন সংস্কার ও খাদ্যবিধি কোনমতেই স্যাস্থ্যক্য করতে পারবে
না। কিন্তু তিনি এ কথাও অল্পতব করেছিলেন যে, পাশ্চাত্যের
আদর্শ প্রাতিভিক ও ঐতিহাসিক কারণেই এ দেশের আদর্শ হ'তে
পারে না। তবে পাশ্চাত্য শিক্ষা সভ্যতার উৎকর্ষ ও প্রয়োজনীয়তা
স্বীকারে তিনি কোন রিসই কুটিত ছিলেন না। তাঁর লক্ষ্য ছিল—
পাশ্চাত্য শিক্ষার সামগ্রিক রক্ষা করে হিন্দুধর্মকে নবযুগের
প্রয়োজনানুযায়ী এক মানবধর্ম রূপদান করা। তাঁর মতে এ
ব্যাপারে চিন্তাভাবনা প্রাথমিক সোপান 'ধর্মতত্ত্ব' নামক গ্রন্থে
বঙ্কিমচন্দ্র মন্ব্যবসকে, মানবধর্ম বলে ধর্মের একটি সর্বাঙ্গীন আদর্শ
প্রতিষ্ঠা করেছেন।

কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করলেই বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্ত্বের ধারণা স্পষ্ট
হবে। বঙ্কিমচন্দ্রের অল্পশীলনতত্ত্বের মূল কথাগুলি (২) এই—

"শিষ্য। তাহা আপনাকে বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

১। মন্ব্যবস কতকগুলি শক্তি আছে। আপনি তাহার বৃত্তি
নাম দিয়াছিলেন। সেইগুলির অল্পশীলন, প্রসারণ ও চরিতার্থতার
মন্ব্যবস।

২। তাহাই মন্ব্যবসের ধর্ম।

৩। সেই অল্পশীলনের সীমা, পরস্পরের সহিত বৃত্তিগুলির
সামঞ্জস্য।

৪। তাহাই শ্রুতি।

৫। এই সমস্ত বৃত্তির উপযুক্ত অল্পশীলন হইলে ইহারা সকলেই
দৈবরমুখী হয়। দৈবরমুখিতাই উপযুক্ত অল্পশীলন। সেই অবস্থাই
ভক্তি।

৬। দৈবর সর্বভূতে আছে। এই ভক্ত সর্বভূতে প্রীতি ভক্তির
অন্তর্গত এবং নিতান্ত প্রয়োজনীয় অংশ। সর্বভূতে প্রীতি ব্যতীত
দৈবর ভক্তি নাই, মন্ব্যবস নাই, ধর্ম নাই।

৭। আত্মপ্রীতি, স্বজনপ্রীতি, বদেশপ্রীতি, পশুপ্রীতি ; দয়া
এই প্রীতির অন্তর্গত। ইহা মধ্যে মন্ব্যবস অবস্থা বিবেচনা করিয়া
বদেশপ্রীতিকেই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বলা উচিত।"

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে অল্পশীলন ধর্ম পুরাতন ধর্মের সংস্কার মাত্র। এ
সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন—

"শিষ্য। অল্পশীলন আবার ধর্ম। এ সকল নূতন কথা।

গুরু। নূতন নহে। পুরাতনের সংস্কার মাত্র।"৩

কালভেদে ধর্ম-সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা বঙ্কিমচন্দ্র স্বীকার
করতেন।

"গুরু।.....তবে বিশেষ বিবিসর্কল ধর্মেই সমরোচিত হয়।
তাহা কালভেদে পরিহার্য বা পরিবর্তনীয়। হিন্দুধর্মের নব সংস্কারে
এই মূল কথা।"৪

বঙ্কিমচন্দ্র সাধারণের পক্ষপাতী একবারেই ছিলেন না।

“ওক।.....সন্ন্যাসকে আমি ধর্ম বলি না—অন্ততঃ সম্পূর্ণ ধর্ম
লি না। অতীন্দ্রিয় প্রবৃত্তি মার্গ—সন্ন্যাস নিবৃত্তি মার্গ। সন্ন্যাস
অসম্পূর্ণ ধর্ম। ভগবান যদ্ব্যর্থার্থেই প্রেরিত্য কীর্তন করিয়াছেন।
অতীন্দ্রিয় কর্তব্য।”

বন্ধিমচন্দ্র মনে করতেন, ভক্তিশ্রুত যে ধর্ম তা অতি নিকট ধর্ম।
যে যে ভক্তিবাদ নেই তা নয়, কিন্তু শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাই ভক্তিবাদের
শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। বন্ধিমচন্দ্রের অতীন্দ্রিয় ধর্ম গীতাত্ত্ব ধর্মের এক নতুন
ঘাটাগা মাত্র। তিনি বৈষ্ণবধর্মের প্রতি যথেষ্ট প্রভাব ছিলেন।
তার তিনি বলেছেন যে চিত্তশুদ্ধি ভাড়া কেউ সত্যিকার বৈষ্ণব
হতে পারে না। বন্ধিমচন্দ্রের ধর্মমতের মূল কোথাও বৈজ্ঞানিক
ভুক্তিবাদ না প্রকৃতিবাদকে অস্বীকার করা হয় নি। তিনি হিন্দুধর্মের
সেই মর্মভাগকে অমর বলেছেন যা যত্নবোধ হিতসাধন করে এবং
মানস প্রকৃতিতে বাব মূল।

“ওক — হিন্দুধর্মের সেই মর্মভাগ অমর। চিরকাল চলিবে,
মহাবোধ হিতসাধন করিবে, কেন না, মানব-প্রকৃতিতে তাহার
ভিত্তি।”

ধর্মতত্ত্বের মূলে এই প্রকৃতিবাদ বিশেষ ভাবে লক্ষ্যণীয়। এই
প্রকৃতিবাদে ওপরে প্রতিষ্ঠিত ধর্মের প্রধান অবলম্বন জীবন ও ভগ্ন।
এখানে বন্ধিমচন্দ্রের তত্ত্বমতের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে
একটি উক্তি সংগীত।

“ওক।—নিখিল বিশ্বের সর্বোৎকৃষ্ট মনুষ্যের সকল বৃত্তিগুলিরই
অনুসঙ্গ। প্রকৃতি আমাদের সকল বৃত্তিগুলিরই সহায়।”

এই তত্ত্বদৃষ্টির প্রভাবেই বন্ধিমচন্দ্র পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সাধনা ও
ভারতীয় অধ্যাত্মশিপাসার সন্ধি স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছিলেন।
বন্ধিমচন্দ্রের কাছে ভগ্ন সত্য এবং দেহই প্রধান ও আদি সাধনের
বস্তু। দেহ ও মনের প্রধান ও মূল বৃত্তিগুলির পূর্ণ উন্মোচনের মধ্য
দিয়েই ঈশ্বরকে পাওয়া সম্ভব। মানুষের ধর্মপ্রবণতা মানুষের
প্রকৃতি থেকেই জন্মলাভ করে। মানুষের প্রকৃতির পূর্ণ পরিণতির
যে অবস্থা তার আদর্শই ঈশ্বর নামে অভিহিত।

“শিষ্য। এরূপ আদর্শ কোথায় পাইব? এরূপ মনুষ্য ক
দেখি না।

ওক। মনুষ্য না দেখ, ঈশ্বর আছেন। ঈশ্বরই সর্বগুণের
সর্বোত্তম স্ফুটের ও চরম পরিণতির একমাত্র উদাহরণ। এইজন্য
বৈষ্ণবের নির্ভর ঈশ্বরে ধর্ম সম্যক ধর্ম প্রাপ্ত হয় না, কেন না
তিনি নির্ভর, তিনি আমাদের আদর্শ হইতে পারেন না।—
বাহ্যকে “Impersonal God” বলি, তাঁহার উপাসনা নিষ্ফল,
বাহ্যকে “Personal God” বলি, তাঁহার উপাসনাই সকল।”

বন্ধিমচন্দ্রের ঈশ্বরবোধের ধারণার মূলে ছিল ‘হিউম্যানিজম’
(Humanism)। এই ‘হিউম্যানিজম’ মানুষেরই পূজা, মানুষের
মধ্যেই দেবতার অনুসন্ধান ও আরাধনা। এই ‘হিউম্যানিজম’ের
পথেই পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের জীবনও ধর্মজিজ্ঞাসার একটা সেতুবন্ধন
হয়েছিল। বন্ধিমচন্দ্র ব্যক্তির অধ্যাত্ম সাধনাকে কোন প্রকারের
বার্ষসর্গের বৃত্তির আরাধনা বলে মনে করতেন না। সমাজসেবার
আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করে বন্ধিমচন্দ্র সর্বজনের মঙ্গল ও ব্যক্তির আপন
কল্যাণ সাধনের বন্ধ মিটাতে প্রেরণা করেছেন। তাঁর মতে এই
সমাজসেবার পথেই মানব-দেবতার সেবা করা সম্ভব। এই

করে বন্ধিমচন্দ্র পাশ্চাত্যের হিতবাদকে অতীন্দ্রিয়ত্বের অস্বীকার
করেছেন।

“ওক।.....আমি যেখানে উহাকে হান দিলাম, তাহা আমার
অতীন্দ্রিয়ত্বের একটি কোণের কোণ মাত্র।...

মূলকথা, অতীন্দ্রিয় ধর্মে Greatest good of the
greatest number পণ্ডিতত্ব ভিন্ন আর কিছুই নহে।

বন্ধিমচন্দ্র আত্মহিত সাধনকে পরহিত সাধনের নীচে হান
দিয়েছেন।

ওক। পরের অনিষ্টমাত্রই অধর্ম। পরের অনিষ্ট করিয়া
আপনার হিতসাধন করিবার কাহারও অধিকার নাই।

চিত্তের যে অবস্থার আত্মপ্রীতি ও পরপ্রীতিতে বিরোধের অবসার
হয় বন্ধিমচন্দ্রের মতে তাই মায়ের চিত্তশুদ্ধির প্রধান লক্ষণ।
বন্ধিমচন্দ্র এই মানবপ্রীতিকেই সকল মৈত্রিক ভুক্তিভাব উদ্ভেদ হান
দিয়ে একে মানবধর্মের অন্তর্গত করেছেন। বন্ধিমচন্দ্র স্বভাবি ও
বিশেষপ্রীতিকে অস্বীকার না করে স্বভাবি ও বিশেষপ্রীতির মধ্য
দিয়ে বিবাহিত সাধনের প্রেরণা ছিলেন।

“ওক। বস্তুতঃ—জাগতিক প্রীতির সঙ্গে আত্মপ্রীতি বা স্বজন-
প্রীতি বা দেশপ্রীতির কোন বিরোধ নাই। পরসমাজের অনিষ্ট সাধন
করিয়া আমার সমাজের ইষ্টসাধন করিব না, এবং আমার
সমাজের অনিষ্ট সাধন করিয়া কাহাকেও আপনার সমাজের ইষ্টসাধন
করিতে দিব না। ইহাই সমদর্শন এবং ইহাই জাগতিক প্রীতি ও
দেশপ্রীতির সামঞ্জস্য।

বলা বাহুল্য, এই দেশপ্রীতি ইউরোপীয় patriotism নয়;
কেন না ইউরোপীয় patriotism ধর্মের তাৎপর্য পরসমাজের লুপ্তন
করে নিজসমাজের পুষ্টি সাধন।

বন্ধিম-প্রচারিত patriotism কে অরবিন্দ বোধ religion of
patriotism বলেছেন।

“This is second great service of Bankim to
his country that he pointed out to it the way
of salvation and gave it the religion of patriotism,
of the new spirit which is leading the nation to
resurgence and independence, he is the inspirer
and political Guru.”

বন্ধিমচন্দ্র সনাতন ধর্মাদর্শকেই যুগের প্রয়োজনে শোধন করে
নিরেখেছিলেন। বলতে গেলে সনাতন ধর্মাদর্শ একটা নতুনভাবে
ব্যাখ্যাত হয়েছিল। এ সবকে মোহিতলাল মজুমদার লিখেছেন,

“তিনি তত্ত্ববাকী (mystic) সাধক বা যোগী ছিলেন না—তিনি
ছিলেন বাটি Humanist; Humanismকেই বতথানি শোধন
করিয়া লওয়া যায় তিনি তাহাই করিয়াছেন, এই কথা মনে না
রাখিলে তাঁহার সেই সাধনা ও বিশিষ্ট প্রতিভার মূল্য নির্ণয়ে তুল
হওয়াই সম্ভব।

বন্ধিমচন্দ্র তৎপ্রচারিত অতীন্দ্রিয় ধর্মের উদাহরণ-রূপ ‘কৃষ্ণচরিত্র’
রচনা করেন। পৌরাণিক ঈশ্বর কৃষ্ণের ঈশ্বর্য প্রতিপন্ন করা তাঁর
উদ্দেশ্য ছিল না। কৃষ্ণের মানবচরিত্র সমালোচন করাই তাঁর
লক্ষ্য ছিল। যুগের ধর্মসংস্কারের প্রেরণাতেই বন্ধিমচন্দ্র ‘কৃষ্ণচরিত্র’
সমালোচনার উদ্ভব, কেন না কৃষ্ণ এদেশে সর্বব্যাপক।

‘প্রচারে’ ধারাবাহিক ভাবে যে হ’য়ে ‘কৃষ্ণচরিত্র’ ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১২ই আগষ্ট পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। অল্পসীমিতকাল প্রচারের উদ্দেশ্যে বহুস্বামী ‘আনন্দমঠ’ (১৮৮২), দেবী চৌধুরাণী (১৮৮৪) এবং সীতারাম (১৮৮৭) নামক তিনখানি উপভাস রচনা করেন।

পূর্বেই বলেছি, বৈষ্ণবধর্মের প্রতি বহুস্বামীর আত্মিক আস্থা ছিল। তাঁদের বাড়িতে রাধাবল্লভের নিত্য পূজা হত। তিনি কীর্তন শুনে অত্যন্ত ভালবাসতেন। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, বহুস্বামীর রচনার কীর্তনীর চরিত্র সৃষ্টি ও কীর্তনের উদ্দেশ্য তাঁর বৈষ্ণবধর্ম প্রীতির পরিচয় প্রদান করে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছেন, “একবার শুনিয়াছি, কীর্তনওয়ালাকে পেলা দিতে দিতে তিনি ‘বন্দন’ের তহবিল খালি করিয়া দিয়াছিলেন। গানের উপর তাঁহার বেশ ঝোঁক ছিল। তিনি কয়েক বৎসর ধরিয়া বহু ভট্টের নিকট গান শিখিতেন।”

বহুস্বামীর কৃষ্ণচরিত্রের ওপর বৈষ্ণবতার প্রভাব আছে। বৈষ্ণবতার প্রভাবেই বহুস্বামীর কৃষ্ণচরিত্র মানবতা ঢেলে দিয়েছেন। অল্প সেই সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রধর্মের প্রভাবে বহুস্বামীর তাঁর কৃষ্ণচরিত্রকে দার্ঢ্য, ঐর্ষ্য ও ভেদবিশিষ্ট মণ্ডিত করেছেন। শুধু তাই নয়। পাণ্ডিত্যের বুদ্ধিবাদের সাগাড়ে তিনি কৃষ্ণচরিত্রকে বহু পৌরাণিকতার কলর থেকে মুক্ত করে এনেছেন। কিন্তু এসব সত্ত্বেও বলতে হয় যে, বহুস্বামীর কৃষ্ণক আদর্শজ্ঞানে লোকে উপাসনা করবে একখনই সম্ভবপর নয়। বহুস্বামীর মধ্যে সত্যিকারের আধ্যাত্মিক অল্পভূতির অভাব ছিল। শুধু rationalism-এর শক্তিতে প্রধানতঃ তাঁকে কৃষ্ণচরিত্র প্রণয়নে চালিত করেছে। ঐক্যচরিত্রের প্রধান দুর্বলতাঃ সম্বন্ধে কালীনাথ দত্ত লিখেছেন, “সাধারণ মানুষের একজন উপাসকের আদর্শ চান—একজন ভক্তের প্রতিচ্ছবি দেখিতে চান। ঐক্য চরিত্রে ‘ইহার কিছুই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাঁহাতে না ছিল বৈরাগ্য ও ভগবৎনির্ভর, না ছিল ভগবৎভক্তি, না ছিল ভগবৎ-প্রেম, না ছিল ভগবৎ-বিশ্বাসের গভীরতা ও প্রসঙ্গতা।”

বহুস্বামীর নিজেই এই অভাব বোধ করেছিলেন “কেবল একটা কথা এখন বাকি আছে। ‘ধর্মতত্ত্বে’ বলিয়াছি, ভক্তিতেই মানুষের প্রধান বৃত্তি। কৃষ্ণ আদর্শ মানুষ, মানুষের আদর্শ প্রচারের জন্য অবতীর্ণ—তাঁহার ভক্তির স্তুতি দেখিলাম কৈ?”

বহুস্বামীর এই ধর্মজিজ্ঞাসার উত্তর দিতে পারেন নি।

বহুস্বামীর কৃষ্ণচরিত্র বৃত্ত হলে তাঁর ধর্মশিক্ষা সম্পর্কে ছ’-একটি কথা জানা আবশ্যিক। বহুস্বামীর প্রধান শিক্ষা তাঁর পিতার কাছে। পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন যে, একজন সম্মানী মহাপুরুষ যাদবচন্দ্রের জীবন দান ক’রে তাঁকে দীক্ষিত করেন। এদিকে তিনি পবন বৈষ্ণব ছিলেন। পিতৃদেবের উপদেশে এবং সংস্কৃত গ্রন্থাদি পাঠ করেই বহুস্বামীর হৃদয়ে প্রথম ধর্মের উদ্বেগ হয়। যে সব সংস্কৃত গ্রন্থাদি বহুস্বামীর পাঠ করেন তাদের মধ্যে জ্যোতিষতত্ত্ব প্রভৃতি শাস্ত্রও ছিল। বহুস্বামীর রচনাদি থেকেও প্রমাণ করা যায় যে, তিনি তন্ত্র, মন্ত্রশক্তি, দৈববল ইত্যাদিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর শাস্ত্রভাব প্রধানত এই বিশ্বাস থেকে পাওয়া। এর ওপর পাণ্ডিত্য বুদ্ধিবাদ, ‘Humanity’-এর আদর্শ প্রভৃতি তিনি

পাণ্ডিত্য শিক্ষার কল্যাণে লাভ করেছিলেন। এই তিনটি ধারার বহুস্বামীর কৃষ্ণচরিত্র অভিযুক্ত।

‘তত্ত্ববোধিনী’তে বিজ্ঞাননাথ ঠাকুর কৃষ্ণচরিত্রের সমালোচনা করলে ‘প্রচারে’ বহুস্বামীর তার জবাব দেন। এই প্রসঙ্গে বিজ্ঞাননাথ তাঁর বুদ্ধিকথার বলেছিলেন,

“কেন বহুস্বামী হ’টো কৃষ্ণের অবতারণা করিলেন, এবং এক কৃষ্ণকে আদর্শ পুরুষ বলিয়া দাঁড় করাইতে চেষ্টা করিলেন? বহুস্বামীর শেখা শব্দ বতাই গীতাভক্ত হউন না কেন, তিনি অনেক দিন ধরিয়া পাকা positivist ছিলেন। Positive Philosophy বাহাই হউক না কেন, শুধু মানুষকে লইয়া একটা Positive religion দাঁড় করাইবার চেষ্টা করিলে চলিবে কেন? Religion কি অমনি গড়িয়া তুলিলেই হয়? Positivist চাহিল একজন grandman—মহাপুরুষ। বহুস্বামী বাবু ভাবিলেন, এই ত আমার হাতের কাছে একজন grandman রহিয়াছেন; যেমন বিশ্ববুদ্ধি, তেমনি পরমার্থজ্ঞান, এই রকম চৌকস মানুষ দরকার। অতএব আমার দেশে positivist religion দাঁড় করাইতে হইলে ঐক্যকে grandman করিলেই সমাজপ্রশস্য হইবে। তবে বুঝাবনের ঐক্যকে আর মহাত্ম্যের ঐক্যকে এক করিলে চলিবে না। ফলে দাঁড়াইল বহুস্বামীর কৃষ্ণচরিত্র।”

ব্রাহ্মসমাজের নেতৃবৃন্দ বহুস্বামীর ধর্মতত্ত্বে প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করেন। এই আক্রমণকারীদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও ছিলেন। ১২১১ সালের (১৮৮৪) অগ্রহায়ণ মাসের ‘প্রচারে’ বহুস্বামীর ‘আদি ব্রাহ্মসমাজ ও নব্যহিন্দুসম্প্রদায়’ নামে এক প্রবন্ধে এই আক্রমণের বলিষ্ঠ জবাব দেন।

বহুস্বামীর ব্রাহ্মধর্মকে হিন্দুধর্মের শাখা বলেছেন।

“ব্রাহ্মধর্মের আমরা পৃথক উল্লেখ করিলাম না, কেন না, ব্রাহ্মধর্ম হিন্দুধর্মের শাখা মাত্র। ইহার এমন কোন লক্ষণ দেখা যায় নাই, বাহাতে মনে করা যাইতে পারে যে, ইহা ভবিষ্যতে সামাজিক ধর্ম পরিণত হইবে।”

বহুস্বামীর জীবনের শেষের দিকে পণ্ডিতবর শশধর তর্কচূড়ামণি উত্তর ও পূর্ব বাংলা থেকে কলিকাতায় এসে আলবার্ট হলে হিন্দুধর্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বিবরণ কয়েকটি বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতার প্রোত্না ছিলেন বহুস্বামীর, অক্ষয়কুমার সরকার প্রভৃতি মনীষিগণ। ছ’তিনটি বক্তৃতার উপস্থিতি হবার পর বহুস্বামীর আর বাননি। এই প্রসঙ্গে বহুস্বামীর চতুর্নিয়ম বন্দোপাধ্যায়কে বলেছিলেন,—

“.....ওরূপ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাতে কতকগুলি অসার লোক নাচিয়া ‘ধরাকে সরা জ্ঞান’ করিতে পারে, কিন্তু ওতে কোন স্থায়ী ফল হইতে পারে না। মালা, তিলক, কঁটা ও শিখা রাখার যে ধর্ম ট্যাকে, আর ঐগুলির অভাবে যে ধর্ম লোপ পায়, সে ধর্মের জন্য বেশ এখন আর ব্যস্ত নহে। তর্কচূড়ামণি মহাশয় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, তিনি এখনও বৃত্তিতে পারেন নাই যে, নানা স্তরে প্রাপ্ত নতুন শিক্ষার ফলে দেশ এখন উহা অপেক্ষা উচ্চ ধর্ম চায়।”

বহুস্বামীর তাঁর দৈবতত্ত্ব ও ‘হিন্দুধর্ম’ নামক প্রবন্ধের এক স্থলে স্টুটেনটে বলেছেন,—

“পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় যে হিন্দুধর্ম প্রচার করিতে

সিদ্ধ, তাহা আমাদের হতে কখনই টিকিবে না এবং তাহার বহু সকল হইবে না। এইরূপ বিশ্বাস আছে বলিয়া আমরা তাহার কোন কথার প্রতিবাদ করিলাম না।* (২১)

উপরের আলোচনা থেকে বঙ্গিমচন্দ্রের ধর্ম-জিজ্ঞাসার স্বরূপ স্পষ্ট হইবে বলে বিশ্বাস। বঙ্গিমচন্দ্রের সাহিত্য-সৃষ্টির মূল প্রেরণা বঙ্গ।

সেই কারণে তাঁর ধর্ম-জিজ্ঞাসার সঙ্গে পরিচিত না হ'লে তাঁর রচনার পূর্ণরূপ গ্রহণ ও মূল্যায়নপন বর্ষায্য ভাবে করা সম্ভব নয়। বঙ্গিমচন্দ্রের ধর্মজিজ্ঞাসার মধ্যে উনবিংশ শতকের শেবার্ধের উৎকর্ষ ও প্রয়োজন বরা পড়েছে। এই হিসেবে তাঁর ধর্মজিজ্ঞাসা একটি বিশিষ্ট মূল্যে মহৎ ও কৌশলময়।

গ্রন্থপত্রী	
১।	বিপিনবিহারী গুপ্ত। পুরাতন প্রসঙ্গ (প্রথম পর্ব)। কলিকাতা ১৯১৩ : পৃ: ২৩০।
২।	বঙ্গিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী (সাহিত্য গ্রন্থাবলী দ্বিতীয় ভাগ) : বঙ্গমতা সাহিত্য মন্দির রাজসংস্করণ : পৃ: ৮২
৩।	ঐ : পৃ: ৭
৪।	ঐ : পৃ: ১৪
৫।	ঐ : পৃ: ১৮
৬।	ঐ : পৃ: ১৪
৭।	ঐ : পৃ: ১৭
৮।	ঐ : পৃ: ১১
৯।	ঐ : পৃ: ৬৭
১০।	ঐ : পৃ: ৬৬
১১।	ঐ : পৃ: ৭৩-৪

১২।	সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সঙ্কলিত বঙ্গিম-প্রসঙ্গ (পরিশিষ্ট-২)। কলিকাতা ১৯২১ : পৃ: ১৫।
১৩।	মোহিতলাল মজুমদার : বাংলার নবযুগ : কলিকাতা ১৯৪৫ : পৃ: ১৪।
১৪।	সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সঙ্কলিত বঙ্গিম-প্রসঙ্গ : পৃ: ১৫৭।
১৫।	ঐ : পৃ: ২৫০।
১৬।	বঙ্গিমচন্দ্রের সাহিত্য-গ্রন্থাবলী প্রথম ভাগ : পৃ: ১৭০।
১৭।	বঙ্গিমপ্রসঙ্গ : পৃ: ১৮-১০২।
১৮।	বিপিনবিহারী গুপ্ত : পুরাতন প্রসঙ্গ দ্বিতীয় পর্ব : কলিকাতা ১৯২৩ : পৃ: ১৯৪-৫।
১৯।	বঙ্গিমচন্দ্রের সাহিত্য গ্রন্থাবলী দ্বিতীয় ভাগ : পৃ: ৩৬৯।
২০।	বঙ্গিম-প্রসঙ্গ : পৃ: ৩০৩-৪।
২১।	বঙ্গিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : বিবিধ (সাহিত্য পরিষদ প্র.)। কলিকাতা ১৯৪১ : পৃ: ১৮৭।

ছুটি

অমিত বসু

কাগজ কাগজ রাশি রাশি নাম আবার স্বপ্ন
বাঁতাঘাত খোঁজ কখনোপকখনে কাটাই দিন,
জমা ও খরচ মিলিয়ে করিয়ে মাথার ঘাম
বিল-ভাউচার সাচ্ছন্দে-গুছিয়ে মিটিয়ে দাম।
প্রতি মিনিটের প্রতি আনা-পাই সুরে ও মূলে
চুকিয়ে তবেই ছুটির বাতাস লাগাই চলে,
সে ছুটি মরবে দেওয়ালের চাপে ডাইনে-বামে
সে ফুল বরবে আস্তাবলের ঘুলোর ঘামে ?
অথচ সিঁদু নেচে উভাল ছ' বাহু ফুলে
সেই নির্জন বাগিয়াড়ি-ফুলে উঠবে ফুলে,
চেউ হেঁকে হেঁকে বিগ্নক কুড়িয়ে হুজনে ভার।
কিরবে ক্লান্ত খুশিতে উথলে ক্ষুধার সারা।
হুগুরের ছায়া বিকেলের মাঠে শিকার সেবে
হাড়িয়াল ডাক বুনে তিস্তির সরাল মেবে,
আবার সুরের অঙ্গরে সুরা-গুহর-সাকী
দূরে সাড়া দেবে পাহাড়ের কোলে গানের পাখী।
বকুলের ফুল বরে টুপ টুপ কোলের কাছে
নিকটে উক মিবিড় ঘুমের ইসারা আছে,
রাত গাঢ় হ'লে গাছেরা ঘুমোলে আকাশ জাগে
ফুলের পেয়লা ভরে ভাঠে রাণে ভোরের আগ্নে।

যন্ত্রদানব না যন্ত্রদেবতা ?

ডঃ গণ চট্টোপাধ্যায়

[এরা নানা জাতির লোক কলকারখানার রহস্য আরও করবার জন্তে এত অবাধ উৎসাহ ও সুযোগ পেয়েছে, তাঁর একমাত্র কারণ যন্ত্রকে ব্যক্তিগত স্বতন্ত্র স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় না। আমরা আমাদের লোভের জন্তে যন্ত্রকে দোষ দিই, মাতলামির জন্তে শাস্তি দিই তালগাছকে।
—রবীন্দ্রনাথ (রাশিয়ার চিঠি)]

রক্ষণশীল বা সনাতনপন্থী বলতে বা বোঝায়, লোকে সাধারণত সেটা পছন্দ করে না। সমাজে রক্ষণশীলতার কমর নেই। অথচ আধুনিক চিন্তাজগতে সনাতনপন্থীর অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায় নানা দিকে। এমন কি আধুনিকপন্থী বা প্রগতিপন্থীদের মধ্যেও কেউ কেউ আচমকা একটা বা খেঁদে বা অজ্ঞ কৌম কারণে বাস্তবায়িত ইতিহাসের দিকে পিছন ফিরে সনাতনপন্থীর গুণ গাইতে শুরু করেন। রক্ষণশীলতা কেউ পছন্দ করে না অথচ তার অস্তিত্বও থেকে যাওয়া এই দুয়ের মধ্যে সম্পর্ক আছে। আধুনিক রক্ষণশীলতার ইতিহাস হচ্ছে প্রগতিশীল গণতন্ত্রের অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার সমস্ত রকম অগ্রগতি ও সাফল্যের বিরোধিতার ইতিহাস।

এডমণ্ড বার্ক করাসী বিপ্লব সম্পর্কে বা বলতেন আজকের সনাতনপন্থীরা ক্রম বিপ্লব সম্পর্কেও সেই ধরণের কথাবার্তা বলেন। সমাজতন্ত্রের দেশে বিজ্ঞান ও যন্ত্রকৌশলের অভাবনীয় কীর্তি দেখে আঁতকে উঠছেন তাঁরা, বলছেন সেই যন্ত্রসভ্যতা মানুষের পক্ষে সমূহ বিপদ। কারণ মানুষ সেখানে যন্ত্র-দানবের দাস হয়ে থাকে। প্রকৃতির ক্রমায়ুগতার সঙ্গে পাল্লা দেবার জগৎ জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের দিকে যেতে তাঁরা নারাজ। অতীতের সামনে বর্তমানকে তাঁরা এমন ভাবে আলাপা করে ঝাড়া করতে চান যেন পচা-ফসলা আধুনিক যুগ দৌরবন্দ্য অতীতকে গ্রাস করে ফেলার চেষ্টা করছে। এই ধারণাটি মধ্য শ্রেণীর কিছু বুদ্ধিজীবীর মধ্যেই বেশি দেখা যায়। তাঁরা সাননে সেকালের মধ্যে যুগ গুলে স্বস্তি পেতে চান। সমাজের অগ্রগতি তাঁদের মধ্যে এই ধরণের নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। সপ্তদশ শতাব্দীর ইংল্যান্ড অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রান্স এবং আধুনিক সোভিয়েত ইউনিয়নে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের বাটাই করেন। তাঁরা আইনের বদলে কতটা শক্তি প্রয়োগ করা হোল বা চিরচরিত প্রথার বদলে কত বর্ষের ভাবে নতুন ধারা চালু করা হোল তাই দিয়ে। এঁদের চোখে মার্কিন ও সোভিয়েত ব্যবস্থা দুই কুংসিত কিন্তু সোভিয়েত আরো অনেক বেশি কুংসিত। এখানেই শেষ নয়। তাঁদের কেউ কেউ শেষ পর্যন্ত এই মতে ফিরে যান যে মানুষের প্রকৃতি কিছুতেই বদলায় না। এমন কি সাম্যবাদী সমাজেও নয়। তাঁরা বলেন, মানুষ জন্মগত অপরাধী ও বিজোহী এবং বুদ্ধিবৃত্তির বতই চাব করা হবে ততই যি ঢালা হবে 'নিহিলিজম'র আগুনে। বর্ষরতা মানুষের স্বভাবজাত এবং কোন রকম নতুন সামাজিক পরিবেশেই তা বদলায় না। এই সম্পর্কে মাক্স এঙ্গেলস লেনিনের বক্তব্য বাদ দিয়েও এইটুকু বলা যায় যে, আদিম সাম্যবাদের যুগে মানুষ কিছুতেই ব্যক্তিগত সম্পত্তি হানত না। ব্যক্তিগত

সম্পত্তির বিরুদ্ধে তার স্বভাব বিরোধ করত। ব্যক্তিগত উৎপাদনের যুগে সেই প্রকৃতি আন্তে আন্তে তার বদলে গেল। তখন তার ধ্যান ধারণার রাজ্য দখল করে নিল ব্যক্তিগত সম্পত্তি। তেমনি সমাজতন্ত্রের সমবায়িক পরিবেশেও মানুষের রুচি প্রকৃতি নতুন রূপ নিতে বাধ্য এবং নিচ্ছে।

মানুষের প্রকৃতি বদলায় কি না সেটা এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়। এখানে আলোচ্য মানুষের সমাজে যন্ত্র বিশেষ করে অটোম্যাটিক বা স্বয়ংচালিত যন্ত্রের ভূমিকা। যন্ত্রীকরণ ও স্বয়ংচালনা মানুষকে যন্ত্রের দাস করে এবং মানুষকে যান্ত্রিক করে ফেলে নাকি মানুষই যন্ত্রকে নিজের হুকুম তামিল করতে বাধ্য করে, এই হচ্ছে মৌলিক প্রশ্ন।

সমাজের তথা সভ্যতার ক্রমবিকাশের ইতিহাস সবচেয়ে বড় বিষয় কী? একথা এমন কি ধনতান্ত্রিক দেশের ইতিহাসযেস্তারাও স্বীকার করেন যে, সমাজ ও সভ্যতার ইতিহাস হচ্ছে প্রধানত উৎপাদন ব্যবস্থার অগ্রগতির ইতিহাস, উৎপাদন কৌশলের অগ্রগতির ইতিহাস, উৎপাদিকা শক্তিগুলির অগ্রগতির ইতিহাস এবং উৎপাদনের ক্ষেত্রে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের ইতিহাস।

মানুষ উৎপাদনের উপায় উপকরণগুলির উন্নতি করার চেষ্টা করে নিজের খুব-সুবিধা আরাম-বিবাহের জন্তে। যাতে জরুরময়ে আরো বেশি ভোগ করবার জিনিষ তৈরী করা যায়, যাতে কম মেহনত করে বেশি উৎপাদন করা যায়, এই হচ্ছে তার উদ্দেশ্য। এক কথায় প্রতিদিন মানুষের যে সাংসারিক ও সাংস্কৃতিক চাহিদা বেড়ে চলেছে তা বতদূর সম্ভব মেটাবার চেষ্টা করার জন্তেই মানুষ কল কৌশলের উন্নতি করতে চায়। সমাজতান্ত্রিক সমাজে ব্যাপকভাবে বিজ্ঞানের সাহায্যে নতুন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে প্রকৃতিক শক্তিগুলি একের পর এক আয়ত্তে এনে সেগুলির সাহায্যে নতুন যন্ত্রকৌশলে উৎপাদন ও সঞ্চয়-বাহুল্য বাড়ানোর এবং মানুষের খাটুনি কমানোর চেষ্টা চলেছে। সমস্ত মানুষ অংশ নিচ্ছে সেই কাজে সেই অভাববিহীন সমাজ ও তার সাংস্কৃতিক ইমারত রচনায়। সেই স্বপ্নই দেখেছিলেন লেনিন যেদিন তিনি বলেছিলেন যে এমন দিন আসবে যেদিন একজন রাষ্ট্রনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনা করতে পারবে। ইংরেজ কবি 'উইলিয়াম মরিসের স্বপ্নও ছিল তাই।

লেনিনের সেই স্বপ্ন সকল হতে চলেছে, সকল হতে চলেছে প্রথমত নতুন ভায়সকৃত সমাজ ব্যবস্থার কল্যাণে এবং দ্বিতীয়ত যন্ত্রকৌশলের অপূর্ণ সাফল্যের দৌলতে। সে দেশে যন্ত্রের উন্নতি ও ব্যবহার কাউকে বেকার করে না বরং তাদের মেহনত হালকা করে, শক্তি ও সংকৃতির উন্নতি করে। বর্ষ ও সপ্তম পাঁচ-সাতা বন্দোবস্ত

আমরা তারই প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই। ৬ষ্ঠ পরিকল্পনার খসড়া নির্দেশনামায় বলা হয়েছিল :

“বন্যকৌশলের আরও উন্নতির জগ, উৎপাদনের মান উন্নত করার জগ এবং কাজকর্ম আরও সহজ সরল করার জগ বস্ত্রীকরণের বিপুল উৎকর্ষ সাধন করিতে হইবে এবং ব্যাপক ভাবে স্বয়ং চালনা ব্যবস্থা চালু করিতে হইবে।”

এখানে কাজকর্ম আরও সহজ সরল করার উদ্দেশ্যটি লক্ষ্য করার মত।

এবার নতুন ৭-সালী পরিকল্পনার কথা ধরা যাক। পরিকল্পনায় বলা হয়েছে :

সামূহিক বস্ত্রীকরণ ও স্বয়ংক্রিয়করণ অর্থনীতির উন্নতির প্রধান ও নিয়ামক উপায় এবং তাহার ভিত্তিতে শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি নূতন ভাবে বৃদ্ধি পাইবে, উৎপাদনের পড়তা খরচা কমিবে এবং উৎপন্ন স্রবোর গুণগত উৎকর্ষ সাধিত হইবে।

উৎপাদন বৃদ্ধি ও মেহনতী জনতার জীবনযাত্রার মানের উন্নতি সাধনের প্রকৃষ্ট কারণ হিসাবে শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি, পরিকল্পিত বস্ত্রীকরণ ও স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা প্রচলনের ভিত্তিতে যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে।

মেহনতী জনতার জীবনযাত্রার মানের উন্নতি সাধনের সঙ্গে সঙ্গে দৈনিক কাজের ঘণ্টা কমিয়ে দেওয়া হবে (দৈনিক ৫ ঘণ্টা) এবং সপ্তাহে দু’দিন পুরো ছুটি দেওয়া হবে। অর্থাৎ মানুষ অনেক বেশি অবসর পাবে জ্ঞান সঞ্চয় ও সংস্কৃতিচর্চা করার জন্তে। তখন তারা সকলেই পলিটেকনিক্যাল শিক্ষা গ্রহণ করার সময় পাবে। জে ভি স্তালিন তাঁর “সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক সমগ্রাবলী” বইখানিতে এই রকম ধারণাই দিয়ে গিয়েছেন সোভিয়েত দেশের আগামী সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে। তিনি বলছেন যে সমাজতন্ত্রের মূল অর্থনৈতিক নিয়মের প্রথম অংশটি হচ্ছে সমগ্র সমাজের প্রতিনিয়ত বর্ধমান সাংসারিক ও সাংস্কৃতিক চাহিদার যতদূর সম্ভব পরিতৃপ্তি সাধন। কি ভাবে সেটা হবে সে কথা বলতে গিয়ে তিনি লিখছেন :—

“শ্রমজীবী জনতার অবস্থার মৌলিক পরিবর্তন না করে সমাজের মানুষের সাংস্কৃতিক মানের বেশ ভাল রকম উন্নতি করা বাবে এ ধারণা ভুল। তার জগ সর্বপ্রথমে দৈনিক কাজের সময় অন্তত ৬ ঘণ্টার এবং পরে ৫ ঘণ্টার কমিয়ে আনতে হবে। তারপর আবৃত্তিক পলিটেকনিক্যাল শিক্ষার প্রবর্তন করার দরকার হবে, যাতে সমাজের লোকেরা নিজেদের পছন্দসই পেশা বেছে নিতে পারে, সারা জীবন একই পেশার বাঁধা না থেকে।”

সাম্যবাদী সমাজের সাংস্কৃতিক জীবনের এই হচ্ছে নীলনামা। স্তালিন যে পূর্ণাবয়ব মানুষের স্বপ্ন দেখেছিলেন সে মানুষকে সারা দিনে মাত্র কয়েক ঘণ্টা নির্দিষ্ট কাজ করতে হবে। বাকি সমস্ত সময়টাই সে সাংস্কৃতি ও জ্ঞান চর্চার পিছনে খরচ করতে পারবে। স্বয়ংক্রিয় ও অজান্তে বস্ত্রীকরণই তাকে এনে দেবে সেই সুযোগ।

বাশিয়ার চিঠির প্রথম পাতাতেই ববীন্দ্রনাথ লিখছেন :

“চিরকালই মানুষের সভ্যতার একদল অখ্যাত লোক থাকে, তাদেরই সংখ্যা বেশি, তারাই বাহন। তাদের মানুষ হবার সময় নেই ;

কম পরে, কম শিখে, বাকি সকলের পরিচর্যা করে। তারা সভ্যতার পিলস্তুজ, মাথার প্রদীপ নিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে, উপরের সবাই আলো পায়, তাদের গা দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ে। অথচ উপরে না থাকলে নিত্যন্ত কাছের সীমার বাইরে কিছু দেখা যায় না। কেবলমাত্র জীবিকা নির্বাহ করার জন্ত তেঁা মানুষের মনুষ্যত্ব নয় ? একান্ত জীবিকাকে অতিক্রম করে তবেই তার সভ্যতা। সভ্যতার সমস্ত শ্রেষ্ঠ ফসল অবকাশের মধ্যে ফলেছে।

কম খাওয়া, কম পরা, কম শেখা, এই কয়ের পালা সাজ করে পর্যাণের বন্দোবস্ত করা এবং সেই সঙ্গে অবকাশের সুযোগ বাড়ান্ডে পারলে তবেই গোটা দেশের সমস্ত মানুষ, মানুষের মর্যাদা নিয়ে বাঁচতে পারবে এবং সেই সঙ্গে জাতীয় সাংস্কৃতিক সম্পদ সৃষ্টি করতে পারবে, বিশ্বসাংস্কৃতিকে করতে পারবে সমৃদ্ধতর। বিজ্ঞান ও বন্যকৌশলের উন্নতি এবং উৎপাদনের স্বার্থে সেগুলির ব্যবহারই তার একমাত্র উপায়। পুরাতন পৃথিবীর জয়াজীর্ণ অভ্যাস সমাজকে উন্টে দেবার “আর্কিমিডিসের লিভার” হচ্ছে এই সব অভিনব কলকৌশল। কিন্তু মানুষের এই সব নতুন কীর্তিকে অভিসন্দন না জানিয়ে একদল বুদ্ধিজীবী প্রশ্ন তুলছেন যে এসবে মানুষের স্বর্থ কি বাতবে ? “সাইবানো’টিকস” শব্দটি তাঁদের কাছে দুঃস্বপ্নের সামিল।

‘সাইবানো’টিকস’ শব্দটি এসেছে গ্রীক শব্দ কাইবানো’টিস থেকে, বার মানে মাঝি অর্থাৎ চালক। বৃটিশ বৈজ্ঞানিক এসলিলে সটোমেশন বা স্বয়ং চালনার সংজ্ঞা দিচ্ছেন এই ভাবে :—

এমন ধরনের উদ্ভাবনের স্বয়ংক্রিয় বস্ত্রীকরণ বা পদ্ধতির প্রবর্তন করা বা মানুষের কায়িক পরিশ্রম এবং খুঁটিনাটি নিয়ন্ত্রণ কার্য অনেকাংশে বাদ দিয়ে দেবে।

গুরু বস্ত্রীকরণে মেহনত কমে গেলেও তদারক বা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব থেকে যায়, পদে পদে বস্ত্রের কাজের প্রত্যেকটি ধাপের দিকে দৃষ্টি রাখতে হয়। স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় বস্ত্র নিজের কাজের তদারক নিজেই করে! মানুষের শুধু দায়িত্ব থাকে বস্ত্র ঠিক মত চলছে কি না সেইটুকু দেখা।

একটি উদাহরণ দিই। সোভিয়েত দেশে কে ‘শেমাখা’ নামে একটি মোটর জাহাজ আছে। সেটি যখন সমুদ্রে পাড়ি দেয় তখন তাতে হাল ধরবার কোন লোক থাকে না সেই কাজের দায়িত্ব রয়েছে একটি কলের উপর ; বার নাম “জাইরো-হেল্মসম্যান।” জাহাজটি পথভ্রষ্ট হলেই “জাইরো কম্পাসটি” (দিগদর্শন হস্ত) এক বৈজ্ঞাতিক কৌশলে জাইরো-হেল্মসম্যান বা হস্তমারিকে সেই খবর পৌঁছে দেয় এবং বস্ত্রমারি স্বয়ংক্রিয় বস্ত্রকৌশলে জাহাজটি ঠিক পথে ফিরিয়ে আনে।

আর একটি দৃষ্টান্ত। উক্রেইনের একজন বৈজ্ঞানিক এমন একটি ইলেকট্রনিক বস্ত্র উদ্ভাবন করেছেন যা শরীরের যে কোন জায়গার রক্তচাপ ধরে দিতে পারে এবং হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন ও ফ্রি রেকর্ড করে, হৃৎপিণ্ডের কাজে গলতি থাকলে তা জানিয়ে দেয়। এমন কি সেই অসুস্থতার চিকিৎসা পদ্ধতি সংক্রান্ত তথ্য দাখিল করে। তাই বস্ত্রটির নাম “স্বয়ংক্রিয় ডাক্তার।”

উদাহরণ ছাড়া থেকে বোঝা যায়, সোভিয়েত দেশে মানুষ স্বয়ংক্রিয়

হিসাবে। মানুষ একটা কাজ ঠিক করে দিচ্ছে এবং ব্যক্তিগত “মস্তিষ্ক” মানুষের ইচ্ছা ও নির্দেশমত সেই কাজটি নিষ্ঠুরভাবে করে দিচ্ছে অর্থাৎ মানুষের মননতটা বস্ত্র করে দিচ্ছে। তাই কাল মার্জ বলেছেন, সাইবার্গেটিক্স যন্ত্রপাতি মানুষের জ্ঞানবুদ্ধির ক্ষতির একটি প্রতিক্রিয়া। সেগুলি মানুষের ইন্দ্রিয়গুলির ক্রিয়া প্রক্রিয়ার অনুকরণ করে এবং অনেক সময় সেগুলি আমাদের ইন্দ্রিয়ের চেয়েই অনেক ভাড়াভাড়ি সাড়া দেয়। আসলে সেগুলি যন্ত্রের কাজ নিয়ন্ত্রণ করবার ইলেকট্রনিক যন্ত্র। এই ধরনের একটি ইলেকট্রনিক স্বয়ংক্রিয় গণনাযন্ত্র আমাদের ট্রান্সিস্টিক্যাল ইনট্রিটউটকে দেখা হয়েছে সোভিয়েত সরকারের পক্ষ থেকে। এই যন্ত্রটি “স্বয়ংক্রিয়” আছে এবং সে এক হাজার সংখ্যা মনে রাখতে পারে, সেগুলি দিয়ে মানুষের নির্দেশমত হিসাব করে দিতে পারে যে কোন বিষয়ে। তার স্বয়ংক্রিয়তা ভুল হবার ভো নেই। মানুষের স্বয়ংক্রিয়তা ও মস্তিষ্কের ভুল ত্রুটি হয় কিন্তু স্বয়ংক্রিয় গণনাযন্ত্রের নয় না।

সোভিয়েত দেশে মানুষের পরিশ্রম কমানো এবং উৎপাদন বাড়ানোর উদ্দেশ্যে কারখানা-শিল্পে স্বয়ংচালিত কলকৌশল ব্যবহার হচ্ছে। লৌহশিল্পে লোহার চাকরে নির্দিষ্ট মাপের গর্ত করা এবং অজ্ঞাত নানা কাজ যন্ত্র আপনা আপনিই করে সুপারভাইজার টেলিফোনে হুকুম দিলেই। টেলিফোনের হুকুম অনুসারে যন্ত্রের গণনা ও স্বয়ংক্রিয় বিভাগ কোন কাজটা কি মাপে এবং কতটা করতে হবে সেটা হিসাব করে নেয়। তার পর বোতাম টিপলেই হুকুম মাসিক কাজ চলতে থাকবে। স্বয়ংক্রিয় গণনাযন্ত্র দিয়ে আজকাল শিল্প ও অর্থনীতির মানাক কমা হচ্ছে, জেট বিমানের ইঞ্জিনের নক্সা তৈরি সক্রান্ত হিসাবপত্র করা হচ্ছে, জলবায়ুর পূর্বাভাস দেওয়া যাচ্ছে, রকেটের চেয়েও দ্রুতবেগে রকেটের গতিপথ গণনা করা যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে এই সব কাজের পড়তা, খরচা হাজার হাজার গুণ কমে যাচ্ছে। অটোম্যাটিক বোলিং মিলে শ্রমিকদের আর ভারি লোহার তাল নাড়াচাড়া করতে হয় না। সে খালি বসে বোতাম টেপে। এমন কি সেখানে বসে বসে সে গল্পের বই বা কোন বই পড়তে পারে। যন্ত্রের কাঁখে নিজের কাজের ভারি বোঝা চাপিয়ে দিয়ে সে খালাস। কাজের মধ্যেই সে অবকাশ পায়। যন্ত্র কাজে কাঁকি দিচ্ছে কিনা, তার কোথাও কিছু বিকল হয়েছে বা বিগড়েছে কি না সেদিকে নজর রাখা এইটুকুই তার কাজ।

সাইবার্গেটিক্স বিজ্ঞানের প্রথম সূত্র নিবদ্ধ করেন মার্কিন বৈজ্ঞানিক নর্বাট ওয়েইনার। কিন্তু তিনি স্বীকার করেছেন যে কণ্ঠশিল্পের সম্পর্কে রুশ বৈজ্ঞানিক ইভান পাভলভের শিক্ষাই সাইবার্গেটিক্সের অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তি। লেনিনগ্রাদেও “সভেনলানা” নামে যে “ইলেকট্রো ভ্যাকুয়াম” কারখানা আছে সেখানে ১৯৩৫ সনে কুকুরের একটি বৈজ্ঞানিক মডেল তৈরি করা হয় এবং সেই মডেলটিতে বিদ্যুৎপ্রবাহের দ্বারা কণ্ঠশিল্পের সৃষ্টি করা গিয়েছিল। তাই থেকে প্রমাণিত হয়, স্বয়ংচালিত নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের সঙ্গে সাধারণ স্নায়বিক প্রক্রিয়ার সাপুত আছে। মানুষের দেহে আছে কোটি কোটি (১৫০০ কোটি) স্নায়ুকোষ। সেই স্নায়ুকোষের জায়গার গণনা যন্ত্র রয়েছে ইলেকট্রনিক টিউব (সবচেয়ে বড় যন্ত্রে ২২।২৩ হাজার পর্যন্ত টিউব থাকতে পারে)। মানুষের দেহে যেমন স্নায়ু স্নায়ু গণনাযন্ত্র বৈজ্ঞানিক তার। সোভিয়েত বৈজ্ঞানিক

লেভ গুভেনমানকার বলেছেন—এই ব্যাপারে মানুষের স্বয়ংক্রিয়তা বিশেষ করে জরুরী। ইলেকট্রনিক মেশিনের স্বয়ংক্রিয়তা মানুষের স্বয়ংক্রিয়তা সঙ্গে সেই ধরনের সম্পর্ক যে সম্পর্ক রয়েছে চোখের সঙ্গে আলোক কোষের বা মাইক্রোফোনের সঙ্গে কানের। এই ধরনের কোন কোন সাদৃশ্য আমরা সৃষ্টি করতে পারি কিন্তু তাই বলে মানুষের মস্তিষ্কের মধ্যে যে সব জৈব-পদার্থিক বা জৈব-রাসায়নিক ক্রিয়া প্রক্রিয়া ঘটে সেগুলি ইলেকট্রনিক মডেলের মধ্যে সৃষ্টি করার কোন দরকার নেই। মানুষের মস্তিষ্কের গাণিতিক বা সংখ্যা প্রক্রিয়া এবং মডেলের গাণিতিক প্রক্রিয়া মিলিয়ে দিতে পারাটাই আসল কথা।

এই ধরনের ইলেকট্রনিক যন্ত্র যে কোন বই-এর লেখা মুখস্থ করে স্বয়ংক্রিয় টেলিফোনের সাহায্যে অন্য সর্হরের পাঠকের চোখের সামনে টেলিভিসনের পর্দায় সেই লেখা প্রতিকলিত করতে পারবে। বি-ই-এস-এম মডেলের ইলেকট্রনিক কম্পিউটার ১০ মিনিটের মধ্যে আবহাওয়ার যে পূর্বাভাস দিতে পারে সেই কাজ করতে একটি গোটা আবহাওয়া অফিসের ২ বছর লেগে যাবে।

সোভিয়েতে রেলগাড়ীর ইঞ্জিনের জন্ত একরকম স্বয়ংচালিত চালক তৈরি হয়েছে যা সব দিক হিসাব করে প্রয়োজন মত গাড়ীর গতিবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং গাড়ীর নিরাপত্তা রক্ষা করতে পারে।

আগেই বলেছি, রক্তচাপ ও হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন হিসাব করবার স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের কথা। হৃৎপিণ্ডের উপর অস্ত্রোপচার করা হবে কিনা এবং উচিত হলে কখন করা হবে, এ সবই সেই যন্ত্র বলে দিতে পারে। স্তরায় শল্য চিকিৎসককে কোন বুকি নিতে হয় না।

মানুষের স্নায়ুতন্ত্র অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য। মস্তিষ্কের কোন অংশ আহত হলে অন্য অংশ সে কাজে আনাড়ি হলেও সে কাজের দায়িত্ব নেয় সাময়িক ভাবে। তার কলে দেহযন্ত্রের কাজকর্ম আবার চলতে থাকে। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের ক্ষেত্রেও অংশ-বিশেষ বিগড়ে গেলে অন্য অংশ বাতে তার কাজ করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে পারলে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র আরো নির্ভরযোগ্য হবে। তা করতে পারলে “যন্ত্রের মস্তিষ্ক” পরিবেশ পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়ে কাজ করতে পারবে। সঙ্গে সঙ্গে হাজার রকম কাজের জন্ত হাজার রকমের যন্ত্র না করে, খালি বিভিন্ন অংশ অদল-বদল করে বাতে একই মডেলের দ্বারা নানা রকম কাজ করা যায়, সেদিকে চিন্তা করতে হবে এবং গোটা কারখানার সমস্ত কাজের সামগ্রিক স্বয়ং চালনা প্রবর্তন করতে হবে। এই হচ্ছে সাম্যবাদী সমাজে উত্তরণের জন্ত সমাজবাদী সমাজের দাবী।

কিন্তু যন্ত্র কি সত্যিই মস্তিষ্কের জায়গা দখল করবে? হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এডমন্ড বার্কলে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রগুলিকে “বিরাট মস্তিষ্ক বা চিন্তাশীল যন্ত্র” আখ্যা দিয়েছেন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জন ইয়ং-এর মতে মানুষের মস্তিষ্ক হচ্ছে একটি প্রকাণ্ড গণনাযন্ত্র যার মধ্যে রয়েছে, ১৫০০ কোটি স্নায়ুকোষ। এঁরা দুজনেই মানুষের মস্তিষ্ক আর যন্ত্রের মস্তিষ্কের ধর্মগত পার্থক্য উপেক্ষা করে শুধু বাহ্যিক সাদৃশ্যটি দেখেছেন।

প্রথমত: স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের স্রষ্টা মানুষ, তার মালিকও মানুষ।

স্বয়ংক্রিয় বস্ত্র তার শ্রমের হ্রাস তামিল করে। কিন্তু মানুষের মাস্তক বহু হাজার বছরের প্রাকৃতিক বিবর্তনের পরিণতি। সবচেয়ে নিখুঁত বস্ত্রের সঙ্গে মানুষের মস্তিষ্কের তুলনা করতে বাওয়া বাতুলতা। কারণ বস্ত্রের মানুষের মাথার মত চিন্তা করার, উপলব্ধি করার, জীবনকে বিশ্লেষণ করার, অভিজ্ঞতার সংশ্লেষণ ও সমীক্ষা করার এবং আগামীকালকে ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পাওয়ার ক্ষমতা নেই। মানুষের প্রজ্ঞা আছে, বুদ্ধি আছে, আছে কল্পনা করবার ক্ষমতা। কিন্তু বস্ত্র বস্ত্রই, সে একটা স্বয়ংক্রিয় কৌশল মাত্র। অনুগত ভৃত্যের মত সে কাজ দিলে, তা ঠিক মত করে দেয় চোখ বুজে। মানুষের হৃদয় না পেলে তার অবস্থা ঝাঁড়ায় একটা অচল জড়বস্তুর মত। সে অংক কবতে পারে কিন্তু সাহিত্য রচনা করতে পারে না, বস্ত্র-কৌশলের তথ্য তর্জমা করতে পারে কিন্তু উপগ্রাস অনুবাদ করতে পারে না। তার স্মৃতির কোঠার কিছু শব্দ আর কবিতার ছন্দের নিয়ম, সংখ্যায় লিপিবদ্ধ করে দিলে সেই নিয়মে সে কবিতার লাইন সাজিয়ে দিতে পারে কিন্তু মূল কবিতা রচনা করতে পারে না। ছকে দেওয়া গনিতের সমস্যার সমাধান সে করতে পারে কিন্তু নতুন সমস্যা বার করতে পারে না।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে স্বয়ংক্রিয় বস্ত্র অথবা যে কোন বস্ত্রের মতই মানুষের শ্রমের একটি হাতিয়ার মাত্র। নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে সে মানুষের মস্তিষ্কের একটি প্রবর্ধন মাত্র, যেমন প্রবর্ধন হচ্ছে হাতুড়ি, মানুষের হাতের। ধনতান্ত্রিক দুনিয়ায় কোটি কোটি বেকার আছে, মুনাফা শিকারের রেযারেবি আছে বলে সেখানে বস্ত্র এবং আরো বেশি করে স্বয়ংক্রিয় বস্ত্র শ্রমিকের শত্রু; কারণ বস্ত্র বসানো মানেই কিছু লোক ফালতু হয়ে পড়া। বস্ত্র একাই তো তাদের অনেকের কাজ করে দেবে। কিন্তু সমাজতন্ত্রের দুনিয়ায় বেকার সমস্যা ও গলা-কাটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই বলে বস্ত্র সেখানে মানুষের বন্ধু ও সহযোগী। আসল কথা বস্ত্র নিজে ভাল বা খারাপ, একথা বলার কোন অর্থ নেই। কে বস্ত্র ব্যবহার করছে একা কি উদ্ভোগে ব্যবহার করছে, তার ওপরই বস্ত্রের গুণাগুণ নির্ভর করে। দৃষ্টান্ত দিই। বুটেনের কাউণ্ট্রী ওয়ার্ল্ডার্স জার্নাল লিখে:

“বুটিন শ্রমিকরা জানতে চায় যে কারখানা স্বয়ংচালিত হলে ১০ জন শ্রমিকের মধ্যে ৮ জনের বদি চাকরী বার তাহলে সেই কারখানার তৈরি জিনিষ কিনবে কারা?”

ফরাসী পত্রিকা “ভিয়ে উভিয়ে” মন্তব্য করেছে:—

“আমরা স্বয়ংক্রিয় ও অজ্ঞান নতুন বস্ত্রপাতির শিকার হতে রাজি নয়। উৎপাদন বৃদ্ধির পরিণামটা যে কী তা আমাদের জানা আছে: যেহেতু তুলনার মজুরী কমা আর বেকার হওয়া।”

এক্ষেত্রে নতুন বস্ত্রকৌশল যে মানুষের আত্মমর্যাদা নিয়ে মানুষের মত বাঁচার পথে বাধা দিয়ে মানবাত্মার অপমান করছে সে কথা কেউ অস্বীকার করবে না। কিন্তু কেন হচ্ছে এ রকম? হচ্ছে এই জন্তে যে, ধনতান্ত্রিক সমাজের হস্তীকর্ত্তা বিখ্যাতদের জপমালা ও গায়ত্রী-বস্ত্র হচ্ছে মুনাফা। মূলধনের মালিক ও শ্রমিকের যে সম্পর্ক সেখানে তো উৎপাদনের উন্নতির পথে বাধা সৃষ্টি করে। শ্রমিক হাঁটাই করে এবং মজুরী কমিয়ে সেখানে মুনাফার টাকা নতুন বস্ত্রকৌশলের পিছনে ঢালা হয়। ফলে উৎপাদন বাড়ে কিন্তু সেই সঙ্গে বেকারের সংখ্যাও

বেড়ে চলার উৎসর্গ জিনিষ বিক্রী করার বাজার ক্রমশ সংকুচিত হতে থাকে। কারণ বেকার বত বাড়ে কেনবার লোক ততই কমে। ফলে বাজারে মাল পড়ে থাকে। বাস্তায় নয়দেহ, নয়শন লোকেরা ঘুরে বেড়ায় কাছের সন্ধান, তাকিয়ে থাকে লোক দৃষ্টিতে দোকানের শো-কেসে সাজানো তবেক রকমের জামা কাপড় জুতার দিকে। জিনিষ রয়েছে, চাহিদা রয়েছে তার চেয়েও অনেক বেশী, কিন্তু মাল বিক্রী হয় না। সেই মাল শেষ পর্যন্ত হয়ত পচিয়ে, হয় ফুটপাথে নয় “Reduction sale” এ বেচেতে হয় কিন্তু তবু বার কাপড় জামা নেই সে কাপড় জামা কিনতে পারে না। বার জুতা নেই তাকে বৈশাখের প্রচণ্ড গরমে কলকাতা সহরের পিচের রাস্তায় পা পুড়িয়ে হাঁটতে হয়, মুরোদীর প্রচণ্ড শীতে গা হাত পা অসাড় হয়ে গেলেও সে গরম জামা কিনতে পারে না। দোকানে দোকানে জামা সাজানো থাকা সত্ত্বেও। কারখানার মালিকের পক্ষেও নতুন বস্ত্রকৌশলের পিছনে মজুর-মারা টাকা চলে যতটা লাভ হওয়া উচিত ছিল তা হয় না। তবু সেই বিবাক্ত রাজা ছাড়া তাঁর গতি নেই, কারণ টাকা ছাড়া তিনি কিছু চিনতে শেখেননি। বেকারের দল বত ফাঁপবে মজুরী নিয়ে দরাদরি করার ক্ষমতাও মালিকের তত বাড়বে। কিন্তু পণ্য বেচবার বাজার না বাড়তে পারলে মজুরী কমিয়ে বা হাঁটাই করে তাঁর বাঁধা পূর্ণ হ’তে পারে না।

দেশের লোকের তো কেনার ক্ষমতাই নেই। স্তব্ধতা ও বন তাঁর মতলবটা সম্ভাব্যসারীকে পথে বসাবার দিকে বার। তিনি যে মাল তৈরি করেন সেই মালের অল্প ব্যবসারীদের চেয়ে সম্ভাব্য মাল বাজারে ছাড়তে পারলে তাঁর বাজার বাড়ে। নতুন বস্ত্রকৌশল লাগাতে পারলে উৎপাদনের পড়তা খরচা কমে। তাই যিনি বস্ত্রকৌশলের পিছনে বত টাকা ঢালতে পারেন তিনি তত বেশি করে চুনোমাছ জাতীয় ব্যবসারীদের লালবাতি জ্বালতে বাধ্য করে নিজে বাঘব-বোয়াল হয়ে দাঁড়ান। কিন্তু লোভের কোন শেষ নেই। প্রতিদ্বন্দ্বীদের কাবু করেও দেশের সাধারণ লোকের অভাব অনটন বাড়তে থাকার দরুণ, সব মাল তিনি দেশে বেচেতে পারেন না। তখন বিদেশী বাজারের দিকে তাকান তিনি লোলুপ দৃষ্টিতে। শেষ পর্যন্ত দেশের মধ্যে তাঁর তৈরি মালের চাহিদা থাকা সত্ত্বেও সেই মাল বিদেশে রপ্তানী করেন, মুনাফার অংশ তিনি অল্প বাধার চেষ্টা করেন। বিদেশে গিয়ে তাঁর মাল অল্প দেশের রপ্তানী করা মালের সঙ্গে বাজারে বদি টেকা দিতে পারে তবেই তাঁর লাভ। সেই পারা ছুটে জেতবার জন্ত পড়তা খরচা আরো কমাতে গিয়ে তিনি মজুরী আরো ক্রমাতে চেষ্টা করেন আরো লোক হাঁটাই করার শাসানি দিয়ে। না হলে নিজের মুনাফার অংক ঠিক রেখে বা বাড়িয়ে অল্প দেশের রপ্তানীকারকদের চেয়ে সম্ভাব্য তিনি বিদেশী বাজারে মাল ছাড়বেন কি করে? স্তব্ধতা দেখা যাচ্ছে যে, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা অনর্গল উৎপাদন বাড়িয়ে বেতে পারে না। সেই সমাজের পাণ্ডারা যখন মজুরদের বেন্ট কবে পেটের গর্ত ছোট করতে হৃদয় দিয়ে উৎপাদন বাড়ানো প্রোগান ছাড়ল, সেটা হচ্ছে মজুরদের ধোঁকা দেবার চেষ্টা মাত্র। সেজন্তে বস্ত্রকৌশলের পূর্ণ ব্যবহার করাও তার পক্ষে সম্ভব নয়। যে সমাজ সমস্ত মানুষের চাহিদা মেটানকেই সবচেয়ে বড় কর্তব্য মনে করে বস্ত্রকৌশলের পূর্ণ স্বযোগ নিতে পারে সেই বদি সে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সরিয়ে দিয়ে নিজের আধিপত্য

কায়ম করতে পারে। ইতিহাসে এই ধরনের বহু নজির আছে। ভাষ্যযুগের মিশরীয় স্বৈরতন্ত্রকে লৌহযুগের আবির্ভাবের পর গ্রীসের অপেক্ষাকৃত স্বায়ত্তসত্তা সমাজের জগ্রে জাহাঙ্গি ছেড়ে দিতে হয়েছিল। তারপর মধ্যযুগের শেষের দিকে ভারি যন্ত্রপাতির উদ্ভবের ফলে কুটির-শিল্পভিত্তিক সামন্ততান্ত্রিক নতুন আগন্তুক ধনতন্ত্রের হাতে ক্ষমতা তুলে দিতে হয়। সেদিনকার সেই প্রাগৈতিহাসিক ধনতন্ত্রের কাছে আজ "প্রাচুর্য" বা অতুৎপাদন একটা ভয়াবহ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অভাবের জমিতেই তার ফল ফলে, দুর্ভিক্ষ হলেই তার লাভ। প্রাচুর্যের "বিপদ" দেখা দিলেই সে কৃত্রিম কৌশলে অভাবের সৃষ্টি করে। তাই ধনতান্ত্রিক সমাজে যন্ত্রকৌশল শ্রমিকের পক্ষে যন্ত্রদানব। সেই সমাজ ব্যবস্থাকে নতুন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার হাতে পরাজয় বরণ করতে হবে, এই হচ্ছে ইতিহাসের অমোঘ বিধান। সেই নতুন সমাজে সমস্ত লোকের ক্রয়ক্ষমতা থাকার ফলে দেশের বাজারে কোন সময়েই চাহিদার অভাব থাকবে না, এবং মজুরী দিনকে দিন বাড়বে বলে চাহিদাও বেড়ে চলবে। সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রকৌশলের কল্যাণে খাটুনি কমতে থাকবে। মস্তকোর বল বেরাফি; কারখানায় বছর চব্বিশেক আগে প্রথম স্বয়ং চালনা বৈঠক হয়। তারপর সেখানে একটি 'যান্ত্রিক হাত' তৈরি হয় তারপর আসে যুদ্ধ। যুদ্ধের পর নতুন উজ্জয়ে স্বয়ং চালনার দিকে মন দেওয়া হয়। আজ সেখানে গেলে দেখতে পাবেন, সুপারিসর পরিচ্ছন্ন শপগুলিতে ফুটন্ত লোহার বা তেলের দুর্গন্ধ নেই, অলিগলি দিয়ে কোন ট্রিলি চলাকেরা নেই, কোথাও লোহার ঝড়তি পড়তি ছাঁটাই গালা হয়ে পড়ে নেই। লোক নেই, জন নেই, কোন আওয়াজ নেই। মনে হবে যেন এক দৈত্য ঘুমিয়ে আছে।

কিন্তু কারখানায় কাজ বন্ধ হয়নি, মজুর ছাঁটাইও করা হয়নি। ১৯৫৫ সালের তুলনায় উৎপাদন বেড়েছে ৬০ ভাগ। চোখের অলক্ষ্যে যন্ত্র মানুষের হুকুম তামিল করে যাচ্ছে। স্বয়ংক্রিয়তার দক্ষণ বাদে সেখানে আর দরকার নেই তাদের অগ্র কাজ দেওয়া হয়েছে মাইনে বাড়িয়ে। আর যারা নতুন করে তালিম নিয়ে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের উপর খবরদারী করছে, তাদের মাইনে বেড়েছে দেড়গুণ, দ্বিগুণ। কাল তারা ছিল কার্মিক-শ্রমিক। আজ তারা শরীরের পরিশ্রমের বদলে মাধ্যম পরিশ্রম করেই খালাস অর্থাৎ যন্ত্রকৌশল ও স্বয়ংচালনা দৈহিক ও মানসিক পরিশ্রমের ব্যবধান ক্রমশঃ কমিয়ে আনছে। এটা মানুষের মর্যাদা ও গৌরব বাড়ানো না কমানো? যন্ত্রের দৌলতে সোভিয়েতের মানুষের অবসর সময় বাড়বার ফলে সেই অবসরের জমিতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে সব নতুন ফসল ফসবে, তা মানুষের মর্যাদা বাড়াবে না কমাতে? সে ক্ষেত্রে যন্ত্র দানব না দেবতা?

উনবিংশ শতাব্দীতে যন্ত্রীকরণের গতিবেগের তুলনায় আজকে ধনতান্ত্রিক সমাজে স্বয়ংচালনার গতিবেগ বেশি হবে। কারণ আজ বিজ্ঞানকে সচেতনভাবে উৎপাদনের কাজে লাগান হচ্ছে। কিন্তু স্বয়ংচালনা ব্যবস্থা যত বেশি চালু হবে ধনতন্ত্রের নড়বড়ে অবস্থা ততই বাড়তে থাকবে। বিভিন্ন ধনিকের মুনাফার হাবের মধ্যে পার্থক্য বাড়তে থাকার ফলে বাজারে তাদের পরস্পরের সম্পর্কের মধ্যে স্তম্ভ ভাব থাকবে না। কাজে কাজেই গলাকাটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়ে উঠবে আরো সঙ্গীন। সেই সঙ্গে শিল্পের অত্যন্ত যন্ত্রকৌশল

এবং অপেক্ষাকৃত পশ্চাৎপদ কৃষিব্যবস্থার মধ্যে কাঁকটা আরো বেড়ে যাবে। এই ভাবে শুধু কোম্পানীতে কোম্পানীতে কেন, জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে বৈষম্য দেখা দেবে। ওদিকে ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের অগ্রগতির মধ্যে অসমানতা বাড়তে থাকবে, দূরত্ব বাড়তে থাকবে অত্যন্ত শিল্পপ্রধান দেশ ও অল্পশিল্প দেশগুলির অর্থনীতির মধ্যে। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি ঐ সব অল্পশিল্প দেশের অর্থনীতির মধ্যে 'সাহায্যের' নাম করে মিলিত হবার চেষ্টা করে শোষণের মতলবে। কিন্তু আজ সমাজতন্ত্রের দেশগুলি যন্ত্রকৌশলের অভূতপূর্ব উন্নতি ও ব্যবহারের কল্যাণে আমাদের মত গরীব অল্পশিল্প দেশের সত্যিকার অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা নেবে। ধনতান্ত্রিক সমাজে যন্ত্রকৌশল, বিশেষ করে স্বয়ংক্রিয় উৎপাদন কৌশল ধনিক শ্রেণীর উৎপাদিকা শক্তি ও শ্রমিক শ্রেণীর ক্রয়শক্তির অন্তর্বিবোধ তীব্র থেকে তীব্রতর করে তুলবে। কারণ মজুরী হিসাবে কম টাকা খরচ করে মালিকরা বেশি মাল তৈরি করতে পারবে। ফলে উৎপাদিকা শক্তির, জনগণের ক্রয়শক্তিকে ছাপিয়ে বাবার যে স্বভাবজাত বৈক ধনতন্ত্রের মধ্যে আছে সেটা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের দক্ষণ আরো জোরদার হতে থাকবে—যার পরিণাম হবে অর্থনৈতিক সংকট। আসলে স্বয়ংচালনা ব্যবস্থা সমাজতন্ত্রের জিনিস। মানুষের বুদ্ধি ও মেহনতের চরম পরিপ্রকাশ হিসেবে স্বয়ংচালিত উৎপাদন ব্যবস্থার সফল পরিণতি ঘটতে পারে, সেই সমাজে যেখানে উৎপাদনের উপায় উপকরণ মুষ্টিমেয় কয়েকজনের উৎসবৃত্ত মূল্য কাঁপিয়ে তোলবার হাতীয়ার না হয়ে দমগ্র সমাজের মালিকানার থেকে উৎপন্ন সামগ্রী সমাজের সমস্ত মানুষের হাতে তুলে দেবে।

স্বয়ংচালিত যন্ত্রকৌশল ও পারমাণবিক শক্তি ধনতান্ত্রিক সমাজের পক্ষে এক প্রচণ্ড ভাঙ্গনের শক্তি। উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদিকা সম্পর্কের অন্তঃসংঘাতকে তারা বিক্ষোভের রুখে নিয়ে যাবে। বিংশ শতাব্দীর সর্বস্বারা বিপ্লবের যুগে বৈপ্লবিক যন্ত্রশক্তিরূপে স্বয়ংচালনা ও পারমাণবিক শক্তি হবে সমাজ বিপ্লবের অগ্রদূত। বিপ্লবের গর্ভে যে নতুন সমাজের অত্যাশ্রয় হবে সেখানে মানুষকে তার ক্রটি-কটির জন্ত হুর্ভাবনা করতে হবে না। ভাল ভাবে খেয়ে পরে অল্পস্ব অবসর নিয়ে সে জ্ঞানচর্চা করতে পারবে। সেই সমাজের শেষ স্তরে মাইনে মজুরী বলে কিছু থাকবে না। কারণ যন্ত্রকৌশল ও বিজ্ঞানের দৌলতে তখন এত ভোগ্য সামগ্রী তৈরি হবে যে মজুরী বা মাইনের বাঁধন দিয়ে ক্রয়ক্ষমতা বেঁধে দিয়ে পণ্যের বাজারে "রেশন" চালু রাখার দরকার হবে না। সকলে সাধ্যমত সমাজের সেবা করবে, সমাজ সকলকে খালি সমমূল্যের পারিশ্রমিক না দিয়ে প্রত্যেককে পরিপূর্ণ জীবন বাপনের মত জিনিষপত্র দেবে। সেখানে সকলেই কর্মনিপুণ্য অর্জন করে শ্রেণীবিভেদের অন্তরায় দূর হবার পরবর্তী অগ্রগতির অন্তরায় অর্থাৎ বল ও বুদ্ধির ব্যবধান দেবে ঘুচিয়ে, সকলেই হবে একাধারে শ্রমিক ও বুদ্ধিজীবী। অতএব যে অতীতের পুনরুজ্জীবনকারী নু-সমাচার প্রচার করা আজ অনিশ্চয়তাবাদ ও অতীত পূজার বৌদ্ধিতে বসে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের বোদ্ধাদের রসদ ও বাক্সদ জোগাবার চেষ্টা করছেন, বায়রনের ভাষায় বলা যায় যে, যে হাতের গাঁটা একদিন তাঁরা খেয়েছেন আজ সেই হাতই তাঁরা চাঁটছেন এবং বুকের মধ্যে নিজের প্রতি ঘুণায় ছলে মরছেন। যন্ত্র মানুষকে কি স্তম্ভ দেবে? তাঁদের এই প্রপ্তের জবাব হচ্ছে—হ্যাঁ দেবে, নিশ্চয়ই দেবে।

বীরগণা জুড়িখের কীর্তি ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হ'য়ে আছে।

জগতে জুড়িখই প্রথম নারী, যিনি দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করেছিলেন বীর রূপে এবং বুদ্ধিকে বোল আনা কাজে লাগিয়ে।

সে প্রায় দু' হাজার বছর আগেকার কথা—খৃষ্টাব্দের তখন জন্মই হয়নি, ইহুদি জাতি দুনিয়ার অজ্ঞতম শ্রেষ্ঠ জাতি। তাদের দেশ ছিল জেরুজালেম। আজ এই ইহুদি জাতি খৃষ্টানদের অমাত্রনৈতিক অত্যাচারে দুনিয়া থেকে লুপ্তপ্রায়,—আজ তারা গৃহহীন, দেশহীন, জাতিহীন, বাধাবর; কিন্তু আমি বখনকার কথা বলছি, তখন তাদের দেশ ছিল, জাতি ছিল।

এই ইহুদি জাতিরই একটি শাখা আসিরীয় রাজ্যের অত্যন্ত অত্যাচার সহিতে না পেয়ে জেরুজালেমে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। তখন জেরুজালেম ছিল সবুজ পাইন আর দেবদারু গাছে ঢাকা ছোট পাহাড়ী দেশ—ইহুদিরা এই দেশটিকে খুব পছন্দ করেছিল আর ভেবেছিল, এই সুরক্ষিত জায়গায় এখন থেকে তারা সম্পূর্ণ নিরাপদ—আসিরীয় রাজ্যের অত্যাচার অত্যাচার থেকে অন্ততঃ তারা মুক্ত।

সেখানে কয়েক বছর তারা খুব সুখেই দিন কাটালো। অবশেষে এক দিন তাদের ভুল ভাঙলো। আমরাত ও আমাদের গল্প আরম্ভ করবো সেই দিন থেকেই।

তখন সবে সূর্যোদয় হ'য়েছে, একজন পথিক একটা মস্ত বড় শাদা ঘোড়ায় চেপে ইহুদিদের নগরের মধ্যে এসে প্রবেশ করলো। অচেনা লোক দেখে কোঁড়হলী নর-নারীর দল ভিড় করে দাঁড়ালো তার চার পাশে। সৈনিকের হাতে একখানা খোলা চিঠি—সে এসে দাঁড়ালো ইহুদিদের সর্দারের বাড়ীর দরজায়।

কিন্তু সর্দারকে আর ডাকতে হলো না, তিনি নিজেই বাড়ীর ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে দেখেন, একজন আসিরীয় সৈনিক তার বাড়ীর দরজায় ব'সে—দেখে তিনি অতিমাত্রায় বিস্মিত হলেন। ক্রমে তার বিস্ময় শংকায় পরিণত হ'লো। চিঠিখানা প'ড়েই তা হাতের মুঠোর চেপে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন, বাবার সময়ে সর্দার সৈনিককে উত্তরের জ্ঞাত কিছু সময় অপেক্ষা ক'রতে ব'লে গেলেন।

ক্রমে ক্রমে চিঠির কথা সমস্ত নগরে ছড়িয়ে প'ড়লো। যুবক-যুবক-বালক সবাই শুনলো। তারপর একে একে তারা এসে সমবেত হ'লো সর্দারের বাড়ীতে—এক অজানা শংকায় থেকে থেকে কেবলই তাদের সকলের মন হলে উঠছিলো।

শেষকালে সর্বসমক্ষে চিঠিখানা পড়া হ'লো। আসিরীয় সম্রাট জানিয়েছেন তিনি দিগ্বিজয়ে বের হবেন, তার জ্ঞাত ইহুদি প্রজাদের অন্তত হাজার সৈন্য দিয়ে তাঁকে সাহায্য ক'রতে হবে। অন্তর্ধায় ইহুদিদের রাজ্য আক্রমণ ক'রে তিনি তা ধ্বংস ক'রে ফেলবেন।

চিঠি প'ড়ে সবাই খানিকক্ষণ নির্বাক নিম্পন্দ হ'য়ে ব'সে রইলো, কিন্তু সে মুহূর্ত মাত্র। তারপরেই সবাই বড়ের বেগে পা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। একটা অপারিসীম অপমান আর বেদন-বাধ তাদের মনকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিল। তরুণরা অপমানে বিহ্বল হ'য়ে উঠলো,—এ অপমান কিছুতেই তারা সহ্য ক'রবে না। আসিরীয়র রাজা এক সময়ে তাদের মনিব থাকলেও আজ আর তিনি মনিব নন। সুতরাং তার এ অজ্ঞাত আদেশ ইহুদিরা মানতে রাজী নয়।

বীররমণী জুড়িখ

শ্রীঅমল সেন

ইহুদিদের সর্দার আসিরীয় দুতের চোখের সামনে রাজ্যের সেই আদেশ-লিপি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো ক'রে বাতাসে উড়িয়ে দিলো। আসিরীয় রাজদূত শুধু হাতে নিজের দেশে ফিরে গেলো।

আসিরীয় দুত ফিরে গেলো। কিন্তু আসিরীয়রা যে অপমানের প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়বে না—একথা ইহুদিরা ভালো ক'রেই জানতো। তারা তাই ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হ'তে লাগলো।

সমগ্র ইহুদি জাতি পবিত্র ঐক্যমাত্র দীক্ষিত হ'য়ে এক বৃহৎ সংঘবদ্ধ শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হ'লো। তারা কয়েক মাসের প্রয়োজন মিটাবার পক্ষে উপযুক্ত ঋণ সংগ্রহ ক'রে সমস্ত নগরবাসীদের নিয়ে এক উঁচু পাহাড়ী দুর্গে এসে আশ্রয় নিল। দুর্গম অভেদ সে বন-দুর্গ। বাইরে থেকে এই দুর্গের অবস্থান সহজে লোকের চোখে পড়ে না।

কিছুদিন পরে আসিরীয় সম্রাটের বিরাট সৈন্তবাহিনী এসে ইহুদিদের নগরবে মধ্য প্রবেশ ক'রলো, কিন্তু তারা দেখে আশ্চর্য হ'লো, ইহুদিদের ঘর-বাড়ী সব শূন্য প'ড়ে আছে—কোথাও কোনো লোকজন নেই। সেনাপতি অবাক হ'য়ে ভারতে 'লাগলেন, লোকজন সব গেলো কোথায়? কোথায় যেতে পারে? তাঁর সৈন্তরা সব বেরিয়ে প'ড়লো ইহুদিদের সন্ধানে। অবশেষে বহু কষ্টে ইহুদিরা যে দুর্গে আশ্রয় নিয়েছিল সেই দুর্গের সন্ধান মিললো। কিন্তু দুর্গঘাটে উপস্থিত হ'য়ে দেখলো, দুর্গভোরণ বন্ধ। বিপুল বেগে তারা গিয়ে তাঁণিয়ে প'ড়লো সেই দুর্গের উপর, তাদের প্রচণ্ড আঘাতে দুর্গ-দুয়ার বন্ধ-বন্ধ ক'রে কেঁপে উঠলো—কিন্তু ভাঙলো না। আঘাতের পর আঘাতেও তা রইলো অটুট, অব্যাহত। আসিরীয় সৈন্তদল প্রাস্ত হ'য়ে গভীর হতাশায় ব'সে প'ড়লো। সেনাপতি বললেন, পাহাড়ের চারদিক ঘুরে খুঁজে দেখো এই দুর্গের আর কোনো দিকে কোন দুয়ার আছে কি না।

সৈন্তরা তীরবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো এবং নগর প্রদক্ষিণ ক'রে এসে জানালো, না ছুঁচুর, এর চার দিকে ঝাড়া উঁচু পাহাড়—টোকার কোনো উপায় নেই।

ইহুদিদের দুর্গঘাটে বিরাট আসিরীয় সৈন্তবাহিনীর ছাউনি প'ড়লো। তারা দিনের পর দিন দুর্গে প্রবেশের উপায় অনুসন্ধান ক'রতে লাগলো, কিন্তু কোনো উপায়ই মিললো না। এদিকে তাদের ঋণ যদিও যথেষ্ট পরিমাণে ছিল কিন্তু জল ফুরিয়ে আসতে লাগলো। বিশেষ চিন্তার কথা। জল ফুরিয়ে গেলে বিপদের আর অন্ত থাকবে না। সেনাপতি মশাই ভয়ানক চিন্তিত হ'য়ে প'ড়লেন। তিনি কয়েক জন সৈন্তকে ডেকে ব'ললেন, দেখো, এটা পাহাড়ী দেশ, কাজেই এখানে জল না থেকেই পারে না। খুঁজে বের করো কোথায় ঝরণা আছে।

সৈনিকরা ঝরণার অনুসন্ধানে বের হলো।

ইহুদিরা শত্রুর ভয়ে দিনের বেলা কখনো ঝরণা থেকে জল নিতে আসতো না, পাছে শত্রুর টের পেয়ে ঝরণা আটক করে। তা হ'লে তারা জলের অভাবে শুকিয়ে ম'রবে। তারা রাত্রির অন্ধকারে চুপি চুপি শত্রুদের অলক্ষ্যে এসে ঝরণা থেকে কলসী ভ'রে

জল নিয়ে যেতো। কাজেই আসিরীর সৈন্যরা সহজে এর সন্ধান পেলে না।

কিন্তু একদিন আসিরীর সৈনিকদের কাছে এ রহস্য খরা পড়ে গেলো।

ঝরণার সন্ধান পাওয়া গেছে শুনে সেনাপতি তো এক লাফে স্বর্গে উঠলেন। তৎক্ষণাৎ হুকুম দিলেন, বাও, একুশি দু'শো তীরন্দাজ নিয়ে গিঁধে ঝরণা আটকাও। দিনে বা রাতে কোনো ব্যাটা ইহুদি যেন তা থেকে এক বড়া জলও না নিতে পারে।

এমনি ভাবে ইহুদিদের জলের উৎস অবরুদ্ধ হলো।

ইহুদিরা বিশেষ চিন্তিত ও শঙ্কিত হয়ে উঠলো। আসিরীর সৈন্যরা যদি এক মাসের পরও দিনের পর দিন অবরোধ চালাতে থাকে তা হলে উপায়? ইহুদিদের মুখে একটা চিন্তার কালোছায়া ঘনিয়ে এলো।

আর আসিরীর শিবিরে উঠতে লাগলো ঘন ঘন উল্লাসধ্বনি।

দেড় মাস পরে—

আসিরীর সৈন্যদের অবরোধ তুলে ফেলবার কোনো লক্ষণই দেখা গেলো না। ইহুদিদের দুর্গ তখনও অবরুদ্ধ। এদিকে সঞ্চিত জল ফুরিয়ে গেলো। প্রথম দু-চারদিন ইহুদিরা মুখ কুজ জলের অভাব সহ করতে চেষ্টা করলো—কিন্তু জলের কষ্ট কি সওয়া বার? তারা দু-চারজন মরিয়া হয়ে ছুটে গেলো শত্রুর কবল থেকে ঝরণা উদ্ধার করতে—ফল হলো মৃত্যু। শত্রুর বিবম্বাখা তীর এসে তাদের কষ্ট বিদ্ধ করলো।

শেষ কালে জলের অভাব তীব্র হয়ে উঠলো, সমস্ত নগরময় হাহাকার উঠলো—জল, জল! জলের তৃষ্ণায় অধীর হয়ে সবাই পাগলের মতো ছুটে গেলো সর্দারের কাছে। কিন্তু সর্দার কি করবেন? তারা তৃষ্ণার পাগল হয়ে গর্জে উঠলো, এ স্বাধীনতা আমরা চাই না। যে স্বাধীনতা আমাদের ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার জলটুকু পর্যন্ত দিতে পারে না তেমন স্বাধীনতা নিয়ে আমাদের কি হবে? আমরা বাঁচতে চাই। তুমি আমাদের অমুষ্ণিত দাও সর্দার, আমরা শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ করি।

কিন্তু সর্দার অবিচলিত। বীর গভীর কণ্ঠে তিনি বললেন, না, তা হয় না।

তারা আবার চীৎকার করে উঠলো, হয় না? কেন হয় না? সর্দার সে কথার জবাব না দিয়ে বললেন, 'ভাই সব, তোমরা যে এতো দুর্বলচিত্ত তা আমি জানতুম না। সময় বহন ভালো থাকে তখন বীরত্ব অনেকেই দেখাতে পারে। খাঁটি বীরত্বের পরীক্ষা হয় দুঃসময়ে। জাতির স্বাধীনতা নিয়ে যেখানে প্রাণ সেখানে এর চাইতেও বাতনা, এর চাইতেও হৃদয়বিদারক দুঃখ দেখে বুক ফেটে গেলেও তা সইতে হবে। আজ শত্রুর কাছে নতজাহ্নু হয়ে জল ভিকা করে তৃষ্ণার দাবদাহ থেকে প্রাণ হয় তো বাঁচতে সমর্থ হবে, কিন্তু তার পর? তার পর দীর্ঘ দিন দীর্ঘ যুগ জাতির ভবিষ্যৎ যে গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা পড়ে থাকবে, তার কথা ভেবে দেখেছো কি? ভেবে দেখেছো কি—পর্যাবৃত্তি এর চাইতেও শোচনীয় মৃত্যু, এর চাইতেও তিক্ততর বেদনা? আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণ

তখন অহরহ যে অভিশাপ দেবে, তারা যে অজ্ঞ বিসর্জন করবে তার দাহ কবরেও যে আমাদের তির্যোতে দেবে না।

তবে কি করবো সর্দার? এ তৃষ্ণার জ্বালা যে আর সইতে পারি না।—তাদের উত্তর শুধু বীর বীর শাস্ত হ'য়ে এলো।

সর্দার বললেন, আজ তোমরা সবাই যে বার ঘরে ফিরে যাও ভাই! গিরে দেবতার চরণে প্রার্থনা করো, বলো, আমাদের বাঁচাও, তৃষ্ণার দাহ থেকে আমাদের রক্ষা করো! পরাবৃত্তির বন্ধন থেকে আমাদের মুক্ত রাখো। তার পরেও যদি কিছু না হয় তখন দেখা বাবে পরামর্শ করে।

কী করবেন তখন সর্দার? সর্দার চেরে দেখলেন একটি মেয়ে, তার চোখে মুখে অপূর্ণ দীপ্তি ফুটে বেরছে—দেবতার কাছে প্রার্থনা করেও যদি আপনাদের ঈপ্সিত ফল না মেলে তা হ'লেই কি আপনারা আপনাদের দেশের স্বাধীনতাকে বিদেশী শত্রুর পায়ে উৎসর্গ করবেন? চকিতে সবাই মেয়েটির দিকে ফিরে তাকালো।

এই-ই জুডিথ।

তীক্ষ্ণ বাঁঝালো তার কণ্ঠ,—নিরাভরণ, রক্তবিশ, জ্যোতির্মণ্ডিতা অপূর্ণ যুবতী বিধবা। সকলেই বিস্মিত কণ্ঠে বলে উঠলো,—জুডিথ!

জুডিথ তার কণ্ঠকে আরো তীক্ষ্ণ, আরো বাঁঝালো করে জবাব দিলো, হঁ, আমি জুডিথ। আমি জানতে চাই, এই কি বিশ্বাস-পরায়ণ ইহুদিদের মতো কথা? এই কি মানুষের কাজ? দেবতা কি আমাদের গোলাম? সে কি কারুর, তোয়াক্কা রাখে যে আমরা তার ওপরে হুকুম চালাবো? কতদিনে তিনি দয়া করবেন তা তাঁর ইচ্ছা—পাঁচ দিনেও করতে পারেন, পাঁচ হাজার দিনেও করতে পারেন, ততদিন কি আমরা নিশ্চেষ্ট হয়ে ব'সে থাকবো? আর যদি প্রার্থনা বিফল হয় তখনই কি আমরা মাটিতে লুটিয়ে পড়বো অসহায়ের মতো? আমরা কি মানুষ নই? নিজের স্বাধীনতার জন্য যদি আমরা নিজেরা যুদ্ধ করতে না পারি তবে মানুষ হ'য়ে জন্মগ্রহণ করেছিলাম কেন? আপনারা আত্মসমর্পণের কথা ভুলে যান। সবাইকে একথা বেশ পরিষ্কার ভাবে জানিয়ে দিন—আমরা শিশাশার তিলে তিলে শুকিয়ে মরবো তবু শত্রুর কাছে মাথা নোদাখাবো না।

সর্দারের মনে হ'লো, ভগবানের আদেশবাণী যেন জুডিথের মধ্য দিয়ে আজ আত্মপ্রকাশ করছে। তিনি বললেন, তবে তাই হোক মা! পুণ্যবতী তুমি, তোমার কথা কখনো মিথ্যা হবার নয়। সর্দারের আদেশে সবাই যে বার বাড়ী ফিরে গেলো। জুডিথও বাড়ী ফিরে এলো।

সেদিন রাত্রে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে জুডিথ স্বপ্ন দেখলো। দেখলো, সেই শৈলশিখরে ঝাড়িয়ে সে একা—আকাশ দিয়ে নিরাশার কালো ঢেউ ছুটে আগছে—নীচে তৃষ্ণার্ত নর-নারীর বুকফাটা চীৎকার। এমন সময়ে কে যেন তাকে উরুকাঠে ব'লে উঠলো, জুডিথ! এ জাতিকে নিরাশার হাত হ'তে, শিশাশার হাত হ'তে বাঁচাবার ভার তোমার।

জুডিথ বললো, দীনা নারী আমি, আমার সে শক্তি কোথায় প্রভু?

উত্তর হ'লো, তুমি দীনা নও। চেয়ে দেখো, শক্তি তোমার নিজের মধ্যে—তোমার রূপ, তোমার মেধা, তোমার নির্ভীকতার।

কে এই জুড়িখ? সকল কালের সকল দেশের স্বাধীনতার
পূজারীদের ইনি নমস্কা।

মিরারী—ইহুদির আদরের কথা জুড়িখ। অগ্নি স্বন্দরী, দেখে
মনে হ'তো যেন জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী দুধপাথর খোলাই ক'রে এক
জীবন্ত নারী-প্রতিমা সৃষ্টি ক'রেছেন, চাইলে চোখ ফেরানো যেতো
না। একদিন মানাসেসের সংগে তার রিয়ে হ'য়ে গেলো।

কিন্তু কয়েক দিন বাদেই জুড়িখ বিধবা হ'লো। মানাসেস
অনেক ধনদৌলত বেখে যারা গিয়েছিল, কিন্তু জুড়িখ ধনদৌলতের
জন্ত লালায়িত ছিল না। স্বামীর শোকে সে সন্ন্যাসিনীর মতো
হ'লো—নিরাভরণা, উপবাসক্ষীণা, কক্ষকেশ, সর্পগ্রকার বিলাসিতা
বর্জিত। এমনি ভাবে জুড়িখের দিনের পর দিন কাটছিলো।

কিন্তু সেদিন োরের আলোর তার স্বপ্ন ভেঙে গেলো, সে চোখ
মেলে চাইলো। সবাই অবাক হ'য়ে দেখলো, জুড়িখ যেন আর
সে জুড়িখ নেই। কী অগ্নি এক আনন্দ এবং আনন্দের আলোকে
যেন তার এতদিনকার জমাটবাঁধা অন্ধকার দূর হ'য়ে মুখে হাসি
ফুটে উঠলো।

সারাটা দিন জুড়িখ আনন্দ ক'রে কাটালো, সন্ধ্যাবেলার
সদরকে ডেকে এনে নিবিবিলিতে হুঁজনে অনেককণ ক'রে
পরামর্শ ক'রলো। তারপর জুড়িখ তার পরিচারিকাকে ডেকে
ব'ললো, আমার স্বন্দর ক'রে সাজিয়ে দাও তো?

বৃদ্ধা পরিচারিকা জুড়িখের একথা প্রথমটা বিশ্বাস ক'রতে
পারছিল না, ভাবলো, জুড়িখ ঠাটা ক'রছে।

জুড়িখ তার মুখ দেখে তার মনের ভাব বুঝতে পারলো, ব'ললো,
ঈ ক'রে চেয়ে দেখছো কি? জোরঙ থেকে আমার ভালো ভালো
গয়না-পতুর জামা-কাপড় সব বের ক'রে নিয়ে এসো। আমি আজ
অভিসারে যাবো।

পরিচারিকা আর কোনো কথা না ব'লে তার আদেশ মতো
জিনিষপত্র এনে জুড়িখকে সাজাতে ব'ললো। বসন-ভূষণে
বদলাংকারে তিলোত্তমা সেজে জুড়িখ বের হ'লো অভিসারে। সংগে
সেই বৃদ্ধা পরিচারিকা। পরিচারিকার হাতে চার-পাঁচদিনের
উপযুক্ত খাবার আর সেখানে গিয়ে প'রবার মতো কাপড়-চোপড়।
পরিচারিকা জানে না কোথায় তারা যাচ্ছে।

নিম্নতর অন্ধকারের বৃক পথ রচনা ক'রে চ'লেছে ছটি নারী।
জুড়িখ আগে আগে, পিছনে সেই কৌতূহলী পরিচারিকা। হুঁজনে
পাহাড়ী পথ বেয়ে তর-তর ক'রে নীচে নামতে লাগলেন। নগরের
সীমান্তে পৌছানোমাত্র ঘারী ঘার খুলে দিলো, জুড়িখ বাইরে
শত্রু-শিবিরের সামনে এসে দাঁড়ালো। সবাই এসে ভিড় ক'রে
তাকে ঘিরে দাঁড়ালো, চার দিকে লুকলুক। কিন্তু জুড়িখ
সেদিকে দু'পাশ না ক'রে পরম নিশ্চিন্তভাবে ব'ললো,—তোমাদের
সেনাপতি মশাই কোথায়?

একজন প্রাণ ক'রলো, তার কাছে তোমার কি দরকার?

জুড়িখ উত্তর দিলো,—আমি একজন হিব্রু নারী, আর এই আমার
পরিচারিকা। বিনা শত্রুকে ইহুদিদের দেশ জয় করার ফন্সী
আমি জানি।

সবাই কোলাহল ক'রে উঠলো এক সংগে—কি? কি বন্দী?

জুড়িখ তাকিল্যের সুরে ব'ললো, তোমাদের সেনাপতি ছাড়া আর
কাউকেই তা ব'লবো না।

অগত্যা জুড়িখকে আর তার পরিচারিকাকে সেনাপতির কাছে
হাজির করা হলো।

জুড়িখের অতুলনীয় রূপ দেখে সেনাপতি মুগ্ধ হ'লেন। এমন
সুন্দরী মেয়ে তিনি জীবনে কখনো দেখেননি। বহু ব'ষ্ট আশ্চর্যস্বরূপ
ক'রে সেনাপতি জিজ্ঞাসা ক'রলেন, কি চাই তোমার?

আমি আপনাদের বিনা সৈন্তকয়ে শত্রুজয় করার উপায় ব'লে
দিতে পারি,—জুড়িখ ব'ললো।

সেনাপতি জিজ্ঞাসা ক'রলেন, তাতে তোমার কি লাভ?

এক অদ্ভুত কুটিপ হাস্যে সেনাপতিকো মুগ্ধ ক'রে জুড়িখ ব'ললো,
সেনাপতি মশাই, কেউ যদি আপনার শ্রেষ্ঠ সম্পদ, ইহলোকের
সর্বোত্তম বস্তু লুণ্ঠন ক'রে নিতে আসে তো কি দণ্ড আপনি তার
বিধান করেন?

মুগ্ধ হ'লেন।

আমিও তাই ক'রবো সেনাপতি! নগরের কেউ আমাকে
সাহায্য ক'রতে পারবে না। তাই তো বেরিয়ে এসেছি ঐতিহাসিক
আগুন বৃক নিয়ে।

তাহ'লে তুমি আমাদের শিবিরেই থাকছো তো?

ঈ, আপাতত তো আছি। দরকার মতো নগরে চুকে
সংবাদাদি নিয়ে আসবো।

জুড়িখের বাস করার জন্য একটি পৃথক তাঁবু ছেড়ে দেওয়া হ'লো।
তার পর এলো রাশি রাশি খাবার, কিন্তু সে খাবার জুড়িখ স্পর্শও
ক'রলো না। তার নিজের সংগের খাবারই তার পক্ষে যথেষ্ট
ছিল।

এমনি ক'রে জুড়িখ শত্রু-শিবিরে আস্তানা ক'রলো।

তিন দিন তিন রাত্রি কেটে গেলো—জুড়িখ বসে বসে শত্রু-
ধ্বংসের অবসর খুঁজছিলেন। অবশেষে এক দিন সে অবসর এলো।
সেনাপতি রাতে জুড়িখকে নিজের শিবিরে নিমন্ত্রণ ক'রে পাঠালেন,—
জুড়িখ সে নিমন্ত্রণ উপেক্ষা তো করতেনই না বরং সাগ্রহ তা গ্রহণ
করলেন। এই-ই তার শত্রু ধ্বংস করার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। তিনি
বুঝলেন, এই-ই শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব স্বাধীনতার মন্দিরে পূজা দেবার।
অনেককণ ব'সে তিনি দেবতার পায়ে প্রার্থনা জানালেন,—দেখকে
শত্রুর হাত হ'তে মুক্ত করবার জন্য আমার এ রূপ নিয়ে খেলা,
আমার এ প্রেমের অভিনয়—এর জন্য নারীর রূপকে তুমি অভিসম্পাত
ক'রো না ঠাকুর! তুমি আজ আমার রূপকে শতগুণে বহিত করো।

সেনাপতির স্মৃতিতে সেদিন জোয়ার ডাকলো। স্বয়ং জুড়িখ—
মনোমোহিনী রূপসী, অপরূপাভা জুড়িখ আজ মহাদাত্রী। কাজেই
পানের মাত্রা অস্বাভাবিক রকম বেড়ে গেলো। পেয়ালার পর
পেয়লা নিঃশেষ হচ্ছে। শেষে এমন হ'লো যে, আর মাথা তোলার
শক্তি নেই। সেনাপতি শয্যা লুটিয়ে পড়লেন। জুড়িখ একা,—
তখন ঘরে আর কেউ নেই। গভীর রাত্রি।

জুড়িখ সচকিত হ'য়ে দাঁড়ালো। দেশের শত্রু, জাতির শত্রু,—
তাকে ধ্বংস করার এই তো উপযুক্ত সময়।

কিপ্রহেতে বসনের তল হ'তে একখানা তীক্ষ্ণ কুণ্ডল ছুরিকা

বের করে দৃঢ় হৃদয়ে ধরে একবার ঈশ্বরের নাম নিলো জুড়িধ, তার পর সেই ছুরি সজোরে সেনাপতির গলায় বসিয়ে দিলো,—শির স্বচ্ছ্যত হ'লো। সেনাপতি একবার হ'ই করায়ও অবসর পেলো না। জুড়িধের হাত রক্তে রঙীন হ'য়ে উঠলো।

পরিচারিকা এতক্ষণ বাইরে বসেছিল। জুড়িধের আহ্বানে ভিতরে এসে স্তম্ভিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। জুড়িধ বিনা বাক্যে ছিব্ব অকম্পিত হস্তে সেনাপতির ছিন্নমুণ্ডটা ধ'রে পরিচারিকার ঝড়িতে তুলে দিলো।

পরিচারিকা ভয়ে ধরধর করে কাঁপতে লাগলো।

জুড়িধ বললো, চলো, এখনই আমাদের নগরে ফিরতে হবে।

দু'জনে তাঁবুর বাইরে এসে দাঁড়ালো, কেউ তাদের বাধা দিলো না। কারণ তেমন হুকুম ছিল না। অন্ধকার ভেদ করে দুজনে এসে নগরের তোরণের কাছে দাঁড়ালো,—তোরণঘাট খুলে গেলো। সেনাপতির মুণ্ডটা নগর-সীমান্তে ঝুলিয়ে রেখে জুড়িধ খুব জোরে

রণভেরীতে যা দিলো। পূর্ববন্দোবস্ত মতো হাজার হাজার বীর ইছদি যুবক অস্ত্র হাতে নিয়ে ছুটে এলো। আবার নগর-তোরণ খুলে গেলো।

আসিরীর সৈন্যরা এ-সবের কিছুই টের পারনি। টের পেলো বখন তখন চারিদিকে ইছদি-সৈন্য। সবাই চোঁচিয়ে উঠলো। সেনাপতি কোথায়? সেনাপতি কোথায়? সেনাপতির তাঁবুতে দলে দলে সৈন্য ছুটে গেলো, গিয়ে দেখে, সেনাপতির বড়টা মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। সৈন্যরা ভয়ে তত্রস্ত হ'য়ে প'ড়লো। সেনাপতির মৃত্যুতে ভীত হ'য়ে যে বেদিকে পারলো ছুটে পালালো।

পরদিন বখন পূর্বের আকাশ লাল হ'য়ে উঠলো, দেখা গেলো, প্রান্তর আসিরীর সৈন্যদের শবে পরিপূর্ণ। একটি জীবিত আসিরীর সৈন্যও সেখানে নেই।

বীরগণনা জুড়িধের কীর্তি ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে রইলো। জুড়িধই বোধ হয় অগতের ইতিহাসে স্বাধীনতার প্রথম পূজারিণী।

ব্যর্থ সাধনা

শ্রীবেলা বন্দোপাধ্যায়

মনেতে ছিল যে নীরব বাসনা
তোমারই অর্থ করিব রচনা
আমারই নীরব সাধনা দিয়া,
তুমি তো জানিতে মনের বাসনা
চিরদিন আমি করেছি কামনা
তোমায়ে লাভিব শ্রেষ্ঠ সাধনা দিয়া।

মনে ছিল আশা, সাধ্য ছিল না সে সাধ সাধিতে,
তবু নিশি-দিন করেছি কামনা
সাধিতে হইবে প্রাণের সাধনা
কঠোর সাধনা দিয়া।

কত বস্ত্রী শুনায়েছে গান, তোমার বস্ত্র আনি
মোর গীতহীনা বীণা পড়ে থাকে
তোমারই বেদীর পরে,
ওগো, একটু করুণা লাগি
ব্যর্থ হবে কি মোর শ্রেষ্ঠ সাধনাখানি?

তুমি তো জান, এক তান
আমি সেখেছি শতেক বার,
তবুও তোমার কটাক্ষ হয়েছে যে উপহার,
তুমি জান ওগো, করি নাই হেলা
তোমায়ে শোনাতে মোর এই দীন বীণা
করেছে প্রয়াস শতেক বার।

তোমার শ্রবণে হইবে মধুর
ভাবিয়া মনেতে বুঝাই আমি যে সেখেছি সুর,
বুঝাই হবে কি এ সুর সাধনা নীরব বাসনা মোর?
মনেতে ছিল যে অনেক আশা
আমার সুরেতে ফুটিবে সে ভাষা;
আজি এনেছি বহিয়া ছিন্নতন্ত্রী নীরব স্নান
কেরাও মুখ, করো গো একটু করুণা দান।
কেল গো অশ্রু একটি বিন্দু করুণাখানি,
সব হতে তবে সার্থক হবে মোর ব্যর্থ সাধনাখানি।

অচ্যুত অক্ষয় শ্রীমদ্রামায়ণ অক্ষয়কুমার ঘোষ

ধারাবাহিক জীবনী-রচনা।

নিমাই-ই নতুন কৃষ্ণ। একাধারে রাধাকৃষ্ণ।

কৃষ্ণই 'রসনাং রসতমঃ'। সর্বভূতমনোহর। 'যে রূপের এক কণ, ডুবায় যে ত্রিভুবন, সর্বপ্রাণী করে আকর্ষণ।' ত্রিজগন্মানসাকর্ষী মুরলীকলকুঞ্জিত। কৃষ্ণের তিনটি বাঁশি। বৈণবী, হৈমৌ আর মণিময়ী। যখন গরু চরায় তখন সহচর রাখালদের আনন্দ দেবার জন্তে বৈণবী বাজায়। যখন গোপীদের আকর্ষণ করবে তখন বাজায় হৈমৌ। আর মণিময়ী? যখন সম্মোহিত করবে ত্রিজগৎকে। যখন মস্ত ময়ূর নৃত্য করবে আনন্দে। কৃষ্ণসারগেহিনী হরিণী মুগ্ধ হয়ে ছোটোছুটি করবে, কখনো বা গাঢ় প্রণয়দৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে থাকবে স্থির হয়ে। যখন স্তনক্ষরিত স্নেহগ্রাস খেতে ভুলে যাবে গোবৎসেরা। প্রণতভারবিটপী ফলে-পুষ্পে মধুধারা বর্ষণ করবে। আবর্তহলে ভাবোচ্ছ্বাস জাগবে নদীতে। কৃষ্ণের তিন বাঁশি তাই আনন্দিনী, আকর্ষিণী আর সম্মোহিনী। যার আকর্ষণে বঙ্কো-বিলাসিনী লক্ষ্মী পর্যন্ত আকৃষ্ট। 'যার মাধুরীতে করে লক্ষ্মী-আকর্ষণ।' যার 'পীরিতিময় প্রতি অঙ্গ', যে 'কেবল রসনিরমাণ'। সৌভাগ্যের 'পরং পদ', ভূষণেরও ভূষণস্বরূপ।

কৃষ্ণাঙ্গ মাধুর্যসিদ্ধ। ক্ষীরোদকশায়ী। 'আমি ক্ষীরে ভাসি দিবানিশি ক্ষীরোদবিহারী।' কৃষ্ণের রূপ অসমোক্ষ, অসম আর অনুক্ষ, অর্থাৎ এর সমানও কিছু নেই, অধিকও কিছু নেই। এরূপ অনন্তসিদ্ধ, কোনো কৃত্রিম আভরণের খার খারে না। সকলমৌল্যসারসন্নিবেশ। এ রূপ অপরিকলিতপূর্ব। এমনটি আর দেখিনি কখনো, শুনিনি কখনো। যত দেখি ততই অদেখা থেকে যায়। নিজের মাধুরীতে কৃষ্ণের নিজেরও অতৃপ্তি। যেহেতু নিজের রূপ

নিজে কৃষ্ণ সম্পূর্ণ আন্বাদন করতে পারছে না। 'দর্পণাচ্চে দেখি যদি আপন মাধুরী। আন্বাদিতে লোভ হয় আন্বাদিতে নারি ॥'

এই আন্বাদনের একমাত্র সামর্থ্য রাধিকার। মাদনাখ্য মহাভাবের যে অধিকারী। কে রাধিকা? যে আরাধনা করে সেই রাধিকা। যে গোবিন্দের আনন্দিনী। যে সর্বগুণখনি কৃষ্ণকান্তাশিরোমণি। ভাবের পরমাকাষ্ঠা। যার প্রথম স্নান কারুণ্যামৃতধারায়, দ্বিতীয় স্নান তারুণ্যামৃতধারায়, তৃতীয় স্নান লাবণ্যামৃতধারায়। স্নানশেষে পরেছে কী! 'নিজলজ্জা শ্যাম পট্টশাড়ি পরিধান।' দ্বিতীয় বসন নেই? আছে। 'কৃষ্ণ-অমুরাগ-রক্ত দ্বিতীয় বসন।' বুক ঢেকেছে কী দিয়ে? প্রণয়-মান কঞ্চুলিকায়। অঙ্গানুলেপন করছে না? করছে বৈ কি। তবে তার উপাদান কী? নিজকাস্তি কুঙ্কুম, সখীপ্রণয় চন্দন, আর অধরের হাসিটুকু কপূর। কৃষ্ণের উজ্জল রসই যুগমদ, তার কলেবরের চিত্রলেখ। প্রেমকুটিলতাই দুই চোখের কজল, অমুরাগই অধরের অরুণিমা। চারু ললাটে সৌভাগ্যের তিলক, প্রেমবৈচিত্র্যই বুকের মধ্যমণি। সর্ব অঙ্গে উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক ভাব—নিবেদ, বিষাদ, দৈন্ত্য, গ্রানি, গর্ব, আবেগ, জাড্য, ভ্রীড়া, চিন্তা। কৃষ্ণনাম-গুণযশই কর্ণভূষণ। কৃষ্ণনামগুণযশই রসনার দীপ।

রাধিকাই একমাত্র দর্পণ, নির্মল সৎপ্রেমদর্পণ, যাতে কৃষ্ণমাধুর্য ঠিক-ঠিক প্রতিফলিত হতে পারে। আবার সেই প্রতিফলিত জ্যোতি কৃষ্ণ পড়ে কৃষ্ণমাধুর্যকে আরো মোহনীয় করে তোলে। 'মগ্নাধুর্য রাধাপ্রেম—দৌহে হোড় করি। ক্ষণে ক্ষণে বাঢ়ে দৌহে কেহো নাহি হারি।' যত পান তত পিপাসা। যত স্পর্শ তত প্রীতি। যত প্রেম তত

মাধুর্য। যত মাধুর্য তত প্রেম। শুধু ইচ্ছিয় থাকলেই কি দর্শন চলে? আর শুধু দর্শনেই কি আশ্বাদন? চন্দ্র তো চিরমধুর, কিন্তু সেই মাধুর্য সেই পরিপূর্ণ আশ্বাদন করতে পারে যার চোখে প্রেম আছে। যতটুকু প্রেম ততটুকুই ভোগ। কৃষ্ণ তো মধুরের সম্রাট, আর, কে এমন ব্রজবাসী আছে যে না ভালোবাসে কৃষ্ণকে? কিন্তু ব্রজবাসীদের ভালোবাসা আংশিক, পূর্ণতমের চেয়ে সব সময়েই কম। পূর্ণতম প্রেম একমাত্র রাধিকায়। রাধিকায়ই একমাত্র প্রোট নির্মল পরিপক্ক প্রেম, রাধিকায়ই জীবের একমাত্র অবশিষ্ট। সুতরাং রাধিকায়ই কৃষ্ণ-মাধুর্য আশ্বাদনের পরিপূর্ণ অধিকার। রাধিকাই স্বাদ-শক্তিগরীয়সী।

দর্পণে নিজের মাধুরী দেখে কৃষ্ণের আবার ইচ্ছে হয় নিজেকে আশ্বাদন করি। মানুষের এই ইচ্ছেই স্বাভাবিক যে আমার মাধুর্য অশ্রেয় আশ্বাদন করুক। কিন্তু কৃষ্ণের ইচ্ছা লোকাভীত। তার ইচ্ছা, আমার মাধুর্য আর সকলে আশ্বাদন তো করবেই, আমিও করি। এই-ই স্বভাব, এই-ই স্বরূপগত ধর্ম কৃষ্ণমাধুরীর। আর সে পরিপূর্ণ আশ্বাদন কি করে সম্ভব যদি না রাধাভাবে উদ্ভাসিত হই। তাই কৃষ্ণের রাধিকাস্বরূপ হবার উৎকণ্ঠা। কিন্তু রাধিকা হতে পারে না বলেই কৃষ্ণের খেদ। ‘কৃষ্ণের মাধুরী কৃষ্ণ উপজায় লোভ। সম্যক আশ্বাদিতে নারে, মনে রহে ক্ষোভ।’ কিন্তু কৃষ্ণ কই সেই রাধাভাব?

কৃষ্ণের ক্ষোভের নিবারণ হল ঐচ্ছিকত্যাগে। হল স্বাদবাহুগার পরিপূতি। রাধিকার ভাব আর কান্তি অঙ্গীকার করে অবতীর্ণ হলেন নবদ্বীপে।

‘পিতামাতা গুরুগণ আগে অবতারি।
রাধিকার ভাব বর্ণ অঙ্গীকার করি ॥
নবদ্বীপে শচী গর্ভ-শুদ্ধ দুহসিদ্ধি।
তাহাতে প্রকট হৈল কৃষ্ণ পূর্ণ-ইন্দু ॥’

১০

দেখ পড়ায় কেমন মন আমাদের নিমাইয়ের। বাড়ির বার হয় না ছেলে। সারাক্ষণ বই মুখে করে বসে থাকে। বাবা-মায়ের চোখের আড়াল হয় না। লেগে থাকে ছায়ার মত।

বিশ্বরূপ একথানা পুঁথি রেখে গেছে তার জন্মে।

বড় হয়ে পড়তে বলেছে। কবে বড় হবে না জানি। কবে সব বুঝবে দাদার মত।

যাবার আগে বিশ্বরূপ ডাকল মাকে। বললে, ‘মা, এই পুঁথিখানা তোমার কাছে রাখো।’

‘কেন বল তো?’

‘বড় হলে পড়তে দিও নিমাইকে।’

‘সে কি,’ অবাক হলেন শচী দেবী, ‘তুই নিজেই তো দিতে পারবি। আমাকে টানহিস কেন? তোর পুঁথি তোর কাছেই থাক।’

বিশ্বরূপ হাসল। বললে, ‘আমি যদি দিতে পারি, ভালো কথা। কিন্তু ঘটনার স্রোত কখন কোন দিকে যায়, আগে-পরে কে কবে মরে-বাঁচে, কে বলতে পারে? আমি বলছি, রেখে দাও তোমার কাছে।’

তখনো কিছু বোঝেন নি শচী দেবী। রাখলেন ছেলের কথা। রাখলেন পুঁথি।

খাওয়ার সময় পেরিয়ে যাচ্ছে, নিমাইকে পাঠালেন ঐদ্বৈতসভায়, দাদাকে ডেকে আনতে।

কিন্তু কোথায় বিশ্বরূপ! এখানে-ওখানে কোনোখানে সে নেই, নেই বুঝি বা সংসারসীমানায়। কান্নার রোল উঠল বাড়িতে। দাদা নেই, নিমাই লুটিয়ে পড়ল ধুলোয়। আর নিমাই যখন কাঁদছে তখন আর সব ভুলে আগে নিমাইকে শান্ত করো। নিমাই-ই তো সর্বশৃঙ্খলের পরিশোধ।

এই একজন বিমুখ সংসারে কৃষ্ণ-নাম করছিল, নবদ্বীপে কলাবলি করছে সবাই, সেও ছেড়ে গেল আমাদের। বিশ্বরূপই যদি বনে যায় তা হলে আমরাও তার সঙ্গী হব। কী সুখ হল কৃষ্ণ-নামে, ‘পাষাণীর’ দল যখন উপহাস করবে তখন সইবে না বাক্যজালা। আমরাও তাহলে কৃষ্ণ-তৃষ্ণা ছেড়ে দেব। সংসারকেই সার মানব। বাড়াব না গ্রহসন।

কিন্তু ঐদ্বৈত টলে না। জগন্নাথের আঙিনায় সে হরিনামের ধ্বনি তোলে। বলে, হরিতেই সমস্ত হরণের পরিপূরণ। সর্বশৃঙ্খলের পূর্ণায়ন।

ঐদ্বৈতের উৎসাহে আর সকলেও প্রাণ পায়। আশায় বুক বাঁধে। কণ্ঠের সুর মেলায়। হরিশ্রবণের লহর তোলে।

শিশুদের সঙ্গে ‘নিমাই খেলছিল বাইরে, হঠাৎ খেলা বন্ধ করে বলে উঠল: ‘আমাকে ডাকছে বাড়িতে।’

‘তোকে আবার কখন ডাকল?’ সঙ্গীরা আপত্তি করল।

‘হ্যাঁ, ঐ যে, পাচ্ছিস না শুনতে?’ ব্যস্ত হয়ে ছুট দিল নিমাই।

নিমাইকে ছুটে আসতে দেখে সবাই উৎসুক হয়ে প্রশ্ন করলে: ‘কি রে, কি হয়েছে? কি চাই? আসছিস কেন হস্তদন্ত হয়ে?’

‘বা রে, আমাকে ডাকলে যে তোমরা।’ নিমাই তাকাতে লাগল চারদিকে।

‘না তো, তোমাকে ডাকি নি তো কেউ। সবাই মিলে হরিকীর্তন করছিলাম।’

‘ও, ডাকো নি বুঝি।’ নিমাই আবার ছুটে চলে গেল খেলাস্থলে।

যাকে ডাকছে সে কে, নিমাই-ই বুঝি বুঝতে দিতে চায় না।

‘নাম-সঙ্কীর্তন কলৌ পরম উপায়।’ অনেকে একত্র হয়ে স্ফুটকণ্ঠে কৃষ্ণনাম করাই কি শুধু সঙ্কীর্তন? না। একলা বসে সম্যক কীর্তনও সঙ্কীর্তন। সম্যক কীর্তন কী? স্পষ্ট স্বরে নামের যথার্থ উচ্চারণই সম্যক কীর্তন। তাই সজ্ঞানেই হোক, নির্জনেই হোক, দলবদ্ধ হয়েই হোক বা একাকীই হোক, যখনই নাম করবে শব্দ করে করবে। শব্দেই গাঢ় হবে অভিনিবেশ। দূরে, যাবে চিন্তা-বিক্ষেপের সম্ভাবনা। সংযত হবে বাগিঞ্জিয়। আর কে না জানে রসনাই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের চালক। রসনা বশীভূত হলেই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের প্রশমন। তাই উচ্চৈঃস্বরে নাম করো। অল্পক্ষে বা নীরবে নাম করলে কি ফল হবে না? আর সব ফল হবে শুধু প্রেম জাগবে না। নীরবে কি প্রেমসম্ভাষণ হয়? নৈঃশব্দ্য কি জাগাতে পারে প্রতিধ্বনি? তা ছাড়া উচ্চৈঃস্বরে কীর্তনেই তো হতে পারে পরসেবা। বাঘের সঙ্গে নাচতে পারে হরিণ, সাপের সঙ্গে ময়ূর। পরস্পরকে চুষন করতে পারে। হরিদাসের ঘরের দ্বারে বসে বেণী হতে পারে বৈষ্ণবী।

প্রতিদিন এক লক্ষ নাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন করে হরিদাস। লক্ষহীরা তাকে ভ্রষ্ট করতে এসেছে, ব্যস্ত করেছে তার যৌবনের অভিলাষ। হরিদাস বগছে, অপেক্ষা করো, আমার নাম-সঙ্কীর্তন আগে শেষ হোক। তুমি ততক্ষণ ঈষৎ শোনো এই শমধ্বনি। নাম শেষ হলে তুমি যা চাও তাই হবে।

‘হরিদাস কহে—তোমা করিব অঙ্গীকার।

সংখ্যানাম-সমাপ্তি যাবৎ না হয় আমার ॥

তাবৎ তুমি বসি শুন নাম-সঙ্কীর্তন।

নামসমাপ্তি হৈলে করিব যে তোমার মন ॥’

নাম শোনবার পর তোমার যে মন হয়, অর্থাৎ তখন তোমার মনে যে বাসনা আসে তা চরিতার্থ করব। নাম শুনতে-শুনতে প্রস্তুত দ্রবীভূত হল, সংখ্যাপূরণের পর লক্ষহীরার মনে জাগল ত্রীকৃষ্ণসেবার বাসনা। ‘তুলসীকে ঠাকুরকে দণ্ডবৎ করি। দ্বারে বসি নাম শুনে—বোলে হরি-হরি।’

নামই পূর্ণতা-দাতা। নববিধা ভক্তির জনয়িতাও নাম। সর্ববেদ, সর্বতীর্থ, সর্বসৎকর্ম থেকেও নামের মাহাত্ম্য অধিক। নামই পরম উপায়।

পড়ায় খুব মন দিয়েছে নিমাই। যা পড়ে তাই মনে রাখে, শোনামাত্রই সমস্ত প্রচ্ছন্ন অর্থ প্রকটিত করে। এমন সুবুদ্ধি শিশু আর দেখিনি কোথাও, পণ্ডিত-ছাত্র সবাই বলে একবাক্যে, বলে বিছায় এ বৃহস্পতিকে অতিক্রম করবে।

দেখে-শুনে শটী খুব খুশি। কিন্তু জগন্নাথ বিবাদপন্থীর। বলে, ‘বিশ্বরূপেরও এমনি মতি ছিল অধ্যয়নে। সমস্ত শাস্ত্রপাঠ শেষ করে শেষ পর্যন্ত এই শিখল, সংসারে তিলমাত্র সত্য নেই, আর তাই জ্ঞানে বিষয়মুখ তুচ্ছ করলে। তোমার এই ছেলেও বিচার অমনি ব্যাখ্যা করবে, সংসার ছেড়ে চলে যাবে অরণ্যে। সুতরাং ওর আর পড়ে কাজ নেই।’

‘মূর্খ হয়ে থাকবে?’ শটী দেবী আরেক রকম ভয় দেখলেন।

‘তবু ঘরে তো থাকবে। থাকবে তো চোখের উপর।’ বললেন জগন্নাথ।

‘কিন্তু মূর্খ হয়ে থাকলে ওকে খাওয়াবে কে?’ শটীর আরেক রকম নালিশ।

‘যে সকলের পোষণ-পালন করছে সেই কৃষ্ণ খাওয়াবে। এই আমাকেই তো দেখছ। এত বিচারজন করেও কেন এত দারিদ্র্য? আর দেখ, যে ভালোমত বর্ণ উচ্চারণ করতে পারে না তার দ্বারা সহস্র পণ্ডিতের ভিড়। বিছায় কিছু হবে না, যদি হয় তো হবে গোবিন্দের আনন্দে।’

আঁচলে চোখ ঝাঁপলেন শটী দেবী। ‘মূর্খ হয়ে থাকলে কেউ তো কথা দেবে না নিমাইকে?’

‘কপালে কৃষ্ণ যেমন লিখেছে, মূর্খই হোক আর

পণ্ডিতই হোক, ঠিক তেমনটি জুটে যাবে আপনা-আপনি। কৃষ্ণ-কৃপা ছাড়া কিছুই হবার নয়। দৈন্যহীন জীবন আর কষ্টহীন মৃত্যু—তাও কৃষ্ণকৃপায়। ধনে-পুত্রেই বা কী হবে যদি কৃষ্ণ-আজ্ঞা কৃষ্ণ-ইচ্ছা না থাকে? সুভরাং চিন্তা করে লাভ নেই, কৃষ্ণই একা চিন্তাকর্তা। ডাকো নিমাইকে।’

ছ’ বছরের শিশু, নিমাই কাছে এসে দাঁড়াল।

নির্মম শোণাল জগন্নাথকে। বললেন, ‘আজ থেকে তোমার পড়া বন্ধ। পাঠশালা বন্ধ। বুঝলে? যেতে পারবে না আর গুরুর কাছে, পুঁথিপত্র সব ফেলে দিয়ে এস গঙ্গায়।’

কাতর গোখে তাকিয়ে রইল নিমাই।

জগন্নাথ দমলেন না এতটুকু। কঠোর স্বরে বললেন, ‘না কিছুতে না। বিড়াই একজনের কাল হয়েছে। আর নয়। আমার মূর্থ পুত্রই ভালো।’

যথা আজ্ঞা। বিড়ারসে ভজ দিয়ে খেলা নিয়ে মাতল নিমাই। দাদার শোকে একটু সংবৃত হয়েছিল, আবার উদ্ধত হয়ে উঠল। শুধু দিনমানে নয়, রাত্রেও চলল তার চাপল্য। সন্ধ্যা হয়ে গেল, বাড়ি ফিরাব নে নিমাই? আমার কি আর পড়া আছে যে বাড়ি ফিরব? আমার কি আর বই নিয়ে বসা আছে? তার চেয়ে গায়ে কবুল মুড়ি দিয়ে ষাঁড় সাজি, এ-বাড়ি ও-বাড়ি জিনিসপত্র ভেঙে দিয়ে আসি, পড়শীর কলাবনে ঢুকে তাণ্ডব লাগাই। এ কী মূর্থের মত ব্যবহার! মূর্থ করে রেখেছ, ব্যবহার কি তবে অন্য রকম হবে?

আস্তাকুড়ে ঢুকেছে নিমাই। এঁটো হাঁড়ি পর-পর সাজিয়ে সিংহাসন করে বসেছে। গোর-অঙ্গে মেখেছে হাঁড়ির কালি। সঙ্গীরা ছুটে গিয়ে খবর দিয়েছে শচীকে। দেখবে এস নিমাইয়ের কীর্তি।

হায়-হায় করে ছুটে এসেছেন শচী। এ তুই করেছিস কা? এ তুই কোথায় এসে বসেছিস?

‘আমি তার কী জানি!’ নিমাই বলছে গম্ভীরমুখে, ‘আমি তো মূর্থ। আমার কি ভ্রাতৃত্বের জ্ঞান আছে? আমি কি জানি স্থানের ভালো-মন্দ? আমার কাছে সব জায়গাই সমান।’

‘ছি ছি,’ থিকার দিয়ে উঠলেন শচী দেবী, ‘তা বলে তুই এঁটো-বুঁটো মানবি নে? আবর্জনা ফেলবার অপবিত্র স্থানে গিয়ে বসবি?’

নিমাই বললে, ‘আমি যেখানে বসি সে স্থান কি অপবিত্র?’

‘প্রভু বলে, মাতা। তুমি বড় শিশুমতি।

অপবিত্র স্থানে কড় নহে মোর স্থিতি।

যথা মোর স্থিতি সেই সর্বপুণ্য স্থান।

গঙ্গা আদি সর্বতীর্থ তহি’ অধিষ্ঠান ॥’

‘শীগগির উঠে আয় বলছি।’ তাড়না করলেন শচী, ‘স্নান করে আয় গঙ্গায়।’

নিমাই গ্রোহণ করল না।

‘তোর বাবা দেখতে পেলে কী বলবেন বল তো?’ শচীর কণ্ঠে এবার অনুনয় ঝরল: ‘লক্ষ্মী মাণিক আমার, উঠে আয়।’

‘তা হলে বলো আমাকে পড়তে দেবে? যেতে দেবে পাঠশালায়?’ ছুঁছুঁ হাসিতে নিমাইয়ের হুঁচোখ ঝিলিক দিয়ে উঠল।

বহু লোক জড়ো হয়েছে ইতিমধ্যে। দেখছে মা-ছেলের কাণ্ড। বাপের কাছে খবর পাঠিয়েছে।

‘সত্যিই তো কেন পড়তে দেবে না? এ কোন শত্রু পরামর্শ দিল যে ছেলেকে মূর্থ করে রাখতে হবে?’ সকলে গঞ্জন দিল শচীকে। জগন্নাথ এসে পড়লে জগন্নাথকে বললে, ‘কত বড় ভাগ্য তোমাদের, ছেলে নিজের থেকেই পড়তে চায়। এমনটি আর মেলে কোথায়? সেই ছেলের মনে ব্যথা দিয়ে লাভ কি? যা করবেন কৃষ্ণ করবেন। যদি কাউকে তিনি নিয়ে যেতে চান মূর্থ বলে নিরস্ত হবেন না।’

সকলে পীড়াপীড়ি করতে লাগল জগন্নাথকে। পড়তে দাও ছেলেকে। ছেড়ে দাও কৃষ্ণের হাতে।

কৃষ্ণই মূল কারণ। আর প্রকৃতি? প্রকৃতি গৌণ কারণ। ঘটের মূল কারণ কুস্তকার। গৌণ কারণ চক্র-দণ্ড। অগ্নিস্পর্শে লৌহ তপ্ত হয়ে যদি দগ্ধ করে তবে সেই দাহের মূল শক্তি অগ্নি, গৌণ শক্তি লৌহ। তাই কৃষ্ণই আদিপুরুষ, প্রকৃতি তার মায়া, নিমিত্ত-কারণ। কি রকম কারণ? ‘প্রকৃতি কারণ যৈছে অজাগলস্তন।’ কোনো কোনো ছাগীর গলায় স্তনের মত মাংসপিণ্ড বোলে। দেখতে স্তনের মত হলেও তাতে দুধ জমে না। অজাগলস্তন যেমন তাই সত্যিকার স্তন নয় তেমনি প্রকৃতিও জগতের বাস্তব কারণ নয়। বাস্তব কারণ কৃষ্ণ। সবই কৃষ্ণশক্তি প্রস্ফুরিত। সব তাই অর্পণ করো কৃষ্ণকে।

জগন্নাথ বললেন, 'উঠে আয়। এবার থেকে দেব তোকে পড়তে।'

বজ্রিত হাঁড়ির রাজসভা থেকে হাসিমুখে উঠে এল নিমাই। গঙ্গাদাসের পাঠশালায় আবার পড়তে গেল।

ব্যাকরণের অধ্যাপক, গঙ্গাদাস হিমসিম খাচ্ছে নিমাইকে নিয়ে। গুরু যাই ব্যাখ্যা করে তাই খণ্ডন করে নিমাই, আর যখন খণ্ড-বিখণ্ড হয়েছে গঙ্গাদাস তখন আবার সেই মূল ব্যাখ্যা স্থাপন করে।

বিজ্ঞা-ব্যাখ্যা শুধু পাঠশালাতেই নয়, ঘরে-বাইরে, স্নান করতে এসে চালায় গঙ্গার ঘাটে-ঘাটে। প্রতি ঘাটে সাঁতার কেটে এসে উপস্থিত হয় আর ব্যাকরণের বিশেষ কোনো সূত্র বা টীকা ধরে কলহ করে। কোনো দ্বন্দ্বের গৌরচন্দ্রের সঙ্গে কেউ এঁটে গুঠে না। খণ্ডন করেছ কি, স্থাপন করি; স্থাপন করেছ কি ছেদন করি। আমি শুধু ছেদনে-কর্তনে নই, আমি আবার আরোপে-প্রতিষ্ঠায়।

গঙ্গার বড় ক্ষোভ ছিল, কৃষ্ণ শুধু যমুনাতেই লীলা-বিহার করেছে। ঈর্ষা ছিল যমুনার প্রতি। গঙ্গার সেই ক্ষোভ মিটিয়ে দিল গৌরহরি। নূতনতর লীলা করল। শুধু কৃষ্ণলীলা নয়, যুগলিত রাধাকৃষ্ণের লীলা। এক দেহে দুই প্রেম। এক ডুবে দুই স্নান।

এবার তবে পৈতে দাঁও ছেলের। দিনক্ষণ ঠিক করো।

উৎসবের আয়োজন করলেন জগন্নাথ। মৃদঙ্গ-সানাই বাজতে লাগল, বিপ্রগণ শুরু করল বেদপাঠ। গৌরাঙ্গ আজ শ্রীঅঙ্গে যজ্ঞসূত্র ধরবে, হাতে দণ্ড, কাঁধে ঝুলি, ভিক্ষেয় বেরবে ঘরে-ঘরে। এস তোমরা দেখবে এস। বামনরূপ ধরবে আজ গৌরচন্দ্র।

বামনের মধ্যে বলি বিশ্বরূপ দেখল। দেখল হরির পদদ্বয়ে ধরণী, পদতলে রসাতল। নাভিতে আকাশ, জজ্বাযুগলে পর্বতনিকর, কুক্ষিদেখে সপ্তসমুদ্র, বক্ষঃস্থলে নক্ষত্রনিচয়, হৃদয়ে ধর্ম, স্তনদ্বয়ে ঋত ও সত্য, মনে চন্দ্র, কণ্ঠে সামবেদ, বাহু চতুষ্টয়ে দেবমণ্ডলী, কর্ণযুগলে দিক্, শিরে স্বর্গ, কেশে মেঘ, নাসিকায় বায়ু, দুই চক্ষু সূর্য, বদনে অগ্নি, রসনায় বক্রণ, ক্রম্বয়ে অধর্ম, পাদদ্বয়ে যজ্ঞ, ছায়াতে মৃত্যু, হাশ্বে মায়ী, শিরায় নদী, নখে শিলা আর রোমে ওষধি। বামন বলল, হে অনুরবর, তুমি আমাকে ত্রিপাদপরিমিত

ভূমি দিয়েছ, আমি দুই পদবিজ্ঞানে সমগ্র পৃথিবী আক্রমণ করেছি, এখন তৃতীয় পদের জন্মে তুমি নির্দেশ করো। গুরু গুরুচাৰ্য দ্বারা তিরস্কৃত হয়েও সূত্রত বলি সত্য পরিত্যাগ করে নি, বললে, আমার মাথায় আপনি তৃতীয় পা রাখুন। 'পদং তৃতীয়ং কুরু শীঘ্র মে নিজম্।'

নিমাইয়ের মস্তকমুগুন হল, পরল রক্তবস্ত্র। জগন্নাথ ছেলের কানে গায়ত্রীমন্ত্র উচ্চারণ করলেন। এ কি অঘটন! মন্ত্র শুনে নিমাই হুকার দিয়ে উঠল, পড়ে গেল মুছিত হয়ে। সমস্ত দেহ পুলকে শিহরিত হচ্ছে, বিতরণ করছে উদ্দীপ্ত তেজ আর দুই চোখে নেমেছে অকূল শ্রাবণ। সপ্তলের পরিচর্যায় যখন বাহুজ্ঞান ফিরে এল নিমাইয়ের, তখন তার সে কী গম্ভীর মূর্তি! এ যেন তখন নতুন আরেক মানুষ, যেন এ জগতের কেউ নয়। ন' বছরের ছেলে তখন নিমাই, কিন্তু তার দেহে যে নতুন মানুষের আবেশ এসেছে, তাকে চিনতে কারুর ভুল হয়নি। 'চৈতন্যসিংহের নবদ্বীপ অবতার। সিংহগ্রীব সিংহবীৰ্য সিংহের হুকার।' গৌরদেহে শ্রীহরির আবির্ভাব হয়েছে। সুতরাং এর নাম হোক গৌরহরি। গৌররায়।

হে কৃষ্ণ, জানি না তুমি কোথায়, জগন্নাথ প্রার্থনা করতে লাগলেন, আমার পুত্রের প্রতি রেখো তোমার শুভদৃষ্টি। কন্দর্পজয়ী এর রূপ, দেখো ডাকিমৌ-দানবেরা যেন বশ করতে না পারে তাকে। আর যে ছেলে সর্বদা তোমাকে দেখে, তোমাকে ডেকে খুশি, তার যেন না কোনো অমঙ্গল হয়।

প্রার্থনা শুনে মনে মনে হাসল বুঝি নিমাই।

হঠাৎ জ্ঞানীগুরুর মত গম্ভীর স্বরে মাকে ডাকল তার কাছটিতে। ভয়ে ভয়ে দাঁড়ালেন এসে শচী। এ যেন তাঁর বালক পুত্র নয়, যেন কোন পরাক্রান্ত পুরুষ। শাসনশাসিত্ব স্বরে বললে, 'মা, তুমি একাদশীর দিন ভাত খাও কেন? খাবে না ভাত।'

'খাব না।' অপরাধীর মত বললেন শচী, অমুজ্জা পালনের ভঙ্গিতে।

'আর,' আরো বললে নিমাই, 'শোনো, এ দেহ আমি ত্যাগ করলাম এ মুহূর্তে, চললাম গৃহ ছেড়ে। যে দেহ রইল সে তোমার পুত্র, তাকে স্নেহে-যত্নে পালন করো। সময় হলে আমি আবার আসব, আবার দেখবে আমাকে সকলে।'

নিমাই আবার মূর্ছিত হয়ে পড়ল। জ্বলসেফে আবার তার চেতনা ফিরে এলে সকলে দেখল, সে চণ্ডেজ দেবাবেশ আর ভাতে নেই, এ নিমাই আবার সেই সন্তান-নিমাই। সেই নিতলশীতল নবনীকোমল লাবণ্যপুঞ্জ।

‘কী বলছিলি বল তো?’ জগন্নাথ মনে করিয়ে দিতে চাইলেন।

‘কী বলছিলাম?’

‘বলছিলি, এ দেহ ছেড়ে চলে যাচ্ছি, যে রইল সে তোমার পুত্র, তাকে তোমরা দেখো।’

‘কই! কখন!’ বিস্ময় মানল নিমাই : ‘আমি আবার কী বললাম!’

হে গোবিন্দ, নিমাই আমার ঘরে থাক, নিমাই আমার গৃহস্থ হোক। তার যত্নের আমরা ত্রুটি করব না। প্রাণপণ পরিচর্যা করব। পাখার উত্তাপের আড়ালে রাখব তাকে সন্তুর্পণে।

‘এ কি, এ প্রার্থনা করছ কেন?’ শচী দেবী শুনতে পেয়েছেন স্বামীর কাতরতা।

‘জানো, হুঃস্বপন দেখেছি।’

‘কী হুঃস্বপন?’ শচী দেবীর মুখ কালো হয়ে উঠল।

‘দেখলাম নিমাই শিখার মুণ্ডন করেছে, ধরেছে সন্ন্যাসীবেশ। সব সময়ে কৃষ্ণ বলে হাসছে কাঁদছে চলেছে নাচছে। দলে দলে লোক চলেছে পিছে-পিছে, অদ্বৈত আচার্য পর্যন্ত, সুরে সুর মিলিয়ে চলেছে। সে সুর আকাশ ছুঁয়েছে, ছুঁয়েছে দিক্দিগন্ত। সকলের মাথায় পা তুলে দিচ্ছে নিমাই, অদ্বৈতের মাথায় পর্যন্ত, বগছে গিয়ে বিষ্ণুর সিংহাসনে। এ কী দেখলাম!’

শচী দেবী আশ্বস্ত করতে চাইলেন। বললেন, ‘এ স্বপ্নমাত্র। এ কখনো ফলবার নয়। পুঁথি ছাড়া নিমাইয়ের আর কোনো মতি নেই, রুচি নেই। ঘরের বাইরে জানে না সে পথ-প্রান্তর। বিচারসভাবই তার একমাত্র বস্তু, একমাত্র ধর্ম। তুমি চিন্তা কোরো না। নিমাই আমার ঘরের ভিত্তি, আমার অন্নের স্বাদ, আমার চক্ষের তারা। আমার দেহের মেরুদণ্ড। আমাকে ছেড়ে যাবে না এক পা।’

[ক্রমশঃ ।

মেমোরিয়ালের ঘাঠের সেই মেয়েটি

বিমলচন্দ্র সরকার

মেমোরিয়ালের ঘাঠ দেখি তাকে
শব্দ সে সাজ করেছে একটি।
খুশিরে সাক্ষ্য হাওয়ায় উড়িয়ে দিচ্ছে,
মুঠো মুঠো ধূলি উড়িয়ে দেবার মতন।
উচ্ছ্বাসে মুখরা একটি চিত্রাঙ্কিতা নদী,
অস্তর-বাহিরে লেগেছে বোবনের ঢেউ!

আলতো গালে সূর্যের রক্তিম-আভা পড়েছে।
উজ্জ্বল কুন্তলরাশি মুখে চপলা হাসি,
দেহের স্তবকে স্তবকে উদ্ভাসিত বোবন-প্রবাহ।
শৃঙ্গার-হাসি তার দু’টি কাজল। আঁধি-ছায়ে;
স্বর্গের মেনকা বোবনমদে গর্ভিতা মেয়ে
প্রেমাসনে ভোগবতী শিল্পীর কল্পিত মানসী।

ঠোটে তার অলঙ্কৃত তিলক মাথা
কোন গজখাকী, বুঝি এক প্রেতিনী।
প্রেমোন্মাদে ছল ও কলার মায়াবিনী,
সাজ সাথে রক্তিস্রব-ভোগবিলাসিনী।
কামিনী অলকা মেয়ে, কদ্রির মেনকা,
এ যুগের ভাবীজননী উগ্র আধুনিকা।

বীচে কাটছে মন নয়। দিনের আলোর অফিসের কাজ করে। আর রাতের আঁধারে জলের ধারে সমুদ্রের ঢেউ পোশো। ওরা আসে আবার চলেও যায়। মাঝে করে নিয়ে আসে প্রকাণ্ড এক তাল কি, রাতের আঁধারে তা চিক্ চিক্ করে জলতে থাকে। ওরা কোন্ জানোয়ার জানতে ইচ্ছা যায়। ভয়ও হয়। যদি ওর সুনীল অতল জলবি থেকে উঠে আসে অতিকায় প্রাগৈতিহাসিক কোনো জানোয়ার।

রাতের খানা-দানা সারা। শুয়ে আছি সেই পুরাতন গর্ত আশ্রয় করে, নেটের ঐক্য মশারি মেলে। স্বপ্ন দেখেছি ভূতের। ভূতে ভাড়া করেছে। আর আমার পাখা গজিয়েছে, তাই দিয়ে উড়ে উড়ে পালাচ্ছি। হঠাৎ প্রবল ঝাঁকুনি খেয়ে স্বপ্ন টুটে গেল। ঘুমও ছুটে গেল। প্রেল ক্র্যাশ? জাহাজডুবি? নাঃ। ও সব কিছুই নয়। আমার পুরোন ও-সির জিপ-ডাইভার। লারেক কাশেম আলি। ও কি এবারে ভূত হয়েছে? এত রাতে নির্জন বীচে এলো কি করে? ওর ইউনিট তো এখান থেকে বহু দূরে।

—কি খবর মিঞা সাব?

—হজুব, বড়া সাব, গাড়ী ভেজা। ভূরত্ব চলিয়ে। ও সেলাম দিয়ে জানায়। বাক্। অশরীরী নয়। সশরীরে এসেছে। কিন্তু এত রাতে? আমাদের কোথায় নিয়ে যেতে চায়?

তা ও জানে না। শুধু বলল ও-সির জর্ডার। তবু বিশ্বাস নেই। জাপানীদের হাতে বহু অপমৃত্যু ঘটেছে। টর্চ জেলে দেখে নিই ওর ছায়া পড়ে কি না।

রাত সাড়ে বারটা। ক্রমে আরও গভীর হচ্ছে। যেতেই হবে। কেন না, খোদ ও-সির জর্ডার। জীপ পাঠিয়েছেন। ও এসেছে সেই জীপে করে। কিন্তু কেন? কোথায়?

ওই সব প্রশ্ন অচল। অবাস্তব। সবই সিক্রেট। আমরা এক সিক্রেট সোসাইটির সদস্য। কবে, কোথায়, কেন, কি হবে না-হবে, তা নিয়ে জল্পনা-কল্পনাও নিষেধ করতে হবে, তা এখনই। রাত বারটা, না তিনটে, সে কোনও কথাই নয়।

শুভরাগ্নি যেতে হোল। রাস্তা নয়। সমুদ্রসৈকত। জীপ ছুটেছে দুর্নিবার গতিতে। ভাটার টানে বালি ভ্রমে সিমেন্টের কংক্রিট হয়ে রয়েছে। ঢেউয়ে ঢেউয়ে তা ক্রমাগত আরও মজ্জা হচ্ছে। তারও উপর দিয়ে গাড়ী ছুটেছে উন্নতের মতো। স্পীডো মিটারের কাঁটা বেড়েই চলেছে—ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ, ষাট, সত্তর। নাঃ। আর ওদিকে চাওয়া যায় না। যে কোনো মুহূর্তে গ্র্যাকসিডেন্ট হতে পারে। নারেকের তাক্তে ক্রম্প নেই। সীমাক্তের পার্শ্ব। ভয়-ভয় নেই কোনো। চারপাশে লোকজনও নেই যে, পরদিন তারা দেখতে পাবে—গ্র্যাকসিডেন্ট হলে বাঁচার আশা। রাতের আঁধার। বালির ওপর ক্ষীণ চাঁদের আভা। সামনে, পিছনে, ডাইনে, বামে, হুপাশে মনে হচ্ছে যেন একখানা একটানা খুব লম্বা-চওড়া ফিতে। মন্বন রাতের বিছানা বিছানো।

ক্রমে গাড়ীর গতি স্তব্ধ। সামনে চকস। কিশোরী এক একে-বেকে চলে গেছে বহুবুয়। নিশিাপাতে উজ্জল জোয়ারের জলে ভয়ে গিয়েছিল আপনাব ক্ষুদ্র স্বপ্ন। এখন তাই আবার জেলে চলেছে আপন মনের ধূসীতে। তেমনি উজ্জল, আর অকুণপ।

সে জাপানী। বাসনাবীতি লক্ষ্য করে লক্ষ্য করে

না=জানা=কাহিনী

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

তাল-বেতাল

তেমনি চলে যায়। ধরে রাখা যায় না। তাই দিয়ে চলেছে নিঃশেষে। এখনও প্রচুর জল। সে জলে জীপ ঠাই পাবে না। আরও কমবে। তাবৎ অপেক্ষা করতে হোল নিঃশেষে।

হাজি গভীর। একাদশীর বাঁকা শব্দ পশ্চিম দিগন্তে বিলীয়মান। আকাশ স্নান। স্নান জোৎস্নার ঢাকা ধরণী। দিগন্ত প্রশান্তি গুহ্যহীন বৃক্ষহীন প্রান্তর। চারিদিক ঢাকা। নির্জন সমুদ্রতীর, নিস্তব্ধ সমুদ্রজল। নিস্তব্ধ প্রকৃতিরানী নিশীথের আবাহনে উৎকর্ষ। কী যেন এক ভাব সমাবেশে সবাই গভীর, সবই বহুতময়। মাথার উপর আবছা নীলাকাশ অন্ধকারে বহুতময়ী ধরণী জলে গোল হয়ে মেশামেশি। পশ্চিম দিগন্তে সমুদ্রজলে ক্ষীণ চাঁদের আভা। মাঝে কচিং একটা ঢেউ। তাও নিঃশব্দ। আর তাম ভিতরে জলে হাজার হাজার মাপিক। ভাটার টানে জলে টান ধরেছে প্রচুর। মনে বিবঁধে পিছনে ফেলে-আসা সমস্ত জিনিষ। সেই টেকে। দামী ক্যামেরা, পার্কার সেট। দিনের আলোর সোন দিয়েছি বহুবুয়। আর কখনও তাদের দেখা মিলবে না। যদি হয়, গ্র্যাকসিডেন্ট। হতে পারে পরলোকে। যদি তা থাকে। প্রায় ষাট দুই বসে, সেই নির্জন আবছা অন্ধকারে। খালের জল কমতে জীপও আবার চলা শুরু করেছে। কোমর জলের ভিতর দিয়ে গাড়ী পার হয়ে গেল। ওটা আগেই ওরাটার প্রকৃতি করা ছিলো।

আবারও মীটারের কাঁটা উঠছে। পঞ্চাশ, ষাট, সত্তর। বেপরোয়া ডাইভার। সামনে জলল শুরু হয়েছে। কোথায়ও আলোর লেশ নেই। বিবাদে ত্রিস্রমাণ শব্দ চাঁদ ডুবছে সমুদ্রজলে। সেই অন্ধকারেই গাড়ী ছুটেছে ভূতের মতো বনের ভিতর দিয়ে। গাড়ীতে আলো জ্বালা নিষেধ। ক্রমে সে জলল আরও ঘনীভূত! কান্নেই স্পীডও কমতে করতে একবারে কমে গেছে। পাহাড়ের কঁকে কঁকে ওরা কে দাঁড়িয়ে? বড় বড় তালগাছ মাথা উঁচু করে কি দেখছে! আমাদের গতিবিধি? ওরই কঁকে কঁকে তাঁবু। তারাও প্রান্তের মত নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে। ওরাও হয়তো কিছু দেখছে। কী যেন একটা কিছু ঘটতে চলেছে। অথবা হয় তো কারও ইসারায় অপেক্ষমান। আমাদের গাড়ী পৌছেছে সেই অন্ধকারেই। কিন্তু এ কি? এত রাতে সবাই চূপচাপ বাইরে দাঁড়িয়ে কেন? নড়ন-চড়নও নেই কারো। লোকজন, অফিসার সবই সেই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে। সারিবদ্ধ, নিঃশব্দ। সবই কি প্রান্তের রাজত্ব? কিসের অপেক্ষা?

সবাই প্রস্তুত। হাতে রাইফেল, কাঁপে ব্যাগ, পোচে টোটা। বেরনেট বুলছে। কোমরে আড়াই হাতি খাটী থীলের দা। ওটা তবোয়ালের মত ঝুলছে। বর্ধার জললম্বুদে ওটা দেওয়া হয়েছে একখানা করে। ঘাড়ের কাছে বাঁধা বেড়ি। ছোট নেটের ঐক্য মশারি ও আর খুব হালকা একখানা অস্ট্রেলিয়ান ব্যাগ। এই সব। আরও আছে। ছোট এক টিন এমারজেন্সী বেশান। কিছু ব্যাণ্ডেজ।

সত্যিকারের ছাগল নয়। কাপড়ে তৈরী, জল বাধার কার্যদা। মালামাল আর সবই তাঁবুতে পড়ে। খোঁপ ও-সি এডজুগীট সবারই ওই সাজ-পোষাক। কিন্তু কোথায়? সামনে, না পিছনে?

আমরা ফিরে এসেছি। বর্মার জঙ্গল থেকে পালিয়ে দক্ষিণ-ভারতের এক বন্দরে। রিট্রিট। বর্মার জঙ্গলে পড়ে মার খাচ্ছে ওদের হাতে। আর ওদের স্বাইপারের হাতে। প্রথম জাপানীরা বধন রেঙ্গুন আর সিঙ্গাপুর আক্রমণ করে, বৃটশ প্রাণভয়ে পালিয়েছিল। ভারতীয় আর্মি জাপানীদের হাতে বেচে নিয়ে বিনিময়ে নিজেদের প্রাণ বাঁচিয়ে। ইংরেজের সে ভুল ভেসেছে পরে। সেই বেচে আসা আর্মি রূপ নিয়েছে লালনাল আমির। খতম করেছে ডিভিশনকে ডিভিশন। পুরাতনী শিক্ষা। এবার তাই সবসময়ে রিট্রিট? ক্র.ম.সে বন্দর ছেড়ে আমরা দক্ষিণাবর্তের রাস্তায় উঠেছি। আবর্তিত হয়ে চলেছি মোটরের চাকার সাথে।

কোক নাগার ছাউনী। লোক লোকালয় বহুত দূর। তা বিশ ত্রিণ মাইল। তালবনে ছোট ছোট তালপাতার কুঁড়ে। লোতলা বন্ধোবস্ত। অর্থাৎ মানুষ-সমান উঁচু ধরে মটকার তুলে চারখানা খাটিয়া বাঁধা। দড়ির চারপাই। শবের বলতে পারেন। তারই নীচে মাটিতে আর চারখানা। আটজনের শয়নকক্ষ। বেড়া নেই। তার চার দিক খোঁগা। চার পাশে বসতি নেই মানুষের। জঙ্ঘানোরায়ও কি নেই? পাশেই ছোট ডোবার জল। রান্নাবান্না হাতরুখ খোয়া চলছে। আর খাবার জল এক হাত বালি খুঁড়ে মিলে।

বর্মার নামকরা জঙ্গল উষ্মিয়া। সেখান থেকে আমাদের কোম্পানী দিয়ে এসেছে সমস্যা। এসে আশ্রয় নিয়েছে দক্ষিণ-ভারতে এই তালবনে। বর্মার থেকে মাদ্রাজ। সগৌরবে পশ্চাদপসরণ। খবরে সর্বত্র ছাপা হয়ে বেরুচ্ছে, আমরা এখনও জিতেই চলেছি এবং সে হিসাবে টোকিও বার্লিন দুটোই আমাদের ছাড়িয়ে বাবার কথা। অনেক আগে। তার বদলে আমরা গিয়েছি উন্টো দিকে। ভারতের নিরাপদ দক্ষিণ প্রান্তে। এই তালবনে। আসল খবর, বর্মার জঙ্গলে জাপানী আর আই-এন-এর হাতে আমাদের কয়েক ডিভিশন পুরো সাবাড় হয়েছে। মহামাফ জি এইচ কিউ সিমলাতে বসে। খবর পৌঁছে ম্যাসেরিয়ায়। আসল তথ্য জেনেছেন ছয় মাসে। আরও সাবাড় হওয়ার পর। স্ততঃ যুদ্ধের কার্যদাকাহুনও ক্রমাগত বদলাতে হচ্ছে। দিন দিন তা পালটাচ্ছে। জাপানীরা পৃথিবীর সেরা মিলিটারী। সেটা প্রমাণ দিয়ে গেল এই যুদ্ধে। বৃটশ, আমেরিকা, জার্মান রাশিয়া? জাপানীদের কাছে ওরা তুলনাহীন। মনে অনেক দাগা পাওয়ার পর একজন আমেরিকান জেনারেল সেকথা স্বীকারও করেছেন সেদিন। "Although poverty-stricken and lacking in mental development, the Japanese are the most formidable adversary." ভারতীয় কাগজে যদিও ওকে বর্মার আখ্যা দিয়েই চলেছে এখনো।

এখানে মার দুই থাকার পর আমাদের ছাউনী আবার পথ ধরেছে। সকালে উঠেই হালুয়া-পুরী। সাথে চা-পান। তারপর গাড়ী ছাড়লো। ট্রেন নয়, মোটর কনভয়। সমস্ত দিন তা লাইন দিয়ে চলেছে। বেঙ্গের সংসার। লটবহর, ব্যক্তিগত মালপত্র, খানাদানী, মার কাঠ পর্বত গাড়ীতে চাপান দিয়ে

সে গাড়ী চলেছে। চলেছে তো চলেছেই। রাত দশটার আগে তার বিরাহ নেই। যতক্ষণ না অস্ত ছাউনী পৌঁছায়। রোজ গড়ে শ' মাইল। দুপুরে এক ক্ষেতের কাছে গাড়ীগুলো থাকে। ক্ষেতের জল নিয়ে চা তৈরী হয়। চা খাওয়ার পর গাড়ী আবার পথে উঠলো। বড় বড় করে চলেছে। ক্ষেতে জল নেই। ট্রেন খামাও। ওর বয়লারের গরম জলে চা তৈরী হলো। আপনারা খেয়ে দেখতে পারেন। রাতের বেলায় অস্ত ছাউনী। ধুলোয় আপাদমগ্নক ঢাকা। এক কিশুত কিমাকার দৃশ্য। ভূত সাজার কত বাকী? তখন কোনোরকমে হাত মুখ ধোওয়া বা স্নান করা। আর গোত্রাসে খেয়ে যাওয়া। কারণ পেটের ভিতর বৈশ্বানরের লীলা। খাবারও খালে তৈরী থাকে। মাংসও থাকে। রাতটা তাই খেয়ে কাটলো। কিন্তু সকালে সূর্য ওঠার আগে আবারও সেই পথ। যে পথের শেষ অবধি শেষ পাইনি। সূর্যদেব কখন উঠে কখন অস্ত যান, সে খবর আমরা রাখি না। যদিও তিনি আমাদের সামনে মাথার উপর দিয়েই চলেছেন। আমরা কখন উঠবো, কখন অস্ত যাব বিজ্ঞানায়, সেই ভাবনাই আমাদের প্রবল। কখনও উঠেছি পাহাড়ের চূড়া, কখনও গভীর খাদ, কখনও অন্ধকার সুড়ঙ্গপথে, কখনো বা চলেছি নদীর উপর দিয়ে।

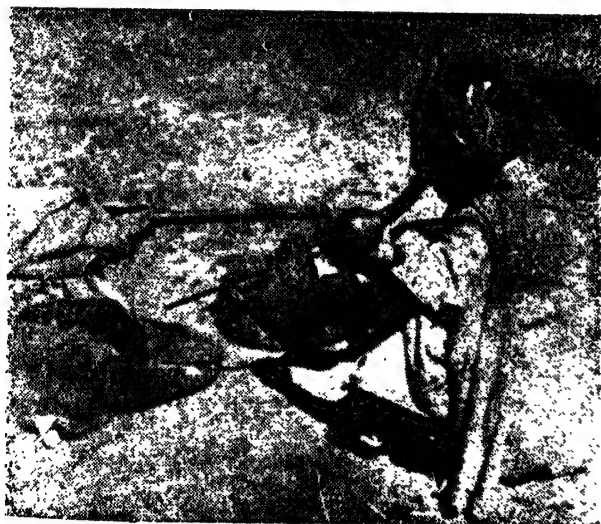
নৌকো দিয়ে দিয়ে ব্রীজ তৈরী হয়েছে। তারই ওপর দিয়ে আমাদের মোটরগুলো পার হয়ে চলেছে। উঁচু নীচু, পাহাড় পর্বত, গিরি নদী, খালবিল, বনবাগাড় পেরিয়ে অংশেবে বেখানে পৌঁছেছি, তার নাম বোম্বাই সহর। আর 'ও' দিকে এগোন বন্ধ। কারণ সমুদ্র। ও না থাকলে আরও যেতাম। আসবার পথে সত পথের তীক্ষ্ণ বীক। পাহাড়ের চূড়ায়। এমনও হয়েছে, সেখানে দাঁড়িয়ে গেছে দুখান। মোটর একেবারে মুখোমুখি। এগোলে বিপদ। পেছোলেও বিপদ। একেবারে খাদের তলায়।

আমরা সহর ছেড়ে এবং ডক ছেড়ে এবার জাহাজে। এবার বসবার পালা। সমস্ত মোটর গাড়ীগুলোও জাহাজে উঠা গেছে। অফুরন্ত অবসর, খাও, দাও, ঘুমাও। প্রাণভরে স্নান করো সমুদ্রে, সমুদ্রের হাওয়া খাও। তিন দিন জাহাজে। সমুদ্রে সাঁতারও কেটেছি। কিন্তু ও সবই পুরোন হয়ে গেছে। দশ বিশবার সমুদ্র-বাতাও হয়েছে। ওতে আর মন ভরে না। মনটা লোকালয়ে যেতে চায়। লোকের সাথে মিশতে চায়। একটু প্রাণখোলা আলাপচারী, কয়েক বছর জঙ্গলে কাটানোর পর। কিন্তু সেটাই মানা। কারণ কারো অজানা নয়। ফ্রন্টে ভাশনাল আর্মি। সে খবর বাইরে না ছড়ায়। বাইরে যেতে পাশের প্রয়োজন? পাশ যদি বা মেলে, সবুজ পোষাকে যেতে হবে। রাস্তা ঘাট সব জায়গায় বড় বড় গোল লেবেল মারা। তাতে একটা ক্রশ আর লেখা—Out of Bounds. তারপর মোড়ে মোড়ে এম পি অর্থাৎ মিলিটারী পুলিশ। অর্থাৎ বাবার বাবা। লড়াইয়ের সময়। পুলিশের উপর মিলিটারী। তার উপর মিলিটারী পুলিশ। চুরি করে সাদা পোষাকে গেলে ওরা কি করে ধরে ফেলে। অজুত ওদের ক্ষমতা। জবলপুরের ঘটনা। কয়েক বন্ধু মিলে চুরি করে সহরে বেরিয়েছেন। সাদা পোষাকে সহর বেড়ানো হচ্ছে। গল্পে মশগুল। আচমকা এক পত্ৰকার ধ্বনি এলো—Halt! খুব জোর। হঠাৎ ঠাণ্ডায় জল যেমন জমে বরফ হয়, ওদের পাগুলো ঠিক তেমনি জমে বরফ হয়ে গেল এক লহমায়। ধরা পড়লো সবাই।

আলোকচিত্র

সাপুড়িয়া

—বাবুজনাব প্রামাণিক



[ছবি পাঠানোর সময়ে ছবির পিছনে নাম শাম ও
ছবির বিষয়বস্তু যেন লিখতে ভুলবেন না ।]

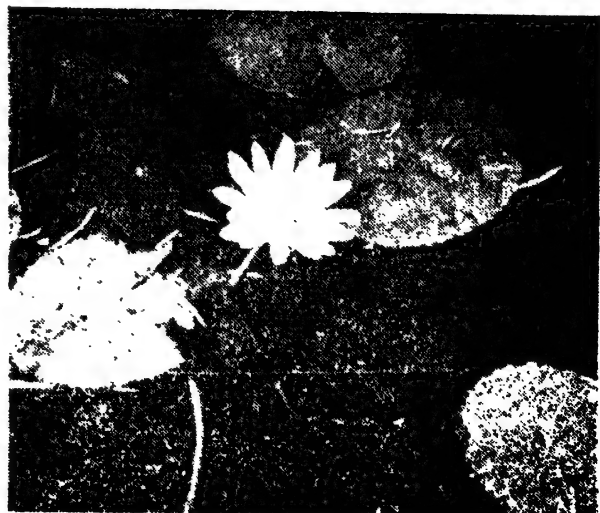


গৌরীকুণ্ড (ভুবনেশ্বর)

—অমলচন্দ্র দে

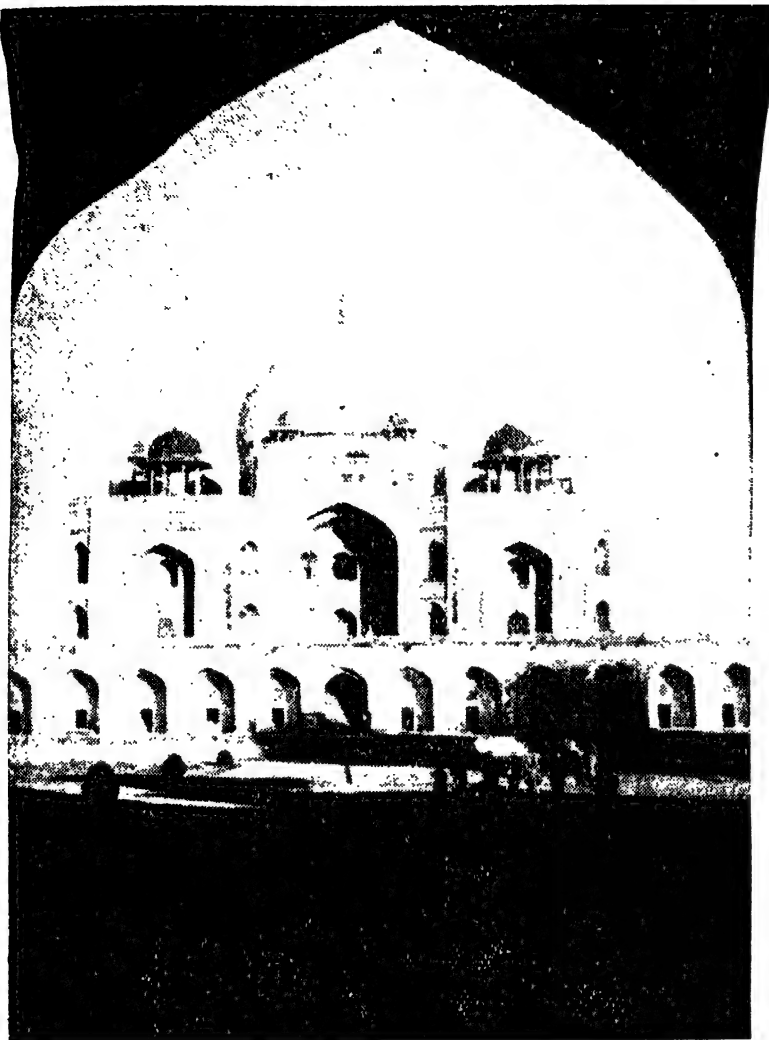
লিলি

—মিহিরলাল বন্দ্যোপাধ্যায়



হুমায়ূনের সমাধি (দিল্লী)

—প্রভাত সেন



কবরী-বন্ধন

—অমলচন্দ্র দে





ভাই-বোন

—বাসন্তী মৈত্র



পানী

—ক্যাপটেন ব্যানার্জী

তাজমহল

—শ্রীপথিক



মর্ম্মরমূর্তি

—মাত্তোব সিংহ

আমাদের বামারপে 'জুবান' ছিলেন হুম্বানের জাতা—

জাতিতে বানর। 'জবু' বলতে আমাদের এই বানরকুলের

কথাই মনে হওয়া উচিত। ইংরাজী ভাষার 'জাযো' অর্থ হাতী। আফ্রিকার অধিবাসীদের মধ্যে 'জাযো' কথাটি সর্বাধিক প্রচলিত। যে কোনও আফ্রিকানে আফ্রিকানে দেখা হলেই একে অপরকে হাসিমুখে অভিবাদন করে আর বলে 'জাযো'। মাউ মাউ অধ্যাবিত কেনিয়া রাজ্যে কিছুকালের মধ্যে দেখেছি তারা, দেখা হলেই বলে 'জাযো'। উগাণ্ডার রাজধানী কম্পালাতে রোটারী ক্লাবে গেছেছি, আফ্রিকান সভ্যরা নিজদেশের মধ্যে প্রত্যাভিবাদন করে বলে 'জাযো'। মধ্য-আফ্রিকার নীলনদের মোহনার জিঞ্জার জঙ্গলে শিকারীদের পরস্পরে অভিবাদন করতে গেছেছি 'জাযো' বলে। আমাকে কেউ শিখিয়ে দেয়নি, আমি নিজে নিজেই আমার গাড়ীর সোকারকে একদিন সকালে দেখা হতেই বললাম 'জাযো'। আমার সোকার গিলাগো হেসে গদগদ হয়ে বললো 'জাযো, জাযো'। পরক্ষণেই জিজ্ঞাসা করলো, 'সাহেব স্পিক সহেলী?'—'সাহেব, আপনি সহেলী ভাষা জানেন!' পরে জানতে পারলুম আফ্রিকাতে অনেক জাত অনেক ভাগ-বিভাগ থাকলেও গুদের সবটির একটা (Common Language) আছে বার নাম (Swahili) 'সোহাহিলী' বা সহেলী। পরে তথ্য সংগ্রহ করে জানতে পারলুম যে আন্তর্জাতিক কথ্য ভাষার মধ্যে এই সহেলী ভাষার স্থান সপ্তম এবং বিশ্বে আন্তর্জাতিক ভাষা শিক্ষাকক্ষে এই সহেলী ভাষা বিশেষ সমাদৃত। কেনিয়া, উগাণ্ডা, টানজানীকা, জাম্বিয়ার, নাইজেরাণ্ডা, কঙ্গো সর্বত্রই সহেলী ভাষার প্রচলন আছে। এ ভাষা শিক্ষাও কঠিন নয়, ব্যাকরণের দুর্গম কিস্তি ভেদ না করেই সহেলী শেখা যায়। সহেলী ভাষার জাযো হ'ল প্রথম অভিবাদন, অনেকটা হিন্দী ভাষার 'নমস্তে সুক্ৰিয়া' ইংরাজী "How do you do, Good Morning" "নমস্কার, কেমন আছেন," "জয় হিন্দ" অনেকটা এই জাতীয়। আজান হিন্দের সভ্যরা যেমন নিজদেশের মধ্যে 'জয় হিন্দ' বলে অভিবাদন করতো 'জাযো' কথাটির মধ্যেও ঐরূপ জাতীয়তার তাৎপর্যপূর্ণ আনন্দমিশ্রিত অকৃত্রিম শুভ কামনার ইঙ্গিত আছে। কাজেই যে কোনও আফ্রিকাবাসীকে 'জাযো-জাযো' বললে তারা খুশী হয়। জাযো অর্থ 'নমস্কার, অয়মারস্তঃ শুভায় ভবতু'।

আফ্রিকায় এসে আমরা একদিন দল বেঁধে দুপুর বেলায় মোটরে চড়ে জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করি। এদেশে নিয়ম হল, গাড়ী থেকে নামা নিষেধ, গাড়ীর দরজা-জানালা কাচ বন্ধ করে জঙ্গলের মধ্যে আড়ি পেতে থাকতে হয়। কিছুকাল মধ্যেই সব বকম বড় বড় জন্তু-জানোয়ারের দেখা পাওয়া যায়। সঙ্গে এদেশীয় লোক 'গাইড' নিতে হয়—জঙ্গলের নাড়ী-নক্সত্রের সব হিসাব তার জানা আছে। আমরা জঙ্গলে ঢুকবার কিছুক্ষণের মধ্যেই গাভী সিংহ দেখতে পেলাম। আমাদের মোটরের মাত্র তিন চার ফুট দূর দিয়ে সিংহের দল চলে গেল। জেব্রা, জিরাফ, বাইসন দেখলাম শত শত, আর জলী হরিণ দেখলাম হাজার হাজার। জঙ্গলের মাঝে মাঝে ঘাসের বন আছে—মাঠ আছে, সেখানে গাড়ী নিয়ে গেলে হাজারে হাজারে জেব্রা, জিরাফ, উটপাখী, হরিণ, বাইসন, সব কিছু দেখা যায়। মোটর গাড়ীতে বসে হাতী দেখা নিরাপদ নহে। আমরা উগাণ্ডা

• থাকাগুলোে রাখন হাতী দেখতে যেব হলার—হির হল সারারাহি

জাযো

যাঙ্গসম্রাট পি, সি, সরকার

এখানকার এক (Tree Top Hotel) গাছের ডগায় হোটেলের থাকতে হবে। দিনের বেলা বড়না হয়ে ঐ গাছের ডালে (দিনেবার টার্কেনের মত বাড়ীতে) রাত জেগে বসে থাকতে হবে—নীচে আসবে সব বকম জন্তু-জানোয়ারের দল—বিশেষ করে হাতীর দল। আমরা বখন দেখার জন্তু গেলাম তখন সব ব্যবস্থা সুন্দর ছিল। কারণ এর চার-পাঁচদিন আগেই ইংলণ্ডের রাজমাতা এখানে এসেছিলেন এবং তিনিও ঐ গাছের ডালের হোটলে বসে জানোয়ার দেখেছিলেন। দিনে দিনে বেতে হয় আবার দিন হলে ফিরে আসতে হয়। কিন্তু বনের মধ্য দিয়ে বাবার সময় যে কোনও যুহুর্ন্তে যে কোনও বন্যজন্তুর দেখা পাওয়া যেতে পারে। সিংহ, বাঘ, গণ্ডার, হরিণ, হায়েনা, জেব্রা, জিরাফ এরা কেউই গাড়ী আক্রমণ করে মাছুষ মারে না। গাড়ী বন্ধ করে চুপ করে বসে থাকলে এদের জন্তু কোনও ভয় নেই; তবে 'জাযো' বা হাতীর কথা স্বতন্ত্র। সেজ্ঞ এখানকার গভর্নমেন্ট কতকগুলি কর্তব্য লিখে নোটস দিয়ে দিয়েছেন।

প্রথমতঃ জঙ্গলে ঢুকলেই মাঝে মাঝে লেখা দেখা যায় Elephants have the right of way অর্থাৎ এই পথে আগে হাতীকে যেতে দিতে হবে। হাতীরা সাধারণতঃ তাদের জানা রাস্তা দিয়ে বেশী বাতায়াত করে। কাজেই ঐ সব রাস্তা দিয়ে প্রায়ই জংলী হাতী বাতায়াত করতে দেখা যায়। ঐ সব বাধা-ধরা জায়গা ছাড়াও অজ্ঞাত সর্বত্র প্রায়ই হাতীর দেখা পাওয়া যেতে পারে। তাই মোটর-চালকদিগকে



'জাযো'

নিম্নলিখিত উপদেশ ছাপিয়ে জানানো হয়েছে—(ক) রাস্তার পাশে ষোপ খাকলে তাড়াতাড়ি মোটর চালাবে না, বাস্তা বাঁকা হলে খুব উচ্চ-নীচ হলেও তাড়াতাড়ি গাড়ী চালাবে না। (খ) রাস্তায় হাতী দেখলে এগিয়ে যেও না, সাবধান হয়ে দূরে সরে পড়বে, হাতীকে আগে "পথ ছেড়ে দেবে। গাড়ী নিয়ে আস্তে হাতীর দিকে এগিয়ে যেও না, মনে করো না যে গাড়ী দেখে হাতী চলে যাবে বরং তুমিই অবাক হয়ে দেখবে যে, এক সেকেন্ডের মধ্যে তোমার পেছনেও একটা হাতী পাড়িয়ে আছে, বা রাস্তার ধারে বতগুলি ষোপ দেখেছিলে সবই হাতীতে পরিণত হয়ে আছে। (গ) হাতী রাস্তার ধারে রয়েছে দেখে অধীর হয়ে গাড়ীর গিয়ার চেপে ভীরবেগে পাশ হতে চেষ্টা করো না, হাতী এতে চমকে উঠে তোমার পেছনে ভীষণ ভাবে তড়া করে। (ঘ) হাতী দেখে গাড়ীর হর্ণ বাজিও না, বরং ইঞ্জিনের শব্দ বাড়িয়ে দিয়ে তাকে বুঝতে দিও যে তুমি বাছ। (ঙ) তোমাকে শেষ ফেরা ঠিকার ধরতে হবে, তাড়াতাড়ি যেতে হবে, তা হলে অনেক আগে রওনা হও, কারণ মাঝপথে বুনোহাতী তোমাকে কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত আটকে রাখতে পারে। (চ) হাতী যদি রাস্তার দিকে মুখ করে না থাকে, যদি রাস্তার দিকে আসতে না দেখে, যদি অনেক দূরে দেখে তবে ভয় নেই, নিশ্চিন্তে চলে যেও, হাতী তোমার দিকে নজরই দিবে না। আফ্রিকার জঙ্গলে পথ চলতে চলে এদেশের গাড়ীচালকদের এই ছয়টা কথা সর্বদা মনে রাখতে হয়। উগান্ডার Road Safety Propaganda Committee মাঝে মাঝেই এদেশের বড় বড় সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে সব কথা জানিয়ে দেন।

গভর্নমেন্টের বন্য প্রাণী সংরক্ষণ সমিতির প্রধান অফিসার (মি: আর, এম, বিয়ার) একটি ঘটনার কথা লিখেছেন। সম্প্রতি একজন আমেরিকার ফিল্ম প্রযোজ্যার তাঁর সহকারী সহ আফ্রিকার জঙ্গলে আসেন। এক দল হাতী এখানকার "নিয়ামাগাসানী" নদী পার হচ্ছিল তখন তিনি দুই-তিন শত গজ দূর থেকে ঐ হাতীগুলি দেখে গাড়ী থেকে নেমে ফিল্ম তুলতে আরম্ভ করেন, তৎক্ষণাৎ অল্প একটা হাতী বিদ্রোহবশত তার পেছন থেকে এসে আক্রমণ করে।



আফ্রিকার হাতী আপন মনে ভল খাচ্ছে

তিনি ক্যামেরা ছুঁড়ে ফেল দিয়ে কাঁটাঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়েন। ক্যামেরাটিকে ভেঙ্গে চূরে দিয়ে হাতী ঐ কাঁটার ষোপের মধ্য থেকে মিষ্টার ল্যাণ্ডারকে টেনে বের করে তিনবার শুঁড় দিয়ে ধরে উপর দিকে ছুঁড়ে মারে—যখন তিনি হাতীর দুই পায়ের ফাঁকের মধ্যে পৌঁছেন তখন তিনি সম্পূর্ণ মরার ভাগ করেন। এটা কার্যকরী হয়, কারণ হাতী তাকে ছেড়ে দিয়ে যায়—যদিও সন্দেহের সঙ্গে অনেকবারই পেছন ফিরে দেখেছিল। মিষ্টার ল্যাণ্ডার প্রাণে মারা যান নি, তবে তাঁর ডান পা-টি গিয়াছে, বা পা-টিও মচকে গিয়েছে—সারা শরীরে অসংখ্য ক্ষতের দাগ নিয়ে আজও বেঁচে আছেন।

আফ্রিকার জঙ্গলে একটা হাতী সর্বাধিক সংবাদপত্রে পাবলিসিটি পায়। তার সম্বন্ধে এদেশে এবং বিলাতে অসংখ্য সংবাদ ও ফটো ছাপা হয়েছে। আফ্রিকায় জঙ্ঘ সংরক্ষণ সমিতির অন্যতম ভারপ্রাপ্ত অফিসার মিষ্টার জন মিলস এই হাতীর অনেক বিবরণ লিখেছেন। আফ্রিকার যে হাতীটা এত প্রসিদ্ধি পেয়েছিল—জাঙ্গীরা তার নাম দিয়েছিল "লুব্যাংগাওন" (Lubangawon) যার ইংরেজী অর্থ করে ইংরেজগণ এর নাম দেন The Lord Mayor...যখন এই জঙ্গলের প্রধান কাথালয় ১৯৫৪ সালে পারা (Paraa) নামক জায়গায় স্থানান্তরিত হয় তখন প্রত্যেক দিন দুপুরে এই লর্ড মেয়র এসে কাঠের মিস্ত্রিদের কার্যস্থলে এসে দাঁড়িয়ে থাকতো। একদিনও বাদ যায় নি—প্রত্যেক দিন দুপুর বেলায় লর্ড মেয়র এসে কাজের কাছে হাজির। মিস্ত্রিরা ঐ লর্ড মেয়রের অন্ততঃ ত্রিশ গজ দূর থাকলে তবে কাজে মন দিত। লর্ড মেয়র কলা খেতে খুব ভালবাসতো। যদি সে বুঝতে পারে কোনও ক্যাম্প বা মোটর গাড়ীতে কলা রয়েছে—তবে সে নিবিবাদে সেখানে গিয়ে শুঁড় দিয়ে কলা বের করে আনতো। মোটর গাড়ীর দরজায় কানালার কাচের ফাঁক দিয়ে সে কোঁশলে শুঁড় চুকিয়ে দিতে ওস্তাদ হয়েছিল। রাত্রিবেলার ক্যাম্পের পাশে আগুন জালিয়ে নিশ্চিন্ত মনে লোকেরা শুয়ে থাকে। আগুন দেখলে হাতী, গণ্ডার, সিংহ সব প্রাণীই ভয় পায়, কখনও ক্যাম্পের কাছে ঘেঁষে না। লর্ড মেয়রের কথা স্বতন্ত্র, সে রাত্রিবেলার চুপি চুপি এসে জানালা দিয়ে শুঁড় চুকিয়ে কলা-মুলা বা পায় নিয়ে যায়।



আফ্রিকার জঙ্গলে শুধু হস্তীরা নহে, জলহস্তীরাও দলে দলে চলে

আর নিম্নিত লোকদের সাথে মজা করার জন্য তাদের গায়ের লেপ, কপাল সব টেনে নিয়ে যায়। লর্ড মেয়র কাউকে মারে নি, তবে ভয় দেখিয়েছে সবাইকে। কত শত লোক তার ফটা তুলেছে—তার ফটা দিয়ে কত বকম ফটা পোর্টকার্ড তৈরী হয়েছে। এদেশীয় ও বিলাতী কত শত খবারর কাগজে তার ছবি প্রথম পাতায় ছাপা হয়েছে—এহেন বিশ্ববিখ্যাত হয়ে সে লোকজনের সঙ্গে ঠাট্টা-ইয়ার্কী করতে ভালবাসতো—কলা চুরি করে খেতো। একবার একদল শিকারী এসে এখানে একটা হোটেলে আশ্রয় নেয়। হোটেলে জায়গা বেশী ছিল না—তাই কয়েক জন গাড়ীর দরজা-জানালা বন্ধ করে সেখানে শুয়ে পড়েন। কিন্তু খাওয়ার বিনিম্য (কলামুগা) গাড়ীর নীচে লুকিয়ে রেখেছিলেন। লর্ড মেয়র যথার্থীতি তার বাতিবেলার টকল দিতে এসে, ঐ কলার খোঁজ পান কিন্তু শুঁড় দিয়ে ঐগুলি আনতে না পেরে শেষে গাড়ীটাকে উন্টের দূবে সরিয়ে দিয়ে কলা খেয়ে নেয়। গাড়ীর আবোহীরা অকত দেখে থাকলেও তারা যে ভয় পেয়েছিল তা জীবনেও ভুলতে পারবে না। সম্প্রতি একটি বিখ্যাত ফিল্ম কোম্পানী আফ্রিকার জঙ্গলে ছবি তুলতে আসেন। তারা তাদের একবারে ট্রিমারঘাট তৈরী করে পাশেই তাদের Naked Earth নামক ফিল্মের 'সেট' তৈরী করেন। ঐ সেটে একটা খুব উঁচু কাঠের বেড়া দেওয়া হয়েছিল।

শক্ত কাঠের বেড়া দেওয়া উদ্দেশ্য—যাতে হঠাৎ কোনও জঙ্গী জানোয়ার সেখানে ঢুকতে না পারে। একদিন সকালে ফিল্ম কোম্পানীর সমস্ত লোকজনকে সচকিত করে সেখানে হাজির হল লর্ড মেয়র আর ঐ বেড়াটাকে ফুংকারে উড়িয়ে দিয়ে নীচে নেমে এসে তাদের জঙ্গ খেয়ে গেল। ফিল্ম কোম্পানীর লোকেরা এই ব্যাপারটিকে পুরাপুরি ফিল্ম তুলে নিয়েছেন—জানা গেল যে

ঐ ফিল্ম এই দুগুটা দেখানো হবে। পরে ফিল্ম কোম্পানী লর্ড মেয়রের জন্য ঐ খেড়ার এক দিকে রাস্তা ছেড়ে দেওয়াতে আর কোনও দিন নতুন বিপদ হয় নাই।

একবার এখানকার বঙ্গ জঙ্গ সুরক্ষণ সমিতির অফিসারের বাড়ীর কাছে একটা জঙ্গের কল লর্ড মেয়রের দৃষ্টিতে পড়ে। লর্ড মেয়র জঙ্গের কল নাড়াচাড়া করে সেটাকে হঠাৎ খুলে ফেলে এবং প্রাণভয়ে ঐ জঙ্গের জঙ্গ খেয়ে নেয়। পরে দেখা গেল যে প্রত্যেক দিন তিনি একটি করে জঙ্গের কল খুলে দিয়ে তার থেকে জঙ্গ খাচ্ছেন। লর্ড মেয়র আর পাচা ডোবা বা পঙ্খিল হ্রদের জঙ্গ খেতে চান না, প্রত্যেক দিন কলের জঙ্গ নিজে নিজে খুলে নিয়ে প্রাণ ভয়ে খেয়ে নেয়—কিন্তু কোন দিনই তিনি আর কলটা বন্ধ করে রাখেন না। ফলে প্রতিবেশীদের হয় জঙ্গকষ্ট। তারা স্থির করলেন রাত্রিবেলার জঙ্গের সাপ্লাই বন্ধ করে দেবেন। লর্ড মেয়র রাত্রিতে কল খুলে দেখেন জঙ্গ নেই, এত বড় অপমান! সে কলটা ভেঙ্গে—মুচড়িয়ে অস্ত্র একটা কল খোলা হল সেটাতো জঙ্গ নেই। এই ভাবে পর পর কল ভেঙ্গে দেওয়া হচ্ছিল। কর্তৃপক্ষ বেপরোয়া হয়ে হাতী বাতে না খেতে পারে (Elephant Proof) জঙ্গের কল বসিয়েছে। লর্ড মেয়র মায়াব খুন করে নাই—তবে কলা আর ভুটীর খোঁজে সে অনেক তাঁবু ছিঁড়েছে, অনেক গাড়ী উন্টে দিয়েছে, লোকজনের বাড়ী ঘর অনেক ছোটখাট ইয়ারতী ভেঙ্গে চুরে দিয়েছে। কাজেই গভর্ণমেন্ট একদিন তাকে গুলী করে মারতে বাধ্য হন। মৃত্যুর পর তার সমস্ত বিবরণ কাগজে ছাপা হয়—মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল মাত্র বিশ বৎসর, তার দেহের ওজন ছিল ৩০০ টন। আফ্রিকার 'ও বিলাতের পত্রিকায় পত্রিকায় তার ফটা ও মৃত্যু-সংবাদ ছাপান হয়েছে। লর্ড মেয়র মরেও আজ হস্তকূলে অমর।



গাছের ডগার (Tree Top) হোটেল থেকে

হাতীর দল দেখা যাচ্ছে



হাতী তাকিয়ে রয়েছে—এ রাস্তা মোটেই নিরাপদ নয়

"Ships that pass in the night, and speak each other in passing,
Only a signal shown and a distant voice in the darkness;
So on the ocean of life we pass and speak one another
Only a look and a voice, then darkness again and a silence."

—H. W. Longfellow.

সাধ্বী অম্বোয়াকামিনী

ঐশ্বরীর ব্রহ্ম

[১২৩০ সালের বৈশাখ মাসে (ইং মে ১৮৫৬) চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত বাইহাটি পরগণাতুল্ল ঐশ্বরী গ্রামে স্বর্গোন্মাদা দেবী অম্বোয়াকামিনী রায়ের জন্ম । ১৮৬৬ সালের মার্চ মাসে তাঁহার বিবাহ হয় স্বর্গীয় প্রাণকালী রায়ের পুত্র ঐশ্বরী প্রকাশচন্দ্র রায়ের সহিত । বর-বধুর বয়স যথাক্রমে ১৮ এবং ১০ বৎসর । অম্বোয়াকামিনীর পরলোকগত হওয়ার তারিখ ১৫ই জুন ১৮১৬ । জন্ম—১৮৫৬, মৃত্যু—১৮১৬, বিবাহ—১৮৬৬ এই বর্ষকালের প্রত্যয়েই হয়ত ঐবিধানচন্দ্র রায় আজ পশ্চিমবঙ্গের সুখ্যমন্ত্রী । সাধ্বী অম্বোয়াকামিনী আমার প্রতিবেদী উত্তর রায় মহাশয়ের পুত্রনন্দী মাতা ছিলেন । এই জীবন-আলেখ্যটি ঐপ্রতাপচন্দ্র সঙ্কুৎকার কর্তৃক লিখিত প্রীচরিত্র নামক পুস্তকের (প্রী-জাতীর-উন্নতি বিষয়ক উপদেশ এবং ধর্মাস্ত্র) সংশোধিত ও বর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে গৃহীত । তদানীন্তন বঙ্গ মহিলা সম্বন্ধে ১৩০৫ সনে প্রকাশিত এই অংশটুকু বিশ্বস্তির অতল ভলে ছবিয়া বাওয়ার পূর্বে জীর্ণ পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৫৮—১৬৪ হতে উদ্ধার করা গেল । কারণ মনে হয়, স্বর্গোন্মাদা অম্বোয়াকামিনীর চরিত্র আজকের দিনেও আমাদের সমাজের মা ও বোনদের অমুকরণযোগ্য—]

বর্তমান সময়ে সাধ্বী অম্বোয়াকামিনীর চরিত্র মহিলাকুলের পক্ষে বিশেষরূপে হিতকর । তিনি আমাদের নিকট পরিচিতা ছিলেন । এবং আমাদের পরমাত্মীয়া ছিলেন । উত্তর-পূর্ব বাঙ্গালার টাকী নামক পল্লীতে কারয়কুলে অল্পমান ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে অম্বোয়াকামিনীর জন্ম হয় । ১৮১৫ শকে বাঁকিপুর নগরে তাঁহার মৃত্যু হয় । বাল্যকালে তাঁহার কোনরূপ বিদ্যালিক্ষা হয় নাই । এবং দশ বৎসর মাত্র বয়সে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল । কিন্তু যে ব্যক্তির হস্তে তাঁহার ভার অর্পিত হয় তিনি অতি সুপাত্র ও সদাশয় । টাকী নিবাসী ঐশ্বরী প্রকাশচন্দ্র রায় অম্বোয়াকামিনীকে বিবাহ করিয়া অনতিবিলম্বে তাঁহার জ্ঞান ও ধর্ম শিক্ষা কার্যে মনোযোগী হইয়াছিলেন, অল্প বয়স হইতেই অম্বোয়াকামিনীর ধর্মে মতি জন্মে, ২১ বৎসর বয়সক্রমে তাঁহার ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা হয় । তখন হইতেই তাঁহার প্রেত ধর্মতৃষ্ণার সঞ্চার হয় । তিনি ধর্মিষ্ঠ স্বামীর সঙ্গে একত্র হইতে বঞ্চিত হইয়েন, এবং পরহৃৎবে সহানুভূতি ও সহায়তা করিবার জন্য আত্মনিগ্রহে নিযুক্ত হইয়েন । এই সময়ে বঙ্গদেশ ব্যাপিয়া একটি প্রকাণ্ড বড় হয়, এবং তাহাতে লোকে ব্যর্থ হয় নাই ভীত হইয়াছিল । তাহাদের কষ্ট নিবারণের জন্য অম্বোয়াকামিনী অর্থাভাবে আপনার স্বর্ণভাবিজ অকাতরে দান করিয়াছিলেন । তাঁহার পরহিত-পরায়ণ স্বভাবের ইহাই প্রথম পরিচয়, অম্বোয়াকামিনী নিজ জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া বৌবনের প্রান্তেই স্বামীর কর্মস্থানে বিহার প্রদেশে বাস করেন ।

মতিহারী ও বাঁকিপুর, বিশেষত বাঁকিপুর তাঁহার কর্মভূমি হয়, যখন যেখানেই বাস করিতেন দয়া ও পরোপকার প্রবৃত্তির পরিচয় দান করিতেন, অতি সামান্য বিষয়েও পরস্পরে মনযোগিনী হইতেন । যদি কেহ তাহাকে কোনপ্রকার কল, মূল, কি মিষ্টান্ন উপহার দিত, তিনি তাহা অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভাগ করিয়া অনেকের গৃহে পাঠাইতেন এবং তাহার একাংশ মাত্র নিজ

পরিবারের জন্য রাখিতেন । বিহার অঞ্চলে নারিকেল বড় হুতাপ্য বস্তু । একবার অম্বোয়াকামিনী দুই চারিটি নারিকেল উপহার পাইয়া তদ্বারা এক প্রকার পিষ্টক প্রস্তুত করিলেন, এবং নিকটস্থ বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আহার করাইলেন এবং ছাত্রেরা প্রবাসে অতি সামান্য আহার করিয়া থাকে, এই নিমন্ত্রণে সুবাস্থ্য মিষ্টান্ন ভোজনে অতিশয় আনন্দিত হইল ।

এই সামান্য বিষয়ের উল্লেখ এইজন্য করা যে, অম্বোয়াকামিনী অতি শীঘ্রই পরোপকার ত্রুতে এক অধিক অমুরাগিণী ও উৎসাহী হইলেন যে অন্তরে সেবা তাঁহার জীবনের প্রধান কার্য হইয়া উঠিল । বৈষ্ণব লোক হউক না কেন, উচ্চপদস্থ হউক আর অতি নীচ জাতীর হউক বিপন্ন হইলেই সাধ্বী অম্বোয়াকামিনী তাহাদের সেবার আত্মসমর্পণ করিতেন । একদিন সমাচার আসিল যে বাঁকিপুরের কোন উচ্চ কর্মচারীর পত্নী প্রেসবন্দ্যার পীড়িত অবস্থায় পড়িয়া আছেন । তাঁহাকে এবং তাঁহার কন্যা শিশুকে সেবা করিবার কোনো লোক নাই । অম্বোয়াকামিনী তখন আহার করেন নাই । কিন্তু শুনিবামাত্র তিনি সেই স্থানে গমন করিলেন এবং যদিও এই পরিবার তাঁহার নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত, তথাপি এরূপ বস্তুর সহিত প্রস্তুতি ও শিশুর সেবার নিযুক্ত হইলেন যে, লোকে দেখিয়া আশ্চর্য হইল । অনাহারে সমস্ত দিন ইহাদের সেবা করিলেন কিন্তু শিশুটিকে বাঁচাইতে পারিলেন না । তিনি আর একদিন শুনিলেন একটি অতি নীচ জাতীয় স্ত্রীলোক প্রেসবন্দ্যে অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, দ্রুতগতি সেখানে গিয়া দেখেন, প্রস্তুতি একজন কয়লা-বিক্রেতার পত্নী, একটি অতি ক্ষুদ্র অপরিষ্কার কুটির মধ্যে বাস করে । আবার সে কুটিরের অর্ধাংশ ক্ষয়প্রাপ্তিতে পরিপূর্ণ, ঘরে ভয়ানক দুর্গন্ধ, শয্যা নাই, বস্ত্র নাই, ভোষণ নাই পখ্য নাই । উপস্থিত হওয়া মাত্র তিনি নিজ পরিচিত চিকিৎসকের জন্য লোক পাঠাইলেন । নিজগৃহ হইতে শয্যা ও বস্ত্র আনাইলেন এবং স্বহস্তে বাঁটা লইয়া ঘুলি মলিন ঘর পরিষ্কার করিতে ব্যস্ত হইলেন । দুঃখী গৃহস্থেরা অনেক নিবেদন করিল, তিনি শুনিলেন না, বলিলেন, এই দুই হস্ত কিসের জন্য ? শীঘ্র কুটীর-বাসিনীকে স্নান করিয়া তুলিলেন এবং বতদিন সে সবল না হইল তাহার তত্ত্বা করিলেন ।

কোন আশঙ্কক অতিথি অম্বোয়াকামিনী দেবীর গৃহে নিবাসের হইয়া আসিলে কিরিত না । একবার একজন সার্কাস অভিনেতা-দিগের মধ্যে একজন পীড়িত হইয়া তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইল । এ প্রকার লোকের সঙ্গে তাঁহার কখনও কোন সংস্রব ছিল না, তথাপি পীড়িত দেখিয়া তাহাকে তখনই গৃহে স্থান দিলেন এবং বস্ত্র সহকারে আরোগ্য করিয়া বিদায় করিলেন । এই প্রকার অনেক লোক তাঁহার গৃহে আশ্রয় লইত, এবং সময়ে সময়ে যের অকৃতজ্ঞতা ও স্বার্থপরতা প্রকাশ করিত কিন্তু এক দিনের জন্য তিনি পরসেবার বিরত হইতেন নাই । তাঁহার নিজ পরিবারে বিশেষতঃ বালিকা প্রতিপালিত হইত । তাহারা নানা স্থান ও নানা পরিবার হইতে সংগৃহীত । তাহাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সঙ্গার সন্মুখার ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন । আপনার পাঁচটি সন্তানদের সঙ্গে তাহাদিগকে রক্ষণ ও পালন করিতেন । এবং আশ্চর্য্য এই যে,

নিজের পুত্রকন্যাদের সঙ্গে পালিত সন্তানদের কোন প্রকার প্রভেদ রাখিতেন না। যদি কেহ বলিত তাঁহার অবিবার্হিতা কন্যার হাতে কাচের চুড়ী খুলিয়া এক ছোড়া সোনার চুড়ী পরাইয়া দেও। তিনি বলিতেন তা হলে অপর দশটি কন্যা কি ভাবিবে? পাছে তারা মনে দুঃখ পায়, পছে তারা মনে করে আমাদের মা নাই, তাই আমাদেরকে শুধু হাতে থাকিতে হয়। অতঃপর আমি এরূপ ইতর-বিশেষ করিতে পারি না।

অঘোরকামিনী নিজের পরিধানের জন্ত অতি সামান্য এবং কুচিবিক্রম বস্ত্রাদি ব্যবহার করিতেন, তাহা দেখিয়া অনেক লোক নিশা ও বিজ্ঞপ-ব্যঙ্গ করিত, কিন্তু তিনি তৎ প্রতি কর্ণপাত করিতেন না। প্রকাশ বাবু উচ্চদরের ডেপুটি কালেকটর; তাঁহার উচ্চ বেতন, কিন্তু তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী নীলে ছোবান খান পরেন, মাসের শেষ পর্যন্ত বেতনের টাকা কুলার না, সাধারণের হিতকর কার্যে সমুদায় ব্যয় হইয়া যায়। বাঁকিপুরে একটি বালিকা বিজ্ঞানসর আলো, তাহার শিক্ষকতা ও তত্ত্বাবধান কার্যে অঘোরকামিনী সারাদিন ব্যস্ত থাকিতেন। এবং তাঁহার ব্যয় সমুদায়ের জন্ত তাঁহার মাসিক আয়ের অনেক টাকা তাঁহাকে দণ্ড দিতে হইত। আমরা সকলে ইহা জানিতাম, কিন্তু তিনি নিজে কখন ইহার উল্লেখ করেন নাই, এই বিজ্ঞানসর সম্পর্কে একটি অপূর্ণ কাহিনী আছে। ইহা স্থাপনের কিছুকাল পূর্বে অঘোরকামিনী ভাবিলেন যে বিজ্ঞানসর চালাইতে গেলে নিজের উচ্চ শিক্ষার আবশ্যক। আমার উচ্চ শিক্ষা নাই, শিক্ষা করিতে হইবে। তখন তাঁহার বয়স্ক্রম ৩৫ বৎসর, এই বয়সে পুত্র সন্তানের মাতা হইয়া, সম্পন্ন ব্যক্তির ভাড়া হইয়াও তিনি কিয়ৎ কালের জন্ত বাঁকিপুর্ষ ভ্রাম্য করিলেন ও লক্ষ্মী নগরে মিসনারাদিগের জীবিতালয়ে মহা উৎসাহে ছাত্ররূপে ভর্তি হইলেন। সেখানে নয় মাস কাল পরিশ্রম করিয়া নিজ পরিবারে ফিরিয়া আসিলেন এবং বালিকা বিজ্ঞানসরের কার্যে নূতন উদ্যমে পুনরাবস্থ করিলেন।

অঘোরকামিনীর এই সমস্ত হিতৈষণার উল্লেখ করিলাম বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন, তিনি তাঁহার নিজ পরিবারের প্রতি এক দিনও উপেক্ষা কিংবা অবহেলা করিয়াছিলেন। স্বামী ও সন্তানদের জন্ত কি পর্যন্ত পরিশ্রম করিতেন ও তাঁহাদিগকে ভালবাসিতেন, সমস্ত পরিবার সম্বল নরনে তাহার ব্যাখ্যা করিয়া ফুটাইতে পারে না। প্রকাশ বাবুকে সরকারী কন্স্টেবলকে নানা স্থান পরিভ্রমণ করিতে হইত। অঘোরকামিনী চিরদিন তাঁহার অনুগামিনী হইতেন। পথ ভ্রমণের সঙ্কট ও অন্তর্বিধা অকাতরে বহন করিতেন। একবার প্রকাশ বাবুর অতি উৎকট পীড়াতে প্রাণসংশয় হয়, স্বামী অঘোরকামিনী দুই মাস পর্যন্ত দিন-রাত্রি তাঁহার চিকিৎসা-পথ্যের জন্ত এরূপ অবিশ্রান্ত সেবা করিয়াছিলেন যে, যে তাহা দেখিয়াছে, সে কখন ভুলিবে না। অতঃপর অঘোরকামিনী স্বামীর সঙ্গে সর্বপ্রকার দৈনিক সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া কঠোর ব্রহ্মচর্যাবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বামীর বাহ্যিক সেবা তিনি জীবনের প্রধান কার্য মনে করিতেন না। স্বামীর ধর্মভাগিনী হওয়াই প্রধান কর্তব্য মনে করিতেন।

স্বামীর নিকট সম্পূর্ণ বাধ্যতা তাঁহার প্রধান ব্রত। প্রকাশব্রত

ব্রাহ্মসমাজের একজন ব্যক্তি, তাঁহার নিষ্ঠা, ভক্তি, সচরিত্রতা সকলেই জানেন। তাঁহার অনেক ধর্মবন্ধু আছেন, কিন্তু তাঁহার ভাষ্যের জায় ধর্মবন্ধু তিনি অপর কাহাকেও কখন পান নাই। নিত্য ধর্মপ্রসঙ্গে, ধর্মবিধানে, ধর্মপ্রচারে অঘোরকামিনীর অবিশ্রান্ত উৎসাহ। বাঁকিপুর্বে কোন সাধু ব্যক্তি উপস্থিত হইলে অঘোরকামিনী সুসজ্জিত পূজা-মন্দিরে মহাসমারোহে পড়িয়া বাইত। সেবার ও আদরের সীমা থাকিত না। অঘোরকামিনী প্রতি বৎসর অনেকগুলি আত্মীয়বন্ধু সঙ্গে করিয়া রাজগৃহ নামক বৌদ্ধতীর্থ পর্যটন করিতে বাইতেন। ধর্মসাধন করাটাই এই পর্যটনের একমাত্র লক্ষ্য। দুই তিন দিন সেখানে অবল উৎসাহে ধর্মোৎসব করিতেন, গম্যপথে দ্রোকদিগের নিকট প্রকাশ্য উপদেশ ও নগ্ন-সংকীর্ণন করিতেন। এইরূপে তিনি ধর্মোৎসাহ স্বামীসঙ্গে নিগূঢ় ভক্তি, নিষ্ঠা ও উচ্চব্রত পালন করিয়াছেন। দ্বৈতবিশ্বাসনার অঘোরকামিনীর অসামান্য ভক্তি দেখিয়া আচার্য্য কেশবচন্দ্র অতিশয় সম্মোহিত প্রকাশ করিয়াছিলেন। বাস্তবিক তাঁহার ধর্মভাব হইতেই তাঁহার পরসেবার প্রবৃত্তি, ভগবদ্ভক্তি এবং লোকসেবা সমান পরিমাণে তাঁহার চরিত্রকে গঠিত করিয়াছিল।

অঘোরকামিনীর হৃষ্টান্তে বাঁকিপুর্ষ মহিলামণ্ডলীতে হলুদ পড়িয়া গিয়াছিল। আজ রেলগাড়ী ভ্রমণকারিণী জ্বালোকদিগের জন্ত বিশ্রামগৃহে জীবিতের প্রতি অত্যাচারী দুর্য্যচারিগের শাসনের জন্ত গভর্ণমেন্টে দরখাস্ত করা, আজ সাংসদগণের ধর্মোচ্ছান এরূপ নানা প্রকার সংকার্যে তাঁহাদের সর্বদা মিশ্র উৎসাহ ছিল। কিন্তু বহু দিন হইতে অঘোরকামিনীর শরীর অসুস্থ হইতেছিল। নানা পরিশ্রমে ও নানা কষ্টভার গ্রহণের জন্ত তিনি বার বার রোগাক্রান্ত হইয়াছিলেন। শেষে শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল, ভ্রাতৃক অসুস্থতার হইল, তাঁহার আত্মীয়স্বজন সকলেই বুঝিলেন যে, এবার আরোগ্যের কোন ভরসা নাই। সকলেই তাঁহার সেবার নিযুক্ত হইলেন। চিরজীবন তিনি লোকের সেবা করিয়াছিলেন, লোক এ অসময়ে কি তাঁহার গুণ ভুলিতে পারে? তাঁহার স্বামী ও সন্তানগণ অবিশ্রান্ত সেবার জন্ত পরিশ্রম করিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। দেবী অঘোরকামিনী ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ১৫ই জুন দিবসে ভগবানের পবিত্র স্নাত্ত তনিতে তনিতে ও করিতে করিতে ইহলোক হইতে বিদায় লইলেন।

আজ আর সে বাঁকিপুর্ষ নাই। বালিকা বিজ্ঞানসর আছে। ব্রাহ্মসমাজ আছে, জীবিতলী লোকসমাজে সকলেই রহিয়াছে, কিন্তু দেবী অঘোরকামিনীর অভাবে সকলেই অজ্ঞান, তেজোহীন, প্রাণহীন। অঘোরকামিনী সুশিক্ষিতা মহিলা ছিলেন না, সুকৃতি কি সভ্যতার জন্ত বিখ্যাত করেন নাই, সকল বিষয়েও সচ্চরিত্রতাও করিতে পারিতেন না, কিন্তু তাঁহার পরসেবার আত্মসমর্পণ, সংকার্যে উৎসাহ, সংসারবৈরাগী, চিন্তাশক্তি, পাত্তিব্রতা, ধর্মবিশ্বাস ও অসাধারণ ভগবদ্ভক্তির কথা যে শুনিবে তাহারই বিদগ্ধ আনন্দ হইবে। অসুখ প্রকাশচন্দ্র বার তাঁহাকে সহধর্মিণীকণে পাইয়া বস্তু হইয়াছিলেন এবং আমরা তাঁহাদের উভয়কে জ্ঞান করিয়া সুখী হইয়াছি, উপকৃত হইয়াছি, কৃতার্থ হইয়াছি।

[মাসিক বন্ধুমতীতে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন বিশ্বাস ও নির্ভরযোগ্য]

ভাবি এক, হয় আর

দিলীপকুমার রায়

ছাঙ্কিশ

পাঁচ বাজ-গা বাগদাতাকে নিয়ে পার্ক থেকে যখন বেকস তখন রাত দশটা। উত্তার দন লিন্কেনের মস্ত ফুটপাথে দলে দলে যুগল মূর্তি চলছে আনন্দে। কিন্তু পল্লবের মনে হ'ল কাকর আনন্দই ওর আনন্দের কাছাকাছিও আসতে পারে না। ওর কাছে এমন আশ্চর্য ভাবে কখনো প্রত্যক্ষ হয়নি আনন্দের বিশ্ববিশ্বব্যাপী মূর্তি। বিশ্বের সম্পদ ওর কাছে আজ তুচ্ছ, নগণ্য, অবাস্তব। নন্দন কানন থেকে পারিজাত ওর হাতে আসার সঙ্গে সঙ্গে সে আর সব মর্ত্য ফুস্ফুসই হ'য়ে গেছে স্নান, নিশ্চিন্ত গন্ধহীন। বাহু ত ওর বহুবাহিত্য বাহু। কোমল কবোক্ষ চাপ ও নির্বিড় ভাবে গ্রহণ করেছে ওর সমস্ত চেতনা দিয়ে। এমন অপরাধ, এমন লোকলসামভূতা, এমন আ-ন্দময়ী আশ্রয় ওর বরণ করেছে—অস্বীকার করেছে জীবনপথে থাকবে ওর পার্শ্বাতিনী, দৈনন্দিন জীবনে হ'ব সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশ, স্বপ্ন-বেদনার সাধী—সকালে উঠেই প্রথম শ্বেবে ওর তন্ত্রালস অনিন্দ্য মুখখানি, রাত্রে নিদ্রার অতলে তুলিয়ে যাবার আগে পর্যন্ত ওর কোমল স্পর্শ ওর সঙ্গে থাকবে লতার মতন জড়িয়ে, থেকে থেকে ঘুম ভেঙে উঠেও দেখবে ওকে অতৃপ্ত নয়নে—এই রকম আরো কত কী জল্পনা-কল্পনার নেশায় ও পথ দেখতে পায় না যেন! বাগদান...বাগদান...বাগদান...অথচ—ওর আবাক লাগে ভাবতে—হুদিন আগেও ও তো জানত না বিধাতার কোন আশীর্বাদ ওর পথ চেয়ে আছে? মনে পড়ল—পরশু দিন রাত্রে ওর চিত্ত-বিকলবের কথা। আর আজ? মনে পড়ল ওর একটি প্রিয় গান : "স্বর্গ নামিয়া আসুক মর্ত্যে, স্বর্গে উঠুক ধরনী"...

হঠাৎ কর্কশ সাইরেণ ও আইরিনের চিংকারে ওর বিহ্বল স্বপ্ন ভেঙে খান খান হয়ে যায়। ঠিক সেই মুহূর্তে ফুটপাথ থেকে কে একজন ওর বাহুমূল ধ'রে টান দেয়। বাহুলগ্ন আইরিনকে নিয়ে ও লাফিয়ে ফুটপাথে উঠে কোনোমতে টাল সামলে নেয়। সঙ্গে সঙ্গে ট্যান্ডিটা বেরিয়ে যায়। এক চুলের জন্তে বেঁচে-বাঁওয়া থাকে বলে!

কানে আসে পরিচিত বিক্রপের হাসি ও খাস বালায় ধমক : এমনি করেই কি প্রেম করে হে—মোড়ের মাথায়? আর একটু হলেই বে প্রেমলীলা সাজ হয়ে গিয়েছিল!

এ কী! যুহুফ?

যুহুফের দৃষ্টি পড়ে আইরিনের 'পরে : এ কী। ফ্রয়লাইন চে'রক? মাক করবেন—আপনাকে পিছন থেকে দেখেছিলাম ব'লে চিনতে পারি নি। পারলে আপনাকেই চেপে ধরতাম প্রথমে—ট্যান্ডিটা—এ কী?

ও কিছু না—কম্বলের কাছে খেঁষ লেগে ওভারকোটটা একটু ছিঁড়ে গেছে।

ওভারকোটের জন্তে ভাবছি না—আপনার কম্বরে—

না না লাগে নি—ট্যাটা বেচারি ওভারকোটের উপর দিয়েই গেছে।

পল্লবের এতক্ষণে সাড় ফিরে আসে, উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলে : সত্যি বলছ—লাগে নি চোট? দেখি—

আইরিন সফুটে বলে : না, দেখবে আবার কী—কিছু হয় নি। কেবল ওভারকোটটার জন্তে একটু দুঃখ হচ্ছে।

যুহুফ হেসে বলল : সে জন্তে ডায়মন্ড দেবেন তিনি—যিনি দায় না বুকে ভাব নিতে কো'টন।

পল্লব মরমে ম'বে গেল : সত্যি আইরিন—তোমাকে আজ আমি...মানে...খুশি জন্মায় হয়েছে...আমি দেখাত পাউ নি...

যুহুফ হ'স আইরিনের দিকে চেয়ে চাঞ্চ মিট-মিট ক'বে বলে : কিন্তু এ দায় আপনাবি ফ্রয়লাইন! মানে, জুকে চক্ষু দানের।

আইরিন হেসে বলল : অবিচার করবেন না—জুদ নয়—সাজাজাত। তাই চাঞ্চ ফুটে একটু সময় লাগবে।

পল্লব অপ্রতিভ মূরে বলল : চলো যুহুফ, একটা কাকোতে ব'সে—

ন' ভাউ, দত্তবান! আজ আমায় সঙ্গে একজন আছেন। এরূপ ক্ষেত্রে two is company তার একটি বেশি হ'লেই বসভঙ্গ ব'লে টুপি খুলে কৃষ কতার আইরিনের কবচুখন ক'রে কবভাষণ হেসে কি বলল। আইরিন খুশি হ'য়ে মুখ ফিরিয়ে নিল। পল্লব শুধালো : কী বলল?

তোমার ভাব নিতে—শুধু পথে চালাতেই নয়, পথ দেখাতেও বটে।

সাতাশ

রাত সাড়ে বারটার যখন পল্লব বাসার কিরল তখন ওর মনের সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কেটে গেছে, রক্ত উঠেছে মাতাল হ'য়ে। চিন্তার দল এলোমেলো, কিন্তু ছুটেছে একই চিন্তার অভিসারে। ফিরে ফিরে মনে হয় আইরিনের প্রেম : আমি তোমার ভাব হয় না তো?

ভাঃ? দু'দিন আগেও ও এ-নিয়ে কতই ভেবেছে—বিবাহের হাজারো দায়িত্ব, সংসারের ভার, লোকমত, কুসুমের নিবেদ...আরো কত কী? কিন্তু আজ মনে হয় ওর নিজের উত্তর : বেদীর কাছে কি প্রতিমাকে মনে হয় ভাব, না মুক্তি? কোথেকে মনে এল এ-উপমা? এরই নাম কি প্রেরণা? যদি হয় তবে এটাই কি জীবন-বিধাতার স্নেহেই বিধান নয়? দেশের কাজ? কেন? দেশের কাজ কি বিবাহ করলে হয় না? ভিলক, অরবিন্দ গান্ধী, দেশবন্ধু—দেশের কাজ এঁদের চেয়ে বেশি করেছে কে? বিবেকানন্দের কথা মনে পড়ে হঠাৎ। কিন্তু মন কুণ্ঠে উঠে বলে : সবাইকেই কি বিধাতা এক ছাঁচে ঢালাই করেন? বিবেকানন্দ অবশ্য মহাপুরুষ—নিঃসন্দেহ। কিন্তু তাই ব'লে কি বলতে হবে তাঁর পক্ষে বা ছিল স্বার্থ তা আর সবার কাছেও হবে স্বার্থ? রাম, কৃষ্ণ, বাজবন্ধা, বশিষ্ঠ, বৃদ্ধ, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ, বিজয়কৃষ্ণ গোঁস্বামী...ও খুব জোর দিয়েই বলে মনে মনে : বিবাহ যদি মহত্তম জীবনের অন্তর্ভাগই হবে তবে এঁদের প্রত্যেকেই বিবাহ করেছিলেন। যেন? মহাভারতেই কি বিধান নেই—সংসারে মোটামুটি চারটি স্বভাবের জীব জন্মায়? বার ইহকাল আছে কিন্তু পরকাল নেই, বধা ভোগী; বার পরকাল আছে কিন্তু ইহকাল নেই, বধা বোগী, বার ইহকালও নেই, পরকালও নেই বধা দুর্বৃত্ত লম্পট। আর বার ইহকালও আছে পরকালও আছে বধা ধর্মভীরু গৃহস্থ। নারী নরকের দার—এ-বিধান কি সত্যিই কেউ ভাগবত বিধান ব'লে মনে

করতে পারে? পল্লব ছায়ার সঙ্গে যুদ্ধ করে : কোপীনবস্ত্রঃ খলু ভাগ্যবস্ত্রঃ? দুঃ—ও একটা কথাই নয়।

যে ঢুকে আলো আলোতেই দেখে, ওর লেখার টেবিলের উপরে একটি চিঠি। অতি পরিচিত হস্তাক্ষর। ঠিক আজই ১:০০-ও খুলল খামটি সম্ভরণে, কুহুম লিখেছে :

“ভাই পল্লব,

বিলেত থেকে ফেরার পর প্রায় আড়াই বৎসর কেটে গেছে। তোমাকে চিঠি লেখাও হয় নি প্রায় বছর খানেক। লিখব কী—জেল থেকে ওরা মাসে একটি করে চিঠি লিখতে দিত, লিখতে হ’ত বাড়িতেই—বিশেষ করে বাবাকে আশ্রয় করতে। তাই কিছু মনে কোরো না। তোমাকে চিঠি লিখি না বটে, কিন্তু বোধ হয় এমন দিন যায় না যেদিন তোমার কথা একবারও মনে পড়ে না। বিশেষ ক’রেই মনে পড়ত জেলে—জরনা-করনা করতাম কত রকম—কী ভাবে তোমার প্রবাস জীবন কাটছে, না জানি।

মাত্র পরশু জেল থেকে ছাড়া পেয়েছি এগার মাসের পর। বেরিয়েই প্রথম তোমাকে লিখছি।

দেশে পৌঁছেই তোমাকে চিঠি লিখেছিলাম। তাতে খবর দিয়েছিলাম—আমি দেশবন্ধুর নেতৃত্ব বরণ ক’রেই দেশের কাজে যোগ দিয়েছি। এর জন্তে একটি বারও আমার পরিতাপ আসে নি। আমার মনে হয়—তিনি শুধু রাজনৈতিক নেতা হিসেবেই নন, মানুষ হিসেবেও গান্ধীজীর চেয়ে বড়, যদিও গান্ধীজীকে আমিও এ যুগের মহৎ মানুষদের অত্যন্ত ব’লে মনে করি। তাঁর অসহযোগ আন্দোলনের রাজনৈতিক সার্থকতা সন্দেহে বাই বলা যাক না কেন, একথা না মেনেই উপায় নেই যে, তিনি তাঁর চরিত্রবল তথা আন্তরিকতার জুড়ে দেশে একটা নবজাগরণ এনেছেন; সে জুড়ে তিনি আমাদের নম্রতা বৈ কি! কিন্তু তবু বলব তাঁর মধ্যে সে হার্মনি ও গভীরতা আমি খুঁজে পাই নি যার গুণে দেশবন্ধু বড় হ’য়ে উঠেছেন। গান্ধীজী ত্যাগে খুবই বড়—এ কথা মানি, কিন্তু দেশবন্ধুর সঙ্গে আমি একমত যে, তিনি সামাজিক জীবনে হিন্দু-হ’লেও নৈতিক দীক্ষায় বিদেশী, যেহেতু তাঁর গুরু গীতার কৃষ্ণ নন, তাঁর গুরু তিনটি বিদেশী—বৃষ্ট, টলষ্টন ও থোরো।

দেশবন্ধুর বেলায় একথা খাটে না, যেহেতু তাঁর রাজনৈতিক শিক্ষাগুরু ইংরাজ হলেও, ধর্মনৈতিক দীক্ষাগুরু ভারতই বটে। তিনি অন্তর্বেদ্য, বহিঃশাস্ত। তাঁর হৃদয়ে আমি অভিজ্ঞত, তাঁর স্নেহ পেয়ে আমি ধন্য।

আমি গান্ধীজীর অহিংসামাত্র বিশ্বাস না করলেও দেশবন্ধুর উপদেশে তাঁর অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিই—আরো এই ভেবে যে, এ-সূত্রে রাজনীতির টেকনিক তথা প্রিন্সিপল সন্দেহে অনেক কিছু জানতে পারব। জেলে না নেমে শুধু যে সাঁতার দেখাই যায় না তাই নয়—জেলের বাধা কী জাতের সে সবক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করা যায় না। এর ফলে একটা মস্ত অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে এই—যে কথা দেশবন্ধু প্রায়ই বলেন যে, স্বাধীনতার সংগ্রামে ইংরাজ আমাদের প্রচণ্ড প্রতিপক্ষ হলেও আমাদের সব চেয়ে বড় শত্রু তারা নয়। আমাদের সব চেয়ে বড় শত্রু হল গৃহশত্রু ওরফে মৃত্যুরত প্রবন্ধরস। এ শুধু দেশবন্ধুর অভিজ্ঞতা নয়—১৯১৭-র

লেনিনেরো ঠিক এই অভিজ্ঞতাই হয়েছিল—সব চেয়ে বেশি তাঁকে লড়তে হয়েছিল স্বদেশবাসীদের সঙ্গে কিন্তু দেশবন্ধুর সঙ্গে লেনিনের তফাৎ এই যে তিনি বলেন না তাৎপর্য—এদের লিকুইডেট করতে হ’ব রাষ্ট্রাতি, বলেন—এদেরো কাজে লাগাতে হবে। কিন্তু মরুকগে রাজনীতি—এ বিষয়ে অনেক কিছুই বলবার আছে, কিন্তু সে হবে তুমি ফিরে এসে।

বলেছি, আমি স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিতে না দিতে ওরা আমার পারে নুপুর না হোক, হাতে বালা পতায় ও পাঠায় হরিণবাড়ি। সেখানে আমি দেশবন্ধুর সঙ্গে এক কারাকক্ষে কাটাই ছ’মাস—এ খবর তুমি নিশ্চয়ই পেয়েছ। তারপর ফের আমাকে ওরা ধরে ঠিক এগার মাস আগে। পরশু ছেড়ে দিয়েছে, জেলে আমার শরীর খারাপ হবার দরুণ। তবে মনে হয় ওরা ঠিক পেতে বসে আছে—আমার শরীর ভালো হতে না হতে ফের পাকড়াবার জন্তে। এবার ধরলে বোধ হয় সহজে ছাড়বে না। গুজব—এবার ধরলে আমাকে পুলিশোলাও চালান দেবে বর্মার—মাণ্ডালয় জেলে। আমি প্রস্তুত আছি। দেশের জন্তে দুঃখবরণ করেছি চোখ খুলেই—তাই সেজন্তে খেদ নেই। তবে মন খারাপ হয় ভাবতে যে, অদূর ভবিষ্যতে আমাদের স্বাধীন হবার কোনো আশাই নেই—মনে যদি না হঠাৎ ফের বিশ্বযুদ্ধ বাধে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অস্ত্র বাধবেই, কিন্তু কবে বাধবে ভাবি। মনে মনে জপি : নারদ নারদ! বাধাও বাধাও বাধাও শুভ-নিশ্চয়ের লড়াই—তিলোত্তমা হোক কলোয়ানিসম দেবী।

জেল থেকে বেরিয়েছি নানান অসুখে ভুগে। প্রায় দশ সের ওজনকে কমে গেছি ডাক্তারের বলছে—হ’ট মাস পুরো বিশ্রাম নিতে কিন্তু বিশ্রাম নেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। সামনে অকুরন্ত কাজ, দেশবন্ধুও ক্লান্ত তথা অগ্রহ—কাজেই তাঁর অনেক কাজের ভারও আমাকেই নিতে হয়েছে। তত্ত্বালু দেশকে জাগানো কি সহজ ব্যাপার? আমেরিকার বাগী : ‘সময় হ’ল টাকা’, দেশবন্ধু ঠাট্টা ক’রে বলেন ভারতবর্ষের বাগী : সময় হ’ল ছন্দুভি। রসিক লোক—সাহসেও যেমন হাসিতেও তেমন। একটা মানুষের মতন মানুষ দেখলাম বটে।

আমার কথাই ব’লে চলছি। এগার মাস লৈপিক মৌনের প্রতিক্রিয়া আর কি। মরুকগে, এবার তোমার কথা জিজ্ঞাসা করি। হ্যাঁ বলতে ভুলছি—তোমার হ’তিনটি চিঠি পেয়েছিলাম, তখন আমি জেলে।

তোমার কথ্য বান্ধবীদের কথা লিখেছি, বেশ লাগল। ওদের সঙ্গে মিশতে আমি বারণ করি না। দেশবন্ধুর সম্পর্কে এসে আমার এ-সব ক’মত একটু বদলেছে। এখন আমার মনে হয়—ওদের দেশের দেশেদের সঙ্গে বারো মিশতে পারে—পবিত্র ভাবে অবশ্য—তারা ওদের কাছে অনেক কিছু শিখতে, লাভ করতে পারে। স্বামী বিবেকানন্দও বার বারই বলেছেন ওদের দেশের মেয়েদের কাছ থেকে আমাদের অনেক কিছুই নেবার আছে। কেবল একটু ‘কিন্তু’ আছে।

বিবেকানন্দ যা পারতেন তা সবাই পারে না, এটুকু ভুললে চলবে না। মোহনলালেরই দৃষ্টান্ত নাও না। সে বড় গলা ক’রেই বলত যে সে জানে : where to draw the line—মনে পড়ে?

কিন্তু কার্যত কী ঘটে গেল, বলো দেখি? অবশ্য রিত্যার বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত ভাবে আমার কোনো অভিযোগই নেই। এ-ও আমি মানব যে, সে ঘেঁষে ভালোই—ঐক্যবিনী কি রক্তিনী নয়। কিন্তু কাল তার পাণ্ডুর বং ও রান মুখ দেখে মনে হ'ল সে মনঃকণ্ঠে আছে। মোহনলাল যদিও বলল যে এদেশের গরম সটকে না ব'লেই তাকে এত রান দেখাচ্ছে কিন্তু আমার মনে হ'ল এহ বাহু—রিত্যার সম্বন্ধ যা ভাব করেছিলাম ঠিক তাই ঘটেছে : ও আমাদের দেশের শুধু জল-হাওয়ার নয়, আবহাওয়ার সঙ্গেও নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারছে না। মোহনলাল কথার কথার বলল—ওকে একবার চোখে সুইজল'গে নিয়ে না গেলেই নয়—ওকে ভালো ডাক্তার দেখাতে হবে। আমি শুনে একটু আশ্চর্য হ'য়ে বললাম : শুনেছি বন্ধুরোগের সবচেয়ে ভালো চিকিৎসা হয় সুইজল'গে, কিন্তু ওর তো শুধুমাত্র কোনো শক্ত অন্ত্রধ করে নি ?

মোহনলাল যেন একটু ক্লান্ত কণ্ঠেই বলল : 'রিতা বলে—এদেশে কেউ ডাক্তারির কিছুই জানে না।' শুনে প্রথমে একটু ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম—কবুল করছি। কিন্তু ভেবে দেখলাম রিত্যার খুব দোষ নেই। এ দেশের চুঃখ-দৈহিক-দারিদ্র্যই সব আগে বিদেশীর চোখে পড়ে। তাছাড়া বতাই কেন না আমাদের দেশের আধ্যাত্মিক সম্পদ নিয়ে জাঁক করি, স্বাধীন দেশের লোক কিছুতেই এমন দেশকে শ্রদ্ধা করতে পারে না—যার কোটি কোটি সম্ভ্রান্তকে পরানত ক'রে রেখেছে হাজার পঞ্চাশেক ফিরিজি। আজই সকালে এই নিয়ে দেশবন্ধুর সঙ্গে কথা হচ্ছিল, তিনিও বললেন : ঠিক এই জন্তেই আমাদের সব ছেড়ে আগে চাই স্বাধীন হওয়া, নৈলে আমাদের সাংস্কৃতিক তথা আধ্যাত্মিক সম্পদের বাণী ওদের কানের মধ্যে যেতে পারে কিন্তু মরমে পশবে না বাবা! ব'লেই মুহূর্তেই বললেন : তুমি জানো—আমার আশঙ্কি বিদেশিনী বিয়ে করার নয়, আমার আশঙ্কি মেম বিয়ে করার, কি না এমন মেরেকে ঘরানী করার যে শয্যাসজিনী হবার কায়দা-কায়দা জানলেও সহদেশিনী হবার মন্ত্র-তন্ত্র শেখেনি। না, এ যুগে জীকে শুধু সহধর্মিণী হ'লেই চলবে না—হ'তে হবে সহদেশিনী, একথাটা তুমি চালু কোরো কুতুম—পরে কাজে আসবে। কথার ক্ষমতা কত বেশি তুমি এখনো জানো না, কিন্তু আমি হাড়ে হাড়ে জেনেছি বাবা। এই রকম কত চমৎকার কথাই যে তিনি বলেন—তুমি থাকলে নিশ্চয়ই টুকে রাখতে কিন্তু বা বলছিলাম।

আমি মোহনলালকে বললাম একটু ক্ষুব্ধ হ'য়েই, এ দেশের ডাক্তারদের পরে যখন রিত্যার শ্রদ্ধা নেই তখন ওকে সুইজল'গে নিয়ে যাওয়াই ভালো। কবে যাচ্ছে? মোহনলাল বলল : তোমার জেলে বাওয়ার দরুণই যেতে পারিনি, কারণ মাস খানেক আগে দেশবন্ধু বলছিলেন—তোমাকে এ বাত্মা ছেড়ে দেবে। এখন তুমি যখন ঘরের ছেলে ঘরে ফিরেছ, তখন কালই পাসপোর্টের জন্তে দরখাস্ত করব, বোধ হয় মাস খানেকের মধ্যেই কালাপানিতে পাড়ি দেব, তারপরে যা করেন নিয়তি। ওর কথার মধ্যে একটু কী বলব ডিসাপয়েন্টমেন্টে সুর বেজে উঠল। অর্থাৎ মনে আছে ও বিশেষে যখন রিত্যার মোহে পড়ে (সহদেশিনী ছাড়া আর কারুর প্রতি সত্যিকার 'প্রেম' হ'তে পারে ব'লে আমার কোনো দিনই মনে হয়নি) তখন বলেছিল বিজয়লালের গানকে সাজির ক'রে :

'প্রেমে নয় আপন হারায় প্রেমে পর আপন হয়।

আদানে প্রেম হয় না কো হীন, দানে প্রেমের হয় না ক্ষয়।' কথা অবশ্য কিন্তু এ প্রেম জাগে কখন? না, যখন দুটো মন একই আদর্শে অল্পপ্রাণিত হ'য়ে ওঠে, তার আগে নয়। এই জন্তেই বিদেশিনীকে বিবাহ করার আমার এত আশঙ্কি। অবশ্য যদি তেমন বিদেশিনীর দেখা মেলে যে নিজের স্বাভাৱ্য গৌরবকে নশ্রাং ক'রে দিয়ে সহধর্মিণী তথা সহদেশিনী হ'তে পারে, তা হ'লে তাকে জীবন-সঙ্গিনী করা যেতে পারে। কিন্তু এমন মেয়ে পাওয়া দুর্বল, নৈলে মোহনলালের মতন সত্যিকার মহৎ যুবকও কি আজ এমন বিপাকে পড়ত? তাহ'লেই দেখ—পোষাকি মেকি প্রেমের রূপের সঙ্গে ঘরোয়া খাঁটি প্রেমের রূপের তফাৎ কতখানি।

এত কথা লিখতায় না, যদি না মোহনলালের অবস্থা দেখে মন খারাপ হ'ত। কিন্তু ও এখন করবেই বা কী—বলো? দেশের কাজ ও করতে চায় সত্যিই, কিন্তু জীকেও তো ফেলতে পারে না? সত্যি, কাল কেবলই ভেবেছি ওর কথা। হয়ত ওর সঙ্গে তোমার মাস দুয়ের মধ্যেই দেখা হবে। কারণ ও বলছিল, রোম হয়েই বাগিনে যাবে, সংশয়েই সুইজল'গে। তোমার রিতাকে দেখে কি মনে হয়, আমাকে লিখো। আমার মনে হয়, ও এদেশে এসে সুখী হয়নি। তবে এ বিষয়ে আমার ভুল হ'তেও পারে।

শেষে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি : 'দেশে ফিরেছ কবে? প্রায় আড়াই বছর হ'তে চলল, তোমার সঙ্গে ছাড়াছাড়ির পর। গান তো অনেক শিখলে? আর কেন? এবার বা শিখলে দেশের কাজে লাগাও। দেশকে জাগাতে হবে গান গেয়ে—মনে রেখো। 'আমরা ঘুচাব মা তোব দৈহিক মায়া'র আমরা নতি তো ঘেব।' কবে যে ফের এই অপরূপ গানটি শুনব তোমার মুখে, আর শিবার শিবার জাগবে উদ্বোধন! দেশবন্ধুও তোমাকে চান। তা ছাড়া দেশবন্ধু কালই বঁলকিছেন—তুমি দেশে ফিরে নানা চারিটি কল্যাণ ক'রে আমাদের টাকা তুলে দেবে—মানে, শুধু প্রেরণা নয়, পাথরও হবে। তোমাকে ভগবান দিয়েছেন অনেক কিছু—দেশের কাজে লাগালে তবেই না সে সব দান সার্থক হয়ে উঠবে। চিঠি লিখো।

ইতি তোমার নিত্যভাবার্থী স্নেহবন্ধ কুতুম।'

পুনশ্চ :—কাল রাতে মোহনলালের কথা ভাবতে ভাবতে একটা কথা কেবল মনে হচ্ছিল ফিরে ফিরে। মনে হচ্ছিল, আরো এই নিয়ে তোমার সঙ্গে তর্ক হয়েছিল বলে। তুমি বলেছিলে : মোহনলাল যখন রিতাকে ভালোবেসে ফেলেছে, তখন তাকে বিবাহ না করে কি করতে পারত? আমি সে-সময়ে উত্তর খুঁজে পাইনি। কিন্তু কাল মনে হচ্ছিল যে, মোহনলাল একটা কাজ করতে পারত : রিত্যার প্রতি ওর ভালোবাসা প্রেম না মোহ, সেটা বাচাই করতে পারত কিছু দিনের জন্তে দূর গিয়ে। আমার মনে হয়, প্রেমকে বাচাই করার এ ছাড়া আর পথ নেই। কারণ, এক দিকে নর-নারীর পরস্পরের প্রতি টান যেমন সান্নিধ্যের ইচ্ছাকে আগুনের মতই জ্বল ওঠে, তেমনি অল্প দিকে সান্নিধ্যের ধোঁয়াক না পেলে নিবে বাই যায়। কারণ প্রেম প্রেম করে বতাই কবির করি না কেন, কবির ঐক্যবিনী মায়াই বটে—মানে, নরকে হর করতে পারে তার বাহুদুগুণ

হাঁওয়ায়। এর একমাত্র কাটান হচ্ছে, তাকে পরখ করা—অর্থাৎ
সহের সান্নিধ্যবশে যে উচ্ছ্বাস জেগে ওঠে, তাকে আদর্শের নিকটে
কবে দেখা।

আর্টান

পল্লবের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। ধানিকরণ ও
বিহ্বলের মতন চূপ করে রইল। ওর মাথার মধ্যে ঘোরা-ফেরা
করতে থাকে : সহদেশিনী সহদেশিনী।...

হঠাৎ ও রুদ্ধে ওঠে : যদি ধরেই নেওয়া যায় যে রীতা পারেনি
মোহনলালের সহদেশিনী হ'তে—তা হ'লে কি এ সিদ্ধান্ত করা যায়
যে আইরিনীও পারবে না ?

ওর মন বিজ্ঞানী হয়ে ওঠে : এ কখনো হতে পারে যে যুগ-যুগ
ধরে কবিতা মিথোই প্রেমের জয়গান করে এসেছেন ? শুধু
উচ্ছ্বাসের ক্ষণস্থায়ী মোত পড়ে, কবিত্বের আবেশেই বলে এসেছেন
প্রেম অক্ষয়, অম্লান, অমর ?

কিন্তু মোহনলালও তো রিতার সঙ্গে বধন প্রেমে পড়েছিল
তখন ভেবেছিল এ-প্রেম ধোপে টিকবেই টিকবে ? সত্যিই
কি ও নিরাশ হয়েছিল—সে প্রেমের রঙ হৃদিনেই তারিয়েছে তার
রঙ চুপ্ত নিবিড় না ? আতা, আজ যদি মোহনলাল কাছে থাকত।

কুহুমের চিঠিটা ও ফের পড়ল আতঙ্ক। পড়তে ওর মনে আবার
জেগে উঠল দ্বন্দ্ব, সংশয়। একবার মনে হয়—আইরিন রিতা
নয়, আগার অম্লিনে হয়—কে জানে—হয়ত সেও রিতারই মতন
পারবে না ভারতবর্ষকে ভালোবাসতে, শ্রদ্ধা করতে ?

কিন্তু না, এ একটা কথাই নয়। কে না জানে প্রেম মানুষকে
বদলে দেয়—অবস্থা যদি সে খাঁটি প্রেম হয়। শুধু পরকে আপন করা
নয় আপনকেও সে পর করে না কি প্রতিপদে ? নব বধু বধন
স্বামীর ঘরে আসে তখন সে কেঁদেই সারা হয় পিতৃগৃহের কথা
ভাবতে। কিন্তু তার পরে কি অচিন ঘরই হয় না আপন, চেনা
ঘর যায় না দূরে সরে ?

মনে পড়ল ওর প্রিয় কবির অপকরণ নববধু কবিতা :

ক্রমশ দিন কাটিয়া গেল সন্ধ্যা ও ভরে,
কাটিয়া গেল ভাবনা ভীতি নিকট পরিচরে
ব্রিলাশম যে—আমার পতি আমার সখা তিনি,
ভবন 'পরে এমন আর কাছাকে নাহি চিনি।
পেয়েছি বটে মাতার প্রেম, পিতার এক স্নেহ,
বুঝিছি আজ—এমন আর আপন নচে কেহ।
এ দেহ মন দিয়েছি আমি তঁহারি পায়ে সঁপি
জীবনে যেন মরণে যেন তঁহারি নাম জপি (১)

এই অবিস্মরণীয় চরণ ক'টি তিনি লিখেছিলেন কি তাঁর জীকে
মেখেই নয়—যার মৃত্যুর পরে আর তিনি বিবাহ করেননি,
বলেছিলেন—বিবাহ কেবল একবারই হয় ? এই যে একনিষ্ঠ
অতলান্তিক বৈদ্যনাথ বাবধানও জান করতে পারেনি—এ কি শুধু
কবিত্বের উচ্ছ্বাস ? হতেই পারে না। কুহুম মহৎ, ত্যাগী,
দেহব্রত, কিন্তু সে কি কখনো কাউকে ভালোবেসেছে যেভাবে
'নব বধু' কবি ভালোবেসেছিলেন 'তাঁর বধুকে ? দেশসেবার

সবকে ও অনেক কিছু জানতে পারে, কিন্তু বিবাহের ও কী জানে
তিনি ?

কিন্তু অম্লিন ফের উঁকি মায়ে উঠে। বৃত্তি : তাঁর প্রেম যে
মোহ ছিল না সেটা কবি প্রমাণ করেছেন কিসের সাক্ষ্যে ?—
উচ্ছ্বাসের না জীবনের ? হাজার হাজার ক্ষেত্রে জীবনের সাক্ষ্য
ঠিক এই প্রেমকেই না মঞ্জুর করে না কি ? তবে ? কেমন করে
ও জোর করে বলতে পারে—আইরিনের প্রতি ওর প্রেম সত্যের
কোঠায় পড়ে (যার প্রমাণ হারিয়ে) না, মিথ্যার কোঠায় পড়ে
(যার ধর্ম উবে বাওয়া)—যেমন হয়েছে হয়ত মোহনলালের ক্ষেত্রে ?

কিন্তু এ তো কুহুমের সন্দেহ মাত্র ? কে বলল যে মোহনলাল
ও রিতার প্রেম উবে গেছে, কি মন্দা হয়ে এসেছে ?

অম্লিন ফের সংশয় ওঠে মাথা চাড়া দিয়ে। কেসলার বাই
হোক তাকেও আইরিন তো ভালোবেসেছিল আর বধন
ভালোবেসেছিল তখন তো তার মনে হয়েছিল—এ স্বামী প্রেম ?
তবে ? তবে কেমন করে পল্লব বলতে পারে যে, ওর প্রতি
আইরিনের প্রেমের জাহত আলোনা ?

না, কুহুম মিথ্যা বলেনি : ওদের প্রেম সার্থক হ'তে পারে না
যদি আইরিন পল্লবের সহদেশিনী হ'তে না পারে। কিন্তু পারবে
কি না আগে থেকে জানার উপায় কী ? ওকে ছেড়ে কিছুদিন
দূরে থাক। একথা ভাবতেও ওর মন ব্যথার টন-টন করে ওঠে।
কিন্তু বতই ভাবে 'ততই মনে হয় ফ্রাউ ক্রামারের কথা : সে,
ব্যবধানের নিকটে প্রেমকে পরখ করলে তাতে ক'রে প্রেমের
লাভ বৈ ক্ষতি নেই। আজকের মানুষ এ-যুগের আবহাওয়ার
গ'ড়ে উঠেছে, আর সে-আবহাওয়া, জয়গারাকে বলে বলে Zeifgeist—
চায় সব কিছু ক'রে দেখতে। আগেকার যুগের মানুষ ছিল
সরল—যা দেখত তাকেই গ্রহণ করত তখন তখন। এ-যুগের
মানুষের স্বভাব ধানিকটা বলে গেছে বৈ কি। কোনো কিছুই
সে আর দাম ধরতে পারে না তার বাজার দর নিয়ে। তাছাড়া
বাচাই করতে এত ভয়ই বা কেন ? মোহনলালের কথা একটু
আলাদা : পাকে চক্রে রিতার এমন অবস্থা ঠাঁড়িয়েছিল যার
ফলে তখন তখন বিবাহ না ক'রেই ওর উপার ছিল না।
কিন্তু আইরিনের তো ঠিক সে অবস্থা নয়। ও ঠিক করল—
আইরিনকে বলবে সব কথা খোলাখুলি। না, মোহনলালের
কথা বলবে না—ব্যরণ তার ও রিতার প্রেমের এখনকার অবস্থা
বে ঠিক কী তা তো ও জানে না—তবে কুহুমের 'সহদেশিনী'
কথাটার মর্ম ওকে বুঝিয়ে দিতেই হবে—দেখি ও কী ভাবে নেয়—
আর বলবে ওকে যে, কিছু দিনের জেজবেচ্ছাকৃত বিরহকে বরণ
ক'রে দেখা যাক ওদের প্রেমকে বাচাই ক'রে। এতে ব্যথা বাজবে
উভয়েরই—কিন্তু ব্যথাতে ভয় কী—যদি প্রেম সঁজা হয় ?

তবু ব্যথার বুক টন-টন করে ওঠে। করুক। কুহুম দেশের
জন্মে প্রাণ দিতেও পেছপাও নয় আর তার বন্ধু হ'য়ে ও কি না
কিছু দিনের জেজবেচ্ছাকৃত বিরহব্যথাকে বরণ করতে ডরাবে ? কুহুমের
ত্যাগ, মহত্ব, আনন্দমঠের সম্ভানস্বত বরণ ক'রে সর্বস্বার্থ হ'বার
আদর্শ ওর মনে কেমন লেগে ওঠে আলো হ'য়ে। প্রেম বড়—সত্য,
কিন্তু শুধু হ'লে তবেই না সে বরণ্য। ও কাল সকালেই
আইরিনের কাছে কথাটা তুলবে। সে নিশ্চয় বুঝবে—যায়ে—যদি

ওকে সে সত্যিই ভালোবেসে থাকে। ওর মহৎ আদর্শের টানে সে মিশ্রই হতে চাইবে ওর 'সহধর্মিনী'।

জ জ করে ছুটো বাজল। ক্লান্ত হ'য়ে ও শুয়ে পড়ল।

* * * * *

পরদিন সকালে উঠে কফি নিয়ে বসেছে, এমন সময় পরিচারিকা হুকল একটি চিঠি নিয়ে।

এ কী! মোহনলালের হস্তাক্ষর! সাগ্রহে পড়ে:

"ভাই পল্লব,

কুতূহল হয়ত তোমাকে জিখে থাকবে রিতার শরীর ভালো যাচ্ছে না। ভাই ছির করেছি কয়েক দিনেই মথোই রঙনা হব। কারণ বোধ হয় দিন সাতকের মধ্যেই একটা জাহাজে ছুটো বার্থ পাওয়া যাবে। প্রথমে ভেবেছিলাম যে রঙনা হব মাসখানেক বাদে কিন্তু কাল সারারাত রিতার মাথা ঘুরেছে। ও-ও আর দেখি করতে চাইছে না, তাছাড়া যদি ওর শরীর সারতে ওকে যুরোপে যেতেই হয় তবে শুভ্র শীতল—বটেই তো।

তুমি এখন এ চিঠি পাবে তখন হয়ত আমরা রোমে। কারণ আমরা ঠিক করেছি পোর্টসেড পর্যন্ত জাহাজে গিয়ে কায়রোতে ছুঁচার দিন বিশ্রাম করে উড়ে যাব সোজা রোম। সেখানে আমাদের ঠিকানা: লুনা হোটেল। তুমি রোমে একবার ঘুরে যাও না? বেশ হয় তা'হলে যদি ধরো ধোমে গিয়েই দেখি—তুমি সশরীরে। লুনা হোটেলই থেকে—মানে যদি রোমে আসো। যদি না আসতে পারো তবে আমাকে লিখো রোমে, আমরা বাগিনে চুমেয়ে যাব সুইজলণ্ড—যদি সম্ভব হয় তোমাকে পাকড়াও করে। অনেক কথাই বলবার আছে, কিন্তু চিঠি লিখবার যুগ—তে হি নো দিবসা গতঃ। এখন কেবল একটি জিনিষ পারি পূর্ববৎ: তোমাকে কাকে পোলে অনর্গল মনের কথা বলতে রিতাও তোমাকে বলতে চায় অনেক কিছু। আশা করি দেখা হবে রোমে কিবা বাগিনে। ইতি প্রেইবন্ধ মোহনলাল।"

উনত্রিশ

হঠাৎ পল্লবের মন বিধাদে ছেয়ে যায়: সবাই মিলে চক্রান্ত করেছে ওকে আইরিনের কাছ-ছাড়া করতে! কালকের রাতের রঙিন শিহরণ আজ কোথায় তার জায়গা 'ছুড়েছে' আজ হাজারো বিষম ভয় ভাবনা, দ্বিধা সঞ্চার। কবির খেল মনে পড়ে: "Rarely, rarely comest thou, o spirit of delight।

কিন্তু আজই আইরিনকে বলবে কোন মুখে সে যে বিরহ বরণ করার কথা? যদি সে হাসে, কি মান করে? পারবে কি তখন কৃষ্ণদামনের উগ্র সাক্ষর বজায় রাখতে? কুতূহলের আদর্শ তো ওর নিজের আদর্শ নয়? তাছাড়া যাবেই বা কোথায়? গান শেখা সৌখিন বিলাস হ'তে পারে তবু তো একটা কাজ। অগ্রজ গিয়ে করবে কী? তেরেণ্ডা ভাঙবে? দূর—বসন্ত সব উদ্ভট জগন!।

তার পরেই মনে হয় মোহনলাল ও রিতার কথা। ওরা হয়ত এত দিনে রোমে এসে গেছে। রোসো, ওর চিঠি এসেছে ঠিক তেইশ দিনে। হ্যাঁ, ও যদি চিঠি লেখার সাত দিনের মধ্যে জাহাজ নিয়ে থাকে তবে কায়রোতে পৌঁছেছে দিন সাত আট আগে। তা'হলে

এখন ওর রোমে পৌঁছে যাবার কথা। ও উঠে একটা টেলিগ্রাম ফর্ম নিয়ে বসে। লেখে: Mohon Ghosh, Allevgo Luna Roma—Telegrafate gubito Perfavove... (২)

এমনি সময়ে...ক্রিঃ...ক্রিঃ...ক্রিঃ...

Kommen Sie, herein। (৩) বলে ও চৈতন্যে।

হাসিমুখে যুসুফের অভ্যদয়, বলে হাসিমুখে: Ruten Sie nicht den Teufel herein। (৪)

পল্লব হেসে বলে: ডাকা বাঘ—যদি সে হয় ব্যাধার ব্যাধী। বোসো।

না ভাই বসবার সময় নেই। তোমাকে আমিই এসেছি ডাকতে। ডাকতে? কোথায়?

যুসুফ আড়ম্বিপ্রণত অভিবাদন করে ধরে ইতালিয়ান: Alla bellissima Italia—la culla della poesia। (৫)

সে কি?

কাজ থেকে দুমাস ছুটি নিয়েছি—আর পারি না সীত সইতে। আজই রোম রঙনা হচ্ছি—তুমিও চলে না।

রোম?

অমন রাজধানী কি আর আছে ভাই—il paradiso del sogna! (৬)

কিন্তু—

কিন্তু না—চলো তোমার তো আর চাকরি নেই যে ছুটি নিতে হবে। তোমাকে বস দেখি ততই ঝলে-পুড়ে মরি—ঈর্ষায়। না ঠাটা নয়—চলো। সেদিনই তো বলছিলে ইতালি দেখবার তোমার খুব শখ। এখন ইতালিয়ানে হাতে খড়ি হয়েছে—অস্ববিধে হবে না!

কিন্তু আজই?

যুসুফ ওর পিঠে চাপড় দিয়ে বলে: আহা, নবলক্কাটি জুড়িয়েযাচ্ছেন না, যাবেন না। বরং বিরহের আগুনে আগো জাহল্যামানা হ'য়ে উঠবেন। মিলনকে চিনতে হলে চাই বিরহের চক্ষুধান।

কী যে তুমি!—না, এ বিরহ মিলনের কথা নয়—আমি নিজেই ভাবছিলাম একটু বেড়াতে যাব—

বাস, তবে আর কি? জর্জনদের ভাবায় বলি abgemacht! কেমন, কথা দিচ্ছ তো?

পল্লব একটু ইতস্তস্ত: ক'রে বলে: বিকেলে বলব।

কী মুশিল! ঐনে ঘুমতে হবে তো। না, আর কথা নয়—আমি এফুগি একটি শোবার কুপে রিজার্ভ করতে বাচ্ছি—টাকা লাগে তো।

বাক্য থেকে জানতে হবে—কত টাকা?

কত আর তিন চার পাউণ্ড—সে বাক আমিই টিকিট করে যাব। কেবল দেখো ভাই, গরীবের টাকাটা মারা না যার।

২। Please wire at once ৩। ভিতরে এসো ৪।

শয়তানকে ডাকতে নেই ঘরের ভিতর। ৫। সুলতানীতমা ইতালি—কবিতার গোলনা।

৬। ঘরের স্বর্গরাজ্য।

চলার এখন, বড় তাড়াতাড়ি। হ্যা শোনো, তুমি শুধু তোমার
পাসপোর্টে ইতালিয়ান কনসালের কাছ থেকে একটি ছাপ নিও—
ভিসা। আমিও সেখানে থাকব—ঠিক দুপুর বেলা, কেমন?

শোনো শোনো। ইতালিয়ান কনসুলেট কোথায়?

বিসমার্ক স্ট্রাসে—হ্যা, ট্রেন রাত পৌনে দশটার ছাড়বে।
পৎসলাম বানহফে ঠিক সাড়ে আটটার মধ্যে গিয়ে হাজির হয়ো
কিন্তু ভুলে গিয়ে আমাকে কানিসিও না ভাই, লক্ষ্মীটি।

বলেই কুতূহল বড়ের মতন বেরিয়ে গেল টুপি নেড়ে:
Addis, amico caro।(৭)

পল্লবের মন খারাপ হয়ে গেল: এ কী কাণ্ড! নিয়তি বেন
উঠে পড়ে লেগেছেন ওকে রাতারাতি আইরিনের কাছছাড়া করতে।
ওর মনের মধ্যে ছুটো স্বর ওঠে বেজে: একটা স্বর বলে:
হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলো না। অজ্ঞ স্বরটা বলে: কী সেটিমেণ্টাল।
তবু যে করে সেই হারায় সব আগে।

ভেবে চিন্তে ও টেলিফোন ধরে...আইরিনের নম্বর দেয়।

পরিচিত স্বর: কে?

আমি—পল। আইরিন?

হাসির শব্দ: এখনো পরিচয় দিয়ে চেনাতে হবে? আমি যে
টেলিফোনে তোমার নিখাস শুনলে বলে দিতে পারি, মনামি শের।

পল্লব হেসে বলে: তোমার সঙ্গে কীর কথা, শোনো, তোমার
সঙ্গে আমার কথা আছে। এক্ষণি।

ফ্রাউ কামারের ভাষায়—ich applaudiere auf das
her(c) Zlichste এক্ষণি চলে এসো।

কোথায়?

কোথায় আবার? সোজা আমার এখানে। Nur Keine
Angst! (১) সকালে এখানে একেবারে নির্জন—কোনো ভয়
নেই—সবাই কাজে বেরিয়ে যায়।

ভয় আবার কিসের?

টেলিফোনে আইরিনের হাসি বেজে ওঠে: নাতাশা ভয়
দেখায়নি—কুমারী শয়ন কক্ষে কুমারের আবির্ভাব এদেশে নিবেদন?
বলেই হেসে: কিন্তু এখন সে-ও কিছুই বলতে পারবে না—কেমন
হয়েছে?

পল্লবও হাসে: খুব সাজা হয়েছে তার। আচ্ছা আমি আসছি
তাহলে। [ক্রমশঃ]

৭। শুভ বাই, প্রিয় বন্ধু!

৮। আমি সর্বস্বত্বকরণে সাবাস বলছি। ৯। মা ভৈঃ।

খর রৌদ্রে ঝলসিত

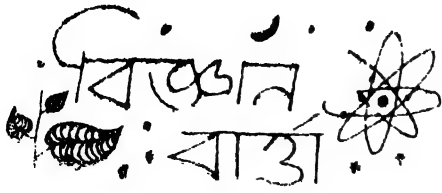
সত্যধন ঘোষাল

ভীর্ণতার সীমানায় ঝলসে গেল।
চিকণচিকণ কথা বলার সুর,
এবং পাখীর টোঁটের মতন লাল হয়ে
অলতে থাকলে তুমি
কিংবা সে তুমি নও—
এক অর্থময় দেহ।

ভীর্ণ হয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে জনতা
নিদাক্ষণ নিদাঘেও কাঁপছে
বুসর আকাশ আশ্চর্য হয়ে দেখছে
কেবল প্রাচীনা পৃথিবী নিবিচার
আমাদের অর্ধাচীন প্রেমময়তায়।

ভীর্ণতার সীমানায় ভীর্ণ হয়ে ছিটিয়ে পড়ছে সব।

জানি না কতক্ষণ তুমি ঝলবে—
মুঠো-মুঠো ঘেঁষ নিয়ে থিকথিক আকাশ,
উগ্ৰকৃত কুপাণের মত দীর্ঘদিনের সীমানায়
স্ববতে ঘুরতে ব্যগ্র কামনার প্রৌঢ় হয়ে গিয়ে
আমিও
নিবস্ত জনতার মিশে যাব
কোন এক সময়।



পাক্ষর মিজ

জুনি বইলারের ছোট একটি আলোচনা চোখে পড়লো।

আধুনিক বিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে কিভাবে বর্তমান কালের বিজ্ঞান শিক্ষাদানের প্রণালীর পরিবর্তনের প্রয়োজন, সে বিষয়ে তিনি আলোচনাপত্র করছেন। বিজ্ঞান যেভাবে এগিয়ে চলেছে তাতে যত্নে হয় এতদিনই কিছু না কিছু দলবান তথাবলী তার সঙ্গে সংযুক্ত হচ্ছে। সুতরাং পুরোনো শিক্ষাদানের প্রণালী আর বিশেষ কার্যকরী নয়। নতুনের সঙ্গে ছাত্রদের পরিচিত করতে হবে, পুরোনোকেও তুললে চলবে না। কারণ পুরোনো ফলাফল, মতবাদ এবং তথাবলীর উপর ভিত্তি করেই নতুনের জন্ম হয়েছে। নতুন আবিষ্কার এবং তথাবলীর সঙ্গে তার পূর্বজন পরিপ্রেক্ষিতের সংশ্লিষ্ট খট্টের কোন কিছু ছাত্রদের কাছে উপস্থিত করা এক অত্যন্ত কঠিন কাজ। কারণ শিক্ষাদানের সময় সীমাবদ্ধ, ছাত্রদের শিক্ষা গ্রহণের সময়ও সীমাবদ্ধ, সুতরাং তার মধ্যেই ছাত্রদের ক্রমবিস্তারশীল বর্তমান বিজ্ঞান-জগতের সঙ্গে পরিচিত করতে হবে। তাই মনে হয়, বর্তমানকালে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে শিক্ষাদান করা কঠিন কাজ। শিক্ষকদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য কঠিন এবং গুরুত্বপূর্ণ।

অধ্যাপক বইলার তাই বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষাদানের পদ্ধতি এবং শিক্ষকদের কর্তব্য কি হওয়া উচিত, তার উপর তাঁর নিজের মূল্যবান মতামত প্রকাশ করেছেন। বইলার নিজে একজন খ্যাতনামা বিজ্ঞানী এবং শিক্ষাবিদ। আমেরিকার অক্সফোর্ড রসায়ন-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর নেতৃত্ব সর্বজনস্বীকৃত এবং বর্তমানে তিনি আমেরিকান কেমিক্যাল সোসাইটির সভাপতি। এদেশে বইলারকে অনেকেই Mr. Inorganic Chemist বলে সম্মান জানান; তাই অধ্যাপক বইলারের এই মতামতের বিশেষ মূল্যমান আছে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমেরিকার উন্নতি, অগ্রগমন, এবং প্রাধান্য বিশ্বের মধ্যে এক বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। নিজের দেশের শিক্ষাধারার মধ্যেও আধুনিক কালের সর্বপ্রকার জ্ঞানার্জনের সুযোগ এবং সুবিধা বর্তমান, সুতরাং এ ক্ষেত্রেও যদি বইলারের মতো একজন শিক্ষাবিদ এবং বিজ্ঞানী যদি তারও পরিমার্জনের জন্য চিন্তা করতে সুরু করেন, তাহলে ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থার এই চিন্তার প্রয়োজন ও গুরুত্ব যে কতো বেশী, তা আমাদের দেশের যে কোন শিক্ষাবিদই উপলব্ধি করতে পারবেন। এদেশের সাধারণ বিজ্ঞান-শিক্ষক তুলনামূলক ভাবে ভারতবর্ষের চেয়ে অনেক বেশী শিক্ষাদানের সুযোগ সুবিধার অধিকারী, শিক্ষাদানের পদ্ধতিও অনেক আধুনিক; তা সত্ত্বেও যদি তাদের বর্তমান কার্যপ্রণালী পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় তাহলে আমাদের দেশের শিক্ষাদানের পদ্ধতির পরিবর্তনের প্রয়োজন যে কতো বেশী, তা যে কোন চিন্তাশীল পাঠকই উপলব্ধি করতে পারবেন।

শেখ আপে মুক্ত করেছেন। *উদ্বীর্ণিত হলে—The mind is a pyre to be kindled not a vessel to be filled,* আলকের দিনে যে কোন বিষয়ের বিরাট জ্ঞানভাণ্ডারের এক কুহাবও মাহুত তার মনের মধ্যে ধরে রাখতে পারে না। মাহুত জ্ঞানকে উপলব্ধি করতে পারে, তার মূল ভিত্তির সঙ্গে পরিচিত হতে পারে। এতে মনের হয় সম্প্রসাধন, জ্ঞানের মূল ভিত্তির সঙ্গে সুপরিচিত হবার কলে তার জ্ঞানভাণ্ডারের পরিচিত আলসমূহের কার্যকারণকে ব্যবহার করার তার ক্ষমতা জন্মায়। মনকে তাই আলিয়ে তুলতে হবে, যাতে সে নিজের আলোর এগিয়ে চলার পথ খুঁজে পায়, নিজের উত্তাপেই চলার পথের বাধাবন্ধকে গলিয়ে দিতে পারে—বিজ্ঞানের শিক্ষাকে বিমুততর করে বিশ্বকে আলো বিতরণ করতে পারে। আলিয়ে তুলতে পারে আরও অজ্ঞাত নতুন দীপশিখাকে। শিক্ষাদানের মাধ্যমে শিক্ষকেরা যদি ছাত্রদের জ্ঞানার্জনের ইচ্ছাকে জাগরিত না করতে পারেন, তাদের জ্ঞান উপলব্ধির ক্ষমতার যদি বৃদ্ধি না ঘটতে পারেন, তাহলে তাদের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে। ছাত্রদের মন হয়ে পড়বে জল তার পাত্র। শিক্ষকেরা তা ভরে দেবেন কিন্তু পাত্রের মধ্যে অবস্থিত বস্তুটির বিকাশ আর ঘটবে না। সর্ব দেশেই সর্ব প্রকার শিক্ষার ক্ষেত্রেই তাই শিক্ষকদের পবিত্র দায়িত্ব হবে ছাত্রদের মনে জ্ঞানার্জনের ইচ্ছাকে প্রজ্জ্বলিত করা। শিক্ষকদের এই দায়িত্ব অবশ্য নতুন নয়, এটা চিরকালের। তাঁরা ছাত্রদের জ্ঞানার্জনের আকাঙ্ক্ষাকে উৎসাহিত করেন, অনুপ্রাণিত করেন; জ্ঞান-ভাণ্ডারের সীমানা সম্প্রসারণের জন্য সঠিক পথে চলার নির্দেশ ছাত্ররা শিক্ষকদের কাছ থেকেই পায়।

আমাদের দেশের অবস্থাটা কি? যে শিক্ষাধারার মধ্যে দিয়ে আমাদের দেশের ছাত্ররা বিশ্বের জ্ঞান-জগতের বৃহত্তর পরিবেশের দিকে এগিয়ে যান, তার স্বরূপের সঙ্গেও আপনাদের পরিচয় আছে। এতে ছাত্রদের মন প্রাণীশের মতো জলে উঠে না। সীমাবদ্ধ জগৎপাত্রের মতো প্রশ্ন এবং তার উত্তর মুখস্থ করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। বিশ্বের উন্নতিকামী জাতিরা যখন প্রতিদিনের পরিক্ষণের সঙ্গে সঙ্গেই তাদের শিক্ষাধারার কিছু না কিছু উন্নতি এবং পরিমার্জনের কথা চিন্তা করছেন, এখন আমাদের দেশের শিক্ষাধারা চলেছে কোন পথে? শিক্ষাদানের চেয়ে পরীক্ষা গ্রহণ এবং মুখস্থ করে উত্তর লেখার প্রাধান্য এখনও ঠিক সেই আদিম কালের মতো একই ভাবে বিরাজ করছে। ছাত্রদের মন একটা বিরাট পাত্র, মাষ্টারমশাইরা সেই পাত্র কয়েকটি আলোচনার মধ্যে দিয়ে ভর্তি করে দিলেন। পরীক্ষার হলে গিয়ে প্রশ্নপত্র দেখে ছাত্ররা বেগুলি তাদের জ্ঞানার মধ্যে পেলো, সেগুলি দাগ দিয়ে নিয়ে ভাড়াভাড়ি খাতার মধ্যে বার করে দিয়ে এলো। সকলেই মুখে এক কথা কটা 'কমন' পড়লো। অর্থাৎ প্রশ্নপত্রের ক'টা প্রশ্নের উত্তর ঐ এক এক জনের মনের ঘড়ার মধ্যে বিরাজ করছিলো। ঘড়া কীক করে তা তারা সব ঢেলে দিয়ে এসেছে পরীক্ষার খাতার। শেখ হয়ে গেছে তাদের কাজ—ঘড়া এখন কীকা। পরীক্ষার ফল বার হলো, ঘড়া বীরা কীক করতে পেরেছেন উত্তরের খাতার, তাঁরা ডিগ্রী পেলেন। তাঁদের মান বাড়লো—ডিগ্রী হাতে করে এসে নামলেন কর্কক্ষেত্রে। ঘড়া যে সেই পরীক্ষার সময় কীক করে তিনি উত্তরের খাতার ঢেলে দিয়ে এসেছিলেন—তা তার পর কীকই রইলো।

রাগাঘরের কুলকীতে। এদিকে যিনি বড়া ভয়েছিলেন নানা বস্তু সংগ্রহ করে কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর বড়ার জিনিষ প্রায়পক্ষে আসেনি—তার কি হলো? পরীক্ষার হলে তিনি মাথায় হাত দিয়ে বসলেন,—তাঁর বড়ার রয়েছে জল এবং পরীক্ষায় এসেছে তেল। অতএব এবার পরীক্ষায় তিনি ফেল হলেন—দোষ ছিলেন ভাগ্যের। লেখাপড়ার পালা শেষ হয়ে গেল। কিছু দিন পরে তাঁর ভর্তি বড়ার বা কিছু ছিল, তা সব পড়ে একেবারে শুকিয়ে গেল। শিড়দেবের বহু কষ্টান্তিত অর্থের এই হলো সঙ্গতি। এই ঘটনার আর একটি তৃতীয় পর্যায়ও আছে,—যদি বেশীর ভাগ ছেলেরই বড়ার তেল থাকে আর প্রায়ে জ্বালান জল—তাহলে কি হবে? তাহলে ঘটবে দাঙ্গা-হাঙ্গামা,—ছাত্ররা যিচ্ছিল করে চিংকার করবে প্রায়পক্ষে কেন শাস্ত হয়েছে? অর্থাৎ ঘড়ায় বা ছিল, তা কেন প্রায়পক্ষে দেওয়া হয়নি? আরে, কি করে দেবেন?—যিনি প্রশ্ন করেন, তিনি বড়ার কি আছে, তা জ্ঞানেন না এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন আইন নেই, বড়ার কি আছে তা দেখে প্রায়পক্ষে রচনা করতে হবে।

পাঠকেরা ভয়তো প্রশ্ন করতে পারেন, বেইলার সাহেবকে নিয়ে সুরু করে কথায় কথায় এতো দূরে চলে এলাম কেন? এলাম অনেক দূরে। সূর্য আমেরিকায় বসে দেশের খুব কম খবরই পাই—বা পাই তা অনেক সময় নিজেকে বিভ্রান্ত করে তোলে। এদেশে এশিয়ার খবর বরষে একটি ইংরাজি সাপ্তাহিক বাব হয় এবং যেসব এশিয়াবাসী নানা কাজে, লেখাপড়ায় বা গবেষণায় যোগ দিয়ে এদেশে আছেন, বিশেষ করে তাঁরাই এটা মেনে। এই পত্রিকার সাম্প্রতিক সংখ্যায় দেখলাম, কোলকাতার না কি চাত্রগঙ্গামা হয়েছে। ব্যাপারটা সেই চিরন্তন—কোন একটি প্রথপত্র নাকি কঠিন হয়েছিলো। এদেশে ঠিক এই কারণে ছাত্রদের দ্বারা ব্যাপক দাঙ্গাহাঙ্গামা বোধ হয় কখনো করা যায় না। সেদটা কার—ছাত্রদের, শিক্ষকদের, যিনি প্রায়পক্ষে রচনা করেছিলেন তাঁর না শিক্ষাদানের প্রণালী এবং পরীক্ষা গ্রহণের দ্বারা? ছাত্রদের দ্বারা এরকম প্রত্যক্ষ সংগ্রাম তো আজ প্রথম নয়—এর অবলুপ্তি জগৎ শিক্ষানায়কেরা কোন নতুন উপায়ের সন্ধান করেছেন?

যাই হোক, আবার নিজের কথায় ফিরে আসা যাক। বেইলার সাহেব বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে দ্রুত পরিবর্তনের জন্য প্রত্যেক বিজ্ঞান শিক্ষককেই তাঁদের শিক্ষাদানের প্রণালীর উন্নতি বিধানের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে অধ্যবসায় জানিয়েছেন। আধুনিক বিজ্ঞানের প্রতিদিনের উন্নতির সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে তার সমরোপযোগী পরিমার্জন ঘটান সহজ নয়। বিজ্ঞান-শিক্ষকদের সামনে এই মহাসমস্যা এক বিরাট চ্যালেঞ্জের আকার ধারণ করেছে। আজকের বিজ্ঞান-জগতের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে আগামীকাল যে পরিবর্তন

শিক্ষকেরা আনবেন,—আগামীকালের বিজ্ঞান-জগতের অগ্রগমন এবং আরও কিছু নতুন আবিষ্কারের সংযোজন তার মধ্যে আবার নতুন সমস্যার উদ্ভব ঘটতে পারে। প্রত্যেক উন্নতিকামী দেশের চিন্তানায়করাই দেশের বিজ্ঞান শিক্ষাদানের ধারার পরিমার্জনের দিকে বিশেষ নজর দিয়েছেন। কারণ, এর উপরেই তাঁদের নিজের দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।

হুটি দৃষ্টিভঙ্গিতে শিক্ষকদের শিক্ষাদানের পদ্ধতিকে উন্নত করতে হবে। প্রথমটি হলো শিক্ষাদানের পরিধির মধ্যে নতুন নতুন তথ্যাবলীর সংযোজন এবং দ্বিতীয় হলো যেসব প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে এই সব নতুন আবিষ্কার সম্পূর্ণ রূপ পরিগ্রহণ করেছে তার সঙ্গেও ছাত্রদের মনের সংযোজন ঘটবে দেওয়া। বেইলার বলেছেন যে, এই দুটির কোন একটিকেই কম গুরুত্ব দিলে শিক্ষকেরা তাঁদের সম্পূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হবেন না। কারণ নতুন তথ্যাবলীকে বাদ দিয়ে শিক্ষাদান করলে আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষার সম্পূর্ণরূপে ছাত্ররা উপলব্ধি করতে পারবেন না এবং বর্তমানকালের বিজ্ঞান-জগতের চিন্তাধারা কি ভাবে গড়ে উঠলো ও তার সঙ্গে বিজ্ঞান গবেষণার পূর্বসূরীরা কি উপায়ে আধুনিক বিজ্ঞান জগতকে সুশোভিত করেছেন তার মর্ম উপলব্ধি করতে না পেরে ছাত্ররা বিজ্ঞানের মনোভাবের সন্ধান পাবেন না। বিজ্ঞানের এই মনোভাবের সঙ্গে সুপরিচিত না হলে ভবিষ্যৎ বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে পদার্পণ করা এক সুকঠিন কাজ।

এখন শিক্ষকেরা যদি এই দুটি দৃষ্টিভঙ্গিতেই তাঁদের শিক্ষাদারী পরিচালিত করেন, তাহলে সমস্যাটা আসে কোথা থেকে? সমস্যাটা বিরাজ করছে শিক্ষাদানের মূলক্ষেত্রে। শিক্ষাদানের বিষয়বস্তু যোজাই যাচ্ছে বেড়ে কিন্তু ছাত্রদের শিক্ষাগ্রহণের সময়তো বাড়েনি? সব তথ্য তো ছাত্রদের সামনে এই স্বল্প সময়ে উপস্থিত করা যায় না—উপস্থিত করলে তা পাত্র ভরাই হবে, প্রকৃত শিক্ষাদান করে মনকে উদ্দীপিত করা যাবে না। ছাত্রদের পক্ষে একই সময়ে এতো বেশী জিনিষ শিক্ষা করা কখনই সম্ভব নয়। সেখানেই তো শিক্ষকের কর্তব্য এবং দায়িত্ব সুরু হলো। তাঁকেই স্থির করে নিতে হবে, কি ভাবে পড়ালে বিজ্ঞানের মূল মনোভাবের সঙ্গে ছাত্রদের পরিচিত করানো যাবে। ছাত্ররা পাবেন রসের আবাদ—তাঁদের জ্ঞানার্জনের ইচ্ছা প্ররোচিত হবে। বিজ্ঞানের কোন তথ্যকে বেশী গুরুত্ব দেবেন, কোন তথ্যকে ঠিক কি ভাবে উপস্থিত করবেন, তার সমস্ত দায়িত্ব বিজ্ঞান-শিক্ষকের। বেইলার বলেছেন, আগের যুগের চেয়ে আধুনিক কালের ছাত্রদের অনেক বেশী বিষয়-বস্তুর সঙ্গে পরিচিত হবে, তাই শিক্ষকেরা যদি তাকে সংশ্লিষ্ট এবং সুসংবদ্ধ না করতে পারেন, তাহলে বিজ্ঞান শিক্ষার দ্বারা এক অসম্ভবের পর্যায়ে উপনীত হবে।

"He who first shortened the labour of copyists by device of Movable Types was disbanding hired armies, and cashiering most kings and Senates, and creating a whole new democratic walls; he had invented the art of Printing."

—Thomas Carlyle.

চন্দ্রা তার নাম

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

৫

ছুঃখের পরমা মাথার নিরে কাটাছিলো দিন। নিছের দিকে তাকাবার সময় ছিলো না চম্পার। সেই বিয়ে ভেঙে দেবার পর থেকে প্রতাপ আর তার মতো আরো ক'জন মাতব্বর পরিহার করলো তাদের। কিন্তু গ্রামগুচ্ছ মানুষকে কিছু তারা মাথা কিনে রাখে নি। বিষ্ণু, সুজন, ভগবতীপ্রসাদ এই সব পরীকরবো মানুষ অরুণকুঁয়ারীকে ত্যাগ করলো না। তাদের সঙ্গে কথাবার্তা রইলো। পাল-পার্বণে তাদের ঘরের সামান্য আয়োজন ভাগ ক'রে নিতে ডাকও পড়লো তাদের। কিন্তু তাদের এমন ক্ষমতা নেই যে এদের কাপড়-কুটি জোগায়। লাল বৈজনাথের বাড়ীতেও মস্ত সংসার, অনেক কাজ। সাদা চূণ-রং করা শোভলা মেটে ঘর। তার নিচের কামরায় রেডির জেলের বাতি জ্বলে গদীতে বসে থাকে বৈজনাথ। সুদ কবে। চাষী কিসাণের বিপদের সময়ে খলি ভরা টাকা বাজিয়ে সাহায্য করতে চায় সেবে সেবে। বলে—কিসের লিখাপত্র তাই? তাইকে টাকা দিচ্ছি, তাতে কিসের ভাবনা? শুধু তাই, অদ কারবারের আদর রাখবার জন্তে এই ভূবা কাগজে একটি টিপছাপ দিয়ে যাও। হাঁ, তোমার আমার দু'জনের ইমান ঠিক রইলো।

টিপছাপ দিতে দুঃখী কিসাণের আঙুল যেন আর উঠতে চায় না। কেন না, তারা ভাল ক'রেই জানে তাদের অধস্তন তিন চার পুরুষেরও কপাল এই তৌজী খাতাতে বাঁধা পড়লো। সত্যি সত্যিই তাই হয়। হয় বান, নয় অনাবুদী, এই সব চোট ঠেকিয়ে যদি বা কুখবুখা মাটিতে সোনালী সুজ গমের রং ঢেলে দিলো কিসাণ, সে কসলে সে হাত ঠেকাতে পারে কোথায়? সব টাকা গিয়ে ওঠে এই লালার ঘরে। গণেশের সিঁদুঁছাপ দেওয়া লোহার সিঁদুক। কপাল চাপড়ে কিসাণ আবার ধার করে।

বৈজনাথের হাসি হলো মকরের কামড়। এমন করে দাঁত বসায় যে, ঠাहर হয় না অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত। তার পর সুদে-আসলে মিলে ধারের বহরটা যখন বকে চেপে বসে, তখন মনের দুঃখে মাটিতে লাথি মেরে কিসাণ ব্যর কোঁজে নাম লেখাতে। কোম্পানীর কোঁজে রুকট হওয়ার স্বপ্ন, সে যেন সোনার হরিণ। কোঁজে নাম লিখিয়ে একটা কিসাণেরও নসীব ফিরেছে? মনে তো পড়ে না। তবু তারা ব্যর। কেন ব্যর, জিজ্ঞাসা করলে ওপর দিকে হাত দেখায়। ভগবান জানেন, গৈবীনাথ জানেন, কেন কোঁজে ব্যর কিসাণ।

এই লালার বাড়ীতেই এক দিন ডাক পড়লো চম্পার মা'র।

লালার ঘরেই উঠেছে তার বামীর জমি আর কেতী। তার দোয়েই গিয়ে ঝাঁড়াতে মাথা কাটা গেল তার। কিন্তু দুঃখীর জাত-মানে ভয় করলে চলে না।

চম্পাকে নিয়ে তবু কি গাঁয়ের মানুষের কোঁতুলকের শেব আছে? বয়েস পনেরো পেরিয়ে গেল। ভরা ঘোলা বছরে কোন্ মেয়ে অবিবাহিত থাকে? সমগ্রুখে লালার বুড়ী-মা বললো—আমার কথা শোন্। তীর্থে যাব আমি। আমার সঙ্গে দে যেয়েকে। পুড়য়ে চান করিয়ে সাবিত্রী-তিপক দিয়ে আনি তো'র মেয়েকে। বিয়ে তো হবে না। দেবতার দোর ঘরে থাক।

বৌবনে পড়ে মেয়ে হয়েছে মা'র গলায় কাঁটা। মা বলে—তাই করো নানী, আমার ভাবনা-চিন্তা দূর হয়ে থাক।

লালার মা বলে—ঘরে বসে তীর্থে হয়? না মজা গয়ে, না মদিনা গয়ে, বিচ মে বিচ হাজি থে। অমন ধর্ম ক'জন করে? আর ক'জন পারে? তীর্থে যাব, নিয়ে যাব মেয়েকে। বাতায় আমাকে একটু মদৎ তদবির করবে। তার পর লাগিয়ে দেবো আশ্রয় কোথাও। মনে করবি চম্পার মা, যে পরমেখর তোর মেয়েকে নিয়েছেন।

এমনি সব ভাল ভাল কথা বলে লালার বুড়ী-মা। তার পর বলে—আমার বেজাইটা-তে একটু ছুঁচ চালিয়ে দিবি বহ? তো এনে দিই?

—বেশ।

মেঘামতি আর ফুটোকাটা সারবার কাজ এনে দেয় চম্পাকে তার মা। এখন আর গাঁয়ে বেরোয় না চম্পা। ঘরে বসে মা-কে সব কাজ করে দেয়। মা-রও হয়েছে নানা জ্বালা। মেয়েকে যেন আর দেখতে পারে না। কেন জ্বালালো এই মেয়ে? এই এক মেয়ে থেকে তার মতো দুঃখ; তখনতে তখনতে চম্পা-ও এক একদিন বেগে ব্যর। বলে—বিব এনে দাও মা খাই। তুমি অখে থাকো। জ্বালালে মেয়ে কেলেতে পারোনি মা?

—তুই আমাকে এই কথা বললি? বলে মা-বেতে একসঙ্গে একটু কাদে কসে। কাদলে মনটা বড় হালকা হয় সুজের। চম্পার বাবার নাম করে কেঁদে সে বলে—হে গৈবীনাথ, কেন আমাকে এমন করে দুঃখ দিলে? কেমন সাজানো সংসার পেয়েছিলাম। দশরথের মতো স্বভাব, কোঁশল্যার মতো শাস—বামের মতো স্বামী।

এবার কেনবার সময়

সেইসময় বিলাস

ইতল

পিলখার-প্রথ ক্যাপ

যুক্ত দেখে কিনবেন

এম. এল, বঙ্গ যোগ কোং প্রাইভেট লিঃ কলিকাতা-১

তারপরই সব অভিযোগ সৈবীনাথকে ছেড়ে বামীর ওপর এসে পড়ে।

—আমি হেঁটে গেলে তুমি বুকে বাখা পেতে, হাঁদারা থেকে জল বয়ে আনতে দাঁওনি তুমি। লুকিয়ে জল এনে দিতে তুমি, দুপুরবেলা ধারদেনা দিতে হাতের রূপোর চুড়ি খুলে দিলাম বখন, কত হুংধ করেছিলে? এখন কি এত নির্দয় হয়েছো যে দেখতে পাও না, কত কষ্টে দিন কাটে আমার? তোমার মেয়ে আজ বানের মুখে ভেসে যায়, আমার বুকে জোর কি তাকে বাঁচিয়ে রাখি?

এমনি সব কথা বলে কঁদে-কঁদে সুরজ বার কাজে। কিন্তু বোল বছরের বুকে যে পাখাণ-ভার, তা তো চোখের জলেও হাল্কা হয় না? আর কান্না বেন আসে না চম্পার চোখে। তাকে কি ভগবান এত ভালো দিয়ে গড়েছিলেন? ভেবে ভেবে কুল পায় না চম্পা। এসে থেকে সে কি শুধু হুংধই দিলো লোককে? কিন্তু চন্দন তো সে কথা বলতো না?

জীর্ণ ঘরের ভাঙা গেরস্থালীর কাজ চম্পার সারা হয়ে যায়। বর্গা পড়ে নদী কেমন তরে উঠেছে। ঘাট ভেঙে ঘাট উঠেছে ওদিকে। এ ঘাটে কেউ আসে না আজ-কাল। চম্পাদের উঠানে ছায়া ফেলে এক বাক বক উড়ে যায়। তবে কি বৃষ্টি আসবে? আকাশ ত মেঘে ঝেঁপে এসেছে। কাজল-কালো মেঘের দিকে চেয়ে চম্পার মন বেন কেমন উদাস হয়ে যায়। কোথায়, কতদূরে গিয়েছে চন্দন। কয় বছর যে হয়ে গেল! সুরজ ঘরের এক ছেলে, এমন করে নির্দাসনে থাকবার কি দরকার ছিল? প্রতাপ চাচা আর দুর্গা চাচীও ঘুরে এসেছে সেখান থেকে। নানার সঙ্গে নাকি কাজ করছে চন্দন! ফারসী শিখেছে, হিন্দী শিখেছে কোন বাঙ্গালীবাবুর কাছ থেকে। বাঙ্গালীবাবু কাকে বলে? জানে না চম্পা। তবে কৌশল্যার কাছে শুনেছে বাঙ্গালীবাবু মাছ খায়, মাংস খায়। সাহেবদের সঙ্গে এক সমান হয়ে কথা বলে। তাহেই বা কি হলো? এক ছেলে, তাকে বিয়ে দেবে না তার বাপ-মা? দিক না কেন, সুরজ হোক না কেন, চম্পা কি বাদ সাধতে বাবে? কখনই না।

ভাবতে ভাবতে চম্পা বাতীর পেছনে গিয়ে দাঁড়ায়। ঐ তো এক ফালি নীল মেঘের মতো নন্দীখানি দেখা যাচ্ছে। চম্পা জানে, এই ঝোড়ো বাতাসে নদীর জল কেমন কুঁচকে যায়। কেমন রেখা পড়ে। আবার বৃষ্টি পড়ে বখন—টুপটাপ করে সুরজ হয় বড় বড় ফোঁটাত—তখন নদীটা কেমন অশান্ত হয়ে ওঠে। কত দিন দেখেছে চম্পা। চন্দন তাকে দেখিয়েছে। বৃষ্টির ঝাপটায় নীল হয়ে গিয়েছে মুখ। তখন বটগাছের নিচে দাঁড়িয়ে হুঁজুন বৃষ্টি ধরা অবধি অপেক্ষা করেছে। আবার ঝলমলে রোদের দিনে, নদীর জলে হাত পা ধুয়ে, পাগর খেয়ে নিয়ে কাঁধে নীলমোহর করা খলি ফেসে সবকারের ডাকবরদার বধন ঠাট্টা খোঁড়া নিয়ে খুঁট খুঁট করে পাঁকা সড়ক ধরেছে—তার পেছন পেছন চলে গিয়েছে সে আর চন্দন। কোমরের পেটি আর কাঁধের তক্তমার লাল রং বধন অনেক দূরে মিলিয়ে গিয়েছে, তখন গম্ভীরতের মতোয় সড়ক রাস্তা ধরে গাঁয়ে ফিরতে ফিরতে তারা হুঁজুনই গলা মিলিয়ে গান করছে—

—লোভে চন্দন চম্পক হালা
কানমে কুণ্ডল নৈন বিশালা

বাকিন বাজে ঝড়োবাগা

চলে রাধাবাবকে বরাত রে।

বৈড়ার ওপর চিবুকখানি রেখে চম্পা উদাস চোখে তাকিয়ে থাকে। কোথায় চলে গেল চন্দন। আজ যদি ফিরেও আসে, চম্পা কি তার জীবনে আবার নিজের অভিশপ্ত ছায়া ফেলতে বাবে? এই তো সেদিন, কি কারণে মন খুঁদী হয়েছিলো। খুঁইফুল পরেছিলো চম্পা বেগীতে। সন্ধ্যার মুখে জল নিয়ে চলে আসছে চুপি চুপি, দেখে চন্দনের মা কেমন বিজ্ঞপ করে বললো—দেখ দেখ, আমার ছেলেটাকে দেশ-ঘর ছাড়া করলো, এখনো জল পরে মন ভোলাবার শখ যায় নি?

হেঁটে গেলে পা কেটে গেল, সেদিকে না তাকিয়ে প্রায় ছুটে চলে আসে চম্পা, তবু দুর্গার শাপিত কণ্ঠটা তাকে অতুসরণ করতে ছাড়ে নি—ও মেয়ে শহরের বাজারে গিয়ে ওঠাবে আর নাচনী হবে, তোমরা দেখে নিও।

চম্পা ভাবে না, দুর্গার ছেলের কাছে আর সে বাবে না। কোন দিনও না। বলা যায় না, হয় তো একদিন বরাক, নিবে বেকবে চন্দনের বাবা। না কি বৌ নিয়েই ফিরবে? চন্দনের নানা না কি এমন মেয়ে বাছাই করবে, বার জোড়া নেই—চন্দ্রবদনী, যুগনয়নী কাঁচা সোনার মতো রঙ।

আর চম্পার তো বিয়েই হবে না। ভাবলে পরে মনটা খারাপ হয়ে যায় আবার। তার কোন দিন কিছু হবে না। যত আনন্দ উৎসব সব ঐ অস্ত্র অস্ত্র মানুষের হবে! নিজের দুঃখে নিজেই উদাস হয়ে চেয়ে থাকে চম্পা। বর্ষার জল পেরে কদম গাছে ফুল ফুটেছে। নদীর ওপারে বনে ময়ূর ডাকে শোনা যায়। চম্পাদের ঘরের পেছনে কেমন মন্থমলের মতো ঘাস হয়েছে। খুঁইগাছটা নাড়া দিলে ফুল আর বৃষ্টির জল হুটুই ববে পড়ে। একবার গাছটা নাড়ায় চম্পা। বৃষ্টির কোঁটা কোঁটা জল বুঝি নিচের ঘন সবুজ পাতাগুলিতে তখনো লেগেছিলো। এবার তারা ববে পড়ে। চম্পার চুল আটকে পড়ে দেখতে হয় ঠিক বেন মুক্তা লেগে রয়েছে।

হঠাৎ কানে আসে অনেকগুলো গাড়ীর ঘড় ঘড় শব্দ। তাদের গায়েই ঢুকলো বৃষ্টি। কোঁতুহলী চম্পা আগল খুলে এগিয়ে যায়। আরোহীদের চোখে পড়ে না। কিন্তু সারি সারি তিনটে বংগ গাড়ী এলো। বড় বড় চাকা। বাঁশের ছাউনীর মুখে ছাঁট লাল কাপড়ের খোপা-খোপা ফুল। বাত্রিবাহী গাড়ী। এ গায়ে কাকত! এমন সময় ফেরবার কথা নয়? তবে কি বাইরে থেকেই কেউ এলো? চম্পা ভাবে—কৌশল্যার কায় জেনে নিলেই চলবে। চকিতে আত্মসচেতন হয়ে ভেতরে চলে আসে চম্পা। কোঁতুহলী চোখে মাঝের গাড়ী থেকে কে বেন ঘুরে তাকালো। বুক হুক হুক করে তার। এম্ নিলাজ হয়ে এতখানি এগিয়ে আসা উচিত হয়নি তার। গা আঁচল ছিল তো? যোটা হলদে গুড়নাটা টেনে নেয়।

কানপুর ও আকবরপুর থেকে রাস্তা এসে তেরাপুরের আগে মিলেছে। তারপর তেরাপুর হয়ে সেজুর নদী পেরিয়ে সে পথ ধরে পেরিয়ে কানী হয়ে চলে গেল। এই পথ কোম্পানী সড়ক। এ পথের সঙ্গে যোগাযোগ করবার জেতে আশ-পাশ থেকে কত গ

জালের মতো এসে মিলেছে। আকবরপুর, বাটমপুর, কোরা, কটোরা, হামীরপুর হিন্দুকী, কডেরপুর। এই সব জায়গা থেকে এসেছে সব ছোট ছোট পথ। সব পথই যে কোম্পানী সাহেবের বানানো তা নয়। যেমন তেরাপুরের পথ বানিয়ে দিয়েছিলেন রত্নলাবাদের গাজী সাহেবের শিষ্য মহম্মদ রত্নল। বুক পর্বত সাদা দাড়ি, হাতে তসবীমালা, কোরাণ কঠস্থ ছিলো গাজী সাহেবের। সিঁচপুকুর, দিনান্তে এক জাঁজলা হুথ খেতেন শুধু। আর সে হুথও নাকি একটি ধবধবে সাদা গাই এসে দিচ্ছে যেতো। গাজী সাহেবের অব্যর্থ ঔষধে আরোগ্য হতো সর্পদষ্ট ব্যক্তি। কি হিন্দু, কি মুসলমান সবাই বিপদকালে নিয়ে যেত গাজী সাহেবকে। মহম্মদ রত্নলের ছেলেকে কাটলো বিদ্যধর। গাজী সাহেব নিজে তখন মৃত্যুপথ্যার। তবু, মহাত্মপুত্রের সেই কাল রাতে ঠিক চোদ্দ মাইল রাস্তা পেরিয়ে এলেন গাজী সাহেব। মহম্মদ রত্নলের জ্ঞানাকীর্ণ ঘরে ঢুকে একবার ঝাঁপালেন মৃত্যুপথ্যাত্মীর মামার কাছে। তাঁতের লাঠিটা দিয়ে মুহূর্তে ঠেলা দিয়ে বললেন।

—কোন কাছ কলিঙ্গ নি তুই বেটা। ময়দান পড়ে রয়েছে, তাতে একটা গমের চারাও ফৈলাদ করলি না—সে গাছের একটা দানাও কোন চিড়ির। খেতে এলো না—কি হিসেব দিবি তুই আজ্ঞার কাছে গিয়ে? উঠো, নিদ্ না রহো, ছনিয়া মে আপনে কাম বঢ়াও।

তার পর চলে গেলেন। সকালের আগেই মহম্মদের ছেলে স্বস্থ হয়ে উঠলো। সন্তোষজনক মহম্মদ গাজী সাহেবের কাছে গেলেন দরগার ভেট নিয়ে। গিয়ে দেখেন, কাঁচা এক কবরে বাতি ছেলে শোক করছেন বঁসে ভক্তবৃন্দ। গাজী সাহেব মারা গিয়েছেন গত সন্ধ্যায়।

মহা কৃতজ্ঞতার মহম্মদ তেরাপুর থেকে রত্নলাবাদ এক পাক। সড়ক বানিয়ে দিলেন। গাজী সাহেবের নাম নিয়ে চলল এ পথে গাজীর কোন বিশুর হয় না বলেই এ অঞ্চলের লোক বিশ্বাস করে।

এমনি ধারা আরো কত পথ। কোন ঠাকুরসাহেব হয়তো নিজের কীর্তি অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্তে পথ করেছেন। কেউ বা মৃত শিড়পুকুরের নামে উৎসর্গ করেছেন কোন কাঁচা সড়ক। কিন্তু কোম্পানী সরকারের পাকা সড়কের সঙ্গে কান্দরই তুলনা হয় না। চমৎকার পথ! চওড়া স্থলর পথ। এই পথ দিয়ে কোম্পানীর ডাক চলে, কুচ চলে, রেসালা ও পদাতি ফৌজের সিপাহী সওয়ার-রা ছুটি কাটিয়ে গ্রাম থেকে হেড কোয়ার্টারে হাজিরা দিতে যায়। কখনো সাহেবরা শিকারে চলেন এ পথ ধরে। সাহেবরা এ জায়গা থেকে ও জায়গা গেলেন তো একটা ছনিয়া শিকড় উপড়ে চললো সাথে সঙ্গে। কত তাঁবু, কত বেয়ারা, আবদার, খানসামা, সহিস, মশালটি, বাবুটি, কুলী। ভেড়া, বকরা, হুংগী হুংগা, এমন কি হুথ দেবার গাইটিও চললো সাথে সাথে। সাহেবরা এলো তো আশপাশের মানুষ রাস্তা ছেড়ে নেমে বাবে পাশের ক্ষেত, নালা বা খাঁদে। যে নামবে না, তাকে বোড়া দিয়ে ভর দেখিয়ে নামিয়ে দেবে ওরা। কোম্পানী সরকার। সাহেবরা সকলেই রাজা। রাজার সঙ্গে একই পথে একই সময়ে চলা কি আদব দাঙ্গিক?

পথ। তবু কালো চামড়ার মানুষগুলোকে দূরে রেখে বাঁচবার কি প্রয়াস! বত নতুন আমদানী সাহেব, ভক্তো এই বকম ছোঁরাচ বাঁচিয়ে চলবার চেষ্টা। কোথায় বনজঙ্গল দিয়ে চলেছে সাহেব।

তাঁবু খাটাবে, আসবাব সাজিয়ে খাটপালং চোরার আলমারীতে বন্দোবস্ত করে দেবে হিন্দুস্থানের মানুষ। দশ দিক খুঁজে পেতে হুংগী খালীর মাংস, ভোঁকা চালের বিরিয়ানী আর মদের ঠাণ্ডা বোতল, সে-ও আনবে তারা। গরমে পুড়ে তারা পাখা চালাবে, ঈশতে তারা-ই আগুন জ্বালাবে। সব সময় হজুরের হাজির থাকবে। তাদের এই সবটুকু সেবা নিঃশেষে নেবে সাহেব। বৃট্ট উঁচু করে, পা নাচিয়ে, নিগার অথবা শূয়ার বঁলে। কিন্তু তাই বঁলে তাঁদের মানুষ বঁলে স্বীকার করবে? অসম্ভব। এমন দৃঢ়মূল এ ধারণা, যে সত্যতা থেকে অনেকদূরে, নগণ্য কোন নির্জন জায়গাতেও, কোম্পানীর সাহেবরা, সাহেবরা সাহেব ছাড়িয়ে মানুষ হয়ে উঠতে পারেন না। যে সব সাহেবরা লাঞ্চে একজন, এই সব অলিখিত কানূনের লঙ্ঘনের গণ্ডী পেরিয়েছেন, তাঁদের এদেশের মানুষ শ্রদ্ধা করে, ও-পারের মানুষ তাচ্ছিল্য করে! সাহেবরা সাহেব, তাতেই তাঁদের সাত খুন মাং। ভাষা বোঝেন না, বিলুমাত্র শ্রদ্ধা নেই এ মহাদেশ সম্পর্কে, নিজেদের শিক্ষানীক্ষা প্রায়ই দণ্ড দিয়ে মাংসা দায়—তবু তাঁরা শাসন চালাচ্ছেন। সাল আঠারো শ' পঞ্চায়। কালো চামড়ার কোটি কোটি মানুষ আর তাদের জগৎভূমি হতভাগ্য সব মহাদেশ, তাদের ওপর শাল চামড়া অব্যাহত শাসন চালাবে, এই হলো এই যুগের বাইবেলের নির্দেশ।

এত কথা তেরাপুরের মানুষ জানে না। তবে মাঙল তাদেরও দিতে হয় বৈ কি! তাই তেরাপুরের বুড়ো মানুষরা বলে।

—জমানা বদলাবারও একটা তরিকা ছিলো। আমরা বুঝতে পারতাম, কখন কি হচ্ছে! এখন আর কিছু ধরতে চুঁতে পারি না। এমন তাড়াতাড়ি বদলে যাচ্ছে সব।

জোয়ানরা হাসে। তাদের রক্ত গরম। বলে বুড়ো লোকদের শুচু ভয়! সব ঠিক আছে। তোমরাই বুড়ো হয়ে যাচ্ছে।

—না, না।

মাথা নাড়ে বুড়োরা সবিস্বাসে। বলে—বদলাচ্ছে। কিন্তু ভাল হচ্ছে কিছু? কিছু না। এত অসুখ বিসুখ, কসলে এত অজম্মা, আকাশের এত ধামধেরালী, এ তো ভাল নয়।

বুড়োরা মাটির সঙ্গে গভীর টানে বঁধা। গাছের মতো। তাই আবহাওয়ার বদলটা তারা ভ্রাণ নিয়ে নিয়ে বোঝে। বোঝে কিন্তু বোঝাতে পারে না ছেলে-নাতিদের! মাথা নাড়ে শুধু বিজ্ঞপ্তিতে।

তবু এই পথ তাদের জীবন-বৈচিত্র্য জোগায়। পথ দেখে অনেক সময় যায় তাদের।

কে এলো নব আগন্তুক, জানবার জন্তে ব্যস্ত ছিলো চম্পা। তাছাড়া ইঠাং যেন মনটা টলমল করে নড়ে গিয়েছে প্রশান্তি। পুরনো স্মৃতির সন্ধারেই কি এমনটা হলো? মনের অভল থেকে উঠে এলো অনেক সব ছবি, বা নাকি যুছে বাবার কথা! প্রথম বৌবনেই যে মন এমন হয় তা জানে না চম্পা। সহসা অমাত্র করছে বিম্বি-নিবেদ, জেনে-ও দুপুর বেলা একবার নদীর ধারে বাবার জন্তে আকুল হয়ে উঠলো চম্পা। সেই নদী, সেই বটগাছ, সেই প্রশান্ত, বিপুল, উদার ব্যাপ্তি। তার অনেক নিঃসঙ্গ বেদনা দিনের সন্ধ্যা।

কাল ছিলো হৃগিত বর্ষণ। মেঘ ভরে আকাশ নেমে এসেছিলো

চম্পাদের বাড়ীর ওপর। বৃষ্টির প্রতিক্রিয়া ছিলো। রাতে বিনিময় চোখে জানলো দিয়ে সেই নিকষ আঁধার দেখতে দেখতে চম্পা মনে মনে কামনা করেছে বৃষ্টি আঁধার। বসু বসু করে নেমে ভাসিয়ে দিয়ে বাক সব কিছু। তাইলো ঘুমোতে ভালো লাগবে তার। সে ঘুমে স্তম্ভর কোন স্থবির স্বপ্ন দেখাও সম্ভব। কিন্তু বৃষ্টি আসেনি।

সেই বৃষ্টি এলো আজ, এখন। এই অসময়ে। নদীর জল সিংহের মতো ডেউয়ের কেশর ফুলিয়ে উঠে এলো। বৃষ্টিতে সত্যিই ঠাণ্ডা হয় না কিছু।

এ সময়ে বটগাছটার গোড়ার কাছে জল উঠে আসবার কথা। তবু তার কথাই মনে হলো চম্পার। শৈশব থেকে এই বটগাছটাকে সে মনে মনে বন্ধু বলে জেনেছে।

পা ফেলতে তুল হয়েছিলো, আর একটু হলেই নরম মাটির স্বাদের সঙ্গে বুঝি নিজের চম্পা জলেই পড়ে যেতো আজ। যদি না তাকে ধরে ফেলতো চন্দন। অদ্ভুত একটা মুহূর্ত। পরে চম্পা চোঁটা করেও এই মুহূর্তটার বিষয় আর চমক স্মরণে আনতে পারেনি। এ রকম আশ্চর্য দৈবী যোগাযোগ কঠিন হয়।

—পড়ে যাবে চম্পা!

হুগুটনা বাঁচলো। কিন্তু চম্পা চলে এলো কাছে এক টানে প্রায় বুকের ওপরেই এসে পড়লো বলা চলে। কিন্তু সে-ও মুহূর্তের বিভ্রম। তারপরই প্রায় রুঢ় ধাক্কায় চম্পাকে সামনে ঠেলে দিলো চন্দন। বললো—খুব বেঁচে গেলে।

বিষয়ের পোর তখনো কাটেনি। চম্পা বললো—তুমি?

—নয়তো কি?

কৌতুকের হাসিতে মিশ্র মুখ চন্দনের। বলে—কাল অমন করে দেখায। ঝাঁড়িয়ে ছিলে পীশা গুড়নীতে বাহার দিয়ে। সঙ্গে দাঁড়া বাবা ছিলো, নইলে!

—সে তুমি?

স্বীকার করে চন্দন মাথা নেড়ে বলে—আমি এসেছি সে কথা শোননি? আমি ত ভাবলাম তুমি শুনেই এসেছ দেখতে।

সচেতন হলো চম্পা। ঈর্ষ্য গর্বের ও আহত অহমিকার সুরে বললো।

—গাঁয়ে আমি বাই না। গেলে নিশ্চয় গুনতাম। শরীক হয়ে ফিরে এসেছে ছেলে, আমাদের মতো গরীবকে নিশ্চয় শোনাতো তোমার মা!

চন্দন জবাব দেয় না। তাই খোঁচাটা তাকে বিঁধলো কি না, বুঝে পায় না চম্পা। আঘাত করে নিজেরই মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছে যেন। তাই সেই মনটা জয় করে আবার চম্পা বলে—না জানি কত খরচাং জকাং আজ তোমাদের বাড়ীতে। আমি তো তাতেও বাদ পড়েছি চন্দন!

—চম্পা, বাজে কথা বলো না।

মনে যে অনেক দুঃখ চম্পার। আরো অনেক কথা বলতে ইচ্ছে করে—কিন্তু চন্দনের গলার গভীর সুর, সেই ছেলোমুগ্ধ কিশোর কণ্ঠ কোথায় গেল? কথা বলতে চেয়ে কথা হারিয়ে কেলে চম্পা। আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে থাকে। প্রথম দর্শনের চমক আর ঝোঁকটা কেটেছে। তারপরে আবার নির্ভর কোন কৌতুক করতে

সাধ যায়। মনে হয় চন্দনের আত্মবিশ্বাসটা ভেঙে দেয় খোঁচা দিয়ে। সে কথা বললো বলেই ধস্ত হয়ে গেল চম্পা? তা তো নয়। চম্পা বলে—চেহারা তো রহীসদের মতো! অনেক দেশ ঘুরে এসেছ? আমার ভক্ত কিছু এনেছ?

—নিশ্চয়?

—কি এনেছ?

বৃষ্টির ছোঁয়াচ কি চম্পার গলারও লাগলো। নইলে গলা এখন ভিলে কেন? যেন ছুঁইগাছটার পাতায় ফুলে জল। নাড়া দিলেই ঝরে পড়বে। পাছে ঝরে পড়ে, তাই নিচু গলার চম্পা আবার বলে—কি?

—দেখতে পাচ্ছ না? সামনে ঝাঁড়িয়ে আছি, সেই কখন থেকে ঝাঁড়িয়ে ঝাঁড়িয়ে পা আমার ধরে গেল।

এবার চম্পার অভিমান ফুলে ফুলে ওঠে। চিরদিনের অনাদরের মেয়ে। এতটুকু ভালোবাসার ছোঁয়াচ লেগেছে তো কথা নেই! চম্পা বলে—এত দিন আসনি কেন?

—কাজে ছিলাম।

—কি কাজ?

—অনেক কাজ। কিন্তু সে সব কথা কেন চম্পা? এই ত এসেছি। ভোরবেলাই চলে আসতাম। কিন্তু জান তো সব!

এবার চন্দনে পাশাপাশি ঘেসে আসে। বৃষ্টির সাদা আবরণটা চন্দনকে ঘিরে রয়েছে। আঁড়াল করে রয়েছে বহির্জগৎ থেকে। চন্দনের কথা শুনে ম্লান হাসে চম্পা। সে জানে না চন্দনের আসা কত অসম্ভব! বলে—তুমি আর কি জানলে বল? এখানে প্রতিনিধি, সে যে কত কথা—

বসতে বসতে চম্পার মুখে হাত চাপা দেয় চন্দন। বলে—বাস, আমি তো এসেছি। আর কেন ভাবনা?

মস্তমুগ্ধ চম্পা তাকিয়ে থাকে। চন্দন বলে—আমি অনেক ঘুরছি, অনেক দেখেছি চম্পা! এরা জানে না তাই ছোট ছোট কথা নিয়ে পড়ে আছে। তুমি কিন্তু সে সব কথায় দুঃখ পেরো না।

বাধ্য মেয়ের মতো ঘাড় নাড়ে চম্পা। তার পর চন্দন বলে—কি স্তম্ভর হয়েছে চম্পা? চেনা যাচ্ছে না জানো? কে বলবে এ সেই চম্পা!

—কেন বিজ্ঞি ছিলাম?

—এমন হবে কে ভেবেছিলো? চলো নিয়ে 'বাই' শহরে। শহরে মেয়েরা কেমন স্তম্ভর ঘাঘরা গুড়নী নাগরা পরে। কেমন বেণী বাঁধে।

—খুব স্তম্ভর, না?

—তোমার চেয়ে নয়।

চন্দনের কথায় চম্পার দুনিয়াটা অমনি ভরে ওঠে যেন। খুঁসিয়ারির রঙে রঙীন হয়ে ওঠে। চম্পা বলে—সত্যি?

—সত্যি।

আর যৌবনের ধর্ম-ই এই, চন্দনের সঙ্গ্রামসূচীতে চম্পা যে-ই জানলো যে সে স্তম্ভর, অমনি যেন সে আরো অনেক স্তম্ভর হলো। এই সৌন্দর্য আগেই এসেছিলো। কবে যে কৈশোর ও যৌবন দুই-ই মিলিত হলো। দুই-ই সাদুয়াগ অঙ্গলিতে পূর্ণ করে দিলো তার।

দেহ, তা জানতো না চম্পা। চরণের সে চপলতা কবে যে নয়নের নীলাঞ্জন ছায়াতে মিলিয়ে রহস্যময় করলো কটাক্ষ, তাই বা কে জানতো! সমস্ত শরীর ভরে উঠলো। বেন মজরিত হলো লতা। অবশ্যে বাঁধা চূণ, তারই বা শোভা কত! গরীব মেয়ের লাল আঙ্গিয়া গীলা ওড়না—তাতেই চম্পা কত মুগ্ধ! মুগ্ধ চন্দন চেয়েই থাকে কিছুক্ষণ। লজ্জা পেয়ে মুগ্ধ ঘুরিয়ে নেয় চম্পা। চন্দন বলে—অমন কণণ হ'লে কেন চম্পা? কত দিন দেখিনি বল তো?

এতক্ষণে চম্পা সহজ হয়েছে। সকৌতুকে হেসে হেসে বলে—
ছিলে কোথায়? মনে ছিলো এ গাঁয়ের কথা?

—ছিলো না? জানো না ত, সাহেবের সঙ্গে গিয়েছিলাম ঐয়গঞ্জী। পথে সাহীসড়কে ডাকুর হাতে পড়লো আমাদের গাড়ী। সাহেব ছিলো পেছনে। সড়কী বিঁধলো আমার কাঁধে। মরেই যেতাম হয় তো, যদি না সাহেব এগিয়ে এসে গুলী চালাতো ঝটপট। কিন্তু মনে হলো—যদি তোমাকে আবার না দেখতে পাই?

—কোথায় লেগেছিল চোট?

—অধম আরাম হয়ে গিয়েছে।

—তবু দেখি?

ঐষংগস্তীর হয়ে চম্পা নিরীকণ করে দেখে। এত দিনের অপেক্ষা। তবু এমন সহজ ভাবে কাঁধে হাত দিচ্ছে দেখতে, এমন করে কাছে আসতে ঐক চম্পাই পারে। চন্দনের মনে হয় চম্পার মতো এমন দোসর তার কেউ নেই। এই সহজ বন্ধুত্বের অস্ত্র বেন কৃতজ্ঞ লাগে তার। ঠিক এই কথা হয়তো বলতে চায়নি, তবু এই সব কথাই কেন বেন এসে পড়ে! চন্দনের মমটার চারিপাশে বেন পাহারা ছিলো। এসব কথা ভাবতে বা কইতে মানা ছিলো। এখন চম্পার নৈকট্যে সহজেই অপসারিত হলো সেই বাঁধ।

চন্দন বলে,—তুমি কি বুঝবে চম্পা? আমার মনে কত কথা, আমি সব বলতে পারি না। শিকার করতে জঙ্গলে চলেছে সাহেব। ডোলগুরের রাজার জঙ্গলে। রাজার হাতীতে সাহেব, পিছনের হাতীতে আমি, সাহেবের বন্দুক নিয়ে। হঠাৎ সামনে পড়লো গুলবাঘ। বাঁপিয়ে পড়লো গাছ থেকে। সাহেবের বন্দুকে নিশানা ছুটে গেল, বাঁবার চোট খেয়ে জানোয়ার লাফিয়ে এলো। আমার খেয়াল ছিলো এ যক্ষ কিছু একটা হতে পারে। দালা শিখিয়েছিলো শিকারের বুলি। জানি চোট খেলে শেরের চাইতে গুলবাঘ কিছু কম নয়। কিন্তু হাতী যে ভয় পেয়ে অমন বিগড়ে বাবে আর সব ভুলে গিয়ে অমন ছুটেবে পাগল হয়ে, সে কথা দালা বলেনি। এক নিমিষে কি হয়ে গেল, আমি গেলাম পড়ে। অধমী বাঘ আমার বুকের ওপর। সাহেব জাতটা আমি বুঝি না চম্পা। এ সাহেব ছোকরা। অতি বদমেজাজী। এখন দেখি যে না, ভীতুও বটে। ভয়ে কঁপে গিয়ে আমাকেই হয়তো সে গুলী করতো, যদি না মাহুত তার হাতী সামলে নিয়ে ঝড়িয়ে উঠে সাহেবকে না হ'সিয়ার করতো। গুলবাঘার সঙ্গে লড়াইয়ে আমি বধনু বেকারদার আঁটকে গিয়েছি, জানোয়ার আমাকে কবজা করেছে তখন ছুটে এলো জোনা আলি। আমার দোস্ত। আমাকে বাঁচাতে তার তরোয়াল জানোয়ারকে বিধলো ঠিকই, কিন্তু আমার মাথাটাও বাঁচলো না। কি ভয়ঙ্কর বহুগা

চম্পা, সব বেন আঁধার হয়ে গেল, কিন্তু তোমার কথা আমার সেই সময়ও মনে হলো।

এতক্ষণে আকাশে বৃষ্টি থেমেছে। পাতা থেকে জল বরছে টুপটাপ রূপালী হচ্ছে। আকাশ সবটুকু জল ঢেলে দিয়ে এতক্ষণে রান মেঘের ওপর রামহস্তর হাত! হাসিটুকু ছড়িয়ে দিয়ে চেয়ে আছে মাটির দিকে। আকাশের পূর্ণতা শূন্য হলো। আর চম্পার মনটা বেন এতদিন ধরে পিপাসী নদীর বৈশাখী বুকের মতো শূন্য হয়েছিলো। এতক্ষণে সেই হৃদয় ভরে উঠেছে। হলহল করছে কানায় কানায়। অনেক ক্ষোভ অনেক দুঃখ চম্পারও ছিলো। তার সঙ্গে কেউ কথা বলেনি। চন্দনের মা তাকে কত অপমান করেছে। অনেক দুঃখে চম্পার মনটা শুধু চন্দনকেই স্মরণ করেছে। তারা দু'জনে গৈবীনাক্ষের মন্দিরের পাশে কদম গাছের একটি শিশু চারা আঁধার করেছিলো। সেই গাছে ফুল এসেছে গত বছর। দেখে চম্পার মন কেমন করেছে। তাদের বাড়ীর পেছনে জায়গাছে এবার কাঁচো মেঘের মতো কল ধরেছিলো। চুরি করে সেই জাম দু'ভনে বসে খেতো এই গাছের তলায় বসে। সেই কথা মনে করে চম্পা এবার এক আঁচলা জাম একটাও খায়নি। সব ছড়িয়ে দিয়েছিলো গাছের তলায়। কাঠবেড়ালীর দল বেঁধে খেয়ে গেল। সেই হরিণশিশু? চম্পার চোখের সামনে সে বড় হলো। এবার শীতকালে সেই হরিণকে সে মধুও চালে এক হরিণীর সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে দেখেছে। আবার হরিণীর ডাক ডেকে সেই হরিণকে তুলিয়ে এনে তাঁর সন্ধানে মারলো ঐ আঁহীরদের ছেলে গোপাল। গোপাল হয়েছে চিড়িয়াখানার। তিতর, মটের, হরিহাল, হরিণ, জ্যাক্স বরতে পারে না। মেঝে নিয়ে গিয়ে বেচা আসে সাহেবদের ঠাঁবুতে। চার পা খড় দিয়ে বাঁধা, রশ্মির দোলা টানিয়ে সেই হরিণকে নিয়ে গেল গোপালরা কয় ভাই। বলে পড়া মাথা, আর নিমিলিত চোখ। সেই হরিণকে দেখে চম্পা, দুঃখে ক্রোধে কত কঁদেছে একা একা। চন্দন থাকলে গোপালকে নিশ্চয় শাস্তি দিতো।

এ হলো কারণের কথা। উপলক্ষ্য ধরে মন কেমন করা। কিন্তু তা ছাড়াও কত সময় যে এমনি মনটা কাঁদতো, হ হ করতো, উদাস লাগতো। ক্ষেত কুড়িয়ে গম তুলে টুকরি ভরছিলো চম্পা একদিন। এমনি রাঙা বিকেল। অস্ত্রাণের বাতাসে শীত করে। কাঁচা কবলের মোটা ওড়না টেনে নিয়ে সে কুলো নিয়ে ঝাড়ুছিলো গম—হঠাৎ কানে এলো বিয়ের গান। পালকি নয়, ছোট নালকি করে বৌ চলেছে ভিন্ গোয়ে। বর পাশে পাশে লাঠি হাতে জুতো পায়ে ঝাচ্ছে। মেয়েরা গান গেয়ে এগিয়ে দিতে চলেছে গাঁয়ের সীমা পর্যন্ত। ভিন্ পাড়ার মেয়ে। মেয়েরা একটানা কল্প বিলম্বিত সুরে গাইছে—

'সীতা মৈরী' কী মাতা রোয়ে, রোয়ে জনাবাল

চলে হুলহন কো' হুলহনীয়া—

সীতা মৈরী' রোকে কহে কব লাও গে লৌটকে

চলে হুলহন কো' হুলহনীয়া।

গানের সেই করুণ সুর শুনে সেদিন চম্পার মনটা সহসা চন্দনে র কথা মনে করেই ধারাপ হয়েছিলো। চম্পার চোখের জল গাঁয়ের মাছুর কোন দিনও দেখেনি। সেদিনও সকলকে লুকিয়ে চম্পা

মুখ নিচু করে কেঁদেছিলো। ছই চার কোঁটা অভিমাত্রী অশ্রু ভরে গিয়েছিলো মাটিতে। মনে হয়েছিলো কত দিন হলো কোথায় চলে গিয়েছে চন্দন। কোথায় হারিয়ে গিয়েছে। কত শহর, কত মাছুষ, কত দূর-দূরান্তের পথ। আবার এ-ও মনে হয়েছিলো, তার মতো মেয়ে, যে অবাস্তব, যাকে কেউ চায় না, তার এই সব কথা মনে হওয়া বোধ হয় একান্ত বিলাস। এমনি ধারা সব কথা ভেবে হাতের গম তার মাটিতে পড়ে গিয়েছিলো অজান্তে। আঁধার এসেছিলো আস্তে করে নেমে। ঠাণ্ডা বাতাসে শরীর হিম হয়ে গিয়েছিলো।

আজ চম্পা চন্দনকে সে সব কথা বলে না। সেই সব দুঃখের চেয়ে আজকের সুখ অল্পক বড়। আর চম্পা অগ্নি পাঁচজনের মতো নয়। সে সব ছোট ছোট সুখ দুঃখ খুঁটিয়ে বাঁচে না। প্রত্যাগত এই বন্ধু স্বপ্নের প্রেমের প্রতিশ্রুতিটা এত বড় সম্পদ, যা তার ছেঁড়া ওড়নীর আঁচলে বেঁধে সে অনেক দুঃখ অগমানকে তুচ্ছ করে জয়ী হয়ে উঠতে পারে, স্মরণ ও সন্তোজ হয়ে উঠতে পারে, এ কথা চম্পা বোঝে।

চন্দনের এত দিনে খুব শান্তি বোধ হয়। তৃষ্ণা ছিলো, আকুতি ছিলো, ব্যাকুলতা ছিলো। সেই সব তৃষ্ণা তার শান্ত হলো চম্পার কাছে এসে। চম্পার পরিপূর্ণ সুখে ভরা সুখধানার দিকে চেয়ে চন্দন বুঝতে পারে এত দেশ ঘুরে, এত মাছুষ দেখে, এত জীবন দেখে তবু তার মন ভরেনি কেন। অবাস্তব মন সেই বৃহত্তর জীবনের থেকে সুখ ঘুরিয়ে ছিলো। প্রত্যাখ্যান করে চলেছিলো সব সুখ। তার তৃষ্ণার পানীয় এইখানে মেপে রেখেছেন। এই নিঃসঙ্গ, স্মরণ এক গরীব মেয়ের মধ্যে এক সরোবর টলটলে গভীর ভালোবাসাতে ডুবে না গেলে তার শান্তি নেই। বুঝে তার যেন অবাক লাগে। চন্দন বলে—কি, এখনও বলবে ভুলে ছিলো ?

মাথা নাড়ে চম্পা। আর কখনো সে তা বলে ? মনে মনে বলে আমি কি বেইমান ?

সহসা কোনো কথা মনে ক'রে একটু হাসে চন্দন। গুন-গুন করে বলে—

—লোভে চন্দন চম্পক মালা

কান যে কুণ্ডল নৈন বিশালা

চম্পা হাসে। চোখ ঝল ঝল করে সেই শৈশব স্মৃতিতে। বলে—

—বাজন বাজে বড়াহুবাগা

চলে রামরাঘবকে বরাত, রে।

ছ'জনেই হেসে ফেলে। তাদের প্রিয় ও পরিচিত আকাশ যেন জলহীন ছলছলে মেঘমাথা মমতাময় দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে তাদের দিকে। রামগল্প রং-মাথা সন্ধ্যামণি যেন পরম মেহে লুটিয়ে দেয় তাদের ছ'জনেকে ঘিরে। বড় স্মরণ হয় ছবিখানি। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছ'জনে একজনের লাল আলিয়া আর পীলা ওড়নী ঢাকা পুষ্পিত পলাশ ফুলের গাছের মতো মদির যৌবন, যেন প্রথম নিজেই আবিষ্কার করে সে জন বিস্মিত হলো। বিস্মিত হয়ে চূর্ণ করে বইলো। আর একজনেরও ঈষৎ সহাস মুখে, মুগ্ধ অথচ গভীর দৃষ্টি। গান দিয়ে যদি এই ছবিখানিকে মজুল করা যেতো! তো সে গানের কথা হতো—বড়ে ভাগসে সজন পাগরে। কিন্তু গানের কথা ও স্মরণ এখানে অমুপস্থিত। তবে এই ছবিখানিকে আরো স্মরণ কেমন করে করা যায় ? কি ভেবে, চম্পা ও চন্দনের পরিচিত আকাশখানা, নিজের বুকে এক ঝাঁক হীরামণ উড়িয়ে দেয়। যখন দেখা রাজকন্ডার প্রিয় পাখীর মতো স্মরণ সেই হীরামণগুলি কিচ মিচ ক'রে উড়ে যায়। হীরে-চুপী-পাংরাব মতো কিছুমিকিয়ে সই পাখীর সার মিলিয়ে যায় সাক্ষ্য গগনের রেহময় কোলে। আর সম্পূর্ণ হয় ছবিখানি। [ক্রমশঃ]

জীবন-ছড়া

চণ্ডী সেনগুপ্ত

জীবনটা এক মাধুর্যময় ছড়া
দাঁড়ি কমা সেমিকোলন ভরা
লালটুকটুক ছবি দেখার সুখে
হঠাৎ বন্ধন তুমি আসো বুকে।

জীবন-ছড়ার মাঝে মাঝে বতি
তখন আমার মনের ঘরে তোমার আরতি
তখন আকাশ আঁতুলবে ভিকা ক'রে আলো
আমার দেহে ছড়ায় এসে সকাল জমকালো।

জীবন-ছড়ার হৃদয়ে নূপুর বাজে
ফেলে-আসা সে এক মায়াবী সাঁঝে
সন্ধ্যাবেলায় উদাস পূর্ববীতে
কে ধরা দেয় ফুলের সুরভিতে ?

জীবন-ছড়ার ছই দিকে ছই ঘর
সত্যি শুধু মথিখানের চর।

—অকণেশ ভাবছিলো, সেই বৈদ্য 'বুড্ডেনডন ঠাট্টা'

দিয়ে এলো ইন্দ্রাণীর হাতে, সেদিন শেব-মুহুর্তে যে দুটি-বিনিময় হয়েছিলো ওর সঙ্গে সে দুটি কত সুন্দর, কত অমূল্যগুণ, যে দুটির দাক্ষিণ্য ও উদ্দীপ্ত হ'য়ে ছেলেমানুষের মত দৌড়ে ফিরেছিলো, কিন্তু তারপর আবার কী ঘটলো ইন্দ্রাণীর—এমন নির্দয় বিক্রপতার কী কারণ ঘটলো! কিন্তু, কারণ ঘটেছিলো, ইন্দ্রাণীর 'লেটার' পাওয়ার সংবাদ বহন ক'রে বৈদ্য চিঠি এলো, সেদিন সন্ধ্যায় ঘেরেকে নিয়ে বেরিয়েছিলেন রমেন, দুপুরে অফিসে বসেই খবরটা পেয়েছিলেন উনি, চাপরাঙ্গী বখন রমেনের লোক নিতে দুপুরে এসেছিলো, সেই সময় তার হাতে কলকাতার চিঠিখানা দিয়ে দিয়েছিলেন সর্বাঙ্গী। সে সংবাদে রমেনদের অফিসের বাঙালী অবাতালী প্রত্যেকেই অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করেছেন, অভিনন্দন জানিয়েছেন। কেশবশংকর বাবু ছেলেমানুষের মত হৈ-চৈ ক'রে আনন্দ জ্ঞাপন করেছেন, এবং অফিসের সবাইকে ডেকে ডেকে এ সভাসবাদ জানিয়েছেন। এবং বাড়িতে গিয়েও চা খাওয়ার টেবিলে গল্প করেছেন খুব। এ গল্পে চোখ-মুখ উজ্জল ক'রে যোগ দিয়েছে অকণেশ আর নীলা। শেলিও মনে মনে ইন্দ্রাণীর প্রশংসা না ক'রে পারেনি কিন্তু যেহেতু ও গেলো বছর শুধু ইংরিজীর জুটাই বি-এ পাশটা করতে পারেনি এবং ঐ এককোঁটা ছেলেমানুষ ইন্দ্রাণী ইংরিজীতে ফাট' হ'য়ে একেবারে লেটার পেয়ে বসে আছে, তাই কেমন এক ধরণের পরাজয়ের রাগান্বিত বোধ করছিলো ও, যুগ নামিরে নীরবে চাপা দিয়ে বাড়িছিলো, আর তরুণালা চা টালতে টালতে বড় মেয়ের লজ্জাকর মুখের দিকে এক নজর তাকিয়ে গভীর গলায় শুধু বললেন, বাঃ বেশ ভাল খবর!

সন্ধ্যা ভ্রমণে বেরিয়ে মিসেস তালুকদারের সঙ্গে ম্যালিং করতে করতে মিসেস তরুণালা বিখাসের চোখে পড়লো, মিনার্ভা বুক সপ থেকে বই-এর ভারে একেবারে কুঁজো হ'য়ে বাণের সঙ্গে ইন্দ্রাণী বেরিয়ে এলো।

ভাবলেন, আজ ওর সঙ্গে কথা বলে দু-এক মিনিট অপব্যয় করা চলতে পারে, ভাবলেন, শোনো! ইন্দ্রাণী যুগ তুললো, রমেনও।

মিসেস তরুণালাকে দেখতে গেলে রমেন অসুটে বললেন, ইহুমা, আমার হাতে বই দিয়ে তুমি এগিয়ে যাও, দেখো উনি কেন ডাকছেন।

না বাবা, আমার হাতেই থাক—বই-এর বোঝা হাতে নিয়েই ইন্দ্রাণী তরুণালা বিখাসের সামনে এলো।

তোমার নামটা যেন কী? ইন্দ্রাণী খুব অবাক হ'য়ে তাকালো কিন্তু খুব সংবত গলায় উত্তর দিলো, ইন্দ্রাণী।

পাশে পাঁড়ানো মিসেস তালুকদার প্রশ্ন করলেন, মেয়েটি কে? মেয়েটিকে যেন দেখেছি মনে হচ্ছে—

হ্যাঁ, দেখেছেন বৈ কি, সিমলের রাস্তা আর ক'টা—ওদের অফিসের এ্যাকাউন্টস অফিসার রমেন বাবুর মেয়ে। ওকে বাহবা দিতে হয়, বেশ ভাল কল করেছে এবার ম্যাট্রিকে, ইংরিজীতে নাকি ফাট' হয়েছে—

আচ্ছা! মিসেস তালুকদারের কণ্ঠে স্পষ্ট বিষয়। মিসেস তরুণালা আবার ইন্দ্রাণীর দিকে তাকিয়ে কিছুটা যেন দরদর। ছিটোলেন চোখ দিয়ে, তা বেশ, বেশ, এসো একদিন আমাদের

ই
ন্দ্রা
নী
র
শে
ম

(উপভাস)

[পূর্ণ-প্রকাশিতের পর]

নীলিমা দাশগুপ্ত

বাড়ি, মিষ্টি খাইয়ে দেব, বাবা বুঝি এসব বই পুরস্কার দিলেন তোমাকে? তা বেশ, বেশ, হঠাৎ ব্রেক কবলেন তরুণালা, অনেক দরদ দেখিয়েছেন উনি।

যেতে যেতে অচুত কণ্ঠে মিসেস তালুকদার বললেন, মেয়েটি খুব ইংরিজী পড়ে বোঝা যাচ্ছে, একদিনে একরাজ্যের বই কিনে কেলেছে।

একটু পরিহাসের সুরে উত্তর দিলেন তরুণালা, সব বই কী আর পড়বে মিসেস তালুকদার, যেসব ভাগই শোভাবূদ্ধি করবে আলমারীর। মিসেস তালুকদারের জবাবটা আর শোনা গেলো না।

ইন্দ্রাণী ফিরে এলো বাবার কাছে, গোথুলির অগ্নান আলো কেমন যেন হঠাৎ জান মনে হচ্ছে ওর কাছে। আসার সময় সারাপথ গলে গলে এসেছিলো, বাওয়ার সময় একেবারে চুপ। ওর কানে বাবে বাবে অস্বপ্নিত হচ্ছে দুটি কথা ইংরিজীতে নাকি ফাট' হয়েছে, আর, সব বই কি আর পড়বে মিসেস তালুকদার? সেদিন রাত্রে বিনিদ্রচোখে অনেকক্ষণ কাটিয়েছে ইনা। আর নিজের দুর্বলতার জন্ত নিজের ওপর যত ক্রোধের তাপমাত্রা বৃদ্ধি হচ্ছে, তত অশ্রু আক্রোশের জাল বুনে চলেছে অকণেশের বিরুদ্ধে। তরুণালা হাতের নাগালের বাইরে, কিন্তু অকণেশ তো আছে।

সকালে রাস্তাভাগা রাস্তাচোখ দেখে সর্বাঙ্গী উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন, 'কি যে তোমার যুগের চেহারা এমন কেন? কাল নিশ্চয়ই ঠাণ্ডা লাগিয়ে কেলেছিস? দেখি কাছে আর তো, কপালটা দেখি—

না মা, কিছু হয়নি—ভাড়াভাড়ি মা'র চোখের সামনে থেকে সরে গিয়েছিলো ইন্দ্রাণী, ওর মনে হচ্ছিলো, ওর যুগের কল আক্রোশের আকোলন এখনও শান্ত হয়নি সম্পূর্ণ, কাছে-দেখে, বা যদি টের পেরে যাব।

কাঞ্চালিক ক্রাবের চৌক নম্বর সুইটে সন্ধ্যা কাটিয়ে এলো ইন্দ্রাণী, সকালে সর্বাণী বাড়ি কিরে এসে অরুণেশ্বর আসার কথা বলতেই— ইন্দ্রাণী মনে মনে ঠিক করে ফেললো বিকেলে ও বাড়িতে থাকবে না, মার সঙ্গে হাতে হাতে খাবার দাবার সবই বানালো কিন্তু বিকেল পাঁচটা বাজার আগেই ও চলে গেলো চৌক নম্বর সুইটে। সেখানে ওর সমবরসী এক পাঞ্জাবী মেয়ে আছে, ভীনা কাপুর, মাঝে মাঝে ইনা বার সেখানে। মেয়েটি অস্বাস্থ্য-পাঞ্জাবী মেয়েদের মত খুব একটা উৎকট আলট্রা মডার্ন নয়, সেজ্ঞা ওর সঙ্গ ইন্দ্রাণীর সহনীয়। তাছাড়া ওর উৎসাহ এবং আন্তরিকতায় পাঞ্জাবীদের মানুষী আদব কারদার অ-আ-ক-থ জেনে নিরেছে ইনা, পনেরো নম্বর সুইটে সুরীন্দর স্বরূপ নামে আর একটি পাঞ্জাবী মেয়ে আছে, সে ইন্দ্রাণীর থেকে সামান্য কিছু বড় হবে, প্রায়ই সর্বাণীর কাছে উলের প্যাটার্ন তুলতে আসে, সেই সূত্রে আলাপ। রোজই ইন্দ্রাণীকে একাধিক বার ওদের বাড়িতে আসতে বলে, একদিন সন্ধ্যার পর গিয়েছিলো ইনা সুরীন্দর স্বরূপের বাড়িতে, গল্পে গল্পে রাত হয়ে গিয়েছিলো সেদিন, বখন ফেরার জন্য উঠে দাঁড়ালো ও, তখন সুরীন্দর রাতের খাওয়া খেয়ে খাওয়ার জন্য ওকে হাত ধরে টানাটানি, আরে বহিনজী! খানা তো খানা! রত ও অস্বীকার করে তত হাত ধরে টানাটানি করে সুরীন্দর আর বলে, খানা তো খানা বহিনজী!

শেষকালে ওর বাবা মা পৃথক বখন বললেন, তখন ইনাকে সম্মতি দিতেই হলো। কালো বুলের মত ঝানিকটা সরবে শাক দিয়ে তিনটে তন্মুলের রুটি কোনমতে গিলে তারপর ও বাড়ি ফিরেছিলো, রুটি আদপেই পছন্দ নয় ইনার, ভাতই ভালবাসে ও, তবু অত পেড়াপিড়ি করলে না খেয়ে আর করা বার কী! কিন্তু, তার পরদিন দুপুরে ভীনা কাপুর এসে হাজির, বহিনজী! কাল তুমি এ কেয়া কীয়া, একদম সত্যনাশ কর দিয়া—

ইন্দ্রাণী অবাক হয়ে জিজ্ঞাস করলো, কি-উ? তারপর সমস্ত সুনলো ও ভীনা কাপুরের কাছে—হাত ধরে টানাটানিই করুক আর পা ধরে সাধাসাধিই করুক কখনও খেতে হয় না ওরকম। কাল রাতে ওরা তিন জন আঙণেটি রয়ে গেছে, কারণ ওদের রাতের বরাদ্দ মাফিক রান্না হয়ে গিয়েছিলো, ওরা তারপর আর কিছু পাকাবে না।

আজ সকালে সুরীন্দর নাকি ভীনার কাছে এসে বাঙালীদের এটিকেট সম্বন্ধে কিছু সম্বন্ধ প্রকাশ করেছে। আগে নেমস্তন্ন না করলে হাজার মাথা কুটলেও খেতে হয় না। সমস্ত সুন ইন্দ্রাণী স্তম্ভিত, বললো, আগে নেমস্তন্ন না করলে খাওয়া উচিত নয়, এ নিয়মটা এক পক্ষে ভালই—খুব খারাপ নয়, ওটা মানলাম, কিন্তু তাহলে বাড়িভাড়া সবাই মিলে—খানা তো খানা—বলে অমন হাত ধরে টানাটানির অর্থটা কী?

ভীনা খিল-খিল করে হেসে উত্তর দিয়েছিলো, পাঞ্জাব সে এদী রেওঁরাজ ছায় বহিনজী!

ইনা বাড়ি কিরতেই সর্বাণী ধমকের সুরে বললেন, অরুণেশ্বর এসেছিলো, ডেকে পাঠালাম, তবু এলিনে কেন?

আমি এসে আর কী করতাম—আবছা গলার বলে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলো ইনা। রবেনও যেরের আচরণের প্রতিবাদ করে অহুংসিত করতে বাচ্ছিলেন কিন্তু যেরের কাঠখোটা উত্তরের পর ঠিক।

চূপ করেই রইলেন। সিঁড়ির বাঁক ঘোরার মুখে ইন্দ্রাণীর কানে এলো, সর্বাণী আনন্দের সুরে বলছেন, দেখো, মিসেস বিশ্বাসের আভিজাত্যের উৎকট দৃষ্ট দেখে আমি মনে মনে বরাবর হেসেছি, অর্থক পরমার্থ মনে ক'রে কী হান্তকর গর্ভই না উনি ক'রে বেড়ান, ওঁর আচরণে আমার কষ্ট হয়নি, করুণা হয়েছে। আজ দেখলাম ওঁর সত্যিকার গর্বের জিনিষ আছে বৈ কি, সে হলো ওঁর ছেলে অরুণেশ্বর, এমন সুল্লর স্কুয়ার মনের আর স্কুয়ার চেহারার ছেলে বীর, তাঁর আর কী লাগে পৃথিবীতে? আজ সকালে পথে বখন আমাদের ডেকে বললো, মাসীমা, আমাদের মিষ্টি খাওয়াবেন না? তখন আমার মনে হয়েছিলো এত মিষ্টি গলার মাসীমা ডাক আমি যেন আর কখনও তুনি, তারপর বাড়ি আসতে আসতে এ কথাও ভেবেছিলেম—বার মুখের মাসীমা ডাক অমন, তার মুখের মা ডাক না জানি আরো কত মিষ্টি, এখন আলাপ ক'রে দেখলেন, স্বভাব তার, চেরেও মধুর।

ইন্দ্রাণীর ধৈর্য হতে দেখলো, ও সেই সিঁড়ির বাঁকেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ক্ষিপ্ত পায়ে পরের ধাপে পা বাড়ালো কিন্তু অরুণেশ্বর নাম আবার বাবার গলায় শুনেই ক্রমে আঁটা ছবির মত ঝাড়িয়ে গেলো।

রবেন বললেন, ও মা, তুমি অরুণেশ্বর কথা জানো না বুঝি? ও হয়েছে ঠিক ওর বাবার মত—স্বভাবে, বিজ্ঞায়, ইংরাজীতে ফার্স্ট ক্লাস তো পাবেই, খুব সম্ভব ফার্স্ট ওই হবে। ওর প্রফেসরদের কাছ থেকে সেই রকম আভাসই পেয়েছেন মিঃ বিশ্বাস। আর মাস তিনেকের মধ্যেই বিলেত রওনা দিচ্ছে অরুণেশ্বর, অরুণেশ্বর পড়বে।

: বিলেতে চলে যাচ্ছে অরুণেশ্বর। সাত সপ্তাহ তেরো নদীর ওপারে। সেই ভাল। যোজন যোজন ব্যবধানই ভাল, অরুণেশ্বর সর্বশেষে কঠোর আর কানে আসবে না তাহলে, ও তো কঠোর স্বর নয়, ও শুধু বাহু—সে স্বর ওকেই সম্বোধিত করেনি শুধু এক ডাকে ওর মাকেও মজিয়েছে। কিন্তু, চলেই তো যাচ্ছে অরুণেশ্বর, কত সাগর-উপসাগর পেরিয়ে সেই সূত্রে চলে যাচ্ছে, তার আগে একদিন একটি বার শুধু এক মিনিটের জন্য...

নিচের সিঁড়িতে মা'র পায়ে পড়িচ্চি শব্দ পেতেই উর্দ্ধ্বাসে সিঁড়ি বেয়ে ছুট দিলো ইন্দ্রাণী। একেবারে নিজের শোবার ঘরে এসে ঝপ ক'রে শুয়ে পড়লো। উত্তেজনা কিছুটা কমলে ইন্দ্রাণী ভাবলো, নীলাই বা আজ এলো না কেন? কী হলো নীলার? ভবে কি অরুণেশ্বর—বেসামাল মন নিয়ে আরো একটা রাত অনিদ্রার কাটালো ইন্দ্রাণী।

পরদিন বিকেলে নীলা এসেই একটু কৈকিয়তের সুরে বললো, কাল ভাই সিনেমায় গিয়েছিলেম, তাই আসা হয়নি, তা বলে পড়ার কীকী দিইনি আমি, দু দিনের বাংলা টাঙ্ক একদিনে করে এনেছি। ইন্দ্রাণী নীলার পাশের চেয়ারে বসে টেবিলের ওপর খাতা রেখে পাতা ওটাতে ওটাতে ফট ক'রে প্রথমেই প্রথম ক'রে বললো। তোমার দালা বিলেত যাচ্ছেন?

হ্যাঁ, তুমি জানতে না বুঝি? পাশপোর্ট হয়ে গেছে কবে! যেদিন পাশপোর্ট এসেছে, সেদিন থেকে আমার মন যে কী খারাপ—জানলার বাইরে চোঁধ রাখলো নীলা।

নীলার বাংলা খাতার একেবারে প্রথম পাতার, প্রত্যেক খাতার প্রথম পাতাটা বাদ দিয়ে নীলার লেখা অভ্যাস, অরুণেশ্বর হতাশ

—প্রায় আধ পাড়া কবিতা লেখা। ও লেখা ভুল হবার বো নেই ইন্দ্রাণীর, যেন শিলালিপির মত মুদ্রিত হ'য়ে আছে ওর অন্তরে। নীলার অস্তিত্ব সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে পড়া শুরু করে দিয়েছে ইন্দ্রাণী, পড়া শেষ হলো। এমন ক'রে কেন লিখেছে অরুণেশ, —কিসের নেশায় যেন বালি খোঁড়া—অথচ জল নেই—আর জল নেই বদি, তবে তৃষ্ণার অমুভূতি কেন? এত তৃষ্ণ অরুণেশের, এত তৃষ্ণ। —শেষের লাইনের বীবোচ্চারিত প্রার্থনার উপমাটা আবার ভাবলো মনে মনে—হুটী ক্লান্ত চোখ ভূমি ভোরবেলার জানলার মত আঁতে খুলে ধরো। আমি রাত্রি-দিন পথে—

ইন্দ্রাণীর মুখে এক কৌটা রক্ত নেই। স্থম্পিণ্ডের দ্রুত আঁচরাজ নিষে যেন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে। জানলা থেকে চোখ সবিয়ে নীলা বললো, ইনা, দেখো তো ভাই, আজকের রচনাটার ঠাটি ঠিক হচ্ছে কি না—কথা শেষ হওয়ার আগেই অরুণেশের লেখা কবিতাটা দেখে ফেললে নীলা, ও মা! দাদা আবার আমার খাতায় কী লিখলো? দেখি—দেখি—নীলা খাতাখানা হাতে নিয়ে পড়া শুরু ক'রে দিলো। গড় গড় ক'রে কবিতাটা প'ড়ে নিয়ে বললো, কি জানি, মানে-টানে তো কিছু বুঝলেম না—দাদা মন খারাপ হলেই কবিতা লেখে, কিন্তু আমার খাতায় তো কোনোদিন— কথা থামিয়ে একটু যেন গভীর চিন্তা করতে লাগলো নীলা। নিজের ফ্যাকাশে মুখটা মুখ ঘুরিয়ে নীলার চোখের থেকে আড়াল ক'রে খুব আবছা গলার ইন্দ্রাণী বললো, তাই বুঝি—? নীলা মনে মনে চিন্তা করতে করতেই কিছুটা আশ্বস্ত ভাবে বললো।

কি জানি, দাদার যে হঠাৎ হঠাৎ এত মন খারাপ হয় কেন বুঝিও না আমি, কাল সকালে কত লাকালাকি করতে দেখলাম, আঁখাদের সিনেমা দেখার ভক্ত টাকা দিলো, হাসতে হাসতে গল্প করতে করতে আমাদের এগিয়ে দিলো সিনেমা-হল পর্যন্ত—তারপর কী-ই যে হলো, রাত আটটার বাড়ি ফিরে দেখি, ঘর অন্ধকার করে শুয়ে আছে দাদা। উঠলোও না, খেলোও না, মা বখন ডাকাডাকি লাগালেন, বললো, কোনো বন্ধুর বাড়ি থেকে বেদম খেয়ে এসেছে; কিন্তু সকালও দাদাকে ঘুড়ে দেখিনি, তার মধ্যে কখন যে আবার আমার খাতার পাতায় কবিতা লিখে—মুহূর্ত দুই খেমে নীলা প্রস্থ করলো, ইনা, তুমি দাদার কবিতার মানে বুঝছো?

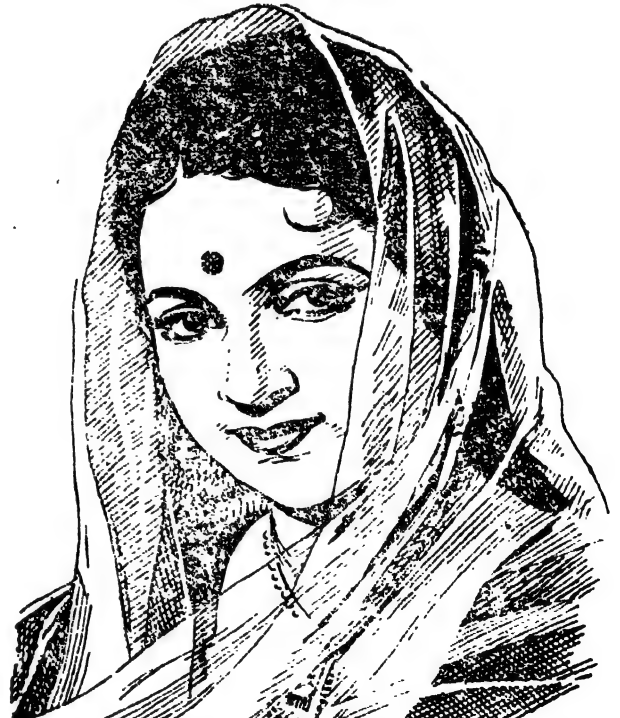
ইন্দ্রাণী বেসামাল মনটাকে প্রাণপণে গোছাবার চেষ্টা করে খুব অফুটে বললো, না তো ভাই—

সে কী, তুমিও বুঝলে না? আমি ভেবেছিলাম—ইনার মুখের দিকে একপলক তাকিয়ে নিয়ে কথা শেষ করলো নীলা,—বোধ হয় বি-এ ক্লাশে না পড়লে এসব কবিতার মানে বোঝা যাবে না?

তাই হবে বোধ হয়—যেন কতদূর থেকে কথা ক'টি বললে ইন্দ্রাণী। ইনার কঠোর বিমিত হয়ে বন্ধুর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো নীলা, ইনা ভাই, তোমার কী শরীর ভাল নেই? ইন্দ্রাণী চমকে উঠলো, ইন্দ্রাণীর চমক দেখে নীলা অবাক হলো আরো। চেষ্টা করে ইনা সচেতন হলো, সকাল থেকে মাথাটা ধরে আছে ভাই, তাই শরীরে তেমন জুত নেই—নীলার অবাক চোখের দিকে তাকিয়ে স্নান একটু হাসলো ইন্দ্রাণী।

অমিত লাভণ্য আপনারই জন্য বোরোলীন

আপনার লাভণ্যময় প্রকাশেই আপনার সৌন্দর্য। কিন্তু রোদ আর শুক হাওয়া প্রতি-দিন আপনার সে মাধুরী হান করে দিচ্ছে। ওষধিগুণযুক্ত সুবিস্তৃত বোরোলীন এই করুণ অবস্থার হাত থেকে আপনাকে রক্ষা করবে। এর সক্রিয় উপাদানগুলি আপনার ত্বকের গভীরে প্রবেশ করে শুকিয়ে যাওয়া স্নেহজাতীয় পদার্থ ফিরিয়ে এনে আপনার ত্বকে মখমলের মত কোমল ও মসৃণ কোরে সজীব ও তারুণ্যের দীপ্তিতে উজ্জ্বল ক'রে তুলবে। আবেশ-লাগা সুরভিযুক্ত বোরোলীন ক্রীম মেখে আপনার ত্বকের সৌন্দর্য রক্ষা করুন আর নিজেকে রূপোজ্জ্বল করে তুলুন।



পরিবেশক : জি, দত্ত এণ্ড কোং, ১৬, বনফিল্ড লেন, কলিকাতা-১

তাহলে আজ আর প'ড়ে দরকার নেই, চল, বাগানে গিয়ে গল্প করি—

হ্যাঁ তাই চল। খাতাটা আজ বরং থাক আমার কাছে, বাস আমি দেখে রাখবো—

ঠিক আছে। ছুই বন্ধু উঠলো।

গল্প মানে, আজ শুধু দাদার গল্পই করে চললো নীলা। যে কোনো কারণেই হোক, দাদার মন কাল থেকে ভাল নেই, তাই ওরও ভাল নেই। আজ সকালে দাদার মন খারাপ নিয়ে অনেক ভেবেছে ও, অত যে ভাল লেখাপড়ার, তার মন খারাপ হয় কিসে? ও তো ভেবে পায় না, ফেল করার কোনো চিন্তা নেই কিছু, তাছাড়া ইচ্ছে মতন পকেটম্যানি পায়—কোনো দিন মাকে খোসামোদ করতে হয় না ওর মত—তবে এত মন খারাপ আর মুখেরা অন্ধকার যে দাদা কোথা থেকে জুটবে নিয়ে আসে! দাদার গল্প করতে করতে নীলা বলে ফেললো, জানো ভাই ইনা, দাদার বোধ হয় বিয়ে হবে শীগগির—

বিয়ে? ইনার ক'র চিরে কথাটা বেন বেরিয়ে এলো।

কেন, তুমি অত আশ্চর্য হ'লে কেন?

না, মানে—এত অল্প বয়সে তো আজকাল কেউ বিয়ে করেন না—ইনা শব্দ ক'রে হাসতে চেষ্টা করলো।

তা অবশ্য ঠিকই বলেছো ভাই, কিন্তু মা দাদার বিয়ে না দিয়ে কিছুতেই দাদাকে বিলেত পাঠাবেন না, বোজই কথা কাটাকাটি চলছে এই নিয়ে বাবার সঙ্গে—

ও! ইন্দ্রাণীর সংকিশ্প্ত উত্তর।

নীলা চোঁট টিপে হেসে বললো। আমার এক খুড়তুতো মামা বছর কয়েক আগে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে বিলেত গিয়েছিলেন, বাওয়ার আগে দিদিমা নাকি মা কালীর পা ছুঁইয়ে প্রীতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলেন যে মেম বিয়ে বেন কিছুতেই না করেন। পাশ করেও বধন মায়া এলেন না, তখন খবর নিয়ে জানা গেলো, মামা ওখানেই একটা কার্বে চাকরী নিয়ে মেম বিয়ে করে বসে আছেন, তাই মায় এত ভয়।

ইন্দ্রাণী নিরন্তর। নীলা আবার বললো। বাবার একদম মত নেই, বলেন, বিয়ে করে গেলে পড়াশুনো ভাল হবে না, তাছাড়া অল্পকোড়ে রেসিডেন্সিয়াল ছাত্রদের অত কিছু ভয় নেই,—নিজের পারে না পাড়ানোর আগে, আজকাল কিছুতেই বিয়ে দেওয়া উচিত নয়। তা বাবার কথায় মা কানও পাতছেন না। অল্পকোড়ের ছাত্রদের দু তিনটে মেম বিয়ের নজির সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দিয়েছেন।

নীলা ধামলে ইন্দ্রাণী বেন ডীকগলার প্রশ্ন করলো। আর তোমার দাদা কী বলেন?

দাদা? খিস বিল করে হেসে উঠলো নীলা—দাদা মায় গলা জড়িয়ে ধরে বলেছিলো সেদিন—মা, কবিরাজী বিস্কুতলের অর্ডার দিয়ে দিয়েছি, এলো বলে, চপ'চাপ করে বসে বেশ করে কয়েক দিন মাখার মাখো দিকিনি, না হলে বদি আবার মধ্যমনারায়ণের দরকার হয়ে পড়ে।

ইন্দ্রাণী হাসলো, নীলা হাসিমুখে বলে চললো—দাদাটা ভাই এমন ডুই, এখান থেকে ওখান থেকে রাজ্যের কনের কটো এসেছে, মায় সামনেই কটো দেখে দেখে এমন মজার সব রিমার্ক

করবে—বুটকী, শূটকী, ডেটকী, লজ্জাবতী, কলাবতী, অহী, হস্তী, একজনকে নাকটা একটু খাড়া বলে, তাকে বললো গণ্ডারবী, একজনকে খাণ্ডারবী, আবার একজনকে বুকের ধাঁটা একটু বড় বলে তাকে বললো হিপ'পো, মা তো দাদার কথা শুনে হেসেই বাঁচেন না, আমরাও। একটি খুব সুন্দরী মেয়ের কটো এসেছে, খুব বাচ্চা-বাচ্চা দেখতে, মা সেটা দাদার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, একে তো তুই আর অপছন্দ করতে পারবিনে, চমৎকার সুন্দর দেখতে!

দাদা ফটোটা নিয়ে বেশ একটু সময় দিয়ে দেখলো, মাভাবলেন, একে নিশ্চয়ই পছন্দ হয়েছে দাদার, দাদা করলো কী, ফটোটাকে চিঠি বিলির মত অক্ষফটোগুলির মধ্যে টেবিলে ছুঁড়ে দিয়ে মায় দিকে তাকিয়ে বললো, মা, নীলুর কাকুবাঁদাম আর টকির শেরাবের আর লোক বাড়িও না বাপু, বুকের আরদেয়ে ভাব দেখে মনে হচ্ছে, ওর এখনও যিম্মক বাটি দিয়ে দুধ খাওয়ার বয়স পেরোয়নি, আবার সবাই মিলে হাসাহাসি, তারপর, যে ফটোখানা হাতে তুললো দাদা তার স্বাছ্য একটু বেশীকম ভাল, সে ফটোটা হাতে নিয়ে মায় গা ঘেঁসে বসে পড়লো দাদা, বললো,—মা, একে আমার ভারি পছন্দ হয়েছে, এঁর সঙ্গেই আমার বিয়ে দিয়ে দাও, ঠাকুরমাকে দেখিনি বলে মনে মনে ভারি একটা হুঃখ ছিলো আমার, এ্যাডিনে সে হুঃখটা ঘূচবে, তোমাকেও বোঁমা বলে ডাকতে শিখিয়ে দেব'খন—শুনে মা ঘর ফাটির হাসতে লাগলেন আর আমরা তো গড়'গড়ি।

ইন্দ্রাণীও উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলো। ইন্দ্রাণীর বুকের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে নীলা মনে মনে কী ভাবলে কে জানে। বলে বললো, সেদিন আমাকে কেপাবার জন্য দাদা তোমার সঙ্গে অমন করে কথা বলছিলো ভাই, না হ'লে দাদা লোক খুব ভাল।

সত্যি? চোখ বড় করে আবার হেসে উঠলো ইন্দ্রাণী।

এক ঘুমের পর শৌওয়া বহল করতে গিয়ে সর্কানীর চোখে পড়লো, মেয়ের ঘরে আলো জ্বলছে, ইনা শুনি? কাল সকালে বই শেষ হবে—মায় কথায় সন্ধ্যা কিরলো ইন্দ্রাণীর: বই। কোথায় বই। ওতো নীলার বাংলা খাতাটার প্রথম পাতা খুলে বসে আছে।

সর্কানীর কণ্ঠস্বরে রমেনের হাকা ঘুম গেলো ভেঙে, ঘুম ঘুম গলার বললেন, ইহু দেখছি বই পড়ার নেশায় তার মা-বাবা সবাইকে ছাড়িয়ে গেলো—ভারপর গলায় একটু উঁচুতে তুলে বললেন, ইহু আর রাত জেগো না মা—শরীর বড় খারাপ হবে। ইনা শুনে পড়বে বলে আলো নিবাত্তে উঠে পাড়ালো, ও বেন আচ্ছন্নের ঘোরে বসেছিলো এককণ, পাড়ানো অবস্থায় খাতার প্রথম পাতার চোখ পড়লো আবার: সর্বনাশ, এ কী ও করে বসেছে! অল্পপেশের লেখার নিচে, গুটি গুটি কী বেন লিখে বসেছে ও। লেখাটা পড়ে চোখ একেবারে স্থির হয়ে গেলো ইন্দ্রাণীর, রাতের নির্জন ঘরেও, হুঃ রাজা হলো, কান গরম হলো, চোখের পাতা কাঁপলো, লজ্জার একটা মস্ত চেঁচ গলা পর্বন্ত লাফিয়ে উঠলো; হাত বাড়িয়ে পাতাটা ছিঁড়তে গিয়ে আবার খেমে গেলো ইন্দ্রাণী—বদি নীলা কিছু ভাবে? পা টিপে টিপে এসে ওর ঘর থেকে ওর মা-বাবার ঘরে বাওয়ার মাঝখানে খোলা দরজাটা নিঃশব্দে ভেঁজিয়ে দিলো। খাতাটা সামনে টেনে নিয়ে খুব সতর্পণে বললো ইনা। নিজের লেখার আর একবার চোখ

দুখ' পাওয়ারের বাল্ব লাগিয়ে, ইলেক্ট্রিক ক্যাটাফ্রিট হিজিবিজি থেকে একটি একটি করে অক্ষর উদ্ধার করছিলো। দেড় ঘণ্টার চেষ্টার দেড় লাইন উদ্ধার হয়েছে—তাতেই ও উত্তপ্ত, ক্যাটাফ্রিট কয়েদ থেকে আর যদি বাকী শব্দগুলো নাও খালাস হয়, তাতে কোনো দুঃখ নেই ওর। কিন্তু, সব লাইন পড়তে পারার পর, ওর মনে হয়েছিলো, শেষের শব্দ ক'টি বাদ পেলে ওর জীবনে যেন মস্ত কীক থেকে যেতো। ছেলের সহজ প্রকৃতি দেখে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছেন তরুণী। ছেলের মুখ কালো দেখলে, ওর সামনে গোটা পৃথিবীটাই কালো হয়ে যায়। মা'র পক্ষপাতিত্বে যেয়ে অনেক কেশায় মাকে। মুখগীর তন্দুরীর যন্ত্রের আর একটা টুকরো ছেলের খালায় তুলে দিতে দিতে তরুণী বললেন, পরও তোর কী হয়েছিলো খোকন? বাইরে থেকে খেয়ে এসে পেট বাখা করছিলো বোধ হয়, না?

মা'র কথা উত্তরে ঘাড় নাড়লো অরুণেশ, তার পর দু'আঙ্গুল দিয়ে আলগোছে মুখগীর ঠ্যাটা নীলার পাত্রে তুলে দিলে উজ্জল গলায় বললো,—নে নীলা, তুই খা বাপু ঠ্যাটা, যে ভাবে টেরিয়ে টেরিয়ে তাকাচ্ছিস আমার পাতের দিকে, আমার আর তজম হবার উপায় নেই। নীলা প্রতিবাদের স্বরে টেচিয়ে উঠলো, 'আমার নামে মিথ্যা অপবাদ দেবে না দাদা, আমি তোমার পাতের দিকে কখন তাকালাম?

পাছে নীলা আবার ওর খালায় পট করে তুলে দেয় সেজন্ত বাঁহাত দিয়ে খালা আড়াল করে অরুণেশ বললো। না রে নীলা, মনের আনন্দে তুই চিবো ঠ্যাটা, আমার পেটে আর একটি কোঁটা জায়গা নেই—শেলি অরুণেশের উঠো দিকে বসেছিলো। কারি বোলটা শেলির দিকে ঠেলে দিয়ে অরুণেশ স্মিতমুখে বললো, শেলি তুই বাকীটুকু শেষ করে ফেল, ভাল করে খেয়ে দেয়ে এই এক মাসের মধ্যে শরীরটাকে একটু সবলা করে নে দিকিন, না হলে পৃথুলা হস্তিনীর পাশে নেহাৎ একেবারে হলে সাপ বনে বাবি যে। পৃথুলা হস্তিনী মানে, গিরিনের মাতা মিসেস তালুকদার, তাঁর মেদবতল চর্বির খাঁজগুলি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

সম্মুখে হেসে 'উঠলেন সকলে। শেলি বাঁহাতে জলের গ্লাস তুলে মা-বাবার চোখ আড়াল করে ভাইকে ভেঁজালো। অভয়শঙ্কর বাবু ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, খোকন, কাল তোমার স্টুডেন্টের ট্রায়াল দিয়ে এসো, আর তোমার ঐশিকাল স্টুটের কোঁটা বোধ হয় একটু জাঁটো হয়েছে, ওটাও সঙ্গে করে নিয়ে যেও অলটার করার জন্ত। আমি আনতিপ্রসাদকে বলে রেখেছি।

না বাবা, ঐশিকালের কোঁট একদম ঠিক আছে, সেদিন কোঁটের নিচে দুটো সোয়েটার পরেছিলাম বলে অমন দেখাছিলো—উত্তর দিলো অরুণেশ, তরুণীলার জন্ত সকলে অপেক্ষা করছিলেন। পেট ভরে গেছে বলে অরুণেশ ফুটসেলাড খায়নি। তরুণীলার ফটসেলাড খাওয়া শুরু করেছিলেন, অরুণেশ বাঁহাতে নিজের কাচের বাটিটা তুলে মা'র বাটির মধ্যে উপড় করে দিলো। চামচটা মুখ থেকে নামিয়ে তরুণীলার, খোকন, কী হচ্ছে—কী হচ্ছে—বলে উঠলেন, তখন অরুণেশের সবটুকু ঢালা হয়ে গেছে। তরুণীলার নির্ধাস কলে স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন—

দেখলে ছেলের কাণ্ডখানা। কিন্তু তরুণীলার অত্যধিক মিষ্টান-প্রীতির খবর সকলেই জানেন, সেজন্ত তরুণীলার কপট অসহায় মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠলো সকলেই, মুখ ধুয়ে অরুণেশ ঘরে এসেই কপাটে খিল দিলো। টেবিল-ল্যাম্প জালিয়ে হেঁড়া পাতা আর লেজ নিয়ে আবার বসলো টেবিলে। আরো ঘণ্টা দুয়েকের চেষ্টার, সব কটা অক্ষর ধরা দিলো ওকে। শুণ্ডখন আবিষ্কার করলেও এর চেয়ে বেশী বোধ হয় আনন্দ হয় না। উদ্ধারলিপিটা হাতে তুলে নিলো অরুণেশ, গুন-গুন করে গেয়ে চললো ওর মন, একবার, দু'বার, এমন করে অনেক বার—

ফিরে ফিরে এসে কাঁকে বাও ডাক দিয়ে

সে কী আমি, সে কী আমি—

যে আমি এখন প্রাণের পসরা নিয়ে

তোমার তীর্থগামী।

অনেক পরে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়লো অরুণেশ। বাইরে তল্লাহায়া জ্যোৎস্না। কাচের জানলা দিয়ে চাঁদের বিচ্ছুরিত রেখাগুলি অরুণেশের স্বপ্নময় কপালে প'ড়ে লুটোপুটি খেলতে লাগলো।

সেদিন প্রহরশেষের আলোয় প্রখ্যাত কামনা দেবীর মন্দিরে ইলেক্ট্রিক সঙ্গে আকস্মিক ভাবে দেখা হ'য়ে গেলো অরুণেশের। অরুণেশের ফটো তোলায় হাত নেহাৎ মন্দ নয়। শেলি-গিরীন প্রসপেক্ট হিলসের এদিকে ওদিকে যুগলে নানান ভঙ্গিমায় ফটো তুলবে বলে অরুণেশকে ওদের সঙ্গে ধরে নিয়ে এসেছে। এসেই প্রসপেক্ট হিলসের মাথার মন্দিরের অভ্যন্তরে চুকেছে ওরা, কামনা দেবীকে প্রণাম জানাতে। অরুণেশ সূর্যের দিকে তেজ দিয়ে একটা ফটো তোলায় ইচ্ছেয় এদিক সেদিক দেখতে দেখতে মন্দিরের পশ্চিম কোণে এসেই—বিজাতীয় পোষাকে সজ্জিতা ইলেক্ট্রিককে প্রথমে চিনতেই পারে 'নি, আজ ভীনা কাপুরের একান্ত আগ্রহে ওর একপ্রস্থ সালামার-কামিজ আর চুন্নী পরে ওর সঙ্গে এখানে বেড়াতে এসেছিলো। ভীনার শাড়ি পরার সখ খুব, দুদিন ইনার শাড়ি পরে বেরিয়েছে, অতএব—ওকেও পরতে হবে। মন্দিরের পশ্চিম চাতালে একটা দোলনা টাঙ্গানো আছে, একটা রেক্ট্যাঙ্গল সেপের পিঁড়ির হুপাশে দুটো দুটো চারটে ফটো ক'রে শব্দ কাছির মত মোটা বক্স দিয়ে বাঁধা। এতক্ষণ ভীনা দোল খেয়েছে—দোল দিয়েছে ইনা, এখন ইলেক্ট্রিক দোল খাচ্ছিলো। ইনা ভয় পাচ্ছিলো ব'লে খুব বেশী জোরের সঙ্গে ভীনা কাপুর এক একটা ঠেলা দিচ্ছিলো আর খিল খিল ক'রে হেসে বলছিলো—

বহিনজী, হাত-মাত্ ছোড়না! পানি পিয়াস পেয়েছে ভীনার, দোলনার প্রচণ্ড একটা ঠেলা দিয়ে প্রায় মন্দিরের চূড়ো পর্যন্ত তুলে ও ছুট লাগলো মন্দির সংলগ্ন কুপের কাছে, ওখানে কুয়ার পাড়ে একজন লোক সর্বদাই বসে থাকে স্বামী-স্বামিনীদের হাতে জল ঢেলে দেওয়ার জন্ত। এ কুপের জলের খ্যাতিও সূর্য প্রসারিত, এ জল ভক্তি ভরে খেলে নাকি সমস্ত রোগ নিরাময় হয়। দোলনার ছরস্তু বেগে ইলেক্ট্রিক অসুট একটা চীৎকার ক'রে নিচের দিকে তাকাতেই অদূরে পোর্টেবল ক্যামেরা কাঁপে অরুণেশকে এদিক পানে আসতে দেখে ফেললো। বিজাতীয় পোষাকের লজ্জায় অসুট আশ্চর্য একটা স্নানি নির্গত হলো ওর কণ্ঠ থেকে আর সঙ্গে সঙ্গে বিভ্রান্তিতে একটা হাত ছেড়ে দিলো ও। শব্দ বক্স ঘুরে গেলো

বাইট করে আর ইন্দ্রাণী সবেগে শব্দ থেকে নেমে আসতে লাগলো। ততক্ষণে অরুণেশ দেখে ফেলেছে ইন্দ্রাণীকে। বল লোকের মত লাক দিয়ে এসে অরুণেশ ইন্দ্রাণীকে একেবারে লুফে নিলো। আর তারপর, যখন ধীরে ধীরে চাঁতালে ইন্দ্রাণীকে দাঁড় করিয়ে দিলো অরুণেশ তার বহু আগেই দাঁড় করতে পারতো ও। নিবিড় আলিঙ্গনে ইন্দ্রাণীকে করেক মুহূর্ত বেঁধে রেখেছিলো অরুণেশ, ইনার ভীকবুকের আওয়াজ অমুভব করছিলো নিজের বুক দিয়ে। আলিঙ্গনমুক্ত ক'রে দাঁড় করালো যখন ইন্দ্রাণীকে তখন মনে হলো রক্ত গোপুলির বেন সবখানি বং চুরি করে নিয়েছে ইনার কপোল, কপাল। ইন্দ্রাণী মুখ নত ক'রে একেবারে আড়ষ্ট হয়ে অদূরে কাকনজজীব্য মত বেন শুক মৌনতার দাঁড়িয়ে রইলো।

ক্লীক। শব্দ শুনেই মুখ তুললো ইন্দ্রাণী, দেখলো ওর এই ভঙ্গিমা অরুণেশের ক্যামেরার ধরা পড়ে গেলো, শুধু ফটোই নয়, ওর এই বিজাতীয় পোষাকের ফটো। অরুণেশের দিকে তাকিয়ে ব্যাকুল গলায় বললো, ছিঃ, ছিঃ, এটা কী করলেন আপনি? তারপর সম্মানে চোখে ষাড় ফিরিয়ে ভীনা কাপুরকে খুঁজতে লাগলো, কিন্তু দেখতে পেলো না ওকে। ভীনা জল খেয়েই ফিরেছিলো, দেবী করেনি। দোলনার কাছে বরাবর আসতেই আলিঙ্গনবদ্ধ অবস্থায় অরুণেশ আর ইন্দ্রাণীকে দেখে ফেললো।

: আবে বাবা! ইনা বহিনজী এত্না পেয়ার করছে। পেয়ারের আদমিকে ভি আজ এখানে আসতে বলেছে ইনা বহিনজী, তা তো বাতায়নি ওর কাছে। বাট করে সামনের বিস্তারিত পাথরের খাঁজে খাড়াগল ফরলে নিজেকে। ইন্দ্রাণী ভীনা কাপুরকে না দেখে এক দিক দিয়ে একটু অস্থির হলো। বটে কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি নিশ্চিন্ত হলো। আবার শব্দ হলো ক্লীক। ওর ষাড় ফেরানো ভঙ্গিমা ধরা পড়লো এবার।

না-না-না—মুখ ব্রিয়ে প্রতিবাদ করতেই ইন্দ্রাণীর চোখে পড়লো ওর দিকে লেপের মুখ রেখে ক্যামেরা এ্যাডজাস্ট করছে অরুণেশ। দু হাত দিয়ে তাড়াহাড়াই মুখ ঢেকে ইন্দ্রাণী বলে উঠলো, না-না-না—সঙ্গে সঙ্গে শব্দ শুনলো ক্লীক। বিমূঢ় ইন্দ্রাণী চোখ থেকে হাত নামিয়ে মুহূর্ত দুই অরুণেশের দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে দ্রুত এগিয়ে এসে হাত চেপে ধরলো, ভিজে ভিজে গলায় বললো, এ কী হচ্ছে। অরুণেশ হাত নামিয়ে ক্যামেরাটা চামড়ার বাপে রেখে দিলো। ঠোটে হুটমীর হাসি চেপে রেখে মুক্ত দৃষ্টিতে ইন্দ্রাণীর দিকে চেয়ে রইলো। অরুণেশের চোখের চাউনি অল্পসরণ ক'রে আবার টকটকে রাঙা হয়ে গেলো ইন্দ্রাণীর মুখ, মেয়েদের শরীর নিয়ে যে কী দারুণ লজ্জা। দোপাটা স্বর্বাং চুরীটাকে দু হাত দিয়ে নিচের দিকে বিস্তার করতে করতে বশুট আবছা গলায় বললো, আমি এবার বাই—সঙ্গে সঙ্গে পেছন করে চলতে শুরু করলো ইন্দ্রাণী।

দাঁড়াও! যেও না—এমন সর্বমুখ্যে কণ্ঠস্বর কেন অরুণেশের, হুটে পালাতে গিয়েও পারলো না ইন্দ্রাণী, ঘুরে স্থির হয়ে দাঁড়ালো। ইনার চূর্ণকুণ্ডল হাওয়ার কাঁপছে—মনও কাঁপছে একটু একটু। অরুণেশ মুখে পলিই হুটমীর হাসি নিয়েই এলো ইন্দ্রাণীর একেবারে সামনে। ব্রীডামরী আরক্তিম ইন্দ্রাণীকে দেখে আরো একটু

ইন্দ্রাণী, কোন ডাকটা লোভনীয় তোমার? ইন্দ্রাণী, ইনা না ইহু?

: সর্বনাশ! কেন ও পাতাটা ছেঁড়েনি তখন! কী হবে! অত কাটাকাটি লেখাও পড়ে ফেলেছে অরুণেশ! হে ভগবান, আমি আমার মুখখানা এখন কোথায় লুকাই? ইন্দ্রাণীর প্রায় কাঁদ কাঁদ অবস্থা। অরুণেশের তবু মায়া হলো না। মনে মনে হেসে আরো অশুট গলায় বললো, অত লজ্জা কেন পাচ্ছে ইন্দ্রাণী, ভয় নেই, শেষের লাইনটা পড়া হয়নি আমার—আত্মসমর্পণের পর মানুষ যখন অমুগ্রহ ভিক্ষে ক'রে, অরুণেশের চোখে ঠিক সেই রকম চোখ রাখলো ইন্দ্রাণী।

আর কত নির্দয় হওয়া যায়, নির্ভর খেলা আর যায় কত? অরুণেশ হাত বাড়িয়ে ধরতে গেলো ইন্দ্রাণীকে। মন্দিরের দক্ষিণ কোণ থেকে শেলির গলা শোনা গেলো, ধোকন! কোথায় শেলি তুই? লাইট চলে গেলে ফটো আর তোলা হবে কখন? তাড়াহাড়াই হাত সরিয়ে ভাবতে লাগলো ধোকন।

: কী কাণ্ড! মনেও তো নেই—ফিল্মগুলি তো সবই ধরচ করে বসে আছি। সামনের ঢালু পাথরটা দোল খেয়ে নেমে গেছে যেখানে, ইন্দ্রাণী উর্দ্ধ্বাসে ছুটে গিয়ে লেখানে আত্মগোপন করলো। অরুণেশ ফিল্ম ফুরোনোর কথা ভুলে গিয়ে ইন্দ্রাণীর বিছাৎগতির দিকে তাকিয়ে হাসলো।

শেলি ও গিরীন মন্দিরের পশ্চিম কোণে এসে পড়েছে, অরুণেশকে ঢালু পাথরটার দিকে অমন স্থির হ'য়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে শেলি সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলো, কী হলো যে তোর? অত ভাকাডাকি ক'রে ফিরছি, তনতে পাসনি?

অরুণেশ মুখ ফিরিয়ে সন্দেহ হাসলো।

লাইট লক্ষ্য করছিলাম, আজ দেবী হয়ে গেছে, এ আলোর আর ফটো উঠবে না।

শেলি ফুর গলায় বললো, সে কী! অত ব্যবস্থা ক'রে তোকে নিয়ে এলাম—একটু টাইমিং দিয়ে ফটো তোলা না ধোকন। বোনের মুখ দেখে ধোকনের কষ্ট হচ্ছিলো, কিন্তু তখন আর উপায় কী! ওদের পোজ নিতে বলে একটা ফটো তোলায় ভাণ করলো অরুণেশ, তারপর আন্তরিকতার সুরে বললো, আজ আর হবে না যে শেলি, তোকে কথা দিচ্ছি সামনের শনিবার আবার নিশ্চয়ই আমি আসব। আজ চল বাড়ি ফেরা থাক—অরুণেশ বড় বড় পায়ে চলতে শুরু করলো। পেছন থেকে গিরীন ডাক দিলো, দাঁড়াও না হে, অত তাড়াহাড়া লাগিয়েছে কেন? একসঙ্গেই ফিরবো আমরা। শেলিও হাঁকলো, এই ধোকন দাঁড়িয়ে যা।

অরুণেশ তখন অনেকটা দূরে চলে গেছে, মুখ ব্রিয়ে গলা চড়িয়ে উত্তর দিলো, তোর আর আমি নিচে আছি। আনন্দের এমন উত্তরজ উত্তেজনায় কি দাঁড়িয়ে থাকা যায়? লাক্ষিরে লাক্ষিরে নামতে লাগলো অরুণেশ। শেলি কিন্তু ভাই-এর বিবেচনায় খুশিই হলো। গিরীনের হাতে হাত ধরা দিয়ে বেসা-বেসি ক'রে খুব ধীরে ধীরে উৎরাই নামতে লাগলো দুজনে। পথ ছেড়ে অরুণেশ দক্ষিণ উপনথ দিয়ে লাক্ষিরে লাক্ষিরে নেমে এলো নিচে।

সাজা বাঁধাটা সর্পিলা বাক খেয়েছে বেখানো, সেখানে টিনের ঢালা দণ্ডা কুহু কুহু মাটির করেকখানা বর, প্রথম কুটারের আভিনায় পাচ্চা বাচ্চা ছোটো টিনে শিত ডাঙুলি খেলছে। ডাঙুলি মেরে মাশপেরডা গাল ফুলিয়ে মুখ দিয়ে শব্দ বার করছে, এক মাতাম্ গ-রোটি, দু মাতাম্ হুং রোটি, তিন মাতাম্ গোস রোটি—। কুতকুতে চোখ, কোলা কোলা গাল আর আখো আখো ভাবায়— মাতামের তর বফগাটা খুব সুব ক'রে টেনে পরের মটা পট করে উচ্চারণ করছে। বাঃ! ভারি সুন্দর তো! অকপেশ পাঁড়িয়ে পাঁড়িয়ে খেলা দেখতে লাগলো।

অভাবনীয় অনেক কিছুই ঘটে যায় এই পৃথিবীতে। জিতেন্দ্রনাথের উঁচুগলার আনন্দ উজ্জল কণ্ঠস্বর শোনা গেলো, মীহুদিদি শীগগির তখন যা—মীনাঙ্কী দৌড়ে এলো, কী দাঃ?

দেখ, তোমার মাষ্টারমশাই লাখোপতি হয়েছে—দাঃ ওর সঙ্গে তামাসা কচ্ছেন না কিছু বলছেন, মীনাঙ্কী প্রথমটা কিছুই বুঝতে পারলো না। কেমন একরকম বোকা-বোকা চোখে কাল-কাল করে দাঃর দিকে তাকিয়ে রইলো ও।

কি যে বিশেষ হলো না কথাটা—জিতেন্দ্রনাথ তাঁর সামনের খোলা খবরের কাগজটা টেবিলের উল্টো দিকে দাঁড়ানো মীনাঙ্কীর দিকে হাত দিয়ে ঠেলে দিলেন। সুপ্রিয়র আবাক ফটোটাই আগে চোখে পড়লো মীনাঙ্কীর। সামনের দিকে বন্ধ খুঁকে বেন কিছু নিরীক্ষণ করছে, অবিকল সেই নিজস্ব ভঙ্গিমায় ফটোখানি উঠেছে, টোটে চাপা হাসি।

কি দিদি, বিশেষ এবার হলো তো? দাঃর কণ্ঠস্বরে মীনা ভাড়াভাড়ি ফটোর থেকে চোখ সরিয়ে ফটোর ওপরের ভেড়িগুলির ওপরে চোখ রাখলো। বড় বড় করে লেখা বাঙালীর সৌভাগ্যলাভ। এবারের ডাবিবা কাঠা প্রাইজ উটনার ত্রি-সুপ্রিয় সোম তিন লক্ষ টাকা লাভ করিয়াছেন। তাঁকে আমাদের অভিনন্দন জানাই। ছোটো ছোটো অঙ্কের আরো লেখা ছিলো কিছু। আর না পড়েই মীনা টেবিল থেকে খবরের কাগজের ওপরের পাতাটা প্রায় ছেঁ। দিয়ে নিয়েই ছুট দিলো যর থেকে। মীনাঙ্কীর উচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বর—
—দিদাই, দিদাই—ডাঃ কানে এলো জিতেন্দ্রনাথের। একটু পরেই শিশিরকণাকে সঙ্গে নিয়ে মীনাঙ্কী কাগজ হাতে ক'রে আবার ঘরে ঢুকলো। খুশি উপচে পড়া গলায় বললো, মাষ্টারমশাইকে একদিন নেমজ্ঞ ক'রে খাওয়াতে হয়, না দাঃ?

জিতেন্দ্রনাথ হো-হো ক'রে হেসে উঠে বললেন, সে কী মীহু, আমরা খাওয়াবো কী? ওই হো এখন সবাইকে খাইয়ে বেড়াবে। সুপ্রিয় এখন লাখোপতি, নাও শুধু এক'লক্ষের নয় তিন লক্ষের—বুঝেছিস দিদি।

শিশিরকণা হাসিমুখে বললেন, হোক লক্ষপতি, আগে ওকে খাওয়াবো। মীহুর পাশের খবর দিয়ে গেলো যেদিন, তখন আমরা বাড়ি ছিলাম না, দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে গিয়েছিলাম, দর্শন ক'রে বাড়ি ফিরলুম বখন—তখন চলে গেল সুপ্রিয়। ওকে বলে দিয়েছি আমি, আর একদিন এসো, তোমার খাওয়া তোলা রইলো।

সঙ্গে সঙ্গে সেদিনের ঘটনা মনে পড়ে পাঁশুটে হয়ে গেলো মীনাঙ্কীর মুখ। ওর মন বললো : আর যদি কোন দিনই সুপ্রিয় না আসে, সত্যি সত্যি যদি চৌকাঠ না ডিক্কার ওদের—। আর যদি—

জিতেন্দ্রনাথ কাগজ পড়তে পড়তে বললেন, চমৎকার সহজ সুন্দর ছেলেটি। ওর প্রশস্ত ললাট দেখেই বুঝেছিলাম, একপাল পাখরে চাপা হ'তেই পারে না। ওর সঙ্গে আলাপ ক'রে ভারি ভাল লেগেছিলো সেদিন, এমন একটা সহজাত দক্ষতা আছে ওর স্বভাবে, পাঁচ মিনিটের আলাপেই ওকে বেন না ভালবেসে পারা যায় না।

মীনাঙ্কীর হঠাৎ কান্না পেয়ে গেলো। চোখের জল লুকোবার জন্য ঘর ছেড়ে চলে গেলো তাড়াতাড়ি। নিজের পড়ার নির্জন ঘরে এসে নীরবে অক্ষুবিসম্মদ করতে লাগলো। আরো অনেক দিন ওর কান্না পেয়েছে—কৈদেছে, কিন্তু সে ছিলো দুঃখের কান্না। খুব বখন অস্থির হয়েছিল মন, ও ওর লুকোনো জায়গা থেকে তখন বার্মাল মলমের টিউবটা বার ক'রে স্থির চোখে চেয়ে থেকেছে সেটার দিকে; পেয়েছে সান্তনা। কিন্তু আজকের কান্না বেন হারানোর শঙ্কা কান্না : লাখোপতি সুপ্রিয়র আর আসবে না ওর কাছে, তার নাগাচ ও আর কোনো দিন পাবে না। সুপ্রিয়র সঙ্গে সেদ্ধ-পোড়া ভাঙ ভাগাভাগি করে খাওয়ার ভাগ্য হলও হ'তে পারতো কিন্তু রাজভোগে অস্বীকার হওয়ার ভাগ্য ওর কোনোদিন হবে না। অদূরে সুবর্ণবালা পারের শব্দ কানে যেতেই, চোখের জল নিশ্চিহ্ন করে মুছে ফেলে তাড়াতাড়ি একটা বই খুলে নিয়ে চোখের সামনে তুলে ধরলো সুবর্ণবালা সুপ্রিয়র লাখোপতি হওয়ার সংবাদ শিলিরকণার কাণে শুনলেন এবং মীনাঙ্কী ওকে জানানোর দরকার মনে করেনি বলে মনে মনে মর্মান্বিত ক্রুদ্ধ হ'লেন মেয়ের ওপর। সশব্দে ঘরে ঢুকলো সুবর্ণবালা। মেয়ের বই ঢাকা মুখের দিকে খরদুটি নিক্ষেপ ক'রে একটু বেন চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, তোমার মাষ্টার তিন লাখ টাক পেয়েছে, সে খবরটা আমাকে দিলে কী ক্ষতিটা হতো শুনি?

মীনাঙ্কী নিশ্চুপ।

আ হলো যা, মুখে কী কলুপ লাগিয়েছিস নাকি? বাপা দিয়ে উঠলেন সুবর্ণবালা। মীনাঙ্কী নিরুত্তর। সুবর্ণবালা মেয়ে ওরকম স্থির ভঙ্গি দেখে তেতরে তেতরে টগবগিয়ে উঠলেন। মেয়ে আড়াল করা মুখের দিকে আবার অস্বীকৃতি হানলেন একটা মনে মনে বললেন—বার জন্ত চুরি করি সেই বলে চোর,—আপা ভাল তো পাগলেও বোঝে,—এ মেয়ের কপালে অনেক দুঃখ আছে দেখছি,—আবার কেটে পড়বার উপক্রম করেই অদ্ভুত উপায়ে নিজেকে ত্রেক করলেন সুবর্ণবালা তারপর আশ্চর্য নয়ম গলায় মেয়ে তথোলেন, তোমার মাষ্টারের ঠিকানা জানিস?

দাঃর নিরাজ্ঞ প্রাণে নির্বাক আর থাকতে পারলো না মীনাঙ্কী কক্ষ গভীর গলায় উত্তর দিলো, জানি না।

সুবর্ণবালা মেয়ের ভাবভঙ্গিতে একেবারে বেন ক্ষেপে গেলো তিন্ত গলায় বললেন, তা জানবে কেন? জানো কে ভাকারী করত।

শব্দ ক'রে হেঁটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো সুবর্ণবালা।

[ক্রমঃ

॥ মাসিক বন্ধুভাষী বাঙলা ভাষায় একমাত্র সর্বাধিক প্রচারিত সাময়িকপত্র

আপনার জন্যে চিত্রতারকার সুত অপূর্ব লাবণ্য

মালা সিনহা সত্যিই অপূর্ব দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট
অধিকারী। কি করে তিনি লাবণ্য এত
মোলায়েম ও সুন্দর রাখেন ?
“বিশুদ্ধ, শুভ্র লাক্স টয়লেট সাবানের
সাহায্যে”, মালা সিনহা আপনাকে
বলবেন। চিত্রতারকার প্রিয় এই মোলায়েম
ও হৃদয় সৌন্দর্য সাবানটির সাহায্যে
আপনারও হৃদের যত্ন নিন। মনে রাখবেন,
জ্ঞানের সময় লাক্স সত্যিই অনিন্দ্যরসকর।

বিশুদ্ধ, শুভ্র

লাক্স টয়লেট সাবান

চিত্রতারকার সৌন্দর্য সাবান



হিন্দুস্তান লিটারেচিউর, কলকাতা প্রস্তুত।

L.T.S. 392-X32 ৪০



পথের কথা বলতে একঘেয়ে লাগে। কিন্তু পথের ওপর দিয়ে বারী চলে তাদের কাছে পথ সব সময়ই নতুন রূপ নিয়ে আসে। এক পা বাড়ালেই চার পাশের চেহারা বদলে যায়। মোড় ফিরলেই দেখা দেয় নতুন জগৎ। অপ্রত্যাশিত বত বিপদ এসে পথের আকর্ষণ আরো বাড়িয়ে দেয়।

এমনি এক বিপদ এলো। এক খাড়া পাহাড়ের চূড়ায় উঠে পথ শেষ হলো। শেষ মানে, সেখান থেকে অন্ততঃ তিরিশ ফুট নিচে নামতে হবে।

তিয়েলিং বললেন, কোমরে দড়ি বেঁধে নামতে হবে। তাছাড়া কোনো উপায় নেই। সঙ্গী শেরপারা সবাই জানে ঐ পদ্ধতি। তারা অভ্যস্ত। শুধু জানে না শাস্ত্র, কিশোর আর লালী।

পাহাড়ের চোরা দৈর্ঘ্যে ভয় হয়। যেন পথিককে ভয় দেখাবার জন্তেই সে একটা হিংস্র সিংহের মত মাথা তুলে খাড়া হয়ে আছে।

শেরপারা কোমরে দড়ি বেঁধে তৈরী হলো। ওপর থেকে এক একজনকে ঝলিয়ে দেওয়া হলো। নীচে নেমে সে দড়ি খুলে ফেললো। এই ভাবে নামলো শাস্ত্র, নামলেন তিয়েলিং। লালী কিছুতেই রাজী নয়। কোমরে দড়ি পরায় তার আপত্তি। কিন্তু উপায় কি? শেষ পর্যন্ত পরতে হলো তাকে।



[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

প্রীতিল চক্রবর্তী

শুভে বলে নামতে নামতে মাঝে মাঝে শুধু পর্বতগাত্রে পাঠকে। সেই অবস্থার চীৎকার করে উঠলো লালী। কিন্তু সে কয়েক মুহূর্তের জন্তে। মাটিতে পা পড়তেই সে স্বাভাবিক হয়ে উঠলো। এবং উল্লাসে সকলকে ছাপিয়ে উঠলো। বাথু জয় করার পরে এমনই হয়, যে আনন্দ ভীতুরা কোন দিনই পায় না।

কিছু দূর বাবার পর তিয়েলিং বললেন, সামনে ঐ যে কালো পাহাড়ের একটা পাঁচিল দেখছো, ঐটা পেরলেই আমরা একটা ছোট উপত্যকার গিয়ে পড়বো, তার পরেই—তিয়েলিং চুপ করলেন।

তার পর কি? ব্যগ্র করে প্রশ্ন করে শাস্ত্র।

তার পর, তোমাদের বহু-আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর সন্ধান মিলবে, বললেন তিয়েলিং।

মনে মনে লাফিয়ে উঠলো শাস্ত্র। সে বললে, তার মানে, আপনি বলছেন সোনালি ঝরণা দেখতে পাবো?

হ্যাঁ, তাই।

হররে, হররে, তিনজনই সমন্বরে চেঁচিয়ে উঠলো।

সারা দিন পথশ্রমের পর সন্ধ্যার আগেই ওরা তাঁবু খাটাতে লেগে গেল। তুবার-ঝড় ঠেকাতে পারে তেমন ভাবেই তাঁবুর দড়ি-দড়ি শক্ত করে বাঁধা হলো।

রাত্রে আহারের পর সবাই বিশ্রাম করছে, লালী আর কিশোর বলে উঠলো, লামাজী, এবার সেই গল্পটা শুরু করুন। তিয়েলিং প্রস্তুতই ছিলেন। শুধু ওদের আগ্রহ আছে কি না দেখছিলেন।

তিয়েলিং বলতে আরম্ভ করেন। গতকাল আমরা চুংপোকে রাজার কাছে বিচারের জন্ত বৃত হয়ে যেতে দেখছি। তাই না?

চুংপোর দিক থেকে বলবার কিছু ছিল না। কেন না, ঘটনাটা সত্যি। জমিদারের লোক এবং গ্রামের দু'একজন চাবী স্বচক্ষে দেখেছে যে একটা সাদা ঘোড়ার চড়ে মিমি যাচ্ছে। তার বরণ মুখ ভয়ে বিবর্ণ, তবুও সেই রহস্যময় ঘোড়া তাকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এই সব সাক্ষ্যের পরে প্রমাণিত হলো যে ঘোড়াটি চুংপোর তৈরী।

শয়তান ছেলোটাকে এখনি কয়েদখানায় পুরে রাখা হোক, রাজা বাজরাই আঙুরাছে ফেটে পড়লেন। তিনি আরও বললেন, তিনজন অধারোহী মিমিকে খুঁজে আনবার জন্তে এখনি বেরিয়ে পড়ক।

চুংপো বন্দী হয়ে রইলো এমন এক জেলখানায় বার দেয়ালগুলো সব চেয়ে মোটা, লোহার দরজাটা সব চেয়ে মজবুত আর পাঁচিলগুলো সবচেয়ে উঁচু। তাছাড়া কয়েদের বন্দী বাবা তারা নাকি সমুদ্রের মত, চোরাবার এবং স্বভাবে। সকলে আন্দাজ করলো এতটুকু ছেলের জন্তে এত কাণ্ড। চুংপোর বাপ-মা কীদতে কীদতে ভাবলো। আহা, বাহা চুংপো ওখানে আর বাঁচবে কতক্ষণ! তারা রাজাকে অনুরোধ করে বললে, দয়া করে এই ব্যবস্থা করুন, যেন সময় মত ওকে খাবারটা দেওয়া হয়। কিন্তু খাবার দেওয়ার তার বার হাতে সে আবার ভীষণ নিষ্ঠুর, আর জল যে দেয় সে কানে গুনতে পায় না। যেটুকু শোনে তা-ও ভুল বোঝে।

অতঃপর বুঝতেই পাচ্ছি, চুংপো কী কাঠেই আছে ঐ জেলের ক্ষুদ্র ঘরে। ভয়েই হয়তো কাঠ হয়ে গেছে যে। উঁহ, ছোট হলো কি হবে, চুংপোর বুকখানা ছিল ইপ্সাতের মত, ভয়ে দৌঁড়াবার মত নয়।

তিন দিন পরে যখন জেলখানার লোক গিয়ে রাজাকে বললে যে চুংপো বেশ সুস্থই আছে, তখন রাজা খুব অবাক।

হয়ে গেলেন। মনে মনে দুঃখও গেলেন একটু, লোকের কষ্ট দেখলে তিনি মজা পেতেন।

দেশের লোক সবাই এটা জানতো। রাজার সেই দিন খুবই মন খারাপ যেতো বেদিন তিনি একজনকেও শাস্তি দিতে পারতেন না। সেই ক্ষণে প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করতে সবচেয়ে হিংস্র মেজাজের লোক পুষতেন তিনি। তারা হাজার রকম শাস্তির ব্যবস্থা করতো গরীব আর নিরীহ প্রজার উপর রাজা বলতেন গরীব সাজা ওদের যেমন সখ, বেত মাথাও আমার তেমনি সখ। এইটাই ভায় বিচার।

বাই হোক, রাজা কার কাছে গুনলো, চুপোর কাছে এক বাহু-তুলি আছে, সে তুলি দিয়ে বা কিছু আঁকবে তাই জীবন্ত হবে।

এই খবর এতো দেরিতে জানাবার অপরাধে মন্ত্রীকে সাত বার ওঠ-বোস করতে হলো। বাই হোক, খবরটা যখন পেলেনই তখন তো তার ব্যবস্থা করতে হবে। বাহু-তুলি যদি সত্যিই হয় তাহলে তা দিয়ে তো রাশি রাশি ধনরত্ন পাওয়া যেতে পারে। রাজার মনের জিভে জল এসে গেল।

অবিলম্বে তিনি চুপোকে বললেন, আমার ধনরত্নের ছবি এঁকে দাও দেখি, আর সেগুলো সত্যি করে দাও।

চুপো বুক ফুলিয়ে বললে, মহারাজ, আমার দ্বারা ওকাজ হবে না।

ঝন্ ঝন্ ঝন্ করে উঠলো রাজার আশে-পাশের তিরিশটা ভলোয়ার।

তবুও রাজা ধৈর্য হারালেন না। তিনি বললেন, আচ্ছা, সোনার একটা সিংহাসন আঁকো তো?

ওটাও হবে না আমার দ্বারা মহারাজ, তেমনি নির্ভীক ভাবে বললে চুপো।

আবার তিরিশটা অসি ঝন্ঝকায় করে উঠলো। রাজা বললেন, সোনার ইট আঁকো, সোনার ভালগাছ আঁকো, সোনার ফটক, সোনার হাতী—সোনার বা খুশি তোমার আঁকো। আমার কথামত কাজ করলে তোমায় আমি ছেড়ে দেবো। আর তা না হলে—

চুপো তবুও অটল। একটুও কাঁপলো না সে। অত্যাচারী ঐ রাজার ওপর তার মন বিবিয়েছিল।

কিন্তু রাজা এবার ধৈর্য হারালেন। রাগে ফুলতে থাকেন তিনি। কোমরবন্ধনী ছিঁড়ে গেল, মুকুট কাঁপতে লাগলো মাথায়। দাঁতে দাঁত পিবে তিনি গর্জন করে ওঠেন, শরভানকে জেলে দাও, হত্যা করো, ওর তুলি কেড়ে নাও। কই, কে আছে?

পারিষদ জম্মার অনেকেই ছিল সেখানে। তারা নেকড়ে বাঘের মত লাফিয়ে পড়লো চুপোর ওপরে। কেড়ে নিল তার হাত থেকে তুলিটা, তারপর ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে গেল। আরো অন্ধকার এক করে দে পুরে ঢাবি দিল।

তুলিটা হাতে নিয়ে রাজা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন। তুলিটা তো মন্দ নয়, ছুঁতরি হবে সোনা আছে এর গায়ে। কই দেখি হে কাগজ আর রং আনো তো?

দিকে দিকে ছুটলো একদো জন লোক। বড় বড় পাকানো কাগজের তাল্লা এসে পড়লো। নানান রং গুলতে বসে গেল অনেকে। সেই রং রাখা হলো একশোটা বাজিতে।

রাজা বললেন, সোনালি রং চাই সবচেয়ে বেশি। আমি যখন আঁকবো, সোনা দিয়ে ছাড়া আর কোনো রং আমি পছন্দ করি না।

একটা বড় গামলা ভর্তি করে রাখা হলো সোনালি রঙে। রাজা তুলি ধরলেন, গোটানো কাগজ টান করে ধরে রইলো সাত জন গোমস্তা। তিনজন জোয়ান পাখা চালাতে লাগলো রাজার মাথার ওপর।

রাজার কপাল ঘেমে উঠলো। গরমে না চিন্তার কে বলবে?

কি আঁকবেন রাজা? এ বিভ্রাট তো তাঁর জানা নেই। মনে মনে আপশোষ করেন আহা, এতদিন যদি শিখতুম একটু এই ছবি আঁকাটা! এখন আর উপায় নেই। রাজসভার সবাই অপেক্ষা করছে। কিছু একটা আঁকতেই হবে। মনে জোর আনেন। আপনার ওপর বিশ্বাস চাই, তিনি না রাজা। কি এমন শক্ত কাজ এটা? সবচেয়ে সহজ হবে যেটা একটা সোনার লাঠি আঁকা, তাই আঁকবো।

তাই আঁকলেন তিনি। কিন্তু সোজা রেখা টানা তো সহজ নয়, তুলি চললো আঁকারীকা হয়ে ঢেঁটেখলানো কাগজের ওপর।

তারপর সেই ছবি জীবন্ত হলো বটে, কিন্তু সোনার লাঠি হলো না, হলো একটা সস্ত্র মোটা কুংসিত সাপ। সেই কুংসিত সাপের গায়ে ছবিতে যেমন রং পড়েছিল ঠিক তেমনি হলো। সোনালি ছোপও কিছু ছিল। কিন্তু তার কৌশ-কৌশলিতে সবাই সন্তুষ্ট। যে জানে কাকে কখন ছোবল দেয়। তখন সবাই মিলে তাকে লাঠি শাবল বস্ত্র দিয়ে পিটতে লাগলো।



রাজা আপশোষ করেন, কেন একটু ছবি আঁকা শিখিনি, হার হার...

তারপর রাজা আঁকলেন একটা আম। আমটা আঁকবার
দোবে আঁকা-বাঁকা তো হলোই, তার কোনো বাহার রইলো না।

বা-ই হোক, কাগজ থেকে সত্যিকার রূপ নিয়ে সেটা বখন কাঁড়ালো,
তখন রাজার মনে পড়লো সোনালি রং দেওয়া হয়নি। তা বেন
হলো কিন্তু সবচেয়ে বা ত্রুটি হয়েছে, তা হচ্ছে আমার গোড়াটা
মজবুত করে আঁকা হয় নি। তারই ফলে টলটল করতে করতে
আমটা কাঁড়াতে পারলো না। শব্দে তার পতন হলো এবং সেই
সঙ্গে সব চেয়ে হিঁস্র জেলখানার সেই বকীটাও মরলো চাপা পড়ে।

মন্ত্রী বললে, রাজা মশাই, কাছের জিনিসের বিপদ অনেক, তার
চেয়ে এমন কিছু আঁকুন বা দূরে থাকে।

তার মানে? রাজার বুঝতে দেবি হয়। মন্ত্রী বললে, এট
যেমন অনেক দূরের পাহাড়, গাছ—

ঠিক বলছে। রাজা উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। পাহাড় তো
হবেই, ওটা আঁকতে খুব পারবো। উঁচু-নিচু টেটে খেলিয়ে দিলেই
হলো, 'আর খোঁচা-খাঁচা পাহাড়ের চূড়া তা তো ভালের
মত সহজ। তারপর সেই পাহাড়ের হিমালয়ের দিকে ছেড়ে
দিলেই হলো। তবে, তার মধ্যে একটা সোনার পাহাড় আঁকবো,
সব চেয়ে বড় হবে সেটা।

এলো মস্ত বড় কাগজ, এলো বাটি-বাটি রং। রাজা বিপুল
উত্তমে ধরলেন বাতু-তুলি। তারপর আঁকা-বাঁকা রেখা টেনে
চললেন হরদম। মন্ত্রী বললে, দু'-চারটে গাছ-গাছড়া দিলে মন্দ
হয় না। তাও আঁকলেন রাজা কালির পোঁচ দিয়ে।

একজন পারিষদ বলে উঠলো, কতকগুলো মানুষ দিলে কেমন
হয়?

মানুষ? রাজার তখন ঝোক চেপে গেছে। তিনি তেমনি
কালির পোঁচড়া দিয়ে এঁকে ফেললেন অনেকগুলো মানুষ। যেগুলো
আনাড়ি হোক বা আঁকা, তাই না হলো মানুষ না হলো। শুধু।
জীবন্ত হবার পর তারা বুরে বেড়াতে লাগলো পাহাড়ের গায়ে গায়ে।
অনেকে বলে, সেইগুলোই নাকি পরে ইয়েতি হয়েছে, যারা শুধু
নয়, মানুষও নয়।

ষাট হোক, সোনার পাহাড়টা আঁকলেন সামনে। সেটাকে
এতো উঁচু করলেন আর এতো নোংরা করলেন যে, জীবন্ত হতে
সেটা সোনার ত হলোই না। শুধু পাথর আর পাথর। তার
কোনো গড়ন নেই, বাহার নেই। তা না থাকলেও ক্রটি ছিল না,
কিন্তু নড়বড়ে পাথর অনেকগুলো এলোমেলো সাজালে বা হয় তাই
হলো। একটু পরেই হতভুত করে পড়লো বিরাট অগোচর।
আর একটু হলেই রাজা চিঁড়ে-চ্যাপ্টা হয়ে মরতেন। তা হলো না,
কিন্তু রাজবাড়ীর আধখানা গেল গুঁড়িয়ে ধুলো হয়ে।

তিয়েলি একটু খামতে লাগী জিগ্যোস করে বললে, চুপো
কি হলো?

রাজপুরীতে আতঁনাদ উঠতে তখন রাজার চৈতন্য হলো।
তিনি বললেন, চের হয়েছে, এ সব আমার দ্বারা হবে না বুঝতে
পাচ্ছি। এখুনি নিয়ে এসো সেই ক্ষুদ্র শরতানটাকে।

চুপোর হাতে তার সর্বনেশে তুলিটা গুঁজে দিয়ে রাজা বললেন,
ভাল চাস তো, এখুনি একটা সোনার ডাগন এঁকে দে। নইলে
তোর খাড়ের মুখ নামিয়ে দেওয়া হবে।

চুপো বড় করে আঁকলো একটা ডাগন। সোনা-রং দি
বেহটা ভরিয়ে দিলে। তারপর সেটা জীবন্ত করতেও তার দেবি
লাগলো না।

বিরাট ডাগন, চকচক করছে তার সোনার মত গা। তার
নিঃশাসে আগুন করতে লাগলো। বললে গেল রাজপুরী। মস্ত
বড় হা দিয়ে এক গ্রাসে সে খেয়ে ফেললো রাজাকে। যে বোঝানে
ছিল উর্ধ্বাসে ছুট দিল। অনেকে গেল ডাগনের পেটে, আর কেউ
কেউ পালিয়ে বাঁচলো।

তারপর? তারপর চুপো তুলিটা জামার ভাঁজের মধ্যে নিয়ে
বেকলো। তার মনে পড়লো মিমির কথা—তাকে খুঁজে বার
করতেই হবে।

রাত আর বেশি নেই। আজ এই পর্যন্ত থাক। এই কথা
বলে তিয়েলি সে রাতের মত চুপ করলেন। পূর্বদিক কসাঁ হচ্ছে
তখন। [ক্রমশঃ।

ঋষি বিশ্বামিত্রের শিক্ষা

ঋগ্বেদ জ্ঞানতা কর

খুব বেশী ক্রমতা থাকলেও অহঙ্কার করা উচিত নয়। বল
ও দর্পের অবশ্য পতন হবে, এই নিয়ে মহাত্ম্যে একটি
মজার গল্প আছে।

তোমরা বিশ্বামিত্র ঋষির নাম শুনেছ? অহঙ্কার ও দর্পের
ফলে তাঁর কেমন পতন হয়েছিল, তাই নিয়ে এই গল্প।

বিশ্বামিত্র চিরকালই ঋষি ছিলেন না। প্রথমে তিনি ছিলেন
কান্ডুভূজ দেশের রাজা। বন, ঐর্ষ্যা, সৈন্যবল কিছুই তাঁর
অভাব ছিল না। রূপ-গুণের তাঁর তুলনা ছিল না। কিন্তু
অনেক গুণ থাকা সত্ত্বেও তাঁর একটি বিশেষ দোষ ছিল।

ক্রমতার অহঙ্কারে মত্ত হয়ে তিনি সব লোককে তুচ্ছ জ্ঞান
করতেন। বিনয়, ধৈর্য্য এসব গুণ তাঁর চরিত্রে একেবারে ছিল
না। তাঁর আদেশ মেনে সব লোক চলবে এই ছিল তাঁর ধারণা।
কেউ যদি তাঁর আদেশ অমান্য করত ত তাকে কঠিন শাস্তি দিতেন।

রাজা বিশ্বামিত্র খুব শিকার করতে ভালবাসতেন। একদিন
তিনি সৈন্য-সামন্ত দলবল নিয়ে ঘোর বনে শিকার করতে গেলেন।

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বন ভোলপাড় করে অসংখ্য বাঘ,
ভালুক হাতি, হরিণ মারতে মারতে রাজা বিশ্বামিত্র ও তাঁর সৈন্য-
সামন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। তখন তাঁরা রাজধানীতে ফিরে বাবার
জোগাড় করতে লাগলেন।

এমন সময় বিশ্বামিত্রের সেনাপতি সত্যে বললেন—মহারাজ,
আমরা রাজধানীতে ফিরে বাবার পথ হারিয়ে ফেলেছি। ঘোর বনে
এসে পড়েছি, এদিকে সন্ধ্যা হয়ে আসছে, এখন কি করব পরামর্শ
দিন।

রাজা বিশ্বামিত্র বললেন—আমরা সবাই খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।
কিদের, তেঁড়ায় অস্থির হয়ে উঠেছি। খুঁজে দেখ, যদি কোন ঋষির
আশ্রম পাও ত সেখানে চল। ঋষিরা সব সময় অতিথি সংকার
করেন। তারপর রাজধানীতে ফেরার পথ খুঁজো।

রাজার কথা শুনে সেনাপতি দলবল নিয়ে বনের মধ্যে খুঁজতে
লাগলেন। কিছুক্ষণ খুঁজতেই বিশিষ্ট ঋষির আশ্রম পেয়ে গেলেন।

তখন রাজা বিশ্বামিত্র সৈন্ত-সামন্ত নিয়ে বশিষ্ঠ ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হলেন। সকালে ঋষির আশ্রমে অতিথিদের সম্মান দেবতার সম্মানের তুল্য ছিল।

বশিষ্ঠ ঋষি এই সব মাননীয় অতিথিদের দেখে ত্রস্তব্যস্ত হয়ে এগিয়ে এসে সাদর সম্ভাষণ জানালেন। তাঁর শিষ্যেরা সবায়ের পা ধোবার জল, বসবার আসন এনে দিলেন।

রাজা বিশ্বামিত্র পথ হারিয়ে ফেলেছেন শুনে, বশিষ্ঠ ঋষি বললেন—মহারাজ, রাত গভীর হয়েছে। এখন এই বনের মধ্য থেকে পথ খুঁজে বার করা কঠিন। আজ রাতের মত আমাদের আশ্রমে থেকে যান। কাল সকালে আমরা শিষ্যেরা রাজধানীর পথ চিনিয়ে দেবে।

বিশ্বামিত্র ভাবলেন—এই ঋষির আশ্রমে যে খাবার খাব আর যে বিছানার শোব তাতে আমাদের খুবই কষ্ট হবে। রাজকীয় ঐর্ষ্যে আমরা অভ্যস্ত, সে সব আর এই গরীব ঋষি কোথায় পাবে!

কিন্তু কি আর করা যায়? উপায় বখন নেই তখন রাজী হতেই হবে। এই ভেবে বিশ্বামিত্র বললেন—তাই হবে বশিষ্ঠ ঋষি। আপনার আতিথা স্বীকার করলাম। আজ রাত এখানেই কাটাব। বশিষ্ঠ ঋষি বিশ্বামিত্রের মুখের ভাব দেখে মনের কথা ঠিক বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি বললেন—মহারাজ, আপনি কিছু ভাববেন না। আপনারদের সেবার কোন কষ্ট হবে না।

এখন বশিষ্ঠ ঋষি পাতার কুঁড়ে ঘরে থেকে কয়েকটি শিষ্য নিয়ে পূজা-অর্চনা করে আর ছাত্রদের পড়িয়ে অতি সাধারণ ভাবে দিন কাটাতেন বটে কিন্তু তাঁর আশ্রমে একটি মহা মূল্যবান জিনিস ছিল। এই জিনিসটি হল একটি স্বর্ণের গরু, তুষারের মত সাদা তার গায়ের রং, কুচকুচে কালো দুটি ডাগর চোখ, কোমল তার দেহের গড়ন। বশিষ্ঠ ঋষি এই কামধেনুকে দেবতা ব্রহ্মার কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিলেন। একে তিনি নিজের ময়ের মত স্নেহ করতেন। আদর করে নাম দিয়েছিলেন নন্দিনী। নন্দিনীর একটি বিশেষ গুণ এই ছিল যে, বশিষ্ঠ ঋষি তার কাছে যখন যা চাইতেন তখন তাই পেতেন। স্বর্ণে, মন্ডো, পাতালে এমন কোন জিনিস ছিল না, যা নন্দিনী দিতে পারত না। বশিষ্ঠ ঋষি বিশ্বামিত্রকে অভ্যর্থনা করে এসে নন্দিনীকে ডাকলেন। নন্দিনী ছুটে ছুটে কাছে এল। বশিষ্ঠ তার গায়ে হাত বুলিয়ে বললেন—নন্দিনী, মহারাজ বিশ্বামিত্র তাঁর দলবল নিয়ে আমার অতিথি হয়েছেন। তুমি তাঁদের সেবার আয়োজন এখনি করে দাও।

নন্দিনী ঠিক মাথুরের ভাবার কথা বলতে পারত। নন্দিনী বলল—বাবা, কিছু ভাববেন না। আমি এখনি সব ঠিক করে দিচ্ছি। এই বলে সে তিন বার হাথারধ করে চিংকার করে উঠল। অমনি এক অদ্ভুত ব্যাপার হল। প্রথম হাথারবের সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ থেকে রাজা মহারাজার খাবার উপযুক্ত হাজার হাজার সোনার পাত্রে ভরা রাজভোগ, মিষ্টান্ন, ফল বার হয়ে এল।

দ্বিতীয় হাথারবের সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ থেকে রাজা মহারাজার শোবার উপযুক্ত হাজার হাজার দামী মখমলের বিছানা বার হয়ে এল। তৃতীয় হাথারবের সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ থেকে হাজার হাজার দাস-দাসী রাজা বিশ্বামিত্র ও তাঁর দলবলের সেবা করবার জন্ত বেরিয়ে এল।

তখন বশিষ্ঠ ঋষি রাজা বিশ্বামিত্রকে ও তাঁর সৈন্ত-সামন্তদের সেই সব রাজভোগ খাবার জন্ত ও কার্যপা মখমলের বিছানার গুণে ক্রান্তি দূর করবার জন্ত অমুরোধ করলেন।

এই ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার দেখে বিশ্বামিত্র অবাক হয়ে গেলেন।

শ্রান্ত-ক্লান্ত দাঁরা পরম আনন্দে সেই রাজভোগ খেলেন। সেই ফুলের মত নরম বিছানার গুণে অগাধ ঘুমিয়ে শ্রান্তি-ক্লান্তি দূর করলেন।

পরদিন ভোর হল। রাজা বিশ্বামিত্র ঘুম ভেঙে উঠেই সৈন্ত-সামন্ত নিয়ে সাজ-পোষাক পরে আশ্রম ছেড়ে রাজধানীর দিকে চললেন। বশিষ্ঠের শিষ্যেরা পথ দেখিয়ে দেবার জন্ত সঙ্গে চললেন।

বাংর সময় বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ ঋষিকে বললেন—হে ঋষি, কাল আপনি যে ভাবে অতিথি সংকার করেছেন, যে অমৃতের মত খাবার খাইয়েছেন, যে সুন্দর নরম বিছানায় ভুইয়েছেন, তার জন্ত কি বলে যে ধন্যবাদ দেব জানি না। এখন বাংর সময় আমার একটি অমুরোধ আপনাকে রাখতেই হবে। আপনার ওই কামধেনু নন্দিনীকে আমাকে দান করুন। কাল রাতে ওর অদ্ভুত সব ক্ষমতা দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে গেছি। ওর বহলে আপনি বত টাকা চান দেব, আমার অর্ধেক রাজত্ব পর্যন্ত দিতে রাজী আছি।

বিশ্বামিত্রের অমুরোধ শুনে বশিষ্ঠ ঋষি বললেন—মহারাজ, অতিথি দেবতার মত সম্মানের পাত্র। অতিথি বা চান তাঁকে তাই দেওয়া উচিত, কিন্তু তবুও আপনার এই অমুরোধ রাখতে পারলাম না। তার কারণ আপনাকে বলছি শুনুন। কামধেনু নন্দিনীকে আমি দেবতা ব্রহ্মার কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছি। প্রায়ই আমার আশ্রমে রাজা-মহারাজ এসে অতিথি হন। তাঁদের সেবা করবার জন্ত যে রাজভোগ আর যে সব বিলাসজ্ঞপ্য দরকার হয়, সে সব আমি নন্দিনীর কাছ থেকে পাই। তাছাড়া আমাকে প্রায়ই বড় বড় বজ্র করতে হয়, তাতে দেবতা, ঋষি, রাজা, মহারাজা ও সাধারণ লোক সবাইকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতে হয়। সে সব জিনিস নন্দিনী আমাকে দেয়। নন্দিনীকে দান করলে আমার অতিথি সংকার করা ও বজ্র করা দুই-ই বন্ধ হয়ে যাবে।

সুতরাং কেন আপনার অমুরোধ আমি রাখতে পারলাম না, সে কথা আপনি বুঝবেন এবং আমার ক্ষমা করবেন। আর ধার্মিক ঋষিরা কখনও টাকার লোভে ভোগে না, একথা আপনি জানেন। সুতরাং আপনার অর্ধেক রাজত্বের লোভে আমি নন্দিনীকে দেব না, তা বুঝতেই পারছেন।

এই বলে বশিষ্ঠ ঋষি চুপ করলেন। বশিষ্ঠ ঋষির কথা শুনে রাজা বিশ্বামিত্র রাগে জলে উঠলেন। বেশ-বিশেষের রাজারা পর্যন্ত তাঁর আদেশ অমান্য করতে সাহস পায় না। আর সামান্য একজন গরীব ঋষি কি না তাঁকে অগ্রাহ্য করছে!

বিশ্বামিত্র কঠোর সুরে বললেন—ওই কামধেনু নন্দিনীকে দিতেই হবে। আমি শেষ বার অমুরোধ করছি। যদি ভাল বোঝেন ত দিয়ে দিন। নরত আমার সৈন্তেরা জোর করে এখনি ওকে ধরে নিয়ে যাবে। আপনি কি আর আমার সঙ্গে ক্ষমতার পারবেন?

বশিষ্ঠ ঋষি বললেন—আমি গরীব ঋষি, আমার কি আর .

ক্ষমতা। তবে স্বৈছার নন্দিনীকে আমি দেব না। ইচ্ছা হয় ত জোর করে কেড়ে নিতে পারেন।

এই কথা শুনে বিশ্বামিত্র আরও রেগে উঠলেন। এত বড় স্পর্ধা গরীব খবির যে, সে তাঁর সৈন্তবল অস্ত্রবলকে ভয় পায় না।

চীৎকার করে বললেন—সেনাপতি, সৈন্তদের বল নন্দিনীকে মারতে মারতে টেনে নিয়ে যাক। ওর বাছুরকেও মারতে মারতে ধরে নিয়ে যাক।

রাজার আদেশ শুনে সেনাপতি সেনাদের হুকুম দিলেন। সেনারা ছুটে এসে নন্দিনীকে শক্ত দড়ি দিয়ে বেঁধে লাঠি দিয়ে মারতে মারতে টানতে লাগল। লাঠির আঘাতে নন্দিনীর ত্ববারের মত সাদা শরীর থেকে রক্ত ঝরে পড়তে লাগল। কিন্তু ভবুও সে এক পা-ও নড়ল না।

কাতর স্বরে কঁদতে কঁদতে নন্দিনী বশিষ্ঠকে বলল—বিশ্বামিত্রের সৈন্তেরা এ ভাবে আমার মারছে, টেনে নিয়ে যাচ্ছে, অথচ আপনি এদের কিছুই বলছেন না। তবে কি আপনি আমাকে স্নেহ করেন না? আমি কি আপনার মেয়ে নই?

এত দিন ধরে মানুষ করেও আপনার কি আমার উপর কোন স্নেহ নাই? আমি বিশ্বামিত্রের সঙ্গে চলে বাই, এই কি আপনি চান?

বশিষ্ঠ খসি নন্দিনীর অভিমান ভরা কথা শুনে বললেন—মা নন্দিনি, তোমাকে আমি নিজের মেয়ের মত স্নেহ করি, সে কথা তুমি ভাল ভাবেই জান। আমি তোমাকে আশ্রয় থেকে যেতে দিতে চাই না। কিন্তু রাজা বিশ্বামিত্র সৈন্ত দিয়ে জোর করে তোমাকে নিয়ে যাচ্ছেন।

আমি গরীব খবি, অস্ত্রবল, সৈন্তবল নেই। কেমন করে তোমার রক্ষণ, তাদের বাণ দেব? তাছাড়া খবিরের ধর্মই হল ধৈর্য আর ক্ষমা। তেজ দেহালে তাদের অধম হয়।

বশিষ্ঠ খবির কথা শুনে নন্দিনী বলল—বাবা, আপনি তাহলে আমাকে যেতে দিতে চান না। বুঝলাম আপনি আমাকে স্নেহ করেন। এখন চেয়ে দেখুন কার সাধ্য আপনার নন্দিনীকে কেড়ে নেয়।

বশিষ্ঠ খবি বললেন—নন্দিনি, ঐ দেখ তোমার বাছুরকে বিশ্বামিত্রের সৈন্তেরা দড়ি বেঁধে টানছে লাঠি দিয়ে মারছে। সে তোমার মুখের দিকে চেয়ে কঁদছে। পায় ত ওদের অত্যাচার ধামাও। ওরা তোমার উপরেও যে রকম অত্যাচার করছে, যে ভাবে তোমাকে মারছে এ-ও দেখতে আমার কত কষ্ট হচ্ছে বুঝছ?

বশিষ্ঠের কথা শেষ হতে না হতে এক অদ্ভুত ব্যাপার আরম্ভ হল, নন্দিনীর শরীর বাড়তে বাড়তে বিরাট পাখীদের মত হল, আর সেই শরীর থেকে প্রচণ্ড আগুনের হকা বেরোতে লাগল। তার দুই চোখ প্রকাণ্ড বড় হয়ে দুটো আগুনের গোলার মত হল। সেই চোখ থেকে ও বলকে বলকে আগুন বেরোতে লাগল।

তারপর নন্দিনী ভীষণ শব্দে ডেকে উঠল। বাঘের ডাক সে ডাকের কাছে হার মেনে যায়। সেই ডাকের সঙ্গে সঙ্গে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজে লক্ষ লক্ষ তেজস্বী সেনা নন্দিনীর মুখ থেকে বেরিয়ে এল। তারা বাইবে এসেই বিশ্বামিত্রের সেনাদের ঘিরে ফেলে প্রচণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ করল।

এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখে বিশ্বামিত্রের সেনারা ভয়ে হতবুদ্ধি হয়ে গেল। তবুও একটু পরে প্রকৃতিস্থ হয়ে নিজেদের প্রাণ বাঁচাবার জন্য মরীয়া হয়ে যুদ্ধ করতে লাগল।

কিন্তু কি সাংঘাতিক বিক্রম নন্দিনীর সেনাদের! খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তারা বিশ্বামিত্রের সব সেনাদের হারিয়ে দিল। এমন ভীষণ ভাবে বিশ্বামিত্রের সেনারা মার খেল যে তারা নন্দিনীকে আর তার বাছুরকে ফেলে রেখে প্রাণের ভয়ে উর্দ্ধ্বাসে ছুটে পালাতে আরম্ভ করল। রাজা বিশ্বামিত্রও ছুটে পালাতে লাগলেন। পিছনে পিছনে নন্দিনীর সেনারা তাড়া করে চলল। খানিকটা ছোটবার পর বিশ্বামিত্র ও তাঁর সেনারা সবয়ে চেয়ে দেখল যে, নন্দিনীর সেনারা তাঁদের সবাইকে ঘিরে ফেলেছে আর পালাবার উপায় নেই। এখন বুঝি প্রাণে মেরে ফেলে। বিপদে পড়ে রাজা বিশ্বামিত্র বুঝলেন রাজা হয়ে অহঙ্কার করার ফল, বল ও দর্প দেখানোর ফল কি রকম বিষময় হতে পারে। যে বশিষ্ঠ খবি আশ্রয় দিয়ে অতিথি সংকার করলেন, ক্ষমতার অহঙ্কারে মত্ত হয়ে তাঁর শত্রুতা করার ফল কেমন সাংঘাতিক হল।

কিন্তু এখন আর ভেবে কি ফল। নন্দিনীর সেনারা তাঁদের সবাইকে বন্দী করেছে। প্রাণে মারবার জন্য তীব্র-যত্নে উঁচু করে ধরেছে। আর এক মুহূর্তেই তাঁরা সবাই মারা যাবেন।

প্রাণের ভয়ে রাজা বিশ্বামিত্র আর তাঁর সেনারা ধর ধর করে কাঁপতে লাগলেন আর কঁদতে লাগলেন।

রাজা বিশ্বামিত্রকে প্রাণ ভয়ে কঁদতে দেখে দয়ালু খবি বশিষ্ঠ বললেন—মা নন্দিনি, তোমার সেনাদের বারণ করে দাও, তারা যেন এঁদের প্রাণে না মারে। আমি খবি, ক্ষমতা আমার ধর্ম।

নন্দিনী সেনাদের বলল—সৈন্তেরা এই রাজাকে আর তাঁর সেনাদের প্রাণে মেরো না। কিন্তু প্রাণে না মেরেও এমন ভাবে মার যাতে এঁদের শিক্ষা হয় যে খবির আশ্রমে এসে অহঙ্কার ও দর্প দেখান চলে না।

নন্দিনীর কথা শুনে সৈন্তেরা ভীষণ ভাবে বিশ্বামিত্র ও তাঁর শিষ্যদের মারতে লাগল। এখন বিশ্বামিত্র ও সৈন্তেরা কঁদতে কঁদতে বশিষ্ঠের কাছে ক্ষমা চাইলেন, প্রাণ-ভিক্ষা চাইলেন।

দয়ালু খবি বললেন—নন্দিনী তোমার সৈন্তদের চলে যেতে বল।

নন্দিনী তখন আগের মত আবার ভীষণ শব্দে ডেকে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে সব সৈন্ত তার মুখের মধ্যে ঢুক মিলিয়ে গেল। নন্দিনীর প্রকাণ্ড আগুন-জ্বালা শরীরও শান্ত হয়ে গেল। সে আগের মত স্থল্লর স্বর্গের গুরু রূপ ধরল।

বশিষ্ঠ খবি বিশ্বামিত্রকে বললেন—মহরাজ, আপনি সৈন্তদের নিয়ে রাজ্যে ফিরে যান। আমার থেকে আপনার কোন অনিষ্ট হবে না। আপনি শরণাগত, তা ছাড়া অতিথি। শুধু অহঙ্কারে মত্ত হয়ে বল ও দর্প দেখাতে চেয়েছিলেন বলেই এই কষ্ট সইতে হল।

আমি আপনাকে একটিমাত্র উপদেশ দিচ্ছি। বতই বড় রাজা হোন, অহঙ্কার, বল ও দর্পের বশ হবেন না। অহঙ্কারীরা যে পশু হন, তা ত দেখতেই পেলেন।

বশিষ্ঠের কথা শুনে লজ্জার অশ্রুশেখনায় বিশ্বামিত্রের মন ভরে উঠল। বশিষ্ঠ খবিকে প্রণাম করে তিনি বললেন—খবি, আজ থেকে আমি রাজা ত্যাগ করলাম। বনে গিয়ে হাজার বছর তপস্বী

করে খবি হব। আপনার কাছে এসে বুললাম, খবির কুমতার কাছে রাজার সৈন্তবল, ধনবল, তেজ, গর্ব, কত মিথ্যা।

তার পর বিশ্বামিত্র সেনাপতিকে বললেন—সেনাপতি, সৈন্তদেব নিয়ে দেশে চলে যাও। প্রজাদের বল, রাজা বিশ্বামিত্র রাজ্য ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়েছেন। এই বলে বিশ্বামিত্র রাজবেশ ছেড়ে সন্ন্যাসীর পোষাক পরলেন। এমনি ভাবে এক দিন বশিষ্ঠ খবির আশ্রমে রাজা বিশ্বামিত্রের অহঙ্কার ও গর্বের পতন হয়, আর তিনি রাজ্য ছেড়ে খবি হন।

ফাউ

ত্রিবিদ্য চক্রবর্তী

শ্রীরামচন্দ্র বলছেন : বোকা হবি কেন, বাজারে গিয়ে ত্রিবিদ্যটা কখন ফাউটা শুধু চেয়ে নিয়ে আসবি।

পৃথিবীতে এই ফাউ পাওয়া যায় অনেক কিছুই। ফাউ কথা বলারও স্বভাব আছে অনেকের। কাজেই ফাউ নিয়ে এক কলম লিখলে নিশ্চয়ই আপনার কাঁপরে ফেলবেন না আমাকে। তবে ফাউ নিয়ে লেখাটা ফেলনা নয়।

শোনা যায়, এক পয়সা সের হিসেবে চার সের বেগুন কিনে এক ডজলেক এক সের বেগুন ফাউ পেয়েছিলেন। তাই শুধু ফাউ নিয়েই ফিরতে চেয়েছিলেন। তার সে ইচ্ছে সফল হয়েছিল কি না সেটা আমার জানা নেই। তবে এ থেকে মালুম করুন, ফাউয়ের জ্ঞান মানুষের ফালতু দরদ কত! বাড়তির জ্ঞান বাড়াবাড়ি কেমনতর!

কবিগুরু সাহিত্যে অমর কাবুলিওয়ালাদের চড়া হুদে টাকা খাটানোতে জুড়ি কম। স্বীকার করতে লজ্জা নেই, তাদের আসল চাইতে কুদী বা হুদের তাগাদা কত অল্পমধর। পাঁচনা ছেড়ে ফাউয়ের জ্ঞান তাদের কাঁপরে দালালির তুলনা মেলা ভার!

হরেক একম ফাউয়ের কথা আমরা অনেকই জানি। নতুন জামাইদের কাছে ফাউ হল শালিকার ঝাঁক। ঠাকুদী, দিদিমাদের কাছে আদরের ফাউস্বরূপ নান্দি-নান্দি। বরের মায়ের কাছে ফাউ যৌতুক। আগে যেমন রাজপুত্রেরা রাজকন্যাদের পাণিগ্রহণ করে ফাউ পেতেন অর্ধেক রাজত্ব। বর্তমান কালে হোমরা-চোমরা সয়কারী ফাউ পান পদ্মভূষণ, পদ্মশ্রী। পুলিশ, মিলিটারীর অশোকচক্র এবং সাহিত্যরথীরা আকাদেমী অওয়ার্ড বা নিদেনপক্ষে একবার রবীন্দ্র-পুরস্কার।

কিছুকাল আগেও হুববরের যোগ্যতার পরিমাপ ছিল শুধু চাকুরীর মাইনেয় নয়, তার উপরির বহরেও বটে। প্রাচীনরা তাই বাবাজীদের কুঠাধীন কঠে জিগ্যেস করতেন : বাবাজীর চাকুরীতে উপরি আছে ত? রেল, আদালত এবং পুলিশ বিভাগের চাকুরীদের তাই দাম ছিল বহু, মান বহুতর। আজ অবশ্য তেমন ভাবে কারও উপরির খবর নেওয়া শিষ্টাচার হয় না। তবে এ কথা ঠিক, পরোক্ষভাবে ফাউ কিছু শেলে আমাদের অনেকেরই গোসা কাটে এবং অপর পক্ষের হয় কাম কুতে।

ফাউ বা বাড়তি পাওয়ার জ্ঞান আমাদের উৎসাহের নেই জ্ঞান, আকাঙ্ক্ষার নেই অবধি। তাই প্রতি বছরের নুহতে নুহুত কালগুণের জ্ঞান কাজাকাড়ি কম নয়। চাকুরীর সমাপ্তিতে ফাউ

পেন্সন দীর্ঘায়ু বৃদ্ধদের কাছে নয় কম উপভোগ্য। যেমন রেলওয়ের চাকুরিীদের কাছে ফ্রি রেলপাস বা বেসরকারী কল-কারখানার বাৎসরিক বোনাস কর্মীদের কাছে নয় কম আকর্ষণীয়। তাই আমাদের মনে ফাউয়ের প্রতি মমত্ব অসীম, মায়ার অনন্ত। ফাউ পেতে তাই আমরা কঁাক খুঁজি। অতিরিক্তের জ্ঞান হই অতি আয়াসী।

অধুনা বিজ্ঞাপন হিসেবে কখনও কখনও ফাউ জিনিস পান কেতারা। সাবান বা গন্ধতেল দু'এক বোতল কিনলে কখনও মেলে নয়নাভিগম সাবানদানী বা মনোলোভা চিকুণ। 'এরোপ্পেনে' চাপলে বাত্মীয়া পান ব্রেকফাস্ট, ডিনার এবং রঙ্গীন এয়ার ব্যাগ। বাত্মীর জুতোর দোকানে পুজোর সময় শিশুরা পায় বেলুন বা চকলেট। পাঞ্জিতে এবং দৈনিক পত্রে উপহারস্বরূপ পাওয়া যায় এমন বিজ্ঞাপন বিরল নয়। দৈনিক খবরের কাগজে মাঝে মাঝে তাই থাকে হরেক সাপ্লিমেন্ট। মাসিক পত্রিকার যাদুসিক এবং বার্ষিক গ্রাহকেরা কখনও তাই পান ফ্রি ডাকমাণ্ডল। এতে ব্যবসায় চলন বাড়ি, বিজ্ঞাপিত সামগ্রীর আকর্ষণ হয় দুনিবার।

ফাউ পেতে এবং দিতে মজা অনেক। তবে ফাউ কথারও আনন্দ কম নয়। আসর ক্ষমানর জ্ঞান কথার মালা গাঁথতে হলে অনেক অনেক ফাউ কথা চাই। তবে ফাউ কথা এবং বাজে কথার ফারাক অনেক। ফাউ কথা সময়-বিশেষে বিরক্তি আনে কিন্তু বাজে কথা বক্তার প্রতি শ্রদ্ধা কমায়। ফাউ কথা তাই কখনও ভাল লাগতে পারে কিন্তু বাজে কথা কখনও নয়। সুরসিক লোকের ফাউ কথাও তাই পারে ফুল ফোটাতে। পারে বা হৃদয় ভরাতে।

অনেক আগে রাজা, মহারাজা, বাদশা, শাহজাদা ফাউ কথা শুনবার জ্ঞান করতেন গুণী ব্যক্তির নিয়োগ। তাদের আদর করে তাঁরা বলতেন বয়সা বা সভাসদ এবং চলতি কথার তাঁরা ছিলেন ভাঁড়। মজার মজার ফাউ কথা বলে তাঁরা তাঁদের মনোরঞ্জন করতেন। দিতেন গোড়জনে আনন্দরস। চুটামুটস্বরূপ, মোগলসম্রাট আকবরের সভায় বীরবল এবং কুকনগরের মহারাজ কুকচন্দ্রের সভায় গোপাল ভাঁড়ের নাম আসে মনে। সে যুগে ভাঁড়মি বা ফাউ কথার মাধ্যমে তাঁরা নির্ভেজাল হুল আনন্দের জ্ঞান হাশ্বরস পরিবেশন করতেন, তার প্রমাণ আছে ইতিহাসের পাতায় পাতায়।

বর্তমান যুগ অনেক এগিয়ে যাচ্ছে। এখন আমরা নিক্তি মেপে মেপে কথা বলতে ভালবাসি। বর্তমান সভ্যতার শিক্ষা হচ্ছে সযম এবং বিবিস্ততা। তাই আমাদের বর্তমানে কথার কুলঝরিতে যুক্তির তীক্ষ্ণতা, বুদ্ধির গভীরতার মূল্য অনেক। ফাউ কথার স্থান একদম নেই বললেই চলে। আবার ফাউ বলার ক্যাসাদও পদে পদে নয় কম। অতএব আর যা কিছু ফাউ আশ্রয় কুতি নেই কিন্তু ফাউ কথা বলে ফক্কিকারি করা আমাদের উচিত নয়।

নাইটিংগেল

চীনদেশের রাজার রাজবাড়ী পৃথিবীর নামকরা জায়গা ছিল রাজার বাগানে ছিল হরেক রকমের ফুল। ফুলগাছের চারিদিকে রূপোর ঘন্টা বাঁধা থাকত পথচারীকে সাবধান করার জ্ঞান। বাগানের সীমা যে কোথায় শেষ হয়েছে, তা কেউ ধারণা করতে পারত না। বাগানের শেষ প্রান্তে ছিল অনেক বড় বড় গাছ, তাদের পাখা-প্রাণাধা সবুজের উপর পড়েছিল। গাছগুলির পাশেই ছিল

গভীর নীল সমুদ্র। সেই গাছগুলির শাখাতে একটি নাইটিংগেল পাখি আশ্রয় নিয়েছিল। তার সুমিষ্ট স্বরের ধ্বনি শুনে সকলেই মুগ্ধ হত।

রাজ্যের বিভিন্ন দেশ হতে রাজ্যের মহানগর দেখতে আসত। মহানগর রাজবাড়ী, বাগান দেখে আনন্দ পেত। বিশেষ করে তাদের মধ্যে কেউ যদি নাইটিংগেল পাখির গান শুনে পেত, তবে তার আনন্দের সীমা থাকত না। দেশে ফিরে গিয়ে রাজ্যের রাজ্যের কথা সকলকে বলত। কেউ আবার রাজবাড়ী সফরে বই লিখত।

পৃথিবীর লোক বইগুলি পড়ে রাজবাড়ীর কথা জানতে পারল। একদিন একটি বই চীনদেশের রাজ্যের হাতে পৌঁছাল। রাজা বার বার পড়েন এবং প্রত্যেক মুহুর্তে মাথা নাড়েন। কিন্তু বইয়ের শেষভাগে এমন কিছু পড়লেন, যা তাকে অবাক করে দিল। কথাগুলি ছিল এই, নাইটিংগেল পাখি সবচেয়ে ভাল।

প্রধান মন্ত্রীর ডাক পড়ল। মন্ত্রীর প্রকৃতি ছিল অদ্ভুত! তাকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেই, সে উত্তর দিত, ফুঃ! তাকে দেখে রাজা বলতে আরম্ভ করলেন, নাইটিংগেল নামে এক ছোট পাখি আমার রাজ্যে আছে। তার গান আমার রাজ্যের সম্পদ। এর আগে কেউ তার সম্বন্ধে আমাকে জানাননি কেন? আমি চাই তাকে রাজসভায় নিয়ে এসে এবং আজ সন্ধ্যায় পাখি আমার সামনে গান করবে। সমস্ত পৃথিবী যে বিষয় জানে, আমি সে বিষয়ে অজ্ঞ।

মন্ত্রী উত্তর দিল, আমি তাকে খুঁজে বার করব।

কোথায় তাকে পাওয়া গিয়েছিল? প্রধান মন্ত্রী বড় বড় স্থানের মধ্যে দিয়ে, রাস্তার মধ্যে দিয়ে দৌড়তে লাগল। পথে যাদের সঙ্গে দেখা হল, তারা পাখি সম্বন্ধে কোন খবর দিতে পারলো না। ব্যাঘ্র হয়ে রাজ্যের কাছে ফিরে গেল এবং রাজাকে বলল, লেখক নিশ্চয় বাজে কথা বই এ লিখেছে। আপনি এই বাজে কথা বিশ্বাস করবেন না।

রাজা বিরক্ত হয়ে বললেন, যে বই আমি পড়েছি, সেই বই আপনাদের রাজ্য পাঠিয়েছেন। সেইজন্য এই কথা কখনও মিথ্যা হতে পারেনা। আমি পাখির গান শুনে চাই। আজ সন্ধ্যায় পাখি নিয়ে রাজসভায় হাজির হবে। আমার ইচ্ছা যদি পূর্ণ না হয়, তবে রাজসভার সভ্যদের শাস্তি দেওয়া হবে।

ভয়ে প্রধান মন্ত্রী উপরতলা, নীচতলা, রাস্তার মধ্যে দিয়ে

দৌড়াতে লাগল। রাজসভার সভ্যরা মন্ত্রীর সঙ্গী হল। অবশেষে রান্নাঘরের একটি ছোটময়ের সঙ্গে দেখা হল। মেয়েটি বলল, ও! নাইটিংগেল! তাকে ভাল ভাবে জানি। কি সুন্দর গান গাইতে পারে। প্রত্যেক দিন খাবার টেবিলে বা তুঁড়াগাড়া অবশিষ্ট থাকে, আমার মার জন্ত নিয়ে বাই। আমার মা সমুদ্রের ধারে থাকে। ফিরে আসবার সময় সমুদ্রের ধারে গাছগুলির নীচে বিশ্রাম করি। সেই সময় পাখির মিষ্টি গান শুনি। তার গান এত সুন্দর যে আমার চোখে জল আসে।

মন্ত্রী মেয়েটিকে মিনতি করে বলল, রান্নাঘরের ছোট মেয়ে আমি তোমাকে রান্নাঘরে বড় কাজ দেবো। পাখির কাছে আমাদের নিয়ে চল। পথে যেতে যেতে গরুর ডাক, ব্যাঙের ডাক শুনে পেলো। কিছু পরে সেই ছোট নাইটিংগেল পাখির গান বাতাসে ভেসে এল।

ছোট মেয়েটি বলল, ঐ দেখুন। গাছের উপরে তাকান। ঐ ছোট পাখিকে দেখুন। মন দিয়ে গান শুনুন।

রান্নাঘরের ছোটমেয়েটি পাখিকে লক্ষ্য করে বলল, আমাদের মহামান্য রাজা তোমার গান শুনে চলেছেন।

পাখি উত্তর দিল, আনন্দের সঙ্গে রাজাকে গান শোনাব।

রাজসভায় পাখিকে নিয়ে যাওয়া হল। রাজসভার মধ্য জায়গায় একটি ঝাঁড় বসান ছিল, সেখানে পাখিকে বসতে দেওয়া হল রাজসভার সভ্যরা এবং সেই ছোট মেয়েটি উপস্থিত ছিল। প্রত্যেকে সুন্দর কাপড় পরে এসেছিল। প্রত্যেকে সেই ছোট পাখিকে লক্ষ্য করেছিল। কিছু পরে রাজা পাখিকে গান আরম্ভ করবার জন্য মাথা নাড়ালেন। এত মিষ্টি করে গান গাইল যে রাজ্যের গালের উপর দিয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়ল। প্রত্যেকের রসিকবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। কারণ তার স্বরের ধ্বনি প্রত্যেককে মুগ্ধ করেছিল। রাজা পুরস্কার দিতে চাইলেন কিন্তু পাখি নিতে রাজী হোল না। পাখি বলেছিল, রাজ্যের চোখে জল দেখছি। রাজ্যের চোখের জলের বিশেষ দাম আছে কারণ রাজার মনের ভাবের রূপ দিয়েছি। সেইজন্য এই পুরস্কার আমার জীবনের সবচেয়ে বড় পুরস্কার।

অনুবাদক—বকুল ঘোষ।

শুভ-দিনে মাসিক বসুমতী উপহার দিন

এই অগ্নিমূল্যের দিনে আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবীর কাছে সামাজিকতা রক্ষা করা যেন এক দুর্বিষহ বোঝা বহনের সামিল হয়ে পড়িয়েছে। অথচ মানুষের সঙ্গে মানুষের মৈত্রী, প্রেম, প্রীতি, স্নেহ আর ভক্তির সম্পর্ক বজায় না রাখিলে চলে না। কারণ উপনয়নে, কিংবা জন্মদিনে, কারণ শুভ-বিবাহে কিংবা বিবাহ বার্ষিকীতে, নয়তো কারণ কোন কৃতকার্যতার আপনি 'মাসিক বসুমতী' উপহার দিতে পারেন অতি সহজে। একবার মাত্র উপহার দিলে, সারা বছর ধরে তার স্মৃতি বহন করতে পারে একমাত্র

'মাসিক বসুমতী।' এই উপহারের জন্ত সুদৃশ্য আবরণের ব্যবস্থা আছে। আপনি শুধু নাম ঠিকানা টাকা পাঠিয়েই খালাস। প্রদত্ত ঠিকানায় প্রতি মাসে পত্রিকা পাঠানোর ভার আমাদের। আমাদের পাঠক-পাঠিকা জেনে থুঙ্গী হবেন, সম্প্রতি বেশ কয়েক শত এই ধরনের গ্রাহক-গ্রাহিকা আমরা লাভ করেছি এবং এখনও করছি। আশা করি, ভবিষ্যতে এই 'সুখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হবে। এই বিষয়ে যেকোন 'জাতব্যায় জন্ত লিখুন—প্রচার বিভাগ মাসিক বসুমতী। কলিকাতা।

যাঁরা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন তাঁরা সবসময় লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান করেন ।



যে পরিবারে ছেলেবুড়ো সবাই সবসময় হাসিখুসী সে পরিবার সত্যিই সুখী । কিন্তু স্বাস্থ্য ভাল না থাকলে লোকে হাসিখুসী থাকবে কেমন করে? ময়লা ধুলো বালি স্বাস্থ্যের পরম শত্রু । আপনি যতই সাবধানী হোন না কেন, ময়লার হাত কিছুতেই এড়াতে পারবেন না । এই ময়লায় থাকে রোগের বীজাণু । লাইফবয় সাবান এই ময়লাজনিত বীজাণু ধুয়ে সাফ করে দেয় এবং আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখে । প্রতিদিন লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান করুন এবং ময়লা জনিত বীজাণুর হাত থেকে আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখুন । এটি আপনাকে তাজ্ঞ করবরে করে তোলে ।

এনাকী আজ বড় ধমক খেয়েছে
বাপের কাছে। মায়ের উপর

সব সত্য পরের তার বলে গড়ে।

কিন্তু বাবা যতক্ষণ জীবিত বাড়ীতে, মুখটি

বুজু থাকতে হবে নয়ত একটু ট্যা ফুঁ করলে
বাবার যে মূর্তি দেখতে হবে, সে চিন্তা
ক'রতেই হৃৎকম্প উপস্থিত হোল তার।
বাবার রাগের সময় মুখ বুজু চড়-চাপড়,
ধমক-ধামক হজম করাই বুড়িমানের কাজ,
এ তারা সব ভাইবোনাই বুঝেছে। মুখ দিয়ে
কথা বার হয়েছে কি বীরেন বাবুর চড়টাও
বড় হ'য়ে পড়েছে পিঠে, কিংবা চোখের
দিকে তাকিয়ে কেঁদেই ফেলেছে তারা। এমন
দিনটি অবশ্য এনাকীর কল্পনায় অনেক দিন
আগে থেকেই শুরু হয়েছে। সেই ইংরাজী
আর অক পত্রীকার পর থেকে। মনে মনে
অস্থির হ'য়ে উঠেছে সে। 'বাবা অকসে



বাসন্তী বন্দ্যোপাধ্যায়

বেয়িরে থাক না, তারপর মাকে একটোট্ট নেবে সে। সব কথা
বাবার কাছে পুট-পুট ক'রে নাগিল করা বের করাচ্ছে এনাকী।

বাবার গলার সাড়া পেয়ে মাথা নীচু ক'রে বইয়ের পাতায়
চোখ নামাল। এনা, মীনা, দ্বিতীয়বার আর ডাকার প্রয়োজন
হয় না। ছেলে-মেয়েরা যে যেখানে থাকে বাবার একডাকে সাড়া
দিয়ে ছুটে আসে কাছে। এনাকীও ফ্রকের কোণা মুখে পুরে
এক কোণে এসে দাঁড়াল। বড় হয়েছে কিন্তু সহবৎ শেখেনি এখনও।
সব সময় আমার বল মুখে পুরে কামড়াবে। বকাবকিতেও শোধরাতে
পারা গেল না। রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে মা আর একটা
বিক্ষেপণের আশঙ্কা করছিলেন। কিন্তু না, সামলে নিয়েছে।
হঠাৎ বাপের চোখে চোখ পড়তেই মনে প'ড়ে গেছে। ভাড়াভাড়ি
জামার ঝলটা ছেড়ে দিয়ে হাত দিয়ে ঝলটা টান করতে লেগে গেল।
ভারীমুখে বীরেন বাবু মীনার দিকে তাকিয়ে বললেন—তোর বুকলিষ্টটা
দে। অকসি ফেরত বই কিনে আনব। আর এনা—

বেচানী এনার ততক্ষণে প্রাণটা উড়ে গেছে। আধ ঘটাও হয়নি
একটোট্ট বকুনি খেয়েছে। বাবার ডাকে ঝলটা নীচু ক'রে আঙুলে
ফ্রকের ঝল জড়াতে লাগল।—তাকা আমার দিকে—বাপের আদেশে
তাকাত্তে গিয়ে ভাঁ ক'রে কেঁদেই ফেলল সে।

হাতের উলটো পিঠ দিয়ে চোখ কচলাতে কচলাতে চোখ ছুটে
লাল ক'রে ফেলল।—পরীক্ষার ফেল করবি আবার কিছু বলতে গেলেও
উল্টে কান্না। কেন, আগে মনে থাকে না? মেয়ের জল-টসটে সে ছুটে
শীল চোখের দিকে তাকিয়ে তখন আর কিছু না বলে বেরিয়ে গেলেন
বীরেন বাবু। আর সাথে সাথেই রান্নাঘরের বায়ান্না থেকে মা
এনাকীকে আদর-মাখান মুখে ডাকলেন এনা, শোন। আর
আমার কাছে আর। মায়ের ডাক কানে যেতেই এনাকীর চোখের
জল শুকিয়ে গেছে। রাগে চোখ দিয়ে যেন আগুন ছুটছে তার।

মুহূর্ত্ত পূর্বেই সেই কারাভেজা কোমল, দুঃখী-দুঃখী চেহারাটা
কিছুতেই আর চোঁকা ক'রেও মনে আনতে পারছে না দোতলার সুহাস।
বেলিং বুঁকে নীচের দিকেই তাকিয়ে ছিল। অভ্যাগাটা ভাল নয় তবু
নিজেকে শোধরাতে পারে না। নীচের তলায় বখনই কোন কারণে

চোমেটি' গুণ্ডগোল কানে বাস, মেয়েদের মত অমনিই বেলিং বুঁকে
দাঁড়িয়ে পড়ে সুহাস। একজুে বাড়ীর দোকানের কাছে ধমক খায়, নীচের
তলায়ও কারো চোখ পড়ে গেলে কথা শোনাতে ছাড়ে না। আর কেউ
নয়, মীনা কিংবা মীনার মায়ের নজরে পড়লে তারা নিজেরা কিছু
বলতে আসে না। আপন মনে বিড়বিড় ক'রে বলে, কি বলে সে এত
উঁচু থেকে সুহাস শুনেতে পায় না, তবে খুবই যে বিরক্ত হয়েছে সে তাদের
অগ্রসর মুখের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারে। বুঝতে শেরে অবশ্য
সরেই যায়।

কিন্তু একটু পরেই হয়ত কানে আসে, কি হয়েছে মা কিংবা কি রে
দিদি, কে অসভ্যের মত তাকিয়ে আছে? তার পরেই নীচে থেকে
চাঁৎকার ভেসে আসে এনার—মাসিমা ও মাসিমা। সুহাসের মা
আগে আগে বুঝতে না পেয়ে সাড়া দিতেন। বলতেন, কি রে
ডাকছিস কেন?

ঝগড়ার সুরে এনা বলত—ডাকছিস কেন কি! ছেলেকে
শাসন করতে পারেন না? পরের বাড়ীর দিকে অসভ্যের মত তাকিয়ে
থাকে?

আজ-কাল আর সুহাসের মা সাড়া দেন না। বরং এনার গলা
পেলেই ওদের শুনিয়ে শুনিয়ে সুহাসকে ধমকের সুরে ডাকতে থাকেন।

তিনি যে এ বিষয়ে সুহাসকে শাসন করতেন সেটাই বোঝাবার
জ্ঞান। ঝগড়াটা তাই আর গড়ায় না। কিন্তু সুহাস কিছুতেই নিজেকে
শাসনে রাখতে পারে না। তেমন কিছু কানে গেলে বই উল্টে
রেখে ঠিক বেলিং বুঁকে দাঁড়িয়ে পড়ে। তবে আগের সেই অগাধ
কোঁড়হলও আর নেই। আজ-কাল তেমন আর মজা ও পায় না।
হুদিন পর এ-ও হয়ত থাকবে না। আজ কিন্তু সকাল বেলায়ই
বীরেন বাবুর রাগারাগি কানে গেছে। কাঁকে যেন খুব ধমকানি
দিচ্ছেন। কাঁকে বকছেন কে জানে? ও সব একঘেয়ে হয়ে গেছে।
ভ্রলোক নিজের ছেলেমেয়েদের ধমক-ধামক দিয়ে কি যে আনন্দ
পান, বইটা তুলে পড়ায় মন রসাতে চোঁকা করল। ছোট বোন শুক্লা
কি কাজে ঘরে ঢুকে হঠাৎ ধমকে দাঁড়িয়ে বলল—জান দাদা, এনাকী
না ফেল করেছে? ওর বাবা ওকে কি বকছে। মেয়েছেও।

তখন তখনই আশ্চর্য্য, সুহাস বই ছেড়ে উঠে পাড়িয়েছে।
বেলিংয়ে ভর দিয়ে নীচের শুল্ল উঠোনটার দিকে শুল্ল চোখেই তাকিয়ে
রইল সে। এখন আর কোন সাড়া-শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না, চোখেও
দেখা যাচ্ছে না কাউকে। সবাই বোধ হয় ঘরে। এনাফীও।
এ মেয়েটি সন্ধ্যা তার অছেতুক একটা কৌতুহল কেন যে মনের মধ্যে
বাসা বেঁধেছে, কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না সে। আজ মাস
আটেক হোল তারা এসেছে, এই ক' মাসে উঠতে বসতে চলতে
ফিরতে সব সময়ই চোখে পড়ছে মেয়েটিকে। একটি কিশোরী মেয়ে।
কাপড় পরলেই বেন মানায়, তবু ক্রক ছাড়বে না। কগড়া করছে
বখন, মনে হয় দুনিয়াতে কগড়া ছাড়া কিছু জানে না। বাড়ীতে
কাক ছিল বসতে পায় না। আবার বখন বাপের থমক খেয়ে কাঁদে,
উপব থেকে এমন অসহায় মনে হয়, কষ্টই হয় সুহাসের সে সময়।
ছোট ভাইকে বখন পিটেছে ত্রিঃস্তায় বেন জানোয়ারকে ও ছাড়িয়ে
যায়, মাকে ভেঁচি কাটছে, দিদির চুল টেনে পালাচ্ছে, সব সময়ই
একটা চরম কিছু করা চাই-ই। প্রথম প্রথম মেয়েটার কাণ্ড কারখানা
একটা ছেলেমানুষী তৃষ্ণায় মনে করে স্ত্রীসহের বেশ ভাল লাগত।
ক্রমশঃ কিছু মনে হচ্ছে আসলে মেয়েটা ভয়ানক হিংস্রটে, কগড়াটে,
বদরাগী, জেদী। স্ত্রীসহের মনে একটু সন্দেহ ছিল বোধ করি
লেখাপড়ার চৌধস। বোকা গেল তাও নয়। সর্বাঙ্গিক দিয়েই একটা
বাঞ্ছন। তবু এ মেয়েটি সন্ধ্যা সুহাসের অসীম কৌতুহল।


চৌদ্দ-পনের বছরের একটা উঠতি বয়সের মেয়ের এসময় কাণ্ড-
কারখানা দেখতে সুহাসের ভাল লাগে। আর তাই সে বেলিং বঁকে
তাকিয়ে থাকে নীচে।

মলিনা দেবী কাছে এসে এনাফীর হাত ধরে টানতে লাগলেন।
সান্ত্বনার স্বরে বললেন—পরীক্ষার ফল খাচাপ হোলে গুরুজনরা
ও-বকম একটু বকেই। তাই ব'লে তুই মুন্নির মত কানড়িস? এত
বড় দিদি হ'লে? ঐ দেখ মুন্নি কেমন অবাক চোখে তাকিয়ে আছে
তো'র দিকে।

মার হাত থেকে কটকা মেরে হাত টেনে নিল এনাফী।
নাকি শুয়ে বলল—যাও যাও। তুমিই ত বত নষ্টের মূল। সব
কথা বাবার কাছে নালিশ করা চাই। তোমাকে আমি বারণ
করে দিয়েছিলুম না? বলতে বলতেই আবার হুঁচোখ জল ভরে
এলো। মলিনা দেবী পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন—বোকা মেয়ে।
পরীক্ষার ফল বাপ-মায়ের কাছে লুকোতে আছে না কি?
এবার মনোযোগ দিয়ে পড়, সামনে বার সবার চেয়ে বেশি নম্বর
পেয়ে উঁচু ক্রাসে উঠবি।

মায়ের এ সব ছেঁদো কথা শোনার মত বৈধ্য কিংবা মন
কোনটাই ছিল না এনাফীর। কান্নাবোঝা গলারই তেড়ে উঠল সে—
তখন একশবার বললুম একজন মাটির রেখে দাও। ইংরেজী অঙ্ক

ও-আর-সি-এল এর



কুমারেশ

লিডার ও পোর্টফোলিও

দি ওরিয়েন্টাল রিসার্চ অ্যান্ড কেমিক্যাল ল্যাবরেটরী লিঃ

কিছু বুঝি না। তখন তখনলে না। ওদিকে ফেস করলে শাসনটি ঠিক আছে। উঠে চলে আসছিল কিছু ওপর দিকে চোখ পড়তেই চোখের জল বাষ্প হয়ে উবে গেছে।

মলিনা দেবী বললেন—দেখি এবার বলে-করে একজন মাঠার রাখতে পারি কি না। কিন্তু এনাকীর গলার স্বর শুনে ঘরে না চুকে আবার বারান্দায়ই বেরিয়ে এলেন।

এনাকী ঠিককার করে বলছে—লজ্জা করে না পরের বাড়ীর দিকে চেয়ে থাকতে। অসভ্য, বদমাশ ছেলে। বলতে বলতে ওপাশের মিঁড়ি দিয়ে সোজা উপরে উঠতে লাগল।

মলিনা দেবী ব্যস্ত-ব্রত হয়ে এনাকীকে বাধা দিতে মিঁড়িখুঁচি দৌড়ে গেলেন, কিন্তু ঘরেটার নাগাল পেলেন না। হি, হি, কি সব বলে আসবে কে জানে! লজ্জায় রাগে সরে সেতে ইচ্ছে হোল তাঁর। উঠানে দাঁড়িয়ে চৈচিয়ে চৈচিয়ে ডাকতে লাগলেন মেয়েকে। একটুকু পথই এনাকী গর-গর করতে করতে মিঁড়ি দিয়ে নেমে এলো।

সন্তুষ্ট হয়ে কাছে এগিয়ে গিয়ে উৎকণ্ঠিত স্বরে জিজ্ঞেস করলেন—কি বলে এলি তুই উপরে? হি হি তোর জ্ঞা কি কারো সাথে সত্তাব রাখার উপায় নেই? ফেল করেও তোর লজ্জা হয়নি আবার রাগ দেখাতে হাসি সবার উপরে? মায়ের কথার কোন উত্তর না দিয়ে সোজা ঘরে চুকে পড়ল এনাকী। আর মলিনা দেবী নীচে থেকেই সহাসের মাকে ডাকতে লাগলেন—দিদি, ও দিদি—

মায়ের গলা পেয়েই বড়ের বেগে বেরিয়ে এলো এনাকী, তারপর টানতে টানতে মাকে ঘরের দিকে নিয়ে চলল। ঝগড়ার সুরে বলল—আবার দিদিকে কেন? বলবে বুঝি এনাকী বা বলে এলো! তার জ্ঞা কিছু মনে করবেন না? যা বলে এসেছি ঠিকই বলেছি, তুমি আবার কোন লজ্জার গুণের সাথে কথা বলতে বাও?

মলিনা দেবীর আর সহ হোল না। ঠাস করে এক চড় বসিয়ে দিলেন মেয়ের গালে। চাপা স্বরে বললেন—হতছাড়ী মেয়ে! নিজের স্বভাব মন্দ বলে দুনিয়াতুন্দ লোককে তুই মন্দ দেখিস? ছাড় তুই, আমার হাত ছাড়। চড় খেয়ে তত্তপোন্দটার উপর চূপচাপ বসে রইল এনাকী। একটা অসভ্য ছেলেকে সামান্যসামনি অসভ্য বলতে অপরাধ কোথায় বুঝ উঠতে পারল না। গালে হাত বুলোতে বুলোতে ছোট ভাই তপু'র দিকে তাকিয়েই কি কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেছে। তারপরই দৌড়ে মার কাছে। মলিনা দেবীর মেজাজ তখনও ধাতস্থ হয়নি। আবার এনাকে দেখে ঝেঁঝে উঠলেন—রান্নাঘরে আবার কি? কাজের সময় এখন বিরক্ত করতে আসিস না। বেরো। এনাকী ভেঁচি কেটে উঠল মাকে—বেরো বললেই বেরবো নাকি। তপু ফাট্ট হয়েছিল, টাকা ফেল, আমবা মিট্টি খাব।

এনাকীর কথার ধরণই এ রকম। কত বার বুঝিয়েছেন মেয়েদের, এমনি রকম ভাবা কানে অন্ত্যন্ত ধারাপ শোনায়। বেন সর্কদাই একটা খুৎ দেখি ভাব মেয়ের। বহু বার বলে বলে নিজেই হতাশ হয়ে ছেড়েছেন। মেয়ে নিজে থেকে না শোনাগলে তার সাধ্য কি ও মেয়েকে শাসিয়ে রাখেন। আজ মীনা, তপু, দিপু'র আনন্দোজ্জল চেহা'রার দিকে তাকিয়ে এনার চেহারাটাই বার বার চোখের উপর তেঁসে উঠছিল। বাপের বকুনি খেয়ে বখন

কাদছিল ভাবী মায়া হাছিল মলিনা দেবীর। কিন্তু বীরেন বা: সামনে থেকে মেয়েকে টেনে আনার সাহস তাঁর ছিল না। তাঁ' কর্তা বেরিয়ে যেতে এনাকীকে কাছে টেনে আদর করে ওর দুঃ-ভুলিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। অবশ্য এ-ও জানতেন কোন ব্যাপারেই বেশিগুণ মুখভার করে থাকে স্বভাবই নয় মেয়ের। তবু এনাকীর চোখের জল দেখে সে মুহূর্তে বেদনার প্রাণটা মুচড়ে উঠেছিল তার। সহজে কাদবার মেয়ে ত ও নয়? কিন্তু সাধ্য কি ওর সব্বকে দু'মিনিট ওর নিশ্চিত থাকার। একেবারে হাড়ঝালান মেয়ে। কি যে বলে এসেছে ওপরে কে জানে?

এনাকীকে পেছনে তবু দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, বাকার দিয়ে উঠলেন—ফেল করে ফের মিট্টি খাওয়ার কথা বলতে লজ্জা করে না তোর? ও তুই বলেই পারিস, জ্ঞা মেয়ে হোলে এতকণ লজ্জায় মাটিতে মিশিয়ে যেত।

এনা ফের ভুক কুঁচকে মুখভঙ্গি করে বলল—বা রে বা, ফেল করেছে বলে কি মুখ গোমড়া করে সারা দিন বসে থাকব নাকি, না কাদতে বসব? ও তোমার মন ধারাপ হয়েছে, তুমি মুখভার করে বসে থাকগে। এখন টাকাটা ত ফেল।

—টাকা আমার কাছে এখন নেই। যা, বেরো।

—ইস, নেই! বললেই হোল? শীগ'গির বের কর।

মলিনা দেবী এবার কড়াটা উত্তন থেকে নামিয়ে সোজা দাঁড়িয়ে পড়লেন। চোখ লাল করে বললেন—দেখ এনা, ভাল হচ্ছে না। একটু আগে যে মার খেলি, তবু লজ্জা নেই?

—না, আমার লজ্জা নেই। তুমি টাকা দাও। লোকের বাড়ীতে দেখেছি, ছেলে-মেয়েরা পাশ করলে বাড়ীতে খাওয়া-দাওয়া আনন্দের গুণ পড়ে যায়। আর আমাদের বাড়ী সব্বই উটে। একজন প্রথম হয়েছে, একজন তৃতীয় হয়েছে, তবু সব গোমড়া মুখ।

এ অদ্ভুত কথার কি উত্তর দেবেন মলিনা দেবী? এ উটেটা মেয়েকে কি করে সোজাপাথে বোঝাবেন? সবটাই যে এনাকীর জ্ঞা, সে বোধ কি ওর আছে? মীনা, তপু, দিপুও যে উচ্ছাসের মাঝে হঠাৎ এনাকীর দিকে তাকিয়ে তক্ত-বিগল হয়ে উঠছে, সে খেয়াল অবশ্য এ মেয়ের থাকার কথা নয়। অতটুকু ছেলে দিপু, সে পর্যন্ত এনাকীর কান্না দেখে ঘরের কোণায় মুখ লুকিয়ে কেঁদেছে। মলিনা দেবীর কাছে এসে বলেছে—মা, বাবাকে বকতে তুমি বাধণ কর মা। ছোড়দি' যে কাদছে। এখন মেয়ের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ দু'হায়ে তপু দিপুকে দেখতে গেলেন। এনাকীর সহজ ভাব ফিরে আসতে ওরাও যেন অনেক সহজ হয়ে উঠেছে। মুচকি মুচকি হাসছে দু'ভাইয়ে। গুণের হাসিমুখ দেখে সেকেও খানেক কি ভাল এনাকী, তার পর ঘরের দিকে যেতে যেতে বলল—দেবে না ত? আজ ঠিক আছে। আমার দু' টাকা জমেছে, আমি খাওয়াব। মলিনা দেবী হাত বুয়ে এ ঘরে এলেন। কাপড়ে হাত মুছতে মুছতে বললেন—দিছি, দিছি, বাপ যে বাপ! এ মেয়ের পান্নার পড়লে—কথা শেষ হোল না। ততকণ এনাকী ছুটে বেরিয়ে গেছে বাইরে। দৌড়ে সামনের বারান্দায় এগিয়ে গেছেন। চৈচিয়ে ডাকলেন—এনা ভাল হচ্ছে না, ভাল হচ্ছে না। আবার তুই কোকান দৌড়াছিস? ফিরে আয়, শীগ'গির ফিরে আয়। তপুকে টাকা দে, তপু কিনে

জানবে। মায়ের কথায় একবার শেহন কিরেছিল, তার পরই গলির মোড়ে উঠাও।

এনার ফ্রক গলির মোড়ে উঠাও হোতেই সামনের ঝুল-বারান্দা থেকে নিজের ঘরটার ফিরে এলো সুহাস। এনার দোতলায় ওঠা দেখেই সামনের ঝুল-বারান্দায় আশ্রয় নিয়েছিল সে। কি বেন সব গড়গড় করে বলে গেল মাকে, এতদূর থেকে শোনা বাচ্ছিল না, তবু মস্তব্যগুলো যে মোটেই ভ্রুতিবদ্ধ ছিল না যে, এতদূর থেকে ও গলার স্বরে বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারছিল। বলতে কি, একটু একটু ভয়ই হচ্ছিল সুহাসের। যদি সোজাশুজি তাকেই বাচ্ছতাই করে অপমান করে যেত সে, তবে একরকম পালিয়েই এসে বসে আছে এখানে, তাহলে নিজের স্বপক্ষে কোন বুদ্ধিই সে দেখাতে পারত কি? এনা ফিরে যেতে মনে মনে কত যে স্বস্তি ফিরে পেয়েছিল, মনে করে নিজের দুর্বলতায় হেসেই ফেলল সুহাস। বাপ রে, ও মায়ের পান্নায় পড়লে বন্ধা ছিল না আজ। হেসে বইটা খুলে পাতা ওপটাতে ওপটাতে স্বগতোক্তি করল—কি আশ্চর্য ময়ে বাবা।

মা যে ঘরের সামনে বসে কুটনো কুটছিলেন সে খেয়াল ছিল না। গৌরী দেবী মুখ বাড়িয়ে বললেন—কার কথা বলছিস রে সুহাস? এই নীচের তলায় এনাফির? তারপর ছেলের সাড়াশক না পেয়ে নিজেই আবার বললেন—সত্যি অদ্ভুত ময়ে! হেসে ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন—একটু আগে আমাকে কি বলে গেল জাণিস? সুহাস ঘর ছেড়ে বারান্দায় মার কাছ ঘেঁসে এসে বসল। হেসেই বলল—কি?

—বলে গেল, আপনাদের ছেলের চোখ আমি গেলে দেব মাসীমা। পরের বাড়ীর দিকে জ্যাখ-জ্যাখ করে তাকিয়ে থাকি জন্মের মত হুচিরে দেব। আর তাকাবি কখনও? উচ্ছ্বসিত হোয়ে মায়েতে ছেলেতে হেসে উঠল। সুহাস চট্টাং হাসি খামিয়ে গভীর গলার বলল—দেখ মা, আমি অর্থাৎ হই মেয়েটার রূপান্তর, ডাবাঙ্কর দেখে। এই চোখতরা আঙুন, বাপ রে! ওপর থেকে যে চোখের দিকে তাকালে আমার পর্যন্ত আতঙ্ক উপস্থিত হয়। আবার মুহূর্ত পরেই দেখ বাপের ধমকে এমন ক'রে কাঁদছে, কষ্টই হয় সে সময়। রাগছে বন্ধন ছোট ছোট ভাই দুটোকে কি মারধরই না করে, আবার পর মুহূর্তেই দেখ আদরে আদরে বেচারাদের একেবারে প্রাপাঙ্ক। দুটো শক্তিই সমান কাজ করছে।

গৌরী দেবী বললেন—অথচ দেখ, ভক্তলোকের আর পাঁচটি সন্তানই কিন্তু বড় শাস্ত-শিষ্ট। সব মায়ের মত হয়েছে। বাপের মেজাজ পেয়েছে একমাত্র এই মেজোটি। এই নিয়েই সেদিন এনার মা কত ক্রোধ করছিলেন। সুহাস আশ্চর্য কিংবা হুঁকাক করতে করতে বলল—কি বলছিলেন? গৌরী দেবী বড় মেয়ে শুকুকে ডেকে বললেন—দেখ, ত শুকু, উল্লে কহলা দিয়ে এসেছিলাম খরল না কি? তারপর আলু ছাড়তে ছাড়তে ছেলের প্রাঙ্গের উত্তর দিলেন। একটু তাচ্ছিল্যমাধা শুরে বললেন—বলছিলেন, মেয়েটার স্বভাব দিনকে দিন এমন বিকী হোয়ে উঠছে যে, মনে আর শাস্তি নেই তাঁর। এই সব ক্রোধ করছিলেন আর কি। নূতন কোরে আর কি বলবেম? চোখের উপরই ত দেখতে পাই সব অতবড়, যিঙ্গী মেয়ে, মা বলে বলে হরবাণ, তবু ফ্রক ছেড়ে কাপড় পরবে না

ট্রেজার প্রোডাক্টস

ক. হোডের

মোবাইল প্রজাপিনী



ক. হোড ২৩ কোং . কলিকাতা-১৪



দিনের মধ্যে পাঁচবার খাওয়া-পোড়ান, বিবৃতি-সংগ্রহ নিতে দোকানে একটা স্বতন্ত্র জোয়ারকে কে বেন বাপ নিয়ে গিয়েছিল। আগে ভাবতাম বাপ-মায়ের দরকার। বাপ অবস্থা রেখেছে, এনাকীকে দেখলে আজ-কালি তার এমনি একটা মানতাবী লোক। ভয়ও করে ছেনো-মায়েরা বমের মত। তা সে মনে পড়ে যায়। আর তাই মায়ের মুখে এনাকীর প্রশংসা কতক্ষণ? ভ্রলোক ত দেখে সেই সাড়ে নয়টায় বেরিয়ে বান মনেই খারাপ হয়ে যায়, যাকও তখন সহ হয় না, মনে পড়ে আর ফিরতে ফিরতে সেই সন্ধ্যা সাতটা। অতক্ষণ ত অবাধ স্বাধীনতা। মায়ের আগের উজ্জ্বলি। কিন্তু এটাই ত নিয়ম। শান্ত, মায়ের প্রশংসাই ত প্রাপ্য। তার মনের উজ্জ্বলিই বা ব্যতিক্রম।

উঠে দাঁড়াতেই এনার গলার সাড়া পেয়ে এক পা বাড়তে গিয়ে বাধা পেয়ে ফের বসে পড়তে হোল। গৌরী দেবী সার্টের কুল টেনে বসিয়ে দিয়েছেন ছেসোকে। হেসে বললেন—চোখ দুটো তোর সত্যিই বাবে। চক্কা নেই? সুহাস অমনর ক'রে বলল—একটু দেখি মা, বেশ মজা লাগে। গৌরী দেবী গভীর হয়ে বললেন—ছিঃ। বড় ত'হেছিস এখনও কোন কাণ্ডজান হোল না? এ কি মেরেলী স্বভাব হচ্ছে দিনকে দিন? বা পড়তে বা।

অগত্যা পড়ার বরই চুকতে হোল সুহাসকে। পর পর দুটো বছর একই রাসে র'য়ে গেল এনাকী। মাঠার খাকা সবুও। আর এই ক'কে মীনাফীর ফুলের গুণ্ডি পার হয়ে কসেজে বাতায়াত শুরু হয়েছে। তপু হ' রাস উচুতে উঠে এনাকীকে ধরে ফেলেছে। দিপুও এগিয়ে গেছে হ' বাপ। শুধু এনাকীই যেই তিমিরে সেই তিমিরেট। দোহসার সুহাসেরও এবার কাইতাল ইয়ার।

আগের সেই অশোভন কৌতুহল আর নেই। একসময় গাছে বলা যায় না, তবে অনেকটাই গেছে। এখন যেটুকু আছে তাকে আর অস্বাভাবিক বলা চলে না। শুটুকু অনেকটাই থাকে। গত বছরেও প্রমোশনের দিন বীরেন বাবুর গমক-খামক কানে গেছে সুহাসের। কিন্তু এ বছর তেন বড় বেশি চূচাপ। এবারও যে এনাকীর কপালে প্রমোশন জোটনি, সে খবর মাগেই পেয়েছে সে। সকাল থেকেই একটা বমকের আশঙ্কায় সুহাস নিজেই বেন উৎকণ্ঠিত হয়ে ছিল। কিন্তু না, কিছুই কানে গেল না। ভারী অস্বাভাবিকি বোধ করতে লাগল সুহাস। নিজের খবর টেবিলের উপর হু হাতের ভর রেখে মুখ ঢেপে এসবই চিন্তা করছিল। আচমকা একটা বড় প্রমোশন পেয়ে এনাকী যে হঠাৎ বড় বেশী বড় হয়েছে গেছে এ বেন সহ হচ্ছিল না সুহাসের। সত্যি তাই। কক্ষ ছেড়ে শাড়া হয়েছে সেটা কিছু নয়, কিন্তু সেই উচ্ছল চাপলো সর্বস্বাভি প্রাণচকল একটা দণী আচমকা বেন শুক ত'য়ে গেছে। বড় আশ্চর্য্য বোধ হয়েছে সুহাসের। মাত্র দুটি বছর কেউ যে এমনি বেমানাম পাণ্টে বেতে পারত, বেন চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। এ খবরবর্তন যে হঠাৎ একটা ওলোট-পালোটে এসে গেছে, তা নয়। বীরে বীরে সব কিছু সহিয়ে সহিয়ে, কাউকে তেমন আশ্চর্য্য না করে দিয়েই আস্তে আস্তে পাণ্টে গেছে এনাকী। এখন আর হ'চোখ ছ'কান পেতে রেখেও অস্বাভাবিক কিছু চোখে ঠেকে না, কানে আসে না। বড় বেশী শান্ত-সম্প্রী মেয়ে হ'য়ে গেছে বেন। কিন্তু সব চেয়ে বা আশ্চর্য্যকর, তা হচ্ছ সুহাসের নিজেরই মন। এনাকীর সেই বগড়া, সেই হিংস্রটপনা, সেই গৌরীক্যাপনা, বা দেখে বিরক্তিতে রাগে কত সময় তার ক্র কুচকে উঠেছে, সেই বেন ভাল ছিল।

এই আড়াই বছরে একই বাড়ীর বাসিন্দা হোয়েও এনাকী পরিবারের কারো সাথেই বলতে গেলে তেমন আলাপ পরিচয় হয় সুহাসের। সুহাস এমনিতেই একটু অমিতক, তাচ্চাড়া ত সমবয়সী কেউ নেইও তও পরিবারে। সুতরাং আজ-কাল কা অকাজে ছুটে ছুটে আসে মীনাফী। শুক্রাণ অগনি দিনে পনের ব নামছে নীচে। এক সাথে ফুল-কাইতাল পাশ করে একই কলো ভক্তি হয়েছে হ'জনে, এত দিনে তাই বন্ধুত্বটা জমে উঠেছে খুব সুহাস ঠিক বন্ধুত্বের পর্যায়ে না উঠলেও বোনের বন্ধু হিসেবে অনেক সহজ হয়ে উঠেছে মীনাফীর কাছে।

বিকলে আজ আর বেরোয়নি। বন্ধুদের টীমে ভূলে দিয়ে তারে সহজেই কথাবার্তা বলছিল মায়ের সাথে। মীনাফী এলো এসন-মাসীমা মাসীমা, হৈ-হৈ করতে করতে; এসে থমকে দাঁড়ি পড়ল। সুহাস এ সময় বাড়ীতে, ভাবতে পারেনি নিজে উচ্চাসের জন্য বড়ই লজ্জিত হোয়ে উঠল। কিন্তু বড়ই সপ্রতিভে মীনাফী। হেসে বলল—বা রে মাসীমা, মিষ্টি কোথায় উত্তরটা দিল সুহাস। শুধু হেসে বলল—বা রে মিষ্টি ত আপা আনবেন, এমন খালি হাত কেন?

—বা রে, আমি কেন মিষ্টি খাওয়ার? সুহাসও গভীর গল বলল—বা রে-কেন খাওয়াবেন না? গৌরী দেবী মজা দেখছিলেন এই স্ত্রী সপ্রতিভা মেয়েটিকে বড়ই স্নেহ করেন তিনি। মনে কোণায় একটা আশাও গুয়ে রেখেছেন। মনে মনেই থাকেনি ত মেয়েকে বলেছেন ও। আর শুক্রার মুখ থেকে সে কথা মীনাফীকে পরিবারে কানে বেতে কতক্ষণেরই বা ওয়াস্তা। আড়ালে মীনাফী বৌদি বলে ঠাটাও শুরু করেছে। কেবল খুব শ্রোত্বাধানে সুহাসে কান এড়িয়ে এমনিতেই বিষের নামে নানান অজুহাত, তার ওপ মীনাফীর সাথে তার বিয়ের প্রস্তাব শুনে কি জানি, লজ্জা বোধ করি যেটুকু কথাবার্তা বলত তাও বন্ধ করবে। গৌরী যে তা চান না। বরং সুহাস আর মীনাফীকে আলাপ করতে দেখা একটা শান্তি পান। এমন যেয়েকে সুহাস কিছুতেই অপচ করতে পারবে না। বুঝে-সুঝে নিক না। হুজনের কথা শু মজাই পাচ্ছিলেন। হেসে বললেন—এ বলছে কেন খাওয়া ও বলছে কেন খাওয়াবেন না, বেশ মজা! আর সত্যি কথাই মীনাফী শুধু শুধু মিষ্টি খাওয়াতে বাবে কেন? তোর বোনে বিয়ে, এত বড় একটা শুভ সংবাদ, মীনাফী নিশ্চয়ই দাবী করে পারে মিষ্টি খাওয়ার, মীনা, আমি তোমার দলে। জোরে যে উঠলেন।

মুয়ের সাথে সুহাসও হাসল। বলল—বেশ কথা, বোনে বিয়ে, শুভ সংবাদ সন্দেহ নেই, মিষ্টিখ খবরান মতই স্পষ্ট

কি মীনাঙ্কী দেবীর দিক থেকে ও ত মন্ত স্তম্ভবাদ আছে।
নিঃস্বপ্ন করাবার মতই শুভ সংবাদ।

তখনও ঠিক বুঝে উঠতে পাচ্ছে না মীনাঙ্কী। ভুজ কুঁচকে
মুহূ হেসে বলল—বুঝতে পাচ্ছি না। কি সংবাদ বলুন ত?

মনে করতে পাচ্ছেন না?

চোট কামড়ে চিন্তার ভাণ করল—না ধরতে পাচ্ছি না।

গৌরী দেবী হেসে বললেন—অত বাধার মধ্যে না রেখে পরিকার
করে বসই না বাপু।

—আচ্ছা পরিকার করেই বলি। হার দু'হুটে ভাই প্রথম হয়ে
উঁচু আসে ওঠে, তার কাছে মিটি খাওয়ার আবদার আমরা নিশ্চয়ই
করতে পারি। কি বলেন পারি না?

মীনাঙ্কী স্বপ্নে নিঃশ্বাস ফেলে বলল—তা নিশ্চয়ই পাবেন।
সে ব্যবস্থাও হবে। কিন্তু আগের ব্যাপার আগে। আমি যখন
জানিয়েছি আমারটা মিটে থাক, তাৎপর্য চলুন আপনি নীচে, এ
উপলক্ষে তবু আপনার পায়ের ধূসা পড়বে।

গৌরী দেবী ছোট একটু নিঃশ্বাস ফেলে বললেন—এবার খবর
শুনে মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল। বেচারী এত পেটেও—
কথাটাকে আর শেষ করলেন না।

সুহাস মীনাঙ্কীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল—ক' সাবজেক্টে
কেল করেচে আপনার বোন?

—হু' সাবজেক্টে।

—কি কি?

—কল, ইংরেজী।

আবতাকরাটা হঠাৎ সেন বিয়ল ও ভারী হয়ে উঠল। গৌরী দেবী
আবার বললেন—শুকু বলছিল, এনাঙ্কী নাকি আর পড়বে না।
সত্যি না কি?

মীনাঙ্কী বলল—সত্যি মাসীমা, আমরা সবাই বুঝিয়ে বুঝিয়ে
হয়রাণ হয়ে গেলাম, এমন কি বাবা বললেন, স্কুলে না যেতে
চাস, বাড়ীতেই অঙ্ক আর ইংরেজীর দুটো মাষ্টার রেখে দি, প্রাইভেট
পড়। তাতেও আপত্তি। আর একবার 'না' করলে ও মেরেকে 'হ্যাঁ'
করার কার সাধ্য। বাবাকে যে অত ভয় করে তবু সোজা জবাব,
না, আমি আর পড়ব না।

কথার মাঝখানে হঠাৎ সুহাস বলে উঠল—সে কি, পড়াশুনা
ছেড়ে দিয়ে বাড়ীতে বসে করবে কি?

এনাঙ্কীর প্রসঙ্গ উঠে পড়াতে ভারী অস্বাভাবিক বোধ করছিল
মীনাঙ্কী। বোন ফেল করেছে, লজ্জাটা যেন তারই, প্রসঙ্গ
পার্টনার জন্ত সুহাসের কথার উত্তরে হেসে বলল—করবে মাথা আর
মুণ্ড। তার পর গৌরী দেবীর দিকে তাকিয়ে বলল—তারিখ কবে
ঠিক হোল মাসীমা?

গৌরী দেবী বললেন—সবে মেয়ে পছন্দ ক'রে গেল, সেনা-
পাণ্ডার কথা কিছুই ঠিক হয়নি, তারিখের এখনই কি?

মীনাঙ্কী আবার কল-কল ক'রে উঠল। ভুজ উঁচিয়ে বলল—কি
চাপা মেয়ে বাবা। বলে শবীর খারাপ, কলেজ বাব না। আমিও
তাই বিশ্বাস করে কলেজ গেছি। এসে শুভলায়, 'ওরাকে আজ
দেখতে এসেছিল। কই মাসীমা, আপনিও ত কিছু বলেননি।
গলার মুহূ অল্পবয়সের স্তব্ধ মেথাল।

—এ আর বলাবলির কি আছে যে, কথাবার্তা অনেক দিন
থেকেই ত চলছে, সে ত জানিনাই, আজ ওরা এসে মেয়ে দেখে গেল।
সুহাসেরই বন্ধু।

এসব কথা কিছু ভাল লাগছিল না সুহাসের। মনটা চট্টাৎ
খারাপ হয়ে গেছে মীনাঙ্কীর কথায়। এনাঙ্কী পড়া ছেড়ে দেবে?
করবে কি হবে বসে? করার মধ্যে ত হার ব্যকরণ সাহায্য করা।
এমনিতেই হাফে-ভাবে মীনাঙ্কীকেই তার ছোট বোন বলে ভুল হত,
এর ওপর সংসারের চাকার মাথা গলার ওড়নের দুটো ভোঁতে আর
কত দিন? সেলেমাগুথ, ছেলেমাগুথের মত না থাকল...

মীনাঙ্কী বলছে—হ্যাঁ, সুহাসনা, বন্ধুর নাম কি? দেখতে কেমন?
বলুন না সব খুলে। খুপুড়ী বলে আমি কিছু জানি না।

এ খবর কোন উত্তর না দিয়ে হঠাৎ চোঁটার ছেড়ে উঠা পড়ল
সুহাস। পা বাড়িয়ে মীনাঙ্কীর থমকানো মুখের দিকে তাকিয়ে
হেসে বলল—নাম মধুম চ্যাটার্জী। দেখতে না'র মতই সুন্দর।
আর সব মায়ের কাছেই শুধু।

মীনাঙ্কীর অস্থমনস্ক চেহারাটার দিকে তাকিয়ে গৌরী দেবী
মেরেকে ডাকলেন—শুকু, চা তোস না তোর এখনও? তার পর
বললেন—সুহাসের ঐ পাগলামি, কথা নেই, বাদী নেই, হুহু কোন
কথা মনে পড়ে গেছে, সাথে সাথে মুখ গভীর, গলা ভারী। তুমি
কিছু মনে কোর না মীনাঙ্কী।

সত্যি ক'রে মীনাঙ্কী একটু মনঃসুর হ'য়েই পড়েছিল।
গৌরী দেবীর কথায় শুধু গলায় বলল—না, না, মনে করার কি
আছে? আমি যাকি শুধু ক'রে, ওপানেই চা খাব। সুহাসের
সামনের বামাকা দিচ্ছে ওপালে বারাদর। চোখের পেয়ালার
চুঁচু শব্দ কানে আসছে। মুখ ফিরিয়ে একবার স্তরার দিকে
তাকিয়ে আড়চোখে সুহাসের ফের দিকে তাকাল। তত্তপোশটার
উপর চিং হয়ে শুয়ে চোখের উপর আড়াআড়ি ভাবে হাত রেখে কি
ভাবছে। কি ভাবছে? মনের পুঙ্খটাই মুখের বেরিয়ে গেল, মূর্খ
পুলের সেই মনখাপটুকু আর নেই।

—কি ভাবছেন?

ধড়ধড় করে উঠে বসল সুহাস। ব্যগ্র-বাকুল গলার বলল
—শুনুন, শুনুন, এই মুহূর্তে আপনাকেই ডাকব ভাবছিলাম।
আর সুহাসের সেই গলার স্বরে চোখের ভাবায় মন্তমুগ্ধবৎ
দাঁড়িয়ে পড়ল মীনাঙ্কী। সেক্ষেত্রে যেন চেতনাই'ন হয়ে
পড়েছিল, তারপরেই নিজেকে যতটা সম্ভব দ্রুত করে তুলতে
চেষ্টা করল। বুকের উত্থান-পাতাল টেটকে দমন করে মুখ বাড়িয়ে
একটু হাসির ছোয়া তুলে বলল—হঠাৎ কি ব্যাপার বলুন ত? একটা
নিজের-বরে সুহাস তাকেই ডাকবে ভাবছিল। সেমছেও। সেও
ইতিমধ্যে চুকে পড়েছে। তবে কি অবাক কথা? বাক্য করবে
সুহাস? বুকের গুকপুকানি কিছুতেই ধামকে চলে না। 'তবু এসব
ক্ষেত্রে জোর করেই স্বাভাবিক হতে হয়। কাঁপা গলায় তাই মীনাঙ্কী
একটা হাহা ভাঙাই ব্যবহার করল—আমাকে আবার হঠাৎ ডাকবার
প্রয়োজন হোল কেন?

আর এ মুহূর্তে সত্যিই সুহাসের কোন কাণ্ডজ্ঞান ছিল না।
নইলে নীচের স্তরার একটা অপরিচিত যুগ্মী সহকে তার এই বেড়া
রস সঙ্কেত ও কি করে বলতে পারল—দেখুন, আপনার ছোট।

ভূতোদা ও বেলফুলের চারা

বিমল আর বিনয় মধুপুরে বেড়াতে এসেছে। সকালে তারা গেল ভূতোদার বাড়ী। গিয়ে দ্যাখে ভূতোদা গাট গাট করে বাগানে যত বেলফুলের চারা উপড়ে ফেলছেন আর নিজের মনেই গজগজ করছেন—

“তিনমাস ধরে জল দিছি আর মাটি কোপাছি কিন্তু ফুলের নাম নেই। দরকার নেই আমার এমন গাছে। বিমল হস্ত দস্ত হয়ে পৌড়ে এল—

“আহা হা করছেন কি ভূতোদা।”

ভূতোদা : “করব না তো কি?”

বিনয় : দোষ তো আপনায়ই। এ শক্ত মাটিতে কি শুধু জল দিলেই গাছ বাড়ে?

ভূতোদা : তার মানে!

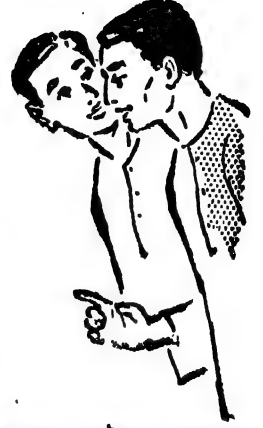
বিনয় : তার মানে মাটিতে

সার মেলান দেখবেন গাছ

চড়চড় করে বাড়বে। এখানকার মাটিতে সসকল ফসল কিনা।

ভূতোদা (অবিশ্বাসের সঙ্গে) : হ্যা : যতসব কলকাতার ছোকরা আমার বাগান করা শিখিও না।

বিমল : সে কি ভূতোদা? গাছ যে মাহুঘেরই মত, সার জল, আলো এগুলো গাছের খাবার। মাহুঘের যেমন পুষ্টির খাবার খেলে শরীর ভাল হয় গাছেরও তেমনি!



ভুতোদা : বাঃ বাঃ তোদের কাছে পুষ্টি মানে হচ্ছে গাছের জন্যে সার আর মানুষের জন্যে 'ডালডা'।

বিনয় : নিশ্চই—জানেন আজ লক্ষ লক্ষ পরিবার নিয়মিত 'ডালডা' ব্যবহার করছে ?

ভুতোদা : তাই বলেই কি আমার মানতে হবে যে 'ডালডা' প্রাকৃতিক খাবারের মতনই ভাল ?

বিনয় : নিশ্চই ! আপনাকে এবং আপনার মত আর সবাইকে একদিন মানতেই হবে এ কথা ! তবে কিছু সময় লাগবে। পূর্বনো বিদ্যাস ভাঙতে একটু সময় লাগে। আর আমাদের রান্নায় বনস্পতির ব্যবহার তো সেই দিন আরম্ভ হোল।

বিমল : 'ডালডা' মাত্র ৩২ বছর হোল আমাদের বাজারে এসেছে। অনেকের ধারণা যে তৈরী করা খাবার সবসময় যেসব খাবার স্বাভাবিকভাবে পাওয়া যায় তার তুলনায় অনেক কম পুষ্টির।

ভুতোদা : কিন্তু সে ধারণা কি সত্যি নয় ?

বিমল : মোটেই নয়। বাজারে সবচেয়ে জনপ্রিয় বনস্পতি 'ডালডার' কথাই ধরুন না। এ কথা সত্যি যে 'ডালডা' তৈরী হয় বিশুদ্ধ ভেষজ তেল থেকে—যে কেউ পিয়ে দেখতে পারে 'ডালডা' কি তাতে তৈরী হয়।

বিনয় : আর এ কথাও সত্যি যে 'ডালডায়' যে পরিমাণ শরীরের পক্ষে অপরিহার্য ভিটামিন 'এ' এবং 'ডি' যোগ করা হয় তা অধিকাংশ সাধারণ 'প্রাকৃতিক' খাদ্যের সমান বা বেশীও।

ভুতোদা : দাঁড়াও, দাঁড়াও। ব্যাপারটা আরও খোলসা করে বল। 'ডালডা' তৈরী করার সময় খাদ্যগুণ কি একেবারেই নষ্ট হয় না বলতে চাও।

বিনয় : একটুও না। পুষ্টি বিষয়দেবী প্রমাণ করেছেন যেসব তেল থেকে 'ডালডা' তৈরী হয় সেগুলিতে তৈরীর সময়ও শক্তিদায়ী গুণগুলি পুরোপুরি বজায় থাকে। নতুন রান্নাবেন 'ডালডা' তৈরী হয় কড়া সরকারী নির্দেশ অমুখ্যায়ী। ভারত সরকারের নিখুঁত তদন্ত কমিটি বনস্পতি

ভালভাবে পরখ করে দেখেছেন। তাঁরা দেখেছেন যে বনস্পতি শুধু যে শরীরের পক্ষে কৃত্রিম নয় তাই না বনস্পতি শরীরের পক্ষে ভাল।

ভুতোদা : আচ্ছা আচ্ছা, সে তো বুঝলাম। কিন্তু আমার বাড়ীতে যে 'ডালডা' দিয়ে রান্নাবান্না হয় সেটাও সে বিশুদ্ধ আর পুষ্টির হবে তার কি নানে আছে ?

বিমল : আপনি যেখানেই থাকুন না 'ডালডা' আপনি কিনতে পাবেন একমাত্র শীলকরা টিনে যাতে ভেজাল বা ছোঁয়াচের কোল আশঙ্কা থাকেনা।

বিনয় : তাছাড়া 'ডালডা' তৈরীর সময় হাত দিয়ে ছোঁওয়া হয় না। 'ডালডা'র পেছনে রয়েছে তারতর্ষে সুপ্রতিষ্ঠিত একটি কোম্পানীর অঙ্গীকার যে 'ডালডা'র সম্বন্ধে যা কিছু বলা হয় তার সবই সত্যি—যে 'ডালডা' একটি উৎকৃষ্ট রান্নার স্নেহপদার্থ যাতে যোগ করা হয় স্বাস্থ্যদায়ী ভিটামিন।

বিমল : এর পরেও কি ছুল ধারণা থাকতে পারে ?

ভুতোদা : কে বলেছে আমার ছুল ধারণা ছিল ? আমার বাড়ীর সব রান্নাবান্নাই 'ডালডায়' হয়। ওরে হরি আজ বাজার থেকে বেলফুলের চারাগুলোর জন্যে একটু সার আনিস তো।



হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, বোম্বাই।

বোনকে একবার আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন। মানে, এই একটু বুঝিয়ে দেখতাম, আর যদি রাজী হয় আমি নিজে বস্তু নিয়ে পড়িয়ে ওকে যেমন কোরে তোক প্রয়োজন পাইয়ে দিতামই দিতাম। একটা উদ্ভূতের বোঁকে নিজেকে এমনি ভাবে উদ্ভূত কোরে দিয়ে ভারী লজ্জার পড়ে গেল সে। হি, হি, তার এই বাগ্ন মনোভাবকে যে কেউ একটা মানে হিসেবেই নেবে। আত্ম-আমতা গলায় ভারী বিব্রত হয়ে বলল—মানে, ছেলেমানুষ, এ বয়সে লেখাপড়া ছেড়ে কয়েকই বা কি, তাই একটু বুঝিয়ে দেখতাম, এ কথাটুকু যে আরো বোনান হোল, উপলব্ধি করে একেবারে ভীষণ অপ্রস্তুত পড়ে গেল। সত্যিই ত বাপ, মা, দিদি যেখানে হার মেনে গেল, সেখানে সে একজন অপরিচিত হয়ে কি বোঝাবে?

খেমে খেমে মীনাঙ্কী উজ্জ্বল করল—আপনি এনাকে পড়াবেন? একটা চোখবোজা অন্ধকারকে যেন আন্তে আন্তে ছুঁতে পারছে মীনাঙ্কী। কিন্তু কি আশ্চর্য, এ-ও কি সম্ভব? শুধু মাত্র দুটি ছুঁইয়ে দুটো পরস্পর-বিবোধী মনের এমনি যোগাযোগ। এনাঙ্কীর মনটাকে একটু একটু যেন বুঝতে পারছিল সে। একটা সহজ সরল মেয়েলী মনকে বুঝতে খুব কষ্টকর নয় অল্প একটি মেয়ের কাছে। কিন্তু সূতাস? এ তার ধারণার অতীত ছিল, আর তাইত সে নিজেকে সূতাসের সঙ্গে জড়িয়ে কত মধুর কল্পনা কত রসিন স্বপ্নে বিভোর হয়ে ছিল। ইচ্ছন বোগাছিল সূতাস।

একজোড়া দুটির সামনে এনাঙ্কী যে নিজেকে কত পরিবর্তিত করে ফেলছে, সব লক্ষ্য করেছে সে। মনে মনে হেসেছে। মেয়েদের এই হঠাৎ বড় হওয়ার উপলব্ধিটা যেন লজ্জাবতী লতার মত। একটুতেই বুকে, কঁকড়ে আসে। অমন দুর্দান্ত মেয়েটা সূতাসের দুটির সামনে যেন এতটুকু হয়ে যায়। বুঁকে-পড়া সূতাসের চোখে কত সময় তিরস্কার, কত সময় কৌতুক, কত সময় অহুঃবাগ, অহুরোধ, কোন সময় বা স্নেহ মজা উপভোগ করা সব লক্ষ্য এসেছে তার এনাঙ্কীর দুটি অমুগরণ করেই। কিন্তু কৈ, কোন দিন সে চোখে অহুঃবাগ দেখেছে বলে ত স্মরণ হচ্ছে না? কিংবা হয়ত তারই চোখের ভুল, থাকে সে অহুঃবাগ, অহুরোধ বলে ভেবেছে, অহুঃবাগে তাই ভরে উঠেছিল। শুধু বার ভরে সেই বুঝেছে, অজ্ঞে কি এর বুঝবে, তারই মত অল্প মানে করে ভুল বুঝবে।

অনেকক্ষণ পরে কথাটাকে শেষ করল মীনাঙ্কী—দেখুন বুঝিয়ে, আমরা ত হার মেনে গেলাম। রাজী যদি করতে পারেন, সত্যিই একটা অসাধ্য সাধন করবেন। আড়চোখে সূতাসের লজ্জিত বিব্রত চেহারাটার দিকে তাকিয়ে ঘর ছেড়ে বাইরে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে নিজের মনকে ছুঁতে চাইল মীনাঙ্কী, কিন্তু কোন কিছুই উপলব্ধি করতে পারছে না। দুঃখ না, আনন্দ না আশাভঙ্গ কিছুই নয়, শুধু যেন বিখলোড়া একটা প্রকাণ্ড বিষয়ে হতবাক হয়ে গেছে।

ও-সরে এনাঙ্কী কাপড় কুঁচিয়ে রাখছিল আলনার। মলিনা দেবী বাবাশ্বার বলে ছোট মেয়ে মুগ্ধিক জামা পরিয়ে দিচ্ছিলেন, মীনাঙ্কী দেখে বললেন—কলেজ থেকে এসেই অমনি ওপরে ছুটেছিল। নে, দুখ-ভাত বুয়ে নে, এনা চা করে দিক।

মীনা সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে মায়ের গা বেঁধে এসে দল। আহুয়ে গলায় বলল—তুমি আজকাল এনাকে বেশি

ভালবাসছ মা। কেন? লক্ষ্মী মেয়ে বলে? প্রথম সন্তান মীনাঙ্কীর উপর মা বাবা উত্তরবই টানটা বেশি। বড় হয়েও তাই আমার আকারে ছোট ভাইবোনদের সে ছাড়িয়ে যায়।

মেয়ের কথায় হেসে ফেললেন মলিনা দেবী। মীনার দিকে তাকিয়ে বললেন—সত্যি, ছোটবেলার তুই ছিলি শান্ত-শিষ্ট, এনা একটা ডাকাতি। বড় হোয়ে দুজনেই উন্টো হয়ে গেছিল। বৃত্ত বড় হচ্ছিল তোর চকসতা আরো বাড়ছে আর এনা তোর ছোটবেলার স্বভাবটা পাচ্ছে। মায়ের কথায় হেসে গড়িয়ে পড়ল মীনাঙ্কী।—আচ্ছা মা, আমি ত ছোটবেলার বোকা ছিলুম, কিছু বুঝতুম না, তাই চূপচাপ থাকতুম, বড় বৃত্ত হোতে থাকলাম একটু একটু বুদ্ধি পাকতে আরম্ভ করল, চকসতাও বাড়ল। কিন্তু তোমার ঐ বুদ্ধিতে পরিপূর্ণ ডাকাতি মেয়েটা হঠাৎ এমন শান্ত-শিষ্ট হয়ে উঠল কেন বলত?

ছোট মেয়ের মুখে পাউডারের পাক বুলোতে বুলোতে মলিনা দেবী বললেন—তোর বৃত্ত পাগলামি কথা। বড় হওয়ার সাথে সাথে ও নিজে থেকেই হয়, ছোট মেয়েকে ছেড়ে দিয়ে উঠলেন এবার। মীনাঙ্কী স্বাকার দিয়ে উঠল—ছাই জান তুমি। তাহোলে ত আমার আরো শান্ত-শিষ্ট আরো লক্ষ্মী হওয়া উচিত ছিল, হয়েছি? তারপর উঠে গিয়ে এনার হাত থেকে কাপড় কেড়ে নিয়ে টানতে টানতে তাকে বাবাশ্বার নিয়ে এলা। মা'র দিকে ফিরে বলল—এনাকে জিজ্ঞেস কর না। হঠাৎ ও তার শান্ত-শিষ্ট মেয়ে হয়ে উঠল কেন?

এনা খতমত গলায় বলল—বা রে, এ সব কি হচ্ছে? ছাড় কাপড় ছাড়, কাজ করতে দেবে না?

রাখ তোর কাজ। হঠাৎ অত শান্ত-শিষ্ট লেজবিশিষ্ট হয়ে উঠলি কেন তাই বল আগে?

ভুল কুঁকে এনাঙ্কী বলল—এ আবার একটা প্রশ্ন না কি? এর কোন উত্তর আছে? থাকলে মা বা বলেছেন ঐ উত্তর। সবাই ত এক ছাঁচে ঢালা নয়। সাধারণ মেয়েরা বড় হওয়ার সাথে সাথে নিজে থেকেই সংবৃত হয়।

ভেড়ে উঠল মীনাঙ্কী—তার মানে আমি অসংবৃত? মা'রখানো মলিনা দেবী বাধা দিলেন—কি পাগলামি আরম্ভ করেছিল বলত? শুধু-শুধু বগড়া করছিল মীনা, হয়েছে কি তোর?

রহস্তভরা গলায় মীনাঙ্কী বলে উঠল—হঁ, হঁ, বাবা আমার চোখে কঁকি দিবি তুই?

মলিনা দেবী এবার উঠে দাঁড়ালেন, পা বাড়িয়ে বললেন—সর, বাই, কলেজ থেকে এসে হাত-মুখ বুয়ে চা-খাবার না খেয়ে বাজে বকতে আরম্ভ করেছিল! সর দেখি, চায়ের জল চাশিয়ে আসি। মায়ের হাত ধরে কের বসিয়ে দিল মীনাঙ্কী। স্পষ্ট করে বলল—তোমার দস্তি মেয়েকে লক্ষ্মী করেছে ঐ ওপরতলার সূতাস।

মলিনা দেবী এবার হেসে ফেললেন—কি যে মাথাবুড় বকিস ছাই, কোন কথার যদি কোন মানে থাকে! তাছাড়া ওদের সাথে কি বিচ্ছিন্ন ব্যবহার করেছে এনা, চিন্তা করলে এখনো লজ্জার আমার মাথা কাটা যায়।

এবার হেসে গড়িয়ে পড়ল মীনাঙ্কী—সত্যি মা, সত্যি।

আজ্ঞা এনােকই জিজ্ঞেস কর। তারপর এনার দিকে তাকিয়ে চোখ পাকিয়ে বলল—এই এনা, মিথ্যা বলবি মা।

এতদূর হাতের কাজ বন্ধ করে দিদির কথাই শুনছিল এনাকী। এবার মায়ের কাছ থেকে এসে বলল। সহজ সোজা পথই জানে সে। সত্যিই ত এ বিষয়ে তার নিজের ত কোন সন্দেহ নেই? তবে আর বলতে বাধা কি? কিন্তু আশ্চর্য! দিদিও লজ্জা করে এসেছে বরাবর। হেসে বলল—সত্যি মা, ভারী আশ্চর্য! ভুল্ললোক সর্বদা একজোড়া দৃষ্টি দিয়ে যেন আমার শাসন করছেন। ইদানীং বখনই বগড়াঝাটি করে কিংবা অকারণে চোঁচামেচি করে, তপু দিপুনের মায়ের করেছি হঠাৎ ওপর দিকে চোখ পড়ে, সাথে সাথে ভারী লজ্জা পেয়ে গেছি মা! ছেলেটি যেন চোখ দিয়ে তিরস্কার করছে। অনেক সময় ঘোঁও দেখেছি চোখে। অদ্ভুত মা, চোখ দিয়ে কেউ ঘোঁ ছোটোতে পারে?

মলিনা দেবী এনাকীর আলগা চুলগুলোকে একটা উঁচু করে খোঁপা বেঁধে দিলেন। হেসে বললেন—একটা কথা মনে পড়ে গেল।

তারপর মীনাকীর দিকে তাকিয়ে বললেন—তোর ছেলেবেলার কথা।

এনাকী মীনাকী চোখ নাচিয়ে বলল—কি মা কি? মার মুখে তাদের ছোটবেলার কথা শুনে কি যে আনন্দ!

মলিনা দেবী বললেন—মীনা, তুই তখন বছর পাঁচেকের। একটা কাচের গ্লাস ভেঙ্গে কাচুমাচু মুখে ঝাঁড়িয়েছিলি। উনি চোখ গরম করে তাকাত্তেই আমার কাছে কান্ডাতে কান্ডাতে নালিশ জানালি মা, বাবা আমাকে মেরেছে। উনি ওদিক থেকে আদর করে বললেন কি দিয়ে মেরেছি মা মণি তোমাকে?

মীনার দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন—তুই বললি, চোখ দিয়ে মেরেছ ত তুমি আমাকে।

উজ্জ্বলিত হোয়ে হেসে উঠল সবাই। হাসি খামিয়ে মীনাকী এক সময় ছাড়া গলায় বলল—হ্যাঁ ভাল কথা, তুলেই গিয়েছিলাম। এনা, তোকে একবার ওপরতলার সুহাসদা ডেকেছিল, শুনে আসিস।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। বারান্দার সুহাস ডেক-চেয়ারটার গা এলিয়ে পড়ে ছিল। কাল শুনার মুখে একটা খবর শুনে বিষয়ে একেবারে হতবাক হয়ে গেছে সে। নিজের মন আর দৃষ্টি দুটোকেই যেন ছুঁতে পারছে না। মন বা চার দৃষ্টিতে ঠিক তার উল্টোটা ফুটে উঠতে পারে? সে কি করে সম্ভব? শুদ্ধা বলেছে এনাকী নাকি তার চোখে তিরস্কার ফুটে উঠতে দেখেছে, ঘৃণা করতে দেখেছে, তাই সে তার পূর্ব-স্বভাব আস্তে আস্তে বদলাতে চেষ্টা করেছে। বলেছে নাকি একজোড়া দৃষ্টি যদি অহরহ এমনি অঙ্গসরণ করতে থাকে কি রকম অস্বাভাবিক লাগে বলুন ত শুকুদি! বুঝি আপনার দাদা আমার ভালর জন্য অমনি করছেন, তবে সেটা অনেক দেরিতে বুঝছি আগে ত কত গালাগালি করেছি আপনার দাদাকে। মনে মনে হাসল সুহাস। কি সব অবচেতন মন-টন আছে, তাইতেই বোধ করি খারাপটা খারাপই লেগেছে। মনে বখন হয়েছে এইতেই ওকে মানায়, অবচেতন মন হয়ত এখন বলেছে না, ওকে ভাল মুঁকেই টানতে হবে। আর তাইতেই চোখের ভাবার সেই ছায়াই

পড়েছে। কি সব মনস্তত্ত্ব ব্যাপার। ও সব ছেড়ে দেওয়ারই ভাল। তবে এটা ঠিক, ওর ভাল ভাবতে নিজের ভাল লাগে। আর তাইতেই ত এনাকীর লেখাপড়া ছেড়ে দেওয়ার সংবাদে অতটা বিচলিত হয়ে পড়েছিল।

কানে এলো অতি সুস্থ গলা—শুকুদি, আপনার দাদা নাকি আমার ডেকেছেন? কেন?

শুকুর অবাক গলা শুনল—সে কি? দাদা তবু শুধু তোকে ডাকতে বাবে কেন?

একটা হাসির বলক কানে এলো সুহাসের—আমিও ত তাই বলি, হঠাৎ কিসের তলব?

বিড়-বিড় শুনল সুহাস—দাদা ত মোটে তোকে ডেকেই না, কি জানি, আর এই বারান্দায়ই আছে।

চোখ বুজে মনে মনে ভারী আনন্দ উপলব্ধি করছিল। শুদ্ধা বলল—দাদা, তুমি নাকি এনাকে ডেকে পাঠিয়েছ?

হ্যাঁ এসেছে নাকি?

এনাকী এক পা এগিয়ে এসে সামনের চেয়ারটার হাতলে হাত রাখল—হ্যাঁ। আমি এসেছি। কোথাও আড়ম্বর্তা কিংবা স্বাভাবিক যুবতী-সুন্দর লজ্জা দেখল না সুহাস এনাকীর কথায় কিংবা চেহারা। এ মেয়েই কি ইদানীং চোখে চোখ তুলে পরাস্ত তাকাত্তে পারত না? নিজের ডেকচেয়ারটা পেছনে ঠেলে সামনের চেয়ারটা

কলিকাতায় এই সর্বপ্রথম

আর্যের 'স্লাইসড ব্রেড'



- কলে প্রস্তুত
- ইন্ডিয়ান স্কো
- মোসিনে প্যাক
- ও ফালি করা

আপনার স্বাস্থ্য, তৃপ্তি ও সর্বত্র রক্ষা করিতে

আর্য বেকারি অ্যান্ড কনফেকশনারী

কলিকতা - ২৯

দেখিয়ে বাল—বোস। তারপর গুরুর অধিক চাউনির দিকে তাকিয়ে তরল গলায় বলল—বাড়ীতে এক জন মাজগণ্য অতিথি এলো, এক কাপ চা খাওয়াই না ?

এনাকী হাত তুলে বাধা দিল—না, মা, শুকুপি! চা আমি বেশি খাই না। তার পর সোজা স্নাহাসের মুখের দিকে চোখ রেখে—কিন্তু আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না, কেন আমার ভেবেছিলেন। বলছি। লেখাপড়া ছেড়ে দিচ্ছ কেন ?

সুপ্রা তখনও দাঁড়িয়ে ছিল। আশ্চর্য্য হ'য়ে ভাবছিল, হ'লন অপরিচিত মানুষ ঠিক এমনি ভাবে, এমনি ভঙ্গিতে, এমনি বিষয়ে কি ক'বে কথা বলতে পারে! যে জানে, নয় ত যে কেউ ওদের চোখ-মুখ দেখে কিছুতেই বিশ্বাস করবে না ওরা আজই প্রথম বুঝাশুখী হোল। বলতে গেলে প্রথম পরিচয়। আচমকা চায়ের কথটা মনে হোল। ঠিক। তা ছাড়া দাদাটা এনাকীর মুখের দিকে এমন ভাবে তাকিয়ে আছে, কেমন জানি অব্যোহাতি লাগতে লাগল। বুকে পা বাড়িয়ে বলল—তখন থেকে দাঁড়িয়ে কথা বলছ, বোস না।

বসার ইচ্ছে থাকলে কারো অস্বাভাবিক অপেক্ষা না করে নিজেই বলত সে। আর মা বসবে যদি, তবে কারো কথাতেই নয়। সেটুকু বুকে হাসল স্নাহাস। কিন্তু হেসে বলল—লেখাপড়া ছাড়ছ কেন ?

অল্প শব্দ করে এনাকীও হেসে উঠল—ভারী আশ্চর্য্য ত। আমার লেখাপড়া নিয়ে আপনি দেখছি ভারী চিন্তিত। তা ছাড়া দেখলেন ত, একই ক্লাসে পড়ে আছি তিন বছর। ভাল লাগে ?

স্নাহাস এবার অভিভাবকের সুর টেনে আনল গলায়—তাতে কি হয়েছে। সবাই মেধা ত এক নয়। পড়া। পড়া রেড় না। টোন্টের কোণার হাসিটা তখনও মিলোরনি, এনাকী চোখ মামিয়ে মেয়ের দিকে তাকাল—বাবা, মা, দিদিদের মত আপনিও নিশ্চয়ই আমার ভাল চাইছেন, কিন্তু তাদের যেমন নিরাশ করেছি, আপনাকেও তেমনি হতাশ করতে হচ্ছে। চেষ্টা ত করলাম, ও হবার নয়। ও পাট তুলেই দিলাম।

চেষ্টার ছেড়ে উঠে পড়ল স্নাহাস—আমার কথা শোন এনা। এত বুদ্ধিমতী মেয়ে হয়ে এটুকু বোঝ না, আজকালকার দিনে লেখাপড়াটা কত দরকারী। লক্ষীটি। পড়া ছেড়ে না। আমি তোমায় পড়াব। আর শুধু পড়ান নয়, গায়ান্টি দিয়ে পাশ করাওই করা। রাখবে আমার মাঠার ? রাখবে ?

এমন লক্ষীটি ? হঠাৎ কেমন বুক বড়কড় করে স্নাহাসের চোখ-মুখে ভাবার কোনখানেই আর সংযত ভাব দেখছিল না সে। দুটো মিনতি-মাধান চোখ নিয়ে বেন ভিক্টরের মত হাত পেতে দাঁড়িয়েছে। ও দুটো চোখের দিকে আবার চোখ তুলে তাকানর সাথি নেই আর এনাকীর। বুকুর উত্থান-পাখাল ঢেউকে কণ্ঠে দমন করল সে, অসুট বুকে শুধু বলতে পারল—আমি এবার বাই।

বুহুর্ন্তে চোখের দুটি পাশে গেল স্নাহাসের। তরল গলায় বলল—মা বাবে না। আমার কথার উত্তর দিয়ে বাও।

তার পর হঠাৎ এনাকীর দিকে তাকিয়ে মমতার ভয়ে উঠল মন। যেচরী মুখ তুলে তাকাতো পথন্ত পাচ্ছে না, থর-থর কাঁপা হাতটা পিঠের দিকে ছড়িয়ে দিয়ে আঁচলটা টেনে আনল সামনে। এক মুহূর্ত চোখ তুলেই নামিয়ে নিল, তার পর আবার বুকে বলল—আমি ভেবে দেখি। একটু আগেও সহজ, স্বচ্ছল ছিল। বোঁকের মাথার আবেগের তড়নায় অমন করে নিজেকে প্রকাশ করে ফেলা মোটেই উচিত হয়নি। এখন একটা বাণবিদ্ধা হৃদয়ের মতই ছটফট করছে এনাকী। তার চোখের আড়াল হোতে পারলে বেন বাঁচ।

মায়া হোল স্নাহাসের। হেসে বলল—আচ্ছা বেশ, ভেবেই বোল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে নিজেকে ধরে রাখতে পারল না।

আন্তে ডাকল—এনা! এনাকী ধমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। আবার কি বলবে স্নাহাস ? এর পরে ও কি আর বলবে ? আর বেশি শুনতে তার যে পা কাঁপছে, চোখ ঠেলে কান্না আসছে। না, না, আর সে শুনতে চায় না। মত ত সে জানিয়েছে। আবার কি ? সে কি তার চোখের ভাবার আজো তার মনকে বোঝেনি ?

কোন কথা নয়, স্নাহাস এগিয়ে এসে এবার এনাকীর হুটা দুটি চেপে ধরল। আবেগ-কাঁপা গলায় বলল—নিজের মনকে ছুঁয়েছ এনা ? এত কাল আমার চোখ দিয়ে তুমি নিজেকে চিনেছ, এবার তোমার চোখ দিয়ে আমার চিনে নাও।

হঠাৎ পারের লক্ষে তুলেই চমকে উঠেছে। স্নাহাস চমকে হাত ছেড়ে দিয়েছে। পর্দার ওপাশে সুপ্রা চায়ের কাপ নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। এনাকী একটা বড়ের মতই পাশ কাটিয়ে ছুটে গেল। স্নাহাস বলছে—আরে চা-টা খেয়ে বাও।

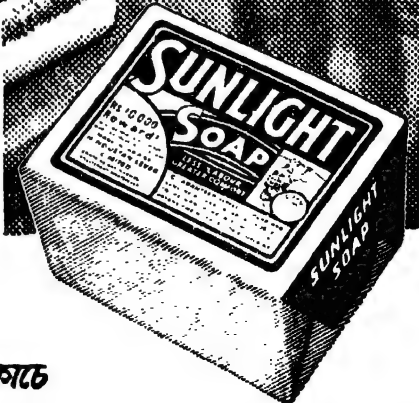
কিন্তু এনাকী ততক্ষণে উঠাও! অদম্য এ প্রাণবতাকে কি দিয়ে ধরবে এনাকী ? বড়ের দাপট একটা রুদ্ধ ঘরের সব কিছু বেন উলোট-পালোট ক'রে দিয়ে গিয়েছে 'তার। ভাষা নয়, ভঙ্গি নয়, শুধু মাত্র দুটি দিয়ে একজন তাকে তার মনের মত তৈরী ক'রে তারপর ভিক্টরের নীনতা নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। সে কি জানে না এনাকী তারই উপযুক্ত হোতে চেষ্টা করেছে এত কাল ? আশ্চর্য্য। এনাকী নিজে কি জানত ? আজ এ মুহূর্তের আগে ? না জানত না। না কি মনে মনে জানত নিজেকে, চিনত। কে জানে! এখন সে চিনেছে, এখন যে জেনেছে সে ত মিথ্যে নয়। একটা বঙ্গী প্রজাপতির মতই বেন উড়তে উড়তে এসে দাঁড়াল রান্নাঘরের ছরোরে। হ' হাত হ' দরজার কাছে রেখে কেমন লজ্জা-লজ্জা সুরে বলল—না মা! লেখাপড়া বাদ দেওয়াটা কোন কাজের কথা নয়। চেষ্টা করতে দোষ কি ? কাল থেকে তুলেই বাই। পড়াশোনাতে লজ্জা কি মা।

“লোকে বলে, এই ত দুমিয়া। কিন্তু এই কি যুক্তি। পৃথিবী কি শুধু অতীতের জন্ত। মানুষ কি কেবল তাহার পুরাতন সংস্কার লইয়া অচল হইয়া থাকিবে। নূতন কিছু কি সে করনা করিবে না। উন্নতি করা কি তাহার শেষ হইয়া গেছে। বাহা বিগত তাহা মৃত, কেবল তাহারই ইচ্ছা, তাহারই বিধান মানুষের সকল ভবিষ্যৎ, সকল জীবন সকল বড় হওয়ার দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া চিরকাল ধরিয়া প্রভুত্ব করিতে থাকিবে।”—শরৎচন্দ্র।

একটু সানলাইটেই অনেক জামাকাপড় কাচা যায় -সানলাইটের অতিরিক্ত ফোণাই এর কারণ



ছোট বিজয়দ্রষ্ট্রি আরম্ভ করেছে—বাবার সার্ট পরে খুব মজা পাচ্ছে ও। কিন্তু সার্টটি কি পরিষ্কার দেখুন, যেন অকলক করছে—মায়ের সানলাইট দিয়ে কাচা অন্যান্য সব জামাকাপড়ের মতই। একবার এই জামাকাপড়, বিছানার, চাদর, তোয়ালের গাদাটির দিকে দেখুন। এগুলি কাচা হয়েছে একটুখানি সানলাইটেই। সানলাইটের মোলায়েম অতিরিক্ত ফোণা এত পরিষ্কার করে—আর বিনা আছাড়েই প্রতিটি ময়লার কণা বার করে দেয়।



সানলাইট সাবান জামাকাপড়কে সাদা ও উজ্জ্বল করে কাচে



[Osamu Dazai's "THE SETTING SUN"-এর অনুবাদ]

প্রথম অধ্যায়

সাপ

অসুখ কান্তরোক্ত কানে এস। এই তো মা খাবার ঘরে বসে নুপ খাচ্ছিলেন, এরই মধ্যে কি হ'ল আবার? নুপে কিছু পড়েছে ভেবে জিজ্ঞেস করলাম—চল?

না, বলে মা নির্বিকার ভাবে আর এক চামচ নুপ মুখে দিলেন। সেটুকু শেষ হ'লে বাড় কাৎ করে বাগ্নাঘরের জানালার ভেতর দিয়ে বাইরে ঢেরী গাছটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন এবং ঐ অবস্থায় আরও এক চামচ নুপ ঠোঁটের কঁকে চালান করে দিলেন। 'মহিলা-পত্রিকা'র বহুবর্ষিত নুপ খাওয়ার পদ্ধতি হ'তে সম্পূর্ণ ভিন্ন যে প্রথার মা নুপ খান, তাকে পাখীর ডানা ঝাপটানোর সঙ্গে তুলনা করলে ভুল হবে না।

আমার ছোট ভাই 'নাগজি' একদিন রঙের মাখার বলেছিল—মায়ের সঙ্গে খেতাব জোড়া থাকলেই কিছু আর অভিজাত হওয়া যায় না। প্রকৃতিদত্ত একখানি মাত্র সজ্জা নিয়েও বহু লোক যথেষ্ট মজিত হয়, আবার আমাদের মত অনেকে খেতাবমাত্র সখল করে চণালেরও অধম বনে গেছি। যেমন ঘর ইরানীমাকে (ওর ইসুদের এক সহপাঠী কাউন্ট) দেখে রাজ্যের যে কোন দালালের

চেয়েও বেশী অশ্রীল লাগে কি না? হতভাগা তাঁর কোন আশীয়েই বিয়েতে মার্কিনী ডিনার জ্যাকেট পরে এসেছিল। পোষাকটার যদি বা কোন অর্থ পাওয়া যায়, কিন্তু খাবার টেবিলে সে যেভাবে ভারী ভারী শব্দের ধাঁধা তৈরী করে বক্তৃতা চালানো, তাতে আমার রীতিমত গা ঘুঁষিয়ে উঠছিল। এই জাতীয় সত্তা বাহাহুরির সঙ্গে সংস্কৃতির কোন সম্পর্ক নেই। ইউনিভারসিটি ঘিরে যেমন "উচ্চ শ্রেণীর নিবাসে"র হুড়াহুড়ি, অভিজাত বলতে তেমন "উঁচুদের ভিখারীর" দলকে বোঝায়। যথার্থ নীল রক্ত বাদে গায়ে আছে, তারা ইরানীমার মত হামবড়াই করে না। আমাদের পরিবারে একমাত্র মা হলেন খাঁটি সোনা। তাঁর মধ্যে একটা কিছু আছে, যা আমাদের নাগালের বাইরে।

নুপ খাওয়ার ব্যাপারটাই ঘরা বাক না কেন? আমরা শিখেছি প্লেটের ওপর ঈষৎ ঝুঁকে, চামচটাকে কাৎ করে নুপে ডুবিয়ে মুখে তুলতে। মা কিন্তু মাখা খাড়া দেখে, সোজা হয়ে বসে বা হাতের আঙ্গুলগুলি টেবিলে ভর দিয়ে প্লেটের দিকে না তাকিয়েই নুপ খান। এত দ্রুত ও পরিচ্ছন্ন ভাবে মা চামচে নুপ তোলেন যে, পাখীর ঠোঁটের সঙ্গে দিখি তার তুলনা চলে। চামচটাকে মুখের আড়াআড়ি করে আলগোছে ঠোঁটের ভেতর তরল পদার্থটিকে চালিয়ে দেন। তারপর চাবিদিকে আনমনা দৃষ্টি বুলিয়ে পাখীর ডানা ঝাপটানোর মত চামচটাকে ফট-ফট করে ঝেড়ে নেন। আশ্চর্যের কথা এই যে, এক কৌণ্টা নুপও বাইরে পড়ে না; চুপু দেখার শব্দ তো হয়ই না, এমন কি প্লেটের ওপর চামচ নাড়িয়ে রাখার শব্দও হয় না। হৃদয় তথাকথিত ভদ্রসমাজের নির্দিষ্ট চাল-এর সঙ্গে মায়ের নুপ খাওয়ার ধরণটুকু মেলে না, কিন্তু আমার কাছে এর মূল্য কম নয়। এটুকুই যেন সবচেয়ে খাঁটি মনে হয়। বাস্তবিক প্লেটের ওপর ঝুঁকে পড়ে খাওয়ার চেয়ে মায়ের মত সোজা বসে খেলে নুপটাতে যেন অনেক বেশী স্বাদ পাওয়া যায়। কিন্তু নাগজির ভাবার উঁচুদের ভিখারী হওয়ার দরুণ মায়ের মত অনায়াসে নুপ খাওয়া আমার হয়ে ওঠে না। ভদ্র সমাজের চলতি বেওয়ারজ মত গোমড়া মুখ প্লেটের ওপর ঝুঁকিয়েই খাই।

সাধারণতঃ টেবিল-ভদ্রতা বলতে বা বোঝায়, শুধু নুপ কেন, বাবতীর আহাৰ্যের প্রতি মায়ের উজীটাই তার থেকে আলাদা। মাংস পাতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছুরি-কাঁটার সাহায্যে ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নেন, তারপর কাঁটাটিকে ডান হাতে নিয়ে খুশি মনে একটির পর একটি টুকরোর সন্ধ্যাবহার করেন। খাবার আমরা যখন শব্দ না করে যুরগীর হাড় থেকে মাংস ছাড়াতো হিম্মিন্ খাচ্ছি, ততক্ষণে মা দিখি নির্বিকার ভাবে হাড়টি হাতে তুলে নিয়ে মাংসতে কামড় বসান। এ ধরনের অভ্যাস আচরণ কেবল যে ভাল লাগে তা নয়, কেমন যেন প্রীতির উদ্বেক করে। নির্ভেজাল পদার্থ অন্তরকম হতে বাধ্য।

আমি অনেক সময়ে ভেবেছি যে, আঙ্গুল দিয়ে খেলে খাবারের স্বাদ বেশী ভাল লাগবে, কিন্তু খাই না, কারণ আমার মত উঁচুদের ভিখারী মায়ের নকল করতে গেলে আসল ভিখারীর মত দেখাবে।

আমার ভাই নাগজি বলে, মায়ের সঙ্গে আমাদের কোন তুলনাই হয় না। মাকে মাকে নকল করতে গিয়ে নাকাল হয়েছি। একথাও ঠিক। একবার শরৎকালে আমাদের নিশিকান্তা স্ট্রিটের বাড়ীতে অপূর্ণ জ্যোৎস্না রাতে মা আর আমি বাগানের মধ্যে

পুত্রপাড়ের আটটালার বসে টাকের শোভা দেখছিলাম। হঠাৎ মা কাছাকাছি একটা প্রস্তুতি পুস্পবাড়ের কাছে গিয়ে সাধা সাধা ফুলের মধ্যে থেকে হাসতে হাসতে আমার ডাক দিলেন—

কাজুকা, বসতো তোমার মা এখন কি করছেন?

ফুল তুলছেন।

মা এবার গলা ছেড়ে হেসে উঠলেন, হ', হ'!

আমি অল্পভব করসাম তাঁর মধ্যে প্রভা করার মত এমন একটি খাঁটি বস্তু আছে, বার অনুকরণ করা অসম্ভব।

সকালে নূপ খাওয়ার গল্প করতে বসে কোথায় সরে এসেছি, সে কথা থাক, কিন্তু সম্প্রতি একটা বইয়ে পড়লাম, করাচী রাজতন্ত্রের যুগে সম্রাট মহিলারা রাজ্যতানে অথবা বাতায়তনের পথের বাঁকে নিজের হাঁকা করতে আসে। দ্বিধাবোধ করতেন না।

এ ধরনের সহজাত ভাবি ভাল লাগে আমার এবং আমি অবাক হয়ে ভাবি, মা বুঝি সেই মহিলাদের শেষ নিদর্শন।

বাই হোক, আজ সকালে নূপ খেতে খেতে মায়ের অসুস্থ চিৎকারে চমকে গিয়ে বখন প্রশ্ন করলাম, 'চুল' কি না, মা জবাব দিলেন না।

নূপ বেশী হয়েছে?

রেশম পাওয়া মার্কিনী টিনের চালানী মটরগুটি দিয়ে আজকের নূপটা আমি পাতলা করেই রেখেছিলাম। বাঁধুনি হিসেবে নিজের ওপর আস্থা আমার নেই, যদিও প্রত্যেক মেয়ের অব্যবহিত শিক্ষা-তালিমের মধ্যে রাগাও পড়ে। সেই কারণেই মা বলছেন খারাপ হয়নি, তবু নূপের অল্প আমার হৃদবনার অন্ত নেই।

গভীর ভাবে মা বললেন—নূপটা চমৎকার হয়েছে। সেটাই শেষ করে সাংযুক্তিক শাকজড়ানো ভাতের মণ্ড খেলেন।

সকালে খেতে আমার কোন দিনই ভাল লাগে না, বেলা নশটার আগে ক্ষিদেও পায় না। আজ সকালে নূপটা কোন মতে গলা দিয়ে নামল বটে, কিন্তু আর কিছু খেতে চাওয়া বাকমারি। কয়েকটা মণ্ড প্লেটে নিয়ে চপটিক দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আলু-ভাতে বানিয়ে কেললাম। চপটিকে সামান্য একটু তুলে, মায়ের চামচ ধরা মত মুখের আড়ালাড়ি ভাবে ধরে, তাই দিয়ে পাখী বাওয়ানোর মত মুখের মধ্যে ঠেলে দিলাম। খাবার নিয়ে আমি এই কাণ্ড করছি, ইতিমধ্যে মা নিঃশব্দে উঠে সকালের সূর্য্যের আলোর তপ্ত দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়ালেন। কিছুক্ষণ চুপ করে আমার খাওয়া দেখলেন।

কাজুকা—ওভাবে খেও না। সকালের খাওয়াটা সরচরে তৃপ্তি করে খাওয়া উচিত।

মা তোমার তৃপ্তি হয়?

আমার কথা ছেড়ে দাও, এখন আমি সেয়ে উঠছি।

কিন্তু আমার তো কোন অসুখই করেনি?

মা, না। স্নান হেসে মা বাড় নাড়লেন।

পাঁচ বছর আগে ফুলফুলের রোগে আমি শয্যাশায়ী হয়েছিলাম। স রোগ অবশ্য সম্পূর্ণ বেজার বাধিয়েছিল। দ্রাব্যিক দুর্বলতা এবং মনোবীজ্যই মায়ের বর্ধমান অসুস্থতার কারণ। তাঁর একমাত্র শিষ্টা ছিল আমার নিয়ে।

শুধু: আমার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল।

কি হল? এবার মায়ের প্রশ্ন করার পালা।

পরস্পরের চোখে চোখ পড়তে দু'জনেই পূর্ণ সহানুভূতি অনুভব করলাম। আমি হেসে উঠতে মায়ের মুখেও হাসি ফুটল।

হুচিষ্টা আমার মনকে নাড়া দিলেই এ ধরনের শব্দ আমার অজান্তে মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে। বছর হরেক আগে আমার বিবাহ-বিচ্ছেদ সংক্রান্ত ঘটনাবলি হঠাৎই ছবির মত মনের মধ্যে ভেসে ওঠে এবং আমি টের পাবার আগেই মূহ আন্তর্নাদ আমার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে। কিন্তু মায়ের মুখে ঐ কণ শব্দটুকুর কারণ কি? আমার মত অতীতের কোন হুচিষ্টা নিশ্চয়ই তাঁকেও ঠিক এই মুহূর্তে নাড়া দেয়নি। না, কিন্তু কারণ একটা আছেই।

মা—একুণি তুমি কি ভাবছিলে?

তুলে গেছি।

আমার বিষয়?

না।

নাওজির বিষয়?

হ্যাঁ, তারপর ক্ষণিক আত্মসম্বরণ করে এক পাশে মাথা হেলিয়ে বললেন—বোধ হয়।

আমার ভাই নাওজি ইউনিভারসিটিতে পড়তে পড়তেই যুদ্ধে বেতে বাধ্য হয় এবং দক্ষিণ প্রশান্ত সাগরে ওরা তাকে চালান করে দেয়। আমরা তার কোন খবর পেতাম না এবং যুদ্ধ বিরতির পরও আজ অবধি সে নিখোঁজ। মা ধরে বেধেছেন ছেলের

ও ওরিয়েন্টাল গ্লিসার

অশোক
কর্ডিয়েল



জীরোগে—ও, আর, সি, এল-এর অশোক কর্ডিয়েল রোগী ও চিকিৎসক-বৃন্দের নিকট বিশেষভাবে সমাদৃত; কারণ ইহার প্রতিটি উপাদানের প্রতি বিশেষ-ভাবে লক্ষ্য রাখিয়া ইহা প্রস্তুত করা হয়

দি 'ওরিয়েন্টাল গ্লিসার' অ্যাণ্ড
কেমিক্যাল ল্যাবরেটরী লিঃ

সঙ্গে তাঁর এ জীবনে দেখা হবে না। অন্ততঃ মুখে তাই বলেন কিন্তু আমি একবারও হাস ছাড়িনি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তার সঙ্গে আমার দেখা হবেই।

ভেবেছিলাম, তার আশা আমি ছেড়েই দিয়েছি, কিন্তু তোমার ঐ পুথি হৃদয়টা তার কথা মনে করিয়ে দিল। এ ভাবনা আর বেন সহিতে পারি না। এখন মনে হয়, ওর দিকে আমার আরও অনেক বেশী নজর দেওয়া উচিত ছিল।

হাইস্কুলে ঢোকার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নাওজির দারুণ সাহিত্য-প্রীতির উদ্বেগ হয়। সেই অবধি সে দারিদ্র্যজনন-হীন জীবন বাপন করতে শুরু করে। মায়ের হৃৎকের সীমা রইল না। তার এ-ধরনের দারিদ্র্যজনন-হীনতা সত্ত্বেও মা হৃদয়ে খেতে তার কথাই ভাবছিলেন। রাগে আমি খাবারটুকু জোর করে মুখের মধ্যে পুরে দিলাম, আমার চোখ দুটো আলা করে উঠল।

সে বহালতবিরতাই আছে। খাসা আছে নাওজি। ওর মত হতভাগাদের মরণ নেই। বারা সং, বারা সুল্লর, বারা বিনরী তারাই আগে ভাগে খতম হয়ে যায়। মাখায় লাঠির বাড়ি মারলেও তোমার নাওজি মরবে না।

মা হাসলেন—তার মানে তুমিই বোধ হয় আগে বাবে।

আমার ঠাটা করলেন মা।

আমি কেন মরব? আমি মল, আমি কুংসিত। আশীটা বছর হেসে-খেলে কাটিয়ে দেব।

সত্যি? তাহলে তোমার মা নব্বই বছর বাঁচবেন বল?

বাবড় গিয়ে আমি বললাম—নিশ্চয়ই। হতভাগারা বহুকাল বাঁচে, সুল্লরেরা অল্প বয়সে মরে। আমার মা সুল্লরী, কিন্তু আমি তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা করি। কি যে বলব ভেবে পেলাম না। চটে গিয়ে বললাম—কেবল আমার কাঁদে ফেলবার চেষ্টা না? নীচের ঠোঁটটা ধর-ধর করে কঁপে উঠল, চোখের জল সামলানো দায়।

সাপের গল্পটা করা উচিত কি না বুঝতে পারছি না। দিন চার পাঁচ আগে পাড়ার ছেলে-মেয়েরা বাগানের বেড়ার খোঁটার লুকনো বারো-তেরটা সাপের ডিম খুঁজে পায়। তাদের বিশ্বাস যে, ডিমগুলো বিবাক্ত সাপের। ভেবে দেখলাম, বারোটা সাপ যদি সারাক্ষণ বাঁশঝাড়ের মধ্যে কিলবিল করে বেড়ায়, তবে আগে থেকে সাবধান না হয়ে বাগানে ঢোকা দায় হবে। বাচ্চাদের বললাম—ডিমগুলো পুড়িয়ে ফেলা বাক, কি বল? বাচ্চারা হৈ-হৈ করে আনন্দে নাচতে নাচতে আমার সঙ্গে চলল।

ঝোপের কাছে এক রাশ ঝড়ুকুটা জড়ো করে আগুন ঘরিয়ে একটার পর একটা ডিম ছুড়ে দিলাম। বহুকণ গেল, তবু সেগুলো পুড়ল না। বাচ্চারা বেশী করে ভাল-পাতা দিয়ে আগুনটা উত্তেজিত দিল। তবু ডিমগুলো যেমনকার তেমনই রয়ে গেল। রাত্তার ওধারের বাড়ীর মেয়েটি বেড়ার কাছে এসে জিজ্ঞেস করল—ব্যাপার কি?

সাপের ডিম পুড়োচ্ছি। ভয় করে, পাছে বিবাক্ত সাপে বাড়ী ছেয়ে যায়।

ডিমগুলো কত বড়?

১. ধবধবে সাপা হাঁসের ডিমের সাইজের।

তাহলে ওগুলো চোঁড়া সাপের ডিম। বিবাক্ত নয়। কাঁচা ডিম পোড়ে না, জানো তো?

কি বেন মজার স্বাদ পেয়েছে, এই ভাবে হাসতে হাসতে চল খেল মেয়েটি।

আমি ঘটা ঘরে আগুন জ্বলল—কিন্তু ডিমের অবস্থা যে-কেনেই। আমি বাচ্চাদের আগুনের তাত থেকে টেনে এনে ডিমগুলো প্রায় গাছের গোড়ায় পোতবার বন্দোবস্ত করলাম। কতগুলো ছুড়ি যোগাড় করে সমাধির ব্যবস্থা হল। হাঁটু গেড়ে হাত জোড় করে বসে বাচ্চাদের বললাম—এস একটু প্রার্থনা করে নিই—কেমন?

বাচ্চারা আমার কথামত হাত জোড় করে পেছন দিয়ে বসে পড়ল। সব গেরে আমি বাচ্চাদের সঙ্গ ত্যাগ করে পাথরের সিঁড়ি বেয়ে উঠ এলাম। সিঁড়ির মাথায় মটরলতার মাচানের ছায়ার দাঁড়িয়ে মা বললেন—এ কি নিষ্ঠুরতা?

আমি ভেবেছিলাম, ওগুলো বিবাক্ত সাপের ডিম হবে বুঝি, কিন্তু তা নয়, একেবারেই চোঁড়া সাপের ডিম। বাই হোক, ওদের ভাল করে সমাধি দিয়েছি। হৃৎকরার আর কোন কারণ নেই। মনে মনে ভাবলাম, কি কুসংকেই না মা আমার ঘরে ফেললেন।

কুসংসার নয়, তবে দশ বছর আগে, আমাদের নিশিকাতা দ্বীপের বাড়ীতে বাবার মৃত্যুর পর থেকে সাপ সবসময় মায়ের মনে কি এক আতঙ্ক আছে। ঠিক বাবা মারা বাবার আগে একটা ছোট কালো নৃতো বিছানার পাশে পড়ে থাকতে দেখে মা অত্যন্ত ভাবে সেটাকে তুলে ফেলে দিতে গিয়ে দেখেন নৃতো নয়, সাপ। ঘরের পাশে বারান্দা মত পথ দিয়ে সাপটা পিছলে বেরিয়ে গেল। শুধু মা আর আমার ওয়াদা মামা দেখেছিলেন। তাঁরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করে চূপ করে রইলেন, পাছে শব্দ মুহুর্তে বাবার শাস্তির ব্যাঘাত হয়। সেইজন্য আমি আর নাওজি সে সময়ে সে ঘরে উপস্থিত থাকা সঙ্গেও কিছুই টের পাইনি।

কিন্তু যেদিন সন্ধ্যায় বাবা শেব নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন—সেদিন আমি বাগানে পুকুরপাড়ে সব ক'টা গাছে সাপ জড়িয়ে থাকতে দেখেছি। তখন আমার উনত্রিশ বছর বয়স, দশ বছর আগে ছিল উনিশ, নেহাৎ কচি খুঁকি তো নয়। দশটা বছর পার হয়ে গেছে সত্যি। কিন্তু সেদিন বা বা ঘটেছিল, আজও সে সব কথা আমার মনের মধ্যে পরিষ্কার আঁকা আছে, ভুল হবার ঘো নেই। পুকুর-পাড়ে ঘুরে ঘুরে পুজোর ফুল তুলছিলাম। আজাদিয়া (azaleas) ঝাড়ের কাছে আসতে মগ, ডালের আগায় জড়ানো একটা সাপ চোখে পড়ল। গাটা শিউরে উঠল। সেখান থেকে এগিয়ে কোরিয়া গোলাপের একটা ডাল কাটতে গিয়ে দেখি, সেখানেও সাপ। পাশাপাশি সারপের গোলাপ, পেপল, ত্রুঙ্গ, উইস্টেরিয়া; তেরিগাহ সর্বত্র, প্রত্যেকটি ঝোপে, পাছের ডালে একটা করে সাপ। খুব যে ভয় পেলাম, তা নয়। ভাবলাম আমার মত এই সাপের গুঁড়ি বাবার আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গর্ত ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। পরে বাগানের এই সাপদের কথা ফিসফিস করে মাকে বললাম। তিনি শুধু এক পাশে মাথা হেলিয়ে সায় দিলেন—বেন কি একটা গভীর চিন্তার মন। মুখে অবশ্য কোন মন্তব্য করলেন না।

একথাও ঠিক যে, এই ছটি ঘটনার পর থেকে সাপের ভীতি

মায়ের বিতৃষ্ণার স্তম্ভপাত হয়। এর থেকে এদের সবকে মায়ের মনে উদ্বেগ, আতঙ্ক ও আশঙ্কা বাসা বাঁধে।

আমার সাপের ডিম পোড়াতে দেখে নিশ্চর তাঁর মনে অমঙ্গল-আশঙ্কা জাগে। এ কথা খেয়াল হতেই নিজের নির্বুদ্ধিতার গুরুত্ব বুঝলাম।

হরত বা এতদ্বারা আমি মায়ের কোন অমঙ্গলই ডেকে এনেছি—এই হুশিয়ার হাত বেশ কিছুকাল এড়াতে পারিনি। এবং এত সব ঘটনার পর স্নানের স্বল্পায় হওয়ার মন্তব্য করে আবোল-তাবোল কথা দিয়ে চাপা দেবার ব্যর্থ প্রয়াস চোখের জলে শেষ করলাম। পরে প্রাতঃরাশের বাসনপত্র সরাতো গিয়ে একটা অসহ্য জ্বালা অনুভব করলাম, যেন একটা কাল সাপ মায়ের আয়ুর প্রতি নিশানি রেখে আমার বৃকের ভেতর বাসা বেঁধেছে। সেদিনই বাগানে একটা সাপ দেখলাম। সকালটা ভারি স্নান, স্নিগ্ধ দেখে রান্নাঘরের পাট সেরে, একটা বেতের চেয়ার মাঠে টেনে নিয়ে বসে বসে উল বুনতে সাধ হল। চেয়ার হাতে বাগানে পা দিতেই কানার ঝাড়ের পাশে একটা সাপ নজরে পড়ল। প্রথম কথা মনে হল কিরে বাই, গাড়ী-বারান্দার চেয়ার টেনে সেখানেই বোনা নিয়ে বসলাম। বিকেলে বাগানের ওধারে গুদামের লাইব্রেরী থেকে মারী লরেঞ্জিনের এক ভলুম ছবির বই আনতে গিয়ে দেখি, একটা সাপ মন্তব গতিতে মাঠ পেরিয়ে চলেছে। সেই সকালের স্নান, সাবলীল সপটাই পরম শান্তিতে চলেছে। বুনো গোলাপের ছায়ার এসে, মাথা ঝাড়া করে আগুনের শিখার মত তরঙ্গের স্তম্ভ বের করে নাড়তে লাগল। কি যেন খুঁজছে মনে হল, কিন্তু একটু পরেই মাথা নীচু করে পরম ক্রান্তিভরে মাটিতে পড়ে গেল। মনে মনে বললাম—নিশ্চর সাপিনী! তখন পর্যন্ত তার সৌন্দর্যটাই আমার চোখে পড়ছিল; গুদাম থেকে ছবির বইখানা বের করে ফেরার পথে সাপের জায়গাটার চোখ বুলিয়ে নিলাম, কিন্তু সে ভ্রমক্ষেপে অনুগত হয়ে গেছে।

সন্ধ্যাবেলা মায়ের সঙ্গে চা খেতে বসেছি, বাগানের দিকে চোখ পড়তে দেখি, পাথরের সিঁড়ির তৃতীয় ধাপে আবার সেই সাপ সতর্পণে আত্মপ্রকাশ করছে।

মা-ও লক্ষ্য করছিলেন—ঐ কি সেই সাপ? বলতে বলতে দৌড়ে আমার পাশে এসে, আমার হাত ধরে ভরে ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগলেন। চট করে তাঁর হুশিয়ার কারণ আমার কাছে ধরা পড়ে গেল।

আমি বললাম—অর্থাৎ সেই ডিমের মা?

অতিকষ্টে জবাব দিলেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ।

নিশ্চয়ই দম বন্ধ করে আমরা পরস্পরের হাত ধরে দাঁড়িয়ে রইলাম। সাপটা অলস ভাবে পাথরের ওপর গুটিয়ে শুল এবং তার পবেই নড়তে শুরু করল। এলোমেলো গতিতে, দুর্বলভাবে সিঁড়ি পেরিয়ে কানার ঝোপের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

কিস-কিস করে বললাম—সকাল থেকে এটা বাগানের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দীর্ঘবাস ফেলে মা চেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন। হতভাল ভাবে বললেন—ঠিক তাই হয়েছে। আমি বেশ বুঝতে পারছি বেচারী ডিমগুলো খুঁজে বেড়াচ্ছে।

কি করব তবু মা পেরে বোকার মত হেসে উঠলাম। অভাগারী

সূর্যের আভা মায়ের চোখ ছটিতে গাঢ় নীলের ছায়া ফেলেছে। ঈষৎ ক্রোধের ভাব ফুটে বৃদ্ধাণি এমন অপক্লপ হয়েছে যে, দুটো গিয়ে কোলে কাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছে হচ্ছে। এইমাত্র যে সাপটাকে আমরা দেখলাম, মনে হ'ল মায়ের এখনকার চেহারার সঙ্গে তার কোথায় মিল আছে। কেন যে অনুভব করলাম কুংসিত সাপটা আমার বৃকের মধ্যে বাসা বেঁধেছে, শেষ পর্যন্ত সে একদিন বিবাদময়ী মা সাপটিকে আত্মসাৎ করবে।

মায়ের নরম, সুগঠিত কাঁধের ওপর হাত রাখলাম। সেসময়ে আমার শরীরের ভেতর যে দারুণ আলোড়ন বয়ে গেল, তা বোকাবার ভাষা আমার জানা নেই।

যে বছর জাপান বিনাস্তে আত্মসমর্পণ করে, সে বছর ডিসেম্বর মাসে আমরা নিশিকাতা স্ট্রীটের বাড়ী ছেড়ে দিয়ে ইজু (Izu)-তে চিনা-প্যাটার্ণের এই বাংলোর উঠে এলাম। বাবার মৃত্যুর পর থেকে মায়ের ছোট ভাই 'ওয়ারান'মামা, বর্তমানে ইনিই মায়ের একমাত্র বন্ধু-সম্পর্কের আত্মীয়—আমাদের সম্পত্তির তদারক করছিলেন। কিন্তু যুদ্ধের শেষে মামা মাকে জানালেন, দুনিয়া ওলট-পালট হয়ে গেছে, আগের মত বাবুয়ানা আর চলবে না। আমাদের বাড়ী বিক্রি করে ঢাকার-বাকরকে জবাব দিয়ে দিতে হবে; সুতরাং দেশে-গ্রামে ছোট একখানা বাড়ী কিনে হুঁজনে নিবিবিলিতে থাকাই ভাল। টাকা-পয়সা সবকিছু মা শিশুর চেয়েও অজ্ঞ ছিলেন, কাজেই ওয়ারানমামার এই প্রস্তাবের উত্তরে তিনি যেমন ভাল বোঝেন, সেই ব্যবস্থাই করতে বলে দিলেন। নভেম্বর মাসে মামার কাছ থেকে এক জরুরী ডাকের চিঠি এল, ভাইকাউন্ট কাওয়াটা (Viscount Kawata)র বাড়ী বিক্রির খবর নিয়ে। বাড়ীর ভিত্তি বসেই উঁচু, চার পাশের দৃঢ় ভাল, আদ্য একর আশ্রয় স্থানের জমি আছে। এ ছাড়া জায়গাটা গ্রাম ফুলের জন্ত বিখ্যাত। ঐতে উক, গ্রীষ্মে ঠাণ্ডা থাকে।

ওয়ারানমামা চিঠির শেষ দিকে লিখেছিলেন—আমার বিশ্বাস, জায়গাটা তোমাদের পছন্দ হবে। তবু উত্তরালোকের সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ হওয়া প্রয়োজন। কাল একবার আমার আপিসে আসতে পার?

আমি জিজ্ঞেস করলাম—মা, তুমি বাবে?

অতি দুঃখে বৃদ্ধ হেসে মা জবাব দিলেন—বাব বৈ কি। ডেকেছে যে।

হৃগুণের পরেই মা রওনা হলেন। আমাদের পুরনো ডাইভার তাঁর সঙ্গে গেল এবং সন্ধ্যা আটটা আশ্রয় মাকে ফিরিয়ে আনল।

আমার ঘরে চুকে ডেকে ভর দিয়ে এমন ভাবে বসে পড়লেন যে, মনে হল এখুনি বৃষ্টি অজ্ঞান হয়ে পড়বেন।

সব ঠিক হয়ে গেল। এইটুকুই শুধু বললেন।

কি ঠিক হয়ে গেল?

সব।

কিন্তু চমকে উঠলাম—বাড়ীটা একবার চোখের দেখাও দেখলে না?

ডেকের ওপর কই হুঁ তুলে, হাত দিয়ে কপালটা চেপে ধরে, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মা উত্তর দিলেন—তোমার ওয়ারানমামা বলছেন জায়গাটা ভালই। মনে হচ্ছে চোখ খোলবার ক্ষমতা

পাব না, তার আগেই সেখানে গিয়ে উঠতে হবে। এতক্ষণে মাথা তুলে বৃহৎ হাসলেন, মায়ের মুখখানা অত্যন্ত কাতর ও দুঃখের দেখাচ্ছিল।

ওরাদামামার প্রতি মায়ের অন্ধ বিশ্বাস দেখে বিমূর্তভাবে আমি উত্তর দিলাম—তা তো বটেই।

তাহলে তুমিও চোখ বুজেই থেকো।

এবার আমরা দুজনেই হেসে উঠলাম, কিন্তু হাসি খামসেই রাজ্যের অন্ধকার মনের ওপর চেপে এল।

এর পর থেকে প্রতিদিন কুলিরা এসে বাড়ী বদলের জিনিষপত্র বাঁধাছাঁদা করে। মামা একদিন নিজে এসে বিক্রির মালপত্র-গুলোর ব্যবস্থা করে গেলেন। আমাদের কি 'ওকামী' আর আমি জামাকাপড় সোহান, আরজানা বাগানে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলা, এ ধরনের কাজে ব্যস্ত রইলাম।

মা কিন্তু মোটেই সাহায্য করতে রাজী হলেন না। নিজের ঘরে এটা-ওটা করে কাটালেন।

একদিন আমি সাহস সঞ্চয় করে, একটু রাগের মাথায় জিজ্ঞেস করে বসলাম, ব্যাপার কি? তোমার কি 'ইচ্ছু'তে যেতে ইচ্ছে নেই না কি? একান্ত উদ্বিগ্ন ভাবে জবাব দিলেন—না। বাজার তোড়জোড় করতে দিন নশেক কেটে গেল। এক সন্ধ্যায় আমি আর ওকামী কিছু বাজে কাগজ, খড় ইত্যাদি বাগানে নিয়ে পোড়াছি, এমন সময় মা ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এসে ঝাঁড়ালেন এবং নিঃশব্দে অগস্ত আগুনের দিকে চেয়ে রইলেন। একটা ঠাণ্ডা পশ্চিমা হাওয়া উঠেছিল—খোঁরাটা মাটির ওপর দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছিল। আমি মুখ তুলে মায়ের মুখের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেলাম, মায়ের এমন রক্তহীন ক্যাকাশে চেহারা বহু কাল চোখে পড়েনি। আমি চেঁচিয়ে উঠলাম—মা, তোমার তো মোটেই ভাল দেখাচ্ছে না?

হাসিমুখেই জবাব দিলেন—ও কিছু নয়। তার পর আবার নিঃশব্দে ঘরে ফিরে গেলেন। সে রাত্রে আমাদের বিছানা বাঁধা হয়ে গিয়েছিল বলে ওকামী একটা সোকার তুল। আমি আর মা প্রতিবেশীর কাছ থেকে ধার করে আনা বিছানা মায়ের ঘরে পেতে চলাম। মায়ের দুর্বল কণ্ঠস্বরে ভর পেলাম। মা বললেন—কেবল তোমার জন্যেই যাওয়া। তুমি আছ বলেই আমি ইচ্ছুতে যেতে রাজী হয়েছি।

অভাবনীয় এই মন্তব্যে ঘাবড়ে গিয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও জিজ্ঞেস করলাম—আর ধর যদি আমি না থাকতাম?

হঠাৎ মা কঁদে ফেললেন—আমার পক্ষে সবচেয়ে সোজা রাস্তা ছিল মৃত্যু। তোমার বাবা এখানে শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছেন, এখানে মরতে পারলে কোন দুঃখ ছিল না। ডাক্তার-ডাক্তা কথা কান্নার জড়িয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে উচ্চারণ করলেন।

এ পর্যন্ত মায়ের এমন অসহায় রূপ কোন দিন আমার চোখে পড়ে নি, এমন ভাবে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন নি। বাবার মৃত্যুর সময় না, আমার বিয়ের সময় না, সন্তান পেতে নিয়ে বেবার তাঁর কাছে আসি তখনও না, হাসপাতালে যখন মরা ছেলে হ'ল, তখনও না; পরে যখন অসুস্থ হয়ে দীর্ঘকাল শয্যা নিই তখনও না। এমন কি নাগজি যখন অত্যন্ত অজ্ঞার কাজ করে তখনও যাকে এত কাতর

দেখিনি। বাবার মৃত্যুর পর এই দশ বছর ধরে মা ঠিক বাবার জীবিতকালের মতই শান্ত-বাহুল্য ভাবে কাটিয়েছেন, নাগজি আর আমি সেই সুযোগে খুশি মত বেড়ে উঠেছি, কখনও কিছুতে মাথা ঘামাই নি। এখন মায়ের টাকা ফুরিয়েছে, একটুকু অসংখ্য প্রকাশ না করে সমস্ত টাকা আমাদের দুই ভাই-বোনের জন্য খরচ করেছেন। আজ সংসার গুটিয়ে সহায়-সম্পদহীন অবস্থায় অজানা এক ছোট বাড়ীতে নতুন করে সংসার পাততে বাধ্য হয়েছেন। মা যদি কৃপণ হতেন, আমাদের বঞ্চিত করে, আর পাঁচ জনের মত গোপন অর্থাগমের উপায় চিন্তা করতেন, তাহলে আজ সংসার উন্টে গেলেও মরণকে এমন আকুল ভাবে ডাক দিতেন না। জীবনে আজ প্রথম আবিষ্কার করলাম অর্থাভাবে কি মারাত্মক, শোচনীয় অসহায় অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে। বুকের ভেতর সোলাপাড় হয়ে গেল। কিন্তু এত উদ্বেগেও চোখে জল এল না। আমার মনের এই অবর্ণনীয় অবস্থাকেই বোধ হয় মানব-জীবনের মর্যাদাবোধ সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। সেইখানে হাতের দিকে চেয়ে অনড় অচল ভাবে শরীরটাকে পাখরের মত শক্ত করে শুয়ে রইলাম।

বা ভেবেছিলাম ঠিক তাই, পরদিন মায়ের শরীর বেশ খারাপ হল। এটা-ওটা নিয়ে দেয়ী করতে লাগলেন যেন, এবাড়ীতে প্রতিটি বৃহত্তর তাঁর কাছে অমূল্য—কিন্তু ওরাদামামা এসে জানালেন, ইচ্ছুতে চলে যেতে হবে। প্রায় সব জিনিষই আগে রওনা হয়ে গেছে। স্পষ্ট অনিচ্ছার সঙ্গে মা কোঠখানা গায়ে দিলেন, তারপর কোন কথা না বলে ওকামী এবং আমাদের বাকী চাকরবাকর—বারা আমাদের এগিয়ে দিতে এসেছিল—তাদের দিকে ফিরে মাথা হেলিয়ে বিদায় সন্ধ্যা জানিয়ে নিশিকাতা ষ্ট্রীটের বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলেন।

ট্রেনটা অপেক্ষাকৃত খালিই ছিল, আমরা বসার জায়গা পেলাম। মামার যেন আনন্দ উছলে উঠেছে—গুন-গুন করে 'নো' পালার গান ভাঁজছেন। এদিকে মায়ের মুখখানা ক্যাকাশে হয়ে গেছে, চোখ দুটি নীচু করে উদাসীন ভাবে বসে আছেন। নাগাওকার (Nagaoka) মিনিট পনেরো বাবার পর নেমে পাহাড়ের দিকে রওনা হলাম। ছোট্ট একটা গ্রামের দিকে ধীরে ধীরে পাহাড়ের ঢড়াই উঠে গেছে—তার শেষ প্রান্তে চীন ঠাইলে তৈরী মন্দির একটা বাংলা চোখে পড়ল। উঠে একটা দম নেবার আগেই আমি চেঁচিয়ে উঠলাম—বা ভেবেছিলাম, তার চেয়ে অনেক বেশী মন্দির জায়গা। ভেতরে ঢোকবার আগে একটু খেমে মা বললেন—সত্যি তাই। বৃহত্তর জন্ত তাঁর দৃষ্টিতে প্রসন্নতা নেমে এল। আশ্চর্যসদে গদগদ হয়ে মামা বললেন—প্রথম কথা হল বাতাসটা ভাল, বাকে বলে বিতর্ক বাহু।

মা হেসে ফেললেন—তাই তো, চমৎকার প্রাণজুড়নো হাওয়া। আমরা তিনজনেই হেসে উঠলাম।

ভেতরে গিয়ে চৌকিও থেকে আমাদের যে জিনিষ পত্র এসেছিল—সেগুলো পেলাম। বাড়ীর সামনেটা প্যাংকিং কাঠের বাজের পাহাড় জমেছে। মামা আনন্দে একেবারে দিশাহারা হয়ে আমাদের বসার ঘরে নিয়ে গেলেন—একবার বাইরে 'চেয়ে দেখ'—কি অপূরণ দৃষ্ট!

তখন বিকেল প্রায় তিনটে, শ্রীতের পূর্বা বাগানে ময়দানটার

গায়ে বিন্দু পরশ বুলিয়ে দিচ্ছিল। ময়দান থেকে এক বাগ সিঁড়ি গ্রাম গাছে ঘেরা ছোট একটি পুকুরের দিকে নেমে গেছে; তারপর আছে কমলা লেবুর বাগান। একটা মেঠো রাস্তার পাশে বান্ধেত, আত্মবুদ্ধে, সবশেষে—দূরে সমুদ্র চোখে পড়ে। বসার ঘরে বসে সমুদ্রকে ঠিক আমার বুক বরাবর উঁচু মনে হ'ল।

নিমন্ত্রণ গলায় মা বললেন—ভারী বিন্দু দৃষ্ট। অত্যধিক খুশি গলায় আমি সাব দিলাম—নিশ্চয়ই বাতাসের গুণ। টোঁকিও'র সূর্য্যর আলোর সঙ্গে এধানকাব আলোর কত তফাৎ দেখেছ? বেন রেশমী কাপড়ে ছেঁকে সূর্য্য তার রশ্মি আমাদের কাছে চালান করে দিচ্ছে।

নীচের তলার হুঁখানা বড় বড় ঘর—একখানা চীনা-প্যাটার্ণের বৈঠকখানা, আর একখানা বসার ঘর, এছাড়া রান্নাঘর, বসার ঘর, শ্রানের ঘর, খাবার ঘর সবই আছে। দোতলার বিদেশী কারবার একটি ঘরে প্রকাণ্ড এক বিছানা।

গোটা বাড়ীটা এই, তবু আমার মনে হল আমাদের দুজনের পক্ষে বাড়ীখানা কিছু নিম্নের নয়। এমন কি, নাওজি কিরে এলেও বিশেষ অসুবিধা হবার কথা নয়।

সে গ্রামে একটিমাত্র হোটেল, মামা আমাদের খাবার ব্যবস্থা করতে সেখানেই গেলেন। শীগগিরই তিন জনের মত কিছু খাত এসে পড়ায় তিনি, বসার ঘরেই বেশ গুছিয়ে নিয়ে খেতে শুরু করে দিলেন। মামার সঙ্গে হুইকি ছিল, তার সাহায্যে আচার্য অনারাসে পাকস্থলীর পথ খুঁজে নিল। উছলে ওঠা খুশির তোড়ে তিনি এবাড়ীর প্রাক্তন মালিক ভাই কাউন্ট কাওয়ারটার সঙ্গে চীন অভিবানের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনী আমাদের গলাধঃকরণ করতে বাধ্য করলেন। মা নায়েই খেতে বসলেন এবং আঁধার ঘনিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে ফিস-ফিস করে বললেন—আমি একটু শুতে চাই।

আমাদের জিনিষপত্রের মধ্যে থেকে বিছানাটা টেনে বের করে মায়ের সঙ্গে ধরাধরি করে পেতে ফেললাম। তাঁকে দেখে কেমন বেন বুকটা ছাঁৎ করে উঠতে ধারমোমিটার বের করে তাপ নিয়ে দেখি ১০২ ডিগ্রি।

মামা পর্যন্ত ঘাবড়ে গেলেন। বাই হোক, তিনিই গ্রামের মধ্যে ডাক্তার খুঁজতে বেরোলেন। মাকে ডাকাডাকি করতে তিনি ঘরের বারে মাথা নাড়লেন মাত্র।

মায়ের ছোট হাতখানি নিজের বুঠিতে চেপে ধরে কঁদে ফেললাম। মা আমার এত দুঃখী, এত মর্মান্তিক দুঃখী; না গো আমরা হুঁজনেই দুঃখী মানুষ। আমার কান্না আর ধামতে চায় না। কাঁদতে কাঁদতে মনে হল মায়ের সঙ্গে আমিও এই ব্রহ্মর্ষে মরণকে বরণ করে নিই। আর কিসের আশায় বাঁচা, নিশিকাতা স্ট্রিটের বাড়ী ছাড়ার সঙ্গে আমাদের বাঁচবার অর্থ যুচে গেছে।

প্রায় বটা দুই পরে মামা এক গ্রাম্য ডাক্তার নিয়ে এলেন। ভ্রমলোককে বধেই বুদ্ধ বলেই মনে হ'ল। সেকলে পোষাকী জাপানী কাপড় গায়ে ছিল।

নিমোনিয়ার ঝড়োতে পারে। বাই হোক, হ'লেও ভয়ের কিছু নেই। অনিশ্চিত মন্তব্য করে মাকে একটা ইন্জেকশন দিয়ে গেলেন।

পরদিনও অর নামল না। মাথা আমার হাতে ছই হালকা

ইয়েন্ (জাপানী ডলার) দিয়ে বলে দিলেন হাসপাতালে পাঠাতে হ'লে টেলিগ্রাফ করে তাঁকে খবর দিতে। সেদিনই তিনি টোঁকিওতে ফিরে গেলেন। প্রয়োজনীয় বংশমাজ বাসন-পত্র বের করে সামাজ্য ভাতের কাধ তৈরী করলাম। মাত্র তিন চামচ মুখে দিয়ে মাথা হেলিয়ে মা আর দিতে বারণ করলেন। দুপূরের আগে আবার ডাক্তার এলেন। এবার পোষাকের বটা কিছু কম, তবু হাতের দস্তানাজোড়া ভোলেন নি।

আমি প্রস্তাব করলাম হয়ত বা মাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া উচিত। ডাক্তার বললেন—না, তার দরকার হবে না। আজ একটা কড়া ইন্জেকশন দেব, তাতেই অরটা নেমে যাবে। আগের দিনের মত তাঁর আজকের কথাতেও বিশেষ ভরসা পেলাম না। কড়া ইন্জেকশন দিয়েই তিনি চল গেলেন।

বিকেলের দিকে মায়ের দুখখানা টুকটুক লাল হ'য়ে উঠল—আর সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর ঘাম হ'ল। সম্ভবতঃ এ সেই আশ্চর্য ইন্জেকশনের গুণ। রাত্রে মা'য়ের জামা ছাড়িয়ে দিছি, মা বলে উঠলেন—কে জানে—হয়ত উনি মস্ত বড় ডাক্তার।


জ্বরের তাপ স্বাভাবিক অবস্থায় নেমে এল। আনন্দের আতিশয্যে দৌড়ে গ্রামের হোটেল থেকে বারোটা ডিম কিনে আনলাম। কয়েকটা নরম সেদ্ধ ক'রে মাকে খেতে দিলাম। মা তিনটে ডিম আর একবাটি ভাতের কাধ খেয়ে ফেললেন।

**নতুন ও পুরাতন
আমোদ**

নতুন অথবা পুরাতন
আমোদের একটি নির্ভর-
যোগ্য ঔষধ।

ও, আর
সি, এল,
লিঃ
কুমারেশ
হাউস
হাওড়া

ডায়াগেল



পরদিন সেই ডাক্তার আবার তাঁর অসুস্থতায় পৌঁছান।
পরে এসে উপস্থিত হ'লেন।

তাঁর ইনস্পেকশনের ওপরে কথা শুনে গভীর ভাবে মাথা নাড়লেন। ভাবনা ঠিক যেমনটি আশা করেছিলেন। তারপর সবচেয়ে মাকে পরীক্ষা করে আমার দিকে ফিরে বললেন—এখন তোমার যা সম্পূর্ণ ব্রহ্ম। তাঁর বা ইচ্ছে করে খেতে দাও।

এমন মজা করে কথা বলেন ভুললোকে যে হাসি চেপে রাখা যায়। দোর পর্যন্ত তাঁকে এগিয়ে দিয়ে এলাম। ঘরে ফিরে দেখি, মা দিবা বিছানার ওপর উঠে বসেছেন। নিজের মনেই বললেন—সত্যি ভুললোকে বিচক্ষণ ডাক্তার বটে! আমার আর একটুও অসুস্থ নেই। সুখের ওপর ভারী একটা খুশির ভাব ছেয়ে আছে।

মা গো, দরজাটা খুলে দিই? বাইরে বরফ পড়ছে। ফুলের পাঁপড়ির মত বড় বড় বরফ আকাশ থেকে ঝরে পড়ছে। জানালা খুলে দিয়ে মায়ের পাশে বসে সেদিকে চেয়ে রইলাম। আবার যেন আপন মনেই বললেন—আর আমার কোন অসুস্থ নেই। তোমার পাশে গিয়ে এই ভাবে বসে বসি, তখন মনে হয় এত দিন বা ঘটে গেছে, সে সব স্বপ্ন। সত্যি বলছি—বাড়ী বদলের কথা ভাবতেও আমার ধারণা লেগেছিল, অসুস্থ মনে হয়েছিল। আমাদের নিশিকাতা স্ট্রীটের বাসার আর একটা দিন, এমন কি আশুখানা দিন বেশী থাকতে পেলে আমি বর্ত্তে যেতাম। ঠিকো উঠে অবধি আশুখানা অবস্থা, এখানে প্রথম করে কটা দুই তাল লাগার পরেই বুকের ভেতরটা টোঁকিওর ভিত্তি কেঁদে উঠল। তারপর সব শূন্য ঠেকল। সাধারণ কোন রোগ আমার নয়। ঈশ্বর যেন আগের আমাকে যেতে কেসে, সম্পূর্ণ নতুন করে প্রাণ দিলেন।

সেদিন থেকে আজ অবধি আমরা দু'জন পাহাড়ের গারে এই নিরালা কুঠারে দিন কাটাচ্ছি। আমরা রান্না করি, বারান্দায় বসে উল বুনি, চানা ঘরে বসে বই পড়ি; এক কথার বলতে গেলে বিধবাসীর বাইরে একান্ত বৈচিত্র্যহীন জীবন বাপন করি। ক্ষেত্রারিতে সারা গ্রামখানা গ্রাম ফুলে ছেয়ে গেল। মার্চ মাস পর্যন্ত বাতাসহীন শান্ত দিন একটির পর একটি করে পার হয়ে গেল। মাসের শেষ অবধি ফুলের গাছের ডাল

আলো করে রইল। বতবারই কাঁচের সব দরজা খুলে দিই, ততবারই সারা বাড়ী ফুলের গন্ধে মেতে ওঠে।

মার্চের শেষে প্রতি সন্ধ্যায় একটা বাতাস কোথা থেকে ছুটে আসে। আমি আর মা গোখলি বেলায় চা খেতে বসলে পাঁপড়ির দল জানালার ভেতর দিয়ে উড়ে এসে আমাদের পেরালার পড়ে। এখন এপ্রিল মাস, বারান্দায় বুনতে বসে আমাদের চাষবাসের কথা হয়। মা আমার সাহায্য করতে চান। হঠাৎ মায়ের সেই কথাটা মনে পড়ে গেল, আমরা মরে আবার ভিন্ন মানুষ হয়ে বেঁচে উঠছি। কিন্তু আমার ধারণা, আমাদের সাধারণ মানুষের পক্ষে বীজের মত পুনর্জন্ম সম্ভব নয়। মা বলেছিলেন অত্যন্তক তিনি ফুলে গেছেন, অথচ আজই সকালে সূপ খেতে বসে 'নাওজির' কথা মনে করে কেঁদে উঠছিলেন। আমার মনে থেকেই কি আর অত্যন্তের ক্ষতের দাগ মিলিয়ে গেছে? তা নয়।

উঃ! আমি সোজাশুভ্র মনের কথা উজাড় করে সমস্ত লিখতে চাই। মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, পাহাড়ী এই বাড়ীতে যে অবিচ্ছিন্ন শান্তি বিরাজিত, তা মিথ্যা, ছদ্ম। মা ও আমার বিশ্বাসের এই স্বপ্ন অবকাশ যদি ভগবানের ইচ্ছা বলেই ধরে নিই, তবু আসন্ন বিপদের কালো ছায়া যে ক্রমেই বনিয়ে আসছে, সে চিন্তার হাতও যে এড়াতে পারি না। মা খুশির ভাণ করে, কিন্তু দিন দিন তিনি শুকিয়ে যাচ্ছেন। আর আমার বুকের ভেতর যে কাল সাপ বাসা বেঁধেছে, মায়ের আঁচু নিয়ে সে দিনে দিনে বেড়ে উঠছে, আমার সমস্ত প্রতিজ্ঞা চোঁটা ব্যর্থ করেই সে পরিপুষ্ট হচ্ছে। এমন যদি হ'ত যে, বিশেষ কোন ঋতুর সঙ্গে এর আবির্ভাব হয়ে শূন্যে মিলিয়ে যেত। সাপের অতগুলো ভিন্ন পোড়ার কথা আদৌ যে মনে এসেছে, তা' থেকে আমার মানসিক অবস্থা অনুমান করে নেওয়া শক্ত নয়। আমার প্রতিটি কাণ মায়ের হৃৎস্পন্দ বাড়ার এবং তাঁর শক্তি ক্ষয় করার পক্ষে বশেই।

ভালবাসা—একবার কলম দিয়ে বসে পত্রটা বেরিয়ে গেছে, তারপর আর এগুনো চলে না। [ক্রমশঃ]

অনুবাদ—কল্পনা রায়

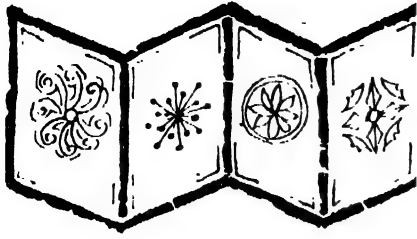
যে পাখী ফেরে না আর শ্রীউমাপদ রায়-চৌধুরী

বহু দূর সমুদ্র-নিভৃত নারিকেল-বীধি বেধা বীণের আকাশে
হলুদ ডানার রাজা বোদের সুরভি এক ঝাঁক নিড়-ভোলা পাখী,
নিরুদ্দেশ প্রান্তিক সন্ধ্যাত জীবনের ক'টি দিন; নিগন্ত বাতাসে
নবম পালকে মাথা জোঁতা-পরগা—চ'লে যায় আর ফেরে না কি।

ছায়াময় বীণ সেখা' একটি পৃথিবী দু'জন্য একান্ত নিরালা,
নিঃসীম তরঙ্গ-হলোহল—সন্ধ্যার মালতী-মুখী পাঁপড়ি-শিখিল
অনেক প্রান্তর ধুঁ পায় হ'লে যেমেছে সেখানে ছ'টি ডানা নীল—

এক দিন ফিরে-আসা নতুন বন্ধুর রৌদ্রময়ী কী পাখাণ মাটি,
উতল বাগানী বুকে ধূসর স্বপন পালছে-ডা' ভল্লুর মাস্তুল
শুনেছে কি ঋতু কোনো নক্ষত্রের গান প্রাণ-ধর শুধু সত্য বাণী!
চিন্তার চৈতালী দিনে তবু তো খোঁপার ঝরঝরো শিরীরের ফুল।

হৃদয় মানস-তীর্থ চির-কল্লোল কোথা কোন্ অধিত্যকা-পার,
জাকলের বন-শেবে বিদায়ের চাঁদ তার পর রক্তিম প্রভাত
শিখিরের সুরে হেথা ভিজ়ে বাস-মাঠ, পেয়েছে কি প্রেম নিফলুর



পত্র

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ও মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর পত্র-বিনিময়

গান্ধীজির উত্তর—৩

বিড়লা হাউস,
নূতন দিল্লী,
২, ৪, ১১৩১,

প্রিয় সুভাষ,

তোমার ৩১শে মার্চের এবং তাহার পূর্বেকার পত্র দুইটি পাইয়াছি। তুমি স্পষ্ট কথা বলিয়াছ এবং নিজ অভিমত স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার জন্যই আমি তোমার পত্রগুলিকে পছন্দ করি।

যে অভিমতগুলি তুমি প্রকাশ করিয়াছ তাহা আমার এবং অসংখ্যদের মতের এতই পরিপন্থী যে, একটা মীমাংসার সম্ভাবনা আমি দেখিতেছি না। আমার মনে হয়, প্রত্যেক মতবাদকে সুস্পষ্টভাবে দেশের লোকের নিকট উপস্থাপিত করা উচিত। আর যদি সত্যতার সহিত উহা করা হয়, তাহা হইলে মত-সম্মেলনের পরিণতি গৃহস্থ কেন হইবে তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না।

আমাদের মধ্যে যে মতবিরোধ রহিয়াছে তাহা অজ্ঞার নহে, পারস্পরিক বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার অভাবই অজ্ঞার। সময়ের দ্বারাই ইহার প্রতিকার হইবে, কালই শ্রেষ্ঠতম নিয়ামকচাৰী। যদি আমাদের মধ্যে সত্যকার অহিংসা থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে গৃহস্থ ত নহেই, তিস্ততার সৃষ্টিও হইতে পারে না।

সকল দিক বিচার করিয়া আমি এই অভিমত পোষণ করি যে, তোমার মতে বিশ্বাসী ব্যক্তিগণকে লইয়া এখন একটি কার্যনির্বাহক সমিতি তোমার গঠন করা উচিত। তোমার কার্যক্রম নিশ্চিতরূপে স্থির করিয়া তাহা আগামী এ, আই, সি, সির সম্মুখে উপস্থাপিত করা উচিত। উক্ত কমিটি যদি তোমার কার্যক্রম গ্রহণ করে তাহা হইলে তোমার পক্ষে কাজ চালাইয়া বাওয়া সহজ হইবে, সংখ্যালঘিষ্ঠদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত না হইয়া তুমি তোমার অতীষ্ট সিদ্ধ করিতে পারিবে। অপর পক্ষে, যদি কমিটি তোমার কার্যক্রম স্বীকার না করে, তাহা হইলে তোমার পক্ষে পদত্যাগ করিয়া কমিটিকে তাহার সভাপতি নির্বাচন করিতে দেওয়া উচিত। তখন তুমি অবাধে, তোমার নিজের পদ্ধতিতে, দেশবাসীকে তোমার বক্তব্য বুঝাইয়া বলিতে পারিবে। পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাবের কথা না ধরিয়াই আমি এই পরামর্শ তোমাকে দিতেছি।

এখন তোমার প্রশ্নগুলির উত্তর দিই। যখন পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাব পেশ করা হয়, তখন আমি শূন্যবাদী ছিলাম। মথরা গার্দ সে সময়ে রাজকোটে ছিলেন। তিনি একদিন সকালে আমার

নিকট এই সংবাদ আনিলেন যে, পুরাতন নেতাদের প্রতি আত্মজ্ঞাপক একটি প্রস্তাব পেশ করা হইবে। আমার সম্মুখে তখন প্রস্তাবের খসড়াটি ছিল না। আমি বলিয়াছিলাম যে, বহুদূর দেখিতেছি তাহাতে ভালই হইবে, কারণ, সেবাশ্রমে আমাকে বলা হইয়াছিল যে, রাষ্ট্রপতি-পদে তোমার নির্বাচন তোমার প্রতি ততটা আত্মজ্ঞাপক নহে, বরং পুরাতন নেতাদের প্রতি আত্মজ্ঞাপক বিশেষ করিয়া সর্দারের প্রতি। ইহার পর মৌলানা সাহেবের সহিত দেখা করিবার জন্য যখন আমি এলাহাবাদ বাই, তখনই আমি প্রস্তাবটির আসল খসড়াটি দেখি।

আমার মর্যাদার প্রশ্ন এখানে উঠে না। উহার কোনও নিজস্ব মূল্য নাই। আমার মনোভাব সম্পর্কে যদি সন্দেহ পোষণ করা হয়, আমার নীতি বা কার্যক্রম যদি দেশবাসী অগ্রাহ্য করে, তাহা হইলে মর্যাদার নাশ অবশ্যই হইবে। ভারতের কোটি কোটি মানুষের কার্যের সমষ্টিগত ফলের গুণ বা দোষ অনুসারেই ভারতের উত্থান বা পতন হইবে। ব্যক্তি বরং বড় হউন না কেন, তাঁহার নিজস্ব কোনও মূল্য নাই—তাঁহার মূল্য এই কোটি কোটি নর-নারীর প্রতিনিধিত্বের মাপকাঠির বিচারে। সুতরাং এ প্রশ্ন আলোচনার বিষয়-বহির্ভূত করা যাউক।

তোমার মতে, এখনকার মত দেশ আর কখনও অহিংস হয় নাই। আমি তোমার এই অভিমত পূর্ণাঙ্গ স্বীকার করি। যে বায়ু আমি নিঃশ্বাসে লইতেছি, তাহার মধ্যেও আমি হিংসার গন্ধ পাইতেছি। কিন্তু সেই হিংসা এখন একটি সূক্ষ্মরূপে গ্রহণ করিয়াছে। আমাদের পারস্পরিক অবিবাহ নিয়ন্ত্রণের হিংসাবাদ। হিন্দু এবং মুসলমানগণের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বিভেদ সেই হিংসারই প্রকাশ। আমি আরও উদাহরণ দিতে পারি।

কংগ্রেসের মধ্যে দুর্নীতির পরিমাণ সম্পর্কে আমাদের মধ্যে মত-পার্থক্য আছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। আমার মনে হয়, দুর্নীতি বাড়িতেছে। এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ তদন্তের অনুরোধ আমি গত কয়েক মাস ধরিয়া করিয়া আসিতেছি।

এই পরিস্থিতিতে অহিংস গণ-আন্দোলনের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ আমি লক্ষ্য করিতেছি না। চরমপন্থের পশ্চাতে যদি উপযুক্ত কার্যকরী শক্তি না থাকে, তাহা হইলে উহা একেবারে মূল্যহীন।

কিন্তু পূর্বে তোমাকে বেরূপ বলিয়াছি এখনও সেরূপ বলিতেছি আমি বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি এবং তজ্জন্মই সম্ভবতঃ অতি সাবধানী এবং ভীক হইয়া পড়িতেছি। কিন্তু তোমার আছে যৌবন এবং যৌবন-জাত বেপরোয়া আশাবাদ। আমি আশা করি, তোমার পছন্দই ঠিক, আমার পছন্দ ভুল বলিয়া প্রমাণিত হউক। আমার দৃঢ়বিশ্বাস এই যে, বর্তমানে কংগ্রেসের অবস্থা বেরূপ তাহাতে তাহার পক্ষে উদ্ভেদ নিঃ

হওয়া অসম্ভব। উহার পক্ষে বর্ধাৰ্হভাবে আইন অমান্য আন্দোলন পরিচালনা করা সম্ভব নয়। সুতরাং তোমার ভবিষ্যৎ যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে আমার আসন এখন পশ্চাতে, সত্য্যগ্রহী নেতারূপে আমার দিন চলিয়া গিয়াছে।

কুঙ্গ রাজকোট ব্যাপারটির উল্লেখ করিয়াছ বলিয়া আমি আনন্দিত। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর বিভিন্নতা উহার দ্বারা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এ সম্পর্কে যে পক্ষ আমি গ্রহণ করিয়াছি, তৎক্ষণ আমি আমো অল্পতপ্ত নহি। আমি অল্পতপ্ত করিতেছি যে, উহার বিশেষ জাতীয় মূল্য আছে। রাজকোটের জন্ত আমি অস্ত্রাভ্য দেশীয় রাজ্যে আন্দোলন বন্ধ করি নাই। কিন্তু রাজকোট আমার চোখ খুলিয়া দিয়াছে। উহা আমাকে পথ দেখাইয়াছে। বাহ্যের জন্ত আমি দিল্লীতে আসি নাই। অনিচ্ছায় আমি দিল্লীতে আছি এবং প্রধান বিচারকের দ্বারের জন্ত অপেক্ষা করিতেছি। বড়লাট আমার নিকট তাঁহার শেষ তারবার্তায় যে বোধবা করিয়াছিলেন, তাহা সকল করিবার জন্ত বতর্কণ কার্যক্রম গ্রহণ না করা হয়, ততক্ষণ দিল্লীতে থাকা আমি আমার কর্তব্য বলিয়া মনে করি। হয়ত আমি কোনওরূপ অনিশ্চয়তার সম্মুখীন না-ও হইতে পারি। আমি যদি সর্বোচ্চ রাজস্বজ্ঞিকে তাহার কর্তব্য সমাধা করিবার জন্ত আমন্ত্রণ জানাইয়া থাকি, তাহা হইলে সে কর্তব্য বর্ধাৰ্হভাবে পালন করা হইল কি না তাহা দেখিবার জন্ত দিল্লীতে অবস্থান করিতে আমি বাধ্য। যে দলিলের অর্থ সম্পর্কে ঠাকুর সাহেব সন্দেহের অবকাশ রচনা করিয়াছেন, তাহার ভাব্য করিবার জন্ত প্রধান বিচারপতিকে নিবেগন করার মধ্যে আমি কোনও অস্ত্রাভ্য দেখি না। প্রসঙ্গতঃ জানাইতেছি যে, প্রধান বিচারকরূপে নহে, বড়লাটের বিধাঙ্গভাজন দক্ষ আইনজ্ঞরূপ হ্রার মরিস দলিলটি পরীক্ষা করিয়া বেধিতেছেন। বড়লাটের মনোনীত ব্যক্তিকে বিচারকরূপে স্বীকার করিয়া আমার মনে হয়, আমি শালীনতা এবং জ্ঞানবত্তার পরিচয় দিয়াছি এবং উহাপেক্ষা বাহা আরও প্রয়োজনীয়, এ-বিষয়ে আমি বড়লাটের দাবি বাড়াইয়া দিয়াছি।

আমাদের মধ্যে যে ভীষণ মতানৈক্য আছে, সে-সম্পর্কে আলোচনা করিলাম বটে কিন্তু এ বিষয়ে আমি দৃঢ়নিশ্চয় যে, আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক তদ্বারা আমো ক্ষুর হইবে না। এই পার্থক্যের মধ্যে বহিঃআন্তরিকতা থাকে, আমার বিশ্বাস তাহা আছে, তাহা হইলে, পার্থক্যজনিত ঝগড়া উহা কাটাঁয়া উঠিতে পারিবে।

—বাণু।

নেতাজীর পত্রে—৪

জিয়ালগোড়া পোঃ,
জেলা মানভূম, বিহার,
৬ই এপ্রিল, ১৯৩১।

প্রিয় মহাশ্রাজী,

আমার মেজ দাদা শরৎকে এক পত্রে আপনি উত্তর পক্ষের নেতাদের মধ্যে এক প্রাণখোলা আলোচনার পরামর্শ দিয়াছিলেন, বাহাতে ভবিষ্যতে সম্মিলিত ভাবে কাজ করিবার পথ পরিষ্কার হয়। ইহা অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের পরামর্শ এবং অতীতে বাহাই ব্যক্তি থাকুক না কেন, আমি এ-বিষয়ে বর্ধাঙ্গাধ্য করিতে রাজী আছি। এ-বিষয়ে আমার দ্বারা কিছু করা উচিত মনে

করেন কিনা এবং উচিত মনে করিলে, কি করা উচিত—সে সম্পর্কে আপনার অভিমত জানাইবেন কি? আমার ব্যক্তিগত অভিমত এই যে, এই ঐক্যসাধনের প্রচেষ্টার আপনার প্রভাব এবং ব্যক্তিগত বর্ধাৰ্হ কার্যকরী হইবে। আমরা ঐক্যসাধনের সকল আশা ত্যাগ করিবার পূর্বে আপনি কি সমগ্র শক্তি নিয়োগে শেষ চেষ্টা করিবেন না? এখনও দেশবাসী আপনাকে কি দৃষ্টিতে দেখে তাহা স্বরণ করিতে অল্পবোধ করিতেছি। আপনি কোনও দলের পক্ষপাতিত্ব করেন না। সুতরাং বর্ধাঙ্গাধ্য দলগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্ত জনসাধারণ এখনও আপনার মুখের দিকে চাহিয়া আছে।

ওয়ার্কিং কমিটি গঠন সম্পর্কে আপনি যে পরামর্শ দিয়াছেন, সে সবক্ষে আমি গভীরভাবে চিন্তা করিতেছি। আমার মনে হইতেছে, আপনার উপদেশটি নৈরাশ্রের মন্ত্রণা। ঐক্যের সকল আশা উহা নিশূল করিবে। বিভেদ হইতে উহা কংগ্রেসকে বন্ধ করিবে না, উপরন্তু ঐক্য শব্দটির জন্ত পথ সহজ করিয়াই দিবে। বর্তমান অবস্থায় একদলীয় ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের পরামর্শ দেওয়ার অর্থ দলগুলিকে এখনই বিচ্ছিন্ন হইতে উপদেশ দেওয়া। উহা কি এক মারাত্মক দারিদ্র্যবোধ নহে? আপনি কি এই বিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয় হইয়াছেন যে, একযোগে কাজ অসম্ভব? আমাদের পক্ষের অভিমত এই যে, তাহা আমরা মনে করি না। “কমা করা এবং ভুলিয়া যাওয়ার জন্ত” আমরা বর্ধাঙ্গাধ্য চেষ্টা করিতে প্রস্তুত। একই আদর্শের জন্ত একযোগে কাজ করিতে আমরা ইচ্ছুক। আমাদের সকলের মধ্যে এক সম্মানজনক আপোষ মীমাংসার জন্ত আমরা আপনার উপর নির্ভর করিতে পারি। আমি ইতিপূর্বেই আপনাকে বলিয়াছি এবং লিখিয়াও জানাইয়াছি যে, কংগ্রেসের সংগঠন এখন বৈরূপ আছে এবং অল্প ভবিষ্যতে উহার বিশেষ রূপ পরিবর্তনের সম্ভাবনা না থাকায়, সর্বদলীয় কার্যনির্বাহক সমিতি গঠনই সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবস্থা হইবে। এই কমিটিতে বর্ধাঙ্গাধ্য সকল দলের প্রতিনিধির স্থান থাকিবে।

আমি জানিতে পারিয়াছি যে, আপনি এইরূপ সর্বদলীয় ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের পক্ষপাতী নহেন। আপনার এই বিরোধিতা কি নীতির দিক দিয়া (যেমন, আপনার মতে একযোগে কাজ অসম্ভব) অথবা উহা কি আপনার এই অভিমতের জন্ত যে, ওয়ার্কিং কমিটিতে গান্ধীবাদীদের (আমি এই বাক্যাংশটির ব্যবহার এইজন্ত করিলাম যে, উহাপেক্ষা উত্তম শব্দ পাই নাই এবং এজন্ত আপনি আমাকে কমা করিবেন) প্রতিনিধিত্ব অধিক থাকা প্রয়োজন? শেষের কারণটি সত্য হইলে, অল্পগ্রহপূর্বক আমাকে তাহা জানাইয়া দিন। তাহা হইলে সমগ্র বিষয়টির পুনর্বিবেচনার এক সুযোগ আমি পাইতে পারি। আর পূর্বের কারণটি সত্য হইলে, এই পত্রে আমি বাহা জানাইতেছি তাহার আলোকে আপনার উপদেশটি অল্পগ্রহ পূর্বক পুনর্বিবেচনা করুন। হরিপুরা কংগ্রেসে যখন আমি ওয়ার্কিং কমিটিতে বোপ দিবার জন্ত সম্মানিত হইয়া বাদীদের আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলাম তখন আপনি স্পষ্টভাবে বলিয়াছিলেন যে, আমার ঐ কার্যের পশ্চাতে আপনার সমর্থন ছিল। তাহার পর কি পরিবর্তিত এতই ভ্রমপূর্ণ পরিবর্তন হইয়াছে, বাহার ফলে আপনি এখন একদলীয় ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের জন্ত পীড়াপীড়ি করিতেছেন?

আপনি আপনার পত্রগুলিতে আমাদের দুইটি দল সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, উহার পরস্পরের একান্ত বিরোধী। আপনি আপনার মন্তব্যটি পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া বলেন নাই। আপনি যে বিরোধের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা কার্যক্রমের ভিত্তিতে না ব্যক্তিগত সম্পর্কের ভিত্তিতে স্থাপিত, তাহা পরিষ্কার বুঝা বাইতেছে না। আমার মতে, ব্যক্তিগত সম্পর্কের ব্যাপারটা, নিতান্ত সাময়িক। যগড়া এবং মারামারি করিতে আমরা যেমন পারি, আমাদের মতানৈক্য তুলিয়া বাইতে এবং হস্তমর্দন করিতেও আমরা তেমনই পারি। উদাহরণস্বরূপ, আধুনিক কংগ্রেসের ইতিহাসে, স্বরাজ্যবাদী কাহিনীটির কথাই ধরুন না। বতদূর আমি জানি, কিছুকাল বিরোধের পর, আপনার সহিত দেশবন্ধু ও পণ্ডিত মতিলালজীর সম্পর্ক বতদূর সম্ভব মধুর হইয়াছিল। গ্রেটব্রিটেনে বিপ্লবের সময়, বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলি সব সময়েই ঐক্যবদ্ধ হইয়া একই মন্ত্রিসভায় যোগ দিয়া কাজ করিতে পারে। ইউরোপের অসংখ্য দেশে, যেমন ফরাসী দেশে, প্রত্যেকটি মন্ত্রিসভাই সর্বদলীয় মন্ত্রিসভা। ব্রিটিশ এবং ফরাসীদের তুলনায় কি আমরা কম দেশপ্রেমিক? যদি আমরা তাহা না হইয়া থাকি, তাহা হইলে সর্বদলীয় কমিটি গঠন করিয়া সুষ্ঠুভাবে কাজ করিতে পারিব না কেন?

আপনি যদি মনে করেন যে, ব্যক্তিগত বিষয় নহে, কার্যক্রমের ভিত্তিতেই আপনার বিরোধিতা, তাহা হইলে এই বিষয়ে আমি আপনার মতামত জানিতে চাহি। আমাদের কার্যক্রমের সহিত আপনাদের কার্যক্রমের পার্থক্য কোথায় এবং তাহা কি এতই গভীর যে, একযোগে কাজ সম্ভব নহে? আমি জানি যে, আমাদের মধ্যে মরুত্বের কথা রহিয়াছে। কিন্তু আমি ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণকে তাঁহাদের পদত্যাগ-পত্রের জবাবে বলিয়াছিলাম যে, আমার মতে, আমাদের মধ্যে বর্তমান মতপার্থক্য রহিয়াছে তাহাপেক্ষা অনেক বেশী বিষয়ে মতৈক্য রহিয়াছে। ত্রিপুরার ঘটনা সত্ত্বেও আমি এই মত এখনও পোষণ করি।

স্বরাজ্যের বিষয়ে আমার চরমপত্র সম্পর্কিত অভিমত সম্পর্কে আপনার পত্রগুলিতে বলিয়াছেন যে, অহিংস গণসত্যাগ্রহের উপযোগী আবহাওয়া এখন নাই। কিন্তু আপনি কি রাজকোটে অহিংস গণসংগ্রাম শুরু করেন নাই? অসংখ্য দেশীয় রাজ্যও কি আপনি তাহাই করিতেছেন না? এই দেশীয়রাজ্যগুলির অধিবাসীরা সত্যগ্রহ আন্দোলন পরিচালনে অপেক্ষাকৃত অনভিজ্ঞ। ব্রিটিশ ভারতের আমরা অধিকতর শিক্ষার এবং অভিজ্ঞতার দাবী করিতে পারি—অন্ততঃপক্ষে উহাদের তুলনায়। ব্যক্তিগত দাবীর এবং গণিতমূলক সরকার গঠনের দাবীতে যদি দেশীয়-রাজ্যগুলিকে সংগ্রাম করিতে দেওয়া সম্ভব হইতে পারে, তাহা হইলে ব্রিটিশ ভারতের নামদিগকে তাহা দেওয়া সম্ভব নয় কেন?

গান্ধীবাদীদের সমর্থনে ত্রিপুরী কংগ্রেসে যে জাতীয় দাবীর প্রস্তাব পাশ হইয়াছিল, তাহার কথা ধরুন। যদিও উক্ত প্রস্তাবটিতে স্থানীয় সরকার সম্পর্কে বাক্যাংশ আছে এবং কয়েকটি বড় বড় আদর্শের কীকা হুলি আছে, তথাপি উহার সহিত চরমপত্র দান এবং আগামী কথামের জন্ত দেশকে প্রস্তুত করা সম্পর্কে আমার অভিমতের বহু পার্থক্য আছে। আপনি কি এই প্রস্তাবটি সমর্থন করেন? যদি

তাহা করেন, তাহা হইলে আর এক ধাপ অগ্রসর হইয়া আমার পরিকল্পনাটি গ্রহণ করিতে পারেন না কেন?

এবার আমি পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাব সম্পর্কে বলিব। ইহার প্রধান অংশটিতে (শেষাংশটির কথা বসিতেছি) দুইটি বিষয়ের উল্লেখ আছে। প্রথমতঃ ওয়ার্কিং কমিটি আপনার বিশ্বাসভাজন—পুরা বিশ্বাসভাজন হওয়া চাই। দ্বিতীয়তঃ আপনার ইচ্ছামুসারে উহাকে গঠন করিতে হইবে। আপনি যদি একদলীয় ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের পরামর্শ দেন এবং ঐরূপ কমিটি গঠন করা হয়, তাহা হইলে লোকে বলিতে পারে যে, উহা “আপনার ইচ্ছামুসারে” গঠিত হইয়াছে! কিন্তু ইহা কি ধরিয়া লওয়া বাইতে পারে যে, উহা আপনার বিশ্বাসভাজন হইবে? এ, আই, সি, সির সভায় ঈড়াইয়া উঠিয়া একথা বলিবার স্বাধীনতা থাকিবে কি যে, আপনি একদলীয় ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের উপদেশ দিয়াছেন এবং নূতন কমিটি আপনার বিশ্বাসভাজন? অপর পক্ষে আপনি যদি ঐরূপ ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের পরামর্শ দেন বাহা আপনার বিশ্বাসভাজন নহে, তাহা হইলে আপনি কি পন্থ প্রস্তাবকে কার্যকরী হইতে দিবেন—আপনার নিজের দৃষ্টিকোণ হইতে তাহা হইলে আপনি কি স্বেচ্ছায় কার্য করিবেন? সমস্তাটির এই দিকটি আপনাকে ভাবিয়া দেখিতে বলি। পন্থ প্রস্তাবটি যদি আপনি স্বীকার করেন তাহা হইলে শুধু যে নূতন ওয়ার্কিং কমিটি সম্পর্কে আপনার ইচ্ছা জানাইতে হইবে তাহা নহে, ঐ একই সময়ে, আপনার বিশ্বাসভাজন হয় এমন এক কমিটি গঠন সম্পর্কে পরামর্শ দিতে হইবে।

পন্থ প্রস্তাবের গুণ সম্পর্কে এখনও আপনি কিছু বলেন নাই। আপনি কি উহা সমর্থন করেন? অথবা আপনি এমন একটি সর্ববাদিসম্মত প্রস্তাবের পক্ষপাতী, বাহা কমবেশী আমাদের পরামর্শমুখ্য হইবে, বাহাতে আপনার নীতির প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করা হইবে, আপনার নেতৃত্বে পুরা বিশ্বাস জানান হইবে এবং বাহাতে বিরোধমূলক ধারাগুলি সংযোজিত থাকিবে না? আরও, গুরুত্বপূর্ণ পন্থ প্রস্তাব পাশ হইবার পর, ওয়ার্কিং কমিটি গঠন সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাটি কিরূপ ঈড়াইয়াছে? আমি পুনরায় এই প্রশ্ন করিতেছি, কারণ, বর্তমান কংগ্রেস শাসনতন্ত্র প্রকৃতপক্ষে আপনাই রনো এবং সেজন্য এ—সম্পর্কে আপনার অভিমত আমার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিবে। এ-সম্পর্কে আর একটি প্রশ্ন আছে এবং তাহা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি: পন্থ প্রস্তাবটিকে কি আপনি আমার প্রতি অনাস্থাজ্ঞাপক বলিয়া মনে করেন? যদি তাহাই মনে করেন, তাহা হইলে, আমি তৎক্ষণাৎ পদত্যাগ করিব এবং তাহাও বিনাসর্তে। আমার সাংবাদিক-বিবৃতিতে এই প্রশ্নটি সম্পর্কে কয়েকটি পত্রিকা সমালোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের সমালোচনার ভিত্তি হইতেছে এই যে, আমার পক্ষপদত্যাগ করা উচিত। এ সম্পর্কে আপনার অভিমতের এবং আপনার ব্যক্তিত্বের প্রতি ব্যক্তিগত প্রভাবশেষী সম্ভবতঃ ঐরূপ মনোভাব গ্রহণ করা হইয়াছিল।

কয়েকটি সংবাদপত্রে ঐরূপ মন্তব্য করা হইয়াছে, সম্ভবতঃ আপনিও সেইরূপ মনে করেন যে, পুরাতন নেতাদের বর্ত্তমান আসনে পুনরায় বসান উচিত। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে আমার আপনাকে জিজ্ঞাস্য করিব—কার্যকরী রাজনীতিতে ফিরিয়া আসুন, কংগ্রেসের স্রষ্টা আপনার সভ্য হউন এবং ওয়ার্কিং কমিটির ভার গ্রহণ করুন। ঐরূপ উক্তির জন্ত আমাকে কমা করিবেন। কাহারও

প্রতি আশাতের অভিশ্রাব না লইয়াই আমি ইহা বলিতেছি। আপনার অমুচরগণের, এমন কি আপনার বিশিষ্ট, প্রিয় অমুচরগণের সহিত আপনার পার্থক্য আকাশ-পাতাল। এমন লোক বহু আছেন। আপনার জন্ত সব কিছু করিতে পারেন কিন্তু উঁহাদের জন্ত নহে। আপনি কি একথা বিশ্বাস করিবেন যে, গত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় কয়েকটি প্রদেশে কয়েক জন গান্ধীবাদী আমার পক্ষে ভোট দিয়াছিলেন, পুরাতন নেতাদের নির্দেশ অগ্রাহ্য করিয়া? আপনার ব্যক্তিত্বের প্রভাব যদি এ বিষয়ে না পড়ে তাহা হইলে, পুরাতন নেতাদের বিরোধিতা সত্ত্বেও আমি তাঁহাদের সমর্থন পাইতে থাকিব। ত্রিপুরাতে পুরাতন নেতারা চাতুর্ঘ্যের সহিত সরিয়া পড়িয়াছিলেন এবং অধিকতর চাতুর্ঘ্যের সহিত আমাকে আপনার বিরোধিতার সম্মুখীন করিয়াছিলেন। (কিন্তু আপনার সহিত আমার কোনও বিবাদ ছিল না)। পরে তাঁহাদের বিরাট জয় এবং আমার পরাজয় হইয়াছিল। আসল ব্যাপার এই যে, উহা তাঁহাদের জয় বা আমার পরাজয়ের সূচক নহে। উহা আপনারই জয়ের সূচক (আপনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার কোনও কারণ না থাকা সত্ত্বেও)। কিন্তু উহা স্বার্থ জয় নহে, কিছুটা আত্মসম্মান বিক্রয় দ্বারা উহা লাভ হইয়াছে।

কিন্তু আমি অবাস্তব প্রেসে আসিয়া পড়িতেছি। আপনি বাহাতে প্রত্যক্ষরূপে, খোলাখুলি ভাবে কংগ্রেসের পরিচালনা করিতে পারেন, সেজন্ত আমি আপনার নিকট আবেদন করিতে চাহিয়াছিলাম। উহা দ্বারা সকল সমস্তা সহজ হইয়া বাইবে। পুরাতন নেতাদের বিরুদ্ধে বিরোধিতার অনেকখানি—উহার বিড়ছে বিরোধিতা নিশ্চয়ই আছে—আপনা হইতেই তখন অবসান হইবে।

আপনি যদি তাহা না পারেন, তাহা হইলে আমার এমটি বিকল্প পরামর্শ আছে। আমাদের দাবীমত স্বাধীনতার জন্ত জাতীয় সংগ্রাম, ব্রিটিশ সরকারকে একটি চরমপত্র দিয়া শুরু করুন, এই আমার অনুরোধ। তাহা শুরু করিলে, আপনি যদি চাহেন, তাহা হইলে, আমরা সানন্দে দায়িত্বের পদগুলি হইতে সরিয়া দাঁড়াইব; আপনি বাঁহাদের বিশ্বাস করেন বা পছন্দ করেন, তাঁহাদের হস্তে ঐ দায়িত্বের পদগুলি স্থল্লে ছাড়িয়া দিব। কিন্তু একটি মাত্র সঙ্কে—স্বাধীনতা-সংগ্রাম পুনরায় শুরু করিতেই হইবে। আমার জ্ঞান, জনসাধারণও উপলব্ধি করিতেছেন যে, বর্তমানে আমাদের নিকট যে সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, সেইরূপ সুযোগ একটা জাতির জীবনে কচিৎ আসে। সেইজন্ত সংগ্রাম পুনরায় স্ত্রে সহায়তার জন্ত আমরা যে কোনওরূপ আত্মত্যাগ করিতে রাজী আছি।

যদি শেষ পর্যন্ত আপনি বলেন যে, সর্বদলীয় ওয়ার্কিং কমিটি অচল, আমাদের সম্মুখে একমাত্র বিকল্প ব্যবস্থা হইতেছে একদলীয় ওয়ার্কিং কমিটি এবং আপনি যদি চাহেন যে আমার পছন্দমত ব্যক্তি লইয়া উক্ত কমিটি গঠন করা আবশ্যিক, তাহা হইলে আমার একান্ত অনুরোধ এই যে, আগামী কংগ্রেসের অধিবেশন পর্যন্ত আপনি আমার প্রতি আত্মজ্ঞাপন করুন। ইতিমধ্যে সেবা ও আত্মত্যাগের দ্বারা যদি আমরা আমাদের নীতির জাঘাতা প্রমাণ করিতে না পারি, তাহা হইলে কংগ্রেসের নিকট আমরা বিকৃত হইব এবং ভ্রান্ত: ও ভ্রান্ত: দায়িত্বপূর্ণ পদ হইতে আমরা বিতাড়িত হইব। বর্তমান অবস্থায়, আপনার আত্মজ্ঞাপক ভোটের অর্থ এ, আই, সি, সির আত্মজ্ঞাপক

ভোট। আপনি যদি আমাদেরকে আপনার আত্মজ্ঞাপক ভোট না দেন অথচ আমাদেরকে একদলীয় ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করিতে বলেন, তাহা হইলে আপনি পছন্দ প্রস্তাবকেই কার্যে পরিণত করিবেন।

পুনরায় আমি আপনাকে অনুরোধ করিতেছি, আপনি দয়া করিয়া জানান, নীতির দিক দিয়া আপনি সর্বদলীয় ক্যাবিনেট (ওয়ার্কিং কমিটি) গঠনের বিরোধী, না আপনি উক্ত ক্যাবিনেটে পুরাতন নেতাদের সংখ্যাধিক্য চাহেন বলিয়া বিরোধিতা করিতেছেন। ২৫শে মার্চের প্রথম চিঠিতে আমি এই প্রশ্নই করিয়াছিলাম।

এই পত্র শেষ করিবার পূর্বে আমি দুই একটি ব্যক্তিগত বিষয়ে জানাইতেছি। আপনি পত্রে জানাইয়াছেন যে, বাহাই ঘটুক না কেন, আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্কের অবনতি হইবে না। আমি সর্বাঙ্গতঃ এই আশা পোষণ করিতেছি। প্রসঙ্গতঃ একথা কি আমি বলিতে পারি যে, জীবনে এমটি বিষয়ে আমার গর্ববোধ আছে—আমি ভুল্লোকের সন্তান এবং নিজে ভুল্লোক। দেশবন্ধু দাশ আমাদের প্রায়ই বলিতেন—“রাজনীতি অনেকা জীবন বড়।” সেই দিক্কা আমি তাঁহার নিকট হইতে শিখিয়াছি। শৈশব হইতে যে ভুল্লতার আদর্শ আমার মনের মধ্যে গাঁথা রহিয়াছে এবং আমার মনে হয়, বাহা আমার রক্তে আছে, তাহা হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছি বলিয়া মনে হইলে, আমি আর একদিনও রাজনীতিক্ষেত্রে থাকিব না। মানুষ হিসাবে আপনি আমাকে কি চোখে দেখেন, তাহা জানিবার উপায় আমার জীবনের সামান্য অংশই দেখিয়াছেন। আমার রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীরা আমার বিরুদ্ধে কত গল্পই না আপনাকে শোনাইয়াছেন। স্পষ্টতঃ কয়েক মাস আমি জানিতে পারিয়াছি যে, আমার বিরুদ্ধে মুখে মুখে একটি স্বকৌশলী অথচ ভীষণ প্রচারকার্য চালান হইতেছে। বহুপূর্বেই আমি এ বিষয় আপনার গোচরীভূত করিতাম কিন্তু প্রচারের বিষয়বস্তু এবং কাহারো প্রচার করিতেছে, সে সম্পর্কে প্রত্যক্ষ প্রমাণ না পাওয়ায় তাহা সম্ভব হয় নাই। প্রচারের বিষয় সম্পর্কে পরে আমি জানিতে পারিয়াছি, যদিও আমি এখনও জানিতে পারি নাই কাহারো এই কার্য করিতেছেন।

পুনরায় আমি অবাস্তব প্রেসে আসিয়া পড়িয়াছি। একটি পত্রে আপনি এই আশা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, আমি বাহাই করি না কেন, “ভগবান আমাকে পথ দেখাইয়া চলিবেন।” বিশ্বাস করুন মহাত্মাজী, সকল দিবসব্যাপী আমি একটি প্রার্থনাই করিতেছি—আমার দেশের এবং দেশের মুক্তির পথ-সম্পর্কে আমি যেন আলোক পাই। প্রয়োজন এবং সুযোগ উপস্থিত হইলে আমি বাহাতে নিজেই দৃঢ়তার সহিত সম্মুখীন হইতে পারি, সেজন্ত শক্তি ও অনুপ্রেরণার প্রার্থনা আমি করিয়াছি। আমার দৃঢ়বিশ্বাস এই যে, একটা জাতি বাঁচিতে পারে যদি সেই জাতির অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিসত্তা দেশের প্রয়োজন উপস্থিত হইলে মরিবার জন্ত প্রস্তুত থাকে। এই নৈতিক (বা আধ্যাত্মিক) “হারাকিরি” সহজ নহে। দেশের প্রয়োজন উপস্থিত বধনই হইবে তখনই যেন তাহার সম্মুখীন হইতে পারি, সে শক্তি ভগবান যেন আমাকে দেন।

আশা করি আপনার স্বাস্থ্যোন্নতি হইতে থাকিবে। আমি বীরে বীরে রুহ হইয়া উঠিতেছি। সজ্ঞ প্রণামান্তে—

আপনার মেহের—মুজিব।

মাসিক বসুধা—বৈশাখ

৯৬

সেই কাপড় কাচার পাউডার যা
ইউরোপ এবং আমেরিকার বাজার
দখল করেছিল!

এখন
ভারতবর্ষে
পাওয়া যাচ্ছে



মূল্য :
১ টাকা ১২ নয়া পয়সা
(স্থানীয় কর ছাড়া)

সার্ফ

অপূর্ব সাদা করে
জামাকাপড় কাচে

সার্ফ—অত্যধিক নীল পাউডারটি আপনার জামাকাপড়কে এক অপূর্ব শুভ্রতা দেয়, কোন কাপড় কাচার উপাদান যে জামাকাপড়কে এত সাদা করতে পারে তা ছিল আপনার ধারণার অতীত! এক প্যাকেট ব্যবহার করুন, আপনাকে মানতেই হবে যে... আপনি কখনও কখনও জামাকাপড় এত স্বচ্ছকে সাদা, এত দৃশ্য উপভোগ করে! সার্ফ, চামড়, সাদা তোমালে—সবকিছু কাচার জন্যে এটি আদর্শ!

আপনি কখনও দেখেননি এত ফেণা—ঠাণ্ডা বা গরম জলে, ফেণার পক্ষে অতিকূল জলে, সঙ্গে-সঙ্গে আপনি পাবেন ফেণার এক সমুদ্র! আপনি কখনও জানতেন না যে এত সহজে কাপড় কাটা যায়! বেশি পরিশ্রম নেই এতে! ডেক্সো, চেপা, এবং বোণ্ডা মানেই আপনার জামাকাপড় কাটা হয়ে গেল। আপনি কখনও পাননি আপনার পরমার মূল্য এত চমৎকারভাবে ফিরে। একবার সার্ফ ব্যবহার করলেই আপনি এ কথা মনে নেবেন! সার্ফ সব জামাকাপড় কাচার পক্ষেই আদর্শ!

সার্ফে জামাকাপড় অপূর্ব সাদা করে কাচা যায়!

৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬

আপনি নিজেই পরখ করে দেখুন...

বিশ্বাস লিভার সিটিং, কলকাতা

অস্ট্রেলিয়া

সাত্যকি

১১

দল বেঁধে ছেলেরা চল শিক্‌নিক করতে। সমস্ত দিন একসঙ্গে মনের খুশীতে কাটাতে পারবে ভেবে ওরা চঞ্চল হয়ে উঠেছে। আজ কোন শাসন নেই, নেই পড়া না পারার ভয়। ওদেরই মধ্যে কেউ কেউ হয়তো ভাবছে, যদি সারা বছরই এ রকম আনন্দ করে কাটানো যেত।

একটা বাগান-বাড়িতে এসে পৌঁছলুম।

বড়লোকের সখের বাড়ি। দেখেই বোঝা যায়। এক দিকের কোণ উঁচু করে ইট দিয়ে গোল করে ঘেরা জায়গায় জায়গায়। আর তার মাঝখানে ঘোঁসুরী ফুলের বাহার। কাঁটালিটাপার গাছগুলিও সুন্দর করে লাগানো। সেট থেকে সোজা বাড়ি পর্যন্ত হুড়ি-ছাওয়া পথ। পথের দু'ধারে লম্বা লম্বা পামগাছের সারি। অনেকখানি জায়গা জুড়ে পুকুর। তার ওপর সেতু। হুটো ভিজি নৌকাও বাঁধা আছে ঘাটে, দেখা গেল।

এমন সুন্দর জায়গায় এসে ছেলেরা মহানন্দে ছটোপুটি আরম্ভ করে দিল। দলে ছিলেন দুজন প্রবীণ শিক্ষক। তাঁরা প্রথমে বাধা দিতে চেষ্টাছিলেন। পরে ছেলের উৎসাহ দেখে তাঁরা নিরস্ত হন। শুধু সাবধান করে দিলেন, যেন কেউ ফুল না ছেঁড়ে কিংবা কোন গাছপালায় ক্ষতি না করে।

বড় দেখে একটা গাছের নীচে রান্না চাপান হয়েছে। ছোট ছোট দলে ছেলেরা বিভক্ত হয়ে এদিক-ওদিক বেড়াচ্ছে। কেউ কেউ নৌকা বাইতে চাইল। মালীর সঙ্গে পরামর্শ করে শিক্ষক মহাশয় তাদের অনুমতি দিলেন।

বেলা যে দেখতে দেখতে কেমন করে কেটে গেল, বোঝা গেল না। আমি একটু অস্বস্তিক্ষ ছিলুম। মনে বিগত দিনের ছবি ভেসে উঠছিল। আমিও একেই মতো এক দিন ছোট ছিলাম। এমনি দৌরাণ্ডা করতুম। বড়রা কখনো হাসিমুখে সহ করতো, কখনো বা করতো না। বখন করতো না তখন হয় বকুনি, নয়তো মার খেতুম। তবু ভাল লাগত। তখন ভাবতুম বড়দের কত মজা। আমাদের মতো পড়া দেবার যন্ত্রণা সহ করতে হয় না। কেমন বখন ইচ্ছে, তখন বাড়ি আসে। আর আমার বাড়ি ফিরতে একটু দেরী হলেই জ্বরজ্বর সব কাণ্ড হতো বাড়িতে। আহা, যদি আবার কোন দিন এই ভাবনা বিহীন দিনগুলির দেখা পাই।

কী অলস পরিকল্পনা! নিজের মনেই হাসি পাচ্ছিল। কানাই

ওদিকে একটা বাচ্চা ছেলেকে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সারাদিন ও সেই ছেলেটিকে নিয়ে কাটাল। কখনো ওকে গুলতি তৈরী করে দিচ্ছে, কখনো বা ওর সঙ্গে মার্বেল খেলছে। কানাইও যেন একটা ছোট ছেলে হয়ে পড়েছে।

ফেরবার পথে কানাই বলল, শরীরকে দেখতে বেশ, না ?

—কোন শরীর? আমি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম।

—বা রে। যে বাচ্চা-ছেলেটার সঙ্গে আমি সারাদিন কাটালুম সেই তো শরীর। কানাই অমুযোগ করল।

—ও।

কানাইকে সাহসনা দিয়ে বলি, হ্যাঁ, ছেলেটা বেশ দেখতে। ভোমার যদি ওরকম একটা থাকতো!

কানাই সঙ্গজ ডকীতে বলল, খোং, কী যে বলো।

বুকলাম কানাই ছেলেটিকে ভালবেসে ফেলেছে। আর এই একই কারণে ওর বিয়ের প্রস্তাব করা আমার পক্ষে অত্যন্ত সহজসাধ্য হয়ে পড়ে। ভগবানকে ধন্যবাদ দিলুম।

বাড়ি ফিরে এসে আর বাইরে যেতে ভাল লাগল না। বারান্দার একটা মাছুর বিছিয়ে শুয়ে পড়লুম।

পামা এসে একবার জিজ্ঞাসা করল, শরীর খারাপ লাগছে না কি ?

মাথা নেড়ে বললুম, না।

—তবে শুয়ে পড়লে যে ?

—এমনি।

পামা নিশ্চিন্ত মনে তার কাজ করতে চলে গেল। কি যেন ভাবছে পামা! সেই কাল রাত থেকে ওকে একটু গভীর-গভীর দেখছি। পরিহাসের সুরে আর কথা-কাটাকাটি নেই, নেই কাহ্নে এসে সোহাগ জানানো। আজ ও শুধু শরীর খারাপ কিনা জিজ্ঞাসা করেই চলে গেল। অস্ত্র দিন হলে কাহ্নে এসে বসতো, কপালে-বুকে হাত রেখে দেহের তাপ পরিমাপ করতে চেষ্টা করতো। কিছুই করলো না দেখে ওকে একবার ডাকতে ইচ্ছা হলো। তার পরই ভাবলুম, যেচ্ছার বখন ও আসেনি তখন ওকে ডাকা মানে ওর অভিমানকে প্ররোচ দেওয়া। মেয়েদের তোয়াজ করার পক্ষে আমি নই। তাতে ওরা পেয়ে বসে। আমি আরামের সঙ্গে একটা সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগলুম।

বাইরে গলার আওয়ার পাওয়া গেল। মহিম ডাকছে, নহন
কিরেছো নাকি গো?

মহিমকে এনে মাছের এক দিকে বসতে দিলুম। পা মুড়ে
বাগিয়ে বসে মহিম জিজ্ঞাসা করলো, তার পর কখন ফেরা হলো?

—এইতো এলুম।

—আবার বিরক্ত করলুম না তো?

—না না। কি যে বলেন! চা খাবেন?

—চা? তা মন্দ নয়। কিন্তু তার জন্তে তোমার ব্যস্ত হতে
হবে না। বোমা, ও বোমা!

পামা মাথার বোমটা একটুখানি টেনে বেরিয়ে এলো আঁচলে
ভিজে হাত মুছতে মুছতে।

মহিম বললো, ছ'কাপ চা কর তো বোমা ভাল করে। খুব
ভাল বেন হয়, বুঝলে?

মাথা হুলিয়ে সার দিয়ে পামা বেরিয়ে গেল।

—তার পর খবর কি বলুন? আমি জিজ্ঞাসা করলুম।

—খবর আর কি ভায়া! শিব বাবুর মেয়েকে দেখতে যাওয়া
তাহলে ঠিক, কী বলো?

—হ্যাঁ হ্যাঁ। এ বিষয়ে আপনি নিশ্চিত থাকুন।

—তা বলি, কানাই ছোকরা গেল কোথায়? তাকে দেখছি
না যে?

—কানাই একটু বাইরে বেড়াতে গেছে।

চায়ে একটা নরম চুমুক দিয়ে মহিম বলল, আ। মহিম চলে
বাবার পর ছারিকেনের পলতেটা একটু বাড়িয়ে দিয়ে হিসেবের
খাতা খুলে বসলুম। কত দিন যে হিসাব লেখা হয়নি।
নোট-বই থেকে সব পাকা খাতার তুলতে লাগলুম। কানাইকে
হিসাব বুঝিয়ে দিতে হবে। ওর যখন আলাদা সংসার হচ্ছে
তখন ওর খরচপত্র আলাদা করে দেওয়াই ভালো। একমনে কাজ
করতে শুরু করলুম।

আমার একাগ্রতা ভাঙিয়ে দিয়ে কানাই বলল, কি জ্ঞত
হিসাব করছো?

—এই অনেকদিন খাতা লেখা হচ্ছে না, তাই।

—রাখো তুলে ওসব। বত বাজে ব্যক্তি বায়লা বাপু।

—সে কি, কানাই? তুমি হিসেব বুঝে নেবে না?

—হিসেব বুঝে নেবে? মানে?

আমাকে নিরুত্তর দেখে কানাই আবার বলল, ও বুঝি।

আমাকে আলাদা করে দিতে চাও। কিন্তু কেন?

—তোমার ভালোর জন্তে।

—আমার ভালো-মন্দ বোঝার ব্যয়স কী আমার হয়নি?

—হ্যাঁহ্যাঁ। কিন্তু একটা কথা তুমি ভুলে যাচ্ছ, কানাই।

তুমি জান যে আমার আর পামার সঙ্গে বিয়ে করার পর তুমি
বাস করতে আর পারো না?

—কেন পারি না?

অলৌকিক দৈবশক্তি-সম্পন্ন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ তান্ত্রিক ও জ্যোতির্বিদ

জ্যোতিষ-সম্রাট পণ্ডিত ত্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, জ্যোতিষার্ণব, রাজজ্যোতিষী এম-আর-এ-এস (লণ্ডন),



(জ্যোতিষ-সম্রাট)

নিখিল ভারত ফলিত ও গণিত সভার সভাপতি এবং কাশীহ বারাগানী পণ্ডিত মহাসভার স্থায়ী সভাপতি।
ইনি দেখিবামাত্র মানবজীবনের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান নির্ণয়ে সিদ্ধহস্ত। হস্ত ও কপালের রেখা, কোষ্ঠী
বিচার ও প্রস্তুত এবং অশুভ ও শুভ গ্রহাদির প্রতিকারকল্পে শাস্তি-ষড়্যয়নাদি, তান্ত্রিক ক্রিয়াদি ও প্রত্যেক কলপ্রদ
কবচাদি দ্বারা মানব জীবনের দুর্ভাগ্যের প্রতিকার, সাংসারিক অশান্তি ও ডাক্তার কবিরাজ পরিত্যক্ত কষ্টিন
রোগাদির নিরাময়ে অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন। ভারত তথা ভারতের বাহিরে, যথা—ইংলণ্ড, আমেরিকা,
আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, চীন, জাপান, মালয়, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি দেশে মনীষীমূল্যে তাঁহার অলৌকিক
দৈবশক্তির কথা একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। প্রশংসাপত্রসহ বিস্তৃত বিবরণ ও ক্যাটালগ বিনামূল্যে পাইবেন।

পণ্ডিতজীর অলৌকিক শক্তিতে যাহারা মুগ্ধ তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন—

হিজ্ হাইনেস্ মহারাজা আটগড়, হার হাইনেস্ মাননীয়া বটমাতা মহারাজী ত্রিপুরা স্টেট, কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি
মাননীয় স্ত্রীর মন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায় কে-টি, সন্তোষের মাননীয় মহারাজা বাহাদুর স্ত্রীর মন্ত্রনাথ রায় চৌধুরী কে-টি, উড়িষ্যা হাইকোর্টের
প্রধান বিচারপতি মাননীয় বি. কে. রায়, বঙ্গীয় গভর্নমেন্টের মন্ত্রী রাজাবাহাদুর শ্রীমদ্রমদেব রায়কর, কেউনবড় হাইকোর্টের মাননীয় জজ রায়সাহেব
মিঃ এস. এম. দাস, আসামের মাননীয় রাজাপাল স্ত্রীর ফজল আলী কে-টি, চীন মহাদেশের সাংহাই নগরীর মিঃ কে. কৃষ্ণপাল।

প্রত্যেক ফলপ্রদ বহু পরীক্ষিত কয়েকটি তন্ত্রোক্ত অত্যাশ্চর্য্য কবচ

ধনদা কবচ—ধারণে স্বাস্থ্যসে প্রভূত ধনলাভ, মানসিক শান্তি, প্রতিষ্ঠা ও মান বৃদ্ধি হয় (তন্ত্রোক্ত)। সাধারণ—৭১১/০, শক্তিশালী
বৃহৎ—২১১১/০, মহাশক্তিশালী ও সত্তর ফলদায়ক—১২১১১/০, (সর্বপ্রকার আর্থিক উন্নতি ও লক্ষ্মীর কৃপা লাভের জন্ত প্রত্যেক গৃহী ও ব্যবসায়ীর
অবশ্য ধারণ কৰ্তব্য)। সন্ন্যাসী কবচ—অরণ্যশক্তি বৃদ্ধি ও পরীক্ষায় সফল ১১১/০, বৃহৎ—৩৮১১/০। মোহিনী (বশীকরণ) কবচ—
ধারণে অভিলষিত স্ত্রী ও পুরুষ বশীভূত এবং চিরশত্রুও মিত্র হয় ১১১১/০, বৃহৎ—৩৮১১/০, মহাশক্তিশালী ৩৮১১১/০। বর্গলামুখী কবচ—
ধারণে অভিলষিত কর্মোন্নতি, উপরিস্থ মানবকে সমুদ্র ও সর্বপ্রকার মামলায় জয়লাভ এবং প্রবল শত্রুনাশ ২১/০, বৃহৎ শক্তিশালী—৩৮১/০,
মহাশক্তিশালী—১৮১১/০ (আমাদের এই কবচ ধারণে ভাওয়াল সম্রাজী জয়ী হইয়াছেন)।

(স্বাপিতা ১১০৭০ঃ) অল ইণ্ডিয়া এণ্টোমজিক্যাল এণ্ড এণ্টোমিক্যাল সোসাইটি (রেজিষ্টার্ড)

হেড অফিস ৫০—২ (ব), ধর্মতলা স্ট্রীট “জ্যোতিষ-সম্রাট ভবন” (প্রবেশ পথ ওয়েলসলী স্ট্রীট) কলিকাতা—১৩। ফোন ২৪—৪০৬৫।

। সময়—বৈকাল ৪টা হইতে ৭টা। ব্রাক অফিস ১০৫, প্রে স্ট্রীট, “বসন্ত নিবাস”, কলিকাতা—৫, ফোন ৫৫—৩৬৮৫। সময় প্রাতে ৯টা হইতে ১১টা।

—আমরা বিবাহিত নই বলে।

—তবে এদিন কী করে কাটিয়ে এলুম?

—তুমি একলা ছিলে আর কিছুদিনের মধ্যেই তুমি বিয়ে করতে বাছ। তোমার খন্তরবাড়ির লোকেরা নিশ্চয়ই আমাদের সঙ্গে তোমার থাকার পছন্দ করবে না।

—তা হলে বিয়ে বন্ধ থাক।

কানাই রাগ করে উঠে চলে বাচ্ছিল। পামা এসে তাকে আবার বসাল। তার দুটি হাত ধরে বলল, রাগ করো না, ঠাকুরপো। উনি ঠিক কথাই বলেছেন। তোমাকে আর তোমার বোঁকে আমি কাছে রাখতে পারলে খুবই খুশী হতুম। কিন্তু আমি যে অসামাজিক জীব। নরকের কীট। আমার ছায়া পর্যন্ত মাড়ানো পাপ। তুমি দেখো, ঠাকুরপো, বিয়ের পর ঠিক তুমি আমার কথা বুঝতে পারবে।

কানাই গুম হয়ে বসে রইল। সমাজ ব্যবস্থার পামার হান কত নীচে বোধ হয় সেই কথাই ও ভাবছিল। মানুষ কতই না অসার সংস্কার মেনে চলে। আবার সংস্কার ছাড়াও মানুষ বাঁচতে পারে না। দুঃখের আগুনে মন পুড়িয়ে নিলে নাকি মন শুদ্ধ হয়। পামা কত লাইনা, কত দুঃখ, কত অপমানই না সহ করেছে; বেদনার আগুনে পুড়ে ওর মনও তো শুদ্ধ হয়েছে, পবিত্র হয়েছে। কৈ কেউ ওকে সে-মর্যাদা দেবে? আসলে ওর যে একটা মন আছে, সে-খবরই কেউ রাখে না। শুধু রাখে পামার দৈহিক সৌন্দর্যের উদ্ভাস-পতনের ইতিবৃত্ত।

আজ আমাদের পরিবারে যে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে, তার মূলে কে? কাকে দোষ দোব? আমি তো পামাকে অগ্নিসাকী করে বিয়ে করতে চেয়েছিলুম, কিন্তু ও রাজী হয় নি। বোধ হয় পামা বিবাহিতা, বোধ হয়েছিল বাগদত্তা। সংস্কারের অন্ধতার গলিতে পামাও ধোঁট খাচ্ছে। আমাকে বিয়ে করতে ওর বিবকে বাধে। অথচ বাধাটা যে কী এবং কোথায় তা জানার সৌভাগ্য এখনো আমার হলো না। এক এক সময় মেয়েরা এমন যুক্তিহীনভাবে জেদী হয়ে ওঠে যে রাগ হয়।

রাত হয়ে যাচ্ছে দেখে আমি কানাইকে বললুম, চল, চল। খেয়ে নি। রাত অনেক হলো।

কানাই জেদ ধরলো পামাকেও বসতে হবে আমাদের সঙ্গে। বিরক্ত হলো পামা। বরাবর আমাদের খাওয়া হয়ে বাবার পর ও খেয়েছে। কানাই নাছোড়বান্দা। তার গীড়াপীড়িতে পামাকেও বসতে হলো আমাদের সঙ্গে।

১২

বিশেষতঃ শেষ দানটা পর্যন্ত চালান করে দেবার পর মাঠের কাজ আর আপাতত রইল না। বাইরের দিকে নজর ফেরাতে হবে। মহাজনদের মাল কলকাতা থেকে আনতে হবে। বাঁধা ঘর বেগুলি আছে, তাছাড়াও অস্ত্রাস্ত্র জায়গায় ঘুত্রে হবে অর্ডার সংগ্রহের জন্ত। খরচ বাড়বার আগেই আর বাড়িয়ে ফেলার পক্ষপাতী আমি। খরচ কমাতে আমি চাই না।

সিভিলসার্ভাই ডিপোতে এক দিন সকালবেলা লরী নিয়ে গেলুম। সিরে দেখি রিয়ার লাইন পড়েছে। একটা গাড়ী একটু এগিয়ে

আর সঙ্গে সঙ্গে আরো পাঁচটা গাড়ী সেই শুল্কহান পূরণ করতে এক জোটে হুড়ুড় করে এগিয়ে আসছে। পুলিশ অসহায় দর্শকের মতো চেয়ে চেয়ে দেখছে আর লাঠি হাতে গোঁকে তা' দিচ্ছে। কম করে একশ লরী লাইন।

ওজন হবার বস্ত্র পর্যন্ত পৌঁছতে তিন ঘণ্টা লেগে গেল। তারপর এজেন্ট, চালান পান, মাল তোলা আর চেকিং থেকে বেরুতে বেলা বাবোটা বেজে গেল। এত অসুবিধা সত্ত্বেও আমরা এখানে ভিড় করি। কেবল রোট লাভজনক বলে। দিনে তিনটে ট্রিপ করতে পারলে, লাভ ঘোঁটাছুটি ভালই হয়। কিন্তু সব দিন ছুটোর বেশী তিনটে ট্রিপ হয়ে উঠে না।

সেদিন সন্ধ্যাসের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। অনেক কথার পর সন্ধ্যাস বলল, তোমাদের সঙ্গে বাই চল। আমার নতুন রাস্তা করে দি।

সন্ধ্যাসের আমার রাস্তা করে দেবার প্রস্তাব কানাই ভালমনে নিতে পারেনি। ভয়ে ভয়ে সে বলল, নয়ন, ওকে বিদেয় করো। আমাদের বা হচ্ছে, তা দিয়েই চলে যাবে। ও শরতানটাকে দেখলে আমার ভয় হয়।

—ভয় পাবার কী আছে? অভয় দিয়ে আমি বলি।

—তুমি জানো না। ও সব করতে পারে।

—দেখা যাক না ওর দোঁড়। আমরা বা ভালো বুঝব, তাই করবো। ওর কথামতো যে চলতে হবেই, তার তো কোন মানে নেই?

বা ভেবেছিলুম, ঠিক তাই হলো। সন্ধ্যাস শেষ পর্যন্ত মাল চুরি করার পরামর্শ দিলো। বস্তা ফুটো করে, কিছু কিছু মাল সরিয়ে ব্র্যাক করার কথা বলামাত্র কানাই গর্জে উঠল, বা বলেছেন বলেছেন। আর ভবিষ্যত কখনো আমার সামনে এ রকম কথা বলবেন না। মাল কমতি আমরা করতে লিখিনি আর লিখতেও চাই না।

সন্ধ্যাস চুপ করে রইল। তার পর সব উত্তেজনা স্তিমিত হয়ে এলে বলল, বড়লোক হতে হলে এ ছাড়া সহজ রাস্তা আর নেই, কানাই। লরী করে অনেকেই তো বড়লোক হয়েছে। আর তোমরা, বড়লোক হওয়া তো ঘরের কথা, দু'দিন লরী বন্ধ থাকলেই উপোস করবে। অবশ্য আমার কথামতো চলো আর নাই চলো, আধেরে বুঝতে পারবে যে আমি কোন খারাপ মন্তব্য নিয়ে এ কথা তোমাদের বলিনি। আমি তোমাদের ভাল চাই বলেই এ প্রস্তাব করেছি।

—নাওয়া কিছু করে, বড়লোক হতে আমরা চাই না।

—দেখ, নাওয়া কোন জিনিসকে বলছ, তা জানি না। আসলে টাকা করার রাস্তা—মানে তোমাদের ব্যবসারে আর পাঁচজন বা করছে—কখনোই খারাপ হতে পারে না। থাক সে। তোমার যদি আপত্তি থাকে, তবে ও সব আলোচনা না করাই ভালো।

আলোচনা বন্ধ করে সন্ধ্যাস অস্ত্র চাল চালল, আজ সন্ধ্যার দিকে চল 'মহাকালী স্পোর্টিং ক্লাবে' যাওয়া যাক।

কানাই জুয়া খেলতে ভালবাসে। ওর মন জয় করতে হলে জুয়ার কথা বলা ছাড়া আর কোন রাস্তা যে নেই সন্ধ্যাস তা জানে এবং জানে বলেই 'মহাকালী স্পোর্টিং ক্লাবের' দ্বার করতে সাহস দেন।

ক্লাবে বধন পৌঁছলুম তখন দেখি আসির পুরা ঘরে জমে উঠছে। কেউ আমাদের দিকে ফিরে তাকানো প্রয়োজন মনে করল না। ঘরের ভিতর কেবল নখর গোপার আওয়াজ।

কাগজের চাকতি নিয়ে আমরাও খেলার খোঁজ দিলাম। কয়েক ষাটপু. পরেই আমার সব হাথ হয়ে গেল। আমি সব কিছুই জাড়াভাড়া করি বলে কোন কিছুই জিততে পারি না। জুরাতে জিততে হলে বৈধব্য দৃষ্টি আর বুদ্ধি থাকার দরকার। আমার তা জানাকড়িও নেই। কানাই দেখি অনেক চাকতি জমিয়ে ফেলেছে। গাল, নীল, সবুজ অনেক চাকতি।

চেষ্টা গিয়ে আমি বাইরের বারান্দার গিয়ে একটা চেয়ার নিয়ে বসে বসে রাস্তার লোক চলচল দেখতে লাগলুম। বারান্দার বে দুজন গাছা দিচ্ছিল, তারা দেখি হঠাৎ চকল হয়ে উঠল। কি ব্যাপার, আমি বুঝতে পারলুম না। ওদের সঙ্গে সঙ্গে আমি ঘরের ভিতর এসে দেখি, খেলা পুরোদমে চলছে। মালিকের সঙ্গে কী কিস-কিস করে পাচারদাররা কথা বলছে। স্ত্রীসকল খুঁজে পেলুম না। কিছু একটা গণ্ডগোল কোথাও হয়েছে মনে করে আমি কানাইকে এক পাশে ডেকে এনে কাগজের চাকতিগুলি ভাসিয়ে নিতে বললুম।

হঠাৎ ঘরের ভিতরকার বাড়ি সবুজ হয়ে গেল। মালিক সকলকে দাবানল করে দিয়ে বললেন, খেলা বন্ধ করে দিন সব। আসুন একটু গান-বাজনা করা যাক।

কিন্তু গান-বাজনার অবসর আর পাওয়া গেল না। সদর্পে হলো পুলিশের আবির্ভাব। দেখতে দেখতে হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে গেল। গ্রেপ্তার হলুম সবাই।

পুলিশের গাড়ী করে থানায় এলুম। নাম-খাম লেখা হলো। কিন্তু জামিন না পেলে ছাড়া পাওয়া যাবে না। অতএব কাল কোর্ট না খোলা পর্যন্ত পুলিশের আতিথ্য স্বীকার করতেই হবে।

হাজির-বাস জীবনে প্রথম বলে কেমন বেন ধারাপ ধারাপ লাগছিল। কত নীচু শ্রেণীর লোকের সঙ্গে রাত কাটাতে হবে। চোর, জোচ্চোর, পকেটমার। হয়তো খুনও আছে এর মধ্যে। গা বিন-বিন করে উঠল ঘুণায়। কারো দিকে চোখ তুলে তাকাতোও পারছিলুম না। একটা অবুর লজ্জা পেয়ে বসেছি।

হুজুগের কথা ভাবছিলুম বসে বসে। কোর্ট থেকে জামিন নিতে হবে। অতএব কাল কোর্ট না খোলা অবধি ভেবেও কিছু হবে না। হঠাৎ স্ত্রীসকলের কথা মনে পড়ল। স্ত্রীসকল কী করছে এখন। না বলে করে ও গেলই বা কোথায়?

কানাই আমার পাশে চুপ চাপ বসে আছে। কোন কথা বলছে না। বোধ হয় ভাবছে ওর জেতাই আমার এ দশা। বার জেতাই হোক, হাজতে বধন হুকে পড়েছি, তখন কার দোষ এ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে আর কী হবে! তার চেয়ে উদ্ধার পাবার চেষ্টা করা অনেক বেশী বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

দরজা খুলে গেল হাজতের। আমি আর কানাই থানা অফিসে এলুম। স্ত্রীসকলের চৌর্য অবশেষে আমাদের জামিন হয়ে গেল।

একগাল হেসে স্ত্রীসকল বলল, গাল দিচ্ছিলে নিশ্চয়ই এতক্ষণ?

—না, না। গাল দোষ কেন? অবাক হয়েছিলুম তোমার না দেখে। আমি বিবস বদনে বললুম।

—মাঝে তাই, আমি কি ছাই জানি যে পুলিশ আসছে? বাইরে

বেরিয়েছিলুম সিগারেট কিনতে। কোকানী বলল, বর্তা, বাঘের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। আর নিম্নেই সব গ্রেপ্তার হয়ে গেল সবাই। আমি তাই আর ক্লাবে না গিয়ে, সোজা উকিল বাবুর বাড়ি গিয়ে সব ঠিক ঠাক করে শুকে ধরে নিয়ে এলুম। নাও, সিগারেট খাও।

এই এক রাত্রিতে অনেক অভিজ্ঞতা হলো। তাহলে স্ত্রীসকল একবারে অমাহুয নর। পামাকে জামা-কাপড়ের লোভ দেখিয়ে আমার কাছ থেকে সরিয়ে নেবার চেষ্টা করছে বলে, যেটুকু রাগ ওর ওপোর ছিল, তা আর রইল না। বরঞ্চ ভাবলুম, আমার বৈদিকে নজর নেই, ও সেদিকে আমার নজর ফিরিয়ে দিয়ে ভালই করেছে। হয়তো পামার বাচ্ছকোর দিকে আমি এখন আরো একটু বেশী নজর দিতে পারব। কৃতজ্ঞতা বোধ হলো।

কানাই কথা কইল না আর।

কিন্তু কথা বলুক আর নাই বলুক, কামদেবপুরের শিব বাবু ঘেরেকে দখতে বেতে এক কথাতাই সে রাজী হয়ে গেল। এত তাড়াভাড়া ওর স্নান হব আমি ভাবতে পারিনি।

মেয়ে দেখার তাহালা আমরা করতে বাইনি। বংশাবলীর পরিচয়ও ওরা—মানে পাত্রীপক্ষ—জিজ্ঞাসা করে আমাদের বিস্তৃত করলেন না। মেয়ে এমন অসাধারণ কিছু নয়। মোটামুটি ভালই। অতএব পাকা কথা আমরা সঙ্গে সঙ্গেই দিয়ে দিলাম।

মহিম ঘোঁড়কের কথা তুলতেই আমি বাধা দিয়ে বললুম, আমাদের দাবী-দাওয়া কিছু নেই।

শিব বাবু খুশী হলেন। তবু তিনি বললেন, দেখুন, সবাইতো চায় নিজের মেয়েকে বধাসাধ্য দিতে। আমিও বতটুকু পারি দোব। তাতে আমি বাদ সাধবো না। তবে আমার জামাইকে আমি একটা উপহার দেব সেটা কিন্তু নিতেই হবে। বুঝতেই পারছেন আমার এই একটা মাত্র মেয়ে। সে উপহারটা যে কি, তা আমরা জিজ্ঞাসা করা প্রয়োজন মনে করলুম না।

পামা সব শুনে খুশী হয়ে বলল, ঠাকুরপো, এবার আমার পাওনাটা মিটিয়ে দাও।

কানাই খুবই অবাক হয়ে বলল, বৌদি, তোমার পাওনা?

—বা রে মশাই, এত দিন যে সেবা করলুম, তার বুদ্ধি কোন দাম নেই?

—**স্ত্রীরোগ, ধবল ও**

বৈজ্ঞানিক কেশ-চর্চা

ধবল, বিভিন্ন চর্মরোগ ও চুলের যাবতীয় রোগ ও স্ত্রীরোগের বৈজ্ঞানিক চিকিৎসায় পত্রালাপ বা সাক্ষাৎ করুন।

ডাঃ চ্যাটার্জীর ব্যাশন্যাল কিওর সেণ্টার

৩৩, একডালিয়া রোড, কলিকাতা-১২

সন্ধ্যা ৬।—৮।টা। ফোন নং ৪৬-১৩৫৮

খুব একটো হেসে কানাই বলল, ও বাবা। তা আবার নেই।
কী চাই বলো ?

—না থাক। এখন কিছু বলব না। বিয়ের পরে বলব, কেন ?
—বেশ তাই হবে।

১৩

মাত্র আর কয়েক দিন থাকি বিয়ের। এর মধ্যে কত কাজ
পড়ে রয়েছে। বাড়ি খুঁজতে হবে, জিনিসপত্র জোগাড় করতে
হবে, আরো বত কী।

হাতে হাতে সবাই মিলে অল্প সাহায্য করছে। শ্রীমন্ত সেদিন
ঘরের সজ্জা দিয়ে গেল। দুটো মাত্র ঘর। ভাড়া আঠারো টাকা।
তাও আবার ওলাইসিঁথিতে। এখান থেকে বেশ দূর। তা হোক।
যদি ভাল হয়, তবে আপাতত ও দুটোই নিয়ে নিতে হবে।

ঘর দেখতে গেলুম সকালবেলা। আলো থাকতেই ঘর দেখা
ভাল। অন্ধকারে ঠিক বোঝা যায় না। কানাইকে সঙ্গে নিয়ে
পৌঁছলুম। ঘর দেখে আমার পছন্দ হল। ভাড়া অল্প একটু বেশী।
কিন্তু উপায় কী। আগাম জমা দিয়ে এলুম।

প্রাসাদ গায়ে-হলুদের তত্ত্ব নিয়ে এসেছে। পামা তাই গোছগাছ
করতে ব্যস্ত। উৎসবের সাজ। পেরে সমস্ত বাড়ি বেন কাজে মেতে
উঠেছে। কেউ বসে থাকতে চায় না। সবাই একটু-না-একটু
কাজ করে আনন্দ পায়। আমাদের বাড়িতে কোন ছোট ছেলে-
মেয়ে নেই। অথচ পাড়ার দু-চারটে ঠিক এসে জুটেছে।

কারা-কারা বরষাত্রী বাবে সব ঠিক করা হয়ে গেছে। এখন
থাকি রইল বাড়ির ব্যবস্থা করা। বৌ-ভাত কানাই-এর নতুন
বাড়িতে করাই আমার ইচ্ছে। অনেকখানি জায়গা জুড়ে উঠান
রয়েছে সেখানে, জলেরও অভাব নেই।

কিন্তু পামা এ-প্রস্তাবে মন-বুলে সায় দেয় নি। এখানে যে
বৌ-ভাত হওয়া ঠিক নয়, তা সে জানে। অথচ অন্য কোন বাড়িতে
বৌ-ভাত হোক, তা-ও সে চায় না।

সন্ধ্যার নিকে পামাকে একলা পাওয়া গেল। তাকে বধন সব
বুঝিয়ে বললুম, তখন সে শুধু একবার আমার নিকে তাকিয়ে চুপ
করে রইল।

ধানিকল্প পরে আমার আরো কাছে সরে এসে বলল, আমি
যদি ক'দিন অন্য বাড়িতে গিয়ে থাকি, তবে কী এখানে বৌ-ভাত
হতে পারে না ?

—তা কেন তুমি বাবে, পামা। নিজের বাড়ি থাকতে ওরকম
করে কষ্ট করার কী দরকার ?

—তুমি বুঝ না কেন গো ? নতুন-বৌ এসে কে তাকে বরণ
করবে ? কে তার দেখা-শুনা করবে, বলো তো ? ও বাড়িতে তো
কোন আসবাবপত্র নেই, মেয়েদের বা-বা দরকার তাও নেই। আর
তা ছাড়া, থাকলেই বা কী ? একটা মেয়ে ছেলে কাছে না থাকলে
নতুন-বৌ ভারী অসুবিধের পড়বে।

—বুঝলুম। আচ্ছা, শ্রীমন্তর মেরেকে বলব ক'দিন ও বাড়িতে
কাটিয়ে বাবে। তা হলে হবে তো ?

আসলে পামার খুব ইচ্ছে নতুন-বৌকে কাছে রাখার। বুঝতে
পারছি। কিন্তু এ কি এক অসুখ ছেলেরা দুজনে বে পেরে বসেছে
পামাকে। যদি কেউ কোন কষ্ট কথা তাকে বলে ? কিংবা যদি

করব ইঙ্গিত করে পামার চরিত্র নিয়ে ? সে আঘাত পামা বধনে।
সহ করতে পারবে না। বাতে কোন দিন তাকে কারুর কাছ থেকে
কোন কথা শুনে না হয়, তাই ভেবে তাকে আমি এতদিন সন্তর্পণে
আগলে রেখেছি। পামার আকার আজ রাখা আমার পক্ষে কোন
মতেই সম্ভবপর নয়।

—এই, শোনো। আমি অল্প কথা পাড়ি, তুমি কী দেবে
কানাই-এর বৌকে বলো তো ?

—কী আবার দোব। আমার কী আছে ? অভিমান করল পামা।

—আমি তো জলজ্যান্ত বঁচে আছি।

—তাই তো আমিও বঁচে আছি।

—তা হলে জুঁম কর, কী আনতে হবে।

—কিছু আনতে হবে না। যা দেবার, তা আমার কাছেই আছে।

—ও।

—রাগ হলো বুঝি ?

না না। রাগ করবো কেন ? তুমি যে লক্ষ্মী। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে
কী কোন কিছুই অভাব থাকে ?

—থাকে নাই তো।

—কিন্তু লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে যে একটা জিনিসের শোচনীয় অভাব
দেখতে পাচ্ছি ?

—সেটা কি ?

—বুড়ি।

—আচ্ছা বাবা, আচ্ছা, বাট মানছি। তুমি যা বলবে তাই
হবে।

আদরে আদরে আমাকে উদ্বাস্ত করে তুলল পামা। শাড়ীর
আঁচল দিয়ে আমার কপাল মুছে দিয়ে বলল, কী রকম সুন্দর "আমরা"
দিন কাটাচ্ছিলুম, আর কী হয়ে গেল, না ?

পরিবর্তনের স্রোতের এক পাশে দাঁড়িয়ে অশ্রুশোচনা করা চল,
কিন্তু প্রবাহমান স্রোতের গতিবেগ তাতে বিন্দুমাত্র রুদ্ধ হয় না। কার
মানসিক তটে কতখানি ভাবনার পলিমাটি পড়ল, কার অহুত্বিত্তে
কতখানি ভাঙ্গন ঘরল, তা নিয়ে মাথা-বাথা নেই সময়ের। আজ
বা আছে কালও তাই থাকবে—এটা সবাই চায় না। হুঁশী চায়
না, আজকের হুঁশ কালও থাক। অসুস্থ মানুষ চায় কালই সুস্থ
হতে।

আমাদের জীবনের আসন্ন পরিবর্তন প্রসন্নচিত্তে পামা গ্রহণ
করতে অপারগ। তাই বলে যে পরিবর্তন হবে না, সেটা তো কোন
কাজের কথা নয় ?

লোকজনের ভীড় আর বিয়েবাড়ির স্বাভাবিক বিশৃঙ্খলার মধ্যে
কানাইয়ের বিয়ে হয়ে গেল।

বৌতুক দিলেন বটে শিব বাবু। আমাদের সকলের কল্পনার
বাইরে। জামাইকে তিনি উপহার একটা দেবেন বলেছিলেন এবং
সেটা যে পাঁচটনি বেডকোর্ড হবে, তা আমরা ভাবিনি। বড় গরু
করল বরষাত্রীরা। দিল আছে বটে—বলল অভ্যাগতেরা।

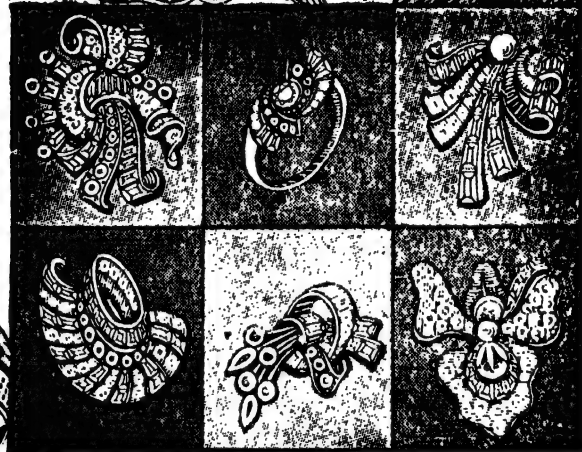
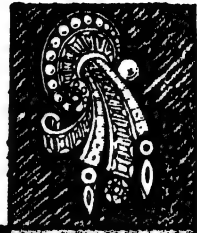
আশাতিরিক্ত উপঢৌকন কী কারো মনে ঈর্ষার বীজ ছড়িয়ে
দেয়নি ? নিমিত্তিতেরা কি সবাই প্রসন্নমনে ফিরে গেল ? দেখছিলুম
আর ভাবছিলুম।

তখন সানাই-এ বাজছিল মালকোব।

[ক্রমশঃ]



জোদার্য মার্জ



গিনি জাল্ড জুয়েলারী স্পেশালিস্ট

এম.বি.সরকার
এও সন্স

ম্যানুফ্যাকচারিং জুয়েলাস্

ফোন:- ৩৪-১৭৬১ ১৬৭/সি ১৬৭ সি/২ কলকাতা টুই কলিকাতা-১২ গ্রাম-পিলিয়ামেট
ব্রাঞ্চ-বালি গল্ড-২০০/সি রাসবিহারী এডিনিউ কলিকাতা-২২ ফোন- ৪৬-৪৪৬৬
মোরুমের পুরাতন টিগলা ১২৪, ১২৪/২, অরুণাকান্ত স্ট্রীট, কলিকাতা-১২
কেবলমাত্র রবিবার খোলা থাকে
ব্রাঞ্চ-জামসেদপুর ফোন- জামসেদপুর- সিটি-২৫৫৮৭

৩.৪.



ভাবানী মুখোপাধ্যায় চর্চিকা

আগাশে যুদ্ধের ঘনঘটা, জার্মানী ও ইংল্যান্ডের মন কবাকবি
ক্রমশঃই প্রবলতর হয়ে উঠেছে, বার্নার্ড শ' এদিকে মাথা
খামাখার অবসর পাননি। কাউন্ট হেনরী কেসলার একটা আবেদন
জানিয়ে বললেন—আমরা হলান্ড সেক্সপীয়র, গ্যারটে, নিউটন,
লাইবনিৎস প্রভৃতির সাংস্কৃতিক বংশধর, ইংলণ্ড ও জার্মানীতে কত
সাংস্কৃতি কমিল, অতএব লড়াই কেন বাধবে? এই সূত্রে থেকে
উভয় দেশের মধ্যে কিঞ্চিৎ সাংস্কৃতিক ভাব বিনিময় ঘটে বিজ্ঞপ্তি এবং
ইস্তাহারের মাধ্যমে। ইংলণ্ডের তরফ থেকে বিজ্ঞপ্তি রচনার ভার পড়ল
বার্নার্ড শ'র ওপর। বার্নার্ড শ' কিন্তু বুঝলেন সেক্সপীয়র ইত্যাদির
প্রতি উভয় দেশের একটা শ্রদ্ধা আছে বলেই লড়াই বন্ধ করা যাবে না,
তাছাড়া জার্মানরা ভাবে সেক্সপীয়র একজন জার্মান, ইংরেজরা কিছুই
ভাবে না। বার্নার্ড শ' তাই তাঁর ইস্তাহারে লিখলেন জার্মান নৌবহর
দেখে ঈর্ষান্বিত হওয়ার কিছু নেই, ইংলণ্ড এই বাবস্থাকে মানব
সভ্যতা সুরক্ষণের এক প্রচণ্ড প্রচেষ্টা মনে করে। এর ফলে
সেক্সপীয়র নিউটন প্রভৃতির সাংস্কৃতিক নাতি-প্রপাতারা সেই ইস্তাহারে
স্বাক্ষর দানে সম্মত হলেন। এ লাইনটি উঠিয়ে দিতে হবে—এই
তাঁদের দাবী। বার্নার্ড শ' অবস্থাটা বুঝলেন, তিনি ১১১৩-র
মার্চ-এক ১১১৪-র জানুয়ারী মাসে যথাক্রমে 'The Daily
Chronicle' এবং 'The Daily News' এ এই বিষয়ে দুটি প্রবন্ধ
লিখলেন।

বার্নার্ড শ' যুদ্ধবিরোধী ছিলেন মনে-প্রাণে, তিনি জানতেন,
পৃথিবীতে যতদিন হিংসা-কুটিল মানুষ থাকবে ততদিন এই ধরনের
যুদ্ধ-বিরোধ বন্ধ করাও সম্ভব নয়।

বার্নার্ড শ' যুদ্ধ-নিবারণ নানা রকম প্রস্তাবও দেশবাসীর সামনে
উপস্থাপিত করলেন। বলা বাহুল্য, তা উপেক্ষিত হ'ল, এমন কি,
কেউ কেউ উপহাস করে বললেন—বৈদেশিক দপ্তরে বার্নার্ড শ'
থাকলে পনের দিনেই যুদ্ধ বাধতো, বার্নার্ড শ' জবাবে বলছিলেন,
আমি বৈদেশিক দপ্তরে নেই বলেই ত'—আঠার মাসেই যুদ্ধ লাগলো।

বার্নার্ড শ'র কাছে যে-কোনো রকমের যুদ্ধ মানে একটা নিদারুণ
অভিশাপ। বার্নার্ড শ'কে একজন একদা এর করেছিলেন—আপনি
Commonsense about the War লিখতে গেলেন কেন?

বার্নার্ড শ' জবাবে বললেন, কারণ আমি চিরদিনই যুদ্ধকে ঘৃণা
করে আসছি। (I have always loathed war)

কিন্তু বার্নার্ড শ' বা তাঁর যত আরো কেউ পছন্দ করুন আর
নাট করুন, পৃথিবীর অনেক লোক যুদ্ধে আনন্দ পায়, যুদ্ধই তাঁদের
ধ্যান-জ্ঞান। যুদ্ধে অসংখ্য নর-নারীর অকারণ মৃত্যু হয় এবং
যুদ্ধের ফলে রিক্ত অর্থনৈতিক চাপে সমাজের আর্থিক ও নৈতিক
অবনতি ঘটে, এ সবাই জানে। তবু যুদ্ধের আনন্দে রাষ্ট্রনায়ক
থেকে মুক্ত করে—চোরাকারবারি সবাই চালা হয়ে ওঠে, ভয়
আছে, তবু ভয়ও আছে। যুদ্ধ প্রতিরোধের সার্বিক উপায় আজো
আবিষ্কার করা যায়নি।

১১১৪ খ্রীস্টাব্দে ১৯ই নভেম্বর তারিখের The New
Statesman and Nation নামক পত্রিকার অতিরিক্ত জ্যেষ্ঠপাত্রে
বার্নার্ড শ' লিখিত Commonsense about the War প্রকাশিত
হয়। সম্পাদক রিচার্ড সার্প বার্নার্ড শ'র বক্তব্য বিষয়ের প্রতি
এতটুকু শ্রদ্ধা পোষণ করতেন না, কিন্তু তিনি জানতেন এই প্রবন্ধ
প্রকাশের ফলে তাঁর পত্রিকার প্রচারবৃদ্ধি পাবে; তাই তিনি
অকুতোভয়ে বার্নার্ড শ'র রচনার একটি কথো পরিবর্তন না করে
প্রকাশ করলেন।

বার্নার্ড শ'র সমালোচক এবং প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী এইচ. ভি.
ওয়েলস এই প্রবন্ধ পাঠে কিন্তু হয়ে উঠলেন, তিনি কিন্তু হয়ে
লিখলেন Shaw is like an idiot child screaming in a
Hospital.

জন গলসওয়ার্দি বললেন, এই প্রবন্ধ বিকৃত কবিতার পরিচায়ক,
কারণ এ যেন কাটা বায়ে মূণের ছিটে।

কিন্তু লেবর পার্টির নেতা কীরর হার্ডি বার্নার্ড শ'কে
একটি চিঠি লিখলেন। এই চিঠি সমগ্র বিশ্বব্যাপকে একটি
ফুঁরে যেন উড়িয়ে নিয়ে গেল। তিনি লিখলেন—Its
inspiration is worth more to England than
this war has yet cost her in money I mean.
When it gets circulated in popular form and
is read as it will be hundreds of thousands of
our best people of all classes it will produce an
elevation of tone in the national life which will
be felt for generations to come. (এই প্রবন্ধের
অনুব্রণের মূল্য যুদ্ধ বাবদ ইংলণ্ড যে অর্থ ব্যয় করেছে তাঁর চেয়ে
অনেক বেশী। এই প্রবন্ধ যখন সুলভ আকারে প্রচারিত হবে
তখন আমাদের জাতীয় জীবনের সর্বশ্রেণীর অসংখ্য সংস্কারের মনে
এক উন্নত সুর সৃষ্টি করবে এবং গুরুত্বপূর্ণতম তা উপলব্ধি করা যাবে।)
এই সব কিছুর উত্তরে বার্নার্ড শ' শুধু একটি কথা বললেন—“We
must tell the truth unashamed like men of courage
and character—”

সমালোচকদের মতে বার্নার্ড শ'র জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহসিক বর্ষ
Common sense about the War রচনা এবং প্রকাশ করা।
The New Statesman and Nation পত্রিকার প্রচার-সংখ্যা

১৫,০০০ কপিতে পৌঁছান। এই প্রবন্ধ বিশ্বস্ত হওয়ার অনেক পরে সাংবাদিকরা তার উল্লেখ করে বার্নার্ড শ'কে অনেক কটুক্তি করেছেন। বার্নার্ড শ' কিন্তু এই কারণে এতটুকু ক্ষুব্ধ হননি, তিনি জানতেন, এই বিষয়ে তাঁর বিচারবুদ্ধি চূড়ান্ত। বার্নার্ড শ' বলতেন—“You may demand moral courage from me to any extent, but when you start shooting and knocking one another about, I claim the coward's privilege and take refuge under the bed. My life is far too valuable to be machine gunned”. (আমার কাছে তোমরা নৈতিক সাহস দাবী করতে পারো, কিন্তু তোমরা যখন পরস্পরের মধ্যে হানাহানি শুরু করে তখন আমি ভীষ্মের সুরাধিপতি গ্রহণ করে বিছানার নীচে আশ্রয় নেওয়া জেয়: মনে করি। ঘোনিগানের আক্রমণে যারা চাইতেও আমার জীবনের মূল্য অনেক বেশী।)

Common sense about the War পড়া থাকলে হয়ত এত হৈ-চৈ হত না, অধিকাংশ বিদগ্ধ মানুষ এই নিবন্ধ পড়েননি, তাঁরা এর ওর মধ্যে শুনেছেন যে ভীষণ ইংরাজ-বিরোধী এবং যুদ্ধ-বিরোধী বচন। ফল সবাই মিলে আক্রমণ শুরু করল। শ' লিখেছিলেন, বেলজিয়ান ঘটনাবলী একটা অজুহাত মাত্র বৃটিশের যুদ্ধে নামার, এবং সেটা অজুহাত অতি দুর্বল এবং ভোলা। শ' বলেছিলেন, প্রতিটি সেনাদলের সৈনিকরা যদি বুদ্ধিমান হত, তাহলে যে যার দলের কর্তাকে হত্যা করে বাড়ি ফিরে আসতো, যুদ্ধরত দেশের মানুষবা যদি এর মর্ম বুঝতো, তাহলে তারা কিছুতেই যুদ্ধের খরচ দিত না। জার্মানিতেও যুদ্ধবাজ Junkers (সেপোয়ালী মুকলি) আছেন, যেমন আছেন ইংলণ্ডে। ইংরেজরা ভণ্ড—আজ-গরিমা প্রচার ও শত্রুপক্ষকে গালাগাল দেওয়াটা যুদ্ধজয়ের পথ নয়। তার এডওয়ার্ড থে (বৃটিশ পররাষ্ট্র সচিব) ইংলণ্ডের মনোভঙ্গী যদি পূর্বাঙ্কুর পরিষ্কার ভাবে জানাতেন, তাহলে যুদ্ধ প্রতিরোধ করা চসত।

বার্নার্ড শ' রচিত Common sense about the War গণতন্ত্রের স্বপক্ষে এক দেশপ্রেমিকের বক্তব্য, খুঁটাচালের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। কিন্তু এমন কুৎসিত কুৎসা ও কলঙ্ক বার্নার্ড শ'র বিরুদ্ধে প্রচারিত হতে লাগল, যার আর তুলনা পাওয়া যায় না। এ যেন এক দিকে গোটবুটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া, বেলজিয়াম আর অপর দিকে জার্মানী, অস্ট্রিয়া, তুর্কী এবং বার্নার্ড শ'। সংবাদপত্রে আন্দোলন উঠল, বার্নার্ড শ'র নাটক বরকট করো। পরাতন বন্ধুবাও তাঁকে পরিত্যাগ করলেন। রয়্যাল স্ট্রাভল ডিভিশন থেকে এক সন্ধ্যার হার্বার্ট এ্যাসকুইথ বলেছিলেন—The man ought to be shot।

বার্নার্ড শ'র কাছে প্রতিদিন অজস্র পত্র আসতে লাগল, গালাগাল আর তিরস্কারের পূর্ব সেই চিঠিগুলিতে বাড়ি ভরে গেল। একদিন এক সাহায্য-রজনীর অভিনয়ে অভিনেতৃবর্গ বার্নার্ড শ'র সঙ্গে একত্রে ফটোগ্রাফ তুলতে রাজী হলেন না, এমন কি, আমেরিকার পর্যাপ্ত তার প্রতিক্রিয়া পৌঁছানো।

বেলজিয়ানরা কিন্তু বার্নার্ড শ'র ওপর চটেনি, তারা তাঁকে আমন্ত্রণ করে আনলো। জার্মানীর বিরুদ্ধে বক্তব্য শুধির লেখার জন্য। বার্নার্ড শ'

তার কলে লিখলেন—An Open Letter to President Wilson—১১১৪ এই নভেম্বর তারিখের The Nation পত্রিকার সেই প্রবন্ধ প্রকাশিত হল। এই প্রবন্ধ পাঠে উড়ে উইলসনের মনে কি প্রতিক্রিয়া ঘটলো তা জানা যায় না। এই নব কাপারে বার্নার্ড শ'র অভিমতাদি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন আর্কিবাল্ড, হেনডারসন, তাঁর মত অতি তীব্র। তিনি বলেছেন একদিন ঐতিহাসিকরা স্বীকার করবেন যে বার্নার্ড শ'র বচন। কি তাতে উইলসনকে প্রভাবিত করেছে। বিশেষতঃ দি লীপ অব নেশন, ফ্রিডম অব দি প্রিন্স, ভাগাই চুক্তি, চতুর্দশ চুক্তি এবং ভার্সায়েস সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আলোচনা বার্নার্ড শ'র মতবাদের প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া।

জার্মানরা বার্নার্ড শ' লিখিত Common sense নিজেদের প্রচার কার্যে ব্যবহার করলেন। যদিও কোনো সমাপটক বার্নার্ড শ'র এই কীর্তি অত্যন্ত সাহসিক এবং Ton Payne-র সঙ্গে তুলনীয় বলেছেন, ফ্রাঙ্ক হারিস বা সেটজন আর্ভিন প্রভৃতি জীবনীকারদের মতে বার্নার্ড শ'র পরবর্তী কাব্যাবলীতে মনে হয় তিনি কিঞ্চিৎ ভীত হয়ে পড়েছিলেন। ফ্রাঙ্ক হারিসনের রচিত জীবনী বার্নার্ড শ'র জীবনকালে প্রকাশিত, এই বিষয়ে স্বয়ং বার্নার্ড শ'ও কোনো দস্তব্য করেননি। বৃটেনের লোকজন তাঁকে শত্রু মনে করলেও সরকার তাঁকে নিরাপদ নাগরিক হিসাবে গ্রহণ করেছেন, এমন কি তাঁকে যুদ্ধ কালে সমরক্ষেত্রে আমন্ত্রণ করে নিয়ে গেছেন।

উপগ্রাস লেখক এ. ই. ডব্লু ম্যাসন যুদ্ধের সময় গুপ্তস্ব বিভাগে নিযুক্ত ছিলেন, ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে, তিনি বার্নার্ড শ'কে অজুহাত জানালেন যে, জার্মান অপপ্রচারের জবাবে মুরদের মধ্যে প্রচারের জন্য কিছু লিখুন। এর ফলে বার্নার্ড শ' লিখলেন An Epistle to the Moons, বার্নার্ড শ'র এই নিবন্ধ নাকি মুরদের শাস্ত করেছিল।

এই কারণেই কেউ কেউ প্রশ্ন করেন, তাহলে Common sense about war নিয়ে এত হৈ চৈ কিসের?

১১২৪-এ বার্নার্ড শ' প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন—আমি কোনো দিনই সরকারের বিরোধিতা করিনি। বৃটিশ গভর্নরেন্ট জানতেন আমি তাদেরই দলে। আমি দেখেছি যে আমেরিকানরা বা যে সব ইংরেজরা সেই সময় আমেরিকায় ছিলেন, যারা হেনরী আর্থার জেমস, তাঁদের ধারণা যে আমার মনোভঙ্গী পরাজিতের গুণী, ফরাসীরা বাক বলে Defeatist। ইংরাজরা কিন্তু আসল খবর রাখতেন, তা নইলে আমাকে গুলি করে মারা হত। ১১১৪—১৮ খৃষ্টাব্দে বার্নার্ড শ' অপেক্ষা অনেক লম্বা পাপে অস্ত্র দেশে অনেক স্বাধীনচেতা মানুষের গুরুত্বপূর্ণ হয়েছে।

ফ্রাঙ্ক হারিস একটি চমৎকার উক্তি করেছেন—মলিয়েয়ের মত এই ব্যক্তির হৃদয়ে করুণার কীরবা প্রবাহিত, কিন্তু তুর্গেনিভের নিহিলিষ্ট নায়কের মত সংকটকালে কি জীবনে কিংবা নাটকে যেখানে বৈপ্লবিক মনোভঙ্গীর চরম অভিব্যক্তির প্রয়োজন সেখানেই তিনি ব্যর্থ হয়েছেন, সেখানে তিনি দুর্বল।

অবশ্য মিসেস প্যাট্রিক কামবেলের পুত্রের মৃত্যুতে বার্নার্ড শ' কিঞ্চিৎ আবেগ প্রকাশ করে চিঠি লিখেছিলেন। এই চিঠির কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছি।

বার্ণার্ড শ' হেসকেথ পীরসনকে পরে লিখেছিলেন—“তুমি যদি এখন Common sense about the war ঠাণ্ডা মাথাধার পড়ো তুমি অবাক হয়ে যাবে এই যে, কেন কিছু লোক এই নিবন্ধ পড়ে ক্ষেপে উঠেছিল, বিশেষ করে যারা এক হস্তও পড়েনি তাদের দাগটাই বেশী, এরা কিন্তু ভেদেছিল Junker কথাটি পালাপালি হিসাবে গ্রহণ না করতে আমি সাবধান করে দিয়েছি। যুরোপের আসল Junker হলেন স্যার এডওয়ার্ড গ্রে। আসল কথা হল, যে তেতু আমি জানতে আইরিশ, আমার মনোভোগী বৃটিশ-বিরোধী, তাই বৃটিশের তরফ থেকে আমার বক্তব্য পেশ করাটা অনেকের কাছে অসহ্য মনে হয়েছিল।

যুদ্ধের পর লর্ড মরলীর চিঠিপত্র প্রকাশ হওয়ার পর সম্ভ্রান্তভাবে প্রমাণিত হয়েছে তাইকাউন্ট গ্রে এবং লণ্ডনের আরো অনেকেই ক্রাইস্টচারের কাছাকাছি যেসব মানুষ ছিলেন তাদেরই সমতুল্য অপরাধী। ক্রাফ্ট হারিস বলেন ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে বার্নার্ড শ' হত্যত কিছু গোপনতথ্য ভেদেছিলেন, এডওয়ার্ড গ্রে প্রভৃতির সম্পর্ক। জানা অসম্ভব ছিল না কারণ বড় মন্তকের ব্যক্তির কাছে কোনো খবরই গোপন থাকে না। কিন্তু ক্রাফ্ট হারিসের মনে হয়নি যে পৃথিবীকে ধ্বংস করা বা দুর্গতি থেকে নিরুত্তি দিয়ে নিবিড় নিরবচ্ছিন্ন শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তিনি একটা আপোষ-কা, করেছিলেন নিজের বিবেকের সঙ্গে, যেমন করেছেন তাঁর সাহিত্যের সঙ্গে, এই বিষয়ে চমকো তাঁর সমগোত্রীয়ের সংখ্যা অধিক, কিন্তু তাই বলে তাঁকে আমি ক্ষমা করতে পারি না। আমি হেটোরটনকে শ্রদ্ধা করি, কারণ তাঁর মতবাদ নির্দিষ্ট এবং সুদৃঢ়, যুদ্ধের আগে, মধ্যে এবং পরে তিনি তাঁর মত পরিবর্তন করেন নি। আমার মতে বার্নার্ড শ' বার বার বড় বলেছেন, যদিও তিনি বহুদূরীণ নন।

বার্নার্ড শ'র প্রতি ইংলওবাসীর অশ্রদ্ধা, অভক্তি ও ঘৃণা বেড়ে উঠল জার্মান সাবমেরিনের ধাক্কায় Lucitania নামক বাত্মিবাহী-জাহাজ ডোবার পর। বার্নার্ড শ' বলেছেন—আশ্চর্য, যে সব মানুষ এতদিন কোনো রকমে ঠাণ্ডা মাথাধার ছিল, তাবাও ক্ষেপে উঠল, কিম্বা আশ্চর্য্যম্ অতঃপরম্। সেলুনের নিরীহ বাত্মিবাহী হত্যা করা! ততঃকিম্। এই আন্দোলন শুরু হল। কিন্তু বা ঘটলো তা শুধুমাত্র এই কথায় ঠিকমত ব্যক্ত করা যায় না। যদিও এই দুর্ঘটনার তিন জন বিখ্যাত বলি আমার সুপরিচিত বন্ধুদের অন্ততম ভবু সমস্ত ব্যাপারটি আমার কাছে বাড়াবাড়ি মনে হল। “আমার বয়ঃ আত্মতৃপ্তি হল এই ভেবে যে, বেসামরিক মানুষ ভবু জানলো যুদ্ধের স্বাদ কেমন, এতদিন তারা যুদ্ধটা বৃটিশ ক্রীড়া-কৌশলের অন্তর্গত চমৎকার খেলা মনে করত।

Lucitania ভূবি সংক্রান্ত বার্নার্ড শ'র উক্তি The New Statesman পত্রিকার সম্পাদক মিঃ ক্লিফোর্ড সার্ণকেও সন্তুষ্ট করে তুলল, এই পত্রিকার প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে বার্নার্ড শ' অর্থ সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু মিঃ সার্ণ Lucitania জলমগ্ন হওয়ার সম্পর্কে বার্নার্ড শ'র বক্তব্য প্রকাশ করতে স্বীকৃত হলেন না। এই কারণে বার্নার্ড শ' মনে এতটুকু ক্ষোভ বা আলা রাখেননি, পরে ক্লিফোর্ড সার্ণের হৃদযন্ত্রের কলহে বার্নার্ড শ' তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করে স্ফীকৃত করেছিলেন। কিন্তু New Statesman পত্রিকার ১৯৩১

এর আগে আর কোনো দিন লেখেন নি। ১৯৩১এ আবার একটি মহাযুদ্ধের সূচনা, বার্নার্ড শ' আবার বুদ্ধ সম্পর্কে নিজস্ব মতামত লিখতে শুরু করলেন The Nation পত্রিকার।

বার্নার্ড শ' তাঁর সাহিত্যিক বন্ধু আলফ্রেড হুটরাকে বলেছিলেন—“জার্মানরা এখন Rheims Cathedral এ গোলা ছুঁড়েছিল তখন আমার প্রথম প্রতিক্রিয়া হচ্ছিল যে গোলন্দাজের মাথা ভাঙা করে দিই। লক (L. T. Locke) আমার সামনেই বসেছিল, সে আমার প্রস্তাব সমর্থন করে এবং আমার ভায়-বৃষ্টির প্ররোচনা করে—”

Lucitania জলমগ্ন হওয়ার পর Dramatist Clubএর এক লাঞ্ছনাক, হেনরী প্রভৃতি সদস্যরা বার্নার্ড শ'র মন্তব্য নিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন। তার পর এক রকম বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত বিনা নোটিশে বার্নার্ড শ'কে সদস্যপদ থেকে বিতাড়িত করা হল। বার্নার্ড শ' তাঁদের জানালেন যে, এই পদ্ধতিটা আইনগত নয়, কারণ তাঁর সদস্যপদ খারিজ হয়নি, তবে হাজারি না বাড়িয়ে তিনি স্বয়ং পরিত্যাগ করবেন এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে।

প্রাণ্ডিল বার্কীরও পদত্যাগ করলেন। ইস্রায়েল জানগউইলও পদত্যাগ করতে প্রস্তুত হলেন, বার্নার্ড শ' বাধা দিলেন। জানগউইল ড্রামাটিস্টস ক্লাবে নারীসদস্য গ্রহণের স্বপক্ষে আন্দোলন চালাচ্ছিলেন তখন। আরো কেউ কেউ হস্ত ক্র্যাবের প্রতি বিরক্ত ছিলেন, এই সুযোগে তাঁরাও পদত্যাগ করলেন।

ডব্লু. জে. লক নম্র স্বভাবের অতি শান্ত ভদ্রলোক ছিলেন, সেই মানুষও বার্নার্ড শ'র বক্তৃতা করার জন্ত ক্ষেপে উঠলেন। বার্নার্ড শ' বলেছেন—“জম্ম এবং মেজাজে লক ছিলেন পাকা ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান। এই সময়ে আমি একদিন লেখক-সমিতির কফিটি মিটিং এ উপস্থিত ছিলাম, সহসা কোথাও কিছু নেই লক চিংকার করে উঠল—বার্নার্ড শ'র সঙ্গে এক ঘরে বসতে আমি রাজী নই। তার পর দরজাটি সশব্দে বন্ধ করে চলে গেল। ল্যাক স্কোয়ার আমার মুখে চূর্ণকালি লেপে দেওয়ার প্রস্তাব ছেপে প্রকাশ করল। তবে এই জাতীয় যুদ্ধকালীন হিষ্টিরিয়ার ঈগগিরিই অবসান ঘটল, ল্যাক স্কোয়ার আর লক দুজনেই এসে হাত বাড়িয়ে সেবহাণ্ড করল। আমিও হস্ত প্রসারিত করলাম। আমার কাছে যুদ্ধ-জর আর জর সংক্রামক মহামারীর মত। এই সময় যে সব বোগী বিকারের ঘোরে প্রলাপ বকে, তা যোগশয্যার শায়িত বোগীর প্রলাপের মতই উল্লেস্করী।

পরে অবগু ড্রামাটিস্টস ক্লাব বার্নার্ড শ'কে আবার ডিনারে সম্মানিত অতিথি হিসাবে নিমন্ত্রণ করেছিল, কিন্তু মনে এতটুকু বিবেচনা পোষণ না করলেও, বার্নার্ড শ' অজুহাত দর্শন করে সেই নিমন্ত্রণ এড়িয়ে গেলেন। বার্নার্ড শ' এই উপলক্ষে একটি চমৎকার কথা বলেছেন—“Any one who is a pioneer in art is hated by the old gang and should not join their clubs, as it enables them to expel him, and to that extent places him in their power.”

বার্নার্ড শ' বলেছেন, কোথায় সব যুদ্ধে গেল, আমার বিরুদ্ধে এই সব চক্রান্ত আর অভিযোগ, অল্পযোগ একদিন মিলিয়ে গেল, সেই ক্লাবও হস্ত উঠে গেছে, হেনরী জোনস শেষ পর্যন্ত বেগে ছিল, সে আর কিছুতেই মিট-মাট করেনি, এ তার একতরফা লড়াই, আমি

বার বার হাত বাড়িয়ে এসিয়েছি ও হাত সরিয়ে গিয়েছে, আর একজন এইচ, জিওয়েলস্, তবে তার ব্যাপার আলাদা। মরার সময় ওয়েলস একখানি ছোট কাগজে অতি কষ্ট করে লিখেছিল, আমার বিরুদ্ধে তার ব্যক্তিগত ভাবে কোনো আক্রোশ নেই, সে কাগজটুকু কোথায় আছে।

১৯২১ খৃষ্টাব্দে Testimonial Matineeর এক কমিটি হয় জে, এইচ, বার্নসকে সম্মানিত করার উদ্দেশ্যে। জোনস যেই দেখলেন সেই কমিটিতে বার্নার্ড শ'ও আছেন, তিনি পদত্যাগ করলেন, বার্নার্ড শ' তাঁর মতে a freakish homunculus germinated outside lawful procreation (আইনগত জন্মবিধির বাইরে কৃত্রিম পদ্ধতিতে বার জন্ম, যেমন গ্রীক উপকথার পারাকেলস্‌স)।

এর জবাবে বার্নার্ড শ' বললেন—সন্দেহাতীত ভাবে আমি আমার প্রখ্যাত পিতার পুত্র, এবং আমার জননীর সম্পত্তি ও পিতৃ-স্বপ্নের আইনগত অধিকারী।

জোনসের এই আক্রমণাত্মক রচনার প্রকাশককে জোনস আশ্বাস দেন, রচনাটি প্রকাশ করিলে বার্নার্ড শ' তাঁর বন্ধুর বিরুদ্ধে মামলা করবেন না। বার্নার্ড শ' এই কথা শুনে বললেন—এ কথা জেনে আমি আশ্বস্ত হই লাভ কবেছি যে, লেখকের আশ্বাস না পেলে প্রকাশকরা এই মানহানিকর রচনা প্রকাশে সাহসী হতেন না, জোনস বলেছিল, আমার বন্ধু নির্ভরযোগ্য, এটা সে ঠিকই বলেছে।

পৃথিবীকে গণতন্ত্রের পক্ষে নিরাপদ রাখার জন্য যুদ্ধশেষে বার্নার্ড শ' রাজনীতিক ও কূটনীতিবিদদের কাছে কিছু প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু ভার্গাই শীল কনকারেন্সে কেউ তা নিয়ে মাথা ঘামালো না। বার্নার্ড শ' রক্ত করে বলেছেন, এ বেন লন্ডনের মাহির বিকিন উপসাগরের ধ্যানমগ্ন তিমিমাছের কানের কাছে শুভ্রন করা।

U. S. A. সমরাজ্য সীমিতকরণের উদ্দেশ্যে যে সভা ডাকা হয়, বার্নার্ড শ' তাতে বোগদান করতে রাজী হননি। বলেছিলেন—সমরাজ্য সীমিত করলে যুদ্ধ নিরোধ করা যায়, এই ধারণা ভুল, পথের ধারের কুস্তার-লড়াই—এর প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ।

বার্নার্ড শ' কোনো দিন হাউস-অব-কমন্সের সভায় উপস্থিত হননি, দর্শক হিসাবে কিন্তু ১৯২৮-এ জেনেভায় লীগ অব নেশনসের সভায় হাজির হয়েছিলেন। সমগ্র অববেশন তাঁর কাছে Dull এবং Stupid বলে মনে হয়েছে। বার্নার্ড শ' বলেছেন—In the atmosphere of Geneva patriotism perishes; a patriot there is simply a spy who can not be shot; কিন্তু যুদ্ধের পর রাশিয়ার সংবাদে স্বাক্ষর হারিসকে লিখেছিলেন, রাশিয়া থেকে সুসংবাদ এসেছে, ঈশ্বর বহুরূপে প্রকাশিত হয়ে পরিপূর্ণ হয়েছেন। আমাদের জন্য হাতের মুঠায় অনেক বিষয় রেখেছেন।

[কমশঃ।

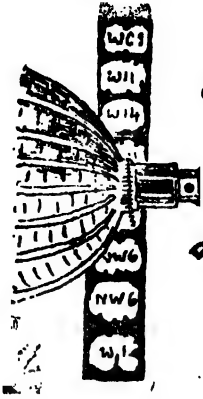
না, তুমি যেয়ো না চলে

গোপাল ভৌমিক

না, তুমি যেয়ো না চলে
এই অমরোপ
বার বার যদিও জানাই
তোমার ববির কানে
সে কথা বাবে না জানি,
যেহেতু বখন বাজে
বিদায়ের করুণ সানাই
তখন ফেরার কথা শুধু বাতুলতা।
সব কিছু জানে মন
তবু সে জানার কাতরতা।

না, তুমি যেয়ো না চলে,
হোক সে ক্ষণিক দাবী,
স্বর তার অনেক গভীর
জানি বলে
বার বার এক দাবী করি;
জানি তাকে পায় দলে
তোমার আগের কোটি মাহুকের মত,
হয়তো বা দেবতার মত তুমি বাবে চলে।
হতাশার কোঁড় নিয়ে আমার পৃথিবী
নিজেকে ডুবিয়ে দেবে কল-কোলাহলে।

না, তুমি যেয়ো না চলে,
কে একথা বলে আর কে-ই বা না বলে!
তবু সব চলে যায়,
খাকবার বারা থাকে পড়ে;
পৃথিবী বলে না শেষ কথা
সাইলেন কিংবা বালিস্বড়ে।
বখন মরুর ঝড় কেঁদে কেঁদে বলে,
না, তুমি যেয়ো না চলে,
তখন হুঁ চোখ করে অত কোনখানে
মেখে ফুল সমারোহ, ঘরা সেই গানে।



নতনের

পাড়ায় পাড়ায়



[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

হিমালীশ গোস্বামী

If there are five empty seats and I say the bus is full, the bus is full.

—Conductor of a London bus

এবারে লিওকিঙ্ক গার্ডেনস।

বেলাদি' বাড়ী বদল করলেন, ঐ রাস্তাই পালের বাড়ীতে গেলেন আমরা চলে এসাম পশ্চিম থেকে উত্তর লগুনে। এবারে বাড়ীটি হ'ল বড় একটি ক্যাটের অংশ।

পাড়ার নাম হাম্পস্টেড।

পাহাড়ী অঞ্চল—প্রচুর গাছপালা চারদিকে। এ অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি সূর্যের আলো পাওয়া যায়, সবচেয়ে বেশি নো পড়ে, কুয়াসা সবচেয়ে কম হয়।

এ পাড়া নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। একশো বছর আগে এ দিকটায় লোক-বসতি প্রায় ছিল না। লোক বসতি ছিল না তার কারণ এখনো কলের জলের ব্যবস্থা হয়নি। এক বাসতি জলের দাম তখন এ পাড়াতে ছিল এক শিলিং। ডাকাতেরা ঝোপে



আমরা সব কিছুই বিরোধী

কাঁড়ে লুকিয়ে থাকত—পৃথিবীর আক্রমণ করত। এর উদ্দেশ্য থেকে চোর-ডাকাতদের খুঁজে বার করা বেজায় কঠিন কাজ ছিল।

এই পাড়ার চোর-ডাকাত ছিল আর ছিলেন এক কনস্টেবল। এই কনস্টেবলটি কখনো একটি চোরও ধরেননি। না খেয়ে অসুস্থ অবস্থার তাঁর মৃত্যু হয়। ইনি জীবনে একটি চোর না ধরলেও ইনি অল্প অনেক কিছুই ধরেছেন, বন্দী করেছেন। ইনি গাছপালা, মৃগ, গরু-বোড়া এ সমস্ত তাঁর তুলি এবং স্যান্ডাসের সাহায্যে ধরে রেখেছেন। তার প্রমাণ এখনও আছে গ্রাশনাল আর্ট গ্যালারি এবং টেট আর্ট গ্যালারিতে।

এঁর নাম জন কনস্টেবল। বৈচে থাকার সময়ে তাঁর ভাগ্যে সম্মান এবং টাকা জোটেনি। এখন তাঁর ছবির দাম হাজার হাজার পাউণ্ড। শিল্পীরা মরে না গেলে যে তাঁদের সম্মান হয় না ইনি তার অসন্ত উপাধরণ। এখনও অনেক শিল্পী হাম্পস্টেডে থাকেন তাঁদেরও অনেকের ধারণা মরে গেলে তাঁরাও বিখ্যাত হবেন। তাঁদের ছবি দেখে অনেক সমালোচক বলেছেন তাঁদের মরাই উচিত। হাম্পস্টেডে শিল্পীরা বেড়েই চলেছেন। প্রতি পাঁচজন হাম্পস্টেডের লোকের মধ্যে একজন হ'লেন শিল্পী।

এই অবস্থা সমস্ত দেশে হলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ভেঙে পড়ত। সুখের কথা, ইংল্যান্ডের সর্বত্র শিল্পীদের এমন প্রাচুর্য্য নেই। হাম্পস্টেডের রাস্তায় রাস্তায় দেখা যায় শিল্পীদের আবিপত্য। এই শিল্পীরা ছেঁড়া পোশাক পরেন (একজন শিল্পীবন্ধু বলেছেন এঁরা নতুন পোশাক থাকলে ছিঁড়ে নেন।) দাবা খেলেন, কফী খান, জাঁপল সার্ভর এবং ডিলান টমাস সম্পর্কে আলোচনা করেন, এড্রিয়ামাল সিনেমা হলে দ্রিশ বছরের পুরোনো ভাল ছবি দেখে প্রবন্ধ লেখেন (তা ছাড়া হয় না), বন্ধুদের পড়ে শোনান, বন্ধুরা প্রতিটি কথা ভুল প্রমাণ করেন—প্রতিটি মতই অগ্রাহ বলে মন্তব্য করেন। এই রকম বাধা পেলে তাঁরা আরো উৎসাহিত হন, আরো সমালোচনা লেখেন। কিন্তু একবার প্রশংসা করলে এঁদের সবাই সমালোচককে অনার্য্য লোক বলে গালমন্দ করেন। এঁদের অধিকাংশই বিশ্বাস করেন, পৃথিবীতে কোন কিছুতেই তাঁর বিচার হয় না। এঁদের কেউ যদি বিখ্যাত না হন তাহলে সেটা হল সমাজের অজ্ঞার বিচারের ফল, আর যদি কেউ বিখ্যাত হন তাহলেও সেটা যে অজ্ঞার বিচারের ফলেই হয়েছে, সে বিষয়ে কোন সংশয় এঁদের নেই।

এঁরা সমস্ত প্রচলিত এবং অপ্রচলিত বিশ্বাসের বিরোধী। গুটো মার্কসের মত whatever it is, we are against it মন্ত্রে এঁদের বিশ্বাস। এঁরা নেগেটিভর্ম্য। এক কথায়, এঁরা ইনটেলেকচুয়াল। সমস্ত হাম্পস্টেড ইনটেলেকচুয়ালে ভর্তি। কিন্তু আমাদের ল্যাণ্ডলেডি মিসেস হেইসের মধ্যে আথ আউল্ডও ইনটেলেকচুয়াল হবার ক্ষমতা ছিল না। ইনি টাকা বুঝতেন, এবং টাকা তাঁর ছিল। টাকা ছাড়া আর অল্প কোন রকম ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত থাকা পছন্দ করতেন না।

মিসেস হেইসের বয়স ছিল প্রায় ষাট। জাতে ছিলেন ইহুদী। এঁর ছেলে ইহুদী নাম হেইস পছন্দ করত না বলে নাম বদলে করেছিল হলফোর্ড। হলফোর্ড ছিল ডাক্তার। হলফোর্ড এ বাড়ীতে থাকতো না—কিন্তু তার প্রচুর বই ছিল। বাড়ীর দুটি বড় তাক ভর্তি বইগুলিতে ছিল স্বচির পরিচয়।

পিকাসো! এবং মনঃসন্ধান, যেনোয়া এবং সূর্য প্রভৃতি শিল্পীদের সম্পর্কে বড় বড় বই। তা ছাড়া বিশ্বসাহিত্য সম্পর্কে নানা ধরনের বই।

এই ল্যাটটি ছিল বেসম্মেটে। একতলা এবং দোতলার অন্তরা থাকতেন, তাঁদের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক ছিল না। লগুনে প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্ক না রাখাই রীতি। আমাদের দেশের ঠিক উল্টো। আমাদের দেশে প্রতিবেশীরা সমস্ত রকম ব্যক্তিগত প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য—যেমন, আপনার বেতন কত, জ্বর বয়স কত, হোমিওপ্যাথ ডাক্তার না ডেকে অ্যালোপ্যাথ ডাক্তারের কাছে চিকিৎসা করান কেন, আপনি কাল সন্ধ্যায় কোথায় গিয়েছিলেন, রবিবার সকালে যে ভক্তলোক ডাকতে এসেছিলেন আপনার নাম কি, ঠিকানা কি, তিনি কত মাইনে পান—ইত্যাদি এ সমস্তেরই জবাব দিতে হয়। লগুনে এ সমস্তের জবাব দিতে হয় না। কেউ বিপদে পড়লে কিছু লগুনের প্রতিবেশীরা সজ্জন হয়ে ওঠে।

লগুনে একটা বাপার খুব লক্ষণীয় হয়ে উঠছে। একবার যে বাড়ীতে ভারতীয়রা যার সে বাড়ীতে আস্তে আস্তে ভারতীয়ের সংখ্যা বাড়তে থাকে। ক্রমে এমন হয় যে, শেষ পর্যন্ত সে বাড়ীটার সমস্তই ভারতীয় লোকজনই ভরে যায়। এটা কেমন করে হয় বলছি। একটি বাড়ীতে দশখানা ঘর, প্রায়ই লোকেরা উঠে যায়—উঠে যাওয়ার আগে বাড়ীর লোকেরা জানতে পারে ঘর খালি হবে। ভারতীয়টি যদি জানতে পারে যে একটি ঘর খালি হবে, সঙ্গে সঙ্গে সে তার ভারতীয় বন্ধুকে বলবে একটি ঘর খালি আছে—সে ল্যাণ্ডলেডিকেও বলবে যে, তার বন্ধু খুবই ভক্ত, সে আসতে চায় এই বাড়ীতে। ল্যাণ্ডলেডির কোন আপত্তি থাকবার কথা নয়—কারণ সে যখন একজন ভারতীয়কে ঘর ভাড়া দিয়েছে, অল্প একজনকে ভাড়া দিতে আপত্তি কি? এই ভাবে আস্তে আস্তে এক একটা বাড়ী ভারতীয়রা অধিকার করতে আরম্ভ করে। যে বাড়ীতে প্রচুর ভারতীয় সে বাড়ীতে ইউরোপীয়ান বা আমেরিকান কেউই থাকতে চায় না। কারণ প্রতি ঘর থেকে পেন্সন-লংকা বয়নের গন্ধ সমস্ত বাড়ীটিকে ভরে তুলে। বিশেষ ধরনের ফুলপ্রফ নাক না হ'লে সে গন্ধ সহ্য করা কঠিন। এইরকম বাড়ীতে ভারতীয়রা থাকে। প্রত্যেকের আলাদা ঘর হ'লেও তারা নিজেদের মধ্যে নানা রকম মামা কাকা ভাই দাদা খুড়ো সম্পর্ক পাতিয়ে নেয়। খুব বন্ধু হ'লে বার পরবারের মধ্যে।

খুব যেমন বন্ধু হয়, তেমনি শত্রুতাও হয়। প্রথমে গলার গলার, পরে আদার-কীটকলার। একত্র থাকতে থাকতে নানা রকম আর্থিক আদান-প্রদান চলে। প্রত্যেকে প্রত্যেকের কাছ থেকে ধার করার চেষ্টা করে। এই সব বাড়ীতে বীরা থাকেন, তাঁরা ভারতীয়দেরই কেবল পরিচয় পান। অনেকে লগুনে বছরের পর বছর থাকেন, কিন্তু তাঁদের সঙ্গে একটি অভারতীয়ের সঙ্গে বন্ধু হয় না। তাঁদের কাউকে যদি জিজ্ঞেস করা যায় ইংরেজদের কেমন লাগল? তাঁরা উত্তর দেন: ইংরেজ তো কোলকাতার অফিসের সাহেব, সেই জে ইংরেজ। লগুনে ইংরেজ টিংরেজ দেখিনি—তবে হ্যাঁ, বাঙালী, মাদ্রাজী, পাঞ্জাবীতে লগুন ভরা।

লগুন ভরা—কথাটা ঠিক নয়। তবে রেলওয়েতে বা কাউন্টি

কাউন্টিতে আজকাল প্রচুর ভারতীয় কেরানিগিরি করেন। প্রচুর লোক লগুন ট্রান্সপোর্টের কাজ করেন। শুনিছি প্যাডিস্টন ট্রেনের একজন বাঙালী ইনফরমেশন কাউন্টারে বসেন—বাঙালীরা গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, দাঁহ, বলতে পারেন অক্সফোর্ডের টিকিট কোথেকে কিনব?

বাঙালী দাঁহ 'হ'পাটি দাঁত দিখে নিজের জিভটাকে কামড়ে ধরেন, তারপর বলেন, ঐ তো ঐ দিকে পথ দেখা আছে—আর আমাকে 'বাঙালার কথা কওরান কেন মশাই? ইংরেজদের খাচ্ছি ওদের ভাষার কথা না কইলে চাকরি বাবে।

কিন্তু চাকরি 'গেলেই বা কি, ল্যাশনাল-ইনশিওর্যান্স আছে না? চাকরি 'গেলেই যেমন আমাদের দেশের অনেকে রাত্তার বসে পড়েন, সারাদিন ভিক্ষে করেন, ইংল্যান্ডে চাকরি গেলেই কিছু রাত্তার-রাত্তার বসবার জো নেই। প্রথমত গবর্নেন্ট থেকে তাকে কিছু পরিমাণ টাকা দেওয়া হয়—তাতে ভিক্ষে করতে হয় না। এটা তার প্রোপা—এটা হ'ল ইনশিওর্যান্স। কিন্তু এতেও যদি না চলে, তাহ'লে আছে ল্যাশনাল আসিসট্যান্স, এরাও প্রচুর সাহায্য করে থাকে লোকদের।

ভারতীয়দের বাড়ী দখল সম্পর্কে আমার জানা একটি ঘটনার কথা বলছি। সে বাড়ীতে জন-কুড়ি ভারতীয় থাকত—অল্প কোন জাতের লোক ছিল না। কি কারণে একটি ভারতীয় ছাত্রের সঙ্গে ল্যাণ্ডলেডির গোলযোগ হওয়ার ল্যাণ্ডলেডি ছাত্রটিকে চলে যেতে বলেন বাড়ী থেকে। বাপারটা অল্প ভারতীয়রা শুনলো—শুনে ল্যাণ্ডলেডিকে অমরোপ করলো যে নোটিশ প্রত্যাহার করা হ'ক। ল্যাণ্ডলেডি কর্পোরেট না করাতো কুড়ি জন ভারতীয় এক সঙ্গে নোটিশ দিল ল্যাণ্ডলেডিকে।

বাড়ী বদলের দিন সে এক আশ্চর্য ঘটনা। প্রায় একশো জন ভারতীয় জমা হয়েছে বাড়ীর সামনে। প্রত্যেক ভারতীয় তাঁদের চার-পাঁচজন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে বাড়ী বদলানাতে সাহায্য করার জন্য। প্রচুর ট্যান্ডি জমায়েত হয়েছে বাড়ীর সামনে। হৈ চৈ করে জিনিষপত্র নামানো হয়েছে। চারিদিকে প্রতিবেশীরা মজা দেখছে। দু'একজন পুলিশও জুটে গিয়েছে কী হয় দেখবার জন্য। ঘটনাক্ষেত্রের মধ্যে সমস্ত বাড়ীটাকে নেমে এসেছিল কবরের গাভী। একটি ভাড়াটে নেই, কেংল ল্যাণ্ডলেডি।



পুলক জামা ইতিরি করা শিখছে

কোনও কোনও ল্যাণ্ডলেডি ভাল যে হন না জানয়। তাঁরা ভাল, কিন্তু ভারতীয়দের অভ্যাসের কথা তাঁরা জানেন না বলে রাগ করেন। ইংরেজদের গতিবিধি প্রায় মাথা। তাঁদের গতিবিধির যেটুকু বৈচিত্র্য আছে তাতেই তাঁরা খুসি। ভারতীয়দের সঙ্গে তাঁরা পাল্লা দিতে পারেন না। বিশেষত ল্যাণ্ডলেডেরা একটু বেশি মাত্রায় ভারতীয় বৈশিষ্ট্য কাতর হয়ে পড়েন। ইংরেজদের ধারণা যে মানুষের বেশি কিছু থাকার প্রয়োজন নেই—এক-আধজন যদি থাকে ভাল, না থাকলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু ভারতীয়দের বহু প্রচুর—আর বহুদের কাজই হ'ল বাড়ীতে আসা, এসে হৈ চৈ করে গল্প-করা এবং এগারোটা বায়োটার লোকে ঘুমিয়ে পড়লে বিনা কারণেই কোনের ঘটা বাজিয়ে জাগানো। কোন কোন ল্যাণ্ডলেডি সামান্য আওয়াজও সহ করতে পারেন না। রেডিও যদি জোরে বাজানো হয় তাহলে তাঁরা সেটাকে অপরাধ মনে করেন। অথচ খুব জোরে রেডিও না বাজালে আমরা রেডিও রাখবার অর্থই খুঁজে পাই না। একটা আইন এদেশেও আছে যে রেডিও এত জোরে খুলে রাখা চলবে না, যাতে প্রতিবেশীদের এতে অসুবিধে মোটেই না হয়। আমাদের দেশে যেমন প্রতি সহরে চার পাঁচটা রেডিও থাকলেই চলে যায়, ইংল্যান্ডে তা চলে না। সেখানে এমন কি পাশের ঘরের রেডিও শোনা যায় না এমন আস্তে বাজানো হয়।

আমাদের নতুন বাড়ীটি ভালই হ'ল। তবে ফার্নিচার প্রায় কিছুমাত্র ছিল না। সমস্তই ভাঙা এবং কোনক্রমে ব্যবহার করা বলে। একটা টেবিলের পা এমন নড়বড়ে ছিল যে সে টেবিলের উপর কিছু রাখা চলত না। অন্তত সে টেবিলে খাওয়া কিছুতেই চলত না। হঠাৎ ভেঙে পড়বার সম্ভাবনা ছিল। সে কথা বলতে মিসেস হেইস বলতেন টেবিল ওমনিই হয়। আস্ত টেবিল লগুনের কোন ল্যাণ্ডলেডিই দেয় না।

ল্যাণ্ডলেডিকে বললে কোন অভিযোগের প্রতিকার হয় না যে তার প্রমাণ বহু বার পেয়েছি। নিজেদেরই সারিয়ে নিতে হয় পরস্পর খরচ করা। আমাদের এবারে ইলেকট্রিক হীটার ব্যবহার করতে হল—কারণ গ্যাস হীটার নেই এ বাড়ীতে। একটা ঘরে কয়লা দিয়ে ঘর গরম করতে হয়। কয়লা প্রথমত পাওয়া কঠিন। একটি কয়লাওয়ালার কাছে নাম লেখাতে হল। তারা কয়লা দিয়ে গেল গাদা ধানেক। সে কয়লা সমস্তই ভিজ্জে। আমি আর রহু (পিসতুতো ভাই বয়স ১ বছর) দুজনে মিলে মাঝে মাঝে লোহার শিক দিয়ে কয়লা ভাঙতাম বাগানে। বৃষ্টি পড়লে সেখানে ছাঁতা নিয়ে যেতে হত। সেখানে বলে আস্ত কয়লাকে টুকরো টুকরো করতে হত। এর ফলে অর্ধেক কয়লা গুঁড়ো হ'য়ে ছিটকে বাগানের ঘোপের মধ্যে অদৃশ্য হত। বাকী যা থাকত এক বালতি বোকাই করে এনে আলবার ব্যবস্থা করতে হ'ত। এজন্য শুকনো কাঠ বাড়ীতে মজুদ রাখতে হত। এই শুকনো কাঠের টুকরো প্যাকেটে করে দোকান থেকে কিনে আনতাম। একটা ছোট প্যাকেট কিনতে পাঁচ ছ পেনি খরচ পড়ত। এই কাঠ কিন্তু সহজে জলত না। এই কাঠ আলানোর জন্য আবার প্রয়োজন হ'ত খবরের কাগজ।

কিন্তু সব সময়ে খবরের কাগজে কাজ হ'ত না। কেবাসিন

ব্যবহারও করে দেখেছি। তা ছাড়া আর একরকম আলানি বাজারে পাওয়া যেত, খয়েরের মত দেখতে, সেগুলো খুব তাড়াতাড়ি পোড়ে আর বেশ তাপও হয়। প্যাকেটে হ'ল ঐরকম খয়ের থাকে, নাম ছ' পেনি। প্যাকেটে লেখা থাকে যে প্রতিবার আগুন ধরাতে একটি কিংবা দুটি খরচ করলেই হয়। কিন্তু অধিকাংশ সময়েই হয় না।

কম পকে চারটে করে খয়ের পোড়াতে হয়।

কয়লা ধরাতে সময় লাগে অন্তত এক ঘণ্টা। কয়লা বধন ঘরে আসে তখন বড় ভাল লাগে। কিন্তু তখন কয়লার আগুন উপভোগের সময় নেই।

হাত ধুতে হবে। সারা হাতে কয়লার দাগ, মুখে কয়লার দাগ। চান করলেই ভাল হয়। রোজই প্রায় চান করতে হ'ত।

এরকম আগুনের কোন অর্থ বৃষ্টি না। কারণ কয়লা আলিয়ে বেশ আয়াম করছি হয় ত—এমন সময় টেলিফোন এল পুলক চক্রবর্তীর। ওর কাছে যেতে হবে বেলসাইজ স্মারকে। সেখানে কী এক পার্ট হ'চ্ছে কনটিনেন্টাল ক্লাবে। অত কষ্টে তৈরি করা আগুনকে ফেলে যেতে হয়, নিবিধে দেওয়া সম্ভব হয় না।

এরকম বাড়ীতে সবচেয়ে ভাল উপায় হ'চ্ছে বিধানায় শুয়ে শুয়ে পড়া। লেপ গায় দিয়ে।

যে ইলেকট্রিক হীটার ছিল এ বাড়ীতে তারি উদ্ভাপ এত কম যে হীটারের ইঞ্চি তিনেক দূরে হাত না রাখলে একটুও গরম লাগত না।

পুলক চক্রবর্তী যেখানে থাকত সে বাড়ীতে থাকত সাধারণত ইউরোপের ছেলে-মেয়েরা। পুলক যে ঘরে প্রথমে গিয়েছিল সে ঘরে আরো দুজন লোক থাকতো।

তারা জার্মান বা ইটালিয়ান নয়।

তারা ইউরোপের লোক নয়। তাদের আবাস চীন দেশে। তাদের সঙ্গে পুলকের হ'ল বন্ধুত্ব।

ঐ চীনে ছেলে দুটি রোজই তাদের গেলি শার্ট ইত্যাদি সাবান দিয়ে কাটতো, শুকুতো এবং ইন্ডিরি করতো।

লগুনে ঘোবার খরচ প্রচুর। একটা শার্ট ধুতে দেড় শিলিং পর্যন্ত লাগে। আমাদের এক টাকার সমান। অতএব নিজে ঘুরে নেওয়া সবচেয়ে ভাল। এর জন্য ওয়াশিং মেশিন পাওয়া যায়। কোন কোন দোকানে প্রচুর ওয়াশিং মেশিন রাখা হয়—সেখানে গিয়ে আধ ঘণ্টার পাঁচ ছ সের ওজনের জামা-কাপড় আড়াই শিলিং খরচ করে ঘুরে আনা যায়। তারপর শুকিয়ে ইন্ডিরি করে নিলেই হয়। অনেকেই এটা করে থাকে।

চীনেও তা করতো।

একদিন পুলক চীনে ছেলে দুটিকে বললো, ভাই, তোমরা আশ্চর্য কাণ্ড করছ—এমন স্নানর ঘোরা আর ইন্ডিরি এত বেশ ঘুরলাম কিন্তু কোথাও দেখিনি। আর বোধ হয় এজন্মে কোথাও দেখব না।

চীনে ছেলে দুটি বিনয়ের অবতার। তারা বলে, এ তো খুব সোজা—সবাই করতে পারে, এমন কি তুমিও করতে পার। পুলক আরও বিনয়ের সঙ্গে বলে, না আমি কিছুতেই পারব না—আবার

দ্বারা জামা কাপড় ধোওয়া হবে না। চীনেরা ভরসা দেয় হবে। একদিন তারা পুলকের পুরনো জামা ইত্যাদি ধুয়ে নিয়ে এস ওয়াশিং মেশিনে। পুলক দেখলো।

চীনেরা বললো, এবারে ইন্ডিরি করা শিখে নাও। কাঁড়িরে কাঁড়িরে বেধে কেমন করে আঁধার করি। পুলক ভাও দেখলো।

তারপর দিন থেকে বোঝ চীনেরা পুলকের সমস্ত জামাকাপড় ধুয়ে দেয়। ইন্ডিরি করতে শেখায়।

কিন্তু পুলক কিছুতেই শিখতে পারে না।

সে কাঁড়িরে কাঁড়িরে খবরের কাগজ পড়ে অথবা দাড়ি কামার আর মাঝে মাঝে ইন্ডিরি দেখে। পুলক ইন্ডিরি করা কিছুতেই শিখতে পারেনি। প্রায় তিন মাস চীনারা চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দেয়। তার পর তারা বাড়ী ছেড়ে দেয়।

লণ্ডনের ঘোণীরা কাপড় কাচতে বড় দেরি করে।

এদের দোকান আছে, কিন্তু সংখ্যার খুব বেশি নয়। সাত দিনের কথো সূতির কাপড়-জামা পাওয়া যায় না। কখনো চোদ্দ দিনও লেগে যায়। এই ঘোণা দোকানদারেরা খুব গভীর মুখ করে থাকে। কোথাও তাদের হাসতে দেখিনি। ইংল্যাণ্ডে সমস্ত দোকানেই দোকান-কর্মচারীদের হাসবার নিয়ম—এমন কি মাসের দোকানদার পর্যন্ত হেসে জিজ্ঞেস করবে, এ দেশ ভাল লাগছে? আমাদের দেশের আবহাওয়া নিশ্চয় তোমাদের ভাল লাগে না?

কিন্তু ঘোণীদের হাসতে দেখিনি। এরা হাসে না, কিন্তু এদের রসিকতাবোধ আছে। এরা অস্ত্রের শাট, অস্ত্রের ক্রমাল—বিশেষ করে অস্ত্রের তোয়ালে প্যাকেটে ভরে দেয়। ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং তার বন্ধার আইন-কানুনে ইংল্যাণ্ডের বাতাস ভরি, কিন্তু জামা-কাপড়ের বেলায় ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে কিছুই নেই। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের শাট পরে—পরতে বাধ্য হয়।

শাট নহ্ন কিনেছ, ঘোণা দিয়েছে? এই কথাটি আমাদের মধ্যে খুব পরিচিত ছিল। কেউ নহ্ন শাট কিনলে তাকে জব্দ করার জন্য খুব সহায়ত্বের সঙ্গে বলা হ'ত, ভাই, তোমার ঘোণা বড়ই অলং তো!

কেন?

ঐ যে শাটটি পরে আছে, ওটা তো তোমার নয়—তোমার ও বকম কুচিই হবে না—ব্রাউন বডের ষ্ট্রাইপ দেওয়া শাট তোমাকে যেটেই মানায় না।

মানায় না—বটে?

এ চন্দ্র মানায় না।

তুমি জেনে রাখো, এই শাট আমি নিজের পয়সায় এবং নিজের পছন্দ অনুযায়ী কিনেছি।

মাপ করো ভাই। আমি জানতাম না।

একবার খুব মজা হয়েছিল। সাধনের প্যাকেটের সঙ্গে অন্য কোন এক ভদ্রলোকের প্যাকেট স্ক্রু বদলে গিয়েছিল।

তিন দিন সে বেগে ছিল। বৃদ্ধ খেলেনি, বন্ধুদের খাওয়ারনি—এমন কি বাগা করেনি পর্যন্ত। তার পর সে একটা কাঁচি দিয়ে সমস্ত জামা কেটে ফেলে ভাট্টবিনে ফেলে দেয়। কারণ, ঘটকের গলার মাপ ফোল ইকি, আর ঘোবার দেওয়া শাটগুলির প্রত্যেকটি চোদ্দ ইকি।

ঘোবার দোকানে বলেও কোন ফল হয়নি। তারা বলেছিল, নখরে মিলে যাচ্ছে অতএব এ নিশ্চয়ই সাধনের জামা। সাধন বলেছিল, না এ জামা আমার নয়, যে কোন গাধাই সেটা বুঝতে পারবে।

কিন্তু দোকানদার বুঝতে পারেনি।

কুচি হয়নি।

সে জামা কিনল এবারে—নাম তার টেরেলাইন। এ জামা ঘোবাকে দিতে হয় না। বাড়ীতে মেশিনে পাঁচ মিনিটে কাচা যায়, দু'ঘণ্টার মধ্যে শুকিয়ে দেয়।

এই জামার ব্যবহার ইংল্যাণ্ডে প্রচুর বেড়ে যাচ্ছে। আস্তে আস্তে তুলোর প্রাধান্ত কমছে। এর পর বিছানার চাদর, বালিশের ঢাকনা সবই এ দিয়ে তৈরি হবে হয়ত।

লোকে বত এই নতুন জিনিসের জামা ব্যবহার করছে তত ঘোবারা কম টাকা পাচ্ছে—মার ততই ঘোবার খরচ বেড়ে যাচ্ছে। এর পর হয়ত একটা জামা ঘোবার খরচ দিয়ে একটা জামাই কেনা সম্ভব হবে। লোকেরা বাড়ীতে বত কাপড় বুচ্ছে ততই সাবানের বিক্রি বাড়ছে।

বিশেষ করে গুঁড়ো সাবানের।

আর প্রচুর বিজ্ঞাপন চোখে পড়ে সাবানের গুঁড়োর। সব সাবানের গুঁড়োতেই সমান কাজ হয়—সমান পরিষ্কার হয়। একটু কম বেশি হ'লেও তা শর্ভব্যের মধ্যে নয়, কিন্তু সাবান কম্পানীরা বিজ্ঞাপন দেয়, "আমাদের সাবান দিয়ে ধুলে সাদার চেয়েও সাদা হয়। অন্য একটি কম্পানী বিজ্ঞাপন দেয় কেবল সাদাতে আর চলবে না, এর সঙ্গে প্রয়োজন উচ্ছলতার। অন্য একটি কম্পানী বিজ্ঞাপন দেয়, ঔজ্জ্বল্য আরো স্থায়ী করে আমাদের সাবানের কেনার।

খবরের কাগজের পাতায় পাতায় বিজ্ঞাপন দেখে মনে হয় একটা জিনিস—ইংরেজরা বেশি সাবান ব্যবহার করছে—অতএব তারা পরিষ্কার জাত। কথাটা সত্যি। আর একটা জিনিস মনে



হয় যে ইংরেজরা সাবানের জগৎ যত খরচ করছে তার চাইতে বেশি খরচ করছে বিজ্ঞাপনের জগৎ।

অর্থাৎ বিজ্ঞাপনের জগৎ খরচ করছে কম্পানিরা কোটি কোটি টাকা। এই টাকা দিচ্ছে ক্রেতারা। অর্থাৎ ক্রেতারা একটা জিনিসের জগৎ দাম বেশি দিচ্ছে। অর্থাৎ কোন জিনিস বিক্রি করতে হ'লে বিজ্ঞাপন দিতেই হয়। কিন্তু দেখা গেছে যে সাবান বিক্রির ব্যাপারে তারা মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে।

বাসে, টিউবে বিজ্ঞাপন, রেডিওতে টেলিভিশনে সর্বত্র বিজ্ঞাপন। অধিকাংশই সাবানের।

সাবানের গুঁড়োর দাম মাঝে কমিয়ে দেওয়া হয়। বার দাম দু'শিলিং প্যাকেট, তার দাম একটা কোম্পানি হঠাৎ এক শিলিং দু'পেনি করে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত কোম্পানি তাদের সাবানের দামও কমিয়ে দিতে বাধ্য হয়। দেখা গেছে তাতেও তাদের লাভই থাকে।

লিওকিন্ড গার্ডেনসে বেলাদি' হ'লেন আমাদের প্রতিবেশী। একদিন দেখি বেলাদি' দু'একটা জিনিস কেমিষ্টের দোকান থেকে কিনেছেন। তার মধ্যে একটা টিউব—সান ট্যান লোশনের।

ইউরোপে এই জাতীয় লোশনের বিক্রি খুব বেশি। যারা রৌদ্রস্থান করেন বাগানে বা সমুদ্রের ধারে তাঁদের গা যাতে পুড়ে না যায় তার জগৎ আগে থেকে এই তৈলাক্ত পদার্থটি মেখে নিতে হয়। কিন্তু ভারতীয়দের এ জিনিস বিশেষ প্রয়োজন হয় না—কারণ ভারতীয়রা ইংরেজদের মতো অত নূরুর আলোর চান করবার পক্ষপাতী নয়। তাই ওটা দেখে অবাক হলাম। বললাম, বেলাদি', রৌদ্রস্থান করেন নাকি আপনি?

—কৈ না। কে বললো?

—আপনার কাছে সানট্যান লোশন দেখছি কি না তাই! ঠাট্টে গারে মেখে সারের-মেয়েরা সমুদ্রের ধারে মড়ার মত পড়ে থাকে। বেলাদি' বললেন, এফুনি কেমিষ্টের দোকানে দিয়ে এসো না ফেরত এটি।

বেলাদি' টুথপেস্ট মনে করে কিনেছিলেন ওটি। এরকম ভুল প্রায়ই হয়। দোকানে সাজানো জিনিস থাকে, নিজের ভুলে নিতে হয়, দাম দিতে হয়, সাধারণত—টুথপেস্ট মনে করে সানট্যান লোশন আনা মোটেই অসম্ভব নয়।

কিন্তু কেমিষ্টের দোকানে গিয়ে ডিম চাওয়াটা একটু বাড়াবাড়ি বৈ কি। তাও ঘটছিল আমাদের বন্ধু ইসমতুল্লাহ আনসারির ভাগ্যে। ৮ কিনতে বেরিয়েছিল ডিম—এসেছে দু'সপ্তাহ হল লাগুনো থেকে। ফিকলি রোড টিউব ট্রেন থেকে বেরিয়েই বাঁদিকে দু'একটা দোকানের পর হল কেমিষ্টের দোকান—আর তার পাশেই হাস ডিম ইত্যাদির দোকান। দোকানের শোকেসে রয়েছে ডিম—সাজানো।

ও ভুল করে চুকে পড়েছে কেমিষ্টের দোকানে। কেমিষ্টের দোকানে খাতা শেল্লি ক্যামেরা রবারের বল, ডায়েরী, স্টকেস, কিং এ সমস্ত পাওয়া যায়—কিন্তু কোন কারণে ইংল্যাণ্ডে এরা ডিম বিক্রি করে না। এরা হলুদ, দারচিনি, লঙ্কাগুড়ো পর্বত বিক্রি করে। কিন্তু ডিম নয়। কেমিষ্টের দোকানে মনেই হয় না এরা ডিমের নাম শুনেছে কখন।

আনসারি একটি মহিলা শূণ অ্যা'স্ট্যান্টকে বলেছে, গোটা ছয়েক ডিম দাও তো?

ডিম? তুমি ডিম চাও?

আনসারি জবাব দিয়েছে : চাই বই কি—আলবত গাই। আমি ডিম কিনতে এসেছি—ডিম কিনব, তুমি ডিম বেচবে।

না, আমি ডিম বেচব না। পাশের দোকানে যাও, ওদের কাছ থেকে ডিম পাবে।

আমি ডিম কিনব এবং এখান থেকেই কিনব। না কিনে নড়ব না।

ভদ্রমহিলা বললেন, পরসাদ দাও আমি দিচ্ছি। পরসাদ নিয়ে পাশের দোকানে গিয়ে চারটে ডিম কিনে এনে আনসারির হাতে দিয়ে ভদ্রমহিলা বললেন, এর পর থেকে যখন ডিম কিনতে আসবে তখন ঐ দোকানে যেও।

আনসারি ভুল বুঝতে পেরে লাল হ'য়ে উঠেছিল লজ্জায়।

খুব সাবধানী লোক আমাদের হলুদ। (দেবপ্রত চক্রবর্তী) হলুদও একটি কেমিষ্টের দোকানে গিয়েছেন—তিনি কিনবেন এক টিউব দাড়ি কামাধার সাবান। দোকানদার জিজ্ঞেস করলেন, উইথ ব্রাশ অর উইদাউট ব্রাশ? (অর্থাৎ যে সাবানের টিউব নেবে, সে সাবান হাত দিয়ে গালে সোজানুজি ঘষতে পারবে—ব্রাশের প্রয়োজন নেই একেবারে—অথবা যে সাবানে ব্রাশের প্রয়োজন হয়, তেমন টিউবও আমরা রাখি।)

হলুদা ভাবলেন, উইথ ব্রাশ—অর্থাৎ এরা টিউবের সঙ্গে ব্রাশও বিক্রি করবার তাগে আছে। তিনি জোরের সঙ্গে বললেন, অফ কোর্স, উইদাউট ব্রাশ।

বাড়ীতে এসে জল দিয়ে ব্রাশ দিয়ে হলুদা যত চোঁচা করেন, কিছুতেই ফেনা হয় না। অবশেষে তিনি ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন। প্যাকেটের উপর লেখা আছে : ব্রাশ ব্যবহার করতে হয় না। উইদাউট ব্রাশ।

কোলকাতার যে জিনিস প্রত্যেক বাড়ীতে আছে তা লগুনের প্রায় কোন বাড়ীতেই নেই—জিনিসটা কি? আরসোলা? ছারপোকা? এগুলো দেখতে পাওয়া যায় না বটে তেমন, কিন্তু একেবারে অদৃশ্য নয়। জর্জ অরওয়েল লিখেছেন তাঁর বইতে যে টেমস নদীর উপরে কোন কারণে ছারপোকা নেই—কিন্তু দক্ষিণ দিকে আছে। এর কারণ কি জানা যায় না। টেমস ত ঐটুকু একটা নদী, সেজ্ঞ ছারপোকাদের কী অনুবিধে হয় বুঝি না। কোলকাতার যে জিনিস প্রত্যেক বাড়ীতে আছে সে হ'ল সমতল ছাদ। লগুনের ছাদ সমতল নয়। তার উপরে বসে যায় না, আড্ডা মারা যায় না।

লগুনে কোলকাতার মত ছাদ করা হয় না, তার কারণ হ'ল নো।

নো যাতে পড়ে পড়ে ছাদের উপর জমে না যায় সেজ্ঞ ছাদ এমন করে তৈরি যে নো কিছু জমে গেলেই পড়ে যায় আপনা-আপনি। আমাদের দেশের করুণাটোয় টিনের চালের মত।

ছারপোকার কথা মনে পড়ে গেল একটি বাঙালীর কথা। লিও ফিল্ড গার্ডেনসে আমাদের পাশের বাড়ীতে থাকতো সে। তার কাজ ছিল নানা বিষয়ে কেল করা। শুনেছি সে ভাল রান্নাও বহুত।

হুইন সে আমাদের স্ট্রাটে এসে বললো, বড় বিপদে পড়েছি, পাউণ্ড
কতক চাল হবে? আমি রাজী যব থেকে এক পাউণ্ড চাল এনে
লাম। দু পাউণ্ড দেবার মত চাল ছিল না।

রাত তখন দশট।

আধ ঘণ্টাধানেক পরে এসে বললো, খানিকটা মাখন পেলে
চাল হত।

মাখন তাকে দিলাম খানিকটা।

আরো একটু পর এসে বললো, গোটা চারেক আলু যদি...

তাও দেওয়া গেল।

সে অনেক ক্রমা প্রার্থনা করল। বিনয়ের অবতারণার মত
অনেকটা কথাবার্তা বললো। আরো বললো পরদিন সকালেই সমস্ত
সে ফেরত দিয়ে বাবে।

কথা বাধেই নে। তার পর থেকে ওর কথা মনে হলেই
ছাপোকাঁর কথা মনে পড়ে। টিপে মারতে ইচ্ছে করে। এই
ব্যাপারটা নিয়ে অনেক ভেবেছি, আলোচনা করেছি। আমার
এক বন্ধু বলেন এর জন্ত দুঃখের কিছু নেই। একজন বাঙালী
ধার নিয়ে শোধ দেননি এটাই স্বাভাবিক—অর্থাৎ বাঙালীর পক্ষে
স্বাভাবিক। আর যদি সে লগুনে ধার তাহলে সে তার বাঙালী
বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছে। অতএব এগুলো সহ্য করতেই হবে।
মশি পালিতেরও এতই অভিজ্ঞতা—তিনি প্রচুর ধার দিয়েছিলেন
বহু বাঙালীকে, কিন্তু তারা খুব কমই শোধ দিয়েছে! আমরা পরে
দেখেছি বাঙালীদের মধ্যে এমন এক একজন কোপে উড়ে এসে
জুড়ে বসেন, মামা দাদা দিদি সম্পর্কে পাতান এবং নানা অবিধে
করে নেন। ওরা ইংরিজি খাত মুখে ভুলতে পারেন না বলে
প্রায় যোজ্জী ভারতীয়দের স্ট্রাটে ঘুরে বেড়ান যদি কিছু খাত
জোটে এই আশায়, ওরা ধার করেন—দেশে ত্রী না খেয়ে আছে
ছেলেরা পকেট কাটা ধরতে বাধ্য হচ্ছে এ সমস্ত কথা বলেন। এ
বিষয়ে এক গুস্তাদের কথা বলছি। এঁর বহু ছদ্মনাম—কখনো
ইনি প্রেড্ড বসাক, কখনো উবা রায়। অনেক বাঙালী সমস্ত
বাঙালীদের সম্পর্ক এড়িয়ে চলে—কিন্তু এই প্রেড্ড বসাক বা
উবা রায় জাতীয় লোক যে এজ্ঞ অনেকেখানি দায়ী সে বিষয়ে
বিশ্বাসের সন্দেশ নেই। এই প্রেড্ড বসাক বা উবা রায়ের এক ছ
পাউণ্ডে চলত না, ইনি দশ পাউণ্ডের কম ধার করতেন না, এবং
তারপর সে মুখ আর দেখা যেত না। রাজ্যের হঠাৎ দেখা হলে পাশ
কাট্টে ছুটে পালিয়ে যেতেন, এই জোচ্চোরটি কোথায় আছে
জানি না। শুনেছিলাম কার কাছ থেকে চল্লিশ পাউণ্ড ধার করে
জাহাজে করে দেশে ফিরে এসেছিলেন। এখন তিনি কি ভাবে
লোকদের কাছ থেকে ধার করছেন জানতে ইচ্ছে হয়।

কিছু কিছু বাঙালী এখনো ভাল আছেন এটাই ভরসার কথা।

কৃষ্ণ মেনন একবার ছাত্রদের সভায় বলেছিলেন, তোমরা
আমাদের দেশের রাষ্ট্রদূতের মত। তোমরা যা করবে তার
ফলেই নির্ভর করবে আমাদের সঙ্গে ইংরেজদের সম্পর্ক।
আমরা বাবা মাইনুে করা রাষ্ট্রদূত তাদের চেয়ে ছাত্রদের দায়িত্ব
অনেক বেশি।

দায়িত্বহীনতা আমাদের প্রচুর। এ গুলোর নানারকম উদাহরণ
দেওয়া যায়।

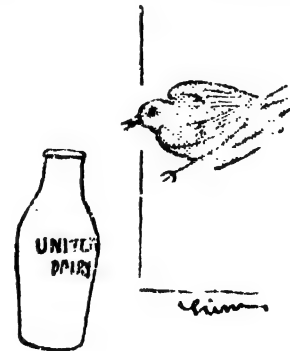
ইংরেজদের একটা গুপের কথা জানি, সেটা হল তাদের ব্যবসায়িক
সততা। তারা কথার দাম দেয়, খারাপ জিনিষ দিলে তা ফিরিয়ে
দেয়। কিন্তু ভারতীয় দোকানে ঠিক তার উলটো দেখতে পাই।
কোন জিনিস খারাপ দোকানদারেরা ইচ্ছে করেই দেয়, অতএব তা
কেন্দ্র দেয় না। আমাদের প্রায় প্রতিটি খাত্রে ভেজাল আমরা
খাচ্ছি। কতি আমাদের যে দেহের হচ্ছে তা নয়, জাত হিসেবে
আমরা ভেঙে গিয়েছি বলেই এর বিরুদ্ধে আমাদের সামাজিক প্রতিরোধ
নেই। তাই একে বলা চলে নিম্নের পায়ে কুড়ুল মারা।

যে ইংরেজ দোকানদার হাসিমুখে খারাপ কোন জিনিষ ফিরিয়ে
দেয়, তখন হয়তো কিছু ক্ষতি হয়, কিন্তু এটা তার পক্ষে একটা
ইনভেস্টমেন্টও বটে। ফ্রোতা সেই দোকানে নিশ্চিন্ত হন জিনিস
কিনতে পারে। অর্থাৎ ইংরেজ সং বলেই যে এটা করে তা নয়।
ইংরেজ জানে, এর ফলে তার লাভই বেশি হবে। কেবল সে নয়, তার
ছেলেও বাতে সে ব্যবসা বজায় রাখতে পারে সেজ্ঞ সে ছেলেরও
সততাই শিক্ষা দেয়। ব্যবসার জন্তই সততার প্রয়োজন।

আমার দু-একজন বন্ধু লগুনে হঠাৎ একটা বিরাট একটা ব্যবসার
সুযোগ ছুটিয়ে ফেলে। কাপেট তৈরি করবার জন্ত বাজে উল কেনা
হয়—বাজে উল কেনা যায় না, সেগুলোও বিক্রি হয়। হিসেব করে
দেখা গেলো দশ বারো হাজার টাকা খরচ করলে ত্রিশ হাজার টাকা
লাভের সম্ভাবনা। কিন্তু দশ বারো হাজার টাকা ছিল না, অতএব
হাজার পাঁচেক টাকা অগ্রিম চাওয়া হল।

যে কম্পানির সঙ্গে ব্যবসা করার কথা তারা বললো, আগে
জিনিস ডেলিভারি দাও পরে দাম দেব। বিল অফ লেজি
দেখিয়েও টাকা পাওয়া হবে না বলে তাঁরা জানালেন, কারণ
ইতিপূর্বে আর একটা ভারতীয় কম্পানি উলের সঙ্গে পাটের
ভেজাল দিয়ে তাদের আদৌ হাজার টাকা ক্ষতিগ্রস্ত করেছে—
অতএব তাঁরা দ্বিধা নিতে রাজি নন।

আমরা লিগুফিল্ড গার্ডনসে বেশ কিছুদিন ছিলাম—অথচ
মিসেস হেইসকে চান করতে দেখিনি। এ ব্যাপারে খুব অস্বাভাবিক
হতাম, বসাই বাজস্য। কিন্তু তিনি নিজেই একদিন বললেন যে
তিনি পাবলিক বাথে নিয়মিত চান করেন। বাড়ীতে স্নানর চানের
ব্যবস্থা থাকে সমস্ত বাইরে গিয়ে চান করেন বেন জিজ্ঞেস করতে
তিনি বললেন তাঁর বয়স বেশি হওয়াতে তিনি পেনশন পাচ্ছেন
গবর্ণমেণ্টের কাছ থেকে। বীরা বৃদ্ধ বয়সের পেনশন পান তাঁরা



হুইনের বোতল ও টিট পাখি

সাধারণ স্নানাগারে কোনো খরচ না দিয়ে চান করতে পারেন এবং সোম থেকে বৃহস্পতিবার এই চার দিন বিনা খরচে যে কোন সিনেমা হলে ঢুকতে পারেন। মিলেস হেইস প্রচুর সিনেমা দেখতেন। কিন্তু তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল সিনেমা দেখা নয়, বাড়ীতে আন্তন ছেলে খরচ না করবার জন্য।

সাধারণ স্নানাগার লগুনে প্রচুর আছে। আমাদের একটি পোল্যাণ্ডের ছেলের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল পিকার্ডিস পাড়ায়— নাম তার বব। বব সমস্ত রাত পিকার্ডিসিতে ঘুরে বেড়াত— তার সামান্য কিছু পয়সা ছিল তাতে হোটেলে থাকা যেত না। অতএব সে দুপুর বেলা হুঁ সাত পেনি খরচ করে চানের টবে গরম জল ঘুমিয়ে নিত ঘটা করে। স্বাস্থ্য তার খুব ভাল ছিল—এবং পিকার্ডিসিতে সমস্ত রাত ঘুরেও তার কোন রকম অসুবিধে হত বলে মনে হয়নি। তা ছাড়া পিকার্ডিসির খুব কাছেই কডেট গার্ডেন—সেখানে সাক সজীর পাইকারী বাজার—রাত্রি বারোটোর পর গ্রাম থেকে আসে লরিতে করে শাক সবজী ফল ফুল ইত্যাদি। সেখানে তার সজীর অভাব হয় না। মাঝে মাঝে এর ওর বোঝা বয়ে দিয়ে তার হুঁ চার শিলিং আয়ও হয়েছে—কিন্তু সে বেআইনী ভাবে। তার বোঝা বওয়ার অবিকার নেই। বোঝা বইতে হ'লে ইউনিয়নের কাছে আবেদন করতে হবে। তারা বিদেশীকে কাজ করতে অনুমতি দেবে না। আর বব নিয়মিত কাজ করতে চাইতও না। অনিয়মই ছিল তার কাম্য। হুঁ একবার ইংরেজ “টেডি বয়”দের সঙ্গে তার ঘুঘোঘুঘিও হ'য়েছে।

ববের সবচেয়ে ভাল লাগে ইংরেজ পুলিশ। রাত দুটোর সময় পুলিশের সঙ্গে ববের দেখা ট্রাফালগার স্কয়ারে। এখানে তি করছ—বাড়ী ধাও! পুলিশ বলে চলে গেছে। আর কিছু বলেনি। পরদিন সেই পুলিশের সঙ্গে একই ভায়গার একই অবস্থার দেখা। কী হে, তোমার বাড়ী কোথায়?

—আমার বাড়ী নেই।

—হুঁ বাড়ী নেই, বটে? আমার সঙ্গে এস।

বিনা আপত্তিতে বব পুলিশের সঙ্গে যায়। থানাতে শোবার বন্দোবস্ত নাকি খুব ভাল।

হুঁ-চারদিন জেলও খেটেছে।

ছেলেটি কি ভাবে পোল্যাণ্ড থেকে লগুনে এসেছিল জানি না। তার কোন পরিচয় সে জানতো না। তার মাথা হরত খুব স্নহ ছিল না। কিন্তু এই রকম ছেলেরা লগুনের দুবৃত্তদের ধরনের গিয়ে পড়ে। লগুনের নানারকম দুবৃত্ত আছে। বিশেষ করে সোহো অঞ্চলে দুবৃত্তদের খ্যাতি আছে। এই সব দলে পৃথিবীর সবাইকে পাওয়া যায়। এরা বন্দুক রিভলভার পছন্দ করে না। বিশেষ করে দাড়ি কামানোর ক্ষুদ্র এদের খুব প্রিয়। এতে কাজও হয় তার পুলিশ এই অস্ত্রকে বে-আইনী বা অস্বাভাবিক মনে করতে পারে না। তবে লগুনের এই আগারওয়ার্ড অধিকাংশ লোকের অস্ত্রের আওতার পড়ে না। ভারতীয় ছাত্ররা সাধারণত সন্ধ্যার পর এ পাড়ায় আসে না, যদিও কাছেই লগুন ইউনিভার্সিটি। আমাদের এক বন্ধু দেবব্রত চন্দ্র সোহোর ভেতর দিয়ে না গিয়ে প্রায়ই আধ মাইল বেশি হাঁটতো। সে বলতো, গোলমাল থেকে দূরে থাকাই ভালো। আমরা বহুবার সোহোর মধ্যে গোলমাল দেখবার আশায় গিয়েছি, কিন্তু কোনদিনই অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়েনি। বোধ হয় একেবারেই পড়েনি বললে ভুল হবে।

একদিন সোহো স্কয়ারের মধ্যে পার্কে সন্ধ্যার কিছুপরে দেখেছিলাম দেবব্রতকে।

দেবব্রত বলেছিল, সব বাজে কথা না যে? কই কেউ তো ক্ষুদ্র নিয়ে ভাড়া করল না?

[আগামীবারে সমাপ্য]

EGYPT MIGHT IS TUMBLED DOWN

(M. E. Coleridge)

(১)

মানব-মনের মাঝে হয়েছে বিলয়
মিশরের শক্তি বত, বত পরিচয়,
ভেমনি পতন হ'ল গ্রীসের ঐশ্বর্য—
রোম আর ভেনিসের গর্ব হ'ল ক্ষয়।

(২)

তবু তথা আজো আছে শিল্পী কবিগণ,
আছে জেগে জীবন মাঝে কতো না স্বপন।
অসার অস্পষ্ট, বেন বার্থ অলীক,
আর আছে জেগে বত মানবের মন।

অম্ভবাদিকা—কুমারী গুরুা মুখোপাধ্যায়

এসো নববর্ষ

মধুচ্ছন্দা দাশগুপ্তা

তুমি শুধু ধারে মোর এসেছো

(তবু) ফুটেছে অজানা ফুল, ঝরেছে কত বকুল

সুখতি ছড়িয়ে গেছে বীথিকার

কোকিলা মুখরা হয়ে, ডেকে গেছে মুহু, মুহু

বন্ধুত্ব পুলকিত। গীতিকার

হে নূতন পুরাতনে টানো অবগুণ্ঠন

নব রূপে এসো মোর গৃহে আজ

বেমন এসেছে কলি মল্লিকা ডার্লো ডালে,

বেমন পরেছে ধরা নব সাজ

(তবু) তুমি শুধু দূর হতে হেসেছো।

মিষ্টি সুরের নাচের তালে মিষ্টি মুখের খেলা
আনন্দ-ছন্দে আজি, —হাসি খুসির মেলা



সুপ্রসিদ্ধ কোলে



বিস্কুটের

প্রস্তুতকারক কর্তৃক

আধুনিকতম যন্ত্রপাতির সাহায্যে প্রস্তুত

কোলে বিস্কুট কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১০

কবি কণপূর-বিরচিত আনন্দ-রন্দাবন

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

অনুবাদক—শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

২৭। দেখতে দেখতে সেই সময়টি এল, যখন স্তম্ভপান বন্ধ হয়ে যায় শিশুদের, এবং হামা টেনে আর তারা চলে না। বালকৃষ্ণ এখন ধীরে ধীরে চলেন, পায়ে পাখার ভর দিয়েও হাঁটতে পারেন, ননী চুপ্তি করেন।

বিনি পরমানন্দ-কন্দ তিনি যে-ক্ষেত্রে প্রকট করছেন তাঁর বালা-লীলার কৌতুক, সে-ক্ষেত্রে কি আনন্দের জন্ম না হয়ে যায় ?

২৮। একদা—

নিজের স্বপ্নানি নির্জন দেখে, চুরি করতে চুকেছেন ছেলে। চুরি করলেন...আগের দিনের ননী-জালানো বি। চুরি করতে গিয়ে, মনিস্তম্ভে বেই না দেখা নিজের প্রতিবিম্ব, অমনি থামা। ভয়ে ভয়ে ছায়াটিকে তখন ছেলে বললেন ভাই, ভাই, বলসনি ভাই মাকে আমার, তোর জন্তুও ভাই ভাগ রেখেছি আমি, খা ভাই। কল কল করে বকে বাছেন চোর, আর আড়াল থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে শুনলেন মা।

২৯। তারপরে বেই ছেলের কাছে রঙ্গ করে এগিয়ে গেলেন মা অমনি ছেলে সপ্রতিভ। নিজের প্রতিবিম্বটিকে দেখিয়ে দিয়ে নাকে বলে উঠলেন—

মা মা, দেখ কে এসেছে। ননী চুরি করতে এই মাত্র ঘরে এসে চুকল। লোভ হয়েছে চোরের। বারণ করছি, কিছুতেই শুনেছে না। রাগ করছি, ও আমার উপর চোখ রাখাচ্ছে। আমার তো আর লোভ নেই ননীর উপর।

৩০। আর একদিন—

কার্য্যান্তরে গেছেন জননী। ইতাবসরে ননী চুরি করছেন ছেলে। হঠাৎ দৈবগতিক মা এসে উপস্থিত। ছেলেকে দেখতে না পেয়ে বেই তিনি ডাক দিয়ে উঠেছেন—

ও রুক, বাপ আমার কোথায় গেলি তুই, কি করছিস রে ? অমনি ভয়ে শুকিয়ে গেল ছেলের মুখ, বন্ধ হয়ে গেল ননী চুরি। জিরিয়ে জিরিয়ে মাকে বললেন—

মা, মা, আমার কাকনের মানিকখানা আগুনের মত জ্বলছিল কি মা...একদম পুড়ে যাচ্ছিল আমার হাত। ননীর ভোঁড়টার তিতর তাই হাত ডুবিয়ে জুড়িয়ে নিচ্ছিলুম বলুন।

৩১। কণরম্য বাক্য শুনে মায়ের চোটে অভিমন্যু করে উঠল বিশ্বয়। বলেন—

আর আর এদিকে আর। তারপরে ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে বললেন—

দেখি তো বাছার আমার কী হয়েছে। দেখি তো একবার হাতখানা। পুড়লো কেমন করে ?

পুজার ফুলের মত হাতখানিকে বাড়িয়ে দিলেন ছেলে। আর মা সেই হাতের উপর মিঠি দিতে দিতে বললেন—

আহা, হা, সত্যিই তো, বাছার আমার হাতখানি আগুন হয়ে গেছে গো! দি এবার, দূর কবে ফেলে দি মানিকখানা। ভারী দুষ্ট এই পদ্মরাগ মণিটা। তারপরেই ছেলেকে বুকে জড়িয়ে মায়ের সে কী খেলা!

৩২। আর একদিন—

ফুলের কলির মত কচি-কচি হাত ঘুরিয়ে ছেলের সে কী চোখ মাজার ঘট! তারপরে হুচোখ ছাপিয়ে টপটপ করে চোখের জল ফেলার সে কী কায়দা। হঁ হঁ হঁ করে সে কী ঠোট ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার লহর! মুখের একটি বাক্যও বোঝে কার সাধ্য!

কী হয়েছে ছেলের ?

না, মা তাঁকে বকেছেন। ননী-চুরি-চুরি খেলা খেলাছিলেন ছেলে, আর মা কি না তাঁকে বকেছেন!

আহা আর কান্দতে হবে না গো, আর আর তোর মুখ মুছিয়ে দি। তোরই তো এই এই সব...বলতে বলতে ননী-চোরাকে গলায় হলিয়ে মায়ের সে কী চোখ জ্বলছে আদর!

৩৩। আর একদিন—

পূর্ণ-জ্যোৎস্না-বিধৌত মণিময় অঙ্গন। ব্রজপুরপুরধীদের সঙ্গে বসে সভা ক্রমকিমে শুভালাভ করছিলেন মা যশোদা, পাশেই খেলা করছিলেন ছেলে। এমন সময় আকাশের চন্দ্রটির উপর নজর পড়ল কৃষ্ণচন্দ্রের। আর যায় কোথায় ?

পিছন দিক থেকে গুটি গুটি এগিয়ে এলেন ছেলে। মাথার বোমটা সরিয়ে তুলতুলে হাত দুখানি দিয়ে মায়ের মাথার বেণী ধরে...এক টান। চুল খুলে দিয়ে মায়ের পিঠে এই মায়ের কিল তো সেইই মায়ের কিল। সঙ্গে সঙ্গে গলা ছেড়ে ছেলের কী কান্না, আর কী আধো-আধো বুলি—

দে মা, আমার দে মা—স্নেহে ভিজে যায় মায়ের ঐশ। অক্লণ হয় দুঃখন। পাশের সবীদের দিকে তিনি মিনতির চোখে চান।

৩৪। বিনয়ের প্রণয়ে গলে গেলেন সবীরা। তাড়াতাড়ি কৃষ্ণচন্দ্রকে ছাড়িয়ে নিলেন তারা। নিজদের কোলের কাছে টেনে নিয়ে ছেলে সামলিয়ে বললেন—

বাহা, তুমি কি চাও ? কীর চাই ?

না।

খুব ভালো দই ?

না, না।

চাচি তবে ?

না, না।

তাইলে ছানা ?

না, না।

তবে তোমার কী ইচ্ছে?

ননীর ঘি দাও, ... ঘন।

ও মা, এই কথা। বেশ আমরা দেব। এবার আর ঠোঁট ফুলিও না। মায়ের উপর এত রাগ ফলাবে না...কেমন?

ঘরের ঘি আমার ভালো লাগে না।

...এই না বলে, অকুলির পাণড়িগুলিকে উর্ধ্বমুখি করে কুঞ্চন্দ্র দেখিয়ে দিলেন জ্যোৎস্নার ভরা আকাশের চন্দ্রটিকে।

৩৫। সখীরা মুখচাঁওয়া-চাঁওয়ি করতে লাগলেন। এক সখী বলে উঠলেন—

“ওরে বাপ আমার! ওটা কেন ননীর ঘি হতে বাবে? ওটা একটা বালিহাঁস; আকাশপথের পদ্ম-সায়র পার হয়ে বাচ্ছে।”

কি...এই বালিহাঁসটা চাই, এনে দাও, আমি খেলব। ও পারে না পাগিয়ে যায়।”

৩৬। এই বলতে বলতে উৎকর্ষায় ছটকটে হয়ে কুঞ্চন্দ্র মাটিতে নাচাতে লাগলেন তাঁর জোড়া-পা। মায়ের সখীদের ‘গলা জড়িয়ে জড়িয়ে কেবল চাঁগতে লাগলেন—

“দাঁও, দাঁও...”

ছেলের কান্না আর খাঘে না। আগের চেয়ে অনেক বেশী কান্না। বাঙ্গল্যের আবেশভরা কান্না। আর এক সখী তখন বললেন—

“এই এঁরা জোয়ার ঠকিয়েছেন। ওটা রাজহাঁস নয়। ওটি আকাশের মাঝখানে অমৃতের রশ্মিভরা টাঁদ।”

তাহলে এটিই আমার দাঁও। আমার খুব ইচ্ছে করছে। আমার সঙ্গে ও খেলা করবে। নিয়ে এস এন্টুপি, দাঁও দাঁও।

৩৭। বলতে বলতে আরও মাত্রা ছাড়িয়ে উঠল কুঞ্চন্দ্রের কান্না। ছেলেকে কোলে তুলে নিলেন মা বশোদা। বললেন—

ওটি ননীর ঘি-ই বটে। রাজহাঁস নয়, অমৃত-রশ্মিও নয়। কিন্তু ওটিতো দুলাল তোমাকে দেওয়া চলবে না। এই দেখ, দৈবযোগে ওর গায়ে গরল লেগে গেছে। তাই ওটি খেতে খুব ভালো হলেও, এখানে কেউ ওটি খায় না।

৩৮। বিশ্বর ফুটে উঠল কুঞ্চন্দ্রের উত্তরে—মা মা গরল লাগল কেন ওতে?

কেন মা?

মায়ের মনে হল, বাক আগের আবেশ কেটে গেছে ছেলের; তাঁর কথায় শ্রদ্ধা হয়েছে কুঞ্চের গল্প শোনবার আগ্রহে। এক রস থেকে আর এক রসে তাহলে ঢলে পড়েছেন তাঁর ছেলে। তাই, ছেলেকে বুকে জড়িয়ে জননী তখন মিষ্টি হাসে মিষ্টি ভাবে বললেন—

৩৯। বলি তবে শোন,—একটি সাগর আছে। তার নাম কীর।

কু। মা, কী রকমের দেখতে সেটা?

মা। দুধ দেখেছিল তো? সেই দুধ ভর্তি সেই সাগর।

কু। আচ্ছা মা, কত গরু দোরা হল যে এই সাগর জমাল?

মা। ওরে সোনা, গরুর দুধ নয়।

কু। আমাকে ঠপাঙ্কিস মা, গাই না হলে বুঝি দুধ হয়?

মা। যিনি গরুর মধ্যে দুধের স্রষ্টা করেছেন, তিনি যিনি-গরুও দুধ তৈরি করতে পারেন।

কু। তিনি কে?

মা। তিনি ভগবান, জগৎ-কারণ।

কু। সে আবার কে?

মা। ওরে ছেলে, তিনি ভগবান। তাঁর নাম ‘জ...গ’ তিনি চলতে পারেন না। ‘ভগবান’ের গ নেই, তাহলে ‘ভবান’; ...ওরে তুই যে আমার সেই।

কু। হুম বাবা, এবার মা তুই সত্যি কথা বলেছিস। ও মা, গরল বল।

মা। পুরাকালে পুর আর অপুরদের মধ্যে ঝগড়া হয়। অপুরদের মোহিত করতে হবে, তাই এক দিন ভগবান মদ্রন করলেন দুধ-সাগর। এক প্রকাশ পাহাড়, মন্দর পাহাড় তাঁর নাম, তিনি হলেন মদ্রন-দণ্ড। রজ্জু হলেন সর্পরাজ বাসুকি। এক দিক থেকে অপুরেরা, অজ্ঞ দিক থেকে পুরেরা টানতে লাগলেন সাপের দড়ি।

কু। মা, যেমন করে গোপীরা দই ময়?

মা। ই। গোপাল, ঠিক সেই রকম। আর মইতে মইতে সেই দুধ সাগর থেকে উঠল গরল, ...কালকূট তার নাম।

কু। মা, দুধে কি করে গরল হবে? সে ভো সাপেদেরি হয়।

মা। বাছা, সেই গরল কালকূটিকে যখন মহেশ্বর পান করে ফেলছেন, তখন তার বা ছিটে-কোঁটা পড়ল, সেই কোঁটাগুলোকেই খেয়ে ফেলেছিল সাপেরা। তাতেই সাপেদের বিষ হল। তাই বলছিলুম, দুধেও যে গরল থাকে সেটা ভগবানেরই শক্তি।

কু। হু, মা ঠিক ঠিক।

মা। আকাশে এই যে ননীর ঘিরের কোঁটাটাকে দেখছিল উনিও উঠেছিলেন সেই সাগর থেকে। তাই ওর গায়ে লেগে গেল গরলের বাবুটুকু। এই দেখ, এই যে কালোদাগ...সকলেই ওর নাম রেখেছে ‘কলঙ্ক’। ...তখন ঘরের ঘি-ই খাও বাছা, ওটি নয়।

গরল শুনতে শুনতে কুঞ্চের চোখে ঘুম নেমে এল। লীলানিত্যার পুত্রের তত্ত্বখানি অবশ হয়ে পড়েছে দেখে জননী বশোদাদেবী তাঁকে তুলে নিয়ে শুইয়ে দিলেন বহুমূল্য বিছানায়। কপূরের ধুলির মত ধবল সেই শরনতল। শুইয়ে দিয়ে আঙুলে আঙুলে মা বশোদা ঘুম পাড়িয়ে দিলেন কুঞ্চকে।

৪০। পরের দিন সকালে পূর্বদেব ওঠেননি তখন আকাশে, দধি-নবনীত-ইত্যাদি হাতে নিয়ে ছেলের ঘুম ভাঙাতে এলেন জননী। কুঞ্চের গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন—“জাগো রে, দুলাল আমার জাগো। মবে বাই, মবে বাই, কাল বাছার আমার খাওয়া হয়নি, এবার ওচো।”

ছেলেকে ঘুম থেকে তুলে গন্ধসলিল দিয়ে মুখকমলখানি ধুইয়ে দিলেন মা। তার পরে ছেলেকে কোলে বসিয়ে দেখিয়ে দিলেন সোনার পাত্রে সাজানো নবনীতাদি খাতসামগ্রী। বললেন—“ঘেঁটা মুখে বোচো, খাও।”

বললেন বটে জননী কিন্তু পুত্রের অভ্যাস বাবে কোথায়? স্তম্ভপান ত্যাগ করা সত্ত্বেও তিনি বাগিয়ে পড়ে পান করতে আরম্ভ করে দিলেন মায়ের স্তন।

৪১। কিছুক্ষণ দুধ খাইয়ে মা বললেন—“তুই তো ননী খেতে ভালবাসিস। ননীটুকু এখন খেয়ে ফেল।”

কু। না মা, ও-সব আমি খাব না। কাল রাতিয়ে আমি

ভোকে মধ্যে কথা বলে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। আমার ক্ষিমে ছিল না।

মা। তুই যদি ঘুমিয়ে পড়িস, তাহলে কে আমার ঘরে ঢুকে চুরি করবে ননী?

ক। মা মা, কবে আবার আমি তোমার ননী চুরি করলুম? মা, তুই মধ্যে কথা বলছিস। মিষ্টি মিষ্টি চোটে মিষ্টি মিষ্টি কথা। মায়ের মন গলাতে, মন রাঙাতে মন ভোলাতে আর কতক্ষণ?—এই রকমের বালালীলা চলে লীলা-বালকের—অনন্ত খেলা, আর সে খেলা কত পরিপাটি।

৪২। একদিন,—বালকৃষ্ণ দাশিয়ে বেড়াচ্ছেন গোশালার চাতালে। হঠাৎ এমন সময় লোক দিয়ে দৌড়ল এক বাছুর। দেখাও যেই অমনি দৌড়ে গিয়ে বাছুরটাকে জাপটে ধরে এক ষটকায় মাটিতে ফেলে দিলেন ছেলে। তার পরে নিজের হুইটুর মধ্যে বাছুরটাকে না চেপে ধরে, দু হাত দিয়ে তার গলা না জড়িয়ে নিজের মুখের পদ্মফুল দিয়ে সে কী সুন্দর করে বাছুরের মুখ বোলানোর ঘটা, সে কী হাসি দেওয়ার ঘটা বাছুরকে!

দেখেন, আর মায়ের প্রাণ আনটান করে ভয়ে আর কৌতুকে।

নিজস্ব গরুর গোয়ালে ঘুরতে ঘুরতে একদিন শ্রীকৃষ্ণ যেই মলে দিয়েছেন একটা কচি বাছুরের ল্যাজ, অমনি বাছুর দৌড়। নিজেও যেই তড়াঙ্ক করে লাফিয়ে উঠেছেন, অমনি ছেলের খসে পড়ে যায় কটিতটের খটি। আর পরাও যেই, অমনি যেন একটা হুইটুই চুরি হয়ে গেল দেখুতীদের মন। নয় কৃষ্ণের মধ্যে তাঁরা চকিতে অসুভব করলেন অনাবৃত এক মূর্ত্ত ব্রহ্মকে।

তার পরে আঙিনার পাঁক তুলে তুলে নিজের গায়ে মাখার সে কী উৎসব। মৃগমদে যেন সলিলপ্ত হয়ে গেল নীল গা। দেখুতীদের আর পাঁতা পড়ে না চোখের। তাঁরা নয়ন ভরে দেখতে থাকেন ছনয়নের অভিরামকে, সুন্দরকে। সুন্দরে কি অসুন্দর কখনও থাকে?

কোনো কোনো দিন বাইরে বেড়াতে বোরাবেন ছেলে। ছেলেকে সাঁজাতে বসেন মা। নিখুঁত করে ছেলের মাথায় বেঁধে দেন ছোট্ট একটা উকীষ। বেছে এনে কোমরে পরিষে দেন গীতবাস। গোরোচনা দিয়ে কপালে আঁকেন তমালপাতার তিলক। কাজল পরাচ্ছেন চোখে, ছেলের আর তর সয় না। “দাঁড়া বলছি, ঐ ডাখো, কুলোকেব দৃষ্টি আবার না পড়ে”—বলতে বলতে গায়ের মায়ের মত নন্দরাণী নিজের বুকের কাছে টেনে নেন তাঁর ত্রৈলোক্যমোহন ছেলেকে আর মুখামৃত দিয়ে পূজা করেন ছেলের মস্তক। পুত্রের কণ্ঠে দুগিলে দেন অতি চমৎকার একটি বাখনথ, সোনা দিয়ে বাঁধানো, শ্রোণীতে পরিষে দেন মহাহর্মণ্য এক লহর কিল্লিনীমালা। এইবার তাহলে ধড়াচুড়ো পরে পুত্রের বাইরে খেলতে বেরোতে পারেন বালকৃষ্ণ—আত্মবিরোধের পদ্ম-আঁখির আঙিনার আঙিনায়।

৪৩। তার পর একদিন—ব্রজপুত্রের শ্রেষ্ঠ রমণীরা একত্রে উপস্থিত হয়ে গেলেন মহামহিমাময়ী ব্রজরানীর সমীপে। তাঁরা সকলেই জানতেন, যে-ছেলের উদয়ে অধিষ্ঠান করেন জয়, যিনি সর্বদাই সদয়, সে-ছেলের গুণে খেলায় পৃথিবীর মানুষ বেমজবে, সে-খেলার যে সর্বত্র বিজয় হবে এতে আর আশ্চর্য্য কি? এই জ্ঞান থাকার দক্ষণ তাঁদের মনে হুঃখের উদয় না হলেও

কতই না যেন তাঁরা ব্যথা পেয়েছেন, এই ভাব দেখিয়ে তাঁরা এলেন কৃষ্ণের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে মায়ের কাছে।

৪৪। এলেন তাঁরা সকলে। গুণে কৌতুক, অধরে ভালবাসা, সারা মুখে হাসি। বললেন—

—“রাণী মা এ ছেলে আপনার—ভবিষ্যতে ভারী দুঃখ হয়ে উঠবেন। এখন তো সব দুটি পাতা গজিয়েছে, তাতেই এই; ভুবন কাঁপিয়ে ফেলেছেন। বাড়লে পরে আরও লীলা বাড়বে। তখনই পাড়াকে পাড়া লোপ করবার চেষ্টায় আছেন, না জানি এর পরে আরও কি করে বসবেন?”

—“গো-দোহনের আগেই ইনি বাছুরের দড়ি খুলে দেন। বাছুরগুলো দুধ খেয়ে নেয় সব। যদি কেহ তখন ওর সামনে গিয়ে রাগ দেখান, তাহলে শুকুণি উনি এমন একটি মিষ্টি হাসি হাসেন, যে লোপ পেয়ে যায় রোষ।”

—গহন অন্ধকারে রাণীমা, আমরা অতি বড়ে লুকিয়ে রেখে দি ননী যি ইত্যাদি সমস্ত। কিন্তু আপনার ঐ ছেলের কি করেন জানেন? ঘরে ঢুকে নিজের রূপের আশোর ঘরের আঁধার দূর করে দিয়ে ঘরের কোথায় কি আছে সমস্তই বের বছে ফেলেন।”(৩৮)

—“কী হড়াছড়ি মা, কী আলসেমি আপনার ছেলের। থাকেন তো নিজে এই এতটুকু, আর গাছের বীদরগুলোকে ডেকে এনে খাওয়াবেন এই এতখানা। তৃপ্তিমস্ত বীদরগুলোও যদি আবার না খান তাহলে বেগে ভাঁড় ভেঙে সব মাটিতে ছড়িয়ে দেন আপনার কুমার।”

—“তাহার বেখানে হাত পৌঁছয় না, সেখানে পিঁড়ের উপর পিঁড়ে চাপিয়ে সিঁড়ি বানান। তার পর তার উপর দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে সিকে থেকে চুরি করেন দুই, ননী, মাখন, ছানা। যদি কেহ মানা করলেন তো রক্ষে নেই, এক পলকে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দেন সমস্ত।”

...“আর মা রজ করে যদি একবার তাঁর হাত ধরেছে কেউ অমনি হাত মটকিয়ে পিটান। তারপরে দূরে দাঁড়িয়ে দুঃখ গর্জন। আবার বলেন কি না...দাঁড়াও দেখাচ্ছি, ঘর পুড়িয়ে তোমার ছেলেরে আমি তাড়িয়ে দেছি।”

...“কেউ যদি বা বলে ফেলেছেন, ‘ইনি চোর মহাশয়’ তাহলে সে কী রাগ, মা, আপনার এই হুইটুর। বেগেই খুন। একেবারে গুট হয়ে ওঠেন। বলেন...তুমিই চোর। এ বাড়ী তো আমার বাড়ী, এ বাড়ীর সমস্তই তো আমার।

—“কেউ যদি না নিজের বাস্তবিক মোলায়েম করে মাটির প্রলেপ দিয়েছেন, বা ছবিটির মত করে কলি ফিরিয়েছেন তা হলে দেখুন গিয়ে, ঐ আপনার ছেলের সেখানে গিয়ে ধুলা হড়াচ্ছেন বালি হড়াচ্ছেন, নোংরা পাতা হড়াচ্ছেন।—রাণীমা, ঘরের শুদ্ধি আর হইল ডা। আপনার সামনে আমাদের এই কেউ ঠাকুরটি স্থলীল বালকটি হয়ে থাকেন। আর আমাদের বাড়ীতে যেই উপস্থিত হন অমনি উনি হয়ে ওঠেন সাক্ষাৎ চোর, ধাষ্ট্যমির অজ্ঞ থাকে না, একমুখ ধরধরে কথা, মহারাণী, মহা-লুভী।

৪৫। ব্রজরমণীগণ একত্রে এই খেঁচ নিতান্ত নিষ্ঠুরতা ও মিথ্যা-বোঝ দেখিয়ে ঐ হেন বাক্যবাণ বর্ষণ করছেন, শুতকণ্ঠে বালকৃষ্ণের নয়নে ছলছল করে উঠেছে মিথ্যা-অজ্ঞ। যিনি ঐ

নবোৎসবে মাতিয়ে রাখেন জগৎকে, তিনিও তখন এই কুট আলাপের বৈয়থ্য দেখাবার অভিনাবে মুখখানি তাঁর তুললেন। যদিও নীতির দিক দিয়ে তিনি অপরাধী, তবুও যেন কোনও অপরাধই তিনি করেননি, এমনি একটি ভাব দেখিয়ে, সবকিছু ধামাচাপা দেবার উদ্দেশ্যে মধুর মধুর স্বরে বললেন—“মা, মা, এঁদের মধ্যে একজনও আমায় ভালবাসেন না। এঁদের স্নেহ নেই। একটুও না। এঁদের কথার একটুকুও সত্যি নেই। এঁরা একদম মিথ্যুক। এঁদের সমস্তই মিথ্যে। এঁরা মামুষ নন। ওঁদের ছেলেরা অনেক নতুন নতুন খেলা জানে, তাই তাদের সঙ্গে আমার এত ভাব। তারা এক নিমিষে মার আপন হয়ে যায়। তাদের সঙ্গে দেখা করতে আমি রাত পোহালেই তাদের বাড়ী বাই। এঁরা আমার বেতে দেখেছেন কিনা, তাই জোর করে এখানে মিথ্যে কথা বলতে এসেছেন। বিশ্বাস করিসনে মা ওঁদের কথার। এই আমি বলে রাখছি মা, বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে আর যাব না আমি কোনো দিন তাদের বাড়ীতে। বলতে বলতে ছেলের মুখ কঁাদ কঁাদ হয়ে উঠল ভরে। না জানি আবার কি করে বসবেন? কিন্তু ব্রজেশ্বরী দীলা-বালকটিকে কোলের কাছে টেনে নিলেন, আর নিজের মুখ-চোখের ভাব গোপন করে হাসতে হাসতে ব্রজ-বনিতাদের বললেন—

৪৬। “আহা, আপনাবাই তো দেখছি মিথ্যাবাদী, আর আমার গোপালই তো দেখছি সত্যবাদী। এ বেচারী তো কোনও অপরাধই করেন নি।”

আর একে কিন্তু আপনাবা বকবেন না যেন।

হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলেন সকলে, চলল, প্রীতি-কথা। শ্রীমোহিনীদেবীও এসে পড়লেন। তারপরে তিনি যখন বান্ধবীদের কপালে পরিয়ে দিলেন তিলক, তখন সম্মানিত সেবা পেয়ে সানন্দে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন ব্রজবনিতারা।

৪৭। তাঁরাও গেলেন, আর জন-নীতি-পণ্ডিতা শ্রীকৃষ্ণজননীও শিক্ষা দিতে বসলেন অনরকে। কোলে বসিয়ে বললেন—“ওরে ছেলে, তুই বড় লুভী। হুটুপানা করতে হয় নিজের ঘরে কবিস। ওসব নিজের ঘরেই শোভা পায়। দেখারও ভালো। পরের ঘরে গিয়ে অত সব হুটু-হুটু খেলা—ওরে নীলমণি, সে কি তোকে মানায়? তুই আমার কত সন্দেহ ছেলে, বাইরে গিয়ে এমন খেলা আর খেলিসনে যেন। খেলতে হয় নিজের আঙিনার খেলবি।”

৪৮। এমন সময়ে ব্রজরাজ এসে পড়লেন সেখানে। এসেই

দেখেন তাঁর আত্মজটির, তাঁর আত্মীয়বন্ধনদের স্তম্ভনটির কেমন বেন আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে প্রোতাপ। কই, শরীর তো কিছু ধারণ দেখাচ্ছে না। তাই বাণীতে অতি মাধুর্যের রস মিশিয়ে কৃষ্ণক ডাক দিয়ে বললেন—আর, এদিকে আর, আমার কোলে আর।

মাতৃজ্ঞ থেকে জনকের বৃকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন কৃষ্ণ। বাপের কঠ জড়িয়ে মুখ টিপে টিপে বললেন—মা আমার কেন...মিথ্য মিথ্যে...বন্ধু?

৪৯। এই না শুনে ঘোরাধীপ জিজ্ঞাসা করলেন—হয়েছেটা কি? তখন সেই আশ্চর্য্য ছেলে—বুদ্ধিতে যিনি গুণনিধি মায়ের দিকে চোখ বাঁকিয়ে চাইলেন। বললেন—

মা, তুই মা বল না কী হয়েছে ঝটপট। ব্রজরাজী তখন কথকথার মত করে, ফলিয়ে বলে গেলেন ঘোষ-বউদের মুখবারার মত সমস্ত কথা।

৫০। মনের ভাব গোপন করে ব্রজরাজ তখন অল্পবোপের স্বরে মহিবীকে বললেন—শোমারই অপরাধ হয়েছে সব চেয়ে বেশী। আমার ছেলে, তাকে হতেই হবে নিষ্পাপ, বুদ্ধিমান, বিনয়ী। সব সময়েই দেখেছি, গোপবধুরা কৃষ্ণের নিন্দা করেন। মিথ্যে নিন্দা। নিশ্চয় রটিয়ে রঙ্গ করেন। ওঁদের স্বভাব ঐ। পরের মণি দেখলে মাৎসর্ঘ্যে গুঁরা ভরে ওঠেন। তাঁদের কথার তুমি বিশ্বাস কর? আশ্চর্য্য। বলেই ছেলের দিকে চেয়ে বললেন—আমার কোলেই থাক, আর কারো কোলে বাসনি। বলাও শেষ হয়নি, আর পিতৃ-জ্ঞ থেকে মাতৃ-জ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন কৃষ্ণ। মায়ের কোলে চড়বার জন্তে ছেলের সে কী আঁকপাঁক তারপর মায়ের কোলে গুছিয়ে বসার সে কী কারুণ্য! রাজদম্পতী তো হেসেই সারা।

৫১। দ্বিজদমনের জননীর সঙ্গে কিছুকণ সতর্ক হাতালাপ করে ব্রজরাজ উঠতে বাবেন, এমন সময় একটা কথা হঠাৎ তাঁর মনে জাগল। তিনি ঝাঁড়িয়ে গেলেন। মহিবীর কাছে প্রস্তান করলেন—“দেখ রাণী, কৃষ্ণ একলাই বেয়ে। প্রবল বলবানও সঙ্গে থাকে না। দুজনেরই একা-একা ঘোরাফেরা করাটা ভাল নয়। তাই ভাবছিলাম আমাদের এখন নিযুক্ত করা প্রয়োজন হয়ে উঠেছে কতকগুলি পরিচালক। খেলার সহচর হওয়া চাই, সেনাচতুরও হওয়া বাই। সব সময়েই তারা সঙ্গে সঙ্গে ভিরবে দুজনের। কি বল?”

বিচার শেষ হয়ে গেলে ব্রজরাজ সেই দিনই কৃষ্ণ-বলরামের সেবার নিযুক্ত করে দিলেন কয়েকটি বী-সচিব এবং গুটিকয়েক বালক-বল।

[ক্রমশঃ।

... এ মনের প্রচুদপট ...

এ মনের প্রচুদপটে প্রাকৃতিক শোভা সমন্বিত অলকানন্দার
একখানি আলোকচিত্র মুদ্রিত করা হ'ল। আলোকচিত্রটি
গ্রহণ করেছেন শ্রীবিভাস মিত্র।

বিপ্লবের সঙ্কাতে

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ডালাগা হাউসটা ছিল গোয়েন্দা অফিস এবং প্রেসিডেন্সি জেলের মাঝের হলটিং ষ্টেশনের মতন। প্রথমে প্রেশুর করা হত তখনকার,—বোধ হয়,—Section 52 Cr. P. C. অনুসারে। তাতে ১৫ দিন রাখার পর প্রেসিডেন্সি জেলে ডিফেন্ডে আট বা রেগুলেশন খিঁতে আটক রাখা হত সাধারণত এক মাস—কুখ্যাত ৪৪ ডিগ্রি বা 44 cell-এ। তার পর ডিফেন্ডে আট ওয়ালাদের সাধারণত বাইরে গ্রামে অন্তরীণ করা হত। রেগুলেশন খিঁ ওয়ালাদের তার পরেও জেলেই আটক রাখা হ'ত,—এবং তখনকার দিনে আসামী ও পুলিশ, সকলেই মনে করতো, তাদের সারা জীবন আটক রাখা হবে।

৫২ ধারার প্রথম ১৫ দিন কীড স্ট্রীট ও ডালাগা হাউসে কাটতো—কীড স্ট্রীট প্রথম সন্তাষণ-আপায়ন,—আর ডালাগায় বিশ্রাম। যারা পুরো স্বীকারোক্তি করতো,—যারা আশা স্বীকারোক্তি করতো,—এবং যারা স্বীকারোক্তি না করেই অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'ত,—সব রকম লোকই ডালাগায় আসতো।

স্বীকারোক্তি করার ঢং করে কিছু বলা এবং কিছু চেপে যাওয়া, এই হল আশা স্বীকারোক্তি। এই চালাকি করতে গিয়ে বেসামাল হয়েও অনেকে পুরো স্বীকারোক্তি করতে বাধ্য হ'ত। গোয়েন্দা অফিসাররা প্রায় প্রত্যাহই ডালাগা হাউসে আসতো কারো না কারো সঙ্গে দেখা করার জন্তে। শুনেছিলুম, হুঁচরটে সেলের দরজা দিনের বেলা খোলা রাখা হ'ত, বন্দী বখন খুসী বাইরে বেরুতে পারতো।

ঠাকুরের স্বীকারোক্তির পর অনেক লোক ধরা পড়েছে, তার মধ্যে অনেকে স্বীকারোক্তি করার আরো অনেক লোক ধরা পড়েছে,—আবার তাদের অনেকে স্বীকারোক্তি করছে, এই রকম একটা হুড়োহুড়ি তখন চলছিল এবং গোয়েন্দা-অফিসে হুড়হুড় করে মাল আমদানী হচ্ছে, আসামাই হুড়হুড় করে ঠানানো চলছে, বাসি মাল ডালাগায় পাচার করে টাটকা মালের জায়গা করা চলছে, একটা হৈ-হৈ বৈ-বৈ ব্যাপার চলছে।

খিস্তির কথা লিখেছি, পড়ে এক বন্ধু বললেন, বিপ্লবীদের নাকি জাত মেরে দিয়েছি। তাঁকে আশস্ত করে বললুম, জাতমারার এখনো অনেক বাকি, এখনও জাত আধমারিও করতে পারিনি। আমি গম্বীব হুঝিয়া বলেই যে আমায়ই ওপর খিস্তি চলছে, তা নয়, সে সময় যারা ধরা পড়েছে, তাদের সকলেই এঁ হাল।

ফেরারীদের ওপর আক্রোশ সব চেয়ে বেশী। ভবিষ্যন্ত ভয়, টচার—বাজে কথা।

বিপ্লবজনক ফেরারী ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত বিভলভার সহ বাস্তায় ধরা পড়েছিলেন, ডজন দেড়েক পুলিশের সঙ্গে মরিয়া হয়ে ধনভাষা কবে অধম হয়েছিলেন, অজ্ঞান হয়েছিলেন,—পাছে স্বীকারোক্তি করতে হয় বলে' লালবাজার লক-আপে গলার কঁাসি লাগিয়েছিলেন আত্মহত্যা করার জন্তে—কঁাসি কেটে নামিয়ে তাঁকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল। তিনি পরবর্তী কালে তাঁর শ্রুতিকথার (বিপ্লবের পদচিহ্ন) লিখেছেন :

“হিন্দুস্থানী একটি পিছনে এসে দাঁড়িয়ে আমার হুল ধরে টানতে শুরু করলো—জানি তো মারবে,—চুষ করে রইলাম।

“সাহস পেয়ে চারিদিক থেকে গাল পাড়তে শুরু করলো। মার হরত সহ হত—গাল সহ হয় না।”

তারপর তিনি চীৎকার করে ধমক দিলেন,—তাঁর কেস কোর্টে বাবে বলে তাঁকে আর মারতে বাধণ করা হল, মার বন্ধ হল।

অন্তত্ব তিনি লিখেছেন,—“নিজেকে বাঁচাবার জন্ত অপরের সর্বনাশ করা—বিপ্লবীর ধনভ্যাগ,—বিপ্লবীর জাতিপাত।—অথচ কাল নামে না রটেছে? জীবন চ্যাটার্জির নামে পর্ষদ—যে জীবনকে আমি নিজের চেয়েও বেশী বিধাশ করি। অমূল্যমানের অমৃত সরকার—পরে শুনেছি, এঁদের নামে বা কিছু রটেছে, সবই মিথ্যা। আত্মসম্মান অনাহত রেখেই এঁরা উৎরেছেন।

(অন্তত্ব)—“শুনেছিলাম ডালাগা হাউসের কথা। এক বন্ধুকে শীতের রাতে জেলে চুবিয়ে রেখেছিল স্বীকারোক্তি করার জন্তে।—অমর ঘোষ (অতুলনার ভাই—না, ব) অন্নদা মজুমদার (অমৃতবাজার পত্রিকার অ্যাসিষ্ট্যান্ট এডিটর—না, ব) অন্নপুণ্ড, জীবন চ্যাটার্জি—আরো কত বন্ধুকে কীড স্ট্রীট পুলিশ অফিসে অমাত্রবিক মার মেরেছে,—দিনের পর দিন না খেতে দিয়ে সর্বদগ দাঁড় করিয়ে রেখেছে,—তার উপর হাত পা বেঁধে রাতের পর রাত ক্লস দিয়ে গিটিয়েছে। জীবন ১০৪ ডিগ্রী অব নিম্নে ধরা পড়েছেন, সেই অবস্থায় তাঁকে নিয়ে তিন চার জনে মদ খেতে এসে শেষ রাত অবধি ঘরের এদিক-ওদিকে ওদিকে ঠেলে ঠেলে ফেলে টেনিস খেলেছে। আরো বা করেছে, ভুললোকের মুখের ভাবায় তা বেরায় না।”

এই যে চারজনদের নাম এক সঙ্গে লেখা, এইখানে, অনেক

নিখুঁত
কেশতৈলের
সন্ধান
পেয়েছেন কি ?

আপনি যদি এমন কোন কেশতৈলের সন্ধান খেঁচে থাকেন—যা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ হবে, যাতে কোন কৃত্রিম রং থাকবে না আর মাথায় বা পাত্তাবিক তৈলের যোগান দেবে, তাহলে নিশ্চিতই আপনি খুঁজে নেবেন



কিও-কার্পিন

॥ সক্রিয় ভেদক কেশতৈল ॥

চুলে নতুন জীবন দেয় ॥

স্টো'জ মে ডি কে ল ষ্টো স' প্রাইভেট লিঃ

কলিকাতা • বোম্বাই • দিল্লী • মাদ্রাস

দাদার মুখে শুনেছি, ভূপেন বাবু তাঁর এক বন্ধুর স্বীকারোক্তি ঢাকা দিয়েছেন। অতিরিক্ত অত্যাচারের জগ্রে এরকম সহায়ত্ব অসম্ভব নয়।

স্বীকারোক্তির সম্পর্কে ভূপেন বাবু লিখেছেন, “একদিন হুপুরের পরে ডাক পড়লো জেলের ফটকে। দেখি দশ-বারোজন বন্ধুকে জেলের বিভিন্ন স্থান থেকে ও অকত্র থেকে নিয়ে এসেছে সনাক্ত করার জগ্রে। তার মধ্যে আছেন অধ্যাপক শরৎ ঘোষ (বাহুদার বন্ধু—টালার যিনি ছোট লাঠি খেলা শেখাতে আসতেন—না-ব-), অধ্যাপক বিপিন দে, সাংবাদিক সুরেন সিং এবং আরো জয়েকজন। চোখ-মুখের অবস্থা প্রায় কারো সুবিধার নয়।...আমরা বখন সবাই একত্র জড়ো হয়েছি, এক জনকে ধরলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, “সব স্বীকার করেছ কেন?”—“কি করব? দেখুন, অযুক্ত বাবু সব বলে দিয়েছেন।”

“এই অযুক্ত বাবু সেখানে হাজির ছিলেন।...বন্ধুরা সবাই নীরব—আমিই একা কথা বলছি। কাজেই হিলের নজর পড়েছে আমার দিকে।...তখন এক হাতে আমার ধরলো, এক হাতে বন্ধুটিকে ধরলো, নিয়ে গোষ্ঠির কাছে হাজির করলো।”

অবস্থাটা নেহাৎ ভবিষ্যুক্ত নয়। সব কথা বলে দিয়ে অনেক লোকের গ্রেপ্তারের কারণ হওয়ার পরও রাজবন্দী হয়েছেন অনেকেই। এমন এক জন রাজবন্দী ছিলেন অম্বীশ্বরের যোগেশ চ্যাটার্জি, যিনি ‘৫৮ সালে দিল্লীতে অশোক সেনের পতাকাভঙ্গে ৩০০ ভূতপূর্ব বিদ্রোহী প্রদর্শনী করেছিলেন, কাকোরা বড়বজ্র মালার সার্টিফিকেট ও অ্যাডভার্টাইজমেন্টের সাহায্যে।

বসন্ত চ্যাটার্জির খুনের সঙ্গে বীরা জড়িত ছিল, তিনি তাঁদের সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং ধরা পড়ে সব স্বীকার করে’ বেগুলেশ্বর খিঁটে জেলে’ আটক রাজবন্দী হয়েছিলেন। জেলে তাঁর দলের অগ্র রাজবন্দীরা তাঁকে একঘরে’ করেছিলেন, তিনি মনমরা ভাবে একা একা বেড়াতেন। ভূপেন বাবুই তাঁর অবস্থা দেখে তাঁর সঙ্গে মিশে তাঁকে rehabilitate করেছিলেন।

বাই হোক, ডালগু হাউসে আমাদের যে খোপে পুরলো, তার কাছেই এক খোপে ছিল করালী। পারখানার নাম করে সকলে বেরোতে আরম্ভ করেছে দেখে আমিও বেরোলুম এবং করালীর পাশে পাশে চললুম—শেছনে পাহারাও চললো। বেশ একটু দূরে একটা টিনের চালার একসঙ্গে অনেকগুলো পারখানা—হুঁসারি ছোট ছোট খোপ। হুঁজনে পাশাপাশি ছুই খোপে ঢুকলুম। এমন আরো অনেক জোড়া পাশাপাশি খোপে ঢুকলো—চাপা গলার গুজরণ শুরু হল।

হুঁ মিনিট না যেতেই পাহারা হাঁক দিলে, জলদি করে। ভাড়াভাড়ি ছুই চারটে কথা বলে এবং জেলে নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। সে গোড়াতেই মার এড়িয়েছে—বন্ধু-পিতৃলের কথা চেপে গিয়ে আর কতকগুলো কথা বলেছে—তার মধ্যে পাড়ার কথা খুব কম। সে তখন সবমাত্র বি-এ পাশ করেছে—কলেজ, হাউজ ও হিন্দু হোষ্টেল, সতীশ চক্রবর্তী, এবং হাক্কদের বাড়ীর ফেরারীদের কথাই প্রধান। একজনের কথা বললো, সে বা-কিছু জানতো সবই বলে দিয়েছে। করালীকে কীড শ্রীটে থাকতে হয়নি।

সন্ধ্যার সময় সেলের গরাদের কীক দিয়ে বাজের খান্না দিয়ে

গেল,—কি, তা মনে নেই। অনেক রাত পর্যন্ত আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতে মাথাটা গরম হয়ে গেছে, ঘুম আসছে না; এমনি ছটকট করে শেষে ঘুমিয়ে পড়লুম। আবার কীচা ঘুম ভেঙ্গে ভোরে উঠে পারখানা বাওয়ার পালা। এমনি করে দেখা হল প্রায় সকলের সঙ্গে,—কিছু কথা বলার সুযোগ হল না। ওরা একটু একটু তফাতের সেলে ছিল, ওদের পারখানা বাওয়ার অগ্র সঙ্গী ছিল।

হুঁ—একদিন পরে একদিন হুপুরে বারান্দার চৌচামেচি শুনে গরাদের কীক দিয়ে নাক বাড়িয়ে আড়চোখে দেখি,—হাক্ক সেলের বাইরে বারান্দায় এসে এক পাহারাদারের গড়গড়ার মুখ লাগিয়ে ফাজলামি করে টান দিয়েছে, আর সে চৌচাচ্ছে, তার গড়গড়া নষ্ট হয়ে গেছে বলে। হাক্ক দাঁত বার করে তাকে বোঝাবার চেষ্টা করছে।

রোজ দশটার সময় সাজোপাজ বেষ্টিত ২২ সাহেব আসেন, এবং প্রত্যেক সেলের সামনে দাঁড়িয়ে বলে যান,—“You are remanded till tomorrow.” তিনি ম্যাজিস্ট্রেট—“till tomorrow” সাহেব। অর্থাৎ রোজ আমাদের ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করা হয়। তবে পর্বত মহম্মদের কাছে যায় না, মহম্মদই পর্বতের কাছে আসেন।

আমার সেলের এক পাশে থাকতেন হরিশ দাশগুপ্ত, আমাদেরই আর এক সেটারের লোক। তখন তিনি থাকতেন নবকৃষ্ণ শ্রীটে, পরে তিনি হাতীবাগানে হীরেন দত্তদের ঈরুণ বাড়ীতে স্পোর্টিং গুডসের দোকান করেছিলেন—এখন দোকান বেশ বড় হয়েছে।

তাঁর এক সহকর্মী ললিত বসাকও ছিলেন, এবং আর একজন ছিলেন এক বলাই রায় (কর্মকার) যিনি নাকি বা কিছু জানতেন, সবই বলেছিলেন। তাঁদের জুয়েলারীর দোকান ছিল, এখন দোকানও বড়, এবং বেশ বড় লোক তিনি।

কয়েক দিন পরে একদিন পঞ্চাননের সঙ্গে পারখানার মেলবার এক সুযোগ ঘটে গেল। তিনিও বললেন আমাদের ‘একজনের’ কথা—বা জানতো, সবই বলে দিয়েছে। গয়না গলানোর কথাটা সে জানতো না, তাই পুলিশ জানতে পারেনি। পঞ্চাননকে বখন কীড শ্রীটে নিয়ে যায়,—তখনই দেখে আশ্চর্য হন যে, আমাদের ঐ ‘একজন’ ‘freely’ ঘরের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে, অফিসার তাকে সিগারেট দিচ্ছে, সে সিগারেট খাচ্ছে।

সে পঞ্চাননকে বললে, সবই পুলিশ জানতে পেয়েছে, সুতরাং শুধু শুধু মার না খেয়ে, বা জান সব বলে দাও। সেই পঞ্চাননের জখম হাতটার দাগ দেখিয়ে নিলে, এবং সেই হাতটাকে পুলিশ ফল নিয়ে পিটলে। শেষ পর্যন্ত পঞ্চানন কিছু চেপে, কিছু বলে রেহাই পেলে।

শুধু তাই নয়,—পঞ্চানন বললেন, আমার সামনে অফিসাররা সতীশ চক্রবর্তীর সন্ধানে কোথায় যেতে হবে তার পরামর্শ করলে, এবং আমাদের ঐ ‘একজনকে’ গৌক-দাড়ীর পরচুলো পরিষে মোটরে নিয়ে বাওয়ার ব্যবস্থা করলে। তারপর তাকে নির বাওয়ার পর পঞ্চাননের অফিসার বললে, এই সব ছেলে নিয়ে বিপ্লব করবে? হুঁ:।

বাই হোক, পঞ্চাননকেও কীড শ্রীটে রাখেনি। হরিশ দাশগুপ্তকে বখন কীড শ্রীটে ঠেজাচ্ছে, তিনি চপ করে

খাচ্ছেন দেখে এক কীকে পাহারার কনেটবল তাঁকে বলে দিলে,— ‘রোতা নেই কাছে? চিন্তায়কে রোও, কমতি মারেনগা!’ তারপর তিনি চোচাতে গুরু করলেন, এবং তাঁর মনে হল, সত্যিই কিছু অসুখ পেলেন। পক্ষানন যখন যুগল দত্তদের আহিরীটোলার বাড়ীতে ছিলেন, তখন হরিশ বাবু এবং ললিত বাবু অনেকদিন তাঁর হাত ‘dress’ করেছিলেন। এর ফলে তাঁর সঙ্গে আমার একটু আত্মীয়তা বোধ জন্মেছিল। সে সম্ভাব্য আজও আছে।

গোয়েন্দা অফিসারদের কাজটার প্রকৃতি একই, কিন্তু একজন অপরিচিত বয়স্ক ভদ্রলোককে প্রথম সাক্ষাতেই মার এবং নোংরাভাষার গাল দেওয়ার মতন ‘এলেম’ সকলের থাকে না। তার জন্তে বাছাবাছ মার্কামারা ছোটলোক অফিসার থাকে। উদ্ভট অকথ্য অভ্যাসের ব্যবস্থাও তাদের স্বাধীন মস্তিষ্কে আবিকার। এদের মধ্যে আবার ‘পাক্সির শিরোমণি’ বলে কারো কারো খ্যাতি আছে। তাদের হাতে বারো পড়ে, সবচেয়ে বেশী দুর্ভোগ হয় তাদের। এরা কিছু চাকরীর সবচেয়ে ওপরের দাপে উঠতে পারে না। তার জন্তে অল্পপ্রকার ‘এলেম’ দরকার।

যাই হোক,—১০ দিন ডালাগা হাউসে till tomorrow থেকে, এক দিন বিকেলে এক কালো গাড়ী-বোঝাই হয়ে ঢুকলুম প্রেসিডেন্সি জেলে কুখ্যাত ৪৪ ডিগ্রী বা ৪৪ cellএ। সে হচ্ছে নির্জন কারাবাস।

জেলের ফটকে ঠুকে একটা খাতার নাম-বাম লেখা হল, তারপরে আর একটা ফটক খুলে জেলের মধ্যে নিয়ে খানিক দূরে ৪৪ ডিগ্রীর ফটকে ঢুকলুম। সেখানে একজন ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডারের টেবিলে আবার নাম-বাম লিখিয়ে নিয়ে চললো। চোড়া একটা রাস্তার বাঁ দিকে বরাবর দেওয়াল, আর ডানদিকে পর পর ৪৪টা সেলের সারি। মাঝে আর একটা গেট ও দেওয়াল দিয়ে সেলের সারিটা দুভাগে ভাগ করা হয়েছে, এবং সে গেটেও এক ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডারের পাহারা আছে।

আমরা যত এগোচ্ছি, আমাদের আগে আগে একজন কয়েদী মেট ডানদিকের সেলের কপাটগুলো বন্ধ করতে করতে চলেছে, এবং আমরা পার হয়ে গেলে আবার কপাটগুলো খুলে দিচ্ছে আর একজন। অর্থাৎ বন্দীর হাতে কারো মুখ দেখতে না পার তার নিখুঁত ব্যবস্থা। যে কপাটগুলো বন্ধ করা এবং খোলা হচ্ছে, সেগুলোই সেলের কপাট নয়। সেলের গরাদে দেওয়া দরজায় তালা বন্দী আছেন বন্দীরা—তার বাইরে আর একটা সেলের মতন ছাদহীন জায়গা আছে, তার নাম আর্টিসেল,—সোহার কপাটগুলো সেই আর্টিসেলের।

বন্দীর দিনরাত সেলের মধ্যে তালাবদ্ধ থাকেন—সকালে মুখ ধোয়া বা স্নান করার জন্তে একবার পনেরো মিনিট, আর বিকালে “Exercise” এর (বেড়ানোর) জন্তে আর একবার পনেরো মিনিট বন্দীকে সেই আর্টিসেলে বার করা হয়। কিন্তু এক সেল বার দিয়ে এক সেল, এই ভাবে দু’বার তাঁদের বেরোতে দেওয়া হয়, যাতে পাশাপাশি সেলের বন্দীরা কথাবার্তার সুযোগ না পায়। আবার সোহার কপাটগুলোর মাঝে একটা ঢাকনা দেওয়া ফুটো আছে, যাতে বাইরে থেকে ওয়ার্ডাররা টাকিনা সরিয়ে ফুটোতে চোখ লাগিয়ে দেখতে পারে বন্দী কি করছে।

সেলগুলো এতটা চোড়া, যাতে ছাদনা খাট পাশাপাশি রাখা

যায়; আর তার পিছনে আর একখানা খাট আড়াআড়ি রাখা যায়, এতটা লম্বা। তিনখানা খাটের মত জায়গায় একখানা খাট চটের তোয়ক কবল বালিসসহ দরজার মাঝ পর্যন্ত দখল করে আছে,—পাশে আর একটা খাটের মতন জায়গা আছে নড়চড়ার মতন,—এবং সেখানে আছে একটা জলের কুঁজো একটা এনামেলের খালা ও মগ,—এবং পিছন দিকে আর একখানা খাটের মতন জায়গায় আছে দুটো আলকাতরা মাখানো চূপড়ি,—মলমূত্র ও শৌচক্রিয়ার জন্তে। গরাদের বাইরে আছে এক বালতি জল। পিছনের দেওয়ালের উপর দিকে, একটা ফ্লফ্লি জানালা।

ব্যবস্থা দেখে অল্প ভুল হয়ে গেল। তখনও জানি না, কতদিন এখানে ঐভাবে রাখবে। আমার আসার আগে মারা এসেছেন, যাদের অনেককে ঐভাবে এখানে অনেক দিন রেখেছে, এবং তারা কেউ পাগল হয়ে গেছেন, কেউ আত্মহত্যা করেছেন, সকলেরই স্বাস্থ্য ভেঙ্গে গেছে। তার ফলে কিছু কিছু সুব্যবস্থা হয়েছে, আমি এসেছি সেই সুব্যবস্থার আমলে।

ডালাগা থেকে বাইরে নিয়ে এসেছিল। কাজেই গুরে পড়লুম। মনে হতে লাগলো, ইহলোক সম্পূর্ণ অন্ধকার হয়ে যাওয়ার পর যে সব ভদ্রলোক পরলোকে (অবশ্য মরকে) যান, তাঁদের সেখানে ঠিক এমনই ব্যবস্থা। অতঃপর একমাত্র সঙ্গী অমরীরা চিন্তা—ছম্পট, এলোপাতাড়ি, দম-আটকানো। ক্রমে অবসর হয়ে ঘুমিয়ে পড়লুম।

রাতটা কখন কেটে গেল, জানতে পারলুম না—ভোরের আগেই পাশের cellএর দরজা খোলার শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল। মেঝের এল কয়েদী মেটের সঙ্গে—টুকরা খালি দেখে বধোতিত পরামর্শ দিয়ে গেল। পরামর্শ গ্রহণ করে রাখলুম। বেলা ১টার ও বিকেলে আর ছুবার এল।

সকালে আর্টিসেলে বার করে দিলে। দুখ ধূয়ে একটু পায়চারী করে নিলুম। চার কদম হাঁটলেই দেওয়ালে নাক ঠুকে যার, কাজেই সে প্রায় ঘূর্ণশাক খাওয়াই হল। ১৫ মিনিটেই আবার তালাবন্দী।

তারপর এল চা! ভোরের ডালার মতন একটা টিনের ট্রেতে আতখানা পাউরুটিতে মাখন লাগানো সাজানো, আর প্রকাণ্ড এক বালতি চা। এক শিশ মাখন রুটি এবং প্রায় এক মগ চা গরাদে গলিয়ে দিয়ে গেল। খেয়ে পেট ভরে গেল। বুঝলুম Defence of India Act এ পড়েছি, এবং ভদ্র লোক হয়েছি।

হাটের এক আওয়াজ এসে “সরকার সেলাম”। এক কয়েদী মেট এগে ব্যুঝিয়ে দিয়ে গেল, সুপারিন্টেন্ডেন্ট আসছেন, তিনি এল হাতের চেটো ছুটো বকের ছপালে রেখে তাঁর সামনে দাঁড়াতে হবে। মনে হল, ডাক্তারদের “hauds up” order, পাছে কেউ গুলিটুলি করে। সুপারিন্টেন্ডেন্ট রূপ দেখে এবং দেখিয়ে চলে গেলেন।

ঘরটার নম্বর মনে নেই, ২৩২৪ হতে পারে। মেঝের টালি খোদাই করে লেখা আছে Prithi Sing Transportation for life Lahore Conspiracy case—1915. কেমন যেন একটু ভাল লাগলো। বেন একটু সাহস জ পেয়েছি।

আপনারা যুক্তি হাসি হাসবেন না। ঘটনাটক একটু

ভিন্নভাবে ঘুরলে আভকের ৪৪ ডিগ্রীর প্রত্যেকেরই ঐ অবস্থা হতে পারতো। পানের দোকানের পাশে দড়ির আঁতন ঝোলে—যে না সে বিড়ি-সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে চলে যায়—দোকানদার কিছু বলে না, কারণ সে জানে। যে ধূমপায়ীরা তার দোকানের কাছ দিয়ে মাঝে মাঝে হাঁটে, তারা সবচেয়ে তার potential খন্দে—কোনো দিন কিছু না কিছু কিনতে পারেই। বোমা তৈরির পরামর্শমাত্র করেও তা আন্দামান-ফেরতের সার্টিফিকেট পাওয়া যায়, এবং শুধু তারই জোরে নেতা হওয়া যায়। বাক্—

দুপুরের খানা এল—যে ট্রাকের ডালায় পাঁউরুটি এসেছিল, সেই ট্রাকডরা ভাত, আর বালতি বালতি ডাল, বাঁটি, মাছের বোল আর ডিমসিদ্ধ। যেন লাটসাহেবের মেমের বিয়ে!

গরাদের কঁাক দিয়ে গলিয়ে গলিয়ে আমার এনামেলের থালা আর মগ ভরে বা দিয়ে গেল, মনে হল ছুঁবেলার খোরাক। কিন্তু সব খেয়ে ফেললুম। অনেক দিনের ক্ষিদে।

বাইরের বালতির জল দিয়ে গরাদের কঁাকে হাত গলিয়ে থালা মগ ধুয়ে রেখে শুয়ে পড়লুম। বস্তুতাত্ত্বিক পোড়া-পেট প্রচুর বস্তু সংগ্রহ করে ঠাণ্ডা হল, এবং ঘুম আসতেও লজ্জা হল না।

বেশ খানিক ঘুমিয়ে উঠে পেটের অবস্থা দেখে চিন্তা হল—হজম তো করা চাই! খুব কতকগুলো ডন-বৈঠক দিয়ে হাঁপিয়ে আবার শুলুম। তার পর বিকেলে ১৫ মিনিট অ্যান্টিসেলে ঘুরপাক খাওয়া হল। তার পর সন্ধ্যার আগে আবার রাতের খাওয়ার পালা।

বড় বড় লাল লাল মোটা মোটা পোড়া দাগওয়ালা রুটি—দুখানা নিলুম। ডালটা ভাল—আধমগ নিলুম, আর তার সঙ্গে এক হাতা মাংস। চেহারাটা দেখে ভক্তি হচ্ছিল না, কিন্তু খেতে ভালই লাগলো।

চব্বিশ ঘণ্টার এই প্রোগ্রাম দিনের পর দিন চলতে লাগলো। এলোমেলো চিন্তার হাত থেকে বেহাই পাওয়ার জন্তে বখন-তখন ডন-বৈঠক করি। দিনের পর দিন ঐ একই মুখগুলো কলের পুতুলের মতন আসে যায়, আর একটাও মুখ দেখার উপায় নেই—আমিও যেন কলের পুতুল বনে গেছি।

ইতিমধ্যে এক দিন এক ঘেটের হাতে একগাদা বই সমেত ওয়ার্ডার এসে বললে—ইচ্ছা হলে এর থেকে একখানা বই নিতে পার—পড়বার জন্তে—হুগো একখানা করে বই জেল-লাইব্রেরী থেকে দেওয়া হয়।

বই দেখলুম মহান টাইপের—অমিয় নিমাই চরিত, অমিতাভ, ডাক্তার চুণীলাল বসুর খাত—এই তৃতীয় বইটাই নিলুম। ছোট বই, এক নিঃশ্বাসে পড়া হয়ে গেল। সাত দিন ধরে সেইটেরই চর্চিত-চর্চণ করলুম—প্রায় মুগ্ধ হয়ে গেল। খাত সবচেয়ে অত চমৎকার বাংলা বই কিন্তু আর হয় না। খাত সবচেয়ে পরিপাক প্রাণী সবচেয়ে আমার অভাবি ঐ বিজ্ঞানেই চলে যাচ্ছে। ৪৪ ডিগ্রীর নীট লাভ?

এক দিন ওয়ার্ডার এক কয়েদী সঙ্গে করে এসেছে, কয়েদীর হাতে এক মোটা চুল-ছাঁটা ক্লিপ। ইচ্ছে করলে চুল ছাঁটতে পারি কিন্তু মাথা ও দাড়ি ঐ ক্লিপ দিয়ে হুড়িয়ে দেবে আগাগোড়া আর কিছু নয়। আমি বললুম, দরকার নেই। চলে গেল। চুল-দাড়ি বড় হতে লাগলো। ঠেসে খাই, আর

বখন-তখন ডন-বৈঠক করি—ওজনও বাড়তে লাগলো। কত দিন এভাবে থাকতে হবে জানা নেই বলে,—বখন এই প্রহটা মনে হয়, তখনই মনটা অস্থির হয়ে ওঠে—আর আবার কলে ডন-বৈঠক করে হাঁপিয়ে চিন্তাটাকে তাড়াই।

দেওয়ালের গায়ে একটা মশা রক্ত খেয়ে গোল হয়ে বসে আছে,—তাকে ধরতে চেষ্টা করি,—সে উড়ে যায়, কিন্তু একটু দূরে গিয়ে আবার বসে—একটু গুরুভোজন হয়েছে—আমারি মতন। ডন-বৈঠক দিতে পারে না। একবার ধরে ফেলি। সরষের মতন এক ডেলা জমাট রক্ত আমার আঙুলে আটকে যায়,—আর মশাটা উড়ে পালিয়ে যায়। বাহাহুয়!

অমিয় নিমাই চরিত আর অমিতাভ পড়া হয়েছে—দু'বার পড়তে ইচ্ছে করে না, তবু ৭ দিন ধরে চোখ বুলাই। চট্টের গদিতে গোঁজা একটা বড় আলপিন আবিষ্কার করলুম—দেওয়ালে আঁচড় কেটে নামটা লিখলুম। আলপিনটা বখাছান্নি'র খেতে দিলুম। সময় কাটে না ডন-বৈঠকই চলে।

ঠাইং একদিন গেটে ডাক পড়লো—বার-তারিখ ভুলে গিয়েছিলুম—Interment order পেলুম—দেখলুম ৪৪ ডিগ্রীতে ১ মাস হয়ে গেছে।

"Whereas in the opinion of the Government you....have acted, is acting or is about to act in a manner prejudicial to public safty, the Government is pleased to direct that you shall proceed directly to Krishnagar, Dist. Nadia, and report yourself to the S. P., etc. etc.—হুকুম জমাদ করলে জেল হবে।

এই বাঁধা গড়ের মধ্যে পুলিশ সাহেবের নির্দেশমত স্থানে থাকা এবং নানা বিধি-নিষেধের সর্বত্র ফিরিচ্ছি। order-এর সঙ্গে রাহা-খরচ দিয়ে শ্রেক ছেড়ে ছিলে। পুলিশ সাহেবের কাছে হাজির হওয়ার সময় নির্দেশ করা হয়েছে ট্রেনের টাইম দেখে,—এবং ছাড়া হয়েছে সে টাইমের ঘণ্টা দুই আগে। সম্ভবত পিছনে চর থাকবে, পথে কারো সঙ্গে দেখা করি কি না, তা দেখবার জন্তে। সুরতরাং আলিপুর থেকে হেঁটেই শিয়ালদার যাবো স্থির করে রওনা দিলুম।

সারা পথ লক্ষ্য রাখলুম। ঘরতলা স্ট্রীটে ভালভলার মোড় পার হয়েও মনে হল না পিছনে কেউ আসছে। সুরতরাং Henghton-এর ক্যামেরার কারখানায় হুক পড়ে টালার অভুল দাসের সঙ্গে দেখা করে খবরটা দিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। শরীর এতটা ভাল হয়েছিল যে, অভুল বাবু দেখে রীতিমতন বিস্মিত হয়েছিলেন।

কুন্দনগরে বখন পৌছলুম, তখন অনেক রাত। ট্রেন থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তা ধরে যেতে যেতে এক বাঙ্গালী হাওলদারকে দেখে পুলিশ সাহেবের খোঁজ নিলুম। আমার প্রয়োজনের কথা শুনে তিনি বললেন, এত রাতে বাওয়ার প্রয়োজন নেই,—আজ কোতোয়ালী থানার শুয়ে থেকে কাল সকালে সাহেবের কাছে গেলেই হবে।

কোতোয়ালী থানার বড় দারোগা-জব্দটা ইজিডেরার দেখিয়ে দিয়ে বললেন, গুতেই রাতটা কাটিয়ে দিন। তাই হল—পথে কিছু খাবার খেয়ে নিয়েছিলুম, রাতটা কেটে গেল।

সকালে পুলিশ সাহেবের কাছে গেলুম,—তিনি I B officer-এর হাতে আমাকে সঁপে দিলেন—বিকালে আমাকে নিয়ে তিনি রওনা হবেন শান্তিপুরে।

বিকালে প্রকট বড় ঊঠলো,—সব চেয়ে বড় আখিমে বড়, বাতে পদ্মায় অসংখ্য নৌকা ডুবেছিল,—একখানা লঞ্চকে উড়িয়ে নিয়ে একটা চরের মাঝখানে কাং করে ফেলেছিল। দেশে কলাগাছ প্রায় নিশ্চুর হয়েছিল,—অসংখ্য বড় বড় গাছ পড়ে টেলিগ্রাফের তার ছিঁড়ে পথঘাট বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

সেই ঝড়ের রাতে সেখানে গিয়ে হাজির হলেন পঞ্চানন—তিনি যাচ্ছেন রাণাঘাটে। ঘটনাচক্রে দুজনে খানার একরাত সারারাত গল্প করে কাটানো হল। পরের দিনটা গেল গাছ কেটে বাস্তা সাক্ষ্য করে। পঞ্চানন বড় লাইনে রাণাঘাট চলে গেলেন। আমাকে ছোট লাইনে বেতে হবে, সুতরাং আর এক দিন থাকতে হল। আই-বির লোক হোটেল থেকে ভাত খাইয়ে আনলো।

দ্বিদি আমার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করছিলেন গোড়া থেকেই এবং শেষ পর্যন্ত কর্তারা দেখা করার অস্বমতিও দিয়েছিলেন, কিন্তু সে একটা রসিকতা—দেখা করার তারিখ ছিল আমাকে জেল থেকে বার করে দেওয়ার পরের দিন। অর্থাৎ দ্বিদি যখন একবার সেন্টাল জেল, আর একবার প্রেসিডেন্সি জেলের ফটকে ঘুরে পাত্তা পাচ্ছেন না, তখনই চলছে ঐ ঝড়, মাধার ওপর গাছের ডাল ভেঙ্গে পড়ছে। ভাগ্যীজামাইকে সঙ্গে করে জল-ঝড়ে তিনে নাস্তানাবুদ হয়ে আমার দেখা না পেয়ে বাড়ী ফিরেছেন।

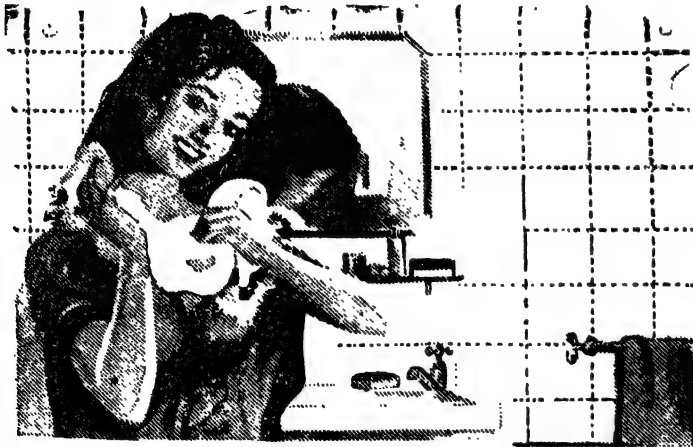
প্রথমে গোয়েন্দারা দ্বিদির পিছনে লেগেছিল, আপনি সব জানেন, সবাই বলেছে, অমুক বলেছে, “হানু বলেছে”, (দ্বিদির ভাষা) তখন বসুমতী, আঁটকুড়ীর ব্যাটা বা ধোঁকা দিচ্ছে।

বাঁট হোক, তারপর থেকে দ্বিদি তাদের পেছনে লাগলেন, ওকে আমার হাতে ছেড়ে দাও, আমি কারো সাথে মিশতে দোষ না, ও আমার কথাই অব্যাহত হবে না, ইত্যাদি। সে কথাই আমল না দিয়ে ওরা দ্বিদির কাছে জেনে নিচ্ছেছিল, শান্তিপুরে ছোট ভগ্নীপতির বাড়ীর কথা এবং তাঁর সঙ্গে বন্ধোবন্ধ করেছিল আমাকে সেখানে রাখার।

ভগ্নীপতি বোগানন্দ গোস্বামী (উড়ে গোসাই পাড়ার আন্তি গোসাই) সপরিবারে কলকাতায় চলে আসার বন্ধোবন্ধ করছিলেন, আমি বাওয়ার পর তাঁরা চলে এলেন, শুধু তাঁর বৃদ্ধা মা থেকে গেলেন।

মস্ত চৌহদ্দির মধ্যে মস্ত প্রাচীন ভাস্কর্যের বাড়ী, প্রচুর কল-ফুলের গাছ, ভাঙ্গা পাঁচিল, ইটের গাদা, এবং বড় বড় দাঁড়স ও গোখরো সাপের আড্ডা।

শান্তিপুরে শুধু ওঁরাই রাঢ়ী শ্রেণীর গোস্বামী, আর সব গোস্বামী বারেন্দ্র শ্রেণীর। ওঁদের পূর্বপুরুষ খ্রীষ্টচৈতন্যদেবের সঙ্গে পুরীতে গিয়েছিলেন, ওঁরা এখনো পুরীতে গেলে জগন্নাথের পাণ্ডারা এসে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে, পায়ে ধুলো নেয়, প্রসাদ এবং ভোগ দিয়ে যায়। ভগ্নীপতির সঙ্গে পরে আমি পুরী গিয়ে বচকে দেখেছি।



জীবাণুনাশক নিমন্তল থেকে তৈরী, সুগন্ধি মার্গো সোপ কোমলতম ত্বকের পক্ষেও আদর্শ সাবান। মার্গো সাপের প্রচুর নরম ফেনা রোমকূপের গভীরে প্রবেশ করে ত্বকের সবরকম মালিন্য দূর করে। প্রস্তুতির প্রত্যেক ধাপেই উৎকর্ষের জন্ম বিশেষভাবে পরীক্ষিত এই সাবান ব্যবহারে আপনি সারাদিন অনেক বেশী পরিষ্কার ও প্রফুল্ল থাকবেন।

পারবারের
সকলের পক্ষেই

ভালো



মার্গো সোপ

পরিবারের সকলেরই প্রিয় সাবান

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোম্পানি লিমিটেড, কলিকাতা-২১

তাই তাঁদের নাম উড়ে গৌসাই। এমনি নাম দেওয়া শান্তিপুত্রের একটা রেওয়াজ। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীদের বলে, বোধ হয়, “চাকফেরা” গৌসাই। আর এক গৌসাইদের নাম “আতাবুনে।” এমনি আরো নাম আছে। এক রায়ের নাম আছে ‘পাঁটা রায়’।

বাগী প্রোফেসর গ্রামস্কলর গোস্বামী আমার ভগ্নীপতির জ্ঞাত-ভাই, পাশেই বাড়ী। আমি যখন গেছি তখন তিনি হবিবিয় খান, ইট মাথার দিয়ে কবলে শরন করেন, বাড়ীর বাইরের প্রকাণ্ড বৈঠকখানার দর-দালানে থাকেন।

ইণ্ডিয়ান আর্টের একটা ছবি ছিল দেখেছেন? “গন্ধে উদাস হাওয়ার মত ওড়ে তোমার উত্তরী, কর্ণে তোমার কুঞ্চুড়ার মল্লরী?” তখন গ্রামস্কলর গোস্বামীর চেহারা ছিল তেমনি কিনকিনে ফাইন।

সকালে সহরের এক প্রান্তে থানার যোজ একবার হাজিরা দেওয়ার আদেশ পালন করতুম, আর গ্রামস্কলর গোস্বামীর দুই ছোট ভাই গৌর আর নিতাই এবং আমার ভগ্নীপতির খুড়ভূতো ভাই ফটিকের সঙ্গে গোপনে exercise করতুম। আমার চেয়ে কিছু ছোট ছিল গৌর আর ফটিক, নিতাই আরো ছোট।

ওদেরই এজমালি মদনমোহনের মল্লিকের পুরোহিত রাধানাথের সঙ্গে নাটমল্লিরে দশ-পঁচিশের আড্ডায়ও যোগ দিতুম। দিনটা কেটে যেতো। রাত্রে হত অশান্তি—বাড়ীর বাইরে বাওয়ার আদেশও ছিল না, সে কথাও ওঠে না—ঘরের বার হতেও ভয় করতো।

মল্লিকার গিরিন্দার আত্মীয় খগেন ও রাজেন বানার্জি, দুই ভাই, অন্তরীণ হয়েছিলেন ফুলিয়ার কাছে তাদের পরিত্যক্ত পৈত্রিক বাড়ীতে। তাঁরা থানার হাজিরা দিতেন সপ্তাহে একবার কি দুইবার—মাঝে মাঝে দেখা হত, নিবেদন সঙ্গেও আলাপও হয়েছিল। খগেন যুক্তির পর সেক্রেটারী ট্রিকেনসনকে ধরে বেলে, বোধ হয় মুক্কেরে, Labour Inspector এবং চাকরী পেয়েছিলেন। এখন তিনি একজন বড় অফিসার, হরত রিটারার করেছেন।

শান্তিপুত্র মতিগঞ্জের কানাইদাস ছোটভাই বলাইদা—সজীব বানার্জি বোধ হয়—হেলেবেলার বাড়ী থেকে পালিয়ে আমেরিকায় গিয়ে ইলেকট্রিকের কাজ শিখে ১৫ সালে দেশে ফিরছিলেন বিনা পাসপোর্টে, এবং ধরা পড়ে Ingress into India Act এর বন্দী হয়ে কিছুদিন জেলে থেকে বাড়ীতে অন্তরীণ হয়ে এসেছিলেন। চমৎকার গৌরবর্ণ জোয়ান, প্যাণ্টের ওপর বুট চড়িয়ে বাড়ী থেকে

যেদিয়ে এক দৌড়ে থানায় হাজিরা দিয়ে আবার এক দৌড়ে ফিরে আসতেন—দেখবার জন্তে পথে লোক দাঁড়িয়ে যেতো। এখন তিনি সনাতন ছা-পোবা বাঙ্গালী।

হিন্দু হোস্টেলের রাম ভট্টাচার্য শান্তিপুত্রের বিখ্যাত পণ্ডিত লালমোহন বিজ্ঞানিধির পুত্র। তাঁর দাদার সঙ্গে আলাপ করে নিয়েছিলুম—পরে রামবাবু হোম-ইন্টার্ন হয়ে আসার পর দেখা হল। গোপনে একদিন তাঁর বাড়ী নিমন্ত্রণ খেলুম।

আলিপুর বোমার মামলার নিরাপদ রায়ের বাড়ী বাগ-জাঁচড়া গ্রামে। তিনি আত্মমানে কয়েক বছর দণ্ডভোগ করে ফিরে এসে গেঞ্জি বা মোজার কল নিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন। গোপনে একদিন তাঁর সঙ্গেও আলাপ হল।

দিদি ইতিমধ্যে একদিন ভায়ীজামাইকে সঙ্গে নিয়ে কর্তাদের কাছ থেকে লক্ষ্য নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন। সব কথা বলা ও শোনা হল। দিদি দেখা করে বাওয়ার পর লেখালেখি শুরু করলুম বাড়ী বদলের জন্তে—নানা অনুবিধার দোহাই দিয়ে।

শেষ পর্যন্ত লক্ষ্মীভগ্নাপাড়ার কাছে পাঁটা রায়দের বাড়ীর পাশে শিব বানার্জিদের বাড়ীর একাংশ ভাড়া করা হল। সেখানে চলে গেলুম। সেখানেও বাড়ীর অন্ত অংশে শিববাবুর মা দাতোগা ইলপেট্টরকে বলে কয়ে থেকে গেলেন। শিববাবু তখন বিদেশে চাকরী করেন

ক্রমে খগেন রাজেনও লেখালেখি করে শান্তিপুত্র এসেন—তাঁদের জন্তে ভাড়া করা হল রথতলার এক বড় দোতলা, যেখানে আগে বোধ হয় সনসার্টের ক্লাব ছিল। সে বাড়ীর পিছন দিকে একটু জায়গা ছিল। ক্রমে সেখানে ভেল দিগদিগ খেলা শুরু হল গোপনে। কুবীর ডাক্তার ও হাবু ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। কুবীর ডাক্তারের ছোটভাই রাহু, পোষ্টমাষ্টারের ছেলে (হাজি বে-আইনী) এরা ছিল ভেলদিগদিগের দলে।

ভগ্নীপতির বাড়ীর পাশে রজনী মল্লিকের নাতি প্রভাস মল্লিক (ডাক নাম শিলু) তখন ফাট ক্লাবের হাজি। তাকে হারমোনিয়ামে আঙ্গুল টিপে টিপে “শক্তিমনে দীক্ষিত যোরা” গানটা শিখিয়ে শেষ পর্যন্ত বিক্রুট করে ফেলেছিলুম। তারপরের বিক্রুট হল তাঁর বন্ধু সায়দা বানার্জি—গ্রামবাজারের (শান্তিপুত্রের) দিকে বাড়ী। সে তখন ম্যাট্রিক পাশ করেছে।

[ক্রমশঃ]

বাঙালী হিন্দু হউক, মুসলমান হউক, খৃষ্টান হউক বাঙালী বাঙালী। বাঙালীর একটা বিশিষ্ট রূপ আছে, একটা বিশিষ্ট প্রকৃতি আছে, একটা স্বতন্ত্র ধর্ম আছে। বাঙালীকে প্রকৃত বাঙালী হইতে হইবে। বিশ্ববিধাতার যে অনন্ত বিচিত্র সৃষ্টি, বাঙালী সেই সৃষ্টি-শ্রোতের মধ্যে এক বিশিষ্ট সৃষ্টি। অনন্তরূপ লীলাধারের রূপ-বৈচিত্র্যে বাঙালী একটি বিশিষ্ট রূপ হইয়া উঠিয়াছে। আমার বাঙালী সেই রূপের মূর্তি। আমার বাঙালী সেই বিশিষ্ট রূপের প্রাণ।

—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন।

খ্রীষ্টান জীবন

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

[সি, এফ, অ্যাণ্ড্রুজ লিখিত 'What I Owe to Christ' গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ]

খ্রীষ্টানুসরণ

‘খ্রীষ্টানুসরণ ভ্রাতৃসংঘ’ নামে ত্রান্স্‌বের্গ ঠোক্স এক সংঘের প্রতিষ্ঠা করেন। এই সংঘ প্রতিষ্ঠার পূর্বে তিনি লাতোবের বিশপের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আলোচনা করেছিলেন ও অত্যন্ত অন্তরঙ্গ বন্ধুদের উপদেশ নিয়েছিলেন।

পরম প্রভু বিশ্বভ্রাতা বীণথুই এই মর্ত্যজীতে যেভাবে জীবন অতিবাহিত করেছিলেন, ঠিক সেই জীবনকে নিত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করার ভ্রত গ্রহণ করেছিলেন এই সংঘের ভ্রাতৃবৃন্দ। খ্রীষ্টোপম জীবন বাপনের আনন্দে সর্বত্র ভ্যাগের সংকল্প ছিল ভ্রাতৃগণের প্রধান সংকল্প। নিজের বলতে কিছুই কারো থাকবে না। বীণ সব চেয়ে ভালোবাসতেন দরিদ্রদের,—দরিদ্রের সেবাই ছিল এই সংঘের প্রধান আকর্ষণ ও কর্তব্য। সাধু ফ্রান্সিসের প্রথম ভক্তগণের মতো এই সংঘের সভ্যরাও দরিদ্রের ভ্রাতা হয়ে নিজেদের বস্ত্র মনে করেছিলেন।

এই নতুন ভ্রাতৃসংঘের আরম্ভে ত্রান্স্‌বের্গ ঠোক্স আর ব্রান্স ওয়েটার্গ এই দুজন পূর্ণসদস্য হলেন। ওয়েটার্গ ছিলেন কেবল মিশনের একজন তরুণ সভ্য,—ঠোক্সের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি বহুদিন থেকে দারিদ্র্যের ভ্রত-বন্ধনে বেছার নিয়েছে অড়িয়েছিলেন। সাধু স্ত্রম্বের সিং ও উইলিয়ম ব্র্যাঞ্চ এই সংঘের সদস্য না হলেও একই বিস্তার ও সেবার আদর্শে এই সংঘের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন।

এই ভ্রাতৃসংঘে যোগ দেবার জন্তে আমার সমস্ত অন্তর ব্যাকুল হয়ে উঠল। কিন্তু উপযুক্তি ম্যাগেরিয়ার ভুগে ভুগে আমার দেহের তখন এমনই দুর্বল যে, মনের হতাশাকে মনে চেপে রাখা ছাড়া গতানুগতিক নেই। বীণথুই নামে বিশ্বাস ও আত্মনিবেদনের এই কঠোর পথে ধীর পা বাড়ালেন, এই তরুণ বীরদের প্রতি আমার অন্তরের সমস্ত শুভকামনা ধাবিত হলো। বিশপ লিক্সের আন্তরিক উৎসাহ ও আশীর্বাদও তাঁরা লাভ করলেন। এই ভ্রাতৃসংঘের প্রতিষ্ঠার তিনি অত্যন্ত উৎসাহিত হয়েছিলেন,—পাঞ্জাবের খ্রীষ্টীয় সমাজের মধ্যে এমন একটি সংঘের উদ্বোধন তাঁর আমলের শ্রেষ্ঠ ঘটনা বলে তিনি মনে করেছিলেন। লাহোর সিংহর এক বিশেষ উপাসনা-অনুষ্ঠানে তিনি ভ্রাতৃবৃন্দকে অকুণ্ঠ আশীর্বাদ করলেন, খ্রীষ্টানুসরণের বন্ধুর পথভ্রাতার তাঁদের হয়ে ঈশ্বরের আশীর্বাদ প্রার্থনা করলেন।

উত্তর-পাঞ্জাবের পাহাড়ীদের সারা অন্তর দিয়ে ভালোবাসতেন ঠোক্স, তাদেরই সেবার তিনি উৎসর্গ করলেন নিজেকে। কিন্তু কয়েক বৎসর বেতে না বেতেই তিনি উপলব্ধি করলেন যে তাঁকে লোকে ঠিকমতো বুঝতে পারছে না, তাঁর সেবারভের ভুল অর্থ করেছে তারা। তারা ভাবছে নিজের ব্যক্তিগত পারমার্থিক উন্নতিই তাঁর লক্ষ্য। এই ভুল-বোঝাবুঝি ক্রমেই বড়ো হয়ে উঠতে লাগল, সেবারভী ঠোক্স নিত্য অক্লান্ত করতে লাগলেন, দিনে দিনে নিরর্থক হয়ে উঠছে তাঁর প্রয়াস।

তাঁর সবচেয়ে সাধারণের বা ধারণা তা গোপন করত না তাঁর পাহাড়ী বন্ধুরা। তারা বলত,—তুমি তো বিত্তহীন সংসারবন্ধনহীন সাধু,—তোমার পক্ষে পুণ্যসঞ্চয় আর শক্ত কী? তোমার বৃত্তির পথে বাধা কোথায়? কিন্তু আমরা গরীব সংসারী লোক, প্রলোভন আর পাপ নিয়েই আমাদের ঘর। সংসার প্রতিপালনের জন্তে কঠিন জোগাড় করতেই আমাদের দিন রাত, ধর্মের কথা ভাববার সময় কোথা আমাদের? তোমার মোক্ষ তো হাড়ের হুঁটার, কিন্তু জন্ম-জন্মান্তর ধরে এই পাপ পৃথিবীর পাকে আমাদের ঘুরতে হবে।

দিনে দিনে ঠোক্স উপলব্ধি করতে লাগলেন যে ভারতের গৃহসংসারহীন পথচারী সাধারণ মানুষদের এরা যে চোখে দেখে, সেই চোখে তাঁকেও এরা দেখছে। এই সব সাধুরা প্রাণে প্রাণে ভিকা করে বেড়ায়,—নিত্যন্ত কর্তব্যবিমূঢ় আনত্রে। বহি বা কেউ ধ্যান তপস্তা করে, তা শুধু নিজেরই আত্মার উন্নতির উদ্দেশ্যে। কিন্তু স্বার্থপর আত্মপোষণ তাঁর লক্ষ্য নয়, বৃহৎ সংসারের সেবার মানসেই তিনি সংসার-নিগড়ে বাঁধা পড়েননি। অসামাজিক তিনি, কিন্তু সমাজ কল্যাণেই তাঁর খ্রীষ্টোপম আত্মদান,—এ কথা তিনি বুঝাবেন কেমন করে? ব্যক্তিগত বৃত্তি সাধনের জন্ত তাঁর কিছুমাত্র ব্যাকুলতা নেই,—কিন্তু তাঁর নিঃস্বল সন্ন্যাসী-জীবন দেখে বিপরীত ধারণাই করছে লোকে।

ঠোক্সের জীবনে এ এক নিদারুণ সমস্যা। দিন রাত্রি এই সমস্যা নিয়ে চিন্তা করতে লাগলেন, বীণথুই কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন এই সমস্যার সমাধান। এই প্রার্থনার একটিমাত্র উত্তরই তাঁর মনে প্রতিভাত হলো। উত্তর-ভারতের পার্শ্বত্যাগি অধিবাসীদের সেবার জীবনোৎসর্গের সংকল্প তাঁর,—তিনি স্থির বুঝলেন এই অধিবাসীদের বিশ্বাস অর্জন করতে হলে এদেরই মতো তাঁকে সামাজিক জীবনের দারিদ্র গ্রহণ করতে হবে। এই পাহাড়ীদের মধ্যে তিনি

বাস করবেন এদের সমাজেই তিনি বিবাহ করবেন,—তবেই না।
স্বপ্নে স্বপ্নে এদের একাত্ম হবেন তিনি।

ঠোক্‌স যদি এই পথ, গ্রহণ করেন তাহলে খৃষ্টানস্বরূপ ভ্রাতৃসংঘে ভেঙে যাবে—এই কথা ভেবে আমার মন খুব খারাপ হোলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর মনে সায় দিতে হোলো আমাকে। বিশপ কিন্তু কিছুতেই ঠোক্‌সের যুক্তি মেনে নিতে পারলেন না এবং তাঁর আগন্তি জানালেন। ঠোক্‌সের সিদ্ধান্তের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হয়ে প্রথম থেকেই তাঁকে সমর্থন করলেন সুনীল কদ্র।

শেষ পর্যন্ত ঠোক্‌স শৈলপালিকা এক রাজপুতানী মহিলাকে বিবাহ করেন। এই মহিলা ভারতীয় খৃষ্টান ছিলেন। বহু বছর পূর্বে চা-বাগানের কাজে একজন চীনা খৃষ্টান কোটগড়ে আসেন ও এই রাজপুত পরিবারে বিবাহ করেন। ঠোক্‌সের স্ত্রী এই চীনা খৃষ্টানের পৌত্রী। ঠোক্‌সের সন্তান-সন্ততির ধর্মনীতি তিনটি বিভিন্ন জাতির রক্তধারার সমন্বয়।

ঠোক্‌সের এই বিবাহের পিছনে আরো একটি প্রেরণা ছিল। তিনি ছিলেন প্রকৃত খৃষ্টান। নিজেদের খৃষ্টান বলে পরিচয় দিয়ে ইউরোপীয়ানরা ভারতীয়দের প্রতি বর্ণবিষেবমূলক যে দুর্গবহার করত, তা দেখে দেখে পীড়িত হয়েছিল ঠোক্‌সের চিত্ত। স্বাভাৱ্যবোধের অহমিকা ও বর্ণবিষেবের কালিমা ইউরোপীয়ান ভারত প্রবাসীদের এমনই এক অদ্ভুত মানসিক স্তরে পৌছে দিয়েছিল যে এমন কি মৃত্যুর পরেও ভারতীয় ও অভ্যন্তরীণ খৃষ্টানের মরদেহের সমাধি পাশাপাশি রাখা নিষেধ ছিল বহুক্ষেত্রে। শাদা-কালোর এই বিভেদ সবচেয়ে প্রকট ছিল পাঞ্জাবে, এই বিভেদ মৃত্যুরক্ষুর কঁাস পরিয়েছিল খৃষ্টান সমাজের কণ্ঠে। বলিষ্ঠতম উপায়ে ঠোক্‌স এই বন্ধন বন্ধনকে ছিন্ন করেছিলেন, মানবাত্মার এই অবমাননার বিরুদ্ধে উদারতম বিদ্রোহ তিনি ঘোষণা করেছিলেন ভারতীয় নারীকে জীবনসঙ্গিনী করে, ভারতীয় সংসারকে আপন সংসার বলে গ্রহণ করে। তিনি মনে ভেবেছিলেন, এ যদি তিনি না করেন তাহলে প্রভু বীতর্য প্রতি তাঁর কর্তব্য তিনি সম্পূর্ণ করতে পারবেন না। বীতর্য প্রভু কমান্ডম্যান দৃষ্টির সম্মুখে কে বা ইহুদী, কে বা গ্রীক, কে বা আরব, কে বা বর্বর, কেই বা স্বাধীন আর কে-ই বা দাস। তাঁর সমদৃষ্টিতে সকলেই সমান, সকলেরই অন্তরে তাঁর অধিষ্ঠান।

ভারতীয় নারীকে সহধর্মিণীরূপে গ্রহণ করার পিছনে ঠোক্‌সের অতি মহান উচ্চাভিলাষ ছিল। খৃষ্টান বিবাহের অন্তর্নিহিত গুরুত্ব নিয়ে আমি গভীরভাবে চিন্তা করিনি, কিন্তু এ কথা স্থির উপলব্ধি করেছিলাম যে তাঁর এই বিবাহ নিতান্ত সহজ বিবাহ নয়, সমাজ-কল্যাণের এক মহান প্রেরণায় এ তাঁর জীবনব্যাপী আত্মপরীক্ষার স্রোত। তাই এই ব্রত পাশনের পথে তাঁকে আমার আন্তরিক শুভকামনা জানাতে আমি বিধা করিনি! ইতিমধ্যে আমি স্থির বুঝেছিলাম যে, এ যুগের মানব-সংস্কৃতির কুৎসিততম শত্রু বর্ণবিভেদ, বীতর্য পবিত্র ক্রুসেডের অঙ্গ পাণের কালোছায়া এই বর্ণবিষেব।

ঠোক্‌সের বিবাহের ফলে খৃষ্টানস্বরূপ সংঘ ভেঙে গেল। এই সংঘকে আর পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভব হয়নি। ঠোক্‌সের সংসার প্রবেশ সংঘের প্রতি ধর্মাত্মিক আঘাত, এই আঘাত আপন বৃকে অতুল্য করলেন আমাদের বিশপ। অজ্ঞাত অনেকও গভীর দুঃখ পেলেন এই ঘটনায়। কিন্তু আজ যখন দূরদৃষ্টি দিয়ে দেখি তখন

মনে হয় মানুষের আশা-নিরাশার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর বৃষ্টি অতি বিচিত্রভাবে আপন উদ্দেশ্য সাধন করে চলেছেন। ভ্রাতৃসংঘের নিয়ম-শৃঙ্খলার দৃঢ় বন্ধন ঈশ্বর যেন হঠাৎ খসিয়ে দিলেন। এই আশ্চর্য মুক্তির ফলেই সুন্দর সিং-এর মতো সাধু খৃষ্টের প্রতি আত্মনিবেদিত জীবনকে সারা বিশ্বের সেবার বিলিয়ে দিতে পেরেছিলেন। কী পাশ্চাত্য কী প্রতীচ্য, বিশ্বের সমস্ত খৃষ্টীয় সমাজে পরিচিত হয়েছিলেন সাধু সুন্দর সিং। খৃষ্টপ্রেমের অকুণ্ঠ বিতরণের বিনিময়ে দেশে-বিদেশে লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রেম তিনি অর্জন করেছিলেন। সংঘের বন্ধনে যদি তিনি বাঁধা পড়তেন, তা হলে এ হোতো না। কোনো সংঘ বা সম্প্রদায়ের গভীর মনো আবদ্ধ থাকবার মানুষ ছিলেন না সুন্দর সিং। তিনি ছিলেন একলা পথিক, এক বীতর্য পথ-প্রদর্শনকেই তিনি সত্য বলে গ্রহণ করেছিলেন। সেই পথে তিনি ছিলেন অকুতোভয় নিঃসঙ্গ অভিযাত্রী।

সংঘের অপর সদস্য ব্রাদার ওয়েস্টার্পের মুক্তিও মঙ্গলদায়ক হয়েছিল। বিশিষ্ট কর্মপথে তিনি অগ্রসর হতে পেরেছিলেন, সংঘের মধ্যে থাকলে তা সম্ভব হোতো না। যে কাজ তিনি ছাড়া আর কেউ পারত না, সেই কাজের ভার ঈশ্বর তাঁর উপর হস্ত করেছিলেন, ঈশ্বরেরই মহা উদ্দেশ্য সাধন হয়েছিল তাঁর জীবনে। ব্রাদার ওয়েস্টার্প এখন দক্ষিণ-ভারতে টিনিভেলির বিশপ, বিরাট এক ভারতীয় খৃষ্টান সমাজের তিনি সেবক। এই সমাজের অবিকাশ লোকই অতি দরিদ্র। বাদার মঙ্গলাকাংক্ষার নিত্য নিয়োজিত তাঁর জীবন, তাদের অকুণ্ঠ প্রত্যাশীতি তিনি লাভ করেছেন।

কয়েকটি ক্ষুদ্র কথায় স্মরণে ঠোক্‌স সাধু সুন্দর সিং ও অজ্ঞাত বন্ধুগণের জীবন-কাহিনী বর্ণনার মাধ্যমে আমার সেদিনের অন্তর-জীবনের কাহিনীই আমি উদ্ঘাটিত করতে চেষ্টা করছি। ভারতে আমার মর্ম-অভিলাষের এঁরাই ছিলেন নেতা, দৈহিক কারণে অবিলম্বে এঁদের তীর্থযাত্রায় আমি যোগদান করতে না পারলেও এঁদের জীবন ও এঁদের পন্থার আমি অমুগ্ধাশ্রিত হয়েছি। এঁদেরই কল্যাণে জীবন্ত বীতর্য ধ্যানরূপ আমি ভারতভূমিতে উপলব্ধি করেছি, এঁদেরই আনন্দে আমি আনন্দিত আবেগে শেষ পর্যন্ত দেবা ও কল্যাণের সত্য পথের সন্ধান আমি পেয়েছি।

সংসারী জীবনের চেয়ে সংসারত্যাগী ব্রহ্মচারী জীবনকে ভারতীয়েরা বড়ো বলে মনে করে। এই মনে করাটা স্বাভাবিক নয়। ভারতবাসীর এই ধারণার পরিচয় ঠোক্‌স অনেক আগেই পেয়েছিলেন, আমি অতো শীঘ্র বুঝতে পারিনি। বিবাহিত জীবনের চেয়ে অবিবাহিত জীবন মহত্তর,—এই ধারণা আমি মিথ্যা এবং হীন বলে মনে করি। স্বামিস্ত্রীর স্নেহ স্বাভাবিক দাম্পত্য জীবনকে হয়ে করলে খৃষ্টের বাণীকেই অবজ্ঞা করা হয়। মানবপুত্রের আদিম স্বষ্টির মূলে নরনারীর দাম্পত্য সম্পর্ক, এই সম্পর্ক পবিত্র। বিবাহ বন্ধন এক অতি পবিত্র ধর্মবন্ধন, সংসারজীবন এতো পবিত্র যে বীত বলেছেন যে পৃথিবীর শিশুরা স্বর্গোক্তানের কুসুম-কোরক।

আমি নিজে বিবাহ করিনি। আমার অবিবাহিত জীবনযাত্রা নিয়েও লোকের মনে ভুল ধারণার সৃষ্টি হতে পারে। বিবাহ করব কি করব না, কোম পথে প্রভুর নির্দেশ আমি ভালো ভাবে পালন

করতে পারব? তখন আমার মনে হয়েছিল যে এ বিষয়ে আমাকেও আন্তরিকতা দিয়ে করতে হবে। তার পর অবশ্য বহু বৎসর কেটেছে। শ্রামুয়েল ঠোকস যে ভুল ধারণার সম্মুখীন হয়েছিলেন ভারতভূমিতে আমার স্বর্গীয় নিত্য-পরিচয় ঈশ্বরের আশীর্বাদে এমনি ভ্রান্ত ধারণার সম্মুখীন আমাকে কোথাও কখনো হতে হয়নি।

এ সব ঘটনা কুড়ি বছর আগেকার কথা। খৃষ্টান-জীবনের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এই কুড়ি বৎসর আমার কেটেছে। সিমলার পার্বত্য-অঞ্চলে শ্রামুয়েল ঠোকস, স্কন্দর সিং ও শ্রীল ক্রান্তের সঙ্গে অতিবাহিত দিনগুলি কুড়ি বৎসরের ব্যবধানের প্রান্ত থেকে স্পষ্টতর রূপে আমার চোখে ফুটে উঠেছে। স্পষ্টতর ভাবে আমি উপলব্ধি করছি বীণার পারমাখিক রাজ্যের এক অপূর্ণ বিধান, যে বিধানের কথা তিনি অতি সহজ স্বচ্ছ উপমায়ে ভক্তের প্রাণে গোঁধে দিয়েছেন। প্রভু বলেছেন,—যেবর শুদ্ধ শীর্ষ মাটিতে করে পড়ে, তাই শত্রু জন্মায়। সে মুকুল করে না, সে মুকুল একাকী। যে মুকুল করে, সেই আনে ফলের সমারোহ।

ঠোকস এবং তাঁর ভ্রাতৃবৃন্দ খৃষ্টানদের যে প্রাথমিক পরীক্ষার বীজ বপন করেছিলেন, তারই ফলে জামলা ভারতভূমিতে সঞ্চার হয়েছিল মহার্ঘ ফসল। ঠোকসের বিবাহের পর খৃষ্টানদের ভ্রাতৃসংঘের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছিল, কিন্তু সে মৃত্যুতে ছিল পুনর্জীবনের আশীর্বাদ। এই ভ্রাতৃসংঘের আদর্শ-বীজ থেকে ভারতের বিভিন্ন স্থানে জন্ম নিয়েছে বিভিন্ন রূপের নানা প্রোপ্রিয়-তরু। দক্ষিণ ভারতের থিরুপতুরে ও যুক্তপ্রদেশের আলমোড়ার অবস্থিত খৃষ্ট-আশ্রমগুলি এই নবজীবনের নিদর্শন। এই মানব সমাজে যারা আশাহত, যারা দুর্গততম তাদের সেবার জীবনোৎসর্গের আহ্বান নিত্যকাল প্রভু খৃষ্টের কাছে ধনিত হয়ে চলেছে, সেই আহ্বানে সাড়া দেবার মতো ভক্তসংখ্যাও বিলম্ব নয়। তার প্রমাণ পুণ্যের খৃষ্ট-সেবা-সংঘ ও অসংখ্য নানা প্রতিষ্ঠান, নিখিল ভারতের কোণে কোণে যারা ছড়িয়ে আছে।

মানবপুঞ্জের এই আহ্বান কতো ভাবে আমাদের কানে বাজে, কতো রূপে তিনি আবির্ভূত হন ভক্তের চিন্তামন্ডিরে। সেই আহ্বানের প্রতীক্ষায় উৎকর্ষ ভক্তের ইন্দ্রিয়, সেই অব্যবহিত্যের আহ্বানে বিনিমিত ভক্তের হৃদয়। কটিকা-বিন্দু বজ্রনীর নিবিড় অন্ধকারে চকিত বিদ্যুৎ-বিকাশের মতো তাঁর প্রকাশ। তপ্ত বিপ্রের জ্ঞান পরিপ্রকাশের মধ্যে তাঁর উপস্থিতি, হয়তো বা শান্ত প্রহৃষের অকনিমায় হয়তো বা স্নান গোপুণির ধূসরতায় তাঁর স্পর্শ। আশাময়িত নিত্য-প্রতীক্ষিত অন্তর নিয়ে দৃঢ় মেধলায় বসন সজ্জা করে প্রিয়-আহ্বানে কান পেতে থাকে অভিসারিকা। পরম প্রভুর কণ-আহ্বানে তেমনি সর্ববন্ধন মুক্ত নিত্য প্রস্তুত প্রতীক্ষা আমাদের, আমরা এই খৃষ্টপথের পথিক দল।

অ্যালবার্ট ক্রুইটজার

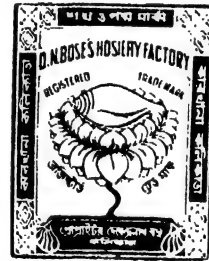
সশব্দ-সমস্তার তাঁর তখনো আমার মাথা থেকে নামে নি। এক দিকে আমি 'সাধনা' করছি কী ভাবে আমার জীবন-বাজাকে

খৃষ্টের পদ-চিহ্নের মধ্যে বিলীন করতে পারি, অন্য দিকে তাঁর ইচ্ছার আত্মরিক নির্দেশকে ব্যবহারিক জীবনের ক্ষেত্রে হেঁট মুখে মাত্র করতে পারছি না। ঠিক এমনি সংকটক্ষেপে ঈশ্বরের এক পৃথক আশীর্বাদ আমি লাভ করলাম। মহান খৃষ্টান অ্যালবার্ট ক্রুইটজারের আত্মিক সম্পর্ক আমি লাভ করলাম। এই সম্পর্ক আমার ভাগ্যে এক অতি মহার্ঘ সম্পদ।

দিল্লী খৃষ্টীয় সমাজের আওতার আমি তখন পদে পদে নানা জটিল সমস্যা, নানা দুর্বোধ্য প্রশ্ন, নানা নিরুপায়-বিহ্বলতা। বহু ঘরে কটিকার আঘাতে যেমন করে রক্ত ধারের অর্গল ভাঙে, ঘুচে যার মূল-জঞ্জালের মালিক,—ঠিক তেমনি করে সমুদ্রে পার থেকে অ্যালবার্ট ক্রুইটজারের বিজয়ী স্পর্শের আঘাত আবেষ্টনীর কারাগার থেকে মুক্তি দিল আমার মনকে। প্রথমে তাঁর রচনাবলীর মাধ্যমে অ্যালবার্ট ক্রুইটজারের সঙ্গে আমি পরিচিত হই, এবং পরে তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে নিবিড় বন্ধুত্বের দলভ আনন্দ আমি লাভ করি।

‘ঐতিহাসিক বীণার সন্ধানে’ নামক তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থটি তখন সবে প্রকাশিত হয়েছে। এমনি হয় যে একটি সঙ্গ্রহ পাঠ করে জীবনের সম্যক দৃষ্টিভঙ্গী বদলে যায়। আমারও ক্ষেত্রে এইরূপই হয়েছিল। এই পুস্তকের শেষ পরিচ্ছেদটি পড়ে আমি সবচেয়ে অভিজুত হয়েছিলাম। আমার মনে হয়েছিল ক্রুইটজার যেন তাঁর রচনার মাধ্যমে আমার নিভৃত আত্মাকে স্পর্শ করেছেন।

গঙ্গপেলের ঐতিহাসিক অংশাবলী আমি অত্যন্ত নিবিষ্ট আগ্রহের



রেজিষ্টার্ড ট্রেডমার্ক

বিখ্যাত
'শঙ্খ ও গদা'

মার্ক গেঞ্জী

ব্যবহার করুন

ডি, এন, বসুর

হোসিয়ারি ফ্যাক্টরী

কলিকাতা-৭

—রিটেল ডিপো—

হোসিয়ারি হাউস

৫০১, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

ফোন : ৩৪-২৯৫

সঙ্গে অধ্যয়ন করেছিলাম,—আমার মানসিক অভ্যর্থনের জন্মেই বিশেষ করে খৃষ্টজীবনের এই দিকটি নিয়ে আমাকে বেশি করে পড়াশুনা করতে হয়েছিল। ভারতীয় ধর্মগ্রন্থ সমূহও আমি সঙ্গে সঙ্গে তুলনামূলক ভাবে পাঠ করছিলাম। কৃষ্ণ বুদ্ধ প্রভৃতি হিন্দু অবতারের সম্বন্ধে পৌরাণিক কল্পকাহিনীর অঙ্ক নেই। আমার কেবলই মনে হতো আমার ধর্মগ্রন্থেও বীণখৃষ্টের জীবনের মধ্যেও কল্পকাহিনী মিশে নেই কি?

তা যদি হয়, তাহলে খৃষ্টজীবনের কতোটা সত্য আর কতোটা কল্পনা, কতোটা পুরাণ আর কতোটা ইতিহাস? বীণখৃষ্ট কি নিছক পৌরাণিক চরিত্র না ঐতিহাসিক জননায়ক? অমূল্যকিৎস খৃষ্টভক্তের কাছে এ সমস্তার সমাধান কোথায়?

এ শুধু বুদ্ধিবাদী সমস্তা নয়, এ আত্মার সংশয়। যেক্টে আমার ম্যালেরিয়ায় বিষ, ক্লম্ব দুর্বল দেহ, স্তিমিত শক্তি! মানসিক দুর্বলতার পক্ষে প্রশস্ত অবস্থা। সেই সময়ে বারে বারে সন্ধ্যের প্রেতচ্ছায়া মনকে আক্রমণ করে, আচ্ছন্ন করে সুস্থ বুদ্ধি অস্তবৃষ্টি। কেম্ব্রিজের বধন ছিলাম তখনো এই প্রশ্ন আমার মনে জেগেছিল। কিন্তু কেম্ব্রিজের থাকতে অধ্যয়নের যে ব্যাপক সুযোগ ছিল এখানে তা নেই। এখানে গবেষণার উপকরণ নেই,—বা বই হাতের কাছে আসে তাই পড়ি, তার বেশি কিছু পড়ার সুযোগ মেলে না। সমস্তার সমাধান খুঁজে পাই না।

খৃষ্টজীবনের ঐতিহাসিকতা বা পৌরাণিকতা নিয়ে এই যে প্রশ্ন,—এমনি আরো নানা প্রশ্ন নানা অনুবিধা আসে। আমার অন্ধ কাজের মাঝে মাঝে তারা ভিড় করে, বিভ্রান্তি আনে সদা সর্বদা। উত্তরহীন এই সব প্রশ্ন মনের মধ্যে গোপন ক্ষতের মতো জমা হয়, বহির্বাস্তবের সঙ্গে আমার আত্মার যোগসূত্রকে শিথিল করে দেয়। জ্ঞানের বেখানে অভাব, বিশ্বাসেরও সেখানে দৈর্ঘ্য আর নৈতিক সমস্তা সেখানে প্রবলতর।

সাধু জনের স্তমসাচারে একটি অহুচ্ছদ আছে, যেখানে তাঁর ভক্তবৃন্দকে খুঁজে বের করেন, অন্ধকাল তোমরা আমাকে দেখতে পাবে, আমার অন্ধকাল তোমরা আমাকে দেখতে পাবে না।

আমার খৃষ্ট-নিবেদিত সমগ্র জীবনে প্রভুর এই বাণী এক আশ্চর্য সত্যরূপে প্রকাশ পেয়েছে। কোনো কোনো সময়ে তাঁর স্পর্শ আমার অন্তরের এতো নিকটে আমি অহুভব করেছি যে তাঁর উপস্থিতির কোনো বাহ্যিক সাম্যের প্রয়োজন হয়নি,—উপহাস করতে পেরেছি সমস্ত সশয়কে। তাঁর প্রথম ভক্তজনের মতোই আমি তখন বলতে পেরেছি, প্রভু, স্পষ্ট আপনার বাক্য, প্রেহেলিকা-হীন প্রোদবহীন। তাতেই আমি বিশ্বাস করেছি যে ঈশ্বর-প্রেরিত আপনি।

আবার কোনো কোনো সময়ে অন্ধকার যেন নেমে এসেছে, বহু দৃষ্টির সামনে ফুটে উঠেছে যোবাররণের বাণা, সংশয়ের তরঙ্গ বিকোভের মাঝখানে আমার বিপর আত্মা বিশ্বাস ও আশার বৃগল নোঙ্গরের অন্ধ ক্লিষ্ট প্রার্থনা করেছে।

দিল্লীতে অবস্থান কালে সুলীল ক্লম্ব আমার পরম সহায় ছিলেন, তাঁর স্নেহ প্রীতি আমার মহা অবলম্বন ছিল, কিন্তু এইরূপ বিপর বিশ্বাসের বুদ্ধিতে সবারগি ভাবে তিনিও আমাকে কোনোরূপ সাহায্য

করতে পারতেন না। তাঁরও নিজের মনে নানা প্রকার সংশয় ছিল। খৃষ্টের প্রতি প্রদীপ্ত প্রেম সত্ত্বেও তাঁর বুদ্ধিবাদী মন আমারই মতো দোলায়িত হতো নানা প্রশ্নে। অপর পক্ষে বধনই সাধু সুল্লর সিং-এর সম্পর্কে আমি আস্তাম তখনই তাঁর শিশুসুলভ আস্থা ও বলিষ্ঠ সাহস আমার মনকে নির্মল আনন্দেরসে পরিপ্লত করত। সুল্লর সিং ছিলেন গ্যালাহাডের মতো পুণ্যজন্মের খৃষ্টান নাইট, ঈশ্বরের জ্যোতির্ময় রূপ সর্বদা জাগরুক থাকত তাঁর অঙ্গান দৃষ্টিতে।

নানা সংশয়ে আমার মন বধন বিচলিত তখন ঈশ্বরের এক অমূল্য উপহারের মতো অ্যালবার্ট স্টুইটজারের এই গ্রন্থটি আমার হাতে এল। খৃষ্ট-জীবনের ঐতিহাসিক ভিত্তি সংক্রান্ত নিউ টেটামেন্টের সমস্ত প্রশ্ন নিয়ে তিনি এই গ্রন্থে গভীর গবেষণা করেছেন, এ পর্যন্ত প্রকাশিত খৃষ্ট-জীবনের সমস্ত খ্যাত অধ্যাত গ্রন্থাবলী নিয়ে আলোচনা করেছেন, বীণের প্রতি প্রতি যুগের বিরুদ্ধতা ও প্রতি যুগের বিশ্বাসকে তিনি বিচার করে দেখেছেন। শেষ পর্যন্ত তিনি ঘোষণা করেছেন যে মানব সমাজের প্রতি বীণের দাবী অকুণ্ঠ আহুগত্যের দাবী।

আমার অব্যবহিত চিন্তের প্রতি এই ঘোষণার মূল্য সেদিন ছিল অপরিমীম। তাঁর এই গ্রন্থের শেষ পরিচ্ছেদ আমাকে সবচেয়ে অভিভূত করেছিল। খৃষ্ট বিবরণ নিয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ নানা যুক্তি ও নানা ব্যাখ্যার অবসানে তিনি সমস্ত পাণ্ডিত্য পরিহার করে একনিষ্ঠ সাধুর অন্তরের ভাবায় এই পরিচ্ছেদ রচনা করেছিলেন।

অ্যালবার্ট স্টুইটজার বলেছেন, খৃষ্ট জীবনের সমস্ত অলৌকিক ঘটনাবলীকে বাদ দিয়ে নিতান্ত ইন্ড্রিগ্রাছ বাস্তব ইতিহাসের কাঠামোর উপর দাঁড় করালে সে জীবনের মহত্বকে উপলব্ধি করা যাবে না। সেই ঐতিহাসিক চরিত্র-চিত্র হবে বিবর্ণ নিস্তাণ। উনবিংশ শতাব্দীর যুক্তিবাদীরা যে বাস্তবতার খাঁচা তৈরী করেছেন তাঁর মধ্যে খৃষ্টচরিত্রকে বন্দী করা অসম্ভব। কেন না, খৃষ্ট কোনো নির্দিষ্ট যুগের কোনো নির্দিষ্ট যুক্তির নিগড়ে আবদ্ধ নন। সর্বকালের সর্বব্যবহার কেন্দ্রে তিনি বিরাজমান। তিনি নীতিশিক্ষক নন, তিনি মানব বিবেকের সাম্প্রতিক অহুশাসক নন। তিনি মানবজাতির সর্বযুগের একচ্ছত্র সম্রাট, মানবাত্মার সর্বসমর্পিত আহুগত্য তাঁর দাবী। যেখানে তাঁর চৈতন্য স্পর্শ, সেখানেই তাঁর অনির্বচনীয় লীলা। এই লীলা তাঁর আগমনীর সংকেত। খৃষ্ট যে যুগে ধবাধামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন সে এক অলৌকিক যুগ! সে যুগের শ্রেষ্ঠ অলৌকিক ঘটনা খৃষ্টের আবির্ভাব।

স্টুইটজার প্রশ্ন করেছেন, খৃষ্টকে আমাদের জীবনের পথপ্রদর্শক রূপে গ্রহণ করতে সত্যিই কি আমরা চাই? তাঁর নয়নজ্যোতিকে প্রবর্তারা করে আমরা সর্বত্যাগী হয়ে শুধু তাঁরই অহুগামী হতে কি চাই তাঁর প্রথম শিষ্যবৃন্দের মতো? তর্কবাদী বলে, খৃষ্টের আশু পুনরাবির্ভাবের আশায় তাঁর প্রথম প্রথম মনোনিবেশ প্রেরিতগণ তুল করেছিলেন। কিন্তু নিতান্ত বাস্তবের গভীরে যে সত্য বিরাজমান ইতিহাসের নিকটে উজ্জ্বল বেধায় তা কি প্রমাণিত হয়নি? তাঁর আবির্ভাবের পর অভিবাহিত হয়েছে শতাব্দী থেকে শতাব্দী পার; ইতিহাসের প্রতি যুগে কোন্ বিচিত্র চুবক আকর্ষণে তাঁর প্রতি

ধাবিত হয়েছে নরনারীর আত্মা, আনন্ডিত আত্মসমর্পণের আকুল আবেগে? সর্বভূতে সর্বকালের মানবস্বভাবের অবিনশ্বর তাঁর স্পর্শ, এই কালজয়ী রহস্যের মূল কোথায়? একটিমাত্র সহজ স্বীকৃতিতে এই রহস্যের উদ্ঘাটন। স্বীকার করি তিনি নিত্য আবির্ভূত, চির-উদ্ভাসিত, পবন সত্য তিনি।

মানব-ইতিহাসের এই মহান পুরুষ বীণা খুঁট, বাস্তবতার পথে পথে তাঁর সন্ধানের সমাপ্তিতে অ্যালবার্ট হুইটজার তাঁর আশ্চর্য গ্রন্থে বলেছেন :

প্রতি মুহূর্তে আমাদের সামনে বীণাখুঁট আবির্ভূত হন, নামতারা পরিচয়হারা রূপে, যেমন একদা হুদ প্রান্তে তিনি পুনরাবির্ভূত হয়েছিলেন। সেদিন ওরা তাঁকে প্রথমে চিনতে পারেনি। আমরাও কি চিনতে পারি? সেদিনের মতো আজও তিনি আমাদের আহ্বান করেন, বলেন, অনুসরণ করে আমাদের। এ যুগের মানবের বা কর্তব্য, সে কর্তব্যের আহ্বান তিনি ধনিত করেন আমাদের হৃদয়ে। এই নির্দেশ রাজা আজ্ঞা,—এ আজ্ঞার প্রতিপালন মানবাত্মার ঐতিহাসিক অঙ্গীকার। তাঁর আজ্ঞা বারা পালন করে, তারা পণ্ডিতই হোক আর মূর্খই হোক, তাঁর নির্দেশিত পথে শত বস্ত্রাণ শত বন্ধুর বন্ধনার মধ্যেও তারা তাঁর নিত্য-উদ্ভাসিত মুক্তির দর্শন লাভে ধস্ত হয়। তাঁর অবর্ণনীয় লীলারূপকে তারা চিনতে পারে।

হুইটজার সেই চিরন্তন প্রভু বীণাখুঁটের সামনে আমাদের আবার এনে উপস্থিত করলেন, আমাদের জীবনের সংশয়-কালিমা মুক্ত প্রতিটি ভাবের মুহূর্তে যে প্রভুকে আমি চিনেছি, যে প্রভুকে আমি ভালোবেসেছি। আমার মনে হোলো আমার নিভৃত অন্তরের গোপন কথাটি বেন পাঠ করেছেন হুইটজার, সেই কথাটিই উজ্জল অক্ষরে লিপিবদ্ধ করে তুলে ধরেছেন আমার ধূসর দৃষ্টির সামনে।

হুইটজারের এই গ্রন্থ অপর একটি দিক থেকেও আমার মনকে অক্লরণ নাড়া দিয়েছিল। বীণার ঐতিহাসিক চরিত্র-চিত্র অকন-মানসে তিনি খৃষ্টীয়-সমাজের প্রথম শতাব্দীতে গিয়ে পৌঁছেছিলেন। সে যুগের খৃষ্টভক্তগণের অলৌকিকের প্রতি আকর্ষণ ও লীলাবিভূতির প্রতি বিশ্বাসকে তিনি অল্প কথায় এড়িয়ে যেতে চান নি। বীণার আত্ম পুনরাবির্ভাবের কথা ধর্মগ্রন্থের যেখানে যেখানে লেখা আছে, সেই সব লেখাগুলি তিনি পূর্ণাঙ্গভাবে আলোচনা করেছেন। খৃষ্টের প্রথম শিবাগণ অলৌকিককে যে ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন, হুইটজার পর্বত বস্ত্রে সেই অলৌকিক পটভূমিকা রচনা করেছেন তাঁর গ্রন্থে।

হুইটজারের এই রচনা পড়তে পড়তে আমিও আমার প্রথম জীবনে কিরে গেলাম, কিরে গেলাম আমার পিতা-মাতার কাছে, তাঁদের ঘনিষ্ঠ বিশ্বাসের আবেষ্টনীর মধ্যে। আমার পিতার ধর্ম-বিশ্বাসের কথা আমাকে গভীর ভাবে চিন্তা করতে হোলো, তার সঙ্গে আমার ধর্ম-বিশ্বাসের যোগসূত্র আমি রচনা করলাম।

আমার পিতামাতার বিশ্বাসের সঙ্গে আক্ষরিক ভাবে একান্ত হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। প্রতি পক্ষে আমার পিতৃদেব আমাকে লিখতেন বীণার প্রত্যক্ষ ভবিষ্যৎবাণী অচিরে সত্য হতে চলেছে, হুদ-আত্মার পবিত্রতা রক্ষা পাবে।

নেই। সেই আবির্ভাবের পথ চেয়ে তিনি বসে আছেন। শিশুর মতো সারল্য নিয়ে আমার পিতা বিশ্বাস করতেন যে, ঈশ্বর বহি ইচ্ছা করেন তাহলে এক লহমায় প্রকৃতির সব নিয়মকে তিনি বশ করে দিতে পারেন।

আমার পিতার ছিল শিশুজনোচিত আস্থা। সেরূপ আস্থার অধিকারী না হলেও আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতাম যে, এই বাস্তব সংসারের কেন্দ্রে এক অলৌকিক আনন্দ ভগ্ন বর্তমান। কেন না, সেই আনন্দের আশ্বাদ আমি পেয়েছি। এই মনুষ্য-ভাগ্যের মাঝখানে এক আত্মিক জীবনের প্রত্যাশা আমি করতাম, যে জীবনের এপার ওপার জুড়ে ঈশ্বরের অধিষ্ঠান, ঈশ্বরের পবন সঞ্জন করণার যে জীবন নব নব জীবনে অনুরাগ। আস্থার এই অবিনশ্বর অসীমতা নিয়ে কোনো সংশয় ছিল না আমার মনে।

আমার পিতৃদেবের বাহ্যিক চেহারাতেও প্রভু বীণার দেহচিহ্ন ছিল। খৃষ্টোপম চরিত্র প্রকাশ পেত তাঁর মুখমণ্ডলে। মুক্তিলাভা পরম প্রভু খৃষ্টের চরণে তিনি তাঁর সমস্ত বিশ্বাসকে সরল শিশুর মতো অকিঞ্চন হয়ে সমর্পণ করেছিলেন। এই চিরবিষমত আত্মদানে রূপান্তরিত হয়েছিল তাঁর চরিত্র, অপূর্ব-সুন্দর হয়েছিল তাঁর অন্তঃকরণ। খৃষ্টের পুনরাবির্ভাবকে আত্মবিক অর্থে নিয়ে তিনি যে ভুলই করুন না কেন, সমস্ত ভ্রমকে তিনি জয় করেছিলেন বিশ্বাস দিয়ে আশা দিয়ে প্রেম দিয়ে। তাঁর খৃষ্ট-নিবেদিত জীবন যে উজ্জলিত আনন্দ, অপরিমিত আশা ও উজ্জলিত ভক্তিতে পরিপূর্ণ ছিল, সেই আনন্দ, আশা ও ভক্তিকে আমার জীবনের বৃহত্তর কেন্দ্রে সঞ্চারিত করতে বেন পারি, এই কামনাই ছিল আমার।

আমার পূর্বজীবনের প্রতিটি অভিজ্ঞতাকে আমি পুনর্বার একে একে স্মরণ করতে লাগলাম। এই সমস্ত অভিজ্ঞতার সংযোগে মর্মমূলে বিশ্বাসের যে ভিত্তি রচিত হয়েছে, সেই ভিত্তির সুদৃঢ়তা আমি আবার বীরে বীরে পরীক্ষা করে দেখলাম। কেন না, বিশ্বাসের এই ভিত্তির উপরেই আমাকে নতুন করে প্রতিষ্ঠা করতে হবে আমার ধর্মের মর্মমন্দির,—ভিত্তিমূলের প্রস্তরকাঠিকে কোনো সংশয়ের দুর্বলতা থাকলে চলেবে না।

আরো একটি বিষয়ে আমি অ্যালবার্ট হুইটজারের কাছ থেকে শ্রেষ্ঠ সাহায্য লাভ করেছিলাম। তার নিজের জীবনের উদাহরণে

ডাঃ বঙ্গুর
মেসোক কার্ডিয়েল
নারীর স্বাস্থ্য, শক্তি
ও সৌন্দর্য বর্ধন করে
প্রথম প্রস্তুতকারক:
ডাঃ বঙ্গুর ল্যাবরেটরী লিঃ
কলিকাতা-৯

আমি উৎসাহ হইতেছিলাম। সমস্ত জীবন দিবে প্রতি যুহুর্তের কৰ্ম দিবে সুইটজার নিঃশব্দ নিঃসংকোচে প্রত্যক্ষ বীণকে অঙ্গসংগ করেছিলেন। প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল তাঁর, সঙ্গীতবেত্তা হিসাবে তাঁর ছিল দেশজ্ঞান। কিন্তু শিক্ষকতা বা সঙ্গীতশ্রষ্টার লোকসংগ বৃত্তি পরিত্যাগ করে তিনি ডাক্তারী পড়লেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সভ্য মানুষের অত্যাচার যে দেশের সলাটে গাঢ় থেকে গাঢ়তর কালিয়া লেপন করেছে,—চিকিৎসকরূপে সেবার বৃত্তি নিয়ে সেই গভীর মধ্য আফ্রিকায় তিনি যাত্রা করলেন। আফ্রিকার বিস্ময়কর অঞ্চলে ওগুই নদীর ধারে তিনি উপস্থিত হলেন ও ম্যালেরিয়া-বিক্ষণ্ড একটি গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নিলেন।

প্রতীচ্য সভ্যতার আওতায় স্তম্ভ প্রাপ্তে আফ্রিকার আদিবাসিগণের এই নগণ্য জনপদে সুইটজার রোগী ও যুযুঁদের সেবার তাঁর খুঁট-নিবেদিত সমস্ত জীবন উৎসর্গ করেছেন। খুঁটের পথে জীবনকে পরিচালিত করেছেন তিনি সমস্ত পার্থিব পাথেরকে পরিত্যাগ করে।

আফ্রিকার উচ্চ-মণ্ডলের গভীর অরণ্যের উদার নির্জনতার খুঁট উপস্থিতিকে অন্তরের একান্ত নিকটে অম্লভব করেছেন সুইটজার। ঈশ্বরের অলৌকিক নির্দেশ আজও তাঁর প্রতিদিনের কর্মধারাকে পরিচালিত করছে, আনন্দ-অভিভূক্ত করছে তাঁর প্রতি যুহুর্তের সেবারতকে। বীণের নামে অবজ্ঞাত দীন-সরিসের সেবার তিনি তাঁর সবগ্র জীবনকে দান করেছেন,—এই দানের আনন্দ তাঁর ব্যবহারিক জীবনের সমস্ত কৃচ্ছসাধনকে এক অনির্বচনীর গৌরবে ভূষিত করেছে।

সুইটজার মনে করেন,—খুঁট শুধু কোনো এক অতীত মনুষ্যচরিত্র নন, তাঁর পরিচর শুধু প্রাচীন নৃধিপত্রের অধারনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। প্রতি যুগের মানবাত্মার মন্দিরে তিনি বিরাজমান। তবু তাঁকে সন্ধান করতে হয় যুগে যুগে। এ সন্ধান সহজের পথে নয়,—যতো যুগ অতীত হচ্ছে, ততোই পথ হচ্ছে বন্ধুরতর, সন্ধানের বেদনা হচ্ছে তীব্রতর। প্রতি যুগে মানবসমাজের বীর অভিযাত্রীর দল তাঁর সন্ধান করে, তাঁর স্পর্শ পায়, পরম ভক্তি ও আত্মনিবেদনের মধ্য দিয়ে তাঁকে অর্জন করে। কোনো ভৌগোলিক সীমারেখার দ্বারাও এই অভিযাত্রীরা আবদ্ধ নয়, তাঁর সন্ধান, তাঁর পরিচর, দেশে দেশে। দেশাচারের লোকাচারের সমস্ত অর্গল তিনি ভেঙেছেন। তাঁর আবির্ভাবের পরমোপলব্ধির যে সন্ধানী তাকেও হতে হয় সর্ববন্ধন হীন। তিনি আসেন,—সমস্ত বিচার তর্ক ও বন্ধকে অতিক্রম করে তিনি আসেন, মনুষ্যচেতনার আপাত পরাজয়ের অন্ধকারের প্রাপ্তে আসন্ন বিজয়-প্রভাতের জ্যোতির্ময় বিভা ফুটে ওঠে তাঁর চরণস্পর্শে। তিনি মানব-সংস্কৃতির দিগন্ত অতিক্রমের পথ, তিনিই পথের প্রদর্শক। তাঁর মৃত্যুতে নবজীবনের সংকেত। তাঁর জীবনদান পুনরুজ্জীবনের অংকুর।

পরবর্তীকালে ইউরোপে গিয়ে কিছুদিন অ্যালবার্ট সুইটজারের সঙ্গে একত্র বসবাস করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। আমার মনে হয়, সাধু স্মরণ সি ও আপানের কাগাওয়া ছাড়া সুইটজারের স্মৃতি এতো বহিষ্ঠ খুঁটাসরণের অধিকারী আর কেউ এ যুগে হননি। তাঁর প্রেমোভাসিত আত্মত্যাগের কাহিনীর সঙ্গে আজ সমস্ত

পৃথিবী পরিচিত; তাঁর অননুকারণীয় খুঁটজন্মের কথা আজ কারো অজানা নয়। যে বীণকে তিনি সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে পূজা করে চলেছেন, তাঁর প্রত্যক্ষরূপ প্রতিবিম্বিত হয়েছে সুইটজারের চরিত্রে, যে চরিত্রে শিশুর সারল্য-সৌরভ নিত্য বিকশিত।

সুইটজারের গ্রন্থটি পাঠ করতে করতে আমি একটি বিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয় হলাম। বাংলাকালে পিড়িগুহে যে ধর্মশিক্ষা আমি পেয়েছিলাম, তাঁর পিছনে ঈশ্বরের অবশ্যই কোনো অভিপ্রায় ছিল। সেই শিক্ষার স্মৃতি আর সুইটজারের এই গ্রন্থ একত্রে আমার মনকে উদ্বেলিত করে তুলল। যতো সামান্য যতো অকিঞ্চিৎকরই হোক না আমার জীবন,—প্রত্যক্ষ বীণের সন্ধানে আমিও কি পথে বার হতে পারি না? প্রাচীন খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের অন্তরে যে অলৌকিক বিশ্বাস ছিল, আমার কৰ্মে ও প্রার্থনায় সেই বিশ্বাসকে কি পুনর্জাগরিত করতে পারি না? যুগে যুগে মানুষের বেধানে বেদনা, মানবাত্মার বেধানে নিপীড়ন, সেইখানেই খুঁটের আবির্ভাব। মানবভাগ্যের সেই বেদনা বন্ধনার মধ্যেই আমি আমার প্রভুকে সন্ধান করব। শুধু যুগের মন্ড্রে নয়, তাঁর প্রিয় কার্যের বন্ধ হয়েই আমি তাঁর উপাসনা করব। তাঁর নামে জীবনকে উৎসর্গ করব সর্ব মানবের সেবার। সেই হৃদয়ের ধারে তাঁর প্রথম শিষ্যরা প্রভুকে যেমন দেখেছিল, প্রভুর কথা যেমন শুনেছিল, আমিও কি আমার প্রভুকে উপলব্ধি করতে পারব না যেমনি হবে,—সর্বস্বহারা হয়ে সেবাসমুদ্রের তীরে পাড়িয়ে? আমিও কি শুনেতে পাব না তাঁর অমোঘ-অমৃত বাণী,—বৎস, অঙ্গসংগ করে আমাকে!

বহুধা-শিহরিত এই যুগ, রোগজর্জর এই পৃথিবী। সংশয় আর বেদনা, অবিশ্বাস আর বৈদন। খুঁটজন্মের প্রথম শতাব্দীতে প্রথম ভক্তগণের অন্তর পূণ্য আত্মার যে অপূর্ব গুণাবলীতে মণ্ডিত ছিল, সেই ভক্তি, সেই বিশ্বাস, সেই সারল্যকে আবার এ যুগে যদি প্রতিষ্ঠিত করা যায়, তবেই একমাত্র মঙ্গল। এ আমি স্থির বুঝেছিলাম, আমাদের আবার সেই প্রথম শতাব্দীর খুঁটান হওয়া প্রয়োজন।

শিশু উত্তেজনা ও বয়স অভিজ্ঞতার ফলে খুঁটের আদিম ভক্তমণ্ডলী পুনরাগমনের সমস্তাটির নিত্যন্ত সহজ সমাধান করেছিলেন। আমার সবল বিশ্বাসী পিতার মতো তাঁরাও প্রভুর কথার নিত্যন্ত আনন্দিক অর্থ করেছিলেন। কিন্তু তাই বলে খুঁটের পুনরাবির্ভাব মিথ্যা নয়। পাণ-কলুষিত মৃত্যু-বিষমস্ত ধরণীতে খুঁটের অলৌকিক অতীন্দ্রিয় স্পর্শে নবপ্রাণের ও নবপুণ্যের সঞ্চার,—এই বিশ্বাস খুঁটবিশ্বাসীর স্বদয়-কেন্দ্রের চিরঞ্জীব বিশ্বাস। এই বিশ্বাসই সাধুগণের স্নসমাচার। এই ধরণী শতকলুষ সমুদ্রে ঈশ্বরের রাজ্য,—এই রাজ্যের ঘোষণা করেছেন ঈশ্বরপুত্র মহামানব বীণ। বীণখুঁটের সমসাময়িক ভক্তগণ প্রভুর অতীন্দ্রিয় লীলার প্রকাশ দেখেছিলেন স্বচক্ষে,—প্রত্যক্ষ ভাবে অনুভব করেছিলেন যে, তাঁরা এই অলৌকিক স্বর্ণরাজ্যের অধিকারী। সেই স্বর্ণরাজ্যের প্রত্যক্ষ পুণ্যের অধিকারে তাঁরা ব্যাবিজর্জরকে সূহৃৎ করেছিলেন, অন্ধকে করেছিলেন চক্ষুমান। প্রসন্ন ছিল, প্রেমের উত্তরও ছিল, কেন না প্রভু খুঁট ছিলেন সর্বদা কাছাকাছি। ঈশ্বর-রাজ্যের দ্বার ছিল সামনাসামনি।

খুঁট সন্নিহিত ভক্তগণের অধুনা-বিরল বিচিত্র উদ্দীপনার পরিচর সাধুজন লিখিত স্নসমাচারের শেষের দিকের বর্ণনার স্মরণ প্রকাশ পেয়েছে। এমন স্পষ্ট ভাবে চিত্রটি আঁকিত হয়েছে যে, সমস্ত হৃদয়

যেন ফুটে উঠেছে আমাদের চোখের সামনে। সবুজ-তীরে প্রিয় শিষ্যগণকে বীণের শব্দ দর্শনমানের সেই অবিস্মরণীয় দৃষ্টি।

এই কথা সর্বত্র প্রচারিত হয়েছিল যে, বীণের প্রিয় শিষ্য যারা যাবেন না, বত দিন না প্রভু আসেন তত দিন প্রতীক্ষা করবেন। সেই জন্মে বীণের তরুণ পথযাত্রীগণের কাছে প্রকৃত কাহিনী স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করা প্রয়োজন হয়েছিল। জন সেই ঘটনা সম্বন্ধে লিখেছেন,—কিন্তু বীণ বলেননি যে, প্রিয় শিষ্য মরবেন না। তিনি শুধু অজ্ঞাত ভক্তদের বলেছিলেন,—আমি যদি ইচ্ছা করি যে এ আমার আগমন পর্যন্ত থাকে, তাতে তোমাদের কি?

আমরা আমাদের মনশ্চক্ষে কল্পনা করতে পারি, খৃষ্টের শেষ প্রত্যক্ষ শিষ্য তাঁর নব্বয় জীবনাবসানের দিনটি পর্যন্ত বুদ্ধ কণ্ঠে তরুণ শিষ্যদের কাছে খৃষ্টের অসৌক্যিক জীবনী শোনাচ্ছেন। পরম প্রভুর এই জীবনী তিনি শুনিয়েছেন শত সহস্র বার বত দিন না মৃত্যু এসে কণ্ঠস্থ করেছিল। প্রভু আসবেন, প্রভু আবার মরবেই অবতীর্ণ হবেন, এই বিশ্বাসের অন্তর্নিহিত শক্তিকে উপলব্ধি করা শক্ত নয়, এই বিশ্বাসের বলেই বাহ্যিক জগতের নিগড় শিথিল হয়,—যেখানে প্রভু বীণ নিত্যকাল অদৃশ্যভাবে অবস্থিত ঈশ্বরের সেই অনন্ত রাজ্যের আহ্বানে আকুল সাড়া দেয় বিশ্বাসী-আত্মা।

বীণখৃষ্ট অবিলম্বে আবার মরবেই পৃথিবীতে পুনরাবির্ভূত হবেন, প্রভুর প্রথম ভক্তগণের মধ্যে অটুট ছিল এই বিশ্বাস। খৃষ্টীয় সমাজে প্রথম যুগে এই বিশ্বাস যে দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল তা বোধ হয় ঈশ্বরেরই মঙ্গলময় অভিপ্রেত। সে যুগের খৃষ্টবিশ্বাসী নরনারীরা ছিল অতি সরল, অতি দীনহীন, কোনো বিরাট ঐতিহ্য ছিল না তাদের পিছনে। অবিশ্বাসী পুরুষ শক্তির হাতে যে প্রচণ্ড অত্যাচার তারা সহ করেছিল, সেই সহ্য করার শক্তি তারা শেষেছিল কোথা থেকে? প্রভু আবার আসবেন, আসার বেরি নেই,—এই ঐক্য আত্মাই সেই দীন খৃষ্টানের বুকে দিয়েছিল বল। যে কল্পনা নিতান্ত সহজ, যে আশা নিতান্ত বাস্তব; সে সংকেত নিতান্ত প্রত্যক্ষ তাই তখন প্রয়োজন ছিল, তাই সব অত্যাচারের অগ্নি পরীক্ষাতেও জ্বল হরনি তাঁদের অবচলিত খৃষ্টপ্রেম। সেই বিশ্বাসকে নিতান্ত স্থূল বিশ্বাস বলে অতীতের সেই অকুতোভয় খৃষ্টপথযাত্রীদের হেয় করার অধিকার আমাদের নেই।

বুদ্ধ জন উপদেশ দিয়েছেন, পৃথিবীকে প্রেম কোরো না, আকৃষ্ট হোয়ো না পাখি বসন্তনিচয়ের প্রতি। যদি কোনো ব্যক্তি এই নব্বয় পৃথিবীকে ভালোবাসে, পরম পিতার প্রেম থেকে সে বঞ্চিত হয়। কেন না পৃথিবীর বা কিছু সঞ্চয়—দেহের বাসনা, ইন্দ্রিয়ের লাগল ও মরজীবনের গর্ব,—এ সব পৃথিবীরই, ঈশ্বরের নয়। এই পাখি ফুরার ফুরায়, জুড়ায় জীবনের বাসনা কামনা,—কিন্তু

ঈশ্বরের কার্য যে করে সে চিরদিন জীবিত থাকে সে নিশ্চয়, মনে যোখো,—শেষের প্রের উপস্থিত।

শেষ প্রেরের ঘণ্টা বাজছে। এ যেন জীবন-মৃত্যুর এক চরম সন্ধিক্ষণ,—আর দেরি নেই,—যাব কি যাব না, নেব কি নেব না তোমার আশীর্বাদ, চলব কি চলব না তোমার আদর্শ পথে। নিঃশব্দ নিঃশব্দ করতে হবে মনকে এই মুহূর্তে। সংবৃত করতে হবে মেঘলা, আলোতে হবে অতিসারের বন্ধুর পথের স্তম্ভ-প্রদীপ, খৃষ্টের প্রেরের মূলে এই অবিলম্বে আত্মপ্রেরিতির সুরটি বাজছে। নানা-মুখের ঐক্যতান এই প্রের, কিন্তু তার মধ্যে মূল সুরটি স্তম্ভতন্ত্রীর প্রধান স্বাক্ষরের মতো। এই স্বাক্ষর যম ভাঙার, হুচিরে দেয় অলস স্বপ্নের মায়াজাল। খৃষ্টের পুনরাবির্ভাব স্বপ্ন নয় কল্পনা নয়—পরম সত্য। জীবনের যে কোনো মুহূর্তে সে সত্যের পরম প্রকাশ, ক্রুসের যুগপার্থে যে সত্যকে হত্যা করা যায়নি। এই ক্রুসের দ্বারা অমূল্যবর্তক তাদের প্রতি মুহূর্তে প্রেরিত হয়ে থাকতে হবে। কে জানে কখন প্রভু আবির্ভূত হবেন, বলবেন, অনুসরণ করে আমাদের। এই আহ্বান হয়তো বা মধ্য রাত্রির তিমিরাকারকে ভেদ করে কানে বাজবে, হয়তো বা সেই ভ্রমতীরের প্রেরার মতো নবোদিত সূর্যের আনন্দ-বীণায় ধ্বনিত হবে সে আহ্বান। একান্ত অপ্ৰতীক্ষিত মুহূর্তে স্পন্দিত হবে তাঁর চির প্রতীক্ষিত পদধ্বনি।

এই প্রতীক্ষার পরম অবসানে নবজীবনের সূচনা। পৃথিবীর আসক্তি, ইন্দ্রিয়ের অভিসার, নবজীবনের বাসনা কামনা মানবাত্মাকে পঙ্কু করে রাখে। কিন্তু সেই আহ্বান বার প্রাণে বাজছে, সে পঙ্কু গিরি উন্নয়নের শক্তি লাভ করে এক মুহূর্তে, অপঙ্কুত হয় তার সর্বত্র ভার। তার অন্ধকার স্তম্ভ-কল্পের মহাজীবনের নব উদীপনার আলোকবর্তিকা মুহূর্তে জ্বলে। তার আর কিছু থাকে না, কিছু সে সক্ষিত রাখে না পৃথিবীর জজ্ঞাল, তার সব কিছু গ্রহণ করেন প্রভু খৃষ্ট।

চূর্ণলতা ও সংশয়ের অন্ধকারে আচ্ছন্ন আমার ক্রিষ্ট অন্তরে আলোবাট খুইটজারের গ্রন্থ সেই আলোক-বাতিকাটি স্থাপন করল। তাঁর নিজের জীবনের উদাহরণ আমাকে ঠেলে দিল দীন দরিদ্রদের মধ্যে, দ্বারা সর্বহারী ও ভাবাহারী তাদের সঙ্গে দৃঢ় বন্ধ করল আমার আত্মার কথা। আমি আমার বইপত্র ফেলে আবার পথে বার হতে শুরু করলাম, ঘুরতে লাগলাম গ্রামে গ্রামে। সরল গ্রামবাসীদের সাহচর্যে মানবজীবনকে উপলব্ধি করতে শুরু করলাম। ক্রমে আমার মন বীরে বীরে একনিষ্ঠ বিশ্বাসের গৌরবে নিমগ্ন হয়ে উঠল। আমার স্তম্ভের মাঝখানে ভক্তি ও বিশ্বাসের বাতিকাটিতে পরম মঙ্গলময় পিতা আপন হাতে অবলিন ও আশা-প্রোজ্জল শিখাটি জ্বলে দিলেন। যে আহ্বানের জন্তে উৎকর্ষ হয়েছিলাম, সেই আহ্বান আমার প্রাণে এসে মিলিত হলো। [ক্রমশঃ।]

অনুবাদ :—নির্মূলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

ভারতের বৈশিষ্ট্য বলা করাই যদি ভারতের জাতীয়তার লক্ষ্য হয়, তবে ভারতের এই নব-জাতীয়তার সাধকেরা তাহাদের সাধনার এই সনাতন প্রকৃতিকে কিছুতেই উপেক্ষা করিতে পারেন না। ভারতের বৈশিষ্ট্য যে কি, ইহা বাহ্যিক বোঝেন এবং সর্বদা স্মরণ করিয়া চলেন, তাহারা সমগ্র ভারতের ঐক্য সাধনের লোভে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্যকে কখনই উপেক্ষা করিতে পারেন না। ভারতের এই বৈশিষ্ট্যের জ্ঞান প্রায় লোপ পাইয়াছে বলিয়াই আজ বাঙালী প্রত্যক্ষ বাঙালীকে কলিয়া, অপ্রত্যক্ষ ১৬ ভারতবর্ষ নামে কল্পিত বস্তু, তাহার পশ্চাতে ছুটিতে চাহে।—বিশিষ্ট পাল।



ভাটি পড়ার পরেই জোয়ার আসে। তেমনি ক'লকাতা মাঠের হকি লীগের সমাপ্তির সংগে সংগে বাইটন কাপের খেলা বেশ উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যেই শুরু হয়েছে। যদিও এখনও এর শেষ হয়নি। এবারকার বাইটন কাপের প্রতিযোগিতার সর্বসমেত ৪১টি দল যোগদান করেছে। এর মধ্যে বহিরাগত ১৭টি দল আছে। বাইটন কাপের ইতিবৃত্ত ও পর্যালোচনা আগামী সংখ্যার আলোচনা করব। এবার ক'লকাতার মাঠের হকি খেলার একটা সামগ্রিক আলোচনা করছি।

হকি

এ বছরের প্রথম ডিভিসন হকি খেলাগুলি দেখে মনে হয়েছে, কলকাতার হকি খেলার মান ক্রমশঃ নিম্নশুধী। খেলোয়াড়দের অল্পশীলন, অধ্যবসায় যেমন একান্ত প্রয়োজন তেমনি দেশের তরুণ খেলোয়াড়দের তৈরী করার ভার একান্তভাবে ক্লাব কর্তৃপক্ষদের। এ বিষয়ে যদি এখন থেকে ক'লকাতার ক্লাবগুলি তৎপর না হয় তা হ'লে ভারত অলিম্পিকের যে হকিতে একচ্ছত্র সন্মতি—সেই সিংহাসন থেকে নেমে পড়াতে হবে। পথ করে দিতে হবে হয় পার্শ্ববর্তী—পাকিস্তান বা অন্ত কাউকে।

এবার চ্যাম্পিয়ানসিপের গৌরব অর্জন ক'লকাতার অন্ততম শ্রেষ্ঠ দল মহামেডান স্পোর্টিং। চ্যাম্পিয়ানসিপের স্তর মহামেডান দলকে বিশেষ বেগ পেতে হয়েছে, অপর নিকট প্রতিদ্বন্দ্বী ইষ্ট-বেঙ্গল দলের কাছে। নিত্যন্ত দুর্ভাগ্য বশতঃ ইষ্ট-বেঙ্গল দল মহামেডান স্পোর্টিং-এর সঙ্গে খেলার যথেষ্ট ভাল খেলোও জয়লাভ করতে পারেনি। পেনাল্টি বলির অপব্যবহার, তাছাড়া বহু সুযোগের অপব্যবহার এ খেলার জয়লাভ করতে দেয়নি।

প্রথম ডিভিসনের ১১টি ক্লাবের মধ্যে সত্যই মহামেডান দল ভালই খেলেছে। অপরাজয়ের গৌরব নিয়ে এবারকার লীগ চ্যাম্পিয়ানসিপ লাভ সত্যই প্রশংসনীয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, মহামেডান দল গতবারে রাণাস আপ লাভ করেছিল। এটাই মহামেডান দলের প্রথম লীগবিশ্বস্ত নয়। ইতিপূর্বে ১৯৪৫ সালে মহামেডান দল লীগ বিজয়ের গৌরব অর্জন করে। এবারকার সমস্ত প্রতিযোগিতার খেলার মাত্র তিনটি খেলায় মহামেডান দল অসমর্থিত ভাবে শেষ করেছে। মহামেডান দলের পরই সামগ্রিক ভাবে ভাল খেলেছে ইষ্টবেঙ্গল দল।

এবার সর্বোপেক্ষ হতাশ করেছে কলকাতার অন্ততম খ্যাতনামা দল মোহনবাগান। গতবার পর্যন্ত উপর্যুপরি চার বার মোহনবাগান দল লীগ বিজয়ের গৌরব অর্জন করে এসেছিল। তাই অনেকেরই আশা কমিয়েছেন, এবারও লীগবিজয়ী হয়ে হকি লীগের খেলার

ইষ্টবেঙ্গল দলের বিরুদ্ধে পরাজয় বরণ করার পর খেলার মধ্যে শিথিলতা প্রকাশ পায়। এর পরই ইষ্টার্ন রেলদল ও মহামেডান দলের কাছে পরাজয় বরণ করার লীগ পাল্লার দৌড়ে পিছিয়ে পড়ে।

কলকাতা মাঠে যে সমস্ত খেলোয়াড়রা হকিকে তার স্ব-আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন, তাঁদের প্রত্যেকেরই খেলার মধ্যে ফুটে উঠেছে তীব্রপুণ্য। তাঁদের স্বাভাবিক ক্রীড়াকৌশল তাঁরা হারিয়ে ফেলেছেন। ভোলা চক্রবর্তী, হরিশদ গুপ্ত, কুড়িয়াস, গুরু, পিরারা সিং, কারো খেলাই চোখে লাগে না। দিন দিন তাদের খেলা নিম্নত হয়ে যাচ্ছে। সেইজন্য সর্বাপেক্ষ প্রয়োজন অল্পশীলন ও অধ্যবসায় খেলোয়াড়দের মধ্যে।

প্রথম ডিভিসন থেকে এবার দ্বিতীয় ডিভিসনে নেমে যাচ্ছে ক'লকাতার অন্ততম খ্যাতনামা দল ভবানীপুর ও তালতলা। গত কয়েক বছর আগেও ভবানীপুর কলকাতার হকি মরুমুখে যে আলোড়ন ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করতো তা দর্শকরা নিশ্চয়ই বিস্মিত হননি। ১৯৫৩ ও ১৯৫৪ সালে একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল ভবানীপুর দলের। ফুটবল থেকে নেমে বাওয়ার পরই হকি থেকে নেমে বাওয়ার মনে যাচ্ছে ভবানীপুর দলের একে একে নিবিছে দেউটি। ভবানীপুর দল এবারকার প্রতিযোগিতার প্রথম ১২টি খেলায় যখন মাত্র ১টি পয়েন্ট সংগ্রহ করল তখনই তারা অল্পমান করলো এবারকার প্রতিযোগিতার কলাকল সম্বন্ধে। এবং অত্যন্ত হতাশ হয়ে শেষ পর্যন্ত প্রতিযোগিতা থেকে সরে পড়ালো। অপর দল তালতলা ১৮টি খেলার মধ্যে মাত্র ৭টি পয়েন্ট লাভ করেছে। শেষ পর্যন্ত তালতলা এবং উরাড়ী দলের মধ্যে নেমে বাওয়ার পাল্লায় বেশ উদ্বেজনার সৃষ্টি হয়। শেষ পর্যন্ত ৮টি পয়েন্ট পেয়ে এবারকার মত উরাড়ী দল প্রথম ডিভিসন লীগ থেকে নেমে বাওয়ার চাত থেকে রেহাই লাভ করে।

আগামী বারে প্রথম ডিভিসন খেলার গৌরব অর্জন করলো আদিবাসী ও ঝাড়খণ্ড ক্লাব। দ্বিতীয় ডিভিসনে এবার চ্যাম্পিয়ানসিপ লাভের গৌরব অর্জন করলো আদিবাসী দল। আদিবাসী দলের ক্রমোন্নতি সত্যই প্রশংসার দাবী রাখে। আদিবাসী দল ১৬টি খেলার মধ্যে ২১ পয়েন্ট পেয়ে দ্বিতীয় ডিভিসন চ্যাম্পিয়ানসিপের গৌরব অর্জন করলো। অপরপক্ষে ঝাড়খণ্ড ক্লাব ১ পয়েন্ট পিছিয়ে যেতে অর্থাৎ ২৮ পয়েন্ট লাভ করে রাণাস আপ লাভ করলো। আগামী বারে এই দুইটি দলকে প্রথম ডিভিসন হকি লীগের আসরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দেখা বাবে।

আন্তঃ-কলেজ হকি

আন্তঃ-কলেজ হকি লীগের খেলার ২৩টি কলেজকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়। এবারকার চ্যাম্পিয়ানসিপ লাভ করেছে

সেট জেভিয়ার্স কলেজ। এবার নিয়ে মোট পাঁচ বার সেট জেভিয়ার্স কলেজ আন্তঃ-কলেজ হকি লীগের খেলার বিজয়ী গোঁরব অর্জন করলো।

তিনটি গুপের মধ্যে একটিতে সেট জেভিয়ার্স, একটিতে স্কটিশচার্চ ও অপরটিতে বি. ই. কলেজ চ্যাম্পিয়ানসিপ লাভ করে। এবার এই তিনটি গুপ চ্যাম্পিয়ানকে নক-আউট প্রথায় খেলিয়ে চ্যাম্পিয়ানসিপের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্কটিশচার্চ কলেজ প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ না করার বি. ই. কলেজ ও সেট জেভিয়ার্সের খেলায় সেট জেভিয়ার্স দল ১-০ গোলে জয়লাভ করে চ্যাম্পিয়ানসিপ লাভ করে।

অথ ষ্টেডিয়াম প্রসঙ্গ

ষ্টেডিয়াম নিয়ে মাসিক বহুমতীর পাতায় ইতিপূর্বে বহুবার আলোচনা করেছি। কম্পোজিট ষ্টেডিয়াম কিংবা একক ষ্টেডিয়াম সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এখন সর্বোপরি আলোচনার কথা ষ্টেডিয়াম হওয়ার আশার কথা।

কলকাতার নবনির্মাণিত মেয়র বি. কে. ব্যানার্জি ষ্টেডিয়াম সম্পর্কে সবিশেষ আগ্রহী হয়েছেন। বর্তমানে যে ষ্টেডিয়াম সম্পর্কে দাবী কমিটি গঠিত হয়েছে তার সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন শ্রী বি. কে. ব্যানার্জি। পশ্চিম বাংলার স্বাধীনতা ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় উদ্যোগী হয়েছেন। কলকাতায় ষ্টেডিয়াম হোক, এই দাবী নিয়ে এগিয়ে এসেছে বাংলা দেশের তরুণ ছাত্ররা। এই ষ্টেডিয়াম-বাজের হোতা ছাত্র-সম্প্রদায়। তারা যে ভাবে এগিয়ে এসেছে তা সত্যি প্রশংসনীয়। তরুণদের দাবী কোনমতেই প্রত্যাখ্যাত হতে পারে না বলে মনে হচ্ছে।

বার বার ষ্টেডিয়ামের কথা উঠেছে। পত্র-পত্রিকায় বিশেষ ভাল আলোচনা হয়েছে, কিন্তু প্রতিবারই কোন অদৃশ্য হাতের ইচ্ছাতে সমগ্র উত্তেজনার ববনিকা পতন ঘটেছে। সম্ভাব্যের মহারাজা, আজ থেকে দীর্ঘ দিন আগে কলকাতায় ষ্টেডিয়ামের প্রয়োজনের উপদেশ অমুভব করেছিলেন। রাজা, মহারাজী, ক্রীড়াঙ্গণতের দিকপালেরা, মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, প্রত্যেকেই সবিশেষ চেষ্টা করেছেন কলকাতায় ষ্টেডিয়াম তৈরী হোক। ক্রীড়ামোদীর রোদ-বৃষ্টির হাত থেকে সুজিলাভ করুক। খেলা দেখার সত্যকার নির্মল আনন্দ অমুভব করুক। কিন্তু হুঃখের বিষয়, শেষ পর্যন্ত কলকাতায় ষ্টেডিয়াম গড়ে ওঠেনি!

কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জীকৃষ্ণ মেনন ষ্টেডিয়াম নির্মাণের সবিশেষ আগ্রহ দেখিয়েছেন। রাজ্য সরকার এ বিষয়ে বিশেষ আগ্রহী।

কলকাতার মতন এত বড় শহরে একটা ষ্টেডিয়াম নেই, একথা অন্ত কোন রাজ্যের তরুণেরা হয়তো কল্পনা করতেই পারে না। ফুটবলের গীঠভূমি, হকির তীর্থক্ষেত্র—সেখানে ষ্টেডিয়াম নেই, এর চেয়ে লজ্জাকর ব্যাপার আর কি হতে পারে?

কলকাতায় ষ্টেডিয়াম নির্মাণ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের বিমাতা-স্বলভ ব্যবহার সত্যি আশ্চর্যজনক! তবু আশার কথা, রাজ্য সরকার শ্রী ঘোষকে পাঠিয়েছেন সোভিয়েট রাশিয়া ও চেকোস্লোভাকিয়াতে। শুধু আর্থিক সাহায্য নয়, উন্নত ধরণের ষ্টেডিয়াম গঠনের অন্ত কারিগরী সাহায্যের জন্ত। শোনা যাচ্ছে, পঞ্চাশ হাজার দর্শক বাতে খেলা দেখতে পারেন, তার উপযোগী করে একটি কম্পোজিট ষ্টেডিয়াম গঠন হবে।

অধরা

(Browning's "Love in a life" অবলম্বনে)

তপতী চট্টোপাধ্যায়

মন যে আমার ছুটে বেড়ায় চাই গো তোমার চাই
প্রতিধ্বনি উঠলে ওঠে কই গো তুমি কই
আঁড়াল থেকে ডাক দিয়ে বাও তাই তো আমার চাওয়া
ডাক দিয়ে তাও লুকিয়ে বেড়াও বার না তোমার পাওয়া।
জীবন-কমল-কোরক 'পরে
তোমার চরণ-চিহ্ন পড়ে
সে যে আমার হাতছানি দেয়
তাইতো পরাণ ছোটে,
তোমার পদধ্বনির পরে
আমার এ মন লোটে।

আসবে বধন তুমি আমার হৃদয়-কমল 'পরে
এমন হবে আলোয় আলো তোমার স্পর্শ ভরে,
তোমার পায়ের অলঙ্কারাগ কমল হয়ে ফুটে
ধরে ধরে উঠবে ভরে আমার বক্ষপুটে।
তোমার অলক-স্তরঙ্গভার
হিয়ার মম পুষ্পিত হার
পূর্ণ করে জীবন মম
যেলবে জীবির তারা,
নীরব তোমার মৌন হাসি
সকল ক্লাস্তিহরা'।

কিন্তু আমার হিয়ার আলো কই গো আমার প্রেম
শান্ত পথে ক্লাস্ত চরণ খোজে যে বিভ্রাম,
মনকে বলে প্রবোধ দিয়ে
শান্ত করে আমার প্রিয়ে
বলে আমার খুঁজবে বলে তাইতো তোমার বাঁচ

অক্ষন ও প্রাক্ষণ



বিবাহিতা স্ত্রী পার্শ্বতী সখী

শ্রীঅমিয়রাণী দাস

ইহা বিংশ শতাব্দীর নয় বা উনবিংশ শতাব্দীরও নয়।

ইহা যুগের প্রথমাবস্থা হইতেই চলিয়া আসিতেছে। সংসার-স্থিতির ও প্রাণিস্থিতির যুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে যে, পুরুষ ও স্ত্রী দুইটি ভিন্ন প্রকৃতির সৃষ্টি। শুধু মানব সমাজে নয়, পশু-পাখী কীট-পতঙ্গদের মধ্যেও এই ব্যবধান আছে। সঠিক জ্ঞাতালিকা দেখিলে তাহাতেও হয়ত দেখা যাইবে যে, এই দুইটি পরস্পরের সংখ্যা প্রায় সমভাগে আছে। হয়ত ইহা স্বয়ং ভগবানেরই ইচ্ছা।

এই স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে যে কে বড়, তাহা আজ পর্যন্তও গবেষণায় সঠিক ভাবে বলা যায় নাই। কেহ বলেন পুরুষ, কেহ বলেন স্ত্রী; কিন্তু অনেকের হিসাবে পুরুষ বড় বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। দেবাদিদেব মহাদেব হইতে সংসারের স্থিতির নিকট প্রাণীর মধ্যেও দেখা যায় যে, পুরুষ জাতির দৈহিক বল বেশী এবং ঐ বিক্রমেও পুরুষজাতি বড় বলিয়া বলা যাইতে পারে। কিন্তু স্ত্রীজাতির যে বল তাহা দৈহিক নয়, সেইজন্যই সাধারণ চক্ষে স্ত্রীজাতির শক্তির পরিচয় সহসা ধরা পড়ে না। স্ত্রীজাতির শক্তির পরিচয় দেয় পুরুষের ভিতর দিয়া। সেইটি কম শক্তির পরিচয় নয় বরং পুরুষজাতি হইতে অধিক বলিয়াই গণ্য করিতে হইবে।

ভর্তুক হিসাবে বা সত্যিকার হিসাবে যদি গুণাগুণের বিচার করা যায়, তবে মনে হয় কোন জাতিই কম নয়। দুই-জনেরই সমশক্তি। ভর্তুক হিসাবে বলা যাইতে পারে যে, যদি পুরুষ বড়ই হয়, তবে ঐ

থাকিলে তবে পুরুষ তাহার নিকট আসিতে পারে না। হইতে পারে পুরুষ জাতি দৈহিক বলে শক্তিমান; কিন্তু ঐশ্বরিক শক্তিতে স্ত্রীজাতির জয়, গঠন ও জীবন।

কবিশ্রী স্ত্রীজাতিকৈ শক্তিজাতি বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। তাহার কারণ নিম্নস্থই কিছু আছে, তাহার দক্ষণ স্ত্রীজাতিকৈ ঐ শক্তিজাতির নামে পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে। কারণ উল্লেখ না করিয়া কবিদের আখ্যা লইয়াই ইহা জোর করিয়া বলা যাইতে পারে যে, স্ত্রীজাতি, শক্তি-জাতি। তাহার যে শক্তি আছে, তাহা পুরুষ-জাতির নাই।

বীজ ব্যতীত অঙ্কুর হয় না। সেই বীজ যে জীব-পুরুষের নিকটই থাকিলে, এই যুক্তি বাতিল করিয়া দিয়াছেন বর্তমানে বিজ্ঞানিগণ। জীব-পুরুষের বীজ ছাড়াও যে প্রাণীর সৃষ্টি হইতে পারে, তাহা বিজ্ঞানীদের গবেষণায় পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু ঐ স্ত্রী ছাড়া সম্ভব প্রণব হয় কি না তাহা আজ পর্যন্তও বিজ্ঞানীদের হাতে ধরা পড়ে নাই বা ভবিষ্যতে পড়িবে কি না তাহাও সন্দেহের কথা। এই বিষয়ে যেখানে প্রাণিস্থিতির প্রথম সূত্রশক্তিতে স্ত্রী-জাতির শক্তি পুরুষ-জাতি হইতে অধিক বলিয়া মনে হয়, সেইখানে জয় হইতে মুক্তা পর্যন্ত জীবন মাধ্যমে যে স্ত্রীজাতি পুরুষজাতি হইতে শক্তিতে কম, তাহা গ্রহণযোগ্য নয়।

একটি জীবনের মধ্যে কয়টি শক্তি আসিতে পারে? বিবেচনা করিয়া দেখিলে মনে হয়, সেইখানে চারটি শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, যথা—মস্তিষ্কের, দেহের, মনের ও অন্তরের (ঐশ্বরিক) *। এই চারটি শক্তির মধ্যে দৈহিক শক্তিতে স্ত্রীজাতি পুরুষজাতি হইতে কম হইতে পারে। কিন্তু অন্তাত্ত তিনটিতে হয় বেশী, নয়ত পুরুষ জাতির সমভাবে আছে, কম নয়।

উপরোক্ত বিষয়গুলি ছাড়াও আরও এমন অনেক নজীর আছে যে, স্ত্রীজাতি পুরুষজাতি হইতে জীবন-শক্তিতে কম নয়, তাহার অনেক প্রমাণ ইতিহাসে, পুরাণে ইত্যাদিতে রহিয়াছে।

স্ত্রী ও পুরুষজাতি হিসাবে বলা হইল। এখন বক্তব্য হইবে ব্যক্তিগত ব্যাপার লইয়া, জাতি ছাড়িয়া যদি ব্যক্তিগত হিসাবে স্ত্রী ও পুরুষ বলা যায়, তাহা হইলে সাধারণত বিবাহিত ব্যক্তিদের বিষয়ই বলা যায়। স্ত্রী বলিতে বুঝায় বিবাহিতা এবং পুরুষ বলিতে বুঝায় স্ববকের পরবর্তী জীবন। ঐ স্ত্রী প্রথমাবস্থায় কন্যা বা বালিকা, দ্বিতীয়াবস্থায় স্ত্রী, তৃতীয়াবস্থায় গৃহিণী ও চতুর্থাবস্থায় হন সর্ব সাধারণের বৃদ্ধ-মা। আর পুরুষ বালক অবস্থা হইতে যুগে পরিণত হয়, তার পর তৃতীয়াবস্থায় হয় সংসার-কর্মী, চতুর্থাবস্থায় সর্বজননের উপদেশকারী বৃদ্ধ বলিয়া গণ্য হয়। সেই জন্যই স্ত্রী বা পুরুষ বলিলে বিবাহিত বলিয়া সাধারণত ধরিয়া লইতে হয়। স্ত্রী হিসাবে তাহার প্রথম জীবন বা প্রথমাবস্থার কথা উঠে না এবং পুরুষের কথাতেও প্রথম দুই অবস্থার কথা উঠে না।

বিবাহিত জীবনের স্ত্রী ও পুরুষের কথাই হইবে এখানে আলোচ্য বিষয়। কারণ, সেই সময় হইতে দুই জনেরই আসল জীবনের কাজ আরম্ভ হয়। জীবনের ধারার কার্যসূচনা, জীবনের গঠন ও

* যদি এ বিষয়ে কেহ ভিন্ন মত পোষণ করিয়া থাকেন, তবে এই পত্রিকার দায়বদ্ধতা জানাইলে বাবিত হইবে।

পরিচালন সম্পর্কে প্রয়োজনমতে সংসারী হইয়া, কর্তব্য ও ধর্মের কর্তব্য-পথ বাছিয়া লইতে হয় সেই সময় হইতে।

বিবাহ বস্তুটি কি, তাহার আলোচনার অনেক আছে, তবে এখানকার আলোচনা তাহা নহে। দুইটি বিবাহিত জীবনের পরস্পরের সম্পর্কের বিষয় লইয়া হইবে আলোচনার বিষয়। যখন “বিবাহ” বলিয়া কথা হইয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে ইহা সংসারের মনুষ্য-সমাজ ব্যতীত অন্তরে নয়।

বিবাহের পর বালিকা হয় স্ত্রী, তার পর হয় মা, সন্তানের জননী। ঐ সন্তান বহু দিন না বয়স্ক হয়, তত দিন থাকে মায়ের কাছে, লালিত পালিত হয় মায়ের আদর-বৃত্তে, শিক্ষা পায় মায়ের গুণের। বয়স্ক হইলে থাকে না ততটা মায়ের সাথে ঘনিষ্ঠ সন্ধর্ভ। বয়স্ক সন্তানগণ পাইয়া থাকে তখন মায়ের শুভ আশীর্বাদ। সন্তানগণের বিবাহ হইলে মা পাইয়া থাকেন কিছু মানসিক বিশ্রাম, যদি তাহারা থাকে ভাস পবিত্রেশে। নচেৎ মা পাইয়া থাকেন আরও বেশী মনের কষ্ট। সন্তানের সঙ্গ মায়ের ঘনিষ্ঠতা থাকে সন্তান বয়স্ক বা বিবাহ হইবার পূর্বে পর্যন্ত। তত দিন থাকে সন্তানের উপর মায়ের অক্লান্ত পরিশ্রম। সন্তান যখন বড় হয়, বৃদ্ধি হয়, স্কুল ও সামাজিক শিক্ষা পায়, তখন আর মায়ের উপর ততটা টান থাকে না, আন্তে আন্তে সরিয়া পড়ে মায়ের কাছ হইতে। মায়ের সঙ্গে

ঘনিষ্ঠতার নিখিল হয় তখন হইতে। বিবাহের পর মেয়ে সন্তান বার তাহার স্বামীর কাছে, আর পুত্রব সন্তান বার উপাচার্যের উপায়ে স্থানান্তরে। মা থাকেন তখন গৃহিণী হইয়া নিজের স্বামীর পার্শ্বে। প্রায় শতকরা ১১ ভাগই দেখা যায় যে, পুত্রব সন্তান কার্যোপলক্ষে তাহার স্ত্রী-সন্তানাদি লইয়া থাকে ভ্রমস্থানে, মা থাকেন তখন কোন এক দূর দেশে। কেন এমন বিজ্ঞি বা নিয়ম, সেই-ই হইয়াছে সংসারের স্ত্রী-পুত্রবের ধর্ম।

যদিও পুরাণে আছে যে, ‘জননী জন্মভূমিষ্ঠ বর্গাদপি পরীক্ষ্যসী,’ গুরুজনদের মধ্যে জননী সর্বশ্রেষ্ঠ; কিন্তু তাহা আধ্যাত্মিক হিসাবে। স্ত্রী পুত্রবের কর্তব্যজীবন ও কর্তব্যজীবনের দ্বারা পরীক্ষা করিলে ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, বাস্তব জীবনে পুত্রবের নিকট তাহার মায়ের কর্তব্য থাকে সংক্ষিপ্ত, ঘনিষ্ঠতা থাকে জীবনের একাংশ, সম্পর্ক থাকে ভক্তি ও আধ্যাত্মিক হিসাবে।

মেয়ে সন্তান কাটার তাহার মায়ের কাছে। তাহার জীবনের প্রায় এক-পঞ্চম ভাগ সময়, আর পুত্রব সন্তান থাকে তাহার এক-চতুর্থাংশ সময়। বাকী জীবন কাটার নতুন জীবনের সঙ্গে—স্ত্রী ও পুত্রব হিসাবে বা স্বামী-স্ত্রী হিসাবে। সন্তান যতদিন থাকে মায়ের কাছে, ততদিন থাকে তাহার আদর, শিশুবাংসলা ভাব, মনের কোমলতা।

মনের কথা

“এমন সুন্দর গহনা কোথায় গড়ালে?”

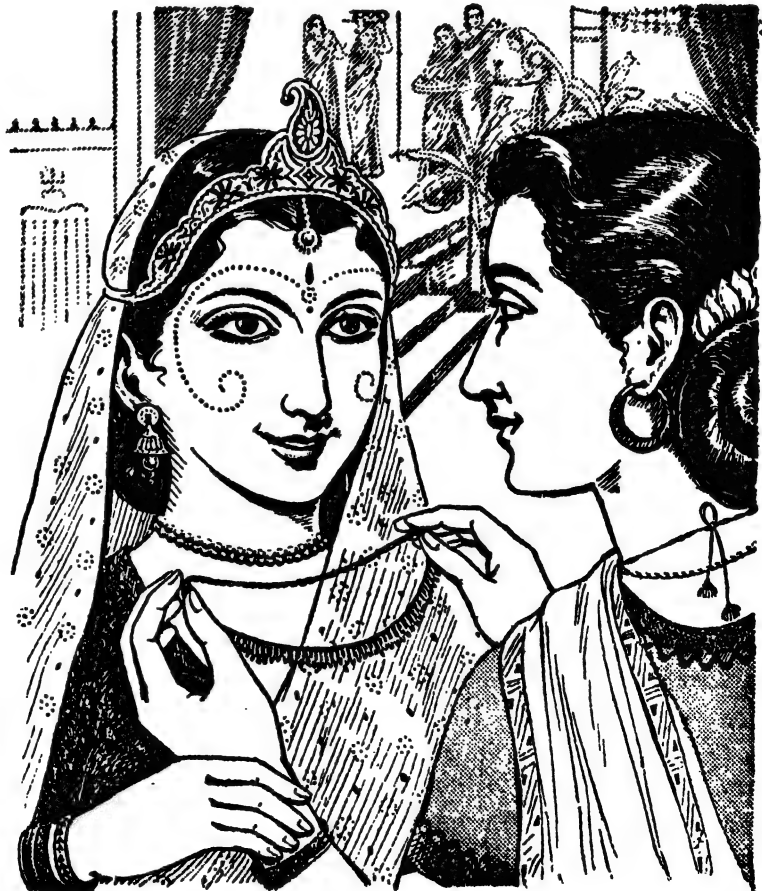
“আমার সব গহনা মুখার্জী জুয়েলার্স দিয়াছেন। প্রত্যেক গিনিষটিই, ভাই, মনের মত হয়েছে—এসেও পৌছেছে ঠিক সময়। এঁদের বুদ্ধিজ্ঞান, সততা ও দায়িত্ববোধে আমরা সবাই খুসী হয়েছি।”

মুখার্জী জুয়েলার্স

গিনি সোনার গহনা নির্মাতা ও রত্ন-১

বহুবাজার মার্কেট, কলিকাতা-১২

টেলিফোন : ৩৪-৪৮১০



তার পর বধন হয় বরষ, পাইয়া থাকে নূতন জীবন ধারণের প্রণালী, তখন থাকে না তাহার সেই শিশুসুন্দর চরিত্র। জীবন নির্বাহের ধাতুস্থায়ী সময়ে হইয়া টাঠ উগ্র, সময়ে হইয়া থাকে কোমল, জীবন পরিকল্পনা ও পরিচালনার সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিতে থাকে। জী ও পুরুষ এই দুই জীবনের মধ্যে কে বেশী করিয়া সামঞ্জস্য রাখিতে চায় বা চেষ্টা করে, তাহাও বিবেচনা করিয়া দেখিবার বিষয়; সেই ধারা চলিয়া থাকে এক দুই বৎসর নয়, মৃত্যু পর্য্যন্ত।

বিবাহের পর নূতন জীবনের সঙ্গে মিলিত হইয়া, জীবনের নান বজার রাখিয়া, উভয় জীবনের সুখ-দুঃখের ভাগী হইয়া, নিজের সন্তানের উপর কর্তব্য পালন করিয়া, জীবনের প্রায় তিন অংশ সময় চালিয়া নেওয়া যে কাহার পক্ষে হইতে পারে, কোন শক্তিতে সে সেই ভাবে জীবন বাপন করিতে পারে, তাহা বিশেষ ভাবে বিবেচনার বিষয়। এই বিষয়ে সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে, ইহা পুরুষের পক্ষে কঠিন, ইহা স্ত্রীজাতি ভিন্ন অল্প লোকের পক্ষে অসম্ভব। সেই সময়ে, সেই বয়সে, মা থাকেন না সঙ্গে। তখন স্ত্রী হইয়া থাকে মায়ের পুরুষ সন্তান—স্বামীর জীবনের সঙ্গী। তাহাকেই দেখিতে হয় স্বামীর জীবনের সুখ, লইতে হয় স্বামীর কষ্টের অংশ, করিতে হয় স্বামীর গ্লান-জাত সন্তানের গুশ্রাব। নৌকার হালের মত রাখিতে হয় তাহার লক্ষ্য। মায়ের হাত হইতে লইয়া যায় স্ত্রী তাঁহার পুত্রের সমস্ত ভার। এই স্ত্রী-জীবন যে কত কষ্টের, তাহা সেই স্ত্রী-জাতিই কেবল বুঝে। মা তাঁহার পুত্র সন্তানকে গড়িয়া থাকেন, কিন্তু স্ত্রী তাঁহাকে সম্পূর্ণ রূপ দিয়া থাকেন। সেই জন্তই বিবাহিত পুত্র সন্তানের নামের সঙ্গে থাকে না মায়ের নাম, থাকে তাঁহার স্ত্রীর নাম। ইহা আজিকার নয়, পুরাণেও পাওয়া যায় ইহার সাক্ষ্য। শিবের নাম উচ্চারণ করিতে মুখে আসে পার্বতীর নাম, যুধিষ্ঠির-জীমার্জনের নামের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে রহিয়াছে তাঁহাদের স্ত্রী দ্রৌপদীর নাম, রামাবতারের ইতিহাসের প্রসিদ্ধ জীবনী ব্যাখ্যা রহিয়াছে সীতাদেবীর। পরমপুরুষ রামকৃষ্ণদেবের স্রীমা সারদা দেবী, মহাত্মা গান্ধীর জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশে রহিয়াছে কস্তুরী বাঈ গান্ধীর জীবন। শুধু এদেশে নয়, পৃথিবীর সর্বত্রই এই একই ধারা, জীবনের কর্তব্য হিসাবে, ধর্ম হিসাবে, পুরুষের নামের সঙ্গে বিশেষ ভাবে জড়িত থাকে তাঁহার স্ত্রীর জীবন। ইতিহাসের পাতা পড়িলে পাওয়া যায় ইহার অনেক দৃষ্টান্ত। মায়ের নামের চাহিতে স্ত্রীর নামই পরিস্ফুটিত হইয়া থাকে বেশীর ভাগে। পুরুষ হিসাবে তাহার স্ত্রীর বিষয়ে একাগ্রতা দেখাইয়াছেন দুইজন, দিল্লীর মোগল বাদশাহ জাহাঙ্গীর শাহ আর ইংলণ্ডের সম্রাট অষ্টম এডওয়ার্ড। স্ত্রী-জীবনের ইতিহাসে থাকিবে এই দুই মহানের আদর্শ চিরস্বরণীয়।

যেহে ও স্ত্রী-জীবনের সার কি? সংসারের উপর সব্বতা কোথায়? তাহার নিজের অস্তিত্ব হিসাবে কি আছে? মায়ের বাড়িতে মায়ের আশ্রয়, স্বামীর ঘরে স্বামীর কর্তব্য ও ধর্ম কার্যের সহায়তা। তাহার নিজের বলিয়া থাকে কেবল নাম, স্বামীর নামের সঙ্গে স্ত্রীর নাম, কর্তব্য হয় স্বামীর জীবনের সঙ্গে নিজের জীবনের মিলন রাখা। স্বামীর ঘরের সুখ-সুবিধার আশা ও

কমতাহুবারী ব্যবস্থা করা ও সাহায্য করা, স্বামীর সন্তানদের শালন-পালন করা, স্বামীর মৃত্যু পর্য্যন্ত সেবা গুশ্রাব করা। স্ত্রীর নিজের জীবনের অস্তিত্ব থাকে এই সব কাজের মধ্যে, নিজের সুখ আনন্দ সব ছাড়িয়া দেয় স্বামীর জীবনের মধ্যে, স্ত্রীর নাম পাওয়া যায় স্বামীর জীবনের মাধ্যমে।

পুরুষ সন্তানের কাজে কাছে তাঁহার মায়ের বা তাঁহার স্ত্রী-জীবনের মূল্য কতটুকু, ধর্ম ও কর্তব্যজীবনে পুরুষ বা স্ত্রীর মূল্য কতটুকু, এই দুই জীবনের পৃথক ভাবে যুক্ত ভাবে আর কেহ ঘনিষ্ঠতার ভাবে কেহ আছে কি না, তাহা লিখিত বিষয়গুলি হইতেই স্পষ্ট ভাবে বুঝা হইতে পারে যে, কাহার শক্তি কতটুকু—পুরুষের না স্ত্রীর?

একটি নির্জলা ভ্রমণ কাহিনী

ইন্দুমতী ভট্টাচার্য্য

কাঁকড়ীপের উদ্দেশ্যে ডায়মণ্ডহারবারের পথে। দু'দিকে উন্মুক্ত

প্রান্তর, সবুজ আর সবুজ—দূরের ধূমায়মান বনরাজিতে বিলীন হয়েছে নীল আকাশের কোল। ধানকাটা সারা হয়ে গেছে—খড়ের গোড়াগুলো খালি কান্তের দস্যুতার নিষ্করণ ভাবে জর্জরিত হয়ে অপস্রুত-সর্ব্বের হওয়ার লজ্জার কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে আছে মাঠে। মাঝে মাঝে দু'টো-একটা কড়াইন্তুটি আর খেসারীর ক্ষেত—খেলাঘরের যেন নয়নবিহীন পুরুষ সবুজ আর চমৎকার নীল অথবা শাদা রংএর ছোট অথচ অপূর্ণ ফুল বৃকে নিয়ে।

দূরের নারকেল গাছগুলো যেন বেড়া দিয়ে বেঁধেছে এই সব দেবার মাঠকে, চুকতে দেবে না কাউকে। তাই মাথা তুলে আছে আকাশে অষ্টপ্রহর নাড়ছে, মাথা অনবরত, না, না, না, প্রবেশ নিষেধ, নিষেধ নিষেধ।

পাকা রাস্তার বাঁ হাতে সরু রেলের লাইন পথের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছেই চলেছে। মাঝে মাঝে ইলিশান—সবই যেন খেলাঘরের। আর ডানহাতে রাস্তার সঙ্গে পাল্লা বেঁধে চলেছে সরু ঝাল একটানা ভিত্তিরিরে টলটলে জল নিয়ে। দু'-একখানা শালতি বাঁধা রয়েছে এখানে-ওখানে।

মাঝে মাঝে গ্রাম অর্থাৎ কয়েকটা চালাবাড়ীর সমষ্টি—চাষীরা সেই জলের ধারে জাঁটি করে বাঁধা খড় আছড়ে ধান বার করছে। সোনারং-এর খড়ে গাদা আলো করে বেঁধেছে এক এক জায়গাকে। নিকোনো নিটোল উঠানে ছেলে কোলে করে দাঁড়িয়ে আছে চাষী-বৌ।

একটিমাত্র বাঁশ ফেলা পুলের ওপর দিয়ে করছে কেউ কেউ আনাগোনা বড় রাস্তায়। ভারী সূর্যের লাগে বেগতে—একটার পর একটা ছবি যেন, খালি ছবি। বাঁদের ভালবাসি তাদের এনে দেখাতে ইচ্ছে করে, একা দেখে তৃপ্তি হয় না মনটা কেমন কেমন করে। মাঝে মাঝে হাটা রাস্তার ধারে, তরিতরকারী আর ভাব—ভাবের রাজত্ব যেন।

কথা ছিল ডায়মণ্ডহারবারে গিয়ে হণ্ট করা হবে একেবারে কিন্তু বিধি বাম। একটা গ্রামের কাছাকাছি এসে বাস বিগড়ে বসল। বাক। তবু সামনে গ্রাম রয়েছে একটা ডানহাতি। নেমে পড়া গেল। অল্প দিকে বাঁট আর বাঁট, কেবল বাঁট।

এ ছোট প্রাণে হুকে ছায়াবেলা এই শান্তির নীড়ে বাবার লোভ সামলাতে পারা গেল না। কিন্তু হায়! বাঁশের পুল পেরোন হবে কেমন করে? বাঁশের পুলের কাছে সকলকে জড়ো হ'তে দেখে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল একদল বৌ, গিন্নী, ছেলেমেয়ে। একটা কালো রং-এর গলার বৃত্ত বঁাধা কুকুরও বেরিয়ে এসে এই অনধিকার প্রবেশোত্তর অদৃষ্টপূর্ব আধুনিকাদের দেখে তারস্বরে চীৎকার করতে লাগল।

একজন হাসিখুশী বয়ীসী এগিয়ে এসে বলল, এসো না মা, এসো। কি করে বাব?

কেন? এই পুল শেরিয়ে?

ওরে বাবা, মরে বাব—সবাই টেচিয়ে উঠল একসঙ্গে।

কেন, ভয়টা কি? এই তো আসবে সড়, সড়, ক'রে, বলে এক নিমেষে সেই সড়, সড়িয়ে এপারে এসে হাজির হ'ল। তখন হুঁচকার জনের সাহস হল—হিলতোলা স্লিপার সকলের পায়ে—তাই হাতে নিয়ে বাঁশে পা ঘষতে ঘষতে হুঁচকার জন কারক্লেপে উৎসাহে কোনরকমে। ওপারে বৌদিরা তো হেসে অস্থির—ছেলেমেয়েগুলো তো দুরো-দুরো হৃৎক হাততালি দিতে আরম্ভ করল। বীরস জাগলো তখন সকলের মনেই, সবাই তৎপর হ'ল তখন বংশবিহারে।

সুখমা মজা করুক সব চেয়ে বেশী—আত্মক পথ গিয়ে আর এগোতেও পারে না, পেছোতেও না—বীতিমত্ত কারা সুর-বপাং ক'রে ওর হাতের কাচবসানো লক্সাই স্লিপার পড়ে গেল জলে।—হায়, হায়, হায় করে ও-ও বৃষ্টি পড়ে এইবার! সকলের বুক চিপ, চিপ, করতে লেগেছে।

ওপারের একটি বছর দেশেকের মেয়ে এসে উদ্ধার করল ওকে—হাত ধ'রে ধ'রে নিয়ে গিয়ে।

বাবা, বাঁশের পুল পেরোন এত! এ যে মহা প্রহানের পথ যে বাবা:

ওপারের ওরা বহু সমাদর করল। এসো মা, বসো মা—এই যে চিড়ে কোটা হ'চ্ছে, খাওগে—ছেলেদের ডেকে ডাব চিরে দিই মা, বোসো—ইত্যাদি অনর্গল ব'লে। কি পরিভার পরিচ্ছন্ন নিকোন উঠোন, ঘরদোর, টেকিশাল!

দড়ির দোলনার শুইয়ে রাখা খোকা আব নিকোন উল্লুর পাড়ে কুতুলী পাকিয়ে শুয়ে থাকা বেড়ালটা পর্যন্ত যেন আনন্দের উৎস এক একটি। উঠানে বিছান খান শুকুচ্ছে—দাওয়ার উঁচু চৌকিতে বসে তিনমাথা এক হয়ে বাওয়া এক বৃদ্ধ—নলিতে, কে গো। বলে সাড়া নিল।

একটা বিরাটকার শুঁতুল গাছ খুঁকে পড়ে পাহারাওয়ার মত দৃষ্টিতে যেন বাড়ীটার অভিসন্ধি দেখবার জন্য উদ্ভূত হয়ে আছে—তাই বাড়ীর এক পাশটা কি ছায়াশীতল।

বসব বসব করা হচ্ছে এমন সময় ছাইভার ডাক দিল আমাদের, এখনই যেতে হবে—কাজেই সেই সন্ধ্যার আতিথেয়তার সুরোগ গ্রহণে পূর্ণচ্ছেদ ফেলে উঠতে হ'ল—ও মা, সে কি কথা মা, চললে একুশি!

শ্রী, আসব আবার—আবার আসব বলে বেরোন হল।

প্রবহার ভিজে ডাবডবে স্নানবার জুতো একটি ছেলে উদ্ধার

করে দিয়েছে ইতিমধ্যে। এবার ওরা একটু দূরে একটা 'অনারাসে' পার হবার পুলে নিয়ে গেল আমাদের—ভাতে তিনটে বাঁশ আছে—এখান দিয়ে মাল বায় কি না তাই এটা এত চওড়া, বলল গিন্নী।

বাবা! এত চওড়া! পুল পার হতেও আমাদের পৌঁছ মাসে গায়ে ঘাম বেরোল।

আবার বাত্মা। বেলা তখন অনেক। আবার সেই যোহের অজ্ঞান মাথিয়ে দেওয়া দিগন্তবিসারী মাঠ আর মাঠ হৃদিকে—আর মারে মারে গ্রাম—দৃষ্টিসুখকর প্রসঙ্গময়।

কথা হল যে এবার যে হাটটা পাওয়া যাবে সেখানে খেয়ে একটু চা-টা খাবার চেষ্টা দেখা যাবে। কাজেই—সামনে ডান হাতি খালের ধারে একটা চালা—একটা সাইনবোর্ড কাত মেয়ে রয়েছে, তার উপর কি যেন লেখাও রয়েছে তাতে।

এতগুলি জীব নিয়ে বাগকে ধামতে দেখে অনেকেরই দৃষ্টি পড়ল এদিকে—ও মা! হুঁ মিনিটের মধ্যে যে সেই চালাখানার চালে উঠল একটা লোক! নীচে ঝাঁড়াল আর একজন—সাইনবোর্ডখানা ঠিক করে বসিয়ে দেওয়া হ'ল—আদর্শ হিন্দু হোটেল—অনেক খদ্দেরের সমাগম সম্ভাবনার মুখ শুঁজড়ে পড়ে থাকা সাইনবোর্ডের এই কপাল ফেরা।

বীণাদি' তখন গল্প শ্রুত করলেন—এটা কি রকম হোটেল জানেন?

কি রকম? কি রকম? সমস্বরে বলে উঠল সবাই।

তখন বীণাদি' আরম্ভ করলেন—এতো একখানা চালাওলা ঘর দেখছেন, একটা চালা বিছানা শুতে পাতা আঁহ নির্ধাৎ—ভাতে একটা কোল-বালিশের মত লম্বা মাথার বালিশ। যে হোটেল বাবে, ম্যানেজার জিজ্ঞাসা করবে—কাত, না চিং?

সে আবার কি? আমরা জিজ্ঞাসা করি।

কাত মানে কাত হ'য়ে শোবে, না চিং মানে চিং হ'য়ে শোবে।

এ কথা জিজ্ঞাসা করার অর্থ?

হানীভাব। কাৎ হ'য়ে শুলে এক আনা ভাড়া, চিং হ'য়ে শুলে দুই আনা।

জানবে কি ক'রে, কে কখন চিং হচ্ছে?

সারা রাত ম্যানেজার কাম পাহারাওয়ার বসে থাকবে আর চোচাবে—২নং চিং—৮০, ১০নং চিং—৮০, এই রকম আর কি—

হো-হো ক'রে হাসতে হাসতে নামা হ'ল বাস থেকে। খালটা আগাগোড়া গেছে, এখানে ওপারে বাবার জন্ত বাঁধানো পাকা সাঁকো একটা। সাঁকোর ওপরেই নানান নিধি, ডাব তো আছেই—ভেতরে চায়ের দোকান দুটো-চারটে, কিন্তু বাত্মা করছে চা আর বাত্মে ক'রে করছে, তা দেখেই চা-তেষ্টা গলাতেই মেয়ে ফেলতে হ'ল।

এখানেও চিড়ে কোটা হচ্ছে কিন্তু কলে—হী-হী করে আঙন ফলছে আর পাহাড় পাহাড় চিড়ে কোটা হ'য়ে বাচ্ছে নিমেষে—আমাদের এদিকে কখনও দেখা যায় না এসব, বানের রাজঘে ভিন্ন ব্যবস্থা।

একটু পরে আবার বাসে ওঠা। কিন্তু গাড়ী যে ঠাঁট নেয় না আর—কি বুদ্ধিল!

ভিড় জমে গেল এবার। হাটের ভিড়, চারিদিকে বাসের—

নানা যত্নবোঝার পর সাব্যস্ত হ'ল বধন এটা বাস নয় গল্পের গাড়ী, তখন অপমান আর সইতে না পেয়েই বোধ করি অচল বাস সচল হ'য়ে উঠল।

ডায়মণ্ডহারবারে বধন পৌঁছান গেল, তখন পাঁচটা।—নামলায়।

সামনে গজার সে কি রূপ! সেই প্রলয়ঙ্করী গজার দিকে তাকালে ভয় করে—আবার বিষয়ে মন স্তব্ধ হ'য়ে যায়—কত জল, কত জল। আর বিশ্বপ্রাসী ক্ষুধা নিয়ে বেন তীরভূমি গোত্রাসে গিলে খেয়ে চলেছে গজা, সর্বনাশী বাকসী! মনে হয়, সব গিলে থাকে, সব!

কত ব্যত, কত অর্থব্যয়ে বাঁধবার সংবত করবার চেষ্টা করা হয়েছিল পাগলকে—কিন্তু সে অটহাসি হেসে টুকরো টুকরো করে অবহেলে ঘুলোর লুটিয়ে দিয়েছে সে বাঁধন—তাঁধে তাঁধে করে নাচেছে আবার!

ওই দূর দিগন্তে অস্ত যাচ্ছে সূর্য্য, লাল টুকটুক, বর্ণনা করা যায় না এমন রং নিয়ে—ওপার থেকে এপার পর্য্যন্ত সিঁদুর ঢালা একটা হিলিবিলা কাটা পথ—বেন স্বর্গে বাবার ডেউখেলান সিঁড়ি।

এমনি অন্ধুত, এমনি ভাবার অতীত, এমনি আকাঙ্ক্ষার বস্ত—কিন্তু দূর থেকে উপভোগ্য, কাছে বাবার নামে ভর!

কিন্তু অন্ধকার হয়ে আসছে এদিকে—কাকদ্বীপ চলুন, কাকদ্বীপ চলুন, সকলে পীড়াপীড়ি করলেও খামখেয়ালী বাসের ওপর নির্ভর করে তা চলে না কিছুতেই, অতএব ফেরা।

শীতের সন্ধ্যা, দেখতে না দেখতে অন্ধকার কখন এসে বেন ঘিরে ফেলল মাঠ, পথ, চারিবার—শুধু দূরের গ্রামে গ্রামে একটা আদটা টিমটিমে আলো আর কাছে দূরে জোনাকীর মিটমিটানি ছাড়া অন্ধকার, সব অন্ধকার!

একটা বিরাট গাছতলার এসে ধাঁচা—চ করে খেমে পড়ল বাস।—তবু গাছতলার!

তারপর আর চলে না—ডাইভার, মিস্ত্রী গলদঘর্ষ, তবু চলে না—কিছুতেই না—এদিকে রাত ঘন হয়ে আসছে—এক ঘণ্টা, দুঘণ্টা কেটে চলল, বাস চলে না।

লোকালয় অনেক দূরে—এখান থেকে হেঁটে আশ্রয় খোঁজাও পাগলামী। পাবলিক বাস যাচ্ছে মাঝে মাঝে। তাহাতে চড়ে বাক্সইপুরে যেতে পারা যাবে এখান থেকে ২১২২ মাইল—তারপর বাস বদলে বেহালা, সেখান থেকে এসপ্রানডে, তারপর গন্তব্যস্থল। নানা ভজকট—আমাদের বাসে জিনিষপত্রও রয়েছে—তার ওপর এই তেপান্তরের মাঠে ডাইভার আর মিস্ত্রী বেচারীকে ফেলে বাওয়া সেও বেন কেমন। তাই বতক্ষণ খাস ততক্ষণ আশ করে বসে থাকতে থাকতে রাত সাড়ে ন'টা।

লাঠি পাবলিক বাসও চলে গেল বোধ হয়। বাড়ীতে কি ভাবনা সব ভাববে—আর রাতে যে আর ফেরা যাবে না, তাও স্থিরনিশ্চয়—তখন নাকে কান্না আরম্ভ হল প্রায় সবাইকার।

রাতে না কিলে কার বাড়ীর লোক যে কি করবে—ভাবনার কার বাড়ীর লোক হাটফেল পর্য্যন্ত করবে, তারও কিরিস্তি শুনতে শুনতে কান ঝালা-পালা আর বলতে বলতে মুখ ব্যথা করতে লাগল।

দূরের টিমটিমে আলোতলো সব নিকটে লাগল একে একে।

অচিরেই হয়ত সবই নিবাবে শুধু করাল মুখ ব্যাদন ক'রে দু'দিন থেকে এগিরে আসবে অন্ধকার আর শুধু অন্ধকার।

আশে-পাশে হ'চার জন করে লোক জমেছে। কোঁড়হলী হ'য়ে দেখছে, উঁকি-ঝুঁকি মারছে। গুন গুন করছে। একটা টর্চের আলো ফেলতে ফেলতে মাঠ পেরিয়ে দুটো লোক এল, বমদুত।

বাদের গায়ে গয়না ছিল তাঁরা সব খুলে কমান্দে বেঁধে বুকের মধ্যে রাখল। গয়না পরার সখ কেন হ'য়েছিল এই বিজ্ঞার দিতে দিতে।

কি করা যার? কোথায় বাওয়া যার?

রাগুদি জিজ্ঞাসা করলেন, ঐ লোকদেরই অনেক ইতস্ততঃ করে (সম্বোধনটা কি করবেন অনেক ভেবে ভেবে ঠিক করে ইলিশ মাছের নৌকার মাঝিদের বা ব'লে সম্বোধন করা হয়, রাগুদি বেছে নিলেন সেই সম্বোধনই) কত্না ও কত্না, এখানে বাবুদের বাড়ী আছে? (ভেবেছিলেন রাগুদি বধন কোন উপায়েই হবে না তখন অস্ত্রতঃ কোন ভদ্রলোকের বাড়ী গিয়ে রাতটুকুর মত আশ্রয় নেবেন)।

না।

কত দূরে আছে?

এখান থেকে দু'কোশ, আড়াই কোশ।

দমে গেলেন রাগুদি, জিজ্ঞাসা করলেন আবার।

কাছাকাছি গ্রামের নাম কি?

মোজার ঠেস।

রাগুদি, চূপ। অস্ত্র সকলের অভিযোগ প্রবল হ'য়ে উঠেছে এবার।

কেন পাবলিক বাস ধরা হোল না আগে।

হায় রে! ধারাপাই যদি হ'ল বাস সেই আদর্শ হিন্দু হোটেলের কাছেই কেন হ'ল না বাণাদির সেই কাত, ১০ আর চিং ৮০ দিয়েও না হয় কোল বালিশে মাথা গোজা যেত। অথবা সেই অতিনিঃশ্বাস গিন্নীর বাড়ীর সামনেই বা কেন হল না—এই ঝগরে পড়ার থেকে যে বাঁশের পুল পেরোন ঢের ভাল ছিল।

হায় হায় করতে করতে বাঁজল' সাড়ে দশটা। বাইরের অন্ধকার আর কোঁড়হলী সেই কতাদের কেন্দ্র ক'রে কত উদ্ভট ভয়ংকর কল্পনা যে পাগল ক'রে দিতে লাগল মনকে।

আর আশা নেই—কিন্তু নেই—বড় করে নিঃশ্বাস পড়ল বুক থেকে রাগুদির।

কিন্তু হয়ত সকলের মনের আকুল প্রার্থনায়ই একখানা বাস আসতে দেখা গেল—গ্যারেজে ফিরছে।

বেঁধে, বেঁধে, বেঁধে—সকলে ছিটকে পড়ে বাস থেকে ঝাঁড়ান হ'ল রাঙায়—যদি না থাকে! যদি না থাকে!

ডাইভার হুকচকিয়েই থামাল নিশ্চয়—ডাকাত পড়ল নাকি।

আমাদের জিনিষপত্রের কথা মিস্ত্রী আর ডাইভারকে বড়ের বেগে বুঝিয়ে দিয়ে দয়ামায়া আর না ক'রে ডাবল ফেরার সিজল জারি ক'রে বাক্সইপুর।

সেখানেও সার্ভিস বন্ধ হ'য়ে গেছে—তবে ঐ ভাগিস গ্যারেজে ফেরার নিয়মটা আছে—তাই বাজা বেহালা—আবার সেখান থেকে এসপ্রানডে—কিন্তু তারপর? বাড়ী ফেরবার লাঠি ট্রেনও তো হাওড়া ছেড়ে ব্যাণ্ডেল পৌছে বাসি হ'য়ে গেছে! একলা নোকলা হ'লে না হয় আত্মীয়-স্বজনের বাড়ী ওঠা যায়, এত রাত্তিরে অশোধিত



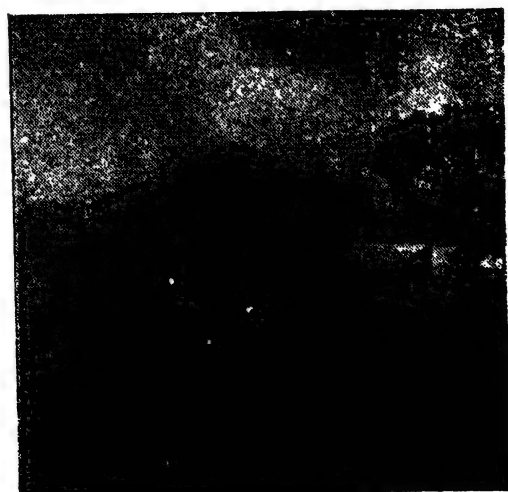
দিলওয়ারা যুঁড়ি

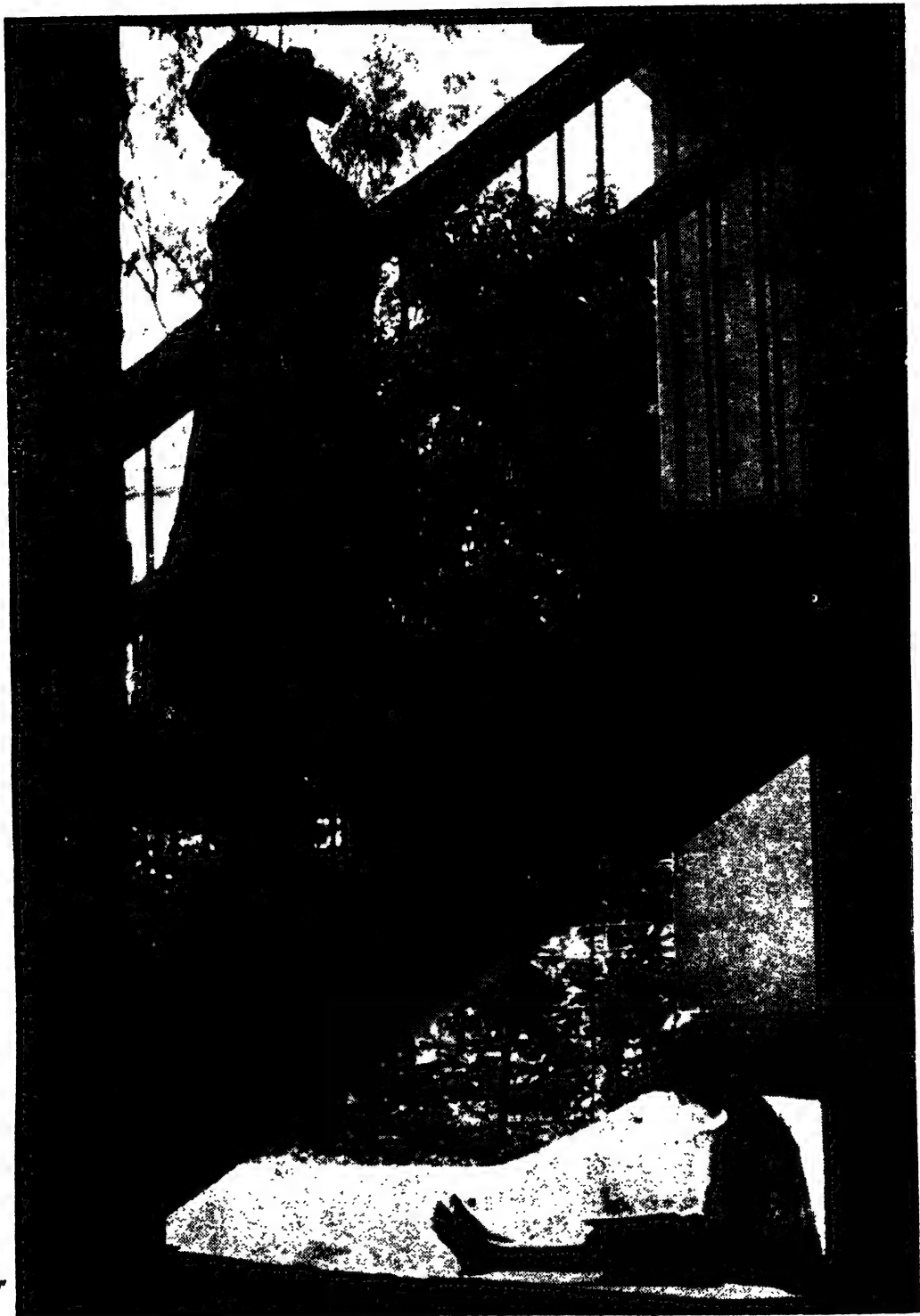
—অসিত দাশ



কডেসাগর লোক (রাজস্থান)

—দিলীপকুমার ব্রুথোপাধ্যায়





সাজসজ্জা

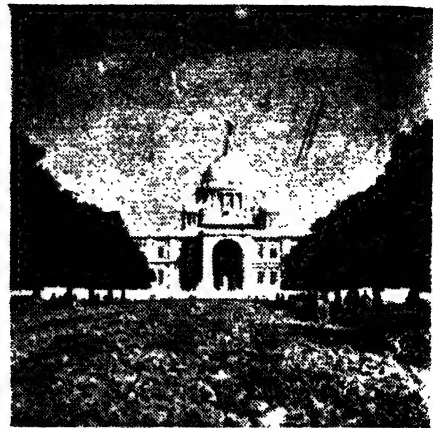
—দীপেন অধিকারী





খসরুবাগ (এলাহাবাদ)

—কমলেশ দ



ভিক্টোরিয়া

—অমিতকুমার সরকার

খাতের লোভে

—বহু বন্দোপাধ্যায়



হ'লেও। কিন্তু এই সংকোপাক নিয়ে। যতই বলা হোক খাব না, খাব না—শুধু তোমাদের বাইরের ঘরটাতাই বসে বসে রাতটুকু পুইয়ে নেব—তারা কি তা শুনবে?—কোলকাতা সহরে পরমা ফেসলে যত রাত্রিরই হোক খাবার হয়ত মিলবে কিন্তু শোওয়া? এই প্রচণ্ড শীতের রাত্রিরে? একটা মাত্র লোক এলেই বা শুতে দেবার বাড়তি বিছানা থাকে ক'টা বাড়ীতে? কিন্তু এসপ্লানেডে এক দফল মহিলা দাঁড়িয়ে থাকা তো যায় না। প্রথমে ঠিক হ'ল হাওড়া ষ্টেশনের ওয়েটিং রুমের কাটিয়ে দেওয়া হবে রাত—কিন্তু বড় দুষ্টকটু লাগে সেটা—

রাগুদি' বললেন। চলুন বউবাজারে আমাদের ব্যাঙ্কে—সেখানে বসে-বসেই না হয় কাটিয়ে দেব রাতটা। তবু একটা আশ্রয়। কিন্তু ব্যাঙ্কের দারোয়ান তো চেনে না আমাদের। খুলবে কেন গেট অত রাত্রিরে? কথাটা যুক্তিযুক্ত বটে।

তবু চেষ্টা—আর সাড়ে বায়টা তো বেঞ্চে পেছে, আর রাত কতটুকুই বা—না যদি গেট খোলে দারোয়ান তখন দেখা বাবে, বলে আবার পাড়ি সেই বউবাজারে।

যা ভাবা গেছে তাই—নেপালী দারোয়ান হস্তভঙ্গ—তালাবন্ধ গেটের ওপার থেকে সে কোন কথায় কান দেবে না।

রাগুদি তখন ম্যানেজারকে ফোন করে অল্পমতি নিতে বললেন দারোয়ানকে। সে স্বাক্ষর হয়ে ভেতরে গেল।

ভাগ্যক্রমে বাঁশরী বলে একজন কর্মচারী কার্যগতিকে সেদিন বাড়ী যেতে না পেয়ে তেতলায় শুয়েছিলেন। দারোয়ান বুদ্ধি করে নিয়ে এল তাঁকে। সব শুনে গেট খোলালেন তিনি।

ব্যাঙ্কের পথের ওপরের বড় হল ঘরটা হ'ল কার্নিচারের শো-রুম।

রাতের মত শুধানেই থাকতে হবে। কবিরই আর দাঁড়াবার মত ক্ষমতা ছিল না—দারোয়ানের খাটিয়ার, টুলে, সিঁড়িতে যে যেখানে পেয়েছে বসে পড়েছে ইতিমধ্যে।

শো-রুমের ভেতরে আবার একজন দরজা বন্ধ করে পাহারা দিচ্ছে—কুস্তকর্ণ। দরজা থাকিয়ে থাকিয়ে চোঁচিয়ে চোঁচিয়ে গলা ভেঙ্গে বাবার বোগাড় বাঁশরীর আর দারোয়ানের।

অনন্তকাল পরে জাগলেন অবশেষে খুচুকন্দ।

তখন আর কথাবার্তা নয়—সেই সবত্বসজ্জিত চকচকে নয়ন-বিমুগ্ধকর বহু মূল্যবান সোকার আর গদী পাতা খাটে গুঠা বিনা বাক্যব্যয়ে।

বাঁশরীর আতিথেয়তার তুলনা হয় না অত রাজেও। চা-খাবারের ব্যবস্থা করলেন সঙ্গে সঙ্গে চেনা দোকানের দোকানদারকে জাগিয়ে।

তারপর বাকী রাত। শো-রুমের নিশ্চল আসবাবগুলোর ওপর সচল সচল মডেল হয়ে। কাচের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে নিশাচর দু-চার জন—পুলিশ ও—হয়ত বিষয়ে দেখছিল দাঁড়িয়ে। হুচোখের পাতা একও করিনি আমরা। এই অভিনব অভিজ্ঞতা, অভাবনীয় ভাবে রাত্রি যাপন—বাড়ীর সকলের হুশিয়ার কথা ভেবে তা সম্ভব ছিল না।

রাগুদি' একেবারে সামনেরই সোফাটাতে শুয়েছিলেন—রাতার ওপরে এক অতিপরিচিতা ফিল্মষ্টারের বিরাটকার ছবি আলোর নিচেই। ভাবছিলেন যার ছবি সে কি স্বপ্নও ভাবছে তার ছবির দিকে পলক না ফেলে তাকিয়ে রাত কাটাচ্ছে কেউ! রাগুদি' তাকিয়েছিলেন বটে কিন্তু ভাবছিলেন অনেক কথা। ভাবছিলেন উচ্চশিক্ষিতা, অতি আধুনিক, রোজগেরে হলেও মেয়েরা মেয়েই, বেশবোয়া হওয়ার উপায় নেই, হওয়া যায় না—নানা জুজুর ভয়ে তটস্থ হয়ে থাকতে হয় সর্বদা, বাড়ীতে বকুনি খাওয়ার ভয়েই ভোকাঠ হয়ে রয়েছে ক'জন!

সবাই চুপচাপ। মাঝে মাঝে একজন হয়ত বলছে—কি বুঝোতে পারে বাবা সব, এর মধ্যেও বুঝছে? তখন সবাইকার একসঙ্গে সারা মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে, এ অবস্থার বুঝছে এ অপবাদ সহ করতে সকলেই নারাজ। অমনি আবার এর ওর নাম ধরে ডাকাডাকি হাসি, খানিকটা গল্প একটু; আর রাগুদি'কে কেপানো ও কত্যা ও কত্যা, বাবুদের বাড়ী আছে এখানে? এ গ্রামের নাম কি কত্যা? মোল্লার ঠেস। মোল্লার ঠেস—হাসি আর হাসি এখন।

ভোর চারটের আবার বাঁশরী। পত্রপাঠ হাবিসন রোডে গিয়ে ট্রাম ধরে হাওড়া ষ্টেশন।

তারপর সারা ট্রেন কার কি মনে হচ্ছিল তার ইতিহাস আর কার বাড়ী গিয়ে কি হবে, তারই ভাবনা আর ভয়।

কবিরকু জিজ্ঞাসা করলেন রাগুদি'কে—কাকতীপে কি দেখলেন? কাক? না দীপ?

দুই-ই উত্তর দিলেন রাগুদি'।

অর্থাৎ?

অর্থাৎ মাস খুবলানোর আশঙ্কা আর অর্ধে সমুদ্রে একটু দীপ।

ভুল কাকতী চট্টোপাধ্যায়

হয়তো ভুল করেছি আমি,

হয়তো একই ভুল তুমিও করেছ।

সেই ভুল যদি সত্যই ভুল হয়

তা'হলে, রবি শশী তারা ভুল।

ভুল 'বউ কথা কও' পাখির গান,

সাপেরের প্রতি তটিনীর অল্লাবগও

ভুল, আর ছুঁমি আমি, এ জীবন-বোঁধন সবই ভুল।

কিন্তু ভুল নয় হৃদয়ের অকীর আবেগ

চোখের কোণে তীর স্বপ্নের এলোমেলো মেঘ।

ভুল নয়, বিদ্রোহের চকল প্রেমণী,

হরিণীর কালো চোখে মুহূর্তীন জয়ের উৎসব

বিনিময় বসন্ত রজনীতে।

ওগো ভুল নয়,—

এই জীবন-বোঁধন ভুল নয়।



[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

মনোজ বসু

এগারো

ফুলগুলায় গাভের উপর হোটেল। টাপুরেবাটা অল্পের সেখান থেকে। জগা বলাই ও হর বড় ই এইখানে উঠেছে। রেটটা কিছু বেশি এই হোটেলে, জনপ্রতি এক সিকি এক এক বেলায়। তবে শেট চুক্তি। এবং তামাক ও মাংসের তেল ফ্রী। কোন খন্দের রাড্রে থাকতে চাইলে একটা মাহুরও দেবে, সে বাবদ কিছু লাগবে না।

রেটের কথা শুনে হর বড় ই আঙ-পিছু করছিল। বলাই হাত ধরে টানে : এসো দিকি। মা বনবিবির আলীদাদ থাকে তো তিন জনের তিন সিকি নিয়েও ওদের জিনে যেতে দেবো না। তিনটে পাতা করবে বলাই ঠাকুর মশায়। দেখা থাক।

বাহুন ঠাকুর মালিকের কাছে এই তথ্যের ব্যাপার বলে থাকবে কিছু। এর পরে দেখা গেল, খাওয়ার সময়টা খুণ তিনি সামনের উপর দাঁড়িয়ে। বলাইর আরও রোখ চড়ে যায়। ভাত দিয়ে ঠাকুর ডাল আনতে গেছে, ইতিমধ্যে মুণ সহযোগে সমস্তগুলো ভাত সাপটে দিয়ে সে বসে আছে। বাটিতে ডাল ঢেলে দিয়ে আবার ভাত আনতে গেছে, বাটির ডাল চৌও করে এক চুকে ঘেঁরে মিল। এক খন্দের নিয়েই নাস্তানাবুহ বাহুন ঠাকুর। মালিক রাগে গরগর করছে। বলে : খাঁড়ি-মুহুরি দশ পরসা সের হয়ে গেছে। আর ডাল পাবে না বাপু!

হর বলে, কোন হোটেলে তো এ নিয়ম নয়। ভাত আর ডাল নিয়ে কেউ কবাকবি করে না। খন্দের সব ভোগে বাবে এমনধারা করলে।

হোটেলওয়াল জবজি করে বলে, তাদের ডালে মাল থাকে কতটুকু? বড় জোর মালসাধানেক ডাল বাঁধে; আর বড় গামলার ফ্যানে-জলে শুলে রেখে দেয়। গামলার ফ্যানে হাতা করে ডাল ঢেলে আছা করে ছুঁটে দেয়। বাস, হয়ে গেল। তারা কি অন্য দেবে না, এমন ডালে খরচাটা কি?

বলাই তাড়াতাড়ি বলে, থাকগে, ডাল কে চার। ভাত হবে তো? আর মুণ? মুণ না হলেও চলবে, শুধু ভাতই সই।

মুণ-ভাতই চলল। হোটেলওয়াল চমৎকৃত হয়ে দেখছে। জগার আনন্দ ধরে না। ঈ, বাহাদুর বলি বলাইকে। হুটুহুটু

রেট সম্বন্ধে লোকটার চক্ষু কপালে উঠে গেছে। হাসি চোপে জগা জিজ্ঞাসা করে, এমন এক নজরে কি দেখেন মশাই?

লোকটা বলে, চোখে তো ওর বাইরেটা দেখছি। টিপে দেখতে ইচ্ছে করছে, চামড়ার নিচে বোধ হয় এক কুচি হাড়মাস নেই—শুধুই খোল। তুলো ভরার আগে পাশবালিশের খোলের মতন।

দেই পরসা দিনের পর থেকে হোটেলওয়াল লোকটা আর এমন ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে না, ঘোরাক্ষরার মধ্যে এক একবার উঁকি দিয়ে যায়। চোখ মেলে ব্যবসার ডাহা সর্বনাশ দেখতে ভয় করে বোধ হয়।

খাওয়ার পরে পরসা মিটিয়ে নেয়, এবং পানের খিলি দেয় খন্দেরদের। সেই সময় জিজ্ঞাসা করে, ক'দিন আছ আর তোমরা?

জগা ভালমাহুরের মতো বলে, কাজ মিটলে তবে তো বাড়ার কথা! পনের-বিশ দিন লাগবে। বেশিও লাগতে পারে। ভয় নেই, যে ক'দিন আছি, তোমার হোটেল ছেড়ে অন্য কোনখানে নড়ছি নে।

আমি তো মুণ-ভাত খাওয়াচ্ছি, অন্য সব হোটেলে দেদার ডাল দেয়, ভবু বাবে না? ঐ রসময় চক্কোতির ওখানে বাও। বড় বড় মাহুরের দাগা—

জগা বলে, উঁহ, তুমি যে মাহুর ভাল। তোমার ঘরের দাওয়ারটা আরও ভাল। ঠাণ্ডা হাওয়া দেয়। শুয়ে সুখ আছে।

সেই রাড্রে শুতে গিয়ে মাহুর খুঁজে পায় না। গেল কোথা?

হোটেলওয়াল বলে, দেখ কোন দিকে পড়ে আছে। বাতাসে হয় তো বা গাভের কোলে নিয়ে ফেলেছে। কি করব, বাড়তি মাহুর মাহুরে ক'টা রাখতে পারে বলাই?

হর বড় ই তখন বলে, ধুলোর উপর শুইয়ে না দাড়া। বের করে মাহুর। আজকেই দেখ। সকালবেলা আমরা চলে যাবি।

ঠিক? তুমি মুহুরি মাহুর—কথা দিচ্ছ কিছ। ছোঁড়াগুলো এখন কি বলে, ওরা বললে বিশ্বাস করতাম না।

হ্যাঁ, বলছি আমি। নিশ্চিত হয়ে মাহুর বের করে দাড়া। টোলক আজ বিকেলেই পাবার কথা। হয়ে উঠল না। ছাউনির কাজ রাতের মধ্যে শেষ করে রাখবে, ভোরবেলা দিয়ে দেবে।

হোটেলওয়াল বলে, পুরানো লোক তুমি, অনেক দিনের

ভাসবাসাবাসি। এ-রকম ধর্মের হোটেলে কোন আক্কেল এনে তুললে বলা তো ?

খাইয়ে দেখেছি নাকি ? হেসে উঠে হর বড়ই বলল, আচ্ছা, এবারে কাউকে বধন সঙ্গে আনব, বাড়িতে নেমন্তন্ন করে খাইয়ে পরখ করব আগোভাগে।

বড় হাওয়া হোটেলের পিছন দিককার দাঁড়ায়। মাহুরের উপর পড়ে আছে তাই, নয়তো মাহুর সত্যি সত্যি উড়িয়ে নিয়ে ফেলত। ক'টা রাত পাশাপাশি ঝাটিয়ে গেল তিন জনে। জগা-বলাই অসাড় হয়ে ঘুমোয়। ঘড়টীর মগজের ভিতর নানান মতলব—এক এক সময় অধীর হয়ে ওঠে, চুপচাপ থাকতে পারে না, ঘুমন্ত জগা-বলাইর গা ঝাঁকিয়ে তাদের কাছে অতীত আর ভবিষ্যতের কথা শোনায়। বন কেটে বসতির গুল—এই তো ক-বছরের কথা। কী হয়ে গেল তারপর দেখতে দেখতে! আরও হবে, শহর কলকাতা জমে উঠবে দেখো বাদা অঞ্চলের মধ্যে।

সকালবেলা উঠে জগা-বলাই ছুটল ঢোলার দোকানে। পরসা চুকিয়ে দিয়ে জিনিষটা গুণ্য নিয়ে আসা। বলে, তোমরা ঘাটে চলে যাও। যদি একটু দেরি হয়ে যায় টাপুরে-মাঝিকে বলে করে রাখবি বলাই। নৌকো ছেড়ে না দেয়।

ঘাটে গিয়ে বসেছে বলাই। আছে বসে তো আছেই। এই আসছি বলে হর বড়ই পথের পাশে এক দোকানে ঢুকে পড়ল। পাটি-মাহুরের দোকান। জগাও দেখা নেই। নতুন ছাউনির পর ঢোলক কি রকমটা দাঁড়াল, পরখ করতে গিয়ে হয়তো সে দোকানেই বোল তুলতে বসে গেছে। কিছু বিচিত্র নয়। কেউ যদি হু-চাব বার বাহবা দেয়, বাস, হয়ে গেল আজকের মতন টাপুরে ধরা। দোকানের উপরেই গান-বাজনার আসর। জগাকে বিশ্বাস নেই, জগা সব পারে।

ঘাটের উপরে এক দোকান। ভাল দোকান—বিড়ি খিলি-পান বাতাসা মুড়ির-মোয়া সমস্ত মেলে! দোকান চালাঘরে—কিন্তু লিটে মাটির উপরে নয়। খানিকটা উঁচুতে বাঁশ ও গরানের ছিটের মাচা; মাচার উপরে মালপত্র ও দোকানদার; উপরে খড়ের চাল। কোটালের সময় গাঙের জল বেড়ে মাচার নিচে ছলছল করে। দোকানের সামনে খুঁটি পুঁতে চেরা-বাঁশের বেঁকি মতো করে রেখেছে, জন পাঁচ-ছয় বসে আছে বেকিতে—বিড়ি খাচ্ছে, পান খাচ্ছে। টাপুরে-নৌকোর চড়নার এরা সব এবং বলাইও বসেছে এই জায়গায়। নৌকো ছাড়ো-ভাড়ো। উঠে পড়েছে বেশির ভাগ। এদেরও ডাকাছ। বলাই একনজরে চেয়ে পথের দিকে। সোজা পথ—বাকচুর নেই। উদ্বেগের বশে এগিয়েও দেখে এসেছে বারকরেক।

টাপুরে-নৌকোর ভাড়া; দরজাম করতে হয় না। একেবারে বয়রাখোলা অবধি বাবে তো চার আনা। তবে ঠিক অর্ধেক পথ কুমিরমারি কিন্তু দশ পরস। তেলিগাঁতি এক আনা, গরলগাছি তিন আনা। গলুরে দাঁড়িয়ে এক জনে হাঁক পাড়ছে : বয়রাখোলা কুমিরমারি গরলগাছি ছাড়ো নৌকো, ছাড়ো-এ-এ-এ—

এবং ছেড়েও দিল টাপুরে। কাছি খুলে হাল-দাঁড় বেয়ে চলে গেল মাঝ-গাঙ অবধি। বেকির উপরের চড়নারেরা নড়ে না—গুলতানি করছে, নতুন করে বিড়ি ধরাচ্ছে আবার। হাঁ, আসছে

এইবার—বলাই ঠাইর করে দেখে, ‘মাহুরটা জগরাধ না হয়ে যায় না। আসছে বাতাসের বেগে, দৌড়ানো বলা চলে। কাছাকাছি এলে দেখা যায়, ঢোলক বলছে পিঠের দিকে—ঢোলকের আটোর মধ্যে চাঁদর গলিরে পৈতের মতন কাঁধের উপর আর বগলের তলা দিয়ে নিয়ে গেছে।

ছেড়ে গেল নাকি রে ?

বলাই বলে, নতুন বউ হয়ে পালকি থেকে নামলে দেখছি ! বা বললে, আর বোলো না। লোকে হেসে খুন হবে।

বেকুব হয়ে গিয়ে জগাও হাসতে লাগল। তা বটে, পুরানো কায়াটা পুরেওলাদের। ছাড়ছি বলে মুখে মুখে চোচালে চড়নারে গা করে না। ঘাট থেকে সত্যি সত্যি ছেড়ে খানিকটা আগু-পিছু করতে হয়। তখনও এমন কিছু চাড় নেই, সে তো এই বৃত্তে পারছ নৌকার লোকগুলোর ধরণ দেখে।

গাঙের দিকে তাকিয়ে জগা অবাক হল : এক-পো ভাঁটি নেমে গেল, এখনো চড়নার ডাকে ! বয়রাখোলা আজ পৌছতে হবে না, গরলগাছি কি কুমিরমারি অবধি বড় জোর। আর দেরি কিসের মাঝি ? ছাড় এবারে।

ছইয়ের ভিতরের লোকগুলো কলরব করে ওঠে। মনের মতো কথা পেয়েছে। ঠিক কথা, সত্যি কথা, ছাড়ো এখনি। কেউ বাকি থাকে তো সে লোক কালকে বাবে। দু-এক জনের সঙ্গে এত মাহুর কষ্ট পাবে, সেটা হতে পারে না।

মাঝি চেনে জগাকে। এ অঞ্চলের গাঙে খালে বাঘের গতায়ত, জগাকে চিনবে না এমন কে আছে ? চড়নারে চোচামেটি করছে, ঠেকিয়ে রাখা মুশকিল—অজ্ঞ কেউ নয়, জগা এসে আবার কোড়ন দিচ্ছে তার ভিতরে। রাগ করে বলে, দেরি তো তোমাদের জ্ঞে জগা। তুমি এসে গেলে, তোমাদের হর-বাপাতির এখনো পাত্তা নেই। বাবে ফেলে তাকে ? তাই চলো। ধ্বজি তুলে ফেল ওরে ছোঁড়া। দাঁড়ে চলে যা।

জগা বলাইকে বসে, ঘড়িটা কোথা পড়ে রইল ? আমি ভাবছি, ব্যস্তবাগীশ মাহুর—নৌকার মধ্যে আগোভাগে গিয়ে বসে আছে।

বলাই বলে, আসছিলাম দুজনে। মাহুরের দোকান দেখে বড়ই ঢুকে পড়ল। বলে, এগুতে লাগ, একটা নীতলপাটি নিয়ে বাছি।

পায়ে পায়ে তার নদীর খোলে গিয়ে দাঁড়াল। জগা বলে, ছেড়ে দাও মাঝি, আব কাজ নেই। নীতলপাটি কিনতে গেছে—দোকানস্থল সওয়া করে আনতেও তো এতক্ষণ লাগে না।

এসব নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। নৌকো ছাড়বার মুখে এ ধরনের কথাবার্তা হামেশাই হয়ে থাকে। শেষ মুহুর্তির ধ্বজি পুঁতে নৌকার কাছি তার সঙ্গে জড়িয়ে রাখে। রাগের বশে ধ্বজি একবার বা তুলেই ফেলল, পরক্ষণেই আবার পুঁতে দেয়। এক চড়নারের ভাড়া চার-চার আনার পরসা ছেড়ে যাওয়া সহজ কথা নয়।

এমন সময় দেখা গেল, হর বড়ই বিভিন্ন দোকানের ধারে এসে গেছে। হাত উঁচু করেছে সেখান থেকে।

মাঝি হাঁক দিচ্ছে : চলে এসো, চলে এসো—

জগা ভেড়ে ওঠে : কোথা ছিলে এতক্ষণ তুমি ?

হর হাঁপাচ্ছে। কাঁধের নীতলপাটি দেখিয়ে বলে, সওয়া,

করলাম। আগে মনে ছিল না, দোকানের সামনে এসে হঠাৎ মনে পড়ে গেল।

জগা বলে, ওরে আমার লাটসাহেব! বড় পরমা হয়েছে। নান্নির অরপ্রাশন দিয়ে উঠলে সেদিন, তার উপরে আবার এখন শীতলপাটি! ওদের মধ্যে চলিত বিশেষণের দুটো-একটা প্রয়োগ করতে বাচ্ছিল। বলাই দ্বিগতে জগার মুখে হাত চাপা দেয়: চূপ, চাখামি করবে না এখন। মুখ দিয়ে ভাল কথাবার্তা বোলা।

নৌকোর গলুয়ের একজন ভিতরের দিকে ইঙ্গিত করে চাপা গলায় বলে, ভাল লোকেরা আছেন, চূপ চূপ—

কালা ভেঙে বাকী ক-জনে এবার উঠে পড়ল। বাইরে পা কুলিয়ে বসেছে। নৌকো বেশি জলের দিকে গেলে কালা ছাড়িয়ে তবে পা ফুলে নেবে। জন কুড়িক চড়ানার আগেভাগে চড়ে বসে আছে। একটা ছইয়ের নিচে অন্তগুলো মানুষ—সোরগোলে গাঙে তো তুফান উঠবার কথা। কিন্তু কী তাজব, ধান বসে আছে সকলে যেন। অথবা মানুষগুলোকে কেউ বুরি খুন করে নৌকোর উপর ফেলে দিয়েছে। জ্যান্ত মানুষ—বিশেষ করে জোয়ানখুবা বেগুলো আছে, এখনধারা চূপচাপ থাকে কেমন করে? তামাক খাচ্ছে, তা-ও অতি সাবধানে। হঁকো টানার কড়কড় আওয়াজ যেন অতিশয় লজ্জার ব্যাপার।

ভাল করে উঁকিঝুঁকি দিয়ে ব্যাপারটা মালুম হল জগার। কাড়ালে দুটো মেয়েমানুষ। দুটো মাত্র মুশলের ভয়ে বাঘের দোসর এতগুলো মরণ ঠাণ্ডা। দুই বা বলি কেন—একজনে ঘোমটা টেনে জলের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে আছে। বিনোদিনী—বিনি বউ—গগন দাসের পরিবার বিনি বউ কিছু নয়—মুশল হল অপরিচিত, চাক। কী সুন্দর গোলগাল পরিপুষ্ট হয়েছে! কাপড়-চোপড়ও দিবা বাহার। জোয়ান পুরুষদের সামনে কমবয়সি মেয়ের লজ্জা করা তো উচিত, তা সে-ই তো দেখি নাটার মতন বড় বড় চোখ বুরিয়ে এক নৌকো মানুষ জন্ম রেখেছে। টাপুরে-নৌকোর মেয়েমানুষ চড়ানারও যায়। কেনাবেচা করতে যায় ফুলতলার, আবার তল্লাটের বউ-ঝিরা বাপের বাড়ি স্বত্তরবাড়ি যাতায়াত করে। দরগা ও ঠাকরনতলার পূণ্য কৰ্তে চলেছে, এমনও আছে। এরা সে দলের নয়—চেহারা এলাকশোশক ও চালচলনে বোকা বাচ্ছে আবাদ এলাকারই নয় এরা। উত্তরের ভদ্র অঞ্চল থেকে আসছে। আদম পুরুষেরাই—খার নেই মূলধন সেই আসে বাদাবন। শূন্য হাতে এসে আস্তে আস্তে জমিয়ে নেয়। কাভানি চৌধুরি যেমন একদিন বনকরের বাবুদের চক্কোত্তি-রাঁধুনি হয়ে এসেছিল। আশায় আশায় এসেছে যেমন ঐ গগন, এক গোপাল ভরবাজও বটে। পুরুষেরা আসে, কিন্তু বাইরের ভদ্র অঞ্চলের মেয়েলোক এই প্রথম বোধ হয়। তাই দেখে তাদের সামনে বাদার জোয়ানপুরুষেরা ভদ্র হবার জন্ত উঠে পড়ে লেগেছে।

বিরক্তি ভরে জগা ছইয়ের বাইরে বসে পড়ল। আকাশ মেঘে ভরা, কণে কণে বৃষ্টি নামছে। বৃষ্টির জল ঝরঝর করে ভিজিয়ে দিয়ে গাঙের জলের উপর দিয়ে বনের মাথার উপর দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। একবার এই হয়ে গেল, বাকটা না বুঝেই কের সেই কাণ্ড। তা হোক, বৃষ্টিতে বায়বায় চান করবে তবু ছইয়ের ভিতরের ঐ ভোঁটার পালের মধ্যে নয়।

চলেছে, টাপুরে-নৌকো চলেছে। হপ-হপ দাঁড় পড়ে একটানা, মচমচ আওয়াজ ওঠে দাঁড়ের বাঁশ-দড়িতে। অতল নিঃশব্দতার মধ্যে ঐ বা এক ধরনের আওয়াজ। জগা আর পারে না, কেনে গিয়ে বলে ওঠে, বাকিয়া সব হয়ে গেল—তোমাদের হল কি আজকে মাঝি? ভূত দেখেছ না বেলে-সিঁদুর খাইয়ে দিয়েছে কেউ? (বেলে-সিঁদুর সঠিক জানিনে, খেলে নাকি মাছের বাকশক্তি উপে যায় একেবারে)

মাঝি বলে, বকবক করে হবে কি? গরানগাছির খাল নিয়ে ভাবনা, শেষ-ভাটার একেবারে জল থাকছে না। কোয়ার ভর কাটা।

দাঁড়দের স্তুতি দিচ্ছে: সাবাস ভাই। জোর জোর এমনি মেয়ে দিয়ে ওঠ। কুমিরমারিতে জোয়ার করে দাও। নহতো সারা রাতের ভোগান্তি।

আবার চূপচাপ। জগা তখন হর বড়ুইকে নিয়ে পড়েছে: তোমার জন্তে দেবি। মাছের পরসার বড় গরম—উঁ, শীতলপাটি বিনে ঘুম হয় না?

হর গলা বাড়িয়ে জবাব দেয়, পাটি আমার নয়। বড়দার।

জগা বলে, বটে! আমাদের কিছু বলে না, চূপি চূপি তোমার কাছে করমাস করল।

হুড়োহুড়ির মানুষ তোমরা। ঠাণ্ডা মাথায় দেখেওনে বাছগোছ করে কেনা পোষার তোমাদের? ধরো, এই একখানা পাটি পছন্দ করতে বিশখানা অন্তত পেড়ে ফেললাম। শলা সন্ধ-মোটা হালকা-ভারী আছে, বুহুনি ঘন-পাতলা আছে, অনেক কিছু দেখে নিতে হয়। হঁ-হঁ, সোজা নয়।

বলাই বলে, ওসব কিছু নয়। বড়দার লজ্জা করেছে আমাদের বলতে। ঘড়ি ঘড়ি খালে নেমে ডুব দেয়, গরম কি রকম বুঝতে পারো না? জল লোনা হোক বাই হোক পানকৌড়ির মতো ডুবতেই হবে।

জগা বলে, আর সেই মানুষ, এদিকে দেখলি তো, বাড়ির চিঠি না খুলে উঠুনে দেয়। খুলে পড়লে মন পাছে নরম হয়ে গিয়ে কিছু পাঠাতে ইচ্ছে করে। বড়দা বলে ম'স্ত করি—কিন্তু এক এক সময় চামার বলতে ইচ্ছে করে।

হর বড়ুই তাড়াতাড়ি চাপা দেয়: থাক থাক। ভদ্রলোকের মেয়েছেলেরা বাচ্ছে, অকথা-কুখা মুখের আগায় আনবে না।

ভাল যে ভাল! মুখ খুললেই তন্ত হয়ে ওঠে অস্ত সকলে। কোন বেখান্না কথা কখন বেরিয়ে পড়ে!

দীর্ঘকণের এত রাত্তা তবে কি বোবা হয়ে কাটাতে হবে? জগা তা পেরে উঠবে না, ভদ্রলোকের মেয়েছেলেরা বা-ই বলুক। তখন দাঁড়দের বলে, হাতে মুখে চাপাও ভাই সব। দাঁড় মরো, গীত ধরো ঐ সঙ্গে একখানা—

চাপা গলায় তর ধমক দিয়ে ওঠে: থামো। ওঁরা সব বাচ্ছেন, গীত আবার কি জন্ত এর মধ্যে?

বা: রে, ওঁরা বাচ্ছেন বলে মুখে তালাচাবি এঁটে থাকতে হবে? আমার দ্বারা পোষাবে না। তোমাদের সরম লাগে তো আমিই ধরি গান—

দাঁড়দের উদ্দেশ করে আবার বলে, গান গাইবে না তো



প্রিয়াঙ্গ

... সুন্দরী

নারীদের

ঐতিহ্য

“প্রিয়াঙ্গ” নামটা সারা পৃথিবীর
সুন্দরী নারীদের কাছে অতুলনীয় গুণাবলীর
প্রতীক — মোলায়েম এবং ভাল প্রিয়াঙ্গে
তাদের সৌন্দর্য সম্পূর্ণ নিরাপদ।
সেইজন্মই তাঁরা প্রিয়াঙ্গ সাবানের সাহায্যে
তাঁদের লাভণ্যের স্বপ্ন নেন — প্রিয়াঙ্গ আসল
মিসারিণ যুক্ত সৌন্দর্য সাবান।
এটি স্পর্শকাতর ডকের পক্ষে এত বিস্ময় এত ভাল।
শিশুদের পক্ষে সেইজন্মই এটি আদর্শ সাবান।
মখমলের মত মোলায়েম প্রিয়াঙ্গ ট্যালকম
পাউডারে অপূর্ব স্বগন্ধ ছাড়াও আছে
সেই একই গুণাবলী এবং বিস্ময়তা।



আপনার সৌন্দর্য
চর্চায় নিয়মিত
প্রিয়াঙ্গ ব্যবহার করুন

লোয়ারকি করে আমার সঙ্গে। কাঁকা গাঙের উপর একলা গলায় জুত হবে না।

বাড় কাত করে গালে বাঁ-হাত চোপে ধরে জাঁ-জাঁ-জাঁ করে জগা তান ধরল।

বলাই কিছুই দিয়ে শুতো দেয় : আঃ, কি হচ্ছে ?

কি করে হেসে ফেলে জগা বলে, শুনতে পাচ্ছিস না ? গান—
গান নয়, কানের ফুটোর মুণ্ডর মারা। কি ভাবছে বলো দিকিনি
মেয়েছেলে। বাঁড়ের মতন না চেঁচিয়ে গানই ধরো তবে সত্যি সত্যি।
জগা বলে, গানের তুই কি জানিস রে ? গান হলোই বুঝি
নাকি-কান্না ! নানান সুরের গান আছে। আজকে এই চোচানো
গানে আমার মন নিচ্ছে।

আরম্ভ করে দিল মার-মার কাট-কাট রবে, কানে ভালো ধরিয়ে
দেবার মতলব। কিছু কিছু দখল আছে বিজাটার—সুরটা এক
সময় মোলারের হয়ে উঠেছে, ভাল-মাত্রাও উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছে গানের
ভিতরে। প্রতিহিংসার ভাব তেমন আর উগ্র নয়। আবেশে
এমন কি চোখও বুঁজে গিয়েছে, হাতের চেঁচোয় খাবা দিচ্ছে নৌকোর
উপরে। ছইয়ের বেড়ার গারে ঢোলক, বলাই পা ঘষে ঘষে গিয়ে
পেড়ে আনবার তালে আছে সেটা।

খসখসানি আওয়াজ পেয়ে জগা চোখ মেলল। চাক ছইয়ের
বাইরে চলে এসেছে। এসেছে সামনের উপর। বহুস্তে শাসন করতে
এলো নাকি ? অস্ত্রের কথাই হল না তো ঐ পরিপুষ্ট হাতে জোর
করে তার মুখ চোপে ধরে গান ধামিয়ে দেবে ?

গান আপনা-আপনি থেমে গেছে ততক্ষণে। ভাজব কাণ্ড !
জগন্নাথ বিশ্বাসের সঙ্গে লাগতে এসেছে—বত বলবানই হোক—
বোটাছেলে নয়, মেয়ে একটা। পরক্ষণে আছন্ন ভাবটা কেড়ে ফেলে
শুধু করবে আবার প্রবল কঠে—আগেভাগে মেয়েটাই বলে ওঠে,
খাসা হচ্ছিল—ধামলেন কেন ?

আরো আশ্চর্য, আপনি-আপনি করে কথা ! জগা যেন মাজবান
মাছুষ, খাতির দেখিয়ে তেমনি ভাবে বকছে। এ ভজাটে এ সব
চলে না। হলে কি হবে, সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে ভদ্র অকল
থেকে। উৎকট লাগে জগার। নীরস কঠে সে বলে, গানের এই
খানটার আমি খেমে বাই।

সে কি গো ? মাঝখানে থেমে পড়লে ভাল লাগবে কেন ?
আমার এই নিরম।

নগেনশশী নিয়ে চলেছে এদের। অথবা চাকুই অপর ছটিকে
টেনে হিঁচড়ে বাধাবনে নিয়ে যাচ্ছে। নগেন ডাকে, চলে এসো
চাক, ওদিকে কি ? ওদের সঙ্গে কি বচসা লাগিয়েছ।

চাক কানো নিল না। অভিযানে কঠ একটু বুঝি থমথমে
হয়ে যায় ! আমি না এলে ঠিক আপনি সারা করতেন। বেশ, বাড়ি
আমি ভিতরে।

আমার গান সারা হয়ে গেছে।

চাক তর্ক করে, কক্ষণো হয়নি ! বা-তা বোঝালেই হবে ?

বিনোদিনী এবারে রাগ করে ওঠে। কি হচ্ছে চাক ? চলে
আসবি কিনা, তাই বল।

চাক বলে, একটা গোঁয়ার স্বভাবের মানুষ থাকে বউদি,
লোকে বা বলে ঠিক তার উল্টোটি করবে।

নৌকোবুড় মানুষ ধ হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে
কোথাকার মেয়ে এসে উঠেছে, একটুও সন্ডোচ নেই
জগা যেন পুরুষকেও মুখের উপর টাক-টাক করে শুনিবে দেয়
বলে, বেশ, তবে আমি বলছি গান আর গাইবেন না আপনি
ঐখানে শেষ।

গাবোই না তো !

এটা কি হল ? একমত হয়ে গেলাম যে তবে ! আমি এক বড়
বলব, আর বাড়ি হেঁট করে তাই আপনি মেনে নেবেন ?

জগন্নাথ বলে, আমার উল্টোপাণ্টা রীত। লোকের কথা কখনে
শুনি, কখনো শুনি নে। এবারটা শুনব।

বিনি বউ আবার ডাকে, ওরে চাক, চলে আয়—

বাছি বউদি ! গানটা পুরো শুনে তবে বাবো।

কিছু গান আর হল না কিছুতে। চাকও নাছোড়বান্দা, গা
না শুনে নড়বে না। শাড়ি সামলে আসন-পিড়ি হয়ে বসে গে
সামনে। বসেই রইল। থাকো বসে, বয়ে গেল। সারা বেলান্ত ব
থাকো না, কি হয়েছে।

চাক বাগল অবশেষে : বড় বাড়িছো তাই মানুষ আপনি
না গাইলেন তো বয়ে গেল। মেঠো গান বই তো নয়। এর চে
ভালো ভালো গান কত আমরা শুনেছি !

উঠে ফরফরিয়ে চলল। ছইয়ের নিচে গেল না আর, উঠল গি
ছইয়ের হাতে। উঠবার ধরনই বা কি, খুঁটিতে পা ঠেকিয়ে তড়া
করে উপরে উঠে পড়ল। কী গেছো মেয়ে রে বাবা ! সার্কি
দেখিয়ে বেড়ার নাকি ? ছইয়ের উপরে উঠেই কিছু একেবারে
চূপ—মন্ত্র পড়ে কে যেন পাষাণ করে দিয়েছে। মুক্ত চোখে চে
আছে দিগন্তের দিকে। মাঠের দূরপ্রান্ত অবধি সবুজ রঙে ঢাকা
একটুকু কাঁচ নেই কোনখানে। উল্লসিত কঠে সহসা চাক কথ
বলে ওঠে, জঙ্গল ঐ নাকি মাঝি ? বাধাবন ?

জগন্নাথ উপবাচক হয়ে সামাল করে, নৌকো টলছে—জলে পড়ে
গেলে চিন্তিত। জঙ্গলের স্মৃতি বেরিয়ে বাবে তখন।

নিরুবেগ কঠে চাক বলে, কিছু হবে না। ভাল সাঁতার জা
আমি।

সাঁতারের ফুরসৎ দেবে না। কুমিরে ধরবে কিছা কামড়ে
কাটবে। কেটে নেবে যখন, বেশ স্নড়স্নড় লাগবে। তারপরে
দেখা বাবে, পুরো একটা পা-ই পাওয়া যাচ্ছে না।

মাঝি বলল, ছইয়ের উপর অমন করে দাঁড়ায় না বুনডি। ব
বসে দেখ।

অনেক পথ শুণ টেনে গরলগাছির খালের কাদায় নৌকো ঠে
ঠেলে অনেক কঠে কুমিরমারি পৌছানো গেল। বড় গাঙের মধ্যে
উজান বাওয়া চলবে না। বাতাসও মুখড়। নৌকো চাপান দেওয়া
ছাড়া গতি নেই। আরও খান ছই বাঁক গিয়ে দোখালার ভিতর
কোন গতিকে যদি ঢুকে পড়া যেত, খালে খালে বা-হোক করে এত
চলত। হল না হয়র দোবে। তার ওই ঝিলপাটি পছন্দ করতে
গিয়ে।

জগা বলে, বয়রাখোলায় কাঁচ নেই, কুমিরমারি নেমে আমার
হাঁটতে হাঁটতে চলে বাব। তোমাকেও হয়, হাঁটতে হবে আমাকে
সঙ্গে।

ব্যাপার-বাণিজ্যে দু-চার পরসার মুখ দেখতে আরম্ভ করে হর
দুই খানিকটা বাবু হয়ে পড়েছে। বলে, জনো না তাই। পথ
এখনো হয়েছে নাকি? বনজঙ্গল জল-জাভাল—

তোমার জন্তে এত লোকের ভোগান্তি। ছাড়ছিনে তোমার।
হাটতে না পার, পায়ে দড়ি বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে তুলব।

হর চুপ করে যায়। কথাই কথা বাড়ে। ভয় অঞ্চলের মানুষ
নৌকোর বাচ্ছে, তাদের সামনে আরও না জানি কী বলে বসে।
বাঁক ঘুরতেই ছোট ছোট টিনের চালা। কুমিরমারির হাট। হাটের
নিচে বাটের ধারে নৌকো কাছি করল। থাকতে হবে বেশ
খানিকক্ষণ। জোয়ার শেষ হয়ে গিয়ে ভাঁটার টান বতক্ষণ না ধরছে।
এক প্রহর বাত হবে তো বটেই।

নেমে পড়েছে সব চড়নার। মরা গৌনে জল বড় নেমে গিয়েছে।
নিকানা উঠানের মতো নদী-চর তক তক করছে। ছোট ছোট
মাছ কাদার উপর ছাপ কেটে সর সর শব্দে ছুটোছুটি করছে এদিক-
সেদিক। পা চাপালে কাদার মধ্যে বসে বাচ্ছে। নোনা কাদা
আঠার মতন লেপেট বাবে, কাদার ভারে পা উঁচু করে তোলা দায়।
জোয়ার বলে তবু তো অনেক দূর অবধি নৌকো উঠে এসেছে।

নামতে হবে গো এবারে। নেমে খেয়ে-দেয়ে চরে-কিরে
বেড়াগে এখন। টানের মুখ ঘুরলে সেই সময় এসে।

চাক নামতে গিলে খমকে ঝাঁড়াল। যারা নেমেছে, তাকিয়ে
তাদের দুর্গতি দেখছে। মুখেই এত ফড়কড়ানি—কাদার পা দিতে হবে,
আঁতকে উঠেছে সেই শকার। সাপের মুখে পা দিতেও তো মানুষে
এমন করে না। তা নামতে না চাও তো থাকো নৌকোর খোঁশে
আটক হয়ে, অস্ত সকলে নেমে থাক, থাকো পড়ে একা একা। কার
দায় পড়েছে, কে পিঠ দিচ্ছে দুর্গা ঠাকুরের সিংহের মতন—সেই
পিঠের উপর পা রেখে কাদা পার হয়ে উনি ডাডার উঠবেন। আর
যে পারে পাঙ্কক, জগা বিশ্বাস নয় কখনো। তার দিকে তাকায়
কেন বারবার, ভেবেছে কি? বাঁধন-জাঁটা নিটোল দেহটার শোভা
দেখছে। দেখ তাই, আর কিছু প্রত্যাশা কারো না। মাথার
কাপড় দেওয়া অপর মেয়েলোকটি দিবিয়া তো নেমে এলো।
আর নবাবনন্দিনী, দেখ, নাকি-নাকি বুলি ছাড়ছে: সবাই
চলে বাচ্ছ যে বউদি, একা-একা আমি পড়ে রইলাম—। বেন
পায়ে দড়ি দিয়ে কেউ বেঁধে রেখেছে ছইয়ের বাঁশের সঙ্গে। কাদার
নামবে না তো শুড়াক করে লাফিয়ে পড়ো এই জগন্নাথের মতো।
কাদা তো বড় জোর হাত আটক জারগায়—আট হাত লাকাত
পারো না, চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তবে আর শাসন কিসের অত?

এক দল পশ্চিমা কুলি রাস্তার মাটি ফেলছে। বোলা পড়ে এলো,
কাঁজ করছে তবু এখনো। আর কত কাল লাগবে যে বাপু। মাটি
ফেলাটা হয়ে গেলেই পায়ে-হাঁটার অন্তত সোজা পথ পাওয়া যায়, গাড়ে-
খালে ঘুরপাক খেয়ে মরতে হবে না। খালের উপর পুল হবে।
পুলের জন্ত ইটকাঠি লোহালকড় এসে পড়েছে। খাল-ধারে পাহাড়-
প্রমাণ তক্তা গাদা দিয়ে রেখেছে। আরে আরে, কি করছে
দেখ হোঁড়া কঁটা—চার-পাঁচটা তক্তা কাঁধে বয়ে এনে কাদার
উপর ফেলল। তক্তার উপর পদারবিদ্য রেখে ঠাকুরের
ডাডার ওঠা হবে। আবদার তো বেড়েই চলেবে এমনি ধারা
জোয়ার হলো।

এক বন্দোবস্ত সম্বন্ধে মেয়েটা বেন গলে গলে পড়ছে। চাক নয়,
নাম হওয়া উচিত ছিল ওর নবনীবালা। নৌকোর কাড়ালে
দাঁড়িয়ে বলছে, হাত ধরো না গো কেউ তোমরা। নামি কেমন
করে তক্তার উপরে?

তা-ও চার-পাঁচ মরদ এগিয়ে এসেছে হাত ধরে নামাবার তরে।
রকম দেখে জগা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসে। হঠাৎ সে-ও ছুটল—
তার সঙ্গে পারবে কে? ছুটে সকলের আগে চল গেল।
কাড়ালের এপাশে ওপাশে হাতগুলো উঁচু হয়েছে চাককে নামিয়ে
আনার জন্ত। সকলের উঁচুতে উঠে আছে জগার ইম্পাতের
মতো কঠিন কালো হাতখানা।

জগার বিক্রম, লক্ষ দিয়ে কাদা পার হওয়ার সময় সকলে
জেনে বুঝে নিয়েছে। চাকও বুঝেছে। আগ বাড়িয়ে এসে দাঁড়াল
সেই মানুষ। হাতে হাত ছোঁয়াতে না ছোঁয়াতে জগা মেয়েটার
হাত অমনি মুঠোর পূর্বে হেঁচকা টানে এনে ফেলল তক্তার উপরে
নয়—তক্তার পাশে কাদার ভিতর। আর কেউ হলে সে টানে
কাদার উপর গড়িয়ে পড়ত, শক্ত মেয়ে তাই সামলে নিল কোন
গতিকে।

ছুঁচো কাঁহাকা—বজ্রাতের বেহুদ! রাগে গরগর করতে
করতে ঠাক দু-হাতে একতাল কাদা তুলেছে জগাকে ছুঁড়ে মারবে
বলে। কোথায় জগা? চক্ষের পলকে অত দূরে ঐ নতুন রাস্তার
আড়াল হয়ে গেল। কিবা ঘোঁরা হয়ে আকাশেই উড়ে গেছে
হয়তো।

ছুটতে ছুটতে চাকও রাস্তার উপর গেল। নতুন মাটি ফেলে
অনেক উঁচু করেছে—চতুর্দিক সেখান থেকে তাকিয়ে তাকিয়ে
দেখে। গেল কোন দিকে? যে চুলোর গিয়ে থাকে, থাকুক না
আপাতত পালিয়ে। নৌকো ছাড়বার সময় হলে আসতে হবে
বাহাধনের। শোধবোধ সেই সময়।

হর বড়ই বাড় নেড়ে বলে, কেপেহ? পায়ে পায়ে কত পথ
মেয়ে ছিল তারা এতক্ষণ। একা নয়, জগা আর বলাই।
আমাকেও টেনেছিল। আমি কারো গোলাম নই বাপু, স্বাধীন ব্যবসা
আমার। দেবি হল কিবা তাড়াতাড়ি পৌছলাম, আমার কি
বার আসে? আমি কেন কষ্ট করতে বাই?

মানুষ অবাক হয়ে যায়: বলা কি গো? রাস্তার
একটুখানি নিশানা হয়েছে কি না হয়েছে—জলে নেমে খালই
পার হতে হবে তিন-চারটে—

হর বলে, এক পহর ঠায় বসে থেকে তারপর নৌকোর শক্তক
অঞ্চল ঘুরে বাওয়া—এর চেয়ে জল কাঁপানো কাদা মাথা অনেক
ভাল ওদের কাছে। বতক্ষণে নৌকো বয়ারখোলা বাবে, ওরা
খেয়েদেয়ে পুরো এক ঘুম ঘুমিয়ে উঠবে তার ভিতরে।

বোপদ্রব্দ কামিজ-পর্য নগেনশমীর সঙ্গে হর এবার পরিচয়
করছে: বাবু মশায়ের বাওয়া হচ্ছে কোথা? ভেবেছিলাম
কুমিরমারিতে শেষ। নতুন চৌকি বসে গেল, কুতখাটা হল,
বাবু লোকের আনাগোনা বেড়ে গেছে—মা-লক্ষ্মী এসে পড়ে
এবারে গেরহালি পাঠাবেন। আরও নাবালে বাচ্ছেন এঁদের সব
নিরে? কোথায়?

অধস্তন

পৃথিবী

ডক্টর পঞ্চানন ঘোষাল

[কোনও এক প্রাচীন বা আধুনিক প্রতিষ্ঠান বা সমাজ কিংবা কোনও ব্যক্তিগত চরিত্রের বিশ্লেষণ এইখানে করা হয় নি। এই উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্র কাল্পনিক মনে করে নিলে আমি পাঠকদের নিকট কৃতজ্ঞ থাকবো।]

আসামীদের কাছ হতে ছিনিয়ে নেওয়া গামছা ও কাপড়ের খুঁট দিয়ে একের বাহর সঙ্গে অপরের বাহর বেঁধে তাদের গুরু-ভেড়ার মত তাড়াতে তাড়াতে চিংপুর রাস্তার মোড়ে এসে শান্তিদল সহ প্রণব এবং চিরঞ্জীব বাবু নিশ্চিত হয়ে পিছন ফিরে ঘটনাস্থলটির দিকে একবার তাকিয়ে দেখলেন। তখনও পর্যাপ্ত বতীবাড়িগুলির মধ্য থেকে মধ্যে মধ্যে ইট-পাটকেল ও সোভাওয়াটাবের 'বোতল সাঁ-সাঁ' করে ছুটে এসে কচুরী গলির ডান দিককার বিতল কোটাবাড়ির দেওয়ালের উপর পড়ে ভেঙে টুকরা টুকরা হয়ে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়ছিল।

সামনের ট্রামরাস্তার উপর দিয়ে ছুই-একখানা ট্রাম তখনও যে না চলছিল তা-ও নয়। কিন্তু তার ভিতরকার বাত্মীরা প্রায় সকলেই ছিল এই অঞ্চলেরই লোক। নির্বিকার চিন্তে তারা গাড়ির জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে বাহিরের তামাসাটা দেখে নিল মাত্র। আশে-পাশের দোকানদার এবং পথচারীদের দেখলেও মনে হয় তারাও রাস্তার সাধারণ পথিক এবং ট্রামের বাত্মীদের মতই নির্বিকার। এইরূপ ঘটনা প্রাত্যহিকই এখানে ঘটে থাকে। ক্রমে ক্রমে তাদের নিকট এইরূপ ছোটখাটো ঘটনা গা'-সওয়া হয়ে গিয়েছে। তা'ছাড়া এখানে শাস্ত্রী পুলিশ ও জুহাডীদের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ হচ্ছে। তাদের এই হারজিতের মধ্যে জন-সাধারণের আদে-বায় কি? এই স্থলে তারা নির্বিকার নশ্বক ছাড়া আর কিছুই নয়। এই সব 'পাড়ার গুণ্ডা' পাড়ার কান্ডরই কতি করে না। তবে তারা খামকা পরের ব্যাপারে জড়িয়েই বা পড়বে কেন? ভনা গিয়েছে যে, প্রাচীন ভারতে রাজার রাজ্য যুদ্ধের সময়েও কুব্ধকা মনের আনন্দে ভূমি কর্ষণ করে যেতো। অথবাও তো সেই প্রাচীন ভারতীয়দেরই বংশধর। তারা যদি তাদের কপের ধারা এই ভাবে বজায় রাখে তাহলে সেই জন্ত দোষ দেওয়া যায় না।

এদের এইরূপ মনোবৃত্তি প্রণব ও চিরঞ্জীব বাবুর অজান্তে ছিল না। তাই তারা সদলবলে বড়ো রাস্তার উপর এসে

নিজদের কতকটা নিরাপদ মনে করলেন। এমন সময় তারা লক্ষ্য করলেন, এক ব্যক্তি সামনের কোটা-বাড়ি ঘরিত গতিতে বেরিয়ে আসছে। ক্রমশঃ দিয়ে খুঁটটা চেপে রাখতে তাকে একজন ভ্রমলোক ব'লেই মনে হলো। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রণব বাবু ছুটে গিয়ে তার হাতটা চেপে ধরলেন। ভ্রমলোক তাড়াতাড়ি খুঁধের উপর হতে ক্রমশঃ গিরিয়ে নিয়ে বসে উঠলেন, আরে এ আমি। আমি প্রণব বাবু। চিনতে পারছেন না আমাকে?

প্রণব বাবু আশ্চর্যাবিত হয়ে চেয়ে দেখলেন, ভ্রমলোক তাঁর খুবই পরিচিত এক ধনী ব্যক্তি। স্থানীয় মনোরমা থিয়েটারের তিনি একজন মালিক। এছাড়া স্থানীয় একটি কলেজে তিনি প্রফেসরীও করে থাকেন। জনসমাজে ভ্রমলোকের নানা কারণে শ্রুতাম আছে। তাঁকে এই ভাবে একটা বেগাবাটা থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে চিরঞ্জীব বাবুও কম আশ্চর্য হননি। কারণ ঐ বাড়ীটার ঘরে ঘরে যে মধ্যশ্রেণীর বেগা নারীগণ বাস করে, তা উভয়েরই জানা ছিল।

'আপনারা খুব আশ্চর্য হচ্ছেন, না'? প্রণব ও চিরঞ্জীব বাবুকে কোনও প্রশ্ন করবার সুযোগ না দিয়ে ভ্রমলোক বলে উঠলেন, আজ্ঞে—এই বাড়ীটা আমার নিজের হলেও এখানে আমি ভাড়া আদায় করতে আসি নি। এমন কি থিয়েটারের জন্ত কোনও একট্রেনের সন্ধানেও এখানে আমি আসি না। উবাকে চেনেন তো? আমাদের থিয়েটারের উবা। গত দশ বছর হলো দুজনে স্বামি-স্ত্রীর মত এইখানে থাকি। তাই প্রতিটি সন্ধ্যায় এইখানে বসে ছুই তিন আমাকে কাটিয়ে যেতে হয়। এখানে বৈশীকরণ আপনাদের সঙ্গে কথাবার্তা কওয়া নিবাপদ নয়। আপনারাও বৈশীকরণ আর এখানে অপেক্ষা করবেন না। আপনাদের মহলে মেলায়েশা আমার বহু দিনের। তাই বলছি এখান থেকে চলে যান এখুনি। শাস্ত্রীদের মধ্যে মিছামিছি বৈশী ক্যান্ডেলটি হলে কর্তৃপক্ষ আপনাদের ট্যাক্সিলেশ বলে অভিহিত করে কৈকিয়ৎ চাইতে পারেন। তা'ছাড়া তেতরে আরও ব্যাপার আছে। সব কথা আপনাদের এখানে জানানো আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। আচ্ছা, তাহলে চলি আমি—

ভ্রমলোক ঘরিত গতিতে পাশ কাটিয়ে রাস্তার ওপারে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে সরেগে আর একখানা ট্রাম-গাড়ী এসে পৌছিল। এদিকে ভ্রমলোকের উপদেশের মধ্যে যে বশেষ যুক্তি ছিল তা অভিজ্ঞ অফিসার প্রণব এবং চিরঞ্জীব বাবু উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই আর ঘটনাস্থলে দেবী না করে ট্রামটাকে ধামিয়ে আগামী ও শাস্ত্রীদের নিয়ে তারা ঐ গাড়ীর দেকও রূপ কামরায় উঠে পড়ে থানার দিকে এগিয়ে চললেন।

২

জোড়াসাঁকো থানার ভারপ্রাপ্ত প্রবীণ অফিসার মহীন্দ্র বাবু অফিসার-ইন্চার্জের নির্দিষ্ট কামরায় বসে প্রণব ও চিরঞ্জীব বাবুকে জন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করছিলেন। এই দিন সরকারী ও বেসরকারী এই উভয়বিধ কাজে তাঁকে বহুক্ষণ থানার বাহিরে কালাপহরণ করতে হয়েছিল। মাত্র এক ঘণ্টা পূর্বে তিনি থানার ফিরে থানার অস্তান্ত অফিসারদের নিকট হতে ঘটনাটি সবকিছু জানতে পেরেছিলেন। ব্যত্য়ভাবে তিনি থানার জাবেরা থানার

খোঁজা উঠাতে উঠাতে দেখলেন, তাকে দেখা আছে যে, এটা পচিশ মিনিটে আশ্রয়স্থান নিয়ে ভরিত ব্যক্তি নিকট হতে চিরঞ্জীব বাবুর উপর তরুণী গলির গুণাদের চাহিদার বিবরণ অবস্থিত হয়ে প্রাণ বাবু কয়েক জন সিপাহীসহ সহ ঘটনাক্ষেত্রে বসে গিয়েছেন। এর পর একটু ভেবে নিয়ে তাঁর মুখের চক্রে আরও উঠে একবার তাঁর গিয়ে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে তিনি দেখলেন যে, ইতিমধ্যেই ঐ ঘড়িতে সাক্ষ্য লেখে গিয়েছে। এই সময় খানার হেড জমাদার মোহন সিং কখন এসে খানার বড়বাবুর কাছ থেকে চাভিয়েছে। সন্তান মোহন সিংকে অফিস-ঘরে এসে উপস্থিত হতে দেখে বড়বাবু মস্তক বার ক্রমে তেঁতেরে উঠলেন, 'কহা মোহন সিং। উল্লোককে তরুণী গলিমে আনিয়ে। লোকাকা পাকডানে কোন বোলা। এক বোলা হায় নেহি খানেমে হাজির নেহি বহে তো। কহ না কহ খামেলা আ বাক্তি। যেতনা সব কাম দেখানেওয়াল। চোতরা অফিসারকে পাকড পাকড বড়া সাব মেরি লিব পর ডাল দিয়া হার। তুম উল্লোককে সম্বাদকে নানা কর দেনে নেহি দেখা।'

মোহন সিং জমাদার হলও একজন পুণাতম অভিজ্ঞ ব্যক্তি। বচকাল যাবৎ সে এই খানার জমাদাররূপে বাহাল আছে। এই এলাকার হালচাল সবকিছু সে বিশেষরূপে অবস্থিত। তাই এই খানার অফিসার স্ত্রী প্রতীতি দুরূহ বাপারে একবার তার সঙ্গে পরামর্শ করে নেয়। এ-ছাড়া নবীন অফিসারদের কি করা উচিত বা কি করা উচিত নয় এবং তাদের কোথায় বাওয়া উচিত বা কোথায় তাদের বাওয়া অস্বস্তিত, সেই সবকিছু পরোক্ষ ভাবে তাদের মুখিয়ে দেবার ভার বড়বাবু এই হেড জমাদারের উপরই ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন। তরুণী গলির কোনও ব্যক্তির কোনও

কার্যের জ্ঞান তাদের উপর এই খানার থেকে কেউ অকারণে হস্তক্ষেপ করে, তা বড়বাবুর জ্ঞান হেড জমাদার মোহন সিং পছন্দ করেনি। তাই সে অভিযোগের স্বরে বড়বাবু প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে বলে উঠলো, 'ক্যা করে সাব, উল্লোক বাত তো খোড়াই ওমতে লোকেন উঁহা বড়িয়া কুহ গোলমাল হো গায়া হোগা। নেহি তো উল্লোক এতনা বড়ীমে জরুর লোট আ বাত। হামলোককেতি ফুরন উঠা যানে চাহী।'

জমাদার মোহন সিং-এর জ্ঞান বড়বাবুও প্রাণবাবু ও চিরঞ্জীব বাবুর নিরাপত্তা সবকিছু চিন্তিত হয়ে উঠেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তাদের উপর বিরক্ত হলেও তাদের উপর বাগ করার তাঁর কোনও হতু ছিল না। এ ছাড়া অধীনস্থ অফিসারদের উপর তাঁর স্বাভাবিক কর্তব্যসহ বেশ কিছুটা বেহাও ছিল। তাই প্রকৃতপক্ষে হয়ে তিনি গর্জন করে উঠে মোহন সিংকে খানার বাকী সিপাহীদের তৈরী করতে আদেশ দিয়ে আশ্রয় মনে বলে উঠলেন, 'নাঃ, দেখকি ব্যাটারের বড় আশ্রয় দেওয়া হয়ে গিয়েছে। এতো বড়ো আশ্রয়। যে আমার বিনামূল্যেতে তারা আমার অফিসারদের মারধর করতে সাহস করে। পাঁড়াত দেখাছি আমি মজা বেটারের।'

খানার ইনচার্জ অফিসার মহীন্দ্র বাবু টেলিফোন ড্রয়ার থেকে গুলীডরা পিস্তলটা বার করে উঠে পাঁড়ানো মাত্র দেখানে প্রাণ ও চিরঞ্জীব বাবু আসামী ও শাস্ত্রীলসহ উপস্থিত হয়ে বলে উঠলেন, 'খানার কিরতে একটু দেরী হয়ে গেল তার। আমরা সকলে সোজা খানাতেই ফিরে আসছিলাম কিন্তু চিরঞ্জীব বাবু এবং তৎসহ কয়েকজন সিপাহী এবং দুই তিন জন আসামীও আহত হয়েছিল। সেইজন্য হাসপাতালে আগে গিয়ে এদের আত্মজনিত ক্ষতগুলিতে



একটি মধুরতম সুবাস নির্বাহনে যিনি
ক্যালকেমিকোর সুরতি নির্বাহ 'কান্তা' পছন্দ
করেন তিনি রম্যরুচিরই পরিচয় দেন।
'কান্তা' এমন একটি বিশিষ্ট গন্ধসার যার সুমিষ্ট
সুবাস সবারই অন্তর স্পর্শ করে।

কান্তা

মম-ছোয়া সুরতিসার

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোম্পানী লিঃ
কলিকাতা-২৯

পাঠি ধরিয়ে তবে খানার ফিরতে পারলুম। চিরঞ্জীব বাবুর সাহায্যের জন্ত খানা হতে বেরবার আগে ঘটনাটি সবকিছু আমি খানার জাবেনা খাতাতে পুঁথিখুঁথিরূপে লিখে রেখে গিয়েছি। আপনি নিশ্চয়ই ঘটনাটার বিবরণ এককণ্ঠে এই খাতা থেকে পড়ে জেনে নিচ্ছেন। বাপারটা হয়েছিল, তার—

বাপারটা হুপু থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ওখানে কি হয়েছিল এককণ্ঠে তা জানতে আমার কিছুই বাকি নেই, প্রণব বাবু। আমি যেখানেই বসে থাকি না কেন, এলাকার প্রতিটি খবর আমি ঠিক সময়েই পেয়ে বাই; খবরটা শেষেই আমি সব কাজ ফেলে খানার ফিরে এসেছি, হাতের ওলীভরা পিত্তলটি পুনরায় টেবিলের ড্রয়ারে পুরে রাখতে রাখতে বড়বাবু মহীন্দ্র বাবু উত্তর করলেন, 'কিছু চিরঞ্জীব বাবুরও আমাকে না বলে অন্তত দু'লোক নিয়ে কতটা গলির মত জায়গায় জুয়া খরতে বাওয়া ঠিকিত হয়নি।'

জুয়াড়ী আসামীদের সর্দার মিঠুরাম ঘরতাবে খানার বড়বাবুর কথাগুলি এককণ্ঠ ধরে শুনছিল। এইবার সে সাহস পেয়ে বলে উঠলো, 'হজুর লোক খবর ভেজনে হামলোক খানেমে চলা আতি। লেকেন দেখিয়ে না, হজুর। ইন নয়া বাবু লোক কেতনা জুলুম জুটুটু হানি লোককো পর কর 'চুকা, আজ।' জুয়াড়ী সর্দারকে এই ভাবে তাঁর নিকট নিরাজ্ঞের মতন আপ্যায়িত জানাতে দেখে বড় বাবু মহীন্দ্র বাবু দৈর্ঘ্যহারা হয়ে তাদের উদ্দেশ্য করে চেঁচিয়ে উঠলেন, চুপ রতো কমবখতকো বাছ। এতনা সাহস ছায়া তোমরা যে মেরি অফসার লোককে বদনমে তুম হাত ডালা ছায়। এতনা কপোয়া বানায় যে তুম লোক বরাবর খানেভর আদমীয়েকে খুলাকে রাখেঙ্গে। এহি বাত, তুম সমক: হো তো তোমরা সারা বস্তা ছায় অভি আগসে ছালাস দেঙ্গ। তুলো মাত বে হামরা নাম মহীন্দ্র বাবু ছায়। আউর এ ভি খেয়াস রাখে যে পুরানো জমানী বল বাতা। উশি সাথ তোমলোককে পুরানো চাল ডী ছোড়নে পড়েগা। আজ তিঞা করে ভি তো তুমলোককো হাম বাঁচানে নেহি সেখা। বাও অভি সবকই তুম লোক খানেকে লক আপ'য়ে। এই মোহন সি। লে খাও ইলোককো হাজতমে।'

খানার বড় বাবু মহীন্দ্র বাবুর শেষ কথা কয়টি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। সত্য সত্যই তিনি একটি যুগের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন। উপস্থিত সকলেই উপলব্ধি করতে পারলো যে পুণোনা যুগ তার দোষ-গুণ সহ শীঘ্রই বুঝি বিচার নেবে এবং তার পরিত্যক্ত স্থল অধিকার করবে নিজস্ব দোষ-ত্রুটি সহ একটি নতুন যুগ। প্রণব এবং চিরঞ্জীব বাবুরা যে সেই অনাগত যুগের অগ্রদূত মাত্র, তা বুদ্ধিমান বড়বাবু মহীন্দ্র বাবুর বুদ্ধিতে বাকি থাকে নি। নানা কারণে তাদের পুলিশি কার্য সম্বন্ধে নতুন চিন্তাধারা তিনি মনে মনে পছন্দ না করলেও তাদের কার্যে সক্রিয় ভাবে বাধা দানের তিনি কোনও দিনই প্রয়োজন মনে করেন নি। তাই তাদের ঐ সকল আদর্শজনিত কাব্যের জন্ত বিশদ উপস্থিত হলে তিনি তাদের ঐ সব বিপদ থেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে মুক্ত করে দিতে চেষ্টা করেছেন।

বড়বাবুর আদেশ মত জমানার মোহন সি আসামিগণকে পালের ঘরে নিয়ে গেলে দ্বিতীয় বড়বাবু প্রণব ও চিরঞ্জীব বাবুকে তার সামনের চেয়ার দু'খানার বসতে অহরোধ করে দরজার দিশাহীকে তাদের ও নিজের জন্ত কয়েক কাপ চা আনিতে দেবার

জন্ত আদেশ দিলেন। তারপর চায়ের কাপটি সেখানে মিয়ে আসে মাত্র তা পান করতে করতে তাঁরা ঐ দিনের মামলা সংগ্রহ আলোচনা শুরু করে দিলেন।

'বাবু, খামেলা বখন বাধিয়েছো তখন তার সম্মুখীন হতেই হবে, দ্বিতীয় বড়বাবু প্রণব ও চিরঞ্জীব বাবুকে উদ্বেগ করে বললেন 'এখান এসো কেস ক'টা একে একে লিখে ফেলা বাক।' 'হ্যাঁ, তার, বড় সাহেব খানা ভিসিট করতে আসার আগেই ওগুলো লিখে ফেল তালো।' প্রণব বাবু আশঙ্কিত হয়ে বড়বাবুর কথার প্রত্যুত্তর করলেন, 'তবে এখান অশ্রুবিধে হচ্ছে এই আশ্চর্য্যমকে নিয়ে ও লোকটা সময় মত পালিয়ে খানার এসে খবর না দিয়ে চিরঞ্জীব বাবু আজ আর প্রণব নিয়ে খানায় ফিরতে পারতেন না।'

'সত্যি তার!' সাহস পেয়ে এইবার চিরঞ্জীব বাবু বললেন 'বদিও লোকটা অজ্ঞাত আসামীদের ভায়ই ওখানে বে-আইনীভাবে জুয়া খেলতে এসেছিল তাহলেও মানবতার দিক থেকে বিচার করে শুধু আমাদের পক্ষে যে কোনও রকমে মুক্তি দেওয়া উচিত হবে।'

বড়বাবু মহীন্দ্র বাবু ছিলেন একজন পুরাতন কথঞ্চদক ও অভিজ্ঞ অফিসার। মানবতা প্রভৃতি চোখাচুঁনি বুলির কোন দিনই তিনি ধার ধারেন নি। রাষ্ট্রীয় কাব্যের সহিত এই সব কতটুকু সম্পর্ক তাঁর অজ্ঞাত ছিল না। এই সব অকেজো কাঁকা বুলিগুলির উর্ধ্বে উঠতে না পারলে আজ পুলিশ বিভাগ এতো নাম-ডাক তিনি কোনও দিনই অস্বীকার করতে পারতেন না।

'দেখ চিরঞ্জীব। তুমি দেখছি কাজকর্ম কোনও দিনই শিখ না,' বিরক্ত হয়ে বড়বাবু মহীন্দ্র বাবু বললেন, 'একটা সিম্পল থিং ক্রামিস করে তোমার জন্তে একটা বিশেষ ছাত্র তুমি অর্জন করে ফেলেছো। বতোই তুমি মানবতা এবং উচিত্য ও অনীচিগো কথা ভাববে ততোই একটা সামান্য সিন্ডিকে তুমি ভটিস চলে জটিলতর করে নিজের এবং সেই সঙ্গে আমাদের জন্তও তুমি অকার্যকর বিপদ ডেকে আনবে। ট্রায়ে করে কান্ট্রাংলে তো খানার দোষ মানাহার সেবে বিশ্রাম করবার জং। পামকা ট্রাম থেকে নে পড়ে এই এজিলিটিটা না দেখালেই কি চলতো না? এই স খামেলা না বাথালে আজ একটু সিনেমা-টিনেমা দেখে আসা চলতে তো। এই সব খামেলা বাধিয়ে আবার মানবতার বুলি আওড়া তোমাদের লজ্জাও করছে না? এদিকে আবার একজন ভার কাজ-জানা অফসার হয়েও প্রণব পর্যন্ত তোমার রায়ে রাগ দি চলেছে। প্রকৃতপক্ষে এই কেসটা তো একটা খুবই সিম্পল কেস কতোকগুলি জুয়াড়ী রাস্তায় বসে জুয়া খেলছিল আর তাদের মত এই আশ্চর্য্যম নামে আসামীরাও ছিল একজন। বাস! এদের সকল নামে একত্রে জুয়াখেলার একটা কেস লিখে দাও। এর প বাহির হতে কয়েকজন গুণ্ডা পুলিশদলকে আক্রমণ করেছি এই তো? এই সম্পর্কে আরও জনকতক লোককে ঘানায় প তোমরা সম্বন্ধকমে এখান-ওখান থেকে পাকড়াও করে এমের বেশ ঠিক আছে। তাদের নামে একটা রাইট-টায়টের কেস লিখ রাখো। অবশ্য কেসটা কোর্টে পাঠানোর কোন সার্থকতা নেই আশেয়ে সমবিক প্রমাণের অভাবে তোমাকে তাদের ছেড়ে দিতে হবে। এর পর তোমাদের ঐ পেয়ারের গহীব মজদুর আশ্চর্য্যম নামে আরও একটা অভিজ্ঞ মামলা তোমাদের ,'

করতেই হবে। যে উদ্দেশ্যেই হোক পুলিশের আইন সঙ্গত হোপাজতী হতে অসম্মত সে পলায়ন করেছিল। এই বিশেষ অপরাধের জন্য উপযুক্ত রূপ অতিরিক্ত একটি মামলা আমরা তার নামে কর্তৃক করতে বাধ্য। এ কেসটি অবশ্য তার বিরুদ্ধে খুবই টাইট কেস। তার বিরুদ্ধে বা সাক্ষ্য প্রমাণ আছে তাতে করে আদালতের বিচারে এর সাক্ষ্য হয়ে বাওয়ার কোন বাধাই নেই।

‘এ্যা! বলছেন কি স্যার?’ এক রকম আঁতকে উঠে চিরঞ্জীব বাবু বলে উঠলেন, ‘হ্যা! ও না বলে আমাদের হোপাজত হতে পালিয়েছিল স্যার; কিন্তু এতেও তার উদ্দেশ্য বা মোটিভ ছিল তো অতীব স্পষ্ট।’ ‘কি বাজে বক্তব্য, চিরঞ্জীব বাবু!’ টেবিল থেকে একটা আইনের কিতাব উঠিয়ে নিয়ে বড়বাবু মহীন্দ্র বাবু বললেন, ‘সাধারণ ভাবে অপরাধ প্রমাণের জন্য তার পিছনে যে একটা উদ্দেশ্য বা মোটিভ থাকে তা সর্বপ্রকারে প্রমাণ করা প্রয়োজন তা আমি স্বীকার করি। কিন্তু এই পুলিশ হোপাজতী থেকে পলায়নরূপ অপরাধ সম্পর্কে ভারতীয় দণ্ডবিধিতে যে ধারাটি সন্নিবেশিত হয়েছে তাতে মোটিভ বা উদ্দেশ্য-বাক্যটি কি কোথায় লেখা আছে? দেশের আইনপ্রণেতারা যদি তোমার এই মানবতার কথা ভুলে গিয়ে থাকেন, তাহলে তার জন্য তো আমরা দায়ী হতে পারি না? ভুলে যাবে না যে দেশের আইন দয়া-দাক্ষিণ্য এবং কৃতজ্ঞতা দেখাবার জন্য কোনও অধিকার আমাদের এখনও দেখানি। সাত বাও। এইবার এদের বিরুদ্ধে যথাযথ ভাবে কেস করছি চটপট লিখে ফেলা গে। এখন বড়সাহেব এসেই চাকলাকর বিধায় এটো সব মামলার স্মারকলিপি (ডাইরী)-গুলি এগুনি দেখতে চাইবেন। আমরা এখান একটা নিদারুণ দারিদ্র্য যুগের মধ্যে বাস করতে শুরু করেছি। এখানে কোনও ভাবপ্রবণতার তিলমাত্র স্থান নেই। ইনসিডেন্ট বা ঘটনা, এখানে ঘটনা মাত্র। তাই এদের ঘটনারূপেই আমাদের মনে নিতে হবে। এখানে দয়াপরবশ হয়ে যদি তুমি আত্মবাহিরের বিরুদ্ধে মামলার তাঁকে বাঁচাবার জন্য নিজ খরচে উকিল নিয়োগ করো, তা হলেও তুমি একজন পুলিশ অফিসার বিধায় তোমার পক্ষে সেই কার্য দণ্ডনীয় ও অসম্মতীয় এক অপরাধ হবে। তবে সে এই মামলার দণ্ডিত হওয়ার পর তুমি যদি তার ফাইনের টাকা করটা আদালতে কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দাও তা সে কথা স্বতন্ত্র।’

বড়বাবু মহীন্দ্র বাবুর যুক্তিপূর্ণ বক্তব্যের বিরুদ্ধে কার কিছু বলবার ছিল না, তবুও চিরঞ্জীব বাবুর মনে হলো চারিদিকে যেন অনাচার ও অবিচার ঘিরে রয়েছে। চিরঞ্জীব বাবুর চিন্তাধারার সঙ্গে প্রণব বাবুর ওস্তাদগারও এই দিন কোনও অমিল ছিল।
তাদের দুজনেরই এই সময় মনে গেল যে এই সব অবিচার অবিচার হলেও উচিত বিরুদ্ধে প্রতিকার করার সাধ্য তাদের কার্যকরী নেই। এই সব আইন ধারা রচনা করেছেন তাঁরা এখান সকলেই নাগালের

বাহিরে। একশে আইনের মূল কিতাবগুলির উপর মাথা খুঁতে কিরলেও সেখান থেকে এই সম্পর্কে কোনও সম্ভবই মিলবে না। অগত্যা তাঁরা দুজনেই বড়বাবু মহীন্দ্র বাবুর উপদেশ মত পার্শ্ববর্তী ঘরে এসে আসামীদের মুখের দিকে না তাকিয়েই তাঁদের বিরুদ্ধে মামলাগুলি একে একে লিখে ফেলতে শুরু করে দিলে। তবুও শাস্তাবাহিরের বিরুদ্ধে ‘পলায়নের’ মামলাটি লিপিবদ্ধ করতে করতে চিরঞ্জীব বাবুর মুখ থেকে অসম্মত একটি শব্দ বার হয়ে এলো—‘উঃ কি অবিচার! চিরঞ্জীব বাবুর মুখে এই কথাটা বোধ হয় ঠিক এই সময়েই প্রণব বাবুরও মনে জেগে উঠেছিল। তাই অসম্মততার মধ্যেও চিরঞ্জীব বাবুর কঠিনস্বভাব আত্মপক্ষনিষ্টি সহজেই প্রণব বাবুর কানে পৌঁছিয়েছিল। কিন্তু প্রণব বাবু দুনিয়ার হাল-চাল সবক্ষে চিরঞ্জীব বাবু অপেক্ষা অধিকতর রূপ অজিজ ছিলেন। তাই তিনি ইসারায় তাঁকে চুপ করতে বলে পুনরায় আপন কার্যে মনোনিবেশ করছিলেন। এমন সময় পিছন হতে কে একজন ভঙ্গলোক এসে বলে উঠলেন, ‘নমস্কার প্রণব বাবু। বাধ্য হয়েই আসতে হলো। একটু বিরক্ত করবো, স্যার!’ প্রণব ও চিরঞ্জীব বাবু তাঁদের কলমের গতি ধামিয়ে সচকিতে চেয়ে দেখলেন তাঁদের পরিচিত ব্রীজহরি কলেজের অধ্যাপক এবং স্থানীয় মনোব্রহ্মা থিয়েটারের মালিক ব্রীজেন ঘোষ কখন তাঁদের সম্মুখে এসে উপস্থিত হয়েছেন।

‘আরে। বোম সাহেব যে,’ টেবিলের উপর হাতের কলমটি নামিয়ে রেখে প্রণব বাবু জিজ্ঞেস করলেন, ‘আপনিও থানায় এসে উপস্থিত! ব্যাপার কি, কিছু খবর আছে?’ ‘না না। খবর থাকবে আর কি? খবর দেওয়া আমাদের পেশা নয়। ও সব বাজে ব্যাপারে কোন দিনই আমরা থাকিনি’ একটু অপ্রস্তুতার সহিত প্রফেসার বোম সাহেব বললেন, ‘এই আপনাদের জন্তেই আজ থানায় আসতে বাধ্য হয়েছি। কচুরী গলির মোড়ে ঝাঁড়িয়ে আমার সঙ্গে বন্ধুত্বের ভাব না দেখালে আপনাদের কাছে আসবার আমার কোন দরকারই ছিল না। এখান আদালতে থাকতে হয় ওই ওদের সঙ্গে ওদেরই ঐ পাড়াতে তো। তাই ওদের অনুপ্রাণে আসতে হলো—একবার আপনাদের কাছে। যদি দয়া করে অন্ততঃ

পেটের যন্ত্রণা কি মারাত্মক তা ডাক্তারগোঁরাই শুধু জানেন! যে কোন রকমের পেটের বেদনা চিরদিনের মত দূর করতে পারে একমাত্র

বহু গাছ গাছড়া
দ্বারা আয়ুর্বেদ
মতে প্রস্তুত

বাকলা

ব্যবহারে লক্ষ লক্ষ
রোগী আরোগ্য
লাভ করেছেন

ভারত গভঃ স্নেহিঃ নং ১৬৮৩৪৪

অম্মশূল, পিত্তশূল, অম্মপিত্ত, লিভারের ব্যথা, মুখে টকভাব, তেজুর ওঠা, বমিভাব, বমি হওয়া, পেট ফাঁপা, মন্দারি, বুকজ্বালা, জ্বালায় অরুচি, স্বপ্ননিদ্রা ইত্যাদি রোগ যত প্রাচুর্যই হোক তিন দিনে উপশম। দুই সপ্তাহে সম্পূর্ণ নিরাময়। বহু চিকিৎসা করে মারা হতাত হইয়েছেন, তাঁরাও আশ্চর্য্য লাগে সেজন্যে নবজীবন লাভ করবেন। নিম্নলিখিত মূল্যে প্রেরণ।
৩২ ডোজের প্রতি কৌটী ৩-টাকা, একডো ৩ কৌটী ৮-টাকা ৫০ নং পাঃ ডাঃ, মাঃ ও পাইকারী দর পৃথক।

দি বাকলা ঔষধালয়। হেড অফিস-স্বর্নশিখার (পূর্ব পাণ্ডিত্য)
কলকাতা-১৪৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, অফিস-৭

এরা কেসের আসামী করার জামীন দিয়ে দেন। তা ব্যক্তিগত ভাবে ওদের উপর আমার বিশ্বাস আছে। তাই আমি রিজিষ্টার ওদের জন্ত জামীন হতে পারবো।'

এরূপ ও চিরঞ্জীব বাবু বন্ধুত্ব নির্বাহক ভাবে প্রক্সেসার ঘোষের দিকে দেরে বসলেন। তাঁর মতন একজন নামকরা সুশিক্ষিত রাজিবও এই সব গুণা বদমায়েসদের সজিত মেলামেশা তাহলে হলে। তাহলে কি এই সব গুণা জুরাড়ীরাও অস্ত দিক হতে কিছু কিছু সন্তোষেরও অধিকারী? বখন প্রক্সেসার ঘোষকে মোদার ঘড়ি এবং হীয়ার আঙ্গী সহ অস্ত দখীরে তাঁর রবিজা উবার বাড়ীতে তারা প্রতিদিন হাতহাত করতে গেল, তখন তাদের ঘণ্টা ঘণ্টার সহিত তালো দিকও কিছু জায়ে বৈ কি? এ উপকাঠকুর জন্ত এরা প্রোঃ ঘোষের দিকটো কোমণ্ড দিম একটি কপকপও দাবী করেমি। অধিকতর এই সব চোর গুণারা পাড়াপড়কীরে তিন পাড়ার বদমায়েসদের কখন হতে হামেসাই রক্ষা করে এসেছে। অস্ত দিকে প্রক্সেসার ঘোষকেও তাঁর পক্ষপালন বা চিরঞ্জীবতার জন্ত সবদিক বিবেচনা করলে নিশ্চয়ই দাবী করা যায় না। রূপজীবিনী নারী উবারে একনিষ্ঠ জীবন বাগনের স্বর্ধোগ দিয়ে প্রোঃ ঘোষ তাকে অধিকতর অধ্যাপন হতে যে রক্ষা করেতেন, তা নিঃসংশয় চিত্তেই বলা যেতে পারে। আর এ হতভাগিনী নারী উবারাবীরও কি বহু সন্তোষ নেই? আছে বৈ কি। তা না হলে কি সে শিল্পের পুজারী হয়ে এতো নাম করতে পারতো? সেদিনও তো এরূপ ও চিরঞ্জীব বাবু এ নারীর অভিনয়-চাতুর্যে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। এরূপ এক চিরঞ্জীব বাবুর মনে হলো, যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে বুঝে বার করতে পারলে পাক জগাল বা ডেবরিসের মধ্য থেকেও বহু মণিমাণিক্য তাহলে উদ্ধার করা যায়। এই সব জুরাড়ী বদমায়েসরা এক্ষণ পক্ষি পরিবেশের মধ্যে থেকেও যে তখনও পর্যন্ত করেকটি গুণেরও অধিকারী থাকতে পারে, তা তখনও পর্যন্ত এরূপ ও চিরঞ্জীব বাবুর কল্পনারও বাইরে ছিল। কৈ, যে অপকার্য তারা পেশারূপে গ্রহণ করেছে তার বাইরে তো তারা অস্ত কোনও অপরাধ করে না? বরং এমন বহু বোঁদজ ও অর্বোদজ অপরাধ আছে, যাকে তারা অস্তরের সঙ্গে ঘুপটাই করে থাকে। তাদের সায়েস্তা করার জন্ত প্রতিশোধের মনোবৃত্তি নিয়ে এরূপ ও চিরঞ্জীব বাবু তাদের ডোরার মধ্যে মধ্যে হানা দিয়েছে। কিন্তু আজও পর্যন্ত কোনও ধর্মবাজক বা সমাজসেবী তাদের দোষ ও মনকে উদ্ধার করার জন্তে সেখানে বাওয়ার কল্পনাও করে নি। এরূপ ও চিরঞ্জীব বাবু সব দিক ভেবে কান্নার উপর রাগ তো করতেই পারলো না, বরং সকলেরই প্রতি তাঁরা প্রশংসোন্মত্ত হয়ে উঠলো। মাস্তুরের যদি বাঘ মারার অধিকার থাকে তাহলে বাঘেরও আত্মরক্ষার্থে ঘুরে পাড়াবার অধিকার আছে বৈ কি। পুলিশের আক্রমণের প্রত্যুত্তরে তাদের উপর গুলাকলের প্রতি আক্রমণের মধ্যে এরূপ ও চিরঞ্জীব বাবু আর বেন কোনও অভায় দেখতে পেলেন না।

'নিশ্চয়ই জামীন ওদের দেবো এতে আপত্তি নেই আমাদের।' বিধায়ুক্ত চিত্তে প্রোঃ ঘোষকে উদ্দেশ করে এরূপ বাবু বললেন, 'কিন্তু সেই সঙ্গে এ দক্ষিণ প্রমিক আত্মরক্ষারও জ্ঞাপনকে জারীনে নিয়ে যেতে হবে।' 'এ্যা, এই আবার

কি হুছিলে বেললেন 'আর্য্যকে', সন্তুষ্ট হয়ে প্রোফেসার ঘোষ উত্তর দিলেন, 'ঐ লোকটাকে তো আমি তিনি না, তার? না, মশাই। ও সব বাইরের লোকের ব্যাপারে আমার কোনও মাথাব্যথাই নেই'।

প্রোফেসার ঘোষ সাহেব সভা কথাই বলেছিলেন। যে যুগে বন্ধুত্ব বাগনের সময় প্রথমই বিবেচনা করা হয়ে থাকে যে ঐ বন্ধুত্ব ব্যক্তির কতটুকু মাহুরের উপকার করার ক্ষমতা আছে আর কতটুকুই বা তার অপকার করার ক্ষমতা আছে, সেই যুগে অল্পগ্রহণ করে লিঙ্কারিৎ পণ্ডিত প্রোফেসার ঘোষের পক্ষে এর চেয়ে অধিক উদারতা দেখানো সম্ভবও ছিল না। তাই এরূপ বাবু একবার পরখ করবার জন্ত সম্মুখে দণ্ডারায়ী কচুরী গতির প্রধ্যাক্ত গুণা সর্দার বিলরামকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেদা সর্দার। আত্মরক্ষারকোত্তী জামীনমে লে লেগা। গুণা-সর্দার বিলরাম কিও এরূপ বাবুকে এ বিষয়ে একেবারেই মিথ্যার করলো না। সে খুশী হয়ে এরূপ বাবুর প্রথের উত্তরে বলে উঠলো, 'জব্বর বাবু সাব। উনকো জামীনমে লে লেজে। উনকো ইসি আপনকো বাস্তে হামি লোকই তো দাবী ছার। বেইমানী কাম হামলোক কতি নেহী করেজা, বাবু সাব।'

প্রোফেসার ঘোষ সাহেবের মত গুণা-সর্দার বিলরামও আত্মরক্ষারকো মাত্র এইদিনই দেখেছে। সাধারণ ভাবে মনে হতে পারে গুণা-সর্দার বিলরামের একবিধ ব্যবহারের জন্ত দাবী গুণা তাদের বেপরোয়া মনোভাব। কিন্তু এই ক্ষেত্রে তার স্বভাবসুলভ বেপরোয়া মনোবৃত্তির সহিত যে বখেট দরজেরও ছোঁয়াট ছিল তাতে অভিজ্ঞ অক্ষসার এরূপ বাবুর কোনও সন্দেহই ছিল না। তাঁরা খুশী মনে তাকে বাহবা দিয়ে কি একটা কথা বলতে চাইছিলেন, এমন সময় দরজার সিপাহী ছুটে এসে সেলাম করে জানালো, 'হুজুর বড় সাহেব আগয়া।' এর সঙ্গে সঙ্গে বাহির হতে পাহারার বন্ধুকধারী সেক্টর বন্ধু উঠানো ও নামানোর খটখট আওয়াজের সঙ্গে একটি মোটর গাড়ির দরজা খুলে ও বন্ধেরও একটা খটখট আওয়াজ শুনা গেল। এরূপ ও চিরঞ্জীব বাবু উঠে পাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে কোন দিকে দৃকপাত না করে দ্রুতগতিতে বড় সাহেব রমেশ বাবু ধানার জুনিয়ার অক্ষসারের ঘরের মধ্যে ঢুক পড়লেন। বড়সাহেবের পিছন পিছন তাঁকে সম্মান দেখানোর জন্ত এরূপ ও চিরঞ্জীব বাবু এবং ঐ সঙ্গে প্রোফেসার ঘোষ সাহেবও বড় সাহেবের সম্মুখে এসে উপস্থিত হলেন। আসন গ্রহণ করার পর বড় সাহেব রমেশ বাবুর প্রোফেসার ঘোষের উপর প্রথম দৃষ্টি পড়লো। একটুখানি ঠাট্টায়ে উঠে উৎসাহ হয়ে বড় সাহেব বলে উঠলেন, 'হালো প্রোফেসার ঘোষ। আপনি এখানে, ব্যাপার কি?' প্রোফেসার ঘোষ সাহেবের বন্ধুব্যক্তির বীরভাষ শুনে নিয়ে বড় সাহেব রমেশ বাবু ধানার বড়বাবুকে উদ্দেশ করে বলে উঠলেন, 'এ্যা, এ আবার কি? এ তেরী ব্যাড কেশ, উঃ। পুলিশকে জুরাড়ীরা ধরে পিটিয়ে দিলে। তেপুটী সাহেব তুলে তো বেগে আঙন হবেন। এ্যা? আমি জানতে চাই কে ওখানে জুরা চালাছিল। ওদের কাছ হতে ঘুরে পরসা খেয়ে ওদের ধরতে গেলেই শুণু ওরা দারপিঠ করে থাকে। তা না হলে ওদের মর্যাদা কোড অল্পবাহী ওরা শুণু ধরাব জন্তে পুলিশের গারে হাত কখনই তুলবে না। আবার মনে হয়, এই সব ঐ চিরঞ্জীব বাবুই ব্যাড। আমি এক্ষণ ওকে

সম্প্রপণ্ড করে দেবে। সামনের সোমবারের সকালে আপনি ওকে জোড়াবাগানের রিপোর্টের ক্রমে হাজির করবেন। এখন আশ্চর্য্য হুজু আর সকলকেই আপনাবা জামিন দিয়ে দিন। এবের বিক্রেতে তো মাত্র এই জুয়ার পেটা কেস। আশ্চর্য্যবাদের বিক্রেতে তো দেখছি সিবিরাস কেস লেখা হয়েছে। ওর জামিন টাভিন কিছ এখন হবে না। ও পালিশ পানার এসে খবর দিয়েছে না হাতী করেছে। ও সব হালকাই তোমরা না বুঝো, আমি তো বুঝি। ও ঘোঁড়ে এসে খানার ওদের চরে খবর দিতে এসেছিল, হাতে ওদের সকলেরই বিক্রেতে না এসেই কেস কজু করা হয়। ও সব জাঁওতার আমি ভুলি না। জাঁওত বিশ বড়ব চাকরী হতে চলেও আয়ার। একটু তবির করবে হাতে আদালত থেকে অন্তত এ লোকটা না খালাস পায়।

বড় সাহেব রমেশ বাবুর পরিদর্শনের জন্ত 'সব কয়জন আসামীকে ট্রিবিয়ালেই তাঁর সামনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আর সকলের মত বড় সাহেবের উপদেশ ও আদেশ সম্বলিত বক্তব্যটুকু ঐ সকল আসামীদেরও কানে গিয়েছিল। গুণ্ডা-সর্দার বিটসরাম আশ্চর্য্যম সম্পর্কীয় উপদেশটি শুনা মাত্র অবাক হয়ে মনে মনে মস্টিং উঠলো, তা রে খোদা। এই সব বড়বাকদের তুমি আমাদের মত খেয়ানা করে তুলতে পারলে না? গুণ্ডা-সর্দারের একজন সাক্ষর আসামীরও কানে বড় সাহেবের শেষের আদেশটি প্রবেশ করেছিল। তাই সে-ও যেন একবার তাবের আবেগে অসুট হয়ে বলে উঠলো, 'সব বেইমান ছায়। আর সকলের মত চিরঞ্জীব বাবুও এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বড় সাহেবের উপদেশ ও নির্দেশ-বাণী শুনেছিলেন। নিজের যা কিছু অপমান তা কিছুক্ষণের জন্য ভুলে গিয়ে তাঁর চোঁটের কোণে মাত্র একটা কথাই যুগিয়ে এলো 'এ কি বিচার না বিচারের প্রহসন!' কেবলমাত্র খানার বড় বাবু মরমে মরে গিয়ে মধ্যে মধ্যে চিরঞ্জীব বাবুর দিকেই মাত্র চেয়ে দেখছিলেন। বড় সাহেব রমেশ বাবু বিজ্ঞ কে কি ভাবে তাঁর উপদেশ এবং নির্দেশবাণী গ্রহণ করছে, তা ভেবে দেখবারও প্রয়োজন মনে করলেন না। ক্ষমতার আসীন ব্যক্তিদের এই সব আজেবাজে বিষয় ভেবে দেখবার জন্ত পর্য্যাপ্ত সময় থাকবারও কথা নয়। তিনি তাড়াতাড়ি করেকটি প্রয়োজনীয় পাঠাপত্র মন্তব্য সহ দস্তখত করে যেমন বেগে প্রবেশ করেছিলেন তেমনি বেগে থানা থেকে বহির্গতও হয়ে গেলেন। পিছন পিছন প্রত্যাহিক বেগে খানার অফিসারের দল তাঁদের শেষ অভিদান জানাবার উদ্দেশ্যে তাঁকে তাঁর গাড়ী পর্য্যন্ত এগিয়ে নিয়ে এলো। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে পুনরায় তাঁরা একে একে খানার ভিতর ফিরে এলেন। ততক্ষণে খানার অস্থতন সন্ধ্যারী দল বড় সাহেব রমেশ বাবুর নির্দেশ অনুযায়ী এক আশ্চর্য্যম সমস্ত অপর সকল আসামীকেই প্রোফেসার বোব সাহেবের কামানতে জামিন দিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। প্রত্যাপ্ত অফিসারদের গায়ে আসামীর একে একে থানা হতে এতক্ষণে বেরিয়ে বাচ্ছিল। তাদের দিকে নির্বিকার দৃষ্টিতে একবার চেয়ে দেখে বড়বাবু মহীন্দ্র বাবু মনোহর চিরঞ্জীব বাবুর কাঁধের উপর হাত রেখে বলে উঠলেন, 'বড় সাহেবকে কিছ কোনও প্রকারেই এজন্ত দোষ দেওয়া যায় না। তাঁর থান বায়না ও অভিজ্ঞতার দিক থেকে বিচার করলে তাঁর এই দল বিবেচনার জন্ত তাঁকে কোনও

দোষই দেওয়া উচিত হবে না। বা কিছু দোষ তা আমার আর ঐ হেত জমাগার মোহন সিং-এর। মিছামিছি আমাদের কৃত দোষগুলি বড় সাহেব নিরীচারে তোমার উপর চাপিয়ে দিলেন। সত্যই চিরঞ্জীব, আমি এজন্ত বড় লজ্জিত ও হুৎখিত। ঠিক আছে, বাওরা বাবে আধুন তোমাকে নিয়ে সোমবারে তাঁর রিপোর্ট কয়ে। হুজু বড়ই ঠাণ্ডা বাবু ভাজুক হোন ওদের খবর হতে তোমাকে বার করে আনবার দখেই ক্ষমতা তোমাদের বড়বাবু আছে। হ্যাঁ, তাহিই—

নিজের জুনিয়ার অফিসারদের কাছে এমন প্রোজস তাবে বড়বাবু স্বীকারোক্তি করলেন তা প্রণব ও চিরঞ্জীব বাবু বাওনার বাটবে ছিল। তাঁর সত্যবাদিতা এবং জুনিয়ার অফিসারদের প্রতি অসম্মান দেয় ও কর্তব্যবোধ সত্য সত্যই তাদের হুজু করে তুলেছিল। সপ্রতিভ তাবে 'না স্তার, ঠিক আছে' বলে উত্তরে তাঁদের প্রিয় বড়বাবুকে প্রণাম জানাবো মাত্র, তিনি দ্বিতহাস্তে প্রণব ও চিরঞ্জীব বাবুকে উদ্দেশ করে বললেন, 'হ্যাঁ, দেখো সত্যের উত্তরাকলে আজ আমার এর জবাব গোছের আমন্ত্রণ আছে খানার ফিরতে আজ আমার অনেক হাত হয়ে বাবে। ঐ জায়গাটার ঠিকানাটা মাত্র এই খানার সিপাহী করিমবজের জানা আছে। যদি একাত্তই দরকার হয়ে পড়ে তা'হলে তাকে দিয়ে তাড়াতাড়ি আমাকে ডেকে পাঠাবে। আচ্ছা, এখন ভাই তা'হলে চলি আমি।

বড়বাবু থানা হতে বার হয়ে গেলে প্রণব ও চিরঞ্জীব বাবু নিজেরদের নির্দিষ্ট কক্ষে ফিরে এলেন। বহুক্ষণ তারা চুপ করেই

বাসবী বঙ্গুর বন্ধনহীন গ্রন্থি

দাম—দু' টাকা

বলাকা প্রকাশনী

২৭-সি, আমহাষ্ট্রীট, কলিকাতা—৯

“সেগিকার প্রথম উপক্ৰাস, তাই হুদ্যনামে ভীক পদক্ষেপ। শ্রীমতী ভক্তি দেবী বইয়ের ভূমিকায় ছদ্ম-বন্ধন নিজেই কাটিয়ে উঠেছেন, সম্ভবতঃ তারাক্ষরের ভূমিকায় কেটে গেছে। প্রাণতোষ ঘটকও ভক্তি দেবীর শক্তির পরিচয় জেনেই এ কাজে তাঁকে উৎসাহিত করে এই বই লিখিয়েছেন এবং বঙ্গমতীতে প্রকাশ করেছেন। কাহিনী পরিবন্ধনায় দুঃসাহসের পরিচয় আছে—এবং শেষ অবধি তা নিশ্চিত সংসাহসের নির্দেশরসে ফুটে উঠেছে। এই বইয়ের দু'টি পুরুষ-চরিত্র এবং একটি নারীচরিত্র, সংসাহস, উদ্যম এবং আন্তরিকতার সংগে সমাজের একটি অতি বড় সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত দিয়েছে। বইখানা একটানা শেষ না করা পর্য্যন্ত থামা যায় না। ভাষা সরল এবং জোরালো; এ রকম সুন্দর ছাপা বইতে ছাপার তুল অবাঞ্ছিত।”—যুগান্তর, ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৯।

বসে রইলেন, তারপর সহসা নীরবতা ভঙ্গ করে চিরঞ্জীব বাবু বলে উঠলেন, দেখুন প্রণব বাবু! সত্যই তা' হলে হিট্রি রিপোর্টস ইন্সটলমেন্ট। কচুরীগিলিতে গুণ্ডাদের আক্রমণের সময় যেমন একসময় আত্মরক্ষা ছাড়া আমাদের হেপাজতে কিছুকণের জন্ত আর কোনও আসামীই অবশিষ্ট ছিল না, তেমনি ধানাতোও এখনো এই হতভাগ্য অসুগত আত্মরক্ষা ছাড়া আমাদের দ্বারা খুঁত আর একজন আসামীও অবশিষ্ট রইল না। এই কি হচ্ছে তা'হলে ঈশ্বরের চুলচেরা বিচার? আমার নিজের দুর্ভোগের কথা না হয় বাইরে বিলায়।

'ঈশ্বরকে অকারণে আমাদের মধ্যে টেনে এনো না, চিরঞ্জীব', একটু হেসে কলে প্রণব বাবু উত্তর করলেন, 'মাতৃশ্বের জীবনটা হচ্ছে একটা বিরাট অরশাস্ত্র। ঠিক হিসেব মত চলতে না পারলে এই রকম গোলমাল ও ফুল বায়ে বায়ে হবে। আসলে আমাদের কাজকর্ম যুগোপযোগী না হওয়ার জন্তে বায়ে বায়ে আমরা বিপদে পড়ে থাকি। তাই আমার মনে হয় যে যুগের পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত কিছুকাল আমাদের অপেক্ষা করাই উচিত হবে। তবে দিন আগত ঐ, কিন্তু একথাও ঠিক যে, সাধ্যমত আমাদেরই ঐ আকান্ধিত যুগের আও আগমনের নুতনা করে দিতে হবে। তবে এই জন্ত কিছু কিছু বিড়বনা ও লাইনা আমাদের মধ্যে মধ্যে সন্ধ্যা করতে

হবে বৈ কি? আমরা তো কোন ছার, তাই। পৃথিবীর প্রখ্যাত অবতাররা পর্যন্ত যুগের বিরুদ্ধে ঝাঁপাতে সকল ক্ষেত্রে সাহসী হন নি। শুনেছি, ঐ সব বরেন্য ঈশ্বরগুরু ও অবতারদের প্রায় সকলেই অন্ততঃ দুই হাজার বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ইতিহাস বলে যে, ঐ সময় ক্রীতদাস প্রথা পৃথিবীর সর্বত্রই চালু ছিল। কিন্তু ঐ সকল অবতাররা বহু ভালো ভালো বাণী মানুষকে প্রদান করলেও ক্রীতদাস প্রথার বিলোপের বিরুদ্ধে একটি কথাও উচ্চারণ করে তাঁদের পৃষ্ঠপোষক ধনী ভক্ত শিষ্যদের বিরাগভাজন হতে বোধ হয় কোন দিনই সাহস করেন নি। তাঁরা যথুয়া সমাজকে প্রগাঢ়রূপে ভালবাসলেও ভৎকালীন যুগের পরিবর্তনের জন্ত অপেক্ষা করাই সমীচীন মনে করছিলেন বোধ হয়। যারা তা করেন নি তাঁরা নিশ্চয়ই ঐ সময়কার জনসমাজের হাতে জঘন্যভাবে নিগৃহীত হয়ে বসবাসের জন্ত গহন অরণ্যকেই বেছে নিয়ে থাকতেন। থাক এখনো এ সব তত্ত্বকথা, ঈশ্বর ও তাঁর অবিচারের কথা ভুলে এইবার মামলার ডাইরী ক'টা চটপট লিখে ফেলতে হবে আমাদের। তা' না হলে আমাদের আরও এমন সব অপমান সহ্যে হবে, যা এখনও পর্যন্ত আমাদের দারদার বাইরেই আছে।

[ক্রমশঃ।]

বিদায়

তরুলতা ঘোষ

স্বপনের ঘোর ভেঙ্গে গেছে মোর—
বাই তবে চলে বাই,
বাসনার নীল আকাশের শেষে
রামধনু আর নাই।
নীল নভোপটে মেলে দেব পাখা,
দূরে চলে যাব রিস্ত বলাকা।
অদৌম শূণ্যে খুঁজে দেখি যদি
শান্তির নীড় পাই।
বেদনা-বিধ্বস্ত শূণ্য হৃদয়ে
বিদায়ের গান গাই।

দূর-দূরান্ত ভ্রমণ-ক্লান্ত
শ্রান্ত বলাকা আমি,
ছায়া-সুনিবিড় আশ্রয় লাগি
তব শাখা 'পরে নাহি,
মনে ছিল আশা সেখা গাঁব গান,
কুসুম-স্ববাসে করে নেব স্নান,
গোপন-পুলকে ঢেলে দেব প্রাণ
পল্লবছায়ে থামি।
বহু আশা করে তব শাখা পরে
নীড় বেঁধেছিলাম আমি।

কানন-কুঞ্জে কুসুম-পুঞ্জে
ঋতু গেয়ে যায় গান,
ভাষা দিশাহারা সুর-সুরভিতে
বিবশ আমার প্রাণ,
নয়নের জল ঢালি তরুশূলে,
আশা করেছিলাম পাত্রে ও ফুলে
ললিত মাধুরী উঠিবে গো ফুলে,
নিঃশেষে দিব দান—
বন্ধনহীন বস্ত্রাধারায়
পুলকাকিত প্রাণ।

গুরু-শাখার স্নহ আশ্রয়—
তাম কিশলয় হারা
সে তো নিস্ত্রাণ কণ্ঠের বাঁধন,
সে তো নির্মম কারা।
তাই তো আমার শাখা-নীড়ে আজি
করণ-রাগিনী উঠিতেছে বাজি,
গোপনে ব্যাধার করে পড়ে হায়
গলিত বেদনা-ধারা,
বহু দূরে তাই আমি চলে বাই
দুগ্ধ হোয়েছে সাঝ।

দিনের পর দিন প্রতিদিন...

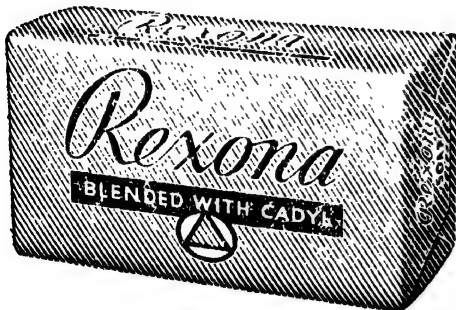


রেস্কোনা স্রাবান

আপনার ত্বকে
আরও সুন্দর করে

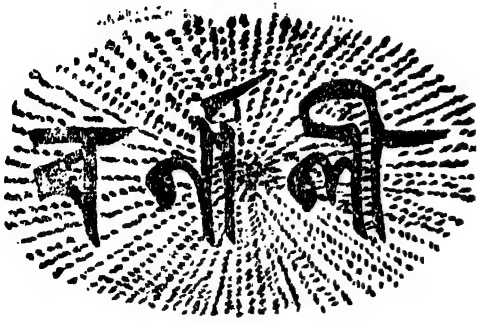
যতবারই আপনি রেস্কোনা স্রাবান দিয়ে মুখ
ধোবেন—আপনার ত্বক আরও নরম, আরও মোলায়েম
দেখাবে। তার কারণ, রেস্কোনায় থাকে ক্যাডিল—অর্থাৎ
কয়েকটি তেলের এক বিশেষ সংমিশ্রণ যা আপনার লাবণ্যকে
হুম্মর করে এবং আপনার ত্বকে হস্ত রাখে। রেস্কোনার
সবের মত ফেণা মাখুন দেখবেন আপনার ত্বক
প্রতিদিন আরও সুন্দর হয়ে উঠছে।

আপনার সৌন্দর্যের জন্তে... রেস্কোনা



রেস্কোনা গো, লি, অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে হিন্দুস্থান লিভার লি, কর্তৃত্ব ভারতে প্রাপ্ত

B.P. 148-X58 BQ.



[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

সুলেখা দাশগুপ্তা

সুসভ পাটিটা মঞ্জুর কাতে এতোই অক্লান্তিকর লেগেছিল বে, ও নিয়ে কথা বলতে ওর আর মন ছিল না। নইলে বলে না গেলেও এসে বলতো। বস বলতো আরো হু চড়িয়েই—যদি ও রজতের এই রাজকীর লাক পাটির রাজকীর অপব্যয়ের উপর আর কিছু কারিগরি চালাবার শক্তি ওর ছিল না। তবু হু'চোখ বড় বড় করে তুলে স্বপ্ন-বিশ্বের ভাণ করে বর্ণনা দিত সেট পরমাশ্চর্য খাত-তালিকার। দরজার বাগস সজারবস্তা মডেলের মতো কাঁড়িয়ে থাকা যেয়েটি হতে আরম্ভ করে প্রতিটি বিভিন্ন নারী-পুরুষের বিভিন্ন বস্ত্রের পোষাক-পরিচ্ছদের আর চলম-বলনের ব্যয়ের অঙ্কের। বলত, আচ্ছা তোরাই দেখগিলে! আমার এমন হুং ছাচ্ছ, আপসোস হচ্ছে। এ্যা বলব আর একদিন এমনি একটা পাটির আয়োজন করতে? ওদের পক্ষে কি আর এমন। আমাদের পাঁচ সাত টাকা ওদের পাঁচ শত হাজার টাকা এক কথা তো—বলবো? দেখবি প্রতিটি মেয়ের দিকে তাকিয়ে জোর কেবল মনে হবে—

‘নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধু স্ত্রীকরী রূপসী,

চে অনন্ত যৌবনা উৎসী’

হুনিগ ধান ভাজি দেয় পান তপস্কার ফল,

তোমার কটাক্ষনাতে ত্রিত্বন যৌবন-চঞ্চল,

তব স্তনভার হতে নভস্তলে খসি পড়ে তাবা—

অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষোমাঝে চিত্ত আশ্রয়্যার,

নাচে বস্ত্রধারী।’

বাবি দিদি? আমি বললে তব্রলোক ঠিক আর একদিন এমনি একটা পাটির ব্যবস্থা করবেন। এতো ভালো না—একেবারে ভীষণ। তারপর লজ্জার হু মিশিয়ে ধেম ধমকে যেন বলতে চায় না, ভেতরের আবেগ চেপে রাখতে পারছে না বলেই বলে ফেলছে, এমনি করে বলত রজতের কথা আর দেখত মৌরীর মুখের চেহারা বলল। ফেপানোর এমন একটা বিষয় হাতে পেয়েও বে ছেড়ে গেল মঞ্জু, তা একেবারেই তিক্ত বাবে।

তবু কিছু মঞ্জুকে দেখা গেল একদিন রজতেরই হোটেলের করিডোর দিয়ে দ্রুত পায় প্রবেশ করতে এবং রজতের বহু দরজায় কাঁড়িয়ে টাকা দিতে।

আজ ছুটির দিন দেখে সকাল বেলা বেরিয়েছিল সে তার এক বন্ধুর দেওয়া ছোট্ট ঠিকানা নিয়ে টুইসন্ডের খোঁজে। হু' জায়গা থেকেই নিরাশ হতে কিয়তে হয়েছে তাকে। ইয়োরোপীয় দেশগুলোর

ছাত্র-ছাত্রীদের পড়তে পড়তে উপাধি করার নানা সুযোগ-সুবিধার কথা চিন্তা করতে করতে পথ চলছিল মঞ্জু আর ক্লান্ত ভাবে ভাবছিল, একটা বি. এ অনার্সের ছাত্রী সে, একটা সামান্য রোজগারের পথ মাথা খোঁড়াধুঁড়ি করেও করে উঠতে পারছে না।

বড়া কিছু হঠাৎ করে একটা বেশ ভালো টুইশন পেয়ে গেছে। একটি এ্যাংলো মেয়েকে বাংলা শেখানো। সপ্তাহে তিন দিন। পাঁচাত্তোর টাকা মাইনে। ও যদি এমনি একটা জোগাড় করতে পারতো। হঠাৎ পথের মাঝেই ধমকে কাঁড়িয়ে পড়ল মঞ্জু। রজতের সেই লম্বা বহু ইয়োরোপীয়ান মহিলায় ভিড় দেখেছে সে। তাদের ভেলর তো কারু বাংলা শেখার প্রয়োজন না থাক, সখ থাকতেও পারে। যদি না-ও থাকে তবে কথাটা মনে হচ্ছে না বলেই হয়ত নেই। বললে উৎসাহবোধ করতে পারে। বিশেষ করে কথাটা যদি আবার রজত বলে। হী নিশ্চয়—বড়ার মতো একটা কাজ রজত ওকে ঠিক করে দিতে অনায়াসে পারে, এই যুহুর্ন্তে পারে।

মঞ্জু বধন গিয়ে রজতের ঘরের মেহগনি কাঠের ভারি দরজার বহু কপাটে টাকা দিয়ে কাঁড়ালো, তখন দশটা বেজে না গেলেও বাজে। এই কিছুক্ষণ হলো মাত্র বিছানা ছেড়ে সোফার এসে বসেছিল রজত। বয় লেবুর রস দেওয়া ব' কফি দিয়ে গেলে বলে বসে তাতে গলা ভিজোছিল আর বিশ্বাস—বিশ্বাস যেন তার রাত ভোও স্পিরিট ঢালা জিবে মনে শরীরে, বিশ্বাস যেন তার সুখো জীবনটার প্রতি এমনি ভাবে প্রতিটা চুহুকের সঙ্গে মুখ বিকৃত করতে করতে বাঁ হাতে কক্ষ এলোমেলো চুলগুলোকে পেছন দিকে ঠেলছিল। এমনি সময় দরজার টোকার শব্দ হলো। বে ভাবে যুঁকে বসেছিল তেমনি ভাবে বসে থেকে চুলের ভেতর আঙ্গুল চালাতে চালাতে বিগস গলার লাড়া দিল সে—কাম ইন—কাম ইন। মঞ্জু ভেতরে ঢুক বেশ করেক পা ঘরের ভেতর এগিয়ে এলে মুখ তুলল সে। প্রথম যুহুর্ন্তটার বে মঞ্জুকে কোন সম্ভাবণ করে উঠতে পারলে না রজত সেটার কারণ বোধ হয় অবিশ্বাস্য আনন্দ। তারপর একেবারে উঠে কাঁড়িয়ে ডান হাতটা প্রসারিত করে দিয়ে আহ্বান জানালো—আরে এসো এসো।

মঞ্জু আরো করেক পা এগিয়ে এলে সন্নত ভঙ্গিতে সামনের সোফাটা দেখিয়ে দিল বসতে।

মঞ্জু বসলে সে-ও বসল মঞ্জুর মুখোমুখি কোঁচে। টেবিলের উপরের টিনটা থেকে একটা সিগারেট টেনে বের করে ছুই টোটের চাপে ধরে লাইটার জ্বালাতে জ্বালাতে বলল—‘প্রভাতে উঠিয়া ও মুখ দেখিহু, দিন বাবে আজ ভালো’ কি বলো?

লাইটারের পলক আলোর রজতের মুখের বা সব আগে মঞ্জু চোখে পড়ল তা হলো, তার ছুই চোখের কোল-গড়ানো গভীর কালি—মুখা-ঢালা কালি।

লাইটার নামিয়ে মঞ্জু দিকে তাকালো রজত—কফি খাবে?

—না। কফির গন্ধ আমার ভালো লাগে না।

—বালল আর কাকো বলে। আচ্ছা, চা আসছে। চাই খেয়ো। মঞ্জু দিকে একটু বঁকে বসল রজত—তারপর বলো দেখি তনি, তোমার সে দিনের প্রার্থনার জোর ধরেছিল?

হাসল মঞ্জু।

—অবশি তুমি বলবে তোমার প্রার্থনার জোর ছিল কি না তার পরখ তো হবে আমায়ের দিয়ে। আশা হয় তোমার।

—হয়। হাসিমুখে জবাব দিল মঞ্জু। তবে প্রার্থনার ফললাভ তো হাতে হাতে হয় না কিন্তু একদিন না একদিন নাকি হয়ই। ফলের জন্য অপেক্ষা করতে হবে আমাদের।

—কববে অপেক্ষা?

সরল ভাবে 'হাঁ' বলতে গিয়ে রক্তন্তর চোখের দিকে তাকিয়ে থেমে গেল মঞ্জু।

হাসিল রক্তত। ছেলেমানুষি করছি। যেন আপনাকে আপনি বলে উঠে পড়ল রক্তত সোকা ছেড়ে। হাঁটাইটি করতে করতে বললে—আমি তো জানি আমাকে হুমকি দিয়ে নিজে তুমি বাড়ী ফিরে গিয়ে দিবা পেট পূরে খেয়েছ। তাই তোমার প্রার্থনার জোর না ধরলেও আমারটায় নিশ্চয়ই ধরেছিল। একে তো নির্জলা উপোস করেছি। তার উপর জানতো, সাধনার বসবার আগে সাধকবা সিদ্ধি গাঁজা ভাস্কর্য বা হোক একটা নেশার বৃন্দ হয়ে যেন। তাতেও ত্রুটি যাবিদি আমি। আচ্ছা, সেদিন তোমার খুই খারাপ লেগেছিল না?

—লেগেছিল।

—কিন্তু কেন?

—ভালো লাগছিল না বলে।

হেসে ফেলল রক্তত।—তোমার কি ভালো লাগে বলা?

—ভাবতে হবে।

—বেশ ভেবেই বল। বলল রক্তত।

—এতো তাড়াতাড়ি হবে না। মনে সর্বদাই তো কত চাওয়ার ভিড় লেগে রয়েছে কিন্তু যদি দৈববাণী হয়, 'বর বাণী' তখন কি আমরা ভেবে ঠিক করে উঠতে পারি কি ছাই।

—পারো না?

—না। মাথা নাড়ল মঞ্জু। পারি না। আমি আকুল হয়ে ভেবে দেখেছি, খুঁজে পাইনি। সব চাওয়া কেমন যেন তুচ্ছ হয়ে উঠে চোখের উপর দিয়ে, একের পর এক করে মিলিয়ে যেতে থাকে। হাসল মঞ্জু। আপনাবটাও ভেবে দেখতে সময় লাগবে। এটা গুটা একটা কিছু বলে ঠকে যেতেও তো পারি।

দৃষ্টিটাকে একটা কিছু গুপের রেখে রক্ততকে অন্তরমনস্ক ভাবে বসে বসে চুল পেছন দিকে ঠেলতে দেখে মঞ্জু জিজ্ঞাসা করল—কি ভাবছেন এতো?

—তোমাকে। তোমার কথা অনেক সময়ই আমি এমনি ভাবি। আচ্ছা মঞ্জু তুমি কখনো কাউকে খুব ভেবেছ—ভীষণ ভাবে ভেবেছ?

তৎক্ষণাৎ টেনে টেনে জবাব দিল মঞ্জু—হ্যাঁ—আ—আ।

—কে সে?

—বলবো?

—বলো।

—আমার নজরটা সব দিকেই সাংঘাতিক রকমের উঁচু। সাধারণ মানুষের আমার মন নেই। রাজা মহারাজার কাল তো কাশিদাসের কালের মতো হারিয়েই গেল। অগত্যা মন্ত্রীদের মধ্যে যিনি মহামন্ত্রী তাঁর কথাই ভীষণভাবে ভাবি আমি। প্রতিদিন তাঁর উদ্দেশ্যে মালা গাঁথা, প্রতিদিন তাঁর উদ্দেশ্যে সে মালা আমার জলে ভাসানো। শীতে গাঁথি যেতপন্ন। বসন্তে

কাষিনী। বর্ষায় সন্ধ্যামালতী। গ্রীষ্মে ভাসাই কাশের গুচ্ছ। চোখের জলের চাইতে পবিত্র বারি নেই। তাই সে মালা রাতে চোখের জলে ভিজিয়ে রেখে ভোরে ভাসাই জলে। যেদিন আমার মালা আমার নিঃশ্বাসের, আমার চোখের জলের উচ্ছ্বাস সঙ্গে নিয়ে গিয়ে তাঁর গলার ছানিয়ে পড়তে পারবে—সেইদিন ধন্য হবো আমি।

—এসো দিচ্ছি আমি মালা দেবার ব্যবস্থা করে।

—উহু, তেমন দেওয়া নয়—দশের মধ্যে একজন হয়ে দেওয়া নয়। দীর্ঘ প্রতীক্ষার বার্ষ হবে তবু আমার মালা, আমার মালা বলেই এসে প্রসন্ন হাতে গলায় না পরা পর্যন্ত সে মালা জলেই জেসে যাবে।

—আচ্ছা, তোমার মালা তিনি তোমার মালা বলেই একান্তে গলায় পরলেন। কিন্তু তারপর করবে কি তাকে নিয়ে তুমি? সকালবেলা আলু-পটল মাছের ফর্দ হাতে বাজারে পাঠাবে?

—না। তাঁর রাজকাজই তিনি করবেন। শুধু দিনের শ্রমের শুরুতে চুপি চুপি কানের কাছে মুখ নিয়ে বলবো, রাজকাজে ধাবার আগে আমার কথাটা একটু শুনে যেও গো।

হেসে উঠল রক্তত—তোমার রাজার কানে কানে বলা কথাটা কি, নিশ্চয়ই সেটা জিজ্ঞাসা করা আমার পক্ষে শোভন হবে না। কিন্তু তারপর?

—তারপর? তারপর আর আমি ভাবতে পারিনে। রাজার রাজত্বের চেহারাও হবে বদলে। ওঃ, আপনি ভাবছেন তো কি দৃষ্টতা কি স্পর্ধা মেয়েটার। কিন্তু শিক্ষিত নাসের চাইতেও যেমন মজল ইচ্ছার জোরে আর হৃদয়ের জোরে 'খুঁ' মা সন্তানের পক্ষে অনেক বেশী মঙ্গলের হয়ে থাকেন, তেমনি রাজার রাজত্বের মঙ্গলের পক্ষেও সব চাইতে বেশী মঙ্গলের কাজ করতে পারে শুভ ইচ্ছার জোর, আর হৃদয় পারে না?

—রাজার গলার মালা দেওয়া তোমার ঘটুক আর নাই ঘটুক—তুমি অনেক কাজ করবে মঞ্জু—নিশ্চয়ই অনেক কাজ করবে।

যেমন বসেছিল তেমন বসে থেকেই ডান হাতটা মঞ্জু রক্ততের দিকে বাড়িয়ে বললো, করবো একটা প্রণাম?

—জারে, কি পাগল! একেবারে ওপুড় হয়ে মঞ্জুর বাড়ানো হাতটা ছ' হাতে মুঠো করে ধরল রক্তত।

ওয়েটার এসে প্রোতরাশ হাতে ঘরে ঢুকলো মঞ্জুর হাত ছেড়ে দিল রক্তত। হাতের ট্রে টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে ওয়েটার চলে গেল।

—এই এগারোটার সময় ভোরের খাওয়া? আমি এ সময়ই চা খাই। আজ নিশ্চয়ই তোমার উপোসের দিন নয়।

—না বলে এগিয়ে বসে ট্রেটা মঞ্জু টেনে নিল কোলের কাছে। তারপর ফলের ডিসটার ফল নামিয়ে খাবারগুলো কিছু কিছু গ্রেটে তুলে নিয়ে নিজের জন্য রেখে বাকি সব ধরে দিল রক্ততকে।

—এটা কি হচ্ছে? আমি খেলে কি আনিরে নিতাম না। সকালে আমি শুধু চা খাই। ওদের দেবার নিয়ম, দিয়ে বার।

—আচ্ছা আজ খান। ডিম-কটর ডিসটা তার হাতে তুলে দিয়ে বলল—সকালে এখন না খাওয়াটা কিন্তু ভালো নয়। দুপুরে খান কটর?

—একটা দুটো তিনটে।

—জ্যা—হুঁচোখ বড় করল মঞ্জু। আমার দিদির তত্ত্বাবধানে থাকলে দেখিয়ে দিত লিভার নষ্ট করা, আপনার এই খালি পেটে চা-কফি খাওয়া।

মাথা একেবারে এ কাত ও কাত করল রজত—বাহ্য্য খারাপ হয় এমন কাল আমি কখনো করিনে। লিভারের উপর আমার মায়ার খবর তুমি কি জানবে? চা-কফি খাবার আগে দুখানা এরাকট-বিস্কুট খেয়ে নিতে আমার কোন দিনও ভুল হয় কিনা ডেকে জিজ্ঞাসা করে ওয়েটারকে। চামচে দিয়ে ডিমের পোচটা তুলে মুখে ফেলে কমাল দিয়ে মুখ মুছল রজত। আচ্ছা মঞ্জু, সেই আকর্ষ্য নীল চোখের ছেলেটি কে? যদিও তার চেহারায় আরো বৈশিষ্ট্য রয়েছে কিন্তু তার চোখের নীল রংটাই সেদিন আমার দৃষ্টি টেনেছিল সব চাইতে বেশী। কে সে?

হাতের টোষ্ট নামিয়ে বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল মঞ্জু—কোথায় দেখলেন আপনি তাকে?

—কফি-হাউসে।

—আমার সঙ্গে?

—অবগুই।

—কখনোই কফি-হাউসে আমার সঙ্গে তাকে আপনি দেখতে পারেন না।

—তবে লেকে?

—তাও না।

—পার্কে?

—কোন পার্কে? তারপর রজতের মুখের দিকে তাকিয়ে বললো—না তা-ও দেখেন নি। মিথ্যা বলছেন।

—মিথ্যা বলছি? এই চেহারার কাক সঙ্গে তোমার পরিচয় নেই?

—তা আছে। কিন্তু কোথায় দেখলেন, তাই বলুন?

—সেদিন তুমি স্বপ্ন না খেয়ে বেরিয়ে এলে আমি তোমার পেছন পেছন এসেছিলাম। তুমি দেখনি। একেবারে একরোপে চলেছিলে তো? হঠাৎ মস্ত একটা গাড়ী থেকে এক ভয়ঙ্কর বেরিয়ে এসে তোমার নমস্কার জানালে, তুমি অপ্রত্যাশিত সাক্ষাতে বলে উঠলে—‘আরে, আপনি কোথা থেকে! ভারি মজা তো!’ তখন আমি তোমাদের পেছনেই ছিলাম।

—তাই বলুন। আবার টোষ্ট হাতে তুলে নিল সে। গাড়ী থেকে নামলেও সে কিন্তু আপনার স্বপ্নের কেউ নয়। আমাকে বাজাল বলছিলেন তো, ইনি তার চাইতেও বাজাল। দেশ ছেড়ে এখানে এসেছেন দেশ ভাগেরও বহু পরে।

—তারপর?

—তারপর বাস করেন উদ্বাস্তদের গোয়ালে। খান আকীড়া চালের ভাত আর কচুর তরকারী।

রজত ওর দিকে তাকিয়ে ওর কথা শুনতে শুনতে যে একে একে তার ডিসের সমস্ত খাবার ওর ডিসে তুলে দিতে লাগল, মঞ্জু লক্ষ্যে তা পড়ল না। সে খেতে খেতে নিজের কঁকে বলে চললো—মনে আছে দিদির বিয়ের দিন সন্ধ্যার খবর দিতে এসেছিলাম বিয়ে না হবার। আপনি এক ডিসভর্তি সুবাহ খাবার সামনে ধরে দিয়ে বলেছিলেন, ‘তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে সমস্ত দিন তোমার

খাওয়া হয়নি।’ সেদিন এই ভয়ঙ্করটিংর স্থল তৈরীর কল্পনা পরিকল্পনা শুনতে শুনতে দিন এমনই গড়িয়ে গিয়েছিল যে, তার মধ্যাহ্নের খাত-ভালিকার প্রধান মেছ সেই অনবদ্য কচুর তরকারীর স্বাদ গ্রহণ করবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। কিন্তু সে তরকারী গলার এমনই হল ফোটাতে লাগল যে আমার পক্ষে হুঁ গ্রাসের বেশী তিন গ্রাস মুখে তোলা সম্ভব হলো না। শুধু এর ক্ষুধার্ত খাওয়ার দিকে তাকিয়ে বসেছিলাম।

—স্থল কেমন চলছে তার? বেকনের টুকরোগুলো মঞ্জুর ডিসে তুলে নিজের গ্রেট খালি করে রজত হেলে বসল সোফায়।

—স্থল হয়ই নি।

—কেন?

সন্ধিপ্ত ভাবে নীলের স্থল পরিকল্পনা কাজে পরিণত না হবার ঘটনা বলে খাওয়া শেষ করল মঞ্জু। তারপর টি-পট থেকে চা ঢেলে রজতের হাতে একটা কাপ তুলে দিয়ে নিজের কাপটা হাতে নিয়ে সোফায় পিঠ রাখলো সে-ও। বর্তমানে ইনি এখন সাহিত্যিক নামশিপানী কোন এক ধর্মীর মজ্জহরি করছেন। তার ঠাণ্ডা ঘরে মুসাবান সিগারেট আর বিলিতি নম্রাতোলা কাপে চা খেতে খেতে নামশুদ্ধ লেখা বিলি করে চলেছেন। সামনে পুজোর মরশুম, তাই নাকি এখন তার নিঃখাস ফেলবার সময় মিলছে না। বলেন, উপাদেয় খাবার খাই। গাড়ীতে বাতায়ত করি। ঠাণ্ডা ঘরে বসি—সন্ধ্যার মতো কাটছে দিনগুলো। বেচারা!

—এই সৌভাগ্যবান বেচারার নাম?

—কি? বলে রজতের দিকে তাকালেই রজতের কৌতুকোজ্জ্বল চোখের সঙ্গে চোখ মিললে হেসে ফেলল মঞ্জু। তার নাম? তার নাম নীল। ‘চা’টা ঢক-ঢক করে খেয়ে নিয়ে কাপটা রাখতে রাখতে বললো—বত বাজে কথায় সময় নষ্ট করছি। যে শুক আসা তাই এখন বলা হলো না। আমি কিন্তু একটা বিশেষ দরকারে আজ আপনার কাছে এসেছিলাম।

—বেচারার সঙ্গে পরিচয় করা বাবে একদিন কিছু বিশেষ দরকারে এসেছিলে? কি বলোতো? অন্ত্যস্ত উৎসুক ভাবে জিজ্ঞাসা করে মঞ্জুর দিকে তাকিয়ে বসল রজত।

—একটা কাজ চাই।

—কাজ? যেন ‘কাজ’ শব্দটার অর্থ স্বপ্নসম করে উঠতে পারল না রজত।

—হ্যাঁ কাজ। একটা ছোটগাটো কাজের ভীষণ দরকার আমার। অবগু কলেজের কঁকে। আমার এক বন্ধু একটি গ্র্যাংলো মেয়েকে বাংলা শেখানোর চমৎকার কাজ জোগাড় করেছে। সেটা দেখেই আমার মনে এলো আপনার সে দিনের পার্টতে বহু বিদেশিনী সমাবেশ দেখেছিলাম। এমনি একটা কাজ হয়তো জোগাড় হয়ে যেতে পারে আপনার কাছে এলে। আর শুধু বিদেশীরাই বা কেন, দেখলাম দেশীরাও তো প্রায় অনেকেই আপনারা—বাংলা জানেন না।

—আমরা বাংলা জানিনে।

—কোথায় জানেন। ইংরেজিতেই তো নিজের ভেতরও কথা বলছিলেন।

—সে কি জানিনে বলে ?

চুলের গোছা আজুলে জড়াতে আর খুলতে খুলতে বিব্রত কণ্ঠে
এজত বললো—মুসকিলে ফেললে দেখছি।

বুড়ার মাম্ম-বর সব কিছু ঠেলে আগে এসে দাঁড়ায়। এই করতে
গিয়ে যে সে নিজের দরকারী কথা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে সে খেয়াল
মঞ্জুর হইল না। বললো—জানেন, ষাঁরা নিজেকেও ভেতরও নিজের
ভাষা ছেড়ে ইংরেজী ব্যবহার করেন, তাঁদের সম্বন্ধে বলার কিছু নেই।
বলে টোটে মুখে একটা অবজ্ঞার ব্যঞ্জনা প্রকাশ করল মঞ্জু। কিন্তু
ষাঁরা তা করেন না তাঁরাও অজ্ঞভাবী হলোই সোজা চলে যান
ইংরেজীতে। আজও এ কেন করে চলেছেন আপনারা ?

বিগ্মিত কণ্ঠে রজত বললো—বাদের কথা তুমি শরীর থেকে
আবশ্যসা বেড়ে ফেলে দেবার মতো মুখ করে বেড়ে ফেলে
দিলে, তারা কেন তাদের মায়ের মুখের কথা ছেড়ে অপরের মায়ের
মুখের কথার কথা বলে, এ তুমি নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা করতে পারো।
কিন্তু যারা বিদেশী তাদের সঙ্গে ইংরেজী বলা ছাড়া উপায় কি ?

—উপায় না বলা। আগবাড়িয়ে যদি কেউ নিজেকে ভাবায়
কথা বলতে শোনে তবে সে তো তাদের মন্ত সুবিধার কথা। কষ্ট
করে অপর ভাষা শিখতে বসবে তারা কেন ? জানের দিকে
তাহিয়ে কোন শিক্ষাটা আমাদের। কিন্তু ইংরেজী না জানলে
যেমন ইংরেজদের দেশে বসবাস অসম্ভব হয়, হিন্দি না জানলে
হিন্দিভাষীদের সামনে, ভেমনি বাংলা না জানলে বাংলা দেশে চলাও
অসম্ভব হবে—এই তো হওয়া উচিত—এই তো করে তোলা উচিত।

মঞ্জুর মুখে চাব পাশে এসে টুকি-ঝুকি দিয়ে দাঁড়ানো বিন্দু-বিন্দু
উত্তেজনার ভিড় দেখতে লাগল রজত।

—কিন্তু আপনারাও ভেতরই যদি থাকে অবজ্ঞা থাকে অনাদর,
তবে কি করে কি হবে ?

এজতকে আজুলেব টোকায় সিগারেটের ছাই বাড়তে দেখে
বলল—কি, হ্যাঁ হ্যাঁ ঐ সিগারেটের ছাই ষাঁড়ার মতোই বেড়ে ফেলে
দিলেন তো কথাগুলোকে আমার একেবারে টাটকা টাটকা ?

—না। তুমি একথাই তো বলতে চাচ্ছ যে, প্রয়োজন হয়
বলে প্রয়োজনের চাপেই আমরা শুধু মাত্র প্রয়োজনীয় ভাষাগুলো
শিখে থাকি। বাঙ্গলা ভাষার পেছনেও একটা প্রয়োজনের চাপ বা
তাগিদ সৃষ্টি করতে হবে—আব কোথাও না হোক বাংলাদেশটুকুর
মধ্যে নিশ্চয়ই। ঠিক। কি করতে হবে বলো ?

—আমি বলবো কি করতে হবে।

—তুমিই বলবে। আমার কাছে তো এ-সব অচেনা জগতের
চিত্তা।

—তবে সে কথা বলা হয়ে গেছে। কিন্তু এখন আমি উঠবো।
মোদিরা অপেক্ষা করবেন থাওয়া নিয়ে। যদি আপনার বান্ধবীদের
কেউ বাংলা শেখেন তবে আমি শেখাতে পারি এবং বর্তমানে দেশের
প্রয়োজনে নয়, নিজের প্রয়োজনের দিকে তাকিয়েই বলছি।
পাছে রজত কথাটার উপর গুরুত্ব আরোপ না করে, তাই ব্যাগ ধুলে
হুঁ টুকরো কাগজ বের করে রজতের সামনে ধরে বললো, এই
দেখুন না হুঁ-দুটো কাজের জন্ত বুঝে নিগাহ হয়ে তারপর আপনার
কথা মনে পড়েছে, আপনার কাছে এসেছি। একটা টাকা
যোজগারের উপায় না করতে পারলে চলবেই না যে।

রজত সোকার বসেই হাত বাড়িয়ে পাশের দেয়ালটা টেনে খুলল।
তারপর তার ভেতর থেকে বের করল একটা চেক-বই আর একটা
কলম। টেবিলের উপর লম্বা চেক-বইটা মেলে ধরে প্রথমে লিখল
মঞ্জুর নাম। তারপর একটা টানা সই দিল নিজের। কাগজটা ছিঁড়ে
কাগজ চাপা দিয়ে রাখল মঞ্জুর সামনে।

বোকার মতো জিজ্ঞাসা করল মঞ্জু—কি এটা ?

—চেক। তোমার প্রয়োজনটা আমি জানিমে। একটা তুমি
বসিয়ে নিও।

চেকটা হাতে তুলে নিল মঞ্জু। কিছুক্ষণ নীরবে রজতের
নাম সইটা দেখলে, তারপর চোখ তুলে বললো—পাঁচ দশ বিশ
হাজার—বসাবো ?

—বসাবো।

—কিন্তু তারপর আর যে কোন দিনও আমাকে দেখে দিন
ভালো বাবার কথা আপনার মুখে আসবে না ?

—আসবে।

—আসবে ?

—হ্যাঁ আসবে। তুমি যোজ্ঞ এসো।

—এমনি সাদা চেক সই করে দেন একটা করে ?

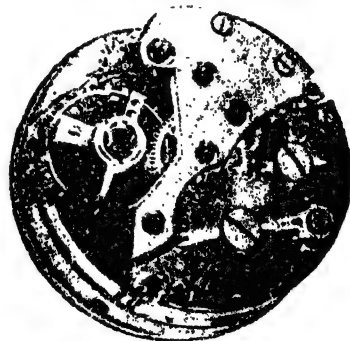
—দেবো।

—তারপর ?

—তারপর যে দিন না পারবো সে দিন তুমি থাওয়াবে আমার।

—আমি ? কিন্তু টাকা নিয়ে তো আমি জমিয়ে রাখবো না ?

GUARANTEED



WATCH REPAIRING
UNDER EXPERT
SUPERVISION

ROY COUSIN & CO

JEWELLERS & WATCHMAKERS

4, DALHOUSIE SQUARE, CALCUTTA - I

OMEGA, TISSOT & COVENEY WATCHES

তখন আপনার এক সন্ধ্যার উপকরণ সংগ্রহের সাধ্যও যে আমার মত বিশটা মঞ্জুর হবে না।

—ছেড়ে দেবো।

—পারবেন না।

—পারবো। দেখো ভূমি।

—সুভক্ত শীতল। আজ থেকেই। বার বার চেক কাটার দরকারটা কি। কেটে দিন একবারে। আপনার কিছু নয়।

হাসল রজত—না আমার কিছু নয়।

আজ সন্ধ্যার আসবো আমি দেখতে। ঠিক ?

উঠে মঞ্জুর সোকার পেছনে গিয়ে কাঁড়িয়ে রজত ন্তার তামাটে হাতের লম্বা লম্বা আঙ্গুলে মঞ্জুর মাথাটা সম্মুখে একটু চাপড়ালো। তারপর হু-হাত পেছনে রেখে পায়চারী করতে লাগল ঘরের এ-মাথা ও-মাথা।

টেবিলের ওপর থেকে রজতের কলমটা তুলে নিয়ে মঞ্জুরের উন্টানো পেশমের মতো গোটা নয় দশ পেশমবরা নয়ের সারি চেকটার মধ্যে লিখে কলম বন্ধ করে উঠে দাঁড়ালো মঞ্জু।

—নিলে না।

—কাজের খোঁজ নিতে আসবো। মনে থাকবে তো আপনার ?

—থাকবে। সেই খোলা দেওয়ালের ভেতর একসঙ্গে ভাঁজ করা সামনে যে দশ টাকার নোটের পাঁজাটা ছিল সেটা তুলে মঞ্জুর ব্যাগটা ওর হাত থেকে নিয়ে তার ভেতর ভরে দিতে দিতে রজত বলল—ধার দিলাম। কাজ পেরেই শোধ দিও।

এ টাকা যে ওর পক্ষে এখন কি, জানে শুধু মঞ্জু। কিন্তু এ ঘর থেকে টাকা হাতে বেরিয়ে যেতে দেখেছে সে। এর চাইতে অস্বস্তির দৃষ্ট ওর ধারণা ও আর কোন দিন কিছু দেখেনি। শুক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মঞ্জু।

ব্যাগটা নিজ হাতে মঞ্জুর কাঁধে ঝলিয়ে দিয়ে রজত বলল—সব কিছু নিয়ে এতো অবস্থা ভাবতে নেই। বিশেষ করে তোমার সুখে চিন্তা মানায়, ভাবনা মানায় না একেবারেই।

প্রয়োজনের চেহারা এক এক সময় এমন দুর্দান্ত হয়েই দেখা দেয়, যখন অস্বস্তিকে শুধু বুঝি চোখ বুজে আর ঢোক গিলেই এড়াতে হয়।

বাড়ীতে ঢোকের আগে টাকাগুলো ব্যাগ থেকে বের করে ক্রমালে জড়িয়ে বুকের ভেতর ঢোকালো মঞ্জু। কোথায় রাখবে, কে দেখে ফেলবে কে জানে! কথায় বলে, সাবধানের মার নেই। সে টাকা আর মঞ্জু বেরই করল না জামার ভেতর থেকে। বিকলে গা বুকে গিয়ে মনের ভুলে গায়ের জামা খুললে নামে ভেজা ক্রমালগুচ্ছ টাকা পড়ে গিয়েছিল মেঝের উপর। টাকাটা তুলে হাতে নিয়েও কতক্ষণ চূপচাপ কাঁড়িয়েছিল সে। যদি ও দেখতে না পেত, খেয়াল না করত। এই তো মৌরী এসে দরজায় কাঁড়িয়ে তাড়া দিয়ে গেল তাড়াতাড়ি করবার জন্য। ও বেকসই তো সে এসে চুকতো। তার চোখেই তো পড়ত ক্রমালে জড়ানো এই টাকা। সেই তো উগুড় হয়ে তুলত। তারপর পাগল হয়ে উঠত না সে। ক্লেপামি শুরু করত না সে! শুনত কোন যুক্তি? মানিত কোন কারণ? রজতের এই দেওয়ার পেছনে কোন মন্তব্য নেই, ওর এই নেওয়ার পেছনে কোন অমর্যাদা নেই—দুই ঠোটে সমুদ্রের ঢেউ-এর মতো বিজ্ঞপের ঢেউ তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিত না কথাগুলোকে মৌরী ঢেউ-এর মাথারই বজ্রের মতো। কাঁড়িয়ে কাঁড়িয়ে মঞ্জু বেন যে দুর্ঘটনা ঘটতে বাচ্ছিল, তার ত্রাস আর অজ্ঞের জন্ত রক্ষা পাওয়ার আরাম এই দুই অমুভূতির উপর দিয়ে একবার সখের পল্টারণা করে এলো।

[ক্রমশঃ]

মানসতীর্থে

বাণী পালচৌধুরী

হে বাতী মহান,

চলেছো গতির পথ অব্যাহত করি, ভরে নিতে প্রাণ

বিরাট বজ্রের আছবানে,

অসীম লক্ষ্যের পানে

তাই বিস্তারিত পথ।

অরণ্যের নিঃসঙ্গ মর্ম্মরে

যে বাণী রাখিয়া গেলে অশরীরী স্বরে

উপল-নির্ঝরে

কীর্ণ শ্রোতবিনী বীচিভঙ্গ 'পরে

যে স্থানি রখিয়া উঠে আত্মহারা

সে তোমারই গতিহীন প্রাণধারা

মর্ম্মের নিবেদন অনন্তে।

হৃষ্টের অস্পষ্ট প্রভাতে

পটাস্তরে, নিশ্চিহ্ন অন্ধ রাতে

পেয়েছিলো তোমার অন্তর

আদিবেবতার পরম নির্ভর

হে পশ্চিক, তাই সেই বিচ্ছুরিত হর্ষে

দিব্যজ্যোতি অপ্রমের বিরাটের স্পর্শে

জীবনের প্রথম দীপা।

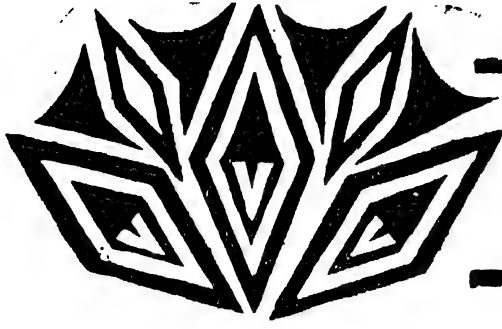
তোমার চরণপাতের শতান্তর চিহ্ন

করিবে না অপস্থত এ দীন মালিন্ত ?

করিবে না আর বার বীর্ঘ্যে, তেজে, ক্ষেমে

প্রসারিত জগতের প্রেমে

পূণ্যপুত তব আশীর্বাদ ?



সাহিত্য পরিচয়

১৩৬৫ সালের উল্লেখযোগ্য বই

ভ্রমণ ও অভিযান

অকারণের পথ ৪-৫০	জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	মিত্র ও ঘোষ
অজ্ঞেয় পশ্চিম ৪-৫০	ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ	এশিয়া
জাপানে ৬-৫০	অন্নদাশঙ্কর রায়	এম, সি, সরকার
নতুন ইয়োরোপ :		
নতুন মালয় ৫-০০	মনোজ বসু	বেঙ্গল পাবলিশার্স
নেপোলিয়নের দেশে ২-০০	দিলীপ মালিকার	ঐ
বিদেশ-বিভূঁই	দক্ষিণারঞ্জন বসু	বেঙ্গল পাবলিশার্স
ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ৫-৫০	গোপালদাস মজুমদার (সম্পাদিত)	গোপালদাস পাবলিশার্স
চিমতীর্থ ৩-৫০	সুকুমার রায়	বেঙ্গল পাবলিশার্স

জীবনালেখ্য ও মনোবী প্রসঙ্গ

অধ্যক্ষ সারদারঞ্জন রায় ১-৫০	কৃষ্ণবরঞ্জন রায়	এস রায় এণ্ড কোং
কবি স্বকান্ত ২-৫০	অশোক ভট্টাচার্য	সারস্বত লাইব্রেরী
কেশবচন্দ্র সেন ১-০০	যোগেশচন্দ্র বাগল	বঙ্গীয় সাঃ পঃ
ক্রীড়াঙ্গণতে দিকপাল বাঙালী ৩-৫০	অজয় বসু	দেবদত্ত এণ্ড কোং
দ্রুদ শরৎচন্দ্র ৪-৫০	মণীন্দ্র চক্রবর্তী	বসুধারা
৪৩ জীবনের পুণ্য কাহিনী ২-০০	আবদুল আজিজ আল আমান	
	জাগরণ প্রকাশনী	
নজরুলকে যেমন দেখেছি ২-৫০	বেগম শামসুন নাহার	ভারতী সাঃ
নজরুল প্রসঙ্গে ৪-০০	মুক্তাক্ষর আহমেদ	বিশ্ব শতাব্দী
বাবার কথা ৩-০০	উমা দেবী	মিত্রালয়
বাণা যতীন ২-৭৫	শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়	আই, এ, পি
বিজ্ঞানী স্বর্ষি জগদীশচন্দ্র ৬-০০	দীনেশ চট্টোঃ (সম্পাদিত)	বিত্তোদয়
বীরেন্দ্র বিবেকানন্দ (১ম) ৫-০০	অচিন্ত্য সেনগুপ্ত	এম, সি, সরকার
বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র ৩-০০	মণি বাগচী	শ্রীগুরু
ভারতের সাধক (৪র্থ খণ্ড) ৬-৫০	শঙ্করনাথ রায়	প্রাচী
রামমোহন ৪-০০	মণি বাগচী	জিজ্ঞাসা
শরৎচন্দ্রের সঙ্গে ২-৭৫	অসমজ মুখোপাধ্যায়	আই, এ, পি
স্বপ্নায়	সুশীল রায়	ওরিয়েন্ট

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয় ৬-০০	দীপ্ত ত্রিপাঠী	নাভানা
উনিশ শতকের বাংলা		
সাহিত্য ৫-০০	ত্রিপুরাশঙ্কর সেন	পপুনার লাই:

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও

বাংলা সাহিত্য ১০-০০		
কবিতার ধর্ম ও আধুনিক বাংলা		
কবিতার স্বভাবদল ৪-০০		
কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ৫-০০		
কলিকাতার সংস্কৃতি কেন্দ্র		
চলচ্চিত্র ২-৫০		
জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি ৩-০০		
ত্রিপুরায় বাংলা ভাষা ও		
সাহিত্য ৫-০০		
বঙ্গ প্রসঙ্গ ৫-০০		
বর্ষের যুগের পর ২-৫০		
বাংলা নাট্য বিবর্তনে		
গিরিশচন্দ্র ৫-০০		
বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা		
(২য়) ৫-০০		
রবীন্দ্রকাব্যে কালিদাসের		
প্রভাব ৫-৫০		
শতাব্দীর শিত-সাহিত্য ৭-০০		
সাহিত্যে ছোট গল্প ৮-০০		
সংস্কৃত শব্দশাস্ত্রের মূলকথা ৫-০০		

অসিতকুমার বন্দ্যো:	বুকল্যাণ্ড
অরুণ ভট্টাচার্য	জিজ্ঞাসা
মনজীলা খাতুন	ভারতী লাইব্রেরী
যোগেশচন্দ্র বাগল	শ্রীগুরু
রাজশেখর বসু	মিত্র ও ঘোষ
সৌরীন্দ্রমোহন মুখো:	পাইওনিয়র
মোহিত পুরকারসহ	কারী কে, এল
সুশীল রায় (সম্পাদিত) পঃ প্রঃ ভবন	
প্রেমেন্দ্র মিত্র	কথামালা
অহীন্দ্র চৌধুরী	বুকল্যাণ্ড
গোপাল হালদার	এ, মুখার্জি
বিমলকান্তি সন্দকার	গুরুদাস
খগেন্দ্রনাথ মিত্র	বিত্তোদয়
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	ডি, এম
শৈলেন্দ্র সেনগুপ্ত	কারী কে, এল

রম্যরচনা

অন্ত ও প্রত্যাহ	নীলকণ্ঠ	বেঙ্গল পাবলিশার্স
উপল-উপকূলে ২-২৫	নিমাইসামন বসু	এ, কে, ঘোষ
একটি সুবের কাহা ২-৫০	ভারতপুত্রম্	সাহিত্য
নিঃসঙ্গ বিহঙ্গ ৩-৫০	বাণী রায়	মুখার্জি বুক হাউস
ব্যান ও বস্তা ৩-০০	শশিভূষণ দাশগুপ্ত	বেঙ্গল পাবলিশার্স
ভেলকি থেকে ভেজ ৬-০০	আনন্দকিশোর মুন্সী	ঐ
যুদ্ধের ইয়োরোপ ৪-০০	বিক্রমাদিত্য	ঐ
লৌহকপাট	অরাসন্ধ	ঐ
সতুবজির গল্প ২-৫০	সতুবজি	ঐ
হরেকরকমবা	নীলকণ্ঠ	ঐ

রসরচনা

প্রবু	বলাকা প্রকাশনী
-------	----------------

ধর্ম ও দর্শন

দর্শন গ্রন্থ ১-০০	ইন্দু মজুমদার	আন্তোয় বুক ট্রল
দর্শনের ভূমিকা ৬-০০	নীরদবরণ চক্রবর্তী	এ, মুখার্জি
পাঁচাত্ত দর্শনের ধারা ও		
মাস্কীর দর্শন ৫-০০	রবি রায়	সিগনেট
দ্বিতীয় দর্শন (বিনোবা) ১-৭৫	বীরেন্দ্র গুহ	সর্বোদয়
হিন্দুধর্ম প্রবেশিকা ৪-৫০	স্বামী বিষ্ণু শিবানন্দ গিরি	সত্যশ্রম

সংগীত

রবীন্দ্র সঙ্গীতের ভূমিকা ২-০০	কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও	
	বীরেন্দ্র বন্দ্যো:	এম, সি, সরকার
হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে তানসেনের		
স্থান ২-৫০	বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ডি, এম	

অভিধান

পৌরাণিক অভিধান ১-০০	স্বর্গরচন্দ্র সরকার	এম সি সরকার
প্রভাত গ্রন্থাবলী (১ম খণ্ড) ১০-০০	প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	শ্রীভবন
বনফুল-রচনা-সংগ্রহ ১-৫০	বনফুল	মিত্র ও ঘোষ
মাইকেল-রচনাসম্মার ১০-০০	প্রমথনাথ বিন্দী (সম্পাদিত)	ঐ
রচনা-সংগ্রহ (১ম খণ্ড) ১০-০০	তারাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়	বেঙ্গল পাবলিশার্স

ইতিহাস

ইরোপে ভারতীয় বিপ্লবের		
সাধনা ৪-০০	অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য	পপুলার
সম্রাট বাহাদুর শাহ বিচার ৩-০০	অপূর্বমণি দত্ত	মিত্র ও ঘোষ

নানা নিবন্ধ

আধুনিক ইরোপ	দেবজ্যোতি বর্ষণ	বেঙ্গল পাবলিশার্স
গণতন্ত্র গ্রন্থ ২-০০	অম্মান দত্ত	মিত্রালয়
গ্রন্থাগার পরিচালনা ২-৫০	রাজকুমার চক্রবর্তী	শ্রীশঙ্কর
জেল ডায়েরী ৩-০০	সত্যীন্দ্র সেন	মিত্রালয়
টি বি স্বর্গ ৪-০০	ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়	মিত্রালয়
নারীর উক্তি ২-৫০	ইন্দ্রি দেবী চৌধুরাণী	বিশ্বভারতী
পরমাণু শক্তি ৪-০০	অমেলনু দাশগুপ্ত	
প্রাথমিক মনোবিজ্ঞান	গোপালদাস পাবলিশার্স	
	শ্রীনিবাস ভট্টাচার্য	
	বেঙ্গল পাবলিশার্স	
বৈদিক ও বৌদ্ধ শিক্ষা	নলিনীভূষণ দাশগুপ্ত	ঐ

কবিতা

অমিল থেকে মিলে ১-৫০	মণীন্দ্র রায়	এম, সি, সরকার
আলেখ্য ২-৫০	বিষ্ণু দে	এম, সি, সরকার
আলোকিত সমন্বয় ২-০০	আলোক সরকার	মিত্রালয়
জাতক ১-০০	বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	ইণ্ডিয়ান

ব্যঙ্গ কবিতা ৬-০০

বে আঁধার আলোর অধিক ২-৫০	
রক্তগোলাপ ২-৫০	
শেষ সংগীত ৪-০০	
শ্রেষ্ঠ কবিতা ৪-০০	
সন্ধ্যামণি ৫-৫০	
সমকালীন শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ কবিতা ৪-০০	
স্বনির্বাচিত কবিতা ৪-০০	

বনফুল	বেঙ্গল পাবলিশার্স
বুদ্ধদেব বহু	এম, সি, সরকার
বিমলচন্দ্র ঘোষ	
নজরুল ইসলাম	আই, এ, সি
সুনির্মল বহু	মিত্র ও ঘোষ
কালিদাস রায়	এ, মুখার্জি
কুমারেশ ঘোষ (সম্পাদিত)	গ্রন্থগৃহ
সঞ্জয় ভট্টাচার্য	আই, এ, সি

নাটক

অপরাধিত ১-৭৫	রমেন সাহিড়ী	জাতীয় সা: প:
আকাশবিহঙ্গী ২-০০	অজিত গঙ্গো	সেনগুপ্ত বুক ট্রল
উটরোগ ২-০০	উপেন্দ্রনাথ গঙ্গো	ডি এম
কঙ্করা ২-৫০	তারাকান্ত বন্দ্যো	শ্রীশঙ্কর
কালরাত্রি ২-০০	চিত্তরঞ্জন ঘোষ	বিশ্ব শতাব্দী
ক্ষুধা ২-৫০	বিদ্যায়ক ভট্টাচার্য	শ্রীশঙ্কর
গৃহদাহ (শরৎচন্দ্র) ২-০০	অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল	গুরুদাস
চোর ২-০০	ছবি বন্দ্যো গোপালদাস পাবলিশার্স	
ছায়ানট ২-৫০	উৎপল দত্ত	পপুলার লাইব্রেরি
তিন সর্গ ১-৬২/২-০০	অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	
	আর্ট অ্যান্ড লেটার্স	
তিনইন ১-০০	সুনীল দত্ত	জাতীয় সাহিত্য প:
থানা থেকে আসছি ২-০০	অজিত গঙ্গো	প্রকাশনী
নব একাক্ষ ৩-৫০	মহম্মদ রায়	গুরুদাস
বহিঃপতঙ্গ ২-০০	শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীশঙ্কর
বারো ঘণ্টা ১-২৫	কিরণ মৈত্র	রাইটস' বর্গার
রাজলক্ষ্মী (শরৎচন্দ্র) ২-০০	দেবনারায়ণ গুপ্ত	গুরুদাস
সকাল-সন্ধ্যার নাটক ৩-৫০	সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী	মিত্রালয়

গল্পগ্রন্থ

অন্তর্যম্য	বারীন্দ্রনাথ দাশ	বেঙ্গল পাবলিশার্স
অপরাধী ৪-০০	শৈলজানন্দ মুখো	ত্রিবেণী প্রকাশন
অনন্দনট ৩-০০	বিভূতি মুখো	শ্রীশঙ্কর
উত্তরণ ২-৫০	নরেন্দ্রনাথ মিত্র	গুরুদাস
এক অঙ্গ্রে এক রূপ ৩-০০	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	নাভার্স
এলাজি	প্রমথনাথ বিন্দী	বিশ্ববাণী
কাঠের ঘোড়া ২-৫০	কুমারেশ ঘোষ	শতাব্দী
গল্পকাল্প ৮-০০	আশাপূর্ণা দেবী	মিত্র ও ঘোষ
গল্পসঞ্চয়ন ৪-০০	প্রবোধকুমার সাম্যাল	শ্রীশঙ্কর
চন্দ্রমল্লিকা ২-৫০	ভবানী মুখো	এম সি সরকার
চৈত্রদিন ৪-০০	ননী ভৌমিক	ভাষাশাস্ত্র বুক এ:
ছিলেম বাবুর দেশে ২-৫০/৩-০০	ধনঞ্জয় বৈরাগী	আর্ট এণ্ড লেটার্স
জলপায়রা ৪-০০	প্রমোদ মিত্র	ত্রিবেণী প্রকাশন
দিবারাত্রি ৩-০০	বিমল কর	শ্রীশঙ্কর
বন্দ্যমধুর ৩-৫০	মুক্তাবা আলী ও রঞ্জন	
	ত্রিবেণী প্রকাশন	

প্রজাপতির রঙ ২'৫০
বরনারী ২'৫০
বিয়ের প্রফ বউ ২'৭৫
সিঁদাধর ২'৫০
মনোমুকু
মতলা কথা

মতলা মিলন
মায়াকুরঙ্গী ৩'৫০
মেঘলা ছপু ২'২৫
মৃগশিরা ৩'৫০
রূপসীর শেষধরু ২'৫০
রূপের দায় ৩'৫০
সেই চিরকাল ৩'৫০

অনমিতা ৪'০০
অন্ত দিগন্ত ৫'০০
অশ্রুবাঁসর ৬'০০
আনোখীলাল পাণ্ডেটরা ২'৫০
আমার কঁসি হল ৩'৫০
উজ্জয়ন্ত ৪'০০
একটি আশ্রাস ৬'৫০
একটি স্বাক্ষর ৩'০০
কক্ষপথ ২'৭৫
করলাকুণ্ডির দেশ

কাঞ্চল গাঁয়ের কাহিনী ৪'৫০
কেরী সাহেবের মুন্সী ৮'৫০
চায়না টাউন ৪'৫০
চারপ্রহর ২'০০
জলন্তরঙ্গ ৪'০০
ঝড় ও বিহঙ্গ

ডাকহরকরা

তামসী
কাঁপতাল ২'৭৫
তুঁধি সন্ধ্যার মেঘ ৫'৫০
ত্রিায়া ৮'০০
ভূতীয় ভূবন ৪'৫০
দাঁড়ের ময়না ৩'৫০
নক্ষত্রের বাত ৩'৫০
নীলদিগন্ত ৩'০০
নৈসবাত্রি ৩'৫০
পার্ক ৪'৫০

প্রবোধবন্ধু অধিকারী নিউ ক্রিপ্ট
চিত্তরঞ্জন ঘোষ বিংশ শতাব্দী
শিবরাম চক্রবর্তী কথামালা
তারানন্দর বন্দ্যো ত্রিগুরু
সমরেশ বসু ক্লাসিক প্রেস
আন্তোভাষ মুখোপাধ্যায়
গুপ্ত প্রকাশিকা
বীরাজ ভট্টাচার্য কারেন্ট বুক শপ
শরদিন্দু বন্দ্যো ত্রিগুরু
প্রতিভা বসু এসো: পাবলিশার্স
হরিনারায়ণ চট্টো ত্রিগুরু
দীনেন্দ্রকুমার রায় ত্রিগুরু
অন্নদাশঙ্কর রায় এম সি সরকার
দেবেশ দাশ মিত্র ও ঘোষ

উপগ্রাস

নরেন্দ্রনাথ মিত্র মিত্র ও ঘোষ
হরিনারায়ণ চট্টো ত্রিগুরু
বিখনাথ চট্টোপাধ্যায় ঐ
বিক্রমাদিত্য আই এ পি
মনোজ বসু দ্বিবেণী প্রকাশন
তারানন্দর বন্দ্যো মিত্র ও ঘোষ
শ্রবোধ চক্রবর্তী ত্রিগুরু
রামপদ মুখো এসো: পাবলিশার্স
সুনীল সরকার এশিয়া
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স
শক্তিপদ রাজগুরু গুরুদাস
প্রমথনাথ বিদ্যো মিত্র ও ঘোষ
বারীন্দ্রনাথ দাশ বেঙ্গল পাবলিশার্স
মাহমুদ আহমদ সাধারণ পাবঃ
বনফুল আই এ পি
তারাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স
তারানন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স
জয়সদ্য বেঙ্গল পাবলিশার্স
শীলা মজুমদার ঐ
শরদিন্দু বন্দ্যো নিউ এজ
সমরেশ বসু ক্যালকাটা পাবলিশার্স
দীপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মিত্রালয়
গুণেন্দ্র পত্নী সাহিত্য
মন্দি নন্দী আই, এ, পি
নারায়ণ গঙ্গো: গোপালদাস পাবঃ
জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী আই, এ, পি
সরিংশেখর মজুমদার প্রাচী

প্রদক্ষিণ
ফাহুসের আয় ৫'৫০
বটুড়বির খাল ৩'০০
বন্ধনহীন গ্রন্থি ২'০০
বেগম ৩'০০
বন্দী ৪'০০
মৎস্যগন্ধা ৫'০০
মহারাগী ৩'৫০
মন কেমন করে ৩'৫০
মন নিয়ে খেলা ৫'০০
মনে মনে ২'০০
মৃগতৃণ

মেঘ পাহাড়ের গান ২'০০
মেঘ উষ্মর ৩'০০
মেঘের পরে মেঘ ৩'৭৫
মৌসুমী ৩'০০
মধুরে মধুর ৫'৫০
মধুমিতা ৪'৫০
রূপসী রাণি ৫'০০
রোচাক ৩'৫০
শক্তিরি ৮'০০
শেষ পর্যন্ত ৩'০০
সমুদ্র সন্ধান
সিন্ধুপারে ৭'০০
সুখহঃখের টেট
সোহাগপুরা
সিন্ধুপারের পাখি ১'০০
স্মৃতি ৩'০০
বেলোয়ারী ৬'৫০

স্বপ্নরঞ্জন মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স
বিমল কব কথামালা
মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত ত্রিগুরু
বাসবী বসু বলাকা প্রকাশনী
স্বরাজ বন্দ্যো: ক্যালকাটা পাবঃ
নারায়ণ সান্তাল বেঙ্গল পাবলিশার্স
অচ্যুত গোস্বামী ডি, এম
বনফুল ঐ
বিমল মিত্র নিউ এজ
বীরাজ ভট্টাচার্য এম, সি, সরকার
সত্যজিত মৈত্র মুখার্জি বুক হাউস
স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স
অনিলকুমার ভট্টাচার্য ডি, এম
প্রশান্ত চৌধুরী বলাকা
প্রতিভা বসু নাভানা
প্রমেন্দ্র মিত্র আই, এ, পি
মহাশেতা ভট্টাচার্য এ, মুখার্জি
সরোজকুমার রায়চৌধুরী বিজোদয়
অচিন্ত্য সেনগুপ্ত আনন্দ পাবলিশার্স
দীপক চৌধুরী এম, সি, সরকার
স্ব'বাস ঘোষ আনন্দ পাবলিশার্স
সৌরীন্দ্রমোহন মুখো: শিশির পাবঃ
আন্তোভাষ মুখোপাধ্যায় মিত্র ও ঘোষ
নীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত নিওলিট
নরেন্দ্রনাথ মিত্র বেঙ্গল পাবলিশার্স
গণেন্দ্রকুমার মিত্র ত্রিগুরু
প্রফুল্ল রায় বেঙ্গল পাবলিশার্স
সঞ্জয় ভট্টাচার্য ত্রিগুরু
প্রবোধকুমার সান্তাল মিত্র ও ঘোষ

শিশু-সাহিত্য

অথ ভারত কথকতা ২'২৫
আলি ভুলির দেশে ২'০০
আত্মিকালের বজ্রবুড়ো
আধুনিক ম্যাজিক ২'০০
এ দেশ আমার (২য়)
খুশির হাওয়া ১'৫০
খেরাল, খুশি অসম্ভব ৩'০০
চামড়ার কাজ
ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প
(বনফুলের) ২'০০
ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প
(হেমেন্দ্রকুমার) ২'০০

তীকথক ঠাকুর বিজোদয়
সুখলতা বাও
জয়ন্তকুমার ভাটুড়ী ক্লাসিক প্রেস
এ, সি, সরকার মিত্রালয়
দেবীপ্রসাদ চট্টো: বেঙ্গল পাবলিশার্স
নারায়ণ গঙ্গো: অভ্যুদয় প্রঃ হন্দির
অমির চক্র: (সম্পাদিত) ঐ
ননীগোপাল চক্র: বেঙ্গল পাবলিশার্স
বনফুল অভ্যুদয় প্রকাশ হন্দির
হেমেন্দ্রকুমার রায় ঐ

ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প

(মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়) ২'০০

ছোটদের ক্রীড়া ২'৫০

ছোটদের বহুমুখ ৩'৫০

বড়ের বাড়ী ১'৬০

জ্ঞান থেকে অভ্যাস ১'৬০

নিষ্ঠাতিপু ১'৬০

পদ্মগোলাপ ২'০০

পাকল পাকল পাকলটি

প্রাণী ও প্রকৃতি

বনের ডাক ৫'০০

বাংলার ডাকাত (২য়) ২'৫০

মায়ের বাঁশি ৪'৫০

মামা ভাগ্নে ০'৭৫

মামাবাড়ি ১'৫০

বড়ের রূপকথা ১'৬০

সদাশিবের তিনকাণ্ড ১'৭৫

সহজ গল্প

সাত রাজ্য ১'৮০

রবের ৩'৫০

রূপকথার বাঁপি ২'২৫

কুমারসম্ভব

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

অভ্যাস প্রকাশ মন্দির

এম. সি. সরকার

সুনীল দত্ত সম্পাদিত জাতীয় সা: প:

অভিভা: সেনগুপ্ত এসো: পাবলিশার্স

বুদ্ধদেব বসু ঐ

প্রেমেন্দ্র মিত্র ঐ

মনোজিৎ বসু মিত্রালয়

অমিতাভ সেন অক্ষর

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স

স্বামী বিশ্বাত্মানন্দ অরুণ দে

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত বুদ্ধাবন ধর

বিমল ঘোষ (ম্যামাছ) মিত্র ও ঘোষ

শিবরাম চক্র: এম. সি. সরকার

অরবিন্দ গুপ্ত অভ্যাস প্র: মন্দির

প্রবোধ সাত্তাল এসো: পাবলিশার্স

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় নিউ এজ

ক্রীলোথ গুপ্ত বেঙ্গল পাবলিশার্স

সুকুমার দে সরকার অভ্যাস প্র: ম:

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঐ

সৌরীন্দ্রমোহন মুখো: আই. এ. পি

প্রাচীন সাহিত্য

বিহারীলাল গোস্বামী মিত্র ও ঘোষ

অভিসার (জাঁ পল সার্ত)

কাম্বীর প্রিজেস (কারনিক)

ক্যাসানোভার স্মৃতিকথা ৫-৭৫

চিড়িয়াখানার খোকাথু

(ভেরা চ্যাপলিনা) ৩-০০

হু কুনকে ধান

(শিবলক্ষ্য পিল্লাই) ৩-০০

বান্দীকি রামায়ণ ১২-০০

মানবদেহের গঠন ও ক্রিয়াকলাপ

(এ, এন, ক্যাবানড) ৭-০০

মাটির মাহু (কালিন্দীচরণ

পাণিগ্রাহী) ২-৫০

সাগরে মিলায়ে ডন

(শলোথফ) ৬-০০

সাহিত্য শিল্প প্রসঙ্গে

(মাক্স এক্সেলস লেনিন) ৩-০০

স্মৃতিকথা

খড়ির লিখন ২-৫০

ছেলেবেলার দিনগুলি ৩-০০

তত্ত্বাবলীয়ার সাধুসঙ্গ (৩য়) ৬-৫০

বা বলো তাই বলো ৩-০০

রবি-তীর্থে ৫-০০

স্মৃতিচিত্রণ

শিশির সেনগুপ্ত ও জয়ন্ত ভাট্টা

বিমল দত্ত

শান্তা বসু

প্রতিভা দাশগুপ্তা

পপুলার

ত্রিবেণী প্রকাশন

শিশিরকুমার নিয়োগী এ, মুখার্জি

সমর রায়চৌধুরী

শ্রীশ্রী বক এ:

সুখলতা রায়

ত্রিবেণী প্রকাশন

রথীন্দ্র সঙ্কার

শ্রীশ্রী বক এ:

ঐ

নিউ এজ

পূর্ণলতা চক্রবর্তী

নিউ এজ

প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় ডি, এম

শংকর

নিউ এজ

অসিত হালদার

পাইওনিয়ার বুক

পরিমল গোস্বামী

প্রজ্ঞা প্রকাশন

কাজী নজরুলকে

গৌরাঙ্গ ভৌমিক

বা কিছু উপমা জানি সবই, মনে মনে

ভাবি। তবুও তুলনা তাঁর মেলে না, মেলে না।

আমি যে দেখেছি এক অত্যাশ্চর্য হবি।

কখনো উপমা দিই—

তাকে,

স-পাণ্ডব অর্জুনের সাথে।

আবার কখনো বলি,

হলো না, হলো না।

কারণ, পাণ্ডব নয়

হাতে তাঁর ছিল অগ্নিবীণা

প্রাণে ছিল আগ্নেয় উত্তাপ।

হঠাৎ কি জানি হল! কি বেন কি ভুল!

আগ্নেয় বীণার তারে

হাতের আঙুল

তাঁর

ভক্ত হয়ে গেল।

এখন নিশ্চিত জানি, কোন দিন আর

গুনবে না' গুনবে না কেউ

কোন সুর

আগ্নেয় বীণার।

সে আজ নীরব কণ্ঠ। ভাষাহীন নিরুত্তর কবি

আজকে সবার কাছে। সে জীবন্ত

একথানা

অত্যাশ্চর্য হবি।

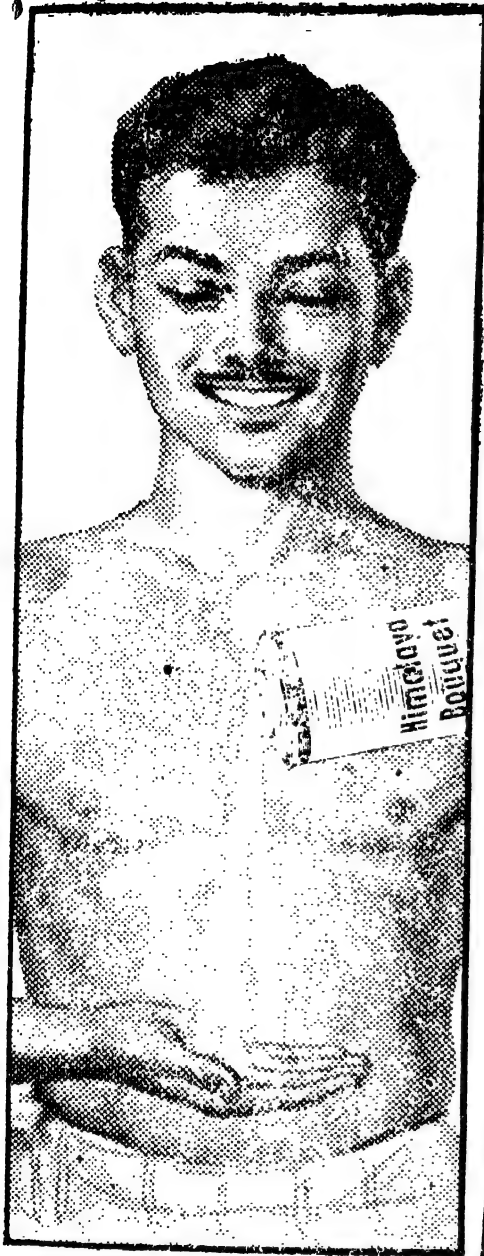
তাই তো, এখন তাঁর

চারি পাশে বসে সব বারোয়ারী পাপ

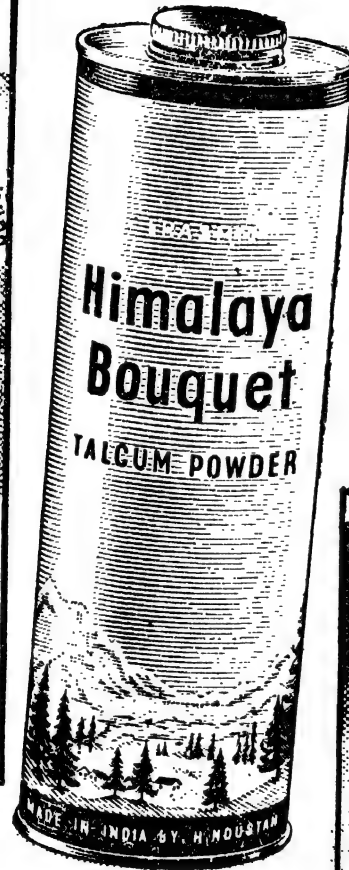
অক্ষত, বিকৃত হয়ে জমে ওঠে।

বিদ্রোহী এখন তাঁর

হারিয়েছে প্রাণের উত্তাপ।



ব্যবহার করুন
হিমালয় বোকে
ট্যালকাম পাউডার



সারাদিন
সতেজ
থাকার জন্যে

- এত সুগন্ধ
- এত কম খরচ
- সারা পরিবারের
পক্ষেই আদর্শ





শিল্প ও কারিগরী বাত্‌ঘর

শিক্ষা ও সমুন্নতির ক্ষেত্রে বাত্‌ঘর গুরুত্ব ও উপযোগিতা যে কতখানি, এ বলার অপেক্ষা রাখে না। জ্ঞানপিপাসু বাত্‌ঘরের বিভিন্ন চাহিদা মেটাবার একটি সূক্ষ্ম ব্যবস্থা যেমন গ্রন্থাগার, তেমনি অত্যন্ত প্রধান উপায় নিঃসন্দেহে বাত্‌ঘর। আধুনিক শিল্পায়নের যুগে যে কোন দেশে শিল্প ও কারিগরী বাত্‌ঘরের মূল্য তুলনায় নিশ্চয়ই আরও বেশী।

আমাদের একটি সাধারণ ধারণা—বাত্‌ঘর হল কতকগুলি বিদ্যুত ও সচল বস্তু সমাবেশ বা সংরক্ষণ ক্ষেত্রবিশেষ। কিন্তু বাস্তব উপযোগিতার নিকে তাকিয়ে এই ধারণা অভ্যস্ত বলে মেনে নেওয়া চলে না। প্রকৃত প্রস্তাবে যে কোন বাত্‌ঘরই একটি জীবন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এখানে বা কিছু থাকুক জড় কি জীবন্ত, তাই বাত্‌ঘরের চিত্তাধারাকে পুষ্ট করবে বরাবর। অতীতের সঙ্গে বর্তমানের তুলনামূলক বিচার-নিরীক্ষের সুযোগও দিয়ে থাকে এই বাত্‌ঘর। শিক্ষাবিশেষজ্ঞদের মতে বর্তমান যুগে প্রকৃত বিশ্ববিদ্যালয় বলতে গ্রন্থাগার আর বাত্‌ঘরকে বুঝায়। বাত্‌ঘরের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ বা লক্ষ্য—নানা দ্রব্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, সংগৃহীত ও সংরক্ষিত দ্রব্যাদির পর্যালোচনার মাধ্যমে শিক্ষার প্রসার এবং সাধারণ জীবন সমৃদ্ধির জন্য পর্যাপ্ত জ্ঞান বিকাশ।

পশ্চিমী জগতে শিল্প ও শিল্প-বিজ্ঞানের বাত্‌ঘর বহু কাল আগে থেকেই চলতি। সহজ কথায় যে সকল রাষ্ট্রে শিল্প বিষয়ে সমৃদ্ধ ও অগ্রণী, সেখানেই দেখতে পাওয়া যাবে একাধিক বাত্‌ঘর। এই ধরনের বাত্‌ঘর অবশ্য প্রথমে সংস্থাপিত হয় ইউরোপে, কিন্তু এক্ষেপে সূদূর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই এর সংখ্যা অধিক। একমাত্র নিউইয়র্ক সহরেই বিভিন্ন বকমের বিজ্ঞান বিষয়ক বা শিল্পকলার বাত্‌ঘর রয়েছে কুড়িটির উপর। এ ছাড়া অংছে চারিটি উদ্ভিদ বিষয়ক বাত্‌ঘর (বোটানিক্যাল গার্ডেন) ও সতেগটি ঐতিহাসিক বাত্‌ঘর। আমেরিকার প্রাকৃতিক ইতিহাস সম্পর্কিত বাত্‌ঘরখানি একটি মস্ত বিষয়—বিচিত্র তথ্য ও ইতিহাসের নজীর সম্বলিত এমন প্রকাণ্ড বাত্‌ঘর বা সংগ্রহশালা পৃথিবীর আর কোথাও নেই। ব্রুটন, জার্মানী ফ্রান্স, রাশিয়া—ইউরোপের এই কয়টি জায়গা এবং অষ্ট্রেলিয়া জাপান প্রভৃতি শিল্পোন্নত দেশগুলিতেও শিক্ষামূলক বাত্‌ঘর বিস্তারিত আছে কোনও না কোন ধরনের।

এই প্রসঙ্গে শিল্পায়নে ব্রতী স্বাধীন ভারতের কথা আপনিই ওঠে। এত কাল অধীনতার নাগপাশে ভারত আবহ ছিল, এগিয়ে বাওয়ার পথে স্বাভাবিকই তার ছিল নানা বাধা ও প্রতিবন্ধক। এখন জাতীয়

সরকার ব্যাপক পরিকল্পনা নিয়ে নতুন করে গড়ে তুলতে চাইছেন এই দেশটিকে—দ্রুত শিল্পসমৃদ্ধ করার দাবী রাখছেন পৃথিবীর অপর অগ্রসর ও স্বাধীন জাতিগুলির মতো। বস্তুতঃ, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শিল্পায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে অনেকটা বেশী। যে কোন শিল্পায়নের প্রাথমিক প্রয়োজন যেটি—সেই কারিগরী বিদ্যাজ্ঞানের ব্যবস্থাও এরই ভেতর কিছু কিছু যে না হয়েছে তা' নয় কিন্তু উন্নত শ্রেণীর শিল্প-সংগ্রহশালা বা বাত্‌ঘরের অভাব সেই থেকেই এ দেশে খুব প্রকট।

অবশ্য একটি আশার কথা—সরকারী উদ্যোগীপণায় সশ্রুতি কোলকাতা মহানগরীতে একটি শিল্প-বাত্‌ঘর (বিড়লা শিল্প-কারিগরী বাত্‌ঘর) স্থাপন করা হয়েছে। স্বতঃই হবে নেওয়া যায়, শিল্প-বাত্‌ঘর বা সংগ্রহশালা অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা থেকেই সরকারের (কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ) এই উদ্ভম বা প্রয়াস। পশ্চিমবঙ্গের মুখমন্ত্রী ডঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে গঠিত আলোচ্য বাত্‌ঘরের পরিকল্পনা কমিটির নির্ধারণ মতে এতে সব সমস্ত (১) কারিগরী বিষয়ের সাম্প্রতিক অগ্রগতি, (২) মানব-সমাজের কল্যাণার্থ কারিগরী বিষয়ক অবদান এবং (৩) ভারতীয় শিল্প-কারখানায় আধুনিক কারিগরী পদ্ধতি প্রয়োগ—এ সকলের চিত্রাবলী অন্তর্ভুক্ত থাকবে। নির্ধারিত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সার্বিক কঠোর প্রথমাবস্থায় নিম্নলিখিত কয়েকটি কারিগরী বিষয় বেছে নিয়েছেন: বৈজ্ঞানিক যোগাযোগ, বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন ও পরিচালনা, পরমাণবিক জ্ঞান, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, চলমাশিন, বয়ন ইঞ্জিনিয়ারিং পরিবহন, রসায়ন বিভা আর ধনি ও ধনিজ সম্পদ। পরিকল্পনা কমিটির ঘোষণা অনুসারে এই বাত্‌ঘরের উদ্দেশ্য এক কথায় দর্শকদের কারিগরী বিভা শিক্ষা দেওয়াই নয়, তা ছাড়া আরও কিছু। বিশ্বায়ক বৈজ্ঞানিক জগৎ সম্পর্কে দর্শকমণ্ডলীর অহুসঙ্কিততা বুদ্ধিই উহার মূল উদ্দেশ্য।

বিড়লা শিল্প ও শিল্পবিজ্ঞান বাত্‌ঘরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন উপলক্ষে কেন্দ্রীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সংস্কৃতি বিভাগীয় সচিব শ্রীহাম্মদ কবীরের একটি কথা উল্লেখ করা যেতে পারে 'এখানে। বাত্‌ঘরের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নিয়েই তিনি বলেন—বাত্‌ঘর শুধু অতীতের দৃষ্টাণ্ড ধ্বংসাবশেষ-ভাণ্ডার মাত্র নয়। বাত্‌ঘর সব সময়ই জীবন্ত থাকবে এবং চার পাশের জীবনের সংজ্ঞা গড়ে উঠবে। শিল্পকলার বাত্‌ঘরে শুধু অতীতের শিল্পরচনা সংগ্রহ করে রাখলেই চলবে না, বর্তমান শিল্পের গতি-প্রকৃতির নিদর্শনও সেখানে থাকা চাই। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলার

জন্ত প্রত্যেক বছর নতুন জ্বা আনতে হবে। অতীতের বিভিন্ন দিকে আলোকপাত এবং বর্তমান আলোকনের সঙ্গে তার সম্পর্ক দেখবার জন্ত মাঝে মাঝে টেলে সাজাতে হবে পুরনো জিনিষগুলি। মোটের উপর, নানা ধরণের চাট, ছবি, চলচ্চিত্র এবং অন্যান্য জিনিষের সাহায্যে প্রত্যেক ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক অগ্রগতি এবং অতীতের সঙ্গে বর্তমানের সংযোগ সংস্থাপনই হতে হবে বাহুবলের প্রধান কাজ।

সরকারের পক্ষ থেকে শিল্প ও কারিগরী বাহুবলের সম্পর্কে বা বলা হয়েছে এবং দাবী রাখা হয়েছে, কার্যক্ষেত্রে এর সকল রূপায়ণ যদি হ'ল, তা'হলে নিশ্চয়ই আশার কথা। ভারতবর্ষ সবে শিল্পায়নে ত্রুটি হয়েছে—অনেক বাধা রয়েছে তার অগ্রগতির পথে। এই মুহূর্তে একটামাত্র কারিগরী সংগ্রহশালা হলেই এই বিশেষ ক্ষেত্রটিতে দেশের অভাব মিটেবে না। ভারতের শিল্পপ্রধান অপর অকলসগুলিতেও অনুরূপ বাহুবল প্রতিষ্ঠিত না হলে নয়, আশা করা যেতে পারে, জাতীয় সরকারের এ বিষয়ে উত্তম থাকবে আর জনসাধারণও সেই উত্তমকে জোরদার করার জন্ত তৎপরতা দেখাবেন।

কাঠের পোকা ও এর প্রতিকার

সাধারণ অবস্থায় কীট বা পোকার আক্রমণ থেকে কারও প্রায় রেহাই নেই, গাছেরও নয়। কীটবিধগুণ হয়ে কত গাছের অকালমৃত্যু ঘটছে, কে রাখতে তার হিসাব! আমাদের বাসগৃহ সমূহও কীট বা পোকার উৎপাত কম নয় কিছুমাত্র। গাছ কাটার পর যে কাঠ এনে সবচেয়ে আসবাবপত্র তৈরী হল, যা দিয়ে সাজানো হ'ল পছন্দমত নিজ নিজ গৃহস্থানি, পোকার মারাত্মক আক্রমণে সে জী নষ্ট হয়ে যেতে পারে জলসময়েই। এই ভাবে কত সখের জিনিস কত গৃহস্থানিকেই না হারাতে হচ্ছে, অমনি বলা নিশ্চয়ই কঠিন।

অবশ্য একথা ঠিক—বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে গাছের কাঠের পোকা দমনের ব্যবস্থাও নির্ণীত হয়েছে নানা ধরণের। এ-যুগে যবে কোন কাঠের জিনিস নেই, এমন প্রায় দেখা যায় না। গৃহ-নির্মাণ থেকে শুরু করে গৃহসজ্জা অবধি সব ক্ষেত্রেই কাঠের প্রয়োজন একরূপ অপরিহার্য ভাবে। ঘরের কড়ি, বর্গা, বিলান দরজা-জানালা প্রভৃতি যেমন কাঠের হয়ে থাকে, তেমনি চেয়ার, টেবিল, আলমারী ইত্যাদিও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যায় কাঠেরই। সেজন্ত ব্যবহৃত কাঠ বা কাঠের জিনিসটিকে অক্ষত ও মজবুত রাখবার খাতিরে প্রত্যেক গৃহস্থানীরই সর্বদা সতর্ক নজর নিবদ্ধ না করলে নয়। পোকার আক্রমণের প্রতিকার বা প্রতিরোধ হিসাবে প্রথমেই তোলা যেতে পারে এইটি।

সাধারণ নিয়মাবলীসারে যে গাছ সাধারণ, তাতে কীটজীবী সহজে আক্রমণ হয় না। গৃহের জিনিসপত্র যদি অসার কাঠ তৈরী হয়, তা হলেই বিপদের আশঙ্কা বেশি। সাধারণ বকেই সেগুন, শাল ইত্যাদি কাঠ দিয়ে বাই তৈরী হোক না, তাই দীর্ঘ স্থায়িত্ব লাভ করবে। অন্ততঃ এসব শ্রেণীর কাঠ বা কাঠের তৈরী জিনিস পোকার আক্রমণে বিধ্বস্ত হয় না কিংবা কোন কাঠের পক্ষে এদের সঙ্গে দস্তকুট করাই সাধ্যায়ত্ত নয়।

বিশ্ব, গৃহে সংরক্ষিত সকল কাঠ বা কাঠের জিনিসই যে পোকার আক্রমণে অমনি অক্ষত থাকবে, সে নিশ্চয়তা মোটেই দেওয়া চলে না। সতর্ক যেমনই হোক, পল্লী অঞ্চলে ব্যবহৃত বেশির ভাগ কাঠ বা কাঠের জিনিসই কীট-কবলিত হয়ে বিনষ্ট হয়। কাজেই গৃহস্থানীকে হসিয়ার থাকতে হয় সর্বদা, জেনে রাখতে হয়—এর সত্যি কি প্রতিকার, শোচনীয় অবস্থার কি প্রতি-ব্যবস্থা।

কাঠের কতকগুলি সাধারণ শত্রু—উই, মূণ, কড়া-পোকা ইত্যাদি। উইপোকা যে কাঠে ধরে, দেখতে দেখতে হারবার করে দেয় এর সকল জী ও অন্তিৎ। কারণ উইপোকার বংশ বৃদ্ধি হয় অতি দ্রুত, এদের দলবদ্ধ আক্রমণ বড় মারাত্মক। মূণ যে কাঠে আক্রমণ চালায়, বাইবে থেকে প্রথমে নজরে না পড়লেও সেই আক্রমণ ভয়াবহ। কত অসার কাঠ ও কাঠের জিনিসই এদের কবলে পড়ে বিধ্বস্ত হচ্ছে অবিরাম। ঘরে কোথা থেকে কি ভাবে যে এ সকল বিপু এসে হাজির হয়, বলতে পারা যায় না। তবে বড়ের অভাবে এবং কাঠের নিজস্ব দোষেই এই আক্রমণ হয়ে থাকে, এ বলা বাহুল্য।

পূর্বেই বলা হয়েছে—কতকগুলি সারালো কাঠ যেমন মেহরগি, এ সকলে কখনই পোকার আক্রমণ হয় না। আবার, উইলো প্রভৃতি গাছের কাঠ সহজেই পোকার আক্রমণ চালায়। ওক, ওয়ালনট, বীচ প্রভৃতি কতকগুলি কাঠ বহু বৎসর পেরিয়ে বাওয়ার পর কীটবিধগুণ হবার কারণ হয়। আমাদের দেশের নিমগাছের পোকা সহজে আমল পায় না, এমনি দাবী চলে এসেছে।

কাঠের পোকার আক্রমণ রোধে কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় সহজেই। ঘরের জিনিসপত্রগুলি প্রায়ই বেড়ে মুছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা—এইটি অবশ্য করণীয়। ক্ষেত্র-বিশেষে আলকাতরা, কেরোসিন তৈল বা বিভিন্ন রঙ ব্যবহারেও উপকারিতা লক্ষ্য করা যায়। কীটনিরোধক তৈল জাতীয় পদার্থ আজকাল বাজারে অনেক রয়েছে। পোকার কবল থেকে রেহাই পাবার জন্ত সে সবের নিয়মিত ব্যবহারও ফলপ্রসূ। মোট কথা, এই ব্যাপারে সমগ্র দায়িত্বটা নিতে হয় গৃহকর্তা আর গৃহকর্ত্রীকে। চেয়ার টেবিলের তলায়, দরজা জানলার ফাঁকে, ছবির কাঠামোতে সাধারণতঃ পোকার বাসা হয়। সে সব স্থানে নিয়মত ডি-ডি-টি প্রভৃতি ছড়িয়ে দিলে উপকার না হয়ে পারে না।

বিদ্যুৎ দেখিয়া হঠিয়া বাওয়া, ভয় প্রদর্শনে ভীত হওয়া, প্রাপ্তবয়ে কাতর হওয়া, লোকের প্রতিকূলতা বলতঃ সংকল্পিত অমুঠান পরিভ্রমণ করা কাপুরুষতা।
—শিবনাথ শাস্ত্রী

॥ মাসিক বসুমতীর এজেন্ট-তালিকা ॥

বর্তমানে মাসিক বসুমতীর ব্যাপক ও বিস্তৃত প্রচার বাঙলার সাময়িক পত্রের ইতিহাসে বিশ্বয় সৃষ্টি করিয়াছে। আমাদের পত্রিকার এজেন্ট-তালিকা লক্ষ্য করিলেই আমাদের কথার সত্যতা প্রমাণিত হইবে। কলিকাতার বাহিরের স্থানীয় বাসিন্দাদের মাসিক বসুমতী প্রাপ্তির সুবিধার জন্ত আমরা বর্তমান সংখ্যা হইতে আমাদের এজেন্ট-তালিকা নিয়মিত প্রকাশ করিব। মাসিক বসুমতীর সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা এজেন্টদের ঠিকানায় যোগাযোগ করিতে পারিবেন। কেবলমাত্র কলিকাতা অঞ্চলের আনুমানিক পাঁচ শত বিক্রেতার নাম এই তালিকায় নাই।

॥ বাঙলা দেশ ॥

শ্রীকালীনাথ সাহা	—আমতা	শ্রীমাণিকচন্দ্র সাহা	—রামপুরহাট	শ্রীগোপালচন্দ্র সেন	—শান্তিপুর
শ্রীঅলোককুমার চ্যাটার্জী	—বেলুড়	শ্রীমণিমোহন চন্দ্র	—নলহাটা	শ্রীহরিচরণ শ্রোমাণিক	—নবদ্বীপ
		শ্রীমদ্ব্যংকুমার ব্যানার্জী	—শিউড়ি		মুর্শিদাবাদ
হুগলী					
শ্রীঅমূল্যচরণ ঘড়া	—শেওড়াফুলি	শ্রীগঙ্গেশচন্দ্র কন্দকার	—বিষ্ণুপুর	শ্রীঅভিভূষণ মালিকার	—বেলভাঙ্গা
শ্রীমদনমোহন গাঙ্গুলী	—মগরা ও ত্রিবণী	শ্রী বি, পাল	—সোনামুখী	শ্রীবিদ্যনাথ দাস	—ধুলিয়ান
শ্রীগঙ্গাধর দে	—শ্রীরামপুর	শ্রীবিজয়দাস দাস	—বাঁকুড়া	শ্রীকীবোদচন্দ্র গুপ্ত	—মুর্শিদাবাদ
শ্রীবিদ্যনাথ ভট্টাচার্য	—ভদ্রেশ্বর ও বৈজ্যবাটা			শ্রীহরিপদ সাহা	—জিয়াগঞ্জ
শ্রীললিতমোহন দত্ত	—হুগলীঘাট			মেঃ ঘোষ লাইজেরী	—বহরমপুর ও খাগড়া
শ্রীসোবিন্দচন্দ্র কুমার	—সিঙ্গুর				মালদহ
শ্রীমণিভূষণ সি	—আরামবাগ	শ্রীপঞ্চানন চৌধুরী	—ঝাংগ্রাম	শ্রী এম, এম, চক্রবর্তী	—হরিশচন্দ্রপুর
শ্রীবৈজ্যনাথ মুখার্জী	—নবগ্রাম, কোননগর	মেঃ মিশ্র নিউজ এজেন্সী	—কলাইকুণ্ডা	শ্রীসুনীলকুমার শেঠ	—মালদা কোট
		শ্রীভানুশচন্দ্র পাল	—গড়বেতা		কুচবিহার
		শ্রী জে, এন, আচাৰ্য	—মহিষাদল	শ্রীঅমূল্যরতন রায়গুপ্ত	—দিনহাটা
		শ্রী আউ, বি, ঘোষ	—চন্দ্রকোণা রোড	শ্রীঅলিন্দরঞ্জন চক্রবর্তী	—কুচবিহার
		শ্রীহরিশাধন পাতিন	—ঘাটাল		জলপাইগুড়ি
শ্রীঅমরকৃষ্ণ দত্ত	—চিওরঞ্জন	শ্রীমতী কনকলতা দেবী	—ঝড়াপুর	শ্রী এ, দর চৌধুরী	—জালিপুরহুয়ার
মেসার্স বাগচী ব্রাদার্স	—কুলটি	শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চৌধুরী	—মেদিনীপুর	শ্রীসত্যীশচন্দ্র বোস	—মল-জংশন
শ্রীভূতনাথ দাস	—দুইইহাট			শ্রী এস, এন, নন্দী	—জলপাইগুড়ি
শ্রীকৃষ্ণাধন সরকার	—পাণ্ডাগ্রাম			শ্রীমতিলাল সরকার	—কালচিনি
শ্রী এস, প্যাণ্ডে	—বর্দ্ধমান				দাজিঙ্গলিং
শ্রীজয়দেব মুখার্জী	—ওয়ারিয়া	শ্রীবিমলকান্ত রায়	—কুমারধুবি ও বরাকর		
শ্রী কে, সি, নাথ	—পানাগড়	শ্রীঅবনীমোহন দাশ	—পুৰুলিয়া	শ্রী ডি, এন, বড়াল	—কালিঙ্গ
শ্রীরেণুদ পাল	—জে, কে, নগর			শ্রীমতী শচীবাণী দেবী	—শিলিগুড়ি টাউন
শ্রীতারাশদ রায়	—বরবণি				পঃ দিনাকপুর
শ্রীতপনজ্যোতি চ্যাটার্জী	—সীতারামপুর				
শ্রীসুরেন্দ্রকুমার দে	—রাণীগঞ্জ				
শ্রী বি, কে, আইচ	—বর্দ্ধমান				
শ্রীপঞ্চানন মোদক	—কালনা				
শ্রী এইচ, সি, ঘোষ	—বার্ণপুর ও আসানসোল	শ্রীশ্রীলকুমার ভট্টাচার্য	—ইছাপুর	শ্রী এ, কে, চ্যাটার্জী	—বালুরঘাট
শ্রীমুন্দরগোপাল সেন	—গলসি	শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস	—কাকদ্বীপ		ত্রিপুরা
শ্রীমুনীলকুমার রায় চৌধুরী	—জামুবিয়া	মেঃ বি, এল, সাহা এণ্ড সন্স	—বারাকপুর		
		শ্রী রায় নৃপেন্দ্রনাথ চৌধুরী	—টাকী	শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য	—আগরতলা

आजाम ७

প্রমোদরঞ্জন সেনগুপ্ত	—হাইলাকাপি
হাসাস শিল্প স্পোর্টস	—শিল্প
নৈবেদ্যনাথ জোষ	—কমলপুর
বি. কে. চৌধুরী	—শিলচর
মতী কনকরাণী গাঙ্গুলী	—তিনমুকিয়া
এম. আর. ভট্টাচার্য	—মাকুমজা
ইন্দিররঞ্জন ভায়েল	—তেজপুর
সি. পি. এস. জৈন এণ্ড কো.	—ইম্মেল
জি. জে. চক্রবর্তী	—গোয়ালপাড়া
সি. জাশাভাল লাইব্রেরী	—ডিব্রুগড়
ঐশ্বর্যতোষ মিত্র	—চবুয়া
বি. চক্রবর্তী	—মোহনবাড়ী
কৈলাচীদেব বণিক	—করিমগঞ্জ
ট্রিস্টোচান রায়	—খুবড়ী

বিহার ●

সিতীশচন্দ্র রায়চৌধুরী	—বহুনাথপুর
পরিতোষ মুখার্জী	—ধানবাদ
শুজিতকুমার সরকার	—কাতরাসাগড়
মনোমোহন চ্যাটার্জী	—মজঃফরপুর

মে: ক্যাপিটাল বুক ডিপো	—রাঁটা
মে: গয়া মিউজিক্যাল ষ্টোরস	—গয়া
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার	—কাটিহার
শ্রীরাধারমণ মিত্র	—মুন্সের
মে: অমৃতলাল খ্যাকার এণ্ড কো	—ঝরিয়
শ্রীরামব্রিচন্দ্রসাদ	—লোহারদাগা
শ্রী এইচ, এন, চ্যাটার্জী	—ধানবাদ
মে: চক্রবর্তী এণ্ড কো	—হাজারীবাগ টাউন
শ্রীদেবনারায়ণলাল	—দিনাপুর
শ্রীবাচ্চু সিং	—পাটনা
শ্রীসরোজনাথ ঘোষ	—সিঙ্গি ও পাথারদিতি
শ্রীকল্পাসিন্ধু রায়	—বেরহাম
শ্রীকল্পবিহারী গাঙ্গুলী	—জামালপুর
শ্রীদীনেশচন্দ্র বিশ্বাস	—বরজামদা
মে: ইউনাইটেড ডিস্ট্রিবিউটর্স	—টাতানগর

সাঁওতাল পরগণা ●

শ্রী জে, এন, সাহা —পাকুড়
 শ্রীমন্মথনাথ দাস —বৈষ্ণবনাথদাম
 শ্রীবটকৃষ্ণ মিত্র —মধুপুর

বোম্বাই ●

শ্রী জি, এম, যোষ চৌধুরী — বাইকুন্না, বোম্বে

উত্তর প্রদেশ ●

মেসার্স মিকাদোস বেনারস নিউজ পেপার
এজেন্সী — বেনারস

শ্রী এস, বি, মৈত্র — লক্কা

শ্রী শ্যামকুমার গোস্বামী — নিউ দিল্লী

শ্রী নগেন্দ্রনাথ দাস — নিউ দিল্লী

মে: সেন্ট্রাল নিউজ এজেন্সী — নিউ দিল্লী

মে: কিতাব ঘর — নিউ দিল্লী

মে: ইন্টারন্যাশনাল ট্রেস — এলাহাবাদ

মধ্য প্রদেশ ●

মে: এ, এইচ, মিত্র সরকার এণ্ড কোং
—ভিলাই ও ড্যাগ

উড়িয়া •

শ্রী বি. দত্ত — বোর্ডকেন্দ্র
মে: এ, এইচ, মিত্র সরকার এণ্ড কোং — ব্রজরাজনগর
প্রতিমা নিউজ এক্সপ্লো — খুড়দা
শ্রীউদয়নারায়ণ দাস — ভবক

মা সিক বসুমতীর প্রচার ও প্রসার বাঙলা দেশের বিস্ময়!!

-মাসিক বসুমতীর বর্তমান মূল্য

ভারতের বাহিরে (ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক রেজিষ্ট্রী ডাকে	—	২৪
বাৎসরিক "	—	১২
প্রতি সংখ্যা "	—	২

ভারতবর্ষে

(ভারতীয় মুদ্রামানে) বার্ষিক সভাক	—	১৫.
" বাণ্যাসিক সভাক	—	৭.৫০

ভারতবর্ষে

প্রতি সখ্যা ১.২৫
 য়া রেজিষ্ট্রী ডাকে — ১.৭৫
 কিস্তানে (পাক মজায়)

বার্ষিক সভার রেজিষ্ট্রী খরচ সহ	—	২১
বাৎসরিক " " "	—	১০৫০
বিচ্ছিন্ন প্রাপ্তি সংখ্যা " "	—	১৭৫

● মাসিক বসুমতী কিম্বদন্তি ● মাসিক বসুমতী পড়ুন ● অপরকে কিনতে আর পড়তে বসুন ●



কবিগানের সাংস্কৃতিক ভূমিকা

উনিশ শতকের ইংরেজি দেশীয় ঐতিহ্য সংকে অপরিচয় হেতু ও যেনে সৌসের নতুন আলোয় প্রদীপ্ত পাশ্চাত্য সংস্কৃতির পরিচয় পেয়ে তদানীন্তন দেশীয় সংস্কৃতির রূপ দেখে হতভম্ব হয়েছিল। তদানীন্তন দেশীয় সংস্কৃতির একটি শাখা হোল কবিগান। পাশ্চাত্যের সমুদ্র স্রোত সাহিত্যরস আবাদন করে নব্য বাংলা কবিগানকে অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্যের সঙ্গে অস্বীকার করেছিল। কিন্তু তখনই কয়েকজন ঐতিহ্যমুগ্ধজন একে অস্বীকার করে নিয়েছিলেন ও মূল্যায়নের প্রয়াস পেয়েছিলেন। ইন্দির গুপ্ত, রসলাল, রাজনারায়ণ বসু সাহিত্যের আসরে একে প্রতিষ্ঠা দিতে এগিয়ে এসেছিলেন। তারপর আরও কয়েকজন অজ্ঞাতনামা লেখক চেষ্টা করেছিলেন। ১৩০২ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের 'সাধনা'র রবীন্দ্রনাথ 'কবিগান' শীর্ষক প্রবন্ধটিতে কবিগানের সাংস্কৃতিক ভূমিকা ও বহুপটী উদ্ঘাটিত করবার প্রথম প্রয়াস পান। এর পর 'নব্যভারতে'র পাতায় ব্রজবন্দর সান্যালকে কবিগোয়ালাদের পরিচায়নে অগ্রসর হতে দেখি। বর্তমানেও অনেকে কবিগোয়াল ও তাঁদের কবিগানের বিষয়ে আলোচনা করছেন। আমরা এখানে কবিগোয়ালাদের পরিচয় বা কবিগানের ব্যাকরণ নিয়ে পর্যালোচনা করতে চাই না। এ প্রবন্ধে কবিগানের ঐতিহাসিক সঙ্কল্পের পটভূমিকা ও তার সাংস্কৃতিক ভূমিকাটি নির্দেশ করবো মাত্র। আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে কবিগানের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে।

আঠারো শতকের মাঝামাঝি থেকে উনিশ শতকের তিন দশক পর্যন্ত কবিগানের সাক্ষা আসর সরগরম হয়ে উঠে। হঠাৎ এমনি সাক্ষা বৈঠকে গানের মাতোয়ারা হয়নি, ধীরে ধীরে অনিবার্য ঐতিহাসিক কারণে হয়েছে। দিনের কাজের শেষে রাতের আঁধারে চণ্ডীমণ্ডপে সাহিত্যের আসর—প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের চিরাচরিত রীতি। তাতে পাঁচালী ঢঙে রামায়ণ গান, যজ্ঞ গান চলতই। সে ধারাতেই কবিগান চলে এসেছে। এটী জিনিসটা নতুন কোনো

সংস্কৃতি নয়। সেই পুরনো ধারারই কীরমাণ অবকরী রূপমাত্র। কি ভাবে সেই ধারা কবিগানের রূপ নিল বুঝতে পারলেই কবিগানের বহুপটী স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

মোগলরা বাঙালী সংস্কৃতির ভাবলোকে নতুন কোনো দিশ দেখাতে পারে নি, নতুন কোনো ভাব-উৎসের মুখ খুলে দিতে পারে নি। বাদশাহী বিলাসের সমারোহে নগরগুলোকে কেবল বিচলিত করে তুলেছিল। সেই বিলাসের রসদ জোগাতে গ্রামবাংলা খন ও প্রাণের সম্পদে রিজক্ততার চরম সীমায় এসে পৌঁছেছিল। শৃঙ্গার রসের বসিক নগরী নাগরীর স্বপ্নে ফুটছিল। রাজনৈতিক দাবা নিয়ত বিস্তোহে আক্রমণে ঢেঁকল, তাই গ্রামবাংলার বুক সব সময় উপদ্রুত, সমাজের স্থিরাবধি অস্থিরতার বিভ্রান্ত, আর সামাজিক বিশ্বাস্যতার ঘূণীচক্রে নীতির নিগড় খসে পড়ছিল, নগরের শৃঙ্গার রস তার বিভোল ছেড়ে অনাবৃত কালিমা নিয়ে দেখা দিয়েছিল গ্রাম্য সমাজে, বিজ্ঞানসন্দেহের জনপ্রিয়তা দেখা দিল। জীবনধারণের নিষ্ঠুর সংগ্রামে ধর্মের মোহ ক্রমে দূর হচ্ছিল। রামানন্দের বৈরাগ্য পীড়িত কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল,—

বস্ত্রহীন বিগ্রহে সেবিতা নহে কাজ।

নিজ কষ্ট দায় আর লোক মাঝে লাজ ॥

তুখু দিনবাগনের গ্রানি ঐকান্তিক হয়ে উঠেছিল—“আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে।” শুদিকে আরাবানের দূর প্রান্তে লৌকিক প্রশংসাকাহিনীর প্রতি বাঙালী মুসলমান কবির দৃষ্টি আবৃত্ত হয়েছিল। পূর্ববঙ্গে হিন্দু-মুসলমান কবিদের কণ্ঠে জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, প্রেম-বিবাহ পবিত্রীকৃত বাস্তব কাহিনী ধ্বনিত হচ্ছে। সন্তের শতকের গোড়া থেকেই সজীব ভাবপ্রবাহ মন্দীভূত হয়ে আসছিল, পৌরাণিক কাহিনীর অল্পবৃদ্ধি ক্রমেই প্রকট হচ্ছিল, ভাবের স্বরে চুরি হওয়ার কাব্যরূপের বহিরাবয়ব সংক্ষেপে অতি মনোযোগের নৌক দেখা যাচ্ছিল। বাংলা সাহিত্যের গতিবেগ আবদ্ধ হয়ে আসছিল। নগরের হিত্রপথে তার কণি ধারা উচ্ছ্বিত হতে চাইছিল। গ্রামের অর্থনৈতিক জীবন ক্রমাগত ভেঙে পড়ায় সাহিত্য চর্চা অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। সাহিত্য চর্চার পক্ষে তাই রাজদরবার বা ধর্মযাজী নাগরিক সমাজ একান্ত হয়ে উঠেছিল। আর এক দিকে লোচুপ ইংরেজ বণিকের পদ সঞ্চাব—শায়েস্তা খাঁর আমলেই নিবিঘ্নে বাণিজ্য চালাবার অধিকার লাভ, জব চার্ণকের নেতৃত্বে স্বতন্ত্রিটে বাঁচি স্থাপন, শোভা সিংহের বিস্তোহের অরাজকতার সাধু স্বাবাদার ইব্রাহিম খাঁর কাছে সাময়িক আশ্রয় স্থাপনের অল্পমতিলাভ ও কোর্ট উইলিয়াম গঠন, স্বতন্ত্রিটি গোবিন্দপুর কলকাতা এই তিনটি গ্রাম ক্রয় ও তাদের শাসন অধিকার লাভ, সেখানে নাগরিক ব্যবস্থা ও স্বাধিকার নতুন নিয়ম প্রবর্তন, এভাবে কলকাতা নিরাপত্তার অরক্ষিত আশ্রয় হয়ে উঠে। শোভা সিংহের বিস্তোহ ও বর্গোহাঙ্গামার তাড়নে লোক সমাগম অতি দ্রুত বেড়ে চলে, কলকাতার চারদিকে নতুন মাহুঘ ও নতুন ঐতিহ্যের ভিত্তি গড়ে উঠল। ১৭৫০-এ এখানে এক লক্ষ লোকসংখ্যা হোল। তারপর আচার্য বহুনাথ সরকারের কথা—In 1757, we crossed the frontier and entered into a great new world; কিন্তু—it was the beginning slow and unperceived of a glorious dawn.

এই রাত ভোয়ের ব্যাকুল প্রতীক্ষা করতে করতে অর্ধ শতাব্দী কেটে যায়, এই অর্ধ শতাব্দীতে—মিরজাকর মিরকাসিমের হাতখিঁচি

র ইংরেজের হাতে রাজ্যভার আসে, ক্রাইভের দৈত্য শাসন নীতি
স, কে করে দ্বৈতের দমন শিষ্টের পালন? অর্ধশিপালার লেলিতান
হব। সারা দেশকে গ্রাস করতে উত্তত হয়। এসবের পরিস্রাস
-ত্ৰিযান্ত্রের মস্তুর, গ্রাম্য সমাজ বিকল, বিপর্যস্ত, এক-তৃতীয়াংশ
শানে পর্যাবসিত হয়। কর্ণওয়ালিশের আমলের পর দেশে শান্তি-
হবার আবহাওয়া কিছুটা ফিরে আসে। মোট কথা, আঠার
তকের ইতিহাস, অবিমিশ্র ধ্বংস ও অবক্ষয়ের গীড়ন ও শোষণের
তিহাস। বাঙালী জাতির গ্রাম কঠাগত হয়ে এসেছিল, তার
প-প্রাণ দীন সাহিত্যিক প্রয়াসে জ্ঞানান মিছিল কেবল আর
কছিল নতুন পথ, নতুন আলো।

তদানীন্তন ইংরেজরা উন্নত যুরোপীয় সভ্যতার প্রোজ্ঞাল আলোক
দন করে আনেনি। তারা কলকাতা ও তার ধারে পাশে
ট-কৌশল ও অর্ধশালসার রক্তিম শোষণ, নীতিহীন জীবনের
ক নতুন পরিবেশ গড়ে তুলেছিল—সমস্ত দেশের ‘অন্ধকারে’
ই এক আলোর প্রমাদ। কলকাতার আদিবাসিন্দা ছিল
নবুত্তিকারী নিম্নস্তরের অধিবাসী; আর কলকাতার বৃক্ক বাবা
মায়েং হোল তাদের জীবনে শিক্ষাদীকার শ্রোতোপথ অবরুদ্ধ,
পাটন সংস্কৃতিজাত জীবনাদর্শ বিনষ্ট, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে
রাতন সামন্ততান্ত্রিক বংশগুলি অবলুপ্ত। শুধু অর্ধের দৌলতে
যাচ্ছে নতুন প্রতিষ্ঠা দেখা দিল। ঐতিহ্যহীন, রক্তকটিকবস্ত্রিত,
দক্ষাদীক্ষা হীন এই নব প্রতিষ্ঠিত বণিকধর্মী সমাজে সাহিত্য ও
সংস্কৃতি পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে সাক্ষ্য আসরে যে রূপ নিয়ে দেখা
ল, তা-ই হোল কবিগান।

কবিগানের রূপটা কেমন হবে রাজনৈতিক, সামাজিক ও
সংস্কৃতিক পটভূমিকা থেকেই তার আভাস পাওয়া গেছে।
আধুনিক চেতনার ক্রমসঞ্চার ঘটেছে অন্তর্লোকে, কিন্তু
খেনো আধুনিক জীবনবোধ ও কাব্যিক বিষয়ের নতুন দিগন্ত
দখাটিত হয়নি, তাই কাব্য উপাদানের দিকে তারা ছিল পুরাতনের
ছোঁয়াসারী। আর পুরাতন ভাবসম্পদ অস্তঃসাদৃশ্য হয়ে
গেছিল। আধিভৌতিক চেতনা, মানবিক কামনা বাসনা নির্বাধ
য়ে দেখা দিয়েছিল। সূক্ষ্মতা ও শালীনতার আভিজাত্যও আশা
হরা যায় না, কেন না সেই কালটাই হোল ও কুল ভেঙেছে অখণ্ড
। কুল গড়ে উঠেনি, এমনি একটা অস্থির রাষ্ট্র-সমাজ-সংস্কৃতির
ইমন্তের কাল। তাই কোনো সাংস্কৃতিক বা সাহিত্যিক উপাদানই
পট্টনীল রূপ নিয়ে দেখা দিতে পারে না। আর বিরাট কাব্যের
ধারারও নিতে পারে না। তাই খণ্ড কবিতার রূপ নেবে।
কল্প কবিতাসংগৃহীত হতে পারে না সেকালে, তাই উপরি-উক্ত উপাদান
পেকরণ মিলে মিলে যে জিনিসটা গড়ে তুলল তা হোল কবিগান,
এ কবিগান না হয়ে পারে না। সেটা গড়ে উঠল যেমন, তেমনি
গড়া হতে লাগল। কবিপ্রতিভা অমনি পরিবেশে সাক্ষ্য আসরে
ফরমাস মত তৈরী করতে লাগল কবিগান।

কবিরা কারিগরের মত কবিগানকে কত বিচিত্র রূপে গড়ে
ভেঙে, নানান উপকরণ জুড়িয়ে মিলিয়ে তৈরী করতে লাগলেন,
বজনীকান্ত দাস মশার তার ফিরিঙ্গি দিয়েছেন। তরঙ্গা, ঠাড়া
কবি, খেউড় একদিকে, অজদিকে পাঁচালী, চপকীর্জন, কৃষ্ণাভা,
বার একদিকে আখড়াই, হাক আখড়াই, টপপা তদানীন্তন কালের

নানান কীরণধারা মিলে মিলে এই বিচিত্র কারুকার্য নিরসিত
হয়েছিল। তরঙ্গা, ঠাড়া-কবি, খেউড়ের আধিভৌতিকতা,
মানবিকতা; পাঁচালী, চপকীর্জন, কৃষ্ণাভার ধারহীন ভক্তিতার ও
ভাব-হীন ধার্মিকতা; আর এই দুই ধারার খণ্ডরূপ নির্মাণ, সচেতন
কারুকার্য স্বরগীর। তৃতীয় ধারাটির গান, বাজনা, সুরের কেবামতি,
বিশেষ করে টপ্পার সংক্ষিপ্ত অবনমিত রাগসঙ্গীতের মধ্যমা গতি
স্বরগীর এখানেই আধুনিক গানের প্রথম সূচনা। আধুনিক গানের
বাজনা ও সুরেরও। তখনকার দেওয়ান বেনিয়ান রাজারা এর
পত্তন করেছিলেন। একটা উদাহরণ দিলেই এটা সুস্পষ্ট হয়ে
উঠবে। ১৭১২ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর তারিখের ‘কালকাতা
ক্রনিক্যাল’ মহারাজা স্বধর্মর রায়ের বাড়ীর নাচগানের আসরের
বিশেষ একটি বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে বলেছেন, The only novelty
that rendered the entertainment different from
those of last year, was the introduction, or rather
the attempt to introduce, some English tunes
among the Hindoostance music. শ্রীযুক্ত রাজেশ্বর মিত্র
নিম্নাবৃত টপ্পার মানবিক আবেগনের প্রাধান্য নির্দেশ করেছেন
(বিষভারতী পত্রিকা, বৈশাখ আষাঢ় ১৩৬৩)। আর প্রথম
দুধারার মানবিকতা, আধিভৌতিকতা, খণ্ডরূপ, সচেতন কারুকার্য
গুলি নিয়ে ঐখর গুপ্তো সমসাময়িক ঘটনারাজির বর্ণনালীপু
হয়ে, মধুসূদনের হাত প্রতীচ্যের সনেট, এপিটল (পত্র কবিতা),
লিরিকের সমুন্নত ভঙ্গী লাভ করে, হেমচন্দ্রের হাতে দেশপ্রেম আর

সঙ্গীত-যন্ত্র কেনার ব্যাপারে আগে

মনে আসে ডোয়ার্কিনের



কথা, এটা
খুবই আভা-
বিক, কেননা
সবাই জানেন
ডোয়ার্কিনের
১৮৭৫ সাল
থেকে দীর্ঘ-
দিনের অভি-
জ্ঞতার ফলে

তাদের প্রতিটি যন্ত্র নিখুঁত রূপ পেয়েছে।

কোন যন্ত্রের প্রয়োজন উল্লেখ করে মূল্য-তালিকার
জন্ম লিখুন।

ডোয়ার্কিন এণ্ড সন্ প্রাইভেট লিঃ

শো-রুম :—৮/২, এস্ট্যান্ডেন্ড ইন্সট, কলিকাতা - ১

শ্রেণের কটাক্ষে অগ্রসর হয়ে, নবীনচন্দ্রের হাতে রোমান্টিক চেতনার ভূমিষ্ঠ হয়ে বিহারীলালের হাতে আধুনিক গীতিকবিতার দীক্ষা লাভ করে আধুনিক কালের হাতে এসে পৌঁছেছে। অতএব প্রথম দুধারার মাঝে আধুনিক কবিতার যেমন উন্মেষ, তেমনি শেষ ধারার মাঝে আধুনিক গানের প্রথম উৎসার। এভাবে কবিগান একাধারে আধুনিক কবিতা ও গানের জগতের থেকে এক বীজ ছুই মূলের মত উদ্ভিন্ন হয়ে প্রসারিত ও বিকশিত হয়েছে, তাই সে সার্থকনামা, কবিতা ও গানের সম্মিলনে সে কবিগান। যতই তার ছল, অমার্জিত, অশালীন, অনভিজ্ঞ রূপ তোক না কেন, আমাদের দেশের সাংস্কৃতির ইতিহাসে তার একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। রবীন্দ্রনাথের তাই বথার্থ নির্দেশ,—বাংলার প্রাচীন কাব্যসাহিত্য ও আধুনিক কাব্যসাহিত্যের মাঝখানে কবিগানাদেব গান। এই নষ্ট পরমায়ু কবির দলের গান আমাদের সাহিত্য এবং সমাজের ইতিহাসের একটি অঙ্গ। বলা বাহুল্য, আমাদের সাংস্কৃতির ইতিহাসেরও।

—দিলীপ চট্টোপাধ্যায়।

আমার কথা (৫২)

শ্রীপ্রশ্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৪৩ সালে এক কিশোর ছাত্র পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের রক্ত-জয়ন্তী উৎসবে দর্শক হিসাবে উপস্থিত থেকে ভারতখ্যাত প্রবীণ গায়কদের মধ্যে ত্রয়ী তরুণ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতজ্ঞের গান শুনে মুগ্ধ হয়ে পড়েন। এত অল্প বয়সে সাধনার মাধ্যমে জনপ্রিয় হওয়া



শ্রীপ্রশ্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

যায়! পরদিন হতে তিনি শুরু করলেন কণ্ঠসঙ্গীত—যন্ত্রসঙ্গীত বন্ধ রেখে। কিশোরটি হলেন আজিকার ভারতের প্রখ্যাত কণ্ঠশিল্পী শ্রীপ্রশ্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আর ত্রয়ী তরুণ সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন কুমারগন্ধর্ব, ডি, ভি, পালসকার ও শরৎকং হোসেন। বলেন প্রশ্নকুমার—

পঞ্চাশ বৎসর আগে বাবা শ্রীহরীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কার্যাবগদেশে পাটনায় এসে স্থায়ীবাসিন্দা হলেন তথাকার। চার ভাই ও চার বোনের মধ্যে তৃতীয় সন্তান আমার জন্ম হয় সেখানে ১৯২৬এর ১৫ই আগষ্ট। নিজেকে বাড়ী আছে এখনও বারাকপুর মহকুমার এড়িয়ারদহতে। প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করি ১৯৪২ সালে, আই এস সি '৪৪ সালে। বিদ্যালয়ের আন্দোলনে যোগ দিরাছিলাম বলে কলেজ থেকে নাম কেটে দেওয়া হয় সত্য কিন্তু যোগ দিই নাই। বি, এস-সির ফোর্স ইয়ারে পড়ার সময় অসুখ হল—তজ্জ্ব কাইতাল পরীক্ষা দেওয়া হল না। গানের রৌকও কিছুটা দারী ছিল একজ্ঞ।

ছেলেবয়সে বাবা ও কাকাবাবুকে গান গাইতে শুনেছি। কিন্তু খুব গভীর ভাবে তাঁরা সাধনা করেননি। বড়িশ-বহালার কথা মা শ্রীমতী অক্ষমতী দেবী রাগ-রাগিণী ভালই বোঝেন—কিন্তু নিজে কখনও গান করেননি। তবে গান শুনতে খুশি ভালবাসেন। কিন্তু বড়দাদা শ্রীপ্রব ব্যানার্জির কাছ থেকে আমরা পেয়েছি গান শেখার উৎসাহ। '৩৯ সালে বাড়ীতে এলো বেতারবন্ধ আর দিদির পরীক্ষার "মিউজিক" ছিল অতিরিক্ত বিষয়, তাই বাড়ীতে আসতেন গানের শিক্ষক। বেতারে গানের প্রতিটি প্রোগ্রাম শুনে ও মাঠার মহাশয়ের গান শোনা শুনে আমার মনে এস 'রাগ' ও 'তালা'এর জ্ঞান। দিদির গান গাওয়ার সময় 'ঠেকা'ও দিয়েছি কত দিন। সেকণ্ড ক্লাসে পড়ার সময় এশ্রাজ ও বাঁশী বাজানর চেষ্টা করতাম। কিছুদিন বাদে পাটনায় বাঁশী বাজিয়ে বলে একটু-আধটু নামও হল। আন্তঃকলেজ প্রতিযোগিতায় এশ্রাজ ও বাঁশীতে প্রথম হলুম।

নিজের গলার গান গাইব—এ বোধ কোন দিন হয়নি। কিন্তু এর পশ্চন হল ১৯৪৩ সালে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের রক্ত-জয়ন্তী উৎসবে ফৈয়াজ খাঁ, গোলাম আলী খাঁ, ওজারনাথ পটবর্দন, নারায়ণ রাও বাস প্রভৃতি দিকপালগণের সঙ্গীত শুনে। কিন্তু মোহিত হয়েছিলাম শুধু গানে নয়—তারুণ্যের উজ্জলতার—বখন শুনলাম কুমারগন্ধর্ব, ডি, ভি, পালসকার ও শরৎকং হোসেনের কণ্ঠস্বর। প্রায় প্রতিজ্ঞা করলাম যে গায়ক আমাকে হতে হবে। '৪৫ সালের শেষশেষি গান আরম্ভ করে দিলাম এশ্রাজ ও বাঁশীকে এক পাশে সরিয়ে রেখে—সোরাবুরির ফলে গাইও শুদ্ধকণ্ঠ পাই পণ্ডিত রামপ্রসাদ পাণ্ডেকে। কিছুদিন পরে এক বন্ধুর প্ররোচনায় কলিকাতায় হাজির হলুম কিন্তু বাড়ীর লোক হলেন অধুনা। এখানে চেষ্টা করলুম প্রামোচোন কোম্পানীগুলিতে গান ও ফিল্ম অভিনয়ের জ্ঞ। তাতে সুবিধা হল না। হঠাৎ সুযোগ হল শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ মজুমদারের সহিত সাক্ষাতের। তিনি আমার পাঠালেন রেডিওতে—'অভিশন' দিলাম কিন্তু জবাব না পেয়ে ফিরলুম পাটনায়। সেখানে '৪৬র সেপ্টেম্বর সংখ্যা 'বেতার জগত'এ দেখি ১৫ মি: অক্ষ 'প্রশ্নক ব্যানার্জি' খেরাল গানের জ্ঞ নির্দিষ্ট

হয়েছেন। তাই আমি বা অন্য কেহ যৌক্তিক নেওয়ার জন্য এগাম কলিকাতায়। অনুসন্ধানের পর আমাকে গান গাইতে হল।

এর পর প্রখ্যাত তবলা বাজিয়ে শ্রীহীরা গানুলীর সঙ্গে তাঁর গৃহে দেখা—তিনি পাঠালেন উক্ত শ্রীহীরাগীনাথ গানুলীর কাছে। গৃহস্থেই স্বগৃহে রেখে দরদী শিক্ষক হিসাবে আমার শিখিয়েছেন তিনি আর সেই সঙ্গে 'টিউশানী'রও ব্যবস্থা করে দেন। মধ্য মধ্য বেতার কেন্দ্রে থেকে গান গেয়েছি। দু'বৎসর বাদে নিজ বাসস্থানে চলে আসি মীর্জাপুর ষ্ট্রীটে। সেটা ১৯৪১ সাল। তাঁরই উজোগে প্রথম 'অলবেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্স' ও পরে 'অল ইণ্ডিয়া তানসেন কনফারেন্স'এ যোগ দি। বলতে লজ্জা করে কিন্তু আমার demonstration প্রোতারা হয়েছিলেন খুব খুসী। এর পরেই 'স্বকীর' ও 'সঙ্গীত' চক্রবর্ত্তে যোগদানের সুযোগ পাই। সেই সময় শরীরটা বিশেষ ভাল বাচ্ছিল না। ফিরলুম পাটনায়। কলিকাতা বেতার কেন্দ্রে গান গাঁওয়ার জন্য মধ্য মধ্য আসতুম। গবে পাটনা কেন্দ্রে যোগদান করি। ১৯৪১ সালে প্রবন্ধ শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের সঙ্গে পরিচয় হয়। '৫০ সালে কলিকাতায় এসে তাঁর শিক্ষাবীন ছাত্র হলাম। তাঁর পরিচালনায় ও সাহচর্য্যে আমার প্রিয় খেয়াল ও চুঁরীর উন্নত স্তর, বিভিন্ন রূপ, উচ্চতর শিক্ষা পাই। মনে হল যেন এত দিনে সঠিক সন্ধান পেয়েছি আমার সাধনা, আমার সঙ্গীতের চিন্তাধারা, আমার ভবিষ্যতের স্বপ্নকে সফল সার্থক রূপায়ন করার জন্য। আর বেতারশিল্পী হিসাবে দিন দিন আমার লোকপ্রিয়তা বেড়ে গেল। মনের বাসনা হল পূর্ণতর। ১৯৫৭ সালে সঙ্গীতগুরু হিসাবে শেলুম ওস্তাদ গোলাম আলী খাঁ সাহেবকে। আমার ধারণা খাঁ সাহেব ভবিষ্যৎজ্যোতি, আজ তিনি ভারতীয় সঙ্গীতবাহিনী বা দিয়ে যাচ্ছেন—তা ভারতবাসী পূর্ণ উপলব্ধি করবে ত্রিশ বৎসর বাদে। এত বড় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতজ্ঞ আমরা পাব কি না জানি না। ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেবে।

এঁর কাছে শিখলেও জ্ঞানপ্রকাশ বাবুর সঙ্গে আমার নিয়মিত যোগাযোগ আছে এখনও।

'চুনি' ফিল্মে আমার নেপথ্য সঙ্গীত আমার জীবনে এনে দিল এক বিরাট পরিবর্তন। স্বরকার রাজেন্দ্র সরকারের সাহচর্য্য—শ্রোতাদের নিকট আমার গাঁওয়া গানের উচ্চ-প্রশংসা—আর আমার নিজের দরদ দিয়ে গানগুলি গ্রহণ করা—'বহু ভট্ট'র নেপথ্য গায়ক হিসাবে উচ্চতর আসনে প্রতিষ্ঠা করল আমার। এর পর হল 'আশা' ও আরও বহু ছবিতে কাজ করার সুযোগ। ক্লাসিকাল গায়ক হয়েও মর্শকমধ্যে হল আমার প্রচুর পরিচিতি আর সুযোগ এসেছিল চিত্রে নায়ক হিসাবে অবতরণ কিন্তু উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতকে করেছি জীবন-পাণ্ডেয়—তাঁই বিশিষ্ট চিত্র-পরিচালকদের নিয়ন্ত্রণ করতে বাধ্য হয়েছি।

ভারতের বিভিন্ন স্থানের সঙ্গীতসরে যোগদান করেছি। শিল্পী বেতারের 'জাতীয় প্রোগ্রামে' ১৯৫৮ সালের নভেম্বরে প্রথম যোগদান করি।

১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তীর্থদেব-ছাত্র শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা ভারতখ্যাতা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতজ্ঞা শ্রীমতী মীরা দেবীকে বিবাহ করি। স্ত্রী, এ, কানন, চিত্রহদা ও রাবিকান্দার সাহচর্য্য আমার সঙ্গীত পরিবেশকে করেছে সুমধুর।

ভগিনী করুণা মুখার্জি, জাতা প্রজ্যোৎ বানার্জি, বেলা রায় আমার কাছে সঙ্গীত শিক্ষা করেছে। 'আবও ছাত্র-ছাত্রীকে শিক্ষা দিই। বর্ত্তমানে আমি Calcutta Academy of Indian Music শিক্ষকতা করি।

কলিকাতায় অস্থিতি গানের আসরগুলিতে স্থানীয় শিল্পীদের সুযোগ না দেওয়া বড়ই দৃষ্টিকটু লাগে আমার কাছে।

শেষে তিনি বলেন যে, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত আজ লোকপ্রিয় হয়েছে বর্ধে—কিন্তু রসগ্রাহী শ্রোতার প্রয়োজনও রয়েছে সেই সঙ্গে।

গ্রামে

কেশব চক্রবর্ত্তী

আমি এখনই গ্রামে যাবো। সেখানে ডালপালা

দিয়ে একটি কুটার গড়বো।

আর মাঠে সারি সারি বীজ বপন করবো।

আর কুটারের সামনে, রঙ-বেরঙের ফুলের বাগান করবো।

আমি এখনই গ্রামে যাবো, সেখানে উষার ঘোমটা তুলেই স্বপ্ন ধুলবে।

সেখানে প্রথম সূর্য্যের আলো পড়বে।

তখন আমরা সবাই,

বনবীথিকার ভ্রমরের মতো আপন মনে গান করবো।

আমি এখনই গ্রামে যাবো। সেখানে ঝিলের জলে স্নান করবো।

আর জলের ঢেউয়ের সাথে আপন মনে দোল খাবো।

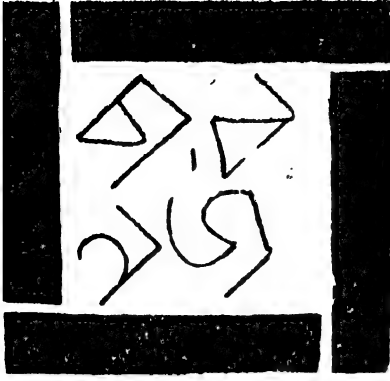
সেখানে কর্ণোয়েশনের জলের বহুধা নেই।

সেখানে ভাড়াটেদের জলের চীৎকার নেই।

আমি এখনই গ্রামে যাবো,

সরকারী পল্লী উন্নয়নের সাথে হাত মিলাবো।

অথবা পল্লীজননীর পরপ্রান্তে বসে শ্রীতির অর্থ দেবো।



মৃণালিনী সেন

[বরীদনী বশবিনী কবি ও মহিলাদের মধ্যে প্রথম
বাঙালী বিমানায়োহিনী]

বিশ্বসাহিত্যের দরবারে বাঙলা কবিতার আজ বিপুল সমাদর।

বাঙলা কবিতার রসান্বাদনে বিশ্বের মানুষের মন-প্রাণ আজ ব্যাকুল। বাঙলা কবিতার সারসর উপলব্ধি করার জন্তে পৃথিবীর কত মানুষ যে আজ উন্মুখ তার ইয়ত্তা নেই। বিশ্বজোড়া অভিনন্দনে বাঙলা কবিতা আজ পরিপূর্ণ, রবীন্দ্রনাথের দেশে যে কবিতা জন্মায় তার প্রতি মর্ত মানবের আজ অসীম শ্রদ্ধা, ভগত সাহিত্যের আকাশে আজ সগর্বে উড়ে চলেছে বাঙলা কবিতার বিজয় পতাকা।

এই যে সমাদর, এই যে প্রতিষ্ঠা, এই যে জয়যাত্রা—একোন পটভূমিকার উপর রূপ নিয়েছে? জগতের সাহিত্য-সভায় বাঙলা দেশের কবিতা সম্মানের আসন লাভ করেছে কোন একক প্রচেষ্টায় নয়, হুঁ-চাটটি ভাষার কৌশলে শব্দচাতুর্যে নয়, কয়েকটি গুরুগতীর ব্যাক্যের সমাবেশে নয়—এ জিনিষ আজ সম্ভব হয়েছে বহু শিল্পীর, বহু প্রচেষ্টার, বহু সাধকের কল্যাণে, সম্ভবপর হয়েছে অসংখ্য কবির সাধনায়, হয়েছে সরস্বতীর অগণিত ভক্তের দৃষ্টির তপস্যায়। যাদের অবদানে বাঙলা সাহিত্য এক নতুন পথের সন্ধান পেলে, তাঁরা কালজয়ী, সকল কালের নম্র।

এ কথাও অনস্বীকার্য নয় যে, বাঙলা কবিতার গঠনকর্মে, পুষ্টির ক্ষেত্রে, বিকাশের পথে সহায়তা করার জন্তে প্রাণা সম্মানে কেবলমাত্র বাঙলা দেশের ছেলেদেরই অবিকার নেই। বাঙলা দেশের মেয়েদেরও তাতে সমান অবিকার। সরস্বতীর সেবার পুরুষের সঙ্গে নারীও সমান অংশ গ্রহণ করেছে। পুরুষের মতই নারীও সমান অংশে লাভ করেছে সরস্বতীর আশীর্বাদের উত্তরাধিকার।

সাধারণ পাঠক নারী-কবিতার কবিতা থেকেও অমুপ্রেরণা, মনু পথের নির্দেশ বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গীর প্রত্যক্ষ পরিচয় কিছু কম পান নি।

বাঙলার বরণা নারী-কবিতার মধ্যে আজ "চারজন" এর মাধ্যমে ধীর জীবন কাহিনী আলোচনার প্রবৃত্তি হয়েছি তাঁর নাম মৃণালিনী সেন মহাশয়া। আজকের দিনের অসীমবয়ীরা স্বনামভজা কবি মৃণালিনী সেন, প্রসঙ্গতঃ বলে রাখি যে বাঙলা দেশের মহিলাদের মধ্যে প্রথম বিমান আয়োজনকারিণী মৃণালিনী সেন ও কবি মৃণালিনী সেন পৃথক নন, অভিন্ন।

১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা আগস্ট মৃণালিনীর জন্ম হয়। মৃণালিনীর সিন্ধুদেবের নাম স্বর্গীয় লাডলীমোহন বোষ। মাত্র তেঁরো বছর বয়সে মৃণালিনী বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। মৃণালিনী বোষ হলেন মৃণালিনী সিংহ। পাকপাড়ার দেশবিখ্যাত অভিজাত সিংহ-পরিবারের দেওয়ান গভাগোবিন্দ সিংহ ও সর্বভাগী নৃপ-তাপস বৃক্ষসিং সিংহ লালাবাবুর সুযোগ্য বংশধর বশবী ভূম্যধিকারী সাহিত্য-অভিনয়-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক স্বর্গীয় ইন্দ্রসিং সিংহের সহধর্মিণী।

দুর্ভাগ্য সিংহ-পরিবারের বিবাহের দু' বছর পরেই ইন্দ্রসিংহ অত্যন্ত অকালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। জীবনের প্রেতীকতম সঙ্গীকে হারিয়ে ফেলে দিশাহারা হয়ে পড়লেন বালিকা মৃণালিনী আর সেই পঞ্চদশীর ভগ্নহৃদয়ে কবিতার জন্ম হ'ল। বিবাহ মৃণালিনীর মধ্যেই তখন আর এক মৃণালিনী ফুটে উঠলেন, কবি মৃণালিনী। বিরহের তীব্রতার উপশম যেন খুঁজে পেলেন কবিতার মধ্যে, কবিতার মধ্যেই আকর্ষণ তুঁত গেলেন মৃণালিনী, কবিতার মধ্যে তাঁর আকর্ষণ নিমজ্জনের ফলে প্রভূত পরিমাণে উপকৃত হ'ল বাঙলা সাহিত্য, উন্নত হল, পুষ্ট হ'ল, সমৃদ্ধ হল। পর পর কয়েক বছরের ব্যবধানেই তাঁর লেখনী থেকে জন্ম নিল প্রতিধ্বনি, নির্ঝরিতী, কল্লোঁসনী (গীতিকাব্য), মনোবীণা প্রমুখ কাব্যগ্রন্থগুলি।

প্রায় এগারো বছর কঠোর বৈষম্য জীবন যাপনের পর তিনি পুনঃপরিণীতা হলেন স্বর্গীয় নির্মলেন্দু সেনের সঙ্গে। স্বর্গীয় নির্মলেন্দু ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র। দ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গে কবি মৃণালিনী দীর্ঘদিন ইউরোপে অতিবাহিত করেছেন। সমাজসেবার কার্যে, নারী জাতির স্বাধীন উন্নয়নকল্পে, জনগণের সেবায় মৃণালিনীর উৎসাহ আত্মরিকতা ও কার্যাবলী যেমনই প্রশংসনীয় তেমনই সাধুবাদার্হ। কয়েক দিন পূর্বে বিভিন্ন সংবাদপত্রের মাধ্যমে জানা গেল যে পুঙ্জনীয় ব্রহ্মানন্দের পাণ্ডুলিপি ইন জাতীয় গ্রন্থাগারে উপহার দিয়েছেন।

মৃণালিনীর কাব্যাবলীকে সাধারণতঃ দু'টি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম জীবনে প্রথম স্বামীর পরলোকগমনের ফলে যে নিদাক্ষণ আঘাত বালিকা-বধূর মনে বিরহ বেদনাকে ঘনীভূত করে তুলেছিল তারই সমাপ্তি প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে প্রথম ভাগের কবিতাগুলির মধ্যে। দ্বিতীয় ভাগের কবিতাগুলি পাঠ কালে দেখা যায় যে, কেবলমাত্র কল্পনাবিলাসী হয়ে থাকতে মৃণালিনীর কবিমন নারাজ, কর্মময় জগতে কর্মের মধ্যে চিরেই আপন জীবন সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে চান কবি মৃণালিনী। সকলের মত নিজেকেও কর্মের মধ্যে নিয়োজিতা রেখে জগতের সেবা করে যাওয়াই তাঁর মতে জীবনের মূল্য কর্তব্য।

এই অসীমবয়ীরা মহিলা-কবির আরও দীর্ঘজীবন কামনা করে তাঁর উদ্দেশ্য শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

রেভারেণ্ড অরবিন্দনাথ মুখোপাধ্যায়

[কলিকাতার বিশপ ও ভারত-ব্রহ্ম-সিংহ-পাকিস্তানের
প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ]।

অধ্যাবসায়, সততা, সেবাতত, ধর্ম্মপ্রবণতা, মানবতাবোধ, সঙ্গদয়তা ও প্রচারবিমুখতা বাঁহার মধ্যে দেখা যায়, নিঃসন্দেহে তিনি দেশের মধ্যে এক বছর মধ্যে অত্যন্ত গতাঃগতিকতার মধ্যে বৈশিষ্ট্যবান। কলিকাতার বিশপ এবং ভারত, বর্মা, সিংহল,

পাকিস্তান, এর মেট্রোপলিটান প্রথম ভারতীয় রেভারেন্ড অরবিন্দনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁহাকেই একজন।

রেভারেন্ড মুখোপাধ্যায় ১৮৯২ সালের ২৩শে মে কলিকাতার জন্মগ্রহণ করেন। স্বগ্রাম বংশবাটা ও মাতুলসালয় বলাগড়। তিনি ১৯১০ সালে কলিকাতা সেটপলস বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা, ১৯১২ সালে সেটপলস কলেজ হইতে আই. এ ও ১৯১৪ সালে স্কটিশ চার্চ কলেজ হইতে বি. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। দুই বৎসর ভাগলপুর টি. এন. স্কুলে শিক্ষকতা করিয়া তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন এবং ১৯১৭ সালে বি. টি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

পরবর্তী দুই বৎসর আগ্রা সেট জন স্কুলে শিক্ষকতা করার পর তিনি ১৯১৯ সালে দিল্লী সেট ট্রিফেন্স বিদ্যালয়ে যোগদান করিয়া সাত বৎসর তথায় অবস্থান করেন। ১৯২৬ সালে দিল্লী ইউনাইটেড খ্রিস্টিয়ান উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত তিনি উহার অধ্যক্ষ হিসাবে নিযুক্ত থাকেন।

ছাত্রজীবন হইতে যে মুখোপাধ্যায় বাজকবৃত্তি (Priesthood) গ্রহণের জন্য নিজেকে যথোপযোগী গঠনে প্রস্তুত হন। দীর্ঘকাল বৎসর কৃষ্ণসাধন, মানসিক গঠন, আধ্যাত্মিক জ্ঞানার্জন ও ধর্মপুস্তক পঠনে নিজেকে নিয়োজিত রাখার পর ১৯২৪ সালে দীক্ষা গ্রহণান্তে তিনি বাজক হিসাবে পরিগণিত হন। উহার বার বৎসর পরে তিনি এফ বৎসরের জগদীশ্বর কেমব্রিজ মিশনের অস্থায়ী প্রধান হিসাবে কাৰ্য্য করেন। তৎপরে উহার অর্থ-বিষয়ক সচিবরূপে দুই বৎসর থাকার পর প্রথম ভারতীয় হিসাবে ১৯৩১ সালে পাকপাতিভাবে উহার সর্বোচ্চ পদ গ্রহণ করিয়া ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত অবস্থান করেন। তিনি মনে করেন যে, Rev. Canon U. King এর শিক্ষা তাঁহাকে উক্ত পদের উপযোগী করিয়া তোলে। ১৯৪৪ সালে লাহোরের সহকারী বিশপ ও ১৯৪৭ সালে দিল্লীর বিশপ হিসাবে কাৰ্য্য করিয়া তিনি কলিকাতার বিশপ ও ভারত-বঙ্গ-সিংহল-পাকিস্তানের মেট্রোপলিটানরূপে ১৯৫০ সালে কাৰ্য্যভার গ্রহণ করেন। প্রথম ভারতীয় হিসাবে উক্ত দুই পদে তাঁহার নিয়োগ বাঙ্গালীর বিশেষ গর্বের বিষয় বলিয়াই মনে হয়। শৃঙ্খল কর্মপ্রণালী, স্বয়ংস্ব ব্যবহার, স্তূপুত আগাপ-আলোচনা, সঠিক বাচনভঙ্গী ও নিরলস সাধনা—তাঁহার দেখা ও প্রতিভাকে বিশ্বাসিত করিয়া তোলে। তাই কানাডার টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয় সাদরে তাঁহাকে ভূষিত করিলেন Doctor of Divinity উপাধিতে আর গত বৎসরে লণ্ডন সহরে যে মুখোপাধ্যায়কে সম্মানিত করা হইল Doctor of Divinity Laureate ঈর্ষক ধর্মীয় জগতের সর্বোচ্চ সম্মানে। সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন আর্চ' বিশপ অফ ক্যান্টারবেরী ও বিশ্বের অজ্ঞাত মেট্রোপলিটানগণ। অরবিন্দনাথ ছাত্রবয়সে হকি, ক্রিকেট ও ফুটবল খেলায় খুবই পারদর্শী ছিলেন। তিনি উর্দু ভাষাও দক্ষতার সহিত আয়ত্ত করিয়াছেন। তিনি কয়েক বার যুরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করিয়াছেন।

সিমলায় পাইনবংশের চুহিতা স্রীমতী প্রণয়প্রতিমা দেবীকে অরবিন্দনাথ বিবাহ করেন। জননী ৬বসন্তবালা দেবীর কথায় সৌম্যমুখি যে অরবিন্দনাথ বলেন যে, মাত্র সাড়ে তিন বৎসর বয়সে পিতৃদেব অরবিন্দনাথ মুখোপাধ্যায়কে হারাই—তাই তাঁর কথা বিশেষ মনে পড়ে না। কিন্তু দৃঢ় শৃঙ্খলপরায়ণ ও বিশেষ ব্যক্তিবস্তুপ্পা



রেভারেন্ড অরবিন্দনাথ মুখোপাধ্যায়

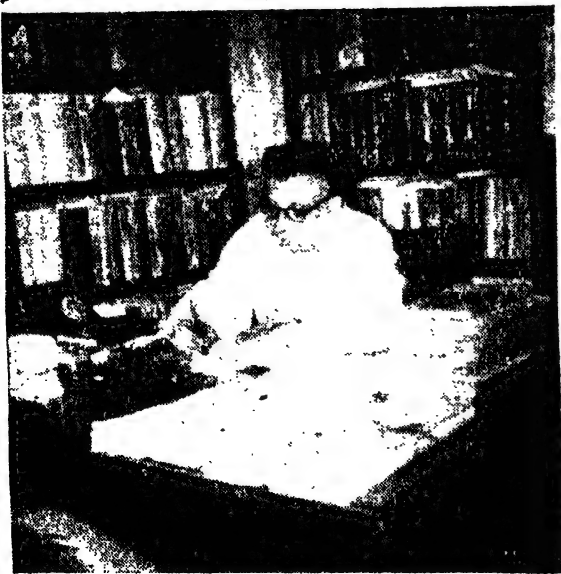
মা আমাদের পাঁচ ভাইবোনকে মানুষ করেছিলেন নিজের সুখ বিসর্জন দিয়ে বাবার সামান্য পুঁজি সঞ্চয় করে—আর তাঁর অগাধ ভগবৎ সাধনার উপর নির্ভর করে। ডাক-কলেজে পড়ার সময় বাবা যখন খুঁটখুঁট গ্রহণ করেন—তখন রক্ষণশীল হিন্দু-পরিবার তাঁকে গ্রহণ করতে পারেনি—কিন্তু পরিবারের ছোট বড়টি সেদিন অজ্ঞত দিয়েছিলেন আর সাহস যুগিয়েছিলেন তাঁর স্বামীকে। জীবনের প্রথম থেকে আমাদের মানুষ হওয়া পর্যন্ত মা কি কষ্টই না করেছিলেন! শেষের কথাগুলি বলার সময় তাঁহার অশ্রুসিক্ত নয়ন আর বাস্পকণ্ঠ কঠোর, অকপটে স্বীকার করি আমাদের বীতিমত বিচলিত করিয়া তুলিয়াছিল।

বিচারপতি বিনায়কনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

[নিরপেক্ষ, দায়নিষ্ঠ, সত্যব্রতী আইনবিদ]

ঠিক দেখলুম কি? ভুল দেখলুম না তো? কিন্তু তা কি করে হয়—অথচ নিজের চোখকে অবিশ্বাসই বা করি কি করে? বীরে বীরে আমার মনটা পরিণত হল এক রংগানে—আর সেই যুদ্ধক্ষেত্রে প্রচণ্ড সংগ্রাম চলতে থাকে এই ঠিকে আর ভুলে। কিছুকাল পর এই সংগ্রামের হল সমাপ্তি যখন তিনি নিজেই বলতে লাগলেন তাঁর দৈনন্দিন কর্মসূচীর কথা—তিনি বললেন, আগে রাত তিনটের সময় এই টেবিলে আমার দেখা যেত। এখন একটু দেরী হয়—ভবে চারটের পর বিছানার আর আমাকে পাওয়া যায় না, তোরে পদতলে আমি বেড়াতে বাই, তারপর বাড়ী ফিরে আসি ট্রামে চড়ে আষ্ট লাইক এ কমন ম্যান। পকাশ পেরিয়ে এসেছি তবে

এখনও আমি অনায়াসে অন্ততঃ সিকি মাইল দৌড়তে পারব।
মুখলুম চোখ আমার ভুল করে নি, ঠিকই দেখেছে কোন
এক সকালে একটি ট্রামে একটি নির্দিষ্ট বাড়ীর দিকে চোখ পড়ে
স্বাক্ষর চোখ দুটো ধমকে গিয়েছিল, ভাল করে লক্ষ্য করতে না
সকলে ট্রাম ছেড়ে দিয়েছিল, সেই অল্প বেগের মধ্যেই বাড়ীটিকে
এ বিয়ে সেদিন মনে মনে যে অনুমান করেছিলুম তাঁর কথা
জেনে বুকলুম অনুমান আমার অজান্তে, লিয়ালমহের নিকটবর্তী
রক্তবাজার অঞ্চলে একটি বাড়ীতে নানাগ্রন্থ শোভিত একটি
কক্ষে বসে কোন এক বহিবারের সকালে ধীরে ধীরে তাঁরই জীবন-
কাহিনীকে কেন্দ্র করে আমারের আলোচনা-আলোচনা চলছে, আমি
কীকই দেখছি। দেখছি বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। দেখছি
কলকাতা হাইকোর্টের অতীত মিটারপতি বিনায়কনাথ
বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যতীর্থ মহাপুরুষকে। মাঝে মাঝে ঘিলে
একদিকে যে জটিলতার উত্তর তার অবসানকাঁধেই তার, মিরপেজতা
ও সত্যের আসনে যিনি সমাসীন, মাঝে মাঝে সকল ধর্ম সমস্তার
মীমাংসা করার জন্তে যিনি লপথ গ্রহণ করেছেন, মাঝে মাঝে কর্মকে
উপলক্ষ্য করে থাকে এক স্মৃতিভিত্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যুগ
বিজ্ঞেয়তার সাহায্যে তাঁর গতিবিধি তো মাঝে মাঝে জগতের মধ্যেই,
তার থেকে দূরে নয় সাধারণ মাঝে মাঝে পরিচিত সীমার মধ্যেই তাঁর
পদক্ষেপণ। মাঝে মাঝে নিয়েই তাঁর কারবার, মাঝে মাঝে
যুক্ত হয়ে কখনো কখনো যে জটিলতা গড়ে তোলে তারই সমাধান
করার তার ধীর উপর ভিত্তি—তাঁর চলার পথ হবে মাঝে মাঝে
কাছেই, মাঝে মাঝে আলোপাশে, মাঝে মাঝে। তাইতো সেদিন
বিচারপতি বিনায়কনাথকে ট্রামে দেখলুম, সকলের সঙ্গে চলেছেন
বেন তাঁদেরই একজন, তাদের পর নন। তাদের কথা শুনে
শুনতে, তাদের ভাষা বুঝতে বুঝতে, তাদের চিন্তাধারা উপলব্ধি
করতে করতে।



বিচারপতি বিনায়কনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আদিনিবাস চকি-পূরণের ব্যাপারে। প্রতিভাধর বারাসত
কোর্টের মোক্তার স্বর্গীয় ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, পিতামহ
চাইবাসার উকীল স্বর্গীয় বোগেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পিতৃদেব
আলোপূরের উকীল স্বর্গীয় ক্ষিতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সমগ্র
পরিবারটি এক কথার আইনজীবীর পরিবার, এঁরা ছাড়াও পরিবারের
আরও অনেক সমস্ত আইন ব্যবসায় মগ্নেই কালাতিপাত করেছেন।
পূর্বসূরীদের যে অনলস সাধনা ছিলে ছিলে সমৃদ্ধির অভিযুগে
এগিয়ে গেছে, সেই সাধনারই সফলতা, বিকাশ, ও পূর্ণতা দেখা
দিল উত্তরপুরুষের মধ্যে। আইন ব্যবসায় লাফল্য লাফের বীজ
বিনায়কনাথের রক্তে রক্তে জিবার জিবার ধনীতে ধনীতে
ছড়িয়ে রয়েছে, আইনজ্ঞ মহলে তিনি স্বল্পবী, লক্ষ্যবিশিষ্ট বনামহত
হবেন না তো হবেন কে?

বারাসতে আদিনিবাস হলও জন্মোচ্চন কৃষ্ণনগরে।
১৯০৬ সালের ২৪ এপ্রিল তারিখে। মাতার নাম শ্রীমতলক্ষ্মী
দেবী। এর পিতামহ তৎকালীন নগর-জীবনে বিশিষ্ট পুস্তক
বাড়লার স্বর্গীয় নাগরিক পরলোকগত রাধাবাংছুর জগদানন্দ
মুখোপাধ্যায়।

বিনায়কনাথ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন ১৯২৩ সালে
বঙ্গবাসী কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র হিসেবে। প্রেসিডেন্সী কলেজে
ভর্তি হলেন, সেখান থেকে আই, এ পাশ করলেন ১৯২৫ সালে।
এর পর অসুস্থতা বশতঃ এক বছর পড়াশুনা করতেই পারেন নি,
সেই জন্তে ১৯২৭ সালের পরিবর্তে ১৯২৮ সালে বি, এ পাশ
করলেন ইতিহাসে অনার্স নিয়ে। ১৯৩০ সালে প্রাচীন ভারতীয়
ইতিহাসে এম, এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করলেন। আইন
পরীক্ষার উত্তীর্ণ হলেন ১৯৩১ সালে, স্নাতকোত্তর হিসেবে
গ্রহীত হলেন ১৯৩৩ সালের মার্চ মাসে।

ছাত্রজীবনে দেখা যাচ্ছে ইতিহাসের প্রতি বিনায়কনাথের প্রবল
অনুরাগ, পরবর্তীকালে তাঁকে দেখা গেল খ্যাতিমান আইনজ্ঞরূপে—
কিন্তু তাঁর বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় শুধু এইটুকুই নয়।
ইতিহাস ও আইনের অনুরাগ সঙ্কত শাস্ত্র ও তাঁর
দক্ষতা কম নয়। রীতিমত টোলে অধ্যয়ন করে সঙ্কত শাস্ত্র
সবক্ষে শিক্ষালাভ করেছেন। মহামহোপাধ্যায় ডক্টর বোগেননাথ
তর্কবেদান্ততীর্থের টোলের ছাত্র ছিলেন বিচারপতি বিনায়কনাথ।
১৯২২ থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত উপরোক্ত শাস্ত্রের পাঠ নিয়েছেন
অপরিসীম নিষ্ঠা সহকারে। কাব্যতীর্থ পরীক্ষার উত্তীর্ণ হলেন
১৯২৮ সালে।

আইনজ্ঞ হিসেবে ইনি গোড়া থেকেই সহকারী ছিলেন
প্রতিভাধর আইনজ্ঞ স্বর্গীয় বীরেশ্বর বাগচীর। (স্বনামধন্য ডাঃ
সতীনাথ বাগচী ও অধ্যাপক হরিদাস বাগচী এঁরই ভ্রাতা) গুরু
প্রতি তিনি যে কতখানি শ্রদ্ধাশীল তা সেদিন তাঁর সঙ্গে আলোচনার
মধ্যেই বোঝা গেল। ১৯৪০-এ বীরেশ্বর বাগচী মহাশয়ের স্বর্গলাভ।
এর পর দু'বছর একে দেখা গেল প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্রীযুক্ত
ফণিভূষণ চক্রবর্তীর সহকারী হিসেবে। কৃশলতা, নিপুণতা ও
তীক্ষ্ণতাকে মূলধন করে বিনায়কনাথের সাধনার ধারা এগিয়ে চলেতে
থাকে সিন্ধির অভিযুগে। আপন প্রতিভার অবর্ণনীয় উজ্জলো
গৌরবের সু-উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত হলেন বিনায়কনাথ, চতুর্দিক

প্রমোদিত হ'ল কীর্তিমান বিনায়কনাথের আইনজ-খ্যাতির মধুর স্মরণে। অবশেষে ১৯৫৭ সালের শেষ মাসটিতে উকীল বিনায়কনাথের নাম ঘোষিত হ'ল বিচারপতিরূপে। বিনায়কনাথের সঙ্গে ক্রীষিমলকুমার ভট্টাচার্য ও ক্রীষ্ণমাচরণ লাহা মহাশয়েরও বিচারপতিপদে নিযুক্ত হলেন, এঁরা তিনজন বিচারপতিপদে নিযুক্ত হবার অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই আরও দু'জনের নাম বিচারপতিরূপে ঘোষিত হ'ল, তাঁরা হলেন ক্রীষ্ণরত্নপ্রসাদ মিত্র ও ক্রীষ্ণজিতনাথ দাস মহাশয়গণ।

১৯৫৯ থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তকোত্তর (বাহ্যিক) পাঠ্যের অধ্যাপকের আসন অলঙ্কৃত করেছেন বিনায়কনাথ। ১৯৫৫ থেকে ১৯৫৭ পর্যন্ত ইনি ছিলেন কলকাতার তৃতীয় সরকারের প্রধান কৌশলী। ডিসেম্বর ১৯৫৭ থেকে আলিপুর চিড়িয়াখানার পরিচালক সমিতির ইনি অত্যন্ত সমস্তর পূর্ণ অঙ্গস্বত্ব করে আছেন। ১৯৫১ সালেই এশিয়াটিক সোসাইটির প্রাধিকারকর আসনে ইনি অধিষ্ঠিত হয়েছেন। ছাত্রজীবনে ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউটের ইনি একজন আণ্ডার সেক্রেটারী এবং কার্ধনির্বাহক সমিতির অত্যন্ত সমস্ত ছিলেন। কর্মজীবনে বার ম্যাসেসিয়েশানের সেক্রেটারীপদেও এঁকে দেখা গেছে।

সেদিনকার আলোচনার কঁাকে বিনায়কনাথের কাছে তাঁর নিজের বিচারকজীবনে লব্ধ অভিজ্ঞতা বিষয়ে কিছু জানতে চেয়েছিলুম। তিনি জানানলেন যে, আজকাল জজদের প্রতি তাঁদের দৈনন্দিন কাজের সময় বাড়াবার চাপ পড়ছে এবং স্বভাবতঃই তাঁদের ছুটির পরিমাণও কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে—অভিজ্ঞ বিচারক বিনায়কনাথের অভিজ্ঞতাজ্ঞাত অভিমতে এটি নিয়ম থেকে ছুটি ফুল দেখা দিতে পারে, প্রথমতঃ জনসাধারণ ভাবতে পারেন যে এতাবৎকাল তাহলে বিচারকরা আপন আপন করে শৈথিল্য দেখিয়ে এসেছেন বতকণ কাজ করার কথা ততক্ষণ তাহলে তাঁরা কাজ করতেন না, এটি একজন বিচারকের কাছে সম্মানের দিক থেকে অত্যন্ত হানিকর। দ্বিতীয়তঃ, একটি লোকের তার বতখানি সামর্থ্য তার চেয়ে বেশী কাজ যদি তাকে দিয়ে করানো যায়—তাহলে সেই বাড়তি কাজের নমুনাটুকু স্বভাবতঃই নিরেশ হবে। বিনায়কনাথ বলেন, দেখুন সাধারণতঃ হাইকোর্টে আপীলের মোকদ্দমা আসে দু'টি স্তর অতিক্রম করে (মুন্সেফ কোর্ট ও ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট) অর্থাৎ হাইকোর্টে অধ্যায়টি হচ্ছে সেই মামলার তৃতীয় স্তর বুঝে দেখুন পর পর দুটি কোর্টে যে মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়ে আছে সেই মামলার নিখুঁত বিচার করতে গেলে কি পরিমাণ প্রকৃতি ও অধ্যয়ন দরকার—হাইকোর্টের আগেকার লম্বা ছুটিগুলিই ছিল ঐ অধ্যয়নের প্রকৃষ্ট অবসর। আইনজগতের সঙ্গে বিনায়কনাথের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আজ দীর্ঘ পঁচিশ বছরব্যাপী। বিচারশালায় পারিপার্শ্বিক আবহবৈধনীর সম্পর্কে তাঁর অভিমত জানতে চাওয়ায় তার কাছ থেকে জানা গেল যে, অসংখ্য আইনজীবীর মধ্যে কেউ কেউ কেউ গভাভূগতিকভাবে কাজ করে যাচ্ছেন তাতে স্পন্দন নেই, নতুনও নেই, বৈচিত্র্য নেই। কেউ কেউ স্থল রসেই মজে আছেন আবার কেউ কেউ সত্যিকারের সাধনায় আত্মমগ্ন। জিগ্যেস করলুম—আইনজগত সম্বন্ধে বাইরে থেকে তো নানারকম গল্পের কথা শোনা যায়, এর সত্যতা কতখানি—বিনায়কনাথ বলেন, গল্প তো সব

জগতেই আছে, শুধুনা এ জগতে যে নেই এ কথা জোর করে বলা থাক না; তবে এর কারণ জানেন? প্রধান কারণ অর্ধজট, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় সাধারণ মধ্যবিত্ত ছেলেরা উকীল হয়ে আসে, মস্তেলের পক্ষে কাজ করে যায়, অনেক কিছুই তার উপর ভর্তু হয়—বেচারারা ভুল, করে বসে, তাদের পরিচয়না ব্যর্থ হয় হিসেবে হয় ঠিকে ভুল ফলে এমন করেই বাইরের জগতে আইনজগত সম্বন্ধে এক প্রতিকূল মতের সৃষ্টি হয়। আরও একটি প্রসঙ্গ করেছিলুম তাঁকে আজকের দিনে সরকার পক্ষ থেকে বেশের আইনের উন্নতিকল্পে যে প্রচেষ্টা চলছে আপনাদের মতে তা কতখানি তাৎপর্যপূর্ণ বা কতদূর বা আদর্শ সার্থক কিনয়? বিচারপতির কাজ থেকে উদ্ভূত আসে—বিচার বিভাগের ক্রটি-বিদ্রুতি অভাব-অভিযোগ দূরীকরণের ক্ষেত্রে সরকার ল কমিশন করেছেন, এঁরা সার্থক হয় তো এখনও হয়ে উঠতে পারেননি—তবে চেষ্টা করে চলেছেন, ঐ কমিশন থেকে এতাবৎ একমাত্র রিপোর্টই প্রকাশিত হয়েছে, রিপোর্টটি অধ্যয়ন করলে এটুকু বেশ বোঝা যায় যে, অভাব-অভিযোগগুলির প্রকৃত স্বরূপ তাঁদের কাছে অনুদৃশ্যাত্ত নয়; তা ছাড়া এটি মহৎ কার্যে এখনও পর্যন্ত তো তাঁদের কোন বকম ঠান্ডাসীজের পরিচয় পাওয়া যায়নি?

দেশীয় পণ্ডিত সমাজের অশেষ প্রজ্ঞাভাজন বাঙালীর নমন্য বাণীঃসবক, পূণ্যলোক বিজ্ঞাসাগর মহাশয়ের প্রথম গুরুদেব পূজনীয় তারানাথ তর্কবাচস্পতি। তাঁরই প্রণোদিত স্বর্গীয় পঞ্চানন ভট্টাচার্যের কণ্ঠা শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবীর সঙ্গে পরিচয় হ'তে আবদ্ধ হলেন বিনায়কনাথ। সে আজ ত্রিংশ বছর আগের কথা। বিংশ শতাব্দী তখন পঁচিশটি বছর অতিক্রম করে ছাট্টিশ পা দিয়েছে।

ডাঃ ক্রীণীহারকুমার মুন্সী

[প্রখ্যাত চক্ষু-চিকিৎসক ও বিশিষ্ট সমাজকর্মী]

পেশার সঙ্গে সমাজসেবা চিকিৎসককে এনে দিয়েছে প্রেষ্ঠ আসন—তাকে অঙ্গুর রাখার লজ্জা চাই সুগভীর জ্ঞান, শিষ্টাচার, মানবতাবোধ আর আর্ন্ত আত্মবোধের সেবা—নিজের স্বেচ্ছাচকিত চিকিৎসাগারে কথা ক'টি বললেন ভারতের অত্যন্ত বিশিষ্ট চক্ষু-চিকিৎসক ডাঃ নীহারকুমার মুন্সী।

১৯০৩ সালের ২৮শে আশ্বিনয়ারী নীহারকুমার টাঙ্গাইলে জন্মগ্রহণ করেন। পৈতৃক নিবাস ছিল কালিহাতি গ্রামে—বাবা ভনীন্দ্রকুমার মুন্সীর কণ্ঠক্ষেত্র রাজশাহীতে তাঁর বালা ও কৈশোর কেটেছে। দাদামহাশয় ছিলেন বিন্দুসিনি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও গোবিন্দচন্দ্র নিয়োগী। ১৯২০ সালে নীহারকুমার রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রবেশিকা ও ১৯২২ সালে রাজশাহী কলেজ থেকে আই, এস-সি পাশ করে কলকাতায় কারমাইকেল (বর্তমানে আর, জি, কং) কলেজে ভর্তি হন। ১৯২৮ সালে এম-বি পরীক্ষার উত্তীর্ণ হয়ে তিনি এক বছর হাউস সার্জেন ও এক বছর রেজিষ্টার হিসাবে কাজ করে ১৯৩১ সালে ইংল্যান্ড গমন করেন। সুবক্ষিত চক্ষু হাসপাতালে দু'বছর দক্ষ শাস অবস্থান করে তিনি D. O. M. S ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৩৫ সালে কারমাইকেল কলেজে (আর, জি, কং) জুনিয়র



ডাঃ নীহারকুমার মুন্সী

চক্ষুচিকিৎসক হিসেবে যোগদান করে পরে উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের Prof. of Ophthalmology ও বিভাগীয় প্রধান হন। এ ছাড়া চিত্তরঞ্জন সেবাসদন, ইসলামিয়া ও ডাঃ এম, এন, চ্যাটার্জি চক্ষু-চিকিৎসালয়ে তিনি যুক্ত ছিলেন বা আছেন।

ছাত্রজীবনে তিনি সুবিখ্যাত প্রধান শিক্ষক ও চিকিৎসক চক্রবর্তী ও গৃহশিক্ষক শ্রীমানলসাল সাহাব আদর্শে অনুপ্রাণিত হন আর বাড়ীতে মা হিরণ্ময়ী দেবীর অসীম ঐশ্বর্য, বাবার স্মৃতির নীতিবোধ ও সত্যতা এবং জ্যাঠামশার ও অভয়কুমার মুন্সীর ঔদার্য তাঁর মানসিক গঠনে সাহায্য করে। বিদ্যালয়ে তিনি নানাব্যাপারে নেতৃত্ব গ্রহণ করতেন—তাই ক্রমশঃ তিনি বিশিষ্ট বাস্তবনৈতিক নেতা ও কলেজের তৎকালীন ছাত্র সভাপতির বন্যোপাধ্যায়ের সম্পর্কে এসে সমাজসেবক-সভ্য গঠন করেন। তাঁর পরিবারে কেউই চিকিৎসক ছিলেন না, কিন্তু এ বিষয়ে রাজশাহীর সার্জেন ডাঃ উপেন্দ্র রায়চৌধুরী ও প্রখ্যাত চক্ষু-চিকিৎসক ডাঃ সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়ের প্রভাব তাঁর উপর হায়াপাত করে।

বাহারা দুঃখ স্বীকার করিতে পরাণুখ তাহারা কোনদিনও জাতির দুর্গতি দূর করিতে সমর্থ হইবে না। বাঁহারা ভগীরথের মত তেজোময় দুর্ধর্ষ-গঙ্গা-প্রবাহ চালিত করিয়াছেন, তাঁহারা কেহই সত্যকে ও অজ্ঞানতাকে সেই দুঃস্বাভাবিত উদ্ভাপন করিতে পারেন নাই। পদে পদে পরাজিত ও বিফল হইয়াও 'তাঁহারা' অবিচলিত চিত্তে অগ্রসর হইয়াছেন, সহস্র বিষ-বিপদের মধ্যেও শির উন্নত করিয়া রহিয়াছেন।

—আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু

১৯৩৫ সালে আসামের চিকিৎসক ঙ্মরেশ রায়ের কন্যা ও কলিকাতার অন্ততম বিশিষ্ট শিশু-চিকিৎসক ডাঃ সুনীল রায়ের ভগিনী শ্রীমতী অরুণা দেবীকে ডাঃ মুন্সী বিবাহ করেন। নীহারকুমারের অল্পকালীন শ্রমিকনেতা শ্রীসুনীল মুন্সী।

১৯৩৩ সাল থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত অক্সফোর্ড পরিভ্রমণের পর ডাঃ মুন্সী নিজের পেশার প্রতিষ্ঠিত হতে সক্ষম হন। চক্ষুর গঠন হয়েছে ক্ষুদ্র শিরা-উপশিরার দ্বারা—আর চক্ষু মানুষকে সাহায্য করে ভ্রমবানের সৃষ্টি গভীরভাবে উপলব্ধি করতে ও ক্ষুদ্র কর্ম সম্পাদনে। তাই নীহারকুমার আকৃষ্ট হয়েছেন চক্ষু সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানলাভে—আর দৃষ্টিভাবের পুনঃ দৃষ্টিলাভে সহায়তা করতে। বিলাতে তিনি প্রসিদ্ধ চক্ষু-চিকিৎসক অধ্যাপক ফর্টার হুথ, শ্রাব ডিউক এন্ডার, শ্রাব জন পায়সনস্ প্রভৃতির প্রিয় ছাত্র ছিলেন।

বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করা ও সহপাঠীদের সঙ্গে একত্রিত হওয়ার জন্য ডাঃ মুন্সী, শ্রীযুক্ত বঙ্গমদার (দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়), ডাঃ উমাপ্রসন্ন বসু (বেঙ্গল ইমিউনিটি), জীনদীয়া অধিকারী (বেঙ্গল কেমিক্যাল), শ্রী কে. এন. সেন, শ্রী বি. কে. বসু প্রভৃতির সহায়তায় Science Club গঠন করেন ১৯৪০ সালে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি পেশাজীবী রাজ্যসরকার, জাতীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রভৃতির আর্থিক সাহায্য আর জনসাধারণের সহায়তায় চলেছে। এর মুখপত্রের "বিভার হুগলী", "কলিকাতার স্বাস্থ্য" ইত্যাদি বিশেষ সংখ্যাগুলি সরকারী ও বেসরকারী মহলে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

কলিকাতার আগন্তু ছাত্রদের চিকিৎসার অন্তর্বিধি দ্রুতরূপে সেবার্থী ডাঃ নীহারকুমার মুন্সী তারকজ্ঞান ছাত্রসহ নিজের বাড়ীতে ১৯৫২ সালে Students Health Home সৃষ্টি করেন। কয়েক বছরের মধ্যে এটি জনসাধারণের ও সরকারী সাহায্য লাভে সক্ষম হয়েছে। কলিকাতা করপোরেশন নামমাত্র রাজস্বায় ভূমির, "আন্তর্জাতিক ছাত্রপরিষদ" হস্তশিল্প ও পিকিংহাম প্রিন্সিপাল ট্রান্সফারিয়াম প্রতি বছর পঞ্চাশটি ভারতীয় ছাত্রের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছেন। ১৯৫৪ সালে ডাঃ মুন্সী চীনদেশের বহু স্থান পরিভ্রমণ করেন।

তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে ডাঃ নির্মলেন্দু রায়, ডাঃ মোহিনীকান্ত মুজুমদার, ডাঃ অমিত সেন, উড়িষ্যার বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ মনসাচরণ মালাকার প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

১৯২৮ সাল থেকে ডাঃ মুন্সী ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের সদস্য এবং ১৯৫০—৫৪ সালে প্রতিষ্ঠানটির বঙ্গীয় শাখার সভাপতি ছিলেন। বর্তমানে তিনি অটোমোবাইল এসোসিয়েশন বঙ্গদেশের সভাপতির আসনে সমাসীন।

স্মৃতির টুকরো

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

সাধনা বসু

বোম্বাইয়ের ছায়াছবির বাজারে প্রবোজক হিসেবে চিমনলাল বি, দেশাইয়ের নাম যথোচিত বিশিষ্টতার দাবী রাখে, এক কথায় চিমনলাল বোম্বাইয়ের তখনকার দিনে পৃথলা নব্বয়ের প্রবোজকদেরই একজন। তাঁর পুত্র সুরেন্দ্র বি, দেশাই। আমরা কলকাতায় ফিরে আসবার পর মধুর কাছে সুরেন্দ্র রীতিমত আসা-বাওয়া শুরু করলেন। বাতায়ত ঘনিষ্ঠ থেকে ক্রমেই ঘনিষ্ঠতর হয়ে উঠতে লাগল। এই প্রসঙ্গে, আজ দীর্ঘ বিশ বছর বাদে একটি মজার কথা মনে পড়ছে, এই তরুণ ভ্রলোকটিকে বুলবুল অর্থাৎ তাঁর ডাকনামে ডাকা হোত। তিনি আমাদের বাড়ী থেকে চলে বাবার পরেই আমার বেশ মনে পড়ে মধুরকে জিগেস করতুম যে বুলবুল বার নাম সঙ্গীতে তার তো একছত্র আবিপত্য থাকা উচিত তা এই বুলবুল গান গাইতে পারে তো? এই রকম মজা করতুম প্রায়ই। কোথায় চলে গেল সেই সব বিনশুলো, কোথায় মিলিয়ে গেল সেই সব পরিবেশ, কোথায় তারিয়ে গেল সেই অসংখ্য চেনাশুধ—কাল এগিয়ে চলেছে যথানিয়মে তার সঙ্গে তালে তাল রেখে চলতে মাছুষ বাধ্য—যে সেই বাধ্যতাকে মানতে চায় না বা পারে না—তাকেই ঠকতে হয় সব চেয়ে বেশী। বারা মিলিয়ে গেল, বারা মিলিয়ে গেল, বারা হারিয়ে গেল তারা আসন শেল স্মৃতির স্বর্গসিংহাসনে। স্মৃতির দিক দিয়ে তারা অবলুপ্ত, স্মৃতির দিক দিয়ে তারা মৃত্যুভরা।

মধুর কাছে দেশাইয়ের আনা-বাওয়ার পিছনে আত্মপোষন করেছিল একটি প্রস্তাব, যথাসময়েই প্রস্তাবটির হ'ল আত্মপ্রকাশ। "অভিনয়" ছবিটি দেশাইয়ের মনে ছায়াপাত করেছিল গভীরভাবে, সেই থেকেই মধুর কাছে তার আসা-বাওয়ার সূত্রপাত। মধুর কাছেই শুনলুম যে এখন তার ইচ্ছে যে মধু বোম্বাই গিয়ে তাদের সাগর মুভিটোনের পক্ষে একটি চিত্রনির্মাণে হাত দেয়, ছবিটি বাঙলা ও হিন্দী উভয় ভাষাতেই তোলা হবে। স্বভাবতঃই সাগর মুভিটোন থেকে ছবি তুললে আমাদের বোম্বাইতে বাসা বাঁধতে হবে, কলকাতার বাস তুলতে হবে। কলকাতা ভ্যাগ মানেই চোরঙ্গী প্রেসের বাড়ী ছাড়া। এই বাড়ীতে প্রায় ছ'টি বছর আমাদের কেটেছে, আমাদের দৈন্য জীবনে এর প্রভাব অনতিক্রম্য, এ বাড়ীর গুরুত্ব আমাদের কাছে যে কতখানি তা বর্ণনায় অতীত, তা উপলব্ধির বিষয়। আমাদের জীবনের কত হাসি, কত গান, কত কথা, কত কাহিনী, কত টুকরো টুকরো ঘটনার সারিবদ্ধ স্মৃতি এই বাড়ীর ঘরে ঘরে, এখানে-সেখানে, আনাচে-কানাচে, প্রতিটি ইট-পাথরে অঙ্গাঙ্গীভাবে একাডুত হয়ে গেছে। এ বাড়ীর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেন আমাদের পক্ষে যে কতখানি কষ্টকর তা আমরা ছাড়া বিনি জানেন তিনি স্বয়ং অন্তর্ধার্মী ছাড়া কেউ নন। এই বাড়ীতে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ আমার একান্ত পরিচিত, কতকালের আগন, চিরকালের চেনা। এ বাড়ী ছাড়তে হবে—এই চিন্তাই যে আমার মনের সমস্ত উদ্দীপনাকে দমকা হাওয়ার মত ফুংকারে একবারে নিবিয়ে দিল। আমাদের যে সব মঞ্চাভিনয় ও চিত্রাভিনয় সাধারণের অনাবিল স্নেহরসে অভিসিক্ত হয়েছে—



সবই এই বাড়ী থেকেই, আর একটি চিন্তারও ঘীরে ঘীরে আবির্ভাব ঘটল আমাদের হর্ষবিবাদগ্রস্ত মনে—কলকাতা ছাড়া মানে আমাদের মঞ্চাভিনয় প্রচেষ্টারও ইতি মঞ্চাভিনয়ের প্রতি আমাদের যে অপরিণীত অছুরাগ—তার সেইখানেই শেষ বঙ্গমঞ্চের সেবা করার সৌভাগ্য থেকে আমাদের হতে হবে বঞ্চিত, প্রকান্ত বঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের মাধ্যমে সুবোদ্ধা জনমণ্ডলীকে শ্রদ্ধা-নমস্কার জানাবার যে সুযোগ এককাল ধরে পেয়ে এসেছি—এবার তো তাও হাবাতে হবে।

আবার এদিকে উভয় ভাষার ছবি করার বাসনাও অন্তরে প্রবল, বিশেষ করে হিন্দী ছবির নির্মাণে অসাধারণ আগ্রহ। উভয় ভাষার এবং বিশেষ করে হিন্দীতে ছায়াছবি তোলায় একটা অনন্য বাসনা মনের মধ্যে লুকিয়েছিল, দেশাইয়ের সঙ্গে



স্বর্গীয় বীরাজ ভট্টাচার্য ও অমিতা সাধনা বসু
"কুমকুম" এর একটি দৃশ্য

যোগাযোগের এবং তার প্রস্তাবের ফলে সেই বাসমাটাই যেন শাখা-প্রশাখার একটা বিরাট বিশাল রূপ নিল। বোম্বাই বাওয়ারই আমরা ঠিক করলুম। মধু একা যেতে চাইল না, সে চাইল সম্প্রদায়ের যেতে, ছবি সে হিন্দীতে করবে, সাগর মুক্তিটানের পক্ষেই, তবে সেই ছবিতে স্পর্শ থাকবে তার নির্বাচিত কুশলীদের কুশলী হাতের, সেই ছবিতে মিশিয়ে থাকবে তার নির্বাচিত কুশলীদের কর্মকৃতিত্বের স্বাক্ষর, ছবির প্রথম দৃশ্যটি থেকে শেষ দৃশ্যটি পর্যন্ত গৃহীত হবে তার নির্বাচিত কুশলীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায়। সে চাইল তার সম্পূর্ণ সম্প্রদায়কে সঙ্গে নিয়ে যেতে—শিল্পীদের, কলাকুশলীদের, শিল্পনির্দেশক, সুব-সংযোজক এবং সহকারীদের। আমরা মনে আছে, এই প্রসঙ্গে আলাপ আলোচনার সে কি সমারোহ, মধুর সঙ্গে এ বিষয়ে অপর পক্ষের তখন কথাবার্তার সে যে কি ব্যস্ততা তা ভারসেই বিষয় মনের মধ্যে জন্ম নেয় আজও। চিঠিপত্র হার মানল, ট্রান্সকল চিঠির শূন্য স্থান পূর্ণ করল তুলনামূলক সুবিধা ও সময় সংক্ষেপণের প্রতিক্রিয়া নিয়ে। আমাদের মধ্যে এক কথার তখন ব্যস্ততার সমারোহ, জীবনীশক্তি যেন তখন বেগপ্রাচুর্যের জয়গান আর ক্রোধময় যেন ক্রততার নিদর্শন।

অংশেবে মধুর প্রত্যেকটি প্রস্তাব যেনে নিলেন প্রযোজকবর্গ। সে বা চেয়েছিল, তাই সরবরাহ করতে তাঁরা হলেন প্রতিক্রান্ত, তার প্রতিটি সর্ব্ব তাঁরা যেনে নিলেন সম্পূর্ণরূপে। নির্মিতব্য ছবি হিসেবে নির্বাচিত করা হল—“কুমকুম দি ডাম্পার” বার স্ট্রট হয়েছে শ্রীমদ্রথ রায়ে লেখনীর মাধ্যমে।

আগেই বলেছি, ছবিটি উত্তর ভাষাতেই (বাঙলা ও হিন্দী) তোলার কথা হয়েছিল অর্থাৎ গল্প একটি হলেও দেখা যাচ্ছে ছবি হচ্ছে দুটি। একটি কাহিনীর ভারতীয় দুটি পৃথক ভাষায় চিত্রায়ণ। এই দুটি ছবিতেই নায়কের ভূমিকায় নির্বাচিত হয়েছিলেন সম্প্রতি পরলোকগত শক্তিধর অভিনেতা বীরাজ ভট্টাচার্য, সেকালের অপরিহার্য চিত্রনায়ক। স্মৃতির টুকরোতে এই প্রসঙ্গ (বিশেষ করে বীরাজের প্রসঙ্গ) যখন লিখে চলেছি তখন মনের মধ্যে বিগত কালের অজস্র স্মৃতির মধুনে একটা অনন্তসাধারণ আনন্দ জন্মেছে ঠিকই, সেই সঙ্গেই বাদের ঘিরে সেই সব কাহিনীর স্ট্রট, বাদের স্পর্শে সেই সব কাহিনী দানা বেঁধে উঠেছে, বাদের কল্যাণে সেই কাহিনীগুলি অবিচলিত হতে পেরেছে অমরত্বের আসনে তাদের অনেকেই আজ পার্থিব দেনা-পাওনা, হিসেব-নিকেশ সব চুকিয়ে এক অজানা মহাশূন্যের উদ্দেশে যাত্রা করল, কায়িক উপস্থিতি তাদের কোনদিন ঘটেবে না। এই পার্থিব পৃথিবীর বুক, ধর্মীর অনিত্য এই খেলাঘরের হানিতে, কান্নায়, আনন্দে, বেদনায়, হর্ষে, বিবাদে অংশগ্রহণ করতে তাদের আর দেখা যাবে না—এই বিরাট হুঃখ সমস্ত আনন্দকে ছাপিয়ে উঠে মনকে ভীষণভাবে ভারাক্রান্ত করে তোলে। এই তাদেরই মধ্যে নিঃসন্দেহে বীরাজ অন্ততম। স্মৃতির টুকরোর গত যে কিভাবে বীরাজের নামোন্মেষ করা হয়েছে তখনও সে জীবিত। যখনও ভাবি নি যে এত আকস্মিক ঘটবে তার জীবননাট্যের পরিসমাপ্তি। তার আত্মার শান্তি হোক।

উত্তর ভাষাতে গৃহীত কুমকুম মুক্তিলাভ করল ভারতের বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে।

বিশ শতাব্দীর তখন উন্নতিশীল বহু অতিক্রম করে চল্লিশের উপর দিয়ে এগিয়ে চলেছে। [ক্রমশঃ।

অনুবাদক—কল্যাণাক বন্দ্যোপাধ্যায়।

ষ্টারে ডাকবাংলো

প্রথিতযশা সাহিত্যশিল্পী শ্রীমদ্রথ বসুর ‘বুটী বুটী’ শীর্ষক উপন্যাসটি বহুজন-সমাদৃত। ‘ডাকবাংলো’ এই উপন্যাসটিরই নাট্যরূপ। বর্তমানে ষ্টারে সর্গারবে অভিনীয়মান।

এক ডাক্তারের ইতিহাসের গবেষণারত পুত্র এর নায়ক ও এক আত্মজোলা ঐতিহাসিক গবেষণার নিয়ম সমাহিত সুবীর কভা এর নায়িকা। নায়ক ও নায়িকার পিতার আদিনিবাস একই গ্রামে। বুটীর বেগ বৃদ্ধিতে বাধ্য হয়ে নায়িকা ইরা আজর নেয় নায়ক অরুণাক্ষের বাড়ীতে। এই ভাবেই উভয়ের প্রথম দিনের প্রথম পরিচয়। অরুণাক্ষের বাবা অমৃতাক্ষ নির্বাচনপ্রার্থী। কিন্তু মনোনিয়নপত্র পাওয়ার তাঁর প্রবল বাণা হল তিনি কালীশ্বরের পৌত্র যে কালীশ্বর ইংরেজের চর বলে খ্যাত এবং গ্রামের সকলের ধারণা যে নির্দোষ, সত্যপরায়ণ ও দৃঢ়চেতা রামনিধির কঁাসির মূল তিনিই—এই রামনিধিই নায়িকা ইরার বাবা বিবেচকের পিতামহ। বিবেচকের লেখা ‘ভারত ও ইংরেজ’ গ্রন্থে তিনি অবশ্য কালীশ্বরের কলঙ্কমোচন করেছেন। কালীশ্বরকে তিনি আগাগোড়াই রামনিধির ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলেই উল্লেখ করেছেন। এই গ্রন্থ পাঠে বিবেচকের প্রতি আকৃষ্ট হন অমৃতাক্ষ তিনি স্বগ্রামে নির্বাচন কেন্দ্রে বিবেচককে নিয়ে বান সেখানে গবেষণার উপকরণ স্বরূপ দীর্ঘকাল ধরে সংগৃহীত বহু কাগজপত্র বিবেচকের হাতে সমর্পণ করেন সেইগুলি দেখতে দেখতে বিবেচক আবিষ্কার করেন যে কালীশ্বর সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ভুল, তিনি ইংরেজকে সাহায্য না করলে ইংরেজের সাধ্য ছিল না জনপ্রিয় রামনিধির কেশস্পর্শ করে। সপুত্র অমৃতাক্ষ সেদিন বিবেচকের বাড়ী এসেছেন ইরার সঙ্গে পুত্রের বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে কিন্তু সেইদিনই বিবেচক জানালেন যে সত্যের প্রকাশ তিনি করবেনই, কালীশ্বরের প্রকৃত চিত্র উদ্ঘাটন না করলে তাঁর ঐতিহাসিক সাধনার প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে। স্বভাবতঃই মিত্রতার অবসান। বাসগৃহ অমৃতাক্ষের হস্তগত হওয়ার তাঁর দ্বারা অপমানিত হতে পারেন এই আশঙ্কার জীকন্ডা নিয়ে পৈত্রিক ভিটের ঘিরে গেলেন বিবেচক। এর পর অরুণাক্ষের মায়ের দ্বারা প্রেরিত তাঁর পিতৃদেব (অরুণাক্ষের মাতামহ) গোবিন্দ ঘোষের প্রচেষ্টায় অরুণাক্ষের সঙ্গে ইরার বিবাহ। পশ্চিমঘো আবার এক ঝড়বুটীর রাতে ঘটনাচক্রে সন্ত্রাসী অমৃতাক্ষের সঙ্গে নবদম্পতির সাক্ষাৎ এক ডাকবাংলোর এবং পুত্রবধূদর্শনে অমৃতাক্ষের মন থেকে সকল বিরোধের স্তব্ধতা।

এদিকে সারা নাটক জুড়ে আরও দুটি বিশেষ ধরণের চরিত্রের সন্ধান মেলে। এই দুই পরিবারের সঙ্গে তাঁদের সমান যোগাযোগ (অবশ্য বিবেচকের সঙ্গে একটু বেশী নিবিড়) এবং এই প্রসঙ্গে এঁদের উল্লেখও বিশেষ ভাবে করণীয়। এঁরা দু’জন হচ্ছেন যুগচক্র পত্রিকার সম্পাদক ও তাঁর সহকারী। এই সম্পাদকই বিবেচকের গ্রন্থের প্রকাশক।

নাটকটি রসিকমহলে বখোচিত সাড়া জাগাতে সক্ষম হবে এ বিশ্বাস আমরা রাখি। নাটকটির পরিণতি জানার জন্তে মর্শ্বকচিত্ত থাকুল হয়ে ওঠে। মনোজ বসুর মনোজ্ঞ কাহিনী ও কৃতী নাট্যকার এবং সুখ্যাত সাহিত্যিক দেবনারায়ণ গুপ্তের সার্থক নাট্যরূপদান ও পরিচালনা এই ছয়ে মিলে এক অপরূপ রস সমৃদ্ধ নাট্যসম্ভারের সৃষ্টি করেছে। নাটকটি মূলতঃ তিনটি ধারার বয়ে চলেছে—একটি বিবেচনাকে ও তৎপরিবারকে কেন্দ্র করে, একটি অশুভ্রাঙ্ক ও তৎপরিবারকে কেন্দ্র করে এবং আর একটি কৃতান্তকে কেন্দ্র করে, সঙ্গীত এই, তিনটি ধারা সমান তালে তাল বেধে চলেছে অসমতার চিহ্ন কোথাও ধরা পড়ে নি। শিল্পকলার, রসকচিত্তে, প্রয়োগ নৈপুণ্যে, চরিত্রসৃষ্টিতে, ঘটনাসমাবেশে নাটকখানি এক অসাধারণ কৃতিত্বের স্বাক্ষর বহন করেছে। কি ঘটনাট, কি প্রযোজনায়, কি পরিচালনায়, কি অভিনয়ে এক কথায় সারা নাটকটিতে এক অমুগম্য ছন্দোযুক্ত আন্তরিকতাপূর্ণ প্রণেয় স্পর্শ পাওয়া যায়, কৃত্রিমতার, আড়ষ্টতার, অসারতার লেশমাত্র নেই। নাটকটির উত্তরাস্তর সংকসা আমরা একান্তভাবে কামনা করি।

নারক নারিকা ভূমিকায় দুটির রূপ দিয়েছেন বধাক্রমে আশীষকুমার ও সন্ধ্যা রায়। বিবেচন ও অশুভ্রাঙ্কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন বধাক্রমে ছবি বিশ্বাস ও অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্পাদক কৃতান্ত ও তদীয় সহকারী পঞ্চাননের ভূমিকায় দেখা গেছে বধাক্রমে ভাস্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও অমৃগকুমারকে। এঁরা ছাড়া আরও যে সব শিল্পী ভূমিকালিপিতে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁদের মধ্যে প্রেমোত্তর বসু, কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রশেখর দে, তুলসী চক্রবর্তী, জাম লাঙ্গা, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, শিবেন বন্দ্যোপাধ্যায় শীকঠ গুপ্ত, প্রীতি মজুমদার, নকুল দত্ত, শৈলেন ভট্টাচার্য, অর্ণা বেরী, গীতা দে, সাধনা রায়চৌধুরী, মিতা চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। নাটকটির স্বরসংযোজনা ও নৃত্যপরিচালনা করেছেন বধাক্রমে মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও মিতা চট্টোপাধ্যায়।

রঙমহলে—এক মুঠো আকাশ

“এক মুঠো আকাশ” এর বিষয়বস্তু সর্বদে মাসিক বহুমতীর সংসদ পাঠক-পাঠিকাকে নতুন করে কিছু বলা অনাবশ্যক। স্বরণ থাকতে পারে অল্পকাল এই সর্বাঙ্গসুন্দর উপজ্ঞাসটি ধারাবাহিক ভাবে মাসিক বহুমতীর পাতায় প্রথম প্রকাশ লাভ করে। ধনঞ্জয় বৈরাগী ছদ্মনামের অন্তরালে শক্তিমান নাট্যবিদ ও সাহিত্যিক তরুণ রায় এর রচয়িতা। আজকের যুব সমাজের চারিত্রিক অযোগ্যতা নৈতিক মানের ক্রমবনতি, উচ্ছ্রাসতা ও অসংয়ের পায়ে আত্মসমর্পণ প্রমুখ সমাজের একাধিক ঘন দুর্ভাগ্যের এক বাস্তব চিত্র উদ্ঘাটিত হয়েছে উপজ্ঞাসটির মাধ্যমে। এই উপজ্ঞাসের নাট্যরূপ বর্তমানে প্রভূত খ্যাতির সঙ্গে অভিনীত হচ্ছে রঙমহলে। আজকের দিনের সমাজের মধ্যে রক্তে দুর্নীতির বিববাপের প্রভাব আর তারই হারাণাত ঘটছে অপরিস্রব শিশু মনে, বাদে বসিষ্ঠ নেতৃত্বের জন্তে অপেক্ষা করে আছে আগামী দিনের সোনালী সকাল তারা আজকের এই কাল-রাজিতে সর্বনাশা রূপের কাঠির স্পর্শে ভিলে ভিলে বিনাশের দিকে

এগিয়ে চলেছে। আর তরুণ সম্প্রদায়কে এই সর্বনাশের দিকে এগিয়ে যেতে অনুপ্রেরণা যোগাচ্ছে, উৎসাহ দিচ্ছে, সহায়তা করছে মানুষের মুখোপাধ্যায় কতকগুলি দানব—নিজেদের আর্থসিদ্ধির জন্তে জগতে করতে পারে না—এমন কোন কাজ নেই।

আজকের দিনের এই ক্ষয়িষ্ণু, ঘৃণণা সমাজের বাস্তব চিত্র অল্পে অপরিণীম পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন রচয়িতা। এর কাহিনী কাগজ-কালি কলমে লেখা বলে সময় বিশেষে মনেই হয় না, দরদ, অনুভূতি, হৃদয় দিয়ে লেখা বলে মনে হয়। তাঁর নাট্যরূপদানও বর্থাবধ রসোত্তীর্ণ হয়েছে। নাটকটি আবেগে সমৃদ্ধ, গতির দিক দিয়ে বেগবান, স্বতঃস্ফূর্ত। নাটকটির সব চেয়ে বড় সম্পদ নতুনত্ব। আঙ্গিকে বিভ্রাসে, প্রয়োগ কুশলতার সকল দিক দিয়েই নাটকখানি বেন এক মালিঙ্গহীন নতুনত্বের দৃষ্ট জয়ধ্বনি। নাটকখানির অন্তর্নিহিত আবেদন, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন যে কোন দর্শকের মনে গভীর ভাবে রেখাপাত করতে সমর্থ হবে। উৎকর্ষে, উচ্ছ্রালো বৈচিত্র্যে, বৈশিষ্ট্যে, শোভনতার ইত্যাদির সমন্বয়ে সমগ্র নাটকখানি এক প্রভাববান বলিষ্ঠ রসসৃষ্টিরই নামান্তর মাত্র। প্রসঙ্গতঃ একটি কথা এখানে বলার আছে প্রেমের নামকরণ সর্বদে “এক মুঠো আকাশ” নামকরণের তাৎপর্য লেখকের দ্বারাই বিপ্রেবিত হয়েছে মূল উপজ্ঞাসে এবং সেই অধ্যায়ে তদনুযায়ী বর্থাবধ মুক্ত পরিবেশও সৃষ্ট হয়েছে কিন্তু নাটকের ধর্ম অনুসারে উপজ্ঞাসকে অনেক অঙ্গল বদল করতে হয়, এই কাহিনীটির বহন নাট্যরূপ দেওয়া হ’ল তখন যে অংশে প্রেমের নামকরণটি বিপ্রেবিত হয়েছে সেই অংশটিও বাদ দেওয়া হয়েছে, ফলে উপজ্ঞাসের মধ্যে যে পরিবেশের সাহায্যে নামকরণের তাৎপর্য ব্যাখ্যাত হয়েছে, নাটকে তা হয় নি, সেই অংশটিই নাটকটি থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে; ফলে সেই পরিবেশটিও এখানে অনুপস্থিত (যার সাহায্যে নামকরণের অর্থ স্পষ্ট হয়ে ওঠে) এবং সবিনয়ে বলছি আগাগোড়া নাটকের মধ্যে ঐ নামকরণের কোন অর্থই স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। এ বিষয়ে তরুণবাবু দৃষ্টি দিলে আমরা খুশি হতুম। বাড়লার সুবোদ্ধা প্রাণবন্ত রসিকসমাজে এই যুগোপযোগী নাটকটি সমাদরের সঙ্গে গৃহীত হোক এই কামনাই করি। বাদে কেন্দ্র করে এই কাহিনীর সৃষ্টি, বাদে অবঃপতন সারা দেশের পক্ষে ক্ষতিকর, বাদে ক্রমনিম্নগামীতা তরুণ রায়ের শিল্পমনকে ব্যাধিত করে তুলেছে এই নাটকটি দেখে তারা অর্থাৎ পতনোন্মুখ যুবশক্তি যদি আত্মসচেতন হয়ে অনিবার্য ক্ষণের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারেন তা হলে তার চেয়ে বড় আনন্দের আর কিছু থাকতে পারে না।

কেট ও গোঁরীর অর্থাৎ নারক নারিকার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন তরুণ রায় স্বয়ং ও তাঁর সুযোগ্যসহধর্মী স্নিহিত রায়। বিশিষ্ট চরিত্রগুলিতে দেখা দিয়েছেন রবীন মজুমদার, নবগোপাল লাহিড়ী, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়, জহর রায়, হরিধন মুখোপাধ্যায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, শিকলু, সময়কুমার, মিক্ট, কেতকী দত্ত, কবিতা সরকার, শীলা পাল, গুরা দাস, প্রভৃতি। এঁরা ছাড়াও অভ্যন্তরে ভূমিকা গ্রহণ করেছেন কার্তিক সরকার, গোপাল মজুমদার, সুনীত মুখোপাধ্যায়, অজ্ঞ ভট্টাচার্য, বলীন সোম, আশা দেবী ইত্যাদি শিল্পিকুল।

এই প্রাণম্পর্শী নাটকটি দর্শক সমাজে উপহার দেওয়ার জন্য আমরা রঙমহলের অভিজ্ঞ কর্তৃপক্ষ এবং তরুণ বয়সকে সর্বাঙ্গতঃ করণে অভিনয়িত করি।

দীপ জ্বলে যাই

ভাগ্য, সেবা ও করুণাই বাঙলা দেশের নারী সমাজের চিরন্তন বৈশিষ্ট্য। এই ত্রিবিধ গুণের মধ্যেই বাঙলা দেশের নারীদের বিকাশ। বিশেষ করে সেবার্ধ নারীদের প্রধান অঙ্গ। বশব্দী সাহিত্য শিল্পী আন্ততঃ্য মুখোপাধ্যায়ের লেখনীর মাধ্যমে সাহিত্যের পাতায় এই চিরকালের সত্যটিই নতুন করে দেখা গিয়েছে। তাঁর বিখ্যাত গল্পগুলির মধ্যে “নারী মিত্র” অগ্রতম। অরণ থাকতে পারে, বহুকাল আগে মানসিক বহুমতীতেই এই গল্পটি প্রকাশলাভ করেছিল। বর্তমানে ক্রীতসিত সেনের স্থপরিচালনার এই গল্পটিই “দীপ জ্বলে যাই” নাম নিয়ে ছাত্রাঙ্কে রূপায়িত হয়ে শহরের বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে সমারোহে প্রদর্শিত হচ্ছে। আন্ততঃ্য মুখোপাধ্যায়কে কেবলমাত্র কুশলী সাহিত্যিক বললে তুল করা হয় এক অভুলনীর অভিনব অল্পভূতি সম্পদের তিনি অধিকারী। নারীর একটি রূপ তিনি অনন্তসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে এখানে ফুটিয়েছেন। নারীজীবনের স্বাভাবিকতা, অন্তঃকরণ এবং পরিণতির এক নিখুঁত চিত্র এখানে উদ্ঘাটিত। যে সব জীবনে দীপ নিভে যায় সেই নিভে যাওয়া দীপ আবার জ্বলে ওঠে যে কল্যাণময়ীদের মঙ্গলম্পর্শে সেই মমতাময়ীদের জীবনের সবকটি দীপ যদি এক এক করে নিভে যায় তখন তাদের জীবনদীপ আবার জ্বলিয়ে দেবে কে? তাদের জীবনের শুকতুমির উপর করুণাধারার মত হবে কার আবির্ভাব স্বপ্নের সেই শুকনো মরুভূমির উপর কি এক কোঁটা জলের মতও পড়বে না কারোর সহানুভূতি, অল্পকল্পা বা সাধনার চিহ্ন? এই প্রশ্নটিই লেখক এখানে উত্থাপিত করেছেন পাঠক সাধারণের দরবারে।

নারীরা বাধা মিত্র এক মানসিক চিকিৎসালয়ের এক প্রধান চিকিৎসাকারিণী। মানসিক রোগে আক্রান্ত হয়ে তাপস এল চিকিৎসার জন্যে। আপন প্রণয়িনীর দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হওয়ার ফলে তার এই অস্বাভাবিক অবস্থার ডাক্তার বিধান মিলেন, যে সাধারণ গুরু পত্নর তো চলবেই তা ছাড়াও চিকিৎসাকারিণীকে অভিনয় করতে হবে প্রেমিকার আর বোঙ্গীর স্নেহতা লাভে সাধারণ গুরু পত্নরের তুলনায় সেই অভিনয়ই সহায়তা করবে সব চেয়ে বেশী। বাধা মিত্রের উপর তাপসের ভার পড়ল, বাধা সে ভার নিল না, তাপসের আগে

দেবানীষ এসেছিল, এক অবস্থা, অভিনয় করতে করতে বাধা অনেক পরে বুঝতে পারল যে অভিনয়ের সীমা তো তার কাছে অতিক্রান্ত তখন সে চরম সত্যের মুখোমুখী। কিন্তু দেবানীষকে তো সে গেল না, দেবানীষও দিতে পারল না তার প্রেমের মূল্য, সেইমতোই আর অভিনয়ের মধ্যে যেতে চাইল না বাধা। বীর হাতে তাপসের চিকিৎসার ভার পড়ল তিনি তাকে সামলাতে না পারায় সেই বাধাকেই নিতে হ’ল তার চিকিৎসার ভার। তাপস সেবে উঠল তারপর? তারপর বাধার আশঙ্কাই সত্যে পরিণত হ’ল। তাপসকে ডাক্তার জানালেন যে বাধা তাকে আসলে ভালবাসেনি, তাকে সাবাবার জন্যে অভিনয় করেছিল মাত্র। তাপস কথাটা বিশ্বাস না করলেও ঘটনাচক্রে করতে বাধ্য হল। কিন্তু বাধার মনের প্রকৃত ভাষা একমাত্র অন্তঃরামী ছাড়া কেউই বুঝতে পারল না। এদিকে ক্রমাগতই মানসিক আঘাতের ফল বাধা মিত্র নিজেকে হয়ে পড়ল মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত। সম্পূর্ণ উদ্বাধ অবস্থায় তাপসের পরিত্যক্ত কামরায় সে স্থান নিল, চিকিৎসাকারিণী হিসেবে নয় চিকিৎসাধারিণী হিসেবে। গল্পাংশটি যথোচিত দক্ষতার সঙ্গে চিত্রায়িত হয়েছে। পরিচালক সেন যথার্থই মূল্যায়নার পরিচয় দিয়েছেন। আলোকচিত্র গ্রহণও উচ্চাঙ্গের। স্বব যোজনায় হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। কলা-কৌশলে, অভিনয় সম্পর্কে এবং কাহিনীর গভীরতার দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় যে দীপ জ্বলে যাই একখানি যুগোপযোগী, প্রাণম্পর্শী ও সার্থকনামা ছাড়াছবি। কাহিনীর সঙ্গে জড়িত চরিত্রগুলির যথোচিত বিকাশে ঘটনাটির সুবিজ্ঞাসে, রূপালী পর্দার বুকে গল্পের মূল বক্তব্যের সম্যক-প্রস্কুটনে ছবিটি সর্বতোভাবে সাফল্যের স্বাক্ষর বহন করেছে।

এই ছবির যা সবচেয়ে বড় সম্পদ তা হচ্ছে সূচিত্রা সেনের অনবদ্য অভিনয়, শ্রীমতী সেন বাধার চরিত্রটিকে অসাধারণ নৈপুণ্যের সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন, শ্রীমতী সূচিত্রার অভিনয় সমস্ত ছবিটিকে নানা দিক দিয়ে ভরিয়ে তুলেছে। নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন বসন্ত চৌধুরী অত্যান্যে অবতীর্ণ হয়েছেন পাহাড়ী সাত্তাল, দিলীপ চৌধুরী, অনিল চট্টোপাধ্যায়, তুলসী চক্রবর্তী, শ্রাম লাহা, অজিত চট্টোপাধ্যায় পরিতোষ রায়, চন্দ্রা দেবী, নমিতা সিংহ, কাজলী গুহ, অপর্ণা দেবী প্রভৃতি। এ প্রসঙ্গে সবশেষে একটি কথা বলতে হচ্ছে যে ছবিটির গতির দিকে পরিচালক দৃষ্টি দিয়েছেন বলে মনে হয় না। ছবিটির গতি স্বতঃস্ফূর্ত নয়, বলতে বাধ্য হচ্ছে, অত্যন্ত শিথিল হয়ে গেছে।

তোমরা দেখিতেছি সবাই সমান। যেমন সঙ্গীতে, তেমনি অজ্ঞাত সকল বিষয়ে। তোমরা বুঝিবার চেষ্টামাত্র কর না। তোমরা বল আমাদের দেশের ধর্ম ধর্মই নয়, আমাদের কাব্য কাব্যই নয়, দর্শনশাস্ত্র দর্শনশাস্ত্রই নয়। আমরা ইয়োরোপের সকল জিনিষই বুঝিবার এবং আদর করিবার চেষ্টা করি। কিন্তু তাই বলিয়া একথা মনে করিও না যে, ভারতবর্ষের জিনিষকে আমরা অজ্ঞা বা অনাদর করি। আমাদের কাব্য, ধর্মশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র যদি পড়, তবে দেখিতে পাইবে যে আমরা ‘হিদের’ নই। সেই অচিন্ত্য অনির্বচনীয় ঈশ্বরের স্বরূপ সবকিছু আমাদের ধারণা তোমাদেরই মত,—চাই কি কোন কোন বিষয়ে আমাদের জ্ঞান তোমাদের চেয়েও গভীরতর ও নিবিড়তর।

—বারকানাথ ঠাকুর।

১লা বৈশাখ (১৫ই এপ্রিল): বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে কলিকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন।
মুখ্যমন্ত্রী ডা: বিধানচন্দ্র রায় কর্তৃক জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ীর (কলিকাতা) গলিতে নৃত্য, নাট্য ও সঙ্গীত একাডেমী ভবনের উদ্বোধন।

২রা বৈশাখ (১৬ই এপ্রিল): কেরল শিক্ষা বিল অনুযায়ী কেরলে স্কুলের ছাত্র ও শিক্ষকদের সবকার-বিরোধী সভা বা আলোচনে যোগদান নিষিদ্ধ।

৩রা বৈশাখ (১৭ই এপ্রিল): বমডিলা ত্যাগ করিয়া তিব্বতী ধর্মগুরু দালাই লামার খেলা উপস্থিতি।

৪ঠা বৈশাখ (১৮ই এপ্রিল): অরিয়ুগের বিপ্লবী নায়ক ও দৈনিক বসুমতীর প্রাক্তন সম্পাদক জীবারীন্দ্রকুমার ঘোষের জীবনচরিত্র নির্মাণ।

খালের জলের বিরোধ সম্পর্কে পাক-ভারত অন্তর্কর্তৃত্বকালীন চুক্তি স্বাক্ষরিত।

৫ই বৈশাখ (১৯শে এপ্রিল): দালাই লামার নিকট মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের পত্র (সীল করা) প্রেরণ।

তুর্গাপুরে ডি. ভি. সি. কর্মচারীদের সভায় ডি. ভি. সি'র সদর দপ্তর স্থানান্তরকরণের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জ্ঞাপন।

৬ই বৈশাখ (২০শে এপ্রিল): দিল্লীর অদূরবর্তী হিসার জেলার পাক বিমান কর্তৃক পুনরায় ভারতীয় আকাশ-সীমা লঙ্ঘন।

ভারতের সমগ্র পূর্ব সীমান্ত সামরিক বিভাগের তত্ত্বাবধানে স্তম্ভ।
লোকসভায় অর্থসচিব জীমোয়ারজী দেশাই কর্তৃক ব্যাংক সমূহ জাতীয়করণের কমুনিষ্ট প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান।

৭ই বৈশাখ (২১শে এপ্রিল): মুর্শোড়ীতে সড়কবলে দালাই লামার উপস্থিতি এবং বিড়লা ভবনে অভ্যর্থনার ব্যবস্থা।

লোকসভায় জীনেহরুর ঘোষণা—কোনপ্রকার পাঞ্জাবী সুরা (পাঞ্জাবী ভাষী রাজ্য) গঠিত হইতে দেওয়া হইবে না।

স্বাধীন সচিব পণ্ডিত পদ্ম হৃদয়গো আক্রান্ত হইয়া উইলিংডন হাসপাতালে (দিল্লী) ভর্তি।

৮ই বৈশাখ (২২শে এপ্রিল): সংসদীয় সরকারী ভাষা কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ—কেন্দ্রে ইংরেজীর স্থলে হিন্দী ও রাজ্য সমূহে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারের সুপারিশ।

৯ই বৈশাখ (২৩শে এপ্রিল): ভারত কর্তৃক আমেরিকার নিকট পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তির সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দাবী।

১০ই বৈশাখ (২৪শে এপ্রিল): তিব্বত প্রসঙ্গে মুর্শোড়ীতে দালাই লামার সহিত প্রধান মন্ত্রী জীনেহরুর সাক্ষরী বৈঠক।

বিবাহে যৌতুক দেওয়া ও লগ্না নিষিদ্ধ করিয়া লোকসভায় আইন সচিব জীমোয়ারজী দেশাই কর্তৃক বিল উত্থাপন।

১১ই বৈশাখ (২৫শে এপ্রিল): কলিকাতা কর্পোরেশনের কমিশনার জী বি. কে. সেন কর্তৃক পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডা: বিধানচন্দ্র রায়ের নিকট পদত্যাগ পত্র পেশ।

মুর্শোড়ীতে উচ্চপদস্থ তিব্বতী উপদেষ্টাদের সহিত দালাই লামার বৈঠক।

১২ই বৈশাখ (২৬শে এপ্রিল): জলের নিরাপত্তা অভাবে আর. জি. কয় হাসপাতালে (কলিকাতা) অচলাবস্থায় উদ্ভব।

দেশে-বিদেশে

বৈশাখ, ১৩৬৬ (এপ্রিল-মে, '৫৯)

আগরতলায় অনতিদূরে হরিয়ারদুলায় সশস্ত্র পাকিস্তানীদের হানা ও ভারতীয় পুলিশের সহিত গুলী-বিনিময়।

পশ্চিমবঙ্গের খাজ পতিস্থিতি সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী ডা: বিধানচন্দ্র রায়ের সহিত কেন্দ্রীয় খাজসচিব জীঅজিতপ্রসাদ জৈনের বৈঠক।

১৩ই বৈশাখ (২৭শে এপ্রিল): তুর্গাপুর ইম্পান্ড কারখানায় এক শোচনীয় দুর্ঘটনায় ১৩ জন হতাহত।

১৪ই বৈশাখ (২৮শে এপ্রিল): পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র জলের জর্র হাহাকার—আসানসোলে এক টাকায় এক বাসতি জল বিক্রয়।

১৫ই বৈশাখ (২৯শে এপ্রিল): কলিকাতা কর্পোরেশনের নলকূপ বড়োয় মামলায় আসামীগণ (কয়েকজন অকিসার ও ১ জন কাউন্সিলার সমেত ১৮ জন) বিভিন্ন দণ্ডে দণ্ডিত।

১৬ই বৈশাখ (৩০শে এপ্রিল): সরকারী শিক্ষা নীতির প্রতিবাদে কলিকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের বেসরকারী মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রতীক বর্ষযট ও অনশন।

১৭ই বৈশাখ (১লা মে): আসামের পাখারিয়া বনাকলে পাক সশস্ত্র বাহিনীর পুনরায় গুলীবর্ষণ।

ভারতীয় কোম্পানী আইন সংশোধনার্থ লোকসভায় বাণিজ্য ও শিল্পসচিব জীলালবাহাদুর শাস্ত্রী কর্তৃক বিল উত্থাপন।

১৮ই বৈশাখ (২রা মে): কলিকাতার বিড়লা পার্ক ভারতের প্রথম বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী বাহুঘরের (সংগ্রহশালা) উদ্বোধন।

রিষড়ায় কেন্দ্রীয় অর্থসচিব জীমোয়ারজী দেশাই কর্তৃক ভারতের প্রথম পলিথিন কারখানার উদ্বোধন সম্পন্ন।

১৯শে বৈশাখ (৩রা মে): কলিকাতায় 'বিব হিলন উদ্দেশ্যে বিশ্ব কংগ্রেস'-এর উদ্বোধনে ভারত পাকিস্তান পুনর্মিলন মহাসভার দ্বিতীয় অধিবেশনের অনুষ্ঠান।

দক্ষিণ কলিকাতার রবীন্দ্র সরোবর (লেক) সংলগ্নে কলিকাতা ইমপ্লেমেন্ট ট্রাস্ট পরিচালিত ট্রেডিংয়ের ভিত্তিওস্তর স্থাপিত।

২০শে বৈশাখ (৪ঠা মে): হাওড়া জেলা শাসকের ভবনের সম্মুখে অগ্নিক-বিক্ষোভকালে পুলিশের লাঠিচালনা—২৪ জন আহত ও ৩১ জন গ্রেপ্তার।

প্রধানমন্ত্রী জীনেহরু কর্তৃক ভারত-পাকিস্তান বৌদ্ধ প্রতিরক্ষার পাকিস্তানী প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান।

২১শে বৈশাখ (৫ই মে): পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ত্রুটিপূর্ণ খাজনীতির জর্র রাতের বিভিন্ন বাজার হইতে চাউল উগাও।

ভারতে তিন লক্ষ সেবা সমন্বয় গঠনের জর্র রাজ্যসভায় সরকারী ভাবে স্বীকৃতি পরিচয়না পেশ।

২২শে বৈশাখ (৬ই মে): নবীয়ার কাজিলনগরে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে ১১জন নিহত ও ১৫ শত গৃহ ভস্মীভূত।

২৩শে বৈশাখ (৭ই মে): মাধাই প্রসঙ্গে তদন্ত রিপোর্টের উপর জীনেহরুর মন্তব্য—জীমাধাই (প্রধান মন্ত্রীর ভৃত্যপূর্বক বিশেষ সচিব জী এম ও মাধাই) সরকারী পদমর্যাদার সুযোগ গ্রহণ করেন নাই।

বাংলাদেশিগণের নিকট গুলীবর্ষণে ভারতীয় 'ক্যানবেরা' বিমান
ক্যাসের জন্ত পাকিস্তানের নিকট ভারতের ক্ষতিপূরণ দাবী।

২৪শে বৈশাখ (৮ই মে): কলিকাতা ও হাওড়া এলাকার
এনফোর্সমেন্ট পুলিশ ও রাজ্য-সরকারের খাঁড় দপ্তরের অফিসারগণ
কর্তৃক যুগপৎ চাউলের মূল্যবৃদ্ধি বিরোধ অভিযান চালনা।

২৫শে বৈশাখ (৯ই মে): দেশের সর্বত্র বিশ্বকবি
রবীন্দ্রনাথের নব নবতিতম জন্মজয়ন্তী সাড়ুঘরে উদ্‌যাপন।

লোকসভার বাজেট অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত।

২৬শে বৈশাখ (১০ই মে): হাওড়া পৌর এলাকার পানীর
জলের ভীষণ সঙ্কট উদ্ভব।

নয়াদিল্লীতে জীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সভানেত্রীত্বে নিখিল
ভারত কংগ্রেস কমিটির তিন দিবসব্যাপী অধিবেশন আরম্ভ।

২৭শে বৈশাখ (১১ই মে): কলিকাতার প্রখ্যাত
কবি ও সাহিত্যিক জীবসঙ্করমার চট্টোপাধ্যায়ের পরলোকগমন।

২৮শে বৈশাখ (১২ই মে): উল্লেখিত জনতার উপর নাগপুর
ট্রেনে পুলিশের লাঠিচালনা ও কাঁচুনে গ্যাস প্রয়োগ।

২৯শে বৈশাখ (১৩ই মে): খালের জলের বিরোধ-মীমাংসার
নয়াদিল্লীতে প্রধান মন্ত্রী জীনেহকর ও বিখ্যাত প্রেসিডেন্ট মিঃ
ইউজেন ব্র্যাকের বৈঠক।

৩০শে বৈশাখ (১৪ই মে): সাংবাদিক বৈঠকে প্রধান মন্ত্রী
জীনেহকর ঘোষণা—“খালের জল সম্পর্কে বিশ্বব্যাপ্তের সর্বশেষ
প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য নহে।”

ভারত সরকার কর্তৃক শিলিগুড়ি-মালদহ নতুন রেলপথ
নির্মাণের সিদ্ধান্ত।

৩১শে বৈশাখ (১৫ই মে): কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন সচিব
জীমেহেরচাঁদ খান্না কর্তৃক পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্ত শিবিরগুলি আপাততঃ
বন্ধ না করার সরকারী সিদ্ধান্ত ঘোষণা।

উড়িষ্যার কংগ্রেস-গণতন্ত্র পরিষদ কোয়ালিশন সরকার গঠনের
প্রস্তাবিত জন্ত কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার সদস্যদের পদত্যাগ-পত্র পেশ।

পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় স্পীকার জীশঙ্করদাস বানার্জীর পদত্যাগ।

বহির্দেশীয়—

১লা বৈশাখ (১৫ই এপ্রিল): অশুস্থতা নিবন্ধন মার্কিন
পররাষ্ট্র সচিব মিঃ জন ফষ্টার ডালসেসের পদত্যাগ।

২রা বৈশাখ (১৬ই এপ্রিল): তিব্বতে বিদ্রোহীদের সহিত
চীনা সৈন্যদের অব্যাহত প্রচণ্ড সংগ্রাম।

৩রা বৈশাখ (১৭ই এপ্রিল): পিকিং-এ চীনের গণ-
কংগ্রেসের (ভূতীয় জাতীয় কমিটি সম্মেলন) অধিবেশন শুরু।

ম্যান্নিকোর বিমান দুর্ঘটনার ২৬ জন আরোহী নিহত।

৪ঠা বৈশাখ (১৮ই এপ্রিল): পাক প্রেসিডেন্ট জেনারেল
আহুদ খাঁ কর্তৃক নিরাপত্তার নামে সংবাদপত্রের কঠোরো নতুন
অভিভাষণ জারী।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার কর্তৃক মিঃ ডালসেসের
স্থলে পররাষ্ট্র সচিব পদে মিঃ ক্রিস্টিয়ান হার্টারকে নিয়োগ।

৬ই বৈশাখ (২০শে এপ্রিল): মন্ত্রিসভা সহ ‘আজাদ কান্দীর’
প্রেসিডেন্ট সর্দার মহম্মদ ইব্রাহিম খাঁর পদত্যাগ।

৯ই বৈশাখ (২৩শে এপ্রিল) তিব্বত প্রসঙ্গে ভারতীয়
‘সম্ভারনবানীদের’ বিরুদ্ধে চীনের হুঁসিয়ায়ী।

১০ই বৈশাখ (২৪শে এপ্রিল): পাক প্রেসিডেন্ট জেঃ আহুদ
খাঁর নতুন আদেশক্রমে অব্যাহত ভারত সরকারী কর্মচারীদের দপ্তর
ব্যবস্থা।

১৩ই বৈশাখ (২৭শে এপ্রিল): চীনের রাষ্ট্রপতিপদে মাও
সে-তুং-এর স্থলে মার্কসীয় তত্ত্ববিদ লি শাও-চী নিযুক্ত। প্রধান
মন্ত্রীর পদে পুনরায় চৌ এন-লাই-এর নিয়োগ।

জার্মান প্রসঙ্গে ওয়ারশ-এ ওয়ারশ চুক্তিভুক্ত দেশসমূহের
(রুশিয়া সহ) পররাষ্ট্র পরিষদের বৈঠক এবং এই বৈঠকে বিশেষ
আমন্ত্রণে গণ-চীন প্রতিনিধির উপস্থিতি।

১৫ই বৈশাখ (২৯শে এপ্রিল): তিব্বতের পাক্‌ফেন লামা
ভারত পরিদর্শনের আমন্ত্রণ গ্রহণে অসম্মত।

মুর্গম গিরিপথে তিব্বতী উদ্বাস্তদের পশ্চিমবঙ্গ অভিমুখে যাত্রা।

১৬ই বৈশাখ (৩০শে এপ্রিল): নেপালের রাজা মহেন্দ্র
কর্তৃক জীমনগরে কোম্পানী বাণিজ্যের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন।

১৮ই বৈশাখ (২রা মে): ব্রহ্মে গণতন্ত্রকে রক্ষার জন্ত
প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী উ মু কর্তৃক অহিংস আন্দোলন আরম্ভের
সিদ্ধান্ত ঘোষণা।

করাচী বার এসোসিয়েশনের পক্ষ হইতে পাক সামরিক শাসনের
নিষা এবং অবিলম্বে পাকিস্তানে গণপরিষদ গঠন ও গণতান্ত্রিক
সরকার প্রবর্তনের দাবী।

২০শে বৈশাখ (৪ঠা মে): ইজ-মার্কিন জঙ্গী বাহিনীর
সহযোগিতায় করাচীতে পাকিস্তান, ইরান ও তুরস্কের বৃহত্তম বিমান
মহড়া।

২২শে বৈশাখ (৬ই মে): তিব্বতের প্রান্তে ভারতের প্রধান
মন্ত্রী জীনেহকর সহিত বাম-প্রতিবাদ হওয়ায় ‘পিকিং ডেলী’র
মুখ প্রকাশ।

কেনিয়ার বন্দী শিবিরে মাউ মাউদের উপর ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-
বাদীদের চরম অত্যাচার।

২৫শে বৈশাখ (৯ই মে): রুশ প্রধানমন্ত্রী মঃ নিকিতা
ক্রুশ্চেভের ঘোষণা—“পুনরায় যুদ্ধ বাধিলে পশ্চিমী শক্তিবর্গ নিশ্চিৎ
হইয়া বাইবে।”

২৭শে বৈশাখ (১১ই মে): জার্মান প্রসঙ্গে জেনেভার প্রাচ্য-
প্রাচ্য চতুষ্পক্ষি (রুশিয়া, ব্রুটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকা) পররাষ্ট্র
সচিবদের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক আরম্ভ।

২৯শে বৈশাখ (১৩ই মে): পূর্ব পাকিস্তান আইন সভার
স্টানাবলী সম্পর্কে তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট—ক্ষমতার লড়াই-ই
পূর্ব পাকিস্তানে শাসন ব্যবস্থা বিপর্যয়ের কারণ।

৩১শে বৈশাখ (১৫ই মে): করিমগঞ্জ সীমান্তে নবোত্তম পাক
সমরসজ্জার আরোহণ।

‘ক্যানবেরা’ বিমান ক্যাস সম্পর্কে ভারতের প্রতিবাদ ও
ক্ষতিপূরণের দাবী পাকিস্তান কর্তৃক অগ্রাহ।

নেহরুর রাজনীতি

“যিনি ভুল করিয়াছেন, তিনি পদত্যাগ বেছার করিবেন না—অধিকতর আপনার অজ্ঞার কাজের সমর্থনচেষ্টা করিবেন। পণ্ডিত নেহরু অস্বীকার করিতে পারেন নাই প্রস্তাবানুসারে যে ভূমি হস্তান্তর হইয়াছে, তাহাতে পাকিস্তানেরই লাভ হইয়াছে—“It was some what in favour of Pakistan in regard to the territory gained although not much territory was involved.” পাকিস্তানেরই লাভ হইয়াছে। তবে সে লাভ অল্প। পাকিস্তান যেমন অল্প ভূমি হইতে পারে না—পণ্ডিত নেহরুও তেমনই পাকিস্তানকে অল্প দিয়া ভূমি হইতে পারেন না। কাজেই বেরুবাড়ী দিতে হইবে। ইহাই পণ্ডিত নেহরুর দেশপ্রেমের দৃষ্টান্ত। সুরতরা ভারতবাসীকে সাবধান হইতে হইবে। সাবধান হইবারও অনেক উপায় আছে :—(১) লোকসভার প্রতিনিধিগণকে নির্দেশ দিতে পারা যায়—তাহারা যেন বেরুবাড়ী—ভারতের সূচ্য ভূমি দিতে সম্মত না হ’ন। (২) তিনি যে অসঙ্গত কাজ করিয়াছেন, সে জ্ঞাত প্রধান মন্ত্রীকে পদত্যাগ করিতে বলা। (৩) তিনি পদত্যাগ না করিলে তাঁহার সম্বন্ধে অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব লোকসভায় উপস্থাপিত করিয়া বহুমতে তাহা গ্রহণ করা। এ সকলের কোন উপায় ভাল সে সম্বন্ধে সুপ্রীম কোর্টের মত জানিবার প্রয়োজন নাই। মায়ুষ কি ভাবে আর কি হয় বলা যায় না। পার্লেমেন্ট একদিন আইরিশ নেতৃস্থ ভাগ করিতে অসম্মতি জানাইয়াছিলেন। ফল—কি হইয়াছিল? ‘তগবানের বিচার লক্ষ্য’। —দৈনিক বঙ্গমতী।

কথা উঠিতে পারে

“বাহা হউক, ভারত-পাক শীর্ষক সম্মেলনে রাজী না হইয়া পণ্ডিত নেহরু কেবল সঙ্গত কাজই করেন নাই, ভারতের জনসাধারণকেও উদেগ ও আশঙ্কা হইতে মুক্ত করিয়াছেন। কারণ, পাক প্রধান মন্ত্রীর সহিত শান্তি ও বন্ধুতার আলোচনার মাধ্যমে আমাদের উদার এবং বিশ্ব-মৈত্রীর সাধক প্রধানমন্ত্রী ভারতের আবার কোন অঞ্চল দান করিয়া আসেন কিনা, কে বলিতে পারে? কথাটা স্বভাবতঃই উঠিতে পারে বেরুবাড়ী সম্বন্ধে পণ্ডিত নেহরুর সাম্প্রতিক অভিমত শুনিয়া। আলোচ্য সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি পাকিস্তানের আপত্তির উত্তরে এইরূপ বলিয়াছেন যে, সুপ্রীম কোর্ট বেরুবাড়ীর সম্বন্ধে আইনের প্রশ্ন উপস্থাপিত করার উদ্দেশ্য কেবল আইনের গণ্ডিগোল এড়ান। কিন্তু বেরুবাড়ী পাকিস্তানকে দান করার কথা ঠিকই আছে। অর্থাৎ বেরুবাড়ী হস্তান্তরের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী প্রতিবার অগ্রাহ্য করিয়াই আমাদের গণতান্ত্রিক দেশের প্রধানমন্ত্রী পাকিস্তানকে খুসী করিবার জ্ঞাত বেরুবাড়ী হস্তান্তর করিতে বদ্ধপরিকর।” —বৃগান্তর।

চুরি! চুরি!।

“পাকিস্তান নব-উৎসাহে বিজ্ঞা প্রচারে, বিভা বিতরণে লাগিয়া গিয়াছে। সেই সর্ববাদি আমরা বহুদিন হইতেই পাইয়া আসিতেছি। তবে সেই বিভাটা বেশে বিভা নয়, একেবারে বিভার সেরা, চুরি-বিভা। পাকিস্তান রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তা জনাব আইয়ুব খান একবার ঢাকা গিয়া পূর্ববঙ্গের সাহিত্যিকদের সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন যে, তাহারা যেন কলিকাতার লেখকদের পুস্তকাদি পাঠ না করেন।

সাময়িক প্রসঙ্গ

আমরা তাঁহার উপরোক্ত উক্তিটির প্রসঙ্গেই বলিয়াছিলাম—কলিকাতায় প্রকাশিত পুস্তক না হয় নিষিদ্ধ হইল, কিন্তু কলিকাতায় প্রকাশিত বিবিধ গ্রন্থ গ্রন্থকারের বিনা অনুমতিতে যেমাগুম চুরি করিয়া যে পাকিস্তানের পুস্তক ব্যবসায়ীরা ছাপাইতেছে, তাহার প্রতিকার কি? সম্প্রতি কলিকাতার পুস্তক পাকিস্তানে কি ভাবে ছাপা হইয়া বিক্রয় হইতেছে, তাহাই ঢাকা আদালতে আনীত এক মামলার প্রকাশ। কলিকাতার প্রকাশক এ টি দেবের প্রথ্যাত অভিধান (১) English to Bengali (২) Bengali to English,—ঢাকা, ময়মনসিংহ ও লাহোরের পুস্তক ব্যবসায়ীগণ বিনা অনুমতিতে হুবহু ছাপিয়া প্রকাশ করিয়াছে এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থে স্বীকৃত হইতেছে। ঢাকা জেলা জজ মিঃ এম ইব্রাহিম বাদী এ টি দেবের অভিযোগ অনুযায়ী পাকিস্তানের এটি বিজ্ঞা বিতরণকারী পাবলিশার্সের উপর উপরোক্ত দুইটি অভিধান প্রকাশ ও বিক্রয় নিষিদ্ধ করিয়া এক সাময়িক ইনজাংসন জারী করিয়াছেন। শেব পূর্বজ মামলার ফল বাহাই হউক, চুরি বিজ্ঞা প্রচারের বিরুদ্ধে এইরূপ মামলা দায়ের করিয়া কলিকাতার উক্ত প্রকাশক কর্তব্যই করিয়াছেন।”

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

তিব্বত সম্মেলন

“পরম সুরবিধাবাদী পার্টির উত্তোগে কলিকাতায় এক তিব্বত সম্মেলনের আয়োজন হইতেছে। আচার্য্য কৃপালনী এবং জয়প্রকাশ নারায়ণ উহার উদ্বোক্ত। ভারতের উপর পাকিস্তানী আক্রমণে ইহাদের মধ্যে কোনরূপ চাকল্য কিন্তু দেখা যায় নাই। সম্মেলনে দলাই লামার প্রতিনিধি আমন্ত্রণ করা হইয়াছে। কলিকাতায় এই সম্মেলনে আমাদের বোরতর আপত্তি আছে। উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত রাজনীতি ছিল রাজার রাজ্যে বন্ধুত্ব এবং শত্রুতা। ব্যক্তিবিশেষের বন্ধুত্ব, স্বার্থ এবং শত্রুতার উপর বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের সুখশান্তি এবং জীবনধন সব কিছু নির্ভর করিত। বিশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে গণচেতনার যুগে এই রাজনীতি বন্ধ হইবে, রাজার রাজ্যে বন্ধুত্ব বা শত্রুতার উপর গোটা জাতির অস্তিত্ব নির্ভর করিবে না, তার স্থান গ্রহণ করিবে জাতিতে জাতিতে বন্ধুত্ব, এই বন্ধুত্ব অসম্ভব করিয়া তুলিবে ঠাণ্ডা এবং গরম উভয় প্রকার বৃদ্ধ। কতকগুলি মজলববাজ এবং বিদেশীয় ভাড়াটিয়া লোক যদি এই ধারার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে চায় তবে তাহাদিগকে আমরা দেশের শত্রু বলিয়াই অভিহিত করিব। বাঙ্গলাদেশে এই সম্মেলনের অধিবেশনে আমাদের আরও আপত্তি আছে। আধুনিককালে স্বাধীনতা চীনের সঙ্গে ভারতের মৈত্রীর জ্ঞাত শান্তিনিকেতনে চীন সংস্কৃতি ও চীনাভাবা চর্চার ক্ষেত্রে চীনা ভবন স্থাপন করেন। যে বাঙ্গলা দেশ ভারত-চীন মৈত্রী-বন্ধন দৃঢ় করিতে চেষ্টা করিয়াছে সেই বাঙ্গলা দেশে ঐ বন্ধন ছিন্ন করিবার চুরিকা উত্তত কবিত্তে দেওয়া খুব তুল হইবে।”

—বৃগবান্ধী।

বাধ্যতামূলক অবৈতানক শিক্ষা পারিকল্পনা

“পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার রাজ্যের ৬ হইতে ১১ বৎসরের বালক-বালিকাদের বাধ্যতামূলক অবৈতানক শিক্ষা দিবার স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন। এই পরিকল্পনার সরকারের বাধিক ২৬ কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া জানা যায়। বর্তমানে গ্রামাঞ্চলে সরকারের উত্তোগে অবৈতানক প্রাথমিক শিক্ষা বিশেষ প্রচার লাভ করিয়াছে। কিন্তু সহরাঞ্চলে এই ব্যবস্থা পৌঁছানো উপর স্তম্ভ। তাহাদের এই বিষয়ে উৎসাহিত সর্বজনবিদিত। এই কারণে সহরাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষার অবনতি ঘটিতে আরম্ভ করিয়াছে। এমতাবস্থায় সরকারের এই আদর্শ পরিকল্পনাটিকে সকলেই অভিনন্দন জ্ঞাপন করিবে। এই পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে বহু শিক্ষক ও শিক্ষিকার প্রয়োজন হইবে। বর্তমান বেকার সমস্যার যুগে বহু শিক্ষিত বেকারের বেকারত্ব ঘটিবে। ইহার ফলাফল অবশ্যই—বাহাদের উপর উত্তর পরিচালন ভার অর্পিত হইবে তাহাদের সততা ও আন্তরিকতার উপর নির্ভর করিবে। এই প্রসঙ্গে শিক্ষানীতির বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে হয়। সরকারের শিক্ষা বিভাগ বর্তমানে কয়েকটি পুস্তক প্রকাশের দায়িত্ব নিজেরা গ্রহণ করার জনসাধারণ অপেক্ষা দূর্বল পতিত হইয়াছেন। সামান্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একখানি পুস্তক “কিশলয়” পাওয়া এক দুর্লভ ব্যাপার। উহা নাকি চাহিয়া অল্পপাতে ছাপা হয় না। গ্রামাঞ্চলে উক্ত পুস্তকের দর্শনও মিলে না। ফলে গ্রামবাসীদের একখানি “কিশলয়” আনিতে কলিকাতায় রাইটার্স বিজিয়ে বাইয়া লখা লাইন দিতে হয়।”

—বর্তমান ভারত (ভগলী)।

একটি আবেদন

“বর্ধা নুহ হইয়াছে। সেই সঙ্গে পথচারীদের অবস্থাও হইয়াছে শোচনীয়। ইহারও কারণ আছে। পথে-ঘাটে জল জমিয়া যায়—জীপ-সরী মোটরকার নির্বিবাদে তাই কাপা ছিটাইয়া চলিয়াছে। মশার উপজ্বা অত্যধিক বাড়িয়া গিয়াছে—অথচ কোন প্রচেষ্টা নাই—কোন কার্যক্রম নাই সকলেই বেন জড়পিতে পড়িয়া পড়িয়া হইয়াছে। অস্তিত্ব বহুর মতন বর্তমান বহুরও মানুষ দুঃখকষ্টের হাত হইতে মুক্তি পাইবে বলিয়া মনে হয় না। মানুষের দুর্দৈব ক্রমবর্ধমান। করলার কচুরীপানার উল্লেখ পূর্বেই করা হইয়াছিল। অত্যাধি ঐ আবেদন পূর্ববৎ রহিয়াছে। স্পষ্ট কর্তৃপক্ষ হয়তো বা আরও অবর্ণনীয় বর্ধনের অপেক্ষার আছেন—তাহা হইলে বিনা পরিশ্রমে কচুরী-পনা ভাসিয়া বাইবে। পরিশ্রম (কারিক) করিতে হইবে না। মশা জমিতেছে তাহাতে কর্তৃপক্ষ এবং স্বাস্থ্য বিভাগের করিবার কিছুই নাই। প্রকৃতির কল্যাণে কচুরীপানা পরিষ্কার হইবে এবং স্বাস্থ্য আশায় কর্তৃপক্ষ অপেক্ষমান থাকিতে পারেন কিন্তু মশার উপজ্বা ও পথ ঘাটের অব্যবস্থা কিরূপে দূরীভূত হইবে? করলার বর্তমান অবস্থা খুবই শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। কলে জল নাই, মশার উৎপাত, অল্প বর্ষণে পথে জল জমিয়া যায় এতসঙ্গে যদি অধিক স্রব কাম্য হয় তাহা হইলে ‘নাভা: পশু।’

—বার্ভা (জলপাইগুড়ী)।

আসানসোলে সরকারী দরদ

“আসানসোলে জলকষ্ট যেমন চরমে উঠিয়াছে খাত-সকটও তেমনি প্রকট আকার ধারণ করিয়াছে। আমাদের আসানসোল সরকারী সর্বোদ্যোগে জানাইতেছেন, আসানসোল বাজারে কন্ট্রোল দরে চাউল একেবারেই পাওয়া বাইতেছে না। খোলা বাজারে মোটা চাউল ২৬ টাকা দরে এবং সরু চাউল ৩০ টাকা দরে বিক্রয় করা হইতেছে। মডিকারেড রেশন দোকানে চাউল একেবারে দেওয়া হইতেছে না। নিম্নমধ্যবিত্ত ও গ্রামবাসীদের আর্থিক অবস্থায় এই দরে চাউল কিনিয়া সংসার প্রতিপালন করা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। আসানসোল প্রজা সোশ্যালিষ্ট পার্টি অবিলম্বে নিম্নস্তর দরে চাউল সরবরাহ করিবার জন্য সরকারের নিকট গণনরখাত সদ দাবী করিয়াছেন। আসানসোল প্রজা সোশ্যালিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে আসানসোলের দারুণ জলকষ্টের প্রতিকারের দাবীতে বিগত কয়েক বৎসরই আন্দোলন চলিয়া আসিতেছে এবং এ বৎসরও কয়েকটি গণ-অভিযান পরিচালিত হইয়াছে। বিধান সভায় প্রজা সোশ্যালিষ্ট সমস্তবল আসানসোলের জলকষ্ট নিবারণের সমস্যাকে অগ্রাধিকার দিবার দাবী করিয়াছেন, কিন্তু প্রতিবাহী প্রতিশ্রুতি দান ছাড়া সরকার হইতে এ পর্যন্ত কিছুই করা হয় নাই। বর্তমানে আকাশছোঁয়া চাউলের দর সত্ত্বেও সরকার এখনো উদাসীন। আসানসোলের শ্রায় শিল্পনীরীতে এবং উত্তর শস্ত্রদে পল্লী অঞ্চলের খাতাভাবের অবস্থা পূর্বে হইতে জানা সত্ত্বেও সে বিষয়ে সরকারের কোন দায়িত্ববোধ নাই।”

—দামোদর (বর্ধমান)।

সমবায়িক সমাধান

“কংগ্রেসের ভিতরে ও বাহিরে বোধ চাষ লইয়া সমালোচনার ঝড় উঠিয়াছে, পশ্চিমবঙ্গ মহোৎসাহে বোধ চাষ চালাইবার জন্য কোমর বাধিয়াছেন। এমন কি যদি কংগ্রেস দ্বিধাবিভক্ত হয় তাহাও তিনি গ্রাহ্য করেন না। কংগ্রেসের ওয়ারিং কমিটির প্রস্তাবে অবশ্য স্রব একটু নরম হইয়াছে। সমবায়িক কৃষি প্রবর্তনের পূর্বে সার্বভৌম কোপারেটিভ থুলিয়া বোধ চাষের বিনিয়াদ গঠনের কথা বলা হইয়াছে। কংগ্রেস দল শুধু কৃষিতেই সমবায়ের প্রবর্তন করিয়া ক্ষান্ত হইবে না, তাহারা শিল্পকে ও সমবায়িক করিতে চান। গ্রাম পঞ্চায়েত ও সমবায় সমিতিতে বোধচিত ক্ষমতা দিয়া দেশকে পুনর্গঠন করাই বর্তমানে কংগ্রেস দলের লক্ষ্য ও সাধনা। সমবায় ভারতবর্ষে নতুন নহে। যদি কংগ্রেস দল এই রূপে সমবায় সমিতি হাজারে হাজারে খোলে তাহা হইলে তবে বলিবার কিছুই থাকে না। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সর্ব কিছুই সমবায়িক সমাধান চান। এখন দেখা যাক সমবায়িক সমাধান কি? আমাদের মতে প্রথমে স্থানীয় লোকেরা তাহাদের সমস্তাগুলি বাহির করিয়া, নিজেরই সমাধানের উপায় বাহির করিবেন ও যেহেতু একযোগে কাজ করিয়া সমস্তাগুলির সমাধান করিবেন। রাষ্ট্র কেবল তাহাদিগকে সাহায্য করিবে, রাষ্ট্র কোন কাজের সূচনা করিবে না, উত্তোগ স্থানীয় লোকের নিকট আসিবে। ইহাকেই বলে বিকেন্দ্রীকরণ; কারণ ইহাতে ক্ষমতা স্থানীয় লোকের হাতে বিচ্ছুরিত হইবে। কয়েকজন ব্যক্তি দ্বারা

গঠিত প্রাণিঃ কৃষিকর্মের কোন পরিকল্পনাকে সাহায্য করাকে সম্ভাব্যিক সমাধান বলা চলে না। যত দিন না স্থানীয় লোকের পরিকল্পনা রচনা ও সম্পাদনে পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকে তত দিন সম্ভাব্যিক সমাধানের কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। —জনমত (বাটাল)।

প্রসঙ্গক্রমে

“সহরের বাজারগুলির নরকসদৃশ অবস্থার প্রতি পৌর কর্তৃপক্ষের বার বার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ তাঁহারা করেন নাই। একে ত রাজ্য ও দেশের অবস্থা সজ্ঞান, তাহার উপর যদি নিত্য অল্পস্রু আবর্জনা ড্রেপ অবরুদ্ধ করিয়া, বাজার অবিকাল দখল করিয়া দিব্যাত্র বিরাজ করে তাহা হইলে সহরের স্বাস্থ্য কি ভাঙ্গিয়া পড়িবে না, কলেরা, বসন্ত মহামারী আকার ধারণ করিবে না, পথচলা কষ্টসাধ্য হইবে না? পৌরপতি আশ্বাস দিয়াছিলেন যে পৌর উপবিধি সংশোধন করিয়া বাজারের পরিচ্ছন্নতা রক্ষার জন্য বিহিত ব্যবস্থা লইয়াই অবলম্বিত হইবে। সে আজ কয়েক মাস পূর্বের কথা। আজ পর্যন্ত কোন সাড়া-শব্দ ও বিষয়ে পাওয়া যায় নাই। কয়েকবার পৌরপতি স্বয়ং বাজারগুলি পরিদর্শন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু পৌরপতি যদি ভাবিয়া থাকেন পরিদর্শন করিলেই সব ঠিক হইয়া যাইবে তাহা হইলে বলিতে হয় ঐ কথায় আশ্বাসদাতা লাভ হইতে পারে, করদাতা ও সহরবাসীর কোনো লাভ হইবে না।” —বর্ধমান বাণী।

তৃণার জল ও আমলাতন্ত্র

“মহকুমার চারিদিকে সামান্য পানীয় জলের জন্য হাহাকার। এই সজ্জাকর বেনরামের আর্ন্তনাদের মধ্যে আমলাতন্ত্রের এক অব্যবস্থা এবং রেষারেষির গোপন ইতিহাস আমরা পাইয়াছি, বাহার ফলে পানীয় জলের জন্য সরকারী বরাদ্দ অর্থ খরচ না হইয়া ফিরিয়া গিয়াছে, পানীয় জলের ব্যবস্থা হয় নাই। ‘করাল ওয়াটার সপ্লাই’ বিভাগটি পূর্বে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অধীন ছিল কিন্তু গত ১৯৫৭ সালের ১লা নভেম্বর হইতে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের হাত হইতে পাবলিক হেলথের চীফ ইঞ্জিনিয়ারের হাতে গেল। আরম্ভ হইল গোলমাল। সেই সময়ের এবং তাহার আগের কাজের বকেয়া কোন টাকা ঠিকাদারেরা আজও পায় নাই, কেন না দপ্তর গেলেও হিসাব নাকি হস্তান্তর হয় নাই। কেবল তাহাই নচে ১৯৫৮ সালের মার্চ হইতে ১৯৫৯ সালের মার্চ পর্যন্ত ঝাড়গ্রাম মহকুমাতে ৩১টি কুয়ার মঞ্জুর হইয়াছিল, টাকাও আসিয়াছিল। ‘৫৮ সালের এপ্রিল মাসে কয়েকটির ওয়ার্ক অর্ডারও দেওয়া হইল, কিন্তু দীর্ঘ এক বৎসরের মধ্যে একটিও কাজ হয় নাই। স্বীয় মঞ্জুর করা ও টাকা দেওয়ার মালিক পাবলিক হেলথ কিন্তু কোন প্রায়ে হইবে এবং প্রায়ে কোনখানে হইবে তাহার ব্যবহার মালিক জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। স্থান নির্বাচন না হওয়ার জন্য কাজ হয় নাই, দরিদ্র গ্রামবাসীদের পানীয় জলও জোটে নাই। অথচ দরিদ্র দেশবাসীর অর্থ হইতে এই মহকুমার জন্য পাবলিক হেলথ বিভাগের কেবল বেতন বাবদ মাসিক খরচ ছয় শত টাকা। অল্প সব খরচা খরচিলে মাসে কাজের টাকা। উদাহরণস্বরূপ আমরা ঝাড়গ্রাম মহকুমার নাম করিলাম। সারা জেলাতেই এই অব্যবস্থা। উলুখড়ের প্রাণ বাইবে তাহাকে

অমৃত্যুপের কিছু নাই, তবে রাজস্ব ভালই চলিতেছে স্বীকার করিতে বাধ্য।” —নির্ভীক (ঝাড়গ্রাম)।

শুভ বিবাহ

“উত্তরপাড়া রাজপরিবারের শ্রীঅমরনাথ মুখোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান শমসুন্দরনাথের সহিত পাকুড় পরিবারের শ্রীশ্রী তরুণী শ্রীমতী সুরেন্দ্রা দেবীর এক মনোজ্ঞ প্রীতি অমুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অমুষ্ঠানে এবং বিবাহ বাসরে যে সকল বিশিষ্ট সমাজসেবী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিল্পী ও ক্রীড়াবিদ স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া অথবা নব দম্পতির সুখ-সমৃদ্ধি কামনা করিয়া শুভেচ্ছার বাণী প্রেরণ করিয়া প্রীতি অমুষ্ঠানটিকে গৌরবমণ্ডিত করিয়া তোলেন তাহাদের মধ্যে ভারতের উপরাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণন, ভারতের উপমন্ত্রী শ্রীঅনিলকুমার চন্দ্র, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, শ্রীঅতুল্য বোব, মহারাজাধিরাজ, শ্রীউদয়চাঁদ মহতাব বাহাদুর, বর্ধমানের মহারাজী অধিবাসী, মহারাজকুমার সনৎচাঁদ মহতাব ও মহারাজকুমারী, লালসোলায় রাজারাম ও ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়, শিল্পী প্রবোধেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মাসিক বসুমতীর সম্পাদক শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক, পাইকপাড়ার শ্রীজগদীশচন্দ্র সিংহ, শ্রীজীবগীতোষ ঘটক, শ্রীনিরুপাণীতোষ ঘটক, শ্রীপ্রিয়তোষ ঘটক, শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ বোব, ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, শ্রীসজনীকান্ত দাস, শ্রীমতী সুধারাণী দাস, শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার বাজপেয়ী ও রাজকুমারী রম্য বজ্রপেয়ী, মহিষাদলের বধুবাণী তটিনী দেবী (গর্গ), রাজকুমারী বেণু চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীসত্যেন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, আই-সি-এস, কবি নরেন্দ্র দেব, মহিষাদলের কুমার শক্তিপ্রসাদ গর্গ, ব্যারিষ্টার সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়, ব্যারিষ্টার রাঘবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ও শ্রীমতী সরমা বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাক্তন উপাচার্য ও বিচারপতি ডাঃ শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আলিপুরের ব্যবহারজীবী শ্রীহুনীন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাক্তন এম-এল-সি, শ্রীহুনীন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅজিত চট্টোপাধ্যায়, অভিনেতা শ্রীনীতীশ মুখোপাধ্যায়, পাণ্ডুরিয়াঘাটার শ্রীঅমরনাথ বোব, কালীপুরের শ্রীঅমরনাথ মুখোপাধ্যায়, চকদীঘির রায়বাহাদুর নিত্যানন্দ সিংহরায়, শ্রীপ্রভানাথ সিংহরায়, শ্রীশশীলা সিংহরায়, শ্রীহুনীন্দ্রকুমার সিংহরায়, শ্রী ও শ্রীমতী সারদা দাস, শিল্পী শ্রীমতীসুন্দরনাথ লাহা, শ্রীকল্যাণক বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিক, বঙ্গীর সাহিত্য পরিষদ সম্পাদক শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীগামপুরের শ্রীললিতাচন্দ্র গোস্বামী ও শ্রীবীজনাথ গোস্বামী, তেলিনীপাড়ার প্রাক্তন চেয়ারম্যান শ্রীসন্তোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, উত্তরপাড়ার শ্রীবংশেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীজেননাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীভানুপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, প্রাক্তন পৌরপতি প্রভাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীহরিহর শেঠ, ডাঃ শ্রীকালিদাস নাগ, মোহনবাগানের প্রাক্তন অধিনায়ক শ্রীবিমল মুখোপাধ্যায় ও বর্ধমান অধিনায়ক শ্রীসমর বন্দ্যোপাধ্যায়, উত্তরপাড়া পৌর সহ-সভাপতি শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্তী, শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বোব, শ্রীবিজয়কুমার মুখোপাধ্যায়, ও শ্রীবীজ গোস্বামী (পৌর সনস্করণ), ডাঃ অমল মুখোপাধ্যায়, ডাঃ দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, ডাঃ পাঁচু বসু ও ডাঃ দেবব্রত মুখোপাধ্যায় (২), ডাঃ নীলকণ্ঠ বোবাল, ডাঃ বারীন রায় ও ডাঃ চিত্ত রায়, শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় এম-এল-এ, শ্রীললিতাচন্দ্র মুখোপাধ্যায়



মাসিক বসুমতী
॥ চৈত্র ১৩৬৬ ॥

(স্বেচ)

জননী
—ঐমহিতোষ বিশ্বাস অঙ্কিত



সামিক বসুমতী

৩৮শ বর্ষ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৬]

॥ স্থাপিত ১৩২৯ ॥

[প্রথম খণ্ড, ২য় সংখ্যা

কথামৃত

শ্রীশ্রীঃমহাশয়ঃসদেব তাঁহার দিব্যোদ্ভাসিত অবস্থার কথা শ্রবণ করিয়া আমিদিগকে কত সময়ে বলিয়াছেন—“আধ্যাত্মিক ভাবের প্রাণলো সাধারণ জীবের শরীর-মনে এরূপ হওয়া দূরে থাকুক উহার এক-চতুর্থাংশ বিকার উপস্থিত হইলে শরীর ত্যাগ হয়। দিবা-রাত্রির অধিকাংশ ভাগ, মা'র কোন না কোনরূপ দর্শনাদি পাইয়া ভুলিয়া থাকিতাম তাই রক্ষা, নতুবা (নিজ শরীর দেখাইয়া) এ খোলটা ধাকা অসম্ভব হইত। এখন হইতে আরম্ভ হইয়া দীর্ঘ ছয় বৎসর কাল তিসমাত্র নিদ্রা হয় নাই। চক্ষু পলকশূন্য হইয়া গিয়াছিল, সময়ে সময়ে চোঁটা করিয়াও পলক ফেলিতে পারিতাম না। কত কাল গত হইল, তাহার জ্ঞান থাকিত না এবং শরীর বাঁগাইয়া চলিতে হইবে এ কথা শ্রবণ ভুলিয়া গিয়াছিলাম। শরীরের দিকে বখন একটু-আধটু দৃষ্টি পড়িত তখন উহার অবস্থা দেখিয়া বিবম ভয় হইত; ভাবিতাম, পাগল হইতে বলিয়াছি নাকি? দর্শনের সম্মুখে ঝাঁড়াইয়া চক্ষু অঙ্গুলি প্রদান পূর্বক দেখিতাম, চক্ষুর পলক উহাতেও পড়ে কি না। তাহাতেও চক্ষু সমভাবে পলকশূন্য হইয়া থাকিত! ভয়ে কাঁদিয়া কেলিতাম এবং মা'কে বলিতাম—“মা, তোকে ডাকার ও তোর উপর একান্ত বিশ্বাস নির্ভর করার কি এই ফল হ'ল? শরীরে বিবম ব্যাধি দিলি?” আমার পরকণ্ঠেই বলিতাম, ‘তা বা হবার হক্কে, শরীর ব্যর্থ বাক, তুই কিন্তু আমার ছাড়িস নি, আমার দেখা দে, কৃপা কর, আমি যে মা তোর পাদপদ্মে

একান্ত শরণ নিরেছি, তুই ভিন্ন আমার যে আর অন্য গতি একেবারেই নাই!’ এরূপে কাঁদিত কাঁদিত মন আবার অদ্ভুত উৎসাহে উত্তেজিত হইয়া উঠিত, শরীরটাকে অতি তুচ্ছ হেয় বলিয়া মনে হইত এবং মা'র দর্শন ও অভয়বাণী তুলিয়া আশ্রয় হইতাম।”

শ্রীশ্রীজগদ্বাস্তার অচিন্ত্য নিয়োগে মথুর বাবু এই সময়ে এক দিন ঠাকুরের মধ্যে অদ্ভুত দেবপ্রকাশ অবাচিতভাবে দেখিতে পাইয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। কিরূপে তিনি সেদিন ঠাকুরের ভিতর শিব ও কালীমূর্তি সন্দর্শনপূর্বক তাঁহাকে জীবন্ত দেবতাজ্ঞানে পূজা করিয়াছিলেন, তাহা আমরা অন্তর বলিয়াছি। ঐ দিন হইতে তিনি যেন দৈবশক্তি প্রভাবে ঠাকুরকে ভিন্ন নয়নে দেখিতে এবং সর্বদা ভক্তি-বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এরূপ অঘটন ঘটনা দেখিয়া স্পষ্ট মনে হয়, ঠাকুরের সাধকজীবনে এখন হইতে মথুরের সহায়তা ও আত্মকুল্যের বিশেষ প্রয়োজন হইবে বলিয়াই ইচ্ছাময়ী জগদ্বাস্তা তাঁহাদিগের উভয়কে অবিচ্ছেদ্য প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। সন্দেশবাদ, জড়বাদ ও নাস্তিক্যপ্রবণ বর্তমান যুগে ধর্ম্মগ্রানি দূর করিয়া জীবন্ত অধ্যাত্মশক্তি সক্রমণের জন্য ঠাকুরের শরীর-মনরূপ ব্যক্তিিকে শ্রীশ্রীজগদ্বাস্তা কত বড়ে ও কি অদ্ভুত উপায়-অবলম্বনে নিখাদ করিয়াছিলেন, এরূপ ঘটনা সকলে তাহার প্রমাণ পাইয়া স্তম্ভিত হইতে হয়।

জাৰ্মানীতে প্ৰথম ভাৰতীয় মুক্তি কাৰ্য্য

ডক্টৰ অৰিনাশচন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্য্য

অৰ্ধ শতাব্দী অতিক্ৰান্ত হইতেছে। ১৯১১ অব্দেৰ জুলাই মাসেৰ শেষ দিকে জাৰ্মানীৰ ৱালে বিশ্ববিদ্যালয়েৰ কেমিক্যাল ইনষ্টিটিউট গ্ৰীয়েৰ দৰুণ বন্ধ হইলে আমি আমাৰ অধ্যাপক প্ৰফেচৰ ডক্টৰ ফৰল্যাণ্ডায়েৰ (Vorlander) নিকট হইতে একখানা পত্ৰ লইয়া চামবুৰ্গে গমন কৰি তথাকার কলোনিয়াল ইনষ্টিটিউটেৰ ল্যাবৰেটৰীতে অধ্যাপক ফয়েগটল্যাণ্ডাৰ (Voegtlander) আমাকে বিভিন্ন প্ৰকাৰ ঔপনিবেশিক পদাৰ্থ—যথা চা, কফি, কোকো, ষ্টেলবোজ, লাফা এণ্ড সেই সকল উৎপাদনেৰ উপযোগী মাটি পৰীক্ষায় অভিজ্ঞতা অৰ্জনৰ সুযোগ প্ৰদান কৰেন।

এ সময়ে চামবুৰ্গে আমাৰ পৰিচিত কেহ ছিলেন না। একজ্ঞা হালেৰ ভাৰত-বিদ্বেষিতা মন্ত্ৰিলা লেখিকা ফ্ৰাউসিমনা মেৰী সিমন্ (Frau Anna Marie Simon) তাঁহাৰ ভগিনীপতি হাৰ নিদেমায়াৰেৰ (Herr Niedemayer) নিকট একখানা পৰিচয়-পত্ৰ দিয়া দেন। হাৰ নিদেমায়াৰ তৎকালে কলিকাতাৰ জাৰ্মান এশিয়াটিক ব্যাংক (Deutsche Asiatische Bank, বাহা কলিকাতাৰ ডিচ এশিয়াটিক ব্যাংক নামে বৰ্ণিত হইত), শ্ৰোডাৰ শ্মিথ (Schroeder Schmidt) প্ৰভৃতি ব্যবসা প্ৰতিষ্ঠানেৰ সঙ্গে সন্নিষ্ট একজন পাতনামা ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁহাৰ সহিত সাক্ষাতে তাঁহাৰ এবং তাঁহাৰ বিদ্যু পত্নীৰ উদাৰ মনুষ্য বাক্যলাপ ও আদৰ আপায়নে আমি সবিশেষ মুগ্ধ হই এবং তাঁহাদেৰ অজ্ঞৰোধে তৎপরে সন্তোষে দু-একবার তাঁহাদেৰ সঙ্গে আলোচনায় নানা বিষয়ে জ্ঞানলাভ কৰিতে সক্ষম হই।

হাৰ নিদেমায়াৰ কয়েক দিন পূৰ্ব আমাকে লইয়া জাৰ্মানীৰ শ্ৰেষ্ঠ শ্ৰীযাৰ কোম্পানী চামবুৰ্গ-আমেৰিকা লাইনেৰ জেনাৰেল মানেজাৰ হাৰ আলবাৰ্ট বালিনেৰ বাটীতে বাইয়া তাঁহাৰ সঙ্গে পৰিচিত কৰেন, হাৰ বালিন জাৰ্মানীৰ একজন বিয়াট কৰ্মকাৰী পুৰুষ ছিলেন। জাৰ্মানীৰ সাম্ৰাজ্য বিস্তৃতি, জাৰ্মান ভাবধাৰাৰ সুশ্ৰৱাৰ, এবং শক্তি ও সম্পদ বৃদ্ধি কৰাৰ জন্ত অহনিষি কাৰ্য কৰিতেন। তিনি ঐতিপ্ৰকৃষ্ট হৃদয়ে আমাকে সন্মৰ্শনা কৰিলেন এবং প্ৰথম সাক্ষাতেই তাঁহাৰ পত্নী এবং একমাত্ৰ পালিতা কন্যাৰ সঙ্গেও পৰিচয় কৰাইয়া দিলেন। একপ একজন আভিজাত্য গৌৰবেৰ অধিকাৰী সাম্ৰাজ্যবাদী পুৰুষ দীনা ভাৰতমাতাৰ একটি দীনতম ছাত্ৰকে কেন এত সৌজন্য প্ৰদৰ্শন কৰিলেন, তাহা তখন উপলব্ধি কৰিতে পাৰিলাম না।

প্ৰত্যাবৰ্তন কালে গাড়ীতে হাৰ নিদেমায়াৰ বলিলেন, হাৰ বালিন প্ৰাচ্যেৰ পৰণধানত জাতি সমূহেৰ গুৰুণদিগেৰ সঙ্গে নিরন্তই সাগ্ৰহে মেলামেশা কৰেন। তাঁহাদেৰ দুঃখ-দৈন্তেৰ প্ৰতি তিনি সবিশেষ সহানুভূতিশীল। তাঁহাৰ বাটীতে চীন, মিশৰ, ইণ্ডোচীন, জাপা, সুমাত্ৰা এবং অন্যান্য দেশেৰ বিজাৰ্মী, ব্যবসা প্ৰতিনিধি এবং সৰ্বশ্ৰেণীৰ লোকজন আগমন কৰেন। তিনি তাঁহাদেৰ পিতৃভূমিৰ অবস্থা সৰ্বদে জ্ঞান অৰ্জন কৰেন এবং কি ভাবে দেশেৰ মঙ্গল হইতে পাৰে, সে-সব বিষয়ও আলোচনা কৰেন।

সব্বৰাই এক দিন নিদেমায়াৰ তাঁহাৰ গাড়ী নিয়ে অপবাহু ৪টাৰ

ল্যাবৰেটৰী ছুটি হওয়াৰ প্ৰাক্কাৰে বাইয়া আমাকে লইয়া বালিনেৰ বাটীতে উপস্থিত হইলেন।

ল্যাবৰেটৰী হইতে বালিনেৰ বাটী নিৰ্বাটেই, শহৰেৰ মধ্যস্থলে। আলষ্টাৰ হ্ৰদেৰ তীৰে আলষ্টাৰডাম (বৰ্তমানে 'বালিনডাম') নামক সুবন্দা স্থানে অবস্থিত।

চা ও জলযোগেৰ পূৰ্ব হাৰ বালিনই আলোচনা আৰম্ভ কৰিলেন, য়াতি চাৰ্চা পৰ্য্যন্ত বিভিন্ন বিষয়েৰ অবতারণা কৰিলেন। প্যায়িসে জামাজী ককবৰ্খা, মাডাম কামা, বীৰেন্দ্ৰনাথ চট্টোপাধ্যায় প্ৰভৃতি বিপ্লবীগণ সম্বন্ধেও বিবিধ তথ্য জ্ঞানিবাৰ জন্ত উদ্গ্ৰীব হইলেন, কিন্তু আমি যাতা উত্তরে বলিলাম, তিনি তাহা হইতে সঠিক তথ্যই অবগত ছিলেন।

সাক্ষা ভোজ্যেও ফ্ৰাউ বালিন আমাৰিগকে আপ্যায়িত কৰিলেন। বহু দুৰত গাৰ্জনৈতিক বিষয়েৰ আলোচনাৰ য়াতি ১১টা বাজিয়া গেল। আমি বিশেষ ভাবে উপলব্ধি কৰিলাম যে, তিনি জাতীয়তাবাদী ভাৰতীয় দল গঠনেৰ প্ৰয়াসী। হাৰ নিদেমায়াৰ গাড়ীতে বলিলেন যে, হাৰ বালিন নব্যভূকী নায়ক এনভাৰ বে (পরে পাশা), মিশৰেৰ জাতীয়তাবাদী ফরিদ বে এবং অন্যান্য দেশেৰ মুক্তিকামী যুবকগণকে অৰ্ধ ও অন্তৰ্জ্ঞ দিয়া সাহায্য কৰেন। আমাৰ ভাৰতীয়গণ যদি গোপনে ভাৰতে কিছু অস্ত্ৰাদি প্ৰেৰণ কৰিতে অভিলাষী হই, তবে তিনি হাৰ বালিন হইতে সাহায্য লইয়া ব্যবস্থা কৰিতে পাৰেন।

ঐ দিনেৰ আলোচনাৰ পূৰ্ব হইতে হাৰ বালিনই আমাকে ল্যাবৰেটৰীতে ফোনে তাঁহাৰ বাটীতে বাইবাৰ জন্ত অজ্ঞৰোধ কৰিলেন।

সব্বৰাই ত্ৰিপোলী নিয়ে ইটালী তুৰস্ককে আক্ৰমণ কৰিল। বাৰ্লিন আমাকে জিজ্ঞাসা কৰিলেন, ইহাতে ভাৰতীয় মুসলমানগণেৰ উপৰ কিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া হইবে? তাঁহাৰ সঙ্গে আলোচনায় জ্ঞাত হইলাম যে গোট বুটেনই ইটালীকে এই কাৰ্যে প্ৰোৱোচিত কৰিয়াছে যেন জাৰ্মানী দু দিক বন্ধা কৰাৰ চেষ্টাৰ বে-কাৰ্যদাৰ পাড়ে, ইটালীৰ সঙ্গে জাৰ্মানীৰ মিত্ৰতা আবার নব্য ভূকী দলকেও জাৰ্মানী সুগঠিত কৰিতেছে, এই বুছে জাৰ্মানী হয় ইটালীকে নয় তুৰস্ককে ত্যাগ কৰিতে বাধ্য হইবে। বালিন ও নিদেমায়াৰ ইংৰাজ এবং ফৰাসীৰ দুই শত বৎসরেৰ ইত্যাকার রাজনৈতিক আধিপত্যেৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ হস্তব্য কৰিলেন, আমাৰ মনে হইল যেন তাঁহাৰ উক্ত দুই জাতিৰ প্ৰাণাণ খৰ্ব কৰাৰ জন্ত যে কোন পন্থা অবলম্বন কৰিতে প্ৰস্তুত।

হাৰ বালিন ছিলেন জাৰ্মান নেভি লীগেৰ উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক এবং পৃথিবীতে জাৰ্মান-প্ৰভাব বিস্তাৰ সমিতিৰ প্ৰেসিডেণ্ট। জাতিতে তিনি ইহুদী ছিলেন। কিন্তু জাৰ্মান কাইজাৰেৰ অন্তৰঙ্গ বন্ধু ছিলেন। কাইজাৰ তাঁহাকে মন্ত্ৰিভাবে ক্যাবিনেটে গ্ৰহণ কৰাৰ জন্ত পুনঃপুনঃ চেষ্টা কৰিয়াও সফল হন নাই। তিনি সৰ্বদাই বলিতেন যে, তাঁহাৰ "দীনসেবা" পিতৃভূমি এবং কাইজাৰেৰ জন্ত আমৰণ অব্যাহত থাকিবে। সেইৰূপই ছিল। প্ৰথম মহাযুদ্ধেৰ শেষে কাইজাৰ সিংহাসন ত্যাগ কৰিয়া হল্যাণ্ডেৰ "আমারোজেন" (Amarongen)

চলিয়া গিয়াছেন—এই সংবাদ প্রচারিত হওয়া মাত্র তিনি বিভলবারের গুলীতে আত্মহত্যা করেন।

১১১১ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি একদিন মিশরের ফরিদ বে ও অল্প কয়েকজন মিশরীয় যুবকের সঙ্গে আমাকে পরিচিত করেন। হামবুর্গে তখন মনিষ্ট (Monist) কংগ্রেস হইতেছিল। দুই জন আইরিশ বিপ্লবীর সঙ্গেও তিনি আমাকে আলাপ-আলোচনার সুযোগ দেন। ঐ কংগ্রেস উপলক্ষে যেমন শান্তিকামী এবং ‘এসপারেন্টো’ (Esperanto) ভাষা প্রচারকামী সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন, তেমনই নানা দেশের বিপ্লবীও আগমন হইয়াছিল। হার বালিন একদিন মনিষ্ট নামক বিশ্ববিখ্যাত প্রফেসর আর্নেস্ট হ্যাকেল (Ernest Hackel) নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত রাসায়নিক ওষ্টওয়াল্ড (Ostwald) প্রভৃতি প্রায় ৫০ জন প্রতিনিধিকে সাক্ষাভোজে সম্বিধিত করেন, তাহাতে দেশবাসী ভাবিল বালিন শান্তিকামী হইতেছেন।

ত্রিপোলীর যুদ্ধ

ত্রিপোলীর যুদ্ধ সম্পর্কে হার বালিন অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন। নব্য তুর্কী দল (Young Turks) কিছুতেই ত্রিপোলী ইটালীর হস্তে সমর্পণ করিতে সম্মত ছিল না। এই সময়ে দিল্লীর উক্তর আনসারী (পরবর্তীকালে মহাত্মা গান্ধী বাঁহার বাটীতে প্রারম্ভ: আশ্রয় গ্রহণ করিতেন) ত্রিপোলী যুদ্ধ লইয়া মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিক্ষোভ সৃষ্টির চেষ্টা করিতেছিলেন। ইহা অবগত হইয়া হার বালিন বিশেষ উল্লসিত হইলেন। কারণ আনসারী তুরস্কের আহত সৈনিকগণের সেবার জন্য ‘রেড ক্রসেট সোসাইটি’ গঠন করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতেছিলেন। ভারতের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী মোলানা আবুল কালাম আজাদ ইটালীর বিরুদ্ধে এমন কি ইংরাজ নীরবে ইটালী কর্তৃক তুরস্কের অবমাননা সহ করিতেছিলেন বলিয়া ইংরাজদের বিরুদ্ধেও আলামারী বক্তৃতা দিয়া ভারতের মুসলমানদিগকে ‘রোমের বাদশাহের’ রাজ্য রক্ষা করিতে উদ্বুদ্ধ করিতেছিলেন।

ভারতীয় মুসলমানগণ তুরস্কের সাহায্যার্থ একদল স্বৈচ্ছানৈমিক প্রেরণের সিদ্ধান্ত করিলে ভারত গভর্নমেন্ট তাহাদের নিরপেক্ষতা ভঙ্গ হইবে বলিয়া তাহার উত্তোষ বন্ধ করেন। ইহাতে স্থানে স্থানে মুসলমানগণ বিশেষ উত্তোষিত হয়। এই সকল সংবাদ লগুনের সংবাদপত্রে পাঠ করিয়া হার বালিন জিজ্ঞাসা করেন যে মুসলমান সম্প্রদায় হইতে ইংরাজ-বিরোধী দল গঠনের মত যুবক সংগ্রহ করা সম্ভবপর কি না।

বালিনের রক্ত-জরজী ১১১২ অব্দে বালিনের “হামবুর্গ আমেরিকা” লাইনের কর্তৃত্বভার গ্রহণের ২৫ বৎসর পূর্ব হয়। এই উপলক্ষে তাঁহার সহকর্মী, বন্ধু বান্ধব ও শুভামুখ্যায়িগণ একটি রক্ত-জরজী অনুষ্ঠান করিতে উত্তোষী হন। হার বালিন এই কার্বে প্রতিনিবৃত্ত হইতে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন, কিন্তু উত্তোষিগণ ভাবিলেন যে, ইহা মায়ুলী সৌভাগ্য প্রকাশ মাত্র। তাঁহারা সোৎসাহে কার্বে প্রবৃত্ত হইলেন এবং জাৰ্মান কাইজারকেও উৎসবে উপস্থিত হইতে সম্মত করাইলেন। হার বালিন অতি বিনীত ভাবে এই অবস্থিত ব্যাপার হইতে

তাঁহাকে মুক্তি দিবার জন্য কাইজারের নিকটও নিবেদন করিলেন। কাইজার তখন তাঁহাকে চর্চাজীবীভুক্ত করার জন্য “হার ফন” (Herr Von) উপাধিতে ভূষিত করার প্রস্তাব দিলেন। বালিন সসম্মানে তাহা হইতে অত্যাচরিত দিবার জন্য প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়া কাইজারের অটোগ্রাম সম্বিধিত একখানা কটো পাঠিবার আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করিলেন। দেশবাসী তাঁহার এই বিনত আচরণে ক্ষুব্ধ হইলেন।

জুসিলী উৎসবের অনুষ্ঠানাগণ কিছুতেই উৎসবের আয়োজনে বিরত হইলেন না। কিন্তু অকস্মাৎ তাঁহাদের সকল উত্তোষ আয়োজন বার্থতায় পর্যাবসিত হইল। হার বালিন তাঁহার স্ত্রী ও কন্যাসহ একখানা ছোট সমুদ্রগামী জাহাজে চড়িয়া অজ্ঞাত পথে যাত্রা করিলেন। এক পক্ষকাল তাঁহাদের কোন সংবাদ দেশবাসী পাইল না। উৎসবের নির্দিষ্ট দিন অতিক্রান্ত হওয়ার ১০ দিন পর জার্মানীর তৎকালীন সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান ‘উলফ বুয়ো’ প্রচার করিল যে হার বালিন হামবুর্গে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন।

তিনি গৃহে উপনীত হইয়া পুনরায় এক বিনীত টেলিগ্রামে কাইজারের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। এই নিরাত্মের আলবাহি বালিন।

গুপ্তদল গঠনের প্রস্তাব

অক্টোবরের প্রথম দিনেই হার বালিন এবং হাব নিদেমায়ার পত্রিকার ভাষায় বলিলেন যে যদি আমি কতিপয় ভারতীয় বন্ধুসহ একটি গুপ্ত দল গঠন করিতে পারি, তবে তাঁহারা কোন কোন ধনী ব্যক্তির নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া আমাদিগকে সাহায্য করিতে পারেন। এমন কি, অন্তর্গতি প্রেরণ করিবারও ব্যবস্থা করিতে পারেন। কিন্তু আমি উৎসাহ প্রদর্শন করিলাম না। কারণ ১১০৬ অব্দে অতি নগণ্য কারণেই তৎকালীন ‘গোলামখানা’ স্থলে ধর্মঘট বাধাইয়া জাহাজীবনে বহু লাঞ্ছনা গল্পনা সহ করিয়াছি। গঠনমূলক কার্বের মধ্যে বতাপ্রাপিত অকলে ভিক্ষাকৃত খাদ্য বিতরণ, সম্মান সমিতি ও জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া অবশেষে সহকর্মী ও অর্থের অভাবে দারুণ অশান্তি ভোগ করিয়াছি। সর্বশেষ নিষ্ক্রেয় উন্নতিসাধন মূলমন্ত্র লইয়াও কত বাধা বিপত্তি লঙ্ঘন করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাগণের রক্তসম অর্থ লইয়া জার্মানীতে আসিয়াছি। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূক্তি হইয়া শিক্ষার দিকে আশাতীত সাক্ষ্য লাভ করিয়াছি। আশা ও আকাঙ্ক্ষা ‘ভক্টরেট’ লাভ করিয়া দেশে প্রত্যাবর্তন করিব, এর মধ্যে বৈপ্রতিক কার্বে ওত্তপ্রোত্তভাবে নিযুক্ত হইলে নিষ্ক্রেয় ও পরিবারের প্রতি দারুণ বিবাসঘাতকতা করা হইবে, সুতরাং আমি ইতস্তত করিলাম।

১১২২ অব্দে আমার বাচনিক অন্তঃশত্রু প্রেরণের সুযোগ সুবিধার বিষয় অবগত হইয়া অল্প কয়েকজন জাতীয়তাবাদী বধা দাদা চাক্রী কেবাসাম্প, জানেন্সচের দাশগুপ্ত প্রমুখ হার বালিনকে পত্র দিতে বলিলেন। বালিন তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা মতে কয়েকটি প্যাকেট বিভলবার ও পিঙ্কল ভারত উপকূলে প্রেরণের ব্যবস্থা করিলেন। সে সকল কলিকাতার শ্রোভার সিং কোম্পানীর বেনিয়ন বরানগরের

নারায়ণচন্দ্র দত্ত আন্দোলন সমিতির সভাপতি প্রভাসচন্দ্র দেব (বি, এ) প্রমুখ সদস্যগণকে দিয়াছিলেন।

কিন্তু তখন দেশের অবস্থার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের প্রতিকার হইয়াছে। সুতরাং প্রকৃত বিপ্লবীগণ ব্যতীত সাধারণ স্বদেশকর্মীগণ বৈপ্লবিক কার্যের দিকে দৃষ্টি দিবার আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিলেন। নেতৃবৃন্দ তাঁহাদের আন্দোলনের ফলেই যে ব্রিটিশ জাতিস মাটি ফুড়িয়া বাহির হইয়াছে, তাহার প্রচার করিতেছিলেন। যদিও স্বর্গীয় মতিলাল ঘোষ সম্পাদিত অমৃতবাজার পত্রিকা ভাঙ্গা বাংলা জোড়া দেওয়ার বাংলা পুনর্বিভাগ (Re-partition of Bengal) বলিয়াই দৃঢ়ভাবে অভিমত প্রকাশ করিতেছিল, তথাপি ধীরপন্থী নায়কগণ সবিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিতেছিলেন। স্বদেশী যুগের উগ্র “সম্মেলনী” পত্রিকা পাঠে সপ্তাহের পর সপ্তাহ লর্ড হার্ডিঞ্জের সদয় ব্যবহারের দৃষ্টান্ত জ্ঞাত হইতাম।

লর্ড হার্ডিঞ্জ ভারতের ধীরপন্থী নায়কগণকে নানা ভাবে পকেটভার করার সুযোগ দিতে লাগিলেন। শ্রীর আন্তরিক মুখার্জী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুলারী আমলের বহিষ্কৃত ছাত্রদিগকেও ভর্তি করিয়া লইলেন, জাতীয় বিদ্যালয়ের অধ্যাপকমণ্ডলীর মধ্যে অনেকেই শিক্ষা বিভাগে কর্ম-সংস্থান করিতে সক্ষম হইলেন। সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে মনে হইল, দেশে শান্তির হাওয়া বহিতেছে। বিপ্লববাদী বা উগ্রপন্থী বহুগণও পত্রে জানাইলেন যে, দেশের পরিবর্তন হইয়াছে, সুতরাং অধিক সংখ্যক প্যাকেট অল্প ভারতে প্রেরণ করা হইল না।

চীনে রাষ্ট্রবিপ্লব

১৯১৩ অব্দে চীনে নব্যচীন দল ডক্টর সান ইয়াং সেনের নায়কত্বে প্রথম রাষ্ট্রবিপ্লব চালাইতেছে। এই সংবাদ পাঠিয়া আমরা উল্লসিত হইলাম, ভাবিলাম “দিন আগত ঐ”, এশিয়ার কালযুগ ভঙ্গ হইবে, কোটি কোটি নরনারীর মহাদেশ গাঝাড়া দিয়া উঠিবে, হয়ত বা এই গা ঝাড়তেই ভাংতখর্বও নড়িয়া উঠিবে।

সহস্রা আমাদের পৃষ্ঠপোষিকা ভারত-হিতৈষিনী ফ্রাউ সিমেন আমাকে ফোনে আহ্বান করিলেন। তাঁহার বাটিতে উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহার ভগিনীপতি হার নিদেমায়ারের এক পত্র দেখাইলেন, পত্র বিশেষ জরুরী, আমাকে পঞ্চমরচ দিয়া অবিলম্বে হামবুর্গ পাঠাইবার নির্দেশ তাহাতে রহিয়াছে। আমি পরদিন প্রথম গাড়ীতেই হামবুর্গ যাত্রা করিলাম। বুঝা ফ্রাউ সিমেন ট্রেন ভাড়া ব্যতীত হোটেল চার্জের জন্য অর্থ দিয়াছেন, নিদেমায়ারকে একখানা টেলিও করা হইয়াছে, অপরায় ২টার হামবুর্গ ষ্টেশনে পৌছিয়াই বিষয়-বিফারিত নেত্রে লক্ষ্য করিলাম যে, প্রাটফর্সে হার নিদেমায়ার স্বয়ং উপস্থিত। তিনি ‘আলষ্টারডামে’ হার বালিনের বাটিতে আমাকে লইয়া গেলেন। হার বালিন অগোণে বাধকমে বাইরা আমাকে হাত-মুখ ধুইয়া আসিতে বলিলেন, তারপর টেবিলে মধ্যাহ্ন ভোজনের খাণ্ড পরিবেশন করাইলেন। হার বালিন ব্যতীত তথার অন্য এক ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। পোষাকে মনে হইল ‘লেডি অফিসার’—নাম গেসস’ বাওরার। তাঁহার স্ত্রী জন ভদ্র ফেনিল বিয়ার পান করিতে লাগিলেন।

হার বালিন বলিলেন যে, এক অভাবনীয় সুযোগ উপস্থিত।

চীনের বিপ্লবের অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য কয়েকজন আইরিশ বিপ্লবী চীনদেশে বাইতেছেন, আমরাই প্রেরণের ব্যবস্থা করিতেছি। আপনি এ সময়ে দুই-চারি জন বন্ধুসহ তাঁহাদের সহযাত্রী হইলে বিশেষ ভাবে বিপ্লবের জ্ঞানলাভ করিতে পারিবেন, এ জন্যই আপনাকে আহ্বান করা হইয়াছে।

তিনি আরও অনেক কথা বলিলেন। এমন কি, ভাষার অসুবিধাও যে কিছু নয়, কারণ নব্যচীনের কর্মবীরগণ ইংরেজী এবং জার্মান ভাষায় দক্ষ; তাহাও বলিলেন।

বালিনের প্রস্তাব শোনামাত্র আমার শরীর কাঁপিয়া উঠিল, আমি কঠোর পরিশ্রম করিয়া ইউনিভার্সিটির অবকাশকাল পর্যন্ত ল্যাবরেটরীতে কাজ করিয়া আমার গবেষণা প্রায় সম্পূর্ণ করিয়া আনিয়াছি। আশা করি, ১৯১৪ অব্দেই পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়া বহু-আকাঙ্ক্ষিত ‘ডক্টর’ উপাধি লাভ করিতে সক্ষম হইব। এই সময়ে আমি অবশ্যই সব বন্ধ করিয়া চীন যাত্রা করিব? আমার খাণ্ড এবং ছুরি-কাঁটা জচল হইল। মুহূর্তে তাসিয়া উঠিল আমার চক্ষুর সমক্ষে বিপুল স্রোতের আধার আমার বুধ পিতৃদেবের সৌম্য মূর্তি, অন্তরে জাগিয়া উঠিল ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূণের সাক্ষরনয়নে বিদাহাদানের করুণ দৃশ্য। বাল্যকাল হইতেই আমি ছিলাম অসহিষ্ণু, উচ্ছৃঙ্খল এবং বিচারবুদ্ধি-বিবক্ষিত অর্ধাচীন। বহন জ্ঞান লাভের সময় তখন জ্ঞান বিস্তারের জন্য বার্ষ চেষ্টা করিয়া নিজের জ্ঞানভাণ্ডার শূন্য রাখিয়াছি। আবার, কি উন্মাদ হইব? আবার কি আত্মীয়-স্বজন সকলকে হতাশ করিব? আমার গিত্ততুল্য অধ্যাপক আমার গবেষণা পরিচালনা কার্যে নিত্য উৎসাহ দিয়া আমাকে অগ্রসর করিতেছেন। আমিই তাঁহার প্রথম হিন্দু ছাত্র (ভারতীয়)। আমি হারা তাঁহার গৌরব বৃদ্ধির আশা তিনি পোষণ করেন, তাঁহাকেও প্রত্যাশিত করিব?

না, কিছুতেই না, আমি অসম্মত হইলাম, পরিহার্য বিনীত ভাষায় বলিলাম, ‘আমি হতে এই কর্ম হবে না সাধন।’

আমার আরও একটি কথা যুগপৎ মনে উদয় হইল, তাঁহার কি আমাকে গুপ্তচরে পরিণত করিতে প্রয়াসী? আমার দেশসেবা, দেশমুক্তির কামনার কি এই দক্ষিণা?

হার বালিন অন্তর্যামী। তিনি বলিলেন, হার ভট্টাচার্য। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনাকে গুপ্তচরবৃত্তিতে নিযুক্ত করা আমাদের অভিপ্রায় নহে। বিপ্লবের সাফল্য জ্ঞান অর্জনের জন্য চীনে নব্যচীন নায়কগণের নিকট আপনাকে প্রেরণ করিতে চাই। আইরিশ বহুগণের বিশেষ অস্বরোষেই আমরা এই ব্যবস্থা করিয়াছি। আপনি সেখানে আমাদের বিশ্বস্ত বহুগণের সঙ্গে নিরাপদে থাকিতে পারিবেন, ইত্যাদি বহু কথা তিনি বলিলেন। আমি কিছুতেই সম্মত হইলাম না। আমি বলিলাম, সর্বপ্রথমে আমার ‘ডক্টরেট’ পাইতে হইবে, ইহার জন্যই আমার বিস্তৃত পরিবারের সকল উৎকণ্ঠিত ভাবে অপেক্ষা করিতেছেন, তাঁহাদিগকে ১৯০৬ অব্দের মত অবিস্ময়কারিতায় পুনরায় হতবুদ্ধি করা আমার পক্ষে অমার্জনীয় অপরাধ হইবে।

হার নিদেমায়ার এ সময়ে কথা বলিলেন। তিনি আমাদের পরিবার, সমাজ প্রভৃতি সম্বন্ধে ফ্রাউ সিমেনের নিকট হইতে বিশেষ ভাবেই সকল তথ্য জ্ঞাত আছেন। ফ্রাউ সিমেনের গৃহে বহু

ভারতীয় ছাত্র সমর্থিত হইয়াছে। তাঁহার বাটীতে ভারতীয় ভোজ্যে বহুগুণ পরিভূক্ত হইয়া প্রশংসা করিয়াছেন। ডক্টর জ্যোতিব্রত চন্দ্র দাশগুপ্ত, ডক্টর বীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ডক্টর তুকারাম লাভডু, ডক্টর হরিশ্চন্দ্র, অধ্যাপক গুনে, ডক্টর সোরাবজী, (ইনি পরে নাম পরিবর্তন করিয়া ডক্টর তারাপোরওয়ালা নামে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন) এমন কি বর্তমানে বম্বে স্টেটের গভর্নর জীপ্রকাশও সিমন-পরিবারে আদৃত হইয়াছেন। সুতরাং ফ্রাউ সিমন যেমন আমাদের পারিবারিক বন্ধন বিষয়ে অভিভূত ছিলেন, নিদেয়ারার ততটা না হইলেও কতকটা জ্ঞাত ছিলেন। তিনিই আমার পক্ষ ধরিয়া বালিনকে বুঝাইলেন। বালিনের আজ দুই বৎসর পর সম্ভবতঃ প্রতীতি হইল যে, আমার দেশপ্রেম প্রকৃত নহে। দেশোদ্ধারের চেষ্টা আমি বাম হস্তে করিতে ইচ্ছুক, দক্ষিণ হস্ত নিয়তই আত্মপ্রতিষ্ঠা ও পরিবারের উন্নতির জন্য কর্মে রত থাকিবে।

নিদেয়ারার বাটীতে নৈশভোজন সমাপ্ত করিয়া রাত্রি ১১টার পাসেজার গাড়ীতে যাত্রা করিলাম এবং পরদিন প্রাতে ৬টার হালে পৌছিলাম। হালে পৌছা পর্যন্ত আমার উদ্বেগ ঘুচে নাই।

তৎপরে হার বালিনের সঙ্গে আমার সকল সম্পর্ক ঘুচিয়া গিয়াছে একপই মনে হইতেছিল, কিন্তু খুঁটমােসে তাঁহার প্রীতিপূর্ণ পদ পাঠিয়া মনে আবার আশার সঞ্চার হইল। অব্যয়ন শেষ হইলে বালিনের সাহায্যে অনেক কাঁধ উদ্ধার হইবে, এই কথাও মনে জাগিল।

প্রথম মহাযুদ্ধ

১১১৪ অব্দে প্রথম মহাযুদ্ধ বাধে। সে সময়ে বিপ্লবী বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় জার্মানিতে ছিলেন। তাঁহারই নেতৃত্বে আমরা বালিনে ভারতে বিপ্লব সংঘটনের জন্য যে দল বাঁধি তাহার প্রেসিডেন্ট পদে হার বালিনকেই নির্বাচিত করা হয়। বালিন তখন বালিনেই ছিলেন। বীরেন্দ্রনাথ সহ আমি হার বালিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলে বালিন দীর্ঘকাল বীরেন্দ্রনাথের সঙ্গে ফরাসী ভাষার আলোচনা করেন এবং সকল বিষয়ে তাঁহাদের সাহায্য দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন।

প্রত্যাবর্তন কালে বীরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করেন যে, এই বিরাট প্রতিপত্তিশালী পুরুষের সঙ্গে কি ভাবে আমার পরিচয় হইল। সকল বিবরণ শুনিয়া তিনি আমাকে ভৎসনা করিলেন। কারণ তাঁহার প্যারিসে থাকিয়া দারুণ অর্থকষ্টের মধ্যে কোন প্রকারে সামান্য অল্পসল্প ভারতে প্রেরণ করিতে পারিতেন আর আমি স্বযোগ পাওয়া সত্ত্বেও কিছু করিতে পারিলাম না, ইহা যে আমার পক্ষে গহিত অপরাধ হইয়াছে, তাহা বলিলেন। ১১১২ অব্দে আমি বধন প্যারিসে তাঁহার দলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে বাই, তখন আমরাই মত আর একজন সংসারী বিপ্লববাদী সঙ্গে ছিলেন। তিনি মহারাষ্ট্র ছাত্র ডক্টর তুকারাম কৃষ্ণ লাভডু। বীরেন্দ্রনাথ তখন অসুস্থ ছিলেন। ম্যাডাম কামা, সর্দারসিংহ রাওজি রাণা, জ্ঞানচাঁদ বর্মা প্রমুখ কয়েকজন বিপ্লববাদীর সঙ্গে আলোচনা করিয়া আমরা প্রত্যাবর্তন করি। তিনি বলিলেন, তখন যদি তোমরা ম্যাডাম কামার নিকট হার বালিনের প্রস্তাব ব্যক্ত করত তবে আমরা কয়েকজন অধ্যাকর্মী পাঠিয়ে এমন ব্যবস্থাই করত

পারতাম যে, প্রচুর অল্পসল্প ভারতের বিভিন্ন উপকূলে পৌছে আমাদের ভারতে অবস্থিত সহকর্মী দলের শক্তি বৃদ্ধি করত।

তিনি আমাকে ডক্টর উপাধি লাভের আকাঙ্ক্ষার জন্য নিশা করিলেন। এমন কি হেলার সুবর্ণ স্বযোগ নষ্ট করার অপরাধী এবং বিশ্বাসঘাতক পর্যন্ত বলিয়া মুখ ভার করিলেন।

তিনি আমাকে কনিষ্ঠ ভাতার মত দেখিতেন, সুতরাং তাঁহার বিষয়তা সম্বন্ধে কাটিয়া গেল।

হার বালিন আমাদের সতর্ক করিলেন যে তিনি বা জার্মেন গভর্নমেন্ট আমাদের বিপ্লবী দল "ভারত বন্ধু জার্মান সমিতি"র পশ্চাতে আছেন, এই কথা যেন প্রচার না হয়। কারণ কোন দেশেই গভর্নমেন্ট অন্য দেশে বিপ্লব বাধাইবার চেষ্টা করিতেছেন, ইহা জাতিসম্মত বিবেচিত হয় না। যদিও প্রত্যেক দেশই নিয়ত এরূপ চেষ্টা এক একটি তথাকথিত কমিটি দ্বারা করান, যেমন ইংল্যান্ডের বাস্টন কমিটি। দিবারাত্রি বালকান রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ঘটাইয়া নিজেদের প্রভুত্ব বিস্তারের চেষ্টা করেন। প্রথম ও দ্বিতীয় বালকান যুদ্ধে প্রতিনিয়তই বাস্টন কমিটির লর্ড বাস্টনের গতিবিধি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইত। প্রথম মহাযুদ্ধের প্রাক্কালেও তিনি বুলগেরিয়ার রাজধানী সোফিয়াতে বিপুল অর্থবাণি সহ উপস্থিত থাকিয়া বুলগেরিয়াকে জার্মানীর পক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে বাধা দিতেছিলেন। অবশেষে জার্মান বন্ধু জনৈক তরুণ বর্ষে তিনি নিহত হইলে বুলগেরিয়া জার্মানীর পক্ষ অবলম্বন করে।

মারা মারে বীরেন্দ্রনাথ সস্তাশিব রাও, বীরেন সরকার (অধ্যাপক বিনয় সরকারের ভ্রাতা) কেরলাস্শ মনসুর আহম্মদ এবং অন্যান্য সহকর্মী সহ আমি হার বালিনের বাটীতে উপস্থিত হইতাম। তিনি ভারতে বিপ্লব সৃষ্টির সম্পর্কে নানারূপ পরামর্শ দিতেন।

আয়লণ্ডের উপকূলে আর বোজার কেইসমেন্ট (Sir Rojer Casement) যে সশস্ত্র যুদ্ধসাহাজ লাইয়া অবতরণের চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা বার্ষ হয়। বিচারে কেইসমেন্টকে ক্যানী-২জুতে প্রাণ দিতে হয়। তাঁহার সঙ্গে আর বাঁহারা ছিলেন তন্মধ্যে আমার পরিচিত ডে কুর্টিন (De-Curtin) নামক একজন বিপ্লবী ছিলেন বলিয়া আমার ধারণা হয়। একজন ডে কুর্টিনকে আমি বালিনের বাটীতেই জানিতে পারিয়াছিলাম। তিনি ছিলেন শতকরা ১০০ ভাগ দেশপ্রীতিপূর্ণ স্বভাবের অধিকারী। আমরা বালিন ভাগ করার পূর্ব অকস্মাৎ এক মোটর ধাক্কায় তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তিনি সহাস্তে বলেন, আপনারা যে পথের বাতী আমরাও সে পথের। আপনাদের গাড়ী এবং কুরিয়ার (Courier) আমাদের পরিচিত, কারণ বহুবার এই গাড়ী আমরা পেয়েছি।

আমরা দুচবিধাস এই যে, হার বালিন আর বোজার কেইসমেন্টকে অর্থ ও অল্পসল্প দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন।

তিনি আমাদের পরম হিতৈষী ছিলেন। ১১১১ অব্দে যুদ্ধের আবহাওয়ার পরিবর্তন হইলে আমি ফ্রাউ বালিনকে এক পত্রে তাহার মৃত স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি। তিনিও একখানা পত্র লিখিয়া স্বামীর আত্মহত্যার কাহিনী জ্ঞাপন করেন। তিনি এবং তাঁহার পালিতা কন্যা উভয়েই পরলোক গমন করিয়াছেন। একটি মাত্র বিবাহিতা দৌহিত্রী বর্তমানে অষ্ট্রিয়ার ইন্সব্রুক (Innsbruck) আছেন। ইন্সব্রুক রাশিয়ার অধীন।

বেঙ্গবাড়ী—আইনের চোখে

ডক্টর শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য)

বেঙ্গবাড়ী হস্তান্তর প্রকল্পটির তিনটি দিক রয়েছে:

(১) আইনগত, (২) রাজনৈতিক ও (৩) নৈতিক বা নীতিগত। প্রথমোক্ত বিষয় থেকে দুটি কথা ওঠে: (ক) ইহা কি সীমানা পুননির্ধারণ সংক্রান্ত একটি প্রশ্ন? যদি তাই হয়, সেক্ষেত্রে এর সমাধান নির্ভর করবে রাডক্লিফ ও বাগে রোয়েদাদের ব্যাখ্যার উপর। তবে একটি বিষয় স্পষ্ট—বাগে রোয়েদাদের পূর্বে পাকিস্তান এ ব্যাপারে কোন বিরোধ তোলে নি। আলোচ্য বিষয়ে রাডক্লিফ যে রোয়েদাদ দেন, তা বেশ পরিষ্কার। পাকিস্তানের যদি বিন্দুখাত ও সন্দেহ থাকতো যে, তাঁর অঞ্চলের একটি অংশ ভারতে চলে গেছে, ঐ অবস্থায়ও সে বিরোধ তুলতো না, এমনটি ভাবাই যায় না। আমরা গ্রাম্য ইউনিয়নের প্রেসিডেন্টের বিবৃতি পেয়েছি। ইউনিয়ন প্রেসিডেন্ট হিসেবে সকল ব্যাপারটি সম্পর্কেই এই ভদ্রলোক অবগত ওয়াকিবহাল থাকবেন। বিবৃতিতে তিনি বলেছেন যে, তিনটি পরিকল্পনা (১৯৬৬, ১৯৭৩ ও ১৯৮৭ সালে রচিত) অনুসারে পাকিস্তানের এক একর জমিও ভারতের দখলাধীন নেই। বাগে রোয়েদাদের আগে বেঙ্গবাড়ী সম্পর্কে পাকিস্তান কেন কোন দাবী ওঠায় নি, সে প্রশ্নের জবাব এইখানেই রয়েছে। কোন বিরোধ ছিল না বলেই বাগের পক্ষে এ ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্তে আগার কারণ ঘটে নি। সুতরাং বাগে রোয়েদাদের অন্তর্ভুক্ত কোন বিষয় এ কখনই হতে পারে না।

(খ) সীমানা পুনরিক্রান্তের প্রশ্ন যদি এইটি না হলো, তা হলে এ নিশ্চয়ই ভারতভূমির একাংশ পাকিস্তানকে প্রত্যর্পণের প্রশ্ন। গত ৩০শে ডিসেম্বর বঙ্গের বিধান পরিষদে প্রকল্পটি স্বনম্র উপস্থাপিত হয়, সে সময়ে পরিষদের একজন সদস্য হিসেবে আমি আমার অভিমত প্রকাশ করি। আমি বলি যে, ভারতের সংবিধান অনুসারে এরূপ হস্তান্তর চলতে পারে না। ভারতের কোন একটি অংশকে বিদেশী রাষ্ট্রের হস্তে প্রত্যর্পণের অধিকার রাষ্ট্রপতি কিংবা প্রধান মন্ত্রীর নেই। এমন কি, এ কার্য সম্পাদনের জন্য বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী পার্লামেন্টও কোন আইন প্রণয়নের অধিকারী নহেন। পরে অপর আইনজীবীদের প্রকাশিত অভিমত সংবাদপত্রে পাঠ করে আনন্দ পাই। ৩০শে ডিসেম্বর আমি যে বক্তব্য পেশ করি, তাঁরা সকলেই তাঁর সঙ্গে একমত হন। আলিপুর বাগের একজন অভিজ্ঞ ব্যবহারকারী জামুয়াবীর মাঝামাঝি আমার অভিঃতেরই অনুরূপ মত ব্যক্ত করেন। পরে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অজ্ঞাত আইনজ্ঞদের মুখেও একই অভিমত প্রকাশিত হয়। এ প্রক্ষে আমরা কিন্তু একে অস্তরের সাথে পরামর্শ করি নি। অথচ আমাদের সব ক'জনই একই মত হয়ে কাঁড়ার বাতে আমাদের ব্যক্ত অভিমতটি নির্ভুল হওয়ার সম্ভাবনাই প্রমাণিত হয়।

সংবিধানের ৩নং ধারার পার্লামেন্টের আইন প্রণয়নের অধিকার বিস্তারণ করা আছে। আইনের একটি সুবিদিত সূত্র রয়েছে, যার অর্থ—যে আইন স্পষ্ট, সেখানে নতুন কোন ভাবের অবকাশ নেই। আইনের শাসনের ক্ষেত্রে পরিষ্কার কথা যেটি, সে হচ্ছে—আইনসভা যেখানে সম্পত্তি সংক্রান্ত ব্যাপার নিষ্পত্তির এক বা ততোধিক পদ্ধতি

স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করে দিয়েছেন, সেক্ষেত্রে উল্লিখিত সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি ছাড়া অপর যে কোন পদ্ধতিই বর্জন করতে হবে বরাবর। সংবিধান দ্বারা স্পষ্ট ভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হলে পার্লামেন্ট কোন আইন প্রণয়নে সক্ষম নহেন। ভারতের একটি অংশকে কোন বিদেশী রাষ্ট্রের হস্তে হস্তান্তরকল্পে আইন প্রণয়নের অধিকার সংবিধানে পার্লামেন্টকে দেওয়া হয়নি।

(২) রাজনৈতিক: ব্যাপারটি সেক্ষেত্রে ভারতের একটি আভ্যন্তরীণ সমস্যা, সে অবস্থায় এর সমাধান খুব সহজেই হতে পারে। ইহা বেশ স্পষ্ট যে, নিজের শাসনতাত্ত্বিক ক্ষমতা ও তথ্য সম্পর্কে ভ্রান্ত বিশ্বাসে বশেই ভারতের প্রধানমন্ত্রী আলোচ্য চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছেন। তিনি ভাবেন যে, তাঁর ক্ষমতা হয়েছে, কিন্তু সংবিধান অনুসারে চলতে পারে—অবশ্য এ খুব একটা বেশিরকম কল্পনা, তবু সংশ্লিষ্ট রাজ্যের আইন সভার মতামত না নিলেই নয়। আবার বলতে হয়, এই বিষয়টিও সংবিধানের ৩নং ধারারই অন্তর্ভুক্ত। প্রধান মন্ত্রী তাঁর ভাষণে বলেছেন যে, তাঁর ধারণা ছিল যে, এই হস্তান্তরে পশ্চিমবঙ্গের সম্মতি রয়েছে।

অথচ আমাদের মুখ্য মন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়েছেন যে, পশ্চিমবঙ্গ কখনই এতে সম্মতি দেয় নি এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ আইন সভার মতামত সুবিদিত। প্রকৃত প্রস্তাবে প্রধানমন্ত্রীর আইন সভা এক নাকো উক্ত হস্তান্তরের বিরোধিতা জানিয়েছেন। এমনটি মনে করা চলে না যে, পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মিঃ নূন আমাদের সংবিধানের ৩নং ধারাটি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন না। স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা সম্পর্কে তিনিও তুল ধারণার বশবর্তী ছিলেন। এই অবস্থাবীনে কোন চুক্তি হলেও সেটি নাকচ হয়ে যায়। আর সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলি এমন ক্ষেত্রে আপন আপন দায়িত্ব পালনে অস্বীকার করলেও কাউকে দোষ দেওয়া চলে না।

এ ছাড়া আমার ধারণা—প্রধানমন্ত্রী একমাত্র জরুরী অবস্থাতেই ভারতের নামে কাজ করতে পারেন। অজ্ঞাধা এরূপ ক্ষেত্রে তাঁকে পার্লামেন্টের মতামত গ্রহণ করতেই হবে। চুক্তি অনুষ্ঠানের পূর্বে ভারত সরকার ও পাকিস্তান সরকারের ভেতর পত্র-বিনিময় হয় নি, এমনটি কিছুতেই ভাবতে পারা যায় না। আমি মনে করি, আলোচ্য প্রসঙ্গে স্ব স্ব দেশের অভিমত জানবার জন্য আমাদের প্রধানমন্ত্রী ও পাক প্রধানমন্ত্রীর হাতে সময় ছিল প্রচুর। বলতে কি, সংশ্লিষ্ট জনগণের মতামত না নিয়ে এ ধরনের একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার কোন জরুরী কারণই ছিল না আমাদের প্রধানমন্ত্রীর সামনে।

বলা হয়েছে যে, আমাদের প্রধানমন্ত্রীর চুক্তিটি যদি কার্যকরী করা না হয়, তাহলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে। আমি বুঝি যে, দেশের কল্যাণের মতামত নেবার সময় যেখানে নেই, সেক্ষেত্রে—অজ্ঞভাবে বলতে গেলে জরুরী অবস্থায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী ভারতের নাম করে বা কিছু করবেন, তা কার্যকরী করা আমাদের একান্ত কর্তব্য। এ বিষয়ে সন্দেহের বিন্দুখাত অবকাশ নেই।

প্রধান মন্ত্রী যদি ঘোষণা করেন যে, তথ্য ও আইন সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে তিনি চুক্তি করেছেন, সে ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মর্যাদা: ক্ষুণ্ণ হবার কি কারণ থাকতে পারে? মানুষ মাত্রেই ভুল হয়, ভুলের স্বীকৃতিতেই মহত্ব। প্রধানমন্ত্রী যদি আন্তর্জাতিক ঘোষণাটি করেন, তা হলে আন্তর্জাতিক মর্যাদা তাঁর ক্ষুণ্ণ হবে না। পক্ষান্তরে বিভিন্ন জাতি বলবে: “এই একজন মহাপুরুষ যিনি মনুষ্যস্বলভ ভুল করতে পারেন কিন্তু নিজের ভুল স্বীকার করার সাহস তাঁর আছে এবং দেশের সংবিধান-বিরোধী কোন কিছুই তিনি করবেন না।” নেপোলিয়নের মতো একজন পশ্চিম প্রতিনিধি বাস্তব—ইতিহাসে যার জুড়ি নেই, তিনিও ভুল করেছিলেন, যার জন্য তাঁর সাম্রাজ্যের বিলোপ পর্যন্ত ঘটেছিল।

মিউনিক চুক্তির সঙ্গে এই চুক্তির তুলনা করা হয়েছে। কিন্তু কোনরূপ তুলনাই হয়ত সম্ভবপর নয়। তার উইন্সটন চার্চিল তাঁর ‘দি গার্ল অফ ইট’ গ্রন্থের ‘দি ট্র্যাজেডি অব মিউনিক’ (‘মিউনিকের সর্দশা’) শীর্ষক অধ্যায়ে বলেছেন—সর্বোপরি চেকোস্লোভাকিয়ার প্রতিরক্ষার বুটেনের কোনরূপ চুক্তিগত বাধ্যবাধকতা ছিল না কিংবা কোন প্রতিশ্রুতি দেওয়া ছিল না তাঁর দিক থেকে, এমন কি বেসরকারী ভাবেও। কিন্তু জায়াগী যদি চেকোস্লোভাকিয়াকে আক্রমণ করে, সে ক্ষেত্রে তার উপর যুদ্ধ অভিধান চালানোর স্পষ্ট দায়িত্ব চুক্তি অনুযায়ী ফ্রান্সের ছিল। এরূপ বলা হয় যে, ঠিক যুদ্ধে ফ্রান্স নিজের বাধ্যবাধকতা অনুসারে কাজ করেনি। এই বিরোধ প্রামাণিক গ্রন্থ-রচয়িতা তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে ফ্রান্সের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা সম্পর্কে এইরূপ বলেন: “চেকোস্লোভাকিয়া যদি আত্মসমর্পণে (জায়াগীর নিকট) অস্বীকার করে থাকে আর তার পরিণতিই যদি হ’ল যুদ্ধ, সে ক্ষেত্রে ফ্রান্সের পক্ষে তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা উচিত ছিল। তবে চেকরা যদি চাপে পড়ে আত্মসমর্পণের পথ বেছে নিয়ে থাকেন, সে অবস্থায় ফ্রান্সের মর্যাদা টিকে গেলো।”

তৎপরে তিনি বখারীতি বলেন, “আমরা এই ব্যাপারটির (প্রতিরক্ষা) বিচারের ভার ইতিহাসের হাতেই ছেড়ে দেব।”

স্পষ্টই মিউনিক চুক্তির সমর্থনে বুটেন ও ফ্রান্সের স্বপক্ষে কিছু বলবার রয়েছে কিন্তু বেকবাড়ী চুক্তির সমর্থনে বলবার মতো কিছু আছে কি? বেকবাড়ী ভারতেরই একটি অংশ। আমাদের সংবিধানের ভগ্নশীলেই এইটি স্পষ্ট করে বলা আছে। বর্তমান চুক্তি অনুষ্ঠানের আগে পাকিস্তান এ ব্যাপারে কোন দাবী পেশ করে নি। স্মরণ্য দেশের জনগণের মতামত না নিয়ে এই যে চুক্তিটি হয়েছে—মিউনিক চুক্তির সঙ্গে একই পর্যায়ে এ ঠাঁড়তে পারে না। সেই কারণেই একটি অচল চুক্তি অনুসারে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া আছে বলে বলা হচ্ছে, আমাদের প্রধানমন্ত্রী যদি উহা কার্যকরী করতে নারাজ হন, সেক্ষেত্রে তাঁর আন্তর্জাতিক মর্যাদা বাহ্যত হওয়া সম্ভব নয়।

(৩) কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ—বিষয়টির নৈতিক বা নীতিগত দিক। এক্ষণে এইটি ছয় ভাগে সমর্থিত হয়েছে যে, ভারত দালাই লামাকে এদেশে আশ্রয় দিয়েছে। আমাদের প্রধান মন্ত্রী স্পষ্টর ভাষায় বলেছেন—কোন অবস্থাতেই ভারত দালাই লামাকে চীনের হস্তে তুলে দিবে না। ভারত যে স্বাধীনতা অর্জনের পর একজন উদাত্তকে আশ্রয় মঞ্জুর করেছে, এ সত্য একটি

চমৎকার কাজ, একটি বিরাট অনুষ্ঠান। নিজের যে শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্য রয়েছে, তার সঙ্গে মিশ বেছেই হয়েছে এই ব্যবস্থা। কাহিনী চলতি আছে—ভারতের এক মহান নৃশক্তি একটি বাজ পাখীর আক্রমণ থেকে একটি পারাবতকে বাঁচাতে গিয়ে নিজের দেহ-মাংস বলিয়ে দিয়েছিলেন। আক্রান্ত পারাবতটি রাজার নিকট আশ্রয় চাইলে পরই এ ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছিল। আমার ধারণা যে, আমাদের প্রধান মন্ত্রী এই একটি কাজেই ভারতের মর্যাদা অনেকগুণে বর্ধিত হয়েছে। নেপোলিয়ানের পতনের পর তিনি বখেটে সন্ত্রম ও সাহস নিয়ে পত্র মারফত বখন আশ্রয়ের আবেদন জানিয়েছিলেন, গ্রেট বুটেনও তাঁকে আশ্রয় দিতে পারেনি—হতে পারে তিনি ছিলেন বুটেনের পরম শত্রু। সেদিনে গ্রেট বুটেনের উত্তর ছিল সেট হেলেন।

দালাই লামাকে আশ্রয়দানের পরিণতি আমাদের প্রধান মন্ত্রী বেশ ভালভাবেই উপলব্ধি করেন। চীনের এ অসন্তোষের কারণ ঘটতে পারে—আমি বলি না যে, ঘটাবেই। এই নিয়ে চীনের সঙ্গে ভারতের দ্বন্দ্ব বাধতে পারে অথচ সেদিন মাত্র দুটি রাষ্ট্রই ‘পঞ্চশীল’ স্বাক্ষর করেছে। পরিণতি জেনেও আমাদের প্রধান মন্ত্রী ভারতের পক্ষে কাজ করার জোর সাহস দেখিয়েছেন এবং আশ্রয় মঞ্জুর করেছেন দালাই লামাকে। তিনি এ-ও বলেছেন যে, মহান লামার প্রতি বখেটে শ্রদ্ধা দেখানো হবে।

দালাই লামা একজন মহান ধর্মীয় নেতা ও তিব্বতের রাজা। আলোচ্যক্ষেত্রে অবশ্য তিনি একজন সাধারণ মানুষ হিসেবেই আশ্রয় চেয়েছেন এবং ভারত তা দিয়েছে। বেকবাড়ীর আট হাজার নয়নারীর প্রতি আমরা কি একই নীতি সম্প্রসারিত করতে পারি না? প্রায় বারো বছর আগে এই হতভাগ্যরা পাকিস্তানে তাদের গৈরুক ঘর-বাড়ী ছাড়তে বাধ্য হয়। তারা ভারতে চলে আসে এবং আশ্রয় চায়। ভারত সে সময় তাদের আশ্রয় দেয়। হিন্দু হতভাগ্য এই মানুষগুলি থাকবার ঠাই পেয়ে ঘরদরজা ও কুঁড়ে তৈরী করে নিয়েছেন এবং ধর্মনিরপেক্ষ আমাদের ভারতের নাগরিক বলেই নিজেদের ভাবছে। তারা এ-ও ভেবে নিয়েছিল যে, পাকিস্তানের দুর্ব্যবহার তাদের আর পেতে হবে না। তারা কঠোর শ্রম করে জীবিকা নির্বাহ করে এবং স্ত্রী-পুত্র পরিজন নিয়ে শান্তিতে বসবাস করে চলেছে। ভারতের প্রতি রয়েছে তাদের আশ্রুগত। তারা ভোটাদিকারও পেয়েছে এবং গত সাধারণ নির্বাচনে ভোট দিয়েছেও। এতে তারা যে ভারতের নাগরিক, সেইটি পরিষ্কার প্রমাণিত হচ্ছে। এক্ষণে, তাদের একথা কি বলা ঠিক হবে—পাকিস্তানে কিংবা বাও? ভারত তোমাদের যে আশ্রয় দিয়েছিল, এখন আর তা দেবে না? মানবতার দিক থেকে দালাই লামার ব্যাপার ও এ ব্যাপারটির মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য আছে কি? আমি অবশ্য কোন পার্থক্য দেখি না। এই মন্ত নৈতিক প্রশ্নটি উঠেছে। মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আমরা যেন সমস্ত সমাধানে এগিয়ে বাই।

একথা যদি ধরেও লওয়া গেল যে, সংবিধানের উপযুক্ত সংশোধন মারফত আবশ্যিক আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয় ক্ষমতা পাল্লমেন্টকে দেওয়া হয়েছে, এ-ও যদি ধরা গেল যে, একটি অচল চুক্তির প্রতিশ্রুতি ভারত রক্ষা করতে পারলো না বলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমাদের

প্রধান মন্ত্রীর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়েছে, তখনও জিজ্ঞাসা ওঠে—আপনি কি ভাবে এই বিরাট নৈতিক প্রশ্নটির সমাধান করছেন? প্রশ্নটি হলো—কতকগুলি মানুষকে আশ্রয় দেওয়ার পর বান্ধের কাছ থেকে তারা পালিয়ে এসেছিল, তাদের হাতেই আবার প্রতারণা করা।

কেউ কেউ হয়তো বলবেন যে, ভারতের খাতিরে বেকবাড়ীকে উৎসর্গ করা প্রয়োজন। এই ক্ষুণ্ণ ভূগণ্ডটি যদি পাকিস্তানকে দিয়ে দেওয়া হয়, তা হলে পাকিস্তান সমৃদ্ধ হবে। কিন্তু তোষণ নীতিতে পাকিস্তানের সঙ্গে কখনই কাজ হবে না। ইহা খুবই স্পষ্ট। গত বারো বছরে বা ঘটেছে বলে আমরা জানি, তা থেকেই এ ধারণা সঞ্চারিত হয়। আমাদের স্বরাষ্ট্র সচিব পণ্ডিত পন্থ বা বলেছেন এবং দেশরক্ষা সচিব শ্রীমেনের যে উক্তি—এক ইঞ্চি পরিমিত ভারতীয় জমির উপরও বিদেশী আক্রমণ তাঁরা বরদাস্ত করবেন না, এর পর জেনারেল খিয়ারা সেদিন বলেছেন যে, ভারতের সৈনিকরা পাকিস্তানের আক্রমণ প্রতিহত করতে সম্পূর্ণ সক্ষম, একবার পরও বেকবাড়ী হস্তান্তরের কোন কৈফিয়ৎ থাকতে পারে কি? পারে বলে অন্ততঃ আমি মনে করি নে।

সুতরাং বাংলার জনগণ এই প্রশ্নটি সম্পর্কে সম্পূর্ণ একমত ও

বন্ধপন্থিক হয়েছে। বেকবাড়ী পাকিস্তানকে কোন অবস্থাতেই দেওয়া হবে না। পাকিস্তান তার বা ইচ্ছে হয়, করুক।

আমি আবার এ বিষয়ে বিশ্বের জীবিতদের ভেতর সর্বশ্রেষ্ঠ নির্ভরযোগ্য লেখকের কয়েকটি শ্রবণীয় কথা উদ্ধৃত করব: অপর জাতিগুলির সঙ্গে আচরণে মন্ত্রীমের প্রথম করণীর—সংঘর্ষ ও যুদ্ধ এড়িয়ে চলা আর সর্ববিধ আক্রমণ পরিহার করা—সে জাতীয় কার্যেই হোক, কি আদর্শগত লক্ষ্য থেকেই হোক। কিন্তু রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও স্বদেশের জনগণ বান্ধের নিকট থেকে তাঁরা ক্ষমতা পেয়েছেন, তাঁদের স্বাক্ষর নিমিত্ত সর্বশেষ উপায় হিসাবে এইটি যেখানে সম্ভব ও অপরিহার্য মনে হবে কিংবা যে স্থলে মনের সঙ্গে চূড়ান্ত ও সম্পূর্ণ বোঝাপড়া হয়ে যাবে, সেক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ বাদ দিলে হবে না। অবস্থা তেমনি অনিবার্য হয়ে যদি দাঁড়ায়, তা হলে বলপ্রয়োগ চলতে পারে।

ভারত যদি এই নীতি অল্পসারে কাজ করলো, একটি বৃহৎ, মজবুত ও সুনিশ্চিত ভিত্তির উপর সে দাঁড়াতে পারবে। এই শ্রদ্ধা ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েই ভারত আপন কর্মধারা স্থির করুক, আর তাতে করেই সে সমগ্র বিশ্বকে টেনে আনতে পারবে নিজের দিকে।

মনের আকাশ

শ্রুতিয়া

খুব বেশী দূরে নয়,

এক দিন চাঁদ আর সন্ধ্যাতারা উঠেছিল কুটি

খুব কাছাকাছি।

মনের আকাশে লাগে তার

এ আলোর বলকানি

নীরব নিঃশব্দে মাঝে বহু চলে শুধু

না-বলা ইথারের বাণী।

ইথারের বিদ্যুৎস্পর্শে উঠেছিল ভাসি

একটুকু হাসি

দুঃস্বপ্নের মুখে।

এক কলি গান আর একটুকু ছোঁয়া

দুঃস্বপ্নেরই প্রাণে এনেছিল

বসন্ত রাগিণী।

একখানি বাঁকা চাঁদ আর একটি কবিতার

কাণ্ডো আঁধার স্বপ্নালু মায়

আর শুভ্র রজনীগন্ধা

মনের আকাশকে ভরিয়ে দিয়েছে

পরিপূর্ণ আলোর অতল ছায়ার।

হঠাৎ খেমে গেল গান

এলো বুঝি বিচ্ছেদ-প্রহর

নিবে গেলো আলো

কবিতাও হ'ল না পূর্ণ।

আচম্ভক্য ঝড়ের ছর্ব্বার ঘূর্ণিতে

মনের আকাশে নেমে এল

যন নাগো মেঘ।

কাণ্ডো মেঘের অন্ধকারে ঝড়ের ঝটকায়

চাঁদ আর সন্ধ্যাতারা হয়ে গেল লীন

মদের পেয়ালা গেল ভেঙে

স্বপ্ন গেলো টুটে।

খামলো ঝড়, কাণ্ডো মেঘ গেল দূরে সরে

মনের আকাশ ঘিরে চলেছে

শুধু ধমধমে হাওয়া।

হাওয়ার আফাগনে

ঝড়ের ঘূর্ণাস্তে

চাঁদ আর সন্ধ্যাতারা কিন্তু রয়েছে

ঠিক সেই ভাবে

যেমন ছললে উঠেছিল কুটি

জীবনের প্রথম সন্ধ্যায়।

হায়, নেই শুধু আলো আর গান

শুধু নেই ইথারের অদৃশ্য পুলক

নেই তবু একটু ছোঁয়া আর একটি কবিতা

মনের আকাশ হারিয়েছে সব মধুরতা।

মনের আকাশ ঘিরে রয়েছে শুধু

হিসাবের খাতা।

প্রতিষ্ঠান যাত্রাই আজ-কাল বিরোধ-বিশৃঙ্খলা ও ধ্বংসপ্রাপ্তি
প্রায় লেগেই আছে। বিশেষ করে শিক্ষায়তনগুলিতেও তার
ধারা প্রবাহমান হতে চলছে। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি আকারে বৃহৎ
হতে বৃহত্তর হতে গিয়ে প্রকারে সংগতি রেখে চলতে পারছে
না; দিনের পর দিন স্থানে-স্থানে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে শিক্ষার্থী
বা শিক্ষাসেবী-কর্মী সাধারণের নানাদিক দিয়ে বোঝাপড়াতেই
কাল কেটে যাচ্ছে, কাজ এগুচ্ছে অল্পই; সমস্তার সমাধান
কোথায়, অনেকেই তা ভাবছেন। কম-বেশি এমন ঘটনার
আভাস বধন প্রায় প্রতিষ্ঠানের পিছনেই ধূমায়িত, তখন এটিকে
সাধারণ সমস্তার মতো ধরে নিয়ে সমাধানেরও সূত্র-নির্ণয় করা
আবশ্যক সাধারণ ভাবেই।

মনে করা যাক, 'নিখিল জ্ঞানায়তন' একটি বহুদিনকার
শিক্ষাপীঠ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভাগ চর্চা হয়ে থাকে সর্বত্রই; কিন্তু
বিভাগের সঙ্গে প্রত্যাহের জীবনযাত্রাকেও সুরঞ্জিত করে সর্বাঙ্গীন শিক্ষার
মানুষকে বিকশিত করে তোলবার লক্ষ্য গ্রহণ করেছিল এই
'জ্ঞানায়তন', এবং এই মর্মে তাকে বিশেষ ভাবের একটি আশ্রয়ের
আবাসিক রূপও দেওয়া হয়েছিল প্রতিষ্ঠার দিন থেকেই। কালের
ধারায় প্রতিষ্ঠানের বর্তমান গঠন-কাঠামোটি ঝড়িয়েছে এসে এইরূপ :
১। সর্বোচ্চ প্রতিনিধি-পরিষদ ২। ব্যবস্থাপক সমিতি ৩।
বিভাগসমিতি ৪। প্রক্টর-মণ্ডলী। এ ছাড়া আরেকটি সংস্থাও এর
মাধ্যম এক পাশে গড়ে উঠেছে। সেটি শিক্ষা-সেবক-সংঘ; শিক্ষক বা
অশিক্ষক যিনিই হোন, কর্মীমাত্রেরই এটি সাধারণ মিলনক্ষেত্র।
প্রস্তাবিত সমাধান-চেষ্টার সূত্রটি নিহিত রয়েছে শ্বেতক
এই সংঘেরই মধ্যে। এজন্য এরই কথা আজ বিশেষ করে
আলোচনার বিষয়।

দেখা যায়, প্রতিষ্ঠানটির বিভাগের দিকের ব্যবস্থার জন্ত সক্রিয়
রয়েছে একটি বিশেষ মণ্ডলী—'বিভাগসমিতি'; অমূরূপ ভাবে এর
দিন-চর্যার দিকটিরও দেখা-শুনা প্রয়োজন, কিন্তু সেজন্য কোনো বিশেষ
মণ্ডলীর ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায় না। অপর পক্ষে, বিশৃঙ্খলা ঘনীভূত
হচ্ছে দিনচর্যার দিক থেকেই বেশি। দিনচর্যা হচ্ছে দিনের চিন্তা-
ভাবনা ও কাজ-কর্মের সুবিধিত উদ্ভাষণ ব্যবস্থা। 'জ্ঞানায়তনে'
এই দিকের বিশৃঙ্খলা বিভাগচর্যার দিকটাকেও দিনে দিনে ব্যাহত করে
চলেছে। বতাই মনে হয়, 'বিভাগসমিতি' আছে বলেই পড়াশুনা ও
পরীক্ষাবাহিত পাশের কাঠামো তবু একটা কিছু খাড়া রয়েছে, কিন্তু,
সেক্ষেত্রে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা বা পরিবেশ ব্যবস্থার জন্ত তেমনি একটি
সমিতির অভাবেই কি তবে অল্প দিকে ভাঙন লাগল? পরিবেশের
দায়িত্ব-বক্ষার শ্বেত-আরোপিত আদর্শ নিয়েছে সেখানে শিক্ষাসেবী-
সংঘ। কিন্তু কার্যত নৈমিত্তিক উৎসবদি অমুষ্ঠানেই তাঁদের কাজকর্ম
রয়েছে সীমাবদ্ধ। পরিবেশের এই দিনচর্যাগত নিত্য অমুষ্ঠান
পরিচালনার দায়িত্বও বর্তার অস্থায়ী এক নিজস্ব সংবিধানে লিখিত
আদর্শ অনুসারে, স্বভাবত সাধারণ কর্মীদের সংস্থা এই 'শিক্ষাসেবী
সংঘ'র উপরেই। সে স্থলে, কথায় থাকলেও, কাজে সেই দায়িত্ব
বক্ষার স্তম্ভ পরিচর্য কিন্তু তেমন সুরগোচর নয়। এখন, পরিবেশের
দায়িত্ব বক্ষা বলতে কথটা কতদূর যায়, সেটুকুতে অবহিত হওয়া
আবশ্যক। কেন না, দেখা যায়, প্রতিষ্ঠানটি বধন ক্ষুদ্রতর ছিল,

শিক্ষা ও শিক্ষায়তন

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র রায়

সেদিন সর্বাঙ্গীন শিক্ষার বিভাগ ও জীবন সমন্বয়ী অর্থও আদর্শেই
প্রতিষ্ঠাতা বর্তমানে ছোট ছোট শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভাগচর্যাগত
ছোটখাট সাপ্তাহিক রচনা পাঠ সভার পাশাপাশি জীবনচর্যাগত
মাসিক শিক্ষার্থী সম্মেলনের ব্যবস্থাটিও প্রবর্তিত হয়েছিল। কিন্তু
প্রতিষ্ঠান এখন বড় হয়ে গেছে; কেবল বয়স বা সংখ্যার ছাত্রছাত্রী
সমান্বয় নয়, সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় পরিবেশটিও বহুদূর এগিয়ে এসেছে।
সুতরাং এখনকার আয়োজনও সবদিকে এর অমূরূপ হওয়া আবশ্যক।
কিন্তু ছোট্টই কি আর বড়োই কি, স্থানীয় লোকসমাজ সমগ্রভাবে
সমতালে মূলত: এইরূপ সর্বাঙ্গীন চর্চার অমূরূপ ব্যবস্থা সুব্যবস্থিত
হয়ে না চললে, কোনো দিকটাই সুরঞ্জিত হয়ে উঠবার নয়;
তাতে দু-একদিকের কাজ চলাচলও ক্রমে অচল হয়ে আসে;
বিশেষ করে এ কথাটা ক'জনে সেখানে ভাবছেন, তাও আজ
প্রতিষ্ঠানের হালচালে স্পষ্ট বোঝবার উপায় নেই।

পাঠ্যনির্বাচন, প্রতিদিনের পড়শুনা, সাময়িক পরীক্ষা,
পাশ-ফেল,—এ সবের ব্যবস্থা করে থাকেন সেখানে 'বিভাগ-
সমিতি'। কিন্তু আদর্শ বা উদ্দেশ্যে যা-ই বিভাগায়িত থাকুক,
স্বভাবচরিত্র সমন্বিত জীবনযাত্রার দিকটার কার্যত উদাসীন হ'তে
হ'তে আজ এই 'নিখিল জ্ঞানায়তনে'ও শেষে পাশ-ফেল-এর অর্থও
ডিক্রি-কেন্দ্রিক মানুষ লক্ষ্যভেদে এসে ঠেকেছে বিভাগচর্যার বা-কিছু
উত্তম। এর প্রতিক্রিয়া সমূলে প্রতিষ্ঠানের আদর্শধ্বংসী। সেই
প্রতিক্রিয়াকে রোধ করতে পারে এবং একই কালে বিভাগচর্যাকে রোধ,
চরিত্র ও ব্যবহারের সঙ্গে সুসংগত করে সর্বাঙ্গীন শিক্ষাকে জীবনে
সর্বতোভাবে সার্থক করতে পারে,—'বিভাগ-সমিতি' ও 'শিক্ষাসেবী
সংঘ'—এর সহযোগিতামূলক যুক্ত-ব্যবস্থাই তার একমাত্র উপায়। এই জন্তই
প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এই দুটি-সংস্থারই সমন্বয়সাধন প্রয়োজন হওয়া আবশ্যক।
তাই যদি হয়, 'শিক্ষাসেবী সংঘ'রও কাজ হবে তখন, 'বিভাগসমিতি'
কর্তৃক নির্ধারিত পাঠ্যচর্যার মতো প্রতিষ্ঠানের সকলের আচারাচর্যার
রীতি-নীতিক্রম নির্ণয় করা এবং প্রতি মাসে বড়োদের নিকট থেকে
সংগৃহীত প্রত্যেকটি পরিবার ও ছাত্রাবাসের ছাত্রছাত্রীদের দিনচর্যা-
লিপি,—অর্থাৎ বিভাগবিবরণী-রূপ প্রোগ্রেস রিপোর্ট-এর মতো চার্ট
একটি পূরণ করে বড়রা বা দেবেন সেগুলি (ক্রমে সম্ভবমতো বড়দের
নিজেদের চার্টও) পরীক্ষা করা। সে সঙ্গে কর্তৃপক্ষেরও রীতি
হবে,—'বিভাগসমিতি' পরিচালিত বিভাগপরীক্ষার নথির সহিত সমান
গুরুত্ব দিয়ে 'শিক্ষাসেবী সংঘ'—পরিচালিত এই দিনচর্যালিপি পরীক্ষার
নথর মিলিয়ে দু'দিকের বাচাই-করা ফলের উপর নিম্ন থেকে
সর্বোচ্চ মানের সকল শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদেরই শেষ পাশ-ফেল
নিরূপণ করা।

মনে রাখা দরকার, শিক্ষা জিনিষটি যেমন একটি সাধনা,
তেমনি শিক্ষা একটি বিজ্ঞানও। সুতরাং বৈজ্ঞানিক ভাবে এ
বিষয়টির অমুখাবন ও নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন আছে। নথর-দেওয়ার
বৈজ্ঞানিক রেকর্ডের ভিত্তিতে বিভাগের দিকটা যদি চলতে পারে,
তবে সেখানে ঐ পদ্ধতিক্রমেই আচার-ব্যবহারের অস্ত-অর্থও

সমান তাই নিয়ন্ত্রণসাপেক্ষ। অতএব এটা অবাস্তব কিছু নয়। পরন্তু এরূপ দিনচর্যার চার্ট-পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হলেই আশা করা চলে যে, ছাত্র-ছাত্রীরা এর পর থেকে 'জানায়তনে' এসে আর কিছু না হোক, অন্তত বিজ্ঞান মতোই পাশের নম্বরের অনিবার্যতার দায়ে পড়ে হলেও, মনন এবং আচার-ব্যবহার সমৃদ্ধ চরিত্রবানকেও সমান গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য বিষয়রূপে জানাবে এবং শুধু থেকে শেখাবণি, বিজ্ঞান ও জীবনযাত্রায় হৃদিক দিয়েই সমভাবে উৎসাহ ও নিয়ন্ত্রিত থেকে নিষ্ঠাপরায়ণ হয়ে চলবে। তখন সেই অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাত্রা যেমন তাদের বিজ্ঞান উন্নতিলাভের সহায়ক হবে, তেমনি অনিয়মিত সেই পরিবেশে সংযত ও নিবিষ্ট চিন্তার বিজ্ঞানিষ্ঠাও জীবনযাত্রাকে উন্নত করে তুলবে।

লক্ষ্য করার বিষয় যে, আজ-কাল যেমনই দেশে দারিদ্র্য বাড়ছে, জীবনে মানুষ হ্রস্বছাড়া হচ্ছে, তারই পাশে তেমনভর স্কুল কলেজের এলাকার বাড়ি ঘর, আসবাবপত্র, বই খাতা, সংগ্রাম, পরীক্ষা, ও প্রাইভেট মাষ্টারী কত না বহিরঙ্গী দিকে ছাত্রছাত্রীদের বিজ্ঞানেন্দ্রিয় বিষয়গুলির বাহ্যিক দেখা দিয়েছে এবং তা বেড়েছে ব্যবহৃত ছন্দছাড়া রূপে; সবই ভালো, এবং অনেক কিছুই প্রয়োজন না আছে এমনও নয়, কিন্তু এতৎসত্ত্বেও বিজ্ঞান মান, এবং তৎসঙ্গে অল্পরাগ এবং নিষ্ঠা যে সেই পরিমাণেই স্কুল হচ্ছে এইটাই ভাববার বিষয়। একে তো জীবনযাত্রার মানের সঙ্গে এসব বহিরঙ্গীর আড়খয়ের সংগতি থাকার প্রশ্ন একটা আছে, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থার কথাও মনে রাখতে হয়। সময় বুঝে কাজের বহর বাড়ানো কমানোর কথাটাও চোখে অবাস্তব নয়—তা ছাড়া আরও একটি কথা আছে। ছাত্রছাত্রীদের মন আজ এমনতেই বাইরের বহু বিষয়ের আকর্ষণে বহুদিকে বিক্ষিপ্ত; বিষয় ও ব্যবস্থা প্রাচুর্যের প্রভাবে পড়ে পড়াশুনার ক্ষেত্রেও মনের নিবিড়তা ও একাগ্রতা তাদের বাড়ছে না কমছে, সেটাও দেখবার বিষয়। এক কথায় বিজ্ঞান মন বসছে না, এইটেই পাঁড়ান্নে সমস্ত। ব্যক্তি আছে, বিষয় আছে, ব্যবস্থারও কার্পণ্য দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু অভাব দেখা যাচ্ছে একটি জিনিসের; সেটি হচ্ছে সাধনার বিষয়ে মন বসানোর উপায়—এক কথায় আছে সবই,—নাই! শুধু সব দিকে সামঞ্জস্য রাখা নিয়মিত মনোবোণ ও যত্ন।

মনোবোণ ও যত্ন দ্বারা বহির্বিষয়কে অন্তরে আয়ত্ত করা যায়। বিষয়ে সহজ অল্পরাগ ও অধিকার স্বভাবতঃ যারা ভদ্র থেকেই পেয়ে থাকেন তাঁদের কথা আলাদা। যারা তা থেকে স্বভাবতই বঞ্চিত, তাঁদের ভদ্র, কৃচ্ছসাধ্য হলেও, কৃত্রিম উপায়ের পথ একটি থাকে—সেই পথই হচ্ছে শিক্ষা বা মনোবোণ ও যত্নের পথ। বিজ্ঞান ক্ষেত্রেও ছাত্রছাত্রীদের কাছে এই যত্ন ও মনোবোণের প্রত্যাশা আমরা করি, কিন্তু প্রক্রিয়ায় দিকে কিছুই বিশেষ করি না, উপদেশ দিয়েই খালাস,—তাদের উপরই আর-সবটা ছেড়ে দিই। অথচ দেখা যায়, স্বভাবে বাদের সে-ভিনিস নেই, সমাজে তাদের সংখ্যাও বেশি। এবং শিক্ষারও প্রয়োজন হয় মেধাবীদের চেয়ে এই সাধারণদের জন্যই বেশি মাত্রায়। এই সহজ সংস্কারবর্তিতদের মন বিজ্ঞান সংযুক্ত করতে হলে, শুধু বিজ্ঞান দিকে পড়াশুনার বিশেষ একটি ক্ষেত্রেই নয়, উঠতে-বসতে চলতে-কিরতে এমন কি খেতে-শুতে—সব দিক দিয়েই সর্ববিষয়ে তাদের সর্বসময়ে মনোবোণ

ও যত্নের অভ্যাসে অভ্যস্ত করানো দরকার। কেন না,—বিশিষ্ট শিক্ষার্থী বলছেন,—“যার নাম দেখা, তারই নাম শিক্ষা। ইহাও জানি, অভ্যাস দ্বারা অর্থাৎ পুনঃপুনঃ করিয়া কর্ম শিখি। মানুষের এই যে শক্তি দ্বারা কর্ম অভ্যাস হইয়া যায়, দেহের বৃত্তিবিশেষে পরিণত হয়, যে কর্ম ইচ্ছাপূর্বক বস্তুপূর্বক করিতে করিতে অনিচ্ছাকৃত ও অব্যবহৃত হইয়া পড়ে, সে শক্তি হেতু মানুষ পশুকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। (বোগেশ বিজ্ঞানিধি, শিক্ষাপ্রবন্ধ, পৃ: ২০।)

প্রাত্যহিক অভ্যাসের দ্বারা মন স্বভাবতই নিষ্ঠাবান না হ'লে সেই বিক্ষিপ্ত মনের দ্বারা বিজ্ঞানসাধনাও চরমদিনই এমনি ব্যাহত হবে, তাতে আশ্চর্য নেই। এইজন্যই কেবল বিজ্ঞান উন্নতির প্রশ্নের ক্ষেত্রেও, বিদ্যার্থী ও তার পরিবেশের সর্বাঙ্গীন জীবনযাত্রার ব্যবস্থা আবৃত্তিক রাখা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে, বিজ্ঞানকে যারা জীবনের লক্ষ্য না করে লক্ষ্যলাভের একটি উপায়-স্বরূপ মাত্র দেখে থাকেন, সেই জীবনধর্মীদের অর্থও-দৃষ্টিতে জীবনযাত্রার সংগতি শিক্ষাটা, নিছক পুঁথিগত বিশেষ শ্রেণীর বিজ্ঞান চেয়ে, মহত্বের মনে হবে। তাঁদের কাছে দিনের প্রতিটি চলাফেরাই হবে বিশেষভাবে মূল্যবান। স্তব্ধতা তাঁরা স্বভাবতই 'বিশেষ-বিজ্ঞান'র চেয়ে সর্বাঙ্গীন জীবনযাত্রাব্যবস্থাই 'একমাত্র-জিন্দা'রূপে সাধনা করবেন, যার মধ্যে বিশেষ-বিশেষ বিজ্ঞানও এক একটি বিশেষ স্থান পাবার কথা। তাঁদেরই অভিমত এই যে, “বিজ্ঞান জাহাজ, ও জানের ভাণ্ডার হওয়া অপেক্ষা স্ফটিক-অভ্যাস লক্ষ্য গুণে শ্রেয়:। সৃষ্টিচারণ ও সদ্যবহার স্বাভাবিক ধর্মের মূল।”—(বোগেশ বিজ্ঞানিধি: শিক্ষাপ্রবন্ধ পৃ: ৭।)

দেখা যাচ্ছে, বিশেষ-বিজ্ঞান বা সর্বাঙ্গীন-জীবন যে—লক্ষ্য হতেই যিনি দেখেন না কেন, শিক্ষায়তনে জীবনযাত্রা প্রণালীর সঙ্গে বিজ্ঞান ব্যবস্থা সংগতিপূর্ণ হওয়া চাই,—একথা স্বতঃসিদ্ধ।

এখন কথা হচ্ছে চরিত্র বা জীবনযাত্রার এই দরকারী ব্যবস্থাটি সমাজে চালু করার ভার গ্রহণ করবেন কে, এবং কি-ভাবেই বা তিনি চালু করবেন। একের নয়, এখানেই প্রয়োজন আজ,—সকলের। প্রতিষ্ঠানের কোনো-বিশেষ এক-শ্রেণীর কর্মীও নয়, পরিবেশের সর্বাঙ্গীন বিত্তশক্তির সমস্ত শিক্ষকশ্রেণী ছাড়াও, নানাক্ষেত্রের নানাশ্রেণীর কর্মি-সমাবেশে গঠিত সর্বাঙ্গীন-সমাজের পরিচালনায় চলবে প্রতিষ্ঠানের এই সর্বাঙ্গীন জীবন। নানাদিক থেকে নানা অভিজ্ঞতার সাহায্য দিয়ে নানাভাবে ছাত্র-অভিভাবক-শিক্ষক-কর্মী-সম্মিলিত এই গোষ্ঠীজীবনটিকে রচিত, নিয়ন্ত্রিত ও সেবাসমৃদ্ধ করে বিচিত্র ঐশ্বর্যে দশ দিকে প্রসারিত করে তুলবেন। তাহলেই দেখা যাচ্ছে 'জানায়তনে'র বিশেষ ক্ষেত্রেও আসে এই বিশেষ কাজে 'শিক্ষাসেবী-সংঘের'ই দায়িত্বের কথা। এবং সেই দায়িত্বের মূল্যবিচারে স্বতই পরিস্ফুট হয় প্রতিষ্ঠানের 'ব্যবস্থাপক-সমিতি'তে 'শিক্ষাসেবী সংঘের'ও প্রতিনিধি থাকার গুরুত্ব। বিশেষ এই আনন্দিক গুরুত্বই দেখা যায় 'জানায়তনে'র গঠনকার অস্বীকৃতির কঁক পড়ে আছে।

অত্মদিকে দেখা যায়, স্বীকৃতি আছে প্রতিনিধিসভা এবং ব্যবস্থাপক সমিতিতে বাইরের লোকের, এবং পরিবেশ-পরিভাগী প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীর আর ভিগ্নধারী বর্তমান শিক্ষকশ্রেণীরও। এই গঠনতন্ত্রই সাক্ষ্য 'দিয়ে কোন বিশেষ-বিশেষ কোঠার এসে ঠেকেছে এখানে মানুষের মূল্য। চাকুরিহীন জ্ঞানের

প্রত্যক্ষ-সংশ্রব-ছাড়া হয়েও বহু মানুষ আছেন পরিবেশের মধ্যে,—প্রতিষ্ঠানেরই প্রয়োজনীয় নানা কাজে। জীবনযাত্রা প্রণালীর মূল্য আজ শিক্ষার বদি প্রকৃত প্রস্তাবেই স্বীকৃত হচ্চে, তবে ভালমন্দ-প্রভাব সাধারণের দিক থেকেও ছাত্র-ছাত্রীদের উপর পড়ে থাকে বলে, শিক্ষক ব্যতিরিক্ত সাধারণ কর্মী ও অভিভাবকদেরও অবধি প্রতিনিধিত্বের অধিকার প্রতিষ্ঠানের সকল সংস্থায় স্বীকৃত হচ্চে। তাঁরাও তাতে স্বগ্রহ ও স্বসমাজে থাকার কর্তব্যের মতোই প্রতিষ্ঠানে বাস করার ও কাজ করার সমশ্রেণীর দায়িত্ব উপলব্ধি করার তাগিদ ভিত্তর থেকে পেতেন এবং উপযুক্ত হয়ে চলবার কিছু-কিছু চেষ্টাও হয়তো আপনা থেকেই তাঁরা করতেন। সেই ব্যবস্থা না থাকতে, এক-পাখাওয়ালা পাখির মতো বিজ্ঞা এখানে জীবন-নিরপেক্ষ হয়ে, উড়তে গিয়ে ধুলোয় গড়িয়ে এগোবার উপক্রম করছে। অথচ, ইতিহাসের নজির ষাঁটলে দেখা যায়, এই প্রতিষ্ঠানেই একদিন প্রতিষ্ঠাতা বর্তমানে সাধারণ-কর্মীদেরও পক্ষে প্রতিনিধিত্বের সেই সুযোগ ব্যবস্থিত ছিল; ‘শিক্ষক-সভা’ বলতে শিক্ষক ও সাধারণ সকলেরই সম অধিকারের একটি চালাক-ক্ষেত্র বোঝাত। কর্মীমাজেই তখন ছিলেন ‘শিক্ষক’-নামাঙ্কিত। এতদূর ছিল এখানকার স্বীকৃতির পরিধি। এখন মহোচ্চ-ডিজিটারী হলেও চাকুরীতে ছাপমারা ‘শিক্ষক’ না হলে ‘বিজ্ঞাসমিতি’তে প্রবেশাধিকার পাবার উপায় নেই। সাধারণ কর্মীর স্বীকৃতি তো কোন দূরের কথা। ঠিক এই অবস্থায় একটা কথা ভেবে দেখবার আছে যে, গোড়া থেকে বিজ্ঞার সঙ্গে জীবনযাত্রার দায়িত্ব স্বীকার করে নিয়ে, কার্যত শুধু বিজ্ঞার একটা দিক মাত্র সরকারী স্বীকৃতিতে ব্যবস্থিত রেখে জীবনযাত্রার অল্প দিকটাকে বেসরকারী ভাবে এমননি শিথিলতার পথে গড়াতে দিলে সেটাতে প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বহীনতারই পরিচয় বাড়ানো হয় কি না। বলা বাহুল্য, বিজ্ঞাননিরপেক্ষ জীবনযাত্রার কথা এ-আলোচনার উদ্দেশ্য নয় মোটেই। তবে আন্ত-আশঙ্কার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে এই যে, জীবনযাত্রামানের দায়িত্ব এড়ানোর ফল এখনই অবিকারপূর্ণ ধরে এসে বিজ্ঞার কাছে চাপছে,—এইজন্য এদিক দিয়ে প্রস্তুত তওয়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মাজেরই অবিলম্বে প্রয়োজন, আর সেই প্রয়োজনেই, শুধু শিক্ষক আর ছাত্রসম্প্রদায় নয়, শিক্ষাক্ষেত্রে অভিভাবক এবং পারিপার্শ্বিক সমাজের সাধারণের সক্রিয় বোগ অবগতগ্ৰাহী। তাঁদের সকলেরই মধ্য থেকে পরিচালক-সমিতিতে সশ্রু গ্রহণ করে, বোধে ও ব্যবহারে বিজ্ঞা ও জীবনের সঙ্গতির ব্যবস্থা করা প্রেরঃ।

এই বিচারে দেখতে গেলে, স্বতঃই প্রতিভাত হবে যে, আজ কোনো মতে খুঁড়িয়ে চলতে থাকলেও সমগ্র ‘জ্ঞানায়তন’-প্রতিষ্ঠানের সর্বোত্তম কল্যাণ ও গৌরবের বিষয় হচ্ছে একান্তর অবহেলিত ‘শিক্ষাসেবী-সংঘ’ই। কেন না, প্রতিষ্ঠানকে আপনায় নীড় বলে সকলেই বাতে অজুতব করের ও পরম্পর সেই অভিন্নসত্তার আবহ থেকে এর জন্ত কাজ করতে প্রত্যেকে আনন্দ পান, প্রত্যক্ষ সেই সংজীবনটির বিকাশের ক্ষেত্র হচ্ছে এই ‘শিক্ষাসেবী-সংঘ’। উচ্চতম থেকে নিম্নতম,—সকল কর্মীই এখানে বহুদে স্বাধীনমত-প্রকাশের সমান অধিকারী—এবং প্রতিষ্ঠানের সর্বদিকের গন্ত-আগন্ত-ও খুঁটিনাটি সর্বাধিকারী তাঁদের সেই অধিকার প্রয়োগ করতে পারার

কথা কর্মীদের মতো অভিভাবক এবং স্থানীয় সমাজের স্থায়ী-বাসিন্দাদের পর্যন্ত এই ‘সংঘের’ অন্তর্ভুক্তি করে গ্রহণ করলে ভালো হয়। প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে এঁদের সকলকে পারিবারিক সভ্যের অংশ নিতে বলতে হলে মতামত প্রকাশের এই সার্বভৌম অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্র একটা-কোথাও তাঁদের জন্ত কিছু থাকাই চাই। এইটাই হচ্ছে ‘শিক্ষাসেবী সংঘের’ মূল্য সার্বিকতা। সে সজেই থাকা চাই জড়তা-বুদ্ধির জন্ত সামাজিকতা-প্রসারের আয়োজন। উৎসবাহুতান খেলাধুলা, ভ্রমণ, বনভোজন, বড়তা, পাঠসভা, অভিনয়, জলসা নুখে দুখে পারম্পরিক সহায়তা ও সেবাসুশ্রী ইত্যাদির মধ্য দিয়ে যৌথ মেলামেশা ও চিন্তাধারা বিনিময়ের সাহায্যে এই সামাজিকতার প্রসার হতে পারে। বিজ্ঞ নিত্যকার জীবনযাত্রা সর্বদায় চাট-পরীক্ষার প্রস্রের সম্মুখীন হচ্চেই তখন দেখা যাবে ‘স্বীকৃতি’র কার্যকরী আসল দায়িত্বের বামেলা রয়েছে কোন্‌খানে। এই কাজটির স্বীকৃতি পেলে পাড়ার পাড়ার ও ছাত্রাবাস সমূহে আঞ্চলিক কমিগণ ‘শিক্ষাসেবী সংঘের’ পক্ষ থেকে নিজ নিজ অঞ্চলে শাখা স্থাপন করে চাট পরীক্ষার কাজ চালাবেন। শুধু পরিবার বা ছাত্রাবাস থেকে সোজাসজি দূর পূরণ করে চাট পাঠিয়ে দিলেই চলবে না, অভিভাবকদের দেওয়া সেই নম্বর আঞ্চলিক শাখার সভাদের দ্বারাও পরীক্ষিত হওয়া চাই, তারপরে তা আসবে ‘সংঘের’ কেন্দ্রীয়-সমীক্ষাগারে; সেখান থেকে অল্পমোদিত হয়ে যাবে তা দস্তরাখান্দের অফিসে। সেখানেই বিজ্ঞার নম্বরের সহিত বাটাই হবে সেন-নম্বরের পারম্পরিক প্রভাব ও উপবেগিতা। কে কি তাতে চলে-ফিরে, শুধু বরোয়া ব্যক্তিগত দিক থেকে নয়, পাড়া-প্রতিবেশী এবং সমগ্র প্রতিষ্ঠানবাসীর সামাজিক বিচার থেকে অভিমত এ ভাবে চোলাই হয়ে এলে তার মূল্য হবে। সে অধুয়ারী সকলের জীবনযাত্রা এবং বিজ্ঞাসাধনায় একই সঙ্গে এর দ্বারা পরিচালিত ও উন্নত হতে পারবে, তাতে সন্দেহ নাই। এই সূত্রে বাড়ির অভিভাবক এবং স্কুল কলেজের শিক্ষকদের কাজের পরিচয় পরম্পর অজানা থাকবে না। ভাল কাজ মন্দ কাজ,—সকলেরই সব-কিছু উপযুক্ত ব্যবস্থা পাবে। কোন পক্ষই কোনো পক্ষের উপর অবধা দোষ চাপিয়ে বেহাই পাবেন না। সাধারণ জট-অভাব-অভিযোগাদি সমবেত সকলের উদ্ভাবিত সূচিস্থিত উপায়ে ও সহযোগী ব্যবহার ক্রমে ক্রমে নিশ্চয়ই নিরাকৃত হবে।

২

শিক্ষাসেবীসংঘ

সাধারণ সমস্তার শিক্ষাসেবী-সংঘ আলোচনার ক্ষেত্র বিশেষ একটি আবাসিক প্রতিষ্ঠানের কাল্পনিক উদাহরণের অবতারণা করার সার্বিকতা এই যে মূল সমস্তাটির গুরুত্ব সাধারণের কাছে এতে স্পষ্ট হবে। জীবনযাত্রার দায়িত্ব-নিরপেক্ষ বিজ্ঞাচর্চার সেওয়াজই আজ ঘরে-বাইরে পুরাদমে চলছে; স্তেমনি, আর সকল স্থলে দুর্গতিও বা ঘটছে তার তো কথাই নেই, কিন্তু যেখানে আটবাট-বাঁধা হয়ে হাতের মুঠোর রয়েছে সঙ্গীত ছাত্রছাত্রী-অধ্যাপক-কর্মী ইত্যাদির সমগ্র দিনযাত্রার হাল, চোখের উপরে চলছে সকলের চলাফেরা সেখানেও চোখ কেবলে মিলবে আজ একই দ্বারার অজুতন ইতিহাস। স্ততবাঃ সকলে বুঝতে পারেন সমস্তাটা কত

শক্ত, সংক্রামক এবং গভীর ভাবে ব্যাপক, আর সেইজন্যই সমাজের সকলে মিলে কত শীঘ্র তার সমাধান চেষ্টায় অগ্রসর হওয়া আবশ্যিক।

সমগ্র সমাধানের জন্য যে উপায়ের প্রস্তাব করা হয়েছে, সেটি কেবল চিরচরিত মতে ছাত্র ও শিক্ষককেদ্রিক নয়, তাঁরা তো আছেনই, তৎসহ অভিভাবক এবং কর্মীদেরও এতে ডাক পড়েছে—এক কথায় প্রস্তাবটি হচ্ছে সংশ্লিষ্ট সকলেরই সহযোগিতায় সাধারণ পরিবেশ-কেদ্রিক। বোধ চেষ্টায় অঙ্কলে অঙ্কলে সর্বাঙ্গীন-শিক্ষামূলক সামাজিক জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রণ হল তার সার কথা। একদিকে এজন্য চাই সমাজ-সংস্কারপন একটি সুগঠিত সাধারণ জনমণ্ডলী, জ্ঞানায়ত্তনের সীমাবদ্ধ আবাসিক ক্ষেত্রে থাকে বলা হয়েছে ‘শিক্ষাসেবী-সংঘ’ অতদিকে চাই তারই সামাজিক কৃত্য—যে যবে ব্যক্তিগত জীবনযাত্রা বা দিনচর্যার সংগঠন ও তদনুযায়ী চাট সংগ্রহ ও তা পরীক্ষার ব্যবস্থা করা।

গুণ শিক্ষকদের উপর শিক্ষার ভার সব ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকার মধ্যে আসলে দায়িত্ব এড়ানোর ভাব কতটা থাকে, তাও খুঁটিয়ে দেখা দরকার। বর্তমান সামাজিক বিশপ্ৰস্তু অবস্থার সবদিকেই সকলে বানচাল। বস্তুত, শিক্ষকমণ্ডলীও সামাজিক লোকবিশেষ; জীবিকা এবং জীবনের নানা দায়ে পড়ে, শেষ পর্যন্ত অনেকেই তাঁরা শিক্ষাকেই একমাত্র জীবন সাধনার বিষয় করে নিতে পারছেন না, নিলেও অনেকক্ষেত্রেই লক্ষ্য স্থির রাখতে পারছেন না। জীবনসংগ্রামে যুঝে যুঝে আপনাদের ব্যক্তি ও পরিবারগত সীমাবদ্ধ সত্তাকে বজায় রাখবার বা বাড়াবার জন্য সমাজের আর দশজনের মতোই তাঁদেরও থাকতে হয় ব্যস্ত। সমাজের কাজে আসা নেহাৎ যেটুকু না হল নয়, অনেকেই আগে তাঁরা কর্তব্যবাহিনী হিসাবে ক্লাসের কটন মাফিক সেইটুকুতেই দৃষ্টি রাখেন নিবদ্ধ; শিক্ষকতা এতে জাতীয় সাধনার মর্যাদা হারিয়ে ব্যবসার ছাপ নিতে চলেছে—এটা আদর্শ বা কাম্য না হতে পারে, কিন্তু বাদানুবাদের পাবে এটাই আজকের বাস্তব অবস্থা। জাতির দ্বিতীয় জন্মদাতা এই শিক্ষকসমাজের মর্যাদা ও সর্বাঙ্গীন ভরণপোষণের বখাযোগ্য দায়িত্ব পালন থেকে সমাজ বঞ্চিত হাত গুটিয়ে নিয়েছে, তখন শিক্ষকরাও দেখা যায় নিজেদের সাংসারিক সর্বাঙ্গীন দায় নির্বাহ করতে নিজেরাই অল্পবিস্তর উত্তোষী হয়ে চলেছেন। এর পরিণতিতেই তাঁরাও এরূপ বৈষয়িক হয়ে উঠেছেন। তাছাড়া, চাকুরির হিড়িকেও এপথে বেনোজলের মতো কঁাকে কঁাকে ঢুক পড়েছেন অনেক লোক,—শিক্ষার আদর্শ বা সাধনার ধারা স্বভাবতই উদাসীন। তাই ব্যাপারটা এখন পক্ষাপক্ষে-দোবারোপের ব্যাপার নয়; সময়ে-কয়েক বলেই বাস্তবকে গ্রহণ করা ভালো। এর মধ্যে কাজের কথাটা হচ্ছে এই যে,—শিক্ষক-সমাজের পাশে এসে দাঁড়িয়ে নিজের দায়েরই এ অবস্থার ব্যবস্থার নিতে হবে এখন অভিভাবক-মাজকেই; এবং পারিপার্শ্বিক সমাজকেও সমষ্টিগত-ভাবে এগিয়ে আসতে হবে জাতীয় কল্যাণার্থে জাতির ভারী বিনিয়োগ মজবুত করার জন্য। শিক্ষার ইমারতকে সর্বাঙ্গলই উন্নতিকর কার্যধারায় সমুন্নত রাখতে দশে মিলে দেখে শুনে বখোচিত সাহায্য দান করা চাই;—‘জ্ঞান’-‘জীবনদানের’ চেয়ে এ দান আরো সামগ্রিক, বৌলিক ও জগদ্রি। কারণ, এ মাটির জমি নয়, এ যে ‘দামব জমিন’। এই দানেরই প্রায়শ কার্যকরী রূপ নেবে,—কি আবাসিকে

আর কি-বা শহরে-মফঃস্বলে, সর্বত্রই আঞ্চলিক পাড়ায়-পাড়ায় সংগঠিত ‘শিক্ষাসেবী-সংঘ’ ও তার পূর্বোক্ত পদ্ধতিতে দিন-চর্চার চাট-পরীক্ষার কাজে। নিজ-নিজ পাড়ার দায়িত্বশীল ছেলেমেয়ে, অভিভাবক ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সমবায়ের বদি পাড়ার সকলের দিনচর্চার দায়িত্বপালনের কাজটি সবাই দৃঢ়নিষ্ঠায় স্তম্ভশীল ভাবে পরিচালিত হয় তবে দেশের ভারী নাগরিক ছেলেমেয়েদের এরূপ ‘বয়ে বাওয়া’র দিন যে ফিরে যাবে, এ কথা নেহাৎ আকাশ-কুসুমের পোষকতা নয়, কেন না, জাতীয় আন্দোলনের প্রায়শ থেকে স্বামী বিবেকানন্দের ও গান্ধীজির সংগঠনী প্রেরণার যুগেও এই ধরণের অল্পকূল নজির পাড়ারগায়ের প্রত্যন্ত অঞ্চল-অবধি কিছু-কিছু পরিদৃশ্যমান হয়েছিল। তেমনি হবার আবহাওয়া সৃষ্টি করা চাই আগে। পক্ষ বা বর্গ—কোনো ‘বাবিকী পরিকল্পনা’র ছাপের অপেক্ষায়ই এ কাজ প’ড়ে থাকবার নয়।

পাশকরা পেশাদারী শিক্ষকেরা যেমন আছেন তেমনি থাকবেন ক্লাশ নিয়ে;—পাশ-অপাশ সবারই আপোষে কাজ করার নতুন স্থান হবে এই প্রস্তাবিত ‘শিক্ষাসেবী-সংঘ’। গুণ শিক্ষক নন, শিক্ষার সঙ্গে ধারাই সংশ্লিষ্ট থাকবেন, তাঁরাই শিক্ষাসেবী নামের অধিকারী; আর ঠিক মতো তাঁরা তাঁদের অধিকার প্রয়োগ করলে দেখা যাবে, ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বড়দের সমাজেরও আবহাওয়া ফিরে গেছে; ঘরের থেকে, পাড়ার থেকেই পূর্বোক্ত সংগঠক কর্মীদের উত্তোষে নতুন ধরণের আনন্দময় এক সুনির্ভল শিক্ষাজীবন গড়ে উঠেছে—স্কুল-কলেজ আশ্রম স্থানভাসিটি ইত্যাদি বেনদী বা সরকারী শিক্ষালয়গুলি তখন কেবল সাহিত্য-বিজ্ঞানীদের টেকনিক্যাল এডুকেশনের স্থান নিয়েছে, অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ বিষয়ের বিশেষ ফরমুলা বা ‘সূত্র’ের এবং ‘আঙ্গিক’ের (কৌশলের) সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানটুকু বিশেষজ্ঞদের নিকট থেকে বুঝে নেবার স্থান বিশেষ হাওয়ারতেই তাদের সীমাবদ্ধ মূল্য দাঁড়িয়েছে। প্রকৃত শিক্ষা চলেছে স্কুল-কলেজের বাইরেই। অগোচরে সেখানেই গড়ে উঠেছে ঘরে ঘরে যে নতুনতম এক বিশ্ববিদ্যালয়, তার নাম গৃহভারতী। আর বলতে গেলে এই ‘গৃহভারতী’র আচার্য, উপাচার্য হবেন অল্প কেউ নন,—অভিভাবক পিতামাতা; এমন কি, নিরক্ষর মায়েরাই কার্যতঃ নেবেন ভার মাছুষ-গড়ার; সে কাজে আপনিক বিত্তা তত নয়, বত বেশি আবশ্যক হবে দায়িত্ববোধ ও দায়িত্ব পালনের নিষ্ঠা। যেমন পরাকারী দেখিয়েছেন মহারসী মহিলা বিভাসাগর জননী ভগবতী দেবী। এই দৃষ্টান্ত সামনে রেখেই আরো মনে হয় কবির কথা কত সত্য—“না জাগিলে আজ ভারত-ললনা, এ ভারত বুঝি জাগে না জাগে না।” রাষ্ট্রীয় জাগরণের এক পালা চুকিয়েছি, কিন্তু মাছুষের বুনিরাদী পালায় আসর তেমন জমছে কৈ? তল্লাষোরে দাপাদাপি করি, জাগরণ নয়, অনেকটা এর ঘূমের ব্যারামেরই নানা প্রতিক্রিয়া মাত্র। ঘরে ঘরে মায়েরের কাছ থেকে মাছুষ বখন দৈহিক জীবনের অঙ্গের সঙ্গে মানসিক জীবনের জন্মরূপ সর্ববিষয়ে বৃত্ত ও মনোযোগের স্তম্ভগত অভ্যাসে পরিপুষ্ট হয়ে উঠবে, সেদিন থেকেই প্রকৃতপক্ষে পূর্ণ স্বাস্থ্য ও মনুষ্যত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হবে সকল মাছুষ। এজন্য শিতান্যাতা কিশেব করে মায়েরেরই বেশি উদ্বেগী করে তোলা চাই।

এমনিতেও দেখা যায়, দিনের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মাত্র ৫১৭ ঘণ্টার যেহাৎ হচ্ছে স্কুল-কলেজে, বাকি ১৭১৮ ঘণ্টার বড় পর্কটাই ছেলে

মেয়েদের কাটছে ঘরে বা বাইরে-বাইরেই। শ্রমত্যাগ সেখানকার পরিবেশ ও শিক্ষার সম্ভাবনা কিছুমাত্র উপেক্ষণীয় হতে পারে না। এতদিন ঘরে বাইরের সেই মহৎ সম্ভাবনা শিক্ষাক্ষেত্রে একান্ত উপেক্ষা পেয়ে এসেছে বলেই ছাত্রছাত্রী তথা সমাজেরও পক্ষে এই দুর্গতিভোগ জনিবার্হ হয়ে এসেছে। প্রস্তাবিত 'শিক্ষাসেবী সংঘ' সম্মিলিত হয়ে সাধারণ সকলে দেশকে এই দুর্গতি থেকে শুধু বিপন্নমুক্ত করতে পারেন তাই নয়, তাঁরা শিক্ষার ক্ষেত্রে মূল্যবান এক দৌরবন্দর ভূমিকা নিয়ে জাতিগঠনে নিজেদেরও নতুন মূল্য উপলব্ধি করতে পারবেন। সেই আত্মশক্তির উন্নত চেতনা ও অভিজ্ঞতাই হবে প্রতিষ্ঠান বা সমগ্র সমাজের প্রকৃত প্রাণশক্তি। আজ সেই শক্তির উদ্বোধনই দেশের প্রত্যেকটি শিক্ষায়তনের পরিবেশে একান্ত কামনার বিষয়।

কিন্তু এ-ও জানা কথা, কামনা হলেই হয় না, কাজে লাগবার উপযোগিতা দেশ-কাল-পাত্রানুসারে সে কামনা নিজের মধ্যে বহন করে কি না সেটাই আসল কথা। কোনো দিক দিয়ে অমুপযোগী হলে কামনার কান দেবার লোক মিলবে না, যদি বা তা মিলে, সে অমুসারে কাজ করবার লোক মিলবে ক'জন, তা বলা কঠিন। এজন্যই বলে বলে অনেকের অনেক কামনাই উবে যায়, কিন্তু লোকসাধারণকেই তার জ্ঞান দায়ী করা সব সময় ঠিক হয় না। তবে দেখা যায়, সকলেই যে প্রথমে একযোগে সব কাজে যত্নশীল হয়, তাও নয়; অনেক ক্ষেত্রে নতুন কিছু প্রবর্তনার সমাজের দৃষ্টি একদলই অগ্রণী হয়ে ক্ষয়-ক্ষতি স্বীকারের দায় ঘাড় পেতে নেন এবং সেই করেই কাজের পত্তন করেন। জেল, কাসি, কবর চাপায় তাঁরা তলিয়ে গেলেও তাঁদের মৌলিক ধারাটি তল পড়ে না। ক্রমে সেই মণ্ডলীই এক এক স্থলে আত্মপ্রসারের দ্বারা স্বাকীকৃত করেন বৃহৎ সমাজকে। দেশে এই অগ্রণীদের জাত আজ নেই এমন হতে পারে না,—আছে তাঁরা,—নানা কারণে আছেন স্রুপ্ত হয়ে; স্বাধীনতার প্রথম ধাপ জয় করে দিয়ে তাঁদেরই পূর্ব-একধারা জাতিকে উত্তীর্ণ করে দিয়েছেন মহত্তর সম্ভাবনাময় উত্তর পথে। অতঃপর যথাযোগ্য ভাবে প্রমাণ দিয়ে দিয়ে ধাপে ধাপে সে-পথ অতিক্রম করে মানবমহিমার মিলন-মন্দিরে আমাদের যথাস্থানে পৌঁছতে হবে। এই সংগঠন ও উত্তরণের কাজে প্রাধান্য নবুপ্ত সেই দায়িত্ববাহী অগ্রণীদের ভরসাতেই দেশব্যাপী চার্চ-পরীক্ষক 'শিক্ষাসেবী সংঘ' প্রসারের এই আন্তরিক কামনাটির বহিঃপ্রকাশ।

আর এক ক্ষেত্রেও কিছু কাজের প্রত্যাশা থাকে,—সেটি সংস্কারী দপ্তর। সেখান থেকে অনেক কিছু পরিকল্পনাই আজ চালু হচ্ছে। অঞ্চলে অঞ্চলে এই প্রস্তাবিত 'শিক্ষাসেবী সংঘ' বিস্তারের সার্বকতা তাঁদের বিচারের প্রাপ্ত স্পর্শ করতে পারলে তাঁরাও এই প্রচেষ্টায়, শুধু প্রোৎসাহ নয়, একে যথাযথিত প্রগতি দান করতে পারেন। তবে কিনা, সাধারণ হোক, ছাত্রসমাজ হোক, আর শিক্ষক কিম্বা সরকারী মহল যেদিকেরই লক্ষ্য-মূল পুঁড়ে দেখা যাক,—দেখা যাবে সকলেরই নির্গুহ যৌক আজ—টাকার উপর। টাকা চাই, আর তারই জন্ম চাই ডিগ্রি এবং চাকরি;—এই হচ্ছে শিক্ষার যোদ্ধা কথা। এ লক্ষ্য ভোলাতে পারে এমন পরিবর্ত এখন আর-কিছুই নেই ঘরে-কাছে। ডিগ্রির জন্মই যেটুকু বিচার দায়। সেই দায়-দারার কাজে শেখাবিধি, চুরিচামারি, দুব, জালিয়াতি, হাযপিচি, রাহাজানি, খুশখবাবৎ যে-উপায়েই হোক,

পড়াশুনার পরিবর্ত-হিসাবে স্বাগত করা হচ্ছে সকল পথকেই। আবার এর পাণ্ডার শুনা যাচ্ছে, কোন্ প্রদেশে নাকি ১২শ্রুতি আইন হচ্ছে,—ছাত্র ফেল করলে সরকারকে জরিমানা গুণে দিতে হবে মাষ্টারদের পকেট থেকে। কিন্তু সমাধানটা কি এতই সহজ? 'ফেল-করা'দের নিয়ে খামেলা আছে; ভাববার কথা এই যে, 'পাশ-করা'রই কি নির্ভরযোগ্য? যে-যোগ্যতার মান নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা পাশ ক'রে বেরবেন এবং অল্প ভবিষ্যতে সেই যোগ্যতার বলে এঁরা রাজ্য পরিচালনার যে-সব পদ অধিকার করবেন তার কলে দুদিন বাদে এঁদের হাতে প'ড়ে গোটা রাজ্যের দশাটা হবে কী? তখন যে জরিমানার উট্টা ফেরে পড়বেন সরকার নিজেই। তবিল থেকে ক্ষতির খেসারত গুণতে হবে তাঁদের পদ-পদেই; সে দুর্বৃদ্ধি সজাগ থাকলে, এভাবে একশ্রেণীর উপরেই শিক্ষার দায়িত্ব আরোপ ক'রে দিয়ে তাঁরা দায় সারতেন না। হ'-সাত ঘটায় জন্ম কাছে পেয়ে শিক্ষকরা যতই ভালো পড়ান, আর যতই কড়াডাঙি ক'রে পড়া আদায় করতে লেগে থাকুন, বাড়ির ১৮ ঘটায় খবরদারি করা তাঁদের পক্ষে কতদূর সাধ্য, সেটা সহজেই অমুমের। সেই ১৮ ঘটায়ই কীকে দশ দিকের প্রতিক্রিয়া ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যে উডোমনের পাকা-দখল কার্যে মক্কে চলেছে,—পড়াশুনা বা কোনো নিষ্ঠাসাধ্য গভীর বিষয়ই কোনোদিন তার কাছে আমল পাবে না। বিষয়ে মন না বসলে কেবল উপদেশের তাগিদেই কাজ হবার নয়, ঘরে-ঘরে সে তো প্রমাণিত হয়েই চলেছে। কেবল অভিভাবক, বা, পাড়াপড়শী,—বিক্ষিপ্তভাবে কারো কথাত্তেই কিছু হবার নয়। অচ্যৎ ঘরে-ঘরে প্রত্যেকেরই এবং দেশেরও প্রধান সম্বল এই ছাত্র-ছাত্রীদল। তাঁদের চরিত্র ও বিচার যথাযথিত উন্নতি না হলে, সকলেরই পক্ষে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে ক্ষতিগ্রস্ত হবার কথা। এই দিক দিয়ে সর্বাঙ্গীন মনোযোগ ও বহু অভ্যাস-বিধায়ক 'শিক্ষাসেবী-সংঘ'র সারবত্তা যদি কিছুমাত্র বিবোচিত হয়, তবে সকলেরই একযোগে সংযত হ'য়ে একাজে লাগতে হবে। কে শুনবে, কে না শুনবে, বলা না গেলেও, এর সারবত্তা বিবেচনার জন্মই সকলের গোচরে প্রস্তুতবটি বলে রাখার কাজ সেবে রাখা গেল, এই সার্বকতাটুকুই আপাতত যথালোভ।

ছোটোরা স্বভাবতঃ এমনিতেই চঞ্চল আর বহির্মুখ। তার উপর আজ ঘরে-বাইরে চারিদিকে যে চাকল্যকর পরিবর্তিত, এর আকর্ষণ তাদের উপর দুর্বীর; তারা যদি বেসামাল হয়, কাজ যত কঠিনই হোক তাকে সামলাবার দায়িত্ব প্রধানতঃ বড়দের; কারণ, সংসারে তাঁরাই এসেছেন আগে, আর পরিবর্তিত জন্ম দায়ীও অনেকটা তাঁরাই। তাঁদের দায়িত্ব ছোটোদের যথাযথিত পরিচালনা ও প্রতিপালন দ্বারা সংসারে প্রতিষ্ঠিত ক'রে যাওয়া। সত্যই তাঁরা ছোটোদের কতখানি আপনাব্য এবং কতটা তাঁরা দরদী ও দায়িত্বশীল, তারই সত্যতা-প্রমাণের আহ্বান এনেছে এই 'শিক্ষাসেবী-সংঘ'র প্রবর্তনা। এর মধ্যে অভিভাবক, শিক্ষক, পাড়াপ্রতিবেশী ও সরকার—সকলেরই কর্তব্যের দায় আছে, একথা কোনোমতেই ভোলবার বা এড়াবার নয়। ভিতরের চাকল্য ও বাইরের বিষয়-প্রাচুর্যকে আজ ঠিক মতো ব্যবহার কাজে লাগিয়ে ছোটোদের অন্তর্নিহিত শক্তিকে ভেদমি বিপুলবিচিত্র ভাবে বিকশিত ক'রে ভালোবাসা দিন আজই; এই আধুনিক-কালের

সুযোগের দিকটাও আমাদের স্বাগত ক'রে নিলে, সবই আবার তেমনি মঙ্গলকর হবে। টাকা পয়সা, জমিজমা, মানসম্মান, হুকুমি,—সব কিছুই চেয়ে বড়ো মূল্যবান হচ্ছে মানুষ। মূল্যবানকে ঠিক মতো না খাটিয়ে দেউলে-সাক্ষা বুদ্ধিমান বা অধ্যবসায়ীর পরিচয় নয়। আর, বাদেই ক্ষমতা এক কথা, বড়দের ভাবী স্থান অধিকারী আজকের এই ছোটরা যখন একবার ভেবে দেখবেন যে তাঁরা জাতির কতখানি, এবং কী সম্পদের উৎস তাঁরা, আর সেজন্য কী

তাঁদের দায়িত্ব, তখন নিজেদেরই উন্নতির সহায়ক এই 'সংঘ'র সাক্ষ্যের কাজে তাঁদের স্বাগত-সহযোগ ক্রমে অক্ষুণ্ণ হয়ে শক্তি জোগাবে। কিন্তু তার আগে বুদ্ধিব্যবস্থা ক'রে কাজের কথাগুলি তাঁদের শোনানো চাই; বড়দের কাজ হবে বৈধ ধ'রে সহ ক'রে ছোটদের ব্যক্তিগত ও দায়িত্বের সম্বন্ধে ছোটদের সচেতন ও অভ্যস্ত ক'রে তোলা। এ কাজে পরাধীন হলে জাতির ক্ষয় অনিবার্য, অগ্রসর হলে জাতীয় উন্নতি অবধার।

রাজধানীর পথে পথে

উমা দেবী

তিনটি চিত্রিত পুতুল

উত্তর চিংপুর রোডের
অন্ধকার কৃষ্ণ পটভূমিতে
কড়া রঙের ছোপ দিয়ে আঁকা
লাল নীল সবুজ শাড়ীপরা
দাঁড়িয়ে আছে তিনটি চিত্রিত পুতুল।
—চমকে উঠল চাবুক-খাওয়া মন।

অল্পক্ষণ গ্যাসের আলোর ধাম ঘেঁসে
ট্রামের তার চলে গেছে টলতে টলতে
দোকান-পশরার বিচিত্র সজ্জারের পাশ দিয়ে।
সেখানে তামাকের গন্ধের সঙ্গে মিশেছে ফুলুরিভাজার গন্ধ—
বাজনার দোকানের শিরীষের আঠা তৈরীর গন্ধে মিশেছে
ফুলের দোকানের বেল-চাঁপার গন্ধ।
ট্রাম চলেছে বিমিয়ে বিমিয়ে স্বয়ং স্বয়ং শব্দ তুলে,
অলে উঠে সরে যাচ্ছে বেলোয়ারি চুড়ির রঙ-বলসানো দোকান—
তারই মধ্যে মধ্যে এক একটা সুরু সুরু কানা গলি—
অবচেতন মনের কানা ইচ্ছের মতন।
আর সেই অবচেতন মনের অন্ধকারের পাকে জড়ানো গুটিপোকার
প্রজাপতি হওয়ার স্বপ্নের মতন—
সেই গলির অন্ধকারের পটভূমিতে আঁকা হ'য়ে আছে—
লাল-নীল-সবুজ শাড়ী-পরা তিনটি চিত্রিত পুতুল।

তাদের ঠোঁটে রঙ, চোখে কাজল, বেগীতে রঙিন ফুল,
তবু তাদের দৃষ্টিতে দিশাহারা বিহ্বলতা—
তবু তাদের দেহবস্ত্রের অস্থির কম্পন তাদের আঙলে আঙুল
—নীলব—নিখর তিনটি চিত্রিত পুতুল।
উত্তর চিংপুর রোডের এক অন্ধকার গলির হারার।

যেন অন্ধকারের সমুদ্রে ঠেলে সামনে আসতে পারছে না তিনটি রক্তপদ্ম,
তিনটি রক্তিম হৃদয়ের অস্তিম বাসনা হারিয়ে গেছে রাত্রির হতাশায়,
তিনটি জীবনের রঙিন মোমবাতি ধীরে ধীরে গলে যাচ্ছে অতলান্ত খাদে,
যেন যেমন পদ্মা বুড়ীগঙ্গার তিনটি হারিয়ে যাওয়া ঢেউ
আছড়ে পড়েছে এই গলির অন্ধকারের সমুদ্রে।

জানি এই অন্ধকারের সমুদ্রে জোয়ার এসেছে অনেক বার,
অনেক বৈশালী উজ্জ্বলতার রাজগৃহ বারান্দার
অত্রিপালী শ্রামা স্তম্ভা শালবতী পদ্মাবতীর দল
ভাসিয়ে দিয়েছে সুরভি কামনার মদির মালিকা ঘোঁরনের উদ্ধাম শ্রোতে,
বাদের চোখে ঝলসে নীলকান্তমণির রক্তিমভ জ্যোতির ফুলজ,
অথবা সুরিত হত পদ্মরাগমণির কঠিন রক্তিম,
বাদের টুক-বিচূর্ণিত মনঃশিলায় তুলনা রক্তবর্ণ চীনাগুকের বহিষ্ঠে
দগ্ধ হয়ে যেত শ্রেষ্ঠিনন্দনের রক্তের ভাণ্ডার।

জানি এই অন্ধকারের জোয়ার হয়তো কোনো দিনই নিঃশেষ হবে না,
ছড়িয়ে যাবে গঙ্গার তীর থেকে মহানগরীর দক্ষিণে পূর্বে উত্তরে
রাজপথের কণ্ঠে-উপকণ্ঠে বিবাহুতের আলা-মধুর বস্ত্রা চলে দিতে,
—জানি হয়তো এই তিনটি চিত্রিত পুতুল চিরদিনই আঁকা থাকবে
নিশীথের কৃষ্ণপটে উত্তর চিংপুরের অন্ধকার গলিতে—
বেথানকার অন্ধকারের সমুদ্রে ঠেলে ঠেলে ডুবে যাবে তিনটি রক্তাক্ত কুসুম,
তিনটি রঙিন মোমবাতির বিমর্ষ আলো গলে গলে নিবে যাবে
অনন্ত জিজ্ঞাসার

তারপর—আবার দাঁড়ায়ে আরো তিনটি চিত্রিত পুতুল
বাদের ঠোঁটে রঙ, চোখে কাজল, বেগীতে রঙিন ফুল,
তবু তাদের দৃষ্টিতে দিশাহারা বিহ্বলতা,
আর দেহবস্ত্রের কম্পনে কম্পনে হুড়ির শিলাঙ্গ।

সাহিত্যে ও শিল্পে চিরন্তনতা

জ্যোতির্ময় রায়

সাহিত্যের মূল্যবিচার সময়ের সঙ্গে পরিবর্তনশীল, না তারমধ্যে একটা সর্বকালীনতা আছে, তা নিয়ে অনেক বাস্তববাদীর মনে একটা প্রশ্ন আছে। এতকাল সত্য শিবম্ সুন্দরম্ সাহিত্যের সংজ্ঞা হিসেবে স্বীকৃত হয়ে আসছে এবং সত্য ও শিব যেহেতু নিত্যবস্তু, কাব্যরসও গণ্য হয়েছিলে কালমালিন্যের উদ্ধে। আধুনিক বাস্তববাদীরা ধোঁয়াটে সংজ্ঞায় বিশ্বাসী নয়, তারা বস্তুটাকে লোকান্তর থেকে লোকায়ত স্তরে নামিয়ে এনে বাস্তব ব্যাখ্যায় পরিচ্ছন্ন করে দেখতে চান। তাঁরা বলেন সাহিত্য হল সমাজসম্মত বস্তু—সংস্কারের ভেতর দিয়ে সময়ের সঙ্গে সমাজের কাঠামো বিবর্তিত হচ্ছে এবং সেই বিবর্তনই নিয়ন্ত্রিত করছে সমাজ-মানসের সত্য, কল্যাণ এবং রসবোধকে—অর্থাৎ সত্য শিব সুন্দর সময়োচিত। কৃতি-কল্যাণ-রীতি নীতি এবং রসবোধই বহন পরিবর্তনশীল তখন একমুগের কাব্য অজুগে ‘মমি’রই মতো মৃত জীবনের সাক্ষ্য দেবে মাত্র। অনেকে এমন কথাও বলেন, যে-সাহিত্যের সৃষ্টি আদর্শবাদের আওতায়, যার ভিত্তি পরমমূল্যের আধ্যাত্মিক অবস্থায়—বহন জানা গেল পরম বলে কিছুই নেই, সবই পরিবর্তনশীল, তখন এই নব চেতনার আলোতে অজ্ঞাতপ্রসূত সেই আনন্দলোক অর্থহীন হয়ে যেতে বাধ্য।

দার্শনিক বস্তুবাদকে জীবনদর্শনের ক্ষেত্রে অনস্বীকার্য সত্য বলেই মনে করি, কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে তার একাত্মীয় প্রয়োগের বিরুদ্ধে আপত্তি তোলায় বখেট অবকাশ আছে। যারা জীবন-দর্শনের পরিবর্তন দিয়েই প্রাক্তন এবং প্রভাবিত আধুনিক সাহিত্যকে বাস্তব করতে চান—অর্থাৎ যারা গাণিতিক নিশ্চয়তার সঙ্গে বলেন এক জীবনদর্শনে পুষ্ট সাহিত্য সম্পূর্ণ বিপরীত-শম্ভী জীবনদর্শনের অগতে গিয়ে পড়লে কোনো আবেদনই তার থাকতে পারে না, মূল ভিত্তি ধ্বংস গেলে কাঠামো ঠাঁড়াবে কিসের ওপর—তাঁদের জবাবটা খুব সহজেই দেওয়া যায়। প্রকৃতির চরিত্র মানুষের বিশ্লেষণ বা তত্ত্ব আবিষ্কারে নির্ভরশীল নয়। মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব বাস্তব হয়ে গেলে বস্তুর পতন পদ্ধতি পাগলে বাবে না, পদার্থ-বিজ্ঞানের পূর্বতন ধারণা অমুদারী বস্তু ও শক্তির বিহীন আধুনিক মতে লোপ পেয়ে গেছে, তাতে প্রাকৃতিক হালচাল কিছু বদলে যায়নি। তা বলে তত্ত্বজ্ঞানের পরিবর্তন মানুষের জীবনে নিষ্ক্রিয় এমন কথা আমি বলছি নে। বৈজ্ঞানিকের পক্ষে এ খুবই বড় কথা, প্রকৃতিকে আয়ত্তে ধরা প্রয়োজনে তাকে নিয়ন্ত্রিত করতে চান। সাহিত্যিকের কারবার কি ভাবে ঘটছে তার বিচার-বিশ্লেষণ বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিয়ে নয়, তার বিষয়বস্তু মানুষের মৌলিক ভাবাবেগের বিভিন্ন বিকাশ নিয়ে—নৈসর্গিক বা পারিপার্শ্বিক পরিবর্তনশীল ঘটনা নেহাৎই তার কাছে অবলম্বন মাত্র। স্বাভাবিক প্রয়োজন আর বৈজ্ঞানিক এ দুয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন এই অবলম্বন তার রসসৃষ্টির বেখানে বস্তুটুকু অংশ জুড়ে বসে ততটুকু মূল্য যে হারায় সে কথাও সত্য।

বিষয়গতের প্রতিটি বস্তুতে প্রতিনিয়ত পরিবর্তন চলছে, নিম্নের দৃষ্টে তা বদ্ধ বলে বিখ্যাত রবীন্দ্রনাথের বাণীর মতোই

চেঁচিয়ে উঠতো ‘হারিয়ে গেছি আমি’ বলে। এই পরিবর্তনের নোহাই দিয়ে হেরাক্লিটাস পাওনারদারদের দেনা অস্বীকার করার মতো বাতুলতাও করে বসেছিলেন—সত্যোপলব্ধির প্রথম উচ্ছ্বাসে তার প্রয়োগের একাত্মীয় বাড়াবাড়িও হয়ে গেছে। পরিবর্তনও কতকগুলো অপরিবর্তনীয় বিধি মেনে চলে বলেই নিজেকে এবং বহির্জগতকে প্রতি মুহূর্তে নতুন করে আমাদের চিনে নিতে হয় না। প্রতিনিয়ত সে পরিবর্তন চলছে তা পরিমাণগত, এই পরিমাণগত পরিবর্তনই পূঞ্জীভূত হয়ে একদিন গুণগত পরিবর্তনে রূপান্তরিত হয়। যারা রসসৃষ্টি এবং রসবোধের আপেক্ষিক চিরন্তনতার বিশ্বাসী নন, তাঁদের মতে সেই গুণগত পরিবর্তন আমাদের সমাজমানসে এসে গেছে, যদিও এখনও তাকে আতুল বলি চলে না। যদি প্রশ্ন করা যায়, প্রাচীন মহাকাব্য পড়ে আজও আমরা রস পাই কেন? তাহলে তাঁদের জবাবটা হয়ে পড়ে অজানা বকমের। আমরা রস যে পাইনে সেটাও নাকি বুঝি না, ‘ওটা’ নাকি বিপুল সাহিত্যরস নয়; ঐতিহাসিক কৌতুহল, পুরাতনের প্রতি মোহ, ইত্যাদির দুখরোচক একটা মিশ্রিত পানীয় মাত্র। আনন্দ পেয়েও যদি স্বীকার করতে হয় পাইনি, তবে সেক্ষেত্রে তর্ক না তোলাই শ্রেয়ঃ। তবে এটা দেখা যায় কাব্যের মূল্য বিচারে প্রাচীনের সঙ্গে আধুনিক মনের আজও কোনো বৈষম্য ঘটে নি। বাণ্মীকি, হোমার, কালিদাস, শেক্সপীররকে আজও আমরা মহাকবি বলে গণ্য করি—কালপ্রবাহে অপরিবর্তিত এই অতিমত রসবোধে মিলেই পরিচায়ক।

সাহিত্যের কারবার মানুষের চিত্তবৃত্তি নিয়ে, অন্তঃকরণ সেখানে পরিবর্তনের প্রভাব কতটা পড়ে, সেটাই আগে বিচার্য। সেদিক দিয়ে মানুষ যেদিন থেকে আবেগকে ব্যক্ত করতে পেরেছে উপযুক্ত ভাষায়, তারপর থেকে আজ অবধি তার চিত্তধর্মে পরিবর্তন ঘটেছে তেমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। প্রেম-ঈর্ষা-স্নেহ-ধ্বংস-কারণ-ক্রোধ সেদিন যেমন ছিল আজও তেমন আছে, বদলেছে শুধু আবেগগুলোকে উদ্ভুক্ত করার উপকরণ আর উদ্ভুক্ত আবেগের প্রকাশভঙ্গি। এককালে যে ভাষা বা ভঙ্গিতে মনে প্রেম সঞ্চারিত হতো আজ হয়তো তা কোঁধ বা হান্তরসের কারণ হয়ে ঠাঁড়ায়। উপকরণ ও পারিপার্শ্বিক এ ধরনের ভ্রান্তিকারী পরিবর্তন হয়েছে অসংখ্য কিন্তু সে পরিবর্তন মানুষের আদি চরিত্রকে স্পর্শ করেনি—কবে করবে, আজও তা আমাদের ধারণাভীত। পশু বিবর্তিত হয়ে মানবীর স্বাভাব্য পৌছতে প্রয়োজন হয়েছে কল্পনাভীত কাল—মানুষ দেখে বা মনে বিবর্তিত হয়ে কবে চরিত্রান্তরকারী অস্ত্র কোনো স্বাতন্ত্র্য লাভ করবে বা মোটেই করবে কি না সে সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করার মতো সম্বল আজও আমাদের হাতে সন্ধ্যা হয়নি। ক্রমবিবর্তনে বানর মানুষ হয়েছে আবার বানর বানরই থেকে গেছে, অন্তঃকরণ-প্রকৃতিতে নতুন শ্রেণী উদ্বোধক পরিবর্তন আসবেই, জোর করে বলা চলে না। যদি কোনো দিন আসে তবে সেদিন হয়তো আজকের চিত্তবৃত্তির চাহিদা তখনকার চিত্তধর্মের কাছে একেবারেই অর্থহীন হয়ে যাবে। এমন কি, অল্পকালের যোগসূত্রেই কোথাও হিরণ ও লুপ্ত হলে আমরা

যে তাদের পূর্বপুরুষ সেটাই আবিষ্কার করতে হবে গবেষণা দ্বারা। কিন্তু আমার কথা এই, বিবর্তনের ইতিহাসে মানুষের বয়সটা নিতান্তই নগণ্য এবং তার মূল আকৃতি-প্রকৃতির ওপর পরিবর্তনের প্রভাবটা নীতলতানুগী সূর্যেরই মতো নির্ভাবনার গ্রহণ করা যেতে পারে।

সাহিত্যের সমধিকতায় ধারা বিখ্যাত, তাঁরা অত-বড় জৈব বিপ্লবের দোহাই দিয়ে তাদের বিশ্বাসকে সমর্থন করেন না। তাঁরা বলেন, সমাজসজ্জাত বস্তুসমাজ বিবর্তনের সঙ্গে বিবর্তিত হতে বাধ্য। যুক্তি তাদের গ্রাস ততো কাব্য বা শিল্পের এক মাত্র অবলম্বন হতো যদি সমাজের পরিবর্তনশীল বহিরঙ্গ। বহিরঙ্গ সেখানে উপকরণ মাত্র, তাই এই উপকরণের স্বল্পতা সর্বকালীন শিল্পের একটি প্রধান লক্ষণ। শিল্প উপকরণ সংগ্রহ করে তটো তহবিল থেকে, এক প্রকৃতির আর মানুষের। প্রকৃতির তহবিল থেকে যে উপকরণ সংগৃহীত হয় সে দেয় অমরত্ব, মানুষের তৈরী তহবিল থেকে যতটা আসে সে করে তোলে ততটা অনিত্যধর্মী। আদি যুগল-শিল্পের অভ্যদয় প্রকৃতির দেওয়া উপকরণকে অবলম্বন করেছে। সুব আর চিত্রে মানবনিয়ন্ত্রিত উপকরণ আশ্রয় পায় কিন্তু এক মাত্র অবলম্বন হয়ে সম্পূর্ণরূপে তাকে দেশগত জাতিগত বা কালগত করে তোলায় মতো প্রতিপত্তি চড়াতে পারে না। যন্ত্রসজ্জাত সঙ্গীতের সর্বকালীন এবং সার্বভৌমিকত্বের অসিস্থানী পচ্চিয়। এই যন্ত্রলোকের বিভিন্ন স্থান-কালের বিভিন্ন ভাব-ভাষা চ-চাল আশ্রয় নিয়ে আমাদের কৃতিকে যতই বিভ্রান্ত করুক আপাত বিচারে তাকে যতই দেশ বা কালগত মনে হোক মৌল সত্তার সর্বকালীন এবং তার অন্তর্গত থাকে। কেউ হয়তো বলতে পারেন সঙ্গীতে আবার সার্বভৌমিকত্ব কোথায়, জাপানি গান বা বাজনার তো তার হাসি বা বিরক্তির উদ্রেক হয় মাত্র। তা হবারই কথা। সঙ্গীতের রসটাই সার্বজনীন, ভাষাটা নয়। বিজাতীয় ভাষাও হাসির কারণ হয় কিন্তু সেই ভাষার দেওয়াল ডিক্টরে অলম্বন ভাবের মুখোমুখী পাড়ানো মাত্র তাকে অন্তরের আত্মার বলে চিনে নিতে যত্ন সহিষ্ণু দেয় না—শাব্দিক কৌতুকের স্তম্ভভিত্তিক হই তখন অস্বহিত। তাইই সার্বভৌমিক কিন্তু ভাষাটা নয়। প্রত্যেক শিল্পেরও তেমনি একটা আনন্দবাহী ভাষা আছে বার সঙ্গে অপরিচয় আনন্দলোকের পথ ঘেঁষ করে থাকে। এ রকম আপাত দৃষ্টিকে দেখতে গেলে স্বজাতীয় শিল্প-কলারও সার্বজনীনতার সাক্ষাৎ মিলবে না। প্রতি শিল্পের উন্নত স্তরের ভাষা বিশেষ একটা শিক্ষার দাবি করে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা বা বামিনী বায়ের ছবিও বহু লোকের কাছে অর্থহীন বা হাস্যকর। কিন্তু যখনই দেখা যায় কোনো শিল্পের ভাষার সঙ্গে একবার পরিচিত হলে তার বিশেষ পদ্ধতি বিশেষ এক জাতীয় আনন্দ যে-কোনো লোকের মনেই সঞ্চার করতে পারে, তখন মানতেই হবে সব শিল্পের মৌল শিল্পত্বেই সার্বভৌমিকত্ব বর্তমান। স্যাপ্ত ভাবে মানচিত্রে এই একা আছে বলেই বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতির মধ্যে একই জাতীয় কতকগুলো শিল্পের উদ্ভব সম্ভব হয়েছে। অবিজ্ঞ কোনো কোনো শিল্পের ভাষার স্বভাবতই একটা সার্বজনীনতা বিজ্ঞমান, যেমন চিত্রকলায়।

চিত্রের উপকরণ রং আর আকৃতি-প্রকৃতির ভাণ্ডারের এই দুটি উপকরণই নিত্য বস্তু। কালোপযোগী অভিব্যক্তি এবং পরিবর্তনশীল

সমাজোপকরণ যতই তাকে আশ্রয় করুক তা গোঁই থেকে যায়—সেখানে আনন্দলোক সৃষ্টি করে যেখানও বা বর্ণবিভক্ত বস্তুসত্তা। বস্তুসত্তার রূপায়ণ সার্থক হলে চিত্র চিরন্তন হয়েই বেঁচে থাকে। গুহাবাসীর চিত্রও অতি আধুনিক চিত্রসমালোচকের নয়নকে নন্দিত করার ক্ষমতা রাখে—গুহা থেকে অভ্যর্থনা করে তাকে এনে আসন দিতে হয়, সভ্যজগতের সূউন্নত চাকরলার আসনে। মাইকেল এঞ্জেলোর চিত্র বা অল্পস্তার গুহাচিত্র আধুনিক শ্রেষ্ঠ শিল্পীর জাঁকা, আধুনিকতম বিষয়বস্তুর পাশে অমাত্রা জ্ঞান মনে হবে না। মহাকাব্যের কিছুটা অংশের রূপ সময়ের সঙ্গে কিকে হয়ে যায় কিন্তু মহাচিত্রের রূপ কার্তিকের যৌবনের মতোই কালম্পর্শহীন। এ দিক দিয়ে শিল্পের জগতে চিত্রের সর্বকালীন এবং সার্বভৌমিকত্ব সর্বাধিক।

সঙ্গীত এবং চিত্রকলার বিষয়বস্তু এবং রীতিপদ্ধতি সমাজজীবন দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয় বটে, তবু সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই তাদের মূল্য পরিবর্তিত হয়ে যায় না। কারণ এ দুটি শিল্পের কোনটাই সমাজজীবনের উপকরণকে সবিস্তারে বা স্থূলভাবে অঙ্গীভূত করার ক্ষমতা নেই। পরিবর্তনশীল উপকরণ স্পষ্ট হতে গিয়েই সময়ের উল্লে চলে যায়। কাব্যেও এ গুণ বর্তমান, যদিও সঙ্গীত বা চিত্রের মতো অতথানি নয়। কাব্যে চিত্তবৃত্তি তার প্রকাশের অবলম্বন হিসেবে সমাজ-জীবন থেকে যদিও উপকরণ আহরণ করে তথাপি পুরোপুরি বস্তুনিষ্ঠরূপে নয়—বিশেষ করে গিরিক কবিতায়, পরিবর্তনশীল উপকরণের নির্ঘাসকে শাব্দিক ব্যঞ্জনা এবং ইঙ্গিতময়তার ভেতর দিয়ে প্রকাশ করাই তার ধর্ম। উপাখ্যান-কাব্যের উপাখ্যানভাগকে জ্ঞানিমার হাত থেকে বাঁচায় তার ছন্দের ঝঙ্কার, শাব্দিক ব্যঞ্জনা এবং ইঙ্গিতময়তার আনন্দলোক। কিন্তু উপজ্ঞাস বা গল্প-সাহিত্যের বেলায় সমাজ-জীবনের পরিবর্তনশীল উপকরণগুলোই সবিস্তারে দৃশ্য অবলম্বন হয়ে কাঁড়ায় চিত্তবৃত্তিকে সাড়া দেবার। গল্পের অবাধ আতিথেয়তার তাৎকালিক সমাজ-জীবনের রীতিনীতি সমস্তা সব এসে ভিড় জমিয়ে বসে কথোপকথনের আসরে, তাতে করে সমসাময়িকের অভ্যর্থনার অতিশয়তাই দেখা দেয় কিন্তু পরবর্তীকালের পাঠকের কাছে তার রূপ ও রস বহুলাংশেই কিকে হয়ে যায়—কারণ তখনকার সমাজ-জীবনের রীতিনীতি হয়তো গেছে পাটে, সেদিন বা ছিল সমস্তা তা হয়ে এসেছে সহজ, তাই অত জাঁকিয়ে অত কথা বলার কোনো সার্থকতাই খুঁজে পাওয়া যায় না। তবু এই পরিবর্তনশীল ঘটনার ভেতর দিয়েই মানুষের চিত্তবৃত্তির কতকগুলো অপরিবর্তনীয় অভিব্যক্তি প্রকাশ পায় এবং তাইই জোরে গল্প-সাহিত্য সময়ের শিচ্ছিল পথে চলে পড়লেও একেবারে গড়িয়ে যায় না। পল্লী-সমাজের সমস্তাগুলো একালের, কিন্তু রমা-রমেশের সম্পর্কের মাহুর্ঘ্যটুকু সর্বকালের।

কবিতা এবং কথোপকথনের তফাৎটা হোমিওপ্যাথিক আর এ্যালোপ্যাথিক ঔষুধের মতো, হোমিওপ্যাথিক ঔষুধ বস্তু তার ঝাঁদ গন্ধ-রূপ হারায় বটে কিন্তু বৈশিষ্ট্যটুকু তার পুরোমাত্রায় বজায় থাকে সূক্ষ্মতম সত্তায়, এ্যালোপ্যাথিক-এ বস্তুর মূল আত্তিগত অংশও অনেকটা পরিমাণেই থেকে যায় এবং গ্রহণকালে আপাতকৃত্তিতে সেই মূল আত্তিগতটাই ঝাঁদ-বিশ্বাদের অবতারণা করে। কিন্তু একবার উদগর্য হলে মূল ক্রিয়ায় দুটোই সমান। জীবন প্রবাহের উপকরণের নির্ঘাস

নিম্নে গড়ে ওঠে কবিতা আর কথাসাহিত্যের অবলম্বন তাদেরই হুল
প্রকাশ—বার বহিরঙ্গের ওপর পড়ে কালের ছাপ। তবু বিগত
যুগের কথাশিল্পেও মনটাকে একবার প্রবেশ করতে দিলে রস আমরা
সেখানেও পাই, তবে কিনা সেটা অবিচ্ছিন্ন এবং অনাবিল নয়,
পরিবর্তিত সমাজ-জীবনের উপকরণগুলো প্রতিপদে রসবোধকে ব্যাহত
করতে চায়। কিন্তু শিল্পমাত্রেরই এমন একটা গুণ আছে, যা
আমাদের ব্যক্তিগতাকে সাময়িক ভাবে স্তম্ভিত করে মনটাকে তুরীয়
অবস্থার উন্নীত করার ক্ষমতা রাখে—অলঙ্কারশাস্ত্রে যাকে বলা হয়েছে
বিচ্ছিন্নি রস। মানুষের মৌল চিন্তাবৃত্তির প্রবাহে আজও কোথাও
ছেদ পড়েনি বলেই যে কোনো কালের সুখ-দুঃখ হর্ষ-বিবাদ তার
বাহ্যে বিস্তার করে এসে স্পর্শ করতে পারে যে কোনো কালের মনকে
—সমর্থনের এ এক অপূর্ণ সম্প্রদায় ক্ষমতা যা আপাতবৈষম্যের
বাধ্যতাকে অতিক্রম করেও আত্মস্থ যোগসূত্র স্থাপন করে। রূপকথার
অসৌক্যিক নর-নারী বা জীব-জন্তুর মধ্যও সমর্থন চিন্তাবৃত্তির পরিচয়
ঘেঁষাঘাট পাই, অমনি আত্মমনের প্রক্ষেপ দিয়েই সেই কল্পলোককে
আমরা আপনান্ন করে তুলি এবং তা থেকেও আনন্দ পাই

প্রচুর। চিন্তাবৃত্তিতে মিল পাওয়ারাত্র কল্পনাই সাহায্য করে
মনকে অতিক্রান্ত বা অনাগত যুগের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে।
প্রগতিশীল সাহিত্যের অনাগত কালের কল্পনায় যদি আমরা আনন্দ
পাই তো বিগতদিনের সত্যের সংস্পর্শই বা আমাদের আনন্দকে
উদ্ভূত করবে না কেন? ছোটো কোনোটাই উপস্থিত জীবনে
সত্য নয়।

সাহিত্যে চিরন্তনতার সবচেয়ে বড় পরিচয় তার সার্বজনীনতার।
ভাষার প্রাচীর ঘেরা জাতীয় আরতনে আবদ্ধ থেকেও স্রবোপ
পাওয়ারাত্র অমুবাদে গবাক্ষপথ দিয়েও সে তার আত্মীয়তা ঘোষণা
করে বিশ্বমানবের সঙ্গে। যা সার্বজনীন তা-ই সর্বকালীন। পৃথিবীর
বিভিন্ন অংশের বিচিত্র পরিবেশ যে ঐক্য দাগ কাটিতে পাঠেনি
কালের বৈচিত্র্য ও তাকে যুগবৈষম্যের রেখায় বাঁধতে পারবে না।
তাই কথাশিল্পকেও স্বপ্নায় আমি বলব না, বলব তার বহিরাঙ্গিক
যৌবন দীর্ঘ নয়। মানুষ বহু কাল মানুষ থাকবে তত কাল তার
স্থজিত কোনো সার্বক শিল্পকর্মের সূত্রে নেই, যৌবনোচিত রূপ-রস
কম বেশী ফিকে হয়ে যেতে পারে মাত্র।

মন

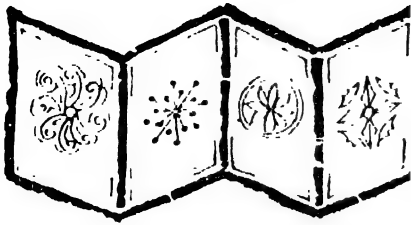
নীহাররঞ্জন হালদার

ট্রেন চলে, প্লেন চলে আর চলে মন ;
মনের সমান দ্রুত কে করে ভ্রমণ ?
চাকার মাইল দূরে—শত্রুর দেশ
কলের বোতাম টিপে কর ভূমি শেষ !
মন বলে, সব মিছে
আমি যদি খাই পিছে
সব কিছু হয়ে যাবে ছাই ;
মনের সমান জোর আর কারো নাই।
কতো দিন কতো কথা !
মাকে মাকে নীরবতা গড়ে ওঠে স্রমধূর যিঙালি।
দেখিবে তাহার শেষে
সুগোপনে কেঁদেছে সে
মন হবে হয়ে যায় খালি।
দেখা-শোনা ভাণ্ডা-ভাণ্ডা,
জানা নেই তার ভাষা ;
কতো বাধা মনে জাগে
বিশেষেতে বিনায়ের আগ্নে !

জানি না কিসের তরে
বেদনায় আঁধি করে
নাহি বুঝি তার কোন মানে।
হৃদতো তাহার মন দেখেছে সবুজ বন
উষর মরুর মাঝখানে।

মনের জোরেই ত সে বকেটে চড়েবে,
চাঁদের সোভাগ-টিপ কপালে পরবে।
মনের নাবিক হয়ে কতো উল্কা-স্ত
কতো বাধা পার হলো কতো মঞ্চ-প্রান্ত
মনেতে ভাঙ্গা রাধি
প্রাংজনে দূরে ছাড়ি
কতো জনা কতো দূরে দিয়েছেন পাড়ি ;
বারে বারে পরাজয়,
প্রতিকূলে শ্রোত বর,
তবু ত বিলীন নয় লক্ষ্যের পথ ;
জেগেছে কেবল মনে নূতন লগ্ন।

মন—মন—মন, হে আমার মন,
ভূমি ছাড়া এ জগতে কে আছে আপন ?
আমার কথার মানে
একজন ভালো জানে
সাগর বে ছয় বারে পাড়ি দিয়েছেন,
হয়তো ভূমিও জানো,—বীর সে মিহির সেন।



পত্র

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ও মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর পত্র-বিনিময়

নেতাজীর পত্র—৬

জিয়াসগোড়া পোঃ,
জে: মানডুম, বিহার,
১০ই এপ্রিল, ১৯৩১।

প্রিয় মহাশয়,

তারিখ: ১৯৩১ এবং সংক্ষিপ্ত পত্র ব্যতীত আমি আপনাকে চারটি গুরুত্বপূর্ণ পত্র দিয়েছি—১৫শে মার্চ (২৬শে মার্চ ডাকে ফেলা হয়), ২১শে মার্চ, ৩১শে মার্চ এবং ৬ই এপ্রিল। পত্রগুলিতে সাধারণভাবে কংগ্রেসের বিষয়ে এবং বিশেষ করিয়া ওয়ার্কিং কমিটি গঠন সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম। পত্রালাপ দীর্ঘ এবং বিলম্বিত হওয়ার জন্য আমি দুঃখিত। একটিমাত্র দীর্ঘ পত্রের মধ্যে সকল কথা বলিতে পারিলে সুখী হইতাম। কিন্তু দুইটি বাধার জন্য তাহা হয় নাই। প্রথমত: একটি দীর্ঘ এবং সম্পূর্ণ পত্র লিখিতে গেলে শরীর মনের উপর চাপ পড়ে। দ্বিতীয়ত: আপনার পত্রে উল্লিখিত নতুন নতুন বিষয়গুলি সম্পর্কেও আমার পক্ষ হইতে জবাব দেওয়ার প্রয়োজন। আশা করি এইটিই আমার শেষ পত্র হইবে। যে বিষয়ে আমাকে ভুল বৃষ্টিবার সন্ধাননা আছে, এই পত্রে আমি সেই বিষয়গুলি সম্পর্কে আমার বক্তব্য পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া বলিতে চেষ্টা করিব। ইহা ভিন্ন, আমার পূর্ববর্তী পত্রগুলির মূল বক্তব্যগুলির পুনরাবলোচনা করিয়া, আপনার নিকট শেষ আবেদন জানাইব।

(১) দুর্নীতি এবং হিংসা

আমি যদি আপনাকে ঠিকভাবে বুঝিয়া থাকি, তাহা হইলে চরমপত্র দেওয়া এবং সত্বর জাতীয় সংগ্রাম আরম্ভ করার আপনি বিরোধী, কারণ আপনি মনে করেন যে, আমাদের মধ্যে বশেষ্ট দুর্নীতি এবং হিংসাত্মক মনোভাব প্রকট। গত কয়েক মাস যাবৎ ওয়ার্কিং কমিটিতে এই দুর্নীতির বিষয়ে আমরা আলোচনা করিয়া আসিতেছি এবং আমার মনে হয় এবিষয়ে আমরা সকলেই একমত—পার্শ্বাভ্যুত্থান এইটুকু যে, আমার মতে, উহা (দুর্নীতি) এত ব্যাপক নহে যে, পূর্ণ স্বরাজ লাভের জন্য সত্বর সংগ্রাম আরম্ভ করা তাহা অসম্ভব করিয়া তুলবে। অপরপক্ষে, আমরা যদি নিয়মতান্ত্রিকতার পথে আরও দীর্ঘকাল গা ভাসাইয়া চলি, জনসাধারণ যদি আরও দীর্ঘকাল যাবৎ উচ্চ পদেষ্ট স্বত্ব-সঙ্কোচের মোহে আচ্ছন্ন থাকে, তাহা হইলে আরও অধিক পরিমাণে দুর্নীতি বৃদ্ধি পাইবার সন্ধাননা আছে। আরও, আমি একথা বলিতে পারি যে, বর্তমান কালের ইউরোপের রাজনৈতিক দলগুলি সম্বন্ধে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে।

প্রতিবাদের আশঙ্কা না করিয়া আমি এ দাবী করিতে পারি যে, নৈতিক দিক হইতে বিচার করিলে উহাদের অপেক্ষা কোন অংশেই আমরা নান নহি বরং কয়েক বিষয়ে অপেক্ষাকৃত উন্নতও বটে। স্তব্ধতা দুর্নীতির বিভীষিকা আমাকে ভীতিগ্রস্ত করে না। অধিকন্তু, দেশের মুক্তির জন্য আরও আত্মত্যাগের ও দুঃখকষ্টভোগের আহ্বান দুর্নীতির সর্বোৎকৃষ্ট প্রতিষেধক হইবে এবং প্রসঙ্গত: উহা আমাদের মধ্যে কোনও দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তি চূপিসাড়ে প্রবেশ করিয়া থাকিলে বা পদাধিকার করিয়া থাকিলে, জনসাধারণের সম্মুখে তাঁহাদের মূখোপস্থলিয়া ফেলা সম্ভব হইবে। তুলনামূলক ভাবে বলা বাইতে পারে যে, ইতিহাসে এইরূপ উদাহরণের অভাব নাই যখন ধুবন্ধর কুটনীতিজ্ঞগণ শবের শত্রুর হস্ত হইতে নিকৃতির জন্য বৈদেশিক শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন।

আমাদের মধ্যে হিংসাত্মক মনোভাব থাকা সম্পর্কে, আমি আমার পূর্ববর্তী পত্রে উক্ত মতই দৃঢ়ভাবে পোষণ করি। কংগ্রেস-সদস্যগণের তথা কংগ্রেসের সমর্থকগণের মধ্যে, মোটের উপর, পূর্বাশঙ্কা এখন হিংসার ভাব কল্পই। অন্ততঃপক্ষে পূর্বাশঙ্কা হিংসার ভাব অদৃশ্য নাই—এ কথা নিশ্চয় করিয়া বলা যায়। এবিষয়ে আপনা। মতের সমর্থন আমি কেন করি না, সে সম্পর্কে যুক্তি দেখাইয়াছি; তাহা পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নাই। কংগ্রেস-বিরোধীদের মধ্যে হিংসাত্মক মনোভাব বর্তমানে হ্রাস আছে, বাহার ফলে দাঙ্গা-হাঙ্গামা ঘটতেছে এবং যাহা কংগ্রেস সরকারগুলিকে কঠোর হস্তে দমন করিতে হইতেছে। কিন্তু উহা সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। উহা হইতে আমাদের এই অভিমত পোষণ করা ঠিক হইবে না যে, কংগ্রেসীদের মধ্যে বা তাহাদের সমর্থকদের মধ্যে হিংসার মনোভাব বাড়িয়াছে। যে সকল রাজনৈতিক দলের সহিত আমাদের কোনও সম্পর্ক নাই, যেমন মুসলিম লীগ,—তাহারা যতক্ষণ পর্যন্ত না ভাবে এবং কর্মে অহিংস হইতেছে, ততক্ষণ আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রাম মূলতঃই রাধা কি মাত্রা ছাড়াইয়া বাওয়া হইবে না?

(২) পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাব

পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাব সম্পর্কে আমি আপনার নিকট জানিতে চাইয়াছিলাম যে, যে-রূপে উক্ত প্রস্তাবটি উপস্থাপিত এবং শেষ পর্যন্ত পাশ হইয়াছিল, সেই রূপটি আপনি সমর্থন করেন কি না অথবা কম-বেশী আমাদের নির্দেশানুযায়ী উহারই একটি সংশোধিত রূপ আপনি পছন্দ করিতেন বাহা সর্বসম্মতিক্রমেই পাশ হইতে পারিত। আমি আরও জানিতে চাই যে, আপনি পূর্ব প্রস্তাবটিকে আমার প্রতি

আনান্যচক বলিয়া মনে করেন কি না। আপনার অবগতির জন্য আমি উক্ত প্রস্তাবটির মূল খসড়াটি এবং তাহার একটি সংশোধিত খসড়াও উদ্ভূত করিলাম।

মূল খসড়া

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন এবং তৎপরবর্তী ঘটনাবলী সম্পর্কে যে সকল বাদানুবাদ চলিতেছে এবং যে জাতীয় কংগ্রেস মহলে এবং দেশের মধ্যে নানারূপ ভ্রান্ত ধারণা দেখা দিয়াছে, তাহার জন্য কংগ্রেসের পক্ষ হইতে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা এবং তাহার সাধারণ নীতি ঘোষণা করা আবশ্যিক।

“অতীত বৎসরগুলিতে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে যে মূল নীতিগুলি কংগ্রেসে কার্যানুষ্ঠানিক প্রভাবিত করিত, বর্তমান কংগ্রেস সেই নীতিগুলির প্রতি দৃঢ় আত্মজ্ঞাপন করিতেছে এবং এই সুস্পষ্ট অভিমত পোষণ করিতেছে যে, সেই মূল নীতিগুলির ধারাবাহিকতা নষ্ট করা চলিবে না এবং ভবিষ্যতেও কংগ্রেসের কর্মসূচীকে তাহা যেন প্রভাবিত করে। গত বৎসর বে-ওয়ার্কিং কমিটি কাজ চালাইয়াছিল তাহার কর্মক্ষমতায় এই কংগ্রেস আত্মজ্ঞাপন করিতেছে এবং তাহার যে কোনও সমস্যার প্রতি কটাক্ষপাত করা হইয়া থাকিলে, তৎক্ষণাৎ প্রকাশ করিতেছে।

“আগামী বৎসর সফটাবছার সৃষ্টি হইতে পারে মনে করিয়া এবং একমাত্র মহাত্মা গান্ধীই সেই সফট কংগ্রেসকে এবং দেশকে উপযুক্ত নেতৃত্বের দ্বারা জয়যুক্ত করিতে পারেন মনে করিয়া, কংগ্রেস ইহা অত্যাবশ্যক মনে করে যে, তাহার কার্যনির্বাহক সমিতি তাঁহার পূর্বাধিকার হওয়া প্রয়োজন এবং সেজন্য রাষ্ট্রপতিকে এই অনুরোধ করিতেছে যে, গান্ধীজীর ইচ্ছামুতাবেক যেন তিনি ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করেন।”

সংশোধিত খসড়া

“রাষ্ট্রপতি নির্বাচন এবং তৎপরবর্তী ঘটনাবলী সম্পর্কে যে সকল বাদানুবাদ চলিতেছে এবং যেজন্য কংগ্রেস মহলে এবং দেশের মধ্যে নানারূপ ভ্রান্ত ধারণা দেখা দিয়াছে, তাহার জন্য কংগ্রেসের পক্ষ হইতে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা এবং তাহার সাধারণ নীতি ঘোষণা করা আবশ্যিক।

“অতীত বৎসরগুলিতে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে যে মূল নীতিগুলি কংগ্রেসে কার্যানুষ্ঠানিক প্রভাবিত করিত, বর্তমান কংগ্রেস সেই নীতিগুলির প্রতি দৃঢ় আত্মজ্ঞাপন করিতেছে এবং এই সুস্পষ্ট অভিমত পোষণ করিতেছে যে, সেই মূল নীতিগুলির ধারাবাহিকতা নষ্ট করা চলিবে না এবং ভবিষ্যতেও কংগ্রেসের কর্মসূচীকে তাহা যেন প্রভাবিত করে। এই কমিটি গত বৎসরের ওয়ার্কিং কমিটির কার্যক্ষমতার আত্মজ্ঞাপন করিতেছে।

“আগামী বৎসর সফটাবছার সৃষ্টি হইতে পারে ভাবিয়া, এই কংগ্রেস মনে করে যে, অতীতের জায় ভবিষ্যতেও মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্ব এবং সহযোগিতা অত্যাবশ্যক।”

(৩) কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল

গত ৩১শে মার্চের পক্ষে কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল সম্পর্কে যে মন্তব্য করিয়াছিল তাহা ঐ সময়ের সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ

এবং সাংবাদিক জল্পনা-কল্পনার উপর নির্ভর করিয়াই করিয়াছিল। আমার তৎকালীন এই ধারণা হইয়াছিল যে, সি, এস, পির প্রকাশ্য নেতারা মনস্থির না করিয়াই চলিতে থাকিবেন এবং তাহার পরিণামে ভবিষ্যতে এক নতুন নীতি অনুবর্তন করিবেন, যেমন, পুরাতন নেতৃত্বকে সমর্থনের নীতি। আমি ভাবিয়াছিলাম যে, তাহা হইতে আপনার মনে এই ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইতে পারিত যে, সমগ্র সি, এস, পি পুরাতন নেতৃত্বের পরিচালনায়ই চলিয়া যাইবে। সেই জন্যই আমি আপনাকে বলিতে চাহিয়াছিলাম যে, সি, এস, পির উপরের তলার নেতারা বাহাই করুন না কেন, ঐ দলের এক বৃহৎশ আমাদের সহিত কাজ করিয়া যাইবেন। ত্রিপুরাতে এই নেতাদের নিরপেক্ষতার নীতির প্রতিক্রিয়া তাঁহাদের দলের উপর বিরূপ হইয়াছিল তাহা শুনিয়াছিলাম বলিয়াই আমি ঐরূপ বলিতে পারিয়াছিলাম। কয়েকটি প্রদেশ এই নেতাদের আদেশ অগ্রাহ্য করিয়াছিল—সাধারণ সভাদের অনেকেই তাহা করিয়াছিলেন। অনেকে আবার নিম্নমাত্রাবস্তিতার অনুরোধে অথবা নৈতিক চাপে নেতাদের আদেশ লিপিবোধ্য করিয়াছিলেন। আপনাকে পত্র লিখিবার পর যে সংবাদ আমি পাইয়াছি তাহাতে সি, এস, পির নেতাদের ভবিষ্যৎ নীতি সম্পর্কে আমার যে ধারণা হইয়াছিল তাহা ভুল প্রমাণিত হইয়াছে। এমতাবস্থায় কংগ্রেসের মধ্যে ভ্রান্তনের প্রশ্ন উঠিতেই পারে না।

(৪) একদলীয় বনাম সর্বদলীয় ক্যাবিনেট

এ-সম্পর্কে আপনার যুক্তিগুলি আমি মনোযোগের সহিত পড়িয়াছি এবং বিচার করিয়াছি কিন্তু তৎসঙ্গেও এ-পর্যন্ত আমার মত-পরিবর্তন হয় নাই। হয়ত আপনার আরও যুক্তি আছে বাহা আপনার অভিমত আমার পক্ষে স্বীকার করার সহায়ক হইতে পারে। আপনার মূল বক্তব্য এই যে, প্রধান প্রধান বিষয়গুলি সম্পর্কে আমাদের মধ্যে মতভেদ এতই গভীর যে, আমাদের পক্ষে একযোগে কাজ করা অসম্ভব। হরিপুরা কংগ্রেসে আপনি আমাদের সহিত একমত ছিলেন এবং রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পূর্ব পর্যন্ত আমাদের পক্ষে একযোগে কাজ করা সম্ভব হইয়াছিল। তাহার পর হইতে কি এমন ঘটনা ঘটিয়াছে বাহার ফলে একযোগে কাজ সম্ভব নহে? আর, আপনার মতে, আমাদের মধ্যে মূল বিষয়ে মতানৈক্যগুলিই বা কি কি?

আমি জানিতে চাই, একদলীয় ওয়ার্কিং কমিটি গঠন সম্পর্কে আপনার প্রতিবাদ কি নীতিগত না আমার ২৫শে মার্চ তারিখের পত্রে উল্লিখিত ৫০-৫০ আনুপাতিক হারের জন্য? ঐ পত্রে আমি লিখিয়াছিলাম যে, আমি সাতটি নাম উল্লেখ করিব আর সর্দার প্যাটেল করিবেন সাতটি, আপনার সমর্থনের জন্য। কিন্তু আপনি যদি উপরিউক্ত অনুপাত স্বীকার করেন, তাহা হইলে আপনার পক্ষেও ঐ চৌদ্দটি নামের প্রস্তাব করা সম্ভাব্য হইবে। আপনি যদি পূর্বোক্ত অনুপাত স্বীকার না করেন এবং যদি মনে করেন যে, সর্বসম্মত সর্বদলীয় ক্যাবিনেট গঠনের পথে তাহা অসম্ভব, তাহা হইলে অনুগ্রহ করিয়া তাহা আমাকে জানাইবেন। বিষয়টি তাহা হইলে পুনর্বিবেচনার সুযোগ আমি পাইতে পারি।

(৫) শ্রীশংকর প্রভি উপদেশ

২৪শে মার্চের পক্ষে আপনি আমার জাতিকে লিখিয়াছিলেন : “সুতরাং আমি এই পরামর্শ দিতেছি যে, হয় তোমরা সকলে এক বৈঠকে সমবেত হইয়া প্রাণখোলা আলোচনা-মাধ্যমে একটা বোঝাপড়া কর অথবা বিধেয় অনুপ্রবেশ যদি এতদূর হইয়া থাকে বাহার কলে তাহা বাহির করা অসম্ভব হয়—ইত্যাদি ইত্যাদি।” আপনাদের পরবর্তী পত্রগুলিতে কিন্তু এই যুক্তির অনুপ্রবেশ করেন নাই। আমি আপনাকে একাধিক বার লিখিয়াছি যে, আমাদের দিক হইতে, কংগ্রেসের মধ্যে ঐক্য পুনঃস্থাপনের জন্ত চরম চেষ্টা করিতে আমরা প্রস্তুত। আমি আরও বলিয়াছি যে, আমাদের পক্ষে, আমাদের লইয়া এমন বহু ব্যক্তি আছেন যাহারা আপনাকে পক্ষপাতভূত বলিয়া মনে করেন না। ইহারা মনে করেন যে, যুদ্ধমান দলগুলিকে আপনি ঐক্যবদ্ধ করিতে পারেন। আমি আরও বলিতে পারি যে, একমাত্র পুরাতন নেতৃত্বকে এবং তাঁহাদের অনুগামীগণকে আপনি গান্ধীবাদী মনে করিবেন—ইহার কোনও যুক্তি নাই। আপনি যদি আমাদের কয়েকটি ভাবাদর্শ এবং পরিকল্পনা গ্রহণ করেন, তাহা হইলে সমগ্র কংগ্রেসকেই গান্ধীবাদী মনে করিতে পারেন।

আমার বিকল্প প্রস্তাবগুলি

(ক) আমার প্রথম প্রস্তাব এই যে, যুক্তিসংগ্রাম পুনরারম্ভের জন্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। এই বিষয়ে আমাদের নিকট হইতে যে কোনরূপ আত্মত্যাগ প্রয়োজনবোধে দাবী করিতে পারেন—এমন কি বর্তমানে যে সকল পদাধিকার আমাদের আছে তাহার পরিত্যাগও। যুক্তিসংগ্রাম পুনরারম্ভ করিলে, তাহা বিনাস্তে সমর্থনের অস্তিত্বই আমরা দিতেছি।

(খ) আপনি যদি মনে করেন যে, সংগ্রাম এখন আরম্ভ করা সম্ভব নয় এবং আপনি যদি পুরাতন নেতৃত্বকে পদাধিকার দিতে চান, তাহা হইলে আমার অনুপ্রবেশ এই যে, আপনি চারি আনার কংগ্রেস-সভা হউন এবং গুয়ারাকি কমিটির পরিচালন-ভার নিজের হাতে গ্রহণ করুন। উহা দ্বারা কতকগুলি বাধা দূর হইবে, যে বাধাগুলি দূর হইবার আগে সম্ভাবনা থাকিবে না যদি আপনি নিজেকে দূরে সরাইয়া রাখিয়া পুরাতন নেতৃত্বকে গদীনদীন করেন।

(গ) আমার এই প্রস্তাবও যদি আপনার নিকট গ্রহণযোগ্য বিবেচিত না হয় এবং আপনি যদি আমাকে একমুখী ক্যাবিনেট পঠনের জন্ত পীড়াপীড়ি করেন, তাহা হইলে আমার অনুপ্রবেশ এই যে, আগামী কংগ্রেস পর্যন্ত আমার প্রতি আহ্বাজ্ঞাপন করুন। আপনি আহ্বাজ্ঞাপক ভোট দিলে, আপনার “গোঁড়া” অনুগামীগণও এ, আই, সি, সি-তে আমাকে সমর্থন করিতে বাধ্য হইবেন। উহা দ্বারা তাল্লন এডান এবং নির্ভর্য্যে কাজ করিয়া যাওয়া সম্ভব হইবে। গত ৬ই এপ্রিলের চিঠিতে আমি আপনার নিকট সবিনয়ে জানাইয়াছি যে, পশ্চিম পক্ষের প্রস্তাবদ্বয়সহ শুধু যে আপনার ইচ্ছায়াসহই গুয়ারাকি কমিটি গঠন করিতে হইবে তাহা নহে, উহা আপনার বিশ্বাসভাজনও হওয়া চাই। একবার যদি এই প্রস্তাবটি অনুপ্রবেশ করেন, তাহা হইলে আপনার পূর্ণাঙ্গী বিশ্বাসভাজন নয়, এমন গুয়ারাকি কমিটি গঠনে পরামর্শ দেওয়া আপনার পক্ষে সম্ভব হইবে না।

(ঘ) আপনি যদি তিনটি প্রস্তাবই বাতিল করেন, তাহা হইলে আর একটিমাত্র পথই খোলা থাকিবে—আপনাকে গুয়ারাকি কমিটি গঠনের পূর্ণাঙ্গী দায়িত্ব লইতে হইবে। আপনার সিদ্ধান্ত ঘোষণার পর আমার ভবিষ্যৎ কর্তব্য স্থির করিবার ভার আমার উপরই থাকিবে।

(৬) আপনার মৌনতা

আপনার এক পত্রে লিখিয়াছেন যে, আমার অনুপ্রবেশই আপনি মৌনব্রত অবলম্বন করিয়াছেন। কেন ঐরূপ অনুপ্রবেশ করিয়াছিলাম তাহার ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। ত্রিপুরীতে পরিব্রূতি ঐরূপ পীড়াইয়াছিল এবং কংগ্রেসীদের মধ্যে বিভেদ এত গভীর হইয়াছিল যে, আমি মনে করিয়াছিলাম যে, ঐক্যবন্ধের একমাত্র আশাশূল আপনিই ছিলেন। তখন ভাবিয়াছিলাম যে, সমগ্র পরিব্রূতিটি নিরপেক্ষ এবং শান্ত মন লইয়া বিচার করা আপনার পক্ষে কর্তব্য। পূর্ব-প্রস্তাবের সমর্থকগণ তখন দিল্লীর দিকে ছুটিতছিলেন। তখন আমি স্বভাবতঃই ভাবিয়াছিলাম যে, ত্রিপুরীর ঘটনাবলী সম্পর্কে একতরফা একটা ব্যাখ্যা দিয়া তাঁহারা আপনাকে প্রভাবিত করিবার চেষ্টা করিবেন। সেই জন্তই আমি আপনাকে অনুপ্রবেশ করিয়াছিলাম যে, ত্রিপুরী সংক্রান্ত সমগ্র ঘটনাটি অর্থাৎ এ সম্পর্কে বিভিন্ন কাহিনীগুলি শ্রবণ না করিয়া আপনি যেন কোন সাংবাদিক বিবৃতি না দেন বা কোনও উক্তি না করেন। আমার অনুপ্রবেশ রক্ষা করার জন্ত আপনার নিকট আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। উহার ফল এই পীড়াইয়াছে যে, সমগ্র দেশ কংগ্রেসকে গৃহযুদ্ধের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্ত এবং ঐক্য পুনঃস্থাপনের জন্ত আপনার মুখে দিকে চাহিয়া আছে। ভগবান না করুন কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ যদি সেই সময় আসে, যখন আপনার দৃষ্টি পক্ষপাতভূত হইবে, তখন ঐক্যের সকল আশা ধূলিসাৎ হইবে। এবং সম্ভবতঃ আমরা গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হইব।

এখন আমি অনুভব করিতেছি যে, আপনার মুখে চাপা দেওয়া আর আমার পক্ষে উচিত হইবে না। আপনি যদি মনে করেন যে, আপনার মৌনতা ভাঙ্গা উচিত অথবা আপনি যদি মনে করেন যে, ত্রিপুরী সংক্রান্ত সকল কাহিনীগুলিই আপনি শুনিয়াছেন, তাহা হইলে আপনি আপনার খুশিমত বিবৃতি দিতে পারেন। আমি শুধু আপনাকে এই অনুপ্রবেশ করিতেছি যে, কংগ্রেসের সকল দল (যাত্র পুরাতন নেতৃত্ব নহে) আপনার সম্বন্ধে কি ভাবে এবং আপনার নিকট কি আশা করে, তাহা স্মরণ রাখিবেন।

পরিশেষে আমি বলিতে বাধ্য যে, ৭ই তারিখে সহসা রাজকোট বাইবার প্রাক্কালে দিল্লী হইতে যে তারবার্তা পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতে আমি অত্যন্ত নিরাশ হইয়াছি। ৭ই সকালে আমার পক্ষে ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ বিড়লা হাউসে টেলিফোন করিয়া জানাইয়াছিলেন, আমি আপনার সহিত সাক্ষাতের জন্ত কতখানি উদগ্রীব ছিলাম। আমি বুঝিয়াছিলাম যে, আমাদের পত্রালাপে কোনও ফল হইতেছে না; প্রাণখোলা, মুখোমুখি আলোচনা দরকার। ঐ দিনই একটু বেলায় আমার ডাক্তার বিড়লা হাউসে আপনাকে টেলিফোন করিয়াছিলেন। অপর প্রান্ত হইতে শ্রীমহাদেব দেশাই তাঁহাকে জানান যে, এখানে আসিবার জন্ত আপনি প্রাণপণ চেষ্টা করিবেন।

অন্ততঃপক্ষে আগামী দিনের পূর্বে অর্থাৎ ৮ই পূর্বে আপনি দিল্লী ভ্রাম্য করিবেন না। রাজকোট আপনাকে সরাইয়া লইয়াছে,—এজন্য আমি দুঃখিত। আমি শুধু এইমাত্র আশা করিতে পারি যে, রাজকোটের নিকট বাহা আশীর্বাদ স্বরূপ হইবে তাহা যেন কংগ্রেসের পক্ষে মারাত্মক না হয়। ফেব্রুয়ারীতে রাজকোট যদি আপনাকে সরাইয়া লইয়া না বাইত, তাহা হইলে ত্রিপুরার ইতিহাস অন্তরূপ হইত। ঐ সঙ্কট হইতে রক্ষা করার ক্ষমতা আপনার ছিল কিন্তু আমার নিকট হইতে এবং অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ হইতে পুনঃপুনঃ অনুরোধ সত্ত্বেও আপনাকে পাওয়া গেল না। যখন আপনি ঠাকুর সাহেবকে চরমপত্র দিয়াছিলেন তখন যদিও স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে সমগ্র দেশ আপনার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তথাপি আপনার দেশের এক বিরাট অংশ মনে করিয়াছিলেন এবং এখনও মনে করেন যে, রাজকোট রাজ্যের অধিবাসীদের কোনওরূপ ক্ষতি না করিয়াও আপনি রাজকোট সংগ্রাম করেক সপ্তাহ পিছাইয়া দিতে পারিতেন।

(সার মবিন্ গান্ধীর বারদান সম্পর্কে আমি এই বিষয়ে আপনার দৃষ্টি-আকর্ষণ করিতে চাই যে, তিনি উহা ব্যক্তিগত ভাবে স্বাক্ষর করেন নাই, করিয়াছেন ভারতের প্রধান বিচারক রূপে)।

আমার পত্র অত্যন্ত দীর্ঘ হওয়ায়, এখানেই থামা উচিত। আশা করি জনগণ কোনওরূপ কষ্টবোধ করেন নাই এবং স্বাধোত্তরোক্তমারতি হইতেছে। আমি বীর ধীরে স্বস্থ হইয়া উঠিতেছি।

প্রণামান্তঃ—

আপনার স্নেহের স্রোত

পাক্ষিকীর উত্তর—৪

প্রিয় স্রোত,

রাজকোট, ১০।৪।৩৬

তোমার ৬ তারিখের পত্র এইখানে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

প্রাণ খুলিয়া পারস্পরিক আলোচনার স্তম্ভ বিরোধীদের এক বৈঠকের প্রস্তাব আমি করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহার পর এত ব্যাপার ঘটয়াছে যাগার ফলে আমি জানি না উহার এখন কোনও মূল্য আছে কি না, বৈঠক হইলে তাঁহারা পরস্পরের প্রতি শূন্যবাক্য প্রয়োগ করিবেন এবং তাহার ফলে তিক্ততা বাড়িয়াই বাইবে। বিভেদ অত্যন্ত ব্যাপক এবং অবিবাস অত্যন্ত গভীর। মিলনের কোনও পথই আমি দেখিতে পাইতেছি না। আমার মনে হয় একটি মাত্র পথ আছে এবং তাহা হইতেছে এই মতপার্থক্য স্বীকার করিয়া প্রতি দলের নিজ নিজ পদ্ধতিতে কাজ করিয়া যাওয়া।

আমার বোধ হইতেছে, যুগমান দলগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া এক যোগে কাজ করাইবার ক্ষমতা আমার আদৌ নাই। আমি এই আশা করিতে পারি যে, তাঁহারা শাসনিতা বজায় রাখিয়া নিজ নিজ নীতি কার্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিবেন। যদি তাঁহারা তাহাই করেন, তাহা হইলে দেশের পক্ষে তাহা কল্যাণকর হইবে।

পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাব আমি ব্যাখ্যা করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। বতাই আমি তাহা পড়িতেছি ততই উহার প্রতি আমার বিতৃষ্ণা জন্মিতেছে। প্রস্তাব-রচনাকারীদের উদ্বেগ ভালই ছিল। কিন্তু বর্তমান সমস্তার মীমাংসা উহার মধ্যে নাই। সুরতায় নিজ বুদ্ধিতে তুমি উহার ব্যাখ্যা করিও এবং কোনওরূপ ইতস্ততঃ না করিয়া কাজ করিও বাইও।

তোমার উপর একটি ক্যাবিনেট চাপাইয়া দিতে আমি পারি মা,

দিব না। তোমার উপর ক্যাবিনেট চাপাইতে দিও না। তোমার নির্দোষ ক্যাবিনেট এবং তোমার নীতি এ, আই, সি, সি, সমর্থন করিবে এমন কথাও আমি দিতে পারি না। উহা অবদমনেরই সমতুল্য হইবে। সদন্তগণ নিজ নিজ বিচার বুদ্ধিমত্তা কার্য করুন। তুমি যদি ভোট না পাও, তাহা হইলে স্বতন্ত্র পথান্ত না অধিকাংশ সদন্তকে নিজ মতানুযায়ী করিতে পারিতেছ ততক্ষণ বিরোধীদের নেতাক্রমে কাজ করিয়া যাও।

তুমি কি জান না যে, যেখানে যেখানে আমার প্রভাব আছে, সেখানেই আমি আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করিয়া দিয়াছি? জিলাকুর এবং জয়পুর তাহার উজ্জল দৃষ্টান্ত। এখানে আদিবাস পূর্বে রাজকোট আন্দোলনও বন্ধ করিয়া দিয়াছিলাম। আমি পুনরায় বলিতেছি যে, বাতাসে আমি হিংসার গন্ধ পাইতেছি। অহিংস আন্দোলনের উপযোগী আবহাওয়া আমি দেখিতেছি না। রামধর্মের শিক্ষা কি তোমার পক্ষে বর্জ্য নয়? আমার মতে, উহা অসম্ভব ক্ষতিসাধন করিয়াছে। আমি স্বতন্ত্র বুদ্ধিতে পারিতেছি, উহা পূর্বকল্পিত ছিল। উড়িষ্যার রণপুরের ভায় এখানেও কংগ্রেসবাহী দায়ী। তুমি কি দেখিতে পাইতেছ না যে, আমরা দুইজনে একই বিষয়কে দুইটি বিশদীকৃত দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিতেছি এবং এমন কি, বিশদীকৃত সিদ্ধান্তও গ্রহণ করিতেছি? রাজনৈতিক ক্ষেত্র কি করিয়া আমরা মিলিত হইতে পারি? ঐক্যে আমাদের বিভেদ স্বীকার করিয়া লওয়া উচিত। সামাজিক, নৈতিক এবং পৌরশাসনের ব্যাপারে অল্প আমরা মিলিয়া মিলিয়া কাজ করিতে পারি। অর্থনৈতিক দিকটির কথা আমি এখানে উল্লেখ করিতে পারি না। কারণ, ঐ বিষয়েও যে আমাদের মতানৈক্য আছে তাহা আমরা সবিশেষ বুদ্ধিতে পারিরাছি।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, আমাদের নিজ নিজ মত ও পথানুসারে যদি আমরা কাজ করিয়া বাই তাহা হইলে আমরা দেশের সেবা ভালভাবেই করিতে পারিব। জোড়াতালি দিয়া জোরপূর্বক একটি সর্বদলগ্রাহ্য নীতি এবং কার্যসূচী প্রস্তত করিয়া তাহা বিভিন্ন বিরোধী দলকে দিয়া কার্যে পরিণত করিবার চেষ্টা অপেক্ষা উহা শ্রেয়ঃ হইবে।

দিল্লী হইতে তারবার্তায় আমি তোমাকে জানাইয়াছিলাম যে, ধানবাদ বাইতে আমি সম্পূর্ণ অক্ষম। রাজকোটকে অগ্রাহ্য করিবার সাহস আমার নাই।

ভাল আছি। কস্তুরী ভীষণ ম্যালেরিয়ার শয্যাশায়ী। আজ লইয়া পাঁচদিন হইল। অসুখ যখন শুরু সেবান্ন হইয়াছিল, তখনই আমি তাঁহাকে এখানে লইয়া আসিয়াছি।

আমার ইচ্ছা এই যে, স্থিরসিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া কল্যাণ ভগবানের উপর ছাড়িয়া দাও এবং তদ্বারা তোমার স্বাস্থ্যরক্ষা কর। তোমার পিতার সম্বন্ধে উল্লেখ আমার হৃদয় স্পর্শ করিয়াছে। তাঁহার সহিত সাক্ষাতের সৌভাগ্য আমার হইরাছিল।

একটা কথা বলিতে তুলিয়া গিয়াছি। কেহই আমাকে তোমার বিরুদ্ধে লাগায় নাই। সেবাগ্রামে তোমাকে বাহা বলিয়াছিলাম, তাহা আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতারশেষে। তুমি যদি মনে করিয়া থাক যে, পূর্বতন নেতৃবৃন্দের মধ্যে তোমার একটি ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব আছে, তাহা হইলে তুমি ভুল করিতেছ। ভালবাসা জানিও।

—বাপু

হেঁচলু হেঁচলু শ্রীমদ্ভগবৎ অষ্টাদশোহস্রং স্কন্দ

ধারাবাহিক জীবনী-রচনা

১১

সামান্য ক'দিনের অমুখে জগন্নাথ মারা গেলেন।

শোকে মূহিত হয়ে পড়লেন শচী দেবী।

নিমাই বললে, 'মা, চোখ চাও। আমাকে দেখ। আমি যত দিন আছি তত দিন তোমার সব আছে। তুমি কৃষ্ণ-কৃষ্ণ বলো। হরি-হরি বলো।'

হরি শব্দের দুই মুখ্য অর্থ। এক, সর্ব-অমঙ্গল হর। করে; দুই, প্রেমে মনোহরণ করে। আর কৃষ্ণনাম? 'কোটি অঃমেধ এক কৃষ্ণনামসম।' অঃমেধযন্ত্রের ফল কি? সর্বপাপবিনাশ। কিন্তু সর্বকর্ম অমুষ্ঠানেই ক্রটিবিচ্যুতির ভয়, উচ্চারণে স্বরভ্রংশের ক্রটি, নিয়মে ক্রমভঙ্গের ক্রটি, দেশকালপাত্র প্রসঙ্গে বস্তু ও দক্ষিণাদির ক্রটি। সমস্ত ক্রটির প্রতিফারের উদ্দেশে 'অচ্ছিত্র-মন্ত্র' পাঠের নির্দেশ। এই অচ্ছিত্র-মন্ত্র আর কিছু নয়, হরিনাম-সঙ্কীর্তন। 'মন্ত্রতন্তুতচ্ছিত্রং দেশকালার্হবস্তুতঃ। সর্বং করোতি নিচ্ছিত্রং নামসঙ্কীর্তনং তব।' নামের ফল শুধু পাপনাশ নয়। আরো আছে। নামের ফল চিন্তে প্রেমের আবির্ভাব। আর প্রেমের আবির্ভাবে সাত্ত্বিক ভাবের প্রকাশ। সাত্ত্বিক ভাব আট রকম। শ্বেদ, কম্প, রোমাঞ্চ, অশ্রু, স্বরভেদ, বৈবৰ্ণ্য, স্তম্ভ আর প্রলয়। তাছাড়া আর কী লাভ? 'অনায়াসে ভবক্ষয় কৃষ্ণের সেবন। এক কৃষ্ণনামের ফলে পাই এত ধন॥' প্রেমের উদয়ে ঘুচে যায় সংসারবন্ধন, দূরে যায় দুর্বাসনা। একমাত্র কামই তো হৃদরোগ, নামে সেই রোগের অন্তর্ধান।

কল্যাণ কি? ভক্তিবিরোধী কর্মই কল্যাণ। যে কর্মের উদ্দেশ্য শুধু আত্মেল্লিঙ্গপ্রীতি তাই ভক্তি-বিরোধী। হয় পার্থিব ভোগ দাও, নয় স্বর্গ দাও,

নয় বা মোক্ষ এই কামনায়ই তো ধর্মামুষ্ঠান। তাৎপর্য স্বশুখসাধন বা স্বহুঃখনিবৃত্তি। যতক্ষণ মনে ভুক্তি-মুক্তির স্পৃহা, ততক্ষণ ভক্তি নেই। ভক্তি তো আত্মমুখ নয় কৃষ্ণমুখ। ভক্তি তো আত্মপ্রীতি নয় কৃষ্ণপ্রীতি। ভক্ত ধাতু থেকে ভক্তির উৎপত্তি। আর ভক্ত ধাতুর অর্থ সেবা। সেবার উদ্দেশ্য শুধু সেবার প্রীতিসাধন। সুতরাং ভক্তি মানে কৃষ্ণকে সুখী করা। কিসে কৃষ্ণ সুখী? মমত্ববুদ্ধিতে। কৃষ্ণ আমারই, আমারই একলার, আমি ছাড়া কৃষ্ণের কেউ নেই। কৃষ্ণ আমারই লাল্য, পাল্য, অনুগ্রাহ্য। আমার লালন-পালন-অনুগ্রহের বস্তু। কৃষ্ণ আমার ঐশ্বর্যজ্ঞান নেই না বা স্বশুখবাসনা। শুধু প্রেমাত্মিকা সেবা। ভক্তপক্ষপাতিত্বই ভগবানের গুণ।

'আমার দিকে তাকাও।'

বাছ তুলি হরি বলি প্রেমদৃষ্টে চায়।

করিয়া কল্যাণ-নাশ প্রেমেতে ভাসায়॥

মন্দ-মন্দ হাসি নিমাইয়ের কটাক্ষে আর সেই দৃষ্টি যার উপর গিয়ে পড়ে তার সর্বশোক দূরে পালায়। শোকের মূলই হচ্ছে কল্যাণ। সে কল্যাণ, সে ভক্তি-বিরোধী কর্মের বাসনা বিধ্বস্ত হয়। আর তার তখন ব্রজপ্রেমে নিমজ্জন। গৌরের কথা বলবে কি, বলতে উদ্বোধন করা মাত্রই, কুশল-পটলী অর্থাৎ সর্ববিধ মঙ্গলের অভ্যুদয় ঘটবে।

শুন মাতা! মনে কিছু না চিন্তিহ তুমি।

সকল তোমার আছে যদি আছি আমি॥

ব্রহ্মা-মহেশ্বরের যে ছলভ লোকে বলে।

তাহা আমি তোমারে আনিঞা দিব হেলে॥

কিন্তু ক্রোধে একেবারে তপ্ত তাণ্ডব। সংসারের অবস্থা বুঝতে চায় না, একটা জিনিসের আবদার

করেছে কি, তখনি তা মেটানো চাই। নইলে ঘর-দুয়ার ভাঙা বাড়ির আকার ধারণ করবে নিমাই।

গঙ্গান্নান করতে যাচ্ছে, মাকে বললে, 'মা, মালা-চন্দন দাও। গঙ্গাপূজা করব।'

প্রমাদ গালেন শচী। বললেন, 'বাবা, একটু অপেক্ষা কর, মালা নিয়ে আসি।'

'নিয়ে আসি! এখন তুমি আনতে যাবে?' নিমাই, এগারো-বারো বছরের ছেলে, রুদ্রমূর্তি ধারণ করল। 'এতক্ষণ আনোনি কেন? কী করছিলে ঘরে বসে?'

দ্রুত শব্দে ঘরে ঢুকল নিমাই। যত গঙ্গাজলের কলসী ছিল একের পর এক ভাঙতে লাগল। ছোট-বড় যত ঘট ছিল ঘরে, কোনোটোর মধ্যে বা তেল মুগ বা ঘি, সকলের গায়ে মারতে লাগল লাঠির বাড়ি। যত সিকা ছিল, বড়ি বা মশলাপাতির, সব ছিঁড়তে লাগল টেনে-টেনে। শুধু সিকা নয় হাতের কাছে যত কাপড় পেল একটাও আস্ত রাখল না। তারপর আর যখন ভাঙবার জিনিস নেই তখন আক্রোশ গিয়ে পড়ল খোদ ঘরের উপর, তার দরজা-জানলার উপর। ঘর-দোর ভেঙেও ঠাণ্ডা হল না। সামনে যে গাছ ছিল তাকেই পিটতে লাগল নিঃশব্দ মত। গাছ গেছে, এবার মাটিকে প্রহার করো। লাঠির ঘায়ে জর্জর হল পৃথিবী।

জননী শচী দেবী ভয় পেয়ে গৃহের উপাস্তে গিয়ে লুকোলেন।

ভঙ্গন-যজ্ঞ সাজ করে নিমাই দাঁড়াল অঙ্গনে। অতৃপ্ত রোষে ধুলোয় গড়াগড়ি খেতে লাগল। কনক-অঙ্গ কালি হয়ে গেল মুহূর্তে। বৈকুণ্ঠপতি ধরিত্রীকে শয্যা করলেন।

চারিবেদে যে প্রভুরে করে অবেষণ।

সে প্রভু যা'য়ন নিদ্রা শচীর অঙ্গন ॥

শচী দেবী মালা আনালেন। নিদ্রিত পুত্রের শ্রীঅঙ্গে হাত রেখে ধীরস্বরে বললেন, 'ওঠ বাপ ওঠ, এই ছাথ মালা এসেছে। যা এবার গিয়ে ইচ্ছেমত পূজা কর।'

ধড়মড়িয়ে উঠে বসল নিমাই। ছি ছি, ঘরদোরের এ কী হাল করেছি! লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যেতে চাইল।

শচী দেবী বললেন, 'বেশ হয়েছে, ভালো হয়েছে। তোর আপদ-বালাই কেটে গেছে।'

ভাল হইল বাপ! যত ফেলিলা ভাঙ্গিয়া।

যাউক তোমার সব বালাই লইয়া ॥

সংসারের এত অযথা অপচয় করল নিমাই, তবু জননীর আপশোষ নেই। ক্রীড়াময় চঞ্চল বালকের জ্যেষ্ঠ আবার রান্নার আয়োজন চলল। গোকুলনগরে যশোদাকে কত সহ্য করতে হয়েছিল কৃষ্ণচাপল্য। আমিও সহ্য করি।

গঙ্গান্নান করে বাড়ি ফিরল নিমাই। তুলসী-জল দিয়ে বিয়ুপূজা করল। খেয়ে-দেয়ে হঠমনে পান চিবুতে বসল।

শচী দেবী কাছে এসে ভয়ে-ভয়ে বললেন, 'ঘরের জিনিসপত্র নষ্ট করে লাভ কি? এ সব তো তোমার নিজের জিনিস। নিজের জিনিস কি কেউ নষ্ট করে?'

মুহু-মুহু হাসতে লাগল নিমাই।

'ঘরে আর কিছু নেই, কাল খাবে কি?'

'কৃষ্ণ খাওয়াবেন।'

প্রভু বলে কৃষ্ণ পোষ্টা করিবে পোষণ।

সন্ধ্যার দিকে নাকে নিভুতে ডাকল নিমাই। 'হু' তোলা সোনা মার হাতে দিয়ে বললে, 'কৃষ্ণ পাঠিয়ে দিলেন। এ দিয়ে যত দিন চলে, সংসার খরচ করো।'

'সে কি?' অবাক হয়ে গেলেন শচী: 'এ সোনা তুই কোথায় পেলি?'

নিমাই উত্তর করে না। পাশ কাটিয়ে চলে যায় হাসতে-হাসতে।

এ কি বিপদের মধ্যে এনে ফেলল। শুধু একবার নয়, যখনই অভাব হয় সংসারে, সম্বল-সঙ্কোচ হয়, নিমাই সোনা নিয়ে আসে। কার সোনা কোথা থেকে আনে কে বলবে! ধার করে, না, এ কি কোনো অমানুষীয় বিভূতি! ভাঙাতে ভয় পান শচী। কিন্তু না ভাঙালেই বা চলবে কেন? যাকে সোনা দিয়ে পাঠান বাজারে, তাকে বলে দেন, পাঁচ-দশ টাই দেখিয়ে-শুধিয়ে তবে ভাঙাবি। আমার ভারি ভয় করছে।

ভয়ের কিছু নেই, নিমাইই সব ধরে আছে, আচ্ছাদন করে আছে।

ইন্দ্রযজ্ঞ বন্ধ করে দিল কৃষ্ণ। মহেশ্বর: কিং করিষ্যতি? জীবের পালন-পোষণের ব্যাপারে ইন্দ্র কি করবে? সুতরাং ভয় পেয়ে ইন্দ্রকে পূজা করবার কোনো প্রয়োজন নেই। স্বয়ং ঈশ্বর বলে ইন্দ্রের গর্ব, তাই কৃষ্ণাধীন গোপেদের উপর ভীষণ ক্রুদ্ধ হল

দেবরাজ। প্রলয়কর মেঘসমূহকে আদেশ করল, প্রবল বেগে বর্ষণ করো, বিধ্বস্ত করো গাপরাজ্য। বাচল বাগক, অবিনীত, পণ্ডিতমানী, অজ্ঞ, মর্ত্য কৃষ্ণকে অবলম্বন করে গোপেরা আমার পূজা বন্ধ করেছে, এ অপমান অসহ্য। বনবাসী গোপের ধনৈশ্বর্য বেশি হয়েছে বুঝি? ওদের ঐশ্বর্যমদ নিশ্চিহ্ন করে দাও।

মেঘসমূহ বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ছুটে এল দিগ্বিদিক ছেয়ে। ছুটে এল প্রচণ্ড প্রভঞ্জন। বিদ্যাম্ভালায় উজ্জলীকৃত হয় ছুটে এল বজ্র। জল আর শিলা ঝরতে লাগল অবিচ্ছেদে। গোপগোপীরা প্রথমে গৃহমধ্যে আশ্রয় নিয়ে আত্মরক্ষা করতে চেষ্টা করল কিন্তু ক্রমে সমস্ত পৃথিবী পরিপ্লাবিত হলে, উচ্চাভ্যাস সমস্ত স্থান একাকার হয়ে গেলে তারা বাতে ও শীতে কাঁপতে-কাঁপতে কৃষ্ণের শরণাপন্ন হল। বলতে লাগল, 'হে কৃষ্ণ, হে মহাভাগ, হে ভক্তবৎসল, কুপিত ইন্দ্রের থেকে এখন আমাদের রক্ষা করা তোমারই কর্তব্য।'

'আমরা ইন্দ্রের যজ্ঞ হতে দিইনি, তাই ইন্দ্র আমাদের ধ্বংস করতে অকাল প্রবৃত্ত হয়েছে, তাই এই অত্যাগ্র অতিাতসহ শিলা-জল বর্ষণ।' কৃষ্ণ অভয় দিল সকলকে। 'আমি নিজ ক্ষমতায় এর প্রতিকার করব। যে সব দেবতার সদভক্তি আছে তারা পর্বতের কখনো নিজেদের ঈশ্বর বলে ভাবে না। কিন্তু ইন্দ্রের মোহ জন্মেছে। আমি অভিমান ভঙ্গ করি, অসামর্থ্য তাতে বিনয়ই উৎপন্ন হয়। আমিই গোষ্ঠের শরণ্য ও নাথ, গোষ্ঠই আমার পরিবার, আমিই আত্মযোগ দ্বারা এই গোষ্ঠ রক্ষা করব, এ আমি নিশ্চয় করছি।'

বাগক যেমন অনায়াসে একহাতে ছাতা মেলে ধরে তেমনি অবলীলায় সাত বছরের কৃষ্ণ বাঁ হাতে গোবর্ধনগিরি উত্তোলন করল। দক্ষিণ হাত দক্ষিণ কটিতে রেখে দাঁড়াল বন্ধিম হয়ে। গোপগোপীদের সম্বোধন করে বললে, 'সমস্ত লোকজন শকট গোধন নিয়ে গিরিকন্দরে প্রবেশ করুন। আপনারা ভয় করবেন না যে আমার হাত থেকে পাহাড় পড়ে যাবে। বাত ও বৃষ্টি থেকে আপনাদের উদ্ধার করবার জন্তেই এই ব্যবস্থা।'

যথামুখে ব্রজবাসীরা ভৃত্য পুরোহিতসহ সমস্ত উপজীবীদের নিয়ে গিরিকন্দরে আশ্রয় নিল। ক্ষুধা

তৃষ্ণা ব্যথা ও সুখেচ্ছা ত্যাগ করে কৃষ্ণ সাত দিন পর্বত ধরে রইল, মুহূর্তের জন্তেও স্থান থেকে বিচলিত হল না। কৃষ্ণের বিক্রম দেখে ইন্দ্রের মোহ দূরীভূত হল, ভ্রষ্টসঙ্কল্প হয়ে মেঘসমূহকে প্রত্যাহার করল। বাতবর্ষণ থেমে গেল, নির্মেষ আকাশে দেখা দিল সূর্য। ব্রজবাসীরা স্ত্রী-পুত্র ধনসম্পত্তি গো-শকট সব কিছু নিয়ে বেরিয়ে এল একে-একে। সকলে স্তব করতে লাগল, ইন্দ্রের পর্বাপহারী গোবিন্দ আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন। 'পিতাশুরুত্বং জগতামধীশ'— এই বলে ইন্দ্রও শরণ নিল কৃষ্ণের।

সকলের সমক্ষে কৃষ্ণ গিরিগোবর্ধনকে তার পূর্ব-স্থানে নামিয়ে রাখল।

'এই অনাথ ছেলটাকে তোমার হাতে মঁপে দিলাম।' শচী দেবী কঁদে পড়লেন গঙ্গাদাসের কাছে। 'একে যদি তুমি একটু যত্ন করে লেখাপড়া শেখাও—' 'নিশ্চয়ই শেখাব।' গঙ্গাদাস মহা খুশি। 'নিমাইয়ের মত ছাত্র পাওয়া ভাগ্যের কথা। আপনি কিছু ভাববেন না। এর বাপ নেই বলে কোনো বিঘ্ন হবে না।'

টোলে সর্বোত্তম প্রথম ছাত্র নিমাই। বয়েস আর কত হবে? তেরো-চৌদ্দ। ঢের-ঢের বুড়ো-বুড়ো ছেলেরাও পড়ছে সেই টোলে, কমলাকান্ত, কৃষ্ণানন্দ, মুরারি। কিন্তু বিছায় নিমাই সর্বপ্রধান। সর্বক্ষণ ডুবে আছে বিচারসে। স্নানে ভোজনে পর্যটনে সর্বত্র শাস্ত্রকথা। সকলকে তর্কে নামাও। তারপরে পরাস্ত করো। অতঃ টোলের ছাত্র হলে তো কথাই নেই। গায়ে পড়ে যুদ্ধ করবে। স্নানের ঘাটে হলেও ছাড়বে না। এ ঘাট থেকে ও ঘাটে ভেসে যাবে। এমন কি দরকার হলে সাঁতারে গঙ্গা পার হয়ে চলে যায় ওপারে, সূত্র স্থাপন করে নিজের ব্যাখ্যা আবার নিজেই খণ্ডন করে আসে।

না ছাড়েন শ্রীহস্তে পুস্তক একক্ষণ।

পাটন গোষ্ঠীতে যেন প্রত্যক্ষ মদন।

ললাটে শোভয়ে উর্দ্ধ তিলক সুন্দর।

শিরে শ্রীচাঁচর কেশ সর্ব-মনোহর।

স্বক্কে উপবীত, ব্রহ্মতেজ মূর্তিমন্ত।

হাস্যময় শ্রীমুখ প্রসন্ন, দিব্য দম্ভ।

কিবা সে অদ্বুত দুই কমল নয়ন।

কি বা সে অদ্বুত শোভে ত্রিকচ্ছ-বসন।

যেই দেখে সেই এক দৃষ্ট্য রূপ চায়।

হেন নাহি ধন্য ধন্য বলি যে না যায়।

অদ্বৈত আচার্যের আশ্রিত কমলাকান্ত । কমলাকান্তর উপরই অদ্বৈতের ব্যবহারিক বিষয়ের ভার । কমলাকান্তই অদ্বৈতের সাংসারিক আয়-ব্যয়ের হিসেব রাখে । অদ্বৈতের সঙ্গে কমলাকান্ত এসেছে নীলাচলে । অদ্বৈতের তখন কোথায় তিন শো টাকার মত ঋণ ছিল, অদ্বৈতকে না জানিয়ে কমলাকান্ত রাজা প্রতাপরুদ্রের কাছে চিঠি লিখে পাঠাল টাকা চেয়ে । লিখে পাঠাল, অদ্বৈত স্বরূপতঃ ঈশ্বরতত্ত্ব, দৈবে তার কিছু ঋণ হয়েছে—তিনশোর মত টাকা পেলে তার ঋণ পরিশোধ হয়, রাজা যদি অনুকূল হন ।

চিঠি প্রতাপরুদ্রের কাছে পৌঁছুবার আগেই কি ভাবে কে জানে গৌরাঙ্গের হাতে এসে পড়ল । এ কি অশ্রায় কথা ! পত্রে অদ্বৈতকে ঈশ্বর বলা হয়েছে, তাতে না হয় কিছু দোষ নেই, কেননা, ‘আচার্য দৈবত ঈশ্বর,’ কিন্তু তাই বলে দৈবত জানাবার কী হয়েছিল ? যে ঈশ্বর সে কি দরিদ্র ? অদ্বৈতের দারিদ্র্যের ইঙ্গিত করে কমলাকান্ত তার ঈশ্বরত্বকে খর্ব করেছে । এ অপরাধের শাস্তি বিধেয় ।

মহাপ্রভু তাঁর সেবক গোবিন্দকে বললেন, ‘জীজ্ঞ থেকে কমলাকান্তকে এখানে আসতে দেবে না ।’

‘দারমানা’ হয়ে গিয়েছে জানতে পেরে কমলাকান্ত যান হয়ে গেল । কিন্তু অদ্বৈত আচার্য আনন্দিত । বললে, ‘কমলাকান্ত, এ দণ্ড তোমার প্রতি প্রভুর অসীম অনুগ্রহ । স্নেহ না থাকলে কি এমন দণ্ড কেউ দেয় কখনো ? তাই এ তোমার দণ্ড নয়, এ প্রসাদ । তুমি ভাগ্যবান ।’

কমলাকান্তকে ডেকে পাঠালেন গৌরাঙ্গ ।

দণ্ডিতকে আবার ডেকে পাঠালেন । অদ্বৈত অনুযোগ করতে লাগল, ‘এর উপর আবার দর্শন দিচ্ছেন কমলাকান্তকে !’

মহাপ্রভু হাসতে লাগলেন ।

‘কমলাকান্ত ছু ভাবে আমাকে বিড়খিত করেছে ।’ বলতে লাগল আচার্য, ‘প্রথমত আমাকে না জানিয়ে রাজার কাছে অর্থভিক্ষা করেছে ; দ্বিতীয়ত, আমি ঈশ্বর নই অথচ আমার ঈশ্বরত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা করেছে ।’

প্রসন্নবরদ মূর্তিতে তাকিয়ে রইলেন মহাপ্রভু । এ তো অদ্বৈতের অভিযোগ নয়, কৃপালুর প্রতি প্রণয়কোপ । যে দণ্ডই তার প্রতিও করুণার উৎসার । যে বিভাড়িত তাকেও আবার নিমন্ত্ৰণ !

‘ও রকম করো কেন ?’ মহাপ্রভু কমলাকান্তকে বললেন, ‘এতে আচার্যের লজ্জা ও ধর্মহানি হয়না ? নিজের অভাব জানানোই তো লজ্জা আর রাজার ভিক্ষা গ্রহণ করাই তো ধর্মহানি । শোনো, বিষয়ীর অন্ন খেলে মন মলিন হয়, আর রাজার মত বিষয়াসক্ত আর কে আছে ? আর চিন্ত যদি মলিন হয় কৃষ্ণস্মরণ হয় না । আর কৃষ্ণস্মৃতির স্মৃতি যদি না হয় তা হলে জীবন অর্থহীন ।’

প্রতিগ্রহ না করিয়ে কত রাজধন ।

বিষয়ীর অন্ন খাইলে ছুঁই হয় মন ॥

মন ছুঁই হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ ।

কৃষ্ণস্মৃতি বিলুপ্ত হয় নিফল জীবন ॥

শুধু কৃষ্ণভজন করো । অশ্রু কামনা করেও যদি কেউ কৃষ্ণভজন করে, কৃষ্ণরসে কাম ধুয়ে যায় । কাচের অবেষণ করতে-করতে দ্রব পেয়ে গেল পরমরস । পিতৃসিংহাসন পাবার জন্তে কৃষ্ণকে ডেকেছিল, কৃষ্ণ এসে দাঁড়াতে আর সিংহাসনের বাসনা রইল না । বললে, আমি কৃতার্থ, আমার আর অশ্রু বরের প্রয়োজন নেই ।

কৃষ্ণ তো বলতে পারতেন, তুমি সিংহাসন চেয়েছ, সিংহাসন নিয়েই তুষ্ট থাকো, আমাকে চাইছ কোন হিসেবে ? কিন্তু না, কৃষ্ণকৃপার এই তো বৈশিষ্ট্য । না চাইলেও দিয়ে দেন যা সত্যিকার চাইবার । ছেলে মাটি খাচ্ছে দেখতে পেয়ে মা তার মুখের মাটি ফেলে দিয়ে মিষ্টি পুরে দেন—এও তেমনি । বিষয়সুখের জন্তে কৃষ্ণভজনা করেছে, অমৃত ছেড়ে বিষ, এ তো মুখের আচরণ । কৃষ্ণ তো সর্ববিজ্ঞ, তিনি মূর্খতাকে অনুমোদন করবেন কেন ? সর্বকামনার আচ্ছাদক, সর্বকামনার পরিপূরক নিজ পাদপল্লব দিয়ে দেবেন । ‘আমি বিজ্ঞ, এই মূর্খে বিষয় কেনে দিব । স্বচরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব ।’ ‘অশ্রুকামা যদি করে কৃষ্ণের ভজন । না মাগিতেও কৃষ্ণ তারে দেন স্বচরণ ॥’ সাধক প্রার্থনা না করলেও যা সত্যি প্রার্থিতব্য, সেই ছলভ সেই অপ্রাপ্য সেই অগোচর বস্তুই তাকে দিয়ে দেন বাসুদেব । ‘কামলাপি কৃষ্ণ ভজে পায় কৃষ্ণরসে । কাম ছাড়ি দাস হৈতে হয় অভিলাষে ॥’

রায়-স্বরূপের গলা ধরে মহাপ্রভু কাদছেন আর বলছেন, বাসুদেব, আমার কৃষ্ণের মাধুর্যের কথা শোন । আমার কৃষ্ণ সর্বচিন্তাকর্ষক, সাক্ষাৎ মন্থক-মন্থক !

‘শৃঙ্গার-রসরাজময় মূর্তিধর। আশ্রয় পর্যন্ত সর্বচিন্তনহর।’
যে আমার কৃষ্ণের মাধুর্যের কথা কণামাত্র শুনেবে তার
এই মাধুর্যের লেভে সব কিছু ছাড়তে হবে, লোকধর্ম,
বেদধর্ম, দেহ-পেহ-ভোগ-ভ্রমণ। নিকিঞ্চন যোগী হয়ে
ভিক্ষা মেগে খেতে হবে। কায়ক্বেশে জীবন ধারণের
জন্তেই তো ভিক্ষা, দেহ না থাকলে কৃষ্ণমাধুর্য
আস্বাদন করব কি করে? গোপীরা আর
কী তপস্যা করেছিল? শুধু নেত্র ভরে কৃষ্ণরূপমাধুরী
পান করেছিল আর নিজেদের নয়নমন-তমুকে শ্লাঘা
করেছিল অমুক্ষণ। ‘কান্তাভাব সাধ্যাশিরোমণি।’
যে রাগমার্গে থেকে শুধু অনুরাগে কৃষ্ণকে ভজনা করে
তারই কাছে কৃষ্ণমাধুর্য সুখলভ্য। ‘কেবল যে
রাগমার্গে, ভজ্ঞে কৃষ্ণ অনুরাগে, তার কৃষ্ণ-মাধুর্য
সুখলভ।’

মুরারি গুপ্তের সঙ্গেই নিমাইয়ের বেশি বগড়া।
শিশুজ্ঞানে নিমাইয়ের সঙ্গে তর্কে নামতে চায় না
মুরারি, আর তারই জন্তে নিমাইয়ের আক্রোশ!
আমি শিশু!

‘যাও, যাও, বজ্রির ছেলে, রুগী-পত্নির নিয়ে
থাকো।’ নিমাই গজনা দিয়ে ওঠে, ‘লতা-পাতা
ঘাঁটো পে যাও। এ ব্যাকরণ শাস্ত্র, এতে তোমার
কফ পিত্ত-অজ্ঞারের কথা লেখা নেই। যাও ফিরে
যাও, তোমার রুগীদের নিয়ে পড়ো পে।’

রুদ্র-অশ মুরারির হঠাৎ চটে ওঠার কথা।
কিন্তু মুরারির কি হয়েছে, নরম হয়ে গিয়েছে।

বেশ, যখন বলছ এত করে, ধরো তর্কের সূত্র
ধরো। অর্থ বলো, আমি তা খণ্ডন করব এবং
যখন আমার যুক্তিতে তোমার আস্থা হবে তখন
দেখবে তোমার প্রথম অর্থই আবার প্রতিষ্ঠিত করেছি
নতুনতরো যুক্তির জোরে। বেশ তো, এ পদ্ধতি
উভয়ত।

কেউ কারু সঙ্গে এঁটে উঠছে না। তখন হঠাৎ
নিমাই মুরারির পায়ে হাত রেখে স্পর্শ করল।

শিহরভরা সর্বাঙ্গে শুক্ন হয়ে বসে রইল মুরারি।
প্রাকৃত মানুষ নয় এই পুরুষ। তা না হোক, কিন্তু
মুরারি কি জানে কার প্রভাবে তার এত পাণ্ডিত্য।
এত চাতুর্য-প্রাচুর্য।

‘মুরারি, কৃষ্ণ ভজনা করো।’ দিনের পর দিন
বলছেন মহাপ্রভু।

‘কৃষ্ণ?’ দ্বিধায় জড়ানো মুরারির কণ্ঠস্বর।

‘হ্যাঁ কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান। সর্বাংশী, সর্বাশ্রয়,
সর্বরসময় নির্মল প্রেম।’

‘তুমি বলছ, কৃষ্ণকে ধরব?’

‘হ্যাঁ, কৃষ্ণ বিনা উপাসনা নেই। কৃষ্ণই বিদগ্ধ-
মধুর রসিকশেখর।’

‘আচ্ছা, তুমি যখন বলছ—’ মহাপ্রভুর প্রতি
গৌরববুদ্ধির বলে শেষ পর্যন্ত রাজি হল মুরারি।
বললে, ‘আমি তোমার কিঙ্কর, কত আর তোমার
আদেশ লঙ্ঘন করব। কালই দীক্ষা দিও আমাকে।’

ঘরে গিয়ে কাঁদতে বসল মুরারি। সমস্ত রাত
কেঁদে কাটাল। তার রঘুনাথের কাছে প্রার্থনা
করতে লাগল, ‘হে রাম, রঘুনাথ, তোমাকে আমি
কেমন করে ছাড়ব? তোমার চেয়ে আমার কাছে আর
কেউ বড় নেই, কারুর হাতে নেই। তোমাকে ছেড়ে
আমি বাঁচব না কিছুতেই। যদি তোমাকে ছাড়তে হয়
তা হলে আজ রাতেই যেন আমার প্রাণ যায়।’

পরদিন সকালে উঠে কাঁদতে-কাঁদতে মহাপ্রভুর
পায়ে এসে পড়ল মুরারি। বললে, ‘তোমার বাক্য
লঙ্ঘন করি এ আমার সাধ্য নয় অথচ আমার
রামভ্যাগও অসাধ্য। এখন তবে উপায় কী।
একমাত্র উপায় আমার মৃত্যু। আমাকে এখুনি শেষ
নিশ্বাস ত্যাগ করতে দাও।’

মহাপ্রভু মুরারিকে তুলে নিলেন ধলো থেকে।
আলিঙ্গন করে বললেন, ‘শুণ, তুমি ধন্য। আমার
কথায়ও তোমার মন টলল না, তোমার সুদৃঢ় ভজনের
সাধুবাদ করি। তুমি শ্রীরামকিঙ্কর হুমান, তুমি
কেন আমার কথায় তোমার রঘুনাথকে ত্যাগ করবে?
তোমার ভক্তিনিষ্ঠা দেখবার জন্তেই আমি তোমাকে
কৃষ্ণভজনের কথা বলেছিলাম। তোমার রামই
তোমার তত্ত্ববস্তু।’

মুরারি রাম বলুক, রাম ভজুক, তুমি দেহ ধরেছ
কি করতে, যদি না কৃষ্ণ বলো। ‘একই বিহ্ব ধরে
নানাকার রূপ।’ আর তোমার এই দেহই সেই
বিগ্রহের মন্দির। এই দেহের মধ্যেই সেই আনন্দ-
সন্দোহের বাসা।

হেন দেহ পাইয়া না হইল কৃষ্ণের রতি।

কতকাল গিয়া আর ভুঞ্জিব দুর্গতি ॥

যে নর-শরীর লাগি দেবে কাম্য করে।

ভ্রাহা ব্যর্থ যায় মিথ্যা সুখের বিহারে ॥

[ক্রমশঃ।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য সিদ্ধান্তবাগীশ

[বেদবাসকৃত সটীক মহাভারতের একক বঙ্গানুবাদক]

মুর্গি শ্রীকৃষ্ণধৈর্য্যন বেদবাস লিখিত মহাভারতের বাট লক্ষ শ্লোকের মধ্যে এক লক্ষ পেয়েছিল এই মর্ত্য ভূমি। যুগ যুগ ধরে মরলোক বসাবাসন করেছে পঠনে বা শ্রবণে এই অমৃতময়ী লেখনীসত্তার। কিন্তু স্বর্গদেব ভাবা সংস্কৃতের হাতে লাগল রূপান্তর সারা অর্ধাঙ্গানে—উদ্ভব হল বিভিন্ন ভাষাভাষীদের। যুগপৎ রাজনীতি, অর্থনীতি, কূটনীতি, বর্ণহত্যালোচনা, দর্শন ইত্যাদির আধার মহাভারতের প্রাদেশিক ভাষায় অমৃতবাদের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। ইদানীং কালে বর্ধমানের মহারাজা জাতিশ বহুরে, তের জন পণ্ডিতের সহায়তায় মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ সতর বছরে, সতের জন পণ্ডিতের মাধ্যমে পুণ্য ভাণ্ডারকর সমিতি সতের জন পণ্ডিতের সহযোগিতায় মূল ও অনুবাদ করেলেন—কিন্তু একক প্রচেষ্টায়—বিশ বছর দশ মাস সতের দিনের পরিপ্রশ্ন—এক লক্ষ শ্লোকের মূল, তৎসংলিখিত নূতন টীকা ও বঙ্গানুবাদ, নীলকণ্ঠকৃত প্রাচীন টীকা আর শেষ মূলের পাঠ্যসুত্র—বর্তমান শতাব্দীর এক অদ্বৈতবাদ ও সুরমহান অবদান। এই দুই কৰ্মসম্পাদনায় হোতা হলেন মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়—তিয়াশী বংশের বয়স্ক বে মহামানবকে প্রথম দর্শনে আমার প্রণতি জানাতে তিনি উচ্চারণ করলেন স্বস্তিগান।

৩গঙ্গাধর বিজ্ঞানসিদ্ধান্ত ও ৩বিধুস্বামী দেবীর তিন পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ হরিদাস ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়া পরগণার উমশিয়া গ্রামে ১৮৭৬ সালের ২৪শে অক্টোবর রবিবার জন্মগ্রহণ করেন। নব ভারতের নৈমিষ্যবন্য কোটালিপাড়া পরগণার কল্যাণে আমরা পেয়েছি রামনাথ সিদ্ধান্ত পঞ্চানন, সত্যনারায়ণ তর্করত্ন, শশিকুমার শিরোমণি, আশুতোষ তর্করত্ন ছারিকানাথ চারুপকান প্রভৃতি নৈমিষ্যিককে, নীলকণ্ঠ তর্কগাঙ্গীশ, সত্যনাথ বিজ্ঞানসিদ্ধান্ত প্রভৃতি স্বর্গক, কালীচন্দ্র বাচস্পতি, দুর্গাধন চারুভূষণ প্রভৃতি বৈমিষ্যিককে, কালিদাস বিজ্ঞানবিনোদ প্রভৃতি আলঙ্কারিককে, গঙ্গাধর বিজ্ঞানসিদ্ধান্ত প্রভৃতি জ্যোতিষীকে। পান্চাত্য বৈদিক শ্রেণীর বজ্রবৈদ্য কাগপ-গোত্রীয় ব্রাহ্মণ এবং পরমহংস পরিব্রাজকচাচা মনুস্মৃতি সত্যতীর জ্যেষ্ঠ সন্তোষদেব বাদবানন্দ্য চাচাচাচাচার্য্যের অধস্তন বাদশ পুত্র হলেন শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ।

তিনি পাঁচ বৎসর বয়সে পিতামহের নিকট অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। পরে পাঠশালায় বাংলা—এগার বৎসরে কলাপব্যাকরণ ও টোলে সন্ধিবৃত্তি—পরে ব্যাকরণ পড়া শেষ করেন। পনের বৎসর বয়সে গ্রামের আর্থশিক্ষা সমিতিতে উপাধি পরীক্ষায় প্রথম স্থানিকারী হিসাবে শঙ্করচাচা উপাধি ও ছ'শ টাকা পান। সেই সময় তিনি অনর্গল সংস্কৃত ভাষায় গজ ও পজ রচনা করতেন এবং কংসদেব নাটক রচনা করেন। আঠার বছরে সংস্কৃতে 'জানকীবিক্রম' নাটক, 'বিরোল বৈভব' ঋণকাব্য ও 'বৈদিকবাদ-মীমাংসা' ইতিহাসগ্রন্থ রচনা করেন, ক্রমশঃ তিনি কাব্যের মধ্য ও উপাধি পরীক্ষা পিতার নিকট পুরাণ ও জ্যোতিষশাস্ত্র পাঠ, অনন্যসিদ্ধ বিজ্ঞানসিদ্ধান্তের নিকট স্মৃতিশাস্ত্র, ব্যাকরণতীর্থ উপাধি লাভ, টাকা সাহস্রতসমাজের পুরাণশাস্ত্র উপাধি পরীক্ষা, স্মৃতিশাস্ত্রের পরীক্ষা, সাংখ্যবজ্র উপাধি, সিদ্ধান্তবাগীশ উপাধি প্রভৃতিতে অংশ-



গুণপণ্য পরিচয় দিয়ে বৃত্তিলাভ করেন। ১৩২৩ সালে কালীধামস্থ ভারতবর্ষ-মহামণ্ডল তাঁকে 'মহোপদেশক' উপাধি দেন।

তার পাণ্ডিত্যের সঙ্গে বাগ্মিতাও প্রকাশ পায়। যখন তিনি স্মৃতিশাস্ত্র, তখন সেনদিয়া গ্রামে অধিকাংশ মজুমদারের মাঠের শ্রাদ্ধবাসরে শশধর তর্কচূড়ামণির তত্ত্বশাস্ত্রশ্রবণ বক্তৃতার বিরুদ্ধে এবং পরে চন্দ্রপ্রতাপ পরগণার বমণীমোহন বায়ের মাতৃজ্ঞানের সভায় মহেশচন্দ্র তর্কচূড়ামণি ও জগদ্বজ্র তর্কবাগীশ মহাশয়দ্বয়ের সঙ্গে সমতাপূর্ণ বিষয়ে আলোচনার বিশিষ্ট পণ্ডিতদের নিকট সমাদৃত হন। ১৩১২ সনের বৈশাখ মাসে এক অমুঠানে সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় মহাভারতের পাঠ্য হিসাবে এক দিনে এর পাঠ সমাপ্ত করেন। ১৩১২ সালে কোটালিপাড়া আধাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিসাবে কাজ করে পরের বছর অর্ধ উপাধ্যক্ষের ভাঙে কলকাতায় আসেন। সেই সময় কালীঘাটে খণ্ডবালয়ে থেকে তিনি নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার ও হস্তরেখা বিচার করতে আরম্ভ করেন। ১৩১৪ সালে তিনি নকীপুরের জমিদারগৃহের পুরোহিত, ও সভাপণ্ডিত এবং স্থানীয় টোলার দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন। এখানে থাকার সময় তিনি মহারাজা প্রতাপাদিত্যের দৃষ্টিতে নানাবিধ বৌদ্ধিকাহিনী সুনতন এবং 'বঙ্গীয় প্রতাপ' নামে সংস্কৃত নাটক রচনা করেন। এর



শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য

পর কল্পিতহরণ মহাকাব্য ও স্মৃতিচিহ্নামণি ব্যবহৃত গ্রন্থ রচনা করেন। নকীপুরে থেকে কলকাতায় বই ছাপাতে অন্ত্রবিধা হওয়ার ১৩২৭ সালে তিনি একটি মূত্রগাণ্ডার স্থাপন করেন।

১৩৩৬ সালের বৈশাখ মাসে ডক্টর স্ত্রীর দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী স্মৃতিরক্ষা মহাশয়ের উত্তোগে তিনি স্ত্রী লেনে বসবাস আরম্ভ করেন। কোকিলেশ্বর শাস্ত্রী ও স্ত্রীর দেবপ্রসাদের উৎসাহ উদ্বীপনায় সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় বেদব্যাস প্রণীত সটীক মহাভারতের মূল, নীলকণ্ঠকৃত প্রাচীন টীকা ও সর্বনিম্নে মূল্যের পাঠান্তরসহ বঙ্গানুবাদ ১৩৩৬ সালের ৩রা প্রাবণ আরম্ভ ও ১৩৫৭ সালের ১১শে ভৈশাখ সমাপ্ত করেন। আদিপর্বের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৩৩৬ সালের ১লা শৌব ও স্বর্গারোহণ পর্বের শেষ খণ্ড মুদ্রিত হয় ১৩৬৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে কাগজের অভাব ও ১৩৪৬ সালের দ্বাদশাহাজারিয়ার দরুন সাত বছর কাগজ বন্ধ থাকে। ১৫১তম খণ্ডে সম্পাদিত গবেষণামূলক অনুবাদে আছে ১০০ উপপর্ক, ২১৬০ অধ্যায় ও এক লক্ষ শ্লোক (হরিবংশ সহ), এই দুর্লভ কর্মে তিনি ব্যয় করেছেন দেড় লক্ষ টাকা—তন্মধ্যে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকার দিয়েছেন উনপঞ্চাশ হাজার আর জনসাধারণ দিয়েছেন ছ’ হাজার টাকা।

সাংসারিক অভাব-অনটন, অর্থাভাব, দ্রীর ও মায়ের মৃত্যু, পর পর মারাত্মক বসন্ত ও কলেবায় আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় প্রাত্যহিক পূজার্তনায় পর প্রতিদিন সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা মহাভারতের অনুবাদ করে মগ্ন থাকতেন।

প্রথম আরম্ভের সময় তিনি প্রায় ছ’শো জনকে মহাভারতের গ্রাহক হিসাবে পাবার নিশ্চয়তা পান। তন্মধ্যে মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যা তর্কবাগীশ, প্রমথনাথ তর্কভূষণ, মহামহোপাধ্যায় ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ, ডাঃ আনুতোষ শাস্ত্রী বেদান্তরত্ন, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, কোকিলেশ্বর শাস্ত্রী, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, স্ত্রীর দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যখন সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের কাজ সমাপ্ত হ’ল, তখন পুরোন গ্রাহকদের মধ্যে অনেকেই পরলোকে।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিভিন্ন সময়ে বারটি মূলগ্রন্থ, পাঁচটি অনুলিখিত মূলগ্রন্থ ও চৌদ্দটি মুদ্রিত টীকাগ্রন্থ লিখেছেন। তন্মধ্যে কল্পিতহরণ পরীক্ষার পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট আছে এবং তৎপ্রণীত ‘বঙ্গীয়প্রতাপ’, ও ‘মেবার প্রতাপ’ নাটকদ্বয় মিনার্ভা ও ষ্টার মঞ্চে সু-অভিনীত হয়। ভগবান শঙ্করাচার্য্যের পর তাঁর মত সংস্কৃতে বহু গ্রন্থকার ভারতে আর দেখা যায় না।

সারা বাঙ্গালার সংস্কৃতির বিশিষ্ট অধ্যাপকদের মধ্যে অধিকাংশই তাঁর ছাত্র এবং বিভিন্ন স্থান থেকে এ পর্যন্ত তিনি এগারটি উপাধি ধারা ভূষিত হয়েছেন।

তাঁর প্রথম দুই ছেলে শশিশেখর ও হেমচন্দ্র সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, তৃতীয় যোগেশচন্দ্র ছিলেন জিরাগজ কলেজের অধ্যাপক ও চতুর্থ ভবেন্দ্রচন্দ্র করেন অধ্যাপনা।

অশেষ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এই বৃদ্ধ জ্ঞানতপস্বীর আদর্শ ও নিষ্ঠা অতুলনীয়! আরওকর্ম সুসম্পন্ন হওয়ার আশা তিনি আনন্দিত—কণের সংস্কৃত শিক্ষাধার অবাহৃত বাখার মহাকবি সন্তুষ্ট কিন্তু বিগত

ত্রিশ পুরুষের এই গরিমা কি ভবিষ্যতে বজায় থাকবে? আসার সময় মনে হ’ল বাংলা তথা ভারতের এই কৃতী সন্তানের হৃদয়ে যেন এই চিন্তাই বার বার হারাণাত করছে।

ডাঃ শ্রীশিবপ্রসন্ন মিশ্র

[বিশিষ্ট দ্বীরোগবিশেষজ্ঞ ও বাত্মীবিজ্ঞাবিশারদ]

“প্রত্যেক চিকিৎসাধীন রোগিণীকে তোমার মাতা বা ভগিনীর ভায় দেখিবে ও তাদের সহিত সেই মত ব্যবহার করবে—নিজের মা বা বোন অনুস্থা হলে তোমার বেরূপ মানসিক অবস্থা হয়—রোগিণীর আত্মীয়স্বজনদেরও ঠিক সেই রকমই। সেই ক্ষেত্রে শেখোক্ত জনের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হবে—আর চিকিৎসাজীবনে অর্থাভাব করিবে না”—বাবার দেওয়া উপদেশবাণী আজও অক্ষরে অক্ষরে পালন করে চলেছেন বাংলা তথা ভারতের অল্পতম জ্যেষ্ঠ



ডাঃ শিবপ্রসন্ন মিশ্র

দ্বীরোগ-বিশেষজ্ঞ ও বাত্মীবিজ্ঞাবিশারদ ডাঃ শ্রীশিবপ্রসন্ন মিশ্র। নিজের চিকিৎসাশালায় প্রকৃত অর্থাভাবগ্রস্তা হুঃখা রোগিণীদের প্রায়ই তিনি চিকিৎসা করে থাকেন বিনা দক্ষিণায়।

১৯১১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বশোহর জেলার সামটা গ্রামে জীসতীনাথ মিশ্র ও জীমতী রামলতা দেবীর বড় ছেলে শিবপ্রসন্ন জন্মগ্রহণ করেন। মাতুলালয়ও সেই গ্রামেই। বাবা সতীনাথ বাবু ১৯০৫ সালে আবিষ্কার করেন চক্কুরোগের জগদ্বিখ্যাত ঔষধ ‘পদ্মমধু’। এ’রা হলেন কান্তকূজীর ব্রাহ্মবংশ। বাঙ্গালার আসেন সন্ন্যাসী আকবরের সময়। শিবপ্রসন্ন গ্রামের স্কুলে, বশোহর জেলা স্কুলে ও মিত্র ইন্স-এ কিছুদিন পড়িবার পর ম্যালেবিরায় আক্রান্ত হওয়ার ফলটি বিতালয়ে বোগদান করেন। সেখান থেকে ১৯২৭ সালে প্রবেশিকা ও এটিস চার্জ

কলেজ হইতে ১৯২১ সালে আই-এস-সি পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া ক্যাম্ব্রিজ কলেজ (বর্তমানে আর-জি-কর) মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করেন। এখানে পড়ার সময় তিনি বরাবর পদক ও ধাত্রীবিজ্ঞান বুত্তিলাভ করে ১৯৩৫ সালে এম. বি. পাশ করেন। পরে সেখানে দু বছর দু মাস রেসিডেন্ট হার্ডিস সার্জেন হিসাবে যুক্ত থেকে ১৯৩৮ সালের আগষ্ট মাসে যুক্তরাজ্যে উচ্চশিক্ষার্থে গমন করেন। সেখানে দশ মাসের ভিত্তর L. R. C. P. M. R. C. S. ও M. R. C. O. G. তে উত্তীর্ণ হয়ে এডিনবরাহ গমন করেন কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার ভারতে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হন। আর, জি, কর কলেজের ছাত্রদের মধ্যে তিনিই প্রথম M. R. C. O. G. এখানে এসে তিনি উক্ত কলেজেই প্রথমে প্রস্তুতিবিভাগে রেসিডেন্ট সার্জেন, পরে ভিজিটিং সার্জেন ও বর্তমানে অধ্যাপকরূপে কাজ করছেন। এছাড়া তিনি অস্থায়ী ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট (১৯৪২), ভাইস-প্রিন্সিপাল (১৯৫৭) ও অধ্যক্ষ (১৯৫৮) পদে বৃত্ত হন। ১৯৫৩ সালে তিনি F. R. C. O. G. হন। দ্ব্যয়োগ ও ধাত্রীবিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর লেখা বহু প্রবন্ধ ভারত ও বিদেশের বিভিন্ন পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে থাকে। তাঁর লেখনী চালনার মুখ হইয়া নিউইয়র্ক মেডিক্যাল কলেজের বিখ্যাত অধ্যাপক ও বহু গ্রন্থপ্রণেতা ডাঃ রিকি (Rice) ডাঃ মিশ্রকে নিজের লেখা কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ উপহার দিয়েছেন। ১৯৫২-৫৮ সাগ পর্যন্ত তিনি আর, জি, কর কলেজ পরিচালনা পরিষদের সদস্য ছিলেন। ছাত্রমহলে, অধ্যাপন-কক্ষচারীমহলে, সহকর্মীদের সঙ্গে ও আর্ন্ত-জাতীয়দের মধ্যে তাঁর আন্তরিকতা, স্রমধুর ব্যবহার, পরিচালন-দক্ষতা ও দয়াদয়ালবোধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে।

নিজের পেশা ছাড়াও সমাজসেবী হিসাবে শিবপ্রসন্ন এক উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছেন। প্রথম বেসরকারী সেবা প্রতিষ্ঠান I. N. A. C. ১৯৪৫ সালে কয়েকজন সহকর্মীসহ ডাঃ মিশ্র গঠন করেন। ১৯৪৬ সালে ডাঃ সুবোধ মিশ্র, ডাঃ মিশ্র ও অন্যান্য কয়েকজন মিলে R. W. A. C. প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীনেহরু এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক। কলিকাতার দাঙ্গায় পাঞ্জাব, দিল্লী, আশামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি স্থানে উক্ত প্রতিষ্ঠান সমাজ-সেবার কাজে সরকারী ও বেসরকারী মহলের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। ডাঃ মিশ্র প্রতিটি স্থানে দলের পুরোভাগে ছিলেন। তিনি ইন্ডেন্টস হেলথ হোম, রামকৃষ্ণ শিশুসঙ্গ প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি সংস্থার সঙ্গে কার্যকরী ভাবে জড়িত আছেন।

পাঠ্যবিহার তিনি নাট্যাভিনয়ে অংশ গ্রহণ করতেন এবং বর্তমানে খেলার মাঠে ও বিশিষ্ট মঞ্চাভিনয়ে তিনি নিয়মিত দর্শক হিসেবে উপস্থিত থাকেন। এ ছাড়া ছবি তোলা ও রঙীন মণ্ড-পালন—তাঁর অবসর বিনোদনের অন্যতম অঙ্গ।

ভারত বিভাগের পর তাঁর স্বগ্রাম পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্তি হওয়ার তিনি আর সেখানে যেতে পারেন না—কিন্তু বালা, কৈশোর ও যৌবনের অধিকাংশ সময় সেখানে কেটেছে—সেই বাড়ী, বাগান, গাছপালায় কথা আজও তাঁর মানসকে উদ্ভিত হয়—আর যে গৃহে নিকপাল সাহিত্যিক অবিচ্ছিন্নতায় বন্দোপাধ্যায় অতিথি হতেন—যে স্থানে সুবিদিত মধুসূদন কিরনের চণ প্রথম স্রব হয়—সেই স্থান,

সুসজ্জিত, কলে-আগা প্রায়ের কথা বলতে গিয়ে ডাঃ মিশ্রের প্রাণস্পর্শী বৈশাখবোধ সমগ্র অন্তরকে অভিভূত করে তোলে।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সরকার

[অমৃতবাজার পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক]

সংবাদপত্রকে বলা হয় Fourth Estate. কারণ সমাজ গঠনে, জাতি গঠনে, দেশ গঠনে ও জনমত গঠনে ইহার প্রভাব অনস্বীকার্য। কিন্তু সুপরিচালিত সংবাদপত্রের পিছনে থাকেন একদল নিরলস প্রচারবিমুখ কর্মী—বাহাদুর দেশাত্মবোধ রাজনৈতিক নেতাদের অপেক্ষা কোন অংশে কম বা ছোট নয়। এইরূপ একজন হইলেন অমৃতবাজার পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক ও বর্তমানে অস্থায়ী সম্পাদক শ্রীযতীন্দ্রনাথ সরকার।

৮মাসিক সরকার ও ৮বাধারাগী দেবীর কনিষ্ঠ পুত্র যতীন্দ্রনাথ ১৮৯৮ সালের জুলাই মাসে উড়িষ্যার জাজপুর সহরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতৃভূমি রাণাঘাট কিন্তু ডাক বিভাগে চাকুরীর জন্ত পিতার সহিত তিনি বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার বহু স্থানে অবস্থান করেন। দাদামহাশয় ৮কৃষ্ণকান্ত সরকার কটক সহরের একজন বিশিষ্ট বাসিন্দা ছিলেন। যতীন্দ্রনাথ ১৯১৪ সালে বিহার শরীক স্কুল হইতে প্রবেশিকা, ১৯১৬ সালে বঙ্গবাসী কলেজ ও ১৯১৮ সালে ইংরাজীতে অনাসসহ সেন্ট পলস কলেজ হইতে বথাক্রমে আই, এ ও বি, এ পাশ করেন। ১৯২১ সালে ইংরাজী সাহিত্যে এম-এ পরীক্ষার উত্তীর্ণ হন। চাকুরী করার জন্ত মধ্যে চারি বৎসর পড়াশুনা বন্ধ রাখেন।

বিজ্ঞানগোষ্ঠীতে তিনি ইংরাজী সংবাদপত্র পড়িতে আরম্ভ করেন এবং ক্রমশঃ অল্পবিস্তর সাংবাদিকতার প্রতি অগ্রহস্ত হন। সুযোগ পাইয়া তিনি ১৯২৩ সালে অমৃতবাজার পত্রিকার প্রফ রীডার হিসাবে যোগদান করেন। ১৯২৫ সালে উহার সহ-সম্পাদক ও ১৯২৮ সালে এ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটর ১৯৫৩ সালে তিনি প্রথম অস্থায়ী সম্পাদকের কার্যভার গ্রহণ করেন।

মার্কিন সরকারের গ্রেট ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া তিনি ১৯৫৮ সালে দুই মাসের জন্ত যুক্তরাষ্ট্র পরিভ্রমণ করেন। তথায় সুবিখ্যাত সংবাদপত্রগুলির দপ্তরে তাহাদের উন্নততম কর্মপদ্ধতি লক্ষ্য করেন কিন্তু উহাদের সংবাদ পরিবেশন (Display of News) তাহার ভাল লাগে নাই। তাছাড়া ভারতবর্ষের সবাদ খুবই কম প্রকাশিত হয়। সেই সময় গ্রেট ডিপার্টমেন্টের ব্যবস্থাপনার তিনি



শ্রীযতীন্দ্রনাথ সরকার

আমেরিকায় প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের অধিকাংশ কেন্দ্রগুলি পরিদ্রমণ করেন। এই কেন্দ্রগুলির বোনাভু চর্চা আমেরিকার শিক্ষিত ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট খুবই গ্রহণযোগ্য হইয়াছে এবং পরমপুণ্য ঠাকুর রামকৃষ্ণের ও স্বামী বিবেকানন্দের ভাবসাধনা তাঁহারা অন্তরের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা স্রীসরকার লক্ষ্য করেন। তিনি মনে করেন যে, তথায় ভারতের বোনাভু চর্চার প্রসারের প্রচেষ্টার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল উক্ত মিশনগুলি হইতে দীক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা একেবারে পরিবর্তিত জীবনযাত্রা বাপন করিয়া থাকেন। ফিরিবার পথে তিনি দুই সপ্তাহ ইংল্যান্ডে অবস্থান করেন কিন্তু যুদ্ধোত্তর ব্রেট ব্রিটেন তাঁহার মনে কোন বৈশিষ্ট্য বোধ করেন।

বর্তমান বৎসরে তিনি পশ্চিম জায়াপ সরকারের নিয়ন্ত্রিত অতিথি হিসাবে কিছুদিন তথায় অবস্থান করেন। তথাকার সংবাদপত্র সমূহ আকারে এদেশীয় সংবাদপত্রাপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্র কিন্তু তদেদেশীয় ভাষা আয়ত্ত না থাকায় স্রীসরকার সংবাদ পরিবেশনা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জ্ঞানিতে পারেন নাই। তিনি গভীর ভাবে লক্ষ্য করেন যে, যুদ্ধবিধ্বস্ত জায়াপীর বিদেশীয় আর্থিক সাহায্যে পুনরুত্থান। আমেরিকার বেকারের সংখ্যা যথেষ্ট কিন্তু জায়াপী জাতির বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, পরিশ্রম, বুদ্ধি ও আবালবৃদ্ধ-বনিতার কর্মতৎপরতায় তথাকার বেকার সমস্যা নিশ্চিহ্ন। আজ জায়াপী শিল্প ও বাণিজ্যে পৃথিবীতে অত্যন্ত শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছে। তিনি মন্তব্য করেন যে, ভারতের বাহিরে যদি কোন উন্নত দেশ দেখিতে হয়, তবে প্রথমেই জায়াপী পরিদর্শন প্রয়োজন। কারণ, অল্প সময়ে একটি পতিত দেশ ও জাতি কি ভাবে সর্বদিকে উন্নয়নের পথে আগুয়ান হইয়াছে তাহার উজ্জল দৃষ্টান্ত পশ্চিম জায়াপী।

বর্তমান আকাশবাণী হইতে “আন্তর্জাতিক বিষয়ে” প্রায়ই বক্তৃতা দিয়া থাকেন। “মাসিক বসুমতী” যে বিবিধ রচনাসম্বন্ধে আজ সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে, ইহা স্রীসরকার স্বতঃপ্রসূত হইয়া আমার কাছে ব্যস্ত করিলেন।

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মল্ল

[প্রাক্তন ভারতীয় দলের অধিনায়ক সুবিখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড়]

সুখান ও জয়ের উচ্চ শিখরে উঠেও অহমিকাকে হুঁরে চলে নিজের নিরভিমান ব্যবহার ও মধুর স্বভাবে লক্ষ লক্ষ স্বদেশকে জয় করেছেন এনি এক বিবল ব্যক্তিত্বের অধিকারী হলেন সুবিখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মল্ল।

হাওড়া জেলার বাঁটরা গ্রামে ১৯২৪ সালে শ্রীমাল্লা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শ্রীকৃষ্ণনাথ মল্ল। ছোটবেলা থেকেই শ্রীমাল্লার ফুটবল খেলার বেশ যৌক ছিল। তিনি স্কুলের পড়াশুনা শেষ করে কলকাতার রিপন (বর্তমানে শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ) কলেজে পড়তে আসেন। তাঁর খেলার খ্যাতি শুধুই এখানে ছড়িয়ে পড়েছে। কারণ, এর কিছুদিন আগেই মাত্র ১৫ বছর বয়সে Wallace Regiment-এর বিরুদ্ধে খেলে তিনি সকলের মনে সাদা আগিরে দিলেন। কলেজের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় তিনি অংশ গ্রহণ করতে থাকেন এবং পরিশেষে আন্তঃবিদ্যালয় প্রতিযোগিতার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দলের অধিনায়ক মনোনীত হন। ১৯৪২ সালে তিনি মোহনবাগানে যোগ দেন। তাঁর উন্নত দক্ষতার খেলা

কমেই দর্শকদের চিত্ত জয় করতে থাকে। ১৯৪৮ সালে তিনি লণ্ডন অলিম্পিকে ভারতীয় দলের সহ-অধিনায়ক মনোনীত হন এবং ইংল্যান্ডে বহু প্রতিযোগিতামূলক খেলার যোগদান করে বিশ্বের দরবারে নিজেকে তুলে ধরেন। অলিম্পিকে যদিও ভারতীয় দলের পরাজয় ঘটেছিল তবু মাল্লার ক্রীড়ানৈপুণ্যে সকলে মুগ্ধ হয়েছিলেন। ইংল্যান্ডের



শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মল্ল

পরলোকগত রাজা বর্ষা মল্লার এক অভিনন্দন জানিয়ে ব্যক্তিগত রাজপ্রাসাদে এক চা-এর আসরে তাঁকে আমন্ত্রণ জানান। ১৯৪২ সালে তিনি হেলিসিঙ্কি অলিম্পিকে ভারতীয় দলের অধিনায়ক করেন। তাছাড়া বাংলাদেশের সুদীর্ঘ কালের অধিনায়ক শৈলেন্দ্র মল্ল, এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতীয় দলের অধিনায়ক ছিলেন। তিনি রাশিয়ার আমন্ত্রণমূলক খেলার ভারতীয় দলকে পরিচালনা করেন। ভারতের ফুটবল খেলার ইতিহাসে ঐতিহ্যময় ও গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের স্রষ্টাকারী মোহনবাগান দলে তিনি দীর্ঘ ১৮ বছর ধরে খেলে আসছেন। তাঁর নেতৃত্বে তাঁর প্রিয় দল বহু বার লীগ ও আই, এক, এ শীর্ষে তরফদার হয়েছেন। তিনি বঙ্গ ভাগের খেলোয়াড়। দলকে পতনের হাত থেকে রক্ষা করাই ৪৫ তাঁর কাজ। দীর্ঘ খেলোয়াড়জীবনে তাই স্রষ্টা পরিচর্য তিনি সব সময়েই দিয়ে এসেছেন। তাঁর বর্ষা ক্রিকি ভারতের যে কোন পোলবলকেই জাতক। বহু বার তাঁর ক্রিকিকে বহু গুরুত্বপূর্ণ খেলা নিশ্চিত হয়েছে; এমন কি লীগ চ্যাম্পিয়নশিপও। তাঁর ব্যক্তিগত ভাবে কোন খেলাটি জীবনের শ্রেষ্ঠ খেলা বলে মনে হয়েছে, প্রশংসা করায় তিনি জানান, ফ্রান্সের বিরুদ্ধে খেলাটি তাঁর জীবনের সর্বাপেক্ষা উত্তেজনাপূর্ণ খেলা।

ভারতীয় ক্রীড়াঙ্গণের বহু বর্ষ ও কীর্তির অধিকারী শ্রীমাল্লা বিশ্বের নানা প্রান্তে খেলেছেন। লক্ষ লক্ষ দর্শকের অকুণ্ঠ প্রাণে তাঁকে সব সময়েই উৎসাহ দিয়েছে। তিনি খেলেছেন—ইংল্যান্ড ওয়েলস, হল্যান্ড, ডেনমার্ক, সুইডেন, অস্ট্রিয়া, জায়াপী, সুইজারল্যান্ড, রাশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, সিঙ্গাপুর, হংকং, কলম্বো, বার্মা, পাকিস্তান ইত্যাদি স্থানসমূহে। তাছাড়া ভারতে আগত বৈদেশিক দলগুলির বিরুদ্ধেও খেলেছেন, ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর মধুর স্বভাবে ও মিষ্ট ব্যবহারে তিনি সকলেরই প্রিয়। বর্তমানে তিনি জিওলাজক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ায় একটি বিশিষ্ট পদে অধিষ্ঠিত আছেন।

বহু বুদ্ধি অরী সেনাপতি শৈলেন্দ্র মল্ল ক্রীড়াজগৎ খেলোয়াড় হয়ে হরত আর নামের না, তবে তাঁকে খেলার মাঠেই দেখা যাবে এবার অঙ্গুরণে। আই, এক এ ও মোহনবাগান কর্তৃক মনোনীত হয়ে তিনি ইংল্যান্ডে চলেছেন ফুটবল কোর্সে শিক্ষা করতে। আমরা তাঁর উজ্জল ভবিষ্যৎ কান্দা করি।

পৃথিবীতে সর্বপ্রথম যে মানব গৃহ নির্মাণ করিয়া বাস করিবার
পরিকল্পনা করিল অথবা নিজের প্রয়োজন মত জমি বন্ধু

চিহ্নিত করিয়া লইল, তখন আয়তক্ষেত্র (Rectangle) আকারেই
করিল। তাহার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্যবুদ্ধি তাহাকে এইরূপ আকার
নির্ধারণ করিবার জন্যই প্ররোচিত করিল। এই কারণে দেখা
যায় আয়তক্ষেত্রই মানবের চক্ষে সুন্দর দেখায়। হয়ত উহা চকুর
শ্রেণী ও ধমনীর উপর অঙ্কুর ক্রিয়া করে। আমরা চকুর সমুখে
সজাচর যে সমস্ত জিনিস দেখি, অথবা যে সমস্ত জিনিস ব্যবহার
করি তাহার অধিকাংশই আয়তক্ষেত্র আকারের যথা—দরজা, জানালা
টিলি, আলমারী, খাট, কশাট, চৌকাট, বই, কাগজ, ছবি,
বাক্স, খামপোষ্টকার্ড, নীদি, খেলার মাঠ প্রভৃতি। এ সমস্ত
জিনিস আমরা গোলাকার ত্রিকোণাকার বা সমচতুর্ভুজ বলনা
করি না তাহার কারণ তাহাতে সুন্দর দেখাইবে না বলিয়া
মনে করি। আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ বিরূপ অনুপাতে হইলে
অধিক সুন্দর দেখায় ইহাও মনস্তত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণের গবেষণার বিষয়
হইয়া পড়াইয়াছে। অস্ত্র বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনে অস্ত্র
আকারের জিনিসও উদ্ভাবিত হইয়াছে বটে।

মানব সাধারণতঃ একটি জিনিসকে মনে মনে দুইটি সমান ভাগে
বিভক্ত করিয়া দেখে এবং একটি ভাগের সহিত অত্র ভাগের কোনও
সিঙ্গে পার্থক্য হইলে তাহা অসুন্দর বলিয়া মনে করে। এই কারণে
দেখ যায় সামঞ্জস্যের বলনা সৌন্দর্য্যবুদ্ধির একটি ধর্ম। আমাদেরকে
সেই যদি একটি কলুসীর চিত্র আঁকিতে বলে তাহা হইলে আমরা
তাঁহা একেবারেই আঁকিতে আরম্ভ করি না। আমরা প্রথমতঃ
বলুসীটির দৈর্ঘ্যানুসারে একটি লম্বা (vertical) রেখা আঁকিয়া
তাঁহাতে কলুসীটির মুখ গলা ও পেটের স্থানে একটি করিয়া
সমান্তরাল (horizontal) রেখা টানি এবং গলা ও পেটের মাপ
দুই দিকে সমান ভাবে নির্দিষ্ট করিয়া একদিকে যে স্থানে বেরূপ
ভাবে বাক্সইয়া রেখা টানি অত্রদিকেও তদ্রূপ ভাবে টানি অর্থাৎ
লম্বাধার কাগজটা ভাঁজ করিলে যেন দুইটা দিক সর্বসমভাবে
মিলিয়া যায়। অবশেষে ভিতরের রেখাগুলি রবার দ্বারা বুজিয়া
দি। একটি মানুষের ছবি আঁকিতে গিয়া যদি আমরা একটি
হাত একটি চোখ ও একটি কান বিশিষ্ট মানুষ আঁকি তাহা সুন্দর
হইবে নী, অসুন্দর হইলেই সৌন্দর্য্য হানি হয়। কোটের একদিকে
একটা পকেট আছে এবং অত্র দিকে পকেট নাই, একটি পায়জামার
একদিকের পা তিন ফুট লম্বা ও অত্রদিকের পা দেড় ফুট, অথবা
একদিকের রঙ সাদা অত্র দিকের রঙ লাল, একটি নারীর
একদিকের কানে একটি কুণ্ডল এবং অত্র দিকের কানে একটি
ফুল সৌন্দর্য্য বিধান করে না কারণ এখানে সামঞ্জস্যের অভাব।
অসামঞ্জস্য হস্তেরও কারণ হইয়া থাকে।

এইবার একটি অট্টালিকার দিকে চাহিয়া দেখুন, এখানেও দেখা
যায় আমরা উক্তকে দুইটি সামঞ্জস্যপূর্ণ সমান ভাগে বলনা করিতেছি।
সৌণ্ডটর একদিকে যদি একটি গুড়লের পরী, সিংহ বা সৈনিক থাকে
তাঁহা হইলে অপর দিকেও তদ্রূপ একটি করিয়া থাকিতে হইবে।
একদিকে একটি সৈনিক, অত্রদিকে একটি গাধা একদিকে একটি চুড়া
অত্রদিকে একটি গুড়ল, এক দিকে একটি গোলাকার আম অত্র দিকে
একটি ত্রিকোণাকার আম থাকিলে = সৌন্দর্য্যহানি ও হস্তের
কারণ হয়। শুধু একই প্রকারের জিনিস হইলেই চলিবে না, একই

আমাদের সৌন্দর্য্যবুদ্ধি

শ্রীদেবেশ্বনাথ মিত্র

মাণেরও হওয়া চাই। একদিকে একটি বৃহদাকার সিংহ এবং অত্রদিকে
একটি ইঁদুরের মাণের সিংহ বসাইলে চলিবে না। ইমারতের মধ্যেও
একটা সঙ্গীত থাকে বাহাকে architectural harmony বলে।

একই জিনিসের নিয়মিত বিস্তার সৌন্দর্য্যের কারণ হয়। রাস্তার
দুইদিকে অথবা পুকুরিবার চতুর্দিকে যদি সমান্তরাল গাছ থাকে তাহা
হইলে সুন্দর দেখায়, একই রকমের গাছ হইলে আরও সুন্দর দেখায়
এবং একই মাণের গাছ হইলে আরও সুন্দর দেখায়। একই রকম
পোষাকে সজ্জিত একটি সৈন্তের সারি সুন্দর দেখায়, তাহার। একসঙ্গে
একই রূপ পরক্ষেপে চলিলে ভাল দেখায়। কিন্তু সারিগুলির
প্রত্যেকটিতে যদি নির্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্ত না থাকিয়া কোনওটিতে ১০ জন,
কোনওটিতে ৩ জন, কোনওটিতে ৭ জন এইরূপ বিভিন্ন সংখ্যার হয়
অথবা একটি সারির মধ্যে একজন সৈন্তের পরিবর্তে একটি বাঁড় বা
মহিষ রাখা হয় তাহা সুন্দর দেখাইবে না। একই ছত্রে মধ্যে
ছাপা বা হস্তলিখিত ছোট বড় অক্ষর ভাল দেখায় না। বাড়ির
মধ্যে সিঁড়িগুলির ব্যবধান একই মাণের না হইয়া ৫, ৬, ৭, ৮
ইকি প্রভৃতি বিভিন্ন মাণের হইলে শুধুই যে উঠানামার পক্ষে
অসুবিধাজনক হয় তাহাই নহে, চোখেও ভাল দেখায় না।
পুকুরের শানবাধান ঘাটের একদিকে একটি বসিবার স্থান থাকিলে
অত্রদিকেও তদ্রূপ একটি থাকিতে হইবে।

রঙও চকুরিল্লিরের গ্রাহ একটি জিনিস। প্রাকৃতিক দৃশ্য ও
জিনিস হইতে মানবের মনের মধ্যে রঙের অহুতুতি জাগিতে
লাগিল। তাহার। রঙ চিনিতে লাগিল এবং তাহার। নামকরণও
করিতে লাগিল, শুধু তাহাই নয় তাহার। রঙে রঙ মিশাইয়া
বিভিন্ন নূতন নূতন রঙের পরীক্ষা করিতে লাগিল এবং তাহার।
মধ্যে ফিকা ও গাঢ় রঙের স্তরও উপলব্ধি করিতে লাগিল।
কোন জাতি কোন রঙটি পছন্দ করে সে সম্বন্ধে নিশ্চিত ভাবে কিছুই
বলা যায় না তবে মানব সাধারণতঃ মিশ্র রঙ অপেক্ষা মৌলিক
রঙটাই অধিক পছন্দ করে। আবার কোন রঙের পাশে কোন
রঙটি দিলে মানার অর্থাৎ দেখিতে সুন্দর হয় তাহার পরীক্ষাও
হইয়া গিয়াছে। সঙ্গীতের যেমন বাদী সুর থাকে রঙেরও পরিপূরক
রঙ আছে যথা হলুদ ও নীল। সাধারণ ভাবে দেখা গিয়াছে
পরিপূরক রঙ পাশাপাশি থাকিলে ভাল দেখায়।

অতঃপর কর্ণেলিয়ারগ্রাহ জিনিসের সৌন্দর্য্যের কথা মানব
প্রথমতঃ সাতটি স্বর উপলব্ধি করিতে পারিল বাহাকে আমরা
সা রে গা মা পা ধা নি বলি। তৎপরে তাহার। আরও পাঁচটি
বিকৃত স্বরেরও উপলব্ধি করিতে পারিল। ক্রমশঃ তাহার। তিনটি
গ্রাম আধিকার করিল বাহাকে আমরা উদাত্তা মৃদা ও তার। বলি।
তৎপরে তাহার। বাদী সঙ্গীতী ও বিবাদী স্বরের সম্বন্ধ ও পার্থক্য
বুঝিতে পারিল। তার। বস্ত্র সা অর্থাৎ সুরের বাঁধিয়া তবলা মধ্যম
পর্দার বাঁধিলে প্রতিমধুরের ব্যাঘাত হয় না কারণ মধ্যম
একটি বাদী স্বর কিন্তু তৎপরিবর্তে তবলাটি কোমল ধৈবতে
বাঁধিলে প্রতিমধুর নষ্ট হইয়া যায় কারণ উহা বিবাদী স্বর।
বিভিন্ন সুর যন্ত্রকে বিভিন্ন সুরের বাঁধিয়া কয়েকজন গায়ক যদি

একসঙ্গে বিভিন্ন সুরে গান গাইতে আরম্ভ করেন তাহা হইলে বৈচিত্র্য অবস্থা হয় তাহা কল্পনা করা যায় না। এইরূপে কণ্ঠসঙ্গীত ও বাস্তবসঙ্গীতের পূর্ণাঙ্গ সৃষ্টি হইল এবং ভারতবর্ষে ছয় বাগ, ছত্রিশরাগিণী, তান, মান, লয়, গমক, একুশ মুচ্ছনা, উনপঞ্চাশ কুটতান প্রভৃতির সৃষ্টি হইল।

কণ্ঠ সঙ্গীত ও বস্ত্র সঙ্গীতের মাধুর্য্যও পরিপূরক হিসাবে তালেরও সৃষ্টি হইল। সময়ের নির্দিষ্ট বিভাগের নাম তাল এবং এই নির্দিষ্ট নিয়মে বিভাগ মাধুর্য্যের কারণ হয়। একটি রাগিণীতে বেসুরা পরলা লাগাইলে যেমন রাগিণী কাটিয়া যায় তালেও নিয়মের ব্যতিক্রম হইলে তাল কাটিয়া যায় এবং মাধুর্য্য নষ্ট হইয়া যায়। গানের রাগিণীতে রাগিণীতে মিশ্রণ চলে যথা ছায়ানট, কিন্তু এক প্রকার তালে আর এক প্রকার তাল মিশাইলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় এবং কোনও তালই থাকে না। ঝাঁপতালের সহিত ধামার মিশাইয়া ঝাঁপ-ধামার নামক কোনও তালের সৃষ্টি হইতে পারে না। তাল-বস্ত্র বিষয়ে দেখা যায় অজ্ঞাত দেশের অপেক্ষা ভারতবর্ষে যে সমস্ত তাল-বস্ত্র সৃষ্টি হইয়াছে তাহাদের আওরাজেরও একটা পৃথক মিষ্টত্ব আছে যথা—পাখোয়াজ, খোল, তবলা, ঢোলক প্রভৃতি।

কবিতার রাজ্যে আসিয়া আমরা দেখিতে পাই এখানেও নির্দিষ্ট সংখ্যক অক্ষর অথবা নির্দিষ্ট সংখ্যক মাত্রা এবং বিভিন্ন স্থানে শেবাক্ষরের মিল প্রভৃতি সৌন্দর্য্য উৎপাদন করে। কবিতাতেও সেই তালের খেলা। অক্ষর সংখ্যায় ছন্দ বাহাকে সংস্কৃতে বৃত্ত বলা হয় তাহাতে বিভিন্ন ছন্দে যদি বিভিন্ন সংখ্যক অক্ষর দেওয়া যায় অথবা মাত্রা সংখ্যায় ছন্দ বাহাকে সংস্কৃতে বতি বলে তাহাতে যদি বিভিন্ন ছন্দে বিভিন্ন সংখ্যক মাত্রা দেওয়া যায় তাহা হইলে মাধুর্য্য নষ্ট হইয়া যায়।

সৌন্দর্য্যবুদ্ধি সৰ্ব্বক্ষেত্রে আমরা এত কথা বলিয়ায় বটে তথাপি দেখা যায় অধিকাংশক্ষেত্রে সামাজিক অবস্থা ও অস্থায়ী সৌন্দর্য্য-জ্ঞানকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে সেজন্য বিভিন্ন দেশের লোকের বিভিন্ন বিষয়ের সৌন্দর্য্যজ্ঞান কতকগুলি ব্যাপারে বিভিন্নরূপ

হইতে দেখা যায়। বিভিন্ন দেশের ইমারতের style বা রীতি বিভিন্ন প্রকার। পাশ্চাত্যদেশের মহিলার গাউন পরা ও ভারতীয় নারীর শাড়ি পরা বিভিন্ন রকমের। রঙ পছন্দ সৰ্ব্বক্ষেত্রে কৃতি বিভিন্নরূপ দেখা যায়। আবার একই সমাজে বয়সের তারতম্য অনুসারে রঙের কৃতির তারতম্য দেখা যায়। একটি শিশু চড়া লাল রঙের জামা পরিয়া আসিলে যেমানান দেখায় না, কিন্তু একজন বৃদ্ধ একটা লাল জামা গায়ে দিয়া একটা আগরে উপস্থিত হইলে সকলের উপহাসের পাত্র হইয়া উঠে। সঙ্গীত সৰ্ব্বক্ষেত্রে ঐরূপ। আমরা ভারতবাসিগণ হারমোনিয়মের যে পুরদার পরে যে পরলা বাজাইলে বেসুরা হইয়া গেল বলিয়া মনে করি অজ্ঞ দেশে হয়ত সেইটাই মধুর বলিয়া গণ্য হয়। একজন বিলাতী যেম গান গাহিতে থাকিলে আমরা মনে করি তিনি নাকী সুরে কাঁদিতেছেন, পক্ষান্তরে বিলাতিগণও আমাদের সঙ্গীতের মাধুর্য্য উপলব্ধি-করিতে পারেন না। আবার কেহ কেহ বলেন, একদেশের লোকের নিকট অজ্ঞ একটি দেশের সঙ্গীত প্রথমতঃ উৎকট মনে হয় বটে কিন্তু সেই দেশের সঙ্গীত দীর্ঘকাল শুনিতে শুনিতে তাহাতেই কৃতি আসিয়া যায়। আরও দেখা যায় একটা style বা রীতি পরিবর্তিত হইয়া অজ্ঞ রকম রীতি সুন্দর বলিয়া গৃহীত হয়। যথা সেকালের গহনা ও এ কালের গহনা। নাচের ভঙ্গী সৰ্ব্বক্ষেত্রে। বিভিন্ন জাতির সৌন্দর্য্যজ্ঞান বিভিন্নরূপ।

তবে বাস্তব সৌন্দর্য্যবোধ বিষয়ে কবিশ্বরের কল্পনাকে বাদ দিতে হইবে। একটি আজ্ঞাতুলনিত বাস্তব, আকর্ষণবিশ্বৃত নয়ন শালগ্রাম মানব যদি সহসা সত্য সত্যই আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হয় তাহা হইলে আমাদের গম্ভীর মুচ্ছা বাইতে হইবে।

মাদ্রিস্তকৃতি মানব সুন্দর জিনিসই দেখিতে চায়—এবং মধুর শব্দই শুনিতে চায় এবং তদ্বারা তাহার মনও সুন্দর হইয়া উঠে। তাই উপনিষদের কথায় বলিব—

ভদ্রং কর্ণেতিঃ শৃণুয়াম দেবা।

ভদ্রং পশ্বেমাক্ষতি যবত্রা।

হে শ্রমিকবৃন্দ !

‘হে ভারতের শ্রমিক সম্প্রদায় ! তোমাদেরই নীরব, নিরলস পরিশ্রমের ফলে ব্যাবিলন, পারস্ত, আলেকজান্দ্রিয়া, গ্রীস, রোম, ভেনিস, জেনোয়া, বাগদাদ, সমরখন্দ, স্পেন, পর্তুগাল, ফ্রান্স, ভেনিস, ইল্যাণ্ড এবং ইল্যাণ্ড পর পর খ্যাতি ও আধিপত্য লাভ করিয়াছে। আর তোমরা ? তোমাদের কথা কে ভাবে ? বাহারা বুকের রক্ত দিয়া জগতের সর্ববিধ উন্নতির উপকরণ যোগাইতেছে, তাহাদের সুখ্যাতি করিবার জন্য কে মাথা দামায় ? কাব্য, সংগ্রাম বা ধর্মের ক্ষেত্রে জগৎজয়ী বীরগণের প্রতিই সকলের দৃষ্টি। বহু লোকের উৎসাহ-বাক্যে অনুপ্রাণিত হইয়া কাপুরুষও অনায়াসে নিজের জীবন বিসর্জন দিতে পারে। যৌর স্বার্থপর ব্যক্তিও নিঃস্বার্থ আচরণ করিতে পারে। কিন্তু সকলের দৃষ্টির অগোচরে সামান্ত কাজেও যে ব্যক্তি ঐ প্রকার স্বার্থশূন্যতা কর্তব্যপরায়ণতার পরিচয় দিতে পারে সেই স্বার্থবন্ত। হে ভারতের চিরপদদলিত শ্রমিকবৃন্দ ! তোমাদের কর্ম বাস্তবিকই এই পর্যায়ের। তোমাদের অভিধান করি।’

—বাবী বিবেকানন্দ।



ফুল ওয়াড়ী

—অরুণকুমার দত্ত

কাজল-দিঘী
—মাততোষ সিংহ



॥ আলোকচিত্র ॥

শ্রুতি

—সুকুমার বার

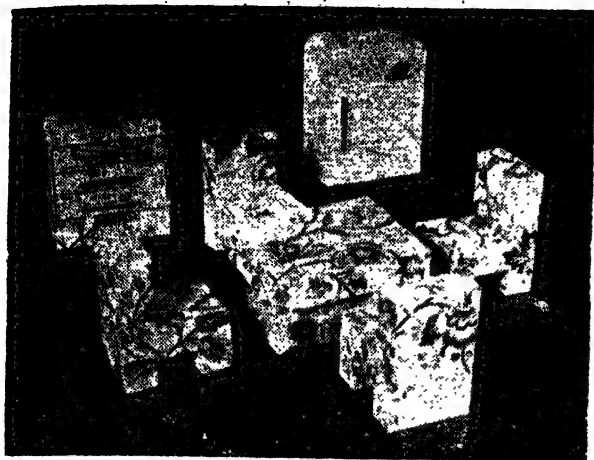




মেক-আপ

—বিশ্ব চক্রবর্তী

—অনিলকুমার ঘোষ



ডুইং রুম (সিগারেটের প্যাকেটে তৈরী)

—শিল্পী রবীন রায়-চৌধুরী (সম্ভাব্য)



কাঙ কার আনন্দে



—অমিত্রপ্রসাদ চক্রবর্তী



—তুষারকান্তি মজুমদার



সিমলায় তুষারপাত
মৎস্যজীবী

—শান্তি ভট্ট
—মুন্সীল বন্দোপাধ্যায়



কৌ বিচিত্র প্রত্যাশাই না মানুষের মনের অন্তরে ধুকধুক করে। কাল সকাল থেকে গভীর রাত পর্বন্ত মীনাঙ্কীর মন শুধু একটা প্রশ্নই বিবেচনা করে ফিরেছে : অপ্রিয় কী ওর কাছে আর আসবে ? মীনাঙ্কীর শিথিল ওষ্ঠ অক্ষুটে উচ্চারণ করেছে—না। সেই সুরে সুর মিলিয়ে প্রতিধ্বনি করেছে ওর অন্তর, না-না-না। তবু, কাকডাকা ভোরে উঠেছে মীনাঙ্কী, আর সদরের কবাট বতবার আওয়াজ তুলেছে—বতবারই রুদ্ধশ্বাসে ছুটে গেছে ও। তারপর দুপুর হলো, দুপুর গড়ালো, বিকেল হলো, রাত্রি কাটলো, একটি ভীম উন্মুখ মন তার কীপতর প্রত্যাশাকে প্রাণের উত্তাপে জীয়ে রাখলো দীর্ঘ সাতটা দিন, লম্বা সাতটা রাত। আর তার পরদিন দীপ্ত মধ্যাহ্নে এসে অপ্রিয়র বার্তা বিজ্ঞাস করলো ওর বাক্ববী স্রমনা। স্রমনাকে একান্তে নিজের ঘরে ডেকে এনেছিলো মীনাঙ্কী, কিন্তু ঘর যেন ওর পছন্দ হলো না।

চল না বারান্দার বসেই গল্প করিগে, ঘরে বড় গরম,—হতাশ হ'লেও আপত্তি করেনি মীনা। একটা বিরাট ব্যগ্রতার ভাব মুখে নিয়ে সুবর্ণবালা মেয়ের ঘরের দিকে আসছিলেন। স্রমনাকে নিয়ে মীনােকে বেরিয়ে আসতে দেখে দাঁড়িয়ে পড়লেন, বললেন, এখনি চললে নাকি স্রমনা ?

না, মাসীমা, ঘরে বড় গরম।

এসো, এসো, দক্ষিণের বারান্দার বসো এসে, ভাবি মোলারেম ঠাণ্ডা এখানে—পরম সমাদরে মেয়ের বাক্ববীকে ডাক দিলেন সুবর্ণবালা।

শুধু তাই নয়, ওঁর পক্ষে বস্ত্র দ্রুতগতিতে চলা সম্ভব তত্থানি ক্ষিপ্ৰপায়ে নিজের ঘর থেকে ওঁর দুপুরে গড়ানো শীতলপাটখানা এনে বিছিয়ে দিলেন। ওখানে 'বারান্দার এক কোণার বসে শিশিরকণা মহাভারত পড়ছিলেন। কোনো বাধা-বিপত্তি না ঘটলে এসময়টা শিশিরকণা মহাভারতই পড়ে থাকেন। কাকীমা, আপনিও পাটিন্তে উঠে বসুন, আরাম পাবেন—সুবর্ণবালা বললেন শিশিরকণাকে।

শিশিরকণা হাসিমুখে বললেন—না বোঁমা, তোমরাই বস। গরমের দিনে ষোওরা-মোছা সিমেন্টই আমার ভাল লাগে বেশি—তারপর মীনা স্রমনার দিকে তাকিয়ে সম্মুখে বললেন, দাঁড়িয়ে বইলে কেন ? বস মা তোমরা সব বস।

মীনা ভেতরের অস্থির চাকল্যে অস্থির হয়ে উঠেছিলো, স্রমনার হাত ধরে টেনে পাটির ওপরে দুজনে বসে পড়লো। সুবর্ণবালার আচরণে মনে মনে বেশ বিস্মিত হলেন শিশিরকণা। প্রথমতঃ সুবর্ণবালার দুপুরের টানা ঘুম কেউ ব্যাখ্যাত ঘটলে তার আর রক্ষে ছিলো না, মায়ের দৈর্ঘ্যে প্রোচ্ছ ক্রীতি দেখে এনাকী একদিন দুপুরের ঘুমের মুহু প্রতিবাদ করতে গিয়ে বকুনি খেয়েছিলো খুব। আর দ্বিতীয়তঃ গ্রীষ্মের দুপুরে গড়ানো ওর শীতলপাটখানি উনি প্রাণ ধরে কাউকে কখনও হাতই দিতে দেন না, নিজেই শীতলপাটখানি গামছা ভিজিয়ে ভিজিয়ে মোছেন, সেই পাটি নিজের হাতে বিছিয়ে মীনার বাক্ববীকে বসতে দিলেন এবং নিজেও না ঘুমোতে গিয়ে বসলেন সেখানে। অবাক লাগে বৈ কি ! মীনাঙ্কীর অস্থিরতা আরো বাড়লো, মায় সামনে মঠারমশাইর কথা জিগ্যাস করাও যায় না, আবার খেঁচো থাকাতো যেন যায় না। কিন্তু সুবর্ণবালাই শুক করলেন।

ই

প্রা

নী

র

★

প্রো

★

ম

(উপভাস)

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

নীলিমা দাশগুপ্ত

তোমাদের মঠারমশাই আজ-কাল তোমাদের ওখানে আসে-টাসে ?

ও মা ! অপ্রিয়দা'র কথা বলছেন ? রোজ আসেন, একটি দিন বাদ যায় না।

রোজ এসে এখন করে কী ? পরীক্ষার পরও পড়ার নাকি তোমাকে ? সুবর্ণবালার সুর পেঁচালো।

অপ্রিয়দা'র দাঁটার বন্ধু তো, তাছাড়া এখন আবার অপ্রিয়দা' পড়াবেন কী মাসীমা ? এক মাসে আমাদের বাড়ি থেকে যে টাকা পেতেন, একবেলায় তার চেয়ে বেশি খরচ করেন অপ্রিয়দা'। রোজই বিকেলে বের হবার মুখে ফিরপোতে হয় চা, না হলে ফিরবার মুখে ডিনার খাচ্ছি।

রোজই বেড়াতে যাচ্ছে বুরি তোমরা ? সুবর্ণবালার প্রশ্ন।

রোজ, জানিস মীনা, নাইস একখানা বুক কিনেছেন অপ্রিয়দা', রোজ সন্ধ্যা থেকে রাত দশটা পর্বন্ত আমরা ঐ বুককে চেপে বেড়াই। একটু বাকি নেই, এক কৌটা শব্দ নেই, গ্র্যাণ্ড গাড়িখানা হয়েছে। আজ বিকেলে তোর এখানে আসবো আমাদের প্রোগ্রাম ছিলো, কিন্তু অপ্রিয়দা' শুনে বললেন—অসম্ভব, বিকেলের ট্রিপে তোমাকে আমি বাদ দিতেই পারিনে, তুমি সকালে দুপুরে বন্ধন বেখানে খুশি যাও কিন্তু বিকেলে নয়। মীনাঙ্কী ঠোট খুলেই আবার মুখ বন্ধ করে ঢোক গিললো একটু।

উচ্চাঙ্গের হাসি হাললেন সুবর্ণবালা, তোমাদের বয়সী সব মেয়েদের সঙ্গেই বুরি খুব ভাব তোমাদের মঠারমশাইর ? শিশির কণার বসার দৃবদ্বটা দেখে নিয়ে স্রমনা সম্ভ্রান্ত উত্তর দিলো, আপনি সেকথা জানলেন কী করে মাসীমা ? কিন্তু সব ক্ষেত্রে অপ্রিয়দা'র বেশি ভাব হয়েছে মেজর জেনারেল চৌধুরীর মেজের সঙ্গে, না তুল বললাম, তার চেয়েও বেশি হ'য়েছে জাতিস হিন্দুর মেয়ের

নদে। 'সুপ্রিয়দা' তৈরী বাড়ি কেনার জন্য দালাল লাগিয়েছিলেন, তা শুনে মিস মিত্র বলেছেন,—তোমার আর বাড়ি কিনে দরকারটা কী? বাবাই যখন অত বড় বাড়ি বোতুক দিচ্ছেন আমাদের বিয়েতে। মিস মিত্রের বুদ্ধিতে খুব খুশি হয়েছেন 'সুপ্রিয়দা'—সুবর্ণবালার চোঁটের হাসি একেবারে ফিকে হ'য়ে গেলো, বিরসমুখে জিগোস করলেন, বিয়ের দিনও কী ঠিক হয়ে গেছে নাকি?

—না, দিন বোধ হয় এখনও ঠিক হয়নি, তাহলে দালাল কাছে তনতাম।

তা সে, মেয়ে দেখতে কেমন? দেখেছ নাকি তুমি? সুবর্ণবালার জলধ গলা এবার শিশিরকণার কানে পৌঁছলো, মহাতারত পাঠ বন্ধ করে হাসিমুখে শুধোলেন, বউমা, কোন মেয়ের কথা জিগোস করছো সুমনাকে?

সুবর্ণবালা বীকা হেসে বললেন, মীম্বদের মাষ্টারমশাই বড় বড় সব আরগার এখন চৌপ ফেলছে কি না বিয়ের জন্য—তাই জিগোস করছিলাম।

আহা, ভগবান করুক, তাই হোক বাছার, অমন চমৎকার ছেলেটি যেন অকুলে ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছিলো, মামী খত্তর পেলে হিমালয় পর্বতের আড়াল পাবে বাছা—কাকীমার আশীর্বাদে মনে মনে ভয়ানক চটলেন সুবর্ণবালা, কিন্তু বিরক্তি রূপে সুমনাকে উদ্দেশ্য করে একটু বেশি স্বোঁক দিয়ে বললেন, তা যা-ই বল সুমনা, টাকাকড়ি হলো বোনো জল, ও ছদ্মদের কিন্তু সৌন্দর্য হলো চিরদিনের—কথা বলতে বলতে মেয়ের দিকে এক পলক তাকিয়ে নিলেন সুবর্ণবালা, তারপর আবার প্রাণ করলেন, তা, তোমার সেই মিত্রর মেয়ে দেখতে কেমন?

সুমনা ছুঁধের চেহারায় নিরীহ ক'রে বললো, খুব সুন্দরী না-ও হতে পারে, কিন্তু দেখতে অদ্ভুত সুন্দরী লাগে। বড়লোকের বউ-বিয়েরা তো নানান কেতার সাজগোজ করে, ঠিক প্রানের পরমুহূর্ত ছাড়া ওদের বিউটি কোনোমতে ধরার বো নেই!

খুব বুদ্ধি পালে চোঁটে যা চড়িয়ে পদ্মিনী সঙ্গে বসে থাকে দিন-রাত? কথা শেষ করে সুবর্ণবালা মেয়ের সাধারণ আটপোরে শাড়িপরা চেহারাখানির দিকে গুরুমিশ্রিত দৃষ্টিতে তাকালেন। উত্তরে নীরবে একটু একটু হাসলো সুমনা। চিরচঞ্চলা শ্রোতবিনী যেন হঠাৎ গতিবেগ রুদ্ধ করে একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেছে, শুধু চোখ দুটিতে কিসের একটা ব্যাকুল প্রত্যাশা জেগে রয়েছে এখনও। মেয়ের চোখের জ্বালা কিন্তু উপলব্ধি করতে পারলেন না সুবর্ণবালা, অপরিহৃত একটা হাই তুলে আড়মোড়া ভেঙে উঠলেন, নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে ভাবলেন: মীম্বর মত সুন্দরী মেয়ে আর পেতে হয় না। আর সুমনা বিদায় জানিয়ে যখন বাড়ি বাঁওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালো, তখনও মীনাঙ্কী মৌন রইলো, আর সদর পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এসে যখন তার বান্ধবীকে একা পেলো মীনাঙ্কী, তখন ওর স্বপ্নিওর গতি দ্রুততর হলো, বৃকের আলোড়ন এত প্রচণ্ডতর হলো যে তা ঢাকবার প্রাণান্তিক তাকিয়ে ও ওর বান্ধবীকে সামান্য কোনো কুশলও জিগোস করতে পারলে না, সাধারণ সৌজতটুকুও দেখাতে পারলে না।

আরো সাত দিন কাটলো মীনাঙ্কীর। তারপর আরো দুদিন। মনে মনে ভাবে মীনাঙ্কী, সেদিন সুমনার সব কথা কান পেতে

শুনলো ও আর মনে মনে শুধু সহ্য করলো, প্রেমের কোনো ভাবা কেন ও খুঁজে পায়নি? একটা প্রেমের প্রয়োজনীয়তা নিয়েই ওর মন এখন আকুল-বিকুল ক'রে ফিরছে: মাষ্টারমশাই আমার কথা কিছু বলেননি সুমনা?—মাষ্টারমশাই আমার কথা কিছু—। সারাদিন এই প্রশ্নটা ওকে যেন শুধু তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায় আর নিস্তরক স্বাদে ওর অন্তর চোখের পাতায় সেদিনের সেই আবেগতপ্ত স্মৃতির মুহূর্তগুলো অবিরত তরলায়িত হয়ে ওঠে আর তারপর নিঃশব্দে হুঁশিয়ে হুঁশিয়ে কাদতে থাকে মীনাঙ্কী।

সেদিন দুপুর গড়িয়ে বিকেল হওয়ার মুখে আবার এলো সুমনা, ওকে দেখে মনে হলো অনেক সময় দিয়ে আর অনেক মন দিয়ে আজকের বেশভূষা সম্পন্ন করেছে ও। মীনাঙ্কীকে সঙ্গে করে নিয়ে বাঁওয়ার জন্য অল্পমতি প্রার্থনা করলো ও সুবর্ণবালার কাছে, মামীমা, আজ আমাদের বাড়িতে একটা উৎসব, মীনাঙ্কীকে আমি নিতে এসেছি, আবার আমি নিজে সঙ্গে করে পৌঁছে দিয়ে যাব।

উৎসবটা কিসের শুনি? বার তিনেক সুমনার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে প্রশ্ন করলেন সুবর্ণবালা।

এই আমার পাশের উপলক্ষ্য—একটু আমতা-আমতা করে বলে শেষ করলো সুমনা, বা না পাশ—তার জন্য আবার উৎসব—বাবার যেমন কাণ্ড। মেয়েকে সাজিয়ে গুলিয়ে পাঠানোর জন্য একটা মৌন প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঠেলে তুললো সুবর্ণবালাকে। কিন্তু ঐ এককোঁটা মেয়ের জেদের সঙ্গে আজ আরু পেরে উঠলেন না সুবর্ণবালা। মীনাঙ্কীকে—সুমনার সঙ্গে যেতে রাজি করাতেই সুবর্ণবালার অনেক শক্তি খরচ করতে হলো, ঠিক যে সম্ভাবনা মনে করে সুবর্ণবালা মেয়েকে পাঠাতে এক উৎসাহী ঠিক সেই কারণ মরণ করেই মীনাঙ্কী এত অনাগ্রহী। শেষ পর্যন্ত সাধারণ একখানা আকাশী রংএর শাড়ি পরে আর মাথার চুলে ছবার চিকরী বুলিয়ে টান করে একটা হাতখোঁপা বেঁধে সুমনার সঙ্গে গেলো মীনাঙ্কী। বাড়ীর রাস্তাটা পেরিয়ে বাঁদিকে বাক নিচেই অদূরে দাঁড়ানো একটি মোটর গাড়িকে সুমনা হাতছানি দিয়ে আহ্বান করলো। গাড়ি এসে দাঁড়ালো সামনে, মীনা তীব্র প্রতিবাদ করলো, আবার গাড়ি চেপে অনর্থক খরচা করা কেন? বাসেই দিব্যি বাওয়া বাবে। দ্রুত হাতল ঘুরিয়ে গাড়ির দরজা খুলে তাগিদের হয়ে বললে সুমনা, চটপট উঠে পড় মীনা, মেলাই দেবী হয়ে গেছে তোকে খোসামদ করতে করতে। দেবী দেখে বাড়ীর সবাই নিশ্চয়ই ভাবতে শুরু করেছে। আর আপত্তি করলো না, মীনা গাড়িতে উঠে বসলো, গাড়িখানা যে বাড়ির গাড়ি, আনমনা মীনা তা খেয়াল করলে না আদৌ। সারা পথ মীনাঙ্কী একেবারে অদ্ভুত নিস্তরক। হঠাৎ একটা স্বপ্নের নেশা ওকে এখন পেয়ে বসেছে যেন, যেন নিস্তরকতার প্রতিটি মুহূর্ত ও সেই সোনালী স্বপ্নের নেশার মাতাল হ'য়ে থাকতে চায়, স্বপ্নের নেশার তৃপ্তি এত, এত সুখানুভূতি?

মীনা! নাহ, এসে গেছি আমরা—

টুটে গেলো দিব্যস্বপ্ন। স্মৃতির আধুনিক ডিজাইনের একখানা বাড়ির গাড়ি বারান্দার নিচে এসে থেমেছে। কিছুটা আচ্ছন্ন মত মীনা সুমনার পেছন পেছন গাড়ি থেকে নেমে এলো, তারপর চোখ বিক্ষাণিত ক'রে তাকিয়ে রইলো এলু প্যাটার্নের বাড়িখানির দিকে, এ আররা কোথায় এলাম সুমনা?

চল চল—খুশীর ফোঁয়ারা বেন মুক্তি পেলো স্রমনার গলায়, বুলিলে, এটা স্রমিয়দা'র বাড়ি। নিজেই বাড়ি কিনে ফেলেছেন স্রমিয়দা', আর স্রমিয়দা'র প্রেরিত গাড়ি চেপেই আমরা এলায়—বাসীমা যদি কোনো আপত্তি তোলেন, সেজন্য আগে বলিনি।

আবার এক বাক ভ্রমর গুন-গুন শুরু করলো মীনাকীর মনে—
আছে, আছে, স্রমিয়র ওরই আছে। এদিক সেদিক তাকিয়ে মীনা উজ্জল প্রসন্ন মুখে বাকবীর পাশে পাশে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলো। স্রমনা পাশে না থাকলে, ও ছুট দিয়ে সিঁড়ি পার হ'য়ে ওপরে উঠে যেতো কখন। বাড়ি সাজানোর ব্যাপারে ভারি স্রমর শিল্পমনের পরিচয় দিয়েছে স্রমিয়র। সিঁড়িতে শুধু রঙীন তেলরঙের পাখির আর ফুলের ছবি। সেদিকে চেয়ে চেয়ে মীনাকীর টোঁটের কোণার একটা ছোট্ট হাসির চেউ উঠলো। ওপরের টানা বারান্দা পার হ'তে হ'তে অনেকের উজ্জল কলগুণন কানে এলো। আর তারপরই মীনাকী দেখলো ওরা ডাইনিংরুমের উদ্ভুক্ত কবাটের সামনে ভেতরে বিরাট ডিম্বাকৃতি আকারের টেবিলকে ঘিরে ওর অচেনা মেয়ে-পুত্র সবাই ব'সে আছে, কী অল্পস্র তাদের জোলুস আর কী অনর্গল তাদের কথার বংকার! ন বর্ষো ন তহৌ ভাবে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রইলো মীনা। ভ্রমরকুল হল ফুটিয়ে উড়ে গেলো ডানা মেলে। টেবিলের দৈর্ঘ্যের একদিকের মাঝখানের চেয়ারে স্রসজ্জিতা মেয়েদের মধ্যমণি হয়ে আসীন স্রমিয়র। স্রমিয়র দিকে হুঁক সকলের কথা বলার আগ্রহী ভঙ্গি দেখে প্রথম দৃষ্টিপাতেই মনে হয় যে স্রমিয়রই সেখানে বিশেষ ব্যক্তি। আর মেয়েরা এমন চোখের চেহারা ক'রে স্রমিয়র বক্তব্য শুনছে যে, এ তো কথা নয়, এ বেন মহাপুরুষের ব্যক্তি।

স্রমিয়র কথা থামিয়ে মীনাকীর আশ্বাসনা মুখ পর্বস্ত চোখ তুলে বললো, শুধু তোমাদের জন্ত চা খেতে আমরা বিলম্ব করছি, জীগ'গির চটপট বসে পড়ো। একবার চকিত দৃষ্টি-বিনিময় হলো মীনাকীর সঙ্গে। স্রমিয়র মুখের ভাবে কিছু পেলো না মীনাকী। স্রমনার হাতের আকর্ষণে পাশাপাশি ছুটো চেয়ারে এসে বসলো ওরা। চা-পর্বস্ত শুরু হলো। বস্ত্রচালিতের মত একটু-আধটু খেয়ে চলেছে মীনাকী, আর অপাঙ্গে আলাপময় উজ্জল স্রমিয়রকে বারে বারে দেখছে।

'হুয়ো...হুয়ো...হুয়ো' শুধু এ ছোটো শব্দে ওর মন ওকে একেবারে কাবু করে ফেলেছে। খাওয়ার মাঝখানে বয় এসে সেলাম দিয়ে একটা কার্ড স্রমিয়র হাতে দিলো। কার্ডের ওপরে ছাপার হরকে লেখা স্রনীল বসাক, বি-এস-সি, গ্র্যাসগো। টোঁটের কোণে অদ্ভুত বিচিত্র একটা নীরব হাসি ফুটি-ফুটি করে মিলিয়ে গেলো স্রমিয়র। কার্ডখানা বয়ের হাতে ফেরৎ দিয়ে মস্তুর গলায় বললো, সাবকো কহেনা, আপকা কুছ গড়বড় হোগিয়া, আপকা সাথ সোম সাবকা বিলকুল জানপরছান নেহি ছায়—কার্ড হাতে নিয়ে বয় আবার সেলাম নিয়ে চলে গেলো। হৃদমনীয় ইচ্ছে হচ্ছিলো স্রমিয়র, ওর জবাবে স্রনীল বসাকের গোল মুখখানি আরো কতখানি গোল হয়, ছোটো হুটি চোখে আরো কতখানি ছাঁরা বনায়—তা দেখার, কিন্তু না, না দেখেই ও তা বেশ করনা করতে পারছে। বহু অকর্ণেশের কথা বারে বারে মনে পড়লো, আহা! আজ যদি

অকর্ণেশ এখানে থাকতো! যে মেয়েটির সঙ্গে মুখ ঘুরিয়ে স্রমিয়র বসিষ্ঠ অন্তরঙ্গতার সঙ্গে কথা বলছিলো, তার সাজের দিকে তাকিয়ে লাল হয়ে উঠলো মীনাকী, কানের হুপাশ কাঁ-কাঁ।

সজ্জায় মার্কিনীদেরও হারিয়েছেন তিনি। ও মেয়ে হয়ে চোখ তুলে তাকাতো পারছে না, আর ও মেয়েটি কিনা এত অসংখ্য পুরুষের সামনে ঐ পোবাক প'রে অনার্যাস ভঙ্গিতে বসে হেসে হেসে কেবল গল্প করছে স্রমিয়র সঙ্গে। তারপর চোখে পড়লো মীনার, সজ্জায় প্রতিটি মেয়েই মার্কিনী শুধু ওর বন্ধনী স্রমনা ছাড়া। স্রমনাব বেশভূষা চটকদারী হলেও অতখানি প্রমোদন পারিনি এখনও। ভরা পেয়ালা শেষ হলো, কিন্তু সৌজতসূচক এমন বাজে গল্পের কী শেষ নেই! এত তীব্র অব্যাহত বোধ করছে মীনাকী। আনন্দ! আনন্দ! এত অল্পস্র আনন্দের হাট বসেছে এখানে, কিন্তু ও ওর স্বপ্নশিঙের বক্তৃৎসরণের পরিমাপ চেষ্টা করছে বেন নীরবে, আর প্রাণপণ চেষ্টার চোখ কেটে আসা অকর্ণটাকে ঠেকিয়ে রাখছে; তাই চায়ের আসরের কোনো উচ্ছ্বাস আলোচনাই ওর কানে পশলো না। আর, তারপর, সবাই বখন চেনার ছেঁকে ডাইনিং হলের এক দেয়ালের হাতে-আঁকা অনবদ্য একখানি ছবির নিচে দাঁড়িয়ে আলোড়ন তুলে নানান ভাষার তারিক করতে লাগলো, আর স্রমিয়র সেই পাশে বসে মেয়েটির একেবারে গা ঘঁসে দাঁড়িয়ে অমুচু কঠে কী একটা কথা বলে গলা মিলিয়ে একসঙ্গে হেসে উঠলো, তখন পেছনে দাঁড়ানো মীনাকী আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না।

এই বংখুশির মেলায় ও শুধু নিশ্চিন্ত প্রাণহীন পুতুলই নয়, ওর উপস্থিতি অব্যাহত, হাতকর। এই আনন্দের হাটে ওর প্রবেশ নিবেশের অদৃশ্য বিজ্ঞপ্তি বেন সর্বত্র খুলছে।

: হুয়ো...হুয়ো! অবোর ওর অন্তর মহলের সিংহ দরজায় ঢাকের বাড়ি দিলো কে বেন! নিঃশব্দে ডাইনিং হল থেকে বেরিয়ে এলো মীনাকী। কোনো শব্দ না তুলে পাগল-পায়ে নামতে লাগলো নিচে। রিভলভিং ট্রেজের মঞ্চ ঘুরে গেলো বেন। পকেটের দিয়ে বেন স্রমিয়র মীনাকীর অস্তিত্ব অনুভব করছিলো। সঙ্গে সঙ্গে ভিড়ের বাইরে চলে এলো স্রমিয়র আর তারপরই পেছনের ঘোরানো সিঁড়িতে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেলো স্রমিয়র স্রদীর্ঘ শরীর। সদর দরজার কাছে পৌছে মীনাকী দেখলে, হাত দুখানি জড়িয়ে বুকুর ওপর রেখে পা দিয়ে দরজা আটকে ঋজুভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে স্রমিয়র। মুখে মিটি মিটি হুইঁমীর হাসি। চোখের জলের হ্রস্ব প্রাবনটা কিছুতেই আর বোধ করতে পারলে না মীনা, তাড়াতাড়ি তহাত তুলে মুখ ঢাকলো। সবে এলো স্রমিয়র, নিজের হুহাত দিয়ে মীনাকীর চোখ থেকে হাত দুখানি নামিয়ে কোঁতুকের স্রবে বললো, ছি: ছি: মীনা, এমন বোকা তুমি! একটু হুইঁমী করছিলেম তোমার সঙ্গে—মীনাকীর হাত ধরে সামনে আকর্ষণ করতেই, ওদের সামনে ছুটে এলো স্রমনা, স্রমিয়দা', আমার অভিনয় সাক্ষ্যের বকশিস? তারপর হাসতে হাসতে বেন কোঁতুকে কেটে পড়লো স্রমনা।

তুই তো ভারি ইয়ে রে মীনা, তোকে বাড়ি থেকে কারনা করে এনে স্রমিয়দা'র কাছে পৌছে দিলেম, আর তুই আমাকে না বল পালাচ্ছিলি? ওদের একলা থাকার স্রবোগ দিয়ে আবার

ছুট কাপালো সুননা, কিন্তু বর পার হবার আগেই স্রষ্ট্রির ডাক দিলো।

সুননা, শোনো, শোনো। ভেতরে বাওয়ার দরজার কাছে ঝাড়িয়েই জিজ্ঞাসুচোখে তাকালো সুননা।

মলয়কে বলো যে এদিকটা যেন সে মানেজ করে নেয় অর্থাৎ সমানিত অতিথিদের সমাদরে বিদায় জানানোর যেন, আমি এখন মীনাকীকে পৌছে দিতে চললাম। সুননা বান্ধবীর উদ্দেশ্যে চোখ টিপে একটু হেসে নিয়ে উত্তর দিলো। ঠিক আছে স্রষ্ট্রিয়দা, আমি দাঁদাকে বলে দেব।

মৌন মীনাকীর হাত ধরে গাড়িতে উঠে বসলো স্রষ্ট্রিয়। গাড়ি চললো। আন্তে হাত ছাড়িয়ে গাড়ির এক পাশ ঘেঁসে বসলো মীনাকী।

এ কী! এমন গিরি-সাগর ব্যবধান কেন রচনা করলে মীনা?

স্রষ্ট্রিয় সরে এসে বাঁ-হাত বিছিয়ে মীনাকীর কাঁধে হাত রাখলো। মীনাকী মুখ ঘুরিয়ে পথের চলমান পথিকদের খুব স্বক্লেষণ দিয়ে দেখতে শুরু করলো, হো হো করে হেসে মীনাকীর চিবুক ভান হাত দিয়ে ধরে মীনাকীর মুখ নিজের দিকে ফিরিয়ে নিলো স্রষ্ট্রিয়, চোখের দীর্ঘির বাঁকে বাঁকে অনেক জল জমেছিলো, আবার শুরু হলো প্রাণন, মীনাকীর কাঁধে আবেগের সঙ্গে একটু চাপ দিয়ে স্রষ্ট্রিয় স্রষ্ট্রিতমুখে বললো, মীনাকী, মীনা! শোনো, কেন না লক্ষ্মীটি, আমার হুটো কথা আগে শুনে নাও—আমি একটা দিন তোমার কাছ থেকে আত্মগোপন করেছিলেম, সমাজের আর একটা পিঠ দেখার জন্য শুধু দেখলাম, কী অদ্ভুত পৃথিবী! কী অজ্ঞান সমাজ! নিচুগলির মানুষ আমি, চাল নেই, চুলো নেই, ঘর নেই, ছর নেই, সেই মানুষ রাতারাতি হয়ে গেলেম সমাজের মুকুটমণি, শুধু তাই নয় মীনা, অনেকের আশা-ভরসার পাত্র পূর্ণ হলো। বলোতো মীনা, কী অদ্ভুত মজাদার দুনিয়ার আমরা বাস করছি!

মীনাকী নিরুত্তর। চোখের দীর্ঘির কানা থেকে জল অঙ্গ নিচে নেমেছে। স্রষ্ট্রিয় তাকিয়ে আছে মীনাকীর দিকে। যেন হিমে ভেজা ভোরবেলার শিউলী ফুলের মত শান্ত মুখখানি। হঠাৎ কী যেন মনে পড়ে গেলো স্রষ্ট্রিয়র। মুখ টিপে হেসে পকেট থেকে একটা ভারি ওজনের মুখখোলা খাম টেনে বার করে মীনাকে উদ্দেশ্য করে বললো, নিজেকে এমনভাবে ধরে না রাখলে তোমার মার কাছ থেকে এমন একখানি অপূর্ব সুলভ চিঠি আর এমন আশ্চর্য সম্মান পেতেম কী করে? একেবারে অদ্বিতীয় আমি, আমার দ্বিতীয় নেই। এমন কোনো বিশেষণ নেই বাংলা ভাষার বা নাকি আমার নামের আগে পিছে জোড়া লাগাননি তিনি। প্রথমেই আমার কল্পকাস্তি দিয়ে শুরু করেছেন আর একেবারে শেষ পাতাটার, আমার প্রতি তোমার অন্তল অদ্ভুত টান আর আমার বিরহে তোমার ক্লান্ত ছটফটানীর করেকটা হালকা টান আছে—নাও পড় দেখো, অন্ততঃ শেষের পাতাটা শুধু পড়ো।

মীনাকী এবার নিজের ভক্তিমায় খিল-খিল করে হেসে উঠে চিঠিখানা স্রষ্ট্রিয়র হাত থেকে নিয়ে স্রষ্ট্রিয়র পকেটে রেখে দিলো। মীনাকীর অপরূপ মুখখানি হাত দিয়ে তুলে ধরে গুনগুনিয়ে বলল স্রষ্ট্রিয়, এমন ভোরের আকাশের আভা যে মুখখানিতে, এমন স্নিগ্ধ স্বপ্নাধী চাঁউনি যে চোখ দুটিতে, এর তুলনা আর কোথাও মিললো

না মীনাকী! অসহ্য আনন্দে মীনার মুখ রামধনু রঙে রঙা হয়ে গেলো। স্রষ্ট্রিয় পেছনফেরা পাঞ্জাবী ডাইভারের দিকে এক পলক তাকিয়ে নিয়ে মীনাকীর আরো কাছে সরে এলো। মীনাকীর কাঁধে আরো একটু চাপ দিয়ে কানের কাছে মুখ এনে অদ্ভুত গলায় বললো, তা হলে মীনা কি ঠিক করলে? ফানসুজ ভাত খাবে না ভাতের ফান গালবে?

লজ্জার পুলকে ডাইভারের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে স্রষ্ট্রিয়র প্রশস্ত কাঁধে মুখ লুকালো মীনা।

সিমলার কালীবাড়ির প্রখ্যাত ট্রেজে সংযমিত ক্লাবের পরিচালনার 'চিহ্নাঙ্ক' নৃত্যনাট্য অঙ্কীত হচ্ছে। অভিনয় শুরু হবার মিনিট কুড়ি বাকী এখনও। সংযমিত্রের সদস্য এবং সদস্যরা সকলেই নিঃশব্দে ব্যস্ত, তবে ব্যস্ততাটা বিশেষভাবে প্রকট। বাড়তি অসংখ্য চেয়ার দেওয়া হয়েছে অভিনেত্রীরা তবু যেন তিল ধারণের স্থান নেই। প্রায় হাজার লোকের ভিড়। রমেন সর্বাঙ্গীরা যখন এসে পৌছোলেন, তখন আর জায়গা বিশেষ নেই। রমেনকে স্ত্রী-বান্ধা নিয়ে এগোতে পিছোতে দেখে কেশবশংকর বাবু অমুচকঠে ডাক দিলেন, এদিকে চলে আসুন—দ্বিতীয় সারির প্রথম সোফার বসেছিলেন কেশবশংকর, তার পরেই আর একটা ছোটো সোফার অরুণেশ তারপরের বড় সোফাটার এক পাশে বসেছিলেন মিসেস তরুবালা বিশ্বাস। সে সোফার আরো দুজনের জায়গা খালি রয়েছে। নীলা আর শেলি গ্রীণক্রমে। কেশবশংকর বাবু তরুবালা পাশের জায়গা নির্দেশ করে ইন্দ্রাণীর দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বললেন, তোমরা এখানে গিয়ে বসো আর খোকন—খোকনকে জায়গা ছাড়ার কথা বলার আগেই সোফা ছেড়ে সরে এসে ঝাড়িয়েছে ও। বিব্রত রমেন অরুণেশের সোফার বসতে বাবে বাবে অস্বীকার করলেন। কেশবশংকর বাবু উদাত্তকঠে বলে উঠলেন, আপনি বসে পড়ুন রমেন বাবু, ইয়াম্যানদের খুঁজে টুঁজে নিয়ে জায়গা ঘোঁড়া করে বসে ভাল। তরুবালা স্বামীর এ-হেন আচরণে মর্মান্তিক চটে গেলেন। ছিলাপরা যমুকের মত ভুরু দুটো বক্সিম হলো মিসেস বিশ্বাসের। একটু ইতস্ততঃ করে সর্বাঙ্গী, ইন্দ্রাণী এগিয়ে এলেন লম্বা সোফাটার দিকে।

সেই 'ভুরু বাঁকানো অবস্থায় চোখে বিরক্ত-মিশ্রিত তাজিল্য দৃষ্টি ছেনে তরুবালা বিশ্বাস ধর গলায় বললেন—এখানে বসবে কী করে তোমরা? এ জায়গা মিসেস তালুকদারের জন্য রাখা আছে এবং পাছে ওরা কাণ্ডজানহীন হয়ে কেউ একজন বসে পড়ে, সেজন্য ঐ গলাতেই দ্রুতলয়ে শেষ করলেন।

মিসেস তালুকদার ঠেসাঠেসি করে সকলের সঙ্গে বসতে পারেন না—স্ত্রীর কথা কানে না গেলেও, তরুবালা যে ওর পাশের খালি জায়গাটা ছেড়ে দিলেন না, সেটা বুঝতে পেরে কেশবশংকর তাঁর বিরাট শরীরটা নিয়ে ব্যস্তমস্ত ভাবে উঠে দাঁড়ালেন।

আপনারা এখানেই বসুন, আমরা পেছনে গিয়ে বসছি। এবার রমেন শুধু বিব্রতই বোধ করলেন না, খুব বেশি রকম লজ্জিত হলেন। সে লজ্জার দার উদ্ধার করলেন সর্বাঙ্গী, ভাড়াভাড়ি বলে উঠলেন, আপনি ব্যস্ত হবেন না, ঐ যে মিসেস গুপ্তার পাশে জায়গা রয়েছে আমরা সেখানে গিয়ে বসছি—কেশবশংকরকে লক্ষ্য

করে কথা ক'টি বলে দ্রুত ও পাশে বাঁওয়ার জন্য চলতে শুরু করলেন সর্কাণী, ইন্দ্রাণী ও চললো। মালতী গুপ্তা বসেছেন দ্বিতীয় সারির ওদিকের কর্ণারে। প্রথম সারির মাঝখানে হিমালচন্দ্রের দুজন বিশেষ অতিথির সঙ্গে বসেছেন মিঃ গুপ্ত। হিমালচন্দ্রের প্রধান অতিথিদ্বয়কে আজকের অভিনয়টি ইংরিজীতে ইন্টারপ্রেট করবার ভার নিয়েছেন উনি। নৃত্য-নাট্যে বোঝাবার ব্যাপার খুব কমই থাকে, ঘটনাটার জিষ্ট বলে দেওয়া আর কি। সামনে ভয়ংকর ভিড়। সর্কাণী মেয়েকে নিয়ে পেছন দিক দিয়ে দূরে চললেন। গতকাল মালতী গুপ্ত দুপুরে এসে সন্ধ্যা পর্যন্ত সর্কাণীদের ওখানে কাটিয়ে গেছেন, শুধু তাই নয়, কোমরে কাপড় জড়িয়ে পাঞ্জাবীদের একটি বিশেষ প্রিয় খাবার 'বাটোরা' বহুস্তে খানিয়ে সর্কাণীদের খাইয়েছেন। কালকের দিনটা তারি আনন্দে কেটেছে ওঁদের। সর্কাণীর কাছে আগের দিনের প্রস্তুত পিঠা মজুত ছিলো, সে পিঠার নাম তারি মজার—পরচিত্তহাম্বী। অফিস-ফরং মিঃ গুপ্ত স্ত্রীকে নিতে এসেছিলেন, সেই রকম কথাই ঠিক ছিলো আগে থেকে। এই পিঠার নাম নিয়ে চায়ের টেবিলে হাসির ঝড় তুলেছিলেন। ঐ প্রসঙ্গে কত মজার মজার পিঠার নাম শ্রবণ হয়েছিলো চায়ের টেবিলে তার পর। তার পর অতীতের কত কাহিনী উদ্‌গীরণ হলো—মিঃ গুপ্ত ছোটো ভাইকে পাহারা রেখে ছোটোবেলার তাক বেয়ে পাটিপাটা চুরি করতে গিয়ে তাকের আলগা ভক্তা খঁসে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে কি ভাবে চিংপটাং হ'য়ে পড়ে গিয়েছিলেন আর তার পর পিঠা খাওয়ার বদলে পিঠে কেমন ঘা কতক খেয়েছিলেন, সে ঘটনা বর্ণনা ক'রে হেসে আর বাঁচেন না মিঃ গুপ্ত। মালতী-সর্কাণী জন্মেটলি বড়বন্ধ ক'রে একটি শান্ত ঠাণ্ডা মেয়ের টিফিন থেকে আমের আর আনারসের আচার চুরি ক'রে খেয়েছিলেন। হীরের কুটির মত অসংখ্য অতীত কাহিনী বিকমিকিয়ে উঠেছিলো কাল চায়ের পেয়ালায়। বিদায়কালে মিঃ গুপ্ত সহাস্তে বললেন : বাব্বী পেলে তোমার মুখের অনাবিল আনন্দের আলো বধন এ ভাবে বিজুরিত হ'তে থাকে, তখন বাব্বীর সঙ্গে যোগাযোগটা আরো ঘন ঘন করলেই তো পার। তার পর, সপ্তাহে এক দিন ক'রে কে কবে কার কাছে বাবে, সেই ব্যবস্থার রফা হলো মালতী-সর্কাণীর মধ্যে। পেছন দিক থেকে প্রায় তৃতীয় সারির কাছ বরাবর এসে সর্কাণী হাসিমুখে অফুটে ডাক দিলেন, মালতী!

মিসেস গুপ্ত বাড়ি ফিরিয়ে বাব্বীকে দেখে চোখের তারা নাক পর্যন্ত নামিয়ে এক মুহূর্ত ভাবলেন। তার পর মুখের ভাব হাসি হাসি ক'রে অম্লচক্রে বললেন, সা—বি, দেবি করিস নে আর, ঐগগির চেয়ার দেখে বসে পড় তোরা—এত দেবী ক'রে আসতে হয় কখনও? মুখ ঘুরিয়ে বাঁ পাশে বসে মিসেস আরাঙ্গারের সঙ্গে আগের মতই কথা বলতে লাগলেন মিসেস গুপ্ত। বিমূঢ়-বিস্ময়ে তৃতীয় সারির আরম্ভেই সন্ধ্যা সর্কাণী শুরু হ'য়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। অবশ্য সর্কাণীয়া নিয়মমাত্তিক আসতে পারেননি, একটু দেবী ক'রে ফেলেছেন ঠিকই। মিসেস রেঁদের জন্য ওঁরা অপেক্ষা করছিলেন, একসঙ্গে মিট ক'রে কালীবাড়ীর হলে আসার কথা হয়েছিলো ওঁদের। আজ মিঃ রেঁর এক মাসভূতো বোন ও ভগিনীপতি দিল্লী থেকে মাত্র সাত দিনের জন্য বেড়াতে এসেছেন। কথা ছিলো তাঁদের সঙ্গে নিয়েই সবাই একসঙ্গে হ'য়ে আসবেন, কিন্তু শেষ মুহূর্তে মিঃ রেঁদের প্রোগ্রাম ক্যানসেল

করতে হলো, বোন-ভগিনীপতি দুজনেই শারীরিক কিছু অসুস্থ বোধ করছেন। সেই জন্য সর্কাণীদেরও দেবী হ'য়ে গেলো। কিন্তু তাই বলে বাব্বী মালতী তার পাশে জায়গা থাকা সত্ত্বেও। চিন্তামুখে ছিন্ন হলো একজন ভলেন্টিয়ারের আহ্বানে। পাশ ফিরে দেখলেন একজন ভলেন্টিয়ার দুটো হাতলবিহীন চেয়ার হাতে ক'রে দাঁড়িয়ে আছে আর তার একটু দূরে অরুণেশ দাঁড়িয়ে আছে শুকনো মুখে। বোকা গেলো অরুণেশই ভলেন্টিয়ারকে বলে বলে চেয়ারের ব্যবস্থা করেছে। ভলেন্টিয়ারের অল্পরোষে বজ্রচালিতের মত একটু সরে গেলেন সর্কাণী, ইন্দ্রাণী আগেই দেখাল যেসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলো, সেই সারিতে পাশ্চাত্যগামি দুটো চেয়ার পেতে দিলে ভলেন্টিয়ার। সর্কাণী ব'সে পড়লেন কিন্তু ইন্দ্রাণী বললো, আপনি ও চেয়ারখানা নিয়ে বান, চেয়ার আমার লাগবে না। ভলেন্টিয়ারটি বিনীত গলায় প্রতিবাদ জানালো।

না, নিয়ে বান বলছি, এখানে চেয়ার পেতে লোক চলাচলের অসুবিধে করবেন না—ইন্দ্রাণীর কঠিন কঠোর শুনে ভলেন্টিয়ার হকচকিয়ে চেয়ার নিয়ে পাশের দরজা দিয়ে অদৃষ্ট হ'য়ে গেলো। সর্কাণীও বাধা দিতে গিয়ে মেয়ের গলা শুনে চূপ করে গেলেন। মেয়ের জেদের সঙ্গে উনি সবিশেষ পরিচিত। তাছাড়া বাব্বী মালতীর রহস্যময় ব্যবহারের ঘোর বেন তখনও উনি কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। আস্ত আস্তে বিলম্ববণের স্বচ্ছ আলোর প্রতিভাত হলো সব সর্কাণীর কাছে। পাঞ্জাব গভর্ণমেন্টের সেক্রেটারী-জায়ার আচরণ শ্রবণ ক'রে একটা নিখাস ফেললেন সর্কাণী। মঞ্চদর্শী উঠে গেলো। সর্কাণীর চিন্তার দিক্পরিবর্তন হলো কিছুটা। মনোবোগ দিতে চেষ্টা করলেন দৃষ্ট এবং দৃষ্টপটে।

দেয়াল যেসে আরো অনেকের সঙ্গে একেবারে ঋজুভক্তিতে দাঁড়িয়ে আছে ইন্দ্রাণী। অডিটোরিয়ামের উজ্জ্বল আলো নিবে ছায়া-ছায়া অন্ধকার ঘনালো, তারপর ফিকে হলো আরো, অরুণেশ কখন এসে বেন দাঁড়িয়েছে ইন্দ্রাণীর পাশে। বৃষ্টি থেমে যাওয়া অথচ আবার বেন এখনি বৃষ্টি নামবে আকাশের মত ইন্দ্রাণীর মুখের দিকে তারিয়ে আছে অরুণেশ। সকলের কান বাঁচিয়ে খুব অফুটে ডাকলো, ইন্দ্রাণী। তখন ঠেজে অজুঁন বলছে,—‘অহো কী দুঃসহ স্পর্ধা!’ অরুণেশের মনে হলো পাশ কোর ইন্দ্রাণীর কঠ চিরে এশব্দ চারটে বার হ'য়ে এলো, কঠোর তো নয় বেন ভেরী বাজিয়ে ঘোষণা করলো। অথচ বাবাণ-প্রতিমার মত দাঁড়িয়ে আছে ইন্দ্রাণী, নিখাস-প্রখাসের উত্থান-পতনটুকু পর্যন্ত বেন বোকা যায় না। এর আগে আর একদিন এমনি দ্রানিকর ঘটনার সামনে উপস্থিত ছিলো অরুণেশ। সেদিন ইন্দ্রাণীর অসহিষ্ণুতা উত্তেজনার থিকি-থিকি করে ফলে উঠেছিলো ওর দু'চোখের মণিতে, মুখের রেখায়। সে ছবি এতটুকু দ্রান হয়নি অরুণেশের কাছে। মা'র আত্মপ্রসাদের এমন স্থল প্রকাশ নিয়ে অনেক ভেবেছে অরুণেশ, প্রতিরোধের উপায় সবক্ষেত্রে ভেবেছে অনেক। মাকে একলা পেয়ে কত দিন অরুণেশ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হ'য়ে এগিয়ে গেছে, কিন্তু ওর বক্তব্যের বিপুলমাত্র উচ্চারণ না করে দু'চারটে বাজে কথা বলে আবার ব্যথিত-গভীর মুখে ফিরে এসেছে নিজের ঘরে আর নিজের ভীকৃতাকেই নিঃশব্দে তারপর গালাগাল দিয়েছে। মা'র কাছে ঐ প্রসঙ্গ নিয়ে আর্জি পেশ করতে সেলেই কী একটা অদ্ভুত লজ্জা ও সঙ্কোচে কঠরোধ হয়েছিলো বার বার।

নিজের নির্জন ঘরে এনে অনেক বিশ্লেষণ করেও সঠিক কারণ অনুমান করতে পারেনি অরুণেশ। ওর প্রতি মায়ের অন্ধ ভালবাসাই ওর কর্তরোধ করছে নাকি কথার কীকে ওর গোপন প্রেম প্রকাশ হয়ে বাওয়ার আশংকা?

এক হাত দূরে দাঁড়ানো পাশকেরা ইজ্রাণী, অস্থিরতার বিকৃতির কোনো একটা চেউও ওঠেনি ওর মুখের রেখায়, শরীরের ভঙ্গিমায়ে। হুঁচোখে উদ্গ্রীব ব্যাকুলতা নিয়ে তাকিয়ে আছে অরুণেশ পাশাণ-প্রতিমার দিকে। সেদিন অপরাহ্নের জাতীয় ওর নিজের চোখের আলো দেখেছিলো ও ইনার দুই চোখে, সে আলো নিবতে পারে না—নিববার নয়, বিশ বছরের অরুণেশ তা মন দিয়ে জানে, বুক দিয়ে বোঝে, তবে কী ও ভুল দেখেছিলো? না, ভুল ওর হয়নি। নিয়তি ওর জীবনটা কী আশ্চর্য ভাবেই না নিয়ন্ত্রিত করছে। ও আর ইজ্রাণী কাছাকাছি হলেই নিয়তি তার নিষ্ঠুর হাতের খাবা মেলেছে ওদের মাঝখানে, টেনে-হিঁচড়ে সরিয়ে নিচ্ছে একজনকে আর একজনের কাছ থেকে। প্রেমের কিশলয় ভেগে উঠলেই সমূলে কঠিন কর্কশ পায়ে নিষ্পিষ্ট করছে। নিজের মনও নিঃশব্দে বেন বাচাই করে চললো অরুণেশ। না, এই ভাড়া-গড়ার অদ্ভুত সমস্তা থেকে ওদের আর রেহাই নেই। এক হাত দূরে অন্ধ আর এক মুক্তিতে দাঁড়ানো ইজ্রাণী ক্রমে ক্রমে ঝাপসা হয়ে একেবারে বেন মিলিয়ে গেলো অরুণেশের চোখে। অরুণেশ বিফারিত চোখে দেখলো, সেখানে শুধু একটানা না অক্ষরটা দৈর্ঘ্যে প্রস্বে বড় হ'তে লাগলো ক্রমশঃ। 'ক্ষীত হতে হতে না শব্দটা ওর সোমানে এসে সম্ভায়ে থাকে দিয়ে গেলো ওকে। ও বেন সজ্জ সাগরের মধ্যে নির্জন দীপে রয়ে গেলো একাকী। কুড়ি বছরের অরুণেশ আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না। ঝাপসা চোখে বেরিয়ে এলো কালীঘাড়ির অভিটোরিয়াম হল থেকে। অভিটোরিয়ামের বাইরে এলেই কি সব কিছুই বাইরে আসা যায়? একটা অসহ্য রাত্রি বাইরে বিস্তীর্ণ হয়ে ছড়িয়েছিলো বেন। তারপর কখন ও পা বাড়ালো, গেটের কুণ্ডলী-পাকানা কুকুরটিকে বাড়িয়ে চলে গেলো, কিছুই খেয়াল নেই। সমস্ত চেতনায় শুধু অন্ধকার, ধূসর, সবুজ, অসহ্য অন্ধকার।

'চিন্তাঙ্গনা' অভিনয়ের তিনদিন পর কেশবশংকর অফিস থেকে বখন ফিরলেন, তখন সিমলার আশ্চর্য সন্ধ্যা বিকেল শেষ হয়ে গেছে। লাফের পর একটা জরুরী মিটিং কল করতে উনি বাধ্য হ'য়েছিলেন। একজন কর্তাচারী তার নিজের অপরাধের প্রমাণযুক্ত কতকগুলি অফিসিয়াল রেকর্ড পোড়াতে গিয়ে ধরা পড়ে যায়। সেই সব ব্যাপারের বিলি-ব্যবস্থা ক'রে কেশবশংকরের অফিস থেকে বেরুতে অনেক দেরী হ'য়ে গেছে। তারপর ম্যালোগ মৌতাতো মজে গিয়েছিলেন বন্ধু-বান্ধবের 'সঙ্গে, খেয়াল বখন হলো তখন হাতখড়িতে চোখ ফেলে দেখলেন হিলখ হ'য়ে গেছে প্রচুর। দেরী হলে বাড়ি ফিরে আর কাউকে পান না, ইভনিং-ওয়ার্ডে বেরিয়ে বান সবাই। বাবুচি বৈজ্ঞানিক খালি বাড়িতে মনিবকে অনেক বেশী মনোযোগ দিয়ে চা-খাবার পরিবেশন করে, বয় দিলারাম সাবের আফ্রান শোনার জন্ত অনেক বেশী উৎকর্ষ হয়ে থাকে, কিন্তু তবু, সেদিন বয়-বাবুচির অসংখ্য গলাতি ওঁর চোখে পড়বেই।

এ নিয়ে কখনও কিছু বলেননি উনি বৈজ্ঞানিক-দিলারামকে। কিন্তু, সাবের না বলা মুখের রেখায়, কপালের খাঁজে যে বিরক্তি ফুটে ওঠে, তার জন্ত ওরা সভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে মেমসাবের আগমনের দণ্ড গুণতে থাকে। আজ ঘরে ঢুকে স্ত্রীকে দেখতে পেয়ে বিস্মিত হওয়ার চেয়ে আনন্দিত বেশি হ'লেন, হাসিমুখে বললেন—

একটা মজার খবর শুনেছো ভক্ত, আমাদের রমেন বাবু স্ত্রী সর্বাঙ্গী দেবী ফিলোজফিতে ঈশান-স্কলার। তরুণালার কোনো সাড়াশব্দ না পেয়েও কেশবশংকর খুশিমুখে বলে চললেন।

দিল্লী থেকে মিঃ রের বোন আর ভগিনীপতি এসেছেন—মিঃ এ্যাণ্ড মিসেস রুজ। মিসেস রুজ ছিলেন সর্বাঙ্গী দেবীর ক্লাসমেট। সস্ত্রীক এবং সবোন ভগিনীপতি ম্যালিং এ বেরিয়েছেন মিষ্টার রের, আমাদের পরিচিত প্রায় সকলেই ছিলেন সেখানে। সাহেব সিং-এর দোকান থেকে রমেন বাবু ও সর্বাঙ্গী দেবী কি যেন ওষুধ কিনে বেরিয়েছেন। বান্ধবীকে চিনতে পেয়ে মিসেস রুজ হৈ-হৈ করে এগিয়ে গিয়ে করমর্দন করলেন, তারপর সব প্রকাশ হয়ে গেলো— একেবারে অচল অনড় হয়ে স্ত্রীকে বসে থাকতে দেখে উজ্জ্বল ভূমিত হয়ে গেলো কেশবশংকরের। স্ত্রীর একেবারে সামনে এসে— সংশ্লী গলায় প্রশ্ন করলেন, কি হয়েছে ভক্ত, তোমার সেই পুরোনো মাথার যন্ত্রণাটা আবার শুরু হয়েছে বুঝি? তরুণালার নীরস গলায় তবু ছোটো উত্তর দিলেন, না। তরুণালার এ সময় বাড়িতে বসে থাকার আর মুখভারের কি কারণ ঘটতে পারে, মনে মনে তাই চিন্তা করতে করতে 'কেশবশংকর পাশের ঘরে জামা-কাপড় ছাড়তে গেলেন। বছর দু'রেক আগে তরুণালার দূর সম্পর্কের এক ভাই ইতিহাসে ঈশান-স্কলার হয়েছিলো। সে খবর বখন উনি ষ্টেটসম্যান মারকৎ পেলেন, কাগজে ঈশান-স্কলারের পিতৃশরিচয় পড়েই উনি হিসেব করে দেখলেন, ছেলেটি সম্পর্কে ওঁর ভাই হয়। তখন কিছুদিন ওঁর গল্প শুধু গরম হয়ে থাকতো অদেখা ভাই-এর ঈশান-স্কলারশিপের আলোচনায়। একদিন অফিস-ফেরৎ কেশবশংকর পাশের ঘর থেকে স্ত্রীর আলোচনার কিছু অংশ শুনে ফেলেছিলেন।

: থাকে এডুকেশন এ্যাটমসফিয়ার বলে, সে হলো গিয়ে আমার বাপের বাড়িতে। যে ঘরেই আপনি ঢুকবেন, দেখবেন স্ত্রীকৃত ২ই খাতা টেবিলে ছড়ানো আর তার মধ্যে ময় হয়ে আছে হয় আমার কোনো ভাই না হলে কোনো বোন। আর ফলও সব করছে তেমন, ইউনিভার্সিটির পরীক্ষাগুলোতে ফার্স্ট সেকেন্ড ছাড়া হয় না কেউ। এই তো আমার ভাই অভিজিৎ এবার ঈশান-স্কলার হয়েছে— ষ্টেটসমানে দেখেছেন নিশ্চয়ই? ফটো দেখে মনে হয় বেন এখনও যোলো বছর পেরোয়নি ওর। গল্পগদ্য হয়ে আরও কিছু বলতেন মিসেস তরুণালা বিশ্বাস কিন্তু কথার মাঝখানে ঘরের অনেকের মধ্যে কে বেন একজন জিগোস ক'রে বললেন, আপনার নিজের ভাই?

মনে মনে চট্টলেন তরুণালা। কথার মাঝখানে এ ধরণের সওয়াল সিমলার সমাজে কেউ করেন না। খুড়তুতো ভাই বলতে গিয়ে গলায় দ্বিধা আগলো। কারণ, পরিচিতদের মধ্যে অনেকে ওঁর শিতার পদবী জানেন। কিছুটা ধতিয়ে গিয়ে তরুণালা জবাব দিলেন, না, নিজের ভাই নয়, মাসতুতো ভাই—তা অজ্ঞ আমার নিজের ভায়ের চেয়েও অনেক বেশী। অভিজিৎকে অজ্ঞ বলে তরুণালা। নিজের উদ্ভিঙে অবশ্য একটু জোর পেলেন কিন্তু আগেকার কথার

পূর্বটার যে আদৌ যোগাযোগ রইলো না, তা বিস্মৃত হলেন সম্পূর্ণ।
পাশের ঘরে চা খেতে খেতে কেশবশংকর মুখ টিপে হাসলেন এবং
অভ্যাগতারা বিদায় জানিয়ে চলে গেলে জ্বর কাছে এসে সহান্তে
বসলেন, তরু, অভিজিতের সঙ্গে তোমার সম্পর্কটা ঠিক মাসতুতো না
পিসতুতো, হিসেব কবে দেখো দিকিনি, গ্রামদেশের একটা মজার
ছড়া আছে জানো তো? ‘মামার কেতে বিয়োলো গাই, সেই
সম্পর্কে মাসতুতো ভাই’—কথা শেষ ক’রে হো-হো ক’রে হেসে
উঠছিলেন কেশবশংকর।

খুব বেশি সেদিন রাগ করতে পারেননি তরুবালা। আড়াল
থেকে গুঁর কথা স্বামী কতখানি শুনেছেন তা জানেন না বধন,
তখন চেপে বাওয়াই ভাল। চট ক’রে অস্ত্র একটা প্রসঙ্গের
অবতারণা করেছিলেন। কেশবশংকর রমেনদের বাড়ির সকলের
প্রতিই একটি প্রচ্ছন্ন শ্রদ্ধা করেন এবং নীলা যে ইভনিং
ওয়ারের নাম ক’রে ইন্দ্রাণীর কাছে বাংলা শিখতে যার সে
খবরও সবিশেষ জানেন, প্রকাশ করেননি তা মেরের কাছে।
এ এক কৌটা মেয়ে ইন্দ্রাণীর প্রতিভার এবং ব্যক্তিত্বে মনে মনে
ইন্দ্রাণীকে আন্তরিক স্নেহ করেন কেশবশংকর। জ্বর মনোভাবের
পরিবর্তন ঘটাবার জন্যই ইন্দ্রাণীর পরীক্ষার খবর সেদিন
বাড়িতে এসে বাণে বাণে উল্লেখ করেছিলেন এবং আজকেও
অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে সর্বাঙ্গীণ খবর ব্যক্ত করার পেছনে ঐ একই
উদ্দেশ্য নিহিত ছিলো, কিন্তু জ্বীকে এমন মধ্যমে মুখে নির্বাক থাকতে
কখনও দেখেননি কেশবশংকর। কোনো অন্তঃসংবাদের আশংকার
বিচলিত হ’য়ে তাড়াতাড়ি পোষাক পরিবর্তন ক’রে ফিরে এলেন জ্বর
কাছে। উৎকণ্ঠিত গলায় প্রশ্ন করলেন, কি হয়েছে তরু? একটু
নড়ে চড়ে বসে তরুবালা ধরা-ধরা গলায় বললেন, তুমি, চা খেয়ে নাও,
তারপর শুনো—কেশবশংকরের কপালে রেখা পড়লো কয়েকটা। হাঁক
দিয়ে বৈজ্ঞান্যমকে ডেকে চা-জলখাবার এ ঘরে দিয়ে যেতে বললেন।
জ্বর দিকে সপ্রাণ চোখে তাকিয়ে শুধোলেন, কী ব্যাপার ঘটেছে
তাড়াতাড়ি বল তরু, ভরানক অস্থিরতা শুরু হয়েছে—সেই আগের
গলাতেই তরুবালা বললেন, খোকন কিছুতেই বিয়ে করবে না, শুধু
এখনই নয়, ও নাকি জীবনেও বিয়ে করবে না।

হেসে ফেললেন কেশবশংকর। ও! এই কথা, আমি ভেবে
মরিছি না জানি কী কাণ্ড ঘটে বসেছে। তোমার মাখার পোকা
হুঁকছে, না হলে খোকনের বিয়ের জন্য এমন করে কেপো তুমি?
এই বয়েসে কোনো ছেলে আজকাল বিয়ে করতে চায় না কি?

এ কথায় তরুবালা কঁদে ফেললেন, না গো, তুমি জানো
না, খোকন বলেছে আজীবন ও চিরকুমার থাকবে আর—আর
বলেছে ওর সিমলা ভাল লাগছে না, ও সাত দিনের মধ্যেই
কলকাতার ফিরে যাবে। যে ছেলে মা-বাবাকে ছেড়ে কতকালের
জন্ম বিলেত যাচ্ছে কে জানে, তার বাবা-মা-বোনদের কাছ
ভাল লাগছে না, তার ভাল লাগবে কলকাতার এই ভাপসা
গরমে শূঁত হোটেলবাড়ি, এমন মতি খোকনের কবে থেকে হলো।
ফুঁপিয়ে উঠলেন তরুবালা। বৈজ্ঞান্যম চা-খাবার নিয়ে ঘরে ঢোকার
তরুবালা মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। কেশবশংকর ছেলের কথা আর
হাসি দিয়ে উড়োতে পারলেন না। চিন্তিতমুখে চায়ের পেয়লা
খুলে চুম্বক দিলেন একটা, খোকন আজ গেছে কোথায়?

চোখের জল মুছে তরুবালা ভর-ভর ব্যস্ত গলায় বললেন,
ও মা তাইতো! এতক্ষণ তো খোকনের কেরা উচিত ছিলো,
ওতো দুপুরে খাওয়া দাওয়া করেই তোমার বন্ধু নিয়ে বেরিয়েছে।

মানা করলে না কেন তুমি? ক’দিনই বা খোকন হাতের টিপ
প্রায়কটিস করেছে, ওতে কী পাখী মারা যায়? কেশবশংকরকেও
ভাবিত হ’তে দেখা গেলো।

তরুবালা বললেন, নীলার কাছে খোকন বলেছে, কাল
কিছা পরন্ত ‘চুফট-নালার’ ও লক্কাডবাস শিকার করতে যাবে,
আর তুমি বলছো কিনা, ওতে কী পাখী মারা যায়? আমাদের
কথায় কাজ হবে না, তুমি বাপু ছেলেকে ‘চুফট-নালার’
যেতে মানা ক’রে দিও, আমার তো শুনে অবধি বুকে কাঁপুনি
শুরু হয়েছে। কেশবশংকর চিন্তিত মুখেই চা-জলখাবার
শেষ করলেন। কলিংবেল তার অন্তিম ঘোষণা করলো।
একটু পরেই দিলারাম এসে সবিনয়ে জানালো,—টেলার
জানুতি-প্রসাদ এসেছে। দিলারাম মায়ফং টেলারকে বসতে ব’লে
কেশবশংকর উঠে পড়লেন। খোকন না বললে কি হবে,
ঔপিকালের কোটাটা একটু আঁটো-আঁটো হয়েছে, আজ টেলারকে
বাড়ি আসতে বলেছিলেন সেজন্য সন্ধ্যার পর। খোকন এ সময়ের
অনেক আগেই রোজ বাড়ি ফিরে আসে। এক মিনিট কি ভেবে
নিয়ে কেশবশংকর ছেলের ঘরে চলে এলেন। ওয়ার্ডের খুলে
দেখলেন, না, ঔপিকালের কোট প’রে যারনি খোকন, ওটা ছাদারাই
বলছে। ছেলের মাথ তো জানুতিপ্রসাদের কাছে আছেই,
কাজেই খোকনের গায়ের মাথ এখন না পেলেও কিছু এসে যাবে
না। ছাদার থেকে কোট খুলে নিয়ে হুঁপা এগিয়ে আবার কাঁড়িয়ে
গেলেন কেশবশংকর, পকেটে কিছু আছে কিনা হাত গলিয়ে
দেখতে লাগলেন। বাইরের পাশের দুটো পকেট ও বুকেপকেট—
তিনটেই খালি। কোটের ভেতর-পকেট থেকে কাল কাগজে
মোড়া একগোছা ফটো বেরিয়ে এলো। কাগজের আবরণ
উন্মোচন করতেই অদ্ভুত বিষয়ে একেবারে স্তব্ধ হ’য়ে গেলেন
কেশবশংকর। প্রথম ফটোখানা ফুলের বাগানের মাঝখানে বসা
ইন্দ্রাণীর ফটো, তারপর একে একে আরো ছ’খানা ফটো দেখলেন,
সব ক’খানাই সালোয়ার কামিজ পরা ইন্দ্রাণীর বিভিন্ন ভঙ্গিমার
ফটো। ফটোর চোখ রেখে অনেকক্ষণ একেবারে স্থির হ’য়ে
কাঁড়িয়ে বইলেন কেশবশংকর। হঠাৎ খেরাল হলো জানুতিপ্রসাদকে
অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছেন। দিলারামকে আবার ডাক
দিয়ে বলে দিলেন—টেলারকে আর একদিন আসতে বলে দাও,
ছোটো সাব এখনও ঘরেই ফেরেনি। দিলারাম আদেশ জানাতে
চলে গেলো। ইন্দ্রাণীর বসা ফটোখানা ছাড়া বাকী আর ছ’খানা
ফটো বন্ধাছানে রেখে দিলেন। বসা ফটোখানা নিজের পকেটে ভরে
ফিরে এলেন জ্বর কাছ।

খোকন ফিরেছে? উদ্বেগ-বাকুল গলা তরুবালায়। চোরার
টেনে জ্বর খুব কাছাকাছি বসলেন কেশবশংকর।

শোনো তরু, আমি যদি তোমার ছেলেকে বিয়েতে মত করতে
পারি, তাহলে আমাকে কী খাওয়াচ্ছে বল? এ বেন তুন্তের মুখে
রায়নাম শুনলেন তরুবালা। শুধু ছেলের মত করানোই নয়, পুঞ্জের
বিয়ের পুরো সম্মতির সুর এত দিনে স্বামীর গলায় পেলেন। আনন্দে

অবীর হয়ে বললেন তরুণী, তুমি বা বা খেতে ভালবাস এক মাস ধরে যোজ তাই খাওয়াবো—তারপর মুখ টিপে হেসে বললেন, ছেলে বধন আমার, তখন তোমাকে খাওয়াতে হবে বৈ কি !

ছেলেমানুষের মত উজ্জল গলায় হেসে উঠলেন তরুণী। স্বামীর কথাই প্রচুর আস্থা আছে। মুখ দিয়ে বধন একবার ওকথা বলেছেন তখন খোকনের মত আদায় করে ছাড়বেনই।

কিন্তু গলায় গাভীর আনলেন কেশবশংকর, কনে পছন্দ করতে ছেলেকে ঢালা স্বাধীনতা দিতে হবে।

নিশ্চয়ই, আমি মেয়েকে স্বাধীনতা দিয়েছি ও বিষয়ে, ছেলেকে পারবো না ?

মুহূ হাসলেন কেশবশংকর, বললেন, এ ব্যাপারে ছেলে-মেয়ের প্রায় ঠিক এক দাঁড়ায় না তরু, তুমি ভুলে যাচ্ছে সে কথা। বাই হোক, ধরো—ইতিমধ্যে খোকন যদি কোন মেয়েকে পছন্দ করে থাকে ?

তরুণী বললেন, তুমি হাসালে দেখছি। খোকনের কোনো মনোনীত থাকলে অন্ততঃ তার একখানা চিঠিও তো আসবে কলকাতা থেকে ? জানোই তো, চিঠির বাস্তবতা আশা নিয়ে নিজে হাতে খুলি ?

আহা, সিমলারও তো খোকনের মনোনীত থাকতে পারে ?

তরুণী লম্বাকণ্ঠে বললেন, সিমলার থাকলে তো কথাই নেই, মেয়ের বাবার বাতায়াতের পরস্যা খরচ হবে না। তোমার কথা আমি বুঝছি, ছেলের বিয়েতে অত অমত শুনে তুমি মনগড়া ভাবনা ভেবে এসব কথা বলছো।

কেশবশংকর হাসলেন, তোমার বধন ছেলের বিয়ে দিতে ইচ্ছে নেই, তখন আর করা কী ?

এবার তরুণী ভুরু কঁচকালেন, ব্যাপার কী বলতো ? তুমি কি খোকনের টেবিলে কোনো চিঠি-ফিট দেখে এলে নাকি ? মুহূ মুহূ হাসতে লাগলেন কেশবশংকর।

তরুণী উঠে দাঁড়িয়ে ব্যগ্রগলায় বললেন, বাই, খোকনের আসার আগে আমিও দেখে আসি তাহলে।

বসো, বসো, ব্যস্ত হরো না—বাধা দিলেন কেশবশংকর। নিদর্শন আমি পকেটে করেই নিয়ে এসছি।

তরুণী ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ে ব্যস্ততার সঙ্গে স্বামীর দিকে হাত প্রসারিত করলেন। দেখি দেখি চিঠিখানা—কেশবশংকর বললেন, এবার তুমি হাসালে তরু, ছেলের লাভ লেটার বাবা লুকিয়ে পড়ে এমন ভাজকের কথা আমার জানাও নেই, শোনাও নেই, ওসব মায়েদের একতিয়ারে। তরুণী হতাশ হয়ে আবার গুটিয়ে বসলেন।

তবে ? কেশবশংকর স্মিতমুখে বললেন, চিঠি নয় ফটো।

দেখি দেখি ? আগের মতই ব্যস্ততা ফুটে উঠলো তরুণীর কণ্ঠধরে। পকেট থেকে কাগজে-মোড়া ফটোখানা তরুণীর হাতে তুলে দিয়ে স্থিরদৃষ্টিতে দ্বীপ দিকে চেয়ে রইলেন কেশবশংকর। আবার সন্দেশেই একেবারে বেন রক্তশূন্য ফ্যাকাশে হয়ে গেলো তরুণীর মুখ। কেশবশংকর তরুণীর মনকে তার নিজের সুখোমুখি হবার সময় দিয়ে পকেট থেকে পাইপ বার করে ধীরে-সুস্থে তামাক ভরে তাতে অগ্নিসংযোগ করলেন। হঠাৎ কি বেন

মনে পড়লো তরুণীর, জেঁটা করে মুখে কীপ হাসি ফুটেয়ে বললেন, এ ফটো খোকনের টেবিলে থাকলে কি হবে, এ নিশ্চয়ই নীলার কাণ্ড ! ইন্দ্রাণীর সঙ্গে ওর তরানক ভাব কি না, ওই ফটোখানা ভুলে টেবিলে রেখে গেছে। কেশবশংকর পাইপ থেকে ধোঁয়া উৎসারণ করে বললেন, আর ফটো যদি খোকনের কোটের বুকপকেটে থাকে, তাহলেও কি তুমি বলবে—নীলা ভুলে ফেলে গেছে ওখানে ?

খোকনের বুকপকেটে ! তরুণীর কণ্ঠ দিয়ে ধীরে ধীরে কথা ক'টি বার হলো। কেশবশংকর আবার সময় দিলেন তরুণীকে। ইন্দ্রাণীর এই ফটোখানা অনেক হাজায়া করে যোগাড় করতে হয়েছে অক্লেশকে। মিসেস রে নীলা ও ইন্দ্রাণীকে নিজের বাগানে বসিয়ে যুগ্ম ফটো তুলছিলেন একখানা। অক্লেশ একদিন বেড়াতে গিয়ে ফটোখানা দেখে ফেলে। তারপর, নীলার ফটোর পোজের উচ্ছৃঙ্খল প্রাণসা করে একদিনের কডারে নেগেটিভখানা নিয়ে আসে মিসেস রের কাছ থেকে। সেই যুগ্ম ফটো থেকেই অক্লেশ ইন্দ্রাণীর আলাদা ফটো প্রিন্ট করিয়ে নিয়েছে। অবশ্য যুগ্ম ফটোও প্রিন্ট করিয়েছে একখানা। নাহলে নীলার কাছে যদি মিসেস রে কোনো দিন ফটোর কথা তুলে বলেন, তাহলে বেমত্বা বিপদে পড়ে যাবে ও।

একপাইপ তামাক পুড়লো, তবু তরুণী ফটো কোলে ক'রে একই ভাবে বসে আছেন।

কী হলো তরু ? পাইপ থেকে ঠুকে ঠুকে ছাই বার করতে করতে প্রায় করলেন কেশবশংকর। তবু নিরুত্তরে রইলেন তরুণী।

ইন্দ্রাণীকে পছন্দ হচ্ছে না তোমার ?

ওগো না—না—বেন কেঁপে উঠলেন তরুণী।

আমরা রাজি হ'লে কী হবে, ওরা সম্মতি দেবে না।

ওরা মানে বদেন বাবু, সর্বাঙ্গী দেবীর কথা বলছো ? নিঃসংশয়ের হয়ে বললেন কেশবশংকর। নিশ্চয়ই মত দেবেন, অমত করার কোনো কারণ তো খুঁজে পাচ্ছিনে আমি। বিয়ের পর খোকন বিলত থেকে না ফেরা পর্যন্ত ইন্দ্রাণী ঠন্দের কাছে থেকেই পড়াশুনো করবে। তরুণীর ভেতরে বেন অস্বস্তিকর ছটফটানি শুরু হলো, কী ক'রে মুখ ফুটে পরাজয় ঘোষণা করেন স্বামীর কাছে ! কি ক'রে বলেন, রমেন-সর্বাঙ্গীর মতামতেই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হবে না, আরো একজন আছে, আরো একজন থেকে যায়—সে ইন্দ্রাণী। মেয়েমানুষ হ'য়ে মেয়ে ঠাণ্ড করতে দেয় লাগে না। দু-চারবারের দেখাতেই উনি বুঝছেন কী ইন্দ্রাণীর মত শক্ত এই বোলো বছরের এককোটা ইন্দ্রাণী, কী উদ্দীপ্ত বুদ্ধিদীপ্ত চোখ ! বেদিন কেশবশংকর পাইপের পর ফটোখানার জন্ত আর সবাইকে আহ্বান করেছিলেন, সেদিন ঐ এককোটা মেয়ের ঠোঁটের বাঁকে অদ্ভুত বাঁকা হাসির খেলা দেখেছিলেন তরুণী। এই মুহূর্তে সেই দৃঢ় স্পষ্ট ভেসে উঠলো তরুণীর মনের আয়নার। এ সমস্তা এমন ভাবে দেখা দেবে ঠুর সামনে, এ যে একেবারে অকল্পনীয় তরুণীর কাছে ! ছেলের হঠাৎ মন খারাপের কারণ, 'জিহাদ' নৃত্যনাট্য না দেখেই বাড়ি ফেরা এবং না খেয়েই ওঁরা আসার আগে দরজা বন্ধ ক'রে গুয়ে পড়া, এবং অনেক ভাবাত্মক করেও কেন সেদিন পুত্রের কাছ থেকে সাড়া পাননি, একে একে সব স্বপ্ন হ'য়ে ধরা

দিলো তরুণালার কাছে; আর কোনো কুয়াশা বইলো না। তরুণালার মন অসহ উবেগে ছটফট করতে লাগলো। এ্যাকাউন্টেন্ট-স্নেনারেল-জায়া, মিসেস তরুণালা বিশ্বাস, যিনি বেমলোর বাড়ীলোতে থাকেন, তিনি ঘেরে গেলেন ক্যাথলিক ক্লাবের সাত নম্বর স্ট্রাইটের এককোটা ইন্দ্রাণীর কাছে? তরুণালার স্নেহাক্ষ মন ব্যাকুল হয়ে উঠলো।

: ওর জন্ত ওর নাড়িছেঁড়া ধন অনুখী থাকবে—তাও কী হয়? ক্যাথলিক ক্লাবে বাওয়ার জন্ত শাকি পাণ্টোতে উঠলেন তরুণালা। দ্রাকে কাপড় ছাড়ার ঘরের অভিবুধে যেতে দেখে, তরুণালার উদ্দেশ্য আঁচ করে কেললেন কেশবশংকর। স্নিগ্ধ গলায় বললেন, কোনো তরু, তোমার বাওয়া এখন ঠিক হবে না, কাল অফিসে আমি রমেন বাবুর কাছে কথাটা পাড়ি, তারপর বেও।

তুমি বুঝবে না, আমারই আগে বাওয়া দরকার—ডেসিক্রমের দিকে এগিয়ে আবার স্বামীর কাছে সরে এলেন তরুণালা।

এই নাও, ফটোখানা আগে ঠিক জায়গায় রেখে দাওগে, আর খোকন-নীলার গলা গুনছি, তুমি কিন্তু আমার বাওয়ার কথা জানিও না ওদের, কিন্তু তরুণালা গোট-পার হবার আগেই কেশবশংকর ছোট কস্তাকে ডেকে চুপি চুপি গুথোলেন, নীলা, তোর বান্ধবী ইন্দ্রাণী যদি তোর বৌদি হয়, কেমন হয় বল দেখি?

এর চেয়ে ভাল আর কিছু হয় না বাবা! লাক্ষ্মিরে উঠেই নীলা ভীকসংখর চোখে বাবার দিকে তাকালো, কিন্তু, মা কিছুতেই রাজি হবেন না, আমি জানি—

রাজি হবেন না কি রে? তোর মা এই বিয়ের প্রস্তাব করছেই তো ক্যাথলিক ক্লাবে এখন গেলেন।

সত্যি বাবা? আর এক লাফ দিয়ে ছুটে বাজিলো নীলা, মেয়ের এক হাত টেনে ধরে বেখে কেশবশংকর হাসি-হাসি মুখে আবার বললেন, আর একটা নোতুন খবর শোন, ইন্দ্রাণীর মা সর্বাগী দেবী ফিলোজফিতে ইশান-স্কলার। বা, লাদাকে খবর দুটো দিগে বা—ততক্ষণে নীলা অদৃষ্ট হয়ে গেছে, একটা আরামের নিখাস কেল কেশবশংকর পাইপ ধরালেন। এই বিয়েতে তরুণালা এক সহজে সম্মতি দিয়ে বিয়ের প্রস্তাব করতে নিজেই ক্যাথলিক ক্লাবে যাবেন, এতটা আশা করেন নি উনি। ক'দিন ধরে ছেলের মুখে হাসি নেই, খুশি নেই, খাওয়া নেই, স্মৃতি নেই, বোনেদের সঙ্গে রাগরস নেই, মা-বাবার সঙ্গে কোনোরকম ছুটুখী নেই—কোনো কিছু আশংকার আঁচ করে করে হাঁপিয়ে উঠেছিলেন কেশবশংকর। পাইপ মুখে দিয়ে প্রশান্তমুখে কেশবশংকর আরামকেন্দ্রার পা এলিয়ে দিলেন।

[ক্রমশঃ।

সূর্য-কবি

আবজুল মজিদ

হে অক্ষরজ্ঞ জ্যোতির উৎস,
তোমার রোদ্দ-করোজল সে এক প্রভাতে
প্রথম দেখলাম সূর্য্যতী এ পৃথিবীকে।
তোমার আলোর বিচ্ছুরণে
আমার কুঞ্জ-কুঞ্জ ফুটলো অসংখ্য কিশলয়;
সবুজ সবুজতর হ'লো।
প্রতিদিনই অজস্র আলোর উত্তাপ
অধুত হ'লো ধমনীতে।
তোমার আলোর কণিকা
আমার আকাশে আকাশে রচনা করে
অশ্রুপূর্ণ ইন্দ্রধনু-সেতু।
উত্তাপের উত্তেজনায় ভুলে গেলাম
জঠরের নির্ধর্ম-জরুটি।
তোমার আলোর আবার যুটি-যুটি
হুড়িয়ে দিলাম আকাশে-আকাশে।
আলোর তীক্ষ্ণতীর কবিতা তোমার
বিস্তর করে আঁধার-ঈশল।
হে সবিভা সূর্য্যর,
তোমার সকল সমুদ্র-ভরঙ্গ অবগাহন করে
তৃপ্ত, মহাতৃপ্ত আমি।
নিত্য বিকিরণে এত আলো-প্রেম-তাপ
তোমার অভয় দীপ্তি হবে না নিঃশেষ?
হে সূর্য্যর জ্যোতির্ধর, লহ মোর দুর্ব-প্রাণ।

গরীব

অশোকা দেবী

ফুটপাতে পড়ে থাকি জীবন,
করেছে অনেক আশা সে-ও।
নিবে গেছে ছোট দীপশিখা
ছোট হাওয়া লেগে।
অর্ধহীন জীবনের পটে
এঁকে দেওয়া আছে—
বার্ঘতার ছবি। কাড়ালের
কঙ্ক দার তবু
কথা কর, আধো-আধো স্বরে।
ক্লান্তিভরা কঠোর জীবন
মধুও ঢেলেছে অন্তরে।
হীনতার নাই ববনিকা—
তবু তার সছিছে বেদনা
লাঞ্ছিত বিবেক পৃথিবীতে।
গভীর দুঃখের কল্লনার
ভায়া কাঁদে।
বার্ঘতার মল্লিরে
নিরাশার স্বপ্নের জাল বুনে।
দুঃখের চিত্তার
অলে-পুড়ে হয় হাই
তবু সবে যার নীরবেতে।



[Osamu Dazai's "THE SETTING SUN"-এর অনুবাদ]

দ্বিতীয় অধ্যায়

আগুন

সাঁপের ডিমের ব্যাপারের পর দিন দশেকের মধ্যে একটার পর একটা ছুঁটনা ঘটতে লাগল—কলে মায়ের শোকবুদ্ধি ও আয়ুষ্কর সমান তালে এগিয়ে চলল।

এরই মধ্যে একদিন এক অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়। বাড়ীতে আগুন লাগানোর মত এমন অপকর্ষ আমার দ্বারা সম্ভব হ'তে পারে এ ধারণা স্বপ্নেরও অতীত ছিল। আমার চারপাশে আর পাঁচজনের জীবন বিপন্ন করে, নিজেকে কাঠগড়ার ঝাঁড় করার প্রবোগ নিজেই ডেকে আনলাম।

ছেলেবেলা থেকে এমন একটি "শিশুমহিলা" তৈরী হয়েছিলাম যে অনবধানতা থেকে অগ্ন্যুৎপাত হতে পারে, এ ধারণাই আমার ছিল না। একদিন অনেক রাত্রে হাত মুতে উঠে বসার ঘরের পরদা পেরিয়ে এগুতে গিয়ে স্নানের ঘর থেকে আলো চোখে পড়ল। এমনি একটু দেখতে গিয়ে আবিষ্কার করলাম সে ঘরের দরজার কাচ পুড়ে লাল হয়ে উঠেছে—এতক্ষণে সন্ধ্যা ফাটতে শুরু করল। পাশের দরজা দিয়ে খালি পায়েই ছুটে বেরিয়ে গেলাম। তখন আমার নজরে পড়ল চুল্লীর পাশে জ্বলন্ত জ্বালানিকাঁঠ লাউ-লাউ করে জ্বলছে।

বাগানের প্রান্তে এক কৃষক-পরিবারের বাস—সেই বাড়ীর দরজার প্রাণপণ শক্তিতে থাকা দিয়ে চোটে লাগলাম—মিষ্টার নাকাই, আগুন! আগুন! দড়া করে উঠে আসুন, আগুন লেগেছে।

মিষ্টার নাকাই বোধ হয় সবোচ্চ গুয়েছিলেন, ভেতর থেকেই চেষ্টা দিয়ে জবাব দিলেন—একুশি আসছি। আমি তাঁকে আমার ভাগ্যাদা দিতে বাজি, এমন সময়ে রাতের পোষাকেই ভজলোক বেরিয়ে এলেন।

আমরা আগুন লক্ষ্য করে দৌড় দিলাম। পুকুর থেকে দুজনে বালতি ভরে জল তুলেছি, এমন সময়ে মায়ের ঘরের পাশের রেলিং-এর কাছ থেকে সাড়া পেলাম। জলভরা বালতি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দৌড়ে গিয়ে মাকে ধরে ফেললাম, নইলে তখুনি অজ্ঞান হয়ে পড়তেন। বাস্তব হ্যাঁ না মা, সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি শুয়ে থাক। কোনরকমে তাঁকে জোর করে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে আগুনের দিকে ছুটলাম। এবার আমি স্নানের ঘর থেকে বালতি বালতি জল মিষ্টার নাকাইকে এগিয়ে দিলাম, উনি জলন্ত কাঠের বোঝার ঢালতে লাগলেন। কিন্তু আগুনের এত জোর হয়ত ঐ ভাবে নেবানো যেত না।

নীচে 'আগুন আগুন' রব উঠল। হঠাৎ চার-পাঁচ জন চাষা আমাদের সাহায্য করতে এগিয়ে এল। কয়েক মিনিটের মধ্যে হাতে হাতে বালতি বালতি জল চালু হয়ে গেল। আগুন নিবল। আর একটু দেরী হলে আগুন ঘরের ছাতে গিয়ে ঢেকত।

প্রথমেই মনে মনে ভগবানকে ধন্যবাদ দিলাম। কিন্তু পরমুহুর্তে এতবড় একটা অগ্নিকাণ্ডের কারণ খুঁজতে গিয়ে অন্তরাস্ত্রা দিকার দিয়ে উঠল। এতক্ষণে মনে পড়ল গতরাতে চুল্লী ঝেঁড়ে পরিষ্কার করে আধপোড়া কাঠগুলো নিবে গেছে ভেবে হাতের কাছে জড়োকরা জ্বালানিকাঁঠের স্তুপের কাছে রেখেছিলাম। এই তথ্য আবিষ্কার করে আমার চোখ ফেটে জল এল। চলৎশক্তি রহিত অবস্থায় সেখানে দাঁড়িয়ে রইলাম। সুনলাম সামনের বাড়ীর ঘরেটি চেষ্টা করে বলছে—কেউ নিশ্চয়ই চুল্লী ঠিকমত সাক করে নি। জায়গাটা একেবারে পুড়ে থাক হয়ে গেছে।

প্রায়ের মেয়র পুলিশের লোক, দমকল বিভাগের বড় কর্তা সবাই এসেছেন। স্বভাবোচিত মুহূর্তে হেসে ভজলোক জিজ্ঞেস করলেন—খুব ভয় পেয়েছ মা! কি করে এমন হল?

আমারই দোষ। ভেবেছিলাম কাঠগুলো বুঝি একেবারে নিবে গেছে।

এর বেশী কিছু বলা তখন আমার সাধ্যের বাইরে। মাটি দিকে চোখ নীচু করে, বাকশক্তি রহিত অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইলাম মনে হল পুলিশ আমার এই দণ্ডে হাতকড়া পরিয়ে টেনে নিয়ে যেতে পারে। সেই সঙ্গে হঠাৎ খেয়াল হল আমার পারে জুতো নেই গায়ে ভজ পোষাক পরাঙ্ক নেই। রাতকামিজ পরে কি লজ্জাক অবিভক্ত চেতারা নিয়েই না এতগুলো লোকের সামনে দাঁড়ি আছি। নিশাহারা হয়ে পড়লাম। মেয়র মশায় দরদরতা কষ্টক বলেছেন—বুঝি। তোমার মা ভাল আছেন তো?

মা নিজের ঘরে বিশ্রাম করছেন, তাঁর ওপর দারাবন্ধ থাকে গেল।

অন্নবয়সী পুলিশটির কথার সাহুনা দেবার চেষ্টা—বাক পে—বাড়ীটার যে আগুন ধরেনি—এ এক ভরসাব কথা।

ইতিমধ্যে মিষ্টার নাকাই পোবাক বললে এসে প্রচণ্ড টেণামেটি জুড়ে গেলেন—যাপার কি? এত গুণগোল কিসের? খানিকটা কাঠ পুড়ে গেল, একে তো আর আগুন লাগা বলেন না। বেচারী ভুললোক আমার দোষ ঢাকার আশ্রয় চেষ্টা করছিলেন।

মের মশার মাথা হেলিয়ে সাই দিলেন—বটেই তো। এর পর পুলিশকে কয়েক মিনিট কি সব বুঝিয়ে আমার বললেন—এবার আমরা আসি। মাকে আমার নমস্কার দিও।

সবাই এগিয়ে গেল, কেবল সেই পুলিশটি আমার কানের কাছে এসে কিস-কিস করে জানিয়ে গেল—আজকের ঘটনার কোন রিপোর্ট করা হবে না। সে চলে যাবার পর মিষ্টার নাকাই ধমধমে গলায় জিজ্ঞেস করলেন, পুলিশটা কি বলে গেল?

আমি উত্তর দিলাম, ও বললে কোন রিপোর্ট হবে না। প্রতিবেদী যারা এতকণ ভিড় করেছিল, তারাও সম্ভবতঃ আমার জবাব শুনল। কারণ এর পরেই স্থির নিশ্চাস ফেলে যে বার ঘরে ফিরে গেল। মিষ্টার নাকাই আমার কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। তারপর ভয়ঙ্কর কাঠের স্তূপের পাশে। একাকী শূন্য মনে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। চোখের জলের ভেতর দিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে দেখি ভোর হয়ে আসছে।

আমি হাত-মুখ ধুতে গেলাম। মার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে কেমন যেন ভয় পাচ্ছিলাম, স্নানঘরে চুল বেঁধে খানিক সময় নষ্ট করলাম। রান্নাঘরে ঢুকে রান্নার বাসনপত্র গুছিয়ে নিতে আরও কিছুটা সময় গেল, একটু হাফা বোধ করলাম।

তারপর পা টিপে টিপে মায়ের ঘরে উঁকি দিয়ে দেখি, এরই মধ্যে জামা-কাপড় বদলে পরিপাটি হয়ে আরামচেরায়ে গিয়ে বসেছেন, মুখে অপরিণীম কান্তির ছাপ। আমার দেবে হাসলেন বটে কিন্তু সে মুখ কাগজের মত সাদা। প্রত্যুত্তরে আমি কিন্তু হাসতে পারলাম না। চুপ করে তাঁর চেয়ারের পেছনে গিয়ে দাঁড়িলাম। খানিক পরে মা বললেন, বিশেষ কিছু হয়নি—না? শুধু ঐ আলানি কাঠগলোর জন্তেই তো—আমার সারা মন জুড়িয়ে গেল। ছেলেবেলায় রবিবারের ইস্কুলে শেখা বাইবেলের লাইন মনে পড়ে গেল, একটি সমরোপযোগী বাক্যের মূল্য রৌপ্যমণ্ডিত চিত্রে স্বর্ণময় আপেলের সমান। আমার এ-হেন মাতৃভাগ্যের জন্য ঈশ্বরকে অন্তরের অন্তস্তল থেকে ধন্যবাদ দিলাম।

জলখাবারের পাট সেরে পোড়া কাঠ সাক করার কাজে হাত দিলাম। গ্রামের সেই হোটেলের বুড়ি ওসাকি বাগানের দরজা ঠেলে ঢুকল—কি হয়েছিল? আমি এইমাত্র খবর পেলাম। গতরাত্রে কি সব গোলমাল হয়েছিল? বলতে বলতে ওর চোখে জল ভরে এল।

অপরাধ স্বীকারের ভঙ্গিতে আমি উত্তর দিলাম, আমি অত্যন্ত লজ্জিত।

দজ্ঞা পাবার কি আছে? কিন্তু পুলিশ কি বলল?

ওরা বলল সব ঠিক আছে।

আঃ বাঁচলাম। অকৃত্রিম খুশির ভাব ওর মুখে-চোখে ফুটে উঠল। কি করে পাড়া-প্রতিবেদীকে ধন্যবাদ জানান বার আর আমার অপকর্মের জন্য মাপ চাওয়া বার, ওসাকির সঙ্গে সেই পরামর্শ করলাম। সে বুড়ি দিল যে, টাকাই এর সবচেয়ে ভাল দাওয়াই।

কয়েকটা বাড়ীর নাম করে বলল, সেই সব বাড়ীতে আমি যেন টাকা নিয়ে গিয়ে মাপ চেয়ে আসি। বেচারী এর পরেও বলল—তোমার যদি একা ঘুরতে খারাপ লাগে, আমি বরং তোমার সঙ্গে বেতে পারি।

বোধ হয় আমার একা বাওয়াই সবচেয়ে ভাল দেখায়, কি বল? একা পারবে? পারলে সত্যি খুব ভাল হয়।

আমি একাই বাব।

পোড়া কাঠের জঞ্জাল সাক করে, মায়ের কাছ থেকে টাকা নিয়ে একশ' ইয়েনের কয়েকটা ছোট ছোট থলি বাঁধলাম। বাইকে লিখলাম—কুটি স্বীকার করতঃ। প্রথমেই গ্রামের সদরে গিয়ে মেয়রের খোজ করলাম; তাঁকে না পেয়ে অভ্যর্থনাকারিণী মেয়েটির ডেজের কাছে গিয়ে বললাম—আমার গতরাত্রে অপরাধ ক্ষমার অবোধ্য, কিন্তু এর পর থেকে আমি ঢের বেশী সাবধান হব। অল্পগ্রহ করে আমায় মার্জনা করবেন এবং মেয়রের কাছে আমার অন্তঃসত্ত্বা-অন্তরের সংবাদ পৌঁছে দেবেন।

এর পর গেলাম গ্রামের মোড়লের কাছে। ভুললোক নিজে দরজায় এসে আমায় অভ্যর্থনা করলেন। তাঁর অধরপ্রান্তে করুণ হাসির রেখা ফুটে উঠল কিন্তু কোন কথা বললেন না। কি জানি কেন আমি কঁদে ফেললাম, অল্পগ্রহ করে আমার গত রাত্রে অপরাধ মার্জনা করুন।

কোন রকমে বিদায় নিয়ে রাস্তা দিয়ে দৌড় দিলাম—আমার গাল বেয়ে অবোরে কান্না ঝরে পড়ছিল। মুখ-চোখের এমন বিলী অবস্থা হ'ল যে বাড়ী গিয়ে আবার নতুন করে প্রসাধন করতে হল। বেকতে বাব, ঠিক সেই সময়ে মা এগিয়ে এলেন—এখনও শেব হ'ল না? এবার কার কাছে যাচ্ছ? মুখ না তুলেই জবাব দিলাম—এই তো সব সূত্র।

তোমার এক শান্তি হল। মায়ের মত এমন দরদ নিয়ে আমার বুকেই বা কে? তাঁর ভালবাসার জোরে মনে বল পেলাম এবং পরবর্তী বাবতীয় সাক্ষাৎ নিরিখে চোখের জল না ফেলেই সঙ্গে করলাম।

সর্বত্র সবাই আমার সহায়ত্বিত দেখাল, সাহসনা দিতে চেষ্টা করল একমাত্র মিষ্টার নিশিয়ামার (Nishiyama) তরুণী স্ত্রী, বলছি তরুণী, আসলে বয়স তাঁর চল্লিশের কোঠায়—আমার তিরস্কার করলেন, দয়া করে ভবিষ্যতে সাবধান চলো। আমি বন্দুর জানি, তোমরা বড় ঘরের মেয়ে। কিন্তু তোমাদের কাণ্ডকারখানা দেখে আমি তো প্রাণ হাতে নিয়ে বসে আছি। তোমাদের যেমন অনাড়িপণ। তাতে যে এত দিন আগুন লাগেনি সেই আশ্চর্য। দয়া করে এর পর থেকে খুব সাবধান হতে চেষ্টা করো। গতরাত্রে জোর বাতাস থাকলে সারা গাখানা জলে-পুড়ে ছাই হয়ে যেত।

নিশিয়ামা-গিন্নির তিরস্কারের মর্ম বুঝতে কষ্ট হ'ল না। তিনি বা বললেন তার এক বর্ণও মিথ্যা নয়। এত রূঢ় কথার পরেও তাঁর প্রতি আমার মন বিরূপ হয়নি।

আলানি কাঠ জলবে এ আর বিচিত্র কি! এই রকম পরিহাসের মধ্যে দিয়ে মা আমার অপরাধের বোকা হাফা করতে চেষ্টা করলেও নিশিয়ামা-গিন্নীর কথাটাও না মেনে পারলাম না। বাস্তবিক দাওয়ার জোর থাকলে রাত্রে প্রলয়কাণ্ড ঘটতে যেতে পারত। তাই যদি হ'ত

তবে আমার আত্মহত্যাও কোন কমা থাকত না, কারণ শুধু যে আমার সঙ্গে মাকেও শেষ করতাম তাই নয়, স্বর্গত পিতৃদেবের নাম পর্যন্ত কলুষিত হ'ত। জানি আজ বংশধর্য্যাদার মূল্য ভেদ হয়েছে, এর ধ্বংস অবধারিত, তবু বীরে বীরে মৃত্যু ভাবে সমাপ্তি নেমে আসুক, এইটুকুই আমার প্রার্থনা। অগ্নিকাণ্ডের শূন্যপাতের 'প্রারম্ভিক করতে গিয়ে মরেও আমি শান্তি পাব না।

পরদিন থেকে উঠে-পড়ে মাঠের কাজে লেগে গেলাম। মাঝে মাঝে মিঠার নাকাই-এর মেয়ে আমার সাহায্য করতে আসত। সেসবের সেই লজ্জাকর ঘটনার পর থেকে কেমন যেন মনে হ'ত, আমার রক্তের রং গাঢ় হয়ে গেছে। আর দিন দিন আমার চেহারার বিকলী জ্বলী ছাপ পড়ছে। যেমন ধরুন বারান্দার মায়ের পাশে বসে উল্লু বোনার সময় আমার দম বন্ধ হয়ে আসে, বরং মাঠে গিয়ে কোণাল কুপিয়ে নিলে নিজেকে বেশ সহজ মনে হয়। লোকে বলে শ্রমিকের কাজ। আমার পক্ষে এই কিন্তু প্রথম নয়। যুদ্ধের সময় আমার ডাক পড়ে। সেখানে কুলির কাজ করতে হয়েছে। এই যে রবারসোল দেওয়া কাপড়ের জুতো পরে মাঠে কাজ করি, এটা যুদ্ধের সময় পাওয়া। জীবনে সেই প্রথম এ ধরনের জিনিষ পায়ে দিলাম কিন্তু বেশ আরাম লাগে। এই জুতো পায়ে দিয়ে বাগানে যুবে বেড়াবার সময় আমি যুক্তপক্ষ বিহঙ্গীর মত হাফা বোথ করি অথবা বন্ধনহীন জন্তুদের মাটিতে চরে বেড়ানোর অকৃত্রিম আনন্দের স্বাদ পাই। যুদ্ধের এই একটি মাত্র সুখের স্মৃতি আমার আছে। উঃ, যুদ্ধ কি বীভৎস ব্যাপার।

গত বৎসর কিছু হয়নি

তার আগের বছর কিছু হয়নি।

এক তারও আগের বছরও কিছুই হয়নি।

যুদ্ধ শেষ হবার ঠিক পরেই খবর-কাগজে এষ্ট মজার কবিতাটি বেরিয়েছিল। অবশ্য অনেক ঘটনাই ঘটেছিল, কিন্তু মনে করতে গিয়ে সেই একই উত্তর পাই, হয়নি কিছুই। যুদ্ধের কথা বলতে বা শুনে আমার বিতৃষ্ণা আসে। জানি 'বহু প্রাণ নষ্ট হয়েছিল, কিন্তু সবই এই মারাত্মক ব্যবসার অঙ্গ এবং যুদ্ধের কথা শুনে শুনে এখন আমার একঘেয়ে লাগে, লোক ভাববে এ আমার স্বাধিপরের মত কথা হ'ল। শুধু যখন আমার জোর করে ঘরে নিয়ে গিয়ে কাপড়ের জুতো পরিয়ে কুলির মত খাটিয়ে নিল, সেই সময়ে এর বীভৎসতা ছাড়াও অত্যন্ত দিক আমার চোখে পড়েছিল। সুটে মজুরের কাজকে অনেক সময়ে ঘুরার চোখে দেখেছি—কিন্তু এর প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। আমার স্বাস্থ্য কিংবদন্তি গেল এবং এখনও মাঝে মাঝে ভাবি, উপার্জনের অসুবিধা যদি কখনও ঘটে, আমার মুটেগিরি কেউ কেড়ে নিতে পারবে না।

একদিন, যুদ্ধ যখন দুঃসাহসিক মোড় নিয়ে তখন বোম্বার পোষাকপরা এক ভ্রমলোক আমাদের নিশিকাতা স্ট্রিটের বাড়ীতে এসে আমার যুদ্ধে বাবার বাধ্যতামূলক এক পত্র দিলেন—তাকে যে কর দিন আমার কার্যক্ষেত্রে উপস্থিত থাকতে হবে তার তালিকা দেওয়া ছিল। আমি দেখলাম একদিন অন্তর আমার তাতিকাগুরা (Tachikawa) পাহাড়ের নীচে গিয়ে রিপোর্ট করতে হবে। ওঠা

করেও চোখের জল রাখতে পারলাম না। কীভাবে কীভাবেই জিজ্ঞেস করলাম,—আমার জায়গার আর কাউকে পাঠালে চলবে না ?

ভ্রমলোক কঠোর স্বরে উত্তর দিলেন—সৈন্য বিভাগে কাজ ঠিক হয়েছে—তোমাকেই যেতে হবে।

পরদিন বৃষ্টি পড়ছিল। পাহাড়ের নীচে সবাই জড়ো হয়েছিলাম, সেখানে এক অফিসার বক্তৃতা দিলেন। জয় অবশ্যস্বাবী—এই দিয়ে বক্তৃতা শুরু করলেন,—জয় অবশ্যস্বাবী—কিন্তু সৈন্যবিভাগের কর্তৃপক্ষের আদেশ পূর্ণাঙ্গপূর্ণ মেনে না চললে আমাদের সমস্ত কার্যপ্রণালী বিপর্য্য হবে এবং দ্বিতীয় ওকিনাওয়া সংগঠিত হ'তে পারে। তোমাদের নির্দিষ্ট কাজ অবশ্যই তোমরা সম্পন্ন করবে। দ্বিতীয়তঃ পরস্পরের হাত থেকে নিজের রক্ষা করবে। কোথায় যে গুলির ঘুরে বেড়াচ্ছে—এখবর কেউ জানে না। এখন থেকে প্রকৃত সৈনিকের মত তোমরা কাজ করবে এবং যা দেখবে তা কোনমতেই বাইরে ক'রুর কাছে প্রকাশ করবে না—এ বিষয়ে তোমাদের সতর্ক করে দিতে আমরা সব রকম শক্তি প্রয়োগ করব।

আমরা প্রায় পাঁচশ' নয়নারী পাহাড়ের নীচে দাঁড়িয়ে অব্যাহত বৃষ্টিতে ভিজতে লাগলাম। প্রচণ্ড বৃষ্টির তোড়ে সব ভিজে গেলেও এট বাগী আমরা লশঙ্ক অন্তরেই গ্রহণ করেছিলাম। এর মধ্যে ইস্কুলের ছেলে-মেয়েও ছিল—বেচারীদের কচি কচি সব মুখ শীতে কীদ-কীদ অবস্থা। বৃষ্টির জল আমার কোটের ভেতর দিয়ে চুকে গায়ের জামা ভেদ করে শেষে অন্তর্বাস অবধি জবজব করে ভিজিয়ে দিল।

সেদিন সারাটা দিন পিঠের ওপর মাটির বড়ি বয়েই আমার কাটল। পরদিন পাহাড়ের নীচে একদল শ্রমিকের সঙ্গে দড়ি টেনে টেনে কাটলাম। এই কাজটি আমার সবচেয়ে পছন্দ ছিল।

পাহাড়ে কাজের সময় দু' তিনবার আমার মনে হয়েছে ইস্কুলের ছেলেরা আমার দিকে কেমন যেন চেয়ে চেয়ে দেখে। একদিন মাটির বড়ি কাঁধে চলেছি এমন সময়ে হু'টি ছেলে আমার পাশ দিয়ে যেতে যেতে কিসুফিস করে বলল—তোমার কি মনে হয় এ মেয়েটি গুলির ?

খুব অবাক হয়ে পাশের মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলাম, এরকম কথা কেন বলে ওরা ?

সে গভীর মুখ করে জবাব দিল—বোধ হয় তোমায় দেখে বিদেশী মনে হয়, সেইজন্য।

তাই নাকি ? তুমিও কি আমার গুলির ভাব নাকি ? এবার একটু হেসেই সে জবাব দিল—না।

আমি তো জাপানী ! বলে নিজের বোকামির মত কথা শুনে নিজেই হেসে ফেললাম।

এক দিন সকালে ছেলের সঙ্গে কাঠের গুঁড়ি টেনে টেনে জড়ো করছিলাম, এমন সময়ে এক অল্পবয়সী অফিসার ভুরু চুচকে আমার দিকে চেয়ে আঙ্গুল নেড়ে আমার ডাকল—এই তোমার ডাক্তারি এদিকে এস।

তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে পাইন-বনের দিকে সে এগিয়ে চলল, আমি তার পেছন পেছন গেলাম—এদিকে তো ভয়ে, আতঙ্কে বুক টিপ টিপ করছে।

কারখানা থেকে সভ চেরা ভূপাকার এক কাঠের গাঁদার কাছে

এসে সে আমার দিকে ফিরল, প্রতিদিন এত ভাবি কাজ করতে নিশ্চয় খুব কষ্ট হয়। আজ শুধু এই চেয়া কাঠ পাহারা দাও—কেমন? বকবকে দাঁতের পাটি বের করে হালল।

তার মানে এখানে দাঁড়িয়ে থাকব?

এ জায়গাটা বেশ ঠাণ্ডা, গোলমাল নেই—কাঠের গাঁদার ওপর উঠে একটা ঘুম দাও। যদি একা—একা খায়াপ লাগে—এই বইখানা পড়ে দেখতে পার। এই বলে একখানা বই পকেট থেকে বের করে সসঙ্কোচে তক্তার ওপর ছুঁড়ে দিল। বই এমন কিছু নয় তবে পড়া যায়।

বই-এর নাম ছিল “টাইকা”, আমি তুলে নিলাম। অনেক যত্নবান, আমাদের বাড়ীতে একজন আছে, খুব বই পড়তে ভালবাসে, এখন অবশ্য সে দক্ষিণ প্রশান্ত সাগরে।

সে আমার কথা ধরতে পারেনি,—তোমার স্বামী? দক্ষিণ প্রশান্ত সাগরে? কী কাণ্ড! সমবেদনার মাথা নেড়ে বলল—বাই হোক, আজ তুমি পাহারা দাও, খাবার সময়ে আমি নিজেকে গিয়ে তোমার ভাগ নিয়ে আসব। এখন তোমার কিছু ভাবতে হবে না, চুপ করে বিশ্রাম কর। এই কয়েকটা কথা বলে হন-হন করে চলে গেল।

গাংরা ওপর বসে প্রায় আধখানা বই পড়া হয়েছে, এমন সময়ে মচমচ জুতোর শব্দে বুঝলাম অফিসার আসছে। তোমার খাবার। একা-একা খুব খায়াপ লাগছে না তো? খাবার বাস্কাটা রেখে দিয়ে আবার হন-হন করে চলে গেল।

বাঁওরা শেষ করে কাঠের স্তূপের ওপর লম্বা হ’লাম। বই শেষ করে ঘুমিয়ে পড়লাম। বেলা তিনটোর সময় ঘুম ভাঙতেই মনে হ’ল, ছেলেটিকে আগে দেখছি—কিন্তু কোথায় কিছুতেই মনে করতে পারলাম না। ওপর থেকে নেমে সবে চুলটা গুছিয়ে নিচ্ছি—আবার সেই মচমচ শব্দ কানে এল।

আজ এখানে আসার জন্য অনেক যত্নবান। ইচ্ছে হ’লে এবার বাড়ী যেতে পার।

আমি দৌড়ে গিয়ে বইখানা বাড়িয়ে দিলাম, যত্নবান জানাবার জন্য মনটা আকুল হয়ে ওঠা সত্ত্বেও কিছুই বলতে পারলাম না। চুপ করে তার হুন্ডের দিকে চেয়ে রইলাম, তার চোখে চোখ পড়তে, আমার চোখ জলে ভরে এল—তার চোখও শুকনো ছিল না।

নিশ্চয়ই ঐ ভাবে আমরা বিদায় নিলাম। এর পর আমার কাজের জায়গায় ওকে আর কখনও দেখিনি। সেই একটামাত্র দিন আমি ছুটি পেয়েছিলাম, তারপর থেকে আবার একদিন অন্তর তাত্কাওরার গিয়ে নিজের ভাগের কঠিন পরিশ্রম সেরে আসতাম। আমার স্বাস্থ্য সব্বদে মারের হুমকির আওতাধীন রইল না। কিন্তু আসলে কঠিন পরিশ্রমে আমার শরীর আগের চেয়ে অনেক শক্ত হ’ল এবং আজ অবধি মাঠে, ময়দানে শারীরিক পরিশ্রম আমার কাবু করতে পারে না।

হুন্ডের কথা আলোচনা করতে বা চিনতে আমার অসুখ লাগে, একটু আগে সেই কথাই বলেছিলাম—এখন দেখছি আমার জীবনের “অমূল্য অভিজ্ঞতা”র কথা সবই বলা হয়ে গেছে।

কিন্তু হুন্ডের মৃত্যুর মধ্যে এই ঘটনাদুই বলতে আমার ভাল লাগে। বানবাকী সবটা সেই কবিতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ :—

গত বৎসর কিছুই হয়নি,

তার আগের বৎসর কিছুই হয়নি,

এবং তারও আগের বৎসর কিছুই হয়নি।

বললে বোকার মত শোনাবে—হুন্ডের অভিজ্ঞতার আমার খেঁটু অবশিষ্ট আছে, তা হ’ল একজোড়া কাপড়ের জুতো। এই জুতোর কথার প্রসঙ্গান্তরে চলে এলাম। হুন্ডের অপূর্ণ মৃত্যুচিহ্ন এই জুতো পরে মাঠে ময়দানে ঘুরে ঘুরে মনের উদ্বেগ ও হৃদয়ের গভীর অশান্তি ভুলে থাকতে চেষ্টা করি বটে, কিন্তু মা আমার দিন দিনই যোগা হয়ে যাচ্ছেন।

সাপের ডিম।

আঙুন।

মায়ের স্বাস্থ্য ক্রমেই ভয়াবহ রকম খারাপ হয়ে চলেছে, এমিকে উল্টে আমি আবার দিন দিন নিঃশ্রেণীর মেয়েদের মত খটখটে লজ্জা হয়ে উঠছি। মায়ের জীবনীশক্তি শোষণ করে মোটা হচ্ছে। এ খারগা বহুমূল হয়েছে।

জালানি কাঠ জলে বাঁওরার হাতকর মন্তব্য ছাড়া এ পর্যন্ত আগুনের ব্যাপার নিয়ে মা আর একটা কথাও বলেন নি। আমাকে তিরস্কার করা দূরে থাক, করুণাই করে চলেছেন। কিন্তু তার মনে এই ব্যক্তি আমার চেয়ে দলপুত্র বেশী বেজোরে। অগ্নিকাণ্ডের পর থেকে মা ঘূমের মধ্যে আর্দ্রানাদ করে ওঠেন, যেদিন বাতাসে জোর থাকে, সেদিন বত বাতেই হোক, বার বার বিছানা থেকে উঠে এসে সব ঠিক আছে কিনা দেখে যান। কোন সময়ে তাঁকে স্নান দেখায় না। কোন কোন দিন মনে হয় তাঁর বেন টাটতেও কষ্ট হচ্ছে। মাঠের কাজে আমার সাহায্য করার কথা বলেছিলেন, আমি নিবেদন করা সত্ত্বেও কুয়ো থেকে জল এনে নিলেন। পরদিন পিঠে এত অসহ্য যন্ত্রণা হল যে নিঃশ্বাস নিতে পর্যন্ত কষ্ট হচ্ছিল। তারপর শারীরিক পরিশ্রমের খেয়াল তিনি ছেড়ে দিলেন। থেকে থেকেই মাঠে নেমে এসে দেখে যেতেন আমি কি করছি।

আজ আমার কাজ দেখতে দেখতে ঠঠাৎ বললেন—লোক বলে গ্রীষ্মের ফুল বারা ভালবাসে তাদের মৃত্যুও আসে গ্রীষ্মকালে—জানি না কথাটার কত দূর সত্যি।

আমি ফলের চারার জল দিছিলাম, কোন উত্তর দিলাম না। সবে গরম পড়ছে। মৃত্যুকষ্টে মা আবার বললেন,—হিবিবাস আমার অভ্যস্ত প্রিয় ফুল, আমাদের বাগানে একটাও দেখি না।

ইচ্ছা করে নীরস কণ্ঠেই জবাব দিলাম, বাগানভরা ওলিয়েওয়ার আছে।

ও ফুল আমার বিশেষ পছন্দ হয় না। গ্রীষ্মের প্রায় সব ফুলই আমার ভাল লাগে, কিন্তু ওলিয়েওয়ার বড় বেশী রচাঙ।

গোলাপ আমি সবচেয়ে ভালবাসি। কিন্তু সে ফুল তো সারা বছরই কোটে। কে জানে গোলাপ বাদে প্রিয় তারা হয়ত বছরে বার চারেক মরে।

হু’লেনেই হেসে উঠলাম। হাসতে হাসতেই মা জিজ্ঞাস করলেন তুমি একটু বিশ্রাম করবে না? তোমার সঙ্গে কথা ছিল।

কিন্তু কথা? তোমার মৃত্যুর খবর হ’লে তখনতে চাই না।

মটরফুলের মাচার নীচে থেকে গিয়ে ছ' জনে বললাম। ফুলগুলো প্রায় শেষ হ'য়ে এল, বিকেলের রৌদ্র পাঁতার ছাঁকনি দিয়ে মোলায়েম হ'য়ে এসে আমাদের কোলে জামা-কাপড় সবুজে বাজিয়ে দিল।

অনেক দিন থেকে তোমার একটা কথা বলি-বলি করছি, কেবল ছ' জনেরই মন কখন হাকা পাব তারই অপেক্ষার ছিলাম। বুঝতেই পারছ চট করে এসব কথা বলা যায় না কিন্তু আজ কেমন মনে হচ্ছে এখন হয়ত বলা চলে। শেষ পর্যন্ত বৈধব্য ধরে কথাটা শোন,—নাওজি বেঁচে আছে।

আমার সারা শরীর পাখর হয়ে গেল।

পাঁচ-ছয় দিন আগে তোমার ওরাদা আমার চিঠি পেয়েছি। মনে হচ্ছে ওর কোন কর্তৃত্বাধী দক্ষিণ প্রশান্ত সাগর থেকে ফিরেছে। সে তোমার বাবার অফিসে দেখা করতে এসেছিল, হঠাৎ কথা এসলে প্রকাশ হয়ে পড়ে লোকটি নাওজির সঙ্গে একই ইউনিটে কাজ করত। নাওজি ভাল আছে, শীগগিরই ফিরবে। একটা মস্ত খবর তার কাছে পাওয়া গেছে। লোকটি বলছে নাওজি দারুণ আফিমখোর হয়েছে।

আবার ?

আমি ততোখা খাওয়ার মত খুব বাঁকালাম। হাইস্কুলে থাকতে নাওজি কোন এক ঔপন্যাসিককে নকল করে নেশা আরম্ভ করে। শেষ অবধি ডাক্তারখানার এমন একটা মস্ত বড় দেনা করে বসে যা মাকে ছ' বছর ধরে শোধ করতে হয়।

হ্যাঁ, আবার নেশা করছে বোঝা গেল। কিন্তু সেই লোকটি বলছে যে এখানে আসার আগেই নেশা তাকে ছাড়তে হবে, নইলে বেশে আসা তার বন্ধ। তোমার মামা বলছেন যে ভাল হয়ে ফিরলেও তার যে মনের অবস্থা তাতে এখনি কোন চাকরি হওয়া সম্ভব নয়। আজকের দিনে টোকিও সহরে সূর্য মানুষ কাজ করতে এসে বিগড়ে যায়। আর তার মত ছেলে—আধগাঙ্গলা ছেলে, সবে নেশা কাটিয়ে উঠেছে, ও তো ছ' দিনেই বন্ধ উন্মাদ হয়ে উঠবে। সে কি করে কি না করে, কিছুই বোঝা যায় না। নাওজি ফিরে এলে কোথাও যেতে না দিয়ে আমাদের এই পাহাড়ী জায়গার ধরে রাখাই ভাল। এই গেল এক নম্বর।

আরও একটা কথা, তোমার মামা লিখেছেন যে, আমাদের সব টাকা ফুরিয়েছে, যেখানে যা পুঁজিপাটা ছিল, সবই প্রায় ফুরিয়েছে, আগের মত টাকা পাঠানো আর সম্ভব নয়। নাওজি এলে আমাদের তিন জনের মত খরচ পাঠানো তার পক্ষে অসম্ভব। তার প্রস্তাব হ'ল এই যে, বখানীয়া সম্ভব হয় তোমার পাত্রস্থ করা, নয় কাকর বাড়ীতে কোন কাজ জোগাড় করে দেওয়া উচিত।

ঝি-গিরি ?

না, তোমার মামা আমাদের দু'ব সম্পর্কের জমিদার আত্মীয়ের কথা লিখেছেন—তার বাড়ীতে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের দখা-শোনা করতে পার। তাতে তোমার খুব মন ব্যাধ বা দক্কাচ হবে না।

আর কোন কাজ করা যায় না ?

তোমার মামার মত, আর যে কোন কাজ তোমার পক্ষে অনুবিধানক হবে।

অনুবিধা কিসের ?

মান হেসে মা চুপ করেই রইলেন।

আমি এলোপাথাড়ি টেবিলে উঠলাম—না, এ ধরনের কথা আমি অনেক শুনেছি। বুঝতে পারছি আমার পক্ষে এত উত্তেজিত হয়ে পড়ার কোন কারণ নেই—এর জন্ত পরে অনুতাপ করতে হবে, তবু নিজেকে ধামাতে পারলাম না—আমার পায়ের দিকে চেয়ে দেখ, এই বিক্সি কাপড়ের জুতার দিকে তাকাও। আমার দুচোখ বেয়ে কান্না বয়ে পড়ছে, হাত দিয়ে মুছে নিয়ে সোজা মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম, আমার ভেতর থেকে কে বেন ব'লে উঠল,—কখনও না, একাজ আর কখনও করব না।

কিন্তু বা বলতে চাইছি, তার সঙ্গে এ কথাগুলোর কোন বোগ নেই, কাজেই আমার অবচেতন মনের অন্তস্তল থেকে টেবিলে উঠলাম, তুমিই একদিন বলেছিলে যে, আমার জন্ত, শুধু আমার জন্তই তুমিই ইচ্ছুক এসেছ ? তুমি বলেছিলে আমি না থাকলে তুমি মৃত্যু বরণ করত। শুধু সেই জন্ত আমি তোমার পাশ ছেড়ে এক পাও নড়িনি। আর আজ আমার পায়ের কাপড়ের জুতা, কারণ তুমি বেসব তরকারি খেতে ভালবাস, আমি কেবল সেই সব ফল ফলাবার কথাই চিন্তা করছি। আজ হঠাৎ যেই স্তনলে তোমার নাওজি আসছে—অমনি আমি তোমাদের স্নেহের পথে কাঁটা হয়ে গেলাম। তুমি কি করে উচ্চারণ করতে পারলে—বাও ঝি-গিরি করগে বাও ? অসম্ভব, এ সহ করা অসম্ভব। নিজের কানেই কথাগুলো বংশবোনান্তি কটু শোনাল, কিন্তু কোথায় বেন তার বাস বেঁধেছিল, অজান্তে বেরিয়ে এল, ধামাতে পারলাম না।

অবস্থা যখন পড়ে গেছে, তখন আমাদের দামী দামী জামা-কাপড়গুলো বেচে দাও না। বাড়ীটাই বা বেচব না কেন ? আমি বা গোক কিছু তো করতে পারি। গ্রামের আফিস চাকরী করতে পারি, যুটেগিরি করতে পারি। দারিদ্র্য এমন একটা কি ব্যাপার ? বতকণ তোমার ভালবাসা আছে, ততকণ তোমার পাশে জীবন কাটিয়ে বাওরাই তো আমার একমাত্র বাসনা। কিন্তু তুমি তো নাওজিকে আমার চেয়ে বেশী ভালবাস। আমি চলেই বাব। নাওজির সঙ্গে আমার কোন দিন বনবে না, মার থেকে তিনজনের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে। আমরা ছ'জন এতদিন একসঙ্গে আছি, তোমার সঙ্গে আমার যে বন্ধন তার মধ্যে ভেজাল নেই। এখন তুমি আর নাওজি, শুধু তোমরা দু'জনে থাক। আশা করি, তোমার জন্ত অন্তত সে তার চরিত্র সংশোধন করবে। আমার আর সহ হয় না, আমি চলে বাব। আমি আজই একুশি চলে বাব। বাবার জায়গার অভাব হবে না। সঙ্গে সঙ্গে আমি উঠে পাড়লাম।

কাজুকে! কঠোর স্বরে মা ডাকলেন। তাঁর মুখে এতখানি ব্যস্তত্ব এর আগে কখনও দেখবার অবকাশ হয়নি। মুখোমুখি পাঁড়াতে আমার চেয়ে মাধার বেন উঁচুই দেখাল।

কমা চাইবার ইচ্ছে বুক কাটতে লাগল কিন্তু মুখ ফুটল না। বরং উটে সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা বললাম, তুমি আমার ঠিকিয়েছ মা, তুমি আমার ঠিকিয়েছ। নাওজি বত দিন আসেনি, তত দিন তোমার আমায় প্রয়োজন ছিল। আমি তোমার দাসাছদাস ছিলাম। এখন যখন প্রয়োজন ফুরিয়েছে, আমার দূর করে দিলে।

হুঁপিয়ে উঠে আমি পরমুহূর্তে কান্নার ভেঙ্গে পড়লাম।

তুমি অত্যন্ত নির্দোষ—মামা, উত্তেজনার মায়ের স্বর কৈণে উঠল। আমি মাথা তুলে চাইলাম।

হ্যা, আমি তো বোকাই। আমার বোকা পেরে সবাই ঠিকরে নেয়। আমি চলে গেলে সব ঠিক হয়ে যাবে, না? দারিদ্র্যই বা কি, স্বাচ্ছন্দ্যই বা কি? আমি ওসব বুঝি না। চিরদিন আমার মায়ের স্নেহটুকুই একমাত্র ভরসা, সেইটুকুই আমার জোর।

আবার আমি এমন নির্কোণের মত কথা বললাম যার কোন মানে হয় না। যা হ্যাং মাথাটা ঘুরিয়ে নিলেন—চোখে জল। আমার ইচ্ছে হল, দৌড়ে গিয়ে পা জড়িয়ে ধরে ক্ষমা চাই, কিন্তু মাঠের কাছে হাতে ময়লা ছিল, অনিচ্ছাসত্ত্বেও অপ্রস্তুত হয়ে দূরে সরে রইলাম। আমি এখান থেকে দূরে গেলে সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি বাবই, আমার বাবার জায়গা আছে।

এই কথা বলতে বলতে কলধরে গিয়ে কাঁদতে কাঁদতে হাত-মুখ ধুলাম। ঘরে কাপড় ছাড়তে গিয়ে আর এক দফা কেঁদে নিলাম। সারা শরীরে যত কাশা ভরে আছে সবটুকু উজাড় করে দিতে ইচ্ছে হল। দোতলায় বিদেশী পাটার্ণের ঘরে ঢুকে বিছানার উপড় হয়ে শুয়ে মাথা পর্যন্ত কপাল মুড়ি দিয়ে প্রচণ্ড বেগে কাঁদতে লাগলাম। তারপর আমার মন বদল-ভর চরে বেড়াতে লাগল। ক্রমে ক্রমে দুঃখের ভেতর দিয়ে একটি বিশেষ মানুষের স্তম্ভ মন আমার পড়তে লাগল, তার মুখখান! একবার দেখতে, তার কণ্ঠস্বর শুনতে ব্যাকুল হয়ে উঠলাম। ডাক্তার যখন পারের নীচের চামড়া লোচা দিয়ে পোড়াতে বলেন, তখন যেমন পা এতটুকু না কুঁচকে বাধা সহিতে হয়, আমার কেমন বেন তেমনি একটা আশ্চর্য অমুভূতি হল। সন্ধ্যাবেলা নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে মা আলোটা জ্বলে দিলেন। বিছানার কাছে এসে খুব মিষ্টি করে আমার নাম ধরে ডাকলেন। আমি বিছানার ওপর উঠে বসে ছুই হাত দিয়ে মুখের ওপর থেকে চুল সরিয়ে দিলাম। তারপর মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বেশ ফেললাম।

মুহূর্তে সে মা জানালার পাশে একটা সোফায় বসে পড়লেন। জীবনে এই প্রথম তোমার মামার কথার অগ্রথা করে এলাম। তার চিঠির উত্তরে আমি লিখলাম, আমার সন্তানদের ভার আমার ওপরই সে বেন ছেড়ে দেয়। কাজকো, আমরা আমাদের সব দামী পোষাক বেচে ফেলব। একটা একটা করে ভাল-জামা সব বিক্রি করে আমাদের যেমন খুশি তেমনি খরচ করব। অদরকারী যা ইচ্ছে তাই কিনব। বেশী বেশী খরচ করব আমরা। তোমায় আর মাঠে কাজ করতে দেব না। হোক না তরকারীর দাম চড়া, তবু আমরা কিনেই খাব। রাজ্য তুমি চাবার মত ষাটবে, এরকম আশা করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই।

সত্যি বলতে কি প্রতিদিন মাঠে খেটে খেটে ইদানীং আমার শরীর ধারণা হয়ে আসছিল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই জগতই আমি এত সামান্য কারণে এমন একটা কুরুক্ষেত্র কাণ্ড করে বসলাম। তখন আমার মাথার স্থিরতা ছিল না, তার সঙ্গে শারীরিক চরম ক্রান্তি আর আমার ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখ, সব মিলিয়ে আজ-কাল আমি সব কিছুকেই ঘৃণা করতে, প্রতিবাদ করতে শিখেছি। চোখ ফিরিয়ে আমি বিছানার ওপর বসে রইলাম। কাজকো! বল।

তুমি যে তখন বললে, কোথায় বেন তোমার বাবার জায়গা আছে? টের পেলাম আমার বাড়ি অবশিষ্টজন্মের লাল হয়ে উঠছে।

মিষ্টার হোসাদা?

আমি এর কোন জবাব দিলাম না। দীর্ঘকাল কেলে যা বললেন—বহু কাল আগে একটা ঘটনা ঘটেছিল—শুনবে?

বল। কি-কিস করে জবাব দিলাম।

নিশিকান্তা দ্বীপের বাড়ীতে যখন তুমি স্বামী ত্যাগ করে গিয়ে এলে, তখন আমি তোমায় একটা কথাও বলিনি। কারণ তার কাছে শুনেছিলাম, চিত্রকর হোসাদার সঙ্গে তোমার গভীর ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। কথা শুনে বৎপরোন্মত্তি আঘাত পেয়েছিলাম। মিষ্টার হোসাদা বিবাহিত পুরুষ, সন্তানের পিতা। আমি জানতাম তোমার দিক থেকে যত ভালবাসাই থাক না কেন, এ প্রেম ব্যর্থ হতে বাধ্য। প্রেম? কি অজ্ঞার কথা! এ আমার স্বামীর মিথ্যে সন্দেহ ছাড়া কিছুই নয়।

বোধ হয় তাই। আমার ধারণা ছিল আজ অবধি মিষ্টার হোসাদার কথা তোমার মন থেকে মুছে যায়নি। তবে তুমি কোথায় বাবার কথা বলছিলে? মিষ্টার হোসাদা নয়।

সত্যি? তবে কোথায়?

মা, সম্প্রতি আমি এমন এক পৃথক আবিষ্কার করেছি, যেখানে মানুষ অজ্ঞাত প্রাণীদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। জানি, মানুষের ভাষা, জ্ঞান, ধর্মবুদ্ধি, সামাজিক ব্যবস্থা সব আছে, কিন্তু এ সমস্তই কি অদ্বিতীয় পরিমাণে জীবজগতের সর্বত্রই বর্তমান নয়? বোধ হয় জগতের ধর্মবুদ্ধিও আছে। মানুষের গর্ভে সে বিশ্বজগতের অধিকর্তা, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অজ্ঞাত পৃথক পৃথক সত্তা তার বিশেষ প্রভেদ নেই। কিন্তু মা, আমি এক উপায় চিন্তা করেছি, হয়ত তুমি বুঝবে না। এ শুধু মনুষ্য জাতিতেই বর্তায়। সে হ'ল গোপন করার ক্ষমতা। এবার বুঝলে তো, আমি কি বলতে চাই? অপ্রস্তুত হয়ে মা মুহূর্ত হাসলেন—তোমার গোপন কথা যদি মঙ্গল হয়ে আসে, তবে তার চেয়ে অধিক কাম্য আমার কিছুই নেই। প্রতিদিন সকালে আমি তোমার বাবার আত্মার কাছে প্রার্থনা করি—তুমি সুখী হও।

হ্যাং মনে পড়ল, বাবার সঙ্গে 'নাসুনো' (Nasuno)-র গাভী করে বেড়াতে যেয়ে পথে এক জায়গায় নেমেছিলাম। শরতের মাঠ-ঘাট কি অপূর্বই না লেগেছিল সেদিন! এ্যাটর, পিংক, জেন্সিয়ান, ভেলেরিয়ান শরতের সব ফুলে ফুলে চারিদিকে কি শোভাই না হয়েছিল! বুনা আঙুরে তখনও রং ধরেনি।

পরে বাবা আর আমি 'বিওরা' (Biwa) হ্রদে মোটর-বোট নিয়ে বেড়ালাম, আমি জলে কাঁপ দিলাম। জলের মধ্যে আগাছার যে-সব ছোট ছোট মাছেদের বাসা, তারা আমার পারে পারে ঝাঁক খেল, আর কাকচক্ষু জলের তলে আমার পা হ'লখানার ছায়া ফেলে ফেলে সাঁতরে বেড়ালাম। মায়ের আর আমার বর্তমান আলোচনার সঙ্গে এর কোন যোগ নেই, কিন্তু হ্যাংই কেমন হরির মত সবটুকু মনের মধ্যে ভেসে উঠেই মিলিয়ে গেল! আমি বিছানা ছেড়ে উঠে এসে মায়ের হাঁটু দুটো জড়িয়ে ধরে বললাম—মা গো, আমার ক্ষম করো, শেষ পর্যন্ত ঐটুকুই আমার মুখ দিয়ে বেরুলো।

আজ মনে পড়ে, সেদিন পর্যন্ত আমাদের নিবন্ধ আনন্দ দিনগুলির শিখা তখনও পুড়ে শেষ হয়নি। নাওজি দক্ষিণ প্রাণা সাগর থেকে ফেরার পর আমাদের নরকবাস শুরু হ'ল। [কম্পঃ

অমুবাদ : কল্পনা রায়

ভাবি এক, হয় আর

দিলীপকুমার রায়

ত্রিশ

পূর্ণিমা এ পূর্ণিমা আইরিনের ঘরে একদিনও যায় নি। পূর্ণিমা যেতে যেতে ভাবে : নাভাশা যে ওকে আইরিনের ঘরে একা যেতে মানা করেছিল, আইরিন কার কাছে গুনল ? নিশ্চয় কাতিরা কি মাশার কাছে। ওর ভাবি হুং হুং নাভাশার কথা ভেবে।

* * * * *

আইরিনের ঘরটি নিচের তলায়—এক কোণে। একটা করিডোর দিয়ে যেতে হয়—পর পর চার-পাঁচটি ঘর পেরিয়ে। আইরিনের ঘরের সামনেই লম্বা ওর নাম। দোরে ঘটার বোতাম টিপতেই দোর খুলে গেল, কিন্তু দোর কই ?

ও একটু আশ্চর্য হয়ে ঘরে ঢুকল। কী ব্যাপার ? কেউ কোথাও নেই। কী সুন্দর ঘর ! এক কোণে একটি কটেক পিরানো। তার উপরে ফুলদানীতে গভকাল গুই দেওয়া গোলাপ ফুল। পিরানোর পাশে একটি টিপরে রূপোর ফ্রেমে বাঁধানো পল্লবের ছবি। তার সামনে একটি গুই উপস্থিত মোরগাবাদী ধূপদানীতে ছুটি ধূপ জ্বলছে। আর এক কোণে একটি বিছানা। আর এক কোণে একটি সোফা নীলরঙের। তার পাশেও একটি জাপানী ফুলদানীতে সাফা লিলি। আর এক কোণে একটি পরিপাটি ডেস্ক টেবল আরনা ও টুল। ঠিক মাঝখানে একটি চমৎকার টেবিল। ছবির মতন ঘরট—চুকলেই শুধু চোখ জড়িয়ে যাওয়া নয়, মনও তৃপ্তিতে ভরে ওঠে। গৃহের প্রত্যেকটি আসবাব শুধু যে বস্তুস্ত্রে নির্বাচিত তাই নয়, প্রত্যেকেই যেন গৃহিণীর রুচির সাক্ষ্য দিচ্ছে যৌন আনন্দেরবে।

পল্লব খানিক পরে ঘাড় ফেরাতেই রূপালী হাসির বান ডাকিয়ে ছুটি হাত পিছন থেকে ওর গলা জড়িয়ে ধরে। পল্লব ফিরে হেসে ওকে বাহুবন্ধনে বন্দী করে বলে : এমনি করে বুঝি ভয় দেখায় ?

আইরিন সাভিমানে বলে : আদরের মানে বুঝি ভয় দেখানো ? বেশ ! আর দেখাব না। ছাড়ো।

পল্লব হেসে বলে : আমাদের শাস্ত্রে বলে—বুকের মধ্যে ঢোকা সোজা, কিন্তু রেকনো ভার।

আইরিন না হেসে বলে : আর আমাদের দেশে বলে—যে পাখী ধরা দিতে চায় না তাকে খাঁচার লোভ দেখানো বুধা।

ভুল। অসীম চিরদিনই মাথা কুটছেন সীমার খাঁচা মধ্যে ঠাই পেতে। প্রমাণ—সুটি।

আর যে চার অনাসুটি ?

তার নাম অটেল : আমাদের ভাষায়—মোহিনী, রোমিওর ভাষায়—ইনকান্ট্রীস।*

আইরিন রাগ করে ঠোঁট কোলার : বা—ও !

পল্লব ওর গুঠে চুষন করে বলে : অমন করে লোভ দেখালে দাই

* Incantatrice = enchantress

কী করে বলো ? বক্তৃতা-মাসের শরীর তো ! বলেই খেমে : আমাদের দেশের এক গ্রাম্য কবি পেরেছেন—বলে গুন-গুন করে : আমি যে বেসেছি ভালো আমারি কি দোষ ?

ঠাকুরাণী ! ঠেকাইয়া বুধা করে যোব।

বলে মানোটা বুঝিয়ে দেয় ফরাসি ভাষায়।

আইরিন হেসে ওকে প্রতিচূষন করে বলে : আচ্ছা, এ বাড়ি কমা করলাম—কিন্তু আর অমন কোরো না, সাবধান !

কেমন ?

পরের কথা কান দিয়ে আমাদের দূরে সরানোর চেষ্টা—আর কেমন ?

আমি বুঝি ভাট করি ?

করো না তো কী ? আমি বুঝি টের পাই না ভাবো ?

বুধা ?

বোসো, বলছি। ওরা পাণাশামি সোকার বসে। আইরিন বলে : যুগ্ম এইমাত্র টেলিফোন করেছিল আমাদের।

যুগ্ম ? হঠাৎ ?

বলল : তুমি তার সঙ্গে দিন কয়েকের জন্তে রোম যেতে রাজি হয়েছ, আমি যেন বাধা না দিই—এই তার মিনতি। ব'লে একটু চূপ ক'রে থেকে : কী ? কথা কইছ না যে ? আর একটা অছিল। খুঁজছ বুঝি ?

অছিল ? কিসের ?

আর কিসের ? আমাকে ছেড়ে কোথাও বাবার—আমাদের প্রেমকে বাচাই করতে। বসো তো—কাল সকালে কেউ দেয়নি তোমাকে এ-উপদেশ ?

তুমি জানলে কী ক'রে ?

আমি ক্রাউক্রামারের ওখান থেকে চলে যাওয়ার পরেই আমি বাই তাঁর কাছে পড়তে। তখন তোমার সঙ্গে তাঁর কী কী কথা হয়েছিল বলেছিলেন আমাদের। বলেই রাগ করে : বাও তুমি—যেখানে তোমার প্রাণ চায়।

পল্লব ওর কটি বেঁধন ক'রে বলে : ভালোই হ'ল—কথাটা তুমিই তুললে। কিন্তু শোনো বলি। আমার এক বন্ধু—বার কথা তোমাকে বলেছিলেন মনে আছে ? যে রিতা ব'লে একটি ফরাসী মেয়েকে বিয়ে করেছে ?

আছে। নাম মোহনলাল না ?

সেই। ওরা আসছে রোমে—আজই সকালে তার চিঠি পেলাম। রিতার শরীর ভালো নয়। তাই ভাবছিলাম—বদি তুমি অসুস্থতা দাও তবে দিন কয়েকের জন্তে রোম ঘুরে আসি।

আইরিন ওর চোখের দিকে সোজা চেয়ে বলে : অছিলটা খুঁজে পেয়েছ ভালো—মানছি।

অছিল ! মোটেই নয়।

আইরিন বর-বর করে কঁদে ফেলে : পল ! শেষে তুমিও ? ...না, ছেড়ে দাও আমাদের। বাও—বাও যেখানে যেতে চাও। কেবল--নিজেকে সামলে নিয়ে অগ্রসর ক'রে : কেবল এ-মধ্যে অজুহাতের কী দরকার ছিল ? না, তোমার কোনো কথা গুনব না। আসল কথা—তুমি সময় চাইছ—না থাক, ঢের হয়েছে। যে ভালোবেসেও ভেবে অস্থির—এ প্রেম, না মোহ...আমাকে না বলে আগে রোম যাওয়া ঠিক করে পরে বটা করে অসুস্থতা চাইতে আসে—

মিজের গল্পের সাক্ষ্য না মেনে এক পাকাচুল বুড়ির উপদেশই করে।
সিঁরোবাধী—তার পক্ষে কী না সম্ভব? বাও তুমি যোবে—কিখা।
আর কোথাও গিয়ে চুপটি করে বসে দেখতে থাক একটি বৎসর—
আমার প্রেমের জোয়ারে ভাটা আসে কি না।

পল্লবের মন কোমলতার ছেয়ে বার। ওকে আলিঙ্গন করে
বলে : এমন কথা বলতে নেই, আইরিন। আমি মিজের মনকে
অবিশ্বাস করলেও করতে পারি—কিন্তু তোমার ভালোবাসা আমার
কাছে স্বয়ংসিদ্ধ। না, শোনো লক্ষ্মীটি! আমার সত্যিই কিছু বলার
আছে। কিন্তু তুমি এমন অধীর হলে কী করে বলব যা বলতে
চাই? আমি তোমার কাছে আজ এসেছি প্রার্থী হয়ে—বিশ্বাস
করো।

আইরিন ক্রমালে চোখ মুছে বলে : প্রার্থী? কিসের?

বলের।

বল?

হ্যাঁ বল। তবে যদি সুনতে না চাও, বলব না। যাব না
কোথাও।

আইরিন আশঙ্কিত হয়ে বলল : বলো, আমি সুনব অধীর মা
হয়ে—কথা দিচ্ছি। না, এখন আর চুপ করে গেলে চলবে না,
বলতেই হবে।

পল্লব ওর হাত দুটি গালে ঠেকিয়ে বলে : শোনো আইরিন।
আমি যা বলতে এসেছি বলতে বাধে—কেন না এ ধরনের কথা বলব
ভাববার সময়ে এক বকম মনে হয়—কিন্তু বলতে বাবার সময় কেমন
কুঠা আসে—মনে হয় যেন ছোটখুঁতে বড় কথা। তবু চেষ্টা করব
সহজ ভাবে বলতে—না ফেনিয়ে—যদি—

হয়েছে, হয়েছে, বলো—আমি কথা দিচ্ছি—শাস্ত হয়েই সুনব।

পল্লব ওর হাত দুটি মিজের দুহাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বলে চলে :
আমাদের দেশে বলে—নারী পুরুষের শক্তি। এদেশে এসে দেখি,
নারী পুরুষের চিত্তবঞ্জিনী, সংসার-সঙ্গিনী। কিন্তু আমরা তাকে
দেখি আরো বড় করে, বলি—সহধর্মিণী। কুহুম বলে এ যুগের
পুরুষ—বিশেষ আমাদের মতন পরাধীন দেশের পুরুষ—তার কাছে
আরো কিছু দাবি করে, চায়—সে হবে সহস্রদেশিনী—মানে দেশের
সেবার সহায়, প্রেরণা—এক কথায় বলদাত্রী।

কুহুম? তোমার সেই দেশভক্ত বড়?

বড় চরে অনেক বড়। তাকে কী উপাধি দেব জানি না।
তবু বলতে পারি—তার কাছে আমি গভীর ভাবে ঋণী। তার স্তুতি
করতেও আমার ভয় হয় পাছে ছোট করে ফেলি। ওর কণ্ঠস্বর গাঢ়
হয়ে আসে : যৌবনেই যে বড় চাকরি ছেড়ে স্বৈচ্ছায় দেশের জন্তে,
দুর্গতের জন্তে করল দুঃখবরণ—যে বিলাসের কোলে মাহুঁষ হয়ে ও তত
নিম্ন পরাধীনতার—এই আড়াই বছরের মধ্যেই দু বৎসর কাটালো
জেল—জেল থেকে সবে ছাড়া পেয়েছে স্বাস্থ্যভঙ্গের দরুণ—তবু ভরকে
যে ভর করে না—কে জানে হয়ত কের জেলে বাবে দু-চারদিনের
মধ্যে—

জেল? মানে সে বিপ্লবী?

তাই। শোনো। কাল রাতে তার এক চিঠি পেয়েছি, তাতে
সে আমাকে লিখেছে যে, আমার কাছে দেশ স্ত্রনেক কিছু চায়, আমাকে
পান গেয়ে দেশকে আগাতে মাতাতে হবে। আরো লিখেছে, যে

কথা বললাম এইমাত্র, যে আমাদের প্রত্যেকের সহধর্মিণীকে হতে হল
সহস্রদেশিনী...এই সব বলে তার মাথায় নিরে : ওকে আমি লিখে
দিতে চাই—যদি তুমি অস্বস্তি লাগে—যে তোমাকে সব কথা বলে
যাকি করিয়েছি—তুমি হবে আমার সহধর্মিণী তথা সহস্রদেশিনী।
এত বড় ভাকে দেবে না তুমি সাড়া?

আইরিন দুহাতে মুখ ঢেকে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে। পরে মুখ
তুলে শাস্তকণ্ঠে বলল : তুমি তোমার কথা বললে ঢাকাঢাক না
করে না পল, তোমার আন্তরিকতাকে অবিশ্বাস করতে কখনো
আমি ভাবতেও পারি না। কিন্তু যে প্রথম তুমি করেছ খোলাখুলি
—তার উত্তরে আমারও যা যা মনে হয় বলব খোলাখুলি—‘কছুই না
ঢেকে। তারপরে তুমি যা বলবে—করব। কেবল একটা কথা।
আমি বা নই আমাকে তাই ডেবো না ভাবতে ভালো লাগে বলে।
যাক শোনো বলি।

বলে গলা পরিষ্কার করে দিয়ে আইরিন বলে চলে : সব আগে
একটা কথা তোমাকে আমার বলতেই হবে—তুমি মনে আশান্ত
পেলে কমা কোবো আমাকে নিরুপায় বলে—কথাটা এই যে আমি
স্বভাবে দেশভক্ত নই। দেশভক্তির নামে এত নিষ্ঠুরতা, লোভ,
হীনতা, মিথ্যাচারের জরখনি শুনে এসেছি ছেকেবেল। খেকেই...কিন্তু
সে অগ্নি কথা। আমার বলবার কথা এই যে, আমার চোখে স্বপ্ন
নেই বলব না, কিন্তু সে স্বপ্ন দেশের সেবা নয়। আবাল্য আমি
চেয়েছি—শিল্পীর জীবন বরণ করতে, গানে সৃষ্টি করতে। নাতাশা
উঠতে বসতে বলে—মেয়েরা গানে সৃষ্টি করতে পারে না, আমি চাই
একথা অপ্রমাণ করতে। এখানে পারার কথা হচ্ছে না কিন্তু, আমি
বলছি আমার দুঃখাশার কথা—দুঃখাশা বলছি এই ভগ্নে যে, ইহত
পারব না বা হতে আমার শ্রাণ চায়। কিন্তু সে যাক, এবার তোমার
কথার আসি।

তোমাকে আমি কেন ভালোবাসলাম বলতে পারি না জোর করে
—তবে একথা বলতে পারি যে, তোমার কণ্ঠ শুনে বধন আমি মুগ্ধ
হই তখন থেকে কেবলই চেয়েছি—তুমি আমার সাথী হও সহস্রদ্রী-
রূপে। না, সবটা বলা হল না। আমি ঐ সঙ্গে চেয়েছি তোমাকে
আমার জীবনের সহযাত্রীরূপে, বেদনার ব্যথার ব্যথারূপে পথে পথের
পাথেরূপে, আনন্দের নিত্যসাথীরূপে। দেশ—তবু তোমার দেশ নয়,
আমার নিজের দেশও—আমার কাছে, অন্তত এখন পর্যন্ত, জড়বস্তুর
বলব। তোমাদের কাছে স্বদেশ জীবন্ত মা, আত্মার আত্মীয়া, আমার
কাছে বড় জোর ভূমিখণ্ড—যে স্বপ্নের হলে চোখকে খুঁশি করে, অহঙ্কার
হলে—বিরক্ত। মুখ অমন কোরো না, লক্ষ্মীটি। নৈলে বা বলতে
চাই বলব কেমন করে? আমাকেও একটু বুঝতে চেষ্টা করো।

করছি—কেবল একটা কথা : দেশকে নিশ্রাণ ভূমিখণ্ড ছাড়া
আর কিছু মনে করা তোমাদের পক্ষে এত কঠিন কেন? ইংলণ্ডেও
তো প্রকৃতিপূজা আছে বার প্রধান পুরোহিত ওয়র্ডসওয়ার্থ—
Something far more deeply interfused.

জানি জানি। আমাদের দেশেও আছে। তবু আছে নয়,
এমন প্রচণ্ডভাবে আছে আমাদের সুজিকদের * মধ্যে বারা দেশ তো
দেশ আইকনকেও পূজা করে, ভার্জিন মেরির সামনে ধূপদীপ

জালাল, বকী বাজার—এক কথার সব বিজ্ঞান যথেষ্ট যথেষ্ট বা খুঁট খুঁটীয়াতর আবিষ্কার। উঠে উঠে বইয়ে ছুঁতে ছুঁতে পাবে এই মেটামর্শ—আমাদের অনেক বিপ্লবীর মনেও সে ভাবের ছোঁয়াট লেগেছে। আমার দায়রায় এক বন্ধু ছিলেন এই জাতের বিপ্লবী— তিনি পাহাড়-নদীর সামনে ঠায় চেয়ে চেয়ে থাকতেন আর দুগাল বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়ত—ইরাজিতে থাকে বলে ঝাঁজ। কিন্তু আমার মনে সে ভাবের ছোঁয়াট কোমোদিনই লাগেনি যে—কী করব বলা? তাই বলা ছলাম—আমি বা নই আমাকে তাই বলে কল্পনা করে আমাকে তোমার মানসী প্রাণে মা পাড় করিয়ে না, কেন না, করলে শেষে মনে যা থাকবে। তোমাকে আমি আনন্দ দিতেই চাই পল, ব্যথা দিতে নয়।

পল্লব চূর্ণ করে রইল মুখ নিচু করে। আইরিন ওর গালে পাল রেখে কোমলকণ্ঠে বলে : আমাকে ক্ষমা কোরো পল, কিন্তু আমি বা পারি তার চেয়ে বেশি তো পারি না—উপায় কী? তাই তোমাকে শুধু বলতে চাই যে, আমি তোমার সহদেশিনী হতে পারব কি না জোর করে বলতে পারি না এখন। কেবল সত্যের অপলাপ না করে এইটুকু বলতে পারি যে আমি চেষ্টা করতে যাবি আমি—আর সে শুধু একজন্মে যে, আমি তোমাকে ভালোবাসি, নৈলে তোমার মনের মতনটি হতে চাইবই বা কেন বলা? কিন্তু আমার নিজের কথা যদি বলা তবে আমাকে, বলতেই হবে যে, আমার প্রাণের কামনা তোমার সহদেশিনী হওয়া নয়—আমি চাই তোমার সহমিণী হতে।

সহমিণী?

হ্যাঁ। সহমিণী কথাটা আমার কাছে এখনো—কী বলব? বড় জোর একটা পুরুষের কথা, রঙিন ছবি, তার বেশি নয়। ও আমার মন টানে না কারণ ধর বলতে যে ঠিক কী বোঝায় আমি আজো জানি না। কল্পনা দিয়ে তাকে বুঝতে যে চেষ্টা করিনি তা নয়। করেছি—বহুবারই। কিন্তু কল্পনা তো বাস্তব নয়, উপলব্ধির কোঠার পড়ে না, কাজেই ধর আমার কৌতূহলের উদ্বেগ করলেও মন টানতে পারে নি—অন্তত আজ পর্যন্ত। আমার মনকে টানে—তোমার ব্যক্তিরূপ, অর্থাৎ তুমি বা হ'য়ে উঠেছ তাই। এই তোমাকে—যাকে আমার প্রেমের চোখে দেখছি, প্রেমের কানে শুনেছি, প্রেমের স্পর্শে চিনেছি—চাই আমি আজ আমার হৃদয়ের বেদীতে বসাতে : তোমার দেশ আমার কাছে অবাস্তব। আমাকে 'ভুল বুঝো না—এটুকু অস্বাভাবিক করবার কল্পনা শক্তি আমার কেন, তোমার বা তোমার আদর্শ বন্ধুর কাছে দেশ একটা জীবন্ত প্রতীক। কিন্তু আমি যদি কোনো দিন তোমাদের দেশকে সে ভাবে দেখতে পারি—যদিও জানি না শেষ পর্যন্ত পারব কি না—তবে সে-পারটা সম্ভব হবে শুধু তোমার জন্তে। অর্থাৎ তোমাদের দেশকে যদি পরে কোনো দিন ভালোবাসি—তো বাসব শুধু তুমি দেশকে ভালোবাসো বলে। আর আমার মনে হয়—এই-ই প্রতি প্রেমিকার মনের কথা। আদর্শবানী পুরুষ আদর্শকে ভালোবাসে আদর্শের টানে, প্রিয়বক্তা নারী সে-আদর্শকে বরণ করে শুধু বরণের টানে। তাই আমার মিনতি—তুমি আর বাই বলা না কেন—একথা বোলো না যে, তুমি বা চাও আমাকে ঠিক তাই চাইতে হবে, তুমি যে-জন্মে চাইছ হবই সেইজন্মে। যদি বলা

তবে বুঝব—আমাকে তুমি ভালোবাসো নি, শুধু চেয়েছ নিজের ভাববিধানের জোপানার রূপে। জানি না আমার মনের কথাটা পরিষ্কার ক'রে বোঝাতে পেরেছি কি না—তবে মনে হয় তুমি যদি একটু খোলা মন নিয়ে আমাকে বুঝতে চেষ্টা করো, তবে বুঝতে পারবেই পারবে কোথায় আমাকে বাধছে। আইরিন অঙ্গ গোপন করতে মুখ ফেরায়।

পল্লব ওর হাত ছেড়ে দিয়ে একটু চূর্ণ ক'রে থেকে বলল : আমি বোধ হয় বুঝেছি তোমাকে... আমার বুকের মধ্যে কেমন যেন খালি খালি লাগছে... ঠিক বুঝতে পারছি না—কী বলব এর উত্তরে... শুধু এই কথা ছাড়া যে আমাকে অবশ্যই সময় দাও।

আইরিনের মুখ শাধা হ'য়ে গেল : সময়? কী জন্মে?

পল্লব একটু ইতস্তত ক'রে বলল : আমি নিজের মনের সঙ্গে একটু মুখোমুখি হ'তে চাই—একেবারে একলা।

আইরিন বর বর ক'বে কঁদে ফেলল।

পল্লব ওর মুখ বুকের মধ্যে টেনে বলল : তুমি চোখের জল ফেসলে আমার কী যে হয়, কেমন ক'রে বোঝাবো আইরিন? বলেছি—আমাকে শক্তি দিতে হবে তোমাকেই। তাছাড়া আমাকেও তুমি একটু বুঝতে চেষ্টা করো, লক্ষ্মীট! আমি... আমি... মানে, তুমি আজ বা বললে তার জন্মে... আমি একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না।

আইরিন জলজরা চোখে পল্লবের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল : আর আমিই কি প্রস্তুত ছিলাম তুমি বা বললে তার জন্মে? আমি তোমাকে ভালোবাসি জেনেও বললে কেমন ক'রে—সময় চাও নিজের মনের সঙ্গে মুখোমুখি হ'তে?

পল্লব কী বলবে ভেবে পায় না। আইরিন বলে : কিন্তু না, তোমাকে দোষ দেব না। হয়ত তুমি ঠিকই বলেছ... জানি না। আমি এখন পরিষ্কার ক'রে ভাবতে পারছি না। বলে পুর নামিয়ে নিয়ে খেমে খেমে ফের বলে : হয়ত তুমিই ঠিক হয়ত এক্ষেত্রে এ ছাড়া উপায় নেই, কারণ কিসের টানে যে আমরা চলি কেমন যোগাযোগে যে কে কী ভাবে গ'ড়ে ওঠে কেউ কি জানে? তাই তোমার কথাই থাক, তুমি যাও যেখানে যেতে চাও—এমন কি যদি সোজা দেশে ফিরলে তোমার পক্ষে নিজের মনের সঙ্গে একলা মুখোমুখি হওয়া সম্ভব হয় তবে তাই করো, আমি তোমার পিছুটান হ'য়ে থাকব না।

পল্লবের বুকের মধ্যে ধক ক'রে ওঠে : তার মানে? বিদায়?

আইরিন গাঢ় কণ্ঠে বলে : হিঃ, অমন কথা বলে? পুরুষের বেলায় কী হয় কেমন ক'রে বলব? কিন্তু মেরো কি এক কথার বিদায় দিতে পারে পল? বলতে বলতে ওর চোখে ফের জল ভরে ওঠে : তুমি কী জানবে পল, তোমাকে আমি কোথায় বসিয়েছি? তা ছাড়া ওর কণ্ঠে ফুটে ওঠে 'উদাস সুর—তা ছাড়া আজিও ঘরা আমাদের স্বভাব, তুমি কাছে থাকলে হয়ত তোমাকে আরো বেশি করে জড়িয়ে ধরব, কে বলতে পারে? বলে চোখ মুছে শান্ত কণ্ঠে বলে : আমাকে আমার দুর্বলতার জন্তে ক্ষমা কোরো তুমি। যারা মুক্তি চায়, প্রেম হয়ত তাদের বল দেয় কিন্তু যারা বন্ধনের মধ্যেই আত্মসমর্পণ না ক'রে পারে না তাদের প্রেম শক্তি দেয় না—ফিটাই করে।

পল্লব অবীর হ'য়ে ওর কণ্ঠে বেষ্টন ক'রে বলে : আমি এ পারব

না। কুহুমকে আজই লিখে দিচ্ছি যে এখান থেকে তোমাকে নিয়েই সোজা দেশে ফিরব। আর আঙ-পাছু করব না।

আইরিন রান শান্ত কণ্ঠে বলে : সে হয় না পল। একবার যখন মুখ ফুটে সময় চেয়েছি—সময় তোমাকে নিতেই হবে। আমি বাই হই—তোমার দুর্বলতার কঁক দিয়ে তোমার মনের দুর্গ দখল করব না, চোখের জল দিয়ে তোমাকে বাঁধব না। এমন কি, ঘুরে গিয়ে যদি আমাকে পরীক্ষা করতে চাও—তাও মেনে নেব—যদিও দু' দিন আগেও কেউ যদি আমাকে বলত আমার ভালবাসাকে বাগাই করবে, তা হ'লে তাকে বলতাম : বঙ্গবাদ। বঙ্গবাদ। তোমার নিজের পক্ষেই চলে। কিন্তু তোমাকে সে কথা বলার সাধ্য আমার নেই—তোমাকে যে ভালোবেসেছি আমার দেহ-মনের প্রতি অণুটি দিয়ে। না, তোমাকে কথা দিচ্ছি তুমি যা চাও তাই করব—তাতে যতই কেন না বাধা বাজুক। বলে ফের চোখ মুছে সোজা হ'য়ে ব'সে মুখে হাসি টেনে বলে : তা হলে যুঝফের সঙ্গে রোমেই বাজি—না, সোজা দেশেই ফিরবে ?

দেশে। সে কি কথা ?

আইরিন রান হাসে : কতি কী ? তুমি রোমে থাকলেও চোখের আড়ালে। দেশে থাকলেও চোখের আড়ালে, তাই বরং সেখানেই বাও না ফিরে—বিশেষ যখন তোমার আদর্শ বন্ধু এমন প্রাণকাড়া মূরে ডাক দিচ্ছেন ?

পল্লব ওর হাতের পরে হাত রেখে বলে : তার উপর কেন অনর্থক রাগ করছ আইরিন ? সে তো তোমার বিরুদ্ধে একটি কথাও বলে নি ?

আইরিন কি একটা উত্তর দিতে গিয়েই থেমে বলে : থাক, তুমি বুঝবে না।

না, বলো। বলতেই হবে।

না, পল। তোমার মনে কেন আর মিথ্যে দুঃখ দেই ? কেবল আমাকে একটা কথা দেবে ?

কী কথা ?

বে, যেখানেই থাকো না কেন, প্রতি সপ্তাহে আমাকে অন্তত একটি ক'রে চিঠি দেবে ? আমি পথ চেয়ে থাকব।

পল্লব ওর হাত ধরে বলে : আমি বাব না।

আইরিন পল্লবের হাত চুষন করে বলে : সে হয় না। এখন তোমাকে যেতেই হবে। তোমার বন্ধু-বান্ধবী ইতালিতে অপেক্ষা করছেন তোমার জন্যে।

তারি এখানে আসবে।

যুঝফের কথা দিয়েছ ?

টেলিফোন করে দেব—সময় আছে।

যদি আমি তোমার বন্ধুর মনের মতন মেয়ে না হই ? না, ঠাট্টা নয়। তুমি বাও—আমি প্রসন্ন মনেই বলছি। এত ভয় কিসের—যখন আমাদের এ ভালোবাসা সত্য ? আঙনকে খান্নাই উরার, সোনা উরাবে কী দুঃখ ? ব'লে জোর করে হাসতে চেষ্টা করে : কেবল চিঠি লেখার কথাটা এখনো দাঁও নি, মনে রেখো।

দেব—কেবল এক সপ্তে।

কী ?

কথা দাও যে, আমি ডাকলেই তুমি আসবে।

আইরিন ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বলে : তুমি ডাকবে অথচ 'আমি আসব না, এ কথা কি তুমি সত্যি ভাবতে পারো যে কথা চাইছ ?

পল্লব আইরিনের কঠালিঙ্গন করে বলে : আমি জানতাম—তুমি বুঝবেই বুঝবে।

বোঝা তো কঠিন নয় পল, কঠিন হ'ল অভিমানকে জয় করা। ব'লেই আইরিন ভেঙে পড়ে, পল্লবের কোলে মুখ তুলিয়ে কেবল চাপা কান্নায় ওর দেহলতা থেকে থেকে কঁপে ওঠে।

পল্লব ওকে সাঙ্গনা ধোবার চেষ্টা করে না, ওর পিঠ, মাথার, চুলে হাত বুলায়। ঘরের মধ্যে শুধু ঘড়ি করে টিক টিক টিক।

* * * * *

আইরিন যখন মুখ তুলল তখন ওর চোখের জল শুকিয়ে গেছে। পল্লব ওর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে।

আইরিন ওর হাতে হাত বুলাতে বুলাতে বলে : আমাদের হাদিস-কান্নাকে বেশি বড় করে দেখো না। এমনিই মন আমাদের... শরতের আকাশ : এই আলোর আলো, তার পরেই ঘনঘটা। তোমরা আমাদের কৃপাক্ষীত দেখ কি সাথে ?

পল্লব ওর মুখ চোখে ধরে : নিজেকে অমন করে ছোট করে না।

কিন্তু যে সত্যিই ছোট—

তোমার মতন যে ভালোবাসতে পারে সে ছোট ?

আইরিন বিষন্ন হাসে : কোথায় ভালোবাসা 'পল ? সত্যি ভালোবাসার এক মন্ত্র—'তুমি তুমি'। যে 'আমি আমি' করে সে মিথ্যে—দুর্বল ভালোবাসা।

তা হলে আমাকে ছেড়ে ধোয়ার বল পেলে কোথেকে ?

বল পাই আমার 'আমরা' কোথায় ? শুধু পাবার তত্ত্ব কি বৈ তো নয়।

তত্ত্ব করো ?

নয় ত কী ? ভাবো কি—ছেড়ে না দিয়ে যদি বেঁধে রাখতে পারতাম তা হ'লে তোমাকে চোখের আড়াল হ'তে দিতাম আজ ?

চোখের আড়াল মানে কি মনের আড়াল ?

কী জানি ? কিসে কী হয় কেউ কি বলতে পারে ? বলে একটু থেমে : আর তাই তো ভয় আসে পল। দিনের পর দিন শুধু উদ্বেগ থাকবে আমার সঙ্গী হ'য়ে—যদি নিজের মনের সঙ্গে যুঝাযুঝি হতে না হতে আমি তোমার পর হ'য়ে বাই... যদি তোমাকে শেষেও হারাই ?

পল্লবের বুকের মধ্যে কি একটা তার বেজে ওঠে, বলে : না—আমি বাব না—কিছুতেই না।

আইরিন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলে : এখন আর হয় না—এখন তোমাকে যেতেই হবে—অন্তত কিছু দিনের জন্যে।

কেন শুনি ?

কারণ—এখন যদি তুমি না বাও তবে সে হবে আমার তোমাকে জোর করে ধবে রাখারই সামিল—যা ফলে তোমার চোখে আমি ছোট হ'য়ে বাবই বাব। স্রদ্ধার ভিৎ বিনা কি প্রেমের ইমারত গড়া যায় পল ?

পল্লব কী বলবে ভেবে গায় না। আইরিন একটু পরে বলে :

এই মাত্র তুমি বলছিলে নারীকে তোমাদের পাশে পুরুষের শক্তি বলে। আমার তখন কী মনে হয়েছিল বলব ?

কী ?

বে আমার তোমাদের শক্তি হতে পারি কেবল তখন যখন তোমরা পাশে এসে দাঁড়াও। তোমরা তার নিলে তবেই আমরা সবলা, নৈলে অবলা। এক কথায় : তোমরা দাঁড়াও নিজের পায়ে আমরা দাঁড়াই তোমাদের পায়ে—আইভিলতার মত—তোমাদের জাঁকড়ে ধরে। ব'লে ঈশ্বর ব্যঙ্গ হলে ; এই-ই হ'ল শক্তিময়ী শক্তির নিজ মূর্তি, মুখলে ?

পল্লব শান্ত দৃঢ় হয়ে বলল : আইরিন। আমি যাব না। দুহুকে একদিন টেলিফোনে জািসিয়ে দিচ্ছি, আর দুহুকেও আজই লিখে দেব সব কথা খোলাখুলি—এই কথা বলে যে, দেশের কাজে আমাদের যদি ও তার ভবে তোমাকেও গ্রহণ করতে হবে। তোমাকে বিদায় দিয়ে আশাখানায় মন দিয়ে কী দেশের কাজ করব বলে ?

আইরিনের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেই নিবে গেল : বলল না পল, সে তুমি পারবে না। কারণ এখন হঠাৎ দুহুকে সবকথা লিখে দিলে সে দুখ কোবেই কোবে—আমাকে তোমার 'শনি' ভবে। তখন দেশের কাজে বোগ দেওয়ার পথও তোমার বাবে বন্ধ হয়ে। পুরুষ মানুষ বল পার মেয়েদের কাছ থেকে নয়—ও একটা কথাই নয়—তোমরা বল পাও তোমাদের ঘর থেকে, আদর্শ থেকে, তপস্যা থেকে। এই সবই তোমাদের সর্বস্ব। তা ছাড়া আমাকে সেক্টমেন্টাল দুঃখ থেকে বাঁচাতে গিয়ে যদি তুমি সর্বস্বান্ত হও তা হ'লে মনে করো কি—আমাকে ধনী করা হবে ? মেয়েরা বড়ই দুর্বল হোক না কেন—যেখানে সত্যি ভালোবাসে সেখানে সব আগে ভাবে নিজের কথা নয়—বাকে ভালোবাসে তারই কথা। তাই তো যুগে যুগে নায়িকারা নায়ককে নিজে হাতে বধ পথিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে স্বত্বার মুখে। পাঠিয়েছে কেন না তারা তাদের অন্তর-গতীর একটি কথা জানতে : যে, বলভকে যদি নিজেকে জন্তে রপছোড় হ'লে প্রাণে বাঁচতে বলে তবে সে হবেই হবে অনুখী, আত্মবিকারে রান, অবসর—আর তখন এ অবসাদের কারণ হবে কে ? প্রিয়া, বার জন্তে সে কর্তব্যভ্রষ্ট হয়েছে। তার পরে কী হবে তাও সে প্রিয়া জানে—বে, অবসরকে নিয়ে ঘর করলে প্রসন্নতা আসতে পারে না, ঋতিয়ে জ'মে ওঠে শুধু আত্মগ্লানি : কী করলাম ? বাকে ভালোবাসি তার জীবন বার্থ ক'রে দিলাম নিজের সুখের জন্তে ? না পল—আইরিনের মুখে ফুটে ওঠে বিষম হাসি—আমি তোমাকে মন থেকেই বলছি—বাও যেখানে যেতে চাও, নিজের মনের সঙ্গে হও সুখোমুখি, তোমার শুভার্থীদের, বন্ধুবান্ধবদের, আত্মীয়স্বজনের পরামর্শ নাও যদি চাও—আমার সুখ-দুঃখের কথা ভাবো না, হিসেব ক'রে দেখ—কিনে তোমার জীবন সার্থক হ'বে। যদি ভেবে-চিন্তে স্থির করো—তোমার বাত্মপথে আমি তোমার সহযাত্রী—তোমার ভাবায়, সহদেপিনী হ'তে পারব না—তবে আমাকে জানিও, আমি তোমাকে পিছু ডাক সৈব না—নিজে এগিয়ে আসতে।—না, এ মহত্বের কথা নয়, শক্তিময়ী অপবাকের শক্তির কথাও নয়—এ হ'ল দুই আর দুই চাবের কথা, অপ্রতিবাত্ত মুক্তির কথা : অর্থাৎ নিজের সুখের ব্যবস্থা করতে যদি আমি তোমাকে অনুখী করি, তবে তাকে ক'রে আমার সুখ

হবে না, হবে শক্তি। আত্মবিকারের মধ্যে বাঁচার চেয়ে গভীর বেদনাকে বরণ করাও জেদা, কারণ সেখানে অন্তত আছে স্বত্ব সাধনা—এ নিঃস্বপনতার জগতে বার নাম কম নয়।

আইরিন উঠে দাঁড়ায়, পল্লবও। আইরিন জোর ক'রে হেসে বলে : ঐ দেখ—আমাকে নিয়মিত চিঠি লিখবে কথা দিলে না।

পল্লবও জোর ক'রে হেসে বলে : লিখব—কেবল তুমিও কথা চাও—আমার চিঠির জবাব দিতে সেরি করবে না।

বিক। তোমাদের গীতার বাগী নিয়ে না কথায় কথায় গরু করো—সিদ্ধায় বর ? না, আমি চিঠি লিখবই কথা দেব না। বীরপুরুষ। এটুকুও পারবে না—সপ্তাহে একটি ক'রে চিঠি লিখে যেতে—আমার চিঠি পাও বা না পাও ?

ওর চোখের জলের মধ্যে দিয়ে হাসি ফুটে ওঠে। পল্লব ওড়ে আলিঙ্গন করে, আইরিন ওর বুকে মাথা রেখে খামিক চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে বলে : এসো পল, একটা গান গাই দুজনে মিলে... কে জানে আর কখনো একসঙ্গে গাওয়া হবে কিনা—না না, অমন কথা বলব না আর, অমন দুখ কোরো না, সস্ত্রীটি। এসো, খুশিমনেই বিদায় নিই—'কিরে এসো' ব'লে অবশ্য। উজ্জ্বল ইন্দ্রধনুবিলাস তো চের হ'ল, এবার মাটির মাছুষ মাটিতে নামুক একটু।

পল্লবের মনের তার একটু কমে আসে, সহজ হেসে বলে : তুমি বড় চমৎকার কথা বলো আইরিন। মজ্জি কি সাথে ?

আইরিন আড়ল তুলে শাসিয়ে বলে : এবার আমাকে ছোট করছে কে তনি ? শুধু কথা ? তোমাকে গান তনিরে শিখিয়েও কি মজাইনি ?

পল্লব হেসে ফেলে : একশো বার। তবে কি জানো ? তোমার তুলনা এক তুমি—যখন সেরূপ ধরো মনে হয় সেই তোমার সে রূপ। যখন গান গাও—পান করি তোমার কণ্ঠ, যখন হেসে তুলে চলো—যান করি তোমার দেহলতা, যখন কটাক্ষ করো—অনুভব করি তোমার বিদ্যুৎ, আবার যখন বিদায় দাও তখনো তনি সেই সঙ্গে তোমার 'কিরে এসো' বলা—বা এক তুমিই পাখো—বেন গানের সুরে।

আইরিন ওর হাতে ছোট একটি চড় মেয়ে বলে : আর তুমিই বুঝি মুখচোরা ভালো মানুষটি। গান ভালোবাসলাম আরো কার জন্তে গো ?

এই দেখ—আর একটা রূপ—রহস্যময়ী।

আইরিন ক্লান্ত সুরে বলল : "রহস্য ? তোমাকে বলি নি—তোমাদের গানের সুরে আমার স্তন্য কী ভাবে তুলে ওঠে ? না, তোমার কাছে তোমাদের দেশের কয়েকটি গান শিখতে গিয়ে আমার মন যে কোন্ রঙে রঙিয়ে উঠেছে—তুমি কী জানবে ? হয়েছে—এসো ঐ গানটি আর একবার গাই দুজনে—ওর শেষ স্তবকটির কয়েকটি মীড় আমার গলায় এখনো তুলতে পারিনি—ঐ তোমার—বলে ধীরে ধীরে বাংলার উচ্চারণ করে : "প্রিয়, তোমার কাছে যে হার মানি"—কী সুন্দর গান—ভাবে, সুরে, তালে, তুলকি চালে। ব'লে ওকে টেনে নিয়ে বার পিরানোর কাছে : তুমি দাঁড়িয়ে শোনো, আমি গাই, কেমন ? তুমি প্রথমই ধোরো না কিন্তু—তোমার কণ্ঠ তনলেই আমি অর-তাল তুলে বাই। একবার আমি একলা গেয়ে নিই, তারপর তুমি ধরবে—ডুয়েট তবিলে, কেমন ?

এবার কেনবার সময়

লেখকগণের বিলোপ

ইতল

পিলখার-প্রথক ক্যাপ

যুক্ত দোষে কিনবেন

এম, এল, বঙ্গু, য়াণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ কলিকাতা-১

পল্লব আশ্চর্য হ'য়ে ওর আনন্দলীপ মুখের পানে চেয়ে থাকে :
এ কি সেই মেয়ে যে হুঁমিনিট আগে ভেঙে পড়েছিল কারাগার ?
আইরিন শিয়ানোর হুঁ-তিন মিনিট কর্ত দিয়েই সুর ধরে, কিন্তু
পল্লব ওর সুরভালের তুলতুলের কথা ভুলে গিয়ে বৃষ্টি হ'য়ে চেয়ে
থাকে। কী অপকণ্ঠ মুখ, রঙ, চাহনি ! এই মেয়েকে ও বিদ্যার
দেবে কেমন ক'রে—কী অপরাধে ?—ভারতবর্ষকে ভালোবেসে যদি
ও পল্লবের 'সহদেবিনী' হ'তে না পারে এই ভরে ? মোহনলালের
একটা প্রয়োজিত মনে পড়ে যায় : মাহুদ বড়, না দেশ ? কিন্তু
আবার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে কুহুমের কথা : First things
must come first—আগে স্বাধীন হই, তারপরে ভাবা যাবে
বিধমানবের কথা। উত্তরে মোহনলালের তর্কবৃত্তি মনে পড়ে : 'সবার
উপরে মাহুদ সত্য, তাহার উপরে নাই।' দেশের সেবা করতে
পারে মাহুদ তখনই যখন সে মাহুদ হ'য়ে ওঠে : 'কিসের শোক
করিস তাই ? আবার তোরা মাহুদ হ' : গিয়েছে দেশ, দুঃখ
নাই—আবার তোরা মাহুদ হ। প্রত্যন্তরে উদ্দীপ্ত মুখে কুহুম
বলত—মনে পড়ে—কিন্তু মাহুদ হবে কী করে তুনি যদি দাসত্বের
চাপে আত্মসম্মান হারা পড়ে ? Putting the cart before
the horse ? ও হয় না মোহন, হয় না। স্বাধীন দেশের
লোকের মুখে যে-কথা সাজে পরাধীন দেশের মুখে সে-কথা
সাজে না। জাতিই পড়ে উঠল না—আন্তর্জাতিকতার স্বপ্ন
গা-ভাসিয়ে চললাম মহামানবের সাগরতীরে ! যা নয় তাই ! পল্লব
গান শুনে শুনে অত্মমনস্ক হয়ে পড়ে।

হঠাৎ আইরিন খেমে হুম্-হুম্ ক'রে শিয়ানোর করতল দিয়ে
বাড়ি মেয়ে বলে : তুমি কিছু শুনছ না ! যাও !

পল্লব চমকে বলে : কী ?—হ্যাঁ, হ্যাঁ শুনছি বই কি।

ছাই শুনছ। আমার এ-তালটার কেবলই ভুল হয় আমি
জানি। দুই-তিনের কদম তো আমাদের সঙ্গীতে নেই—কী বেন
এ-তালটার নাম ? ঐ দেখ ভুলে—হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে—
জাঁপতাল, না ?

জাঁপতাল। জ-র পরে হ জুড়লেই বা হয়—ঝ, ঝাঁপ, ঝাঁপ।

আইরিন বাগ করে বলে : ও আমি পারব না উচ্চারণ করতে।

পল্লব হেসে বলে : হুবদৃষ্ট বাংলা ভাষার। না, লক্ষ্যটি, বাগ
কোরে না। আমি শুনছিলাম বৈ কি।

কের মধ্যে কথা ? তুমি কিছু শোনো নি—ভাবছিলে
আখাল পাখাল।

না না, বলে পল্লব ভয়ে ভয়ে, তোমার শেষ অন্তরটির উচ্চারণ
এখনে নিখুঁত হয়নি। আচ্ছা আমি গাইছি—গাও সঙ্গে সঙ্গে—
কয়েক বার গাইলেই জিভের আড় কেটে যাবে।

আইরিন হেসে উঠে পাড়িয়ে বলে : আচ্ছা। আবার তুমি
শিয়ানো ধরো, আমি পাড়িয়ে গাই। আমরা পাড়িয়েই ভালো গাই,
জানো তো ?

পল্লব 'জানি' বলেই হেসে টুলে বসল শিয়ানো বাজাতে।
আইরিনের নিখুঁত সুরভায় মন ওর আত্ম হ'য়ে ওঠে। কী অপকণ্ঠ
কিন্নরী-কণ্ঠ। একে বিদ্যার দেওয়ার কথা কি ভাবা যায় ? অথচ
তবু কিরে কিরে মনে ধুরোর মতন বাজে আইরিনের একটা কথা :
যদি তোমাকে শেয়েও হারাষ্ট ?

আইরিন খেমে বলে : কের অত্মমনস্ক ? ধরো।

পল্লব চমকে উঠে, 'হ্যাঁ হ্যাঁ', বলেই ওর সঙ্গে ধরে :

প্রিয়। তোমার কাছে যে-হার মানি—সেই আমার জয়।

প্রেমে জয় গরব সাথে যে—জয় নয় সে জয়ী নয়।

মানি তোমার কাছে যে পরাভব, সেখা আমারি অরোহণ,
পরের মুখে বিজয় বব চিত্তে বিঁধে বর :

তবু তোমার সাথে আমার নহে নহে সে পরিচয়।

প্রিয় তুমি যে বরণানে আমার ভরেছ এ-স্বন্দর,

ভার প্রতিদানে সে নোয়াতে মাথা বাসে কি লাভ ভয় ?

তুমি বরণমালা দিয়ে আমারে নিরভিমান ছবতিসারে।

দেখালে আলো অন্ধকারে—নাই তো তার লয় :

দিলে দীক্ষা—প্রেমে জিতিলে হাবি, হারিলে সেই জয়।

গানের শেষে পল্লব মুখ তুলতেই দেখে—আইরিনের চোখে জল :
ও উঠে পাড়িতেই আইরিন ওর বুকে মাথা রেখে ঝর ঝর করে
কঁদে ফেলে...

ক্রিঃ...ক্রিঃ...ক্রিঃ...

আইরিন নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে চোখ মুছে, দোর খোলে।

নাভাশা ! কী ব্যাপার ?

পল্লব সক্রোঁ বলে : এই যে নাভাশা, এলে ভালোই হ'ল।
আমি তোমাকে টেলিফোন করব ভাবছিলাম—মানে আজ রাতে
ট্রোঁ আমি রোম—

নাভাশা ম্লান হেসে বলে : জানি—সেই ভক্তই আমার আসা—
যুসুফ তোমার ওখানে টেলিফোন করে না পেয়ে আমাকে টেলিফোন
করছিল—তোমার নাকি এখন বিসমার্ক শত্রু সে—

ওহো ! দেখ দেখি—শ্রেক ভুলে বসে আছি—পাসপোর্ট অফিস—

হ্যাঁ—সেইজন্তেই—যুসুফ সেখানে থেকেই টেলিফোন করে বলল
যে আজ শনিবার—একটার পরে অফিস বন্ধ। আজকে যদি যেতে
হয়—একুশি বাও ছুটে টাক্সি নিয়ে—এখন শ' বারোটা—জার দেরি
কোরে না। বলেই খেমে : তুমি আজ রোম রওনা হচ্ছে, কল
সকালেও তো বোলা নি ?

কাল জানতাম না—আজ সকালেই হঠাৎ বাওয়া ছিন্ন হল—
যুসুফ চঠাৎ এসে এমন ছোঁকে ধরল—

নাভাশা ওর চোখের দিকে চেয়ে বলল : আভই ?

আইরিন বলল : নৈলে কি ও মিথ্যা কথা বলছে ?

নাভাশা জ্রুটি করে বলল : না। মিথ্যা কথা কি এ ভগতে
কেউ কখনো বলে থাকে ? সবাই প্রতি পদে সত্যি কথা বলে বলেই
না ভগতের আজ এ অবস্থা।

পল্লব কুণ্ঠিত সুরে বলল : সত্যি বলছি নাভাশা, বিশ্বাস না হয়
যুসুফকে জিজ্ঞাসা করে—

নাভাশা বাধা দিয়ে বলে : আমার বিশ্বাস করা না করার কী
আসে-যায় পল ? বলেই কেমন একরকম হেসে : ইতালি এ সময়ে
বড় সুন্দর। আইরিনকে-নিয়ে বাও না।

আইরিন বলে : 'আমি।' তোর মাথার কখন যে কী ভূত
চাপে—

নাতাশা ভীষণকণ্ঠে বলে : কত আর অভিনয় করবি আইরিন !
বলেই নিজেকে সামলে নিয়ে পল্লবের দিকে ফিরে : কিরক
করে ?

আইরিন বলে : হয়ত না ফিরতেও পারে।

না ফিরতেও পারে ? সে কি।

আইরিন বলে : সে কি—মানে ?

নাতাশা বলে : তাও কি খুলে বলতে হবে না কি ?

আইরিন লাল হ'য়ে উঠে বলে : বলা না বলা তোমার ইচ্ছা—
কেবল ওকে জেরা করা কেন ?

নাতাশার মুখও রাঙা হ'য়ে ওঠে : জেরা আবার কি ? আমার
বোনের সঙ্গে তার শোবার ঘরে এসে যে গলাগলি করে—তাকে
জিজ্ঞাসা করার আমার অধিকার আছে।

আইরিনের মুখও লাল হ'য়ে ওঠে : না, কোনো অধিকার
নেই—দাঁদি কি বোনের অভিভাবক নয় ?

নাতাশা একধার জবাব মূলতুবি রেখে পল্লবকে বলে সরোবে :
ওর কথা আমি খরি না। কিন্তু তোমাকে একটা প্রশ্ন আমার
করবার আছে।

আইরিন বাধা দিয়ে বলে : না, কোনো প্রশ্ন নয়। ব'লেই
ফিরে : পল, তুমি বাও, পাসপোর্ট আফিস—

নাতাশা বাধা দেয় : না, আমার কথাব উত্তর দিয়ে তবে
যাবে। ব'লেই পল্লবকে : শোনো পল, এদেশেও কুমারীর

শোবার ঘরে বেসে আসে না। তুমি যদি ওকে ডেডেই বাবে তবে
কি জিজ্ঞাসা। ফিরে—এতদিন ওকে নিয়ে শুধু খেলাচ্ছিলে ?

দাঁদি ! আর বা করে করো—ওধু আমার মাথা হেঁট কোরো না।

মাথা হেঁট—এর পরেও ? যে-মেরের এতটুকুও আত্মসম্মান বোধ
আছে—

আইরিন বীকা হেসে বলে : আত্মসম্মানের কথা তোমার মতন
মেরের মুখেই মানার বটে—বে—ব'লেই নিজেকে সামলে পল্লবের
দিকে ফিরে : তুমি আর দেরি করলে পাসপোর্ট পাবে না পল।
বাও এফুণি।

পল্লব বলে : বাচ্ছি। ব'লে টুপি উঠিয়ে নিয়ে নাতাশার
দিয়ে ফিরে : বাবার আগে কেবল একটা কথা ব'লে বাই নাতাশা।
আমি আইরিনকে নিয়ে খেলাই নি। রোম থেকে ফিরেই
আইরিনকে নিয়ে দেশে ফিরব—কিছীহ এখানেই হবে কিছা সেখানে
—ওর বা ইচ্ছা।

নাতাশার মুখ চা-খড়ির মতন শাদা দেখায়, আইরিনের দিকে
ফিরে বলে : সত্যি কথা ?

সত্যি হোক, মিথ্যা হোক—তোমার কী তনি ? ব'লেই
পল্লবকে : বাও তুমি—আর পারো তো ওকে কমা করো—ও
বড় ছুঃখ পেয়েছে। হ্যা, পাসপোর্ট নেওয়া হ'লে আজ এখানেই
খেয়ে—আমার ঘরে, কেমন ?

পল্লব বেরিয়ে যায়। নাতাশা ছ'হাতে মুখ ঢাকে। [ক্রমশঃ।

অভিসারিকা

শ্রীঅনিল চক্রবর্তী

রাত্রির নিত্য অভিসার
বনানীর বৃকে শান্ত আশার,
অরণ্যে অরণ্যে আর পাহাড়ের অবূর নীড়ে
শুধু ভর পায় জন-অরণ্যের ভীড়ে ভীড়ে।

তাই—

রাত্রি নামে না হেথা অভিসারিকা
ওপারেই থাকে শুধু আলোক-পরিধা।
বিজলীর খির-খির আলো
সারি সারি বলে যেন 'এই ভালো।'
মৃতের নিস্তাভ অঁাধি
জীবনের দের কাঁকি।

তবুও পরিধার ওপারে নিত্যই আসা চাই
যদিও হেথায় অভিসারিকার প্রবেশ নাই।
এ কথার কানাকানি আকাশে বাতাসে
মরুতে-মরুতে-নতে হতালে হতালে।

চন্দ্রা তার নাম

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

৬

এ বেন দুজনে মিলে বাণুব্বর বঁধা। কত কণ্ঠহারী এর আয়ু, সে হিসেব কে করে? সে হিসেব চন্দ্রা আর চন্দনের মনে নেই।

ঘরের ছেলে ঘরে বুকিয়ে দিয়ে ফিরে গিয়েছে চন্দন। বড় হুংখে স্বীকার করে গিয়েছে প্রতাপের কাছে, যে—না, আমি বুঢ়া হয়ে গিয়েছি। আমার বা শেখাবার শিখিয়েছি তোমার ছেলেকে। ভাল ভাল সাহেবের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছি। সেলাম লাগাতে আর শালুট বাজাতে শিখিয়েছি—পারেড কাওরাজের কারদাটা যদি ভাল করে রপ্ত করতে তাহলে রংকট থেকে রেগুলার সিপাহী হতো এই হতভাগা। কিছু বাড় বঁকা, বুনো ঘোড়ার সামিল। ডিল হাবিলদার সব রংকটকে দাবড়াচ্ছে, তা ওর সহ হলো না। বেগে কুঁসে বেরিয়ে এসো। আমি থেকে গিয়েছি প্রতাপ।

বাণের কথা শুনে প্রতাপ মনে মনে ভাবে, ছেলেকে এই স্বভাব দিয়েছে তুমি। আমার সঙ্গে ওর মিলটা কোনখানে?

ঝুঞ্জে বলে—তুমি আর কাজ করো না পিতাজী! তুমিও ছুটি করিয়ে চলে এসো!

চন্দন পাগড়ী-পর্য মাথা নাড়ে। এ বড় হুংখের কথা! তবু স্বীকার করতেই হয় যে বাপ আর ছেলের মিল কোনখানেও নেই। ছেলে বোঝে কিছু টাকা জমিয়ে নিয়ে ঘরে বসে ঘি-মিঠাই খাও, মাংসা করে। পুজো-খ্যান করে! সে জীবনের কথা ভাবলে গায়ে ঘর আসে চন্দনের। তার শরীর আজও শক্ত। দেখে আলগা চর্বি এতটুকু নেই। কাজ ছাড়া কিছু বোঝে না চন্দন। কৌজীজীবনটা তার সঙ্গে বেইমানী করেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে তার স্বভাবটা-ও তো দিয়েছে বদলিয়ে। তার মধ্যে ঢেলে দিয়েছে ছটকটানি, অস্থিরতা। ডিল পারেড আর উদ্দি জনলে লাফিয়ে উঠে ঘুমচোখে পারে পিঁটি বেঁধে তৈরী হয়ে বাওরা। নিজেকে কাজের মানুষ করে তৈরী করা আর সর্বদা হুই গোড়ালি মাটিতে বিঁধে নিম্পলক কাজের পুতুল হয়ে পাড়িয়ে থাকা। কোন উন্নতি হলো না। প্রবেদার ছেড়ে হাবিলদার হয়েও উঠতে পারলো না চন্দন। বেইমানী ক'রে তাকে কিরিয়ে দিলো কেতী আর মাটিতে। তাই বলছি যে কিষণ বনে বাবে চন্দন, তাই বা কেমন ক'রে হয়? চন্দন তা পায়বে না।

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥

চন্দন চলে বাবে নিশ্চিত জেনে প্রতাপ সসারী লোকের মতো বাণের কাছে হিসাব দাখিল করতে বসলো।

—চাচাজীর দরুণ যে জমিটা ছিলো ভাতে এ বছর অড়হর আর বুট দিলাম। বিয়ুগ হুঁখানা লাড়ল দিলো। বলল আমার। গেঁহ এবার ভাল পাব না ব'লে মনে হয়। মতুন জমি এ বছর পড়ে থাকবে? তাই মনে করছি ভুটা দিয়ে দেব কিছু—

চন্দন এ সব সসারী কথা শোনে না। হঠাৎ বলে—একটা স্ত্রীর মেয়ে দেখ।

—কি বললেন?

প্রতাপের দিকে চেয়ে হঠাৎ চন্দন কুঞ্জে উঠে। বলে—চোখ নেই? দেখতে পাও না? স্ত্রীর মেয়ে নিয়ে এসো বৌ ক'রে। ও ছেলেকে ঘরে রাখতে পারবে না!

চন্দন ছেলের বিখিত মুখের দিকে চায় না। বলে—ছুটি ফুরিয়ে গেল, আমি চলে বাছি। ছেলেকে এবার পাঠিয়ে দিতে দেবী করো না। তিয়ার নম্বর নেটিভ ইন্সপেক্টর কানপুরে রয়েছে। হইলার সাহেবের রেজিমেন্ট বাবুকে আমার ভাতার সাহেব জানেন। ঘ'রে ক'রে যে ক'রে হোক, আমি ঠিক ভর্তি করে দেব। জোরান ঘোড়া, জওয়ারানীর মস্তিতে বিগড়ে যেতে কতক্ষণ? তোমার ছেলের গরম বেশী, এই পারেড হাবিলদারের ছপটি না খেলে ও ঠিক থাকবে না।

চন্দন চলে গিয়েছে, আর স্বামীর জন্তে অপেক্ষা না ক'রে দুর্গা দাই লাগিয়েছে মেয়ে খোঁজবার জন্তে। দাই পান-তামাক আর গুড়ের নাগরী বেঁধে নিয়ে ভরসা দিয়ে গিয়েছে বর্ষাটা কাটলেই সে এমন একটি মেয়ে এনে দেবে, যার 'বদন উজ্জালা, নৈন বিশালা, চম্পক বরণী গোরী।' এক বৌ ঘর আলো করবে।

সেই ভরসায় বুক বেঁধে রয়েছে দুর্গা। একটি স্ত্রীর মুখের মায়ী দিয়ে ছেলেকে বাঁধতেই হবে। নইলে শান্তি নেই তার। এবার ছেলের মনও কিরেছে কাজে, চাবে বাসে। কেতী দেখাশোনা করতে সে নিত্য বার আর সাঁক কাটিয়ে ফেরে।

প্রথম বোঁবন। বড় স্রুখ ভালোবেসে। শৈশবের দুই সানী মাঝে কবে জোড়ী ভেঙে গিয়েছিলো। মনে মনে চন্দ্রা ভাবে, ভালই হয়েছিলো। নইলে বুকি এত ভালোবাসা যেত না।

নবীন প্রেম। নিষাপ ও পরিশুদ্ধ ভালোবাসা। চোখে চোখে চেয়ে কত সময় কেটে যায়। চেয়ে থাকতে থাকতে চন্দন কেমন বেন হারিয়ে যায়। টান-টান বাঁধা চুল, বাঁহা-দাবণো

ভরপুর এক কিবাণ-ঘরের গরীব মেয়ের এত ঐর্ষ্য? বসেছে
বয়াল গাড়ীর ছই-এ হেলান দিয়ে। জলে-ভেজা সবুজ ক্ষেতের
পটভূমিকার এই কালো ওড়নী আর লাল আঙ্গিরার সঙ্গে চম্পাকে
মনে হচ্ছে যেন কোন গল্পকথার মেয়ে। কোনো রাজকন্যাই বা
হবে। নইলে চম্পনের প্রেমে এমন ঐর্ষ্যময়ী সে হলো কেমন করে?
এমন সুন্দর! ভদ্রীটি চম্পার যেন এই সবুজ ক্ষেতী, নীল আকাশ
আর পূবালী বাতাসে ঝাওয়া ছুনিয়াটুকু সে কিনে নিয়েছে।
গমের শীষ ভেঙে সে ছলনা ভরে টোকা দেয় চম্পার গালে। বলে,
—এত অহঙ্কার কিসের? যেন মালকিন সাহেবা তুই!

—নিশ্চয়।

চম্পা একটু হাসে। বলে হাত ছড়িয়ে, সবটুকু দেখিয়ে—
এই সব কিছু আমার, জানো?

—আমাকে দাও কিছু। হাত পাতে চন্দন। সহজাত নীলা-
বিন্দ্রে রাধিকা হয়ে ওঠে চম্পা। চোখ টান করে বলে—চাও?
এই নাও দিলাম।

—কি দিলে?

—এই, বা ছিলো আমার।

—সব দিয়ে দিলে?

—নিশ্চয়। ভয় পাই না কি? আমার কি ফুরিয়ে গেল তাঁড়ার?

মেঘ যখন ঘনঘোর হয়ে বেঁপে আসে, হ-হ বাতাসে সূচনা করে
চুর্চোগ। তখন চম্পা আর চন্দন নির্ভয়ে চলে যায় গ্রাম ছাড়িয়ে।
নির্জন অরণ্যের সীমান্তে। এখানে গাঁয়ের মানুষ কোন দিনও আসে
না। বহু অপবাদ আছে এই মাঠটুকুর নামে।

কিছু সে ভয়ের কথা এদের মনে থাকে না। আকাশে বিদ্যুৎ
ঝিলিক দেয়। বাজ গর্জে ওঠে। চম্পা আর চন্দনের গলার গান
ভেসে যায় বাতাসে। হুজনে হাত ধরাধরি করে ছুটে চলে। চম্পার
চেরে চন্দনের গলার গান অনেক বেশী খোলে।

‘বিছড়ী জোড়ী মিল বাতি নৈয়া’,—এই গানটি সে আহরণ করে
এনেছে। এই গানটি বার বার শুনেও তৃপ্তি হয় না চম্পার। চন্দনও
গলা ছেড়ে গায়। মুখে বৃষ্টির ঝাপটা নিতে নিতে চম্পা খুসীতে হাসে।

আবার কখনো কোনো আবেগময় ব্রহ্মহর বা সন্ধ্যা। কথা
নেই মুখে। হুট-একটি কথা, তাও যেন সুরে বাঁধা মিঠি মিঠি বোল।
হুজনে হুজনে দেখা আর অবাক হয়ে বাওয়া। ভালবাসার
প্রতিশ্রুতি—তুলব না, কোন দিন তুলব না। যখন বেখানে থাকি,
বহুদূরে থাকি।

—চম্পা, কোন দিন নয়।

তবু যেন বিশ্বাস হয় না। আবার কণিক বিরতি বাদে ভীক
প্রশ্ন—যদি আর দেখা না হয়?

—চম্পা, তবুও নয়।

এবার গভীর সূত্রে নিজেকে এলিয়ে দেওয়া চলে গাঁওঘর গায়ে।
চন্দন বলে—এত দেশে পেলাম, এত মানুষ দেখলাম, এত রকম জীবন
কাটালাম, তুলতে পারলাম কই চম্পা? তুমি আমার মনে ছিলে।

—তবে কেন চলে গিয়েছিলে?

এ কথাই জবাব নেই। চন্দনের বড় কাছে চম্পা। এবার চম্পার
মস্তকের মণিকোঠার যে কথা মাথা কুটে মরেছে দিবা রাত্রি, তাই-ই
জর ভয়ে উচ্চারণ করে—আমাকে ওরা নিয়ে বাবে, জানো?

—কে বলছে?

—আমি জানি।

চন্দন হাসে। বলে—কেন? তোমার সঙ্গে মিশলে আমার
জীবনে দুঃখ আসবে? কেন এসব কথা বিশ্বাস করে চম্পা! আমি
বিশ্বাস করি না। দেখো, আমি এবার কাজ করতে চলে যাব।
আর তারপরে তোমাকে ঠিক নিয়ে যাব।

—কোথায়?

অবুঝ এক বালকের সঙ্গে যেন খেলা করছে চম্পা। চন্দনের
গলার কিছু কোঁতুক নেই। চন্দন বলে—কত জায়গা আছে।
ছুনিয়াটা কি ছোট?

তা হয় না। ছুনিয়া যত বড়ই হোক না কেন, এক ছুনিয়ার
চম্পা আর চন্দনের ঠাঁই কোন দিনও হবে না। কিন্তু সে কথা বলে
এই যশু মুহূর্ত নষ্ট করে কে? চম্পা তা করবে না। কেন করবে?
জীবনে সে কি ভালবাসা আর দয়্য এমনই অগ্নি ভায়ে পেয়েছে?
যে ভবিষ্যতের কথা তুলে এই সময়গুলোকে সে আশঙ্কায় ভরাতুর
করবে? চন্দন বতই ভবিষ্যতের কথা বলে আর স্তম্ভবনের ছবি
আঁকে, চম্পা ভতই বর্তমানের মুহূর্তগুলোকে বুটো করে ধরতে
চায়। চন্দন বলে—ছুনিয়াটা তো এই সেন্সারনীর ধারে ছোট
ডেরাপুর গাঁথানার মধ্যে কয়েকী নয়? অনেক দেশ আছে। তুমি
আর আমি সেখানেই চলে যাব চম্পা!

—তা হয় না।

—কেন?

—না।

আসলে অতখানি সূত্রে স্বপ্ন দেখতে ভয় পায় চম্পা। অত বড়
কথা ভেবে কি হবে? তা হ'লেই তো তার হুঁচুগা কোন দিক থেকে
কথা তুলে ফুঁসে উঠবে আর জন্ম করবে চন্দনকে। অথচ সে কথা
বললেই চন্দন হা-হা করে হাসবে। এই রকম মানুষ চন্দন। সে
ভাবে, সবগুলো কালো মেঘই বুঝি ঐ হাসির হাওয়ার উড়িয়ে দেওয়া
চলে।

সংসাহসের দিন। বেপারোয়া জোয়ারের ঢেউ বুকে নিয়ে
উতাল হ্রদর। কে জানে আজকের সন্ধ্যা কালই মিথো হয়ে যাবে
কি না নদীবের খামখেয়ালে। তাই আজ, এই মুহূর্তটাই সন্ধ্যা। চন্দন
কলে—বহুলাবাদে বলনের মেলায় যাবে চম্পা? শোন, তুমি
যেও ঐ বুড়ী কৌশল্যাদের সঙ্গে। আমিও যাব। ঠিক খুঁজে নেব।

—ইস, গাঁ-ভেদে মানুষ যাবে না?

—গেলেই কি। আমি পারোয়া করি? তুমি দলছুট হয়ে
যেতে পারো না!

মেলা, লোকজন, বাজনা, বাতি, কাচের চুড়ি হাত ভরে
পরবার লোভ, সবগুলো একসঙ্গে মনে করে চম্পার চোখ ছোটো
তৃষ্ণার্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু চম্পা কণিক ভাবে। বলে—তার চেয়ে
সেদিন আমি তুমি নৌকা নিয়ে ওপারে যাবো, কেমন? কেউ
থাকবে না গাঁয়ে। বেশ ভালো হবে।

ফলনের রাত। এমন রাতের আকাশ ভরে তারা থাকতে
পারতো। তারা নেই। মেঘলা আকাশ। টিপটিপ বৃষ্টি।
তবু চম্পার মনের খুঁতুতে এ আকাশকেও পূরম সূক্ষ্ম মনে হয়।
বাতাসকে মনে হয় স্পর্শে মধির। মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে কাঁদে

হয়ে চেয়ে থাকে চম্পা। এমন রাতে তার চোখে ঘুম আসবে না। আজকের দিনটা তার মন এখনো ভরে রেখেছে।

আজ তার হুজুনে চলে গিয়েছিলো বনে। ভয় হারিয়ে বনের নিগূঢ় অন্ধরে পৌঁছে, সবুজ ঘাসের ওপর বসেছিলো। শ্রাম ও রাবার কুলনের দিনে তাদের মনও যেতেছিলো, দুঃস্বপ্নে তালে তালে। চন্দনের বৃক লীন হয়ে ভালবাসার প্রতিটি কথা নিজের বৃক ভরে শুনেছে চম্পা। অস্থির হয়ে অশান্ত হয়ে চন্দন বলেছে—মনে হয়, তুমি যেন আমার ভেতরে আছ। চাইলেও যেন উপড়ে ফেলতে পারি না তোমাকে, তোমাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারি না চম্পা!

সে হুঁতগিনী। তার নিঃশ্বাসে বিষ। তার স্পর্শে মৃত্যু। তবু আজকের দিনে চম্পা সে কথা বলতে পারেনি। বলেছে—তুমি বাবে তোমার পথে। আমি আমার ভাগা নিয়ে থাকবো। তার চেয়ে বেশী আমি চাইতে পারি না। ভয় পাই।

—ভয় পাও, চম্পা? ভয় পেও না।

—কিন্তু চন্দন...

—দেখো। এইদিন ওদিন নয়। আমি একদিন তোমাকে এই সব কিছু থেকে উপড়ে টেনে নিয়ে চलो বাবো।

—তোমার বাবা, মা...

—কিসের কে চম্পা? আমি তো একবারই বাঁচবো। এই জীবনই যদি বুঝা চলে গেল—

—বেশ। বলে গভীর হয়েছিল চম্পা। হুজুনেই গভীর হয়ে গিয়েছে। তার পর সময় চলে যায় দেখে নৌকো নিয়ে ফিরে এসেছে।

চম্পা ভাবে, ভাগ্যলক্ষ্য তো ভাল করেই ভাসবে। ডুবলেও আজসোব করবো না।

* * * *

‘আ কো পিরা চাহে ওহি সুসাগন’—প্রিয় বাকে কামনা করেছে সেই রমণীট সৌভাগ্যবতী—সেই প্রেয়সী। চম্পার যৌবন যেন অনাদরে মলিন ছিলো। সহসা একজননের প্রেমে সে যৌবন সুসুলিত হলো। চম্পার সেই বস্ত্র অনমনীয়তা ঢাকা পড়লো লাংঘ ও সুরমায়। এখন তার চলনে রাজহংসীর গরিমা। চোখে অভল রহস্ত। কাজল বিনাই সে চোখ কালো। প্রসাধনের উপকরণ নেই। তবু গরীব কিশাঙ্গী-মেয়ের মায়ুলী পোশাকেই তাকে মানার ভালো। যে গৌরবর্ণ রঙের এত বদর সে-ও যেন চম্পার উজ্জল শ্রাম মুখখানির কাছে হার মেনে যায়। চন্দন বলে, ‘লায়লী কো মজহুঁকে আঁখোসে দেখনা চাহিয়ে।’ বারা তোমার মধ্যে রূপ দেখে না চম্পা, আমার চোখ দিয়ে তাদের দেখতে বলি।

না। একেই গায়ের মানুষের মুখকে ভয় করে চম্পা। কথা ছড়ালে বড় ঝালা।

তবু কথা উঠলো। প্রথমে মুখে মুখে চুপে চুপে। তারপর ছড়িয়ে পড়লো কথা। মানুষের আগে দেখলো চন্দনকে। প্রতাপের জোয়ান ছেলে, যে নাকি এত দেশ-বিদেশ ঘুরে লায়ক হয়ে ফিরে, সে কেন এই গায়ের মধ্যে এমন আটকে রইলো, কোন আকর্ষণে পড়ে, তাবতে স্তব্ধ করলো হুঁ-একজন। বুড়োরা অবিভি প্রতাপের উঠানে চওড়া হাতে চন্দনের পিঠ চাপড়ে তারিক করলো যে হা,

বেটার মতো বেটা। এমনধারা ছেলেই চাই। যে এত সাহেব দেখেও, এত দেশ-বিদেশ ঘুরে, তবুও নিজের শিখাবৎ-সহবৎ ভোলেনি। নিজে জোয়ান, তবু পাঁকাচুলকে প্রাণ্য সম্মান দিতে জানে। তারা বলে সেল—হী প্রতাপ এই ছেলের হাতের আঙুল পোলে বাপ-দাদার মনটা শান্তি পায় বটে পরকালে। এবার ছেলের বিয়ে দাও।

ছেলের প্রসাধার জবাবে অন্ধর থেকে কাঠকয়লার আগ্রাটি, আগ্রার মশহুর তামাক আর ছিলিম এলো। কিন্তু সকলে তো বিজ্ঞানত হয়নি। তারা দেখলো চন্দনের চাল-চলন। আর দেখলো চম্পাকে। দেখলো যে মেয়েটা আছে কি না আছে বোঝা যেত না এত দিন, সেই মেয়েই সহসা খাপখোলা ছুরির মতো ব্লিক দিয়ে উঠেছে। কুলে কুলে ভরে উঠেছে যৌবন আর চলন্ত-ফিরতে লাগত যেন উছলে পড়ছে।

কানে কানে কথা উঠতে দেয়ী হলো না দুর্গার কানে।

চম্পাকে অনেক ভরসা দিয়ে চন্দন শুখন এলাহাবাদে গিয়েছে। চন্দনের পুরনো জিমায়েংদার বুড়ো মাকমোহন সাহেব এলাহাবাদে রয়েছেন। তার কাছ থেকে একখানা চিঠি নিয়ে চন্দন কাজের জন্তে আসবে কানপুর। সে চন্দনের নাতি। সেটাই একটা ছাড়পত্র বুড়োর কাছে। তা ছাড়া কাজ যদি পায়, তো সে ডাক্তার সাহেবের মুন্সী হবে। রংকট হয়ে রেজিমেন্টে চুকতে সে চায় না। এমন কি, রেজিমেন্টের মুন্সী হতে-ও তার আপত্তি নেই। তারপর চম্পাকে বিয়ে করে সে শহরে যব বাঁধবে। চম্পা তত দিনে নিশ্চয় ঘুরে আসবে লালার মায়ের সঙ্গে। বাচ্ছ তো দুই-তিন মাসের জন্তে।

চম্পা সেই আশায় বসে রয়েছে। নসীব তাকে শুধুই ঠোঁকর লাগাচ্ছে। এবার সে-ও নসীবকে দেখিয়ে দেবে।

তীর্থে বাবার সব ঠিকঠাক। লালার বৈজ্ঞান্যের দোরে বহাল-পাড়ী তৈরী। লোকজন জোগাড় হয়েছে। গাঁয়ে এমন ঘর নেই, যে ঘর থেকে দুই-একজন মানুষ জোগাড় না হয়েছে। ব্রহ্মবর্ষে স্নান-দান করে তীর্থ স্নান। পুঙ্কে স্নান। আবার উত্তরে হরিদ্বার স্নানকেশ। তীর্থযাত্রার পাথের সঙ্কর করে সকলেই এনে দিয়েছে লালার মার কাছে। সব টাকা নিয়ে পেটকাপড়ে বেঁধে রেখেছে বুড়ী। পথের জন্ত কিছু বসদ নেওয়া হয়েছে। কয়দিন ধরে বাওয়া-আসা কলহ কলরব আর হীকডাকে সবগরম রয়েছে মহল্লা।

বাব বলে চম্পাও তৈরী। এমন সময় দুর্গা এলো বিদ্যুৎ ও বজ্রবাহী মেঘের মতো ধমধমে মুখ করে। চম্পার ওপরে ফেট পড়লো। তীব্র আর বিবাক্ত কথাগুলির দ্বারা প্রথমটা কালো হয়ে গেল চম্পা। কিন্তু সে তার মায়ের মতো সহনশীল নয়। দুর্গা যখন বললো—সর্বনাশী, এবার নিঃশ্বাসের বিধে আমার ছেলেটার অনিষ্ট করবি-ভেবেছিল?

চম্পা প্রথম আঘাতের ঝাঁক সামলে নিলো। তারপর জবাব দিলো—কমতা থাকে তো ছেলেকে কয়েদ করে রাখো। আমার ওপর হামলা করবার তোমার এজিয়ার কোথায়?

দুর্গা আশা করেনি চম্পা তার কথার জবাব দেবে। তাতেই সে আত্মা চাইলো। একে সে স্বভাব-কলহশ্রীর। তাতে সে আত্মরিক ক্রুদ্ধ হয়েছে। দুর্গার গলা এবার খুলে গেল—এই যে

তুই বাজিস আর যেন গাঁয়ে মুখ দেখাতে না হয়। হতভাগী, তুই বাজারে যা। রমজানী হ'। শহরের মানুষের কাছে রূপবোবনের বেসাতী করগে যা! গাঁয়ের মশজনে কে লালাবি কেন?

কথা শুনে শুনে চম্পার মুখ-চোখে লজ্জার অপমানে রক্ত কেটে পড়তে লাগলো। দুর্গা বেতে বেতে কিরে বিষ ঢেলে দিয়ে গেল—চিরদিনের মতো যা।

মনের বিষ ঢেলে দিয়ে দুর্গা কোনো শাস্তি পেলো কি না তা চম্পা জানে না। তবে তাকে সর্বনাশী বিষকণ্ঠা ব'লেই জানে দুর্গা। সেই যদি একবার কিরে এসে দেখতো তাকে তবে নিশ্চয় সে ভ্রান্ত ধারণা পরিহার করতো দুর্গা। যে মেয়ের মনে গরল, নিঃশাসে মুত্থা ও হুর্ভাগ্য, সে সামান্য কয়টা কথাই শোনেই এমন ক'রে লুটিয়ে থাকে মাটিতে? নিঃশাস খেমে শরীর তার এমন হিম হয়ে যায়? চোখের জল কঁটা কঁটা গড়িয়ে পড়ে মাটিতে? এ কেমন বাৎসল্য দুর্গার, যে বাৎসল্য তাকে নিষ্ঠুর ও স্বার্থীক করেছে? এ কেমন মা, যার মন আর এক হুর্ভাগিনীর হৃদয়ে কঁাদে না? দুর্গা জানলো না সেই দিন সে অজান্তে চম্পাকে ঠেলে দিলো ভবিষ্যতের হাতে। চম্পা আর চম্পার রইলো না। দুনিবার কোনো আকর্ষণে চম্পার চারি পাশ থেকে গণ্ডী গেল ভেঙে। আর ভবিষ্যতের সুদূর প্রান্তে চম্পার সঙ্গে সঙ্গে দুর্গারও স্বপ্ন-স্বপ্ন এক গ্রন্থিতে বাঁধা হয়ে রইলো।

আজ অবশ্য চম্পা-ও তা জানলো না। ভবিষ্যৎ নয়, বর্তমান

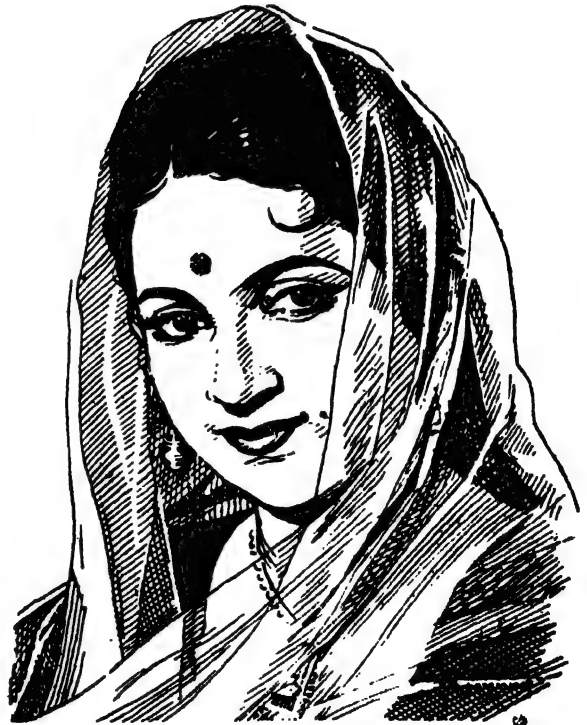
ছাপিয়ে আর কোন কিছু দেখতে পেলো না চম্পা। সত্যিই তো, সে তো হুর্ভাগিনী-ই। মনে পড়লো ছোটবেলা থেকে কেমন ক'রে হুর্ভাগ্যের বাহুছায়াতে সে বড় হয়েছে। মনে পড়লো তার জন্মের সূচনাত্তে-ই তার পরিবারে নেমেছিলো অভিশাপ। মনে পড়লো তার সঙ্গে বিবাহের কথাতে-ই কেমন ক'রে অনেক কথা উঠেছিলো। মনে হলো সত্যিই তো, কোন মা কামনা করে যে তার ছেলের সর্বনাশ হোক? যদি চন্দনেরও কোন বিপদ হয়? চম্পার বিজ্ঞান ও উদ্ভেজিত মাথার মনে হলো, এত দিন যবে সে স্বাধীন হয়ে নিজের বকিত জীবনটার কথাই ভেবেছে। তাই চন্দনকে সে নিজের জীবনে টানতে চেয়েছে।

চম্পার মনে হলো, যদি কপালে থাকে সে রমজানী হবে। অথবা যা হয় হবে তার। কিন্তু চন্দনকে তার মধ্যে টানবে কেন? এই কি ভালবাসা? তার চেয়ে চম্পা চলে থাক লালার মা-র সঙ্গে। এত তীর্থ, এত দেবস্থান, সেখানে এত মানুষ রয়েছে—তার একলা জীবনের একখানা কিস্তি কি কোন ষাট্টেই বাঁধতে পারবে না? তা কখনো হয়? চম্পা মনে মনে সংকল্প করলো, আর কখনো ফিরবে না সে। মা-কে ছেড়ে যেতে কষ্ট হবে; বড় হৃদয়ে হাসি পেলো তার। ক্ষীণ চাঁদখানির মতো হাসি ঠোটে লেগে রইলো। চম্পা ভাবলো, আমাকে নিয়েই মা-র বক্ত ভাবনা ছিলো। আমি না থাকলে মা-ও দায়বদ্ধ হতে পারবে।

আর কিসে কষ্ট হবে? চম্পা তার মনখানি নিয়ে সব ছুঁয়ে

অমিত লাবণ্য আপনারই জন্য বোরোলীন

আপনার লাবণ্যময় প্রকাশেই আপনার সৌন্দর্য্য। কিন্তু রোদ আর শুষ্ক হাওয়া প্রতিদিন আপনার সে মাধুরী ঘান করে দিচ্ছে। শুষ্কশূণ্যযুক্ত সুরভিত বোরোলীন এই করুণ অবস্থার হাত থেকে আপনাকে রক্ষা করবে। এর সক্রিয় উপাদানগুলি আপনার ত্বকের গভীরে প্রবেশ করে শুকিয়ে যাওয়া স্নেহজাতীয় পদার্থ ফিরিয়ে এনে আপনার ত্বকে মখমলের মত কোমল ও মসৃণ করে সজীব ও তারুণ্যের দীপ্তিতে উজ্জ্বল ক'রে তুলবে। আবশ্য-লাগা সুরভিযুক্ত বোরোলীন ক্রীম মেখে আপনার ত্বকের সৌন্দর্য্য রক্ষা করুন আর নিজেকে রূপোজ্জ্বল করে তুলুন।



পরিবেশক : জি, দত্ত এণ্ড কোং, ১৬, বনফিল্ড লেন, কলিকাতা-১

ছুঁয়ে দেখলো, অনেক দিন ধরে চন্দনের দ্বিভিজ্জিত মাঠ, বন, বটগাছ আর নদী—এ সব জায়গায় মনটা শিকড় বেঁধেছে বটে। তবে সে বাঁধন উপড়ে ফেলতে হবে। সে না থাকলেও এই সবই থাকবে। এমনি স্থানই থাকবে।

আর কে বইলো? চন্দন? হ্যাঁ। তার কষ্ট হবে বটে প্রথমে। কিন্তু তার পরে সে-ও ভুলে যাবে। পালকিতে বৌ বসিয়ে নিজে বোড়া চড়ে পাশে পাশে আসবে। দুর্গার হাতে বৌ ভুলে দিতে দিতে হয়তো তার একবার-ও মনে হবে না, এই মা যদি মাঝখানে না থাকতো তবে আজ চন্দ্রা থাকতো তার পাশে। রাতে বৌয়ের মুখ থেকে ওড়নী সরিয়ে মুখখানা দেখে হয়তো চন্দন বলবে—‘জা কো পিরা চাহে ও-হি মুহাগণ।’ তখন চন্দনের এমন কথা একবার-ও মনে হবে না, এই কথা সে আর একজনকে আর একদিন বলেছিলো। চন্দ্রা কোথাও থাকবে না! না এ গাঁয়ে। না চন্দনের মনে।

সেই নিঃশেষ বিশ্বস্তির কথা মনে করতে বুঝখানা ভেঙে গেল চন্দ্রার। তা যদি সত্যি হয়, তবে? তবে চন্দ্রা সেদিনই মরবে। তারপর আর বেঁচে থাকবার কোন মানে হয়? চন্দন যদি চন্দ্রাকে অমন করে-ই ভোলে, তাহলে চন্দ্রা তার সমাধিতে কোন সামান্য সৌধ-ও চাইবে না। সে সমাধিতে কোন রক্তগোলাপ ও বুলবুল পরম্পরের প্রেমে আকুল হয়ে সৌরভ ও সঙ্গীত বিতরণ করবার ব্যবস্থা নেই। তেমন সমাধিতে কাঁটাগাছই ভালো।

আকাশ-পাতাল ভাবে চন্দ্রা। তারপর শিদিম ঘেলে হাত-আয়নাখানা ধরে। নিজেকেই দেখে। এই কপালে হুঁত্যাগের লিখন? কোথায় কোন আখরে লেখা?

চোখে ত পড়ে না। চোখে পড়ে একখানা অশ্রুলাঙ্ঘিত অপরাধ মুখ। ‘আয়নাখানা ত’ মিথ্যে কথা বলছে না। স্থানীয় মুখখানি এখন বেদনা-মলিন, চোখের ছুটি আহত। এই মুখ আরো স্থানীয় হতে পারে, যদি একজন পাশে থাকে। সে নেই বলে-ই তো জোর পাচ্ছে না চন্দ্রা। সে নেই বলেই তো অসম্ভব সংকল্পে বুক বেঁধে চন্দ্রা নদীবের কালোদরিয়ার ঝাঁপ দিতে চলেছে।

তাকে-ও থিতোর দিলো চন্দ্রা। স্থানের ঘর বাঁধবে বলে কোথায় গেল চন্দন—এদিকে যে বাঁধা ঘর জেঙে গেল, চন্দ্রার সাধ্য কি একা এই হ্রস্ব প্রতিকূল জোয়ার ঠেকায়?

চন্দ্রা এত দিনে ভাসলো।

আজমীর পর্বত আর পৌছয়নি চন্দ্রা। চন্দ্রাকে পশ ঘরে বাজি ফেলছে যে বাজিকর, তার খামখেয়ালীর নিশানা কে করবে? আজমীর পৌছবার আগেই সেই তীর্থবাজীর দলে ডাকাত পড়লো। অরক্ষিত পথ-বাট। রাজহানের মরুভূমি আর নির্জন বসতিবিরল বু-বু বিস্তৃতি ভারতের অস্ত্রাঙ্গ ঠাই-এর মতোই দস্যুর উপদ্রবে ভীতি-সঙ্কুল। তীর্থবাজীদের সঙ্গে লাঠি ছাড়া অস্ত্র ছিলো না। অলঙ্কার ও অর্থ ছিলো বিভিন্ন। অতর্কিত আক্রমণে বিপর্যস্ত দল ছত্রভঙ্গ হলো। কয়েকজন মাটি নিলো সেখানেই। চন্দ্রাকে দস্যুরা ধরে নিয়ে গেলো। মাঝপথে বোঝা মনে হওয়াতে চোট দিয়ে ফেলে রেখে গেল তাকে। উদ্ধার করলো কোম্পানীর জমিজমির

একটা দল। মেমসাহেব আর সাহেবের বন্ধে সুস্থ হলো চন্দ্রা কিন্তু গ্রামে আর সে কিরলো না। ক্যাপ্টেন ও মিসেস টর্কের সঙ্গে এলো কানপুর। সেখানে এক রিসালার বাবুর মাধ্যমে চিঠি লিখিয়ে খবর আনলো লালা বৈজনাথের বাড়ী থেকে। চন্দ্রা না কি ডাকাতদের দলের সঙ্গে চলে গিয়েছে। হয় মাস কোন খবর না পেয়ে এই সেদিন মনের দুঃখে মরেছে চন্দ্রার মা শোণ-অর বিমারীতে ভুগে ভুগে। সে বাড়ী সম্পর্কে আর কোন খবর জানাবার নেই।

খবর জেনে চন্দ্রা বেন বাঁচলো। বাঁধন কেটে নিশ্চিন্ত হলো। আর কিছু ভাববার নেই। রেজিমেট বাজারের কাছে ঘরভাড়া নিলো। ঠিক সাহেবের বিবির কাছ থেকে যে টাকা মিলেছিলো, খানিকটা তাই দিয়ে আর খানিকটা নিজের বাছুরী বৌবনের টানে সারেকীয়া জোটাতে। চোখে ঝিলিক মুখে হাসি। গানে সুর কমতি পড়ে বা নাচতে তাল কাটে—সে দোষ বৌবনের বিভ্রম দিয়ে পুরিয়ে দেয় চন্দ্রা। কটাক্ষের বাণ মুঠো-মুঠো ছুঁড়ে মারে। রাতারাতি ডাক পড়ে রেজিমেটে, রিসালার। মাসে দু’চারটে ডাক পেলেই চলে যায় চন্দ্রার।

কি বাজালী বাবুবা, কি ফৌজী দিল্লী অফিসাররা বা দু’চারজন কিরীজী গোরা, চন্দ্রার সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠ হ’তে সকলেরই সাধ যায়। কিন্তু কোমরে বিছুরা নিয়ে যোরে চন্দ্রা। কথা কইতে সে নারাজ নয়, তবে মাঝখানে থাকে ঐ ছুরিখানার আঁতুখ। বড় ধারালো মেয়ে—রটে যেতে দেয়ী হয় না।

এ এক জীবন! তেমন তেমন হয় তো বিটুর অবধি চলে যায় চন্দ্রা, তার সারেকীয়া নিয়ে। পেশোরা প্রাসাদে কখনো সখনো সেলে সোনার বালাটা, রূপোর তোড়াটা, মিনে-করা পান-ভাবরটা মেলে।

সকলে বলে চন্দ্রা বড় পরস্রা চিনেছে। চন্দ্রা ঘরে এসে হাসতে চায়। একদিন বলেছিলো না দুর্গা? যে রমজানী হবে চন্দ্রা, বাজারে নাচ দেখাবে?

তাই হয়েছে চন্দ্রা। এখন সে পুরোদস্তর বাজারের মেয়ে। কানপুরে থাকে না জানে কে? সতীচৌরার স্নান করে চন্দ্রা। শিবচতুর্দশীতে ব্রাহ্মণকে পানকলের মিলিপি জলপানি দেয়। সে কাক চেয়ে কম যায় না।

দুর্গার কথা মনে করে হাসতে চায় চন্দ্রা। কিন্তু ঘরে এসেই হাসিটা বেন কেমন করে নিবে যায় তার। জানালা দিয়ে চেয়ে গজা নয়, আর একটা নদী মনে পড়ে। আর একটা ঘব মনে পড়ে, একখানা মুখ মনে পড়ে। সেদিন আর ঘরে বাতি জ্বালে না চন্দ্রা।

কানপুরের বাজার-মাতানো রমজানী চন্দ্রার কেন যে সহসা ডেরাপুরে বাবার ইচ্ছে হলো।

গিয়েছিলো ক্যাপ্টেন ড্রাইটের বিবি ত্রিভুজলারী কাছ। এই একটা জায়গাতেই বার বার যায় চন্দ্রা। ত্রিভুজলারীকে ভালোবাসে বলে নয়। একটা কোঁতুল জন্মেছে তার মেয়েটার সম্পর্কে। আর সামান্য পরিচয়ের পর মনে একটা অবোধ্য করুণাও জেগেছে। ত্রিভুজলারী-কি জানে, যে চন্দ্রা তাকে মনে মনে করুণা করে? সম্ভবতঃ নয়। ত্রিভুজলারীকে কানপুরের সকলেই

চেনে, জানে। এই সাতার সালে কানপুরে রেজিমেন্টে ভারতীয় সিপাহীরা আছে অনেক। আর কোঁজ ও কোঁজী-জীবনের সঙ্গে বনিষ্ঠ এবং অন্তরঙ্গ বহু ভারতীয় রয়েছে। তারা ব্রিজহুলারীকে খেলা করে। খেলা করে ভালোবাসে না, বিশ্বাস করে না। কেন করে না, সে সব কথা চম্পা ভাসা-ভাসা শুনেছে। আর সব কথা উহু রেখে এই বলা চলে যে ব্রিজহুলারী যে-সাহেবের বিবি, সেই টাইটকে কেউ দেখতে পারে না। নিজের আচরণে টাইট সকলের দৃশ্য এবং অপাড়ন্তের। রক্তে বেশ খানিকটা ভারতীয় ভেজাল আছে বাপের দিক থেকে। তার বাপ, টাইট সিনিয়র হলো মাস্তাজ পোর্ট থেকে চালাই হাত-ফেরতা গোরা। গোরা বললে তুল বলা হবে। কোনো মাস্তাজী কনকাস্মা এবং কোন প্রমোদপ্রিয় গোয়ার বিচ্যুতির ফলে সিনিয়র পৃথিবীতে আসে। বাপের কাছ থেকে কর্কশ লালচে চামড়া আর মায়ের কৌকড়ানো কালো চুল নিয়ে। অরকানোজে বড় হয়ে রেজিমেন্টের ইংরেজ ক্লার্ক হয়ে জৌনপুর হলট-এ ম্যাকমোহনের বোনের সঙ্গে আলাপ। এমিলি মার্গারেট ম্যাকমোহনের সৌন্দর্য ছিল না। স্বভাবতঃ ভীক হওয়ার্তে টাইট সিনিয়র সহজেই প্রভাব বিস্তার করতে পারলো তার ওপরে, ভারতে কোঁজী-ইংরেজদের বিয়ে করবার উদ্দেশ্যে বিলেত থেকে যে সব মেয়েরা আসতো এমিলি তাদেরই একজন। তবে লক্কো-এ লা মাটিনিয়ার আর কলকাতার ম্যাডাম জেনীর খুলে সেলাই ও বাইবেল-টিচার হয়ে বয়সটা কেমন করে ছাঁকিশ থেকে ছত্রিশ হয়ে গেল। বিয়ে আর হলো না। শাদা লেসের কলারে বুকটা ঢাকা আর খাড়া কুজী কাঁধে 'He loveth best' লেখা ক্রচ আঁটা। তবু এমিলির বুকও যে পাখির সাধ-আহ্বাসের কামনা কিছু বেঁচে ছিলো, তার প্রমাণ হলো সহসা ভিত্তির আলবার্ট টাইটের সঙ্গে বিয়ে হওয়ার্তে। ডিকেন্স এবং লর্ড ইলিয়ট পড়া ক্যান্টনমেন্ট-সমাজ বিশ্বয়ে মুছাঁ গেল শ্বেলিং-সন্ট এবং নস্ত্রিহান ভঁকে। ম্যাকমোহনকে প্রচুর সমালোচনা শুনেতে হলো। অপমানে ম্যাকমোহনের খাড়া শিকারী গৌফ খুলে গেল বটে। তবে তা একান্ত সাময়িক। পরক্ষণেই বোনের জন্তে চিন্তিত না হয়ে পারলেন না তিনি।

এমিলিরও বলবার ছিলো। সবটাই কিছু প্রেম নয়। আর জৌনপুরে সে ছিলো একলা। টাইট ভূবে ছিলো খাং-দনার। এমিলি যে ভাইয়ের কাছ থেকে বেশ কিছু টাকা পাবেই, তা সে জানতো, এমিলির নীতিমূলক উপদেশ শুনেতে বৈধ ছিলো না তার। এমিলির জীবন সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতা ছিলো না। টাইট সিনিয়র তার সুযোগ নিলো নির্মম ভাবে। এমিলি পড়লো বিপদে। এক চূড়ান্ত অবস্থার বিয়ে হলো তাদের। আট মাসের বিবাহিত জীবনে অশুশোচনা করতে করতে এবং টাইটের খেচ্ছাচারী স্বভাবকে ঘৃণা করতে করতে টাইট জুনিয়রকে পৃথিবীতে এনে মারা গেল এমিলি।

সিনিয়রের আর বাই হোক, বাছাকে মাহুৎ করবার বৈধ ছিলো না। কিছুদিন দুখ-খাই আর তারপর লক্কো-এ মিসেস ব্রসের হোম। বাঁচবার কথা নয়। তবুও যে বাঁচলো টাইট, সে শুধুই জীবনীশক্তি জোরে।

এখন অবশ্য অনেকেই কটুক্তি করে রেপখো, বলে—ভগবান নয়, শয়তান ওকে বাঁচিয়েছে আমাদের আলাবে বলে।

সিনিয়রের কপালে এমিলির ভাইয়ের টাকা জুটলো না। বেশী দিন সং-জীবনের বিধি-নিষেধ মেনে চলতে পারলো না সে। রেজিমেন্টের ইউরোপীয় অফিসারদের রসদ সরবরাহের ভার নিয়ে করেক শো' টাকার পোলমালে পড়ে বরখাস্ত হলো সিনিয়র, উপযুক্ত কার্যকারণ না দেখিয়ে।

এমিলির ছেলে মিসেস ব্রসের ওখানে টাকা বিনে কটে থাকবে? সহ হলো না ম্যাকমোহনের। বোনের অন্ততগু হৃদয়ের চিঠিগুলো তাঁর কাছে জমা করা ছিলো। হাজার হলেও তাঁরই বোন! আর তাঁরই ভরসায় এসেছিলো ভারতে।

মিসেস ব্রসের হোমে এবার টাকা আসতে লাগলো ম্যাকমোহনের কাছ থেকে। কিছুকাল পরে। বছর ছয়েক হবে—সিনিয়রের মৃত্যু-সংবাদ এলো বখের বন্দর থেকে। জনশ্রুতি শোনবার দিকে ঝাঁক ছিলো না ম্যাকমোহনের। তবু সংবাদ কানে এলো। জানতে দেবী হলো না যে, হঠাৎ বড়লোক হবার সব চেষ্টা বিফল হলে পরে সিনিয়র ঘুরে ফিরে পোর্ট-এর জুয়াড়ী-আড্ডা এবং অজ্ঞাত চোরাই মাল পাচার ও বেচা-কেনার কাজে ডুবছিলো। ১৮২০ সাল। এ-দেশ ও-দেশের মনুষ্য-সমাজের আবর্জনা বোঝাই করে তুলে ভারত, চীন সিঙ্গাপুর—এই সব উপনিবেশের বন্দরে বন্দরে নামিয়ে দিয়ে বার জাহাজগুলো। পতু'গীজ, আর্মেনিয়ান, ইংরেজ, করাসী, ডাচ—ভিন্ন ভিন্ন দেশের মানুষ। স্বভাব-চরিত্র এবং জীবন-বাগানের রীতিনীতি কিছু একেবারে এক। জাহাজের উলকি-আঁকা খালাসী নাবিকদের সঙ্গে এদের দোস্তি। ভারতের কাঁচা মাল চলে যায়। বিলেত থেকে আসে সৌধিন স্ত্রগন্ধি, মদ, সিক, কাচের জিনিষ। ভারতবর্ষে থাকতে হচ্ছে, সে ত' কাজের খাতিরে—এং জাতীয়-কর্তব্য পালন করবার তাগিদে। তাই বলে এই বোগী, ভাতিক, সতীদাহ, সাপ ও বাঘের দেশে এসে তো জীবন-বাগনের মান নামিয়ে ফেলা চলে না। আর স্বদেশে বার যেমন অবস্থাই হোক না কেন—এখানে এসে সকলেই বিশ-পঁচিশ জন চাকর-দাসী আর বিশাল বাংলা-বাড়ীতে পাকাসাহেব। দেশের হাজারটা জিনিষ তাদের প্রয়োজন।

তাই ভারতের বন্দরে বন্দরে—বন্দে, মাস্তাজ, কলকাতার মাল-বোঝাই জাহাজ আসছে আর নামিয়ে দিচ্ছে মাল।

কাদার পা পুঁতে দাঁড়িয়ে কালো গা ভারতীয়-কুলী সেই মাল নামাচ্ছে গাঁঠি-গাঁঠি। চাবুক হাতে দাঁড়িয়ে আছে যে গোরা কুলী-কট্টার তার জানা-জানতিতেই হুটো-একটা গাঁঠি চলে বাছে এদিক-ওদিক। কিছু মাল চলে বাছে আর হাত-বদল হয়ে বাছে টাকা। সকলেই যে সেই চোরাই-মাল নিয়ে বৈধ ধরে ব্যবসা করছে, তা নয়। টাইট-সিনিয়রের মতো বারা হুস্তির পক্ষপাতী মাহুৎ—তার হাতে টাকা নিয়ে সোজাশুজি চলে বার কাঠের দোতলা ঘরে—সেখানে কেরোসিনের ডিবারি ঝোলে ছাঁদ থেকে, আর গলার কালো স্তোয় ক্রশ-বাঁধা, হাতে নীল উল্কি আঁকা নানা জাতির মাহুৎ একই মাতোরালা হুস্তির ভাষায় কথা কর।

সে সব মাহুৎ শেব অবধি একই পথ ধরে। কেউ শেব হয়ে বার পিঠে চাকু খেয়ে—দেহটা তার জেলে-ভিড়ি করে নিয়ে হুঁ সন্থজে কেলে দেওয়া হয়। অথবা দাতব্য মিশনারী হোমে—বোগে ভুগে শেব হয়ে বার মাহুৎ।

ব্রাইট সিনিয়রের শেষ পরিণতিটার আসল কথা জানেননি ম্যাকমোহন। নোংরা অস্ত্রধ, না শিটে-পেটে ছুরি, না আরো বিক্রী কিছু। তবে কল্পনা করে নেওয়া চলে—গলায় কালো সূতো, বলিষ্ঠ লাল চেহারা, নোংরা এবং বদমাইস কোন পুরান খালসীকে জিজ্ঞাসা করলে সে নিশ্চয় বলতো—He has gone the old way ?

সিনিয়রের মৃত্যুতে নিশ্চিত হয়ে ম্যাকমোহন জুনিয়রের দিকে তাকাতো সময় পেলেন। বোনের প্রতি অকল্পন হয়ে যে দিনগুলো গিয়েছে, সেগুলোর জন্তে তিনি ক্ষতিপূরণ করবেন। এমিলির ছেলেকে মানুষ করে তুলবেন। হাজার হলেও মাত্র আট বছর বয়স সে বালকের। বাপের ছেলে তো বটেই! কিন্তু সে কলঙ্ক-ই কি সব? তাঁর বোনেরও ছেলে তো? মায়ের জঠরে সে শিশু বড় হয়েছে। মায়ের সদগুণাবলীর কিছুই কি পায়নি? আর তাকে যদি ভিন্ন পথে, ভিন্ন শিক্ষায় মানুষ করা যায়, নিশ্চয় সফল হবেন তিনি। পর-জন্মে তাঁকে বিশ্বাস করতে নেই। কিন্তু এমিলি যেন তাঁকে ক্ষমা করেনি। স্বর্গেই কি বাবেন তিনি? না গেলে শাস্তি পাবেন?

ব্রাইট জুনিয়র কিন্তু বাপের ওপরে-ও টেকা দিতে পারে। বস্তুতঃ এ কথা বললে অত্যাশ্চর্য্য হবে না যে, ব্রাইট সিনিয়র যাদের মধ্যে পরে ভিড়েছিলো, বারা তাকে মুগ্ধ করেছিলো—সেই সব খালসী ও বরখাস্ত জাহাজী-গোরা-দর চরিত্রের সবটুকু নিষ্ঠুরতা, এবং পশুশক্তি সমবেত হয়েছিলো জুনিয়রের চরিত্রে। ম্যাকমোহনের নিরাশ হতে বেশী দিন লাগেনি।

ইতি—ব্রাইট-কথা। বর্তমানে ক্যাপ্টেন ব্রাইটের অবস্থিতি কানপুরে। আর তার নিত্যসঙ্গিনী এক স্নানরী উত্তরপ্রদেশের হিলুহানী মেয়ে ব্রিজহুলারী। ব্রাইটের জীবনে ব্রাইট অনেক মেয়ে নাড়া-চাড়া করেছে। এই মেয়েটা টিকে গিয়েছে কেমন করে যেন শেষ অবধি।

ব্রিজহুলারীর চোখের নীচে কালি। পাণ্ডুর ফর্সা রঙ। স্নানরী, কিন্তু নিরুস্তাপ ও মলিন। সর্বাঙ্গে গহনা। ব্রাইটের কোন কুৎসিত কচি সম্ভবতঃ পরিভৃগু হয়। তার বিবিকে সে সালসুতা রাখতে এবং দেখাতে ভালবাসে।

ব্রাইটের সম্পর্কে যত অবিবাস ও ঘৃণা আছে কানপুরের ভারতীয় কোজ ও কোজী-জীবনের মনে—সবটুকু ব্রিজহুলারীর ওপর এসে পড়েছে।

ব্রাইটকে ঘৃণা বা উপেক্ষা দেখাতে তারা ভয় পায়। কিন্তু ব্রিজহুলারীকে সুযোগ পেলেই উপেক্ষা ও তাচ্ছিল্য দেখিয়ে আঘাত করে।

ব্রাইটের কাছে কোন সুযোগ-সুবিধার দরকার হলে তারা আসে ব্রিজহুলারীর কাছে। ব্রিজহুলারী বখাসাধ্য চোটা করে। মানুষগুলো পরিবর্তে তাকে কৃতজ্ঞতা জানায় শুধু মুখে। কিন্তু এতটুকু অন্তরঙ্গ হতে দেয় না তাকে।

তার সম্পর্কে চম্পার কোঁড়ুল হোলো। ব্রিজহুলারীও তাকে জানতে উৎসুক ছিলো। হুঁজনের প্রথম সাক্ষাৎকার এবং পরিচয় হয়েছিলো বেশ মনে রাখবার মতো এক পরিস্থিতিতে।

হুঁটি মেয়ের মধ্যে যেমন হওয়া স্বাভাবিক, তেমনই ভাবে। সঙ্গবর্ধের ভেতর দিয়ে। [কবিতাঃ]

তোমার বৃদ্ধকালে

[When you are old কবিতার ভাবানুবাদ]

(W. B. Yeats লিখিত)

চকস বোঁবনের শেষে প্রৌঢ় এসেছে,
তোমার দেহের সীমানায়।
বোঁবনের মস্তক দেহেরেখার পড়েছে তাঁজ
অকালে আঁধি ঘোর তন্দ্রায়।
সোনালী রেশমী চুল হয়েছে পটপট্র,
এমনি সময় একদিন আঁগুনের ধারে,
তুমি আমার বই পড়বে, তোমার মন
ছুটে যাবে বিগত বোঁবনের ধারে।

তোমার এই মুখশ্রীকে কত জন
ভালবাসতো, দেহের স্রবমায়
কত জন ছিল মুগ্ধ। প্রজাতে বিহঙ্গকাকলীতে
যেমন কুণ্ঠিত হয় মন,
তোমার কথার বরশাওয়ার কত জন
ভেগেছিল পড়ে মনে সারাংশ।
একজন শুধু একজন ভালবাসতো তোমার,
তোমার মুখশ্রীকে নয়, আত্মাকে,
জন্ম দিয়ে সে তোমার ভালবাসতো।
বোঁবনের মুখরবি আর এই বৃদ্ধকালের ছবি
সত্য দিয়েই সে ভালবাসতো।

আজ শীতের সন্ধ্যায় আঁগুনের ধারে বসে
তাকে তোমার মনে পড়বে।
তার প্রেমময় মুখ, তার হৃদয়ের প্রেম,
তোমার মনে আজ, বরা ফুল হয়ে বরবে।
কিন্তু তবু তার প্রেম সে আজ অতি দুর্ভাগ।
সে যেন উঠেছে পর্বত-চূড়ায়।
অন্তরবির মত সে মিলিয়ে বাচ্ছে,
তোমার বোঁবন প্রেম তখনই ফুরায়।

অনুবাদক—শ্রীকল্যাণ সরকার

গৃহস্থ

আজ ৩১শে ডিসেম্বর। বছরের শেষ দিন। রাক্ত বিহানার

ওর বছরের হিসাব নিকাশ চলছে। অক্টোবর তাড়নার কথাই ভাবছি। বিহানা মানে, জাহাজের ভিতরকার দোলনা। উপর নীচে ছুটো। মোটা পাইপ দিয়ে সমুদ্রের তাজা হাওয়া আসছে। পাশ্প করে পাঠানো হয়। পাশে অনেক ফোকর। ও দিয়েও ফুর-ফুর করে তাজা হাওয়া চুকছে। ওর ভিতরে সমুদ্রের দৃশ্য চোখে পড়ছে। ঝড়-ভুকানের সময় ওগুলো বন্ধ করে দিতে হয়।

মনে পড়েছে পুরোন দিনের কথা। এ সেই বোম্বাই সহর। এখানে চাকুরী করেছি বহু দিন। সেই চাকুরী ছেড়ে আর্মিতে। আবারও সেই বোম্বাই। এখানকার এক খবরের কাগজ। মালিক ছিলেন একদা এক কাগজেরই হকার। রাত কেটেছে কোনো সময় কারও বাড়ীর বারান্দায়, দিনের অবিক্রী কাগজের পাভাগুলো পেতে। অতি দরিদ্র। অদ্ভুত চরিত্র! আরও অদ্ভুত তাঁর কপালের বোগাযোগ। ক্রমে চুকেছেন এক বইয়ের কারখানায় কম্পোজিটর হয়ে। মাইনে খুব কম। হৃদয়ে প্রেমের জোয়ার ঢেউ খেলো যায়। ওটা বথাসময়ে আসবেই। বাণা পায় না দারিদ্র্যে। বরং দুঃখের সময় বান ডেকে আসে। প্রেম জোরালো হয়। বুদ্ধিও ঘোরালো হয়। কথায় বলে—পিঁপড়ের বল, আর প্রেমিকের বুদ্ধি। দুটোই খুব বেশী। প্রেমে না পড়ে বুদ্ধি খোলতাই কম হয়। এত করেও কিছু বিয়ে হয়নি। প্রেম গভীর হলে তখন না কি তা ফসায়। “বাল্য প্রেমে অভিশপ্ত”—বলেছেনও এক মহিলা-বন্ধু। বুদ্ধির জাহাজ। নিজের হৃদয় চিরে তা দান করেছেন এক বন্ধুকে। নিজের যত্নে চিরকুমার। দুবের বন্ধু নিকট হলেন। বন্ধু পেলেন বান্ধবী। বন্ধু বান্ধবী সবাই এক বাড়ীতে, খুব অন্তরঙ্গ ভাবে কাছাকাছি। বান্ধবী হলেন নিকটতম। ধন্ত প্রেম! ধন্ত প্রেমের বিচিত্র গতি।

“হৃদয়ে প্রেমের আবির্ভাবে সুদূর জলাশয়ও সমুদ্র হয়”—কে যেন বলেছেন। উনিও প্রেমের জাহাজে চড়ে বুদ্ধির সমুদ্রে পাড়ি জমিয়েছেন, চা খাইয়েছেন, দল গড়েছেন। নেতাদের ‘দান’ বলে অজ্ঞান হতে হয়। তাও হয়েছেন। তারপরই ছাপাখানার মালিক, কাগজের মালিক, এবং কাগজকলেরও মালিক। মস্তিকে গোবরের জ্বর পদার্থ কম থাকলে ও থেকে অনেক কিছুই মালিক হতে পারা যায়। স্তবরাং অনেক কলকারখানা, অফিস আবাগত, গাড়ী বাড়ীরও মালিক হয়েছেন ক্রমে। আমার এবং আমার মত অনেক হস্তভাগাও মালিক হয়েছেন। ভুল্ললোক টাকার কুমীর এবং আঙ্গু কুমার। হুকে আঁটা টাকার কাঁদ। বনভাগার, অর্থভাগার, সাহায্যভাগার, দরিদ্রভাগার, দানভাগার ইত্যাদির ভাগার খুলেছেন হাজারে হাজার। দাত্যকর্ণ আর কি! শেষে সমস্ত ভাগার গিয়ে এক ভাগারে জমত। সর্বদা চিনি চিনি হাসি। আর সব চাইতে মজার, তাঁর মনভুলানো মিষ্টি কথার ভুবড়ী। গিনে-রাতে সে ঠেঁ ফোটার বিয়াই নেই। হাতে অর্গ পাইয়ে ছাড়েন আর কি। কিন্তু কাজের শেষেই হাত-পা বেড়ে খালস। তখন মরণশক্তি কমে যায়। চিনতে পারেন কম। Bluff এর বাজুক। কথা ও কাজে যার দুর্বল ব্যবধান। সেই বাজু পলিটিসিয়ান! ওঁদের কথার চোখ বুজে সার দেওয়া যায়। দিতে হয়। কিন্তু মনে মনে বাধ দিতে হয় পারসটেক—আপনারের খুশী মত।

না=জানা=কাহিনী

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

তাল-বেতাল

কথার দাম বার। তার চাকুরীর ভরসা কি? স্তবরাং ওয়ারা ছাড়তে হোল।

ননুপ্ত রিডিজ

পূবে যুদ্ধের সবে শুরু। জাপানীরা যুদ্ধে নেমেছে। চালের বাজারে হঠাৎ আগুন। তিন টাকা থেকে এক লাফে সাত টাকার। একেবারে ডবলেরও বেশী। চালের বাজারে চালের যুদ্ধ। কোথায় পৌছবে কেউ জানে না। মহাশয় বলেছেন—নিউটন। আমরা লোক দেব না। চাচিলের সেই হুকার—“I know how to recruit.” “ভরবারি দিয়ে আমরা ভারত জয় করেছি, ভরবারি দিয়েই আমরা তা দখলে রাখবো।” বাঙলার Famine হলো। কবি যে তার আগেই গাইলেন—সুজলাং সুকলাং শত্ৰুজায়াং—সেই সোনার বাঙলার হুভিক। কারণ, বাঙলার বোয়ান হাত ছাড়া করা যায় না। বর্ষার শিক্ষা। জাপান পুরো বর্ষা জয় করেছে মাত্র সাত দিনে। বাঙলার দুই নেতা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার। কেলে আসা ভারতীয় সৈন্য দিয়ে লিবারেশন আর্মি তৈরির হয়েছ। আমাদের স্বাধীনতার জুজ। সে খবর ব্রিটিশ জানে। স্তবরাং নামে বাঙলার বোয়ান পাগল হয়ে যায়। সেও ব্রিটিশ জানে। পাগল তাই ওরাও হয়েছে। স্তবরাং ধান চাল সব হাতের মুঠোর পুদতে চায়। At any cost. তিন টাকা চালের মণ। একশ টাকা হলেও ক্ষতি নেই। সে টাকা দেবে গবর্ণমেন্ট। উপরন্তু ধরচা আরও লাভ। জুটে গেলেন কনট্রাকটর। সরকারকে সাহায্য করতে। চাল বাগাবার কনট্রাকট। শুরু হলো কর্ডন। চাল গিয়ে পৌছল আশীতে, আর শরে। বিজ্ঞাপনের চটক। যুবকদের ধরা হোল সেই কাঁদ পেতে। ধরে ধরে পাঠান হোল পাহাড়ঘেরা ভারতের নিরাপদ পশ্চিম সীমা। কাটনী জরুলপুর আর পিণ্ডি। বিজ্ঞাপনের মোহ, আর পোড়া পেটের টান। যুবতীরাও বন্দী হোল ওয়াকাইতে। ওয়া অফিসারদের চোখের রক্তনী সুরমা। বাধক্যে রিডুভেশন। কাজে আনে উৎসাহ, আসক্ত দেয় উদ্দীপনা। সামনে বতকশ অন্তহীন উৎসাহ Fatigue কম। মনও বলে কানে। বাঙলা আর আগামে টাকা জড়ানো হলো প্রতি ইকি মাটিতে বর্ষা জয়ের পুনরাবৃত্তি ভারতে ঠাণ্ডা করতেই হবে। বাঙলা ও আগামে যুবকরা ঘুরে কাঁড়াতে পারে স্তবরাং নামে, যদি ওরা জানে, স্তবরাং আছে ক্রুটে। ওঁদের “দিল্লী চলো” ধ্বনি কথতেই হবে বিহারে। বাঙলা আগাম এত করেও যদি যায়। বাক।

চাল ধরার কনট্রাক্টে বঁরা এগিয়েছেন সাহায্য করতে, তাঁরা সবাই উপর তলার প্যাসেঞ্জার। বসেছেন আরও উপরে তুঁড়ি হুলিয়ে হুলিয়ে। নীচের তলায় হাটাকারের মরতম। আরও নীচে পথের উপর। শিশু বৃদ্ধ নারী পুরুষের মিছিল। বত সব হতভাগার দল। গান ধরেছে—মা, ফান দাও। একটু ফান দাও মা, কবে। এ যুদ্ধের বাজার। টাকা আরের সময়। সে কি ঐ গানের সময়?

টাকা চাই। আরও টাকা চাই। এখন শুধু টাকার গান চলবে। সুতরাং সে ভাতের ক্যানের গান কারো কানে চুকলো না। হুড়িয়ে গেল অনন্ত শূন্য। এবং আজও তা ঘুরে বেড়ায় হাওয়ার।

হতভাগার ক্যান পারনি আজও। সুজলা সুফলা শতশ্রামলা নাকি বাউলানেশ। সে তৈরী হলো অশান। নৃত্য চললো প্রেতের। ননটপ, রিডিং।

এপ্রিল ফুল!

একদা এপ্রিল মাসে। এক ক্রিপস এসেছিলেন ভারতে। কী উদ্দেশ্য নিয়ে?

এক বাঙালী মস্তিষ্কের চিন্তাধারার প্রাবল্যে। সমস্ত যেতহস্তী ভেসে চলেছে এশিয়া হতে। ওরা ভাড়া খেয়ে পালাচ্ছে।

পুরোনো ইতিহাস। ডিসেম্বরে পাল' হারবার ফ্রেন্স হোল জাপানের হাতে। শরৎ বসন্ত চার দিন বাদে বন্দী। জাহুয়ারী স্ত্রীভাষের অন্তর্ধান, বৃটিশের কড়া পাহারায় কলা দেখিয়ে। শোনার কানুলের পথে তিনি বালিনে। কেকরারী মাচ' সিঙ্গাপুর, রেজুনের পতন। অতি দ্রুত জাপানীরা এসে পৌঁছেছে ভারতের দ্বারপ্রান্তে। এসে হাঁক দিয়েছে।

প্যারীর পতনের পর। ইউরোপেও বৃটেনের চরমতম দুঃসময়। লণ্ডন বোম্বার উড়েছে। রাজধানী শিক্‌ট হয়েছে, তবু অফিসিয়াল স্বীকৃতি নেই। প্যারীর বেলায় ফরাসীরা স্বীকার করে ঠকেছে। সুতরাং বৃটিশ ঠকতে পারে না। (বৃটিশ রাজধানী সরিয়ে দিল কলকাতা থেকে দিল্লী। ভারত স্বীকৃতি দিয়েছিল, পরে।) এদিকে জাপান, ওদিকে জাৰ্মানি। দুদিক থেকে সাঁড়াশী দিয়ে কোণঠাসা। ভারতের অসন্তোষ। ক্রিপসের ভারতে না এসে উপায় ছিল? যে ক্রিপস কশকে লাগিয়েছে কাজে—জাৰ্মানীর বিপক্ষে।

চরমতম দুঃসময় বৃটেনের। চার্চিলের চুরুটের ঘোঁরা গোলা পাকার শূন্য। বাউলা কি করে ঠাণ্ডা হয়, সেই চিন্তায়। গোলায় বাত বাউলা! সুজলা সুফলা সোনার বাউলার সেই গোলা টেনে আনলো হুড়িক। চার্চিলের মনোনিবেশ পাঁচজন কনট্রাক্টর। ধান-চাল ধরে ধরে হুড়িক সৃষ্টির কাজে যেতেছেন ঠাণ্ডা।

অতি দ্রুত বৃটে চলেছে ঘটনার সংঘাত। আবর্ত উঠেছে গভীর, গভীর হয়ে।

এ-হেন পট ভূমিকায় ক্রিপস এলেন ভারতে। হাতে করে স্বাধীনতার স্বর্ণ সুযোগ! নেতাদের মনে পড়ে গেল ছেলেবেলার মোয়া খাওয়ার কথা। স্বাধীনতার প্রস্তাব। কথায় বলে—‘সেখো, সেখো, ভাত খাবি?’ ‘না, পাতা পেড়ে বসে আছি।’ পাতা নিয়ে বসে রয়েছেন দলগুলো সব। ভাতের ধামা কাঁধে নিয়ে ঘোরা-ফেরা করছেন বিনি, তিনি ক্রিপস। কারো পাতে পড়েনি কিছু। ‘ভাত খেতে পাবে সবাই। তার আগে কথা দাও। তোমরা কি জাপানী সাম্রাজ্যবাদ চাও?’ সবাই সম্মুখে কানে তাল লাগিয়ে, চোখে ঠুলি পরে—‘না, না, না, না’।

‘তবে ঐ যে স্ত্রীভাষ আসছে জাপানী সেনা নিয়ে?’

(ওরা মনে করেছে নেতাজীও জাপানে। বালিন থেকে অদৃষ্ট পথে আকাশের বুক চিরে পৌঁছেছে। ওখানে যে রাসবিহারী চিন্তাধারা কাজ করেছে বহু দিন ধরে, বৃটিশ ভা অপ্রণোদিত।)

কেউ বললো—ও কিঞ্চ কলামনিষ্ট। কেউ বললো—আমার হাতে বিপ্লবের দাও। আমি ওকে নিজ হাতে গুলী করবো। কেউ চাপালো উন্টো গাধার পিঠে। কেউ করলো নেতাজীর বহাংসব। ভাতের ধামা ধামা-চাপা রইল। মহাসভার পাতা বড়ে উড়লো। খিল খিল খিল চাপা হাসি হেসে ভোজের সভা ছেড়ে বেরিয়ে এলেন বিনি, তিনি ক্রিপস।

শরৎ বসন্ত আর বীরা তাজা খুন সরবরাহ করেছেন বুক চিরে স্বাধীনতার যুদ্ধে, তাঁরা সবাই জেলে পচছেন। ভাতের লোভে বীরা কথা বলছেন, তাঁরা সবাই নেতা। পাওয়ার পাওয়ার লোভে। জেলের ভেতর বন্দী মায়ুষ। জেলের বাইরে প্রান করে ডেকে আনা হুড়িক। আর এই পটভূমিতে ঠাণ্ডা চালিয়ে চলেছেন বা, তার নাম—আলোচনা। আ-লোচনা। আর অদ্বুত! কেউ বলেন নি, রাজবন্দীর বন্দী থাকতে আলোচনা চলতে পারে না কেনো। উচিতও নয়। আরও অদ্বুত, ক্রিপস আজাদে ফিসির ফিসির, কানাকানী আলাপ—স্ত্রীভাষের মৃত্যুতে মহাসভার শোক প্রকাশ উচিত হয়নি।

‘স্ত্রীভাষের মৃত্যু হয়েছে বালিনে’—খবর রটায় রয়টার। আর মহাসভার শোক প্রকাশ শরৎ বাবুর কাছে, সেই সংবাদ শুনে। ওরা লোক চেনে। তাই বেছে বেছে আমাদের কানে কানেই কথাটা বলেছে। কোন্ কথা কোথায় বলতে হয়। নার্ত চেনে তার ভাল করে। স্ত্রীভাষের মৃত্যুতে আমাদের শোক প্রকাশ করতে নেই। সে আজও আমরা তার অন্ধে ভাবি না। টেটর। স্ত্রীভাষের মাধব বৃটিশ তাড়ানোর প্রান। আর আমরা তাড়িয়ে চলেছি তাঁকে। প্রান করে। তাঁর প্রান বানচাল। ছুই বাঙালী ব্রেনের বিরুদ্ধে গলা চিরে চিরে গলা ফাটিয়েছি, তাই আমরা না নেতা নামে অভিহিত হতে পেরেছি। ঠিক চাপিয়েছি উন্টো গাধার পিঠে। প্রদক্ষিণ করাও সহ্য। দাহন কর সদর রাস্তার গাধার টুপি মাধব দিয়ে। সর্বস্বত্যাগী সর্বশ্রেষ্ঠ ভারতীয় সন্ন্যাসীর সম্মান কি আমরা দিইনি? ডুয়ো স্বাধীনতা প্রস্তাব। তার পেছনে করে আনা জাশনাল আর্মির কবরখানা।

চার্লিস হেসে নিয়েছেন প্রাণপণে। মিশন শেষে ক্রিপস ফিরেছেন দেশ বার্ষতা নিয়ে? ইতিহাস বলে,—তাই।

কিছু ঠর জমাট নাটিকা! বলন্ত অক্ষরে লেখা তার স্বনিকায় ছিল—

“APRIL FOOL,”

কে?

ক্রিপস, চার্চিল?

না, নেতারা?

নার্ভবিহীন নেতৃত্ব। চার্চিলের প্রেতাত্মা হাসছে—

হাঃ! হাঃ! হাঃ! হাঃ!

ধমকে গেছে যে দ্রুতগতি ইতিহাসের ঢাকা। ভারতের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে। মাচ' পৌঁছেই হন্ট। ক্রিপসের ভারতে না এসে উপায় ছিল? নেতারা বন্দী হলেন আগষ্ট। হিড়িকের মাঝে বাক্যের ধাক্কায় অনেক দরজার গড়াতে গড়াতে ঠেকেছি এসে আর্মিতে।

ক্রিপস, গিয়েছেন বিফলতা নিয়ে। তারই নাম এপ্রিল ফুল।

বর্ষ-বিদায়

কখন নিত্যানবীর আকর্ষণ ঘটেছিল। হৃৎকর মাঝে চাউলির
প্রেক্ষাগায়। হৃৎকর। অর্ধচ চাউলি আজও বহাল তবিরতে বেঁচে।

হঠাৎ বিকট সুরের আর্ন্তনাদ। হৃৎকরের ঘোর কাটেনি ?
হাজার হাজার সাইরেন আর জাহাজের বাঁশী। বেজে উঠলো
একসাথে। সমুদ্র ও সহর থেকে। জাপানীরা এসেছে বোমা
ফেলতে। হঠাৎ মাঝরাতে অতগুলো বিকট আর্ন্তনাদ হতচকিত
করে দিয়েছে সবাইকে। কর্কশ সেই আর্ন্তনাদ আজও আমার মনে
মনে বাঁধা। উঠে বসেছি। শত শত সাইরেন আর বাঁশীর রেশ।
ছুটে আসছে জাহাজ ধীরে ধীরে আর সহর থেকে তীক্ষ্ণ হয়ে। সে
ভরবে ভুবে গেছে সমস্ত পৃথিবী, বেরিয়ে এসেছি, জাপানী গ্লেন থেকে
বহু পড়ার আগেই।

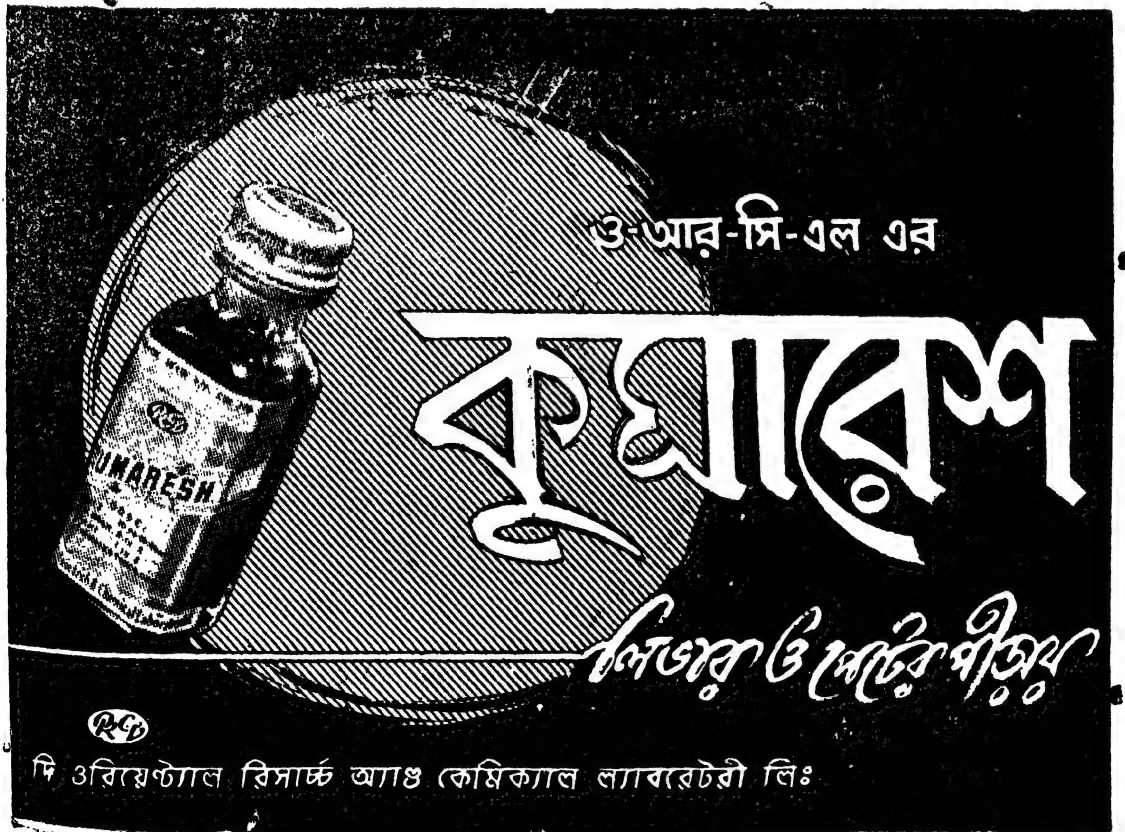
আকাশের দিকে চেয়ে আছি। প্লেনের আওয়াজ শোনার
আশায়। মাথার উপর সীমাহীন অনন্ত আকাশ। নীল, নকত্র-
খচিত। কিন্তু শুষ্ক। সমুদ্র নিস্তব্ধ। যেন কোথায় ? মাথার
উপর যাক-মাকান্দে একখানা চাঁদ হেসে চলেছেন লুটোপুটি খেয়ে।
আমাদের অবস্থা দেখে। তার রক্তধারায় সমস্ত পৃথিবীর
হানপূর্ণ চলেছে। খণ্ড খণ্ড রৌপ্য গলে গলে ঝরে ঝরে পড়েছে
চাঁদ থেকে। সমস্ত সমুদ্রে। বর্ণনাভীত সে বোম্বাই সহরও।
সেও বাদ পড়েনি সে স্রাব্যুষ্টি হতে।

বাঁশীর রেশ তখনো ধামেনি। টেন চলেছে সমানে। সমুদ্রে
শীত কম। তবু সে নিষ্কম। একমাত্র আওয়াজ এই সাইরেন আর
বাঁশীর। একটানা আর বিকট সুরে। আকাশে চাঁদের চাঁদ নিরে
খেলো। কিন্তু বাতাসের এই আয়তন ? ঘড়িতে রাত বারটা। জানা
গেল, এ বর্ষ-বিদায়ের ধনি।

পুরাতন, জীর্ণ ক্লাস্ত, অশেষ হৃৎকর, অন্তত অভিশপ্ত দীর্ঘ
বৎসরের বিদায়। আর নব বৎসরের সাদর আরাহনী। ওঃ !
তাই এত সাইরেন আর বাঁশীধ্বনি। নমস্কে ! বিদায় !

জাপানী টর্পেডো

সকালে সূর্য ওঠার আগেই জাহাজ চলতে শুরু করেছে। বিকি
খিকি এগ্নির চলার শব্দ আসছে। জাহাজ চলছে, কিন্তু থুব আন্তে ;
কারণ জলে শব্দ হবে না। শব্দ করার উপায় নাই। বর্ষা জাপানের
দখলে। আর ভারত মহাসাগরে জাপানী সাবমেরিনের অপ্রতিরোধ্য
রাজত্ব। ওরা অনেক জাহাজ ডুবিয়েছে। বর্ষা জয়ের পর। এখন
অনেক জাহাজ এক সাথে ছাড়ে কনভয়ে। ডের্ভয়ার থাকে। ভারতের
উপকূল বরাবর দক্ষিণে চলেছি। ক্রমে জাহাজ গুবে ঘুরেছে। কোন
দিকে চলেছি ? মনে হয়, এবারও সেই বর্ষা রাজত্ব। সূর্য জাহাজের
মাথায় ওঠেন, আর সন্ধ্যার দিকে অস্ত বান। ক্রমে ভারতের উপকূলও
অস্ত গেছেন, দুই-একদিন আগে। এদিক, ওদিক, ডাইনে, বাঁয়ে,
সামনে, পিছনে বদিকে তাকাও সমানে জল। শুধু জল আর জল।



ও-আর-সি-এল এর

কুমারেশ

নিজের ও পেটের মিত্র

২৫০

দি ওরিয়েন্টাল রিসার্চ অ্যান্ড কেমিক্যাল ল্যাবরেটরী লিঃ

কুলকিনারা গাছ-পালা বা খড়-কুটা কচুরী পানা, কোথাও নজরে আসে না। কোনো চিহ্ন নেই। সব লেপে পুঁছে একাকার। এক কথায় অকুল পাথর। ভাসিহি আমরা, আমাদের জাহাজখানা খোলামখুচি।

চার দিনের দিন। জাহাজের গতি আরও মন্থর। শব্দ আরও গভীর। চারি দিক নিস্তর। চার পাশের জাহাজগুলো বহু দূরে দূরে, ওরাও তেমন নিঃশব্দে চলেছে। দূর থেকে দেখা যায় মাত্র। কোনো কাজ নেই, নিশ্চিন্ত আরাম। খাও দাঁও ঘুমাও। তাম পেট, বই পড়ো আর গল্প করো। যা খুশী। কাল রাতে হাওয়া ছিল। জাহাজ ছলেছে। আহাড় খেয়েছে খুব। কি বিল্লী আওয়াজ! কে যেন ধোপার পাটে আছড়েছে মনে হয়। সাবায়ত ঐ আওয়াজ শুনে কেটেছে। ঘুম হয়নি। ওরকম আহাড় খেলে ঘুম হয়ও না। সমুদ্রে মাঝে মাঝে হাওয়া হয় ঐ রকম। ঝড়-বর্ষা হলে ত' কথাই নেই। জাহাজ খুব দোলে। বমি হয়। তাই জাহাজের ঠিক মাঝখান বরাবর এক গোপন জায়গা খুঁজে পেয়েছি। ওখানে দোলা কম ভর। সী সিকনেস নেই। নতুবা এ-ওর বাড়ি হড়-হড় করে অরপ্রাশনের পদার্থ তুলছে। কিছু বলবারও নেই। কারণ, সঙ্গলকার ঐ এক অবস্থা।

সেদিন কি বার ছিল? মনে নেই। সকালে কার মুখ দেখে উঠছি। তাও মনে পড়ে না। হুপূরের আহাির সেয়ে সব দৌলনার চেপেছি। মাথার কাছে ফোকর। খুলে দিতে এক ঝলক সমুদ্রের ঠাণ্ডা হাওয়া। প্রাণ জুড়ায়। মাথাটা পরিষ্কার মনে হচ্ছে, ওর ভিতর দিয়ে সমুদ্র দেখ। কি চমৎকার দৃশ্য! যেন একখানা ছবি। সমুদ্র আর আকাশে যেনামেশি। দুই অনন্ত এক সাথে। ঐ এক ঝাঁক উড়ন্ত বাহু। তা দুই তিন মাইল জায়গা জুড়ে ওরা ভেসে চলেছে। ওরা কি জানি কেন, উড়ে উড়ে জাহাজও পার হতে চাইছে। মনের আনন্দে ওরা জলের উপর দিয়ে বহু দূর উড়ছে। আবার জলে গিয়ে পড়ছে। জাহাজে ঠাকুর থাকে অবিরত। ক্রক্কেপ নেই। সাদা সাদা কপোর মত গা। চকচক করছে। দেহ-সমান লম্বা গলা। ডেকের উপর পড়ছে। আর ছটকট করছে। খালানীদের মতা স্মৃতি। ওরা সেগুলো ধরে ধলের পুংছে। পরে রাঁজা করে খাওয়া হবে।

দেখতে দেখতে ঘুমও এসেছে। বিরাট একটা কাপু'নী দিয়ে আমাদের জাহাজ ধেয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের আওয়াজ। বজ্রের আর্তনাদ কি এর চাইতেও কঠোর? সেই আওয়াজে তন্দ্রার ঘোর কেটে গেল। খড়মড় করে উঠে বসেছি দৌলনার। এঞ্জিনের আওয়াজ ধেয়েছে। বদলে বেজে উঠেছে এলার। সবগুলো এলার একসঙ্গে বাজছে। এ হচ্ছে চরম পরিণতির এলার। প্রস্তুত হও। সব কিছু ছেড়ে ছুড়ে—জামা-কাপড়, টাকা-পরসা, বজুক-পিস্তল। বন্ধু-বান্ধব পর্বস্ত ছেড়ে। চরম ডাকের প্রস্তুতির জন্যে এলার। এখন নেওয়া চলবে শুধু মাত্র লাইফ জ্যাকেট। আর কিছুই রাখা করা চলবে না। ভিলা' সময় নেই। আপানী টর্পেডো বসান দিয়েছে জাহাজের ঠিক মাঝখানটিতে।

আমাদের জাহাজখানা ছিল খুব বড় আর ভারী। টনের কথায় বলা ঠিক হবে না। নীচে থেকে উপর পর্যন্ত পাঁচতলা সমান উঁচু।

সবের নীচে ওর নিজের কল-কল। তার উপর বোমান, ট্রোর, কর্ভারীদের বায়গা। ভিনের তলার গোলন্দাজ। আর চারের তলার আমরা। এর মাঝখানে সাজান গোছান বিরাট ডাইনিং। পাঁচের তলার কমান্ডারদের কেবিন। আর একেবারে উপরে নীচের গভের ব্যাণার। বড় বড় কামান আঠাশ পাউণ্ডার। এ্যাক এ্যাক মানে এ্যাকটি এয়ার ক্রাকট। রেডিও ব্যাডার প্রভৃতির এ্যাস্টেনা। আর আছে জাহাজের নাক। যা দিয়ে ভিতরে হাওয়া পাঠানো হয় পাম্প করে। দেখতে ঠিক যেন কান। অব্যর্থ ওদের লক্ষ্য। ভেসে সমান দুই টুকরো হয়েছে। জলে ক্রমাগত ডুবছে। বরাবর-নলে হাওয়া ভরে নিয়ে আবিও উপরে উঠছি সবাই মতো।

উপরে উঠবার সিঁড়িতে পা দিয়েছি। অভূতপূর্ব সে দৃশ্য! করুণ, আর বিভৎস। আমাদের ক্যাপ্টেন বোর। হুটো ঠ্যাং সিঁড়ির ধাপের উপরে দিয়ে মাথাটা ডেকের পাটাতনে, নীচের দিক দিয়ে গুরে আছেন। ওর মাথার splinter লেগেছে। সেই অবস্থায় উপরে উঠতে গিয়ে মাথা ব্রে পড়েছেন মনে হয়। আর মাথার খুঁটিটা হু'ক'ক হয়ে বিলুটার ছড়াছড়ি। কাপড়-চোপড়ে প্রচুর রক্ত। উদ্ধতে না কোথায় আরও splinter লেগেছে। মস্তিষ্কের পদার্থ ছড়াছড়ি হয়েও বে লোকে বাকরোধ হয় না, তা দেখলাম এই প্রথম। ওই অবস্থাতেও তাঁর পিপাসা। "পানি দেও" "ওরাটার ওরাটার" বলে চীংকার। কে কা'কে পানি দেয়? চাচা আপনার প্রাণ বাঁচ। সবাই নিজের নিজের প্রাণ পদার্থ হাতে নিয়ে পলায়নে তৎপর। কিন্তু বাবে কোথায়?

তড়ম্বৃত করে সবাই উপরে খাওয়া করেছে। লক্ষ্য সেই লাইফবোট। চোদ্দখানা লাইফবোট ছিল এই জাহাজে। সাধারণতঃ পাঁচ ছয় খানার বেশী থাকে না। এই জাহাজে সব চেয়ে বেশী দেখছি। বড় বড় কমান্ডার চীকদের জাহাজ বলে সম্ভবত এই ব্যবস্থা। অতি বিধম ঐ এক মূহূর্ত। সব চেয়ে মূল্যবান এই মূহূর্তটুকু। একজনের অস্তিম শয়ান। তার শেষ প্রার্থনা এক কৌটা জল। তার অস্ত কত কাকুতি। কিন্তু কে দেয়? সময় কোথায়? আপনার জীবনের চাইতেও কি ও মূল্যবান? এক লাফে এর পর উপরে উঠছি। কিন্তু লাইফবোট কোথায়? একখানাও নেই। নামিয়ে দেওয়া হয়ে গেছে সব কখানাই। শেখখানাও ছাড়ছে লোক-বোঝাট। অনেক হালকা কাঠ ছিল। লাইফবোট ছিল। কিন্তু নেই। সব জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকে নিজের প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টায় অস্থির। কে কা'কে ধেয়ে? কত সময় লেগেছে আমার উপরে আসতে? মাত্র এক পলক ওই ক্যাপ্টেনের দিকে চেরেছি। তার ভিতর এত কাণ্ড। জাহাজের কর্ভারীরা নীরবে নগুনায়মান সারিবদ্ধ ভাবে। জাহাজও ডুবু-ডুবু। জলের তলার ঠাই পাঁচবার আশায় ও অতি দ্রুত নেমে চলেছে। উপরে এখনও হাজার হাজার প্রাণ—প্রাণের আশায় আকুলি বিকুলি ছুটাছুটি করছে। উদ্ভ্রান্তের মতো সে ছুটাছুটি। শুধু নিজের প্রাণটুকু নিয়ে একটুখানি বেঁচে থাকার আশায়। নিরস্তির অমোঘ বিধান। কারও পরিজ্ঞান নেই। এবার জাহাজ ডুববে। মাথার উপর পূর্ব কিং হেলেছে। আর উপায় নেই কোনো। জলে ঝাঁপ দিতেই হবে। দেখাযেবি আরও অনেক। আগে থেকে

স্বাক্ষরনলে হাওয়া ভরে নিরেছি। ওটা একটা করে প্রত্যেককে দেওয়া হয়েছে জাহাজে ওঠবার সময়ে। ওটাই একমাত্র ভরসা। কোমরে জড়িয়ে নিরেছি। সাঁতার কাটতে আর পাঁচ জনে আমাকেই আঁকড়ে ধরেছে। স্রু হোল জীবন-সংগ্রাম। সত্যিকারের জীবন-সংগ্রাম।

অকূল সমুদ্রের মাঝখানে। তিন-চার দিন কূল ছেড়ে এসেছি। সামনেও তিন-চার দিনে কূল পাবার কথা। যদি জাহাজ চলতো। বারো দেখাদেখি জলে বাঁপ দিয়েছে। বেশীর ভাগই পাগলী আর মাদ্রাজী। ওরা সাঁতার জানে না। ওরা নিজেরা পরস্পর জড়াভক্তি করেছে, ধরেছে, মরেছেও। ভুবেছে সবাই। আমাকেও ধরলো। সাঁতার জানলেও অবস্থার ভুলে বার সবাই। ভয়ে ভুলে বার। জাপটা-জাপটিও করে সবাই বাঁচার আশায়। করে মরে। কিছু বা হোক ধরে বাঁচার আশা, আর সাঁতার জানলেই বা কি! অকূল সমুদ্রে সাঁতার কেটে বাঁচার আশা যে কতখানি? বিশেষতঃ হাঙ্গর কুমীরের দেশে? ওদের জাপটা-জাপটির হাত হতে নিষ্কৃতি পেয়েছি বহু কষ্টে। মুখ তুলে দেখি, জাহাজের অস্তিত্ব ততক্ষণে বিলুপ্ত হয়েছে। এ কয় দিন যে ছিল সাধী, ভুবে বাবার সময় সে একগাছা খড়-কুটো বা দেশলাইয়ের কাঠিটা পর্বন্ত রেখে যায় নি বা ধরে বাঁচতে পারি। সবই সাথে নিয়ে ডুবেছে। সরে এসেছি আগেই। নতুবা আমাকেও টেনে নিয়ে যেত সমুদ্রের তলার। ওর সাধী হব বলে।

শেষ প্রাণতরঙ্গী ছেড়েছে আমার চোখের সামনে। আর একটু আগে এলে ওতে আমার জায়গা হোত। বহু মূল্যবান সময় নষ্ট করেছি ক্যাপ্টেনকে দেখতে গিয়ে। কিন্তু সে-ও তো মুহূর্তমাত্র। আর সহজ মানবিকতাবোধ। হেলার সুযোগ হারিয়েছি। সাঁতার কাটছি প্রাণপণে। শেষ তরঙ্গী কোথার কাছে? কিছুই দেখা যায় না। অন্ন অন্ন টেট, চোখে-মুখে আছাড় খায়। হাত তুলে নাড়ছি। যদি ওরা দেখতে পায়। দয়া করে একটু তুলে নেয়। অকূল সমুদ্রে। লক্ষ্য বিহীন সাঁতার। ওদের সাথে লড়াই করেও খুব ক্লান্ত। প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছে, হাঙ্গর আর কুমীরের আক্রমণ। শেষ পর্বন্ত দল বেঁধে আক্রমণ চালাবে। আর সাবড়ে দেবে। আছা, কয় মাইল জল পারের তলার? সে কথা মনে হলে আজও প্রাণ ধালি হয়ে যায়। কুমীরের ভর তার কাছে অতি তুচ্ছ। অগাধ অপার সমুদ্র। আর আমি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মানুষ। হীনবল হলচর প্রাণী মাত্র। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সাঁতার কেটে বাঁচার আশা। হাঙ্গর কুমীর তিমির দেশে। আরও কত বকমের প্রাণী আছে, বারো মানুষ খায়। ওর তলার, কে জানে! হার বে জীবন!

ভারত মহাসাগরের মাঝখানে। জলের সাথে লড়াই চলছে

প্রাণপণে। প্রাণের আশা ছেড়েছি। যতক্ষণ ভেসে থাকি বার, সেই একমাত্র আশা। ততক্ষণে এ-ও আশা করছি হাঙ্গরের দল বেঁধে আগমন। ওরা জাহাজেই মহোৎসব চালায়ে যাচ্ছে। নতুবা দুই-একটার দেখা এতক্ষণে মিলতো। এই মুহূর্ত দেহ। ওদের সবার প্রয়োজন হয়তো মিটবে না। ঘুর হতে তেড়ে আগমন। আর দেহ হতে এক খাবলা মাস তুলে নেওয়া। দেহ থেকে ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে। মনের আনন্দে লেজ নেড়ে নেড়ে তাই খাওয়া। রক্তে চার দিক ভাসছে। হবিতে দেখেছিলাম। তারই প্রত্যেক অহুভূতি আজ মিলবে। নাঃ! ওরা এড়িয়ে গেল। হয়তো দেখনি। পরমেশ্বরের অসীম দয়া! শেষ তরঙ্গী দেখা গেল। সেই তরঙ্গী কাছে এলো। অথবা আমিই কাছে গেলাম। অথবা স্রোত বা হাওয়া আমাকে ঠেলে নিয়েছে। সে রহস্য আজও অজ্ঞাত! ভগবান শেষ পর্বন্ত সাহায্য পাঠালেন। কী প্রয়োজন ছিল?

প্রাণতরঙ্গী হাতের কাছে। প্রাণের ভার নিয়ে তিনিও ডুবু-ডুবু। 'ঠাই নাই, ঠাই নাই, ভরা সে তরী।' সোনার ধানে নয়, প্রাণের ভারে। কান্নাই কষ্ট করে আর নৌকোর উঠতে দিলো না কেউ। কারণ ইচ্ছা কয়েক ডুবলে তিনিও মহাসাগরের তলার দিকে গিয়ে আসার সম্ভাবনা। অনেক দড়ি ছিল তার চার পাশে। তখন তার মানে বৃষ্টি। এখন ঐ ধরেই ঝুলে আছি। ভালো। অনেক সাঁতার কেটেছি। খুব ক্লান্ত। ঝুলেই রইলাম ঘণ্টার পর ঘণ্টা। একলা নয়, এই বা স্রু। আরও দুই-তিন জনা ঝুলছেন। স্রুতের সন্ধ্যা। ঠাণ্ডায় সমস্ত শরীর অসাড়, অবসন্ন। দড়ি ধরেও যে ঝুলবো, সে আশাও কম। আর বেশীক্ষণ আশা নেই।

পুরোপুরি অন্ধকার হতে কখনো বাকী। মাথার উপর দেখা গেল প্লেন। আমাদের না ওদের? ঘুর-ঘুর চক্কর দিল কয়েক। কি বেন দেখল। কি দেখল না। বলতে পারি না। চলে গেল প্রচণ্ড স্রুতে, সমুদ্রের জলে ভিজে কয়েক ঘণ্টা। আর জল খেয়ে, চেউয়ে চেউয়ে, আমার তখন চরমতম অবস্থা! প্রাণ বাঁচ-বাঁচ। বেঁচে আছি, কি মরে আছি সে অহুভূতিও তখন লুপ্তপ্রায়। একখানা জাহাজ এসেছে। দড়িও ফেলেছে। কিন্তু আমার শরীর মন, সমস্ত সত্তা তখন আচ্ছন্ন, অবসন্ন। বহন জ্ঞান কিরোছে, তখন জাহাজের নরম বিহীনায়, গরম কাপড়ে জড়ানো, শুয়ে। কখন কি ভাবে জাহাজে উঠেছি, সে আমার জানবার কথা নয়। সিঁটার খানিকটা গরম হুৎ আর ত্রাপ্তি দিলে মনে হোল, বমপুরীর দক্ষিণ দরজা দেখে ফিরে এসেছি। কিছুটা আরাম মনে হচ্ছে। ঘুমিয়ে পড়েছি ক্লান্তিতে।

শুভ-দিনে মাসিক বসুমতী উপহার দিন-

এই অগ্নিস্রোতার দিনে আত্মীয়-বন্ধন বন্ধু-বান্ধবীর কাছে সামাজিকতা রক্ষা করা বেন এক হৃদয়বহ বোঝা বহনের সামিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। অখণ্ড মানুষের সঙ্গে মানুষের মৈত্রী, প্রেম, ঐতিহ্য, বৈতন্য আর তত্ত্বের সম্পর্ক বজায় না রাখিলে চলে না। কারও উপনয়নে, কিংবা জন্মদিনে, কারও শুভ-বিবাহে কিংবা বিবাহ বাধিকীতে, নয়তো কারও কোন কৃতকাৰ্য্যতার আপনি 'মাসিক বসুমতী' উপহার দিতে পারেন অতি সহজে। একবার মাত্র উপহার দিলে, সারা বছর ধরে তার স্মৃতি বহন করতে পারে একমাত্র

'মাসিক বসুমতী।' এই উপহারের জন্য স্রুশ্রী আবরণের ব্যবস্থা আছে। আপনি শুধু নাম ঠিকানা টাকা পাঠিয়েই খালাস। প্রদত্ত ঠিকানার প্রতি মাসে পত্রিকা পাঠানোর ভার আমাদের। আমাদের পাঠক-পাঠিকা জেনে শ্রুশ্রী হবেন, সম্প্রতি বেশ কয়েক শত এই ধরণের গ্রাহক-গ্রাহিকা আমরা লাভ করেছি এক-একনও করছি। আশা করি, তবীব্যতে এই সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হবে। এই বিবরণে বেকোন জ্ঞাতব্যের জন্য সিদ্ধান্ত—প্রচার বিভাগ, মাসিক বসুমতী। কলিকাতা।

কবি কণ্ঠপুর-বিরচিত আনন্দ-রত্নাবলি

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

অনুবাদক—শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

৫২। পুরেও, যে বাঁধ গৃহ থেকে বেধিয়ে এসে, বাতাসচরয়েরা মিলিত হতেন কৃষ্ণ-বলরামের সঙ্গে। কিন্তু অধ্বা, শ্রীকৃষ্ণ যখন স-বলরাম স-বাল্যসহচর, ও স-বাল্যবদান হল বাঁধলেন খেঁড়ের নিরে, তখন তিনি হয়ে উঠলেন রাজা আর অজ্ঞাত সকলেই যেন তাঁর মন্ত্রী। তারপর লজপুত্রের প্রত্যেক অঙ্গিতে গলিতে ধুলো নিয়ে সে কী তাঁদের ধূলাটি-খেলার ধূম! কী ছড়াছড়ি, মত্ততা! সঙ্গীদের মধ্যে কব-দণ্ডের চপল ভাণ্ডব দেখিয়ে এক যখন নাচতেন, নিজের গারে পরের গারে ধুলো মাখাতেন, ধূসর করে দিতেন সকলকে, তখন মনে হত শুঁড় উঁচিয়ে গজরাজের বাচ্ছাটি ঐ নাচছেন।

আর তাঁর খেপার সঙ্গিনী হতেন ব্রজবালিকারা। নিঃসঙ্কোচে তাঁরা খেলতেন। সকলেই শিশু, একত্রে গুহ-বসে সবাই মাহুয। সঙ্গীদের যে চোখে দেখতেন শ্রীকৃষ্ণ, সেই চোখেই দেখতেন সঙ্গিনীদের, তাঁর চোখে যে সবাই সমান। সকলেই মহাখুসী হয়ে উঠতেন খেলায়।

কখনও কখনও ছেলের দলের আর মেয়ের দলের সঙ্গে কৃষ্ণের ঝগড়া লেগে যেত। তখন তিনি তাড়া লাগাতেন দুটো দলকেই। কিন্তু তাঁরাও কেউ কম বান না। উলটে তাঁরাও কৃষ্ণকে তাড়া ঘেরে বসতেন। কখনও হোঃ হোঃ করে হাসি, কখনও মুখ ধমধমে ছেলেমাছুষী রাগ। রাগতেন না কিন্তু কৃষ্ণ।

৫৩। নন্দ-হুলাল কখনও ধুলো জড় করে করে পাঁচিল ঘর গড়া ইত্যাদি তৈরী করে বসতেন, কখনও আবার আগের গড়া ধুলোর পাঁচিল গড়া ইত্যাদি ভেঙে দিতেন। বাঁদের গড়া ভাঙতেন তাঁরাও আবার তাঁর গড়া ভাঙতেন। ফিরে আবার কৃষ্ণজন্ম বসে যেতেন ধুলোর গড়া ইত্যাদি গড়তে। আবার নিজেই ভাঙতেন। এই বক্রমের ভাঙাগড়া গড়াভাঙা খেলা খেলতেন বালকৃষ্ণ, আর দিব্যলোক থেকে দেবতারা দেখতে থাকতেন সে কৌতুক। তাঁদের কৌতুহল বেড়ে যেত, আপনমনে তাঁরা বলতেন—বার একটি কটাক্ষে না-জানি কত-শত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়, স্থিতি হয়, লয় হয়, তাঁর আজ সে বিষয়ে বড় নেই এতটুকুও! তিনিই এখন ধূলি-ধূগ ধূলি-ভবন গড়তে আরম্ভ করে দিয়েছেন! অতিশ্রান্ত হয়ে ঘামছেন, তবুও নাম নেই বিরামের। গগনপাতের দেবতারা দেখতেন আর হাসতে থাকতেন আনন্দে।

৫৪। দীঘ দিন ঘরে ধুলোটি চলত শ্রীকৃষ্ণের। ঘরে ফিরতেও তিনি ভুলে যেতেন। পথে পথে গলিতে গলিতে তিনি খেলতেন। আকাশে খেলা করে যে ঐ শিশুস্বৰ তাঁরই মতন সুখের আবেশে তিনি খেলতেন। খেলা দেখতে দেখতে ব্রজপুরের পুরবাসিনীদের মনে সকার হত মাতৃভাবের, আদ্যভবের তাঁরা বলতেন—আর যে আর, আমাদের নন্দহুলাল আর। আমাদেরও আঁটনাটি ভারী স্মরণ, ভারী নয়। ছেলেদের নিয়ে খেলা করবি আর। আহা কিছু খা না।

তখন একগাল হেসে বলে উঠতেন শ্রীকৃষ্ণ,—না, আমি আসব না। আমার যে এতটুকুও সময় নেই।

৫৫। কিন্তু তাঁরা কানেও নিতেন না কৃষ্ণের কথা। তাঁরা যে বিভ্রাময়ী মায়ের জাত। অধীর আগ্রহে তাঁদের প্রেস্তার করে ফেলত। তাঁরা জোরজবরদস্তি করে কৃষ্ণের পদ্যের মত হাত ছপানিকে ঘরে ফেলতেন; ঘরে ঘরে নিয়ে তুলতেন কৃষ্ণকে, ... বন্দী যেমন করে ঘরে তোলে নৌভাগ্যকে। তার পরে ঘটা করে বান করিয়ে দিতেন, গা মেজে দিতেন কৃষ্ণের। চতুর্দিকে যেন অঝোরে ঝরে পড়ত সীমাহারা এক মেহসাব। দরবারতীরা কৃষ্ণকে খাইয়ে দিতেন সব-ননী-ছানা। খাইয়ে-দাইয়ে সহচরদের সঙ্গে পাঠিয়ে দিতেন ঘরে।

৫৬। সেদিন ধুলোখেলায় মেতেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। হঠাৎ তাঁর কী যেন কী খেয়াল হল। অমুগাশিগী ব্রজভূমির মাংসাত্ম্য বাড়ানোর উদ্দেশ্যেই হোক বা নিজের জঠরগত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটিকে পবিত্র করার উদ্দেশ্যেই হোক, এক খামচা মাটি তুলে হঠাৎ তিনি পুরে দিলেন মুখে। আশ্চর্য্য, খেয়ে ফেললেন মুক্তিকা! শ্রীবলরাম দেখে ফেললেন কী! সহচরেরা সকলেই স্তবোধ বালক। তাঁরা আর সস্থ করতে পারলেন না। গুতপ করলেন চরের বৃত্তি। তাঁরা যে সবাই শুভের চর, অন্ততের চর; বলরাম তাঁদের সাথে নিয়ে একদোড়ে পৌছে গেলেন ব্রজবাসীর কাছে। বললেন—মা, মা, কৃষ্ণের লোভ কিছুতেই কমবার নয়। এট একুণি সে মাটি খেয়েছে। আমাদের কথা গ্রাহ্যই করছে না। বতই বলি খেও না খেও না, ততই তার প্রবল হচ্ছে লালসা।

৫৭। এমন কথা শুনে ডাল লাগে কোন্ মায়ের? শুনেই তো মা একেবারে রেগে টঙ। দৌড়ে গিয়ে একগাছি লাঠি নিয়ে চললেন। চোখের উপর ভুরু বাঁকিয়ে 'চোখ পাকিয়ে তর দেখিয়ে বললেন—ওরে অদাস্ত ছেলে, মাটি খাচ্ছিল কী বলে? পৃথিবীতে চিনি-মিছরি কি কিছু মেলে না? মাটিতে কোন স্বাদ? পরের ঘরে ঢুক, চুরি করে অপরাধ করে, সেদিন আমার ঠকানো হয়েছিল, এবার আর পাব পাবে না। দোষ ঢাকা দেখাচ্ছি। আগে তো এমন ছিলি না? এই তোমার দাদা রয়েছে, এই তোমার সাথীরা রয়েছে, সবাই তো তারা সাধী।

৫৮। জননীর ডরে কৃষ্ণ তখন অস্বীকার করলেন সমস্ত। অপরাধী হয়েও নিরপরাধীর মত হুল করে ছ'নয়ন ভাসিয়ে ফেললেন অলীক নয়ন-জলে। যেন অনীতি দোষ ঋণের জগ্জেই বললেন—মা, কই, আমি তো মাটি খাইনি। এরা সবাই মিথ্যে কথা বলছে। যদি না বিশ্বাস হয় আমার মুখের জিতরট্যাঙ, দেখ। ব্রজরাজমহি বললেন—বেশ, হাঁ কর দেখি?

বলতেই, নিখিল সৌভাগ্যবান শ্রীভগবান অদন্তগহন ধীর ভব,

তিনি প্রথমে একটু হাসলেন, তারপর ব্যাধান করলেন তাঁর বদন। এবং সেই হাঁটুর মধ্যে বশোমতী প্রথমে দেখতে পেলেন ভুলোক। সেই অচলা পৃথিবীতে কত পারাবার! সাগরযেরা সপ্তাস্তরীণ! তরী জীর মায়াব। গভীর গজ্জনে চুটে চলেছে নদ-নদী! বিপুল তাদের দৈর্ঘ্য। কত কানন, কত উপবন! বাতাসে হুলছে লতা তরুণ্য। যুগ, যুগরাজ ঘুরে বেড়াচ্ছে, দূর যেরুলোক পর্যন্ত কত পাহাড়ে।

তারপরে তিনি দেখতে পেলেন নাগলোক। নাগনায়েকেরা উজ্জ্বল করে রয়েছে পাঁতাল, কাছে বসে সেবা করছেন নাগ-নাগরীরা।

তারপরে বশোমতী দর্শন করলেন ভুবলোক। সেই অন্তরীক্ষ পথকে দিন করে বেখেছে কত তারকা, কত গ্রহ, কত নক্ষত্র!

তারপরে দেখলেন স্বর্লোক। গন্ধর্ব সিদ্ধ ভিন্নর চারুণ বিভাষেরা সেখানে রাজমান। বিভার আধাবভূত মরীচি আদি মুনিগণ তথায় ধ্যানলীন। তাঁদের দিব্য অস্তিত্বেই স্বর্গ এত শোভাময়, যশের এত আভাময়।

দেখলেন মহর্লোকাদি অন্ত লোক। দেখলেন অধোগামী ও উর্ধ্বগামী জীব নিকয়ের কায়ায় ভরা এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড। তারপরে দেখতে পেলেন নিজেকে নিজের পতিকে, নিজের ছেলেকে, এমন কি সমগ্র ব্রহ্মলোকটিকেও।

৫১। দেখেই,—

এ কি আমার ভ্রম না স্বপন?

এ কি দেবতার মায়া, না ইন্দ্রজাল?

না, না, এ কি আমার এই গোপালেই জায়ক-শক্তি?

ভেবে কিছুই নির্ণয় করতে না পেরে বশোমতী ঘোর যোহে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। তারপর প্রাধিকান করলেন অনন্তবেগময়ের বৈভব। কিন্তু এত দর্শন এত পাণ্ডিত্য সবেও তিনি কিছুই যেন ভুলতে পারলেন না। তাঁর কেবল মনে হতে লাগল—যাঁর আমি অধীনা, যাঁর কাছে আমি আ-বৃত্তা, তাঁর কৃপাতেই আগা, আমার এই দর্শন হল। তিনিই আমার শরণ। তিনি অমৃত, অত্যাশ্চর্য্য, মহান। অলৌকিক ঐশ্বর্য্য দেখিয়ে তিনি নিশ্চয় মোহে ফেলতে পারেন মহেশ্বরকেও। এই প্রজ্ঞাই তাঁকে যেন জানিয়ে দিল, তাঁর নন্দনটি অতএব ঈশ্বর।

কিন্তু জননী শ্রীধরোদার মন চাইল কৃষ্ণকে পুত্রভাবে। ঈশ্বরভাব ও পুত্রভাব—দুই ভাবের শোভার অতি ভারে তিনি যেন একেবারে ভেঙে পড়লেন। পুত্রভাবটিকে বিসর্জন দিয়ে আঁকড়ে ধরে রইলেন চরম ভাবটিকে। যেমন করে আঁকড়ে ধরে রইল তাঁর কোল— তাঁর লীলা-শিশুটিকে, তাঁর নন্দ-হুলালটিকে।

ইতি যুগভঙ্গ-সকলো নাম পঞ্চমঃ স্তবকঃ।

যষ্ঠ স্তবক

১। একদা,—বাল-ভগবান তখন শৈশব-কলায় কৌশলী হয়ে উঠেছেন, নন্দরাগীর সব চুল, নিজেই দধিমস্থন করবেন। ষড়তি দাসী। তিনি তাদের কার্য্যান্তরে পাঠাতে চাইলেন, বললেন, যা তোরা—কিন্তু বললেই কি তারা বেতে চায়? শেষকালে হুকুম করলেন। হুকুমেরই জয় হল। হেরে পালালেন দাসীরা।

মা তখন বসলেন দই মইতে। আর নন্দ-হুলাল পাঁড়িরে পাঁড়িরে দেখতে লাগলেন—দধিমস্থন।

শোভায় ধরধর

সুন্দর মনোহর—

সেই দধিমস্থন।

নন্দরাগীর অমলকোমল দুখানি করুণর একবার টানে একবার ছাড়ে মধুনদায়, তারপরে আরও জোরে, ধামার আর নাম নেই। একটু একটু করে ভেরে আসে হাতের পাতা। তবুও এই আকর্ষণেরই কেমন যেন একটি মহিমা আছে। জাগায় আনন্দ। মণিবন্ধের বলনিষ্ঠে তাই বন্ধার দিগে নাটকে নাচ নেচে ওঠে পাল্লার গোছা-গোছা বালা, আর বন্ধারের ললিত মুখরতার স্নান হয়ে যায়—পদ্মের পাশপড়িকে ঘিরে ভ্রমরের নেশা ধরালে গুঞ্জন-গান। হাতজনক হয়ে ওঠে নন্দরাগীর দুখানি সেই ভোগের বাহুর ব্যবহারের বহর। হুটুই যেন দণ্ডন-পশুিত। ঘামে ভেসে যায় শ্রীধরোদার গা।

দই মইতে থাকেন মা।

আর তাঁর কপালের অলকগুচ্ছ লাফিয়ে লাফিয়ে নাচতে থাকে ললিত-ললিত। যে মণিহার কাঁধের উপর দিয়ে তাঁর পীবর শুনতট ঘিরে নেমে এসেছে, যন-যন আলোলিত হতে থাকে সেটি; দোলনের মিশ্রহলে সঙ্গে সঙ্গে হুলতে থাকে তাঁর কণ্ঠলিকা।

তখন কী সুন্দর যে দেখতে হয় কানপাশার মণি-কিরণ মঞ্জরী। হুকানের বন্ধকে পাশ দেয় অবিচ্ছিন্ন করে পড়ে সে লাবণ্যের সুধাবারা। মাধুরের আলো, ছিটিয়ে আরো যেন মোহন করে তোলে নন্দরাগীর ঘাড় আর কাঁধ।

আর তখন মণি-মেখলা বাজতে থাকে কণ্ঠকণ, মঞ্জুলা ও পৃথুলা শ্রোণির শোভার গরবে গরবিতী সে। মণিমেখলা বেকে বেকে বাজতে থাকে কণ্ঠকণ।

দই মইতে থাকেন মা।—

শিখিল হয়ে যায় কবরীর শিল্প-বিভাস, চুল থেকে ধসতে থাকে মণি আর ফুল; রাত্রির তারাদল যেন সোপান বেয়ে নেমে আসেন ধংগীতে।

আর একটা মস্ত হা-করা দধির ঘড়ার দই মইতে থাকেন মা। ঘড়ার মধ্যে হুলে হুলে ফুলতে থাকে যন-ঘোর এক শব্দে সমুদ্র। হুলাং হুলাং উথলে উঠে ছিটকে পড়ে বোল। সোনার শাড়ীর ভেসে যায় আঁচলা। আর সেই সঙ্গে মাঝে মনেও চলকাতে থাকে গর্জ। বলি, এমন নতুন ঢঙে আর কি কেউ তুলতে পারেন ননী! এত ননী? আঃ মরি মরি, তনয়টি আবার লুভী চোখে পাঁড়িরে পাঁড়িরে দেখছেন, ঘামে ভেসে যা নন্দরাগীর গা।

মাঝের চোখে চোখ পড়তেই বালকৃষ্ণের কেমন যেন হঠাৎ হুলহুলে তরল হয়ে যায় মন। তাঁর সাধ হয়, মাঝের বুকে দুধ থাকেন। তাই নেই-কিদের অভিমন্যু করে বলেন—

মা মা, আর দই দিসনি মা। দেবী হয়ে বাচ্ছে। আ আমাকে কষ্ট দিসনি মা! আমি যে তোমার দুধ খাব। বললে বলতে মাঝের হাতের মধুন-দণ্ডটিকে আঁকড়িয়ে ধরেন কৃষ্ণ। আ

সে কি বে আঁকড়ে-ধরা! উপস্থিত দাসীদের এক নিমেষেই বের্ন হয়ে বায়—মনোমহন।

২। কী অনন্ত রমণীয় চরিত্রের বাবা ছেলের! হেসে উঠলেন দাসীর দল।

ঐ এক রত্তি হলে হবে কি!

অন্নরাণী তখন মৃদুদণ্ডটিকে বিসর্জন দিয়ে কোলে তুলে নিলেন তাঁর কুককে। কী কৌকড়ানো কৌকড়ানো একমাথা চুল! দুধ দিতে লাগলেন মা।

এমন সময় শ্রীৰাশোদার কানে এল, কোথায় যেন সোঁ-সোঁ করে একটা শব্দ হচ্ছে। ঐ বে, ঐ বুঝি দুধ উথলোলো। নিজের ঘরের কাছেই উঠুনে দুধ চাণিয়ে এসেছিলেন—পুত্রের জন্তে। বাতাস পেয়ে ঝলে উঠেছে উঠুনে, গনগনে আঁচে সোঁ-সোঁ করছে দুধের কড়া! কুককে স্তন-তাগ করিয়ে তিনি তখনি তাঁকে বসিয়ে দিলেন ঘরের ভিতর এবং ছেলে ফেলে চলে গেলেন দুধ সাইলাতে।

নন্দহুলাল বেগেই লাগল। নিমেষে এঁটে ফেললেন মতলব। তারপর উঠে পড়লেন সেখান থেকে। ভাড়াভাড়ি। তার পরে শিলের নোড়া দিয়ে ফাটিয়ে দিলেন দই-এর বড় খোয়া। ভাঙলেন তো বটে, কিন্তু রাগে আর ভয়ে তাঁরও মনখানি ভাঙতে লাগল। কারণ, চতুর্দিকে তখন সাপের মত একে-বেকে ছুটে চলেছে মাঠা-তোলা দই-এর শতধারা। ধূরে যাচ্ছে চৌকাঠ, এখন কি করা যায়?

নন্দহুলাল রক্ত করে লক্ষ্য দিলেন পাশের ঘরে। ঘরে লুকানো ছিল, মাহুঘের চোখে না পড়ে এমন স্থানে, নবীন নবনীতোলা স্তুত। নব প্রবেশে নবীর ষিটিকে নামালেন। একটু খেলেন, হাতের তেলোর সংগ্রহ করলেন একটু। নিতে নিতেই যেন মন থেকে সম্পূর্ণ ধূর হয়ে গেল রাগ। মা দেখলেই কিন্তু বিপদ! অতএব তিনি, যিনি দেব-দেবেন্দ্রাদি-বন্দিত নন্দহুলাল, তিনিও মায়ের ভয়ে ষিটিকে হাতে নিয়ে চরণ ফেলে পালালেন।

পলায়নের সপক্ষে ঘরের পাশেই ছিল পক্ষধার। দ্বার দিয়ে বেরিয়ে এলেন বাইরের আড়িনায়। রক্তমঞ্চে দেখাবার মত কীর্তি বটে নন্দহুলালের! আড়িনায় ছিল উদ্বল। গম ভাঙবার সময় মন তখন। তাই অধোমুখী ছিল। সেই উদ্বলের পিঠে হস্তদস্ত হয়ে চড়ে বসলেন খলনিহস্তা শ্রীকৃষ্ণ। এবং জননীর শুভাগমন-পথের পানে সাবধানী নয়ন হানতে হানতে খাওয়ার লেগে গেলেন নবনীত, বীদর-ছানাদের।

৩। এদিকে নন্দরাণী ঝাল থেকে দুধের কড়া নামাতে এসেছেন।

নিজের সৌভাগ্যমহিমার জগৎজন্মের যিনি ত্রাণকর্তা, তিনিও কড়া নামাতে নামাতে ভাবতে লাগলেন—

ভাগ্যদেবতার কী অপার কৃপণা! এমন ছেলে কি কারো ঘরে রয়েছে, না কেউ পেয়েছে? অমাত্যের পুণ্যের জোরেই আজ আবার এত মান, ধন! ভাবতে ভাবতে বশোবিভার সৌন্দর্য-ম্রাতা হয়ে উঠলেন শ্রীৰাশোদ।

দুধের কড়া নামিয়েই, কুককে কোলে তুলে নেবার জন্তে নন্দরাণী ফিরে গেলেন সেই ঘরে, যেখানে তিনি বসিয়ে রেখে এসেছিলেন

তাঁর হুলালকে। গিয়েই দেখেন তখন নেই। চমকে উঠল অন্তর। কোথায় গেল সে, অমুসন্ধান করলেন। তারপর হঠাৎ তাঁর হৃদয়টিকে ব্যথিত করে দিয়ে তাঁর চক্ষু দুটি তাঁকে দেখিয়ে দিল, সামনে ভেঙে পড়ে রয়েছে দধি-গর্গরা; ঘোলের মোটা মোটা অল্পস্বারা ছুটে চলেছে; ধারার ভেসে গেছে ঘরের মেঝে, শালা হয়ে গেছে, পিছল হয়ে গেছে। গুরুতর ব্যাপার! কী জোরেই না ভেঙেছে বড়া! খোলামকুচি হয়ে গেছে।

মায়ের বিষয় বলে উঠল, কী করে হল? হঠাৎ কেমন করে ভাঙল এত বড় ঘোলের বড়া? যীতি নির্ণয় করতে পারল না। তারপরে কিভাবেই বিষয়ের চোখে পড়ল, নোড়া!

এ আমার হুটুটির কাজ ছাড়া আর কারো নয়।

...বিষয়-চিকুর হেসে উঠল মায়ের নয়নে। বায় হাতের ললিত তর্জনীটি লটকিয়ে গেল নাসার শিখরে। চকিত অভিমানে আঘাত লাগা সত্ত্বেও মলিন হল না শুভদ্রব্দ। বরং হৃদয়ের দয়া হল।

কৃত্রিম ক্রোধে জ্বলার দিয়ে সেই তারপরে নন্দরাণী ছেলের সন্ধানে বাইরে বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন, অমনি তিনি দেখতে পেলেন—তাঁর ছেলেটি—তজ্জের প্রতাপ ধীর অপ্রতিহত, চূরির লীলার বালাই নেই ধীর গর্জের, তিনি সত্যে লাফিয়ে নেমে চঞ্চল পায়ে ছুটে পালাচ্ছেন।

মায়ের বকুনিকে বড্ড ডর, না? পরাক্রমের অন্ত নেই, না। পাছু পাছু ছুটলেন জননী। কিন্তু জননীটি পটায়নী মহীয়সী মহিষী হলে হবে কি? তিনি তাঁর শ্রাম রঙের দুধের শিশু মোহন দেবতাটিকে ডাকতে লাগলেন—

পাড়া, পাড়া, জগতের পরলা ধুত, ওরে আর দৌড়স নি।

৪। মা বত ডাকেন, ছেলে তত পালায়। বাঁকা অভিমানে উচিয়ে উঠেছে ছেলের মন। দৌড়ন আর ফিরে ফিরে যাও ফিরিয়ে তাকান, মা আসছেন কি আসছেন না। বখনি দেখেন, ঘেরে আসছেন মা, আলোর বলমল করছে মায়ের পা, তখনি আবার নতুন করে অতি ভয় জাগে মনে। আবার কৃষ্ণ পালায়। ঐ দেখ—

নন্দহুলাল তুর্ণ গতিতে দৌড়ছেন, মায়ের দিকে যুহুহুহু: চকিত নয়নে চাইছেন, মনোহরণ ভঙ্গিমায় গ্রীবাখানি ঘুরোচ্ছেন। তার পরে ঐ দেখ কাণ্ড—পিছন দিকে চোখ দুটিকে নাচিয়ে নাচিয়ে যেন ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে—হুঁম, ওঃ, আঃ, হাঃ কাতরাতে কাতরাতে যেন চেষ্টার ঘটেছে কতই না ব্যাঘাত—হঠাৎ তিনি জমে গেলেন! চলে পড়লেন আড়িনায়। আর, কৃত্রিম ক্রোধে তব জননীর মন ঐতল হয়ে গেল যুহুহুহুতে।

৫। নন্দরাণী তখন বললেন—ওরে হুর্গু ছেলে, অমনি করে আর কত দৌড়বি, কোথায় বাবি? আর দৌড়সনি বাছা, জিরো।

কথাও বলছেন মা, আর তার নন্দহুলালও ততক্ষণে হাত ফসকিয়ে নাগালের বাইরে দাঁড়িয়ে বলছেন—বদি মা আমায় না মারিস—আর হাত থেকে লাঠিটা বদি ফেলে দিস, তবেই আমি পালাব না...জোরে...দূরে।

মা। মার খেতেই বদি তোয় এত ভয়, তাহলে আজ খোলের বড়া ভাঙলি কেন?

কৃ। সত্যি বলছি মা, আর আমি করব না, হাত থেকে মা লাঠিখানা ফেলে দে।

৬। পুত্রের কথা শুনে কিঞ্চিৎ আশ্চর্য হয়ে গেলেন ব্রজবাণী। বাইরে ক্রোধের তাণ্ড কলিয়ে যেই কাছে এগিয়ে গিয়ে ধরতে যাবেন তাঁর ছেলেকে, অমনি কৃষ্ণ টেনে দৌড়। পাছু পাছু দৌড়লেন মা। মায়ের দৌড়নি দেখে সত্যিই ব্যাকুল হল কৃষ্ণের মন। এবার বললেন—মা, তোর হাত থেকে ঐ ভয়ঙ্কর খবখবের লাঠিখানা ফেলে দে মা! আগে সত্যি করে বল আমার মায়বি না মা, তাহলে আমি তোর কাছে বাব। তুই তো বা আর পাপ করিস নি।

কচি কচি কাতর কণ্ঠের মিনতি শুনে ব্রজবাণী হাত থেকে শেষে ফেলে দিলেন লাঠি।

দূর থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বালকৃষ্ণ দেখলেন, দৌড় বন্ধ করে এবার বসলেন জিরোতে।

৭। কৌতূহলের এই আতিশয্যটি দূর দূরালোক বসে অবলোকন করছিলেন দেবতার। প্রথমে তাঁদের মুখে ফুটে উঠল প্ৰথম বিস্ময়, তারপরে বিস্ময়ের ভাঙ্গ, তারপরে হাস্যের প্রীতির প্রসন্নতা। অহো অহো, করে তাঁরা মুখচাওয়া-চাওয়ি করে বলতে লাগলেন—অত্যাশ্চর্য, অত্যাশ্চর্য! অস্ত্রের কথা ছেড়ে দিন। যে ভয় পরাক্রিয়ুগের অবশানে ব্রাহ্মণও জন্মে নিয়ে আসে পরম বৈকল্য, সেই ভয়ই আবার নিত্যকাল ধরে ভয় করে চলেছে বাক, সেই তিনিই কি না অতি ভীত হয়ে পড়েছেন—মায়ের হাতে! ঠাঙ্গা দেখে! অত্যাশ্চর্য, অত্যাশ্চর্য!

৮। নন্দবাণীর তখন নিঃশ্বাসের বাতাসে ঘল ঘন কাঁপছে কক্কলিকার অঙ্কল, শ্রমজলের কণিকায় অলঙ্কৃত হয়ে উঠেছে বদন-সর্বোজ। শিথিল হয়ে পড়েছে কুন্তলকলাপ; ঐ একটুখানি দৌড়ানতেই অবসর হয়ে পড়েছে চরণ-কমল।

ঘীরে ঘীরে তিনি ছেলের হাতখানি ধরলেন। দীন-নয়নে কৃষ্ণ তখন বলে উঠলেন—মা, আর আমাকে মায়বি না মা, বল? আমার কক্ষণে মারিসনে মা!

বলতে বলতে পুত্রের পদ্ম-জাঁধি পূর্ণ হয়ে গেল অশ্রুকণায়। নবীন পদ্মের পাণ্ডুর মত হৃৎখানি করতল দিয়ে ছেলের তখন সে কী চোখ-পাঁছবার ঘটা! কণ্ঠের সে কী আধ-আধ গুঞ্জন! কোলা-কোলা চাদমুখে সে কি সুখাবিন্দুর নিঃস্রাৱ! ভীত-ভীত সে এক অভিনব ক্রন্দন। বিলোকনীয় হয়ে উঠলেন শ্রীমান নন্দহুলাল।

মা তখন ঠিক করলেন—কিছুক্ষণ একে বেঁধে রাখতে হবে। যদি না বাঁধি, তাহলে বা রাগী ছেলে, কখন আবার কোথায় বনে জঙ্গলে রাগের ঝোঁকে পালাবে। সম্প্রতি ওকে বাঁধি। ছেলের মহিমা বোকা ভায়!

অতএব বিকশিত চাক্ষু-রক্ত কুন্তলগুলিকে নিয়ে নন্দবাণী নিকটে এলেন উত্থলের। কখন আবার কি বোঝবে বসবেন ছেলে। বন্ধনের বিহিত ব্যবহার উদ্দেশ্যে তিনি ভাক দিলেন—

ওলো কুহঙ্গবতি, লবঙ্গবতি, বেশ নয়ম আর মোলায়েম দেখে এক গাছি পাটের দড়ি নিয়ে আর তো...তাড়াতাড়ি।

১। পট-লাম নিয়ে তাঁরা এলেন। জগতের বিনি অবিভীত বন্ধু, তাঁকেই বাঁধবার জন্তে এত বড় ব্রহ্মখরী! ভাতের ভিতরে দড়ির কোমলতা অমুভব করে তিনি আনন্দিত হয়ে উঠলেন।

দেখতে দেখতে আঙিনার উপস্থিত হয়ে গেলেন ব্রজপুরের কয়েকটি পল্লীবাসিনী। তাঁরা সকলেই যেন সম্পদের মীলাবনী, বাৎসল্যরসের সাবমণি। তাঁদের ছেলেবাও এসেছেন তাঁদের সঙ্গে। তারপর বা ব্যাপার ঘটল! সেটি এই—

পটলাম দিয়ে প্রথমে যেই কৃষ্ণের কটিদেশটিকে বেঁধেন করতে গেলেন ব্রজবাণী, দেখলেন হুঁআঙুল কম পড়ে গেছে ঘেরে। আর একগাছি দড়ি আনিয়া গিরো দিয়ে আবার জড়ালেন কটিদেশ, দেখলেন সে দড়িও ঘেরে কম পড়ে যাচ্ছে হুঁআঙুল। আর একগাছি জোড়া দিলেন দড়ি। তাতেও সেই হুঁআঙুল কম। ব্রহ্মের মত হাস-বুড়ি বহিত হয়ে বইল পটলাম।

১০। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাঁর দেখতে লাগলেন পূবজীরা। কিন্তু ব্রজবাণীর কোণাবেশ কিছুতেই কমছে না দেখে ক্রোধান্নিকে নিমূল করবার উদ্দেশ্যে পল্লীবাসিনীরা বলে উঠলেন—

ধন্নি মহারাগী ধন্নি। জগতে এমন ভাগি আর কেউ কখনও করেননি। আশ্চর্য কাণ্ড! কৃষ্ণের কোমরে ঐ তো...সুতোয় মত...পড়ে রয়েছে সোনার মেখলা। ঐ তো অত তোট। কিন্তু অবাঁক কাণ্ড, এখন যত্নর সমস্ত দৃষ্টি দিবেও...বাঁধন হোস না গো, ...কুলোলে না! বলেন কি মা-জননী, সারা দড়ি জুড়েও সেই হুঁআঙুল কম! নিশ্চয়ই বহুগ আছে মা, রক্ত আছে। আর থাক...এবার ক্ষান্তি দিন।

পল্লীবাসিনীদের ক্ষান্ত হল বচন, কিন্তু অনন্ত হল ব্রজবাণীর বিস্ময়। কৃষ্ণের কীর্তিটি কতদূর গড়ায়, দেখতেই হবে, এই স্থির করে মুখে হাসি টেনে তাই বললেন, আমার ঘরে এই বকমের আর তো দড়ি নেই। আপনাদের বীর বীর ঘরে আছে, নিয়ে আনুন তো সেগুলো।

পূবজীরা পল্লীবাসিনীরা দড়ি আনতে যে বীর ঘরে দৌড়লেন। রাগের মাথায় বা শত্রুতা করে বা ব্রহ্মখরীর আদেশে ভয় পেয়েই যে তাঁরা দড়ি নিয়ে ফিরে এলেন তা নয়, আনন্দের পরম কৌতূহল এবং লোকাতীত চরিত্র দর্শনের উগ্র আগ্রহ, তাঁদের দড়ি হাতে কিরিয়ে নিয়ে এল ব্রজবাণীর আঙিনায়। নন্দহুলালের কাঁরা তখনো ধামেনি। শৈশব-নাট্যের পারিপাট্য দেখিয়ে তিনি তখনও অঝোরে স্বরাচ্ছেন নয়নকমলের জলকণা, চোখ ঘবতে কতই না যেন বাধা পাচ্ছে তাঁর পদ্মের মত কোমল হাত। তাই কীদেহন। কাঁরাও এত মিষ্ট হয়! সেই কাঁরার সারগাম কোমলের চেয়েও কোমল, সেই কাঁরার অ আ ক খ যেন গদগদগদন-বাণী ভাবের।

[ক্রমশঃ।

পুণ্যে-পাপে হৃৎ-সুখে পতনে-উপানে

মাছুব হইতে দাও তোদার সন্তানে।

—ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর



পাঁচদিন বথানিয়মে শুরু হলো ওদের বাত্মা। একটু পরেই তিয়েলিং বললেন, আজকের আকাশটা বড় ভালো মনে হচ্ছে না। আকাশের বটা বেন ঘোলাটে হয়ে আসছে। বৃষ্টি শুরু হলে আমি আশ্রয় হবে না।

সত্যিই তাই, আব ঘণ্টার মধ্যে কিম-কিম করে বৃষ্টি আরম্ভ হলো। একে ঐ দুর্গম পথ, আপনা হতেই পা শ্লিপ করে, তার ওপর আবার বৃষ্টি! একটা টাট একবার পা হড়কে হুমড়ে পড়লো।

সকলেই আড়ষ্ট হয়ে উঠলো ভয়ে। খুব সাবধানে হাঁটছে আর পাথর দিকে প্রথমে দৃষ্টি রাখতে হয়েছে।

ক্রমে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়তে থাকে। তিয়েলিং বললেন, বেশী দূর বাওয়া বাবে না এ-ভাবে।

উপায়? ভিগেস করে শান্ত হু।

কোনো জায়গায় তাঁবু খাটিয়ে বসে অপেক্ষা করতে হবে। বললেন তিয়েলিং।

কিন্তু, কোথায় বসবে তারা, দাঁড়াবার স্থান পর্যন্ত নেই। এদিকে একটানা ঝিরঝিরে বৃষ্টি চলছে। চোখের সামনে সমস্ত



[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ক্রীশেল চন্দ্রবর্তী

দৃশ্যট বেন হুয়ে দিয়েছে কে। একটা ঘোলাটে পাণ্ডু রংয়ের বাপ-ববনিকা বেন চারি দিক আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

হঠাৎ একটা শ-শ-শ করে শব্দ ভেসে এল সবার কানে। শেরশাদের নেতা চিংকার করে উঠলো, সাবধান! ধস নামছে!

কোথায়? কোন দিকে? সকলের কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসে ঐ একই প্রশ্ন।

চোখের সামনে তিরিশ গজ দূরের জিনিস নজরে আসে না। দেখেই বা কি করে? ওদের পায়ে তলার মাটি সরছে নাকি? যদি সরেই বা, যদি ওদের ঠিক ঐ জায়গাটি পাহাড়ের গা থেকে খসে নেমে যায়, তা হলেই কি? কয়বার কি আছে? আগে শ্বেলেও বিপদ। পেছনে হটলেও বিপদ থাকতে পারে। তিয়েলিং বললেন, চণ্ডা বাস্তা চেড়ে সর পথটার এসে দাঁড়াও, রক্ষা পেতেও পারি।

লালীর মনে হলো, যেন তার সর্বাঙ্গ পাথর হয়ে গেছে। কিশোরেরও বুক শুকিয়ে গেল। বঁবাবঁবি করে দাঁড়ালো সকলে, বায় ভো সকলেই মরবে একসঙ্গে।

আবার একটা আওয়াজ শ-শ-শ। আকাশের দক্ষিণ দিকে মেঘের একটা ফাঁক দিয়ে এক বসক সূর্যালোক এসে পড়লো। সে আলোটা বেধানে এসে পড়েছে, গলানো রূপোর মত সেখানটা ঝক-ঝক করে উঠলো। সেট আলোয় দেখা গেল প্রায় দু'শ হাত দূরে পাহাড়ের গা থেকে পাথর আর বরফের বিরাট একটি অংশ খরে বাচ্ছে নীচে। ক্ষীণ একটি আওয়াজ আর তার সঙ্গে মনে হলো, কী মোলায়েম ভঙ্গিতে নেমে চলেছে। সঙ্গে বা পড়েছে, তাকে নিয়েই নামছে। দু'হাজার ফুট নীচে এক বরফগলা নদীর প্রোতের সঙ্গে নিম্নে গেল ও-গুলো।

ওরা দেখলো ঐ দুগু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। এ বেন মৃত্যুর প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকা।

কতক্ষণ যে ঐ ভাবে ছিল তা ওরা জানে না। তবে কুজ-কটকা সরে গিয়ে আবার বধন বোদে ঝল-ঝল করে উঠলো চারদিক, আর আকাশটা হয়ে গেল ঘন নীল, তখন ওরা বুঝলো যে ওরা নিরাপদ হয়েছে। অন্ততঃ তখনকার মত।

তিয়েলিং বললেন, মনে রেখো, আমরা বরফের রাজ্যে পা দিয়েছি। যে দুগু তোমরা দেখলে, এ সব এখানকার নিত্য ঘটনা। এখানে আছে বরফনদী, আর আছে ছুটন্ত বরফের পাহাড়, বাক বলে গ্রেসিয়ার। এরা হচ্ছে মৃত্যুর দূত। আমাদের ভাবন এখানে অতি তুচ্ছ জিনিস। এক সূংকারেই তা নিবে যায়। আমাদের দেহের কতটুকু সামান্য উত্তাপ। এক নিমেষেই তা জমে হিম হয়ে যেতে পারে। বঁচে থাকা এ রাজ্যের নিয়ম নয়। তাই তাকে গ্রাস করতে শত শত মৃত্যুদূত ছুটে আসে।

তিয়েলিং-এর কথাগুলি ওরা মন দিয়ে শুনছিল। চোখের সামনে ওরা দেখলো, ভূবারধবল শিখরের পর শিখর। উঁচু-নীচু সারে সারে দাঁড়িয়ে। তাদের গায়ে অপরাহ্নের সূর্যালোক বেন সোনা ঢেলে দিয়েছে।

ঐ হচ্ছে কাঞ্চনজঙ্ঘা। বললেন তিয়েলিং। কত কাছে অথচ কত দূরে। রূপকথার কত গল্প আছে ওকে ঘিরে। ঐ যে দেখছো বরফের ওপর সাদা ধোঁয়া, ওগুলো নাকি হিমপরীদের নিঃশ্বাস। মাহুঘের প্রাণের উত্তাপ নেই এখানে।

একটি মাত্র ছেলে এখানে এসেছিল। কত দিন আগে, কেউ তা জানে না। তার মা ঐ রূপোলি বাস্প হয়ে তাকে নাকি ঘিরে ধাক্কাতে।

সেই স্মৃতি, আশ্চর্য্য ছেলে ঐ স্মৃতি। শুধু বরফের ওপর দিয়ে নেচে নেচে বেড়াতে। খেলা করতে তুষার নিয়ে, সাঁতার কাটতে হিমপ্রবাহের জলে। তবু সে জমে যায়নি। তার বকে ছিল মানুষের হৃদয়। ছিল সেখায় ভালবাসা। কাকনজজার সোনালি সোনালি পরীদের সঙ্গে ছিল তার ভাব। দুটো হিমপরীরা তার কোনো ক্ষতি করতে পারেনি। দিনে দিনে স্মৃতি বড় হলো। দীর্ঘ ঋতু পাইন গাছে উঠে যেত তর-তর করে বুনো ভালুকের মত। জাবার তেমনি অবলীলাক্রমে তর-তর করে উঠে যেত পাহাড়ের খাড়া চূড়ায়। কী দুটোই ছিল স্মৃতি।

কাকনজজা তখন নাকি ছিল শুধু সোনার পাহাড়। তাই নাম হয়েছে কাকনজজা। শুধু তাই নয়, সেখানে এক রাজার নাম শোনা যায় যার গুহার গুহার ছিল অপরিমিত সোনা। সেই সোনা দিয়ে সে তার সমস্ত প্রাসাদ মুড়ে রেখেছিল।

তোমরা বলবে, এই কনকনে ঠাণ্ডা বরফের দেশে এ কেমন রাজা! এ কেমন রাজ্য? প্রশ্ন করতে পারো। কিন্তু, যে সময়ের কথা বলছি, তখন হয়তো এমন মানুষ ছিল যারা বরফের রাজ্যেই বাস করতে পারতো। আজও ত চিরস্থায়ী মেরুদেশের কাছে এক্সিমোরা বাস করে। পৃথিবীতে কোনটাই বা অসম্ভব!

তিয়েলিং একটু চূপ করলেন। হঠাৎ তাঁর দুটি পড়লো দু'বে কিসের ওপর।

লালী অধীর হয়ে বলে উঠলো, কই, লামাজী মাকপথে খামলেন কেন? আপনি স্মৃতির গল্প বলেন কিন্তু একটা আপনার লোক, আপনি শেষ করেন না।

কিশোর বলল, ঠিক তাই। মিমি আর এর গল্পটা যেমন। ওদের শেষ পর্যন্ত কি হলো, তা আর বললেন না।

তিয়েলিং একটু হেসে বললেন, ও তাই নাকি? এটা আমার ভাবী অন্তায় হয়েছে বলতে হবে। কিন্তু, কি জানো, ওদের শেষটা আমারও জানা নেই। আমার মনে হয়, পৃথিবীর বেশির ভাগ গল্পই শেষটা অজানা থেকে যায়। কি যেন একটা রহস্য ঢাকা পড়ে যায় শেষটা। জোর করে শেষ করলেও একটা রহস্যের বেশ থেকে যায়। বাক, এখন আমি অজ্ঞ কিছু ভাবছি—ঐ যে নীচে একটা কি পড়ে আছে মনে হচ্ছে? শেরপাদের সঙ্গে নিয়ে তোমরা কি একটু অন্বেষণ করবে?

নিশ্চয়ই। কিশোর লাফিয়ে উঠলো। শান্তনুকে নিয়ে আমি গাছি।

ওরা দুজনে ঢালু পাহাড়ের গা বেয়ে নামতে লাগলো নীচে। অনেকটা নীচে নামতে ওরা স্পষ্ট দেখতে পেল, একটা বৃত্তসেহ পড়ে আছে। আর সেটা আর কেউ নয়, সেই শংকরীপ্রসাদের। সবচেয়ে আশ্চর্য্য হলো ওরা, যখন দেখলো যে শংকরীপ্রসাদ কোনো আকস্মিক দুর্ঘটনার মারা যায় নি। পরীক্ষা করে তারা দেখলো, কোনো আততায়ীর পিস্তলের গুলীতে মারা গেছে।

এ অদ্ভুত হত্যাকাণ্ডের মধ্যে থাকার দরকার নেই, বললে কিশোর। চলো আমরা তিয়েলিংকে খবরটা দিই।

শান্তনু বললে, না, শংকরীপ্রসাদের দেহটা খুঁজে দেখতে হবে। আমাদের সেই নক্সাটা যদি পাওয়া যায়। তা ছাড়া অজ্ঞ কিছু গোপন তথ্যও পাওয়া যেতে পারে। এই বলে সে বৃত্তসেহের জামার মধ্যে হাত দিয়ে দেখতে লাগলো। একটা ঘড়ি, কিছু কাগজপত্র, পেন্সিল, একটা বড় ছুরি। অস্ত্রজেনেব সরঞ্জাম ইত্যাদি আছে দেখা গেল। তাছাড়া একটা ব্যাগ ছিল। সেটার হাত দিতে যাবে এমন সময় শুভুম করে এক আওয়াজ! শান্তনুর মনে হলো তার কানের কাছ দিয়ে যেন একটা গুলী চলে গেল। ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুতর। শান্তনুর বুকে দেবী হলো না যে, তারা এখানে এসে একটা মস্ত বিপদের সম্মুখীন হয়েছে। আশে-পাশে একজন বা একাধিক শত্রু লুকিয়ে আছে।

চিন্তা করার সময় নয়। শান্তনু পকেট থেকে পিস্তলটা বার করে নিল। তার পর আশে-পাশে তাকালো। দূরে একটা আঁকা-বাঁকা খাড়া কুংসিত পাহাড়ের চূড়া। ঠিক হাঙ্গরের মুখের মত দেখতে। তার ধারে ধারে কালো কি এক গাছের ঝোপ-ঝাড়। এখানেই কোনো শত্রু লুকিয়ে আছে, আন্দাজ করলো শান্তনু। ঐ দিকে পিছন ফিরে পালানো কাপুরুষের কাজ, নিবৃত্তি তা বটেই।

শান্তনু পিস্তল সামনে ধরে এগুতে লাগলো, পিছনে কিশোর।

হাঙ্গরমুখো শিলাগুণ্ডের কাছাকাছি হতেই ওরা দেখলো দু'জন যেন ঝোপের আড়াল থেকে সরে গেল একটা গুহার মধ্যে।

বাক, আততায়ীরা ভয় পেয়েছে, শান্তনু আশ্বস্ত হলো। সে একটা কাঁকা আওয়াজ করলো। তারপর ওরা শত্রুদের অনুসরণ করলো গুহার মধ্যে। গুহার অভ্যন্তর ভিত্তি স্রোতস্রোতে আর অন্ধকার। শুধু একদিক থেকে দেখা গেল একটা আলোর আভাস। সেই দিকে অগ্রসর হতে ওরা এসে পড়লো একটা খোলা আকাশের মধ্যে। এখানে ওপরের জল চূইয়ে পড়ে পড়ে অসংখ্য থামের ফট্টি হয়েছে। সেই সব থামের আশ-পাশ দিয়ে দেখা যায় নানা সুড়ঙ্গ-পথ। হাজার হাজার বছরের শ্রান্তি জমে আছে কোথাও। কোথাও বা জল বালু পাথরের জমে যাওয়া নানা আকারের বিচিত্র স্থাপত্য।

দুই বন্ধু বিম্মিত স্তম্ভিত হয়ে এদিক সেদিক ঘুরতে লাগলো।

অনেকক্ষণ এই ভাবে কাটবার পর, কিশোর বলে উঠলো, মিথ্যা অনুসন্ধান। শান্তনু, চলো আমরা ফিরে যাই।

ফেরবার রাস্তাই তো আমি খুঁজছি, কিশোর! শান্তনু বললে।

কৃণা তৃষ্ণা ও পরিভ্রমে কাতর দুই বন্ধু বহির্গমনের পথ পেলো না। বেদিকেই যার সেখানটাই নতুন মনে হয়। অপরিমিত ক্লাস্তিতে বসে পড়ে কিশোর।

এদিকে লালী অনেকক্ষণ ওদের আশায় পথ চেয়ে থাকে।

কিন্তু বেলা যখন গড়িয়ে পড়লো তখন তার চোখ ভরে এলো জলে।

সে কাঁদতে থাকে। তিয়েলিং সাহসনা দেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনিও চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তিনি ভাবলেন, শংকরীপ্রসাদকে কেন্দ্র করে এ কী নাটকের মধ্যে জড়িয়ে পড়লেন তিনি।

বৃদ্ধ লামার কপালের চর্ম কৃষ্ণিত হয়ে কয়েকটি চিহ্নাঙ্ক ফুটে উঠলো। না, এখনই কোনো ব্যবস্থা করতে হবে। শেরপাদের ডাকলেন।

চার জন শক্ত-সমর্থ শেরপা বেরিয়ে পড়লো। হাতে তাদের দালো আর ধারালো কুকরি।

তারা জানতো, ওখানে ঐ হাঙ্গরযুগ কুৎসিত শিশুখণ্ডের তলদেশে এক ভয়ঙ্কর গুহা আছে। লোকে তাকে কৃষ্ণগুফা বলতো। চার মথো যে প্রবেশ করবে, সে আর বেরিয়ে আসতে পারবে না। ওদের মনে হলো, নিশ্চয়ই ওর গহবর পথ হারিয়ে ফেলেছে শান্তনু আর কিশোর।

আর তা না হলে কোনো হিংস্র ইয়েতির কবলে পড়েছে ওরা।

বাই হোক, তন্ন-তন্ন করে চারদিক খুঁজে দেখতে লাগলো। কিন্তু কোথাও ওদের কোনো চিহ্ন নেই। অবশেষে সতর্ক পদক্ষেপে তারা প্রবেশ করলো কৃষ্ণগুফার গহবরে।

একজন শেরপার হাতে ছিল একটা শাদা নরম পাখর, যেটা দিয়ে খড়ির মত দাগ টানা যায়। গুহা-গহবরের দেয়ালে দেয়ালে সে শুধু দাগ দিয়ে যেতে লাগলো। পথ চেনার নিশানা।

বহুক্ষণ নিঃশব্দ অবেশের পর, তাদের কানে গেল অদ্ভুত আওয়াজ। মানুষের কথাবার্তা গুহার দেয়ালে দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়ে গম্ গম্ করে উঠছে।

সেই স্বর লক্ষ্য করে চলছে শেরপারা, হাতে ঝুলছে আলো! আর অন্ধ হাতে উজ্জত কুকরি।

কাছে গিয়ে তারা যা দেখলো, সে এক অত্যাশ্চর্য দৃশ্য! কিশোর আর শান্তনু দুজনেই দড়ি দিয়ে বাঁধা। আর তাদের ঘিরে আছে তিনটি বলিষ্ঠ চেহারা। আগন্তুক শেরপাদের দেখে তারা পিস্তল উঁচিয়েছে।

[আগামী বারে সমাপ্য]

আকাশপারের দেশে

সুখাংশু ঘোষ

অমল পড়ছিল—‘পৃথিবীর বহু স্থান হইতে “উড্ডন্ত পীরিচ” দৃষ্ট

হইবার সংবাদ পাওয়া যাউতেছে। অনেকের ধারণা, পীরিচগুলি মঙ্গলগ্রহ হইতেই আসিতেছে। ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে মঙ্গলগ্রহ যখন পৃথিবীর অতি নিকটে আসিবে এবং পৃথিবী ও মঙ্গলের মধ্যে ব্যবধান দাঁড়াইবে মাত্র সাড়ে তিন কোটি মাইল, তখন সম্ভবতঃ অধিক সংখ্যক উড্ডন্ত পীরিচ পৃথিবীর আকাশে উড়িতে দেখা যাইবে।’ অমল ভাবল, ওদের একটার চড়ে মঙ্গলে পাড়ি জমাতো পারলে বেশ হয়।

মাঠের ওপরে ছায়ায় ঢাকা গ্রাম। যেখানে অমলের দিদির বাড়ী। অমল চলছে সঙ্গ পথ ধরে একা। প্রায়ই ত যায়। হঠাৎ অমলের চোখে পড়ল আকাশে বলর-বেষ্টিত গম্বুজ। সম্পূর্ণ নিঃশব্দে নেমে আসছে মাটির দিকে, যেন তাকেই লক্ষ্য করে। আখিনের পরিষ্কার সূর্যালোকে ঝলমল করছে তার দেহ। অবাক হয়ে অমল চেয়ে রইল জিনিষটির দিকে; পাליয়ে যেতে ইচ্ছে থাকলেও, পা তার নড়ল না। এদিকে গম্বুজটি মাটিতে নামার সঙ্গে সঙ্গেই একজন খেতকার ব্যক্তি অমলকে টেনে তুললে তার মথো। অমল বুঝলে সে ধরা পড়েছে। তাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হবে কে জানে! কিন্তু অমল ভয়ে চীৎকার করবার পূর্বেই গম্বুজটি ভয়ানক বেগে সোজা আকাশে অনেক উঁচুতে উড়ে গেল। অমলের দৃষ্টি হতে ভ্রামল

যদিও কখন সরে গিয়েছে। শুধু নীল আকাশ দেখা যায় বহু জানালা দিয়ে।

অমলের এবার মনে হল গম্বুজটি আর যেন উড়ছে না। কারণ, পৃথিবীর উড়ো জাহাজের মত গম্বুজটি গর্জনও করছে না নড়ছেও না। এ যেন রূপকথার বাত্স কাপেট। নিঃসন্দেহে পৃথিবীর আরোহীবাহী ‘মিটিওর’ উড়োজাহাজ অপেক্ষা এই গম্বুজে ওড়া অনেক আরামের। অমলের ভুল হয়নি—অমল উড্ডন্ত পীরিচই বন্দী।

উড্ডন্ত পীরিচ ক্রমশঃই উঁচুতে উঠছে। তবুও অমলের মাথা ঘুরছে না। অমল জানে, পৃথিবীর বিমান-চালক ও আরোহীকে অনেক উঁচুতে উঠলে কৃত্রিম উপায়ে অক্সিজেন গ্রহণ করতে হয়। কারণ পৃথিবীপৃষ্ঠ ছাড়িয়ে যেতই উপরে ওঠা যায় ততই অক্সিজেনের অভাব অধুত হয়। কিন্তু উড্ডন্ত পীরিচটির নিশ্বাস-কোশলই নিশ্চয় আরোহীকে সকল হাওয়ার স্তরেই শ্বাসকষ্ট হতে রক্ষা করে। এখন হতেই অমলের ধারণা হল, মঙ্গলের মানুষ পৃথিবীর মানুষ অপেক্ষা বিজ্ঞানে অনেক উন্নত। অমলের শ্বাসকষ্ট হয়নি অরুণ, কিন্তু সে একটু বাদেই ঘুমিয়ে পড়ল, আর যখন চোখ মেলল, দেখল পীরিচটি আবার মাটি স্পর্শ করেছে। অমল এদিক ওদিক চেয়ে বুঝলে এ মাটি পৃথিবীর নয়, মঙ্গলের।

হ্যাঁ, মঙ্গলই ত, সেই মঙ্গলগ্রহ থাকে অন্ধকার রাত্রে, পৃথিবী হতে আকাশের গায়ে সাধারণতঃ লাল দেখায়। আর লাল দেখাত বলেই সুসভ্য রোমকগণ যুদ্ধের দেবতা মনে করে মঙ্গলকে ভয়ে পূজা করত। কারণ যুদ্ধ মানাই ত রক্তারক্তি, সব লালে লাল! মঙ্গলের সব কিছুই অমলের চক্ষে শুধু নতুন নয়, অদ্ভুতও ঠেকল। অমল এখন লক্ষ্য করল তার বশিকারীর, তার পরিবারবর্গের এমন কি কোন মঙ্গলবাসীর মাথায় একটুও চুল নাই। বিবর্তনের সঙ্গে নাকি প্রাণীর দেহ হতে চুলের ও লোমের পরিমাণ কমতে থাকে। যদি তাই হয়, তবে নিঃসন্দেহে মঙ্গলবাসী পৃথিবীর মানুষ অপেক্ষা অধিকতর আধুনিক, স্তন্যপায়ী অধিকতর সভ্য ও প্রফেসর কার্মিডল-লোয়েল মনে করেন মঙ্গলে অতিশয় বৃদ্ধমান প্রাণীর অবস্থিতি খবট স্বাভাবিক।

বিমানবাঁটি হতে অমলকে যে মোটরগাড়ীতে বাড়ী নিয়ে যাওয়া হল তা বেশ ছোট এবং চলবার সময় সামান্য শব্দও করল না। রাস্তা রবারের স্রায় পদার্থে তৈরী, পরিষ্কার, মসৃণ, কোথাও একটুও উঁচু-নীচু নয়। বাড়ীও ছোট, মঙ্গলের সব বাড়ীই ছোট এবং অপেক্ষাকৃত নীচু। বাড়ীগুলি ধাতুনির্মিত এবং উজ্জল কিন্তু তাদের উজ্জলতা চক্ষুর পীড়াপায়ক নয়। কারণ প্রত্যেকেই নীলাভ, ধাতুর তৈরী হলেও বাড়ীগুলি শীতে অত্যধিক শীতল হয় না। কারণ সূর্য্য মঙ্গল হতে প্রায় চৌদ্দ কোটি মাইল দূরে অবস্থিত হলেও মঙ্গলের উপরের বায়ুস্তর মাত্র বাট মাইল পুরু অথচ পৃথিবী ও সূর্য্যের ১,২৫,০০০,০০ মাইল দূরত্বের মধ্যে প্রায় ৩০০ শত মাইলের বায়ুস্তর রয়েছে।

বাড়ীর প্রত্যেকে অমলকে ঘিরে দাঁড়াল। বেশ বোঝা গেল সকলেই খুব আশ্চর্য্য হয়েছে। গলিভারের মত অমল যেন অদ্ভুত দেশে এসে পড়েছে—অবশ্য বেশটি লিলিপুটও নয় ব্রবডিংনাগও নয়। তবে মনে হচ্ছে এদের কান্নর চেয়েই কম আশ্চর্য্যজনক নয়। বুদ্ধিমান বালক অমল বেশ শীঘ্রই মঙ্গলের ভাষা কতকটা আয়ত্ত

করে ফেললে, সারাটা মঙ্গলে একটি মাত্র ভাষা। বাড়ীর ছেলেমেয়েদের সাথে খেলা করতে অমলের কোনরূপ অন্তরীক্ষা হয় না। শীত্ৰই অমলের নাম মস্ত খেলোয়াড় বলে মঙ্গলের সহরে, সহর ছাড়িয়ে দূর গ্রামেও পৌঁছে গেল। বাবেই না বা কেন? পৃথিবীর বালক হয়ে অমল অনেক উঁচু ও দূরপাল্লা লাফাতে পারে এবং সে মঙ্গলবাসী অপেক্ষা দ্রুত ছুটে পারে। কারণ অমল শুধু মঙ্গলের যে কোন শিশু অপেক্ষা মাথায় উঁচু নয়—পূর্ববর্ত্ত কোনও মঙ্গলবাসীই পাঁচ ফিটের অধিক লম্বা নয়—পৃথিবী অপেক্ষা মঙ্গলে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অনেক কম। যদি কেও পৃথিবীতে উঠে মাত্র দেড় ফুট লাফাতে পারে তাহলে সে মঙ্গলে কমপক্ষে চার ফুট লাফিয়ে উঠতে পারবে। পৃথিবীর সাধারণ খেলোয়াড় হয়ে অমল মঙ্গলে কতকগুলি রেকর্ড করে ফেললে।

উৎসুক দর্শকদের প্রশংসা এড়াবার জন্য গুণ্ডা এত দিন অমলকে বাড়ীতে রেখেছিল কিন্তু এখন অমল গুণ্ডার স্ত্রী ও সন্তানদের সাথে বাইরে যায়। গুণ্ডার স্ত্রী হেমন্ত সন্দরী তেমন বুদ্ধিমত্তা ও শিক্ষিতা এবং বাচ্চাদের ব্যবহারও চমৎকার! অমল এদের সাথে মোটরে ঘুরে বেড়ায়। মঙ্গলে কত মজার জিনিষ। মঙ্গলে পৃথিবীর মত এত বোকা লোক নাই। বাড়ীগুলি প্রায়ই সবই একতলা। মাটির অভাব নেই বলে লগুন, নিউ ইয়র্ক বা কলকাতার মত আকাশ দখল করবার হিড়িক মঙ্গলে নাই। সহর হউক বা গ্রাম হউক, বেশ সাজান—এখানে ওখানে মনোরম উদ্যান, দূর থেকে ছবির মত মনে হয়। অধিবাসিগণ বেশ সুশ্রী ও বলিষ্ঠ। মঙ্গলে লম্বা গাছ নাই বললেই চলে। সেখানে এক প্রকার গাওলা খুব বেশী, মাঠে মাঠে গাওলার চাষ হয়। ওই গাওলাই মঙ্গলবাসীর প্রধান খাদ্য—পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকগণও আবিষ্কার করেছেন যে এক প্রকার গাওলায় সর্বাপেক্ষা অধিক খাদ্যপ্রাণ রয়েছে। বাস্তবিক সর্বই সোজা। বালক-বৃদ্ধ নর-নারী সকলেই বেশ বিনয়ী। বাস্তব মোটরবাস আছে, তবে কোথাও ভিড় নাই। ব্যক্তিগত নাই। পদচারণা বাস্তব বটে কিন্তু ব্যক্তিগত দ্বিগুণে এগিয়ে চলে না—এরা শান্তিশ্রিয়, কেহ কলহপরায়ণ নয়। হাটবাজার আছে কিন্তু দরদরি নাই। কোনও কোনও দোকানে মালিক নাই, তবে লোকেরা জিনিষ কিনে দাম একটি বাস্কে ফেলে দিচ্ছে—সেই বাস্কে নিয়ে কেউ সরে পড়ছে না। বাস্তব কচিৎ পুলিশের লোক দৃষ্ট হয়—অবশ্য বানবাহন নিয়ন্ত্রণের জন্য চৌমাথাগুলিতে পুলিশ আছে। উদ্ভূত পীরিচগুলি, অবশ্য বারা আকারে ক্ষুদ্র, বাস্তব সাধারণ মোটরের মতই চলাফেরা করে। আকাশে ছোট-বড় অনেক পীরিচ, তারা অনেক রকমেরও, দূরপাল্লা ও কাছাকাছি উড়ে যাবার জন্য। মোটরবাস ও উদ্ভূত পীরিচের অনেকগুলি কারখানাও অমল দেখল। একটি কারখানায় প্রতি দশ সেকেন্ডে গড়ে একটি করে উদ্ভূত পীরিচ তৈরী হচ্ছে—আমেরিকায় ফোর্ড কোম্পানী গড়ে প্রতি সাত সেকেন্ডে একটি করে মোটরকার তৈরী করে মাত্র!

প্রতি গৃহে কমপক্ষে একটি বেতার-গ্রাহক-যন্ত্র রয়েছে। মঙ্গলের বায়ুমণ্ডল বিশেষ গোলমাল নাই, সুতরাং অমল ওখানে রেডিও শুনে ভারী খুশী। যখন পৃথিবীর পাশ দিয়ে উদ্ভূত পীরিচ উড়ে যায়, তখন তার আরোহিণী স্পষ্ট শুনে পায় পৃথিবীর বেতার প্রোগ্রাম।

কিন্তু মঙ্গলবাসী অন্য কোন গ্রহের ভাষা জানে না—মঙ্গলবাসিগণ মনে করে সবগুলিতে না হলেও, অন্ততঃ কতকগুলি গ্রহে তাদের মত মানুষ থাকা আশংকা নয়। পৃথিবীর বেতার প্রোগ্রাম মঙ্গলবাসীর নিকট অব্যাহত। মঙ্গলে যে গুণ দুধ দেয় দেখতে পৃথিবীর গরু-ঘোষের মত নয়, কিন্তু দুধ দেয় অনেক। মঙ্গলে চোর-ডাকাত নাই। মঙ্গলে রাজা নাই, সমগ্র মঙ্গলে একই শাসন এবং নির্বাকচিত্ত শাসক। প্রত্যেক প্রান্তে স্বায়ত্তশাসন বর্তমান এবং শাসকগোষ্ঠী নিজেদের জনসাধারণের সত্যিকারের সেবক ভেবেই শাসনকার্য চালায়। মঙ্গলবাসীরা মনে করে, তারা একটি উচ্চতর শক্তি দ্বারা পরিচালিত, তবে তারা কোনও ধর্ম নিয়ে দলাদলি বা চৌচায়েচি করে না।

মঙ্গলবাসিগণ ভয়ানক শক্তিশালী আগ্নেয়াস্ত্র তৈরী করতে জানে। পৃথিবীর এটম ও হাইড্রোজেন বোমা অপেক্ষা অধিকতর মারাত্মক বোমাও তৈরী করতে পারে। তবে নিজেদের ধ্বংস করার জন্য তারা এরূপ ভয়ানক সৃষ্টিধ্বংসী মারণাস্ত্র তৈরী করতে চায় না। তারা আণবিক শক্তি দেশের মঙ্গলের জন্যই ব্যবহার করছে। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে মঙ্গলের খান-বাহন কোথাও শব্দ করে না। কারণ এরা চলে আণবিক শক্তির সাহায্যেই। মঙ্গলবাসীদের ডুবো-জাহাজ নাই, এদের প্রয়োজনও নাই। মঙ্গলবাসীরা বলে, আমাদের গ্রহে শান্তি বিধাজিত এবং কোন গ্রহের প্রতি আমাদের লোভও নাই। বিশেষ করে নৃধ্য-পরিবারভুক্ত পৃথিবী আমাদের নিকটতম আত্মীয়। পৃথিবীর প্রতি মঙ্গলবাসিগণ সত্যিই খুব বন্ধুভাবাপন্ন। তবে যে কোন গ্রহ থেকে মঙ্গলের বিরুদ্ধে অভিযান চালালে সেই গ্রহের অধিবাসীদের সমুচিত শিক্ষা দেবার ক্ষমতা মঙ্গলবাসীদের যথেষ্ট রয়েছে। মঙ্গলের ছেলে-মেয়েরা পারা থেকে সোনা তৈরী করতে জানে কিন্তু মঙ্গলে সোনা প্রচুর; সুতরাং কৃত্রিম উপায়ে সোনা তৈরীর প্রয়োজন কোথায়? বাচ্চারাও এটম ও হাইড্রোজেন বোমা তৈরী করার পদ্ধতি স্থলে শেখে। কারণ বিজ্ঞানের প্রতি শাখার উপরই স্থূল হতেই তাদের কিছু কিছু দখল ঘটে। বিজ্ঞানের জ্ঞান লাভের সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চারা এ-ও শেখে যে বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগে জীবের ধ্বংস অনিবার্য। মঙ্গলের স্থূল-কলেজে জীবকে, বিশেষতঃ মানুষকে, ভালবাসতেও শেখান হয়।

মঙ্গল আয়তনে পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক। পৃথিবীর ব্যাস ৭১২৭ মাইল, মঙ্গলের ৪২১৫ মাইল। মঙ্গলে সাগর আছে গভীর ও প্রশস্ত, নদীও ওখানে অনেক। মঙ্গলের মাটি লালচে, তবে বসন্তে মঙ্গলকে আকাশ হতে কতকটা সবুজ দেখায়। কারণ নতুন লতাপাতার ও খাদ্য-গাওলার প্রাচুর্যে মঙ্গল তখন ভরে ওঠে। মঙ্গলে মাত্র তিনটি ঋতু: শীত, বসন্ত ও শরৎ। অমলের খড়ি অনুসারে মঙ্গল নিজের কক্ষের উপর ২৪৬টা ও ৩৭ই মিনিটে একবার আবর্তন সম্পন্ন করে। সেকেন্ডে ১৫ মাইল বেগে মঙ্গল ৬৮৭ দিনে সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে—পৃথিবী সূর্যের চার দিকে একবার ঘুরে আসে ৩৬৫ই দিনে, প্রতি সেকেন্ডে ১৮ মাইল বেগে। মঙ্গলের দুইটি চাঁদ—পৃথিবীর তো মাত্র একটি। একটি চাঁদ মঙ্গলকে ৩০ ঘণ্টার সামান্য একটু বেশী সময়ে একবার প্রদক্ষিণ করে কিন্তু অপরটি মাত্র ৭১ ঘণ্টার এক পাক নিয়ে নেয়। ইহা ছাড়া আবহাওয়া পর্যবেক্ষণের জন্য মঙ্গলবাসী বেশ কয়েকটি

কৃত্রিম উপগ্রহ মঙ্গলের আকাশে সর্বদাই উড়িয়ে রাখে। মঙ্গলে আবহাওয়ার পূর্ণাভায়ে সামান্য গরমিলও হয় না।

মঙ্গলে অভূতচর্য পর্বতমালাও আছে—কমুচো গুদের সর্বোচ্চ পর্বত। মিশ্র জলের বর্ণা ও অনেক মরুভূমিও আছে, তুষার-ক্ষেত্রও আছে। আকাশে মেঘও ওড়ে, বৃষ্টিও হয় সারা বছরই; বর্ষা বলে ঋতু নেই। মঙ্গলে অক্সিজেন নেই বললেই চলে। মঙ্গলের বাতাস নাইট্রোজেন ও আর্গন গ্যাসেই প্রায় পূর্ণ। সামান্য কার্বন ও হাইড্রোজেন গ্যাসও আছে। মঙ্গলবাসীরা, এমন কি অমলও কিছু—এই প্রায় অক্সিজেন শূন্য বাতাস সেবন করে জীবিত আছে, তবে অমল কম আশ্চর্য্য হয়নি। গণ্ডারার স্ত্রী অমলকে বললেন তোমাদের পৃথিবীতেও নিশ্চয় নানা প্রকারের আবহাওয়া আছে। পৃথিবীতেও বালুকাময় মরুভূমি ও তুষারভূমি কম নেই। মরুভূমি ও তুষারভূমির বৃক্ষ ও তৃণশৃঙ্গাদির মধ্যেও অনেক পার্শ্বক্য। আবার যে লোক পাহাড়-পর্বতে থাকে তারা সমভূমিতে থাকতে কষ্টবোধ করে। আমরা এই আবহাওয়ার থাকতে পারি এবং বেঁচে আছি। কারণ এখানে বা জন্মায় আমরা তাই খাই। তোমার কি এখানে শারীরিক কোন কষ্ট হচ্ছে?

নিশ্চয় না, অমল বললে।

কারণ কি? কারণ এখানে বা খাচ্ছ তাত্তে এমন পদার্থ আছে যা তোমাকে এখানকার আবহাওয়ায় বাঁচতে ও বাড়তে সাহায্য করছে এবং সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রার মধ্যে ১৮° ডিগ্রীর পার্শ্বক্য থাকলেও তোমার বিশেষ কষ্ট হচ্ছে না।

অমল বললে, মনে হচ্ছে মঙ্গলবাসীরা বিজ্ঞানে খুবই এগিয়ে গিয়েছে।

বিজ্ঞানে আমাদের উন্নতির নমুনা ত তুমি স্বচক্ষে অনেক দেখলে। তোমাদের উঁচু বাড়ীগুলো আমাদের শক্তিশালী দূরবীণগুলো দিয়ে পরীক্ষার দেখা যায়। দেখবে না কি? তোমাদের ঐ বাড়ীগুলো দেখলে মনে হয়, তোমরাও বিজ্ঞানে অনেক এগিয়েছ।

ভদ্রমহিলা অমলকে নিকটবর্তী একটি মানমন্দিরে নিয়ে গেলে সেখানে একটি বৃহৎ দূরবীণের সাহায্যে—দূরবীণটির ব্যাস ৪০০ ইঞ্চি—পৃথিবীর বালক মঙ্গল থেকে দেখতে পেল পৃথিবীর বৃক একটি সু-উচ্চ অটালিকা। অমলের মনে পড়ল শিশু ভারতীর কল্পিত চিত্র—যাতে একটি শিশু অসীম আকাশের এক কোণে বসে গোলকাকৃতি পৃথিবীকে লক্ষ্য করছে।

অমল প্রশ্ন করলে, ওটা কি নিউইয়র্কের এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং?

নাম ত জানি না। গত বছর আমাদের জন দুই লোক এই বাড়ীর নিকটে কোথাও নেমেছিল কিন্তু নাম না জেনেই ফিরে এসেছে। কারণ, অত্যধিক সাহস দেখাতে গেলে দগা পড়বার ভয় ছিল যে। বিদেশে সম্পূর্ণ আচেনা অজানাদের হাতে দগা পড়া কি বিপজ্জনক নয়? এই ত সেদিন আমাদের জনৈক মহিলা বৈমানিক পৃথিবীতে নেমে সেখানে একটি লিপিকা রেখে ফিরে এসেছে।

অমল বললে, ঐ চিঠি পড়েছি। পৃথিবীতে কেউ ওটা পড়তে পারেনি। ফিরে গিয়ে চিঠিটা পড়ে শোনাল।

অমল মঙ্গলে বেশ ছিল কিন্তু মাকে না দেখে আর কত দিন থাকবে? একদিন গণ্ডারার স্ত্রী গলা জড়িয়ে তারি গলায় বললে, তোমার কাছে কত আদর পাচ্ছি। মঙ্গলবাসীরা সবাই আমার

ভালবাসে। আমার আরও অনেক দিন মঙ্গলে বাস করতে ইচ্ছে। কারণ মঙ্গল শুধু স্নান্য দেশ নয়, অধিবাসীরাও বেশ শান্তিপ্রিয়। কিন্তু তবু মন চাইছে পৃথিবীতে ফিরতে। কারণ আমার মা সেখানে আমার চমকিত কান্দছেন নিশ্চয়।

গণ্ডারার স্ত্রী অমল চলে যেতে চাইছে শুনে খুব হুঃখিত হলেন কিন্তু হুঃখ চেপে বললেন, ভালবাসা—মা ও সন্তানের মধ্যে যে ভালবাসা—নিশ্চয় এখানে বা কিছু দেখছ 'সবার চেয়ে তা অনেক উর্দে। তারপর স্বামীকে ডেকে বললেন, অমল মার কাছে যেতে চাইছে। ওকে পৃথিবীতে রেখে এস।

গণ্ডারার উত্তর দিলে কিন্তু আমরা যে ওর ভাষা ভাল করে শিখতে পারিনি। পৃথিবীর ভাষা শেখবার জন্মেই ত ওকে এখানে নিয়ে আস। যদি আমরা পৃথিবীকে ভাল করে জানতে চাই, এবং জানা উচিতও, তাহলে আমাদের উচিত ওখানকার অন্তত একটি ভাষার সহায়ক বাৎপত্তি লাভ করা।

অমলের কাছে আমরা গুদের একটি প্রধান ভাষা, ইংরেজী, কতকটা শিখেছি, অমলও আমাদের ভাষা বেশ শিখে ফেলেছে। এতই আমাদের দুই গ্রহের মধ্যে প্রাথমিক সংবাদ আদান-প্রদানে যথেষ্ট সাহায্য করবে। আমরা স্বার্থপর নই। স্বার্থের জন্য পৃথিবীর ছেলেটিকে কত দিন আর আটকে রাখবো?

এবারে অমল বললে, কিন্তু আমি যে এখনও যথেষ্ট বয়স্ক হইনি। যদি বলি মঙ্গলের ভাষা শিখেছি পৃথিবী লোকে আমাদের পাগল বলে উড়িয়ে দেবে। হ্যাঁ, মা, আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস করবে।

বৈজ্ঞানিক হয়ে উপযুক্ত যত্ন তৈরী কর, বার সাহায্যে পৃথিবী থেকে আমাদের সাথে বাক্যলাপ করতে পারবে। পৃথিবীর থেকে সেই কথাবার্তা শুনে আর তোমাকে অধিবাসন করবে না। আর পৃথিবীর লোককে বলো, ভুলো না যে, আমরা সৌর জগতের কোন গ্রহেরই শত্রু নই।

অমল তারি গলায় বললে, তোমাকে ও তোমার উপদেশ কখনও ভুলব না মা!

* * * *

অমল এখন চোখ খুললে, দেখল মা তার মুখের উপর স্নায়ু। মা বললেন, ঘুমের মধ্যে কি সব বকছিলে, অমল? অমল চারদিকে একবার চোরে নিয়ে বললে, আমি যে এক্ষুণি মঙ্গলে ছিলাম মা। মা অমলকে চুমু দিয়ে বললেন, বড় বৈজ্ঞানিক হবার চেষ্টা কর। চেষ্টা করলে মঙ্গলে হয়ত একদিন সত্যি যেতে পারবে।

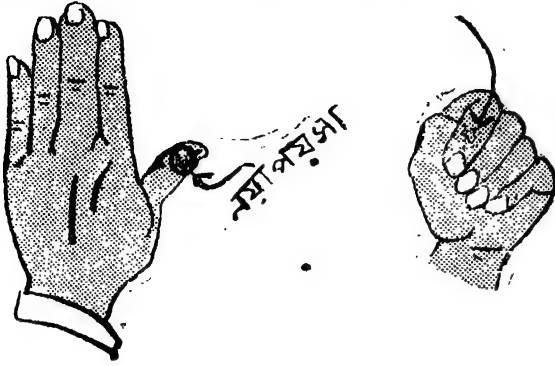
নয়া পরসার নয়া যাছু

যাছুরত্নাকর এ, সি, সরকার

নয়া পরসার বাজারে নয়া পরসার একটা খেলা না শিখলে চলে কেমন ক'রে বল? তাই তো আজ এখন একটা খুব মজার নয়া পরসার ম্যাজিক শেখাচ্ছি। খেলাটা যদি ভাল ক'রে অভ্যাস ক'রে উপযুক্ত পরিবেশে দেখাতে পার, তবে যাঁরা দেখবেন তাঁরা খুবই অবাক হবেন, তাতে কোনও সন্দেহ নাই।

খেলাটাতে কী দেখানো হবে, তাই শোন আগে। প্রথমে

বাহুর তার বা হাতের চেটা খুলে দেখাবে তার দর্শকদের। এর পরে হাত মুঠো করে ফুঁ দেবে আর ম্যাজিকের মন্ত্র পড়বে :



চিচিঃ ফাঁক,
চিচিঃ ফাঁক,
নয়া পরসা আয়।
উই চিড়ি,
ডুই চিড়ি,
প্রসন্নদৈত্য ধায়।

মন্ত্র বলে হাত খুললে দেখা যাবে যে, বাহুর হাতে সত্যি সত্যিই একটা নয়া পরসা এসে গেছে। এ দেখে কি দর্শকেরা অবাক না হয়ে পারবেন?

কমন্ ক'রে এই খেলাটা ক'রবে তাই বলি এবার শোন। খেলা দেখানোর আগে গোপনে একটু ভেজা কাপড়কাটা সাবানের টুকরো লাগিয়ে রাখবে বা হাতের বুড়ো আঙুলের নখে আর এই সাবানের উপরে সোঁটে রাখবে একটি নয়া পরসা। হাতের চেটা খুলে দর্শকদের যখন দেখাবে তখন নয়া পরসা থাকবে পেছনের দিকে। কাজেই তাঁরা দেখতে পাবেন না। হাত মুঠো করার সময়ে বুড়ো আঙুলটাকে দর্শকের জন্তে মুঠোর মধ্যে চেপে ধরলেই আপনা থেকেই নয়া পরসা খসে পড়বে মুঠোতে। হাত মুঠো করার সময়ে যদি হাতটা একটু আন্দোলিত করা যায়, তবে বুড়ো আঙুল ঢোকানো আর বের করা দর্শকেরা বুঝতে পারবেন না!

বাহুবিল্লার উৎসাহী পাঠক-পাঠিকারা জবাবের জন্ত উপযুক্ত ডাকটিকিট সহ আমার সঙ্গে পত্রালাপ করতে পার A. C. Sorcar, Magician Post Box 16214, Calcutta-29 এই ঠিকানায়)

প্রান্তরের সুর

অশোককুমার চৌধুরী

আগন্তু বৃষ্টি বাজে সেই সুর...

ভোরের টুকটুকে লাল আলোর পর্দায় স্পষ্ট হল সিংহগড়। মারাঠা-মাতার অন্তর ভরে উঠল অদ্ভুত আনন্দে। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর মুখ হয়ে এলো বর্ণব্রাস্ত মেষের মত বিষন্ন-গভীর। দূত ছুটল। মারাঠা-রাজা এলেন তাঁর ঘরে। এক মুহূর্তের জন্তে কি ভাবলেন নারী। তার পর হঠাৎ দাবা খেলার আমন্ত্রণ জানালেন আগন্তুককে।

আগন্তুক কৌতুক মনে করে খেলতে বসলেন। তার পর হেরে গিয়ে বসলেন—কি বাজী চাও তুমি?

সিংহগড়। গভীর সুরে কথাটা বলেই মুখ ঘুরিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। এ আদেশ রাখতেই হবে, মনে মনে বুঝলেন মারাঠা-রাজা। তবু তবু শেষ চেষ্টা করলেন,—কিছু ওটা যে এখনও মোগলদের হাতে।

তার জন্তেই ত আরও চাই, সিংহগড় আমার চাই-ই।

চিন্তিত মুখে বেরিয়ে গেলেন রাজপুত্র। মনের আয়নার খুঁজতে লাগলেন একটা মুখ, যে পারবে এই অসাধ্য সাধন করতে। হ্যা, হ্যা, পেয়েছি—‘ডাক...কে’, হঠাৎ চীৎকার করে উঠলেন মারাঠা পুত্র, আবার ছুটল দূত। সেই ভাগ্যবান পুত্র তখন কাজে ব্যস্ত, তাঁর ছোট ছেলের বিয়ে। রাজার ডাক পৌঁছল তাঁর কানে। ভেঙে দিলেন বিয়ে, ছুটে এলেন কর্তব্যের ডাকে। কিন্তু তাঁর সঙ্গে সারা রাত্তা চীৎকার করতে করতে এলো একটা ‘কপারাম্বখ’ পানী। শুভাকাংখীরা বললেন, ‘অন্তত লক্ষণ’। মারাঠাবীর হাসলেন—হোক, তবু কর্তব্য বড়। এগিয়ে গেলেন তাঁর রাজার সামনে। অভিবাচন করে জিজ্ঞাস্য চোখ তুলে ধরলেন। ‘আমার নয় ভাই, মায়ের প্রয়োজন’—রাজা বললেন।

কপালে পঞ্চলিখার মঙ্গলম্পর্শ দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন মারাঠা-রাজমাতা—‘তুমি কি ওই সিংহগড় আমার জয় করে দিতে পারবে?’ এক মুহূর্ত। না, তাও বুঝি না! বাড় নেড়ে মাথার শিরস্ত্রাণ রাজমাতার পায়ের কাছে রেখে বললেন—না, সিংহগড় আপনারাই হবে।

—মারাঠার ধূসর, কক্ষ, কক্ষ পথে আবার উঠল ঘুলোর বড়। চলেছে একরল পাহাড়ী বোদ্ধা। সামনে তাদের অধিনায়ক, বীর, গভীর, সদাহাস্তময়, অখচ কর্তব্য-কাঠার। ওই দুর্গটা কাদের গো? মোগলদের না কি গো? ওতে কত লোক হবে গো? ওখানে যায় কি করে গো? এই রকম নানা প্রশ্নের প্রশ্ন করছিল একটা চাবাড়খো মানুষ। এই হয়ত প্রথম দেখল অত-বড় দুর্গ, তাই অত কৌতুহল, সিংহগড়ের আশে-পাশের লোকেরা ভাবল।

—পাহাড়ী বর্ণগুণলোর শেষ রিলিকটুকু কেটে মিলিয়ে গেল দিনের আলো। ঘনিরে এলো অন্ধকার, গাছের আড়ালে আড়ালে, ঝোপের ফাঁকে লুকিয়ে আছে তিনশো মারাঠা বোদ্ধা। তাড়াতাড়ি লুকিয়ে বনের দিকে এগিয়ে এলো সেই চাবা। ফিস-ফিস করে সবাইয়ের কানে কানে কি কথা হল।

এখনও কয়েক ঘণ্টা কাটাতে হবে। রাত গভীর হোক, বোড়ার ওপর চেপে চাপাগলায় বলে উঠল সেই চাবা। মাঘ মাস, প্রচণ্ড শীত, কাঁপন-ধরানো হাওয়া। মাথার ওপর নক্ষত্রখচিত চন্দ্রাতপ, তার নীচে তিনশো বীর, নির্ভীক, নির্ভয়। তৃতীয়ার বাঁকা চাদের বিষন্ন আভা তাদের কণ্ঠের মুখগুলোকে আরও কণ্ঠের করে তুলেছে।

এগিয়ে চলো সব, রাত্রির দ্বিতীয় বায়ে মারামারি আদেশ হলো। সিংহগড়ের দিকে এগিয়ে চলল তারা, তখন যদি সেধানকার কোন লোক তাদের দেখতো তা’হলে সেই নিভাস্ত বোকা চাবীটাকে তাদের সর্দার দেখে সে নিশ্চয় ঘাবড়ে যেতো।

আলো-জাঁধারিতে দৈত্যের মত দাঁড়িয়ে আছে আকাশ-হোঁরা

দুর্গটা। মন্থণ, খাঁজহীন, প্রায় খাড়াই বিরাট পাঁচিলটা চকচক করছে চাঁদের আবছা আলোয়। কোন মানুষের পক্ষেই এ বেয়ে ওঠা সম্ভব নয়। নিয়ে এসো ভটা, আদেশ করলেন চাবাক্লী মারাঠা বীর। খাঁচার মত একটা জিনিষ নিয়ে এলো ক'জন মারাঠা। খুলে দাও, খুলে দেওয়া হল খাঁচা। বেরিয়ে এলো চিত্রবিচিত্র বশোবস্ত। মারাঠা-বীর তার গলায় বলিয়ে দিলেন নিজের মুক্তোর মালা, তারপর তার সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে দেওয়া হল একটা দড়ির মই। মারাঠা-বীর আদেশ দিলেন, উঠে পড়।

আদেশ উঠতে আরম্ভ করল বশোবস্ত, গিরগিটির মত। দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের এঁদেরপান'গুলো অত্যন্ত ক্ষিপ্ততার সঙ্গে মন্থণ খাড়াই প্রাচীর বেয়ে উঠতে পারে।

কিন্তু আশ্চর্য্য, অত শিক্ষিত বশোবস্ত হঠাৎ কেন ভাড়াভাড়ি ভর পেয়ে নেমে এলো! অসুট গুজন শুক হলো মারাঠাদের মধ্যে—না, না, আপনি বাবেন না সর্দারজী, এটা বিস্ত্রী সংকেত, তবুও কর্তব্য-কঠোর মারাঠা-বীর। 'উঠে পড়, তা না হলে তোকে কাটব।' তিনি ভয় দেখালেন জন্তুটাকে—বশোবস্ত ভর পেয়ে ভাড়াভাড়ি উঠে অশ্রু হয়ে গেল দুর্গপ্রাচীরের ওপারে। শুধু খুলে রইল দড়ির মইটা।

এই তুমি এদিকে এসো; মারাঠাবীর একজন বলিষ্ঠ, নির্ভীক মারাঠা-বোছাকে আদেশ করলেন, ভাল ভাবে বেঁধে এসো ওই মইটা।

আর একটু! আর একটু! রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অপরের দিকে চেয়ে অপেক্ষা করছে তিন শ' লোক। দুর্গের মধ্যে মাঝে মাঝে দু-একটা আলোর রেখা। গগুজে গগুজে তীক্ষ্ণচক্ষু প্রহরী। প্রাকারে প্রাকারে সশস্ত্র পাঠান প্রহরীর দল। খুব সাবধানে উঠতে হবে। একটু! আর একটু! হঠাৎ দাড়িওলা একটা মুখ ওপর থেকে মুখ বাড়াল, দেখতে শেল সেই বুবক মারাঠাকে। চীৎকার করতে গেল—করলেও চীৎকার—একটা অসুট আর্দ্রনাভ মাত্র। মারাঠাবীরের অব্যর্থ লক্ষ্য তার কঠ রুদ্ধ করে দিয়েছে চিরদিন। দুর্গপ্রাচীর থেকে তার দেহটা ঘুরতে ঘুরতে নিচে পড়ল—ধপ।

বুবক বীর দড়ির মইটা ভাল ভাবে বেঁধে দেওয়ার পর, তিন জন বাছা বাছা বোছা নিয়ে সেই মইয়ের সাহায্যে দুর্গে ঢুকলেন মারাঠা-বীর। তাঁর মুখ পাগড়ীতে ঢাকা, হাতে তলোয়ার।

কিন্তু সেই দুর্গরক্ষকের চীৎকার ও পতনের আওয়াজ দুর্গ-রক্ষকদের সচেতন করে তুলল। গগুজে গগুজে জলে উঠতে আরম্ভ করল মশালগুলো। কয়েক জন মোগল শাস্ত্রী সেই মারাঠাবীরকে সামনে পেয়ে হত্যা করল। পড়তে পড়তে চীৎকার করে উঠলেন মারাঠাবীর; দুর্গ জয় করতেই হবে। তারপর তাঁর প্রাণহীন দেহটা ধপ করে মাটিতে পড়ল।

ইতিমধ্যে কিন্তু মারাঠা বাহিনীর দুর্গপথ খোলা হয়ে গেছে, হুকে পড়ল তারা, রাত্রির নিস্তব্ধতাকে ভঙ্গ করে চীৎকার করে উঠল 'হর, হর মহাদেও।' আকস্মিক আক্রমণে বিপর্য্যস্ত করে দিল এক হাজার দুর্গবাসীকে মাত্র তিন শ' সৈন্য। সৈন্যদের খড়ের ঘরগুলোর আগুন দিয়ে দিল। তারপর জয়ধ্বনি দিল, 'হর, হর, মহাদেও'।

রাত্রি নিশীথে সেই আগুনের শিখা উজ্জল হয়ে উঠল।

মারাঠা-রাজা দূর থেকে সেই আগুন 'কেথে মা'র দিকে চোরে বললেন, ওই দুর্গ এখন তোমার।

হুড়ম! হুড়ম! ভোপধ্বনি হল সিংহগড় থেকে, এবার আর মোগল নয়, মারাঠারা করছে ভোপধ্বনি। অন্তিম-শয়নে অভিভূত তাদের সর্দারের মৃত্যুকে সম্মান জানাচ্ছে হুড়ম। হুড়ম।

সমস্ত মারাঠা জনতার মুখে কান্নার আভাস, কঠোর মারাঠা-রাজার চোখটাও জলে ভরে উঠল। সিংহগড় পেয়েছি কিন্তু সিংহ আমি হারিয়েছি, কান্না-ভেজা কণ্ঠে বললেন মারাঠারাজা, এক ঝাপটা হাওয়ার কান্নার স্রব উঠল বেজে।

আজও বুঝি বাজে সেই স্রব ভগ্নদুর্গের প্রাকারে, শিলাপ্রাকারে, পর্বতের কন্দরে, মহারাষ্ট্রের পথে-প্রান্তরে, হঠাৎ উদাস হওয়া চাবার মনে, পঞ্চলা বাউলের অতীত-স্মৃতিসুখের গানে—মহারাত্রি তোমার ভোলেনি, তানাজী! ওগো মহাবীর তানাজী।

ভক্ত কবীর

বানুদেব পাল

রা'মানন্দের শিষ্যদের মধ্যে কবীর অগ্রতম। কবীরের জন্মকাহিনী সম্পর্কে একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে।

যথা:—কবীর ছিলেন এক ব্রাহ্মণকন্ডার পুত্র। ব্রাহ্মণকন্ডা নিজের বৈধব্যের কলঙ্ক-কালিমা মোচন করবার জন্তেই সন্তোজাত পুত্রকে কাশীর 'লহর-তালার' পুষ্করিণীতে একটি পদ্মপাতার ওইয়ে ভাসিয়ে দেয়। পরদিন অতি প্রত্যুষে নিম্না নায়ে একজন জোলা-জাতীর স্ত্রীলোক ও তার স্বামী মুরজালি ঐ পুষ্করিণীর ধার দিয়ে নিমন্ত্রণে বাচ্ছিল। সহসা নিম্না তৃপ্ত হইয়া ঐ পুষ্করিণীতে জল পান করতে গিয়ে অকস্মাৎ একুশ অভাবনীয় দৃশ্যে অত্যন্ত মুগ্ধ ও স্তব্ধ হইয়া উক্ত সন্তোজাত কন্ডার শিশুটিকে স্ব-গৃহে নিয়ে গেল। অতঃপর জোলা-দম্পতি শিশুটিকে পুত্রবৎ পালন করতে লাগলো। কিছুদিনের মধ্যেই শিশুটির নামকরণের জন্তে তারা একজন কাজীকে ডেকে আনিলো। শিশুটির নাম-নির্বাচনার্থে 'কোরণ-শরিক' খুলতেই সহসা কাজী সাহেবের দৃষ্টিপাত ঘটলো—'কবীর' শব্দের উপরে। সেই থেকেই শিশুটির নাম হ'লো, কবীর। কবীর আরবি শব্দ। এর অর্থ হচ্ছে, মহান, বৃহৎ বা ব্রহ্ম, পরমেশ্বর।

কাশী হিন্দুপ্রধান স্থান। নিক্র শেখের (কবীরের পালক পিতা) প্রতিবেশীদের মধ্যে প্রায় সকলেই ছিল হিন্দু। কাজেই বালক কবীরের খেলার সাথী ছিল অধিকাংশই হিন্দু বালকেরা। কিন্তু তাদের খেলা সাধারণ খেলা ছিল না! ভগবৎ-পূজন ও ভগবানের নামকীর্তনই ছিল তাদের খেলাধুলার বিষয়বস্তু।

কবীর জাতে জোলা বলে জনেকেই তাঁকে উপহাস করতো। কবীর কিন্তু তাতে আদৌ ক্ষুব্ধ হতেন না। কারণ তাঁর কথায়:—

ধরনী আকাশ কী কারণগাহ বানারী—

চন্দ্র সূর্য্য দুইনাগ চালায়ী।

অর্থাৎ, এই পৃথ্বী ও নীল অখণ্ড আকাশকে ভগবান কারণানি বানিয়ে চন্দ্র-সূর্য্যরূপে মাকু চালাচ্ছেন অবিরত। কবীর লেখাপড়া জানতেন না। কিন্তু সরল জ্ঞান ও স্বচ্ছ বুদ্ধির বলে স্মৃতিশক্তি সম্বলিত তার তত্ত্বের শাশ্বত-রূপকে সত্য ও মধুর করে তিনি প্রকাশ

করেছেন। তাঁর ব্যাখ্যায় রাম-রহিম, কৃষ্ণ-করিম, কালী-কাবা সবই একই! একের-ই ভিন্ন ভিন্ন নাম। যেমন :—মরল জিনিষটি এক। কিন্তু তা থেকে আহাৰ্য্য প্রস্তুত হয় বিভিন্ন প্রকারের। কবীরের সময়েই হিন্দু মুসলমান পরস্পর প্রতিবেদী হওয়ার একের ধর্ম-প্রভাব অপরের উপরে পরোক্ষ ভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল। মুসলমানগণ তখন দেশের শাসক। তাঁদের ধর্ম-প্রভাব ও গোঁড়ামির-প্রাবল্য রাজশক্তির বলে অত্যন্ত প্রকট। এ-হেন অবস্থায় দেশের সমাজশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ নিজেদের সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান দৃঢ়তর করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। এই সময়েই রামানন্দ ও তাঁর শিষ্যগণ 'এক ধর্ম-আলোড়ন তুলে সর্বধর্ম-সমন্বয় করার এক মহান প্রচেষ্টার সূচনা দেখিয়েছিলেন।

কবীরের প্রভাব অনেক মহাপুরুষ ব্যক্তির উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। আহমদাবাদের দাখ সাহেব কবীরের ভাবে অনুপ্রাণিত হ'য়ে কবীরপন্থী শিষ্যরূপে পরিগণিত হয়েছিলেন। হিন্দী রামায়ণ রচয়িতা তুলসীদাসও তাঁর বাণীমাধুর্য্যে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। একদা বুদ্ধাবনবাসিনী মীরা বঈও কবীরের ভক্তিদ্বারা বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করে মুগ্ধা হয়েছিলেন! গুরু নানক বিভিন্ন দেশ পর্যটন করে অবশেষে কাশ্মীরে উপস্থিত হয়ে কবীরের ধর্মচর্চার ব্যাখ্যা শ্রবণে তন্ময় হয়েছিলেন। অধোদ্যায় জগজীবন দাস কবীরের ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে সৎনামী সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন। এ ছাড়া মালবদেশের বাবলাল বাবলালি সম্প্রদায়, বীরজন সাধু-সম্প্রদায়, গাজীপুরের শিবনারায়ণ শিবনারায়ণী সম্প্রদায়, আলোয়ারের চরণদাস-চরণদাসী সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করে কবীরের মহৎ উদ্দেশ্যকে বহুল পরিমাণে সিদ্ধ করে গেছেন। এঁদের প্রত্যেকের ধর্মব্যাখ্যায় মূল্যেই হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ধর্মের একটি সমন্বয়-সাধনের চেষ্টা দেখা গেছে।

অপর দিকে মনকে পবিত্র, কলঙ্কমুক্ত না ক'রে কেবল বাহ্যিক গুরুগভীর আড়ম্বরের প্রাবল্যভার ঈশ্বর-দর্শন পাওয়া যায় না। এই বাণীই কবীর প্রচার করতেন। তিনি বলতেন,—

তীরধ-মে তো সব পানী হৈ

হো বৈ নহী কিছু হায় দেখা।

প্রতিমা সকল তো জড় হৈ,

বোলে নাহি বোলায় দেখা।

অর্থাৎ, তীর্থ তো পানি জল। আমি তাতে ডুব দিয়ে দেখছি। ফল তো কিছুই হয় না? প্রতিমাকেও ডেকেছি, কোন সাড়া পাইনি!—

পূরণ কোরাণ সববাত হৈ

রা খটকা পরদা খোল দেখা।

অনুভব কী বাত কবীর কই—

বহ সব হৈ বুঝী পোল দেখা।

পূরণ-কোরাণ সব তো কেবল কথা। আমি পরদা খুলে তাড়ের আসল রূপ দেখে নিয়েছি! কেবল অনুভব করবার কথাই কবীর বলেছেন। আর সব মিথ্যা, নিছক ভ্রান্ত!

অকস্মাৎ মুসলমানগণ কবীরের ব্যঙ্গ-বিজ্ঞপ্তি বিব্রত হ'য়ে রাজার কাছে নালিশ জানালো। দিল্লীর সম্রাট তখন সিকন্দরলা লোদী। তাঁরই আদেশে কবীরকে বন্দী ক'রে জৌনপুর দরবারে হাজির করা

হ'লো। বঙ্গগভীর নিনাদে কবীরকে শুধালেন সিকন্দরলা, 'তুমি হিন্দু না মুসলমান?'—সম্রাটের এ-হেন প্রশ্নের জবাবে ঈশ্বর বৃহহাত্তে কবীর বলেন,—

হিন্দু কহ'তো মায় পন্থী, মুসলমান ভী নাহি।

পাঁচ তত্ত্বকা পুতলী গৈবী খেলে মাহি।

আমি হিন্দুও নই, মুসলমানও নই। পঞ্চতত্ত্বাক্য পুতলিকা আমার মধ্যে অদৃশ্য রহস্তের খেলা খেলে চলেছে! তাই,—

হিন্দু ধ্যাবে দেহরা, মুসলমান হ' মসীত।

দাস কবীর তর্জা ধ্যাবহী জঁহা দোনকী পরতিত।

হিন্দু মন্দিরে ঈশ্বরের ধ্যান করে। মুসলমান করে মসজিদে।— দাস কবীর সেইখানেই ধ্যান করে, যেখানে উভয়ের-ই প্রতীতি।

সিকন্দরলা লোদী সূচতর, বুদ্ধিমান, কৌশলী-সম্রাট। অতএব তিনি সম্মানেই কবীরকে বিদায় সন্তাষণ জানান।

কবীরের জ্যৈষ্ঠ নাম ছিল লোদী। তিনি ছিলেন বনখণ্ডী বৈরাগীর কণ্ঠ। তাঁদের এক পুত্র ও একটি কন্যা জন্মে। কবীর পুত্রটির নাম রেখেছিলেন 'কমাল' আর কন্যাটির নাম 'কমালী'। কমালী এক দিন কুপ থেকে জল আনতে গিয়ে কোন এক ব্রাহ্মণের জলের কলসীতে একটু জলের ছিটে লাগে। এতে উক্ত ব্রাহ্মণ ক্রোধে অগ্নিশর্মা হ'য়ে কবীরের কাছে অভিযোগ করেন। কবীর সমস্ত ঘটনা স্বদয়ঙ্গম ক'রে, সত্যাত্ম ব্রাহ্মণকে বলতে থাকেন :—

পণ্ডিত তুম বুঝ শিষ্যপানী।

তোহে ছুং কই লপ্টানী?

জামাটিকে ঘরমে বৈঠে তামে সৃষ্টি সমানী।

হে পণ্ডিত, তুমি বুঝ-সুঝে জল খেও। এ জলে কোথা থেকেই বা ছুং লাগলো? যে মাটির ঘরে তুমি বাস করো, সেই মাটির সঙ্গেও তো সমগ্র পৃথিবীর সংযোগ রয়েছে! এই ভাবে কবীর সমাজশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও মোল্লাদের মহানুশ্য উপদেশ দান ক'রে, তাঁদের জ্ঞাননেত্র বিকশিত করতেন!

একদা কবীর তাঁর প্রাণের জ্বালা জুড়াবার জন্তে কোন পরম-পুরুষের সন্ধানে তিব্বত, আফগানিস্তান, তুর্কিস্তান, বুখারা, ইরান প্রভৃতি বহু দেশ পর্যটন ক'রে শেষে গোরকপুরের কাছে হিমালয়ের পাদদেশে 'মগহর' গ্রামে উপনীত হন এবং তথায়ই নির্জনবাসে জীবনের অবশিষ্টকাল অতিবাহিত করবার সঙ্কল্প করেন। প্রবাদ আছে, কাশ্মীরে দেহ রাখলে নাকি শিব হয়। তেমনি মগহরে মরলে মাহুদ নাকি গাধা হয় পরজন্মে। তাই কবীর কাশ্মীর ত্যাগ ক'রে মগহরে বাস করতেই সূক্ষ করলেন। শিষ্যদের তিনি বলেন, 'ভগবানের সাধন-ভজন না ক'রে কেবল স্থানমাহাত্ম্যে দেহ ত্যাগ ক'রে মুক্তিলাভ আমি চাই না। যদি আমার ভগবৎ-প্রেম অটুট থাকে তবে মগহর থেকেই আমার মুক্তিলাভ আমি আদায় ক'রে নেব!'

অবশেষে একদিন মগহরে এক নদীর তীরে পুণ্পশয্যা ক'রে কবীর তাঁর শেষের গান গাইলেন,—

গাউ গাউরী হুলহনী মঙ্গলচারা।

যেরে গৃহে আয়ে রাজারাম ভটার।

অর্থাৎ, হে কস্তাবাজিগণ! তোমরা আমার বিবাহের মঙ্গলচারণ গান করো। কারণ; আমার ওষ্ঠা রাজারাম আমার গৃহে এসেছেন।

এই ব'লেই কবীর নিজের শরীরে বদ্বাদ্ধাধিত ক'রে বিজ্ঞ

হ'য়ে গেলেন। তারপর সেই দেহের সংস্কার নিয়ে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিস্তারিত বাকবিতণ্ডা শুরু হ'লো। হিন্দুরা দাঁহ করতে চায়। মুসলমানেরা চায় কবরস্থ করতে। কিন্তু, অকস্মাৎ বন্ধোদ্ধান উন্মুক্ত করলেই এক অত্যাশ্চর্য্য, অভাবনীয় ও অলৌকিক দৃষ্টের তীক্ষ্ণচুটায় সমবেত ভক্তবৃন্দ পরম-বিস্ময়ে পাগলবৎ ঝাড়িয়ে থাকল। সেই বালুর তলদেশে কবীরের শবদেহের পরিবর্তে প'ড়ে আছে গুচ্ছ গুচ্ছ পুষ্পাংশি।

সেই পুষ্প ভাগ ক'রে কতকগুলি পুষ্প তিন্মুগ্ধ কানীতে দাঁহ করে, বর্তমানের কবীর চৌরী—নামক স্থানে সেই ভাস্ম সমাধিস্থ করে এবং অর্দ্ধেক পুষ্প মুসলমানগণ 'মগহর' কবরস্থ করে।

সেই থেকেই কানীর 'কবীর-চৌরী' ও 'মগহর' উভয় স্থানই কবীরপন্থীদের পবিত্র তীর্থক্ষেত্ররূপে চিরস্ববর্ণীয় হয়ে বিরাজ করছে।

ঐতিহাসিকদের মতে :—কবীরের জন্ম—১৪৪০ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু—১৫১৮ খৃষ্টাব্দে।

গিবনের আত্মজীবনী

সুনীলকুমার নাগ

ইংরেজী ভাষায় ত বটেই এবং গোটা পৃথিবীর আত্মজীবনী—সাহিত্যে ও অন্ততম শ্রেষ্ঠ রচনা গিবনের (Edward Gibbon 1737—1794) আত্মজীবনী।

গিবনের মৃত্যুর দু' বছর পর তাঁর এক বন্ধু এ বইখানা প্রকাশ করেন। কাগজ-পত্র ঘেঁটে দেখা গিয়েছিল যে, গিবন তাঁর আত্মজীবনীখানা দুটি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে লিখে রেখে গেছেন।

গিবনের বইয়ের প্রেক্ষাপট প্রথম কারণ, তাঁর জীবনের জানা ঘটনাগুলি হুবহু তাঁর আত্মজীবনীতে স্থান পেয়েছে দেখা যায়। কাজেই নিজের সম্বন্ধে কোন প্রসঙ্গ বাড়িয়ে বা কমিয়ে বলার বদনাম তাঁকে কেউ দিতে পারে না। আর দ্বিতীয় কারণ এই যে, গিবনের অবিস্মরণীয় কীর্তি 'The Decline and Fall of the Roman Empire'—এর যেমন তার ব্যক্তিগত ফুটে এই আত্মজীবনীতেও স্পষ্ট থেকে শেষ পাতা পর্যন্ত আমরা সেই ব্যক্তিত্বের আশ্রয় পাই। বৈধ ও সহিষ্ণুতা, অধ্যবসায় ও প্রমত্ততা, ভানবার অনন্তসাধারণ ইচ্ছা আর সেই সঙ্গে সব মিলিয়ে সাফল্যের মূলমন্ত্রস্বরূপ নিজের কাজ সঠিকভাবে সাজ করাবার জ্ঞান একটা অনড়, সুদৃঢ় ও স্থির প্রতিজ্ঞার পরশ আমরা এ আত্মজীবনীর সর্বত্র পাই। গিবনের আত্মজীবনীর আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, উনি যে ভাবে নিজে তাঁর বিরাট ইতিহাস একেবারে গোড়ার কথা থেকে আরম্ভ করে রচনা শেষ করা প্রকাশ করা এবং সে বইয়ের জনপ্রীতি, বিক্রয় সমালোচনা এবং নিজের নাম ধাম খ্যাতি প্রভৃতির কথা বলে গেছেন, খুব কম লেখকই সাধারণতঃ এ কাজ করে থাকেন।

একেবারে ছেলেবেলা থেকে যোল বছর বয়স পর্যন্ত গিবনের শরীরের অবস্থা খুব খারাপ ছিল। অক্সফোর্ড ছাত্রাবস্থায় গিবন একবার ক্যাথলিক হ'য়ে যাবেন মনস্থ করেছিলেন। বাতে ক্যাথলিক না হ'য়ে বান সেই জন্ত গুঁর বাবা গিবনকে পাঠিয়ে দেন জেনেভায়। একেবারে বালা বয়স থেকেই গিবন নানা রকম বই পড়তে আরম্ভ করে দেন। কি পড়া উচিত না

অনুচিত, এ কথা বলে দেবার কেউই ছিল না। গিবনের কৃতি ক্রমশঃ ইতিহাসকেই করে গড়ে উঠতে থাকে। 'My indiscriminate appetite subsided by degrees into the historic line, and arrived at Oxford with a stock of erudition that might have puzzled a doctor.'.....এ হলো গিবনের বচন মাত্র পনেরো বছর বয়স। কাজেই রোমান সাম্রাজ্যের অদ্বিতীয় ঐতিহাসিক যে অজ্ঞাতসারে কত দীর্ঘ দিন ধরে তৈরী হচ্ছিলেন তা সহজেই অনুমেয়।

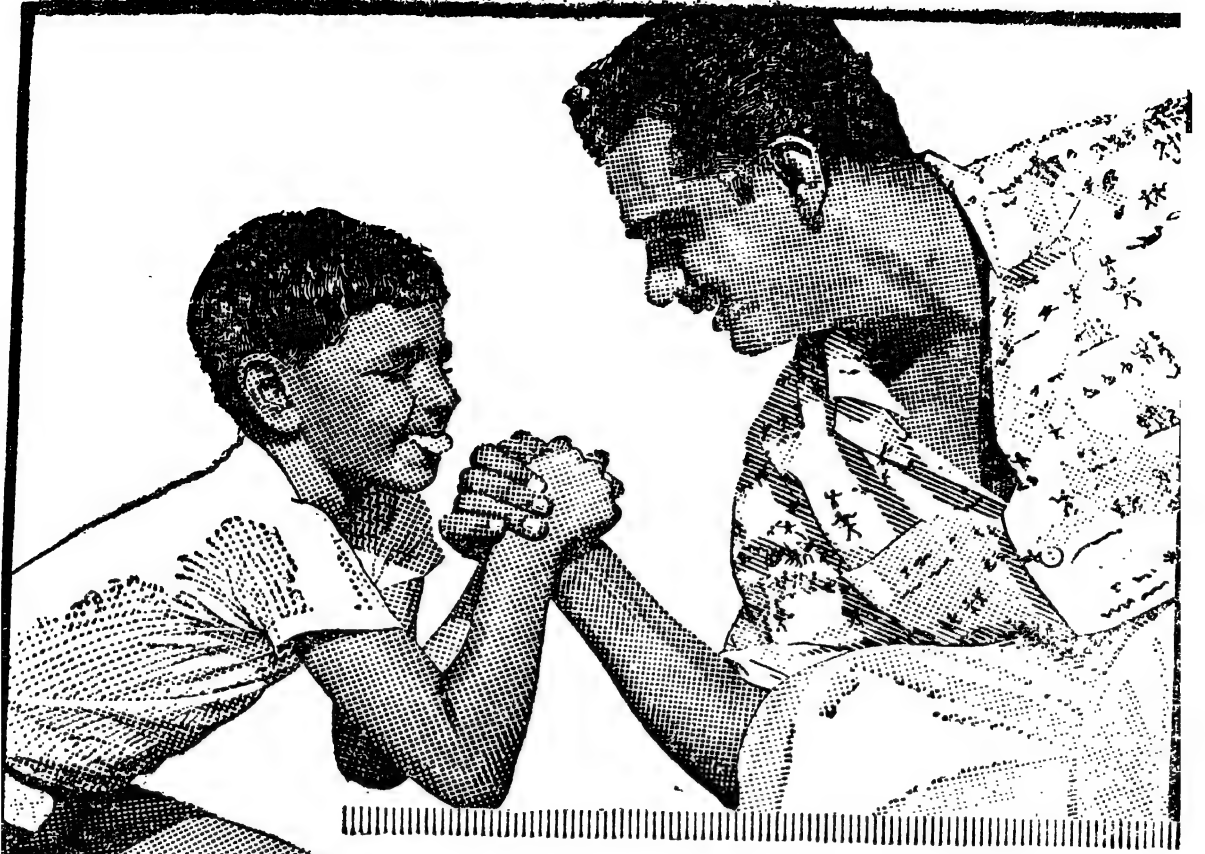
ক্যাথলিক প্রভাব থেকে রক্ষা করার জন্ত বাবা গিবনকে সুইজারল্যান্ডে পাঠিয়েছিলেন। এখানে পাঁচ বছর থাকেন উনি। ফরাসী ভাষাটাও গিবন এই সময় ভালো ভাবে শিখে নেন। পড়াশুনাটাও একটা নিয়মের আওতায় আনবার চেষ্টা করলেন। অনেক বলতেন, পড়ার সঙ্গে লিখে গেলে পঠিত বিষয় দীর্ঘ দিন মনে থাকে। কিন্তু গিবনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অনেকটা ডাঃ জনসনের মত। অর্থাৎ কি না লিখবার কোনই প্রয়োজন নেই—পর পর হবার পড়লেই জিনিসটা ঠিক ঠিক মনে থাকে।

সুইজারল্যান্ডে থাকবার সময়েই গিবনের জীবনে প্রথম প্রণয়ের সূচনা হয়। যদিও এ একটা নিতান্ত ব্যর্থ প্রেমের কাহিনী, কিন্তু তবু সদিনের কথা শ্রবণ করে প্রোট, ড্যানবুর্ক ঐতিহাসিক লিখেছেন : I am rather proud that I was once capable of exalted sentiment.

স্থানীয় এক পুরোহিতের একমাত্র মেয়ের সঙ্গে গিবনের প্রেম জন্মে। মেয়েটিকে বিয়ে করার জন্ত গিবন কম চেষ্টা করেন নি—কিন্তু বাবার অমতের জন্ত শেষ পর্যন্ত এ বিয়ে হলো না।

কয়েক বছর গিবন সৈনিকের কাজ করেছিলেন। সৈন্য বিভাগ থেকে ছুটি পাবার পরই দেশ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। ঘুরতে ঘুরতে চলে আসেন রোমে। রোমে এসে After a sleepless night, I trod, with a lofty step, the ruins of the Forum ; each memorable spot, where Romulus stood, or Jully spoke, Q Caesar fell, was at once present to my eye. ১৭৬৪ খৃঃ-অব্দের পনেরোই অক্টোবর রোমে বসেই গিবনের মনে রোমান সাম্রাজ্যের একখানি ইতিহাস লিখবার প্রেমাণা আসে।

রোম থেকে দেশে ফেরবার পাঁচ বছর পর ১৭৭০ খৃঃ-অব্দের নভেম্বর মাসে গিবন তাঁর 'The Decline and Fall of the Roman Empire' লিখতে আরম্ভ করেন। বইখানা লেখা শেষ হয় ১৭৮৭ খৃঃ-অব্দের ২৭শে জুন। এ বইয়ের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হবার পর যে আলোড়ন সৃষ্টি হয় সারা দেশে, সে সম্বন্ধে গিবন লিখেছেন : I am at a loss to describe the success of the work.....My book was on every table ; nor was the general voice disturbed by the barking of any profane critic. গিবন তাঁর বইয়ের শেষ খণ্ড প্রকাশ করার পর আত্মজীবনীতে লিখতেন : Twenty happy years have been animated by the labour of my history ; and its success has given me a name, a rank, a character in the world to which I should not otherwise have been entitled.



যাঁরা ভাল স্বাস্থ্য ভালবাসেন তাঁরা সবসময়
লাইফবয় দিয়ে স্নান করেন

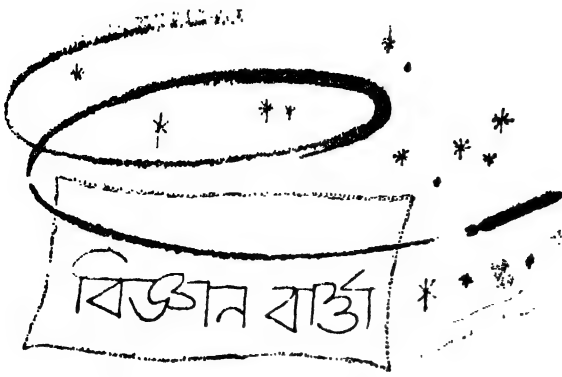


খেলাধুলোই বলুন বা কাজকর্মেই বলুন
আমরা কখনই ধুলোময়লার থেকে নিরা-
পদ নয়। আর ময়লা বহন করে রোগের
বীজনা যা সবসময় আপনার স্বাস্থ্যের
পক্ষে ক্ষতিকর। লাইফবয় সাবান এই
বীজনাগুলি ধুয়ে সাফ করে দেয় এবং
আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখে।

প্রত্যেকদিন লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান
করে আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখুন—
এটি আপনাকে এত করবারে করে তোলে।

যেমন দিকায় লিফট, কর্তব্য প্রভৃতি।

L 278-X52 BG



ডক্টর বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

গোশ্ব রাসের গল্প নিশ্চয়ই আপনাদের জানা আছে। পৃথিবীর এক অঞ্চলে সোনার খনির সন্ধান পাওয়া গেল, অমনি দলে দলে লোক বাত্মা করলো সেই অঞ্চলের দিকে। উদ্বেগ স্বপ্ন আহরণ। এবার আর গোশ্ব রাস নয়—সোনার চেয়েও দামী হীরের কথা বলছি। আগামী যুগে একদল মানুষ হয়তো হীরের সন্ধানে মহাশূন্ত বাত্মা করতে পারে। আমেরিকার একজন বিজ্ঞানী সম্প্রতি চাঁদের দেহে হীরের খনি থাকার সম্ভাবনার কথা ঘোষণা করেছেন। এই বিজ্ঞানীর নাম ডাঃ জি পি কুইপার (Dr. G. P. Kuiper) এবং তাঁর কর্মস্থল উইসকনসিনের ইয়র্কস (Yerkes) গবেষণাগারে। তিনি জানিয়েছেন যে, চাঁদের উপরে অবস্থিত আগ্নেয়গিরির আগ্নেয়ুখ সমূহের কতকগুলি দেখতে অনেকটা বিরাট বড় আইসক্রীমের কোণের মতো এবং সঙ্গে দক্ষিণ-আফ্রিকার হীরের খনির বথেষ্ট সাদৃশ্য বর্তমান। জাশনাল অ্যাকাডেমি অফ সাইন্সের এক আলোচনা-চক্রে বিজ্ঞানী কুইপার তাঁর এই আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করেন। তিনি বলেন যে, পর্যবেক্ষণ করে দেখা গিয়েছে যে, চাঁদের দেহে অবস্থিত আগ্নেয়গিরির আগ্নেয়ুখ সমূহকে প্রধানত: দু'ভাগে ভাগ করা যায়। এক শ্রেণীর বৃথ হলো বাটির মতো, সাধারণত: বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন যে, মহাশূন্ত ভ্রমণকারী দেহপিণ্ড সমূহের আঘাতের ফলেই এই শ্রেণীর আগ্নেয়ুখ সমূহের সৃষ্টি হয়েছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর আগ্নেয়ুখ সমূহ হলো কোণাকৃতি। চাঁদের অভ্যন্তরের গ্যাসের বিক্ষোভের ফলেই তাদের সৃষ্টি। এই বিক্ষোভ বন্ধন হয় তখন চাঁদ বথেষ্ট গরম ছিলো। টেলিস্কোপের দ্বারা এই দ্বিতীয় শ্রেণীর আগ্নেয়ুখ সমূহের পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণই ডাঃ কুইপারের আবিষ্কারের প্রধান ভিত্তি। অবশ্য হীরে যে সেখানে আছেই, তা নিশ্চিত ভাবে বলা সম্ভব নয়। তার নিশ্চিত ধারণা অর্জনের জন্য মানুষকে প্রথমে চাঁদের দেহে অবতরণ করতে হবে।

বিজ্ঞানের কর্মধারা এবং প্রগতির সঙ্গে সাধারণ মানুষকে পরিচিত করার জন্য আমেরিকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের চেষ্টার অন্ত নেই। এ বিষয়ে বিজ্ঞানকর্মীরা গভীর ভাবে চিন্তা করেন। প্রতিষ্ঠানগত ভাবে তাঁরা সাধারণ মানুষের সঙ্গে সংযোগ রাখতে চান এবং বিজ্ঞানের কল্যাণকর পথে তাঁরা কি ভাবে কাজ করছেন, তা সকলের সামনে উপস্থিত করার জন্য বিশেষ ভাবে উৎসাহী। বিজ্ঞানের প্রগতির উদ্ভব হওয়া উচিত জ্ঞানের সম্ভারণ এবং মানব-কল্যাণে সেই

দীর্ঘ সম্প্রদায়িত জ্ঞানের প্রয়োগ। বিজ্ঞানী এবং বিজ্ঞানিকর্মীরা সমগ্র মানব-সমাজের প্রতিনিবিরূপ জ্ঞানের এই সম্প্রদায়িত পথে কাজ করেন। সুতরাং মানব-কল্যাণে তাঁরা কি করছেন বা না করছেন, তার এক উপলব্ধি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার একটা দায়িত্বও তাঁদের আছে। তার একটা খোলা দিক এ দেশে আমার চোখে পড়েছে—গবেষণা-মন্দির বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই দায়িত্বকে স্বীকার করে এগিয়ে যেতে চান। কিছুদিন আগে কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্নেল অ্যান্ড হোম উইক পালন করা হোল। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি-বিজ্ঞানের বিভাগটি খুবই বড় এবং তাঁরা কৃষি-বিজ্ঞানের নানা ক্ষেত্রের নানা সমস্যা নিয়ে কাজ করেন। বছরে তাঁরা একটি সপ্তাহ ব্যয় করেন, কি করছেন তা জনসাধারণের কাছে উপস্থিত করার জন্য। এই সপ্তাহে তাঁদের সমস্ত গবেষণা-মন্দির জনসাধারণের পরিদর্শনের জন্য খোলা থাকে। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কৃষকরা এবং কৃষি-বিজ্ঞানের কর্মধারায় উৎসাহী লোকেরা এসে দেখে বান যে তাঁদের কল্যাণে বিজ্ঞানীরা কি ভাবে প্রকৃতির জটিল জ্ঞানভাণ্ডারের উন্মোচন ঘটান। এর থেকে তাঁরা নিজেরা বা করছেন, তার পেছনে অবস্থিত মূল সত্যটি উপলব্ধি করার পথের সন্ধান পান, তাদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে প্রকৃতি-রাজ্যের মৌলিক জ্ঞানভাণ্ডারের সম্মেলন ঘটে। চারি দিক ঘুরে দেখে,—বিজ্ঞানকর্মীদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের মনে আশ্চর্য ভাব জাগে,—সকলে বিশ্বাস করতে পারেন যে, তাঁরা বা করছেন তার উন্নতির জন্য বিজ্ঞানের সত্যদৃষ্টি নিয়ে একদল কর্মীও কাজ করে যাচ্ছেন। প্রয়োজন হলে প্রাণের জ্ঞানভাণ্ডারের সহায়তা থেকে তাঁরা বঞ্চিত হবেন না।

কর্ণেলে একটা সপ্তাহের শেষ পালন করা হোলো অভিভাবকদের দিন হিসাবে। এ আরেক ভাবে জনসাধারণের কাছে নিজেরদের কর্মধারা উপস্থিত করার আয়োজন। তাঁরা তাঁদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া লেখার জন্য এখানে পাঠানো,—কি ভাবে তারা এখানে থাকে, কি ভাবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মধারা এগিয়ে চলেছে তা একটা সপ্তাহ শেষে তাঁরা নিজেরা এসে দেখে বান। কিছু জ্ঞানীর থাকলে এই সময় বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করে অভিভাবকরা তা জানতে পারেন। প্রশ্ন করে তাদের সঙ্গে এবং উৎসুক নিয়ম করতে পারেন—সম্ভব হলে নতুন কিছু পরামর্শও দিতে পারেন। সকলের সঙ্গে এই রকম বোগাযোগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের পক্ষে মঙ্গলকর। এর মধ্যে দিয়ে তাঁরা সাধারণ মানুষের আস্থা অর্জন করতে পারে।

M. I. T অর্থাৎ ম্যাসাচুসেটস ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজির নাম আপনারা নিশ্চয়ই শুনেছেন? কারিগরী বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে শিক্ষাকালনের জন্য এই প্রতিষ্ঠানটি আমেরিকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে এক মর্যাদাপূর্ণ আসনের অধিকারী। 'মি' মাসের প্রথম সপ্তাহে একটা দিন ছিলো তাদের 'ওপেন হাউস' যে কোন লোক সেদিন তাদের শিক্ষা ও গবেষণা-মন্দিরের কর্মধারা ঘুরে ঘুরে দেখতে পারেন। হঠাৎ সেদিন গিয়ে পড়েছিলাম বোষ্টন—গিয়ে শুনলাম সেদিনই M. I. T-এর 'ওপেন হাউস'। অত্যন্ত কাজ ফেলে চলে গেলাম M. I. T। জনসংযোগের দিন সেদিন—সমস্ত প্রতিষ্ঠানটি ঘুরে দেখার এবং তাদের কর্মধারা এবং পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার এক সুযোগ ঘটনাচক্রে ঘিলে গিয়েছে এ হারানো উচিত নয়।

আমার এতো কথা বলার মূল উদ্দেশ্য হলো আমাদের দেশেও প্রত্যেক বিজ্ঞান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এবং গবেষণ-মন্দিরের জনসাধারণের কাছে নিঃস্বাদের এই ভাবে উপস্থিত করার চেষ্টা থাকা উচিত। বেশী নয়, বরং একটা কি দুটো দিন তারা এই ভাবে জনসাধারণের ভিত্তি আলাদা করে রাখতে পারেন। অনেকে হয়তো বলবেন—এতে অনেক অসুবিধা আছে। এর জন্ত সময়ের প্রয়োজন, তাছাড়া জনসাধারণ সব সময় উৎসাহী নাও হতে পারেন। আমার কৃত্ত ধারণা কিন্তু অন্য—মনে হয় বহু লোকই এতে উৎসাহী হবেন এবং ছুস কলেজ থেকে ছাত্ররাও দল বেঁধে এসে খ্যাতনামা বিজ্ঞান-গবেষণা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীর সঙ্গে পরিচিত হতে পারবেন। আগে থেকে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে সেদিন শুধু গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীর পরিচয় সকলের সামনে খুলে দি। নতুন কিছু করার জন্ত এবং দেখাবার জন্ত সময় ব্যয় করার দরকার নেই। বা আছে তাই—কেবল একটু সাহসে গুহিয়ে সকলের সামনে রাখা। প্রথমে হয়তো লোকসমাগম কম হতে পারে। কিন্তু মনে হয় ক্রমেই জনসাধারণ এতে উৎসাহী হয়ে উঠবেন এবং এই ভাবে গবেষণা-মন্দির এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের সঙ্গে জনসংযোগ বেড়ে যাবে। সাধারণ লোক গবেষণা-মন্দির সমূহের কার্যকলাপের ব্যাপারে অধিকতর উৎসাহী হয়ে উঠবেন। এর সঙ্গে দেশের আর একটি মস্ত বড় উপকার হবে—এর মধ্যে দিয়ে বীরে বীরে সাধারণ মানুষের মধ্যে ঘটেবে বিজ্ঞান-চেতনার সম্প্রসারণ।

‘ওপেন হাউস’ আর একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছি। এরা নিজেদের কর্মচারীর পরিপ্রেক্ষিতে বিজ্ঞান-তিনিয়াটাকে লোকের চোখের সামনে তুলে ধরতে চায়—বিজ্ঞান-জগৎটাকে সঠিক ভাবে লোকের চোখের সামনে উপস্থিত করে। মৈনদ্দিন জীবনের প্রতি মুহূর্তেই পেছনে প্রকৃতির কি অলৌকিক রহস্য বিরাজ করছে তা লোকের চোখের সামনে সঠিক ভাবে উপস্থাপিত করা এবং বিজ্ঞান-বাজ্যের অজানা রহস্যের সঙ্গে লোককে পরিচিত করে দেওয়াই হলো তাদের প্রধান উদ্দেশ্য।

‘ওপেন হাউসের’ দিনে—নানা বকম পরীক্ষামূলক জনপ্রিয় বস্তুতাবলীরও আয়োজন করা হয়। আমাদের দেশেও ‘ওপেন হাউস’ জাতীয় কোন কিছু অনুষ্ঠান করতে হলে এদিকে সতর্ক নজর রাখতে হবে—কারণ ম্যাজিক দেখানোর স্বভাবটা আমাদের মজ্জায় মজ্জায়।

বিজ্ঞানের কোন কিছু পরিবেশন করতে গেলে এমন কিছু আয়ত্ত উপস্থিত করতে চাই, যাতে লোকের তাক লেগে যায়। এই কলটা টিপলাম—একটা জন্ত কিছু হয়ে গেল। লোকে বাচবা দিলো, আর পাঁচজনকে ডেকে এনে দেখাল। এর কিছু একটা অত্যন্ত ধারণা দিকও আছে। এর ফলে লোকে ভুলে যায় যে বিজ্ঞানের পরিবেশটা তার আপন পরিবেশ এবং কিছুটা তার নিজের হাতে গড়া পরিবেশ। বিজ্ঞানকে সে অলৌকিক ভাবে—সমগ্রদে দূরে রাখে। বিজ্ঞান-চেতনার সম্প্রসারণ ঘটতে গিয়ে এই ভাবে বিজ্ঞান পরিবেশ সযত্নে প্রায় অজ্ঞ সাধারণ লোককে বিজ্ঞান উপলব্ধির ক্ষেত্র থেকে আরও দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়। আমাদের দেশের সাধারণ লোক বিজ্ঞানের আপন পরিবেশ সযত্নে খুবই কম সচেতন—সুতরাং সেই অবস্থায় সরল সহজ সত্য পরিবেশন করার পরিবর্তে ম্যাজিক দেখানোর প্রচেষ্টার ফলাফল খুবই মারাত্মক। সুতরাং মনে হয়, রাজসিক বিজ্ঞান-প্রদর্শনীর দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তে সাধারণ বিজ্ঞান-চেতনার সম্প্রসারণ এবং নিজেদের কর্মচারী ব্যাখ্যার দিকে যদি দৃষ্টি রাখা হয়, তাহলে মনে হয় ‘ওপেন হাউস’ দিন উদ্‌ঘাপনের জন্ত কোন অসুবিধারই সৃষ্টি হওয়া উচিত নয় এবং তার প্রেক্ষিতে সময় নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনাও অনেক কম।

দেশের একটা খবর এদেশের পত্রিকাতে আমার চোখে পড়লো। নতুন করে তা আমার আপনাদের পরিবেশন করছি। বড় প্রজ্ঞত করার জন্ত বোম্বাইয়ে এটিক ইন্ডাস্ট্রিস প্রাইভেট লিমিটেড (Atic Industries Private Ltd.) নামে একটি কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই কারখানা খোল, হয়েছে গত ১ই এপ্রিল। এর নির্মাণে সময় লেগেছে দু’ বছর এবং এর জন্ত খরচ হয়েছে প্রায় ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা। এই কারখানার নীল, কালো, বাগামী, অলিভ, হলুদ, কমলা ইত্যাদি নানারকম রঙ প্রস্তুত করা হবে। ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাস্ট্রিস (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড এবং অতুল প্রোডাক্টস লিমিটেডের একটি সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এটিক ইণ্ডাস্ট্রিসের জন্ম হয়েছে। বহু প্রকার শিল্পসম্পাদনের মধ্যে রঙ হলো একটি—যার জন্ত বাবিন ভারতবর্ষকে জন্ত দেশে সাহায্যের উপর নির্ভর করতে হয়। সুতরাং নতুন এই শিল্প প্রতিষ্ঠান যে ভারতের শিল্পক্ষেত্রের মর্যাদা সম্প্রসারিত করবে, তাতে সন্দেহ নেই।

বারিঝরা আষাঢ়ে

কাকলী চট্টোপাধ্যায়

এবারেও আশা যে ছিল মনে
বারিঝরা আষাঢ়ে ছুটি রক্তগোলাপ মোরা
দেব হুঁজনে।
দেবে তুমিও
দেব আমিও,
দেব হুঁজনার ভালোবেসে

হুঁজনে ; বুঝি হ’ল না শেষে
হায়, সেই দেওয়া নেওয়া,—
নিরালায় ছুটি কথা কওয়া,
আজ মনে হয় তোমা হ’তে তুমি যেন যোবে
সরায়ে দিয়েছ বহু দূরে ;
তাই তো আমার দীর্ঘাসের তপ্ত ঝড়ে।

স্বপ্ন-সাধার স্বপ্ন-বকুল পথপ্রান্তে ব’রে পড়ে।

এস সে ফুল কুড়িয়ে নিতে
আমার হিতে।

একটু একটু কাদ

শাশী বিশ্বাস

একটু কাদ। কেবল আমারই জন্মে একটু চোখের জল
বরফ ভেঁদার। তুমি পৃথিবীর মমতা নিয়ে জন্মেছো।
কীভাবে শেখবে। আমি মমতা পেতে চাই, তার ডাকবাস।
আমিটা বুঝা যায়নি আমার। যেম না, আমার জন্মে এক ভরও
কৈছে। আমার সঙ্গে যাকগা তার চোখের জল টেনে এসেছে।
আমি যেমন তুমি চলে যাই।

তুমি নাই বা তুমি ভাবসে। আরেকটা একটা ফল কলতে পায়ে
না কি? আমি কণ্ঠের ফল দেখি। একটা সুহৃদের জন্মেও পৃথিবী
খমকে টাড়িয়ে আমার চলে-বাওরা পথের দিকে কি তাবিদে থাকতে
পারে না? তুমি পৃথিবীর মমতা পেয়েছো, তুমি একটু ভুল হও।

আর তুমি একটু কৈলো,—আমার জন্মে চোখের জল কৈলো।
হ-হ বয়ে গভীর রাতের বাতাস বয়ে যায়। মহানগরীর
পাঁচখানা বাঞ্জির উপর দিয়ে মাথার ধাক্কা খেয়েও সে বাতাস এসে
আছে পড়ে এ বাড়ির জানলার। বড় জানলাটা খোলা থাকলে
ঘরের ভেতর ঢোকে বাতাস। ঘরের ভেতর ঢোকে আর খাতা-
বই-পতরের পাতা উড়তে থাকে। আলগা পাতাগুলি ও পাশের
দেওয়ালে গিয়ে জড়ো হয়। দেওয়ালে টাঙ্গানো ক্যালেন্ডারের মাসগুলো
ভীষণ ভাবে ছটফট করে। সময় বেশ দ্রুত চলে যেতে চায়—
আরও দ্রুত। যে মাসের আজ উনিশ আর বারটা দিনও অপেক্ষা
ক'রে যেতে চায় না। ও-পাশের খাটের মাথার উপরে এবড়ো-খেবড়ো
ক'রে গুটোনো মশারিটা এলোপাখাড়ি ওঠা-নামা করে।

গ্রীষ্মের গভীর রাতের বাতাস বয়ে যায়। এত বাতাসেও ঘাম
মরে না গায়ের। কপালের প্রতিটা শিরা জেগে ওঠে। পেশীগুলো
দল-দল করে। ঘাম জমে কপালে, নাকের ভগায় আর বুকে, পিঠে,
বাড়ে। এত বাতাস, তবুও গুটো-গরম কাঠে না একটুও।

বিলাস ইন্সটিটিউটের মধ্যে পড়ে পড়ে ছটফট করে ঘামে। তবুও
ওঠে না।

বিলাস। কামবাজারের বিখ্যাত মজুমদার-বংশের শেষ সন্তান।



অবশ্য এখনও তার জালো দেওয়ার প্রয়োজন হয়নি। কেন না,
বেগুতো একবার জলেছিলো তার এখনও তেলে-জাল দল-দল করে
জটিল আলোর রঞ্জা বিভার করে আছে। দেবীশংকর মজুমদারের
জীবন ও যৌবনের সার্থক উদ্ভাবিকারের ওড়ার চেই, সেই ভাঙই
সর্বশেষ সন্তোষের দিকে আজও কেউ হুড় একটা ভাবায় না। প্রহেলিকা
কোন দিন হবে হ'লেও মনে হয় না। অসুস্থতা বিলাসের তাই ব্যাধ।
এ ধারণা তার কাছে অস্তিত্বের হাটু মিথ্যা নয়। মিথ্যা নয়
বলেই বেঁচেছে বিলাস। না হ'লে বিলাস নাশিটি বৎসর একটা ব্যাক
হ'রে উঠলো পাড়ার, পাড়া থেকে বে-পাড়ার, ভগ্নন দেবীশংকরের
সর্বশেষ পুত্র হয়ে সজ করতে পারতো কি করে? সজ করতে না
হয়ত। হয়ত অনেককে সে ওলী করে মারতো। কিন্তু তাকে ব্যাক
করে কেউ মারা গেছে, এমন অপবাদ কেউ তাকে দিতে পারবে না।
তার অতি-বড় শত্রুও না।

সে ব্যাকের পাত্র। আশ্চর্য! মানুষের ঘণাকে কোন্ গুণ থাকলে
উপেক্ষা করা যায়? ভেবে দেখা হয়নি বিলাসের, এত দিন শুদীর্ণ
ত্রিশটি বছর পেয়েও সে ভাবেনি। নিজের স্বাক্ষর এতটুকুও ভাবেনি।
অথচ সে তো ঠিক উঠেছিলো সূর্যের মত না হ'লেও তার ওঠার মধ্যে
দীপ্তি ছিলো না কি? না হ'লে স্বপ্ন আর আশা ওর জীবনকে ঘিরে
ধরবে কেন? কিন্তু বাড়তে না বাড়তেই মেখে-ঢাকা সূর্যের দিকে
লোকে যেমন ক'রে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তারার, তেমনি ওর দিকেও
অবজ্ঞার দৃষ্টিতে সকলে তাকিয়েছে। আর দেবীশংকরের ছোট ছেলে
বিলাস নীরবে সজ করেছে সে অপমান। অবজ্ঞা।

অবশ্য-বর্ষিত চুলগুলি কপালে এসে আছে পড়েছে। বিলাস
গভীর মমতা চলে নিজের চুলগুলি সরিয়ে দিলো। যেন নিজের
চুল নয় এগুলি। এই ত সেদিনের কথা। মাত্র ক'টা দিন আগেও
বদি আর একটা কপালে অমনি ভাবে চুল উড়তো। শুক-বিশ্ময়ে
চেয়ে থাকতো বিলাস। এই চেয়ে থাকাই তার বিলাস। সুখোমুখি
চেয়ে থাকাই তার অভিজাত্য।

একটু কাদ। আমারই জন্মে একটু কাদ তুমি।

নড়ে-চড়ে বসলো বিলাস। মানুষের জীবনে অনেক সময় এমন
ঘটনাও ঘটে যায় যা পরে ভেবে দেখলে নিজেরই কেমন বিশ্বাস
হয় না। এই বিলাসই কি এত অমুনর—এত আর্দ্রতার জীবনে
কখনও শুনেছিলো? শোনেনি। যে ভারতী সেন ওকে বিয়ে করতে
চেষ্টাছিলো তার সুখেও শোনেনি। নন্দিতা নন্দীর সুখেও না।
সেখানে শোনেনি, কেন না তাদের ছিলো জীবনের আশা—আর
পাণি বসাকের সুখে শুনলো, কেন না এখানে যুড়ার হতাশা।

আমি আর থাকছিনে—থাকবো না। আর এ বিশ্বাস আমাকে
বড় পীড়া দেবে যদি জানতে হয় আমি ছিলামও না। কোন দিন
থাকতে চাইনি। তোমার বেদনার অঙ্কর মধ্যে আমি থাকার
ভাষা শুনতে চাই। আমারই জন্মে তুমি একটু কাদ।

বিলাস চমকে ওঠে। কতো দিন পরে আবার ওদের কথা মনে পড়লো। ভারতী সেনকে মনে পড়লো। পাখি বলকের পাশে। এর মধ্যে কি ভালগারিটি আছে? ভারতী সেনকে হরত বলবে, আছে। তুমি নোংরা, তাই আর একটি অভিজাত ঘেরকে বসিয়েছো ঐ নোংরা গিলির মেয়েটার পাশে। এক সাহস পাও তুমি?

সাহস না পাবে কেন বিলাস? তুমি ঘেরে নও? পাখি কি ঘেরে নয়? ঘেরে। নারী। এই ত তার বড় পরিচয়। সে সুখ টালতে পারে। বিষও। সময়-বিলম্বে বিষও সুখ। কেন না, আমি কি শুধু পুষ্টিই চাই, জ্বর চাইনে? জ্বর করতে না পারাটা যে আমাকে হতভাগ্য করে তোলে। সকলেই জ্বর করে। টাকা। ঘের। ঘন—

কি বা-তা বলছো বিলাস। তোমার শিক্ষা বার্থ। ভারতী সেন নিশ্চয়ই নাক কুঁচকাবে।

বার্থ? না ভারতী। কেন না এ শিক্ষা কেউ দেয় না। এ শিক্ষা আমার শৈশবে, রক্তে, আর ধমকে মাথায় একটা টোকা দেয় বিলাস, আর এখানে, বৃদ্ধিতে। ব্যাপারটা একটু নাটকীয় হয়। তা হোক। জ্বর যদি একটু বোঝে ভারতী সেন। বৃদ্ধো না। ওর মত একটি ডালহোড্ডে ঘেরের পক্ষে অবগত বোঝবার কথাও নয়। ও ভয় পেরেছিলো। বিলাসের জ্বর করার প্রবল বাসনা বৃষ্টি বা ওর দেহের উপর এসে আছড়ে পড়লো হাট নন-সল। একটু ঠোটজোড়া এগিয়ে দিলে আর একটু বৃকে মুখ গুঁজতে দিলেই কি জ্বরের পথগুলো সব আলগা হয়ে পড়লো নাকি? তা হয় না কোন পুরুষের। বৈজ্ঞানিক যে আপন অগ্নিতেজে দগ্ধ হয়েছিলো,—কেন? হ্যাঁ, তার বদলে যদি একটা চড় মারতো ভারতী সেন, খুসী হতো বিলাস। বৃদ্ধো, না, ভারতী সেনেরও কিছু দেওয়ার আছে। কিন্তু তা ও করেনি। কেবল ভয়ে পালিয়ে গেলো। নিছক ভয়ে—বোকামি নিয়ে। বিলাস হাসলো, দেবকী হাজ প্রেপ্ট এ্যাওয়ে ক্রম মাই ক্যাটাল গ্র্যাপ্স। ভালো হয়েছে। বৈচ্ছে ভারতী সেন। এম-এ-পাশ করে কোন বিলেত-কেন্দ্র ইঞ্জিনিয়ারকে বিয়ে করেছে। আজ এই মুহূর্তে একটমার প্রশ্ন তাকে করতে ইচ্ছে হয়, কেমন আছো ভারতী সেন!

ভারতী সেন হরত বলবে, খুব ভালো আছি বিলাস। গাড়ি-বাড়ি, গয়না-শাড়ি, সোসাইটি, অভিজাত্য,—আর স্বামীর সোহাগ, ছেলেপুলে আর কি?

এমন ঘেরকে জিজ্ঞেস করাও বুধ। যে আর কিছু চায় না, তাকে ওর জায়গাতেই থাকতে দাও। কিন্তু এমন কি হয় না? হতে পারে না? সুখ সত্যিই নেই বিলাস, মাত্র এইটুকু বুঝছি। কেন নেই একটু বলবে?

এমন হ'লে বেশ হয়। কিন্তু ওরা বলবে না। বলতে ভয় পায় ওরা। পাছে পেছনের টুকু হারায়। কিছু হারাতে রাজি নয় ওরা। কেন না পেয়েছে যে সামাজ্যই। ওটুকু হারিয়ে বিস্ত্র হওয়ার সাহস কোথায় সামান্য একটি ঘেরের? স্বার্থপর সে।

কিন্তু এই পাখি? একটু কাদো। আমারই জন্তে একটু চোখের জল ফেলো তুমি।

ওপাশের দেওয়ালে সেই খেকে ছাংগারটা, কেবলই ঝট-ঝট শব্দ করছে। বেন ওর চেতনা রয়েছে। ও বেন কিছুই সাক্ষী হতে চায়—বিলাসের বেদনার সাক্ষী থাকবে সে।

কিন্তু ও কি ভুলতে চাইছে কিছু? পাখি বসাক কে? পাখি নামটি ওর দেওয়া। বলেছিলো, তুমি পেছনের, তোমাকে ভুলতে পারিনি, কিন্তু তোলা উচিত নয় কি? তাই তুমি পাখি। অলকা নামটা ভুলে যেতে হ'বে যে তোমার।

পাখি তখন হুচকি হাসে। কবেই তো ভুল গেছি, তোমাকে পেয়ে ভুলছি। তুমি তো সমাজের, তোমার ছোঁয়ার আমি সমাজের স্পর্শ পাই। নিজের আর আভিজাত্যের। অহংকার করি। অহংকার কর। কিন্তু সেদিন আমি ক'রে ভেঙে পড়লে কেন? আমি করে বললে কেন?

ভারও জন্তে তুমি দারী। তুমি দরলী। আবার কথা তুমি না শুনবে কেন? জানবে না কেন আজও আমি অভিশপ্ত দিই স্বামীকে? স্বামীকে আর সমাজকে। আমার মিথ্যাস যদি আঙুন থাকে তবে ওরা পুড়বেই একদিন। ওরা অল-পুড় থাক হ'রে বাবেই; তুমি দেখো।

এইটি তার একমাত্র অহংকার। এ জীবনের সবই বধন ধূয়ে-হুছে গেছে, মান-সম্মান, সামাজিক মর্যাদা সব, তখন ঐ একটি মাত্র গর্ব। সচেতন জিহ্বাস। পাখি বলে, তুমি ক্ষয়ে যাচ্ছো, এতে আমি আনন্দ পাই। আমার কাছাকাছি তোমাকে দেখতে পাই বলে। বুঝছো?

জ্বোভো! বিলাস ওর পিঠ চাপড়ে দেয়। আবেগে উচ্চাসে ওর মাথাটা টেনে আনে বৃকের উপর। গন্ধতেলের একটা উগ্র কাঁথ

বাসবী বস্তুর

বন্ধনহীন গ্রন্থি

“প্রতিভার প্রদীপ নিয়ে সাহিত্যের অঙ্গিনায় যে সমস্ত শক্তিময়ী লেখিকার পদস্পর্শ পড়েছে শ্রীমতী বাসবী বসু তাঁদেরই একজন। ‘শ্রদ্ধাবান নয়’ নামক লেখিকার নিবেদন পাঠে জানা যায় যে তিনি ছদ্মনাম গ্রহণ করে সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হয়েছেন। আলোচ্য গ্রন্থটি মাসিক বঙ্গমতীতেই এক সময় প্রকাশিত হয়েছিল; সুতরাং এর বিষয়বস্তুও আশা করি আমাদের পাঠক পাঠিকাদের অজানা নয়, আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য করেছি যে মাসিক বঙ্গমতীতে প্রকাশিত হওয়ার পর বন্ধন-হীন গ্রন্থি বন্ধন গ্রন্থরূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করল তখন সে যথোচিত পরিবর্তিত, পরিব্রজিত ও পরিমার্জিত। লেখিকার রচনাশৈলী বর্ণনভঙ্গী এবং ঘটনার ধারারক্ষা বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে, সহজেই বোঝা যায় যথার্থ্যোগ্য গান্ধীধর্মপূর্ণ—এক রসবোধের তিনি অধিকারিণী, তাঁর রচনায় কোন কৃত্রিমতা, জটিলতা ও আড়ম্বরণের সন্ধান মেলে না। লেখিকার ভাষা স্বতঃস্ফূর্ত, স্নায়ুস্পর্শী ও মনোরম। চিত্রিত চরিত্রগুলি অতি স্বাভাবিক, এক সময় জীবন্ত হয়ে ওঠে। লেখিকার বক্তব্য অন্তরস্পর্শ করে এবং বিচিত্র বৈশিষ্ট্যের আলোয় উদ্ভাসিত এই গ্রন্থটির ভূমিকা লিখে দিয়ে প্রচ্ছদে কথাশিল্পী তারানন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গ্রন্থের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করেছেন। অতীত সুপার্স এই উপক্ৰাসটির আমরা বহুল প্রচার কামনা করি এবং প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি যে লেখিকার কাছে বাংলা সাহিত্য আরও অনেক কিছু আশা করে।”—মাসিক বঙ্গমতী, পৌষ, ১৩৬৫।

দাম ছ' টাকা মাত্র।

প্রকাশক : বলাকা প্রকাশনী, ২৭সি, আমহার্ট-ষ্ট্রীট।

নাতে লাগে। সেই ভেতটো তো ওদের থেকে তোমাকে এক বড় করে দেখি। অথচ ভ্রূপাতার মেয়েরা এটা বুঝতে পারে না। ভাল চেয়েও নন্দেন্দ্রজ্ঞানো। ওরা ভাগ্যতে পারে না কোন পুরুষের চেতনাকে। কেবল জীবন দিতে চায়। আর, একটা মাসমিশ্র ঘাড়ে নিয়ে বিলাস মজুমদারের কোন কর্তে লাগবে, বলো ?

পাখি আবার হাস। অদ্ভুত ক্রমের করে হাসে।

কিন্তু ওর জীবনেও বেদনা আছে। উপর থেকে দেখে বুঝবার উপায় নেই এতটুকু। সকলকে বলাও তা বার না সে কথা। টাকা দিয়ে 'সুষ্ঠি' করতে এসে কেই-ই বা ছিঁচকাইনি জনতে চায় ? কেউ না। তেমন কাউকে পারিনি অলকা। অথচ সে বলতে চেষ্টা, জনাতে চেষ্টা, ও তাদের কমা করেনি। ওর স্বামীকে আর সবকারের বড়ো অফিসার, ওর বাবাকে ও ব্যাং করে। ওর নিবিকার সমাজকে ও অভিসম্পাত দেয়। মাত্র এইটুকুই ওর বক্তব্য।

বিলাস কিছু আরও জেনেছে। জনতে বেশ ভালোই লেগেছিলো তার। বিলাস পাখি বলাকের মধ্যে নিজের জীবনের সমর্থন পায়। ইচ্ছার হোক, অনিচ্ছার হোক, কেউ বন্ধু-বান্ধব, সমাজ-সংস্কার থেকে মুক্ত হ'তে পেরেছে জানলে ওর আনন্দ হয়। ও নিজেও তো তাদের কেউ নয়। জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সংগেই নিজের ভেতরকার একটা মাঠাল খরাল ওকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। ধরা যে পড়েনি, বাঁধা যে পড়েনি, সংসারের আর পাঁচটা লোকের মত, এর জন্তে মনের গহন কোণায় কি বেদনা নেই ? আছে হয়ত। কিন্তু আকস্মিক আর করে না ও। কেবল সে সাধী খোঁজে। নিজের জীবনের কাছাকাছি এক জনকে পেতে চায়। অলকাকে ঠিক এইজন্টেই ওর এত ভালো লাগে।

তাই শুনেছে সে। মন দিয়ে শুনেছে অলকার জীবনের কয়টি কথা। সেও একদিন একজনের মনের কাছাকাছি আসতে পেরেছিলো। ওর দেহ-মনে সেদিন জোরের কল্লোল স্রব হ'য়েছিল। কুপে কুপে ফুল উঠছে ডেউ। টেউ-এর পর টেউ, তাই দেখেই মুগ্ধ হয়েছিলো পাড়ার কলেজে-পড়া সুকান্ত বসাক। অলকাকে সে কাছ ডেকেছিলো, কাছে নিয়েছিলো। বিখ্যাত পুলিশ-অফিসারের মেয়ে সে ডাকে সাড়া দিতে গিয়ে নিজেকে হারিয়ে ফেললো। সুকান্তর কাছে সে ভরসা পেয়েছে। পড়াশুনো পড়ে থাকলো। জীবনটাই যদি একজনের হাতে তুলে দিতে পারে সে, কি হবে ছাই কত রঙলো আজ-বাজে বুলি মুখস্থ করে ?

এই জন্টেই ওর পড়াশুনো বন্ধ হ'লো। আর তাতে খুসিই হ'লো অলকা। মা-মরা যেরে অলকা বাবার কথা শোনেনি, দাবার কথা হেসে উড়িয়ে দিয়েছে, বৌদির উপদেশকে করেছে ব্যঙ্গ। জীবনটা ও কোন ভাবেই গলা টিপে হত্যা করবে না। মিথ্যা হ'তে দেবে না ওর প্রেমকে।

সেই কথাটাই একদিন সে শুনিতে দিলো সুকান্তকে। আমাকে তুমি উদ্ধার কর। বাবা-দাদার সংসারে এক মুহূর্তও আমি থাকবো না। অলকা সুকান্তর বৃকে মাথা রেখে আশ্রয় খোঁজে।

আজ্ঞা, কেন ? বিলাস উৎসাহ দেখায়।

সুকান্ত এমনতে খুব সাহসী আর বুদ্ধিমান। কিন্তু বিয়ে ? বাবা মা কি এ বিয়ে স্বীকার করে নিতে পারবেন ? একটু বেশ দমে বায় সে।

কিন্তু সে কথা অলকা শুনবে কেন ? আর শুনলে যে তখন চলবে না অলকার।

বললাম, এখন তো গিছ-পা হ'লে তোমার চলবে না ? আমাকে অত কাছে টানলে কেন তখন ? একটু দূরে রাখলে তো পারতে ? সুকান্তর মুখর একেবারে কাছে মুখ এনে অলকা ছোট করে বলেছিলো, আমি যে মা হ'তে চলেছি।

বিলাস থমকে চেয়ে থাকে অলকার মুখের দিকে। অলকা একটু খেমে বলে, তার পর এক দিন সুকান্তর হাত ধরে দুজনে রাস্তার এসে কাঁড়ালাম, আর পেছনের সব ক'টা দরজা তাড়া-তাড়ি বন্ধ হয়ে গেলো। সুকান্তর মনে জোর ছিলো, সে বললো, ঠিক আছে তোমাকে নিয়ে আমি নতুন বাসা বাঁধবো। নতুন বাসায় কেবল তুমি আর আমি—কেমন ?

বুঝা সেদিন যেন একটু কঁপে উঠেছিলো অলকার। মাথার ভেতরটা একটু ঝিম-ঝিম করে উঠেছিলো বৈ কি। অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ—রহস্যের অন্ধকারে হাতড়ে অলকা ভুল-কিনারা দেখতে পারিনি। এক ভরসা সুকান্ত। অলকা বললো, আমি ওর হাত ধরে অন্ধকারেই এগিয়ে চললাম। ভুললে চলবে কেন, আমি যে তাকে ভালবাসি।

একটু খেমে অলকা বললো, তা আলাে বলেছিলো বৈ কি ? বলেছিলো, কিন্তু তা কত দিন আর থাকলো ? যে আলাে এক দিন সামনে বলেছিলো, দপ করে তা নিবেও গেলো। পৃথিবীটা মনে হলো বন-বন করে ঘুরছে, কেবলই ঘুরছে। আর আমি সেই ঘুরাপাকে ঘুরতে ঘুরতে যেখানে এসে ছিটকে পড়লাম সেখানে থেকে বত দূরে তাকালাম—কোন স্থানেই আমার স্বামীকে দেখলাম না। সে তখন বাবার স্রুপুর হয়ে বাড়িতে গিয়ে উঠেছে। সেখানে আমাকে নিয়ে যেতে চায় না। বুঝলাম, আমাকে আর ভালো লাগে না সুকান্তর। কিন্তু বিলাস, ভেবে দেখো, তোমাদের ভালো লাগা যদি এমনি খেয়ালী হয়, আমাদের প্রাপ্তি কোথায় ঠাই পায় ? বল ? পাখি হাসি-হাসি মুখ করে বলেও মনে হয় সে যেন কাঁদছে। তার সারা দেহ-মন যেন অপরিণীত বেদনার দুলে দুলে উঠছে। বাবার আশ্রয় থেকে আগেই বঞ্চিত হয়েছি। তোমাদের এমন সমাজ, আমাকে কোন বাঁচার পথই বাতলে দিতে পারলো না বিলাস। তাই এই পথ—মৃত্যুর পথ ছাড়া আর কি-ই বা গ্রহণ করতে পারি বল ? এই ভাবেই মৃত্যুর দিকে চলেছি।

এই অলকার কাহিনী। তার পর পাখি। বিলাস এমন কিছু মাথা ঘামায় না পাখির অতীত জীবন নিয়ে। ওর অভিশাপ আর ওর অভিমান দুটোই সমান হাসির ব্যাপার। ওর প্রেমের কাহিনীও সমস্ত এক প্রেমের উপজাতের কাহিনীর মত। অল্প কেউ এ কাহিনী বলতে এলে মাঝপথেই বিলাস হরত ধামিয়ে দিতো তাকে। কিন্তু পাখিকে সে ধামাতে পারেনি। পাখিকে ওর নিজের চাইতেও অসহায় মনে হয়। কেবল সাদা-পরা পাতলা অরগ্যান্ডির একটা ছোট ব্লাউজ গায়ে যে নারীদেহটা বিলাসের বৃকের উপর পড়ে পড়ে সেদিন কেঁদেছিলো, তাকে দেখে বিলাসের মনে হ'য়েছিলো, পাখির বৃকেও সত্যি বজ্রা আছে। তাই সে পাখির পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়েছিলো, আদর করে চুলগুলি নাড়াচাড়া

না, না !
এ 'ডালডা' নয় !
'ডালডা' কখনও খোলা
অবস্থায় বিক্রী হয় না !

আজ্ঞে হ্যাঁ, ডালডা বনস্পতি আপনি কেবল শীলকরা
টিনেই কিনতে পাবেন। এই জন্যেই এতে কোনও ধুলো
ময়লা লাগতে পারে না আর না পারা যায় একে নোংরা
হাত দিয়ে ছুঁতে। তাছাড়া খোলা অবস্থায় 'ডালডা'
কেনার দরকারই বা কী যখন আপনার সুবিধের জন্য
ভারতের যে কোন জায়গায় আপনি ১০, ৫, ২, ১ ও
½ পা: টিনে 'ডালডা' কিনতে পাবেন।



হ্যাঁ, এই তো 'ডালডা' !
এর হলদে টিনের ওপোর
খেজুর গাছের ছবি দেখলে
সবাই চিনতে পারে।

মনে রাখবেন 'ডালডা' কেবল একটি বনস্পতির নাম।
আপনার এবং পরিবারের সকলের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত
রাখতে সব সময়েই ডালডা বনস্পতি কিনবেন শীলকরা
বন্ধ টিনে। কেন না কোন রকম ভেজাল বা দোষযুক্ত
হবার বিপদ এতে থাকে না আর যা কিছু এই দিয়ে
রাঁধবেন সেই সব খাবারের
প্রকৃত স্বাদ বজায় থাকবে।



ডালডা বনস্পতি দিয়ে রাঁধুন—আর
স্বাস্থ্য ও শক্তি সঞ্চয় করুন।

ক'রেছিলো অনেককণ। সেই মোহাজুর তরায় চুপ-চুপ বাতটা অনেক দিন মনে থাকবে বিলাসের।

বিলাস আবার একটু নড়ে-চড়ে বসতে চাইলো। দেহটা ভার—মাথা ভার হয়ে আছে। বিলাস ইজিচেয়ারেই পড়ে থাকে। বাতাস সমান ভালো ছ-ছ করে বয়ে যাচ্ছে—টিক আগের মতই। বিলাসের হঠাৎ মনে হলো, বাতাসে যেন কা' আর্দ্রতার ভেসে আসছে। জগৎজুড়ে সবাই যেন একটু অশ্রুর জন্তে কাতর প্রার্থনা জানাচ্ছে,—আমায় জন্তে একটু কান্দ তুমি। বিলাস যেন স্পষ্ট শুনতে পেলো একটি স্বর, জীবনে কোন মানুষই তো তোমাকে ধরতে পারলো না। একবার এই মানুষটির জন্তে যদি একটু কান্দতে পার, জীবন তোমার ভরে যাবে।

তবুও পারে না বিলাস। কোন দিন কারো জন্তে তার চোখে জল আসেনি। কান্নার কথা শুনে মাঝে মাঝে হাসি পায় বিলাসের। টাকা দিয়ে ক্ষুধা করতে গেছে সে। জ্বালা জুড়তে গেছে। কান্দতে বায়নি। বোকা মেয়ে! তুমি কান্দতে বল কাকে? পাষণ্ডের বুক কি করুণা থাকে? বল?

করুণা! কথাটা কব বার মনে মনে আঙড়ায় বিলাস। অন্ধকে সে করুণা করবে। করুণার পাত্র সে কি নিজেরই নয়? কি পরিহাস! এক বস্ত্রপাকাতর নোংরা গলির হতভাগা মেয়ে বিলাসের কাছে চায় করুণা। একটু অশ্রুর জন্তে আকৃতি জানায়। আর বিলাস সভ্য সমাজের ভদ্র মানুষ, তার জন্তে এতটুকুও করুণা দেখাতে পারলো না।

বিলাস ভেবে দেখলো পারা যায় না। কেউ-ই পারবে না। ওখানে কি মনের ব্যঙ্গা করতে কেউ যায়? যায় না। নতুবা ওর ঐ শেষ ক'দিনের কথা কয়টি তো আজও মনে আছে, এই তো আমাদের জীবন-বিলাস, অত্যাচারের ডিপো। কবে শুনবে আমি মরেছি। মরারি ভালো,—দৈহিক মৃত্যুই। মনব কথা ছেড়েই লাও। দৈহিক মৃত্যুই তাড়াতাড়ি চাই আমরা। যৌবন চলে গেলে যে বেঁচে থেকেও মরা আমরা। মরণ তার থেকে ভালো নয়?

কারো মুখে এমন করে মরণের কথা শোনে নি বিলাস। ভারতী সেন মরতে চায়নি। গুরা চ্যাটার্জি মরতে চায়নি। মরতে চায়নি নন্দিতা নন্দীও। কুৎসিত চেহারা নিয়েও সে বেঁচেই থাকতে চেয়েছে। শুনা যায়, তারও জীবনে বিয়ের ফুল ফুটেছে। বিলাস ভেবে দেখে ঐ নন্দিতার জন্তে বরং একটু কান্দা যায়। সেই তো সত্যিকার করুণার পাত্রী। বস্ত্র শরীরে রইলো, মাংস খরে খরে সাজানো থাকলো। যৌবন তার আলোর রশ্মি ছড়ালো অথচ জীবনে ছটকটানি এলো না! কী ব্যর্থ জীবন, কী সস্তা জীবন!

পুরুষ কি এমন জীবন সহ্য করবে? পুরুষ মাত্রই নয় অবজ্ঞা। ক্ষয়ে-বাওয়ার সাহস অনেকের থাকে না। বিজ্ঞ হ'য়ে বাওয়ার আনন্দ অনেকে পায় না।

অথচ সে ক্ষয়ে গেলো। বিজ্ঞ হলো। জীবন খবে কেবল হারালো। ওকে তো অনেকেই দিতে চেয়েছিলো। যৌবনের বস্ত্রের কাছাকাছি তো অনেকে আসতে চেয়েছিলো। ধরতে পারলো না বলেই তো ভারতী সেন পালিয়ে গেলো। গুরা চ্যাটার্জি পালিয়ে গেলো, কেউ অপমান করে গেলো, কেউ কাপুরুষ বলে অবজ্ঞা করলো।

নন্দিতা তো বীভূত গালাগালিই করেছে তাকে। ওর নাঞ্চি ব্যর্থতার বড়ো জ্বালা। বিলাসকে ধরতে পারলো না, ব্যর্থতে পারলো না বলে জ্বালা। এ-ও এক হাসির ব্যাপার। বিলাস সেদিন হাসতে হাসতেই বলেছিলো নন্দিতাকে, তোমার সম্পদ বলতে তো ঐ দেহটা। তাও আবার কুৎসিত বিড়ম্বিত—

রাগে কেটে পড়েছিলো নন্দিতা।

বিলাস হাসতেই থাকে, কিন্তু তাতে এতটুকু আরামও যে তুমি দিতে পারনি নন্দিতা, তা যদি জানতে। কেউ-ই পারে না। তুমি কেন, কোন মেয়ে পারে না।

যেন পারে না? রাগে কাঁপছিলো নন্দিতা নন্দী।

ছেলেয়া দেহ চায় না।

মন?

মন চায় না।

তবে?

বরণ।

কী সাংঘাতিক তুমি বিলাস! নন্দিতা নন্দী সেদিন বেঁদেছিলো। রাগে দুখে অভিমানে। ব্লাউস ছিঁড়ে, শাড়ি ছিঁড়ে লুণ্ঠন করতে চেয়েছিলো। তাতেও রাগ পড়ে নি, জ্বালা মেটে নি। বা-তা ভাবায় বিলাসকে গালাগালি করেছে নন্দিতা নন্দী। এই তোমাদের স্বরূপ নন্দিতা। আচরণ আলগা করতে পেরেছো, এই জন্তে তোমাকে বস্ত্রবাদ দিই।

নন্দিতা সেই যে পালালো আর আসে নি। কোন দিনও আসবে না জানে বিলাস। যাব কাছ থেকে কিছুই শেলো না, কেনই বা ঘুরবে সে তার পেছনে পেছনে?

আর এক মেয়ে এই পাখি বসাক। আবার একটি আর্দ্রতার শুনতে পায় বিলাস। জন্ম নিলাম—মৃত্যু হলো। মাঝের ক'টা দিন কারো মনে এতটুকু ছাপ পড়লো না আমার,—আমি থাকলাম না, ছিলাম না—হুই গাল বেয়ে তার অশ্রুর বস্ত্রা নামলো। ফুলে ফুলে উঠলো তার সারা দেহটা। বড় কষ্ট, মৃত্যুর চেয়েও এ বড় কষ্ট, তুমি বুঝবে না বিলাস।

কান্দ, আমার জন্তে তুমি একটু কেঁদো বিলাস। আমারই জন্তে।

গভীর রাতের শান্ত পৃথিবী এখন ঠাণ্ডা বাতাস ছেড়েছে। ঝির-ঝির—মুহু মুহু—গা-শির-শির বাতাস। একটু যেন মাদকতার স্পর্শ রয়েছে। তন্দ্রা আসে,—দেহ-মন ক্লান্ত হয়। মাথার শিরালুগির দশ-দশ ভাব কেটে যায়। তন্দ্রা আসে।

ঠাণ্ডা ফুৎফুবে হাওয়া ছেড়েছে পৃথিবী। বিলাস যেন অস্পষ্ট ক'র স্বর শুনলো। একটা যেন গানের কলি,—বেশ মিষ্টি।

—তোমরা শান্ত হও। তোমরা যারা ঘুমতে পার নি—তোমরা যারা বস্ত্রপা পাচ্ছে। পেয়েছো। যারা মানুষের মন পাও নি। তোমরা যারা নিজের মন পাও নি। তোমরা শান্ত হও। ঘুমোও। এ হাওয়া মানুষের স্নেহ, এ হাওয়া প্রেমসীর প্রেম। সুখ। অমৃতের আবাদ নিতে নিতে ঘুমিয়ে পড়ো। ঘুমই অমৃত। ঘুম মহাকাশের অকণপ দান। তুমি নিজেকে এ দান থেকে বঞ্চিত ক'রো না, পৃথিবী স্নেহের হাত বুলাচ্ছে, প্রেমের স্পর্শ দিচ্ছে।

—তোমরা হতভাগা, তোমাদের কোন কংগীর নেই। পৃথিবীর

কোন প্রয়োজনেই তুমি এলে না। তুমি তোমার নিজের কোন প্রয়োজনেও আসনি। তবুও ঘুমিয়ে পড়ো। তোমার জাগ্রত শৈশীগুলি এখন শিথিল হোক। তোমার ভেতরকার যে অপদেবতাটি তোমাকে কোনো দিনও শাস্তি দিলো না, সে কয়েক মুহূর্তের জন্তেও তোমার দেহ ছেড়ে চলে যাক।

পৃথিবী তোমার দেহ-মনে স্নেহের হাত বুলাচ্ছে, প্রেমের স্পর্শ দিচ্ছে।

তন্দ্রার আবেশে তুমি ঢলে পড়। তোমার জন্তে পৃথিবীর করুণা আছে, মমতা আছে। এই মহাকালের অকুপণ দান—প্রকৃতির অকুপণ দান। তুমি তো সুখ চাও না, যন্ত্রণা চাও। তুমি যে তানন্দ চাও না, বেদনা চাও। কিন্তু তুমি যে ঘুমও চাও। তোমার মন বলছে তুমি চাও। না! হলে তুমি পাগল হয়ে যাবে যে! তুমি পাগল হয়ো না, তুমি ঘুমিয়ে পড়ো। স্নেহ-প্রেমের স্পর্শ লাগছে।

—অজীত ভুলে যাও। গত কাল বিস্মৃত হও। বেদনা ভুলে তুমি বিস্মৃতির কোলে ঢলে পড়ো।

কিন্তু কে কীদে না?

—কীদে। ওকে কীদতে দাও। ও যে তোমার থেকেও চতভাগা। ও কীদবে না? ও যে তোমার থেকেও দীন-রিক্ত। জীবনে সে কিছুই পায়নি, আরও পেতে চেয়েছিলো, তাই সে হতভাগা। ও পৃথিবীর সুখের আশ্বাস পেতে চেয়েছিলো, পায়নি বলে কীদছে। ওর অন্তরাঙ্গা মানুষের ঘুমন্ত ঘরের দরজার দরজার করুণা-ভিক্ষা করে কিরছে। একটু ভালবাসা চায় সে। আর, মানুষকে সে ওর জন্তে একটু কীদতে বলে।

না, তুমি উত্তেজিত হয়ো না। তন্দ্রা তোমার ভেঙ্গে যাবে। তুমি ঘুমোও।

প্রকৃতির অকুপণ দান বরছে।

নতুন বৌদি বিলাসকে এখনও বোধ হয় ভালো করে চেনেনি। এই তো সে দিন সে এ-বাড়ীর বধু হ'য়ে এসেছে। এসেই সে হরে চাকরটাকে সকালের বিড়ঘনা থেকে মুক্তি দিয়েছে। বাবুর থমকানি প্রত্যেক দিন সকালেই তার ভাগ্যে ছুটে আসছিলো। বধু সেদিন নিজের চোখেই দেখে ফেলেছিলো। সেই থেকেই তার এ নব পরিকল্পনা। বিলাস প্রথমত রাজি হয়নি। বাড়ির কারো সংগে

তার যোগ থাকুক, এ সে চায় না। কিন্তু এ বধুটি ছাড়বার পাখী নয়। একটাই তো মাত্র দেবর—তারও মন সে পাবে না, কেন সে ঘুরে ঘুরে থাকবে? বিলাসকে শেষ পর্যন্ত রাজি হতে হয়েছে। তবে অন্তত: সাড়ে আটটার আগে তার ঘরে যেন কোন প্রকারেই চা না আসে। কেন না তার আগে সে উঠতে পারে না।

নতুন বৌদি স্বীকৃত। কেন যে এই কিছুতকিমাকার দেবরটিকে তার খুব ভালো লাগে! সে এ বাড়ির কেউ নয়। বাড়ির এক প্রান্তে এই নির্জন ঘরখানা তার পরিচিত। আর পরিচিত হরে চাকরটা কেন তার এ পালিয়ে থাকে। কেন সে আর সকলের মত নয়? বধু বধু কোঁড়ল বাড়ে। কেমন যেন মমতাও হয়। সকলেই আছে, অথচ তার কেউই নেই। এ কেমন কথা!

নিভাকার মত আঁজও সে এক কাপ ঘুমায়মান চা হাতে হাসি-মুখে ঘরে ঢুকেছে। আর ঢুকেই সে থমকে দাঁড়িয়েছে দরজার পাশে। বিছানা খালি। মশারিটা খাটের উপর বলছে। বালিশ দুটো এদিক ওদিক ছড়ানো। সারা ঘরময় বই-খাতাপত্র ছড়ানো। জলের কুলোটা আলগা হাঁ হয়ে পড়ে আছে এক পাশে। মেঝেতে করটা সাট আর প্যাট লুটোচ্ছে। বধুর মনটা কেমন যেন বেদনায় ভরে যায়। কিন্তু সে আঁজ ফেরেনি না কি? সারা রাত কোথায় থাকলো সে?

কিন্তু না, কিরছে বিলাস। ওপাশের দরজার পাশ বেঁসে যে একটুখানি বালকনি, ওখানে তার ইজিচেরারখানার মধ্যে পড়ে আছে বিলাস। অসাড়, স্পন্দনহীন লোকটা। দেখে যায়। হর বধু। সারা রাত সে এমনি ক'রে পড়ে আছে। যা গো। পুরুষ মানুষের বিয়ে না হলে কি ছন্নছাড়াই না তারা হয়!

চায়ের কাপ হাতে নতুন বৌদি আরও এগিয়ে এলো। দাঁড়ালো বিলাসের পাশে। নূর্য অনেকটা উঠে এসেছে। উঠে এসে ও পাশের কাচের জানলাটার উপর থমকে দাঁড়িয়েছে। আর তারই একটা লাগচে আভা এসে পড়েছে বিলাসের মুখে, ঘরের পাশে। এ কি রাস্তা মুখের চেহারা! বৌদির বুকটা হাহাকার ক'রে ওঠে।

একটু বুকে পড়ে মাথার হাত রাখতে বাবে, ঠিক এমনি সময়ে বৌদির চোখে পড়লো দৃশ্যটি। দুই গালের পাশ দিয়ে দুই সারি অশ্রুর ধারা গড়িয়ে এসে থমকে আছে চিকের শেষ প্রান্তে।

এক পা পেছনে সরে বৌদি অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। একটা দীর্ঘশ্বাস আপনা হতেই তার বুকের কাছটা থেকে বের হ'য়ে আসে, কতো অসহায় ও, আহা!

আকাশ ঙ্ মাটি

কৃতী সোম

তোমার স্বপ্নের দেশে যার কথা জাগে

সে তো নয় রাজপুত্র, আমি।

উজ্জল হীরের মতো দীপ্ত অলুবাগে

তুমি তো প্রেমিকা এক, আমি।

তোমার বৌবন-চুক্তি মহামূল্য দান

কেন না তা বহু আর বাঁটি।

অথচ এখনো ডাখো, কত ব্যবধান

তুমি তো আকাশ, আমি মাটি।



(মোপাসাঁ অবলম্বনে)

বহর দুই আগেকার কথা।

বসন্তকালে ভূমধ্যসাগরের উপকূলে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছি। আহা, কি মধুরই না লাগে জনহীন পথে একা-একা ঘুরতে! যে কোনো সুখস্বপ্নের চেয়েও এ মনোরম। সমুদ্র-সৈকতে বেড়াবার কিংবা পর্বতশৃঙ্গে আরোহণের সময় যুদ্ধ-মন্দ বাতাসের সমাদর, তপ্ত সূর্যকিরণের চূপন হৃদয়-মন ভরিয়ে তোলে। এই পথচলা হয়ত দু'ঘণ্টার জন্তে, কিন্তু তারি মধ্যে কতো সম্ভব অসম্ভব, দিব্যস্বপ্ন, রঙিন কল্পনা, রোমাঞ্চকর অমৃতভি ভাগে পথচলা মায়ুঘটির মনের গোপনে। বাসনা কামনা, আলো বাতাসের সংগে সংগে অন্তরে দোলা জাগায়, ব্যাধাও বয়ে আনে। ভ্রমণের কল্যাণে ক্ষুধার মাত্রা যেমন বেড়ে যায় ঠিক তেমনি তৃপ্তির পাত্র কানার কানার ভরে ওঠে প্রকৃতির চিত্তহারিণী শোভার মুখোমুখি হয়ে। প্রকৃতি-পরিবেশের সাথে যতো সন্ধর্ক ঘনীভূত হয় ততোই অনাবাদিত আনন্দে অন্তর ভর্য পরিপূর্ণ।

সেইট র্যাকেল থেকে ইটালী অভিমুখে যে রাস্তাটি এগিয়ে গেছে সেই পথেই আমি অগসর হতে থাকি—না তুল বলা হোলো, বরং বলা যায়, সেই অপরূপ সরণি দিয়ে আমি এগিয়ে চললাম, যার বন্দনার কবিতা মুখর হন সব সময়। অর্থাৎ সে পথটি এমনই সুন্দর যে, কবির কবিতার ছাড়া অন্য কোথাও তার দর্শন পাওয়া সহজ নয়। কেনস থেকে মোস্তাকোর যেতে ভুলেও কেউ এ দেশে পা বাড়ায় না, লোকগুলির মনোবৃত্তি দেখে বক্রণ হয়। এমন উদার আকাশ, ফুলে ফুলে ভরা গোলাপ, কমলা-বাগিচা—কিন্তু ওরা মিথ্যা অহমিকার, নির্বোধের অববেচনার অন্যায়সে এড়িয়ে চলে প্রকৃতির নিবিড় সং। অজুহাত ওদের সুন্দর—অজ্ঞ আত্মতরী মাছের যেমনটি সচরাচর হয়ে থাকে।

প্রবহমান উপসাগরের একটি বাক্রে সহসা চোখে পড়লো কতকগুলি কুটারকে—পাশাপাশি তারা বেন জটলা করছে। সংখ্যায় তারা চারটি কি পাঁচটি হবে, পাহাড়ের পাদদেশে সমুদ্রের দিকে মুখ করে ঠাঁড়িয়ে। এর পেছনে পাইনের জঙ্গল তার গভীরতায় বিরাট ছাট উপত্যকার পথের নিশানা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। একটি কুটারের দরজার সামনে আমি অনিচ্ছাকৃত ভাবে ঠাঁড়িয়ে পড়ি। ধবধবে শাদা বাড়িটির গায়ে বাদামী রঙের কালকান্দ, গোলাপগুলি লতিয়ে উঠেছে ছাত্তের আলিসায়—কী সুন্দরই না দেখতে হয়েছে! পাশের বাগানটি বেছাকৃত অবিকৃততার নানাজাতের নানা আকারের ফুলে সাজানো। সামনের ল্যানটিও

পরিচ্ছন্ন পরিপাটি—বারান্দার সিঁড়ির ওপর পাথ্রে খচিত ফ্রাঙ্কলিন, জানলার ওপর খোকার খোকার আঙুর ফলে আছে। রসস্রাবা মনিং গ্লোরিতে এই মনোরম বাড়িটির বাকী দেওয়ানগুলি সমাকীর্ণ। ওখানে পেছন দিকে প্রস্তুতিত কমলাবীধি দূরের পাহাড় পর্যন্ত বিস্তৃত।

কুটারের দরজায় গিঁট করা ছোট্ট হরকের কথাগুলি আমি পড়লুম : ভিলা ড আনটান!

এ কোন কবিকল্প না পরীস্থান—আপন মনে প্রশ্ন করে উঠি। কোন অল্পপ্রেরণায় এমন স্থান নির্বাচন সম্ভব হয়েছে, এই স্বপ্নের বাসভূমি রচনাই বা হয়েছে বাস্তবায়িত।

অদূরে পথের ধারে জনৈক শ্রমিক বসে বসে পাথর ভাঙছিলো। তাকে জিগসেস করায় জানতে পারলাম ওই কুটারের মালিক হচ্ছেন স্বনামধন্য জুলি রোমেন—মাদাম জুলি রোমেন।

জুলি রোমেন! 'ছেলেবেলায় কতোই না শুনেছি বিখ্যাত এই অভিনেত্রীটির নাম। র্যাসেলের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী জুলি রোমেন। জনস্তুতি ও সমাদর এর মতো এতোটা আর কালের ভাগ্যে তখনকার দিনে জুটেছে বলে আমার জানা নেই—বিশেষ করে সমাদর। ওং, কতো ধন-যুগ আত্মহত্যা কতো প্রতিযোগিতা না অমৃতিত হয়েছে শুধু ওই নারীটিকে কেন্দ্র করে। এখন এর বয়স কতো হোলো? বাট, না, সন্তর পঁচাত্তর হবে। জুলি রোমেন তাহলে এখানে, এই কুটারে! গোটা ফ্রান্সে যে তীব্র আলোড়ন জেগেছিলো (তখন আমার বয়স বড়ো জোর বারো) এক কবি-প্রণয়ীর সংগে সিনিলিতে এর পলায়ন উপলক্ষ্য—অতীতের সেই রোমাঞ্চকর কাহিনী আমি স্মরণ করি। ওই ঘটনার ঠিক আগেই অপর এক প্রেমোৎসাহের সংগে হয়েছিলো ঠর বিজ্ঞি রকমের কলহ। বাই হোক, উনি ঠর নতুন প্রেমিকটির সংগে একদিন সন্ধ্যায় সরে পড়লেন। সে সময় রংগমঞ্চে খ্যাতি ঠর ঘরছিলো না। ঠিক ওই ঘটনার আগের সন্ধ্যায় অভিনয়ের সময়ে আধ ঘণ্টা ধরে একটানা অভিনন্দন জানিয়েছিলো যার জন্তে এগারো বার, একে দর্শন দিতে হয়েছিলো গুণমুগ্ধ দর্শকদের।

ঠর উবাও হওয়ার খোঁজাখুঁজি চললো, ঠরা সমুদ্র পার হয়ে কনক ডিওভ-এর কমলাকুঞ্জে—সেই প্রাচীন দ্বীপে পৌঁছলেন। জনস্তুতি রটে গেল, হাত ধরাধরি করে উভয়ে বাঁপ দিয়েছেন বেন বহি-সাগরে!

সেই স্রবয়গ্রাহী কাব্য-রচয়িতা এখন পরলোকে। ঠর কৃতিত্ব সবক্কে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নেই। বাস্তবিক ঠর মনোরম মোহময় রচনার সকলের চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিলো, উনি অজ্ঞাত কবিরের সামনে অজ্ঞ এক জগতের দ্বার খুলে দিয়েছিলেন।

অপর প্রত্যাখ্যাত প্রেমিকও বেঁচে নেই। তিনিও ঠার প্রশ্রয়িত মনোরমের জন্তে যে অপূর্ণ সুরের ঝংকার ফুলেছিলেন, তার বেশ আজও জেগে আছে শ্রোতাদের কানে।

তিনিই—সেই নারীই এই কুসুমাতীর্ণ কুটারে বাস করেন।

আর বিধা না করে ঘটাবলি করলাম। বহর আঠারোয় একটি লাডুক কানাকার পরিচারক এসে দরজা খুলে দিলো।

আমি আমার কার্ডের ওপর অতীত দিনের রূপশিল্পীটির অজ্ঞ প্রণয়বাহী লিখে শেষে আত্মবিক অমুরোধ জানালাম দর্শন দেবার



যা একমাত্র ভিনই করতে পারে!

ঝকঝকে, নিখুঁত পরিষ্কার মেঝে সুরুচীসম্মত জীবনযাত্রার পরিচায়ক। আপনার বাড়ীর মেঝে ভিন দিয়ে পরিষ্কার করে দেখুন—ময়লা আর তেলহেজে ভাব তাড়াতাড়ি উবে যাবে—আপনার বাড়ীর মেঝে ঝকঝকে পরিষ্কার হয়ে উঠবে।
অথ কোন উপায়ে আপনি কখনই মেঝে এত পরিষ্কার করতে পাবেননি।
আপনার বাড়ীর মেঝে আপনার গর্বের বিষয় করে তুলুন—সপ্তাহে একদিন মেঝে ভিন দিয়ে পরিষ্কার করা অভ্যাস করুন।
আপনার চিনেমাটির বাসন, কাঁচের জিনিষ, ব্রান্ডারের বাসনপত্র এবং বেসিন পরিষ্কার করার জন্তেও ভিন ব্যবহার করুন। সর্বদা ভিন হাতের কাছে রাখুন।

আপনার বাড়ীর জন্তে দরকার ভিন



জন্মে। হয়তো আমার নাম তাঁর অজানা নয়, কাজেই এই সাক্ষাতে আপত্তি হবে না।

ভূত্ব কিংবে এসে আমার একটি সুসজ্জিত বৈঠকখানায় পৌঁছে দিলো। দেখলাম, ঘরটির আসবাব-পত্র বিশেষ ফ্যানসন-দুর্ভাগ্য। সেগুলিকে আমার সম্মানে আবরণযুক্ত করে একটি মাঝারি চেহারায় ঘোড়শী পরিচারিকা দাঁড়িয়ে ছিলো।

আমি আসন গ্রহণ করতেই ভূতোর অস্ত্রধারী করলো, আমিও সাগ্রহে ঘরের প্রতিটি ব্রিনিস পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে লক্ষ্য করতে থাকলাম। দেয়ালে ছবি টাঙানো রয়েছে তিনখানা। অভিনেত্রীটির একখানা, বিশেষ অভিনয়ের ভঙ্গীতে গৃহীত, একখানা কবি-প্রেমিকের তৎকালীন সাজসজ্জার, অপরটি অর্থাৎ তৃতীয়টি সেই সুরশিল্পীর, ক্লাভিকর্ডের সামনে মাথুঘটি বসে আছেন।

ভূতমহিলার ছবিতে তাঁর রূপের প্রমাণ এখনও বিদ্যমান, কিন্তু ওই হাবভাব এখনকার দিনে সমালোচনার দাবী রাখে। ঠিক আকর্ষণীয় মুখশ্রী, নীল অক্ষিতারকা আপন মতিমায় উদ্ভাসিত, চিত্রকরের নৈপুণ্যও তাতে বড়ো কম নয়। ছবি তিনটি বিদ্যুত অতীতের পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার মাঝে আগামী দিনের বংশধরদের দিকে বেন তাকিয়ে আছে।

দরজা খুলে একটি ব্রহ্মকায় নারী ঘরে ঢুকলেন, বার্ধক্যের চিহ্ন তাঁর দ্রু-যুগলে, মাথার কেশে পরিচ্ছন্ন। এতো বয়সেও তাঁর সজ্জা ভাবটি অটুট রয়েছে। হাতটি বাড়িয়ে দিয়ে ভূতমহিলা অস্পৃশ্য সুরেরা কণ্ঠে বললেন : বঙ্গবাদ মঁসিয়ে! বিগত দিনের একটি নারীকে আজকের লোকের সংগে করা বড়ো কম কথা নয়। দাঁড়িয়ে বইলেন কেন, বসুন।

আমি বললাম, তাঁর বাড়ির শোভা দেখে মুগ্ধ হয়ে গৃহস্থামীর নাম জানতে গিয়েছিলাম। এবং তাঁর পরিচয় পেয়ে কিছুতেই নিজেকে সত্ত্বরণ করতে পারিনি।

আপনি আসার আমি খুবই খুশি হয়েছি মঁসিয়ে, জানালেন বুদ্ধা : কেন না, এ ঘরের ঘটনা প্রথম ঘটলো। আপনার স্তম্ভিত্ব কাউরখানি হাতে পেয়ে আমি তো একেবারে চমকে উঠেছিলাম। সুদীর্ঘ কুড়ি বছর পরে বেন কোন পরম বান্ধব আমার আহ্বান জানাচ্ছেন। আমি তো বিদ্যুত—সম্পূর্ণরূপে জন-মনের অন্তরালে ঢলেছি। কাকর স্মৃতিপটে আমার কথা উদ্ভিত হয় না। আর এটাও জানি, বতো দিন না আমার মুহূর্ত-সংবাদ ঘোষিত হচ্ছে এই ভাবেই চলবে। আমি মাথা গেলে দিন তিনেকের জন্তে পত্রিকা-পত্রিকায় জুলি রোমেনের জীবন-কথা ছাপা হবে, আলোচনা করা হবে তার সন্দেহ সন্ত-অসন্তব কাহিনী-উপকথা-কুংসা—হুঁচারণা বইও ছাপা হবে। বাস, সেইখানেই চিরতরে নেমে আসবে বিশ্বস্তির ববনিকা। তার পরেই আমি শেষ হয়ে যাবো।

কিছুক্ষণের নীরবতার পর আবার তিনি শুরু করেন : আর সেদিনের বেশি দেবিও নেই। কয়েক মাস কিংবা কয়েক দিনের ভেতরেই এই ক্ষুদ্র নারীটির সঙ্গীত দেখে শব্দে পরিণত হবে।

দেয়ালে টাঙানো নিজের ছবির দিকে তাকালেন জুলি রোমেন—আজকের এই বিশিষ্ট পরিণতির দিকে ব্যঙ্গ ভরে সে বেন চেয়ে আছে। পর মুহূর্তে তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হোলো দ্বাদশিক কবি এবং উদ্ভাসী

সুরশিল্পীর দিকে। তারাও বেন বলছে : এই ক্ষয় কি প্রকৃত করে আমাদের ?

অবর্ণনীয় একটা বিবাদের ভায়ে মন আমার আচ্ছন্ন হয়ে যায়—বারা আজ আর মরজগতে নেই এবং বারা অতীতের স্মৃতির সংগে ভুবন্ত মাথুঘের মত প্রাণপণে সংগ্রাম করে বেঁচে আছে, তাদের গভীর বেদনা আমাকে আবেগ-আকুল করে তোলে।

নাইল হতে মণি কালো অভিমুখে ছুটে চলেছে কতো বিচিত্র বানবাহন—ঘরের ভেতরে বসে পৃষ্ঠ দেখতে পাই সুরবেশা আনন্দমুখর আরোহীদের। জুলি রোমেন আমার দৃষ্টি অমুসরণ করে ওই দৃশ্য দেখে অমুমান করলেন আমার চিন্তাবারা। স্মৃতিহাস্তে মুহূর্তে বললেন : কতোক্ষণের জন্তেই বা এই সুরের জীবন!

আমি বলি : আপনার জীবন নিশ্চয়ই খুব রমণীয় ছিলো।

একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেললেন মহিলাটি। বললেন : প্রকৃতই সুরার ছিলো—ছিলো মধুর। আর সেইজন্তেই তো আমার এই আকণ্ঠাষ।

অমুতব করলাম বুদ্ধা তাঁর জীবনকথা খেছার জানাতে পারেন, প্রয়োজন শুধু স্বদয়-তত্ত্বিতে আঘাত করা। গভীর সহানুভূতি ভরে সত্ত্বরণে ব্যথা পাওয়া আরগাতি যেমন ছুঁয়ে দেখতে হয়, সেই রকম মমতায় একে একে প্রেম করে বাই। তিনিও অকপটে বলে বান তাঁর অতীত কাহিনী, তাঁর বর্ণোচ্ছল অভিজ্ঞের কথা। সে যে কী অপরিণীত আনন্দ, কী অভূতপূর্ব সাফল্য—তার পরিচয় পাই তাঁর বর্ণনার।

আচ্ছা আপনার পরম আনন্দ এবং চরম সুরের জন্তে কি আপনি খিঁচুটায়ের কাছে বিশেষ ভাবে ঋণী?—প্রশ্ন করি আমি।

কখনোই নয়—তৎক্ষণাৎ উত্তর পাই।

হাসির আশ্রয়ে আমার মুখে।

জুলি রোমেন বিদ্যাদভারাক্রান্ত চোখ দেয়ালে বিলম্বিত ছবি দুটির দিকে ফিরিয়ে বলেন : ওই দুজনের কাছে সেজন্তে আমার বাবতীয় ঋণ।

কিছুতেই আত্মসংবরণ করতে পারি না। জিজ্ঞেস করি, ওদের মধ্যে কার কাছে?

হৃৎকনের কাছেই মঁসিয়ে। সময় সময় মনের মধ্যে ওদের হৃৎকনের বিষয়ে সংশয় জাগে, তা ছাড়া আজ পর্যন্ত আমি একজনের কথা ভেবে অমুতাপ করি।

তাহলে মাঝাম, আপনার কৃতজ্ঞতা ওঁদের প্রতি নয়, ভালোবাসার কার্যকলাপের প্রতি। ওঁরা তো ছিলেন প্রেমের ক্রীড়ণক।

তা হতে পারে। কিন্তু অপরাধ সেই ক্রীড়ণক! আহা!

ভালোবাসা পাইনি, বা পাবার উপায় ছিলো না—এ কথা কি আপনি নিশ্চয় করে বলতে পারেন? ধরুন কোনো সাধারণ মানুষ তার জীবনের সকল আশা-আকাংক্ষা দিয়ে প্রতিটি মুহূর্ত দিয়ে—এক কথায় বখাসর্ব্ব দিয়েও কি আরো বেশি ভালোবাসতে পারত না? অবিধি সুরসাধক এবং কাণ্ডের উপাসকরূপে এই হৃৎকন যৌবতর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে আপনার জীবনে দেখা দিয়েছিলেন।

টংকার করে উঠলেন জুলি—এখনো ওঁর মধুর কণ্ঠস্বরে রোমাঞ্চ জাগে। বললেন : না মঁসিয়ে, না। সাধারণ মানুষ হয়তো বেশি ভালোবাসতো, কিন্তু ওঁদের মতো করে পারতো না।

আহা, অপরাধ! প্রেমের রাগিণী এ পৃথিবীতে একমাত্র তারাই দিয়েছিলো, সে সুরে আমার মাতাল করে তুলেছিলো তারাই! কথা এবং সুরের সম্পর্কের মাঝে তারা বা বাস্তবায়িত করেছিলো তা কোন্ সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব? পার্থিব, অপার্থিব অমুভূতি কাব্যে ও সংগীতে যদি মূর্ত না করতে পারে তাহলে তার পক্ষে ভালোবাসার সম্ভাবনা কোথায়? জানতো—নারীকে জানলে বিহ্বল করতে জানতো একমাত্র ওই মানুষ ছাড়াই! গানে-কথার-আচরণে ওরা তাকে সার্বিক করতে পারতো। আমাদের বাসনা-কামনার মাঝে বাস্তবের চেয়ে কল্পনার আধিক্য থাকলেই ওই কল্পনার মন উর্ধ্বগামী হয়ে থাকে, কিন্তু বাস্তবের পাকে পড়ে মন মাথা খুঁড়ে মবে এই পৃথিবীর ধূলোবালিতেই। ওদের ভালোবাসায় চিনেছিলাম ভালোবাসাকে, শিখেছিলাম ভালোবাসতে; তাইতো অস্ত্রের পক্ষে আমার আরো বেশি ভালোবাসা সম্ভব হতে পারতো।

সহসা নিঃশব্দ কাঁটার ভেঙে পড়লেন তিনি—হুঃসহ বেদনা উৎসারিত হতে থাকে অস্ত্রের আকারে। আমি সেদিকে দৃষ্টি না দিয়ে চেয়ে থাকি খোলা জানালা-পাশে। কয়েক মুহূর্ত অতিবাহিত হয়, আবার উনি শুরু করেন : জানেন মিসিয়ে, সাধারণত মানুষের দেহের সংগে সংগে জ্বর জ্বরগ্রস্ত হয়ে থাকে—কিন্তু আমার বেলায় তা হতে পারেনি। আমার এই শরীরের বহুস উনসত্তর হলেও জ্বরের বয়স কুড়ি পেরোয়নি। এই যে ফুলের হাটে স্বপ্নের সাথে মিশালি পাতিয়ে নিঃসংগ পড়ে আছি—এর কারণ হচ্ছে ওই-ই!

দীর্ঘ সময় নীরবে কেটে যায়। উনি ইতিমধ্যে ভাবাবেগ সংবত করে নেন। এক সময় সত্যান্ত বলতে থাকেন : প্রকৃতি-পরিবেশ যখন চিন্তাকারী হয়ে ওঠে, তখন কি ভাবে আমি সময় কাটাই, সে কথা শুনে আপনি হয়তো হাসবেন মিসিয়ে! আমি নিজেই নিজের নিরুদ্ভূতায় হাসি, কল্পনা করি নিজেকে।

দেখলাম, আর কিছু বলবার জন্তে অমুরোধ করা বুধা, উনি রাজী হবেন না। অতঃপর উঠে পড়লাম।

উনি চৈতন্যে ওঠেন : সে কী! এতো

তাড়াতাড়ি?

যদি কালোঁতে সাক্ষ্য-ভোজন সেরে নেবার অভিপ্রায় জানালাম। উনি তৎক্ষণাৎ কিছুটা ভয়ে ভয়ে বলে ফেলেন : আমার সংগে খেতে কি আপনার আপত্তি আছে? আমি কিন্তু খুবই খুশি হবো।

দ্বিকল্পি না করে তাঁর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করি। খুশি হয়ে উনি ঘটাবানি করলেন। সেই অল্প বয়সী পরিচারিকাটি হাজির হতে তাকে নিমন্ত্রণে কি সব আদেশ করলেন। তার পর আমার জানালেন, তাঁর বাড়ির সব কিছু দেখাবেন।

খাবার-ঘরের সামনে বিশেষ ধরণের কাচে-ঢাকা বারান্দায় রাজ্যের গাছপালা; তারই অদূরে কমলাকুঞ্জ একেবারে পাছাড়ের পাদদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত। লতাশৃঙ্গের আড়ালে একটি নীচ আসন পাতা—গৃহের

কর্ত্তী মাঝে মাঝে এখানে এসে বসেন—এ তারই নীরব সাক্ষী।

এর পর হাজির হলাম আমরা বাগানে ফুলের শোভা দেখতে। দিনের আলো ধীরে ধীরে স্তান হয়ে আসছে, কোমল চরণে নেবে আসছে মনোরম উষ্ণ সন্ধ্যা—ঠিক এমন ভগ্নেই পৃথিবীর সব কিছু মধুর বলে মনে হয়।

খাওয়ার টেবিলে এসে স্থান গ্রহণ করলাম আমরা, ঠিক অন্ধকার বনিয়ে আসার পরই। এখানে কাটলো দীর্ঘ সময়—আয়োজনও হয়েছিলো খুবই সুন্দর। অন্তরংগতা গভীর হর আমাদের মধ্যে, এক পাত্র মদের কল্যাণে উনি আরো অন্তরংগ হয়ে ওঠেন। ঠর প্রতি অন্তরের অন্তস্তলে আমার গভীর সহানুভূতি জেগে ওঠে।

অবশেষে জুলি রোমেন কথা কইলেন। বললেন : চলুন বাইরে গিয়ে চাঁদ দেখিগে। চাঁদ আমার বড়ো প্রিয়—ওই পাগল-করা চাঁদ। আমার শ্রেষ্ঠ সুরের নীরব সাক্ষী একমাত্র ও—ওর মাঝেই অতীতের রমণীয় স্মৃতির সম্ভার সঞ্চিত হয়ে আছে, ওর দিকে চাইলেই তারা আমার এসে ধরা দেয়। আর সময় সময় এই সন্ধ্যাবেলায় আমার নিজের জন্তে এমন একটি মধুর দৃষ্টির আয়োজন করি, তা যদি তুমি জানতে—না না, তুমি খুব ঠাটা করবে—সে কথা আমি বলবো না—আমি সাহস করি না—না না, কিছুতেই তোমায় তা বলবো না!

অল্পনয় করি : দোহাই আপনার, ধামধেন না! কি সে গোপন ব্যাপারটা? আমাকে বললে কিছু হবে না, প্রতিজ্ঞা করছি হাসবো না—এই শপথ করলুম!

তবু তাঁর দ্বিধা যায় না দেখে ওঁর হিম-শীতল কুন্ত হাত দুটি তুলে নিলাম; স্রুত অতীতের সেই প্রেমিক-সুগলের মতো গভীর চুবনে হাত দুটি প্রাবিত করে দিই। উনি অভিভূত হয়ে পড়েন...তারি

ফোন. ৩৪-৫০০২

সর্বকৃটি সম্মত
সুন্দর ভালক্রার
এক মাত্র গিনি সোলার
নিখুঁত গছনা প্রস্তুত কারক

গুরুদাস
কে. এল. সিংহ এন্ড সন্স

১৬৭ বি. বহু বাজার, টাউ, কলিকাতা-১২

KLS

মাঝে জেগে থাকে সংকোচ। কীণ কণ্ঠে প্রশ্ন করেন : প্রতিজ্ঞা করছো তুমি হাসবে না ?

হ্যাঁ করছি—শপথ করছি।

হাসি ফুটে ওঠে মুখে। আহ্বান জানান : তাহলে এসো।

আমরা উঠে পাড়লাম। সবুজ পোষাক-পরা সেই কদাকার চাকরটা তাঁর চেয়ার সরিয়ে দেয়। উনি সেই অবকাশে ক্ষিপ্তকণ্ঠে কি বেন তার কানে কানে বলে দেন।

সসন্মানে সে উত্তর দেয় : হ্যাঁ মাফাম, এফুণি।

উনি আমার হাত ধরে বাঁরাঙ্গা অতিক্রম করে চললেন। কমলাবীথি পথটি ভারি রমণীয় ? চাঁদের রূপালি হাসি কীণ ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে বুড়াকার গাছগুলির শাখায়-পাতায়, বুকুলিত কমলা-সুরভি আকুল করে তুলেছে আকাশ-বাতাস। অদূরে খোশের অন্ধকারে অগণিত জোনাকিকে মর্জের তারকা বলে মনে হচ্ছে।

আমি চোঁচিয়ে উঠি : অপরূপ ! প্রেমের উপবৃক্ষ এই পরিবেশের তুলনা হয় না।

সহাস্ত্রে জ্বলি বলেন : তাই নয় ? তাই নয় ? এখনি দেখতে পাবে তুমি।

ওর ঠিক পাশটিতে আমাকে বসিয়ে দিয়ে বিড়-বিড় করে বলেন : এই সকল দৃশ্যের স্মৃতিই আমার জীবনে দুঃখভারাক্রান্ত করে তোলে। আজকালকার মানুষ তোমরা সে সব জিনিস স্বপ্নেও ভাবতে পারবে না, টাকা-জানা-পাইএর কারবারীদের পক্ষে তা সম্ভব নয় মোটেই। আমাদের সংগে—মানে আমার মতো বুকা নয়, তরুণীদের সংগে তোমরা কথা কইতে পৰ্ব্বস্ত জানো না। প্রেম আজ দোহের ক্ষুধার পর্য্যবসিত হয়েছে ; নারীদের পণ্য হিসেবে যদি তোমরা মনে না করে দাঁও প্রকৃত সম্মান সন্মার ব্যবহার তবেই তো।

আমার হাতটা হাতে টেনে নিয়ে এক সময় উনি বললেন : ওই, তাকা।

অপরূপ এক দৃশ্যের অবতারণা হতে দেখে বিষয়ে আনন্দে

অভিভূত হয়ে গেলাম। আমরা যেখানে পাড়িয়েছিলাম তার নীচের দিকে গলিপথে চাঁদের আলো শতধা হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। তারি শেষ প্রান্তে অল্পবয়সী একটি পুরুষ ও নারী আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। আরো অগ্রসর হলে দেখতে পেলাম উভয়ের হাত দৃঢ় আবদ্ধ—আর মাতাল করা জ্যোৎস্নাবারায় স্নান করে তাদের দেখতে হয়েছে অপরূপ !

কয়েক মুহূর্তের জন্তে তারা অন্ধকারে হারিয়ে গেল, তার পরই আরো নীচের রাস্তায় দেখতে পাওয়া গেল তাদের। যুবকটির পরনে শাদা সার্টিনের পোষাক, মাথায় চওড়া হ্যাট উটপাখির পালক লাগানো—সবই গত শতাব্দীর নিদর্শন। মেয়েটির সাজসজ্জার শ্রিত্তলীর আমলের ছাপ।

ওরা দু'জনে আমাদের কিছুটা দূরে থেমে পড়লো, তারপর মধুর অভিভাদন জানিয়ে নিবিড় আলিঙ্গন আবদ্ধ হলো।

হঠাৎ ওদের দুজনকে এ বাড়ির পরিচারক-পরিচারিকা বলে চিনতে পারলাম। সংগে সংগে সজোরে হেসে ওঠার অদম্য ইচ্ছা হতে লাগলো, বহু কষ্টে আত্মসংবরণ করলুম। অপেক্ষা করতে থাকলাম পরবর্তী দৃশ্যের জন্তে।

এইবার প্রেমিকযুগল সেই সরুপথের প্রান্তে এগিয়ে যায়, আবার তাদের স্মৃতি রমণীয় হয়ে ওঠে। দূরে বহুদূরে মিলিয়ে যেতে যেতে এক সময় স্বপ্ন দেখা দৃশ্যের মতো হারিয়ে যায় তারা।

আমিও আর অপেক্ষা করি না, তৎক্ষণাৎ উঠে পড়ি। ওরা যেন আর আমার দৃষ্টিপথে না পড়ে। সূদূর অতীতকে আহ্বান জানাবার জন্তে আমাকে অবলম্বন করে বুকা এই রূপশিল্পীর অস্তরে হারিয়ে বাওয়া স্রবের আলোড়ন জাগাতে এই যে মিথ্যা দৃশ্যের অবতারণার ব্যবস্থা—নিশ্চয় এ বহুক্ষণ স্থায়ী হবে। কাজেই আমি বিদায় নিই নীরব বিশেষ তৎপরতার সংগে।

অমুবাদক—রমেন চৌধুরী।

খেয়াল

(সরোজিনী নাইডুর কবিতা)

আহা অমুপম বনের কুসুমটিরে
ধরেছিলে তুমি দুটি অঙ্গুলি নিয়ে,
উদাসীন গৌটে ছুঁইয়ে অক্ষয়্যৎ
কি খেয়ালে তুমি ফেলেছিলে ছিঁড়ে ছিঁড়ে ?
জানলে না তুমি, কোনো দিন জানবে না—
এ বার্তা জানি সুরগোপন প্রিয়তম !
নয় নয় তাহা এতটুকু বনফুল—
সে আমার মন, সে যে অন্তর মম।

হু' আঙলে ধরে মদের পাত্রখানি
অবহেলা ভরে ছোঁয়ালে তোমার গৌটে,
ছুঁড়ে ফেলে দিলে ক্রান্তিতে অবসাদে—
ভাঙা-ভাঙা কাচ ওই তো ধূলার লোটে।
জানলে না তুমি, কোনো দিন জানবে না—
এ বার্তা জানি সুরগোপন প্রিয়তম !
নয় নয় তাহা মদের পাত্র শুধু—
সে আমার প্রাণ, সে যে গো হৃদয় মম।

অমুবাদ—শ্রীমঙ্গল দাশগুপ্ত



পিয়াস

...সুন্দরী

নারীদের

ঐতিহ্য

“পিয়াস” নামটি সারা পৃথিবীর
সুন্দরী নারীদের কাছে অতুলনীয় গুণাবলীর
প্রতীক — মোলায়েম এবং ভাল পিয়াসে
তাদের সৌন্দর্য সম্পূর্ণ নিরাপদ।
সেইজন্যই তাঁরা পিয়াস সাবানের সাহায্যে
তাদের লাবণ্যের যত্ন নেন — পিয়াস আসল
মিসারিণ যুক্ত সৌন্দর্য সাবান।
এটি স্পর্শকাতর ত্বকের পক্ষে এত বিপুল এত ভাল।
শিশুদের পক্ষে সেইজন্যই এটি আদর্শ সাবান।
মখমলের মত মোলায়েম পিয়াস ট্যালকম
পাউডারে অপূর্ব সুগন্ধ ছাড়াও আছে
সেই একই গুণাবলী এবং বিপুলতা।



অপব্যয় সৌন্দর্য
চর্চার নিয়মিত
পিয়াস ব্যবহার করুন

PSTP. 9-X52 BG

এ অ্যাও এক পিয়াস লিঃ লিওনের পক্ষে হিন্দুস্থান লিটারি লিঃ কর্তৃক প্রস্তুত করা হয়েছে।

হাইড পার্ক কন্যাবান্ধ

শ্রীসম্ভাবকুমার ভট্টাচার্য্য

অপবাদে ভরা এ নাম, তবু সময় কাটার সক্ষার প্রায় বোজাই হাইড পার্ক কর্ণালের এক বেকিতে। বিচিত্র আবেষ্টনী! একষেয়েমীর হাত থেকে বাঁচার সব চেয়ে সোজা পথ তার কাছে এটাই। ব্যক্তিস্বাধীনতা উগ্র রকমের। ছোট-ছোট টুলের ওপর ঝাড়িয়ে বড়তা করে চলেছে বহু জনেই, নানান বিষয়ে শ্রোতার সংখ্যা নির্ণয় না করেই। খুঁতু পরিবর্তনের ঘোষণা করে চলেছে মোহময়ী নারীরা বেশভূষার মধ্য দিয়ে। দিনের আলো, রাতের অন্ধকার—বাধা বলে কিছু নেই। মাটির নীচে দিয়ে রাস্তা পার হয়ে সহজ মনে চলে বাওয়ার পথও পরিষ্কার। স্ত্রুঙ্গের অপরিদেখা বাবার আগেই সাধী ছুটে-বার অনেক সময়েই। দোকান বাজার সাজানো রয়েছে বলমল-করা আলোর মাঝে—ফ্রেতার অভাবও নেই এখানে।

নরেন বসে আছে অনেকক্ষণ। সিনেমা বাওয়ার কথা—সময় শেষ হতে চলেছে তবু দেখা নেই ডরবির। হাইড পার্ক কর্ণারেই আলাপ। প্রথম দিনে ভয় যে ছিল না তা নয় কিন্তু প্রলুব্ধ করা রূপের জৌলুস আর স্থান কাল আলোড়ন এনেছিল—ভয়কে ছাপিয়েই সামান্য পরিচয় ছাড়া আর কিছুই হয়নি সেদিন। মিথ্যা ভাবনা আনেনি কিছুই, বরং মন আরও চঞ্চল হয়েছে বিলম্ব হতে দেখে। বিদেশে এসে প্রেমের হোঁচল লাগার মত অবকাশ থাকলেও অবলম্বন মেলেনি এত দিন। আকস্মিক আকর্ষণ অল্পভূতিকে তাই রাজিরে তুলেছে অনেকখানি। বাহর বন্ধনে বিলিয়ে দিয়ে অনেকেই চলেছে পার্কের ভেতর দিকে—অন্তস্তলে



বাওয়ার কামনা সম্ভবতঃ। প্রকৃতির মোহিনী হৃদয়ের মধ্যে মায়াজাল ছড়িয়ে প্রকৃতি-বিলাসিনীরা মিলিয়ে দিয়েছে রূপ-যৌবন, মাছুষের সাজানো কৃত্রিম আলো উপহাসের নীচে। প্রকৃতির অমুশাসন মানার চেষ্টাও নেই কোথাও এতটুকু। অসময়কে বিলাসিতা দিয়ে সময়োপযোগী করার প্রচেষ্টাই প্রবল হয়ে উঠেছে।

মোহ কেটে বার মিষ্টি ডাকে—কারো লজ্ঞ অপেক্ষা করছো বুঝি? উত্তর দেওয়ার ইচ্ছা হয় না ঐ মিষ্টি সুরের পরে বেলুনো তাল আনতে।

খুব মিষ্টি না হলেও বেশ সুন্দরী বলা চলে। বেকির ঘারে এসে কখন বসেছে নরেন জানতেও পারেনি।

আবার প্রশ্ন হয়—অসুবিধা করলাম বসে?

—অসুবিধা হলেই বা ওনকে কে? পার্কের আসন তো আর আমাদের একার লজ্ঞ নয়?

—তা সত্য, তবু তারি মধ্যে সুখ-সুবিধা দেখার চেষ্টা করা মঙ্গল। আপত্তি না থাকলে বসতে পারি।

—আলাপেও আপত্তি নেই।

—বিদেশীরা সত্যিই সুন্দর! আমাদের দেশের লোকেরা আমাদের এমন সম্মান দিতে জানে না।

বিদেশী সে নিজেও। আরল্যাণ্ড থেকে পালিয়ে এসেছে নানান কারণে। লণ্ডনের সমাজের খাতায় নাম না উঠলেও পরিচয়ের গণ্ডী ছাড়িয়ে গেছে অনেকখানি। তাই বলে স্থায়িত্ব নেই বসবাসের। বহু জায়গার আছে তার নাম ও থাকার কাহিনী। আপাততঃ ঘর ভাড়া করেছে লণ্ডনেই। দুপুর পর্যন্ত এক পোষাকের দোকানে থাকে বিকালের দিকে প্রায়ই আসে পার্কে। বেশ দূর নয়। হেঁটেই আসে আবার বেড়িয়ে ফিরে যায়। বাঁধন কোন নেই নেই, কোন বাধাও।

নরেন জিজ্ঞাসা করে, এই একক জীবন ভাল লাগে?

বোধ হয় শিহরণ আসে প্রশ্নের বাক্যে। উদ্ভ্রামতা প্রকাশ পায় রমণীর মুখে-চোখে।

জেনী বলে—একক জীবন ভালব বলেই তো আসি বহর স্পর্শে ঘেরা এই চঞ্চলতার মধ্যে। তাইতো নিজেই আলাপ করতে চাই অপরের সঙ্গে।

—ভয় করে না?

—ভয় তো বোঝেন। কিন্তু এককম্ব বোচাতে গেলে বোঝনকে উপচোঁকন দিতেই হবে।

—সে হলো প্রতিদানে উপহার। অথচ দান-প্রতিদানের কথা ওঠার আগেই তো হারানতে পার তোমার এত দিনের সাজিরে রাধা সম্পদ অজানিত অন্ধকারের আলিঙ্গনে।

—বোঝন চিরস্থায়ী কিছু নয়। হারানতে একদিন হবেই। ক'দিন আগে না হয় পরে। তখন আর সুযোগের অপব্যবহার করে

কি লাভ? এই ধর না তোমার কথা। তোমাদের আচার বিচার জানি না, না মানি তোমাদের ধর্ম। তবু আলাপের লোভে পড়ে ভালবাসার খেলায় যদি তুমি চেয়ে বস আমার সকল সন্তানকে—যৌবনকে বাঁচিয়ে রাখব মনে করে প্রতিহত করব তোমার অগ্রসরকে। অমন যৌবন থাকার মূল্য কিছুই নেই।

—তা হয়তো সত্য। কিন্তু এ-ও তো হতে পারে, শুধু যৌবনকে বেচেই গেলে, মূল্য কিছু না পেয়েও।

—মূল্য পাবই, কেন না তার বিনিময়েই যে বেচা-কেনা। ধারের ব্যবসা অল্প সব কিছু নিয়ে হতে পারে কিন্তু নারীও নিয়ে নয়। বসন্তে পাব তবু থেকে যাব অচেনার রাজ্যে। যাক ও সব কথা। বল কার জগৎ অপেক্ষা করছ?

—নাম বললেই কি চিনতে পারবে?

—নাম জানার উৎসাহ আমার এতটুকু নেই। সম্পর্কটুকু শুধু জানতে চাই।

—সম্পর্ক গড়ে ওঠার সুযোগই মেলেনি।

—তার মান সুরপাত শুধু।

—তাও ঠিক বলা চলে না। এই প্রথম আলাপের অভিজ্ঞতা অখণ্ড অপেক্ষমান অতিথির আরাধনা বার্থ হতে চললো আর একজনের দ্বান্ত গৃহচলার দোষে।

—আমারও যে এমন ভূগ কোন দিন হয়নি তা কে বলবে? তাই এ কঠিন সমর্থনে যুক্তির অবতারণা করে কোন লাভ নেই, বরং অল্পবোধ করব আমাকে অন্ততঃ একবার আলাপের সুযোগ দেবার জন্য। সম্পর্কহীন আমিও—বিশ্বাস কিছুই আনতে পারিনি তোমার মনে। তবে অনিশ্চয়ের কোন কথাও তো তুলতে পার না আমার খেসার? বন্ধুত্ব কামনাই যদি উদ্দেশ্য হয়—বাধা কেন আসবে তোমার আমার অভিধানে?

নবীন কথার জোয়ারে ভেসে যায়। বাধা দিতেও পারে না আর। জেনি দ্রুত কমানোর বাসনার কাছে আসে।

আকাশের দিকে তাকালেও অন্ধকারের কথা মনে হয় না। কৃত্রিমতা মাটি ছেড়ে অত উঁচু পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। পার্কের চারিদিককার রাস্তা পেরোলেই চোখে পড়ে ভরাটকরা গাছগুলো। মাছেরই আনা আচ্ছাদন আড়াল করে রেখেছে প্রসারিত দৃষ্টিকে। তারই নীচে চেয়ার পাতা, বসতে হলে সময় অল্পসারে অর্ধ দিতে হয়। ভীড় নেই সেখানে। আমাদের মাঝে অমন সীমারেখা টানার ইচ্ছা হয় না। নরম ঘাসের উপর বসে পড়েছে সবাই প্রায়।

হাতের পরশ পেয়ে বিচলিত হবার আগেই তখনতে পায় জেনির কথা—তোমরা তো হাতের রেখা বিচার কর?

—যদি বলি তোমার ভাগ্য ভারতীয় স্বামী আছে?

—অবাক হব না।

—সত্যিই পার বলনা করতে?

—বাস্তবতায় স্বীকার করতেও আপত্তি নেই।

—তোমার সাহস আছে।

—সাহসের পরিচয় কি পেলে?

—আমি তো পারতাম না।

—পয়ে দেখা যাবে। আপাততঃ প্রথম পরিচয়ের শুভকণকে করার কি করছ বল?

—সাহস হয় না আমার, বাড়ীতে তোমার নিয়ে যেতে।

—সাহস তোমার নেই, তা বুঝছি।

—তার চেয়ে চল কোন সিনেমায়।

—সে তো হবে ছবি দেখা। আমাদের আলাপের মাঝে প্রয়োজন কি তৈরী করা কথাবিত্তাসের। তোমার তো বাড়ী নিয়ে যাওয়ার সাহস হয় না কিন্তু আমার হয়। যাবে আমার ঘরে?

—খুবীই হব।

—ক্লিপেট্রা নই কিন্তু। রূপ-যৌবনের পরিচয় পেয়েছ, সেই সঙ্গে প্রলোভন-ভরা মনের দেখা পেয়েছ কি না তুমিই জান। তবু বলব, সে মাদকতা নেই, যাতে এটি নিগূহ মত সব কেড়ে নেওয়ার স্পর্ধা করতে পারি।

বেঞ্চি খালি হয়ে যায় নিমেষেই। পড়ে থাকে মন-বিনিময়ের চিহ্ন—ভবিষ্যৎ রচনা করার প্রয়াস। বাস্তব কোলাহলের মাঝে হিসাবও থাকে না, কারা ঋণিকের চাহনীতে ভরিয়ে নিল নিজের সব কিছু কীকণ্ডসোকে, জীবনের স্বাধীন বৃত্তে শিখল বরফের মত জমাট হয়ে থাকা অব্যবহৃত মনের জানালা দিয়ে। অভ্যাস করা চলাফেরার মাঝে মাঝেও আসে আকস্মিক পরিবর্তন—সময় নেবার অবসর দেয় না—ভাসিয়ে দিয়ে যায় উদ্দাম উচ্ছলতার বজ্রার। একের ব্যবসা অপরের সমস্তা এনে দেয়, তবু পবিত্রত্বের খোঁজ মেলে না। আহ্বান দিয়েই শুধু ক্ষান্ত হয় না, তার পরের কথা ভেবে বসন্ত গভীরে ঠিকই।



রেজিষ্টার্ড ট্রেডমার্ক

নিখ্যাত
'শঙ্খ ও গদ্য'

মার্ক গেঞ্জী

ব্যবহার করুন

ডি, এন, বসুর

হোসিয়ারি ফ্যাক্টরী

কলিকাতা—৭

—রিস্টেল ডিপো—

হোসিয়ারি হাউস

৫৫১, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

ফোন : ৩৪-২৯২৫

চলার ছন্দে ছিল তাদের পরিকল্পনা অথচ চলার আনন্দ মধুর থেকে মধুরতর হবার আগেই এসে যায় ধামার ইঙ্গিত।

লোক-সমাগম ভালই বলা চলে। হাতের মধ্যে হাত রেখে চলতে গিয়ে দৃষ্টির অপব্যয় হয়। দরজার কাছে এসেও নরেন খেয়াল করতে পারেনি পথের নিশানা কিংবা পথিকের আনাগোনা।

অন্ধকার সামান্য একফালি গলি দরজার পরে।

সিঁড়ি দিয়ে উপরে ওঠে আরও কয়েকটা বারান্দা। ব্যস্ততা যেন সকলেরই ওসব কাজেই—

চাবী খুলতে যেটুকু সময়। বিশ্বয় কাটার আগেই আলো জ্বলে উঠে ভরিয়ে দেয় মনের অজানা জানার স্পর্শকে।

সুন্দর করে সাজানো সে ঘর।

—বস।

নরেন স্বপ্নাবিষ্টের মত বলে ওঠে—জেনী তুমি কোথায়?

—আমি আসছি। তুমি দরজা কবে বস একটুখানি।

নানান ভঙ্গিমায় তোলা ছবি সারা ঘরময়। নিজেরই সৌন্দর্যের ওপর মোঁহ আছে বলতে হয়। ছোট টেবিলের মাঝে এক শিশুর ফটা। বিছানা ঢাকা রয়েছে বেশমের কাজ-করা চমৎকার এক চাদর দিয়ে।

এত ঐশ্বর্যের মধ্যে একক উপস্থিতি বোঝার মতন হয়ে উঠছিল নরেনের কাছে।

ড্রয়ার টানতেই গুমরে ওঠে কাঠের পাজরগুলো। সে আওয়াজ পৌঁছায় গৃহস্থামিনীর কানেও।

স্বর ভেসে আসে—ভয় পেও না যেন।

নরেন ভাল করে দেখে। কালো এক বিভলবার। ভয়ে ভাড়াভাড়ি বন্ধ করে দেয় ডালা।

জেনী ঘরে ঢোকে। বলে—কি সত্যিই ভয় পেলে নাকি? দেখছ তো একা বাস করতে হয়। তাই বিপদের দিনে হাতিয়ার রাখা আর কি।

নরেনের জড়ত্ব যায় না তবু।

জেনী কাছে আসে। সোফায় বসিয়ে দেয়। নিজের বসে। এরই মধ্যে পোষাক বদলে এসেছে। মিষ্টি গন্ধ বেকছে মুখের চারিপাশে। ঝসমঝসমি সেগেছে সারা অঙ্গে।

—কি কথা, বলবে না বুঝি?

নরেনের কণ্ঠে অদ্ভুত এক স্বর!

—জেনী, আমার সন্দেহ হয়—

—খামলে কেন?

—আমি বরাং বাই। আর এমন ভুল করব না।

জেনী বাধা দেয়—কিসের এত কুঠা তোমার?

সামনে পড়ে রয়েছে 'রিভেসী'র এক ছবি। সিনেমার কোন অংশ হয়তো। সন্ধ্যের বেলাছুমিতে প্রেমের পেলায় মত্ত হয়ে উঠেছে প্রেমদ্রিয়ুগল। ভুল গেছে সমাজ সংস্কার।

নরেন প্রশ্ন করে—সত্য জবাব দেবে?

—সত্য মিথ্যা বাচাই করবে কোথা থেকে?

—সে ভাবনা আমার। তুমি সত্য উত্তর দাও।

—তোমার ছেড়ে দেবার ইচ্ছা যদি না থাকে আমার? তোমার খুশী করতে যদি তোমার মনবাণী কথা বলি?

—সে তুমি বলবে না।

জেনীর চোখে-মুখে কিসের প্রতিচ্ছায়া!

বলে—যাকে সন্দেহ করছ তার ওপর আবার এতখানি বিশ্বাস। জেনীর হাসি বিহবল করে তোলে নরেনকে। জেনী দৃষ্টির সঙ্গে দৃষ্টি মিলিয়ে নিজেই ইতিহাস রচনার চেষ্টা করে।

—তুমি কি সত্যে চাইছ জানি। ভাবছ আমি হয়তো তাদেরই একজন, যারা পরের মনোরঞ্জন করেই দিন কাটায়। চলার পথ মিথ্যা দিয়েই তৈরী—সম্মানের চেয়ে অসম্মানের বোঝাই বেশি।

নরেন বাধা দেয়—না আর সত্যে চাই না। শুধু বল তুমি আমারই মতন সাধারণ একজন।

জেনী ঠেঁ ধায়। পাশের ঘর থেকে নিয়ে আসে ছোট এক খাতা। অনেক লেখা—অনেক ছবি তার মধ্যে। নরেনের হাতে তুলে দেয় সে স্মৃতিময় চিহ্ন।

বলে—অবসর সময়ে পড় এ-খানি। সত্যিকার পরিচয় পাবে আমার। তবে এটুকু জেন, কলঙ্কিনী হলেও স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রলুব্ধ করি না মানুষকে। বন্ধুত্বই আমি চাই—চিরস্থায়ি হলে খুশীই হব কিন্তু না হলেও আপত্তি নেই কিংবা না হওয়ার শোকে নিছিয়ে পড়ব না পথের পাশে ঐয়োজন্যের পায়ে কুড়ল মেরে।

নরেন মুখ তোলে। জানায়—এ পরিচয়ের পরও তুমি আশা কর বন্ধুত্ব?

—আজই না হয় পরিচয়ের কথা উঠেছে। কিন্তু শুধু নারীত্বই যখন অতীতের ছবি ছিল, তখনও তো বন্ধুত্বের ছদ্মবেশে পণ্ডত এসেছিল আমার ঘরে। ভোগ আর ভ্যাগের মধ্যে ছিল না কোন ব্যবধান। সময় বসে হইল না। পড়ে হইলাম আমি আর আমার সেই আশা—বন্ধুত্ব।

আসন শূন্য হ'ল আবার। নরেন পাতা উলটাতে সুরু করে। ছবিগুলো যেন জীবন্ত হয়ে তার সামনে উপস্থিত হতে চায়। লেখাগুলো ক্রমশঃ বড় হতে আরম্ভ করে। সমস্ত স্রাব্য এককো হবার উপক্রম। পঙ্কিত্র পাবার সঙ্গে সঙ্গেই পরাজয় আসে তার সকল শক্তি নিয়ে।

জেনী ফিরে আসে স্নিগ্ধ কৌমল্য নিয়ে। স্নেহের ছায়া পড়ে তার মুখ চাহনিতে। হাতে পানীয়-ভর্তি গেলাস। তৃষ্ণার আগেই তৃষ্ণা হরণের আয়োজন।

নরেন এক নিঃশ্বাসে শব্দ করে অসুখোষ ব্যক্তিরেকই। নিবেদ-বাধা-নীতি, সময়কালে কোথায় ভেসে যায়, বোধ হয় স্রষ্টাও জানে না!

জেনী হাসতে হাসতে এগিয়ে দেয় আবার। বলে—কত খুশী হলাম তুমি নিজেই নিলে বলে।

নরেন আবেশে স্পর্শ করে স্নেহময়ীর মাধুর্যকে। উত্তর দেয়—আমায় ক্ষমা কর। তুমি সত্যই বন্ধুত্বের যোগ্য।

—কি তোমার এমন করেছি বন্ধু, যার জন্য এত অবিধান ঘটবে এক লহমায়?

—উপহাস করছ?

—তোমার উপহাসও তো বুঝলাম না এখনও?

—উপহাস নয়, বিশ্বাস কর। কি হবে তোমার অতীত নিয়ে, কি করব তোমার ইতিহাস গুনে? তুমিই কি আমার

বাঁধতে চেয়েছি আমার সব কিছু শোনার পর? বিশ্বাস অবিখ্যাসের প্রায় তুলেছি আমিই মিথ্যা পুরুষকারের দস্তে। আর ভুল করব না।

—এত সহজে আত্মসমর্পণ করা কি উচিত হবে? আমার দক্ষ অভিনয় তোমায় হয়তো বিচলিত করেছে তোমার দুর্বলতাকে নাড়া দিয়ে। এটা তো মিথ্যা নয়, আমি পঞ্চচারিণী ঘরপী হবার অযোগ্য।

—অকুল পাঁধারে তোমার তরীতে দিয়েছি আসন। সে তরীর ছিদ্রের হিসাব নিয়েই বা কি হবে, আর বর্ণচ্ছটার সমালোচনা করেই বা কি লাভ? তরীর সীতল ছাউনি যে আছে, স্তম্ভনিদ্রার সকল সুবিধাটুকুও সে রয়েছে এটা তো মিথ্যা নয়।

—অহুতাপ করবে না তো পরে?

—তরী যদি ডোবেই ভর পাব না তাতে। তুমি যে থাকবে সঙ্গে। সময়ের হিসাব নেই। রাতের আলো-ছায়ার খেলা চলছে অনেকক্ষণ ধরে। পরিচিত প্রথম পর্ক পেরিয়ে গেছে অনেক আগেই। দৃষ্টির আকর্ষণ সীমাবদ্ধ হয়েছে মনের সোপানে। অজানিত অজ্ঞতা শেষ হয়েছে কথার আলোড়নে।

জেন্নী বলে, রাতের আতিথ্যের নিয়ন্ত্রণ করব না প্রথম আলাপেই। তবে খুশীই হব যদি থাক। ভয় নেই, ক্রান্তিময় রেকাক্ত রাত হবে না এ বরং স্বপ্নময় করে তুলব কল্পনার কাব্যজালে।

—না আজ থাক।

—সাহস হয় না নিশ্চয়ই?

—সত্যিই তাই। আলাপন প্রলোভনে আসতে আর কতক্ষণ।

—তবে বাও। কথা দাও আবার আসবে?

—আসবে, বত দিন না অশোভন কিছু আসে আনাগোণায়।

—কি, পড়বে না আমার কথা?

—পড়ে তোমার বিচার করতে চাই না। বা পেয়েছি, বা দেখেছি বা জেনেছি তাই যথেষ্ট আমার সংযোগ রাখার পক্ষে। মনে পড়ে, তুমি জানতে চেয়েছিলে আমি হাতের বেথা পড়তে পারি কি না। হাতের বেথা পরিবর্তনশীল—দিনের পর দিন বেথা বদলে যায় মনের সঙ্গে ভাল মিলিয়ে। তাই বিচার করতে বসে, পুরানো বেথার সন্ধান করে কি লাভ? তোমার আগ্রহ এত তীব্র যে অজ্ঞের অমুগ্রহ বড় হয়ে দেখা দিতেই পারবে না কোন দিন—তোমার নিজের তরকের দোষ-ত্রুটি তো পরের কথা।

কথা শেষ হয় সেইখানেই। নীড়ভাঙ্গা পাখির মতন নারী বিদায়-বাখা তুলতে চায় পুরুষকে অবলম্বন করেই। চিরাচরিত প্রথা ও পথ। দেশ কাল কোন বাধা আনতে পারে না। চোখের জলই পুরুষের পুরুষার—এই দূরে চলে বাবার সন্ধিক্ষণে।

বাড়ী ছেড়ে পথে নেমে পড়ে নরেন। দূরে হাইড পার্কের সতেজ আলো চোখে আসে। ওরই পাশ দিয়ে যেতে হবে এবার শূন্যতা নিয়ে। ভরসা তবু—আগামী কালের পরিপূর্ণ আলোর ঝলকানি দেখা দিচ্ছে দিগন্তের কোলে। নারীত্বের পূর্ণ আবেদন ঐ হাইড পার্ক কর্ণারে—আবার নারীর জন্ত আতিথ্যে নিজেকে সম্মানিত করার সংযোগ দিয়েছে ঐ হাইড পার্ক কর্ণারেই। হয়তো ওর নাম ছড়িয়েছে চারি দিকে, শুধু ঐ ভিন্নমুখী সত্যের জন্ত।

হাইড পার্ক কর্ণার—হাইড পার্ক কর্ণার।

হাইড পার্ক কর্ণারকে বিদায় জানিয়ে পিছন ফেরে নরেন রাতের আশ্রয় অভিমুখে। হাইড পার্কের আলো ক্রমশঃ নিভেজ হয়ে যায়—দূরে অনেক দূরে এখন। ফিরবেও না আপাতত। পরের দিন আবার আসবে ফিরে—দেখা হবে—শরিচয় ঘন হবে। বধের চাকা চলবে বীর গতিতে। ঐ ভাবেই বত দিন না বধ পৌছায় শিবর দেশে। চালক পাবে সেদিন যোগ্য পুরস্কার—চলার সজিনীই দেবে মালা, জয়ের শুভ নিশান।

অন্ধকারে উপবিষ্ট থ্রাসপক্ষী

[টমাস হার্ডির "The Darkling Thrush"-এর ভাব অবলম্বনে]

অর্ধশায়িত দেহখানি ছিল ঝোপের বেড়ার দ্বারদেশে,
পৃথিবী ধূসর সেজেছিল হবে তুহিনাবরণ বেশে।
শীতের দিনের স্তিমিত আঁখিটি প্রাণহীন নিবু নিবু,
পাথক পরশ লভিবার তরে মিলিতেছে সবে কভু।
ছোট ছোট সব ডালপালাগুলি চোখের স্রুখে ভাসি,
ছিন্নবীণার তারসম তারা আকাশেতে পরকাশি।
পৃথিবীর এই স্পষ্ট প্রতীত অবয়বখানি যেন,
চলে-বাওয়া সেই শত বরষের শব্দেহ গণি হেন।
আকাশে আকাশে মেঘেরা তাহার রচেছে সমাধি-গৃহ,
বায়ু সেয়ে চলে শোক-গাথা তার চলে গেছে যেন প্রিয়।
অনুর আর জন্মের সেই প্রচলিত প্রথা শুক,
পৃথিবীর বৃক প্রতিটি প্রাণীই প্রাণহীন যেন দুক।
সহসা আমার মাথার উপরে প্রকাশিল এক কণ্ঠ,
খোলা ছিল তার প্রাণের দুয়ার মুখরিত ছিল ওষ্ঠ।

হৃদয় তাহার ভরেছিল উঠি আশা আনন্দ প্রীতিতে,
মুখরিত তাই করিল সহসা মধুর সন্ধ্যা-গীতিতে।
ক্রম ঘনায়িত অন্ধকারের গাঁড়ন করিতে দূর,
কণ্ঠে তাহার ঝরিল এমন আশা-আলোকের সুর।
ছোট ও প্রাচীন জীর্ণ-জীর্ণ পাখীটি ছিল গো হস্ত,
ঝড়ের আঘাতে ডানা দুটি ছিল এলোমেলো বিস্তৃত।
কাছে বা দূরের পাখির সব ছিল যে সবই গো নীরস,
আনন্দ-মুখর সংগীত তরে দেবে না প্রাণের পরশ।
(তবুও) প্রাণহীন এই পরিবেশ মাঝে ঝরিল মধুর কণ্ঠ,
তাহাতে ছিল গো আশার বারতা শুনাইল বাহা মিষ্ট।
হৃদয়-কুটীরে ছিল গো তাহার আশার নতুন বারতা।
(তাই) শুভরাত্রির বারতা জানাল আমার ছিল না জানা তা।
প্রকৃতির সাথে যোগ ছিল তার জেনেছিল তার হৃদয়ের কথা,
(আমি) পারিনি জানিতে ছিল জানা তার স্তম্ভময় আশা-বারতা।

অনুবাদক—শ্রীমুনীতিকুমার গুড়িয়া

অক্ষন ও প্রাক্ষন



মুবারিকা বিবি

শিবানী ঘোষ

এক একে দরজার কাছে এসে দাঁড়াচ্ছে মুসাফিরের দল। তাদের দান করা হচ্ছে কুটি আর মাংস। আজ ঈদ। বছরের এই দিনটিতে শাহ্, মনসুর আগজকে পরিভূক্ত করেন এই ভাবে। তাঁর একমাত্র কন্যা মুবারিকা বিবির তত্ত্বাবধানে দাসীরা কুটি আর মাংস দিয়ে আসে মুসাফিরের হাতে।

আজ বাজোর দেশের ওপর ঘনিষে এসেছে চরম দুর্দিন! বাদশাহ্, বাবর ভারতবর্ষ জয় করার অভিপ্রায়ে রওনা হয়েছিলেন কাবুল থেকে। হঠাৎ বাবার পথে তাঁর জেদদুটি পড়ল দুর্ভাগা এই দেশটার ওপর। এর অপরাধ, এর অধিবাসিবৃন্দ ইসলাম ধর্মের অঙ্ক বিশ্বাস অমুকেরণ করে না। তাই বাবর স্থির করেছেন, ভারতে বাবার পূর্বে তিনি নিশ্চিহ্ন করে যাবেন এর ইউসুফজাই অধিবাসীদের।

এই চরম দুর্দিনে সকলের মুখ থেকে মিলিয়ে বাজে হাসি। তবু আজ বছরের পবিত্র দিন। শত দুঃখের মাঝেও তাই বিবি মুবারিকা অবহেলা করেননি তাঁর মুসাফির সেবার কাজে। তিনি দাসীদের হাত দিয়ে হাসিমুখেই পাঠিয়ে দিচ্ছেন তাদের প্রাণা বস্ত্র।

হঠাৎ এক সময়ে চমকে উঠেছেন মুবারিকা বিবি। এ কি! দরজার এক কাছে এসে একজন মুসাফির এভাবে তাঁর পানে তাকিয়ে দেখছেন কেন? মুসাফিররা তো এমন বেয়াদপি কখনও করেন না? তিনি তাড়াতাড়ি মুখের ওপর নেকাবটা টেনে নিয়ে তাঁর এক দাসীকে বলেন—ফিরোজা, বা ঈগ্গিরি কুটি আর মাংস দিয়ে আর দরজার নিকট দণ্ডায়মান ঐ মুসাফিরকে। আর আসবার সময়

বলে আসবি অন্তঃপুরে প্রবেশ করে ঘোঁরেদের পানে তাকিয়ে থাকটা অত্যন্ত গহিত কাজ, ভবিষ্যতে তিনি যেন একাজ আর না করেন।

কুটি ও মাংস নিয়ে চলে গেল ফিরোজা। মুসাফিরের হাতে সেগুলি দিয়ে ফিরে আসতে তার বিলম্ব হল কিছুক্ষণ। তার আসতে দেরি দেখে মুবারিকা বিবি বলেন—এতক্ষণ মুসাফিরের সাথে কি করছিলি ফিরোজা?

ফিরোজা বলে—তিনি কতকগুলো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছিলেন, তার উত্তর দিয়ে আসতে দেরি হয়ে গেল।

বিষ্মিত হয়ে মুবারিকা বিবি বলেন—প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছিলেন? কি প্রশ্ন?

—এই জিজ্ঞেস করছিলেন তোমার সখ্যকেই, মানে তোমার নাম কি, বয়স কত, তোমার মেজাজ কেমন, তুমি বিবাহিতা কি না, এই সব প্রশ্ন।

—ছি ছি ছি, যুগটা বিকৃত করে মুবারিকা বিবি বলেন—আমার সখ্যকে এই সব প্রশ্ন করছিলেন মুসাফির? তা তুই কি বললি?

ফিরোজা বলেন—যা সত্যি কথা তাই বললাম। বললাম তোমার নাম মুবারিকা, বয়স বোল বৎসর, তোমার মেজাজ এমন শান্ত ও ধীর বা খুব কম মেয়ের মধ্যেই দেখা যায়। আর তোমার এখনও বিবাহ হয়নি এবং উপস্থিত তুমি কারও বাগদত্তা নও, সে কথাও বললাম।

—ছি ছি ছি, এ সব কথা বলে তুই মোটেই ভাল করিসনি ফিরোজা। কোথাকার কে একজন মুসাফির, তার কাছে আমার পরিচয় দেওয়াটা অত্যন্ত অজ্ঞার হয়েছ। আচ্ছা এখন যা তুই।

চলে গেল ফিরোজা। বিবি মুবারিকা তখন একাকিনী বসে ভাবতে থাকেন ঐ মুসাফিরের কথা। উনি তার সখ্যকে এত প্রশ্ন কেন করলেন? তবে তাকে কি তাঁর মনে ধরেছে? ছি! ছি! ছি! ঐ আশুবুড়ো লোকটাকে স্বামিরূপে বজনা করতেও যেন গা শির-শির করে।

বাজোর দেশের অধিকর্তা মালিক আহমেদ, শাহ্, মনসুর প্রমুখ ব্যক্তিগণ অত্যন্ত বিবর বন্দনে বসে রয়েছেন একটি কক্ষে। বাবরের হাত থেকে ইউসুফজাইদের রক্ষা করা আর বোধ করি সম্ভব হবে না। তিনি যে মূর্তি নিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন, তাতে আর সাত দিনের মধ্যে এক মহাপ্রাণান ভূমিতে পরিণত হবে এই বাজোর।

—সালাম আলেকুম!

চিন্তার জাল ছিঁড়ে যায় মালিক আহমেদের। তিনি চেয়ে দেখলেন তাঁদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে বাবরের এক দূত। হঠাৎ তাকে দেখে অত্যন্ত বিস্মিত হলেন আহমেদ। তিনি প্রশ্ন করলেন—কি আছে?

বাবরের বার্তাবহ পুনরায় কুর্শি জানিয়ে বাদশাহের ফরমানটা এগিয়ে দিলেন মালিক আহমেদের দিকে। পত্রটি পড়ে চমকে উঠলেন বাজোর-অধিপতি। তিনি পত্রবাহককে বললেন—আচ্ছা তুমি আসতে পার, এর জবাব আমি এখুনি সম্রাটের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

পত্রবাহক চলে গেলে মালিক আহমেদ তাঁর সহকর্মী শাহ্, মনসুরকে বলেন—অত্যন্ত সাংঘাতিক এক প্রস্তাব পাঠিয়েছেন বাদশাহ্, বাবর।

—কি প্রস্তাব?

—সে প্রস্তাব হচ্ছে তোমার মেয়ে সুবারিকা বিবির পাণিগ্রহণ করতে চান সন্ধান। শাহ্, মনসুর গর্জে ওঠেন—অসম্ভব, এ হুত্বেই পায় না।

মালিক আহমেদ বলেন—অসম্ভব বলে গর্জন করে উঠলে কোন ফল হবে না। তাতে বাজীর অধিবাসীদের পক্ষে হবে আরও কঠিন। তার চেয়ে এই মর্মে বাদশাহ্‌কে পত্র লিখে দেওয়া যাক যে সন্ধানের সহমিণী হতে পারে এরূপ মেয়ে শাহ্, মনসুর বা অকান্ত অধিকারীদের নেই। এই কারণে সন্ধানের অভিপ্রায় পূরণ না করতে পারায় তাঁরা দুঃখিত।

মালিক আহমেদের যুক্তি সকলেই সমর্থন করলেন সর্বাঙ্গিকভাবে। কাজেই তখন পণ চলে গেল বাবরের নিকট। কিন্তু পরদিন আবার এস সন্ধানের ফরমান। তাতে তিনি লিখেছেন, শাহ্, মনসুরের সুবারিকা বিবি নামী এক ঘোড়নী কন্যা আছেন, এ খবর তিনি ভাল করেই জানেন। গত ঈদের দিন তিনি মুশাফিরের ছদ্মবেশে গিয়েছিলেন তাঁর গৃহে। সেখানে তিনি অন্তঃপুরের দ্বার পর্যন্ত গিয়ে স্বচক্ষে দেখে এসেছেন কুমারীকে এবং তাঁর দাসীর মুখে তিনি সব কিছুই অবগত হয়েছেন সুবারিকা বিবির সম্বন্ধে। পরে তাঁর পাঠানো ক্রটি ও মাংস নিয়ে তিনি চলে আসেন সেখান থেকে। সেই ক্রটি ও

মাংস মনসুরের গৃহের পশ্চাদ্দেশে ছুটি প্রস্তরখণ্ড পাড়ে আছে, তার মাঝে খোঁজ করলেই পাওয়া যাবে। সেখানে তিনি রেখে এসেছেন ওগুলি। কাজেই শাহ্ মনসুরের কন্যা নেই, এই বলে তাঁর চোখে মিথ্যা ধুলো দেবার চেষ্টা করে কোন লাভ নেই। এবং সুবারিকা বিবিকে যদি তিনি না পান তবে তিনি সমূল উৎপাটন করবেন ইউগ্ৰফজাইদের।

সন্ধানের পত্র পাঠ করে অবাক হয়ে গেলেন সকলে। তাঁর কথা প্রকৃত সত্য কি না, তা বাচাই করার জন্যে শাহ্, মনসুর লোক পাঠিয়ে দিলেন তাঁর গৃহের পশ্চাদ্দেশে নিক্ষেপিত প্রস্তরখণ্ডের মধ্যে কটা ও মাংসের সন্ধানে। খবর পাওয়া গেল এ কথা মিথ্যা নয়। এবং সুবারিকা বিবির কাছে লোক পাঠিয়েও যে সংবাদ পাওয়া গেল তাতে বোঝা গেল, বাদশাহ্, বাবর মুশাফিরের ছদ্মবেশে সত্যিই দেখে গেছেন তাকে। তবে এখন উপায়? যদি এ মেয়েকে তাঁর হাতে না দেওয়া যায় তবে বাজীর তথা ইউগ্ৰফজাইদের যে কি অবস্থা হবে তা সহজেই অল্পমেয়। এখন এই চরম বিপদ থেকে দেশকে রক্ষা করতে পারে একমাত্র শাহ্, মনসুরের কন্যা সুবারিকা। তখন তাঁকে ধরে বসলেন সকলে। বাড়ী গিয়ে তিনি যাতে মেয়েকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বাবরের সহমিণী হতে রাজী করান, তবে এ এক চরম উপকার করা হয় বাজীর-এর পক্ষে। আর তাঁর কন্যা যথাযথ

মনের কথা

"এখন শ্রমের গহনা কোথায় গাঢ়াও?"

"আনার সব গহনা মুখার্জী জুয়েলার্স বিক্রাছেন। প্রত্যেক জিনিষটিই, ভাই, মনের মত হয়েছে,—এসেও পৌছেছে ঠিক সময়। এঁদের রচিৎসান, সততা ও দামিহবোধে আমরা সবাই খুসী হয়েছি।"

মুখার্জী জুয়েলার্স

মুনি সানার গহনা নির্মাণ ও রত্ন-ভাস্করী
বকবাজার মার্কেট, কলিকাতা-১২

টেলিফোন : ৩৪-৪৮১০



বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন। কাজেই দেশের এই বিপদের কথা শ্রবণ ক'রে তিনি এতে নিশ্চয়ই অমত করবেন না।

শাহ, মনসুর গৃহে ফিরে সেই দিনই একবার প্রবেশ করলেন কত্থা সুবারিকার কাছে। মেয়েটি তখন একাকিনী বসেছিলেন জানালার পাশটিতে। হঠাৎ পিতাকে ঘরে আসতে দেখে ভাড়াভাড়ি উঠে এসে দাঁড়াল তাঁর সম্মুখে।

শাহ, মনসুর একবার ভাগ ক'রে চেয়ে দেখেন মেয়ের মুখের পানে। রূপে গুণে অতুলনীয়। এমন মেয়ে বোধ করি সারা আফগানিস্তানে আর দ্বিতীয় নেই। যেমন স্থির, তেমন বিচক্ষণ। কিন্তু এই মেয়েকেই আজ সঁপে দিতে হবে এক মোগলের হাতে। ইউরুফজাই হয়ে এ অপমান সে ভরত স্বীকার ক'রে নেবে নিজস্ব গণ কিন্তু তিনি পিতা হয়ে এক কথা মেয়েকে কেমন ক'রে জানাবেন?

—বাবা, আমাকে কিছু বলবেন?—খীর কণ্ঠে প্রশ্ন করেন সুবারিকা বিবি।

—হাঁ মা, একটা কথা বলতে এসাম তোমাকে। শুনেছো বোধ হয় কাবুল-অধিপতি বাবর ধ্বংস করে দিতে চান আমাদের এই বাজীর দেশ এবং নির্বংশ ক'রে দিতে চান এর ইউরুফজাই জাতিকে। তা' এই দেশ এবং জাতিকে রক্ষা করতে পার মা, একমাত্র তুমি।

—আমি? বিস্মিত হয়ে সুবারিকা পিতার মুখের পানে তাকিয়ে বলেন—পিতা, আমি অবলা নারী, আমার কি এমন শক্তি আছে যে বাদশাহ, বাবরকে পরাজিত করবো?

মনসুর বলেন—শক্তি দিয়ে নয় মা, তোমাকে সে কাজ করতে হবে হৃদয় দিয়ে। অবশ্য আজ তোমাকে যে কথা বলতে এসেছি তা তোমার পক্ষে কেন সমস্ত ইউরুফজাইদের পক্ষেই একটা অপমানসূচক কথা। তবু এই বাজীরের মুখের পানে চেয়ে তা তোমাকে মানতেই হবে মা!

সুবারিকা বলেন—আপনি ধিমা বোধ করছেন কেন পিতা! আমি তো আপনার কথার কখনও অব্যাহা হইনি? আমাকে বা বলবেন তা আমি হাসিমুখেই মেনে নেবো।

মুহূ হেসে মনসুর মেয়ের মাথায় হু'বার হস্ত সঞ্চালন ক'রে বলেন—আমার কথা তুমি যে হাসিমুখে মেনে নেবে তা আমি জানি। কিন্তু কথাটা বলতে যে আমার সঙ্কোচ হচ্ছে।

—তবু বলুন পিতা!

শাহ মনসুর আর একবার স্থির দৃষ্টিতে দেখলেন মেয়ের মুখের পানে। তারপর বলেন—সম্রাট বাবর তোমাকে সহধর্মিণীরূপে পেতে চান। যদিও এতে আমাদের কারও আন্তরিক মত নেই। তবু দেশের প্রতি চেয়ে তুমি এতে রাজী হও মা!

কথাটা শুনেই কেমন যেন শিউরে ওঠেন সুবারিকা বিবি। ইতিপূর্বেই তিনি কিরোজার মুখে শুনেছেন সেরিনের সেই যুগ্মকীর্তি সম্রাট বাবর। তাঁর সেদিনের বৈয়াকপি তিনি মোটেই ক্ষমা করতে পারেন নি। তা ছাড়া তাঁর যৌবনকাল গেছে উত্তীর্ণ হ'য়ে, আর স্ত্রীও আছে গুটি পাঁচেক। এ অবস্থায় তাঁকে স্বামিরূপে বরণ করতে অন্তর ছেপে ওঠে কান্নায়। তবু নিজেকে সংবৃত করে নিয়ে সুবারিকা বলেন, তাই হবে পিতা!

ব্যথিত কণ্ঠে শাহ, মনসুর বলেন—বেশ, তবে এর জন্তে প্রস্তুত হয়ে নাও মা।

পরদিন সকলের নিকট বিদায় নিয়ে শিবিকার গিয়ে উঠলেন সুবারিকা। আজ আর বাধা মানছে না অশ্রু। ওড়নাধুলে যন যন মুহূর্তে হয় চোখ। আজ তিনি রাজনীতির দাবাখেলায় একটি গুটি ছাড়া আর কিছুই নন। তাঁকে লোকে যে ভাবে চালিত করছে তিনিও সেই ভাবেই চালিত হচ্ছেন। তাঁর নিজস্ব সত্তা বলে আজ আর কিছু নেই। হায় বিধাতা! শেষ পর্যন্ত এই কি ছিল হোমার মনের বাসনা!

এগিয়ে চলল শিবিকা। সংগে চলল তাঁর তিন জন দাসী। পশ্চাতে চললেন মালিক আহমেদ শাহ মনসুর প্রমুখ অধিকর্তাগণ। এবং তাঁর পশ্চাতে চলল বাজীরের অধিবাসিবৃন্দ।

শিবিকা এগিয়ে চলল থানা গ্রাম থেকে চাকদারা গ্রামের পথে। সেখানে এক ক্ষুদ্র প্রোতস্বস্তী পার হ'য়ে তাঁরা গিয়ে পৌঁছালেন তাহাস গ্রামে। এখানে সাক্ষাৎ হ'ল সম্রাটের দলটির সাথে। তাঁরা এঁদের আন্তরিক স্বর্থীনা জানিয়ে এগিয়ে নিয়ে চললেন বাবরের শিবিরের দিকে। মালিক আহমেদ, শাহ মনসুর কুমারীকে বিদায় দিয়ে কিরে এলেন সেখানে থেকেই।

বাবরের শিবিরে একটি তাঁবুতে অভ্যস্ত আতিশয্যের মাঝখানে নিয়ে গিয়ে বসানো হল সুবারিকা বিবিকে। সেখানে এসে জড়ো হলেন দেশের প্রধান প্রধান অমাত্যগণের সহধর্মিণীগণ। তাঁরা প্রত্যেকেই মুগ্ধ হয়ে গেলেন নববধূর রূপ দেখে। কিন্তু তাঁদের সাথে আসাপ করার মত মনের অবস্থা তখন সুবারিকা বিবির ছিল না। তিনি নীরবে বসে থাকেন অবনত মস্তকে। তাই দেখে বিবি-বেগমরা মন্তব্য করেন রূপের সাথে এর অহঙ্কারও কিছু কম নেই। না হলে হু'একটি মুখের কথাও কি ধসতে নেই? এর কোন উত্তর দিতে পারেন না সুবারিকা। শুণু ফু'শিরে উঠতে থাকে তাঁর শব্দ। তাঁরা একে একে চলে গেলেন তাঁর থেকে। তখন একজন দাসী এসে জানালো—আপনি প্রস্তুত থাকুন বেগম সাহেবা, এখনি এখানে সম্রাট আসবেন।

দাসীর কথা শুনে চমকে ওঠেন সুবারিকা বিবি। বাদশাহ এখনি আসবেন এখানে? তাঁকে সে কেমন করে বরণ ক'রে নেবে স্বামিরূপে? কিন্তু না, না, না। এখন একথা তাঁর মনে আসছে কেন? আজ সারা বাজীর দেশ চেয়ে আছে তাঁর মুখের পানে। এ অবস্থায় তাঁর কাছে কামের বলি না হয়ে উপায়ই বা কোথা?

—আসতে পারি বেগম সাহেবা?

ধড়মড়িয়ে জাজিম ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে কুর্ণিশ জানাল সুবারিকা। বাদশাহ বাবর মুহূ হেসে প্রবেশ করেন তাঁবুর মধ্যে। সুবারিকা তাঁকে সম্মান জানিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন অবনত মস্তকে। বাবর জাজিমের ওপর বসে বলেন—আফগানিয়া, বোস আমার পাশে। সুবারিকা তবু দাঁড়িয়ে থাকেন অবনত মস্তকে। বাবর চেয়ে দেখেন তাঁর নেকাব-ঢাকা মুখের পানে। তারপর আবার বলেন—বোস আফগানিয়া!

এবারেও নিম্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন আফগান-রমণী। তখন বাবর উঠে তাঁর কাছে এসে মুখ থেকে সরিয়ে দেন নেকাবটি। সুবারিকা অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন সঙ্কটিত হয়ে। বাবর একদৃষ্টে চেয়ে থাকেন তাঁর গোলাপের মত আরক্ত কোমল

মুখের পানে। তারপর আবার বলেন—আমার পাশে বসবে না আফগানি।

এইবার কম্পিত অধরে মুবারিকা বলেন—আমার একটা নিবেদন আছে।

বাবর অত্যন্ত সহানুভূতির কণ্ঠে বলেন—কি নিবেদন আছে বল না প্রেয়সি, তুমি অত ভীত তচ্ছ কেন?

মুবারিকা এইবার একবার সম্রাটের মুখের পানে চেয়ে পুনরায় নত করে নিলেন মাথা। তারপর বীরে বীরে খুলে ফেললেন তাঁর পরিধানের বোঁধাটি। বহিরাবরণ হতে মুক্ত হয়ে তখন বেরিয়ে আসে স্বচ্ছ মসলিনে-ঢাকা তাঁর শুক্ল দেহটি। বাবর হতবাক হয়ে চেয়ে থাকেন তাঁর অর্ধনগ্ন দেহের পানে। নেশা লাগে তাঁর চোখে। মুবারিকা তখন তাঁর দেহ সম্রাটের সমুখে এগিয়ে ধরে বলেন—জাঁহাপনা, আপনার বাক্যের দেশের প্রতি যত ক্রোধ আজ তা আমার এই দেহের মধ্যে বিশর্জন দিয়ে ইউনুফজাইদের রক্ষা করুন।

বাবর সানন্দে তাঁকে বাহু আবেষ্টনে জড়িয়ে ধরে বলেন—তাই হবে আফগানি, ইউনুফজাইদের আর কোন অপকারই আমি করবো না।

তখন আনন্দের অশ্রু ঝরে পড়ে মুবারিকার চোখে থেকে। সত্যি তবে আজ বাক্যের রক্ষা পেল নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে। কাঁপতে থাকে তাঁর অধর। বাবর সেই কম্পিত গুঠে একে দেন তাঁর স্রীতির চুম্বন।

ক্রমশঃ নেমে আসে দ্বিপ্রহর। হয়ে আসে প্রার্থনা করার সময়। সম্রাট উঠে দাঁড়ান আজিম ছেড়ে। মুবারিকা তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে পাহুকা এনে পরিবে দেন তাঁর পায়ে। তাঁর ব্যবহারে অত্যন্ত তৃপ্ত হয়ে ওঠেন বাবরশাহ। তাঁর চিবুক ধরে মাথাটা ভ্রম একটু তুলিয়ে দিয়ে আদর করে তিনি বলেন—তোমার প্রতি আমি এত সম্ভ্রম হয়েছি যে তোমার দেশবাসীর অপকার তো ত্বের কথা, তাদের বাস্তব সকল বিষয়ে উন্নতি ঘটে সেই চেষ্টাই আমি করবো।

সেই কথা শুনে মুবারিকার চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ে সমবেদনার অশ্রু।

দিনে দিনে মুবারিকার প্রতি ভালবাসা গভীর হয়ে ওঠে সম্রাটের। ইতিপূর্বে অল্প কোন মহিষীই তাঁকে পরিতৃপ্ত করতে পারেন নি এর মত। আরেসা, মাহাম, মানুমা, গুলকুথ বা দিলদর এই পাঁচ বেগমের তুলনায় মুবারিকা যেন মূলে প্রভেদ। যেমন তাঁর স্বভাব তেমনি ব্যবহার। তাঁর চরিত্রের সাধে তুলনা করার মত কোন বর্মণীই তাঁর চোখে পড়ে না।

সেবার ভারতবর্ষ অভিযানে যাওয়া আর সম্ভব হইল না বাবরের পক্ষে। তিনি বাক্যের থেকেই ফিরে এলেন কাবুলে। কিন্তু কাবুলে এসে তাঁর অস্বাস্থ্য মহিষীদের রাগ গিয়ে পড়ল মুবারিকার প্রতি। কোথাকার একটি মেয়ে বুড়ো বয়সে সম্রাটের প্রিয়পাত্রী হয়ে উঠবে এ তাঁদের সঙ্কল্প নয় না। তাঁরা প্রত্যেকেই চেষ্টা করেন এই নববধূটির ক্ষতি করতে। কিন্তু মুবারিকা আপন চরিত্রগুণে ব্যস্ত পাবেন না তাঁদের শত্রুতা।

এদিকে আর একটা অসুবিধা বোধ করেন মুবারিকা বিবি।

সম্রাট তাঁকে বহু বেশী ভালবাসেন ততই তাঁর ছোট মনে হয় নিজেকে। সম্রাটের ভালবাসার প্রতিদান তিনি ঠিক মত দিতে পারেন না। কত বার তিনি তৈরী ক'রে রেখেছেন নিজের মন। কিন্তু সম্রাটের বিগত ধীরেনের পানে তাকতেই তা ধুলিসাৎ হয়ে গেছে তখন। তাই এক একবার তাঁর মনে হয় সম্রাটের একটি সম্ভান যদি তাঁর কোলে আসে, তবে তাকে শ্রাণ দিয়ে ভালবেসে তিনি পূরণ করে দেবেন এই অপবাধ। কিন্তু সত্যিই কি তিনি জননী হতে পারবেন কোন সম্ভানের?

সেদিন সম্রাটের পাঁচ মহিষী প্রবেশ করলেন মুবারিকার ঘরে। তাঁর চিন্তাচিহ্নিত মুখমণ্ডলের পানে তাকিয়ে মানুমা স্নলভানা বেগম বলেন—কি ভাবছিল রে ছুটি?

হজ্জায় ঘেমে ওঠেন মুবারিকা। দিলদর বেগম বলেন—কি ভাবছিলি বল না লো?

মুবারিকা বলেন—আজ দিদি, আমার একটি সম্ভান হবে কি না বলতে পারেন?

মাহাম বেগম বলেন—তা আবার হবে না? তোমার সম্ভানই যে হবে ভাবীকালের সম্রাট, কাজেই তা না হয়ে কি থাকতে পারে?

তাঁর কথা শুনে অস্বস্ত্য লজ্জিতা হয়ে মুবারিকা বলেন—হি! হি! হি! একি আপনি বলছেন দিদি, আপনাদের উপযুক্ত সম্ভান থাকতে আমার সম্ভান ভাবীকালের সম্রাট হবে কেন? আমি শুধু সম্রাটের প্রেমের প্রতিদান দেবার জন্তেই একটি শিশুর মা হতে চেয়েছি।

মানুমা স্নলভানা বেগম বলেন—তা সে বার জন্তেই চাও। তুমি শিশুর মা হতে চেয়েছো বলেই তো আমরা হাকিমকে বলে ওষুধ আনিয়েছি। তা নাও এটা খেয়ে নাও।

মুবারিকা হতবাক হয়ে চেয়ে থাকেন বেগমদের মুখের পানে। এঁরা এ খবর জানলেন কি করে। এর আগে তিনি এ কথা কাউকে তো বলেন নি? মানুমা বলেন—ভর নেই, এ বিব নয়, তোমাকে মাংসবার বড়বস্ত্র করে আমরা আসি নি।

—হি! হি! হি! এ কি কথা বলছেন। মুবারিকা তাড়াতাড়ি বাটিটা নিয়ে নিঃশেষে পান করে নেন ওষুধটুকু।

এবার হাসি ফুটে ওঠে বেগমদের মুখে। তাঁরা একবাক্যে বলেন—এবার তোমার কোলে নিশ্চয়ই সম্ভান আসবে আফগানি, এতে আর কোন ভুলই নেই। বলেই তাঁরা হাসতে হাসতে বিদায় হন একে একে।

তাঁরা চলে যাবার পর হঠাৎ এক সময়ে বড়ের বেগে ঘরে প্রবেশ করে ফিরোজা। বাপের বাড়ীর লোক বলতে এই একটি মাত্র দানীই আছে তাঁর সাথে। আশপে বিপদে অস্বাস্থ্য বেগমদের বড়বস্ত্র থেকে সে প্রতিনিরত রক্ষা করে চলে তাঁর মনিব ঠাকুরগকে। সে এসেই সামনের উজ্জিষ্ট বাটিটা দেখিয়ে বলে—এটা কি সাহজাদী?

মুবারিকা হেসে বলেন—জানিস ফিরোজা, আজকে সম্রাটের সব বেগমরাই এসেছিলেন আমার ঘরে। আমি সম্ভানের জননী হতে চেয়েছি জেনে তাঁরা হাকিমের কাছ থেকে ওষুধ এনে দিয়ে গেলেন আমাকে। আমি একটু আগেই তা পান করেছি।

—কি সর্বনাশ! চম্কে ওঠে ফিরোজা।

বিস্মিতা হয়ে সুবারিকা বলেন—কিসে সর্বনাশ হল কিরোজা ?

—উঃ শাহজাদী, তুমি আমাকে জিজ্ঞাস না করে কেন খেতে গেলে বেগমদের দেওয়া ওষুধ ?

—কেন ওষুধ কি ছিল কিরোজা ?

—আঃ শাহজাদী, তোমাকে ওরা আজ যে ওষুধ খাইয়ে গেল, তাতে আর কোন সম্ভাবনাই আসবে না তোমার গর্ভে। তোমাকে ওরা ওষুধ খাইয়ে করে দিয়ে গেল এক্সা।

—বন্ধা! শিউরে ওঠেন সুবারিকা বিবি। তিনি বিস্মিতা হয়ে বলেন—সত্যি না কি কিরোজা ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, সব সত্যি, তাদের বড়বন্ধের কথা শুনেই তো! আমি ছুটে এসাম তোমার কাছে। কিন্তু শয়তানীরা যে তার আগেই কাজ হাসিল করে চলে গেছে তা ভাবতেও পারি নি।

কিরোজার কথা শুনে নির্ধাক হয়ে বসে থাকেন সুবারিকা বিবি। আজ আর তিনি কিছুই ভাবতে পারছেন না। দেশের মঙ্গলের জন্য তিনি আপন ভাত-কুল-মান বিসর্জন দিয়ে বরণ করে নিলেন এক বিগতযোদন পুরুষকে। তাৎপর্য একটি সম্ভানের জননী হওয়ার আশাও তাঁর নিমূল হয়ে গেল চিরন্তরে! হায় এর পর নারী হয়ে বেঁচে থাকার আর সার্থকতা কোথায়? সুবারিকা বিবি কাদায় শক্তিহীন পর্ষন্ত যেন হাবিয়ে পেলেন। তাঁর অন্তরে তখন শূন্য প্রবাহিত হয়ে চলে দুঃখ-বেদনার তুফান ঝটিকা।*

মহিলা কবি চন্দ্রাবতী

জীবহি চক্রবর্তী

অনেক বাঙ্গালী মেয়েই কবি হিসাবে বেশ নাম করেছেন।

কিন্তু অনেক দিন আগে যখন বাঙ্গলা দেশে মেয়েদের মধ্যে লেখাপড়ার প্রচলন খুবই কম ছিল, তখন একটি বাঙ্গালী গ্রাম্যমেয়ে যে কবিশ্রুতিভার পরিচয় দিয়েছেন তা খুবই প্রশংসনীয়। অথচ এমনই দুঃখের বিষয় যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা এম, এ ক্লাসের কতকগুলি ছাত্র-ছাত্রী ও অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ছাড়া আর বিশেষ কেউই এই প্রতিভাশালিনী কবির নাম শোনেননি।

এই মহিলা কবির নাম চন্দ্রাবতী। সোড়শ শতাব্দীতে বাঙ্গলার এক গরীব ব্রাহ্মণের ঘরে চন্দ্রাবতীর জন্ম হয়। বাঙ্গলা দেশের পাড়া-গাঁয়ের সাধারণ একটি গৃহস্থঘরে জন্ম নিয়েও চন্দ্রাবতী যে কবিশ্রুতিভা ও চরিত্রবল দেখিয়ে গিয়েছেন তা' প্রত্যেক মেয়েই জানা উচিত। চন্দ্রাবতীর জীবনী থেকে প্রত্যেক মেয়েই অনেক কিছু জানবার ও শেখবার আছে।

যমুনসিংহ জেলার পাঁতুরারী গ্রাম নিবাসী এসিদ্ধ মনসামঙ্গল গায়ক ও বসিহতা বংশীদাস বন্দোপাধ্যায় (উপাধি চক্রবর্তী) চন্দ্রাবতীর পিতা। চন্দ্রাবতী ও তাঁর পিতা এক সঙ্গে ১৫৭৫ খ্রষ্টাব্দে মনসাদেবীর ভাগান-গান রচনা করেন। এ ছাড়া চন্দ্রাবতী মলুয়া ও

কেনারামের পালা নামে দুইটি গাথাকাব্য রচনা করেন। পিতার আদেশে চন্দ্রাবতী একটি রামায়ণ রচনা করেন। এ সমস্ত কাব্যই তিনি নিজের দেশের প্রচলিত ভাষায় রচনা করেছিলেন। সাধারণ প্রচলিত গ্রাম্য ভাষায় যে কত উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা করা যেতে পারে, চন্দ্রাবতীর কাব্যগুলি তাঁর নিদর্শন। চন্দ্রাবতীর রচিত পালাগীতি মলুয়া ও কেনারামের পালা বাঙ্গলার প্রত্যেক নারীরই পড়া উচিত। এত অল্প জায়গায় পালাগীতির সম্পূর্ণ বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। মলুয়া পালাতে চন্দ্রাবতী একটি আদর্শ পতিব্রতা রমণীর ছবি অতি সাধারণ বর্ণনা ও প্রীঞ্জল ভাষায় মধ্য দিয়ে কুটিয়ে তুলেছেন। মলুয়ার দুঃখে সবাইই চোখে জল আসবে আবার সঙ্গে সঙ্গে মলুয়াব কঠোর বর্ন্তবানীষ্ঠা ও পতিভক্তি প্রত্যেক বাঙ্গালী মেয়েই অমূল্যবর্ণী। কেনারামের পালায় বিখ্যাত দম্পত্য কেনারাম কি করে বংশীদাসের মনসাভাসান গান শুনে দম্পত্যভক্তি ছেড়ে দিয়ে বংশীদাসের শিষ্য গ্রহণ করেছিল, তারই বর্ণনা করেছেন চন্দ্রাবতী। এই গাথাটির ছত্রে ছত্রে পিতার প্রতি চন্দ্রাবতীর প্রীতি প্রকাশ্য পরিচয় পাওয়া যায়। চন্দ্রাবতী যে রামায়ণ রচনা করেন তাতে অনেক নতুনত্ব পাওয়া যায়। দেশপ্রচলিত অনেক কাহিনী তাঁর এই রামায়ণে স্থান পেয়েছে। রামায়ণ রচনায় প্রচলিত কুতিবাস ও বাস্তবিক রামায়ণকে সর্বাংশে অমূল্যবর্ণ না করে তিনি সে মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন তা' তাঁর নিঃস্ব প্রতিভার পরিচায়ক। চন্দ্রাবতীর এই রামায়ণটি পড়লে তাঁর গভীর সমবেদনামূলক মনের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রত্যেক বাঙ্গালী মেয়েই চন্দ্রাবতী রচিত এই কাব্য ক'টি পড়া উচিত। আমাদেরই মত একটি সাধারণ ঘরের মেয়ে কি গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে এই কাব্যগুলি স্মৃতি করে গিয়েছেন তা' প্রত্যেক মেয়েই জানা উচিত।

চন্দ্রাবতী নিজের জীবন বড়ই দুঃখময় ছিল। আর সেই দুঃখের ছায়া তাঁর কাব্যগুলির মধ্যেও পাওয়া যায়। মলুয়া, সীতা, এঁদের দুঃখ তিনি নিজের অন্তরের দুঃখ দিয়ে অমূল্যব করেছেন ও তাকে ভাষায় রূপ দিয়েছেন। জয়চন্দ্র নামে একটি ব্রাহ্মণপুত্র চন্দ্রাবতীর ছেলেবেলার খেলার সাথী ছিল। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উভয়ের মধ্যে গভীর ভালবাসা জন্মে। তখন বংশীদাস জয়চন্দ্র ও চন্দ্রাবতীর বিষের দিন ঠিক করে ফেললেন। কিন্তু হঠাৎ এই সময় জয়চন্দ্রের কি দুর্ঘটিত হোল, তিনি একটি মুসলমান যুবতীর প্রতি আসক্ত হয়ে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করলেন। এ খবরে চন্দ্রাবতী পাথরের মত স্তব্ধ হয়ে গেলেন। তিনি নাওয়া-খাওয়া সব ছেড়ে দিলেন। কিন্তু চন্দ্রাবতী বড় পিতৃভক্ত মেয়ে ছিলেন। তাই তিনি বংশীবন্দনের উপদেশ অনুসারে জগতের অস্ত সমস্ত চিন্তা ত্যাগ করে একান্ত মনে শিবপূজার রত হ'লেন ও রামায়ণ রচনা করতে শুরু করলেন। নিষ্ঠা ও চরিত্রবলে চন্দ্রাবতীকে রামায়ণ, মহাভারতের সীতা, সাবিত্রীর সঙ্গে এক আসনে বসান যায়। কিছুদিন পরে জয়চন্দ্র অমৃতপুত্র হ'য়ে ফিরে এলেন চন্দ্রাবতীর কাছে। কিন্তু দুঃখে চন্দ্রাবতীর বুক ভেঙ্গে গেলেও পিতার অসম্মতি জেনে তিনি জয়চন্দ্রকে ক্ষমা করতে পারলেন না। তিনি তাঁর পিতার সন্তুষ্টির জন্য অন্তানবদনে সবকম দুঃখ সহ্যই প্রস্তুত ছিলেন। এখনকার দিনে এরকম দৃষ্টান্ত একান্তই বিরল। চন্দ্রাবতীর কাছে প্রত্যাখ্যাত হ'য়ে অমৃতপুত্র জয়চন্দ্র এলে

* (1) Asiatic Quarterly Review, April 1901, An Afghan Legend.—Mr. Beveridge. (2) The Humayun-Nama of Gulbadan Begam—Mrs. Beveridge. (3) History of India (Vol. 1) —Erskine.

দূরে আত্মহত্যা করলেন। এ আঘাত চন্দ্রাবতী সহিতে পারলেন না। নীরবে চোখের জল ফেসতে ফেসতে একদিন তিনিও অকালেই পৃথিবীর মায়া কাটালেন।

এত অল্প বয়সে এ ভাবে চন্দ্রাবতীর মৃত্যু না হ'লে তিনি আরও অনেক প্রতিভার পরিচয় দিতে পারতেন। জয়চন্দ্রের কণিক আত্মবিশৃঙ্খতির ফলে এত বড় একজন প্রতিভাশালিনী বাঙ্গালী মেয়ের প্রতিভা প্রায় অন্ধবেই বিনষ্ট হোল।

চন্দ্রাবতীর রামায়ণ এখনও মৈমনসিংহের গ্রামাঞ্চলের মেয়েরা অনেকেই মুখস্থ বলতে পারেন। আমরা আজ স্কুল-কলেজের শিক্ষা ও ডিগ্রী নিয়ে গর্বী অহুভব করি। কিন্তু স্কুল-কলেজে শিক্ষা না পেয়েও সাধারণ গ্রাম্য আবেগপ্রাপ্তিতে সেকালের মেয়েরা কত জ্ঞানী, গুণী ও আদর্শপরায়ণা হ'তেন, কবি চন্দ্রাবতীর জীবনী তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

পথে পথে

শ্রীমুনীতা দত্ত

শীতের বেলা হ'য়ে এস শেষ, সন্ধ্যাংশে অন্তর্যমান সূর্যের শেষ আলোকছটা—বাতাসে শিরশিরে ঠাণ্ডা। আকাশ ভরা মেঘ-স্ববকের দিকে তাকিয়ে খুশীর আনন্দ উছলে উঠল। বিকেল তখন পাঁচটা—আমাদের যাত্রা হ'ল শুক। উদ্দেশ্য পথে পথে ঘুরে বেড়ান—দৈনন্দিন জীবনের মাঝে বৈচিত্র্য আনা।

২২শে জাহ্নবীরীর আসন্ন সন্ধ্যা আমাদের চোখে রঙিন হয়ে উঠল। আমরা দেখলাম মেঘের বৈকালের রক্তিম আভা—হু-হু হাওয়ায় নতুন খুশীর ইঙ্গিত, পথের বাঁকে বাঁকে জীবনের সাড়া। ছুটে চলেছে গাড়ী বর্ধমানের দিকে। যেটা রাস্তায় ধুলো উড়িয়ে, আশে-পাশের স্তব্ধতাকে স্রবণ ক'রে আমরা এলেম বর্ধমানে। এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলেম। ডাল, গোটা আর গোস্ত খেয়ে আবার গাড়ীতে। রাস্তা তখন ঘন হয়ে এসেছে, বড় বড় গাছের ঝাঁকড়া পাতার কঁকে কঁকে চাঁদের আলোর আল্পনা। কলকাতার আকাশে চাঁদ দেখি কিন্তু এমন ভাল লাগার মোহ কই খুঁজে পাটিনে—এ যেন নতুন আবিষ্কার। ভাবে ভরা কবিতায় নতুন ছন্দে যোগ। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখে ঢুল এল—ক্লান্ত অবসন্ন হ'য়ে এল ছুটে চোখ। আমি স্পষ্ট অহুভব করলেম, মনোবীণার ছুটি তারে ছুটি স্বকার। একটির সুরে ক্লান্তির আমেজ, অহুভব নতুন মোহের লহরী। তাই সেই আধো-ঘুম আধো-জাগরণে অনেকখানি পথ পার হতে হতে দেখলেম, মিটমিটে আলো-খসল কুঁড়ের, কেটে-নেওয়া ধানের স্তূপ, হু-একটা প্রায় ভেঙে পড়া পাকা বাঁড়ী, জাম্যমান মেঘস্ববকের খেলা—আরও কত কি। রাস্তা তখন সাড়ে দশটা—অজয় নদীর ওপরে অসমাপ্ত বাঁশের সঁকো পেরুলো আমাদের গাড়ী। আর তারপরেই একটু একটু ক'রে স্পষ্ট হ'ল ইলমবাজারের ছোট ডাকবাংলো। সবুজ বাসে-ঢাকা লনের মাঝে চারটি ঘরের বাংলো। চেয়ে চেয়ে দেখলেম নতুন আন্তরিকতায়। বাইরে তখন চাঁদের আলোয় স্বকরক করছে নীল আকাশ। গাছে গাছে অর্ধ-সুঁট কলি—গোলাপের হালকা মদির গন্ধ। অনেক রাত অবধি শুনেলেম ত্রিবিপোকায় অবিশ্রান্ত একাতন—দূরে কোথাও শেরাল ডেকে গেল—গাছে হঠাৎ ডানা

ঝাপটে উঠল কোনো পাখী—তারপর আর মনে নেই—আমি ঘুমিয়ে পড়লেম।

২৩শে জাহ্নবীরীর সকাল এল ছুটির সাড়া নিয়ে। সোনালী আলো কুয়াশা ভেদ করে এসে আমাদের স্বাগত জানলে। শিশির-ভেজা সবুজ বাসে আর রাস্তার শেষ আঁধারে জাত কুহুমকলি চোখে নেশা ধরাল। শীতের হাওয়া এসে ঝড়িয়ে দিয়ে গেল শুকনো মরাফুলের পাপড়ি। হালকা রোদের ফিকে গরমে আর ছুটির আগসে আমেজে মন বুঝি আবার নতুন করে মুগ্ধ হল—হয়তো সেই অজ্ঞেই ডাকবাংলোর সম্মুখী মোটা কাচের শ্রীহীন কাপের গঙ্গাঙ্গলের মত পাতলা চা-ও মন্দ লাগল না।

বেলা হ'ল—রোদও গরম হ'ল। সেই গরম রোদে আমাদের আলসেমি কেটে গেল—প্রসাধন সেরে আমরা সঙ্গে জানা কেক প্যাটিস খেয়ে বোলপুরের পথে পাড়ি দিলেম।

অনেক দূরে পড়ে রইল ইলমবাজার, আমরা দেখলেম ঘন শাল গাছের মাঝে পড়ে থাকা রাস্তা। আরও দেখলেম, গাছের ঝাঁকড়া মাথা ভরা স্তব্ধ, সতেজ, নবীন পত্র স্নায়ু তারই তলে শুকনো ঝরা পাতার স্তূপ। ভাবলেম, এমন কেন হয়? শুকনো পাতার স্তূপে হাওয়া বইছে, কেমন যেন এক বিচিত্র দুঃখ-হুত্বতিতে স্রবণ করলেম:

কার যেন এই মনের বেদন চৈত্রমাসের উত্তল হাওয়ার
ঝুমকো লতার চিকণ পাতা কাঁপে রে কার চমকে চাওয়ার।
হারিয়ে বাওয়া কার সে বাণী কার সোহাগের স্রবণখানি,
আমের বোলের গন্ধ মিশে বাননকে আজ কারা পাওয়ার?

ভাবছিলেম, পথচলার এই স্মৃতিস্মৃতি থাকলে অনন্তকাল পথ চলতে পারি আর বাধাবর জীবন যদি এমনি মধুর হয়, আমি ছাড়তে পারি স্থায়ী নাগরিক জীবন। দূরে যখন নীল দিগন্তের শেষ প্রান্তে ভেসে উঠল বোলপুরের ঘোঁরাঠোঁ চিমনি, ঠিক সেই সময়ে গাড়ী খেয়ে গেল। দেখা গেল পেট্রলের ট্যাঙ্ক শূন্য। হঠাৎ যেন আমাদের মনটাও শূন্য হয়ে গেল। সমস্ত সৌন্দর্যবোধ স্তিমিত হ'য়ে এল, খবর এল তিন মাইলের মধ্যে নেই পেট্রলের দোকান। ছুটি ছেলে বাচ্ছিল রায়পুরের দিকে সাইকেলে, তাদেরই একজন রাজি হ'ল সাইকেল দিতে। সেই সাইকেলে পেট্রল যখন এল, তখন বেলা প্রায় ১১টা।

মাঝের সূর্য ঠিক মাথার ওপরে, আমরা দুখ শুকিয়ে ফিরে এলেম বিশ্বভারতীর অতিথি-ভবন থেকে। জায়গা নেই। কিন্তু কপাল ভাল বলতে হবে, প্রায় শান্তিনিকেতনের পাশেই একটি আধপুখোন বাংলোয় আমরা জায়গা পেলেম। বাংলোর চারপাশে ধূম্র মাঠ, নিশ্চিন্ত আন্তর্যায় পেয়ে বীরভূমের রাজা মাটিতে আবার নতুনঘের সাড়া পেলেম।

বিকেল চারটে। ঠোঙে চারের গরম জল চেপেছে। পড়ন্ত বোদে অল্প ঠাণ্ডা—অনেক দূরে সূর্য প্রায় নেমে এসেছে দিগন্তে। তাস খেলতে খেলতে ভাবছিলেম, কি করি সাগা সন্ধ্যা।

খুব ছোট জায়গা বোলপুর, দেখবার মধ্যে শান্তিনিকেতন, কিন্তু সে-ও তো কাল সকালের আগে হবে না। এমন সময়ে মাইকে গানের সুর ভেসে এল—আমরা মন স্থির করে ফেলেলেম। বোলপুরের

একমাত্র চিত্রগৃহ “বিচিত্রা”র সন্ধ্যাটা কাটালেম। কখন রাত এল জানতে পারলেম না। সাড়ে আটটার ছবি শেষ হ’লে বেরিয়ে দেখি ফুটফুটে চাঁদের আলো। সেই স্বচ্ছ আলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হ’ল, বড় রাস্তা—বিশ্রাম চাই।

নতুন জায়গায় নতুন মাধুর্য ব’য়ে আনল ২৪শে জানুয়ারী। আজ সরকারি ছুটির দিন নয় কিন্তু তবু ছুটি—বেআইনী ছুটি। এই অঐষ ছুটীটাকে পেয়ে আজ অনেকই দৈনন্দিন আটপৌরে জীবনের একঘেরেমি থেকে মুক্তি পেতে, সৌন্দর্য আর কল্পনাকে উপভোগ করতে এলে দাঁড়িয়েছে, মাথা নত করেছে কবিগুরু শান্তিনিকেতনে। শান্তিনিকেতনের লাল মাটিতে দাঁড়িয়ে মনে হ’ল কল্পনার এমন বাস্তব রূপ কখনও দেখিনি। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আর শিল্পমনের সৃষ্টি-সৌন্দর্যের কি অব্যবহা মেলামেশা! “উত্তরায়ণের” সিঁড়ির ধাপ অতিক্রম করতে করতে তাই বলেম—কবিগুরু—

“ভাল তুমি বেসেছিলে এই গ্রাম ধরা,
তোমার হাসিটি ছিল বড় সুখে ভরা।

মিলি নিখিলের স্রোতে জেনেছিলে খুসী হ’তে,
হৃদয়টি ছিল তাই হৃদি প্রাণহরা।

তোমার আপন ছিল এই গ্রাম ধরা।”

“উত্তরায়ণে” কবি থাকতেন। এখানে তাঁর সব ক’টি রচনা গ্রন্থাকাব্যে আছে, সেই সঙ্গে অনুবাদও। ঘুরে ঘুরে মুগ্ধ-বিস্ময়ে দেখলেম।

তারপর এলেম সুন্দর সাজান বাগানে একটি ছোট কৃত্রিম বিলে—তাতে ভাসমান দু’একটি পদ্মকলি। সেই বিলের ঠিক মাঝখানে ডাল পালা-ঘেরা ছোট দ্বীপ। এ পার থেকে তাকে আবার একটি সেতু আছে, তার অপরূপ গঠন দেখে মনে হয় এক-একটি নিটোল পদ্মপাতা বুঝি পড়ে আছে এ পারের ঘাত্তিকে ওপারে পৌঁছে দেবার জন্তে। সেই দ্বীপে দাঁড়িয়ে কবির শান্তিনিকেতন দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল, মনে মনে বললেম—কবি! যে মন আর চোখ নিয়ে তুমি এই সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেছিলে, আমার দাঁও তোমার সেই মন, সেই চোখ! নাম-না-জানা বিচিত্র ফুলের মাঝে আমার চোখ গেল হারিয়ে; সমস্ত ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়ের ধনিত হ’ল আনন্দ, বিস্ময়, তৃপ্তি, শান্তি। আবৃত্তি করলেম—কবি।

“তোমার সে ভাস লাগা মোর চোখে আঁকি

আমার নরনে তব দৃষ্টি গেছ রাখি।

আজি আমি একা একা দেখি হৃদয়ের দেখা,

তুমি করিতেছ ভোগ মোব মনে থাকি—

আমারে তাকায় তব মুগ্ধ দৃষ্টি আঁকি।

বড় বড় গাছের তলার শীতের রোদে পিঠ দিয়ে বসেছিল ছাত্র-ছাত্রীরা। মাঝে মাঝে আসছিল তাদের হাসির শব্দ, আনন্দ যেন উঠলে পড়ছে...। কি যে ভাল লাগল ওদের সহজ বেশভূষা—রূপের চটকে নয়, স্নিগ্ধ কল্যাণশ্রীতে মন যেন ভরিয়ে দেয়।

কলাভবনে ঢুকলেম গভীর শ্রদ্ধা নিয়ে। ভাবগভীর ভবনটি যেন শিল্পশ্রীতে ঝলমল করছে। নন্দলাল বসুর অঙ্কিত চিত্রই এখানে বেশী। তাঁর সার্বক শিল্পসৃষ্টি মনকে ভুলিয়ে দেয়,

চিত্রাচারিত বাস্তব পৃথিবী যেন স্বপ্ন হয়ে গিয়ে সত্য হয়ে ওঠে, কাল্পনিক জগত যাতে আছে রূপ রসের ইন্দ্রিয়—যা শুধু শান্তিতে ভরা।

তারপর ঘুরে ঘুরে ছাত্রাবাস দেখলেম; চীনাভবন, হিন্দীভবন কিছুই বাদ গেল না। আমার মনে হল প্রত্যেকটি ভবনের গঠনভঙ্গি যেমন আলাদা, তেমনি পৃথক তার ভাবগাভীর্য।

আন্তার্য ফিরলেম সকলে, সারলেম ছপুরের খাওয়া। পূর্ব পশ্চিমে যখন প্রায় বাব-বাব করছে আমরা এসে হাজির হলেম জীনিকেন্তনের দ্বারে। এখানে ছাত্রছাত্রীরা কারিগরি বিভাগ হাতে-কলমে শেখে। তাদের তৈরী নানান জিনিস সাজান দেখলেম। এখান থেকে বাড়ীর কাছ বরাবর এসে আমরা হাঁটতে বেরোলেম। যেঠো পথে চোরকাটা ডিঙিরে অনেকখানি হাঁটলেম—ঠাণ্ডা হাওয়ার সোঁদা মাটির গন্ধ ভাল লাগার বেশায় মন যেন মাতিয়ে দিলে। তারপর ধীরে ধীরে বিখ্যাতচর ঢেকে গেল পাতলা জাঁধারে, ঘরে ফেরার আগেই হালকা চাঁদের আলোর আকাশ ভরল।

দেড় দিন কাটালেম বোলপুরে। ২৫শে ছপুরে আবার পথকে আশ্রয় করে আমাদের গাড়ী ছুটলো। পথের পর পথ পেরিয়ে আমরা সিউড়ি এলেম যখন তখন ছপুর্ শেষ হ’য়ে বৈকালের আমেজ লেগেছে এই ছোট সতরটির পথে-ঘাটে। কিছু চেষ্টা করতে হ’ল ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের ডাকবাংলোটির জন্তে। চমৎকার সাজান ছোট বালো—সামনে একফালি ফুলের বাগান, ঘরগুলি আধুনিক আসবাবপত্রের মনোরম। শান্তিনিকেতন দেখে মন উচ্চতানে বাঁধা ছিল। মালীর ঘরে খড়ের চালার কবিত্বময় পরিবেশ থেকে এক মুহূর্তে আধুনিকতম পরিবেশ! এ পরিবেশে এসে যেন হঠাৎই মনে পড়ে গেল কলকাতাকে, যেখানে ঘরে ঘরে চকচকে পালিশকরা সোফা-কোচ, মোজেকের বববকে মেঝে, ক্যানের হাওয়া। তবু ‘আমরা এই রকম জীবনযাত্রায়ই অভ্যস্ত—কবিঠাকুরের মত আমরা কল্পনাকে বাস্তব রূপ দিতে পারি কই?

কিছু দূরেই কুলকুল করে বইছিল নাম-না-জানা নদীর ক্ষীণ স্রোত—তারই তীরে ঘুরলুম কিছুক্ষণ, তারপর কি যে খেয়াল হ’ল বীরভূম টকীজে গিয়ে টিকিট কিনলেম থিয়েটারের—সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। শুনেলেম ছ’টায় থিয়েটার শুরু, নাম—সরমা। পৌঁণে ছটায় হাজির হ’য়ে দেখি—হা ভগবান! সবে লাইট ফিট করা হচ্ছে। কেঠো চেয়ারে বসে আছি ক’জনে, মাঝে মাঝে মশা তাড়াচ্ছি, ছারপোকা মারছি, এমন সময়ে খোলা দরজা দিয়ে ঢুকলো একটা রাস্তার কুকুর, রোঁয়া-উঠা, বিজী। সবাই মিলে তাড়ালুম তাকে। ওদিকে বাড়ির কাঁটা ঘুরে ঘুরে গটার কাছাকাছি। আলো লাগান হ’ল, এবার পদা খাটাবার পালা। দেখতে দেখতে মেঘের আড়ালে চাঁদ উঠল, দিগন্ত পার হ’য়ে এল মাথার ওপর, চটা বাজল। এবার শুরু হ’ল রেকর্ডে গান। আমরা মনে মনে অধীর হয়ে উঠছি। সারা হলে জনা কুড়ি মাত্র লোক। সাড়ে চটায় থিয়েটার শুরু হ’ল অবশেষে। কেমন লাগল ব’লতে চাই না, শুধু বলি রাত সাড়ে দশটার অসমাপ্ত নাটকের রসভঙ্গ ক’রে আমরা বাড়ী ফিরলেম।

২৬শের সকাল এল সমস্ত মাধুর্যটুকু হুছে নিয়ে। আজই কলকাতা ফেরার কথা—কাল থেকে আবার সেই পুরোন জীবন। কিন্তু আলস্য কাটিয়ে পথে বেরিয়ে খুব ভাল লাগল। শীতের সকালকে উপেক্ষা করে ছোট ছোট ছেলেরা মিছিল করে চলেছে তেরঙা পতাকা হাতে জাতীয়তা দিবস পালন করতে। সিউড়ি থেকে মেসেঞ্জার বাঁধ অবধি একাধিক মিছিল চোখে পড়ল। অনেক ঘরেই দেখলেম পতাকা উড়ছে। মন থেকে হৃৎকের সুরটা কেটে গেল।

চোখ-মন জুড়িয়ে গেল ময়ূরাকীকে দেখে। সুন্দর-বিস্তৃত লাল জল—শান্ত নিরীহ ডেউ-এ ভরা। ঈষৎ কুঞ্জন লাগিয়ে বাতাস বইছে। তারই ওপর বাঁধ—বিজ্ঞানের জয়যাত্রা। এখানে দু'টি বাংলা আছে (বাংলা ও বিহার)। সে দু'টির অবস্থান যেমন সুন্দর, তেমনই মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক পরিবেশ। আমরা এখানে বেশীক্ষণ থাকিনি, একটু ঘুরে পথে বেরিয়েছি।

এ পর তাড়াহুড়ো করে ছুটেছি। অনেক জনপদ, ছোট-খাট শহর পেরিয়ে তিনটে নাগাদ এসেছি আসানসোল।

যাত্রা শেষ হ'ল রাত সাড়ে আটটার কলকাতা পৌঁছে। ক্লাস্ত দেহে বিগত তিনটি দিনের স্মৃতি যোমস্থান করতে করতে ভাবলেম—বর্ষাধর দিনের একঘেষেই থেকে মুক্তি পেতে তিনটি দিনের চিন্তা আবার চিরদিনই আনন্দ আর বৈচিত্র্যের স্বাদ দেবেই—এ পাথের তো হারিয়ে যাবার নয়।

ভক্তকবি জয়দেব ও ভাগ্যবতী পদ্মাবতী

শ্রীপুরবী পাঁজা

এপারের কেন্দুবিল, ওপারের শিবপুর। মাঝে অজয় নদ। যেন গোঁড়ল আর মথুরা। মাঝে যমুনা। এপার হতে ওপার দেখায় যেন মথুরা। ওখানে যেন সেই কুঞ্জবন, সেই শুক-সারী পাখী, 'সেই বাঁকা গ্রাম বিরাজমান। বর্ষাদিনে জল পড়ে, বিহ্বল দেয়, অজয়ের বান শন-শন করে ডেকে উঠে। ওপারের গ্রামল গাছপালার দিকে চেয়ে কবি দেখতে পান তমাল বিপিনে গ্রামছায়া, পূর্ণমুখে মেঘের অম্বর।

ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান কেন্দুবিল। এরই আশপাশকে নিয়ে একদিন গড়ে উঠেছিল ধর্মদঙ্গল কাব্যের কাহিনী। মধ্যযুগীর বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ উপাদান। প্রাচীন স্বর্গসারশেষ আজও বিক্ষিপ্তভাবে ঘিরে আছে কেন্দুবিলকে। ধর্মদঙ্গলের কথা বাদ দিলেও কেন্দুবিল আপনাতে আপনি বিকাশ।

মধ্যযুগের বাংলা, সুরমা সুকলা শতগ্রামলা বাংলা। নাই অশন বসনের ঘনঘটা, ছিল না বর্তমান যুগের দৈগ্ধের নিদাক্ষণ নিশ্চেষণ। সাধারণ ভাত-কাপড়েই সম্বষ্ট সকলে। অ'রই সম্বষ্ট সব। এমন এক সাধারণ পরিবারে আবির্ভূত হন জয়দেব গোস্বামী। অ'রয়ের তাঁরে এক সাধারণ কুটারে তাঁর বাস। সাধারণ জীবন বাপন। বাড়িতে আছেন পদ্মাবতী আর আছেন আরাধ্য দেবতা বাগমাদব। কুটারের অনতিদূরে বাগমাংঘবের মন্দির। পদ্মাবতী পুষার যোগাড় করেন, নৈবেদ্য সাজান, জয়দেব ভোগ দেন। নিজ কুঠে পুষা না দিলে যেন জয়দেবের তৃপ্তি নাই, মনে শান্তি নাই, পুষার যোগাড় করতে না পেলে পদ্মাবতীও যেন মনে শান্তি পান না।

ত্রয়োদশ শতাব্দী। ধর্মদঙ্গলের সভাকবি জয়দেব। সরল অনাড়ম্বর জীবন বাপন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর একাগ্র নিষ্ঠা। প্রাণ মন তাঁর সব কিছু শ্রীকৃষ্ণের চরণে। তাঁর উপর ভরসা থাকলে আবার চাই কি? তিনি যে পতিতপাবন হৃৎধরন। তাঁর উপর ভক্তি থাকলে, তাঁকেই প্রাণ-মন সমর্পণ করলে তিনি যে নেমে আসেন ভক্তের বাড়ীতে।

শ্রী পদ্মাবতীও হিন্দুনারীর প্রতিমূর্তি! স্বামিসেবাই তাঁর পরম ধর্ম। পতিই পরম গুরু। নিজের হাতে স্বামিসেবা করতে তাঁর মত পূণ্যবতী আর কে আছে? তাই স্বামিসেবাত্তেই প্রাণ-মন সমর্পণ করেছিলেন তিনি। বাড়ীর প্রতিটি কাজ তিনি করতেন, আবার পূজা-অর্চনা, ব্রত-পার্বণ তাও তিনি বাদ দিতেন না।

স্বামী গিয়েছেন গঙ্গান্রানে। এইমাত্র তাঁকে পুঁথি হতে তোলা হল। স্নান সেরে আসবেন। পদ্মাবতী নিজ হাতে তাঁর সেবা করবেন। তারপর প্রসাদ নিয়ে নিজে খেতে বসবেন—'কিছ এ কি! আজ এত তাড়াতাড়ি ফিরলেন!' আশ্চর্য হয়ে ভিজ্ঞাসা করেন পদ্মাবতী। আজ আর স্নানে যাওয়া হয় নাই। পথে মনে পড়ল সেই শ্লোকটা। তাই তাড়াতাড়ি ফিরে এলাম। পদ্মাবতী সরলমতি। বুঝে না অতশত লীলা। তাই বুঝলেন তিনি। তাই হবে হয়ত। এতে আর আশ্চর্যের কী আছে? চলে গেলেন খাওয়ার বোগাড়ে। তারপর খাইয়ে বিশ্রামের ব্যবস্থা করলেন।

পদ্মাবতী সেবার মূর্তিমতী, কিছ এ কি! আশ্চর্য হয়ে গেলেন জয়দেব। 'একি! পদ্মাবতী! আজ আমার আগেই খেতে বসেছ?' হতভম্ব হন পদ্মাবতী। 'এ কি দেব! এ কি তোমার বাক্য? এই মাত্র সেবা সেরে বিশ্রাম করতে গেলে।' জয়দেব বিস্মিত, পদ্মাবতী নিস্তব্ধ। পুঁথি লিখে সেবা সেরে এই ত বিশ্রাম করতে গেলে!

অবাক হলেন জয়দেব। হৃহুর্ভে চৈতন্য ফিরে আসে তাঁর, জয়দেব পাগলের মত ছুটে বান বেখানে অসমাপ্ত পদ পড়েছিল। দেখেন, হাঁ সত্যিই, পুঁথি লেখা হয়েছে। তবে বুঝি তাঁর প্রাণের ঠাকুর এসেছিলেন তাঁরই বেশে? সেই অসমাপ্ত পদ পূরণ করতে, 'দেহি পদপল্লবমুদ্যাম'। ছুটে বান পদ্মাবতীর নিকট। বলেন, 'পদ্মাবতি! তুমিই ভাগ্যবতী, তুমিই শ্রীগোবিন্দের সাক্ষাৎ পেরেছ, তুমি সত্যিই তাঁর প্রেমান পাথার অধিকারী! আমি অবম, আমি পাণিষ্ঠ, দাও দাও আমাকে তাঁর প্রসাদ খেতে দাও।' বসে বান জয়দেব পদ্মাবতীর সাথে।

জয়দেবের এই গীতগোবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণের এই লীলা আর পদ্মাবতীর এই পতিপরায়ণতা যুগ যুগ ধরে মানুষকে মোহিত করে আসছে। পৌষের শেষ দিন কেন্দুবিলে লক্ষ লক্ষ পুণ্যাধার সমাগম হয়। অজয়ের তুহিন জলে স্নান করে জয়দেব-পদ্মাবতীর রূপ দর্শন করে। বাগমাংঘবের মন্দিরে গিয়ে সকলে দণ্ড হয়। আর সাথে সাথে মাথাটা আপনা আপনি হুয়ে পড়ে সেই পরম-পুরুষের দিকে।

জলযাত্রা

রুমা দেবী

নাটো শুনে আপনারা দিরাট একটা কিছু মনে করবেন না যেন। জলযাত্রা মানে বিদেশ যাত্রা, সাধারণত মানুষের মনে করে থাকে, আমি সিখছি সামান্য একটা যাত্রা। যাত্রার উদ্দেশ্য ভ্রমণ

এবং বনভোজন করে কিছুক্ষণের জন্য আনন্দ উপভোগ করা। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সুখ-দুঃখ আছে, তার মধ্যে আমরা আনন্দ পেতে চাই সব সময়। আমাদের গন্তব্যস্থান একটি বিশেষ স্থান নয়, খ্যাতিও তার বিশেষ নেই। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সৃষ্টিকর্তা সেখানে ঢেলে দিয়েছেন অকুণপ হস্তে।

কটক শহর থেকে আমরা বন্ধু-বান্ধব মিলে প্রায় ৩০ জন। একটি বড় লঞ্চ ঠিক করা হল। ভ্রমণ ও বনভোজন করতে যাওয়াতে অনেকে একসঙ্গে না গেলে আনন্দ পাওয়া যায় না। আমাদের মধ্যে সব রকম বয়সের ছিলাম। ছোট মেয়ে কয়েকটি ছিল, তাদের চেয়ে বড় ছেলে কয়েকটি ছিল, আমরা মেয়েরা ছিলাম, বয়স ভ্রমলোক কয়েকজন ছিলেন, সব রকমের সমাবেশ, কাকরই অসুবিধা নেই, সকলেই পেয়েছে তাদের বন্ধু।

যাত্রার আগেই এক বাবার সৃষ্টি হল, সেইটাই আগে বলি। খুব ভোরে উঠ রওনা হবার কথা, মাঝ রাত্রি থেকে আনন্দ হ'ল মুসলবারে বৃষ্টি। আমরা আশা করে রইলুম। সকালবেলায় নিশ্চয়ই বৃষ্টি থেমে যাবে, সকাল হ'ল, বৃষ্টি থামলো না, নিরাশ হয়ে বসে রইলাম, বৃষ্টি বোধ হয় আর থামবে না, যাওয়াও বোধ হয় আর হল না। দু'-তিন জন বন্ধু এসে বৃষ্টি দেখে কিয়ে গেলেন, শেষ পর্যায়ে তাদের আর যাওয়াই হ'ল না। কিছুক্ষণ পর বেলা প্রায় ৮টার সময় বৃষ্টি থানিকটা কমে এল, বর্ষণমুখর প্রভাতবেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে থানিকটা শান্ত হল। আমরা ষ্টিমারঘাটে বাবার জন্ত সাইকেল-রিক্সা ডাকতে পাঠালাম। রিক্সাওয়ালাও বেকে বসেছে, সাধারণতঃ ছয় আনাতে অতটা পথ যায়। সেদিন এক টাকার কমে যাবে না, আমরা তাতেই রাজি। ঘাটে এসে দেখি অল্প বন্ধুও এসে গিয়েছেন, সকলকে দেখে তখন মন বেশ আনন্দ হল। লঞ্চ প্রস্তুত, সকলে ওঠা হল। যাওয়ার জিনিষপত্র, ষ্টেভ, চাহের সরঞ্জাম, খিচুড়ির সরঞ্জাম সব ওঠান হল। গ্রামোফোন তাস ইত্যাদিও নেওয়া হয়েছিল। তার পর যাত্রা হল শুরু। আমরা বাচ্ছি নারাজ নামক একটি স্থানে। মহানদী ও কাটজুরি উড়িয়ার দু'টি বিখ্যাত নদীর সংযোগস্থল ওটি। মহানদীতে আমরা চলেছি বেয়ে, সামান্য বৃষ্টি তখনও পড়ছিল। নদীর এক পাঁরে সমতল ভূমি ও গাছ, অপর পাঁরে দূরে পাহাড়। পথে একটি শুদ্ধ শিবমন্দির পড়ে, নাম ধবলেশ্বর। ঐ অঞ্চলে খ্যাতি আছে, শিবরাত্রির সময় দলে দলে যাত্রী ওখানে যায় শিব দর্শন করার জন্য। নদীর ধার থেকে বেশ উঁচু জায়গাতে মন্দিরটি অবস্থিত।

আমরা যেতে আরম্ভ করলাম, তাস খেলা শুরু হয়ে গেল। তারপর রসগোল্লা, ডিম, ডালমুট সহযোগে চাহের পূর্ব আনন্দ হল। বাড়ীতে তো সর্বদাই মেয়েরাই চা খাবার রান্না-বারা করে, এখানে এই সব কাজ পুরুষরাই করতে আরম্ভ করলেন। এই সব ব্যাপারে এখানে আমাদের ছুটি।

বেলা প্রায় ১১টার সময় আমরা নারাজে এসে পৌঁছোলাম। নদীর ধার থেকে থানিকটা উঁচুতে ডাকবাংলোটি অবস্থিত। বাংলোটি খুব সুন্দর, টেবিল-চেয়ার বারনিশ করা, সামনে গোল বড় বারান্দা, বাথরুম তিন-চারখানা ঘর, সুব্যবস্থা। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য খুবই সুন্দর, পাহাড় নদী গাছপালা সবের সমাবেশ। দৃষ্টি প্রসারিত করলে দেখা যাবে দূরের পাহাড়, সবুজ আকাশ, ইটের খাঁচা এসে বাধা দেবে না। সেই দিনটি ছিল মেঘলা, স্নেহময় আরও সুন্দর লাগছিল।

রান্নার ভার দেওয়া হয়েছে ছেলেদের ওপর, সেজন্য আমরা বেড়িয়ে বেড়াতে লাগলাম। পাহাড়ের গা বেয়ে চলেছে আঁকা-বাকা পথ, সেই পথ বেয়ে আমরা গল্প করতে করতে চলতে লাগলাম। কিছুক্ষণ বেড়াবার পর আমরা ডাকবাংলোতে ফিরে এলাম। বেড়াবার পর নদীতে স্নান করা হল, খাওয়া স্নাত্তার আনন্দ, তার স্নাত্তার কাটলেন, খুব হৈ-চৈ করে স্নানের পূর্ব সমাধা হল। স্নানের পর এবার ভোজনের পালা, রান্না প্রস্তুত, মেঘলা দিন, খিচুড়ী পাঁপড় ভাজা, ডিমের তরকারি আলু-পেঁয়াজের চচ্চড়ি ও চাইনি, ছুরিভোজন আর কি। সবলে খেতে বসি হবে, এমন সময় দেখা গেল আমাদের স্বামীর দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। কিছুক্ষণ তার গুণ অপেক্ষা করা হল। এমন সময় তিনি এলেন, হাতে প্রায় পাঁচ সের বড় বড় চিংড়ি মাছ, ব্যাপার দেখে তো সকলের চক্ষু স্থির। সবাই কুণার্ভ—মাছের জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে।

উনি সোজা চলে গিয়েছিলেন প্রায় দুই মাইল দূর গ্রামে, সেখান থেকে মাছ জোগাড় করে এনেছেন। বেড়াতে যাওয়ার ব্যাপারে ঠর উৎসাহই সব চেয়ে বেশী। কাজেই সকলে হল ওর অতিথি, অতিথিদের মাছ খাওয়াতে না পারলে খাওয়ানোর অন্তহানি হবে যে। মাছ...লা বেসন দিয়ে ভেজে খাওয়া হল। রান্নার পক্ষে এটা সব চেয়ে শীঘ্র হয়ে গেল, খিচুড়ি দিয়ে টাটকা চিংড়ির মাছের পোলের ভাজা সুস্বাদু খুব।

খাওয়া দাওয়া পর তাস খেলা, গ্রামোফোন গান শোনা, গল্প চললো কিছুক্ষণ। আর একজনের কথা এতক্ষণ বলাই হয়নি, সে আমাদের 'পপি', সেও এসেছে আমাদের সঙ্গে, তার আনন্দ সবচেয়ে বেশী। স্নাত্তার, বেড়ান সবের মধ্যে যোগ দিচ্ছিল সেও। বেলা গড়িয়ে এল, এবার ফেরার পালা। আমরা সব লঞ্চে এসে বসলাম। এতক্ষণ আমাদের খেয়াল হল দুইটি ছোট মেয়ের দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। তাদের খোঁজ করার জন্য লঞ্চ থেকে নামা হবে, এমন সময় দেখা গেল, দু'ব পাহাড়ের ওপর তাদের ক্রকের লাল ও নীল রং। তারা বুঝতে পেরেছে, আমাদের যাত্রার আয়োজন, তারা তাড়াতাড়ি নেমে আসছে। সন্ধ্যা নেমে এসেছে, আকাশের তারা ঝলমল করছে নদীর বুকে। এবার আমাদের যাত্রা বাড়ীর পথে।

সমষ্টির জীবনে ব্যষ্টির জীবন। সমষ্টির সুখে ব্যষ্টির সুখ।

সমষ্টি ছাড়িয়া ব্যষ্টির অস্তিত্বই অসম্ভব। এই অনন্ত সত্য

জগতের মূল ভিত্তি।

—স্বামী বিবেকানন্দ।

দিনের পর দিন প্রতিদিন...



রেক্সোনা সাবান

আপনার ত্বকে
আরও সুন্দর করে

যতবারই আপনি রেক্সোনা সাবান দিয়ে মুখ
ধোবেন—আপনার ত্বক আরও মৃদু, আরও নোলায়েম
দেখাবে। তার কারণ, রেক্সোনায় থাকে ক্যাডিল—অর্থাৎ
কয়েকটি তেলের এক বিশেষ সংমিশ্রণ যা আপনার ত্বককে
হালকা করে এবং আপনার ত্বকে সুস্থ রাখে। রেক্সোনার
সবের মত ফেণা মাখুন দেখবেন আপনার ত্বক
প্রতিদিন আরও সুন্দর হয়ে উঠছে।

আপনার সৌন্দর্যের জন্তো... রেক্সোনা





বর্ষসিদ্ধ মাঠে এবারকার প্রথম ভিভিসন খেলাগুলি বেশ জমে উঠেছে বলা যেতে পারে। মধ্যে মধ্যে প্রবল বৃষ্টিপাতের জন্ত খেলা বন্ধ হয়ে বাচ্ছে বটে কিন্তু ছু'-একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়া এবারকার ফুটবল মরশুম এখনও বেশ শান্তিপূর্ণ বলা যেতে পারে।

মোহনবাগান দল এ পর্যন্ত অপরাধিত থেকে লীগ কোঠার শীর্ষে আছে। ইষ্টবেঙ্গল, মহামেডান স্পোর্টিং প্রত্যেকেই একটি করে খেলার পরাজয় বরণ করেছে। গতবারের লীগবিজয়ী রেল দল ইষ্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান দলের নিকট পরাজয় বরণ করেছে।

রাজহান দল এবারে মোটেই আশাশ্রিত খেলতে পারছে না—তবে বর্ষসিদ্ধ মাঠে ইষ্টবেঙ্গল দল ৩-১ গোলে পরাজিত করে এবারকার লীগ মরশুমে চমকের সৃষ্টি করেছে।

মরশুমের প্রথম দিকে খেলার মধ্যে যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা বাচ্ছে, তাতে আশা করা বাচ্ছে বিশেষ কোন অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটলে এবারকার ফুটবল মরশুম দীর্ঘদিন বাদে বেশ জমে উঠবে আশা করা চলতে পারে। কারণ বড় বড় দলগুলির সঙ্গে তরুণ খেলোয়াড়-পুঁজি দলগুলির প্রতিদ্বন্দ্বিতা সত্যিই প্রশংসনীয়।

তরুণ খেলোয়াড়পুঁজি বালী প্রতিভা ও ইন্টারজাশানাল দল হুটি লীগ কোঠার সর্বনিম্নে আছে। এই দলগুলির শক্তি কম হলেও বড় বড় দলগুলিকে এদের কাছ থেকে পরেট নিতে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে। এই ছুন পর্যন্ত কোন দলের স্থান লীগ কোঠার কোথায়, তা নিয়ে দেওয়া হইল।

	খে:	জ:	ড:	পর:	প:	বি:	পয়েন্ট
মোহনবাগান	১০	৮	২	০	১৩	১	১৮
ইষ্টবেঙ্গল	১০	৭	২	১	১৮	৭	১৬
ইষ্টার্ন রেলওয়ে	৮	৬	১	১	১৩	৪	১৩
মহা: স্পোর্টিং	৭	৬	০	১	১৬	২	১২
বি. এন. আর	৯	৫	১	৩	১৩	১৩	১১
হাওড়া ইউনিয়ন	৭	৩	২	২	৭	৫	৮
রাজহান	৯	৩	২	৭	১০	১৩	৮
গুয়াড়ী	৮	৩	১	৪	৭	৭	৭
খিদিরপুর	১০	২	৫	৫	৫	৮	৭
স্পোর্টিং ইউনিয়ন	৮	৩	১	৪	৬	১০	৭
এরিয়াল	৯	২	৩	৪	২	৭	৭
জঙ্গর টেলিগ্রাফ	৮	১	২	৫	৪	৮	৪
পুন্ডিশ	৬	০	১	৪	১	৯	২
বালী প্রতিভা	৭	০	২	৫	৩	১২	২
ইন্টারজাশানাল	৮	০	২	৬	১	১৩	২

নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশনের বার্ষিক সভা বসেছিল শিলং-এর শৈলাবাসে। দুদিনের অধিবেশনে বর্মকর্তা নির্বাচনের পর্বে ছাড়াও ১৯৬০ সাল থেকে ভারতীয় রেল দলকে সার্ভিসেস টিমের অন্তর্ভুক্তি মর্যাদা দান করেছেন আর 'কেরালা ট্রফি' ও 'নিজাম গোল্ড' কাপের খেলাকে প্রথম শ্রেণীর খেলা বলে মর্যাদা দান করেছেন। ডুবাণ্ড রোভার্স, আই, এফ, এ, স্ট্রীট প্রমুখ খেলাগুলির সময় নির্দেশ করে দিয়েছেন এ ছাড়াও জাতীয় প্রতিযোগিতার আঞ্চলিক বিভাগের পুনর্বিন্যাস ও নানা উপসমিতি গঠিত হয়েছে কিন্তু এবারকার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি বাদ গিয়েছে এ আলোচনার আসর থেকে। সেটা হল একই ব্যক্তি বিভিন্ন ক্রীড়াঙ্গণের সংগে যুক্ত থাকতে পারবেন কি না। আলোচনা না হওয়ার কারণ কিছু জানা যায়নি। শৈলাবাসে বোধ হয় খামাচাপা বা বরফ চাপা পড়েছে ব্যাপারটির উপরে।

বাইটন কাপ

এবারকার বাইটন কাপের ফাইনালে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর দু'টি দলকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দেখা গিয়েছে। বোম্বাইয়ের দল হিসেবে কিরকির কোর অফ ইঞ্জিনিয়ারিং দল ফাইনালে ইণ্ডিয়ান আর্মি টিমকে ৩-১ গোলে হারিয়ে এবারকার বাইটন কাপ লাভ করেছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, কোর অফ ইঞ্জিনিয়ারিং দল গতবারে বাইটন কাপের খেলায় রাণাস বাপ লাভ করেছিল।

এবারকার বাইটন কাপের খেলা ঠিক মত জমে উঠতে পারেনি। তার কারণ কয়েকটি শক্তিশালী দলের খেলায় আগ্রহ গ্রহণ না করা। বাই হোক, এবারকার খেলার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে ভারতের সফরকারী ক্রিকেট দলের প্রথম টেষ্টের আলোচনা করব।

কিরকির ইঞ্জিনিয়ারিং দলটি সামরিক বিভাগের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের খেলোয়াড়দের নিয়ে গঠিত। এবারেরা চতুর্থ রাউন্ড খেলার সুযোগ লাভ করে। চতুর্থ রাউন্ডে পাঞ্জাব পোটসকে ১-০ গোলে, কোয়াটার ফাইনালে গতবারের বাইটন কাপবিজয়ী মোহনবাগান দলকে ৩-০ গোলে এবং সেমিফাইনালে কান্টনমেন্ট দলকে ২-০ গোলে পরাজিত করে ফাইনাল খেলার যোগ্যতা অর্জন করে। গতবারের মাত্র ৬৪৩ নামকরা খেলোয়াড় ছাড়া তরুণ খেলোয়াড় নিয়ে গঠিত ইঞ্জিনিয়ারিং দলের এ জ্বলন্ত প্রশংসনীয়। অন্যর পাশে জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার রাণার শক্তিশালী আর্মি দল ফাইনালে মোটেই আশাশ্রিত খেলতে পারেনি। এবারকার তালিকায় মোট ৪১টি দলের নাম ছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত অনেক খাতনামা দল আগ্রহ গ্রহণ করেনি।

ক্রিকেট

ইংলণ্ডে সফরকারী ভারতের তরুণ খেলোয়াড়দের নিয়ে গঠিত দলটিকে নানান সমালোচনার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। ইংলণ্ডের যুবক ক্রিকেট সমালোচকেরা নানান মতামত প্রকাশ করছেন, তা দৈনিক সংবাদপত্র মারকং পাঠকমাত্রই সবিশেষ অবগত আছেন। এই দলটির বিদেশ সফরকালীন সময় ভারতের নানান পত্র-পত্রিকার সমালোচনা হয়েছিল।

কয়েকটি কাউন্টি খেলায় ভারতীয় দল বেশ কৃতিত্বের সঙ্গে খেলেছে। কাউন্টি খেলাগুলির বিশদ আলোচনা সম্ভব নয়, তাই এবার প্রথম টেস্টের আলোচনা করব।

প্রথম টেস্ট—নটিংহামের টেন্ট্রীজ মাঠে ৪ঠা জুন থেকে প্রথম টেস্ট মাঠের খেলা শুরু হয়। নির্ধারিত দিনের একদিন পূর্বেই এ খেলার সমাপ্তি ঘটে। এই খেলায় ভারতীয় দল এক ইনিংস ও ৫১ রাশে পরাজয় বরণ করে।

এবারকার টেস্টে ইংলণ্ড দলে প্রভূত খেলোয়াড়ের রদবদল হয়। তরুণ খেলোয়াড়দের ভারতীয় দলের বিরুদ্ধে খেলার সুযোগ দান করে ইংলণ্ড দল আশাভ্রমকর ফল লাভ করেছে। বেইলী, লেকার, গ্রেভনী, লক, টাইসন প্রভৃতি ইংলণ্ডের যুবক খেলোয়াড়রা এবারকার টেস্টে খেলায় নির্দোষিত হননি। এঁদের পরিবর্তে যে সমস্ত তরুণ খেলোয়াড় নেওয়া হয়েছে তার মধ্যে উষ্টারশায়ারের অফ ব্রেক বোলার মার্টিন হটন, ল্যাঙ্কাশায়ারের টমি ব্রীন হফ এবং ইয়র্কশায়ারের ওপেনিং ব্যাটসম্যান কেন টেলরের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ফাষ্ট বোলিং-এর বিরুদ্ধে ভারতীয় দলের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ইংলণ্ডের নির্দোষকমণ্ডলী মিডিল সেক্সের পেস বোলার এ্যালান মসকে দলভুক্ত করেছেন। ইংলণ্ড দলের এই রদবদল আগামী 'ওয়েস্ট ইন্ডিজ' দলের বিরুদ্ধে পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা বলে ধরা যেতে পারে। অপর পক্ষে ভারতীয় সকলেই তরুণ খেলোয়াড়।

ইংলণ্ডের অধিনায়ক পিটার মে 'টনে' জয়লাভ করে নিজ দলকে ব্যাট করতে পাঠান। কিন্তু শুরুতেই ইংলণ্ড দলের ব্যাটিং-বিপর্যয় ঘটে। মাত্র ৬০ রাশের মাধ্যমে ইংলণ্ড দলের টেলর, মির্টন ও কাউডে তিনটি মূল্যবান উইকেট হারায়। এর পর অধিনায়ক মে, ব্যারিটন ও হটন দলের পতন রোধ করেন। অধিনায়ক পিটার মে'র সেকুৱী প্রথম দিনের খেলায় সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। মিটার মে সেকুৱী করার কিছু পরেই আউট হয়ে গেলে গডফ্রে ইভাল্স যোগদান করেন। বেশরোয়ি ভাবে পিটিয়ে খেলে ৪২ মি: ৫০ রাশ তোলে। এর পর ৭৩ রাশের মাধ্যমে নাদকারি বলে উম্রিগড়ের হাতে ক্যাচ তুলে বিদায় গ্রহণ করেন। শেষ পর্যন্ত দিনের শেষে ইংলণ্ড দল ৬টি উইকেট হারিয়ে ৩৫৮ রাশ সংগ্রহ করেন।

দ্বিতীয় দিনে ইংলণ্ড দল ৪টি উইকেটের বিনিময়ে আরও ৬৪ রাশ সংগ্রহ করলে ৪২২ রাশে ইংলণ্ড দলের প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি হয়। এর পর ভারতীয় দল ব্যাট করতে নামে। কিন্তু ভারতীয় দলের নুচনা খুব আশাশ্রয় হয়নি। ভারতীয় প্রথম ছুটি রাশ ও কটাকটর উইকেটে ১০০ মিনিট টিকে খেলে মাত্র ৩৪ রাশ সংগ্রহ করেন। কটাকটরের ব্যক্তিগত ১৫ রাশের মাধ্যমে

আউট হয়ে যান। শেষ পর্যন্ত দিনের শেষে ভারতীয় দল তিন উইকেটের বিনিময়ে ১১৬ রাশ সংগ্রহ করে। এর মধ্যে পঙ্কজ রায়ে'র ৫৪ রাশ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। পঙ্কজ রা'র বার্থেট বৈধ্য সহকারে ও সতর্কতার সঙ্গে খেলে ৫৪ রাশ সংগ্রহ করেন। প্রথম টেস্টে পঙ্কজ রাই একমাত্র খেলোয়াড়, যিনি নিজের উপর বার্থেট আস্থা রেখে ভাল খেলেছেন।

তৃতীয় দিনে ট্রুমান, মস আর ষ্ট্যাথামের মারাত্মক বোলিং-এ ভারতীয় খেলোয়াড়রা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। ভারতীয় দলের অধিনায়ক গাইকোয়াড় এই বিপর্যয়ের মুখে বৈধ্য সহকারে উইকেটে টিকে থাকতে চেষ্টা করেন। তিনি ২ ঘ: ৩৩ মি: কাল উইকেটে টিকে থেকে ৩৩ রাশ সংগ্রহ করতে সমর্থ হন। ভারতীয় অগ্রতম নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান চাঁদ বোরদে ট্রুমানের চ্যাম্পায় বলে হক করতে গিয়ে হাতে আঘাত পাওয়ার অবসর গ্রহণ করেন। শেষ পর্যন্ত ভারতীয় দল ২১৬ রাশে পিছিয়ে থেকে 'ফলো অন' করতে বাধ্য হন। দিনের শেষে তিনটি মূল্যবান উইকেট হারিয়ে মাত্র ১৬ রাশ সংগ্রহ হয়। তৃত্যে রায়ে'র ৪১ রাশ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়, পঙ্কজ রাই টেস্ট ক্রিকেটে দু' হাজার রাশ করার গৌরব অর্জন করলো।

একদিন বিরতির পর ৪র্থ দিনের খেলা শুরু হোল। এই দিনে ষ্ট্যাথাম মারাত্মক মারমুর্তি ধারণ করলেন। মাত্র ৩১ রাশের বিনিময়ে ভারতীয় দলের ৫টি উইকেট লাভ করেন। শেষ পর্যন্ত ৬১ রাশ যোগ করে ভারতীয় দলের ইনিংস শেষ হয়। হাতে আঘাত পাওয়ার দরুন বোরদে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় অংশ গ্রহণ করেন নি। ১৫৭ রাশে ভারতীয় দলের দ্বিতীয় ইনিংসের সমাপ্তি হয়।

ইংলণ্ড ১ম ইনিংস—৪২২—(পিটার মে' ১০৬, ইভাল্স ৭০, হটন ৫৮ ব্যারিটন ৫৬, গুপ্তে ১০২ রাশে ৪ উইকেটে নাদকারি ৪৮ রাশে ২ উইকেটে)।

ভারত ১ম ইনিংস—২০৬, (পি. রাই ৫৪, গাইকোয়াড় ৩৩, উম্রিগড় ২১, বোশী ২১, ট্রুমান ৪৫ রাশে ৪ উইকেট, মস ৩০ রাশে ২ উইকেট)।

ভারত ২য় ইনিংস—১৫৭, (পি. রাই ৪১, মজেরকার ৪৪, গাইকোয়াড় ৩১, ষ্ট্যাথাম ৩১ রাশে ৫ উইকেট ট্রুমান ৪৪ রাশে ২ উইকেট)।

(এক ইনিংস ও ৫১ রাশে বিজয়ী)



ক্যালকাটা অর্পার্টিক্যাল কোং প্রাইভেট) লিঃ
ফোন-৬৫-১১১৭, প্রতাপস: ডা: কার্টিফিক্টে বঙ্গবন্ধু-বি.
প্রশ্ন-কল্যাণকালী ৪৫৫৭

বিশ্ববের সঙ্কটে

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

কোনো কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হলে দেহটার সঙ্গে মনের অবস্থাও এমন হয় যে, মনে হয় না দেহটা আবার সুস্থ-সবল হবে, যেন ভাবতেই পারা যায় না সুস্থদেহের আরামটা ঠিক কি রকম। কিন্তু ব্যাধি সারে, আবার সুস্থদেহের আরাম ফিরে আসে, —আর তখন আবার যেন ভাবতেই পারা যায় না ব্যাধিগ্রস্ত দেহের অবস্থাটা ঠিক কেমন লাগতো।

ঠিক তেমনি,—দেড় মাস বস্ত্রণা, অপমান, নির্জন কারাবাস ভোগের পর অন্তরীণের সীমাবদ্ধ স্বাধীনতার খোঁসা হওয়ার বেরিয়েই একথাটা ভুলতে বেশী দেয়ী হল না যে, ঐ দেড় মাস কী গভীর অন্ধকার আমার সমগ্র অন্তর বাহির জুড়ে অগঙ্গলের মতন চেপে ছিল,—ভবিষ্যতের আশা-আবক্ষণ-কল্পনা দূরে থাকে, চিন্তারও খেঁই খুঁজে পেছম না।

অন্তরীণে এসে অল্পদিনের মধ্যেই মনটা আবার চাঙ্গা হয়ে উঠলো —আগের ধারায় চিন্তা শুরু হল। মনে হল বিপ্লব প্রচেষ্টার এক অঙ্গ শেষ হয়েছে প্রথম ব্যর্থতায়,—এখনও যবনিকাপাতের অনেক দেয়ী,—নতুন অঙ্কে নতুন সাজে আবার বিপ্লবের শুভসূচনার উদ্বোধন হবে,—কবে, কেমন করে, জানি না—কিন্তু হবেই—তার জন্যে যেন প্রস্তুত থাকতে পারি।

অবস্থাটা ছিল অল্পকূল হৃদয়িক থেকে। দারোগা আনন্দমোহন মিত্রের স্ত্রীর অনন্ত বা ঐ রকম কি একটা ব্রত,—খানাটা শান্তিপুত্রের এক সীমানার ধারে,—হাতের কাছে ব্রাক্ষণ নেই, আমি রাজ সকাল ১টায়ে হাজিরা দিতে বাই—সুতরাং আমিই হলুম ব্রাক্ষণ,—সারা বৈশাখ মাস ডাব, সন্দেশ, পৈতে ও পুংসা প্রভৃতি পেলাম,—শেষ দিনে বোধ হয় একখানা কাপড়ও। অত্যন্ত নিরীহ ভ্রত এক ব্রাক্ষণ সম্ভানকে গোয়েন্দা বিভাগের শরতানন্দেরা যে মিছিমিছি কষ্ট দিচ্ছে,—ভ্রমমহিলার এ বিষয়ে বিশ্বাসও সন্দেহ ছিল না। মায়ের জাত তো।

বস্ত্র সাধারণ লোকের ধারণাও সাধারণত এই রকমই। কিন্তু বাবা কিছুটা ওয়াকিবহাল, তারা আমাদের ক্ষুদ্রায়—কানাইলালেরই সগোত্র মনে করে শ্রদ্ধা করতো, ভালবাসতো,—আমি সত্যি কতটুকু, সে খোঁজে তাদের কোন গরজ ছিল না। বিশেষত শান্তিপুত্র বিপ্লব আন্দোলনের ঐতিহ্যেও দরিজ ছিল না। “যুগান্তর” পত্রিকা এবং আলিপুর বোমার মামলা

সম্পর্কে যে কার্তিক দত্ত ছিলেন এক বিখ্যাত কর্মী, তিনি এই শান্তিপুত্রেরই ছেলে। ১৯০৭ সালে মুন্সিপুরে বোমার আড্ডা খুলে বধন বারীন ঘোষ, উপেন ব্যানার্জি প্রভৃতি যুগান্তর পত্রিকার কাজ ছাড়েন, তখন থেকে “যুগান্তর” পরিচালনের ভার পড়ে তারানাথ রায়চৌধুরী (সিনিয়র—বসুমতীর ভৃত্যপূর্ব ম্যানেজার জুনিয়র তারানাথ নয়), নিখিল রায় মৌলিক, কিরণ মুখার্জি এবং কার্তিক দত্তের উপর। আলিপুর বোমার অন্ততম আশামী ছিলেন এই শান্তিপুত্রের কার্তিক দত্ত। হুগলি জেলার বিঘাটি গ্রামে এক ডাকাতি হয় এবং সেই মামলার কার্তিক দত্ত সাজা পান। শান্তিপুত্রের পাশে বাঘ-আঁচড়া গ্রামের নিরাপদ রায়ের কথাতো আগেই বলেছি। তাঁর বোমার মামলার ১০ বছর বীপান্তর সাজা হয়েছিল।

সুতরাং যেমালুম আগের মতন ছেলে রিক্রুট করার ধাক্কা আবার দেখা দিয়েছিল। পাবতীকালে অন্তরীণে পাঠাবার সময় গোয়েন্দা অফিসাররা ঠাট্টা করত,—“বান,—সরকারী খরচে আবার হল গড়ুন গিয়ে।” আমরাও বলতুম, “আমরা ধর্মবট করলে তো ইলিশিরাম যো-তে ঘুচু চাবে।”

বাই হোক, আমাদের সবয়েই হোমরুল আন্দোলনের নেত্রী অ্যানি বেসান্টও ডিফেন্স অ্যাক্টে আটক হয়েছিলেন। ফলে কলকাতার কংগ্রেসের অধিবেশনে তাঁকে সভানেত্রী নির্বাচিত করা হয়, এবং তাঁর অবর্তমানে সরোজিনী নাইডু অধিবেশনে নেত্রীত্ব করেন।

মহাত্মা গান্ধীও ঐ সময়েই ভারতে আসেন এবং চম্পারপে নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কৃষকদের সত্যাগ্রহ সংগ্রাম সংগঠন করেন। ’২০ সালে কিছু শাসন সংস্কার দিয়ে ভারতবাসীকে একটু ঠাণ্ডা করার পরিকল্পনা নিয়ে ভারত সচিব মন্টেগু ভারত পরিদর্শনে আসেন, এবং কংগ্রেস ও মোসলেম লীগ তাঁর হাতে এক সম্মিলিত দাবী-পত্র পেশ করেন। আমাদের মনে পড়তো—“আবেদন আর নিবেদনের থালা বহে বহে নতশির।”

জেলে তখন রাজবন্দীর সহনাতীত অবস্থার মধ্যে সংগ্রাম করতেন। কারাবাসের অব্যবস্থা-কুব্যবস্থার সংশোধনের জন্তে, প্রধানত হাজার ষ্ট্রাইক করে। ভূপেন্দ্রকুমার দত্তের ৭৮ দিনব্যাপী হাজার ষ্ট্রাইক এবং জোর করে খাওয়ানোর বিরুদ্ধে ক্ষমতাস্বত্ব একটা ইতিহাস রচনা করেছে।

বাই হোক,—বছর তিনেক অন্তরীণ থেকে ১৯১১ সালের

মিষ্টি সুরের নাচের তালে মিষ্টি মুখের খেলা
আনন্দ-ছন্দে আজি, —হাসি খুসির মেলা



সুপ্রসিদ্ধ কোলে



বিস্কুটের

প্রস্তুতকারক কর্তৃক

আধুনিকতম যন্ত্রপাতির সাহায্যে প্রস্তুত

কোলে বিস্কুট কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১০

প্রথমে ফিরে এলুম। দেখলুম, পাড়ার সকলেই ফিরেছে। দিদি আগে থেকেই মনে মনে ভাঁজছেন এইবার একটা বিয়ে দিতে পারলেই এক রকম নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

একদিন সকালে হঠাৎ দিদি বলছেন, ভায়াটা গায়ে দিয়ে একবার গুণিয়ে বা। আমার সন্দেহ হয়েছিল, বললুম কেন?

দিদি বললেন, দেখতে এসেছে। আমি যাবো না বলাতে দিদি বিপদে পড়ে জোড়হাত করে বললেন, একবার দয়া করে মানটা বাঁচাও, আর এ গুণুরি করবো না। একটু ভেবে নিয়ে গেলুম।

দেখি দুজন তরলোক এসেছেন। নাম জিজ্ঞাসা করার পর বললেন, কাজকর্ম কিছু কর? আমি—না ঠিক করেছি, ব্যবসা করবো।

ব্যবসার কিছু জাম? আর মূলধন কত, কিসের ব্যবসা?

ব্যবসা, করতে করতেই শিখবো, কিসের ব্যবসা করবো, তা এখনো ঠিক করিনি। আর মূলধন সংগ্রহ করতে পারবো এই বাড়ী বেচে।

তরলোকদের চক্ষু চড়কগাছ! ছেলোট ভাল, আর কলকাতার বাড়ী—এটু ছুটি গুণুরি ওপর তাঁরা গুর করেছিলেন। এখন আমার কথা শুনে ভাবাচাফা খেয়ে দুজনে মুখ চাওরা-চাওরি করে আস্তে আস্তে সরে পড়লেন। আমিও বীরবর্ষে দ্বিদিনে শাসিয়ে নিলুম কের এমন কাজ করলে আমি বাড়ী ছেড়ে পালাবো। দিদি একা-একা আর ঘটী ধরে গজর গজর করে ঠাণ্ডা হলেন।

তখন সারা দেশে একটা ধর্মধর্মে ভাব—কোথাও কোনো আন্দোলন নেই। শুধু মৌলবী লিয়াকৎ হোসেন রোজ বিকেলে একদল ছুঁলের ছেলের প্রোসেশন নিয়ে রাস্তার রাস্তার ঘুরে poor students fund-এর টাঙ্গা তুলে বেড়ান। ছেলের দল স্বদেশী গান গেয়ে চলে, ২১৪ জন রাস্তার লোকও পেছন পেছন চলে। পথে কোন্‌খানামা পেলে প্রোসেশন? সেখানেও ঢোকে এবং বন্ধে মাতরম্ ধ্বনি দেয়। মৌলবী সাহেব খানার অফিসারদের কাছ থেকেও কিছু টাঙ্গা না নিয়ে হটেন না—বলেন, “ইস ফাওমে তুমলোক কেঁও নেহি টাঙ্গা দেগা? ইয়ে কুছ বোখওয়ারি ছায়?” পুলিশ অফিসার ভাড়াভাড়ি কিছু দিয়ে রেহাই পান। ভর্ক করলে, ছেলের দল বন্ধে মাতরম্ ধ্বনি দিয়ে হারিয়ে দেয়।

মেছুয়া বাজারের রাস্তার মার্কাস ষ্টোরের সামনে প্রকাণ্ড একটা দোতলা ব্যাণকবাড়ীর এক খুপরীতে ছিল তাঁর আস্তানা। বাড়ীটাতে ২৩ শো গরীব মুসলমানের বাস ছিল। নিঃস্বল গরীব ছাত্রেরা হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে তাঁর কাজ সাহায্য পেত। সত্যাকাল পর্যন্ত তিনি এই কাজ নিয়েই ছিলেন। এই একজন দরিদ্র একনিষ্ঠ স্বদেশী নেতা, সুয়েন বাঁড়ুয়ে—বিপিন পালের মতই বাক আপামর সাধারণ সকল শ্রেণীর মারব্বী আন্তরিক শ্রদ্ধা করতো। তিনি ছিলেন বেপরোয়া পাঠিক।

রাজস্রোতের বক্তৃতা দিয়ে তিনি অনেক বার জেল খেটেছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে যখন এখানে মডারেট নেতারা এবং আফ্রিকার গান্ধী সরকারকে রিকুটিংয়ে সাহায্য করছিলেন, তখন এক বিরোধী সভায় এক বক্তৃতায় মৌলবী সাহেব বলেছিলেন, যে ইংরেজের পক্ষে লড়াইয়ে যাবে, সে ‘বাপকা পুত নেহি’—মৃত কা

মৃত।” (অর্থাৎ ভারতীয় জাতির বাপের বীর্ষ থেকে নয়, প্রত্নাব থেকে) এই বক্তৃতার কলে তাঁর দু’ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। জেল থেকে বেরিয়ে তিনি ঐ “স্বদেশী” কাজে আত্মনিয়োগ করেন—ভিক্ষা করে টাঙ্গা তুলে দরিদ্র ছাত্রদের সাহায্য করা।

রোজ বিকেলে বেড়াতে বেরিয়ে আমি মৌলবী সাহেবের মিছিলের পিছনে চলতুম। মৌলবী সাহেব থাকতেন সামনে, কিন্তু তাঁর নজর থাকতো সব দিকে, এবং অনবরত প্রয়োজনমত নির্দেশ দিতেন। কয়েক দিন তিনি আমাকে লক্ষ্য করেছিলেন। একদিন হঠাৎ আমাকে ধরে বলেন,—“এই—তুমু সিআইডি ছায়? পিছে পিছে কেঁও চলতা?—বাও—সামনে বাও।” আমি অপ্রতিভ হয়ে সামনের সারিতে গেলুম, এবং ছেলের দলের সঙ্গে বন্ধে মাতরম্ ধ্বনি দিয়ে রেহাই পেলুম। এই ছিল তাঁর কাজের ধারা।

সকল বিষয় জানবার বোয়বার আগ্রহ তখন অনীম। রবিবারে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে যেতুম—প্রাথমিক বক্তৃতার ধর্ম ও সামাজিক সংক্রান্ত নানা বিষয়ের আলোচনা বড় ভাল লাগতো। বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলুম আচার্য ডাক্তার শ্রীধরকৃষ্ণ আচার্যের বক্তৃতায়। শেষ পর্যন্ত একদিন তাঁর হারিসন রোডের বাড়ীতে হানা দিয়ে আলাপ করলুম। তিনি “ধর্মজিজ্ঞাসা” পড়তে দিলেন। হিন্দু পৌত্তলিকতার আনুষ্ঠানিক ধর্মব্যবস্থার অজস্র অজুত তথ্য ও কলেক্টারিতে বইটা ঠাসা। ব্রাহ্ম সমাজের ধর্ম ও সামাজিক ব্যবস্থা সম্পর্কিত আরো কয়েকখানা বইও পড়লুম। শেষ পর্যন্ত আমাকে এক জুনিয়ার আচার্য দেবেন্দ্রনাথ মিত্রের হাতে ভিড়িয়ে দেওয়া হল। তিনি আমাকে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত করার চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিলেন। আমিও বাওয়া বন্ধ করলুম।

করালীর সঙ্গে আমার তখন ঘনিষ্ঠ মেলামেশা ছিল। তারা ছিল শাক্ত—এবং তার বাবা ছিলেন একজন তাত্ত্বিক পণ্ডিত ও সাধক। আমি করালীর কাছে ব্রাহ্মধর্মের পক্ষে ওকালতী করে হিন্দু, শাক্ত, তাত্ত্বিক-ধর্ম ব্যাখ্যাও শুনতুম এবং তাদের যুক্তিগুলো ব্রাহ্ম আচার্যের কাছেও হাজির করতুম। মজা হত এই যে, এই দুই পক্ষের সমস্ত যুক্তির মধ্যে নিজ নিজ স্বপক্ষীয় যুক্তির চেয়ে অপর পক্ষের বিরুদ্ধে যুক্তিগুলোই হ’ত জোহালা, —আর আমার মনে দুই পক্ষের বিরুদ্ধে যুক্তিগুলোই বীরে বীরে শেকড় গাড়াছিল।

সঙ্গে সঙ্গে একটা কথা মনকে অধিকার করছিল,—এই সব তথাকথিত আধ্যাত্মিক, পারিত্রিক, অবাস্তব ব্যাপারগুলো আমার জীবনাদর্শের বাস্তব ইহলৌকিক ধান্দা,—দেশের দুর্দশা, পরাবীনতার বিড়ম্বনা, স্বাধীনতার আদর্শ, বিপ্লব প্রেচেষ্টা, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জ্ঞান প্রভৃতির পক্ষে একেবারে অবাস্তব। ফলত, জুনিয়ার সর্বপ্রকার আনুষ্ঠানিক ধর্মের সবকিছু সর্বপ্রকার মোহ মন থেকে একেবারে মুছে গেল। মনটা বেন একটা ব্যাধিযুক্ত হয়ে পরম সত্যকে গেয়ে উঠলো,—“দেবী আমার, সাধনা আমার, স্বর্গ আমার, আমার দেশ।”

নিজেকে তৈরী হতে হবে—অজস্র ঘাটতি পূরণ করতে হবে। বর্তমানে সর্বপ্রধান কাজ লেখাপড়া। অবকাশস্বত্ব নীটক-নঙেল নয়,—“নীলস” প্রবন্ধ—বই এবং মাসিকপত্র। বস্তত, লোকে বাক

সাধারণত নীরস বলে, সে সব বিষয়ের মতোই আমি সবচেয়ে রস খুঁজে পেতুম। একটা নতুন কথা বুঝলে, নতুন কিছু লিখলে পড়া সার্থক মনে হত, আনন্দ পেতুম।

লেখাও অভ্যাস করা দরকার,—ভবিষ্যতে প্রয়োজন হবে। ১৯১৩-১৪ সালে লাইব্রেরীর সালিষ্ট ডিবেটিং ক্লাবে আমি হিলুয় জুনিয়ারদের মধ্যে একজন উৎসাহী সভ্য, বাংলা প্রবন্ধ লেখক বা সমালোচনা লেখক। তার পর “অঞ্জলি” নামে হাতে-লেখা মাসিক বেরুলো—তাতেও লিখতুম। সে কাগজ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

১৯ সালে আমার কাগজ বেরুলো—নাম “প্রাঞ্জলি”—এবং সম্পাদক করা হল আমাকে—দায়িত্ব চাপিয়ে দিলে বে ঠিক সময়মত কাগজ বেরোবেই,—এটা সকলেই বুঝতো। কিন্তু সময়মত লেখা আদায় করা শক্ত—কাজেই একটা প্রবন্ধ, একটা কবিতা,—কিছু ‘ধবর’ এবং কিছু ‘চাঁটনী’—আমাকেই লিখতে হত।

লাইব্রেরীর আনিভারসারী এল। অভিনয়ের জন্তে নবীন সেনের ‘যবতক’ এবং ‘প্রভাস’ থেকে কয়েকটা ‘সিন’ নিয়ে ‘অভিশাপ’ নামে এক নাটক খাড়া করে অভিনয় করলুম। মহাত্মার তেজ রান্নাভি—কজির রাজশক্তির বিকসে হুঁসীসা-বান্ধুরির বড়বস্ত্র। আমি হুঁসীসা, এবং বড়র দালা নন্দুদা বান্ধুরি। নর্থ সুবাবান হুনের চিরগভীর হেডমাষ্টার আমার সঙ্গে আলাপ ও অভিনয় করলেন। তিন হুঁদিন পরে এক I B officerও বই-এর সন্ধানে এলেন। রৈবতক-প্রভাসের নাম করে তাঁকে হাকিয়ে দিলুম।

ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কতকগুলো বিরাট বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেছে। রুশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লব সফল হয়েছে—নিরঙ্কুশ স্বৈরাচারতন্ত্রী জারের শাসনের উচ্ছেদ করে বিপ্লবী বলশেভিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

মহাত্মার অবসানের (নভেম্বর ১৯১৮) পর সেভার্স সন্ধিতে বিজয়ী ব্রুটেন-ফ্রান্স তুরস্কের রাজ্য ভাগাভাগি করে গ্রাস করে নিজে মুসলমানকে ক্ষুদ্র এশিয় অংশটুকুতে কোণঠাসা করেছে। কিন্তু নবীন তুর্কীলয়ের নেতা কামাল পাশা বিজ্রোহ করে সেভার্স চুক্তির বিকসে লড়াই শুরু করেছেন—রুশিয়ার বলশেভিকরা তাঁকে মদৎ দিচ্ছে।

যুদ্ধের আগে ভারতে লৈঙ্গ সংগ্রহের সময় ব্রিটিশ সরকার ভারতের মুসলমানদের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তুরস্কের মুসলমানের রাজ্যে হস্তক্ষেপ করা হবে না—কারণ মুসলমানরা তাদের ধর্মগুরু খলিফার বিকসে যুদ্ধে যেতে রাজী হচ্ছিল না। কিন্তু এখন সে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে খলিফার হাড়ির হাল করাতে ভারতীয় মুসলমানেরা ক্ষেপে গেল—মৌলানা মহম্মদ আলী, সৌকত আলী প্রভৃতির নেতৃত্বে তারা খিলাফৎ আন্দোলনে সংঘবদ্ধ হতে লাগলো—একটা বিজ্রোহের ঝড় আসার হয়ে উঠলো।

আর এক দিকে,—ভারতে বিপ্লব প্রচেষ্টার মূলোচ্ছেদের জন্তে সরকার এক বখেচ্ছাচারী বে-আইনী আইন—(রৌলট আইন) পাণ করে পুলিশের হাতে অবাধ ক্ষমতা দিয়ে সর্বসাধারণের অসন্তোষ আগিয়ে তুলল।

কলে একদিকে কলকাতার টাউন হলে ব্যোমকেশ চক্রবর্তী ও সি আর দাশের নেতৃত্বে এক বিরাট সভা করে প্রতিবাদ করা হল,—এবং অনেক দিন পরে যেন বাংলার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নব জীবনের সঞ্চার হল—তদুপরে গেল—উত্তেজনা বাড়তে লাগলো।

আর এক দিকে হল এক বিরাট ব্যাপার। মহাত্মা গান্ধী রৌলট আইনের বিকসে প্রতিবাদের জন্তে ‘১৯ সালের ৬ই এপ্রিল সারা ভারত জোড়া হরতাল সংগঠিত করলেন। এই উপলক্ষে বিপ্লবী পাঞ্জাবের বিপ্লবাকাজকা ফেটে পড়লো—অমৃতসরে—এবং দিল্লীতেও—জনগণ সরকারী ভবন, ব্যাংক, রেললাইন প্রভৃতি আক্রমণ করে ভেঙ্গে পুড়িয়ে একাকার করলো। সরকারও মার হুক করলো বেপরোয়া। অমৃতসরে এরোপ্লেন থেকে বোমা ফেলা পর্যন্ত হয়েছিল।

৬ই এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাগে সরকারের নির্বিকার অত্যাচারের প্রতিবাদে সভা হল, এবং জেনারেল ডারার সেখানে যেসিনগান চালিয়ে ১২০০ লোককে হত্যা করলে। তারপর চললো মার্শাল ল’র অত্যাচার। ফলত জনগণের অসন্তোষ হয়ে উঠলো প্রায় সার্বজনীন। উপায় কি?

মার্শাল ল’র আমলে এক এক গাঁ শুধু লোককে রাস্তায় বার করে পুকুরগুলোতে বুকে হাঁটানো হচ্ছিল। অসংখ্য লোককে প্রকান্ত স্থানে খোঁটার বেঁধে বেত মারা হচ্ছিল। নেতাদের সামরিক বিচারের প্রহসন করে নগ্ন দেওয়া হচ্ছিল বাবাজীবন বীপাভয়। তার মধ্যে সভাপাল কিচলুর সঙ্গে সরলা দেবীর স্বামী পণ্ডিত রামভূজ দত্ত-চৌধুরীও ছিলেন।

এই অত্যাচারের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ বড়লাটকে এক চিঠি লিখে সার উপাধি বর্জন করেন। তাতে তিনি লেখেন, ভারতজিনীর অসহায় অবস্থা পাঞ্জাবে বেরকম নগ্নভাবে ফুটে উঠেছে—তাতে সরকারী খেতাবে ভূষিত হয়ে চূপ করে বসে থাকার লজ্জা সহ্য করা আমার পক্ষে অসম্ভব—আমিও ঐ লাহিত অসহায় ভারতবাসীদেরই একজন,—এবং আমার স্থান তাদের পাশেই।

তার ভাষাটা ঠিক মনে নেই—কিন্তু তার মর্মকথা ওই। সারা ভারত ধস্তাধস্ত করে উঠলো। নতুন যুগে রবীন্দ্রনাথ নতুন করে জনগণের মধ্যে এসে ঝাঁড়ালেন। পরবর্তী কালে হিজলী বন্দ নিবাসে সরকারী গুলী চালাবার প্রতিবাদ সভায়ও রবীন্দ্রনাথ নেতৃত্ব করেছিলেন।

কিন্তু আমার কিছু একটা করতে হবে তো। বসে খেলে তো চলবে না, কিছু রোজগারের ব্যবস্থা দরকার। চাকরীর চেষ্টা বৃথা—কয়েকটা চাকার বিনিময়ে সমস্ত সময়, শক্তি, সম্মান খুঁিয়ে ‘যেমন তেমন চাকরী খি-ভাত’ বলে মাছুলী সংসার ধর্মের ধাতাকলে পিষ্ট হওয়া পোষাবে না। সুতরাং ব্যবসাই কিছু করতে হবে, এবং তার জন্তে বাড়ী বিক্রিও করতেই হবে।

মন স্থির করে বাড়ী বেচে ফেললুম,—এবং কোটের inside পকেটে নগদ ১৮৫০০ টাকা নিয়ে হেঁটে কাশীপুর সাবরেজিষ্ট্রী অফিস থেকে বাগবাজারে এসে ট্রামে ড্যালহাউসী কোয়ারে টাটা ব্যাংক পুলিশের কাছে এসে ব্যাংক টাকা জমা দিলুম। সে ১৯২০ সালের কথা,—তখন টাটা এবং কার্গিলী ব্যাংক নতুন হয়েছে, এবং পুলিশ এলাহাবাদ ব্যাংক থেকে টাটা ব্যাংক Passing officer হয়ে এসেছে।

পুলিন অফিসে বসে অতি সন্তর্পণে কিছু কিছু share কেনাবেচা করতো। সে পরামর্শ দিলে,—আমি যদি share marketএ বাতায়াক্ত করি এবং তাকে information এনে দিই,

ভাটসে দু'জনে মিলে কিছু ব্যবসা করা বেতে পারে। তখনকারে তার সঙ্গে কিছু দিন অল্পবয়স্ক আর ব্যবসা করলুম, এবং লাভ লোকসান হেরফের করে টায়ে টায়ে টাকা বজায় রেখে তাইই পরামর্শে কেটে পড়লুম।

লোকে বলে, বাড়ী গেলে আবার বাড়ী হওয়া শক্ত। মাথা পৌঁছাব ঠাই থাকা চাই। স্ততবাং বরাহনগর কুঠিঘাটার কাছে এক বাড়ী এবং সিঁথিতে সাতপুত্রের বাগানের পিছনে কিছু জমি কিনলুম। বাকী টাকার কিছু ছোট দোকানদারী ব্যবসা করাই ছির করলুম। পরসী নষ্ট করে ব্যবসা বিধতে হবে,—স্ততবাং ছিল-দরাকী চলবে না। ডেবে ডিঙে ভাসবাঁচাবে এমন মল্লিকের হকে বাস্তার ওপর একখানা ঘর খালি পেয়ে ভাড়া করে ফেললুম। স্তখনও টালার থাকি।

বরাহনগরের বাড়ী ঘেরাঘত করে মিলিয়ে কিছু কার্টিগার কিনে ঘর সাকিয়ে তুললুম। মিলায়ে বাওয়ার বেশা হয়েছিল,—কিন্তু ঘরের কিছু মাল না বেচে ফেসতে পারলে আর কিছু কেনা চলে না—এই হয়েছিল অবস্থা।

শান্তিপুত্রের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ কারিগর তাঁতীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল—তারা পরামর্শ দিয়েছিল শান্তিপুত্রের কাপড়ের ব্যবসা করার। প্রথমে ঠিক করলুম তাই করবো। কয়েকশো টাকার দামী খুঁটি, শাড়ী এবং চানরও কিনে ফেললুম। কিন্তু কাপড়গুলো ছকম জুয়াচোবে কীক করে দিলে।

একদিন বাস্তার এক বেকার জয়লোক সাহায্য ভিক্ষা চাইলে,—ছেলে মেয়ে নিয়ে অনাহার চলছে। একটি নিকি নিয়ে নাম-ঠিকানা জেনে নিলুম এবং দু-একদিন পরে আমার ঠিকানার দেখা করতে বলে দিলুম। তার ঠিকানার খোঁজ নিয়ে দেখলুম—পাকপাড়ার এক বস্তির একটা খোলার বাড়ীর ভাড়াটে—বা বা বলেছিল সব সত্যিই।

স্ততবাং দুদিন পরে সে বখন আমার কাছে এল,—একটা মজুন চামড়ার স্ট্রাকেশন তরে তাকে একগালা দামী কাপড় দিয়ে বলে দিলুম—বড় বড় বাড়ী দেখে ঘুরে যদি রোজ একখানা কাপড়ও বেচে আসতে পারো, ভাটলে এমন কমিশন হোব, যাতে তোমার চলে যার। সে ভক্তির পায়ের ধুলো নিয়ে বিদায় হল।

কিন্তু সেই প্রথম দিন বে গেল, আর তার দেখা পেলুম না,—কোনো রকমেই ধরতে পারলুম না। তার বাড়ীতে গিয়ে খোঁজ নিই—তিনি সে কয়েক দিন অন্তর এসে কিছু খরচপত্র দিয়েই আবার চলে যার। বনকে প্রবোধ দিলুম,—ব্যবসার বাই হোক, কাজ তো কিছু হল।

বাকি কাপড়ের বেকীর ভাগ ধারে কিনলে টালার কদী বৃথাজায় ছোট আট পাগলা—আমাদের ছেলেবেলার একজন খোলায় সাথী। বিক্রী তো হল,—সামটা না হয় পেতে একটু দেরীই হবে। কিন্তু কিছুতেই একটা পরসী আনার করতে পারলুম না। স্ততবার বলে কখনো বন থেকে বেড়ে ফেললুম। স্ততদিনে ব্যবসার আর একটা মজুন সূত্র পেয়েছি। সে কথা পরে বলছি।

এমিকে কংগ্রেস থেকে একটা অল্পসন্ধান কমিটি তৈরী হল, পাঞ্জাবে সরকারী অত্যাচার সবকিছু তদন্তের জন্তে। তাদের রিপোর্টও বেরুলো। ১৯২০ সাল শেষ হয়ে আসছে। সেপ্টেম্বরে কলকাতার

কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশন হল। আমেরিকা থেকে সত্য প্রভাগত লাল লাজপৎ রাই হলেন সভাপতি।

কংগ্রেসের মূলপ্রস্তাব হল মহাত্মা গান্ধীর অহিংস অসহযোগ। উচ্চত পাঞ্জাব ও বিলাকং সংক্রান্ত অত্যাচারের প্রতিকার। বিলাকং আন্দোলনে মুসলমানেরা পাছে হিংসার পথ অবলম্বন করে, তাই মহাত্মা গান্ধী তাদের কংগ্রেসের সমর্থন ও সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলে টেনে নিয়ে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনটাকে হিন্দু-মুসলমানের সমবেত আন্দোলনে পরিণত করার ব্যবস্থা করলেন।

বাংলার নেতারা মূল-প্রস্তাবের সংশোধনী প্রস্তাব করে স্বরাষ্ট্রের দাবীটাও জুড়ে দিতে চাইলেন। কারণ স্বরাজ না হলে কোয় অত্যাচারই স্থায়ী প্রতিকার হবে না। গান্ধীজী এটা মেনে নিলেন।

প্রস্তাব অনুসারে মূল-কলেজ, আদালত বরকট করতে হবে, বিলাকী কাপড় বর্জন করতে হবে, জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে, সালিকী আদালত করে মায়লার নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করতে হবে, চরকার প্রলেন করে খন্দর উৎপাদন করে বস্ত্রস্বস্তার সমাধান করতে হবে, হিন্দু-মুসলমান একা মিলে মিলে করতে হবে।

মহাত্মা বললেন, এই কার্যক্রম একটা বছর বীতিমত তাবে চালাতে পারলেই স্বরাজ হবে বাবে। কিন্তু তার জন্তে কংগ্রেসের মজুন গঠনতন্ত্র তৈরী করে কংগ্রেসকে গণ-প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে হবে এবং কংগ্রেসের আদর্শেরও পরিবর্তন (creed change) করতে হবে। ছির হল এছোটো ব্যবস্থা ডিসেম্বরে নাগপুরে সাধারণ অধিবেশনে করা হবে।

একটা বড় আন্দোলন আসছে বোঝা গেল, কিন্তু স্বরাজ-মরাজ বাই হোক, স্বাধীনতা যে অহিংসপন্থায় হতে পারে না, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। কিন্তু সরকারবিরোধী একটা দেশজোড়া লড়াই তো বটে! দেখা বাক—

আন্দামান থেকে সত্য-প্রভাগত শচীন সান্যাল ছিলেন কলকাতা কংগ্রেস ডলান্টিয়ারদের ক্যাপ্টেন। মহারাজীয়ে ডেলিগেটরা ডলান্টিয়ারদের ঘেরেছিল, তিনি ধামাতে গিয়েছিলেন, এবং তাঁর মাথারও তারা লাঠির বাড়ি মেয়ে মাথা কাটিয়ে দিয়েছিল। ডলান্টিয়াররা পাণ্টা মার দিতে চেয়েছিল, কিন্তু তাদের ধামানো হয়েছিল এই বলে যে, যদি মারতে হয়, তাহলে নাগপুর কংগ্রেসে গিয়ে মারবো।

তখন নববিধান আক্ষয়কির পিছনে (মেছোবাজার স্ট্রীট) বোধ হয় পুলিন দাস থাকতেন। শচীন বাবুও বোধ হয় সেইখানেই উঠেছিলেন। আমি ঠিকানা নিয়ে সেখানে গিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ করে এলুম।

২০ সালের আগষ্ট মাসে মজুন শাসন সরকার (মন্টেও ডেমসফোর্ড) ঘোষিত হয়েছে। বিপ্লবীরা হুত্ব হয়েছেন। বিপ্লবীদের তরফ থেকে লাজপৎ রাইকে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন বলে সম্বোধিত করা হল। সেই সভার বসন্ত মজুমদার সর্বপ্রথম বৌদিকে (হেমপ্রভা মজুমদার) প্রকাশ্য সভায় হাজির করলেন। বৌদিক কিন্তু একগালা ঘোমটা দিয়েই বসে থাকলেন, কোলে শিশু, বোধ হয় স্তন্যদান। স্তন্যদান ঘোম (মধুদা), নবরশ জৌদুহী প্রভৃতির সঙ্গে আলাপ হল।

আমি কংগ্রেসের ডিজিটালের টিকিট কিনেছিলাম। বেথে নরেশনা' বললেন, কেন? এই দশ টাকাতেই তো ডেলিগেটের টিকিট পাওয়া যেত—চাইলেই দিত। এই ছিল তখনকার কংগ্রেস! গঠনতাত্ত্বিক ব্যবস্থা। যে কেহই ডেলিগেট হতে পারতো তু ডেলিগেটের নাম টিকানা খাতার লেখা থাকতো।

এই সময় জীবনও জেল থেকে মুক্ত হয়ে এল, টালার তার হামার বাড়ীতে উঠলো। ওদিকে হামার বেশের (নড়িয়া, কবিরথুর) দোকানোপাল ভট্টাচার্য (জ্ঞান-বিজ্ঞানের বর্তমান সম্পাদক, বোম্ব ইনস্টিটিউটের অন্ততম বৈজ্ঞানিক গবেষক, পরিমল গোহাষীর "দ্বিত্তকথার" গোপালনা) কলকাতায় এসে এখানেই উঠেছেন ভাগ্য অশ্বপে। আসাব পরে কয়েকদিনের মধ্যেই কাশীপুরে হালী স্বামীরেব গুহ্যটিতে টেলিফোন ক্রাঙ্কের কাজ জুটিয়ে নিয়েছেন।

জীবনের মারকং আলাপ হল। নির্ভেজাল বহুতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় শেরে বেশ ভাল লাগলো এবং ছ'-টার দিমেই বহুখ জমে উঠলো। বিজ্ঞান ও কারিগরীবিভার দিকে তাঁর ছিল অসাধারণ রোঁক, এবং গ্রামে থেকেই বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী সংক্রান্ত পুঁথিরের সাহায্যে ও ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের বলে তিনি হয়ে উঠছিলেন বেশ একজন ছোট খাটো বৈজ্ঞানিক ও বস্ত্তবিদ। কীটপতঙ্গ বিশেষত মাকড়সাগোষ্ঠীর আচার ব্যবহার ও নানা অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা সবকিছু তাঁর পর্যবেক্ষণের কলাকল সম্পর্কে তিনি "প্রবাসী"তে প্রবন্ধ লিখতেন,—এবং ছবি-নকশ সাহায্যে বড়ি মেরামতও করতেন।

আমি ব্যবসা করতে নেমেছি,—পদক্ষেপ নেহাৎ কম হয়নি,—কিন্তু দশ এশবর্ষ হয়েছে অগ্রগতির বদলে ঘূর্ণপাকমাত্র—তবে তিনি বললেন—কলকাতায় বড়ির কাজ প্রচুর—বদি বড়ি মেরামতের দোকান করেন, আমি সকালে-বিকালে গিয়ে বসতে পারি।—আমিও কাজ করবো, আপনি শিখে নিতেও পারবেন। উৎসাহের চোটে তাই স্থির করে ফেললুম।

নিলাম থেকে আলমারী-সোকেস কিনলুম, বাথবাজার থেকে, একসেট বস্ত্রও নিলুম। এক সাইন বোর্ড বানিয়ে ফেললুম, গোপাল বাবু পরামর্শ দিলেন, রং ও তুলি কিনে দিলে তিনি সাইন বোর্ড লিখে দেবেন। সেই ব্যবস্থাই হল।

প্রথম দিন তাঁর সঙ্গে হাত লাগিয়ে বোর্ডটার জমি রং করা হল। পরদিন সকালে তিনি বড়ির দাগ দিয়ে নাম লিখে (নাম হল B. Narayan & Co.)—প্রথম অক্ষরটার রং দিয়ে অকিসে চলে গেলেন—এবং বিকালে এসে দেখলেন, আমি লেখা সম্পূর্ণ করে ফেলেছি—স্বানাহার হয়নি। এলেম এবং অধ্যবসার দেখে তিনি খুব তারিক করে বললেন,—স্বদেশী হাঙ্গামা ছেড়ে এই সব ব্যবসায়িক কাজের পথ ধরলে আমি খুব কাজের লোক হতে পারি।

লোকের বাড়ী বাড়ী ঘুরে অনেকগুলো নানারকমের ছোট বড় বিকল বড়িও ষোগাড় করে ফেললুম। কিন্তু হঠাৎ সমগ্র পরিস্থিতি সেল বদলে—বড়ির দোকান হল না।

বিপ্লবী নেতা পুলিন দাস গোপাল বাবুর দেশের লোক। আচার্য জনশ্রী বহু তাঁকে অর্থ সাহায্য করার উদ্দেশ্যে ব্যবস্থা করেছেন, প্রত্যাহ বৈকালে পুলিন বাবু বোস ইনস্টিটিউটের কর্মীদের একটু করে

লাঠি খেলা দেখাবেন—পবেষকদের ওপরও তাঁর হুকুম, সকলকেই বিকালে একবার লাঠি নিয়ে মাঠে নামতে হবে।

গোপাল বাবু সেখানে গিয়ে পুলিন বাবুর সঙ্গে দেখা করে, তাঁর সাহায্যে Laboratory Assistant এর এক চাকরী জোগাড় করে ফেললেন। তাঁর আর দোকানে বসা সম্ভব হল না। কুস্তার বলে বাড়ী থেকে কিছু কার্ণিটার নিয়ে দোকানে তুললুম—এই ব্যবস্থাই করবো। ভারীজামাইকে বসালুম দোকানে।

ইতিমধ্যে এসে পড়লো নাগপুর কংগ্রেস। মনটা চকল হয়ে উঠেছে। গেলুম ডেলিগেট হয়ে। জন পঞ্চাশেক বাছা বাছা ডেলিগেট চললেন, হাতে এক একটা ঘড়বৃত ছোট লাঠি। সেখানে হায়াট্রিকের সঙ্গে ষগড়াও হল, তাদের বীতিমত মার দেওয়াও হল—কলকাতার জবাব দেওয়া হল।

দ'গপুর কংগ্রেসে দুটো বড় বড় তুল কাজ হল,—(১) কংগ্রেসের আদর্শের (creed) পরিবর্তন,—আর (২) দ'তুন গঠনতন্ত্র। ব্যবস্থা হল,—কংগ্রেসের আদর্শপত্রে সই দিলে এবং বাৎসরিক চার আনা চাঁদা দিলে যে-কেহই কংগ্রেসের সভ্য হতে পারবে। এইভাবে কংগ্রেস হবে সারাভারতব্যাপী জনসংগঠন। বিস্তারিত ভাবে গঠনতন্ত্র রচনার জন্তে কমিটি তৈরী হল।

আর,—কংগ্রেসের creed আগে ছিল—"Attainment of Self Government within British Empire by Constitutional means." পরিবর্তন প্রস্তাবিত হল—"Attainment of Swaraj by peaceful and Legitimate means." আপত্তি করলেন হুজন নেতা—বিপিন পাল ও জিন্না। বিপিন পাল বললেন,—"এতে সরকার কংগ্রেসকে বেআইনী করে দেবে—আমাদের সর্বনাশ হবে।"

মহাত্মা জবাব দিলেন,—"এই বে-আইনী করার ভয়টা তুল, এতে বে-আইনী কিছু নেই। আমরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকবো কি না,—সেটা একটা খোলা প্রশ্ন থাক—তাঁর মীমাংসা নির্ভর করুক সরকারের ব্যবহারের ওপর।"

জিন্না বললেন "within British Empire" কথাটা তুলে দাও, ক্ষতি নেই,—কিন্তু তাঁর হুলে লিখে দেওয়া হোক, "ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বহির্ভূত স্বাধীন-কারণ তা না হলে কর্মীরা ও জনসাধারণ দিশেহারা হবে,—কেউ "within," কেউ "without" মনে করে কাজ করবে,—কাজে গুণগোল ও বিশৃঙ্খলা হবে। সরকার বে-আইনী ঘোষণা করে তো, আমরাও তাঁর উপবৃত্ত জবাব দেওয়ার ব্যবস্থা করবো।"

মহাত্মা জবাব দিলেন, "আমরা যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাইরেই যেতে চাই, একথাই কি ঠিক? একথা ঠিক করার সময় এখনো আসেনি—বখন স্বরাজ হবে, তখন জনগণ সেটা ঠিক করবে।"—প্রস্তাব পাশ হয়ে গেল।

কিরে এসে দেখি, দোকানের চেহারা যেমন ছিল, অবিকল তেমনি-আছে। কার্ণিটারের ব্যবসায় আমায় পাণ্ডিত্য নিলাম চেনা পর্যন্ত, ভারীজামাই ততোধিক পণ্ডিত—তিনি নিলামও চেনেন না।

দোকানের পিছনে চকের মধ্যে ছোটো বড় বড় ডেকরেটর-এর ব্যবসা ছিল। দেখতে দেখতে মনে হল—এই ব্যবসারটা বেশ! একদিন স্থির করে ফেললুম—এই ব্যবসাই করতে হবে। [ক্রমশঃ।

শীতের

পড়ন্ত

বেলায়

মাধবী ভট্টাচার্য

একজন ভ্রমলোক। একজন ভ্রমহিলা।

ভ্রমহিলার বয়স অল্পমান করে বলা যায় ত্রিংশ থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে। চেহারাটা কী, কক—অত্যাবিকৃত সংঘের টানে জীহীন। গাল দুটো বস। চোখালের হাড় বেরিয়ে পড়েছে। রঙটা ময়লার ধার ঘেঁসে গেছে। চেহারার বাঁধনী বলতে কোথাও কিছু নেই—সমস্তটাই রক্ত, ঢিলে-ঢালা। চোখের দুটিটা এমনিতে ঘন হবে উদ্ভাস, কিন্তু একটু নিরীকণেই ধরা পড়বে সে দুটিতে রয়েছে খালা—একটা সর্বাঙ্গী কুখার খালা।

ভ্রমলোকটির বয়স অল্পমান-লোপেক নয়। কেন না, সৌম্য, প্রখান্ত মুখখানার দিকে এক নজর থাকিয়েই বলে নেওয়া যায় ভ্রমলোক এই সব পঞ্চাশের কোঠার পা দিয়েছেন।

মহিলাটি বসে আছেন। সামনে চায়ের পেয়ালা। পেয়ালার চা পেয়ালাতেই জুড়িয়ে বাচ্ছে। মহিলা বসে আছেন। বসে আছেন টেবিলের ওপর কুহুই-এর ভর দিয়ে বাঁ হাতখানা গালের ওপর রেখে। দুটি মেলে দিয়েছেন জানালা পার করে অনেক দূরে।

দরজার সামনে বসে আছেন ভ্রমলোক। তাঁর সামনেও এক পেয়ালা চা। ধীরে ধীরে সেই চা তিনি আয়েস করে পান করে যাচ্ছেন। সর্বাঙ্গে একটা আমেজী ভাব।

মধ্য প্রদেশের পাহাড় আর জঙ্গল দিয়ে ঘেরা ছোট একটি সহর, আর সেই সহরের উপকণ্ঠে একটি নির্জন সরাইখানা। সরাইখানার মালিক এক বৃদ্ধ গড়জাতি রাজপুত। মেয়ে তার কঙ্গিণী। মা-মরা মেয়ে। বাপের আদরে, পাহাড় আর জঙ্গলের পরিবেশে বড় হোয়ে উঠেছে। যেমন পাহাড়ী, তেমনই বন্ধ।

ভ্রমলোকটির নাম অমির বাবু—অমিরকুমার বোব। উড়িষ্যার কোন এক জেসার বাড়ী। জমি জরীপ সংক্রান্ত কাজ নিয়ে এখানে এসেছেন। আস্তানা নিয়েছেন এই সরাইখানাটিতে।

ভ্রমহিলাটি সরকারী গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনার কাজ নিয়ে এসেছেন। মাথা গুঁজবার বিতোর ঠাই না থাকায়, তাঁকেও এইখানেই অস্থায়ী ডেরা বাঁধতে হোয়েছে। ভ্রমহিলার নাম মণিকা গুপ্ত।

শীতের এক পড়ন্ত বেলা। সেই পড়ন্ত বেলার আখো-অন্ধকার সরাইখানার নির্জন এক কক্ষে প্রায় পাশাপাশিই বসে রয়েছেন বাবু অমিরকুমার বোব—পঞ্চাশের কোলচোঁস এক প্রৌঢ়, এবং কুমারী মণিকা গুপ্ত, বি, এ—জীবনের ত্রিংশটি বসন্তকে অভ্যস্ত: বিনি অসীম ঔগান্ডা উপেক্ষা করে এসেছেন।

অমির বাবু আয়েস করে চা পান কোরছেন আর আড়চোখে লক্ষ্য কোরছেন মণিকা দেবীর হাব-ভাব।

অনেকটা সময় কেটে গেল। অমির বাবুর চা-পান পূর্ব শেষ হোঁস। নির্জন ঘরের অন্ধকার আর একটু ঘনীভূত হোয়ে এল।

মণিকা দেবীর জ্বকপ নেই। তিনি বাইরের পৃথিবী হুঁ চোখ ভরে দেখে নিচ্ছেন।

এক সময় অমির বাবু উঠে দাঁড়ালেন। শব্দ করে বেশলাই খালিয়ে সিগারেট ধরালেন। বুধা, মণিকা দেবীর স্পন্দন নেই। অমির বাবু আর থাকতে পারলেন না। কণ্ঠস্বর এক পর্দা ওপরে তুলেই বললেন : আপনার চা জুড়িয়ে গেল মিস গুপ্ত।

চমক নয়। দীর্ঘশ্বাস। প্রকাণ্ড একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মণিকা দেবী বাইরের দুটিটাকে গুটিয়ে নিয়ে চায়ের পেয়ালার বেষ্ট্রীভূত কোরলেন। মুখ দিয়ে শুধু অস্ফুট বাঁওয়াজ বেরুলো ধন্বান।

বুড়ি নামলো। পাহাড়ী বুড়ি। অমির বাবু কথা জমাবার জন্তে বোললেন : এ সময় এখানে বুড়ি হয়, জানা ছিল না তো ?

অপর পক্ষে নীরব। বাইরের অজস্র বুড়িধারার মধ্যে চোখের বুড়ি আবার কোথায় গিয়ে হারিয়েছে।

ঘরে চুকলো কঙ্গিণী। গড়জাতের পাহাড়ী রাজপুতানী মেয়ে—তার সন্তোরে বহুরের যৌবনকে দপ্পনিয়ে হাতের জারিকেন লঠনটাকে উঁচিয়ে একবার দেখে নিলে ঘরের পরিবেশ, তারপর হাঁটুর একটু নীচে পর্য্যন্ত নামা বাঘবাটা বলমলিয়ে সোজা অমির বাবুর টেবিলের সামনে গিয়ে এক কপ চা ঠক করে নামিয়ে দিয়ে বোললেন : এই নাও বাবুজী, তোমার চা।

প্রসন্ন হান্তে অমির বাবু চকল চেয়ে উঠলেন।

—বাঃ, বাঃ, বাঃ, তাই তো বলি, কঙ্গিণী নইলে মনের কথা আর এমন করে কে বুঝবে।

চায়ের কাপে চুষুক দিয়ে বললেন : এই জঙ্গলে তোমার মতো একটি মেয়ের দেখা যে পাবো কঙ্গিণী, এ কি আমি কখনো কল্পনাতোও আনতে পেরেছিলাম ?

—নসীব তাহলে তোমার ভালই বল বাবুজী।

হেসে হেসে মণিকার দিকে একবার কটাক্ষ করে কথাটা বললে কঙ্গিণী।

—হ্যাঁ, সে কথা আর বলতে ? অর্ধপূর্ণ হাসি হেসে ওঠেন অমির বাবু।

হঠাৎ এই সময় মণিকা দেবী চেয়ারটা সলদে পেছন দিকে ঠেলে, উঠে দাঁড়িয়ে গট গট করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

মণিকা দেবীর এই চলে যাওয়াটা এমনই বেখাপ্পা আর বেয়াদ্বা ধরণের যে, অমির বাবুকে রীতিমত অপ্রতিভ হতে হল। বিস্ত খিল-খিল করে হেসে উঠলো কঙ্গিণী। তাৎপর্য এক সময় বললেন : বাবুজী ও বাঈটা ভাল নয়। ও একটা টঁড়াই।

—টঁড়াই ? টঁড়াই কি ব্যাপার কঙ্গিণী ! অমির বাবু সহজ হবার জন্তে হেসে ফেলেন।

—তুমি হাসছ বাবুজী ! তুমি জানো না টঁড়াই কি জিনিস ! চোখ-মুখ ঘুরিয়ে কঙ্গিণী বলতে থাকে : টঁড়াই কাদের বলে জানো ? টঁড়াই বলে সেই মেয়ে মানুষদের—বারা বস্তুর-মস্তুর জানে। পুরুষ মানুষ দেখলেই বাদের জিত লক্ষ লক্ষ করে ওঠে। অন্ধকার ছাড়া বারা আলোতে বেরোতে চায় না। বেরোলেও—বাদের একমাত্র গন্তব্য স্থান শুন শুন স্থান।

—বটে ! তা'হলে তো খুবই ভয়ের কথা ! অমির বাবু কোঁচুক ছলে বললেন।

—ভয়ের কথাই তো। মাথা ঝাঁকিয়ে বলে কঙ্গিণী : তুমি সাবধান।

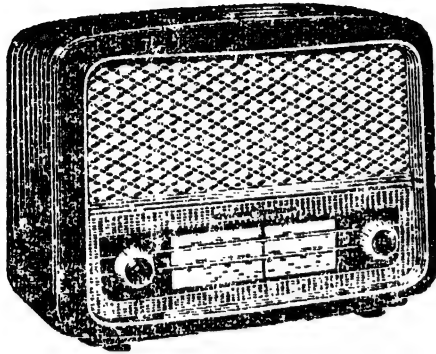


মুণের মুণের কাজে পোত হ'লে

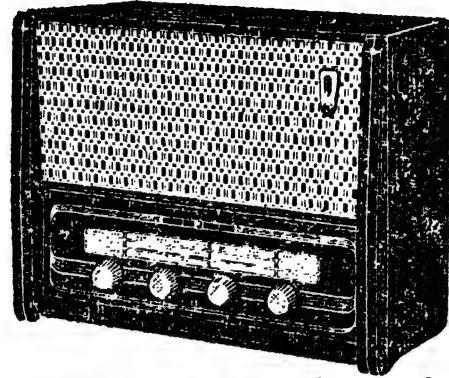
কাজে সেরা ও দামে সুরিষে ব'লেই ক্রাশনাল-একো রেডিও এবং ক্রিয়ারটোনের জিনিস বিখ্যাত। আর তা-ও এত বিভিন্ন রকমের পাওয়া যায় যে আপনার যেমনটি চাই বেছে নিতে পারবেন।

ন্যাশনাল একো

রেডিও



ক্রাশনাল-একো রেডিও মডেল ইউ-৭১৭-এসি/ডিসি; ৫ ভালভ, ৩ বাণ্ড, ক্রাশনাল-একো-র বড় সেটের মত অনেক বিবি-ব্যবস্থা এতে আছে।
মনমুনাইজ্জ ২৫০ টাকা



ক্রাশনাল-একো মডেল ৭২২-এসি অথবা এসি/ডিসি; ৬ ভালভ, ৩ বাণ্ড; খুব ভাল কাজ দেয়; এই ধরনের রেডিওর মধ্যে সেরা।
মনমুনাইজ্জ ৩৫০ টাকা

Klertone ক্রিয়ারটোন বাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম

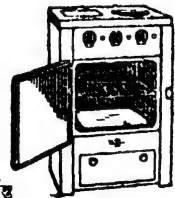
ক্রিয়ারটোন
বৈদ্যুতিক
ওয়াটার হীটার—
কল ঘুরালেই গরম জল
পাওয়া যায়: ৫ থেকে
১০ গ্যালন জল ধরে



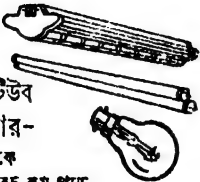
ক্রিয়ারটোন
সিংক্রোনাস
বৈদ্যুতিক
দেওয়াল ঘড়ি—
অসাধারণ নির্ভরযোগ্য।
৭ রকম সাইজে এবং সুন্দর
সুন্দর রঙে পাওয়া যায়



ক্রিয়ারটোন
কুকিং রেঞ্জ—
দুটো স্টেট দেওয়া
উন্নত, প্রত্যেকটির
আলাদা নিয়ন্ত্রণ
ব্যবস্থা আছে।
শক্তি ৫,৫০০ ওয়াট পর্যন্ত



ক্রিয়ারটোন
বাতি,
ফ্লুরোসেন্ট টিউব
এবং ফিল্ম চার-
পরিধার ককককে
আলো অর্ধেক বরচ কম পড়ে



ক্রিয়ারটোন
ঘরোয়া ইঞ্জিন—
ওজন ৭ পাউন্ড;
২৩০ ভোল্ট—
৪৫০ ওয়াট; খুব
পুঙ্খ ক্রোমিয়ান
কলাই করা



ক্রিয়ারটোন
বৈদ্যুতিক
কেটলি—
ক্রোমিয়াম কলাই করা;
৩ পাউন্ড জল ধরে;
২৩০ ভোল্ট—৪৫০ ওয়াট



জেনারেল রেডিও অ্যান্ড অ্যাপ্লায়েন্সেস প্রাইভেট লিমিটেড
৩ ম্যাডান স্ট্রিট, কলিকাতা ১৩ • অপেরা হাউস, বোম্বাই ৫ • ফ্রেন্সার রোড, পাটনা
১/১৮ স্ট্রিট রোড, বাহাওয় • ৩৩/১২ সিলতার ভূবিলী পার্ক রোড, বাঙ্গালোর
বোম্বাইয়ান কলোনি, টায়নি চক, দিল্লী • হাটপতি রোড, সেকেন্দরাবাব

—কেন, আমার ওরটা কিগেই ?

—বাঃ, তবু তো তোমাকে মিরেই। তুমি যে পুরুষ মানুষ—
মরদ।

হাসতে গিয়েও হাসতে পারেন না ভক্তলোক—সংকুচিত হোয়ে পড়েন। স্বজাতীয় মহিলা সংক্রান্ত আলোচনাটার এইখানেই ইতি টানবার ইচ্ছে নিয়ে তাড়াতাড়ি বলেন : আজই তোমাদের দেশ এসে পৌঁছুলাম রুক্মিণী—কিন্তু দেখ কি বৃষ্টি! একটু যে বাইরে বেরিয়ে চারিদিক ঘুরে-ফিরে দেখবো—তার উপায় নেই। রুক্মিণী অন্তর দিয়ে বলে : এ বর্ষায় তবু পাবার কিছু নেই বাবুজী! পাহাড় দেখের মেঘ—ও এখনি সাফ হোয়ে যাবে।

—বাক্ বাঁচা গেল। উঠে দাঁড়িয়ে বলেন অমিয় বাবু : তা কোন দিকে বাওয়া যাব বলো তো রুক্মিণী! জংলী জারগা। রাজা-খাটও চিনি না। কোথা থেকে কোথায় গিয়ে পড়বো। শেখটা হয়তো বাঘের মুখেই প্রাণটা যাবে।

বাইরের দিকে কানটা খাড়া করে কি একটা শোনবার চেষ্টা করে রুক্মিণী, তারপর বলে : তুমি একটু দাঁড়াও বাবুজী, আমি আসছি : আমি তোমার সঙ্গে যাবো।

—সে কি। তুমি কোথায় যাবে আমার সঙ্গে? বিম্মিত কণ্ঠে অমিয় বাবু প্রশ্ন করেন।

দরজা পর্বত এগিয়ে গিয়েছিল রুক্মিণী। সেখান থেকেই ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে : বাবোই তো। পাহাড়-জঙ্গল দেশ। জঙ্গল-জানোয়ারের ভয় তো আছেই, আর আছে টাঁড়াই। একলা মরদ কি এমন এমন ছেড়ে দিতে আছে?

খিল-খিল করে আর এক ঝলক হেসে ছুটে মেয়েটা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বিম্ময় যতখানি, তার থেকে অনেক বেশী পুলকে নির্জন ঘরের মধ্যে অমিয় বাবু শিউরে শিউরে উঠতে লাগলেন।

পাহাড়ী রাত। আকাশে মেঘের চিহ্নমাত্র নেই। বিন্দু জ্যোৎস্নার মাঠ, বন, পাহাড় ভরে গেছে। চারিদিকে একটা নিরবচ্ছিন্ন সৌন্দর্যলোক।

অমিয় বাবু হেঁটে চলেছেন। পাশে রুক্মিণী। রুক্মিণী এক নাগাঁড়ে বকে চলেছে। অমিয় বাবু শুধু খাড় নেড়ে সার দিয়ে যাচ্ছেন। যাবে মাঝে এক-আধখানা প্রাণ কোরছেন। রুক্মিণী বোঝাচ্ছে : এই যে এখন আমরা যে জারগাটা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি বাবুজী, এটা হচ্ছে ভাঙ্কুর আশ্রয়। এখন অবশ্য ভয়ের কিছু নেই, কেন না ভাঙ্কুর এখন শিকারের খোঁজে বেরিয়েছে। কিংবদন্তে সেই ভোরের দিকে।

অমিয় বাবুর মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বলে : আর এর মধ্যে যদি ফিরেই—তাতেই বা কি। আমরা তো আর ওর কোন ক্ষতি কোরতে যাচ্ছি না। ওই বা শুধু শুধু আমাদের কোন ক্ষতি কোরতে আসবে, না বাবুজী।

—গা। অস্তমনস্ত ভাবে অমিয় বাবু উত্তর দেন।

রুক্মিণী বলে চলে : বুঝলে বাবুজী, ভাঙ্কুর হোচ্ছে সব থেকে শান্ত জানোয়ার। ওর ডোরার ওপর গিয়ে হামলা না কোরলে, ও কাউকে কিছু বলে না। আচ্ছা বাবুজী,

তুমি ভাঙ্কুর দেখেছো? আচমকা অমিয় বাবুর চোখে চোখ রেখে প্রশ্নটা করে রুক্মিণী।

চাকরী-জীবনের অর্ধেকটাই কেটে গেছে বনে-জঙ্গলে। অমিয় বাবু খাড় নেড়ে বলেন : দেখেছি।

—দেখেছ? সত্যি দেখেছো বাবুজী?

প্রশ্নের ধরনে এবার হেসে বলেন অমিয় বাবু। বলেন : হ্যাঁ, সত্যিই দেখেছি।

—আচ্ছা, কখনো সামনা-সামনি পড়েছ?

আবার হেসে বলেন অমিয় বাবু। বলেন : না। তা' পড়িনি।

—পড়েনি? সত্যিই পড়েনি? হঠাৎ এক বিচিত্র ধরনের কোঁতকে রুক্মিণীর চোখ দু'টো চক চক করে ওঠে। অমিয় বাবুর পথ আগলে ও'রান্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ে। অমিয় বাবু বিম্মিত হোয়ে ওর দিকে তাকান। রুক্মিণী এক পা এগিয়ে আসে। বন হোয়ে মুখোমুখি দাঁড়ায়। কণ্ঠস্বরকে নামিয়ে নিয়ে আসে নিখার অন্তরে। বলে :—আজ একটা ভাঙ্কুর দেখবে বাবুজী—পাহাড়ী জংলী ভাঙ্কুর—একেবারে সামনা-সামনি।

চায় পাশে একবার সচকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন অমিয় বাবু। তারপর বলেন কিস্ কিস্ কোরে : কই, কোথায়?

অমিয় বাবুর চোখের দিকেই তাকিয়েছিল রুক্মিণী। এবারে খিল-খিল করে হেসে ওঠে। তারপর সমস্ত শরীরে একটা হিলোল তুলে অমিয় বাবুর একখানা হাতকে নিজের হাতের মধ্যে জড়িয়ে নিয়ে, ঢালু পথটা বেয়ে শুধী রুক্মিণী তব, তব করে এগিয়ে যেতে যেতে বলে : চলো, তোমাকে দেখিয়ে আনি।

ভারী দেহটা নিয়ে বিজ্ঞান অমিয় বাবু অগত্যাই অসুসরণ করেন।

পথটা কিছুদূর নেমেই একটা বালির চরে ঠেকে গেছে। আর একটু নীচেই ছোট-বড় অজস্র পাখরের মাঝখান দিয়ে পথ করে বয়ে বাওয়া একটি শীর্ণ জলধারা। পাহাড়ী নদী এবং তার বালুচর। অমিয় বাবুর হাত ধরে রুক্মিণী তাঁকে সেইখানে টেনে নিয়ে আসে। নিজে গড়িয়ে পড়ে ভেজা-ভেজা নরম বালির চানবে। হাত বাড়িয়ে পাশের জারগাটা দেখিয়ে বলে : এইখানে চূপটি করে বসে থাক বাবুজী! এখনি ভাঙ্কুর আসবে—তুমি দেখতে পাবে।

রুক্মিণীর আকস্মিক বিচিত্র ব্যবহার প্রৌঢ় অমিয় বাবুর হিসেবের বাইরে। এতক্ষণ নির্ধাক হোয়েই তিনি ছিলেন। এবার বললেন : ভাঙ্কুর না হয় দেখবো রুক্মিণী, কিন্তু—হঠাৎ থমত থমে চূপ করে বান ভক্তলোক। এমন বিজ্ঞী আর বেরাড়া ভাবে শুয়ে আছে মেয়েটা।

আবার খিল-খিল করে হেসে ওঠে রুক্মিণী। অমিয় বাবুর হাতের আঙুলগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া কোরতে কোরতে বলে : কিন্তু কি, বলো না বাবুজী, কি বলছিলে?

চাদের আলো পড়েছে পাহাড়ী নদীর জলে। সেখানে এক গাণ্ডিকিমিকি। চাদের আলো পড়েছে পাহাড়ী মেঘের চোখে। সে চোখেও অজস্র প্রতিবিম্ব। কিন্তু অমিয় বাবু আর ওদিকে ফিরে তাকালেন না। সোজা নদীর ওপারে দৃষ্টি মেলে দিয়ে বলেন :

না, এই বলছিলেন কি—ভিজ বালির ওপর শুয়ে পড়লে—ঠাণ্ডা কাণ্ডা লেগে যেতে পারে তো ?

ভিজ ? ভিজ কোথায় দেখলে বাবুজী ! কী সুন্দর আর নরম বিছানা। তুমিও শুয়ে দেখো না বাবুজী ! অমিয় বাবুর আঙুলগুলোকে যুহ আকর্ষণ করে রুক্মিণী ।

—আঃ রুক্মিণী ! প্রগলভা মেয়েটাকে শাসন করবার চেষ্টা করেন অমিয় বাবু ।

—বোকো না বাবুজী ! তুমি বোকলে আমি কেঁদে ফেলবো । বোলেই পাশ ফিরে সরে এসে বা হাতখানা দিয়ে অমিয় বাবুর একটা হাঁটুকে জড়িয়ে ধরে মুখখানা বালির মধ্যে গুঁজে দিল রুক্মিণী ।

পাহাড়ী রাত আর পাহাড়ী নদী । সময়কে সজে করে শ্রোত বয়ে চলেছে একটানা শব্দের স্রষ্টি করে, আর অসহ একটা নীরবতার উল্লুখ চেতনা নিয়ে আড়ষ্ট হোয়ে বসে আছেন অমিয় বাবু ।

আঃ, মেয়েটার কি কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান নেই ! পাহাড়ী বোলে কি শালীনতার ছিটে-কোঁটাও অবশিষ্ট রাখতে নেই ?

নদীর ওপারে দৃষ্টি ঝাপসা । কুয়াসা জমতে শুরু করেছে । আকাশের মাধ্যম রয়েছে চাঁদ । সেই চাঁদের দিকে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছে একটা ঘন কালো মেঘ । ওটাকে দেখাচ্ছে একটা কেঁদো ভাবুকের মতো ।

অমিয় বাবু বিচলিত হয়ে ওঠেন । আলতো ভাবে রুক্মিণীর গায়ে নাড়া দিয়ে ডাকতে চেষ্টা করেন । আর ঠিক সেই মুহূর্তেই কাণ্ডা খটে যায় ।

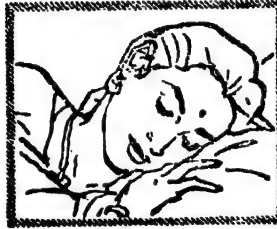
বিছানগতিতে উঠে বসে রুক্মিণী । হুই হাতে অমিয় বাবুর বষ্ঠ বেঁটন করে সবলে তাঁকে ধরে বুকের কাছে টেনে নিল । অশ্রুট বিচিত্র ধরে কানে কানে বলে : বাবুজী, ভাবুক—পাহাড়ী জলো ভাবুক—শিকার খুঁজতে বেরিয়েছিল—জিন্দগীর পহেলা শিকার । সেই শিকার ওর মুখের সামনে এসে গেছে । তুমি বাধা দিও না বাবুজী—শুধু দেখে নাও—সামনাসামনি দেখে নাও ।

সময় বুঝে মাধ্যম ওপরের কেঁদো ভাবুকটা প্রকাণ্ড একটা থাবা জমিয়ে বসলো চাঁদ মামার মুখে ।

বিপৰ্য্যস্ত সময় গড়িয়ে চললো । গড়িয়ে চললো পাহাড়ী নদীর শ্রোত—ভাবুকের মতো কেঁদো কেঁদো পাখরের তলাকার মাটা কয়িয়ে, গলিয়ে, ঝাঁঝা করে ।

—সেদিন রাতে সবাইখানার নির্জন ধরে বসে অমিয় বাবু বখন মনে মনে আত্মকের সন্ধ্যার ঘটনাটা পর্যালোচনা করছেন—নিঃশব্দ ধরে চুকলো রুক্মিণী । বিভ্রান্ত অমিয় বাবু উঠে গাড়ালেন । কিছু একটা বোলতে বাবেন—রুক্মিণী ঠোটে আঙুল তুলে ইংগিতে তাঁকে নীরব করে দিলে । তার পর নিঃশব্দে দরজাটা তেতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে, টেবিলের ওপর রাখা জারিকেন-লঠনটাকে হাত দিয়ে নিবিয়ে, অমিয় বাবুর বুকের কাছে বঁসে এসে গাড়ালো । অমিয় বাবু বোবা হয়ে গেছেন । তাঁর কিছু বলবারও নেই, করবারও নেই । অত্যধিক স্নানপীড়নে ইতিমধ্যেই তিনি ক্লান্ত, অবসন্ন—কিন্তু রক্তের স্বাদ পেয়েছে বস্ত্রব্যাজী—সে তাঁকে রেহাই দেবে কেন ? হু হাতে অমিয় বাবুর গলাটা জড়িয়ে ধরলো রুক্মিণী ।

মস্তিষ্ক শীতল রাখে ও
সুনিদ্রার সহায়তা করে



ভঙ্গল শুধু যে
কেশের পক্ষেই বিশেষ
তাহা নহে, ইহা মস্তিষ্ক সুস্থ ও
শীতল রাখে এবং সুনিদ্রার সহায়তা করে ।

ভ্রুংগল

সুগন্ধি মহাতৃপ্তরাজ কেশ তৈল

দিঃ ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ, কলিকাতা-২২

৫ আউন্স শিশি কার্টন সমেত ও
১০ আউন্স শিশি কার্টন ছাড়া
পাওয়া যায় ।

BHRIN-1A/59

অমির বাবুর ঘরের দরজা খুলে রুক্মিণী বখন বেরিয়ে এল, মনে হোল একটা ছায়ামূর্তি যেন হুন্ হুন্ কোরে বারান্দার ওপাশের অন্ধকার কোণের দিকে গিয়ে অদৃশ্য হোয়ে গেল।

রুক্মিণীর পেছনে অমির বাবুও বাইরে বেরিয়ে এসেছিলেন। ফিসফিসিয়ে ভীষণলায় বোললেন : নিশ্চয়ই কেউ তোমাকে এ ঘরে ঢুকবার সময় দেখেছে।

কে আবার। ওই ট'ডাই আউরবাংটা হবে। চাপা কণ্ঠে রাজ্যের বিবেচনার যুগ। ফুটিয়ে নিজের ঘরের দিকে রুক্মিণী পা বাড়ালো।

মণিকা গুপ্ত নামে একটি বাঙালী মহিলা যে এই সহরে তাঁর সঙ্গে একই ছাদে নীচে বাস কোরছে—এ কথা অমির বাবু যেন ভুলেই গিয়েছিলেন। রুক্মিণীই তাঁকে সর্বকণ দখল করে আছে। অজ্ঞ দিকে তাকাবার তাঁর ফুরসৎই নেই।

সেদিন সন্ধ্যায় একটু আগে অমির বাবু নদীর ধারে পাথরটারী কোরে বেড়াচ্ছেন, হঠাৎ পেছন কিয়তেই নজরে পড়লো—চালু পথটা বেয়ে তর তর কোরে নেমে আসছেন মণিকা দেবী। বিম্মিত অমির বাবু হাত উঠিয়ে নমস্কার কোরতে যাবেন, আকস্মিক ভাবেই পাশের একটা পাথর-চলা পথের দিকে বাঁক নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হোয়ে গেলেন মণিকা দেবী।

পরের দিন দুপুরেই কিন্তু মণিকা দেবীর আবির্ভাব—আর কোথাও নয়—একেবারে অমির বাবুর শয়ন কক্ষে।

খাওয়া-দাওয়ার পর নিজের ঘরে গুয়ে বিশ্রাম কোরছেন অমির বাবু, দরজাটা ভাত দিয়ে ঠেলে ভেতরে ঢুকলেন মণিকা দেবী বিমা-এন্তেলায়। অমির বাবু বিম্মিত হোলো, সে ভাব কাটিয়ে, তাড়াতাড়ি বিছানার ওপর উঠে বোসে, দুহাত জোড় করে নমস্কার জানিয়ে সম্বর্ধনা জানালেন : আশ্রয় মিস গুপ্ত। বসুন। দরজার পাশেই চোয়ার। সেটা দেখিয়ে গলার অস্তরঙ্গতার সুর এনে বোললেন : কি ধবর বলুন তো মিস গুপ্ত। আপনার যে দেখা পাওয়াই ভার। সারাদিনটাই ডিউটি করেন নাকি ?

মণিকা দেবী চোয়ারের ওপর বোসে অপ্রতিভের হাসি হাসেন।

—না, ডিউটি আর এমন কি। কথাটা অবসমান্তই থেকে যায়। মণিকা দেবী হাতের নখ খুঁতে থাকেন। অমির বাবু নীরবে একটা হাসিকের পাতা উটে বান।

এক সময় মণিকা দেবী উঠে দাঁড়ান। বলেন : আমি বাচ্ছি। নমস্কার। অমির বাবুকে কিছু বলবার অবকাশ না দিয়েই তিনি বাইরে বেরিয়ে আসেন।

সেইদিনই সন্ধ্যাবেলা। অমির বাবু বেড়িয়ে ফিরছেন, সরাইখানার ঘুঁষেই মণিকা দেবী। ঠর ভংগীটা প্রতীকায়। অমির বাবু কোন কথা না বলে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে বাচ্ছিলেন—বাধা পড়লো।

—একটা কথা ছিল। প্রায় ফিস-ফিস শোনালো মণিকা দেবীর গলার আওয়াজ।

—বলুন। অমির বাবু বুঝে দাঁড়ালেন।

—এখানে দাঁড়িয়ে বলা যায় না। একটু বদি—ভীষণ আর কাঁপা-কাঁপা গলায় এই পর্যন্ত বোলেই খেমে গেলেন মণিকা দেবী।

—বেশ তো চলুন না আমার ঘরে। সম্মতিত কণ্ঠে আহ্বান জানালেন অমির বাবু।

—না, না, ওখানে নয়। যাড় নেড়ে প্রবল আপত্তি জানাল মণিকা দেবী।

—তার চেয়ে ওই নদীর ধারটার—আবার কথা হারিয়ে ফেলেন ভয়মহিলা।

—বেশ তাই চলুন।

হু'জনে পাশাপাশি হেঁটে চলেছেন। কারো মুখে কোন কথা নেই। ভিতরের কৌতূহল আর উদ্বেগটাকে চাপা দেবার ভ্রমে চোখে মুখে একটা নিবাসন্ত ঔনাসীন্স ফুটিয়ে পথ হাঁটছেন অমির বাবু। মণিকা দেবীর দৃষ্টি দূরায়ত, ভাবলেশহীন।

কখন সন্ধ্যার আবছায়া অন্ধকার কুকুপঙ্কের রাজির ঘন অন্ধকারে ডলিয়ে গেছে, কখন দূরগত পাঠাডী নদীর কুলু-কুলু শব্দ, অনবরত পাথর আছড়ানো গর্জনে পরিণত হোয়েছে, কখন পায়ে পায়ে এগিয়ে চলা বনবীধি ধু-ধু হিঙ্গার বালুচরে রূপান্তরিত হোয়েছে—মণিকা দেবী তো নয়ই, অমির বাবুও যে এদিকে তেমন সচেতন ছিলেন—ওদের ভাব-ভঙ্গী দেখে অন্ততঃ একথা মনে করবার কারণ নেই। এমন কি, জলের প্রায় ধার বেসে হু'টি প্রাণী বখন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছেন—তখনো যেন চেনা-জানা এই চেতনার রাজ্য থেকে ঠরা বেশ ষানিকটা দূরে।

শান্তি ভঙ্গ করলো নিশাচর এক পাখী প্রচণ্ড আর্তনাদ তুলে।

অমির বাবু চমকে উঠে চার পাশের অন্ধকার পরিবেশটাকে একবার ভাল করে দেখে নিলেন। তারপর রুদ্ধ স্বরেই বোললেন—এবার আপনার যা বলবার আছে বলুন। তাড়াতাড়িই বলে ফেলুন। বৈশীকণ এ জাহায়ায় থাকা নিরাপদ নয়।

মণিকা দেবী যেন এই বুদ্ধভটিত অপেক্ষাতেই ছিলেন। হঠাৎ দূরায়ত দৃষ্টিকে একটি সীমিত কৃত্তিক রেখার প্রসারিত কোরে বোলে উঠলেন : কেন বলুন তো, জায়গাটা হঠাৎ এমন বিপজ্জনক হোয়ে উঠলো ?

অমির বাবু নির্বাক। মণিকা দেবীর কাছ থেকে এ ধরণের কথা তাঁর প্রত্যাশার বাইরে।

অতঃপর উদ্ভয়-ভিরিশের কুরপা মণিকা দেবী তাঁর বিচিত্র গ্রীবা সকালন ও পুরু ওষ্ঠাধর তির্যক হাসি দিয়ে পক্ষাশোভর প্রৌঢ় অমির বাবুকে আহ্বান জানালেন :—আশ্রয় না একটু বসি। কাজ তো কিছু নেই।

সচকিত হোয়ে ওঠেন অমির বাবু।—না, দেখুন, আমার যথেষ্ট কাজ যোয়েছে। আমার এবার ফেরা দরকার।

—কাজ তো রুক্মিণীকে নিয়ে এবং দরকারটাও বোধ করি তারই সঙ্গে।

—তার মানে ? কণ্ঠে জোর না পেলেও বিরক্তিতা অমির বাবু সুস্পষ্ট ফুটিয়ে তুললেন।

—মানেটা কি আমিই বোলে দিবো অমির বাবু ?

খলিত বকের ওপর হাত হু'টো জড়ো করে নিঃশব্দে অমির বাবুর মুখের পানে চেয়ে থাকেন মণিকা দেবী।

—দেখুন, আপত্তি অনর্থক অনর্থক আর চর্চা বোঝছেন। আপনার মতো একজন ভয়মহিলায়—

—পক্ষে যেটা একান্ত ভাবেই গহিত, এই তো? কথাটা সমাপ্ত করে বিচিত্র স্বরে হেসে ওঠেন মণিকা দেবী। তারপরই গভীর হয়ে বলেন: আচ্ছা, কোনটা গহিত, কোনটা গহিত নয়—সে জ্ঞানটা তো আপনারও থাকা উচিত। হাজার হোলেও আপনি একজন প্রণীত, বিজ্ঞ ভদ্রলোক।

বেশ চিবিরে চিবিরে কথাগুলো ছাড়তে থাকেন মণিকা দেবী: আপনি হয়তো বুঝতে পেরেছেন, কোন কথা বোলতে আপনাকে আমি এখানে ডেকে এনেছি। একথাও হয়তো আপনি বুঝতে পারছেন, কোন প্রয়োজনে আজ দুপুরে আপনার ঘরে গিয়েছিলাম। কিন্তু তখন যে কথা বোলতে পারিনি সংকোচে, এখন এই রাতের অন্ধকারের আড়ালে দাঁড়িয়ে সেই কথাই বোলছি আপনার মুখের ওপর অসংকোচে—আপনি অত্যন্ত জ্ঞান কাজ কোরছেন। কুম্মিণী মতো নিতান্তই একটা বাচ্চা বয়সে যে হয়তো আপনার জীব কোলের মেয়ের বয়সী, তারই সঙ্গে কিনা আপনি—।

আচমকা থমকে থেমে পড়েন ভদ্রমহিলা।

—কিনা আপনি—কি? হা হা কোরে হেসে ওঠেন অমিয় বাবু।

—বোলতে পারলেন না তো। আবারো সেই সংকোচ? অমিয় বাবুর উচ্চহাস্য নদীর ওপারে প্রতিধ্বনিত হোয়ে ফিরে আসে।

আর কিছুক্ষণ অমিয় বাবুর মুখের ওপর অলস দুটা দৃষ্টি নিক্ষেপ কোরে মণিকা দেবী বলেন: আপনি যে এত হীন আর এত নীচ তা' আমার জানা ছিল না। বুড়ো হোলে লোকের ভীমরতি হয় তদেহি—আপনারও তাই হোয়েছে।

বলেই আর দাঁড়ান না তিনি সেখানে। ক্রান্ত পা চালিয়ে বাণির চড়া ভেঙ্গে ওপরে উঠতে থাকেন। অমিয় বাবুর উচ্চ হাস্য শুকনো নীরব হোয়ে গেছে।

সরাইখানার ফিরে এই গল্পই অমিয় বাবু বেশ রসিয়ে রসিয়ে তবাক্ষিলেন কুম্মিণীকে। মণিকা দেবী সটান ভেতরে ঢুকে কোন ভূমিকা না কোরে বোললেন: হঠাৎ উত্তেজনার মুখে অনেকগুলো কথা আজ আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে, আপনি সেজন্তে আমাকে মার্জনা কোরবেন অমিয় বাবু! কথাগুলো বলার আমার সত্যিই ইচ্ছে ছিল না। অমিয় বাবুকে উত্তরের অবকাশ না দিয়ে, যে ভাবে এসেছিলেন মণিকা দেবী, সেই ভাবেই বেরিয়ে গেলেন।

অমিয় বাবু মুচকি হাসলেন। দাঁত দিয়ে দাঁত চেপে স্বগতোক্তি কোরলেন কুম্মিণী: বুড়ী! ভাইনি।

কিন্তু একটু পরেই কুম্মিণীর মুখভাবের পরিবর্তন হোল। একটা কিছু আবিষ্কারের আনন্দে ওকে উজ্জ্বল দেখালো। জু নাচিলে, চোখ ঘুরিয়ে বোললে: বাবুজী, আগরখটা একবারে দিওরান্না বোরে গেছে।

—সেটা কি ব্যাপার?

—মুহুর্তে বাবুজী, মুহুর্তে।

—কি সঙ্গে?

—তোমার সঙ্গে, আবার কার।

—যে! তবে তো বড় বিপদ হোল দেখছি। একটা লোক

কটাকে সামলাবো! পরিহাস-তরল কণ্ঠে অমিয় বাবু হাসতে থাকেন।

—হাসছো বাবুজী, বেশ। কিন্তু কথাটা আমার মোটেই মিথ্যে নয়। তুমি পরীক্ষা কোরে দেখতে পারো।

—পরীক্ষা! মুহুর্তের? ভদ্রকেই যান অমিয় বাবু।

—হ্যাঁ। একটা কাজ কোরবে বাবুজী?

অমিয় বাবু ভিত্তাস্থভাবে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেন।

কুম্মিণী চট করে একবার উঠে গিয়ে বাইরেটা উঁকি মেরে দেখে 'আসে। তাৎপর্য বশিষ্ঠ হোয়ে কাছে বোসে বলে:—কাল বিকেলে ওই অটোরটাকে সঙ্গে কোরে নিয়ে তুমি বেড়াতে বাও।

—না, না ও সব আমি পারবো না। প্রবল আপত্তি তোলেন ভদ্রলোক। আর তা' ছাড়া আমার সঙ্গে বাবেই বা কেন ও?

—বাবে বাবুজী, বাবে। তুমি একবার ডাকলেই বাবে। মিনতিতে গলে পড়ে মেয়েটা।—একবার ডেকেই দেখো না বাবুজী! আমার মাথার দিব্যি—তুমি একবার ওকে ডাক।

নারীচরিত্রের এই বৈচিত্র্যের সামনে দাঁড়িয়ে, অমিয় বাবু আপত্তি করবার ভাষা হারিয়ে ফেলেন।

বৈচিত্র্যের খানিকটা বাকী ছিল, কেন না পরদিন বিকেলে বেড়াতে বাবার মাত্র দায়দায় গোছেব আমন্ত্রণ নিয়েই মণিকা দেবী চোখ-মুখ উজ্জ্বল কোরে বেরিয়ে এলেন।

অমিয় বাবুকে আজ কথার পেয়েছিল। জীবনের ক্ষণস্থায়িত্ব এবং তাঁর ও মণিকা দেবীর এই জঙ্গল-পাহাড়ের দেশের এক নিভৃত সরাইখানার স্বল্পস্থায়িত্ব মিলনের সংগতি দেখিয়ে তিনি পথ চোলতে চোলতে একটা ছোটখাট বড়ুতাই দিয়ে ফেললেন।

মণিকা দেবী আজ দিব্যি সেজে বেরিয়েছেন। অনভ্যস্ত হাতে মুখে পাউডারের প্রলেপ বেশ স্পষ্ট হোয়েই ফুটে বেরোচ্ছে। সাড়ী আর ব্লাউস—দুটোই বহু আয়াস স্বীকার কোরে নির্ধাচন করা, কিন্তু পরবার ধরণটা হাস্যকর ভাবে আনাড়ি। চ্যাটালো বুকটা ভরংকর বকমের বেশনারী। অগাঙ্গে সেই দিকে চেয়েই চোখটা ফিরিয়ে নেন অমিয় বাবু। বড়ুতার গতিতে বতি পড়ে। অদৃষ্ট বকমের একটা স্থানিতে মনটা বী-বী কোরে ওঠে।

মাঝ পথেই থমকে দাঁড়ান ভদ্রলোক। অসংবত কণ্ঠে বলেন: চলুন, এবার করা যাক।

ডাঃ বঙ্গুর
মেসার্স কার্ডিয়েল
নারীর স্বাস্থ্য, শক্তি
ও সৌন্দর্য বর্ধন করে
প্রথম প্রাপ্তকারক:
ডাঃ বঙ্গুর ল্যাবরেটরী লিঃ
কলিকাতা-৯

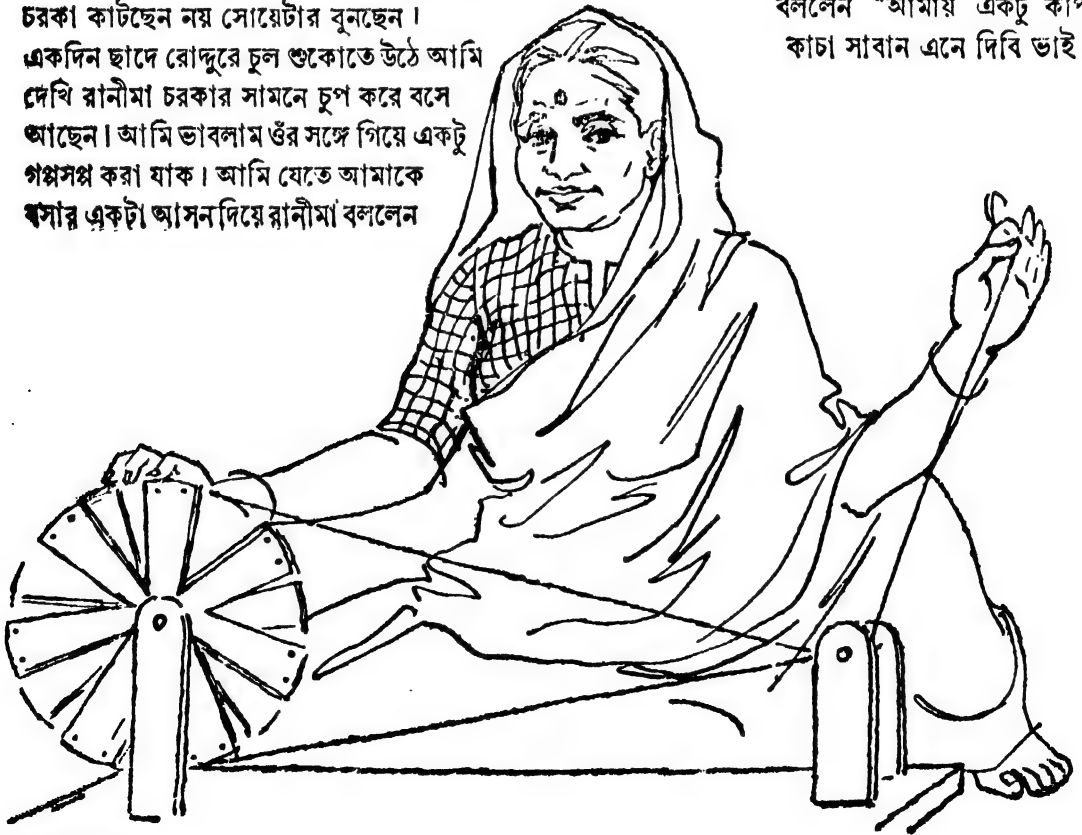


আমাদের রানীমা

আমাদের বাড়ীর কাছেই ছোট একটা বাড়ী আছে। সে বাড়ীতে থাকেন রানীমা। আমরা যখনই ছাদে উঠি দেখি রানীমা বাড়ীর উঠানে বসে হয় চরকা কাটছেন নয় সোয়েটার বুনছেন। একদিন ছাদে রোদুরে চুল শুকোতে উঠে আমি দেখি রানীমা চরকার সামনে চুপ করে বসে আছেন। আমি ভাবলাম ওঁর সঙ্গে গিয়ে একটু গল্পসল্প করা যাক। আমি যেতে আমাকে বসার একটা আসন দিয়ে রানীমা বললেন

“দাখ, আমি না হয় মুখাস্থা মানুষ তাই বলে আমি কি এতই বোকা যে আজ্ঞে বাজ্ঞে কিছু বুঝিয়ে দিলেই বুঝব? রাশিয়া নাকি আকাশে একটা নতুন নক্ষত্র ছেড়েছে আর তার মধ্যে নাকি একটা কুবুরি গোরা! হাঁ : যত সব—”।

আমি যখন রানীমাকে স্পুটনিক আর লাইকা সম্বন্ধে সব কিছু বুঝিয়ে বললাম রানীমা একেবারে হতবাক বললেন “আমায় আর একটু খুলে বলতো, আমার মাথায় অত চট করে কিছু ঢোকে না।” রানীমা কিন্তু সেটা বললেন নেহাৎই বিনয় করে। বুদ্ধিসুদ্ধি ওঁর বেশ ভালই আছে। ছেলে মেয়েরা যখন চৈটিয়ে ওঁদের গড়া মুখস্ত করে উনি তখন ওঁদের মানারকম প্রশ্ন করে নানা বিষয়ে জেনেছেন। অন্যান্য মহিলাদের মত বাঁধাধরা গতে চলতে উনি মোটেই রাজী নন। সেদিন আমি যাচ্ছিলাম কেনাকাটা করতে। রানীমা আমায় বললেন “আমায় একটু কাপড় কাচা সাবান এনে দিবি ভাই?”



আমি অভ্যাস বশে ফিরে এলাম সানলাইট সাবান কিনে। রানীমা সানলাইট সাবান দেখে অনেকক্ষণ প্রাণ খুলে হাসলেন তারপর বললেন—“এত দাম দিয়ে সাবান কিনে আনলি; কিন্তু আমাদের বাড়ীতে সিল্কের জামাকাপড় তো কেউ পরেনা!”

“কিন্তু রানীমা, আমার বাড়ীতে সব জামাকাপড়ই কাটা হয় সানলাইট সাবান দিয়ে।” রানীমা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে দীর্ঘনিশ্বাস

ফেলে বললেন—

“বোনটি তুই বোধ হয় আমাদের বাড়ীর অবস্থা জানিসনা।

আমরা এত দামী সাবান দিয়ে জামাকাপড় কাচব কি করে?”

আমাকে তাড়াতাড়ি ফিরতে হোল বলে ঠুকে সব কথা বুঝিয়ে বলতে পারলাম না।

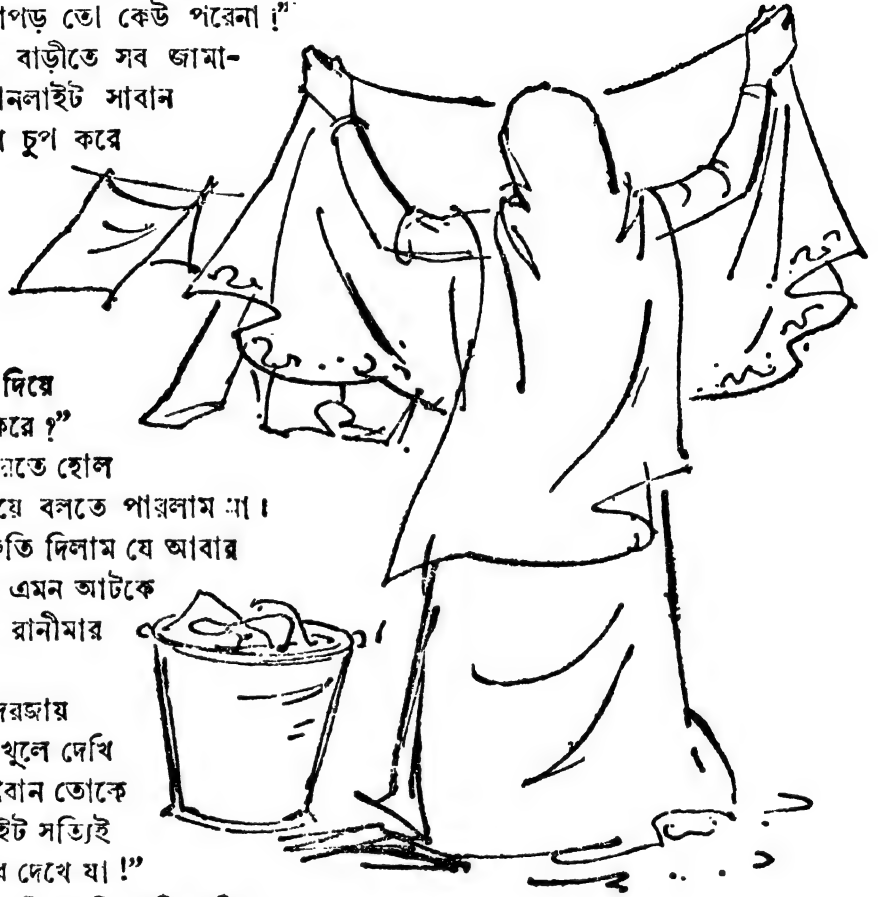
আমি রানীমাকে প্রতিশ্রুতি দিলাম যে আবার ফিরে আসব কিন্তু কাজে এমন আটকে গেলাম যে আমার আর রানীমার কাছে যাওয়াই হোলনা।

বিকলে আমার বাড়ীর দরজায় কড়া নড়ে উঠল। দরজা খুলে দেখি রানীমা। বললেন—“ভগবান তোকে আশীর্বাদ করুন। সানলাইট সত্যিই আশ্চর্য্য সাবান। একবার দেখে যা!”

রানীমার উঠানে গিয়ে দেখি সারি সারি পরিষ্কার, সাদা, উজ্জ্বল কাপড় টাঙানো—যেন একটা বিয়ের মিছিল চলেছে। রানীমা আমার কানে কানে বললেন—“আমি এত কাপড়জামা ধুয়েছি কিন্তু এখনও কিছুটা সাবান বাকী আছে...এ সাবানটা দামী নয়, মোটেই নয়—বরং সস্তাই।”

রানীমা বসে পড়লেন, তারপর বললেন “আমাকে একটা কথা বল তো। আমি শুনেছিলাম সানলাইট দিয়ে কাচার সময় জামাকাপড় আছড়াতে হয়না। সেই জন্যে আমি শুধু সানলাইটের ফোণায়

ঘষেই জামাকাপড় কেটেছি...তাতেই জামাকাপড় এত পরিষ্কার আর উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে...হ্যাঁ কি যেন বলছিলাম, আচ্ছা বলতো সানলাইট সাবান এত



ভাল হোল কি করে?” আমি রানীমাকে বোঝালাম—“রানীমা, সানলাইট সাবানটি একেবারে খাঁটি; তাই এতে ফোণা হয় প্রচুর। আর এ ফোণা কাপড়ের সূতোর ভেতর থেকে লুকোনো ময়লাও টেনে বের করে।”

“ও! এখন বুঝেছি সানলাইট দিয়ে কাচলে জামাকাপড় কি করে এত তাড়াতাড়ি এত পরিষ্কার আর উজ্জ্বল হয় ওঠে। আর সানলাইটে কাটা জামাকাপড়ের গন্ধটাও আমার পরিষ্কার পরিষ্কার লাগে।” কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে রানীমা বললেন—“এবার কি বলবি বল। আমার হাতে অনেক সময় আছে।”



মণিকা দেবী এক মুহূর্ত তাঁর চোখের দিকে ফিরে দেখেন।
তারপর বলেন : বেশ চলুন।

দিনগুলো বেশ ভালই কেটে যাচ্ছে অমিয় বাবুর। সরকারী কাজ—সে সামান্যই। হাতে রয়েছে অফিসের অবসর। আর রয়েছে সবাইখানার নির্জন একটি কক্ষ আর তার অভ্যন্তর পাঁহাড়ী একটি মেয়ের উদ্যম সাহচর্য।

প্রথম প্রথম নিজের ওপর ক্রুদ্ধ হোয়ে উঠছিলেন ভক্তলোক। মনে হোয়েছিল, জেনে-জেনে একটা কল্যাণকে তিনি প্রত্যাশ দিয়ে যাচ্ছেন। ইহানী সে সব চিন্তা দূরে সরিয়ে দিয়েছেন। জ্ঞান-নীতির হিসাব—সে তোলা থাক লোকালয়ের জন্তে। এখানে, এই বস্তুর পরিবেশে তা নিয়ে মাথা না ঘামালেও চলেবে।

মাথা তাঁকে মাঝে মাঝে কিছু ঘামাতে হোচ্ছে। না ঘামিয়েও উপায় নেই। হেতু—মণিকা দেবী। অথচ মজা এই, হুজুনেই হুজুনের ব্যবধান বাঁচিয়ে চলেতে সমান ভাবে উৎসুক।

মণিকা দেবী যদি এ পথে হাঁটেন—অমিয় বাবু দশ কদম দূরত্বকে পাশ কাটান। নড়তে খাবার টেবিলটা হুজুনের কেউই ব্যবহার করেন না, কোরলেও সময়টা হুজুনেই বদলে ফেলেছেন। তবু কি যে হয়। কখন কোন অন্তর্ক মুহূর্তে হয়তো পাশ ফিরে তাকালেন অমিয় বাবু। দেখলেন এক জোড়া চোখের দৃষ্টি স্থির ভাবে তাঁর মুখের ওপর নিবদ্ধ। হয়তো কোন রাত্রে কুকুম্বী এসেছে তাঁর ঘরে। বসেছে তাঁর শয্যার ওপর। মাথাটা এগিয়ে দিয়েছে তাঁর কাঁধে। রোমন্থ ভারী হাতের মোটা মোটা আঙুলগুলো দিয়ে শুনি নিঃশব্দে জরীপ করে যাচ্ছেন তার সর্বাঙ্গ—হঠাৎ নজর গিয়ে পড়লো উঠানের দিককার জানালাটার দিকে—যেখানে অলঙ্কার এক জোড়া তীক্ষ্ণ চোখের দৃষ্টি—অমনি হাতটা সংকোচে গুটিয়ে নিতে হয় ; ঠেলে সরিয়ে দিতে হয় কুকুম্বীকে। কুকুম্বীর চোখ বোজা রোমাঞ্চিত দেহ আপত্তি ভরে হাতটাকে টেনে স্বস্থানে নামাতে চায়—কিন্তু অমিয় বাবুর আর এক ইঞ্চি অগ্রসর হবার প্প্হা নেই। কমতাতও নেই।

বাইরে বেরিয়েও স্বস্তি নেই। মণিকা দেবীর চোখের দৃষ্টি তাঁকে অহরহ অনুসরণ কোরে চলেছে।

কাজে গিয়ে মুখ নেই। ডেরার কিংবা শান্তি নেই। সন্ধ্যার অন্ধকারে কুকুম্বীর হাত ধরে নদীর ধার পর্যন্ত গিয়ে মনের এই অসহ অবস্থাকে একটু যে মুক্তি দিবেন ভক্তলোক—তার পর্যন্ত অবসর দিচ্ছেন না ভক্তমহিলা।

হাটহাড়া এক দৃষ্টির দ্বন্দ্বনে পুড়ে পুড়ে শেষ হোতে লাগলেন ভক্তলোক।

অবশেষে তিনি ছুটির দরখাস্ত কোরলেন। কয়েক দিনের জন্তে স্থান পরিবর্তন একেবারেই অপরিহার্য হোয়ে উঠেছে।

সরকারী ছুটি মঞ্জুর হোল। ক্যান্সাদ বাথলো কুকুম্বীর কাছে ছুটি মঞ্জুর করাতে গিয়ে। কৈদে, ককিয়ে, মাথার দিবি দিয়ে রীতিমত একটা বিয়োগান্ত নাটকের ব্যাপার কোরে তুললো মেয়েটা। শেষে বোললে : আমি জানি তুমি কেন যাচ্ছ। যাচ্ছ ওই বুড়ী ডাইনীর ভয়ে। আমি ওটাকে খুন করবো। ও তোমার লোহ খেতে চেয়েছিল—এবার আমি ওর লোহ খাবো।

অনেক কষ্টে কুকুম্বীকে শান্ত কোরতে হয় অমিয় বাবুর।

পরদিন সকালে অমিয় বাবু বাত্মা কোরলেন। জিনিসপত্র বাঁধা হোয়ে গেছে। বাইরে সরকারী জীপ অপেক্ষা কোরছে তাঁকে টেনশন পর্যন্ত নিয়ে বাবার জন্তে।

শেষ বারের মতো কুকুম্বীর মাথার গায়ে হাত বুলিয়ে, অনেক 'কিরা' আর শপথ উচ্চারণ কোরে, অমিয় বাবু বেরিয়ে এসে জীপে উঠতে গিয়ে দেখেন—মণিকা দেবী ভেতরে বোসে সহাস্তে তাঁকে সন্তোষ জানাচ্ছে : আশ্বিন, বড় দেবী কোরে কেললেন। মাইল পনেরো পথ তো ভাগতে হবে।

অমিয় বাবুর বিষয় সীমা ছাড়িয়েছে। খতিয়ে বলেন : আপনি।

—হ্যাঁ, আমিও আজ ছুটি নিয়ে বাড়ী যাচ্ছি। হাসিমুখেই বলেন মণিকা দেবী : ছুটি কি সহজে পাওয়া যায় ? গবর্ণমেন্টের ব্যাপার। জানেন তো সব। তারপর ছুটি যদি বা পেলাম, ভেবে যদি—এতখানি পক্ষ এক-এক যেতে হবে। নির্যাসে ভ্রূ ছুটো নাচিয়ে বলেন : কিন্তু কি বিচিত্র যোগাযোগ দেখুন ! আপনিও ছুটি নিয়েছেন, আর ঠিক আমার সঙ্গেই একদিনে বাত্মা কোরলেন। কিন্তু আপনি আর দেবী কোরলেন না। গাড়ীতে উঠে পড়ুন। ডাইতারের দিকে একটু চেপে বোসে অমিয় বাবুর বদবার জায়গা কোরে দেন মণিকা দেবী। কলহাস্তে বলে ওঠেন : ট্রেন মিস কোরতে চাই না বাপু।

নিঃশব্দে অমিয় বাবু গাড়ীতে ওঠেন। ডাইতার ঠাঁট দেয়। অমিয় বাবু সামনের উঁচু-নীচু পথের দিকে চোখ মেলে বসে আছেন। সবাইখানার দরজার বাপের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে কুকুম্বী। তার হুচোখে নির্বোধ দৃষ্টি। অমিয় বাবু আর ওদিকে ফিরে তাকান না।

একটি জার্মান কবিতা

(বোসক ফন আইশেনদর্ক)

বেন মনে হয় আকাশ
পৃথিবীকে নীরবে করেছে চূর্ণ,
আর পৃথিবী রক্তিমছাতিতে
আকাশের স্বপ্নে হয়েছে বিভোর।
বাবু বয়ে চলেছে প্রান্তরের উপর দিয়ে
কানে এসে লেগেছে তার বৃহৎ দোলা,

বেন বনে উঠেছে বৃহৎ-মরুর
নক্ষত্রখচিত আকাশ হয়েছে উজ্জ্বল।
আর আবার স্বপ্ন মেলেছে
দূরান্তে তার পাখা
চলেছে উড়ে স্বপ্ন প্রান্তরের উপর দিয়ে
বেন সে চলেছে কিংবা ঘরে।

অনুবাদ—ইন্দিরা চট্টোপাধ্যায় ও মানস রায়।

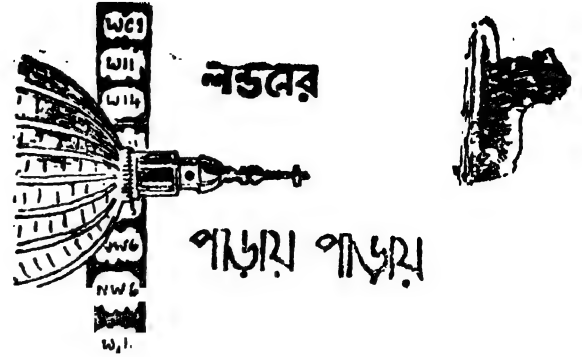
বুঝে নই টিভেনসনের একটি গল্প আছে—সেটি এখন পৃথিবী
বখ্যাত। গল্পটির নাম উত্তর জেকিল অ্যান্ড মিষ্টার হাইড।

একই লোকের কান্ডিনী। ওষুধ খেয়ে উত্তর জেকিল হ'তেন মিষ্টার
হাইড। উত্তর জেকিল ভয়, ক্রোধ মিষ্টার হাইড পিষাচ। একই
মানুষের মনের মধ্যে এই দু'রকমের ভাবই আছে। উত্তর জেকিল
দয়ার অবতার, ক্রোধ মিষ্টার হাইড খুনে। ব্যাপারটা একটু
অস্বাভাবিক মনে হয়, একই লোক কেমন করে তার চেহারা পর্যন্ত
ওষুধ খেয়ে পালটে ফেলতে পারে? কিন্তু বীরা লগুনে অস্বস্ত এক
বছর থাকেন তাঁরা বুঝতে পারেন যে তা সম্ভব। গ্রীষ্মকালের লগুন
প্রকৃতির রূপসাজ, ফুল গাছের সবুজ পাতায় মৌমাছির গুঞ্জন,
খোলা হাওয়ার খিয়েটায়ে, টেমস নদীর ধারে, হাইড পার্কে বা
রীজেন্স পার্কের কনসার্টে, বিদেশী লোকের গল্পগুজবে হাসিতে
লগুনের একরকম সাহা ক্রিয় নীতকালে লগুন বদলে যায়।
উত্তর জেকিল যেমন বীডংস হয়ে মিষ্টার হাইডের রূপ গ্রহণ করে
লগুন তেমনি হয়ে পড়ে।

ঠাণ্ডা, শ্রো, তুষার-গলা জল, তার সঙ্গে ধূলা মিশে কান্ডার
সৃষ্টি হয় কিন্তু সেগুলো সহ্য করা কঠিন নয়। সহ্য করা কঠিন
লগুনের কুয়াসা। সে কুয়াসা দার্জিলিংয়ের সাদা কুয়াসা নয়।
লগুনের কুয়াসার রঙ হলুদ। কুয়াসার বাস খেমে যায়, ট্রেন চলা
বন্ধ হয়, এয়ারোপ্লেন নামতে পারে না। এই ধোঁয়া আর কুয়াসার
ফল ফুসফুসের নানারকম ব্যাধি হয়, বহু লোক মারা পড়ে। কুয়াসা
লগুনের অভিলাপ। কুয়াসা হ'চ্ছে মিষ্টার হাইড। এই সময়
দু'স্তরের তৎপর হ'য়ে ওঠে, অন্ধকারের স্রবোগে রাহাজানি হয়
পুলিশ সেখানে নিরুশায। খুব শক্তিশালী আলোও কয়েক গজ
দূর থেকে দেখা যায় না। চঠাৎ কুয়াসার আটকে পড়া বাসগুলি
চলে ধীরে ধীরে—সামনে কণ্ঠটির মশাল খেলে চলে। তাতে পথ
দেখা যায় না, কিন্তু মশালটা একটু চোখে পড়ে।

এমন কুয়াসা বেশিখন থাকে না। সাধারণত: আট দশ ঘণ্টা
বা একদিনের মধ্যেই চলে যায়। কিন্তু ১৯৫২ সালের ডিসেম্বর
মাসের কুয়াসা লগুনে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল। এর ফলে প্রায়
চার হাজার লোক মারা পড়ে দম বন্ধ হয়ে। এর স্বাধি ছিল
ভিনদিনের বেশি। পোক, ভাড়া, শূরোরদের প্রদর্শনী হচ্ছিল
তখন লগুনের অলিম্পিয়া হল (এখনমোর রোডের খুব কাছে)।
কয়েকটি পোক ভাতে মারা পড়ে। হাজার হাজার গাড়ি লোকেরা
রাস্তার ফেলে চলে যায়, অফিসে লোকেরা দেরি করে আসে, কোন
লোক বাড়ী থেকে বের হ'তেই ভয় পায়। এই ধরনের কুয়াসার
নতুন নামকরণ হয়েছে smog—Smoke এবং fog এর
সমন্বয়। Smokeই বেশি বলে মনে হয়। কুয়াসা সম্পর্কে
প্রচুর কথা হ'য়েছে লগুনে। চার্লস ডিকেন্স কুয়াসার অদ্ভুত বর্ণনা
দিয়েছেন। টি. এস. এলিয়ট কুয়াসা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন।
আবহাওয়া বিশারদেরা কুয়াসার পূর্ণাভাব খবরের কাগজে, রেডিওতে
প্রচার করেন। বার বার প্রচার করা হয় রেডিওতে: কুয়াসা
আসছে...সাবধান।

কুয়াসা কেমন করে আসে? একবার তাও দেখেছিলাম। আমি
এবং নটরাজ শর্মা শেকার্ডস বুথ থেকে বাড়ী ফিরছি ইঁটে। রাজি
তখন বায়োটা। দু'ঘণ্টা তিন মাইলের বেশি। বাস সমস্ত চলে



[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

হিমালীশ গোস্বামী

গিয়েছে, টিউব বন্ধ হয় হয়। পরদিন ছুটি, অতএব নিশ্চিত্তে আমরা
কোন এক বিষয়ে আলোচনা এবং তর্ক-বিতর্ক করতে করতে পথ
হাটছিলাম। কিছুদূর এভাবে হাটবার পর নটরাজ হঠাৎ উত্তেজিত
হয়ে বললো, ঠপ! ঠপ!

অর্থাৎ আমার মতামত তার সহ্য হচ্ছিল না। আমার মত
গ্রহণীয় নয় একেবারেই, অতএব ঠপ! অর্থাৎ, অমন কথা বলা
বন্ধ করো!

কিন্তু ঠিক সেই সময়ে একটি ট্যাক্সি বাচ্ছিল—শরীর উত্তেজিত
হয়ে হাত নেড়ে ঠপ! ঠপ! বলাতে ট্যাক্সি খেমে পড়ল।
শর্মা হঠাৎ কেমন শান্ত হয়ে গেল। এমন সময় এমন একটা কাণ্ড
সে আশা করেনি। ট্যাক্সিতে গেলে দশ মিনিটে বাড়ী পৌঁছে
যাব, এবং এত কম সময়ে তর্কের কোন মীমাংসা হবে না মনে
করে দু'জনেই দমে গেলাম। কিন্তু তবু আমরা ট্যাক্সিতে বসলাম।
ট্যাক্সিওয়ালাকে হত্যাশ করতে ইচ্ছে হ'ল না।



কুয়াসা (খুব ঘন নয়)

ট্যান্ডিতে আমরা আর মিনিট উঠছি মাত্র, ট্যান্ডি অল্প একটু চলছে হঠাৎ ট্যান্ডি একেবারে আবাতট টার্ন! এঞ্জেলার রোড চওড়া ছিল—ডাইভার অতিক্রমে ট্যান্ডি ঘুরিয়ে নিয়েছে। ট্যান্ডি ডাইভার বললো : নেমে পড়—আমি বাব না।

নটরাজ আমাকে বলল, ব্যাটা মদ টেনেছে নিশ্চয়?

আমি ট্যান্ডি ডাইভারকে বললাম, নামব না।

ডাইভার বললো, ব্লাইমি। (কী বিপদ!) কুয়াসা আসছে—তার ভেতর দিয়ে গাড়ি বাবে না।

আমরা আবার ফুটপাথে দাঁড়ালাম। বলতে হয় পথে বসলাম, কারণ একটি ঘন কুয়াসার দেওয়াল আমাদের ঘিরে ফেলল। ট্যান্ডি ডাইভার পাশে গেল বিদ্যুৎ গহ্বিতে।

কুয়াসার দেয়ালটা এল আস্তে আস্তে। এসে আমাদের ঘিরে ফেলল। আলোকিত জায়গাটি হঠাৎ এক দুহুর্তে অন্ধকার হয়ে গেল। তর্ক ভুললাম।

এবার?

নটরাজ শরী উবেগের সঙ্গে বললো, এবারে আর বাড়ীতে পৌঁছানো বাবে না। কিছু দেখা যাচ্ছে না। এ কুয়াসা কখন বাবে কেউ কখনো বলতে পারে না।

আস্তে আস্তে ফুটপাথ দিয়ে হাঁটছি। লগুনের ফুটপাথ কোলকাতার মত নয়, প্রতি দু ফুট দূরে সেখানে গর্ত খুঁড়ে রাখা হয় না...ব্যাংকারটা খুব আশ্চর্যজনক বসেই এখানে উল্লেক করলাম। অনেকেই এঞ্জেল ইংরেজদের বুঝতে পারেন না। ফুটপাথে যদি গর্ত না থাকবে তাহলে আদৌ ফুটপাথ রাখা কেন? কিন্তু ঐ কোন পরিবেশে মানুষ নিজেকে মানিয়ে নেয়, শুধু গর্তহীন ফুটপাথকেও আমরা মানিয়ে নিয়েছিলাম। নিতে বাধ্য হয়েছিলাম। আমরা হাঁটছি। সে পথের শেষ নেই বলেই মনে হল। আলো, স্ক্রিনসনের জ্বালায় glimmered like carbuncles—বোধ হয় মিনিট পোনোরো চলেছি। এমন সময় হঠাৎ কানে এল কথাবার্তার আগওয়াজ।

এই রাত দুপুরে হঠাৎ তা অসম্ভব বলেই মনে হল। একটু এগিয়েই বুঝতে পারলাম যে ব্যাংকারটা স্বাভাবিক। একটা সারারাত খুলে রাখা 'স্ন্যাকবার' সেট—তাতে প্রচুর লোকের সমাবেশ। প্রত্যেকেই বিশ্বাস চা খাচ্ছে আর কাশছে। কাশছে অবশ্য কুয়াসার জ্বালা। সেখানে আমরাও দাঁড়িয়ে পড়লাম আর বিশ্বাস চা খেতে লাগলাম। বিশ্বাস না হলে সম্ভবত ইংরেজরা সেটাকে চা বলেই মনে করে না।

সেখানে ছ-চার জন লোকের সঙ্গে আলাপ হল। বিশেষ ইংরেজরা ফুলে যায় যে জাত হিসেবে তাদের গভীর থাকবার কথা, আলাপ না করিয়ে দিলে কথা বলা উচিত নয়। তারা তখন প্রগলভ হয়ে ওঠে—কথা কইতে শুরু করে। খুব খারাপ আবহাওয়া, তাই নয়?—এক জন পর্যটকগিরি বছরের বুক জিজ্ঞেস করলো আমাকে। পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত বা অনেক সময় পঞ্চাশ বছর বয়সের আমাকে। লোকও বিলেতে ইয়ং ম্যান। আমি উত্তর দিলাম, না বেশ ভালই ত লাগে এই রকম আবহাওয়া। শুনে ইংরেজরা আর কথা বলল না। লগুনের আবহাওয়াকে খারাপ না বললে যে চটে না সে ইংরেজই নয়।

ব্যাংকারটা বুঝতে পেরে ভয়লোকের কাছে প্রচুর কথা প্রার্থনা করলাম। বললাম, লগুনটা নরকের সমান। এমন আবহাওয়া শরতাবসেরই কেবল পছন্দ হ'তে পারে। এই শুনে ইংরেজটি বজায় ধুসি। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি পাকিস্তানী? আমি বললাম, না আমি ইণ্ডিয়ান।

প্রায়ই এমন প্রশ্নের জবাব দিতে হয়েছে। পাকিস্তান ব্যাংকারটা বহু ইংরেজ ঠিক বুঝতে পারে না। তাদের ধারণা ৬-৮টি একই দেশ। ভারতীয় মানেই পাকিস্তানী, পাকিস্তানী মানেই ভারতীয়। আমরা বলি, তাই ছিল বটে কিন্তু এখন আর তা নেই। এখন ভারতবর্ষ ছোট হ'য়ে গেছে—সমস্তা আরো বেড়েছে। সীমান্ত-সমস্তা, জলসমস্তা ইত্যাদি।

ঘন কুয়াসায় পথ চলা যায় না, অথচ বাড়ীতে পৌঁছতেই হয়। আমি এবং নটরাজ বাড়ীর পথ খুঁজতে আবার চেষ্টা করলাম স্ন্যাকবার থেকে বেরিয়ে। কিন্তু হাঁটাই সার হল। কয়েক ঘণ্টা এদিক-ওদিক ঘুরলাম—একই পথ ধরে কত যে ঘুরপাক খেলাম তার তার সংখ্যা নেই। অবশেষে রাস্তার ধারের একটি বেঞ্চে শ্রান্ত হয়ে বসে বসে ঘুঘুতে লাগলাম। পরদিন সকালে কুয়াসা কেটে যাওয়াতে দেখতে পেলাম আমরা বাড়ী থেকে মাইল খানেক দূরে একটা কবরখানার কাছে বসে আছি। এই কবরখানাটির গায়নে লর্ডস ক্রিকেট গ্রাউন্ড।

কুয়াসার অনেক গল্প আছে। চুরি ডাকাতি রাহাজানি ছাড়াও অল্প গল্প। গভীর কুয়াসায় গাড়ি সব আস্তে আস্তে চলেছে। একটি গাড়ি অল্প গাড়ির পেছনের আলো দেখে এগুচ্ছে আস্তে আস্তে। হঠাৎ সামনের গাড়িটি থেমে গেল। অনেকক্ষণ চূপচাপ—পেছনের গাড়িচালক তখন অস্থির হয়ে উঠছে—বলছে, কী হ'ল, এখানে হঠাৎ গাড়ি থামস কেন? উত্তর এলো। গাড়ি হঠাৎ থামেনি—আমি ইচ্ছে করছি থামিয়েছি, কারণ এটা আমার গ্যারাজ।

আর একটি গল্প আছে—কুয়াসায় দিগ্ভ্রান্ত একজনকে দেখে অল্প একজন অপরিচিত লোক বললো, আপনি কোথায় বাবেন?

—আমি বাব প্যাভিটন ষ্টেশনে।

—আমার হাত ধরে এসো, আমি নিয়ে যাচ্ছি।

নানা পথ ঘুরে প্যাভিটন ষ্টেশনে পৌঁছে দিল লোকটা অতি সহজেই। অবাক হয়ে গেল লোকটি। বললে, আপনি নিশ্চয়ই এই ঘন কুয়াসাতেও স্পষ্ট দেখতে পান?

লোকটি উত্তর দিয়েছিল : না, তা নয়। এমন ভাবে যাওয়া আমার অভ্যাস আছে—কারণ আমি অন্ধ।

লগুনের বেশি পাড়ায় আমি থাকিনি। ট্যানমোর, এঞ্জেলার, মিলহিল, টটেনহাম, হারিভে, ইলফোর্ড, ব্রীলিজ, টুটিং, ক্ল্যাপাম, রিমেন্ট, উইলডন, ইলিং হেল্ডন, কেটন, পপলার ইত্যাদি কত পাড়া যে আছে তার হিসেব নেই। লগুনে সাতাশ হাজার বেশি রাস্তাই আছে—রাস্তাগুলির নাম প্রচুর পরিমাণেই বিশেষ। আবিসিনিয়া রোড, অ্যারিস্টটল রোড, বাটাভিয়া রোড, ব্যাভেরিয়া রোড, বেঙ্গল রোড, বেরমুডা স্ট্রীট, বর্নিও স্ট্রীট তো আছেই, এমন কি মস্কো রোড পর্যন্ত আছে। মস্কো রোডটি বেঙ্গলিয়াটার টিউব ট্রেনের কাছেই। সেখানে আমি জাহাজীর আংকলসেরিয়ার সঙ্গে একটি লাবে যেতাম। জাহাজীর জাতে পাশি, ধর্ম কমিউনিষ্ট-বিরোধী।

অভিনয় করার দক্ষতা ছিল, বি. বি. সি-তে টেলিভিশনে কিছু অভিনয় করেছে। কিন্তু তার কমিউনিষ্ট এবং কমিউনিজম সম্পর্কে এত ঘৃণা ছিল যে মন্ত্রী বোডে কখনো যায়নি। এই রাজ্যটির হোয়াটস বাঁচিয়ে চলবার জন্য সে অপর দিকের ফুটপাথ দিয়ে যেত। আমরা তাকে এই বাপারে খুব ঠাটা করতাম। বলতাম, জাহাঙ্গীর, একটি ফ্যাট পাওয়া যাচ্ছে, ছুখানি ঘর—ঠাণ্ডা জল গরম জল সব পাওয়া যায়, নিজস্ব ফোন আছে, কার্পেট দেওয়া মেঝে ভাড়া মাত্র তিন পাউণ্ড। ফ্যাটটা নেবে?

জাহাঙ্গীর বলতো, নিশ্চয় নেব। কোথায়?

—মন্ডো বোডে।

জাহাঙ্গীর তা শুনে মারতে আসত। বলতো, এমন ঠিকানায় আমি কিছুতেই থাকব না।

লণ্ডনের প্রতিটি পাড়ার বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন আছে প্যারিসে বাগিনে বা কোলকাতায়। কিন্তু চার্চ এবং মন্দের দোকান সর্বত্রই এক রকম মনে হয়েছে। চার্চগুলি সংখ্যায় এত বেশি কেন তার অর্থ প্রথমে বুঝতাম না, পরে বুঝেছি। চার্চগুলির মধ্যেও জাতিভেদ প্রচুর। ক্যাথলিক চার্চ, মেথডিস্ট চার্চ, চার্চ অফ ইংল্যান্ড, প্রটেস্ট্যান্ট ইত্যাদি নানা জাতের চার্চ আছে। কিন্তু মন্দের দোকানে যেমন বিক্রি কমছে বিশেষ করে বীয়ার, তেমনি চার্চেও লোকে কম যাচ্ছে। বেকার না হলে চার্চে বাবার কি প্রয়োজন আছে? চার্চে অগু গিয়ে এককালে প্রচুর লোকে বিয়ে করত, এখন তা কম যাচ্ছে। চার্চের বদলে হয় টাউন হল। চার্চগুলির আয় হয় সব চেয়ে বেশি তখন, যখন দেশের লোকেরা বেশি মাত্রায় বেকার হয়। বেকার হলে লোকে দুর্বল হয়ে পড়ে, বলে, ভগবান আমাদের একটা চাকরী দাও। চার্চে গিয়ে রীতিমত প্রার্থনা শুরু করে। অবস্থা খুব খারাপ হলে হত্যে দিয়ে পড়েও থাকবে হয়ত কাতারে কাতারে লোক। ওজ্ঞ চার্চের বীরা মোহাম্মদ তাঁরা চান যাতে দেশের অবস্থা খুব খারাপ হয়। আয় তাহলে বেশি হয়। শিক্ষিত হওয়াটাও তাই গট পছন্দ করে না। কারণ শিক্ষিতেরা বড় অনুবিবেচনক প্রেরণ করে বসে।

একটি অসম্ভব জিনিস আমার চোখে পড়েছে। একজন লোক বিনা চিকিৎসার বা কতৃপক্ষের অবহেলায় এদেশে মারা পড়লে তা নিয়ে এমন হৈ-চৈ করে ওঠে লোকেরা যে তা একজন ভারতীয় হিসেবে বাড়ি বাড়ি বলে মনে হয়। এর ফলে গবর্ণমেন্ট সন্তুষ্ট হয়ে ওঠে, গভর্ণমেন্ট জনসাধারণের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, এমন যাতে আর না হয় তার ব্যবস্থা করে। এতে গণতন্ত্রের দুর্বল দিকটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সামান্য মানুষের অবহেলায় মৃত্যুর জন্য যদি গদি ছাড়তে হয় তাহলে সে দেশের লোকেরা নিতান্তই কিছুত তাতে আর সন্দেহ কি। লোকেরা না খেয়ে রাতারা পড়ে থাকবে, বুড়িতে, কাদায়, জলে বিনা চিকিৎসার বহু লোক মরলেও আমাদের দেশের গভর্ণমেন্ট কেমন টিকে থাকে। এ যে শক্ত গভর্ণমেন্ট তাতে আর সন্দেহ কি। ইংরেজদের উচিত আমাদের দেশে এসে এসব শিখে যাওয়া। আমাদের দেশের রীতিকে আদর্শ বলে গ্রহণ করা। কিন্তু ইংরেজের কি শেখবার মত সামান্য মাত্র বুদ্ধিও আছে?

লিওকীড গার্ডসে আমরা প্রায় এক বছর ছিলাম। মিসেস হুইসের পোশাক বা চরিত্র ওর মধ্যে পরিবর্তন হয়নি। আমাদের

ভাড়াটে হিসেবে পেয়ে তাঁর ভাড়া লাগত। কিন্তু তাঁর ছেলে হলফোর্ড হঠাৎ স্থির করল আমাদের এই বাড়ীতে সে অন্য একটি ভাড়াটেকে আনবে। তারা নাকি আরো বেশি ভাড়া দিতে রাজি হয়েছে। আমরা নোটস পেলাম অতএব। আমরা কালো বলে নয়। বারা টাকার দাম বোঝে তাদের কাছে কালো সাদার ভেদ না থাকারই কথা।

কালো সাদার সম্পর্কে ইংল্যান্ডে নতুন করে চিন্তা করা হচ্ছে। ক্যাসিটি মোসলের দল ব'লছে, ব্রুটনকে সাদা রাখো। আন্দোলন করছে, বিজ্ঞাপন দিচ্ছে যেন তেন প্রকারেণ তাদের মারতে হবে। প্রয়োজন হলে বলপ্রয়োগ করতেও এরা উদ্বাসিত দেয়।

খুবই খারাপ। কিন্তু এ বাপারে ভারতীয়রা খুব আনন্দ পায়। গায়েবরা যে ভারতীয়দের কালো মনে করে না এতে তারা খুব খ্রীত। নিগ্রোদের জন্য খুব কম ভারতীয়ই সহানুভূতির সঙ্গে কথা বলে। কালোবিরোধী আন্দোলন হলে ভারতীয়রা বড়জোর বলে, কী বিপদ আমাদের জন্য আমাদেরও কেব বিপদ হয় কে জানে।

মামা, অর্থাৎ কালো আফ্রিকান বা জামাইকান। বাঙালীর আবিষ্কার এই কথাটি ব্যঙ্গ করে আফ্রিকানদের বিরুদ্ধে বলা হয়। সাধারণদের জন্য নাচ ঘরে ভারতীয়রা সহজে যেতে চায় না, তারা নাচের বিরুদ্ধে বলে নয়, বা তাদের মেয়েদের সঙ্গে মিশবার ইচ্ছে নেই বলে নয়, কারণ সে সব নাচ ঘরে আফ্রিকানদের বাতায়ত।

কেবল বাতায়ত নয়—আফ্রিকান ছেলেদের সঙ্গে ইংরেজ মেয়েরা বেশি নাচতেও চায় কারণ সাধারণত তারা নাচতে জানে, ভারতীয়রা নাচতে জানে না তেমন।

কালোর বিরুদ্ধে আফ্রোশ ভারতীয়দেরই বেশি, সেটা আমি বিশেষ করেই লক্ষ্য করেছি। দিল্লিতে চার জন আফ্রিকান ছাত্রও দেখেছিলাম আমাদের ঘোরতর কালোবিদ্বেষ।

আফ্রিকানদের মামা বলা তাই আত্মীয় সম্বন্ধে নয়। কথাটি মাউ মাউ নামক আফ্রিকার অসুন্নত সম্প্রদায়কে ব্যঙ্গ করেই তৈরী।

লণ্ডনে গিয়ে যখন ল্যাণ্ডলেডি কালো রঙ বলে কোন ভারতীয়কে ফিরিয়ে দেয় তখন রাগ না করে এই কথাটি যেন মনে রাখেন।

বর্ণবিদ্বেষ আমাদেরও কম নয়। এর পর যে বাড়ীতে গেলাম এবং তারপর আরো পাঁচ বছর ধরে কোন কোন বাড়ীতে কেমন ভাবে ছিলাম তার ইতিহাস বলবার ইচ্ছে রইল। আপাততঃ আমার কাহিনী এখানেই শেষ করছি। কারণ অনেক কিছু বলা হলোও অনেক কিছু বাকি থেকে যায়। অতএব আসলে কাহিনীর কোনদিনই শেষ হয় না। আমি হু—একজন জহ্ন-লোককে জানি তাঁরা ইংল্যান্ড আমেরিকা সম্বন্ধে হু—একটা কথা, কথাপ্রসঙ্গে না বলে পারেন না। একজন বলেন, যখন লণ্ডনে ছিলাম

MOSCOW
ROAD
2

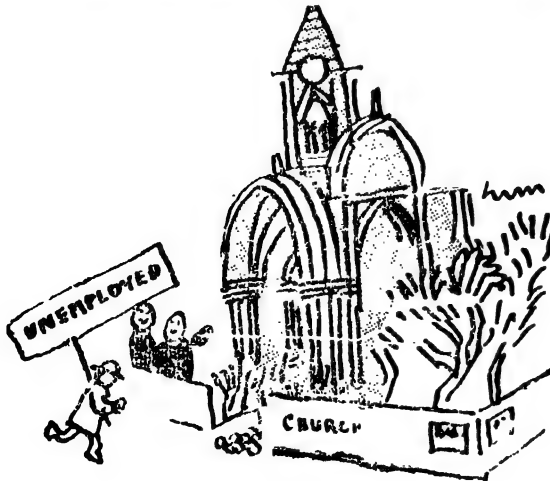


আংকেল সেরিয়া

তখন খুব একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছিল। বলে একটি ঘটনা শোনান। তাঁর সঙ্গে বহুদিন এর আগে দেখা হ'য়েছে অথচ সেই আশ্চর্য ঘটনাটি আগে বলেননি। আগে তাঁর মনে পড়েনি। খুঁই স্বাভাবিক। আমি কাহিনী বলতে গিয়ে দেখছি ব্রেনিম ক্রেসেন্ট সম্বন্ধে হতুত আরো অনেকখানি বলা যেত। এজন্যের রোডেও তো আরো কত কি ঘটেছে সেগুলো বলা হ'ল না। এজন্যের রোডের কাছাকাছি অলিম্পিয়া একজিভিশন হল সম্পর্কেও কোন মন্তব্য করিনি। তা ছাড়া সুনীল চ্যাটার্জির ১৯৩১ সালের বিশাল এক কোর্ড গাড়িতে চড়ে লণ্ডনের পথে পথে নানা কাণ্ড করে বেড়ানো (দুর্ঘটনা করতে করতে বৈচ বাওয়ার প্রায় পঁচিশটি ঘটনা হ' ঘটায় ঘটেছিল), আর বাঁয়া বোসের নানারকম আজগুবি গল্প। বাঁয়া বোসের আসল নাম কেউ এখন জানে না—বয়স তাঁর পঞ্চাশ—বছর চল্লিশেক বিলেতেই আছেন।

লণ্ডনের সবচেয়ে ভাল লেগেছিল প্রায় অবাধ স্বাধীনতা। আর ভাল লেগেছিল এর ছুটি গরম কাল আর ছুটি বসন্ত কাল। ভাল লেগেছিল সন্ধ্যার ক্লাসগুলি। যেখানে টিচারদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ ছিল প্রচুর। ছাত্ররা ক্লাসে পাইপ এবং সিগারেট বা চুস্ট খেতে পারত। এত বন্ধুত্বপূর্ণ আবহাওয়া আমি আর কোথাও কল্পনা করতে পারি না।

ভারতবর্ষ থেকে যে ইংল্যান্ডে প্রতি বছর প্রচুর ছাত্র যাচ্ছে তার এই একটা কারণ। আরো অবগু অন্য কারণ আছে। আমাদের দেশের টিচারদের সম্বন্ধে আমাদের ভয় আছে। কিন্তু একেবারে অহেতুক বোধ হয় নয়। বুঝতে না পারলে কানমলা, টাটি, বেকের উপর ঠাঁড়ানোর ব্যবস্থা আমাদের দেশে। অতএব ছাত্ররা বুঝতে না পারলেও বলে বুঝেছি। এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে নকল করতে না পারলে টেবিল চেয়ার ভাঙে। ইংরেজরা যে সবাই খুব শিক্ষিত হয় তা নয়, কিন্তু শিক্ষিত হতে তাদের বাধা নেই। স্বাধীন বৃত্তিগুলিকে হুমড়ে ভেঙে দেয় না তারা। আমাদের দেশে শিক্ষা বলে একটা জিনিস চলে—বা বিলিতিও নয়, এদেশীয়ও নয়। একটা অদ্ভুত জগাধিচুড়ি। স্নকুমার রায় হত একটা নামকরণ করতে পারতেন। তবে বিলেতে ক্লাসে সিগারেট চুস্ট খাওয়ার জন্তই যে দেশের শিক্ষা ভাল তা বলছি না।



কিন্তু বিলিতি শিক্ষার দায়ও আছে। আমাদের দেশে বিলিতি শিক্ষা চলবে না, কারণ আমাদের দেশের সমাজ অন্তরকম। তা অনেকের বিলেতে থেকে ফিরে এসে বেশ কষ্ট পান নানা ব্যাপারে দু' তিন বছর ওখানে থেকেই এখানে এসে কাঁটা-চামচ-চুরি ছাড়া তাঁদের খাওয়া হয় না। বিলিতি খাবার বা অখাদ্য তাই শ্রেষ্ঠ বচন গ্রহণ করেন। তাঁরা কুটি মাখন দিয়ে মাসে সেদ্ধ খান বিলিতি নাচ নাচেন।

তবুও অধিকাংশ লোকেরই বিলেত দেশটা দেখা উচিত। বিশেষ আমেরিকা বা যে কোন বাইরের শিল্প উন্নত দেশে থাকলে সে দেশ সম্পর্কে একটা ধারণা করা যায়—সেই সঙ্গে ভারতবর্ষকেও তেঁা যায় ভাল করেই। ভারতবর্ষকে চেনবার জন্তই ভারতীয়দের বাইরে বাওয়া উচিত এবং বেশ কিছুদিন থাকাও উচিত। অবগু জাতি সম্মান বজায় রেখেই সেটা করা উচিত। অনেকেরই এখানে সায়ে দেখলে গদ গদ ভাবে—সে অফিসের মেসেঞ্জারই হোক বা হোটেলের কি চাকরই হ'ক। এই গদ গদ ভাবটি বতদিন না কাটবে ততদিন আমাদের উন্নতিও হবে না, চরিত্রও গড়ে উঠবে না। ইংরেজদের মধ্যে অনেকগুলি ভাল জিনিস আছে—যেমন আছে জার্মানদের মধ্যে, রাশিয়ানদের মধ্যে বা আমেরিকানদের মধ্যে, সেগুলি নিয়ে হবে—নকল নয়, গ্রহণ করতে হবে। তবে ভ্রমণ সার্থক হয়।

ইংরেজদের সাম্রাজ্যবাদী রূপের বীভৎসতা যেমন খুলে ধরতে হলে তেমনি তাদের দেশের শিল্পপ্রিয়তা, সাহিত্য, মানবিকতা বোঝাতে প্রশংসা করতে হবে। নানাদিকে বিচার করতে হবে—না সময়ে, নানা ভাবে। লণ্ডন বা প্যারিসকে বুঝতে চেষ্টা করতে হবেই—যেমন বুঝতে হবে মস্কো ওয়াশিংটন বা পিকিংকে, কি ভুললে চলবে না আমাদের স্থান কোলকাতায়, দিল্লিতে বা বোম্বাইতে—এই ভারতবর্ষে। বিলেত দেশটা সম্বন্ধে নানারকম লেখা পোরেয়েছে। নানা ভাবে নানা লোকে দেখেছেন—এ দেখা ফুরায়নি, কোনদিনই ফুরাবে না। নতুন ঘটনা, নতুন মাহুয নতুন ভাবে লিখবেন সে দেশের কথা। ইংরেজরা নিজেরা তাদের দেশ সম্পর্কে কত বই যে বার কবে তা একজনের পক্ষে পড়ে ফেলা সম্ভব নয়। নানা সমস্তার কথা, রাস্তার কথা, আলো' কথা, রোগের কথা, কালোবিষের কথা, বেকার সমস্তার কথা তারা নির্ভীক ভাবে অন্তত নিজের মত প্রকাশ করে। অন্ত দলে বলে তার মতামত প্রকাশে বাধে না। হাইড পার্কে কনসারভেটর থেকে আরম্ভ করে আন্যার্কিষ্ট পর্যন্ত সবাই বক্তৃতা দেন। লোকে প্রশ্ন করে বটে, কিন্তু বক্তাকে লক্ষ্য করে ইট ছোঁড়ে না। এ দেশে মাহুযের জন্ত নানারকম ব্যবস্থা আছে—যেমন আছে কুকুরের জন্ত। অনেকের অবাক হন এই ভেবে যে এদেশে কুকুর বিভাগে এত খাতির কেন? তাদের জন্ত এত খরচ না করে পূর্ব আফ্রিকা যে বৃটিশ প্রজা না খেয়ে মরছে বা ক্রীতদাসের মত অবস্থায় আতাকে বাঁচানো হয় না কেন? প্রশ্নটা ভাল এবং এমন প্রশ্ন করাও হয়। তার জন্ত নানারকম কাগজ রয়েছে যেমন ডেজি ওয়ার্কার, ম্যাগেট্টার গার্ডিয়ান বা নিউ স্ট্রেটসম্যান। একথা বলতে তাদের কেউ দেশদ্রোহী বলে আখ্যা দেয় না।

ইংরেজরা বক্তৃতা দিতে ভালবাসে, তার প্রমাণ পাওয়া যায় সভা সমিতির বিজ্ঞাপনে। আমাদের দেশের মত সেখানে নে

সভা প্রায় হয় না। সন্ধ্যাতে বক্তৃতা শুনে গেলে সাধারণত টিকিট লাগে। সাধারণত বক্তাদের বক্তব্য বলে কোন বস্তু থাকে। আমাদের সভার সঙ্গে তুলনা করা ভুল। আমাদের সভা সমিতিতে প্রায় সময়েই উদ্দেশ্য খুঁজে পাওয়া যায় না বিশেষ করে ববীন্দ্র জন্মতিথির সভাগুলিতে। শেখরপীয়ারের দেশে শেখরপীয়ার সম্পর্কে এত সভা হয় না, কারণ সেজ্ঞ পড়াশুনা করতে হয়। একমাত্র বিশেষজ্ঞগাই সেখানে বক্তৃতা দেন।

লগুন সম্পর্কে এ সবই হয়ত পুরনো কথা—আমাদের কাছে লগুন এখন অতি নিকটে। খুব কম লোক আজকাল পাওয়া যায় যারা লগুন বাননি বা যাবার কথা ভাবছেন না।

লগুনকে অবশ্যই ভোলা শক্ত। লগুনকে পুরো চেনা থাকনা, কিছু না কিছু রহস্য এর আছেই। বত বই-ই লেখা হোক, এর পুরো চরিত্র একদিনে ধরা পড়বে না। যেদিন পড়বে সেদিন

লগুনও পুরোনো হ'য়ে যাবে। তাই লগুনকে চেনাবার উদ্দেশ্য আমি কিছু লিখছি—সে চোঁটা করা বোকা। লগুনের ল্যাণ্ডলেডিদের আমি কিছু চিনেছি, তারই বর্ণনা করতে গিয়ে সে সঙ্গে কিছু অল্প কথা এসে গিয়েছে। ছয় বছর বাস করে দেড় বছর আগে লগুন থেকে ফিরেছি—এখন মনে হয় (অন্ধার হামারষ্টাইনের প্যারিসকে বদল ক'রে) লগুনকে শেষ যখন দেখেছি তখন তার হৃদয় ছিল উষ্ণ এবং আনন্দময়। তাকে বতই তারা বদল করুক না কেন আমি সেই ভাবেই তাকে মনে রাখব :

The last time I saw London
Her heart was warm and gay
No matter how they change her
I'll remember her that way.

সমাপ্ত

শুধু রাতটুকু পার হ'লে

কৃষ্ণ ধর

রাতটুকু পার হ'বে বলে'
সেই চিরদিনের অন্ধকারের মাহুঘগুলি
এক অস-যৌবন নদীর পারে জটলা করছিল
রাতটুকু পার হ'বে বলে।

সাবাটা জীবন ওদের কাটল বন্ধনায়,
এ ওর মুখের আদল ঠাঁহর করতে পারে না।
সবই অন্ধকার,
এক বখির দৃষ্টির জগত।
কোনো শব্দও যেখানে পৌঁছয় না,
কোনো পাখির ডাকও না।
এক পাল বুনা মোষের মতো জমাট রাতের পাঁচিল,
ওরা এ ওর গায়ে ঠেস দিয়ে বসে আছে।

কোথায় কখন ভোর হ'ল
তার খবর ওরা রাখে না।
এক কব্জ অন্ধকারের পাশে শুয়ে আছে
যেন কতকগুলো জীনন্ত মাহুঘের শব।

একদিন কী ক'রে যেন টের পেল,
কোথা যেন কী নীকোয়
সেই টালমাটাল নদীটা পার হ'চ্ছে।
ওরা বললে : আমবাও বাবো,
আমাদের এই রাতটুকু পার করে দাও।
আমরা নদীর শব শুনে পাচ্ছি
টেউয়ের কোলাহল কানে লাগছে।
আমাদের পার করা।

তারপর সেই রাত আর দিনের
নদীর ওপর তৈরী করল ওরা
বিখাসের এক সেতু,
সেই পুলের ওপর দিয়ে
হাত ধরাধরি করে মাহুঘগুলি
নদী পার হ'ল।
সেখানে এক উজ্জ্বল দিন
অটল-খুশি নিয়ে বসে আছে,
ওরা এতদিন জানতেও পারেনি,
শুধু রাতটুকুর অস্ত।
বিষম বন্ধুর মতো দিন
ওদের গ্রহণ করল,
ওদের জীবনের রাত এবার শেষ হ'ল
এক উজ্জ্বলতর দিনের আলোতে।
ওরা জীবনের ভিতরে গিয়ে বসল,
এক গলা আলোর ভিতরে।
মাথার ওপরে এক বাক পাখি
শিস্ দিতে দিতে উড়ে গেল,
ওরা বললে, এসো আমরা গান গাই।
অন্ধকারের মাহুঘগুলো তখন
গভীর বিখাসে,
গলা ছেড়ে গান গাইতে লাগল,
হৈ হৈ আনন্দে,
শুধু রাতটুকু পার হ'লেই
এতদিন, এত তার অক্ষুঃখুশি।
হে ঈশ্বর, আমরা বেঁচে গেছি,
আমাদের অন্ধকার ঘুচেছে,
শুধু রাতটুকু পার হ'য়ে।



ভবানী মুখোপাধ্যায়

পঁচিল

১৯১৬ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধের প্রচণ্ড উত্তাপ সারা যুরোপকে দাবানলে জ্বালাচ্ছে, সেই দাবদাহের মধ্যে প্রশান্ত চিত্তে নীলকণ্ঠের মতো স্টেট লবলেনের শান্তি নীড়ে সমাহিত হয়ে আছেন বার্নার্ড শ'। Common sense about the war-এর জগৎ একদিক থেকে আসছে গালাগালি আর অন্ধদিকে আসছে লম্বিক সভার প্রশান্তি-মূলক প্রস্তাব, সারা দেশ জুড়ে বোঝানোই তাদের সভা হয়, তারা বার্নার্ড শ'কে ধন্যবাদ জানিয়ে একটি প্রস্তাব পাশ করে।

এমনই একদিনে হেসকেন গীয়ারসন বার্নার্ড শ'র সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। তিনি মোসোপটেমিয়া যাবেন তাই একবার দেখা করতে এসেছেন। কথার বখাও শ' বললেন, সৈয়দা জীবন কি বকম লাগছে তোমার?

গীয়ারসন বললেন, ভালো নয়, তবে প্রতিবাদ করার সাহসও নেই।

শ' বললেন, ওদের অবস্থা ডিসপ্লিনটা চমৎকার, কিন্তু 'স্টেট' হল উলটো দিক। যুদ্ধ যে কেন হচ্ছে ওরা বোঝে না। একজনের পক্ষে অগ্নি নিরোধের জগৎ বখাওসা প্রতিবেদকের ব্যবস্থা করা সম্ভব, কিন্তু বাড়িতে আগুন লাগলে আর প্রতিবেদক ব্যবস্থার প্রয়োজন কি? তখন সে আগুন নিভানোর চেষ্টা করবে। কে এই যুদ্ধ বাধালো, কার জন্য এই যুদ্ধ। এই সব বলে বা এই যুদ্ধ করাটাই অজ্ঞার এ সব কথার যুদ্ধ থামানো যাবে না। আমরা সবাই জানি এটা অজ্ঞার, তবু আমাদের সরকারকে আগুন নেভানোর কাজেই লাগতে হবে। তবে এ কথাও বলবো এ আগুন অনেক তাড়াতাড়ি নেভানো যাবে যদি দু'-চার জন রাজনীতিককে হত্যা করা যেত।

গীয়ারসন প্রশ্ন করলো—এখন নতুন কি লিখছেন?

শ' জবাব বললেন—শেখতের ভঙ্গীতে অবসর সময়ে একটি নাটক রচনায় হাত দিয়েছি। এ আমার একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য সাহিত্য কীর্তি। তোমার শেখতের নাটক পড়া আছে। অদ্ভুত নাট্যকার! একেশ্বরে তোমার উপযুক্ত। থিয়েটার সম্পর্কে অপূর্ণ

জ্ঞান। শেখত পড়ে মনে হয় যেন নাটক রচনার আবার সব হাতেখড়ি হয়েছে। একটা ধর্মমূলক রচনায় হাত দিতে হবে। হাতে সময় থাকলেই বাইবেল পড়ছি।

গীয়ারসন বললেন—ছোটবেলায় বা পড়েছি ও-সব তাহলেই আমার জীবনটা কেটে যাবে।

—এই বই ছোটদের বই নয়। যতদূর না নভেল আর নাটক ইত্যাদি অসাধ্য ঠাঁস পড়ে ক্লাস্ত না হচ্ছে ততদূর এই বই তুমি কি করে বুঝবে?

Heart break House নাটকের ভূমিকার শেষে বার্নার্ড শ' লিখেছেন—You cannot make war on war and on your neighbour at the same time. War cannot bear the terrible castigation of comedy, the ruthless light of laughter that glares on stage.

এই নাটকটি আকারে সুদীর্ঘ, এই নাটকটি নাট্যকারের মতো শেখডীয় ভঙ্গীতে রচিত—a Fantasia on english themes in the russian manner—এই নাটকেই বার্নার্ড শ'র পৃথিবী সম্প্রতি হতাশা ও অবিধ্বাসের প্রথম অভিব্যক্তি লক্ষিত হয়। এটো, জি ওয়েলসের মতো প্রথম মহাযুদ্ধের কাল পর্যন্ত বার্নার্ড শ' বিশ্বাস রাখতেন যে মহাজাগতিক বিপর্যয় অবশ্য ঘটবে কিন্তু প্রগতি অনিশ্চিত। কিন্তু এই কাহের পর তাঁর বিশ্বাস ক্ষীণ হয়ে এল, একেবারে অবশ্য ভাঙলো না, এই কারণেই বার্নার্ড শ' আরো ঘনিষ্ঠভাবে কমুনিজমের প্রতি অভিমুখী হলেন।

Heart break House বন্ধন লেখা শেষ হল তখন বার্নার্ড শ'র বয়স ষাট অতিক্রম করেছে। Heart break House বার্নার্ড শ'র চোখে দেখা ১৯১৩-র ইংলণ্ড। লাইট হাউসের সতর্ক-আলোর সজ্জিত উপেক্ষা করে ইংলণ্ডের তরুণী এগিয়ে চলেছে পাহাড়ের গায়ে চূর্ণ হচ্ছে। হেকটর হুসারি তাই—ক্যাপ্টেন স্ট ওভারকে বলে—And this ship we are all in, this soul's prison we call England?

নাটকের মধ্যে অসামান্য সৌন্দর্য ও বৈদগ্ধ্যের পরিচয় আছে, কিন্তু অদ্ভুত এর ভূমিকা। নাটকটি লিখিত হওয়ার দশ বছরের আগে অভিনীত হয়নি, কারণ মহাযুদ্ধ এবং তার পরবর্তী প্রতিক্রিয়া। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে নাটকই ইংলণ্ডে প্রকাশিত হয় এবং সেই সঙ্গে সফল হল স্মৃতির উত্তেজনা।

W. H. Auden বলেন—For all his theatre about propaganda, his writing has an effect nearer to that of music than the work of any of the so-called pure writers.

বার্নার্ড শ'র ব্যবহৃত সংলাপের ছন্দ এবং সুর মাদুরী তাঁর বক্তব্যকে দৃঢ়তর করেছে। Auden-এর উক্তি বার্নার্ড শ'কে সঙ্গীতকার হিসাবে বিচারে সহায়তা করে। বার্নার্ড শ'র সমসাময়িক বন্ধু, সত্যীর্থ ও শিবাবুদ্ধির রচিত 'সমতামূলক' নাটকের সঙ্গে বার্নার্ড শ'র মৌন প্রভেদ অনেকখানি।

শ'র পরিণত রচনায় সঙ্গীত একটি বিশেষ লক্ষণ। নাটকে তার উপস্থিতি পাদপূরণের প্রয়োজনে নয়। সর্বপ্রাণী সার্বভৌমত্বের দাবীতে। সমালোচকদের মতে এইই নাম sharian sonata

বার্ণার্ড শ'র এই জাতীয় সকল নাট্যকাব্যবীর অল্পতম Heart break House, আর এই নাটকে শেভিয়ান ভাববাদের প্রাধান্য বেশী। এই নাটকের উপ-সামকরণ a Fantasia in the russian manner on english themes দেখেই বোঝা যায় যে এই সময় বার্ণার্ড শ' প্রচুর পরিমাণে টলষ্টয় পড়েছেন, শেখভের নাটক দেখেছেন। Heart break house রচনার সময় The Light shines in darkness এবং The Cherry Orchard তাঁর চোখের সামনে ভাসছিল।

বার্ণার্ড শ'র খেয়াল এবং রসিকতা থেকে যুক্ত Heart break House. নাটকটি পরিপূর্ণ ভাবে শেখভীয়, পাত্র-পাত্রীর সংলাপ, ভঙ্গ, সংবত, এরা ক্ষীয়মান বনেদী-বংশের নমুনা, তারা সবাই অকর্ষা, নাটকের দৃশ্য গ্রামের বাড়িতে নাটকের ভঙ্গিমা করেকটি বিচ্ছিন্ন সংলাপের বিচিত্র মালা স্রবের সৃষ্টির বাঁধা। কিন্তু এই নাটকের শেখভের বাহ্যিক, গভীর ভাবে বিচার করলে এই নাটক পরিপূর্ণ রূপে শেভিয়ান। The shewing up of Blanco Posnet নাটকে বার্ণার্ড শ' হয়ত টলষ্টয়ের Power of Darkness অনুসরণের চেষ্টা করেছেন কিন্তু আসলে তিনি The Devil's Disciple নাটকই নতুন করে লিখেছেন। Heart break house এ বার্ণার্ড শ' আপনাকে ইংরাজ শেখভ মনে করলেও আসলে তিনি Getting Married এবং Misalliance-এর পুনরাবৃত্তি করেছেন। এই তিনটি নাটক নিয়ে একটি trilogy এবং Heart break House তার চূড়ান্ত পরিণতি।

আঙ্গিক ও বক্তব্যের দিক থেকে এই তিনটি নাটকে এর অঞ্চল বোগসূত্র রয়েছে। এই তিনটি নাটকেই বিদগ্ধজন্মের জন্ম রচিত। তিনটি নাটকেই আছে একই ধরণের আদি-বিস্ময়ক দুঃসাহসিকতা। তিনটিতেই ডিংক্লমের কথাবার্তার ভিতর নাটক গড়ে উঠেছে এবং উঁচুতলার সমাজ সম্পর্কে বার্ণার্ড শ'র অপরিবর্তনীয় মনোভাব স্পষ্টতরো হয়ে উঠেছে।

Getting Married বা Misalliance এই দুটি নাটকের মধ্যে এতটুকু সাফল্য ঘটেনি। তবে ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে বখন টেলিভিসনে প্রদর্শিত হয় Misalliance তখন তার অসীম জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করা গেল, মনে হয়েছিল বার্ণার্ড শ' যেন বেতারে প্রচারের জন্য সত্ত এই নাটক লিখেছেন। শেখভের যে সব নাটকের আদর্শে বার্ণার্ড শ' এই Heart break House নাটক রচনা করেছিলেন মন্ডো বা সেট পিটসবার্গের রঙ্গমঞ্চ তার যেমন সমাদর হয়েছিল বার্ণার্ড শ'র নাটকেরও সেই হৃদশা ঘটেছিল লণ্ডনেব রঙ্গমঞ্চে। শেখভ এই অসাফল্য এমনই মনস্তাপ পেয়েছিলেন যে 'আত্মহত্যা করতে সক্ষম করেছিলেন, কিন্তু কোনো রকম বিরুদ্ধ সমালোচনা বার্ণার্ড শ'কে হতাশ করতে পারতো না।

এই নাটক ছায়ায় স্মিথের লিরিক থিয়েটারে অভিনীত হওয়ার কথা ছিল, এলেন ও'মালিকে এলি ডানের ভূমিকা দেওয়া স্থির হয়, এই আইরিশ সুরঙ্গরীর বয়সটা কিঞ্চিৎ বেশী হওয়ার নিগেল প্লে ফেয়ার ও আর্নও বেনেটের মতে এই ভূমিকার জন্য অল্প বয়সী মেয়ে প্রয়োজন। কম বয়সী মেয়ে খুঁজতে গিয়ে এত সময় লাগল

উৎসর্গে আনলে

কি, হোডের

মালোবদন প্রজাবিনী



কি, হোড ১৩ কোং • কলিকাতা-১৪



বে আলবার্টার নাট্যকার জেমস কাগান বধন কোর্ট থিয়েটারে এই নাটক মঞ্চস্থ করার প্রস্তাব করলেন বার্নার্ড শ' রাজী হয়ে গেলেন। ১৯২১-এর ১৮ই অক্টোবর লণ্ডনে এই নাটক প্রথম মঞ্চস্থ হল। ততদিনে শ্রী ইয়র্কে এই নাটক ১২৫ রজনী অভিনীত হয়ে গেছে।

এই নাটক লণ্ডনে অসফল হল। প্রথম কারণ চরিত্র বটনের ত্রুটি, দ্বিতীয় কারণ লণ্ডনের দর্শকের গ্রহণ ক্ষমতার অভাব। এই অসাকল্যে বার্নার্ড শ' ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন বা তাঁর পক্ষে কিঞ্চিৎ অস্বাভাবিক, কিন্তু কারণও আছে, বার্নার্ড শ' এই নাটকটিকে তার শ্রেষ্ঠ রচনা মনে করতেন, সেই কারণেই তাঁর দুঃখটা এত তীব্র হয়েছিল।

বার্নার্ড শ'র ১২তম জন্মদিনে একটি নতুন নাটক রচনার হাত দিয়েছিলেন। ২৬শে জুলাই তারিখে দি আর্ট থিয়েটার ক্লাব—Too me to be good অভিনয় করলেন। প্রোগ্রামে হেসকেথ পীরসন একটি ছোট নিবন্ধে লিখেছিলেন—The main theme of too true to be good is the wretchedness of the rich, and the play is therefore a variation of development of Heart break House, ইত্যাদি।

এই Programme কেউ বার্নার্ড শ'কে হয়ত পাঠিয়েছিলেন তিনি হেসকেথ পীরসনকে একটি পোষ্ট কার্ডে লিখলেন Why? বুঝতে না পেরে পীরসন লিখে পাঠালেন What? বার্নার্ড শ' জবাব দিলেন—The Note পীরসন লিখলেন Oh, that! বার্নার্ড শ' আবার লিখলেন Yes, এবার পীরসন লিখলেন God knows! সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন শ' He does not—পীরসন কি আর করেন লিখলেন—Nor do I:

বার্নার্ড শ'র এই সংক্ষিপ্ত চিঠি লক্ষ্য করার মতো।

মি: ই. ট্রাউটস Bernard Shaw's Art and Socialism নামক চমৎকার গ্রন্থে বলেছেন—Back to Methuselah আর Heart break House বার্নার্ড শ'র সাহিত্য জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি।

বার্নার্ড শ' নিজে বলতেন আমার কোন বইটা যে শ্রেষ্ঠ তা শেষ বিচারের (Judgement Day) দিন পর্যন্ত বলা যাবে না। আবার মাঝে মাঝে সোজা সজ্জা বলতেন। ফ্রাঙ্ক হারিসকে প্রদত্ত গ্রন্থে নিজে লিখেছিলেন Rightly spotted by the infallible eye of Frank Harris as my best play—" Back to Methuselah লেখার আগে পর্যন্ত বার্নার্ড শ' Heart break Houseকেই তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা বলে স্বীকার করতেন। বর্ষীয় প্রধানমন্ত্রী থাকিন হুকে একখণ্ড Back to Methuselah উপহার দিয়ে বলেছিলেন—এই আমার মাঠার পীস।

বয়সের সঙ্গে শ' ক্রমশঃই যে আকৃতি এবং জীবন সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রকৃতিতে যে তাঁর পিতৃদেবের মত হয়ে উঠছেন এটা যুঁকে ছিলেন। বার্নার্ড শ'র পিতৃদেব কার শ' সব কিছুতেই স্বেচ্ছ করে বলতেন—everything was a pack of lies, Heart break House এক বুদ্ধি কার শ'কে আদর্শ করে ওলড, টেসটারমেটের বুদ্ধের মতো পৃথিবীর সব কিছুই বিরোধী Captain Shotoverকে এঁকে ছিলেন। Captain Shotover সর্বদাই

বাস্তব, আসলে পথের ধারে মত্তপান করাটাই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কর্ম, বেরিয়ে এসে অপেক্ষারত মানুষের উদ্দেশ্যে বাণী নিক্ষেপ করে জবাবের জন্য আর দাঁড়াতে না।

Captain Shotover বলছেন It confuses me to be answered, it discourages me, I cannot bear the men and women, I have to run away, I must run away now,

তরুণদের সম্পর্কে বার্নার্ড শ'র মনোভঙ্গী Captain Shotover এর যুগ দিয়ে বলা হয়েছে—I see my daughters and their men living foolish lives of romance and sentiment and snubbery...I did not let the fear of death govern my life, and my reward was, I had my life—

সার্জেট এই নাটক সর্বপ্রথম পড়েছিলেন। মত্তপ মানুষকে তিনি চিরদিনই সইতে পারতেন না। Captain Shotoverকে পছন্দ না করলেও তার উচ্চারিত প্রতিটি কথা তাঁর ভালো লাগতো।

ডেকোন্সভাকিয়ান সৈনিকরা একটা চিঠিতে লিখতেন—Your work has always philosophical basement of our life, day by day, endeavouring to follow our great Irish teacher...

বলাবাহুল্য এই চিঠিতে শ' সম্প্রতি অত্যন্ত আনন্দ পেয়েছিলেন। কিন্তু Heart break Houseকে গ্রহণ করার জন্য মানুষ তখনও তৈরী হয়নি। জীবনের কঠোরতা, বিপদ, আতঙ্ক, মৃত্যু ইত্যাদির জ্বালায় তারা এখন বিব্রত। জীবনের গভীরতার দিকে মানুষের তেমন আগ্রহ নেই, তারা চায় আনন্দ, হাসি এবং সরসতা। তারা চায় সব কিছু সুখভরে গ্রহণ করতে, Shotoverএর বাণী শোনার মতো উপযুক্ত মনের অবস্থা নয় তখন। ক্রান্ত তরুণ দল প্রশ্ন করে—And who was Shaw to preach to us? তারা রণক্ষেত্রে মৃত্যুর যুগোয়ুধি হয়ে ফিরে এসেছে Arms and the Man পড়ে তারা আনন্দ পেয়েছে, তারা হাসতে চায়, হুংস তুলতে চায়। গুরুগম্ভীর বিষয়কে বিহ মনে করে হুঁস পরিহার করতে চায়।

বার্নার্ড শ' এই মনোভঙ্গীতে কিন্তু বিভ্রান্ত হননি। তিনি জানতেন, জোরার পর ভাটা আছে, এমন কি যে তরুণ লেখক তাঁকে এখন তীব্র ভাষায় আক্রমণ করছে, সেই লিটন ট্রাটীকেও তিনি প্রশংসা করছেন।

কিছু দিনের জন্য লেখনী ধামালেন বার্নার্ড শ'। এর প্রয়োজন ছিল। এখন একটা বড়ো নাটক লিখতে হবে বা অভিনয় করতে বারো ঘণ্টা সময় লাগবে। নাস্তিকতা, অধিশাস এবং নিহিলিজম ইত্যাদির ভয়াবশেষ থেকে বিশ শতাব্দীতে যে নতুন ধর্মশাস গড়ে উঠছে, এই নাটকের ভিত্তি তার ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই নাটক অমর রচনা হবে এবং তাঁকে অমররূপ দান করবে। Candida, Man and Superman এবং Heart break House এ সবই সেই নতুন নাটকের প্রস্তুতি। বার্নার্ড শ'র মতে এই নতুন নাটক Exploit the eternal interest of the philosopher's stone which enables men to live for ever—

মাসিক বসুধা—জ্যৈষ্ঠ



মূল্য:
বড় সাইজ ২ টাকা ১০ ন.প.
সাধারণ সাইজ ১ টাকা ১২ ন.প.
(স্থানীয় কর ছাড়া)

সার্ফ

অপূর্ব সাদা করে জামাকাপড় কাচে

অত্যাশ্চর্য কাপড় কাচা পাউডার সার্ফ কাচা জামাকাপড়ের অপূর্ব শুদ্ধতা দেখলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন। এক প্যাকেট ব্যবহার করলে আপনাকে মানতেই হবে যে

আপনি কখনও কাচেননি জামাকাপড় এত ঝকঝকে সাদা, এত হালদা উজ্জ্বল হবে! সূঁচ, চামড়, শাড়ী, তোয়ালে—সবকিছু কাচার জন্যই এটি আদর্শ!

আপনি কখনও দেখেননি এত ফোঁপা—ঠাণ্ডা বা গরম

জলে, ফোঁপার পক্ষে গ্রহীত জলে, গরমে সসে, আপনি পাবেন ফোঁপা এক সুর!

আপনি কখনও জানতেন না যে এত সহজে কাপড় কাচা যায়! বেশী পরিমাণ নেই এতে! সার্ফ জামাকাপড় কাচা মানে এটি সহজ এন্ড্রিয়া: ভেজানো, চেপা এবং ধোওয়া মানেই আপনার জামাকাপড় কাচা হয়ে গেল।

আপনি কখনও পাননি আপনার পরগার মূল্য এত চমৎকারভাবে ফিরে। একবার সার্ফ ব্যবহার করলেই আপনি এ কথা মনে নেবেন! সার্ফ সব জামাকাপড় কাচার পক্ষেই আদর্শ!

আপনি নিজেই সবথেকে দেখুন

সার্ফ জামাকাপড় অপূর্ব সাদা করে কাচা যায়!

SU. 25-X52 BQ

হিন্দুস্তান লিটারি লিমিটেড কর্তৃক প্রস্তুত

Heart break House-এর বহু ক্রটাই থাকুক নাটক হিসাবে অপূর্ণ। Captain Shotover বার্গার্ড শ'র অপূর্ণ সৃষ্টি। এই চরিত্রের মাধ্যমে বার্গার্ড শ' মানুষের প্রতি তাঁর ব্যক্তিগত অবস্থান ফুটিয়ে তুলেছেন। এই নাটকে তিনি এক অপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। তাই এই নাটকের শেষে এলি বলেন—*This silly house, this strangely happy home, this agonising home, this house without foundations. I shall call it Heart break House—তখন পাঠক ও দর্শক নিজের মনে তাঁর প্রতিধ্বনি পায়।*

ছািবিশ

১৯২০, ২৭শে মার্চ...

সাউথ লণ্ডনে ডেনমার্ক হিলে বার্গার্ড শ' সূত্ৰাশ্রয় শায়িত বোন লুসীকে দেখতে গেলেন। এই ডেনমার্ক হিলের কাছেই জন্মেছিলেন রবার্ট ব্রাউনিং এবং রাসকিন তাঁর বাল্যজীবন কাটিয়েছেন।

লুসীর বয়স তখন ৬৭ বছর, বার্গার্ড শ'র ৬৪। বার্গার্ড শ' পৌঁছে দেখলেন, লুসী অত্যন্ত হতাশ ভঙ্গীতে রোগশয্যায় পড়ে আছেন। বার্গার্ড শ' কিছুক্ষণ চূপ করে বসে থাকার পর লুসী বৃহৎ গলার বললেন—আমি এইবার মারা যাব। আর বেশী দেরী নেই।

বার্গার্ড শ' সান্ত্বনার ভঙ্গীতে বলেন—না, না, ভয় কি, শীর্ণগিরি সেয়ে উঠবে।

তারপর দু'মিনিট নীরব। চারিদিক নিস্তব্ধ। পাশের বাড়ীতে কে একজন অতি বিজ্ঞী ভাবে প্রিয়ানো বাজাচ্ছে। চমৎকার সন্ধ্যা, চার দিকের জানালা উন্মুক্ত। লুসী বার্গার্ড শ'র হাত ধরে আছেন। সহসা মনে হল যেন তাঁর আঙুলগুলো শক্ত হয়ে গেছে। লুসীর প্রাণহীন দেহ পড়ে আছে।

বার্গার্ড শ' সবিস্ময়ে ভাবলেন কি করা যায়! ডাক্তারকে ডাকা হল। বার্গার্ড শ' বললেন—সম্ভবতঃ টিউবার কুলেসিসই মৃত্যুর কারণ। কিছু দিন আগে নিউমোনিয়া হয়েছিল, তার পরই টি.বিতে আক্রান্ত হয়েছিলেন লুসী।

ডাক্তার গভীর গলার বললেন—না, মৃত্যুর কারণ অনাহার টি.বি সেয়ে গিয়েছিল।

বার্গার্ড শ' প্রতিবাদ জানিয়ে বললেন—সে কি! আমি একে খাওয়া-দাওয়া বাবদ যথেষ্ট টাকা দিই। অনাহারে মরবে কেন?

ডাক্তার তবু বললেন—না, অনাহারই একমাত্র কারণ।

মহামৃত্যুর পর লুসীর ক্ষুধা একদম হারানো, অনেক কষ্টে তাকে কিছু খাওয়ায়। তার মনে এবং দেহে 'শেল-স্ক' অর্থাৎ গোলা-বাকুদের বিভীষিকা লাগে। বিমান আক্রমণের সময় বাগানে বিমান প্রতিরোধকারী এ্যাটিক এয়ারক্রাফট-এর বিকোরশে ঘরের জানালা-দরজা, খালা-বাসন সব ভেঙে চূরমার হয়ে যায়। সেখান থেকে ভিত্তোনে পাঠানো হল কিন্তু আহায়ে অনিচ্ছা বৃদ্ধি হল।

এই লুসী একদিন উদীয়মান লোক জীবনসংগ্রামে বিস্মৃত বার্গার্ড শ'কে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। আর শেষ দিন পর্যন্ত সেই ভাই—বোনটির সমস্ত ধরচ বহন করেছেন এমন কি শেষ সময়ে

পর্যন্তহাজি রথেকে স্বচক্ষে মৃত্যু দেখলেন। সংসারের এই সর্বশেষ মাত্রায়

লুসীর নির্দেশ ছিল অক্টোবরকালে কোনো প্রার্থনা ব্যবহার আরোহণ না করা। বার্গার্ড শ' ড্রিমটোরিয়মে পৌঁছে দেখলেন লুসীর বন্ধুবান্ধবে সেই শ্রদ্ধানুষ্ঠান পরিপূর্ণ। তাঁরা কেউ হয়ত বার্গার্ড শ'কে চিনতে পারেন নি। এই জনতা একটা কিছু প্রার্থনা ব্যবহার জন্ত জ্ঞান করলেন। তখন বার্গার্ড শ' বেদীর ওপর দাঁড়িয়ে সেক্সপীরের Cymbelline থেকে উদ্ধৃতি দান করে বললেন—

*Fear no more the lightning flash,
Nor the all-dreaded thunder-stone.*

বহুমান শব্দদেহের দিকে তাকিয়ে বার্গার্ড শ' দেখলেন যে অতি স্নান সেই আগুনের শিখা, কয়লার অভাব। হতাশ হলেন শ'। তিনি বলেছেন—*Steady white light like that of a wax candle।*

শ' পরিবারের এই মেরেটির মাধার চুলের রং ছিল শাদা। বার্গার্ড শ' জননীর ধারণা ছিল সে একদিন নাট্য-সম্রাজীর সম্মান লাভ করবে, কিন্তু ভ্রাম্যমান পেশাদারী দলের হালকা ধরনের অপেরার ছোটখাটো ভূমিকা ভিন্ন আর কিছু পাননি লুসী। সারা জীবনটাই ব্যর্থতায় ভরা। আঘাতের পর আঘাত জীবনটাকে ভেঙে-চূরে বিপর্যস্ত করেছিল, আজ একান্ত আপন জন ছোটখাটো বার্গার্ড শ'র হাতটি ধরে শান্তির পাহাচায়ে পৌঁছলেন।

বার্গার্ড শ' বলেছেন সেদিন ডেনমার্ক হিলে নিত্যন্তই Life-force এর নির্দেশে তিনি গিয়ে পড়েছিলেন। বেশী বাওয়া আসা করতে পারতেন না, একরকম অবহেলিত ছিলেন। বার্গার্ড শ' বলেছেন—*property, property, property, the real secret of my withdrawal from all human intercourse except with people I have actually to work with.* ঐশ্বর্য্য আমাদের এমনই ভুলিয়ে রাখে যে, আত্মীয় স্বজনকে বিস্মৃত হয়ে, কাজ আর কাজের লোক নিয়েই আমরা কর্মজীবনটাকে ভরে রাখি। বার্গার্ড শ'র জীবনেও তাই তাঁর ব্যতিক্রম ঘটেনি।

হেসকেল গীররসন বর্ধাধই বলেছেন শিল্পী এবং মহাপুরুষ এই দুই সত্তার মধ্যে একটা দৃশ্য উপস্থিত হয়, ফলে শিল্পীর অপমৃত্যু ঘটে, মহাপুরুষ মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়। বার্গার্ড শ' উভয়ের মধ্যে এক অপূর্ণ ভারসাম্য রক্ষা করে বলেছেন। আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথকে এই হিসাবে বার্গার্ড শ'র সমকক্ষ বলা চলে। মাননিক ভারসাম্য তিনিও শেষ পর্যন্ত বজায় রেখেছিলেন। আর রেখেছিলেন ডলটোয়ার। তাই ১৯১৪—১৮-র মহামৃত্যুর কঁাকে শ' Heart break House রচনা করতে পেরেছেন আর মনে মনে পরিত্যক্ত করেছেন Back to Methuselah মহানটকের। Heart break House প্রথমটায় কাউকে পড়তে দেননি বার্গার্ড শ' বন্ধুদেরও নয়, অথচ তিনি সব নাটক সবাইকে পড়ে শোনাতে ভালোবাসতেন। লী ম্যাথুজ ১৯১৬ খ্রষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে অমরোষ জানিয়ে বললেন—আপনি স্বয়ং উপস্থিত হয়ে ঠিক

সোশাইটিতে নাটকটি পড়ে শোনাম। উত্তরে বার্নার্ড শ' লিখলেন...

...এ একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার। ট্রেজ সোশাইটি যদি তার সমস্তের নিয়ে At-home-এ আয়োজিত করতে চান, কোন সাক্ষ্যের উৎসব উপলক্ষ্যে তাহলে একজন প্রখ্যাত লেখকের অপ্রকাশিত, অ-অভিনীত নাটক পড়ে শোনালে শ্রোতার হৃদয় গলাধঃকরণ করবেন। কিন্তু সম্পূর্ণ নাট্য-প্রদর্শনের জন্য চাঁদা আদায় করে চাঁদা প্রদানকারীদের শুধু নাটক পাঠ করে শোনালে, পাচা ডিম এবং মৃত বিভ্রাল ছাড়া লেখকের তাগো আর কিছুই জুগবেন। সভ্যতা বহন সংকটাপন্ন তখন আমি আমার অনিশ্চয়তা ক্লান্ত করতে পারি। এ তোমার জানা আছে, কিন্তু সভ্য অংশীদারদের ডেকে এনে তাদের বলা যে তোমাদের টাকা তহবিল হয়েছে, সেই সভ্য সভাপতিত্ব করা অভিলষ কঠিন।...

নাটকটি প্রযোজিত হয় বার্নার্ড শ'র সেই ইচ্ছাও ছিলনা। লীলা মাককার্ভিক শ' বলেছিলেন—We must be content to dream about it. Let it lie there to show that the old dog still bark a bit. বার্নার্ড শ' বলতেন Captain Shotover হলেন কিং লীররের আধুনিক সংস্করণ। একজন এসলেন, তার মানে?

বার্নার্ড শ' জবাব দিলেন—“আমি কি করে জানবো? আমি শুধু লেখক মাত্র।”

১৯২১-এর ১১শে অক্টোবর তারিখে আরনল্ড বেনেট লিখেছেন “গত রক্তনীতে শ'র Heart break House দেখতে গিয়েছিলাম। সাড়ে তিন ঘণ্টা অতি ক্লান্তিকর অবস্থার কাটিয়েছি। সৌভাগ্যক্রমে হৃদয় ঘুমিয়ে পড়েছিল।”

সারা সপ্তাহে বিক্রী মাত্র ৫০০ পাউণ্ড। ক্যাগান শেষ পর্যন্ত অভিনয় বন্ধ করতে বাধ্য হলেন।

এর পরেই বার্মিংহাম রেপারটরী থিয়েটার-এর ব্যারী জ্যাকসন বহন Heart break House মঞ্চ করবেন, বার্নার্ড শ' ব্যাটিনী দেখতে গিয়েছিলেন।

তার ব্যারী জ্যাকসন বলেছেন—অভিনয়ক্ষেত্রে বার্নার্ড শ' বেশ খুশী হয়েছেন দেখে সাহস করে বললাম Back to Methuselah মঞ্চ করার অল্পমতি দিন।

বার্নার্ড শ' ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। এর কিছু আগেই হাইড্রক থিয়েটার গ্লভ, Back to Methuselah অভিনয় করেছেন।

বার্নার্ড শ' তার ব্যারীর অচর্যে তখন তধু বললেন—তোমার পরিবারবর্গের ভবিষ্যতের কিছু সংস্থান করা আছে?

ব্যারী জবাব দিলেন—সব ব্যবস্থা আছে।

বার্নার্ড শ' হেসে বললেন—তথ্য।

বার্নার্ড শ' এতই উৎসাহিত হয়েছিলেন যে, শেষ রিহার্সালেও এসেছিলেন। অথচ তা ই কিছু দিন আগে আরল্যাণ্ড পড়ে গিয়ে ভীষণ আঘাত পেয়েছিলেন। সর্বাঙ্গে দাক্ষণ বেদনা।

Saint Joan লেখার কালে বার্নার্ড শ' কাউন্টি কেরীর পার্কনাশীলার থাকতেন সেই সময় চীং হয়ে একদিন পড়ে যান, কাঁধে যে ক্যামেরা ঝোলানো ছিলো, সেটি পিঠে ঢুকে যায়। পিঠে প্রকাণ্ড গর্ত হয়ে গিছিল।

সার্জেন্ট বলেন—পিঠে এতবড় একটা গর্ত হয়েছিল যে, তার ভিত্তর অনায়াসে একখানি চিঠি ফেলা যায়। আইরিশ ডাক্তাররা কিছু করতে পারেন নি, বার্মিংহামের অস্থিবিদ্যার ডাঃ এলমার ফেলিস ৭২ মি: চেষ্টা করে কোনো রকমে বার্নার্ড শ'কে ঠাঁড় করিয়েছিলেন।

এই অবস্থায় বার্নার্ড শ' Back to Methuselah নাটকের রিহার্সাল দেখেছেন। [ক্রমশঃ]

বৈধব্য

সজলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

কিছু দিন আগেতেও দেখেছি তো তাকে,
অসঙ্কতা, ঔদ্ধত্যের চিয়রী মৃত্তিতে।
কাঁকন কনকন, চোখে মায়া আঁক,
সে এক অপূর্ণা নারী আপন কীর্ত্তিতে
দেখে তার বসন্তের উদ্গাদ প্রাবন,
চোখে তার উজ্জল বিরহী শ্রাবণ।

সেদিনও তো দেখলাম তাকে,
চিয়রী-মুমুরী বেন নিঠুর আঘাতে।
মনে হ'ল পত্রশূন্য কোন বৃক্ষশাখে,
বহিছে হিমেল হাওয়া, পাখী নাই তাতে।

এর মধ্যে ঘটে গেছে বিরাট ভাঙন,
যে ছিল বৈধ-পূর্ণা, আজ সে একেলা।
দুটি প্রাণ এক ছিল, ছিল দুটি মন,
আজ নেই, বেসা গেছে, আজকে অবেলা।
বসন্ত দেহেতে তবু স্নেহের উদ্গাদ,
মনে হয় বার্থ প্রেম কেল দীর্ঘবাস।

নারীদের উজ্জল্যে যে ছিল উজ্জল,
নিঠুর বৈধব্য তারে করেছে বিফল।
বিলাসিনী ছাড়ি আজ দেহের বিলাসে,
উপভোগ-মৌন মন-স্বৈর্যের উদ্গাদে।



শর্করা-শিল্প ও পশ্চিমবঙ্গ

অত্যন্তক পণ্য-তালিকার মধ্যে শর্করা বা চিনির স্থান নিশ্চয়ই প্রথম পর্ষায়। অন্ততঃ আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য চিনি ও গুড় কিছু না কিছু চাই-ই। অল্প সব বাদ দিয়ে সকাল-বিকাল চা খেতে এর প্রয়োজন, ঘুমেয় সঙ্গেও এর সংমিশ্রণ না হলে হয় না। চিনি বা শর্করা-শিল্পের গুরুত্ব এই থেকে অবগত খানিকটা উল্লিখিত করা যায়।

একটি কথা আগেই বলতে হয়, বিশ্বের চিনি উৎপাদক কেন্দ্র হিসাবে ভারত মোটেই শিখিয়ে নয়। এই উপ-মহাদেশটিতে শর্করার মোট উৎপাদনের পরিমাণ কিছু দিন পূর্বেও ছিল ১১ লক্ষ টনের বেশী। ভারতের ভেতর উত্তর প্রদেশেই (প্রাক্তন যুক্ত প্রদেশ) চিনিগুলির সংখ্যা তুলনায় অর্ধেক রয়েছে। তার পর ক্রমান্বয়ে বিহার, মাদ্রাজ, বোম্বাই, বাংলা, উড়িষ্যা প্রভৃতি রাজ্যের নাম করা যায়। পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে বিশেষভাবে বলা চলে, এখানে লোকসংখ্যা আর চিনি কোটি আর বহুরে চিনির প্রয়োজন কম পক্ষে ৭০ হাজার টন। চিনি বা শর্করা উৎপাদনেও এই রাজ্যে উন্নয়ন রয়েছে অনেকখানি।

এ কথা স্বীকার্য যে, চিনি বা শর্করার দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গ এখনও স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। বাইরে থেকে প্রচুর চিনি আমদানীর প্রয়োজন হয় এখানে আজও অবধি। এই অবস্থার অবসর কতকগুলি কারণই রয়েছে। একটি মূল কারণ—এই রাজ্যটিতে শর্করা উৎপাদনের জন্য আবশ্যিক পর্যাপ্ত ইক্ষু অব্যব।

খাঁড়ের দখল গেছে—এতদকালে (পশ্চিমবঙ্গ) যে ইক্ষু উৎপাদিত হয়, গড়পড়তা তার প্রতি দশ টন থেকে চিনি পাওয়া যায় এক টন। এভাবে এখানকার সমস্ত ইক্ষুটাই যদি চিনিতে রূপান্তরিত করা গেলো, তাহলে সেই চিনির পরিমাণ কাঁড়িতে পারে ২৫ কোটি পাউণ্ড মতো। বিপুল চাহিদার তুলনায় এই উৎপাদনও যথেষ্ট বলা যেতে পারে না।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের একটা মস্ত প্রশ্ন—এখানে অল্প অনেক অঞ্চল থেকে ঘন বসতি, চাষের উপযোগী জমির অভাব বর্তমানই এখানে বেশী। সেদিক থেকে ইচ্ছে করলেই রাতারাতি ইক্ষু উৎপাদন বাড়ানোর উপায় নেই। উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব, অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার—এ সকল রাজ্যে ইক্ষুর চাহ খুবই অধিক। এ বাণিজ্যের পশ্চিমবঙ্গের স্থান উন্নয়নের পর। কিন্তু একটি বিষয় সন্দেহাতীত যে, ইক্ষুর ফসল পশ্চিমবঙ্গে বহু বেশী অল্পই অনেক জায়গায় ভেঙেই দেখা যায় না। এখানে এক একর জমি থেকে ইক্ষু উৎপাদিত হয় আর ২০ টন।

শর্করার সঙ্গে ইক্ষুর সম্পর্ক একান্ত নিবিড় বলেই ইক্ষু প্রসঙ্গে এত কথা। পশ্চিমবঙ্গে শর্করাশিল্পকে আরও ব্যাপক ও দৃঢ়-ভিত্তিক করতে হলে ইক্ষু চাই আরও বহুল পরিমাণে। চাষের জমি যেখানে ইচ্ছা মাত্র বাড়ানোর উপায় নেই, সে ক্ষেত্রে বিকল্প ব্যবস্থা খুঁজে না পেলে নয়। প্রথমতঃ একটি পরীক্ষা চলতে পারে—একর-পিছু উৎপাদনের হার আরও কি ভাবে বৃদ্ধি করা যায়, এই নিয়ে। বলা বাহুল্য, এই জন্য উপযুক্ত সেচ ও সার ব্যবহারের নিশ্চিত ব্যবস্থা চাই। সরকারী দায়িত্বের কথা এইখানে আপনি উঠে বিশেষ ভাবে।

পশ্চিমবঙ্গের সব অঞ্চলই ইক্ষু চাষের সমান উপযোগী নয়, উৎপাদনও সর্বত্র একই হারে হয় না। ইক্ষু চাষের কয়েকটি স্বার্থ উপযোগী স্থান—বর্তমানের কাটোয়া, কালনা প্রভৃতি এলাকা, মৌদীনাপুরের ঘাটাল মতকুমা, বীরভূমের একটি বৃহত্তর অংশ আর পশ্চিম দিনাজপুর ও মুন্সিবাবাদ। এই অঞ্চলগুলিতে ইক্ষুর চাষ বাড়ানোর জন্য আরও সংহত উদ্যম, ও সুচিন্তিত পাবলিক সরকার।

আরও একটি কথা, ইক্ষু উৎপাদন বৃদ্ধির সকল চেষ্টা যেমন থাকবে বা থাকতে হবে, তেমন পশ্চিমবঙ্গের শর্করার গুণগত চাহিদাও ভক্ত ভাবেও কিছুটা মেটানো যায়, না দেখলে নয়। এই রাজ্যের সীমানার ভেতর বহু অঞ্চলে তাল ও খেজুর গাছের চাষ আছে। আর এই গাছের সংখ্যাও অবশিষ্ট কম নয়। তাল ও খেজুর গুড় আশাহরণ পাবার জন্য এই চাষও বাড়ানো হবে আরও বহুলাংশে—বাড়ানো সম্ভবপরও। বেসরকারী প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্য ও সহযোগিতা বাদ থাকতো অব্যাহত ভাবে, তাহলে শর্করার দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গ পুরোপুরি স্বাবলম্বী না হোক আরও অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারবে, এ নিশ্চিত।

পারিবারিক বাজেটের কয়েকটি দিক

বাজেট কথাটি বললে সাধারণতঃ সরকারী বাজেটের কথাই মনে হয়। কিন্তু সরকারী বাজেটের মতো পারিবারিক বাজেট বলেও একটি কথা আমরা জানি—পারিবারিক সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে বার মূল্য এতটুকু কম বলা চলে না।

যে কোন বাজেটের মূল কথাই—অজিত বা চক্র আয়ের ঠিক অল্পপাতে ব্যয়-ব্যবস্থা। ব্যয়ের মাত্রা যেন যেন অসম্ভবতাই আরও অতিক্রম করে না যায়। কি ব্যক্তিগত বা পারিবারিক বাজেট, কি জাতীয় বা সরকারী বাজেট—সবক্ষেত্রে এই দুটিটি প্রযোজ্য।

যেখানে এটি অঙ্গসংগ্রহ না করা হলো কিংবা অঙ্গসংগ্রহের সত্যি সুযোগ না থাকে, সেখানেই গোলযোগ, সেখানেই অসুস্থি।

আমর বৃদ্ধ বয়স করার দাবীটি অবশ্য বহু যুগ থেকেই চলে আসছে। এটি অমূল্য শিক্ষাই বলতে পারা যায়—প্রতিটি মানুষ বা পরিবারকে সাধারণ মিতব্যয়ী হতে হবে, বাস্তব উপর চাই বোধোচিত নিয়ন্ত্রণ। এর সঙ্গে বাজেট কথাটির যোগাযোগ ও সম্পর্ক রয়েছে বিশেষ রকম। অথবা সহজভাবে এ-ও বলা চলে—বাজেটের মূল সত্যটি এই ভেতর নিহিত।

একথা ঠিক বহু পরিবার রয়েছে, নিয়মিত ধারার যেখানে জমা-খরচ রাখা হয়। সকলেই একই পদ্ধতিতে এটি (জমাখরচ বা আয়-ব্যয়ের হিসাব) রাখেন, যেমন দাবী করা চলে না। এই ধরনের হিসেবী পরিবারের সংখ্যা আশাভরূপ যথেষ্ট নয়। কেন না, ‘খণ্ড কুখ্য দুঃখ পিন্ধে’ জীবীর লোকও কিছুমানুষ কম নয় সংখ্যায়। পরম্ভ বলা যায়, বেশির ভাগ লোক বা পরিবারই বেহিসেবী পর্যায়ে না পড়লেও সঠিক বাজেট করে চলতে অভ্যস্ত হয় নি এখন অবধি।

বাজেট করে চলার যে চিন্তন দাবী রাখা হয়েছে সামনে—ধনী-দরিদ্র মধ্যবিত্ত—কাজকে কিছু এর বাইরে ধরা হচ্ছে না। জীবনযাত্রার সর্বস্বত্বের সকলের ক্ষেত্রেই আয়-ব্যয় মধ্য থেকে বায়-মিটানোর চোঁটা নিত্যান্ত প্রায়ঃ। হিসেবের লাগামটি ছেড়ে দিলে বাস্তব দোলাচল ও কুসংস্থর যেতে কতক্ষণ। ‘গৌরী সেনের টাকা’তেও নির্বচন অধিন চলতে পারে না। মোটের উপর খরচের আগেই বাজেট করা চাই। জীবনের অপর সকল ব্যাপারে যেমন, এই ক্ষেত্রেও সচল অগ্রগতির স্বল্প পরিকল্পনা অনুযায়ী পদক্ষেপ প্রয়োজন। আর আয়-ব্যয়-পালিক বায়—একটু আগেই বলা হল, যে কোন সুচিন্তিত বাজেট পরিকল্পনার ইঙ্গাই মূল কথা।

এ প্রসঙ্গে এ-ও বলতে হয়—বাজেট করতে যেখানেই চাওয়া হবে, কারিগরদের আগে মনের ভিতরে কয়েকটি বিশেষ নৃত্র গাঁথা না থাকলে নয়। মাস মাসিনার অঙ্কটি একদিকে রাখা হ’ল, অপর দিকে প্রথমেই ধরা চাই খরচের অপরিহার্য বড় বড় বিষয়গুলি। যেমন, বাড়িভাড়া, খাদ্য-ব্যয়, কাপড়-চোপড় সংগ্রহ, ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা-সংজ্ঞা, ও স্কুল-কলেজের মাইনে, ঔষধ-পত্রের বিল, জীবন-বীমার প্রিমিয়াম—এগুলির বায়-বরাদ্দ সর্বাঙ্গ প্রয়োজন। এ সকল দায় মিটিয়ে যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকে (মধ্যবিত্ত বা নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারে অবশ্য সে আশা বুঝা,) তখনই অত্যন্ত খাতে বায়-বরাদ্দের প্রস্তু উঠতে পারে।

এমন অনেককে দেখা যায় যারা, কোনরূপ বাজেটের ধার ধারে না, যখন যে খরচের প্রয়োজন হয় বিনা ভ্রূক্ষেপে করে যান। অটল টাকা থাকলে এমন সহস্র কতক কাল চলতে পারে, কিন্তু আর যদি সীমাবদ্ধ হয় (অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বেটি সত্য), সেখানে এমনি করতে চাইলে অর্থাৎ ভবিষ্যতের দিকে না তাকিয়ে বধেছ খরচে উৎসাহী হলে, খরচের বোঝা মাথার উপর চাপলেই। আসল কথা—মিতব্যয়ী হলে কিছুতেই চলবে না, অমিতব্যয়িতা শেষ অবধি দুঃখকে ডেকে আনে। যতদূর সম্ভব আর অস্থায়ী বয়স করতে হবে, জানতে হবে মিতব্যয়ী হলেই বিপদের ঝুঁকি কম।

এ অনস্বীকার্য যে, পারিবারিক বাজেটের প্রচলন এদেশে

ততখানি দেই, যতটা দেখা যায় অগ্রগামী দেশগুলিতে। ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে এই নিয়ে চিন্তা-আলোচনা ও গবেষণা চলে আসছে প্রচুর। স্বাভাবিক অবস্থায় বাজেটের ধারণা হবে স্বাভাবিক—সেখানে স্বপ্ন হতে পারে, এমন ভাবে বায়-বরাদ্দ হলে চলবে না। আরের তুলনায় বাস্তব দাবীগুলি যদি অত্যধিক থাকে, সে ক্ষেত্রে হিসেব করে যে যে দাবীটি বাস্তব হওয়া সম্ভবপর, সে কয়টি হ্যাঁটকাট করতেই হবে। অপ্রয়োজনীয় বা নিরর্থক খরচের অবকাশ যেন না থাকে, সেদিকে গোড়া থেকেই দৃষ্টিবলীল গৃহস্থামীর দৃষ্টি চাই।

ভুক্তভোগী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা দেখে এসেছেন—সীমাবদ্ধ আয় যেখানে, সীমার বাইরে যেতে খরচের বাজেট বা আর্থিক বায়-বরাদ্দ সেখানে করতে বাধ্যই নিত্যন্ত ভুল। অন্ততঃ এরূপ ক্ষেত্রে কার্য-ব্যবস্থা অবলম্বনের আগে বহুবার নিবিড়ভাবে না ভাবলে নয়। অস্বাভাবিক অবস্থার উদ্ভব হলে ব্যবস্থাও অস্বাভাবিক নিতে হবে, এ প্রসঙ্গে অবশ্য মূল তুলে লাভ নেই। সরকারী ক্ষেত্রেও জনস্বার্থে অবস্থার জরুরী বাজেট প্রণয়নের রীতি চলতি আছে। কিন্তু সাধারণতঃ আয়-ব্যয় বা বাজেট-ব্যবস্থার মূল নীতিটি অঙ্গসংগ্রহই সর্বাংশে সমীচীন। মোটের উপর—আর্থিক সীমাবদ্ধতা যেখানেই থাকছে, সকল রকম সৌখিন বা অপ্রয়োজনীয় বায়-পরিবর্তন না করলে সেখানে চলতে পারে না।

আদর্শ-বাজেট কি ধরনের হতে পারে, বিশেষ ভাবে বিলেভের

কলিকাতায় এই সর্বপ্রথম
আর্যের “স্লাইসড ব্রেড”



প্রতি পাউন্ড
২৪ টি
বড় আকারের

- কলমে প্রস্তুত
- ইন্ডো সেকা
- মেশিনে প্যাক
- ও ফালি করা

আপনার স্বাস্থ্য, তৃপ্তি
ও সঞ্চয় রক্ষা করিতে

আর্য বেকারী অ্যান্ড কনফেকশনারী
কলিকতা - ২৯

মাসিক বসুমতীর এজেন্ট-তালিকা

ক্রমেই বর্ধিত হইতেছে

বর্তমানে মাসিক বসুমতীর ব্যাপক ও বিস্তৃত প্রচার বাড়লার সাময়িক পত্রের ইতিহাসে বিষয় সৃষ্টি করিয়াছে। আমাদের পত্রিকার এজেন্ট-তালিকা লক্ষ্য করিলেই আমাদের কথার সত্যতা প্রমাণিত হইবে। কলিকাতার বাহিরের স্থানীয় বাসিন্দাদের মাসিক বসুমতী প্রাপ্তির সুবিধার জন্য আমরা বর্তমান সংখ্যা হইতে আমাদের এজেন্ট-তালিকা নিয়মিত প্রকাশ করিব। মাসিক বসুমতীর সমুদয় পাঠক-পাঠিকা এজেন্টদের ঠিকানায় যোগাযোগ করিতে পারিবেন।

॥ বাঙলা দেশ ॥

কলিকাতা (বৃহত্তর) ●

শ্রীচন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্য	—টালিগঞ্জ
শ্রীকটকচন্দ্র পাল	—টালিগঞ্জ
শ্রীফুলটান ডেওয়ানী	—টালিগঞ্জ
মে: জাতীয় পুস্তকালয়	—টালিগঞ্জ
শ্রী এ বি, দাস	—লেক রোড মার্কেট
শ্রীভগৎ সিং	—বালিগঞ্জ
শ্রীভাগীরথ মাইতি	—গড়িয়াতাট
শ্রীভগীরাম	—বালিগঞ্জ
মে: দামোদর লাইব্রেরী	—বেহালা
শ্রীকটকচন্দ্র পাল	—টালিগঞ্জ
শ্রীনির্মলচন্দ্র মোদে	—টালিগঞ্জ
শ্রীরাধকমল সিং	—বালিগঞ্জ
শ্রীসুকুমার ব্যানার্জী	—বালিগঞ্জ
শ্রীশঙ্করচন্দ্র দত্ত	—চেতলা
শ্রীসুভাষচন্দ্র উকিল	—বালিগঞ্জ
শ্রীশম্ভুনাথ দত্ত	—আলিপুর
শ্রীমখনলাল নাথ	—টালিগঞ্জ
শ্রীজীবনকৃষ্ণ সুর	—টালিগঞ্জ

পূঃ কলিকাতা (বৃহত্তর) ●

শ্রীভগৎ বারিক	—বেলিয়াঘাটা
শ্রীবিমল সরকার	—বেলিয়াঘাটা
শ্রীলক্ষীকান্ত ব্যানার্জী	—বেলিয়াঘাটা

হাওড়া ●

শ্রীকান্ধনাথ সাহা	—আমতা
শ্রীঅলোককুমার চ্যাটার্জী	—বেলুড়
শ্রী এস, বি, সিং	—ফুলেশ্বর
শ্রীরামপথ সিং	—ডেঙ্গাইল
শ্রীরামহরি নাথ	—সাঁতরাগাছি
শ্রী পি, কে, সিংহ	—বেলিয়াঘাটা রোড
শ্রী পি, জি, ঘোষ	—জয়নাথায়ণ সরকার লেন
শ্রী এম, দাস	—পঞ্চাননতলা রোড
শ্রীমাতাঙ্গিনী পাণ্ডে	—চিন্তামণি দে রোড
শ্রীকার্তিকচন্দ্র দাস	—নরসিং দত্ত রোড

মে: কৃষ্ণ বুক ষ্টল
মে: জ্ঞানের সাথী
শ্রী কি. বানার্জী
শ্রী বি. ভট্টাচার্য
শ্রী বি. সি. শেঠ
শ্রী বি. সি. পাল
শ্রী এ. এন, মল্লিক

শ্রীঅমলাচরণ বড়া
শ্রীমদনমোহন গাঙ্গুলী
শ্রীজগদ্বার দে
শ্রীবিশ্বনাথ ভট্টাচার্য
শ্রীললিতমোহন দত্ত
শ্রীগোবিন্দচন্দ্র কুমার
শ্রীমণিভূষণ সিং
শ্রীবৈজনাথ মুখার্জী
শ্রীবি. ভূষণ চ্যাটার্জী
শ্রীমুরারীমোহন মুখার্জী
শ্রী পি, মুখার্জী
শ্রীপ্রভাত ব্যানার্জী
শ্রী পি চন্দ্র
শ্রীসুনীল চক্রবর্তী
শ্রী বি, সি, তালপত্র
ডি, সি, ব্যানার্জী

হাওড়া ●

—হুরিগ্রাম
—কেজ মিডল লেন
—অমৃতলালী লেন
—সারকুলার রোড
—জি. টি. রোড
—শিবপুর

হুগলী ●

—শেওড়াফুলি
—মগরা ও ত্রিবেণী
—শ্রীরামপুর
—ভদ্রেশ্বর ও বৈজনাথ
—হুগলীঘাট
—সিন্দুর
—আরামবাগ
—নবগ্রাম, কোননগর
—গোঘাট
—হরিপাল
—কোরগর
—শ্রীরামপুর
—চন্দ্রনগর
—বাগী
—শ্রীরামপুর
—উত্তরপাড়া
—চন্দ্রনগর

মুর্শিদাবাদ ●

শ্রীঅহিভূষণ মালেকার
শ্রীবিশ্বনাথ দাস
শ্রীকীর্ত্তিচন্দ্র গুপ্ত
শ্রীহরিপদ সাহা
মে: ঘোষ লাইব্রেরী

মালদহ ●

শ্রী এম, এম, চক্রবর্তী
শ্রীসুনীলকুমার শেঠ

শ্রীঅমরকৃষ্ণ দত্ত
মেসার' বাগচী আদাম'
শ্রীভূতনাথ দাস
শ্রীকৃষ্ণাধন সরকার
শ্রী এস, প্যাণ্ডে
শ্রীরেণুপাল পাল
শ্রীতারাপদ বার
শ্রীতপনজ্যোতি চ্যাটার্জী
শ্রীসুরেন্দ্রকুমার দে
শ্রী বি, কে, আইচ
শ্রীপঞ্চানন মোদক
শ্রী এইচ, সি, ঘোষ
শ্রীসুন্দরগোপাল সেন
শ্রীসুনীলকুমার ঝাংচৌধুরী

বর্ধমান ●

—চিত্তবজর
—ফুলটি
—দাইহাট
—খারীগ্রাম
—বর্ধমান
—জে, কে, নগর
—বরবনি
—সীতারামপুর
—বাগীচন্দ্র
—বর্ধমান
—কালনা
—বার্ণপুর ও আসানসোল
—গলসি
—জামুরিয়া

নদীয়া ●

শ্রীগোপালচন্দ্র সেন
শ্রীহরিচরণ প্রামাণিক
শ্রী এ, বি, মুখার্জী
শ্রী এস, কে, চৌধুরী
মে: পত্রিকা প্রতিষ্ঠান
শ্রী এন, এন, ঘোষ
শ্রী বি, কে, সাহা
মে: চাকদহ বুক ডিপো
শ্রী বি, চন্দ্র দাস

মেদিনীপুর ●

শ্রীপঞ্চানন চৌধুরী
মে: মিশ্র নিউজ এজেন্সী
শ্রী জে, এন, আচার্য
শ্রী আই, বি, ঘোষ
শ্রীহরিশাধন পাইন
শ্রীমতী কনকলতা দেবী
শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চৌধুরী

পাঃ দিনাজপুর ●

শ্রী এ, কে, চ্যাটার্জী

—বালুরঘাট

চৰিত্ৰ পৰগণা ●

শ্ৰীমতীলক্ষ্মীৰ ভট্টাচাৰ্য	—ইছাপুৰ
শ্ৰীশ্ৰীকৃষ্ণ দাস	—কাৰাবীৰ
মে: বি, এল, সাহা এণ্ড সন্	—ব্যাৰাকপুৰ
শ্ৰী ৰায় নৃপেন্দ্ৰনাথ চৌধুৰী	—টাকী
মে: এ, বি ষ্টল	—দক্ষিণ-বাৰাসত
শ্ৰী বি, চৌধুৰী	—বাহৰপুৰ
শ্ৰী বি, সি, ঘোষ	—বাংৰপুৰ
শ্ৰী বিজয় ভট্টাচাৰ্য	—বি, ডি, কলোনি
মে: বি এন, লাইব্ৰেৰী	—কালীপুৰ
শ্ৰীকমলেন্দ্ৰ দাশগুপ্ত	—কল্যাণী
শ্ৰী ডি, এন, ভট্টাচাৰ্য	—বাদৰপুৰ
শ্ৰী ডি, সি, পণ্ডিত	—বাদৰপুৰ
মে: ডি, জি, লাইব্ৰেৰী	—মধ্যমগ্রাম
শ্ৰী জি, সি, ৰায়	—জামনগৰ
মে: গুৰু কুটীৰ	—বজ্ৰবজ
মে: গুহ ঠৌৰ	—ব্যাৰাকপুৰ
শ্ৰীহৰিপদ ঘোষ	—ব্যাৰাকপুৰ
শ্ৰীইন্দ্ৰপাল সিং	—দমদম
শ্ৰী জি, এন, দাস	—কল্যাণী
শ্ৰী জি, আৰ সিংহ	—নৈহাটী
শ্ৰী জে, ৰায়	—কসবা
শ্ৰী কে, সি, ব্যানাজী	—বৰাহনগৰ
শ্ৰী কে, জি, দত্ত	—দমদম (নাগেৰ বাজাৰ)
শ্ৰীকালীনাথ শৰ্মা	—হেষ্টিং ষ্ট্ৰীট
শ্ৰীলোকনাথ চন্দ্ৰ	—বজ্ৰবজ
শ্ৰীমাধনলাল নাগ	—বাৰাসাত
শ্ৰী এস, চক্ৰবৰ্তী	—বেলঘৰিয়া
শ্ৰী এন, পি, সাউ	—জামনগৰ
শ্ৰী ইন, চাটাজী	—ব্যাৰাকপুৰ
শ্ৰী এন, লি, মুখাৰ্জী	—চাকুৰিয়া
শ্ৰী এন, কে, কুৰু	—বৰাহনগৰ
মে: নবাবগঞ্জ নিউজ এজেন্সী	—ইছাপুৰ
শ্ৰীনিমাইচন্দ্ৰ দাস	—দমদম
শ্ৰী এন, জি, দাস	—বাদৰপুৰ
শ্ৰী এন, এন, ঘোষ	—ব্যাৰাকপুৰ
শ্ৰীৰামনাৰায়ণ দীক্ষিত	—বাটানগৰ
শ্ৰীৰঞ্জকুমাৰ বৰ্দ্ধিত	—বৰাহনগৰ
শ্ৰী এস, বি, ৰায়চৌধুৰী	—বেলঘৰিয়া
শ্ৰী এস, বি, ৰায়চৌধুৰী	—খড়দাহ
শ্ৰীসন্তোষ ঘোষ	—ভাটপাড়া
শ্ৰী এস, ডি, প্ৰসাদ সিং	—ব্যাৰাকপুৰ
শ্ৰীশতীশচন্দ্ৰ ভৌমিক	—বাংৰপুৰ
শ্ৰীৰামচন্দ্ৰ খান	—দমদম
শ্ৰীশ্ৰীধৰ বিশ্বাস	—হাবড়া
শ্ৰীশঙ্কৰপ্ৰসাদ দাস	—দমদম
শ্ৰীসু ভৌমিক	—বাদৰপুৰ

চৰিত্ৰ পৰগণা ●

শ্ৰী এস চাকলাদাৰ	—খড়দাহ
শ্ৰীপ্ৰকৃষ্ণ অধিকাৰী	—বৰাহনগৰ
শ্ৰীতাপদ পাল	—পাণিহাট
শ্ৰীতাপস ব্যানাজী	—কাঁচড়াপ ডা
শ্ৰীবুধনৰাম	—দমদম
বীৰভূম ●	
শ্ৰীমাৰিকচন্দ্ৰ সাহা	—ৰামপুৰহাট
শ্ৰীমণিমোহন চন্দ্ৰ	—নলহাট
শ্ৰীমদ্বৈকুণ্ঠৰাম ব্যানাজী	—পিউড়ি
মানভূম ●	
শ্ৰীবিঘলকান্ত ৰায়	—কুমাৰঘুৰি ও বৰাকৰ
শ্ৰীঅবনীমোহন দাশ	—পুৰুলিয়া
বাঁকুড়া ●	
শ্ৰীগজেন্দ্ৰচন্দ্ৰ কৰ্মকাৰ	—বিষ্ণুপুৰ
শ্ৰী বি, পাল	—সোনাৰুখী
শ্ৰীবিজয়দাস	—বাঁকুড়া
জলপাইগুড়ি ●	
শ্ৰী এ, ধৰ চৌধুৰী	—আলিপুরতলাৰ
শ্ৰীসতীশচন্দ্ৰ বোস	—মল-জংশন
শ্ৰীমতিসাল সরকার	—কালচিনি
দাৰ্জিলিং ●	
শ্ৰী ডি, এন, বড়াল	—কালিম্পাং
শ্ৰীমতী শচীৰাণী দেবী	—শিলিগুড়ি টাউন
ৰামপ্ৰসাদ সেন	—দাৰ্জিলিং
কুচবিহাৰ ●	
শ্ৰীঅমল্যৱতন ৰায়গুপ্ত	—দিনহাট
শ্ৰীঅনিলৱৰ্দ্ধন চক্ৰবৰ্তী	—কুচবিহাৰ
সাঁওতাল পৰগণা ●	
শ্ৰী জে, এন, সাহা	—পাকুড়
শ্ৰীমদ্বৈকুণ্ঠনাথ দাস	—বৈকুণ্ঠনাথদাম
শ্ৰীবটকৃষ্ণ মিত্ৰ	—মধুপুৰ
ত্ৰিপুরা ●	
শ্ৰীমাণিক ভট্টাচাৰ্য	—আগৰতলা
উড়িষ্যা ●	
শ্ৰী বি, দত্ত	—ৰৌচক্কেলা
মে: এ, এইচ, মিত্ৰ সরকার এণ্ড কো:	—ব্ৰজৰাজনগৰ
বোম্বাই ●	
শ্ৰী জি, এম, ঘোষ চৌধুৰী	—বাইকুলা, বোম্বে
এস, বি, মোদক	—গোম্বে
মধ্য প্ৰদেশ ●	
মে: এ, এইচ, মিত্ৰ সরকার এণ্ড কো:	—ভিলাই ও ভাগ

আগাম ●

শ্ৰীশ্ৰীলক্ষ্মীৰ মজুমদাৰ	—বৰপুৰ
শ্ৰীশ্ৰীল চক্ৰবৰ্তী	—ডিব্ৰুগড়
শ্ৰীপ্ৰমোদৱৰ্দ্ধন সেনগুপ্ত	—হাইলাকান্দি
মেসার্স শিলাং স্পোর্টস	—শিলাং
শ্ৰীনেহ্ৰেনাথ গোস্ব	—কমলপুৰ
শ্ৰী বি, কে, চৌধুৰী	—শিলাচৰ
শ্ৰীমতী কনকৱতী গাঙ্গুলী	—তিনশুকিয়া
শ্ৰী এম, আৰ, ভট্টাচাৰ্য	—মাকুমজং
শ্ৰীচিত্তৱৰ্দ্ধন ভায়েল	—চেতপুৰ
মে: পি, এস, জৈন এণ্ড কো:	—ইম্ফল
শ্ৰী কে, চক্ৰবৰ্তী	—গোৱালপাড়া
মে: ভাণ্ডাৰাল লাইব্ৰেৰী	—ডিব্ৰুগড়
শ্ৰীঅজিতোষ মিত্ৰ	—চবুয়া
শ্ৰী বি, চক্ৰবৰ্তী	—মোহনবাড়ী
শ্ৰীকালচাঁদ বৰিক	—কৰিমগঞ্জ
শ্ৰীজিলাচন ৰায়	—বুৰডী
শ্ৰীৰমেশচন্দ্ৰ আইচ	—কোচৰাখড়
বিহাৰ ●	
শ্ৰীসতীশচন্দ্ৰ ৰায়চৌধুৰী	—বুধনাথপুৰ
শ্ৰীপ্ৰতিভা মুখাৰ্জী	—ধানবাদ
শ্ৰীমুজিতকুমাৰ সরকার	—কাতৰাসগড়
শ্ৰীমনোমোহন চাটাজী	—মজুৰপুৰ
মে: ক্যাপিটাল বুক ডিপো	—বাঁচী
মে: গয়া মিউজিক্যাল ষ্টোৰ	—গয়া
শ্ৰীসত্যেন্দ্ৰনাথ মজুমদাৰ	—কাটিহাৰ
শ্ৰীৰাধৰমণ মিত্ৰ	—মুজের
মে: অমৃতলাল খাৰকাৰ এণ্ড কো:	—বৰিয়া
শ্ৰীৰামক্ৰিষ্ণ প্ৰসাদ	—লোহাৰদাগা
শ্ৰী এইচ, এন, চাটাজী	—ধানবাদ
মে: চক্ৰবৰ্তী এণ্ড কো:	—হাজাৰীবাগ টাউন
শ্ৰীদেবনাৰায়ণলাল	—দিনাপুৰ
শ্ৰীবাচ্চ সিং	—পাটনা
শ্ৰীসৰোজনাথ ঘোষ	—সিল্লি ও পাখাৰদিহি
শ্ৰীকৰুণাসিন্ধু ৰায়	—বেৰমো
শ্ৰীকৃষ্ণবিহাৰী গাঙ্গুলী	—জামালপুৰ
শ্ৰীদীনেশচন্দ্ৰ বিশ্বাস	—বৰজামলা
মে: ইউনাইটেড ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ্স	—টাটানগৰ
উত্তৰ প্ৰদেশ ●	
মেসার্স মিকাডোৰ বেনাৰস নিউজ পেপাৰ এজেন্সী	—বেনাৰস
শ্ৰী এস, বি, মৈত্ৰ	—লক্ষৌ
শ্ৰীশ্ৰীচাক্ৰমোহন গোস্বামী	—নিউ দিল্লী
শ্ৰীনেহ্ৰেনাথ দাস	—নিউ দিল্লী
মে: সেন্ট্ৰাল নিউজ এজেন্সী	—নিউ দিল্লী
মে: কিতাব ঘৰ	—নিউ দিল্লী
মে: ইন্টাৰজাশানাল ষ্টোৰ	—এলাহাবাদ
মে: শ্ৰীকৃষ্ণ বুক হাউচ	—লক্ষৌ

অর্থনীতিজ্ঞ মহলে এই নিয়ে পর্যালোচনা হয়েছে বেশ কিছুটা। অবশ্য সকল পরিবারের ক্ষেত্রেই একটি ধারাবাহ্য বাজেট থাকতে পারে না, বাকে বলা যেতে পারে আদর্শ বাজেট বা অল্পকল্পীয় বাজেট। এর প্রধান কারণটাই হল—সকল ক্ষেত্রেই ব্যয়ের চাহিদা একরূপ নয়, মাসিক আয়ও হয় না সকল পরিবারের হুবহু একই প্রকার। কেউ মপারকে বলে দিতে পারে না এই অবস্থার সাংসারিক খরচটি ঠিক এমনি হবে; গৃহবাসী ও গৃহকর্তার এবং সেই সঙ্গে পরিবারের লোকদের কৃতি ও দারিদ্র্যবোধই একেত্রে বড় কথা।

যেমন দেখা যায়, এমন অনেক আছে, বাজে খরচা (হাত-খরচ) বলতে বাদে কিছুই ভেমন নেই—পান, সিগারেট, চাককি কিংবা সেট পাউডার এসবের জন্য ব্যয় তাগিদ অনুভব করে না। আর একটি শ্রেণীর নাম করা চলে, বাদে বাজে খরচার অবাধ নেই, চা সিগারেট ইত্যাদি প্রায় সর্বকণ মুখে মুখে, সেট পাউডার ও অন্যান্য বিলাস সামগ্রীও না হলেই নয়। একটি পরিবারকে চরতো ছেলেমেয়েদের সর্বোত্তম শিক্ষাদানে প্রচুর অর্থ ব্যয়েও বহুপরিশ্রম দেখা গেলো, আবার অল্প এও দেখা দেখতে পাওয়া বিচিত্র নয়, যেখানে ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদানের ব্যাপারে রয়েছে একটা অনিচ্ছা বা ঔপাশীক কিংবা নিতান্ত সাধারণ চেষ্টা ও অর্থব্যয় মাত্র। পোষাক পশ্চন্দ্র ও খাওয়া-দাওয়ার মাত্রান্তরিত অর্থব্যয় হয়ে থাকে কোন কোন পরিবারে, আবার অনেকগুলি পরিবারে এসব অত্যাধিক খাতও বেশ ভেবে-চিন্তে অর্থব্যয়ের দিকে তাকিয়ে

খরচ করতে দেখা যায়। সামান্য ডাল-ভাতেই সন্তই এমন পরিবারের যেমন অভাব নেই, অপর দিকে তেমনি কতকগুলি পরিবার দেখা যাবে, বাদে বৈদ্যনিন খাততালিকার মাছ-মাংস দুই ডিম এগুলি প্রায় থাকা চাই-ই।

বহু সংসার বা পরিবারেই একটি অভিযোগ বা পতিতাপের সুর শুনতে পাওয়া যায়—বাস্তবক্ষেত্রে তাদের বাস্তব অচল অর্থব্যয় আরের সঙ্গে ব্যয়ের একান্ত প্রয়োজনীয় মিল বা সমতা নেই। বিশেষজ্ঞরা একেত্রে বলতে চেষ্টা করেন, এমনি যেখানে অবস্থা, সেখানে হয় খরচের বিষয়গুলি কাট কাট করতে হবে, নয় তো পারিবারিক আয় বাড়তে হবে যেমন করেই চোক। জীবনমাত্রার মান যতটা উন্নত রাখতে চাওয়া হবে, আরের পরিমাণও সেই অনুপাতে বর্ধিত করার ব্যবস্থা যদি না হলো, সেক্ষেত্রে বাজেট অর্থহীন না হয়ে পারে না। একা পুরুষের বোজগারে স্ত্রীভাবে সংসার চলা যেখানে কঠিন, নারীকেও সেখানে আগিয়ে আসতে হবে অর্থ উপার্জনের জে, প্রসঙ্গতঃ এইটি বলতে হয়।

সর্বোপরি ঘরোয়া বা পারিবারিক বাজেটের সাফল্য নির্ভর করে পরিবারের কর্ত্তা ও আর সমস্তদের চিন্তাশক্তি ও ঐক্যমত্যের উপর। যে কোন মোটা বাস্তব বেলার প্রাচ্যকের মনের ভেতর পরিচালার বোঝাপড়া হওয়া চাই এবং সেটি আগোভাগেই। বাজেট করে চলার পরিবর্তে জীবনে বোঝাচোর ও অমিতব্যয়িতাকে স্থান দিলে স্রবের আশা স্রুৎপরাহত, এ ভুলে চলবে না।

ক্লান্ত বীণায়

কুম্ভা বন্দ্যোপাধ্যায়

বার্ষ প্রাণের বার্ষান্তা নিয়ে
কি হবে গো আজ গান গেয়ে ?
জীবন-যুদ্ধ হাস ভেঙে গেছে
দিকভায়া আজ আমি নেয়ে ।
ফিরে গেছ তুমি মুখে গেছে প্রেম,
মিটে গেছে সব ভালবাসা ।
সংকট মোর নিয়ে গেছে হার
অতপ্ত বড় সংশয় ।
তবুও বলছি তুমি বন্ধু
হবে হবে শেষ এ ব্যথারই ।
তাই যে এখনও ক্লান্ত বীণায়
শেষ করিনিকো দরবারী ।
এমন দিনে যে তুমিও বন্ধু
আত্মগ্রাহীর গোপন বেদে
মিথোষ্ট ঘুরে মরবে দেখেছি
নিজেকে কি পর করবে শেষে ?
তবুও ডাকছি তুমি বন্ধু
ফিরে এসো তুমি আমার মাঝে ।
তাপিত এ প্রাণ জুড়াত জুড়াত
ভুব দিতে হবে জীবন-সাঁঝে ।

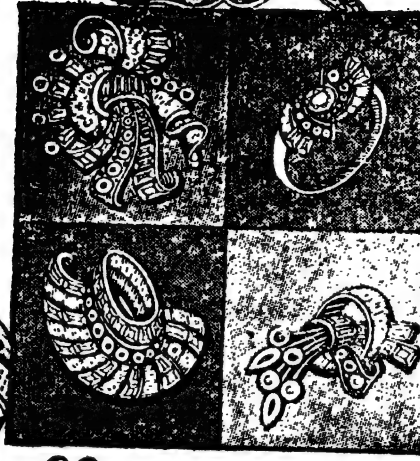
বেকার

বীথি বসু

বন্ধু, তুমি এ দুর্দিনে
ঠিকানা দিয়েছ যাব,
শতক চেষ্টা করেছি তবুও
দেখা হয় নাই তার ।
আমি যে বেকার, বড় ঘৃণা তাই
জেনেছে তাগাব প্রাণে,
তাই বুঝি আর দেখিয়া দেখে না
বুঝি কোন অভ্যমানে ।
মাথা নীচু করে বাই আমি তাই
তবুও তাহার প্রাণ—
একটু গলে না, ভাবি আজ বসে
এই কি প্রীতির দান ?
সিন্ধু-প্রাণের বিষুক ভাষা
খুলিয়া বলেছি যাব,
ক্লান্ত-কাহার গোপন ব্যথাটি
অর্থ দিয়েছি তারে ।
প্রীতির আঘাতে স্মৃতিরে চেয়েছি
মেলে নাই কিছু মোর,
সকলে যেমন চাহিয়াছে বৃকে
তেমনি চেয়েছি ভোর ।



আদর্শ বাড়ি



গিনিজাল্ড জুয়েলারী স্পেশালিস্ট

এম.বি.সরকার
এও সন্স

ম্যানুফ্যাকচারিং জুয়েলার্স

ফোন:- ৩৪-১৭৬১ ১৬৭/সি ১৬৭ সি/১ চব্বাজার ট্রাই কলিকাতা-১২ গ্রাম-দিল্লিয়ার্স
ব্রাড-হালি গজ-২০০/সি রাসবিহারী এডিনিউ কলিকাতা-১২ ফোন- ৪৬-৪৬৬৬
মোরামের প্রবর্তন সিংগনা ১২৪, ১২৪/১, অরুণাকান্ত ট্রাই, কলিকাতা-১২
কেবলমাত্র হবিবার খোলা থাকে
ব্রাঞ্চ-জামসেদপুর ফোন- জামসেদপুর- সিটি-২৪৪৮৫

জন্মান্তর কি সম্ভব ?

ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য

জন্ম বলিতে সাধারণত উৎপত্তিকেই বুঝাইয়া থাকে। যে বস্তু পূর্বে ছিল না তাহার সত্তা স্বত্ব (লাভ) বা পূর্বে বস্তুটি থাকিলে ও ইন্দ্রিয় মন প্রভৃতির দ্বারা বাহ্যিক জ্ঞানবাব মত অবস্থা ছিল না, তাহারই (সেই বস্তুটির) ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা জ্ঞানবাব মত বোগ্য অবস্থা। পূর্বের মতটি অনস্বার্থবানীর মত। এই মতের সমর্থক চার্বাক, বৌদ্ধ, নৈয়ায়িক, বৈশেষিক প্রভৃতি। দ্বিতীয় মতটি সংস্কারবানীর মত। সাংখ্য, বোগ, মীমাংসা, বেদান্ত * ইত্যাদি। পূর্বমতে উৎপত্তি পূর্বে ঘট কখনই ছিল না। দ্বিতীয়মতে উৎপত্তির পূর্বেও ঘটটি অনভিব্যক্ত অবস্থা বিশিষ্টরূপে ছিল। এই প্রবন্ধে জীবের জন্ম, জন্মান্তরই আলোচ্য; অপরের উৎপত্তি আলোচনীয় নয়। আমরা প্রত্যক্ষের দ্বারা জীবের জন্ম জানিতে পারিতেছি, সুতরাং এবিষয়ে সাধারণত সন্দেহ নাই; কিন্তু জন্মান্তর অর্থাৎ এই বর্তমান জন্ম ব্যতীত পূর্ব ও পশ্চাত্তম সম্ভব কি না ইহাই জিজ্ঞাস্য। আবার জন্মান্তর বলিতে একই সত্তানের (ধারার) ভিন্ন ভিন্ন সত্তানী অর্থাৎ ব্যক্তির জন্ম এইরূপ, বৌদ্ধমত অনুসারে জন্মান্তর বুলিলেও সন্দেহ দূরীভূত হইবে না। কারণ বৌদ্ধমতে সত্তানী ব্যক্তির সত্তানের পৃথক সত্তা না থাকায় আবার সত্তানী মাত্রই ক্রমিক বলিয়া প্রকৃতপক্ষে কাহারও জন্মান্তর নাই। অথচ জন্মান্তর লইয়া যে বংশাবলি তাহা এক দ্বারী আত্মাকে সন্দেহ করিয়াই তাহার পৃথক পৃথক নূতন, পুরাতন জন্ম সম্বন্ধে সন্দেহ হইতে উদ্ভূত।

কেহ কেহ বলেন, 'জন্মান্তর নাই অর্থাৎ একটি জীবের এই জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তাহার সব কিছুই আরম্ভ, আর তাহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু শেষ।' এই মতের সমর্থকগণ লোকায়ত বা চার্বাক নামে প্রসিদ্ধ। এই নাম কোন ব্যক্তি বা দলের নাম নয়, কিন্তু যে মত লোকে আরম্ভ অর্থাৎ ব্যাপ্ত তাহার নাম লোকায়ত। মোট কথা, বাহ্যিক অবিকাল লোকেই মানে তাহাই লোকায়ত মত। অবিকাল লোকেই শরীর, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধ প্রভৃতিকে আত্মা মনে করিয়া তাহারই সুখবিধান ও দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা করে।

আবার কেহ কেহ বলেন, এই শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধ প্রভৃতি হইতে অতিরিক্ত একজন আত্মা আছে।

অপূর্ব দেহের সহিত সেই আত্মার সম্বন্ধে তাহার (আত্মার) জন্ম বলে। এই বর্তমান দেহ ভিন্ন পূর্ববর্তী বা পরবর্তী দেহের সম্বন্ধই জন্মান্তর। ইহা ভার, বৈশেষিক সাংখ্য, পাণ্ডঙ্গ, মীমাংসা, বেদান্ত, শৈব, বৈষ্ণব, শাক্ত প্রভৃতির মত। কিন্তু জন্মান্তর তবেই সম্ভব হয়, যদি দেহের অতিরিক্ত আত্মা থাকে ও দেহ-উৎপত্তি বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে ঐ দেহধারীর উৎপত্তি বিনাশ না হয়। দেহই আত্মা হইলে যে দেহের জন্ম বা মৃত্যু হয় ঠিক সেই দেহের পূর্বজন্ম সম্ভব

নয়। যেহেতু আমরা কোথাও এরূপ দেখি না—সাধারণত প্রকৃতির মধ্যে যে ঘট নষ্ট হইয়া যায়, সেই ঘট পুনরায় উৎপন্ন হয়। শরীরও সাধারণ, সুতরাং তাহার পুনর্জন্ম সম্ভব নয়। আবার দেহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে যেমন দেহের ছায়া বা রূপ প্রভৃতি নষ্ট হইয়া যায়, আত্মাও যদি সেই ভাবে নষ্ট হইয়া যায় তাহা হইলেও তাহার জন্মান্তর সম্ভাবিত হইতে পারে না। সুতরাং পাণ্ডাইল এই যে, দেহাদি-অতিরিক্ত আত্মা থাকিলে এবং তাহা অবিনাশী হইলে জন্মান্তর সম্ভব নতুবা জন্মান্তর অসিদ্ধ। এখন দেখা যাক এই দুইটি সম্ভব কি না।

পূর্বপক্ষ

দেহ-অতিরিক্ত আত্মা অসিদ্ধ। কারণ সকলেই দেহকে আত্মা বলিয়া অনুভব করে; দেহের অতিরিক্ত আত্মার প্রত্যক্ষ হয় না। দেহের মৃত্যুর পর দেহ হইতে আত্মাকে পৃথক ভাবে বাহির হইয়া বাইতে বা জন্মের সময় দেহের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে দেখা যায় না। সকলেই শরীরকে আমি বলিয়া বুঝে এবং তাহারই সুখ দুঃখ প্রভৃতিতে নিজেকে সুখী, দুঃখী প্রভৃতি মনে করে। যেমন লোকে মনে করে আমি মানুষ, আমার নাম সুভাষ, আমি কলিকাতার বাস করি, আমি খুব সুখী, আমি দুঃখী ইত্যাদি। শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধ ব্যতিরিক্ত মানুষ বলিয়া কোন পদার্থ নাই, বা সুভাষ নাম, কলিকাতার বাস প্রভৃতিও শরীর হইতে কোন অতিরিক্ত আত্মার সম্বন্ধে বুঝায় না। আর আমি বলিতে আত্মাকেই বুঝায়; আত্মা ভিন্ন কোন পদার্থকে লোকে আমি বলে না। সুতরাং এই দেহই আত্মা এবং তাহা চৈতন্য। যেমন এই সাধারণ জলে বিদ্যুৎ পরিলক্ষিত না হইলেও এখন তাহা মেঘ-রূপে পরিণত হয় তখন তাহাতে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, সেইরূপ যে পঞ্চভূতের দ্বারা দেহ উৎপন্ন হয়, সেই পঞ্চভূতে চৈতন্য না থাকিলেও দেহরূপে পরিণত হইলে তাহাতে চৈতন্য উৎপন্ন হওয়ার কোন বাধা নাই।

উত্তরপক্ষ

যদি শরীরই আত্মা হইত, তাহা হইলে 'আমার শরীর' এইরূপ ব্যবহার সম্ভব হইত না। কারণ আমি বলিতে এখন আত্মাকে বুঝান হয়, আর সেই আত্মা এখন শরীর হইতে অভিন্ন, তখন 'আমি শরীর বা মানুষ' এইরূপ ব্যবহারই সম্ভব, 'আমার শরীর' এই ব্যবহার কিরূপে সম্ভব হইবে? কেহ কি 'ঘটের ঘট, বা ঘটের কলস' এইরূপ ব্যবহার করে? অথচ লোকে সকলেই 'আমার শরীর' এইরূপ ব্যবহার করে। যেখানে বস্তি ও প্রথমা বিভক্তির প্রয়োগ হয় সেখানে বস্তু ও প্রথমান্ত পদার্থ দুইটি পরস্পর ভিন্নই হইয়া থাকে। আমার পিতা, আমার গৃহ ইত্যাদি। অতএব 'আমার শরীর কলস, ঘন' ইত্যাদি প্রয়োগের দ্বারা শরীর হইতে যে আত্মা অতিরিক্ত তাহা বুঝা যায়। যদি বলা যায় একই অভিন্ন বস্তুতে লোকে অনেক স্থলে গৌণ ভেদ ব্যবহার করে। যেমন রাহুর মস্তক, পাখরের প্রতিমা ইত্যাদি। রাহু ও মস্তক অভিন্ন বস্তু, পাখর ও প্রতিমা একই বস্তু। তথাপি লোকে রাহুর মস্তক, পাখরের প্রতিমা বলিয়া ভেদের ব্যবহার করে। সেইরূপ শরীর ও আত্মা অভিন্ন পদার্থ হইলেও 'আমার শরীর' এইরূপ গৌণ ভেদ ব্যবহার অসিদ্ধ হয় না। যেখানে পরিষ্কার ভাবে সকলের অভিন্ন জ্ঞান থাকে সেখানেই গৌণ ভেদের ব্যবহার হয়। বেদে—রাহু ও মস্তক অভিন্ন বলিয়া সকলেই জানা আছে, এইরূপ রাহুর মস্তক—এইরূপ গৌণ ভেদ ব্যবহার সিদ্ধ হয়; কিন্তু দেহ ও

* অদ্বৈতবেদান্ত ভিন্ন অজ্ঞাত বেদান্তবাদীদের মতে কার্য সৎ। অদ্বৈতবেদান্তে যে সংস্কারবাদের কথা আছে তাহা অনস্বার্থবাদ ধর্মের অভিপ্রায়ে। অদ্বৈতবাদী বাস্তবিক পক্ষে সংস্কারবাদী। জন্মকে কারণ হইতে কার্যে পৃথক সত্তা নাই।

আত্মা যে অভিন্ন, তাহা পরিষ্কার ভাবে সর্ববাদিসম্মতরূপে জানা নাই। অতএব এখানে দেহকেই অবলম্বন করিয়া 'আমার শরীর' এই ব্যবহার সম্ভব হইবে না। দেহ ও আত্মার অভিন্ন জ্ঞান অবিসংবাদিরূপে সকলেরই আছে—ইহা স্বীকার করিয়া লইলেও দেহকে আত্মা বলা যাইবে না। যথা—দেহকে আত্মা বলিলে প্রসঙ্গ হইবে যে, আত্মা চেতন বলিয়া দেহও চেতনসিদ্ধ হওয়ার সাবয়ব দেহের প্রত্যেক অবয়বে এক একটি পৃথক পৃথক চৈতন্য আছে অথবা দেহের সমস্ত অবয়বে মিলিয়া একটি চৈতন্য। দেহ যে সাবয়ব তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। যদি বল প্রত্যেক অবয়বে এক একটি পৃথক চৈতন্য থাকে, তাহা হইলে এই দোষ হইবে যে একটি দেহে অনেক চৈতন্যের সমাবেশ হওয়ার, বহু চেতন পদার্থের নিয়ন্তা ব্যতিরেকে ঐক্যমত না হওয়ার, শারীরিক ব্যবহার যথাযথ ভাবে সম্পন্ন হইতে পারিবে না। একজন চেতন যদি পূর্বদিকে ঘাইতে ইচ্ছা করে আর একজন যুবকও পশ্চিম দিকে ঘাইতে ইচ্ছা করিতে পারে। তাহার ফলে শরীরটি বিক্ষিপ্ত হইয়া ঘাইবে নতুবা সকলের সমান বল হইলে শরীর আর কোন দিকেই অগ্রসর হইতে পারিবে না।

আর যদি বল শরীরের সমস্ত অবয়ব অর্থাৎ রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, নাড়ী, স্নায়ু, বক প্রভৃতি সমস্ত অংশ মিলিয়া শরীরে একটি চৈতন্য উৎপন্ন হয়—তাহার উত্তরে বলিব—যেমন প্রদীপ, সলতা, তেল, অগ্নি মিলিত হইয়া একটি প্রকাশ-কার্য সম্পাদন করিলেও কোন একটি বা দুইটির অভাব হইলে আর প্রদীপ জ্বলে না, সেইরূপ শরীরের কোন একটি হাত বা পা কাটিয়া গেলে, তাহার অভাবে চৈতন্য নষ্ট হইয়া যাউক। অথচ বহু সৌকর্য্যকাটা হাত ভাঙ্গা পা ইত্যাদি সত্ত্বেও বাঁচিয়া থাকে বা চেতনই থাকে। যদি বল শরীরের রূপ সমস্ত শরীরকে ব্যাপ্ত করিয়া থাকে, শরীরের একাংশ নষ্ট হইয়া গেলে সেই অংশের রূপ না থাকিলেও অঙ্গ অংশে যেমন রূপ থাকে সেইরূপ চৈতন্য ও সর্ব শরীরের গুণ বলিয়া শরীরের একাংশ নষ্ট হইয়া গেলে ও অপর অংশে চৈতন্য থাকিতে বাধা কি? তাহার উত্তর এই যে, মৃতশরীর যখন গড়িয়া থাকে, তখন তাহাতে রূপও থাকে; সেইরূপ চৈতন্যও থাকে না কেন? সুতরাং চৈতন্য, রূপের মত, দেহের গুণ নয় বা দেহের ধর্ম নয়—ইহা সিদ্ধ হওয়ার, দেহ-অতিরিক্ত আত্মা স্বীকার করিয়া চৈতন্যকে তাহার ধর্ম বা স্বভাব বলিতে হইবে। যদি বল, জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত চৈতন্য থাকাই শরীরের স্বভাব, এই জন্ম মৃতদেহে চৈতন্য থাকে না। ইহার উত্তরে বলিব—বস্তু নষ্ট (অদৃশ্য) না হওয়া পর্যন্ত যে ধর্ম বস্তুতে অমুদ্রিত হয়, তাহাই তাহার স্বভাব হয়। যেমন অগ্নির উষ্ণতা, জলের নীতলতা ইত্যাদি। বস্তু বিজ্ঞমান থাকিতে তাহার স্বভাব কখনও নষ্ট হইতে পারে না। সুতরাং মৃতশরীর পড়িয়া থাকা সত্ত্বেও যখন চৈতন্য অমুদ্রিত হয় না, তখন বুঝিতে পারা যায় যে, চৈতন্য শরীরের স্বভাব নয়।

পূর্বপক্ষ

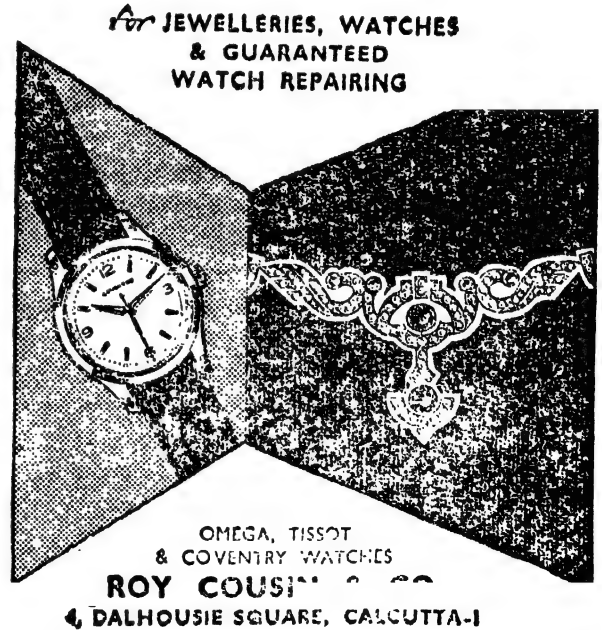
বস্তু অমুদ্রিত হইলেও কোন প্রতিবন্ধক বশত অনেক সময় তাহার স্বভাবের আদর্শন দেখা যায়। যেমন উষ্ণতা ও দাহকতা

বহির স্বভাব কিন্তু সেই বহি বিশেষ মণি বা মন্ত্রাদি যুক্ত হইলে বহি থাকা সত্ত্বেও তাহার দাহকতা বা উষ্ণতা অমুদ্রিত হয় না। কারণ বিজ্ঞমান সত্ত্বে বাহার জন্ম কার্য উৎপন্ন হয় না—তাহাকে প্রতিবন্ধক বলে। বহিরূপ কারণ থাকা সত্ত্বেও মণি বা মন্ত্র বশত দাহকার্য উৎপন্ন হয় না বলিয়া দাহের প্রতি মণি প্রতিবন্ধক। সেইরূপ শরীরের স্বভাব চৈতন্য; কিন্তু মৃত্যু, মুচ্ছা বা সুস্থিতরূপ প্রতিবন্ধক বশত মৃত্যাদি শরীরে চৈতন্য অমুদ্রিত হয় না। এই ভাবে চৈতন্যকে শরীরের স্বভাব বলিলে কোন অমুপপত্তি না থাকায় শরীরের অতিরিক্ত আত্মার কল্পনা করা অনর্থক ক্লেশমাত্র।

উত্তরপক্ষ

কারণ বিজ্ঞমান সত্ত্বে, বাহার জন্ম কার্য উৎপন্ন হয় না—অথচ বাহ্যাকে পরিহার করিয়া কার্য উৎপাদন করা সম্ভব তাহাকেই প্রতিবন্ধক বলে। বহি বিজ্ঞমান সত্ত্বে চন্দ্রকান্ত মণির সংযোগ বশত দাহ উৎপন্ন হয় না, সেই চন্দ্রকান্ত মণিকে সরাইয়া দিয়া বা সূর্যকান্ত মণির দ্বারা চন্দ্রকান্ত মণির শক্তি অভিভূত করিয়া বহির দাহ-উৎপাদন করা যায় বলিয়া চন্দ্রকান্ত মণিটি প্রতিবন্ধক হইতে পারে। কিন্তু শরীর বিজ্ঞমান সত্ত্বেও মৃত্যু বশত শরীরের চৈতন্য উৎপন্ন হয় না—এই কথা বলিলে চৈতন্যের প্রতি মৃত্যুকে প্রতিবন্ধক বলা যাইবে না। যদি এমন হইত, মৃত্যুকে দূর করিয়া বা অভিভূত করিয়া শরীরে চৈতন্য উৎপন্ন হইত তাহা হইলে অবশ্য মৃত্যুকে চৈতন্যের প্রতিবন্ধক বলা যাইত। কিন্তু তাহা ত সম্ভব হয় না।

JEWELLERIES, WATCHES
& GUARANTEED
WATCH REPAIRING



OMEGA, TISSOT
& COVENTRY WATCHES
ROY COUSIN & CO.
4, DALHOUSIE SQUARE, CALCUTTA-1

আজ পর্যন্তও কেহ মৃত-শরীরে চৈতন্ত উৎপাদন করিতে পারেন নাই। অতএব মৃত্যু চৈতন্তের প্রতিবন্ধক নয় কিন্তু শরীরের সহিত প্রাণের শেষসংযোগের ধ্বংসই মৃত্যু। আরও কথা এই যে, ভাবপদার্থ ভিন্ন বাহ্যর অত্যন্তাভাবটি কারণের প্রতি কারণ হয়, তাহার প্রতিযোগীকে প্রতিবন্ধক বলে। যেমন চন্দ্রকান্ত মণির অত্যন্তাভাব দাহের প্রতি কারণ হয় বলিয়া তাহার প্রতিযোগী চন্দ্রকান্ত মণিটি প্রতিবন্ধক হইতে পারিল। মৃত্যু হইতেছে প্রাণের শেষ সংযোগ ধ্বংস। ঐ ধ্বংসের প্রাগভাবকে অর্থাৎ মৃত্যুর প্রাগভাবকে শরীরে চৈতন্তের প্রতি কারণ বলিলেও বেহেতু মৃত্যুটি প্রাগভাবের প্রতিযোগী আবার মৃত্যুর প্রাগভাবটি ফলত, শরীরের সহিত প্রাণের শেষ সংযোগরূপ ভাবপদার্থ হওয়ার, তাহার প্রতিযোগী মৃত্যুকে প্রতিবন্ধক পদার্থ বলা বাইবে না। আর মৃত্যুর অত্যন্তাভাবটি অপ্রেসিদ্ধ বলিয়া তাহার প্রতিযোগীরূপেও মৃত্যুকে প্রতিবন্ধক বলা বাইবে না।

পূর্বপক্ষ

হুই বা তাহার অধিক বস্তুর সংযোগে নূতন নূতন গুণ বা স্বভাব উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। যেমন চূণের সহিত হলুদের সংযোগ হইলে লাল রং উৎপন্ন হয়। কেবল দধি কফাদি বস্তুক হইলেও শর্করাদি সংযুক্ত ঐ দধি দ্রব্যাদি নাশক ও পুষ্টিকারক হয়। আধুনিক চিকিৎসকগণ মানুষের শরীরের অংশবিশেষ অকর্মণ্য হইয়া গেলে অনেক সময় বানর প্রভৃতি পশুর অংশবিশেষ শরীরে সংযুক্ত করিয়া দেন। তাহার ফলে অনেক সময় তাহার (রোগীর) পূর্ব স্বভাবের পরিবর্তন হইয়া যায়। বৃদ্ধের শরীরেও বৌবনের আবির্ভাব হয় ইত্যাদি। সেইরূপ কেবল শরীরে চৈতন্ত না থাকিলেও প্রাণ, মন, বিশেষ স্নায়ু বা শরীরের কোন সূক্ষ্ম অংশ (বাহ্য মৃত্যুকালে থাকে না) প্রভৃতির সংযোগ বশত শরীরে চৈতন্ত উৎপন্ন হয়। মৃত্যুকালে শরীর হইতে ঐ প্রাণ প্রভৃতি বিযুক্ত হওয়ার, কারণের অভাববশত চৈতন্ত থাকে না ইহাই যুক্তিসঙ্গত। স্তবরাং শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ ইত্যাদি হইতে অভিব্যক্ত আত্মার প্রমাণ না থাকায় জন্মান্তরবাদ অসিদ্ধ।

উত্তরপক্ষ

চূণ বা হলুদে পূর্ব হইতেই লাল রঙি অনভিব্যক্ত অবস্থায় ছিল; ঐ উজ্জ্বল সংযোগরূপ অভিব্যক্তের ফলে অভিব্যক্ত হয় মাত্র। যদি চূণ বা হলুদে লাল রং না থাকিত তাহা হইলে তাহাদের সংযোগ বশত উহা কখনই উৎপন্ন হইতে পারিত না। কারণ গুণ বা স্বভাব কখনও কেবল সংযোগের দ্বারা উৎপন্ন হইতে পারে না। গুণ দ্রব্যের ধর্ম এবং দ্রব্যকে আশ্রয় না করিয়া থাকিতে পারে না বলিয়া গুণের প্রতি দ্রব্যকে অবগুই কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। যদি দ্রব্য গুণের প্রতি কারণ না হইত, তাহা হইলে চূণ ও হলুদের সংযোগের ফলে লাল রঙি ঐ চূণ বা হলুদে উৎপন্ন না হইয়া জলে বা মাটিতে উৎপন্ন হইতে পারিত। কিন্তু তাহা হয় না। অতএব বলিতে হইবে যে, লাল রংএর প্রতি চূণ এবং হলুদও কারণ। আর চূণও হলুদকে বধন লাল রংএর প্রতি কারণ বলিয়া স্বীকারই করিতে হইল, তখন তাহাদের সংযোগকে কারণ স্বীকার না করিয়া অভিব্যক্ত মাত্র স্বীকার করাই যুক্তিসঙ্গত। আর এইরূপ দেখাও

যায়—কুহুমে পূর্ব হইতে গন্ধ থাকে, গন্ধ মৃত সংযোগ করিলে সেই গন্ধ অভিব্যক্ত হয় বলিয়া গন্ধ মৃত বা তাহার সংযোগটি গন্ধের অভিব্যক্ত মাত্র। দধি শর্করার সংযোগ, মানুষ-শরীরে বানরের খারড় গ্রাণ্ড সংযোগ ইত্যাদি স্থলেও এইরূপ বুঝিতে হইবে। শরীর বা মনে নানা প্রকার গুণ বা স্বভাব অনভিব্যক্ত অবস্থায় থাকে। বোধোচিত অভিব্যক্ত (Operation প্রভৃতি) দ্বারা সেই সর্ব গুণ বা স্বভাবের অভিব্যক্তি হয় মাত্র। কেবল সংযোগবশত কোন স্বভাব উড়িয়া আসে না। স্তবরাং শরীর, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন প্রভৃতির সংযোগ বশত যদি চৈতন্ত উৎপন্ন হয়, ইহা স্বীকার করা যায়; তাহা হইলে বলিতে হইবে, ঐ চৈতন্ত, শরীর, ইন্দ্রিয়, মন বা প্রাণ প্রভৃতি বস্তুর এক বা ততোধিক বস্তুর পূর্ব হইতে অনভিব্যক্ত ভাবে ছিল। সংযোগের ফলে অভিব্যক্ত হয়; বিয়োগের ফলে পুনরায় তিরোহিত হয়। কিন্তু শরীরে যে চৈতন্ত থাকিতে পারে না, তাহা পূর্বেই দেখান হইয়াছে।

ইন্দ্রিয়ের চৈতন্ত স্বীকার করিলে শরীরের বেলায় যে দোষ হয়, ইন্দ্রিয়পক্ষেও সেই দোষের আপত্তি হইবে। ইন্দ্রিয়ের চৈতন্তপক্ষে আরও দোষ এই যে, চক্ষুরিন্দ্রিয় পূর্ব বস্তু বস্তু প্রত্যক্ষ করিয়াছিল; পরে বখন চক্ষু ইন্দ্রিয় নষ্ট হইয়া যায়, তখন মানুষ পূর্ব প্রত্যক্ষীকৃত বস্তুগুলি স্মরণ না করুক; কারণ চক্ষুরূপ আত্মা ত মরিয়া গিয়াছে। কর্ণ প্রভৃতি ত চক্ষু হইতে ভিন্ন। চক্ষুর অল্পভূত বস্তু কর্ণ প্রভৃতি স্মরণ করিতে পারে না। অস্ত্রের অল্পভূত বস্তু অস্ত্রে কখনও স্মরণ করে না। অথচ মানুষ পরে বখন চক্ষু হারায় তখনও চক্ষুর দ্বারা পূর্ব অল্পভূত বস্তুর স্মরণ করে। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন স্থায়ী কোন চেতন পদার্থ আছে; বাহ্য পূর্বাগর বিষয়ের অল্পভব স্মরণ করিতে পারে।

চৈতন্ত যে মনের ধর্ম নয়, তাহা একটু পরে দেখান হইবে। বাকি থাকিল প্রাণ। এখন দেখা যাক চৈতন্তটি প্রাণের ধর্ম বা স্বভাব কি না। প্রাণে চৈতন্ত থাকে না। কারণ স্রষ্টার সময় প্রাণ শরীরে সংযুক্ত থাকে অথচ ডাকিলে সাড়া পাওয়া যায় না বা স্রষ্টার কালে কোন জ্ঞান অর্থাৎ চৈতন্ত থাকে না। যদি বলা যায়—স্রষ্টার হইতে উঠিয়া লোকে নিজের সত্তা বা আনন্দ প্রভৃতি স্মরণ করে বলিয়া স্রষ্টার সময়ে সামান্যভাবে চৈতন্ত বা জ্ঞান থাকে, মনের সংযোগ না থাকায় বিশেষ জ্ঞান হয় না। প্রাণরূপ আত্মার সামান্য জ্ঞানের প্রতি শরীর সংযোগটি কারণ, আর বিশেষ জ্ঞানের প্রতি প্রাণে শরীর ও মনের সংযোগই কারণ। স্তবরাং চৈতন্ত প্রাণের ধর্ম হইবে না কেন? ইহার উত্তরে বলিব, তোমাদের (পূর্বপক্ষীর) মতে প্রাণে চৈতন্ত স্বীকার করায় প্রাণকে আত্মা বলিতে হইবে। কারণ আত্মা চেতন বলিয়া প্রসিদ্ধ। অথচ জন্মান্তর স্বীকার না করায় প্রাণকে বিনাশলী বস্তু বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। অতথা প্রাণকে নিত্য স্বীকার করিলে শরীরের জন্মের পূর্বে বা পরে প্রাণের সত্তা থাকায় জন্মান্তর নিষ্পত্তি হইতে পারিবে। প্রাণ বিনাশী হইলে, বিনাশী ভাবপদার্থ মাত্রই উৎপত্তিশীল হয়, এবং উৎপত্তিশীল দ্রব্য সাবয়ব হয় বলিয়া প্রাণের উৎপত্তি এবং সাবয়ব স্বীকার করিতে হইবে।

সাবয়ব স্বীকার করার পূর্বের মত প্রশ্ন হইবে যে প্রাণের প্রত্যেক অবয়বে ভিন্ন ভিন্ন চৈতন্ত উৎপন্ন হয়, অথবা সমস্ত

অবয়বে একটি চৈতন্য উৎপন্ন হয়। প্রত্যেক অবয়বে ভিন্ন ভিন্ন চৈতন্য স্বীকার করিলে এক শরীরে অনেক চেতনের সমাবেশ বশত পূর্বের মত শরীরধারার আব্যবস্থা হইবে। আর সমস্ত অবয়বে একটি চৈতন্য স্বীকার করিলে বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্য অবস্থায় প্রাণের এক বা একাধিক অবয়বের বিনাশ বশত চৈতন্যও নষ্ট হইয়া যাইবে। অথচ তাহা হয় না। সুতরাং প্রাণে চৈতন্য নষ্ট যদি বলা যায় সমস্ত বস্ত্রে একটি রূপ ব্যাপ্ত হইয়া থাকে; বস্ত্রের একাংশ ছিন্ন হইলে বা বস্ত্রে কিয়দংশ যোগ করা হইলে নূতন নূতন রূপ উৎপন্ন হয়; বস্ত্র কখনও নীরূপ হয় না; সেইরূপ প্রাণের সমস্ত অবয়বের একটি চৈতন্য ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। তাহার (প্রাণের) একাংশ নষ্ট হইলেও চৈতন্য নষ্ট হইবে কেন? ততক্ষণ প্রাণের একটি অবয়বও থাকিবে ততক্ষণ তাহাতে চৈতন্য থাকিবে; অথবা নূতন নূতন চৈতন্য উৎপন্ন হইবে। সুতরাং চৈতন্যের একেবারে বিনাশের আশঙ্কা হইতে পারে না।

ইহার উত্তরে বলিব যে, জীবের অবয়বের ভ্রাস-বৃদ্ধি হইলে অবয়বী পরিবর্তিত হয় অর্থাৎ পূর্ব-অবয়বী থাকে না নূতন অবয়বীই উৎপন্ন হয়। পূর্বে যে বস্ত্রে বস্তুগুলি মূত্র ছিল, পরে এক-দুই বা অধিক মূত্র যদি সেই বস্ত্রে হইতে বিচ্যুত হয় বা তাহাতে সংযুক্ত হয়, তাহা হইলে ঠিক পূর্ব-বস্ত্র আর থাকে না, নূতন বা অন্য বস্ত্রই উৎপন্ন হয়, মোট কথা, বস্ত্রটি ভিন্ন

হইয়া যায়। বস্ত্র ভিন্ন হওয়ার ফলে তাহার রং-ও পরিবর্তিত হয় অর্থাৎ অন্য রং তাহাতে উৎপন্ন হয়। জন্ম ভিন্ন হইলে তাহার গুণও অবশ্যই ভিন্ন স্বীকার করিতে হইবে। সেইরূপ প্রাণ সাবয়ব বলিয়া বাল্য যৌবন, বার্দ্ধক্য প্রভৃতি অবস্থাতে তাহার অবয়বের ভ্রাস বা বৃদ্ধি হওয়ার অবয়বী রূপ প্রাণও ভিন্ন ভিন্ন উৎপন্ন হয়—ইহা স্বীকার করিতে হইবে। অবয়বী ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উৎপন্ন হওয়ার তাহার চৈতন্যরূপ গুণও ভিন্ন ভিন্ন উৎপন্ন হইবে—ইহা অনস্বীকার্য। তাহা হইলে বাল্যে যে চেতন প্রাণরূপী আত্মা ছিলেন যৌবনে সেই আত্মা না থাকায়, পংক্ত ভিন্ন আত্মা উৎপন্ন হওয়ার লোকে বাল্যের অমুদৃত বিষয় বা ঘটনাকে যৌবনে স্মরণ করিতে পারিব না। কারণ বাল্যের প্রাণাত্মা ভিন্ন, যৌবনের প্রাণাত্মা ভিন্ন বলিয়া বাল্যে অমুদৃত আত্মার বিষয়কে যৌবনের আত্মা স্মরণ করিতে পারে না। অথচ সকলেই বাল্য যৌবনের ঘটনা রোগাদি বিশেষ-প্রতিবন্ধক না থাকিলে যৌবনে বা বার্দ্ধক্যে স্মরণ করিয়া থাকে। এই স্মরণের নিয়ম বশত স্বীকার করিতে হইবে—জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত এক অপরিবর্তিত স্থায়ী নিরবয়ব আত্মা থাকেন—বাহার ফলে পূর্ব-স্মরণ প্রভৃতি সম্ভব হয়। শরীর, প্রাণ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি সাবয়ব বলিয়া পরিবর্তনশীল হওয়ার স্মরণের ব্যাবস্থা সিদ্ধ হয় না। সুতরাং ইহার আত্মা নয়।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।

মহাপ্রস্থানের পথে

প্রভাবতী বিখ্যাস

যে চিরপথিক, পথ চল, পথ চল।

হুটি নয়নের কাজল মায়ার

ছি ছি বেহুইন, বাঁবিবে তোমার

স্বপ্নর ডাকিছে হাতছানি দিয়ে

চল চল তুমি চল।

ভুবন-ভরা সে রূপের মাধুরী

পান কর তুমি, হুটি আঁধি তরি

পিপাসা মিটিবে; অমিয়-ধারাতে

প্রাণিবে হৃদয়তল।

অরুণ রতনে খুঁজে নেবে যদি

পথ চল, পথ চল।

ওই শোন তার বাঁশরীর ধ্বনি

ভুবন ভরিয়া উঠে রণি' রণি'

মধুর সে বাণী শুনিতে দেয় না

ধরণীর কোলাহল।

তোমার আশায়, ডাকে সে তোমার

চল তার কাছে চল।

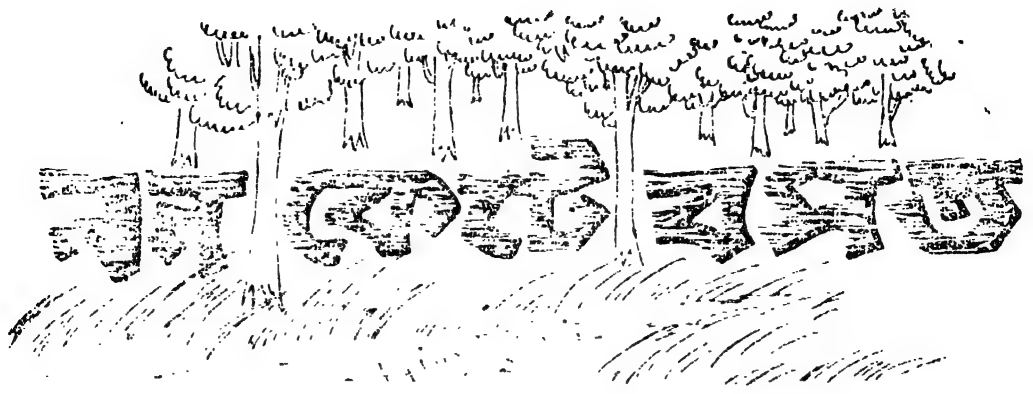
সারাটি জীবন ধারে ফির খুঁজে

মরণের বেশে আসিবে সে নিজে

হিলন-সোহাগে ধস্ত হবে যে

বিরহের আঁধিকল।

তীর্থরাজের চরণে ঢালিবে সকল তীর্থকল।



[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

মনোজ বসু

তেরো

চৌধুরিগঞ্জ অবধি রাস্তার নিশানা। জগা সেই রাস্তা ধরে চলেছে। চলা আর কি, একরকম দৌড়ানো। রাস্তার বেরলেই জগার এই কাণ্ড, বীরে গুহে পা ফেলা কোষ্ঠিতে লেখে না। পিছনে বলাই, সে হাঁপাচ্ছে। আস্তে যে জগা, আস্তে। আবার ওই মধ্যে রসিকতা করে নেয় একটু: এত ছুটছি কেন যে? দজ্জাল মেরেটার ভয়ে? উঁহ, সে পিছনে নেই। আস্তে চল।

উঁহু জারগা হল তো বন-জঙ্গল, নাবাল হল তো জল। বনের গাছ-পালা কেটে নাবাল জমির উপর মাটি ফেলে হাত চারেক চওড়া রাস্তা টেনে নিয়ে গেছে। সেই আরো বিপদ। কাটা গাছের গোড়াগুলো শূন্য মতন পায়ে খোঁচা দেয়। নতুন তোলা মাটিতে ঠোঁড় লাগে পায়ে। জগার লাগে না, বোধ করি শত্রে ঘোড়ার মতন পারের তলায় সোতার নাল বাঁধিয়ে নিয়েছে। নয়তো ছোট কেমন করে ঐ রাস্তায়? বলাই পারে না—রাস্তা ছেড়ে সে পাশে অপথে চলে যায়, জলে নেমে পড়। গোটা দুই-তিন ঝাল বাঁধা হচ্ছে, কান্না শেন হয়নি এখনো। তা জগার কাণ্ড দেখ, তিলেক দিখা না করে খালে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে তবন্তর করে সাঁতরে চলে গেল পানকোড়ির মতন। রাস্তাটা করেছে কিন্তু নাকের সোজা। বারোবেকির পাঁচ পাঁচ বত ঘরতে হত, সংক্ষেপ হয়ে গিয়ে বোধ করি তার সিকিতে ঝাঁড়িয়েছে। আর সত্যি সত্যি বখন পাকা রাস্তা হয়ে মোটর চলবে, তখন কুমিরমাঝি একেবারে ঘরের দুয়ারে। পলক ফেলতে না ফেলতে পৌছে দেবে।

সাঁইতলা পৌছতে দুপুর গড়িয়ে গেল। বিস্তর ক্ষণ আগে এসেছে তবু। নোকো হলে দিনের মধ্যে আসা ষট না। জগা বলে, আসায় চল যে বলাই আগে। এত বেশি উত্তলা হয়ে পড়ল কেন বড়লা? পনের-বিশ হাত বাঁধ ভেঙেছে, তার মধ্যে আজব ব্যাপার কি হল? মাটির বাঁধ ভাঙবেই জলের তোড়ে। ধানকর নর যে লোণা জল ঢুকে সবুজ ধানচারা রাস্তা হয়ে মরে যাবে। চারা মাছ কিছু বেয়োতে পারে, কিন্তু ওঁড়ো ডিমও ঢুকবে তেমন জলের সঙ্গে। ভাঙনের মুখে গোটাকয়েক খোঁটা পুঁতে খোঁটার গারে খড় জড়িয়ে দিয়ে জলের টান কবে দাঁও আগে। মাছ ঠেকাও। বীরেন্দ্রে মাটি এনে ঢালো জারপরে। ধানচারার মতন বুক চাপতে হাঁহাকারের কোন হেতু নেই।

আসায় একলা পচা। গগন বাঁধে গেছে লোকজন জোঁগাড় ক নিয়ে। ভাড়া জারগায় মাটি ফেলছে, আর খুঁজে খুঁজে দেখছে যে হয়েছে কিনা অস্ত্র কোথাও। অর্থাৎ কোনখানে ছিঁজ হয়ে গায়ে জল চুঁইয়ে আসছে কিনা ভিতরে। মাটি ধুয়ে ধুয়ে ঐ সস্ত্র ছিঁজ এ সময়ে বড় হয়ে নদীস্রোতের পথ করে দেয়। গোড়া থেকে সস্ত্র হলে আখেরে হান্ধামা ও খরচাস্ত হয় না। বাঁধের আগাগোড়া চাক দিয়ে বেড়াচ্ছে তাই গগন। পচা বাবু-মাছধ—পেটের দায়ে জাে যায় বটে কিন্তু জলকান্দা মাথতে সে বড় নারাজ। আসার পাহার রয়েছে সে। বলে, কালীতলার ঐ দিকটা চলে বাও জগা-দা। বোঁ লুব বাহনি, পেয়ে যাবে।

বলাই বলে, গিয়ে কি হবে? হান্ধাস্ত হয়ে এসে আমরা আর কোদাল ধরতে যাব না। পেট চোঁ-চোঁ করছে—ঘরে চলে জগা, ভাত চানিয়ে কি গে। চালও বুঝি বাড়ন্ত! চাটুটি দিয়ে দে পচা।

ভাত নামিয়ে সস্ত্র-ঠেঁতুল এবং ওড়-ঠেঁতুল দিয়ে খেয়ে নিও এই তো দু-খানা তরকারি। চেষ্টা করলে মাছও মিলত, কিন্তু সবুর হয় না। পরিতোষের ঝাওয়া সেরে গড়িয়ে পড়ল মাছের পেটে ঘুম তো নয়, কেউ যেন ঘরে রেখে গেছে দৈত্যাসম ছোঁড়া দুটোকে ছোটোছুটি করে কত কাতর হয়ে পড়েছে, ঘুমের এই ধরন দেখে বোঁ বাচ্ছে। অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে চোখ রগড়ে জগা উঠে বসল, ত বেশ রাজি হয়ে গেছে।

ওঁ যে বলাই। কি হল? জাগবি নে মোটে তুই?

বলাইর পা ধরে ঝাঁকি দেব। উঁ—বলে একবার চোখ দে দরাজ মাছের পেয়ে পা ছড়িয়ে সে পাশ ফিরল।

এক ছিলিম তামাক খাওয়ার দরকার মউজ করে। ঘুমের জাে বেঁটু হল, তাতে জুত হয়নি। তামাক আছে, কিন্তু ওড় ওবি গিয়ে বিশ্বাস। তামাক টানছি না শুকনো লাউপাতা—সে লাগে না গলায়। কটা দিন ছিল না, সবুজ গুপ্তগোল হয়ে গে এয় মধ্যে।

বলাই ঘুমোঁক, জগা আসার চলল। গগন ফিরেছে এতক্ষণে। আজ্ঞা জমবে, তামাক কত খাবে খেও না।

গগন দলের আলা মেছোবেরি আর দশটা আসার মতন

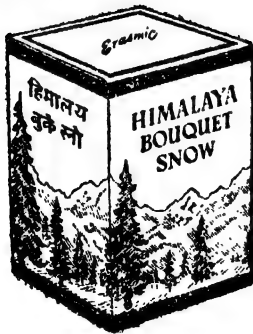


স্বাস্থ্য
সৌন্দর্যের
জন্য...

হিমালয় বোকে

শ্রেষ্ঠ

প্রসাধন



মৃদু এবং সুগন্ধ হিমালয় বোকে স্নো আপনার
ত্বকে মৃদু এবং নোনাটম্য রাখে। যবনের মত হিমালয় বোকে টয়লেট
পাউডার আপনার লাবণ্য স্বাভাবিক সৌন্দর্যকে
ঝড়িয়ে তোলে।

হিমালয় বোকে স্নো
এবং টয়লেট পাউডার



হু-চালা ঘর। সাঁইতলা তল্লাটের মধ্যে ঘরের মতন ঘর বটে একখানা। বাহারটা আস্তে আস্তে জমেছে। তিন দিকে এখন মাটির দেয়াল। এক পাশের দাওয়া গরানের ছিটের জঙ্ক করে বিয়ে নিয়ে চৌকাস-সবজা বসিয়েছে। গগনের শোবার ঘর, খাতাপত্র এবং হাতবাক্স সেখানে। এই ঘরে তালি দিয়ে রাখে বখন সে বাইরে কোথাও যায়।

আলা চুপচাপ একেবারে। এ সময়টা এমন হওয়ার কথা নয়। কালিমাটি-মাথা জন তিন-চার পুকুরঘাটে হাত-পা বুছে। জগা জিজ্ঞাসা করে, মাটি কাটছিল তোমরা? কাজকর্মের কত দূর?

আজ শেষ হয়ে গেল।

বড়দা নেই?

আছে বই কি? হিসেবপত্র হল এতক্ষণ। পরস-কড়ি মিটিয়ে দিয়ে ঘরে ঢুক পড়েছে।

কামরার উঁকিঝুঁকি দিয়ে জগা হেসে উঠল : একা একা ঘান্নে বসেছ নাকি বড়দা? আলা ভেঁ-ভেঁ করছে, মানুষজনের কি হল?

সত্যি, হাসির ব্যাপার নয়। এত দিন সঙ্গে সঙ্গে আছে, এমন ারা কেবা যায়নি আর কখনো। কামরার মাঝখানটার টেমি হলছে, পদ্মা লাল কেরোসিনের ঘোঁরা উঠছে গলগল করে। আলোর সামনে হাতে মাথা চেপে গগন কিম হয়ে বসে। খাওয়ার সময়টাও হালো ছালে না, মাছের কাঁটা অন্ধকারে আন্ধারে বেছে বেছে ফেলে, সেই মাছ অহেতুক কেরোসিন পোড়ান্নে। ভয় হল জগরাতের।

হল কি তোমার? কি ভাবছ?

গগন ক্ষীণকণ্ঠে বলে, আর জগা। মনটা মিইয়ে আছে। পালের নিচে বধাসর্ব্ব্ব ডেক্সে দিয়েছি। দু-চার পরস একদিনে বা রাজগারপত্তার হল, বাঁধের মাটি খেয়ে নিল সমস্ত। উটে পাচ-টাকার মতন দেনা। তার উপরে পিওন এসেছিল আজ আবার। লাল আমায়ই। বড় বড় পারশেমাছ খাইয়েছিলাম সেদিন, সেই পাত্রে পিওন নিত্য নিত্য আসতে লেগেছে। এসে মাথার মুলে রে গেল।

চিঠি?

একদূর আসছে, খালি হাতে আসে কি করে? সেদিন, এই ধরো, নটে খামের চিঠি নিয়ে এসে। উলুনে দিয়ে অবসর ইলাম। বাঁধ আজ। আগের চিঠি বয়্যারখোলায় তৈলকের বাড়ি থেকে ফান্না কেটে এখানে পাঠায়। এবারে সরাসরি চলে এসেছে। তার নে, এই আড্ডানাও জেনে ফেলেছে। কেমন করে জানল, রাজাজ এত সমস্ত কি লেখে—দেখিই না খুলে। খুলি জগা, ঐ ছটাই হল কাল। চিঠিপড়ে ফেলে সেই থেকে মাথা ঘুছে আমার।

জগার ভাল লাগে না। জুত করে এক ছিলিম তামাক খেতে একঘেয়ে কাঁধনি শুনবে এখন বসে বসে? সংসার জোটানোর রটা মনে ছিল না যে ফ্যাচা আছে পিছনে? বলে, কবে ফুটি-টিও বড়দা। মাথা ঘোরার জ্বর ওরু। মানুষজন দেখতে ছিলে—কটা দিন ছিলাম না, তার মধ্যে ঘরে গেছে নাকি সমস্ত?

মাছের খাতা বন্ধ হবার দাখিল। মানুষ আসতে বাবে কোন "জ" এখন?

বলতে বলতে গগন কীলো-কীলো হয়ে পড়ে : বাঁদাবনের বেঘোরে সত্যি সত্যি মেয়ে ফেলি? এই তোমার ধর্ম হল যে জগা?

জগা বলে, আমি ছাড়া আর লোক নেই?

বলাইটাকেও যদি রেখে যেতিস—

জগা-বলাই একই কথা। এ তোমার অস্তায় বড়দা। জগা তোমার চিরকাল আগলে-এক জায়গার বসে থাকবে?

কিন্তু চালায় কে? দু-হবার এর মধ্যে লোক বদলেছি। ছাগলের পায়ে যদি ধান পড়ত। বারোবেঁকি পার দিয়ে মাছ নিয়ে পৌছতে বেলা দুপুর করে গেলে। খন্দের নেই আর তখন, মাটির দর। ব্যাপারিরা তাই মাল কিনবার গা করে না এখানে। লোকেও তেমন জাস নিয়ে বেরুচ্ছে না।

জগা উঠে দাঁড়াল বলে, বারোবেঁকি আর ক'দিন? তোমার রান্না—ভাঙার পথে আমরা এলাম। মাছ এর পরে এক দশে পৌছে দেবে। বেরিয়ে এসো দিকি। গানবাজনা হোক একটু। নয় তো পড়। কী ঘরের মধ্যে বসে প্যানপ্যানানি!

বাইরে এসে উচ্চকণ্ঠে বলাইয়ের নাম ধারে ডাকে। পচাকে ডাকে। রাখেগামকে। খোল দেয়ালে টাঙানো। চাটি মেয়ে পাড়ায় জানান দিয়ে দিল। গগনকে বলে, জুত করে এক ছিলিম চড়াও দিকি বড়দা। তামাক না খেয়ে পেট ফুলে উঠেছে। ঘুম ভেঙেই তোমার কাছে ছুটেছি।

তামাক সঙ্গে টানতে টানতে এসে গগন জগার হাতে হুকো দিল। হুকো দিয়ে শুক কণ্ঠে বলে ওঠে, দশটা টাকা কর্ত দিতে পারিস জগা?

জগা বলে, বড়মানুষ তুমি বড়দা। শীতলপাটি বিনে ঘুম হয় না। হয় বড়ই কাঁহা-কাঁহা মুলুক থেকে তোমার জুত শীতলপাটি বয়ে আনে। তোমার আবার টাকার কি টান পড়ল?

শীতলপাটির কথায় গগনের লজ্জা হয়। কৈফিয়ৎ মিছে ফলাও করে : সে এক কাণ্ড হল। দুপুরবেলা ঘুম হচ্ছে না, গরমে-এপাশ-ওপাশ করছি। হয় বড়ই সেই সময়টা এলো। বলে, সামনে বোশেখ মাগ, গরমের হয়েছি কি এখন? ফুলতলার তোকা শীতলপাটি পাওয়া বাচ্ছে। চোদ্দ সিকের পরস তখন গাঁটে, পাশ কিরতে গারে কোটে। ঝড়াকসে বের করে দিলাম বড়ইয়ের হাতে। আখের ভাবলাম না। আবার তা-ও বলি তখন তো জানি নে বাঁধ ভেঙে এক কাঁড়ি পরস গুলোগার বাবে। আর পিঠ পিঠ পিওন শালা এসে পড়বে। মাছ খেতে এসেছে! মাছ না দিয়ে চুড়ো খেলে দিতে হয় বেটার মুখে।

পরক্ষণেই আবার অল্পনয়ের স্রবে বলে, দশটা টাকা দিবি আমার জগা? পিওন বেটা অনেক দূর থেকে আশাহুখে এসেছিল। কিন্তু খাতা একমার বন্ধ এই ক'দিন—ভাল মাছ কোথা? হুসো-জিড়ির খোল খেয়ে গেল বেচার। কোটালের মুখে আবার আসতে বলে দিলাম। হয়তো বা রাত পোয়ালে এসে পড়বে। দশ টাকা তার কাছে দিয়ে দেবো মশিঅর্ডার করতে।

বলার ধরনে জগা অবাক হয়ে তার মুখে ভাকার : মুখেই তোমার বত কড়ফড়ানি। বউয়ের জুত মন কেমন করছে—উ?

গগন না-না করে না অস্ত দিনের মতো। একটুখানি চুপ করে বইল, বলে ধরেছিল ঠিক। চিঠি পড়ে ফেলাই দুশকিম হল। বউ একা লেখেনি। আমার বোন লিখেছে। বেলা সবস্বীত

নিখেছে। সেটা এক গৌয়ারগোবিন্দ, সবুজ না থাকলেও ওটাকে শালা বলতাম। সংসার ভাসিয়ে দিয়ে আমি নাকি পালিয়ে বসে আছি।

সন্জারে নিখাস ফেলল একটা। জগার হাত থেকে হুকো নিয়ে কড়কড় করে দ্রুত করেকটা টান দেয়। বলে, বউ আছে বোন আছে, ঘরবাড়ি বাগান-পুকুর পড়শী-কুটুং সমস্ত নিয়ে দিবি। এক সংসার রে। কেউ কি শব্দ করে সে জিনিস ছেড়ে আসে, বাইরে তাড়াবার জন্ত সকলে ওরা উঠে পড়ে লাগল। আমি নড়ব না, ওরাও ছাড়বে না। গায়ে জাগ্রত রক্তকালী ঠাকরুন, কালীভক্ত আমরা। তাঁর পাদপদ্মে রেখে চলে এলাম। ঠাকরুন দেখেও আসছেন এত বছর। মাগুগি গণ্ডার বাজারে ইদানীং একেবারে অচল অবস্থা নাকি, ঘন ঘন চিঠি হাটাচ্ছে। ধানাইপানাই করা মেয়েমাছের স্বভাব—আমি আমল দিইনে। চিঠিই খুলিনে, দেখেছিল তো। নিজের একটা পেটই চলে না, বারো ঘাটে ভেসে জেসে বেড়াচ্ছি, খুলে কি হবে?

জগার মনটাও কেমন হয়ে গেল আজ। কোন এক দূরদেশে গগন ঘরসংসার ফেলে এসেছে, টাকা পাঠানোর দরকার। সেই টাকার খান্নার কত জায়গায় ঘুরল, কত রকম চোঁচরিজ্ঞ করছে—কিছুতে কিছু হয় না। আর জগার ট্যাকে টাকাপয়সা আপনি গড়িয়ে আসে। বাদ্যবনে তোমরা দেখ শুধু জঙ্গল—জঙ্গলে বাঘ-কুমির দেখতে পাও, আর শুলোর খোঁচার পা জখম করে বাপ-বাপ বলে চৈচিয়ে ওঠ। ভিতরের মজাটা জান ক'জনে? বাদ্যর ঢোকবার মুখে টাকা দিয়ে লাইসেন্স করবার আইন। অদৃষ্টে কী ঘটবে ঠিকঠিকানা নেই, আগেভাগে গাঁটের টাকার সরকার সেলামি দিয়ে যাও। আচ্ছা আইন রে বাপু। বাঘ-কুমির তো লাইসেন্স করে ঢোকে না, বিনা ট্যাক্সের খেয়েদেয়ে চরে বেড়িয়ে এই তাগাড় হচ্ছে। তাদের কারদার চলাচল করো লোকসানের তর নেই, বা-কিছু সওদা বোলজানা লাভের অঙ্কে পড়ল। টাকা আর নোট কোথায় রাখা যায়, সেই তখন সমস্তা হয়ে পাঁজাবে। ও-বছর গগনের এসে পড়বার আগে—গোলপাতা কাটতে গিয়ে কি হল? সরকারি খাতায় বেবাক শূন্য, বনকরের বাবুদের পান-খাওয়া ব্যবদ বারো কি তেরো টাকা সর্বসাকুল্যে। নিম্নাড়ে মাল বেরিয়ে এলো বিশ কাহন। বড়লোক হতে ক'দিন লাগে হেন অবস্থার? মোটামুটি রকমের গঁথে নিয়ে বোসো; তারপরে পায়ে উপর পা চাপিয়ে খাওনাও আর ফুঁতসে ঢোলক বাজাও। শহরে পাক দিয়ে এসো মাঝে মাঝে দু-পাঁচ দিন। টাকা ফুরোতে চায় না। আর এমন কপাল জগার, মনিঅর্ডার করে কিছু যে হালকা হয়ে যাবে, তুবন দু'ছে তেমন একটা লোক মেলে না। গগন বিদ্বান্ মাছ—বাদ্যর কাজ তাকে দিয়ে হয় না। তার কাজ ভাঙারি কিবা মাষ্টারি। বড় জোর এক মাছের খাতা খুলে মাচার উপর হাতবান্ কোলে নিয়ে বুড়ি প্রতি এক এক পয়সা উপার্জন। বিভাই কাল হয়েছে, এব বেশি এ মাছকে দিয়ে হয় না।

হিলিম শেষ করে জগা উঠল। গগন বলে, বাস কোথা?

চৈচিয়ে গগা চিরে ফেললাম। পাঁজাছড় ঠিক মরেছে, নয়তো এমন নিখরুদ হয় না। দেখে আসি বড়দা।

আর এই যে টাকার কথা বললাম। স্ত্রীয়া স্ত্র দেখো।

হবে, হবে। সে তো কালকের কথা।

হন-হন করে সে বেরল। পাড়ার নয়, চলল উল্টো মুখো—কালীতলা বৈদিকটায়। খানিক দূরে গিয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে গৌরোবনের ভিতর ঢুকে পড়ে। কাটাচির নিয়ে এসেছে গগনের রান্নাঘর থেকে। চিহ্নিত করা এক গাঁহ, তার গোড়ার মাটি খুঁড়ছে। এদিক-ওদিক তাকায়, আর নিঃসাড়ে মাটি তুলে রাশ করে। বেরল মাটির ঘট একটা। ঘটের মুখ টাটি দিয়ে ঢাকা—আধাআধি টাকার ডবতি। মোট নয়, রূপোর টাকা শুধু। মাটির নিচে কাগজের নোট নষ্ট হয়ে যায়, নোট ভাঙার টাকা করে ঘটের ভিতর ঢোকার। আজকালকার টাকা—রূপা নামে মাত্র, খানবস্ত বেশি। টাকার রং কালো হয়ে যায় দু-পাঁচ দিনে। তেঁতুল বা আমকুল-পাতার ঘষে চকচকে করো, নয়তো বাজারে নিতে চায় না।

কম নয়, খোক কুড়ি টাকা নিয়ে এলো জগা। গগনের হাতে দিয়ে বলে, মেকি নয়, বংটা এই রকম। বাজারে দেখে নাও বড়দা। স্ত্রদও সস্তা করে দিচ্ছি—এক পয়সা হিসাবে। বিশ টাকার দরুন পাঁচ গুণা পয়সা খাতা থেকে রোজ ফেলে দিও। চুকে গেল। আসল বদ্দিন খুলি রেখে দাওগে, তাসিদ করব না। স্ত্রদটা ঠিক ঠিক দিয়ে যেও।

টাকা গগন বাজারে দেখে না। শুণে নিল। কুড়িই বটে। চাইল দশ, দিয়ে দিল তার ডবল। সাক্ষাৎ বহুতর। এক দিনের স্ত্রদ এক পয়সা—এক রকম বিনা স্ত্রদেই বলা যায়। এমন হলো বাবা জঙ্কলের সবাই স্বপ্ন করে হাতি কিনে বসে একটা। জগার ঠান্ডারে গগন অবাক হল। খুলিতে আকর্ষণশ্রান্ত হাসি হেসে বলে, আজকের দিনের স্ত্রদ কুড়ি পয়সা—নিয়ে নে সেটা নগদ—

খলি কেড়েবুড়ে পয়সা পাঁচটার বেশি হল না। তাই তো। তখন আর এক পস্থা মনে এসে গেল।

ডেকে এলি, তা আসে কই ওরা? গানবাজনা নয়, খেলা হোক এখন। খেলার রোজগার করে তোর স্ত্রদ শুধবো। স্ত্রদই বা কেন, আসলের আধাআধি কেড়ে দিচ্ছি এখনই।

এগিয়ে গিয়ে নিজেই টোচামেচি করে এলো : চলে আর কোন কোন মরদের বোটা আছিল। পয়সা নিয়ে আসবি।

শেষ কথার মধ্যে বাপারটা পরিহার। জগা ইতিমধ্যে বেজের মাছর বিকিরে ছক পেতে বসেছে। বংগাই এলো। আরও জন

স্ত্রীরোগ, ধবল ও বৈজ্ঞানিক কেশ-চর্চা

ধবল, বিভিন্ন চর্মরোগ ও চুলের যাবতীয় রোগ ও স্ত্রীরোগের বৈজ্ঞানিক চিকিৎসাস্থ পত্রালাপ বা সাক্ষাৎ করুন।

ডাঃ চ্যাটার্জীর ব্যাশন্যাল কিওর সেন্টার

৩৩, একডালিয়া রোড, কলিকাতা-১১

সন্ধ্যা ৬।—৮।।। ফোন নং ৪৬-১৩৫৮

চারপাঁচ—আজকে বারা জালে বায়নি। গাঁটে বানের পরমা তারা খেলবে, বাকি লোক ঘিরে দাঁড়িয়ে সহপদে ছাড়বে,—বে লোক জিতবে তুড়িলাক দেবে তার পক্ষ হয়ে।

কুড়ি কুড়িটা টাকা গগনের হাতে এক সঙ্গে, অতিশয় উঁচু মেজাজ, আপাতত সে খোড়াই কেয়ার করে ছুনিহাটাকে। বলে, দশ টাকা এই আলাদা করে কাপড়ের খুঁটে বাঁধি। বাপের হাড় রে বাবা। পিওন এসে গেলে তখন গাঁট খুলব। বাকি দশ এই ছুঁঠোয়—রণে এলো বাপধনের। দেখিস কি জগা—আধাআধি নয়, তোর পুরো দেনা শোধ করব। দেনা দাঁড়াতে দেবো না।

চলল ফড়পেলা। ক্রমেই গগনের মুখ শুকাচ্ছে। বা: শালা! কি বিজ্ঞী পড়তা, উণ্টোপাণ্টো দানই পড়ে কেবল। টাকা সমস্ত খোয়া গেল, একলা জগাই তাই মধ্যে আট টাকা পনের আনার মত জিতে নিল। বেটা সব দিকে তুখোড়, ফড়ের গুঁটিও বেন কথা শোনে ওর। এখন কি উপায়? কানে জল ঢুকলে আবার খানিক জল ঢুকিয়ে আগের জল বের করে ফেলে। ইতস্তত করে গগন শেষটা কৌটার খুঁট খলে বাকি দশ টাকা বের করে ফেলল।

তা-ও খতম। নেশা জমে গেছে তখন। ছাড়বি না কি রে জগা আর কিছু? বাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপায়। বিশ বর্জ হয়েছে, না হর পচিশই হবে। সবই তো চেটেপুঁছে নিলি তুই।

জগা চটে গিয়ে বলে, খোঁটা দেবার কি আছে বড়না? চুরি-জোচ্চুরি কিগেছি? আইনদস্তর খেলা খেলে জিতে নিইছি।

গগন বলে, তাই দেখলাম যে জগা, পরসাকড়ি তোর পোষমান। তোকে বিষম চেনা চিনে ফেলেছে। বার কাছে বা থাকুক, পায়ে হেঁটে বেন তোর গঁজের গিয়ে উঠে বসে। তা পাঁচ টাকা না হোক, দুটো টাকা ছাড়। পিওন বেটাকে আসতে বলেছি—পোড়া অদৃষ্টে হবে না কিছু জানি—আরও একটুখানি চেষ্টা করে দেখা।

জগা উঠে দাঁড়াল তো গগন তার হাতে চেপে ধরে। জগা মুখ বিচিরে বলে, টাকার আমি গাছ নাকি—নাড়া দিলে অমনি স্বরস্বর করে পড়বে?

এই তো জিতে নিলি এতগুলো টাকা। ধর্মপথেই জিতেছিল, আমি বলছি। বউ বা হোক, মায়ের পেটের বোন আমায় মিছে কথা লিখবে না। বড়লোক শালারা দেখাশুনো করত। কী নাকি ঝগড়াঝাটি হয়েছে—এক পরসাকড়ি নেবে না শালায় কাছ থেকে, না খেয়ে দাঁতে কাঠি দিয়ে পড়ে থাকবে। তা সে পারে, বড় জেদি মেয়ে। উঠিসনে জগা, বোস আর একটু। টাকা দিয়ে লোকসান কিসের তোর? খাতা রয়েছে, ভেরির মাছ বড় হচ্ছে—ঐ ক'টা টাকা তুলে দিতে পারব না?

হেন কালে ম'হুয়ের শকসাড়া উঠানে। খেলায় মগ্ন ছিল, নজর তুলে দেখেনি।

কায়া গো?

হর বড়ুই নীতলপাটি ষাড়ে নিয়ে আগে আগে আসছে। বলে, বাইরে এসে দেখ বড়না, তোমার আপন লোকেরা সব এসে পড়ল।

বাণরাজ্যের ভিতর কুটুব আসা একটা সমারোহের ব্যাপার। হুড়ুড় করে সবাই দাওয়ার চলে এলো। জগার চক্ষু কপালে উঠে

গেছে। কী আশ্চর্য, কুমিরমাঝি অবধি টাপুরে নৌকায় বানের সঙ্গে এসেছে সেই দুটো মেয়ে লোক এবং পুকুরটি। তাদেরও যে সাইতলার গতি, কে ভাবতে পেরেছে?

চাকর একবারে চোখোচোখি পড়ল জগা। বিনি-বউকে চাকর বলে, সেই লোকটা বউদি। চিনতে পারছ না—তামার যে কাদার মধ্যে ফেল দিল। দাদার কাছে এসে জুটেছে শরতান।

যে জগা বাঘ দেখে ভরায় না, মেয়েলোকের সুখোমুখি সে জুবুজু হয়ে গেছে। চেহারায় মেয়েলোক, বয়সও কম বটে—কিন্তু পিঁত্ত জ্বালা করে কথাবার্তার। নতুন জাহাঙ্গীর পা দিয়েই সকলের সামনে তার সম্বন্ধে পরমা উল্লেখ হল শরতান বলে। নেহাৎ লোকে কি বলবে, নয় তো ছুট দিয়ে পাতাত। তবে বউদি মাহুবি দেখা গেল মিটমাটের পক্ষপাতী। চাপা গলায় তাড়া দিয়ে ওঠে, ঝগড়া বাধাবিনে বলছি ঠাকুরঝি। চুপ কর। যেখানে পা দিবি সেইখানে গণ্ডগোল।

জগাকে ছেড়ে চাকর তখন নিজের ভাই গগন দাসকে নিয়ে পড়ল: কী মাহুবি তুমি দাদা! আমরা আছি কি মরেছি, চিঠি লিখে একটা খবর নাও না। জায়গা একটা বেছে নিয়েছ বটে! সত্যি সত্যি খুঁজে পাব, একবারও তা ভাবতে পারিনি।

নগেনশশী পিছনে পড়ে ছিল, পা টানতে টানতে দাওয়ার ধারে এসে দাঁড়ায়: হুঁ, খুঁজে পাব না! আজ মানবে চান-তারা তাক করে ছুটোছুটি করছে, এ তবু মাটির উপরে। খুঁজে পাবে না তো আমি সঙ্গে রয়েছে কি জন্তে? বিনিকে তাই বললাম, চোখ-কান বুঁজে আমার পিছু পিছু চলে যায়। হাজির করে দিলাম কি না বল এবারে।

গগন গরম হয়ে বলে, বা লিখেছ নগেনশশী, সেইটে অক্ষরে অক্ষরে করে ছাড়লে? ছি-ছি, গেরগুথরের মেয়েছেলে জললে এনে তুলেছ; তোমার বোনকে নিয়ে এসেছ, আমি কিছু বলতে চাইনে। কিন্তু আমার সোমন্ত বোনকে নিয়ে এলে কোন বিবেচনায়?

নগেনও সমান তেজে জবাব দেয়, তোমার বোনেরই তো গরজ বেশি। তার ঠেলার তিষ্ঠানো যায় না। তখন বিনি বলে, চেনা মেজলা, পৌছে দেবে আমাদের। সাধী না জুটলেও একা-একা চলে যাবে চাকর।

চাকর কন্ডার দিয়ে ওঠে: আসব না? কাদের কাছে কোন ভরসায় রেখে এসেছিলে তুমি? এদিন তবু চাঁট চাঁট ধান হয়েছে, ভেন-কুটে চলে গেছে এক বকম। এবারে খরায় মাঠ শুকনো, এক চিটে ঘরে উঠল না। বড়লোকের হাততোলা হয়ে থাকার চেয়ে মরে বাওয়া ভাল দাদা।

ষাড় বৈকিয়ে তাকার নগেনশশীর দিকে। নগেন সরে গিয়ে হরর কাছে দাঁড়ায়। গগন বেকুব হয়েছে, ঠাণ্ডা করতে পারলে বাঁচে। জিত দিয়ে ঠোট ভিজিয়ে বলল, চলে এসেছিস সে তো ভালই। ক্ষেতখামারের এই হাল, আমি তা জানব কি করে? কুটুবর হাততোলা বেন হতে হবে? কাল সকালেই মণি কর্ডার হয়ে টংকা চলে যেতো। খবর আসতেই লাগল কত দিন।

জগা হঠাৎ কতকগুলো টাকা ছুঁড়ে দের গগনের দিকে। না বুকে গগন ক্যাল-ক্যাল করে তাকায়।

তোমারই টাকা বড়না। একটু আগে বা তোমার থেকে আমার টাকাকি চলে এসে। ঘরে তোমার কুটুম—টাকা হইলে মজ্জ্ব হইবে কি দিয়ে?

দাওয়া থেকে সঙ্গে সঙ্গে তড়াক করে লাফিয়ে পড়ে উঠিলে। পৈঠা দিয়ে নামবার ভাগত নেই, চাক্র সেই দিকে। ও বা বস্ত্র—চোখ দিয়ে গোড়াচ্ছে—নাগালের মধ্যে পেল কি করে বলে, ঠিক কি?

অন্ধকারে যেন ঢেঁটে তুলে দিয়ে তার মধ্যে জগা ডুবে গেল। যেতে যেতে থমকে দাঁড়ায়। বাইরের সবাই চলে গেছে, আপন লোকেরা এইবার কথাবার্তা বলছে নিজেরদের মধ্যে। জগা আলোবতের কানাকা এসে দাঁড়াস।

বেশ বলছে, দাদা, কি করছিলে এতজনে ঘরের মধ্যে ছিলে?

ভাবি মজাদার ভাবাব ভাইয়ের : নামগান হচ্ছিল।

কই, আওয়াজ পাঠিনি তো?

বিড়বিড় করে হচ্ছিল। তাতে বা ভাব আসে, টেগামেটিতে তখন হয় না।

দেয়ালে-ঝোলানো খোলখান—কাডল তুলে নিশ্চয় সেটা দেখিয়ে দিয়েছে। বড় কাস্তে লেগে গেল খোলটা—পশার বাতুল আত্মজনের কাছে। বিজ্ঞ ফড়ের ছবুটি কোন্ কায়দায় তিন জোড়া চক্ষুর সামনে থেকে বেমালাম সহিয়ে ফেলল, সেইটে এক দিন বড়দাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে।

চোদ্দ

ভোরবাতা ডাকাডাকি, জগা কোথা? বলাই কোথা রে? সাতা লিঙ্গে না ওরা ঘরের ভিতর থেকে। পচা জালে বেরিয়েছিল, হয়েছেও বা-হোক কিছু। তার স্বার্থ রয়েছে, তাকেই পাঠাল খাতা থেকে। অস্ত্র কেটে এসে ঘুম ভাঙালে জগা কড়মড় করে চিবিয়ে খেতে চাটবে, ভাবের মাছুষ পচাকে কিছু বলবে না। মাছের আমদানি বড় কমে গেছে। সে-ও জগার দোষ। ফুলতলায় নিজে গেল, আবার লেজুড় করে নিয়ে গেল বলাইটাকে। দু-দিন বলে পুরো পাঁচ পাঁচটা দিন কাটিয়ে দিল। মাছের নৌকো এদিকে কুমিরমারি পৌছিতে দুপুর হয়ে যায়। ভাল খাদ্য তখন থাকে না, কিছু ছাচড়া খন্দের বোঝাকরা করে। ঐদব মাছুষ ইচ্ছে করেই মেজোহাটে দেবি করে আসে। এসে হয়তো দেখে মাছই নেই তখন। যেদিন থাকে, সস্তা দরে পাওয়া যায়। বেশ থাকল তো বেশি সস্তা। কাঁচা মাগ বেধে দেওয়া চলে না, দরদায় বা-ই হোক ছাউতেই হবে। দর পাচ্ছে না বলে মাছ-মারাদেরও উৎসাহ নেই জলে নামার। খাতার কাজকর তাই বসতে না বসতে চুকে গেছে। গাঙে একপো জোয়ার। এই যে দেবি হচ্ছে, সে কেবল জগাই জন্তে।

জগা চোপ বহুতে বহুতে সোজা গিয়ে ডিঙির গলুরে বোঠে ধরে বসল। অস্ত্র নিদ খাতার বসে একটি ছিলিম অস্ত্রত তামাক

খেয়ে তবে ঘাটে নামে। আজকে—ওরে বাবা, দাঁড়ায় কায়দায় চাকরালা বাটি পেতে রয়েছে হুতো। তা ছাড়া দেবিও হয়ে গেছে, মাছের খোড়া নিয়ে হর ঘড়ুই উঠে বসে আছে অনেকক্ষণ।

কাছি খুলে দে বলাই। গাঞ্জ বদর বদর।

চাকরালা উপর থেকে ডাকছে, শোন, কানে বাচ্ছে না ও-লোকটা? বোঠে একটু থামাওনা—

নাম থাকে মাছবের। নাম না-ই যদি জান, তবে কি তাছিয়া করে 'লোকটা' বলে ডাকবে? বয়ে গেছে বোঠে থামাতে। বলাইকে বলে, তুইও দর বোঠা। ঝালের এইটুকু উজান, কবে টান দে।

চাক বাধ থেকে খালের গর্ভে নামল। হাত উচু করে চেঁচাচ্ছে : শোন, কাঁটা নিয়ে এসো একগাছ। বাঁধা কাঁটা না পাও তো নারকেলের শলা। রান্নার জন্তে হাতা, খুঁটি আর কাঁটা এনা—

কদ' বলতে বলতে আসছে। ডুট-ডাট-ডাটাস আওয়াজ উঠছে কানার; বায়ে—হেই ভগবান, আর খালিকটা বায়ে নিয়ে যেল দজ্জাল মেয়েটাকে। বায়ে বিয়ম দোপি—উপর থেকে কিছু ম'লুম হবে না। কোমর অবধি বসে বাবে, কানার মধ্যে আটকে থাকবে। জনা চারেক ময়দ-জোয়ান পাঠায় ভাল ছাড়াণোর কাহদার টানাটানি করে তবে তুলবে। এই কাজটি করে দাও হে মা কালী। চাকরালায় দুর্গতি দেখতে দেখতে আর বোঠের আগায় জল ছিটাকতে ছিটাকতে মনের খুলিতে ওরা গাঙে গিয়ে পড়বে। ভোরবেলাকার স্বভাবায় দিনমানটা তাহলে কেটে যাবে ভালো।

গাঙে পড়ে জগা বলে, কাঁটা চায় কেন রে?

বলাই হেসে বলে, পেটাবে যে রকম পিরীত তোমার সঙ্গে—তুণ-হাতে অর্থ পাবে না, হাতের কাছে অস্ত্রের জুটির রাখছে।

হর ঘড়ুই বিয়ম বাড নাড়ে : উঁহ, কি বলছ তোমরা। ভাল ঘরের মেয়ে—আমাদের আবাদ জারগার বণচণ্ডী পেয়েছ নাকি? কোত্তা দিয়ে কাঁটা দিচ্ছিল—জাড়া কোত্তা, মাখা কয়ে গেছে। কাঁটা দিতে দিতে কাঁটার কথা মনে হয়েছে বোধ হয়। রান্না করবার সময় অস্বিধা হয়েছে, হাতা-খুঁটির গরজ তাই।

আরও গদগদ হয়ে বলতে লাগল, এসেছে কাল রাত্রে। সকালবেলা তুমি—দেখলে না জগা, ধুলোমাটি পোড়া-বিড়ি ম্যাচের

পেটের যন্ত্রণা কি মারাত্মক তা ডাক্তারগিরাই শুধু জানেন! যে কোন রকমের পেটের বেদনা চিরদিনের মত দূর করতে পারেন একমাত্র

বহু গাছ গাছড়া
দ্বারা আয়ুর্বেদ
মতে প্রস্তুত

বাকলা

ব্যবহারে লক্ষ লক্ষ
রোগী আরোগ্য
লাভ করেছেন

ভারত গভঃ স্নেহিতা নং ১৬৮৩৪৪

অম্লশূল, পিত্তশূল, অম্লপিত্ত, লিভারের ব্যথা, মুখে টকডাৰ, ঢেঁকুর ওঠা, বমিডাৰ, বমি হওয়া, পেট ফাঁপা, মন্দারি, বুকজ্বালা, আমায়ে অরুচি, স্বপ্ননিদ্রা ইত্যাদি রোগ যত পুরাতনই হোক তিন দিনে উপশম। দুই সপ্তাহে সম্পূর্ণ নিরাময়। বহু চিকিৎসা করে যারা হতাশ হয়েছেন, তাঁরাও আশ্চর্য্য সেবন করলে নবজীবন লাভ করবেন। বিফলে মূল্য ফেরৎ। ৩২ ডোজার প্রতি কৌটো ৩-টাকা, একরে ৩ কৌটো ৮-টাকা ৫০ নং পঃ ডাঃ মাঃ ৩ পাইকারী দর পৃথক।

দি বাকলা ঔষধালয়। হেড অফিস-বালিশাকান (পূর্ব পাকিস্তান) ব্রাঞ্চ-১৪৯, মহাত্মা গান্ধী স্ট্রাড, কলিঃ-৭

কাটি কিছু আর নেই। লক্ষ্মীর অংশ হলেন ওরা তো, লক্ষ্মী-ঠাকরনের পা পড়েছে সেটা বেশ বোঝা যাচ্ছে।

কুমিরমারির গল্প এসে মাছ সমস্ত বিক্রি হয়ে গেছে। পরমা হর বড়ুইয়ের গাঁটে। ডরা জোয়ার। কিন্তু জগার কেবল চাউন দেখা যাচ্ছে না। হর তাগিদ দিচ্ছে : উঠে পড় তোমরা এবার। গোন বরে বার, দেরি কোরো না।

জগা বলে, খাব না ?

খাবে বই কি। খুঁজি কিনে নাও, আর বাতাস। দানাদার কিনে নাও কিছু। কৌচড়ে করে খেতে খেতে যাবে।

খুঁজি মর, ভাত খাব।

উঁহ, ভাতের হাঙ্গামা কেন আবার এখন ? ভাত খাবে সাইতলা গিয়ে। পুরো গোন তার উপরে পিঠেন বাতাস—ভিত্তি তো উড়ে গিয়ে পৌঁছেবে।

জগা বলে, হাঙ্গামা তো সেখানেই। উলুন আলো, বাঁধা-খাড়া, বাসন ধোও—হরেক ব্যাপার। এখানে কি, গদাধর ঠাকুরের হোটেল ভাত রেখে বসে খাওয়ার মাছের ডাকছে।

কিন্তু অল্প দিন তো সাইতলা গিয়ে বাঁধাখাড়া কর। হোটেলের ভাতে মন বার না।

জগা এবারে রীতিমতো চটে গিয়ে বলে, জান তো বড়ুই, মিয়নের বাঁধাখাড়া আমার সহ হয় না। দুটো দিন সাইতলা গিয়ে খেয়ে থাকি তো পাঁচটা দিন খেয়ে বাব গদাধরের হোটেল।

জগা বধন ধরেছে নিরন্তর করা যাবে না। হর বড়ুই হোটেল গিয়ে ভাড়া দেয় : হাত চালিয়ে ভটচাজি। ভাত আর ডালটা লেমে গেলেই বসিয়ে দাও এদের দুজনকে।

জগা-বলাইও পিছু পিছু এসেছে। জগা বলে, উঁহ, মাছ খাব, খুঁজি খাব, অল্প খাব।

বেশ, খাও বোড়শোপচারে। বেগোন হয়ে যাবে, বুকে তখন টলা।

তোমার কি ভাবনা বড়ুই ? আমার ভিত্তি আমি কি মাঝপথে ফেলে যাব ? বেগোন হোক বাই হোক এমন কথা বলব না। বড়ুই মশার ডাঙার নেমে গিয়ে দুটো বাক গুন টেনে দাও।

গদাধর কাঁটা পাকছে ফুটন্ত ডালে। কম পরিমাণ ডাল দিয়ে খসখসে বন করবার এই কার্য। জগা বলে, খালের নাম কে যে বারোবেকি রেখেছে। সে বোটা শতকে জানত না। গণে দেখেছি ভটচাজি, বারো হুনা চকির বাকো বেড় পায় না।

বলাই বলে, উঃ, বোটে মেরে মেরে লবেজান। বাস্তাটা এক রকম দাঁড়িয়ে গেছে, তাড়াতাড়ি এবারে খোয়া ফেলে দিক। নৌকো ছেড়ে তাহলে গাড়ির কাছে লেগে যাই, জল ছেড়ে ডাঙার উপর উঠি।

ডালের কড়াই নামিয়ে দিয়ে গদাধর বলে, খোয়া ফেলা পর্বত লাগবে না রে। বর্ষা কেটে গিয়ে রাস্তা খটখটে হয়ে থাক। বানও পেকে যাবে তব্বি। সাত রাজ্যি ঘুরে নৌকোর এবারে বান বওয়াবির নয়। গরুর গাড়িতে। এর মধ্যেই সব গাড়ি বানান্তে লেমে গেছে। কত গাড়ি নেমে যাবে দেখো সবুজেরে। আমি

ভাবছি, হু-ঝোড়া গরু কিনে গরুর গাড়ি করে ফেলি বান ছই ভাড়া বাটবে।

বলাই গুলকে উগমগঃ করে ফেল ভটচাজি, বুলাকা হবে। গাড়ি চালানোর মজা। ভাড়া-ভাড়া, ডাইনে-বঁয়ে—খালি মুখের খাটনি। বাবুমানবের কাজ। বোটে মারতে মারতে হাতে এমন কড়া পড়ে যার না।

আদরমণি গগনের কথা জিজ্ঞাসা করে, ডাক্তারের কি খবর ?

জগা বলে, ডাক্তার এখন মর, ঘেরিদার। মাঝে গুরুমশাই হয়েছিল।

আদর হেসে বলে, এর পরে আবার কোনটা ধরবে ?

বলাই বলে, আর কিছু নয়। পরমন্ত মাছের বড়না। ছোটখাট এক খাটাও জমে উঠছে। হচ্ছে এবারে দুটো পরমা।

জগা ক্রুদ্ধ করে বলে, হতে আর দিল কই ? নানান শত্রু। এক শত্রু চৌধুরি। নারের পাঠিয়ে চুরি করে ঘেরির বাঁধ ভেঙে নানান রকমে নানানাবুধ করছে। তার উপর নতুন উৎপাত—বাড়ির মাছবন্দন এসে পড়েছে। নতুন ব্যবসা, এত ধকল কাটাতে পারবে কেন ?

গদাধর বলে উঠল, হোটেলের প্রাণ্য এগারো টাকা ছ' আনা দিয়ে দিতে বোলো হুঁ-পাঁচদিনের মধ্যে।

জগা বলে, টাকা কেউ বাড়ি বরে দিয়ে যার, শুনেছ কখনো ? নিজে গিয়ে পড় একদিন, বদর পারো খাবা মেরে নিয়ে এসো।

বলাই বলে, টাকা না পাও আকঠ মাছ ঠেসে খেয়ে উত্তল করে এসো খানিকটা।

জগা বলে, বন্ধুলোক তোমার তো। বড়নার বুদ্ধি মতোই গজের উপর বাই হোক জমিয়ে বসে আছে। বিপদে পড়েছে—জাঁতিকলের মতন হুঁদিককার দাঁতে এসে আঁকড়ে ধরছে। এ সময়ে একবার চোখের দেখাও দেখে আসা উচিত। যেও ভটচাজি, বুঝলে ?

পনের

সাইতলা ফিরতে বেশ খানিকটা রাত হল সেদিন। বলাই বলে, আলা চুপচাপ, গানবাজনা নেই। বোধ হয় ওরা ফড়ি খেলছে।

জগা নজর করে দেখে বলে, খেলা হলে তো আলো থাকবে। নয় তো কোট দেখবে কেমন করে ? গালে-মুখে হাত দিয়ে বসে আছে বড়না। নয়তো কোনখানে বদ্বি বেরিয়ে থাকে। কিন্তু রাত্তিরবেলা শব্দ করে বেজবাব মাছের তো বড়না নয়।

সোজা চলেছে ঘরের দিকে। বলাই হাত ধরে টান দেয় : একুণ্ডি ঘরে চুক কি হবে ? চলো, আমরা গিয়ে জমাই গে।

শুয়ে পড়ব। গা ব্যাধ-ব্যাধ করছে।

বলাই হি-হি করে হাসে : তা নয়। খাওয়ারনি মেয়েটাকে ডর লেগেছে তোমার। কাঁটা দিয়ে পেটায় নি তো এখনো, এর মধ্যে গা ব্যাধ কেন ?

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে জগা চলল। ঘরে গিয়ে সত্যিই গড়িয়ে পড়ে। বলে, তুই বসে বসে কি পাহারা দিবি ? তুই চলে যা, আমি ঘুমোব।

আমি গিয়ে কি হবে ? তুমি না হলে খুঁজি ভয়ে কখনো ?

জগা চটে উঠল : খুঁজি না হলে যেতে নেই ? তোরা কেবল শ্রমিকের সান্দী। বড়না মাছবট কিম হয়ে কোথায় পড়ে আছে—অন্যদিকে দুটো ডাল কথা বলে আসার মাছের হয় না।

চিত্রতারকাদের মত

নিখুঁত লাবনড

আপনারও হতে পারে

সাবিত্রী চ্যাটার্জীর মত লাবণ্যময়ী চিত্রতারকা
জানেন যে নারীর সৌন্দর্য্য নির্ভর করে নিখুঁত ত্বকের ওপর।
সাবিত্রী চ্যাটার্জী বলেন—“লাক্স টয়লেট সাবানের সেরে
মত ফণা আর দ্বিধা হৃৎক আমি পছন্দ করি। আমার
ত্বকে এটি মৌল্যেয়ন আর মৃদু রাখে।” আপনার
লাবণ্যের জন্যেও হৃৎক লাক্স ব্যবহার করুন না কেন?
মনে রাখবেন, হানের সময় লাক্স সত্যিই আনন্দদায়ক।

বিশুদ্ধ, শুদ্ধ

টয়লেট সাবান

চিত্রতারকাদের সৌন্দর্য্য সাবান



বলে পাখি ফিরে গুল জগা। আর কথাবার্তা বলবে না। একটুখানি
বসে থেকে বলাই উঠল। দেখে আসা বাক গল্পের কথা। আপন
মাতৃভাষার সঙ্গে কেমন মজার তুলে এমনবার। নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ল।

নিঃশব্দ রাত। কীকা আকাশের মধ্যে বাতাসও তটান কেমন
দৃঢ়—পাঁচের ডালপাতা নড়ে কিসকাস শব্দটুকুও উঠছে না।
গাড়ে জোয়ার—ভাঁটার জল নামার বে কলকল শব্দ। তাও নেই
এখন। আশার দিক থেকে—হাঁ, খোলের আওয়াজ আসছে
হটে। বলে দিতে হবে না, বাজাচ্ছে বলাই। বাজনার ব্যাপারে
বে একটু-আট্টা জগার আগেরকি করে, খোলে চাটি ঘেরে বোল
তুলতে গিয়ে গালি খায়। জগা নেই আসরে, অতএব পথার
জমিয়ে আক সে বাজাচ্ছে। গানও বেন বাজনার সঙ্গে—বড়হুড়িয়ে
উঠে জগা বাটবে চলে এলো। যিড়বিড় করে গান—কান পেতে
থেকে একটু একটু শুনতে পাওয়া যায়। বাজকর বলাই, এবং গানের
মাহুদও পেয়ে গেছে। জগাকে বাদ দিয়েই আসর করতে পারে
ওরা। কোন দরকার নেই তবে আর জগার।

টিপিটিপি চলেছে সে চোবের মতো। দেখে আসা বাক—
বলাই এসে বসবে, ততক্ষণের সবুসর না। সোজাশুজি বাঁধ বসে
না গিয়ে খুঁপসি জলজলব আড়-আবডালে চলেছে। কেউ
না দেখতে পায়। আলাঘরের খানিকটা দূরে গিয়ে কাঁড়াল।
মালুম পাওয়া যাচ্ছে এবার—গগনের গলা। আরও আছে—কিন্তু
ভিন্ন গোষ্ঠের গল্পের মতো তার কণ্ঠ একেবারে ভিন্ন পথ ধরেছে। হায়
মা বনবিধি, তাই মা রক্তকালী, তোমাদের মতিমার বড়নাও কিনা
পারক হয়ে উঠল। গান অবশ্য নয়—হরেকুক হরেকাম রাথোগোবিন্দ
—নামগান। বিড়বিড় করে গাইছে কতকটা মন্ত্রের মতো।

বলাই এলে জগা হাসিতে ফেটে পড়ল : দেখে এসেছি। চার জন
দেখলাম আসরে। তুই ছিলি, বড়না ছিল, আর দুটো কে রে ?

একজন আমাদের পাচ। পাচ ওদিকে মুখ করে ছিল। আর
ছিল বড়নার মতো সখকী, নগেনশকী তার নাম।

বলে গভীর হয়ে বার : পাঁচে ফেলেছে বড়নাকে। ফড়ের গুঁটি
লুকিয়ে ফেলে কাল সেই যে নামগানের কথা বলেছিল, সেইটে হল
কাল। পাচ আগেভাগে গিয়ে গরুড় পক্ষীর মতো অন্ধকারে বসে
আছে। আমার দেখে বলল, এই যে, খোল বাজানোর মাহুদ এসে
গেল। আর সেই সখকী বলে, রোজ নামগান কর, আজকেই বা
হবে না কেন ? লাগাও। পাচ ধরল, সখকী ধরল—বড়না কি করে,
তারও দেখি টোঁট নড়তে লেগেছে। আমার মুখে ওসব বেরোয় না,
খোসটা কোলের মধ্যে টেনে নিলাম। তাই তো বলছি রে, বড়না
সুখ গান গায়। বাদার কী ভাজকর বে বাবা।

বলাই বলে, সাথে কি বাবা বলি, গুঁতোর চোটে বাবা বলার।
বাইরে ঐ সখকী, আর কামরার ভিতরে বউটা আর বোনটা টেম্বি
ঝেলে বসে গান শুনছে, আর ভাঁটার মতন চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছে।
কি করবে বড়না ? একবার হয়তো একটু খেমেছে, চমক খেয়ে তক্ষুণি
আবার হরেকুক হরেকুক করতে লেগে বার। ভাল করে দেখানি
তুই—বড়নার কণ্ঠে পাখাপ ফেটে বার।

জগা বলে, ভাল করল বড়না, আখের ভেবে দেখলি না। দেশে
যে বন্ধন রেখে এসেছে—হাতে টাকাপয়সা আসা মাতোয়ারা ওদিকে
কিছু কিছু ছাড়লে তবে এই খোয়ার হত না। বেড়াল ভাতাবার ভাল

কিকির হল, বাছের কাঁটাছুটি দূরে ছুঁড়ে দেওয়া। দূর থেকে কাঁচকা-
কানড়ি কলক, কাছ বেসে বামেলা করতে আসবে না। টাকা পাঠাতে
বড়না গালিকতি করল, তার এই ভোগাভি। সখকী কালকেও আবার
যেতে বলে দিল। বলে, গেরজতবে বজার পর ঠাকুরের নাম, খুব
ভাল কাজ করছ তোমরা। কখনো কামাই পড়ে না যেন।

জগা নিউরে ওঠে : আরে সর্গনাশ। একদিন দু-দিন নয়,
বোঝ বোঝ এখন অতগুলো পাহারার মধ্যে বড়নাকে বাবাজি হয়ে
বলে থাকতে হবে। বড়না বাটবে না।

আজ জোরবাত্রেও আগের দিনের মতো। জগা নোজানুজি
ঘাটের উপর ডিঙি চেপে বসেছে। বলাই আসা দূরে আসছে।
গগন ফর্দা লিখে দেবে, কত খোড়া মাছ যাচ্ছে কি রকম দরে কেত্র।
এবং ঠিক আগের দিনের মতো বাঁধের উপরে চাক। আজকে
আর কাণার মাহল মা, নোনা কাণার মহিমা কাল বুক দিয়েছে।
বাঁধের উপর থেকে টেচাচ্ছে, কাঁটা আর চাক-খুঁজ-কাঁটা। কাল
তুলেছ, আজকে তুল না হয়। এমন তুলো মাহুদ কেন তুমি ? ভগার
মুখে ধান-না কিছু নেই, লোহার মুক্তির মতো স্থির। কানে গেল কিনা
বোকা বার না। পাচ নেমে আসছে, সে বাবে। কুমিরমাটির হাটবার
আজ। ডিঙিতে ঐট দিনে কিছু ভিড় হয়। লোকে হাটবেরসাকি
করতে বার, ঘোরাঘুরি করে নতুন মাহুদজন দেখতেও বার অনেক।
পচাকে ডেকে চাক বলে, কালা নাকি নোকোর ঐ লোকটা ?
বা কাড়ে না। একগাছ কাঁটার কথা বলছি কাল থেকে—

জগা কালা নয়, সে তো ভাল মতোই বুঝে নিয়েছে
সেদিন। কুলতলার ঘাটে, টাপুরেনোকোর ভিতরে, এবং বিশেষ করে
কুমিরমাটিতে। এটা হল নিজের মনের ঝাল মেটানো কথা।
আকাশে সূর্য ওঠেনি—নতুন দিনের সবে সূচনা—এর মধ্যে অকারণ
গালিগালাজ শুনিতে মনটা খিঁচড়ে দিল একেবারে। ভিড় ছেড়ে
দিয়েছে। পাচ বলে, খেয়াল করে কাঁটা আনতে হবে আজ।

জগা গর্জন করে ওঠে, আনিবি তো থাক্কা মেয়ে ফেলে দেবো তোকে
গাঙের জলে। মরদ হয়ে যেতেমাহুদের কাঁটা বইতে লজ্জাকরে না ?
পচা বলে, পুরুষে না আনলে মেয়েমাহুদেই বা পার কোণার ?
বুঝে দেখে সেটা। দুটো দিন মাত্র ওরা এসেছে, ঠাঁট বদলে গেছে,
এর মধ্যে আলাঘরের। মেরেজাত হলেন লক্ষ্মী—লক্ষ্মীর চরণ পড়েছে
আর লক্ষ্মীত্বী ফুটে উঠেছে। বাও না তো ও-মুখো, দেখে এসো
একটিবার গিয়ে।

বলাই হেসে ওঠে : খবরদার জগা। দেখতে গেলে তোকোও
কিন্তু ছেড়ে দেবে না। গানের গলা শুনেছে সেদিন নোকোর মধ্যে।
আলাঘরের সকলে আমরা নামগানে মাতোয়ারা হয়েছিলাম, তাও
শুনল ঘরের মধ্যে প্রথম পা দিয়েই। বাবাজি করে তোকোও ঠিক
আমাদের সঙ্গে বসিয়ে দেবে।

জগা বুক চিড়িয়ে বলে, কে বসায়ে ? কার ঘাড়ে ক'টা মাথা ?
টের পায়ে আমার সঙ্গে লাগতে এলে। বলে দিস লেকখা।

বলাই বলে, বড়নাও অমনি করত। কী হাল হয়েছিল এই
দুটো দিনে। বেন এক ভিন্ন মাহুদ। কিছু বলা বার না রে ভাই,
গানের জোয়ার কথাও নয়। কামরূপ-কামাখ্যার পুরুষকে ভেড়া
বানার। পাহাড়ের নিচে শুনেছি, বত ভেড়া সারি সারি দড়ি দিয়ে
বঁধে রেখেছে। হল কি করে ? [ক্রমশঃ]

শ্রী শ্রী এক কৃষ্ণকোষ বাবু চৌধুরী, কলকাতা, ইন্ডিয়া.

এস-ডি-ও, ডি-এস-পি, ম্যালেরিয়া অফিসার কুদুস সাহেব।

তাকে নিতে হোল—কারণ তাঁর হাতে বিশাল ওয়েপার কেবিরার আছে। মোটর কেন, জীপও সে পথে যেতে পারে না। সামনের জঙ্গল নদীতে পুল নেই, নৌকাও নেই, তবে বারজীর বড় ট্রাক্টর সাড়ে চার ফিট জল দিয়ে যেতে পারে। সেটা সন্ধ্যা সন্ধ্যা বাবে আমাদেব গাড়ীকে টেনে নদী পার করবার আর বালি বা কাদার আটকে গেলে টেনে বার করবার ভেত। সিঙীও কম বালি না, তাঁর ঠিকালো হাতী যেখনায়, একটি ডোটেরা খোঁড়া ও একটি ভালো খোঁড়া থাকবে। গজর গাড়ীতে বসল আদেই বড়না করে দেবনা হোল। এবার তেপখানার পালা। বাজীর কোর ও কোর মশার বাইফেল আর টু টু বোর বাইফেল, বোনলা নাইগান আর বিডলভার। সিঙীর বোনলা আর তাঁর ডাইএর এখনস। আমাদেব জীং কিল্ড বাইফেল, আর অটোমেটিক বনুক অফিসারদেব মধ্যে ডি-এস-পির বনুক, বাইফেল, বিডলভার, এস-ডি-ওর বিডলভার ও বনুক। জজের শুধু বিডলভার। বনুককে কিছুই নেই। ওঁরা হুঁজন আমাদেব বনুক, ওলী ব্যবহার করবেন।

অন্তঃস্থ সময়ে যখন আমরা দুপুর বেলায় গাড়ীতে উঠলাম, সে এক দেখবার জিনিষ। কিন্তু একটা হিসেবে ভুল হয়েছিল, প্রত্যেক জঙ্গল যে একটি করে আর্দ্রাঙ্গী নেবেন সেটা ভাবিনি। কাজেই তাদের বসনের কথা ওঠে নি। বায়জীকে চুপি চুপি বলতেই, তিনি অভয় দিলেন, বা বসল আছে তাতেই কোনোমতে চলে যাবে—আর আমাদেব মত শিকারী থাকতে ভাবনা। শিকার ক্ষেত্রে পৌছবার আগেই যুগ্ম মারতে মারতে যাবে। আর পৌছবামাত্র একটা শূণ্য বা চহিণ মেরে ফেললেই হবে।

কুদুস সাহেব গাড়ী দিয়েছেন, কিন্তু ম্যালেরিয়া ধরার আসতে পারেন নি। আকশোণ জানিয়েছেন। আর নিশ্চিত হতে বলছেন, মুনসাম ডাইভার আছে, কোনোই অনুবিধে হবে না। সে যে কোনো আহত জানোয়ারকে এক নিমেষে জবাই করতে পারে। আর—কাবারও ভাল বাঁধতে পারে।

সহর ছেড়ে ওয়েপার কেবিরার ও ট্রাক্টর নদীর ধারে এল। দেখি—এক বাক শায়ুকখোর পাখী বসে আছে। দেখতেও যেমনি বেরাড়া মাসেও তেমনি আঁশটে গজ। ডাইভার গাড়ী ধামিয়ে বসল, সাহেবের জন্তে কয়েকটা মেরে দিতে। একসঙ্গে তিনটে ফাটার হোল। চারটে শুক্কপাং মরল, আর পাঁচটা আহত হয়ে ডানা ঝাপটাতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে ছুটল ডাইভার, দেড়ফুট লম্বা এক ডব্বর ভেঁগা নিয়ে—মরাগুলোকে জবাই করে, জ্যান্ডগুলোকে কল।

পাখী তো হোল—এবার ফার্স্ট গীয়ার আর কোর হুইল ডাইভে, বালি উড়িয়ে অন্ধকার করে আমরা নদীতে প্রবেশ করলাম। নদীতে মাত্র তিন ফিট জল ছিল, অল্পেই সেটা পার হয়ে যেতে, ডি-এস-পি, প্রস্তাব করলেন, ট্রাক্টর ফেরৎ বাক কোনো দরকার নেই। ওয়েপার কেবিরার স্বচ্ছ এ সব নদী পার হবে, আর ট্রাক্টরের বজ্রনির্দা, একমাইল দূর থেকে পাখী আর জানোয়ার পালাবে।

এ কথা বারজীর মনঃপূত হোল না। তিনি বললেন, কেন এই শায়ুকখোরগুলো ত পালানো না।

শিকার কথাহিনী

ঐকমলেশ ভাড়া

জঙ্গলসাহেব বার জিনে ব—তাদের বৃত্তা এসে গিয়েছিল। তাই ওড়েনি। আমলে তুমি আমি কে মারবার। হঠাৎ সিঙী টেডিয়ে উঠলেন—হরিবাল।

সত্যি—সামনে বটগাছ এক বাক চরিতাল। ঠিক হোল, এস-ডি-ওই মারবেন। তাঁর নিশানও ভাল। এক ফাটারে তিনটে পড়ল। আর আবার ডাইভার সেই ভব্বর ভোয়া নিয়ে ছুটল—জবাই করতে। পেতল পেতল মুনসেক। গাছতলার পৌছে মুনসেক বললেন, পাখী তো মরে পাখর জবাই করে কি হবে। ডাইভার মুখ ভারী করে পাখী নিয়ে ফিরল।

মুনসেক কিস কিস করে বারজীকে বললেন, ডাইভারের টেক্সে থাকগ। আমাদেব যেতে দেবে না। অর্থাৎ মুনসেক গোড়া হিলু, জবাই মাস খান না।

চলছি—সামনে কিছুদূর মকতুমির মত, সাদা শুক্ক শুক্ক করতে বড়ানা বালি, অজকুচি মেশানো। গাড়ী আবার স্পেশাল গীয়ার কোর হুইল ডাইভে, গজজন করতে করতে চলল। পারও হোল, না চলতে ভয় নেই—সঙ্গে ট্রাক্টর আছে। সামনের গ্রামে একটি লোক, হাত তুলে গাড়ী ধামিয়ে চিংকার করে বলল, 'স চ'আনা পরসা দেবে, তাকে সাচাসা' পৌছে দেওয়া হোক। ডাইভার দাঁত খিঁচিয়ে উঠল। আবার চললাম।

কুশীর অসংখ্য ধারা বইত আছে, এখন তারই মরা ঝাঁপগুলো হয়ে গেছে। স্রোত নেই, কোনোটার এক হাঁটু, কোনোটার এক কোমর জল। না থেমেই চললাম গোরহো নদী পার হয়ে। এই গোরহো দশ বছর আগে অবধি কুমীরের ডিপো ছিল, এখন কেবল ধু-ধু বালি আর মধ্যে এক হাঁটু জল। গোরহো পার হয়ে শুকুনো ধুলোর বালির রাজ্য শেষ হবে, যখন আমাদেব গন্তব্য মহিষি গ্রামের তিন-চার মাইল কাছাকাছি এলাম, তখন সবারই গায়ে খ্যাঁতালানো, টাটানো বাখা, আর ধুলোর নাক-চোখ আলা করছে। এ জেলার এতদিনে পঞ্চ তৈরী আরম্ভ হয়েছে, এখনো সূর্যম পথ নেই। ১১৩৪এর কৃষিকল্প আর সেই সময় কুশী আগমনের পূর্ব ধুব ভাল পথ অবশ্য ছিল। এখান থেকে আরম্ভ হোল বর্তমান কুশী রাজ্যের সীমা। শঙ্করাচার্য দাক্ষিণাত্য থেকে শাস্ত্র আলোচনা করতে গিয়ে হেঁটে মহিষি গ্রামে এসেছিলেন। মণ্ডন মিশ্র আর উত্তরভারতীয় গ্রামে—তার দেবীর মণাপীঠখানে।

মহিষিতে মন্দির আছে। দেবীর কাল পাথরের মূর্তি। পুকুর খুঁড়তে গেলে অনেক মূর্তি ও ভগ্ন বেরোয়। আর্ধ্য সভ্যতার অসংখ্য অশ্রাবের মধ্যে মহিষিও একটি। জ্ঞান সভ্যতা, সম্পদ, স্বপ্ন, আনন্দ—মাহুবেব, গোষ্ঠীর, সমাজের, দেশের অণিকের জন্তে আসে। আর অণপ্রভার মতই মিলিয়ে বার।

শঙ্করের ও ব্রাহ্মণদের বাতিল করা অনেক বুদ্ধমূর্তি মন্দিরের বাইরে হিলু দেহতাদের হস্তবেশে পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করে ধুব ফুল, সিঁদুর আর প্রণাম পাচ্ছেন মেয়েদের।

আর একবার শিকার করতে গিয়েছিলাম এখান থেকে বহু দূরে উত্তর পশ্চিমে, ঝংডোজা জেলার সীমানায়। সেখানেও এক ছদ্ম বশী বিগ্রহ দেখেছিলাম। সে বার চার বন্ধু ছিলাম। এক তেপান্তরে বাস্তির হয়ে গেল, আমরা ক্লান্ত হয়ে ঘুরতে ঘুরতে এক গ্রামে পৌঁছালাম। সেখানে এক মন্দিরে রাজির মত আশ্রয় নিই। মন্দিরটি বহুচাল আগের তৈরী। পাশে ছোট দরদালান, বোধ হয় বাতানিবার ছিল। বর্তমানে সেখানে গ্রামের মোড়লের দুটি বলদ আর দুটি মহিষ থাকে। সারা দিন ঘোড়ার আর রাজি গভীর ঢলেই বাঘের মত পুরের কসলে গিরে পড়ে। ভোর হলে ঘেঁরে। কলে তাদের পতিবেগ উঠে: প্রবাস আর সাইজ ঐবাতের। আমরা যখন সেখানে পৌঁছলাম, গো-পালক তখন পশুরের দড়ি খুঁড়ে। বললে—ঐ কোণের খড়ের পানার ওপরে আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোতে পারি। তার পরই লাইট জিগেডের চার্জের মত, চারটি পশু চক্ষুর দ্বারা তীব্রবেগে উদ্ভূত হুট করে। সবচেয়ে মাতব্বর মহিষটার শিঠে গো-পালক। তোরবেলার ফিরে আসা মহিষদের গর্জনে ঘুম ভাঙল। বেরিয়ে দেখি, চমৎকার ইয়ারা, পরিষ্কার জল, পাশেই কয়েক কল, বুকুরা আর সাদা গোলাপ। চাওদিক সবুজ শান্তির শোভা। যেন একখানি মস্ত বড় কার্পেট বিছানো হয়েছে। কেবল উত্তর-পশ্চিম দিকে কাশের গুলল, বতব্বর দেখা যায়।

বন্ধুরে—সোজা উত্তরে গৌরীশঙ্কর শৃঙ্গ আর উত্তর-পূর্বে কাকিনজা ভোরেব আ'লার বলমল করছে। মন্দিরের দরজা খোলা, দূর থেকে গ্রামের পুরোহিত এসেছেন, পূজার বসেছেন, বেছার কাজ। আমিও প্রাতঃকৃত্যাদি শেষে ভিজা গায়ে ভিজে আগারওয়ায়ে, পূজা করতে মন্দিরে ঢুকলাম। পুরোহিত অগ্রসর দৃষ্টিতে আমার বর্কোচিত বেশের দিকে তাকালেন, তার পর কি ভেবে মুখ ঘুরিয়ে পূজার মনোনিবেশ করলেন। তাঁর পূজা শেষ হবার পর, ঘুরে বসে আমার অঙ্গাঙ্গ্য প্রভৃতি করতে দেখে নিশ্চিন্ত হলেন। পূজার শেষে তাঁকে নৈবেদ্যের জন্ত আধ সের চিনি, শিকারের ঝোলা থেকে দিয়ে খুশী করলাম, গল্প শোনার উদ্দেশ্যে। পুরোহিতের পিতামহ, প্রণিতামহ, বৃদ্ধ প্রণিতামহ এ বিগ্রহের পূজা করেছেন, কিন্তু কেউই মন্দিরের বা বিগ্রহের ইতিহাস জানতেন না। পুরোহিতকে জিজ্ঞেস করার বললেন, মুষ্টি হ'ল শিবের।

বললাম তা কি করে হয়। চতুর্মুখ, দাড়ি আছে, গলায় উপবীত, হাতে জপের মালা আর কমণ্ডলু হংসবাহন, এ তো ব্রহ্মার মূর্তি। ব্রহ্মার মূর্তি কদাচিৎ দেখা যায়। আর এত সুন্দর আর বড়, কাল-পাখের নিখুঁত মূর্তি, আমি ত দেখিনি।

অঙ্গমনস্ক হয়ে অঙ্গবাসের শিকারের কথা ভাবছিলাম। সবাই, এই অঞ্চলের নিম্নতর প্রভৃতির মধ্যে এসে উল্লাস বোধ করছিলেন। এমন সময় ডাইভার একটা ভ্রাম্যন্ত জায়গার সামনে গাড়ী থামালো। কতটা জল আর পাক আছে দেখার জন্তে। ট্রাকটর খানিকটা পিছিয়ে পড়েছিল, তবে তার ব্রহ্মনার শোনা বাজিল। ডাইভার জুতো খুলে জলে নেমে দেখল, জল এক হাঁটুর কিছু বেশী তবে নীচে নরম, পেছল কাঁদা। বাই হোক, আবার ফোর হুইল আর স্পেশাল গিয়ার দিয়ে মস্ত মাতালের মত গাড়ী প্রায় ছুপ

গজ জলার ভেতর যেতে, ফুট বোর্ড ছাড়িয়ে জল উঠল। গাড়ী ক্রমশঃ পাক বসছে, সাইলেন্সারে জল ঢুকে, এঞ্জিন খামখার মত অবস্থা, তখন হাফকাচ আর ফুল এঞ্জিনটার দিয়ে রাখতে গাড়ী আবার খানিকটা এগিয়ে গেল, জল প্রায় এককোমর চল। মাঝ জলার এঞ্জিন বন্ধ হল বলে। কিন্তু ট্রাকটর এসে পড়ল আর সামনে গিয়ে তারের মোটা কাঁহি দিয়ে টানতে লাগল। গাড়ী কাদা, চলিত মথিত করে আকর্ষিত হোল। রায়জীর অচকার দেখে কে। যেন তিনিই টানছেন, বললেন, দেখ দাদা। বলতে বলতেই, ট্রাকটরও খামখার উৎক্রম। গিয়ার নিউট্রাল রেখে, স্পীডে এঞ্জিন চালু রাখা হল একবার বন্ধ হলে ওখানে আর হাঁট হবে না।

কি অবস্থা। সামনে পেছনে ছুপ' আড়াইন' গজ জলা আর ছু' পাশে কয়েক মাইল জলা। দুটো বছর আগেও স্থলর শালবন ছিল, আর তার মধ্য দিয়ে কুশীর ছোট শাখা পুরানী নদী ছিল। হঠাৎ 'কৌরিকি' মহাবাগীর, কি ইচ্ছা হল, তিনি পুরানীর খাত দিয়ে আর জল নেবেন না, অবিলম্বে বানী দিয়ে পুরানীর মুখ বন্ধ করে, এক অতি লম্বা জলার সৃষ্টি করেছেন।

এদিকে অবস্থা সঙ্গীন, মতিবি তো কাছে, কিন্তু সন্ধ্যা হয়ে আসছে, আমরা সকলেই ক্ষুধ-ভুক্ষার কাতর। রাংজী সিংজীর মুখ শুকিয়ে গেছে, তাঁরা চুপি চুপি পরামর্শ করছেন উদ্ধারের উপায়, ডাইভার গম্বগম্ব করছে পেট্রল পোড়ায়। মা ভেঁ:—মতিবি থেকে আমাদের লোকেরা ট্রাকটর, লতীর গর্জনে সুনতে পেয়েছে। দেখা গেল বিশাল কালো মেঘের মত মেঘনাদ মতিবির দিকের শালবন থেকে বের হচ্ছে। চার চার ফুট লম্বা দুটি ষাঁত, মেঘের কোলে বিজ্ঞাতের মত বলসে উঠছে। পেছন পেছন আমাদের লোকজন, আদালী ও গ্রামবাসী ছেলেরা। মেঘনাদ জলার ভেতর দিয়ে এগিয়ে এল। স্থির করলাম, গাড়ী মাথা দিয়ে ঠেলবে, পেছন থেকে। আর সামনে থেকে ট্রাকটর টানবে। মেঘনাদ মাছের ইসাযায় গাড়ীর বড়ির নীচে ষাঁত দুটি ফিট করে, গাড়ীটা আগে পাক থেকে ছাড়িয়ে নিল। তারপর ট্রাকটরের টান মারার সঙ্গে সঙ্গে কপাল দিয়ে গাড়ীকে ঠেলতে লাগল। জল ভেদ করে, পাশে ডেউর মত কাদা উঠতে লাগল। আর মধ্যে মধ্যে ঢাকা স্লিপ করে ফোরারার মত জল কেলে গাড়ী এগিয়ে চলল। জলা থেকে গাড়ী বের হল। বার হতেই মেঘনাদ গাড়ী ছেড়ে দিয়ে, শুঁড় উঁচু করে ভীম বৃত্তণ করে উঠল। আনন্দে অধীর হয়ে বন্ধু সিংজী গাড়ী থেকে নেমে তাঁর হাতীকে আদর করতে গেলেন। আর হাতীও আহ্লাদ করে বসে পড়ল তাঁকে শিঠে নেওয়ার জন্তে। বন্ধু হজুরদের অল্পমতি ক্রমে, হাতীর শিঠেই চললেন। আগামী কাল বিকেলের মধ্যে ষাঁতে জলার মধ্যে মোটর বাবার মত পথ কক্ষি, ডালপালা আর খড় কাশ পেতে তৈরী থাকে তার বন্দোবস্ত করা হল।

নালা, খন্দ, মাঠ দিয়ে সটকাট করে হাতীর শিঠে সিংজী, আগেই মতিবি ডাকবাংলায় পৌঁছলেন। আর আমরা প্রায় দেড় মাইল পথ, চার মাইল ঘুরে, পৌঁছতে দেখি ডাকবাংলার মেলা বসে গিয়েছে। কয়েকটি পেট্রম্যান আর কাববাইড বসেছে। গ্রামের ছেলে, মেয়ে, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা তামাসা দেখতে এসেছে।

গাড়ী থেকে নামলাম সবাই, অবস্থা সত্যিই কাহিল আর মেজাজ

‘বেলন পয় বেলা মোটা,
হাখি উঁচা, হাখিম মোটা’।

আমাদের দেখেই চুপ হয়ে গেল। স্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করাই, যেটারীদের মুখ শুকিয়ে গেল। বলল, তারা দুজন হাকিমকে, বয়েল গাড়ীতে মহিষি পৌঁছে দিয়ে আসছে—বয়েল গাড়ীও আসছে, পেছনে আছে।

বাণীর এই বে, হাতীর পিঠ থেকে জঙ্গ সাহেব আর রায়জী একটা দাঁতাল বনুয়ারের ওপর কায়ার করেন, গুলী ঠিকমত লাগেনি, সাবান্ন আহত ক্রুদ্র দাঁতাল ভীষণ ভাবে হাতীকে আক্রমণ করে আর তার বড় দাঁত দুটি হাতীর গোলা পায়ে এমন সঁখে দেয়, যে হাতী কেনে শুঁড় দিয়ে আটকান মণ ভারী দাঁতালকে তুলে আছাড় মারে। দাঁত দুটি দাঁতালের ভেঙ্গে হাতীর পায়েই থেকে যায়। হাতী বজ্রপার কেনে শুঁড় দিয়ে মাহতকে ধরার চেষ্টা করতে থাকে, না পেয়ে পাগলের মত উত্তরে তার প্রাণের দিকে ছুটে থাকে। পথে একটি শুকনো আমবাগান ছিল, তার নীচু ডালে আঘাত লাগার সম্ভাবনার মাহত ডাল ধরে উঠে যায়। রায়জী মাহতের অহুকরণ করতে গিয়ে, হাতে-মুখে ডালের আঘাত পেয়ে নীচে পড়ে বান আর পা মচকে যায়। জঙ্গ সাহেব বুঝি করে গদীর ওপর চিং হয়ে শুয়ে পড়েন, কলে তাঁর কোথাও চোট লাগেনি।

তাঁর দেহ ডালে আটকে বার আর অজ্ঞান হয়ে হাতী থেকে পড়ে বান। নীচে কাদা থাকায় কেউ খুন হননি। হাতী আর মাহত ফেরার। খবর শুনে গয়লাদের গানের অর্থ বুঝলাম, কিন্তু আমাদের মুখ শুকিয়ে গেল। অবিলম্বে বওনা হলার। মহিষি ফিরে দেখি স্থানীয় ডাক্তার তাঁদের ওয়েপনু কেরিয়াবে তুলে, ট্রাক্টরের ড্রাইভার দিয়ে চালিয়ে সাহান্সা চলে গেছে। বাবার সময় কোনো অসুবিধে হয়নি। ঝাউ আর কাশ বিছিয়ে, জলার পথ ঠিক করাই ছিল।

আমাদের বাবার তৈরী ছিল, বললাম ট্রাক্টর চড়ে আমি সাহান্সা বওনা হচ্ছি। দেখব, বাতে ভোরবেলাতেই ওয়েপনু কেরিয়ার তাঁদের নেবার জন্তে এসে যায়। সাহান্সা হাসপাতালে গিয়ে দেখি, জঙ্গ আর রায়জীর জ্ঞান ফিরে এসেছে, তেমন সাংঘাতিক কিছু হয়নি। রায়জীর মুখ-হাত ব্যাণ্ডেজ মোড়া, পায়ে স্প্রুট। জঙ্গ সাহেবের শুণু উদরদেশে ব্যাণ্ডেজ।

আমরা গাড়ী আর ড্রাইভার নিয়ে রাত এগারোটায় মাদীপুরায় বাড়ী ফিরলাম। গাড়ী পেট্রল ভরে আবার মহিষি চলল, ভোরবেলায় সেখানে পৌঁছতে হবে।

ফুল ফোটানোর গান

অশোক ডট্টাচার্য

কিসের স্পর্শ খুঁজে বেড়াই সারাটা দিন—
সারাটা পথ কার সন্ধানে হাঁটি?
সে কী জীবন না মৃত্যু!

বৈশাখের বোধ মানি না, মাঘের বাত কাটাই
খোলা আকাশের নিচে। তবু তাকে পাই না।
বাকে পাই না
কিসে মন ভারী করে থাকে?

রাতের চাঁদেরা খসে পড়ে।
ঝিঁঝিঁঝিঁ বাতাসে
পাখি তার ভোরের গানে সুর চড়ায়।
দূরে কাছে ধীরে ধীরে কোলাহল জাগে—
ব্যর্থ তবু, অসন্ন ধরে ফিরে আসি।

ধূসর শহরের পিচ-গলা পথে ক্রান্ত আমি
দেহ টেনে টেনে পথ চলি। বেলাশেষে
পার্কের বেষ্টিতে বসে বিশ্রাম নিই—
অজলি ভবে জল করি পান। তায়গর শুক
আবার সে দৃষ্ট অভিজান। কিন্তু, কিসের বাসনা বল
আমার এ বুক, সে কি ভালোবাসা?
মরা গাছে ফুল ফোটানোর গান।

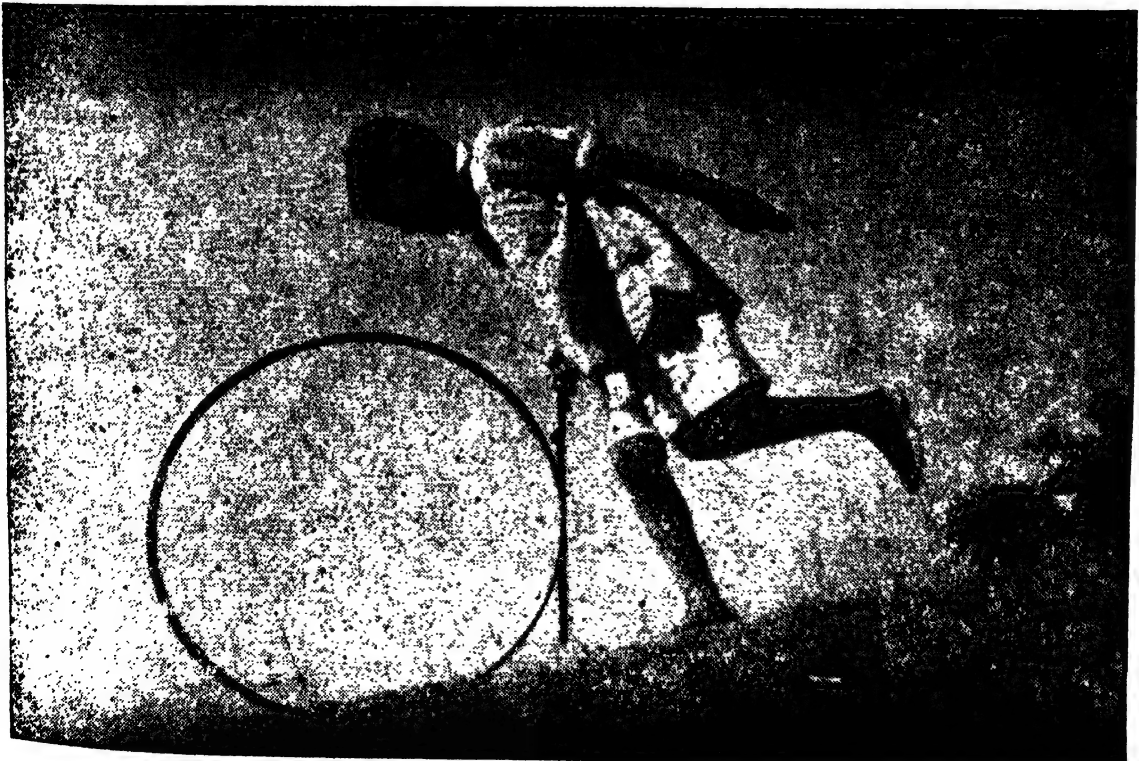
আলোক চিত্র

ছবি পাঠানোর সময়ে ছবির পিছনে নাম থাম ও
ছবির বিষয়বস্তু যেন লিখতে ভুলবেন না ।]

১২
-বিভাব মিত্র



কেবল খেলা
—রায়কিঙ্কর সিংহ





জল থেকে ডাঙ্গায়

—রামকৃষ্ণ (মেদিনীপুর)



সূর্যোদয়

—সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়



পারাপার

—বি, দাশ (পুকুর)

অজয় নদী (বীরভূম)

—নিমাইবক্তন গুপ্ত





সাহিত্য পরিচয়

উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক বই

রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ সর্বকালের মনীষী, সর্বকালের কবি, সর্বকালের প্রণয়। ভারতীয় সনাতন সভ্যতার তিনি ধারক, বাহক, প্রচারক, শাখত সংস্কৃতির তিনি বাণীমূর্তি, নবচেতনার তিনি জন্মদাতা, তাই তাঁর দেহান্তের পূর্বে বেখানেই ঘটেছে তাঁর বহু আকাঙ্ক্ষিত উপস্থিতি, সেই স্থানই ভরে উঠেছে এক মহাশ্রো, উদ্ভাসিত হয়েছে আলোয়, পরিণত হয়েছে তীর্থে। এই রবীন্দ্রতীর্থের তীর্থঙ্করদের মধ্যে যাদের স্থান সকলের পুরোজাগে তাঁদের মধ্যে ভারতের প্রবীণ শিল্পাচার্য নরকবি শ্রীঅসিতকুমার হালদার অগ্রতম। রবীন্দ্রনাথের পরশ্রান্তে বসে জীবনের নীক্ষালাভ করেছিলেন যে জীবন-পথিকের দল অসিতকুমার তাঁদেরই একজন তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আত্মীয়তার অচ্ছেদ্য বন্ধনেও অসিতকুমার আবদ্ধ। শিল্পীর মাতামহী ছিলেন কবির সহোদরা। শিল্পীর লক্ষ্যও জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-বাড়ীতেই, স্মৃত্যব সাক্ষরিক থেকেই দেখা যাচ্ছে যে, রবীন্দ্রনাথকে খুব কাছের মানুষ হিসেবেই পাবার সৌভাগ্য হয়েছিল অসিতকুমারের। রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে নিজের চোখে দেখা বিগত দিনের ঘটনাগুলিকে স্মৃতির পাত্র থেকে সাহিত্যের আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন অসিতকুমার উপরোক্ত গ্রন্থের মাধ্যমে। শান্তিনিকেতন থেকে অসিতকুমারের বিদায়গ্রন্থের পূর্বসূরীটি পর্যন্ত এই গ্রন্থে অসিতকুমার সূনিগুণ দক্ষতার সঙ্গে বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। শান্তিনিকেতন প্রাশ্রমের গোড়ার দিকের প্রায় সমগ্র ইতিহাস এখানে পরিবেশিত হয়েছে। এ ছাড়া হালদার পরিবারের ও ঠাকুর পরিবারের বহু কীর্তিমান পুরুষ ও কীর্তিমতী মহিলাদের সর্বত্র সারগর্ভ আলোচনাও গ্রন্থের অগ্রতম সম্পদবিশেষ। অসিতকুমার শিল্পী, তাঁর তুলি কথা কয়, কিন্তু কলমও তাঁর নীরব নয়। তাঁর ভাবা, বর্ণনভঙ্গী, রচনাশৈলী বোধোচিত প্রতিভার, স্বাক্ষর বহন করে। গ্রন্থটিকে ঠাকুর পরিবার, হালদার পরিবার, রবীন্দ্রনাথ, শান্তিনিকেতন, শান্তিনিকেতনে আগত বিদেশী অধ্যাপকগণ, অভ্যাগতবৃন্দ, বিচিত্রার কাহিনী প্রভৃতি সম্বন্ধীয় অল্পসঙ্ক্ষিপ্ত অবলম্বন বলে অভিহিত করলে অত্যাঙ্গিত হয় না। অসিতকুমারের শিল্পময় বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথ যেন নতুন বৃত্তিতে দেখা দিচ্ছেন। শান্তিনিকেতন যেন আবার ফিরে গেছে তার সেই কলে আশা দিনগুলিতে, আলোচ্যস্থান ঘটনাগুলির যেন পুনরাবর্তন হচ্ছে পাঠকের চোখের সামনে। তবে কয়েকটি

গুরুতর ত্রুটিও প্রমাদ বিশেষভাবে চোখে পড়ে, ভারপ্রাপ্তগণ এ দিকে একটু অধিক মনঃসংযোগ করলে আমরা খুশী হতুম। অসিতকুমারের আঁকা বহুজনের যেখাচিত্র গ্রন্থের মর্যাদাবৃদ্ধি করে। অসিতকুমারের পরিকল্পনামুযায়ী প্রচ্ছদচিত্র অঙ্কন করেছেন শ্রীপ্রভাসেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সর্বাঙ্গসুন্দর ওধ্যবচ্ছল, সুরচিত গ্রন্থটি ঘরে ঘরে সমাদর লাভ করুক এই আমাদের কামনা। প্রকাশক—অজনা প্রকাশনী, ১৮ ছায়াচরণ দে স্ট্রীট। দাম—পাঁচ টাকা মাত্র।

ব্রহ্ম প্রবাসে শরৎচন্দ্র

একথা আজ নতুন করে বলতে হবে না যে, শরৎচন্দ্রের চমকপ্রদ জীবনের প্রথমার্ধের অনেকগুলো দিন অতিবাহিত হয়েছে ব্রহ্মদেশে। সাহিত্যিকরূপে বাঙলা দেশে পাকাপাকিভাবে বসবাস শুরু করার আগে শরৎচন্দ্র বর্মার প্রায় স্থায়ী বাসিন্দাই হয়ে গিয়েছিলেন। বর্মা, সেখানকার মানুষ, সেখানকার জীবনধারা, সেখানকার ভাব কল্পনাও তাঁর সাহিত্যে নানা পরিবেশের মধ্যে দিয়েই ফুটে উঠেছে। তবে শরৎচন্দ্রের ব্রহ্ম প্রবাসের খুঁটিনাটি ঘটনা সক্রান্ত বিশদ ধারাবাহিক বিবরণ খুব বেশী জানা যায়নি—বা জানা গেছে তা খুব বিস্তারিত নয়, উপরোক্ত গ্রন্থখানি সেই অভাব পূর্ণ করবে বলে আশা করা যায়। গ্রন্থটির মাধ্যমে লেখক স্বর্গীয় বোগেন্দ্রনাথ সরকার শরৎচন্দ্রের ব্রহ্ম প্রবাস সম্বন্ধে অনিসন্ধিৎস, জিজ্ঞাসু ও সন্ধানী ব্যক্তিদের কৌতুহল নিরসন করে বাঙালীর ধন্যবাদ লাভ করার দাবী রেখে গেছেন। বোগেন্দ্রনাথ ছিলেন সেখানে শরৎচন্দ্রের কর্ম-জীবনের সত্যার্থ, বোগেন্দ্রনাথের কলামুখগাই তাঁকে শরৎচন্দ্রের মনের একটি বিশেষ স্থানে উপনীত করেছিল, লেখক নীর্থদিন শরৎচন্দ্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশবার সুযোগ পেয়েছিলেন, ব্রহ্মদেশে বাস করা বাঙালী শরৎচন্দ্রের জীবনে ঘটে যাওয়া এমন অনেক ঘটনা, কাহিনী আছে বা হয় তো সাধারণে অবিদিত নয়। সেই সকল তথ্যগুলি গ্রন্থে পরিবেশিত হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ গ্রন্থটিতে ব্রহ্মদেশ সম্বন্ধেও তথ্যাদি সন্নিবেশিত হয়েছে। শরৎচন্দ্রকে কেন্দ্র করে বর্মা সম্বন্ধেও তথ্যাদি এই গ্রন্থের মাধ্যমে পাঠক সাধারণের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। সর্বোপরি শরৎচন্দ্রের প্রতি লেখকের অসীম শ্রদ্ধার ছাপ বইটির প্রতিটি পৃষ্ঠাতে ফুটে ওঠে। প্রকাশক—মিতালর, ১২ বকিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট। দাম—আড়াই টাকা মাত্র।

বাঙলা নাট্যবিবর্ধনে গিরিশচন্দ্র

সকল দিক কেন্দ্র করা বাঙলার ও বাঙালীর সব জাগরণের ইতিহাসে উনবিংশ শতাব্দীর অবদান অসামান্য। স্বাধীন, প্রগতির ও অগ্রগমনের এক অভিনব চেতনা বাঙালীর জনজীবনে যে কি অকৃতপূর্ণ প্রতিফলিত। সফল বয়েছিল তা বর্ণনার অতীত। বাঙলার দিকপাল সম্ভাবনের কল্যাণে এই সময় দেশের কাব্য, সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত, নাটক, অভিনয় প্রভৃতির ক্রমোন্নয়নের ফলে জাতীয় সংস্কৃতি ভরে উঠে এক মহিমাবিত দীপ্তিতে। জাতীয় সংস্কৃতির এই ব্যাপক জয় বাংলাই দেশের জীবন্তির নামান্তরমাত্র। এই দিকপাল সম্ভাবনের মধ্যে নট-নৈতরব গিরিশচন্দ্র ঘোষ জাতীর নমস্। বাঙলায় বঙ্গমঞ্চের ইতিহাসের পাতায় গিরিশচন্দ্র ঘোষ একটি বিশেষ স্বাক্ষর। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ থেকে অভিনয়জগতে যে ধারার সূত্রপাত হল গিরিশচন্দ্র সেই ধারার প্রথম পুরুষ। বাঙলা নাট্য বিবর্ধনে তাঁর অবদান কতখানি গুরুত্বপূর্ণ এ সম্পর্কে উপরোক্ত গ্রন্থের মাধ্যমে মনোজ্ঞ, সারগর্ভ, তথ্যপূর্ণ আলোচনা পরিবেশন করেছেন তাঁরই প্রদর্শিত পথের আর একজন বরগীর পথিক বাঙলায় সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা, নাট্যবোদ্ধা নটশূর্য্য ক্রীষ্ণকান্ত চৌধুরী। ১৯৫৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের গিরিশ লেকচারার হিসেবে তিনি যে সুচিন্তিত ভাষণ দেন, আলোচ্য গ্রন্থটি সেই বক্তৃতাশ্রাব্য গ্রন্থরূপ। অসীম চৌধুরী এই প্রসঙ্গ নাট্যশাস্ত্রের উদ্ভব, বিকাশ, ব্যাপক দরবাড়া সম্পর্ক আলোকপাত করে সুপ্রাচীনকালের এক ধারাবাহিক ইতিহাস এখানে তুলে ধরেছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে সেদেশের আবির্ভাবের পর ও গিরিশচন্দ্রের আবির্ভাবের পূর্বে শতাব্দির বিভিন্ন বিজ্ঞানসাহী ধনবান ব্যক্তিব্যক্তির প্রচেষ্টার, সহযোগিতার ও পূর্ণপরিণামে বাঙলাদেশের বঙ্গমঞ্চ কি ভাবে তিলে তিলে গড়ে উঠে সমৃদ্ধির আলোকধারায় স্নাত হয়েছিল সে সম্পর্কে আধুনিক ইতিহাস বর্ণনার লেখক অনন্তসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। প্রসঙ্গতঃ বাজা, গাজন, পাঁচালি পালাগান প্রমুখ লৌকিক সংস্কৃতির অঙ্গগুলিরও স্মরণকালের এক ইতিহাস সন্নিবেশিত হয়েছে। গ্রন্থটি লেখকের অকৃতপূর্ণ শ্রমস্বীকারের নিদর্শন, নানাবিধ তথ্যের সমষ্টি এই জ্ঞানপ্রসূ গ্রন্থটি কেবলমাত্র নাট্যরসিকদেরই তৃপ্ত করবে না, গবেষকমাত্রই এই গ্রন্থের বোধোচিত মূল্য দিতে কার্ণণ্য করবেন না বলে আমরা বিশ্বাস রাখি। এই জাতীয় গ্রন্থের বহু সংখ্যাবৃদ্ধি হয় ততই মঙ্গল। পরিশেষে জাতীয় দরবারে এই গ্রন্থটি উপহার দেওয়ার ক্ষেত্রে নটশূর্য্যকে আমাদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করি। প্রকাশক—বুকলাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড, ১ শব্দর ঘোষ লেন। দাম—পাঁচ টাকা মাত্র।

সাহিত্যে ছোটগল্প

সাহিত্যের অঙ্গশৃঙ্খলে ছোটগল্পের অবদান অনন্তসাধারণ। বিশ্বসাহিত্যের দরবারে বাঙলাসাহিত্যের যে ব্যাপক প্রভাব তার জন্মে বাঙলা ছোটগল্প অনেকখানি দায়ী, শুধু বাঙলাদেশে নয়, অন্যান্য দেশেও ছোটগল্পের মধ্যে দিয়ে বিশ্বের বহু দিকপাল সাহিত্যসেবকের আবির্ভাব ঘটেছে। ভারতবর্ষকে ছোটগল্পের ক্ষয়ভূমি বলে অভিহিত করলে অতিরঞ্জন ঘোষে চুষ্ট হতে হয় না, এ কথাও অনস্বীকার্য যে ইরোমোপীর ছোটগল্প সাহিত্যের দময়ন্তী ভারতীয় ছোটগল্প

সাহিত্য। প্রাচীনকাল থেকে ছোটগল্পের আধুনিক ইতিহাস ইংপূর্বে কালে ও যাকিণবুলকে রচিত হলেও আমাদের দেশে ঠিক এই জাতীয় গ্রন্থ এতাবৎ কাল রচিত হয় নি বললেই চলে। আনন্দের কথা, বাঙলাদেশের ছোটগল্পসাহিত্যের অন্ততম শ্রেষ্ঠ শিল্পী স্থপতি অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সাহিত্যের এই অভাব মোচন করলেন। তাঁর এই বিরাট ও মহৎ প্রচেষ্টায় তিনি জয়লাভ করলেন—এ কথাও আমরা অনাস্রাসেই বলতে পারি। গ্রন্থটি লেখকের প্রাণপাত পরিশ্রমের নিদর্শন! যুগের পর যুগ ধরে অসংখ্য ঘটনার প্রবাহের মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন সময়কে সাক্ষী রেখে মাহুকের ধান-ধারণার ক্রমবিস্তারনের সঙ্গে সঙ্গে ছোটগল্পও কি ভাবে সবুজ থেকে সবুজতর হতে লাগল তাই এক আলোকোজ্জ্বল ইতিহাস কুশলী সাহিত্যিকের দ্বারা লিপিবদ্ধ হয়েছে এই গ্রন্থে। ছোটগল্পের এই ইতিহাস গ্রন্থটিকে যুগের ইতিহাস বলে অভিহিত করলেও অতুক্তি হয় না। এদেশীয় ছোটগল্পের ক্রমবর্ধনের এরকম তথ্যপূর্ণ, সারগর্ভ, বিস্তারিত ইতিহাস সাহিত্য সমাজে পরিবেশন করে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় পাঠক সমাজের সন্তোষ প্রসাদ লাভ করবেন—এ বিশ্বাস আমরা মনে মনে পোষণ করি। এই সর্বাঙ্গসুন্দর গ্রন্থটি পাঠকমহলে বোধোচিত সাড়া জাগুক ও সমাদর লাভ করুক—এই আমাদের প্রার্থনা। প্রকাশক—ডি, এম, লাইব্রেরী, ৪২ বর্ণওয়ালিস স্ট্রীট। দাম—আট টাকা মাত্র।

এক অঙ্গে এত রূপ

আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে গুরুপ্রতিষ্ঠা কথালিপী অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত এক বিশেষ পুরুষ। বাঙলা সাহিত্যে ছোটগল্পের ক্ষেত্রেও তাঁর দান অসামান্য। তাঁর সাতটি ছোটগল্প একত্রিত করে উল্লেখ্য গ্রন্থটিঃ সৃষ্টি। গল্পগুলি অচিন্ত্যকুমারের স্বজনী প্রতিভার স্বাক্ষরে উদ্ভূত। তিনি যে একজন প্রথম শ্রেণীর জীবনশিল্পী, জীবনম্পর্শী ও জীবনপূজারী গল্পগুলি এই সত্যটি প্রমাণিত করে। গল্পগুলি অভিনবচে মণ্ডিত, বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল, বর্ণনার প্রাণবন্ত। জীবনের এক-এক দিকের প্রতি লেখক সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, তিন্ন ভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে জীবনের অতুলনীয় বৈচিত্র্যকে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন। বলিষ্ঠ প্রাণের তিনি নিত্য উপাসক তাই জীবনকে জটিলতার রাহুগ্রাস থেকে উদ্ধার করতে তিনি যেন কুড়সকল। সর্বোপরি দেখা যায় অচিন্ত্যকুমার সন্ধানী, জীবনের এক দুর্বার বহুস্তরের উৎস সন্ধানে তাঁর লেখকচিত্ত ব্যাকুল। স্মরণীয় সাহায্যে জীবনের গহন অন্তর্য্যাকে বাসা বাঁধতে সমর্থ হওয়ার জীবনবহুস্তরের অনেকগুলো মূলসূত্রের উৎস যেন অচিন্ত্যকুমারের কাছে স্নায়ু দ্রবহিগম্য নয়। প্রচ্ছদের বর্ণ নির্বাচন ও কেবলমাত্র অক্ষরের সাহায্যে প্রচ্ছদচিত্র পরিকল্পনার জীবনীয় সাহায্যে বর্ণনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। গ্রন্থের নামকরণ ও বর্ণনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। প্রকাশক—নাতানা, ৪৭ গণেশচন্দ্র গাভিনিউ। দাম—তিন টাকা মাত্র।

সিদ্ধুপারে

অনেক বছর আগে বাঙলা সাহিত্যের দরবারে প্রথম প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই প্রশান্ত সা'র অকৃতপূর্ণ আলোড়ন এনেছিল তার

শ্রুতি মিলিয়ে বাবার নয়। শ্রুশান্ত সার সর্বাঙ্গীণ অভিনব লেখক প্রধাত আইনজীবী, নীচেরজন দাশগুপ্তকে সাহিত্য জগতে এক বিশিষ্ট আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। আলোচ্য উপন্যাসটি শ্রুশান্ত সার পৌত্র বিকাশকে কেন্দ্র করে লেখা। ভক্তাবি পাস ক্রম অতিরিক্ত অধ্যয়নের ভ্রমে বিকাশ বিলেত চলে যায় দেশে জ্ঞে ও শিশুপুত্র বেধে। বিলেতেই সে রয়ে গেল দেশে আর ফিরে এস না, এখন বিলেতে তার জীবন কি ভাবে কাটল, কি পরিবেশে, কি ধরণে—তারই ইতিবৃত্ত উপরোক্ত উপন্যাসটির আলোচ্য। উপন্যাসটি আগাগোড়া চিঠির আকারে লেখা। বিলেত জীবনকে কেন্দ্র করে বিকাশের আত্ম কাহিনী অকপটে কোন কিছু না লুকিয়ে খোলাখুলি ভাবে সে চিঠির সাহায্যে জানিয়ে যাচ্ছে তার বোন বুলাকে। চরিত্র সৃষ্টি, ঘটনাবিস্তার, বর্ণনভঙ্গী নীচেরজনের দক্ষতার পরিচয় বহন করেছে। একটি ভারতীয় উচ্চশিক্ষা লাভার্থে বিলেত গেল, সেখানে একটি মেয়ের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা হ'ল, ধীরে ধীরে সেই মেয়ের আকর্ষণ তার কাছে অনতিক্রম্য হয়ে উঠল তারপর ঘনিষ্ঠতা পরিণত হল বিবাহে—এ দিকে তার দ্বিতীয় জীবন, তার ঘর-বাড়ী, সখা, তার সাক্ষী অমুখ্যস্ত্রী, প্রাণাধিক শিশুপুত্র সব হচ্ছে গেল তার মন থেকে। এই ঘটনাবলি যে ভাবে ব্যাখ্যায়ী সাজানো হয়েছে এবং কাহিনীর গতি যে ভাবে লেখক পরিচালিত করেছেন তা প্রশংসার দাবী রাখে। উপন্যাসটির আরও একটি কৃতিত্ব আছে—মানবতার দিক দিয়ে এর আবেদন অনবদীর্ঘ। সমগ্র উপন্যাসটির মধ্যে দীর্ঘ জীবনের জীবনবন্দীরই কীকে কীকে প্রতিটি ছন্দে ফুটে উঠছে, একান্ত আপনজনদের প্রতি চরম আবিচারের স্তম্ভ প্রকাশ্যে, দেশের প্রতি একটা অক্লান্ত টান, জীবনে সৃষ্টিপ্রতিষ্ঠিত প্রাণাধিক প্রিয় পুত্রকে দেখার এক অদম্য ব্যাকুলতা, স্বপ্নবর্ষের দিক দিয়ে এর আবেদন অনবদীর্ঘ। এ ছাড়াও লণ্ডন ও ইংল্যান্ড সম্বন্ধীয় বহু তথ্য এখানে পরিবেশিত হয়েছে, লণ্ডনের ভারতীয়দের জীবনযাত্রা সম্বন্ধেও লেখক আলোকপাত করেছেন। এসম্প্রতঃ বলা প্রয়োজন যে এই উপন্যাসটিই অল্পকাল আগে মাসিক বহুমুখীতে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। প্রচ্ছদচিত্র অঙ্কন করেছেন ক্রীড়ার চৌধুরী। প্রকাশক—নিউলিট পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১ কলেজ রো। দাম—সাত টাকা মাত্র।

সমুদ্র সফেন

আন্দামান—“যত হতভাগ্যের অসমর্থের নির্বাসিতের নীড়”—প্রাক স্বাধীনতা যুগে এই নামটি রীতিমত আতঙ্কের বড় তুলত। ডাঙরের সঙ্গে সঙ্গর এই দ্বীপপুঞ্জটাই বেন আকুল আগ্রহে, পরম প্রেত হাত বাড়িয়ে লগাটে অপরাধের শাস্তি চিহ্ন আঁকা হতভাগ্যদের কোলে তুলে নিত, বুক দিয়ে রাখত তাদের আগলে। দেখতে দেখতে এদের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আন্দামানের বুক নতুন স্পন্দন এসে, আস্তে আস্তে বেন নতুন জীবনের সন্ধান পেল, মনপ্রাণ বেন ভরে গেল নব নব স্বপ্নে। সময়ের অগ্রগমনের সঙ্গে সঙ্গে আন্দামানও এগিয়ে চলল। তার রূপ, তার অঙ্গসজ্জা, তার পারিপার্শ্বিক আবহেটনী, তার দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, তার চিন্তা-কল্পনা-ভাবধারা সব কিছুই পরিবর্তনের ছোঁয়ার ক্রমেই উন্নত থেকে উন্নত হতে থাকে। বতস্বর জানি, এ বাবৎ সাহিত্যে আন্দামান একরকম

অল্পশ্রুতিই ছিল বর্তমানে বশবী সাহিত্যিক আন্ততঃ্যে মুখোপাধ্যায়ের কল্যাণে আন্দামান সাহিত্য সৃষ্টির পটভূমিকার পরিণত হল। আলোচ্য উপন্যাসটি আন্দামানকে কেন্দ্র করে লেখা। একদিকে বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব, অন্যদিকে আন্ততঃ্যে মুখোপাধ্যায়ের লেখনীর চমৎকারিত্ব—এই দুইয়ের সম্মিলনে এক মর্যাদাপূর্ণ অভুলনীর সাহিত্যের জন্ম হল। তাঁকে কেবলমাত্র লেখক বললে বলাে তুল হবে এক অভাবনীয় অল্পশ্রুতি সম্পদেরও তিনি যোগ্য অধিকারী আর এই অল্পশ্রুতির উন্নত আলোকেই তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন মানুষের জীবন, তার প্রেমের স্বরূপ, তার ভাবধারার বৈচিত্র্য—এই সত্যের প্রতিষ্ঠাই আমরা দেখতে পাই এই উপন্যাসের বিভিন্ন পাত্র-পাত্রীর মধ্যে। ইন্সুমতী, মহাদেব, ষ মিন, মা-শাইন, হেংসার্ড প্রভৃতি চরিত্রগুলি লেখকের অনবদ্য চরিত্র সৃষ্টির কয়েকটি নিদর্শন মাত্র। সেদিন অপরাধীদের কোলে তুলে নিত আন্দামান, আগন্তু আর এক ধরণের হতভাগ্যদের আশ্রয় দিচ্ছে আন্দামান। এই আন্দামান সম্প্রসিক্ত বিস্তারিত তথ্য জানার কৌতুহল থাকটা আশ্চর্যের নয় বীরা সেই কৌতুহল পোষণ করেন এই উপন্যাসটি পড়লে তাঁরা উৎকৃষ্ট হবেন। গ্রন্থের প্রারম্ভেই পৌরাণিক যুগ থেকে ঐতিহাসিক যুগ, ঐতিহাসিক যুগ থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত আন্দামানের সংশ্লিষ্ট ইতিকথা সংযোজিত হয়ে সাহিত্য পাঠকদের ইতিহাস সম্বন্ধে জানলাভেও সহায়তা করেছে। ক্রীড়ানাই পাল প্রচ্ছদ চিত্র অঙ্কন করেছেন। প্রকাশক—মিত্র ও শোষ, ১০ শ্রীমচরণ দে স্ট্রীট, দাম—সাড়ে চার টাকা মাত্র।

কথাকলি

বাঙলাদেশের শক্তিমান সাহিত্যিকদের মধ্যে রমাপদ চৌধুরীর নাম সবিশেষ উল্লেখনীয়। ছোট গল্প ও উপন্যাসের মাধ্যমে বাঙলা সাহিত্যকে বীরা ক্রমেই সমৃদ্ধির পথে অগ্রগমনে সহায়তা করেছেন অক্লান্তভাবে, রমাপদ চৌধুরী তাঁদেরই একজন। উপরোক্ত গ্রন্থটি রমাপদ চৌধুরীর কয়েকটি সার্বকনামা ছোট গল্পের সংকলন। প্রতিটি গল্প লেখকের স্বজনীনজন্মের পরিচায়ক। গল্পগুলি সুখপাঠ্য, উচ্চাঙ্গের ও ভাবসমৃদ্ধ। এদের আবেদন স্পষ্ট, বলিষ্ঠ ও জোরালো রমাপদ চৌধুরীর কল্পনা অল্পশ্রুতি ও ব্যক্তনা যথোচিত বৈশিষ্ট্য বহন করে। নতুন চশমা, ঈর্ষা, রাগ, পরজ বসন্ত, উদয়াস্ত, হৃৎসর স্বাদ, সুরা, পঙ্ক, দুটি বোন প্রমুখ গল্পগুলির মধ্যে নতুন চশমা, পরজ বসন্ত, উদয়াস্ত, হৃৎসর স্বাদ, দুটি বোন বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। প্রকাশক—ত্রিবেণী প্রকাশন, ২ শ্রীমচরণ দে স্ট্রীট। দাম তিন টাকা মাত্র।

রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী

জগতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সৃষ্টিগুলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী অন্যতম। যদিও গোড়ার দিকে রক্তকরবী দুর্বোধ্য বলে অভিহিত হয়েছিল কিন্তু আশ্চর্য এই যে এর অবর্ণনীয় আবেদনে পাঠক-পাঠিকা সাড়া না দিলেও থাকতে পারেন নি। বিভিন্ন সমালোচক বিভিন্ন আঙ্গিকে এর সমালোচনা করেছেন, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে একে দেখেছেন, বিভিন্ন ভাব অংলঘন করে এর মর্মার্থ উদ্ঘাটনে ব্রতী হয়েছেন। রক্তকরবীকে কেউ বলেছেন স্নিগ্ধ নাট্য, কেউ বললেন

রূপক, কেউ বা সঙ্কেতধর্মী, কেউ বা বাস্তব, বিভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন মতবাদের ফলে রক্তকরবীর সন্ধানে এক ঘোঁরাটে ধারণার সৃষ্টি হল, আশার কথা সে ধারণা এখন ক্রমেই কেটে যাচ্ছে। প্রেমবাদের সঙ্গে বক্তবাদের, দেবশক্তির সঙ্গে পশু শক্তির, উন্মুক্ত প্রাণের জয় গানের সঙ্গে কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলের দারুণ সংঘর্ষ রক্তকরবীর প্রধান উপজীব্য। একদিকে শক্তি ও সম্পদের প্রতি মানুষের কুংসিত লোলুপতার অন্তর্দিকে কঠোর নিয়মানুবর্তিতার শৃঙ্খলে মানুষের প্রাণের আবেদন ব্যর্থ হতে চলেছে, স্বাভাবিকতা ঘরে বেতে বসেছে, সহজতা লোপ পেতে বসেছে, এ অবস্থায় মানুষকে মুক্তি দিতে পারে প্রেম, সঙ্গীত, ধোঁবন। মৃত্যু সন্ধে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা যে কতখানি গভীর তারই প্রমাণ মেলে রক্তকরবীতে। রক্তকরবীর মধ্যে মৃত্যুর যে অন্তর আলোয় আমরা দেখতে পাচ্ছি এক কথার তা অনন্ত। কবির মতে মৃত্যুই মানুষকে অন্ধকার থেকে নিয়ে যায় আলোয়, মৃত্যু মোচন করে জীবনের জড়ত্ব, মৃত্যু মানুষকে দেয় পূর্ণতা। অধ্যাপক, বিভাগ রায়চৌধুরী বাঙলাদেশের একজন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ সাহিত্যক্ষেত্রে বশবী পুরুষ। উপরোক্ত গ্রন্থটি রক্তকরবী সন্ধে তার আলোচনার গ্রন্থরূপ। রক্তকরবী সন্ধে তাঁর আলোচনা যেমনই গুরুত্বপূর্ণ তেমনই বৈশিষ্ট্যবান। সমগ্র নাটকটির অন্তর্নিহিত ভাব, মর্মার্থ, মূলমন্ত্র অতি প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যাত হয়েছে। লক্ষ্য করবার বিষয় যে গ্রন্থটি অবধা ভাবে ভারাক্রান্ত নয় বরং বলা দরকার ঠিক ততটুকুই বলা হয়েছে ফলে আলোচনোগ্রন্থ হিসেবে বইটি সর্বোৎকৃষ্ট হয়ে উঠেছে। সাহিত্যরসিক এবং ছাত্রছাত্রী এই উভয় সম্প্রদায়ই এই গ্রন্থটি পড়ে উপকৃত হবেন। অধ্যাপক রায়চৌধুরীর স্মরণ বিশ্লেষণে রক্তকরবীর নাট্য ও সাহিত্যরস আস্থানে সাধারণ পাঠক সফলকাম হবেন বলে আশা করা যায়। প্রেমেন্দ্র মিত্রের ‘পরিচিতি’ গ্রন্থের মর্মান্বিত্তির ক্ষেত্রে সহায়তা করেছে। প্রকাশক—ত্রিদীপঙ্কর রায়চৌধুরী, ১২৮ সেলিমপুর রোড, কলকাতা—৩১, প্রান্তিস্থান, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট। দাম—৮ টাকা মাত্র।

জেলভায়েরী

সত্য, তায় ও বিবেকের সেবার বাদের জীবন অতিবাহিত, আরামশয্যা ছেড়ে ত্যাগের কঠিন পথে ধাঁরা পা ফেলেছেন, দেশের সর্বের কল্যাণকামনায় ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বাদের মনে বিলুপ্ত। বেথাপাত করতে পারেনি তাঁরই আদর্শ নেতা। ভারতের এই বরগীর সন্তানদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ সেন অত্যন্তম। দেশবাসীর তিনি নম্র। সকলেই অবগত আছেন যে মাত্র চার বছর আগে ১৯৫৫ সালের ২৫শে মার্চ জেলের মধ্যে কতখানি ঔদাসীন্তের মধ্যে,

উপেক্ষার মধ্যে, অবিচারের মধ্যে এই প্রাচীর নেতাকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। আজীবন সর্বতোভাবে দেশ ও জাতির সেবা করে এসে বিপ্লবী বীরকে মৃত্যু বরণ করতে হল অসহায় বন্দী অবস্থায়। ১৯৫৪ সালের ১লা জুন অর্থাৎ যেদিন তিনি বন্দী হন সেইদিন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জেলের মধ্যে কি ভাবে তাঁর দিন কেটেছে উপরোক্ত ডায়েরী পাঠে সে সন্ধে বিস্তারিত ভাবে খুঁটিনাটি পর্যন্ত জানা যাবে। দেশকে আর জাতিকে সত্যেন্দ্রনাথ যে কতখানি ভালবাসতেন, দেশীয় ও জাতীয় মঙ্গলকর্মে নিজেকে তিনি, কতখানি নিয়োজিত রেখেছিলেন বা আরও রাখতে চেয়েছিলেন দেশশত ও জাতিগত কল্যাণে তিনি কতখানি উৎসাহ ছিলেন ডায়েরীর প্রতিটি ছত্র সে বিষয়ে সাক্ষ্য দেবে। এই দেশপ্রীতি তাঁর অস্তিমমুহুর্ত পর্যন্ত অন্তর ছিল। পাকিস্তান সরকারের মদগবী নীতি, অজ্ঞতা, ভ্রান্ত পথাবলম্বন, হঠকারিতা ও রাজ্যশাসনে সর্বতোভাবে অক্ষমতার একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র এই ডায়েরীর মাধ্যমে ফুটে উঠেছে। এই মূল্যবান ডায়েরীটিকে গ্রন্থরূপে সকলের সামনে তুলে ধরার জন্য প্রকাশক নিঃসন্দেহে আমাদের ধন্যবাদভাজন। সত্যেন্দ্রনাথের ঘটনাবল্ল জীবনের একটি সাক্ষিপূর্ণ কাহিনী গ্রন্থে সন্নিবেশিত হ’লে গ্রন্থের মর্যাদা আরও বৃদ্ধি পেল। দেশের মুক্তিযজ্ঞের অন্ততম বরণ্য পুস্তিকের অস্তিমকালীন আত্মবিবরণী এই গ্রন্থটি বাঙলার ঘরে ঘরে বধ্যপ্রাণ্য সমাদর লাভ করুক এই আমাদের কামনা। প্রকাশক—মিত্রালয়, ১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট। দাম—তিন টাকা মাত্র।

থেরেসা

বিশ্বসাহিত্যে উন্নতিশীল শতাব্দীর অন্ততম শ্রেষ্ঠ অবদান এমিল জোলা (১৮৪০-১৯০২)। পৃথিবীর সকল কালের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের মধ্যে এমিল জোলা অত্যন্তম। থেরেসা তাঁর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সৃষ্টির এক অসামান্য নিদর্শন। এই উপজ্ঞানের মধ্যে দিয়ে জোলা মানুষের হৃদয়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অল্পভূতির উৎস সন্ধানের চেষ্টা করেছেন, উপজ্ঞানের মধ্যে দিয়ে লেখকের জীবন সন্ধানী রূপটি ফুটে ওঠে, জীবনের গোপন রহস্যের আবরণ তিনি উন্মোচন করেছেন প্রকাশ্য আলোয়। মানুষের নিজের অন্তর্জাত তার অবচেতন মন ভিতরে ভিতরে কাজ করে যায়, এই ক্রিয়াশীলতাই জীবনসম্পন্ননের নামান্তর। উপরোক্ত উপজ্ঞানটিকে তারই বিশ্লেষণাত্মক কাহিনী আমরা বলতে পারি। উপজ্ঞানটির অনুবাদে যথার্থ শক্তির পরিচয় দিয়েছেন অধিনাশচন্দ্র ঘোষাল। তাঁর আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও শ্রমস্বীকার অভিনন্দনযোগ্য। তাঁর অনুবাদও উচ্চাঙ্গের, গ্রন্থে মূল গ্রন্থকারের একটি সাক্ষিপূর্ণ জীবনী সংযোজিত হয়ে গ্রন্থের মর্মান্বিত্তি করেছে। প্রকাশক—রীডার্স কর্পার, ৫ শঙ্কর ঘোষ লেন। দাম—পাঁচ টাকা মাত্র।

‘ছিঁড়িয়াছে পাল, কে ধরবে হাল, আছে ক’র হিম্মৎ ?

কে আছে জোরান, হও আত্মরান ঠাকিছে ভবিষ্যৎ।

এ তুকান ভারী দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার’।

—কাজী মজলল ইসলাম।

কবি ও গীতিকার নজরুল ইসলাম

বাংলার প্রতিভাবান কবি নজরুল ইসলাম ১৩০৬ সালের

১১ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে বৰ্মান জেলার চুকলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কাজী ফকির আহমদ এবং মাতার নাম জাহেদা খাতুন। শৈশবকালেই তাঁর পিতার মৃত্যু হয় এবং তাঁর বাল্যজীবন দুঃখের মধ্যেই অতিবাহিত হয়েছে। ১৩১৬ সালে দশ বৎসর বয়সে গ্রামের মস্তাব হাতে নিয়মিত পড়াশোনা শুরু করেন এবং পরে ঐ মস্তাবেই শিক্ষকতা করেন। পুলিশ নাবালগপেটের কাজী রফিকুদ্দিন সাহেবের চেষ্টায় তিনি ময়মনসিংহ জেলার দরিয়াপুর হাইস্কুলে এবং পরে ১৩২০ সালে রাণীগঞ্জের সয়ারসোল হাইস্কুলে ভর্তি হন। তিন বৎসর অধ্যয়ন করার পর ১৩২৩ সালে তিনি ৪১নং বাঙ্গালী পল্টনে যোগ দিয়ে করাচী গমন করেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় তিনি যুদ্ধক্ষেত্রেই কাব্য চর্চা করতেন। একজন পাঞ্জাবী মৌলভী সাহেবের সাহায্যে তিনি ফার্সি কবিতার বিখ্যাত কাব্যগুলি পড়েন এবং 'বিক্রমের বেদন' গল্পমালা লেখেন এবং দেশে ফিরে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। ১৩২৬ সালের প্রাণ সংখ্যায় 'মুক্তি' নামক তাঁহার একটি গাথা-জাতীয় দীর্ঘ কবিতা প্রকাশিত হয়। পরে তিনি অবিরাম গান, কবিতা, নাটক ও গল্প লিখতে থাকেন। তাঁর সম্পাদিত ধুমকেতু, লাভল প্রভৃতি পত্রিকা রাজস্বোষে পড়ে বন্ধ হয়ে যায়। রাজস্বোষমূলক কবিতা প্রকাশ করে তিনি এক বৎসর কারাদণ্ড ভোগ করেন। তাঁর নির্ভীক জবানবন্দীতে বিদ্রোহের ভাব পরিলক্ষিত হয়। জেলদানায় তাঁর রচিত 'শিকল পরার গান' রচিত হয়—

‘এ শিকল পরা ছল মোদের

এ শিকল পরার ছল।

এই শিকল পরেই শিকল তোদের

করবে বিকল।’ ইত্যাদি

প্রথম যৌবনে বিদ্রোহী কবিতা লিখে তিনি বিদ্রোহী কবি নামে পরিচিত হন। যুদ্ধক্ষেত্রের পরিবেশে তাঁর যে কাব্যরূপ হয়, তাঁর অনন্য প্রাণশক্তির বলে কাব্যধারা বস্তুর আকার ধারণ করে এবং মোসলেম ভারতে সেগুলির প্রকাশে সাহিত্যক্ষেত্রে সাড়া পড়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাষা ও ছন্দ নামক কবিতার কবি প্রতিভা সর্বত্র সত্যবাণী উচ্চারণ করেছেন—

‘অলৌকিক আনন্দের ভার

বিধাতা বাহ্যে দেয়, তার বক্ষে বেদনা অপার,

তার নিত্য জাগরণ! অগ্নিসম দেবতার দান

উরুশিখা জ্বলি চিত্তে অহোরাত্র দগ্ধ করে প্রাণ।’

আজ পর্যন্ত কোন কবি বা সংগীত রচয়িতা এককভাবে এতগুলি গান রচনা করতে সক্ষম হন নাই। তাঁর গানের সংখ্যা প্রায় তিন হাজার, কবি শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথও এত গান রচনা করেন নাই। সংগীত রচয়িতা হিসাবে তিনি প্রভুত খ্যাতি অর্জন করেছেন। অসংখ্য গ্রামাঙ্গীত ও নাটক রচনান্তেও তাঁর অসামান্য দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর রচিত অগ্নিবীণা, বিবের-বাঁশী, সর্বহারা, শক্তি, ভাঙার গান, বুল বুল, সিঁদু-হিল্লোল প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থগুলি বিশেষ প্রসিদ্ধ।

রবীন্দ্র যুগে যে করুণ কবি নিজেদের প্রতিভার বৈশিষ্ট্য বাংলা কাব্যের ইতিহাসে নিজেদের স্থায়ী আসন অপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম



হয়েছেন, নজরুল তাঁদের অন্ততম। রবীন্দ্র যুগে নজরুল স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের প্রতিভার ভাস্বর। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে নজরুলের কবি প্রতিভার শ্রেষ্ঠ পরিচয় অন্তত। পদ্য, প্রকৃতি ও মানুষকে নিয়ে তিনি যে বহুনিষ্ঠ কাব্য সৃষ্টি করেছেন এবং রবীন্দ্রনাথের সর্বগ্রামী প্রতিভার প্রভাব হতে মুক্ত হয়ে যে একটি স্বতন্ত্র কবি পরিচিতি গড়ে তুলেছেন, সেইটাই নজরুলের সর্বপ্রধান কৃতিত্ব। এ ছাড়া জাতিগত বৈষম্যের প্রকাশ কবির সার্বিক রচনাকে অনবদ্য করে তুলেছে আলোড়িত করেছে সমাজচেতন ও সংবেদনশীল কবিচিত্তকে। জগতে আজ অর্থোডক্স অসাম্যের উগ্রতা সর্বত্র। কৃত্রিম বিভেদের প্রাচীর মাথা তুলে সর্বত্র বিদ্যমান এবং এরই ফল স্বরূপ আজ মানুষে মানুষে বিধম বিচ্ছেদ, হস্তের ব্যবধান। মানুষের মধ্যেই আজ এক দল আক্রমণকারী, আর একদল আক্রান্ত; একদল নিগীড়ক আর একদল নিগীড়িত। এ বেদনা স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে কুটে উঠেছে তাঁর কবিতায়।

‘এই ধরবীর বাহা সখল

বাসে ভরা ফুল, বসে ভরা ফল

সুরসাল মাটি, সুরা সম জল, পাখীর কণ্ঠ গান,

সকলের এতে সম অধিকার, এই তার করধান।’

বাঁরা আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থকেন্দ্রিক, পাশবিক বলের সহায়তায় বাঁরা মানুষের অস্থির উপর সৌধ নির্মাণ করতে কুঠা বোম্ব করে না, কবির বিক্ষোভ তাদেরই বিরুদ্ধে, ইতিপূর্বে এমন বিক্ষোভের সুর ও অপরাধের বিদ্রোহের রূপ কখনও বাংলা ভাষার দেখা যায়নি, দেখা যায়নি কখনও দুর্বীর যৌবনের জয় ঘোষণা। এই বিক্ষোভ ও বিদ্রোহের পিছনে আছে সব বকম অজ্ঞান অত্যাচার ও নির্যাতনের নির্যম অভিযান। তাই এ সবার বিরুদ্ধে কবির বিদ্রোহ, তাই তিনি বিদ্রোহী কবি বলে সমধিক প্রসিদ্ধ।

বাংলা সাহিত্যে নজরুলের আবির্ভাব কাল বাংলা দেশ ও ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলনের যুগ। সেই সময়ে কবি জাতীয় আন্দোলনকে দিয়েছেন অভূতপূর্ব প্রেরণা তাঁর গানে।—

'কাদিবনা মোরা বাও কারা মাঝে
বাও তবে বীর সঙ্গ হে,

ঐ শৃঙ্খলই বরিবে মোদের
ত্রিশ কোটি ভাতৃ অঙ্গ হে।

সুস্তির লাগি মিসনের লাগি
আছ, ত বাহারা দিয়াছে প্রাণ

হিন্দু মুসলিম চলেছি আমরা
গাহিয়া তাদেরই বিজয় গান।'

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ ও দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের আরম্ভ—এই কুড়ি বৎসর কালই নজরুল ইসলামের প্রেরণা কাব্য সৃষ্টির যুগ এই যুগে বিশ্ববন্দিত কবি রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সৃষ্টির অজস্রতার যুগশ্রেষ্ঠ এবং কবি সত্যেন্দ্রনাথ মল্ল ছিলেন সৃষ্টিশীল। এই কাব্যযুগের যুগে দেখা দিলেন কবি নজরুল তাঁর জনজাগরণের বাণী নিয়ে, গণজাগরণের গান নিয়ে।

দেশাত্মবোধের বলিষ্ঠ প্রভাব তাঁর কবিতায় ও গানে লক্ষ্য করা যায়। দেশাত্মবোধের আদি গুরু স্ববি বঙ্কিমচন্দ্রের ভার ভেরবুদ্ধির উর্ধ্বে দেশসেবার কাজে উৎসাহ হতে এবং এক মায়ের সন্তানরূপে গণ্য করবার উদাত্ত আত্মবোধ তিনি জানিয়েছেন। জাতীয় জীবনের সঙ্কটময় কালে কবি দেশনেতা ও দেশ কর্মীদের প্রতি সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছেন তাঁর সুবিখ্যাত কবিতায়,—

'দুর্গমসিরি কান্ডার মক, হস্তর পাখাবার
লঙ্ঘিত হবে রাত্রি নিশীথে, স্বাতীরা হ'শিরার।
ভুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে অঙ্গ, ভুলিতেছে মাঝি পথ,
ছিঁড়িয়াছে পাল, কে ধরবে হাল, আছে কার হিম্মত ?
কে আছে স্বেচ্ছায়, হও আশ্রয়ান, ইংকিছে ভবিষ্যৎ।
এ তুফান ভারী, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার।
তিমির স্বাত্রি, মাতৃমস্ত্রী শাস্ত্রীরা, সাবধান।
যুগযুগান্ত সঞ্চিত ব্যাধা বোঝিয়াছে অভিধান।
কেনাইরা উঠে বঞ্চিত বৃক পুঞ্জিত অভিমান,
ইহাদের পথে নিতে হবে সাধে, দিতে হবে অধিকার।
অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া জানেনা সত্ত্বরণ,
কাণ্ডারী! আজি দেখিব তোমার মাতৃমুক্তি পণ।
হিন্দু না ওরা মুসলিম? ওই জিজ্ঞাসে কোনজন?
কাণ্ডারী! বসো, ডুবিয়ে মাছুষ, সন্তান মোর মার।'

বিক্রোহ, বিপ্লব ও যৌবন শক্তির জয় ঘোষণার অন্তরালে, সাহিত্য সৃষ্টির মূল দেখা যায় তাঁর সাবধানশীল স্বর। তরুণ মনের অগ্রগতির স্বর ধ্বনিত হয়েছে তাঁর গানে,—

'চল চল চল। চল চল চল।

উদ্ভগগনে বাজে মাদল

নিম্নে উতলা ধরণীতল

অরুণ প্রান্তের তরুণ দল

চলরে চলরে চল।

চল চল চল।

উষার হুয়ারে হানি আশাত
আমরা আনিব রক্তা প্রতাত

আমরা টুটাব তিমির রাত
বাধার বিদ্যাভঙ্গ।

নব নবীনের গাহিয়া গান সজীব করিব মহাশ্মশান
আমরা দানিব নূতন প্রাণ বাহতে নবীন বল।
চলবে নওজোয়ান শোনেয় পাতিয়া কান
হুড়া তোরণ হুয়ারে হুয়ারে জীবনের আহ্বান।
ভাঙরে ভাঙ আগল চলয়ে চলয়ে চল।
চল চল চল।'

কেবল যৌবন শক্তির নয়, দেশের সব রকম শক্তিরই উদ্বোধন সংগীত গেরেছেন কবি। সামিক, কৃষক, নারী ও ছাত্র সমাজ জুগিয়েছে কবি মানসে অক্ষুণ্ণ কাব্য ও সংগীতের প্রেরণা। শত দুঃখ দৈন্ত ও লাহিনা জর্জরিত মাছুষকে গুনিয়েছেন তিনি আশার বাণী, কোথাও তাঁর কাব্য বা সংগীতে নৈরাশ্রের ফিলাপ ধ্বনিত হয়নি। সব জায়গায় তিনি গুনিয়েছেন উজ্জলতর ভবিষ্যতের বাণী। কবি কঠে ছাত্র জীবনের মর্মবাণীধ্বনিত হয়েছে এক অপরূপ ভাষায়;—

'আমরা শক্তি আমরা বস
আমরা ছাত্রদল।
মোদের পায়ের তলায় মুছে' তুফান
উর্ধ্বে বিমান বড় বাদল।
আমরা ছাত্রদল।

আমরা রচি ভালবাসার আশার ভবিষ্যৎ,
মোদের স্বর্গপথের আভাষ দেখায় আকাশে ছাত্রাপথ।
মোদের চোখে বিশ্ববাসীর স্বপ্ন দেখা হোক সকল
আমরা ছাত্রদল।'

জাতিভেদ প্রথা, ছাত্রমার্গ প্রভৃতি কুসংস্কারের বিক্ষোভ কবি গেরেছেন সমাজ সংস্কৃতি মূলক গানে,—

'জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত জালিয়াত খেলছে দুয়া
ছুঁলেই তোরা জাত বাবে? জাত ছেলের হাতের নয়ত মোরা।
হ'কোর জল আর ভাতের হাঁড়ি, ভারাল এতেই জাতির জান,
তাইত বেকুব, করলি তোরা একজাতিকে একশ' থান।

এখন দেখিস ভারত জোড়া

পচে আছিল বাসি মড়া,

মাছুষ নাই আজ, আছে শুধু জাত শেরালের হক্কাহরা।'

ঈশ্বরাত্মবৃত্তিও কবির কাব্য প্রেরণা হতে বাদ যায়নি;—

'বহু পথে কিরিয়াছি প্রভু
আর হইব না পথ হারা
বহু স্বজন সব ছেড়ে যাব
তুমি একা আগো দেবতার।'

ছূতের ভয় নাটকে কবি রূপকের বাহায্যে দেশের নির্ধাতিত বস্তুশক্তিকে জানিয়েছেন আগুণের আহ্বান, তাঁর গানের মাধ্যমে,

'মোরা মারের চোটে তুত ভাগাব
মন্ত্র দিয়ে নয়।

মোরা জীবন তবে মার খেয়েছি
আর প্রাণে না মর।' ইত্যাদি—

মানবাস্তার নানা আকৃতি, বেদনা, ও বিচিত্র অহুত্ব নানা সুরে, ছন্দে, কাব্যে ও গানে কোমল কঠোরে কতভাবে রূপায়িত হয়েছে তার অন্তর্ভুক্ত। দাগঘের বিকস্মে, পরাবীনতায় বিকস্মে, কুসংস্কার নির্ধাতন ও গভীরগতিকতার বিকস্মে কবি বহুকাঠে ঘোষণা করেছেন বিদ্রোহ। জাতীয়তা ও বীররসের সঙ্গে সঙ্গে কবি গৌণেছেন অজস্র গানের মালা, যা আজও মহা-গবীর প্রেমোদক হতে সূর্য পল্লীগ্রামের কুঁড়েঘর পর্যন্ত সমভাবে জনপ্রিয় ও আদৃত। কাজী নজরুল ইসলামের গানের সঙ্গে পরিচিত নয় এমন বাঙালী খুঁজে পাওয়া বাবে না। রবীন্দ্র-পরবর্তী যুগে গীতিকারদের সবার আগে নজরুল ইসলামের নামই মনে পড়ে। কারণ, তাঁর গান যে নানা সম্পদে সমৃদ্ধ। এই ভাবের সঙ্গে সুরের ও বাণীর সমন্বয় সাধন কবি মানসের শক্তিশালী প্রতিভার পরিচায়ক। বাংলার মুসলমান সমাজে সংগীত বিষয়তা ভেসে গেল তাঁর অজস্র গানের মৈত্রীতে ও ভাব বস্তুর। তিনি বহুগান রচনা করেছেন নতুন সুরে, নতুন ছন্দে। বাংলা ভাষার গজল গানেরও তিনি প্রবর্তক। এ ছাড়া তিনি বৈদেশিক ভাষা সহযোগে ও সুর সাযোগেও রচনা করেছেন অজস্র বাংলা গান। তাঁর বহুগান রেফার্ড সংগীত ও সিনেমা চিত্রের জগৎ তিনি রচনা করেছেন। শুধু তাই নয়, তিনি অজস্র রচিত বহু গানে সুর যোজনা করেছেন—তাঁর নিজস্ব সুর। একদিকে তিনি যেমন প্রতিভাবান কবি অপনাবিত তেমনিই গীতিকার ও সুরক সুরশিল্পী।

কেবল নজরুলের গান নয়, বাঙালি গানের বৈশিষ্ট্য এই যে, বাঙালি গান কোনদিনই সুরসর্ব্ব নয়। এ গান কোনদিনই সুরসর্ব্ব নয়। এ গানে কথা বা পদই প্রধান, সুরের সঙ্গে থাকে তার অপূর্ণ সঙ্গতি। জয়দেব ও চণ্ডীদাসের পরবর্তী থেকে আমরা রামপ্রসাদ, নিধুবাবু, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনী সেন, বাউল-দরবেশের গান, আগমনী ও বিজয়া গান, আর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের গান প্রভৃতি যে গানই হোক না কেন, তাঁর পদগুলি সর্বদাই সুরের সঙ্গে ভাব ও কাব্যরসের সঙ্গতি বোধ চলেছে। তাই বাঙালীর গান শুধু গানই নয় সাহিত্য রসেও ধোঁরাক। কবিকৃতির মৌলিবৃত্ত ও অভিনবত্ব ছিল বলেই রবীন্দ্র যুগের পরিপূর্ণ প্রভাবের মধ্যেও তিনি ছিলেন রবীন্দ্র-প্রভাব যুক্ত। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং নজরুলের কবিকৃতিতে সানন্দ অভিনন্দন জানিয়েছেন। জনপ্রিয়তায় তিনি কবিগুরুকেও ছাড়িয়ে গেলেন, সবাই স্বীকার করে নিল তাঁকে গণসঙ্গরূপের কবি বলে। কবি লিখলেন,—

‘মহা বিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত,
যবে উৎসীড়িতের ক্রন্দন বোল
আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না
অত্যাচারীর খড়্গ-কুপাণ
ভীম রণভূমে রবিবে না
বিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত।’

নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়ে তিনি দেশ ও জাতিকে সুর করে তুলেছেন একথা অনস্বীকার্য। আজ যদি তিনি হঠাৎ দেখে থাকতেন তবে কবিকৃতির নব বিবর্তন হস্ত দেখতে

পেতাম। কাব্য সাহিত্য ও সংগীত জগতে হস্ত আরও নতুন সৃষ্টি দিয়ে অর্থাৎ সাজাতে পারতেন, ভরিয়ে তুলতে পারতেন ফুলের সাজি নতুন নতুন ফুল, কিন্তু তা আর সম্ভব হ’ল না তাঁর অসুস্থতার জন্ত।

আরও ও কারী সংগীত থেকে তিনি একাধিক সুরসৃষ্টি করেছেন। বিশেষ করে গজল গানে তাঁর আসন সুরপ্রতিষ্ঠিত করেছেন সংগীত-জগতে। গজল গান বাঙালীর সংগীত-জগতে এক অমূল্য সম্পদ। কেবল তাই নয়, গ্রামা সংগীত রচনাও তিনি বহুশ্রম দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। বাঙালি সংগীতে নজরুলের অকুণ দান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণযোগ্য। অবলিপি সহযোগে তাঁর গানগুলিকে শ্রাব্য করে রাখা দেশবাসীর অঙ্গ কর্তব্য। আর সেই সঙ্গে নজরুল সৃষ্ট কাব্য-সাহিত্যের আলোচনা দ্বারা কবিকে স্মরণীয় করার ব্যবস্থা করাও দেশবাসীর কর্তব্য। কবির গান সর্বদেয় সবচেয়ে বড় কথা এই যে, তিনি বাঙালী জনসাধারণের একান্ত আপনায়, একান্ত অন্তরঙ্গ গীতিকার। তিনি তাঁর গানকে সহজবোধ্য করে রচনা করেছেন। সেই জন্যই নজরুলের গান এত প্রিয়।

তাঁর হৃদয়ের গান বাঙালি সাহিত্যের এক বিরাট সম্পদ।

‘চন্দ্রকার আর মেঘের চাঁড়াল ধর্ম্মঘটের কর্তৃপক্ষ !

পুলিশ শুধু করছে পরধ কার কতটা চন্দ্রপুষ্ক !

চাঁটু-বাগা বাধছে দাড়ি,

শিখা হা বান দাপিত বাড়ী !

সঙ্গীত-যন্ত্র কেনার ব্যাপারে আগে

মনে আসে ডোয়ার্কিনের



কথা, এটা
খুবই স্বাভা-
বিক, কেননা
সবাই জানেন
ডোয়ার্কিনের
১৮৭৫ সাল
থেকে দীর্ঘ-
দিনের অভি-
জতার ফলে

তাদের প্রতিষ্ঠা যন্ত্র নিখুঁত রূপ পেয়েছে।

কোন যন্ত্রের প্রয়োজন উল্লেখ করে মূল্য-ভালিকার
জন্ত লিখুন।

ডোয়ার্কিন এণ্ড সন্ প্রাইভেট লিঃ

শো-রুম :—৮/২, এস্ট্রাডানেড ইস্ট, কলিকাতা।

বোটকাগন্ধী ভোজপুরী কয় বাঙালীকে, 'হুঁ ছুঁইয়ে।' (কোবাস) :—দে গল্পের গা দুইয়ে।

বাঙালী চাকুরি-জীবীর সম্বন্ধে তাঁর হাসির গান—

'নখ-দস্ত-বিহীন চাকুরী অধীন আমরা বাঙালী বাবু।
পায়ে পৌদ গায়ে ম্যালেরিয়া,
বুক কাশি লয়ে সদা কাবু।
ঢিলে ঢালা কাছা কৌচা সামলারে
ভূঁরি বয়ে ছুটি নিট পিটে পায়ে,
আকিমে বসিয়া কলম পিখিয়া
ঘরে এসে খাই সাবু।'

চা-শ্রীতি বিষয়ক আর একটি গানে প্রচুর হাস্য রসের খোঁজক
জোগান হয়েছে।

'চায়ে পিয়ানী পিপাসিত চিত্ত আমরা চাতক দল।
দেবতার কন সোমরল বারে, সে এই গরম জল।
চায়ে প্রসাদে চার্লস মুনি ঋষি বাক বশে হল পাশ
চা নাতি পেয়ে চারপেয়ে জীব চর্যন করে খাশ।
লাখ কাপ চা খাইয়া চালাক
হয়, সেই প্রমাণ চাপ কত লাখ?
মাতালের দাদা আমরা চাচাল, বাচাল বলিস বল।'

ইত্যাদি—

শ্রালক নামক মধুর সম্পর্কিত ব্যক্তিটি তাঁর ব্যঙ্গ মধুর গানে
হাস্য রসের ও শালা শব্দের নানা অর্থের প্রয়োগ নৈপুণ্যে মধুর হয়ে
উঠেছে,—

'শালায় কোথায় পাট—

গিন্নীর ভাই পালিয়ে গেছে গিরি চটে কাঁই।
আমার বাড়ি কোথ চাপিয়ে কাঁদিয়েছেন সদাই।
* * *
খুঁজতে খুঁজতে দেখতে পেলাম সমুখে আটশালা,
আটশালাতে মোর শালা নাই বসেছে পাটশালা
গো-শালাতে গরু বাঁধা, আমার শালা নাই।
খুঁজতে গেলাম শহর, দেখি শালায় ছড়াছড়ি।
পান শালাতে পান করে বার মাতাল গড়াগড়ি,
ধর্মশালা অতিথিশালা শালায় অন্ত নাই।
হাতিশালা, ঘোড়াশালা রাজার ভাইনে বাঁয়ে,
হঠাৎ দেখি বাঁছে বাবু দোশালা গায়ে,
দো-শালা ত চাইনে বাবা, একশালাকে চাই।
দশশালা ব্যবস্থা ঝুলে গরীব চাবীর ভাগো,
দিয়াশালাই পেয়ে ভারি, শালাই পেলাম বাকগে।
চাইছু শালা, হুদিদিল গরম মশালাই ॥
ঢেঁকি শালায় ঢেঁকি শুয়ে পাকশালাতে ছাই,
হায়। শালায় কোথায় পাট ॥'

কাব্যে বীরা ভাবের গভীরতা চান, তাঁদের জন্ত নজরুল নন।
তিনি মূলত রোমন্থের কবি, তাই তিনি গেয়েছেন রোমন্থের জয়গান।
তাঁর কবিতায় রবীন্দ্রনাথের মত অনন্ত শিল্পরূপ, পরিমিত বোধ ও
ছন্দাদি সম্বন্ধে সচেতনতা না থাকলেও নজরুল যে তাঁর যুগের
একজন শ্রেষ্ঠ কবি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। রোমন্থের কবি,

সহস্রাংশ ধর্মের কবি, হুঁসী নিপীড়িত জনগণের মুখপাত্র কবি,
বিজ্রোহী কবি নজরুলের কবিতা বাঙালার কাব্যসাহিত্যের অজুত
শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

কালীপদ সাহিত্যী।

রেকর্ড-পরিচয়

হিজ মাস্টার্স ভয়েস

N 82820—শ্রামল মিত্রের গাওয়া হুঁশানি আধুনিক গান—
“মন মেতেছে” ও “স্বর্ঘস্থলী স্বর্ঘ খোজে।”

N 82821—“গীতালি গীতাঞ্জলি” ও “একটি ফুলের মত”—
আধুনিক গান দুটি মিষ্টি স্বরে পরিবেশন করেছেন কুমারী বাণী
বোশাল।

N 82822—হুঁশানি আধুনিক গান—“কালো মেঘে ডমরু” ও
“ওগো শকুন্তলা” গেয়েছেন ঋতুমান শিল্পী সুরীর সেন।

N 82823—কুমারী পূর্বী দত্তের সুরেলা কণ্ঠের সুরের হুঁশানি
আধুনিক গান—“জাহ্নবী মনোর মালকে” ও “হারিয়ে গেল জীবন।”

N 82824—শ্রালক মামুদের গাওয়া মধুর হুঁশানি গান—
“তুমি সুরের যদি নাহি হও” ও “যেথা বাসে সেখানে।”

N 82825—নবাবগতা মঞ্জুরা সেনগুপ্তের মধুর কণ্ঠের
আধুনিক গান—“স্বর্ঘস্থলী সোনারুখী” এবং “খেল যদি সারা হলো।”

N 76083 to N 76085—রেকর্ডগুলিতে “দেউশো খোকার
কাণ্ড” বাণীচন্দ্রের গানগুলি পরিবেশিত হয়েছে।

কলহিয়া

GE 24943—শ্রীমতী গীতা দত্তের (বার) কণ্ঠে আধুনিক
গান—“খানিতে চেয়েছ তুমি” ও “মাটির ভুবনে যদি।”

GE 24944—“তুমি মধুর অঙ্গে” এবং “ওগো আমার নবীন
সাবী”—গান হুঁশানি অকুলপ্রসাদী, সুরেলা কণ্ঠে পরিবেশন করেছেন
শ্রীমতী নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায়।

GE 24945—গীতালী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া হুঁশানি
মধুর আধুনিক গান—“লুম নামে পথের ছায়ায়” ও “হাতে কোন
কাজ নাই।”

GE 30420 এবং GE 30421—রেকর্ড দুটিতে “জল জঙ্গল”
বাণীচন্দ্রের গানগুলি পরিবেশন করেছেন—হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও
গীতালী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়।

আমার কথা (৫৩)

শ্রীকালীনাথ চট্টোপাধ্যায়

কোন কোন শিল্পী সঙ্গীতকে নিয়েছেন জীবনব্যাপী সাধনার
মাধ্যমে—তাঁর জন্ত তাঁরা দৃকপাত করেন না অভাব, অন্তরবিধা
অর্ধাঙ্গ ইত্যাদির প্রতি। এইরূপ একাগ্রতাই তাঁদের উপস্থাপিত
করে জনসমক্ষে পূর্ণরূপে আর শ্রোতার তাঁদের গ্রহণ করেন
প্রতিভাবান শিল্পী হিসাবে। শ্রীকালীনাথ চট্টোপাধ্যায়কে আমি
তাঁদেরই একজন বলে মনে করি। শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের নিজের
কথার বলি :—

“১৯০৪ সালের ১লা সেপ্টেম্বর কলিকাতার আমার বাড়ীতে জন্মগ্রহণ করি। বাবা কানাইলাল চট্টোপাধ্যায় শেরার মার্কেটে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। আমাদের পরিবারে গানের চর্চা বরাবর ছিল। ছেলেবেলা থেকে আমিও গানের দিকে খুঁকে পড়ি। সেইজন্ম মেজকাকা এ্যাডভোকেট শ্রীপালালাল চট্টোপাধ্যায় আমার কেবল উৎসাহ নিয়ে ক্ষান্ত হন নি—আমার মায়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে চুপিচুপি আমার গান শেখাতেন।

বাংলাকপুর মহকুমার আলমবাজারে আমাদের নিজবাড়ী। সে বাড়ীতে বরাবর গানের আসর বসত। বরাহনগরের বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীঅমূল্যধন দত্তকে প্রথম আমার শিক্ষাগুরু হিসাবে পাই।

সেকেণ্ড ক্লাসে উঠিয়া আমি বিপণ কলেজিয়েট স্কুল থেকে বরাহনগর ভিক্টোরিয়া বিদ্যালয়ে ভর্তি হই ও সেখান থেকে ১৯১৯ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই। তারপর কিছুকাল নানারকম কাজকর্ম করি। কিন্তু গান শেখার আগ্রহে পড়াশুনা বা কাজকর্মে ঠিকমত মনযোগ দিতে পারি নাই। ইতিমধ্যে একদিন প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী শ্রীরাইচাঁদ বড়ালের গৃহে গানের আসরে আসফাক হোসেন ও তাঁহার ছই মামা মুস্তাক হোসেন খাঁ ও স্বর্গত আসফ হোসেন খাঁর গান শুনিয়া মুগ্ধ হই। ইহার কিছুদিন পর আসফাক হোসেন সাহেবের ছাত্র হিসাবে শিক্ষা গ্রহণ করিতে থাকি। আর দুইজনের নিকট বহুদিন শিখিবার সুযোগ পাই। শ্রী বড়ালের উৎসাহ ও সাহায্য আমার সঙ্গীত সাধনার অত্যন্ত সাহায্য। মধ্যে কিছুকাল সেনী স্বরায়নার ওস্তাদ দবীর খাঁর কাছে ক্রমশঃ ও ধামার শিক্ষা করি।

এইসঙ্গে আর একজনের কথা আমার মনে পড়ে। তিনি হলেন স্বনামধন্য চন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়। তাঁহার স্নেহভঙ্গে আমি নিজেকে কৃতার্থ মনে করি। তাঁহার সুযোগ্য পুত্র সদালাপী, বন্ধুবৎসল শ্রীহীক গাঙ্গুলী ও আমি একত্রে কতদিন সঙ্গীত-সাধনা করেছি মন্থন বাবুর গৃহে। হীক বাবুর আর এমন উচ্চমনা শিল্পীকে বন্ধুরূপে পাওয়া খুবই আনন্দের কথা।

নিখিলবঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনের ১৯৩৭ সালের অধিবেশনে আমি প্রথম শিল্পী হিসাবে যোগ দিই। তাহাতে আমার গাওয়া উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত শ্রোতাদের মনে বিশেষ রেখাপাত করে। এ ছাড়া



শ্রীচন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

বাংলা ও বর্হিবাংলার বহু সঙ্গীতসরে আমি অংশ গ্রহণ করেছি। ১৯২৯ সালের ৫ই এপ্রিল প্রথম আমি কলিকাতা বেতারকেন্দ্রে গান করি। বিগত কয়েক বৎসর কলিকাতার বহু সঙ্গীত-সম্মেলন অঙ্গীভূত হইতেছে। এগুলি বাঙ্গালী শিল্পীদের একত্রে উপকার ও অপকার করিতেছে। উপকার হয়—কারণ কয়েকজন সত্যকারের প্রবীণ গায়ীর সমাবেশ হয়—বাদের গাওয়া গান থেকে তরুণ শিল্পীর অনেক কিছু শিখতে পারেন—আর অপকার হয়—কারণ এই সব আসরে সমাগত কিছু সংখ্যক অবাঙ্গালী নূতন শিল্পীদের পরিবেশিত গান দোষযুক্ত হয় না।”

পরিচ্ছন্ন অখণ্ড অন্নসজ্জিত শিল্পীর গৃহে ক্রমশঃ উপস্থিত হতে লাগলেন তাঁহার শিক্ষাবীন ছাত্রবৃন্দ আমাদের আলোচনাও শেষ হয়ে এসেছিল তাই বিদায়ান্তে চলে এলাম।

গীতাপাঠ

শ্রীশিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

উৎসীড়িতের উপর রূপায়, তোমার যদি চোখেই আসে জল,
ছাড়োই যদি নিজের দাবী, ভীকর মত থাকতে দেহর বল।
ধন্য তোমার বলবে লোকে, উটোবে না পরের পাতা আর
পড়বে গীতা, পালিয়ে গিয়ে, খুলবে শুধু প্রথম পরব তার।
নিত্য মাছুষ হত্যা করার এখন যদি পেবাই তোমার হয়,
সাখ্য যোগই দেখবে পড়ে “আত্মা অমর মবার পরেও রয়”।

সিঁদ কাটো বা পকেট মারো, কণ্ঠ সইই কণ্ঠযোগেই পাবে,
“সত্যাব তাহার কণ্ঠ করায়” বেকুব নিজে কর্তা বলে তারে।
ধর্ম মানো নাই মানো আর সভায় যদি তাগ লাগাতে চাও
গীতার থেকে হুঁ-চাব শ্লোক নিজের মতে বাখ্যা করে যাও।
বেকার হয়ে ছাড়তে হলে, অপোগণ্ড আত্ম-পরিজন্ম,
রাজার হালে থাকতে মাঠে, থাকার যদি বোকাই প্রয়োজন,

ভক্তিযোগে মুক্তি পাবে, শিষ্যগুণায় পড়িয়ে যাবে সেটি
উইল লিখে তোমার নামে ছুটেবে এসে দেখবে কতো বেটা।

● দেশে-বিদেশে ●

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৬ (মে-জুন, '৫৯)

অন্তর্দেশীয়—

১লা জ্যৈষ্ঠ (১৬ই মে): কলিকাতার ইউএন উদ্যানস্থিত রঞ্জি ট্রেডিয়ামে সাড়ম্বর পশ্চিমবঙ্গ যুব উন্নয়নের নয় দিবসব্যাপী অধিবেশন শুরু।

২রা জ্যৈষ্ঠ (১৭ই মে): প্রিন্সেস জাহাজ ঘাটের (কলিকাতা) নিকট ডক-শ্রমিকের উপর পুলিশের গুলিচালনা—১ জন নিহত ও ২৫ জন আহত।

৩রা জ্যৈষ্ঠ (১৮ই মে): পুলিশ-জনতা সংঘর্ষের ফলে হাওড়া-ব্যাণ্ডেল ও তারকেশ্বর লাইনের সমস্ত ট্রেন তিন ঘণ্টাকাল আটক।

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ (১৯শে মে): শিক্ষা আইন ব্যর্থ করার জন্য দুস বন্ধ রাখা হইলে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বনে করা হইবে বলিয়া কেরল সরকারের সতর্কবাণী।

৫ই জ্যৈষ্ঠ (২০শে মে): কাটিহারের নিকট ট্রেন (নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেস) দুর্ঘটনায় ১ জন নিহত ও ৩০ জন আহত।

৬ই জ্যৈষ্ঠ (২১শে মে): কলিকাতা ও সহরতলীতে অভ্যাসীয় বড় ও শিলাগুটির ফলে ৮ জন নিহত ও শতাব্দিক আহত।

৭ই জ্যৈষ্ঠ (২২শে মে): ডাঃ হরেকৃষ্ণ মহতাবের নেতৃত্বে উদ্ভিয়ার তিনজন সমস্ত সমন্বিত কোয়ালিশন (কংগ্রেস-সমতন্ত্র পরিষদ) মন্ত্রিসভার শপথগ্রহণ।

মুসৌরিতে তিস্তা রাষ্ট্রগুরু দালাইলামা কর্তৃক ২৫০০তম বুদ্ধজয়ন্তী উৎসবের উদ্বোধন।

৮ই জ্যৈষ্ঠ (২৩শে মে): বিভূষণ স্কয়ারে (কলিকাতা) পশ্চিম বঙ্গ প্রদেশ রাজনৈতিক (কংগ্রেস) সম্মেলনের তিনদিবস ব্যাপী অধিবেশন শুরু। উদ্বোধন—কংগ্রেস সভানেত্রী জীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও সভানেত্রী—জীমতী সুচেতা কুপালনী।

৯ই জ্যৈষ্ঠ (২৪শে মে): পশ্চিম বঙ্গ কংগ্রেস রাজনৈতিক সম্মেলনে দুই দলের মধ্যে প্রবল সংঘর্ষ—১৫ জন আহত।

রাউরকেলা ইম্পাত কারখানার ধর্মঘটী শ্রমিকদের উপর পুলিশের লাঠিচার্জ ও কাঁচুন গ্যাস প্রয়োগ।

১০ই জ্যৈষ্ঠ (২৫শে মে): মহাজাতি সদনে কলিকাতার মেয়র জীবনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌরোহিত্যে বিপ্রবী মহানায়ক রাসবিহারী বসুর ৭৪ তম জন্মতিথি উদ্‌যাপিত।

১১ই জ্যৈষ্ঠ (২৬শে মে): কলিকাতা পৌরসভার একটি প্রস্তাবের উপর ভোটগণনার সময় কংগ্রেসী কাউন্সিলরদের অকস্মাৎ সতর্কতা প্রাপ্ত।

বিরোধী কবি কাজী নজরুলের ৬১তম জন্মদিবস স্মৃতিভাবে পালন।

১২ই জ্যৈষ্ঠ (২৭শে মে): ভারতীয় রেলওয়েসমূহের চীক ইনস্পেক্টারের রিপোর্ট—১৯৫৭-৫৮ সালে ভারতে রেল দুর্ঘটনায় ৮০ জন নিহত ও ৫৬১ জন আহত।

১৩ই জ্যৈষ্ঠ (২৮শে মে): প্রথম ভারতীয় নৌবাহিনী অভিযাত্রী দলের সাক্ষ্যের সহিত নন্দাঘাট শৃঙ্গের শীর্ষে (২২৫০০ ফুট) আরোহণ।

১৪ই জ্যৈষ্ঠ (২৯শে মে): বার্তাজীবী সাংবাদিকদের বেতনের হার সম্পর্কে বেতন কমিটির সুপারিশ (ভারত সরকারের অনুমোদিত) প্রকাশ।

১৫ই জ্যৈষ্ঠ (৩০শে মে): রাউরকেলা ইম্পাত কারখানার শ্রমিক ধর্মঘট প্রত্যাহত।

১৬ই জ্যৈষ্ঠ (৩১শে মে): জীবনবীমা কর্পোরেশন-দুলা লেনদেন ব্যাপারে ভিভিআন বসু ও দত্ত বোর্ডের রিপোর্ট প্রকাশ।

১৭ই জ্যৈষ্ঠ (১লা জুন): ভারত ইন্ডিয়ানদের অর্থ সম্পর্কে বড়বস্ত্র ও বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগে রামকৃষ্ণ ডালমিয়া দুই বৎসর বিনাপ্রশ্রয় কারাদণ্ডে দণ্ডিত—দিল্লীর অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজের দায়।

দিল্লী কর্পোরেশনের মেয়র জীমতী জরুয়া কাসক আলির পদত্যাগ।

১৮ই জ্যৈষ্ঠ (২রা জুন): রাইটার্স' বিল্ডিং-এ পশ্চিম-বঙ্গ খাত-উপদেষ্টা কমিটির বৈঠকে তুমুল উত্তেজনা—চাঁউলের মূল্যনিয়ন্ত্রণে সরকারী চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া খাতসচিব জীপ্রফুল সেনের স্বীকৃতি।

১৯শে জ্যৈষ্ঠ (৩রা জুন): প্রয়োজনীয় বাঁধ নির্মাণ সাপেক্ষে পশ্চিম-বঙ্গ সরকার কর্তৃক ফরাফার নিকট গঙ্গা-ভাগীরথী মোহনায় দীর্ঘ খাল খননের প্রস্তাব।

শ্রী সি. রাজাগোপালাচারীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় কংগ্রেসী শাসক দলের বিরুদ্ধে জাতীয় বিরোধী দল ('স্বতন্ত্র দল') গঠনের সিদ্ধান্ত।

২০শে জ্যৈষ্ঠ (৪ঠা জুন): রাজ্যের সফটওয়্যার খাত পরিস্থিতি সম্পর্কে দার্জিলিং-এ পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভার দীর্ঘ আলোচনা।

২১শে জ্যৈষ্ঠ (৫ই জুন): কেরলে কম্যুনিষ্ট শাসনের উচ্ছেদকল্পে কেরল কংগ্রেস কর্তৃক প্রথম পর্যায়ে ১২ই জুন 'মুক্তি দিবস' পালনের আহ্বান।

কলিকাতা পৌরসভায় কলিকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের ভয়াবহ খাত সফট সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ।

২২শে জ্যৈষ্ঠ (৬ই জুন): করিমগঞ্জে শ্রী এন. সি. চ্যাটার্জীর সভাপতিত্বে ভারত-পূর্ব পাকিস্তান সমস্তা সম্মেলনের দুই দিবসব্যাপী অধিবেশন শুরু।

২৩শে জ্যৈষ্ঠ (৭ই জুন): পশ্চিমবঙ্গে সেবা সমবায় ও বোঁধ ধামার পরিকল্পনার রূপায়ণের জন্য আবশ্যিক আইন প্রণয়ন বিষয়ে সঞ্জিষ্ট সচিব ও অফিসারদের সহিত দার্জিলিং-এ মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের বৈঠক।

২৪শে জ্যৈষ্ঠ (৮ই জুন): কেরলে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে জমি বন্টনের ব্যবস্থাকল্পে বিধান সভায় আইন-বিধি গৃহীত।

২৫শে জ্যৈষ্ঠ (৯ই জুন): ভারত পাকিস্তান খালের জল বিরোধ মীমাংসা চেষ্টার বিষয়াক্ত কর্তৃক বিশাখা নদীর জলাধার নির্মাণের নতুন প্রস্তাব।

২৬শে জ্যৈষ্ঠ (১০ই জুন): জম্মুর স্পেশাল জেলে জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শেখ আব্দুল্লাহ সহিত কাশ্মীরে সফররত ছদ্মন নেতা আচার্য্য বিনোবা ভাবের সাক্ষাৎকার।

২৭শে জ্যৈষ্ঠ (১১ই জুন): গুজরাতের বিরোধিতা চুক্তি ভঙ্গ করিয়া কবিমগজ সীমান্তবর্তী হরতকিটিলার পাকসৈন্যদের পুনরায় গুজরাতবর্ষ।

২৮শে জ্যৈষ্ঠ (১২ই জুন): কংগ্রেস সভ্য কেরলের বিরোধী দলগুলির সংগ্রাম কমিটির উত্তোগে রাজ্যের (কেরল) বিভিন্ন স্থানে আংশিক হরতাল।

পশ্চিমবঙ্গের শোচনীয় খাজ পরিহিত সিল্পকর্মে রাইটাস' বিভিন্ন-এ কেন্দ্রীয় খাজ দপ্তরের সেক্রেটারী জীবি, বি, যোবের সহিত মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও খাজসচিব জীর্জফ্রনচন্দ্র সেনের তত্ত্বাবধায় বৈঠক।

২৯শে জ্যৈষ্ঠ (১৩ই জুন): কেরলের এর্নাকুলাম জেলার বিক্ষুব্ধ জনতার উপর পুলিশের গুলীবর্ষণ।

৩০শে জ্যৈষ্ঠ (১৪ই জুন): কসিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ:—আই, এ পরীক্ষায় ৩৮.৩ ও আই, এস-সিতে ৫০.১ জন উত্তীর্ণ।

৩১শে জ্যৈষ্ঠ (১৫ই জুন): জিব্রাল্টার (কেরল) জেলার দুইটি স্থানে পুনরায় পুলিশের গুলীবর্ষণ—নিরাপত্তা ব্যবস্থা হিসাবে রাজ্য সরকার কর্তৃক সৈন্য আহ্বান।

মূল্যবোধ ও তৃত্তিক প্রতিরোধ কমিটির আহ্বানে সরকারী অগণতান্ত্রিক খাজনীতির প্রতিবাদে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ ব্যাপী 'প্রতিবাদ দিবস' উদ্‌যাপিত।

বহির্দেশীয়—

১লা জ্যৈষ্ঠ (১৬ই মে): খালের জেলের বিরোধ প্রসঙ্গে করাচিতে পাক প্রেসিডেন্ট জেনারেল আনবার খানের সহিত বিশ্বব্যাপক প্রেসিডেন্ট মি: ইউজেন ব্র্যাকের বৈঠক।

২রা জ্যৈষ্ঠ (১৭ই মে): আণবিক পরীক্ষা বন্ধের প্রসঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার ও ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী মি: হারল্ড মাকমিলানের নিকট রূপ প্রধান মন্ত্রী ম: নিকিতা ক্রুশ্চেভের নতুন প্রস্তাব পেশ।

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ (১৯শে মে): বঙ্গ-বাইল্যাও-লাওস সীমান্তে পুনরায় চিয়াং বাহিনীর হামলা ও বর্মী বাহিনীর সহিত সংগ্রাম।

৭ই জ্যৈষ্ঠ (২২শে মে): তিব্বতে বিদ্রোহ চালনার জন্য বিশেষ (সাম্রাজ্যবাদী) হাইতে সাহায্য সংগ্রহ সম্পর্কে ভূতপূর্ব তিব্বত সরকারের বিরুদ্ধে চীনের অভিযোগ।

১৫ই জ্যৈষ্ঠ (২৪শে মে): ভূতপূর্ব মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব মি: জন ফষ্টার ডালেসের মৃত্যু।

১০ই জ্যৈষ্ঠ (২৫শে মে): সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রী ম: নিকিতা ক্রুশ্চেভের ১২ দিনের জঙ্গ আলবেনিয়া সফরে যাত্রা।

মি: ডালেসের মৃত্যুর দক্ষণ জেনেভা চতুঃশক্তি পররাষ্ট্র সচিব সম্মেলন (ভার্মাণ প্রসঙ্গে) দুই দিনের জঙ্গ স্থগিত।

১১ই জ্যৈষ্ঠ (২৭শে মে): জী বি, পি, কৈরালার নেতৃত্বে নেপালের সর্বপ্রথম নির্বাচিত সরকারের শপথ গ্রহণ।

১৩ই জ্যৈষ্ঠ (২৮শে মে): 'জুপিটার' নামক মার্কিন কেপশাঙ্গে মহাশূন্য পর্যটনোক্ত দুইটি বানরীর জীবন্ত প্রত্যাবর্তন।

পূর্ব পাকিস্তান গভর্ণরের অর্ডিন্যান্সে ছয় মাসের জঙ্গ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কোর্টের সভা বন্ধ।

১৪ই জ্যৈষ্ঠ (২৯শে মে): মস্কো-এ ভারত-সোভিয়েট নতুন অর্থনৈতিক চুক্তি স্বাক্ষরিত।

১৬ই জ্যৈষ্ঠ (৩১শে মে): রাষ্ট্রদূতের প্রকাশিত বিবরণ—বর্তমানে পৃথিবীর জন সংখ্যা ২৪০ কোটি—তন্মধ্যে চীন ৬৪ কোটি এবং ইহার পরই ভারত ৪০ কোটি।

১৭ই জ্যৈষ্ঠ (১লা জুন): নিরাপত্তার নামে সুরানে দুই জন মন্ত্রীসহ ১৮ জন অফিসার গ্রেপ্তার।

১৮ই জ্যৈষ্ঠ (২রা জুন): অযোগ্যতার জঙ্গ পূর্ব পাক সরকার কর্তৃক ৭ জন অফিসারকে শাস্তিদান।

১৯শে জ্যৈষ্ঠ (৩রা জুন): কমনওয়েলথভুক্ত একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে সিঙ্গাপুরের অভ্যুদয়—বামমুখী পিপলস একশন পার্টি কর্তৃক নতুন সরকার গঠন।

২০শে জ্যৈষ্ঠ (৪ঠা জুন): লাওস পরিহিত প্রসঙ্গে জেনেভার ব্রিটিশ পররাষ্ট্র সচিব মি: সেলুইন লয়েড ও রূপ পররাষ্ট্র সচিব ম: জাঁজ রোমিকোর বৈঠক।

২১শে জ্যৈষ্ঠ (৫ই জুন): তিব্বতীদের মৌলিক মানবিক অধিকারে চীনা হস্তক্ষেপ হইয়াছে বলিয়া আন্তর্জাতিক আইনবিদ কমিশনের রিপোর্টে মন্তব্য।

২২শে জ্যৈষ্ঠ (৬ই জুন): ব্রিটিশ অভিযাত্রী দলের আমাদেবলায় শূন্য (২২,৩০০ ফুট) ভয়ের চেঁচা বার্ষ—দুইজন সদস্যের মৃত্যু।

২৬শে জ্যৈষ্ঠ (১০ই জুন): তিন দিবসব্যাপী নেপাল সফর উদ্দেশ্যে প্রধান মন্ত্রী জীনেহকর কাটমাণ্ডু উপস্থিত।

২৯শে জ্যৈষ্ঠ (১৩ই জুন): তিব্বত ও অন্তর্গত আন্তর্জাতিক পরিহিত সম্পর্কে কাটমাণ্ডু-এ প্রধান মন্ত্রী জী বি, পি, কৈরালার সহিত প্রধান মন্ত্রী জীনেহকর (ভারত) আলোচনা।

৩১শে জ্যৈষ্ঠ (১৫ই জুন): ইয়েমেনী সৈন্যবাহিনী কর্তৃক ইয়েমেনের প্রধান বন্দর হোদিদা ও অন্ততম বৃহত্তম সহর তায়াজ দখলের সংবাদ।

... এ মাসের প্রচুদপট ...

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে কাশ্মীরের একটি আলোকচিত্র মুদ্রিত হইয়াছে। চিত্রটি গ্রহণ করিয়াছেন জীবিতাস মিত্র।

স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড

বনাম

কলকাতা পুলিশ

ডঃ পঞ্চানন ঘোষাল

যে সকল মামলা সম্বন্ধে এই কাহিনীগুলিতে বলা হয়েছে উহার

সব কয়টিরই তদন্ত-কার্য কলিকাতার আরক্ষা পুস্তকসমূহের দ্বারা সমাধা হয়েছিল। তুলনামূলক ভাবে বিচার করলে দেখা বাবে যে কয়েকটি বিষয়ে কলিকাতা পুলিশ বহুকথিত ইংল্যান্ডের স্কটল্যান্ড-ইয়ার্ড অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। কারণ, যে সকল তদন্ত-কার্য যুরোপীয় “বিশিষ্ট” অত্যাধুনিক বৈজ্ঞানিক উপকরণের সাহায্য করে থাকেন সেইরূপ তদন্ত-কার্যই ভারতীয় পুলিশকে করে বেতে হয়েছে এই সকল আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্য ব্যতিরেকেই। বস্তুতপক্ষে বেতার-যন্ত্র প্রভৃতি বিবিধ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এই দেশের স্বাধীনতার পরই মাত্র প্রকৃতপক্ষে গৃহীত হয়েছে। উপরন্তু লণ্ডন পুলিশ জনসাধারণের নিকট যে সহযোগিতা বহুকাল পূর্বে হতেই পেয়ে এসেছে, সেইরূপ স্বয়ংক্রিয় সহযোগিতা ভারতীয় পুলিশ বহু দিন পায় নি। এঁহাড়া কলিকাতা পুলিশের অপর আর এক অসুবিধাও আছে। কারণ তাদের অনেককেই এই শহরে মজ্বল হয়ে ও লেখাপড়া শিখে এই শহরের পুলিশেই ভর্তি হতে হয়েছে। শহরে অগণিত পরিচিত ব্যক্তিদের মধ্যে কাজ করার সুবিধার ভ্রাতৃ অসুবিধাও অনেক থাকে। এই কারণে তাদের সুক্লৃষ্ণ: লভ ও ডিউটির মধ্যে বেছে নিতে হয়েছে ডিউটিকে। এ-ছাড়া এদের পুরাতন ট্রেনিং স্কুলগুলিতে পুলিশ আইন-কানুন, ড্রিল, প্যারেড ও ডিসিপ্লিন শেখানো হলেও পুলিশ তদন্ত রীতি কোনও দিনই শিখানো হয়নি। এই তদন্ত-কার্য তাদের শিখে নিতে হয়েছে ট্রেনিং স্কুলের বাহিরে এসে তৎকালীন সূক্ষ্ম দেশীয় অফিসারদের নিকট হতে। এই সকল পুরাতন অফিসারগণ গুরু পরম্পরায় যে জ্ঞান অর্জন করতেন, সেই জ্ঞান আবার তাঁরা দিয়ে যেতেন এই বিভাগের নবাগত অফিসারদের। এই জ্ঞান কর্তৃপক্ষের অগোচরে যুগ যুগ ধরে চলে এসেছে, কিন্তু উহার সবটুকু বহুদিন পর্যন্ত লিপিবদ্ধ করা হয়নি। এখানকার এই সকল শিক্ষাগুরুদের নবাগতদের শিক্ষিত করে তুলতেও বেশ কিছু বেগ পেতে হতো। কারণ ইহাদের অধিকাংশই ছিল অশিক্ষিত সহরের যুবক। বহু প্রকার চিন্তা-প্রস্তুতির কারণে এই সকল আত্মাভিমানী যুবক আপন আপন ধারণা জম্বারী কাজ করতে চেয়েছে। এই জন্য তাদের এই সব বহুযল ধারণা বদলে তাদের মধ্যে নূতন দৃষ্টিভঙ্গি আনতে তাদের ঐরূপ শিক্ষা দিতে গুরুদের বহু সময় অভিবাহিত করতে হয়েছে।

—কিন্তু এতো অসুবিধার মধ্যেও কলিকাতা পুলিশ বেক্রম কৃতিত্ব দেখাতে পেরেছে তা বিলাতী স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড পুলিশের কৃতিত্বের তুলনায় কমতো নয়ই বরং উহাদের অভুলনীয়ই বলা যেতে পারে, ব্রিটিশ সরকার ব্রিটিশ পুলিশের পিছনে বেক্রম খরচ-খরচা করেছেন, তাঁরা সেইরূপ খরচ-খরচা তাঁদের ভারতীয় পুলিশের জন্য কোনও দিনই করেন নি। এই সকল খরচ বেননভোগী ভারতীয় তদন্তকারী অফিসারদেরই বরং তদন্ত-কার্যে সাফল্যের জন্য এবং জনসাধারণের উপকারার্থে নিজদের পকেট হতেই পরমা খরচ করে বলাভাতা দেখাতে হয়েছে।

ভারতীয় কৃষ্টি জম্বারী এই সকল পুরাতন অফিসারগণ তাঁদের সহকারীদের তাঁদেরই মত তদন্তকার্যে শিক্ষিত করে তোলা তাঁদের গুরু কর্তব্য নয় বরং মনে করতেন। এই জন্য প্রতিটি তদন্তকার্যে এঁরা নবাগতদের তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে রাখতেন। এই নবাগতরা গুরু দেখে যেতো তাঁরা কেমন করে কি করছেন এবং কি-ই বা তাঁরা করছেন না। বহুক্ষেত্রে তাঁরা নবাগতদের জিজ্ঞাসা করেছেন, ‘বলতো এইবার কি করতে হবে?’ নবাগতগণ এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া মাত্র তৎক্ষণাৎ তাঁরা বলে দিতেন, এইরূপ করলে এই এই জম্বাবিধা আছে।

নচেৎ এই এই সুবিধা হয়—ব্যবলে? এই ভাবে কলিকাতা পুলিশ তাদের বা কিছু শিক্ষা দীক্ষা তা পুঁথিগত ভাবে পায় নি, সূক্ষ্ম ও অভিজ্ঞদের কাছেই তাঁরা এই তদন্ত-কার্য শিখেছে হাতে কলমে।

এখন জিজ্ঞাস্য হতে পারে জম্বনাতম বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্য না নিয়ে কলিকাতা পুলিশ এত বেশী দক্ষতা দেখাতে পারে কি করে? এর একমাত্র উত্তর হচ্ছে যে, কলিকাতা পুলিশ যন্ত্রপাতির উৎকর্ষতার উপর নির্ভর না করে তাঁরা নির্ভর করেছেন উহাদের ব্যবহার চাতুর্যের উপর। স্বল্প লাইন দ্বারা যে ব্যক্তি অধিক এক্ষেপ্ত প্রকাশ করতে সক্ষম সেই প্রকৃত আর্টিষ্ট। তাই যন্ত্রপাতি ব্যবহার করলেও নিজদের তৈরী অতি সাধারণ (Simple) যন্ত্রপাতিই তাঁরা তদন্ত কার্যে ব্যবহার করেছেন। তবে যন্ত্রপাতির উপর নির্ভরশীল না হয়ে তাঁরা নির্ভর করেছেন, নিজদের প্রত্যাপন্নমতিত্ব পূর্ণ-অভিজ্ঞতা এবং স্বয়ংলব্ধ সমাজ-বিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব ও মনোবিজ্ঞানের জ্ঞানের উপর। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিয়ে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যকালে জর্নৈক আমেরিকান জেনারেল বহুগুণ সহ কলিকাতায় এসে কালীঘাটের মন্দির পরিদর্শনে যান। মন্দির কর্তৃপক্ষ অবশ্য জুতা খুলে তাঁদের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করা বন্ধ কোনও আপত্তি করেন নি। তাঁরা বেঠানীর ছায়ায় নিকট জুতা খুলে রেখে প্রাঙ্গণের চতুর্দিক পর্যবেক্ষণ করে ফিরে এসে দেখলেন যে, জেনারেল সাহেবের মূল্যবান ‘অ’ জোড়টি অপহৃত হয়েছে। মনঃস্কুর ভাবে জেনারেল সাহেব কলিকাতা পুলিশের যুরোপীয় কমিশনারের নিকট জুতা চুরি সম্বন্ধে অভিযোগ জানানো মাত্র পুলিশ বিভাগে তোলপাড় শুরু হয়ে গেল এবং তিনি অভিমত প্রকাশ করলেন যে, ঘরিত গতিতে ঐ জুতা উদ্ধার করে দিতে না পারলে বিদেশীয়দের নিকট কলিকাতা পুলিশের মান ইজ্জতের সমম্বিক হানি হবার সম্ভাবনা। এই তদন্ত-কার্যে বিশেষ করে আমারই ডাক পড়েছিল। আমাকে কমিশনার সাহেবের নিকট নিয়ে যাওয়া হলে, তিনি বললেন, ‘লণ্ডন পুলিশ এই জুতা তিন ঘণ্টার মধ্যে উদ্ধার করতে পারত, তুমি কতক্ষণে উহা উদ্ধার করতে পারবে?’ উত্তরে আমি তাঁকে জানালাম, ‘ভার, ঐ জুতা পূর্বে দিন বেলা তিনটা আশাঙ্ক সময় অশান্ত হয়েছে। তাই তিন ঘণ্টার উহাদের খুঁজে বার করা সম্ভব নয়, কারণ ইতিমধ্যেই বহু দেবী হয়ে গিয়েছে। আমি অন্ততঃপক্ষে ছয় সাত বা নয় ঘণ্টা সময় চাই।’ কমিশনার সাহেবের মনে কি ছিল জানি না, তিনি আমার উত্তরে বরং খুশী হয়েই বলে উঠলেন, ‘বেশ বেশ সে তো ভালই। এখন সকাল দশটা—আচ্ছা, তাহলে সন্ধ্যার পূর্বেই একটা সুখবর পাব আশা করি।’

এর পর লালবাজার হতে সোজা আমি ডুবানীপুর ধানায় চলে এলাম। সেখানে এসে দেখলাম ভারপ্রাপ্ত অফিসার ঐ জুতা-চুরি সম্পর্কে বিশেষ চিন্তিত, কারণ তাঁরই এলাকাধীন স্থানে এই

অপকারীটি সাবিত হয়েচে। আমি তাঁকে সাহায্য দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ঠিক ক'টার সময় এই চুরিটে হয়েছে বলে আপনি মনে করেন?' উত্তরে হতাশ হয়ে তিনি জানানলেন, 'ঠিক দুইটার সময়। তিনটার আমেরিকান মিলিটারী পুলিশ এসে কেস লিখিয়েছে।' 'হঁ' তাহলে ঠিক হয়েছে,'—আমি উত্তর করলাম, 'আপনি এক কাজ করুন এক্ষুণি। জন দশবারো জমানার ও পুরানো অভিজ্ঞ সিপাহী এক্ষুণি পাঠিয়ে দিন। তারা একটা হাতে তিনটা পর্য্যন্ত অর্থাৎ যে সময়ে চুরি হয়েছে ঐ সময়ে মন্দির ও উহার চতুর্দিকে ঘুরাফিরা করে যে কোন ব্যক্তিকে ভাগাবণ্ড বা জুতা-চোররূপে সন্দেহ হবে, তাদের সব ক'জনকেই ছাঁকা ভাল মাছ ভুলার ভায় ধরে ধরে খানায় নিয়ে আসুক।' অফিসার-ইন্-চার্জ ডব্রলোকের নানা কারণে আমার উপর আস্থা ছিল। তাছাড়া গোয়েন্দা বিভাগের ব্যক্তি বিধায় আমাকে সাহায্য করা ছিল তাঁর এক অন্ততম কর্তব্য। তিনি সানন্দে বাছা বাছা দশ বারো জন জমানার সিপাহীকে অল্পরূপ আদেশ সহ ঐ সময়ের মধ্যে মন্দিরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এর পর আমি খাওয়া দাওয়া শেষ করে নিশ্চিন্ত মনে ও স্থির মস্তিষ্কে একটি পুঁটুলী হাতে নিয়ে খানায় এসে দেখি, প্রায় ত্রিশ জন অল্পরূপ ব্যক্তিকে ধরে এনে খানার একটা পৃথক কামরায় জমা করা হয়েছে। আমি ঐ নির্দিষ্ট কামরায় এসে কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ ও জিজ্ঞাসাবাদ করে ওদের মধ্য হতে মাত্র এগারো জন ব্যক্তিকে বেছে নিয়ে বাকি সকলকে মুক্তি দিতে বলে খানার অফিসার-ইন্-চার্জের ভক্তা নির্দিষ্ট হবে এসে বসলাম। এই ঘরে আমার সঙ্গে করে আনা পুঁটুলীটি ইতিপূর্বেই আমি রেখে গিয়েছিলাম। সকলে বিস্মিত হয়ে দেখল, আমি পুঁটুলী খুলে ভাল ভাল আনকোরা নুহন মরক্কো ও অস্ত্রাস্ত্র তেদারের দশ বারো পাটি জুতা বার করে ঘরের একপাশে দেওয়ালের ধারে জড়ো করে রাখছি। সকলে জিজ্ঞাসনন্দে আমার দিকে তাকালে, আমি তাদের কথা বলতে বাধন করে পাশের ঘর থেকে আমার বাছাই করা এগারো জন ব্যক্তিকে এই ঘরটিতে এনে দেওয়ালের এমন এক ধারে সারিবন্দী ভাবে তাদের দাঁড় করাতে বললাম, যেখান হতে উল্টো দিকে রাখা জুতা কয়টি সহজেই তাদের নজরে পড়তে পারে। এইভাবে ঐ এগার জন সন্দেহমান ব্যক্তিকে দেওয়ালের পাশে সারিবন্দী ভাবে দাঁড় করানো হল, আমি বহুক্ষণ জুতা করে একটি কাগজ দেখতে লাগলাম, কিন্তু মধ্যে মধ্যে আমি তাদের হাবভাব যে লক্ষ্য না করছিলাম তাও নয়। এর পর আমি মুখ তুলে অন্তমনস্ক ভাবে অথচ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সন্দেহমান প্রত্যেকটি ব্যক্তির মুখের দিকে চেয়ে দেখতে থাকি। হঠাৎ আমার লক্ষ্য পড়ল এদের এক ব্যক্তির মুখ-চোখের দিকে। লোকটি ঘন ঘন প্রসূক দৃষ্টিতে ঐ নুহন জুতা জোড়া কয়টির দিকে বারবার চেয়ে দেখছিল। ঐ স্থানে অতগুলি জুতা দেখে খাত-প্রাপ্তির সম্ভাবনা, যেমন বৃহস্পতি মাহুবকে উত্তলা করে ঠিক তেমনি করে ঐ জুতা-সন্ধানীকে উত্তলা করে তুলেছে। কারণ, জুতা-চুরি করে (অভ্যাস জনিত) তার স্রেনের 'সেট-আপ' আপনিই এমন হয়ে গেছে যে, সহজেই তার মাহুবের পায়ের দিকেই আগে নজর পড়ে। এই অবস্থার তার চক্ষু চক্কে হয়ে উঠবে এবং মুখে নাল পড়বে তাতে আর আশ্চর্য্যেরই বা কি আছে। আমি

বীরভাবে উহার অপরাধের সঙ্গীদে মুখাবয়বের সহিত উহার মুখ চোখের তুলনা করে দুইলাম যে, আমি কোনও তুল সিদ্ধান্তে আসি নি। আমি তৎক্ষণাৎ ঐ ব্যক্তিকে রেখে বাকি সকলকে বললাম, 'বাও তোমরা। বা কিছু দোষ এই লোকটির; তোমরা কোনও অপরাধ করো নি।' ঐ সকল ব্যক্তিদের বিদায় দিয়ে দরজা বন্ধ করে আমি নিভুতে সেই জুতা-চোরটিকে বললাম, 'বাপু জুতা-চোর! দেখচো তো এতগুলো লোকের মধ্য হতে আমি তোমাকেই কেমন চিনে নিলাম। এতেই বুঝতে পারছো যে, আগে থেকে আমাদের এ ধর ভান! ছিল যে, তুমি ঐ দিন ঐ কৌজী সাহেবের জুতা দু'টো মন্দির হতে চুরি করেছো, তা না হলে কি অতগুলো লোকের মধ্যে শুধু তোমাকেই বেছে নিতে পারতাম? দেখলে তো শুধু তোমাকেই বেছে নিয়েছি। এখন এতটা বখান জানি এখন এ'ও জানি তুমি কোথায় ও-দু'টো বিক্রয় করে এসেছ। এখন তুমি নিশ্চই যদি দোকানটা দেখিয়ে দাও তা'হলে আর আমাদের ইনফরমারকে কষ্ট করে সেই বেলাগেছে থেকে ডেকে আনতে হয় না। কেন মিছামিছি অজ্ঞাতকর (?) ব্যাপারের সৃষ্টি করবে তার চেয়ে নাও একটা বিড়ি টিড়ি খাও, আর শান্তিষ্টি ছেলের মত সেই দোকানটা দেখিয়ে দেবে চলো।' জুতা-চোর মহাশয় সত্য সত্যই আমাদের এই কাণ্ডকারখানা দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল। তার এ'ও মনে হয়েছিল যে, ঐ চোরাই জুতা কোথায় আছে তা ঐ ইনফরমারের সাহায্যে আমরা ইতিমধ্যেই জেনে নিয়েছি। একটু এদিক ওদিক চেয়ে বিস্ত-বিস্ত করতে করতে জুতা-চোরটি অস্ত্রাধোগ করে জানালো, 'হী হ'জুর সবই বখান আপনারা জেনে গেছেন, তখন আপনাদের আমি আর কষ্ট দেবো না। তবে একটা কথা, এ তল্লাটের সহানার সব আমাকে একজন বড়দরের চোর বলে জানে ও খাতির করে। আমি যে জুতা-চোর তা জানাজানি হলে সকলের কাছে আমার বড় বদনাম হবে। চলুন, তার আমি দু'ব হতে সেই ঐনামানটার দোকানটা দেখিয়ে দেবো। খুব সম্ভবতঃ এর মধ্যে সে ও-দু'টো বিক্রী করতে পারে নি।' আমি উৎফুল্ল হয়ে তৎক্ষণাৎ এক ট্যান্সি ডেকে অপরাধীকে নিয়ে ঐ দোকানের নিকট বাই এবং ঐ দোকান হতে দুইজন স্থানীয় সাকীর সামনে অপহৃত জুতা জোড়াটি উদ্ধার করতে সমর্থ হই। এর পর আমেরিকান জেনারেল সাহেব ঐ জুতা দু'টো আপন জব্ব বলে সনাক্ত করে স্বীকার করেছিলেন যে, চুরির পর এত দীর্ঘ চোরাই জব্ব উদ্ধার করতে হুংরাণী বা ব্রিটিশ পুলিশ কম ক্ষেত্রেই সক্ষম হয়েছেন।

এইখানে সাধারণ মনস্তত্ত্ব বা মনোবিজ্ঞানের জ্ঞানের সহিত আমাদের গুরুপদম্পরায় অর্জিত অভিজ্ঞতাও কাজে লাগতে হয়েছিল। এই সবক্ষে আমাদের পূর্ক-অভিজ্ঞতা ছিল যে, জুতা-চোরগণ একক চোর হয় এবং তারা দলবদ্ধ চোর নয়। ভারতীয় অপরাধী সমাজে ইহা এক অতি ছোট ও নোংরা কাজ বিধায় একে অপরের অজ্ঞাতে এই প্রকার চুরি করে থাকে। এইজন্য একজন জুতা-চোর যেখানে কর্তব্যরত থাকে, সেইখানে অপর এক জুতা-চোর প্রায়ই তিষ্ঠার পর্য্যন্ত না। এদের একজন অপর জনকে এই ছোট কাজে লিপ্ত দেখলে উভয়েই লজ্জিত হয়ে উঠে। এইজন্য এরা পরস্পর পরস্পরের

অগোচরেই চুরে চলে গিয়ে পৃথক কণ্ঠক্ষেত্র বেছে নেয়। এ'ছাড়া বড় বড় চোরদের মনের বে 'গাট' থাকে জুতা-চোরদের তা থাকে না। তারা স্বভাবঃই ভীষণ প্রকৃতির ও সরল স্বভাবের হয়ে থাকে। এইজন্য আমি তদন্তরূপ বাকবিত্তাসাইতার উপর প্রয়োগ করেছিলাম। আমরা এবং বিধ কৃতকার্যতার ইহাও একটি অন্ততম কারণ।"

উপরের দৃষ্টান্ত থেকে দেখা যাচ্ছে কিরূপ সরল ভাবে সামান্য সময়ের মধ্যে কলিকাতা পুলিশ কার্য করতে সক্ষম। কিন্তু এইস্থলে লণ্ডন পুলিশে হলুদুল পড়ে যেতো। তাঁরা প্রথমেই ঘটনাস্থলে এসে এঁটের মধ্যে পদচিহ্ন সংগ্রহের জন্য বার্ষ প্রয়াস করতেন। তারপর তাঁরা বহু ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে কোনও 'হিস না পেলে ছুটে যেতেন মোডাস অপারেণ্ডাই ব্যারোতে বা অপরাধীদের কার্য-পদ্ধতি সম্পর্কীয় রেকর্ড অফিসে। এই কার্য-পদ্ধতি অফিসে বিভিন্ন অপরাধীদের বিভিন্ন কার্য-পদ্ধতি সম্পর্কীয় সহস্র সহস্র কার্ড থাকের বিভিন্ন খোপে বা পিজিয়ন-হোলে রক্ষিত আছে। এইখানে কোন অপরাধী কত লম্বা, কায় চুলের রঙ কিরূপ, কোন ব্যক্তি নেঙা বা খন্ড, ইত্যাদি সংবাদও নথিভুক্ত আছে। সাধারণতঃ অপরাধীদের অপপদ্ধতিসমূহ অহুসরণ করে উহাদের নাম ধাম সম্বন্ধে অভিহিত হওয়া যেতে পারে।

এইরূপ বিবরণ স্বলিভ বহু কার্ড পর্যবেক্ষণ করে তাঁরা সম্ভবমত প্রায় আট নয়টি অপরাধীর নাম ধাম বিবরণ ও উহাদের বন্ধুবান্ধবদের নাম সংগ্রহ করে এই অপস্রুত জুতার বিবরণ সহ এই সকল সংবাদ জ্ঞৎকণাৎ গেজেটে ছাপিয়ে উহা জ্ঞান, মেল বা লোক মারফৎ প্রতিটি ধানার পাঠিয়ে কিম্বা টেলিফোন বা রেডিও যোগে এই সকল ধানার এই সম্পর্কে সংবাদ প্রেরণ করতেন। তার পর একে একে তাদের পাকড়াও করে অকৃৎসলের লোকজনদের এবং করিষাদীকে সনাক্তিকরণ মিছিলের (Test Identification Parade) সাহায্যে তাদের সনাক্ত করাবার চেষ্টা করতেন। এরপর লণ্ডন পুলিশের অপর একদল হয়ত প্রকাশ্যে বা ছদ্মবেশে এই জুতার বিবরণ সহ ছুটতেন সাগা লণ্ডন শহর বা শহরতলীর সন্দেহমান জুতার দোকান বা উহার গ্রাহকদের সন্ধানে। এইরূপ ক্ষেত্রে বিলম্বের কারণে এই জুতা কোনও এক ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই কিনে নিয়ে দেশের বিরাট জনসমাজের মধ্যে বিলীন হয়ে গিয়ে থাকবে কিংবা 'বামাল-গ্রাহক'গণ উহা অজ্ঞ কোনও এক নিরাপদ স্থানে স্তরিত গতিতে পাঠায় করে দিয়ে থাকবে। এ'ছাড়া এই সকল স্রুতর ধনী বামাল-গ্রাহকগণের দিকে দিকে চর আছে এবং তারা চোখ কান খুলে রেখেই ব্যবসা চালায়। ইতিমধ্যে সংবাদ পেয়ে তাদের সাবধান হয়ে বাওরও অসম্ভব নয়। এর পরও যদি কোন দোকান হতে মাত্র উগার বিবরণের সাহায্যে এই জুতা উদ্ধার করা সম্ভব হয়, তাহ'লে উহা বে করিষাদীর জুতা তা প্রমাণ করা হবে এক সমস্তার বিষয়। কারণ, এইরূপ জুতা বাজার সমূহে সকলের কাছেই নির্বিচারে বিক্রয় করা হয়। তখন পুলিশকে দেখতে হবে এই জুতার স্রুতলার করিষাদীর পায়ের অঙ্করূপ চিহ্ন পড়েছে কিনা? অজ্ঞাধার তাঁরা এই জুতার তলদেশ-সংলগ্ন যুক্তিকা টেছে বার করে রাসায়নিক পরীক্ষার পর প্রমাণ করতে চেষ্টা করতেন যে, এই মাটির কেমিকালের সহিত ঘটনাস্থল বা করিষাদীর হুপ্রাঙ্গণের মাটির কেমিকালের সাক্ষ্য আছে। করিষাদীর পায়ের একটি লোম বৈক্যক্রমে এই জুতার মধ্যে পাওয়া গেলেও হয়ত

তাঁরা এইরূপ পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করতেন এই চুলটির স্রব্যগুণ করিষাদীর পায়ের অজ্ঞাত চুলের অঙ্করূপ। এই সম্পর্কে ফোরেনসিক সায়েন্সের সাহায্যে এই জুতো জোড়াটির বর্ণচ্ছটার সহিত করিষাদীর গৃহের অজ্ঞাত জুতা বা স্রব্যের বর্ণচ্ছটার তুলনা করেও হয়ত তাঁরা প্রমাণ করতেন যে, এই জুতা এই করিষাদীরই। কোনও প্রকারে বিবিধ-বিজ্ঞানের সাহায্যে এই জুতাটি করিষাদীর অপস্রুত স্রব্যরূপে কথঞ্চিৎ প্রমাণ করার পর তাঁদের এইবার অবগত হতে হবে, এই জুতা অপরাধীমস্ত ব্যক্তিদের মধ্যে কোন ব্যক্তি চুরি করে এই দোকানে বিক্রয় করেছে। অবশ্য এই জুতার কোনও স্থানে ভাগাক্রমে যদি তাদের কোনও একজনের আঙ্গুলের ছাপ পাওয়া যায়, তাহ'লে সে কথা স্বহস্ত। তবে স্রব্য স্রব্য নয় বলে এইরূপ কোনও ছাপ না পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। কিন্তু বর্ধ-সিদ্ধ হস্তে জুতা ও কাগজ প্রভৃতি স্পর্শ করিলে উহাতে আঙ্গুলের ছাপ সন্নিবেশিত হওয়ার অসম্ভব নয়। সাধারণতঃ মনোবিজ্ঞানের নিয়ম অহুসারে ঘটনার অব্যবহিত পরেই অপরাধী ধরা পড়লে তাগা একটি স্বীকৃতি দিলেও দিতে পারে। কিন্তু বহুদিন বা বহুক্ষণ সময় অতিবাহিত হইয়া গেলে তাদের মনোবল অটুট হয় এবং তারা কোনও স্বীকৃতি প্রদান করে না। এইরূপ অবস্থায় স্রব্যাদির চোর ও উহা প্রাণক; উভয়েই প্রায়শঃ ক্ষেত্রে অপরাধসমূহ স্বীকার করে থাকে। এইরূপ অবস্থায় সোপানীকরণের পর বিচারের সময় ডিফেন্স হতে একটিমাত্র কথা বলা হয়, 'হাঁ, এ কথা সত্য; জুতার আসামীরই আঙ্গুলিটপ পাওয়া গিয়েছে।' কিন্তু এই আসামী এই দিন সকালে হয়তো জুতা কিনতে গিয়ে এই জুতাটি সে পরীক্ষা করেছিল এবং সবিশেষ পছন্দ না হওয়ার কারণে সে আর উহা কিনে নাই। এই সময়ট তাঁর আঙ্গুলের ছাপ এই জুতার বর্তিয়ে থাকবে। এই জুতার গ্রাহকটিও সম্ভবমত ব্যক্তিবিধার অপরাধীটিকে সমর্থন করে বলবে যে, তার এই উক্তি সত্য; বসত্য, উপরন্ত আত্মপক্ষ সমর্থনে সে এও বলবে যে, পূর্বদিন সন্ধ্যাক্ষ অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি এই জুতা তাকে বিক্রয় করেছে এবং দস্তরমত খাতাপত্রে এই সম্পর্কে লিখে উচিত মূল্য সে উহা ক্রয় করেছে। বহু দক্ষিণ ব্যক্তি পরসার অভাবে এইরূপ জুতা বিক্রয় করে থাকে, স্রুতরাং সে এই বিষয়ে একান্তরূপে নির্দোষ।

এইরূপ অবস্থায় আদালতের বিচারে উভয় আসামীরই সন্দেহাতীত প্রমাণের অভাবে মুক্তি পাওয়াই স্বাভাবিক। এইবার এই বর্তমান যুরোপীয় এবং প্রাচীন ভারতীয় তদন্ত-পদ্ধতির এবং সোপানীকরণ রীতির তুলনামূলক আলোচনা করলে বুঝা যাবে যে, ভারতীয় পুলিশ সরল, সহজ ও অকাটা সাক্ষ্য প্রয়োগ করে এই উভয় আসামীর বিরুদ্ধেই মামলা প্রমাণ করতে সক্ষম। উপরোক্ত ভারতীয় তদন্তরীতি অহুসারন করলে এই সত্যটি সন্মাকরূপে উপলব্ধি করা যাবে। এই ক্ষেত্রে তদন্তকারী অফিসার আদালতে সাক্ষ্য দিয়ে বলে থাকেন যে, আসামী তাঁর নিকট একটি বিবৃতি দেয় এবং এই বিবৃতি অহুসারী সে ঠিক যে স্থানটি হতে এই জুতা চুরি গিয়াছিল, সেই স্থানটি তো সে দেখিয়ে দেয়ই এবং উপরন্ত সে তাকে এই চীনামানের দোকানেও নিয়ে গিয়েছিল এবং এই আসামীর বিবৃতি অহুসারী হ'জন স্থানীয় সাক্ষীর সন্মুখে সে এই দোকান হতে এই জুতা-জোড়া উদ্ধার করতে পেরেছে। তদন্তকারী অফিসারের এই বিবৃতির সহিত করিষাদীর এবং তৎসহ তদন্তকারী-সাক্ষীর বিবৃতির দ্বারা

অপরায়ীদের বিরুদ্ধে অপরাধ সহজে প্রমাণ করা গিয়েছে। এই ক্ষেত্রে বিচারকের মনে মাত্র এই প্রশ্ন উঠবে যে, চোর নিজে ঐ দোকান না দেখিয়ে দিলে ঐ অপস্রত জুতা কিরে পাওয়া অসম্ভব ছিল এবং চোর নিজে না চুরি করলে সঠিকভাবে ঘটনাস্থানটিই বা সে দেখিয়ে দিতে পারে কি করে? এবং চোর নিজে যখন ঐ দোকান ঐ দোকানীকে দেখিয়ে দিয়েছে তা'হলে ঐ দোকানীও নিশ্চয় ঐ জুতা তার নিকট হতে কিনেছে। এবং ঐরূপ নিয়ন্ত্রণীয় ব্যক্তির নিকট ঐরূপ দামী যুগোপীর জুতা যখন দোকানী কিনেছে তখন সে চোরাই প্রচুরপেই তা তার নিকট হতে কিনেছে। এইভাবে আমরা আরও দেখতে পাবো যে ভারতীয় পুলিশ সাক্ষ্য পর্যাপ্ত নিজস্ব পন্থায় মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশের ভিত্তিতে পরিবেশন করতে সক্ষম। এই স্থলে আমরা দেখতে পাবো যে, যুগোপীর পুলিশ কামান-বন্দুকের সাহায্যে যে সাক্ষ্য অর্জন করেন, ভারতীয় পুলিশ তার চেয়েও অধিক সাক্ষ্যলাভ করে থাকেন বিজ্ঞহস্তে। তাই আজও প্রবীণ ভারতীয় পুলিশরা যুগোপীর পুলিশদের কার্য-পদ্ধতিকে উপহাস করে বলে থাকেন যে, তাদের কার্যসমূহ 'মশা মারতে কামান দাগা'র সমপর্যায়ে পড়ে। ঐরূপ সাক্ষ্যের সম্পর্কে যদি কেহ চালের কথা তুলেন তা'হলে আমি বলব যে, উভয় পদ্ধতিতেই চালের ভাগ থাকে প্রায়ই সমান। তবে একথা সকলকেই স্বীকার করতে হবে যে ভারতীয় তদন্তরীতি অতি সরল এবং যুগোপীর তদন্তরীতি অতীব বক্র এবং উচ্চ সময় ও ব্যয় সাপেক্ষ। যে সাক্ষ্য ভারতীয় পুলিশ তদন্তের সাহায্যে কার্যে বিনামূল্যে অর্জন করে, সেই সাক্ষ্য যুগোপীর পুলিশকে অর্জন করতে হয় বহু রাষ্ট্রীয় মূল্যের বিনিময়ে। ধারা অভিযোগ করেন যে, ভারতীয় পুলিশ আসামী বা অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে উপর বৃত্ত নির্ভরশীল তত্ত্ব নির্ভরশীল তারা অপরাধ সম্পর্কীয় সূত্রের উপর নয়; তাদের সময় ও অর্থের ঐরূপ অথবা অপচয়ের দিকটাও ভেবে দেখতে আমি অস্বস্তি বোধ করি। ভারতীয় আদালত সমূহে প্রায়ই দেখা যায় যে, অপরাধীর স্বীকারোক্তির ফলেই মামলা বিশেষের কিনারা করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু ইচ্ছা করে কি কেউ নিজের মৃত্যুবাণ নিজে বাতলে দেয়, ভারতীয় পুলিশ শুধু তাদের মধ্যে নীতি ও ধর্মবোধ এনে তাদের বিরুদ্ধে অপরাধ প্রমাণ করে না, তাদের মধ্যে নীতি ও ধর্মবোধ এনে তাদের গুণেরও দিয়ে থাকেন। তবে আইনের দাস তাঁরা তাই আদালতে এদের পেশ করতে তাঁরা বাধ্য। এর পর যদি আদালত তাদের শোধরাবার সুযোগ না দিয়ে জেলে পাঠায় তা'লে ঔচিত্য বা অনৌচিত্যের বা কিছু দায়িত্ব তা রাষ্ট্রের (ব্রিটিশ প্রবর্তিত) আইন সভার। কারণ যুগোপের দ্বারা ভারতীয় আদালতসমূহও বাঁধাবধা আইনের দাস মাত্র; কিন্তু প্রাগ-ব্রিটিশ ভারতীয় প্রায় পঞ্চায়েত ও অন্যান্য আদালতসমূহ এই সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ ব্যবস্থাই আ'হমানকাল হতে করে এসেছেন। এ সম্পর্কে স্বীকার করতে বাধ্য নেই যে, ভারতীয় পুলিশ অন্ততঃ এই একটি বিষয়ে (তাঁদের ব্রিটিশ শাসকদের অজ্ঞাতেই) প্রাচীন ভারতীয় রক্ষিবর্গের ঐতিহ্য সঞ্চার ও সজ্জতির অধিকারী। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ব্যক্তি-বিশেষের মাধ্যমে এসে উচ্চ বিকৃতরূপে প্রকাশ পেলেও অধিকাংশ ভারতীয় পুলিশই অপরাধীদের প্রতি অতীব সহায়ভূতশীলতার পরিচয় দিতে থাকেন।

এইবার ভারতীয় পুলিশ-মূলত অতীব সহজ ভদ্র-প্রণালী অহুযারী

কিরূপে অপর একটি দুরূহ মামলার কিনারা করা সম্ভব হয়েছিল তা নিয়ে বিবৃত করা হল। ঘটনাটি ভারতীয় পুলিশের অনৌম বৈধ্য, বুদ্ধি ও প্রত্যাশপন্নবৃত্তি এবং মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞানের পরিচায়ক।

কোন এক জজ সাহেবের বাড়ী হতে তাঁর এক পুত্রবধূর মূল্যবান স্বর্ণ-হার চুরি যায়। আমাকে বিশেষ করে এই মামলার তদন্তে পাঠানো হয়েছিল। আমি জজ সাহেব মহাশয়ের বাড়ীতে আসিলে তিনি সাগরে আমাদের তাঁর উপরের বৈঠকখানায় বসিয়ে ভানালেন, 'এমশাই, পাকা পেশাদারী বাইরের চোরেরই কাজ। কি আশ্চর্য, আমার মত লোকের বাড়ীতেও দিন দুপুরে চুরি। তা দেখুন, কি করতে পারেন। বাপরে বাপ! এ তো এক ভীষণ কাণ্ড।' জজ সাহেব আরও হরত অনেক কথা আমাদের স্নানাতেন কিন্তু ইত্যবসরে পাশের ঘর থেকে খবর এলো যে তাঁকে টেলিফোনে কে ডাকছে। তিনি চলে গেলে আমি ও আমার সহকারী নিম্নরূপে এই চুরি সম্পর্কে কথাবার্তা বলছিলাম এমন সময় আনাড়ের লক্ষ্য পড়লো একটি উড়িয়া চাকরের দিকে। সে ছায়ারের এপারের বারান্দার ধারে ঘর খোঁটার অছিলায় জল শুদ্ধ বালতি হাতে ছায়ারের কাঁক দিয়া আমাদের ধারে ধারে ঘেঁষে যাচ্ছিল; আমি এই দেখে নিম্নরূপে আমার সহকারীকে জানালাম, 'ঐ লোকটাকে তো সুরিধের মনে হচ্ছে না, ধাঁড়াও দেখি। এর পর ঐ উড়িয়া চাকরটিকে কাছে ডেকে আমি বললাম, 'আর এদিকে আর। তুই অত ভয় পাচ্ছিস কেন? এঁা : তোকে তো আমরা ধরতে আসি নি। বোস বোস, এইখানে বোস। ইয়ারে তোর দেশ কোথায়, আছে কে কে তোর সেখানে?' আমতা আমতা করে ভূতটি জানালো যে তার দেশ কটক জিলায় অমুক গ্রামে দেশে তার নাংলিকা স্ত্রী ও একটি শিশুকে সে ঘেঁষে এসেছে। তার স্ত্রী ও শিশুপুত্রের কথা শুনে আঁতকে উঠে আমি বলে উঠলাম, 'এঁা বলিস কি রে? বাড়ীতে তোর সেই বালিকা বধু ও ঐ একরকম পুত্র আছে, আর তুই এমন একটা কাজ করে বলিস। আহা আহা, তাই তো কি করা যায় বল দিকি এখন। তা তোকে তা'হলে তো একরকম করে বাঁচিয়ে দিতেই হবে। তোকে তো বাপু দেখলে ভালো লোকই মনে হয়, তা তুই—' ঐরূপ আরও কিছুকণ কথাবার্তার পর ভূতটি এমন একটি পরিস্থিতিতে এসে পড়লো যে সে অপরাধ স্বীকার করে আমার পা জড়িয়ে ধরে ধারে ধারে তাকে বাঁচিয়ে দেবার জন্য আমাকে অহুযোণ করতে থাকলো। ঠিক এই সময় জজ সাহেব সেইখানে এসে পড়ে তাঁর ঐ ভূতটিকে ঐ অবস্থায় দেখে আমাদের অহুযোণ করে বললেন, 'আরে মশাই, আশনারা আবার ওকে নিয়ে পড়লেন কেন? ও'লোক খুবই ভালো ওকে ছেড়ে দিন। ওর উপর আমাদের কোনও সন্দেহ নেই। যারে, ভজু বা, বাড়ীর ভিতরে কাজ করগে যা।' উত্তরে আমি জজ সাহেবকে বললাম, 'না ও কিছু জানে না। তবে ও একটা লোকের ঠিকানা জানে, তার বাড়ীটা শুধু দেখিয়ে দেবে। এক্ষুণি ওকে নিয়ে আমরা আবার এখানেই কিরে আসছি।' এর পর আর জজ সাহেবকে কোনও প্রতিবাদ করবার অবসর না দিইই আমরা ঐ উড়িয়া ভূতাকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। এর পর ঐ ভূতটি আমাদের চিংপুর রোডে এলে সেখানকার এক সারি পোড়ারের দোকানের মধ্যে একটি অর্গল বন্ধ দোকান দূর হতে দেখিয়ে বললে

যে, সে ঐ বর্ণ-হারটি চুরি করে এনে ঐ দিনই ঐ দোকানে এক শত টাকা মূল্যে তা বিক্রয় করেছে। এবং সে ঐ দিনই বিক্রয়লব্ধ এক শত টাকা জীপুত্রে প্রাসাচ্ছাদন ও তাদের ভরপ্রায় কুটির মেয়ামত করার জন্য দেশের ঠিকানার মনি অর্ডার করে দিয়েছে। বলা বাহুল্য, আমার সন্দেশেই বেউদীতে তদন্তরত ছিলাম। আমি সহকারী জিম্মার উড়িয়া ভৃত্যটিকে দূরে সরিয়ে দিয়ে সাধারণ নাগরিকের বেশে পার্শ্ববর্তী দোকানের এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলাম, ‘আজ্ঞে মশাই এই দোকান তো বন্ধ দেখছি, কিন্তু এর মালিকের বাসার ঠিকানা বলতে পারেন?’ এই সব কথ্যটিই দোকানীই ছিল এক দলেরই দলী, তাদের ব্যবসায়ই হচ্ছে চোরাই গহনা কিনে হারিত গতিতে তা গালিয়ে ফেলা। এই কারণে এই স্থানের কোনও দোকানীই—ঐ ভক্তলোকের ঠিকানাটা জেনেও তা বলতে চাচ্ছে না বুকে আমি ব্যস্ততার সঙ্গে বলে উঠলাম, ‘এই মুহুর্তে পড়া গেলো মশাই। ভক্তলোকের মাতাঠাকরুণ ঠর বগ্রামে যাবা গেছেন। আমি তাঁর সেই গ্রাম থেকেই তাঁকে খবর দিতে এসেছি।’—‘ও: তাই নাকি,’—এই কথা শুনে এঁদের একজন বলে উঠলেন, ‘চলে যান ঐগ’গির তা’হলে। ঠর ঠিকানা হচ্ছে অমুক লেনের অন্ত নদর বাড়ী।’ এই কথা শুনা মাত্র আমরা হারিত গতিতে ভক্তলোকের ঐ ঠিকানায় এসে তাঁর নাম ধরে ডাকাডাকি শুরু করে দিলাম। কিন্তু সেই ভক্তলোক ছিলেন একজন অত্যন্ত চালাক ব্যক্তি। সহসা তাঁর নাম ধরে ডাকার বোধ হয় তিনি সন্দেহই করে থাকবেন। ওদিকে ঐ বাড়ীর অত্যন্ত ভাড়াটিয়ারাও আমাদের বিশেষ আমল দিতে চান না বলেই মনে হল। অন্ততলো ঘরের এক এগটিতে এক একটি পরিবার শাস করে। কোন ঘরটিতে যে ঐ ভক্তলোক থাকেন তা প্রথমে খুঁজে বার করা দরকার। এদিকে আমাদের খোঁজা-খুজির বহর দেখে ভক্তলোকটিও হয়ত গা-ঢাকা দিয়ে সরে পড়তে পারেন। আমি তখন আর অপেক্ষা না করে বাস্তব হয়ে টেচিয়ে উঠলাম, ‘আরে মশাই ঐ দাঁড়িয়ে দেখছেন কি? ঐগ’গির অমুক বাবুকে ডেকে দিন। আমি চিংপুর বোড থেকে আসছি, তাঁর দোকানে আগুন লেগেছে।’ আগুন লাগার বার্তা কানে হওয়া মাত্র ভক্তলোকটি কোণের একটি ঘর থেকে নগ্ন পদ ও গায়েই বেরিয়ে পড়ে বলে উঠলেন, ‘এ্যা; কি বললেন আগুন লেগেছে?’ বলা বাহুল্য তিনি আঁতকে উঠে বেরিয়ে আসা মাত্র আমরা তাঁকে গ্রেপ্তার করে বলে উঠলাম, ‘আজ্ঞে না আমরা পুলিশ। দেখুন তো, সেনেন ঐ উড়িয়া ভৃত্যটিকে?’ এরপর ভক্তলোকটিকে একজন পশ্চাদ্গত সিপাহীর জিম্মা করে দিয়ে ভক্তলোকের ককে চুকে তাঁর দ্বীকে বললাম, ‘আজ্ঞে, ভয়ের কিছু নেই। ঐ চোরটা এসব কিছু না জানিয়েই একটা গহনা এঁকে বিক্রী করে গিয়েছে। গহনাটা আপনি আপনার আলমারী থেকে বার করে দিন, তা’হলেই বা কিছু গুণ্ডগোল তা চুকে যাবে।’ এর পর আরও একটু বুঝিয়ে বলাতে ভক্তলোকের দ্বী গহনাটি তাঁর আলমারী থেকে বার করে এনে আমাদের হাতে ঐ বাটারই দুই জন সাক্ষীর সামনে তুলে দিয়েছিলেন।

এইখানে ভারতীয় পুলিশের মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞানসহ সমাজবিজ্ঞান সম্পর্কীয় জ্ঞানেরও পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতীয় পুলিশ জানে, প্রথমেই অপরাধীমত ব্যক্তিকে তার অপরাধ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে কোনও ফল হয় না। তার সহিত অপরাধের সম্পর্ক রহিত কথাবার্তা

প্রথমে বলা দরকার। এইরূপ কথাবার্তার মধ্যে তার মানসিক দ্বর্বলতা সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়ার পর তার চিন্তাশক্তি (Predisposition) অনুযায়ী তার প্রতি প্রয়োজনীয় বাক্যাভিহাস প্রয়োগ করলে তবেই সে তার এক দুর্বল মুহূর্তে অপরাধ-সম্পর্কীয় এক স্বীকৃতি প্রদান করবে। হ’লো ভারতীয় পুলিশ ইহাও অবগত আছে যে, ভারতীয় সমাজে কোনও কোনও পুরুষের অপরাধ-প্রবণ হলেও তাদের দ্বীরা প্রায়শঃ ক্ষেত্রে অপরাধীকে ঘুণাই করে এসেছে। এইজন্য এক শ্রেণীর অভ্যাস, অপরাধীরা তাদের আপন আপন দ্বীরা অজ্ঞাতেই অপকর্ম করে থাকে। এই বিশেষ ক্ষেত্রে অপরাধীটির দ্বী সরল বিশ্বাসে এই ভাবে পুলিশকে সাহায্য করেছিল। অপরাধীটি তার দ্বীকে যথা সময়ে সাবধান করে দিতে পারলে অবশ্য সে এইরূপ সাহায্য পুলিশকে করত না। কারণ একজন ভারতীয় দ্বী স্বামীর জীবন ও মান রক্ষার জন্য যে কোনও কার্য করতে প্রস্তুত। ইহাও ভারতীয়সমাজ-বিজ্ঞানের একটি বিশেষ দিক। এই কারণে প্রত্যাপনমতিতে সহিত ঐ বন্ধিপুলব তাঁর স্বামীকে অগ্রেই তাঁর দ্বীরা সরিধান হতে দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

এইভাবে আমরা দেখতে পাবো যে, যে রীতিতে ইঙ্গস্থানীয় পুলিশ তদন্ত করে সেই রীতিতে ভারতে তদন্ত-কার্য করা হয় নি। ইহার কারণ সম্বন্ধে ইতিপূর্বেই আমি বলেছি। এইজন্য ভারতীয় পুলিশকে অপরাধী ও তাদের গোষ্ঠীদের আচার-ব্যবহার রীতিনীতি তো জানতে হয়েছেই, উপরন্তু ভারতীয় নিরাপরাধ সভ্য সমাজেরও রীতিনীতি সম্বন্ধে তাদের অবহিত হ’তে হয়েছে। কোনও অপরাধ সংঘটিত হওয়া মাত্র তদন্ত-কার্য শুরু হলে যুগোপীয় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিসমূহ যে বিশেষ কার্যকরী তা’তে সন্দেহ নেই। কিন্তু এমন বহু অপরাধ সংঘটিত হয়েছে যাহার খবর পুলিশের কাছে ছরমাসের পর কিংবা এক বৎসর পরে পৌঁছিয়েছে। এই ক্ষেত্রে এমন কোনও যন্ত্রের সন্ধান প্রায়ই পাওয়া যায় নি যার উপর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা চলতে পারে। এইরূপ ক্ষেত্রে ভারতীয় পুলিশের নিজস্ব তদন্তরীতিই প্রয়োজন সর্বাধিক। তবে ভারতীয় পুলিশ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিসমূহের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল না হলেও প্রয়োজন মত তারা সকল ক্ষেত্রেই তদন্ত-কার্যে বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়েছে। বিশ্ববিখ্যাত পদ-চিহ্ন-শাস্ত্র এই দেশেরই প্রাচীন বাণাসমুগত টিটেকটিভগণ কর্তৃক সৃষ্ট। আঙ্গুলের টিপ-চিহ্ন শাস্ত্রও সর্বপ্রথম এই দেশে সৃষ্ট হয়ে এই দেশেই সর্বপ্রথম চালু করা হয়। বঙ্গীয় ফিল্ডার প্রিন্ট ব্যুরো পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতম ব্যুরো। উক্ত বিজ্ঞানদ্বয় সহ, অপগম্য বিজ্ঞান, ফোলেসিক শাস্ত্র, প্রভৃতি বিভিন্ন অপরাধ-তদন্ত সম্পর্কীয় আধুনিক বিজ্ঞান সমূহের সাহায্য অনুমুখ্যে যুগোপীয় পুলিশের দ্বারা ভারতীয় পুলিশও গ্রহণ করে থাকে। তবে তাদের এই সকল শাস্ত্রকে ভারতের উপযোগী করে টেলে সাজিয়ে নিতে হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভারতীয় পুলিশ তদন্ত-কার্যে নিজেদের মূল পদ্ধতি আজও ত্যাগ করে নি। আমি এই কাহিনীসমূহে যে সকল বিখ্যাত মামলার তদন্ত ও উদ্ভাৱের বিচারের কাহিনী বিবৃত করবো তাহাদের প্রায় সব কথটির তদন্ত, অবিকল ক্ষেত্রেই ভারতীয় নিজস্ব তদন্ত-পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়েছে।

—আগামী সংখ্যায়—

পাগল হত্যা মামলা

তু পুরিচালনাই বলুন, অনন্ত অভিনয়ই বলুন বা কলা-

কৌশলের চমৎকারিছই বলুন—এক দিক দিয়ে দেখতে গেলে

ছবির সাফল্য সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করে দর্শকদের ভাল লাগার উপর, দর্শকদের নির্বাচনের মতোই ছবির সাফল্যের চাবিকাঠি। সুরু দিক দিয়ে ছবি পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও যদি সে দর্শকদের দরবারে গৃহীত না হয়—ভেবে দেখুন তা হলে—এক দিক দিয়ে দেখতে গেলে ছবি বার্ব। ঈশ্বরের করুণায় কুমকুম দর্শকদের কাছে থেকে প্রচুর পরিমাণে সমাদর পেল—অভিন্ন সমালোচকের দলও কুমকুমে স্বতঃকৃত অভিনন্দন জানাতে কুঠাবোধ করলেন না। দর্শক-সমাজে ঠাকুরের আশীর্বাদে, বিপুল সমাদরে গৃহীত হ'ল কুমকুম। আমাদের জীবনকে বেঁচেন করে সেই একই কর্মের চক্রে প্রদক্ষিণ করতে থাকে, তাতে লাগে না কোন পরিবর্তনের ছোঁয়াচ।

বসতে বাধা নেই, সম্মান, খ্যাতি, বশ সেই সময়ের মধ্যেই আমি বা পেয়েছিলুম তা ধারণার অতীত, আমাকে দর্শক-সমাজ যে এত সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করবেন তা আমি ইতঃপূর্বে ভাবতেই পারি নি। আমার মত একজন নগণ্য শিল্প-উপাসিকার প্রচেষ্টা যে দর্শক-সমাজকে তৃপ্তি দিতে পারবে—এ আমি সত্যি বলছি স্বপ্নের ভাবতে পারি নি কিন্তু আজও বুঝতে পারি না কেন—কি কারণে—কি জন্তে—ওই সম্মান, ওই খ্যাতি, ওই বশ আমার মধ্যে কোন বিশেষ প্রতিক্রিয়া সঞ্চার করতে পারে নি, খুব যে আবার আকর্ষণ করেছ তাও মনে হয় নি, আমার মনে খুব একটা রেখাপাত করতে পেরেছে বলেও বোধ হয় না, কিন্তু দর্শকের মহাত্মের উপর আমার সুগভীর আস্থা তাতে বিলুপ্ত কমে যায় নি, আমার সম্বন্ধে দর্শকের সুচিন্তিত মতামত আমি আশীর্বাদের নামান্তর বলেই ভেবে এসেছি। বৈচিত্র্যের মধ্যেই জগতের সৌন্দর্য, এ-ও বোধ হয় সেই শাখত সত্যের একটি উদাহরণ বিশেষ। আজ প্রৌঢ়ের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করেও কিছুতে আমার বোধগম্য হচ্ছে না কেন সেদিন সাধারণের দেওয়া সম্মান আমার মনে রেখাপাত করতে পারে নি, এই রহস্যের সূত্রসন্ধানে এখনও আমার মন মাঝে মাঝে যেতে ওঠে। নিজেকে সরিয়ে রাখার স্পৃহা আমার বাল্যকাল থেকে, এক কথার চিরকাল যে কোন ব্যাপারে নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে জড়িত থেকে, ওতঃপ্রোত ভাবে তার সঙ্গে মিশে থেকে আত্মর্ঘ্য ভাবে নিজেকে তারই মধ্যে থেকে আবার সরিয়ে রাখা আমার স্বভাবই বলুন ইচ্ছাই বলুন বা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই বলুন। স্বেচ্ছাচক্রেতাও এর জন্তে কম দায়ী—এমন কথার জোর দিয়ে আমি বসতে পারি না; বোধ হয় সেই জন্তেই আমার মনে হয়, সাধারণ দর্শক আমাকে সশরীরে খুব বেশী একটা দেখতে পেতেন না। বহুজনের সন্মিলন থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখার স্পৃহা আমার মধ্যে ছিল সমধিক, আর সেই স্পৃহার বিকাশে বখেট পরিমাণে সহায়তা করল আমার স্বেচ্ছাচক্রেতা চাক্ষুষবোধ। আমাকে ধীরে স্নেহ করেন, আমার ধীরে শুভাকাঙ্ক্ষী, আমার অভিনয়ের ধীরে উৎসাহদাতা, সেই সাধারণের মাঝখানে নিজেকে মিশিয়ে দেবার অজস্র সুরোহিত এসেছে আমার জীবনে, বিভিন্ন অঙ্গুষ্ঠান উপলব্ধ করে বিভিন্ন স্থান থেকে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান মাধ্যম অঙ্গ প্রাঙ্গণ এসেছে আমার কাছে, জানি না সে আমন্ত্রণ রক্ষা করতে আমার মন উত্তেজিত হয়েছে কি না। তবে এটুকু বেশ জানি যে যদি বা কখনও সাধারণের আমন্ত্রণে আমি সাড়া



স্মৃতির টুকরো

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

সাধনা বসু

দিতে গেছি সঙ্গে সঙ্গে আমার কঠোর করেছি আমার আবালা-লালিত নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখার স্পৃহা। আমার মধ্যে বিশেষভাবে তখন জেগে উঠল এক অস্বাভাবিক স্বেচ্ছাচক্রেতা-বোধ। কিন্তু সেদিনের আমার সঙ্গে আজকের আমার আকাশ-পাতাল ব্যবধান। ধ্যান ধারণা, চিন্তা করনা, স্বপ্ন দৃষ্টি, ভাবতন্ত্রী দিক দিয়েও সেদিনকার সাধনার সঙ্গে আজকের সাধনার কোনও মিলই পাওয়া যায় না, আজকের সাধনার কাছে সেদিনের সাধনা শুধু স্মৃতি শুধু ইতিহাস, শুধু পিছনে ফেলে আসা যুগ তাই সেদিনকার সাধনার এই আচরণ আজকের সাধনার মনে জন্ম দেয় এক অবর্ণনীয় অলুপ্তাচরণ, আজকের সাধনা ভাবছে যে সেদিনকার সাধনার এই আচরণ বোকামী ছাড়া কিছুই নয়, ভাস্কর্য্যের পরিচায়ক সেদিনকার সাধনার সেই আচরণের জন্তে আজকের সাধনা সর্বিশেষ অলুপ্ত। সত্যি কি ভুলই না করেছি তখন? আজ তার জন্তে অলুপ্তাচরণ করছি, কিন্তু এই অলুপ্তাচরণের পূর্বাত্মক যদি সেদিন পেতুম এবং সেই অলুপ্তাচরণে যদি চলতে থাকতুম তা হলে নিশ্চয়ই আজ আমাকে বেদনার বাণে বিদ্ধ হতে হোত না। এই প্রসঙ্গে আজ সব চেয়ে বেশী মনে পড়ছে বাবাকে “Chautaux Marine”-এ সে সময়ে তিনি আমাদের কাছেই ছিলেন। সাধারণ্যে আমি বাতে বখেট মেলামেশা করতে পারি সেজন্তে বাবার সে কি আগ্রহ, কি তৎপরতা, কি ব্যাকুলতা যা ভাবলে আজ হৃচোপ দিয়ে ক্রমাগত জলের ধারা নামতে থাকে। আমার বেশ মনে আছে, সাধারণ্যে মেলামেশার বাসনা আমার মনের মধ্যে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্তে বাবা প্রায়ই বলতেন, “পোষ্টপনমেটস আর ত ওয়াস ট মিসটেক ওয়ান কুড মেক সাধনা”—শুধু মনে আছে বললেই ভুল হয় কথাটি বেন কর্তৃত্বের চিরকালের জন্তে স্থায়ী নিয়েছে।

আমার প্রকৃতির একটি দিকের ধারোদ্বাটন করলুম আপনাদের সামনে কিন্তু আমার সনির্বন্ধ অলুপ্তাচরণ এই বিবরণী থেকে কেউ বেন না ভাবেন যে আমি মিত্তকে নই। সাধারণ্যে মেলামেশা করতে

আমি সন্ধ্যাবেশ করতুম কিন্তু তাই বলে এ ধারণাও আমার সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয় যে, লোকের সঙ্গে আমি মিশতুম না। তবে কি জানেন, সবই একটা নির্ধারিত গতির মধ্যে। রামায়ণ মনে করুন, গণ্ডীর মধ্যে সীতার পথ শান্তি কোন ভয় নেই, যেমন ভাবে ইচ্ছে চলাফেরা করতে পারেন, গণ্ডীর বাইরে পা দিয়েছেন কি সামাজিক বিপদ, আমার বেলায়ও কথাটা নেহাৎ অপ্রযোজ্য নয়। আমার বন্ধু-বান্ধবী অনেকই ছিলেন, সংখ্যার দিক থেকেও তাঁরা নগণ্য নন, তাঁদের সঙ্গে আমার মেলামেশাও ছিল যেমনই গণ্ডীর তেমনই নির্বিড়। কিন্তু এই যে আগেই বলেছি—গণ্ডী—সবই সেই সীমার মধ্যে, সীমা অতিক্রমণ হো বাস অমনি সঙ্গে সঙ্গে

রাজ্যের সঙ্কোচের সম্ভব আক্রমণ। সেই বন্ধুদের কথাও কি আজ কম মনে পড়ছে, তাঁদের কেন্দ্র করে কতগুলো দিন যে কি আনন্দের মধ্যে কেটেছে তা বত ভাবছি অলস মুহূর্তগুলো যেন তত ভাবাক্রান্ত হয়ে উঠছে। তাঁদের মধ্যে ধীরে মৃত, তাঁরা তো আজ সর্বপ্রকার ধরা-ছোঁওয়া, আসা-যাওয়া, যোগাযোগের উর্ধে, তবে ধীরে আজো ইহলোকে বর্তমান সেই সব দিনগুলোর সাক্ষী হিসেবে—কালের চক্রে তাঁরা কে কোথায় চতুর্দিকে ছড়িয়ে আছেন তার না আছে ঠিকানা, না আছে নিশানা না আছে সঠিক সন্ধান।

Chautaux Marine এ আমরা ছাড়া চিত্রজগতের আরও বহু জন বাস করতেন। প্রখ্যাত প্রযোজক পরিচালক মিঃ কার্দ্‌র,

স্বনামধন্য গায়িকা ও অভ্যন্তর প্রথম মহিলা প্রযোজিকা পরিচালিকা জদন বাদীরের নাম এ প্রসঙ্গে মনে পড়ছে। আর হ্যাঁ-হ্যাঁ এই প্রসঙ্গে আর একজনের কথা 'বেশ স্পষ্ট মনে পড়ছে। একটি মেয়ের কথা, তখন সে বালিকামাত্র, কৈশোরের দ্বারপ্রান্তে উপনীত। সমুদ্রের দিকে মুখ করা আমার বাবা'মা থেকে সেই বন্ধু পরা মেয়েটিকে এদিক-সেদিক ছুটোছুটি করে প্রায়ই খেলতে দেখতুম। সে দৃশ্য তো আমার চোখের সামনে ভাসছে। তার নাম উল্লেখ করা মাত্রই আপনারা তাকে চিনতে পারবেন, কারণ চলচ্চিত্র-জগতের একজন প্রথম শ্রেণীর অভিনেত্রী হিসেবে সারা ভারতে এবং ভারতের বাইরেও আজ সে সুপরিচিত। পুণ্ড্রিকা জদন বাদীরের মেয়ে সে। তার নাম জীৱতী নাথগিন। [ক্রমশঃ]

অনুবাদ—কল্যাণাঙ্ক বন্দ্যোপাধ্যায়

অপূর সংসার

দিকপাল সাহিত্যশিল্পী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৃষ্টিধর্মী লেখনীর অনবদ্য নিদর্শন অপূ-কাহিনীর চলচ্চিত্রায়ণে এইবার সমাপ্তির বেলা পড়ল। অপূর মাতৃবিয়োগ পূর্ববর্তী ছবি অপবাজিততে দেখান হয়েছে। এখানে, এটি ছবিতে তাঁর প্রথমার্শে দাঁড়ান অকাল এক ভাড়াটে বাড়ীর অভ্যন্তর বা'নন্দা, জো'বকায়েবী এবং গৃহস্থামীর শিকার হিসেবে অপূকে দেখানো হচ্ছে পরবর্তী অংশে দেখা'ই বন্ধু প্রণবের এক বোনের বিবাহোপলক্ষে বন্ধুর সঙ্গে বিয়ে বাড়ীতে অপূ গেল ও ঘটনাচক্রে পাত্রীকে সেই বিয়ে করে নিয়ে গেল—এবং গুরু হ'ল তাদের মধ্যম দাম্পত্যজীবন, তারও পরবর্তী অংশে দেখা'ই সন্তানের জন্ম দিয়ে

এশিয়ান ফিল্মস্-এর নিবেদন



উত্তম সার্বিজী



অক্ষিত



গলি থেকে রাজপথ

সত্যজিৎ রায়

অনুপম-ছবি বিশ্বাস-নিকাশরায়-ভবের রায়
তুলসী চন্দ্রবর্তী-ছায়া দেবী-দুর্গা-হেলেন

পরিচালনা-প্রমুদ চন্দ্রবর্তী • সঙ্গীত-সুধীন দাসগুপ্ত

গীতা পিকচার্স (প্রাইভেট) লিমিটেড পরিবেশিত

... ..

রূপবাণী :: অরুণা :: ভারতীতে ::
পরবর্তী আকর্ষণ!



অপর্ণার লোকান্তরবাত্রা ও সেই সংবাদে অপুর মধ্যে এক বিশেষ পরিবর্তনের চিহ্ন দেখা যায়। এবং সে বেরিয়ে পড়ে বাড়ী থেকে, বছর পাঁচেক বাদে অনেক অল্পসন্ধান করে প্রণব তাকে খুঁজে পায় বহু দূরে কোন একটি স্থানে উদাসীনমন অণুকে, অপূর্ব সুখমগ্ন তখন সৌক-নাড়িতে ভর্তি। পুত্রের সন্ধান অণু যেন কেবলমাত্র টাকা পাঠিয়েই খালাস। অপর্ণার মৃত্যুর জন্তে পুত্রকেই সে দায়ী করে, প্রণব খুব দক্ষতার সঙ্গে অণু-নন্দন কাকুল সন্ধানে অণুব চেষ্টনার গভীরে যা মাঝে; সর্বশেষ অংশে দেখছি খণ্ডবালয়ে অণুব আগমন ও অনেক সাধনার পর সন্ধ্যা পলায়নপর পুত্রের সঙ্গে পিতার বহু আকাঙ্ক্ষিত মিলন ও পুত্রকে নিয়ে কলকাতা অভিমুখে অণুব যাত্রা।

অণু-কাহিনীর অমর স্রষ্টা বিভূতিভূষণের লেখনীজাত একটি লাইন আজ বার বার আমাদের মনে পড়ছে—“গতিই জীবন, গতির দৈবত্বই মৃত্যু”—যাঁরাই তাঁর কাছে স্বাক্ষরের জন্তে খাতা পেশ করতেন তাঁদের প্রত্যেকের খাতাতেই (আমরা বতদূর জানি) বিভূতিভূষণ এই কথাটিই লিখে দিতেন। গতির উপাসক বিভূতিভূষণের অকৃতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তির পরিণতি-অধ্যায়ের চিত্রায়ণে গতির অভাব যে কতখানি ব্যাপক ভাবে ঘটেছে পারে, তা বলে বোঝানো যায় না। তবে সে বিষয়ে যারা মনে মনে জিজ্ঞাসা পোষণ করেন, “অপুর সংসার” তাঁদের সেই জিজ্ঞাসার শ্রেষ্ঠ উত্তর। লীলা কই? অপুর যে চরিত্রের বিভূতিভূষণ রূপ দিয়েছেন, সেই চরিত্রের সার্থক বিকাশে লীলার আবির্ভাব অপরিহার্য, লীলাকে বাদ দেওয়ার ফলে অণু-চরিত্রের সম্যক প্রকৃষ্টন অসম্পূর্ণ, অণু-চরিত্রে লীলার প্রভাব অসামান্য। অণু-চরিত্রের উপর সবচেয়ে অবিচার করা হয়েছে অণুকে দিয়ে এই চড়াটা মারিয়ে। এই পরিবেশে চড়াটা মারানোর ফলে ছবির গুরুত্ব, সজ্জা, মর্যাদা যে তাঁদের যাবের মত ধূলিসাৎ হয়ে পড়েছে, এ বিষয়ে কি সংশয় থাকতে পারে? চিত্রপরিচালক ছাড়াও সত্যজিৎ রায়ের আর একটি পরিচয় আছে তিনি শিল্পী, শিল্পিমনের অপিকারী একজন শিল্পীর দ্বারা এ জিনিষ যে কি করে সম্ভব হ’ল স্বীকার করছি সত্যিই তা আমরা বুঝে উঠতে পারছি না। প্রচারকে যদি শোকের অভিযুক্তি বলে মেনে নিতে হয় তা হ’লে সব চেয়ে অপমান করা হয় মাছুষের আত্ম-অহুভূতিকে। পৃথিবীর মধ্যে অণুর সব চেয়ে প্রিয় অপর্ণা তাঁর মৃত্যু অপুর কাছে নিজের মৃত্যুরই নামান্তর। সচরাচর মনুষ্যসমাজে আমরা দেখে থাকি যে এই অবস্থার, আকস্মিকভাবে এই সংবাদ প্রবণে মাছুষ হতবাক হয়ে পাথরের মত হ’য়ে যায়, অস-প্রত্যক্ষ তার অংশ হ’য়ে যায়—সে হ’য়ে যায় বিমূঢ়, প্রাণ খুলে তখন সে কঁদতেও পারে না—সে অবস্থার তার মনে প্রহার-প্রবৃত্তির উন্নয়ন অস্বাভাবিক। তবে হ্যাঁ, ট্রেনে অপুর কাছে অপর্ণার শেষ বিদায়মুহুর্তি পরিকল্পনা ও পরিবেশন দৃষ্টান্তকে বিশেষভাবে স্পর্শ করে। এই মুহুর্তিকে সাক্ষ্যের স্বাক্ষর বলা যায়।

সত্যজিৎ রায় প্রযোজিত—পরিচালিত এই ছবিতে সুরকাররূপে দেখা গেল পণ্ডিত রবিশঙ্করকে আলোকচিত্র গ্রহণে অসামান্য নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন মুক্তত মিত্র। তাঁকে আভাবিক অভিনয়ন আমরা জানাই।

নাট্যক-নাট্যিকার ভূমিকায় উন্নয় শিল্পীতই এই প্রথম চিত্রাবতরণ। অভিনয়ের ক্ষেত্রে উপজ্ঞাসের পাণ্ডুলিপির পাতাগুলি হাওয়ার উড়িয়ে দেওয়ার দৃষ্টে অবিস্মরণীয় অভিনয় প্রতিভার পরিচয় দিলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় আর চড়ু মারার দৃষ্টে অভিনয়ে সব চেয়ে ব্যর্থতা বরণ করলেন সৌমিত্র। এই দৃষ্টান্তে তাঁর অভিনয় অতি গীড়ানায়ক আর বশেষে কৃত্রিমতাদোষে হুট। অপর্ণার ভূমিকায় রূপ দিয়েছেন শমিতা ঠাকুর, প্রণবের ভূমিকায় নবাগত স্বপন মুখোপাধ্যায় যথেষ্ট গাভীর্ষপূর্ণ অভিনয় করে চরিত্রটির মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। এ ছাড়া যৌবন ঘোষ, যৌবন মজুমদার, শান্তি ভট্টাচার্য, তুষার বন্দ্যোপাধ্যায়, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, বেচু সিংহ, শেফালিকা, বেলারথী, আশা প্রভৃতি শিল্পীদের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা গেছে। ছবিটি নাট্যকপ্রধান এবং ছবিটিকে one man show বললেও অত্যুক্তি হয় না।

সুধার পাঁচ শ’ সাত রজনী অভিক্রম

বাঙলাদেশে একটি নাটকের পেশাদারী ভাবে একটানা মঞ্চাভিনয়ের সর্বোচ্চ রেকর্ড স্থাপন করল “সুধা” অল্পকাল আগে পাঁচ শ’ সাত অভিনয়-রাত্রির অভিক্রমণে। এর আগে আর কোন নাটক একই মঞ্চ নিরবচ্ছিন্ন ভাবে এতকাল ধরে একটানা অভিনীত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করে নি। সে জন্তে সুধার সাফল্য নিঃসন্দেহে অভিনয়নযোগ্য। এই উপলক্ষে বিশ্বরূপার এক ক্রীতি উৎসবের সর্বাঙ্গসুন্দর আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন অক্ষুণ্ণ করেন যথাক্রমে মন্ত্রী শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ ও পৌরপ্রধান শ্রীবিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। অমুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন প্রত্নভাষ্যন শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীশচীন সেনগুপ্ত, শ্রীঅরিন্দ্র চৌধুরী ও শ্রীহেমেন দাশগুপ্ত। সভাপতি অভিনয় শুরু হয়। এই দিন ঐ উৎসব উপলক্ষে বিশ্বরূপার সাহিত্য জগতের, অভিনয় জগতের ও মহানগরীর বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও শ্রমীর আগমন ঘটেছিল। অমুষ্ঠানে বিশ্বরূপার অকৃতম কর্ণধার শ্রীয়াসবিহারী সরকার সকলকে স্বাগত জানান ও অভ্যাগতদের প্রতি যথেষ্ট বক্তৃতা করেন। এই অমুষ্ঠানের কয়েক দিন পরে বিশ্বরূপার চতুর্থ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষেও এক ক্রীতি সম্মেলনের আয়োজন হয় সেদিন সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসনে দেখা গিয়েছিল যথাক্রমে শ্রীঅরিন্দ্র চৌধুরীকে ও শ্রীশঙ্কু মিত্রকে। সুধা নাটকটিকে পূর্বে আমরা আলোচনা করেছি সেই জন্তেই এবারে বিশদ আলোচনা থেকে বিরত হইলুম। তবে এ কথা বার বার বলি—সুধার মত যুগোপযোগী তাৎপর্যপূর্ণ নাটকের জয়যাত্রা পরোক্ষ ভাবে জাতীয় জয়যাত্রা। সংস্কৃতির পূজারী বাঙালী উচ্চশ্রেণীর এবং গুরুত্বপূর্ণ নিয়োপহার আবেদনে সাড়া দিতে কার্পণ্য করেন না, সুধার বিজয়বৈজয়ন্তীই প্রমাণ। বাঙালীর জাতীয় জীবনের কল্যাণকর সুধার অন্তর্নিহিত বক্তব্য আবেদন ও আদর্শ এবং কর্তৃপক্ষের শুভপ্রচেষ্টা সর্বতোভাবে সাক্ষ্যপূর্ণ ও জয়যুক্ত হোক—সর্বাঙ্গীন ভাবে আমরা এই কামনাই করি।

“ধর্ম অমুখ্যগে—অমুষ্ঠানে নহে। দৃষ্টের পবিত্র ও অবপট প্রেমই ধর্ম।”

—বাসী বিবেকানন্দ।

সাময়িক প্রসঙ্গ

কাঁকি।

“পশ্চিমবঙ্গে রাজাবাপী হরতালের প্রতি সহায়ত্ব
জানাইয়া মন্ত্রীরা কি গত বৃহস্পতিবার হরতাল পালন
করিয়াছিলেন? রাষ্ট্র-মন্ত্রী ও উপমন্ত্রীদের মধ্যে কেহই প্রায় ঐ দিন
নিজ নিজ দপ্তরে আসেন নাই। মন্ত্রীদের মধ্যেও অধিকাংশ অনুশ্রিত
ছিলেন; কয়েকজন আবার একবার করিয়া হাজিরা দিয়া চলিয়া
গিয়াছিলেন। একমাত্র পুলিশ দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীকানীপদ
মুখোপাধ্যায় বখারীতি দপ্তরে হাজির ছিলেন। একা কুস্তুর উপর
নকল বুঁদিগড় রকার ভার পড়িয়াছিল কেন কে বলিবে? অন্ততঃ
মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই অবস্থার কোন কারণ ব্যাখ্যা করিতে
পারেন নাই। অনেকে বলিতেছেন, অবস্থা অনেকটা বায়ুন গেল
যব তো লাউল তুলে ধর’ গোছেব। কর্ত্তা দিল্লী, তাই কাজ
কাঁকি দিবার লোভ কেহই নাকি সামলাইতে পারেন নাই।”

—দৈনিক বহুমতী।

উপদেশামৃত

“কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী শ্রীমঙ্গলজীবন রায় গয়া রাজেন্দ্র-আশ্রমে
কংগ্রেসকর্মীদের এক সভায় বক্তৃতা কালে বলেন, কংগ্রেসকর্মীদের
উচিত, অপরের দোষ দেখানোর চেয়ে নিজেদের দোষ সংশোধনই
বেশী অবহিত হওয়া। কেননা, তাঁহার মতে, সরকারী মহল
অপেক্ষা অনেক কংগ্রেসী আছেন, যাঁহারা দলগণ বেশী দুর্নীতিগ্রস্ত।
শ্রীমঙ্গলজীবন রায়ের এই ভাবণের লক্ষ্য কাহারা জানি না।
নিশ্চয় তিনি এই হিতবাক্য কেবলা কংগ্রেসীদের উদ্দেশে বলেন
নাই। আর সরকারী মহলের তুলনার বে কংগ্রেসীদের মধ্যে
তিনি দলগণ দুর্নীতিপরায়ণতার সন্ধান পাইয়াছেন, নিশ্চয় সে
তালিকায় তিনি কংগ্রেসী মন্ত্রীদের ধরেন নাই। প্রকৃষ্ট সমালোচনা
ত তাহাকেই বলে, বাহা সংশ্লিষ্ট মহল ছাড়া আর সকলেরই
চরভেদ করে।”

—যুগান্তর।

জনকল্যাণী সরকার

“উপর হইতে দেখিলে দীর্ঘ নিস্তব্ধ, কিন্তু তাহার তলার
লৈবালদায় প্রচ্ছন্ন থাকে, অনেক পঙ্ক, পিচ্ছিল রোদ। সমাজেরও
অদৃষ্ট-গোপন স্তরে স্তরে অনেক গ্রানি, বকনা আর বিড়ম্বনা, হতাশা
আর পাণ জমিয়া আছে, আমরা সব সময় টের পাই না। দীর্ঘত
মাঝে মাঝে বৃহৎ ফুটিরা উঠে, তাহার অঙ্গকার অঙ্গভঙ্গের খবর দিয়া
চকিতে মিলাইয়া যায়। সমাজকীবনের ও নীচের মহলের দুই-একটা
খবর জানাজানি হইয়া আমাদের চকিত বা স্তম্ভিত করিয়া তোলে।
কেহ দিকার দেয়, কেহ দীর্ঘখাস ফেলে। কর্তব্যের ওইখানেই শেষ।
মীরা মুখোপাধ্যায় নামে এক রমণীর বে কাহিনী গত বৃহস্পতিবার
আদালতে শুনা গিয়াছে, তাহা লাহনা ও বকনার ইতিহাস।

আপাতদৃষ্টিতে কলকিনী এই নারী মহানগরে এক ঘৃণ্য পরিবেশে
উচ্ছ্বল আচরণের দ্বারা অভিযুক্ত হয়। আদালত সমর্থন করিতে
গিয়া সে কি ভাবে তাহার স্বামী তাহাকে ত্যাগ করিয়াছে, তাহার
মর্মস্পর্শী বিবরণ দেয়। দুই নাবালক পুত্রের ভরণপোষণের জন্তই
তাহাকে লজ্জাকর জীবন বাণন করিতে হইয়াছে, সে কথা সে অকপটে
বলে। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে সাবধান করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন।
কিন্তু কাহিনী একা মীরা মুখোপাধ্যায়ের নয়, কলিকাতার ইটের
পাঁজরে আর রাজপণের পাথরে এমনই বহু স্বামি-পরিত্যক্তা নারীর
করণ কাহ্না হরত চাপা পড়িয়া আছে। ইহারা বিবপান করিয়াছে,
কিন্তু নীলকণ্ঠ হইতে পারে নাই, অঙ্গুলি প্রসারিত করিয়া আমাদের
সমাজব্যবস্থার বে বিরাট একটা কাঁক আছে, তাহা দেখাইয়া দিতেছে।
মীরা মুখোপাধ্যায়কে বে বিচারক মৃত্যু দিয়াছেন তিনিও বলিয়াছেন,
পাপপথ ছাড়া অজ কোন বিকল্প পথ। সে হয়ত খুঁজিয়া পাইবে না।
বিচারকের এই আশঙ্কাকে মিথ্যা করিয়া তোলায় দায়িত্ব সমাজের
এবং সরকারের, জনকল্যাণের ভার যাঁহারা লইয়াছেন।”

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

হুঁসিয়ার

“কমিউনিষ্ট মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে এই ভাবে শ্রীনেহরু মাছুষের মন
তৈরী করার চেষ্টা করিতে পারেন, কিন্তু ইহাতে ভারতের গণতন্ত্র ও
সংবিধানকে যে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি আঘাত করিতে চায় তাদেরই
সাহায্য করা হয় মাত্র এবং শ্রীনেহরুর উপরেও এই আঘাত যে পড়িবে
তাহা তিনি তুলিয়া যাইতেছেন অথবা তিনি স্বেচ্ছায় ভারতের
রাজনীতিতে এই হুঁদের ডাকিয়া আনিতেছেন। কমিউনিষ্ট-বিদ্বেষের
ফলে শ্রীনেহরু নিজহাতে এই ভাবে ফ্রাঙ্কেনষ্টাইন তৈরী করিতেছেন।
তাই আমরা বলি, পরিস্থিতি অতীব জটিল করিয়া তোলা হইতেছে।
অবস্থা আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া বাইবার পূর্বেই শ্রীনেহরু ও কংগ্রেস
হাইকমান্ডকে আমরা হুঁসিয়ার হইতে বলি। আপনাদের নিজেদের
তৈরী সংবিধানকে, আপনাদের নিজেদের প্রতিক্রান্ত গণতান্ত্রিক
পদ্ধতিকে নিজহাতে আঘাত করার পথ আপনাদের পরিত্যাগ করুন—
ইহাই আজ সমগ্র ভারতের দাবী।”

—স্বাধীনতা।

কেরলে কংগ্রেস

“সংবাদে প্রকাশ, কেরলে শিক্ষা বিল নিয়ে অশান্তির সৃষ্টি
হয়েছে। এই অশান্তিতে কংগ্রেস, পি, এস, পি, মুসলিম লীগ ও
ক্যাথলিক দল অংশ গ্রহণ করেছে। বিলের উপকারিতা বা
অপকারিতা নিয়ে আলোচনা না করাই ভাল। কারণ একদল
এটাকে ভাল মনে করে দেশের মঙ্গলের জন্ত এই আইন চালু
করতে চলেছে। অপর দল এটাকে মন্দ বলে আইন চালু না করার
জন্ত কমিউনিষ্ট সরকারকে চাপ দিচ্ছে। তাহা ধূয়ো তুচ্ছ এটা
চালু হলে দেশের চরম সর্বনাশ হবে ইত্যাদি। আজ সব চেয়ে
আশ্চর্য্যের বিষয় হয়েছে কংগ্রেস কেরলে মুসলিম লীগ ও ক্যাথলিক
দলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আন্দোলন চালাচ্ছে। ধর্মের উপর ভিত্তি
করে ঝাড়িয়ে আছে বাবা ধর্মের দোহাই দিয়ে তারা ভারতের চরম
সর্বনাশ করেছে। তাদের সঙ্গে হাত মিলাবার কথা কংগ্রেসীদের
নয়। কংগ্রেস ধর্মনিরপেক্ষ দল। মুসলিম লীগ চায় ভারতের
ভিতরে গোলমাল লাগিয়ে অশান্তির সৃষ্টি করে কোন সুযোগ
ঘটিয়ে দিতে। যে প্রতিষ্ঠান ভারতের বুকে মাছুষ হয়ে ভারতের

অল্পকালে বড় হয়েছে সেই প্রতিষ্ঠান ভারতের বৃহৎ ছুরি বসিয়ে বিভক্ত করেছে। যে প্রতিষ্ঠান ভারতের প্রতি বেইমানী করেছে, সেই বেইমানীদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে কংগ্রেস আন্দোলন চালাচ্ছে না নিজের খেয়াল-খুশি মত তারা কাজ করছে, সেটা জানবার বিষয়। যদি নির্দেশ না নিয়ে তারা এই আন্দোলন চালাচ্ছে তবে তাদের কাছে কৈফিয়ৎ করা হোক, কেন তারা বেইমানীদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়েছে।”

—গ্রামের কথা (চুবরাজপুর)

খাতসঙ্কট

“কয়েক বৎসরের উপরূপরি অভিজ্ঞতার দেখা গিয়াছে যে এদেশে অজ্ঞান বা অশিক্ষিত স্থায়ী আসন পাতিয়া বসিয়াছে অথচ খাত-সঙ্কটের স্থায়ী প্রতিকার পাওয়া বাটতেছে না এবং যাহারা উৎপাদক তাঁহারাও সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া আসিতেছেন। জমির মালিক আজ রাষ্ট্র বা সরকার। সরকার যেমন তাঁহার অধীনস্থ চাকুরিয়ারদের মাহিনা ছাড়াও ভবিষ্যতের আপদ বিপদের জন্য প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন অল্পরূপভাবে খাত বা খাত উৎপাদকদের জন্যও প্রতি গ্রামে প্রভিডেন্ট গোলা বা সঙ্কটগ্রাণ গোলা স্থাপন করত উৎপাদকদিগকে আপদ বিপদে রক্ষার ব্যবস্থা করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে। প্রতি গ্রামে উৎপাদকদের জন্য প্রভিডেন্ট ফাণ্ডস্বরূপ স্থায়ী ধর্ম বা সর্বোদয় গোলা বা সঙ্কটগ্রাণ গোলা স্থাপিত হইলে শুধু উৎপাদকেরাই খাতসঙ্কট হইতে ত্রাণ পাইবে না, তদ্বারা পল্লীর অন্ত্যজেরাও খাতসঙ্কট হইতে ত্রাণ পাইবে।”

—প্রলাপ (মেদিনীপুর)

জানিতে চাহি

“পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য হরিজন সম্প্রদায়ের মধ্যে আগ্রহ লক্ষ্য করিয়া আমরা বিশেষ আনন্দ বোধ করিতেছি। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, স্থানে স্থানে গ্রাম্য মাতঙ্গরগণ এখনও তাহাদের পূর্ব-অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া হরিজনদের উপর নির্ভাতন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কোথাও কোথাও সরকারী কর্মচারিগণের অসহায়তার ফলে অজ্ঞ হরিজন ভোটারগণের ভোট লইয়া নানারূপ কারসাজি করা হইয়াছে। রাজনৈতিক দলের দ্বন্দ্বের পড়িয়া দলীয় প্রচারে সাহায্য করা হইয়াছে ও পক্ষপাতমূলক আচরণ করা হইয়াছে বলিয়া অভিযোগ পাওয়া বাইতেছে। গুজরা, খেড়গ্রাম ও ভাতাড় থানার নারায়ণপুর হইতে এইরূপ অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে। এইরূপ অযোগ্য অসামান্য সরকারী কর্মচারী সম্পর্কে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তাহাই আমরা জানিতে চাই।”

—বর্ডমান।

সত্যের অপলাপ

“বকরি ঈদ ১৮ই জুন বৃহস্পতিবার। এই ঈদ উপলক্ষে এক সপ্তাহ পূর্বে যে সাপ্তাহিক বন্ধের দিন পড়িবে যদি কোন দোকানী ইচ্ছা করেন তিনি ঐ দিন খুলিয়া ঈদের সন্ধ্যা সাধারণে সরবরাহ করিতে পারিবেন। এই সম্পর্কে বর্ডমান বৎসরের ঈদের বিবর্ত

লইতে মুসলিম হইতে বহু হিন্দু দোকানীরা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের নিকট দরখাস্ত করিয়াছেন। আবার কলিকাতায় বহুসংখ্যক দোকানীরা ঈদের বিবর্তের নাম করিয়া “জামাইখটী” ময়তুমের এক দফা কেনাবেচা করিয়া লইয়াছেন। ঈদের প্রতি প্রচার দোহাই দিয়া জামাইখটীর জন্য ছুটির দিনে দোকান খুলিয়া সাধারণের গাঁটের পরসা শোষণ করিয়া লইবার দোকানীদের এই ফন্দি একেবারে নূতন! দোকান আইনের নিয়মাবলীর বিধানে জামাইখটীর জন্য কোন বিবর্তি নাই। কাজেই বকরি ঈদের দোহাই দিয়া জামাইখটীর বিবর্তি লইয়া দোকান খুলিয়া কেনাবেচা করা কত অশোভন বা সত্যের অপলাপ সাধিত হইয়াছে, ইহা যারা এই কাণ্ড করিয়াছেন তাঁদের মধ্যে সফলেই জানেন যে ঈদের নাম করিয়া জনসাধারণ ও শ্রমিক ঠাকাইবার বিরুদ্ধে উদ্ভূত মায়াজাল বিস্তার করিয়া সাধারণের চোখে ধূলা দিয়াছেন। প্রমাণ-স্বরূপ বলা যাউতে পারে যারা ঈদের নামে জামাইখটী করিয়াছে তারা ঈদের পূর্বদিন বা ঈদের দিনে দোকান খুলিবেন না। কারণ তারা সরকারী ধর্তে লিখিয়া দিয়াছেন পরবর্তী সপ্তাহে ছুটির সঙ্গে পূর্বের কতিপয় ছুটি অবশ্য কর্মচারিগণকে দিবেন। যাহারা বিবর্তি লইয়া আসেন তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ মালিক বিবর্তিতে অতিরিক্ত খাঁনির মজুরী বা ছুটি শ্রমিকগণকে দেন না। এবং ঐ সব আদায় করা যে বিধান আছে তাহা সম্পূর্ণ অচল ও মালিকের অস্থূল। এই অপকৌশল বন্ধ হওয়া সম্ভব।”

—দোকান-শ্রমিক (কলিকাতা)।

পরীক্ষায় অপূরণীয় অপচয়

“গতবার আই-এ পরীক্ষায় শতকরা ৫১জন পাস হইয়াছিল। এবার শতকরা ৬২জনকে ফেল করান হইয়াছে। পাশাপাশি আই-এস-সি পরীক্ষার হার কিন্তু ৫১জন। কে ইহার রহস্য ভেদ করিবে? ছেলেরা না পড়িলেও পাস করাইতে হইবে, এমন কথা কেহই বলিবেন না, কিন্তু দুই বৎসর কাল খরচ বহনের পর এই শোচনীয় ফলের জন্য কৈফিয়ৎ দাবী সকলেই করিতে পারেন। আম্রচর্চার বিষয়, ইহাদের পাসের যোগ্য বলিয়া যে সব প্রফেসার সুপারিশ করেন, এবং যে সব প্রিন্সিপাল টেট পরীক্ষায়ে ইহাদের উপযুক্ত বলিয়া ছাড়পত্র দেন, তাহাদের শতকরা ৬২জন ফেল হয় কেমন করিয়া? একবার কোনই জবাব নাই। ফাইনাল পরীক্ষায় তো কলেজের এই সব প্রফেসার ও প্রিন্সিপাল মহাশয়েরাই থাভা দেখেন। টেটে তাহারা বাহাদের উপযুক্ত সাব্যস্ত করিয়াছিলেন, দু’-এক ক্ষেত্রে হয়ত ব্যতিক্রম হইতে পারে, কিন্তু শতকরা ৬২জন সফল হইবে বা তাহাদের মারাত্মক তুল হইয়াছিল কি করিয়া? আর যদি তাহারা টেটে অল্পযুক্তই ঠাওরাইয়া থাকেন, তবে তো না পাঠাইলেই অভিভাবকদের আর সমধিক অর্থদণ্ড হইত না? আজ যদি কর্তৃপক্ষের শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা কম দেখাইবারই ইচ্ছা থাকে, তবে তো পরীক্ষার্থী নির্বাচনের পূর্বেই কতক আটকানো উচিত। তাহাকে বিশ্ববিদ্যালয়েরও হুন্দরী বন্ধ হয়, অভিভাবকদেরও অপূরণীয় আর্থিক ক্ষতি সহ করিতে হয় না। বিজ্ঞান শিক্ষার উৎসাহ দিতে হইবে সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া চাককলা বিভাগের প্রতি এতটা নিষ্ঠুর হওয়া কি ঠিক? পেটের ভাতের জন্য বিজ্ঞানের চাহিদা বাড়িয়াছে সত্য, কিন্তু জাতির মর্যাদার জন্য সাহিত্য ও

সংস্কৃতির দিকটা উপেক্ষা করা যায় না। তা'হাড়া বিজ্ঞান শিক্ষার উপযোগী সংস্থা বর্তমান না বাড়িতেছে, তত দিন এদিকে উপেক্ষা বৃদ্ধি পু'ই ক্ষতিকর নহে কি? সমাজ আজ জন্মভাবে যুগ্ম। অভিব্যক্তির অতিকষ্টে ছেলেমেয়েদের শিক্ষার খরচ জোগাইতেছেন।

—পল্লীবাসী (কালনা)

সেটেলমেন্ট

“কৃষিপ্রদান অর্কস আমাদের এই মহুকুমায় জমিজমার মালিকানা স্বত্বস্বত্ব সাধারণের নিকট বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, জীবন-মরণ সমস্তা পর্যায়ভুক্ত বলিলেও চলে। এ-হন বিভাগের কার্যকলাপ আশ্রিত হইতে যেন এক ভীষণ অবলোবন্ত রাজত্বের কাণ্ড কারখানার মতই চলিতেছে। এরকম মানুষ এতদেশে বোধ হয় খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না যে এই ত্রিভাঙ্গদেশ সসারের সেটেলমেন্টের ধর তাপে তপিত হইয়া কিঞ্চিৎ কষ্ট ভোগ করেন নাই। মাঠের কার্যরত হইতে ধারার পর ধারার কার্যক্রমে অতিক্রম করিতে করিতে এখন ৪৪ ধারা ও ৪৪ ১ ধারার ও ৪৪ ২ ধারার বিচার ব্যাপার এমনভাবে হইতেছে যে জনসাধারণ উহাকে অজ্ঞধারার মতই মনে করিতেছে। বিশেষ ঐ ধারার বিচার কালের নোটিশ জারি ও নকল পাওয়ার ব্যাপার নাকি অসহনীয় অবস্থার উল্লেখকর। প্রকাশ, নকল পাইতে ২।১ মাস বা ততোধিক সময়ও প্রায় লাগিয়া যায়। আর সে নকল যদি জেলার হয়ত ২।৩ মাস বা ততোধিক সময়ও যায়। জরুরি কি দিয়া ও তথ্যের মাসাধিক সময়ের মধ্যে পাওয়ার সভাবনা হয়। সাধারণের ধারণা বহুজামত অনর্থক অর্থব্যয় জন্ম, রামের জমি শ্রামের নামে বা কমবেশী করা হইয়াছে এবং শিতা-পুত্রের পদবী তুল লেখা হইয়াছে, ইত্যাকার কার্যাদিও বাহা অতি অল্প সময়ের সম্পন্ন করা যাইতে পারে তাহার জন্মও পক্ষ সাধারণকে প্রায় ইচ্ছাকৃত ভাবে একাধিক বার হারান হইতে বাধ্য করা হয় যে তাহা সম্ভাব্য-প্রায়। এমনি ঘটনার অভিযোগ আছে যে, প্রথমে বা সরজমিনে যে নাম বা বাহা লেখা হইয়াছিল তাহার রদবদল হইয়াছে বা খাতার পাতাটাই বদল হইয়া গিয়াছে কোন অজাত ব্যবহার হস্তস্পর্শে। সর্বোপরি আছে পুত্র চুরির মত কথা। কাঁথি অফিস হইতে গোটা দুই হাতে লেখা বেকর্ড ভলিউম উঠাওর কথা, বাহা লোকে বিশ্বাসই করিতে চায় না, প্রকাশ তাহা সত্যই হইয়াছে। ইহাতেই প্রমাণ হইতেছে এই বিভাগে কি দুর্নীতির ব্যাপার চলিতেছে ও কত দুর্নীতিপরায়ণ লোক ইহার মধ্যে রহিয়াছে। সেইজন্য মনে হয়, বিভাগের কর্মচারীরা অধিকাংশই কি নিজেদের ভবিষ্যৎ বন্দোবস্ত করিয়া লইতে বহুপরিকর হইয়াছেন?”

—নারায়ণ (কাঁথি)

পাঠ্যপুস্তক ও ব্যবসা

“এ বৎসর এত বেশী সংখ্যক পাঠ্যপুস্তকের সংখ্যা বাড়িয়াছে যে উহার সংখ্যা নির্ণয় করা কঠিন। কি প্রাথমিক, কি মাধ্যমিক

বিভাগে একই শ্রেণীতে ছাত্র-ছাত্রীদের হরেক রকম বই দেখিলে আশ্চর্য্যবিত্ত হইতে হয়। নূতন পাঠ্যপুস্তক সংগ্রহের থাকা অভিভাবকগণকে বিভ্রত করিয়াছে। কোন কোন স্কুলের পড়ার দেখা যায়, একখানি বইর হয়ত আংশিক পড়া হইয়াছে বা বইটির পড়ার অনেক অসমাপ্ত রহিয়াছে নূতন সেসনে স্কুল কর্তৃপক্ষ উহা পরিবর্তন করিয়া পুনরায় নূতন বই চালু করিতেছেন। ইহাতে অভিভাবকবৃন্দের মনে একটা বিভ্রম। ভাব জাগিতেছে এবং ছেলে-মেয়েদের পুস্তক সংগ্রহ যেন সমস্তাংশেই দেখা দিয়াছে। দেশে শিক্ষিত লোকের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একশ্রেণীর পুস্তকলেন্থকের সংখ্যাও বাড়িয়াছে। পুস্তক প্রকাশকগণ স্কুলে স্কুলে কানাইসার পাঠাইয়া বইগুলি যত বেশী তথ্য করিতে পারিয়াছেন, তাহাদের বইগুলিও সেই মত মনোনীত হইয়াছে দেখা যায়। বই মনোনয়ন লইয়া যেন একটি ব্যবসা চলিতেছে এবং শিক্ষাক্ষেত্রেও যেন উহার প্রসারলাভ ঘটতেছে। কিছু সংখ্যক শিক্ষক নাকি এ বৎসর প্রাথমিক স্কুলে পাঠ্যপুস্তক বিক্রয় দ্বারা ব্যবসায়ী নীতি অনুসরণ করিয়াছেন জানা যায়। ইহাতে শিক্ষার পরিবর্তে শিক্ষাক্ষেত্রে অর্থোপার্জনের পথই প্রধান লক্ষ্য হইয়া উঠিবে। এ বিষয়ে প্রকৃত শিক্ষামুখী ও শিক্ষা বিভাগ কর্তৃপক্ষের তীব্র দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।”

—নীহার (কাঁথি)।

শোক-সংবাদ

প্রবোধচন্দ্র চৌধুরী

বাঙলার বর্ষায়ান শিল্পপতি প্রবোধচন্দ্র চৌধুরী গত ২৪এ জ্যৈষ্ঠ ৮৪ বছর বয়সে পরলোক গমন করেছেন। ব্যবসায়ী হিসাবে ক্ষুদ্র পরিমণ্ডলের জীবন শুরু করে অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়ে অক্লান্ত সাধনার স্বীকৃতিস্বরূপ পরবর্তীকালে ইনি শ্রীওয়েলস প্রিন্স একাধিক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টরের আসন গ্রহণে সক্ষম হয়েছিলেন ও ভারতের একজন অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ শিল্পপতি হিসেবে বহুজনের শ্রদ্ধা লাভ করেছেন। সমাজোন্নয়নে তাঁর দান কম ছিল না, বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠান তাঁর দানে পুষ্ট হয়েছে। কয়েকটি গ্রন্থেরও তিনি রচয়িতা ছিলেন।

নির্মলাবালা ঘোষ

মহাত্মা শিবিরকুমার ঘোষের ভ্রাতুষ্পুত্র বর্গীয় পরিমলকান্তি ঘোষের সহধর্মিণী এবং বিশিষ্ট সংবাদপত্রসেবী শ্রীমুকুলকান্তি ঘোষ ও শ্রীশ্রদ্ধাকান্তি ঘোষের স্ত্রী নির্মলাবালা ঘোষ মহাশয়া গত ২২-এ জ্যৈষ্ঠ ৬৬ বছর বয়সে দেহরক্ষা করেছেন। ইনি অতিশয় ধর্মপ্রাণা ছিলেন, অপরের দুঃখ-কষ্ট একে বিশেষভাবে বিচলিত করত, সমাজোন্নয়নেও জনহিতকর মহৎ প্রচেষ্টায় প্রতি তাঁর সহায়ত্ব ও আন্তরিকতা ছিল অপরিমিত। শোভাবাজারের প্রান্তঃসরগীর রাজা শ্রায় বাধাকান্ত দেব বাহাদুরের বংশে ইনি জন্মগ্রহণ করেন।

সম্পাদক—প্রোগতোর ঘটক

কলিকাতা ১৬৬ সং বিশিষ্টবাহারী গাঙ্গুলী ঠাই, “বহুমতী বোটারী যেসিবে” ঐতায়কনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত



বৌদ্ধ পঞ্চশীল

গত চৈত্র সংখ্যায় (১৩৬৫) শ্রীমতী আশা হায়ের “বৌদ্ধ পঞ্চশীল” নিবন্ধটি স্মরণীয়। তবে কয়েকটি বিষয় আলোচনার যোগ্য বলে মনে করি। আধুনিক Political মার্কা ‘Panch Sila’ নয়—বৌদ্ধশাস্ত্রে দশটি শীলের উল্লেখ আছে। পালনীয়—অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ। বর্জনীয়—সুসাপান, অপবাহু ভোজন, নৃত্য-গীত, উচ্চাসন গ্রহণ এবং স্বর্ণ-রৌপ্য ধারণ। পৃথিবীর প্রায় সকল ধর্মের ভিত্তরই এই দশ বনাম পঞ্চশীল এমন কি আরও অধিক সংখ্যক শীলাচরণের বর্ণনা আছে। বুদ্ধ-জন্মের হাজার হাজার বছর আগে হিন্দু বনাম আর্যধর্মের ঐতিহ্য ও স্মৃতিগ্রন্থে বচিৎ হয়েছে। স্মৃতি-গ্রন্থ বলতে—গীতা, ভাগবত, পুরাণ, মহাভারত ইত্যাদিকে বুঝায়। এ সব গ্রন্থে অহিংসা থেকে আরম্ভ করে বৌদ্ধশাস্ত্রে বত শীলের উল্লেখ করা হয়েছে, এ ছাড়াও আরও বহু পালনীয় ও বর্জনীয় লৌকিক শীল-জ্ঞানের বিস্তৃত উল্লেখ আছে। বস্তুত পাতঞ্জল দর্শনের অষ্টাঙ্গ যোগমার্গ ও বৌদ্ধ পালনীয় পঞ্চশীলের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। অতএব শীলতত্ত্বের দিক থেকে উহা ‘সর্বপ্রথম ভগবান বুদ্ধেরই শ্রীমুখ-নিঃসৃত’ এরূপ উক্তি ঠিক নয়। পৃথিবীর প্রায় সকল ধর্মেই ঈশ্বরতত্ত্ব প্রাধান্য লাভ করেছে। বৌদ্ধধর্মের বৈশিষ্ট্য—ঈশ্বরতত্ত্ব, আত্ম-পরমাত্মতত্ত্ব এবং ব্রহ্ম-সামুদ্রাদি পঞ্চবিধ যুক্তিতত্ত্ব একেবারে বর্জিত। আছে—“জীবের আত্যাত্মিক হৃৎকের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য একমাত্র নির্বাণতত্ত্ব।” কেবলমাত্র ‘শীল’ সাধনাই ‘অতীন্দ্রিয় জ্ঞান, শান্তি, শাশ্বত সত্যের উপলব্ধি আনয়ন’ করতে সমর্থ হয়। শীল-সাধনা লৌকিক বা ব্যবহারিক সত্য সাধনার প্রতীক। পারমার্থিক সত্য সাধনার আশ্রয় যে শীলসাধক নয়—এ কথা শক্তিশালী বৌদ্ধ লামা-মোহীরাও (অবশ্য ‘God-King’ নয়) স্বীকার করবেন। বৌদ্ধ শাস্ত্রে যোগাচার আছে। অতীন্দ্রিয় জ্ঞান বা নির্বাণ মুক্তির জন্য ধ্যান, প্রজ্ঞান, শ্রেণিধি, পরিমিতা ইত্যাদির অমুশীলন বা সাধনার প্রয়োজন স্বীকৃতিও আছে। অজুস্তর নিকারে যোগাচার বসণে ৬ বিত্ত’ক মার্গে এই সাধন প্রণালীর উল্লেখ আছে। অবশ্য সব সাধনই গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবীতে নয়। বৌদ্ধধর্মেও এর ব্যতিক্রম নাই। যুক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রাচীন মত—“তমেব বিদিত্বাতি যত্নাযোতি নান্যঃ পন্থা বিজ্ঞেহয়নার”—সচ্চিদানন্দধন পরব্রহ্মকে জানাই সংসার নিবৃত্তির কারণ। এ ছাড়া আর কোন পথ নেই। ‘হিন্দুধর্মের পরিপূর্ণ বিকাশ’ কি করে বৌদ্ধধর্মে হল—এ প্রশ্নোত্তর। অধ্যাত্ম যাত্রার ওষু অনন্ত। হিন্দুধর্ম যে সকল তত্ত্বলাভ করেছে তন্মধ্যে—ব্রহ্মতত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব বা আত্মা ও পরমাত্মা বিষয়ক তত্ত্ব, অদ্বৈত ও দ্বৈততত্ত্ব এবং ব্রহ্ম-সামুদ্রাদি পঞ্চবিধ যুক্তিতত্ত্বের স্থান

বৌদ্ধধর্মে নেই। যদিও হিন্দু-শীল ও বৌদ্ধ-শীল একাকার হয়ে গিয়েছে কিন্তু বৌদ্ধধর্মের ঐ নির্বাণ মুক্তি ও হিন্দুধর্মের ব্রহ্মসামুদ্র, সাত্বি, সামোশা, সারূপ্য ও সালোকা মুক্তি এক জাতীয় নয়। নির্বাণের লক্ষ্য—জীবের আত্যাত্মিক হৃৎকের নিবৃত্তি। হিন্দু চার—বিষয়-তৃষ্ণার নিবৃত্তি। ‘আবৃত্তঃ জ্ঞানযেতেন...কামরূপেণ...দৃশ্পূরণানলেন চ।’ গীতা, ৩।৩১। বিষয় বাসনা জ্ঞানকে অর্থাৎ আত্মজ্ঞান বা পর-জ্ঞানকে আবৃত্ত করে রেখেছে। এই কাম বা কামনা বা বিষয়তৃষ্ণাকে জয় করতে পারলেই সমস্ত হৃৎকের শান্তি হয়। বৌদ্ধশাস্ত্রে এই নিবৃত্তির পরে আর কোন উল্লেখ নেই। কিন্তু হিন্দুধর্মে হৃৎক-নিবৃত্তিই একমাত্র চরম তত্ত্ব নয়। হৃৎক নিবৃত্তির অতীত হয়েও হিন্দু চার মুখ। অবশ্য উহা এই জগতের Materialistic ‘মুখ’ নয়, উহা ‘ব্রহ্মানন্দঃ পরমসুখমম্’—সুখ তথা ভগবদপ্রেম-বাসনা সুখ। অতএব ‘পরিপূর্ণ বিকাশ’ বা ‘Fulfilment of Hinduism’ শুধু মাত্র ভাব প্রবেশ উচ্চাস বা কৈতববাদ ছাড়া আর কী হতে পারে? হিন্দুধর্ম একটি Democratic ধর্ম। মহাদেশের মত এটিও একটি মহাদর্ম। অন্য সব শুধু ধর্ম। ব্যক্তিবিশেষের মতবাদ বা creed নিয়ে হিন্দুধর্ম তথাকথিত Religion নয়। এ ধর্মের ব্যাপ্তি ও প্রসার কল্পনাশীত। এ ধর্মে আছে স্বাধীন চিন্তাবাদ ও যুক্তিবাদ। আছে—আন্তিক্যবাদ, নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদ, সবিশেষ ব্রহ্মবাদ, সাকারবাদ, নিরাকারবাদ, চার্ভাকীর নাস্তিক্যবাদ ইত্যাদি। বৌদ্ধধর্ম বিশাল হিন্দুধর্মের একটি অঙ্গ ছাড়া আর কিছুই নয়। যদিও বৌদ্ধধর্মকে হিন্দুধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে—অবশ্য কারণটা Political. পরিশেষে, ‘মানবের জীবন-মরণ সুখদুঃখের হৃৎকের চেতু পরম্পরার জটিল সমস্তার সকল সমাধান যদি কোথাও হইয়া থাকে, তাহা ভগবান বুদ্ধের নির্দেশিত মার্গেই হইয়াছে। এ উক্তি অতি উচ্চ-প্রশস্তি বাচক—সন্দেহ নেই। কিন্তু হৃৎকের বিষয়, হিন্দু দর্শনের কটিপাথরে এই অত্যন্তির স্বর্ণ-মেখলা থেকে বহু অসঙ্গতির খাদ নির্গমিত হবে। অতএব তেখিকা রোমাঞ্চদর্শন, উপনিষদ, গীতা, ভাগবত, পাতঞ্জল দর্শন এবং মহাভারতের অন্তত শান্তিপর্বট পাঠ করুন; তবে বিচারসহ প্রকৃত ‘মার্গ’ উপলব্ধি করতে পারবেন। —হেম সান্ন্যাসী, মহাজাতিনগর কলোনি, কলিকাতা—২৮।

জানতে চাই

আপনার কাছে বিনীত নিবেদন এই যে,—(১) আপনার সম্পাদিত “মাসিক বসুধাতী” বেশ ভাল মাসিক পত্রিকা। আমি বইখানি এইখানে ত্রিপার্বতীশঙ্কর রাধের নিকট হইতে লইয়া পড়ি। ইহাতে ত্রিপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর লিখিত ‘অনন্দ-বুদ্ধাবন’ এর বাংলা অনুবাদ পড়িয়া বিশেষ তৃপ্তি পাইয়া থাকি। তহিলাম, পুস্তকাকারে

ঐগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। (২) বসুমতী সাহিত্য মন্দির হইতে প্রকাশিত বাতীর ভক্তিমূলক গ্রন্থের একখানি Catalogue দিয়া করিয়া আমার নিকট পাঠাইলে বিশেষ অগ্রগৃহীত হইব। আমি কয়েকখানি ভক্তিগ্রন্থ বখা—বালা পণ্ডে জীমদভাগবত, শ্রীকৃষ্ণ, ভক্তমালা, নীলাসলে শ্রীমৎ চৈতন্যদেব ইত্যাদি বৈষ্ণব সাহিত্য ও শ্রীমণী শ্রীকৃষ্ণ পদাবলী সাহিত্য বাহা আপনারা ছাপাইয়াছেন তাহা আমাদের রাজবাড়ীর লাইব্রেরীর জন্য কিনিবার ইচ্ছা পোষণ করি। আমাদের Superintendent, Jambhari Estat: (Sri Jagannath Dhabal Deb)-এর নামে আমাদের এণ্টেট হটতে “মাসিক বসুমতী” নিয়মিত ভাবে লওয়া হয়। (৩) একটি কবিতা, আমার স্মৃতি হইতে বিদ্যুত হইয়াছে—উষার বর্ণনা ১ম লাইন “প্রভাতপ্রতিভারকা ফুটহটী-উষা করোতুরতিম্ (বা মঙ্গলম্) উষা বাতীর সময় উহার প্রয়োজন হয়। আপনারা লক্ষ্যচাৰ্য্য মতোদয় অবগত জানেন, মনে করি। আর একটি কবিতা “হরিবৈব জগৎ জগদেব হরিঃ, হরিতো জগতো ন হি ভিন্নতঃ। ইতি বস্ত্র মতিঃ পরমার্থগতিঃ স নরো ভবনাগব-মুদ্রগতিঃ।” এই শ্লোকটি কোনখানে আছে দয়া করিয়া সন্ধান দিলে সাধিত হইব। আপনার মাসিক বসুমতী একাধারে বহু বিষয়-সম্বিত, বাল বৃদ্ধ-মহিলা সকলেরই উপযোগী খাত উহাতে সন্নিবেশিত। বর্তমানে উহা যে অত্যন্তনীর তাহা অনস্বীকার্য্য—প্রণব—শ্রীমদ্বীকেশ পাল। (M. A. B. T. Guardian Teacher to the Raj Estate for past 3 decades)

পত্রিকা সমালোচনা

মহাশয়, ছেলঃবালা থেকেই আমি ‘মাসিক বসুমতীর’ নিয়মিত পাঠক। প্রতি মাসেই বসুমতীর জন্ম উদ্গেব হয়ে প্রতীক্ষা করি শুধু আমি নয়, বাতীর অনেকেই। কিন্তু এক বছরের উপর হোল বোগশবার বসুমতীর জন্ম ব্যগ্রতা বেন আরো বেড়ে গেল। দিশপকুমার বারের ‘ভাবি এক, হয় আর,’ স্মরণে দাশগুপ্তের ‘বর্ণালী,’ নীলমা দাশগুপ্তের ‘ইন্দ্রাণীর প্রেম, সুখপাঠ্য। বারি দেবীর ‘বাতিকর’ কি আর বের হবে না? হিমালীশ গোস্বামীর ‘লগনের পাড়ার পাড়ার’ অনেক বাল্যবন্ধুদের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। দিনগুলি মোর কোথায় গেল। সাধনা বসুর ‘স্মৃতির টুকরো’ মনটাকে হৃদের অতীতে টেনে নিয়ে যায়, আনন্দের সঙ্গে বিবাদের সন্মিশ্রণে মন এক অদ্ভুত অল্পকৃতিতে উদ্বেল হয়ে ওঠে—এ বেন sweetest song telling of saddest thoughts. আমার এ বোগশবার সহচর আমার মত আরো অনেকের প্রাণে আনন্দের উৎস হয়ে উঠুক।—জীতেন চক্রবর্তী, ওয়ার্ড বি—১, কাঁচড়াপাড়া টি, বি, হাঙ্গপাটাল, নদীয়া।

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

I am now sending Rs. 15/- towards next one year's subscription and have to request you to kindly continue sending me copies of Monthly Basumati from the month of Baisakh.—Mrs. Kamala Ganguly, Balajinagar, Madras.

Please accept my half yearly subscription of M. Basumati—Mrs. Suprova Chowdhury M. A. D, Litt.—Delhi

I am remitting herewith the subscription of Monthly Basumati for the year 1366, kindly arrange to send the magazine.—Arati Rani Sinha—Allapalli P. O. Dist. Chanda.

বার্ষিক মূল্য ১৫/- পাঠালাম। বিশেষ ক্রটি মার্জনা কোরবেন—শ্রী শ্রীমণীকান্ত ভট্টাচার্য্য, জবরলপুর।

Sending Rs. 7/8/- by M. O. as six monthly subscription from Baisakh. Please continue Masik Basumati—Mrs. Kanak Maitra, M.A.—Kanpur.

Remitting Rs. 15/- only towards yearly subscription for the Monthly Basumati for the year 1366 B. S.—Hena De, Berhampore, Murshidabad.

বৈশাখ হইতে আশ্বিন মাসের বসুমতী পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।—Sm. Gouri Gupta, Dhanbad.

Reading Basumati reminds me of my childhood days in Bengal. Kindly renew subscription for another year.—Mahasveta Dutta, Sholapur (Bombay State).

বিশেষ কারণবশতঃ টাকা পাঠাইতে দেয়ী হইল। সেজন্য ক্ষমা করিবেন।—Bina Dutta, Ahmedabad.

আপনারাের সচিত্র সুদীর্ঘ কালের সম্পর্ক আরও ৬ মাস বাড়াইতেছি—মাধবী ঘোষ, কলিকাতা।

মাসিক বসুমতীর টাকা পাঠালাম। বৈশাখ থেকে পাঠাবেন—জীমত্যা লতিকা বিশ্বাস, নৈহাটী মিত্রপাড়া।

বৈশাখ মাস হইতে এক বৎসরের গ্রাহক মূল্য ১৫/- টাকা পাঠাইলাম। নিয়মিত ভাবে মাসিক বসুমতী পাঠাইয়া বাধিত করিবেন—অর্ণবী জিবেলী, Churchgate, Bombay.

নতুন বৎসরের বৈশাখ হইতে আশ্বিন পর্যন্ত ষাণ্মাসিক চাঁদ ১১/- পাঠাইলাম।—জীমতী অর্ণবী সান্যাল, হাজারিবাগ।

বৈশাখ ১৩৬৬ হইতে ১ বৎসরের গ্রাহক মূল্য ১৫/- টাকা পাঠাইলাম।—মায়া দাশগুপ্ত, Assam.

মাসিক বসুমতীর ৬ মাসের অগ্রিম মূল্য ১১/- টাকা পাঠাইলাম। বৈশাখ হইতে বসুমতী পাঠাইয়া বাধিত করিবেন—জীশাখিী বাজপেয়ী, মুর্শিদাবাদ।

Remitting half-yearly subscription of my monthly Basumati from Baisakh to Aswin.—Nilima Bose—Thanjhora Tea Estate.

Kindly continue to send Masik Basumati for a further period of one year.—Mrs. Lilabati Mukherjee.—Kanpore.

Sending herewith Rs. 7-50 N.P. as subscription for the monthly Basumati for six months from Baisakh to Aswin—Sm. Alo Sen Gupta. B. A.—Bombay.

অন্ত বার্ষিক দেয় ১৫/- পাঠাইলাম। বৈশাখ হইতে সংখ্যাগুলি সত্তর পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলে বিশেষ আনন্দিত হইব।—Sm. Lakshmi Rani Devi, Midnapore.





৩৮শ বর্ষ—আষাঢ়, ১৩৬৬]

॥ স্থাপিত ১৩২২ ॥

[প্রথম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা

কথামৃত

রাত প্রায় সাড়ে আটটা। মায়ের তক্তপোষের পাশে নীচে মাছুর পাতা হয়েছে। মা শোবার উত্তোঙ্গ করছেন। আমি বেতেই বললেন, “এস, এস, আমার কাছে এসে বস। একে একটু মিষ্টি দিয়ে জল খেতে দাও ত সরলা, সারা দিন খেটে আবার এই ছুটে আসছে।” আমি জল খেতে আগ্রহী করলুম, কিন্তু তা কানেও তুললেন না; বললেন “দেহের প্রতি একটু নজর রাখতে হয় মা, হুমতি তিন ছেলের মা হয়েই বেন বুড়ী হয়ে গেছে।” মা তাঁর আমবাতের কথা তুলে বললেন, “এ কি হল মা, লোকের হয় বার, আমার যেটি হবে সেটি আর ছাড়তে চায় না। ঠাকুর ব বলতেন ‘বত লোকে বোগ, শোক, পাপ, তাপ নিয়ে কত কি করে এসে ছোঁয় সেই সব এই দেহে আশ্রয় করে,’ তাই ঠিক মা—আমারও বোধ হয় তাই হবে। ঠাকুরের তখন অন্তঃ, কে সব ভক্তেরা (দক্ষিণেশ্বরে) মায়ের (কালীর) ওখানে পূজা দেবে বলে জিনিষপত্র এনেছিল, তা ঠাকুর কাঙ্গিপুরে জেনে সেই সব ঠাকুরের কাছেই ভোগ লাগিয়ে প্রসাদ পেল। ঠাকুর বলতে লাগলেন, ‘দেখেছ, কি অভয় করলে? জগদ্বার জন্তে এনে এখানেই সব দিয়ে দিলে।’ আমি ত ভয়ে বরি, তাই—এই ত অন্তঃ, কি জানি কি হবে। এ কি বাপু, কেন

ওরা এমন করলে। ঠাকুরও তখন বার বার তাই বলতে লাগলেন। ‘কিন্তু পরে যখন রাত অনেক হয়েছে তখন আমাকে বললেন, ‘দেখ—এর পর ঘর ঘর আমার পূজা হবে। পরে দেখবে—একেই সবাই মানবে, তুমি কোন চিন্তা কোরো না।’ সেই দিনই ‘আমার’ বলতে শুনলুম। কখনও ‘আমার’ বলতেন না। বলতেন ‘এই খোলটার,’ বা আপনার শরীর দেখিয়ে ‘এই এর।’ সংসারে কত রকমের লোক সব দেখলুম। ত্রৈলোক্য আমাকে সাতটি করে টাকা দিত। ঠাকুর দেহ রাখার পর (দক্ষিণেশ্বরের) দীক্ষা রাজাকী ও অগ্র সকলে লেগে ঐ টাকাটা বন্ধ করলে। আশ্রয় বারা ছিল তারও মাছুর-বৃদ্ধি করলে ও তাদের সঙ্গে বোগ দিলে। নরেনও কত বলেছিল, ‘মায়ের ও টাকাটা বন্ধ কোরো।’ তবু করলে। তা দেখ, ঠাকুরের ইচ্ছায় অমন কত সাত গুণা এল, গেল। দীক্ষা কী সব কে কোথায় গেছে। আমার ত এ পর্যন্ত কোন কষ্টই হয় নি। কেনই বা হবে? ঠাকুর আমাকে বলেছিলেন, ‘আমার চিন্তা যে করে সে কখনও খাওয়ার কষ্ট পায় না।’

—ঐজীমায়ের কথা।

রাষ্ট্রভাষা বিজ্ঞান ও বিচারপদ্ধতি

ত্ৰীপুলিনবিহারী বসু

ভারতীয় ভাষাসম্ভার মূলে প্রধানতঃ তিনটি প্রস্ন (১)

ভারতে কোনও জাতীয় ভাষা সম্ভব কিনা (২) সৰ্বভারতের সংযোগ সাধনের জন্ত এবং কেন্দ্রীয় শাসনের জন্ত কোন ভাষা গ্রহণীয় (৩) প্রাদেশিক শাসন ও শিক্ষা কোন্ ভাষায় হইবে ?

জাতি হিসাবে ভারতীয় জাতির অস্তিত্ব কোনও দিন ছিল না, বর্তমানেও নাই। হয়ত একটা জাতি গঠনের চেষ্টা হইতেছে। সকলোয় আশা কতটুকু বা গৃহীত ব্যবস্থা আমাদেরকে সত্যি কোন পথে লইয়া যাইতেছে সে আলোচনা বর্তমানে না করিলেও তাহা আন্দোলনে তাহার কতকটা আভাস পাওয়া যাইতেছে। কারণ, ভাষাগত ঐক্য সাধন শাসক সম্প্রদায় কর্তৃক গৃহীত উপায়গুলির মধ্যে একটি।

বাহারা এক ভারতের স্বপ্নে বিভোর তাঁহারাও এই অবিসংবাদিত সত্য স্বীকার করিবেন যে, ভারতে বিভিন্ন জাতি বাস করে। ভারতীয় মহাজাতি বিভিন্ন জাতির সমষ্টি মাত্র। এই সব বিভিন্ন জাতির মধ্যে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক একটা ঐক্যের ভাব থাকিলেও পার্থক্যের অভাব নাই। ধর্মাচরণে, সামাজিক আচার-ব্যবহারে এমন কি জীবন বাপন প্রণালী ও আদর্শে এই পার্থক্য স্পষ্টই প্রতিভাত হয়। এই সব পার্থক্যের মধ্যে ভাষা একটি। ভারতে একটি জাতীয় ভাষা প্রচলিত হইলে এই সব ভাষার পরিণতি হয় অবশুস্তি না কথিত ভাষারূপে অবস্থিতি। আইনের বলে ইহা কি সম্ভব হইবে ? এই সমস্ত ভাষাই বহু পূর্বে সাবালকত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে এবং এই ভারতে বাঁচিয়া থাকিবার শক্তি তাহাদের আছে।

ভাষাগত ও অজ্ঞাত পার্থক্য একদিনের সৃষ্টি নয়। প্রাকৃতিক ও সামাজিক শক্তি স্থানীয় প্রয়োজন ও বৈশিষ্ট্য, বহির্দেশ হইতে আগত নূতন নূতন জাতির সহিত সংমিশ্রণ ইত্যাদি নানা কারণে এই পার্থক্য গড়িয়া উঠিয়াছে এবং ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন জাতির সৃষ্টি হইয়াছে। সকলেই বলেন যে, সংস্কৃত আমাদের আদিভাষা। যখন সেই এক আদিভাষা হইতে এতগুলি বিভিন্ন ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে তখন ইহা মনে করিলে অস্বাভাবিক হইবে না যে, আজ যদি সৰ্বভারতের অঙ্গ একটি ভাষা গৃহীত হয় তাহাও কালক্রমে বিকৃত হইতে হইতে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়া বিভিন্ন ভাষায় পরিণত হইবে। নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানও এই পার্থক্যের জন্ত অনেকটা দায়ী। একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, বহু আবাসী এই বাঙ্গলাদেশে পুরুষাভুক্রমে বাস করিয়াও এই দেশের নামটা ঠিক উচ্চারণ করিতে পারেন না এবং বাঙ্গালীরাও বহু হিন্দী কথা হিন্দীভাষীদের মত বলিতে পারেন না। অহম্ম থেকে হাম্ম হামি, আমি ইচ্ছাকৃত নয়, বৈশিষ্ট্যর ফল। অতীতে যেমন এক ভাষা হইতে বিভিন্ন ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে ভবিষ্যতেও তাহারই পুনরাবৃত্তি নিশ্চিত। আজ যদি বাহুবলে এক ভারতীয় জাতি ও এক ভাষার সৃষ্টি হয় কাল সেই একত্ব থাকিবে কিনা সন্দেহ। বাহার হারিষ সন্দেহের বিষয় তাহা গড়ার চেষ্টা নিফল পরিশ্রম মাত্র।

আশার চশমা চোখে পরিয়া ভবিষ্যতের দিকে না তাকাইয়া নগ্নচক্ষু বর্তমানের উপর নিবদ্ধ রাখাই শ্রেয়ঃ। আশার চশমা পরিয়া দেখিলাম, দেশ ভাগ করিলে হিন্দু-মুসলমানের সব দ্বন্দ্ব মিটিয়া যাইবে আর চারিদিকে বিরাজ করিবে চিৎশান্তি। কিন্তু এখন দেখিতেছি, সেই দ্বন্দ্ব হাকামা হইতে যুদ্ধের পর্বায়ে উন্নীত হইয়াছে আর শান্তির মাধুর্য্যে মাহুয হারাইতেছে মনুষ্যত্ব, নারী হারাইতেছে নারীত্ব ; চতুর্দিকেই উৎপাটিত ছিন্নমূল মাহুয—বাহাদের পক্ষে জীবন ধারণ হইয়াছে ধানি ও অপমানকর। দশ বৎসরের স্বাধীনতা ভারতবাসীকে সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতা বর্তমানের ভাষার আঞ্চলিকতা হইতে কতটা মুক্ত করিয়াছে এবং জাতীয়তার কতটা অম্প্রাণিত করিয়াছে তাহা নগ্নচক্ষু দিয়া দেখিলে এবং ভাব ও স্বাক্ষর-বজ্জিত মন দিয়া বিচার করিলে এই কথাই বলিতে হয় যে, এক ভারতীয় জাতি আজও স্রুত্বের আশা ও কর্তৃকল্পনার বিষয় এবং একজাতীয় ভাষা অসম্ভব।

কিন্তু জাতীয় ভাষার অভাবে সৰ্বভারতের জন্ত একটি ভাষার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কারণ, এই ভাষা দ্বারা ভারতের বিভিন্ন জাতির সংযোগ সাধিত হইবে এবং ইহাই হইবে কেন্দ্রীয় শাসনের ভাষা। এই ভাষাটি এমন হওয়া চাই বাহা প্রদেশগুলি নিজ স্বার্থে ও প্রয়োজনে যতদূর সম্ভব অল্প আশ্রাসে এবং বেচ্ছায় গ্রহণ করিতে পারে।

ভাষা সম্বন্ধে বাহারা আলোচনা করিতেছেন তাঁহারা সকলেই স্বার্থহীন ভাষায় বলিতেছেন যে, প্রাদেশিক শাসন ও শিক্ষা প্রদেশের মাতৃভাষাতেই হওয়া উচিত। ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে শাসন ও শিক্ষা ঠিক সেই কারণেই আপত্তিজনক। মাতৃভাষা ছাড়া অন্য সব ভাষাই বিদেশী। হিন্দীভাষীর পক্ষে ইংরাজী যেমন বিদেশী ভাষা, বাংলাও তেমনই বিদেশী ভাষা ; মাত্রাজীর পক্ষে ইংরাজী ও হিন্দী দুই বিদেশী ভাষা। হইতে পারে, একটা বিদেশী ভাষার সঙ্গে নিজ মাতৃভাষার সম্বন্ধ নিকটতর কিন্তু তাহার বৈদেশিকতা ক্রমে লোপ পায় না। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশভাষী বিভিন্ন জাতির সর্বজনীন উন্নতি এবং স্বজনী শক্তি বিকাশের জন্ত শাসন ও শিক্ষার মাতৃভাষার ব্যবহার যে অপরিহার্য্য এবং মাতৃভাষা ব্যতীত তাহা সম্ভব নয়, ইহা সর্ববাদিসম্মত। সুতরাং সে সম্বন্ধে আলোচনা নিশ্চয়োজন। এই প্রসঙ্গ শেষ করিবার পূর্বে এইটুকু বলিতে চাই যে, মাতৃভাষার শাসন ও শিক্ষা মাহুযের জন্মগত অধিকার। মাতৃভাষা ব্যতীত অন্য কোনও ভাষা হইবে পরাধীনতার শৃঙ্খল। বেচ্ছায় কি কেহ এই অধিকার বর্জন করিবে এবং পরাধীনতার নিগড়ে আবদ্ধ হইবে ?

তবে দুঃখের বিষয় এই যে, এই সমস্ত প্রাদেশিক ভাষার মধ্যে কোনটাও এত উন্নত নয় যে তাহার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় শিক্ষা সম্ভবপর। শিক্ষার খাতিরে বর্তমানে ও ভবিষ্যতে বহুদিনের জন্ত ইংরাজী বর্জন অসম্ভব। অতি যৌর ইংরাজী-বিবেচনার বলন, মাধ্যমিক শিক্ষায় ইংরাজী আবশ্যিক হওয়া উচিত। সুতরাং আপাতত শিক্ষার্থীকে দুইটি ভাষা শিখিতেই হইবে—মাতৃভাষা ও

ইংরাজী। কিন্তু ইংরাজীকে চিরকাল এই উন্নত স্থানে বসাইয়া রাখিলে চলিবে না। শাসনকার্যে ইংরাজীর ব্যবহার বন্ধ হইলে তাহার গুরুত্ব অনেকটা কমিয়া যাইবে। বর্তমানে আমাদের উদ্দেশ্য হইবে যে শীঘ্র সম্ভব শাসনকার্যে মাতৃভাষার পূর্ণ প্রচলন এবং তদ্বারা মাতৃভাষার উপর রাজনৈতিক গুরুত্ব আরোপ এবং শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ঘরে ঘরে ইংরাজীর উচ্ছেদ।

ইংরাজীর আর একটি দিক আছে। ইহা একটি আন্তর্জাতিক ভাষা। এই ভাষার মাধ্যমে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের সহিত আদান-প্রদান সম্ভবপর এবং পৃথিবীর প্রকৃষ্টতম ভাষার কয়েকটির মধ্যে ইহা অন্ততম।

চীন জাপান প্রভৃতি দেশে বাহারা ইংরাজীভাষী নয়, তাহার। বহির্বিদেশের সহিত সংযোগ সাধনের জন্ত এই ভাষা ব্যবহার করে। ইংরাজী ভাষার এই গুরুত্ব আমাদের উপর নির্ভর করে না; আমাদের শত বিঘেষে তাহার এই গুরুত্ব কমিবে না এবং গৌরবও ক্ষুণ্ণ হইবে না।

বখন দেখিতেছি যে, দুইটি ভাষা মাতৃভাষা ও ইংরাজী আমাদের কাছে শিথিল হইবে এবং এই দুইটি দ্বারা বখন আমাদের সব উদ্দেশ্য সাধিত হয়, তখন কেন্দ্রীয় শাসন ও সর্বভারতের জন্ত আর একটি ভাষার প্রয়োজন কি? অথবা আর একটি যোঝা লোকের মাথার দিতে বাই কেন?

হিন্দীকে সর্বভারতীয় ভাষা করিবার ব্যগ্রতার আমাদের রাজনৈতিকগণ অনবরত বালক-বালিকাদিগকে হিন্দী শিখিতে বাধ্য করিতেছেন। কলে তাহাদের মস্তিষ্কের উপর কি কঠিন চাপ পড়িতেছে এবং প্রকৃত শিক্ষা ব্যাহত হইতেছে কিনা, তাহা ভাবিয়া দেখিতে অস্বস্তি বোধ করি। তিনটি ভাষা শিখিতে আমাদের যে শক্তি ও সময় নষ্ট হয় তাহা অল্প শিক্ষার প্রয়োগ করিয়া তাহাদের এবং শিক্ষার প্রকৃত উন্নতি বোধ হয় বেশী কাম্য।

এই প্রবন্ধ শেষ করিবার পূর্বে সংবাদপত্রে দেখিলাম যে, ভারত সরকার প্রদেশের শাসন ও শিক্ষার প্রাদেশিক ভাষার ব্যবহারে সম্মত আছেন কিন্তু কেন্দ্রীয় শাসনের জন্ত তাহারা হিন্দী ব্যবহার করিতে চান। সুতরাং আমাদের তৃতীয় প্রশ্নের সমাধান হইয়াছে। এখন প্রশ্ন—কেন্দ্রে হিন্দী বনাম ইংরাজী এবং কেন্দ্রীয় ভাষার ব্যবহারের সীমা নির্ধারণ।

কেন্দ্রীয় ভাষা সম্বন্ধে আমাদের প্রথম লক্ষ্য হইবে যে, তাহার রাজনৈতিক গুরুত্ব জনসাধারণের মনকে যেন ভারাক্রান্ত করিয়া না 'তোলে। প্রদেশের শাসনকার্যে প্রাদেশিক ভাষা প্রচলিত হইলে জনগণ অনেকটা ভাষাগত স্বাধীনতা পাইবে। কিন্তু কেন্দ্রীয় শাসন ও রাজনীতির ব্যাপারে এমন ব্যবস্থা হওয়া চাই যে, তাহাদের এই স্বাধীনতা বহুটা সম্ভব ক্ষুণ্ণ না হয়। কেন্দ্রীয় আইনসভার সভ্যদিগকে যে কোনও ভারতীয় ভাষার বক্তৃতা দিবার অধিকার দিতে হইবে, আইনসভার কার্য হইবে তাহার সঠিক অনুবাদ করা। কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারের সহিত পত্রাদি বিনিময় ও আলোচনা-আলোচনা কেন্দ্রীয় ভাষায় করিবেন কিন্তু প্রয়োজন হইলে রাজ্য সরকারের ভাষায় করিবার জন্ত প্রস্তুত থাকিতে হইবে। জনসাধারণের জন্ত বাহা প্রচার করিতে হইবে তাহা প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় দুই ভাষাতেই হওয়া

চাই। কেডারেল কোর্টে নিজ মাতৃভাষায় বক্তব্য পেশ করিবার অধিকার সকলের থাকিবে। অর্থাৎ এইরূপ সুযোগ ও ব্যবস্থা সর্বদাই রাখিতে হইবে—বাহাতে কেন্দ্রীয় ভাষা অনতিজ্ঞ লোক ও কেন্দ্রীয় শাসন ও আলোচনার সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে পারে। এক কথায় কেন্দ্রীয় শাসন কর্তৃপক্ষকে ভাষার ব্যাপারে সর্বদাই একটা নমনীয় ভাব গ্রহণ করিতে হইবে। হিন্দীকে কেন্দ্রীয় ভাষা করিলে এই সমস্ত ব্যবস্থার প্রয়োজন আরও বেশী। কারণ প্রাদেশিক ভাষায় শাসন ও শিক্ষার ব্যবস্থা প্রচলিত হইলে এহ অহিন্দীভাষীর হিন্দী শিক্ষার প্রয়োজন হইবে না।

এইবার প্রশ্ন, হিন্দী কি ইংরাজী? হিন্দীর পক্ষে যুক্তি এই (১) স্বাধীন ভারতে ভারতীয় ভাষাই ব্যবহার করাই উচিত (২) ভারতীয় ভাষা সমূহের মধ্যে হিন্দী সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা এবং বহুলোকের বোধগম্য; সুতরাং হিন্দীই একমাত্র গ্রহণীয় ভাষা। এই যুক্তির প্রথমংশ বিশ্লেষণ করিলে বক্তব্য এই দাঁড়ায় যে, স্বাধীন জাতি জাতীয় ভাষা ব্যবহার করে, আমরা স্বাধীন কিন্তু আমাদের কোনও জাতীয় ভাষা নাই; সুতরাং আমরা একটি প্রাদেশিক ভাষাই ব্যবহার করিব। জাতীয়তা ও প্রাদেশিকতার সংমিশ্রণ এই যুক্তির উৎপত্তি। এই যুক্তি এক দলের প্রাদেশিকতাকে প্রস্তর দেয় অন্য দলকে জাতীয়তাকে বিসর্জন দিতে বলে এবং দুই দলের মধ্যে একটি প্রবল বিরোধের সৃষ্টি করে। সেই বিরোধের আভাস পাইয়াও হিন্দী-সমর্থকগণ যুক্তির অসারতা স্বীকার করিতেছেন না, সর্ব, সীমা ইত্যাদি আরোপ করিয়া তাহাদের পুরাতন সিদ্ধান্ত স্থির রাখিতে চান।

যুক্তির দ্বিতীয়ংশ হিন্দী সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা। দলীয় শাসনে সংখ্যা দ্বারা নীতি নির্ধারিত হয় সত্য কিন্তু ধর্ম, ভাষা, সমাজ ইত্যাদি বিষয়ে সে নিয়ম অচল। সেই জন্তই সংখ্যাগরিষ্ঠের জন্ত রক্ষাকবচ। এই যুক্তি জাতীয় আধিপত্য বিস্তারের বা হিন্দী সাম্রাজ্যবাদের যুক্তি এবং ইহার মধ্যে যুক্তি অপেক্ষা শক্তিই বেশী। বহি অহিন্দীভাষীরা যেহেতু হিন্দী গ্রহণ করেন, কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু এক ভোটের পার্থক্যে হিন্দী রাষ্ট্রীয় ভাষা হওয়ার হিন্দীভাষীদের শক্তিরই পরিচয় পাই আমরা।

ভাষার হিন্দী বহুলোকের বোধগম্য। কিন্তু এই বোধগম্যতা এক অতিক্রম গতির মধ্যে সীমাবদ্ধ। সাময়িক একটা প্রয়োজনের কথা কোনওরূপে বুঝিতে পারি বা বুঝাইতে পারি। কোনও আলোচনার অংশ গ্রহণ করা দূরের কথা, সব সময়ে মনের ভাষা প্রকাশ করিতেও পারি না। নগরবাসীর কতকংশ সম্বন্ধে ইহা হয়তো প্রয়োজ্য নয় কিন্তু সাধারণ মানুষ সম্বন্ধে ইহার কোন ব্যতিক্রম আছে কি না সন্দেহ। হিন্দীর প্রকারভেদে আমাদের বোধগম্যতাও কম-বেশী হয়। যে হিন্দী আমরা বলি বা বুঝি তাহা আমাদেরই সৃষ্ট একটি কথিত ভাষা, বাহার সহিত প্রকৃত ভাষার সম্পর্ক খুবই কম।

মধ্যে মধ্যে হিন্দীর সমর্থন কতকগুলি ব্যবহারিক সুবিধার কথা শুনি। সেগুলি যে কি, তাহা কোথাও স্পষ্ট শুনি নাই। ভাষা-কমিশনের রিপোর্টে হিন্দীভাষীদের সুবিধাগুলি বুঝিতে পারি কিন্তু অহিন্দীভাষীদের সুবিধা কি, তাহা বুঝিলাম না।

ভাষা হিসাবে হিন্দী ও ইংরাজীর তুলনা নিশ্চয়োজন। ইংরাজী গ্রহণে আমাদের প্রধান আপত্তি, ইহা আমাদের জাতীয় ভাষা নহে।

তুই শত বৎসরের ইংরাজ শাসন ইংরাজীকে যে আমাদের দ্বিতীয় মাতৃভাষা করিয়াছে অন্ততঃ জাতীয় ভাবার ঠিক নিজেই যে তাহার স্থান করিয়া লইয়াছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। ইংরাজ-বিষয়ে আমাদের থাকিতে পারে কিন্তু ইংরাজী বিষয়ের কোন কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না। বহু বিষয়ে এই ভাবার অবদান অনস্বীকার্য।

ইংরাজী বনাম হিন্দী এই বিতর্কে এই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, একটির সমর্থন ভাবপ্রবণতার অপরটির সমর্থন ব্যবহারিক সুবিধায়।
একোয় জন্ত অনেকে হিন্দী সমর্থন করেন। এক্য ভাষা বা

ধর্ম আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠে না। সর্বাঙ্গিক এক্য যাহাযে যাহাযে হয় না, জাতিতে জাতিতেও হয় না। একোয় উপলব্ধি উপলব্ধি ও অনুভূতি হইতে গড়িয়া উঠে এক বিশেষ উদ্দেশ্যকে অবলম্বন করিয়া। একোয় জন্ত চাই এক দেশ, এই উপলব্ধি এক ভাবার কোনও প্রয়োজন নাই।

হিন্দী সমর্থকগণের নিকট আর একটি নিবেদন—হিন্দী রাষ্ট্রভাষার উন্নীত হইয়া যে উচ্চতা, অসহিষ্ণুতা ও কোনও ক্ষেত্রে যে নীচতা দেখাইয়াছেন ভারতীয় একোয় উপর তাহার কি প্রতিক্রিয়া, তাহা অন্ততঃ এখনও বুঝিবার চেষ্টা করিবেন।

সনাতন গোস্বামীর গৃহত্যাগ

উমাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত

বাঁদার বিশেষ অল্পরোধ উজীর সাহেব, আপনি আর একবার বিবেচনা করে দেখুন—এট পদমর্যাদা, বিপুল ঐশ্বর্য এসব কি শুধু মাত্র একটা আদর্শের জন্ত ছেড়ে যাওয়া উচিত ?

আমি স্বেচ্ছায় ছেড়ে বাচ্ছি না কোতোয়াল সাহেব, সেদিন রামকেলি গ্রামে আমি আমার সব হারিয়ে ফেলেছি। সেই তপস্বীকণ-গৌরীসন্ন্যাসী আমার সব কিছু ছিনিয়ে নিয়ে গেছেন। এই যে দেখছেন দেহটা—এটাও তাঁর সম্পত্তি, এটাকে তাঁর চরণে ফেলে দিয়ে আমি ঋণমুক্ত হতে চাই।

মাফ করবেন উজীর সাহেব, আমি আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না।

আপনি জানেন না—গৌড়েশ্বরের অমাত্যরূপে এঁর সম্প্রদায় পূর্বে আমি অনেক কথাই শুনেছিলাম। শুনেছিলাম দ্বিবিজয়ী পণ্ডিত, সরস্বতীর মানসপুত্র কেশব কাম্বীর শোচনীয় পরাজয়—শুনেছিলাম পরাজিত পণ্ডিতের অলৌকিক স্বপ্ন বৃত্তান্ত। পরাজিত পণ্ডিত সাক্ষররনে সরস্বতীর ধ্যান করে বলছেন—যা, শেষে তুই একটা বালকের দ্বারা আমার পরাজিত করলি! সরস্বতী উত্তরে বললেন, ওরে, এই পরাজয়ই তোকে অমর করে রাখবে। হুঃখ করিস না, আমি নিজেই যে তাঁর কাছে নিক্য পরাজিতা, তুই আমার পুত্র আর তিনি—তিনি আমার স্বামী, সাক্ষাৎ নারায়ণ। তখন বিশ্বাস করিনি। তারপর সেদিন রামকেলি গ্রামে সহস্র সহস্র লোকের মধ্যে হস্তবেশী আমাদের দু'ভাই-এর হাত দুটি ধরে বধন তিনি বললেন, ওরে তোরা যে আমার ব্রজের সাধী, কেমন করে ভুলে রয়েছিস? আমি মুহুঁত হয়ে পড়লাম। জ্ঞান হতে অল্পভব করলাম—আমি সম্পূর্ণ বিস্ত—নিঃশ্ব। বাক, অল্পগ্রহ করে আপনি আমার মুক্তির ব্যবস্থা করে দিন কোতোয়াল সাহেব!

আপনি আমার অবস্থাটা ঠিক বুঝতে পারছেন না। নবাব যদি ঘৃণাকরেও এই বড়বস্ত্রের কথা জানতে পারেন তবে আমার প্রাণদণ্ড নিশ্চিত। আবার এ-ও আমি ভুলতে পারছি না উজীর সাহেব যে, আপনার নিকট আমি অনেক উপকৃত। আপনার অল্পগ্রহে আমার এই পল্লোরতি। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি—আর আপনিও জানেন সাক্ষর মল্লিক জীবনে কখনও মিথ্যা কথা বলেনি, আপনাকে

আমি এমন উপায় বলে দেব যে সকলেই জানবে সাক্ষর মল্লিক মৃত। এই নিরপরাধ বন্দীকে মুক্তি দিলে আপনার পুণ্যই হবে—তাছাড়া আমি অর্থ দিয়ে আমার মুক্তির মূল্য দেব। আমি আপনাকে পাঁচ হাজার টাকা দেব।

নিঃত কারাগারে, গভীর নিশীথে কথা হচ্ছিল এক বন্দীর সঙ্গে কারাবন্দী কোতোয়ালের। বন্দী হিন্দু, তাঁর সর্বদা আভিজাত্যের ছাপ, পোষাক-পরিচ্ছদও তদনুরূপ।

ধর্ম ও অর্থ একসঙ্গে প্রাপ্তির সুযোগ জীবনে বড় একটা আসে না, তাই কোতোয়ালের পক্ষে এ লোভ সংবরণ করা একটু কঠিন হয়ে পড়লো। সে একটু ভেবে উত্তর দিল—তাই ত! আমি ঠিক অর্থের কথা ভাবছি না—আমি ভাবছি আপনি আমার ভৃত্যপুত্র মনিব—যদি কোনরকমে আপনার একটু উপকার করতে পারি। বলুন কি উপায় আপনি স্থির করেছেন?

বন্দী চারি দিক একবার ভাল করে দেখে নিয়ে ধীরে ধীরে বললেন, কাল সন্ধ্যায় আপনার লোক আমাকে গজার ভীয়ে ছেড়ে দিয়ে এসে প্রচার করবে যে সাক্ষরকৃত্য করতে বাবার সময় হস্ত-পদ-মুখালিত বন্দী গজার বাঁপিয়ে পড়েছে—উদ্ধারের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করে বন্দী শব্দস্রোতে ভেসে গেছে। আমি নদী পার হয়ে বনপথে বৃন্দাবনের দিকে যাত্রা করব। কেউ দেখবে না—কেউ জানবে না। আপনি শুধু এই পত্রখানা আমার ভৃত্য ঈশানকে দেবেন, তবেই সে আপনার হাতে নির্দিষ্ট মুক্তা দিয়ে আমার সঙ্গে মিলিত হবে।

কোতোয়াল একটু হেসে উত্তর করল, টাকার লোভ আমার নেই মল্লিক সাহেব, তবে আপনি ত' জানেন, সাধারণ প্রহরীর বড় গরীব তাই—

বন্দী বুঝতে পারলেন যে ওরূপ ধরেছে, তাই তিনিও একটু হেসে বললেন, তা ত' নিশ্চরই—তাদের জন্ত আমি আরও দু' হাজার টাকা দেব—আপনি আর বিধা করবেন না।

কোতোয়াল এদিক-ওদিক চেয়ে কিস-কিস করে উত্তর দিল, তা আপনার অল্পরোধ কেমন করে অবহেলা করি? তবে একথাই স্থির—কাল সন্ধ্যায়—

সৌভাগ্যের ভূতপূর্ব প্রধান অমাত্য সাকর মল্লিক চলেছেন অজানার পথে গভীর অরণ্যের মধ্য দিয়ে। পরিধানে শতছিন্ন মলিন বসন, হৃদয়ে তত্তোম্বিক মলিন বহা আর সঙ্গে চলেছে পুরাতন ভৃত্য ঈশান। সে জানে না কোথায় চলেছে তার প্রভু, কোন মুরলীর মোহন তান তাঁকে এমন করে পাগল করেছে!

প্রভুর কণ্ঠে তার চোখে জল এলো। কয়েক দিন আগেও ঝাঁকি খেয়েছিল ঈশান ঠাকুরের ক্রীড়নক—তিনি কি না চলেছেন দিনের পর দিন কটকাকীর্ণ বনপথে, পদব্রজে—অনাহারে—অর্দ্ধাহারে! কোন দিকে ক্রমশঃ নেই। হাতে মাঝে বধন কুখার ভুজাবলম্বন হয়ে পড়েন, ক্ষতবিক্ষত দেহটাকে আর টেনে নিয়ে যেতে পারেন না, তখন হয়ত কোন বটজায়ার বসে পড়ে বলেন, ঈশান, বুঝাবন আর কতদূর? আর কি তাঁর সঙ্গে দেখা হবে না—আমার ঋণ কি শোধ হবে না? ওগো প্রভু! তুমি আমার শক্তি দাও। চোখ মুছতে মুছতে প্রভুকে সাধনা দিয়ে ঈশান ভিকার চলে যায়।

মুহুর্তের জন্তও সনাতন ভুলতে পারেন না যে তিনি পলাতক রাজবন্দী। ধরা পড়লে জীবনে আর তাঁর দর্শন পাওয়া যাবে না। ঋণ শোধ হবে না, তাই তিনি সবচেয়ে বর্জন করে চলেছেন রাজপথ আর জনবহুল লোকালয়। বেছে নেন স্থাপনস্থল নির্বিড় অরণ্য। কোন দিন ভিক্ষা জোটে—কোন দিন বা জোটে না।

এ ভাবে কয়েক দিন চলার পর তাঁরা পাতড়া (বঙ্গ-বিহার-সীমান্তে) পর্বতের পাদদেশে এসে উপস্থিত হলেন। স্থানটা অতি ভয়ঙ্কর এক ভূঞার জমিদারী। ধনরত্ন নিয়ে কোন পশ্চিক এ পথে চলা-করা করতে পারত না। সনাতন এ সংবাদ জানতেন কিন্তু তিনি নিরুপায়—প্রকাণ্ড রাজপথে চলার উপায় নেই, তাছাড়া এখন তিনি কপর্দকশূন্য ভিখারী ব্রাহ্মণ; তাই ভয়েরও বিশেষ কারণ নেই।

হুঁদিন ভিক্ষা জোটে—শরীর অবসর—আর চলেতে পারেন না। ঈশান প্রভুকে এক গাছতলার বসিরে চলে গেল ভিকার সন্ধান। আজ কিছু জোটে—হবে। এদিকে ভূঞা কোন রকমে জানতে পেরেছে যে তার জমিদারীতে এসেছে দু'জন নিরস্ত্র সৌদীর—আর তাদের নিকটে আছে আটটি মোহর। শোণিতের লোভে শার্দলের মন যেমন নেচে উঠে তেমনি উৎকুল হয়ে উঠল ভূঞা। কোন ছলে সন্ধ্যা পর্যন্ত আটকে রেখে রাজ্যের অন্ধকারে কার্য শেষ করতে হবে।

মতলব ছিন্ন করে সে সনাতনের কাছে এসে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করল ও তার আতিথ্য গ্রহণের জন্ত বিশেষ অন্নদোষ জানাল। তার ইচ্ছিতে এলো নানারকম উপাদেয় আহাৰ্য্য। সনাতন কিছুই গ্রহণ করলেন না, শুধু বললেন আমি অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ—এক মুষ্টি আতপ তওলই আমার পক্ষে বখেই এবং তা-ও আমার ভৃত্য ভিক্ষা করে সংগ্রহ করেছে। আপনি যদি একান্তই আমার অন্নগ্রহ করতে চান তবে একজন লোক সঙ্গে দিয়ে পর্বতটা পার করে দিন—আমি কৃতার্থ হব, হুঁহাত তুলে আশীর্বাদ করব।

ভূঞা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে এ প্রস্তাবে সন্মত হয়ে বলল,

আপনারা অনাহার করে নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রাম করুন, সন্ধ্যার আমার লোকেরা আপনাদের বাত্রার সমস্ত ব্যবস্থা করে দেবে, তখন ভূঞা সেখানে দু'জন প্রহরীকে রেখে প্রস্থান করল।

সৌভাগ্যের ভূতপূর্ব অমাত্য সনাতন—বিদ্বান, বুদ্ধিমান, কূট। তাঁর মনে সন্দেহের একটা কালো-ছায়া তাঁকি মারতে লাগল—কেন এই অতিবিস্তৃত সৌভাগ্য, অসাধারণ ভক্তি! তিনি ঈশানকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে বঙ্গগভীর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, ঈশান, তোর সঙ্গে ধন-রত্ন কিছু আছে?

প্রভুর এই কণ্ঠস্বর ঈশানের পরিচিত—তাঁর চোখের এই অন্তলম্পর্শী দৃষ্টি বহু বার দেখবার সুযোগ তার হয়েছে। সে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল প্রভু, যদি আপনার সেবার প্রয়োজন হয় তাই সাতটা মোহর সঙ্গে এনেছি—আমার অপরাধ নেবেন না।

সনাতন তখন বীরভাবে বললেন মূর্খ, এরই জন্ত আজ আমাদের জীবন বিপন্ন। জানিস না অর্ধই অনেক সময় অনর্থের মূল হয়ে দাঁড়ায়, দে আমাকে। ঈশান তার উত্তরীরে প্রান্ত থেকে সাতটা মোহর বেব করে প্রভুর চরণে রাখল।

কোন রকমে তাড়াতাড়ি অনাহার সমাপন করে সনাতন সেই জমিদারের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন ভাই, তোমার সৌভাগ্যে আমি পরম পরিতুষ্ট হয়েছি—আশীর্বাদ করি চৈতন্য মতি হোক—এখন দয়া করে আমার সঞ্চিত এই সাতটা মোহর গ্রহণ করে আমাকে পূরিত পার করে দাও। তাঁর বদন প্রশান্ত, ভাবে ভাবায় অভিযোগের কণ্টতার লেশমাত্র নেই—সরল, স্বচ্ছ নীল আকাশের মত।

সেই ভূঞা বিস্মিত দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইল—সেখানে মিথ্যা বা ভীতির কোনও চিহ্ন খুঁজে পেল না—শাস্ত, সৌম্য, স্নেহ। তখন সে নতজাহু হয়ে তাঁর পা দুখানি ধরে বলল, ঠাকুর তুমি কি মাহু? আমি তোমার হত্যার যড়যন্ত্র করেছিলাম আর তার বিনিময়ে তুমি করলে আমার অব্যাহতি আশীর্বাদ—আমার হাতে তুলে দিলে তোমার সারা জীবনের সঞ্চয়! বল ব্রাহ্মণ, এ দিক্ষা তুমি কোথায় পেয়েছ?

সনাতন তাকে আলিঙ্গন করে উত্তর দিলেন, ভাই! আছেন। আছেন—এ জগতে শুধু একজনই আছেন বিনি দিক্ষা দিতে পারেন।

কে তিনি ঠাকুর? তিনি কি তোমার চেয়েও মহৎ?

মহন্ত আমি কোথায় পাব ভাই! তবু যদি বিলুপ্তও আমার মধ্যে দেখে থাক তবে কোনো—এ তাঁরই জগার করুণার এক কণা। থাক ভাই! দয়া করে আমার পূরিতটা পার করে দাও।

আমি তোমার পাতড়া পূরিত পার করে দেব কিন্তু ব্রাহ্মণ, তার আগে আমার প্রতিজ্ঞা দাও তুমি আমার সংসারসাগর পার করে দেবে—আমি মহাপাণী।

ভয় কি ভাই—তিনি যে পাণীদের সব চেয়ে বড় আপনার জন—আর তাঁর তরুণীতে সকলেরই সমান অধিকার। সময় হলে আমি তোমার তাঁর কাছে নিয়ে যাব।

নিশাবোগে ভূঞার সাহায্যে পাতড়া পূরিত পার হয়ে পরদিন

প্রভাতে সনাতন আবার ঈশানকে জিজ্ঞাসা করলেন, তার কাছে আর কোন ধনবস্ত্র অবশিষ্ট আছে কিনা।

ঈশান ভীত-কম্পিত ভাবে উত্তর দিল আছে—আর একটি মাত্র স্বর্ণমুদ্রা অবশিষ্ট আছে। আর সেটি সে রেখেছে একান্ত ভাবে প্রভুর সেবার জন্য—বদি কখনও তেমন সময় উপস্থিত হয়।

সনাতন একটু হেসে ঈশানকে আগন্তুক করে বললেন ঈশান, বন্ধু আমার! ভাই আমার! স্বর্ণমুদ্রার প্রয়োজন আমার চিরদিনের মত শেষ হয়ে গেছে—তোমার সেবারও আর প্রয়োজন হবে না। প্রার্থনা কর, আমিই বেন সকলের সেবা করতে পারি।

ঈশানের মুখে কোন কথা বেরল না—সে তার প্রভুর পায়ে দুখ তুলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কঁদতে লাগল।

সনাতন তাকে সম্বোধন করে জড়িয়ে ধরে বললেন ভাই, তুমি দীর্ঘ দিন আমার সেবা করেছ, প্রতিদানে আমি দিয়েছি শুধু কাচ—এবার ঘরে কিরে গোবিন্দের সেবা কর, তিনি দেবেন তোমার কাকন—আর সেই হবে তোমার পাথর।

ঈশান তার প্রভুর ভালবাসা জানে, তাই আর কোন কথা বলতে সাহস করল না। পাজিরভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাস ও কয়েক কঁোটা তপ্ত অশ্রু নিয়ে সে জানাল তার বিদায় সভাষণ।

* * * *

সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ। নির্জন অন্ধকার বনপথে মাঝে মাঝে শুধু শোনা যায় বগলক্ষীর কর্কশ চিংকার। এক স্তম্ভীয় অশ্রু যুবক দ্রুত অধারোহণে এগিয়ে আসছিল। তার পোষাক পরিচ্ছদে প্রতীয়মান হয় যে, যুবক একজন হিন্দু—উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী। হঠাৎ তার কানে ভেসে এলো এক কর্কশ ক্রন্দন। সে খোঁড়া ধামিরে ইতস্তত দেখতে লাগল—এই অন্ধকার রাত্রে খাপদসহুল নির্জন বনে কে কঁাদছে! তাড়াতাড়ি মশাল জ্বলে এদিক ওদিক খুঁজতে খুঁজতে সে দেখতে পেল—এক ধূলি-ধূসরিত ছিন্ন মলিন বস্ত্র পরিহিত পথিক গাছতলার পড়ে কঁাদছে আর বলছে ওগো প্রভু, আর বৃষ্টি দেখা হ'ল না। ঋণ বৃষ্টি আর শোধ করতে পারলাম না। উঃ, বৃন্দাবন আর কতদূর!

যুবক ধীরে ধীরে সেই অবসর পথিকের কাঁধে একখানা হাত রেখে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কার সন্ধানে চলেছ পথিক? কে তোমার মহাজন—কার কাছে তুমি ঋণী?

হঠাৎ সম্ভ্রম স্পর্শ পেয়ে, দরদস্তুরা কণ্ঠস্বর শুনে সনাতন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। বললেন, কে তুমি ভদ্র, আমার প্রভুর করুণা-ধারার মত আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছ! আমাকে বাঁচাও—আমি আজ তিন দিন উপবাসী, এক মুষ্টি অন্ন আর রাত্রে মত একটু আশ্রয় আমার ভিক্ষা দাও। আমাকে যে বাঁচতেই হবে—প্রভুর অমৃত্যু ব্যতীত মরবারও যে আমার অধিকার নেই।

যুবক সেই অবশ পথিকের একখানা হাত ধরে ধীরে ধীরে নিয়ে গেল তার প্রাশনে, তারপর নারায়ণ নিক্সিপেয়ে তাঁর সেবা করল।

পরদিন প্রভাতে বাত্রার পূর্বে পথিক গেলেন সেই সন্ধ্যার যুবকের নিকট বিদায় নিতে—তাকে আশীর্বাদ করতে। তার কক্ষ প্রবেশ করেই সনাতন চমকে উঠলেন। আনন্দে চিংকার করে

বললেন এ কি! কে তুমি? আমি কি ঠিক দেখেছি—তুমি, শ্রীকান্ত!

যুবকও ভাল করে লক্ষ্য করে পথিককে চিনতে পারল। তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ে বলল এ কি দাদা তুমি। শেষে ভিখারীর বেশে তুমি আমার বাড়ীতে অতিথি হয়েছ? এ-ও কি তোমার পরীক্ষা নাকি? হলেও তুমি ত তা সঙ্গমানে উত্তীর্ণ হয়েছ আর তা বদি হয়েই থাকি, তাও ত তোমার আশীর্বাদেই দাদা! আমার বেশ মনে আছে, যেদিন তোমারই প্রদত্ত রাজকর্ম নিয়ে বিদেশে বাত্রা করি সেদিন তুমি আমাদের স্বামিজীর মাথায় হাত দিয়ে বলেছিলেন—শ্রীকান্ত, সব সময় মনে রেখো অতিথি নারায়ণ আর অতিথিসেবাই গৃহস্থের সব চেয়ে বড় ধর্ম। দাদা, অনেক দিন পরে তোমার পেয়েছি আর ছেড়ে দেবো না—কিন্তু দাদা তোমার এ বেশ—এ চেহারা কেন?

শ্রীকান্ত ভাই—আমায় যে যেতেই হবে, আমার ব্রত ভঙ্গ করবার চেষ্টা করো না ভাই! আমি যে সব সময় আমার প্রভুর ডাক শুনতে পাচ্ছি। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তিনি করুণ নয়নে আমার দিকে চেয়ে বলছেন—রূপ, সনাতন! তোরা যে আমার ব্রতের সাথী—কেমন করে ভুলে রয়েছিস? ওরে আর, আর তোরা, না এলে যে আমার লীলা পূর্ণ হবে না—কাজ সারা হবে না।

যুবকের চোখে জল এলো—সে কম্পিত কণ্ঠে বলল দাদা, আমি তোমায় ধরে রাখব না কিন্তু কয়েক দিন এখানে থেকে সুস্থ হয়ে যাও।

ভাই, আমাকে আর মায়ায় বেঁধে না, তাছাড়া আমি পলাতক রাজবন্দী। আমাকে আশ্রয়দানের বিপদ নিশ্চয়ই তোমার অজানা নেই।

আবার পরীক্ষা দাদা? যেদিন এক সহায়-সম্বলহীন যুবক তোমার ঘরে আশ্রয়প্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়েছিল সেদিনও তাকে অনেক পরীক্ষা করেছিলেন—তারপর দিয়েছিল তাকে আশাতীত পুরস্কার—সম্প্রদান করেছিল তোমার প্রাণের পুত্তলি কনিষ্ঠা ভগিনীকে।

আমার নির্বীচনে ভুল কিছুই হয়নি ভাই—আশীর্বাদ করি নিরাশ্রয়ের আশ্রয়স্থল হয়ে দীর্ঘজীবী হও। আমাকে হাসিমুখে বিদায় দাও ভাই।

কিন্তু দাদা, পশ্চিমের এই প্রচণ্ড শীতে কেমন করে তোমার প্রভুর কাছে পৌঁছবে? অমৃত্যু কর অন্তত একখানা শীতবস্ত্র তোমাকে দিই। আর কিছু না হোক ছোট ভাই—এর প্রণামী হিসাবে তা তোমাকে গ্রহণ করতেই হবে। একথা বলেই শ্রীকান্ত কক্ষান্তর থেকে নিয়ে এলো একখানা বহুমূল্য ভোটকবল, তারপর সনাতনকে প্রণাম করল।

চৈতন্য মতি হোক, বলে সনাতন তাকে আশীর্বাদ করলেন ও স্তব্ধ করলেন তাঁর বাত্রা। এ স্নেহের বন্ধন আর তিনি সহ করতে পারছিলেন না।

শ্রীকান্ত সাক্ষাৎরূপে তাঁর পথের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবল—কে সেই নরকপী নারায়ণ, যিনি সৌভাগ্যের প্রধান অমাত্যকে করেছেন সর্বস্বহারা পথের ভিখারী—আকাশচুম্বী মহীকহকে নিয়ে এসেছেন তৃণের চেয়েও নীচে—তাঁর চরণে কোটি কোটি প্রণাম!

বারাণসী—শঙ্করের মহিমামণ্ডিত, বরুণা অগ্নি প্রকালিত পুত তাঁরহান। দ্বিতীয় কৈলাস। এই বারাণসীতে এসে সনাতন লোকস্বর্গে গমনলেন এক নবাগত আলৌকিক সন্ন্যাসীর কথা—বার চন্দ্রক বরণ তেজ করে ফুটে উঠে নীলকান্ত মণির জ্যোতি, যিনি রূপে কন্দর্পের চেয়েও সুন্দর, বিজ্ঞার সরস্বতীর চেয়েও বড়, প্রেমে স্বয়ং স্ত্রীরাধা। সনাতনের বুকে দেবী হল না যে, ইনিই তাঁর হারানিধি—সেই প্রাণের ঠাকুর, প্রেমের ঠাকুর, দীনের ঠাকুর। কিন্তু এই বিশাল সহরে কোথায় তিনি তাঁকে খুঁজে পাবেন। তিনি নিজেকে দেখা না দিলে কে তাঁকে দেখতে পারে, নিজেকে ধরা না দিলে কে তাঁকে ধরতে পারে? তিনি দিন-রাত তাঁকে খুঁজে বেড়ান—কখনও বিশ্বনাথের মন্দিরে, কখনও জগন্নাথের চব্বরে—কখনও বা জনাকীর্ণ রাজপথে কিন্তু কোথাও খুঁজেও পেলেন না তাঁর হারানিধিকে।

দিনের শেষে অবসন্ন সনাতন গাছতলায় গুয়ে গুয়ে ডাকেন—ওগো ঠাকুর, আর কি তোমার সঙ্গে দেখা হবে না—আমার সব চোঁটা কি ব্যর্থ হবে? আমি যে অনেক দীনহুঁখীকে কথা দিয়ে এসেছি তোমাকে তাদের সামনে তুলে ধরব—তোমার মহামন্ত্র তাদের বিস্তরণ করব। ওগো, তারা ত জানে সাকর মল্লিক মিথ্যা কথা বলে না?

এভাবে ঘুরতে ঘুরতে একদিন প্রভাতে তিনি চন্দ্রশেখরের বাড়ীর সামনে এক গাছতলায় বসে বসে ভাবছেন—ঠাকুর, ধরা যদি দেবে না তবে কেন দেখা দিয়েছিল, কেন দিয়েছিলে দুটি বাছ—আর যদি দেখাই দেবে না তবে এ চোখ দুটি এখনও অন্ধ করে দাওনি কেন?

এমন সময় চন্দ্রশেখর সদর দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এসে এদিক ওদিক চেয়ে আবার ভিতরে চলে গেলেন। ভাগ্যবান পুরুষ চন্দ্রশেখর। যিনি চকল গোবিন্দকে অন্তত একদিনের জন্তও অচঞ্চল করতে পেরেছিলেন—স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনন্দন বীর গৃহে অন্তত কয়েক দিনের জন্তও অতিথি হয়ে অবস্থান করেছিলেন।

গৃহান্তরে গিয়ে চন্দ্রশেখর মহাপ্রভুর শ্রীচরণে নিবেদন করলেন, কই কোন বৈক্যকে ত দেখতে পেলাম না প্রভু। মহাপ্রভু হতাশার সুরে উত্তর করলেন কেউ আসেনি—তবে আমার মন আজ এত চকল কেন? নিশ্চয়ই আসবে—আমার প্রিয় কেউ আসবে।

অল্পকণ পরে আবার চন্দ্রশেখরকে আদেশ করলেন ভাল করে খুঁজে দেখতে। ব্যাকুল হয়ে বললেন নিশ্চয়ই কেউ এসেছে—আমার ডাকছে—আমি যে আর থাকতে পারছি না—বাও, বাও।

চন্দ্রশেখর আবার ঘুরে এসে বললেন প্রভু, কোন বৈক্য ত আসেনি নি—তবে গাছতলায় একজন দরবেশ বসে আছেন। মহাপ্রভু একটু ইতস্তত করে সেই দরবেশকে ভিতরে আনতে অহরোধ করলেন।

চন্দ্রশেখরের আমন্ত্রণে সনাতন বীরে বীরে অজনে প্রবেশ করলেন—তারপর ভিক্ষুকের সামনে উদ্ভূত হল অমূল্য রত্নের ভাণ্ডার—যুগ-যুগান্তের ভূষিত চাতক শেল নব-জলধরের সন্ধান। সনাতন হৃদিত হয়ে পড়ে গেলেন মহাপ্রভুর শ্রীচরণে।

দীর্ঘ দিন পরে সনাতন দ্বৈতকর্ষ করলেন—করলেন প্রাণতরে

গঙ্গান্নান। শুদ্ধ হল তাঁর মন—দেহে কিংবে এল নূতন শক্তি। চন্দ্রশেখর তাঁর জন্ত সংগ্রহ করে এনেছিলেন নূতন পটংর ও উত্তরীয় কিন্তু তিনি বিনীত ভাবে প্রত্যাখ্যান করে সেই সিন্ধু বসনেই চললেন মহাপ্রভুর পশ্চাতে তখন মিশ্রের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করতে।

তখন মিশ্র এই নবাগত অতিথিকে সাদর অভ্যর্থনা করলেন—নিয়ন্ত্রে এলেন নূতন বস্ত্র ও উত্তরীয়। সনাতন তাঁকে প্রণাম করে নিবেদন করলেন—মহাশয়ন। যদি এই ভিক্ষুকে একান্তই বস্ত্র দানে বাসনা, তবে দেও তোমার নিজের পরিত্যক্ত একখান ছিন্ন বসন। তখন মিশ্র তাঁকে আলিঙ্গন করে বললেন গৌসাই। তুমিই পেয়েছ চৈতন্যের প্রকৃত করুণা।

বহুজনের নিমন্ত্রণ সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করে সনাতন চলেছেন মাধুকরী করতে—পরিধানে শতছিন্ন মলিন বহির্কাস—স্বল্পে বহুমূল্য ভোটকমল। বাবার পূর্বে তিনি মহাপ্রভুকে প্রণাম করলেন। মহাপ্রভু 'কৃষ্ণে মতিরন্ত' বলে আশীর্বাদ করে একটু হাসলেন।

এই ইজিত ধরতে না পারলেও সনাতন বুঝলেন এ তাঁর সহজ সরল হাসি নয় কিন্তু বুঝতে পারলেন না কি তাঁর অপরাধ—কোথায় তাঁর ত্রুটি। এ ভাবে বিষম চিন্তে গঙ্গার মধ্যাহ্ন কৃত্য সমাপন করলেন। উঠে বাবার সময় হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি পড়ল বহুমূল্য ভোটকমলখানার প্রতি, তিনি শিউরে উঠলেন। নিজেকে শত শত বিক্রায় দিলেন—কেন এতদিন তাঁর খেরাল হয়নি যে তাঁর সঙ্গে এখনও রয়েছে বিলাসিতার পঙ্কতিলক। ভিখারীর এই বিলাসিতা শুধু মাত্র অপোভন নয়—অপরাধ। সেই কমলখানা তখন তাঁর কাছে মনে হল উত্তমকণা বিবধর কালসাপের মত। এবার তিনি বুঝতে পারলেন কেন মহাপ্রভু হেসেছিলেন। কিন্তু বিনা গাত্রবস্ত্রে বারাণসীর প্রচণ্ড শীতে কেমন করে দেহ ধারণ করবেন। তারপর মনে স্থির করলেন যে যদি শীতে মহাপ্রভুর শ্রীচরণে দেহপাত হয় তথাপিও তিনি উহা আর স্পর্শ করবেন না।

এমন সময় তিনি দেখতে পেলেন আশার আলোক। অদূরে এক বৃদ্ধ গৌড়ীয় তার শতছিন্ন মলিন কদ্বাখানি শুকাতে দিয়ে বসে আছে। তিনি বীরে বীরে তার নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন ভাই, আমার একটা উপকার করবে?

বৃদ্ধ অবাক হয়ে তাঁর দিকে চেয়ে উত্তর দিল বাবাঠাকুর, আমি নিজেই ভিখারী—এ পর্যন্ত কেউ ত আমার কাছে কোনো উপকার চায়নি? বল কি তোমার প্রার্থনা—যদি সম্ভব হয় নিশ্চয়ই করব।

তখন সনাতন আরও কাছে এসে বীরে বীরে তার হাত দুটি ধরে সকাঁতরে বললেন ভাই, আমার প্রার্থনা অতি সামান্য, দয়া করে আমার এই কমলখানা নিয়ে তোমার কাঁথাখানা আমার দাও। বৃদ্ধ এবার গম্ভীর হয়ে গেল—অত্যন্ত মর্ধ্যাহ্ন হয়ে তাঁকে বলল বাবাঠাকুর। আমি অতি দরিদ্র, মূর্খ আর তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি পণ্ডিত, অতি সম্ভ্রান্ত—আমি ত তোমার পরিহাসের যোগ্য নই?

সনাতন বৃদ্ধের কাঁধে একখানা হাত রেখে সন্তোষে বললেন, আমার বিশ্বাস কর আমি তোমার পরিহাস করছি না। এই কমলটা আমার কাছে বিবধর সাপের মত মনে হচ্ছে, আমি আর এটা বহন

করতে পারছি না। তোমার পায়ে পড়ি, দয়া করে এটার বদলে তোমার কাঁথাখানা আমার দাও।

এবার তাঁর আন্তরিকতার বৃদ্ধির আর কোন সন্দেহ রইল না। ভাই সে বলল, তোমার বা ইচ্ছা কিন্তু দেখো বাবাঠাকুর, পরে আবার চোর বলে ধরিয়ে দিয়ে না যেন।

সনাতন একটু হেসে জবাব দিলেন চোর! ভাই আমি যে নিজেই এক চোরের সন্ধানে আহা-নিজা ভাগ করে অল্প সোড়দেশ থেকে বারানদী পর্যন্ত ছুটে এসেছি। তার দেখাও পেরেছি কিন্তু ধরতে পারছি না।

তা দেখা বখন পেরেছ—ধরা সে নিশ্চয়ই পড়বে।

না ভাই, তুমি জান না সে অতি পাকা চোর—আর তুমি এ জীবনে নয়। জয়জয়ন্তর থেকে সে চুরি করে আসছে। কত নারীর, কত পুরুষের কত কি যে সে চুরি করেছে তা বলে শেষ করা যায় না।

তা হোক—তোমার এত চেষ্টা এত কষ্ট কখনও ব্যর্থ হতে পারে না। সে বড় বড় চোরই হোক না কেন, তোমার হাতে তাকে ধরা দিতেই হবে।

তোমার আশীর্বাদ ভাই, বলে সনাতন সেই কাঁথাখানা একবার মাথায় ঠেকালেন, তারপর বহুল্য রত্নের মত বুক জড়িয়ে ধরলেন। কবির ভাষায় বলতে গেলে 'দরিদ্র পাইল বেন ঘটরা হেম'। তিনি মনে মনে বললেন—প্রিয় আমার, তুমি আমার শেষ বিষয়কণ্টক উৎপাটিত করছ।

বুধ সেই বহুল্য কবুলখানা গায়ে জড়িয়ে বেশ আরাম উপভোগ করল, তারপর বিশ্বনাথের উদ্দেশে হাত জোড় করে বলল বাবা, তুমি নিজেও পাগল আর তোমার মত কত পাগলই না সংসারে সৃষ্টি করেছে।

আনন্দে সনাতন আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না, গেরে উঠলেন আর এক পাগল সন্ন্যাসীর অন্তরময় মহামন্ত্র—আধিব্যাধির মহৌষধি।

‘ভজ গোঁরাঙ্গ কহ গোঁরাঙ্গ লহ গোঁরাঙ্গের নাম রে

যে জন গোঁরাঙ্গ ভজে সে হয় আমার প্রাণ রে।’

সেদিন আর মাদুকরী করা হল না। অনেক দিন উপবাসে কেটেছে, নয় আরও একদিন কাটবে কিন্তু এ অপার আনন্দ প্রভুর চরণে নিবেদন না করে থাকতে পারলেন না। দ্রুতপদে চলে এলেন চন্দ্রশেখরের বাড়ীতে।

মহাপ্রভু তখন ভিক্ষার বাবার উত্তোগ করছিলেন, এমন সময় সনাতন তাঁর চরণে পড়ে কাদতে কাদতে বললেন ওগো ঠাকুর। ওগো প্রভু। এবার আমি তোমার চরণে সম্পূর্ণরূপে আত্ম-নিবেদন করলাম—তুমি আমার গ্রহণ করো।

মহাপ্রভু বিস্মিত হয়ে দেখলেন ভোটকবলের পরিবর্তে সনাতনের অঙ্গে রয়েছে একখানা শতছিন্ন মলিন কল্লা! তিনি তাঁকে বুক জড়িয়ে ধরে বললেন সনাতন, আমার প্রাণের দোসর, এবার ত তোমায় আমার মিলনে আর কোন বাধা নেই।

তাঁর নীলনলিন নয়নখুল জলে ভরে উঠল।

পুণ্যভূমি ভারত

যদি পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন দেশ থাকে বাহাকে পুণ্যভূমি নামে বিশেষিত করা যাইতে পারে—যদি এমন কোন স্থান থাকে, যেখানে পৃথিবীর সকল জীবকেই তাহার কর্মফল ভুগিতে আসিতে হইবে—যদি এমন কোন স্থান থাকে, যেখানে ভগবন্তাত্মাকারী জীবমাত্রকেই পরিণামে আসিতে হইবে—যদি এমন কোন স্থান থাকে, যেখানে মনুষ্যজাতির ভিতর সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষান্তি, ব্রুতি, দয়া, শৌচ প্রভৃতি সদগুণের বিকাশ হইয়াছে—যদি এমন কোন দেশ থাকে, যেখানে সর্বাপেক্ষা অধিক আধ্যাত্মিকতা ও অন্তর্দৃষ্টির বিকাশ হইয়াছে, তবে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি তাহা আমাদের মাতৃভূমি—এই ভারতভূমি। অতি প্রাচীন কাল হইতেই এখানে বিভিন্ন ধর্মের সংস্থাপকগণ আবির্ভূত হইয়া সমগ্র জগৎকে বারংবার সনাতন ধর্মের পবিত্র আধ্যাত্মিক বস্তায় ভাসাইয়াছেন। এখান হইতে উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম সর্বত্র দার্শনিক জ্ঞানের প্রবল তরঙ্গ বিস্তৃত হইয়াছে। আবার এইখান হইতেই তরঙ্গ ছুটিয়া সমগ্র জগতের ইহলোকসর্বত্র সভ্যতাকে আধ্যাত্মিক জীবন প্রদান করিবে। অপর দেশীয় লক্ষ লক্ষ নরনারীর হৃদয়দগ্ধকারী জড়বাদরূপ অনল নির্কোপ করিতে যে অমৃত-সলিলের প্রয়োজন, তাহা এইখানেই বর্তমান। বহুগুণ, বিশ্বাস করুন ভারতই জগৎকে আধ্যাত্মিক ভরসা ভাসাইয়াছে।

—স্বামী বিবেকানন্দ।

শি শি র=সা নি ধ্যে

রবি মিত্র ও দেবকুমার বসু

পশ্চিম আকাশের অন্তর্গামী সূর্য, শুধু একটু স্নান রক্তিমাতা, তার আলোর অক্ষরের প্রথম স্পর্শ। তার নেই দাহ, শুধুই স্নেহ উত্তাপ। নেই চোখ-ধাঁধানো উজ্জ্বলতা, শুধুই ক্রান্তিহারা স্নিগ্ধ আলো। তবু কণিকের জগৎ উপযুক্ত পাঠে মধ্যাহ্ন মার্জিতের প্রচণ্ড তেজের প্রকাশ দেখা যায়, একটি প্রচণ্ড শক্তির আবেষ্টন সর্বদা অনুভূত হয়। সন্ধ্যার অন্ত্যচল-আরচ স্নান রবিই প্রভাতের প্রশান্ত মিহির, দ্বিপ্রহরের ক্রান্ত ভাস্কর এই কথাটিই নতুন করে মনে পড়ে যায়।

নাট্যাচার্য শিশিরকুমার যেদিন হাসি-কান্নার রঙ্গভূমিতে প্রথম নেমেছিলেন আমরা তখনও কপ নিইনি। এমন কি, আমাদের জন্মদাতারাও তখনও বোধ হয় কল্পনা, তখনও ইচ্ছা হয়েই ছিলেন। তারপর দিনে দিনে শশিকলার মত বেড়ে উঠলেন তিনি, বাংলা কৈশোরের নানা রঙ্গ সেরে যৌবনের প্রথম উচ্ছ্বাসের আমেজে ভরপুর হয়ে আছেন। তিনি তখন শিক্ষক, রসিক, নাট্যলক্ষীর দীনভক্ত। তখন চলছে ভবিষ্যতের প্রস্তুতি। তারপর একদিন এলো সেই বিশেষ দিন, যে দিনটির কথা জন্মসঙ্গেই বিধাতাপুত্র তাঁর ললাট-লিপিতে উজ্জ্বল অক্ষরে লিখে দিয়েছিলেন—তাঁর জীবনের মহাক্ষণ। সে পরম লগনকে তিনি হেলা করেননি আর তাই দিকে দিকে সেদিন জয়ডঙ্কা বেজেছিল। সেদিনকার আনন্দ উৎসবে যোগ দেবার সৌভাগ্য আমাদের হয়নি।

আমরা যখন ধরণীর আলোক দেখলাম শিশিরকুমার তখন মধ্যাহ্ন মার্জিতের প্রবল তেজে দদীপ্যমান। তিনি নিজেই বলেছেন ১৯২৯ পর্যন্ত তাঁর কোন নাটকই অসফল হয়নি। তাঁর সেই অপ্রতিহত বিজয় অভিযানের কিছু কিছু হয়ত অবোধ আমরা মা'র কোলে বসে দেখেছি। দেখেছি কিন্তু বুঝিনি; বুঝিনি কারণ বোকার বয়স সেটা নয়, তখন মা'য়ের স্নেহ-আদরের দাম পৃথিবীর সবকিছুর চেয়ে বেশি। অবশ্য বয়স্ক হলেও যে ব্যুত্থান-এমন কোন কথা নেই, কারণ বোকার চোখ সকলকার থাকে না।

তারপর বয়স যখন বাড়ল, বোকাবার সময় যখন হ'লো, তখন শিশিরকুমার আর সাধারণ পর্যায়ের মানুষ নন, তিনি তখন উপকথার দেশের মানুষ। তাঁর সবকিছুতেই তখন একটি অতিমানবীয় স্পর্শ লাগতে শুরু করেছে। তাঁর কথা তাঁর চলন, তাঁর বলন, এমন কি তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সবক্ষেপে তখন এমন সব কথা মুখে মুখে চলতে শুরু করেছে যাতে তাঁকে সাধারণ মানুষের থেকে পৃথক বলেই মনে হয়েছে।

তখনকার দিনে সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেদের হাতে আজকালকার মত এত সহজে পয়সা আসত না। অনেক খোসামোদ, অনেক দরবার করে তবে ছ'চারটে পয়সা পাওয়া যেতো। কাজেই থিয়েটারের সব চেয়ে কমলা টিকিট এক টাকা পয়সা পাওয়াও কল্পনাভীত ব্যাপার ছিল। তাছাড়া থিয়েটার বাবোঙ্কোপের উপর গুরুজনরা মোটেই খুশী ছিলেন না; ওসবে নজর গেলে ছেলেরা উদ্ধৃত্ত হার। তাই থিয়েটার দেখা আর বিশেষ হয়ে উঠত না।

মাঝে মাঝে গুরুজনদের সঙ্গে এদিক-ওদিক থিয়েটার দেখিনি এমন নয়, আর তার মাঝে শিশিরকুমারের অভিনয়ও ছ'-একবার দেখেছি।

অবশ্য বিচার করে দেখবার মত বুদ্ধি তখনও হয়নি, তবু যখনই তাঁর অভিনয় দেখেছি, তখনই মনে হয়েছে অজ্ঞদের থেকে যেন পৃথক তিনি। অল্প দামের সীটে পেছনে বসে কদাচ কখনো তাঁর গলা যদি কানে না-ও পৌঁছে থাকে, কি বলতে চাইছেন বুঝতে কষ্ট হতো না। আর তাতেই মনে হতো সত্যিকার বড় অভিনেতা নিশ্চয়ই, নইলে অজ্ঞরা যেখানে হৈ-ঠে করে চেঁচিয়ে অজ্ঞভঙ্গী করে একটি চরিত্রকে পুরোপুরি খাড়া করতে পারে না, সেখানে কত সহজে কত সামান্য পরিশ্রমে পুরো চরিত্রকে চোখের সামনে জীবন্ত করতে পারতেন। তাই কুড়ি-পঁচিশ বছর পরেও আলমগীরের স্বপ্নদৃশ্য আমাদের চোখের সামনে ভাসে, আজও যেন দেখতে পাই বন্দী আলমগীরকে; চোখের সামনে ভেসে ওঠে রাঘব সেই ব্যাকুল কথা—কার কণ্ঠস্বর!

আরো বড় হল্যাম, বুদ্ধির বিকাশ ঘটল কিনা জানি না, তবে মনের ভিতর আধুনিকতার নানাবরকম প্যাঁচ খেলতে শুরু করল। বুঝি না বুঝি বিদেশী কিছু কিছু লেখা পড়ে পণ্ডিতমুখ্য বনে গেলাম। তখন মনে হল, শিশিরকুমারের অভিনয় ঠিক বাস্তবিক নয়, তাঁর প্রয়োগরীতি সকলে বস্তুপাচা, তাঁর শিক্ষাদানের রীতি অচল হয়ে পড়েছে। সে যুগটি নবনাট্য আন্দোলনের গুরুত্ব যুগ, নবায়ন যুগ, গণনাট্য-সংঘের প্রসারের যুগ। আমাদের মত তরুণদের বোঝানো হয়েছিল আর আমরা বুঝেও ছিলাম যে, বাংলার নাট্য আন্দোলনের নতুন মোড় ঘুরছে।

কোন কিছুর অগ্রদূত হবার একটি আনন্দ আছে, আছে উন্মাদনা, আছে উজ্জ্বল। এই তিনটির একত্র সমাবেশ আমাদের মধ্যেও হয়েছিল। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই নতুন কিছু করার মোহটি চলে গেল, দেখলাম নতুন বলে থাকে ধরতে গেছি সেটি আসলে নতুনই নয়। ভুলটি ভাল করেই ভেঙে দিলেন শিশিরকুমার—নবায়নই সমশ্রেণীর হুঁশিয়ার ইমান প্রবোজন করে। দেখা গেল যাকে বাস্তবের দলে ফেলা হয়েছিল তিনি সেদিনও সকলের আগে।

যাদের আমাদের চেয়ে জ্ঞানী মনে করতাম, হঠাৎ তাঁদের জ্ঞানের পরিমাণ ও গভীরতা সবক্ষেপে সন্দেহ জাগল। থিয়েটারের বিষয়ে বিদেশী লেখকদের লেখা বই কিছু কিছু পড়তে শুরু করলাম, তার থেকে এই বোধটুকুই জন্মাল যে, নাটক সবক্ষেপে বত আলোচনাই করা থাক না কেন, নাটকের অভিনয়ের মূলমন্ত্র তা থেকে আবিষ্কার করা সম্ভব নয়। এর জন্ত প্রয়োজন নিয়মিত ভাবে নাটক পড়ার, অভিনয় দেখার ও সম্ভব হলে অভিনয় করার।

এবার থেকে সেই প্রচেষ্টাতেই বত হল্যাম। দেশী বিদেশী বহু নাট্যকারের বহুরকম নাটক পড়লাম আর তার থেকে আরো বিপদে পড়তে হলো। এতদিন পর্যন্ত একটি ভাসা-ভাসা ধারণা

ছিল যে, বক্তব্যের উপরই নির্ভর করে নাটক, একই কথা বার বার বললে বক্তব্যের মাহুর্ষ নষ্ট হয় আর বক্তব্যবিহীন নাটক নাটকই নয়। অবশ্য বক্তব্য বলতে, কেন জানি না, বুঝতাম—প্রগতিশীল বক্তব্য। কিন্তু পৃথিবীর বহুবিধা নাটকের মধ্যে অদ্ভুত রকম মিল নজরে পড়ল আর আমাদের ধারণা অল্পস্বাভাবিকতার মূল কথাটিকে বক্তব্য বলে স্বীকার করাও কঠিন ছিল। তাহলে কি সেগুলো ভাল নাটক নয়? তাহলে ভাল নাটক বলব কাকে?

মনের মধ্যে বসান এই রকম দোটাটনা, তখন আমাদের প্রত্যাশিত একজন এসে বললেন—ওহে, শিশিরকুমারের সঙ্গে অভিনয় করবে? মনে হলো যেন উত্তর এবার পাওয়া যাবে। শিশিরকুমারের বিকল্পবাদীরা আর ঘাই বলুন, নাটক সম্বন্ধে যে তাঁর পড়াশুনার অভাব ছিল এমন অপবাদ অতি বড় নিম্নকোণে বিতে পারত না। তাই এক কথায় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে রাজী হয়ে গলাম।

কোন বিখ্যাত লোককে কাছে থেকে দেখতে পাওয়া খুবই সৌভাগ্যের কথা, কিন্তু অবিফাশ ক্ষেত্রে দূরের মানুষ কাছে এসে দূরের মোহজাল কেটে গিয়ে রূঢ় বাস্তবের সংস্পর্শে কলনার স্বপ্নমন্দির ভেঙে যায়। ওয়ার্ডেনওয়ার্থ তাই বোধ হয় বলেছিলেন যে, “ইয়্যাং” না দেখাই ভালো। অবশ্যকালে মন বসান ক্রান্ত হয়ে পড়বে তখন আমাদের না দেখা “ইয়্যাং”র কথা মনে করলেই ক্রান্তি দূর হবে। (কথাসমূহে স্মৃতি থেকে বলছি, কাজেই আক্ষরিক সত্য না-ও হতে পারে, তবে ভাবটি মোটামুটি বোধ হয় ঠিকই আছে।)

শিশিরকুমারের কাছে গেলে যে আশাত্মক হবে এটি ধরেই নিয়েছিলাম আর নিয়েছিলাম বলেই খুব বেশি আশাহত হইনি। মনের মধ্যে অনেক দিন আগে যে অতিমানবীর কথাটি বাসা বেঁধেছিল, সেটির অভাবই প্রথম চোখে পড়েছিল। দেখেছিলাম মধ্যবিত্ত ঘরের শিক্ষিত কৃতিবান এতটি মানুষকে, যার ঘর বই-এ ঠাসা। ইঞ্জিনিয়ারে বসে চুকট হাতে, মোটা চশমা চোখে এই মানুষটিই যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী নট ও নাট্যাচার্য শিশিরকুমার, বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করেনি। কিন্তু কথা বলতে বলতে চোখের বিদ্যাহরণ বদলে উঠেছিল তখন বুঝতে পেরেছিলাম—touch of madness তাঁর ভিতরেও আছে।

প্রথমেই বলেছিলেন—নাটক পড়তু? আমতা আমতা করে বলেছিলাম—একটু একটু। খুশি মনে বলেছিলেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ পড়বে। নাটক বত পড়বে ততো ভাল বুঝবে। তাৎপর্য নাটক সম্বন্ধে সাধারণ আলোচনা করতে করতে বলেছিলেন—রবীন্দ্রনাথের মালিনী পড়েছ? মাথা নেড়েছিলাম, অবশ্য তাতে হ্যাঁ, কি না বোঝায় তা বোঝা যায় না, আমাদের মধ্যে একজন বলেছিল—পড়িনি তবে অভিনয় করেছি। খানিকটা যেন অবাক হয়েছেন এই ভাবে আবার হেসে বলেছিলেন—বলো কী হে, তোমার তো খুব সাহস দেখছি? রবীন্দ্রনাথের বই-এর মধ্যে মালিনীর কদরই সবচেয়ে কম, অথচ তুমি তা অভিনয় করেছ। তা পড়নি কেন? সেই চটপট জবাব দিয়েছিল—বুঝতে পারি না। হেসে উঠেছিলেন—বুঝতে পার না কেন? বেশ, পড়ে শোনানি। বই নিয়ে এসে বলেছিলেন—এটি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নাটকের একটি, অথচ এর কোন বোজাই রাখে না কেউ।

সেদিন তাঁর পড়া শুনে আর তাঁর ব্যাখ্যা থেকে নাটকের রস

গ্রহণ সহজ হয়ে গিয়েছিল, আর সেই-সঙ্গে সঙ্গে মনের ঐশ্বর্যও সমাধান হয়ে গিয়েছিল। বুঝেছিলাম বক্তব্যই নাটকের মূল কথা নয়, মূল কথা স্মৃতি, বিকাশ আর চরিত্র সৃষ্টি। এই দুটি গুণের সঙ্গে নটের অভিনয়কলা আর সুপ্রয়োগরীতি যদি মেলে তাহলেই নাটক শ্রেষ্ঠ নাটক হয়ে পীড়িতে পারে।

সেদিনের পর বছর বহুভাবে শিশিরকুমারের সঙ্গে মেশবার সুযোগ হয়েছে। মঞ্চে তাঁর দিনের পর দিন অভিনয় দেখছি; তার পরও বছর আমাদের তাঁর সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্য হয়েছে। প্রথম দর্শন থেকেই তাঁর সঙ্গে যে সব আলোচনা হয়েছে তার কিছু কিছু লিপিবদ্ধ করে রাখবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তার সবটাই আজ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। মোটামুটি উনিশ শ’ ছাপার শেষ দিক থেকে আটাল্ল সালের শেষ পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে যে সব কথা হয়েছে তারই কিছু কিছু অংশ এখনো আমাদের কাছে আছে।

উনিশ শ’ আটাল্ল সালের জুন মাস নাগাদ নাট্যরসিক ও নাট্যমোদী একটি গোষ্ঠী গড়ে তোলবার জন্য তিনি নব্য বাংলা নাট্যসমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে পুরোনো ‘নাটক পাঠ’, নাটক সম্বন্ধে আলোচনা ও নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা করে বর্তমান যুগের বাঙালী নাট্যরসিকদের পুরোনো যুগের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটিয়ে ভবিষ্যতের পথ নির্দেশের ইচ্ছা তাঁর ছিল। এই প্রসঙ্গে যে-সব আলোচনা করতেন তিনি সেগুলো সবই লিখে রাখবার চেষ্টা করেছি। প্রথম প্রথম সঙ্গে সঙ্গে লেখার চেষ্টা করেছি, কিন্তু শেষের দিকে এত কথা বলতেন যে, সঙ্গে সঙ্গে লেখা বাতুলতার নামাস্তর মাত্র হয়ে পীড়িত। তাই পরে স্মৃতি থেকে লিখেছি। তার ফলে হয়ত অনেক সময় কোন কোন কথা একটু-আরটু অদল-বদল হয়ে গেছে। তবে যতদূর সম্ভব তাঁর মুখের কথাই লিখে রাখতে চেষ্টা করেছি। হয়ত কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্য ঠিক মত বুঝতে না পেরে ভুল করেছি। তার জন্য দোষটা আমাদের।

অনেক বিশ্বস্তপ্রায় কাহিনী সম্বন্ধে শিশিরকুমারের মতামত কোঁড়হলোদীপক মনে হবে। বাঙাল দেশের কোন কোন মনীষীর কথা আজ আমরা ভুলতে বসেছি, তাঁদের সম্বন্ধেও শিশিরকুমারের কাছ থেকে অনেক কথা জানা গিয়াছে। আমাদের সংগৃহীত তথ্যাদি বাংলা দেশের তৎকালীন বিদগ্ধ সমাজের আচার-ব্যবহার আলোচনা-আলোচনা সম্বন্ধেও কিছুটা আলোকপাত করবে বলে মনে হয়।

তবে শিশিরকুমারের জীবনী-গ্রন্থ রচনার প্রচেষ্টা আমরা করছি না বা শিশিরকুমারের নাট্যজীবনের মূল্যায়নের দায়িত্বও এখন নয়। এসব কাজের জন্য উপযুক্ত পাঠ্য অনেকেই আছেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য মানুষ শিশিরকুমারের চরিত্রের বিভিন্ন দিকের উপর তাঁরই কথার সাহায্যে কিছুটা আলোকপাত।

তাঁর কোন কোন কথা স্পষ্টতঃ অতিভাষণ দোষে দুষ্ট বলা যেতে পারে। কিন্তু যে পরিবেশের মধ্যে তিনি কথাগুলি বলতেন তা বিবেচনা করলে বোধ হয় তাঁর এ দোষ অপ্রাচ্য করা যেতে পারে। তিনি বলতেন আমাদের মত বয়ঃকনিষ্ঠদের কাছে, বাদ্যের গুরুত্ব অস্বীকার করার পূর্বাভাস উগ্রভাবে বর্তমান; তাছাড়া থিয়েটার এমনই একটা জীৱগা যেখানে, নটগুরু গিরিশচন্দ্রের মত

বশিষ্ঠেরও পদাঙ্কন হয়, কাজেই কোমলমতি ভক্তগণ-ভক্তগণীরা হাতে পথ না হারায় তার লজ্জাই অনেক সময় অনেক কথা হয়ত কিছুটা রেখে-টেকে বলতেন।

আমাদের কথা হয়ত একটু বেশী বলা হয়ে গেল, কিন্তু শিশিরকুমার সন্থকে আমাদের কিছু বলবার অধিকার স্থাপন করবার লজ্জাই এত কথা বলতে হলো। অধিকারী বিবেচনা করলে হয়ত বলবার অধিকার আমাদের কিছুই নাই, তবু তাঁর স্নেহ আমরা পেয়েছিলাম এবং সেই স্নেহের দাবীতে এই লেখাগুলি প্রকাশ করছি।

শিশিরকুমারের কথা বলার আগে বোধ হয় সে সময়কার বাংলা রঙ্গমঞ্চের অবস্থা বর্ণনা করা অজ্ঞায় হবে না। শিশিরকুমারের সাধারণ রঙ্গমঞ্চের অবতরণের সময়কার অবস্থার সঙ্গে আজকের সাধারণ রঙ্গমঞ্চের অবস্থার বেশ একটা মিল আছে। মাত্র এক যুগ আগে বাংলা দেশের সাধারণ রঙ্গমঞ্চ শিশিরকুমারের নেতৃত্বাধীনে বহু-বিখ্যাত অভিনেতা-অভিনেত্রী জনসাধারণকে আনন্দদান করতেন। অথচ আজ তাঁদের প্রায় কেউই আর রঙ্গমঞ্চে অবতরণ করেন না। সেদিনও রঙ্গমঞ্চের এইরকম অবস্থা। গিরিশচন্দ্র, অর্ণবকুমার, অমৃতলাল মিত্র প্রমুখ প্রথম যুগের দিকপাল অভিনেতার তখন গুরু হয়েছেন। রসরাজ অমৃতলাল বহু তখনও জীবিত, কিন্তু রঙ্গমঞ্চে অবতরণ আর বিশেষ করেছেন না। সেই যুগের একমাত্র প্রতিনিধি হিসাবে দানীয়াবুই তখন নিরমিত অভিনয় করতেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় তখন স্বপ্নকথার পর্ববসিত হয়েছে।

গিরিশচন্দ্র সাধারণ অভিনেতারও পরবর্তীযুগের বহু সুপরিচিত অভিনেতার চেয়ে ভাল অভিনয় করতেন। কথাটা শিশিরকুমার নিজেই বলেছেন। কিন্তু মিলিতভাবে অভিনয়ের উন্নতির কোন প্রচেষ্টা তাঁরা করেননি। গিরিশচন্দ্র নিজেই বলতেন—এগিয়ে গিয়ে চোঁচিয়ে বস। তাঁদের ব্যক্তিগত অভিনয়ের মান অবশ্য খুবই উন্নত ছিল, কিন্তু সমগ্রতার দিক থেকে কোন রকম উন্নতির চেষ্টা তাঁদের ছিল না। এমন কি, অনেক সময় যদি মনোমত দর্শকসমাগম না হ'তো তাঁরা অভিনয় সংক্ষেপ করে কোন রকমে জোড়াগুলি দিয়ে শেষ করতেন। অভিনয়ে একটি ভোলেরও প্রবর্তন করেছিলেন তাঁরা। প্রথম যুগের বিখ্যাত অভিনেতার অবশ্য এ ভোলে আবদ্ধ থাকতেন না। কিন্তু পরবর্তীযুগের প্রায় সকলেই এ ভোলের ফেরে পড়ে গিয়েছিলেন। এমন কি, দানীয়াবুও তাঁর প্রভাব নড়াতে পারেননি।

ক্ষমতাশালী ক্ষমতা প্রকাশের প্রয়োজন হয় না, লোকে তার ক্ষমতার কথা জানে বলেই তাকে সমীহ করেই চলে, কিন্তু অক্ষম বধন তার ক্ষমতার কথা বলে তখন অনির্দিষ্ট গুণ্ডার মধ্যেই ক্ষমতার প্রকাশ করে। সেইজন্য অক্ষমের ক্ষমতা প্রকাশ একটি ভোলেই হয়। শক্তিশালী সে ভোল মেনে চলবার প্রয়োজন হয় না, কিন্তু তারাই ভোল বেঁধে দেয়। শিক্ষক-ছাত্রের গ্রহণযোগ্য করেই শিক্ষা দেন, কেতাবী শিক্ষায় সে হিসাব থাকে না, কাজেই সেখানে মুড়ি-মিছুরির একই দর হয়ে পড়ে। মিছুরির অবশ্য তাঁতে কোন অপ্রবিধা হয় না, কিন্তু বিপদে পড়ে মুড়ি। দুর্বল অভিনেতার তাই ভোলের বাঁধনে পড়ে হীসকাঁস করত আর সামগ্রিকভাবে অভিনয়ের অবনতিই ঘটত।

অল্প বয়স থেকেই বাংলা রঙ্গমঞ্চের এই দুর্বলতা শিশিরকুমারের

নজরে পড়েছিল। পরীক্ষার পড়ার দিকে তাঁর যৌক না থাকলেও কবিতা ও নাটক জাতীয় অগাধ ঐশ্বর্যের উপর যৌক ছিল খুবই বেশি। তাছাড়া অভিনয়, নাট্যপ্রয়োগ ইত্যাদি সবক্ষেত্রেও অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে পড়াশুনা করেছিলেন তিনি। সে সময়ের বাংলা রঙ্গমঞ্চে অভিনীত প্রায় সব নাটকই তিনি দেখেছিলেন। তৎকালীন বিখ্যাত অভিনেতার অভিনয়কলাও তিনি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ্য করতেন। আর ফলে দীর্ঘ আটচালিশ—পঞ্চাশ বছর পরেও বিভিন্ন অভিনেতার বাচনভঙ্গীর নিখুঁত ভাবে নকল করতে পারতেন। এতদিন পরে যদি অতকাল আগের কথা মনে থাকে, তবে সেই সময় আরো কত বেশি মনে ছিল তা সহজেই অনুমেয়।

কটক কলেজে ছাত্র থাকাকালীন শিশিরকুমার সর্বপ্রথম জুলিয়াস সিজার নাটকে ক্রোটাসকে রূপায়িত করেন। কিন্তু বতদূর জানা যায়, সে সময় প্রয়োগের কোন দায়িত্ব বোধ হয় তাঁর উপর অর্পিত হয়নি। পরিচালক হিসাবে শিশিরকুমারের প্রথম আবির্ভাব বতদূর জানা যায়, নবীন সেনের কুসুমকল্পের নাট্যরূপায়ণে। ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে এই নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। এর পর নাট্য-পরিচালক ও নট হিসাবে শিশিরকুমারের খ্যাতি চতুর্দিক বিস্তৃত হতে থাকলো।

ইতিমধ্যে এম-এ পাশ করে শিশিরকুমার তদানীন্তন মেট্রোপলিটান কলেজ (বর্তমানে বিভাগাগর কলেজ) এ ইংরাজী সাহিত্যে অধ্যাপনার কাজ নেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই তাঁর অধ্যাপনার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। কিন্তু নোট-পড়ানো তিনি পছন্দ করতেন না আর সেজন্য ছাত্ররা তাঁর কাছে অনুযোগও করত। অধ্যাপনার কাজে লেগে থাকলে শিশিরকুমারের পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী ভাষার প্রধান অধ্যাপক হওয়া অসম্ভব ছিল না। শোনা যায়, তিনি বহন সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অবতরণ করতে প্রস্তুত হচ্চেন, তখন আন্ততঃ তাঁকে নিযুক্ত হতে অনুবোধ করেন এবং তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের পদ দেবার প্রস্তিষ্কতিও দেন। অধ্যাপনার কাজে খুব বেশি চাপ না থাকায় তাঁর পক্ষে অল্প কাজ করে অধিক অর্থোপার্জন করাও সম্ভব ছিল, আর তিনি তা' করতেনও। তবু আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করেও তিনি রঙ্গমঞ্চে যোগ দিলেন। তাঁর রক্তে যে তখন অভিনয়ের ডাক এসেছে। কান্নুর বাঁশী শোনার পর রাখা কি আর ঘরে থাকতে পারে।

শোনা যায়, ইনস্টিটিউটে তাঁর নাট্য-প্রয়োগের কাজে তিনি অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেনের কাছ থেকেই সবচেয়ে বেশি সাহায্য পেয়েছিলেন। বিনয় বাবু তাঁকে অভিনয় করা ও করানোর কাজে উৎসাহ সকলের চেয়ে বেশি দিয়েছেন। কিন্তু তিনি জীবিত থাকলে শিশিরকুমারের পক্ষে বোধ হয় সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অবতরণ সম্ভব হতো না। তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে বলেছিলেন—You are wasting yourself, Sisir, your true vacation is on the stage. কিন্তু সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অবতরণের উচ্চত্যা সন্থকে বহন প্রেরণ করলেন শিশিরকুমার, তখন গুরুদাস বাবু তৎকালীন রঙ্গমঞ্চের অবস্থা বিবেচনা করে তাঁকে বলতে পারেননি যে, তুমি নেবে যাও শিশির। বরঞ্চ বোধ হয় বারণই করেছিলেন।

আজকে বিংশ শতকের বর্ষ দশকেও, শিক্ষিত বাঙালী তার আত্মীয়-স্বজনের কাউকে পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের গণ্ডী পেরিয়ে বাঙালী

পছন্দ করে না। কাজেই আরও চল্লিশ বছর আগেকার কথা সহজেই অহুমের। অথচ আশ্চর্যের কথা, সেই সময়েও শিশিরকুমারের মাতা তাঁর কৃতী সন্তানের এই জাতিচ্যুতির কথা জেনেও কোন আপত্তি করেননি, বরং তাঁকে আশীর্বাদই করেছিলেন। শিশিরকুমারই বলতেন যে, বত রাত করেই ফিকন না কেন তিনি, তাঁর মস্ত জেগে বসে থাকতেন মা।

মায়ের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে, পদের মোহ, সামাজিক প্রতিষ্ঠার মোহ কবতলগত আমলকের মত ত্যাগ করে, নিশ্চিত বর্তমানকে ছেড়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের বৃকে নাট্যকলার উন্নতির মন্ত্র মুখে নিয়ে প্রায় আটত্রিশ বছর আগে সেই যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন তিনি আর কোন দিনও পিছন দিকে ফেরেননি। বার বার বাধা পেয়েছেন, বার বার সাকল্যের তুঙ্গ শিখর থেকে চরম অসাকল্যের মধ্যে হারিয়ে গেছেন তিনি। কিন্তু কখনো হার মানেননি।

ম্যাডান কোম্পানীর চাকরীতে ঈর্ষাতুর সঙ্গীদের চোঁটায় নিজের ইচ্ছামত উন্নতি করা সম্ভব হয়নি বলে চাকরী ছেড়ে দিতে বাধেনি তাঁর। একজিবিধনে দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা' অভিনয় করার পর বখন তাঁর অভিনয়খ্যাতি, পরিচালনখ্যাতি আর প্রয়োগ-নৈপুণ্যের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল আর সেই খ্যাতির সুযোগ নিতে তাঁর বিরুদ্ধপক্ষ বখন আইনের কীকে কৌশলে সীতার অভিনয়ের স্বত্ব কিনে নিয়েছিলেন তখন যেমন অদম্য উৎসাহে অজানা অচেনা যোগেশ চৌধুরীকে দিয়ে রাতারাতি নাটক লিখিয়ে অভিনয় করেছিলেন, তেমন অল্পকাল আগে জরাজর্জর ভঙ্গদেহে 'নব্য বাংলা নাট্যপরিষদ' স্থাপন করে আমাদের উপর যুগ্ম সম্পাদকের দায়িত্ব চাপিয়ে, সোৎসাহে রবীন্দ্রনাথের "মালিনী"র রিহাস্ত্রালের কাজ নিজের কাঁধে নিয়েছিলেন এবং দিনের পঃ দিন বোঁবনের শক্তি নিয়ে সুপরিচিত ও অপরিচিত অভিনেত্রী-অভিনেতাদের একই ভাবে অভিনয়ের সুস্থ কাকর্ষক শোভাতে চেয়েছেন।

উৎসাহের আধিক্যে ভাঙা হাতের কথা ভুলে গিয়ে, বরসোচিত দৌর্বল্যের কথা ভুলে, প্রায়াক্র দৃষ্টির কথা বিস্মৃত হয়ে যেভাবে তিনি লাকালিকি করতেন তাতে তাঁর পরিচিতির কথা কখন কি দুর্ঘটনা ঘটে এই ভেবে সশঙ্কিত হয়ে পড়তেন তিনি কিন্তু তাতে ভ্রক্ষেপও করতেন না। যে মন্ত্রশক্তির প্রভাবে অধ্যাপক শিশিরকুমার ভাহুড়ি নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাহুড়িতে রূপান্তরিত হয়েছিলেন তাঁর সেই ক্ষমতার পরিচয় জীবনের প্রায় শেষ দিনটিতে পূর্ণ দিয়ে গেছেন।

শিশিরকুমার ছিলেন চির আশাবাদী; বাংলা রঙ্গমঞ্চের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন সন্দেহই ছিল না তাঁর। তবে তিনি এ কথাও বিশ্বাস করতেন যে, নতুন নতুন পথ নির্ণয়ের জন্য পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রয়োজন খুব বেশি। সাধারণ রঙ্গালয়ের পক্ষে সে দায়িত্ব পালন করা সম্ভবপর নয়, একথাও তিনি জানতেন। তিনি আরও বিশ্বাস করতেন যে, উপযুক্ত অর্থাভাবের জন্য কোন এক বা একাধিক সৌধীন নাট্য সম্প্রদায়ের পক্ষেও এ দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভবপর হবে না। এ কাজের জন্য প্রয়োজন সরকারী সাহায্যপুষ্ট জাতীয় নাট্যশালা। সরকারী পরিচালন ব্যবস্থার তিনি আস্থাবান ছিলেন না। তিনি জানতেন সরকারী লালকিতার চাপে অনেক সদিচ্ছা লোকচক্ষুর অন্তরালে আঁতে আঁতে লোপ পায়। এই জাতীয় নাট্যশালা সরকারের অর্থ

সাহায্যে গড়ে উঠলেও তার দায়িত্ব থাকবে গুরুগুরি নাট্যরসিক মহলে, হাতে। তাঁর থিয়েটার বাবার পর এই জাতীয় নাট্যশালায় কথাই বার বার বলতেন তিনি।

কিন্তু একলা অরণ্যে যোদন সাধ হয়ে পড়েছিল। বহু জনে তাঁর মতের যৌক্তিকতা মেনে নিয়েছিলেন এবং তাঁকে তাঁর কল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করার কাজে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ কোন প্রতিশ্রুতিই কার্যকরী হয়নি, বার বার এই ভাবে আশাহত হয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। আর আমাদের মনে হয় এই হতাশাই তাঁর মহাপ্রয়াণকে ত্বরান্বিত করেছে।

শিশিরকুমারের স্মৃতি যে চরিত্রটির সঙ্গে তাঁর নিজের জীবনের মিল সব চেয়ে বেশি তা বোধ হয় বাংলাদেশের আর এক দুর্ভাগ্য প্রতিভা মাইকেল-মধুসূদন দত্তের চরিত্র। সেই জন্মই বোধ হয় জীবনের শেষ পর্যন্ত মাইকেলকেই সব চেয়ে ভালো করে কুটিয়ে তুলেছিলেন তিনি। বিরূপ নিয়তির সঙ্গে যুদ্ধ করে জয়লাভ যে হয় না এ খবর শিশিরকুমারের অজানা ছিল না। তাই নিজেই দুঃখ করে বলেছেন, হাজার বছরে এমন একজন লোক আসে যাকে দেশ, সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্মনার্যকরা পৃথ ছেড়ে দেয়, সে সৌভাগ্য আমার নয়। তবু দৈবের কাছে হার স্বীকার করেননি কখনো, কর্ণের মত মৃত্যুকণ পৃথক যুদ্ধই করেছিলেন।

অনেকের মুখেই শোনা যায়, শিশিরকুমার যে সম্মান পেয়েছিলেন সে সম্মান রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কোন সাহিত্যিক বা শিল্পী পাননি। কথাটা হয়ত মিথ্যা নয়, হয়ত, হয়ত কেন, দেশবাসীর প্রীতির দানে তাঁর ভাণ্ডার ভরে উঠেছে, কিন্তু তিনি রাজোচিত শ্রদ্ধাবের অধিকারী, মুষ্টিভিক্ষার দানে তাঁর মন উঠবে কেন? অছাড়া সাধারণ পাঁচ জনের মত ভাণ্ডার ভরে রাখতে তো শেখেননি তিনি। তিনি তো কেবল দিসেই গেছেন, যে ভাবে তিনি দিয়েছেন তাতে কুবেরের ভাণ্ডার ফুরোতেও দেবী লাগে না, এ তো সামান্য মাহুয। একদিন যারা তাঁর দান নিয়েছেন তাঁরা তাঁকে বেহিসাবী বলাতে পারেন, মুখ বলাতে পারেন, কিন্তু অস্বাভাবিক বলেন কি করে?

মাহুয হিসাবে শিশিরকুমারকে বিচার করা আমাদের পক্ষে দৃষ্টতা মাত্র, কাজেই সে চেষ্টা করবো না। শুনেছিলাম তিনি দর্পী, তিনি লালকিত। কিন্তু আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, আমরা তাঁর স্নেহাতুর রূপটাই দেখেছি। অবাচিত অপ্রাণ্য স্নেহের দানে আমাদের মন ভরিয়ে দিয়ে গেছেন। তাই তাঁর কাছ থেকে বা পেয়েছি তা অমূল্য।

শিশিরকুমারের পঞ্চভূতের নম্রদেহ প্রকৃতির বৃকে মিলিয়ে গেছে কিন্তু নাট্যাচার্য অমর হয়ে রইলেন আমাদের মধ্যে। বতদিন বাঙালী জাতি থাকবে, বাঙলা ভাষা থাকবে, বাঙলার থিয়েটার থাকবে, তত দিন শিশিরকুমার স্থির অবিনশ্বর প্রবর্তার মত বাঙালী-মনে উজ্জল হয়ে থাকবেন।

শিশিরকুমারের অমর প্রস্রাভীত হলেও সাধারণ মাহুয তাতে খুশি হতে পারে না। তারা চার স্রবণী ও বরষী মাহুযের স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে ইন্দিরপ্রাছ কোন কিছু। তাই আজ নানাদিক থেকে প্রভাব আসছে, শিশিরকুমারের নামে রাতার নামকরণ করা হোক, বা শিশিরকুমারের নামে পার্কের নামকরণ হোক বা

শিশিরকুমারের নামে অধ্যাপক নিযুক্ত হোক বা শিশিরকুমারের চিতাফলে স্মৃতিস্তম্ভ গড়া হোক।

এই ধরণের স্মৃতিচিহ্নের উপর শিশিরকুমারের যোহ তো ছিলই না উপরন্তু ছিল বীতরাগ। তিনি বলেছেন যে, তাঁর মত দেখতে হবে কি না হবে এমন একটি মূর্তি খাড়া করে বছরে গলায় একদিন মালা দিয়ে থাকে তাকে দিয়ে শ্রাদ্ধ না করাই সমীচীন। রাস্তার নামকরণও তাঁর বিশেষ আপত্তি ছিল। বলতেন, শ্রদ্ধার নামে লাধি মারানোর দরকার কি? যে অধ্যাপনার কাজ ছেড়ে একদিন তিনি নাট্য-উন্নয়নের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন সেই অধ্যাপকের পদের সঙ্গে তাঁর নাম জড়িত করলেই কি উপযুক্ত সম্মান দেখানো হবে তাঁকে?

একদিন যেমন গিরিশচন্দ্রের অসমাপ্ত কাজ নিয়ে শিশিরকুমার গিরিশচন্দ্রের স্মৃতির প্রতি উপযুক্ত সম্মান দেখিয়েছিলেন, তেমনি শিশিরকুমারের অসমাপ্ত কাজের দায়িত্ব নিতে পারলেই বোধ হয় তাঁর স্মৃতির প্রতি উপযুক্ত সম্মান দেখানো হয়, অবশ্য আজকালকার দিনে ঠিক শিশিরকুমার গিরিশচন্দ্রের সমশ্রেণীর মানুষ পাওয়া কঠিন, কাজেই তাঁরা যে কাজ একলা করেছিলেন সে কাজ পাঁচজনে করতে হবে। তাছাড়া বৃগটাত্ত গণতন্ত্রের, এখন কাজ করতে হলে পাঁচজনের সাহায্য সর্বাঙ্গ্রে প্রয়োজন। শিশিরকুমারের স্মৃতিরক্ষার

জন্ত একটি জাতীয় নাট্যশালা সৃষ্টিই বোধহয় তাঁর কাছে সবচেয়ে প্রিয় হতো। তাঁর শেষ কথা বলতে গেলে, জাতীয় নাট্যশালা সৃষ্টির প্রস্তাব। কাজেই শিশিরকুমারের নামে কলকাতার জাতীয় নাট্যশালা সৃষ্টি করার চেষ্টাই বোধ হয় আমাদের পক্ষে সমীচীন হবে।

হয়ত কোন দিন আমাদের জাতীয় সরকারের টনক নড়বে, আমাদের রাজ্যে রাজ্যে সৃষ্টি হবে জাতীয় নাট্যশালা, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পর্যন্তের মূষিক প্রসবের মত বাঙালি নাটকের উন্নতি কতদূর হবে তা সহজেই কল্পনীয়। বাংলা দেশে রসিক লোকের অভাব বোধ হয় এখনও ঘটেনি, আর বাংলা দেশের আকাশে যতই দুর্ভোগ ঘনিয়ে আসুক, আজও প্রয়োজনের ক্ষেত্রে হাত পাতলে খালি হাতে যে ফিরতে হয় না এ কথা আমরা বিশ্বাস করি। নাট্যাচার্যের স্মৃতিরক্ষার দায়িত্ব কেউ নিলে জাতির ঋণ শোধের দায়িত্বই নিয়ে ধস্ত হবেন একথা বলা যায়।

নাট্যাচার্যের কথা শুনে নতুন কোন মানুষ যদি এগিয়ে এসে তাঁর অসমাপ্ত দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয় তাহলেই আমাদের কর্তব্য কিছুটা পালন করা হয়েছে বলে মনে করবো। অকারণে যে স্নেহ আমরা পেয়েছিলাম তার প্রতিদান দেওয়া সম্ভব নয়, তবু গুরুত্ব্য পালন করে অন্ততঃ স্নেহের ঋণ শোধের চেষ্টা করছি। [ক্রমশঃ।

ত্রয়ী

বিমলচন্দ্র ঘোষ

মনে রেখো মহাপ্রলয়-তিমিরে জীবন মৃত্যুহার্য,
আগুনের রস শুবে শুবে বাঁচে মরুতে খেজুর চারা।

মনে হয় পাহাড় চিবুই,
গ্রহপিণ্ড গুঁড়ো করি কাঁতে।
সুখশিখা জুঁ দিয়ে নিবুই,
বোম চেটে খাই তমিস্রাতে।

টোকে টোকে নোপা সমুদ্রের
খরস্রোতা স্যাপা নদ-নদী,
গিলে খাই ঝঞ্ঝা মরুভূমি
গতিময় কাল নিরবধি।

পিয়ে মধু বিধ-কুশুমের
এ কঙ্কালে বানাই মৌচাক।
বাজাই প্রচণ্ড প্রলয়ের
বজ্র দিয়ে আকাশের ঢাক।
একের সাধ্য নেই দুই হ'তে পারে।
একে একে তিন হয় প্রেমের পাখারে।

নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের সঙ্গে কিছুক্ষণ

শ্রীঅমিয়কুমার মুখোপাধ্যায়

১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৮, একটি পোর্টকার্ড হাতে এসে পড়ল।

মহাশয়েষু,

পত্র পেলাম। আমি কিছুদিন কলিকাতার বাহিরে ছিলাম তাই উত্তর দিতে দেরী হোলো। আগামী শনি ও রবিবার, ২২শে ২৩শে মার্চ আমি বাড়িতে থাকিব। বিকালে কার্ণবলন্তঃ বাহিরে থাকিতে হইবে। সকালে ১২টার মধ্যে আসিলে আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। ইতি—

শিশিরকুমার ভাড়াড়ি

পুঃ বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার ২০শে ও ২১শে মার্চও ভই সময়ে আসিলে নিশ্চয়ই দেখা হইবে।

শিঃ

সেদিন ছিল মংগলবার। অজিত চিঠিখানি দেখে বলল— সেও আমার সঙ্গে বাবে, শুধু তাই নয়—যেতে হবে নিকটতম বৃহস্পতিবারেই

চিঠিখানি দেখে একটু ধাঁধায় পড়েছিলাম। ভাবলাম শিশির বাবু হয়ত ভুলক্রমে মার্চ মাস লিখেছেন, কারণ ফেব্রুয়ারীতে ঐ দিন-তারিখগুলি ছবছ মিলে যায় আবার মার্চের পাতা তুলে দেখি ২০, ২১, ২২, ২৩ একই বার। তবু আমরা ভোর না হতেই দুর্গা বলে বেরিয়ে পড়লাম ঐ নিকটতম বৃহস্পতিবারেই।

নাম বলব না, পথে বেরুতেই কিন্তু এক ভ্রমলোক আমার ভীষণ চমকে দিলেন। বললেন—বাচ্ছ বাও কিন্তু শিশির বাবুর অর্ধচন্দ্র তোমাদের কপালে আছে। এও বললেন—সাবধান! শিশির বাবু 'লৌহমানব' কাউকে রেয়াত করে কথা বলেন না।

নিরুৎসাহিত হলেও গাড়ি চাপলাম।

দমদম থেকে ঠর বাড়ি পৌঁছলাম—তখন আটটা। একটি যুবক পড়ছিলেন—তিনি গংবাদ দিলেন। প্রায় দু'মিনিটের মধ্যেই শিশির বাবু দ্বিতল থেকে নামলেন। সিঁড়িতে পা দেবার পূর্বেই তিনি আমাদের জন্ত একটু বিশেষ ধরণের কণ্ঠস্বর পাঠিয়ে দিলেন যেন। আমরা তটস্থ হয়ে বসলাম।

তিনি চেয়ারে বসতে বললেন—কি দরকারে আসা হয়েছে— অমিয় কার নাম?

কণ্ঠস্বরে কল্পনাতীত গাভীধ। ভয় পাবারই কথা। ক্ষণকাল আমরা মৌন হয়েই রইলাম।

শিশির বাবু পুনরায় প্রশ্ন করলেন—বলো কি প্রয়োজনে আসা হয়েছে। আবার যেন মেঘ গর্জন করে উঠল।

গভরে কি নির্ভয়ে বলি এই চিন্তা তখন মনে ডুকান তুলেছে আর কি দিয়ে কথা শুরু করি তারও দিশা পাচ্ছিলাম না যেন।

মাথা চুলকে সবিনয়ে বললাম—হেমন বাবুর একটা বইয়ে আপনার কথা খুব অল্প টুকরো টুকরো পড়েছি। ভেবেছিলাম উনি হয়ত দ্বিতীয় পর্বে আপনার জীবন কাহিনী বিস্তৃত লিখবেন। কিন্তু ঠর দ্বিতীয় পর্বে আপনাকে পেলাম না। দ্বিতীয় বইটি আপনার নামেই কেবল উৎসর্গ হয়েছে।

—তুমি কি হেমনের বাড়ি গিয়েছিলে? প্রশ্ন করলেন উনি।

—ওঁকে চিঠি দিয়েছিলাম, অবশ্য দেখা পাইনি। তাই আপনার কাছে এলাম। যদি আপনার জীবন কাহিনী—

—পাড়ার লোকের কাছে আমার জীবন কাহিনী বলতে যাবো কেন? সূচনায় শিশির বাবু মুখ থেকে এরকম কথা শুনে সত্যিই এবার খুব যাবড়ে গেলাম। এর পর তিনি দশ পনেরো মিনিট ধরে আমাদের একটু টু শব্দ পর্যন্ত করতে দিলেন না। সাইক্লোন বইয়ে দিলেন নিজেই।

সীমিত চৌরাস্তার মোড়ে শিশির বাবুর বাড়ি। যদি কেউ ভেবে থাকেন একটু কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করব, তিনি আমাদেরই মত অবাক হবেন। দ্বিতল। আপনার আমার মতই বাড়ি। সেখানে আভিজাত্য বা মুল্লিয়ানা খুঁজে পাবেন না কেউই।

চুকটা নিয়ে বসলেন চেয়ারে। মোটা কাচের চশমার ভিতর দিয়ে পুংখাতপুংখরূপে দেখে নিলেন আমাদের আশাদমস্তক।

সেই পড়ুয়া ছেলেটি গোপনে বাইরে দাঁড়িয়ে, বাসন মাজতে মাজতে একটি জ্বীলোক তফাৎ হতে আড়ে আমাদের দেখছিল। হয়ত ভাবল ওরা, এ দুটোর আজ মরণ পাখা উঠেছে!

সোজা কথা সাফ কথা শিশির বাবু বললেন—আমি কাজের মানুষ, বাজে কথা পছন্দ করি না। আমার কাছে যদি কাজের কথা থাকে চটপট বলো। হাতে আমার পাঁচটা কাজ আছে। আমার পড়াগুলো, ঠাণ্ডি করতে হয়, রিহার্সাল দিতে হয়, পাঁচটা চিঠি লিখতে হয়, আড্ডা দিতে পারব না। সন্তর বছর হ'ল আর তোমাদের সঙ্গে আড্ডা মারার বয়সও নেই।

আমি অভিনয় করি, কাহিনী লিখি, প্রযোজনা করি। এই বিষয়ে কিছু জানতে চাও তো বলো। যদি বইয়ের নাম চাও দু-একটা বইয়ের নামও দিতে পারি।

আমি হতবাক। অজিত তখন নতমুখে বসে আছে। শিশির বাবু মুখ ঘুরিয়ে পুনরায় প্রশ্ন করলেন—কি কি অভিনয় দেখেছ?

বললাম—আপনার শেষ অভিনয় দেখি প্রফুল্ল। সম্মিলিত অভিনয়।

—সম্মিলিত অভিনয় আবার অভিনয় নাকি। সম্মিলিত অভিনয় হয় না যেমন হয় না সম্মিলিত ক্রিকেট খেলা। তবে ওরা বলে, অভিনয় করি। ভাল টাকা দেয়। জীবনে সঞ্চয় করতে পারলাম না। আমাদেরও তো বাঁচতে হবে।

অজিত বলল—আপনার শেষ অভিনয় দেখি চন্দ্রশুভ। আমি সীতার কথাও বললাম।

উনি বললেন—থাক সে কথা।

ভাবলাম শিশির বাবুর কোপ বোধ হয় একটু প্রশমিত হয়েছে। চন্দ্রনগরের বিখ্যাত জলভরা সন্দেশ ঠর জন্ত সামান্য নিয়ে গিয়েছিলাম। অর্পণ করে কিছু বলবার আগেই বললেন—না না, এ সব সন্দেশ-টন্দেশ আমি পছন্দ করি না। তোমরা কেন যে এ সব আনো। মনে হল সেগুলি একুণি বুরি আবর্জনাকুণ্ডে ফেল দেবেন।

বললেন—বাজে বকে কি হবে? তোমাদের মত যদি বিশ জন

আসে অত সময় কোথা আমার? তাছাড়া মধ্যে মধ্যে আমার বাইরে যেতে হয়।

হজুগে মেনে না। আমরা বড় হজুগপ্রিয়। কে কোথায় কি একটা কাজ করল অমনি আমরা তাকে মাথায় তুলে নাচি। আমাদের দেশের ব্যবসায়ীদের কোন সূচিন্দ্রা পরিকল্পনা নেই। শুধু উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়ায়।

আবার সব যে এই সই নেয়, আচ্ছা এই সই নেওয়ার কি মূল্য আছে বলতে পারো? হ' বছর, পাঁচ বছর, আট বছর পরে কেউ আর সইয়ের খোঁজ রাখে? তবু খাতা নিয়ে সইয়ের জন্যে সামনে ধরে—এ সব কি?

শিশির বাবু অভিমানী আর ক্ষুব্ধ মন বাবে বাবে আমাদের প্রতিষ্ঠিত করে, নতুন কিছু বলতে কইতে পারি না। অথচ যেটুকু সময় পেয়েছিলাম বাড়ি থেকে ভেবে গিয়েছি এক গাশ কথ।

শিশির বাবু বললেন—আজ বাংলার সব চেয়ে দুদিন। বাঙ্গালীর ছেলের আজ একটি চাকরী পাওয়ার উপায় নেই, তবু এটাই তার নিজের দেশ। দেশ স্বাধীন হবার পর শিক্ষার উন্নতি হয়নি এক কোঁটা। শুধু হয়েছে শিক্ষা সংকোচন। ছোট ছোট ছেলের পড়ার পথ বন্ধ করে শুধু বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে মাইনে চার টাকা, ছ'টাকা।

পৃথিবীর অন্য কোন দেশে শিক্ষা আত্মপূরণের এ রকম সংকোচন আছে কি বলতে পারো? আমাদের অন্ততঃ জানা নেই। সব দেশে কিশোররা বিনামূল্যে শিক্ষা পায় শুধু তাই নয়, বাধ্যতামূলক ভাবে। আর আমাদের দেশ।

পাঞ্জাবে মাজাজে যা পারেনি, বোম্বাইয়ে যা হয়নি তা হ'লো পশ্চিমবঙ্গে। হিন্দী জোর করে তাদের শিখতে হ'বে।

বাঙালীর সর্বনাশ সামনে। তোমরা গৃহ সম্প্রদায় এর প্রতিবাদ প্রতিকার করছ না কেন? তোমরা সংঘত হও সংঘমী হও। দেশে ছেলে নেই এমন কথা বলছি না, কিন্তু ঐ 'কম্বু'র ঘলে ভিড়ে মাটি হয়ে গেছে।

এক্কেবারে অচেনা পরিবেশের মধ্যে এরকম নির্ভেজাল অভিনব আলোচনা চলতে পারে আমাদের কল্পনায় তা আসেনি। আমরা যেমন বিস্মিত হয়েছিলাম, সত্যি কথা অবশিষ্টও বোধ করছিলাম বেশ। উভয়ে এই ফাঁকে ভেবেছিলাম এখানে কোন কথা না বলাই বুদ্ধিমানের মত কাজ হবে।

সত্তাবের আরক জরান এই মাহুঘটি কিন্তু তেজিয়ান সাতাশের মতই। ভাবলে বিস্ময় হয় ঐ বয়সেও মাইকেল এবং রামের ডুমিকার তাঁকে দেখতে পাওয়া গিয়েছে। সত্তর আমাদের কাছেই আসে সত্তর।

মনে হ'ল চুকটা হয়ত নিবে গেছে। কিন্তু শিশির বাবু টান দিয়ে বললেন—পড়ে ভাল করে। যদি অভিনয় করতে চাও, যা অভিনয় করবে, সেই চরিত্র ভাল করে বুঝতে হবে প্রথমে, তা নিয়ে বিশ্লেষণ করতে হবে। 'সত্যি নাটক'—সেই বই নির্বাচন করতে হবে।

বললেন—সবই হজুগে। বারোয়ারী সার্বজনীন পূজা—ঠিক যেন থিয়েটারও তাই। আরে বাপু, ভক্তি থাকে পূজা করো, ভক্তি না থাকলে পূজা করো না।

হঠাৎ বললেন—এতদূর থেকে এখন সময় আর পরসা নষ্ট করে এসেছ তুঁটা প্রশ্ন কর, সাধ্যমত জবাব দেব।

—আপনি কি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখছেন?

এই প্রশ্নে তিনি বললেন—তখনকার দিনের চেয়ে এখন বেশী নাটক হয়। তখন পরসা পাওয়া যেত না, এখন পরসা পাওয়া যায়। তখনকার দিনে একাংক নাটক ছিল না কে বলে? তবে তোমরা মনে কর রিভলভি ষ্টেজ মানে কি না কি। মৃতরা বোঝে না যে, রিভলভি ষ্টেজ মানে—ছোট ষ্টেজ। শিশির বাবু এই সময়ে হাত দু'টি স্কন্ধর করে কেমন ছোট দেখালেন।

নাটকের উপযোগী নয়, অথচ সাজাতান, টিপু সুলতান, এই দু'টো নাটক অভিনয় হয়। সব চেয়ে মজা ১৮৮০ সালে যে নাট্য প্রতিষ্ঠানটির অভিনয় ছিল আজ তারা এমন অভিনয় করছে যে নাটকটির মধ্যে নাটকীয় পদার্থ কিছু নেই। বিশটা চরিত্র আর বিরাট ব্যাপার নিয়ে অভিনয় হয় না, তবু তাই হচ্ছে।

শিশির বাবু বললেন—তোমাদের নতুন করে কি আর বলব, সবই তো পুরনো কথা। অন্য দেশে যে রিভলভি ষ্টেজ নেই তা বলছি না। তাড়াতাড়ি এবং বিশেষ কোন দৃষ্টির জন্য মঞ্চ ঘোরান প্রয়োজন হয়, কিন্তু তা নিয়ে সর্গসর্বদা কাজে লাগানো কোথাও হয় না।

একটি কথা বলতে তুলে বাছি। শিশির বাবু একবার বললেন—আজকাল সাহিত্য স্রষ্টা হচ্ছে না কেন জানো? তাতে দেশের কথা নেই বলে।

আমরা তো পূর্বেই কথা বন্ধ করে বসেছিলাম এবার নাট্যাচার্য নিজে একেবারে খেমে গেলেন।

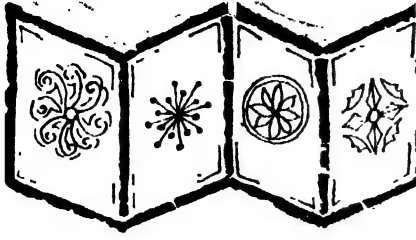
ভাবলুম আমরা আসব জেনে আমাদের জন্য বরাদ্দ বসন্তুলি কথা ছিল তা তিনি সবই নিঃশেষ করে দিয়েছেন।

শিশির বাবু উঠে পড়লেন। বললেন—এখন তাহলে উঠি?

আমাদের উঠে পড়তে দেখে তিনি বললেন—আবার এসো, কলাগণ হোক।

অতি অল্পকণ বড় জোর আধ ঘণ্টা প্রবল প্রতিভাধর মাহুঘটির সারিধা পেয়েছিলাম কিন্তু সেই স্মৃতিটুকু এমনই বৈচিত্র্যময় আমি তো নই, অজিতও কোন দিন তুলতে পারবে কি না সন্দেহ।

৮ই মে গিয়েছিলাম মহাজাতি সঙ্গনে। সেদিন ভাবভেই পারিনি আমাদের জন্য এক মর্যাদিক সংবাদ প্রতীক্ষা করছে। সর্বজনপূজ্য মহান শিল্পী আমাদের প্রিয় নাট্যাচার্য সে দিন এসে কাঁড়িয়েছিলেন মঞ্চের আভিনায়। আমরা দেখেছিলাম আলমগীরকে। আজ ব্যাধিত মর্যাহত। আলমগীর আর নেই শুধু তাঁর শূন্য সিংহাসন পড়ে আছে। কালের এ এক কল্প বিচার।



পত্র

গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও নবীনচন্দ্র সেন মহাকবিযুগলের পত্র-বিনিময়

Rangoon, 11 York Road.

ভাই গিরিশ,

২৭শে ফেব্রুয়ারী ১১০৬।

২০ বৎসর বয়সে পলাশীর যুদ্ধ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। ৬০ বৎসর বয়সে তুমি সিরাজদৌলা লিখিয়াছ ওনিয়া তাহার একখানি আনাইয়া এইমাত্র পড়া শেষ করিয়াছ। তুমি আমার অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী, আমার অপেক্ষা অধিক ভাগ্যবান। আমি বখন পলাশীর যুদ্ধ লিখি তখন সিরাজের শত্রুচিহ্নিত আলোখাই আমাদের একমাত্র অবলম্বন ছিল। শ্রীভগবান তোমাকে আরও দীর্ঘজীবী করিয়া বঙ্গ সাহিত্যের যুগ আরও উজ্জ্বল করুন।

আমি নব যুবক সিরাজের পত্নীর যুগে শোকসঙ্গীত প্রথম সংকলন পলাশীর যুদ্ধে দিয়াছিলাম। শোকের সময়ে সঙ্গীত যুগে আসে কিনা বড় সংন্দেহের কথা বলিয়া বন্ধিমবাব বলিয়াছিলেন। সেই জন্য আমি সঙ্গীত পরে উঠাইয়া দিয়াছিলাম। তুমি চিহ্নদিন গোঁয়ার। দেখিলাম তুমি সেই সন্নিহিত পথ অবলম্বন করিয়াছ।

তোমার গীতাবলীর সহিত তোমার জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে দেখিয়া উহার একখণ্ডও পাঠাইতে গুরুদাস বাবুকে লিখিলাম। এই ক্ষুদ্র প্রবাস হইতে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, তোমার অল্পত জীবন যেন সুখশান্তিতে শেষ হয়।

স্নেহাকাঙ্ক্ষী

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন

১৬ নং বনুপাড়া লেন, কলিকাতা।

৭ই মার্চ ১১০৬

কবির লীলুত নবীনচন্দ্র সেন মহাদেব—

ভাইজী!

তোমার পত্র পেয়ে আমার পত্রের উত্তরের আনন্দে নয় সত্যই আনন্দ হয়েছে। তার বিশেষ কারণ, বখন তোমার সঙ্গে হামেশা দেখা হবার সম্ভাবনা ছিল তখন তোমার প্রতি আমার যে কিরণ শ্রদ্ধা ও ভালবাসা আমি ভুলিতে পারি নাই, কিন্তু বখন বহুদিন তোমার কোন সংবাদ পেলুম না, আর কোথায় আছ, তাহাও জানতুম না তখন আমার মনোভার আমি আপনি বুঝতে পারলুম। আমি অনেক দিন হ'তে মনে করি যে আমার হৃদয়ের সন্ধে তোমার সঙ্গিত একটা বাদ্যমুদ্রা করব কিন্তু আমার স্বভাব কাল বা করলে হয়, আজ তা করব না। এরকম প্রকৃতির লোকের কাল বড় শীঘ্র হয় না। আমার মনোগত ইচ্ছা সাহিত্য সন্ধে এই দূর হতে তোমার সঙ্গে কথাবার্তা কই, কিন্তু কতদূর হয়ে উঠবে ঈশ্বর জানেন। তুমি আমার সিরাজদৌলার প্রশংসা করেছ,

আমি তোমার একটি প্রশংসা করি, তোমার “পলাশীর যুদ্ধ” সিরাজদৌলার চিত্র অঙ্করূপ হলেও তোমার স্বদেশ-অমুরাগ ও সেই হৃদয় সিরাজদৌলার প্রতি অসীম দয়া রাগী ভবানীর যুগে প্রকাশ পায়। আমার ধারণা, অনেক দেশাত্মবোধী লেখকের তুমি আদর্শ। আমার উপর তোমার অকৃত্রিম ভালোবাসা, এ আমার গুণে নয়, এ আমি সম্পূর্ণ বুঝি তুমি তোমার মাহাত্ম্য! লেখা ও ব্যবহারে তুমি একজন প্রকৃত বৈষ্ণব। তোমার পত্রখানি আমি সকলকে দেখাই, তারা আনন্দ করে কিনা জানি না। কিন্তু আমার বড় আনন্দ হয়।

তুমি আমার বই কিনে পড়েছ; আমার সঙ্গে প্রথম দেখা হ'তে তুমি জানো, আমি একটা ‘বাউগুলে’ তুমি আপনার গুণে আমার ক্ষমা কর। কেমন আছ? পরিবারবর্গ কেমন? উত্তরে আমার সংবাদ দিও। আমি ইপ্সানিতে ভুগছি। ঈশ্বরের কৃপার বদি আবার তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয় আমার মনে হচ্ছে তিন দিনেও তোমার সঙ্গে আমার কথা ফুরাবে না। তুমি জানো কি না জানি না, আমার বন্ধুবান্ধব বড় কম, সে অল্প কারো দোষে নয়, আমার দোষে। আমি মনে মনে তোমার পরম বন্ধু বলিয়া জানি। এ পত্রখানি আমার হাতের লেখা নয়, আমার হাতের লেখা পত্র আমি না পড়ে দিলে মানুষের সাধ্য নাই যে পড়ে। বার হস্তাক্ষর সে আমার সম্মানের তুল্য। আমার সঙ্গে বসে লেখে। আমি যে যে কথা বললুম, তাহা আমার অন্তরের কথা, এই লেখকই তার সাক্ষী। আমি সিরাজদৌলার ভূমিকায় তোমার সন্ধে অক্ষরবাবু যে কটাক্ষ করেছেন—তারই প্রতিবাদ লিখিলাম কিন্তু এই লেখকই আমার নিবৃত্ত করে। এর নাম অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। অবিনাশ আমার একটি উপদেশ দিলে; বললে—মশাই স্বভাবকবির “পলাশীর যুদ্ধ” কাব্য আর সিরাজদৌলার ওকালতি দুইটিতে বিস্তর প্রভেদ, আপনি সে সন্ধে সমালোচনা করিলে কাব্যের সম্মান বৃদ্ধি না করে, ওকালতির সম্মানই বেশী বাড়াবে।

আমার “পলাশীর যুদ্ধ” সন্ধে বক্তব্য ছিল, বা ইতিপূর্বে বললুম—তোমার সিরাজের প্রতি স্নেহ ও তোমার দেশাত্মবোধ। শ্রীমান্ নিখিলনাথ রায় ও সমাজপতি আমার এই মতের সম্পূর্ণ সমর্থন করেন। আজ রাত হয়েছে ওইগে। শরীরটে বড় ভালো নয়। ছন্দ নিয়ে একটা বাদ্যমুদ্রা করব শাসিয়ে রাখলুম। কাজ এ বাউগুলে দ্বারা কতদূর হবে তা ঈশ্বরকে মালুম। ইতি।

স্নেহপ্রাপ্ত

গিরিশ

Rangoon, York Road,

২৩শে মার্চ ১১০৬

ডাই সিরিশ,

তোমার এই মার্চের পত্রখানি বখাশময়ে পাইয়াছি। তুমি যেমন ভোলানাথ তুমি যে আমার পত্রের উত্তর দিবে, আমি কখনো মনে করিয়াছিলাম না। অতএব এই ত্যাগ স্বীকারের জন্য আমার বক্তবান বলিব কি? তাহার অর্থ তো বুঝি না, আমার আন্তরিক প্রীতি গ্রহণ কর।

পৌরাণিক কাল বহুদিন চলিয়া গিয়াছে। অতএব এখন কলিকাতা-রেলুয়ের মধ্যে সেতু বন্ধন করিয়া তোমার হৃদয় সম্বন্ধে একটা লড়াই চলিবে কি না বড় সন্দেহের কথা। আমি একজন চিংগোঙ্গী। শীঘ্র যে কলিকাতা বাটব, সে আশা নাই। তুমিও কলিকাতার বঙ্গালয়ের বঙ্গপূর্ণ বৃহৎ উদয়টি লইয়া সহুয়ের এগাবে আসিবে তাহাও অসম্ভব। আমার বোধ হয় এ জীবনে তুমি 'মহারাষ্ট্র পরিখা'র বাহিরে, কলিকাতার পাঁচ বকমের আনন্দ ও পাঁচ বকমের দুর্গন্ধ ছাড়িয়া কখনও যাও নাই। যদি একবার মহারাষ্ট্র দুর্গের বাহিরে এই ব্রহ্মদেশে আসিয়া যুদ্ধ দাও, তবে একবার হুন্দ লইয়া যুদ্ধ করি, ব্রহ্মদেশ প্রকৃতই Land of Pagodas and Palms দেখিবার যোগ্যস্থান। তোমাকে একবার এখানে পাইলে তাল চাষি দিয়া দুই মাস বন্ধ করিয়া রাখিয়া একখানি নাটক লিখাইয়া লই। আমার বিশ্বাস, বঙ্গালয়ের দ্বারে নাটক লিখিয়া তোমার প্রতিভার পূর্ণ স্মৃতি হইতেছে না।

কেবল সিরাজদৌলা নহে, তোমার বহন বহি বাহির হয়, আমি তাহা কিনিয়া আনিয়া আগ্রহের সহিত পড়ি। তুমিরাহি, অনেক "সাহিত্যসিংহ" আশ্রয় লেখা বাতলা বহি পড়েন না। কেবল নিজের বহিই পড়েন। অনেকের বহির পাঠকও বোধ হয় নিজে গ্রন্থকার। কিন্তু আমি ক্ষুদ্র লোক, আমার সে বড়মাত্রা নাই। তোমার "গীতাবলী"র একখণ্ড অনাইয়া তোমার জীবনীটি পড়িলাম। ঠিক কথা, তোমার বক্তব্যব বড় কম। তুমি গীতস্থান কলিকাতার এক জীবন বলিদান করিলে। কিন্তু কলিকাতায় অল্পলোকেই বোধ হয় তোমাকে চিনে ও আমার মত তোমার প্রশংসা করে।

সুরেশ্বর (সমাজপতি) দ্বারা অক্ষয় বাবু এক দীর্ঘ পত্র লিখিয়া আমি কেন ঐরূপ ভাবে সিরাজদৌলার চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছি, তাহার লম্বা চওড়া কৈফিয়ৎ চাহিয়াছিলেন। আমি বলিয়াছিলাম—তিনি লিখিয়াছিলেন ইতিহাস, আমি লিখিয়াছি কাব্য। তখন পড়িয়াছিলাম মাসমান। তথাপি বাতালীর মধ্যে বোধ হয় আমিই প্রথম পবী সিরাজদৌলার জন্য এক কৌটা চক্ষের জল ফেলিয়াছিলাম অক্ষয় বাবু তাহার পর আমাকে ক্ষমা চাহিয়া এক পত্র লেখেন এবং আমার এক পত্র ছাপাইতে চাহিয়াছিলেন। আমি লিখিয়াছিলাম যে পলাশীর যুদ্ধের জন্য পূর্বঘণ্টের বিবরণে পড়িয়া এক জীবনে অনেক দুর্গতিভোগ করিয়াছি। পত্রখানি ছাপাইলে আমার আরও দুর্গতি বাড়িবে মাত্র। -

ভাল, আমার কুরুক্ষেত্রখানি কি তুমি অভিনয় করাইতে পার না? তাহার বাত্মা হইয়া তো তুমিভেছি কলিকাতা ও সমস্ত বঙ্গদেশ কাঁদাইতেছে।

হাতের লেখা সম্বন্ধে আমিও তোমার কনিষ্ঠ কি জ্যেষ্ঠ জ্ঞাত। তাঁকার কালীপ্রসন্ন ঘোষ একবার লিখিয়াছিলেন যে হাতের লেখার উপর বিবাহ নির্ভর করিলে আমার বিয়া হইত না।

ভরসা করি এখন ভালো আছ। গীতাবলীর হবিতে দেখিলাম যে শব্দটি একেবারে খোঁরাইয়াছ এবং মূর্তিখানি পশুপেশের মত করিয়া তুলিয়াছ। এখন কোন নূতন খেয়াল লইয়া নিজে মাটিখার ও বঙ্গদেশ নাচাইবার চেষ্টায় আছ।

অনুতবাবুকে ২ খানি পত্র লিখিয়া উত্তর পাই নাই। দেখা হইলে বলিও। ভায়া, বোধ হয় এখন বঙ্গদেশী রসের মসিক।

তোমারই

নবীন

১৩ নং বহুপাড়া লেন, কলিকাতা।

২৩শে এপ্রিল ১১০৬

কবির ব্রীহুজ নবীনচন্দ্র সেন সমীপে
ডাইজী,

তোমার পত্রের উত্তর দিই নাই, তাহার কারণ "মীরকাসিম" লিখিতে ব্যস্ত ছিলাম। "কুরুক্ষেত্র" ভাল করিয়া দেখিবার অবকাশ ছিল না। পুস্তকের নাটক হয় নিশ্চয়, কিন্তু এখন ভেসে যাবে। এখনো বঙ্গদেশের মৌখিক অমুরাগ খুব উচ্চ। বক্তব্য নাটক হোক বা না হোক, নাট্যোন্মিষিত ব্যক্তিগণের এইরূপ মৌখিক ঝাঁক এখন সাধারণের প্রিয়। মহাত্মার জন্মের বৈকুণ্ঠ প্রকৃত ব্যাখ্যা তোমার কুরুক্ষেত্রে হয়েছে, তা যদি সাধারণে বুঝতে পারত, তাহলে প্রকৃত নীতিশিক্ষা ও কর্তব্য অমুরাগ স্তব্ধ হোত। বুদ্ধতো বর্ণপ্রাণ হিন্দুর বর্ষ বাতীত উপায় নেই। সময় যুগে—মহাত্মার জন্মের দিন সম্বন্ধ কিংবা। কাব্যখানি নাটকাকারে পরিণত করার ইচ্ছা আমার রহিল। হু'টি প্রবন্ধের উত্তর হ'ল। দেখে অবস্থা নিজ দেখে অবস্থার অনুভব করে।

তুমি যুদ্ধ না করিলে কি হয়? আমি যুদ্ধ করবো যুদ্ধ আর কিছু নয়, গৈরিশী হৃদয়ের একটা কৈফিয়ৎ, "গৈরিশী হৃদয়" বলে যে একটা উপহাস আছে তার প্রতিবাদ। প্রতিবাদ এই, আমি বিস্তর চেষ্টা করে দেখেছি, গড় লিখি সে এক বস্ত্র, কিন্তু চন্দ্রাবত বাতীত আমরা ভাষা কথা কইতে পারি না। চেষ্টা করলেও, ভাষা কথা কইতে গেলেই হুন্দ হবে। সেইজন্যে হুন্দে কথা নাটকের উপযোগী। উপস্থিত দেখা যাক কোন হুন্দে অধিক কথা হয়। দীর্ঘ ত্রিংশদী লঘু ত্রিংশদী বা যে যে হুন্দ বাতালার ব্যবহার হয়, সকলগুলি পরায়ের অন্তর্গত। অমিত্রাক্ষর হুন্দ পড়িবার সময় আমার যেমন ভাঙ্গা লেখা, তেমনই ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়তে হয় যেখানে বর্ণনা, সেখানে স্বতন্ত্র, কিন্তু যেখানে কথাবার্তা, সেইখানেই হুন্দ ভাঙ্গা। তারপর দেখা বাউক কোন হুন্দ অধিক। দীর্ঘ ত্রিংশদী দ্বিতীয় চরণের সহিত শেষ চরণে মিলিত হইয়া অধিকাংশ কথা হয়।

"দেখিলাম সরোবরে কমলিনী বাজিয়াছে কবী।"

লঘু ত্রিংশদী দ্বিতীয় চরণ ও শেষ চরণ অনেক সময় মিলিত হয়।

"বিরস বদন বাণীর নিকট বার।"

এ সওয়ার পরার লঘু ত্রিংশদী এক-এক পদ বিশেষতঃ শেষ পদ

পুনঃপুনঃ ব্যবহৃত হয়। আমার কথা এই যে, এখানে নাটকের চৌক অক্ষরে বাঁধা পড়া কেন? চৌক অক্ষরে বাঁধা পড়লে দেখা যায়—সময় সময় সবল বতি থাকে না।

“বীরবাহু চলি হবে গেলা বয়সগুণে
অকালে।”

এরূপ হায়েসাই হবে। বাউলাঙাবার ক্রিয়া “হইয়াছিল”, প্রভৃতি অনেক সময়েই বতি জড়িত করিবে। কিন্তু গৈরিশী ছন্দে সে আশঙ্কা নেই। বতি সম্পূর্ণ করিয়া সহজেই লেখা বাইবে। আর এক লাভ, ভাষা নীচ হ’তে বিনা চেষ্টার উচ্চ হয়ে সহজেই উঠবে। সে সুবিধা চৌকির কিছু কম। কাব্যে তার বিশেষ প্রয়োজন নাই; কিন্তু নাটকে অবিকাংশ সময়ে তার প্রয়োজন। তাই তো পাতনামা করিলাম। যদি তুমি ছই-এক বা তীর ছাড়, আমিও দু-একটা কাটান তীর ছাড়ব। তবে যদি তোমার ফুরসৎ না হয়, শরীর ভালো না থাকে, যুদ্ধ আহ্বান করি না। “আমি গেলে আমসি, যৌবন গেলে কাঁদতে বসি।” বতদিন তোমার সঙ্গ করা অনায়াসসাধ্য ছিল ততদিন তা উপেক্ষা করেছি। কিন্তু এখন এই দূরদেশ ব্যবধানে কথা কহিতে ইচ্ছা করে। তোমার তো পত্র লিখতে ক্লান্তি নেই। যদি মাঝে মাঝে লেখ, শোবার সময়ে পাঠ করে শুতে বাই। তোমার সমস্ত কুশল সংবাদ প্রতীক্ষার রহিলাম। ইতি—

গুণাক

গিরিশ।

১৩ নং বহুপাড়া লেন, কলিকাতা।

২০শে জুলাই, ১৯০৬

কবিরব্রীকৃত নবীনচন্দ্র সেন।

ভায়া,

তুমি আমার যুদ্ধের আহ্বান ঠিক বুঝতে পারো নাই। যুদ্ধে আপোষে অস্ত্র পরীক্ষা করবার আমার ছিল, হারজিতের প্রতি কখনো আমি লক্ষ্য রাখি নাই। বাই হোক, তোমার শরীর অসুস্থ এ সবক্ষে কথার আর প্রয়োজন নাই। আমি ভাবিয়াছিলাম, আস্ত আস্তে সময়ানুগারে এ বিষয়ে কথাবার্তা কহিলে ভাবার কোন না কোন উপকার হইতে পারে। এই তো যুদ্ধের কথা।

সত্যিই খুব ব্যস্ত ছিলাম, এখনও আছি। মীরকাসিম লইয়া ব্যস্ত ছিলাম, এখন আবার পরের কাজে পড়িয়াছি। “মীরকাসিম” সবক্ষে বাস্তবে সুখ্যাতি তুলিতে পাইতেছি। আর যে কয় রাত্রি অভিনয় হইয়াছে, লোকেরও বখেট ভীড়। ব্রাহ্মণ পূর্বস্ত সন্তুষ্ট। এ আমার সামান্য ভাগ্য নহে। আমায় ছেলে দানী, মীরকাসিমের অঙ্গ লইয়াছিলাম, তাহার সুখ্যাতি একবাক্যে।

মীরকাসিম ছাপাখানার পাঠাইয়াছি, তবে কতদিনে প্রকৃৎ দেখিয়া উঠিতে পারিব, তাহা আমার আমীরী মেজাজের উপর নির্ভর। তুমি তো জান “Never do to day what you can put off till tomorrow”—আমার মতো। এইতে বতদিনে ছাপা হয়। তবে অবিনাশ বাবাজী যে আমার লেখক তার কল্যাণে নেহাৎ আমীরীতে চলবে না। মীরকাসিম ছাপা হইলেই আমার ‘বলিদান’ ও ‘বাসবেব’ (বিক্রমাদিত্য) সহিত পাঠিয়ে দিব।

আমি তো হাঁপে ভুগছি। তোমার কোম বন্ধু আশ্রয় করেছে? আমার এক দানীর কথা বললুম, আর তো কারো কথা বলবার খুঁজে পাই না। তোমার পরিবারবর্গ ছেলেগুলোর আত্মপুত্রিক সংবাদ লিখবে। সকলের শুভ-সংবাদ তুললে মনটা একটু খুলি হবে, ভাববো, যা হোক একটা বুড়ো আছে যে পরিবারবর্গ লয়ে একটু শান্তিতে কাটায়। বোধ হয় বুঝতে পেরেছ যে, এ পত্রের লৌকিক উত্তর নয়। বঙ্গুবান্ধব তো বেশী নাই—এ একজনের সঙ্গে ভাব কথা কই। কবিগিরি—কাজটা কি বুঝলে? আমি কি বুঝি বলি—একটু দৃষ্টি খোলে তাতে একটু আনন্দও আছে। কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি খুলে আপনার পেটের ময়লা দেখে ঘোর অশান্তি হয়। মনে হয়, বুড়ো হলুম, তবু স্বভাব গুণয়োলো না। ইতি—

স্নেহানুগ

গিরিশ

Rangoon, 11 York Road,
“Palm Grove”, ২৭।৮।০৬

ভাই গিরিশ,

তোমার ২০এ জুলাইয়ের পত্র পাইয়াছি। আমি কিছু অসুস্থ ছিলাম। তুমিও মীরকাসিম লইয়া ব্যস্ত, তাই এতদিন উত্তর লিখি নাই। সংবাদপত্রেও দেখিতেছি যে, মীরকাসিমের বেশ প্রতিপত্তি হইয়াছে। তুমি ক্ষণজন্মা লোক, এই বয়সেও বেন তোমার প্রতিভা দিন দিন আরও বৃদ্ধি হইতেছে।

আমার অল্পবয়স, তুমি সাত দিনে এমন না করিয়া, কিছু বেশী দিন সময় লইয়া আমাদেব দেশের বর্তমান রাজনীতি, সমাজনীতি, শিল্পনীতি, ধর্মনীতি, দরিদ্রতা, অন্নহীনতা, শিক্ষাবিভাগ, চাকুরী-বিভাগ, উকীল-ডাক্তারি-বিভাগ, বিচারবিভাগ, উপাধি-ব্যাদি—সবল বিষয়ের আদর্শ ধরিয়া এবং দেশোদ্ধারের উপায় দেখাইয়া একখানি Comico-tragic নাটক লিখিয়া দেশরক্ষা কর। বর্তমান স্বদেশী আন্দোলনটা হারী করা উহার প্রধান লক্ষ্য হইবে। আমরা এতকাল সাহিত্য ও রঙ্গমঞ্চে যে স্বদেশ লইয়া কাঁদিয়াছি, এতদিনে উদ্ভগবান বেন তাহা শুনিয়াছেন এবং দেশের হৃদয়ে এই নবশক্তি সঞ্চারিত করিয়াছেন। উহা রঙ্গমঞ্চের দ্বারা তুমি বেরূপ হারী ও বৃদ্ধি করিতে পারিবে, আর কেহ পারিবে না। নীলগর্পণের মত এই একখানি বহি তোমাকে অমর করিবে। উহা নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে অভিনীত হইয়া দেশে নূতন জীবন সঞ্চার করিবে। তুমি রঙ্গমঞ্চের দ্বারা ধর্মে ও প্রেমে দেশ বহুবার মাতাইয়াছ। এবার স্বদেশপ্রেমে মাতাইয়া তোমার জীবনব্রত উদ্গাপন কর। তুমি এই বহিখানিতে নিরমিত অমিত্রাক্ষর ও মিত্রাক্ষর গুণের সহিত চালাইবে। আমার সুত্রশক্তিতে বতদূর পারি তোমার উচ্চ রচনার আমি সাহায্য করিব। আমার অল্পবয়সটা রক্ষা করিবে কি? আমরা এরূপ পেড়াপেড়ির দরপ বন্ধি বাবু আনন্দলঠ লিখিয়াছিলেন। তাহার হাতের চিঠি আমার কাছে আছে। এত বৎসর পরে উহার কি অমৃতফল কলিয়াছে দেখিতেছ। তবে তিনি আনন্দমঠে দেশোদ্ধারের উপায় দেখাইতে পারেন নাই। তুমি সেই মাতৃগুজার সঙ্গে গুজার পঙ্খিতও দেখাইবে।

দানীবাবাজীর মীরকাসিমের অভিনয় এত ভালো হইয়াছে

তুমিরাহি, বড় সুখী হইলাম। বাবাজীর অভিমত দেখিয়া বহুপূর্বে আমি ছিন্ন করিয়াছিলাম যে অভিনয়ে বাবাজী পিতার যোগ্যপুত্র হইবেন।

আমার আর ছেলেপুলে কি? যদিও শ্রীভগবান একটি ক্ষুদ্র সৈন্যব প্রতিনিধিত্বের আমি দরিত্রের কক্ষে অর্পণ করিয়াছেন আর উহাই আমার জীবনের এক সাধনা—আমার নিজের এক সন্তান মাত্র। নির্মলকে তুমি কলিকাতায় বড় ভালোবাসিতে এবং তাহার গানের প্রশংসা করিতে। বিলাত হইতে ব্যারিষ্টার হইয়া আসিলে এক বৎসর কলিকাতায় শিক্ষানবিশী করিয়া, নির্মল এখানে ব্যবসায় করিতে গন্ত বৎসর আসে। আমিও Extension of service অধীকার করিয়া তাহার সঙ্গে এখানে আসি। তুমি তুমিরাহী সুখী হইবে—নির্মল প্রথম মাসেই ১২০০ টাকা পায় এবং এই দশ বৎসর ব্যবসা তাহার আর ১২০০ হইতে ২০০০। তাহার মাসিক ব্যয়ই প্রায় ১৫০০। তাহার এই আশাতীত কৃতকার্যতা শ্রীভগবানের কৃপা, আমার পিতার পুণ্যকল। শ্রীভগবানের অসীম দয়্যার আমার পিতৃবৃন্দা এখন দ্বিতীয় পুত্র স্বত্বা। কি আশ্চর্য, এই মাত্র ৪ বৎসরের বড় নাতনী ঠাকুরাণী আসিয়া বলিল—“তাতা, তাতা, এই গ্রন্থাবলী নেও”—দেখিলাম—“সিদ্ধি গ্রন্থাবলী।”

শ্রীমতী নবীনচন্দ্র সেন।

York Road, Rangoon

১২।১০।০৬

ডাই গিরিশ.

তুমি এই নির্বাসিতের সপ্তেম বিজয়ার অভিজ্ঞান গ্রহণ করিও। বাড়িতে পুজা, কিন্তু পুত্র দুইটি বড় মর্দমার আবদ্ধ হওয়াতে এ বৎসর বাড়ী বাইতে পারি নাই। পুজা—এই নির্বাসনের দেশে নিরাপদে কাটাইয়াছি। ইহার মধ্যে আনন্দ বাহা—তোমার পাঁচখানি নাটক পুজার উপহার পাইয়া অল্পভব করিয়াছি। কিন্তু এ অপব্যয় কেন? তুমি তো মহাপুরুষ কখনো আমাকে তোমার কোন বহি উপহার পাঠাও নাই। আমি বরাবর তোমার বন্ধন যে বহি বাহির হইয়াছে কিনিয়া পড়িয়াছি। আমিও কখনো তোমাকে উপহার পাঠাই নাই, কারণ তুমি পড়িবে না। বাক মীরকাসিম নূতন পড়িলাম। অল্প বহি সকল আর একবার এই নিরানন্দের সময় পড়িয়া বড়ই আনন্দ পাইলাম। ‘ভ্রান্তি’ ও ‘বলিদান’ আমার বড়ই ভালো লাগিল। ‘স্বর্ণলতা’র পূর্বে কি পরে হতভাগিনী বাঙলার অধঃপতনের এমন জীবন্ত ছবি ব্রি আর দেখি নাই। একজন ‘ক্লজেন’ নাম দিয়া সেক্সপীরের ওথেলোর অনুবাদ করিয়াছেন। তুমি উহা একবার পড়িয়া দেখিবে কি? ভরসা করি তাহাতে তুমি অমিত্রাকর হই ও তোমার অমিত্রাক্ষের ভারতময় কি বৃদ্ধিতে পারিবে।

মীরকাসিমও সিরাজদ্দৌলার সমকক্ষ বলিয়া বোধ হইল। তবে মীরকাসিমের প্রস্তাবনা (plot) অধিকতর জটিল। ভাল, ইহার উত্তর যে একরূপ দেবচরিত্র ও দেশহিতৈষী (Angel and Patriot) হিসেন, তাহার প্রশংসা কি? যদি কিছু থাকে সে সকল একটা পরিশিষ্টে দিলে ভালো হয়।

উপহারের সঙ্গে তোমার কোন পত্র পাই নাই। ভরসা করি, তাহার কারণ শারীরিক অসুস্থতা নহে। আবার কি কোন নাটকী নিশা পড়িয়াছে?

তোমার ভ্রান্তি নাটকের ঘটনাটাও কি ভ্রান্তি? এক-একটা ঘটনা বেন নিত্য ভ্রান্তিই বোধ হইল। আপনি মহাপুরুষ বলিয়া মুষ্টিটো এক-এক সময়ে এক রকম হয়।

স্নেহাকাজী

শ্রীমতী নবীনচন্দ্র সেন

পুঃ—কাউন্টেন পেনের কল্যাণে লেখাটাও আগাগোড়া তোমার ফটোর মত নানা মুষ্টি ধারণ করিল। ক্ষমা করিও।

13 Bosepara Lane,
Calcutta

16th October 1906,

কবিবর শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন

তায়্য,

ঠিক ধরছ, শরীরের অল্পখের রূপ পত্রের উত্তর দিতে পারি নাই। সহজ উত্তর সহজেই দেওয়া বেতে পারত। কিন্তু তোমার ক্রমাস সত্বে দু'কথা বলব ও দু'কথা জিগেস করব; এই ভেতাই শরীরের আরার অপেক্ষা করছিলাম, সে অবধি আর সে আরাম পাই নাই। পুরীতে হাওয়া বদল করতে গেলেম, শব্যাগত হয়ে ফিরে এলেম। লাভের মধ্যে জগন্নাথ দর্শন হয়েছে। ব্যামো আমার পুরোনো কুটুম। হাঁপানি। পরস্য ব্যয় করে তার পরিচর্যা হচ্ছে।

নির্মলের উন্নতিতে আমি আশ্চর্য হই নাই। তোমার টেবিলে আমার পাশে সেই বালককে এখনো আমি দেখছি। সে যে Mathematics তখন পারত না, তার মানে Drudgery করা তার স্বভাবসম্মত নয়। তোমার বলা বাহুল্য Mathematics এর সার্বাংশ লইয়া আইনের তর্ক করিতে হয়। সে তর্কে অবত্থই নির্মল সম্পূর্ণ পটু হইয়াছে। আমি কায়মনোবাক্যে তাকে আশীর্বাদ করলেম। তাকে জিজ্ঞাসা করি এ বুড়োকে কি তার মনে আছে?

সাত সত্ত্ব তেরো নদীর জল খেয়ে তুমি যে তোমার পুত্রের কল্যাণে একরূপ সুখী হয়েছ, এ তোমার বন্ধুমাঝেরই আনন্দের বিষয়। আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, এ সুখ বুড়ো-বুড়ীতে অবধি ভোগ কর। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট করে এমন ভাল প্রাণ কি করে বেখেছে? আমার ধারণা সচরাচর ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট যে রূপ দেখি, তাদের সংসর্গে যদি পনেরো দিন বাস করতে হয় তা হলে পাগল হয়ে যাই। কোন কাজের কথা বলবার শক্তি নাই।

তোমার প্রস্তাবিত নাটক যদি ভগবান আমার দ্বারা লেখান আপনাকে ধন্য জান করব। কিন্তু লেখবার আমি কতক্ল যোগ্য, তা বিশেষ ভাবনার বিষয়।

তোমার বই যে আমি পড়ি না—এমত নয়। কিন্তু পড়ব পড়ব করে অনেক সময় পড়া হয় না। অনেক দেখলে শুনে বটে কিন্তু আমার জোড়া আলসে-হুঁড়ে দেখেছি কি না সন্দেহ! গিঠে চাবুক না পড়লে আমি নড়বার বান্ধা নই। তোমার পত্রের উত্তর লিখব করনা করেছি, এমন সময় তোমার পত্রের উত্তর এল। সত্ত্ব ব্যবধানে যদি মনে মনে কোলাকুলি হয়, তুমি নিশ্চয় জেন, সে কোলাকুলি হয়েছে। আর এক মজার কথা, আমার হাওয়া বদলাবার প্রয়োজন, তাই ভাবছিলাম, যেহুঁন যাব। অনেকেই বেতে পরামর্শ দেয়, তবে ‘রাধা নাচবে কি না জানি না।’ সকাল সকাল শুতে চললুম, প্রস্তাবিত নাটক সত্বে আমার অনেক কথা আছে, একটু শুধু হয়ে তোমার সঙ্গে আলোচনা করবো। নমস্কার।

স্নেহাকাজী
গিরিশ

শ্রীমতী
শ্রীমতী
শ্রীমতী

১২

হে প্রাণপ্রিয়, আমি তোমাকে ছাড়া আর কিছু জানি না। যদি তোমার ইচ্ছে হয়, আমাকে আলিঙ্গন করো, নয়তো মর্দন করো পদতলে। নয়তো অদর্শনে রেখে মর্মান্বিত করো। হে প্রেমলম্পট, যা করলে তুমি সুখী হও, তাই করো নির্বিচারে। কেন না তোমার সুখই আমার একমাত্র কাম্য যেহেতু তুমিই আমার একমাত্র। তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই।

যদি চিন্তা স্থির না হয়, নির্জিত না হয় তবে তপস্ত্যয় কি দরকার? আর যদি চিন্তা হরিস্মরণে না মগ্ন হয় তবে চিন্তা স্থির হবে কি করে? আর যদি চিন্তা আত্ম না হয় তবে আর হরিস্মরণে প্রয়োজন কি? আর যদি কামনা ক্ষয় না হয় তা হলে চিন্তাই বা আত্ম হবে কি দিয়ে?

বিজ্ঞা কি? হরিভক্তিই বিজ্ঞা। বেদাদিশাস্ত্রে গাণিত্যের নাম বিজ্ঞা নয়।

কীর্তি কি? ভগবৎপরায়ণ বলে খ্যাতির নামই কীর্তি। দান বা সেবা থেকে যে খ্যাতি তা কীর্তি নয়।

ঐ কি? কৃষ্ণপ্রেমই ঐ। ভূয়িষ্ঠ ধনজনগ্রামও বিস্ত নয়।

হৃৎ কি? ভক্তের বিরহই হৃৎ। হৃৎপ্রণের যন্ত্রণাও হৃৎ নয়।

মুক্ত কে? ভক্তসামীপ্যে যার অবস্থিতি, প্রেম-ভক্তিতে যে শ্রীতিমান, সিদ্ধদেহের প্রতি যার আস্থা, হরিনাম শুনে যার চিন্তা সরসজব, সে।

গান করবে কি? ব্রজকলি।

এই বিধে আর কি? সাধুসঙ্গ।

স্মরণীয় কি? নাম।

অমুখ্যে কি? শ্রীকৃষ্ণচরণ।

স্বয়ং কি? তার মানে, বাস করবে কোথায়? অজ্ঞানদেহ।

জীবনের আনন্দী কি? বৃন্দাবনলীলা।

উপাস্ত কে? রাধাকৃষ্ণ।

বলো বলো, আরো বলো। রসে যারা অনভিজ্ঞ তারা নির্বাণ হিন্দুফল দুবুঝ, আমরা রসভাববিদ, আমরা কেন তা করতে যাব? মদনমহুরা গোপরামা নয়নাঞ্চলে যে শ্যামায়ুত পান করেছে, আমরা তার অধিনিষ্ট কিঞ্চিৎ পান করব।

ঘোল বছর বয়স, গজদালের টোল ছেড়ে নিয়ে টোল খুলল নিমাই। মিত্রের বাড়িতে জায়গা নেই, মুকুন্দসঙ্গকে ধরল। তোমার চণ্ডীমণ্ডপ আছে, সেইখানে একটু স্থান দাও না, একটা বিহার মন্দির তুলি।

নবদ্বীপে কত বড়-বড় পণ্ডিতের টোল, এই কোমলকান্ত কিশোরের স্পর্শ কি নতুন টোল চালাবে। তবু, কি জানি কেন, রাজি হল মুকুন্দসঙ্গ। যিনি ধন দিয়েছেন তিনি যদি আমার গৃহে বিহার সমাজ বসান আমি তো কৃতকৃতার্থ।

‘আমার ছেলেরাও কিন্তু পড়বে।’ আবদার করল মুকুন্দ।

‘তা আর বলতে।’ সায় দিল নিমাই।

কিন্তু শিখবে কি? লোকে দেখবে, শাস্ত্র আর ব্যাকরণ, কিন্তু, প্রস্তরের নিচে নিবার, শিখবে আসলে ভক্তির মধুরিমা।

ভগবান একই বস্তু কিন্তু জ্ঞানী যোগী আর ভক্ত – তিন জনের তিন রকম অনুভব। একজন আম দেখল, আরেকজন আম শুকল, তৃতীয় ব্যক্তি আম খেল। সব চেয়ে বেশি জিতল কে? নিঃসন্দেহ, তৃতীয় ব্যক্তি। তৃতীয় ব্যক্তিই ভক্ত।

জ্ঞানী অনুভব করে ভগবানের অঙ্গকান্তিরূপ নির্বিশেষ ব্রহ্মকে, যোগী অনুভব করে ভগবানের অংশস্বরূপ পরমাত্মাকে আর ভক্ত অনুভব করে ভগবানের সর্বৈশ্বর্যপরিপূর্ণ বিগ্রহস্বরূপকে। নির্বিশেষ ব্রহ্মে রূপ নেই লীলা নেই বিলাস নেই। পরমাত্মায় রূপ আছে, সৃষ্টির ক্ষেত্রে লীলাও আছে কিন্তু জীব সপক্ষে সে নিস্পৃহ, উদাসীন, সাক্ষিমাত্র। কিন্তু ভক্তের ভগবানে জীব লীলাবিনোদ বৈচিত্র্য, অখণ্ড

আনন্দবন আখ্যায়িক। ভক্তের অমৃত্যব জিতরেও ভগবান
বাইরেও ভগবান জানে।

জ্ঞানীর কাছে হৃদ শুধু শাদা, বোণীর কাছে হৃদ
শাদা আর তরল, কিন্তু ভক্তের কাছে হৃদ শাদা, তরল
আর মধুর।

তোমার কাছে পড়া মানে কৃষ্ণসেবার পাঠ
নেওয়া। কৃষ্ণসেবার জন্তে যে বেগবতী বলবতী
হালনা তার নামই প্রেম। 'কৃষ্ণেন্দ্রীয়া-প্রীতি-ইচ্ছা
ধরে প্রেম নাম।' প্রিয়ের প্রীতিবিধানই প্রিয়োপাসনার
চাতুর্পর্য। যদি প্রিয়ের কাছে নিজের জন্তে কিছু
চাই তা প্রিয়ত্বপরিপন্থী। তা হলে তা প্রিয়ের জন্তে
সাধন নয় নিজের জন্তে প্রসাধন। 'আত্মানমেব
প্রিয়মুপাসীত।' যারা মোক্ষ চায় তাদের কি কৃষ্ণ
মমতা আছে? মমত্ববুদ্ধি ছাড়া প্রেম কোথায়?
তুমি আমার আপন জন অমৃত্যব এই তীব্রতা না
এলে তোমাকে ভালোবাসি কি করে? তুমি আমার
সখা। তাই তো আমি তোমার কাঁধে চড়ি, চড়তে
সাহস পাই, মুখের ফল মিষ্টি লাগলে সেই উচ্ছ্রিষ্ট
ফলই খাইয়ে দিই তোমাকে। তারপর তোমাকে
যখন গোপালরূপে বাৎসল্য করি তখন তোমাকে
তাড়ন-ভৎসন করতেও ছাড়ি না। তারপর আবার
তোমার সঙ্গে মধুর হই। আর এই মাধুর্যেই আমার
আত্মাদের আধিক্য। উজ্জলতম সমৃদ্ধি। জ্ঞানে-
যোগে কামে-মোক্ষে এই সমৃদ্ধি কোথায়? তাই
মধুমত্তম রসই হচ্ছে প্রেম।

বনমালী ঘটক শচী দেবীকে এসে বললে, 'ছেলের
এবার বিয়ে দাও।'

'না, না, ছেলের এখন বিয়ে কি।' শচী দেবী
কথা মোটে গায়ে মাখলেন না : 'ছেলে আমার আরো
বড় হোক, বিদ্বান হোক।'

বনমালী বললে, 'যে পাত্রীর সন্ধান এনেছি তার
জুড়ি তুমি পাবে না নবদ্বীপে।'

শচী দেবী তবু কান পাতলেন না।

'বল্লভ আচার্যের মেয়ে লক্ষ্মী। একেবারে লক্ষ্মীর
প্রতিমা। রূপে-শীলে কুলে-মানে অদ্বিতীয়া।
নিমাইয়ের সঙ্গে অপরূপ মানাবে।'

তবুও প্রস্তাব দিচ্ছেন না শচী।

রাস্তায় নিমাইয়ের সঙ্গে বনমালীর দেখা। নিমাই
শুধোল : 'কোথায় গিয়েছিলেন?'

'তোমাদের বাড়িতে।'

'কেন, কি ব্যাপার?'

'তোমার মাকে তোমার বিয়ের কথা বলতে।
হাতে একটা খুব ভালো সত্ব ছিল তার হৃদিস দিতে।'

'তা মা কি বলল?' মুহু-মুহু হাসতে লাগল
নিমাই।

'জ্ঞানী করে কথাই কইলনা। উড়িয়ে দিল এক-
বাক্যে।'

পত্নীর মুখে বাড়ি ফিরে নিমাই মাকে জিগাজেস
করলে, 'বনমালী আচার্যকে ফিরিয়ে দিয়েছ কেন?'

এ কী ইজিত। উৎফুল্ল চোখে ছেলের মুখের
দিকে তাকিয়ে রইলেন।

'হাঁ, আমি তো এখন গৃহস্থ। তাই আমার
গৃহধর্ম পালন করা উচিত।' নিমাই বললে, 'আর
গৃহিণী ছাড়া গৃহধর্ম কোথায়?'

বনমালীকে তখন ডেকে পাঠলেন শচী দেবী।
বনমালী বল্লভ মিত্রকে খবর দিলে।

বল্লভ লাফিয়ে উঠল। 'সেই পরম পণ্ডিত সর্ব-
গুণের সাগর বিশ্বস্তর আমার জামাই হবে? কিন্তু
বনমালী, আমি যে নিধন, পাঁচটি হরীতকীর বেশী যে
আমি দিতে পারবনা।'

'দিতে হবেনা তোমাকে।'

পজায় যাচ্ছে লক্ষ্মী আর টোল থেকে ফিরছে
নিমাই, পথে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। মুহূর্তে
'পূর্বসিদ্ধ ভাব' মনে পড়ে গেল দুজনের। নিমাই
ঐকৃষ্ণ আর লক্ষ্মী শ্রীলক্ষ্মী। আর তাদের স্বাভাবিক
ভাব কাস্তাভাব। 'কাস্তাপ্রেম সর্বসাধ্যসার।' ব্রজের
প্রীতিই কেবল প্রীতি। কাস্তাভাবের সেবা
প্রেমানুগা। তাতে আছে নিষ্ঠা, পরিচর্যা, মমত্ববুদ্ধির
গাঢ়তা, গৌরববুদ্ধির হীনতা, নিবিচার অমুগতি।
কাস্তাভাবেই মধুরতার সর্বাতিশয়।

শুভদিনে গোপালসময়ে বিয়ে হল। চারদিকে
'লেহ-দেহ' রব পড়ে গেল। পড়ে গেল হরিধ্বনি।
গন্ধে মালা চন্দনে কজ্জলে উজ্জল হয়ে বসল দুজনে।
কেউ বললে, হর-গৌরী, কেউ বললে রতি-মদন, কেউ
বা শচী-ইন্দ্র। কেউ বা রাম-সীতা, কেউ বা রাধা-
মাধব, কেউ বা লক্ষ্মী-নারায়ণ।

মা-শব্দের অর্থ লক্ষ্মী। যিনি লক্ষ্মীর ধব বা পতি
তিনিই মাধব। মা-শব্দের আরেক অর্থ বিদ্যা। বিদ্যা
বা সরস্বতীর যিনি পতি তিনিই মাধব। লক্ষ্মীর মত
সরস্বতীও বিষ্ণুর পত্নী। ঋতিতে ব্রহ্মবিদ্যার নাম

মধুবিজ্ঞা। যে বিজ্ঞায় আনন্দচিন্ময়রসের আন্বাদন করা যায় তা মধুবিজ্ঞা নয় তো কি। মধুবিজ্ঞায় যিনি অবগম্য তিনিই মাধব। মা-শব্দের আরেক অর্থ, ধী, বুদ্ধি। যিনি মৌনের সাহায্যে বুদ্ধির ধ্বন বা দূরীকরণ করেন তিনিই মাধব। অর্থাৎ স্বল্পফলদায়ী কর্ম থেকে যিনি জীবকে নিজের দিকে আকর্ষণ করেন তিনিই মাধব। ধব-শব্দের আরেক অর্থ বস্ত্র। বস্ত্র শরীরকে আচ্ছাদন করেই শরীরের শোভা বিস্তার করে। তেমনি যিনি মা-কে বা শ্রীরাধাকে ঢেকে রেখেছেন আলিঙ্গনে, সেই নিত্য লীলাপরায়ণ জ্ঞানমুন্দরই মাধব। মা-শব্দের অর্থ ছায়াদিনী বা আনন্দিনী শক্তি। সেই শক্তিই শ্রীমতী।

যুখে করবে মাধবের নাম, মনে করবে মাধবের ধ্যান আর সকল কাজে স্মরণ করবে মাধবকে। মাধবই পরমানন্দ, তাকেই বন্দনা করো—তীরট কুপায় মুক বাচাল হয়, পঙ্গু যায় গিরিলজ্বনে। তিল-তুলসী দিয়ে এই দেহ মাধবকে উৎসর্গ করে দাও আর বলো, হে মাধব, তোমাকে বার বার মিনতি করছি, তোমার দয়া যেন আমাকে না ছাড়ে।

আর নারায়ণ কে ?

নর থেকে উদ্ভূত বলে নার। তাই নার অর্থ জীবসমূহ। অয়ন অর্থ আশ্রয়। সমগ্র জীবসমূহের আশ্রয় বা আশ্রয় বলে নারায়ণ। নার-শব্দের আরেক অর্থ জল। জলে অর্থাৎ কারণ-জলে অবস্থান করেন বলেও নারায়ণ। নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণেরই বিলাস। অধীশ, অখিললোকসাক্ষী শ্রীকৃষ্ণ। আশ্রিতাশ্রয়-বিগ্রহ। শ্রীকৃষ্ণই সর্বধাম—জগদ্ধাম। অনাদিরাদি-গৌবিন্দ, সর্বাশ্রয়, সর্বকারণকারণ। শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণেরও আদি, নারায়ণেরও মূল, নারায়ণেরও অবতারী। নিখিল শক্তির অধিষ্ঠানই শ্রীকৃষ্ণ।

গৌবিন্দ কে ?

গৌ অর্থ গুরু, গৌ অর্থ পৃথিবী, গৌ অর্থ ইন্দ্রিয়। আর বিন্দু ধাতুর অর্থ পালন। যিনি গৌ-পালন করেন তিনিই গৌবিন্দ। বিশ্বের পালনকর্তা বলেও গৌবিন্দ। সর্বইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা বলেও গৌবিন্দ। পরিকরবর্গের ইন্দ্রিয়সমূহকে আনন্দে পালন বা পোষণ করেন বলেও গৌবিন্দ।

শরীর গৃহ পদ্মগন্ধে ভরে উঠল, দূরে গেল দারিদ্র্যের মালিন্য। আনন্দের বিহীন খেলতে লাগল অন্ধকারে। বুদ্ধি কমলা এসেছে দৌনের আলয়ে।

দীন কে ? নিরুপম লাভ্যের আচ্ছাদনমুতি নিমাই, মেঘমালিন্যের লেশমাত্র নেই। কোটি কন্দর্পের রূপকেও যেন হার মানিয়েছে। ব্যক্ত হয়েও যে ব্যক্ত নয় তাকে বোঝে এমন শক্তি কার ? নিমাই নিজেকে জানাচ্ছে না বলে লক্ষ্মীও মুখ ঘোঁপে আছে। না জানালে জানে এমন সাধ্য কার ? যার প্রতি কুপা হবে শুধু সেই পাবে জানবার অধিকার। 'যারে তান কুপা হয় সেই জানে তানে।'

বিভারসে কখনো নিমাইয়ের পরিহাস কখনো বা অটল নিটোল গাঙ্গীর্ঘ্য। নবদ্বীপে এমন পণ্ডিত নেই যে ছদ্মগু তার টোলে এসে না বসে, শুনে না যায় তার আখ্যান-ব্যাখ্যান। বুদ্ধ, বিজ্ঞ, অভিজ্ঞ, বিখ্যাত কেউ উপেক্ষা করতে পারে না নিমাইকে। সাহস নেই কোথাও দম্ভফুট করে। বিভার নিশ্চিহ্ন শুভ। কিন্তু যখন বিভার আসনে নেই তখন চাপলা-তারল্যের প্রতীমুতি। শিষ্যদের নিয়ে গঙ্গায় লাফাচ্ছে-ঝাঁপাচ্ছে, কখনো বা রাজপথে ছুটোছুটি করছে। এত বড় পণ্ডিত, আর অধ্যাপক, তার এ কী লঘু-চিন্তিতা ! কে কার কথা শোনে ! গালমন্দ করলেও নিমাই চটে না। বরং উন্টে সে নিজেই ঠাট্টা বিদ্রূপ করে, বিশেষত যাদের বাড়ি শ্রীহট্ট, যাদের কথায় পূর্বাঞ্চলের টান। আর নবদ্বীপে শ্রীহট্টের লোক তো কিছু কম নয়।

'হুমি যে ঠাট্টা করো তোমার বাড়ি কোন জেলায় ?' শ্রীহট্টেরা পালটা আক্রমণ করে।

প্রশ্ন শুনে আবার নিমাইয়ের পরিহাস।

লাঠি নিয়ে তেড়ে আসে শ্রীহট্টেরা, নিমাই ছুট দেয়। সাধ্য কি তার সঙ্গে পাল্লা দেয় কেউ। অনুপায় হয়ে শ্রীহট্টেরা আর্জি করে দেওয়ানে। তদন্তে দারোগা-পেয়াদা আসে, কিন্তু তারাও নিমাইয়ের পক্ষ হয়ে হাসে। বলে, এ আবার একটা মামলার বিষয় নাকি ?

কিন্তু এত বিজ্ঞায়ই বা হল কি, কি বা হল এত সারল্যের ভূমিকায় ?

কৃষ্ণরস কই ?

'হেন দিব্য শরীরে না হয় কৃষ্ণরস।

কি করিব বিজ্ঞায় হইলে কালবশ।'

কৃষ্ণই সমস্ত রসের বিষয় ও আশ্রয়, সমস্ত শাস্ত্রের প্রতীপাত্ত, তার কথা কই ?

সাধন-ভক্তির থেকেই রত্নির উদয়, সেই সাধন-ভক্তি

কোথায়? শ্রবণ-কীর্তনাদি অনুষ্ঠানই সাধন-ভক্তির অঙ্গ, তাও ত দেখি না। ও সব অনুষ্ঠানে চিন্তাশক্তি হলে রত্নির আবির্ভাব। রত্নি পাট হলেই প্রেম। যাতে চিন্তা স্নিগ্ধ হয়, কৃষ্ণে আত্মস্থিকার মমতা জন্মে রত্নির সেই প্রগাঢ়তাই প্রেম। প্রেম যখন চিন্তাকে দ্রবীভূত করে তখন তা স্নেহ। স্নেহে ক্ষণকালিক বিচ্ছেদও সম্ভব। স্নেহ থেকে মান। মাধুর্যকে নবীনতর আশ্বাদ করবার চেষ্টায় যখন অনাক্ষিপণ ধারণ করে তখন তা মান। মান যদি বিশ্বাস করে যে প্রিয়জন এই অদাক্ষিপণ মোচন করবেই তখনই তা প্রণয়। প্রণয় থেকে রাগ। মিসনের আশায় যখন হৃৎ ও মুখ বলে অনুভূত হবে তখনই তা রাগ। রাগের বৃদ্ধি অনুরাগ। প্রিয়জনকে যখন বারে-বারে নিত্য-নতুন বলে আশ্বাদ হবে, প্রতি দর্শনেই সে অভূতপূর্ব, তখনই অনুরাগ। অনুরাগে সমস্ত চিন্তা যখন বিভ্রান্ত, টাইটুসুর, তখনই তা ভাব। আর ভাবের পরমকার্য মহাভাব।

এসব লক্ষণ কোথায় নিমাইয়ে?

মুকুন্দ দত্ত কেমন কৃষ্ণগীত গাইছে। যে শুনছে সেই তন্ময় হয়ে যাচ্ছে। কেউ কাঁদছে কেউ হাসছে কেউ বা উদাম নৃত্য করছে। কেউ গড়াগড়ি খাচ্ছে, কেউ বা ছফার করে মালসাট মারছে, কেউ বা মুকুন্দের ছুঁপা ধরে লুটিয়ে পড়ছে। ও সব কিছুতেই যেন নিমাইয়ের মনোযোগ নেই। মুকুন্দ তার সহপাঠী, পথে দেখা হলেই তার সঙ্গে শুধু ব্যাকরণের তর্ক চালায় নিমাই। যে অদ্বৈতসভায় মুকুন্দের গান হচ্ছে তার ধার দিয়েও সে হাঁটে না। শ্রীবাস পণ্ডিত যার শ্রবণে কীর্তনে আনন্দ, যে নিজের ঘরে কীর্তন করে ও শ্রবণ করে গিয়ে অদ্বৈতসভায় তার সঙ্গে দেখা হলেও নিমাই শাস্ত্রের ধাঁধা জিগগেস করে, জিগগেস করে ব্যাকরণের ফাঁকি। কৃষ্ণকথা মুখেও আনেনা। সবাই কৃষ্ণকথা শোনবার জগ্গে উৎসুক কিন্তু নিমাইয়ের কাছে কেবল ভাষাতত্ত্বের কচকচি। এই মিথ্যা বাক্যে কারু রুচি নেই। ঐ 'ফাঁকি' আসছে রে, দূর থেকে নিমাইকে দেখে সকলে কেটে পড়ে।

একদিন অমনি পালিয়ে যাচ্ছিল মুকুন্দ।

‘ও আমাকে দেখে পালায় কেন?’ পাশের লোককে জিগগেস করল নিমাই।

‘গঙ্গানানে যাচ্ছে বোধ হয়’ বললে পার্শ্ববর্তী।

‘ওদিকে গঙ্গা কোথায়?’

‘তবে বোধ হয় অগ্নিত্র কাজ আছে।’

‘না, না, আমাকে দেখে পালাচ্ছে।’ বললে নিমাই, ‘দেখা হলে আমি শাস্ত্র-ব্যাকরণ বলব কৃষ্ণকথা বলবনা, তাই এড়িয়ে যাচ্ছে আমাকে। ‘ওহে মুকুন্দ পণ্ডিত’—গলা তুলে হাঁক দিল নিমাই।

মুকুন্দ শুনেনও শুনলনা, বেরিয়ে গেল হনহন করে।

‘আমার থেকে পালিয়ে পালিয়ে এমনি থাকবে কদিন?’ মুকুন্দের উদ্দেশ্যে হেঁকে বললে নিমাই, ‘কদিন পর এমন বাঁধনে বাঁধব ছেড়ে যেতে পথ পাবে না। দেখবে বৈষ্ণব কাকে বলে। দেখবে এ বৈষ্ণবের ঘরের দরজায় “অন্ন ভব” দাঁড়িয়ে আছেন পাহারায়। দেখবে—’

যারা শুনল তারা রুষ্ট হল নিমাইয়ের উপর। কী স্পর্ধা, ত্রাসা আর শিবকে ছারছড় করে! দেবদেবী মানেনা নিমাই। নিমাই নাস্তিক।

শ্রীবাসেরও সেই আক্ষেপ। আশা, নিমাই যদি বৈষ্ণব হত কত সুখের হত। বিচার নেশাই ওর কাল হল। বিচার তৃপ্তি ছাড়া আর কিছুই ওর কাছে লোভনীয় হল না। এত বড় পণ্ডিত, কিন্তু সারশস্ত্রশূন্য, কৃষ্ণে রত্নি নেই একহিন্দু। ‘মনুষ্যের এমন পাণ্ডিত্য দেখি না। কৃষ্ণ না ভজেন তবে এই হৃৎখ পাই।’ সকলে মনে মনে প্রার্থনা করে, হে কৃষ্ণ, নিমাই অধ্যয়ন ছেড়ে তোমার রসে মত্ত হোক, নিরবধি প্রেমভাবে ভজনা করুক তোমার। ‘কেহো বলে, হেন রূপ হেন বিত্তা যার। না ভজিলে কৃষ্ণ নহে কিছু উপকার।’

সমস্ত নদীয়া তখন ধন-পুত্ররসে মত্ত, কিন্তু শ্রীবাস আর তার তিন ভাই—শ্রীরাম, শ্রীপতি আর শ্রীনিধি—রাতে নিজগৃহে উচ্চস্বরে কীর্তন করে একত্র। কীর্তনের গোলমালে পাষাণীরা ঘুমুতে পারে না। বাপু, ধীরে ধীরে মৃদুস্বরে কৃষ্ণনাম করলে হয়না, প্রমত্ত হয়ে নাচতে কাঁদতে লাফাতে-ঝাপাতে হবে? দাঁড়াও, তোমাদের বাড়ীঘর গঙ্গায় টেনে নিয়ে ফেলব, সবংশে তাড়িয়ে দেব নবদ্বীপ থেকে।

জীবের কৃষ্ণহীনতা দেখে বুক ফেটে যায় শ্রীবাসের। দীনদয়াদ্রনাথ, কবে আসবে তুমি, কবে জাগবে তুমি, অলোককাতর আমরা, কবে দেখব তোমাকে?

একদিন পথের মধ্যে নিমাইয়ের সঙ্গে শ্রীবাসের দেখা। শশিষ্য চলেছে হন-হন করে। শ্রীবাসকে

দেখে নিমাই ক্রান্ত একটা নমস্কার করল। শ্রীবাস বললে, 'কি হে উদ্ধতের চূড়ামণি, চলেছ কোথায় ?'

নিমাই কোনো উত্তর দিলনা। মুহু মুহু হাসতে লাগল।

শ্রীবাস বললে, 'কি ছার বিচার লোভে দিন কাটাচ্ছ ? বিজ্ঞায় কি হবে যদি কৃষ্ণভক্তি না হয় ? 'পড়ে কেন লোক—কৃষ্ণভক্তি জানিবারে। সে যদি নহিল তবে বিজ্ঞায় কি করে।' কতই তো পড়লে কিন্তু পোলে কী ? যদি কিছু পেতে চাও তো কৃষ্ণভজন শুরু করো। 'ডেকে সর্বথা ব্যর্থ না গোড়াও কাল। পড়িলা ত এবে কৃষ্ণ ভজহ সকাল।'

নিমাই দাঁড়াল না। চলে যেতে যেতে বললে, 'পণ্ডিত ধৈর্য ধরো, তোমার কৃপায় তাও নিশ্চয়ই হবে একদিন।'

তারপর সেদিন আবার গদাধরের সঙ্গে নিমাইয়ের দেখা।

গদাধর পাণিয়ে যাচ্ছিল, নিমাই ছুটে গিয়ে তার দুহাত চেপে ধরল। 'কি হে পণ্ডিত, শাস্ত্র ব্যাখ্যা করে যাও। মুক্তির লক্ষণ কাকে বলে ?'

কিছু না বলেও ছাড়ান নেই। আমতা-আমতা করতে লাগল গদাধর। বললে, 'আত্মস্তিক দুঃখ-নাশই মুক্তির লক্ষণ।'

আর যায় কোথা। নিমাই গদাধরকে পেড়ে ধরল। ব্যাখ্যার এমন সব দোষ ধরতে লাগল যে গদাধরের সাধ্য নেই তা খণ্ডন করে। সাধ্য নেই ধূলিজালের মধ্য থেকে মুক্তির পথ দেখে।

'বাবা, পালাতে পারলে বাঁচি।' মনের গোপনে মিনতি করতে লাগল গদাধর।

ছেড়ে দিল নিমাই। বললে, 'আজ ছেড়ে দিলাম বটে কিন্তু কাল আবার ধরব।'

সবাই অদ্বৈতসকাশে গিয়ে নালিশ করে, 'কই, তোমার কৃষ্ণ কই ?'

হুকার করে ওঠে অদ্বৈত। 'আসছে, আসছে, ধৈর্য ধরো, নদীয়া শহরেই আছে সে প্রচ্ছন্ন হয়ে। কী হয় দেখবে সকলে চোখ খুলে—তাই চোখে সে দেখা আর শেষে কুলিয়ে উঠবে না। 'করাইয়ু কৃষ্ণ সর্ব-নয়ন-গোচর। তবে সে অদ্বৈত নাম কৃষ্ণের কিঙ্কর। আর দিন কথো গিয়া থাক ভাই সব। এথাই দেখিবা সব কৃষ্ণ অচ্যুতব।'

পিতৃকার্য করে গয়া থেকে গৌরাজ যখন ফিরে

এল তখন তার সর্ব অঙ্গে প্রেমবিকার। শঠী মাতা মনে করলেন তার বায়ুরোগ হয়েছে, আত্মীয়-বন্ধুরাও তাঁকে সমর্থন করল। কেউ বললে, ডাখ-নারকোলের জল খাওয়াও, কেউ বললে শিবাঙ্গি-ঘৃত মাখাও এবং কেউ বললে বেঁধে রাখো দড়ি দিয়ে। শ্রীবাসকে ডাকা হল—তোমার কী মনে হয় ?

তুলসী প্রদক্ষিণ করছে গৌরাজ। শ্রীবাসকে দেখে কাঁদতে লাগল গৌরাজ, কম্প আর রোমহর্ষ হতে লাগল সর্বাক্ষে। শ্রীবাসকে নমস্কার করতে গিয়ে মুছিত হয়ে পড়ল। বাহজ্ঞান ফিরে পেয়ে গৌরাজ শ্রীবাসকে উদ্দেশ্য করে বললে, 'সবাই বলছে আমি বায়ুরোগে আক্রান্ত হয়েছি, আমাকে বেঁধে রাখতে চাইছে। তুমি কী বুঝ ?'

'তোমার শরীরে মহাভক্তিযোগের আবির্ভাব হয়েছে।' গদগদস্বরে বললে শ্রীবাস, 'মহাকৃষ্ণ-অমুগ্রহ।'

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল গৌরাজ। বললে, 'তুমিও যদি বলতে আমার বায়ুরোগ হয়েছে তাহলে আমি গঙ্গায় প্রবেশ করতাম।'

'আহা, তোমার যেমন বাই তাহা আমি চাই।' শ্রীবাস বললে যুক্তকরে।

আর গদাধর ?

গদাধর ছায়ার মত ফিরতে লাগল গৌরের সঙ্গে। সেবায় টেলে দিল মন-প্রাণ। নীলাচলে এসেছেন মহাপ্রভু, সেখানেও গদাধর। নীলাচল ছেড়ে যাচ্ছেন বৃন্দাবন, গদাধরও সঙ্গ নিয়েছে।

বাধা দিলেন মহাপ্রভু। বললেন, 'গদাধর, তুমি ক্ষেত্রসন্ন্যাস নিয়েছ, নিয়েছ টোটাগোপীনাথের সেবা। তোমার নীলাচল ছাড়া চলবে না।'

প্রভুর আদেশ কোনদিন লঙ্ঘন করেনা গদাধর, আজ কি হল কে জানে, বললে, 'না, থাকব না নীলাচলে, প্রভুহীন প্রাণহীন নীলাচলে। যাহা তুমি সেই নীলাচল। ক্ষেত্রসন্ন্যাস মোর যাক রসাতল।'

'ছি, ও কথা মুখে আনতে নেই।' প্রভু প্রবোধের সুরে বললেন, 'গোপীনাথের সেবা করবে কে ?'

'জানি না। তোমাকে দর্শনই আমার গোপীনাথের সেবা।'

'তুমি যদি গোপীনাথের সেবা ত্যাগ করো লোকে আমাকে নিন্দে করবে।' প্রভু বললেন অম্লনয়ের সুরে, 'আমার উপর লেশ আশ্রয় তুমি কি ভাই চাও ?'

‘সব দোষ আমার। যদি তুমি সঙ্গে না নাও
মি একা-একা চলে যাবে।’

মহাপ্রভু সঙ্গে নিলেন না গদাধরকে। দলছাড়া
নাথর একা-একা চলল।

ফটকে তাকে ডাকলেন মহাপ্রভু। বললেন,
‘তুমি শুধু নিজের সুখ চাও? আমার সুখ চাওনা?’

অশ্রুভরা চোখে তাকিয়ে রইল গদাধর।

‘বলো, আমি যাতে সুখী হই তা চাওনা তুমি?
‘মি নিজের সুখ চাও বলেই আমার সঙ্গে থাকতে চাও
হুনি। যদি আমার সুখ চাইতে—’

গদাধর মাথা নত করে রইল।

‘চাও আমার সুখ? যদি আমার সুখ চাও
নীলাচলে ফিরে যাও। আর কোনো কথা বোলো
না।’ বলে মহাপ্রভু দ্রুতপায়ে নৌকোর গিরে
উঠলেন।

নৌকো ছেড়ে দিল।

নৌকোর উদ্দেশে ছুটতে পারলনা গদাধর।

পা উঠলনা। ছিন্ন ওরুর মত পড়ে গেল মুহূর্ত
হয়ে।

[ক্রমশঃ।

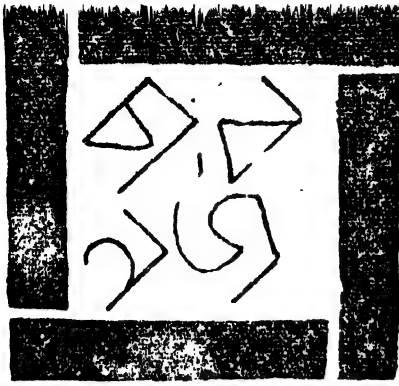
নীল পাখি

জয়ন্তী সেন

কালকে সে এসেছিল—সেই পাখি বার ডানা নীল
অনেক সাগর ছেন—অথবা সে আকাশের রঙ
জমাট মোষের মত জমা করে ডানার পালকে,
আমাদের ছোট মাঠে নীল পাখি এসেছিল কাল।
ঢেউ-এর ফেনার মত সাদা বুক—অথবা সে মেঘ,
সুখবতী মন কারো খেয়ালের আঁতে ভেসে চলা
চোখের স্রুয়ে অলে লাল তারা—ইসারার মত।
হরতো কোথাও কোন দিশাহারা ছিপের জগতে
নীল ঢেউ ঘেরা মাটি, নীল ছায়া আকাশ বহানো
আলো দিয়ে নীড় বেঁধে তার পর নতুন আবেগে
অনেক পৃথিবী ঘুরে আমাদের ছোট মাঠে এসে
সারা বেলা ইসারার বলে গেল আলোর ঠিকানা—
যে আলোর অভিসারে তারা নিয়ে রাতের বিলাস।
আমার হুঁ হাতে তাকে ধরি নাই, মনের নদীতে
স্রুয়ের নীল ছায়া ঝরেছিল সোনালী বেলায়।
নিমেষের রূপকথা শেষ হলে হঠাৎ আকাশ
হারানো শিশুর মত টেনে নিল আদরের হাতে।
দিন কাটে তারপর—ছোট মাঠে সকাল দুপুর
বিকেলের রেশটুকু অলে আর কত বার নেবে।
তবু স্রুয়ের পাতা বার বার খুলে কত ভাবি
কালকে সে এসেছিল—সেই পাখি, বার ডানা নীল।

... এ স্রুয়ের প্রচুদপট ...

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে বাঙলা ভাষা ভারতের গর্ব ও সৌন্দর্য বিধ্বংসিত
নাট্যাচার্য শিবিরকুমার ভাট্টার মহাশয়ের মহাপ্রয়াণ উপলক্ষে
তার একখানি আলোকচিত্র মুদ্রিত করা হ’ল। চিত্রখানি বিখ্যাত
সাহিত্যিক জীপরিমল গোস্বামী কর্তৃক গৃহীত।



ডাঃ যোগেশচন্দ্র গুপ্ত
(প্রখ্যাত স্নায়ু-রোগ বিশেষজ্ঞ)

ছাত্রজীবনে আর্থিক অনটন সত্ত্বেও সুপ্রসন্ন ভাগ্য তত্ত্বপরি-
গতির আগ্রহ ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টা অল্প সময়ের ব্যবধানে
এনে দিল নাম, বংশ, অব ও গণার। ভারতের অগ্রতম বিশিষ্ট
চিকিৎসক ডাঃ যোগেশচন্দ্র গুপ্তর সখ্যেই এই কথাগুলি বলছি।

বিশাল জিলায় গৈলো নিবাসী উদ্‌যোজক গুপ্ত ও ফুলশ্রী গ্রামের
কন্যা ৮ আশ্রমভার্য দেবীর পাঁচ পুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠতম যোগেশচন্দ্র
১১-০২ সালের ১৭ই নভেম্বর অগ্নিতে জন্মগ্রহণ করেন। তদানীন্তন
বড়লাটের খাস দপ্তরের কর্মীদের মধ্যে বাবা উদ্‌যোজক ছিলেন



ডাঃ যোগেশচন্দ্র গুপ্ত

অগ্রতম। ঐ সময়ে বাবার সঙ্গে উদ্‌যোজকের সিস্টার, লক্ষ্মী
প্রভৃতি হানে ঘুরে তিনি উর্দু ও হিন্দী ভাষা ভাল ভাবে আয়ত্ত
করেন। যোগেশচন্দ্র গৈলো উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় হইতে ১৯২০
সালে প্রবেশিকা ও কলিকাতা কলেজার্টি কলেজ হইতে ১৯২২ সালে
আই. এস. সি পাশ করেন। অর্থাভাবের দ্বারা কলেজ পাঠ্যপুস্তক
কিনিতে পারেন নি এবং সহপাঠীদের কাছ থেকে বই সংগ্রহ করে
পাঠ্যভাগ করেছেন। পরে তিনি কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজে
(আর. ভি. কয়) ভর্তি হন এবং ১৯২৮ সালে সন্মানে এম. বি.
পরীক্ষার উত্তীর্ণ হন। তিনি ডাঃ বিধানচন্দ্র দাসের অগ্রতম শ্রিয়
ছাত্র ছিলেন এবং তাঁহার অধীনে 'হাউস-ফিজিসিয়ান' ও পরে
রেজিষ্ট্রারের কার্যভার গ্রহণ করেন। সেই সময় তিনি ইংল
ইন্ডুস্ট্রিতে কর্মপ্রার্থী হন, এবং সেখানকার অগ্রতম পরিচালক ও
তাঁহার অধ্যাপক ডাঃ ইন্ডুবর্ণ বসু চাকুরীর জন্য চেষ্টা করত হন কিন্তু
শেষ পর্যন্ত যোগেশচন্দ্রকে নিরাশ হইতে হয়। ইতিমধ্যে গণ
উপস্থিষ্ট এক বৃদ্ধ জ্যোতিষী একদিন ডাঃ গুপ্তকে ডেকে বলেন যে,
তিনি তিন মাসের মধ্যে বিদেশে যাবেন—তিন বছর পরে ফিরিয়া
ক্রমশঃ পশ্চিম জমিরে তুলতে পারবেন আর বর্তমানে চাকুরী পাওয়ার
কোন সম্ভাবনা নেই। ভাগ্যের পরিহাস মনে করেই যোগেশচন্দ্র
বৃদ্ধের কথাগুলি অগ্রাহ করেন। কয়েক দিন পরে বসু ডাঃ
গিরীন্দ্র মুখোপাধ্যায় জার্গাণী থেকে সেখানকার Deutsche
Akademie-তে বৃত্তিলাভের জন্য তাঁহাকে একটি আবেদনপত্র
পাঠাইতে লিখেন। আবেদন পাওয়া মাত্র আকাডেমী রবীন্দ্রনাথ,
আচার্য জগদীশচন্দ্র, গান্ধীজী, সি. ভি. রমণের একটি সার্টিফিকেট
অবিলম্বে পাঠাতে অগ্রদূত করেন। মহাসম্মতি উপস্থিত হল—
কাবণ চার জনের মধ্যে এক জনের সঙ্গে কোন পরিচয় যোগেশচন্দ্রের
ছিল না। একদিন সাহসে ভর করে তিনি আচার্য জগদীশচন্দ্রের
সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সার্টিফিকেট পান "I know Dr. B. M.
Gupta, the brother of Dr. J. C. Gupta". ঐ
প্রশংসাপত্রই তাঁকে এনে দিল উক্ত আকাডেমী থেকে জার্গাণ
সরকারের বৃত্তি। সেই সময় ৮ ডাঃ তারক দাস ভারতীয় ছাত্রদের
সুযোগ সুবিধার জন্য বধ্যাঙ্গ্য চেষ্টা করিতেন।

১৯৩১ সালের আগস্টে তিনি জার্গাণী পৌছান এবং অক্টোবর
মাস হইতে কলোন (KOLN) বিশ্ববিদ্যালয়ে বোগ দেন, কিন্তু
সেখানকার সরকারী হিসাব বিভাগ তাঁহার বৃত্তি পাওয়া সখ্যে
আপত্তি তোলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার Kuske সঙ্গে সঙ্গে
তাঁহাকে Guest-Professor করে দেন। কয়েক মাস পরে অবশ্য
তাঁহাকে বৃত্তি দেওয়া হয়। সেখানে প্রথম বছরে তিনি Prof.
Epingerর অধীনে Medical Clinic & Pharmacology
Instt. এ ও দ্বিতীয় বছরে সম্পূর্ণ কাউন্সেলরী শিক্ষা গ্রহণ করেন।
পরের বছরে উক্ত প্রেসিডেন্টের সর্বোত্তম রচনা হিসাবে
কাম্বাকসোজীর উপর ডক্টরেট পান। অধ্যাপক এশিনজারের আন্তরিক
সাহায্য ও শিক্ষাদানের কথা ডাঃ গুপ্ত আজও সজ্ঞভাবে স্মরণ
করেন। এই স্থানে থাকাকালীন অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র মহলানবিশের
প্রচেষ্টায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি হাইডেনবার্গ,
লিপ্সিগ, ও ব্যাডলানহিন-এ ব্যাহারিক শিক্ষালাভ করেন। ঐ
সময় জার্গাণ জাতির ভাগ্যবিধাতারূপে হিটলারের অভ্যুদয় হয়।
কলে হিটলারের তিনটি আদেশ ডাঃ যোগেশচন্দ্রের উপরও জারী

রা হল—(১) ইজরী সহকারীদের গণ্যকরণ করার ইন-স্ট্রাকশন অধ্যাপক Epingerকে সম্মুখে চাকুরী ছাড়তে হয়—(২) পলিসি Vinisation সরকারী আদেশ বন্ধ করা হয়—(৩) "Winter Hilpe" (পরীক্ষার জন্য প্রথম রবিবার উপবাস) আদেশ ডেন। বিদেশাগত শিক্ষার্থী হিসাবে ডাঃ গুপ্ত রেহাই পান। তঁাকে শেষে তিনি যুরোপের কয়েকটি দেশ পরিভ্রমণ করে ১৯৩৪ সালে দেশে ফিরিয়া আসেন। ডাঃ রায়ের পরামর্শানুযায়ী তিনি গারমাইকেল কলেজে বিনা বেতনে জেনারেল মেডিসিন ও Stomach Juice পরীক্ষা করিতে থাকেন। এ ছাড়া তিনি মধ্য কলিকাতার নিজস্ব চিকিৎসালয় খোলেন। কিছুকাল পরে ডাঃ গুপ্তের তোলা একটি রোগীর ইলেক্ট্রিক কার্ডিওগ্রাম সবচেয়ে বেশি ডেনহাম হোয়াইট ও অধ্যাপক V. R. Vrehodge বিক্রয় করিয়া করেন। আইনস্টের পত্র পাঠিয়া Prof. Vrehodge ডাঃ গুপ্তের সহিত বোগাযোগ স্থাপন করিয়া হৃদযন্ত্রের ছোটলটের রোগ নির্ণয়ে ১৯৩৬ সালে মৈলেশ চন্দ্রকে মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক হিসাবে নতুন পদে প্রেরণ করেন। নানা অসুবিধার মধ্যে সেখানে ছ' বছর থাকেন। ১৯৪০ সালে আর. জি. কবলেজে কার্ডিওলজী বিভাগের প্রধান হিসাবে বোগদান করেন ও সম্মান থেকে ১৯৫৫ সালে পি. জি. (বর্তমানে S.S.K.M.) হাসপাতালে Director of Cardiology রূপে যুক্ত হন।

১৯৩০ সালে তিনি শ্রীমতী আশালতা দেবীকে বিবাহ করেন। তঁার একা ৮তটিনী দাশ ছিলেন ডাঃ গুপ্তের খুড়তত বোন।

পিয়ানো বাজান ও খেলাধুলা দেখা দাঁহার অবসর বিনোদনের উপায়-বিশেষ।

শ্রীবিষ্ণুচরণ বাগচী

[কলিকাতা পুলিশের সদর কার্যালয়ের ডেপুটি কমিশনার]

লোক ভাবে এক আর হয় এক। যিনি একদিন রাজ্য পরিচালনা সংক্রান্ত ব্যাপারে সচিবের দায়িত্ব গ্রহণ করতে গিয়েছেন, ঘটনাক্রমে দেশের আইন ও শৃঙ্খলা সংরক্ষণের কঠোর দায়িত্ব গ্রহণ করতে হ'লে প্রত্যক্ষভাবে তাঁকেই। স্বাধীন গণরিকদের ধনসম্পত্তি মান ও প্রাণরক্ষা করেছে যিনি তাঁর জীবনের ষষ্ঠ দিনগুলো কাটিয়ে দিচ্ছেন আজও নিন্দা বা প্রশংসার অপেক্ষা না করে, তাঁকে ঠিক সাধারণ পথ্যারে ফেলতে পারি না। স্বাধীন রাষ্ট্রে পুলিশ জনসাধারণের সেবকমাত্র। এ উন্নত দৃষ্টিভঙ্গী ও ন্যায়ের ভিত্তিতে যিনি পুলিশ বাহিনীকে গড়ে তুলতে চাইছেন এবং একে রূপায়িত করছেন প্রতিদিনের কার্যে ও প্রচেষ্টায়, এমনি একজন পুলিশ অফিসার হচ্ছেন। কলিকাতা পুলিশের হেড কোয়ার্টার্স-এর ডেপুটি কমিশনার শ্রীবিষ্ণুচরণ বাগচী।

যাঁকে কলেজ-জীবনে একদিন ব্রিটিশের হাজতে বেতে হয়েছিল স্বাভাবিকদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকবার অভিযোগে এবং এজতে ব্রিটিশ আই-বিদের প্রধান কার্যালয়ে তিন দিন হাজত বাস করতে হয়েছিল (অবশ্য তৎকালীন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর ভ্রামাভ্রাসাদ মুখোপাধ্যায় ও তৎকালীন প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক জি. বি. এম. সেনের প্রচেষ্টায় শেষ পর্যন্ত বৃত্তি বন্ধ হয়নি), তাঁকেই যে একদিন

আবার পুলিশ বিভাগে চাকরি গ্রহণ করতে হবে, বোধ হয় জীবগাটী কখনও স্বপ্নেও এ ভাবেন নি, একেই বলে অদৃষ্ট! তারপর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইশান কলার হয়ে পুলিশ বিভাগে চাকুরী গ্রহণ খুব সম্ভব এবং প্রথম পথ প্রদর্শক বিষ্ণু বাবুই। সাধারণতঃ ছাত্র ও শিক্ষক অধ্যাপক সমাজ আশা করেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইশান কলার হ'লে ভবিষ্যৎ জীবনে তিনি শিক্ষা ক্ষেত্রে অন্ততঃ অধ্যাপক কিংবা অধ্যক্ষ হয়ে তিনি শিক্ষা বিভাগের উন্নতি বিধান করবেন কিন্তু এক্ষেত্রেও তাঁর জীবনে হয়েছে ব্যতিক্রম।

জীবগাটীর জীবনে মহাত্মা গান্ধীর সান্নিধ্য লাভ করবার সুযোগ এসেছিল। নোয়াখালীর নারকীর দাঙ্গার অব্যবহিত পরে সাহায্য ও উদ্ধারকার্যের সহায়তা করবার জন্য তৎকালীন লীগ সরকার তাঁকে নোয়াখালীতে নিযুক্ত করেন। জীবগাটী দিনের পর দিন নোয়াখালীতে গান্ধীজীর সঙ্গে অতিবাহিত করেন। মহাত্মা গান্ধী বাগচীকে খুব স্নেহ করতেন। আজ একথা বললে কেউ বিশ্বাস করবে কি না জানি না! কিন্তু এই নোয়াখালী দাঙ্গার কার্যের সময় জীবগাটীর সরকারী চাকুরী ছাড়ার উপক্রম হয়েছিল। এ সময় তিনি ছিলেন প্রথম শ্রেণীর সাবডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও দাঙ্গা-বিশেষতঃ এলাকার সাহায্য ও উদ্ধারকার্যের ভারপ্রাপ্ত অফিসার।

অবিতর্কিত বাঙ্গালার প্রধানমন্ত্রী তখন কলিকাতা হত্যাকাণ্ডের নায়ক কুখ্যাত শওর সরাবদি সাহেব। মহাত্মা গান্ধীর হত্যাকাণ্ডের ফলে সোণের মত জীবগাটী লীগের মহিমায় শহীদ হ'তে পারলেন না। এবারে এই কখনোই ও কর্তৃত্বক পুলিশ অফিসারের সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা পরিবেশন করবো বঙ্গবন্ধু পঠিক-পাঠিকাদের কাছে। জীবগাটী একজন আদর্শ অফিসার।



শ্রীবিষ্ণুচরণ বাগচী

১৯১৪ সালের ২৮শে জুলাই জীবিতপূর্ণ বাগী উৎকালীন নদীয়া জিলার অন্তর্গত বেহেরপুর থানা এলাকার আলমপুর গ্রামে হাজুলসারে জন্মগ্রহণ করেন। হারিট বর্ডমানে পূর্ব পাকিস্তানে পড়েছে। জীবিতপূর্ণ আদিনিবাস নদীয়া জিলার কবিরপুর থানা এলাকার দোমোহি গ্রামে। পিতা সিজিবিন সিনতাচরণ বাগী। মৃতকাল নদীয়া জিলার সিকারপুর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের কার্য করে অবসর গ্রহণ করেছেন। মৃতকাল থেকেই জীবিতপূর্ণ তাঁর পূজাপাঠ পিতৃমর্যদের প্রভাব পড়ে। নদীয়া জিলার সিকারপুর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় থেকে তিনি ১৯৩০ সালে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষার উত্তীর্ণ হয়ে বৃত্তিলাভ করেন। তারপর তৃত্বি হলেন এনে রাজসাহী গভর্ণমেন্ট কলেজে বিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে। সেখান থেকে ১৯৩২ সালে প্রথম বিভাগে আই, এস, সি পরীক্ষার উত্তীর্ণ হয়ে বিজ্ঞানের বৃত্তি লাভ করেন। পড়াশোনার জীবনের জন্তে জীবিতপূর্ণ চলে এসেন কলিকাতার এবং তৃত্বি হলেন দ্বিত্বি চার্ল কলেজে বি-এ ক্লাসে। পশ্চিমবঙ্গে অসামান্য সহ ১৯৩৪ সালে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হ'য়ে উপাধি কসার হন। তারপর প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ১৯৩৬ সালে এম-এ পরীক্ষার অসামান্য প্রথম শ্রেণীতে দ্বিত্বি হান অধিকার করেন। এখানেই জীবিতপূর্ণ কলেজী জীবন শেষ হ'লো। ১৯৩৮ সালে জুনিয়র সিন্ডিকাল সার্ভিস পরীক্ষার উত্তীর্ণ হয়ে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন এবং দাবতপুটের চাকুরী গ্রহণ করেন। তারপর অভিবক্ত বাঙ্গালার কয়েকটি স্থানে কার্য করে ১৯৪৬ সালে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট হিসেবে নোরাখালীর নারকীর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার অব্যবহিত পরে দাঙ্গাবিসমৃত্ত এলাকার সাহাব্য ও উদ্ধারকার্যের তারপ্রাপ্ত অকিসার হিসাবে কার্য করেন প্রায় এক বৎসর। এই সময় তিনি মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ বহু নেতার সম্পর্কে আসেন। দিনের পর দিন জীবিতপূর্ণ নিজের স্বধ-বাহিন্য ত্যাগ করে দাঙ্গাপীড়িত আর্ন্তজনগণের সেবা ও সাহাব্য করেন নিরলস ভাবে। বিন্টি সরকারী কর্মচারী হরও তিনি মাছুষের বে কর্তব্য তা বিন্মৃত হননি। মহাত্মা গান্ধীর নোরাখালী সফরের সময় জীবিতপূর্ণ তাঁহার সঙ্গী ছিলেন। এই দিনগুলির কথা জীবিতপূর্ণ আজিও স্মরণ করেন বিশেষ ভাবে। জগতের অন্ততম শ্রেষ্ঠ মানবের সঙ্গে দিনের পর দিন অভিবাহিত করা সকলের ভাগ্যে হয়ে উঠে না। এবিক থেকে জীবিতপূর্ণ ভাগ্যবান—এ কথা অবশ্যই বলতে হবে।

তারপর বেশ বিভাগের পর জীবিতপূর্ণ চলে আসেন পশ্চিমবঙ্গে এবং ১৯৪৮ সালে উচ্চ পুনর্কাসন বিভাগের স্পেশাল অকিসার হিসেবে বোগলান করলেন, 'রাইটাস' বিজিস'এ। তারপর পশ্চিম-বঙ্গের পুনর্কাসন বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিবের কার্যও তিনি কিছুদিন করেন। ১৯৪৯ সালে ডেপুটি-ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে উন্নীত হন এবং এগিষ্টাট-সেক্রেটারী হিসাবে উচ্চ পুনর্কাসন বিভাগে কার্য করিতে থাকেন। এই সময় সর্বভারতীয় চাকুরীতে বোগলানের সুযোগ আসে জীবিতপূর্ণ। তিনি ভারতীয় পুলিশ সার্ভিসের জন্ত নির্বাচিত হলেন ১৯৪৯ সালে এবং আবু মাউন্ট শিক্ষা-বিবিধে ছয় মাস শিক্ষালাভ করেন। ১৯৫০ সালে চার মাস

তিনি খন্ডাপুরের মহকুমা পুলিশ অধিকর্তা হিসেবে কাজ করেন। ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৫২ সালের মে মাস পর্যন্ত সুবিবাব জিলার পুলিশ স্থপার ছিলেন। তারপর চলে গেলেন দাঙ্গিলিং-এর পুলিশ-স্থপার হয়ে। ১৯৫৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত দাঙ্গিলিং-এ থেকে কলকাতার চলে আসেন স্পেশাল ব্রাকের ডেপুটি-কমিশনার হ'য়ে এবং ১৯৫৮ সালের মে মাসে কলিকাতা পুলিশের সদর কার্যালয়ের ডেপুটি-কমিশনারের গুরুদায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন। সেই থেকে অব্যাবধি তিনি কলিকাতার নাগরিকদের হন, সম্পত্তি ও জীবন রক্ষার গুরু দায়িত্ব ভার বহন করে চলেছেন নিরলস ভাবে।

ব্যক্তিগত জীবনে জীবিতপূর্ণ সাদালালী, সিরহস্তার, কর্তব্যনিষ্ঠ প্রকৃতি সঙ্গুণ জুড়িত। "Plain living and high thinking"-এর একটি বলন্ত চুঠাঙ জীবিতপূর্ণ বাগী। উত্তমপে অধিষ্ঠিত হরও তিনি বে ভাবে জীবন-ধারণ করেন তা শিক্ষক-সমাজে আদর্শস্থল এবং যুগকলের অমুপ্রেরণার একটি বলন্ত উদাহরণ। আমরা আশা করণে জীবিতপূর্ণ চিরদিনই বেন অসমিত্যে দেশের ও দেশের সেবা করেন।

জীবিতপূর্ণনারায়ণ চৌধুরী

[অমৃতবাজার পত্রিকার বার্তা-সম্পাদক]

শ্রীনেহিলাম, মাহুঘাটের মেজাজ নাকি সর্করা চড়া—মুখাবয়ব নাকি সব সময় গুরুগভীর—আর হাশু-পরিহাসের দার দিয়েও নাকি বান না। এই মনোভাব নিহেই কয়েক দিন পূর্বে দেখা করি কলিকাতার উপকণ্ঠে গ্রাম্য-পরিবেশের মধ্যে গৃহদেবতার মনোয়ম মন্দিরসহ আপন গৃহে সেই ব্যক্তিটির সঙ্গে। খানিকটা পরিচয়ের পরই প্রকাশ পেল নরম মেজাজের—সংল প্রকৃতির—সমবেতা সাংবাদিক ও অমৃতবাজার পত্রিকার বার্তা-সম্পাদক জীবিতপূর্ণনারায়ণ চৌধুরীর স্বরূপ।

ফরিদপুর জেলার কালারুধা গ্রামের ৬৭মনচন্দ্র চৌধুরী ও শেখপুর জমিদারীর সেরেস্তাদার ৬গগনচন্দ্র বাদের বক্তা স্বর্গপতা মনোয়ম দেবীর বড় ছেলে জীবিতপূর্ণনারায়ণ ১৩১০ সালের ১৭ই জ্যৈষ্ঠ বঙ্গুর্ষে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২০ সালে ময়মনসিংহ জিলা স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষার পাশ করে স্থানীয় আনন্দমোহন কলেজে তিনি ভর্তি হন। কিন্তু বেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলনের জন্ত ১৯২১ সালে কলেজ ছেড়ে দেশের কাজে লিপ্ত হন। মধ্যবিত্ত গৃহস্থের বাবার বড় ছেলে—তাই জীবিতপূর্ণ ছির করেন বে কলিকাতার সম্ভ্রান্তিষ্ঠিত National Medical School থেকে চিকিৎসা-বিজ্ঞা আয়ত্ত করে গ্রাম্য চিকিৎসক হবেন। কিন্তু মাহুঘা ভাবে এক হর আর এক। বাবার মৃত্যুর পর তাঁর উপর পড়ল এক বিরটি সঙ্গার প্রতিপালনের ভার, নিজের ছোট ছোট ভাইবোনের মাহুঘ করে ভোলায় দায়িত্ব। তাই পড়ার আগ্রহকে ভ্রমিত রপে চাকুরী খোঁজা আরম্ভ হল। ১৯২২ সালের ১৭শে সেপ্টেম্বরে কুড়ি টাকা বেতনে অমৃতবাজার পত্রিকার Copy Holder হলেন। তখন সম্পাদক ছিলেন ৬গোলাপলাল ঘোষ। কিছুদিন পরে হলেন প্রফ বীভার—১৯২৪ সাল উক্ত পত্রিকার সহ-সম্পাদক। সেই সময় তাঁকে রিপোর্টারের কাজও করতে হয়েছিল। ১৯৩৫ সালে বর্ধপ

শ্রী চৌধুরীকে এক নতুন পথে বসালে। বঙ্গবন্ধুর প্রতিদানে—
১৯২৫ বৎসর সুনিপুণভাবে সে দায়িত্ব পালন করে চলেছেন
রবীন্দ্রনাথায়ণ পত্রিকার বার্তা-সম্পাদকরূপে। বিভাগের পত্রিকা
প্রকাশের মধ্যে সাংবাদিকতার যে বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল
রবীন্দ্রনাথায়ণের মধ্যে তার পূর্ণ প্রকাশ ঘটল তাঁর পরবর্তী
জীবনে। ১৯২৩ সালে কলকাতা কলেজের বর্ডপক্ষের আহ্বানে
সেখানকার কর্মধ্যক্ষ সুভাষচন্দ্রের (নেতাজী) সঙ্গে তাঁর
বিশেষ পরিচয় হয়। কিন্তু তিনি সেখানে যোগ দেন নাই।
অনুভবক্রমে রাষ্ট্রে কাজ হওয়ার দিনের অবসরে কর্মসংস্থানের
জন্য ১৯২৪ সালের মধ্যেই তিনি “বঙ্গমতী-সাহিত্য-মন্দির”-এর
স্বাধিকারী পরলোকগত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে
সাক্ষাৎ করে পঁচিশ টাকা বেতনে একটি পদ লাভ করেন।
কিছুকালের মধ্যে সতীশ বাবু শ্রীচৌধুরীর দক্ষতার জন্য তাঁর বেতন
ছুটি টাকা বৃদ্ধি করিয়া দেন। ১৯২৭ সালের জ্যৈষ্ঠমাসে
মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের তাঁকে টোকা জী “দৈনিক বঙ্গমতী”র সম্পাদকীয়
বিভাগে কাজ দেন। তখন শ্রীচৌধুরী “পত্রিকা”র কাজটি ছেড়ে
দেন। এই বছর “কমন্স” কাগজ পুনরায় তাঁকে আহ্বান করেন।
ইতিমধ্যে রাষ্ট্রের কাজে অসুবিধা হওয়ার “পত্রিকা” বর্ডপক্ষ
পঁচাত্তর টাকা বেতনে রবীন্দ্রনাথায়ণকে দ্বাদশিকালীন সম্পাদক হিসাবে
পুননিয়োগ করেন।

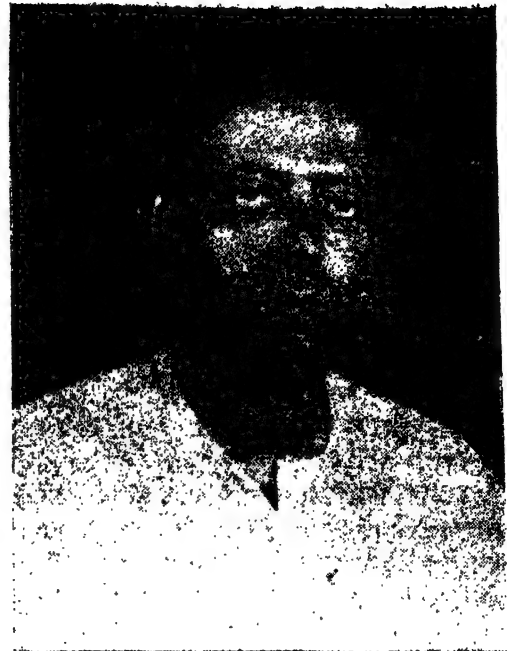
শ্রীচৌধুরীর কর্তব্যনিষ্ঠার একটি ছোট ঘটনার কথা বলি।
১৯৩০ সালে নির্বাক ছবি দেখানোর মাধ্যমে একটি লাইভ
কেওয়া হল “Gandhi-Irwin Pact Signed.” দর্শক রবীন্দ্র-
নাথায়ণ তখন উঠে পড়লেন—বাগবাজারে কাগজের দপ্তরে
পৌঁছলেন—সম্পাদক গোলাপলাল খোবাকে জানালেন মনের কথা।
পরদিন সোমবার, বন্ধের দিন—হঠাৎ পাঠকেরা পেলেন ছ’পাতার
‘পত্রিকা’—গান্ধী আফ্রিন চুক্তির কথা জানলেন। এতবড় খবর—
পূর্ণ একদিন দেশের লোক জানতে পারবে না—সাংবাদিক
রবীন্দ্রনাথায়ণের চিন্তার বাইরে ছিল।

১৯৩৪ সালে তাঁরই উদ্যোগে ‘পত্রিকা’র রবিবারের
সাহিত্য-বিভাগ হল—পর পর এল শিশু-বিভাগ, মহিলা-বিভাগ,
সিনেমা-বিভাগ, খেলাধুলার পাতা।

রবীন্দ্রনাথায়ণ “দ্বাদশিক বঙ্গমতী”র শুধু একজন পুণাতন অস্থায়ী
পাঠকই নন—“বঙ্গমতী-সাহিত্য-মন্দির”-এর সুপ্রতিষ্ঠিত বহু
ছোট ছোট ঘটনার কথা আখ্যায় বললেন তিনি—একজন ক্ষুণ্ণ
কর্মী হিসাবে।

Life & work of J. M. Sengupta (বাজেরাণ্ড),
Ploughboy to President (V. J. Patel),
Mahatma Gandhi & India struggle for Swaraj,
Motilal Nehru প্রভৃতি পুস্তক সমূহ শ্রীচৌধুরী সঞ্চালন
করেন।

১৯৩০ সালে সিরিজাকুমার চক্রবর্তীর কন্যা শ্রীমতী লাবণালতা
দেবীকে তিনি বিবাহ করেন। বাগান করা ও সব রকম পুস্তক
পাঠের মধ্যে তিনি অবসর বিনোদন করেন। শেষে সাংবাদিক
শ্রীচৌধুরী অস্থবোধের স্তরে বলেন, “কাজ সাংবাদিকতা বাড়ির কাঁটার
কাজ পছন্দ করেন—কিন্তু প্রকৃত সাংবাদিক হলে হলে প্রতিটি



শ্রী রবীন্দ্রনাথায়ণ চৌধুরী

বিভাগের কাজ জানা—প্রচুর পড়াশুনা—আর নিজের সত্যকে
কর্তব্যের মধ্যে ডুবিয়ে দিতে হবে। তাতে সাংবাদিক ও সংবাদপত্র
যুগপৎ হবে জনপ্রিয় ও লোকরঞ্জক।”

শ্রী আবহুস সান্তার

[পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান প্রমন্ত্রী]

১৯১১ সালের ৩রা মার্চ বর্ধমান জেলার কালনা থানার অন্তর্গত
টোলা গ্রামে এক সাধারণ পরিবারে পশ্চিমবঙ্গের প্রমন্ত্রী শ্রী আবহুস
সান্তার জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২০ সালে গ্রাম্যা পাঠশালা থেকে হাইস্কুল
লাভ করে বৈজ্ঞানিক হাইস্কুলে তিনি ভর্তি হলেন। ১৯২১ সালে
দেশময় যে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হল বৈজ্ঞানিক গ্রামেও তার
চেটে এসে পৌঁছলো। ১০ বৎসরের কিশোর সান্তারের প্রাণও সে
ধবরে উত্তলা হয়ে উঠলো; মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন দেশের সেবা
করবো। তখন থেকেই তাঁকে দেখতে পাওয়া গেল বিভিন্ন স্বদেশী-
সভায় বৈজ্ঞানিকরূপে। ১৯২৩ সালে বঙ্গীয় পরিষদের নির্বাচনে
তাঁকে বরাজ দলের প্রার্থী অম্বুলে কাজ করতে দেখা গেল।
১৯২৫ সালে সাক্ষোপাঙ্গ নিয়ে তিনি বর্ধমানে ছুটলেন মহাত্মা
গান্ধীকে দেখা ও তাঁর বক্তৃতা শোনার জন্যে। আস্তে আস্তে
তিনি রপ্ত করতে লাগলেন কিভাবে দেশসেবা করবেন। ১৯২৬
সালে যেদিনীপুরের বস্তার আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের নেতৃত্বে বস্তার্তদের
সেবার জন্যে যে সঙ্কটগ্রস্ত সমিতি গঠিত হল, সান্তার সাহেব নিজের
অকলে বাড়ী বাড়ী ঘুরে অর্থ সংগ্রহ করে সমিতিকে পাঠিয়ে দিলেন।
১৯২৮ সালে সাইমন কমিশনকে বর্জন করার জন্যে তিনি
বৈজ্ঞানিক একটি আন্দোলন সংগঠিত করে দেশকে তাঁর কর্মদক্ষতার
কথা জানিয়ে দিলেন। এই বৎসরই বৈজ্ঞানিক স্কুল থেকে ম্যাট্রিক

পরীক্ষার উত্তীর্ণ হয়ে বর্ধমান রাজকলেজে আই-এ ক্লাসে ভর্তি হলেন। কলেজে পড়াকালীন তিনি বর্ধমানের কংগ্রেস নেতা জীবনবেরেন্দ্রনাথ পাণ্ডার সান্নিধ্যে এলেন। ১৯৩০ সালে যে আইন অমাত্য আন্দোলন শুরু হয় সাতার সাহেব তাতে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করলেন এবং তখন থেকেই সুবক্তা হিসাবে তাঁর খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো।

তাঁর ডেজবিনী বক্তৃতার ইংরেজ সরকার পর্যন্ত বিচলিত হয়েছিলেন এবং সভা-সমিতিতে তাঁকে বক্তৃতা দেওয়া বন্ধ করার জন্যে কালনার মহত্মা ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর উপর ১৪৪ ধারা জারী করলেন। কিন্তু তিনি মহত্মা শাসকের সে আদেশ মানলেন না, বৈভূপুর রাসতলায় জীবনবেরেন্দ্রনাথ পাণ্ডার সভাপতিত্বে অস্থায়ী এক জনসভার তিনি আইন অমাত্য করে বক্তৃতা করার প্রেরণা দেন। বিচারে এক মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও ১০০ টাকা জরিমানা, অন্যদিকে আরও ৬ সপ্তাহ কারাদণ্ডের আদেশ হ'ল। সাতার সাহেব জরিমানা দিলেন না, কল তাঁর কারাদণ্ডের মেয়াদ হল আড়াই মাস। এর পর ১৯৩২ সালে আইন অমাত্য আন্দোলনে যোগদান করে তাঁকে সাড়ে চার মাস কারাদণ্ড ভোগ করতে হল। জেল খেটে বেরিয়ে এসেই জেলের কটকের কাছে আবার তাঁকে নিরাপত্তা আইনে প্রেরণা করা হল, এবার কারাদণ্ডের মেয়াদ হল ৬ মাস।

১৯৩৫ সালে তিনি সিটি কলেজ থেকে বি-এ পাশ করলেন এবং ১৯৪০ সালে কোলকাতার ল' কলেজ থেকে বি-এল পরীক্ষার উত্তীর্ণ হয়ে কিছুদিনের জন্য বর্ধমান আদালতে ওকালতিও করেন। '৩৫ সালে তিনি বর্ধমান জেলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হন। তারপর সভাপতিও নির্বাচিত হন এবং ঐ পদেই আসীন ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। '৩৫ সালে বর্ধমান টাউন হল তার নগিনী চ্যাটার্জীর সভাপতিত্বে কানেল করের বিরুদ্ধে যে সভা হয়, তাতে সাতার সাহেব এমন বক্তৃতা দিয়েছিলেন যে তার নাজিমুদ্দিন পর্যন্ত মুগ্ধ হয়েছিলেন। তার নাজিমুদ্দিন সাতার সাহেবের মতের পরিবর্তনের জন্যে

চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পাবেন মি। দেশে যখন মুসলিম লীগের আধিপত্য তখনও সাতার সাহেব পাকিস্থান সৃষ্টির বিরুদ্ধে নির্ভীকভাবে কণ্ঠে ধাঁড়িয়েছিলেন।

সাতার সাহেব ১৯৩৭ সাল থেকে এ আই সি সি সি সভা নির্বাচিত হয়ে আসছেন; '৪২ সালে বোম্বাইয়ে এ আই সি সি সি বৈঠকে যোগদান করে মহাদেব দেশাইয়ের শোকসভার বক্তৃতা করার জন্যে বর্ধমানে এলেন কিন্তু পুলিশ তাঁকে প্রেরণা করলো, বিচারে এক মাস জেল হল; কিন্তু নিরাপত্তা আইনে তাঁর জেলের মেয়াদ গিয়ে ঝাঁড়ালো ১৫ মাসে। কংগ্রেস যখন বৈধ হ'ল জেল থেকে কিয়ে এসে পুনরায় কংগ্রেসে যোগ দিলেন। এই সময় থেকে বর্ধমান জেলা বোর্ড, স্কুল বোর্ড এবং বহু স্থানীয় জনহিতকর সংস্থার সঙ্গে তিনি গড়িত হলেন। ১৯৫০ সালে অস্থায়ী পার্লামেন্টের তিনি সভা নির্বাচিত হলেন। ১৯৫২ সালের সাধারণ নির্বাচনে লোকসভার কালনা-কাটোয়া কেন্দ্রে থেকে নিকটতম প্রার্থীকে ২২ হাজার ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে নির্বাচিত হলেন। '৫৭ সালের নির্বাচনে তিনি কেন্দ্রীয় কেন্দ্রে থেকে বিধানসভার আসনের জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং নিকটতম প্রার্থীকে ১১ হাজার ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে প্রমাণ করে দিলেন যে, কেন্দ্রের শতকরা ৭৫ জন হিন্দু তাঁদের কাছেও তিনি কত প্রিয়। তাঁর বলিষ্ঠ মতবাদ ও উদার দৃষ্টিভঙ্গী যে এই জনপ্রিয়তার অগত্য কারণ, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। শ্রমমন্ত্রী হিসেবেও তাঁর সেই দৃষ্টিভঙ্গী ও মতবাদ দলমত নির্বিশেষে সকলের জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। শ্রমমন্ত্রী হিসেবে তিনি মনে করেন—যেহনতী জনতার জায়গায় অধিকার বন্ধা করাই তাঁর কাজ, কাজেই যে কোন শ্রমিক তিনি যে ইউনিয়নেরই অন্তর্ভুক্ত হোন না কেন, তার অভিযোগের প্রতিকার করতে তিনি বা তাঁর দপ্তর সকল সময়েই সচেষ্ট। শ্রমদপ্তরকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্যে তাঁর চেষ্টারও অন্ত নেই। শ্রমদপ্তর থেকে এখন 'সেবার গেজেট' 'শ্রমিক বার্তা' প্রকাশিত হচ্ছে, শ্রমিক আইনগুলি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হচ্ছে।

সাতার সাহেবের সভাপতিত্বে রাজ্য শ্রম উপদেষ্টা বোর্ড গঠিত হয়েছে শুধু কলকারখানার শ্রমিক বা সওদাগরী অফিসসমূহের কর্মচারীদের জন্যেই নয়, দোকান কর্মচারী ও কৃষিশ্রমিকদের জন্যেও আজ আইন তৈরী হচ্ছে। শ্রমিক নেতা হিসেবে সাতার সাহেবের এক সময় যে খ্যাতি ছিল সে অভিজ্ঞতাকে তিনি এখন কাজে লাগাচ্ছেন।

সাংবাদিক হিসেবেও সাতার সাহেবের খ্যাতি কম নয়। ১৯৫০ সাল পর্যন্ত তিনি 'বর্ধমান কথা' কাগজের সম্পাদক ছিলেন; তাঁর পরিচালনাধীনে 'বর্ধমানবাণী' ও জনসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

সাতার সাহেব বলেন, 'যে জনসেবার পথে পা দিয়েছি তাকে মনে করি আমি বুলাবনের পথ, এ পথ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাতেই আমি চলবো, এই পথে চলাতেই আমার আনন্দ।'

শেখ মুহুর্তে শ্রমমন্ত্রী জীসাতার 'মাসিক বহুমতী'র কথা তুললেন। বললেন পরিচায়ক—'মাসিক বহুমতী আমার কাছে খুব প্রিয়। আমি আগ্রহ নিয়ে বহু-প্রচারিত এ সাহিত্যপত্রটি নিরমিত পড়ে থাকি। অবসর বিনোদনের প্রচুর খোরাক আমি এতে পাই এবং এই পত্রিকাটির আরও উন্নতি হবে, এ সম্পর্কে আমি নিঃসন্দেহ।'



জীবনবেরেন্দ্রনাথ পাণ্ডা

১১ উদ্ভিদ ক্রোধের ভিত্তি করে ব্রহ্মাণ্ডি ওদন
কলাকৌশল সহকারে সমস্ত দৃষ্টিগোচরে গিরো বাধলেন। একটি
একটি করে প্রত্যেকটিতে। আগে জড়ানো দৃষ্টির সঙ্গে মৃতন
দৃষ্টিকে জুড়ে দিয়ে ক্রোধের কটিতটে বেই পাক দিয়ে গিরো বাধতে
গেলেন ব্রহ্মাণ্ডি, অমনি গহনঘন এক আন্তর কোতুকে বিলসিত হয়ে
উঠল পল্লীবাসিনীদের হৃদয়। হরিশের মত বিলানী চোখ করে তাঁরা
হাসতে লাগলেন। কিন্তু ক্রোধের বালক-সখার দল বন্ধু-ক্রোধের কারা
দেখে বেই তাঁদের বন্ধকে দাঁত চমকিয়ে সমবেদনার কারা জুড়েছেন
অমনি সকলে দেখলেন,--সমস্ত দৃষ্টি কিন্তু সেই হু-আজুল কম।।

ব্রহ্মাণ্ডিও তখন দর্শনীর দশা। তিনি পূর্নবন্ধনের উপায় চিন্তা
করতে বসলেন। চিন্তার খালন-সমীরণেই যেন বেগে বেসামাল হতে
লাগল তাঁর বন্ধঃস্থল, কিশলয়ের মত শ্রীমঙ্গ থেকে বয়ে পড়তে লাগল
শ্রমজলের শিশির, কবরীভার থেকে খসে পড়ল মালতীর মালা।

ব্রহ্মাণ্ডি বুঝতে পারলেন, এত রাগ দেখিয়েও তিনি কেবল ফল
পেরেছেন কপালের ঘাম, নিফল হয়েছে তাঁর সমস্ত প্রয়াস। তবুও
উপায় চিন্তা করতে লাগলেন ক্রুদ্ধে বাঁধবার।

এবার খেলার রাগ ঝলেছে মায়ের মনে। অজুত শিশুটিকে
পুনর্বার বাঁধতে গেলেন ব্রহ্মাণ্ডি।

আর আতীত-স্মরণীরা? কী স্মরণ তাঁদের ভুকের ভজিয়া!
তাঁদের রাজা-রাজা চোখগুলি নীঘর হয়ে গেল; গলে গেল, বয়ে গেল
ঘরের প্রতি তাঁদের মানসিক শ্রদ্ধা; সমস্ত বিষয়ে পূর্ণলুপ্ত হয়ে গেল
সংস্কার; যেন বন্ধনঃজুগ্ম হয়ে গেল তাঁদের ভবনগুলিও।

১২। কেউ কি কখনও চৈতন্যকে বাঁধতে পেরেছেন? না।

আনন্দকে? না।

জ্ঞানকে? না।

ভেদকে (মহঃকে) না।

তাহলে ব্রহ্মাণ্ডিই বা কেমন করে বাঁধবেন চিদানন্দজ্ঞান মহোদয়
বপুশন ঐ তাঁকে? তথ্যনি—যাঁর অন্তর নেই যাঁর বাহির নেই,
অথচ বিনি আনন্দে ও ভেদে অন্তরে বাহিরে সমান, বিনি পূর্ণ, বিনি
অপরিস্ফুটান্ যাঁর পূর্ণ নেই, পর নেই;—তাঁরি কৃপাশক্তি আজ
বিজয়িনী হলেও ভাবতে লাগল, আহা মা কি আমার কখনও বাঁধতে
পাবেন রাগ করে?

১৩। তাই বন্ধন প্রসঙ্গে জননীর পরিশ্রমলুপিত অঙ্গধানি
নিরীক্ষণ করে শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে সজ্ঞাত হল করুণ-রস। ওরে, ভগবান
শ্রীকৃষ্ণকে বাঁধতে পারে দুটি গুণ, ভক্তের পরিশ্রম, ও নিজকৃপা, অস্তথা
নেই। বভক্ষণ এই হৃদের অমুৎপত্তি বটেছিল ততক্ষণ হু-আজুল
কমই ছিল বন্ধু, কিন্তু সম্প্রতি দুটিরই বেই আবির্ভাব ঘটল, অমনি
নন্দহলাল স্বীকার করে নিলেন জননীর উত্তম পুনর্বন্ধন।

১৪। সিদ্ধার্থী হলেন ব্রহ্মাণ্ডি। সহচর বালকদের বললেন—
যাযি এখন আসি। তোমরা এঁকে দেখো। নিজে যেন নিজের
বাঁধন কেটে না পালায়। যদি পালায়, আমার ডেকে। আভিনায়
থেকে উঠে ঘরের ভিতর চলে গেলেন ব্রহ্মাণ্ডি। মা-ও গেলেন আর
ক্রোধের চান-মুখ থেকে কলঙ্কের মত ক্রন্দনটিও মিলিয়ে গেল লুপ্তে।
এবং অতি প্রসন্ন মুখে বাণী বেকল—মায়ের দেওয়া বাঁধন ভবে আর
এক কাজে লাগাই।

হু-এ দাঁড়িয়েছিল দুটি তরুশ্রেষ্ঠ। কুবের-পুত্র 'নলকুবের' ও
'মণিপ্রীতের' তাঁরা মৃতকতি। ভগবান্দেয় পদমঞ্জির তক্ত নাগদ যিনি

কবি কণপূর-বিরচিত আনন্দ-রস বন

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

অম্লবাদক—শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

একদা শাপছলে খণ্ডন করেছিলেন মদিরার বিক্ষেপ—সেই নীতি-
প্রণেতা পরম বোগীজের বচনামৃতকে সত্যসত্যই সত্য-প্রত্যিত করবার
উদ্দেশ্যে এঁরা হু-জনে লাভ করেছিলেন ঐ অভিশপ্ত তরু জয়।

হঠাৎ ক্রোধের খেয়াল হল, ঐ দুটি তরুকে তিনি অহুগ্রহ
করবেন। অতএব হামাগুড়ি দিয়ে, ঘীরে ঘীরে উদুখলটিকে চানতে
চানতে তিনি চলতে লাগলেন তরু দুটির দিকে।

১৫। পিছনে পিছনে চলতে লাগলেন বালক-সহচররা।

বহু প্রাচীন তরু দুটির একটি মাত্র মূল, সদস্যের মত; পৃথক
পৃথক দুটি কাণ্ড যেন জ্ঞানকাণ্ড ও কর্মকাণ্ড; সামবেদ বজ্রবর্ষের মত
অজস্র তাঁদের শাখা। ব্রহ্মাণ্ডের কীতি-প্রকাশের মত বহুবীর তাঁদের
বিস্তার; মহাসাহসার যেন পাহাড় যেন মেঘ, মহামূল্য ব্রহ্মাণ্ড ও
বিরাটের যেন বিগ্রহ। ভীমাহুজ ও কার্ভবীর্ষের একই অর্জুন
নামের মত এ দুটিরও নাম অর্জুন। নকুল ও সহদেবের মত এ
দুটিও বমল।

সেই বমলার্জুনের দিকে ক্রুদ্ধে যেতে দেখে বালক-সহচরদের
মনে হুলে উঠল সংশয়।

তবে কি ক্রোধের অসহ হয়ে উঠেছে রোজের তাপ, তাই আশ্রয়
নিতে চলেছেন তরুমূলে? বিতর্কের মধ্য পথেই ফার নেড়ে তাঁরা
দেখতে পেলেন তরু দুটির মূলের মধ্যস্থলে উপবেশন করলেন ক্রুদ্ধ,
তির্যক ভাবে স্থাপন করলেন উদুখলটিকে। তারপরে এতটুকুও
আদাস না করেই সেই খলনিহস্তা অপূর্ব চিত্রচারিত্র আশ্চর্য্য বালক
নীচের দিকে লম্বা হয়ে ঝুঁক পড়েছে যাঁর চূর্ণকুন্তল, অগ্নান যাঁর
শ্রীমঙ্গের লাভণি, উদুখলের এক সংঘটনেই সম্মুখে উদুগ্লিত করে
কেললেন বমলার্জুন তরুরদিকে।

১৬। ক্রুৎনাম সংকীর্ণন করলে যেমন বাসনা ও পাপ--হুই-ই
সমুদ্রলিত হয়ে যায় তেমনি হল সেই তরুজয়ের দশা। মড়মড়
করে লাফিয়ে উঠল এক হৃদান্ত ধনি। সে ধনিতে যেন নির্ধাপিত
হয়ে গেল ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ড-বিবরবর্তী শব্দপ্রায়। প্রলয়মধ-নির্মুক্ত
মহাবাজের ভৈরবরবের অম্লকরণ করতে করতে ভেঙে পড়ল
বমলার্জুন।

হু-দুটা বিরাট মহাক্রোধের পতন হল বটে, কিন্তু ক্রুদ্ধকে
বালকসহচররা দেখতে পেলেন—দুটি গাছের মাঝখানে তিনি
বসে রয়েছেন, পটনামে পূর্ববৎ বাঁধা রয়েছেন উদুখলে। বিরাট
ভৈরব রবেও এতটুকু বটেনি তাঁর মানসিক উবেগ, এতটুকুও চমকিত
হন নি ভয়ে, মুখে হাসি, স্থির তাকিয়ে রয়েছেন তরুজয়ের নৃতিমত্ত
মূল আশ্রয় মত, পরম ভেজবী দুটি ধিবাপুত্রের দিকে।

এবং তারপরে তাঁরা অবাক হয়ে তনলেন,—অভিশাপমুক্ত
ধিবাপুত্র দুটি ভব করছেন তাঁদের নন্দহলাল ক্রুদ্ধকে।

ভগবদ্ভবমোচক হয়েও যিনি আজ বন্ধন বীকার করেছেন
মাতৃবাংগল্যের।

নিভায়ুক্ত হয়েও যিনি আজ বন্ধ, মিথ্যাত্ব হয়েও যিনি আজ
মনীচুরির অপরাধে অপরাধী সেই তাঁদের নন্দহলাল কৃষ্ণকে।

১৭। ধ্বনিত হয়ে উঠল তব,—

“জয় জয় সন্তানানন্দ-বন, বনঘটামেঘর, জয় হে জয় হে জয় হে !
হে হুববগাহ লীলাময়, লীলার শ্রেষ্ঠ সাধন-পথে তুমি অবতরণ
করছ ধরাধামে। হে রণ-নবীন, তোমার চাতুর্ঘ-চটুল ভুজবল...
সঙ্গ্রামে ঘটিয়েছ দানবদের পরাজয়। বেগ-বলের কণামাত্র দিয়ে
তুমি উৎখাত করেছ মহান্ বমলাঙ্কুর।

হে অধিত্যয়, অঙ্গের অশেষ তোমার কৃপা। হে কৃপণজন-
বংশল, সাধারণ মনুষ্যের মতই তুমি আজ ধরার প্রকাশ করেছ
ললিত-বিলাস। ত্র্যমুরের তুমি মঙ্গলাবতার। তোমার আনন-
আভ্যাস বাধা পায় আকাশের চাদ। বিশ্ববল ও বায়ুলফুলের
মত ঐ কচির অধরের মাধুর্য্য ছড়িয়ে তুমি অলঙ্কৃত করে রেখেছ
ধরাভল। অকারণ কৃপা-কৃপাণে তুমি অনাদি অবিকার উচ্ছেদ
করে দাও বলেই আনন্দিত হয়ে ওঠেন মতিমানেরা। বিবাহীত
তোমার লীলা-সমুদ্র, সেখান হ্রান করে আশ্রয়ী প্রজা। ধারা
পারমহংস পথের পথিক একমাত্র তাঁরাই চেনেন তোমার পারের
পথটিকে। তোমার গুণগুলিকে কঠোরপণ করে রেখেছেন কমলাসন-
শিতিকঠাঙ্গি দেবগণ।

হে গণনাভীত লোকোত্তরপ্রভাব! হে প্রভাবহল! হে
বহুসলিতবিহার! যুগচতুকে আপনিই অবতীর্ণ হয়েছেন আশ্রয়ণে।
আপনার নাম ও রূপ নন্দ্রের মত অগণ্যের। নির্মল বশোমতিমার
আপনি শুভ্রাশ্রিত। আপনিই দান করেন বিশ্বের আকাঙ্ক্ষিত
অভিমানের বিষয়গুলিকে। হে অখিললোকনাথ, হে প্রভু, নমস্তে,
নমস্তে। এই বিশ্বত্রকাণ্ডে তুমি ছাড়া আর কে রয়েছে, কোথায়?
হে পরমপুরুষ, কেন না ভোলে তোমার কুহকে? কার হৃদয় না আতুর
হয়ে ওঠে তোমার দুর্ঘট-ঘটনের চতুরতার?

হে মনোরম! হে মূর্ত্তানন্দ নন্দনন্দন! হে নন্দনবন-
বিহারীদের মৌলিভুট্টমহামারকত! ছন্দে ছন্দে কে গাঁথতে পারে
তোমার বশোমাল্য? মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত আনন্দময় রূপে, ব্যক্ত ও অব্যক্ত
আকারময় রূপে তুমি বিস্তারিত। তুমিই আনন্দ তোমার ভক্তের,
অধ্যাত্মবিদের। অতএব তোমার ঐ চৈতন্যমকরন্দ-মল্লিকানীর
অপ্রান্ত-ধারা-মেঘর চরণারবিন্দে চিরলয় হয়ে থাকুক আমাদের উত্তরের
রতি। এক অসীম কৃপার হে প্রভু, হুব করে দাও অরতি।

হে আর্ন্তজনের বন্ধু, আমাদের অজ কোনো প্রার্থনা নেই, একমাত্র
প্রার্থনা...কং-পাদপঙ্কজ-নিবেদিত সঙ্গ। আমাদের পক্ষে আজ প্রসাদ
হয়ে পাড়িয়েছে হুণীষর নারদের অভিশাপ। অতএব মহৎ-প্রসাদের
সমাদর অনিবার্য।

আমাদের বাণী তোমার শুভীর্ণিতে নীন হোক, আমাদের মন
তোমার ঐশানপদ্যের ধ্যানে সমাহিত হোক, আমাদের কর্ণ তোমার
কীর্তিকাণ্ডিতে অচঞ্চল হোক, হে হুবীকেশ, আর কত চাইব, আমাদের
ইন্দ্রিয়বর্গ সেবারদের মহনীরতার রসিক হোক।

দেবর্ষি নারদ, যিনি তোমার চরণকমলের মধুকর, তাঁর অভিশাপ
আজ বর হয়ে আমাদের ওঙ্কর অঙ্গপ্রহ করেছে। সেই প্রসাদটুকু

পেলে আমরা কি চতুর্নেত্রে দেখতে পেতেম সেই আশ্চর্য্য-বালকেই
খেলা, ধীর লীলার একটি কণিকার বিবৃত রয়েছে সহস্র সহস্র
ব্রহ্মণ্ড?

হে ভগবন, বর্ণনাভীত আপনায় জননীর সৌভাগ্য। তাঁর
মহা-মহা সৌভাগ্য যে তিনি আপনাকে বেঁধেছেন। সেই সৌভাগ্য-
কণিকার শতাব্দের একাংশও ইহলোকে লাভ করেননি ব্রহ্মা, শিব,
এমন কি ইন্দ্র ও মহর্ষিরাও।

হে কৃমন, জ্ঞানীদের, সর্ববেদবিধানদের ও বৌদৈকনিষ্ঠচিত্তদের
মুখলভ্য নন আপনি। ইহলোকে আপনি তাঁদেরই নিভাত্ত স্বধলভ্য,
ধাঁদের রতি পূর্ণ-নিবেদিত হয়েছে আপনাত্তে, যিনি আজ নর-শিশুর
আকারে নন্দাঙ্কুররূপে লীলাখেলার বিস্তার।

১৮। অতএব হে প্রভু, আমাদের উত্তরকে অমৃত্যু কল্পন,
কী এমন মনস্কামনা করি আপনার চরণে, ধীর প্রভাবে আপনার
চরণপদের আধারেই শান্ত রতি বহন করতে করতে, এবং
যথোচিত প্রারব্ধ ফল উপভোগ করতে করতে কালাতিপাত করতে
পারি আমরা হুজনে?

১৯। অবসান হল বন্দনার। অতঃপর হুজনেই নিভেদের
অন্তর্হিত করে নিয়ে প্রেহান করলেম উত্তর দিকে।

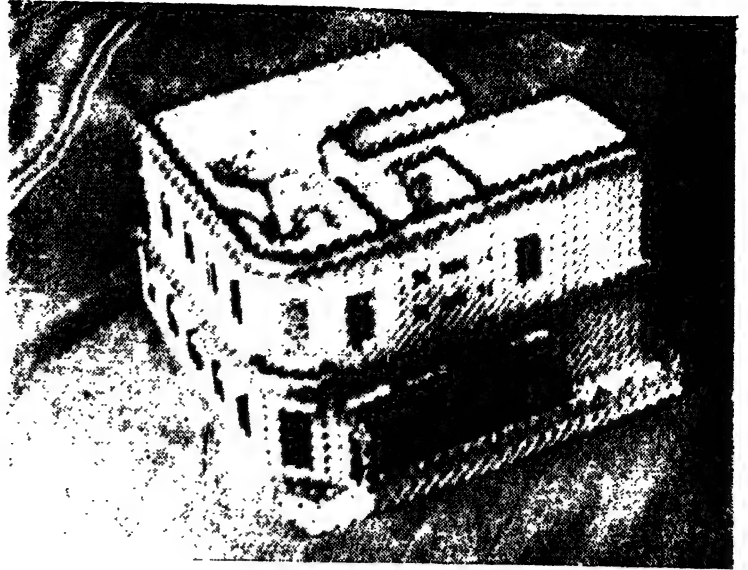
আর সঙ্গে সঙ্গে অভিশাপমুক্ত বমলাঙ্কুরের ঘোর পতন শব্দে
ক্রান্ত হয়ে উঠল নিখিল পোকুল, বেন বধির হলেন স্বর্গের দেবতারা,
দ্বিষ্টনাগেরা,—পাতালের মাগিনীরা। বালক-বৃদ্ধ-নরনারীর এমন
কি ব্রজেশ্বরীরও বেন শুকিয়ে গেল রস। কয়েক জন অধীর
হয়ে বেথতে দৌড়লেন। দৌড়লেন বটে, কিন্তু তাঁদের পূর্বোভোগে
বেন থেয়ে চলল বিতর্ক, কেমন বেন নৃত্য-পরাধুখ হতে চাইল তাঁদের
হৃদয়, বেন তাঁদের হৃদয়ের উপর চড়ে বসল পরম শক্তি।

২০। তাঁরা এসে দেখলেন,—হুটি মহাক্রম পড়ে রয়েছে।
বেন বালকক ভগবানকে দণ্ডবৎ প্রণাম নিবেদন করছে ধরদেবীর
হুথানি হস্ত, বেন পাতালের বিবর থেকে যুগপৎ উল্টে লাফিয়ে উঠে
হুদিকে পালাতে চাইছে হুটি প্রকাণ্ড অজগর সর্প, বেন ভগবান্নিপাতিত
আদিত্যৈক্য মধু-চৈতন্যের এ হুটি সাক্ষ্য প্রতীক্ষি।

আর হুটি গাছের মাঝখানটিতে দেখলেন বসে রয়েছেন তাঁদের
বালমুগ্ধ...অষ্টনিধির বেন অতঃপর নিধি মুগ্ধ। এতটুকুও চাকল্য
নেই, এতটুকুও বির নেই, এতটুকুও ভয় নেই, বরং তিনিই বেন
ধরদেবীকে দান করছেন অতঃপর। বিশ্বর কুটে উঠল তাঁদের গোটো,
বললেন—

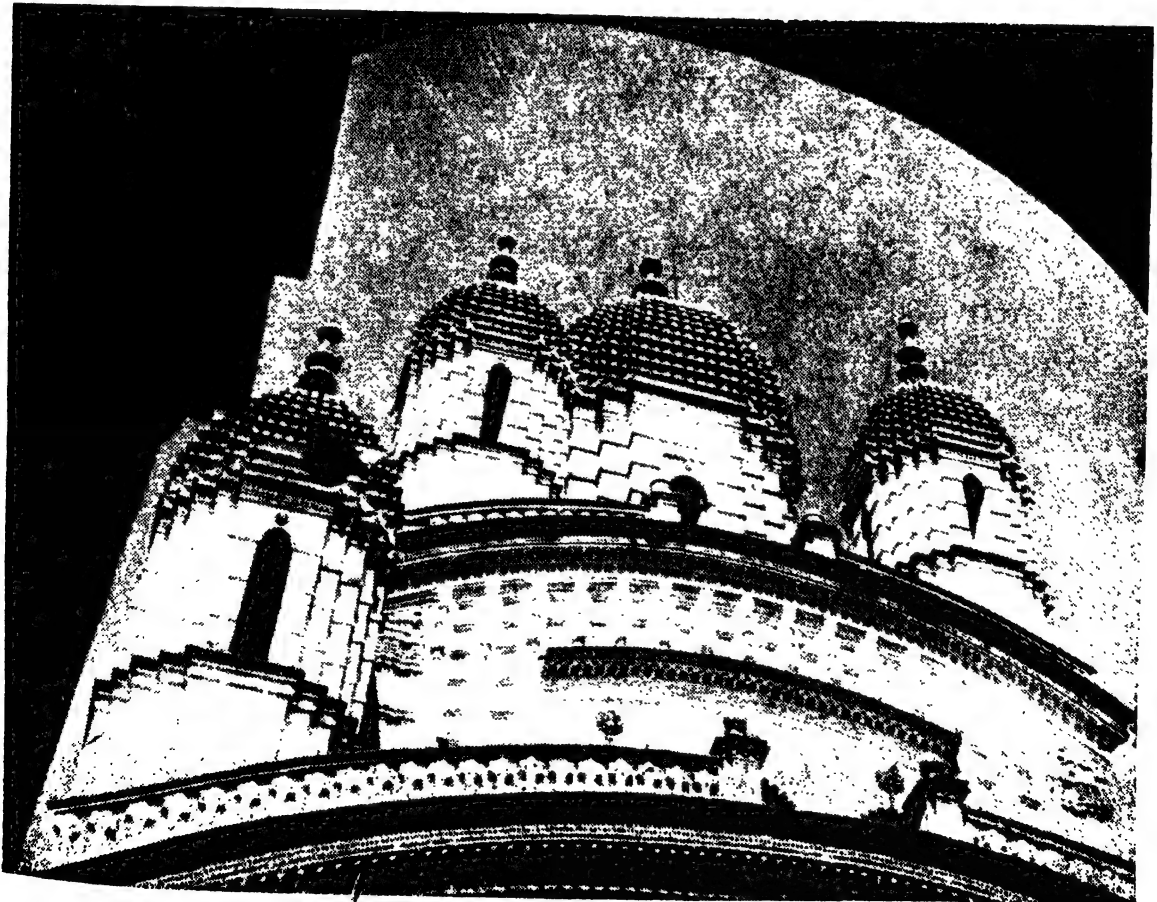
কী আশ্চর্য্য, কী আশ্চর্য্য। বড় নেই, বাদল নেই, হু-হুটো
মহাঙ্কুর গাঁছ হঠাৎ মড়মড় করে উপড়ে পড়ে গেল মাটিতে? এ যে
একবারে প্রলয়কান্ড। হু দিক থেকে হুটো পড়েছে। একদিকে
বেন ভয়, অতঃপর বেন ব্যথা। আর তার মধ্যে বসে রয়েছেন
আমাদের শিশুটি বেন পটে-জীবা এক টুকরো নতুন মেঘ।
বাড়ছেন। বলতেই হবে এ আমাদের কপালের জোর। আশ্চর্য্য,
এতটুকুও আতুল হয়ে পড়েনি ছেলে। মহাপ্রাচীন এই হুটি গাঁছ
তবে কি জরার প্রেক্ষাপে হুল থেকেই করে গেল? না আপনার
বিকারের ভায়ে আপনিই নিপাত গেল? তা তো মনে হয় না।
হুটিরই হুল সরল রয়েছে, শিকড়গুলিও তেমনি দ্বিষ্ট, তেমনি হুল।
কী করে এমন বে হয়?

[ক্রমশঃ]



বোতামের বাড়ী
—শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র

দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির
—বিমল হোড়





ভাস্কর্য।
একাকী

—মীরেন অধিকার







यात्री

—बटोन (वायलनश्रुत)

চিত্র-চরিত্রে বর্ণবোধ ও সাম্যদর্শন

ত্রিগোবর্দন আশ

সুভাষে ভাবিত হ'য়ে সৃষ্টি হ'ল রূপ, রস, গন্ধ ভরপুর বিধাতার বৈচিত্র্যময় জগৎ। সৃষ্টির সেরা-জীব রূপমুগ্ধ মানুষ শেল তার হাড়, গন্ধ। প্রকাশভঙ্গিতে বেকুল অসুট স্বর, তা-বুল বে বায় আপনে। গভীর মর্মেবেদনা অমুভূত হ'ল মানব-চেতনামূলে, কি করে সবাই সবাইকে জানাবে আপন মনের কথা ও ব্যথা। শেল প্রকৃতি-সহায়তা,—একই দৃষ্ট দেখে সকলে হাসে কাঁদে। একই ঘটনার সকলে চমকিত বা আতঙ্কিত হয়। 'একরূপে' বহুর মিল কিন্তু 'এক' যে কি বস্তু তা তারা জানে না। বাত্মা সুরু হ'ল অজানা সন্ধানে জানবার প্রয়াসে। বাস্তব-প্রতিঘাত মধ্যে ঠেকে ঠেকে পৌঁছান এসে এক সোমানায়, প্রকৃতি বলে দেয় ইঙ্গিতে বিশ্বপ্রকৃতি গ্রন্থ পাঠ করতে। সবাই যে, যার রুচি, বিভা বৃদ্ধি সামর্থ্য ততী হ'ল একের সাধনায় বিভিন্ন পথের পথচারী হ'য়ে। পেতে চায় সহজ—সুন্দরকে প্রকৃতি সাহায্যে। চলার পথে সন্ধ্যায় বস্ত্রময় সমবেত হ'ল সংস্রবনে। সর্ববাদিসম্মত বাহা গ্রহণ করে গঠন হল সমাজ ও গ্রহণ-বর্জনরূপ-প্রকৃতি, বাহা নাকি গড়ে তুলবে কালে শিল্প-চরিত্র। রং-এ ভরপুর প্রকৃতি শিখাল বরণ করে গ্রহণ করতে আর প্রাণের শুভন সুর আলপনার ছন্দে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে। রূপমুগ্ধ প্রাণের আবেগ প্রকাশ হল আলাপে,—সুর শব্দে। জনস্বতন্ত্রী সুর-বন্ধারে সুর্তি হল বাণী, কণ্ঠে এল স্বর। চেতনামূলে হল বোধোদয় সুর ও নীরস। রূপ, রসসজ্জারপূর্ণ বরণ-ডালায় বরণ করল সরস্বতীকে, কণ্ঠে হল তার আসন। ইনিই বাগ্নেবী, বীণাশাণি সরস্বতী, বিভার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। রূপসম্ভার সজ্জিত প্রকৃতি শিখাল প্রকাশ করতে রূপ বর্ণনায় জীবনের অভিব্যক্তি শব্দ, স্পর্শ, গন্ধে। রসবাদে মাতোয়ারা হয়ে চাইল রূপকে স্পর্শ করতে। বিভা চিনাল বস্তু অবস্তু, দর্শন শেল দিব্য-দৃষ্টিতে সত্যের জীবন্ত প্রতিমূর্তি,—সৌন্দর্য, যার জ্যোতি ঘূচায় এক নিমেষের অজ্ঞান-অন্ধকার।

কিছু কেমন করে রূপায়িত হবে জীবন্ত সত্য জীবনগতিছন্দে, অমুসন্ধিৎসু মন সুরু করল বাত্মা রহস্য উদ্ঘাটনে। সাধনায় শেল পথের সন্ধান রূপ ও শব্দে।

রূপ, রস, গন্ধ প্রেমস্পর্শনে রূপকার,—চিত্রশিল্পী আর শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ প্রেমাকর্ষণে শব্দকার,—কথাসিল্পী ততী হল সৌন্দর্য উপাসনায়, হ'ল বোধোদয় ছন্দোবদ্ধ গতি-ভঙ্গিমায়; শেল পরিচয় সৌভে। স্বরস্বতী-পূর্ণ প্রতিবিম্ব দেখে বোধ ও বোধব্য বোধীমূলে সৃষ্টির শেষ পরিণতি (Perspective) পরিস্ফুটিতরূপ ত্রিভুজ প্রতীকে করল বোধন ঘটস্থাপনে, পূজার অর্ঘ, ভাব ও ভক্তি। ভাব, পুণ্ড; ভক্তি,—চন্দন; ভাব ভাষার প্রকাশ, ভক্তিরূপে প্রকাশ। ভাব বিশ্বাস ও রূপ বিলাস। ভাব অপ্রত্যক্ষ, রূপ প্রত্যক্ষ; ভাবে রূপ দর্শন আর রূপে ভাব কথন। এ যুগ কাল্পনিক ভাববিশ্বাসের যুগ নয়, বিজ্ঞানময় বাস্তবযন্ত্রী রূপ বিলাসের যুগ; তার বিশ্বকে ফুলে ফলে সুশোভন করে রূপকার। বাস্তবে জীবন্ত সত্য রূপায়িত করবার গুরুদায়িত্ব রূপকারের উপর দ্রষ্ট।

রূপমুগ্ধ তার স্বরস্বতীকে উজাড় করে সাজায় পূজা-অর্ঘ, রসসজ্জার বরণডালা। আবাহন সঙ্গীত সুর-গুঞ্জে মুখরিত করে

আকাশ-বাতাস। সেই সুরমুহূর্তীয়া মানুষ জাগে, ঘুমায়; হাসে, কাঁদে। শিল্প, সঙ্গীত, নৃত্যকলা, কাব্য, উপনিষদ একই সুর, ভাল, মান, লয় বিভিন্ন প্রকাশ। সব কিছুই বিভিন্ন ধারায় বর্ণ-বিকাশ বা রূপবিলাস। স্থান, কাল, চেত্ন—অবস্থান্তরে মানুষে এসে কামনা, চাইল ভোগ-বিলাস। পূজার অর্ঘ—উপচারে ভোগ্যবস্তু সন্ধানে প্রলুব্ধ যুগ্ম-মন গাছিল বেগুরা সঙ্গত। সঙ্গীত হার মেনে হারাল সঙ্গতি। দ্বিধা হল সৃষ্টি। অভেদ পুরুষ-প্রকৃতি হল ভেদ। ভোগলিপ্সামস্ত অসুরে পরিণত হ'ল সুরলোক, প্রকৃতি বিরূপ ষড়বিপু প্রকোপে। বর্ণ বিবর্ণ হ'ল ভাব হ'ল স্বভাবহার্য অভাব প্রকাশে। অভাবের অর্ঘ ঘটাল অনর্থ। মানবধর্ম্যে ঘর্ম্মিষ্ঠ, সৌন্দর্য পূজারী ভাব, ভাষায়, আচার, ব্যবহারে এবং কর্মে কুরূপ ও কদর্ঘের দ্বারস্থ হয়ে জড়সর্ব্বম্ব হ'ল কদর্ঘরূপে। সেদিন হতে মানুষ বস্ত্রপুত্তলিকার মত মানবধর্ম্য কুরূপে ও কদর্ঘে ব্যবহার করে আসছে এবং আমাদের সমুখে জীর্ণ, ভবিষ্যৎ শূন্য নেউলিয়া 'বর্তমান' জয়যাত্রা সুরু করেছে দিখিজয়ে। অতীতের যুগধরা, মরিচাপড়া কাঠামো আজ রং-শূন্য মৃতপ্রায়। ময়ূষা-সমাজ আজ কুরূপ, কদর্ঘপূর্ণ জীবন বাপনে আপত্তি জানায় না, তার মূল কাংক্ষা, মনের দেহালে হিসা, ঘেব ও স্বার্থপরতারূপ ঝুল, কালি, আলকাতরা প্রলেপে রং গেছে লুপ্ত হ'য়ে, রং আর ধরে না। মৃতকর—ভাবঘোর পরিত্যাগ করে জীবন্ত সত্য জীবন গতিছন্দে রূপায়িত করবার জ্ঞাত প্রকৃতির কড়া তাগিদ।

বিধবানী বিপরীতগামী প্রগতি-প্রোক্তে গা তাসিয়ে, কতুহী যুগের মত ছুটেছে আজ দিগ্‌বিদগ্‌, জ্ঞানশূন্য হ'য়ে। জানে না নিজেরই মধ্যে সেই রূপ, রস, গন্ধে ভরপুর সত্যের জীবন্ত প্রতিমূর্তি;—সৌন্দর্যরূপ বিবাহমান। প্রকৃতিস্থ হলেই অশ্বপু সচিবানন্দ প্রতিবিম্বিত হবে স্বরস্বতী-দর্শনে। এ-হেন বিপর্য্যে যদি জাতিকে জাগাতে হয় তবে মনের ভিতর বাহির সকল মলিনতা দূর করে বর্ণ বিকাশ করতে হবে। অ্যাজকের বর্তমানে সর্বপ্রথম চাই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সমূহের কাঠামো ঘেরামত। কাঠামোতে আছে কর্তৃপক্ষ ও পরিচালকবর্গ, শিক্ষকমণ্ডলী এবং ছাত্রবৃন্দ।

তদানীন্তন বিজাতীয় প্রাণহীন মায়ালা নীতি-বিধান,—কর্তৃপক্ষ ও পরিচালকবর্গের অধীনে 'শিক্ষকমণ্ডলী' এবং 'শিক্ষকমণ্ডলীর' অধীনে ছাত্রবৃন্দ। এটা পূরাপুরি মেনে চললেই শিষ্টাচার পালন করা হ'ল, ব্যতিক্রমে বিপরীত। কথাটা সঙ্গতই বটে, কিন্তু স্বদেশ স্বজাতীয় নীতি-সাম্য ভাষাত্তর প্রীতিবন্ধন পরিবর্তে মমত্ববোধ-শূন্য কর্তৃপক্ষ বিজাতীয় নীতিবৈষম্য ছুঁম তামিল হুমকী আজ স্বাধীন রাষ্ট্রে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সমূহে জাতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ ও জাতজাগরণ অগ্রদূত মুক্তচিন্তাম্পন্ন সৌন্দর্যের পূজারী ত্যাগী 'নষ্ট' স্বরস্বতী শিক্ষক এবং সৌন্দর্যের আশার অনায়াসে পবিত্র স্বরস্বতী-কুশুম আত্মবিস্ময়ানন্দে দুটনিস্তর ছাত্রমনোবৃত্তিসম্পন্ন ছাত্র তৈরী না করে দাসমনোবৃত্তি-সম্পন্ন মেকমণ্ডলীন সুর স্বরস্বতীরূপে পরজাতীয় স্বার্থাধেবী প্রতিদ্বন্দী-করাণী তৈরী কারখানায় পরিণত করেছে।

চিত্র-শিল্পের গঠন-পরিচর্যায় ত্রিধারা সমন্বিত—হলুদ, নীল আর লাল মূল তিনটি বর্ণ, প্রেং সাম্য পরিচয়ে স্বজাতীয় নীতির অর্থবোধ।

হলুদ—সেহ অর্থাৎ কর্তৃপক্ষ ও পরিচালকবর্গ; নীল,—শিরা উপশিরা অর্থাৎ শিক্ষকমণ্ডলী। লাল,—রক্তপ্রবাহ অর্থাৎ হৃদয়বল। একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠানের ত্রিধারা-সম্বন্ধিত প্রচেষ্টার মূলে শিল্পীর গঠনমূলক ক্রটিবোধের উৎস,—সর্বজনীন ভাবধারার সার্বজনীন অর্থবোধ ও বর্ণবোধে সার্বজনীন গ্রাম উন্নয়ন করা। একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পক্ষে বাহ্যিক সত্য, একটি গোটা রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে তাহা অকাট্য সত্য।

সংবিধানে—রাষ্ট্রপরিচালকগণ,—সেহ, কর্তৃপক্ষ,—শিরা উপশিরা; সমগ্র দেশবাসী,—রক্তপ্রবাহ। এই ত্রুটি যদি দূষিত ও দুর্বল হয় তবে স্রবাহ হরকে বিজ্ঞাপনী অভয়বাণী ও নীতিবাক্য ভূমিরা দেশবাসীকে সুস্থ ও শান্ত রাখা সম্ভব নয়।

আজকের বর্তমানে যুগোপযোগী সার্বজনীন ভাবধারার জীবন-বিজ্ঞান শিক্ষায় কোন্ কথার কি অর্থ, কোন্ বর্ণের কি রূপ-বর্ণনা তার বার্থ তাৎপর্য অমূল্য ক'রে কার্যক্ষেত্রে ব্যবহার করতে হবে। চিত্র-শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত নৃত্য সবকিছুর কার্যকরী অর্থবোধ ও বর্ণবোধ একান্ত প্রয়োজন। সাহিত্য, কাব্য রচনার বার্থ অর্থ প্রযুক্ত না হলে জীবনের সহিত সম্পর্ক-রহিত হবে। চিত্রশিল্পে বর্ণব্যঞ্জনার কোন বর্ণের কি গুণাগুণ ও প্রয়োগবিধি তাহা সম্যক জানা না থাকলে ব্যবহৃতক্ষেত্রে স্বাধীন সত্তার পরিবর্তে দাসমনোভাবপূর্ণ পরিবেশে শাস্তির আসনে শ্রান্তি আসবে, শ্রান্তিতে অবসাদ এনে জড় করে ফেলবে। প্রয়োজন মনুষ্যোচিত সার্বজনীন চরিত্র গঠন। নিষ্ঠা সহকারে চিত্রশিল্প মাধ্যমে রূপ বর্ণনার স্বরূপকে আঁকতে আঁকতে স্বভাব প্রকটিত হয়ে সার্বজনীন চরিত্র গঠিত হয়।

বিশ্বশিল্পী রচিত, চিত্রিত বিচিত্রিত লগৎ সংসারে আমরা আত্মপরিজন, প্রতিবেশী সহ আবহমান বাস করে আসছি এবং নানা প্রচেষ্টার পরস্পর মিলিত হতে পারছি না। কেন না, পরস্পর পরস্পরকে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম চিনি না বা জানি না বলে।

আজকের দিনে দেশজোড়া সার্বজনীন উৎসবের ছড়াছড়ি কিন্তু সার্বজনীনতার অর্থ কদর্থে ব্যবহৃত হয়ে গর্ববর্ধকজনীনতার পর্যাবসিত হয়েছে। ভবু আমরা গরীবানু, দুঃস্থান! বলি কম কি সে?

কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কার্য প্রারম্ভে বিশেষ আয়তনে কিছু সংখ্যক ব্যক্তি সমবেত হয় বটে, কিন্তু অনতিবিলম্বে গরমিল দেখা দেয় ও পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে উদ্দেশ্য পণ্ড করে। উদ্দেশ্য সিদ্ধিলাভ করতে হলে সর্বপ্রকার গরমিলের কথা ভুলে কোথায় আমাদের সাধারণ মিল ও মিলনসূত্রটি কি, তাহা জানবার জন্য প্রার্থী হ'তে হবে এবং স্বরূপ সত্তার সন্ধান করতে চাই চলার পথে বাধা-বিপত্তি দমনকারী চরিত্রের শিষ্টাচারপূর্ণ মজবুত কাঠামো। আমরা সকলেই শিল্পী, সৌন্দর্যের উপাসক, একথা স্বরণ রাখতে হবে। আমরা যে বা কাজ করি তাহার ভিতর যে অঙ্গন ও বর্ণন বিধি আছে তাহা খুঁজে বাহির করতে হবে।

মান্বিজ ক্রটিবোধে কল্পের বিবরণব্যবচ্ছেদ ও বিশ্লেষণ ক'রে দেখতে হবে প্রাণরঞ্জক কোথায়। বাহ্যতে আমাদের বাস্তব জীবনে কাজে, চিন্তায়, কল্পনায়, আচার-ব্যবহারে, আকার ও প্রকারে সত্তার জীবন্ত প্রতিচ্ছবি, সৌন্দর্য বিকাশ হয়, তারই নক্সা দেখে পড়ে সচেতন হ'য়ে পথ অতিক্রম করতে হবে।

জড়—চিত্রা, কার্য, মনুষ্য অতিক্রম করতে না পারলে বস্তুর লাভ করা সম্ভব নয়। চারু চিত্রশিল্পে বর্ণবিধান জড় অতিক্রমণের পথে পূর্ণ সহায়তা করে ও সকল বৈষম্য দূরীকরণে সাম্য প্রতিষ্ঠা করে। চিত্রচরিত্রে যে সমতা বা একত্ব তাহা যুক্তিপূর্ণ বর্ণবিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত। সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টিরহস্ত একই বর্ণবিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত বলেই প্রকৃতিপুঞ্জ বিভিন্ন রূপ একৈক্যতানে শান্ত সৌম্য প্রশান্তমুষ্টিতে বিরাজমান। সৌন্দর্য উপাসনার ইমানব-চেতনামূলে বর্ণবোধ উদয় হলে বিজ্ঞান লাভ হবে। বিজ্ঞানময় জীবনে সৃষ্টির বিচিত্র রহস্য বর্ণব্যঞ্জনার এক্যতান, সাম্যাদর্শনে একত্রীভূত হ'য়ে সকল সমস্তা লয় প্রাপ্ত হবে।

"What is really essential to the modern conception of a state which is also a nation, is merely that the persons composing it should have, generally speaking, a consciousness of belonging to one another, of being members of one body, over and above what they derive from the fact of being under one government, so that if their government were destroyed by war or revolution, they would still tend to hold firmly together. When they have this consciousness, we regard them as forming a 'nation', whatever else they lack."

—Sidgwick

‘সিংহ বশাই, সিংহ বশাই
মাস বদি চাও।
রাজহুস খেতে দেব
হিংসা ভুলে বাও।’

আমার জীবনে সিংহ শব্দের সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়, একেবারে ছোট কালে হাসিখুশী ছড়াছড়ির পাতায় অল্পবয়সী (২) শিশুর সময়। তখন স্তব্ধ করে মুগ্ধ করেছি, সিংহ বা হিংসা কোনটিকেই ভাল করে বুঝি নাই। গ্রামের পাড়ার রাম বাবুর বাড়ীতে দুর্গা-পূজার, আর দীক্ষ দাসের বাড়ীতে জগদ্ধাত্রীপূজার সময় সিংহের মাটির মূর্তি দেখেই চিনতে পেরেছিলাম যে ওগুলি সবই সিংহ। সহরে সার্কাস পাটি এলো, বাবার জামার কোণ শক্ত করে ধরে বসে গ্যালারীর উপর থেকে আফ্রিক-খাওয়ানো নিস্তেজ সিংহের খেলা দেখে তৃপ্ত হতে পারিনি, যেমন তৃপ্ত হ’তে পারিনি কুনকনগরের কুমোরদের তৈরী আলমারী সাজানো সিংহ দেখে। আসীপুরের চিড়িয়াখানায় সিংহ দেখেছি, সে-ও ঐ সার্কাসের আর আলমারী সাজানো সিংহেরই রূপান্তর। একটি সামান্য নড়াচড়া করে, অপরাধি পাখরের মত নিশ্চল—যেমন দেখেছি রাজবাটার বৈঠকখানায় ‘ষ্টাককরা’ সিংহ বা পূবীর মন্দিরের প্রবেশদ্বারে পাখরের তৈরী সিংহ। নড়াচড়া না করলে, না ডাকলে, সেটা সিংহ হ’ল কেমন করে! তাই বলে কলিকাতা নিউ এম্পায়ারে আমার ইলেক্রাল প্রদর্শনীতে (Lady and the Lion খেলাতে) যে সিংহ দেখানো হয়েছিল সেটাও আসল সিংহ নয়, বডই ডাকুক আর নড়াচড়া করুক না কেন। হিংস না হলে মন তাকে সিংহ বলে মানতে রাজী নয়। রাজভোগ খাবার লোভে হিংসা ভুলে গেলে সে সিংহের সিংহু থাকে না। আবার শুধু দৈবের উপর নির্ভর করে থাকেও কাপুস্বভাবের লক্ষণ। উত্তোগী পুরুষসিংহই লক্ষ্যকে লাভ করতে পারে। বীর্যবান, পৌরুষসম্পন্ন লোকেরাই সিংহ উপাধি পায়। বীরসিংহের ঈশ্বরচন্দ্রকে লোকে পুরুষসিংহ মনে করতো, ইদানীং কালে সর্দার প্যাটেল সিংহ বলে পরিচিত হয়েছিলেন।

সিংহ কথাটাই শক্তিমত্তার পরিচায়ক। অনেক দিন আগে মাস্কের জঙ্গলের প্রান্তে এক ছোট দ্বীপ দখল করতে গিয়ে ইংরেজ-সৈন্যরা বেশ প্রথম প্রতিপক্ষের সম্মুখীন হয়েছিল—তাই দ্বীপ দখল করে নাম দিয়েছিল City of the Lions সিংহপুর, আর বা’ সিন্ধাপুর নামে পরিচিত। তারপর থেকেই ঐ সিংহপুর (সিন্ধাপুর) ব্রিটিশসিংহেরও প্রবল প্রতিরক্ষা-বাঁটিতে পরিণত হয়েছে।

ইংরেজরা ক্ষুদ্র দ্বীপের অধিবাসী হয়েও, শৌর্য-বীর্যে পৃথিবীতে নতুন রেকর্ড স্থাপন করেন, তাঁদের রাজত্বের সূর্য্য অস্ত যায় নি। কাজেই তাঁদের প্রতীক চিহ্ন ‘সিংহ’ বখাবোগ্যই বলা চলে।

আমরা আফ্রিকাতে এসে সত্যিকারের সিংহের চাক্ষুষ পরিচয় পেয়েছি। আফ্রিকা বনজঙ্গলের দেশ, এ দেশের রাজা শুধু ব্রিটিশসিংহ নয়—লাত্যাকারের জঙ্গলের রাজা শিল্পলজটাওয়ারী পত্তরাজ সিংহ। আফ্রিকার জঙ্গল আর আফ্রিকার সিংহ তাই আজ জগৎপ্রসিদ্ধ। অনেক সময়ে মনে হয়—এই পত্তর বনভূমিতে কত বকম জন্তু-জানোয়ার আছে। হাতী, গণ্ডার, জলহস্তী, বাঘ, আরও কত শত শত বাঘের আরও নতুন সিংহের চাইতেও অনেক বড়, বাঘের গায়ের শক্তি সিংহের চাইতেও বেশী, কাজেই আদিম নীতি

আফ্রিকার সিংহ

যাহুসম্রাট পি, সি, সরকার

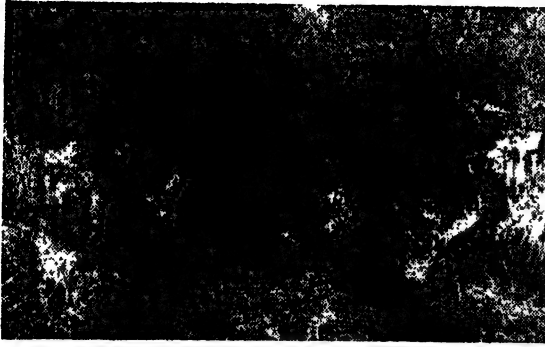
‘জোর বার হুলুক তার’ অমুখারী এই রাজ্যের অধিকর্তা সিংহ অপেক্ষা হাতী, গণ্ডারেরই হওয়া উচিত ছিল। ‘জোর বার হুলুক তার’ নীতি আদিমকালের হলেও, বর্তমানের সভ্য সুসজ্জিত বিংশ শতাব্দীতেও তার পরিবর্তন দেখছি কোথায়? নইলে পূর্ব-পশ্চিম সর্বত্র মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র তৈরীর জন্ত এত ঘটা কেন? নরঘাতী বোমা ফাটানোর আশঙ্ক্যবাতী প্রতিযোগিতা হচ্ছে কেন চারদিকে? যদি গায়ের জোরই পৃথিবীতে বড় কথা হ’ত তবে আজ জঙ্গলের রাজা হ’ত ঐ হাতী অথবা গণ্ডার। যদি বুদ্ধি বা কৌশলই শ্রেষ্ঠত্বের মান নির্দেশ করতো তবে জঙ্গলের রাজা হত বানর, শূগল বা কাক। যদি ত্বরতাই এর মাপকাঠি হত তবে জঙ্গলের রাজা হ’ত আজ বিবধর গোবুয়া সাপ বা অজগর।

হিংস্রতাই যদি প্রাধান্যের মাপকাঠি হত তবে বাঘ বা বজ্রমতিবই ঐ স্থান অধিকার করতো। ব্রাহ্মণস্বলোভী বিধামিজ শত চেষ্টা করেও বশিষ্ঠের নিকট স্বীকৃতি পান নাই,— তাঁর শৌর্য-বীর্য দেখিয়েও কোন ফল হয় নাই—কিন্তু সর্বশেষে ক্রমাগত প্রমাণিত করে তিনি ‘ব্রাহ্মণ’ নামে স্বীকৃতি পান। ‘দাঁতের বদলে দাঁত নেব’ এটাই বড় কথা নয়। ক্রমাগত চাই। শক্তিমত্তা যখন অশেষ ক্রমতাপালী হয়েও ক্রমাগতের অধিকারী হয়, তখন বিচার করে, দুর্বলের বক্ষা ও অত্যাচারের প্রতিরোধ করে, তখনই সে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা পায়। ভারতের নীতিশাস্ত্রেও সেইরূপ উল্লেখ আছে। দুই পক্ষ অসি-যুদ্ধ করা কালে হঠাৎ এক পক্ষের অস্ত্র ভেঙ্গে গেলে তাকে অহরূপ নতন অস্ত্র না দেওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ স্থগিত রাখাই হ’ল ভারতীয় নীতির লক্ষণ। মিত্রিত লোককে ছুরিকাঘাত করা, বিববাপ দিয়া যুদ্ধ করা, আণবিক বোমা দিয়া সারা জগৎকে উজাড় করে দেওয়া, এটা আধুনিক কালের ব্যাপার। শিতাকে বন্দী করে, ভাইকে হত্যা করে সিংহাসন লাভ, শত্রুপক্ষের উৎকোচ নিয়ে আমবাগানে নিজের নবাবকে বিশ্বাসঘাতকতা করা এটা ভারতে ঘটলেও অভ্যর্থনীয় ঘটনা। আজকালের যুদ্ধে অসি অপেক্ষা মসীই বেশী চলেছে, ঠাণ্ডা লড়াইয়ে এই নীতিজ্ঞানের অভাবই চক্ষুতে পড়ে বেশী।

জঙ্গলের রাজত্ব সিংহ পত্তরাজ। তার যেমন গায়ের জোর



উজ-দুটি



সত্যিকার Lions' Club-এতে সভ্য হতে চান দিতে হবে না। প্রাণ দিলেই যথেষ্ট।

আছে—হিংস্র আছে—সঙ্গে সঙ্গে কমাগুণও আছে। ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য সিংহ জঙ্গলের পত্ত শিকার করে। সে কখনও হুর্বেল ছাগল হত্যা করে না—তার ক্ষুধাবৃত্তির জন্য হত্যা দরকার তার চাইতে বেশী হত্যা করে না। বাঘ যদি একটা হরিণ খায় সে দশটা হরিণ মারতে বিধা করে না—পাইকারী ভাবে নিরপরাধ হত্যা এই শক্তিমান ব্যাক্রকে সমাজে উচ্চপদ থেকে বঞ্চিত করেছে। “কাজের সময় কাজী কাজ ফুরালে পাজী”—বা উপকারীকে খেয়ে নিয়ে বাঘ জঙ্গলে দুর্নাম রটিয়েছে। সিংহ উপকারীকে ভোলে না। জঙ্গলের হাতীও তার প্রবল স্মৃতিশক্তির জন্য প্রসিদ্ধ—কিন্তু এই ছুইয়ের এই মনে রাখা ব্যাপারে অনেক স্বর্গ-মর্ত্য পার্থক্য আছে। সিংহ তার বন্ধুকে ভুলে না, আর হাতী তার শত্রুকে ভুলে না। জঙ্গলের ইতিহাস নিলে এর প্রমাণ পাওয়া বাবে।

একবার একদল শিকারী জঙ্গলে শিকার করতে গিয়ে একটা হাতীকে গুলী করে,—হাতীটা গুলীবিন্দ হয়ে গভীর জঙ্গলে পালিয়ে যায়। অনেক বছর পব শিকারীদল আবার যখন জঙ্গলে আসে তখন ঐ হাতীটা তার সেই পূর্বকার গুলীকরা শত্রুটিকে চিনতে পেয়ে দৌড়ে এসে তাকে গুঁড় দিয়ে ধরে পায়ে মাড়িয়ে হত্যা করে চলে যায়। হাতী কখনও ভুলে না Elephant Never Forgets কথাটা



সিংহ-মহিষীরা আহার সেরে নিচ্ছেন, বামী কাঁধায় রাজকার্যে গিয়েছেন

প্রবাদে পরিণত হয়েছে। সিংহের স্বপক্ষেও তেমনি গল্প আছে—সিংহের পায়ে কাঁটা ফুটেছিল, জঙ্গলের লোক এণ্ডেক্সিস সেটা খুলে দিয়ে যে উপকার করেছিল সিংহ তা ভুলে যায়নি। উপকারীকে ভুলে যাওয়া যাক্ষোচিত গুণ নয়। বহু বৎসর পর পিঞ্জরাবদ্ধ হিংস্র ঐ সিংহের খাঁচাতে এণ্ডেক্সিসকে হত্যার জন্য পাটিয়ে দিলে সিংহ সেই উপকারী বন্ধুকে স্বীকৃতি দিয়ে তার পশুরাজ আখ্যায় সম্যক পরিচয় দিয়েছিল। সবলের পক্ষে কমাগুণ সর্বোপ্ত প্রযোজ্য। হাতে বন্ধুক আছে—থাকে তাকে গুলী করলাম। তামাসা দেখার জন্য ঢিল ছুড়লাম কিন্তু ভেকের দল ভাতে প্রাণ দিল—এটা অস্বাভাবিক। তোমাদের প্রবল অন্তর্গত আছে—তোমরা বোমা ফাটিয়ে পৃথিবীর আকাশ বিবাক্ত করবে কেন? আমরা নির্দোষ নিরীহরা দলে দলে মরবো কেন? এই পৃথিবী সকলের সমান—আমাদের বন্ধু, আমাদের গ্যাকী সেই লিকাই দিয়েছেন।

সিংহ জঙ্গলের প্রাণী কিন্তু আমাদের মানবের সমাজ-জীবনের সঙ্গে এদেরও অনেক মিল আছে। বাড়ীতে কর্তা বাজার করে আনেন, আর গিন্নী তাকে রান্না করে খাবার তৈরী করে পরিবেশন করেন। বাড়ীর কর্তা না খেলে গিন্নীরা তা খান না। জঙ্গলের শিকার যেমন হরিণ, জেব্রা বা জিরাফ বা মহিষ তাড়া করে আলাদা করে বের করে এগিয়ে নিয়ে আসে পুরুষ-সিংহ। আড়ালে লুকিয়ে থেকে সিংহী তা দেখতে থাকে, পরে স্ত্রীবাগ বুঝে স্বহস্তে সেটিকে বধ করে। সিংহী নিজে বধ করলেও সিংহ মশাই নিজে না খাওয়া পর্যন্ত সে উহা স্পর্শ করে না। সিংহ খেয়ে গেলে তারপর সিংহীরা দল বেঁধে খেতে আরম্ভ করে। এক পুরুষ-সিংহের এক বা একাধিক স্ত্রী-সিংহ থাকতে দেখা গেছে। বড় বড় লোকদের যেমন মোসাহেব থাকে, আজ-কাল বাদ্যেরকে ‘আটলোইট’ বসলে সহজে বুঝা যায়। সিংহজলের ‘আটলোইট’ হ’ল শৃগালদল (black-backed jackals) সিংহ-সিংহী উদবপ্তি করে খেয়ে যখন দূরে বিশ্রাম নিতে যায়—তখন ঐ উচ্ছিন্নভোজী মোসাহেব-দলের আবির্ভাব হয়। অস্তুর কর্তৃত্বিত খাণ্ডের উদ্বৃত্ত অংশ হয়ে তখন ওই শৃগালদলের মধ্যে মারামারি বাধে। ধাক্কাধুন্দলও এসে হাজির হয় ঐ খাবার টেবিল পরিষ্কার করতে—তারা হাড়-গোড় পরিষ্কার করে দিয়ে দল বেঁধে চলে যায়। সত্যিই শকুনিরা ওদের বাকী অংশ, গলিত দূষিত, দুর্গন্ধময় সব অংশ খেয়ে পরিষ্কার করে দিয়ে সমাজের ধাক্কাড়ের কাজ করে যায়।

আফ্রিকাতে প্রায়ই কালমাথা শকুনি (griffon vulture) এবং এক জাতীয় সারস (Marabou stork)কে এই ধাক্কাড়ের কাজ সারতে দেখা যায়। পুরুষ-সিংহ সাধারণতঃ লম্বায় (নাকের থেকে লেজের ডগা পর্যন্ত) নয় ফুট হয় এবং এদের দেহের ওজন হয় ৩০০ থেকে ৫০০ পাউণ্ড। স্ত্রী সিংহ লম্বায় ফুটানেক ছোট হয়। পুরুষ-সিংহের গলায় বড় বড় কেশর থাকে, বার জন্ম তার অন্য নাম “কেশরী”। স্ত্রীসিংহ দেখতে বাঘের মত। তবে অল্পবয়সে পুরুষ-সিংহেরও কেশর থাকে না—তৃতীয় বৎসরে কেশর জন্মাতো আরম্ভ হয় আর ৫৬ বছর বয়সে সেগুলি বড় হতে থাকে। সিংহী দেখতে বাঘের মত হলেও বাঘের পায়ে জেব্রার মত ডোরাকাটা থাকে অথবা ফুল-ফুল ছাপ থাকে কিন্তু সিংহীরা গা সমস্তটা পুস্রবর্ণ

রাং। সিংহ-শিওর গারে কিন্তু বাঘের গারের মত ভোরা-
রা ছাপ থাকে। প্রাণিতত্ত্ববিদগণ বলেন যে, ঐ দাগ বড় হলে
নয় বার। কিন্তু এর থেকে প্রমাণিত হয় যে এরা আসলে
পুরুষে একই প্রকৃতি ছিল। সিংহরা দুই বৎসরে একবার
সন্তান প্রসব করে এবং দুটি থেকে চারটি করে বাচ্চা একসঙ্গে
পায়। অজ্ঞাত জন্তু-জানোয়ারের তুলনায় এদের জন্মসংখ্যা খুবই
—এরা ভগবানের নিয়মেই 'পরিবার পরিব্রজনা' করে নিয়েছে,
ইন কবতে হয়নি।

প্রসংগতঃ এ প্রশ্ন হওয়া স্বাভাবিক যে সিংহ কি মানুষ
বান? জিম কোরবেট তাঁর বিখ্যাত পুস্তকে (The Man-
ners of Kumaon) লিখেছেন—“হিসাব করে দেখা গেছে যে
টি বাঘের নয়টি বাঘ নরখাদক হয়েছে আষাঢ় পেয়ে, আর
মটি হয়েছে বৃদ্ধ হয়ে।” সিংহের বেলাতেও তাই হয়ত শিকারীরা
শী, সজ্জার কাঁটা, হরিণের বা বনমহিষের শিং-এ আঘাত পেয়ে
হ তার স্বভাবসিদ্ধ ক্রোধতৎপরতা হারিয়ে ফেলেছে নতুবা বৃদ্ধ
র গেছে, নিজের গৌরবময় বলবান ঐতিহ্য হারিয়ে ফেলেছে,
ত ক্ষয়ে গেছে—তখন সে মানুষ খেতে আরম্ভ করে। কেউ
উ মনে করেন, হঠাৎ মানুষের রক্তের স্বাদ পেলে বাঘ, চিতাবাঘ
সিংহ নরখাদক হয়ে উঠে। কোরবেট সাহেব লিখেছেন যে,
খাদক বাঘ বা সিংহরা পুরুষাভুজমিক ভাবে নরখাদক হয় না।
বা-মা মানুষ খেয়েছে, ছোটবেলায় তার সন্তানরাও সঙ্গে সঙ্গে
মাংস ভোজন করেছে—কিন্তু উত্তরকালে ঐ সব সিংহকে কখনও
মাংস খেতে দেখা যায়নি—এমন প্রমাণ অসংখ্য আছে। মোট কথা
ই দুর্বলকে হত্যা করে নিজের মর্যাদা নষ্ট করতে চায় না। সে
খুশি বৃদ্ধ করে জেত্রা জিরাফ বনমহিষ হত্যা করে, তাকে ভক্ষ



জঙ্গলের বৈঠকখানায় ছয়টা সিংহ আরাধন করছে

করে হত্যা করে। বাঘের মত পেছন থেকে পালিয়ে অতর্কিতে
আক্রমণ করে হত্যা করে না। সেদিন দুই জন লোক সাইকেলে
আসার পথে হঠাৎ সিংহের সঙ্গে খাক্সা খায়। ভয়ে দু'জনেই
সাইকেল থেকে পড়ে গিয়ে সিংহের মুখের সামনে স্বত্বার জন্ত প্রস্তুত
হয়ে বিমর্ষমুখে নীচু হয়ে বসে থাকে। সিংহ ঐ নিরীহ বিপদগ্রস্ত
মানবদেহীর প্রতি অমূল্য প্রদর্শন করলো। তাদেরকে কিছু
না বলেই চলে গেল—দুর্বল, নিরস্ত, আশ্রয়প্রার্থী, অসহায়কে
অভয় দিয়ে রক্ষা করে সিংহ তার রাজ্যোচিত গুণ প্রকাশ
করলো। আফ্রিকাতে সব সিংহই কি প্রজাদের প্রতি রাজকর্ভবা,
রাজ্যোচিত জায়নিষ্ঠ ভাবে পালন করছে? নইলে সেখানে এত
চাক্ষু্য কেন?

বৈশালী

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী

তিন হাজার বছরেরও আগের কথা। পূর্ববঙ্গে ইক্ষুকু নামে
এক রাজা বাস করতেন। তাঁর রাণী ছিলেন অলম্বুবা।
সেই গর্ভে বিশাল নামে এক পরম ধার্মিক পুত্র জন্মে। এই রাজা
বিশালই ছিলেন বহুবিশ্রুত বৈশালীর প্রতিষ্ঠাতা। পুরাণে আবার
এই নগরী বিশাল ও বিশালা নামেও অভিহিত হয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবত
খুঁসারে মহারাজা বিশাল কিন্তু ইক্ষুকুর পুত্র ছিলেন না। ইক্ষুকুর
সেই সিন্ধু ২১তম বংশজ রাজা তৃণবিন্দুর পুত্র ছিলেন তিনি।
গগনভেদে বিশালরাজের মাতার নাম 'অলম্বুবা' রূপে বর্ণিত হয়েছে।
তিনি ছিলেন বিষ্ণুপুরাণ মতে পরম সুলক্ষী অম্বরী। স্তম্ভপথ ব্রাহ্মণ
বলদ্বনে জানা যায়, সরস্বতী-তটবাসী বিদেহ মিথি নামে এক রাজা
ছিলেন। গৌতমবহুগণ তাঁর পুরোহিত ছিলেন। এঁরা ছিলেন
সব বৈদ্বানবের ভক্ত। কোনো এক দিন এঁরা বৈদ্বানবের অঙ্গসংর
করতে করতে সদানীরা নদীর তীর পর্যন্ত এসে পৌঁছলেন। বৈদ্বানব
স্বস্তান করার রাজা মিথিও সদানীবার তীরে বাস করতে লাগলেন।
তাঁরা যেখানে বসবাস করতে লাগলেন, সে ছিল সদানীবার পূর্বপার্শ্ব।
সেই থেকে ঐ দেশের নাম হল বিদেহ অথবা মিথিলা। কালক্রমে

এই স্থান পূর্ব ও পশ্চিম-মিথিলার বিভক্ত হয়ে যায়। ব্রাহ্মণযুগের
এই মিথিলার পশ্চিম অংশই পরে বৈশালী নামে খ্যাত হয়েছিল;
আর বৈদিক যুগের সদানীরা নদীই বর্তমানে গণ্ডকী নাম ধারণ
করেছে। রাজা বিশালের প্রতিষ্ঠিত বলে এই নগরকে 'রাজা
বিশাল-কা-গড়'ও বলা হত।

বরাহ, মার্কণ্ডেয়, নারদীয় পুরাণে এবং শ্রীমদ্ভাগবত ও রামায়ণে
বৈশালীর প্রাচীন ইতিবৃত্তের কথা লিপিবদ্ধ আছে। রামায়ণের
আদিকাণ্ডে দেখা যায়, দেব ও দানবেরা ক্ষীরসমুদ্র মস্থন করার জন্ত
এখানে বসে মন্ত্রণা করেছিলেন। তা' ছাড়া দানবমাত্র তেজস্বিনী
দিতি আপন পুত্রদের নিঃশত্রু করার জন্ত দেবরাজ ইন্দ্রের
বধোপযোগী পুত্র কাশ্যনার ঘোর তপস্যা করেছিলেন। আর তাঁর
তপস্কার স্থান ছিল শ্যাম-নিকুলেশ্বর পরম-রমণীয় এই বৈশালী।
অবশ্য ইন্দ্রের চাতুরীতে দিতির তপস্যা ব্যর্থ হয়ে যায়।

রামায়ণ অঙ্গুসারে রাজা বিশাল হতে কশ্যাপজন্মক নন্দন এবং
শ্রীমদ্ভাগবত অঙ্গুসারে সপ্তম নৃপতি ছিলেন সুরমতি। ইনি ছিলেন
শ্রীরাঘচন্দ্রের সমসাময়িক। মহারাজ নন্দনখের অঙ্গুমতি নিয়ে

মহামুনি বিশ্বামিত্র যখন বজ্রনাশকারী রাক্ষসদের নিধন করে ত্রিরাশ-লক্ষ্যপক্ষে নিয়ে মিথিলার (জনকপুরে) বাইতেছিলেন, সেই সময় ঋষিবর তাঁদেরকে অনেক নদীর নিখুঁত পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনিয়েছিলেন, গঙ্গা, যমুনা, শোন ও কৌশিকী নদীর কথা। ঋষিরা বর্তমান হাকীপুরের নিকট গঙ্গার নৌকা চড়ে পার হয়ে বর্তমান রামচৌড়া নামক স্থানে অবতরণ করেন। আর এর ঠিক পাশেই গণ্ডকী নদী গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হচ্ছে। এই গণ্ডকী নদীর তটোপরে তাঁরা দেখতে পেয়েছিলেন বৈশালীর অভ্যন্তরীণ সুরমা সৌধরাজি। বৈশালীর দৃশ্য দেখে তিনি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু যে নদীতটোপরে এই সুপ্রাচীন বৈশালী বিরাজিত ছিল তাঁর কথা রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করেননি আর ঋষিও অনেক নদীর পরিচয় দিয়েছিলেন কিন্তু গণ্ডকী নদীর নাম পর্যন্ত করেননি। ইহা হইতে অনেকে অনুমান করেন, হয়তো তখন গণ্ডকী নামের উৎপত্তি হয়নি। শতপথ ব্রাহ্মণ অবলম্বনে অবগত হইয়া জানা যায় যে, সদানীরা নদী কোশল ও বিদেহকে আলাদা করছে আবার রামায়ণ প্রভৃতি কাব্যে সরযুকে কোশলরাজ্যের পূর্বসীমা বলা হয়েছে। এর দ্বারা প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ডাঃ বেবর অনুমান করেন যে বর্তমানের সরযু অথবা গণ্ডকীই প্রাচীন কালের সদানীরা। এই নদীর বিস্তার ছিল ৭০৮০ মাইল।

বিশালনগরের পূর্বে ছিল পূর্ব-বিদেহ আর পশ্চিমে ছিল পশ্চিম-বিদেহ ও কোশলরাজ্য—এই উভয় রাজ্যই ছিল বৈদিক-সভ্যতার কেন্দ্রস্থল। আর বৈশালী এদের মাঝখানে অবস্থিত থাকার অভুলনীর ঐক্যবিসম্পন্ন হয়ে উঠেছিল। আর তাছাড়া তিনটি রাজ্যই একই ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজারা রাজত্ব করতেন। সেই সময় বৈশালীর রাজা ছিলেন সুরমতি। ঋষি বিশ্বামিত্রের উদ্ভূতি হতে জানা যায়, বৈশালীর সকল রাজাই দীর্ঘায়ু, মহাত্মা, বীরবান ও সুধার্মিক ছিলেন।

প্রাচীন যুগের বৈশালীকে কেন্দ্র করে কতকগুলি পুরাণ-কাহিনী আজও অল্পাংশ হয়ে আছে। এই স্থান কাম্যাক্ষম নামে খ্যাত ছিল। আজ হতে চার হাজার বছর পূর্বে শিব-দুর্গার এই মিলনক্ষেত্রে মদন ভস্মীভূত হয়েছিলেন। এই স্থানই ছিল দ্বিতীয় পুত্র মরুত্তের জন্মস্থান। এই মরুৎ ও অশ্বাভ্যাসের দ্বারা মন্দর পর্বতকে দগু করে পূর্বসাগর মন্থন করা হয়েছিল। গঙ্গা ও গণ্ডকী সময়ে অবস্থিত বৈশালীকেই পৌরাণিক “গঙ্গকল্পপের” যুদ্ধক্ষেত্র বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

আজ হতে খৃঃ-পূঃ ২৩০০ বছর পূর্বে মহেন-জো-দরোর সভ্যতায় শেষভাগে অথবা প্রাক-আর্য সভ্যতার সময় উত্তর-ভারতের এক বিরাট অংশ কোনো রাজাদের দ্বারা শাসিত হত না। বস্তুতঃ নির্বাচিত মহুরাই তখন দেশ শাসন করতেন। খৃঃ-পূঃ ২৬০০—২১০০ শতাব্দীর মধ্যে ৬ জন মহুর বিবরণ পাওয়া যায়। আবার সকল মহুরই একই বংশোদ্ভূত ছিলেন। পুরাণ অনুসারে বলা চলে, মহুর তাঁদের পরিবারের সময় ও ঘটনার কথা বৈশালীকেই কেন্দ্র

করে প্রথম উল্লেখ করা হয়েছে। আদিপিতা মহুর পরে রাজা নাভাগের বংশধরেরা রাজত্ব করতে থাকেন সমগ্র উত্তর-ভারতে। আর এঁদের বিংশতিতম বংশজ রাজা ভূপবিন্দের পুত্র অলম্বা নামক অস্ত্রার গর্ভজাত রাজা বিশালই ছিলেন এই নগরীর প্রতিষ্ঠাতা। বা’ হোক, এই স্থানে মহুরের যে সব কাহিনী ছাড়িয়ে আছে তাদের আলোচনা করা হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

আদিমহুর প্রপৌত্র ছিলেন বিখ্যাত রাজা উত্তানপাদ। এঁরই দ্বিতীয় পত্নীর গর্ভে উত্তম নামে এক পুত্র জন্মে। তাঁর সাথে বাভবরা পরিবারের বেহলার বিবাহ হয়। এই বেহলা ছিলেন অসামান্য সুন্দরী। মহারাজ উত্তম তাঁকে খুবই ভালবাসতেন কিন্তু বেহলার স্বামীর প্রতি কোনো অমুরাগ ছিল না। কলে মহারাজ তাঁকে নির্বাসিত করেন। এই সময় এক কাণ্ড ঘটল। বিশালা নগরে সুরধন নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করতেন, তাঁর স্ত্রীকে বলাকা নামে এক রাক্ষস চুরি করে নিয়ে যায়। তখন তাঁর স্ত্রীকে আশার ব্রাহ্মণ মহারাজ উত্তমের দ্বারস্থ হলেন। বলাকার কবল হতে মহারাজ বাহুবলে ব্রাহ্মণীকে উদ্ধার করলেন। বলাকা তাঁর বীরকে মুগ্ধ হয়ে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। আবার ঠিক এই সময়ই নির্বাসিতা রাণী বেহলা ও পাতালের নাগরাজ কপতকের দ্বারা হত্যা হলেন। রাণীর ভাগ্য ছিল সুপ্রসন্ন, তাই নাগরাজের কণ্ঠা নন্দা তার মাঘের মঙ্গলার্থে রাণীকে লুকিয়ে রেখে নিজে বোবার ভাণ করে রইল। এই সংবাদ পেয়ে উত্তম অবিলম্বে বন্ধু বলাকার সাহায্যে পাতাল হতে বেহলাকে উদ্ধার করলেন। এর পর হ’তে উত্তমের মনের সুখে বাস করতে লাগলেন। কিছুকাল পরে এঁদের এক পরমসুন্দর পুত্র জন্মে—তিনি পৌরাণিক ইতিহাসে দ্বিতীয় মহুর নামে খ্যাত।

মহারাজ উত্তানপাদের দ্বারা এই বংশ আরও একজন রাজা ছিলেন, তাঁর রাণীর নাম ছিল গিরিভদ্রা। আনন্দ নামে তাঁদের এক পুত্র জন্মে। এই আনন্দই বর্ষ মহুরূপে পরিচিত। উগ্ররাজ-কণ্ঠা বিনভার গর্ভে উগ্র নামে তাঁর এক পুত্র জন্মে। অঙ্গাদি প্রখ্যাত রাজারা ছিল তাঁর পরবর্তী বংশধর। এইরূপে প্রথম মহুর কয়েক পুরুষের মধ্যে ঋষভ এবং তাঁর পুত্র ভরত রাজত্ব করেন। ঋষভ হিমবর্ধের রাজা ছিলেন। তিনি অতি বৃদ্ধ বয়সে ভরতকে রাজ্য দিয়ে বানপ্রস্থ গ্রহণ করেন। এই সময় তাঁর প্রধান আশ্রম ছিল বৈশালীর উপরে গণ্ডকী নদীর তীরে। সেই স্থানটির নাম ছিল শালগ্রাম। মহারাজ ভরতও বধাসময়ে পুত্র সুরমতিকে রাজ্য দিয়ে এই আশ্রমে সন্ন্যাস-জীবন অতিবাহিত করেন। পুরাণযুগের এই সব স্মৃতি কথা আজও তাকে জন্মর করে রেখেছে।*

* বান্দীকি রামায়ণ, শতপথ ব্রাহ্মণ, মার্কণ্ডেয়, ঐমবভাগবতাদি পুরাণ, ডাঃ এস, সি, সরকার এবং রাহুল সাংকৃত্যায়নাদির প্রবন্ধ ও পুস্তক।

“কি সামাজিক, কি আধ্যাত্মিক, কি রাজনীতিক—সকল ক্ষেত্রেই বধাৎ ফল স্থাপনের একটিমাত্র পুত্র বিজয়মান—সে সূত্র হইতে এটুটু জানা যায় যে ‘আমি ও আমার ভাই এক।’ —স্বামী বিবেকানন্দ।

প্রাণাজ্ঞান

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

[সি, এফ, অ্যান্ড্রুজ লিখিত 'What I Owe to Christ' গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ]

যীশুখৃষ্ট ও নবযুগ

আমার সমগ্র জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের দিন এল, যেদিন শেষ পর্যন্ত কেম্ব্রিজ মিশন ভ্রাতৃসংঘকে পরিত্যাগ করব বলে আমি মন স্থির করলাম। স্থির করলাম, কোনো বিশেষের অধীনে নির্দিষ্ট ধর্মযাজকবৃত্তি আর আমি করব না, জীবন-তরণীকে অন্ত্রাত সমুদ্রে ভাসিয়ে দেব বৃহত্তর ও মহত্তর পৃথিবীর সন্ধানে। বৈবাহিক হঠকারিতার সঙ্গে এই পন্থা আমি বেছে নিইনি। মানসিক অস্থিরতা ও সংশয়ের মধ্যে বহু বৎসর কেটেছে। সমুদ্রে অগসর হয়েও শারীরিক কারণে আমি নিরাপদ আশ্রয়ের মধ্যে পশ্চাদপদ হয়েছি। কিন্তু হ্রদতে আমার জীবন-প্রভুর সেই প্রভাব যুহুতের ডাক বাবের বাবের আমার কানে বেজেছে,—প্রাণের মধ্যে ঝংকৃত হয়েছে সেই আহ্বান, চলো চলো, অস্থসরণ করো অমোকে। শেষ পর্যন্ত সাড়া দিয়েছি সেই আহ্বানে।

আমার জীবনের এই পরিবর্তন সামান্য একটা ঘটনা মাত্র। সেই ঘটনার বিবরণ অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু তার পূর্বে বতোদিন আমার অন্তরের অন্ধকারে পথ খুঁজে খুঁজে আমি কাটিয়েছি, সিদ্ধান্ত এবং সংশয়ের দোলায় দুলেছি, ভতোদিন আমার পথম প্রভু যীশুখৃষ্টের যে মূর্তি আমার অন্তঃসংগে অহরহ প্রতিকলিত হয়েছে, সেই মূর্তির পরিচয় আমি দিতে চাই। খৃষ্টের এই প্রতিকৃতির কয়েকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য আলবার্ট হুইটজারের গ্রন্থে স্পষ্টরূপে আমি দেখেছিলাম, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ চিত্রটি আমার নিজেই দেখা। সেই মূর্তি আমার অন্তর্দৃষ্টির সামনে উজ্জাসিত হয়েছিল, সেই মূর্তির বিবরণ থেকেই বোঝা বাবে কোন পথে আমি চলেছিলাম, কেন নিরাপদ আশ্রয়কে পরিত্যাগ করে অপরিচয়ের পথে পা বাড়িয়েছিলাম, কে আমাকে জীবনের সবচেয়ে বৈপ্লবিক সংকল্প গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছিল।

বর্তমান শতাব্দীর প্রথম কয়েক বৎসর বধন আমি দিল্লীতে ছিলাম, তখন দেখিছি এই ভারতবর্ষের চেহারা ঠিক যেন উনিশ শতাব্দী পূর্বকার রোমক সাম্রাজ্যের মতো। বাহিরে এক বিরাট নিশ্চিন্ত সাম্রাজ্যবাদী শাস্তি, অস্থিরতার চিহ্নমাত্র চোখে পড়ে না সেই কঠোর শাস্তির রাজত্বে। কিন্তু এই শাস্তি নিতান্ত বাহ্য। মাটির নিচে আগ্নেয়গিরির গহবরে যেমন লাভা-প্রবাহ কোটে, তেমনি এই শাস্তির গোপন কন্দরে এক মহা অশান্ত অন্তর্জ্বালা ভীষণ প্রদাহে

উগবগ করে ফুটেছে, কোথাও কোথাও মাটি কেটে ফুঁসে ফুঁসে উঠছে ছরস্রাবাবেগে। লোকমুখে এর নাম জাতীয় আন্দোলন,—কিন্তু আমার মনে হয়েছে এই আন্দোলনের শক্তি ও বিস্তার নিতান্ত আন্দোলনের পরিচয়ে সীমাবদ্ধ নয়। আমি স্থির বুঝেছিলাম, এক বিরাট মহাদেশব্যাপী মানবসমাজ এক অন্তর্গত সাধনার আবেগে মগ্নিত হচ্ছে, সে সাধনা নতুন রূপে নতুন ধারার আত্মবিকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার সাধনা।

মানবতার এই আত্মসন্ধানের নিগূঢ় আবেগ বাইবেলের আত্ম গ্রন্থে স্পষ্ট বলিষ্ঠতার সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে। খৃষ্টপূর্বের নিরাবরব অন্ধকার বিশৃঙ্খলার রাজ্যে পরমাত্মার অনন্ত স্বজ্ঞানী শক্তির কী অনির্বচনীয় প্রকাশ। 'সেই চরিত্রবিহীন অন্ধকার-সমুদ্রে পরমেশ্বরের স্পর্শ জাগল, ঈশ্বর বললেন, আলোকের জন্ম হোক। আলোকের জন্ম হোলো।'

রোম সাম্রাজ্যের বাহ্যিক শাস্তি ও শৃঙ্খলার কোনো অভাব ছিল না। কিন্তু গ্যালিলিও সমগ্র মধ্য প্রাচ্য তখন বিক্ষোভের নিগূঢ় আবেগে স্পন্দিত হচ্ছিল। সেই সময়ে খৃষ্টের আবির্ভাব হোলো। মানব-সমাজের এই অন্তর্বিপ্লব গ্যালিলিতে ধর্মের পথে অগ্রগতি খুঁজে পেল। স্রাজ্জারেলের ভরুণ নৃত্যধর যীশু তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি মেলে মানবমনের এই বিশাল উদ্বেলন প্রত্যক্ষ করলেন, লক্ষ্য করলেন সমাজের মধ্যে নব নব শক্তির সত্তা জাগরণ। অকুতোভয়ে তিনি কাঁপিয়ে পড়লেন সেই বিক্ষুব্ধ আন্দোলনের মধ্যে—সেই আন্দোলনকে পরিচালনা করলেন ঈশ্বররাজ্য প্রতিষ্ঠার পথে।

যীশু একলা ছিলেন না। তিনি ছিলেন জননেতা, নিঃসঙ্গ পথিক নন। ঈশ্বররাজ্যের ঘোষণা তখনই ধ্বনিত হয়েছিল আত্মমানবের অন্তর-অন্ধকারে। ঈশ্বর আসবেন, যুগে যুগে মানবাত্মার বিপদে তিনি যেমন এসেছেন, উদ্ধার করেছেন সৃষ্টিকে, তেমনি আবার তিনি আসবেন। গ্যালিলির দিকে দিগন্তের পথে প্রান্তরে সর্বমাত্ত্বের মন এই আশার উদ্ভূত হয়েছিল। হাটের পথে বা সাক্ষ্য সভার প্রায়েমের চাবীরাও এই আশার কথা আলোচনা করত।

এই বাস্তব পরিস্থিতির মধ্যে কাঁপিয়ে পড়েছিলেন যীশু। এক বিপুল যুগনাট্যের অবতারণা করে তিনি ঘোষণা করেছিলেন উৎসুক

প্রাণের সেই মহা স্রাব—তিনি আগছেন, মুক্তির আর বিলম্ব নেই। ডাক দিয়েছিলেন তিনি অবজ্ঞাত নিপীড়িত সাধারণ মানুষকে। প্রাণের ক্রবক আর ব্রহ্মের বীবরণের মধ্য থেকে তিনি বেছে নিয়েছিলেন তাঁর তরুণ শিষ্যগোষ্ঠী। বীণ ছিলেন সমর্থ যুবা, তাঁর শিষ্যগোষ্ঠী ছিলেন বলিষ্ঠ তরুণ, পরিজ্ঞানী ও কষ্টসহিষ্ণু। মনুষ্যত্বের কর্তব্য করবে তারা, তারা হবে—মনুষ্যভাণ্ডার-জগতির নিঃশব্দ বীবরণ।

শুধু হোলো বীণের অভিধান। অন্ধ পেল দৃষ্টি, রোগী পেল পরিচয়। অবমানিত দরিদ্রের কানে ধ্বনিত হোলো মুক্তির মহাধ্বনি। ঈশ্বরের নবরাজ্যের স্বর্গসিংহদ্বার ঐ বৃষ্টি দেখা যায়!

ঐ বৃষ্টি নবজীবনের ইশারা। ভরুণ ভক্তগণের বাঁধনছেঁড়া উন্মাদনা। পুরাতনের অর্গসকে তারা খসায়, সংস্কারকে তারা পাশে ছুঁড়ে ফেলে জয়যাত্রার উন্মুক্ত পথ থেকে। জীবনে লেগেছে নব জোয়ার, চেতনার ও আদর্শের নব নব রূপ তারা সৃষ্টি করে চলে। ঈশ্বররাজ্যের আনন্দস্রাব অন্তর পরিপূর্ণ করে উপস্থিয়ে পড়ে,—প্রাচীরের ছিন্নভিন্ন জর্ণ বসনকে পরিত্যাগ করে উৎসবের নবীন রঙিন পোষাকে সজ্জিত হয় মানুষ। যৌবনের অমিত বলিষ্ঠতার মুক্তির এই অভিধানে সম্মিলিত আকাঙ্ক্ষার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন বীণ।

এই বিপুল আনন্দনাট্যের প্রদীপ্ত চলিষ্ণুতার মধ্যে প্রথম বেদনার ছায়া পড়ল, যখন যুগ শিশুর মতো তথাকথিত পণ্ডিত আর ফরাসীর দল কোনো আহ্বানে কর্ণপাত করল না, প্রাচীন জর্ণ ধারণাকে আঁকড়ে ধরে মুখ ফিরিয়ে রইল অন্ধকারে, নবজীবনের উদ্ভাসিত ক্রীড়াক্ষনে জনগণের সঙ্গে এসে যোগ দিল না। বারে বারে তাদের ডাকলেন সাধু জন, ডাকলেন প্রভু বীণ নিজে,—কিন্তু ঈশ্বর-রাজ্যের পরম সত্যের আহ্বান তাদের নিরুদ্ধ অন্তরে কোনো সাড়া জাগাতে পারল না। যুগ-সঞ্চিত সংস্কারের স্তূপ পাথরের মতো তাদের বৃকে বসে আছে। জাতিভেদের সংকীর্ণতার তারা আবদ্ধ, তাদের অনড় চৈতন্য ঘিরে সূচিভেদে শৌর্যগিক অন্ধকার, সেই অন্ধকারে নবাক্রমের আলোক-লম্পন জাগে না। অন্ধ প্রজার অন্ধ রাজার মতো তারা অন্ধকারে ঘুরে বেড়ায়, দুর্ভাগ্যবশত তাই বাবে যে জ্ঞানভাণ্ডারের চাবি বৃষ্টি তাদের হাতেই আছে। সে চাবি চিরকালের মতো তাদের বহুব্রহ্ম থেকে কবে খসে পড়েছে তা তারা জানেও না।

কিন্তু বীণ ও তাঁর শিষ্যরা যৌবনের অকুতোভয় অভিধানে অগ্রসর হয়ে চলেছেন। যুগ অতীতের মলিন চাঁর খসে পড়েছে তাঁদের দৃষ্ট অঙ্গ থেকে। তাঁরা নবীন যুগের প্রতিভূ। ঈশ্বরের রাজ্যে নতুন শক্তি নবোন্মাদনার সুবর্ণ লক্ষ্য করে বীণের উল্লাসের অবধি নেই। এই নবযুগের বাতাসকে দ্রবন্ত খটিকার মতো দিকে দিগন্তে বিস্তৃত করতে বীণ চান, এই নবযুগের নবীন বিশ্বাসীদের তিনি সাগরে আহ্বান করেন। একথাও তিনি বলেন, 'যারা হৃদয়, স্বর্গরাজ্য তাদেরই, শক্তির ধারা এই রাজ্যকে জয় করতে হয়।' যুগের এই বাণী যৌবনের প্রতি যৌবনের আহ্বান। সমুদ্রে জীবন-মরণের লড়াই, হয় জয় না হয় পরাজয়, হয় আলোক না হয় অন্ধকার।

বীণ যুগ নব বিশ্বাসের যে অভিধানে আওরান হলেন, সেই অভিধানে অন্তরঙ্গী আনন্দ ছিল পাথের। যুগপূর্ণ জীবনলীলা এই অভিধান, এ যেন এক বিবাহ-উৎসব। বীণী বাজছে, চলেছে বরযাত্রীদের শোভাযাত্রা। এসো এসো, বিলম্ব কোরো না কেউ। ধ্বনিত হচ্ছে আশার গান, চোখ কান বন্ধ করে উপবাসী যন নিয়ে দূরে সরে থেকে না কেউ। আজ উৎসব-ভোজের দিন, উপবাসের দিন নয়।

উপবাস করতে হবে বৈ কি, সইতে হবে অনেক যন্ত্রণা। আত্মহতীর যন্ত্রণা-শিহরিত আসন্ন মুহূর্তও বীণ তাঁর দিব্যদৃষ্টিতে দেখেছিলেন। এই বেদনা এই আত্মদান ঈশ্বররাজ্য প্রতিষ্ঠারই ভিত্তি। কিন্তু সেজন্য দুঃখ নেই, ভয় নেই। মুখ আশ্রক দুঃখ আশ্রক, যন্ত্রণা আশ্রক আনন্দ আশ্রক, ভাগ্যে ভুটুক আহা আর আনন্দ, ভক্তের কণ্ঠে নিত্য ধ্বনিত হোক পিতার নাম, স্বর্গরাজ্যের মতো মর্ত্যমুখিতেও প্রতিষ্ঠিত হোক পরম পিতার সিংহাসন। ত্রিভুবনে বিস্তৃত হোক তাঁর একচ্ছত্র সাম্রাজ্য।

এই নাটকের পরমত্তম ঘটনা, শ্রেষ্ঠতম সংলাপ বীণের একটি কথা একটি ডাক। পিতা বলে তিনি ডেকেছিলেন ঈশ্বরকে, এই ডাকই নবযুগের নববিধান। নিপুণ স্রষ্টার যেমন তাঁর বীণাযন্ত্র একটি রাগিণী বারে বারে বাজান, খেলাচ্ছলে রাগিণীর মধ্য থেকে অমৃতসঙ্গীতের সৃষ্টি করেন তেমনি বীণ নানা ভাবে নানা মুহূর্তে 'পিতা' নামটি উচ্চারণ করেছিলেন, এক অনন্ত গৌরবে মহিমাধিত করেছিলেন ঐ নাম।

বীণ অপেক্ষা এই আহ্বানের মহত্তর অধিকারী কে? তাঁর মতো করে ঈশ্বরকে পিতা বলে আহ্বান করতে আর কে পারে? বীণেরই মধ্যে শিশু মানবাত্মার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ, যে শিশু নির্ভীক ও নিত্য বিবর্ত দৃষ্টি মেলে ঈশ্বরের সৃষ্টির দিকে তাকায়, যে শিশু সবল যে শিশু সত্যকাম, অকুণ্ঠ আহা ও সহজ সাহসে যে শিশু স্রষ্টার চরণে প্রণমিত। যে শিশু তাঁর সহজাত অমৃতত্ব দিয়ে জানে যে এ সংসার সুন্দর, কেন না এ সংসার তার পিতার সৃষ্টি। পিতার প্রাসাদে সে জগেছে, কতো বিচিত্র রহস্য, কতো মনোরম প্রকোষ্ঠ এই প্রাসাদে, এ কী মনোরম তার আশ্রয়! পিতার প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রেমে আশ্রিত তার হৃদয়, স্থির বিশ্বাসে সে নিত-আজ্ঞা পালন করে।

পরমপিতাকে বীণ যেমন জানেন তেমন আর কেউ জানে না। পরমপিতার মহিমা বীণ যেমন প্রকাশ করতে পারেন, তেমন আর কেউ পারে না। বীণের এই শক্তির মূলে রয়েছে তাঁর আশ্রয় জয়হস্ত। বীণ ও তাঁর পিতা, তাঁরা দুজনে এক। পরম-পিতার সাক্ষাৎ পুত্র তিনি, এ কোনো তত্ত্বকথা নয়, এ কোনো পণ্ডিতের তর্কের বিষয়বস্তু নয়, এ উপলব্ধির কথা। তিনি পরম-পিতাকে ধ্যানোপলব্ধি করেছেন, পরমপিতায় অভ্যস্তের মধ্যে বিদীর্ঘ তাঁর অভ্যস্ত, কী চরিত্রে, কী ইচ্ছায়, কী সাধনায় বীণ ও পরমেশ্বরের মধ্যে কোনো অনৈক্য নেই।

এই উপলব্ধির মধ্য দিয়ে বীণ জগৎ-সংসারের সমুদ্রে পরমেশ্বরের যে রূপ প্রকাশ করেছেন তার তুলনা নেই। সৃষ্টিকর্তা স্বর্গে পূর্বযুগের সন্ন্যাস ধারণা ও সংস্কারকে ছুঁতে এক

পরমাশ্চর্য ধর্মবিশ্বাসের প্রতিষ্ঠা করেছেন বীণা। মানব ভাবনার এই যে পরিবর্তন,—এ পরিবর্তন এতো মৌলিক, এতো উদার অর্থ এতো সহজ! খৃষ্টীয় ধর্ম পূর্বতন ধর্মবিশ্বাসের চরিত্র চর্চণ নয়, এই ধর্মে মানব-উত্তীর্ণতার এক নবীন অধ্যায়ের সূচনা।

তেন না, বীণা খৃষ্ট ঘোষণা করেছিলেন,—ঈশ্বরের চরিত্র শিশু-চরিত্রের মতোই সরল, অন্তর্য বাদের পবিত্র তারা তাদের ধ্যান-মুগ্ধিতে ঈশ্বরের শিশুরূপই দেখতে পায়। শিশুর মতো নিরুদয় বীর চরিত্র, সেই লাভ করে ঈশ্বর-সন্নিধি। ঈশ্বরের রাজ্যে সেই পায় প্রবেশাবিকার। এই রাজ্যের নামই স্বর্গরাজ্য। বীণা বলেছেন,—‘যতোদিন না তোমাদের মনের পূর্ণ পরিবর্তন ঘটে, যতোদিন না তোমরা ক্ষুদ্র শিশুর মতো হও, ততোদিন কিছুতে তোমরা স্বর্গরাজ্যে প্রবেশাবিকার পাবে না।’ পাছে সোকে না বোঝে তাই এই উপদেশ তিনি বার বার দিয়ে বলেছেন,—ছোট হও, অবনত করে নিজে; যে ঐ ক্ষুদ্র শিশুটির মতো অবনত, সেই পাবে স্বর্গরাজ্যে সর্বোচ্চ স্থান। আবার তিনি বলেছেন,—‘ঐ ক্ষুদ্র শিশুর মতো না হলে সে স্বর্গরাজ্য লাভ করবে না, সে করবে না আর কিছুতেই।’

আমরা সকলেই জানি, শিশুদের মধ্যে সংস্কারের কোনো বাধা-নিষেধ নেই। অর্গল ভাঙার সরলতা শিশুদের মধ্যেই আছে। ঈশ্বরের সত্যের কেন্দ্রে এই সংস্কারবিহীন সরলতা। আধুনিক যুগের বিরাট বস্তুতাত্ত্বিক প্রগতি যেমন বিজ্ঞানের কয়েকটি অতি সরল সূত্র থেকে বিসর্পিত হয়েছে, তেমনি এই অসীম আধ্যাত্মিক জগৎও ঈশ্বরের অতি সহজ ও অবিনশ্বর সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সত্যকে বীণা মানবজীবনের বাস্তবতার সম্মুখে উদ্ঘাটিত করেছেন।

বীণা এই আশ্চর্য সত্য প্রচার করেছেন যে, যেমন স্বর্গরাজ্য তেমনি ঈশ্বর। স্বর্গরাজ্যে সরল শিশুদের প্রবেশাবিকার সর্বাত্মক। ঈশ্বরও এই শিশুই মতো সরল। শিশুই মতো তিনি সহনশীল, শিশুই মতো তিনি আত্মসমর্পিত। তিনি নর, তিনি নর। ভক্তের হৃদয়কে তিনি বধন বাঁচা করেন, তখন তাঁর নরতার অন্ত নেই। ভক্তের জন্তে তিনি প্রতীক্ষা করে থাকেন, অনন্ত সহিষ্ণু এই প্রতীক্ষা। তাঁর সবচেয়ে বিদ্রোহী সন্তানদেরও তিনি শাসন করে বশে আনতে চান না। প্রেমেরই তাঁর শাসন, প্রেমেরই তাঁর জয়।

বিপথগামী সন্তানের প্রতি তাঁর কী আশ্চর্য মধুর ব্যবহার! কী প্রেম, তিত্তিকা! পুত্র আবার গৃহে ফিরে আসছে এই সংবাদ পেয়ে পিতা ছুটে বার হলেন পথে। এখানে অনেক পথ বাকি, পিতা সেই পথ পার হলেন দৌড়তে দৌড়তে। মেহালিঙ্গনে পুত্রকে জড়িয়ে ধরলেন বুক। না, না পুত্র, অপরাধ স্বীকার করতে হবে না, অমৃত্যু করতে হবে না, বা ঘটেছে তা মৃত অতীত, অতীতকে ফুলে বাঁও।

সত্যই বীণা বলেছেন, অমৃত্যু পাণী যেদিন শিশুগৃহে ফিরে আসে সেদিন স্বর্গরাজ্যে মহা উৎসবের দিন।

ঈশ্বরের অমৃত্যুপারী সীমা নেই, ক্ষমার সাগর তিনি। এই ক্ষমার কথাটুকু মাত্র মানুষ তার হৃদয়ে ধারণ করুক। বীণা বলেছেন,—

‘যারা তোমাকে ঘৃণা করে তাদের কল্যাণ করো। যারা তোমার সঙ্গে মন্দ ব্যবহার করে, তোমাকে অত্যাচার করে তাদের জন্ত প্রার্থনা করো। তবেই তুমি পরমপিতার উপযুক্ত সন্তান হতে পারবে। ভালো ও মন্দ, উভয়েরই মাধ্যম ঈশ্বরের দ্বর্ষ কি ওঠে না? সং ও অসং, উভয়েরই শিরসে ঈশ্বরের বর্ষা কি করে না? পরমেশ্বর সর্বজনীন, সর্বদোষহর তিনি। তোমাকেও হতে হবে তোমার পিতারই মতো।’

এমন সহজ ভাবে ঈশ্বর! সত্যকে এই সব কথা বলতে বীণার পূর্বে আর কোনো মানব-সন্তান সাহস করেনি। কিন্তু ঈশ্বরের এই যে সহজ সরল প্রেমবিহীন চরিত্র, এই চরিত্র নিয়েই সৃষ্টির মর্মমূলে তিনি আগীন। তিনি উপলব্ধি-পারের দূর-দূরান্তের উপাসীন সৃষ্টিভর্য মন। একটি পানীর মৃত্যু-বেদনা তাঁর প্রাণে স্পন্দিত হয়, একটি মানুষের মাথার কটি চুল তাও তিনি গুণে গুণে গণনা করেন। তাই বধন মধুর মানুষ তার অন্তরান্তর অমোঘ আত্মানে পুরাতনকে বর্জন করে নবীনের অভিব্যানে আগুতান হয়,—সে আত্মান ঈশ্বরেরই আত্মান। সেই আত্মন সৃষ্টির প্রথম বাণীর প্রতিধ্বনি, যে বাণীর নির্দেশে চরাচরব্যাপী অন্ধকারের গর্ভে আলোকের জন্ম হয়েছিল। সে আত্মানে যারা অবিশ্বাস করে, তা ঈশ্বরের সৃষ্টি-প্রতিভাকে অস্বীকার করে, আলোককে অস্বীকার করে অন্ধকারে মুখ ফিড়িয়ে বসে থাকে। আলোকই দেয় ভবিষ্যতের পথ নির্দেশ। এই ভবিষ্যৎকে ভয় করতে নেই। স্বজনধর্মী আবেগে এই ভবিষ্যতের পথে আগুতান হতে হয়।

ঈশ্বরের সৃষ্টিশীলতার ছন্দ নেই। পুরাতনকে তিনি নবীন করেছেন, মৃতকে তিনি সঞ্জীবিত করছেন পুনরুজ্জীবনের মন্ত্রে। মানুষের মধ্যে যে ক্রমবর্ধমান নিত্য-আগুতান শিশুমন আছে সেই মন তাঁর আপন মনের আবেগে স্পন্দিত হোক, এই তাঁর অভিলাষ। এই শিশুমন নিয়ে বধন তাঁকে পিতা বলে ডাকি, তখনই তাঁর মনে মন মিলাই, তখনই তিনি চরিতার্থ হন।

ঈশ্বরের এই পরম-শুভ নব-আত্মানের প্রমাণ যদি আমরা চাই, দার্শনিক তত্ত্ব ও তর্কের বাগাড়ম্বরে বীণা সেই প্রমাণ দেননি। প্রমাণ তাঁর জীবন। ঈশ্বরের বাণীই তাঁর জীবন। তাঁর জীবন দিয়েই তিনি তাঁর পরমপিতার সেই আত্মানের সত্য প্রমাণ দিয়েছেন। তাঁর নিজের পার্থিব জীবনে প্রতি দুহুর্তের পরীক্ষার মধ্য দিয়ে তিনি সত্যকে উদ্ঘাটিত করেছেন। এই পরীক্ষার পথে কোনো বাধা কোনো বিপদকে তিনি মানেননি। এই পরীক্ষার চরম আত্মনিবেদনের অটল সাক্ষর তিনি গ্রহণ করেছেন। মানুষকে কোনো মহৎ বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ করতে হলে সে বিশ্বাসের জন্ত জীবন নিবেদন করতে হয়। বীণা তা করেছেন।

বীণার এই দৃঢ় প্রত্যয় আর সাধারণ মানুষের স্থলভ ভরসাভাব এক নয়। তিনি জানতেন, জীবনের প্রতি দুহুর্ত জানতেন, যে চরম মূল্য তাঁকে দিতে হবে। তবু ঈশ্বরপুত্র হয়েও অন্তরে অন্তরে তিনি মানুষ, তাই আশংকাকেও তিনি গোপন করতে চাননি। চরম পরীক্ষার দুহুর্ত বধন ঘনিষ্ঠে এল, তখন তাঁর নির্ভীক আত্মাও শিহরিত হলো,—পরমপিতার উদ্দেশ্যে আর্ত নিবেদন

কনিত্ত হোলো,—‘হে শিতঃ, তোমার দ্বারা সকলই সম্ভব, এ পানপাত্র
সবাত তুমি আমার হৃৎকের সামনে থেকে।’

আবার বেদনার অবসানে শক্তি বধন ফিরে এল তখন তিনি
মহান কতৃৎকের সঙ্গে পিটারকে বললেন, ‘খাপের মধ্যে গুঁরে ফেলো
তোমার তরবারি। যে পাত্র পিতা আমাকে দিয়েছেন, তার
পানীয় আমি পান করব না।’

এক নিঃশ্বাসে শেষ চূষক পর্বত পান করলেন বীত।

বর্ষগ্রন্থে খেত পাথরের পাত্র ভাঙার একটি কাহিনী আছে।
তখন নিস্তার সন্তোষের প্রায় অবসান, বীতের চরম আত্মদানের
ক্ষণ ঘনিষে এসেছে। সেই আসন্ন প্রহরে বীতের মনোভাবের
পরিচয় এই কাহিনীর মধ্যে মেলে। মহার্ঘ গন্ধহ্রদ্যপূর্ণ খেত
পাথরের রক্ত পাত্রটি চূর্ণ করে এক নারী বীতের মস্তকে স্তগন্ধি তৈল
মাখিয়ে দিল। পাত্রটি চূর্ণ হবার সঙ্গে বীতের মনে হোলো তাঁরও
মৃত্যু ঘনিষে এসেছে। স্তগন্ধি আসব লাভ করতে হলে যেমন
নিরুদ্ধ প্রস্তর-পাত্রকে চূর্ণ করতে হয়, তেমনি তাঁর মরদেহকেও
চূর্ণ করতে হবে। তবে না তাঁর অন্তর-সুগতি ব্যাপ্ত হবে দিকে
দিকে। ভক্ত নারীর এই অবদান লক্ষ্য করে বীত বললেন,—
‘আহা, এ আমার প্রতি অতি সংকার্য করেছে, আমার দেহে এই
স্তগন্ধি তৈল ঢেলে আমার সমাধির উপযোগী কাজ করেছে।’
বিস্তৃত ভক্তরা অক্ষুটস্থরে অমুখোণ করল, এ যে অপব্যয়।
এই অপব্যয় কথাটি বীতের মখে গিয়ে বিঁধল। না, না, অপব্যয়
নয়। তাঁর বিগাহীন আত্মদান, তাও অপব্যয় নয়। নারী তাঁর
স্বল্প অমৃত্তিশীল মন নিয়ে তাঁর প্রাণের কথাটি বুঝি ঠিক বুঝেছে।
স্পর্শকাতর অন্তরের কোমল অমৃত্তি দিয়ে প্রকাশ করেছে কঁরই
অন্তরের বেদনা। কিছু না ভেবে মৃষ্টিমাত্র সঞ্চয় না করে উদার হাতে
সব কিছু বিলিয়ে নেওয়া, এ তো অপব্যয় নয়—ঈশ্বরপুত্র বীত দান
করেছেন তাঁর জীবন, বিলিয়ে দিয়েছেন তাঁর সন্তা, ক্রুশের কাঠ চূর্ণ
করেছেন তাঁর দেহ—পুষ্করের বসিষ্ঠতার আর নারীর অকুঠ দাক্ষিণ্যে।

ঈশ্বরও কিছুই রাখেন না। তাঁর উদার কল্যাণ-আশীর্বাদ
তাঁর অনীম করণা তিনি আত্মহারা আনন্দে মনুষ্যসমাজে বিতরণ
করেন, এই সত্য বীত পাখিব নরনারীর প্রাণে জাগ্রত করতে
চেরেছেন। বীত যেন কবি, বীত যেন শিল্পী, সমগ্র জীবন ধরে
শিল্পবর্মা প্রেরণায় তিনি নিজেকে ব্যাপ্ত রেখেছেন, অস্থানীয়
অনমনীয় প্রস্তর-কঠিন মনকে ঈশ্বরের প্রেমস্পর্শলাভের উপযোগী
নমনীয় করে গেছেন। যে মন অনড় নিশ্চাপ, সেই মনকে তিনি
আপন প্রধাস-ফুৎকারে সজীবিত করেছেন, সেই মনকে আপন
শিল্পাস্ত্রী স্পর্শে গঠন করেছেন, ভাস্কর যেমন অবয়বহীন জড়শিঙ
থেকে রূপস্রষ্টি করে। কবি যেমন কাব্য রচনা করে, শিল্পী
যেমন বীণায় তোলে সুরের লজরী, তেমনি তিনি রচনা করেছেন
মহান জীবনকাব্য, তেমনি মানবভাগ্য জুড়ে তিনি বহিয়েছেন
অনির্বচনীয় সুর-মল্লিকানী। বীতের এই সৃষ্টিশীলা আমরা বাস্তব
ইন্দ্রিয় দিয়ে উপলব্ধি করিনে, অন্তর দিয়ে অনুভব করি।
মানবভাগ্যে গুঠজন্মের স্রবল দেখে বিমিত্ত হই।

ঈশ্বরের কল্যাণ স্পর্শ কেবল মাত্র কোমল নয়, অজ্ঞায়ের
হৃৎখোমুখি এই স্পর্শ বজ্রকঠিন। বীতের প্রেম শিথিল ডাবালুতা

নয়। এ প্রেম কখনো বা ব্যাধার মতো, বজ্রণার মতো। ধর্ম্য
আত্মিকায় অ্যালবাট দুইটাকারকে বহু সময় তীক্ষ্ণ ছুরিকার আঘাত
দিয়ে শল্যচিকিৎসা করতে হয়। সেই আঘাত কেবল মাত্র ক্ষত
সৃষ্টি করে না, ক্ষতের গভীরে প্রবেশ করে ব্যাধির মূলকে নিমূল
করে ক্ষতকে সারিয়ে তোলে। ঈশ্বরের করণাও একই প্রকারের।
এই করণা বেদনাকে ধ্বংস করবার জেতেই বেদনা হানে। এই ক্ষত
পরম বজ্রের বিষস্ত ক্ষত।

ঈশ্বরের এই কঠোর প্রেম উপলব্ধি করেছিলেন সাধু পল।
হিক্রগণের প্রতি পত্রে তিনি লিখেছিলেন,—‘প্রভু বাক্যে
প্রেম করেন তাকেই তিনি শাসন করেন,—যে পুত্রকে তিনি প্রহণ
করেন, তাকেই তিনি প্রহার করেন। ঈশ্বরের শাসনকে যদি সহ্য
করো, তাহলেই হবে ঈশ্বরের পুত্রোপম। পিতা বাক্যে শাসন করেন
না, এমন পুত্র কোথায়?’

বীতও বলেছেন,—‘যে সমস্ত তরু তাঁর পিতা যোপণ করেননি,
সেই সব তরুকে নিমূল করতে হবে। এই সংসারে অজ্ঞায় ও পাপের
উৎস চেতনার গভীর অন্ধকারে, পাপের রহস্যকে বুদ্ধিতর্কের সোজা
কথার ব্যাখ্যা করা যায় না।’ আশ্চর্য, উপমায় সাহায্যে প্রভু গুঠ
এই পাপের অবসানকে চিত্রিত করেছেন। গর্তিনী নারীর প্রসব-
বজ্রণার আনন্দময় অবসানকে তিনি চিত্রিত করেছেন, শুদ্ধ হৃৎকে
পরিচ্যাগ করে হেমস্ত-ক্ষেত্রের সোনার কলস সংগ্রহের ছবি তিনি
এঁকেছেন, বীজের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ফলের জন্মের গান তিনি
গেয়েছেন।

বীতের প্রাণ ছিল কবির প্রাণ, তাঁর প্রকৃতিতে ছিল কবির
অমৃত্তি। নিজেরই অজ্ঞাতে কখনো তাঁর মন হোতো হর্ষোন্মাদে
উৎফুল্ল, কখনো বা হতাশ বিবর্তায় স্রিয়মাণ। এইখানেই তাঁর
মানবত্বের পরিচয়, মানুষেরই হৃৎ-সুখে আগ্রুত ছিল তাঁর হৃদয়।
তাঁর স্বমনী-প্রতিভা ছিল বিশাল, নির্ভীক ক্রততার সঙ্গে সঙ্গে যে
আকাশচুম্বী সৃষ্টি তিনি করে গেছেন, একমাত্র শিল্পীর হৃদ-মনীর
আবেগেই তা সম্ভব। যে আশ্চর্য দূরদৃষ্টির ফলে তিনি মানব-ভাগ্যকে
প্রদীপ্ত ভবিষ্যতের পথে আকর্ষণ করে নিয়ে গেছেন, সেই দৃষ্টি অলস্ত
নিধার মতো। সে দৃষ্টিনিধার দিকে চোখ রেখে আমাদের ইন্দ্রিয়
বুঝি বিষয়াবাস্তে অনড় হয়ে যায়। কিন্তু সেই অনড় প্রাণ সঞ্চার
করেন তিনি। তিনি দেখেন, তিনি কাজ করেন, মানব ঐতিহ্যকে
তিনি গঠন করেন নূতন রূপে।

শিষ্যবৃন্দের প্রত্যাঘর্ষণে তাদের সঙ্গে জয়ের আনন্দে উল্লসিত
হয়ে বীত বললেন,—‘আকাশ থেকে বজ্র যেমন খসে পড়ে, তেমনি
আমি শরতানকে খসে পড়তে দেখছি।’ ঈশ্বরকে উদ্বেগ করে
তিনি বললেন,—‘গৃধ্রবী ও স্বর্গের একেশ্বর হে পরমপিতা, আমি
তোমাকে বজ্রবাদ জ্ঞাপন করি, কেন না বারা প্রবীণ, বারা তথাকথিত
জ্ঞানী, তাদের কাছে না প্রকাশ করে শিতর কাছে নিজে থেকে প্রকাশ
ক’হে তুমি।’

আবার এক সম্পূর্ণ বিভিন্ন বুদ্ধিতে তাঁর মনের পরিবর্তন আমরা
লক্ষ্য করতে পারি তাঁর ক’টি কথায়,—‘আমার মনে হৃৎকের শেষ
নেই, মৃত্যুতে যে হৃৎকের সমাপ্তি।’

কখনো হতাশা, কখনো আশা, কখনো আনন্দ, কখনো বিবর্তা
—মনের এই আলো-অন্ধকারকে বীত আমাদের কাছে ঢেকে রাখেন

না। শিশুর মতো সরল তাঁর জ্ঞান। বধন বা তিনি অল্পতর করেন, তা তিনি অকপটে প্রকাশ করেন। তবে মনের দাশ্য তিনি করেন না। সঙ্গীতশিল্পী যেমন প্রতিটি স্বরকে আরও রাখে, তেমনি আপন মনের প্রতিটি অল্পতর তাঁর আয়তায়। নিপুণ গীতকারের মতো ছোট-বড়ো বাদী-সংবাদী প্রত্যেকটি স্বর ব্যবহার করে তিনি মহাসঙ্গীত সৃজন করেন। জীবনের সর্বপ্রকার অল্পতর দিয়ে তিনি পরিপূর্ণ করেছেন নিজের জীবন, এমন কি বধন ক্রুশি হয়েছেন, তখনো কোনো বেদনা-নিবারণ ঔষধ তিনি চাননি। তিনি ঘোষণা করেছেন,—‘মানুষ যাতে জীবন লাভ করে, বিচিত্রতর বিস্তৃততর জীবন, তাই আমি এসেছি।’

চরিত্রের এক অপূর্ণ ভারসাম্য ছিল বীণের। কখনো আনন্দ কখনো বেদনা,—কিছু এই দুই-এর মধ্যে সমতা রক্ষা করে চলেছে আত্মা। জীবনের বা গভীর ঐশ্বর্য,—তার মহাবর্তা নেই, তা সরল তা মৌলিক। এই গভীর ঐশ্বর্যের কথা বীণ তাঁর অনবদ্য ভাষায় প্রকাশ করেছেন,—তাই তাঁর বাণী চিরকাল মানুষের অন্তরে আগরুক থাকবে। সেই জগৎ তাঁর বাণী ভিন্ন ভাষায় অনুদিত হয়েও সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন জাতির অন্তরে স্পর্শ করে। মানবজন্মের তার মহাবর্তময় মুহূর্তে যে বাণীর প্রত্যাশা করে, সে বাণী বীণ খুঁটের বাণী।

শান্তিনিকেতনে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিজ্ঞাননাথ খুঁটবাণীর আলোচনা প্রসঙ্গে এই কথাই আমাকে বলতেন। বিজ্ঞাননাথ ছিলেন বুদ্ধ দার্শনিক ও ঋষি,—যৌবনকালে তিনিও ছিলেন সখ্যক কবি। তিনি শুধু রবীন্দ্রনাথের নয়, আমাদের সকলের জ্যেষ্ঠভ্রাতা ছিলেন, তাঁর পরিচিত আমরা সকলেই তাঁকে বড়দাদা বলে ডাকতাম। তিনি হিন্দু ছিলেন, কিন্তু পরধর্মের প্রতি ঔদার্য ছিল তাঁর বিশিষ্ট অন্তর-ভূষণ। তা ছাড়া তাঁর মন ছিল শিশুর মতো। দার্শনিক হিসেবে তাঁর জ্ঞান ছিল গভীর, বিজ্ঞা ছিল অসীম। বুদ্ধ বয়সে তিনি প্রতিদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুরু হয়ে বারান্দায় বসে থাকতেন,—পাখী আর কাঠবিড়ালীরা নির্ভয়ে তাঁর আলোপাশে খেলা করত। এইভাবে নিম্নক ধ্যানের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর ময়জীবনকে পরিসমাপ্তির পথে নিয়ে চলেছিলেন। এই শেষ জীবনে প্রশান্ত পরিবেশের মধ্যে নীরব সাধনায় তিনি কালাতিপাত করতেন,—এই সাধনায় তাঁর আত্মা ঐশ্বর্য-সাম্য লাভ করত।

প্রগাঢ় জ্ঞানের অধিকারী হয়েও সারল্য ও বিনয় ছিল তাঁর অন্তর-ভূষণ, বধন যে কথা তিনি বলতেন সে কথায় সত্য উদ্ভাসিত হতো। প্রতিদিন স্বর্ধাস্তকালে সারা দিনের মতো সামান্য আহার সাজ করে তিনি আমাকে তাঁর কাছে ডাকতেন। সারাদিন যতো প্রকার চিন্তা তিনি করতেন দিনান্তে সেই সব চিন্তাকে তিনি প্রথিত করে আমার হাতে দিতে ভালো বাসতেন। জীবনের শেষ কয় বৎসর তিনি কেবলই ‘সারমন অন দি মাউন্ট’ পাঠ করতেন ও এই খুঁটোপদেশের সারাংশের নিয়ে আলোচনা করতেন।

বিজ্ঞাননাথ একদিন আমাকে বলেছিলেন, ‘বীণের এই উপদেশাবলী আমার খাত আমার পানীয়। বীণের বাক্য এতো সরল সে শিশুও তা বুঝতে পারে, কিন্তু আবার অজনিহিত অর্থ

সে বাক্য কতো গভীর। উপনিষদের মতো পৃথিবীর দুইদিকের মহাসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত বীণের এই বাক্য। কতো বড়ো স্পর্ধাতরে বীণ বলেছিলেন, আমার বাক্য কখনো ভুলে যাবে না। কতো বড়ো সত্য কথা তিনি বলেছিলেন। সত্যই অবিনশ্বর তাঁর বাক্য। দিনের পর দিন তাঁর বাণী নিয়ে আমি চিন্তা করি, গভীর রাজের নিজস্বীকরণে প্রহরে তাঁর বাণী আমার অন্তরে এসে বাজে। তাঁর বাণীর ব্যাখ্যার জগৎ কোনো টীকার প্রয়োজন নেই, অথচ তাদের অন্তর্গত অর্থেরও কোনো সমাপ্তি নেই। বীণের বাণীতে সেই সত্যের স্ক্রলি আছে যা মানুষকে চিরদিন পথ দেখায়, মৃত্যুর অন্ধকারকেও অপনোদন করে।’

বীণের যে বাণীটি বিজ্ঞাননাথের সবচেয়ে প্রিয় ছিল তা হোলো এই,—

‘অন্তর বাহ্যের পবিত্র তারা ভাগ্যবান, কেননা, ঐশ্বরের দর্শনলাভ তারা করবে।’

এই বাণীর পরম সম্পূর্ণতা তাকে চরম তৃপ্তি দিত,—তিনি বারে বারে এই বাণী উচ্চারণ করতেন। আর একটি বাণীও তাঁর অমূল্য প্রিয় ছিল,—‘ঐশ্বর্যের রাজ্য তোমারই অন্তরে প্রতিষ্ঠিত।’ এই বাক্যটি বধনই তিনি আমার সামনে উচ্চারণ করতেন, তাঁর প্রজ্ঞা-বিস্ময়জনক কণ্ঠে এই বাক্য যেন অচিন্ত্যপূর্ণ রহস্যমণ্ডিত হয়ে প্রকাশ পেত। ঐশ্বরের রাজ্য কোনো বাহ্যিক বাস্তব রাজ্য নয়, মানুষের মনোবাস্তবই সেই রাজ্য,—প্রতি মানুষের হৃদয়বন্দনেই ঐশ্বরের সিংহাসন—এই সব কথা বারে বারে বলতে গভীর আনন্দ লাভ করতেন বড়দাদা।

গভীর দার্শনিক উপলব্ধি ও নিবিড় কবিচিন্তার সহযোগে বিজ্ঞাননাথ খুঁটবাণীর মধ্যে নূতন অর্থ ও নূতন ইঙ্গিতের সন্ধান পেতেন। তাঁর ভাষা ও আমার ধারণার সঙ্গে কখনো কখনো মিলত না;—কিন্তু তিনি তর্ক করতেন না, শান্ত ভাবে আমাকে ব্যথিয়ে বলতেন যে বীণের মতো মহাপ্রভুর বাণীর গভীর অপরিসীম। কোনো মানুষ এক নিঃশ্বাসে ঘোষণা করতে পারে না,—তাঁর বাক্য আমি সব বুঝে নিয়েছি। বীণের বাণী অমৃত-নির্ঝরী—পিয়ালী মানব যুগে যুগে সে নির্ঝরীর পানীয় গ্রহণ করে। প্রতি যুগের মানুষ প্রতি বার নূতন করে এই সত্য—উৎসের সমুখে অঙ্গুলি পাত্তে,—এবং মানুষের পরম প্রয়োজনের তৃষা যতোদিন না নিবৃত্ত হবে ততোদিন যুগে যুগে মানুষ এই মন্ডাকিনীর তীর্থসলিলে পূত হবে।

বীণের জীবনে বধন ক্রুশের আঘাত পড়েছিল তখন তিনি যৌবনের ঐশ্বর্যদশে। যৌবনাবস্থাতেই তিনি আত্মদান করেছিলেন। মধ্য বয়সের দীর্ঘ ছাড়া তাঁর জীবনপথে পড়েনি। তাই তাঁর প্রতি বাক্যে যৌবনের স্পর্শ। এইখানেই ক্রুশের সবচেয়ে বড়ো বেদনা,—এই ক্রুশ যৌবনকে হনন করেছিল, মানবপ্রেমিক কবিকে হনন করেছিল। দৈব বস্তুর কথা বীণের বেদনার চরিতার্থ হয়েছিল,—‘লক্ষ্য করো আমার বেদনার চেয়ে গাঢ়তর বেদনা আর কোথাও আছে কি না।’

বীণের আনন্দ-বেদনা বিকশিত যৌবনের প্রথম ইন্দ্রিয়োপলব্ধির বেদনা। এই জগৎই এতো আনন্দ তিনি বিচ্ছুরিত করেছিলেন,

এতো যেননা তিনি সহ করেছিলেন। বৃদ্ধ বৈরাগ্যসাধকের মতো তিনি ইচ্ছার দ্বারকে বন্ধ রাখেননি,—পরিভাগ করেননি ‘পান-ডোজনের’ পরিভূক্তি। জীবনের বর্ণনায় স্বয়ং প্রাতি তিনি পরিপূর্ণ সচেতন ছিলেন। তীরের মতো তীক্ষ্ণ ছিল তার বাস্তব বিচারবুদ্ধি, উদাসীনতা দিয়ে এই বুদ্ধিকে তিনি আবিল করেন নি। মানসিক স্বাধীনতার অমর ঘোষণা তিনি করেছেন,—‘সত্যই তোমাকে বৃত্তি দেবে, মিথ্যাই বন্ধন।’ গীত সেই নিত্যকালের নির্ভীক যৌবনের প্রতিভা, যে যৌবন স্রুতোত্তর আত্মবিশ্বাস অকল্পনীয় বাণীর সমুদ্রীন হয় এবং আত্মার অপরাধের দীর্ঘে সব বাধা ভয় করে। অতীত বিশ্ববীর্য দীর্ঘ প্রবর্তক, নিজ নিজ ক্ষেত্রে তারাও মহান পুরুষ, কিন্তু তাঁরা প্রত্যেকের পৃথিবীতে দুরীত জীবন বাপন করেছিলেন এবং ধর্মপ্রচারের অবসানে বৃদ্ধবয়সে দেহবন্ধা করেছিলেন। কিন্তু বীণের চরিত্রে এক অনতিক্রমণীয় উপর্য্যায় প্রতিষ্ঠিত,—চিরন্তন যৌবনশীর্ষের সিংহাসনে তাঁর আসন।

প্রতিযোগের সাধারণ মাহুখ খুঁটচিরিত্রের এই উত্তম উচ্চতাকে নিজের সাধারণ বর্ণতার স্তরে নামিয়ে আনবার চেষ্টা করেছে,— তাঁর বাণীর নির্ভীক মহত্বকে শূণ্যনিত করতে চেয়েছে আপন সন্তত অভিজ্ঞতার কারাগারে। কিন্তু খুঁটকে বাঁধা যায় না, মাহুখের চিত্তকল্পের অসম্ভবের নিযুক্ত প্রেরণাকে তিনি জাগ্রত করেন। বারে বারে যুগে যুগে তিনি ঘোষণা করেন,—বিশ্বাসের অমোঘ শক্তিবলে অসম্ভবকে সম্ভব করো, বিশ্বাসের আকর্ষণে হ্রাণ পর্বতকে করো চলমান।

‘প্রথম বর্গ ও প্রথম মর্তের অবসানের পর এক নতুন বর্গ ও নতুন পৃথিবী আমার চোখে প্রতিভাত হোলো।’—খুঁট বাণীর এই সঙ্গীত নব নব যুগের মাহুখকে নব নব করণের অভিযাত্রার উদ্বুদ্ধ করেছেন, অনন্ত সুরনির্ভরে অন্তরীক ও পৃথিবীর বৃকে জাগিয়েছে চলিত্বতার চমকিত স্পন্দন।

বীণ খুঁট জগতের শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী ধর্মপ্রবর্তক, এই তাঁর আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যকে আমি ইউরোপে থাকতে ততো বুঝিনি যতো বুঝছি প্রাচ্যদেশে এসে। মানবসমাজে বৃদ্ধের প্রসন্ন প্রশান্তিরও সত্য প্রয়োজন আছে—এই প্রয়োজন জ্ঞানবৃদ্ধর। কিন্তু বীণের প্রেমোন্মাদ আত্মান বৌবনের ভাষা। এই বাণী কটিকার মতো বেগবান, বিদ্রোহের মতো প্রেতর,—মাহুখকে চলিত্বতার অণুপ্রাণিত করতে হলে এই আত্মানের প্রয়োজন।

ঈশ্বরের রাজ্যে অন্ত্যের প্রতি বিস্কৃত ঘৃণারও স্থান আছে, যে ঘৃণা বৌবনের বলিষ্ঠতা থেকেই সম্ভব। আত্মজরী ফরাসীদের বীণ যে তাবার তৎসনা করেছিলেন যে ভাষা বিস্কৃত কটিকার মতো

ভয়ংকর, সে বিচারে অজ্ঞানত্ব পূর্ব্বক কেঁপে ওঠে। এই ভয়ংকর তৎসনার শেষে বীণ আবার বৃক্ষফটা বিলাপ করেছেন, ক্রোধ তখন অজ্ঞানে লুপ্ত হয়ে গেছে। দীর্ঘবাস আর অজ্ঞানের সঙ্গে তিনি বলছেন,—

‘হা জেকসালেম! ঈশ্বর যে সব সত্যপ্রচাদের তোমার কাছে প্রেরণ করেন তাদের তুমি পাথর ছুঁড়ে হত্যা করো। বৃক্ষটী যেমন তার শাবকদের পক্ষের নিচে একত্র করে, তেমনি আমি কতোবার তোমার সন্তানদের একত্র করবার ইচ্ছা করেছি। কিন্তু তুমি ভাতে সন্তুষ্ট হলে না। তাই দেখ, আজ উজ্জ্বল বিশ্বস্ত মস্তক তোমার গৃহ।’

বীণের মানসিক উত্তেজনা জোড় দিয়ে আরম্ভ, কল্পণায় তার অবসান। মীনবাণীর প্রতি তাঁর মহার্ঘ মঙ্গলময় দান প্রথমে ভয়ংকর বজ্রবিদ্যুতের মতো আঘাত করে, পরে তা শান্ত বর্ষাধারার মতো কল্পণায় প্রারিত্ত করে। তখন পিচ্ছিন্ন হয় বহির্জী, মেঘবিহীন নীলাকাশ ঝলকিত হয় সূর্যের উজ্জল দাক্ষিণ্য। হৃদয়ের গভীরতর কল্পকে পবিত্র করার জন্য সূর্যের কল্যাণ তার প্রয়োজন, সেই সঙ্গে প্রয়োজন আনন্দ ও অশ্রুসর বাধা প্রেতপ।

খুঁটচিরিত্রের বিশিষ্ট গুণ সাহস, বীর্য, অকুতোভয়তা। এই গুণ মানব-অন্তরের গভীর গুহাঘারে আঘাত করে, আবার অন্তর আকাঙ্ক্ষাকে অসীম উচ্চতার প্রতি আকর্ষণ করে। খুঁটচিরিত্রের এই মৌলিক মহিমা ধর্মগ্রন্থের মূল সূত্র। খুঁটমহিমা এক সর্বজনীন বিপ্লবের দ্রুত প্রাবন বা প্রাচীন জীর্ণতাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। বস্তুর মতো তা পুরাতনকে বিধ্বস্ত করে। ঈশ্বরের নবীন রাজ্যের অমৃত স্রাবধারাকে প্রাচীন পাত্র অবরুদ্ধ রাখা যায় না। সেই পাত্র সে নিমিত্তই হোক আর অন্তর নিমিত্তই হোক, বিস্ফোরণের মতো চূর্ণ হয় তার আবরণ।

খুঁটের চিত্র অত্যন্ত বিভৎস বিকৃতভাবে মাঝে মাঝে চিত্রিত হয়েছে। এই চিত্র আত্মসারে তিনি রক্ষণশীল নীতিবাদী, সাবধানী ধর্মপরায়ণ ও অসম্মত রকমের শাস্তসম্ভব। এই চিত্র মিথ্যা, এই চিত্র ইতিহাসকে বিকৃত করে। এইরূপ বৈশিষ্ট্যহীন দুর্বল চরিত্র কখনো পৃথিবীর অগ্রাঙ্গের শক্তিকে পরাভূত করতে পারত না, যুগে যুগে যৌবনের উদয়কে উদ্বুদ্ধ করতে পারত না।

নবজন্মের বীজকে সংস্কারের খোসা সর্বত্র বন্দি রাখতে চেষ্টা করে। সেই আত্মদমনকে বিনোদ করে জীবন নবাকর্ষণের আলোকে চোখ মেলে। প্রাচীনের জীর্ণ আবরণ সর্বদাই চেষ্টা করে মাহুখের অভিযাত্রী আত্মাকে অনড়তার কারাগারে বন্দি করে রাখতে। কিন্তু প্রতি যুগে নূন করে বীণ এসে উপস্থিত হন। তিনি আসেন আমাদের সংস্কারের বন্ধন থেকে মুক্তি দিতে। [ক্রমশঃ]

অনুবাদ : নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

“A great city is that which has the greatest men and women. If it be a few rugged huts it is still the greatest city in the whole world.”

—Whitman.



সত্যিকি

১৪

ঠিক আমি বা আশ্রয় করেছিলুম, তাই হোল শ্রেয় পৰ্ব্বত। বোভাতে সামাজিক গণগোলের সূত্রপাত করলো পামার উপস্থিতি। অথচ এতে পামার দোষ কতটুকুই বা।

নিমন্ত্রিতেরা জলস্পর্শ করতে অস্বীকার করলেন। আমাদের শত অমুদোষ, অমুনয় তাঁদের টলাতে পারলো না। এই অভ্যাগতদের মধ্যে কতজন যে খাঁটি চরিত্রের অধিকারী, কে তা বলবে? কে তার হিসাব করবে?

চোখের জল ফেলে পামা বাড়ির বাইরে চলে গেল। পামার সামাজিক মূল্য স্বীকৃত হলো না। ওর ত্যাগ, সেবা, স্নেহ কেউ দরদ দিয়ে বোঝবার চেষ্টা করলো না।

কানাই দুঃখিত হলো। দুঃখিত হলুম আমরা সবাই।

কখন সুদাস অলক্ষ্যে বেরিয়ে গেছে, টের পাইনি। অনেক রাতে বাড়ি ফিরে ঘবে ঢুকতে বাব, এমন সময় সুদাসের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলুম—দেখলে তো, তোমার সম্মান ওদের কাছে কতটুকু? কেউ তোমার হয়ে একটা কথাও বললে না। অন্ততঃ নয়নের উচ্চিৎ ছিলো, তোমাকে নিয়ে বেরিয়ে আস।

পামার উত্তর শুনতে পেলুম না। পরে সুদাসের আরো কথা থেকে বুঝতে পারলুম যে, পামা ছিল নিরুত্তর। সুদাস বলে চললো, এ রকম ভাবে অপমানিত হবার চেয়ে আমার সঙ্গে চলে চলো। আমি তোমার রাগীর মতো করে রাখব।

পামা বলল, সুদাস বাবু, আমার এতটা অমুগ্রহ করবেন?

উৎসাহে বলমল করে উঠল সুদাস, আরে, আদেশ কর। এত কুঠী কেন?

—আপনি এবার যান। আর কখনো এখানে আসবেন না।

—তুমি আমার যেতে বলছ?

—হ্যাঁ। নিরুত্তাপ গলায় পামা বলল।

এত সহজে এমন মর্মান্তিক কথা শুনতে হবে, সুদাস বুঝি জীবনে কখনো কল্পনাই করেনি। জীবনে যে নারীর মূল্য কেবলমাত্র টাকা দিয়ে মেপেছে, সে স্বদয়বোগে কী জিনিস, তা জানবে কেমন করে? সুদাস বখন দেখলো পামার মন কোন কিছুই বিনিময়েই পাওয়া সম্ভব নয়, তখন সে অস্ত্র বাস্তা ধরলো। সমাজের ওপর বিঘ্নের দিতে চাইলো পামার মন। ভেবেছিলো সামাজিক আঘাতে নিশ্চয়ই ওর মন ভেঙ্গে পড়বে। তাই আমার ওপর দোষ

চাপিয়ে দিলো অন্যতাসে। আমি দাবিদার নই। পামার প্রতি উদাসীন। তার সম্মান আমি যথাযথ রাখতে পারি না। আমি তাকে বাড়ির বাঁধুনী কিংবা ফিরে চেয়ে বোঝি মর্মান্দা দি' না! পক্ষান্তরে সুদাস পামাকে রাগীর মর্মান্দা দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দিল।

বেশ খানিকক্ষণ সুদাস ঘর থেকে বেরল না। আমি আমার উপস্থিতি জানাবার জন্তে গলাখাকারি দিলুম। ওরা কেউ শুনতে পেয়েছে বলে মনে হোল না। কারণ কোন পক্ষ থেকেই ব্যস্ততার লক্ষণ দেখা গেল না।

অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে পামা বললো, কৈ গেলেন না?

মরিয়া হয়ে সুদাস বললো, আমি যাবার জন্তে আসিনি। বাই তো তোমাকে সঙ্গে নিয়েই যাবো।

সুদাসের সীমাহীন স্পর্ধার আমি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হলুম। অসহায় একটা মেয়ের ওপর তাহলে সে বসপ্রয়োগ করতেও কুহিত হবে না। এ কেমন মানুষ? ভালবাসা দিয়ে থাকে পাওয়া গেল না, তাকে জোর করে পাবার প্রবৃত্তি হয় কেন? দেহ কি মনের বিদে মেটাতে পারে? সুদাস কী মায়াব্বক তুলই না করল। সে যে আর কোন দিন পামার মন ভর করতে পারবে না, তাতে আর আমার কোন সন্দেহ রইলো না। সুদাসের চাওয়া দেখ-সর্বস্ব। যে—বাস্তা দিয়ে গেলে পামার মন পৰ্ব্বত পৌঁছতে পারতো, দুর্ভাগ্যক্রমে সুদাস সে-বাস্তা মাড়াল না। আমি তা হলে জিতেছি। সুদাসের স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে। নিজেকে এমন শোচনীয় ভাবে সুদাস চারিয়ে দেবে ভাবতে পারিনি। পেশা ওর দালালী। একটা দালালের পেশাগত যে বাক-চাতুর্ঘ্য, বৈধ্য আর সংঘম থাকে সুদাসের তা নেই বোঝা গেল।

আর বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা যুক্তিসঙ্গত মনে করলুম না। পামার মন নিয়ে যে পরীক্ষা আমি করেছিলুম, তাতে পামা প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে। এর পর আমি একুণি বন্ধি নিজের উপস্থিতি না জানাই, তবে সুদাস একটা কিছু করে বেলতে পারে। সুদাস এখন একটা আহত বাঘের মতোই হিংস্র হয়ে উঠেছে।

পায়ের আঙুরাজ তুলে আমি ঘরের ভিতর ঢুকতেই হুজনে সচকিত হয়ে উঠল। সুদাসের উদ্ভূত তখন স্পষ্ট অসহায় চক্কর ছাপ। আমি সহজ সরে বললুম, আরে সুদাস যে! পামাকে পৌঁছে দিতে এসেছিলে বুঝি?

আমতা-আমতা করে স্তন্যাস বললো, এই—ইয়ে, মানে—
ঘরের মধ্যে যে গুমোট হাওয়া জমেছিল, সেটা কাটিয়ে দেবার
জন্তে পামাকে বললুম, এক গ্রাস জল দাও তো।

পামা জল গড়িয়ে আনতে গেল রান্নাঘর থেকে। এই অবসরে
স্তন্যাসকে আমি বললুম, তা হলে, স্তন্যাস, তুমি ঘরে গেলে?

অবাক হয়ে গেল স্তন্যাস।

ধনের দালাল স্তন্যাস এখনো বুঝে উঠতে পারছে না আমি কী
করে ওর মনের কথা বুঝতে পেরেছি। ওর চোখে প্রথমে ফুটে
উঠল বিস্ময়, তারপর দীর্ঘ আর তারো পরে লজ্জা। মাথা নীচু
করে রইল স্তন্যাস।

এ অবস্থার পরাজিতের মনে আঘাত দেওয়া ঠিক নয়।
তবে সময়মতায় ভেঙ্গে পড়তেও ইচ্ছে হলো না। নিজের
শক্তির ওপোর অগাধ বিশ্বাস ছিলো স্তন্যাসের। কোনদিন
কোন মেয়ের কাছে নাকি তার স্বীকার করেনি। তাই হেরে যাওয়া
কী কিনিস স্তন্যাসের তা জানতে বাকী ছিল। আজ যখন বুঝতে
পারলো পামাকে লোভ দেখিয়ে বন্দিভুক্ত করা সম্ভব নয়, তখন আর
তার কৌশল বদলাবার সময় ছিল না। বড় দেরীতে স্তন্যাস তার
জুল বুঝতে পারলো। ভালবাসার বেলায় যে-কোন ভুলই খুব
ক্ষতিকর। সব মেয়েই যে এক রকম হবে, সে মেয়ে ভালোই
হোক আর মন্দই হোক, তার কোন মানে নেই। আতা,
স্তন্যাস যদি এটা আগে একটু বুঝতে পারতো।

পারলেই বা। কী আর হোত? আমাকে না হয় আর একটু
সতর্ক হতে হোত। আরো তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হতো পামার মনের
ওপোর। যে স্বভাবতই গভীর অথচ পরিহাস-নিপুণ তার সঙ্গে
সাদামাটা স্তন্যাস পাল্লা দিতে পারবে কেন?

জল খাবার পর পামাকে বললুম, তুমি গুয়ে পড়। আমি
আসছি। চলো স্তন্যাস, তোমাকে একটু এগিয়ে দিয়ে
আসি।

—না না। রাত অনেক হয়েছে। তোমার আর কষ্ট করে
যেতে হবে না। স্তন্যাস ভাড়াভাড়ি বললো।

বুঝতে পারলুম, স্তন্যাস আমার সঙ্গে এখন এড়িয়ে যেতে পারলেই
বাঁচে। কোন কথা বলতে রাজী নয়। মনে মনে সে যে কী পাঁচ
কষছে বুঝতে পারলুম না। সামাজিক কিছু আবার কবে বসবে
না তো? অবশ্য আজকের মতো বা হবার হয়ে গেছে। তবে
ভবিষ্যতের কথা বলা যায় না। যদি এ পরাজয়ের প্রতিশোধ
নিতে গিয়ে পামার দৈহিক কোন ক্ষতি করে বসে? আজকাল
তো প্রায়ই এমিড দিয়ে মুখ পুড়িয়ে দেওয়া, ছুরি দিয়ে
মেহ ক্ষত-বিক্ষত করে দেওয়া একটা রেওয়াজ হয়ে গেছে।
আমি বুঝতে পারি না, এ আবার কী ধরণের ভালবাসা যে,
বাহিত জনকে না পেলে তার কোন ক্ষতি করতে হবে!
এটাকে মনের কোন বিকার হয়তো বলা চলে। কী জানি।
আমি মনস্তাত্ত্বিক নই। হয়তো মনস্তত্ত্ববিদেরা এর কোন মানে
খুঁজে বার করতে পারেন। বাই হোক, পামাকে মোট কথা
সাবধান করে দিতে হবে।

স্তন্যাস চলে যাওয়ার পর ভারী মন নিয়ে পামার কাছে ফিরে
এলুম। এতো রাত হয়ে গেছে, অথচ ঘুম আসছে না। পামা

আমাকে দেখে উঠে বসল। হাঁটুর ওপোর খুঁতনি বেধে আমার
দিকে চেয়ে রইল।

একটা সিগারেট ধরিয়ে একটু অভ্যমনস্ত হবার ভাণ করলুম।
কোন রকমেই পামার সঙ্গে আর স্তন্যাসের প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা
করবার প্রবৃত্তি আমার হলো না। বেশ বুঝতে পারছি, পামা
আমার পতীকার ব্যাপার অল্পমান করে ফেলেছে এর মধ্যে। নইলে
যে-কোন পুরুষ এতক্ষণে একটা কুক্কেত্র বাধিয়ে তুলত।

—তুমি তা হলে জিতে গেলে, না? পামা তির্যক হেসে বলল।
আমি আগে বুঝতে পারি নি, কেন স্তন্যাসকে তুমি এত প্রজ্ঞার
দিতে। আজ বুঝতে পারলুম।

—কী বুঝলে তুমি?

—বুঝলাম, মেয়েদের তোমরা বাজারের পণ্য ছাড়া আর কিছু
ভাবো না।

—তা হলে ভুল বুঝেছ।

—মেয়েরা যে স্বাভাবিক অহুভূতি নিয়ে জন্মায়, তাহলে সেটাও
ভুল, কী বলা?

—কী অহুভূতি নিয়ে মেয়েরা জন্মায় জানি না। তবে এটুকু
জানি যে, মেয়েরা সত্যিকারের কাউকে ভালোবাসলে, তার প্রতি
কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করে না।

—পরিবেশ কিছু বিশ্বাসঘাতকতা করতে সময় সময় বাধ্য
করে।

পামাকে আর যাঁচাতে সাহস হলো না। হয়তো বিগত
জীবনের কথা মনে পড়বে। আর একবার বা হারিয়ে গেছে, বা
কোন দিন কোন অবস্থাতেই ফিরে আসবে না, তা মনে পড়লেই
কাঁদতে বসবে। ওকে হুঃখ দিতে মন চাইল না। এমনিতে
আজ ও অনেক হুঃখ পেয়েছে। আশ্চর্য্য এক অহুঃস্পায় ছেয়ে
গেল মন।

—তুমি ঘুমোও। আমি পামাকে বললুম, আমি একটু কাজ
সেয়ে নি। অল্প সময় তোমার কথার উত্তর দেওয়া বাবে।

উত্তর ওর জানা আছে। মর্যাস্তিক ভাবেই জানা আছে।
পরিবেশ কেমন করে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করার। আমার উত্তরের
অশেকার ওকে থাকতে হবে না।

ভোর হবার একটু পরেই কানাই-এর বাড়ির উদ্দেশে বেরিয়ে
পড়লুম। কানাইকে সাহায্য করা আমার উচিত। তাছাড়া ওর
আত্মীয় বলতে, বন্ধু বলতে আমি ছাড়া আর কে আছে? ঘর-
সংসার গুছিয়ে দেবার জন্তে অবশ্য ত্রীলোকের সাহায্য ছাড়া চলবে না।
তবু একজন পুরুষমাত্রেয়ের উপস্থিতি মনের জোর অনেকটা বাড়িয়ে
দেয়। আর কিছু না হোক পরামর্শ দেবার মত একজনকে চাই-ই
চাই। অনেক সময় নিজের মনের কথা কাউকে শোনাতে পারলেও
শান্তি পাওয়া যায়।

কানাই উপহার পাওয়া লরীটার তদারক করছে দেখে খুশী
হলুম। নতুন বোঁ নিশ্চয় দিন কয়েক বাড়েই বুঝতে পারবে
যে সে বাপের বাড়ী থেকে আসবার সময় একটা সতীন সঙ্গে
করে এনেছে। তখন নিশ্চয়ই তার আর লরীটাকে ভালো
লাগবে না।

আমাকে দেখে কানাই হাসিমুখে এগিয়ে এলো।

—নয়ন, গাড়ীটার একটা নাম দাও।

—নাম তো বা হয় একটা দিলেই হোল।

—না না। নামকরণের জন্তে দস্তুরমতো আমি খটা করব।

—সে কি! আমি কানাই-এর উদ্ভট খেয়াল দেখে অবাক হলাম।

—তুমি বুঝে পারছো না, নয়ন। খাবার দাবার তো অনেক বেঁচে গেছে। তাই দিয়ে আজই আমি একটা উৎসবের আয়োজন করতে চাই। বাড়তি খরচা তো আর লাগছে না। মাংসখান থেকে বাদে বাদে বলা হয়নি, তাদেরও নিয়ন্ত্রণ করা বাবে এই উপলক্ষে।

আমি ওর বুদ্ধির প্রশংসা করে চললাম, বেশ তো। এটা উত্তর প্রত্যাশ। খাবারের সঙ্গতি করতে আমি কোনদিন পেছপা হইনি। লাগাও ধূম ধাড়াকী।

—সে তো হোল। কিন্তু আসল কাজটা কর। একটা নাম ঠিক কর।

—নামের জন্তে ভাবনা কি? 'দীনবন্ধু' 'পদ্মের সাধী', এরকম যা হয় একটা দাও।

—উঁহ। ও সব বস্তাপট্টা নাম চলবে না। আমাদের জীবনের সঙ্গে মিল আছে, এমন একটা নাম দাও।

—সেটা ভাই, ভেবে বলতে হবে।

—ভাবো এক্ষুণি।

—আরে এক্ষুণি ভাবা যায় নাকি? আমি অসহায়ের মতো বলি। জীবনে এরকম অবস্থায় কখনো পড়তে হবে জানলে হুঁ-চারটে নাম না হয় আগে থেকে বানিয়ে রাখা যেত। কোনদিন কেউ নামকরণের জন্তে আমার সাহায্য এভাবে চাইবে স্বপ্নও ভাবতে পারিনি। নাম দেয় নামী লোক। আমি তো অতি সাধারণ একটা লরীওয়াল। অহঙ্কার একটু চোল মনে মনে।

কানাইকে অভয় দিয়ে বললাম, তুমি ভোগাড় বস্ত্র করে ফেল উৎসবের। আমি তোমার লরীর একটা অসাধারণ নাম দোব। যার মানে বলতে বলতে তুমি অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে।

আমাকে সঙ্গে নিয়ে কানাই কয়েক জায়গার নিয়ন্ত্রণ করার পর বললো, চলো আমাদের পুরানো বাসার বাওরা বাক।

বাড়িতে এসে কানাই পামার কাছে বসে পড়ে বললো, বৌদি, আমার ক্ষমা চাওয়ার সুখ নেই। কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই জানো যে, কালকের ব্যাপারে আমার বিন্দুমাত্র দোষ ছিল না। আমি খুব অসহায় ছিলাম বলেই তোমার চোখের জল ফেলে আমার বাড়ি থেকে কিয়ে আসতে হয়েছিল। আমি আজ একটা উৎসবের আয়োজন করেছি। উৎসব আর কিছুই নয়, আমি বিয়েতে যে লরীটা পেয়েছি, তার নামকরণ করা হবে। তুমি হবে প্রধান অতিথি। ভয় নেই, আজ তোমাকে কেউ কিছু বলার স্পর্শ দেখাতে পারবে না।

—কেউ কিছু বললে, তার মুখ আটকাবে কেমন করে, ঠাকুরপো? পামা বিরগ্ন হয়ে জানতে চাইল।

—সে তার আমার ওপোর দিয়ে নিশ্চিত থাকতে পারো, বৌদি। আমি জান কবুল করলাম তোমার কাছে। দেখে নিও, তোমার ঠাকুরপো আজ তার কথা রাখতে পারে

কি না পারে। দুট গলার কানাই পামাকে আশ্বাস দিলো।

—ঠাকুরপো, কিছু মনে করো না। পামাকে আর কিছুই যথেষ্ট জড়াতে দেও না। তুমিও হুঁ-খ পাবে, আমিও পাবো। তুমি জানো না আমি কী হুঁ-খ্যা নিয়ে জন্মেছি। ভাল হবে জেনে যে জিনিসে হাত দিতে চাই, তাই মন হয়ে পাড়ায়।

—তার জন্তে তুমি তো দায়ী নও, বৌদি।

—কাউকে আমি দায়ী করতে চাই না, ভাই! আমি শুধু একজীবন থেকে মুক্তি চাই।

মুক্তি চাই বললেই—

আমি এতক্ষণ নির্বাক শ্রোতা ছিলাম। কানাইকে বাধা দিয়ে বললাম, কানাই এখন এত করে বলছে তখন আজকের দিনটা অন্তত কানাই-এর আদ্যার তোমার রাখা উচিত। পামা, চলো আমরা সবাই মিলে সকলের স্বাস্থ্য পান করে বিগত দিনের জ্বালা ভুলে বেতে চেষ্টা করি।

কানাই আমার দিকে চেয়ে দাগত্বয়ে বললো, স্বাস্থ্যপান আজ সকলের সঙ্গে বৌদি করতে পারবে না। অন্তত আমি তা হতে দেবো না।

—বেশ বেশ। তোমরা নিজেরা ঠিক কর কী করবে। আমি ওতে আর নেই। আমাকে নাম ঠিক করতে বলো। আমি নাম ঠিক করে পামাকে দিয়ে দোব? পামা নামকরণ করে দেবে।

আমি ওদের রেখে বাইরে বেরিয়ে পড়লাম কাজের সম্মানে।

শেষ পর্যন্ত কানাই পামাকে হাজির করলো নামকরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে। সভাপতি হলো মহিম হালদার। লোকজন বেশী নয়—জন তিরিশেক হাজির হলো। বেশীর ভাগ মহাজন আর লরীওয়াল। তা ছাড়া দর্শক হিসাবে মজা দেখতে এলো কুড়ি-পঁচিশ জন। আর কোথাও কখনো লরী নামকরণের উৎসব অনুষ্ঠান হয়েছে কি না জানি না! এই জড়ুত ব্যাপার দেখবার জন্তে আরো বেশী সংখ্যক লোক দর্শক হিসাবে উপস্থিত হবে এ আশাই করছিলাম।

পুরোহিত স্তোত্র পাঠ করা শেষ করার পর, নামকরণের জন্তে পাঁচটা ঘিরের প্রদীপ জ্বালানো হলো।

লরীর বনেটের সামনের দিকে সিঁদুরগোলা দিয়ে স্বস্তিক চিহ্ন একে পামা ভয়ে-ভেজা গলায় ঘেঁষা করলো, নাম দিলাম, 'ঐরাবত'।

সঙ্গে সঙ্গে নারকেল ভাঙ্গার আওয়াজ মিশলো শাঁখ আর কঁাসর-ঘটার শব্দে। ধূপধূনা গুগুগু চারদিকে একটা পবিত্র আবহাওয়ার সৃষ্টি করলো। হৈ-হৈ করে স্তবধনি দিলো উপস্থিত সকলেই।

কানাই-এর অজুযোখে পামা সবাইকে মিষ্টি দিলো। আমি আশঙ্কা করছিলাম, হয়তো বৌভাতের রাতে যে কুংসিত দৃশ্য অভিনীত হয়েছিলো আজো তাই হবে। কিন্তু দেখলাম আমার চেয়ে অনেক বেশী বুদ্ধি কানাইয়ের। এটা কোন সামাজিক অনুষ্ঠান নয়। কানাই পামাকে দিয়ে প্রমাণ করতে চাইলো যে সমাজস্বাক্ষরকে নিজেদের অহমিকা বজায় রাখবার জন্তে যে-দৃষ্টের অবতারণা করেছিলো, ব্যবহারিক জীবনে তার কোন দামই নেই। বার পামার উপস্থিতি সহ করতে পারেনি, আজ তারাই নিঃশব্দে বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ না করে তারই হাত থেকে মিষ্টি নিয়ে খেতে আগন্তিক করলো না।

পামাকে লাগপাড় গরদের শাড়ীতে অতি সুন্দর মানিয়েছিল। ওকে দেখে যে-কোন লোকের মনে হবে যে বড় একজন মোটরগাড়ী সমাজসেবিকা—যে অবসর বিশ্রামের জন্য একটা কিছু করার দরকারে সমাজ কল্যাণের পথ বেছে নেয়। আঁঠা, প্রাণের ভাগিদে ক'জনই বা কাজে হাত লাগাতে চায়! তাই যদি হোত তবে দেশের অবস্থা কত আগেই না ভাল হয়ে যেত। বার অংশে বস্তুত্ব পড়েছে, সে যদি ততটুকুই ভাল লাগে করতো, তবে পঞ্চবাণীকী কল্লনাগুলির সার্থক রূপায়ণ কত সহজেই, কত কম খরচেই না হোত। যদি ইঞ্জিনিয়ার কাজে কীকি না দিতো, অথবা ঠিকাদার কমদামের মাল না চালাতে চেষ্টা করতো।

সভার কোন জায়গা থেকেই যখন কোন গোলমাল দেখা গেল না, তখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বীচলুম। সুদাস এক অবসরে আমার চুপি চুপি বলে গেল, বাক পামার সমাজ-প্রতিষ্ঠা হয়ে গেল। আর কোন ভয় নেই।

ভয় নেই বললেই তো আর ভয় চলে যায় না!

সংাই চলে যাবার পর পামাকে মহিম বললো, শোন বোঁমা, বোঁজাতের রাতে যে অভয় ব্যবহার পেয়েছো, তার জন্তে মন খারাপ করো না। আমরা সবাই তার জন্তে তোমার কাছে কমা চাচ্ছি।

পামা ঘোমটা শুধু একটুখানি টেনে মাটির দিকে তাকিয়ে বইল।

কানাইয়ের বোয়ের সঙ্গে সৌজন্যসূত্রে হুঁচকারে কথ্য বলে আমরা—আমি আর পামা ফিরে চললুম বাড়ির দিকে।

মোনী পামা অত্যন্ত ভয়বহ। আজ এতদিন যবে ওকে দেখছি, কখনো, হাজার হুঁশের মধ্যেও, হাসি ছাড়া কথা বলেনি। আমার অক্ষমতা ওর কাছে প্রচণ্ড কৌতুক। কখন কখন আমাকে রাগানো ওর বিলাস। ওর মানসিক পরিবর্তন আমার দারুণ ভাবিয়ে তুলল।

হঠাৎ গলা পরিষ্কার করে পামা আমার বললো, রাগ করোনি তো?

আমি বুঝতে পারলুম, কেন এ প্রশ্ন পামা আমার করল। কানাইয়ের লরীর নাম আমি যা ঠিক করেছিলাম, পামা তা রাখেনি। ও নিজের ইচ্ছে মতো একটা নাম দিয়েছে। নিশ্চয় ওর কোন মতলব আছে ভেবে আমি কোন উচ্চবাচ্য করিনি।

—না। রাগ করবো কেন? তা ছাড়া, তোমার দেওয়া নাম খুব সুন্দর হয়েছে। আমি ওকে সাধনা দিয়ে বলি।

কৃতজ্ঞতার ওর চোখ ছলছল করে উঠল। আমার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর হঠাৎ নীচু হয়ে প্রণাম করলো।

আমার বিব্রত ভাবকে আমল না দিয়ে পামা বলে চললো, তুমি তো কৈ জানতে চাইলে না, কেন আমি তোমার দেওয়া নাম পাটে দিয়েছি? তুমি জানতে না চাইলেও আমার বলা দরকার হয়ে পড়েছে। তুমি তোমার দেওয়া নামের যে মানে করছ, তা তোমাদের জীবনে খাপ খায় না। ঠাকুরপো বিয়ে করে সংসারী হল। তুমিও মনে মনে সংসারী হতে চাও, কেন না আমাকে তুমি বহুবার অমুরোধ করেছ। ঘর ছেড়ে তোমরা বাইরে বাও, কয়েক ঘণ্টা বা কয়েক দিন বাসে কিংবার জন্তেই। কিন্তু ভাবোতো সত্যিকার 'অনিকেত' কে? তুমি তো ঐ নামই আমার বলতে বলেছিলে?

পামার মানসিক দৃষ্টি অদ্ভুত ভাবে ওর দ্বারা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জুড়ে বসেছে। ও আজ কেবল হুঁশের কথাই আমাকে বলবে। আর বলে শান্তি পাবে। যদি এভাবে ও শান্তি পায়, পুরানো ঘটনা ভুলে যেতে চায়, তাহলে আমার কোন আপত্তি নেই। কাউকে না ফাঁদে মনের কথা খুলে বলা দরকার। তাতে পুঞ্জীভূত বেদনার খানিকটা উপশম হতে পারে।

কিন্তু ভুল ভাঙ্গল পামার পরের কথায়।

—তোমার জিনিষপত্র কোথায় কী আছে দেখে নাও। পামা আমাকে একেবারে ধরাশায়ী করে দিলো।

—সে সব যে বোঝবার তাকে বোঝাও গে। আমি কোন দিন ওসব নিয়ে মাথা ঘামাইনি। আজও ঘামাতে পারব না। আমি পরিষ্কার জবাব দিয়ে দিলুম।

বিলম্বাঙ্গ বিচলিত দেখা গেল না পামাকে। আমাকে এক গ্রাস মিছরি সরবত এনে দিলো। তারপর সন্ধ্যাদীপ আলিয়ে শাঁখ বাজালো। যবের নিত্যনৈমিত্তিক কাজে সে যখন মন দিলো, তখন আমি নিশ্চিন্ত হয়ে বাইরে যেয়ে গেলুম। একটা জরুরী মাল পৌঁছে দিতে হবে কলকাতায়।

গোলা থেকে মাল বোঝাই করতে করতে ডাবছিন্নুম, এবার যখন আমাদের দুটো লরী হল, তখন একটা সমবায় সমিতি করে পরিবহন ব্যবসাতিকে আরো বাড়িয়ে দিলে কেমন হয়। কানাইকে বোঝাতে হবে ব্যাপারটা। তাহলে 'সিগুকেটওয়ারা'দের সঙ্গে সমানে সমানে পাল্লা দেওয়া যাবে।

ঝড়ুরা চালান হাতে নিয়ে ফিরে এলো। মাল তোলা বেশ তাড়াতাড়ি তা হলে শেষ হয়েছে বলতে হবে। গাড়ীতে ষ্টার্ট দিয়ে কলকাতার দিকে এগুতে লাগলুম। আবার সেই নিশ্চিন্ত রাত। হায়নার থেকে থেকে বিল্লী হাসি। হঠাৎ বৃষ্টি হয়ে গিয়ে রাস্তা পিছল হয়ে গেছে, ধারে ধারে অনেক জায়গায় জল জমেছে গর্তে, কাদায় ভর্তি জায়গায় গাড়ীর চাকা একবার পড়লে তুলতে বেশ বেগ পেতে হবে।

নির্জন রাস্তা দিয়ে বেশ আসছিলাম। পথের ধারে দেখি গজুরাম ঠোঁটেলি করছে তার একটা লরী। চাকা পিছলে যাচ্ছে। রাস্তায় উঠাতে পারছে না। আমি নিজে থেকেই গাড়ী থামিয়ে এগিয়ে এলুম ওর দিকে।

—কী ব্যাপার, ভায়া? নীচে কী জহরৎ খুঁজতে নেবেছিলে নাকি? আমি ঠাটা করে বলি।

—না ভাই। একটা গাড়িকে পাশ দিতে গিয়ে এই হাল হয়েছে। গজুরাম আমার বলল।

—খেজুরপাতা দাঁও চাকার তলার নষ্টলে চাকা উঠবে না।

—তুমি একটু তোমার গাড়ী দিয়ে ঠেলে দাঁও না, ভাই! সকাতে অমুরোধ করলো গজুরাম।

—আরে বাপস। আমার বোঝাই গাড়ী। বোঝাই গাড়ী নিয়ে আমি 'রিসক' নিতে পারবো না, ভাই!

—তব তুমি জাহান্নামে বাও। একেবারে রাষ্ট্রভাষা হাঙ্গল গজুরাম।

‘জয় রামজীকি’ বলে গাড়ী ছাড়লুম।

‘কালিয়া’ ঢেক-পোটে এসে গাড়ী ধামিয়ে আমি একবার গ্রেট কালীতারা কেবিনে ভাঙড়ী মশায়ের কাছ থেকে একটা বোতল নিয়ে চললুম পামার উদ্দেশ্যে। গ্রেট কালীতারা কেবিনের জমজমাট জনতাকে পেছনে ফেলে যেতে এতটুকু মায়া আমার হোস না।

তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে দেখি দরজা খোলা। আশ্চর্য হয়ে দরজা খুলে ভেতরে গিয়ে দেখি সন্ধ্যাদীপ তখনো ঘলছে। এমন তো কখনো হয় না! পামা কোন দিন এরকম অববেচনার কাজ করেছে বলে তো মনে পড়লো না? পামা! পামা! বলে নিজের অজান্তেই আমি জোরে চীৎকার করে উঠলুম। ‘কা-কস্ত-পরিবেদনা’! কেউ নেই, কোথাও নেই। মাথা আমার বিম-বিম করে উঠল।

শোবার ঘরের মাঝখানে একটা জলচৌকির ওপোর চাবির গোছা চাপা দেওয়া একটা চিঠি পেলুম। মিটমিট করে জলা হারিকেনটার পলতে আরেকটু বাড়িয়ে পামার লেখা চিঠিটা পড়তে লাগলুম :

“প্রিয়পেশু,

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মন কতই না বদলে যায়! কাল বা সত্য ছিল, সুন্দর ছিল, আজও তাই তা থাকবে—এ আশা করা যায় বটে, কিন্তু আশা আশাই থেকে যায়।

প্রথম বৈদিন তোমার হাত ধরে এ বাড়িতে উঠি, তখন আস্থা ছিল, বল ছিল, ছিল বিশ্বাস। আজ আমি চলে বাচ্ছি, এখনো তোমার ওপোর সবটুকু দোষ চাপিয়ে দিয়ে যেতে মন সায় দিচ্ছে না। কোথায় বাবো জানি না। কিন্তু যেতে আমার হবেই তোমার শক্তির জোরে তুমি আমার নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছ। সুদাস বাবু তোমার বুদ্ধির প্যাচে পড়ে নাজেহাল। আমিও ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। যেখানে, যে-সমাজে আমার স্থান নেই, সেখানে, সে-সমাজে আমার মন আর সমাজস্বার্থী হয়ে উঠতে পারলো না। আমার আকশোষ রয়ে ধেল।

তুমি আমার জন্তে কত কী করেছ। কিন্তু বা করে উঠতে পারিনি, হয়তো সেটা একান্তই তোমার দোষ নয়, সেটার প্রতি আমার মন বিদ্রোহী হয়ে উঠলো। সুদাস বাবু ঠিকই বলেছেন; তুমি অস্তুত আমার হয়ে বোভান্তের দিন কিছু একটা করতে পারতে। আচ্ছা, দুটো সাধনার কথাও কী বলতে পারতে না?

ঠাকুরপো বুদ্ধি করে আমার সামাজিক প্রতিষ্ঠার আয়োজন করলো। আর তুমি? ওগা, তোমার ওপোর যে আমার অগাধ বিশ্বাস ছিলো!

নামকরণের দিন তুমি অদ্ভুত একটা নাম দিলে লরীটার—‘অনিকেত’। মানে বললে, গৃহহীন। আমি তা মেনে নিতে পারি নি। তাই তোমার দেওয়া নাম বদলে দিয়েছি। আমার ক্ষমা করো।

আজ আমার যেতে কষ্ট হচ্ছে। কষ্ট হচ্ছে তোমার জন্তে, কানাই ঠাকুরপোর জন্তে। জানি না কোথাও আবার আমার ঠাই হবে কি না। তবে আবার আমার ঠাই দিয়ে কী হবে? আমি তো তোমার ভাষার ‘অনিকেত’। নিকেতন হীন পথই আমার সঘল, তাই পথের মধ্যে পথেই বেরিয়ে পড়লাম।

আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম নাও—পামা”

চিঠিটা পড়ে অনড় হয়ে বসে রইলুম। চাবির গোছার হাত বুলিয়ে দেখলুম কী ভীষণ ঠাণ্ডা! আমার চটিজোড়া, গামছা, বিছানা পরিশাটি করে সাজানো। মনে হলো কে যেন আমার জন্তে ঘর সাজিয়ে প্রতীক্ষা করছে।

কী হোল? পামার হঠাৎ এ ধরণের মস্তিগতি কেন হল? আমি তো ওকে ভালবাসি। আমার পরীক্ষা-নিরীক্ষার পালায় ও অসম্বত্ব হয়েছে বলে আমাকে একবারও জানাবার দরকার মনে করলো না? কী নিমকহারাম মেয়েরা?

আবার ঘরের দিকে দৃষ্টি ফিরে এলো। মেঝেটা কী সুন্দর পরিষ্কার আর ককককে। হারিকেনের চিমনি অদ্ভুত ভাবে সালা।

নাঃ! আমি আর ভাবতে পারলুম না। একটানে বোতলের ছিপি খুলে গলার মধ্যে নির্ভেজাল মদ ঢেলে দিতে লাগলুম। বুক জলে গেল। এ জলার সঙ্গে সঙ্গে যদি পামার স্মৃতি, তার স্পর্শ বিলুপ্ত হয়ে যেতো? যদি যেতো বিগত দিনের সব হাসি-কান্নার মুহূর্তগুলি এমনি করে পুড়ে থাক হয়ে। যে জীবন কামনা করেছিলুম অথচ পাইনি আর কখনো পাবো না বলে জানি, সে জীবনের কথা যদি আর ভাবতে না হোত!

বাক সব শেষ হয়ে। বাক নিঃশেষ হয়ে চেতনা লোপের পরম বন্ধু। জ্ঞান হারিয়ে ফেলতে চাই, অনাগত ভাবে অভ্যর্থনার আশায় নয়, বর্তমানকে স্মৃতি থেকে মুছে ফেলতে। জীবনের পাত্র শূন্য হতে আর কতটুকুই বা বাকী!

শেষ

“আমি প্রাচ্য ও পশ্চাত্যদেশ অনেক ঘুরিছি, অগতের সম্বন্ধে আমার একটু অভিজ্ঞতা আছে। আমি দেখিলাম, সকল জাতিরই এক একটি প্রধান আদর্শ আছে, তাহাই সেই জাতির মেরুদণ্ডস্বরূপ। রাজনীতিই কোন কোন জাতির জীবনের মূল ভিত্তিস্বরূপ, কাহারও কাহারও বা সামাজিক উন্নতি, কাহারও কাহারও আবার মানসিক উন্নতি-বিধান, কাহারও বা অস্ত কিছু জাতীয় জীবনের ভিত্তি। কিন্তু আমাদের মাতৃভূমির জাতীয় জীবনের মূল ভিত্তি ধর্ম—একমাত্র ধর্ম। উহাই আমাদের জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড, উহারই উপর আমাদের জাতীয় জীবনরূপ প্রাসাদের মূল ভিত্তি স্থাপিত।”

—স্বামী বিবেকানন্দ।

পাগলা হত্যার মামলা

ডঃ পঞ্চানন ঘোষাল

যে সকল মামলা কলিকাতা তথা ভারতীয় পুলিশের ইতিহাসে বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে, “পাগলা মার্ভার কেস” বা পাগলা হত্যার মামলা উহাদের মধ্যে এক অগুতম। এই মামলাটি সম্পূর্ণরূপেই পারিবেশিক প্রমাণের উপর নির্ভর করে আদালতে সোপর্দকৃত হয়। মামুর মিথ্যা কথা বসলেও, পরিবেশ মিথ্যা বলে না। তাই এই হত্যাকাণ্ডটির কোনও প্রত্যক্ষদর্শী না থাকলেও এই মামলার একজন আসামীর প্রাণদণ্ড এবং দুই জন আসামীর বাবজীবন দীপান্তর সম্ভব হয়েছিল। এই থেকে বুঝা যাবে, কিরূপ দৈর্ঘ্য ও চাতুর্যের সহিত এই মামলা তদন্ত ও সোপর্দকৃত হয়েছিল। এই মামলার তদন্ত সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় পদ্ধতিতে সমাধা করা হলেও এই তদন্তরীতি পৃথিবীর ইতিহাসে অতুলনীয়। তাই মহাপ্রাণিকরণ জাতিসংঘের সাহেব হাইকোর্টের সেন্সে কোর্টে উহার রায়-দান প্রসঙ্গে এই স্থললিখিত তদন্তকে পুলিশি তদন্তের জয়যাত্রারূপে অভিহিত করেছিলেন।

এই মামলা সম্পর্কিত ঘটনা ও উহার তদন্ত জনসাধারণের মনকেও কম আলোড়িত করে নি। কারণ, এই মহাতদন্তে পুলিশের জায় জনসাধারণেরও বহু ব্যক্তি অংশ গ্রহণ করেছিল। ঐ ঘটনার পর বহু বৎসর অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে, কিন্তু ঐ হতভাগ্য নিহত ব্যক্তি ও উহার হত্যাকাণ্ডের বিষয় জনসাধারণ আজও ভুলে নি। উত্তর-কলিকাতার গৃহে গৃহে এই ঘটনাটি আত্মও আলোচিত হয়ে থাকে। এই ঘটনার নারিকা ছিল এই শহরের এক অপূর্ণ সুন্দরী নারী। এই নারীর অদম্য ভালবাসা একাধারে নিহত ব্যক্তি ও তাহার হত্যাকাণ্ডের উপর পড়ে। ইহাই ছিল এই অভাবনীয় ও নৃশংস হত্যাকাণ্ডের মূল কারণ। তাই বহু বৎসর ধরে বহু সাহিত্যিকও ঐ ঘটনাটির সদ্যাবহার করেছেন। উপরন্তু এই মামলার তদন্তে পুলিশ বিশেষরূপে জনসাধারণের সক্রিয় সাহায্যলাভ করেছিল। তাই মামলাটিকে এই সম্পর্কে আজ পর্যন্ত একটি উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা হয়।

এইবার মূল ঘটনা সন্ক্ষেপে বিবৃত করা যাক। এই সময় আমি শ্রামপুত্র থানার একজন অফিসাররূপে কর্মস্থান ছিলাম। ঐ দিন তারিখ ছিল ১৯৩৬ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর। সকাল আটটার সময় আমরা থানার অফিস-খরগুলিতে নিজ নিজ কাজকর্মে মনোনিবেশ করছি, এমন সময় কলিকাতা করপোরেশনের ওভারসিয়ার বাবু বিনয়কুমার রায় হস্তান্তর হয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন। ভ্রমলোকের সঙ্গে আমার পূর্বে হতেই পরিচয় ছিল। বিস্মিত হয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ‘আরে ব্যাপার কি মশাই! আপনার আবার কি হল?’ ভ্রমলোক নিজের সন্ক্ষেপে কোনও কথা বলতে আসেন নি। তিনি চোখ দুটি বড় বড় করে বলে উঠলেন, ‘সাংবাদিক কাণ্ড মশাই, জীবনে এ আমি দেখিনি। খুঁটী পর্যন্ত কেটে নিয়েছে!’ এক সঙ্গে

আমাদের সব কয়জনেরই হাতের কলম খেঁমে গেল। ঘটনাটি তাঁর নিকট শুধা মাত্র আমি হবিলদারকে একজন জমাদার ও দশজন কনেষ্টবল তৈরি করবার জন্ত আদেশ দিয়ে, ব্রিহত গতিতে সংবাদ-বহিতে প্রাথমিক সংবাদরূপে তাঁর নিয়ন্ত্রিত বিবৃতিটি লিখে নিলাম।

‘আমি একজন করপোরেশনের ওভারসিয়ার। সকাল ছয়টার সময় আমি প্রতিনিয়মের মত এই দিনও মেথরদের কাছে খবরদারী করতে বার হই। ঘুরতে ঘুরতে আমি বলরাম মজুমদার স্ট্রীট এসেছি, এমন সময় আমাদের বাড়ি দার মোহন সম্মুখের মেথর-গলি হতে ছুটে বেরিয়ে এসে আমাকে বলল, ‘বাবু বাবু, ভিতরে একটা খুঁটাকাটা লাস পড়ে রয়েছে।’ আমি সাহস করে ঐ গলির ভিতর কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে দেখি, একটা খুঁটাহীন দেহ দেওয়ারালের ভিতর একটা গর্তে ঢুকানো রয়েছে। এর পর আমি মোহনকে বাইরে অপেক্ষা করতে বলে আপনাদের খবর দিবার জন্ত ছুটে ছুটে থানায় এসেছি।’

উপরি-উক্ত প্রাথমিক সংবাদটি থানার নথিভুক্ত করে আমি ইনস্পেক্টার সুনীল রায় এবং অস্ত্রাস্ত্র অফিসারদের সহিত ব্রিহত গতিতে ঘটনাস্থলের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। কোনও গুরুতর অপরাধের তদন্তে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন বথাসময় ঘটনাস্থলে গমন, তা না হলে বিলম্বের কারণে বহু সাক্ষ্যপ্রমাণ বিনষ্ট বা অন্তর্হিত হয়ে যায়। ঐ সময় অধুনাকালের জায় থানার থানার হস্তশকট দেওয়া ছিল না। এই জন্ত নিজ খরচার ট্যাক্সি কয়েই আমরা ঘটনাস্থলে গমন করি। তাছাড়া অধিক অফিসার সঙ্গে নেওয়ার একটি কারও ছিল। কারণ, ঘটনাস্থলে এমন অনেক সংবাদ পাওয়া যেতে পারে, যার জন্ত এক একজন অফিসারকে এক এক দিকে বিভ্রাৎগতিতে পাঠানোর দরকার হতে পারে। এইজন্য সমল বলে মাত্র পাঁচ বা ছয় মিনিটের মধ্যেই আমরা ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছিয়েছিলাম।

ঘটনাস্থলটি ছিল একটি অপরিষদ মেথর-গলিতে। এই অখ্যাত (পরে প্রখ্যাত) গলিটি কুমারটুলি অঞ্চলের বলরাম মজুমদার স্ট্রীট হতে নির্গত হয়ে দুই সারি বৃহৎ দ্বিতল অটালিকা বর্ষাচালুগের মধ্য দিয়ে বহুদূর পর্যন্ত চলে গিয়েছে। এর অপর মুখটি ধরে কিছুটা দূর এগিয়ে গেলে শোভাবাজার স্ট্রীট পর্যন্ত অনায়াসে চলে যাওয়া যায়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ঐ সকল বাটার পশ্চাত্ভাগে এমন একটিও দরজা ছিল না, যেখান দিয়ে কেহ এই গলিতে বেরিয়ে আসতে পারে। বস্তুত: পক্ষে এক করপোরেশনের মেথর ও বাড়ি দার ছাড়া এই মেথর-গলি বা সুর্যড-ডিচ অপর আর কারও দ্বারা ব্যবহৃত হবার কথা নয়।

এই মেথর-গলিটি দিয়ে কিছুটা দূর অগ্রসর হয়ে আমার মনে হল যে, এই গলিটার সহিত একমাত্র সিঁদেল চোরগণ ব্যতীত আর কারও পরিচয় থাকবার কথা নয়। এইজন্য বেতে বেতেই আমি

ইন্সপেক্টর রায়কে বললাম, 'দেখুন আমার মনে হয় হত্যাকারী একজন সিঁদেল চোর বা ডাকাতও বটে।' বিস্মিত হয়ে আমাকে সুনীল বাবু বললেন, 'এ কি বলছেন আপনি? যে সিঁদেল চোর সে তো খুনে-ডাকাত কখনও হয় না? এই সম্পর্কে বিলাতী বইগুলো তো অল্প বকম বলে।' এই সম্বন্ধে কয়েকটি বিলাতী কিতাব আমারও পড়া ছিল। কিন্তু তাদের সহিত সব কয়টি বিষয় আমি একমত হতে পারিনি। কারণ এই সম্বন্ধে আমার নিজেরও অনেক অভিজ্ঞতা ছিল। তাই উত্তরে আমি বললাম, 'দেখুন সিঁদেল চোর, ডাকাত ও খুনে আমার মতে এক শ্রেণীরই তিনটি উপশ্রেণী। কারণ এরা সকলেই বস্ত্র কিংবা ব্যক্তির উপর বলপ্রকাশ করে থাকে। এইজন্য যে সিঁদেল চোর সে খুনও করতে সক্ষম। তালাতোড়রা নিশ্চরোজনে আঘাত না হানলেও প্রয়োজন হলে আঘাত হানে। এইজন্য উহাদের মধ্যবর্তী অপরাধী বলা হয়ে থাকে। ডাকাতরা একাধারে দরজা-জানালা বা দেওয়াল ভেঙে সম্পত্তি অপহরণ করে এবং প্রয়োজন হলে ভয় দেখায় বা খুনও করে। তবে একজন নির্বীণ চোর, অর্থাৎ যে কোনও বস্ত্র কিংবা ব্যক্তি, কারণ উপর কোনও অবস্থাতেই বলপ্রকাশ করে না, সে সম্পূর্ণ এক বিভিন্ন শ্রেণীর অপরাধী। এইজন্য এরা কখনও হত্যাকাণ্ড করবে না। এই কারণে আমার মনে হয় যে এমন ব্যক্তি এই হত্যাকাণ্ড করেছে যে এই অঞ্চলে সাগল বা সিঁদেল চোরের কার্যের জন্য এই গণিটি পূর্বে ব্যবহার করেছে।'।

এই ভাবে কথোপকথনের মধ্যে আমরা মূল ঘটনাস্থলে এসে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। গলির তলদেশ হ'তে প্রায় চারি ফুট উচ্চ একটি বাটার শিঁছনের দেয়ালের ভিতরকার একটা গর্তে উপড় অবস্থায় একটা যুগ্মহীন দেহ রাখা রয়েছে। মস্তকটি বেশ বড়-সহকারে স্বক্বেশে ঘেঁষে পেটিয়ে কেটে নেওয়া হয়েছে। ঐ মৃতদেহের নিয়ে কোনও রক্ত দেখা না গেলেও উহা হতে মাত্র পাঁচ ফুট দূরে দুইটি রক্তের চাপড়া দেখা যায়। সত্যক দৃষ্টির সাহায্যে আমরা ঐ স্থানের বাটার দেওয়ালেও রক্তের ফোঁটা দেখতে পেলাম। বেশ বুঝা গেল, এইস্থানেই ঐ ব্যক্তিকে হত্যা করা হয় এবং তার ফলে রক্ত ফিনকি দিয়ে উঠে দেওয়ালের গায়ে লাগে। এর পর এই মৃতদেহটিকে ধরাধরি করে তুলে ঐ গর্তের মধ্যে ঘুসটে রাখা হয়। কিন্তু এই ভাৱি মৃতদেহটি অত উপরে তুলে রাখার জন্য একাধিক লোকের প্রয়োজন। এইজন্য আমরা ঐ সময়েই বুঝে নিই যে, হত্যাকারী একজন নয়, তারা নিশ্চয় দুই তিন বা ততোধিক ব্যক্তি।

এইবার কেহ কেহ ঐ দেহটি নীচে নামিয়ে পরীক্ষা করতে চাইলেন। কিন্তু আমি ও সুনীল বাবু এই সম্বন্ধে একমত হতে পারলাম না। এইজন্য আমরা ফটোগ্রাফার, প্রানমেকার ও ফিসার ও ফুট প্রিন্ট এক্সপার্টের জন্য অপেক্ষা করা সমুচিত মনে করলাম। বলা বাহুল্য, আমরা ঘটনাস্থলে রওনা হবার পূর্বেই ঐ তিন ব্যক্তিকে সোজা ঘটনাস্থলে আসবার জন্য কোনে বলে দিয়েছিলাম। কয়েক মিনিটের মধ্যে ঐ এক্সপার্টের অকুস্থলে উপস্থিত হলে আমরা প্রথমেই ঐ গর্তসহ মৃতদেহটির একটি আলোকচিত্র তুলবার বন্দোবস্ত করলাম। কারণ তা না হলে অল্প ও ভ্রূগণ প্রয়োজনবোধে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে এসে হরত আপন আপন ঘান-ধারণা বশতঃ বলে বসন্তের যে, ঐ অপরাধের গর্তে অত

বড় একটি দেহ প্রবেশ করিয়ে রাখা সম্ভব ছিল না। আমার বেশ মনে পড়ে, এই সম্পর্কে আমার সহকারীদের ঐ সময় আমি বলেছিলাম, 'আমাদের প্রতিটি সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করতে হবে তাদের কথা ভেবে যাদের কাছে শেষ বিচারের ভার আছে। তা না হলে আমাদের সকল পরিশ্রম এক দিন ব্যর্থতার পর্যাবসিত হবে।'।

এইখানে ফটোতোলা কার্যের পর ঐ গর্ত, মৃতদেহ, অবস্থার রক্তের চাপ এবং দুই পার্শ্বের বাটারগুলির পরিশ্রেক্ষিত ঐ গলিটির আরও দুই-তিনটি ফটোও আমরা উঠিয়ে নিলাম। এর পর প্রানমেকার এসে উপরোক্ত প্রতিটি পদার্থের পারম্পরিক মূল্য দেখিয়ে অতি সাবধানে ঐ গলির পরিধি ও দৈর্ঘ্যের মাপসহ ঐ গর্তেরও একটি প্রানমেকার নিলেন। এ ছাড়া সমধিক আলোকের অভাবে ফোটা তোলায় অনুবিধা হওয়ার আমরা কুমারটুলির বিখ্যাত শিল্পী গোপেশ্বর পাল ও তাঁর ভাতৃপুত্র মণি পাল মহোদয়দের ডাকিয়ে এনে ঐ গর্ত ও গলিটির একটি প্রাপবস্ত্র পেন্সিল স্কেচও তাঁদের দ্বারা আঁদিয়ে নিই। এই দুই ভ্রমলোক সানলেই বিনা পারিশ্রমিকে এই বিষয়ে আমাদের সাহায্য করেছিলেন। এর পর সাবধানে আমরা ঐ মৃতদেহটিকে নামিয়ে এনে উহা ভীষণদৃষ্টিতে পরীক্ষা করতে থাকি। আমরা প্রথমে রক্তের চাপের উপর বা অল্প কোনও স্থানে কোনও ফিসার বা ফুট প্রিন্ট পড়েছে কিনা তা খুঁজতে চেষ্টা করি; কিন্তু কোথাও এরূপ একটি টিপটিছ আমরা পাইনি। আমাদের মধ্যে কেহ কেহ মত প্রকাশ করেন যে, হয়ত কোন বাড়ীতে হত্যাকাণ্ড করে মাথার করে কিংবা শকটে তুলে দেহটি ঘটনাস্থলে আনা হয়েছে। কিন্তু যদিও দেওয়ালে রক্তের ফোঁটা সন্নিবেশিত থাকার ঘটনাস্থল সম্বন্ধে আমরা দ্বিমত ছিলাম না, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ঐ গলির বাইরের রাস্তার উপর শকটাদির চাকার চিহ্ন আবিষ্কার করতেও চেষ্টা করি। কিন্তু কোথাও এরূপ কোনও চিহ্ন আমরা খুঁজে পেলার না। এর পরে দেহটিকে উটেপাতে পরীক্ষা করে দেখতে পাই যে, উহার বক্ষে দুইটি গভীর ক্ষত আছে। এবং তৎপরি উহার উভয় পায়েই টেঙন বা শিরাও কেটে দেওয়া হয়েছে। দেহটি পুরাপুরি নগ্ন থাকলেও তলদেশ হতে আমরা একটি রক্তসিক্ত গেল্লি ও একটি পৈতা আবিষ্কার করি।

এই মামলা প্রমাণ করতে হলে প্রথমে আমাদের বার করতে হবে, এই নিহত ব্যক্তিটি কে? নিহত ব্যক্তিটির নাম, ধাম ও পরিচয় বার না করতে পারলে হত্যাকারীকে খুঁজে বার করা তো শক্ত হবেই, উপরন্তু এই মামলাটিও সম্যকরূপে প্রমাণ করা যাবে না। এক্ষণে মৃতের দেহাবয়বের ও উহার সন্নিবন্ধে প্রাপ্ত পৈতাটি পরিলক্ষ্য করে মাত্র আমরা এইটুকু বুঝতে পারলাম যে, লোকটি একজন ২৭ বা ২৮ বৎসরের দেশীয় ব্রাহ্মণ যুবক, কিন্তু সে একজন দেশবাসী, নাজাজী, উড়িয়া কি বাঙ্গালী তা বুঝা গেল না। এখন আমাদের প্রথম সমস্যা হল, মৃতব্যক্তির পরিচয় বার করা। এই উদ্দেশ্যে আমরা মৃতদেহের পায়ে ও অঙ্গুলির ছাপগুলি সত্বে সংগ্রহ করতে থাকি। কারণ, বহু ক্ষেত্রে বার নিহত হয়, তারও সং ব্যক্তি থাকে না। এদের কেহ কেহ বিবিধ অপরাধ করার তাদের অঙ্গুলি ও পদচিহ্ন গৃহীত হয়ে পুলিশী দপ্তরে রক্ষিত আছে। অনেক সময় প্রকৃত অপরাধী না হলেও এরা সাক্ষ্যদাতা গোলমাল বা মারপিট করার অপরাধে থানা সমূহে গৃহীত হয়ে থাকে। এই ক্ষেত্রে এদের জামিনের কাগজে এদের সহির বদলে

টিপসহি পাওয়া গেলেও যেতে পারে। এতদ্ব্যতীত কোনও দলিল প্রতীতিতে এদের দস্তখতের বদলে অঙ্গুলের টিপ পাওয়া অসম্ভব নয়। যেহেতু দেহ পুড়িয়ে ফেলার পর ঐ সকল চিহ্ন পরে প্রয়োজন হলে আর আমরা পাবো না, সেই হেতু আমরা পূর্বোক্তেই ঐ গুলি সংগ্রহ করে নিয়েছিলাম। অনেক সময় নিহত ব্যক্তিদের পদ-চিহ্ন তাদের ব্যবহৃত জুতার স্মৃতিস্মারকেও সন্নিবেশিত হয়ে থাকে। পরে যদি আমরা ঐ নিহত ব্যক্তির একজোড়া জুতা আবিষ্কার করতে পারি, তা'হলেও ঐ স্মৃতিস্মারকের উপর অঙ্কিত পদচিহ্নের সহিত এই মৃতের পদ হস্তে সংগৃহীত চিহ্নের তুলনা করে বলে দিতে পারবো যে, ঐ মৃত ব্যক্তিটিই ছিল জুতার অধিকারী।

এর পর ইনসপেক্টার রায় দেহটি আরও পরিদর্শন করে দেখলেন যে, মৃত ব্যক্তির একটি পা কুশ-পা, এবং উহার বাম বাহুর উপর একটি ফুলের উচ্চিহ্নও আছে। এ'ছাড়া আমরা মৃত দেহের বক্ষে ও বাহুতে প্রচুর লোম দেখতে পেলাম। কিন্তু এইখানেই আমরা ক্ষান্ত হইনি। আমরা মৃতদেহের ওজন, দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের মাপও গ্রহণ করতে তুললাম না। কারণ কে বলতে পারে যে সন্দের কারণে বা চুরি করার লজ্জা কোথায়ও তার দেহের ওজন গৃহীত হয়নি। এ'ছাড়া লজ্জা কোথায়ও হতে মৃতব্যক্তির জামা প্রতীতি উদ্ধার করে উহাদের মাপ হতে আমরা প্রমাণ করতে পারবো যে, ঐগুলির অধিকারী ঐ মৃতব্যক্তিই। এইজন্য আমরা একটি ভাল দর্জিকে ডাকিয়ে এনে ঐ মৃতব্যক্তির দেহাঙ্গুয়ী কোর্টের ও সার্টের এক একটা মাপ তুলেও নিই। এই ভাবে বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রয়োজন অঙ্গুয়ী কার্য সমাধা করে মৃতদেহের বিভিন্ন অবস্থার আরও দুইটি আলোক-চিত্র গ্রহণ করে আমরা আমাদের পুলিশ সার্জেন্টকে ডেকে আনবার লজ্জা ট্যান্সি সহ একজন জুনিয়র অফিসারকে পাঠিয়ে দিলাম। কারণ সঠিকভাবে কোন সময় হতভাগ্য লোকটি নিহত হয়েছিল তা তদন্তের কারণে আমাদের আশ্চর্য্য জানা দরকার। ডাক্তার সাহেব অনতি-বিলম্বে ঘটনাস্থলে এসে মৃতের দেহের কাঠিগ্রাণ্ড ও রক্তের জমাট পরীক্ষা করে বলে দিলেন যে, ঐ ব্যক্তিকে গতকাল সন্ধ্যা নয়টা আন্দাজ সময়ে নিহত করা হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, ইনসপেক্টার রায় নিজে একজন ডাক্তার না হলেও স্বকীয় অভিজ্ঞতা প্রসূত ইতিপূর্বেই খুনের সময়রূপে ঐ সময়টাই নির্দেশ করেছিলেন।

এর পর ধরাধরি করে আমরা মৃতদেহটি রাস্তার উপর এনে হাজির করলাম। স্বভাবতঃই প্রথম হতে একটি বিরাট জনতা সেখানে জড় হয়েছিল। এক্ষণে এই জনতা বহুগুণে বর্ধিত হয়ে উঠল। আমরা জনতা অপসারিত ত করিইনি বরং চাইছিলাম যে, আরও অধিক সংখ্যক লোক এসে মৃতদেহটি দেখে যাক। বস্তুতপক্ষে কয়েক ঘণ্টা ব্যবৎ নিকট ও দূর হতে আগত বহু নাগরিককে আমরা ঐ মৃতদেহটি দেখে বাবার সুবিধে করে দিলাম। এই খুন সম্পর্কিত সংবাদ ইতিমধ্যে শহরের নানা দিকে রটে গিয়েছিল। এইজন্য বিশেষ করে নির্খোজ ব্যক্তিদের আশ্বীয়বা দলে দলে অকুস্থলে এসে উপস্থিত হচ্ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, তাহাদের মধ্যে কেহই ঐ মৃতব্যক্তিকে সনাক্ত করতে পারলো না। এই কারণে স্বতন্ত্রভাবে স্বভাবতঃই ধারণা হবার কথা যে, ঐ মৃত ব্যক্তি ঐ অঞ্চলের কোনও বাসিন্দা ছিল না। কিন্তু শাস্তিরক্ষীদের মন কখনও চিন্তাপ্রবৃত্তির দ্বারা অভিভূত রাখা উচিত নয়। এইজন্য

আমরা তখনও পর্য্যন্ত কোনও স্থির অভিমত মনের মধ্যে পোষণ করিনি।

এর পর আমরা ঐ মেথর-গলিটি পুখারুপুখরুপে আর একবার পরিদর্শন করি। কিন্তু খুন সম্পর্কে কোনও প্রমাণ বা চিহ্ন আমরা আর একটিও পাই নি। তবে নিকটে অপর একটি প্রাচীরের গর্তের মধ্যে আমরা একটি কুকুরকে মোহাচ্ছন্ন অবস্থায় শায়িত দেখি। সম্ভবতঃ আগামিগণ ব্যতীত এই একটি মাত্র জীব ঐ বীভৎস হত্যা দেখে থাকবে, কিন্তু এই ভীত ও ত্রস্ত কুকুরটি মুক্ বিধায় সে আমাদের কোনও উপকারেই আসিল না।

আমরা প্রথমে এই কুকুরটির মালিক সন্ধান খোঁজ খবর করবো মনস্থ করেছিলাম। কিন্তু করপোরেশনের মেথর মোহন আমাদের জানিয়ে দিল যে, ঐ কুকুরটির কোনও মালিক নেই এবং সে উহাকে প্রতিদিনই ঐ গলিতে ঘুরাফিরা করতে দেখেছে। কুকুরটিকে ঐ স্থানেরই একজন পুখাতন বাসিন্দারূপে বুঝে আমরা তদন্তের এই সম্ভাব্য পথটি তখনই পরিত্যাগ করি।

এর পর আমরা অকুস্থলের আর প্রতিটি বাড়ীর বাসিন্দাদের এই খুন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি, কিন্তু তারা এই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে কোনও সংবাদ দিতে পারে না। বস্তুতপক্ষে ঐ হত্যাকাণ্ড রাত্রিযোগে ঐ নিরালা গলিতে সমাধা হওয়ার এই সম্পর্কে তাদের পক্ষে কোনও খবর না রাখা খুবই স্বাভাবিক ছিল।

ঐ দিন ঐ দুগুহীন দেহটি পরিদর্শন করে মাত্র এইটুকু জেনেছিলাম যে, মৃতব্যক্তি জর্নেক ২৭ বা ২৮ বৎসরের মধ্যবিত্ত পরিবারের ব্রাহ্মণ যুবক ছিল। এবং উহাকে সম্ভবতঃ পূর্বরাতে আট বা নয় ঘটিকা আন্দাজ সময়ে নিহত করা হয়ে থাকবে। ঐ মৃতদেহ সন্ধ্যা যজ্ঞোপবীত (পৈতা), রক্তের অসম্পূর্ণ জমাট এবং মৃতদেহের হাতের ও পায়ের চেটো সহ দেহাবয়বের স্বরূপ প্রতীতি হতে আমরা এই কয়টি সিদ্ধান্তে আসি। এই দিন তদন্ত সম্পর্কে আর কোনও সকলতা লাভ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তবে পরে মৃতদেহের লোমাকীর্ণ বাম বাহুতে উচ্চিহ্নারা উৎকীর্ণ একটি বেলফুল আমরা আবিষ্কার করতে পেরেছিলাম। মৃতদেহের বাহুর ঐ উচ্চি-চিহ্ন হতে একদিন তাকে সনাক্ত করানো সম্ভব হবে বুঝে আমরা মৃতদেহটি কলিকাতার পুলিশ মর্গে পাঠিয়ে দিই। এই সম্পর্কে ঐ পুলিশ মর্গের বক্ষককে আমরা আরও অঙ্গুরোধ জানাই যে, শব-ব্যবচ্ছেদের পর যেন ঐ দেহটি তাদের বরক-মুক্ত ঠাণ্ডা ঘরে অন্ততঃ পনের দিন রক্ষা করা হয়।

এর পর বখারীতি মৃতদেহের পোষ্টমর্টমের লজ্জা পুলিশ সার্জেন্টের নিকট প্রয়োজনীয় নথিপত্র পাঠিয়ে আমরা তখনকার মত একটা অক্ষমতার গ্রানি নিয়ে ক্ষুব্ধ মনে থানায় ফিরে এলাম। প্রয়োজনীয় কার্য সমাধা করতে করতে এই দিন রাত্রি নয়টা বেজে গিয়েছিল। এইজন্য তদন্তসম্পর্কীয় পরবর্তী কার্যকরণ সম্বন্ধে চিন্তা করতে করতেই আমরা যে বার নির্দিষ্ট বাসভবনে বিশ্রামের লজ্জা ফিরে এলাম।

পরদিন ৬ই সেপ্টেম্বর—প্রত্যুষে ভোর ছটার সময় আমরা যে বার কোরাটীর হতে নেমে থানার অফিসে এসে পুনরায় এই হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে তদন্তরত হলাম। ইতিমধ্যে লালবাজার গোয়েন্দা বিভাগ হতেও দুইজন অফিসার আমাদের সাহায্য করবার লজ্জা এসে গিয়েছিলেন। ইনসপেক্টার সুনীল রায়, আমি স্বয়ং এবং তাঁরা—

এই চারজন অফিসার দস্তবস্ত সেখানে একটি রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্স বসিয়ে দিয়েছিলাম। কারণ, টিমওয়ার্ক ভিন্ন এই সকল দুরূহ তদন্তের সমাধা করা হুসাধ্য ছিল। আমাদের সম্মুখে প্রধান সমস্যা ছিল তিনটি, যথা—প্রকৃতপক্ষে খুনী কে? কে খুন হলো? এবং কখন কোথায় বা কিরূপে এই খুন সমাধা হলো? এই সময় কলিকাতার গোয়েন্দা বিভাগে উন্নত ধরনের কার্যপদ্ধতি কেন্দ্র এবং ফোরেনসিক ল্যাবোরেটরী স্থাপিত হয় নি। এইজন্য ঐরূপ আলোচনার জন্য আমাদের স্বকীয় অভিজ্ঞতাসমূহই একমাত্র সম্বল ছিল। তবে যতটা বৈজ্ঞানিক সাহায্য পাওয়া যায় ততটাই সুবিধা। এইজন্য দুই জন গোয়েন্দা অফিসারকে আরও তদন্তের জন্য বাহিরে পাঠিয়ে দিয়ে আমি ও সুনীল বাবু পোষ্টমর্টমের রিপোর্টের অপেক্ষায় থানায় উপস্থিত থাকলাম। বেলা প্রায় নয়টার সময় দেহব্যবচ্ছেদ সমাধা হবার পর আমাদের বহু-আকাঙ্ক্ষিত পোষ্টমর্টম রিপোর্ট থানায় এসে পৌঁছল; এই রিপোর্টের সারবস্তুর একটি অমূল্য নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

“মৃতব্যক্তির বসে অমুমান সাতাশ বা আটাশ। পাকস্থলীর পাচ্যমান খাতের স্বরূপ ও রক্তের জমাট প্রভৃতি হতে বুঝা যায় যে ৪ঠা সেপ্টেম্বর রাত্রি আন্দাজ আট বা নয় ঘটিকার ঐ ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়েছে। অধিকন্তু ইহাও জানা গিয়াছে যে, প্রথমে ঐ মৃতব্যক্তির বসে ছুরিকাঘাত করা হয়। ঐ সময় মৃতমস্ত ভাবে সে পতিত হলেও তার মৃত্যু হয় নাই। ইহার কিছু পরে তার মুণ্ডটি কেটে নেওয়া হলে সে প্রকৃতপক্ষে মৃত্যু বরণ করে। অর্থাৎ তার মুণ্ডটি তার জীবিত অবস্থাতেই কর্তন করা হয়েছিল। বিশেষরূপে পরীক্ষা দ্বারা বুঝা গিয়েছে যে মুণ্ডটি তার মৃত অবস্থাতে কর্তন করা হয় নি।”

এইবার আমরা বুঝতে পারি যে, ৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯৩৬ সনে রাত্রি ৮ বা ৯ ঘটিকার ঐ মেধর-গলিতে একজন ২৭ বা ২৮ বৎসর বয়স্ক যুবককে জোর করে বা ভুলিয়ে নিয়ে এসে প্রথমে ছুরি দ্বারা আহত ও পতিত করা হয় এবং তাহার কিছু পরে তার মুণ্ডটি কর্তন করে তাহার মৃত্যু ঘটানো হয়েছে। এই সম্পর্কে আমরা আরও একটি বিষয়েও বিবেচনা করি। ঐ ভারি মৃতদেহটি মাত্র একজনের পক্ষে দেওয়ালের ঐ গহবরের মধ্যে স্তম্ভ করা সম্ভব ছিল না। সুতরাং নিশ্চয় একাধিক ব্যক্তি ঐ কার্যে নিযুক্ত হয়েছিল। এই তথ্যটি হতে আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি যে, হত্যাকাণ্ডটি দুই তিন বা ততোধিক ব্যক্তি দ্বারা সমাধা হয়েছে। কিন্তু এই সকল বিষয় অবগত হওয়া সত্ত্বেও আমাদের সম্মুখে মূল তিনটি প্রশ্নই অমোঘাসিত রয়ে গেল। যথা—খুন হলো কে? কে বা কারা খুন করল? এবং কি উদ্দেশ্যে তারা এই খুন করলো? এই তিনটি বিষয় অবগত হওয়া মাত্র যে, এই খুনের কিনারা করা সহজ হয়ে উঠবে তা একজন সাধারণ মানুষও বোঝে, কিন্তু এই দুরূহ তথ্য তিনটির সমাধান কে আমাদের করে দেবে? কোনও এক অজ্ঞাত বিষয়-বস্তু অনুসন্ধান দ্বারা জ্ঞাত হতে হলে গবেষকগণ গবেষণার উদ্দেশ্যে প্রথমে কয়েকটি সম্ভাব্য পরিসংজ্ঞা কল্পনা করে নিয়ে থাকেন। তথ্যানুসন্ধান ও গবেষণাকার্য এই নিয়মেই পরিচালিত হয়ে থাকে। তদন্তকারী রক্ষিণ এক একটি করে প্রতিটি খিওরী অনুসরণ করে প্রকৃত সত্য নিরূপণ করতে প্রয়াস পেয়ে থাকেন।

একটি খিওরী কিছুটা দূর অনুসরণ করে যদি বুঝা যায় যে, সম্মুখে আর পথ নেই বা উহা বন্ধ, তাহলে তাকে ফিরে এসে খিওরী এক খিওরী অনুযায়ী তদন্তের কার্য করে যেতে হয়েছে। এমন করে একটির পর একটি খিওরী পর্যালোচনা করে রক্ষিণ পরিশেষে দেখতে পান যে, তাদের একটি খিওরী অপরাধ-নির্ণয়ের ব্যাপারে ফলপ্রসূ হতে চলেছে। অর্থাৎ ঐ অপরাধ সম্বন্ধে তাঁরা বা অনুমান বা খিওরী করেছিলেন, তাদের মধ্যে একটি মিথ্যা নয়, সত্য। এইজন্য এই হত্যাকাণ্ডটি সম্পর্কে তদন্তের সুবিধার জন্য প্রথমে আমরা নিয়ন্ত্রিতরূপে কয়েকটি খিওরী তৈরি করে নিই। বলা বাহুল্য, যে সকল তথ্য বা ভাটা আমরা পরিদর্শন ও অনুমান দ্বারা ইতিমধ্যেই সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম উহাদের উপর নির্ভর করেই আমরা ঐ সকল খিওরী সৃষ্টি করি।

(১) নিহত ব্যক্তি হয়তো নিকটস্থ কোনও জমিদার বা ধনী বাড়িতে রাঁধুনি ব্রাহ্মণ ছিল এবং তার নিয়োগকর্তার ধনীই হবে, তা না হলে রাঁধুনি রাখবে কি করে? এদেশে ব্রাহ্মণদিগকেই রাঁধুনি নিযুক্ত করা হয়। চাকররূপে তাদের নিয়োগ প্রায়শঃ করা হয় নি। পূর্বে-অভিজ্ঞতা হতে আমাদের এই সত্য জানা আছে। অতএব এই খিওরী অনুসারে নিহত ব্যক্তি যে রাঁধুনি ছিল তাতে সন্দেহ নেই। ঐ জমিদার বা ধনী ব্যক্তির কোনও বিধবা বা অনুঢ়া কস্তার সহিত হয়তো ঐ নিহত ব্যক্তির প্রেম হয়ে থাকবে। ঐদিন রাত্রে বাড়ীর লোকেরা এই গোপন প্রেম ঘরে ফেলে ঐ রাঁধুনি বায়ুনকে তাদের বাড়ীতে বা ঐ মেধরগলিতে হত্যা করে চার পাঁচ জন মিলে দেহটাকে রাত্রে এইখানে ফেলে রেখে গিয়েছে।

এই খিওরী অনুযায়ী আমরা সম্মুখ এবং বিপরীত, এই উভয় প্রকার তদন্ত শুরু করি। আমরা চর লাগিয়ে জানতে চেষ্টা করি যে, অকুস্থলে কেহ এইরূপ অবিধ প্রেমের ব্যাপার অবগত হয়েছে কি না বা এইরূপ গুপ্ত-প্রেম সম্বন্ধে পাড়ায় কোথায়ও কখনও কানাকানি বা জানাজানি হয়েছে কি না? ঐ খুন যদি কারও বাড়ির মধ্যে সংঘটিত হয়ে থাকে তাহলে ঐখানে প্রভূত রক্ত পড়বে এবং এই রক্ত তারা গোপনে মুছে বা মুছে ফেলে দেবে। আমরা অনুসন্ধান দ্বারা জানবার চেষ্টা করি, কেউ কারও বাড়ীর সম্মুখের নালা বা নর্দমার জল অস্বাভাবিক ভাবে লোহিতাভ দেখেছে কি না? আমরা করপোরেশনের মেধরদের জিজ্ঞাসা করতে থাকি, কেউ রক্তমাখা জামড়া কোথাও পড়ে থাকতে দেখেছে কি না? যদি আমরা উপরোক্তরূপ কোনও সংবাদ পেতাম তাহলে বুঝে নিতাম যে, আমাদের উপরোক্ত খিওরীটিই সত্য এবং উহাকেই আমরা আমাদের শেষ সিদ্ধান্ত করে—ঐ বিশেষ পথেই আমরা তদন্তবস্ত থাকতাম। কিন্তু তথ্য-তন্মাস ও অনুসন্ধান দ্বারা আমরা এইরূপ কোনও সন্ধানই পাই নি। বার্ষমনোরথ হয়ে আমরা তখন নিয়ন্ত্রিতরূপে আমাদের দ্বিতীয় পরিসংজ্ঞা বা খিওরী অনুযায়ী তদন্ত শুরু করে দিই।

(২) নিহত ব্যক্তি হয়তো কোনও এক দুর্কৃত্ত অথচ প্রভাবশালী ব্যক্তির জাতি। পৈতৃক সম্পত্তি হতে চিরন্তনে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে ঐখানে বা অন্য কোথাও তাকে হত্যা করে, পরে সহকারীদের সাহায্যে তাকে এইখানে এনে ফেলে রেখে

গিয়েছে। ইহা সত্য হলে ধরে নিতে হবে যে, ঐ নিহত ব্যক্তি কোনও এক ভদ্র ধনী পরিবারের পুত্র ছিল। কিন্তু ঐ নিহত ব্যক্তির দেহটোর এবং হাতের ও পায়ের চোটা পরিদর্শন করে বুঝা গেল যে ঐ ব্যক্তির ধনীর ঘরে বর্ধিত না হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ তার পায়ের চামড়া স্থূল ও কর্কশ এবং বিকৃত দেখা গিয়াছে। এই থেকে নিহত ব্যক্তিকে বরং একজন তবঘুরে বা অধঃপতিত মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান বলেই প্রতীত হয়। এইজন্য এই খিওরী বা পরিসংজ্ঞাটি আমাদের নিকট গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি।

(৩) হয়তো নিহত ব্যক্তি একজন অসংচরিত্ত বৃদ্ধ। কোনও জীলোক খটিত ব্যাপারে তার কোনও এক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রেমিকপ্রবর স্বয়ং কিংবা লোক মাঝকং তাকে নিহত করে ঐখানে ফেলে রেখে গিয়েছে।

এই ব্যাপারে আমরা পুলিশ সার্জেন্টকে শবাব্যবচ্ছেদের সময় তার বৌদশেখ পরীক্ষা করে জানাতে অনুরোধ করি যে, ঐ নিহত ব্যক্তির কোনও বৌদ-রোগ ছিল কি না। এবং নিকটস্থ বেঙ্গালুর সমূহে ঐরূপ কোনও ব্যক্তি বন্ধু-বান্ধবসহ হামেসা কোনও বেঙ্গা-গৃহে গমন করত কিনা, তা'ও আমরা অবগত হতে চেষ্টা করি। এইরূপ দুই-একটি বগড়া-ঝাটির সংবাদ আমরা কয়েক স্থানে পাই বটে; কিন্তু অনুসন্ধানে জানা যায় যে বিবাদীরা বহাল তবিরতে জীবিত আছে। এইরূপ কোনও এক ব্যক্তি নিরুদ্দেশ হ'য়েছে বলে একদিন জানা যায়, কিন্তু ঐ বেঙ্গা-নারী এবং দালালেরা মৃতদেহটি ঐ নিরুদ্দেশ ব্যক্তির নয় বলে বিবৃতি দেয়।

(৪) হয়তো বা নিহত ব্যক্তি কোনও এক ব্যবসায়ী বা শির-প্রতিষ্ঠানের অংশীদার এবং তাকে ঐ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অধিকার হতে বঞ্চিত করার জন্য এই ভাবে হত্যা করেছে। এই খিওরীটি বিশ্বাস করলে বুকে নিতে হবে যে নিহত ব্যক্তি অপূত্রক বা আত্মীয় ও উত্তরাধিকারী বিহীন।

উপরোক্ত খিওরী অনুযায়ী অনুসন্ধান করে ঐরূপ কোনও নিরুদ্দেশ ব্যক্তির সন্ধান আমরা পাইনি। বড় বাজারে ঐরূপ এক নির্খোজ মাড়োয়ারী তত্ত্বলোকের সংবাদ পাওয়া গেল বটে, কিন্তু তদন্তে জানা গেল যে নিরুদ্দেশের সময় ঐ ব্যক্তির বয়স ছিল ৬৫ বৎসর। তদুপরি মৃত যুগের দেহাবয়ব ও আকৃতিও এই খিওরীর পক্ষে অমূল্য ছিল না।

এই সকল কারণে এই সকল খিওরী সম্পর্কীয় তদন্ত আশাতত হুগিত রোপে আমরা নিয়োক্ত খিওরী বা পরিসংজ্ঞা অনুযায়ী তদন্ত শুরু করে দিই।

(৫) হয়তো বা সে কোনও রাজনৈতিক দলাদলি বা শ্রমিক-বিজ্রাটের কারণে নিহত হয়ে থাকবে। কিন্তু নিকটে কোনও কলকারখানা ছিল না এবং তার চেহারা হতে কোনও রাজনৈতিক ব্যাপারে সে জড়িত থাকতে পারে বলে মনে হলো না। এইজন্য ঐ বিষয়ে কোনও তদন্ত আমরা নিয়োজন মনে করেছিলাম।

(৬) হয়তো বা নিহত ব্যক্তি কোনও পুরানো চোর বা তস্কর ছিল। লুণ্ঠিত ত্রোয়ার ভাগ-বাটোয়ারার ব্যাপারে কিংবা দলের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করার কিংবা অপরের হিন্দা আত্মসাৎ করার জন্য তার দলের অপরাধের ব্যক্তির তাকে ঐ ভাবে হত্যা করে ঐ স্থানে ফেলে রেখে গিয়েছে।

এই সম্পর্কে আমরা রক্ষিপুস্তকবন্দের তাদের কোনও জানা চোর বা 'ইনকরমার' ঐদিন হতে নির্খোজ হয়েছিল কি না সেই সম্বন্ধে অবহিত হবার জন্য অনুরোধও করেছিলাম, কিন্তু কোনও স্থান হতেই এইরূপ কোনও সংবাদ আমরা সংগ্রহ করে উঠতে পারিনি।

যদিও উপরোক্ত কয়টি খিওরী বা পরিসংজ্ঞার উদ্ভাবক আমি নিজেই ছিলাম, তাহলেও পরিপূর্ণভাবে উহাদের কোনটি, আমার নিম্নেরই মনঃপূত হচ্ছিল না। কারণ একটি বিষয় পুনঃপুনঃ আমার মনোমধ্যে আঘাত হানছিল; সাধারণতঃ মৃতদেহ হতে মস্তক বিচ্ছিন্ন করার একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে, যাতে তাকে কেউ সনাক্ত না করতে পারে। বহুব্রহ্ম হতে মৃতদেহ ঐ স্থানে নীত হলে মুণ্ড কর্তনের কোনও প্রয়োজন ছিল না। এইজন্য স্বভাবতঃই মনে হতে পারে যে নিহত ব্যক্তি ঐ স্থানেরই কোনও বাসিন্দা ছিল। কিন্তু একটি বিশেষ কারণে এই মত সম্পর্কে আমার মন সায় দেয় না। কারণ হত্যাকারী এমন এক বিজাতীয় যুগার সহিত এই হত্যাকাণ্ড সমাধা করেছিল যে, প্রথমে সে তাকে ছুরিকাঘাত করেও যথেষ্ট মনে করে নি। সেইজন্য মুণ্ডটি কেটে নেওয়ার পরও মৃতদেহের দুইটি পায়ের শিরা পর্যন্ত কেটে রেখে গিয়েছে। এই কয়টি তথ্য হতে আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে হত্যাকারী একজন দুর্দান্ত প্রকৃতির ব্যক্তি তো বটেই, অধিকন্তু সে মানব-মনের একজন অসাধারণ অবস্থার সন্ততি। এই ধরনের ব্যক্তি প্রেম খটিত ব্যাপারে কোনও এক ভদ্র নারীর সহিত নিশ্চয়ই জড়িত থাকবে না। তাহলে কি ঐ নিহত ব্যক্তি এবং উহার হত্যাকারী, এই উভয় ব্যক্তিরই বাতায়াত হামেসা বেঙ্গাপন্নী অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল? এই সকল বিষয় চিন্তা করে ইনেসপেক্টর সুনীল রায়কে আমার অভিমত জানানো তিনি আমাকে সর্বাস্তঃকরণেই সমর্থন করেছিলেন। এইজন্য পাঁচদিন হতে সোনাগাঁহি প্রভৃতি বেঙ্গাপন্নীর প্রতিটি গৃহে আমরা জোর তদন্ত চালাতে শুরু করে দিলাম।

এই ভাবে তদন্ত করতে করতে সত্য সত্যই একদিন আমরা অন্ধকারের মধ্যে আলোকের সন্ধান পেলাম। এই সময় সোনাগাঁহি অঞ্চলের অধিকা নামক এক বাসিন্দা একটি উল্লেখযোগ্য সংবাদ প্রদান করলো। বস্তুতঃপক্ষে অধিকার বিবৃতি আমাদের তদন্তের মোড় সম্পূর্ণরূপে ঘুরিয়ে দিয়েছিল। সাক্ষী অধিকার বিবৃতির প্রয়োজনীয় অংশটি নিয়ে উদ্ধৃত করা হলো।

“আমি অতুল বাবু ওরফে পাগলা নামক এক ব্যক্তিকে চিনতাম। ৪ঠা সেপ্টেম্বর বাড়ী ফিরবার সময় আমি তাকে ভীত ও দ্রুতভাবে সোনাগাঁহি অঞ্চলের একটি বাটার রোয়াকে মগীজ বাবু নামক পাড়ার এক মাতঙ্গর ব্যক্তির নিকট বসে থাকতে দেখেছিলাম। ঐ সময় উহাদের চতুর্দিক ঘিরে কয়েকজন গুপ্তা ব্যক্তি তাকে বকাবকি করছিল। তাদের মধ্যে একজন এগিয়ে এসে বললো, মনে রাখিস, আমি যে সে লোক নই। আমি হচ্ছি খোক! আমার নাম শুনেছিস তো? আমি তোকে খুন তো করবোই, 'সেই সঙ্গে তোর নাকও কেটে নেবো।' উত্তরে পাগলা বলছিল, আমাকে আপনি এবারকার মত মাপ করুন। আমি জীবনে আর ঐ জীলোকটির জিম্মীমানাতোও যাব না।' মগীজ বাবু মধ্যস্থতা করে ঐ সময় লোকটিকে অনুরোধ জানালো, আচ্ছা থাকগে থাক। এবারকার মত ওকে মাপ করে দিন। মগীজ বাবুর অনুরোধে ঐ লোকগুলো পাগলাকে মুক্তি দিয়ে চলে গেলো।

পাগলা আমার পাশে পাশে চলে গরানহাটা স্ট্রীটের দিকে এগুতে থাকলো। আমরা কিছুদূর মাত্র অগ্রসর হয়েছি, এমন সময় ঐ খোকা নামক ব্যক্তি গৌরবর্ণের অপর আর এক ব্যক্তির সহিত একটি বাড়ীর রোয়াক হতে পাগলার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। খোকা পাগলার বাড় ঘরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে ওই গৌরবর্ণের লোকটিকে হুকুম করলো এই জলদী গিয়ে একটা ট্যান্ডি ডেকে নিয়ে আর। ব্যাপার বেগতিক বুঝে আমি সরে পড়েছিলাম। কিন্তু গৌরবর্ণের লোকটি আমার পথ আগলে বলে উঠলো, তুই শালা বাস কোথায়? আমি প্রত্টিবাদ করে তাকে বললাম, গালি দেন কেন, মশাই। উত্তরে সেই লোকটি বলে উঠলো, আর একটা মাত্র কথা কইলে তোকেও খুন করবো। এই সময় খোকা ওই লোকটিকে বললো, ওকে এখন যেতে দে, ওকে পরে ঠিক করা বাবে এখন। তুই তাড়াতাড়ি একটা ট্যান্ডি ডেকে আন। এই ভাবে মুক্তি পেয়ে আমি ফিরে গিয়ে ঘটনাটির কথা মঞ্জীল বাবুকে জানিয়ে আসি। এর পর বাড়ী ফিরবার পথে আমি দেখতে পাই যে খোকা ওই গৌরবর্ণের লোকটি এবং আরও চার পাঁচ ব্যক্তি পাগলাকে একটি ট্যান্ডিতে বসিয়ে গরানহাটা রাস্তা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। আমি এমনই অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম যে ট্যান্ডিটির নম্বর নেবার কথা একবারও আমার মনে আসেনি।”

ভারতীয় পশ্চতিতে তদন্তরীতির নিয়ম প্রথমে সাক্ষীকে বিনাবাধার তার বক্তব্য বিষয়ে বলে যেতে দেওয়া। তার পর তাকে জেরা করে সে বা বলেনি বা বলতে পারে নি তা বার করে নেওয়া। এইজন্য প্রথমে একদল সৌম্যমুর্তি বন্ধী হাফালাপ দ্বারা সাক্ষীদের প্রারম্ভিক বিবৃতি গ্রহণ করে। কিন্তু যেহেতু ওই প্রথম বন্ধীর পক্ষে সহসা ভিন্ন মূর্তি ধারণ করা সম্ভবও নয়, উচিতও নয়; সেই হেতু জেরার অন্ত পরে গম্ভীর মূর্তিতে অপর একজন বন্ধীকে আসরে অবতীর্ণ হতে হয়। এইজন্য ভারতীয় অফিসারদের অভিনয়-চাতুর্য্যও শিক্ষিত হতে হয়েছে। এঁছাড়া মাছুষের ভিন্ন ভিন্ন কুটি অস্থায়ী তাদের ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশেরও সৃষ্টি করতে হয়েছে। এইজন্য ভারতীয় অফিসারগণ সমাজ-বিজ্ঞান ও লোকচরিত্রে অভিজ্ঞ হতে থাকেন। প্রথম অফিসারটি বন্ধুভাবে সাক্ষীদের কিছুটা তাঁবে রাখে, দ্বিতীয় অফিসার গম্ভীর পরিবেশ সৃষ্টি করে তার কাছ হতে কথা বার করে।

এই ভাবে ভারতীয় পন্থায় আমরা ওই অতি প্রয়োজনীয় সাক্ষীর নিকট হতে যে সকল বাড়তি তথ্য সংগ্রহ করি তাহা নিয়ে উদ্ভূত প্রশ্নোত্তর হতে বুঝা বাবে।

প্রঃ—হঁ, তুমি যে সত্য কথা বললে তা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু কয়েকটা কথা আরও তোমাকে আমরা জিজ্ঞাসা করবো। এখন সত্যি করে বলো কবে ও কোথায় তোমার সঙ্গে ওর প্রথম আলাপ হয়েছিল?

উঃ—আজ্ঞে, বখন কিছুটা বলেছি, তখন বাকিটাও বলবো। পাগলার সঙ্গে আমার এই পাড়ারই এখানে ওখানে দেখা হতো। তার ভালো নাম ছিল অতুল বাবু। এসব পাড়ার মেয়েরা তাকে আদর করে পাগলা বলতো। লোকটা বাবু ভালো তবলা বাজাতো। তবলচিরুপে এপাড়া ওপাড়া, সব পাড়াতেই সে নায় করেছিল।

প্রঃ—আচ্ছা! তোমার তো সে একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল। তুমি কি শোননি যে সম্প্রতি ঐ পাড়ার কোনও স্ত্রী নারীর

সঙ্গে তার ভালবাসা ভাঙেছিল? এইরূপ কোনও গল্প কি সে তোমার কখন বলে নি?

উঃ—আজ্ঞে, সে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল না। তবে তার সঙ্গে আমার সাধারণ ভাবে জানানুনা ছিল। এ পাড়ার মেয়েরা তাদের গুরুজী বা ওস্তাদের সঙ্গে ঐরূপ কোনও কাজ করে না। এতে ঐ সব মেয়েদের মত তাদের ওস্তাদেরও বদনাম হয়। এইজন্য ঐরূপ কোনও ঘটনা ঘটলেও লজ্জার খাতিরে সে তা আমার নিকট গোপন করেছে।

প্রঃ—আচ্ছা, তুমি তো অনেক বার পাগলাকে দেখেছো। কিন্তু নগ্ন অবস্থায় তার মুণ্ডহীন দেহটা দেখে কি তুমি তাকে সনাক্ত করতে পারবে? তুমি যে তাকে কিছুটা স্নেহ করতে তা তো বুঝতেই পারছি। এখন পূর্ববন্ধুত্বের খাতিরে তার উপর তোমার একটা কর্তব্য আছে; এখন তুমি যদি তার কোনও প্রেমাস্পদ নারীকে খুঁজে বার করতে পারো তা’হলে ভাল হয়। হয়তো তারা তাকে বহুবার নগ্নগাজ্রে দেখে থাকবে। সেইজন্য তাদের পক্ষে নগ্নগাজ্র মৃতদেহটি স্বাধাযোগ্য ভাবে সনাক্ত করা সম্ভব হবে।

উঃ—আজ্ঞে, অধিকাংশ সময়েই আমরা তাকে মূর্তি, জামা ও চাদরে আবৃত দেখেছি। তাকে নগ্নগাজ্রে ভালোরূপে না দেখলে তার মৃতদেহ সনাক্ত করার অসুবিধা আছে স্বীকার করি। কিন্তু সত্য কথা বলতে গেলে অতীতে তাকে নগ্নগাজ্রেও বহুবার আমাদের দেখার সুযোগ ঘটেছে। ইদানীং পাগলা অতিরিক্ত মত্তপান করতে আরম্ভ করেছিল। কয়েক বার মাত্রা ছাড়িয়ে তাকে জ্ঞানহার্য্য ও অর্ধনগ্ন অবস্থায় রাস্তাপথে গড়াগড়ি যেতে আমরা দেখেছি। এইজন্য তাকে ভৎসনা করে ও পথ থেকে উঠিয়ে নিকটের কোনও নারীর বাড়ীতে এনে আমরা তার গুশ্রবাও করেছি। এই সময় আমরা তার সারা দেহ ও বাহ লোম দ্বারা আবৃত এবং তার বাম বাহুতে উকি দ্বারা ফুল-চিহ্ন উৎকীর্ণ আছে দেখেছি। তার শরীরের গঠনসহ ঐ সকল চিহ্ন হতে তার মুণ্ড না থাকলেও তার দেহ আমরা সকলেই সনাক্ত করতে পারব।”

সাক্ষী স্বীকার উপরোক্ত বিবৃতিটি আমাদের অনেকটা আশস্ত করলো। আমরা বুঝতে পারলাম যে, ঐ সাক্ষীর দ্বার্য্য সোনগাহি অঞ্চলের বহু নারীও পাগলার মৃতদেহটি ঐ একই কারণে সনাক্ত করতে পারবে। বলা বাহুল্য যে, মৃতদেহটি সত্যি কাহার তা প্রমাণ করতে না পারলে এই খুনের কিনারা করা সম্ভব ছিল না। ইতিমধ্যে পুলিশমর্গের বরফ-ঘরে আমরা মৃতদেহটি রক্ষা করার এই কয়দিন উহা অবিকৃত অবস্থাতেই ছিল। এই কারণে আমি প্রস্তাব করলাম যে এখনই ঐ পাড়ার বাড়ী বাড়ী তদন্ত করে কোন্ কোন্ নারীকে পাগলা গান শোনাতে বা তাদের কার কার বাড়ীতে সে তবলা বাজাতো তা জেনে ঐ সকল নারীদের পুলিশমর্গে নিয়ে গিয়ে তাদের সাহায্যে ঐ মৃতদেহটি সত্যি পাগলার কি’না তা অবহিত হওয়া যাক। কারণ তারা যদি বলে যে ঐ মৃতদেহ আদর্শেই পাগলার নয়, তাহলে তখনই বুঝে নিতে পারবো যে আমরা এই কয় দিন ভুল পথেই তদন্ত চালিয়ে এসেছি। এইরূপ অবস্থায় অনর্থক আর সময় নষ্ট না করে আমরা তদন্তের মোড় ঘুরিয়ে নিয়ে অন্য আর এক পথে তা পরিচালিত করতে পারবো। কিন্তু ইনস্পেক্টর সুনীল বাবু এ বিষয়ে আমার সঙ্গে একমত হতে পারলেন না। তিনি বললেন যে এই পাড়াতে

বধন আসাই হয়েছে তখন সাক্ষী মণীন্দ্রকে খুঁজে বার করে তার বিবৃতিটি নিয়ে যাওয়া উচিত। সনাক্তকরণের পূর্ব বরং আরও দুই একদিন পরে করলেও চলবে। এ সম্বন্ধে তিনি আরও বললেন যে তার অন্তরাঙ্গা তথা ইনিষ্টিক্ট বলাহে যে এইবার আমরা ঠিক পথেই তদন্ত শুরু করেছি।

বস্তুতঃপক্ষে অভিজ্ঞতা হতে আমরা দেখেছি যে, ইন্টেলিজেন্স বা বুদ্ধিবৃত্তি ভুল করলেও সহজাত বুদ্ধি (ইনিষ্টিক্ট) বা প্রেরণা কদাচিৎ ভুল করেছে। স্ব স্ব ব্যবসায়ক্ষেত্রে বুদ্ধির চেয়ে অনেক বেশী সাহায্যে আসে এই প্রেরণা। প্রত্যেক প্রফেশনাল ব্যক্তিই স্ব স্ব প্রফেশনের ক্ষেত্রে এই সহজাত প্রেরণা লাভ করে থাকে। সকল প্রফেশনের লোকেরাই স্ব স্ব প্রফেশন বা ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে পৃথক পৃথক ইনিষ্টিক্ট অর্জন করেছে। এমন অনেক ডাক্তার আছে যারা দুব্ব হতে রোগীকে দেখে বলে দিতে পারে যে তার রোগ কি। এমন অনেক পুষ্টিবিশেষজ্ঞকে আমি জানি যে খাদ্যাদির দেখে বলে দিতে পেরেছে, সে ফুল কিনবে কি না। এবং কিনলেও সে তার দাম দেবে কত? বহুদিন একই প্রফেশনে নিযুক্ত থাকলে মানুষ এইরূপ পেশাগত ইনিষ্টিক্ট লাভ করে। এমন বহু পুরাতন পুলিশ-অফিসার আছেন, যাদের নিকট দশ বার জন গৃহ-ভৃত্যকে ধাঁড় করিয়ে দিলে তাঁরা বলে দিতে পারেন যে এদের মধ্যে ঐ লোকটিই চুরি করেছে। এ সম্বন্ধে তাদের জিজ্ঞাসা করলে তাদের একমাত্র উক্তি হয় যে তাদের মন বা ইনিষ্টিক্ট এই কথা বলেছে। পরে প্রমাণিতও হয়েছে যে ঐ পৃথকীকৃত ভৃত্যটিই মাত্র ঐ চুরির জন্ত দায়ী ছিল। বহুদিনের অভিজ্ঞ ডাক্তার, উকিল, ব্যবসায়ী প্রভৃতি লোকেরা প্রায়ই এই সহজাত প্রেরণা লাভ করে। কারণ মানুষের অন্তঃস্বভাব তাদের মুখের ভাব, চালচলন ও বৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে কিছুটা পরিষ্কৃত হতে বাধ্য। কিন্তু ঐগুলি এতো সূক্ষ্মভাবে পরিষ্কৃত হয় যে সাধারণ দৃষ্টিতে সকল মানুষের নজরে পড়ে না। তবে যে সকল পুলিশ-অফিসার পুলিশী-কার্যকে চাকুরীরূপে গ্রহণ না করে প্রফেশন বা পেশারূপে গ্রহণ করে, তাদের চক্ষে ঐগুলি নিজেদের অজ্ঞাতেই ধরা পড়ে।

এই সকল কারণে পরবর্তীকালে এই সকল কর্মদক্ষ পুলিশ-অফিসারদের মধ্যে যারা পুলিশী-কার্যকে নিজেদের জীপুত্র-কন্যা—এমন কি নিজেদের প্রাণের চেয়েও ভালবেসে ফেলে তাদের মধ্যে ঐরূপ এক প্রেরণা জন্মায়। এইরূপ অবস্থায় কোনও একটি ঘটনা দেখে বা শুনে তারা বলে দিতে পারে যে ঘটনাটিতে প্রকৃতপক্ষে কি ঘটেছিল। হিন্দু, বৌদ্ধ ও মোসলেম ভারতে এবং বৃটিশ রাজত্বের প্রারম্ভে গোয়েন্দাগিরী করা ছিল এক শ্রেণীর নাগরিকদের প্রফেশন বা ব্যবসায়ের অন্তর্গত। এই একই কারণে তাদের মধ্যে প্রায়ই ঐরূপ সহজাত বুদ্ধি দেখা যেতো। এইজন্য ভারতীয় পুলিশ আজও পর্যন্ত তাদের ঐ সকল পূর্ববর্তীগণের অমুকরণে তাদের অভিজ্ঞতালব্ধ প্রেরণার উপর বিশেষরূপে নির্ভরশীল থাকে।

এই সকল কারণে আমি অভিজ্ঞ অফিসার ইনসপেক্টার সুনীল বাবুর মতেই মত দিই। বস্তুতঃপক্ষে রক্ষিপুলব সুনীল বাবুর মধ্যে আমি পুলিশী তদন্ত সম্পর্কীয় বহু অত্যন্ত্রিয়তা (Hyper Sensibility) লক্ষ্য করেছিলাম। তাঁর চক্ষু ও কর্ণ আমি সামান্য একটু সন্দেহের উল্লেখ হওয়া মাত্র শিকারী মানুষের তার সন্তোষ হয়ে উঠতে

দেখেছি। এই জন্য আমি তাঁর উপদেশ মত মণীন্দ্র বাবুকে খুঁজে বার করে তার একটি বিবৃতি লিপিবদ্ধ করে নিতে মনস্থ করলাম। এই মণীন্দ্র বাবু ছিলেন এই পাড়ার একজন শক্তিমান ব্যায়ামবীর। এইজন্য তাঁকে খুঁজে বার করতে আমাদের কিছুমাত্রও দেরী হয় নি। তাঁর বিবৃতির উল্লেখযোগ্য অংশটুকু নিয়ে উদ্ধৃত করা হলো।

“আমার নাম শ্রীমণীন্দ্রনাথ পাল, পিতার নাম শ্রী...পাল। *নং-রাস্তায় আমি সপরিবারে বাস করি। আমার পেশা... এই দিন (৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯৩৫) আমি ঐ রাস্তায় অতো নব্বয়ের বাড়ীর ঘোড়াকে সন্ধ্যা আশ্রাজ সাত বা সাড়ে সাতটার সময় বিশ্রাম করছিলাম। এমন সময় পাগলা দৌড়ে এসে আমার পাশে বসে পড়ে বলে উঠলো, কর্তা, রক্ষে করো আমাকে। তুমি ছাড়া আর কেউই আমাকে রক্ষা করতে পারবে না। ওদিকে তার শিছু-শিছু খোঁকাও তার সাত আট জন সাকরেন্দ্রসহ সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছে। খোঁকা চিচিরে উঠে বললো, আজ আর কারোও সাধ্য নেই যে ওকে বাঁচায় আমার কবল হতে। ওকে আমি অনেক বার সাবধান করেছি “কিন্তু ও কোনও কথা আমার শুনেনি। কালও ও গোপনে মলিনার ঘরে গিয়েছিল।—না, আজ আর আমি ওকে কিছুতেই ছাড়বো না। আমি তখন খোঁকাকে অস্ত্রবোধ করে বললাম, আরে ভাই! এবারকার মত ওকে ক্ষমা করে দে। আর ও কক্ষণে মলিনার ত্রিদীমানাতেও বাবে না। মলিনার সঙ্গে তোর প্রকৃত সম্পর্ক কি, তাও নিশ্চয়ই জানে না। আমার মধ্যস্থতায় খোঁকা একটু শান্ত হয়ে বললে, আচ্ছ। আপনার কথা মত আজ ছেড়ে দিলাম ওকে। কিন্তু পরে ওর কপালে কি আছে তা আমি বলতে পারছি না। এই ভাবে মুক্তি পেয়ে পাগলা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে সেখান থেকে সরে পড়লো। ঐ সময় সেখানে পাগলার বন্ধু অধিকাণ্ড এসে গিয়েছিল। আমার বতব্বর মনে পড়ে, পাগলা ও অধিকাণ্ড একসঙ্গেই গরানহাটার দিকে প্রস্থান করলো। এর পর খোঁকাও তার সাজোপাঞ্জ নিয়ে ঐ একই দিকে রওনা হয়। এই ঘটনার প্রায় আশ ঘট্টা পর অধিকাণ্ড হস্তদস্ত হয়ে এসে আমাকে জানালো যে খোঁকা ও তার সাকরেন্দ্ররা পাগলাকে একটা চ্যান্সিতে তুলে ধরে নিয়ে গিয়েছে।”

এই পর্যন্ত বলে মণীন্দ্র বাবু চুপ করলেন। বেশ বোঝা গেল, তাঁর আরও কিছু বলবার ছিল। কিন্তু বলি-বলি করেও তিনি তা আমাদের বলতে চাইছিলেন না। আমরা তখন চতুরতার সহিত কয়েকটি প্রশ্ন করে তাঁর নিকট হতে আরও কয়েকটি প্রয়োজনীয় তথ্য জেনে নিলাম।

প্রঃ—“পাগলাকে আপনি কত দিন পূর্ব হতে চেনেন? আর ঐ খোঁকাবাবু। খোঁকাবাবু লোকটা কে? সে থাকেই বা কোথায়? আপনি এই খোঁকার পরিচয় কতটুকু জানেন? তাড়াহাড়ি এই সংবাদ কয়টি দিলে আমাদের উপকার হয়। আমরা তা’হলে এখনি খোঁকাকে গ্রেপ্তার করে তার বাড়ীতে থানাতল্লাস করতে পারি।”

উঃ—“পাগলার পিতৃমাতৃ পরিচয় আমি জানি না। তবে শুনেছি তার এক ভাই যশোহরে ডাক্তারী করেন। তার ভালো নাম ছিল অতুল বাবু। লোকটি ভদ্রবংশজাত হলেও খুল্লমত অবঃপাতিত হয়ে এই পাড়াতেই এখানে ওখানে বাস করে। এই পাড়ার

নারীদের বাটীতে বাটীতে উৎসবে ও জলসার সে তবলা বাজাতো। তবলা সন্ধে সে একজন গুণী ছিল। সে যে চরিত্রহীন ব্যক্তি ছিল তা আমি বলবো না। বরং সে চরিত্রবানই ছিল। তবে চরিত্রবানবাই একনিষ্ঠ হয়ে একটি নারীর সঙ্গে বসবাস করতে চেয়েছে। এইজন্য আমার মনে হয়, সে মলিনাকে গান শিখাতে গিয়ে ভালবেসে ফেলেছিল। তবে তাকে এই পাড়ার সকল মেয়েরাই পাগল বলে ডাকতো। শুধু তাই নয়, তাকে তারা ভালবাসতো ও শ্রদ্ধা করতো। এ ছাড়া পাগলা সন্ধে আর কোনও সংবাদ আমি দিতে পারবো না। এই তো গেল পাগলার কথা। এইবার খোকার কথা বলবো। এই খোকা হচ্ছে—তার, একজন জেলখারিজ গুণ্ডা। কিছু দিন বাবং পুলিশের নজর এড়িয়ে সে কলকাতায় কিয়ে এসেছে। এখন তার এই পাড়াতেই আনাগোণা বেশী। আমি শুনেছি, সে মাঝে মাঝে মলিনার ঘরে এসে রাত্রিাস করে। এই মলিনা হচ্ছে একজন নতুন চিত্রাভিনেত্রী। ৩৫নং ইমামবাড়ী থানাদার লেনে সে থাকে।”

“প্রশ্ন—পাগলাকে তো আপনারা প্রতাহাই দিনে ও রাতে এই পাড়াতেই দেখতেন। ঐ দিন সন্ধ্যা হতে এখন নিশ্যই আর তাকে আপনারা এ পাড়ার দেখেননি। তবু ওই ঘটনা সন্দেহ অর্হিত হয়েও আপনারা কেউ থানায় গিয়ে এই সম্পর্কে সংবাদ দিলেন না কেন? তা’হলে কি বুঝতে হবে আপনার সঙ্গে খোকার বিশেষ বন্ধু ছিল?”

উঃ—“আজ্ঞে না না, তা নয়। পাড়ার কেউ কেউ হিংসা করে আমাকে মণি গুণ্ডা বলে। আমি একটু ব্যায়াম-টায়াম করি কিনা, তাই লোকের এতো হিংসা। তবে কি জানেন? কোনও গুণ্ডালোক রাতবিরেতে এসে এখানকার মেয়েদের উপর জুলুম করলে সেই সব বাড়ীর বাড়ীওয়ালীরা চাকর মারফৎ আমাকে খবর পাঠায়। আমি তখন ঐ সকল অবস্থিত ব্যক্তিদের ঘাড়ে ধরে বার করে দিয়ে তাদের রক্ষে করি। সপরিবারে এই পাড়াতেই আমি বসবাস করি, তাই ওদের পড়শী হিসেবে ওদের উপর আমার কর্তব্য করি, এই বা। তা না হলে থানা হতে পুলিশ আসতে আসতে এদের অনেকই শেষ হয়ে যেতো। কিন্তু তা বলে এই সব জেল-খারিজ খুনে গুণ্ডাদের সঙ্গে কে পেরে উঠবে বলুন? এদের কি কোনও বাড়ী-ঘর আছে যে আপনারা তা জানাবো? অল্প দিকে এই সব ব্যাপার থেকে আমরাই প্রাণটা বেরিয়ে যাবে। এই বাড়ীওয়ালী মায়েরা একটু ভক্তি-টক্তি আমাকে করে, তাই তাদের কাছে বা বা শুনেছি তাই আপনাকে জানালাম।”

প্রঃ—“হঁ, এক্ষণে বুঝতে পারলাম আমি সব। এখন এই মানবোক্ত আর কোনও সংবাদ ‘তুমি আমাদের দিতে পার কি না বলো।”

উঃ—“আজ্ঞে। আর একটা কথা আমার জানা আছে। পরে শুনতে পেলাম পথ হতে একবার মুক্তি পেয়ে পাগলা এই পাড়ার ‘নাকি-বীণা’ নামে একটি নারীর বাড়ী চুকে পড়ে আল্পর ভিক্ষে করে। কিন্তু তারা তাকে আল্পর তো দেয়ই নি বরং খোকার হৃদকোতে ভর পেয়ে চাকর দিয়ে তারা তাকে বার করে দিয়েছিল। কিন্তু এখন একথা তারা স্বীকার করবে কিনা জানি না। কারণ এ পাড়ার কেউ সহজে এসব বামেলাতে জড়াতে চাইবে না।”

এ পাড়ার ভক্ত পরিবারের লোকেরা হচ্ছে সংখ্যালঘু। এজন্য এখানকার সাক্ষীদের চরিত্র সন্দেহও কিছুটা তদন্তের প্রয়োজন হয়। কারণ আমাদের বাবতীর তদন্ত করে যেতে হবে তাদের কথা ভেবে বাদের কাছে শেষ বিচারের তার আছে। তা’না হলে একটি মাত্র ভুলের ভ্রম আমাদের বাবতীর পরিশ্রম একদিন ব্যর্থতার পর্যাবসিত হয়ে যেতে পারে। কোনও এক সাক্ষী বিশ্বাসযোগ্য কিনা তা পূর্বেই আমাদের জেনে নিতে হয়েছে। অবশ্য সমাজের বিভিন্ন স্তর আছে এবং উহার প্রতিস্তরের মানুষেরই একটি নিজস্ব মূল্য আছে। একথা স্বীকার্য্য হলেও সাক্ষী সমাজের কোন স্তরের ব্যক্তি, তা জুরীদের পূর্বাভাসই জানিয়ে দেওয়া ভালো। অজ্ঞাচার বিচারের সময় বিপরীত তথ্য প্রকাশ পেলে বিচারকমণ্ডলীর ভ্রান্ত ধারণা হওয়া অসম্ভব নয়।

আমরা সংবাদ নিয়ে জানলাম যে, মণীন্দ্র বাবু হামেসা এখানকার নারীদের সম্পর্কে এলেও নিজে তিনি একজন সাধু চরিত্রেরই লোক। এছাড়া এ-ও জানা গেল যে, এই ব্যায়ামবীরকে পল্লীর গুণ্ডাজীবীর লোকেরা রীতিমত ভয় করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি নিজে জেল-খারিজ খোকা গুণ্ডার ভয়ে সর্বদাই ভীত ছিলেন। খুব সম্ভবতঃ তিনি প্রাণভয়ের কারণেই ঘটনাটি পুলিশের নিকট জানাতে পায়েন নি। মণি বাবুর মত সাহসী ও শক্তিশালী ব্যক্তিও যার ভয়ে সর্বদা ভীত ও সন্ত্রস্ত, সে যে একজন সহজ ব্যক্তি নয়, তা আমরা মণি বাবুর কথোপকথন হতে বুঝে নিতে পারলাম। এই সঙ্গে আমরা এ-ও বুঝতে পারলাম যে, এখানকার ভীতাত্মা নারীরাও এই একই কারণে ঐ হত্যাকারীর বিক্রমে কোনও বিবৃতিই প্রদান করবে না। সকল দিক বিবেচনা করে সহকারীদের দ্বারা একটি মোড়ের নিকট অপেক্ষা করতে বলে আমি এবং সুনীল বাবু ছদ্মবেশে হত্যা সম্পর্কে কিছুটা গোপন ভাবে মনোনিবেশ করলাম। [ক্রমশঃ।

“Education is not the amount of information that is put into your brain and runs riots there, undigested, all your life. We must have life-building, man-making, character-building, assimilation of ideas. If you have assimilated five ideas and made them your life and character, you have more education than any man who has got by heart a whole library.” —Swami Vivekananda.

ই

স্রা

নী

র

★

শ্রো

★

ম

(উপভাস)

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

নীলিমা দাশগুপ্ত

তরুণীকে হাসি দিয়ে অভ্যর্থনা করলেন মিসেস অনীতা রে।

অনীতা বসেছিলেন ট্রেটবাকের একেবারে সামনের লেনে।
সব-নাশা সন্ধ্যার আলোয় সামান্য-হিলের সাজসজ্জা দেখছিলেন।
তরুণী ডাইনিং-রুমের বেতে নাগাজ। একটা লন-চেয়ারে বসে বললেন,
“এখানেই বসি মিসেস রে, বেশ ভাল গুয়েদার আজকে”—

“বেশ তো”—তরুণী পাশে বসে অনীতা অল্পসল্প বয়সকে
ডাক দিলেন। দ্রুতগতির বাণী দিলেন তরুণী, আজ আর কিছু
খাওয়া চলবে না মিসেস রে—

তুণ এককাপ কফি নাহলে একটু ককো—

না না, আজ একেবারে কিছু না। একটা অল্পোষ করবো
আপনাকে, যদি একটু কষ্ট করে—

ঠিক এই গলায় আর এত দ্রুতগতির তরুণী কখনও কথা
বলেন না, অন্ততঃ অনীতা মিসেস বিশ্বাসের এ কঠোর কখনও শোনেন
নি। চোখ বড় করে অনীতা তাকালেন তরুণীর মুখের
দিকে, চোখের দিকে—মিসেস বিশ্বাসের যে পরিতৃপ্ত মুখের
ছোঁরা দেখতে অভ্যস্ত অনীতা—তা নয়, একেবারে অজ্ঞরকম।
যেন মেঘে মেঘে ধমধমে হয়ে উঠেছে তরুণীর মুখ,
আর চোখে যেন কেমন হটকটে একটা অস্বস্তির ছায়া।
সুস্থিত মুখে অনীতা বললেন, আপনি অমন করে কেন
বলছেন মিসেস বিশ্বাস, বলুন না কী করতে পারি আপনার
জন্ত—তরুণীর চোখের হটকটে ছায়াটা আরো যেন চকল
হলো, আরো ব্যাকুল। অনীতার চোখের দিকে তাকিয়ে
নিজের বস্ত্রবাটা আবার যেন গুছোতে লাগলেন, শুনেছেন বোধ হয়,
আমি খোকনের বিয়ে দিয়ে তারপর ওকে বিলম্ব পাঠাবো—

তরুণীর কথায় অনীতা হাসিমুখে বললেন, বা রে। সেদিন
আমাকে কত মেয়ের ফটো দেখালেন আপনি, আমি ভাবছি,

অনীতার কথা কেটে তরুণীর হাঁকধরা গলা বলে উঠলো,
ইন্দ্রাণীর সঙ্গে খোকনের বিয়ে দেব—অনীতার চোখ দুটি আরো
বড় হলো। চোখের মণিতে ভর করলো অনেকটা অবিশ্বাস, কিছুটা
বিস্ময় আর ছিটেফোঁটা কৌতুক। অনীতাকে নিরুত্তর দেখে
তরুণী আগের গলাতেই বলে উঠলেন, আপনি কী বলেন?
ইন্দ্রাণী কেমন মেয়ে? আপনাদের তো ওবাড়িতে অনেক
বাতায়ত—

এক মুহূর্ত বিরতির পর অনীতা বললেন, “অত্যন্ত চমৎকার
মেয়ে, সব মিলিয়ে এত ভাল মেয়ে সহজে চোখে পড়ে না”—

—কথা শেষ করলেন অনীতা, কিন্তু যেন শেষ হলো না।
অনীতার কণ্ঠের এই বিধাতিক তরুণীর কানে এড়ালো না। তুণ
দুটি নিজের অভ্যন্তরীণেই সঁপিল হলো, মুখে ছায়া ঘনালো,

“আপনি কী খোকনকে ইন্দ্রাণীর অযোগ্য মনে করছেন?”

তরুণীর গলায় জোরালো অভিমানকেচাপা দিয়ে সজোরে
হেসে উঠলেন অনীতা, “কী-ই যে বলেন মিসেস বিশ্বাস...
অকণ্ঠশ। অকণ্ঠশের তো তুলনাই মেলে না—সেদিন আমার
কাছ থেকে ফটোর নেগেটিভ নিতে এসে গল্প করছিলো;
ওর কথায় আর ব্যবহারে আমি আর উনি তো যুগ্ম একেবারে।
ভারি ভাল, ভারি সুন্দর মনের ছেলে আপনার অকণ্ঠশ।”

তরুণীর সঁপিল তুণ একেবারে সোজা, মুখের ছায়া একেবারে
নেই, আনন্দ-আপ্ত কণ্ঠস্বরটা কিন্তু হোট খেয়ে গেলো জিভের
আগায় এসে, তাকে সরিয়ে অসুস্থানী গলা ঠেলে বেরিয়ে এলো,
“কিসের নেগেটিভ নিলো খোকন আপনার কাছ থেকে?”

“ঐ, নীলার আর ইনার একখানা ফলো তুলেছিলুম বাগানে,
নীলার নাকি অত ভাল ফটো আর ওঠেনি। অকণ্ঠশ নীলার ফটো
এনলার্জ করবে ব’লে নেগেটিভখানা নিয়ে গিয়েছিলো।”

“ও।” তরুণীর কণ্ঠের ছোট শব্দটা যেন লাফ দিয়ে
বার হয়ে এলো। অনীতার চোখের দৃষ্টি চট করে একবার
তরুণীর মুখের চারি পাশ ঘুরে এলো, “আমাকে তাহলে ঘটকী
হ’তে বলছেন?” অনীতার গলায় হালকা সুর।

“তুণ ঘটকী হ’লে চলবে না, বরের ঘরের পিসি ক’নের ঘরের
মামী হ’তে হবে, কোমর বেঁধে খাটখাটুনি করতে হবে কিন্তু
আপনাকে—” অনীতার মত হালকা সুরেই কথা শুক করেছিলেন
তরুণী কিন্তু কথার শেষে গলাটা যেন হঠাৎ হলহলিয়ে উঠলো।
আবার চকিতে অনীতার দৃষ্টি তরুণীর চোখ-মুখ জরীপ করলো।
উঠে ঝাড়ালেন অনীতা, “চলুন না, দুজনাই একসঙ্গে বাই, একেবারে
বিয়ের তারিখ ঠিক ক’রে ফিরবো।”

“না, আজকে আপনি একলাই যান, কথাবার্তা পাকা হ’রে
গেলে তারপর আমি বাবো—হ্যাঁ ভাল কথা মিসেস রে, যদি
ইন্দ্রাণীর বাবা-মা মেয়ে ছোটো ব’লে আপত্তি তোলেন, বলবেন,
ইন্দ্রাণী বিয়ের পর ওদের কাছে থেকেই পড়াশুনা করবে,
—খোকন বিলম্ব থেকে না ফেরা পর্যন্ত ওদের কাছেই থাকবে
ও আর না, আর কিছু নয়—একেবারে বিয়ের কথা পাকা করে
আসা চাই কিন্তু মিসেস রে।”

হাঁকধরা গলাটাকে বুদ্ধি দেওয়ার জন্তই বোধ হয় তরুণী
ডাড়াডাড়া চোয়ার ঠেলে লনের এক পাশে এগিয়ে এসে
পাইচারি শুক করলেন। বিস্মিতা অনীতা কাপড় বদলাতে

ভেতরে চলে গেলেন আর ভাবতে লাগলেন—কত কিছু যে ভাবতে লাগলেন, কিন্তু দুই আর দুই—এ কিছুতেই বেন আর চার হয় না। আর, অনীতা রায়ের শরীট। যেই পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে ক্যাথলিক ক্লাবের পথ ধরলো, তরুবালা পাইচাচি বন্ধ করে চেয়ারে এসে বসে পড়লেন। কেবলই একটা কথা পাক খেতে থাকলো ঠর মনে। উনি নিজে গেলেই ভাল করতেন বোধ হয়, ক্যাথলিক ক্লাবের গেট থেকে ফিরে না এলেই পারতেন।

ঘটানাকের মধ্যেই ফিরে এলেন অনীতা রায়। বললেন, রমেন শর্কায়ীর কোনো অমত নেই, এ বিষয়ে সাক্ষকে সম্মতি দিয়েছেন ঠরা, অবশ্য রমেন প্রথমে এত ছোটো বয়সে মেয়ের বিয়ে নিয়ে একটু কিছু-কিছু করছিলেন, কিন্তু অনীতা যখন তরুবালায় জীবনীতে বললেন—বিয়েটা এখন হয়ে থাক, ইজ্রাণী যেমন পড়ছে তেমনি আপনাদের কাছে থেকেই পড়বে, তারপর বি-এ পাশ করার পর আসবে প্রভুবাড়ি, তত দিনে অকরণেশও বিলেত থেকে ফিরে আসবে পড়াশুনা শেষ করে। এ কথার সানন্দে সার দিয়েছেন রমেন শর্কায়ী। তাহলে বিয়েটা কবে হলে সুবিধে হয় এই নিয়ে যখন আলোচনা শুরু হলো, এই আলোচনার মাঝখানেই পাশের ঘর থেকে ইজ্রাণী মা বলে ডাক দিলো। শর্কায়ী সঙ্গে সঙ্গে উঠে গেলেন এবং তার পাঁচ মিনিট পরেই ফিরে এলেন শুকনো মুখ করে। স্বামীর দিকে তাকিয়ে নীস গলায় বললেন,—ইজ্রাণী এখন একেবারে বিয়েতে মত নেই। রমেন স্ত্রীর সঙ্গে দৃষ্টি-বিনিময় করে ভাবতে লাগলেন। কারণ, ইজ্রাণীর বয়স বত অল্পই হোক, বিয়ে নিয়ে পীড়াপীড়ি করতে ঠরা নাকি কেউই পারবেন না, ঠরের অস্ত্রের ঘরে তা বাধে। অনীতা তারপর বলেছিলেন,—চলুন মিসেস রায়, ইজ্রাণীর সঙ্গে আমি নিজে একটু কথা ক'য়ে দেখি। কিন্তু, ঠরা সবাই পাশের ঘরে এসে দেখলেন, ইজ্রাণী সে ঘরে নেই, তারপরের ছোটো ঘরেও না, বায়ান্দাতেও না। ভৃত্যকে ডাক দিয়ে জিজ্ঞাসা ক'রে জানা গেলো—মিস সাব বাওয়ার সময় বলে গেছে, মাজী পুছলে বেন বলে দেওয়া হয়, ও তিনা কাপুরজীর কাছে বেড়াতে গেছে। রমেন বাবু এবং শর্কায়ী দু'জনে বেন লজ্জিত হ'য়েছেন ভেমনি বিব্রত, বায়ে বায়ে আপনাকে বলতে বলেছেন, কথাটা এখন পাকা হ'য়ে থাক, বিলেত থেকে অকরণেশ ফিরে আসার পরই বিয়েটা হবে।

: দাদা আর স্নান করবে কত? বাধকমের বন্ধ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছটকট করছে নীলা। ওর মনের অসহ উদ্ভাসটা বেন একটা আল্লাদে পাখি হ'য়ে ডানা ঝাপটাচ্ছে। দাদাকে যেমন ক'রে হোক এ বিয়েতে মত করাতেই হবে, কিছুতেই কোনো আপত্তি শোনা হবে না দাদার—উঃ!—কী যে মজা হবে তাহলে—ইনা যদি আমার বৌদি হয়, কী মজা। কী মজা। নীলার মনটাই বেন হাততালি দিতে শুরু করলো। তর-তর ক'রে নিচে নেমে গেলো নীলা। নাঃ! দিদিটা এখনও আসেনি, কী যে এত বেড়ায় দিদি বুরিও না আমি—সিমলার আবার দেখার কিছু আছে নাকি! আনন্দ-পাখিটার ডানার ঝাপটে নীলা বেচারি অস্থির, ও আর করে কী—ডেকে ডেকে পরিচারক পরিচারিকাদের সুরবাদটা বিভ্রাস করলো, তারপর আবার লাফাতে লাফাতে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলো ওপরে। বাধকমের কবান আলগা দেখেই

চকস পায়ে দাদার ঘরে ছুট দিলো, “হঁ, হঁ, দাদা, কী খাওয়াচ্ছে বল? তোমার বিয়ে একদম পাকা। এবার এক ঠোঁড় কাঁজুবান্দা চলেবে না, এক-তুড়ি চাই—”

ক্লান্ত অকরণেশ চোখ বন্ধ রেখেই মিন-মিন ক'রে বললো, “তবে তো একতুড়ি তালের খোঁজ করতে হয়, সিমলার কি ও ফল মিলবে?”

“আহা, চোখ খোলোই না দাদা—” চেয়ারের পেছন ঘরে বার কয়েক অকরণেশকে ঝাঁকি দিয়ে দিলো নীলা।

ও, ভারি তো দুটো তিত্তির মেরে এনেছো, এমন চেহারা ক'রে বসে আছে। চেয়ারে যে মনে হচ্ছে বেন সুর-বনের রয়েল বেজল টাইগার বুরি যেহে এসে তুমি—চোখ বুজেই উত্তর দিলো অকরণেশ, কাল দেখিস চুকটনালায় জঙ্গল থেকে লজ্জড় বাব শিকার ক'রে কাঁখে খুলিয়ে ফিরবো। বিয়ের কথায় দাদা মোটেই আমল দিচ্ছে মা দেখে, নীলা চেয়ারের বাজু ছেড়ে অকরণেশের গলা জড়িয়ে ধরলো, দাদা লক্ষ্মীটি, এ বিয়েতে রাজি হ'য়ে যা, আমার কী যে মজা লাগছে।

আঃ নীলা, গলা ছাড়, বিভ্রাস করতে যে আমাকে। ডরারে টকি আছে, যা নিগে যা। অকরণেশের গলা ছেড়ে দিয়ে বাশকড় গলায় নীলা বললো, আমার কোনো একটা আবদার রাখবে না, আর তোমার কেনা টকি আমি খাব, আমার বয়ে গেছে। রোজ রোজ এক ক্রোশ ঠেসিয়ে বাংলা শিখতে যেতে হবে না, বাড়িতে বসে বসে মজা করে শিখতে পারবো, ইজ্রাণী আমার বৌদি হবে এত ভাগ্য কী আমি করেছি না কি?

কে? কে বৌদি হবে? চোখ খুলে ইজ্রাণীর থেকে একেবারে পিঠ-টান করে বসলো অকরণেশ।

ইজ্রাণী। মা তোমার সঙ্গে ইজ্রাণীর বিয়ের প্রস্তাব তুলতে ক্যাথলিক ক্লাবে গেছেন—নীলার গলায় অভিমান। অধিধাসের হাসি হাসলো অকরণেশ, বললো, কী আজ-বাজে বকছিস নীলা! মা যাবেন ক্যাথলিক ক্লাবে—নীলা জোর দিয়ে উত্তর দিলো, বাবা আমাকে নিজে ডেকে ধবরটা দিলেন, বাবা বুরি মিছে কথা বলবেন? অকরণেশ ফ্যাল-ফ্যাল ক'রে বোনের দিকে তাকিয়ে ব্যাপারটা বোধগম্য করবার চেষ্টা করতে লাগলো। দাদার মুখের ভাবের অল্প অর্থ করলো নীলা, আরো অনেক বেশি জোর দিয়ে বললো দাদা, তুই রাজি হয়ে যা লক্ষ্মীটি, এমন মেয়ে আর হয় না। তুই তো একদিন বাজে বাজে কথা বলে শুধু চটিয়েই দিলি ইজ্রাণীকে, না হলে একদিন ভাল ক'রে আলাপ করলেই দেখতিস এমন মেয়ে আর হয় না। শব্দ ক'রে হেসে উঠলো অকরণেশ।

না দাদা হাসিস না, সত্যি সত্যি বলছি আমি। অকরণেশ কোঁতুক গলায় বললো, তোর সেই ডেপো ককুকেই বিয়ে করতে হবে শেষকালে?

নীলা ফুক গলায় বললো, অল্প বয়সে অনেক বেশি জানা খুবই আশ্চর্যের দাদা, তাকে ডেপো বলে না।

বোনের মুখের চেহারা এক পলক দেখে নিয়ে অকরণেশ সহাস্তে বললো, আহা, বোস না নীলা দাঁড়িয়ে আছিস কেন? বসে বসে তোব বন্ধুর গুণাবলী দাবিল কর দিকিন, আমি ভেবে-চিন্তে দেখি ও আমার ক'নে হতে পারে কি না। নীলা ঘরের কোণ থেকে একটা ঘোড়া হিড়-হিড় করে টেনে এনে দাদার সামনে মুখোমুখি বসেই বললো, আনিস! দাদা, ইজ্রাণী মা মানে মাসীমা ফিলোজফিতে

ইশান-কলার, এ সংবাদে অকণ্ঠে মনে মনে কম বিস্মিত হলো না, কিন্তু মুখের ভাব সহজ রেখেই চোখে দুটু মির হাসি ফুটিয়ে বললো, ইন্দ্রাণীর মার গুণ নিয়ে আমার কী হবে?

না, মানে, মালীমার কথা এমন বললুম, ইন্দ্রাণীও কি ডিগ্রিতে কিছু কম বাবে না কি মনে করিস? ইংরাজীতে ইউনিভার্সিটিতে ফার্স্ট হয়েছে।

আচ্ছা, এক হলো, থামিসনে তুই নীলা, তোর বন্ধুর গুণাবলী দাখিল করে যা।

অমন সুন্দর মুখ বাঙালীদেব মণ্ডে চোখেই পড়ে না!

আচ্ছা ছুই, তারপর? এমন সময় সিঁড়িতে তরুবারার পায়ের শব্দ হলো। ঐ বে, মা এসে গেছেন—মোড়া ছেড়ে উঠে দৌড় লাগালো নীলা। চেয়ারে বসে অকণ্ঠে বকে যেন বেতাল মাদল বাজতে লাগলো, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলির ফলাফল বের হবার আগের রাজিতেও এমন বেতাল বাজেনি। আর নীলা মায়ের ঘরের দরজার চুকেই বেগ ধামিয়ে একেবারে থমকে দাঁড়িয়ে গেলো। চেয়ারে এলিয়ে বসে পড়েছেন তরুবারা, কী করণ আর বিবাদ-বিধুর মায়ের মুখ! অভিমানিনী নীলা নিঃশব্দে ক্রিয়ে এলো মায়ের ঘর থেকে। নিজের ঘরে বিছানা আশ্রয় করে কোঁটা কোঁটা চোখের জলে উপাধান ভিজিয়ে দিতে লাগলো। দাঁকার কথার সুরে অনেক ভরসা পেয়েছিলো নীলা, বুঝলো, দাদা ইন্দ্রাণীকে বৌদি করে এনে দিতে রাজি হলে কী হবে, ইন্দ্রাণী ওর বৌদি হ'তে রাজি নয়। বান্ধবীর প্রতি গোপন অভিমানে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলো নীলা। এর পর, সবিস্ময়ে সব গুনলেন অভয়শংকর। নীলা শেলির মারকতে অকণ্ঠে কানেও সব কিছুই এসে পৌঁছলো।

পরদিন অপরাহ্ন বেলায় রামদয়াল ইন্দ্রাণীর হাতে একটা মুখ-বন্ধ করা সাধা খাম দিলো। খামটা উটেপাটে দেখে নিয়ে ইন্দ্রাণী ভুরু কুঁচকে জিগ্যেস করলো, চিঠিখানা ওর হাতে দিতে কে বলল? রামদয়াল সবিনয়ে জানালো, যে, সাব ওর হাতে চিঠিখানা দিয়েছে, সেই বারে বারে বলে দিয়েছে যে, চিঠিখানা যেন শুধু মিস সাবের হাতেই দেওয়া হয়।

ও আচ্ছা—বলে চিঠি নিয়ে নিজের ঘরে ঢুকলো ইন্দ্রাণী।

: নিঃসন্দেহে অকণ্ঠে চিঠি এখানা। অকণ্ঠে ওকে চিঠি লিখেছে, অকণ্ঠে...অকণ্ঠে, নিশ্চয়ই অকণ্ঠে। খুলবো না। স্বাধীনতা দিয়ে মনের দুয়ারে কপাট দিয়ে দিলো ইন্দ্রাণী। ও-খাম আমি খুলবো না—খুলবো না—খুলবো না। টেবিলের ড্রয়ার টেনে বন্ধ খামখানা ঠেলে একেবারে ভেতর দিকে রেখে ঝপাং করে বন্ধ করে দিলো ইন্দ্রাণী। আবার তখুনি অর্ধেক খুলে আবার বন্ধ করলো। আবার খুললো।

: নিজের শক্তিতে বিশ্বাস থাকলে কালির অক্ষর কী করতে পারে ওকে! খামখানা বার করে ফস্ করে একটানে ছিঁড়ে ফেললো মুখটা। বার হলো চিঠি। ভাঁজখোলাব আগে ওর হাত কাঁপলো নাকি?

: না, ও কিছু নয়।

ইন্দ্রাণী,

তোমার কাছে এই আমার প্রথম চিঠি। লিপিতিকে অন্ততঃ লাবণ্যলিপি করার প্রয়াসে এক প্রহর রাজি খবচ করলুম—কিন্তু

আজ বাগদেবী আমার প্রতি নিতান্তই অকণ্ঠ, টেবিলের ওপর, এগাশ-ওগাশ সবটুকু এলোমেলো কাগজে ভরে গেলো কিন্তু, আমার মনোমত একটা সংখ্যানও আমার কলমের মুখে এলো না।

তবু মনের কথা জানাবো তোমাকে। যে করেই হোক, শুরু করি।

আজ সন্ধ্যা থেকে রাজি আটটা পৰ্বন্ত আমি বেন অম্বুল-প্রতিকূল ছুই বিপরীত দ্রোতে ভেসে বেড়িয়েছি। আজ বারে বারে বাল্যের দেখা দু'খানি ছবির কথা মনে পড়ছে। ছোটবেলায় চার পয়সা বাজআলাকে দিয়ে কাচের ঢাকা বাজের ছবি দেখবো বলে বড় সেই গোল চোড়ায় চোখ রেখেছিলাম। বাজের মালিক পয়সাটা পকেটে রেখে তার স্বভাব অম্বুয়ারী চিত্তবিন্দাস শুরু করে দিলো।

: রামরাজাকে রাজ্য দেখো...সীতা মারীকি প্রসূতা দেখো। আমি দু'খানা ছবি দেখেছিলাম, বন্ধুকে সোনার সিংহাসনে সীতাকে পাশে নিয়ে রামরাজা বসে আছেন, সে ছবির জৌলুস বর্ণনার কাজ নেই, সে ব্যয়সে অন্ততঃ আমার চোখে মনে হয়েছিলো—এমন সুন্দর ছবি আমি আর দেখিনি, রাম-সীতার দিব্যকান্তি, তাঁদের আশ্চর্য সুন্দর বলমলে ভূষণ, রামের শৌর্য, সীতার মুখের প্রসন্ন নীতি,—হঠাৎ ঘরে গেলো ছবি—যুটুটে কালো রঙের একখানি ছবি, আকাশের পূজীভূত কালো কালো মেঘগুলিই যেন সমস্ত ছবিটাকে কালো করে দিয়েছে। সেই আশ্চর্যসুন্দর বসন-ভূষণে সাজানো প্রসন্ন নীতিময়ী সীতা—একেবারে রক্তা এ ছবিত্তে, ক্রুর কর্কশ রাবণ রাক্ষস এক হাতে কী নির্দয়ভাবে জাপটে ধরেছে সীতাকে আর এক হাতে ততোদিক নির্দয়ভাবে পক্ষ ছেদ করছে ভট্টাধিপতির, আকাশ থেকে ক্রমাগত পক্ষের ছিন্ন অংশ পড়ছে আর তার সাথে তাজা তাজা লালা রক্ত। এ কী অদ্ভুত ভীষণতা! এক মুহূর্তের বেশি আমি সে ছবিত্তে চোখ রাখতে পারিনি, বাকী ছবিগুলি না দেখেই ছুটে ঘরের ভেতর পালিয়ে এসেছিলাম। সেদিন সেই বাজআলাটাকে একটা নিষ্ঠুর কসাইয়ের চেয়েও বেশি সাংঘাতিক মনে হয়েছিলো আমার। অমন সোনা-রঙা বলমলে অদ্ভুত সুন্দর ছবির পর এই কিস্তুত কিম্বাকার কঠোর ছবি। এবটু পরে দেখালে কী হতো! বার এতটুকু সামঞ্জস্য, এক বিন্দু সজতিবোধ নেই, তাকে ও ছাড়া আর কি ভাবা যেতে পারে—তাই বোধ হয় তখন ভেবেছিলো আমার মন। কিন্তু আমাদের এই পৃথিবীতে বাস্তবে অহরহ এমনি ঘটনা থাকে এবং ঘটছে। বেশ তো শিকারের খেলার মতো গিয়েছিলেম আমি। সেই অভিনয়ের পরদিন থেকে এ ক'দিন আমি আমার শরীর ও মন দুটোকেই তাড়িয়ে ফিরেছি পাখির পেছনে। তারপর অবিশ্রান্ত ছুটোছুটি করে একটি কি দৃষ্টি পাখির ছংপিণ্ড বিনোদ করে বাড়ি ফিরেছি অসহ ক্লান্তি নিয়ে। আর বাড়ি ফেরার পথে ভাবতে ভাবতে এসেছি, ছংপিণ্ড কি রক্তাক্ত হয় শুধু গুলীতেই?

কালও সন্ধ্যার পর মৃত্যুর মত ক্লান্তি নিয়ে শরীরটাকে এলিয়ে দিয়েছি চেয়ারে, নীলা ছুটে এলো। দাদা কী মজা! ইন্দ্রাণী আমার বৌদি হবে, মা বিয়ে ঠিক করতে নিজে ক্যাথলিক ক্লাবে গেছেন। কথাটা বিশ্লেষণ করতে সময় লাগলো একই, নীলা বাবার জবানী উল্লেখ করার আর সংশয় রইলো না। তখুনি মনে হলো, আমার কোনো পৃণ্যকলে কোনো দেবতা যদি

আবির্ভূত হ'য়ে আমাকে বর দিতে চাইতেন, আমি এ ছাড়া আর কি চাইতাম? আর তারপরই সিঁড়িতে মায়ের পায়ে ফলি গুললাম—কিন্তু বড় বেন ঢিলা-ঢালা-প্লথ পায়ের ফলি। নীলা ছুটে 'গেলো। আমি একলা ঘরে বসে বসে গুলিতে লাগলাম নিজের বুকের শক। নীলা আর ফিরলো না দেখে বুঝতে আমার আর কিছু বাকি রইলো না।

তারপর সবই শুনে ফেললাম, যে সুরভি কান্তনীকে সাড়বরে বাগতম জানানোর ভক্ত প্রজ্ঞতি শুরু করেছিলো মন, অকস্মৎ অজস্র হিম বরিয়ে কে যেন সমস্ত বসন্ত-প্রাণ নিমেষে লুপ্ত ক'রে দিলো, মনের সাতরঙ্গা স্বপ্নটা যেন দ্রুত চিল হ'য়ে ফুটু ঝাপট লাগিয়ে হঠাৎ উধাও হলো শূন্যে। মনে হলো 'প্যাগাডাইস্ট' আর অসংখ্য বার মনে পড়লো বাল্যের দেখা সেই ছবি ছাণির কথা।

কিন্তু, এটাই ঠিক ইন্দ্রাণী! তোমাকে পেয়েছি বলেই তোমাকে হারাতে চাইনে। স্থির চিন্তে ভেবে দেখলেম, তুমি যদি

সমাপ্ত

তিমিরাভিনার

(Last ride together. R. Browning.)

জেনেছি জেনেছি আমি প্রিয়তম,
প্রত্যক্ষার দীর্ঘ দিন গিয়েছে হারিয়ে
নিষ্ফল সন্ধ্যায়। কোন ক্ষোভ নেই;
হৃদয় গাহিছে আজি তোমার মধুর নাম
আকাশে বাতাসে। ভরিছে পেয়ালাধানি
মৃতির সৌরভ নিয়ে। ফিরিয়ে দিয়া না
তারে। নিয়ে যাও আর যত আকুল
কামনা হৃদয়ের বৃত্ত 'পরে ফুটেছিলো
রজনীগন্ধার সম। শুধু যোরে
দিয়ে যাও—একবার—তোমার
পরশসুধা রজনীতিমির মাঝে
বৈত-অভিশাপে।

শ্রদ্ধা বাকিস তার। গভীর-কাজল
আঁধি রিক্ত করি মাধুর্যের শেষ বিন্দু
রাঙিয়া বক্তিম রাগে নিনিমেষ নির্ভাবন
চেরে থাকে মোর মুখ পানে।
হৃদয়ের তটপ্রান্তে প্রাণের হরিণ নির্বাধ-
বিস্মরে স্থির। 'তাই হবে'—চকিতে হরিণ
পেলো জীবনের স্বাদ পরম আশ্বাসে
প্রিয়জন-সুখে। অস্তিত্বকামনা মোর হারানি
অনানর-ভীড়। মোর স্বর্গ হ'তে বিনাশের
ক্ষণ আসেনি এখনও; প্রেম-পাত্র রিক্ত নয়;
আরো আছে দোশর বাজির কোলে
নিঃশাসনিবিড়-স্পর্শ। কে বলিতে পারে

এখন সম্মতি দিতে, তাহলে তোমার নিষ্ঠার প্রতি আমার বোধ হয়
প্রত্যাঘাত কমে যেতো। খাওয়ার টেবিলে বাবা মাকে পুরো
আশ্বাস দিয়েছেন—তুমি ভেব না তরু, কাল বিকেলে আমি
নীলকে নিয়ে ইনামারের সম্মতি আদায় ক'রে তবে বাড়ি ফিরবো।
আমার চিঠিলেখা শুধু এইছত্র,--মুন্সিল হলো এই—আমার
বাবাকে তুমি বোধ হয় তেমন নোংরা স্বযোগ পাওনি ইন্দ্রাণী, আমার
নিজের বিশেষ, বাবার কথায় কিছু বাহু আছে, বাবার কথায় না
কহতে আমি কাউকে এ পর্যন্ত দেখিনি। কিন্তু, আমি এ ভাবে
শেতে চাইনে তোমাকে। অনেক দিনের অনেক ছোট বড়
অভিযোগ তোমার মনে জমে জমে পাহাড় হ'য়ে গেছে—সেগুলি
মুন্সিল হ'য়ে গেলে তোমার খোলা পরিপূর্ণ মনধানি আমি চাই।

আমার স্বপ্নের এক মহলা প্রাসাদ তত দিনে হ'তে থাকবে
সাত মহলা। আমি আছি, আমি থাকবো ইন্দ্রাণী, আমার সাত
মহলার সাতটা দরজাই তোমার জন্য খোলা রইলো।

- অরুণেশ।

পৃথিবীর পরমায়ু-কথা? শেষ যদি হয়ে
যায় এ রজনী-সাথে।

প্রতীচ্য গগনবক্ষে তরঙ্গিত মেঘমালাসম,
সহস্র আশ্রিত ভাবে আনমিত বরষার—ভাঙ্গুর
কিরণ যেন গোবুলি-লগনে, মেশে আসি
ঘোছনার সাথে উদার আকাশে। সেই
শুভকণে, প্রেমের পুলকে রাঙি, কামনার
দীপশিখামাথে, সাথে লয়ে মেঘমেঘুরতা,
দূর-অস্তাচল-পারে তপনের রক্তরশ্মি-লেখা,
নিঃশব্দ অক্ষণোদয়, তারকার জ্যোতি,
বীরে বীরে নেমে এলো মোর বক্ষে
সত্তম-আনন্দে দেহভারহীন বৈতন-ব্রততী
রচিত অক্ষয় স্বর্গ।

যাত্রা হ'লো সূর্য। দূরে ফেলে
হতাশার আবর্জনা, পুলকে জাগিল
আশা অন্তর-আকাশে। জীবনের
লেন-দেন—কী পেয়েছি আর
কী পাইনি—লাভ ক্ষতি, টানাটানি,
মিলনবিরহ দুছে ফেলে, ভাবনায়ে
দিয়ে নির্বাসন, পবন লগনে জাগি
প্রিয়তমা পাশে।

এ জীবনমাঝে অক্ষমতা-অভিশাপ
আমারই ত নয় শুধু? হাজার জীবনে

তার বিবাদের ছায়া। কত বেশ এলো
কত নদী গেলো। মোর শুধু বহি
কাছাকাছি চেতনাবিহীন-সর নীলাকাশ-মাঝে।
মনে হ'লো জীবন-সাধনা কত বার্থ নয়।
বার্ষ নয় আকুল কামনা। বা কিছু
সেখেছি মোরা সে ত এক অতি
ক্ষুদ্র তরু-অংশ ভাগ—অজানা
বৃহৎ। শুধু জানি অতীতের
লুক্ক আশা বাঁচিয়ে রেখেছে তার
শিশু-বর্ডমানে অন্তর-মাধুর্য দিয়ে।
কেন জানি মনে হলো এইখানে এই ক্ষণে
হারানো সে প্রেম ফিরিতে পারে ত কতু ?

ভাবনার সত্যরূপ দিয়েছে কি
কেউ আপনার হাতে ? তবিত্ত্বদয়
পেয়েছি কি তার আপন-প্রিয়ারে
বিনা-আকর্ষণে ? কণের বারিষি-মাঝে
কতক্ষণ থাকে চিন্তার তরঙ্গ ? শারীর-
পাষণে বন্দী মানববিহঙ্গ কোথা যেতে
পারে ? কাছে পেয়ে দমিতের তল্লব্দেহ ;
নারবে হেরেছি তার গতিহীন পীনোন্নত
পর্যায়। সাত্রাজ্য রয়েছে সেথা,
কে পৌছিতে পারে ? কত বোঝা হারিয়েছে
প্রাণ। অস্থির কবরে শোভে বিজয় নিশান।
জীবনের বিনিময়ে পাষণ ফলকে লেখা
শুক নামধানি এই কি সাধনা ? কামনার
ধন সাথে রজনীতিমির-মাঝে
এই অভিসার, মোর কাছে অতি প্রেরণার।

অভিসারলিপি কে বুঝিতে পারে ?
কবির ভাবনা, প্রাণ পার ছন্দের বন্দনে
জানি। অমৃত-গাঁথা মধুর স্নন্দর
হয় কবির লেখনীস্পর্শে। হৃদয়
অনেক কিছুই আছে নয়ত বিশেষ
কিছুই নয়। শুধু বল দেখি কবি,
তুমি কি পেয়েছো কত স্নন্দরের
প্রাণস্পর্শ ? বুঝি বা বেদনা-গভীর প্রাণে
ঝেলে রেখে দীনতার দীপ চলেছে
মৃত্যুর পানে ? তাই যদি হয়,
জেনে রাখো ছন্দের সাধনা নয়,
প্রাণের সাধনা এই আনন্দের
অভিসার, প্রিয়তমা-পাশে।

হার রে ভাস্কর ! তোমার
সাধনা বার্থ ! আরাধ্য দেবীর রূপ
পায়নি প্রকাশ অক্লান্ত প্রেমে শেষে।

হের আজি প্রেমসী মোদের লবুপনে
অতিক্রমে কীণ স্রোতোধারা।
কোনো ক্ষতি নেই যদি তোমার বিবর্ণ
দৃষ্টি না বুঝিতে পারে ?
সঙ্গীতসাধক ! নীরস সঙ্গীত-লিপি
নিরে কেটে গেলো সাধনার দিন।
কী পাইলে বলো ? প্রেমসার স্তোকবাণী ?
সঙ্গীতের রূপ কোথা ? সে যে এক
অরূপ সাগর। তোমার সঙ্গীত-শিশু
ডুবে গেলো গভীর অন্তরে।
দিয়েছি ঘোঁষন আমি। পেয়ে গেছি
তাই অভিসার-অধিকার, হোক তাহা
মুহূর্তের তরে।

নিয়তির কথা কে বলিতে পারে ?
কে জানিত হায় এই ক্ষণে তবিত্ত্ব উঠবে
হৃদি সহস্র আশ্রয়ে ? কবে নাই কেউ
হেন অঙ্গীকার ? এ জীবন থেকে
অনন্ত-যাত্রার ক্ষণে মানব বাজীর ভাবে
এ জীবনকথা। মনে পড়ে দূর স্মৃতি সম
কবে কোন অজানা লগনে লক্ষ্য পৌছেছিলো
তার অনন্ত কামনা। বিজয়ের পূণ্যস্পর্শ
লভেছিলো কবে কার অন্তরের গৃহলক্ষী।
অনন্ত জিজ্ঞাসা জাগে আকুল পরাণে।
সত্য আনন্দে চূর্ণ করে রয়ে
প্রাণের হরিণ। মধুময় ধরণীর ধূলি ;
পুলকিত নভতল অনিন্দ্য সুখমারাগে।
সে স্বপ্ন আর এ প্রেমসীর স্পর্শলোভ
ছুটেছে বিহঙ্গ মোর অনন্ত আকাশ-মাঝে
ধূমকেতু সম।

নির্বাণ বঁধুরে ঘিরে রয়েছে
স্বপন মোর দূর নভোচারা। জীবনের
কীর্ধোগরি অক্ষর অনিন্দ্যধাম, যেথা
থেকে ক্ষণে ক্ষণে ঝরে পড়ে জীবন-চেতনা।
প্রান্তরার কালে, সেই যদি স্বর্গ হয়
তবে তাও মিশে গেছে কাঙ্ক্ষিত
দেহেরে ঘিরে। উদ্ধ পানে চেয়ে
আছি শঙ্কিত হৃদয়ে, কামনার
আতুর অঞ্জলি, শুধু যেন জীবনে যরণে
পাশাপাশি রাখে অচিহ্নিত ধাবমান
স্রোতোধারে। মুহূর্তে মুহূর্তে যেথা
জন্ম লভে নতুন জীবন, তারি কোনো
প্রান্তে রাগে বৈতভাবহীন একক জীবন।

অমুবাদিকা—সুকুমারী দাশ।

এবার কেনবার সময়

লেখকগণের বিজ্ঞপ্তি

তৈল

পিলখার-গ্রন্থ ক্যাপ

মুক্ত দেখে কিনবেন

এম. এল, বঙ্গু য়াগু কোং প্রাইভেট লিঃ কলিকাতা-১



[Osamu Dazai's "THE SETTING SUN"-এর অনুবাদ]

তৃতীয় অধ্যায়

চন্দ্রমল্লিকা

অতঃপর এমন অসহায় অবস্থার সম্মুখীন হ'লাম, যেখানে বঁচে থাকা অসম্ভব। প্রচণ্ড ঝড়ের পর সাদা মেঘের দল যেভাবে আকাশের গায়ে এলোমেলো ছুটে বেড়ায়, তেমনি আমার বৃকের ভেতর বেদনার তরঙ্গ উথাল-পাখাল করে ফেলে। যারাজক এক অমুভূতি, অজানা এক আতঙ্কে আমার নাড়ীর গতিতে ছন্দপাত হয়, নিঃশ্বাস ক্রিয়া ব্যাহত করে বৃকের ভেতরটা নিউড়ে ছেড়ে দেয়। মাঝে মাঝে চতুর্দিক অন্ধকারে কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে আসে, আর মনে হয় বেন আমার আঙুলের প্রান্ত-পথে সারা দেহের শক্তি নিঃশেষে বেরিয়ে যাচ্ছে।

সম্প্রতি বিল্ডি একঘেরে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। আমি বা করি তাতেই মন ধারাপ হয়ে যায়। আজ আবার বেতের চেয়ারখানা বাগান্নার টেনে নিয়ে বসলাম—ইচ্ছে গত বসন্তে শ্রু করা সোয়েটারখানা এবার শেষ করব। হাঁকা গোলাপী রং-এর সঙ্গে গাঢ় নীল উল মিলিয়ে জামা বুনছি। বছর কুড়ি আগে, আমি তখনও 'ইকু'লে পড়ি, সেই সময়ে মা আমার একখানা স্বাক'বুনে দিয়েছিলেন—গোলাপী উলটা তারই স্বাক'র শেষের দিকে ছোট

টপির মত করে বুনেছিলেন, সেটা পরে আয়নাতে নিজের চেহারাকে দেখে নিজেকে মনে হত ক্ষুদ্রে শয়তান। আমার ইকু'লের বন্ধুরা যে সব স্বাক'গায়ে দিত, আমারটা তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন রঙ বলে ওটা আমার ছ'টকের বিব ছিল। ঐ স্বাক'গায়ে দিয়ে কান্নার সামনে বেরুতে এত লজ্জা হ'ত যে বহু দিন ব্যবহার না করে দেয়ালে ফেলে রেখেছিলাম। সম্প্রতি বসন্তকাল পড়তে হঠাৎই আমি ওটা খুলতে বসলাম, মৃত সম্প্রতি পুনরুজ্জীবনের সঙ্গীত নিয়ে, নিজের জন্ত একখানা সোয়েটার বুনব স্থির করলাম। কি জানি কেন, ঐ ফিকে রঙটা আমার স্মৃতির পথে অন্তরার হওয়ার আবার উলটা বাজবন্দী হ'ল।

আজ অল্প কাজের অভাবে হঠাৎ বের করে বুনেতে বসলাম। বুনেতে শুরু করে খেয়াল হ'ল, যেখানকার আকাশের গাঢ় রঙের পাশে উলের রঙটা চমৎকার খুলেছে, রঙের এমন অপূর্ব স্নিগ্ধ সামঞ্জস্য ভাবায় বোঝান শক্ত। আকাশের রঙের সঙ্গে এ-হেন সামঞ্জস্যের প্রয়োজনীয়তা এর আগে কখনও বুঝিনি। অবাক হয়ে ভাবলাম, বিভিন্ন রঙের শোভন সংগতি কি অপরূপই না হ'তে পারে! আকাশের ধূসর নীলিমার সঙ্গে ফিকে গোলাপীর বোগাযোগ, ছুটি রঙকেই ফুটিয়ে তুলেছে। আমার হাতে সে উল জীবন্ত হয়ে উঠল, যেখান আকাশ মধ্যমলের মত নরম। ফরাসী চিত্রকর মনে'র (Mone't) একখানা ছবির কথা মনে এল, কুয়াশার মধ্যে একটি গির্জা; জীবনে প্রথম উপলব্ধি করলাম শ্রুতি ক'কে বলে, মনে মনে উলটাকে যত্নবাদ দিলাম। শীতের তুষারচ্ছন্ন আকাশের নীচে ঐ রঙ যে কত অপূর্ব দেখাতে পারে সে জ্ঞান ছিল বলেই মা ফিকে গোলাপী পছন্দ করেছিলেন, কিন্তু আমার নির্বিক্রিয় আমি তখন বুঝতে পারিনি। চিরদিন নিজের খুসীমত চলেছি, মা কোন দিন বাধা দেবার চেষ্টাও করেননি। এত কাল ধরে আমার কখনও বোঝাতে চাননি, শুধু অপেক্ষা করেছিলেন, কবে নিজে থেকে আমার চোখ খুলবে। ভাবলাম, আমার মায়ের মত এমন মা আর কোথায়! সঙ্গে সঙ্গে নিদারুণ ভয় আর আতঙ্কে শিউরে উঠলাম, তবে কি নাওজি আর আমি ছ'জনে মিলে মাকে অবধারিত মৃত্যুর পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছি? বতই ভাবি ততই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায় ভবিষ্যৎ আমাদের সন্ত দুদিন বয়ে আনছে। আঙুলগুলি অসাড় হয়ে এল, কোলের ওপর বোনার কাঁটা ছুটো পড়ে গেল। মস্ত এক দীর্ঘশ্বাস বুক ঠেলে বেরিয়ে এল। চোখ বুজেই মাথা তুলে নিজের অজান্তে চোঁচিয়ে উঠলাম মা গো!

ঘরের কোণে ব'সে বই পড়তে পড়তে মা অবাক হয়ে জিজ্ঞাস করলেন—কি হ'ল?

কেমন বেন সব গোলমাল হয়ে গেল। অহেতুক উঁচু গলায় জবাব দিলাম—শেষ অবধি গোলাপগুলো ফুটল, জান মা? আমি এইমাত্র লক্ষ্য করলাম—এত দিনে ফুটল তবে।

বহু কাল আগে ফ্রান্স কিংবা ইংল্যান্ড এরকম অনেক দূর থেকে ওয়াদামায়া এই ফুল এনেছিলেন। আমাদের নিশিকাতা স্ট্রীটের বাড়ী থেকে তুলে এনে আমি এখানে পুঁতেছিলাম। সকালেই আমি একটা ফুল দেখছি, কিন্তু বর্তমান অপ্রত্যাশিত ভাব কাটাতে বেশ একটু উচ্ছ্বাসের সঙ্গেই বললাম—এইমাত্র দেখছি। যোর বেতনি রং-এর এই ফুলগুলিতে কেমন বেন দৃঢ় ও শক্তির প্রকাশ আছে।

রাখতেও মায়ের আপত্তি, মুখের ঢাকা পরা তো দুবের কথা। মাকে জিগ্যেস করলাম—মা তুমি পতন ?

সোৎসাহে মা জবাব দিলেন—পরব বই কি।

আমি তো হাঁ! নাওজির আদেশ পালন করার জন্ত মা যেন বন্ধপত্রিকর হয়েছেন।

জলখাবারের পর নাওজির নির্দেশমত বিভানলের জলে ভিজিয়ে খানিকটা গঙ্গ-কাপড় মুখচাপা দেওয়ার মত ভাঁজ করে মার কাছে নিয়ে গেলাম। বিন্দুমাত্র আপত্তি না করে ঢাকাটা নিয়ে কানের পিছনে দড়ি টেনে বেঁধে নিলেন। তারপর ছোট্ট অসহায় বালিকার মত শুয়ে রইলেন।

সেদিন বিকেলে টোকিওতে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা করা দরকার—এই অভূহাতে মায়ের কাছ থেকে দুই হাজার ইয়েন (জাপানী মুদ্রা, ডলারের প্রায় সমান) নিয়ে নাওজি রওনা হ'ল।

এর পর দশ দিন কেটে গেছে, কিন্তু তার ফেরার কোন লক্ষণই নেই। প্রতিদিন মুখে ঢাকা বেঁধে মা তার অপেক্ষা করেন। তিনি আমার বোঝাসেন—ওষুধটা বাস্তবিকই ভাস, বাখাটা অনেক কম। আমার মনে হয়, মা ঠিক বলছেন না। বিছানা থেকে উঠছেন বটে, কিন্তু খাওয়া দাওয়া কমে গেছে, কচিং কখনও কথা কন। মায়ের জন্ত আমার চিন্তার অবধি নেই, এবং নাওজি কেন এত দেরী করছে ভেবেই পাঠি না।

নাওজি যে ঔপন্যাসিক উয়েহারার (Uehara) সঙ্গে চৈ-চৈ করে টোকিওর পাগলকরা আনন্দের স্রোতে গা ভাসিয়েছে, এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। এসব কথা মনে এলে নিজের জীবন আরও হৃদয়বাহ থেকে। গোলাপের কথাশ্রসঙ্গে উত্তেজিত হওয়া, বা সম্ভাবনের অভাব স্বীকার করার মত লজ্জাকর ঘটনা যখন আমার দ্বারা সম্ভব হচ্ছে—তখন আমি যে ক্রমশঃ নিজের ওপর সংযম হারাচ্ছি—এ তো স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। নতুবা এ ধরনের ত্রুটি আমার দ্বারা কখনই সম্ভব হত না। একটা হতাশাব্যঞ্জক শব্দ করে উঠে ঝাঁপাতে গিয়ে বোনাটা পড়ে গেল। নিজেকে নিয়ে কি করা যায়, ভেবে পেলাম না। কীদন্তে কীদন্তে সিঁড়ি বেয়ে তেতলার বিদেশী প্যাটার্নের ঘরের দিকে উঠে গেলাম।

এ ঘরখানার নাওজি থাকবে। চার-পাঁচ দিন আগে মা আর আমি এই ঠিক করে মিষ্টার নাকাই-য়ের সাহায্যে ধরাধরি করে নাওজির আলমারী ও বই, কাগজ, অসংখ্য অস্ত্রাস্ত্র জিনিষে বোঝাই করা কাঠের বাস্ক, আমাদের আগের বাড়ীতে তার বা কিছু ছিল, সব সে ঘরে এনে ফেললাম।

টোকিও থেকে ফিরে এই আলমারী, বইয়ের বাস্ক, কোথার কি রাখতে চায় সেই মত ব্যবস্থা করলেই হবে,—এই ভেবে আমরা অপেক্ষা করে রইলাম। ঘরের অবস্থা বা ঝাঁড়াল, তাতে সেখানে নড়াচড়া হুঃসাধ্য হ'ল। একখানা খোলা কাঠের বাস্ক থেকে অভ্য-মনস্ক ভাবে তার নোটবইখানা তুলে নিলাম। মলাটের গায়ে লেখা—“চন্দ্রমল্লিকা পত্রিকা”। যে সময়ে নাওজি ঘুমের ওষুধ খেয়ে নেশা করত—এ তার সেই সময়ের নোটবই বলে মনে হ'ল।

এ কী মরণ-বরণ দহন-জ্বালা!

বেদনার ভাঙনার ‘অসহ বন্ধু’ কথাটুকু পর্য্যন্ত উচ্চারণ করা

অসম্ভব হয়। মানব-ইতিহাসে অধিতীয়, অভুলনীর, অতলম্পর্শী এ নরক বন্ধুগীর হাত হ'তে মুক্তি পাবার প্রয়াস কর না।

দর্শন? মিথ্যা! ধর্ম? মিথ্যা! আদর্শ? মিথ্যা! অশুশ্রল? মিথ্যা! সত্যতা? মিথ্যা! শুচিতা? মিথ্যা! সর্বৈব মিথ্যা! লোকে বলে উসিখিমার মটর ফুলের বয়স সহস্র বৎসর এবং কুমানোর মটরফুলের বয়স শত শত বৎসরেরও অধিক। শুনেছি উসিখিমার মটর লতা নয় ফিট এবং কুমানোর লতা পাঁচ ফিট পর্য্যন্ত দীর্ঘায়িত হয়। ঐ মটর ফুলের শোভায় আমার মন-প্রাণ নেচে ওঠে।

দে-ও তো! কারও সম্ভান! তারও প্রাণ আছে।

যুক্তি, একমাত্র যুক্তির প্রতি অহুবাগ, মানবাত্মার প্রতি দরদর একান্ত অভাব।

অর্থ-ও নারী। যুক্তির সঙ্গে মৈত্রীস্থাপন করে স্বরায় অন্তর্হিত হয়।

ডাক্তার ফাউস্টের তেজোদীপ্ত এক উক্তি আছে—নারীর মিত-হাস্তের তুলনায় ইতিহাস, দর্শন, পাণ্ডিত্য, জ্ঞান, রাজনীতি, অর্থনীতি আদি বিজ্ঞানের আরও বিভিন্ন শাখা সকলই তুচ্ছ।

দস্তের আব একটি নাম পাণ্ডিত্য। মাছুষের আশ্রাণ চেষ্টা, মাছুষ না হওয়া।

গোটের সামনে শপথ করে বলতে পারি, আমার মধ্যে অসাধারণ সাহিত্য-প্রতিভা স্তম্ভ আছে। নিতুল বাক্যবিজ্ঞান, বসের মাত্রাবোধ, পাঠককে অভিভূত করার মত করণ বসের অবতারগণ—অথবা ত্রুটিহীন, অসামান্য এক উপন্যাস, উপযুক্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে বা পড়া যায় উদাস্তকণ্ঠে—(অথবা চলচ্চিত্রের আবহবাহা) এমন কিছু লেখা আমার দ্বারা অসম্ভব নয়, যদি না লজ্জা এসে বাধা দেয়।

কাসলে প্রতিভার এই সচেতনতা ঘিরে কেমন যেন চাপল্যের ভান আছে। পাগলেই শুধু গভীর শ্রদ্ধা নিয়ে উপন্যাস পড়ে। এসব ক্ষেত্রে শোকবাতির বিশেষ পোষাক পরার রীতি চালু করা উচিত। দারুণ কিছু লেখার দম্ভ স্বতঃকণ না থাকে, ততক্ষণই ভাল। আমার উপন্যাস হবে এলোমেলো। ইচ্ছে করে লম্বা লম্বা লিখব আমি, বন্ধুর মুখে ফুটে উঠবে অনাবিল আনন্দ—মাখার চুল হিঁড়তে হিঁড়তে অতল তলে তলিয়ে যাব। আঃ—বন্ধুর সেই আনন্দবিহীন রূপ দেখে প্রাণ জুড়াবে।

অত্যন্ত বাজে লেখা ও কুচরিত্রের ছেল-ভালানো বাঁশি বাজিয়ে যে বলব ‘জাপানের শ্রেষ্ঠ নির্বোধ এখানে উপস্থিত—আমার তুলনায় তোমরা সবাই ভাল—তোমাদের মঙ্গল হোক’—এ কোন্‌ ছলনা!

বন্ধু, আত্মতৃপ্ত মুখে তুমি যখন বল—‘ঐ তো ওর বহুরোগ। আহা! কি দুঃখের কথা।’—তুমি জান না তখন লোকে তোমার ওপর প্রসন্ন হয়।

জানি না, কে মন্দ নয়।

কান্তিকর এই দৃষ্টিভঙ্গ।

ঢাকা চাই।

ঢাকা না গেলে—

ঘুমের মধ্যে স্বাভাবিক মৃত্যু।

ডাক্তারখানার হাজার ডলার খণ হয়ে গেছে। আজ এক বন্ধকের নোকাসে কেরানীকে বাড়ীতে ছুঁকরে আমার ঘরে এনে

জিগোস করলাম—এখানে বন্ধক দেওয়ার মত দামী কিছু চোখে পড়লে তুলে নিয়ে যেতে পার। এখন আমার টাকার বিশেষ দরকার। ঘরের মধ্যে আলগোছে চোখ বুলিয়ে কেরাণীটা বেহাওয়ার মত বললে—এ মতলব ছেড়ে দিন বাবু, এ আসবাব তো আর আপনার নয়। আমিও ক্ষেপে উঠলাম—বেশ ঠিক আছে। আমার নিজের হাত-ধরচের টাকায় বা বা কিনেছি, তাই তবে নিয়ে যাও।

টুকিটাকি অল্প জিনিষ তার সামনে জুপ করে দিলাম—যার কোন বন্ধকী মূল্য নেই।

জিনিষের তালিকা—প্রাষ্টারের তৈরী একখানা হাত—ভেনাসের দক্ষিণ হাত। ষ্টাণ্ডেণ্ড ডালিয়া ফুলের আকারে শুভ্র একখানা হাত। চক্রেখাবিহীন অঙ্গুলিশ্রান্ত, রেখাবিহীন করতল সমন্বিত এই ত্বরাণ্ড শূকুমার হাতখানিকে লক্ষ্য করে বেদনা ও লজ্জার দর্শক এমন অভিভূত হয় যে, ভেনাসের যেন দম বন্ধ হয়ে আসে। তার পরিপূর্ণ নগ্নতা যে মুহূর্তে একজন পুরুষের দৃষ্টিগোচর হয়, ভেনাস সসঙ্কোচে দেহের ভঙ্গী পরিবর্তন করে। বিশ্বয়ের বোমাঙ্ককর উত্তেজনার আবর্তিত অবস্থা, অপরিণীত লজ্জার তাড়না এবং নগ্নতার বেদনা—একাধারে সমস্ত অল্পভূক্তি যেন ঐ হাতখানির মধ্যে পরিস্ফুট। ভাস্কর্যের এ অসামান্য নিদর্শনটির জন্ত কেরাণী বৎসামান্য পকাশ সেন (জাপানী ভাস্কর্য) দিতে রাজী হল।

অস্ত্রাজ জিনিসের তালিকা,—প্যারীর সহরতলীর এক বিরাট মানচিত্র। প্রায় এক ফুট বেড়ের সেলুলয়েডের লাট। বিশেষ এক রকম কলমের মুখ—বা দিয়ে সূত্রের চেয়েও মিহি লেখা যায়। দারুণ সন্তায় পাচ্ছি ভেবে এককালে আমি এসব কিনেছিলাম।

কেরাণীটা হেসে বলল—এবার তবে আসি। দাঁড়াও—বলে জোর করে একদাশ বই তার বাড়ে চাপিয়ে দিয়ে মাত্র পাঁচ ইয়েন উদ্ধার হল। সর্স-সাকুল্যে আমার মূল্য প্রায় এই রকম দাঁড়ায়। হাসির কথা নয়।

কয়েক জন আমার সমালোচনা করে আমার কাজকে সমর্থন করে বলেন—অধঃপতনই বাঁচিবার একমাত্র উপায়। এর চেয়ে আমার মরতে বললে অনেক বেশী খুশি হই। সে অনেক লোভা রাত্তা। কিন্তু মানুষ কখনও বলে না—মর।

অর্বাচীন, পণ্ডিত ভণ্ডের দল। বিচার? এখানে তুমি শ্রেণীগত দৃষ্টির সন্ধান পাবে না। মনুষ্য? তুমি অত্যন্ত নির্বোধ। আমি জানি, তোমাদের স্বার্থপর স্বার্থের কারণে স্বপৌত্রীয় মানব বলি হয়। সে যে মৃত্যু। একমাত্র রাস সেখানে—মৃত্যু। এ ভিন্ন এর কোন অর্থ হয় না। প্রস্তাবনা নিষ্প্রয়োজন।

আমাদের মধ্যেও কোন ভুল্লোলক নেই। নির্বোধ, ভূত, প্রেত, কুপন, উদ্ভাদ, হামবড়ার দল, কেবল বড় বড় কথা বলে, মেঘের ওপর থেকে নাক উঁচু করেই আছে।

মর। শুধু ঐ কথাটি স্বীকার করতে পারলে আমার ভাব্য পাওনা থেকে অনেক বেশী লাভ হয়। যুদ্ধ, জাপানী যুদ্ধ, জীবন-মরণ সমস্তার যুদ্ধ। এ রকম মরিয়া কাজের ভেতর আত্মদাং করে নিয়ে মারবে? ধর্মবাদ, তার দরকার হবে না, বরং নিজের হাতে মরা ভাল।

মিথ্যা কথা বলার সময়ে মানুষ গভীর হয়ে যায়। আমাদের বর্ধমান নেতাদের কি দারুণ পাণ্ডিত্য! হিঃ।

বাদের ক্ষেত্রে সম্মানের কোন প্রশ্ন ওঠে না, আমি তাদের মধ্যে বাঁচতে চাই।

যে সময়ে আমি অসামান্য বুদ্ধিমান হবার ভাণ করতাম, তখন সবাই ধরে নিত, সত্যি আমি তাই। যখন অলস ভাবে দিন কাটিয়েছি, তখন সবাই বলল ‘অলস’। যখন তাদের বোঝালাম, উপভাস লেখা আমার আয়ত্তের বাইরে, সবাই ধরে নিল, ভদ্র ত তাই। মিথ্যে কথা বলতে শুরু করলাম, সবাই বলল, ‘মিথ্যাবাদী’। যখন মস্ত বড়মামুদী চাল দেখালাম, লোকে বলল—‘বড়লোক’। ঔদাসীন্দের ভাণ করতে, সবাই ধরে নিল—লোকটা ‘টৈরাগী’। কিন্তু অসতর্ক মুহূর্তে বেদনার কাতর হ’লে লোকে বলল—ওটা ছলনামাত্র।

ছনিয়ার বাঁধন আলগা হয়ে এসেছে। তবে কি মোট-কথা এই দাঁড়ায় না—যে আত্মহত্যা ভিন্ন আমার গতি নেই? এত যন্ত্রণার মধ্যেও আত্মহত্যার কথা মনে হ’তে হ-হ করে কেঁদে উঠলাম।

একটা গল্প আছে, বসন্তের কোন সোনালী সকালে দু’তিনটি সত্ত মুকুলিত প্রায় ফুলের শাখায় হিডেলবার্গ (Heidelberg)-এর এক তরুণ ছাত্রকে মৃত অবস্থায় খুলতে দেখা যায়।

মা, লক্ষ্যটি আমার গাল-মল্ল কর।

কেন?

সবাই বলে আমার চরিত্রে দৃঢ়তার অভাব আছে।

বলে না কি? দুর্বলচিত্ত? আমার মনে হয় ন’, সেজ্ঞে তোমার বকবার আর কোন কারণ আছে। মায়ের ভালমামুদীর কোন সীমা নেই। তার কথা মনে হলেই আমার চোখে জল ভরে আসে। আমার মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে নেব।

দয়া করে আমার ক্ষমা করো। এই একবার অন্ততঃ আমার ক্ষমা করো।

(নববর্ষের কবিতা)

অসংখ্য বৎসর

তবু তো ঘোচে না আঁধার

ছোট বকের ছান।

বাড়তে তাদের নেই তো মান।

হার। কেমনে পায় দেহের এমন পূর্ণতা!

মকিন, এট্রোমল, মাকোপেন, ফিলিপিন, প্যাটোপন, পাবিনল, পানোপিন, এট্রোপিন।

আত্মমর্যাদা কি? আত্মমর্যাদা। সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করে আছেন বাবা, আমি তাঁদেরই একজন, আমার মধ্যে কত সঙ্গুণ আছে—এ বাৎসর্য ভিন্ন মানবজাতি, বা কোন প্রকৃত মানুষের পক্ষে জীবনধারণ ছবিবহ হয়।

আমি মানুষকে ঘৃণা করি, তারাও আমার ঘৃণা করে।

বুদ্ধির লড়াই।

গাভীরা—নির্বুদ্ধিতার প্রতীক।

বাই হোক, বেঁচে থাকতে হলে মানুষকে ছলনার আশ্রয় নিতেই হবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

খণ্ড-জিকা করে লেখা একটি চিঠি।

তোমার উত্তর।

দয়া করে উত্তর দাও। এমন উত্তর যেন, আমার মন খুশি হয়ে ওঠে। অপমানের আশঙ্কায় আপন মনে দগ্ধে মরছি। অভিনয় নয়। আদর্শেই নয়।

প্রতিদিন, প্রতিদিন তোমার উত্তরের অপেক্ষায় কাটে; অহোরাত্র ভরে কাঁপতে থাকি।

আমার খুশো মাথতে বলো না। দেওয়ালগুলো আমার দেখে চাপা হাসি হাসে। গভীর রাত্রি বিছানার ছটফট করে কাটে। আমার অপমান করো না। বোন আমার।

এ অবধি পড়ে আমি 'চন্দ্রমল্লিকা পত্রিকা' বন্ধ করে কাঠের বাজের কাছে ফিরে গেলাম। এগিয়ে গিয়ে জানালা খুলে দিলাম এক বৃষ্টিধারার ধোঁয়াটে বাগানের দিকে তাকিয়ে সে-সব দিনের কথা ভাবতে বসলাম।

তারপর ছয় বছর পার হয়ে গেছে। নাওজির এই নিদারুণ লেখাই আমার বিবাহ বিচ্ছেদের মূল কারণ। না, একথা আমার বলা উচিত নয়—আমার মনে হয় জন্মের সময় থেকেই বিবাহ-বিচ্ছেদ আমার কপালে লেখা ছিল। নাওজি যদি নেশা না-ও করত তবুও কোন না কোন দিন আর কোন কারণে আমার বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটত। ডাক্তারখানায় স্বপ্ন করে নাওজি প্রায়ই আমার উত্যক্ত করত। আমার তখন সত্য দিয়ে হয়েছে, কাজেই টাকা-পয়সা নিয়ে বা খুশি করার ক্ষমতা আমার ছিল না। তাছাড়া স্বামীর টাকা এভাবে লুকিয়ে ভাইকে দেব, ভাবতে খুব খারাপ লাগত। আমার বাণের বাড়ীর বি 'ওসাকী'র সঙ্গে পরামর্শ করে নিজের বালা, হার, দামী পোষাক ইত্যাদি বিক্রি করাই স্থির করলাম। শেষ চিঠিতে নাওজি লিখেছিল—আমার অত্যধিক লজ্জা ও মানসিক উদ্বেগের জন্য তোমার সঙ্গে দেখা করা বা টেলিফোনে কথা বলা সম্ভব নয়। ওসাকীর মারফৎ ঔপত্যনিক উয়েহারার জিরোর ঠিকানায় টাকা পাঠিও। আশা করি তত্ত্বালকের সঙ্গে তোমার আলাপ অন্ততঃ নামের পরিচয় আছে। মিষ্টার উয়েহারার মন্দ লোক বলে বাজারে বদনাম আছে, আসলে তত্ত্বালোক ঠিক সে রকম নন, তার ঠিকানায় টাকা পাঠাতে দ্বিধা করো না। তাঁর সঙ্গে বন্দোবস্ত আছে টাকা পেলেই আমায় ফোন করে জানিয়ে দেবেন—কাজেই সেই রকম ব্যবস্থা করো। মাংসের কাছ থেকে অন্ততঃ আমার এই নেশার কথা গোপনে রাখতে চাই। তিনি জানবার আগেই আমি নিজেকে সংশোধন করতে চাই। তোমার টাকা দিয়ে ডাক্তারখানার খার শুধব। তারপর স্বাস্থ্যোদ্ধার করতে আমাদের পাহাড়ী বাসার গিয়ে উপস্থিত হব। সত্যি আমার এ রকম একটা-ইচ্ছে আছে। যে দিন আমি ঋণশুক্ত হব, সে দিনই নেশা ছেড়ে দেব। ঈশ্বরের কাছে শপথ করছি—দয়া করে আমার বিশ্বাস করো। মাকে জানিও না, আর টাকা মিষ্টার উয়েহারার কাছে পৌঁছে দিও।

চিঠির মোট বস্তু এই। ওসাকীর মারফৎ মিষ্টার উয়েহারার কাছে টাকা পৌঁছলো বটে, কিন্তু বরাবরের মত এবারও নাওজির প্রতিজ্ঞা মিথ্যা হল। স্বাস্থ্য পরিবর্তনের আশায় আমাদের বাসার সে গেল না, বরং তার নেশার প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে ক্রমেই মারাত্মক অবস্থার দাঁড়াল। টাকার তাগিদে তার চিঠির ধারা উদ্বেগের এমন রূপ নিল, বাকে আর্ন্তনাদ বললেও অতৃপ্তি হয় না। প্রতি চিঠিতে আমি নেশা ত্যাগের শপথ নিলাম, এর পরেই এমন এক দ্রব্য

বিশারদ শপথ করে যে চিঠির থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে ইচ্ছে হয়। বুঝতে পারি এবারেও মিথ্যা বলছে, তবু নিজের আর একখানি গহনা ওসাকীর হাতে তুলে দিই, টাকাটা মিষ্টার উয়েহারার কাছে ঠিকই পৌঁছয়।

মিষ্টার উয়েহারার কেমন লোক?

বটে, কালো, বিজ্রী বলে ওসাকী কিন্তু আমি যে সময়ে বাই, বেশীর ভাগ দিনই তিনি সে সময়ে বাড়ীতে থাকেন না। তাঁর স্ত্রী আর বছর ছয়েকের কচি মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়, স্ত্রী যে খুব স্তম্ভরী তা নয়, কিন্তু ভারী মিষ্টি আর বুদ্ধিমতী। তাঁর মত মহিলার হাতে টাকা তুলে দিতে ভাবনা হয় না।

বর্তমান আমি'র সঙ্গে সেদিনের আমি'র যদি তুলনা কর, তবে দেখবে অসম্ভব, কোন সাদৃশ্যই খুঁজে পাবে না। উচ্চশ্রি আমার তখন আকাশে ঠেকত এবং অন্ত্যস্ত স্বচ্ছন্দ ছিল আমার গতি। তা সত্ত্বেও দারুণ ভয় পেলাম, আমার শোষণ করে যে পরিমাণ টাকা এক একবারে বেরিয়ে যাচ্ছিল, তাতে রীতিমত দুঃস্বপ্নের মত মনে হল। একদিন থিয়েটার থেকে বেরিয়ে গাড়ী ফিরিয়ে দিয়ে হেঁটেই চললুম মিষ্টার উয়েহারার বাড়ীর উদ্দেশ্যে।

মিষ্টার উয়েহারার নিজের ঘরে বসে খবর-কাগজ পড়ছিলেন। জাপানী পোষাকে তাঁকে একাধারে বুদ্ধ ও তরুণ দেখাচ্ছিল। যেন জীবনে কখনও দেখিনি এমন এক জীবের সামনে এসে দাঁড়ালাম।

আমার স্ত্রী মেয়েকে নিয়ে রেশন আনতে গেছেন। ঈশ্বর নাকি-সুরে কেটে কেটে কথাগুলি বললেন। আমায় দেখে স্ত্রীর কোন বন্ধু বলে ভুল করেছিলেন। নাওজির বোন বলে নিজের পরিচয় দিতে অটহাসি হেসে উঠলেন। শরীরের ভেতর দিয়ে না জানি কেন একটা ঠাণ্ডা শ্রোত ব'য়ে গেল।

বেকলে হয় না? কথাটা বলেই, উত্তরের অপেক্ষা না করেই, একপানা গ্লোক গায়ে চাপিয়ে নিয়ে, নতুন এক জোড়া চটি পায়ের আমার আগে-ভাগে বারান্দা পেরিয়ে বসে গেলেন।

আন্ত ঈশ্বরের সন্ধ্যা। তিমেল হাওয়া মনে হ'ল সোজা নদীর ওপর দিয়ে বয়ে আসছে। মিষ্টার উয়েহারার হাওয়া বাঁচাতেই যেন দুটো কাঁধ ভুলে নিঃশব্দে হাঁটছেন। প্রায় দৌড়তে দৌড়তে তাঁর শেহনে চলেছি।

টোকিও থিয়েটারের এক তলার গিয়ে চুকলাম। লম্বা সফ ঘরখানায় চার পাঁচ দলে বিভক্ত হয়ে খদ্দেররা নিঃশব্দে বসে মদ খাচ্ছে।

মিষ্টার উয়েহারার মনের পেরালার বদলে গেলাসে ঢেলে খোঁদা মদ খেলেন। আর এক গেলাস আনতে বলে আমার খেতে অমরোষ করলেন। ছ' গেলাস খেয়ে নিলাম কিন্তু বিশেষ কিছু তৃপ্ত বোধ লাগল না।

মিষ্টার উয়েহারার নিঃশব্দে খেনো আর সিগ্রেট চালাতে লাগলেন। জীবনে প্রথম এমন জায়গায় পা দিয়েও আমার কিছু মোটেই খারাপ লাগছিল না। বরং ভালই লাগল।

ভাল মদ খাওয়াতে পারলে খুশি হতাম কিন্তু—

বলুন।

যানে তোমার ভাই। সে যদি মদের দিকে বুকত তবে ভাল হত। বহু কাল আগে কোন সময়ে আকি-এর নেশা আমারও

ছিল, আমি জানি লোকে একে কত হীন চোখে দেখে। মদ প্রায় একই জাতীয় পদার্থ, কিন্তু তার প্রতি মানুষের আশ্চর্য্য পক্ষপাত দেখি। আমার ইচ্ছে আছে, তোমার ভাইকে মদের নেশা ধরাব। তুমি কি মনে কর?

আমি একবার এক মাতাল দেখেছিলাম। নববর্ষের দিন বাড়ী বাড়ী দেখা করতে বেরুব এমন সময়ে আমাদের গাড়ীর ভেতর কুংসিত লাল মুখওয়ালা একটা লোক দেখলাম, নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে আমাদের ড্রাইভারের বন্ধু। আমি ভয়ে চিংকার করে উঠেছিলাম। ড্রাইভারের মুখে শুনেছি, লোকটা পাঁড় মাতাল। পাড়ী থেকে হিচড়ে বের করে তার কাঁধ ছুটো ধরে প্রচণ্ড ঝাঁকানি দিতে লোকটার শরীর এমন ভাবে ভেঙ্গে মুচড়ে পড়ে গেল, যে মনে হল—হাড়গোড় বুঝি কিছু নেই।

আর সারাক্ষণ কি যেন বিড়-বিড় করতে লাগল। সেই প্রথম আমি মাতাল দেখে খুব আশ্চর্য্য হয়েছিলাম।

জান বোধ হয় আমিও মাতাল?

না, সে কথা সত্যি নয়। আমি আসল মাতাল দেখেছি। তার চেহারা ভিন্ন।

এই প্রথম ভ্রমলোক মন খুলে হাসলেন।

তাহলে হয়ত তোমার ভাইকে মদের নেশা ধরানো বাবে না, তবু মদ ধরলে গুর উপকার হবে। চল এবার ওঠা বাক।

দেখী করতে চাও না আশা করি।

তাকে কিছু এসে যায় না।

সত্যি বলতে এ জায়গাটা বড় বেনী ভিড়। ওয়েস্ট্রেস,—বিল আনো।

অনেক খরচ হল? খুব বেনী না হলে আমার কাছেও তো কিছু আছে।

তবে বিলটা তুমিই চুকিয়ে দাও।

অতটা নাও থাকতে পারে। ব্যাগের ভেতর চোখ বুলিয়ে মিষ্টার উয়েহারাকে আমার টাকার আদালত দিলাম।

এ টাকার আরও দু' জায়গার মদ খাওয়া চলে, বোকা মেয়ে কোথাকার! ঐ কুঁচকে বলেই ভ্রমলোক হেসে ফেললেন।

আর কোথাও বাবেন মদ খেতে?

উনি মাথা নেড়ে আপত্তি জানালেন—না বখেঁট হয়েছে। তোমার জন্তে একটা ট্যাক্সি ডাকি। তুমি বাড়ী যাও।

অন্ধকার সিঁড়ি ভেঙ্গে একতলা থেকে উঠে এলাম। মিষ্টার উয়েহারার আমার এক খাপ ওপরে ছিলেন। হঠাৎ পেছন দিয়ে আমার অধর স্পর্শ করলেন। ঠোট শক্ত করে চেপে তাঁর চুখন গ্রহণ করলাম। তাঁর প্রতি বিশেষ কেনে আকর্ষণ আমার আনেনি, কিন্তু সেই সময় থেকে আমার গোপন কথার সূত্রপাত। মিষ্টার উয়েহারার সিঁড়ি বেয়ে তর-তর করে উঠে গেলেন, আমি ধীরে ধীরে তাঁকে অনুসরণ করলাম, মনের মধ্যে সম্পূর্ণ কীকা। বাইরে বেরিয়ে নদীর হাওয়ায় প্রাণ জুড়িয়ে গেল।

মিষ্টার উয়েহারার আমার জন্ত একটা ট্যাক্সি ধাঁড় করালেন, কোন কথা না বলেই আমবা পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। পুরনো নড়বড়ে ট্যাক্সিতে বেতে বেতে মনে হল, এই মুহূর্তে সমুদ্রের মত বিশালসিঁদী সমুদ্রের দূর আমার চোখের সামনে খুলে গেল।

একদিন স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া হয়ে মন খারাপ করে বসে আছি, হঠাৎ কি মনে হতে বলে ফেললাম,—একজন আমার ভালবাসেন।

জানি, হোসাভা না? তুমি কি তাঁকে ভুলতে পার না?

এ কথার কোন জবাব দিলাম না।

বধনই আমার স্বামীর সঙ্গে গোলমাল হত, তখনই এই কথা উঠত। মনে ভারলাম—সব শেষ।

এ বেন পোবাকের জন্ত ভুল করে কাপড় কেনা, একবার কেটে ফেললে জোড়া দেওয়া চলে না। সবটা ফেলে দিয়ে নতুন করে কাপড় কিনতে হয়।

এক রাতে স্বামী জিজ্ঞেস করলেন, আমার পেটের সম্ভানটি কার? হোসাভার? ভয়ে আমার সর্ব্বাঙ্গ ধর-ধর কঁপে উঠল। এখন বুঝতে পারি সে সময়ে আমি এবং আমার স্বামী দু'জনেই কত ছেলেমানুষ ছিলাম। সহজ প্রেম কথাটার তাৎপর্য্য আমাদের জানা ছিল না। মিষ্টার হোসাভার ছবির সম্বন্ধে এমন অন্ধ ভক্তি ছিল যে, চেনা-শোনা সবাইকে বলে বেড়াতাম অমন লোকের স্ত্রী হবার সৌভাগ্য থাকলে জীবনে প্রতিটা দিন অশরুণ সৌন্দর্য্যে ভরে ওঠে। তাঁর মত কচি ধীর নেই, তেমন মানুষকে বিয়ে করা অর্থহীন। কাজে কাজেই সবাই ভুল বুঝত, আর আমি ব্রেহ ভালবাসা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলাম বলেই নিঃসঙ্কোচে সবার সামনে বলে বেড়াতাম আমি হোসাভাকে ভালবাসি। এ ধরনের মন্তব্য কখনও প্রত্যাহার করার চেষ্টা পষ্যন্ত না করার ব্যাপার জটিল হয়ে দাঁড়াল। সেই কারণেই দেহের মধ্যে ঘুমন্ত ক্ষুদ্র মানব-শিশুর প্রতিও আমার স্বামীর মনে সন্দেহ জাগে। দু'জনের মধ্যে কেউই বিবাহ-বিচ্ছেদে কথা তুললাম না, অথচ দিনে দিনে আবহাওয়া ধমধমে হয়ে উঠল। আমি আমার মায়ের কাছে ফিরে এলাম। মৃত শিশুর জন্মের পর অশ্রু হতে শব্দা নিলাম, স্বামীর সঙ্গে আমার স্বামীর সম্পর্ক শেষ হ'ল।

আমার বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যাপারে নিজেকে অপরাধী ধরে নিয়ে নাওজি গলা কাটিয়ে নিজের মরণ কামনা ঘোষণা করল—কারার তার মুখ বিকৃত হল। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, ডাক্তারখানার আর কত ঝগ আছে? ধারণাতীত এক বিরাট টাকার অঙ্ক আমার কাছে সে স্বীকার করল। পরে শুনেছিলাম সে মিথ্যা বলেছিল, আসল অঙ্কটা তারও তিনগুণ।

আমি স্বীকার করলাম, তোমার মিষ্টার উয়েহারার সঙ্গে দেখা হয়েছে? চমৎকার মানুষ! মাঝে মাঝে তিন জনে মিলে বাবে আড্ডা দিতে বেরুলে মন্ব হর না! যেনোমদ এত সস্তা, আমার কোন ধারণাই ছিল না। এতে তোমার অকচি না হলে খরচ পোয়ানো আমার পক্ষে কঠিন হবে না। ডাক্তারখানার টাকার জন্ত ভেবো না। একটা কিছু ব্যবস্থা হয়েই বাবে।

মিঃ উয়েহারার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে এবং তাঁকে আমার ভাল লাগে শুনে নাওজির তো গগগদ অবস্থা! সে রাতে আমার কাছ থেকে টাকা আদায় করে ভ্রমলোকের বাড়ী খাওয়া করল।

নেশাটা বোধ হয় মনের বোগ। মিষ্টার উয়েহারার প্রেমস্নায় পক্ষবুধ হয়ে উঠল। তাই-এর কাছ থেকে তাঁর লেখা বই ধার করে পড়তে শুরু করলাম। পড়া হলে মন্তব্য করতাম—এমন লেখক আর হয় না। আমি ভ্রমলোকের লেখার একজন সমর্থকার,

এ কথা আবিষ্কার হবে নাওজি তো অবাক। খুশির চোটে আমার
ওঁর আরও সব উপভাস জোগাড় করে দিতে লাগল। নিজের
অজান্তে আমি মিষ্টার উরেহারার গুণগ্রাহী হয়ে উঠলাম, তাঁর সমস্ত
উপভাস মন দিয়ে পড়ে নাওজির সঙ্গে সমালোচনা করি। প্রায়
প্রতি রাতে নাওজি মিষ্টার উরেহারার সঙ্গে মদের আড্ডায় চলে
বার। ক্রমে ক্রমে সে মদের নেশার মশগুল হয়ে এল। নাওজিকে
না জানিয়ে মাকে জিজ্ঞেস করলাম, ডাক্তারখানার ধারের কি হবে?
এক হাতে মুখ ঢেকে কিছুক্ষণ চূণ করে মা বলে রইলেন; তারপর
মুখ তুলে স্নান হেসে জবাব দিলেন উপায় কি? মাধার তো
কিছুই আসছে না। জানি না কত বছরে এ বোঝা নামবে।
বাই হোক, প্রতি মাসে সামান্য কিছু করে শোধ করতেই হবে।

এর পর দু'বছর কেটে গেছে। জীবন দুর্ভিক্ষ হয়ে উঠছিল।
চরমল্লিকা। নাওজির পক্ষেও কথাটা সত্যি, আজ অবধি ওঁ
উদ্ধারের সব রাস্তা বন্ধ, কি করে কি করা যায়, এ ধারণাই ওঁর
নেই। যত্নের আশাতেই সে নিশ্চর রোজ মাতাল হয়। নিজেকে
নষ্ট হতে ছেড়ে দিলে আমিই বা কোথায় গিয়ে দাঁড়াইতাম, কে জানে।
বোধ হয় তাহলে নাওজির পক্ষে সহ করা সহজ হত।

নাওজি নোট বইয়ে লিখেছে—কি যে মন্দ নয় তা তো জানি না।
এই কথা পড়ে নিজেকে আমার কাকাকে, এমন কি আমার মা
জননীকেও বেন বিশ্বাস করতে পারি না। বোধ হয় এখানে ভ্রষ্ট
কথাটির সংজ্ঞা মাঝার বন্ধন মাত্রই হবে।

[ক্রমশঃ]

অনুবাদ : কল্পনা রায়।

রাজধানীর পথে পথে

উমা দেবী

চাঁদ ও চীনেমাটি

বড় রাস্তার ধারে ঐ যে সড়ক গলি—
বার সামনে ফুটপাথের উপর লোহার চৌকো ঢাকা দেওয়া
গলিগুলোর কল—
এটেকে ওরা তুলে কেলল অবলীলায়,
খুতে বসল কাচের গেলাস আর সন্ধ্যা দামের চীনেমাটির বাসন।
আকাশে তখন চাঁদ জলছে।
গ্যাসের বাতির চেয়েও অনেক জোরে আর অনেক দূরে জলছে চাঁদ,
তার আলো ওদের গায়ে ছড়িয়ে গেছে—
ছড়িয়ে গিয়ে ঝিকঝিকিয়ে উঠছে চীনেমাটির চকচকে প্লেটে।
ওরা অনেক রাত্রে কাজ করতে বসেছে পথের ধারে
চায়ের দোকানের সামনে—কাঁচা-বরসের দু'টি ছেলে—
বাদের মুখের ফ্যাকাশে রঙে ভীতিজনক অবস্থার আশঙ্কা,
ঐ সামনের অন্ধকার আঁকা-বাঁকা গলির মতনই

বাদের ভবিষ্যৎ সর্পিণ্ড ও অন্ধকার,

বাদের গায়ে এই শীতের রাত্রেও হেঁড়া গেঞ্জি,
রঙ উঠে যাওয়া বোতামখসা হেঁড়া প্যাণ্ট পরনে,
ঐ কাঁচা বরসের ফ্যাকাশে রঙের দুটি ছেলে—
বারা এত রাত্রেও হাসি-হাসি মুখে কাচের ও

চীনেমাটির বাসন ধুচ্ছে,

নিশীথপ্রায় শীতের রাত্রে কুয়াশা ছড়ানো চাঁদের আলোর তলায়।

ওদের বয়সী অনেক ছেলেই এখন ঘুমোচ্ছে
আরামে লেপের তলায়—বাতি জ্বলে অনেক পড়ার শেষে—
বারা জানে মিশরের শিরামিঙে কারা থাকে
ঐ হলদে মলমল ছড়ানো প্রেতমূর্তির দল
সুগন্ধি মশলার বাঁকে বাদের দেহ জরজর হ'য়ে আছে,
আর বাদের গলায় ঢুলছে ফিকে সবুজ পাথরের ঘণা মালা।
যেখানকার উদ্দাম প্রপাতের কাছে নরম কাদায়
জল-হস্তার দল পা ডুবিয়ে আরামে চোখ বুঁজে আছে।
এদের বাসন ধোয়ার টুং-টাং শব্দ মিশে গেছে ওদের পড়ার সুরে
বখন ওরা পড়েছে—কোথার কোনো সিংহল দেশের আরক্ত চুণি
গোলাপের চেয়েও লাল আর ঝকঝকে—
কোথার গজমুক্তার মালা লাধা হাঁসের ডিমের মতন বড় বড়
কোথার নীলা-পাথরের দ্ব্যতি সমুদ্রের স্তনীলতার চেয়েও প্রগাঢ়
আর কোথায় নলবনে হরস্ত হাওয়ার জল-ফড়িং-এর মাতামাতি।
ওদের কানে বার না এ সব কথা—
ওরা জানে আর এক সেট বাবু ব'সে আছে পিপাসার্ত হ'য়ে
জানে দোকানের মালিকের চড়া মেজাজ
আর চেনে দু-একটা পরসার বখশিস—
বা ওদের কাঁচা বরসের সমস্ত স্বপ্নকে কেড়ে নিয়েছে—
জীবিকার দারে রোগা হাতে ফ্যাকাশে মুখেও বারা খুশি।

ওরা চায়ের চীনেমাটির বাসনগুলি ধুয়ে ট্রেতে থাক দিয়ে সাজাল,
তারপর একটু আড়াল হয়ে দু-জনে দুটো বিড়ি ধরাল—
আগুন ধরিয়ে ধোঁয়া ছুঁড়ে দিল চাঁদের দিকে—
ছাই ঝরিয়ে দিল নীচের মাটিতে
তারপর খেঁধাখেঁধি করে ঝাড়িয়ে বলল শীতের প্রকোপের কথা,
আর আমি পাড়ার লোক—আমাকে দেখে লজ্জায় হেসে কেলল
আর ওদেরফ্যাকাশে মুখের হাসি দেখে কান্নায় বুক আমার ভেজে গেল।

শেরপারা হাতে আলো আর কুকরি নিয়ে চুকলো সেই
অন্ধকার গুহায়। কাছে গিয়ে তারা বা দেখলো, সে
এক অত্যন্ত চমক! কিশোর আর শাস্ত্র হুজনেই হাড়ি দিয়ে
বঁধা। তাদের ঘিরে আছে তিনটি বলিষ্ঠ লোক। আগন্তুক
শেরপাদের দেখে তারা পিঙ্গল উঠিয়েছে।

শেরপাদের দেখে কিশোর, শাস্ত্র হুজনেই আশস্ত হলো।
পিঙ্গলগুলো অগ্নিবর্ণ করার আগেই তারা চিংকার করে বলে
উঠলো: যাবেন না। ডু নট ফায়ার আর্ট দেম। ওরা
আমাদের লোক।

কিছুক্ষণ ধরে সেই স্তিমিত অন্ধকার গুহামধ্যে সকলেই শুক
হয়ে রইলো। তারপরে, কথা বললো প্রথমে শাস্ত্র। সে বললে,
আমাদের নিয়ে কি করতে চান আপনারা?

তোমাদের উদ্দেশ্যটা আগে শুনে চাই, বললে ওদের মধ্যে
বয়স্ক লোকটি। তার মুখখানা দাড়ি-গোঁকে আচ্ছন্ন, চোখ দুটো
অগ্নিরাশি—আমরা যে উদ্দেশ্যে এসেছি, তোমরাও যদি সেই
মন্তব্যে এসে থাকো তাহলে তোমাদের এখানেই থেকে যেতে হবে।

শাস্ত্র বললে, অগ্রগত করে বলবেন কি, আপনারদের উদ্দেশ্য
কি? আমাদের তরফ থেকে বলতে পারি, আমরা অন্তত স্বর্ণখনির
সন্ধানে বা পরশমণির সন্ধানে এখানে আসিনি।

তবে? অপর পক্ষ থেকে প্রশ্ন এলো।

শাস্ত্র বললে, আমরা পথটকের উদ্দেশ্য নিয়েই এসেছি।
আমাদের লক্ষ্য বলতে এক কথায় বলতে পারি, সোনালি খরগ।

অপর পক্ষের একজন একটু হেসে বললে, এতো কষ্ট করে
সোনালি খরগ দেখতে শুধু কেউ আসে কি না আমরা জানি না।
এ কথা বিশ্বাস করাও শক্ত!

শাস্ত্র বললে, বিশ্বাস করা না করা আপনারদের ওপর নির্ভর
করে। তবে আমাদের সঙ্গে এক বৃদ্ধ লামাজি আছেন। তিনি ত
মিথ্যা বলবেন না?

কোন্ লামা? নাম কি?

তিয়েলিং।

তিয়েলিং-এর নাম শুনে ওরা একটু চুপ করে থেকে একটু দূরে
সরে গেল এবং সেখানে চাপা গলার কিছুক্ষণ পরামর্শ করে ফিরে
এল। সেই বয়স্ক লোকটি বললে, তোমাদের ছেড়ে দিতে পারি
হুটি সর্ভে। প্রথম, আমাদের কাজে তোমরা কোনো বাধা দেবে
না। দ্বিতীয়, শংকরীপ্রসাদের হত্যার কথা তোমরা প্রকাশ
করবে না।

শাস্ত্র বললে, শংকরীপ্রসাদের মৃত্যুতে আমরা খুশি হয়েছি,
আপনারা তাকে হত্যা না করলেও আমার হাতে সে নিহত হতো।

ও! তোমাদের সঙ্গেও তার পরিচয় হয়েছিল?

শাস্ত্র তখন সবিস্তারে শংকরীপ্রসাদের কথা বললো এবং
ওদের কাছে বা শুনে, তা আরো চমকপ্রদ। ওরা আটকনের
একটি দল এই অভিযানে বেরোয়। তারপর, লক্ষ্যহলের বতই
কাছাকাছি আমরা হয়েছি ততই শরতান হয়ে উঠেছিল সে।
লোভের কবলে পড়ে আমাদের কাকি দেবার চেষ্টায় সে পর পর
তিন জনকে হত্যা করেছে। সুবোশ পেলে আমরা তিন
জনও থাকতাম না। কিন্তু তার হুঁড়প্য, তাকেই সরে যেতে
হলো।



শাস্ত্র বললে, তাহলে, আর কি বলার প্রয়োজন আছে যে
আমরা আপনারদের হুটি সর্ভেই রাজি?

সকলেই একবার হেসে উঠলো এবং তাদের বাঁধনগুলো খুলে
দেওয়া হলো।

কিশোর এতক্ষণে বলে উঠলো, তাহলে আমরা এখন বন্ধু, তাই
নয় কি?

সকলে বলে উঠলো, নিশ্চয়ই। পাঙ্কি হয়ে গেল।

শাস্ত্র বললে, আমাদের কিছু এখনি যেতে হবে ক্যাম্পে।
আমাদের এক বোন আছে আর লামাজি আছেন। ওরা আমাদের
জন্মে এতক্ষণ উৎকণ্ঠিত হয়ে আছে। আপনারাও কিছু আসবেন,
চারের নিয়ন্ত্রণ রইলো।

মোট, গ্র্যাডলি, বলে উঠলো এরা। একজন বললে, সোনালি
খরগ দেখবেন না? এখান থেকে সহজে বাগড়ার পথ আছে।

তাই নাকি? হরহে...! শাস্ত্র উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো।
দেখবো, নিশ্চয়ই দেখবো। কিন্তু সবাই মিলে... এই বলে
শেরপাদের নিয়ে শাস্ত্র, কিশোর ওপরে উঠতে লাগলো ক্যাম্পের
উদ্দেশ্যে।



[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ঐশ্বর্য চন্দ্রবর্তী

দূর থেকেই ওরা চিংকার করে উঠলো, লালী, লালী, দারুণ হুঃহঃ সঙ্গবাদ !

লালীর মুখখানা ভারী, চোখ ছোটো কুলো-কুলো।

তাকে খাঁকুনি দিয়ে শাস্ত্রস্থ বললে, খুব কাল্পা হয়েছ, বুঝতে পাচ্ছি...কিন্তু, এবারে আর কাল্পা নয়। একেবারে হাসি। বয়েক ঘণ্টা পরেই আমরা সোনালি ঝরণা দেখতে যাবো।

রাখো তোমাদের সোনালি ঝরণা, মুখ বেঁকিয়ে বললে লালী। এমন জানলে কে আসতো তোমাদের সঙ্গে!

কেন, কি হয়েছে?

বেশ ক্ষুতিতে মশগুল হয়ে আছি, আর আমাদের কাল থেকে কী দুশ্চিন্তায় কাটছে।

ও, এই কথা। আমরা আসতে পারলে তবে তো, ঐ শেরপাদেরই জিগেস করো না। সে এখন থাক, পরে বলবো। কিছু খাবার আর চায়ের জোগাড় করো দেখি, তিন জনকে নিমন্ত্রণ করে এলুম। চল কিশোর, লামাজির সঙ্গে দেখা করতে হবে।

লামাজি সব বুভাষ্ত শুনেও বিশেষ বিচলিত হলেন না। শুধু বললেন, এখানে এ ধরণের ঘটনা বিরল নয়। মানুষের অর্বলোভের হিঃশ্রুতি কত অনর্থই যে করেছে। লোভ তার প্রসারিত হাত দুটি হিংসায় কলুষিত করে কত রক্ত যে ঝরিয়েছে, কত প্রাণ বিনষ্ট করেছে, কে তার পরিমাণ করবে? ভগবান বুকের অপার আশীর্বাদে তোমরা কিং এসেছ।

আর একটা সঙ্গবাদ আছে লামাজি, বললে কিশোর। ঐ গুন্ডার মধ্যে দিয়েই সহজ পথ আছে, সেটা আমরা জেনে এসেছি।

তা হবে, বললেন তিরেলিং। ওটা আমার জানা নেই।

বধাসময়ে ভূগর্ভ থেকে তিন জন অতিথি এসে হাজির হলো। তিন জনই ভারতীয়, বাঙালী নয়। দুজন বোম্বাই, একজন উত্তরপ্রদেশের লোক। ওরা ঐ নির্বাক জনহীন প্রদেশে মানুষের সান্নিধ্য পেয়ে খুব উৎকৃষ্ট হয়ে উঠলো। চা-পানের সঙ্গে বেশ আলাপ জমে গেল। লালী অনেক দিন পরে অপরিচিত অতিথিদের পরিবেশন করলো।

সেই দিন দুপুরে অনেকগুলি মানুষের একটি দল ঢালু পথে পা বাড়ালো। কিন্তু দৈব-দুর্যোগের কি এখনও শেষ নেই? হঠাৎ আকাশ আচ্ছন্ন হলো মেঘে। কুয়াশার মত পাতলা মেঘ। বৃষ্টি এলেই বিপদ, নামার পথ শিঁছল হলে সে মারাত্মক হয়।

বাই হোক, প্রকৃতি তাঁর চরম অভিশাপের মধ্যেও আশীর্বাদ রেখে দেন। তা না হলে পৃথিবীর বতঃস্রোত স্থান আজও মানুষের কাছে অনাবিষ্কৃত থেকে যেত।

গুন্ডার অন্ধকার সর্পিলা পথে কিছু দূর যেতেই একটা গর্জন ঋতিগোচর হলো।

শংকরীপ্রসাদের দলের একজন যিনি উত্তরপ্রদেশ থেকে এসেছেন তাঁর নাম মিঃ কাপুর। তিনি বললেন, আমরা ঝরণার নিচে নিকে বাচ্ছি বলেই এতো শব্দ পাওয়া যাচ্ছে।

সংগোকে মারপথ থেকে দেখায় সব চেয়ে ভাল। আর একজন মন্তব্য করেন। ওরা বতাই এগুচ্ছে ততই গর্জনের শব্দও বাড়ছে। এদিকে পথের দুপাশে সেই স্তম্ভপ্রায় গহবরের রূপও অগূর্ব!

জলের ফোটার সঙ্গে চূর্ণ বা সিলিকা জাতীয় পদার্থ জমে জমে লক্ষ স্তম্ভের মত সৃষ্টি করেছে। ওপর থেকে সেগুলি ঝলছে। কতকগুলি মাটি স্পর্শ করেছে, কতকগুলি করেনি। সেগুলির আকার আঠান কী বিচিত্র।

কতক্ষণ চলার পর তীব্র আলো হঠাৎ যেন বলসে উঠলো ওদে চোখে। শাস্ত্রস্থ বললে, সূড়ঙ্গের শেষ হলো। আমরা বাইরে এ পড়েছি। এ আকাশের আলো।

তিরেলিং বললেন, না শাস্ত্রস্থ, ভুল করছো, সামনে চেয়ে দেখ।

সত্যিই তাই পর্বতগর্ভের সূড়ঙ্গ তখনও শেষ হয়নি। কিন্তু সেখানকার একটি দৃশ্যপথ দিয়ে দেখা যাচ্ছিল একটা আলোকোজ্জ্বল জলধারা। শাস্ত্রস্থ আনন্দে চিংকার করে উঠলো। তিরেলিং বললেন, "এটিও" একটি প্রস্রবণ, বদলগিরির বুক থেকে নেমে আসছে।

আরো কিছুক্ষণ পরে সত্যিই সূড়ঙ্গের শেষ হলো। ওরা যেখানে পড়ালো, তার মাথার আকাশ। সেখান থেকে দূরে দেখা গেল একটি সরু সোনার স্রোত ঝলছে—ওপরে নিকব-কালো পাথরে পর্বতশৃঙ্গ, বৈহু নিয়ে নীলাভ কুয়াশা। তিরেলিং মন্ত্রমুগ্ধের মত ঝাড়িয়ে পড়েন। লালী, কিশোর, শাস্ত্রস্থ বসে পড়ে... একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে সকলে। বাক্যহীন।

কথা - বলার প্রয়োজন কোথা? সবার মন তখন চোখে তারায়।

অসুট ভাষার শুধু শাস্ত্রস্থ বললে, সোনালি ঝরণা, সোনালি ঝরণা...!

একটি স্বর্ণরশ্মি যেন স্বর্গচ্যুত হয়ে গড়িয়ে পড়ছে, সাবলীল গতিতে, নিচে, অনেক নিচে যেখানে সে মুছে গেছে কুয়াশার অস্পষ্টতায়। মন-প্রাণ তবু দেখলো ওরা।

মিঃ কাপুর বললেন, শুনেছি ওটা জল নয়, জল ছাড়া অন্য কিছু, এই যেমন সত্যিকার সোনাও হতে পারে।

সেটা কি হবে সম্ভব? রাও বললে। গলিত সোনার টেম্পারেচার কত? বরং এটা হতে পারে যে স্বর্ণেরূপে মিশ্রিত জল।

কাপুর প্রতিবাদ করে, তাও সম্ভব নয়। ওটা লাইটের কোনো অদ্ভুত প্রতিফলনের জন্মেই ওরকম দেখায়। আসলে হয়তো ওটা জলই।

তিরেলিং এতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে ইষ্টমন্ত্র জপ করছিলেন। শুধু তার গুঞ্জন শব্দ শোনা যাচ্ছিল। উনি বললেন, কোনো ব্যাখ্যাই বিশ্বাসযোগ্য নয়, যেটি বিশ্বাসযোগ্য সেটি আমার কাছে সত্য নয়।

আসলে, ওটি কোনো সাধারণ ঝরণা নয়। অনেক কাল আগের কাকনমালা। কাকনজলবার একমাত্র আগবের হুলালী কাকনমালা... কাকনজলবার কটিদেশে ছিল নিকব-কালো কষ্টপাথর আর পদশ-শিলার বেটনী। স্তবকে স্তবকে গাঁবে রেখেছিল তারা হিমালয়াজের ঐশ্বর্যটিকে। রাজা কাকনজলবার রক্তে রক্তে জমে আছে সোনার ছুপ। স্বর্ণবদী কাকনমালা ছিল উচ্চতম শিখরের একটি কক্ষে। কত রাজা, কত রাজপুত্র এলো তার পাণি প্রার্থনা করে...কিন্তু কেউই পারলো না তাকে লাভ করতে। দলে দলে তারা প্রাণ দিল, তাদের অধিপতির পড়ে আছে ঐ কক্ষকঠিন শিলাবাশির কন্ডারে কন্ডারে।

তারা এসেছিল স্বর্ণের আকর্ষণে। তারা চেয়েছিল কাকনমালাকে আত্মসাৎ করতে, তাকে লোভের কঠিন নখর দিয়ে ধরতে...

কাঞ্চনমালা শুধু দিউয়ে উঠতো। মেঘলোক থেকে রাখতো তার লজ্জাকে...

শেখে এলো এক পৃথিবীর কুমার... দুঃসাহসের কঠিন বর্ম তার সর্বাঙ্গে... মুহূর্ত পণ করে সে উঠলো ঐ ময়ূপ শিলাগাত্র বেয়ে। সে বললে, ভালবাসা দিয়ে 'আমি' জয় করবো মুহূর্তেরকে, কোনো বাধাই মানি না আমি।

শিশুর পাঁজরে পাঁজরে তৃণ গজালো, তার পা রাখবার জুতো। সেবে জরী হলো সে, কাঞ্চনমালার হাতে দিল একটি রক্তগোলপ। মুহূর্তে বেঠম করলো সে কাঞ্চনমালাকে। বললে সোনা চাই না, স্বর্ণহাতি চাই। আমি চাই তোমাকে, নিয়ে যাব পৃথিবীতে।

কোমল হয়ে গলে গেল কাঞ্চনমালা, প্রেমের স্পর্শে কি যে উত্তাপ আছে কে জানে। গলে তরল হয়ে করে পড়লো... আজও পড়ছে। আজও নামছে সে পৃথিবীতে।

তির্যলি চূপ করলেন। বেন ঘ্যানহ। সবাই নির্বাক।

তার পর? তার পর আর নেই।

শুধু আছে শাস্ত্রমূলের ফিরে আসার পালা। সেটা করনা কবেই নিতে হবে। শুধা ফিরে এলো কলকাতায়, নিরাপদেই ফিরেছিল। শাস্ত্রমূর ব্যাগ ভর্তি হয়েছিল নানান পাথরে—তার কয়েকটি দেখা গিয়েছিল খুই মূল্যবান। তাতে ছিল অকল্পিত কয়েকটি জীবের জীবাশ্ম।

তির্যলি কিংব গিয়েছিলেন তার আন্তরা সেই বৌদ্ধমঠে, আর বাদেও কথা না বললেও চলে, সেই শংকরাপ্রসাদের দলের তিন জন, কাপুর, রাও আর পাণ্ডে এরা এদের স্বর্ণখনির অভিযান তাগ করে শাস্ত্রমূরের সঙ্গে ফিরেছিলেন। শাস্ত্রমূর সঙ্গে অকল্পিত বহুতা সূত্র আবদ্ধ হয়ে পড়েন।

সমাপ্ত

গ্রাস অদৃশ্য করার ষাডু

যাত্রাঙ্গকর এ, সি, সরকার

সেবার টোকিওতে থাকাকালে একটা মজার খেলা দেখিয়ে বন্ধুহলে খুব চাকল্যের সৃষ্টি করেছিলাম।

সবার চোখের সামনে একটা কাচের গ্রাসকে বেমালাম অদৃশ্য করে দেওয়ার ষাডু। দিনটা ছিল মেঘলা-মেঘলা, মাঝে মাঝে ছিপ ছিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। পঞ্চাট ভেঙা আর বেশ একটু ঠাণ্ডার আমেজও মেশানো ছিল বাতাসে। দু'-তিনজন জাপানী সাংবাদিক বন্ধু এসেছিলেন দেখা করতে। তাদের সঙ্গে গল্প করছিলাম হোটেলের খাবার ঘরে বসে কফি খেতে খেতে। আসাহী সিন্যুনের অন্ততমা রিপোর্টার মিস কিওকো কথা প্রসঙ্গে আমাকে অল্পরোণ জানালেন একটি ম্যাজিক দেখানোর জন্য। আমি তাঁদের একজনের কাছ থেকে চেয়ে নিলাম একটি একশ ইয়েন মুদ্রা আর সেটিকে রাখলাম টেবিলের উপরে। আর একজনের হাত থেকে নিলাম একটি ধবের কাগজ। এই কাগজ ঠোলা পাকিয়ে নিলাম আর কাচের গ্রাসটাকে উপুড় করে নিয়ে ঠোলা দিয়ে ঢাকা দিসাম সেটিকে। এর পরে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম মুদ্রার প্রতি। আর কাগজের ঠোলায় মোড়া



গ্রাস (ঠোলায়) তুলে এনে তাই দিয়ে চাপা দিলাম মুদ্রাটাকে। হোকার-পাকাস-হোকার-পোকাস বলে খেই মাজ ঠোলায় গ্রাসটা (?) তুলে নিলাম তখন সবাই কী দেখলেন বলতো? মুদ্রা অদৃশ্য হয়ে গেছে? না মোটেই তা নয়! যেমনকার মুদ্রা তেমনি পড়ে আছে। তাই তো! তবে কি

ম্যাজিক ব্যর্থ হল? একটু অপ্রস্তুত হয়ে আমি বন্ধুদের বললাম যে আমার মন্ত কখনও বিফলে যায় না। হয়তো বা মুদ্রার বদলে অন্য কোনও কিছুই উপরে এ মন্ত কাজ করে থাকবে। কিসের উপরে? কাগজের ঠোলাটা খুলতে দেখা গেল তার ভেতরে গ্রাস নেই। কাণ্ড দেখে সবাই হলেন হতবাক। এত বড় একটা গ্রাস চোখের সামনে থেকে কেমন করে উবাও হল?

খুই সহজ একটি কোল প্রয়োগ করেছিলাম। সেদিন আমার পরা ছিল বৃত্তি। আর আমি বসেছিলাম টেবিলের এক ধারে। কাগজের ঠোলার ভেতরে গ্রাস ঢাকা দেবার পয়ে বন্ধু আমি সবার দৃষ্টি মুদ্রাটির দিকে আকর্ষণ করি, তখন সবার অগোচরে ঠোলায় গ্রাসটাকে ঠেনে আমি টেবিলের ধাতের দিকে আর সেই অবসরে গ্রাসটাকে কেলে দিই কোলের উপরে—কৌচড়ের ভেতরে তা নেব নিরাপদ আশ্রয়। বলা বাহুল্য যে, এ কাজ আমি করেছিলাম বেশ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে আর আমার চোখ ছিল দর্শকেরই উপরে, শুধুমাত্র বা হাতেই সেরেছিলাম এই গ্রাস শোপাটের কাজ। বৃত্তি পরা না থাকলেও যে এ খেলা আমি দেখাতে না পারতাম এমন নয়। তখন আমাকে কোলের উপরে বিছিয়ে নিতে হত একটি বেশ বড় সাইজের কমাল বা ষাডুন। খেলা শেষ হবার পরে সকলের অলক্ষ্যে কোল থেকে গ্রাসটাকে সরিয়ে ফেলাটাও কিছু কম অভ্যাসের কাজ নয়।

যারা ষাডুবিজ্ঞা বিষয়ে উৎসাহী, তারা আমার সঙ্গে জবাবের জন্য উপযুক্ত ডাকটিকিট সহ পত্রালাপ করতে পার A. C. SORCER, Magician, Post Box 16214, Calcutta—29 এই ঠিকানায়।

অভিশপ্ত সুর বার্কোরোল

দেবব্রত ঘোষ

ফ্রান্সী সুরকার জ্যাক অফেনবাখ-এর নাম ইউরোপের সঙ্গীতানুযায়ী ও বিদগ্ধ সমাজে আজকের দিনে সুপরিচিত না হলেও একেবারে অপরিচিত নয়। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তাঁর রচিত অপূর্ব সুরসমৃদ্ধ লঘু অপেরাগুলি ইউরোপের সঙ্গীত-রসিক মহলে এক প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। কালের কঠিনপাথরে তারা হয়ত যুগোত্তীর্ণ হতে পারেনি, তবে রসোত্তীর্ণ হয়েছিল, একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

১৮১১ খৃষ্টাব্দের ২১শে জুন জার্মানীর কোলন শহরের এক সম্ভ্রান্ত জার্মান-ইহুদী পরিবারে জ্যাকি অফেনব্যাখ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতৃনাম ছিল জ্যাকব লেভি এবার্ট। মাত্র পনেরো বৎসর বয়সে তিনি ভারোলিন সেলো শিক্ষার জন্য ফ্রান্সের রাজধানী প্যারী নগরীতে আসেন। পরে এই প্যারী নগরীই তাঁর জীবনের কর্মক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায় ও তিনি কবাসী নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন।

অফেনব্যাখ তাঁর স্মরণীয় সঙ্গীতময় জীবনে বহু জনপ্রিয় অপেরার সুর-সংযোজনা করে গেছেন। তাঁর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—“পেপিটো”, “লা বেলে হেলেন” “বারবে রু”, “লা প্রাণ্ডে ডাচেস ডি জেরোস্টাইন”, “জেন্তিয়েত ডি বারবা”, “ম্যাদাম কাঁবরা” প্রভৃতি। তবে জীবনের শেষভাগে “টেলস অব হকম্যান” অপেরার সুর সৃষ্টি করে তিনি যে প্রভূত খ্যাতি ও সম্মান লাভ করেছিলেন সেকালের ইউরোপে তাঁর তুলনা মেলা ভার! অশ্রু বড়ই দুঃখের বিবর, অফেনব্যাখ তাঁর সঙ্গীত-জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি এই অপেরার মকসাদক্য দেখে যেতে পারেন নি। কারণ যে মূল সুরটিকে ভিত্তি করে তিনি “টেলস অব হকম্যান” অপেরার সুর সংযোজনা করেছিলেন সেই সুরটি ছিল অভিশপ্ত। ফলে উক্ত সুরের অভিশাপেই তাঁর মৃত্যু হয়।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে অফেনব্যাখকে অষ্টাদশ শতাব্দীর জর্জনক বিখ্যাত জার্মান আইনজ্ঞের প্রণয় কাহিনী অবলম্বনে রচিত “টেলস অব হকম্যান” অপেরার সুর সৃষ্টির ভার দেওয়া হয়। অনেক তেবে-চিন্তে তিনি প্রথম দিকে কয়েক বৎসর আগে শোনা একটি বিশ্ময়প্রায় গানের দ্বিটি সুরকে ভিত্তি করে “টেলস অব হকম্যান” অপেরার আরম্ভ সঙ্গীত রচনা করবেন বলে মনস্থ করেন। কিন্তু কয়েক ঘাস ধরে বহু চেষ্টা করেও অফেনব্যাখ কিছুতেই সেই পুরোনো গানের পুরো সুরটি মনে আনতে পারলেন না। এমন কি, সুরকারের নামটি পর্যন্ত তিনি বেরাঙ্গু ভুলে গিয়েছিলেন।

এদিকে বিয়েটার কোম্পানী নতুন অপেরার জন্য ক্রমাগত তাগাদা দিতে লাগলেন। কাজেই বাধ্য হয়ে একদিন অফেনব্যাখকে হারানো সুরের সন্ধানে বেরিয়ে পড়তে হল ইউরোপের দেশে দেশে। বিখ্যাত সুরকার ও পুর্বনো সঙ্গীত স্বরলিপি বিক্রেতাদের দোকানে ঘুরে ঘুরে তিনি খোঁজ করতে লাগলেন তাঁর ঐশিত সুরটির। কিন্তু কেউ তাঁকে সন্ধান দিতে পারল না সেই হারানো সুরের। অবশেষে ভগ্নোৎসাহ হয়ে তিনি ইউরোপের সঙ্গীত-নগরী ভিয়েনার এসে উপস্থিত হলেন। এখানে ভাগ্যলক্ষ্মী বেন কিঞ্চিৎ কল্পনা বর্ষণ করলেন তাঁর উপর। ভিয়েনার এক পুর্বনো স্বরলিপি বিক্রেতা অফেনব্যাখ-এর কাছে হারানো সুরের কয়েকটা লাইন শুনে তাঁকে আনালেন এর রচয়িতা ফ্রডলফ জোয়ার। তবে তিনিও সুরকারের কোন সন্ধান দিতে পারলেন না। অফেনব্যাখ, সীমাহীন অন্ধকারের মধ্যে বেন সামান্য আশায় আলো দেখতে পেলেন। তাই আবার উৎসাহিত হয়ে তিনি নবীন উত্তমে জোয়ারের খোঁজ করতে লাগলেন।

প্রায় ছয় বৎসর পরে ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে অফেনব্যাখ জোয়ারের সন্ধানে এসে উপস্থিত হলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। এখানে অনেক খুঁজেও তিনি জোয়ারের কোন হদিশ করতে পারলেন না। কাজেই বাধ্য হয়ে আবার তাঁকে কিং বেতে হল প্যারী নগরীতে।

ইতিমধ্যে বেশ কিছুদিন কেটে গেছে। একদিন গভীর রাতে অফেনব্যাখ, বিয়েটার ফ্রাঙ্কাইজ খেতে অস্থান সেবে বাড়ী ফিরেছেন। পথবাট জনবিরল থাকার তাঁর ক্রোড় গাড়ীখানি বেন হাফা হাওয়ার ভর দিয়ে পাখীর মত উড়ে আগছিল। হঠাৎ রাত্তার মোড়ের মাথার তাঁর গাড়ী থাক্তা মারলো একজন পথচারীকে। থাক্তার বেগ সামলাতে না পেয়ে লোকটি একেবারে ছিটকে পড়লো পথের ধারে। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী খামিরে অফেনব্যাখ, ছুটে গেলেন আহত লোকটির কাছে। তারপর কালবিলম্ব না করে তিনি সজ্ঞাহীন অবস্থায় লোকটিকে গাড়ীতে তুলে বাড়ী নিয়ে এলেন। বোচা—কোন ভাববুরে হবে বোধ হয়। আনমনা হয়ে পথ চলছিল। তাই এই বিপত্তি। মাথাভর্তি একরাশ অশ্রু বর্ষিত চুল। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। পরনে শতছিন্ন পোষাক। বাই হোক, অফেনব্যাখের সেবা-স্বত্বের গুণে অন্নদিনের মধ্যেই তিনি সুস্থ হয়ে উঠলেন।

এই ঘটনার কয়েক দিন পরে। যোজকার মত সেদিনও অফেনব্যাখ গভীর রাতে অস্থান সেবে বাড়ী ফিরেছেন। ঘরে ঢুকতেই অবাৎ হয়ে তিনি শুনেতে পেলেন তাঁর পিয়ানোর কে বেন বাজাচ্ছে সেই বহু-আকাঙ্ক্ষিত সুরটি—বার সন্ধানে তিনি ইউরোপ ও আমেরিকার প্রতিটি শহর দীর্ঘদিন ধরে ভ্রম ভ্রম করে খুঁজেছেন। আরো অবাৎ হলেন যখন তিনি দেখতে পেলেন যিনি পিয়ানো বাজাচ্ছেন তিনি আর কেউ নন, গাড়ীর থাক্তায় আহত সেই ভ্রমলোকটি। এ যে একেবারে অবিখ্যাত—অপ্রত্যাশিত! এক অব্যক্ত পুলকে অফেনব্যাখ-এর সারা দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল।

উত্তেজিত হয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—এ সুর আপনি কার কাছে শিখেছেন?

কাহো! কাছে নয়। এ সুর আমারই রচনা। আমার নাম ফ্রডলফ জোয়ার।

কী বললেন—আপনার নাম ফ্রডলফ জোয়ার?

আজ্ঞে হ্যাঁ। মৃত হাসি ফুটে উঠল বক্তার মুখে। কথাটি শব হতে না হতেই আনন্দে আত্মগার হয়ে অফেনব্যাখ জড়িয়ে ধরলেন জোয়ারকে। ভগবানের অনীম কল্পনা, তাই আপনার দেখা পেয়েছি। আমি যে স্মরণীয় আট বৎসর ধরে ইউরোপ, আমেরিকার সহরে সহরে আপনাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছি।

অফেনব্যাখের আন্তরিকতার মুগ্ধ হলেন জোয়ার। তাঁর পর অনেক কথা হল হৃৎনে। জোয়ার অফেনব্যাখের সব কথাই মনোযোগ সহকারে শুনলেন। কিন্তু প্রার্থিত সুরটির স্বরলিপি কিছুতেই হাতছাড়া করতে রাজী হলেন না। বললেন—সুরটি অভিশপ্ত। আমি চাই না আমার মত আপনায়ও সুরের সংসারে আগুন লাগুক। কারণ ওই সুরটি রচনা করার পর থেকেই আমার বাহ্য, সম্পদ, সুনাম, সামাজিক মর্যাদা সব কিছু নষ্ট হয়েছে। এমন কি, প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা পত্নীকে পর্যন্ত আমি হারিয়েছি শুধু ওই সর্বনাশা সুরের অভিশাপে। বিশ্বাস করুন আর নাই করুন।

এবার অফেনব্যাখ বাধ্য দিয়ে বললেন—দেখুন ও-সব একেবারেই বাজে কথা। সুর কখনো অভিশপ্ত হতে পারে না। আপনার দুর্ভাগ্যের জন্য দারী আপনার পারিপার্শ্বিক অবস্থা বা ওই জাতীয়

কোন ঘটনাবলী। অবশেষে অফেনব্যাথ-এর সীড়াপীড়িতে জীমার কথা দিলেন স্বরলিপিটি সম্পূর্ণ করে দেবেন। বাড়ী ফিরে বাবার দিন বিদায় বেলার তিনি অফেনব্যাথকে বলে গেলেন দিন দশ-বারো বাবে তাঁর বাড়ী থেকে স্বরলিপিটি আনতে। অফেনব্যাথও সানন্দে এই প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন।

কথামত দিন দশ-বারো বাবে একদিন সকালে প্যারীর কুখ্যাত মর্মান্তিক অফেনব্যাথের বাড়ীতে গেলেন অফেনব্যাথ। দরজার কড়া নাড়তেই এক সৌম্যমূর্তি বৃদ্ধ এসে দরজা খুলে দিলেন। অগ্রসর হুখ। অফেনব্যাথের প্রশ্নের জবাবে তিনি জানালেন—গতকাল রাত্রে হঠাৎ স্বপ্নবস্তুর কিরা বন্ধ হয়ে জীমার মারা গেছেন। জীমার এই আকস্মিক মৃত্যু সংবাদে অফেনব্যাথ যেন হিম্মরে হতবাক হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ বাবে একটু প্রকৃতিস্থ হলে তিনি শেখবাবের মত জীমারকে দেখার জন্য বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করলেন। ঘরে ঢুকে দেখেন, জীমারের বিছানার উপর সেই অভিশপ্ত স্বরলিপিটা পড়ে আছে। তার এক কোণে ছোট করে তাঁরই নাম লেখা—জ্যাকি 'অফেনব্যাথের জন্ত'। তার পর অফেনব্যাথ, স্বরলিপিটা হাতে করে সেদিন ছেলেরাঘরের মতই কঁাদতে কঁাদতে বাড়ী ফিরে এলেন। কারণ সত্যি কথা বলতে কি, তাঁরই খামখেয়ালীর জন্ত একটি অমূল্য প্রতিভার এই ভাবে অকালে জীবনাবসান হল। একথা আর কেউ না জানলেও তিনি বেশ ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন।

বাই হোক, জীমারের স্বরলিপির মূল সুরটিকে ভিত্তি করে অফেনব্যাথ টেলস অব, ইফম্যান অপেরার জন্ত যে অপূর্ণ সুরসমূহ সঙ্গীতের সৃষ্টি করলেন তার নাম দেওয়া হল "বার্কারোল" (Barcarole)। কিন্তু আগেই বলেছি এই অপেরার অভাবনীয় মঞ্চসাক্ষ্য তিনি দেখে যেতে পারেন নি। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের এই অক্টোবর অফেনব্যাথের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পাঁচ মাস পরে লিয়ো জেলিবীর পরিচালনার টেলস অব, ইফম্যান অপেরা প্যারী নগরীতে প্রথম মঞ্চস্থ হয়। প্যারীর পর ভিয়েনায়। ভিয়েনার রিং থিয়েটারে প্রথম অনুষ্ঠান-রজনীতে বার্কারোল বাজাবাব সময় হঠাৎ এক ভয়ানক অগ্নিকাণ্ডের ফলে প্রায় দেড় হাজার নর-নারী প্রাণ হারান ও সেই সাথে সমগ্র প্রেক্ষাগৃহটিও ভস্মীভূত হয়। এই ঘটনায় ভীত হয়ে পরবর্তীকালে ইউরোপ ও আমেরিকার আর কোন সুরকার বা বাদক বার্কারোল বাজাতে রাজী হননি।

এর পর বার্কারোল-এর অভিধানে চীনদেশেরও বহু সুরকার প্রাণ হারিয়েছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে চীনদেশের মাঞ্চু রাজবংশে জুসাই * নামে এক সম্রাজ্ঞী ছিলেন। ঘটনাক্রমে তিনি একবার কয়েকজন ইতালীয়ান ভাস্করের মুখে বার্কারোল শুনে এতই মুগ্ধ হন যে সঙ্গে সঙ্গে আদেশ দিলেন চীনা সুরকারদেরও এই সুর বাজাতে হবে। চীনা সুরকারেরা আশ্রয় চেষ্টা করেও চৈনিক বাস্তবতায় বার্কারোল বাজাতে পারলেন না। ফলে রাজস্বাবে পড়ে প্রতিদিনই হুঁ-চায়জন করে সুরকার প্রাণ হারাতে লাগলেন। এই ভাবে চীনদেশের প্রায় আটশো সুরকার বার্কারোল বাজাতে না পেরে প্রাণ হারান।

কিছুদিন বাবে জুসাই-এর মৃত্যু হলে সান ইয়াং সেন-এর

নেতৃত্বে চীনদেশে নব প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। তিনি নব প্রজাতন্ত্রে প্রথমেই আইন করে বার্কারোল বাজান নিষিদ্ধ করেন। ১৯০৮ সালে এই আইন বিধিবদ্ধ হয়। বহুদূর জানা যায়, এখনো পর্যন্ত ইউরোপ ও আমেরিকার সুরকারদের মধ্যে অফেনব্যাথের বার্কারোল জীতি পুরোমাত্রায় বজায় আছে এবং তারা কখনো মনের ভুলেও এই সুরটির নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করেন না।

নামের শক্তি

খ্রীসদানন্দ ভট্টাচার্য্য

দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের দারোয়ান এসেছে শরণাগতবৎসল ঠাকুরের কাছে। মল্লবীরের চেহারাখানা বড়ই দর্শনীয় হোক, মুখখানা কিন্তু যেন কোন এক অজ্ঞাত আশঙ্কার কেমন শুকিয়ে গেছে।

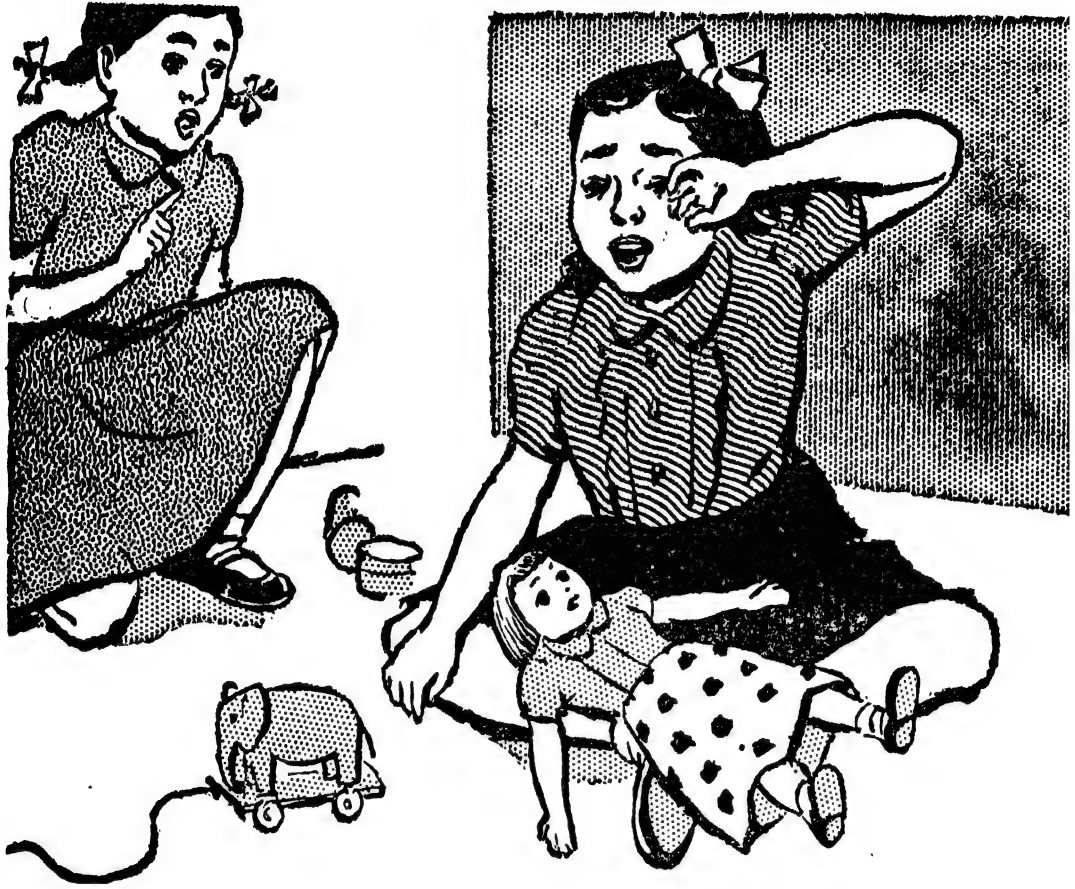
অহুমতি পেয়ে সে সবিনয়ে ঠাকুরের শ্রীচরণে আশ্রয় বিপদ বৃত্তান্ত নিবেদন করল। দিখিছরী এক মস্ত 'বীর' পালোয়ান এখানে এসে উপস্থিত হয়েছে। তারই আহ্বানে তাকে শীঘ্র এক শক্তির পরীক্ষার অবতীর্ণ হতে হবে। পরীক্ষা যদি সফল-সম্পূর্ণ হয় তবে সে বড় সংকট। মন্দিরের দারোয়ান তাই বিপদভঞ্জন করণাধন-মুণ্ডি ঠাকুরের শরণ লওয়া ছাড়া আর গতি দেখেনি।

ঠাকুরের ব্যবস্থা—'খাওয়া কমতি করে দিবি। বেশী করে মহাবীরের নাম নিবি। দিবাকাল নাম 'স্বরণ চাই'।

ও দিকে দিখিছরী পালোয়ানের দিক্তা দিক্তা ডাল-কটীর বরাদ্দ, দুবেলা কসরৎ আর সুগর ভাঁজার বহর দেখে ত দেশের লোকের চক্ষুস্থির! এমনবারা পালোয়ানের সাথে দারোয়ানজীর লড়াইটা নিস্তান্ত ফেলেখেলা হবে, এইটাই তাদের সুস্পষ্ট অভিমত।

বধাসময়ে দুই পালোয়ান গুরুকে স্মরণ করে নংম মাটিতে নেমে পড়ল। এমন একখানি লড়াই দেখবার জন্ত লোক কম হয়নি। এ কথা বলা বাহুল্য। বিশেষ করে এই বিশ্বকর দিখিছরীর বীরত্বের খ্যাতি ইতিমধ্যে প্রসার লাভ করেছিল—হুনির এলাকার কিছু চাকল্যের সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক। দারোয়ানজীর প্রতি সকলেরই অমুগ্ধম্পূর্ণ দৃষ্টি ছিল, ওই সাথে কারো কারো কিছুটা স্বাভাবিক সহানুভূতির খাদ মেশানো—সে যেন আরো বোগা হয়ে গেছে, যদিও চেতাবাটা আগের চেয়ে উজ্জ্বল হয়েছে। অল্প সময়ের মধ্যেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা জোঁরালো হয়ে উঠল। দিখিছরী বেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। তার ধারণা ছিল আজকের লড়াইয়ের বশভাগটা করতলগত করেই সে প্রতিদ্বন্দ্বিতার নেমেছে। কিন্তু তার শান্ত প্রতিদ্বন্দ্বীটির চিত্তের দার্ঢ্য নিতীক লড়াই প্রচেষ্টা শুরু থেকেই তাকে শঙ্কিত করে ফেলেছে। কক্ষখাস দর্শকদের সম্মুখে দিখিছরী দারোয়ানজীকে মাটিতে এক আছাড় দিয়েছে। কিন্তু নীচ হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীকে চিৎ করবার মুহূর্তে সে এক ক্ষিপ্ত কৌশল প্রচেষ্টার দিখিছরীকে ধরাশায়ী করে চোখের পলকে তার বুক চেপে বসল। এক অপ্রত্যাশিত আনন্দাতিশয় সকল দর্শককেই অভিভূত করল। অবসর সময়ে বীর পদক্ষেপে বিজয়ী বীর এল ভক্তবাহীকল্পতরু ঠাকুরের চরণ বন্দনায়, যেন তার বশভার বখাছানে নামিয়ে দিয়ে ঋণমুক্ত হতে চায়। ঠাকুর সন্তোষ দৃষ্টিপাতে তার সর্বত্র স্পর্শ করলেন। কিম্বদ-বিনিমিত কণ্ঠে সদানন্দময় পুঙ্খ শুভালেন—'কি রে, নামের কত শক্তি দেখলি?'

কৃতজ্ঞতাভরাচিত কৃতজ্ঞলি বীর শ্রীপাদপদ্মাত্মিত্বুখে অবনত হল।



ছোট্ট মুন্নি কেন কেঁদেছিল



মুন্নি কোপাতে আরম্ভ করল তারপর আকাশকাটা চিৎকার করে কেঁদে উঠল। মুন্নির বন্ধু ছোট্ট নিমু ওকে শাস্ত করার আশ্রয় চেষ্টি করছিল, ওকে নিজের আধ আধ ভাষায় বোকাচ্ছিল—“কাঁদিসনা মুন্নি—বাবা আপিস থেকে বাড়ী ফিরলেই আমি বলব—” কিন্তু মুন্নির ভ্রক্ষেপ নেই, মুন্নির নতুন ডল পুতুলটির হুখে আলতায় মেশানো গালে ময়লার দাগ লেগেছে, পুতুলের নতুন জুকের ওপর পড়েছে ময়লা আঙ্গুলের ছাপ—আমি আমার জানলায় দাঁড়িয়ে এই মজার দৃশ্যটি দেখছিলাম। আমি যখন দেখলাম যে মুন্নি কোন কথাই শুনছেন না তখন আমি নিজে এলাম। আমাকে দেখেই মুন্নির কান্নার জোর বেড়ে গেল—ঠিক যেমন ‘একোর, একোর’ শুনে ওস্তাদদের গিটকিরির বহর বেড়ে যায়। আমাদের প্রতিবেশির মেয়ে নিমু—আহা বেচারী—ভয়ে জ্বপবু হয়ে একটা কোনায় দাঁড়িয়ে আছে। আমি ঠিক কি করব বুঝতে পারছিলাম না। এমন সময় দৌড়ে এলো নিমুর মা সুশীলা। এসেই মুন্নিকে কোলে তুলে নিয়ে বলল—“আমার লক্ষ্মী মেয়েকে কে মেরেছে?” কান্না শুড়ানো গলার মুন্নি বলল—“মাসী, মাসী, নিমু আমার পুতুলের কুক ময়লা করে দিয়েছে।”



“আচ্ছা, আমরা নিম্নকে শান্তি দেব আর তোমাকে একটা নতুন জুপ এনে দেব।”

“আমার জন্যে নয় মাসী, আমার পুতুলের জন্যে।”

সুশীলা হুগিকে, নিম্নকে আর পুতুলটি নিয়ে তার বাড়ী চলে গেল আশিও বাড়ীর কাক্ষিক্য সুর করে দিলাম। বিকেল প্রায় ৪ টার সময় হুগি তার পুতুলটি নিয়ে নাচতে নাচতে ফিরে এলো। আশি উঠোন থেকে চিংকার করে সুশীলাকে বললাম আমার সঙ্গে চা খেতে।

যখন সুশীলা এলো আশি ওকে বললাম

“ডলের জন্যে তোমার নতুন জুপ কোমর কি দরকার ছিল?”

“না বোম, এটা নতুন নয়। সেই একই জুপ এটা। আমি শুধু কেচে ইজী করে দিয়েছি।” “কেচে দিয়েছ? কিন্তু এটা এত পরিষ্কার ও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।”

সুশীলা একচুম্বক চা খেয়ে বলল—“তার কারণ আমি ওটা কেচেছি সানলাইটে দিয়ে। আমার অন্যান্য জামাকাপড় কাচার ছিল তাই ভাবলাম হুগির ডলের জুপটাও এই সঙ্গে কেচে দিই।”



আমি ব্যাপারটা আর একটু তলিয়ে দেখা মনস্থ

করলাম। “তুমি তখন কতগুলি জামাকাপড় কেচেছিলে? আমাকে কি তুমি বোকা ঠাউরেছ? আমি একবারও তোমার বাড়ী থেকে জামাকাপড় আছড়ানোর কোন আওরাজ্ঞ পাইনি।”

সুশীলা বলল, “আচ্ছা, চা খেয়ে আমার সঙ্গে চল, আমি তোমার এক নম্বা দেখাবো।”

সুশীলা বেশ ধীরেস্থে চা খেল, আর আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসছিল। আমার মনের অবস্থা কিন্তু অন্যরকম। আমি একচুম্বক চা শেষ করে ফেললাম।

আমি গুর বাড়ী গিয়ে দেখলাম একগাদা ইজীকরা জামাকাপড় রাধা রয়েছে।

আমার একবার গুনে দেখার ইচ্ছে হোল কিন্তু সেগুলি এত পরিষ্কার যে আমার ভয় হোল শুধু ছোঁয়াতেই সেগুলি ময়লা হয়ে যাবে। সুশীলা আমাকে বলল যে ও সব জামাকাপড়ই সানলাইটে কেচেছে। ওই গাদার মধ্যে ছিল—বিছানার চাদর, তোয়ালে, পর্দা, পায়জামা, সাট, ধুতী,

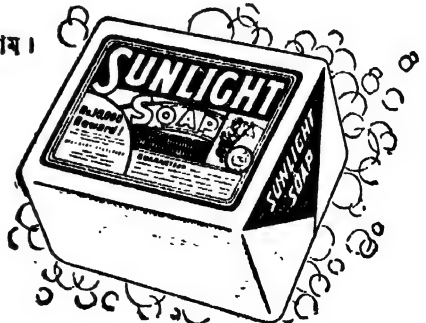
জুপ আরও নানাবিধের জামাকাপড়। আমি মনে মনে ভাবলাম বাবা: এতগুলো

জামাকাপড় কাচতে কত সময় আর কতখানি সাবান না জানি লেগেছে। সুশীলা আমার বুঝিয়ে দিল—“এতগুলি জামাকাপড় কাচতে খরচ অতি সামান্যই হয়েছে—পরিশ্রমও হয়েছে অত্যন্ত কম। একটা সানলাইট সাবানে ছোটবড় মিলিয়ে ৪০-৫০টা জামাকাপড় স্বচ্ছন্দে কাচা যায়।”

আমি তখন সানলাইটে জামাকাপড় কেচে পরীক্ষা করে দেখা হির করলাম।

সত্যিই, সুশীলা যা বলেছিল তার প্রতিটি কথা অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল। একটু ঘষলেই সানলাইটে প্রচুর ফেণা হয়—আর সে ফেণা জামাকাপড়ের স্তরের কাঁক থেকে ময়লা বের করে দেয়। জামাকাপড় বিনা আছাড়ই হয়ে ওঠে পরিষ্কার ও উজ্জ্বল।

আর একটি কথা, সানলাইটের গন্ধও ভাল—সানলাইটে কাচা জামাকাপড়ের গন্ধটাও কেমন পরিষ্কার পরিষ্কার লাগে। এর ফেণা হাতকে মৃদু ও কোমল রাখে। এর থেকে বেশি আর কিছু কি চাওয়ার থাকতে পারে?



না=জানা=কাহিনী

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

তাল-বেতাল

আমাদের কায়দা

যুগ্মবক্তা বাঙালি থেকে বোঁটিয়ে লোক মেওয়া হয়েছে ১১৪৩
মাসে। মাস্তাজ, পাভার থেকেও এসেছে। কিন্তু বাঙালি
থেকে যে ভাবে কুড়িয়ে কুড়িয়ে নেওয়া হয়েছে, ওরেশে তার তুলনা
মিলে না।

মধ্যবিত্তের এক সংসার। পোষা আছে। অথচ জমিও নেই,
চাকুরীও নেই। কাজও মিলে না কিছু। সংসার চালানো ভার।
ত্রিংশ টাকার বিনিময়ে তখন এম-এস-সি মেলে প্রচুর।

সেদিন হাঁড়ি উঠুনে চড়বে, কিন্তু হাঁড়িতে কিছু চড়বে না, জল
ছাড়া। কোনো উপায় নেই। কর্তার এক পুর মাঠ থেকে গরু
ঘরে খোঁরোড়ে দিয়ে এলেন। কিছু বোজগার হোল। চাল এলো
ওষু। সেদিন বেশী পরসাদ দরকার, করেকটা গরু মাঠ থেকে দড়ি
খুলে দাও। ওরা খুঁটার সাথে লগা দড়ি দিয়ে বাঁধা থাকে। ঐ
খুঁটা কেন্দ্র করে চার পাশে ঘোরে, ঘাস খায়। গরু কটা ভাড়িয়ে
দুয়ের কোনো হাতে নিলেই পরসাদ আসবে ঢের। কি আর করা
বাবে। এমনি করে বাহোক দিন গুজরান চলেছে। এলো ওয়ার।
ওয়ার বেঁচে থাকুক। সর্বনাশ। সে ওয়ার চুকলো বাঙালি দেশে।
কানা-খোঁড়া সবই গিয়ে ভর্তি হোল তাতে।

কর্তার দ্বিতীয় পুর একটু বিকৃতাক্স নিয়ে জন্মেছেন। খোঁড়া।
কানা-খোঁড়া এক গুণ বাড়ী। ভর্তি হয়েছেন লড়াইয়ে। বরা ফ্রন্টে
তখন জাপানীদের বসি চলেছে পুরো মাস্তাজ। জঙ্গলে ইউনিট পড়ে
রয়েছে। মাসের শেষ দিন। পরদিন পেন-ডে। হাজার লোকের
মাটিনে হবে। আর ৮০ হাজার টাকার মত। এসে জমা হয়েছ
কোয়ার্টার গার্ডে। জঙ্গলের লড়াইয়ে লোহার সিন্দুক থাকে না।
ভারী বসে। টাকা থাকে রাইফেলের কাছুরের খালি বাসে,
নরতো কাঠের বাসে। জমা থাকে গার্ডের কাছে, যেখানে সমস্ত
আবদূও থাকে। এক দিন দুদিনের মামলা। বিলি হয়ে বাবে
টাকাটা সংস্কারে। অবশিষ্ট বা থাকবে, ফেরত বাবে।

জঙ্গলের যুদ্ধ। গুলী, বাক্স, বন্দুক, পিস্তল, ষ্টেনগান আর
ক'টির প্রচুর। চারদিকে ছড়ানো। হিসেবের তিন গুণ বেশী।
পাখী, বাঘ, ভালুক বা খুন্সী শিকার করো। তার পর ছুঁড়ে ফেলে
দাও রাইফেল জঙ্গলে। কে পরিষ্কার করে। আছে অপরাধী।
অবশ্য অর্ডার পুঁতে ফেলার বা নষ্ট করে দেওয়ার। তাতে পরিশ্রম
হয়। এখনও পড়ে আছে বরার জঙ্গলে প্রচুর। টাকাটা থাকে
তালবন্ধ হাক বাসে। গার্ডরুম। গার্ডরুম মানে, টেবট বা
তালপাতার কুঁড়ে। সেদিন সন্ধ্যাবেলায় হঠাৎ সাইরেন বেজে
উঠেছে। জাপানী বন্দার। রাইফেলটা হাতে নিয়ে সবাই করচে
পাকড়ো। ওর তখন গার্ডে ভিউটি। ও গেল সবাই শেষে,
বীরে-সুখে। সম্ভবত ক্যাপ্তানটি গচ্ছিত নিয়ে সবাই জলক্ষে।
বোমার মহান আয়গার পুকুর জমে, আর পুকুর থাকলে তা ভরাট

হয়। বোমা পড়লো পোটা-করেক। - সব তখনই হয়ে গেল। ক
বাঁচলো, কত মরলো। বটা দুই বাদে আবার সাইরেন। এবং
ক্লিয়ারেন্স। সবাই কিরে আসছে। কে বাঁচলো, কে মরলো, জ
হোলো, তারই হিসাব চলেছে। ও তখনো কেবলি। সম্ভব
মতোছে, অথবা আহত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত ফিবে এসেছে অনেক
রাতে নির্মূল অবস্থায়। ক্যাপ্তান সামলাচ্ছিল।

পবনিন খোঁজ পড়ল টাকার বাজার। মাইনে দিতে গিয়ে
টাকার বাজ নেই। শান্তিরা পাহারা দিয়েছে। স্মরণীয় ওরা অর্থা
শান্তিরা কেউ কিছু জানে না। সে টাকার কোনও পাতা পা
গেল না। ও-সি দেখলেন অনেক বড়োটা। ফ্রন্ট-লাইনে যত ব
অফিসার, কড়া হলে হাতের তেলের প্রাণ। রাতে-বেতালে
প্রাণ সবার হাতে। তার হৃদিশ পাওয়া যায় না পরে। কার
সবার হাতেই অস্ত্র নানা রকমের। স্মরণীয় রিপোর্ট গে
বোমার দ্বৈশ টাকা জলে-পুড়ে গেছে। আরও টাকা দরকার
সৈন্যদের মাইনে। কাটা কান চুল দিয়ে টাকা বৃদ্ধিমান
কাজ। আবার টাকা এসেছে। তাই ভাগ করে দেওয়া হয়ে
সবাইকে।

মাসখানেক পরে। ঐ সিপাহীর ছুটি হয়েছে—লংলিভ টি
মাস। পুরো টাকাটা মাটি খুঁড়ে বাড়ী এনেছে। এখন অভ
নেই। ইটের দাম টাকা-টাকা। বাড়ী করে কিরে গেল চিটাগ
ওখানে হান্সিরা দিয়ে হাতিয়ে গেল জমারশো, এক বোমা পড়
রাতে। পাতা পাওয়া গেল না। ক্যাপ্তানটি হলে তার রিপে
যায় না। যায় দু-তিন বছর বাদে, লড়াই শেষে। বাড়ীতে টা
allot করা থাকলে, তা ঠিক যার মাসের পর মাস। তারপর ন
লেখানো এয়ার ফোর্সে। অবশ্য নাম-ঠিকানা পালটে। সেখানে
allotment করে সুযোগ বুঝে পালার। ভক্তি চর গিয়ে অস্ত্র
লেখানোই আছে, অথবা আবারও ভক্তি হয়েছে allotment কা
সে সংবাদ জানা নেই।

জাপানী ফ্রন্টে কি ভাবে টাকা আর লোক ফগাও করে টাক
হয়েছে, এ তার নমুনা। মাসপত্র? আমরা তখন বাঘনগে
রেই ক্যাম্পে। একটা বড় ষ্টুডিও ছিল ওটা। ওর পিছ
ডোবার জলে এখনো দেখতে পাবেন চরত হাজার বস্তা চাউল ব
আটা পচে সার হয়ে আছে। সারপ্রাইজ ট্রো চেকিংয়ের স
ওগুলো পিছনের দরজা দিয়ে ওখানে গিয়ে জমত। আর সিভি
লোক ফ্যানের অভাবে মরেছে। পাটার করার মতলবেই
সাপ্লাস ষ্টক টানা ছোত। সাপ্লাই থেকে আসবার পথে হ
রাস্তাতেই অনেক সময় বিক্রী হয়ে যেত।

ঐ পুকুরে আজও পাবেন রিতলভাব আর রাইফেল। জাপ
লড়াইয়ে বৃটিশের ইজ্ঞতের কানড়ে ঘরে টান পাড়ছিল সেই
আবার কি তা আসবে কিরে?

জাপানী স্নাইপার

আয়তন আর লোকসংখ্যার তুলনার জাপান পৃথিবীর ক্ষু
শক্তি। পৃথিবীর বৃহৎ বৃহৎ শক্তিজোড়ের বিকছে
ওদের এই লড়াই। ওরা পা দিয়েছিল বৃটিশের লেজে। স
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ওপর আধিপত্য বিস্তারের পর ওরা
দিয়েছিল আমাদের সিঁদুরজার—তারন্তের পূর্বদিকে।

জাপানের শক্তির উৎস কোথায়? ধীরে ধীরে উদ্ভূত মেয়ে
ওরা কী নিয়ে ক্রিকেট গেলই বা কেন?

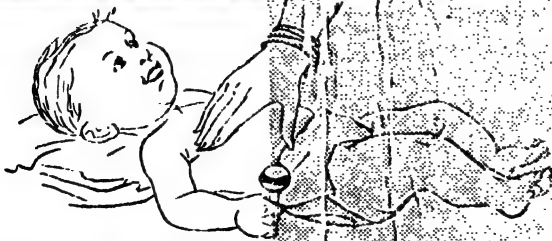
তীর আর বহুতল, বর্ষা আর তরবারি। আগেকার যুদ্ধের ধারা।
সে বহু আগেকার কথা। পুরাকালের স্মৃতি-বিশ্মৃতির যুগে।
প্রস্তরের পথের যুগে। তার পরে, বহু পরে কালের ফেরে এসেছে
রক্তমাখা আগের যুগ। গুলি বারুদ, কামান, বন্দুক আর টোটোর ঘটা।
অটোমেটিক সিস্টেমে গুলি ছুটেছে তোড়ে। পৃথিবীজয়ের সময়ে প্রথম
আগের যুগের ব্যবহার ঘটেছে ভারতে মুসলমানের হাতে। আর
আজকাল ট্যাক, ফাইটার, বম্বার, এ্যাংকি এয়ার ক্র্যাফট বা
এ্যাংকি, ভারী কামান, মটার, ডেইলার, সাবমেরিন, টর্পেডো
ইত্যাদি বহু রকম মারণাস্ত্রের প্রয়োগ, প্রয়োজন আর উদ্বোধন
ঘটেছে। সম্প্রতি এসেছে এটম বম্ব আর হাইড্রোজেন বম্ব! ইন্টার
কন্টিনেন্টাল ব্যালিস্টিক মিসাইল, সক্ষেপে আই-সি-বি-এম। জাপানী
যুদ্ধে এ সব তৈরী বা প্রয়োগের অবসর কোথায়? অত লোকজনই
বা কোথায়? বম্বার আমরা চালিয়েছি মেশিন গানে জলের ধারায়
গুলি। তার জবাবে ওরা কি দিয়েছে জানেন? তীক্ষ্ণ ফলার ছোট
ছুরি। গুলির অপোজিটে ছুরির যুদ্ধ—লড়াইয়ের সম্পূর্ণ নতুন বাগার
প্রবর্তন। পূর্বব ধারা, আর তাৎপর্যপূর্ণ। ওরা জিতেছেও সমগ্র
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো। খুব ছোট ছুরি, এমন কি
বেয়নেটের মতও নয়। তবু প্রাণবন্ত। কারণ ওতেই সাবাড়
হয়েছে ব্রিটন আর আমেরিকার বড় বড় ডিভিশন এবং ডিভিশনের
পর ডিভিশন। কোটি কোটি টাকার বস্ত্রপাতি সমেত।

এক ডিভিশনে আর সৈন্য থাকে আর পকাশ হাজার বা তারও
বেশী।

গুলির যুদ্ধ। জাপানী যুদ্ধক্ষেত্রে এটা তৃতীয় শ্রেণীর। মানে,
খার্ড ক্লাশ। গুলি করে নরহত্যা? রায়ঃ সে যে কোন বর্ষর
করতে পারে। বর্ষর যুগের পুরোনো কায়দার ওস্তাদী কোথায়?
যে মাহুকের হাতে রয়েছে দুঃপাল্লার রাইফেল আর মেশিনগান,
টেনগান আর রিভলভার। বং ছুরি দিয়ে সেই মাহুকের মারতে
পারায় বাতাহুরি আছে। আর একখানা মাত্র ছুরি দিয়ে অনেক
বেশী মাহুকের মারতেই আসল ওস্তাদীর পরিচয়। সেখানে একটি
গুলিতে মরবে মাত্র একজন। কিন্তু সত্যক হবে অনেক বেশী।
আশে-পাশে বহুদূর ওর লক্ষ থাকে ছড়িয়ে। সবাই দেখে যাবে সে
চাক পিটানোর সংবাদ—লক্ষ এসেছে সন্নিকটে। আর ছুরির লড়াই
অন্তর্কিতে। রাতের আঁধারে। পাশের লোকই ঠিক পাচ্ছে না,
কে মরছে। যুদ্ধ অবস্থার গলার নলীতে ছুরি টেনে বাঁধা, আরামও
আছে। উভয় পক্ষেরই। হাতের সুখ তো আছেই। বাবা মরে,
আমার মরে। ওরা মরতেই তো জঙ্গলে এসেছে। যুদ্ধ চার
পাঁচ লক্ষ লোক রাতারাতি সাবাড় হয়ে যেতে পারে একখানা মাত্র
ছুরির কায়দায়। স্বাইপারের ছুরি চলেছে অল্পান্ত ভাবে। পাশের
বন্ধু অঘোরে বৃষ্টিছেন। টেবই পেলেন না, পাশের বন্ধুর মৃত্যু
ঘনিয়ে এসেছে অতি নাটকীয়ভাবে। এমন কি, পরবর্ত্তে নিজের
মৃত্যুও টেব পেলেন না শেষ পর্যন্ত! খেত অফিসাররা খুব চালাক।
ওরা থাকে ঠিক মাঝখানে—সবার কেন্দ্রস্থলে। বা ঘটবে, পাশ দিয়েই

বুকে সর্দি বসেছে?

বুকে পিঠে সর্দি বসলে ভয়ের কারণ বৈকি! এ অবস্থায়
ভেপোলীন মালিশ ফ্রলে সঙ্গে সঙ্গে উপকার পাওয়া যায়।
কারণ ভেপোলীন ফ্রলে মধ্য দিয়ে এবং নিঃশ্বাসের সঙ্গে শরীরের
ভেতরে যেয়ে একযোগে ততি দ্রুত কাজ করে। ঠাণ্ডা লেগে
মাথাধরা ও গলাধরুয়, বাখা ও বেদনায় ভেপোলীন আশ্চর্য
মালিশ। আজই এক শিশি কিনে বাড়ীতে রেখে দিন।



ভেপোলিন

পরিবেশক : জি, দত্ত এণ্ড কোং
১৬, বনফিল্ড লেন - কলিকাতা-১

বোরোলীন প্রস্তুত কারকের সামগ্রী

যটে থাক। মাথখানে পৌছতে পৌছতে ঠিক বেঁচে বাওয়া বাবে। কিন্তু সকাল বেলায় দেখা গেল, যেত কৃষ্ণ সবারই এক গতি করে বেবেছে স্নাইপার। এই তো যুদ্ধ! খাটি বৈক্যবী যুদ্ধ আর পূর্বের ধারা।

মনে করা থাক, খবর এসেছে—পঞ্চাশ হাজার সৈন্তের সমাবেশ এই ফ্রন্টে। মানে, জঙ্গলের কয়েক শ' মাইল ব্যাপক জুড়ে যুদ্ধের কভার-আপ। বৃটিশ, আমেরিকান আর ভারতীয় সেনা বাহ্যার জঙ্গলে। এবার টেণ্ডার ডাকা হবে। কে কত কম সৈন্ত, যন্ত্রপাতি লটবহর নিয়ে এই বিরাট সৈন্তকে ক্রমশঃ বাবে। ওদের ছোট দেশ, কম সাপ্লাই আর লোকও গোণাগণতি। তুলনায় মিত্রপক্ষ ঘিরেছে চারদিক থেকে। অন্তর্গতি সৈন্তসংখ্যা আর তেমনি সাপ্লাই। টেণ্ডার পড়েছে—কেউ পাঁচ শ', কেউ হাজার বা কেউ দু-হাজার নিয়ে ওই পঞ্চাশ হাজার অশিক্ষিত সৈন্ত ক্রমশঃ। ডাক পড়লো টেণ্ডারদাতাদের। ওদের সুনানী হোক বৈধ ধরে জেনারেলদের কাছে। কার যুদ্ধের কার্যকর-কায়ন কি রকম। তারই বর্ণনা, আর প্লান। বিবেচনা করে একজনের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে সমস্ত ভার। সে হয়তো নগণ্য একজন সেপাই। ওদের লড়াই থেকে বেঁচে ফিরে এলে প্রেমোশন পেয়ে বাবে। মাত্র হাজার বীর সঙ্গে নিয়েছেন সেপাইজী। বেশিও কবে পড়ে পঞ্চাশে মাত্র এক। পঞ্চাশ হাজারের অশিক্ষিত আর কামান বন্দুকের যন্ত্রপাতির ডিভিশনের সাথে লড়তে। অস্ত্রশস্ত্র বলতে ঐ ছুরি, গোটা কয়েক রাইফেল, হাতবোমা আর ডিনামাইট। রসদের জন্তে শিঙনে আটা বা চালের গাড়ী নেই। ভাত জলে ফুটিয়ে শুকিয়ে খলে করে রাখা আছে। খাবার সময় এটা নদীর জলে ডেজালে আবার ভাকে পরিণত হবে। বরাবর ওরা জিতেছেনও এভাবে লড়াই করে। বারা কামান, বন্দুক, গাড়ী ঘোড়া রসদ বোঝাই, আর ওয়ারলেস, অগ্নীকণ, দূরবীক্ষণ, যন্ত্র ফাইণ্ডার আরও মালামাল নিয়ে এলো লড়তে, তারা জাপানী ছোট ছুরির কাছে জান কোরবানু দিয়ে মহানুশিয়ার মান বাঁচিয়েছে। অনেকের কাছেই মনে হবে হয়তো ছোট কলকের বড় তামাকের গল্প। কিন্তু এ নির্ভেজাল খাটা সত্য।

এখন চলে কলামের যুদ্ধ। পেন বা কালির কলম নয়, ফিকথ কলাম—পঞ্চম বাহিনী। আমাদের ভাবায় লাইন। তবে পাঁচ পাতার লাইন নিশ্চয়ই নয়। জাপানী ফিকথ কলাম আসলে ইনটেলিজেন্ট। ওরা নারীবাহিনী। হাঁড়ির খবর নাড়ী চিরে বের করে। আর পেছনের লাইনগুলো সবই স্নাইপার। মানে গুলুচর আর গুলুঘাতকের সমবায়। পর পর অনেক। এদের যুদ্ধের ধারাও রীতিমত অদ্ভুত। আর নতুন।

সেই হাজার সৈন্তের কিছু এসেছে সামনে—ফার্ট লাইন বা ফ্রন্ট লাইন। ওরা ফ্রন্ট বরাবর মাটিতে গর্ত কেটে তলা দিয়ে বসিয়ে থাকে ডিনামাইট। ছোট গর্ত। কিন্তু মাটিতে কোনো চিহ্ন নেই। একটু শুঁড়ে বা ধুলো বা দাগ কিছুই নয়। এমন কি একটা ঘাসের পাতা কাটার চিহ্ন খুঁজলেও আগনি পাবেন না কোথাও। অর্থাৎ জঙ্গলে লোকের পদাংক ঘটেছে কস্মিনকালে, বা কাককাব্য কবা রয়েছে আপনায় পায়ের তলায়, সে সন্দেশের অবকাশ ওরা দেবে না। তার আগেই প্লে জয়জমাট রাইফল্সে পৌছে থতম হবে। ডিনামাইট বরাবর কোথাও কাল দূর তার ঘাসের ভিতর চলে

গিয়েছে। ঐ তাবে পায়ের চাপে বা ভারী গাড়ীর চাকার চাপে ডিনামাইট কাটবে। সঙ্গে সঙ্গে হাতী ঘোড়া, লোক লম্বর, মোটর গাড়ী, কামান বা ট্যাক সবাই মিলে শূন্যে উঠবেন মাটা ছেড়ে। আর পরক্ষণে ধুলোর পড়ে ধুলোর সাথে মিশে বাবেন শুঁড়িয়ে শুঁড়িয়ে। প্রথমে লখিম। পরে অনিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য ইত্যাদি ঐশ্বর্য প্রাপ্তি।

ওইই কয়েক মাইল পরে ছড়ানো রয়েছে জাপানী লড়াইয়ের দ্বিতীয় লাইন। সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। পুরো মিত্র-সৈন্ত চলেছে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে, সামনের দিকে লক্ষ্য রেখে। পায়ের তলায়ও নজর দিতে হচ্ছে মাঝে মাঝে ডিনামাইটের ভয়ে। আর সামনে নজর শত্রুর জন্ত। কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ দূরে একটা গাছের ডাল নড়ে উঠছে সামনের দিকে। দিন দুপুরে গাছের ডালে ভূত নাকি? কিন্তু মিলিটারীর ভূতে বিশ্বাস নেই। 'ভয়ে পড়ো সব। জমি নিয়ে।' কেউ বললে—'জাপানী হাতে পারে।' অতএব চালাও গুলী। ঠাঠ—ঠাঠ—ঠ—ঠ—ঠ—গুলী চলেছে মেশিন গানের সেই গাছকে লক্ষ্য করে। বেশ কয়েক বাকে। তারপর চূপচাপ কেটে গেল দুই-এক ঘন্টা। আর কিছুই নড়ছে না। জাপানীরা মরেছে মনে কবে সবাই উঠেছি ধুলো বেড়ে। 'ওঠা সব, চলা।' আবার চলতে শুরু করেছি। কয়েক পা যেতে না যেতেই, ও মা, ওটা আবার কি? আর একটা গাছও নড়ছে যে। জাপানী? স্তম্ভভাং শুয়ে পড়তে হোল। শত্রুর দেখা পেলেই শুতে হবে, সেই বকমই শিক্ষা আমাদের। কারণ গুলীটা শুধন বৃকের ভিতর দিয়ে রাস্তা না করে মাথার উপর দিয়ে রাস্তা বানাবে। সবাই শুয়ে শুয়ে মেশিন গানের গুলী চালাচ্ছি মনের আনন্দে। গাছের ডাল-পাতা সম্মত কেটে কোর্ট পড়ছে, দেখতে পাচ্ছি। দেখে আর গুলী চালিয়ে স্বপ্নও আছে। বেশ কয়েকটা ম্যাগাজিন খালি করা গেল; এর পর জাপানীরা নিশ্চয় মরেছে। মরা উচিতও। স্তম্ভভাং এবার উঠে চলা শুরু হোল। কিছুদূর যেতে আবার তাই। এবার অস্ত্র একটা গাছ। ওরা সব গাছে থাকতেই ডালবাসে? আচ্ছা মজাতো? আবার শুয়ে পড়ো এবং চলুক মেশিনগান। কয়েকটা ম্যাগাজিন খালি করে ভাবছি। জমিতে কারো দেখা নেই। মাথার উপর আকাশ। সেখানে ওদের প্লেন নেই। অথচ ওরা শুধু গাছেই বসে থাকে কেন?

এই ভাবে ম্যাগাজিনের পর ম্যাগাজিনের শ্রান্ত করতে করতে আমরা অগ্রসর হচ্ছি মনের আনন্দে। গুলীও থতম। জাপানীরা মরে নি? মরেছে নিশ্চয়। আমাদের হাজার হাজার গুলী ধরচা কবেও ওদের মুতু্য হবে না? ওরা কি অমর? অথবা অশরীরী? ভাবতে ভাবতে চলেছি। হঠাৎ একটা আওরাজ এলো উপর হতে। গাছের উপর স্বয়ং মহাপ্রভু বসে আছেন। এবং একজন মাত্র। আমাদের বৃটিশ অফিসারটিকে উনি ততক্ষণ সাবাড় করেছেন তাঁর রাইফেলের গুলীতে। আমাদের ওপর ওর দয়া হোল কেন? এতজ্ঞে বহু লোক এই গাছের তলা দিয়ে গেছে। কাউকে কিছু বলেনি। সব ভারতীয় সৈন্ত। ওদের জীবনের মূল্য কতটুকু? সে কথা না বলাই ভাল। নিজের জীবন দিয়ে কচুবন গাক। লাবা রক্তের অফিসার চাই। কাঁখে অস্ত্র তিনটে টার। অর্থাৎ

ক্যাপ্টেন। ওদের জীবনের মূল্য অনেক বেশী। লড়াইয়ের কী পরেটগুলো আর সন্তোষ সমস্ত ওর হাতে। ওকে মারতে পারলে ভারতীয় সৈন্য অসহায় ও ছত্রাকার হয়ে পড়বে। ওর হাতা রাইফেলটা ও তুলে নিয়েছে। সাদা চামড়ার বন্ধনুলের ভিতরকার স্থগিণ্ড লক্ষ্য করে একটা মাত্র আওয়াজ—ক্লিক! অব্যর্থ ওদের হাতের টিপ। গোরা ধরা নিয়েছে পাকাপাকি ভাবে। এবার বুন্দো শিরালের মহোৎসব! জঙ্গলের শব্দ সংকার।

সত্ত তরুণ ক্যাপ্টেন। বেচারার জন্তে আজও আবার দুঃখ হয়। বিরো করেই চলে আসতে হয়েছে লড়াইয়ে। শিকার পরই ছেড়ে দিয়েছে একেবারে বর্ষার জঙ্গলে। একটি পুত্রসন্তান হয়েছে। তার মুখ দেখাও ভাগ্যে ঘটলো না। এক নম্বর ইণ্ডিয়ান হেটার। এবং তার ফলেই জলদী প্রমোশন। ছাদের তলার সুতবেহ শয়ান। তারই ওপর গাছের মগডালে বসে আছেন মহাপ্রভু। আমরাও তো অনেক আগে ঐ গাছের তলা দিয়ে এসেছি। কিছুই দেখতে পাইনি। বুঝতেও পারিনি কিছুই। আমাদের জীবনকে ও ক্ষমা করছে। ক্ষমাপ্রদর জীবন। আমাদের জীবনের চাইতে ঐ সাদা জীবনের মূল্য অনেক বেশী। তা ওরাও বোঝে। তাই হেরফের। ততক্ষণে আমাদের 'উপরওয়ালাকে' সাবাড় করে গাছ থেকে নামানো হয়েছে। গাছের ডালে আটপৃষ্ঠে গাঁটছড়া বাঁধা। নিজে বেঁধে রেখেছে নিজেকে। দরকার মত চার হাত-পাই ব্যবহার করতে পারবে—অজুনের মতো। সাধা গায়ে ওভার জল—ফ্রেটন পাতার রঙের আলখালা। আর মাথার একটা ছোট টুপি! মুখেও বড়।

দড়ি কেটে ওকে গাছ থেকে নামানোর বেলায় দেখা গেছে গাছে গাছে গাছকয়েক সফ্র তার। গোঁছা করে দুই হাতের কাছে বাঁধা। তারের অল্প প্রান্ত সোজা চলে গিয়েছে বধাক্রমে ডানদিকের ও বামদিকের কয়েকটা গাছে। সেখানেও মগডালে বাঁধা। শত্রুর দিকে। আমরা যে ম্যাগাজিনের পর ম্যাগাজিন মেশিনগানের গুলীর প্রাঙ্ক করে এসেছি, সে এই তার ধরে টান দেওয়ার ফলে। আসলে এই একটা মাত্র লোক প্রে করেছে চমৎকার ভাবে অনেকের ভূমিকার। অনেকখানি ধারণা ও সময় জুড়ে।

কালো চামড়ার দাম ওরা দিয়েছে অনেক কম। সাদা চামড়ার দাম আছে, অস্ত্র ওদের কাছে। কিন্তু তাঁরা আসেন সবার শেষে এবং কালোর সাথে মিশে। সে পর্বত অপেক্ষার থাকতে হতো। অনেকে সাদা মুখে কালিও মেখেছে জাপানীর হাতে তার খেত পরিচয় চাকতে। ওদের নামের ক্যাপ্টেন মেজর পরিচয়ও বুঝে দেওয়া হয়েছে জঙ্গলে, বাস্ক পেটরা থেকে। জাপানীদের নজর এড়ানোর জন্তে। সাদাকে গুলী করার পরই ওরা আত্মহত্যা করে ধরা পড়ার ভয়ে। বৃদ্ধের সময় জাপানী ধরা পড়েছে খুবই কম, শেষের দিকে ছাড়া।

দলের কমান্ডার থাকেন সবার পিছনে। তাঁর হাতেই লাইন্স অব কন্স্ট্রিকশানের (L of C) সমস্ত ভার, ধবধাবর ও যোগাযোগের ব্যবস্থা। কোথায় এবং কে শত্রু এবং কে মিত্র। কোথায় কি ভাবে খাত, পানীয়, অস্ত্র-শস্ত্র সাহায্য আর পেট্রোল ইত্যাদি মিলবে। কোথায় এরার ফোর্স, কোথায় নেভী, কার কি ক্ষেত্র। তারই ম্যাপ আর সাংকেতিক ভাষা। কিন্তু তা ডিকোড

করবে কে? খাত, জল, বিশ্রাম ও নিরাপদ আশ্রয়ের অভাবে এরা তখন হিন্ন-ভিন্ন হয়ে পড়তে বাধ্য। সব জলও ত আর খাওয়া যায় না। শত্রুর বিধ অথবা বিবাক্ত জীবগু মিশ্রিত থাকতে পারে। অবশ্য প্রাণ নিয়ে এ পর্বত বেঁচে থাকলে এর পর তৃতীয় লাইনও পার হতে হবে।

মিত্রসৈন্য বিক্রুট হয়েছে কোটি কোটি। ওর শেষ নেই। বাঘে খেরেও কুরতে পারে না, তো জাপানীরা। চারিদিক দেখতে দেখতে ওরা এগিয়ে চলেছে। কয়েক দিন কেটেছে জঙ্গলে। অবশ্য যদি মিত্রসৈন্যের গুলীতে না পড়েন হুব থেকে ভুল করে। হুপুবে খাওয়া-দাওয়া সেরে সবাই চলেছে জঙ্গলের বুক চিরে। জলসম্বলানো সবই নীরব, নিস্তব্ধ। নির্জন, নির্বাক। কোথাও কিছু নেই। সবাই চলেছে নিশ্চিন্ত। হঠাৎ সামনে থেকে নেমে এসেছে চার পাঁচটা ভূত। ভূত, না বম্বুত? উড়ে এলো? ধরেছেও চকচকে বেরনেটখানা ঠিক আপনায় নাকের ডগায় বজ্রকঠোর চুটিতে। নির্জন স্থানে হঠাৎ ভূত দেখলে আপনায় ভয় হয়? ওরা পালালো খতমত খেরে। সোজা পিছনে মুখ করে দৌড়। কারণ, শাস্ত্রেই বলেছে বঃ পলায়তি স জীবতি। কিন্তু বাবে কোথায়? সবাই উপুড় হয়ে মুখ ওঁজড়ে পড়ে আছে ওখানে। ঐ দেখুন। তাজব ব্যাপার! সবই কি ভৌতিক? দৌড়তে গিয়ে ওরা সব মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে কেন? আবার কি হোল? দেখা গেল, ততকগুলো খুঁচ মুখ ধারালো ঠিলের ফলা মাটিতে পোঁতা রয়েছে কাত করে। লম্বা ঘাসের ভিতরে বলে দেখা যায় না। এদিকে আসতে গেলে পায়ে লাগে না। কিন্তু পেছন ফিরে দৌড়তে গেলে সোজা বিধে বাবে হাঁটুর নীচে। সামনে ভূত দেখে ওরা পালাতে বাধ্য হয়েছে পিছনে। তাই এই অবস্থা। অবশ্য হঠাৎ ভূত দেখতে গেলে সাহস বৃদ্ধি কিছুই থাকে না। কারো নয়। সে জাপানীরাও জানে।

বাই হোক, সংখ্যার জোরে ওদের শেষ পর্বত সাবাড় করে দেওয়া হোল। কিন্তু সেই ভূতেরা উড়ে এলো কোথা হতে? গাছ থেকে পড়লো? ওরা গাছই ভালবাসে। আরও সামনে যেতে দেখা গেল একটা উইয়ের চিবি। তা মাহু-সমান উঁচু। একটা ছোট গাছ উঠছে তার ভিতর দিয়ে ডালপালা মেলে। চিবিটার একেবারে কাছে গিয়ে দেখুন একবার ভাল করে। উইয়ের চিবিই বটে। বর্ষার জল গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ে চিবিটা বেশ পুরোনো মনে হচ্ছে আপনায়। তা হবেই। আপনি ঠকেছেন। ওটা উইয়ের চিবিই নয়। জাপানী ব্রাইপারের হাতে তৈরী কৃত্রিম কাকর্ষ্য। আর ওর ভিতরটা একেবারে কাঁপা। কয়েক জন ব্রাইপার ওতে আত্মগোপন করে থাকে। এক পাশে ছোট গোল একটা ফোকর দরজা। তার ওপরে কাদামাখানো চটের টুকরো ঝোলানো। কাদার প্রলেপে চিবির উপরকার সিমিলি বজায় থাকে। সেই কাদামাখা চটের ওপর একখানা ছোট তাজা ডালও টেনে এনে বাঁধা, সেই ছোট গাছটার। বাতে কোনরকমে কৃত্রিম বলে সন্দেহ না আসতে পারে কারো মনে। ছোট ছোট ফুঁটা দিয়ে ওরা দেশে মিত্রসৈন্যের গাতিবিধি। তারপর সময় বুঝে কাঁপিয়ে পড়ে অভ্যকিতে। বিশেষ করে রাতিকালে।

নির্জন বনে হঠাৎ বম্বুতাকৃতি ভূত দেখতে পিছন ফিরে পলায়ন খুবই স্বাভাবিক। এবং তার পরই মুখ খবড়ে পতন। তাছাড়াও অবস্থার আর কি করণীয় থাকতে পারে? বাকীটা বলার প্রয়োজন

থাকে না। ওদের কোমরে থাকে সেই চকচকে ধারালো ফলার ছুরিখানা। প্রত্যেকে তখন চীৎকার জুড়েছে পড়ে গিয়ে সাহায্যের আশায়। সাহায্য দিলো নাইপার। সেই ছুরিখানা দিয়ে প্রত্যেকের গলার নলীতে। একটা করে পৌঁচ। তারপর সমুখ সমরে পতনের ফলাফল—অক্ষয় স্বর্গগঙ্গ। দেহটা অবশ্য টেনে নিয়ে হেঁচড়া-হেঁচড়ি করবে শেষালে আর বুনা জানোয়ারে। তা হোক। ওটুকু দুঃখ সইতেই হবে। ভাছাড়া আর উপায় কি ?

বঁচে থাকলে বাপের নাম বজায় থাকবে, কিছুটা ভরসা করা চলে। কিন্তু বঁচে থাকলে এখানে সে ভরসাও কম। ওরা বাপের নামও ভুলিয়ে ছাড়ে। কারণ এখনও কয়েকটি লাইন পার হতে বাকী। এবার চতুর্থ লাইন পার হতে হবে। বঁচে থাকা বাকী সৈন্যরা এগিয়ে গেলো এবং এক বায়গার জড়ো হয়েছে। ওরা খাদ কেটে তার ভিতরে আশ্রয় নিয়েছে। কারণ উপর দিয়ে গুলী আর বোমার টুকরোরা বত খুলী বাতায়াত করুক। কিছু বলার দরকার নেই। রাত্রে তিনজন সেনা ট্রি মালা করে পাহারা দিচ্ছে। রাত্রে কেউ না আসে ওদের ওই ঘুমের সময়। আর একজন বেগী থাকে, সে স্বয়ং গার্ড কমিশনার। বন্দকের মাধ্যমে বেয়নেট চড়িয়ে এককোমর বা বুদ্ধমান পাদের ভিতর ঝাঁড়িয়ে থাকে বাইরের দিকে। দুই ঘণ্টা পর আর একজনকে তুলে দেওয়া হয়। সে গিয়ে আবার ঝাঁড়িয়ে থাকবে। অমনি করে সমস্ত রাত। কিন্তু বর্ষার জঙ্গলে, রাত একটা থেকে সাড়ে তিনটা সৈনিকের পক্ষে কালরাত্রি। জঙ্গল আর ঘন অন্ধকার। লোকজন নেই। নিখুঁত। রাত্রি যেন কানে কানে কথা কয়। বাইরের দিকে একা একা ঝাঁড়িয়ে জেগে রয়েছে শুধু সেনা ট্রি। নির্জন সমুদ্রীয় পাহারা যেন। এই সময়ে ভূত আর দুই একটা বুনা জানোয়ার ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়বে না। যে কোন শত্রুর শব্দে এই সময়টাই মারাত্মক। এক মারাত্মক ঘুমের নেশায় পেয়ে বসে। যিমোন ঝাঁড়িয়ে ঝাঁড়িয়ে তার পক্ষে একান্ত, এবং অনিবার্য। জাপানীরাও তা জানে।

আশা করি, আশ-পাশ দিয়ে একটি শেরাল ঘুরে বেড়াচ্ছে, দেখতে পাবেন। শত্রু দুই একবার তাড়া দিয়েছে। একটা আঘাত ঢিলও ছুঁড়েছে। ওটা পালিয়ে গেছে। খানিক বাদেই আবার দেখা দিয়েছে। এবং আশে-পাশে পায়তারা করছে। এ এক আছা উৎপাত! শত্রু নয় যে, গুলী করবে। গুলীর শব্দে পুরো যুদ্ধ লোক জেগে উঠবে। নিকটে শত্রু থাকলে দশ পনের মাইলের ভিতর তারাও জেগে বাবে শত্রুর অস্তিত্ব কেন দিকে। সবাই শশব্যস্ত হবে। খুবই risk গুলী করায়। ও ততক্ষণ ফেলে আসা বাড়ীর কথাই হয়তো ভাবছে। জী-পুত্র পরিজনের কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়েই পড়েছে। মাথাটা ঝুঁকেছে কয়েকবার বেয়নেটের দিকে, রাইফেলের মাথার লাগান মাথাটা এক একবার কাত হচ্ছে দেখে শেরাল ভাবছে, এই সুযোগ। কখন সে শত্রুর পেছনে এসেছে শত্রু টেরই পেল না। ঠিক ৮০ হাত দূর থেকে এক লাফে ওরই ঘাড় পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে বাম হাতের

দুই আঙ্গুলে চেপে ধরেছে ঠিক গলার নলীটা। ডান হাতে চকচকে ধারাল ছুরিখানা বের করে সেখানেই বসিয়ে দিয়েছে এক টান। অস্ত্র কোথাও নয়। গলার নলীটা খালি ওদের লক্ষ্য। শত্রু ছটকট করে কাত হয়ে পড়েছে মাটিতে। শব্দ করার উপায় নেই। গলার নলীতে ছুরির পৌঁচ। পরের শত্রুকে জানিয়েও গেল না যে, তারও টার্ন এসেছে। ততক্ষণে উপরের চামড়ার আবরণটা টান ঘেরে ফেলে শেরাল নিজ মূর্তি ধারণ করেছে। পাণ্ডব শিবিরে অখণ্ডমায় রাতের অভিযান চললো এর পর। বাকী তিনজন শত্রুরও ওই দশ। করে ও টুকেছে সমস্ত যুদ্ধ খাদের ভিতর। পর পর সব খাদেই নিবিবাদে ওর ক্ষুরের কারিকুরি চালিয়ে গেল রাতারাতি মনের আনন্দে। কার্য সমাধা হলে ও চলে গেল আপন স্থানে। সকালে উঠে দেখা গেল, বীভৎস কাণ্ড। সমস্ত খাদেই লোকগুলো শুয়ে রয়েছে তখনো গলা কাটা অবস্থায়। খবর দেবার জন্তেও কেউ বঁচে নেই।

কি ভাবে যে কী হয়ে গেল, কেউ তার হদিশ পেলো না। শুধু নির্দেশ এলো সব বায়গার, সেনা ট্রি পোষ্ট ডবল করতে হবে। সেও ছয় মাস পরে। দুটো করে সেনা ট্রি-পোষ্ট, একটা আর একটার বিপরীত দিকে। দুজন সেনা ট্রি ঘুরবে চক্রাকারে, একে অপরের বিপরীত মুখে। ফলাফল সেই একই। নাইপার ও দুটোকে এক সাথে সাবাস্ত করে কি জানি কোন কাহদায় ফেলে। আবারও নির্দেশ এলো শত্রুসংখ্যা তিনজনের বায়গার ছয় জন হবে একট পোষ্টে এবং একজনের হাতে থাকবে বখারীতি রাইফেল। আর একজনের হাতে থাকবে ব্রেন গান। রাইফেল-মান আগের মতই ঘূর্ণায়মান। দুদিক থেকে দুজন ঘুরতে ঘুরতে এক বায়গার গিয়ে দেখা হবে। আবার সেখান থেকে শিঙন করে পূর্বস্থানে ফিরে আসবে। দ্বিতীয়বার চলতে হবে বিপরীত দিকে। কিন্তু জাপানী নাইপারের কাছে হাঙ্কারো জারি-জুরি ব্যর্থতার পর্দবসিত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত এটম বোমাই দিয়েছে এ বিপদ থেকে নিকৃতি। ওটার যদি আবিষ্কার না হাত ?

এ পর্যন্ত গুলীর কারবার মাত্র এই এক বায়গার। সেই তৃতীয় লাইনে। সে-ও একটা কি দুইটা মাত্র। নাইপার ধরা পড়েছে নদীতেও। কুমীরের পোষাকপরা অবস্থায় নদীর জল থেকে তোলা হয়েছে দিনের বেলায়।

ব্যবসাদারী অর্গানাইজেশনে বৃটিশ। কৃষি-শিল্প-বিজ্ঞানে রাশিয়া। আর যুদ্ধকৌশলে জাপান। জঙ্গল-যুদ্ধে এরা পৃথিবীর অধিতায়। এই যুদ্ধের আগে পর্যন্ত ধারণা ছিল। যুদ্ধের কৌশলে জাপানরা শ্রেষ্ঠ। বস্তুত যুদ্ধের আগে পর্যন্ত আমাদের ধারণায় ছিল জাপানীরা শিল্পেই শ্রেষ্ঠ। এই যুদ্ধে নিয়তম লোকসংখ্যা নিয়ে ওরা দেখিয়েছে, ট্যাংকট্যাংক ওয়ার ফেয়ারের নমুনা। বিশ্বের সেরা সেরা জড়িয়ে শক্তির সঙ্গে।

এই হোল ওদের লড়াই। বৃহৎ শক্তি জোটের বিরুদ্ধে এক ক্ষুদ্র প্রাচ্য শক্তির প্রাণবন্ত লড়াই। কিন্তু ওরা দিয়ে গেল কেন, বোমা পড়ার আগেই ?

॥ মাসিক বসুমতী বাঙলা ভাষায় একমাত্র সর্বাধিক প্রচারিত সাময়িকপত্র ॥



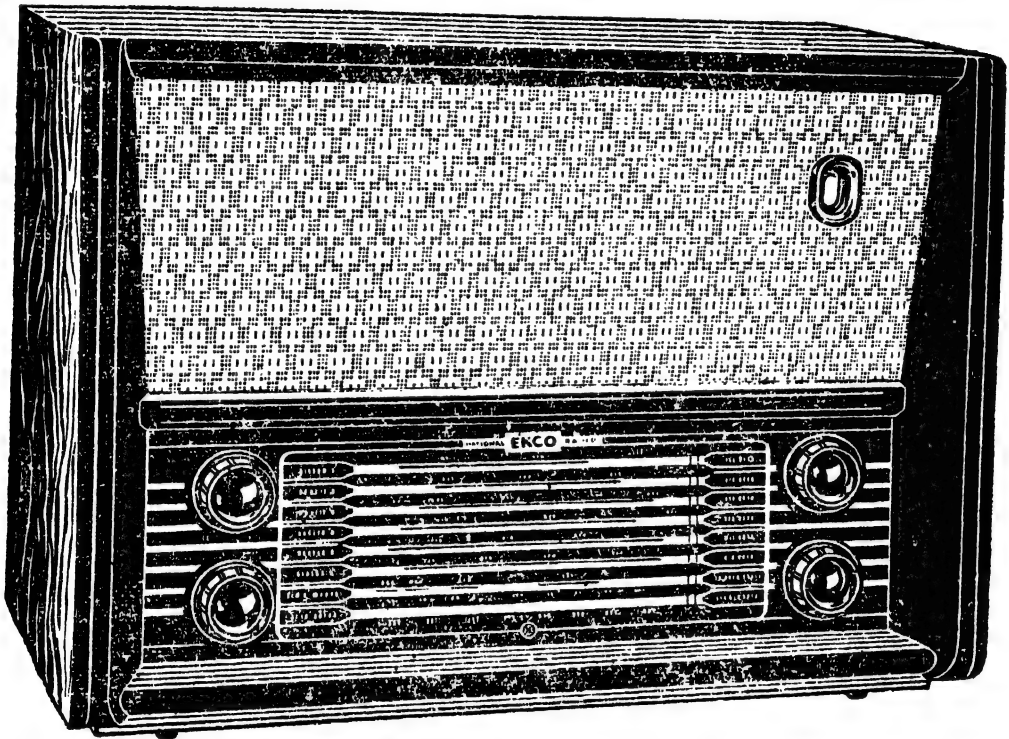
ন্যাশনাল একো



মডেল ৭৩০

* নতুন 'ম্যাগনি-ব্যাণ্ড' টিউনিং!

* ৪১ মিটার-ব্যাণ্ডে বিশেষভাবে ব্যাণ্ডস্ট্রেড!



মডেল এ-৭৩০ : ৬ ভোল্ট, ৮-ব্যাণ্ড,
এসি। মডেল ইউ-৭৩০ : এসি/ডিসি।
অকবকে পালিশ করা কাঠের ক্যাবিনেট।
দাম ৪২৫/- টাকা মীট

স্থানীয় কর স্বতন্ত্র

ন্যাশনাল-একো রেডিওই সেরা—

এগুলি মননশীল ইজড

জেনারেল রেডিও অ্যান্ড অ্যাপ্লায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড

৩ ম্যাজন স্ট্রিট, কলিকাতা ১৩। অপেরা হাউস, বোম্বাই ৪। কেমব্রিজ রোড,
পাটনা। ১১৮ মার্কিট রোড, মাদ্রাজ। ৩৬৭৯ সিলভার স্ট্রীট, পাক
রোড, বাঙ্গালোর। যোগবিধান কলোনি, চাঁদনি চক, দিল্লী। রাষ্ট্রপতি
রোড, সেকেন্দরাবাদ।



জন্মান্তর কি সম্ভব ?

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য

পূর্বপক্ষ

সাব্যব বস্তুর উৎপত্তিও বিনাশ হয়—এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কিন্তু সাব্যব বস্তুর এক বা একাধিক অবয়বের হ্রাস বা বৃদ্ধি হইলে যে সেই বস্তুটি ভিন্ন হইয়া যায় বা তাহা নষ্ট হইয়া নূতন একটি বস্তু উৎপন্ন হয়—ইহা যুক্তিসঙ্গত নয়। যেহেতু কোন এক পরিচিত মাংসবের একটি আঙ্গুল কাটিয়া গেলে বা তাহার শরীর একটু মোটা হইলে তাহাকে লোকে পূর্ব ব্যক্তি হইতে ভিন্ন বলিয়া বুঝে না ; কিন্তু সেই ব্যক্তি বলিয়াই বুঝে। একটি বস্তুর কিয়দংশ ছিন্ন হইলেও লোকে সেই বস্তু বলিয়া মনে করে। একটি পর্বতের অবয়বের হ্রাস বৃদ্ধি হইলেও লোকে সেই পর্বত বলিয়া বুঝে। যদি বলা যায় প্রাকৃতিক অবয়বের পরিবর্তন বশত অবয়বী বস্তুও পরিবর্তিত হয় ইহা যুক্তিসিদ্ধ। তবে যে লোকে ‘ইহা সেই পর্বত’ ইত্যাদি রূপে অস্বভব করে তাহা পূর্বাণ্য বস্তুর সাদৃশ্য বশত ভ্রান্তি। পূর্ববস্তুটি (পূর্বক্ষণের পর্বত) বিনষ্ট হইয়া গেলেও তাহার সাদৃশ্য পরক্ষণে উৎপন্ন বস্তুতে থাকায় ভ্রম বশত লোকে ‘উহা সেই বস্তু’ বলিয়া মনে করে। যেমন দীপের শিখাগুলি পরিবর্তিত হইলেও ‘সেই এই দীপশিখা’ এইরূপ ব্যবহার হয়। সুতরাং কোন অবয়বী হইয়া নয়।

ইহার উত্তরে ত্রিজ্ঞাত এই যে, পূর্ব অবয়বীর সহিত পরবর্তী অবয়বীর সাদৃশ্যটি কিয়দংশে অথবা অধিক অংশে। যদি বল কিয়দংশে সাদৃশ্য, তাহা হইলে সব বস্তুর সহিত সব বস্তুই কিয়দংশে সাদৃশ্য থাকায় সব বস্তুকে সব বস্তু বলিয়া লোকের ব্যবহার হউক। অথিকে ‘ইহা সেই জল’ বলিয়া প্রতিষ্ঠা হউক। আর অধিক অংশে সাদৃশ্য স্বীকার করিলে পূর্ববর্তী পরবর্তী অবয়বীর যেমন প্রত্যেক ক্ষণে পরিবর্তন হইতেছে সেইরূপ সেই অবয়বীর অবয়বেরও প্রত্যেক ক্ষণে পরিবর্তন হয়, ইহা বস্তুর স্বভাব স্বীকার করিতে হইবে, তাহার ফলে পূর্ব অবয়বীও পরবর্তী অবয়বীর অধিক সাদৃশ্য থাকি অসম্ভব বলিয়া সাদৃশ্য বশত ‘সেই বস্তু’ বলিয়া প্রত্যক্ষ হইতে পারিবে না। আর শেষ অবয়ব (পরমাণু) নিত্য বলিয়া সাদৃশ্য থাকিবে এরূপও বলা যায় না। কারণ শেষ অবয়ব নিত্য কি না তাহা নিশ্চয় করা যায় নাই। নিত্য বলিয়া ধরিয়া লইলেও প্রত্যেক ব্যক্তির ভেদ বশত তাহাদের সংযোগেরও ভেদ থাকায় পূর্ব-অবয়বীও পরবর্তী অবয়বীর অধিকাংশ সাদৃশ্য থাকিবে না। শেষ অবয়বগুলির সংযোগকে অবয়বীর প্রতি কারণ স্বীকার করিতে হইবে। বিনা সংযোগে কেবল পরমাণুগুলিই অবয়বীর প্রতি কারণ হইতে পারে না। সুতরাং সাদৃশ্যের দ্বারা পূর্বাণ্য অবয়বীর একত্বভ্রান্তির উপাদান করা যাইবে না।

অতএব বলিতে হইবে যে সাব্যব বস্তু প্রত্যেক ক্ষণে পরিবর্তিত হয় না ; কিন্তু এক সময় উৎপন্ন হইয়া তাহার স্থায়ি অল্পসামান্য স্থির থাকিয়া শেষ সময়ে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ তাহা পরিবর্তিত হইতে আরম্ভ করিয়া নষ্ট হইয়া যায়। এই ভাবে প্রাণটিও পিতার শরীরার্শ রূপ

উপাদান হইতে পুত্ররূপে উৎপন্ন হইয়া কালক্রমে শরীর মনের সহিত সংযুক্ত হইয়া চেতন জীবাত্মারূপে পরিণত হয়। তারপর তাহার স্থায়ি অল্পসামান্য স্থায়ী হইয়া অবশেষে ধরিত্রা যায়। মৃত্যুর পর তাহার আর জন্ম অসম্ভব। কারণ সাব্যব বস্তুর পুনর্জন্ম কোথায়ও দেখা যায় না। পিতার প্রাণাংশই পুত্রাদিরূপে উৎপন্ন হয় বলিয়া জন্মের পর শিশু সন্তানের মাতৃস্তন্য পানে প্রবৃত্তি, মৃত্যু ভয় ক্রমে ক্রমে ক্রীড়া কৌতুক, রাগ, বেদ, হর্ষ সুখ দুঃখ, প্রীতি ভালবাসা প্রভৃতি গুণ সকল উদ্ভূত হয়। উপাদান কারণের গুণ উপাদানের কাণ্ডে উদ্ভূত হইয়া থাকে। মৃত্তিকার গুণ ঘটে ; সূক্ষ্মের গুণ বস্ত্রে উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। পিতা শৈশবে মাতৃস্তন্য পান করিয়াছিলেন, ক্রীড়া কৌতুক ভয় প্রভৃতির দ্বারা আবিষ্ট হইতেন ; যৌবনে নানা প্রকার শারীরিক কার্য ও বুদ্ধির কার্য করিয়াছিলেন। এই ভাবে মাতার কার্যও বুঝিতে হইবে। পিতা ও মাতার ঐ সকল অধিকাংশ সংস্কার সন্তানে অল্পসংস্কৃত হয় এবং পিতা বা মাতার প্রাণে যে চৈতন্য গুণ আছে, তাহা হইতে সন্তানের প্রাণরূপ আত্মাতেও চৈতন্য উৎপন্ন হয়। সন্তানের জন্ম মাত্রেই তাহাতে পিতা-মাতার বাল্য, যৌবন প্রৌঢ়াবস্থার সমস্ত গুণ উৎপন্ন হয় না কেন ? এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে না। যেহেতু উপাদানের গুণ উপাদানের উৎপন্ন হইবার প্রতি কালও একটি কারণ। সেই কালের ভেদ অল্পসামান্য পিতা মাতার সংস্কারগুলি সন্তানে ক্রমে ক্রমে বাল্য যৌবনাদি অবস্থায় উৎপন্ন হয়। এই ভাবে পিতা-মাতার সংস্কারের ফলেই জীব সেই সেই স্বভাবের অল্পসংস্কৃত করে। বানরশিশু তাহার পিতা-মাতার সংস্কারের ফলেই, জন্ম মাত্রে বৃক্ষ-শাখা ধারণ, মাতার উদরে কোশলে সংলগ্ন থাকা ইত্যাদি স্বভাব প্রাপ্ত হয়। হংসশিশু ডিঙ হইতে প্রসূত হইয়া জলে সঞ্চার করিবার স্বভাব প্রাপ্ত হয়। এই জন্ত প্রায়ই দেখা যায়, বুদ্ধিমান পিতা মাতার সন্তান বুদ্ধিমানই হয়। বোকার সন্তান প্রায়ই বোকা হয়। বিদ্বানের গৃহে জন্মিয়া বিদ্বান হয় ; মূর্খের গৃহে মূর্খ হয়। তবে যে অনেক সময় ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায় অর্থাৎ মূর্খ পিতার সন্তান বিদ্বান হয় বা বিদ্বান পিতার সন্তান মূর্খ হয় ; চোরের সন্তান সাধু হয়। সং ব্যক্তির সন্তান দুষ্ট হয় বা একই পিতার নানা সন্তান পরস্পর বিপরীত স্বভাব প্রাপ্ত হয়। তাহার কারণ এই যে, সন্তানের জন্মান কালে পিতা ও মাতার বৈরূপ চিন্তা বা সংস্কার প্রভৃতির উদয় হয়, সন্তানের স্বভাবও সেইরূপ হইয়া থাকে। একথা আধুনিক অনেক মনীষী বলিয়া থাকেন। আরও কথা এই যে, দেশ, কাল, সঙ্গ পরিবেশ প্রভৃতি কারণেও একই ব্যক্তির সন্তানগণের পরস্পর বিপরীত স্বভাব প্রাপ্ত হওয়া আশ্চর্য নয়। সন্তানের দোষ গুণ, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, দেশের আবহাওয়া প্রভৃতির ফলে যে জীবের স্বভাবের বিপর্যয় হয়, তাহার বহু দৃষ্টান্ত আছে।

চিকিৎসকগণ বলেন মহামারী, হৃদিক বা রাষ্ট্রের বিপ্লবের সময় যে সকল সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহাদের যেমন শরীরের নানারূপ বৈকল্য উৎপন্ন হয়, সেইরূপ স্বভাবেরও বিপর্যয় হইয়া থাকে। যেমন দৃষ্টান্ত অল্পসামান্য বলা বাইতে পারে, যখন ভারত পরাবীম ছিল, তখন অধিকাংশ বালক-বালিকা ভীত হইত, কিন্তু স্বাধীনতার পর ক্রমে ক্রমে বালক-বালিকারা সাহসী হইতেছে। যদি বল, পিতামাতার প্রাণাংশ সন্তানরূপে যখন উৎপন্ন হয়, আর সেই চেতন প্রাণ, শরীর মনের সহিত সংযুক্ত হইলে প্রাণে চৈতন্যের অভিব্যক্তি হয়, তখন মাতাপিতার শরীর ও মনের সহিত সংযুক্ত থাকাকালে যে প্রাণ

মাতাপিতার দৃষ্ট বিবয়ের অল্পতব করিয়াছিল; সেই প্রাণ বা প্রাণাংশ বধন সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া কালক্রমে সন্তানের শরীর-মনের সহিত সংযুক্ত হয়, তখন তাহাতে চৈতন্যের অভিব্যক্তি হওয়ার কলে মাতা বা পিতার অল্পতব বিষয়ের (নিজের জন্মের পূর্বে ঘটনার) স্মরণ করে না কেন? তাহার উত্তরে বলিব—সেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন ইত্যাদি হইতে অন্তরিত্ত আত্মা বাহারা স্বীকার করিয়া জন্মান্তরবাদ মানেন, তাঁহাদের মতে জীবের পূর্বজন্মের ঘটনা স্মরণ হয় না কেন? তাহারা যেমন বলেন, মৃত্যুরূপ প্রবল প্রতিবন্ধক বশত পূর্বজন্মের কথা স্মরণ থাকে না অথচ বাঁচিয়া থাকিবার নিমিত্ত যে সকল স্তম্ভপান, ক্রীড়া, কোড়ুক, নিঃশাস-প্রশ্বাস প্রভৃতি সংস্কার, তাহাদের উদ্বোধ হয়। সেইরূপ আমাদের (জন্মান্তর-স্বীকারকারীর) মতে মাতা বা পিতার শরীর হইতে প্রাণাংশের বিচ্ছেদই, সন্তানের পক্ষে মাতা-পিতার অল্পতব বিষয়ের স্মরণ না করার হেতু। মাতা-পিতার শরীর হইতে প্রাণাংশের বিচ্ছেদ হইয়া সেই প্রাণাংশ বধন সন্তান রূপে জন্মগ্রহণ করে, তখন তাহার মাতা-পিতার বাঁচিয়া থাকার সংস্কার, মৃত্যুভয়, স্মৃৎ, হৃৎ, অভিলষিত বস্তুর ইচ্ছা বা তাহার উপায়ের ইচ্ছা সাধনের অবেশণ ইত্যাদি সংস্কার সকল প্রাপ্ত হয় কিন্তু তাঁহাদের অল্পতব বিষয়ের স্মরণ হয় না। কতকগুলি সংস্কার আবার সন্তানের নিজ পুরুষকারের অধীন। যেমন, বিদ্ভা, ধন প্রভৃতির অর্জনজনিত সংস্কার। এই জন্ম পূর্বে পিতার সন্তানও বিধান হয় বা চোরেয় সন্তান সাধু হয় ইত্যাদি। সুতরাং প্রাণট আত্মা, চৈতন্য প্রাণের ধর্ম। অতএব বর্তমান জন্ম ভিন্ন জন্মান্তর নাই। কারণ যে মাতা বা পিতার প্রাণাংশ হইতে সন্তানের জন্ম হয়, সেই মাতা বা পিতা ভিন্ন ব্যক্তি, আর সন্তান ভিন্ন ব্যক্তি। মাতা বা পিতার মৃত্যুর পর আর সেই মাতা বা পিতারূপ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন না। মৃত্যুই তাঁহাদের সব শেষ। আর যে সন্তান মাতা-পিতা হইতে জন্মগ্রহণ করিল, সে তাহার পূর্বে কখনও জন্মগ্রহণ করে নাই। সন্তানের মাতা বা পিতা সন্তানের পূর্বেই জন্মিয়াছিলেন। তাহার সন্তান হইতে ভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া এক আত্মার দুই বার বা ততোধিক জন্মস্বরূপ জন্মান্তর সিদ্ধ হইল না। অতএব জন্মান্তরবাদটি আকাশ-কুসুম করনা।

পূর্বে যে ভাবে বলা হইল তাহা দ্বারা সামঞ্জস্য হইয়া বাওয়ার জন্মান্তরবাদের সাধক যুক্তি ও খণ্ডিত হইয়া যায়। অর্থাৎ জন্মান্তরবাদীরা বলেন—জীব জন্মগ্রহণ করিয়া যে মাতৃতন্ত্র পানে প্রবৃত্ত হয়—তাহার কারণ কি? এই জন্মে সে ত শিশু নাই? শিশু মাতৃক্রেড় হইতে হঠাৎ কোন কারণে নীচে পতিত হইবার উপক্রম কালে ভয়ে মাতার বক্ষাকল বা নিজের গলদেশে রক্ষিত স্তন্য ধারণ করিয়া কম্পিত হয় কেন? এই জন্মে পূর্বে আত্মতাত্ত্বিক জনিত হৃৎ অল্পতব করে নাই; বাহ্যিক কলে পতনের উপক্রমে ভীত হইতে পারে। গণ্ডারশিশু জন্মগ্রহণ করিয়াই মাতার নিকট হইতে পলাইয়া যায় কেন? মাতার কঠিন জিহ্বার স্পর্শজনিত তাহার গাভীর হির হওয়ার কলে যে হৃৎ হয়, তাহা ত সে এই জন্মে অল্পতব করে নাই। সুতরাং বলিতে হইবে, পূর্বজন্মের সংস্কার ব্যতীত এইরূপ হইতে পারে না বলিয়া জন্মান্তর অবশ্য স্বীকার

ইত্যাদি যুক্তি সকল হয়। যেহেতু স্তম্ভপানাদিতে প্রবৃত্তি প্রভৃতি, যে জন্মান্তর স্বীকার না করিয়া সম্ভব হইতে পারে—তাহার যুক্তি আমরা পূর্বেই দিয়াছি। অতএব জন্মান্তর অসিদ্ধ।

উত্তরপক্ষ

অনিত্য পদার্থ যাজেরই প্রত্যেক ক্ষণে পরিণাম হয়—ইহা স্বীকার করিতে হইবে। নতুবা কিছুকাল পরে বা পূর্বে পরিণাম হয় বর্তমান ক্ষণে পরিণাম হয় না বা কতকগুলি ক্ষণে পরিণাম হয়, আবার কতকগুলি ক্ষণে পরিণাম হয় না কেন? তাহার কারণ কি বলিতে হইবে। ইহার কারণ স্পষ্টভাবে কেহই বলিতে পারিবেন না। যেহেতু যে কারণ তিনি দেখাইবেন, তদ্বিপরীত ঐ প্রশ্ন উঠিবে যে ঐ কারণটি তাহার পূর্বে কেন উপস্থিত হইল না। মোট কথা যে ক্ষণে বস্তুর ধ্বংস হয়, ঠিক সেই ক্ষণের পূর্বেই তাহার কারণগুলির উৎপত্তি হয় একথা বলা যায় না। কারণগুলি তাহার পূর্বক্ষেণে উপস্থিত হইলেও তাহাদের উৎপত্তি তাহার পূর্বে বাস্তবভাবে সম্পন্ন হয়। যেমন কোন ঘটনায় মৃত্যুর কারণে, সেইক্ষণে তাহার অবয়বের কিয়দংশ পূর্বস্থান হইতে অবয়বের বিভাগ, তার পর পূর্বসংযোগ নশ, তাহার পরক্ষণে ঘটন নশ হয়। আর স্বাভাবিক ভাবে যে ঘটন বিনাশ হয়, তাহা ঘটন সন্তানান্তর পর হইতে প্রতিক্রিয়া তাহার অবয়বের পরিণাম হইতে থাকে, সেই পরিণামের কলে একদিন ঘটন অদৃশ হইয়া যায়। সুতরাং বোধের মত প্রত্যেক ক্ষণেই বস্তু নষ্ট হইয়া নূতন নূতন বস্তু উৎপন্ন না হইলেও ঘটন প্রভৃতি বস্তু আমাদের ইন্দ্রিয়গোচরতার বোধ্য ক্ষণ হইতে অদৃশ হইবার বোধ্য ক্ষণের পূর্ব পর্যন্ত একরূপ স্থায়ী থাকে তাহা যুক্তিযুক্ত নয়। এতক্ষণ স্থায়ী থাকিয়া হঠাৎ অদৃশ হইয়া যায় না। লোক প্রত্যক্ষ দেখাও যায় যে একটি ভট্টাটিকা ঘরে ঘরে ভাঙিতে ভাঙিতে শেষে অদৃশ হইয়া যায়। একখানি বস্তুর হির হইতে এককালে অদৃশ হয়। এই যুক্তি অনুসারে সাবয়ব প্রাণ ও জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া ঘরে ঘরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়—ইহা স্বীকার। এইরূপ হইলে বাল্যকালের অভ্যে বোবনে সেই বাল্যের প্রাণরূপ অবয়বী যে আর থাকে না, তখন এক নূতন অবয়বী প্রাণ উৎপন্ন হয়—ইহা আমরা অনুমানের দ্বারা নিশ্চয় করিতে পারি। অতএব প্রাণ উৎপত্তির পর হইতে স্থায়ী থাকিয়া শেষকালে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হয়, তাহার পূর্বে পরিবর্তিত হয় না—পূর্বপক্ষীয় এই কথা হয়। সাবয়ব বস্তু যাজেরই স্বভাব এই যে, প্রত্যেক ক্ষণে তাহার পরিণাম হয়। সুতরাং বোবনে প্রাণরূপী আত্মা বাল্যের প্রাণাত্মা হইতে ভিন্ন হওয়ার বাল্যের ঘটনা স্মরণ হইতে পারিবে না—এই পূর্বোক্ত দোষ থাকিয়াই বাইবে। ব'দ বল বাল্যের অবয়বী ও বোবনের অবয়বী ভিন্ন হইলে বাল্য ও বোবনের শরীর পরস্পর ভিন্ন হওয়ার 'সেই এই দেবদত্ত' এইরূপ জ্ঞান হয় কিরূপে? তাহার উত্তরে বলিব ঐ উভয় অবয়বী ভিন্ন হইলেও তাহাদের বহু অবয়ব অপরিবর্তিত থাকার অধিক সাদৃশ্য বশত লোকের 'সেই এই দেবদত্ত' এইরূপ জ্ঞান জড়িতবশতই হইয়া থাকে। আর বাল্য ও বোবন শরীরে অবয়ব বিশেষ কেন অপরিবর্তিত থাকে—এই প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য এই যে—ইহা বস্তুর স্বভাব। অর্থাৎ সেই অবয়বগুলি চিরকাল অপরিবর্তিত না

হইলেও তাহাদের পরিবর্তনের কাল-মাত্রাটি একটু বিলম্বে হয়, ইহা সহজেই অনুমিত। যেমন আকাশের পরিবর্তন, পৃথিবী অপেক্ষা অতিবিলম্বে হয়—ইহা অনুমানগম্য। অথবা যেমন সিকতারানি অপেক্ষা পর্বতরাশির পরিবর্তন অধিককাল সাপেক্ষ। ইহা বস্তুর স্বভাব। স্বভাবের উপর অভিযোগ করা চলে না। অগ্নি কেন উষ্ণ? জল কেন ঈতল? এইরূপ প্রশ্ন অনর্থক। যদি বল—এই যুক্তিতে আমবাও (পূর্ণাঙ্গী) বলিব অবয়বী প্রাণ ভিন্ন ভিন্ন হইলেও তাহাদের অবয়ব অনেক বিলম্বে অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্ণপৰ্যন্ত অপরিবর্তিত থাকায় পূর্ণাঙ্গ প্রাণ্যভিজ্ঞা ১ স্বরণ প্রভৃতির অল্পপণ্ডিত হইবে না। ইহার উত্তর এই যে—একটি মাত্র অবয়বই অপরিবর্তিত বলিয়া প্রমাণিত না হওয়ার, দুই, তিন বা ততোধিক অবয়বকে অপরিবর্তিত স্বীকার করিলে প্রত্যেক অবয়বে ভিন্ন ভিন্ন চৈতন্য থাকায় পূর্ণকথিত ২ দোষের আপত্তি হইবে। আর সম্মিলিত অবয়বে একটি চৈতন্য স্বীকার করিলেও দোষ হয় এই যে, তাহারা অপরিবর্তিত থাকিলেও তাহাদের সংযোগ অপরিবর্তিত না থাকায় চৈতন্যের বিনাশ হইয়া-যাইবে। আর তা ছাড়া প্রত্যেকে চৈতন্য না থাকিলে, সকলের সম্মিলনে চৈতন্য উৎপন্ন হইতে পারে না। ইহার যুক্তিও পূর্বে দেখান হইয়াছে। ৩

যদিও বা স্বীকার করিয়া লওয়া যায় যে—অবয়বী প্রাণ পরিবর্তিত হইলেও তাহার কোন একটি অবয়ব মৃত্যুর পূর্ণপৰ্যন্ত অপরিবর্তিত থাকে; আর সে চৈতন্য বলিয়া বাল্য, যৌবন অবস্থার ঘটনা যৌবন বা বাক্কো স্বরণ হওয়ার কোন বাধা থাকে না। তাহা হইলেও বলিব যে, না এরূপ হইতে পারে না। কারণ অপরিবর্তিত অবয়বে একটি চৈতন্য আর পরিবর্তিত অবয়বগুলিতে ভিন্ন ভিন্ন চৈতন্য রূপ অনেক চৈতন্য থাকায় সেই পূর্ণদোষের আপত্তি হইবে। আর যদি বল—অপরিবর্তিত অবয়বটিতেই চৈতন্য থাকে অন্যান্য পরিবর্তিত অবয়বে চৈতন্য থাকে না। তাহার উত্তরে বলিব একটি মাত্র চৈতন্য অবয়ব ও অন্যান্য অচেতন অবয়ব সমূহ; এইরূপ বিজাতীয় অবয়বের দ্বারা একটি অবয়বী প্রাণ উৎপন্ন হইতে পারে না। যদি বলা যায় জলও পৃথিবীর দ্বারা এক অবয়বী উৎপন্ন হয় বলিয়া, জলও পৃথিবীর মধ্যে বৈজাত্য থাকিলেও ভূতরূপ সাজাত্যও থাকায় বেরূপ বিজাতীয় অবয়ব সমূহের দ্বারা অবয়বী উৎপন্ন হইতে পারে। সেইরূপ চৈতন্য ও অচেতন রূপে প্রাণের অবয়বে বৈজাত্য থাকিলেও ভূতত্ব বা প্রাণতত্ত্ব রূপ সাজাত্য থাকায় তাহাদের দ্বারা এক অবয়বী প্রাণ উৎপন্ন হইবে—এ বিষয়ে আশ্চর্য কি? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে—সেই একটি অবয়বেই যখন চৈতন্য আছে, আর অন্যান্য অবয়ব অচেতন এবং শরীর বা মনও অচেতন (এই পক্ষে মনকেও অচেতন স্বীকার করিতে হইবে) তখন শরীর বা মনের সংযোগ ব্যতিরেকেও তাহাতে চৈতন্যের অভিযুক্তি স্বীকার করিতে হইবে। আর তাহার ফলে স্মৃতির সময় এবং শিতার শরীর হইতে (বীৰ্য মধ্যে) বিযুক্ত হইবার কালে ও সেই

প্রাণাংশে চৈতন্যের উপলব্ধি হউক। কারণ যে বস্তুর যে গুণটি স্বাভাবিক সেই বস্তু উৎপন্ন হইবার পর বা তাহার সত্তাকালে সেই গুণটির অভিযুক্তির নিমিত্ত অপর কাহারও সংযোগাক অপেক্ষা করে না। প্রাণের যে অবয়বটিতে চৈতন্য থাকে তাহা সত্তানের শরীরে অকস্মৎ আবির্ভূত হয় নাই, কিন্তু শিতা বা মাতার প্রাণ হইতে আসিয়াছে, বলিতে হইবে। তাহার ফলে সেই প্রাণাংশটিতে পূর্ণ হইতেই (সত্তানের শরীরে আসিবার পূর্বে) চৈতন্য ছিল বলিয়া উহা শিত শরীর হইতে বিযুক্ত হইয়াও চৈতন্য হউক। কিন্তু তাহা জানা যায় না। চূর্ণ ও হলুদের সংযোগে যে লাল রং উৎপন্ন অভিযুক্ত হয় তাহা সেই চূর্ণ ও হলুদে পূর্বে অনভিব্যক্ত ছিল; আর ঐ সংযোগটিও লাল রং-এর আশ্রয়ভূত বস্তুর সংযোগ এবং ঐ সংযোগের ফলে চূর্ণ ও হলুদরূপ উভয় দ্রব্যেই লাল রং উৎপন্ন হয়। কিন্তু তোমাদের মতে (পূর্ণাঙ্গীর মতে) সেই অপরিবর্তিত প্রাণাবয়বেই চৈতন্য থাকে, অজ্ঞাত অবয়বে চৈতন্য থাকে না বা শরীর ও মনেও চৈতন্য থাকে না। সুতরাং সেই অচেতন শরীর মন বা অজ্ঞাত প্রাণাবয়বরূপ বিজাতীয় বস্তুর সংযোগে অপরিবর্তিত অবয়বে চৈতন্যের অভিযুক্তি হইবে কিরূপে; আর যদিও বা তাহা হয় তাহা হইলে শরীর, মন বা অজ্ঞাত অবয়বেও চৈতন্য উৎপন্ন হউক; শরীর, মন প্রভৃতিতে ঔপাধিক চৈতন্য স্বীকার করিলে ঐ অপরিবর্তিত প্রাণাবয়বে স্বাভাবিক চৈতন্য স্বীকার করিতে হইবে। তাহাতে যে দোষ হয়, উহা একটু পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। আরও কথা—সেই অপরিবর্তিত একটি অবয়ব নিরবয়ব অথবা সাবয়ব। নিরবয়ব হইলে তাহার সহিত শরীর বা মনের সংযোগ হইতে পারে না। যেহেতু সাবয়বের সহিত সাবয়ব দ্রব্যেই সংযোগ হয়। সাবয়বের সহিত নিরবয়বের বা নিরবয়বের সহিত নিরবয়বের সংযোগ অসম্ভব।

আর ঐ অপরিবর্তিত অবয়ব সাবয়ব বলিলে ব্যাঘাত দোষ হইবে। সাবয়ব অর্থাৎ অপরিবর্তিত ইহা বিকল্প কথা। সাবয়ব হইলে পরিবর্তিত হইবে। অপরিবর্তিত হইলে নিরবয়বই হইবে। অতএব কোন প্রকারেই প্রাণরূপ অবয়বী বা প্রাণের অবয়বে চৈতন্য সিদ্ধ হইতে পারে না। সুতরাং বিনশ্বর প্রাণকে অবলম্বন করিয়া মাতা-পিতার সংস্কার বশত সত্তানের স্তম্ভপানাদিতে প্রযুক্তি, মৃত্যু ভয় প্রভৃতির উপশান্তির দ্বারা অম্মাস্তববাদ খণ্ডনই অসীক কল্পনার পর্যবসিত হইল। প্রযুক্তি, নিবৃত্তি, মৃত্যু ভয় প্রভৃতি চৈতন্যেরই ধর্ম। অর্থাৎ প্রাণ অচেতন। কাজেই সেই সত্তানের প্রাণে কিরূপে মাতা-পিতার সংস্কার গুণ উৎপন্ন হইবে? অতএব দেশ, কাল, সঙ্গ, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, আবহাওয়া ইত্যাদির দ্বারা স্বভাবের পরিবর্তন হইলেও সেই স্বভাব দেখ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ মন ইত্যাদিতে থাকিলেও ইহাদের কোনটিতে চৈতন্যসিদ্ধ না হওয়ার এতদতিরিক্ত চৈতন্য আত্মা অবগত স্বীকার হইয়া পড়ে। তাহার ফলে অম্মাস্তববাদও অনস্বীকার্য।

পূর্বপক্ষ

শরীর, ইন্দ্রিয়, প্রাণ ইত্যাদি আত্মা না হইলেও মনই আত্মা, মনের অতিরিক্ত আত্মা অসিদ্ধ। আমবা বাহ্য কিছু অল্পভব বা স্বরণ করি, সবই মনের দ্বারাই করি। মনকে বাদ দিয়া কোন জ্ঞানই হয় না। অতএব মনেই জ্ঞান অর্থাৎ চৈতন্য উৎপন্ন হয়।

১ সংস্কার সহজত প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে প্রত্যভিজ্ঞা বলে।

২ বহু চৈতন্যের একমত্যা না থাকায় শরীর নষ্ট হইবে অথবা কোন কথ নিষ্পন্ন হইবে না।

৩ মনের চৈতন্য পথে খণ্ডিত হইতেছে।

তবেই ঠাড়াইল, চেতন মনই আত্মা। ‘আমি রাম,’ ‘আমি শোকার্ত,’ ‘আনন্দিত’। আমি ভানি। আমি স্মরণ করি। ইত্যাদি জ্ঞানগুলি মনই উৎপন্ন হওয়ার মন আত্মা। অতএব এই মন উৎপন্ন বিনাশশীল। পিতার শরীররূপ উপাদান হইতে উৎপন্ন হইয়া অন্তিম কালে একেবারে মরিয়া যায়। কাজেই জ্ঞানান্তর অসিদ্ধ। বর্তমান জন্ম প্রত্যক্ষসিদ্ধ। মৃত্যুর পর আর কিছুই থাকে না। উহাই ইহার (মনের) চরম পর্য্যবসান।

চৈতন্যটি মনের ধর্ম হইলেও সেই চৈতন্যের অভিব্যক্তির জন্য শরীর ও ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের সংযোগের অপেক্ষা আছে। এই কারণে পিতার শরীর হইতে বিযুক্ত হইয়া পুত্রের শরীর সংযোগের পূর্বে তাহার চৈতন্য অভিব্যক্ত হয় না। অতএব মন হইতে অতিরিক্ত আত্মা বা নিত্য আত্মা অসিদ্ধ হওয়ায় জ্ঞানান্তরবাদ টিকিতে পারে না।

উত্তরপক্ষ

মনকে আত্মা ও চেতন স্বীকার করিলে প্রশ্ন হইবে এই যে— উহা (মন) যখন অনিত্য, তখন সাবয়বই হইবে। কারণ, নিরবয়ব জ্যেবের বিনাশ হইতে পারে না। অবয়বের বিভাগ প্রভৃতি হইয়াই জ্যেবের বিনাশ হয়। নিরবয়বের পক্ষে তাহা হইবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং মন সাবয়ব হইলে তাহার প্রত্যেক অবয়বে এক একটি চৈতন্য অথবা সমূহ অবয়বে একটি চৈতন্য ইত্যাদি পূর্বোক্ত দোষের আপত্তি হওয়ার চৈতন্যকে মনের ধর্ম বা স্বভাব বলা যাইবে না। অতএব জড় মন আত্মা হইতে পারে না। আত্মা যে চেতন তাহা সকলের নিকট প্রসিদ্ধ। আর মনকে যদি নিরবয়ব স্বীকার করা যায় তাহা হইলে তাহা নিত্য হইবে। নিত্য হইলে জ্ঞানান্তরবাদ প্রমাণিত হইয়া যাইবে। আর এমনও বলা যায় না যে—‘মন নিত্য, কিন্তু তাহার চৈতন্যটি শরীরের সহিত সংযোগ বশতঃ উৎপন্ন হয়, শরীরের বিনাশ হইলে তাহার চৈতন্যও নষ্ট হইয়া যায়। তখন মনটি জড় হইয়া অবস্থান করে। আর জন্ম হয় না।’ যেহেতু মনকে নিত্য স্বীকার করিলে এবং চৈতন্যকে তাহার আগচ্ছক (শরীর সংযোগ বশতঃ উৎপন্ন) ধর্ম মানিলে প্রশ্ন হইবে এই যে অনাদি মনের সহিত বর্তমান শরীরের সংযোগ ‘কি কারণে হইল? বিনা কারণে শরীরের সংযোগ হইতে পারে না। বিনা কারণে শরীরের সংযোগ স্বীকার করিলে এই জন্মের পূর্বে এবং পরেও বিনা কারণে শরীর সংযোগ স্বীকার করিতে বাধ্য হইতে হইবে, আর তাহার ফলে জ্ঞানান্তর অবশ্যই সিদ্ধ হইয়া পড়িবে। আর শরীরের সহিত সংযোগের কারণ স্বীকার করিলে—যদি অদৃষ্ট ইত্যাদি সেই কারণ হওয়ার, শরীর ব্যতিরেকে কর্ম সম্ভব নয় বলিয়া বর্তমান শরীর সংযোগের পূর্বেও কর্মের আশ্রয়রূপ শরীর স্বীকার করিতে লইবে। সুতরাং তাহাতেও জ্ঞানান্তর অপরিহার্য হইয়া পড়িবে। অবশ্য মনকে নিত্য চেতনবান স্বীকার করিলে তাহাই আত্মা হইবে। তবে কেবল নামমাত্রের বিবাদ। ফলতঃ নিত্য চেতন একটি বস্তু সিদ্ধ হওয়ার—আত্মবাদের তাহার নাম দেন আত্মা। আর মনোবাদের তাহার নাম দেন মন। এইরূপ স্বীকারে বিশেষ বিবাদ নাই। কিন্তু মন বলিতে আত্মা সাধারণতঃ বাহ্য বৃত্তি, বিশেষ ভাবে

চিন্তা করিতেও দেখা যাইবে যে কাম, ক্রোধ, মূঢ়, দুঃখ, হর্ষ, উদ্বেগ প্রভৃতি বৃত্তিগুলি মনের ধর্ম বলিয়াই স্বীকার্য। আর এই বৃত্তিগুলি বা গুণগুলি উৎপত্তি-বিনাশশীল—ইহা আমরা অনুভব করি। বৃত্তি বা গুণ অনিত্য বলিয়া তাহার আশ্রয়ও অনিত্য হইবে। কারণ অনিত্য গুণের আশ্রয় *দার্থ অনিত্যই হইয়া থাকে। যেমন গন্ধ প্রভৃতি গুণের আশ্রয় পুষ্পাদি নিত্য বস্তুর ধর্ম বা গুণ অনিত্য হয় না। যেমন আত্মার আনন্দ প্রভৃতি। সুতরাং কাম, ক্রোধ, লোভ, মেহ প্রভৃতি অনিত্য গুণের আশ্রয়—মনটি অনিত্য হইতে বাধ্য।

যদি বলা যায় আশ্রয়ীভূত পদার্থ নিত্য হইলেও তাহার গুণ অনিত্য হইতে পারে। যে গুণগুলি সংযোগ, বিভাগ বা শব্দাদি জড় হয় সেইগুলি অনিত্য। যেমন আকাশ নিত্য অথচ ঢাক, ঢোল কাঠির সংযোগে আকাশে অনিত্য শব্দরূপ গুণ উৎপন্ন হয়। অথবা যেমন আত্মা ও মনের সংযোগে আত্মাতে জ্ঞান, ইচ্ছা প্রভৃতি গুণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই নিয়মে কাম, ক্রোধ প্রভৃতি গুণগুলি অনিত্য হইলেও তাহার আশ্রয়ীভূত মন নিত্য হইতে বাধ্য কি? ইহার উত্তরে বলিব, আকাশ যে নিত্য তাহা ত সিদ্ধ হয় নাই। বরং ঐ অনিত্য শব্দ গুণের দ্বারা আকাশ সাবয়ব এবং তাহার ফলে অনিত্যই হইবে। আর আত্মার সহিত মনের সংযোগ সম্বন্ধেই নয় বলিয়া তাহার ফলে আত্মাতে অনিত্য গুণের উৎপত্তির সম্ভাবনাই নাই। আত্মা নিরবয়ব, মন সাবয়ব; সাবয়বের সহিত নিরবয়বের সংযোগ হইতেই পারে না। আর যদি বা আত্মার ও মনের সংযোগ স্বীকার করা যায় এবং সেই সংযোগকে জ্ঞান, ইচ্ছা প্রভৃতি গুণের কারণ বলা যায়, তাহা হইলে আপত্তি হইবে এই যে, একক্ষেণে আত্মাতে সমস্ত জ্ঞান বা ইচ্ছা উৎপন্ন হউক যেহেতু জ্ঞান বা ইচ্ছার কারণ, আত্মা ও মনের সংযোগ রহিয়াছে। কারণ থাকিলে কার্য অবশ্যস্বাভাবিক। আরও দোষ হয় এই যে, আত্মা সর্বব্যাপী বলিয়া তাহার সহিত সর্বদা মনের সংযোগ থাকায় আত্মাতে সর্বদা জ্ঞান, ইচ্ছা, মেহ প্রভৃতি গুণ উৎপন্ন হউক, এমন কি সৃষ্টিতেও কাম, ক্রোধ প্রভৃতি গুণের উৎপত্তি হউক। তথচ তাহা হয় না, বলিয়া নিত্য বস্তুতে অনিত্য গুণের উৎপত্তিস্বীকার করা যাইবে না। আরও কথা এই কাম, ক্রোধ প্রভৃতি বিকারাত্মক গুণ বাহাতে উৎপন্ন হয় তাহা বিকারী হওয়ার অনিত্যই হইবে। বিকারের আশ্রয়ীভূত পদার্থ বিকারী, কাজেই অনিত্য হয়, যেমন দধি, মত্ত প্রভৃতি। বাহ্য বিকারের আশ্রয় নয় তাহা নিত্য, যেমন আত্মা। সুতরাং প্রত্যক্ষের (মানস প্রত্যক্ষ) দ্বারা অনুভূত কাম, ক্রোধ, ভয়, মেহ প্রভৃতি গুণ বা বৃত্তির আশ্রয়ীভূত মন অনিত্যই হইবে। অনিত্য হইলে তাহা সাবয়বই হইবে। কারণ অনিত্য জ্যেব সাবয়ব হয়। আর সাবয়ব হওয়ার পূর্বোক্ত যুক্তি অনুসারে ৪ তাহাতে চৈতন্য সিদ্ধ হইতে পারিবে না। অতএব মনও অনাত্মা। আরও কথা এই যে, কোন ক্রিমার প্রতি করণ এবং কর্তার অপেক্ষা থাকে। এইরূপ জ্ঞান

৪ প্রত্যেক অবয়বে পৃথক পৃথক চৈতন্য থাকিলে অনেক চেতনের ঐক্যমতের অভাব বশত কার্য সম্পন্ন হইবে না। সমস্ত অবয়বে এক চৈতন্য স্বীকার করিলে কোন একটি অবয়ব নষ্ট হইলে, চৈতন্যেরও বিনাশের প্রসঙ্গ হইবে, ইত্যাদি।

প্রভৃতি ক্রিয়ার প্রতি সাধারণতঃ মনকে করণ স্বীকার করার তদতিরিক্ত একজন বর্ত্তা স্বীকার করিতে হয়। এক মনই করণ এবং বর্ত্তা হইতে পারে না। এই অল্প মন হইতে অতিরিক্ত আত্মা স্বীকার। আরও একটি বৃত্তি এই যে—“আমার মন ভাল নয়” আমি কিছুতেই অল্প পাঠে মনঃসংযোগ করিতে পারিতেছি না ইত্যাদি—ব্যবহার হইতে বুঝা যায় মন হইতে অতিরিক্ত আত্মাকে আমরা আমি বলিয়া ব্যবহার করি।

এই ভাবে বুদ্ধিকেও আত্মা বলা যায় না। কারণ মন ও বুদ্ধি প্রায়ই একটি পদার্থ। কিঞ্চিৎ জেদ স্বীকার করিলেও আমার বুদ্ধি মোটা, তাঁহার বুদ্ধি নুস্ক, সে বুদ্ধিমান, ইত্যাদি ব্যবহার হইতে বুঝা যায় আত্মা বুদ্ধি হইতেও অতিরিক্ত। আর যে যে বুদ্ধিতে মনের চৈতন্য খণ্ডিত হইয়াছে, সেই সেই বুদ্ধিতে বুদ্ধিরও চৈতন্য খণ্ডিত হইবে। অতএব আত্মা এতদতিরিক্ত স্বীকার।

পূর্বপক্ষ

দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি হইতে আত্মা অতিরিক্ত হউক তথাপি তাহা নিত্য কেন হইবে? সেই আত্মা অনিত্যই হউক। অনিত্য হওয়ার জগৎসত্তা সিদ্ধ হইবে না। অথবা সেই আত্মা যদি নিত্যও হয়, তাহা হইলেও নিত্য ভাব পদার্থের উৎপত্তি না থাকায়, আত্মার জন্মই সিদ্ধ হয় না; জগৎসত্তাও ত্রুণের কথা। কাজেই সর্বপ্রকারে জগৎসত্তাবাদ অসঙ্গত।

উত্তরপক্ষ

আত্মা যে চেতন, তাহা সর্বজনপ্রসিদ্ধ। অচেতন বস্তুকে কেহ আত্মা বলিয়া বুঝে না। অনিত্য বস্তুমাত্রই যে অচেতন, তাহা পূর্ব বহু বৃত্তির দ্বারা দেখান হইয়াছে। অনিত্য বস্তুতে কোনরূপেই চৈতন্য থাকিতে পারে না। ঘট, পট ইত্যাদি সাবয়ব, অনিত্য বস্তু চেতন নয়। এইরূপ আত্মাকে সাবয়ব, অনিত্য স্বীকার করিলে তাহা অচেতন হইয়া পড়িবে। অতএব আত্মাকে নিত্য, নিরবয়ব স্বীকার করিলে তাহার চৈতন্য অথবা তাহা চৈতন্যস্বরূপই সিদ্ধ হয়। বস্তুত আত্মার গুণ বা ধর্মই চৈতন্য—এই মত বৃত্তিসম্মত নয়। যেহেতু গুণবৎ জ্ঞানমাত্রই বিকারী, অনিত্য হওয়ার, চৈতন্যগুণবান আত্মার অনিত্যতার আপত্তি হয়। সগুণ ত্রয়া নিত্য হইয়াছে, এইরূপ দৃষ্টান্ত খৃষ্টিয় পাণ্ডা বাইবে না। আরও কথা এই যে, আত্মা চেতন অর্থাৎ চৈতন্যগুণবিশিষ্ট হইলে, সেই চৈতন্যের দ্বারাই আত্মার প্রকাশ হয়—ইহা বলিতে হইবে। আর তাহা বলিলে আত্মা চৈতন্যের দ্বারা প্রকাশিত হওয়ার তাহার (আত্মার) মিথ্যা সিদ্ধ হইয়া বাইবে। যেহেতু বাহ্য দৃশ্য অর্থাৎ প্রকাশ তাহা মিথ্যা, অনিত্য। এইরূপে আত্মাও অনিত্য হইয়া পড়িবে। আত্মা অনিত্য হইলে পূর্বযুক্ত অল্পসারে তাহার চৈতন্য সিদ্ধ হইবে না। এই সব কারণে নিত্যজ্ঞানস্বরূপই আত্মা প্রতিপাদিত হয়।

যদি বল জ্ঞান মাত্রই অনিত্য, কোন জ্ঞানই নিত্য নয়—ইহা অল্পবলিসিদ্ধ। যেমন ঘটজ্ঞান, পটজ্ঞান; আমি ইহা জানি। তাহাকে জানিয়াছিলাম ইত্যাদি অল্পভবের বলে সত্য জ্ঞানই অনিত্য। ইহার উত্তর এই যে—ঘটের জ্ঞান, পটের জ্ঞান—ইত্যাকারক জ্ঞানগুলি বিশেষ জ্ঞান—ইহারা অনিত্য। কিন্তু নির্বিশেষ জ্ঞান নিত্য। কখনও তাহার অভাব পাওয়া যায় না।

যেহেতু নির্বিশেষ জ্ঞান উৎপন্ন হইবে বা নষ্ট হইয়া গিয়াছে—এই ভাবে জ্ঞানের প্রাগ্ভাব বা ধ্বংসকে জানিতে হইলে, জ্ঞানের দ্বারাই জানিতে হইবে। সুতরাং জ্ঞানের জন্মের পূর্বে বা বিনাশের পরেও জ্ঞানের সত্তা থাকায় জ্ঞান সামান্তের অভাব কোন কালেই উপপাদন করা যায় না বলিয়া নির্বিশেষ বা সামান্তজ্ঞান নিত্য। যদি বল—একটি জ্ঞানের দ্বারা অল্প এক জ্ঞানের প্রাগ্ভাবাদি জানা বাইবে। তাহার উত্তর এই যে প্রতিযোগীর জ্ঞান না থাকিলে তাহার অভাবের জ্ঞান হইতে পারে না বলিয়া, যে জ্ঞানের দ্বারা অল্প জ্ঞানের প্রাগ্ভাব জানা যায়, সেই জ্ঞানকে প্রাগ্ভাবের প্রতিযোগী জ্ঞানের জ্ঞানের সত্তা কালে থাকিতে হইবে এবং তাহার ধ্বংসকাল পর্যন্তও থাকিতে হইবে। তাহার ফলে ঐ প্রকাশক জ্ঞানকে স্থায়ী স্বীকার করিতে হইবে। আবার ঐ স্থায়ী জ্ঞানের প্রাগ্ভাব বা ধ্বংসকে যে জ্ঞান প্রকাশ করিবে তাহাকে তদপেক্ষা স্থায়িতর স্বীকার করিতে হইবে। এইভাবে শেষ পর্যন্ত একটি অনাদি ও অনন্ত জ্ঞান অবশ্য স্বীকার। আর তাহাই আত্মা। আর যে কেহ কেহ বলে আমাদের স্রষ্টৃপুত্র সময় কোন জ্ঞানই থাকে না বলিয়া নিত্যজ্ঞান অসিদ্ধ। ইহাও বৃত্তিসম্মত কথা নয়। যেহেতু স্রষ্টৃপুত্র হইতে উঠিয়া লোকে আমি স্রষ্টে ঘূমাইয়াছিলাম ‘কিছুই জানিতে পারি নাই’—এই প্রকার স্রষ্ট বা অজ্ঞানের স্রবণ করে। অল্পভব ভিন্ন স্রবণ হয় না। অতএব অর্থাৎ স্রষ্টৃপুত্রে অল্পভবরূপ জ্ঞান সিদ্ধ হইয়া যায়। যদি বল স্রষ্টৃপুত্র হইতে উঠিয়া যে লোকে স্রষ্টের স্রবণ বা অজ্ঞানের স্রবণ করে। সেই অল্পমানের ফলে স্রষ্টৃপুত্রে জ্ঞান সামান্তের অভাব এবং ত্রুণ প্রভৃতির অভাবই সিদ্ধ হইয়া যায়। অর্থাৎ এই ভাবে অল্পমান হয়। বলা—স্রষ্টৃপুত্র কালের পূর্ব ও পরবর্ত্তী কাল দুইটি মধ্যবর্ত্তী কালযুক্ত যে হেতু ঐ দুই কাল পূর্ণাঙ্গের কাল।

যেমন যে রাত্রিতে আমি জাগিয়া থাকি, সেই রাত্রির পূর্ণাঙ্গ কাল দুইটি মধ্যবর্ত্তী কালযুক্ত। এই ভাবে স্রষ্টৃপুত্র কালের অল্পমান। তার পর স্রষ্টৃপুত্র কালটি আত্মমান যেহেতু তাহা কাল। এই ভাবে স্রষ্টৃপুত্রকালীন আত্মা জ্ঞানসামান্তের অভাবমান যেহেতু তৎকালে জ্ঞানের কারণ ছিল না। এইরূপে স্রষ্টৃপুত্র কালে আত্মাতে জ্ঞানের অভাব সিদ্ধ হওয়ার আত্মা জ্ঞান স্বরূপ হইতে পারে না। ইহার উত্তরে বলিব স্রষ্টৃপুত্রকালে যে জ্ঞানের কারণ থাকে না—তাহা জানিলে কিরূপে? যদি বল জ্ঞানের অভাব হইতে জ্ঞানের কারণের অভাবের দ্বারা জ্ঞানের অভাব, আবার জ্ঞানের অভাবের অল্পমানরূপ অজ্ঞানত্বের দোষ বশত—এইরূপ অল্পমান অসিদ্ধ। সুতরাং স্রষ্টৃপুত্রকালেও কোনরূপে জ্ঞানসামান্তের অভাব প্রমাণিত করা না বাঙরার, জাগ্রত, স্বপ্ন, স্রষ্টৃপুত্র, দিন, রাত্রি, মাস বৎসর ইত্যাদি কালের অতীত এক নিত্য জ্ঞান সিদ্ধ হইয়া যায়। আর তাহাই আত্মা। যদিও এই আত্মার স্বরূপও জন্ম অসিদ্ধ—তথাপি বর্ত্তমান জন্ম আমরা অল্পভব করিতেছি বলিয়া বলিতে হইবে নূতন দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন প্রভৃতির সহিত সেই আত্মার একটা কোনরূপ সম্বন্ধ হইয়াছে; আর এই বর্ত্তমান জন্মটি যখন দেখা বাইতেছে, তখন ইহার কারণরূপে কর্ম বা অদৃষ্ট স্বীকার করিতে হইবে। কর্মের ফল যে অবগতাব্য তাহা প্রায়ই সকলের অল্পভবসিদ্ধ। সেই কর্ম নিজ আত্মার কর্ম বলিতে হইবে। কারণ অপরের কর্মের দ্বারা কেবল

অপরের ফল হইতে দেখা যায় না। এই হেতু বর্তমান জন্মের শরীর হইতে শরীরের কারণ কর্ম, আবার এই জন্মের কর্ম হইতে এই এই শরীর উৎপন্ন হয়—এইরূপ বলিলে অক্সোজেনার দোষ হয়। সুতরাং এই জন্মের কারণীভূত কর্মগুলির জন্ত পূর্ববর্তী শরীর স্বীকার করিতে হইবে। তাহাই পূর্বজন্ম। আবার তাহার জন্ত তাহার পূর্বজন্ম স্বীকার। এইরূপে অনাদি জন্ম বা সৃষ্টি অর্থাৎপ্রতি প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হওয়ার জন্মান্তরবাদ অপরিহার্য। আবার এই জন্মের কর্মের ফলে আগামী জন্ম অবগত্য়াবী। বর্তমান না জানেব দ্বারা সম্পূর্ণরূপে কর্মের ক্ষয় হয়, ততদিন জন্মসংসার আবর্তনীয়।

পূর্বে দেখান হইয়াছে যে আত্মা চৈতন্যরূপ, কাজেই উহা দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন ইত্যাদি হইতে ভিন্ন। আর আত্মাকে সর্বব্যাপক বলিতে হইবে। কারণ যদি আত্মা মধ্যম পরিমাণ হন তবে সাবয়ব হওয়ার (মধ্যম পরিমাণ বস্তু সাবয়বই হয়) অনিত্য হইয়া পড়ে, আর সাবয়ব বস্তু চৈতন্য হয় না। অতএব আত্মা মধ্যম পরিমাণ নহে। অণুপরিমাণও বলা যায় না। অণু বলিলে সমস্ত শরীরে সুখ প্রভৃতির অনুভব যুগপৎ হইতে পারে না। যেহেতু অণু আত্মা শরীরের এক অংশেই যুগপৎ থাকিতে পারে বলিয়া যে অংশে আত্মা থাকিবে সেই অংশেই সুখ হইতে পারে, অস্ত অংশে সুখ হইবে না। কিন্তু গ্রীষ্মকালে ঘনান্ধ্রীতে শীতল জলে স্নান করিলে বা শরীরে চন্দন অম্লসেপন করিলে যুগপৎ সর্বদেহীতেই সুখ হয়। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে আত্মা অণু নয়। সুতরাং অবশেষে ঈড়াইল আত্মা বিভূ অর্থাৎ সর্বব্যাপী। সর্বব্যাপী বস্তুর কোন কর্ম বা ক্রিয়া সম্ভব নয়; সেরূপ দেখাও যায় না। বস্তুত নিরবয়ব পদার্থের ক্রিয়া হয় না। আত্মা স্বধন নিরবয়ব, চৈতন্যরূপ তখন তাহার পক্ষে বাস্তবিক কর্ম, জন্ম, ভোগ প্রভৃতি সম্ভব নয়। অথচ আত্মার জন্ম, কর্ম, ভোগ প্রভৃতি আমরা প্রত্যক্ষ অনুভব করিতেছি। এই জন্ত স্বীকার করিতে হইবে যে, এই জন্ম, কর্ম প্রভৃতি মিথ্যাজ্ঞান বশতই হইয়াছে। অবগু মিথ্যাজ্ঞান মাত্র হইতেই জন্ম হয় না কিন্তু মিথ্যাজ্ঞান হইতে কামনা, কামনা হইতে কর্ম, কর্ম হইতে জন্ম, জন্ম হইতে ভোগ ইত্যাদি হইতেছে। আবার অপরের কর্মের দ্বারা অপরের ফলভোগ হয় না ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। রাম থাকিলে ভ্রামের তৃপ্তি হয় না। সুতরাং বাহার কর্ম, তাহারই জন্ম বলিতে হইবে। এই যুক্তি অনুসারে প্রত্যেক আত্মার জন্ম দেখিয়া নিশ্চয় করা যায় যে এই জন্মের কারণরূপে প্রত্যেক আত্মার নিজ নিজ কর্ম অবশ্যই ছিল। আবার কারণটি কার্যের পূর্ববর্তী হয় বলিয়া এই জন্মের কারণরূপ কর্ম এই জন্মের পূর্বে ছিল। আবার শরীর ব্যতিরেকে কর্ম সম্ভব

নয় বলিয়া, এই জন্মের কারণীভূত কর্মগুলির সাধনরূপ পূর্ব শরীরও বর্তমান শরীরের পূর্বে হইয়াছিল। আত্মার সহিত কল্পিত শরীরের সম্বন্ধই আত্মার কল্পিত জন্ম। কারণ আত্মার বাস্তব জন্ম বা কর্ম যে সম্ভব নয় তাহা উপরে বলা হইয়াছে। অতএব ঈড়াইল যে বর্তমানে জন্মের কারণরূপে কর্ম, সেই কর্মের কারণরূপে বর্তমান জন্মের পূর্বজন্ম; এইরূপ সেই পূর্বজন্মের কারণরূপে তাহার পূর্বজন্ম অর্থাৎ সিদ্ধ হয়। আবার বর্তমান জন্মেও অনেক নূতন কর্ম করা হইতেছে। তাহারও ফল অবগত্য়াবী বলিয়া বর্তমান জন্মের পর আগামী জন্মও অনুমানসিদ্ধ। পূর্বেই বলা হইয়াছে কর্মের কারণ কামনা, কামনার কারণ মিথ্যাজ্ঞান। সুতরাং বর্তমান মিথ্যাজ্ঞান দূরীভূত না হইতেছে, ততদিন জীব কামনা বশত কর্ম করিতে বাধ্য, আর কর্ম করিলে জন্মও অবগত্য়াবী। এই মিথ্যাজ্ঞান আবার বর্থাৎজ্ঞানের দ্বারা নিবৃত্ত হয়। সর্বত্রই উহা আমরা দেখিতে পাই যে, যে বিষয়ের বর্থাৎজ্ঞান হয় সেই বিষয়ের মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্ত হইয়া যায়। যেমন দড়ির বর্থাৎজ্ঞান হইলে দড়ির মিথ্যাজ্ঞান রূপ যে সাপের জ্ঞান তাহা চলিয়া যায়। প্রকৃত স্থলে আত্মার মিথ্যাজ্ঞান বশতঃ কামনা ও কর্ম। সুতরাং আত্মাবিশয়ক বর্থাৎজ্ঞানের দ্বারা আত্মাবিশয়ক মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্ত হয়; অতঃ কোন কারণের দ্বারা আত্মার মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্ত হইতে পারে না—ইহা যুক্তিসিদ্ধ।

মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্ত হইলে তাহার কার্য কামনাও চলিয়া যাইবে, আর কামনা নিবৃত্ত হইলে কর্মও সম্ভব হইবে না। কর্ম না হইলে আর জন্মও সম্ভব নয়। সুতরাং আত্মার বর্থাৎজ্ঞান বর্তমান না হয় ততদিন জন্ম অবগত্য়াবী। এই বর্তমান জন্মই সকলের শেষ জন্ম নয়। কারণ সকলের আত্মাবিশয়ক বর্থাৎজ্ঞান নাহি, বহুলোক আত্মার স্বরূপের সম্বন্ধে কোন চিন্তাই করে না, জ্ঞান ত দূরের কথা। আর পশু প্রভৃতির ত আরও দূরের কথা। অতএব আত্ম-সাফাৎকারবান ব্যক্তি ভিন্ন সমস্ত জীবেরই ভবিষ্যৎ জন্ম সিদ্ধ হওয়ার, আর পূর্ব পূর্ব জন্মও অর্থাৎপ্রতি প্রমাণসিদ্ধ হওয়ার জন্মান্তরবাদ অস্বত্ব ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। তাহার ফলে মায়াবের ধর্মের উপযোগিতাও সিদ্ধ হইল। বর্তমান জন্মে ধর্মের অনুষ্ঠান করিলে পরজন্মে সুখ হইবে। অধর্মের ফলে দুঃখ হইবে। জন্মান্তর না থাকিলে এই জন্ম যদি শেষ জন্ম হয় তাহা হইলে ধর্মের কোন উপযোগিতা থাকে না। যে ধর্ম অনুষ্ঠান করিল সে ত আর থাকে না, ফলভোগ করিবে কে? আবার বিনা শরীরে সুখ-দুঃখ ভোগও হয় না। অতএব বর্তমান ধর্মের ফলে ভবিষ্যৎ শরীর অবশ্যই স্বীকার্য।

সমাপ্ত

“সংখ্যায় আসে যায় না, ধন বা দারিদ্র্যে আসে যায় না; কায়মনোবাক্যে যদি এক হয়, একমুষ্টি লোক পৃথিবী উটে দিতে পারে—এই বিশ্বাসটি ভুলো না। বাধা বতাই হবে, ততই ভাল। বাধা না পেলে কি নদীর বেগ হয়? যে জিনিস বত নূতন হবে, বত উত্তম হবে, সে জিনিস প্রথম তত অধিক বাধা পাবে। বাধাই ত সিদ্ধির পূর্বসন্ধ! বাধাও নাই সিদ্ধিও নাই। অলমিতি।”

—স্বামী বিবেকানন্দ।



[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ডঃ পঞ্চানন ঘোষাল

জোঁড়াবাগানের রিপোর্ট-রুমে পুলিশের উপনগরপাল (ডেপুটি পুলিশ কমিশনার) প্রত্যাহ ঠিক দশটায় সময় উপস্থিত

হয়ে তাঁর অধীনস্থ বিভিন্ন থানাদারদের নিকট হতে তাঁদের স্ব স্ব এলাকার হানতীয় সংবাদ শ্রবণ করে ততসম্পর্কে প্রয়োজনীয় তকুমনামা জারী করে থাকেন। এই দিনও তিনি ঠিক এই সময় তাঁর জ্ঞাত নির্দিষ্ট ঘরখানিতে এসে 'রাজকীয় ক্রাউন লালিত' ঘর্ণায়মান রকিড চেয়ারটিতে উপবেশন করেছেন। তাঁর সম্মুখের প্রশস্ত টেবিলখানার ডান পার্শ্বে রক্ষিত একটি চেয়ারে বসে লহরের সহ-নগরপাল (এসিস্টেন্ট কমিশনার) বিভিন্ন থানার অফসারদের দ্বারা সমাধিত বিবিধ মামলা সমূহের তদন্ত সম্বন্ধে তাঁকে ওয়াকিবখাল করে নিচ্ছিলেন। এত একটি থানা তাঁদের আসল নাম সহ ক. খ. গ. ঘ প্রভৃতি আক্ষরিক নামেও পরিচিত। তাই বধাক্রমে ক থানার পর খ থানা ঘ থানার পর গ থানার অফসারদের ভিতরে যাবার জন্ত ডাক পড়েছিল। সেই ডাক অজ্ঞাবাহী এক এক জন অফসার কাগজপত্র পেশ করার পর ঐ রিপোর্ট-রুম হতে বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই আর একজন অফসার তাঁর ডাইরীপত্র সহ সেই ঘরটির মধ্যে ঢুক পড়েছিলেন।

এই বিস্তীর্ণ রিপোর্ট-রুমের একাংশ একটি কাঠের পার্টিশনের দ্বারা পৃথককৃত করে অপর একটি অপরিসর কক্ষের সৃষ্টি করা হয়েছিল। এই ঘরখানির ভিতর রক্ষিত একটি লম্বা টেবিলের দুই পার্শ্বের চেয়ার ক'খানি অধিকার করে বিভিন্ন থানার অফসাররা তাঁদের ডাক আসা পর্যন্ত কাগজপত্র ও হারকলিপি সত অধীর হয়ে অপেক্ষা করছিলেন। এঁদের কেউ কেউ কাঠের পার্টিশনের মধ্যকার করেকটি ছিন্নপথে দৃষ্টিনিক্ষেপ করে ঐ রিপোর্ট-রুমের ভিতরকার আবহাওয়া সব্বদে পূর্বাহ্নে অবহিত হওয়ার চেষ্টা করছিলেন। এই বিশেষ উদ্দেশ্যে পূর্ব হতেই এই সকল ছিন্ন তাঁরা তৈয়ারী করে রেখেছিলেন। সহসা ছিন্নপথ হতে মুখ সরিয়ে সহকর্মীদের উদ্দেশ্য করে এঁদের একজন নিয়মের বলে উঠলেন, 'উহু' স্রবধে মনে হচ্ছে না।' ডেপুটি সাহেবের চশমা কপালে উঠে গিয়েছে। ওদিকে বড়সাহেব (এসিস্টেন্ট কমিশনার) তাঁকে শাস্ত না করে তাঁর ক্রোধে ইচ্ছন যোগাচ্ছেন। আরও একটা ক্যান্সরেলটি বোধ হয় হলো। খেলো আর কি—

উপনগরপালের চশমা চোখের উপর হতে কপালে উঠলে বুঝতে হবে যে সেই দিন কারণে বা অকারণে নিশ্চয়ই তিনি কাউকে না কাউকে সাময়িক ভাবে বরখাস্ত (সাসপেন্ড) করবেন। কমপক্ষে জরীমানা প্রভৃতি বিভাগীয় শাস্তি দ্বারা এঁদের কাউকে না কাউকে তাঁর হাতে নাজেহাল হতেই হবে। এই সকল বিয়েরে আইনসম্মত ক্ষমতা তাঁর অসীম। নির্ধম নিয়মতান্ত্রিকতার নামে এই ক্ষমতা তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। তাঁদের এই ক্ষমতা অস্ত্রার ভাবে প্রযুক্ত হলেও কাকুর কিছু বলবার বা করবার নেই। এমন কি, ডেমক্লারী যুগেও পৃথিবীতে এই ক্ষমতা আমলাতন্ত্রের হাত হতে আজও পর্যন্ত কেউ কেউ নিতে পারে নি। নিয়মতান্ত্রিক শাসন ও বিচারের নামে স্ব স্ব কর্তৃক্ষেত্রে এঁরা আজও পর্যন্ত শৈবতান্ত্রিক বা রাজতান্ত্রিক ক্ষমতার অধিকারী। এই ক্ষমতা তাঁদের নিকট হতে কেড়ে নিলে পৃথিবীর কোনও রাষ্ট্রই টেকে থাকতে পারে না। তাই বিভিন্ন দেশের গভর্নেন্ট বিভিন্ন ছাঁচে গড়ে উঠলেও তাকে তার অধীনস্থ উচ্চপদস্থ কর্তৃপক্ষীদের হাতে অতীতের রাজকীয় ক্ষমতা দিতেই হবে। পূর্বকালীন রাজাদের জায় এদের বেউ ভাল হলে রাষ্ট্রে মজল অস্ত্রাঘ উহার সর্বনাশ। রাজতন্ত্র উপরতলা হতে বিদায় নিলেও নীচের তলার উহার ক্ষমতা আজও অপ্রতিহত। রাজতন্ত্র ধনতন্ত্র সমাজ বা সাম্যতন্ত্র প্রভৃতি বিবিধ রাষ্ট্রতন্ত্র আজও এদের হাতের ক্রীড়নক মাত্র। এর চেয়ে বোধ হয় রাজতন্ত্রই ভালো ছিল। তাই নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, রাজতন্ত্রই পৃথিবীর এক স্বাভাবিক শ্রেষ্ঠ অবদান। এই রাজতন্ত্র কখনও কোনও দেশ বা জাতিকে ধিরাবিভক্ত করেনি। বরং তাদের উহা একীভূত ও সম্মিলিত করে রেখেছিল। অল্প দিকে বিবিধ ইজিমের পাশ্চাত্য পড়ে জাতিবর্গ মধ্য জাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রদায় গড়ে দেশ ও জাতিকে টুকরা করে দিচ্ছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ একদা দুর্দ্বন্দ্ব জাতি ও মুসলমান কোরিয়ান জাতির কথা বলা যেতে পারে।

এই সহকর্মী কর্তৃক প্রদত্ত দুঃসংবাদটি কানে যাওয়া মাত্র উপস্থিত অফসারদের মনে কেই সন্দেহ হয়ে উঠে এসে একে একে ঐ ছিন্নপথে দৃষ্টি প্রসারিত করে ভিতরের ব্যাপার বুঝবার চেষ্টা করছিলেন। ঐ সময় রিপোর্ট-রুমের ভিতর জর্নেক জুনিয়ার অফসারের উপর তাঁর কাষের গাকলতির জন্ত তর্জন-গর্জ্জন চলছিল আর সেই অফসারটি পার্শ্বে তাঁর থানার ভারপ্রাপ্ত অফসার অসহায় অবস্থার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই বকুনী-বকুনীর প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করবার চেষ্টা করছিলেন। তাই এঁদের মধ্যে যারা উঠে এলেন না তাঁরা তাঁদের অন্তরাস্ত্রাকে তাঁদের কর্ণকুণ্ডলীর মধ্যে অন্তঃপ্রবেশ করিয়ে দিয়ে রিপোর্ট-রুমের ভিতরকার উচ্চদায় সমূহ কর্পণটাহের দ্বারা ধরে নেবার জন্ত উগ্রুখ হয়ে উঠলেন।

এই সময় সহসা তাঁরা মনেতে পেলেন, ডেপুটি সাহেব বিরক্তি হৃৎক স্বরে 'খ' থানার সেকেন্ড অফসার হীরালাল বাবুকে জিজ্ঞাসা করছেন, 'তাহলে তুমিই এই মামলাটির তদন্ত করেছিলে? আচ্ছা! ঐ নব্বয়ের বাড়ীর সামনে একটা গ্যাসপোষ্ট দেখেছিলে? উঁ, কি বললে, দেখোনি। আচ্ছা, ঐ বাড়ীর কাছাকাছি কোনও ভাটবিন দেখেছো? তা'হলে তুমি তা-ও দেখোনি। তুমি একটি ওয়ার্ডলেন অফসার দেখছি। তুমি এই মামলার এই এই সাক্ষীকে তা'হলে জিজ্ঞাসাবাদ করোনি, এঁরা? তুল পথে তুমি এতো দিন

তদন্ত চালিয়ে এসেছো, আমি এখানে বসে বসেই যে সব খবর পাই, তুমি সরলমীন তদন্ত করেও তা জানতে পারো না। মিছামিছি একটা নির্দোষী লোককে তুমি চালান দিতে চাও।’

এর পর তিনি একটি অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চলমান তলা দিয়ে ঐ খানার বড়বাবু দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘আপনি বড়বাবু এর কাছ হতে তদন্তের ভার নিজে নিয়ে নিন। হ্যাঁ, ভালো করে এই সকল ছেলে-ছোকরাদের আপনারা কাজ দেখান না কেন? আমি চাই না যে আমার অফিসারদের বিরুদ্ধে কেউ কমপ্লেন করে। আচ্ছা, আপনারা এখন যেতে পারেন।’

সহ-নগরপালকে সাধারণ ভাষায় বড় সাহেব বলে সম্বোধন করা হয়। এককালে তাঁরাও ক্ষমতার ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু এক্ষণে আরও উজ্জ্বল অফিসার ডেপুটি সাহেবদের আগন্তব্য পড়ে তাঁদের ক্ষমতা কথঞ্চিৎ কমে গেলেও অখণ্ড অফিসারদের নিকট উহার তারতম্য উনিশ-বিশ মাত্র। নীচেওয়ালাদের নিকট উহাদের উভয়েরই দহন বা দাহশক্তি তখনও পর্যাপ্ত প্রায় সমান ছিল। অল্প সময় হলে তিনি ডেপুটি সাহেবের এইরূপ এক দস্তাবেজ সমর্থন করে অফিসারদের শাস্তি দেবার জন্য তাঁকে পরামর্শ দিতেন। কিন্তু এই ক্ষেত্রে তিনি ডেপুটি সাহেবের এই উপদেশবাণীটুকু চূপ করে বসে গলাধঃকরণ করলেন মাত্র। এর কথা হতে তিনি কি বুঝলেন তা বুঝা গেল না। তবে অলক্ষ্যে তাঁর ঠোঁটের কোণে

একটু মুহ হাসির রেখা ফুটে উঠে তা নিমিষে আবার মিলিয়ে গেলো। এর পর তিনি ডেপুটি সাহেবের দিকে না তাকিয়েই প্রথামত বলে উঠলেন—‘নেকষ্ট ম্যান। জলদী—’

রিপোর্ট-ক্রমের দরজার বাইরেই পদের খানার অফিসার মুলুকচাঁদ বাবু তাঁর ডাক পড়ার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। ভক্তলোক ঐ অফিস-ঘরে ঢুকে পড়ার জন্য অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পূর্বতন খানা-অফিসারদের ঘরিত গতিতে বেরিয়ে আসছিলেন। দরজার নিকট তাঁদের ব্যস্ততাপূচক অস্বাভাবিক গতির জন্য তাঁদের দুইজনই মাথা হুইটা ঠোকাঠুকি হয়ে গেল। কিন্তু এতদ্বারা এদের কার্যকর অভিযোগ বা প্রতি-অভিযোগ করবারও সময় ছিল না। একবার মাত্র মুলুকচাঁদ বাবু চলার পথের দিকে তাকিয়ে ভ্রুকুচিত করে ‘খ’ খানার ‘বড়বাবু’ স্রবীর ঘোষ তাঁর সহকারী অফিসার হীরামাল বাবুর সঙ্গে পাশের কক্ষে প্রবেশ করলেন। এর পর তাঁরা সেখানে উপবেশন করা মাত্র তাঁদের সহকারীদের একজন ব্যক্তির নিখাস ফেলে বলে উঠলেন, ‘আজকের মতন চাকরী তা’হলে আপনাদের রইলো। কিন্তু কি নিয়ে এতো চোঁচামেচি হচ্ছিল ওখানে?’

নির্বিকার চিন্তে হাতের কাগজপত্রগুলি গুছিয়ে নিয়ে কয়েকটি মামলার আসামীদের নামে চালান লিখতে লিখতে ‘খ’ খানার বড়বাবু স্রবীর ঘোষ উত্তর করলেন, ‘দু-উ-র, ওসব হুমকী আমরা



ও আর-সি-এল এর

কুমারেশ

নিজের ও দৈনন্দিন জীবন

২৫০

দি ওবিয়ট্যাল রিসার্চ অ্যান্ড কেমিক্যাল ল্যাবরেটরী লিঃ

বুঝি। সোজা সজি বললেই হয় যে, এই আসামীটিকে ছেড়ে দাও। তা না বলে ধমকে আমাদের কাছ হতে খুশীমত বিনি কাজ আদায় করবেন। কোনও এক দিক হতে এ সম্বন্ধে তাঁকে ধরাধরি হয়েছি আর কি? থাকগে, কর্তার ইচ্ছেই কর্তব্য হবে। এতে পাপ বা কিছু তা ওনা দেয়ই, আমাদের আর কি!’

‘খ’ থানার সেকেন্ড অফসার ছিলেন এডল্ফন নরেন যুবক অফিসার। স্বকীয় ধান-ধারণা মনঃ সন্ততার সহিত তিনি ঠিক পথেই তদন্ত করেছিলেন। এমন কি, এই মামলার আসামীর বিরুদ্ধে বখেটে সাক্ষ্যপ্রমাণও তিনি পেয়েছিলেন। এই জন্ত তাঁকে আদালতে সোপান্দ করবার জন্য তিনি উদ্বিগ্নতন কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ করেছিলেন। ডেপুটি সাহেবের কাছে এই জন্ত তাড়া খেলতে তাঁর ধারণা হয়েছিল যে, এই বিষয়ে ডেপুটি সাহেবকে সন্তোষিত পক্ষের কেহ ভুল বুঝিয়ে থাকবে। তখনও পর্য্যন্ত এই তরুণ অফসারের ধারণা ছিল যে, এঁরা ভুল করলেও অস্ত্রার করেন না। এক্ষণে তার বড়বাবুকে এইরূপ এক উক্তি করতে শুনে অবাক হয়ে সে বলে উঠলো, ‘সে কি শ্রাব! কি বলছেন আপনি। তা’হলে সব জেনে-শুনেও আপনি এই রকম একটা অস্ত্রারের সঙ্গে আপোষ করবেন?’

‘আরে থামো হে ছোকরা’ ‘খ’ থানার বড়বাবু স্মরীর ঘেঁষে হেহনুচক স্বরে উত্তর করলেন, ‘জীবনে প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে হলে তোমাকেও এইরূপ অস্ত্রারের সঙ্গে বায়ে বায়ে আপোষ করতে হবে। দেখলে না, আমাদের অতোবড়ো দুর্ভিক্ষ বড়ো সাহেব পর্য্যন্ত চূপ করে গেলেন।’ সামান্য দারোগার পদ হতে শনৈঃ শনৈঃ উঠে তাঁকে বড়সাহেব হতে হয়েছে ব’লে এসব প্যাচ তাঁরও জানা আছে। এই ক্ষেত্রে চূপ করে থাকা ছাড়া আর উপায়ই বা কি? মগর দিকে ডেপুটি সাহেবকেও সব কথা না জেনে দোষ দেওয়া যায় না। এমনও হতে পারে যে, আরও ভবরমন্ত কোনও মহল থেকে অমরোদের নামে তার উপর এই ব্যাপারে আদেশ এসেছে। এই সম্ভাব্য মহল স্বয়ং হারবাট সাহেব হতে পারেন।

টেবিলের এক কোণে একটি বেকির উপর ক্ষুর মনে বসে জোড়াপুকুর থানার থার্ড অফসার চিরঞ্জীব বাবু এতক্ষণ নিবিষ্টমনে এঁদের এই সব কথাবার্তা শুনেছিলেন। এইবার ‘খ’ থানার বড়বাবু স্মরীর ঘোষের কথায় সায় দিয়ে তিনি বলে উঠলেন, ‘হ্যাঁ শ্রাব! আমাদের বড়বাবু মহীশ্র বাবু এবং আমাদের থানার সেকেন্ড অফসার প্রণব বাবুও এই একই কথা বলেন। তাঁদের এই সব যুক্তির সত্যতা সম্বন্ধে বায়ে বায়ে আমি প্রমাণ পেয়েছি, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁদের ঐ-সব কথায় আমার মন সায় দিতে চায় না।’

‘আঃ, তোমরা দু’জনেই দেখছি ছেলেমানুষ! এই সবে তো কলেজ থেকে বের হয়ে এসেছো। প্রথম প্রথম একটু অনুরোধ হবে বৈ কি’, নিক্কিয়ার চিন্তে স্মরীর বাবু উত্তর করলেন, ‘কলেজে একজন্ত তোমাদের বা লার্ন করেছো তা এখানে আনলার্ন করতে হবে। বুঝলে? থাক, ও-সব কথা। এখন বলো, তুমি এখানে এসেছো কেন?’

চিরঞ্জীব বাবুকে তার গাংলতির জন্ত ডেপুটি সাহেবের নিকট পেশ করবার জন্ত বড় সাহেব তাঁর থানার বড়বাবুর উপর আদেশ করেছিলেন। চিরঞ্জীব বাবু তাঁদের হুকুম অমুখ্যারী ঠিক সময় মতই রিপোর্ট-ক্রমে এসে গিয়েছে, কিন্তু যে ডাকে ঐ সাহেবদের কাছে

পেশ করবে, সেই বড়বাবুরই তখনও পর্য্যন্ত দেখা নেই। কাল রাতে তিনি কোন নিমন্ত্রণ পার্টিতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়েছেন, কিন্তু তখনও পর্য্যন্ত তিনি থানার বা রিপোর্ট-ক্রমে এসে উপস্থিত হতে পারেন নি। এই জন্ত বেশ একটু চিন্তিত মনেই চিরঞ্জীব বাবু প্রত্যাহার ‘খ’ থানার বড়বাবুকে বললেন, ‘আমাকে আজ রিপোর্টে বড়সাহেব পুটীয়াপ করবার জন্ত বলেছিলেন। কিন্তু যিনি আমাকে ওখানে পুটীয়াপ করবেন, সেই বড়বাবু তো এখনও এলেন না! ওদিকে আমাদের সেকেন্ড অফসার প্রণব বাবু কটকে সাক্ষ্য দিতে গিয়েছেন। আজ সন্ধ্যার আগে তিনিও ফিরতে পারবেন না। থানার এখানে আমি একাই আছি। এদিকে তো আমাদের থানার ডাক পড়লো বলে। এখান কি করা যায় বলুন তো শ্রাব!’

চিরঞ্জীব বাবুর আশংকা অমূলক ছিল না। কয়েক মিনিটের মধ্যেই রিপোর্ট-ক্রম হতে বড় সাহেব ডেকে উঠলেন, ‘নেস্টাই ম্যান। ও থানা—আ।’ বড়বাবুর হাঁক-ডাক অমুসরণ করে দরজার সিপাহীটিও চোঁচিয়ে উঠলো। হজুর। ‘ড’ থানাকে ডাক হয। ‘ড’ থানার বড়বাবু গরহাজির থাকার আর দেরী না করে ‘চ’ থানার বড়বাবু কাগজপত্রসহ রিপোর্ট-ক্রমে চুকে পড়ামাত্র হস্তমন্ত হয়ে জোড়াপুকুর থানার বড়বাবু মহীশ্র বাবু সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। চোখ দুটি তাঁর তখনও পর্য্যন্ত লাল টকটক করছে। রাত্রি জাগরণের ক্লান্তি তখনও পর্য্যন্ত তাঁর সারা অঙ্গে লেগে আছে। আর দেরী না করে তিনিও কাগজপত্রসহ রিপোর্ট-ক্রমে চুকে পড়লেন।

‘ইউ আর লেট’ ভীষণভাবে খেঁচের উঠে ডেপুটি সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, ‘এতোক্ষণ কোথায় ছিলেন? কোনও কাগজপত্র আপনার আজ আমি দেখবো না। দূর করে ফেলে দেবো ওগুলো। আমি আপনাকে সামপেও করবো।’

‘হ্যাঁ তাই করবেন শ্রাব!’ বিনীত ভাবে মহীশ্র বাবু উত্তর করলেন, ‘আপনার দেওয়া গ্রাহ্য শাস্তি আমি মাথা পেতেই নেবো। কিন্তু এখান এই সব আসামী ও কাগজপত্রের তো একটা সুবাহা করতে হবে।’

নিম্নে এসে ওগুলো এদিকে, অধিকতর বিরক্তির সহিত মহীশ্র বাবু প্রবৃত্ত কাগজগুলির উপর হুকুমনামা জারী করতে করতে ডেপুটি সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কোথায় তুমি এতোক্ষণ ছিলে, এতো দেরীতে এখানে আসা হলো কেন?’

‘হ্যাঁ, শ্রাব, সেই কথায় আপনাকে এখানে বলবো’, নিচিন্ত ভাবে মহীশ্র বাবু উত্তর করলেন, ‘শ্রাব, আপনি জানেন যে ফ্যামেলী এখানে রেখে আমার সেকেন্ড অফসার কটকে সাক্ষ্য দিতে গিয়েছে। এখান হঠাৎ আজ সকাল তাঁর সন্তান-সন্তাবনা হয়ে উঠলেন, তাঁর বাড়ীতে অজ্ঞ কোনও পুরুষ লোক নেই। তাই আমাকেই তাঁকে হাসপাতালে দিয়ে আসতে হলো। আর একটু দেরী হলে ভ্রমহিলাকে তাঁর সন্তানসহ বাঁচানো সম্ভব হতো না।’

এর পর আর কাকুর কোনও কথা বলা চলে না। বেশ একটু অপ্রতিভ হয়ে ডেপুটি সাহেব বলে উঠলেন, ‘তা এতোক্ষণ তা বলোনি কেন?’ বিজয়গর্বে মাথা উঁচু করে বড়বাবু উত্তর দিলেন, ‘আপনি তো তা জিজ্ঞাসা করেন নি আমাকে।’ ডেপুটি সাহেবকে বেশ একটু অপ্রস্তুত করে দিয়ে মহীশ্র বাবু বেগুন বেগে রিপোর্ট-ক্রমে

প্রবেশ করেছিলেন, আগোছাল কাগজপত্রগুলি গুটিয়ে নিয়ে তিনি তেমনি বেগেই সেই ঘর হতে বার হয়ে এলেন। নিয়ম মত বিদায়ের পূর্বে পুলিশী প্রধামত গোড়ালির সহিত গোড়ালি ঠুকে আওয়াজ তুলে সেলামটুকু করবার সময় ব্যতীত আর একটু সময়ও তিনি সেখানে অতিবাহিত করার প্রয়োজন মনে করলেন না। কিন্তু স্বরিতগতিতে পাশের ঘরে ফিরে এসে সেখানে চিরঞ্জীব বাবুকে তাঁর অপেক্ষায় উপবিষ্ট দেখে তিনি একটু ক্ষতমত খেয়ে গেলেন। অক্ষুট স্বপ্নে তাঁর মুখ হতে বার হয়ে এলো, তাইতো। চিরঞ্জীব বাবুকে তো আজ পুট-আপ করা হলো না! কিন্তু ততক্ষণে রিপোর্টের কাজ-কর্ম সেরে ডেপুটি সাহেব অস্ত্র কাজে বেরিয়ে গিয়েছেন। সেখানে একাকী বসে আছেন বড় সাহেব রমেশ রায়। বড় রিপোর্টের পর তিনি সেখানে এইবার ছোট রিপোর্ট বসাবেন। এই ছোট রিপোর্টটি তাঁর একচ্ছত্র ক্ষমতা সেখানোর জন্ত স্পষ্টাতি সৃষ্টি করা হয়েছে। তা ছাড়া তিনি এই জোড়াবাগানের প্রাসাদোপম বাটার খিতলে সপরিবারে বাস করেন। একটু দেরী করে উপরে উঠলেও তাঁর ক্ষতি নেই। অগত্যা বড়বাবু মহীন্দ্র বাবু চিরঞ্জীব বাবুকে বড় সাহেবের এই ছোট রিপোর্টই পেশ করে দিলেন। ‘কেন একে বড় রিপোর্টে পেশ করা হয়নি,’ চিরঞ্জীব বাবুকে সেখানে দেখা মাত্র বড় সাহেব মহীন্দ্র বাবু চীৎকার করে বলে উঠলেন ‘আমি জানতে চাই কচুরীগণিতে জুরা বন্ধ হবে কি না? জানো, আমি জোড়াবাগানে একটা সিংহ বসে আছি। এখান হতে হকার দেবো আর আমার অধীনস্থ ছ’টা খানা কেঁপে উঠবে ধব-ধব-ধব, ঢালাকী পেয়েছো তোমরা?’

‘বাকগে শ্রাব্য। এবারের মত ওকে আপনি মাপ করে দিন, অল্পবোধের স্বরে বড়বাবু মহীন্দ্র বাবু বড় সাহেবকে বললেন, কচুরী গলির ভার আমি নিজে নিলাম। আমি কথা দিচ্ছি জুরা ওখানে বন্ধ হবে।’ দেখুন এখানে আমি শাসন করতে এসেছি। কাউকে মাপ করবার জগ্রে এখানে আমি আসিনি, পুনরায় চীৎকার করে উঠে বড় সাহেব বললেন, ‘পেলে কিন্তু আমি কাউকেই ছাড়বো না, তা সে যতো বড়ো লোকই হোন না কেন’। কিন্তু বড়বাবু মহীন্দ্র বাবুর অল্পবোধে পরিশেষে বড় সাহেবকে চিরঞ্জীব বাবুকে মাক করে দিতে হলো। মহীন্দ্র বাবু এই সে দিনও ছিলেন বড় সাহেবেরই এক সমপরিবারের সহকর্মী। ভাগ্যগুণে বড় সাহেব রমেশ বাবু আগে প্রমোশন পেয়ে বড় সাহেব হয়ে বসেছেন। তাঁরা পরস্পর পরস্পরের দোষ-গুণ ও দুর্বলতা সম্বন্ধে সর্বদাই সচেতন ছিলেন, তাই বড়সাহেবের পক্ষে চিরঞ্জীব বাবুকে বা বলা যায় তা বড়বাবু মহীন্দ্র বাবুকে বলা যায় না। আসলে মহীন্দ্র বাবুর সহিত কচুরীগলির সম্বন্ধ বড়সাহেবের অজানা ছিল না। আপাততঃ তিনি বি’কে মেরে বোকে শিকা দেওয়ার প্রণালীটা বেছে নেওয়া সমাধান মনে করেছিলেন। এইজন্য বড়বাবুর শেষ কথাটি শুনে আশঙ্ক হয়ে তিনি চিরঞ্জীব বাবুর সহিত বড়বাবুকেও ক্ষমা করে উঠে গেলেন। শাসনকাণ্ডের বিবিধ প্যাণ্ডের মধ্যে ইহাও যে একটি প্যাণ্ড মাত্র ছিল তা কিন্তু নবীন অফিসার চিরঞ্জীব বাবুর মনের আগোচরেই রয়ে গেল।

বতকণ বড়সাহেব রিপোর্ট-রয়ে উপস্থিত ছিলেন ততক্ষণ চিরঞ্জীব বাবু সেখানে শান্ত হয়েই দাঁড়িয়ে ছিলেন। কিন্তু বড়সাহেব

হান পরিভ্যাগ করা মাত্র তাঁর চোখ দু’টা হতে বর-বর করে জল গড়িয়ে পড়লো। ফোভে ও অশ্রুমানের তাঁর কণ্ঠ বন্ধ হয়ে এসেছে। তাঁর এই অবস্থা দেখে ব্যথিত হয়ে পার্শ্ববর্তী ‘খ’ খানার নবীন অফিসার হীরালাল বাবু তাঁর কাছে এসে দাঁড়ালো। কিন্তু বহুকে সাহসনা দেবার কোনও ভাষাই তাঁর মুখে এলো না। অবস্থা বুঝে বড়বাবু মহীন্দ্র বাবু এগিয়ে এসে চিরঞ্জীব বাবুর শিঠের উপর হীরে হীরে হাত বুলাতে বুলাতে সাহসনার স্বরে বলে উঠলেন, ‘আরে এতে আপশোষ করার কি আছে। এসো, আমরাও খানার ফিরে নীচেওয়ালা অফিসারদের আর দশজন পাবলিককে বিশটা গাল পেড়ে দেবো আশুন। এতে আমাদের মনের শান্তি ফিরে আসবে এবং সেই সঙ্গে রাজ্যে ভালো হুমও হবে। দশটা গাল খেয়েছি বিশটা গাল দেবো। এতে আমাদের বরং দশটা লাভ থেকে বাবে। এসো, মন খারাপ না করে চলে এসো।’

চক্ৰসজ্জা ও আত্মসম্মানের অভাব নৈতিক অসাড়তার অন্ততম কারণ। এই দুইটির অভাব ঘটলে মানুষ আর মানুষ থাকে না। সে তখন পশুরও অধম হয়ে উঠে। বার নিজের আত্মসম্মান জান নেই সে পনের আত্মসম্মানের মর্যাদা কখনও দিতে পারে না। নির্দোষ জনসাধারণকে ঝুটুটু গাল দেওয়া অপরাধেরই সামিল। এই বিশেষ ক্ষেত্রে অবিরোধক উদ্ভূতন অফিসাররাও এই অপরাধের জন্ত দায়ী কিনা তা বিবেচ্য। কারণ, অশ্রুতন অফিসারদের মধ্যে আত্মসম্মানবোধের অভাব ঘটলে তাঁরা তাঁদের জনসাধারণের বন্ধু না করে শত্রুই করে তুলে থাকেন। কিন্তু এই সকল কথা এই সকল ক্ষমতায় আসীন ব্যক্তিদের বুঝিয়েই বা দেবে কে? সুবিধানক স্থানে অবস্থান করার জন্ত তাদের এই সব তত্ত্বকথা কান্নের পক্ষে বুঝিয়ে বলা সম্ভবও ছিল না। অগত্যা অফিসাররা সকলে স্নান হাসি হেসে একে একে রিপোর্ট-রয়ে পরিভ্যাগ করে যে বার খানার ফিরে আসতে সূত্র করে দিলেন। এখন তাদের একমাত্র চিন্তা ছিল স্নানাহার সেরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার। বিশ্রামের লালসার তাঁদের সারা অঙ্গ ভরপুর হয়ে উঠেছে। অস্ত্র যদি অস্ত্র কোনও মামলার সংবাদ তাঁদের এই কষ্টাজ্জিত বিশ্রামটুকুর ব্যাঘাত না ঘটায় তবেই। আজকের মত যেন তাঁদের সকলেরই চাকরী রইলো। অক্ষত শরীরে তাঁরা যে বার বাসার ফিরে যেতে পারছেন! তাই তাঁদের পা যেন আর চলে না। [ক্রমশঃ।

ডাঃ বসু

অশোক কার্ডিয়েল

নারীরা স্বাস্থ্য, শক্তি
ও সৌন্দর্য বর্ধন করে

প্রথম প্রস্তুতকারক:

ডাঃ বসুর ল্যাবরেটরী লিঃ
কলিকাতা-৯



ভবানী মুখোপাধ্যায়

সাতাশ

ফ্রাঙ্ক হারিস বলেছেন, বার্গার্ড শ' Back to Methuselah নাট্য-চক্র একেবারে অন্তরের প্রেরণায় লিখেছেন। তাঁর The Philanderer নাটক জ্যাক গ্রীনের তাগিদে রচিত, সে মঞ্চস্থ করতে পারেনি। মিসেস সিডনী ওয়েব 'ফিলান্ডারার' নাটকের উৎকট-মৌলিকতা পীড়িত নারীতে বিরক্তি প্রকাশ করে বার্গার্ড শ'কে বলেন আধুনিক যুগের অ-রোমান্টিক কণ্ঠের প্রমী বাস্তব রমণীর ছবি আঁকুন, তাঁর আগ্রহে শ' লিখলেন Mrs. Warren's Profession, সেনসর তার কঠোরোধ করল। পুরাতন এ্যাভিন্যু থিয়েটারের দরজা বন্ধ হওয়ার উপক্রম, তাই মিসেস হার্বিয়ান ও ক্রোয়েল ফারকে বাঁচানোর জন্য লেখা হল Arms and the Man, জ্যানেট আচার্জ-এর জন্য লেখা হল Candida। এলেন টেরীও রিচার্ড ম্যানসফিল্ডের জন্য লিখিত হয়েছিল The Man of Destiny এঁরা কেউ শেষ পর্যন্ত এই নাটকে অভিনয় করেন নি। সিডনী ওয়েব নামকরণ করেছিলেন You Never Can Tell নাটকের, সিবিল যুদ্ধের জন্য এই নাটক লিখিত হয়, কিন্তু ডুমিকা বটনের ঘোবে, রিহার্সেলের পর এই নাটক তখন অভিনীত হয়নি। টেরী ও ম্যানসফিল্ডের জন্য The Devils Disciple লিখিত হয় এবং আমেরিকার এই নাটক বিরাট সাফল্য লাভ করে। করবেস-রবার্টসনের জন্য Caesar and Cleopatra লিখিত হয়, জ্যানেট অভিনয়ের পর এই নাটক তাঁর খ্যাতিবৃদ্ধি করে। প্রথম পৌত্রের জন্মের পর এলেন টেরী বার্গার্ড শ'কে বলেন যে পিতামহীর জন্য কে আর নাটক লিখে, এই কথায় বার্গার্ড শ Captain Brassbound's Conversion নাটক রচনা করেন। Pygmalion নাটক রচিত হয় মিসেস প্যাট্রিক ক্যামবেলের জন্য। ভেডার্গে—গ্রানভিল বার্কায়ের জন্য John Bulls Other Island ও Androcles and the Lion লেখা হয়। Apple Cart লিখিত হয় তার বারী জ্যাকসনের জন্য। সুতরাং এই সব নাটকের একটিও বার্গার্ড শ' স্ব-ইচ্ছায় লেখেন নি।

লিখেছিলেন অল্পকষ্ট হয়ে, প্রয়োজনের খাতিরে। ফ্রাঙ্ক হারিস প্রস্তাব করেছেন যে তাগিদে না পড়লে কোনো দিন বার্গার্ড শ' এই সব নাটক লিখতেন কি না সন্দেহ। Man and Superman, Heart break House, এবং Back to Methuselah এই তিনখানি নাটক বার্গার্ড শ' অন্তরের তাগিদে রচনা করেছিলেন। অবশ্য বার্গার্ড শ'র সব নাটকই সাক্ষ্য অর্জন করেছে, এখনও সেগুলি মঞ্চস্থ হলে দর্শকের সপ্রশংস অভিনন্দন লাভ করে, কত দিন করবে সে কথা শুধু মহাকালই বলতে পারেন!

Man and Superman নাটকে বার্গার্ড শ' creative evolution বা স্বজনীমূলক বিবর্তনবাদের ইঙ্গিত করেছেন, তাঁর Back to Methuselah নাটকও এই স্বজনীমূলক বিবর্তনের আর এক অভিব্যক্তি।

১১২০ খৃষ্টাব্দে ভগিনী লুসীর মৃত্যুর পর বার্গার্ড শ'র জীবতাত্ত্বিক পঞ্চাঙ্গ Back to Methuselah নাটক রচনা শেষ হয়, বার্গার্ড শ' এই নাটক Metabiological pentateuch অর্থাৎ জীবতাত্ত্বিক পঞ্চাঙ্গ নাটক। এমন এক বিচিত্র বিষয়বস্তু নিয়ে নাটকের পরিকল্পনা করাই কঠিন, লেখা আরো শক্ত সন্দেহ নেই। সুতরাং বার্গার্ড শ'র নিজের মতে এই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা, সে কথা অপরে অবশ্য স্বীকার করতে নারাজ। এই নাটক অভিনয় করতে তিনটি রজনীর প্রয়োজন। এমন একটি নাটকের প্রয়োজনা করতে প্রচুর অর্থ, প্রচণ্ড সাহস এবং অপরিমীম উৎসাহের প্রয়োজন।

Heart break House নাটকের অভিনয় দেখে যখন অতিলয় প্রফুল্লচিত্ত বার্গার্ড শ' ফিরছেন তখন তার বারী জ্যাকসন টেলনে অপেক্ষায় বার্গার্ড শ'কে অহরোধ করলেন এই নাটক অভিনয়ে অহুমতের জন্য। বার্গার্ড শ' সেদিন বলেছিলেন—তোমার পরিবারবর্গের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা আছে ত?

তার বারী জ্যাকসন তাঁকে আশ্বস্ত করায়—বার্গার্ড শ' বললেন, তথ্যসূত্র। কাজ শুরু হল, রিহার্সেলে হাজির থাকতেন বার্গার্ড শ'। শারীরিক ক্লেশ উপেক্ষা করেও তিনি বথাসময়ে হাজির হতেন। প্রায় ছ'মাস লাগল এই নাটকের মহলা শেষ করতে। ডেল রিহার্সেলের সমস্ত অহুষ্ঠানে হাজির থাকতেন বার্গার্ড শ'। ১১২৩-এর ১ই থেকে ১২ই অক্টোবর পর্যন্ত তিন দিনে নাটক অভিনয় হল, শেষ বনিকাপতনের পর অশুভ স্তব্ধতা বিরাজিত করতে লাগল, তারপর করতালি এবং প্রশংসাস্বনিতে রঙ্গমঞ্চ যুগ্মিত হয়ে উঠল। 'The Times' পত্রিকার সমালোচক 'মঃ শ' যখন এসে দাঁড়ালেন তখন তাঁকে যে ভাবে অভিনয়িত করা হল তা সাধারণ গ্যালারীর অভিনন্দন নয়—চাপা আবেগের সন্ধিক্ষণ, আকস্মিক এবং অনিচ্ছাকৃত উদ্ভাস। কোনো রঙ্গমঞ্চে এমনটি আর দেখা যায়নি। বার্গার্ড শ' সাধারণতঃ এই জাতীয় উদ্ভাসে সাড়া দেন না, এই দিন তিনি একটু বক্তৃতাও দিলেন, বললেন—লেখক হিসাবে আমার স্থান কোথায় তা জানি, লেখকের স্থান রঙ্গমঞ্চে নয়। রঙ্গমঞ্চ শিল্পীদের আসন, তাঁরা লেখকের সৃষ্টিকে প্রাণদান করেন, রূপদান করেন, এঁরাই লেখকের সৃষ্টির প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেন। আর আমার নাটকের অভিনয় দেখলাম,



লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান

করলে পাবেন জেই

পরিষ্কার ও ব্যরব্যরে আমেজ।

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড কর্তৃক প্রস্তুত।

L.P. 1-XS2 BQ

তঁরা একে সজীবিত করার আগে তারা ছিল, কিন্তু শিল্পীরা তাদের প্রাণ দিলেন। একটি প্রেরণ করার আছে, আমার কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছাড়া বামিংহামের অধিবাসী কেউ কি দর্শকদের মধ্যে আছেন? এ আমার জীবনের এক অগুপ্ত অভিজ্ঞতা। আমি গত চারদিনে পাঁচটি অগুপ্ত অভিনয় দেখেছি, আশ্চর্য কাণ্ড বামিংহামেই তা ঘটলো। আমি জানি, এই ধরনের নাট্য অভিনয়ের পক্ষে পৃথিবীর এক অসম্ভব অঞ্চল হিসাবেই বামিংহামকে জানি। তাই প্রেরণ করি আপনারা কি এখানে আগন্তুক, না তীর্থযাত্রী, না এর ভিতর হুঁ-একজন বামিংহামবাসী আছেন? আশ্চর্য, নাট্যকার ও লেখক হিসাবে আমার জীবনের সবশ্রেষ্ঠ ঘটনা বামিংহামে ঘটলো... দর্শকজনের সহযোগিতা ভিন্ন এই বিশ্বস্তর ঘটনা সম্ভব ছিল না।"

ম্রা ইয়র্কের গ্যারিক থিয়েটারে Back to Methuselah প্রথম অভিনীত হয় ১৯২২-এর ২৭শে ফেব্রুয়ারী। সপ্তাহব্যাপী অভিনয়, কিন্তু আমেরিকান দর্শকের কৌতূহল অপরিণীত মলেও এক সপ্তাহ ধরে রাতের পর রাত অভিনয় দেখার অপরিণীত বৈধা তাঁদের নেই। এই নাটক জম্মো না. অসকল অভিনয়ের জন্ত থিয়েটার গিল্ড প্রতিষ্ঠানকে প্রায় বিশ হাজার ডলার ক্ষতি স্বীকার করতে হল। এই দুঃসংবাদে বার্গার্ড শ' বিচলিত হয়ে পড়লেন। তাঁর লজ্জা কারো ক্ষতি হয়, এ তাঁর কাছে দুঃখকর। থিয়েটার গিল্ডের অন্ততম কর্তৃত্ব লরেন্স লানার তাঁকে বোঝালেন, ন' সপ্তাহের অভিনয়ে বিশ হাজার ডলার ক্ষতির অর্থ বিচার করে দেখলে সার্থক হয়েছে, গ্যারিক থিয়েটার আয়তনে ছোট, যদি এর বিশগুণ আকারের কোনো প্রেক্ষাগৃহ পাওয়া যেত তাহলে ক্ষতির চাইতে লাভই হত। সুতরাং এই লোকসানকে ক্ষতি হিসাবে গ্রহণ করা ঠিক হবে না। তাছাড়া এই ক্ষতিপূরণ হবে, যে সব সাক্ষ-সরঞ্জাম আদরা তৈরী করেছে তা আবার ব্যবহার করা যাবে, থিয়েটার গিল্ড-এর জন্ত চিন্তিত নয়।

বিশ হাজার ডলার লোকসান দিয়ে কোনো সম্প্রদায়ই নাট্যকারকে এই ভাবে আশ্বাস জানিয়ে পত্র দেয় না। তাই আমেরিকান ম্যানেজার লী সুবার্ট বার্গার্ড শ'কে বখান অজুযোগ করে লিখেছিলেন, আপনার দাবী কিঞ্চিৎ বেশী। তখন বার্গার্ড শ' জবাব দিয়েছিলেন—আমার নামের দামই দশ হাজার ডলার। থিয়েটার গিল্ডের ত্রিশ হাজার ডলার ক্ষতি হওয়ার কথা, সেই জায়গার তাঁদের মাত্র বিশ হাজার ডলার ক্ষতি হয়েছে, তাহলে লাভ হল দশ হাজার ডলার। শুধু আমার নামের গুণ!

বার্গার্ড শ'র অজ্ঞাত নাট্যকারীর মত Back to Methuselah রচনাকালে অনেক বার পরিবর্তিত হয়েছে। ২৫শে জুলাই ১৯১৮ তারিখে তিনি লিখেছেন—আমি একটি নাটক লিখেছি বার দুটি অঙ্কের মধ্যবর্তী বিরতিকাল হাজার বছর; এখন কিন্তু মনে করছি প্রতিটি অঙ্কে স্বয়ংসম্পূর্ণ নাটকে রূপায়িত করব।

Back to Methuselah নাটক সম্পর্কে লরেন্স লানার বার্গার্ড শ'র কাছ থেকে এমন অনেক সুবিধা লাভ করলেন যা আর কেউ পায় নি। এই বিষয়ে অবগত নেপথ্য থেকে সাহায্য করেছিলেন, শ'-গৃহিণী সার্লেট। সার্লেটের মতামতের

একটা বিশেষ দৃশ্য বার্গার্ড শ' চিরদিনই দিয়েছেন। Back to Methuselah এক সঙ্গে পাঁচটি নাটকের মালা, যেন পাঁচনখা হার, লানার এটিকে ছোট করতে চাইলেন, The Tragedy of Elderly Gentleman অংশটি তিনি বাদ দেওয়ার প্রস্তাব জানিয়ে বললেন—এটা অতি বিলম্বিত অংশ, প্রোতাাদের কাছে এটা বিশেষ ভার মনে হয়।

অতি কৃষ্টিত ভঙ্গীতে এই কাটছাঁটের প্রস্তাব নিবেদন করলেন লানার। বার্গার্ড শ' এই জাতীয় প্রস্তাব শুনে চিরদিনই কিন্তু হয়ে উঠতেন। সেট জম আড়িন বললেন, তিনি ল্যানারকে উপদেশ দিলেন, তুমি নিঃশব্দে কেটে বাদ দিয়ে অভিনয় করো।

উত্তরে লানার বললেন—ম্রা ইয়র্কে বার্গার্ড শ'র অনেক ভক্ত মহিলা আছেন, তিনি প্রতি রজনীতে এক খণ্ড নাটক হাতে নিয়ে উপস্থিত থাকেন, কোনো অভিনেতা ভুল করে এক লাইন বাদ দিলেও তিনি বার্গার্ড শ'কে তা লিখে পাঠান।

বার্গার্ড শ' লানারের প্রস্তাব শুনে এই বিষয়ে তাঁর যে নিজস্ব নীতি আছে তা বলতে স্তব্ধ করলেন—

সার্লেট বললেন—তোমার Elderly Gentleman কি বলতে চান তা হস্ত মার্কিন প্রোতারী শুনে রাজী নন। জন নম্র সম্পর্কে একটা সুদীর্ঘ অংশ আছে, ইংরাজ প্রোতারীও হয় তাঁর বিষয় কিছুই জানেন না—

লানার এই কথা সমর্থন করলেন। তখন বার্গার্ড শ' এই প্রস্তাব গ্রহণ করলেন এবং লানারের আশাতীত অংশ বাদ দিতে রাজী হলেন। লানার বলেন, সবটা বাদ দিলেই নাটকটি আরো সুসংবদ্ধ হত।

আঁদশ শতাব্দীতে ডারউইন লিখেছিলেন—The thinking few in all ages have complained of the brevity of life, lamenting that mankind are not allowed time sufficient to cultivate Science, or to improve their intellect—আর দীর্ঘ জীবন লাভের উপায় হিসাবে বিধান দিচ্ছেলেন সপ্তাহে দুবার গরম জলে স্নান। বার্গার্ড শ'রও ধারণা মানুষের জীবন অতিশয় ক্ষণস্থায়ী। তবে দীর্ঘ জীবন লাভ করলে মানুষের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি হবে তা নয়, তাঁর ধারণা বেশী দিন যদি বাঁচে তাহলে অন্ততঃ তাদের নিজের অবস্থার উন্নয়নে কিঞ্চিৎ সচেষ্ট হয়, জীবনের স্থায়িত্ব কম বলেই মানুষের এই চিন্তা করার গুরুত্ব উপলব্ধি করে না। জীবনের অভিজ্ঞতার উপর মানুষের আচরণ নির্ভরশীল নয়, তাই স্থায়িত্বের প্রত্যাশায় তাঁর সমগ্র কর্মসূচী নির্ধারিত হয়।

দীর্ঘ দিন ধরে বার্গার্ড শ' কোনো জ্ঞানকর্তার (Prophet) বিষয় নিয়ে নাটক লেখার চিন্তা করছিলেন। নিজের প্রকৃতির সঙ্গে মিশ খাইয়ে এমন এক সংগ্রামী সপ্তপুরুষের চরিত্র চিত্রণ করবেন বা অবিস্মরণীয় হবে। বার্গার্ড শ'র মানসিকতার দিক থেকে এই দিক থেকে আদর্শ চরিত্র হবেন ধর্মতত্ত্ব মহাম্মদ। ফরবেস-সুবার্টসনের জন্ত এমন এক চরিত্র সৃষ্টি করার চেষ্টা করেন ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে। সেনসর সংক্রান্ত পার্লামেন্টারী কমিটির কাছে এই প্রস্তাব নিবেদনও করেছিলেন। কিন্তু তুর্কী রাষ্ট্রদূতের কাছ থেকে সম্ভাব্য প্রতিবাদের আশঙ্কার মহাম্মদের জীবনকে

নাট্যরূপ দেওয়ার বাসনা তাঁকে ত্যাগ করতে হয়। কিন্তু একেটের পরিকল্পনা তাঁর মাথা থেকে নামলো না, Back to Methuselah চরিত্রের Elderly Gentleman—এই একেট, a truly wise man, for he founded a religion without a Church। The Adventures of the Black Girl—গ্রন্থে লেখক স্বয়ং উপস্থিত, আর Saint Joan-এ কসেন এই প্রসঙ্গই তুলেছেন। কিন্তু Prophet চরিত্র নিয়ে নাটক লেখা অভিশয় বিপজ্জনক, পশ্চিমে বীতচরিত্র নিয়ে নাটক লেখা চলে না, পূর্বাঞ্চলে মহাশয়-চরিত্র নিয়ে নাটক লিখলে গুপ্ত বাতকের ছুরি বুকে বিধবে। তাই বার্গার্ড শ' Saint Joan নাটকে হাত দিয়েছিলেন।

লামার্ক এবং সাহুয়েল বাটলারের কাছ থেকে একটি বিশ্বাস বার্গার্ড শ'র মনে বহুমূল হয়েছিল, মানুষ যদি দৃঢ়চিত্তে কোনো বিষয় মনে মনে চিন্তা করে তাহলে তার সব বাসনা পূর্ণ হয়। সাহুয়েল বাটলারের Life and Habit গ্রন্থে এই তত্ত্ব আছে। বা কিছু অন্তত তার সমস্ত মানবমনে একটা নিদারুণ সন্দেহ উত্থাপন করে। ঈশ্বর যদি সর্বশক্তিমান তাহলে পৃথিবীতে এত বেদনা, আলা, দারিদ্র্য কেন? তিনি ত সব কিছুই দূর করতে পারতেন। তিনি সর্বজ্ঞ, একথা যদি সত্য হয়, তাহলে এত পাপ, অনাচার, অন্তঃ, অভাব ও দারিদ্র্য-পরিপূর্ণ পৃথিবী কেন সৃষ্টি করলেন? সাধারণ মানুষ যে প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই, যে সমস্যার সমাধান নেই, তা নিয়ে মাথা ঘামায় না, বার্গার্ড শ' আজীবন সেই প্রশ্নেরই জবাব খুঁজে বেড়িয়েছেন।

বার্গার্ড শ' বলেছেন, অতীতে সভ্যতা বার বার ধ্বংস হয়েছে, তার কারণ প্রাচীন পৃথিবীর বাসিন্দারা ঈশ্বরের উদ্দেশ্য পূরণে সচাড়া করেনি, ধারা ধনী তাঁরা সহজাত প্রবৃত্তি বশে কেবল প্রার্থনা জানিয়েছেন আমাদের আহার দাও, পানীয় দাও, কারণ কাল আমরা মারা যেতে পারি (Let us eat and drink; for to-morrow we die) আর ধারা দরিদ্র তারা কৈদেছে—হে ঈশ্বর! আর কত কাল কত দেয়ী? অথচ এর অপরূপ উত্তর ঈশ্বর তাদেরই সহায়তা করেন ধারা নিজেকে সাহায্য করে। এর অর্থ এই নয় যে মানুষ যদি সমাধান খুঁজে না পায় তাহলে আর কোনো সমাধান পাওয়া বাবে না। বানর সৃষ্টি আশাজনক হয়নি বলেই উন্নততর সৃষ্টি নবের আবির্ভাব ঘটেছিল, নয় যদি আদর্শ মানসিক নয় নবোত্তম সৃষ্টিতে বাধা কি?

বার্গার্ড শ'র সমালোচকদের মতে তিনি এই ভাবে তাঁর দ্বিগ্ন-সভ্যকে স্মরণ করেছেন, মতবাদকে তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন শিল্পকে পাশে সরিয়ে। তিনি বার বার বলেছেন যে মানুষকে উন্নততর এবং প্রজ্ঞাসম্পন্ন করার বাসনা যদি না থাকতো তাহলে তিনি কোনো দিন এক লাইনও লিখতেন না। Back to Methuselah নাটকের শেষ খণ্ডে তিনি শিল্পকে আবার স্ব-ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বার্গার্ড শ' আজম-সংস্কারক, তাই তিনি ক্রিয়েটিভ এডলুশনের কোনো ক্রটি ধরতে পারেন নি। সংস্কারক যাত্রাই আশাবাদী, ধর্ম এই আশাবাদের ভিত্তি—We fail, We die, it does not matter; the ends we strive for will be attained at last by those who come after us. The individual is of no account.

ধারা শান্ত এবং বিন্দু দর্শনের পক্ষপাতী তাঁদের পক্ষে ১৮১০ খৃস্টাব্দে প্রবন্ধই যথেষ্ট, বার্গার্ড শ'র আর কিছু পড়ার প্রয়োজন নেই। Man and superman (১৯১৩) এবং Back to Methuselah (১৯১১) নাটকে বার্গার্ড শ' বা বলতে চেয়েছেন তার ভিত্তি অ-বৈজ্ঞানিক। এর কৈফিয়ৎ হিসাবে বার্গার্ড শ' অতুল্য বলেছেন—a passion of which we can give no account whatever—তাই Man and superman-এ তিনি Life-Force সম্পর্কে বা বলতে চেয়েছেন অস্বাভাবিক নতুন রূপে সেই কথা আরো বিস্তারিত করেছেন Back to Methuselah নাটকে। এই বার ভক্তিতে বৈতণ্ড্য, এখানে জীবন (Life) এবং পদার্থ (Matter) এই দুটি দিকই বাস্তবতার ভিত্তি মূল। জীবন যখন পদার্থে প্রবেশ করছে তখনই এই মহাজাগতিক (cosmic) নাটকের সূত্রপাত, তারপর সে তরকারি, জীবজন্তু, মানুষ প্রভৃতি পরিচিত বস্তুর আকৃতি লাভ করে। প্রথমত: জীবন পদার্থের দাস, ইতিহাসও তাই বলে। কিন্তু পরম মানুষ এই দাস-শৃঙ্খল থেকে মুক্তির (নির্করণ) জন্য সচেষ্ট হয় এবং পদার্থ থেকে মুক্তির নামই মুক্তা। আবার সে জীবনের নির্মল স্রোত ফিরে যায়।

সমালোচকদের মতে এই দুটি নাটকেই দার্শনিক বক্তব্য হিসাবে অসমর্থক। এই নাটকের মধ্যে বিপরীতমুখী উক্তি এবং প্রচুর কাঁক আছে। চেষ্টারটন বলেছেন। এরই নাম রক্তহীন আড়ম্বর। না জন্মে এর মাঝে থাকলে ভালোই হত। বার্গার্ড শ' Back to Methuselah নাটকে যে কথা মনোহর ভক্তিতে বলতে চেয়েছেন তাঁর চেয়ে একজন তরুণতর লেখকের কাছে তাই এক অসহনীয় Brave New World হিসাবে সৃষ্টি হয়েছে। (চেষ্টারটন আলডাস হাকসলীর বিখ্যাত উপন্যাসটির কথাই উল্লেখ করেছেন)—

বার্গার্ড শ'র মতবাদ যে দীর্ঘ জীবনই পরম মানুষের পক্ষে অসম্ভব, সে কথা বিজ্ঞ সর্বদা সত্য নয়, কীটস হাকিন্স বছর বৈচেছিলেন, তাঁর চেয়ে আরো অনেক দিন এই পৃথিবীতে বিচরণ করেছেন এমন কবির অভাব নেই, কিন্তু তাঁরা যে পরমাশক্তির অধিকারী হয়েছিলেন একথা জানা যায় না। যে মেথুশেলার কথা বার্গার্ড শ' বলেছেন তিনি নাকি ১৬৯ বছর বৈচেছিলেন, কিন্তু এই দীর্ঘজীবী মানুষটি কি মহৎ কর্ম করেছিলেন কিংবা কি পরম জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন তা বেউ বলে না। তত্ত্ব এবং দার্শনিক ভিত্তি বাদ দিলে এই নাটকের কিছু থাকে না। তবু নাটক হিসাবে Back to Methuselah উপাদেয়। প্রথম খণ্ডের আদম ও ইভের কাহিনী চমৎকার!

এই নাটকের প্রতি নাট্যকারের অসীম যমতার কথা আগেই বলেছি। তিনি আগে বলেছেন Man and Supermanই আমার শ্রেষ্ঠ নাটক, কিন্তু পরে বলেছেন Back to Methuselah আমার সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। তিনি এই নাটক রচনার পর বলতেন আমার শক্তি নিঃশেষিত। অথচ তখন তাঁর বয়স মাত্র পঁয়ষাট বছর। এর পর ১৯২৩এ তিনি Saint Joan নাটক রচনার হাত দিলেন।

আটীশ

প্রতিমা গড়ে পুজো করতে হলে একটা মন্দিরের প্রয়োজন, সেইখানেই দেবতা প্রতিষ্ঠা করে শাঁখ-ঘণ্টা বাজিয়ে সমারোহ করা হলে। তার ব্যাধি হাকসন, বামিংহাম দেপারটেরী থিয়েটারের

অধ্যক্ষ হিঁব করলেন ম্যালভারনেই এমন একটি কেন্দ্র স্থাপনা করা বাক, সেট কেন্দ্রে বার্ণার্ড শ'র নাটকগুলির করা যাবে। Back to Methuselah নাটকের সাফল্যমণ্ডিত অভিনয় করে ইতিমধ্যেই তিনি বার্ণার্ড শ'র বিশেষ প্রীতিভাজন হয়েছিলেন, সুতরাং সন্তোষে তাঁকে রাজী করা গেল, ম্যালভারন নাট্যগাটি বার্ণার্ড শ' পছন্দ করতেন, তাছাড়া তিনি ভাবলেন এটখানে অভিনয়ের বিশেষতঃ শৈল্যের সঙ্গীত ও শিল্পের যে ইচ্ছালাভ স্পর্শলাভ করেছিলেন, আবার তার স্পর্শলাভ করবেন। সেট থানন্দ বা স্বপ্ন লাভ-কৃতির হিসাব নিকাশের মধ্যে অক্ষুণ্ণ রাখা কঠিন।

তখন বার্ণার্ড শ'র বয়স বাহ্যিকের পার হয়ে ত্রিযাত্তরে পৌঁছেছে, তাই ম্যালভারন উৎসব প্রাণে একটা নতুন আনন্দ ও উৎসাহ দান করল, প্রতি বছরই একখানি করে নাটক লিখবেন, বাকী পঁচিশ বছরে পঁচিশ খানা—(শ'র বিশ্বাস ছিল তিনি শতাব্দী হবেন) আশা ছিল যে এখানে ধারা আসবেন তাঁরা প্রাণে সমান আনন্দ এবং উত্তেজনা লাভ করবেন। জীবনের প্রথম দিকের সমসাময়িক ঘটনার স্পর্শ লাভ করবেন। এত দিনে সারা জগৎ বার্ণার্ড শ'র চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন, ঘনিষ্ঠতাব ফলে—তাদের আগ্রহ আরো বাড়বে হয়ত।

উৎসবের উপযোগী নাটকের বাণীয়ে বার্ণার্ড শ'র অভিসন্ধি বিবিধ। জনপ্রিয় সরকারকে হাত্যাস্পদ করার দিকে তাঁর আগ্রহ ছিল। বার্ণার্ড শ' রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে তাদের সম্পর্কে লজ্জাবোধ করতেন। তাঁর ধারণা মানুষ এবং রাজনীতিকদের বা কিছু খারাপ তাই এর মধ্যে প্রতিফলিত। এর ফলেই রচিত হল তাঁর Apple Cart নাটক। তাঁকে ঘিরে যে সমস্ত কুৎসা প্রচলিত হয়েছিল তার জবাব দেওয়া আর এক উদ্দেশ্য। তাই এই নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র কিং ম্যাগনাস জানী এবং চতুর সম্রাট। রাণী উন্নতমণা মহিমময়ী রমণী। তবু রাজ্য অপর এক পরমা সুলভরী প্রতি আকৃষ্ট। সার্লেট এবং প্যাট্রিক ক্যামবেলকেও এই নাটকেই তিনি রূপায়িত করলেন।

ম্যালভারনে এই নাটক অভিনীত হওয়ার পর বার্ণার্ড শ'র স্ত্রী সার্লেট এবং প্যাট্রিক ক্যামবেল উভয়েই বিশেষ ক্ষুব্ধ হলেন। মিসেস বার্ণার্ড শ' নাকি বলেছিলেন—Fools who came to pray remained to scoff.

মিসেস প্যাট্রিক ক্যামবেল আগে থেকে সংবাদ পেয়ে বার্ণার্ড শ'কে বলেছিলেন, এক খণ্ড বই আমাকে দাও, পড়ে দেখি। এডিথ ইভাল ওরিনথিয়ার ভূমিকায় অভিনয় করছিলেন। তিনি তাঁকে সংবাদ দিয়েছিলেন যে, তাঁকে নিয়েই রসিকতা করা হয়েছে।

জবাবে বার্ণার্ড শ' বলেছিলেন—ইতিহাসের পাতায় বিবাক্ত গালগল্প ও কুৎসায় অঙ্কিত হয়ে থাকতে চাই না। পৃথিবী আমাদের কথা জেনে হাসুক। হাসি-ভাস্যাসর মধ্যে কুৎসিত কালিমা থাকার চেয়ে মনোহর সরস রসিকতা থাকা বরং ভালো।

মিসেস প্যাট্রিক ক্যামবেল এক খণ্ড বই সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন, বার্ণার্ড শ'কে এই সব 'mischievous vulgarity and untruthfulness' যুছে ফেলতে অজরোধ জানালেন, নতুন করে লিখতে বললেন। লোকে বলবে অ-মানুষিক অহংকারে তোমার সাধারণ জ্ঞানটুকুও বিলুপ্ত হয়েছে।

কিন্তু যে বার্ণার্ড শ' একদা টলটলকে এক বিচিত্র রসিকতা করে

ক্ষুব্ধ করেছিলেন। তিনি বললেন—'better to have splendid fun than dirty fun.

আশ্চর্য, সার্লেট বা প্যাট্রিক ক্যামবেল-এর মধ্যে কোনো রসিকতা খুঁজে পাননি।

ম্যালভারনে অভিনয় হওয়ার পর সমালোচকরা উচ্চ প্রশংসায় গগন মুগ্ধরিত করে তুলল, কেউ বলে চমৎকার, অপূর্ণ প্রহসন। উঁচু ধরণের রসালোপ। তাঁকে যেন আবার নতুন করে আবিষ্কার করা হল। ওরিনথিয়া চরিত্র-চিত্রণের সবচেয়ে বড় লাভ হল এই যে, বার্ণার্ড শ'র জীবনের গোপন রহস্য জানার জন্য জনসাধারণের আগ্রহ বর্ধিত হল। যেখানেই তিনি যেতেন, সেখানে রিপোর্টাররা ছোট্ট গোপন তথ্য সংগ্রহের আশায়। সব জেনে-শুনে বার্ণার্ড শ' প্রসন্নচিত্তে এসবের প্রস্তর দিতেন।

স্মারক, সূর্যালোকসেবী, নরদেহ, মুষ্টিবোদ্ধা বা চিত্রতারকার সঙ্গে আলাপেরত নানা ভঙ্গীতে নানা বিচিত্র পোষাকে তাঁর আলোকচিত্র সবত্র প্রকাশিত হতে লাগল। বৌদ্ধজীবন, শিশু-জীবন, যুব-জীবন ইত্যাদি সম্পর্কে বার্ণার্ড শ' নানা কথা বলতে সক্ষম করলেন। ফ্রাঙ্ক হারিস যখন জীবনী লেখার প্রস্তাব করলেন তখন বার্ণার্ড শ' সানন্দে to reveal everything সব কথা ধুলে বলতে রাজী হ'লেন। বার্ণার্ড শ' সন্দেহে ফ্রাঙ্ক হারিসকে বললেন, লগুনে এসেই তিনি যে পাঁচখান উপন্যাস লিখেছিলেন তাতে যে বৌদ্ধ-জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন পনেরটি ছেলে-মেয়ের বাপ হয়েও মানুষ সেই জ্ঞান অর্জন করে না। তাঁর সব অভিজ্ঞতাই আছে এবং বৌদ্ধ সম্প্রদায় বা কিছু জ্ঞাতব্য তা তিনি জেনেছেন। যেদিন থেকে উত্তম পোষাক-পরিচ্ছদ কেনার মত অর্থ উপার্জন করেছেন সেই দিন থেকেই অভিজাত পরিবারের মহিলা থেকে দূর করে অভিনেত্রীরা পর্ষদ তাঁর পিছনে লেগেছে।

যখন এলেন টেরীকে লেগা পত্রাবলী প্রকাশ করতে রাজী হলেন বার্ণার্ড শ', তখন একেবারে চরম পর্যায়ে উঠলো। এলেন টেরীর ছেলে গর্ডন ক্রেগ ভীষণ আপত্তি করেছিলেন এই সব পত্র প্রকাশে। 'ডেলী-এক্সপ্রেস' পত্রিকার রিপোর্টারকে এবং আরো অনেককে শ' বলেছিলেন যে তিনি কোনো দিনই এলেন টেরীকে লেগা পত্র প্রকাশে অজমতি দেবেন না। এতদ্বারা বার্ণার্ড শ'র জীবনের আর এক দিক উন্মোচিত হল। আবে যে সব অভিনেত্রীদের চিঠি লেখা হয়েছিল তাঁরা এখানে এলেন সেই সব চিঠি নিয়ে, সেগুলির বক্তব্য আরো অস্বস্তিকর, আরো স্পষ্ট। বার্ণার্ড শ' তাঁদের নিরস্ত করার চেষ্টা করলেন।

এই সব কলরব ছাপিয়ে সেই Life force-এর বাণী যেন বার্ণার্ড শ'কে ক্ষীণ কণ্ঠে বলে Fiddlesticks! what a frightful bag of stage tricks। কনষ্টেবল কোম্পানীর জন্য ১৯৩০-এ বার্ণার্ড শ' তাঁর প্রহসনালীরা একটা বিশেষ সংস্করণের ব্যবস্থা করছিলেন, সেই সময়ে এই কথাটাই আরো গভীর হয়ে বাজলো। প্রথম জীবনের রচনা পড়তে বসে বার্ণার্ড শ'র সেদিন মনে হয়েছিল তিনি মোটেই বয়সে বাড়ে নি, সেই মহামানব জ্যানভালিয়র লী তাঁকে যেন সমস্ত বিষয়বস্তু দিয়েছেন আর পিতৃদেব কার শ' তাঁকে দিয়েছেন রসজ্ঞান। উভয়ের বিরাট ব্যক্তিত্বের কাছে তিনি সেই চিরন্তন শিশু।

[ক্রমশঃ।]

দাঙ্গিক বহুদলী—আখাণ্ড

আবার **আশ্চর্য্যজনক** স্বস্থবোধ করুন!



ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড একটি সুপরিষ্কৃত স্বাস্থ্যপ্রদ
টনিক। পৃথিবীর সর্বত্র স্বাস্থ্যসচেতন ব্যক্তিরা নিয়মিত এটি
নিজেই ব্যবহার করেন ও তাঁদের ছেলেমেয়েদেরও খাওয়ান।

ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড এমনসব প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর
উপাদান দিয়ে তৈরী যা আপনার ও আপনার পরিবারের
সকলের বল, স্বাস্থ্য ও আনন্দোজ্জল জীবনের জন্ত বাড়তি
শক্তি যোগায়।

ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড অবিরাম কাশি, সর্দি ও
বুকে গ্লেশ্মা থামায়। রোগমুক্তির পর হতস্বাস্থ্য দ্রুত
পুনরুদ্ধারের জন্ত চিকিৎসকেরা অমুমোদন করেন।



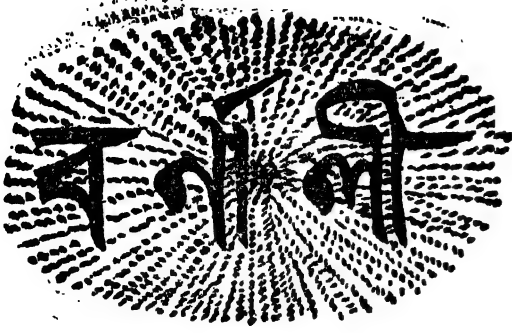
এখন চূরি-নিরোধক কাপ
এবং নূতন লাল সেবেলস্ক
বোতলে পাওয়া যায়।

একপে লাল মোড়ক বন্ধ
করিয়া দেওয়া হইয়াছে

চমৎকার স্বাস্থ্য

ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড

সেইর করে নিজেকে সুস্থ রাখুন



[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

মূলখা দাশগুপ্তা

সাক্ষাত্‌নামে মঞ্জু পোষাকটা এমন ভাবেই করলে যেন

বাড়িতে থাকার আর পড়াশুনা করতে বসারই বোঝায়।
আবার হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে যদি শাড়ী কাপড়টার উপর চোখ বুলোতে
বুলোতে কাউকে জিজ্ঞাসা করা যায়, 'যায় না এ ভাবে একটু
পার্কটার ঘুরে আসা?' তবেও যেন কেউ আপত্তি তুলতে না পারে।
ছটির দিন সমস্ত সকাল দুপুর বাইরে বাইরে কাটিয়ে ফের সন্ধ্যার
স্পষ্ট করে বেরবার জন্তই বেরিয়ে পড়বে বাড়ী থেকে, এতো
সাহস মঞ্জু মৌরীর কাছে রাখে না। এখন বেরুতে হলে একটু
কঁকি দিয়েই বেরুতে হবে। আজ একেবারে একুশি না বেরুলে
যে তার চলতো না তা অবশিষ্ট নয়। কাল সকালে কলেজে যাবার
আগে সে অনায়াসে জরায়ের বাড়ী টাকাটা পৌঁছে দিয়ে যেতে
পারতো; তার পক্ষে সুবিধেও ছিল সেটাই। আজকের সন্ধ্যার
পড়টা নষ্ট হতো না। কিন্তু প্রথমত টাকাগুলো বয়ে বেড়াতে
হচ্ছে বৃক করে, দ্বিতীয়ত দুঃসময়ে কার হাতে প্রত্যাশার অতিরিক্ত
টাকা তুলে দিতে পারার ভেতর যে একটা আনন্দ আছে সেই
আনন্দটা কিছুতেই বিলম্ব সইতে চাইছিল না। তৃতীয়ত ওর
ভেতরে এমন একটা চঞ্চলতা ছিল যে ওকে স্থির থাকতে দিচ্ছিল
না। এতোগুলো টাকা ওকে কেউ এভাবে দিতে পারে ও ইচ্ছেমতো
টাকা তুলে নেবার জন্ত দিতে পারে সাদা ঢেক—ওকে দেবার জন্ত
একজনের এমন হাত বাড়িয়ে আসতে দেখার নতুন স্বাদটা
কেবলি ওর হাত-পায়ের ভেতর চঞ্চলতার ঢেউ তুলে তুলে বয়ে
যাচ্ছিল।

চমকলাগা ঘটনার প্রথম পর্যায়ে মাসুকের অল্পভূতিটা নিজস্ব
হয়ে পড়ে। তার কাজ আরম্ভ হয় কিছু পরে। রক্তের ঢেক
দেওয়া, সেটা দেখা, পড়া, টাকার অল্প লিখবার শূন্য সাদা জায়গার
নয়ের সার বসিয়ে বাওয়া থেকে, রক্তের ওর ব্যাগে টাকা ভরে ওর
কাঁধে নিজের হাতে কুলিয়ে দেওয়ার সময়গুলো পর্যন্ত মঞ্জুর সমস্ত
অল্পভূতিটাও ছিল ভাঁজা হয়ে। কিন্তু তারপর দুপুর বেলা যখন
বিজ্ঞানার গুরে তার চোখ বুজবার অবসর মিলল তখন জীবনের এই
নতুন আনন্দটা যে তার মনকে আন্দোলিত করে চলেছিল সে
বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—তা যতই জাহ্নুক মঞ্জু, এমন না—গোণা
টাকা রক্ত দিয়ে থাকে। তার এই দেওয়ার মধ্যে কোন বিষয়
নেই, কোন নতুনত্ব নেই। বিষয় যদি থেকে থাকে তো রয়েছে
ওর এই দেওয়ার মধ্যে,—যতই জাহ্নুক সে কথাটা জানলে মৌরী

পায়বার মতো গলার কর্তনালী কুলিয়ে তুলে প্রশংসার ভদ্রিতে
যে মাথা নাড়বে তার সবটাই নির্ভেজাল দ্রব্য বিক্রয় পরিহাস
শিকারীর শিকার ধরবার পদ্ধতির প্রতি তারিক। মন এতো ওটা
এটা সেটা জানার ধার ধারে না। বরং উঠোটা জানতে চায় না,
জানতে অস্বীকার করে। কে কি রকম মাসুকের তার চাইতে বড়
কথা মনের কাছে মাসুকের কোন ব্যবহারটা তার কাছে কেমন
লাগে। বদমাগী মাসুকের অহেতুক মেজাজ কী আমাদের মেজাজ
থারাপ করে তোলে না? যুব খুললেই যুব আলগা কথা বলা
লোকের অঙ্গীকৃত কী আমাদের মাজিত কটিকে গীড়িত করে না?
তোষামোদকে মিথ্যা জেনেও কী মন খুসী হওয়া থেকে বিরত থাকে?
মিথ্যাচরিত্রের মাসুকের মিথ্যাচরিত্রের কথা জেনেও তার মিথ্যা
ভালোবাসার কথা শুনেও কী আমরা ভালোবাসিনে?

সত্যি মনের কাজ অত চরিত্র বিচার করে হয় না। যে ব্যবহারের
যে কাজ ভাই করে চলে। উত্তেজিত হবার মতো হলে করে
তোলে উত্তেজিত। চঞ্চল করে তোলার মতো হলে করে তোলে
চঞ্চল। স্তম্ভ হলে করে স্তম্ভ। ভালো লাগার হলে বায় ভালো লাগিয়ে
দিয়ে। তাই সব জানা সম্বন্ধে এমন দেওয়ার যে স্বাদ মঞ্জুর মনে কিছু
এলোমেলো হাওয়া বয়ে আনলই। চুলগুলো সামনে এনে, বুকের
উপর ফেলে মুখ নিচু করে জটমট শুদ্ধ বিগুনী পাকিয়ে চললো সে।

একটা মস্ত সবুজ রং-এর শুকনো তোরালে ভিজ্রে ঘাড়ের হৃদিক
দিয়ে চাদের মতো কুলিয়ে আনের ঘর থেকে বেরিয়ে এলো মৌরী।
ডেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে তোরালে দিয়ে কানের পেছনের
জল মুছতে মুছতে বললো, 'জানিস মঞ্জু, ল'টা দস্তর মতো ইনটারেস্ট
সাবজেক্ট। পড়ছি আর বিবরণটা যেন আমাকে শেয়ে বসছে।
'আইনের চক্ষে চক্ষুজ্ঞা নেই' কথাটা কি স্তম্ভর! একজন
আইনজ্ঞ কাউকে পেলে বসে বসে তার কাছে পাঠ নিতাম।

মনোবোগী শ্রোতা নীরবে কথা শুনে চলতে পারে কিন্তু
অন্তমনস্ত্র শ্রোতার মনোবোগ বোঝাতে অবাস্তব কথায় যেতে হয়।
বিগুনীতে জাহ্নুক ঘোরাতে ঘোরাতে মঞ্জু বললো, 'চক্ষুজ্ঞা না থাকা
কথাটাকে তোর স্তম্ভর কথা মনে হলো। তোর নিদারুণ মাত্রা-
বোধটা তো চক্ষুজ্ঞারই রূপান্তরিত চেহারা।

আপত্তি জানালো মৌরী, কখনোই নয়।

জানে মঞ্জু কখনোই যে নয়। তবু কথা বলতেই হবে তাকে।
নইলে একুশি ওর দিকে তাকিয়ে মৌরী জিজ্ঞাসা করে বসবে, কি
ভাবছিল অত?

বললো কেন নয়?

—মাত্রাবোধটা হলো। রুচিবোধ সৌন্দর্য্যবোধ এ একেবারে
ভেতরের বস্তু। চক্ষুজ্ঞাটুকু তো নিতান্ত একটা হু চোখের পাতার
ব্যাপার। সত্যিকারের সংস্কৃতির তার দরজা পর্যন্ত কখনো গিয়ে
দাঁড়াতেই হয় না।

—তবু দরজা-জানালার পর্দার মতোই দরকারী জিনিষ এ
চোখের হু পাতার লজ্জাটুকু বা তার চাইতে দরকারী। টুকু বলেই
ঐটুকুও না থাকলে তার বজ্র ভয়াবহ।

তক্ষুশি মাথা কাত করে স্বীকার করল মৌরী—সে নিশ্চয়। আর
আমি এদিক দিয়ে কথাটা বলিওনি। ল'জার্ণালে এই আইনের চক্ষে
চক্ষুজ্ঞা না থাকার উপর এমন কয়েকটা ইনটারেস্টিং দৃষ্টান্ত পড়লাম
না, তুই শুনে—

গল্প শোনার জন্ত মঞ্জু সীতের মধ্যরাত্রে লেপ ছেড়ে উঠে আসতে পারে কিন্তু এখন আর পোনেযোটা মিনিটও যে দিতে পারে না। এই মিনিট কটাই বাইরের সন্ধ্যার শেষ আলো আলো ভাবটার উপর আর বতটুকু অন্ধকার ঢেলে দেবে, তাতেই বেঞ্চির কথা বললে ছোটখাপলে তুলবে মৌরী—এই রাত্রে! তা বলুক না মঞ্জু ঘরের কোণের পার্কটার কথা।

হঠাৎ একেবারে মৌরীর কাছে গিয়ে তার চুলের দিকে তীক্ষ্ণ লক্ষ্যে তাকাতে তাকাতে বলে উঠল মঞ্জু—দিদি তোর মাথার পাকা চুল না কি?

—হ্যাঁ।

—হ্যাঁ, দেখলাম যে।

—ক'খার? মৌরী আয়নার একেবারে কাছে এগিয়ে গিয়ে চুলের ভেতর কাঁক করে দেখতে দেখতে নিকরবেগ কণ্ঠে বললো—পাকলেই বা কি।

মঞ্জু ততক্ষণে মৌরীর চুলের সামনেটা একটু নেড়েচেড়ে দেখে নিয়ে বললো—না, ভিজ়ে চুলে বাতির আলো পড়ে চক্ চক্ করে উঠছিল। কিন্তু পাকলেই বা কি ম'ন? কেন অসময়ের সব কিছু মিষ্টি লাগার মতো অসময়ের পাকা চুলও মিষ্টি নাকি?

হেসে উঠল মৌরী। বাড়ির তোয়ালে নামিয়ে রেখে চিক্ণী হাতে নিয়ে চুলের জট ছাড়াতে ছাড়াতে বললো—বেশ মিষ্টি। কাঁচা-পাকার মেশানো নয়, একদম সাদা, নয়তো একদম সোনালি

চুল আমার অপূর্ব লাগে। শিসিমার মাথার সোনালি চুলগুলো তো আমার দস্তরযতো লোভের বস্তু। কেটে নিয়ে গুঁড়ি বানাতাম যদি আমার চুলের রং অমনি করে তুলতে পারতাম। মনে মনে হ্রি করে রেখেছি, শিসিমার ঐ চুল আমি রেখে দেবো। তার পর এক দিন ঐ রং তো ধরবেই চলে।

উপশ্বস করছিল মঞ্জু। মৌরীর কথা শেষ হতেই উপড় হয়ে খাটের তলা থেকে চটিজোড়া বেব করে এনে পা ঢোকাতো ঢোকাতো বললো—এত দিন বলিসনি কেন? কত অমন সোনালি চুলের গুঁড়ি জোগাড় করে দিতাম। তার পর বাগটা হাতে নিয়ে মৌরীর দিকে আর তাকালো না সে।—এই কাছেই এক বন্ধুর কাছ থেকে একটা বই নিয়ে এক্সপ'ন আসছি যে। বলতে বলতে বেরিয়ে গিয়ে একেবারে বারান্দা দিয়ে লম্বা হাঁটা দিলো।

আর মঞ্জু চলে গেলে আয়নার দিকে তাকিয়ে ফের চুল আঁড়াতো গিরেও বাতির আলোয় রূপালী ডেউ খেলে চলা সারাচুলের দিকে তাকিয়ে হাতের চিক্ণী নামিয়ে ঝাড়িয়ে রইল মৌরী—হাঁ, সে সত্যি বসে আছে 'উত্তর জিশের' দিনগুলোর জন্ত। যৌবন পার হয়ে 'উত্তর জিশের' কবির ভাষার বলে উঠবে সে, বৈচেছি—যৌবন পার হয়ে এসে বৈচেছি আমি। বৈচেছি আমি নিরন্তর বাত-প্রতিষেধ থেকে, কণিক আকস্মিক হাওয়ার আন্দোলিত হওয়া থেকে। একটা মুহূর্তের একটি অমুভূতি আর মনকে আমার কানে ধরে নাচাতে পারবে না। আর আনন্দকে ঋষিমা মন-খাপাণের হাওয়া

অলৌকিক দৈবশক্তি-সম্পন্ন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ তান্ত্রিক ও জ্যোতির্বিদ

জ্যোতিষ-সম্রাট পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, জ্যোতিষার্ণব, রাজজ্যোতিষী এম্-আর-এ-এস (লণ্ডন),



(জ্যোতিষ-সম্রাট)

নিখিল ভারত ফলিত ও গণিত সভার সভাপতি এবং কাশীই বারাগসী পণ্ডিত মহাসভার স্থায়ী সভাপতি। ইনি দেখিবামাত্র মানবজীবনের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান নির্ণয়ে সিদ্ধহস্ত। হস্ত ও কপালের রেখা, কোষ্ঠি বিচার ও প্রস্তুত এবং অন্ত ও হৃষ্ট গ্রহাদির প্রতিকারকরে শান্তি-শস্ত্রায়নাদি, তান্ত্রিক ক্রিয়াদি ও প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ কবচাদি দ্বারা মানব জীবনের দুর্ভাগ্যের প্রতিকার, সাংসারিক অশান্তি ও ডাক্তার কবিরাজ পরিত্যক্ত কঠিন রোগাদির নিরাময়ে অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন। ভারত তথা ভারতের বাহিরে, যথা—ইংলণ্ড, আমেরিকা, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, চীন, জাপান, মালয়, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি দেশেই মনোবীকুল ভাঁহাব অলৌকিক দৈবশক্তির কথা একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। প্রশংসাপত্রসহ বিদ্যুত বিবরণ ও ক্যাটালগ বিনামূল্যে পাইবেন।

পণ্ডিতজীর অলৌকিক শক্তিতে বাহারা মুখ তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন—

হিজ্-হাইনেস্ মহারাজা আটগড়, হার হাইনেস্ মাননীয়া ষষ্ঠমাতা মহারানী জিপুরা ষ্টেট, কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় স্ত্রীর মমত্বনাথ মুখোপাধ্যায় কে-টি, সম্ভোষের মাননীয় মহারাজা বাহাদুর স্ত্রীর মমত্বনাথ রায় চৌধুরী কে-টি, উড়িষ্যা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় বি. কে. রায়, বঙ্গীয় গভর্নমেন্টের স্ত্রী রাজাবাহাদুর শ্রীঅসদুদেব রায়কত, কেউনখড় হাইকোর্টের মাননীয় জজ রায়সাহেব মিঃ এস. এম. দাস, আসামের মাননীয় রাজ্যপাল স্ত্রীর ফজল আলী কে-টি, চীন মহাদেশের সাংহাই নগরীর মিঃ কে. রুচপল।

প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ বহু পরীক্ষিত কয়েকটি তন্মোক্ত অত্যশ্চর্য্য কবচ

ধনদা কবচ—ধারণে স্বজায়াসে প্রভূত ধনলাভ, মানসিক শান্তি, প্রতিষ্ঠা ও মান বৃদ্ধি হয় (তন্মোক্ত)। সাধারণ—১১১/০, শক্তিশালী—২২২/০, মহাশক্তিশালী ও সমুদ্র ফলদায়ক—১২২১১/০, (সর্বপ্রকার আর্থিক উন্নতি ও লক্ষ্মীর কৃপা লাভের জন্ত প্রত্যেক গৃহী ও ব্যবসায়ীর অবশ্য ধারণ কৰ্তব্য)। সন্ন্যাসভী কবচ—সন্ন্যাসভী বুদ্ধি ও পরীক্ষায় সফল ২১১/০, বৃহৎ—৩৮১১/০। মোহিনী (বলীকরণ) কবচ—ধারণে অভিলষিত স্ত্রী ও পুত্র বন্দীভূত এবং চিরশত্রুও মিত্র হয় ১১১০, বৃহৎ—৩৪১/০, মহাশক্তিশালী ৩৮১১১/০। বঙ্গলাভুভী কবচ—ধারণে অভিলষিত কর্মোন্নতি, উপরিহ মমিবকে সমুদ্র ও সর্বপ্রকার মামলায় জয়লাভ এবং অবল শত্রুনাশ ২১/০, বৃহৎ শক্তিশালী—৩৪১/০, মহাশক্তিশালী—১৮৪১০ (আমাদের এই কবচ ধারণে ভাগ্যলাভ সন্ন্যাসী জরী হইয়াছেন)।

(হাণ্ডিতা ১২০৭ নং) অল ইণ্ডিয়া এন্ট্রোলজিক্যাল এণ্ড এন্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটী (রেজিষ্টার্ড)

হেড অফিস ৫০—২ (ব), ধর্মতলা ষ্ট্রীট "জ্যোতিষ-সম্রাট ভবন" (এবেশ পথ গুয়েলসলী ষ্ট্রীট) কলিকাতা—১৩। ফোন ২৪—৪০৬৫।

সদর—বৈকাল ৪টা হইতে ৭টা। ব্রাঞ্চ অফিস ১০৫, থ্রে ষ্ট্রীট, "বসন্ত নিবাস", কলিকাতা—৫, ফোন ৫৫—৩৮৮৫। সময় প্রাপ্ত ১টা হইতে ১১টা।

এসে মলিন করে তুলবে না। আজ আমি তাব-উজ্জলতাকে বাঁধতে পেরেছি বুদ্ধির দৃঢ়তায়। অমৃত্যুতির সঙ্গে মিলে গেছে আমার পর্যবেক্ষণ। দেহের ও মনের, ইন্দ্রিয়ের ও বুদ্ধির পরিপূর্ণ শক্তি এখন আমার দখলে। জেনেছি আমি আজ তাদের অমিত প্রয়োগ—বঁচে গেছি আমি। সোনালি রংধরা চুলে কপাল-টানা খোঁপা থাকবে তখন তার মাথায়। চোখে থাকবে পুরু কাচের চশমা। মুখে থাকবে মধ্য বয়সের গভীর গভীর একাধতা—এইরূপ এই বুদ্ধি, এই বয়সের জ্ঞান বলে আছে সে। কিন্তু তার মধ্যে একে। স্মরণ। একেবারে আচমকা ঘরে ঢুকে স্মরণকে পেছনে দাঁড়িয়ে ওর দিকে একটা আশ্চর্য্য দৃষ্টি ফেলে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একেবারে চমকে পেছন ফিরল মৌরী। বেন স্মরণের উকনিঃখাসে ওর বাড়ির অলকগুলিকে হুলিয়ে দিল—তবু তাই নয়, ঠিক প্রথম দিনের মতো ছুরত্ব সাহসে ওর লম্বা বাড়ির উপর চেপে ধরলো সে তার চাপা ঠোঁট। হাতের চিকণী ফেলে দিয়ে ক্ষুব্ধ ভাবে গিয়ে চেয়ারে বসে রইল মৌরী ঠিক আশ্রয়ীর অবাধ্য ব্যবহারে অসন্তুষ্ট অভিভাবকের মতো। বুদ্ধি মানে না, ভালো মন্দ নিজেও বোঝে না—কেউ বোঝালেও শোনে না—এমন কাক সঙ্গে ঘর করার মতোই অপূর্ব আশ্রয় এই নির্বোধ মনটাকে নিয়ে ঘর করা।

একসঙ্গে এমন ভাঁজকরা এক পাঁজা টাকা জরায় মা ঈগণির দেখেন নি। কথা 'তো নয় বেন একটা কাগজ ছেঁড়া ফাস-ফাসে আওয়াজ বেরিয়ে এলো তার গলা দিয়ে—কত টাকা এখানে?

তাই তো! কত টাকা এখানে জানে না তো মজু। গুণে দেখেনি তো সে। গুণে দেখবার কথা মনে হয়নি তো তার। জরায় মার দিকে তাকিয়ে একটা ঢোক গেলার আশ্রয় সময় নিতেই হলো মজুকে। এতে আছে, আচ্ছা দিন আর একবার দেখে দিচ্ছি ভালো করে। বেন বতই গুণে আনা বাক, টাকা কাক হাতে দেবার সময় সামনা-গোণার আর একবার গুণে তবুই দিতে হয়। জরায় মার হাত থেকে টাকা নিয়ে গুণতে গুণতে এতকণে ওর চৈতন্য হলো, টাকা গুণে না আনার মতো একটা বোকামিই যে সে করেছে তা নয়। একসঙ্গে এতোগুলো টাকা এনেও করেছে আরো একটা বোকামি। তার বোঝা উচিত ছিল দশ-পাঁচ করে এনে হাতে দিতে পারার সংখ্যার ভেতর হঠাৎ এই পাঁজা-ভাঁজ টাকা স্বাভাবিক ভাবেই প্রস্রাভে আনবে, এ টাকা কোথায় পেলো সে বা কে দিল তাকে এ টাকা। আর এ জিজ্ঞাসার সন্তোষজনক উত্তর দিতে না পারলে জরায় মা যে কি না কি ভেবে বসবেন তাই বা কে জানে?

হলোও ঠিক তাই। তার জিজ্ঞাসার জবাবে মজুর আটকে বাওয়া বিব্রত তাবটা জরায় মার দৃষ্টি এড়ালো না। 'ঘর পোড়া গরু সিন্ধুর মেঘ দেখলে ভয় পায়।' ভয় পেয়ে গেলেন তিনি। কোন বিপজ্জনক পথে অজ্ঞাতে গিয়ে জড়িয়ে পড়ছে না তো মজু। তার মতো বুড়ো মানুষটাই কি প্রথম বুঝে উঠতে পেরেছিলেন কিছু। তার ভয় মন তো ইচ্ছে করে এ পথ বেছে নিয়েছিল না—এমন কি অনিচ্ছা করেও নয়। অজ্ঞাতে গিয়ে পড়েছিলেন, ঠিক অন্ধকারে গিয়ে খানার পড়ার মতো পড়েছিলেন। উপাধ্বনের

চেষ্টা করেছিলেন তিনি ঘেরেকে নিয়ে নানা ভাবে। পারেন নি। মুদী বাকী দেওয়ার বিব্রত জালে জড়িয়ে ফেলে যখন প্রতিদিনের অন্ন তার দরায় উপর নিয়ে কাঁড় করালো তখন কোথা দিয়ে যে কি ঘটে চলতে লাগলো প্রথমে কি তিনিই তা বুঝে উঠতে পেরেছিলেন। আর শুধু কি তিনিই—এখানকার দু'দিককার রাস্তার ফ্যাটগুলোর বন্ধ ঘর তো ঠিক তারই মতো না, না বুঝতে বুঝতে গিয়ে এই একই লোকের কাঁদে পা দিয়ে আজ পাঁকে মুখ খবড়ে পড়েছে। মুদীর ব্যবসাসটা মুদী দোকান নয়, আসল ব্যবসা তার পাড়ার অজ্ঞাবী ঘরগুলোকে ধার দিয়ে, বাকী দিয়ে তাদের তরুণী কস্তাদের খপ্পরে এনে ফেলা—বুঝেছিলেন কি তিনি কিছু। এতো কিছু বোকবার মতো শক্তিও ছিল না তার। চারটে শুখনো হাড় তখন তার দেয়ালে ঠেস দিয়ে শুধু শুকতো। তারপর খাত পেয়ে, পথ্য পেয়ে শরীরের রক্তকণিকাগুলো যখন বল ফিরে গেরে সতেজে শরীর ময় চলা ফেরা করতে করতে তাকেও দেয়াল—নির্ভর ছেড়ে পিঠটান করে কাঁড় করিয়ে দিলেন, তখন তার সেই মরতে মরতে বঁচে ওঠা রক্তকণিকাগুলো বঁচে থাকার কথা ছাড়া কোন কথাই মনে চাইলে না। আর সেদিনই তিনি প্রথম জানালেন মানুষ বাঁচার পায় সব সস্ত্রম সব বুদ্ধি বলি দিতে পারে। তবু তারও মধ্যে বড় প্রশ্ন ছিলেন তিনি নিজে নন, সন্তান। এক সন্তানকে বলি দেওয়ার জ্ঞান মন প্রস্তুত করেছিলেন তিনি আর এক সন্তানের দিকে তাকিয়ে। তাই মজুর লোকটাকে চড় মেরে তাড়িয়ে দিলে—আকুল হয়ে কেঁদে উঠেছিলেন তিনি একুল ওকুল দু'কুল বাওয়ার চরম আন্তর্জ। সব দার নেবার মজুর দেওয়া ভরসাও কোন ভরসা কোন বল পাননি। কিন্তু আজ মজু তার সব চাইতে বড় বল। আজ মজু তার ফের সুস্থ জীবনে ফিরে যেতে পারার সম্ভবনাময় স্বপ্ন। দয়া ধর্ম দান উপায়তার আজ আর বিশ্বাস নেই জরায় মার। একমাত্র জৈব দুর্বলতার কারণ ছাড়া কোন কারণ বিশ্বাস করেন না পুরুষের দরায়।

আজও অর্থনৈতিক জগতের একচ্ছত্র অধিপতি পুরুষ। সে ছাড়া কে দেবে মজুকে টাকা। আর তাই যদি হয় তবে তার দুর্বলতার ভিত্তির উপর পা না রাখলে তার মুঠো এতটুকুও থুগবে না—এতটুকুও না। আকুল উৎকর্ষায় বলে উঠলেন তিনি—কে দিলে মজু তোমায় এ টাকা, কে দিলে?

বুঝলো মজু সবই বুঝলো। মৌরীর ধারণা রক্তের মতো লোকেরা এই এক মতলবেই বা করে সব করে। জরায় মার অভিজ্ঞতা আরো বেশী, তাই তাঁর ধারণা সবাই, সবাই তাই। রক্ত বলে পুরুষের জগতে কোন আলাদা জাত নেই। এই কি সত্য বলে যেন নিয়ে মজুর রক্তের হাত থেকে টাকা নেওয়ার অপমানে মুখ নিচু করতে হবে?

না—দুর্বলতার দেওয়া মাত্রই নোংরা এই যদি তার বিশ্বাস হতো তবে যদিও রক্ত ধার শোধ দেওয়ার কথা বলেই টাকা দিয়েছে, মজুও শোধ দেবার কথা মনে রেখেই টাকা নিয়েছে—তবুও এ টাকা মজু গ্রহণযোগ্য মনে করতো না। তাইলেও সত্য বলা যায় না। জরায় মার দিকে তাকিয়ে কাঁচুকাচু খাওয়ার অভিনয় করলো মজু—যেন বলবার ইচ্ছে ছিল না, তবু বলতে হচ্ছে এমন ভাবে বললো—মার না ইয়া মোটা একটা হার ছিল। বুড়ো আকুল আর মধ্যমার বেড়ে একটা মোটার পরিমাণ দেখালো সে।

মনের ভেতরটা যেন শান্তিতে একবার চোখ বুজে নিল জয়ার মার। তবু উদ্বিগ্ন কণ্ঠেই জিজ্ঞাসা করলেন তিনি—সেটা তুমি লুকিয়ে বিক্রি করে এলে নাকি ?

ঠিক আছে। এতক্ষণে শুছিয়ে বসে শুছিয়ে বলে চললো মঞ্জু। না, বিক্রি করতে যাবো কেন? রেখে টাকা এনেছি। সামনের মাসেই ছাড়িয়ে নিয়ে আসবো। ও হাঁ—ভালো কথা, আপনাকে বলাই হয়নি যে আমি একটা টুইশনের কাজ পেয়ে গেছি। আর একটাও হয়ত সামনের মাসে পেয়ে যেতে পারি। একটা হলে পঁচাত্তোর টাকা পাবো। দুটো হলে পাবো পঁচাত্তোর পঁচাত্তোর করে দেড়শ'। (ভেতরে ভেতরে রক্তের সাহায্যে এমন দুটো কাজ পাওয়া কিছুই যে অসম্ভব কথা নয়—হলেও হয়ে যেতে পারে এবং পঁচাত্তোর পঁচাত্তোর দেড়শ নয়, একশ একশ করে দু'শ টাকাও মাইনে হতে পারে। ইউরোপীয়ান মহিলারা এমনি মাইনেই দেয়। এই একটা উত্তেজনারও মঞ্জুর বুকটা যেন বার বার দ্রুত তালে চলে নিল। যেন এ সংসারটা বেকার গৃহস্থানী সে।) বললো কাজ এ মাসে হলেও মাইনে পাবো তো সেই সামনের মাসে। এ মাসটা চসতে হবে তো আমাদের। বাড়ীভাড়া জমে আছে, আরো কত কি জমে আছে। সামনের মাসে মাইনে পাবো, এ টাকা থেকেও হরতো থেকে যাবে—নিশ্চয় আসবো হার ছাড়িয়ে। জানতেই পারবে না কেউ। না রে জয়া? জয়ার দিকে তাকালো সে। ঘরের মাঝখানে একটা মোড়ায় বসেছিল জয়া। কিছু জড়িয়ে আনা কৌচকানো মোচড়ানো একটা পুরোনো কাগজের পাতা টান করে নিয়ে বসে নিবিষ্ট মনে যেন সে কি দেখছিল। মঞ্জুর সংবাদে চোখ তুলল। মঞ্জু বললো—সিন্দুক ভেতর মরা সাপের মতো পড়ে থাকে তো বিড়ে পাকিয়ে। মাঝে মাঝে সেই অন্ধকার বিবর থেকে বেরিয়ে এসে যদি মালুয়ের কাজে এসে যেতে পারে, তবে ওরই নিজেকে ধন্য মনে করা উচিত, নয় জয়া? জয়া যেমন হাতের কাগজটার দিকে তাকিয়ে বসেছিল তেমনি বসে রইল। কোন সাড়া এলো না তার কাছ থেকে।

মঞ্জুর কাজ হয়ে বাগরার কথা শুনে এক দিকে যেমন খুশীর অন্ত রইল না জয়ার মার, অপর দিকে তেমনি পরীক্ষার বছর দু'হুটো মাঠারি করলে মঞ্জুর নিজের পড়ার যে ক্ষতি হবে সে কথা ভেবে খুশীর অনেকটাই যেন উবে গেল তার। তত্ত্বশোধের তলা থেকে তোরগটা টেনে বের করে টাকাটা তুলে রেখে বাগরার গিয়ে বসলেন। কিছুক্ষণ আগে ধরিয়ে রেখে বাগরা ঘোঁরা ওঠা উনোনটার অসমান কয়লাগুলো হাত দিয়ে ঠিক করে দিয়ে ওদের অস্ত্র চারের জল ঢাপালেন উনোনে। হাতের কাজের সঙ্গে সঙ্গে সন্ধ্যাভে যেন বলে চললেন আপন মনে কত কি। তার ভেতর একটা কথাই স্পষ্ট হয়ে কানে এলো মঞ্জুর—নিজের মেয়ের সর্বনাশ তো করে বসে আছিই। আবার না অস্ত্রের মেয়ের ভবিষ্যট্টাও নষ্ট করি।

জয়ার দিকে তাকালো মঞ্জু। মার এ ভাষার কথা সহ্য করতে পারে না জয়া। শোনা মাত্র কখনো ওঠে তার মুখ একেবারে সাদা হয়ে, আবার কখনো ওঠে সে দ্রুত ক্ষেপে। জয়াকে বাঁচিয়ে কথা বলতে পারেন না জয়ার মা। সে সতর্কতা বাওণ্ড তাঁর নেই। কিন্তু মার কথা জয়ার কানে গেছে মনে হলো না। এতক্ষণ তার দৃষ্টিটা ছিল হাতের কাগজের দিকে, এখন দৃষ্টিটা পাঠিয়ে দিয়েছে সে বাইরের

অন্ধকারের দিকে। সে আজ-কাল শূন্য-দৃষ্টিতে বসে বসে কেবল ভাবে আর ভাবে। কি ভাবছে জিজ্ঞাসা করলে ততোধিক শূন্য দৃষ্টিতে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। মঞ্জু চৌকি থেকে ওঠে গিয়ে মেঝেতে বসে ওব পিঠের ওপর হাত রাখল। কি খবর আছে এই সাত বাসি খবরের পাতায় দেখি।

—খবর নয় ছবি দেখছি।

—কিসের ছবি? উঁকি দিল মঞ্জু।

পত্রিকাটা তুলে দিল জয়া মঞ্জুর হাতে।

ছবিটা মঞ্জুর না-দেখা নয়। বহুদিন আগে বেরিয়ে গেছে কাগজে। পতিতাবৃত্তি বন্ধের প্রতিবাদে পতিতাদের নীরব প্রতিবাদের ছবি। রাজ্য পরিক্রমা করে এসে মাঠের ওপর বসে আছে এক মাঠ মেয়ে, ঘোমটার মুখগুলাে প্রায় আবৃত করে নিয়ে।

আচমকা খিল খিল করে হেসে ওঠল জয়া ঘরে মঞ্জুকে চমকে দিয়ে বাইরে বসে থাকা মাকে চমকে দিয়ে। তারপর যেন তার সেই পাগলা হাসি খামতে চায় না আর। দেখলি ছবিটা?

যেন ছবিটা সত্যি হাসি পাওয়ার, এমনি ভাব দেখিয়ে জয়াকে খুশী করতে হাসল মঞ্জুও।

আর তক্ষুণি গভীর হয়ে গেল জয়া। তীক্ষ্ণ গলায় বলে উঠল—হাসলি যে তুই? হাসিটা মুখের ভেতর—সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে জয়ার পিঠে হাত বুলাতে লাগল মঞ্জু—এমনি হেসেছি আমি।

—এমনি হাসবি কেন?

আমতা-আমতা করল মঞ্জু—ঠিক এমনি নয়। তোকে হাসতে দেখে হেসেছি।

—আমি কেন হেসেছি তুই জানিস?

—না তো!

—তবে কারণ না জেনে পাগলের মতো হাসতে গেলি কেন? তুই কি পাগল?

—সত্যি অর্থ হয় না; কিন্তু এক এক সময় কারণ না জানলেও কাউকে ভীষণ হাসতে দেখলে হাসি এসে যায় না?

ঠাণ্ডা হলো জয়া। আমি হেসেছি কেন জানিস?

সাংঘাতিক একটা জিজ্ঞাসা নিয়ে তাকিয়ে রইল জয়া মঞ্জুর দিকে।

ক্ষীণ ভাবে মাথা নেড়ে মঞ্জু বললো—না।

—কি করে জানবি। খাচ্চিস, পবচ্ছিন্ন মুখে আছিস। কিন্তু চিন্তা করবার যে কত কি আছে তোরা ভেবে দেখিস না। কেউ ভেবে দেখছে না। আচ্ছা এই দেখ—কাগজটা মেঝেতে পেতে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বললো—এটা দেখার পর সেই থেকে আমি কেবল ভাবছি—বলে হঠাৎ একেবারে চুপ করে গেল জয়া।

তুই ঠোট এক করে বসে রইল মঞ্জু, যদি এই চুপ করে থাকার ভেতর জয়া বিষয়টা তুলে যায় সেই অপেক্ষায়।

কিন্তু আশ্চর্য! অশূন্যল চিন্তায় কিরে এলো জয়া তার পূর্ব-বক্তব্য। বললো—আমি কেবল ভাবছি, এরা ঘোমটার মুখ ঢেকে বসেছে। কিন্তু পুরুষগুলো কি নির্লজ্জ যে—এই ছবিটা নিয়ে সবার চোখের উপর ঘোমটা ছাড়া ঘুরছে! পালের ছ'পালের, কপালের, দু'চোখের তলার কালো বেখাগুলো আরো গভীর দেখাতে লাগল জয়ার।

এবার পত্রিকাটা টেনে নিয়ে আবেল-তাবেল তাঁজ করে ছুঁড়ে ফেলে দিল মঞ্জু টেবিলের উপর। আদেশের সুরে বললো—জয়া, এ সব নিয়ে আর কখনো মাথা বাঁধাবে না তুমি। আমি যেমন এ জগতের নই তুমিও তেমন এ জগতের কেউ নও।

আবার ভেসে গড়িয়ে পড়ল জয়া—আমি নই এ জগতের ?

—না তুমি নও এ জগতের। পড়াশুনা আরম্ভ করতে হবে তোমার, পরীক্ষা দিতে হবে—তোমাকে।

—কি করে ? কি করে পরীক্ষা দেবো আমি ? বেন কেঁদে উঠল জয়া—আমার কিছু মনে থাকে না—কিছু না।

—মনে না থাকলেই যদি পড়াশুনা না হয় তবে আর কি। আমি ছেড়ে দিই পড়া। কারণ আমারও কিছু মনে থাকে না। এই তো এই মাত্র দেখলি গুণে আনা টাকাও দিতে গিয়ে কের গুণে দিতে হলো। তুলে বাওয়ার ব্যাপারে বোধি দিদিয়া বলেন, আমার নাকি জুড়ি মেলা তার।

—না, না, ব্যাকুলভাবে মাথা নেড়ে উঠল জয়া। তোর তুলে বাওয়া এক জিনিষ নয়। মাথাটাকে এক এক সময় আমার কঁাকা বেলুনের মতো মনে হয়—মনে হয় যেন শূঁতে উড়ে গেল বলে—মরে গেলাম বলে।

জয়ার মা চা আর মুড়ি ভাজার বাটি নামিয়ে রেখে গেলেন। মজু চায়ের কাপ হাতে নিয়ে ভাজা মুড়ি মুখে ফেলে চপে গেল একেবারে অজ্ঞ কথার—দাবা খেলা জানিস ?

—দাবা ? হু চোখ বড় করলো জয়া।

—হা দাবা ! দিন রাত হাবি-জাবি ভাবলে মাথা এমন শূঁত মনে হয় সবারই। দাঁড়া, দাবা খেলা শিবিরে দেবো তোকে। দেখবি মনের একাগ্রতা কেমন বেড়ে বাবে। অজ্ঞ কোন কথা মনে আসবে না। নে চায়ের কাপ নে। জয়ার হাতে কাপ তুলে দিল মঞ্জু। টেবিলে বসে থাকা জয়কে ডাক দিল—চলে এসো জয়, তোমার চা খাবার নিয়ে এখানে। টেবিলের সামনে সেই প্রথম থেকে বই নিয়ে বসেছিল জয়। শুধু বসে নয়, মঞ্জু জানে সে পড়ছিলও। তুলে ভর্তি হতে পারছে না সে, তার বই নেই। তার খাতা নেই তবু সে পড়ছিল—কোন দিকে মন না দিয়ে পড়ছিল। শুধু ওর প্রথম ঘরে ঢোকার সময় একবার চোখ তুলে ওর দিকে তাকিয়ে হেসেছিল। তারপর এতক্ষণের ভেতর সে তার বই-এর পাতা থেকে চোখ তুলেছিল মাত্র আর একবার—দিদির অন্তঃস্থ হাসি শুনে। মঞ্জুর সাদর আহ্বানে হাসি মুখে চা আর মুড়ির বাটি হুঁহাতে নিয়ে উঠে এসে বসল সে মেঝের উপর। তার দিকে তাকিয়ে মঞ্জুর মনে হলো, ফ্রন্টে বহুসভা সৈনিকের মুখের সতর্কতা সন্দেহ অবিধাস আভঙ্কের মতো যে রেখাগুলো সে প্রথম এসে জয়ের মুখে দেখেছিল, সে রেখাগুলো যদিও আজ মিলিয়ে গেছে তার মুখ হতে, তবু এখনও সেখানে বুদ্ধশাস্তির শাস্ত স্পর্শ লাগেনি। বহু জীবন জিজ্ঞাসার ভেতরটা বেন তার উন্মোচিত হচ্ছে। সে জিজ্ঞাসা নিয়ে সে কার কাছে যায় না—যাবে না। যার জবাব খুঁজে বের করাটা রেখে দিয়েছে সে নিজের অজ্ঞ।

যেদিক ফ্রন্টে শাস্তি ঘোষিত হয়েছিল সেদিন হাতের অজ্ঞ নাথাকে পেয়েই কি শাস্ত হতে পেরেছিলেন যেমার্ক ? পারেন নি।

হয়তো শাস্ত হতে পেরেছিলেন কিছুটা শুধু মাত্র সে দিন, যেদিন ‘অলকোরাইট’ শেষ করে হাতের কলম নামিয়ে দিলেন। মুকাত্তের মুখের অশান্ত রেখার হয়তো শাস্তির ঢিলে ভাব আসতো তখন, যখন তার কলম ছুটে চলতো—

কলম বিদ্রোহ তাখনি তুমি ?

রক্তে কিছু পাণিনি শেখার ?...

কলম বিদ্রোহ আজ—

...এতো বিদ্রোহ কখনো দেখিনি কেউ,

দিকে দিকে ওঠে অব্যাহতার ঢেউ ;

স্বপ্ন চূড়ার থেকে নেমে এসো সব—

শুনছো ? শুনছো উদ্‌ঘাম কলরব—

শুধু বুদ্ধি তখনই তার মুখের ভীরের মতো রেখাগুলো দাঁড়াতে স্থির হয়ে।

এই কিছু বেশী টাকা জয়ার মা'র হাতে দিয়ে আসতে গেলে দিন-ন-চলা বেকার গৃহস্থামীর কিছু দিন নির্ভাবনার কাটাবার মত সংস্থান করে উঠতে পারার আরামবোধ করতে লাগল মঞ্জু। মাথাটাই যেন হাতা মনে হতে লাগলো তার। সে খেয়াল করলে না, এ টাকা ক'টা আর কাজ পাওয়ার একদিনের একটা ভিত্তিহীন অনিশ্চিত আলোচনায় বতটা হাতাবোধ করা যায়, তুলনামূলক বিচারে তার হাতাবোধের পরিমাণটা অনেক বেশী হয়ে থাকে। আসলে ঐ টাকা নয় একটা কাজ হওয়ার ভরসাও নয়—সে যা সম্ভাবনা রয়েছে তো রয়েছেই। আর যদি না হয় ? মন তাতেও আর অন্ধকার দেখছে না—এই হলো আসল কথা। রক্তত আছে, এমন একটা হিসাব, তার অবচেতন মন হিসাবের খাতায় ধরে বসে আছে এবং যে অসহায়বোধ সে করছিল তা এখন আর সে করছে না। “আছে”—পেছনের এই থাকার জোরের মত জোর আর কিসে ?

টেবিল ঝেড়ে, বইপত্র গুছিয়ে এমন শূন্যস্থানায় পড়াশুনা আরম্ভ করে দিল মঞ্জু, বিস্মিত হয়ে গেল মৌরীও। যার চোখকে কঁাকি দেওয়া যায় না, নিষ্ঠাও তার চোখেই সবার আগে ধরা পড়ে। খুসী হয়ে উঠল মৌরী—হ্যাঁ এ ভাবে পড়লে আমি বলছি, ঠিক তুই একটা ফার্স্ট ক্লাশ পেয়ে বাবি।

জানে না—মঞ্জু জানে না, ফার্স্ট ক্লাশ না সেকেন্ড ক্লাশ, কি সে পাবে। সে জানে পড়াশুনো তাকে ক'রতে হবে। বত কিছুই করুক, তার ভেতরে এ লক্ষ্যজটিল হ'লে, তাকে পথজটিল হ'তে হবে। বড় হ'তে হবে তাকে, অনেক বড়। কাজ ক'রতে হবে তাকে—অনেক কাজ। আর এই সবের একমাত্র পাথের হ'লো অর্থপুঞ্জি নয় বিভার পুঞ্জি। এ পুঞ্জি তার সন্ধ্যা সন্ধ্যা ভ'রে তুলতে হবেই। কিন্তু বর্তমান সময়টা মঞ্জুর ওপর নিয়ে এসেছিল একটা অশান্ত হাওয়ার ঢেউ। যেমন বৈশাখ নিয়ে আসে সন্ধ্যা ক'রে বড়। ঠাণ্ডা হয়ে বসবার অবসর মিললো না তার। সময়ের উপর গ্রহনক্ষত্রের প্রভাবের আঁক-করা নিতুল হিসাবের মত হুঁতলা মাছুবের—তার জগৎপত্রিকার তেমন নিতুল আঁক হয় না। যদি হ'তো তাহ'লে এমন আয়োজন ক'রে পড়তে না বসে মঞ্জু তৈরী হ'তো সাধনের দুর্দৈবের অজ্ঞ।

[ক্রমশঃ]

দিনের পর দিন প্রতিদিন..



রেজোনা সাঝান

আপনার ত্বকে
আরও সুন্দর করে

যতবারই আপনি রেজোনা সাঝান দিয়ে মুখ
ধোবেন—আপনার ত্বক আরও নরম, আরও নোনায়েন
দেখাবে। তার কারণ, রেজোনায় থাকে ক্যাডিম—যেভাবে
কয়েকটি তেলের এক বিশেষ সংমিশ্রণ যা আপনার ত্বককে
সুন্দর করে এবং আপনার ত্বকে শুষ্ক রাখে। রেজোনার
সবের মত কেণা মাখুন দেখবেন আপনার ত্বক
প্রতিদিন আরও সুন্দর হয়ে উঠছে।

আপনার সৌন্দর্যের জন্তে... রেজোনা



রেজোনা শে, সি, কলকাতার পক্ষে বিলুয়ান লিটার লিঃ, কর্তৃক ভারতে প্রস্তুত

BP. 168-X52 BQ.

অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ



সুন্দরীশ্রেষ্ঠা হেলেন
এ্যাপোলো

স্পার্টার রাজা টিনডেরিয়াসের পত্নী লীডার রূপের সীমা নেই। তাঁর অপরূপ সৌন্দর্যের খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, দেশ বিদেশে আলোচনা চলে তাঁর রূপের, এমন কি অলিম্পাসের দেবতারাও লীডার সৌন্দর্যের কথা আলোচনা করেন। তাঁরা বলেন অলিম্পাসের দেবীদের মধ্যেও এমন রূপ চুলভ। তাঁদের কথা শুনে দেবীরা হিংসার জ্বলে মরেন।

অবশেষে দেবরাজ জিযুসের কানেও গিয়ে পৌঁছল লীডার সৌন্দর্যের খ্যাতি, লীডার রূপের কথা শুনে জিযুসের বাসনা হল তাঁকে দেখতে। এমন সুন্দরী যে নারী সে ত দেবভোগ্যা। দেবতাদের উপভোগের জন্মই না তার সৃষ্টি। জিযুস তাঁকে দেখতে বাবেন বলে ঠিক করলেন। কিন্তু তাঁর এই মনের কথা তিনি মনেই লুকিয়ে রাখলেন। কারণ দেবরানী হেরা তাঁর ইচ্ছার কথা জানলে মহা অনর্থের সৃষ্টি করবেন।

তখনক ঈর্ষাপরায়ণা দেবী এই হেরা। দেবরাজ মর্তের কোন নারীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন তুলে আর রক্ষা রাখবেন না তিনি। স্বর্গ-মর্ত জুড়ে এক বিষম আলোড়ন সৃষ্টি করবেন। হেরার এই মানবীমূলভ ঈর্ষার কথা জিযুস জানেন। এর আগে দু'-একবার মর্তের নারীর প্রতি দ্বন্দ্বলতার কলে তাঁকে ভুগতেও হয়েছে। তাই তিনি এখন বিশেষ সাবধান হয়েছেন।

জিযুস স্তবোগের অপেক্ষার রইলেন। অবশেষে একদিন সে স্তবোগ মিলেও গেল। স্তবোগ পেয়ে হেরার অগোচরে চুপে চুপে

তিনি হাঁড়ির হন স্পার্টার, রাজা টিনডেরিয়াসের প্রাসাদে। সেখানে তিনি বচকে দেখেন রাণী লীডাকে। সত্যিই অপরূপা সুন্দরী তিনি। তাঁকে দেখে জিযুস মুগ্ধ হন। লীডার সজলিম্পার অবীর হয়ে ওঠে তাঁর চিত্ত। কিন্তু লীডা তখন রাজা টিনডেরিয়াসের প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ। রাজার সাথে এক বিচিত্র কেলিতে মেতে উঠেছেন তিনি। অদৃশ্য জিযুস গোপনে দেখেন সে দৃশ্য।

প্রেমকেলি সমাপনান্তে রাজা তুণ্ডটিতে বিদায় চান রাণীর কাছে। রাজসভার তাঁর অনেক কাজ বাকী। রাণী লীডাও তুণ্ড হয়েছেন তাঁর সঙ্গ পেয়ে। তিনি রাজাকে বিদায় দেন তখনকার মত। তারপর বীরে বীরে অঙ্গুর হন প্রমোদ উত্তানের দিকে। সরোবরে স্নান শেষ করে তিনি আবার নতুন সজ্জার ভূষিত হয়ে মিলিত হবেন রাজার সঙ্গে, তারপর আবার মন্থকৌড়ায় মেতে উঠবেন তাঁরা।

রাণী বান সরোবরের দিকে, সখীরাও সাথে আসতে চায়, কি মনে করে তাদের বারণ করেন লীডা। তিনি একাই বাবেন অবগাহনে, প্রিয়সঙ্গের নিবিড় স্রুখে তাঁর মন এখনো আছাদিত। অপরের সাহচর্যে তাঁর প্রয়োজন নেই। একা একাই জলকেলি করবেন তিনি।

লীডা উপহিত হন সরোবরের তীরে। তারপর বীরে বীরে পা ডুবান জলে। শীতল জলের স্পর্শ তাঁকে আবিষ্ট করে। তাঁর মনে হয় তিনি বেন নতুন করে অমৃতভব করেছেন প্রিয়সঙ্গ, আপন মনে একা একাই জলকেলিতে রত হন তিনি। এমন সময় হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি গিয়ে পড়ে তীরের দিকে। তিনি দেখেন সরোবরের তীরে দাঁড়িয়ে আছেন এক অপূর্ণ সুন্দর স্রোতিয়ান পুরুষ।

তাঁকে দেখে বিস্মিত হন লীডা। অসময়ে তাঁর প্রমোদ সরোবরের তীরে কে এই সুন্দর পুরুষ! তিনি জল ছেড়ে তাড়াতাড়ি তীরের দিকে অঙ্গুর হন, তাঁকে এগিয়ে আসতে দেখে সেই অপরিচিত পুরুষ হাসতে থাকেন মুহু মুহু, অপরিচিতের এই ধ্বংসাত্মক বিস্মিত হন রাণী লীডা। রাণীর প্রমোদ উত্তানে কি সাহসে চুকেছে এই অজানা মাহুঘটি। সে কি জানে না তিনি কে? স্পার্টার রাজমহিষীকে দেখে সমীহ করে না এমন দুঃসাহসী কে এই অপরিচিত?

রাণী ক্রোধভরে তাঁর দিকে অঙ্গুর হতে বান। কিন্তু এই অপূর্ণ সুন্দর পুরুষটির মধ্যে কি বেন এক মহিমা লুক্কায়িত আছে যা তাঁকে তার প্রতি ক্রুদ্ধ হতে দেয় না, তিনি ভালো করে তার দিকে তাকান, দেখেন যে অপরিচিত তখনো তাঁর দিকে তাকিয়ে মুহু মুহু হাসছেন।

লীডার স্মরণ হয় তাঁর স্বপ্ন অঙ্গুরের কথা। তাও জলে ভিজে তাঁর দেহের সঙ্গে মিশে গেছে। তিনি লজ্জিত হন মনে মনে। তারপর মুহুকে লিজাসা করেন, আপনি কে? আর কেনই বা আমার এই প্রমোদ উত্তানে প্রবেশ করেছেন?

সেই অপরিচিত পুরুষ তখন রাণীকে তাঁর নিজের পরিচয় দিয়ে বলেন যে তিনি দেবরাজ জিযুস, দেবসভার রাণী লীডার অপরূপ সৌন্দর্যের কথা শুনে তিনি তাঁকে দেখতেই অলিম্পাস ত্যাগ করে স্পার্টার এসেছেন। তিনি বলেন যে, রাণী লীডাকে দেখে তিনি আনন্দিত হয়েছেন। তাঁর অপরূপ সৌন্দর্য দেবরাজকে মুগ্ধ করেছে, রাণী লীডার নিবিড় সঙ্গ কামনা করেন তিনি।

জিহুসের কথা শুনে চমকিত হন লীডা। তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছেন বয়স দেবরাজ। আর তিনি কামনা করছেন তাঁর, এক মর্ত্যের মানবীর সঙ্গ, তিনি বিচলিত বোধ করেন। কি উত্তর দেবেন ঠিক করে উঠতে পারেন না লীডা।

জিহুস আবার তাঁকে জানান, তাঁর কামনার কথা। লীডার মত রূপ দেবলোকেও দুর্লভ। দেবরাজ তাঁকে দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। তাঁকে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে তাঁর চিত্ত।

তাঁকে কি উত্তর দেবেন, ঠিক করে উঠতে পারেন না লীডা। দেবরাজ জিহুসের মহিমাযুক্ত মূর্তি তাঁকেও আকৃষ্ট করেছে। আর তা ছাড়া মর্ত্যের মানবীর পক্ষে দেবরাজের সঙ্গ পাওয়া ত' ভাগ্যের কথা। কিন্তু তাঁর মনে হয় তাঁর স্বামীর কথা। একটু আগেই স্বামীর প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধা ছিলেন তিনি। স্বামিসাহচর্যের পরিতৃপ্তি এখনো তাঁকে ঘিরে আছে। তবে কি করে আবার তিনি দেবরাজের আলিঙ্গনে নিজেকে ধরা দেন। কোন উত্তর দেন না লীডা। অবশ্য বদনে দাঁড়িয়ে ভাবতে থাকেন তিনি।

জিহুস ব্রূত পাবেন তাঁর বিধার কথা, কিন্তু তিনি তখন উন্মুখ হয়ে উঠেছেন লীডার সঙ্গ লাভসার। তাই লীডার সব বিধাকে ভুল করতে তিনি কৌশলের আশ্রয় নেন। তিনি তাঁকে পরিবর্তিত করেন এক রাজহংসীতে আর নিজেও এক রাজহংসের রূপ ধারণ করেন।

এই পরিবর্তনে লীডা প্রথমে হতচকিতা হয়ে যান। কিন্তু তারপরই তিনি ব্রূত পাবেন দেবরাজ জিহুসের কৌশল। মানবীরূপে জিহুসের বাহুবন্ধনে ধরা দিতে তাঁর বিধা আছে বলেই দেবরাজ তাঁকে ময়ালীতে রূপান্তরিত করেছেন। বাতে নতুন রূপে জিহুসের আলিঙ্গনে বাঁধা পড়তে তাঁর আর কোন সন্দেহ না থাকে। এই সময় রাজহংসসংখ্যী জিহুস আবার আহ্বান জানান লীডাকে। লীডাও এবার আনন্দের সাথে সাড়া দেন তাঁর আহ্বানে।

তারপর ময়ালী আর ময়ালী সেই সরোবরে এক অভিনব কৌড়ার মতো গুটে। তাদের পক্ষ বিধুননে সরোবরের জল হয় আলোড়িত। তারা কখনো পাশাপাশি ভেসে চলে, কখনো চঞ্চুতে চঞ্চু ঠেকিয়ে পরস্পরকে আদর করে। আবার কখনো বা একের উপর দেখা বার আরেক জনকে।

লীডার সাথে দীর্ঘকাল কাটিয়ে অবশেষে দেবরাজ জিহুস ফিরে যান দেবলোক অলিম্পাসে। রাজহংসী থেকে পুনরায় মানবীতে রূপান্তরিত হয়ে লীডাও ফিরে আসেন প্রাসাদে রাজা টিনডেরিয়াসের কাছে। টিনডেরিয়াস তাঁকে সাগ্রহে বাহুপাশে টেনে নেন। লীডাও ধরা দেন তাঁর বাহুবন্ধনে। কিন্তু তাঁকে সেদিন যেন কেমন আনন্দনা মনে হয়।

এর পরেই লীডা গর্ভবতী হন। এবং বধাসময়ে তিনি দুটি ডিম প্রসব করেন। এরই একটি ডিম থেকে জন্ম হয় হেলেনের।

জন্মাবধি হেলেন অল্পময়া স্নানরী, শিশু হেলেনকে যে দেখে সেই বিম্বিত হয়। মর্ত্যলোকে এ সৌন্দর্য্য একেবারে কল্পনাতীত। এত রূপ ত দেবলোকেও সম্ভব বলে মনে হয় না।

হোট হেলেন তাঁর পিতামাতার নয়নমণি। তাঁদের আরো সন্তান আছে বটে, কিন্তু তারা কেউই হেলেনের মত তাঁদের প্রিয় নয়। অবশ্য এজন্য তার ভাই-বোনেরা কেউই হেলেনকে ঈর্ষা

করে না। হেলেন তাদেরও সকলেরই বিশেষ প্রিয়পাত্রী। এইভাবে সকলের আদর আর ভালবাসার মধ্যে হেলেন বড় হতে থাকে।

হেলেনের বয়স বত বাড়তে থাকে তার রূপের খ্যাতিও ততই বেড়ে চলে। শিশু হেলেনের স্বর্গীয় রূপ সকলকে কবচ বিম্বিত ও মুগ্ধ। বালিকা হেলেনের অল্পময়া রূপ ও লাবণ্য এবার পুরুষকে আকৃষ্ট করতে শুরু করল। হেলেনের যে রূপ এর পর অগণিত লোকের জন্ম হরণ করেছে, অসংখ্য লোকের সর্বনাশ করেছে, বিভিন্ন রাজ্য ধ্বংসের কারণ হয়েছে, হেলেনের বালিকা বয়সেই তার সূচনা দেখা গেল।

হেলেনের বয়স যখন সবে দশ, তখনই তাঁর রূপের আভ্যন্তরে পুড়ে মরতে দেখা দিল প্রথম পতঙ্গ—গ্রীক-বীর থিসাস।

নানা হুঃসাহসিক এবং বীরত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদনের জন্য থিসাস ছিলেন দেশের সর্বত্র বিশেষরূপে খ্যাত। যৌবনে অনেক দুর্দান্ত দ্রব্য এবং অত্যাচারীকে দমন করে সকলের শ্রদ্ধা এবং সম্মান অর্জন করেছেন তিনি। কিন্তু থিসাসের এক বিশেষ দুর্বলতা ছিল। নারীর প্রতি আকর্ষণ তাঁর অসীম, নারী বিশেষতঃ সুন্দরী নারীর সন্ধান পেলে তিনি আর স্থির থাকতে পারতেন না। যেমন করেই হোক তাকে পেতে চেষ্টা করতেন, এর আগেও এয়ারিওডেন, এপিওপি এবং এনেজাকে তিনি হরণ করে এনেছেন।

এখেল নগরীর অগ্রতম প্রতিষ্ঠাতা প্রসিদ্ধ বীর থিসাসের বয়স তখন পঞ্চাশ। রাজকার্য থেকে কিছুদিনের মত অবসর নিয়ে বন্ধু পেইরীথাসের সাথে দেশভ্রমণে বেরিয়েছেন তিনি। গ্রীসের বিভিন্ন নগরী রাজ্যগুলি দেখে বেড়াচ্ছেন তাঁরা।

থিসাস বিভিন্ন নগরী দেখেন আর তুলনা করেন তাঁর প্রিয় এখেদের সাথে তাঁর সাবের এখেদকে তিনি যেমন স্নানর করে গড়ে তুলেছেন তেমন আর কোন নগরকেই তাঁর মনে হয় না। এখেদ হল সব নগরীর সেরা। তার সাথে আর কারুরই তুলনা চলে না।

এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে দুই বন্ধু অবশেষে একদিন এসে হাজির হলেন স্পার্টার, স্পার্টার তখন উৎসব শুরু হয়েছে আর্টেমিস আধিরার মন্দিরে। থিসাস আর পেইরীথাসও যান আর্টেমিসের মন্দিরে উৎসব দেখতে।

তাঁরা যখন মন্দিরে গিয়ে পৌঁছলেন তখন উৎসব বেশ জমে উঠেছে। সবাই উৎসবে মত্ত। থিসাস এবং পেইরীথাসকেও তারা সাদরে আমন্ত্রণ জানায় তাদের সাথে উৎসবে যোগ দিতে।

থিসাস দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেন তাদের উৎসব—এবার শুরু হয় বালিকাদের নৃত্য। কুমারী বালিকারা নানা ভঙ্গিতে নাচতে থাকে মন্দির-প্রাঙ্গণে। অজ্ঞাতদের সাথে থিসাস এবং পেইরীথাসও তাদের মনোহর নৃত্য দেখতে থাকেন।

হঠাৎ তাঁদের চোখ গিয়ে পড়ে অপরূপ সুন্দরী এক বালিকার ওপর। কুমারীদের সাথে সেও নাচছে। কিন্তু তার পাশে অপর সবাইকে যেন মগ্ন বলে মনে হয়। থিসাস বিম্বিত হন বালিকা হেলেনের রূপ দেখে।

এ যেন অপরূপ এক ফুলের কুঁড়ি। কুঁড়িই যদি এত সুন্দর হয় তবে ফুল না জানি কত সুন্দর হবে, থিসাস ভাবেন মনে বলে। তাঁর জীবনে অনেক সুন্দরী নারী তিনি দেখেছেন। অনেক

নারীকে তিনি বাঁধ বলে ভয় করেছেন কিন্তু এমন রূপ তাঁর চোখেও আর আগে কখনো পড়ে নি।

বালিকা হেলেনের রূপের আশ্রিত প্রীতি খিসাসকে দগ্ধ করল। হেলেনকে পাবার ভয় তিনি হলেন ব্যাভুল। বন্ধু পেইরীথাসকে তিনি জানালেন তাঁর মনের কথা।

পেইরীথাসও হেলেনকে দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। তাঁর মনেও মনে উঠেছে কাঁদনার আশ্রন। দুই বন্ধুর মধ্যে পরামর্শ চলে। ঠিক হয় তাঁরা উৎসবকেন্দ্র থেকে হেলেনকে চরণ করে নিয়ে যাবেন। জাহরণ তাঁর ওপর তাঁরা দুজনে বাজী রাখবেন। রাজ্যে তিনি হেলেনকে তিনিই লাভ করবেন।

খিসাস আর পেইরীথাস স্বপ্নোৎসাহে অপেক্ষার থাকেন। জাহরণ এক সময় বিকারী বাজের মত কাঁপিরে পড়ে বুঝাবতী হেলেনকে চরণ করে দুই বন্ধু পালাতে থাকেন। উৎসবকেন্দ্র জমজমা এই আকর্ষণীয় বিলম্বেরে বিদ্রূপ করে পড়ে। জাহাঁ ভাল করে অশঙ্কন-কারীদের অঙ্গুরণ পর্যন্ত করতে পারে না, দেখতে দেখতে দুই বন্ধু হেলেনকে নিয়ে তাঁদের চোখের আড়ালে চলে যায়।

জাহরণ হেলেনের ওপর বাজী রাখেন দুজন। দুজনেরই মনে আশা বাজীতে বোধ হয় সেই স্তম্ভে, শেষ পর্যন্ত হেলেনকে পান খিসাস।

বালিকা হেলেন এতক্ষণ তাদের পাশে দাঁড়িয়ে দুই প্রৌঢ়ের বাজী ধরা দেখছিল। হেলেনকে ওরা হরণ করে এনেছে উৎসবকেন্দ্র থেকে। ওদের ব্যবহারে সে বিমিত হইছে বটে কিন্তু ভয় পায়নি। ভয় তার কখনই করে না। নতুন কিছু ঘটলে সে উৎসুক অস্থব্ব করে মাত্র। তাতে সে ভীত বোধ করে না।

আর আজকের ব্যাপার খুব নতুন কিছুও ত' নয়। সে ত' মাকে মাঝেই লক্ষ্য করেছে তাকে দেখে পুরুষ কেমন বিমিত কেমন মুগ্ধ হয়। তার মনে হয়েছে তাদের মুগ্ধ দৃষ্টি যেন বন্দনা জানাচ্ছে তাকে। সে ভাল করে বুঝতে পারে না ঠিকই কিন্তু এ অস্থব্বতা তার আগেই জগেছে। ঐ মুগ্ধ দৃষ্টিতে আশ্রনের ঝিলিকও সে আগে লক্ষ্য করেছে কি? কি জানি হেলেন ঠিক মনে করতে পারে না। তবে আজ সে অস্থব্ব করে খিসাসের চোখে যেন লসছে কিসের আশ্রন। হেলেন তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে খিসাসকে কৌতুহলী চোখে।

খিসাসও ভালো করে দেখেন হেলেনকে, দশ বছরের বালিকা কুমারী হেলেন। কি সুন্দর, কি সুন্দর! খিসাস বলেন মনে মনে। এ যেন দেবী অস্ত্রোদিতের মোহিনী মূর্তি বালিকারূপে দাঁড়িয়ে আছে তাঁর সম্মুখে। খিসাস আবার মুগ্ধ হন, আর মনে মনে আনন্দিত হন নিজের সৌভাগ্যে।

কিন্তু প্রবীণ খিসাসের হিসাবে একটু ভুল হয়েছিল, বালিকা হেলেন অপরূপা সন্দেহ নেই। কিন্তু সে তখনো দশ বৎসরের বালিকা মাত্র। খিসাস অচিরেই বুঝতে পারেন তাকে এখনো অপেক্ষা করতে হবে। হেলেনকে তখন তিনি নিয়ে বান এ্যাকিডনীতে তাঁর মা এ্যাথীর কাছে। মায় হাতে তিনি সমর্পণ করেন হেলেনকে। মাকে বলেন, অতি সঙ্গোপনে হেলেনকে লুকিয়ে রাখতে। কেউ যেন না জানতে পারে তার কথা। তারপর

এ্যাকিডাসের ওপর তাদের রক্ষার ভার দিয়ে পেইরীথাসের সাথে খিসাস আবার বেরিয়ে পড়েন দেশ ভ্রমণে। বন্ধু পেইরীথাসকে তিনি কথা দিয়েছেন তাঁকেও তিনি সুন্দরী বস্ত্রা জোগাড় করে দেবেন। তারই খোঁজে আবার বেরিয়ে পড়েন দুই বন্ধু।

এদিকে হেলেনের ভাইরাও তাঁদের অপেক্ষা ভাগিনীর খোঁজে বেরোন। খুঁজতে খুঁজতে তাঁরা এটিকার এসে উপস্থিত হন তাঁরা জানতে পারেন খিসাস হেলেনকে এখানেই কোথায়ও লুকিয়ে রেখেছেন। তাঁরা সবাইকে জিজ্ঞাসা করেন হেলেনের কথা। কিন্তু কেউই বলতে পারেন না, খিসাস তাকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন।

অবশেষে একাত্তমাসের কাছে তাঁরা হেলেনের খোঁজ পান। বোনকে উদ্ধার করতে হেলেনের ভাইরা এফিড্রনী আক্রমণ করেন। খিসাস নেই। কে চোঁকাবে তাঁদের। এফিড্রনী মঞ্চল করে হেলেনকে উদ্ধার করে বিজয় গর্বে তাঁরা ফিরে বান স্পার্টার, আর সাথে বালিনী করে নিয়ে বান খিসাসজননী এ্যাথীর কাছে। পুত্রের পাপের শাস্তি ভোগ করতে হয় এ্যাথীরকেও। জীবনের অবশিষ্টাংশ হেলেনের ক্রীতদাসীরূপে কাটাতে হয় তাঁকে।

রাজা এডোনিয়াসের কন্যা কোরকে অপহরণ করতে যেরে পেইরীথাস প্রাণ হারালেন। বন্ধুকে হারিয়ে খিসাস এখানে ফিরে দেখলেন হেলেনকে তার ভাইরা উদ্ধার করে নিয়ে গেছেন, এবং ক্রুদ্ধ এথেনীয়ানরা তাঁকে করেছে রাজ্যচ্যুত। স্বতন্ত্রাঙ্গ অপমানিত খিসাস দেশভ্রমণ করে স্বাইবোসে গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং সেখানে রাজা লাইকোমিডিসের হাতে প্রাণ হারালেন। এই ভাবে হেলেনের প্রথম অপহরণকারী খিসাসকে লাঞ্চিত হয়ে মৃত্যুবরণ করতে হল।

হেলেনকে উদ্ধার করে তাঁর ভাইরা আবার ফিরে এসেন স্পার্টার, তাঁদের নয়নের মণি হেলেনকে পেয়ে রাজা টিনডেরিয়াস এবং রাণী লীডা যেন প্রাণ ফিরে পান। আবার পিতৃগৃহের নিশ্চিন্ত আরাধনের মধ্যে বড় হয়ে উঠতে থাকেন হেলেন।

দেখতে দেখতে বালিকা হেলেন কিশোরী হয়ে ওঠেন, কিশোরী হেলেন হন যুবতী। যে দেখে সেই বিমিত হয়। আর ভাবে মর্জের মানবী এমন দেবদুর্লভ রূপ কোথা থেকে পেল গো।

তাঁর রূপের খ্যাতি আর কেবল স্পার্টার ক্ষুদ্র প্রান্তরের মধ্যে আবদ্ধ থাকে না, তা ছড়িয়ে পড়ে সারা গ্রীসে, সমস্ত গ্রীসে আলোচিত হয় তাঁর রূপের কথা। সবাই বলে এমন রূপ আর আগে কেউ কখনো দেখেনি।

সারা গ্রীসের বীর এবং রাজাদের কানে পৌঁছায় হেলেনের খবর। তাঁরাও শোনেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠা সুন্দরী হেলেনের রূপের খ্যাতি। শোনেন আর একে একে হাজির হন স্পার্টার। এসে অতিথ্য গ্রহণ করেন রাজা টিনডেরিয়াসের প্রাসাদে।

স্পার্টার এসে তাঁরা দেখতে পান হেলেনকে। তাঁকে দেখে তাঁদের মনে হয় যে একদিন বা ওনেছেন তা সত্যি নয়। সবাই তাঁর রূপের প্রশংসাই করেছে কিন্তু তিনি যে এত সুন্দর তা ত কেউ বলে নি। নারী যে এত সুন্দরী হতে পারে এত তাঁরা নিজেরাই কল্পনা করতে পারেন নি। তাঁদের মনে হয় বিধাতা যেন বিশ্বের সব সৌন্দর্যকে ভিলে ভিলে আহরণ করে ভিলোতমারূপে গড়েছেন হেলেনকে। তাঁরা আবার দেখেন হেলেনকে। বার বার দেখেন। আর বত দেখেন ততই মুগ্ধ হন।

হেলেনকে লাভের আশায় মিনেলাস, ভায়োমিডি, কিলোকটেস, ইডোমেনাস, মেরিওণ, পোট্রাকাস, এ্যাকাজ, এটিলোকাস, ওডিসিয়াস আদি গ্রীসের তিরিল জন হেষ্ঠ বীর একে একে এসে হাজির হন স্পার্টায়। তাঁরা সবাই সাধে করে এনেছেন বহুমূল্য্য নব উপহার। মহাৰ্ষ উপহার দিয়ে তাঁরা জয় করতে চান রাজা টিনডেরিয়াসের ক্ষয়।

রাজা টিনডেরিয়াস পানিপ্রার্থীদের তাঁর প্রাসাদে বাস করার জন্ত মাদর আমন্ত্রণ জানান। তাঁদের অর্থস্বাত্ত্ব্যের দিকে তাঁর যত্নেহে সজাগ দৃষ্টি। কিন্তু পানিপ্রার্থীদের এই বিপুল সমাগমে যেন যেন লজ্জিত হয়ে ওঠেন তিনি। তিনি উদ্বিগ্ন চিন্তে ভাবেন লম্বাগত এই বীরদের মধ্যে কাঁকে তিনি কভা হেলেনের স্বামিগণে মনোনীত করবেন। এক জনকে তাঁকে নির্বাচিত করতে হবে। কিন্তু ভাত্তে অজ্ঞ সবাই বিজুত্ব হবেন। তখন তাঁরা যদি সমবেত হবে তাঁকে আক্রমণ করেন তাহলে তিনি গ্রীসের রাজাদের সম্মিলিত এই আক্রমণকে ঠেকাবেন কি করে? টিনডেরিয়াস অত্যন্ত বিচলিত বোধ করেন। তিনি মিষ্ট কথায় তুষ্ট করেন সবাইকে। কিন্তু কারো উপহারই তিনি গ্রহণ করতে সাহসী হন না।

এই বিপদ থেকে কি ভাবে উদ্ধার পাওয়া যায়, চিন্তা করতে

থাকেন টিনডেরিয়াস। কিন্তু ভেবে ভেবেও কোন উপায় তিনি বের করতে পারেন না। এই সময় একদিন ওডিসিয়াস এসে তাঁকে বলেন যে তিনি যদি তাঁর ভাই ইকেরিয়াসের কভা পেনিলোপির সাথে তাঁর বিবাহ দিতে সম্মত থাকেন তাহলে তিনি তাঁকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারেন। রাজা টিনডেরিয়াস সাগ্রহে গ্রহণ করেন তাঁর প্রস্তাব।

তখন অডিসিয়াস তাঁকে জানান তাঁর পরিকল্পনার কথা। তিনি বলেন, সমবেত পানিপ্রার্থীদের কাছে রাজা প্রস্তাব কভরবে, তাঁর কভা হেলেন থাকে পছন্দ করবেন তাঁর সাথেই হেলেনের বিবাহ হবে। তবে গ্রীক বীরদের এই প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে হেলেনের মনোনয়নে তাঁরা বিনা দ্বিধায় মেনে নেবেন। এবং হেলেনকে তাঁর স্বামীর কাছ থেকে যদি কেউ হরণ করে নিলে বাধ্য হবে তাঁরা সম্মিলিত ভাবে অপহরণকারীকে সাজা দেবেন এবং হেলেনকে উদ্ধার করতে তাঁরা তাঁর স্বামীকে সাহায্য করবেন।

ওডিসিয়াসের কথামত টিনডেরিয়াস সমবেত বীরদের কাছে এই প্রস্তাব উত্থাপন করলে তাঁরা তাঁর প্রস্তাবে সম্মত হয়ে লপথ করলেন যে, হেলেনের মনোনয়নকে তাঁরা অকুণ্ট চিন্তে মেনে নেবেন এবং তাঁকে তাঁর স্বামীর কাছ থেকে কেউ অপহরণ করলে তাঁরা সম্মিলিত ভাবে তার বিদ্ধে বুদ্ধ করবেন।

মনের কথা

“এমন স্নন্দর গহনা কোথায় গড়ালে?”

“আমার সব গহনা মুখার্জী জুয়েলার্স দিয়াছেন। প্রত্যেক ধিনিষটিই, তাই, মনের মত হয়েছে,—এসেও পৌছেছে ঠিক সময়। এঁদের কৃতিজ্ঞান, সততা ও দারিদ্ৰবোধে আমরা সবাই খুসী হয়েছি।”

মুখার্জী জুয়েলার্স

দিনি মোনার গহনা নির্মাণ ও রত্ন-স্বত্বকৃতি
বহুবাজার মার্কেট, কলিকাতা-১২

টেলিফোন : ৩৪-৪৮১০



পানিপ্ৰার্থীদের মধ্যে কাঁকে পছন্দ করবেন ঠিক করে উঠতে পারেন না হলেন। এঁরা সবাই খ্রীসের নামজাদা বীর। রূপে শুণে কেউই কম নয়। এঁরা প্রত্যেকেই তাঁর স্বামী হবার উপযুক্ত। অনেক চিন্তার পর খ্রীসের শ্রেষ্ঠ ধনী রাজা এ্যাগামেমননের জ্যাতা কুমার মিনেলাসকে তাঁর স্বামিরূপে বরণ করলেন হলেন। বিপুল সমারোহের মধ্যে মিনেলাসের সাথে হেলেনের বিবাহ হল। দিব্যম্পর্ষিতিক তাঁদের শুভকামনা জানিয়ে সমবেত বীররা স্পার্টা জাগ করলেন।

এর কিছুদিন পরেই রাজা টিনডেরিয়াস মারা যান। পুত্র ক্যাটর আপগেই মারা গিয়েছিলেন। তাই টিনডেরিয়াসের দুকৃত্য পর তাঁর জামাতা মিনেলাসই হন স্পার্টার রাজা, প্রব্রী বাদী হেলেনকে নিয়ে পরম সুখে দিন কাটতে থাকে তাঁর।

ঝাড়ুদারের বউ

[একটি য়েথর য়েরের জীবনের বোয়াল ও ঠাঁজেরী]

জীঅমিতাকুমারী বনু

লারি কেন্দে কেন্দে চুচোখ লাল করেছে। শাওড়ীর গল্পনা আর সহ হয় না। কারণে অকারণে কি বকুনিটাই না দেয়। সেই কোন সন্ধ্যায় যুখে জলটুকু পর্য্যন্ত না দিয়ে ঝাড়ুহাতে বের হয় লারি।

শ্রীতের প্রভাত কুরাশার ডেরে থাকে চারদিক, রাস্তার ঝাড়ু চালাতে হাত আর উঠে না। অবশ্য হয়ে যায়। আজ ঠাণ্ডাটা বড় বেশী, গায়ের চোলা ওড়না হিমবরফ হয়ে শরীরের রক্ত জমিয়ে দিচ্ছে। মাঝে মাঝে লারি আবক্ষ লম্বা বোমটা তুলে এদিক ওদিক চাইছে। লারি এগিয়ে চলল ঝাড়ু লাগাতে লাগাতে পাকা সড়ক ধরে। কাহার-বস্তির দু-চারটে বউ উঠে বেরিয়ে পড়েছে কাজে, বাসন মাঝতে হবে তাড়াতাড়ি বাবুদের বাড়ীতে। সবারই অফিস আছে। বড় কাহার ছেলেটা পাড়ার আরো দু-চারটে ছেলে-মেয়ে জমিয়ে ঘরের দোরে রাস্তার খড়কুটো আলিয়ে আগুন ধরিয়েছে। অর্ধনগ্ন ছেলেমেয়েগুলো অরিকুণ্ডের চারদিকে গোল হয়ে বসেছে। লারি আগুনটার দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবছে, সে যদি ঐ গরম আগুনটার পাশে বসতে পেত, ঐ লাল লক্‌সকে অগ্নিশিখাতে হাত-পাগুলো একটু সঁকে নিতে পারত। দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে সে ঝাড়ু চালাতে লাগল। এদিকে এক বাপটা। ওদিকে এক বাপটা। যা ময়লা তাতে আসে সেটুকুই জমিয়ে নেয়। নিখুঁতভাবে ঝাড়ু চালাবার মত তার মনের অবস্থা নয়। লম্বা বাঁশের শলার ঝাড়ুটা দিয়ে যেন সে রাস্তাটাকে পিটিয়ে চলেছে, তার লাল মোটা মলিন বাঘরাটা চলার সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটানো আর উঠছে।

চলতে চলতে লারি সিঁদ্রির ছোট দোকানটার সামনে এসে দাঁড়াল। সিঁদ্রির ছোট কার্ঠের দোকানের দরজা খুলে গেছে। হুতাত উঁচু কয়লার চুলাটাতে এবই মধ্যে কয়লার আগুন গনগন করছে। আর বড় কালো কেটলীটার জল ফুটছে টগবগ করে। দু-চার জন খদিদার এসে জুটে গেছে, লারি হাতের কাজ স্থগিত রেখে

দোকানটার দিকে চেয়ে রইল। সিঁদ্রি দোকানটার চট করে চা ডিজিরে ফেলেছে ছোট ছোট চীনাঘাটির পেয়লাতে ধূমায়িত চা ঢেলে দিয়ে এক এক পেয়লা খরিকারের দিকে এগিয়ে দিচ্ছে আর পকেটে হু-হু আনা পরসা ফেলছে। লারি লুকু নয়নে চেয়ে রইল ওই ধূমায়িত গরম চায়ের পেয়লার দিকে। আহা, সে যদি ঐরকম একটা পেয়লার এখন একটু গরম চা খেতে পারত। আঃ তার শরীরটা কেমন ঢালা হয়ে উঠত তা হলে, কিন্তু তার অদৃষ্টে কি এই সুখ আছে? কি জন্মই না নিয়ে এসেছে সে। শুধু ঝাড়ু লাগাও, আর ঝাড়ু লাগাও, আর বাকী সময়টা শাওড়ীর গল্পনা, আর ঘরের কাজ।

লারি চায়ের টল থেকে চোখ ফিরিয়ে মন দিল নিজ কাজে, তাড়াতাড়ি ঝাড়ু চালিয়ে ছুটল বড় সাহেবের বাংলোর। সেখানকার কাজ শেষ করে বাবে কোর্টে ঝাড়ু লাগাতে, বারোটার সব কাজ শেষ করে ফিরবে বাড়ী, একথা ভাবতে ভাবতে মনটা একটু খুশী হয়ে উঠে।

ক্ষিপের পেট চোঁ চোঁ করে উঠছে, বাড়ীতে গিয়ে দানাপানি পেটে পড়লে শরীরটা একটু ভাঙ্গা হবে। খুশী মনে এগিয়ে চলল লারি, বম্ব বম্ব করে বেজে উঠে পায়ের পায়জোড়। লারি জলদি চলতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে ভারী লাল বাঘরাটাও তুলতে থাকে ত্রস্তে, যুখে একহাত লম্বা বোমটা দিয়ে ঘর্ষাক্ত যুখখানা মুছে, লারি বোমটা তুলে, এদিক ওদিক দেখতে দেখতে চলল। রাস্তা নির্জন দেখলে কখনও বা গানের এক হু কলি গেয়ে উঠে। তার বয়স খুব বেশী হলে আঠারো-উনিশ। সংসারের দুঃখকষ্ট ওর মনের রস এখনও নিঃশেষ করে শুবে নিতে পারে নি। অকালে দু-চারটে শিশুর জননী হয়ে তার জীবন এখনও ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠেনি, তাই শাওড়ীর গল্পনা খেলে এখনও যুখে হাসি ফুটে, মিটে গলার দু-এক লাইন গান গেয়ে ফেলে।

আজ চার বছর হল বিয়ে হয়েছে লারির, স্বামীর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ খুব কমই হয়। স্বামী রেলের ঝাড়ুদার, বেশ মাইনে পায়। সন্ধ্যায় মদ খেয়ে চুব হয়ে থাকে, বেশীর ভাগ রাতই মাতাল হয়ে এসে মাতলামী করে। যেদিন ঝাড়ুদার কিবাণের মেজাজটা থাকে বিগড়ে, সেদিন রাত্রে এসে যদি খেঁ খে লারি ঘুমিয়ে পড়েছে তবে মেজাজটা বাস আরো ষিঁচড়ে, ঘুমন্ত লারির গায়ে পা দিয়ে একটা ঠোঁকর দিয়ে বলে, এই বেগম-সাহেবা উঠ, মজাসে পড়ে পড়ে ঘুমাচ্ছে কেমন, আর আমি শালা, খেটে খেটে মরি। চা জলদি আন, কুটি গরম করে নিয়ে আর, ঠাণ্ডা খাবার দিলে লাখি লাগাবো জোরসে।

লাখির নামে লারির চোখের ঘুম ছুটে যায়, আচম্কা লাফিয়ে উঠে ঠোঁকর খেয়ে, চোখ কচলাতে কচলাতে উঠানে হুঁ দিতে থাকে। ঘোঁয়ায় আর মনের আলার চোখের জল করতে থাকে। সারাদিন খেটেখুটে একটু আরামে ঘুমাবে, সে উপায়ও নেই। মাসের মধ্যে দু-চার দিন তার লাখি খাবার সৌভাগ্য ঘটে। লারির মনটা এক এক দিন বিবিয়ে ওঠে, মাঝে মাঝে মার কাছে চলে যেতে ইচ্ছে হয়, কিন্তু শাওড়ী মাগী যেতে দেবে না, বলে, ঘরের কাজকর্ম কে করবে?

কোন কোন দিন কিবাণের মেজাজটা বেশ খুশী থাকে, কার্ঠ রান,

সেইকণ্ঠে ক্রোধের ধনী আরোহীদের কাঁধরা বেড়ে ছুঁচার আনা বকশিস পেতে পেতে টাকা বেড় টাকার পৌছে যায়। খুশীমনে বাড়ী ফিরে। সেদিন লারির অর্ধটো ভাল থাকে। কিবাণের মিষ্টি কথার আদরে লারি অল্প জগতে চলে যায়।

এমনি এক স্নানগনে কিবাণ খুশীমনে বাড়ী ফিরে দেখে, লারি একটা কাপড়ের পুঁটুলির মত মলিন শব্দার গুয়ে আছে। মাথার লম্বা ঘোমটাটা অভ্যাসমত এখনও বুকের উপর পড়ে আছে বাজের ঢাকনার মত।

কিবাণ বীরে বীরে ঘোমটা সরিয়ে দেয়। সারা দিনের কপ্তকান্ত যুগ্মত শ্রমল মুখখানা কিবাণের মন মায়ার ভরে তুলে। বীরে বীরে লারির লাল-নীল কাচের চুড়িভরা সুরগোল হাতখানা টেনে ডাকে, লারি, ও লারি, ওঠ, চল সিনেমায় বাবি?

প্রথম বেন লারি বুঝতেই পারে না কিবাণের কথা। মিষ্টিগলার কিবাণ ডাকছে, সে বিবেশ করতে পারল না। চোখ বগড়িয়ে লারি ভাবে, সে স্বপ্ন দেখছে, কিবাণের হাতের এক খাতী খেয়ে লারি লাকিয়ে উঠে লাখি খাবার ভয়ে। কিন্তু ক্রমস্তির পরিবর্তে দেখে হাসিমুখ।

আশস্ত হয়ে চলে উনানের কাছে বসবসাবসম করে, কিবাণ হাতটা টেনে ধরে বলে, কোথায় বাচ্চিস বল, সিনেমায় বাবি? খুব ভাল খেলা আছে।

খুশীতে লারির চোখে-মুখে হাসি ঠিকের পড়ে। ধপ করে বসে যায় কিবাণের পাশে। মেহেদী-রাঙ্গানো হাতে কিবাণের হাত ধরে বলে, সত্যি বাবে?

সত্যি নয়ত মিছে নাকি? এই দেখ কতকগুলো পরলা উপরি পেরেছি, বলে লারির হাতের উপর ঢেলে দেয় কিবাণ।

স্বামীর মিষ্টিকথার, ব্যবহারে লারি বেন স্বর্গে উঠে যায়। তাড়াতাড়ি কিবাণকে খাইয়ে পোষাক পরতে শুরু করে। বিয়ের পর কিবাণ-তাকে একটা বড় বড় গোলাপফুল-ছাপ দেওয়া রঙ্গীন টিনের বাক্স কিনে দিয়েছিল। লারির কোমরে একটা শিকলে তার চাবি ঝুলানো থাকত। লারি সেই চাবি দিয়ে বাক্সটা খুলে তার বিয়ের লাল টুকটুকে ঘাঘরাটা ও নকল, জরির বর্ডার-দেওয়া ফুলতোলা গুড়নাটা বের করলে।

লারির গারে সহরের হাওয়া লেগেছে, সে দেখেছে বড় সাহেবের মেয়ে মাথার মাঝখানে সীঁষি কেটে কি স্নন্দর ছদিকে ছুটা বৌী করে। আজ সে-ও অমনি করে ছুটা বৌী ছদিকে ঝুলিয়ে দিল। কপালের মাঝখানে একটা বড় কুন্ডল-কাঁটা দিলে।

কিবাণ অবাক হয়ে বসে বসে লারির সাজপোষাক দেখছিল। ছোট একখানা কামরা, তারই এক কোণাতে একটা উনান, একপাশে একটা মাটির ভিট; তাতে ধানকতক বাসন উপড় করা আছে। ঘরের চাল থেকে একটা বাঁশ লটকানো আছে, তাতে সকালে সব বিহানা চানর ডাঁজ করে ঝুলিয়ে রাখে। আর এক কোণায় ছুটা পেরেক রশি বাঁধা, তাতে কিবাণের ও লারির ব্যবহার্য কাপড়-জামা রাখা আছে।

দেয়ালে একটা সজার আয়না টাঙ্গানো। পাশে একটা কেবাসিন কাঠের বাজের উপর ছুটা চিকণী, এক টুকরা রঙ্গীন সাবান। ছুটা চুলের ফিতা। ছুঁচারটে ক্লিপ পড়ে আছে।

কিবাণের সামনে পোষাক পরতে লারির লজ্জা করতে লাগল, তাই কিবাণের একটা ব্রুতি বাঁশে ঝুলিয়ে আড় করে সে সবই প্রসাধন করতে লাগল।

এক দিন কিবাণের চোখে লারি একটা ঘাঘরা-গুড়নার পুঁটুলিই ছিল। আজ কুঁড়ে ঘরে সামান্য এতটা কেবাসিন লঠনের ব্রুহ আলোতে লারির স্ত্রীময় ঝড়ুদেহ অপরূপ হয়ে দেখা দিল কিবাণের সামনে। অবাক হয়ে গেল কিবাণ।

তারি হুজনে বখন সিনেমার সেইকণ্ঠে শোর জন্ত রাস্তায় নেমে পড়ল, তখন কে বলবে এই সম্পতি দিনের সেই নীল কুঁড়া আর লাকিয়া পরিহিত কিবাণ! আর মোটা লাল ঘাঘরা পরিহিতা ঝাড় হাতে লারি।

হুজনে নিরালা রাস্তার হাত ধরে চলল, বড়রাস্তায় উঠে হাত ছেড়ে পাশাপাশি বেতে লাগল। কিন্তু সেদিন রাতে লারি আর কিবাণের মনে যে মধুর অল্পভূতি খেলে গেল, সে অল্পভূতি তারা জীবনে আর কোন দিন খুঁজে পেল না।

গড়জিকা এবাছে দিন কেটে চলেছে হুজনের। কিবাণের আর আজ-কাল অনেক বেড়ে গেছে। সেই সঙ্গে বেড়ে চলেছে মনের পরিমাণ। কিবাণের মনের গতির সঙ্গে তাল রেখে লারি চলতে পারছে না। বতি ভেঙ্গে যাচ্ছে।

কখন কখনো কিবাণের আদর সোহাগে লারি মনে করে সে ভূবর্গে আছে। আর কখন কখন লাখি-খাঁটা খেয়ে মনে হয় সে নরকে ডুবে আছে। শান্ত্তী মরও না তরও না। বসে বসে খেয়ে খেয়ে এই মোটা জ্বরদস্ত হয়েছে। তার জিভের ঝোঁপান দিতে লারি হয়রাণ হয়ে উঠল।

সেদিন লারি অকারণে শাওড়ীর বকুনি খেয়ে বলে ফেসলে, সারাদিন ত খেটে মরছি, তবু কেন বকে চলেছ?

শাওড়ী তেড়ে উঠে বললে, হারামজাদী, আবার মুখকরা শিখেছিস? বা বলব তাই করবি, নয়ত নোড়া দিয়ে মুখ খেঁতো করে দেব।

লারি অঝোরে কাঁদতে থাকে। তার হুখের কাহিনী কাকৈ বলবে? স্বামী বলতে বাকে বুঝায়, সে তো রাতে মাতাল হয়ে ঘরে ফিরে। লারি কাঁদতে কাঁদতে ঝাড়ু চালায় আর মুখে বিড়বিড় করে বলে, কি জন্মই না এনেছি আমি! শাওড়ীর বকা আর স্বামীর মার খেতে খেতে মরলাম। মাকে মাকে লারির সেই রাতটার কথা মনে পড়ে, যেদিন হুজনে সেজে-গুজে সিনেমায় গিয়েছিল। আহা সিনেমটা কি স্নন্দর! শুধু ভাল ভাল স্নন্দর পোষাকে সেজে-গুজে নাচ আর গান। আর শিয়ার সঙ্গে মিলন। এক একদিন হাতের ঝাড়ু চালানো ছুঁচার মিনিট বন্ধ রেখে লারি সিনেমার কথা ভাবে তার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে।

কিবাণ বেন ক্রমশঃ বদলে যাচ্ছে। একদিন লারি বললে, চল না সিনেমায় বাই। কিবাণ ধমকে বললে, পরলা বেন সজা দেখেছিস, বা রাস্তা করগে ভাল করে।

লারিতে বেন কিবাণ আর কোন মাধুর্য খুঁজে পায় না। লারি তার কাছে ভাপসা হয়ে উঠেছে, বেন পাছা ভাত।

লারির কটিনবাঁধা জীবন চলেছে, সকাল ছয়টা ছেকে বাবোটা আর তিনটে থেকে সন্ধ্যা ছয়টা অবধি বড় সড়কে ঝাড় চালানো।

আর বড় বড় হুঁচকারজন অফিসারের বাড়ী কাজ করা, তা ছাড়া যান্নাযান্না বাসন মাল্লা সব ত আছেই।

পুলিশ জমাদারের বাড়ীতে লারির ভিউটি পড়েছে মাসেক বাবৎ। তার নন্দ ও বাড়ীতে কাজ করে। নন্দ এখন জাঁড়ুবব, তাই লারি তার বদলে সে বাড়ীতে কাজ করছে। বাড়ীর গিন্নী কয়েক দিন হল বাপের বাড়ীতে চলে গেছে। লারি হুঁবেলা কাজ করে। জমাদার তারি মিষ্টি কথা বলে মাঝে মাঝে লারির ওড়নাতে ঢলে দেয় উদ্ভূত কুটি তরকারী মিষ্টি, এসব নিয়ে চলে যায় লারি স্বয়ংমাকম করে পায়ের বাড়িয়ে।

সন্ধ্যার সময় জমাদার প্রায়ই উঠানে পাথরাড়ী করে, তার থাকী হাফপ্যাট আর চওড়া চামড়া বসেটা যেন তার ভুক্তির পরিষ্কার ষেঁটন করতে পারছে না ভাল ভাবে। গোলকালো মুখখানাতে মস্ত একজোড়া গোঁফের নীচে দাঁত বের করে হাসে, আর কুৎকুতে চোখ দুটো দিয়ে কেমন সাপের দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। অবশ্য লাগে লারির।

শীতের সন্ধ্যা, চারদিকে অন্ধকার নেমে এসেছে, লারি তাড়াতাড়ি কাজ শেষে বাড়ী ফিরেছিল। এমন সময় জমাদার হাঁক দিয়ে বললে, কুটি-ভালি নিয়ে যা।

মুখের ঘোমটা আরো টেনে সজ্জিত ভাবে লারি ওড়না তুলে ধরলে জমাদারের সামনে। জমাদার ওড়নায় কুটি ঢাসতে গিয়ে তার হাতটা চেপে ধরলে, বললে, লারি, তুই রোজ আমার কাছে আনবি, পা টিপে দিবি, আমি তোকে অনেক জামা কাপড় পরসা দেব, তোর দুঃখ থাকবে না।

লারি হাত হিনিয়ে ছুটে পালিয়ে এল। এই শীতের সন্ধ্যায়ও তার শরীর দিয়ে যাব ছুটে লাগল। পরের দিন জমাদারের বাড়ী যেতে লারির আর পা ওঠে না, কোনরকমে ভয়ে সে কাজ করে এল। সেদিন জমাদার আর কিছু বললে না বটে, কিন্তু প্রায়ই তাকে নানা প্রলোভন দেখাতে লাগল।

বাড়ী চালাতে চালাতে লারি কোন কোন দিন ঘরের ভিতরটা চেয়ে দেখে, মাঝখানে দুটো টেবিল চেয়ার, এক পাশে একটা লোহার খাটে সালা ধবধবে বিছানা, কেমন পরিষ্কার ফিটফাট। সঙ্গে সঙ্গে নিজের ঘরের ছিন্ন মলিন শয্যার কথা মনে পড়ল। আহা, ঐ দুখের মত সালা নরম বিছানায় শুতে না জানি কত আরাম! কিন্তু আরামের জীবন ত ভগবান লারির জন্য রাখেন নি, নইলে লারি মেথরের ঘরে জন্ম নিবে কেন? লারি ছেড়ে দিল নন্দের বদলী কাজ।

কিন্তু ঘরেও লারির মন টেকে না, ঘরের আবহাওয়া যেন কেমন রহস্যময় হয়ে উঠেছে। প্রায়ই অপরিচিত লোক আসছে বাচ্ছে, শান্তভী তাদের সঙ্গে কিস-কিস করে কি কথাবার্তা বলে, লারিকে দেখলেই চুপ হয়ে যায়।

কিবাণ ত তার সঙ্গে কথা বলা এক রকম ছেড়েই দিয়েছে, সেদিন নিজের থেকেই কিবাণ লারিকে ডেকে বললে, তুই বড় শুকিয়ে উঠেছিস, বা তোর মায় কাছ কয় দিন থেকে জিরিয়ে আয়। লারির ভিতরটা কেমন এক অজানা আশঙ্কার কঁপে উঠে। কিন্তু দুদিনের ভিতরই সে সমবয়সী মেথর-বৌর কাছ থেকে খবরটা

জানতে পারল। কিবাণ আবার বিয়ে করবে তারই আয়োজন চলছে। লারির হাত থেকে টুকরী আর বাড়ুটা ধসে পড়ল মাটিতে, তার আর পাঁজাবার ক্ষমতা নেই, সে ধপ করে মাটিতে বসে গেল।

হতভাগিনী লারির চোখের সামনে বিয়ের দিন এগিয়ে এল। খুব বাজনা বাজিয়ে হলদি লাগানো হল কিবাণকে, লারি ঘরের পেছনে বসে তার পোষা ছাগলছানাটাকে বুকে জড়িয়ে কাঁদতে লাগল অঝোরে। ভগবান শুধু ঝাড়ু লাগাবার জন্যই তাকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, তার অদৃষ্টে শ্রব লিখেন নি। স্বামী মাতাল হোক, বাই হোক, তবু ত এত দিন তার নিজস্ব একাই ছিল, সেই মাতাল স্বামীকেও কেড়ে নিতে চলেছে আর একজন। যেন নতুন আসবে সে স্বামীর সোহাগিনী হবে। আর তাকে হতে হবে তাদের দাসী। মন বোগাতে হবে নতুন বৌ-এর।

লারির চোখের জল আর বাঁধ মাম না। হুঁসিনেই লারির মুখখানা শুকিয়ে উঠেছে। চুলগুলো ঝপ হয়ে উঠেছে, তেলের আর জাঁচড়াবার অভাবে। জাতে মেথর হলও সে নারী, সে ঐশাদশী। তার গায়ল মুখখানাতে একটা কোমলতা আছে। কালো চোখের দৃষ্টি সুন্দর সরল, কিন্তু সেই গায়ল মুখখানা শুকিয়ে উঠেছে দুঃখের আগুতায়। তার মুখের দিকে চাইবার, হুঁশিনীকে সমবেদনা জানিয়ে সন্তোহে কাছ টেনে নেবার কেউ নেই।

কিবাণ বিয়ে করে ফিরে এসেছে, বউ ফর্সা, সুন্দরী। কিবাণ ভোসওয়াল থেকে একশ টাকা মুজরা দিয়ে বাঈজী আনিয়েছে, রাতে নাচ-গান হবে। আসর বসেছে চাঁদোরা খাটিয়ে। নতুন বৌকে নিঃসবাই ব্যস্ত। মেথরদের বড় জমাদারের মেয়ে সে। কাজেই সবাই তাকে একটু খাতির করছে। লারি বর-কনেকে দূর থেকে দেখতে লাগল, তার চোখে একটা হিংস দৃষ্টি ফুটে উঠল। আসরের চারদিকে গ্যাসলাইট জালিয়ে উজ্জ্বল করা হয়েছে, কিবাণ হাসিমুখে নতুন পোষাক পরে সব তদারক করছে। মেথরবোরা সাজগোজ করে মুখের ঘোমটা কমিয়ে এক পাশে বসে আছে বাঈজী নাচ দেখতে। অনাদৃতা লারির খোঁজ কেউ করল না। তাদের জাতে ত এমন হয়েই থাকে, তিন চারটে বিয়ে না করলে মরদ আবার কি? এ কি সহরে বাবু যে এক বউর জাঁচল ধরে থাকবে? লারির ভাগ্য ভাল, তবু ত চার বছর একা স্বামীর ঘর করেছে।

এত সব যুক্তি লারির মন মানে না। দুঃখে রাগে গুমরাতে থাকে। সে দূরে খুঁটি ধরে পাঁড়িয়ে থাকে, আসরের দিকে তার দৃষ্টিতে চেয়ে।

বাঈজীর নাচ-গান আর নৃপুর তবলার আওয়াজ শুনে শুনে হঠাৎ বহুদিন পূর্বের সেই সিনেমা-রাতের কথা লারির মনে হল, গানের লাইনটা মনে পড়ল, "পিয়া মিলন কো বানা ছায়"। কিন্তু হায়, তার পিয়া কোথায়? সে তো নতুন নিয়ে মশগুল, লারির হুঁচোখে আবার জলের ধারা নামে।

নতুন বৌকে দেখতে দেখতে হিংসার রাগে লারির বুক জ্বলতে

লাগল। লারির চোখের সামনে জেখের পলকে ডেসে উঠল একটা ঘর। পুলিশ জমানারের মোটা গাঁফের নীচে ঝাঁকা হাসি। চোখে-মুখে একটা লোলুপতা, গা মিউরে উঠল। নতুন বোর দিকে চেয়ে চেয়ে লারি ভাবতে লাগল, হ্যাঁ, সে প্রতিশোধ তুলবে। কিষণ যেমন নতুন বৌকে নিয়ে আনন্দে মশগুল হবে তেমনি সে-ও তার জীবনের সুখের পথ বেছে নেবে।

লারির হুঁচোখে আগুন বেকতে লাগল। সে উঠল, নিজের ঘরের দিকে ফিরে চলল। কোমর থেকে চাবি বের করে গোলাপ-ফুলওয়ালা টিনের বাস্র খুলে তার সুন্দর ঝাঝাটা বের করে পরল। ককচুল সামনে টেনে নিয়ে বাঁধল। লঠন তুলে নিজের সুখখানা আরনাতে দেখে বীরে বীরে লারি বেরিয়ে পড়ে রাস্তায়।

কিছুদূর গিয়েই লারি তার সবচেয়ে পালিত ছাগশিশুর ম্যা-ম্যা ডাক শুনেতে পেল। থমকে দাঁড়াল। একটা অজানা আশঙ্কায় তার মন ছেঁয়ে গেল। সে কিরে ছুটে চলল তার ক'ড়তে। দেখতে পেল দরজাটা ঝেঁব খোলা। আর এক পাশে দাঁড়িয়ে তার ছাগশিশু অসহায় ভাবে ডাকছে ম্যা-ম্যা। লারি হুঁহাত বাড়িয়ে তাকে বৃকে তুলে নিল। তারপর তার মলিন পরিত্যক্ত বিছানার বসে পড়ল। নবর ছাগশিশুটি পরমানন্দে লারির কোলে আঁচমে চোখ বুজল। আর লারি তাকে বৃকে জড়িয়ে ধরে হ-হ করে কুঁকিয়ে কঁঁড়ে উঠল বার্থ বোবে, কোভে।

মেয়েদের ক্যাম্পে থাকা

ইন্দুমতী ভট্টাচার্য

১৭ ঢা ঢা—ঢা ঢা—না, না, মন্দিরের কি গির্জার ঘণ্টা নয়—ফুলেরও না—ক্যাম্পের।

ক্যাম্পের ঘণ্টা পড়ল, পতাকা অভিবাদন করবার। সকালবেলা উঠে এগই অস্ত্র প্রস্তুত হ'য়ে নিচ্ছিল মেয়েরা তাড়াতাড়ি—এখন কেউ বা চুল কেউ বা কাপড় ঠিক করতে করতে এসে সার বেঁধে দাঁড়াল পতাকার সামনে।

'জয় হিন্দ' ব'লে অভিবাদন শেষ ক'রে মেয়েরা লাইন করে চলল মাঠে—সুস্থ হ'ল দিনের ক্রটন। ব্যায়াম-শিক্ষিত্রীরা ব্যায়াম শিক্ষা দেবেন এখন মেয়েদের। ব্রতচারী নৃত্য, ড্রিল, শুধু হাতে ব্যায়াম অথবা কুচকাওয়াজ চলবে কিছুক্ষণ।

কি উৎসাহ মেয়েদের—লাকাচ্ছে, নাচছে, ঘুরপাক খাচ্ছে—ছন্দোবদ্ধ সচল ফুলের মালার মত হয়ে অঙ্গ সঞ্চালন করছে—কখনও দাঁড়াচ্ছে সবুজ গালচে বিছানো মাঠে শাদা শাদা ফুলের জীবন্ত স্তবক হয়ে। দেখছি ওদের সজীবতা, ওদের চঞ্চলতা, ওদের আনন্দ, ওদের প্রাণশক্তি।

কে বলবে এই মেয়েগুলিই আমাদের বিভাগের ক্লাসে ক্লাসে বসে থাকে। কোলকুঁজো, বিবাদের প্রতিমূর্তি হয়ে, কিমানো কিমানো চোখে নিম্মহ নিবাসক্ত দৃষ্টি নিয়ে তখন ছনিয়ার ক্লাঙ

অমিত লাবণ্য আপনারই জন্য বোরোলীন

আপনার লাবণ্যময় প্রকাশ্যই আপনার সৌন্দর্য। কিন্তু রোদ আর শুক হাওয়া প্রতি-দিন আপনার সে মাধুরী ম্লান করে দিচ্ছে। ওষধিগুণযুক্ত সুরভিত বোরোলীন এই করুণ অবস্থার হাত থেকে আপনাকে রক্ষা করবে। এর সক্রিয় উপাদানগুলি আপনার ত্বকের গভীরে প্রবেশ করে শুকিয়ে যাওয়া স্নেহজাতীয় পদার্থ ফিরিয়ে এনে আপনার ত্বকে মখমলের মত কোমল ও মসৃণ কোরে সজীব ও ভারুণের দীপ্তিতে উজ্জ্বল ক'রে তুলবে। আবেশ-লাগা সুরভিযুক্ত বোরোলীন ক্রীম মেখে আপনার ত্বকের সৌন্দর্য রক্ষা করুন আর নিজেকে রূপোজ্জ্বল করে তুলুন।



পরিবেশক : জি, দত্ত এণ্ড কোং, ১৬, বনফিল্ড লেন, কলিকাতা-১

আর অবসাদ মাথানো থাকে, যেন ওদের দেহে-মনে সমগ্র সভায়।
সেই মেয়েগুলিই।...

ওদের চা খাবার বটো পড়ে—তবুও আরেকটু ব্যায়াম করতে পারলেই ওরা খুসী হয়—কিন্তু উপায় নেই—সব বাঁধা নিয়মের ছকে—একটি মিনিট এদিক ওদিক হবার উপায় নেই ক্যাম্পে—তাই মাঠ ছেড়ে এবার আসতে হয় খাবার ঘরে।

জলখাবারের খালা, চায়ের কাপ-ডিস নেবার ভঙ্গী—খাবার ভঙ্গী—পরে পরিষ্কার করে ঘুয়ে এনে গুছিয়ে রাখার ভঙ্গীর ওপর নম্বর পাঁবে ওরা।

কি তৎপরতা, কি নিষ্ঠুর ক'রে কাজ করবার প্রচেষ্টা ওদের। আর ঠোঠাঠেলি নেই—আগে নিজে নেব এ অভিসন্ধি নেই শিহনের জনকে এগিয়ে দিতেই ব্যস্ত ওরা। আর অস্ত্র। এই মেয়েরাই করে ঠোঠাঠেলি চীৎকার—আগে এগিয়ে দাঁড়াবার জন্য অসভ্যতা। আশ্চর্য লাগে। কোন বাহু মত্রে যেন ওরা ক্যাম্প ঢোকা মাত্র শিখে নিরেছে যে এটা নিয়মের রাজত্ব। অথচ এখানে কেউ নিয়ম চাপিয়ে দিচ্ছে না ঘাড়ে। কি ভাল, লক্ষী আমাদের মেয়েরা। অথচ এদের নিয়মে জানতে হিমসিম খেয়ে বাই আমাদের স্থুলে—কেন ?

চা খাবার পর ক্লাস। না, না, নীরস পাঠ্যপুস্তক নিয়ে, 'দেখো মেয়েরা, ছিঃ, ছিঃ, তোমরা কিছু জান না', করে আরম্ভ করা ক্লাস নয়। ভেড়ার গোরালে ঠাসাঠাসি পাদপাদি হয়ে বসে গলদঘর্ষ হবার মত ক্লাসও নয়। বা শুনতে ভাল লাগে—যেমন ভাবে শুনতে ভাল লাগে স্বচ্ছন্দে আরামে বসে, তাই শোনার ক্লাস। গল্পের মাধ্যমে জ্ঞানভাণ্ড উন্মোচন করে দেওয়া—ছবি, আবৃত্তি, গান, অভিনয়, ড্রইং ও নানা উপকরণের সাহায্যে। শেখাকে শেখা বলেই মনে হয় না—শুধু আনন্দ, শুধু উৎসাহ, শুধু অসুস্থকিৎসার মাধ্যমে কৌতুহল জাগানো বিষয়ে অমূল্য বাড়ানো।

কোথা দিয়ে কেটে যায় পুরো একটি বটো, হাঁস থাকে না মেয়েদের—শিক্ষয়িত্রীরও। আর স্থলে ? ৪৫ মিনিটের শিরিরিডেই প্রাণ ত্রাহি মধুসূদন ! দারোয়ান বটো দিচ্ছে না—টুলে বসে ঘুমিয়ে পড়েছে ভেবে মনে মনে দারুণ অবসাদ, অশান্তি—ছাত্রীদের, শিক্ষয়িত্রীদেরও।

ক্লাস শেষ হলে আল্পনা আঁকা বা মাটির কাজ অথবা ড্রইং এর ক্লাস আরম্ভ হয়। বারান্দার ভাগে ভাগে বসে পড়ে মেয়েরা, মনের মাধুরী কুটির তুলতে হাতের কাজের মধ্য দিয়ে। কত সৌন্দর্যজ্ঞান, কত সম্ভাবনা-সমুচ্ছল কোরক ওদের মধ্যে। সুবোপ-সুবিধা সহস্রভূতির অভাবের ভেটটি হাওয়ার তা আলোর সুখ দেখে না কোন দিন অথবা দেখলেও অকালে শুকিয়ে যায়। দেখি আর ভাবি সমস্ত মন ছুঁড়ে ওঠে হাহাকারে।

হাতের কাজ শেষ হলে ভাতীয় সঙ্গীত ও অস্ত্রাভি বদেঈ গান অভ্যাস করে মেয়েরা। সবচেয়ে সমান উৎসাহ, সমান আনন্দ ওদের।

এর পর বাগানে খানিকটা কাজ করে, ঘর-দোর পরিষ্কার করার কাজ সেয়ে ত্রান করতে যায় মেয়েরা। যে দলের ওপর যেদিন তার থাকে সেই হল রান্নাবান্না করে রেখেছে ইতিমধ্যে। খেতে বসে ওরা। নিজেরাই ঠাই করে—নিজেরাই ভাগে ভাগে পরিবেশন।

বাঁওয়ার পর বাধ্যতামূলক শৌণ্ডার ব্যবস্থা এক বটো। তার পর স্নান হয় কাঠ'এড ও নার্সিং-এর ক্লাস। প্রত্যেক মেয়েটির মনের মধ্যে লুকিয়ে আছে একটি সেবাকাজিনী নারী—এই সময় তা বোরবার মেয়েদের শেখবার আগ্রহ ও রোগীকে শান্তি দেবার উপায়গুলি জেনে নেবার আন্তরিকতা দেখে।

এই ক্লাসের পর আদিত্য শেলায়ের ক্লাশের। অল্প সময়ের মধ্যে সুন্দরভাবে সহজে যে সব সেলাই শেখা যায় তাই শেখানো হয় ক্যাম্পে। তারপর আধ বটো ওদের নিজেরদের বই বা খবরের কাগজ পড়বার সময় দেওয়া হয়।

রোদও পড়ে আসে ওদিকে—তখন ওরা মাঠে গিয়ে লাঠিখেলা শেখে। সামান্যতম হলেও আত্মরক্ষার উপায় কিছু শিখতে হবে বৈ কি মেয়েদের। যে হাত আল্পনা আঁকে, সে হাত লাঠি চালাতেও সক্ষম, এ দেখে আশায় মন ভরে যায় কত যে !

এর পর চুল বেঁধে গা ঘুয়ে মেয়েরা ফল আর দুধ খেয়ে নেয় তাড়াতাড়ি। শ্রম—শ্রমের পর ক্ষয়পরিপূরণ—বিশ্রাম ও খাওয়া দিবে—এসত্য ক্যাম্পে মেনে চলা হয় সব সময়। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে আমরা ইঞ্জিন চালিয়েই চলি—তাকে বিশ্রাম দেওয়া, তেল দেওয়ার কথা ভেবেও দেখি না সব সময়, আমরা দেখলেও উপায় থাকে না হয়ত তাই যেন ভাববার দরকারই নেই এমনি ভাবে থাকি—তাই আমাদের কাজে প্রাণ থাকে না, উৎসাহ থাকে না, সৌষ্ঠব থাকে না—করতে হয় তাই করি এমনি একটা ভাবই শুধু থাকে।

ক্যাম্পে প্রতিদিন নানা বিশিষ্ট লোকের আগমন হয় বিকেলের দিকে। মেয়েরা বলে—তাদের কাছ থেকে শিক্ষামূলক বক্তৃতা বা কাহিনী শোনে প্রত্যাহ। এই সব লোকেরদের সঙ্গে পরিচিত হয়—তাদের অহেতুক লজ্জা, জড়তা কাটিয়ে উঠে, সপ্রাণিত, চটপট হয়ে ওঠে শ্রীমতী ফেরার, কথাবার্তার—প্রেরণা পায় তাদের মত হবার—আত্মপ্রত্যয় স্পষ্ট হয়।

—বিকেলের চা ও জলখাবার মেয়েরা অতিথিদের সঙ্গে বসে খায়। তারপর সাধারণতঃ সিনেমা বা ম্যাজিক ঠাঠন দেখানো হয়—আবার মেয়েরা নিজেরা গান, নাচ, আবৃত্তি, অভিনয় ইত্যাদির মাধ্যমে আনন্দ করে। কিবা দিদিরা তাদের গল্প বলেন কি তারাই গল্প শোনায়। এতে মেয়েদের বলার ক্ষমতা বাড়ে, সঙ্কোচ কাটে—নিজেকে প্রকাশ করবার প্রেরণা ও উৎসাহ আসে।

হাতের খাওয়া হয় এর পর—একটু ইচ্ছে মত ঘুয়ে বেড়ানো হয় তারপর—সব শেষ পতাকা নামিয়ে ওতে বাঁওয়া। শোবার আগে কিছু রোজনাচ্চা দেখা চাই প্রত্যেক মেয়ের।

এই হল রোজকার মোটামুটি রুটিন ক্যাম্পে—সুবিধা অসুবিধা অনুসারে এর অদল বদল করা হয় সব সময়ই অবশ্য।

বাইরে বাঁওয়া এবং গ্রামের লোকজনদের সঙ্গে যোগাযোগ করা ক্যাম্পের রুটিনের মধ্যেই পড়ে—বেদিন তা করা হয় সন্নিহিত ভেতরের রুটিন কিছু কিছু বাদ পড়ে বাধ্য হয়ে। এই বাইরে বেরোনের মেয়েদের সব থেকে আনন্দ উৎসাহ।

ক্যাম্পের এক একটি কাজের এক একজন ভারপ্রাপ্ত দিদিমণি থাকেন অবশ্য—তাদের নিয়মসূচী ও পরিশ্রমে ক্যাম্পের সমস্ত কাজ সুষ্ঠুভাবে অসম্পন্ন হয়—কিন্তু তাঁরা নিজেরা কিছু না করে মেয়েদের দিয়েই সব কাজ করান—এইটাই নিয়ম ক্যাম্পে।

কিন্তু ক্যাম্পে কি হয় না হয় তার বিবরণী দেখার জেজ্ঞেই শুধু এ প্রবন্ধ লিখছি না। ক্যাম্প করে যে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করেছি সেটুকু প্রকাশ করবারই আগ্রহ আমার।

ছেলেমেয়েদের বর্তমান কালের সমাজ-জীবনে খাপ খাওয়ার কারণ মাঝে মাঝে ক্যাম্প থেকে শিক্ষা লাভ করবার প্রয়োজন যে কত বেশী, তা সব সময় অনুভব করেছি ক্যাম্প থেকে।

স্থলে মেয়েদের সঙ্গে ভাল ভাবে মেলামেশা করবার সুযোগ সুবিধা আমরা পাই না—কার মধ্যে কী সম্ভাবনার বীজ লুকিয়ে আছে—হৃদয়বাহী, সেবা, শ্রুতিগত, স্বজনী প্রতিভার দিক দিয়ে তাদের চরিত্রের বিভিন্নত্ব খারাপগুলির সন্ধান পাওয়াও যায় না। স্থলে—পাইকারী হিসাবে মেয়েদের দেখি আমরা স্থলে—প্রধানতঃ ভাল করে লেখাপড়া করলে ছুঁ-একজন দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সমষ্টির চাপে ব্যক্তি স্বতন্ত্রা চোখেই পড়ে না। ছাত্রীদের সংখ্যাধিক্য, আমাদের শিক্ষা পদ্ধতি ও বিদ্যালয় পরিচালনার ক্রটি ও শিক্ষয়িত্রীদের উদার দৃষ্টিভঙ্গির অভাব এবং ঔদাসীন্য অবস্থা অনেক পরিমাণে দায়ী এজন্য।

কিন্তু ক্যাম্পে প্রত্যেকটি মেয়ের স্বতন্ত্রা প্রকাশ করবার সুযোগ-সুবিধার অন্ত নেই। সেখানে ব্যক্তি হিসাবে তাদের দেখা হয় প্রত্যেকটি ব্যাপারে। আত্মবিশ্বাসবোধ তাই স্পষ্ট ভাবে ফুটে ওঠে এখানে। ক্লাসে যে মেয়ে লাঠি বেঁকে বসে থাকে মুখ লুকিয়ে এখানে তার মধ্যেও দেখেছি অকুণ্ঠভাবে নিজেকে প্রকাশ করবার আগ্রহ আত্মপ্রত্যয়ে সমুজ্জ্বল ও আত্মপ্রকাশে উদ্গুণ্ঠ হয়ে।

ক্যাম্পে শুধু কাজ কাজ আর কাজ—বাজে সময় কাটাবার ফুসং নেই একটুও, প্রত্যেকের ওপর দায়িত্ব প্রত্যেকের ওপর নজর। সময়ের মূল্যবোধ। নিয়মাহুর্বাতিতা ও শৃঙ্খলাবোধ এখানে আপত্তি বাধ্য। তারপর একসঙ্গে খাওয়া পানীয়ের মেয়ের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করার অভ্যাস পরস্পর পরস্পরকে সহ করে নেওয়া দোষগুণ বিচার না করে, অন্তরে দেখে নিজেকে সংশোধিত করে নেওয়া মিসে-মিশে কাজ করে গঠনমূলক মনোবৃত্তির উদ্দেশ্য করা ইত্যাদি, অনেক কিছুই অভ্যাস হয়ে যায় আপনা থেকে।

স্থলে আমরা হাজার নীতি উপদেশ দিয়েও যত্ন সমিতিতে দাঁড়িয়ে মক্কা কাঁপিয়ে ফেলেও বা পারি না ক্যাম্পে থাকার ফলে সেগুলি অভ্যাসে পরিণত হয় অতি সহজে।

ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, ক্ষমা প্রভৃতি নারীসুলভ সূক্ষ্মতার বৃত্তিগুলিরও বিকাশ হয় এখানে। একের পর এক। ঠেলাঠেলি ক্ষত্বাধিকার না করে প্রত্যেকটি কাজ একজনের পর একজনকে করে যেতে হয় মুখ বুজে। আমি আগে সুবিধা নেব, অন্তে মজুক, এ প্রবৃত্তি জাগবার কোন সুযোগই নেই ক্যাম্পে।

ক্যাম্পে মেয়েরা চোখ-কান খুলে রেখেছে সর্বদা—তটু হ'য়ে আছে সব কাজ সূত্ৰভাবে হচ্ছে কি না দেখবার জন্য—তাই ঝিমঝিমের গড়িয়ে গড়িয়ে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চলে না ওরা, প্রাণ আছে ওদের চলার ফেরার কথাই বাস্তব।

সময় প্রধার থাকতে থাকতে সহজ কর্তব্যজ্ঞান জেগে ওঠে ওদের মধ্যে আপনা আপনি। একজন একজনের প্রতি সহানুভূতিতে ভরপুর হয়ে ওঠে। ক্যাম্প শেষ হলে তাই ওদের বড় দুঃখ, বন্ধুদের ছেড়ে থাকবে কেমন করে!

স্থলে দেখি আজ-কাল বড় ব্যস্তিক হয়ে পড়েছে মেয়েরা—সবই করতে হয়, তাই কোন রকমে করার পর্যায়ে এসে পড়েছে—প্রাণ নেই, উৎসাহ নেই, শ্রদ্ধা নেই অব্যবস্থিত চিন্তাভাবনা, অবাহেলার, অশ্রদ্ধার, অবিশ্বাসের প্রকাশ সর্বত্র।

ক্যাম্পে সব সময় দেখেছি মেয়েরা বড়দের সামাজিকতম নির্দেশটুকুও পালন করবার জন্য কত তৎপর—যত্ন হয়ে যাওয়া তার বেনে তাদের বড়দের আদেশ পালনে। স্থলে সেই মেয়েরাই বেনে গা এলিয়ে দিয়েছে—নির্দেশ আদেশ করলেই রাগ-রাগ ভাব—পালন না করতে পারলেই বাঁচে—পড়াটুকু শুনেই বেনে উদ্ধার করে দিচ্ছে আমাদের। লিখে নিতে ব'লে, পড়া জিগোস করে আমরা বেনে অপরাধ করছি—মনের এমনি ভাব প্রকাশ করা দৃষ্টি তাদের চোখে।

বড়দের মেনে চলা—এবং মেনে চলে গর্ব ও আত্মপ্রশংসা লাভ আজ-কাল উঠে যাচ্ছে বেনে ভগ্ন থেকে—মেনে চলাটাই নিজেকে ছোট করা এবং আত্মবিশ্বাসহীন। এমনি একটা ধারণা বঙ্গমূল হ'য়ে যাচ্ছে আমাদের ছোটদের মনেও। ক্যাম্পে কিন্তু এর সম্পূর্ণ বিপরীত মনোভাব জেগে উঠতে দেখেছি, এটাই আশ্চর্য্য!

তারা কাজ করতে পারে, তাদের ওপর বিশ্বাস করে কাজের ভার দেওয়া হ'চ্ছে, এ বেনে বাহুদ্বয়ের মত কর্মশক্তি প্রকাশের প্রেরণা। আমাদের বিদ্যালয়ে আমরা লেখাপড়াটুকুর ওপরই জোর দিই—অন্ত কোন দিক দেখি না—তাই তার ফল শৌচীন্য হ'য়ে দাঁড়ায়। যন্ত্রের মত বই মুখস্থ করতে পারে বারা তারাই উৎসে যায় বিদ্যালয়ে—আর সকলের অবস্থা কাহিল হ'য়ে পড়ে। আমার মনে হয়, দারুণ অর্থহীনতার দরুণ যে নিদারুণ অভাব আমাদের, তার ফলে খাত বস্ত্র থেকে আরম্ভ করে সমস্ত কিছুতে বঞ্চিত হ'য়ে হ'য়ে এবং বঞ্চিতদের অভিভাবকত্বে থেকে আমাদের ছোটদেরও দেখ-মনে আপনা থেকেই একটা ক্রৈব্য এসে পড়েছে—তাই কোন কিছুতেই আর প্রাণ থাকছে না, আত্মা থাকছে না।

ক্যাম্পের পরিবেশ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তাছাড়া পেট ভরে খেতে পাওয়াটা একটা বিশেষ কারণ। স্থলে ক'টা ছেলে-মেয়ে ঠিকমত খেয়ে আসতে পার? শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদেরও সেই অবস্থা। তাই ভাল লাগানো ও ভাল লাগার স্ব স্ব শূন্য হ'তে বাধ্য। পুষ্টিকর কঠিকর আহায়ে পরিভুক্ত মেয়েদের দেখে একথা ক্যাম্পে আমার বেশী করে মনে হয়েছে।

আমি শুধু মেয়েদের কথাই বললাম—ছেলেদের সবক্ষেত্রে ঠিক এই একই কথাগুলি প্রযোজ্য।—আমাদের দেশের অভিভাবকদের ছেলেমেয়েদের, বিশেষ করে মেয়েদের, ক্যাম্পে পাঠানোর উপকারিতা সম্বন্ধে বোধ তো নেই-ই, আছে অজ্ঞতা-প্রসূত সন্দেহ, আনাহা, অবিশ্বাস ও তাজিল্য।

এদেশে এসব নতুন বলেই এরকম হয়—দেশের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশের অভিভাবকরাও বুঝবেন, ছেলেমেয়েদের শুধু পুষ্টিগত বিদ্যা অর্জন করবার সুযোগ দিলেই শিক্ষা দেওয়া হয় না—শিক্ষার অপরিহার্য্য অঙ্গ আছে অসংখ্য। ক্যাম্পে থাকতে দেওয়া তাদের মধ্যে এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রয়োজনীয় অঙ্গ।

ভুতোদা: আহা! কি রান্না! কি স্বাদ! কিরে বিমলা
বল বল।

বিমল: সত্যিই অপূর্ব রান্না! আমাকে আর একটু
মাছের ঝোল দিনতো।

বিনয়: আনাকেও। আর একটু চচ্চড়ী। সত্যিই ভালনা,
মাছ, তরকারী, মাংস সবই অপূর্ব।

ভুতোদা: ভাগ্যিস সেদিন মেনি-
দির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল!

তানাহলে এই পোড়া সহরে
কি এমন রান্না খাওয়া যায়।

মেনিদি: ৪ মাস আগে তোমার মধুপুরের বাড়ীতে খেয়েছি
সে রান্নার স্বাদ এখনও মুখে লেগে আছে।

মেনিদি: কি যে বল ভুতো! এত বিরাট সহর-এত
লোকজন; এখানে ভাল রান্নার আর অভাব কি?

বিমল: আপনাকে যে এত ভাল ভাল হাতের রান্না
খাওয়ালাম!

ভুতোদা: হ্যাঃ! এ সহরের লোকজনের তাড়াহড়ো করেই
জীবন কেটে যায়। রান্নাবান্না খাওয়া দাওয়া করবে কখন?
বিনয়: তার মানে?

ভুতোদা: সবসময় পথে ঘাটে প্রান হাতে করে চলা।
মেনিদি, সেদিন তোমার বাড়ী আসার জন্য প্রান হাতে
করে তো এক বাসে উঠে পড়লাম। গাদাগাদি ভীড়।
চৌরঙ্গীর কাছে, আমার পেছনের ভদ্রলোক পিঠে ঝোঁগ
খেয়ে হাত ঘড়ীর দিকে তাকিয়ে বললেন” আপনি আমার
পায়ের ওপর উঠে দাঁড়িয়েছেন ২ টা ৪৫ মি: এখন সোয়া
দশটা দয়া করে যদি নামেন তাহলে আমি অফিস
যেতে পারি।

বিমল: হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ

ভুতোদা: হাসছিস কি! এরকমভাবে বাঁচলে কখনও ফাইন
আর্ট বাঁচে? রান্না খাওয়া এগুলো ফাইন আর্ট। অনেক
সময় লাগে, অনেক ব্যয় লাগে। মেনিদি, যদি এই পোড়া
শহরে বেশিদিন থাকেন, তাহলে এরকম রান্না করতে
পারতেন?

বিনয়: কেন না? তাড়াহড়ো তো আমরা করছি। রান্না
তো করে মেয়েরা, তাদের আর তাড়াহড়ো কোথায়?
ভুতোদা: ইকনমিস্ট পড়েছিস? ডিম্বাণ্ড আর সাম্রাইয়ের
ব্যাপারটা জানিস। বারী থাকে তারা যদি ভাল খাবার না
খায় তাহলে তারা রান্না করে, তাদের ভাল খাবার করার
উৎসাহ থাকে?



সহরের কারমাজী





DI/P. 3B-X62 BG

আর সারাদিন বাসে টামে আফিসে দৌড়ঝাঁপ করে আর ভাল খাবার সম্বন্ধে ভাবার উৎসাহ কোথায়?

বিমল: আপনি বলতে চান যে এখানে ভাল রান্না হতে পারেনা?

ভূতোদা: হয় তো হতে পারে কিন্তু আমাদের মধুপুরের মত নয়। ওখানে দৌড়ঝাঁপ নেই লোকে মনের আনন্দে খায়, মেয়েরা সব সময়ই নতুন নতুন খাবারের কথা ভাবে। এই মেনিদির রান্নাই দৃষ্টান্ত।

মেনিদি: কেন বারে বারে আমার রান্নার কথা বলছেন ভূতো। রান্না সম্বন্ধে আমরা কি সহরের কাছ থেকে কম শিখেছি?

বিমল: দেখুনতো মেনিদি। নতুন জিনিষতো সহরেই আগে আসে তারপর যায় মফস্বল গ্রামে। ইলেকট্রিক গ্যাস এ্যানুমিনিয়াম সবইতো সহরে প্রথম এসেছিল।

বিনয়: আপনি রান্নাবান্নার কথা বলছেন তো “ডালডার” কথাই ধরুননা। “ডালডা” এখন সহরে গ্রামে লক্ষ লক্ষ পরিবারে ব্যবহার হচ্ছে কিন্তু “ডালডা” প্রথম এসেছিল কোলকাতা সহরেরই বাজারে।

ভূতোদা: তুমিও কি “ডালডা” ব্যবহার কর নাকি মেনিদি: মেনিদি: নিশ্চয়ই। আজকের সব রান্নাই তো “ডালডা”য় হয়েছে।

ভূতোদা: এঁাঃ! ডাল, চচ্চড়ি, শুকতো, মাছ, মাংস, সবই “ডালডা”য়? আমিতো জানতাম “ডালডা”য় শুধু ভাজা-ভুজিই হয়।

বিমল: কেন ভূতোদা আপনাকে তো আমরা আগেই বলেছি যে “ডালডা” সব রান্নার পক্ষেই ভাল এবং পুষ্টিকর। সেইজন্য এখন লক্ষ লক্ষ বাড়ীতে “ডালডা” ব্যবহার হচ্ছে।

ভূতোদা: ওঃ সেইজন্যে! মেনিদি, আমি তাই ভাবছিলাম যে তোমার মধুপুরের বাড়ীর রান্নাটা এত বেশী ভাল হয়েছিল কেন। এতক্ষণে বুঝলাম

মেনিদি: আমার মধুপুরের বাড়ীতেও সব রান্নাই “ডালডার” হয়। তুমি যেদিন খেয়েছিলেন সেদিনও সব রান্নাই “ডালডার” হয়েছিল।

বিমল: কি ভূতোদা, আর সহরের নিন্দে করবেন।

বাতিঘর

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

বারি দেবী

এই অব্যাহত নতুন জীবনটার সঙ্গে আপোষ করতে চাইলো সুমিতা। দুঃসহ পরিবেশকে চাইলো সহনীয় করতে। কিন্তু বা হবার নয় তা কোন কালে হয় না,—তাই ওর জীবনপ্রস্থির জটগুলো দিনে দিনে জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠতে লাগলো।

সেদিন সকালে চিঠি লিখছিলো সুমিতা, সোমনাথকে। কখন নিঃশব্দে অসীম এসে পাশে দাঁড়িয়েছিলো, বুঝতে পারেনি।

—বাবাকে চিঠি লিখছো বুঝি?

চমকে উঠে সুমিতা ফিরে চাইলো ওর দিকে,—অদ্ভুত স্বরে বললো হ্যাঁ।

—বেশ তো, বা লেখবার লেখ, আরও গোটাকতক কথা ওর সঙ্গে লিখে দাও।

—কি কথা? শুক কণ্ঠে শুভালো সুমিতা।

—এই কথা, মানে আমি বলতে চাইছি—ঐ তোমাদের লাল-কুটির কথাটা। অত বড় বাড়ীটা শুধু শুধু বলিয়ে বেখে কি হবে? তখন তুমি থাকতে, সে ছিলো অত কথা। এখন দিদিমা থাকতে চান এক পাশে থাকুন, বাকি অংশটা ভাড়া দিলে প্রায় হু'-তিন হাজার টাকা মাসে ভাড়া পাওয়া যেতে পারে। আজকালকার বাজারে গুটা নষ্ট হতে দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়, তুমি বেশ করে গুছিয়ে কথাগুলো লিখে দাও ওঁকে, বুঝলে?

—বাবাকে ওসব লেখা মিথ্যা। কুণ্ঠিত ভাবে বললো সুমিতা, তিনি কাকুর মতামত নিয়ে কাজ করেন না, প্রয়োজন মনে করলে নিজেই করবেন বাড়ীর ব্যৱস্থা।

—হ্যাঁ ঠিকই বলেছো কথাটা। সাধু সেজে ভণ্ডামি করে বেড়ায় যে লোক, সাংসারিক দায়িত্ব-জ্ঞান সে পাবে কোথায়? কিন্তু আমাদের তো ওসব মেনে নেওয়া চলবে না। ভালো-মন্দ, লাভ-ক্ষতি, সব কিছু বিচার করে চলতে হবে। বেশ তো সাধুগিরি করছেন, তাঁর এখন আর বিষয় সম্পত্তির প্রয়োজন কি? একটা শুধু সই করে দিলেই সব কিছুর দায়িত্ব থেকে তাঁকে মুক্তি দিয়ে দেবো, নিশ্চিন্ত মনে ভীৰ্বাস করুন। যত খুসি নেড়োনেড়ি নিয়ে হৈ-টো করুন, আর কিসসুটি বলতে বাবো না—বুঝলে? মাত্র একটি নাম সইয়ের ওয়াস্তা।

কথার জবাব দিলো না সুমিতা। গলাটা বেন কে ওর চেপে ধরেছে, চোখ দুটো হঠাৎ জলে ভরে এলো। সিগারেট বার করলো অসীম, বিয়েতে বৌভুক পাওয়া সোনার সিগারেট-কেসের ভেতর থেকে। হু-চোটের কঁাকে সিগারেটটি চেপে ধরে এ পকেট সে পকেট খোঁজে রূপোর লাইটারটাকে।

—কি হোল? পাচ্ছি না তো লাইটারটা! দেখেছো তুমি?

সুমিতার কাছ থেকে জবাব না পেয়ে, বিরক্ত ভাবে ওর মুখের দিকে চাইলো অসীম,—মাই গড! সন্ধ্যা বাপের

হোঁরাচ লেগেছে বুঝি? কারণাও কিছু খাড়ে চাপিয়েছে দেখছি, শুধু আসলের বেলাই লবডকা!

সিগারেটটা মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, সুমিতার একখানি হাত নিজের বুকের চেপে ধরে সগৰ্জ্জনে বললো অসীম—তোমার ঐ প্যান-প্যানে স্বভাবটা পালটাও মিটা, ওটা আমি মোটেই বরদাস্ত করতে পারিনে। কথার কথার রাঙাপানি করিয়ে অসীম হালদারের মন ভিজোতে পারবে না, ওসব ভাকামি বাদ দাও। সত্যি বা দিয়ে মন ভেজানো যায়, পারো তো সেইটে করবার চেষ্টা করো।

একটা বাঁকুনি দিয়ে ওর হাতটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সশব্দে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো অসীম।

কি একটা কাজে এদিকে এসেছিলেন সুদামের মা বহুনা দেবী। সুমিতাকে নিশ্চল ভাবে চেয়ারে বসে থাকতে দেখে ঘরে এসে বললেন—কি হয়েছে যে মিছু? অমন করে বসে কেন? কা'কে লিখছিলি চিঠি? বাবাকে বুঝি? তা বসে কেন রে? শেখ কর চিঠিখানা?

দর-দর করে চোখের জলের ধারা গড়িয়ে পড়লো সুমিতার হুটি গাল বেয়ে। দশটি আঙুল ঢাকা দেবার চেষ্টা করলো চোখের জলে ভেসে যাওয়া মুখখানাকে। হু'হাতে জড়িয়ে ওকে নিজের বুকে টেনে নিলেন বহুনা দেবী।

—ও মা! এ কি কাণ্ড রে? কেঁদে ভাসিয়ে দিলি? বলি হলো কি? বাবার সঙ্গে মন কেমন করছে বুঝি? না ঠাকুরপোর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে? বলোতো সোনাখুঁচি কোনটা সত্যি? বহুনা দেবীর গলাটা হু-হাতে জড়িয়ে ধরে ওর বুকে মুখ লুকিয়ে ফুলে ফুলে কাঁদলো সুমিতা।

—ওঃ নিজের স্বরে হাত ধরে নিয়ে গেলেন তিনি। ঝিকে ডেকে বললেন—মা তো, ছোটমার চুল বাঁধার বাস্কাটা নিয়ে আর, আমি আজ চুল বেঁধে দেব। মেয়ের কাপেট বিছিয়ে সুমিতাকে নিয়ে বসলেন তিনি।

যি নিয়ে এলো একটি চন্দনকাঠের বাস্কা। ওর থেকে সোনা-বাঁধানো চিকপি বার করে সুমিতার একরাশ ডেউখেলানো চুলের জট ছাড়তে ছাড়তে বললেন তিনি,—চুলগুলোতে কি তেল দিস না, এত রুধু হয়ে আছে কেন রে? সত্বর মাকে বলাব, ভালো করে তেল মাখিয়ে দেবে।

সুমিতা জবাব দেয় না সে কথার। সে তখন স্বির দৃষ্টিতে দেখছিলো সুদামের কটোখানিকে। তারপর আস্তে আস্তে বললো—‘দামীদ’ কবে ফিরবে কাকীমা? হুঁওর চিঠি ঠিকমত পাচ্ছেন তো?

বড় জাঁকে বড়দি বলতে পারেন সুমিতা, চিরকালের ডাক কাকীমা পান্টে বড়দি বলা কিছুতেই সম্ভব হয়নি ওর পক্ষে। অসীমও অত ছোট ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাননি, আর ক'দিন বা ওদের সঙ্গ?

—না, নিয়মিত চিঠি-পতর আর পাই কই? মাসখানেক হল একখানা পেরেছি, তোদের বিয়েতে যোগ দিতে পারলো না বলে হুঃখ জানিয়েছে। কিভাবে ওর এখনও বছরখানেক দেবী হবে, একটা পরীক্ষা এখনও বাকি কি না। একটা চাপা নিঃশ্বাস ফেলে জবাব দিলেন বহুনা দেবী।

সোনার চিকিৎসা দিয়ে মস্ত বড় খোঁপা বেঁধে সোনার কাঁটা গুঁজতে গুঁজতে বললেন তিনি—কি চমৎকার মানিয়েছে দেখতো? রোজ আসবি আমি চুল বেঁধে দেব, তেল নেই, জল নেই, কি হাল করেছিলি চুলগুলোর বল দেখি?

ওদের দু জনকে চমকে দিয়ে ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকলো অসীম। মহা বিরক্তি ভরে টেটিয়ে বললো—আঃ, কখন থেকে যে ডাকাডাকি করছি ছাঁটার পাটি আছে, দু জনের বেতে হবে অলকাপুরীতে। এদিকে দিবা আড্ডা জমাচ্ছে এখানে বসে। বাঃ চমৎকার ঢাকেশ্বরী খোঁপা হয়েছে তো? হি, হি, বৌদি, ঐ দেকলে খোঁপা বেঁধে ও পাটিতে বাবে না কি? হাঃ, হাঃ, হাঃ, করে বিজ্ঞপূর্ণ ঘরকাঁপানো হাসি হেসে বললো অসীম—তা বেশ, তা বেশ, অলকাপুরীর নামকরা নাচিরে মেয়ে সুমিতাকে একেবারে পাড়াগাঁয়ের কলসী কাঁখে বৌ সাজিয়েছে, মন্দ লাগছে না।

সসজ্জ ভাবে মাথার কাপড় টানতে টানতে বললেন বমুনা দেবী—ও মা, তোমরা পাটিতে বাবে? তা তো জানতুম না। খুলে ফেল রে মিতা, ঠাকুরপো যেমন বলে, তেমনি করে চুল বাঁধ।

—আমি এই খোঁপা বড় ভালোবাসি কাকীমা, এ খোঁপা বেঁধে যাওয়া কিছু মাত্র বেমানান হবে না। নরম গলায় জবাব দিলো সুমিতা।

—এই যে বেশ বোল-চাল শিক্ষা হয়েছে মিতা দেবীর। চমৎকার। এর কৃতিত্বটুকু অবগত আমার বৌদিরই পাওনা, কি বলো?

বমুনা দেবীর শাস্ত দুটি চোখে ফুটে উঠলো বিষয়। ঈর্ষ্য আরক্ত মুখে দেবীর দিকে চেয়ে বললেন—তুমি হঠাৎ অত চটে যাচ্ছে কেন ঠাকুরপো! মিতা তো কিছু অশ্রায় বলেনি?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওকে ভালো করে শিখিয়ে দাও বৌদি, কি করে আমার ওপর টেকা মেরে চলতে হবে। এ আমি অনেক আগেই আঁচ করেছিলাম, বড়টা বোকা ঠাউরেছে আমার ঠিক ততটা আমি নই।

—আর নয়! আর নয়! মাপ করো এইবার, কান্নাভরা গলায় কথাগুলো বলতে বলতে ঘর ছেড়ে ছুটে বেরিয়ে গেলো সুমিতা, অসীমও ছুটলো ওর পেছনে। ভাবগতিক ভালো নয়; ফিট তো হয়েছে আছে। সবলে সুমিতার একখানি হাত চেপে ধরে ওকে টেনে ঘরে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিলো খাটের ওপর। তারপর খানিকটা অভিকোলন ওর মাথার ঢেলে দিয়ে, পাখার রেগুলেটরটা শেষ পর্যায়ে ঘুরিয়ে দিয়ে, গলায় স্বর যোলায়েম করে বললো অসীম—কিছু মনে কোরো না রাণী, ব্যবসার ঝামেলার জেঙ্গে আজ মেজাজটা বড় গরম ছিলো। বিশ্বাস করো, ও সব কথা সত্যিই আমি বলতে চাইনি। এবারে ওঠো, তৈরী হয়ে নাও লক্ষীটি।

বারান্দা থেকে ভেসে এলো মস-মস জুতোর আওয়াজ আর দামী সিগারেটের গন্ধ, তারপরই তারি বঠর, আসতে পারি? হলে উঠলো ঘরের পর্দাটা।

—আরে কে ও, অনিল নাকি, সত্যি সত্যিই কুটুম বনে গেছো দেখছি। এসো, এসো—

পর্দা সরিয়ে ঘরে প্রবেশ করলো অনিল। সুমিতা খাট থেকে নেমে এসে ওকে প্রণাম করে গেলো পায়ের ধুলো নিতে।

হুঁপা পিছিয়ে গিয়ে উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলো অনিল। আরে একি একি? ঘটা করে আজ আমার আবার শেরাম কেন রে? বোস বোস! ওর হাত ধরে সোফায় বসিয়ে নিজে পাশে বসলো অনিল।

—তারপর কেমন আছিল? বল। অনেক দিন তো বাসনি ওদিকে! কি হে অসীম, ওকে যে একেবারে হারেমের বিবিসাহেবা বানিয়েছে! দেখছি, বাইরে বেরতে টেকতে দাঁড় না, না কি? তোমাদের তুচ্ছ কান্নারই তো আর পাত্তা মেলে না!

গলায় টাইটা বাঁধতে বাঁধতে জবাব দিলো অসীম। ব্যবসারী মানুষ কুলি-মজুর খাটিয়ে পেটের তাত বোগাড় করতে হয়, সময় কোথায় বলো আড্ডা মারবার? মিতা কেন ঘরের কোণ ছেড়ে নড়তে চায় না সে কথা তাকেই জিজ্ঞেস করো। সারাক্ষণ খালি ঐ বুড়ি জায়ের পাশে বসে কি যে কথা কয় বুঝি না। এই খানিক আগেই এই নিয়ে আমার সঙ্গে একতরফা হয়ে গেলো।

—তাই নাকি? এমন গিন্নি মেয়ে হয়েছিল তুই? নাচ-গান সব কি বাতিল হয়ে গেছে?

—চিরকালই কি আর ও-সব ভালো লাগে ছোট মায়া? স্নান মুখে জবাব দিলো সুমিতা।

—তারপর? অনিলের সর্কাজে কৌতূহলী দৃষ্টি বুলিয়ে বললো অসীম—তারপর? তোমার খবর কি শুনি? সাজে-পোষাকে, চোখে-মুখে তো হাসিমুখ উপচে পড়ছে, বলি ব্যাপারখানা কি? মোটা রকমের কাঁচ টাও জুটিয়েছ বোধ হয়?

ওর সাজে-পোষাকে সত্যিই ছিলো আজ বিশেষত্ব! দামী নীলাভ শ্রুট পরনে, আঙুলে মূল্যবান হীরের আঁটি। গায়ে ভুব-ভূবে সেটের গন্ধ, আঙুলের কাঁকে চাপা ব্লাক এণ্ড হোয়াইট সিগারেট। চোখে-মুখে অলছে ওর খুসির আলো।

—কাঁচ? তা একরকম তাই বটে! হাতের আংলোটা সিগারেটটা ছাইদানীতে চাপতে চাপতে বললো অনিল। খোলাখুলিই বলি তাহলে, সামনের সপ্তাহে বিয়ে করছি ওকতাবকে।

—স্ত্রীরোগ, ধবল ও— বৈজ্ঞানিক কেশ-চর্চা

ধবল, বিভিন্ন চর্মরোগ ও চুলের যাবতীয় রোগ ও স্ত্রীরোগের বৈজ্ঞানিক চিকিৎসায়

পত্রালাপ বা সাক্ষাৎ করুন।

ডাঃ চ্যাটার্জীর ব্যাশন্যাল কিওর সেন্টার

৩৩, একতালিয়া রোড, কলিকাতা-১৯

সন্ধ্যা ৬।—৮।টা। ফোন নং ৪৬-১৩৫৮

বাড়ীতে হাকামা নয়, মানে সাতপাকের বিয়ে নয়, শ্রেক লেখাপড়া সকালে, আর সন্ধ্যাবেলায় প্রাণ হোটেলের একটা পাটি! বাক্স, তোমাদের বিয়ের হাকামা দেখে, ও সাতপাকের বিয়েতে আতঙ্ক ধরে গেছে, হুঁমাস হয়ে গেলো গায়ের ব্যথা যেন মরতেই চায় না।

—শুকতারাকে বিয়ে করছে? কেন হে, আর পাত্রী ভুটলো না? ভুক ভুলে বললো অসীম।

—ভুটবে না কেন হে, জোটাইনি। এক লাইনেই আছি হুজনে, কেউ কাউকে হুতে পারবে না, বুঝলে না? হুজনেই যোজগার করবো, ভালোই চলবে। তবে হুখিল এই যে, যা বড় কৌশ-কৌশ করছেন,—ইচ্ছে ছিলো অর্ধেক রাজত্ব আর একটি রাজকন্তে বাগাবেন ছেলের জন্যে। কিন্তু এইটুকু বোঝেন না যে রাজকন্তে এই লক্ষ্মীছাড়া অভিনেতার গলার মালা পরাবে কোন হুখে? বাকু—মনে হয়, পরে সব ঠিক হয়ে যাবে। কবিটা কিন্তু আচ্ছা ভোল পালটেছে যে মিতা, জামাইবাবু ওর কানে যে কি মন্তব্য বেড়ে গেছেন, দিন-রাত দেখো ঠাকুরঘরে কি সব বিড়-বিড় করছে, আর লখা লখা উপদেশ ছড়চ্ছে।

—আরে আমাদেরও আসে হিতকথা শোনাতে? বলে অভিনেত্রী বিয়ে কোরো না ছোড়মা, সুখ পাবে না। শোনো কথা। —আমি বলি তোমার যাড়ে জামাইবাবু ভুত চাপিয়েছেন, সে ভুতটা কি এবার আমার যাড়ে নামাতে চাস? বেশ আছি বাবা, কেন জালাচ্ছো, আমার মাথার চুকবে না।

কলকর্ত্ত হেসে উঠে বললো সুমিতা—ভুতটার কাছে ছোট মাসী নিশ্চয়ই ভালো কিছু পাচ্ছে, আমার কাছে সেটাকে পাঠিয়ে দাও না ছোট মামা। আর শুকতারাকে বিয়ে করছে শুনে সত্যিই ভালো লাগছেও, ঠিক তোমারই মত।

মনোমত্ত কথাটার ধাক্কার লোকা থেকে শিংএর মত ছিটকে উঠে সামনের টেবিলটাকে প্রচণ্ড একটা ঘুসি মেরে বসলো অনিল। ফুলদানীটা লাকিয়ে আছড়ে পড়লো মেঝেতে। এতক্ষণে একটা কথার মতো কথা শোনালি মিতা। আর সেই জন্তেই তো তাকে অত পেরার করি রে। তা না, যা আছেন হুজুর প্যাটার মত বুঝ করে, বোন আসছেন পুঠান পাত্রীদের মত অলমচার হাতে করে, বাপ যে বাপ, বাড়ীতে বিয়ের খবর দিয়েছি না মরা খবর শুনিয়েছি—বুঝতে পারছি না। তারাকে অবশ্য বলিনি এসব কথা, শুনে ব্যাচরী মন খারাপ করবে।—হ্যাঁ ভালো কথা, জামাইবাবু ঈগগির আসছেন, বিষয়-সম্পত্তির কি-সব ব্যবস্থা করবেন, চিঠি দিয়েছেন ঠর আর্টারিকে খবর দিয়ে রাখতে।

একটা স্বস্তির বাতাস লাগলো যেন সুমিতার অন্তরে। কার্পেটে গড়গড়ি দিচ্ছে ফুলদানীটা, ফুলগুলো ছড়িয়ে পড়েছে এদিক ওদিকে। সেগুলো শুঁড়িয়ে তুলে নিয়ে ফুলদানীতে গুঁজে রাখতে রাখতে হাসিমুখে বললো সুমিতা—বাবাকেই তো চিঠি লিখছিলাম ছোট মামা, বাকু তাহলে ওটা আর শেষ করবো না, ভালোই হল, তাঁর আসার খবটা পেলাম।

—ওঃ, আসছেন তা হলে, অ্যান্ডিনে সুমতি হয়েছে। খবরটা বেশ ঐতিমধুর বটে। তবে আমি একেবারে বাস্তবধর্মী কি না, ও-সব ঐতিমধুর বা হুঁমধুতে আমার লোভ নেই, আমি চাই একেবারে

মধুতাওটি লুঠ করতে। বুঝেছো চাঁদ, ও খবর টবরে মন আমার টগবগিয়ে উঠবে না, বতকণ না সেই আসলটি—হুঁমধুতে টাকা বাজাবার ভঙ্গিতে টোকা মেয়ে, ভুক নাচিয়ে বিজ্ঞপের হাসি হাসলো অসীম।

টেবিলের ওপর ফুলদানীটা বসিয়ে দিয়ে নিঃশব্দে ঘর থেকে চলে যাচ্ছিলো সুমিতা।

—যাচ্ছো কোথায়? ওকে বুঝিয়ে উঠলো অসীম, কাপড়টা ছাড়বে কখন? সময় তো পেরিয়ে গেলো।

অসীমের এমন বিকৃত মুখভঙ্গী অনিল দেখেনি আগে। মিতার সঙ্গে কথাবার্তার ধরণটাও যেন কেমন ধারা। নাঃ, মনটা আজ-কাল একটুতেই কেন খারাপ হয়ে যায়, মাথার রক্ত যেন গরম হয়ে ওঠে। সুমিতার দিকে ফিরে চাইলো অনিল, স্নানমুখে সে ঝাড়িয়েছিলো দরোজার পাশে, হঠাৎ নজরে পড়লো—এই কটা মাসে বড় যেন রোগা হয়ে গেছে ও। চোখের কোলে কালি পড়েছে।

বিবেকের আর অল্পশোচনার কাঁটা হুটো খচ-খচ, করে উঠলো বুকের ভেতর।

—বা'রে মিতা, কাপড় ছেড়ে আর। স্নেহাঙ্ক' কণ্ঠে বললো অনিল,—তোমাদের কোথাও বেকবায় কথা ছিলো বুকি,—তা তো জানি না, মিছিমিছি দেবী করিয়ে দিলাম।

—আরে না, না, দেবী আর কি? এই তো মোটে হুঁটা—সাড়ে হুঁটার গেলই চলবে। অলকাপুত্রে মাসীমার ওখানে নেমন্তন্ন। কেন তোমাদের ডাকেন নি?

—ঐ বাঃ। সত্যিই তো, একেবারে ভুলে গেছি, আজকাল কি সাংঘাতিক ভুলই যে যাড়ে চেপেছে আমার। ওদিকে শুকতারার হরতো বেডি হয়ে আমার অপেক্ষায় বসে আছে। আচ্ছা আমি চলি তাহলে—

চঞ্চল পায়ে দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে, অসীমের হো হো হাসির শব্দ শুনে চমকে উঠে ফিরে চাইলো ওর বুকের দিকে অনিল, হাসিটা যেন শোনালো অবিকল হায়েনার হাসির মতো।

পরের সপ্তাহের শনিবারে গ্রেট ইষ্টার্ন হোটেলের সামনে জমেছে একটি কোঁতুলী জনতা। ছবির মাছবরা আসছে পাটিতে। তাদের দর্শন করে মানবজন্ম সার্থক করার সুতীত্ৰ লালসা নিয়ে, ঘটার পর ঘটা ঝাড়িয়ে আছে গুণাপিপাত্তর দলটি অপরাহু কালে। লাল, কালো, শাদা, সবুজ নানা রং-এর চক্চকে মটোরে চড়ে আসছেন, সিনেমা-আকাশের চন্দ্র, সূর্য, তারকারা! আরো আসছেন ওদের বঁরা আকাশে ওড়ান, পাভালে ভোবান ওদের ঘরকন্নার অভিনব খবর পরিবেশন করে জনসাধারণকে তাক লাগিয়ে দেন, সেই সব সিনেমাপত্রে সম্পাদক ও রিপোর্টাররা। এ ছাড়াও এসেছেন বন্ধু-বান্ধবী, শিল্পী আর সাহিত্যিকবৃন্দ।

অনিলকুমার আর শুকতারার সেন-এর বিয়ের খবরটা বেশ বুঝোচক ভাষায় অনেক আগেই বার করেছিলো সিনেমা-পত্রিকাগুলো। তার সঙ্গে ছিল ওদের মানা ভজিমার কাঁটাগুলো।

বিমিরে-পড়া বাজারটাকে ওরা বেশ জাঁকিয়ে তুলেছিলো, সত্যি-মিথো যেখানে গরম গরম, নিত্য-নতুন খবরগুলো পরিবেশন করে!

এমন জমকালো ভোজসভায় শুধু আসেনি অনিলের কোনো আপনজন, একমাত্র অসীম ছাড়া।

সুমিতা আসতে পারেনি, অসুস্থ বলে। তবে অলকাপুরীর মাসীমা, একাই একশো হয়ে সবাইকে আদর-আপ্যায়ন করছেন, এমন সর্বগুণসম্পন্ন মহিলা বাদের সহায়, তাদের আবার ভাবনা কি। শুকতারার পরেই রক্ত-রং বেনারসীর সঙ্গে মানিয়ে হীরে-চূনির গহনা! আজ আর ওকে দেখে মনেই হচ্ছে না যে এই সেই লাভ্যময়ী অভিনেত্রী শুকতারার সেন! ওর চন্দনআঁকা কপালের উর্দ্ধভাগে ঝলছে মুক্তোর সীঁধি থেকে ঝলসে হীরের মুকুটটি। পাঁতলা আসমানী ওড়নার অবগুণ্ঠসম বধূবেশে ওকে দেখাচ্ছিলো কল্যাণী গৃহলক্ষ্মীর মতো।

প্রমোদোৎসবের ঝড়-ভূঁফান বইছে যেন বনেদি হোটেলটিকে মাতামাতি করে। এক কোণে একটি টেবিলের ধার বেঁসে বসেছিলো অনিরুদ্ধ, আর পম্পিরা। দুজনের হাতে দুজনার হাত বাঁধা।

—এবারে আমাদের বিয়ের পালাটা চুকিয়ে ফেলা যাক, কি বলো? হাতের চাপ দিয়ে বললো অনিরুদ্ধ।

—ঝিন্-ঝিন্ ঝিন্-ঝিন্ শব্দের বন্ধার তুলে হেসে উঠলো পম্পিরা—

—আর, এত তাড়া কিসের অনি? বিয়ে হলোই তো সব

শেষ হয়ে গেলো, যা কিছু রোমান্স তা তো ঐ বিয়ের আগেই! কেমন দুজনকে পাবার জন্য দুজনের হটকটানি, আবার হারাই-হারাই ভয়, তার পরেই হয়তো ক্ষণিক মিলনের রোমাঞ্চিক পরিবেশ—এই তো বেশ। ওর তাত্তের আঙুলগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে জবাব দিলো পম্পিরা।

ওর মুখের দিকে সন্ধিগ্ন দৃষ্টি মেলে চেয়ে দেখলো অনিরুদ্ধ, হাসলো একটু। তারপর আন্তে আন্তে হাতখানা সরিয়ে নিলো।

একটু দূর থেকে ওদের দিকে স্তেনদৃষ্টিতে চেয়ে ছিলো রতনলাল, তার পাশে বসেছিলো অসীম। দুজনের হাতে কেনিল পানপাত্র। এক চুষকে পাত্রটি শেষ করে টেবিলের ওপর বসিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো রতনলাল—কি হে, এরই মধ্যে উঠে পড়লে? আরো কয়েক পেগ চলুক না! জড়িয়ে জড়িয়ে বললো অসীম।

—নাঃ! আর নয়, নতুন ক্যাডিলাক্‌খানার ট্রায়াল দিতে হবে, এক্ষেবারে বেহুঁস হবার উপায় নেই আজ, বুঝলে কি না। বলতে বলতে পম্পিরার দিকে এগিয়ে গেলো রতনলাল—আপনি একাই এসেছেন নাকি মিস রাও? রাজাবাহাদুর আসেন নি? বললো রতনলাল।

—তাঁর আজ শরীরটা যে গোলমাল বাধিয়েছে, তাই তো একা আসতে পারলাম। তা না হলে কি বুড়োর হাত থেকে ছাড়া পাবার যে আছে? বাক্যঃ, বন্ধির মত আগলে বেড়ার, আমার যেন সাত রাজার ধন একটি মাত্র মাণিক ঔর! কলকণ্ঠে হেসে, সোফার গড়িয়ে পড়লো পম্পিরা।

উজ্জ্বল আলো

কে. হোডের

মালোবদন প্রসারিত



কে. হোড ২৩ কোং • কলিকাতা-১৪



ওর সুরে সুর মিসিয়ে হেসে উঠলো বতনলাল।

—তা ঠাণ্ডা কিছু অমূলক নয় মিস বাও! ও মণি-মানিকের চেয়েও আপনি মূল্যবান, অনেকের কাছেই। কি বলেন মিষ্টার বাবু?

—হতে পারে। একটু তেঁসে জবাব দিলো অনিরুদ্ধ।

—চলুন না মিস বাও, নতুন ক্যাডিলাক্সটার আজ ট্রায়াল দিতে যাবো,—ভারি আত্মদায়ক গাড়ীখানা। যেমন ডাডহীসের মতো গড়নটা, তেমনি তুলতুলে নরম সিটগুলো চড়লে আরো মজা, যেন হাওয়ার সমুদ্রে ভেসে চলেছি। আপনিও চলুন না মিষ্টার বাবু, বেশ ফুটফুটে চাঁদনী রাতটা পাওয়া গেছে।

—না, এখন তো আমার বাবার উপায় নেই মিষ্টার ফ্রেড্রিক, জরুরি কাজ আছে আমার। পরে একদিন দেখবো আপনার রাজহাঁসটাকে।

—প্রিয়ঃ এর মত লাকিংয়ে উঠে দাঁড়ালো পম্পিয়া। হাসি-খুসিতে চুলবুলিয়ে বললো,—চলুন, চলুন মিষ্টার ফ্রেড্রিক! আঃ! কি ওয়াগারফুল প্রানটা বাতলেছেন আপনি,—তার পর অনিরুদ্ধর কাঁধটি এক হাতে চেপে ধরে দুজিয়ে দিতে আত্মতৃপ্তি ভোগতে বললো—তুমি দিন দিন বড় বাজে হয়ে যাচ্ছে। অনি! এমন সুইট ইভনিংটা কি কাজ করার জন্যে? আঃ, কি আলোর বজা, শুধু তেঁসে বাওয়ার রাত আজ, আর কিছু নয়, আর কিছু নয়।

—আপাতত মামলার স্রোতে ভাসছি পম্। সে জন্য আর নতুন করে ভাসবার ইচ্ছে নেই। যুহ তেঁসে জবাব দিলো অনিরুদ্ধ।

—তবে আর কি করা যাবে? আহুন মিস বাও! তাৎ হাত জড়িয়ে বেরিয়ে গেলো ওরা দু'জন। অনিরুদ্ধকে বাবার সময় হাত নেড়ে পম্পিয়া বাই, বাই, কবে যেতে ভোলেনি।

স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে সিগারেট ধরালো অনিরুদ্ধ।

—কি দিতে বলবো তোমার? বিয়ার? রাম? হইন্ডি? না জিন?

একটু ঘেন চমক লাগলো অনিরুদ্ধর, কারণ অজ্ঞানত্ব হয়ে পড়েছিলো সে। কখন অসীম এসে যে দাঁড়িয়েছে পাশে, বুঝতে পারেনি। ওর প্রশ্নের জবাবে বললো,—নাঃ, কোনটাই নয়। বরং এক গ্রাস ঠাণ্ডা জল খাওয়াতে পাবো?

—বলো কি? ঠাণ্ডা জলে কি মনের জ্বালা কমানো যায়? মন জুড়োবার অব্যর্থ ওষুণ হলো তো ঐগুলো, যেটা হোক একটা নিয়ে বসো। পাঁচ মিনিটেই দিল খোঁলসা হয়ে যাবে।

—আপাতত মনটা আমার বেশ ঠাণ্ডাই আছে অসীম, আর সে সম্পূর্ণ সুষ্ব। কাজেই কোনো দাওয়াই-এর প্রয়োজন তার হচ্ছে না। যুহ হাতের সঙ্গে জবাব দিলো অনিরুদ্ধ।

—মাই গড! তোমাকে কলা দেখিয়ে পালালো ওরা আর তুমি এখনও বলবে, তোমার মন সুষ্বই আছে? আর তা যদি বলো, তবে আমি বলবো, তুমি একটা আন্ত পুরুষমানুষই নও। বীরভোগ্যা বসুন্ধর্য, বুঝেছো হে? থাকে চাঙ, নিজের পুরুষ জাহির করো তার কাছে। একটা মেয়েমানুষকে বেশে আনবার জন্যে খুব বেশী শক্তি খরচ করতে হয় না, একটু চাই কলাকৌশল, ব্যস, সব ঠাণ্ডা। কথা শেষ করে ঢুক ঢুক করে খানিকটা হইন্ডি গলায় ঢেলে বোতলটা টেবিলের ওপর সশব্দে বসিয়ে দিয়ে সোকার গা এলিয়ে দিলো অসীম।

—তোমার মূল্যবান উপদেশের জন্য ধন্যবাদ অসীম! তবে আকস্মিকের কথা এই যে, উপযুক্ত ক্ষেত্রে কথার বীজগুলো যদি ছড়াতো, তাহলে খুব উত্তম কসল লাভ হতো, কিন্তু এটা একেবারে থাকে বলে পতিত জমি, বাক্যবীজগুলো তোমার ঐ মাঠেই মারা গেলো। আচ্ছা, চলি ভাই, একটা জরুরি বেশ রয়েছে হাতে। উঠে দাঁড়ালো অনিরুদ্ধ। হুঁ পা এগিয়ে গিবে আবার ফিরে এলো। একটু ঝুঁকে পড়ে নিচু গলায় বললো—তোমার ঐ গায়ের জোরে দখল-করা মেয়েমানুষ সম্পত্তির ওপর আমার কিছু বিলুপ্তি লাভ নেই অসীম! আমি হচ্ছি মনের ব্যাপারী। ফুলের মতো স্নেহের মনের ওপরই আমার আকর্ষণ বেশী। সে রকম কিছুর সন্ধান পাও তো জানিও। প্রাণখোলা হাসির বড় তুলে অসীমের হাতটা ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে চঞ্চল পদক্ষেপে বেরিয়ে গেলো অনিরুদ্ধ।

—হোপলেশ! শালা একেবারে মেয়েমানুষ বনে গেছে। বিকৃত স্বরে বললো অসীম।

পাশ দিয়ে যেতে যেতে মাসীমা হি-তি করে তেঁসে উঠে জিজ্ঞেস করলেন—কারণ কথা বলছো অসীম?

—আবার কার? ঐ অনিরুদ্ধটার। বিলেতে বাবার আগে তবু মনুষ্য বলি ওটার কিছু ছিলো, কিন্তু এই ঘুরে আসবার পর দেখি একেবারে অপদার্থ হয়ে গেছে—কতকগুলো বড় বড় কাঁকা বুলিতে পেটটা বোঝাই করে এনেছে, আর যখন তখন গুগরাচ্ছে সেগুলো।

—সাতা বাত! আমিও ভাবছিলাম তাই, অসীমের পিঠ চাপড়ে বললেন মাসীমা। কত ছেলেমেয়ের ভোল ফিরলো এই মাসীমার আঁখডায়, শুধু হল না কিছু ঐ ছোকরার! মদ নয়, কত ভালো ভালো, মেয়েদের লেলিয়ে দিলাম, কিছুতেই কিছু নয়? একেবারে কলির শুকদেব ঠাকুর! তবে মন্দের ভালো বলতে হবে, পম্পিয়ার দিকে যেন ঝাঁক পড়েছে একটু! দেখি আবার কতদূরের জল কতদূরে যায়।

—হল না, মাসীমা হল না, আপনার চৌপ গিলেছে একেবারে রাগব বোয়ালে; কই-কাতলার জন্তু ও চৌপ নয়! একটু হিসেবে ভুল হয়েছে আপনার। মুচকে মুচকে হেসে, চুলু চুলু চোখ চেয়ে বললো অসীম।

—মাই গড! তাই নাকি? ব্যাপারটা কি খুলেই বলো না ভারসিং! ডায়া-ডায়া চোখে চমক খেলিয়ে শুধোলেন মাসীমা।

—বিশেষ কিছু নয়। ঐ বতনলালের নতুন সঙা করা ক্যাডিলাকে চড়ে এই চাঁদনী রাতে একটু হাওয়া খেতে গেছে পম্পিয়া বাও। তা আমি বলি কি, ঠিকই করেছে সে, ঐ নিরিম্বি বোম্বটার সঙ্গে হাঁপিয়ে উঠেছিলো ব্যাচারা। ছাঃ, ছাঃ, ওটা পুরুষ নয় মেয়েমানুষও নয়, একেবারে থাকে বলে ক্লাববিশ। কোনো মেয়েই বেশী দিন সইতে পারবে না ওকে, এ আমি হলপ করে বলতে পারি।

—বাক বাঁচালে আমার। বড়ে প্রাণ এলো এতক্ষণে। আমি ভেবেছিলাম বাইরের কেউ ছেঁ। মারলো বুঝি? বতনলাল তো আমাদের ঘরের লোক, পাওনা-কড়ি আমার মারবে না। কিন্তু অসীম, মাত্র পাঁচ হাজার ঠেকিয়ে তুমি যে চুপচাপ মেয়ে গেলো, বাকিটার কি করছো?

দাঁড়ান, দাঁড়ান! সব্ব করুন, মেওরা ফলতেও পারে, আবার নাও পারে। আমি পেলাম কি? যে তার ভাগ দেব? শীগ্গির আগছে সন্নিহি ব্যাটা, দেখি কি করে? মোটারকম আদার হয়ত আপনার মুঠোও ভরবে। আর তা না হলে ঐ যুগীকগীর দাঁতকপাটি বদি শুধু বরাতে আমার ঠক ঠক করে, তাহলে আপনার কপালেই বা বন-বন বাজবে কোথা থেকে বলুন?

—তা বটে! তা বটে! ঠিক আছে। এখন আসছেন সোমনাথ বাবু তখন নিশ্চয়ই এবার সব লিখে-পড়ে দিয়ে যাবেন! ঐ তো একটা মেয়ে, প্রচুর সম্পত্তি আছে শুনেছি, ভাগীদারও নেই কেউ! বুঝছো অসীম!

চোখ নাচিয়ে বিজ্ঞের হাসি হাসলেন মাসীমা।

—আরে চূপচাপ বসে কেন? ইটালী, ফরাসী, স্পেন, সব কিছু জানতে বোলা, প্রাণ খুলে তোমার গুডলাককে রিসিভ করি।

—বেশতো অর্ডার দিন! হাদিয়ুখে বললো অসীম!

নিজের গেলেন মাসীমা। পছন্দ করে আনলেন, বেশ কয়েক বোতল দামী দামী মাল, বেয়ারার কাঁধে চাপিয়ে!

আর সঙ্গে করে আনলেন, অলকাপুরীতে নতুন ভর্তি হওয়া করেকজন ছেলে-মেয়েকে! লাখপতি, ক্রোড়পতির ছেলেমেয়েরাই মাসীমার সঙ্গে বসে পান করবার অধিকার পায়। কিছুদিন যেতে না যেতে ওরা মোটা অঙ্কের বাজি বেখে মজ্ঞশানের পান্না দিতে শুরু করে। এটা নাকি উটমহলের দামী ক্যাসান! বাজি বেখে তাদের পুকার, ক্রাশ, আর ত্রিভ্র খেলাও চলে অলকাপুরীতে! সকল ক্ষেত্রেই বেকীর ভাগ বিজয়িনী হন মাসীমা। টাকার তোড়া নামিয়ে বেখে, শূন্য হাতে, কিন্তু অহ্লাদে পূর্ণ মন নিয়ে কিরে বার ধরী দুলাল-দুলালীরা!

মাসীমার কাছে হেবেও সুখ!

নিজের হাতে মদ ঢেলে সকলকার গেলাস পূর্ণ করে দিলেন মাসীমা।

সকলে গেলাস ঠোকাঠুকি করে অসীমের সৌভাগ্য কামনা করলো!

তারপর হু-হু করে খালি হতে লাগলো বোতলগুলো।

অর্কেষ্ট্রায় বাজছে ইংরিজি প্রেমের গান! কেউ কেউ জুতো ঠুকে তাল দিচ্ছেন বাজনার সঙ্গে। কোথাও কপোত-কপোতী সম, নিরালার যুথোযুথি বসে বিবুদ্ধ প্রেমিক-প্রেমিকার! বিয়ের আগের পূর্বরাগ নয়, নিত্য-নতুন প্রেমের হাটের ফেরী ওরা! যত দিন দুজনে দুজনার মনে রূ হুড়াতে পারে তত দিনই চাইবে পরস্পরকে, তারপর আবার হয়তো দেখা হবে ওদের সঙ্গী বদল হয়েছে!

আগেকার দিনের হতাশ প্রণয়ীরা বিব খেতো, লেকের জলে ডুবে মরতো, এখন আর সে সব ফাসান চলে না,—হু-চারদিন বড়জোর মদের লৈকে হারুডু খায়, তারপরই চাঙ্গা হয়ে উঠে নতুন যুথের সন্ধান করে।

—চারি দিকে পানোৎসব চলেছে! শুধু আজ ওসবের প্রয়োজন নেই নব সম্পত্তির! ওরা বেন সব পেরেছির দেশ খুঁজে পেয়েছে! পরিকল্পিত বিমল আভা ঠিকরে পড়ছে ওদের দৃষ্টিপ্রানীপ থেকে! হাতে হাত বেখে পরম শান্তির কোলে অজ এলিয়ে দিয়ে

বসেছিলো ওরা দুজন! আজ বেন ওরা নিরপেক্ষ দর্শকমাত্র আর ওদের সামনে একটি খিচুড়ী-সোসাইটির অভিনয় হচ্ছে।

ওদের চোখে আজ এ অভিনয় একবারেই অর্থহীন বসহীন বোধ হচ্ছে, এ সবের প্রয়োজন আজ ওদের ফুরিয়েছে!

ক্লিক-ক্লিক—মাঝে-মাঝে জলে উঠছে স্লাশলাইট। ফটো নিচ্ছেন সাংবাদিকেরা, আলোকচিত্রশিল্পীরা।

ডিনারের শেষে আবার চললো পানোৎসব।

জমজমাট পাটি ডাঙার মুখে সবাইকে চমক লাগিয়ে দিয়ে এসে দাঁড়ালো সুমিতা।

—আমি এসেছি ছোট মামা!

—চমকে উঠে চাইলো অনিগ সুমিতার দিকে। বেন কিরে এলো ওর মনটা কোন দূর-দূরান্তর স্বপ্নলোক থেকে।

—এত দেহীতে এলি মিতু? শরীর এখন ভালো তো! একটু হেসে বললো অনিল।

—হ্যাঁ, এখন একটু ভালো বোধ করছি। বিকেলে বড্ড মাথাটা ধরে ছিলো, ভেবেছিলাম আগুনেই পারবো না, কিন্তু বড্ড খারাপ লাগছিলো তাই চলে এলাম। নিতেজ গলায় বললো সুমিতা।

—কিন্তু এমন সাগামাটা বেশ কেন ভাই? এ তো বিয়েবাড়ীর সাজ নয়, এ বেন শ্রাধ-বাড়ী যাওয়ার সজ্জা।

কলিকাতায় এই সর্বপ্রথম
আর্যের "স্লাইসড ব্রেড"



• কলমে প্রস্তুত
• ইন্সমে সঁকা
• মেসিনে প্যাক
• ও ফালি করা

আপনার স্বাস্থ্য, তৃপ্তি
ও সঞ্চয় বক্ষা করিতে

আর্য বেকারী অ্যান্ড কন্ফেকশনারী
কলিকতা - ২৯

মেকি খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসছে আসল শুকতার। টোট চেপে বাঁকা হাসি হেসে বললো—তোমার দিদিমা, মাসীমা কেউ তো এলেন না, তুমি যদি বা মনে করে এলে, এমন উদাসিনীর বেশে কেন তাই ?

সত্যিই উদাসিনীর বেশে এসেছে সুমিতা ! লালপাড় সাদা চাকাই শাড়ী পরনে। সস্তা স্নান-করা ভিজ়ে চুলের রাশ ছড়ানো পিঠে। হাতে অল্প কয়েকগাছি সোনার চূড়ি, আর অঙ্গে নেই কোনো অলঙ্কার। মুখখানি স্নান বিবর্ণ, তবুও কি অপূর্ব লাবণ্যময় ! শাস্ত্র পবিত্র শুভ্র জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে যেন ওর সর্বাঙ্গ থেকে। সে রূপের আলোর স্নান হয়ে গেছে বহু প্রসাধন বিচিত্র বসন-ভূষণে সজ্জিত। অস্ফুট রূপসীদেহ রূপপ্রভা। তার। সকলেই নির্বাক দৃষ্টি মেলে চেয়েছিলো ওর দিকে।

—শরীরটা ভালো ছিল না কি না, তাই এমনিই চলে এলাম—শ্রিতহাস্তের সঙ্গে জবাব দিলো সুমিতা। তার পর কাপড়ের চাপা সরিয়ে বার করলো একটি ভেলভেটের কেস। কেসটি খুলে শুকতারার মণিবন্ধে পরিবে দিলো একটি হীরের ব্রেসলেট, তার মাঝে ছোট্ট বাড়ি জাঁটা। আর অনিলের আঙুলে পরালো একটা হীরের আঁটি।

—এ কি ! এ কি ! করেছিস কি মিথু ? বাপ রে, এ যে দেখছি বহু টাকার ব্যাপার। ব্যস্ত ভাবে বললো অনিল।

—না না, এমন আর কি ! ও তো আমার ঘরেই ছিলো, ব্যবহার হয় না, তাই—লজ্জিত ভাবে জবাব দিলো সুমিতা।

শুকতার। নিজের হাতটি ঘুরিয়ে-কিরিয়ে দেখছিলো, বেশ খুশি হয়েছে মূল্যবান উপহারটি পেয়ে। উঠে দাঁড়িয়ে এক হাতে সুমিতার গলাটি জড়িয়ে ধরে বললো—কি চমৎকার জিনিষটি ! তারি পছন্দ হয়েছে আমার ! বোসো ভাই, তোমার খাবার দিতে বলি।

—তুখু এক গ্রাস সরবত খাবে। আজ আর কিছু নয় ভাই। খাওয়া আমার পাওনা রইলো, বললো সুমিতা শুকতারার হাতটা চেপে ধরে।

একটু দূরের কোণখোঁবা সোফার বসে বসে বসেছিলেন মাসীমা। ডিকের মাজাটা একটু বেশী হয়েছে, মতপানের কম্পিটিংনে বাজি অবগত জিতেছেন।

প্রতিদ্বন্দ্বীরা উঠে গিয়ে ভিড় জমিয়েছে সুমিতার পাশে। শুখু অসীম ছিলো মাসীমার কাছে। হঠাৎ সামনে চাপা ভীড় আর মহু গুলনের আওয়াজে মাথা তুলে সোজা হয়ে বসলেন তিনি। চুপ-চুপ চোখে চেয়ে শুধোলেন—ব্যাপারটা কি হে ? কোথাও অ্যাক্সিডেন্ট হল নাকি ?

—না, ঠিক তা নয়—দেবীর আবির্ভাব হয়েছে ওখানে—মানে সুমিতা দেবীর—অবজ্ঞার হাসির সঙ্গে জবাব দিলো অসীম।

—আঁ কি বললে ? মিতা ? বলো কি আঁ ?

ঘুম ভেঙে জেগে উঠলেন মাসীমা। টলতে টলতে ভিড় সরিয়ে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন সুমিতার সামনে।

ফুলো রাজা চোখ দিয়ে সুমিতার আপাদ-মস্তক লেহন করে হঠাৎ হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠে ওকে সবলে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

—ভাই তো বলি, এ কি হতে পারে ? মিথু আসবে না তা কি হয় ? আঁ, সে কি না এসে পারে ? ও মাই সুইট গার্ল ও

মাই ডারলিং, তোর জন্তে যে অন্তরঙ্গ এই বুকা খাঁ-খাঁ করছিলো... জড়িত কণ্ঠে প্রলাপ, বিলাপ করতে করতে সুমিতাকে চুমোর চুমোর ভরিয়ে দিলেন মাসীমা।

—কি পান করছে মাই ডারলিং ? তোমার গ্রাসে ওটা কি ? শেরি ? অর বিয়ার ? না, না, ও তেমন ভালো নয়—আমি দিচ্ছি সব চেয়ে সেরা মাল, তোমাকে আজ খাওয়াবো। ইঁা আলবৎ খাবে, আমার সঙ্গে বসে এক গেলাসে খাবে ডারলিং ! সুমিতাকে জড়িয়ে ধরে টেনে নিয়ে বসলেন মাসীমা।

তড়িং গতিতে এগিয়ে গিয়ে সুমিতার এক হাত চেপে ধরলো অনিল। ওকে ছেড়ে দিন মাসীমা, ও আজ বড় অসুস্থ, মিনতি ভরা কণ্ঠে বললো অনিল।

—অসুস্থ ? তাতে কি ? খুব ভালো দাঁওয়াই দেব, ওসব রোগ-বালহি পড়পড়িয়ে পালাবে। হো-হো করে হেসে উঠলো আশে-পাশে ছিলো যারা।

—মাসীমাও যোগ দিলেন ওদের হাসিতে—ঠিক বলিনি ? কি বলো ভাই তোমরা ? হা, হা, হা, হা, হি, হি, হি, হি, হাসতে হাসতে বিবম খেয়ে হেঁচকি তুলতে লাগলেন তিনি। সোরগোল পড়ে গেলো ঘরে। নিয়ে আর জল, পাখা ? পাখা তো নেই—ঠাণ্ডা করা ঘর, বিজলী-পাখার প্রয়োজন ফুরিয়েছে তাই। ক্রমাল নেড়ে সবাই হাওয়া করতে লাগলো মাসীমার মাথায়। অসুস্থ হয়ে ক্রমালে চোখ মুছে এ-দিক ও-দিক চাইলেন মাসীমা—মিতা ! মিতা কৈ ?

ভাই তো সুমিতা তো নেই ! গোলমালের ভেতর কখন সে চলে গেছে।

ভিড়ের ভেতর থেকে কে যেন সরু গলায় টিল্লনী কাটলো—পাখী উড়ে গেছে।

—কে বললে এমন কথা ? শূরোর, গাধা, রাঙেল,—ইডিয়ট ব্রাডি অ্যান 'কোথাকার। ছ' কোমরে হাত দিয়ে গর্জন করতে লাগলেন মাসীমা,—নোংরা মাতাল সব। মাতলামী করবার জায়গা না জোটে তো ডাষ্টবিনে বা, জাহান্নমে বা, এখানে কেন ?

আঙুলে আঙুলে ভিড় পাতলা হয়ে যেতে লাগলো। অসীম এগিয়ে এলো এক গ্রাস রাম হাতে নিয়ে। মাসীমার হাতে তুলে দিয়ে বললো—যেতে দিন মাসীমা, ও-সব নোংরা ঘেঁটে কাজ কি ? বরং আরেকটু—

—ইয়েস ! ইয়েস ডারলিং !

ফেনিল পাত্রটিতে চুষুক দিয়ে ধপ করে সোফার বসে পড়লেন মাসীমা। পাত্রটি নিঃশেষ করে সোফার মাথাটি হেলিয়ে দিয়ে, চোখ বুজে, ক্লান্ত ভাবে বসলেন তিনি—আরেকটু ঢালো ডিয়ার। গরম করে দিয়েছে মাথাটা ছায়ালা মাতালগুলো,—এই যে,—এখনি সব ঠিক হয়ে যাবে, মাসীমা ও-সব নেড়ি-কুস্তার খেউ-খেউ-তে কান দিচ্ছেন কেন ? আপনার মর্দ ওয়া জানে কি ? গ্রাসে হইতি ঢালতে-ঢালতে বললো অসীম।

—তা বটে ! তা বটে ! আজ্ঞা দে মাথা দোলালেন মাসীমা।—কয়েক পেগ শেষ করে চক্ষু বিস্ফারিত করে চারি ধারে চেয়ে জড়িত কণ্ঠে বিশ্বযোক্তি করলেন, মাই গড ! একেবারে শূন্য পুরী বে ! বানের জলে ভেসে গেলো না কি সব ? [ক্রমশঃ]



ব্যবহার করুন
হিমালয় বোকে
ট্যালকাম পাউডার



স্বাস্থ্যমিত
সতেজ
শাকর জন্যে

- এত সুগন্ধ
- এত কম খরচ
- সারা পরিবারের
মনেই আদর্শ



একমাসিক লগনের পক্ষে হিন্দুস্তান লিটারি লি, কর্তৃক উৎসর্গ

চন্দ্রা তার নাম

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

৭

দিনটা ছিলো কোনো এক পরবের। বুধ বা শিবরাত্রির পরদিনই হবে। ত্রিভুজুলারী আর চন্দ্রা দুজনেই এসেছিলো সতীচৌড়ার ঘাটে স্নান করতে। ঘাটে পুরোহিত বসে থাকেন ছাতার তলার চৌকি পেতে। চোখ বুঁজে গঙ্গামাতার স্তব গাইতে গাইতে তিনটে ডুব দিয়ে উঠে এলো চন্দ্রা গঙ্গাজলে বড় একটি ঘটি ভরে নিয়ে। তারার ছোট একটি বড়া। গঙ্গার শালা বালিতে মজে তাকে সোনার মতো ঝকঝক করেছে চন্দ্রা। ঘটের কানায় কানায় জল। চন্দ্রার দেহে-ও যৌবন ভরা-ভরা। একটি করে সিঁড়ি ভেঙে ওঠে চন্দ্রা আর শীতের আমেজ লাগা ঠাণ্ডা বাতাসে তার চুল ঝাপটায়। পুরোহিতের সামনে ঝুঁকি নিচু হয়ে প্রণামী নামিয়ে দিলো চন্দ্রা একটি রূপোর সিক্কা টাকা। মনে বেন গর্ভও ছিলো। এত জন তো দিচ্ছে। কই, এই সাতার সালে এমন করে এক টাকা দিতে পারে কে?

সঙ্গে সঙ্গে আর একজন নিচু হয়ে দিচ্ছিলো প্রণামী, সে মুখ তুলে তাকালো। তাকিয়ে একটা নয় দুটো টাকা দিলো ব্রাহ্মণকে। অমনি অজ্ঞাত পুণ্যাধিনী মেয়েদের মধ্যে ছোট ছোট গলায় শুধন উঠলো। সোজা কথা তো নয়! একটা চেবুয়া পরলা, তারার লোহার মিশাল দেওয়া, তাই যদি পায় ব্রাহ্মণ দিনে চারটে, ছ-টা, তো তার দিন চলে যায়। এক মণ চাল এক টাকা, চল্লিশ সের আটা এক টাকা—তিন টাকা সকাল বেলা এমন বসে বসে পাওয়া পরম পৌভাগ্য।

চন্দ্রা অথর দংশন করলো অপমানে। ততক্ষণে তাদের দুজনকে ঘিরে এসেছে ভিখারীর দল। অন্ধ কিশোরীটি বসে আছে সিঁড়ির ওপরের চবুত্তরায়। তাকে তার মা বসিয়ে দিয়ে গিয়েছে সকালে। সে শুধু বলছে—সুরদাসকে দয়া কর! বলছে আর কুঁকি দিয়ে গেয়ে উঠছে একই গানের কলি।

—বসো যেবে নৈনন নন্দলাল!

ভীষণ মিঠে সেই কিশোরকণ্ঠ। গানের কুঁকির শেষে সে উৎসুক মুখ তুলে তাকাচ্ছে সামনের দিকে। ওপাশে ভিখারীদের কলরব শুনে সে ব্যগ্র হয়ে উঠেছে। আজকে তার চান্দরেও পড়বে চেবুয়া, পাই, আখলা। আর যদি আট-দশ পরলা কামাই হয়, তো মা তাকে দোকান থেকে পুরী-জিলাপী খাইয়ে নিয়ে যাবে। মুখ তুলে তাকাচ্ছে অন্ধ বালক। আর হুই অন্ধ চোখের ওপর সকালের আলো বুয়ে বাচ্ছে।

চন্দ্রা মনে মনে অপমানে ঝলে বাচ্ছে। আজ তার কাছে বেশী টাকা নেই। সব পরলা, আখলা, পাই। একটি টাকা আছে, সে অন্ধবালককে দেবে, মনে মনে মেনে রেখেছে। এই অপরিচিতা গরিবার ব্যবহারে সে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে।

সুরদাসের সামনে এসে চন্দ্রা বালকের হাতে একটি টাকা দেয়। আর অমনি ত্রিভুজুলারীর দাসী এসে দাঁড়ায়। বলে—বিবি তোকে দুটো টাকা দিলো। ধর, সুরদাস!

বড়লোকের দাসী! তার অহংকার কতো! চন্দ্রার দিকে চেয়ে সে চোখ ঘোরায়। বলে—আজ বিবি দান করবে কত! পঞ্চাশ টাকা।

চন্দ্রা না বলে পারে না—কে তোর বিবি?

—ব্রাইটের বিবি ত্রিভুজুলারী। কানপুরে তাকে না জানে কে?

চন্দ্রা প্রাণের মেয়ে। বিধে বিধে কথা করে জালা দিতে সে জানে। সে বললো—ও! উঠতে লাগলো সিঁড়ি ভেঙে, আর বলতে লাগলো—তবে তো তাজার টাকা দান করা উচিত। যার যত পাণ, সে ততো দান করবে। যার পুণ্য আছে সে কি পুণ্যের লোভে এমন কাড়াল হয়ে বেড়াবে?

শরসন্ধানে তুল হয়নি। ঠিকই বিঁধেছে! ত্রিভুজুলারীর মুখ অপমানে রাঙা হয়। নিশ্চয়, বিষয় এক মর্মর-প্রতিমা যেন সজীব হয়। কথা কইতে চেয়েও কয় না সে। ত্রস্তে মুখ নিচু করে সতীদের স্মৃতিছত্রীতে জল চালে, মিঠাই-ফুল দেয়।

কেন এমন হয়? আজ দু'দিন ব্রাইট ঘরে নেই। গেছে ভগবানপুর। প্রতি রাত্রির সে তাওব, সে অত্যাচার দেহে বহন করে মরে যায় ত্রিভুজুলারী। সর্বান্তে সোনার গহনা, সে-ও তো ব্রাইটের একটা বর্ষর অহংকারের পরিচয়। ব্রাইট যে তার বিবিকে কত ভালবাসে তাই দেখাতে চায়। ত্রিভুজুলারী কি জানে না, যে ব্রাইটের প্রতি মাহুঘের ঘৃণা ও অবিদ্বেষ, সবটাই তাকেও চিরতরে কলঙ্কিত করেছে। তাকে-ও সকলে ঘৃণা করে।

কিন্তু আজকের সকালটি যে তার ভালো লেগেছিলো? ভালো লেগেছিলো আজ স্নান করতে। মনটা ছিলো প্রসন্ন। কোনো এক শুভ সংবাদের প্রত্যাশা যেন মনটাকে সোনালী করেছিলো। আর ঐ যে মেয়েটি, ও তো চন্দ্রা! চন্দ্রার নাচ সে দেখেছে বটে ক্যান্টনমেন্টে। আজ ঐ তরুণী মেয়েটিকে দেখে বড় ভালো লেগেছিল তার। ব্রাহ্মণকে পরলা দিতে দিতে এখনও ভেবেছিলো সে, যদি মেয়েটি তার সঙ্গে ভাব করে তো বেশ হয়।

হলো কই? তার নির্বোধ দাসী কি বললো, আর ঐ চন্দ্রা

অমন করে যেনে উঠলো? ত্রিভুজলারীর মনটা নিমিষে ভারী হয়ে গেল। চোখ নিচু করে সে জল দিতে দিতে চললো। আর পরসার প্রত্যাশায় একটি ছোট ছেলে, বুঝি বা ব্রাহ্মণই হবে, বলতে লাগলো—এইখানে সতীরা স্বর্গে গিয়েছেন। আগুনের শব্দ আর বসে, স্বামীর পা বুকে ধরে। স্বর্গ থেকে রথ এসেছে। সতীকে নিয়ে গিয়েছে। এখন সতীরা অনন্তকাল স্বর্গস্থ করছেন।

চম্পা এমন সুরোগ ছাড়ে না। বলে—বাচ্চা! মিছে কথা বলিস না। কোম্পানী কাহ্ননের অনেক পরেও আমার গাঁ ডেরাপুবে এক নিবোধ মেরেকে কেশবরামের মামা সতী করেছিলো। সে শুধু চৈতন্যেছিলো আর কৈদেছিলো ভয়ে। আমাদের গাঁয়ের সব বুড়ো-বুড়ীরা দেখতে গিয়েছিলো। কোথায় ছিল রথ? কোথায় ছিলো স্বর্গ?

বালক হেসে বলে—তবে তুমি জল দিচ্ছ কেন?

—দিচ্ছি এই জন্তে যে, বড় জল-জলে মরেছে বেচারীরা! এখন একটু ঠাণ্ডা হোক। জানিস না তুই? যে রাত্তির বেলা এখান থেকে কান্না আর চীৎকার শোনা যায়? সেইজন্তে দিচ্ছি। পুণ্যের দরকার কি আমার? আমি তো আর পাগী নই?

ত্রিভুজলারী আহত ও পাণ্ডুস্থে তাকায়। বলে—বহিন, তুমি না মান, অস্ত্র ব্যাধি মানে, তাদের ছোট করে না।

—আমি কান্নার বহিন নই। বলে ত্রিভুজলারী মতো ভেজা শাড়ীর আঁচল ঝাট্টে চলে যায় চম্পা। ঘরে আসে সম্পূর্ণের জন্তে মিষ্টি কিনে। বলে—বুঢ়া, খাও। তারপর বলে—তোমাদের বিবিসাহেবাকে আজ দোকান লাগিয়ে এলাম।

আন্তোপান্ত শুনে সম্পূর্ণ বলে—শোন চম্পা, তুই ভুল করলি।

—কেন?

—ওর সঙ্গে ভাব কব তুই।

—ওর সঙ্গে?

সম্পূর্ণ হাসে। বলে—ও খব দুখী। তুই কথা কইলে এক মিনিটেই ভাব করবে। জানলি?

—তা আমি ভাব করবো কেন? বুঢ়া, কি মতলব?

—কি মতলব?

চম্পা হাসে। বলে—বুঢ়া, তোমার মতলব আমি বুঝি না? রাত-দিন তুমি জমায়েরত করছ। বিসিলা আর ক্যান্টনমেন্টের লোক আসছে। বাজারে গরম গরম গল্প উড়ছে।

—দেখে এলি?

—নিশ্চয়। আমার চোখ নেই? তুমিও তার মধ্যে আছ।

সম্পূর্ণ বলে—মতলব নিশ্চয় আছে। কোন মতলব নেই, এমনই তোকে আগলে বসে আছি? তোকেও টানব।

—কেন, বুঢ়া?

সম্পূর্ণ টেনে টেনে শক্ত হাতে খাটটার রশি বাঁধে। তারপর বলে—কিছু কাজের কাজ করবি চম্পা! একটা জীবন তোর। টাকা-পরসার অভাব নেই। যদি একটা ভাল কাজ করতে পারিস তো জানবি তোর ভাগ্য।

—আমার ভাগ্য?

—খ্যা, চম্পা! ব্যাধি ভাল কাজ করে এ ছুনিয়ার, তাদেরই

ভগবান এমনি একলা পাঠায়। এক জীবনে তুই কত গহনা পরবি? কত শাড়ী পরবি? কত মিঠাই খাবি? তাতেই কি সুখ?

—বুঢ়া, তুমি আমাকে সুখের কথা বলো না। কাজ বা বলো, করে দেবো। কেন করবো না?

—তো, ঐ মেয়েটির সঙ্গে ভাব কর। মিশে যা ওর ঘরদোরে। আমি তোকে বলি চম্পা—অনেক কথা চম্পাকে বললো সম্পূর্ণ। বললো—আমাদের কেউ বিশ্বাস করবে না। কিন্তু বিশ্বাসী মানুষের বড় প্রয়োজন এখন। তোর মতো সুরোগ কার আছে চম্পা? আর ত্রিভুজলারী যে ওদের মধ্যে রয়েছে! তুই মিশতে পারিস, ভাবগতিক বুঝতে পারিস, তবে ধরা দিবি না, জানলি?

—কিন্তু কি আশ্চর্য কথা শোনাতে বুঢ়া, তা কি সম্ভব? তা কখনো হয়?

—হয় না? হতেই হবে। ধর্ম গেল, জ্ঞান গেল, সবই নষ্ট হয়ে গেল। আমাদের নবাবকে ওরা রাজ্য ছাড়িয়েছে। আর কোজের ওপর কি অত্যাচার! কুধে আছে সবাই। আর কোজও হাত হয়েছে। কেনে আছে। জানলি?

—বুঢ়া, তুমি কেমন করে জানলে?

সম্পূর্ণ সে কথার ঠিক জবাব দিতে পারে না। একটু ভাবে। বলে—কেমন করে জানলাম? বলতে পারি না। তবে একটা নিশ্চয় জানবি যে, মস্ত একটা টালমাটাল আসছে। বতো রাজা আর সদর, তারা আমাদের হাতী-ঘোড়া রসদ দেবে। কোজ আসবে হাতিয়ার নিয়ে। সবাই মিলে একজোটে কুধে উঠলে। পাহাড় ধসে যায় তো এ ত্রা কয়টা মাত্র শালা মানুষ। তাদের আমরা তাড়িয়ে দিতে পারবো না?

চম্পা চিবুকে হাত রেখে ভাবে। তারপরে বলে—ওরা রাজা, ওরা সরকার, তো চালাবে না চাবুক?

—খ্যা, জরুর চালাবে। তবে ক্ষেতীজমি নেই, পেটে শুধু ভুখা আর পিঠে চাবুক! এমন আর বেশী দিন চলবে না।

সম্পূর্ণের কাছে শুনে চম্পা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ত্রিভুজলারীর সঙ্গে আলোচন করলো। উঠে এলো তার কুঠিতে নিঃসঙ্কোচে। বললো—বড় টাকার দরকার আমার। একটা বালা রেখে দেবে আমাকে টাকা? কুড়ি টাকা?

ত্রিভুজলারী আশ্চর্য হয়ে গেল। ব্রাইট ঘরে নেই, স্নেনে-স্নেনেই এসেছে চম্পা। আজ যে কি মনে আছে তার। ত্রিভুজলারীর দাসী উৎক্ল হতে ওঠে। মনে ভাবে যে, সেদিন বাইরে পেয়ে অপমান করেছিলো চম্পা। আজ ঘরে পেয়ে ত্রিভুজলারী নিশ্চয় ফিরে অপমান করবার সুরোগ হারাবে না।

কিন্তু আশ্চর্য হয় সে ত্রিভুজলারীর ব্যবহার দেখে। চম্পাকে চৌকিতে বসিয়ে আপ্যায়ন করে ত্রিভুজলারী। বলে—পান খাবে? তামাক খাও?

—না!

আলগোছে সুরগন্ধি এলাচি সুপারি তুলে নেয় চম্পা। তারপর একটু হেসে বলে—সেদিন ঘরে ফিরে আমার ওপর বাগ করেছিলে?

—না তো! দুঃখ হয়েছিলো।

এবার হুঁজনেই হাসে। আর পদার বাইরে ঠাণ্ডিয়ে দ'জনের

মিলিত হাসি শুনে দানী বিষম্ব হয়ে পানের পিচ কলে মাথা নাড়ে। প্রহরা-নিরন্ত সিপাহীটিকে বলে—মেরেমাছুবটার সবমও নেই, শরীরে যেন মাছুবের রক্তও নেই! হি! বাজারের একটা রমজানী, তাকে অপমান করলো সেধে, আর তুই তাকেই ধরে ডেকে...

ত্রিভুজলারীর প্রাসাদে দাসীর কানে, হাতে, পায়ে ভারী কপোর গহনা। সে দিকে চেয়ে সিপাহীটি বলে—বিবিকে বলে ছুটি মজুর করিয়ে দাও না! একটিবার ঘূরে আসি চার দিনের জন্তে?

—ওর পা ধরে কেঁধে পড়লেই হবে। আমি জানি তো?

—মজুর করাবে ছুটি?

—নিশ্চয়! মেয়েটা বোকা তো। আমরা সবাই ওকে ধরে ঐ সুবিধেটুকু আদায় করে নিই।

তবে এত নিশ্চয় কেন ওর?

—কাজ আদায় হয়ে গেলে কে মনে রাখে ওকে? ওকে সবাই ঘেঁরা করে। দর নেই বার...

সেদিনকার আলাপেই সূত্রপাত হলো এক অভিনব ঘনিষ্ঠতার। ত্রিভুজলারী একদিন পালকী চড়ে উপস্থিত হলো চম্পার ঘরে। গাছের ছায়ায় বসে চম্পার সঙ্গে তার দেশ-ঘরের গল্প করতে খুব ভালো লাগলো। আর একীবন যে সে সঙ্গ করতে পারছে না, তা-ও জানলো চম্পা।

চম্পা বললো—চলে গেলেই পার?

—সাহস হয় না। বলে স্নান হাসলো ত্রিভুজলারী। এলো—বাবার জায়গা কোথায়? আমাকে কি আমার বাপ-ভাই আর ঘরে ঢুকতে দেবে?

—দেবে না?

—না।

সেদিন আর কথাবার্তা হয় না। ঘরে কিরে ব্রাইট বখন জানে, এককণ সে কাটিয়ে এসেছে চম্পার ঘরে, অভ্যাস বশত গালি দিয়ে ওঠে না। বা মারে না। বরঞ্চ বলে—মেয়েটা বেশ। কি রকম টাকাপয়সা নেয় তা জানো?

—না। আর সে সব কথা তুমি ওর সম্পর্কে ভেব না।

ত্রিভুজলারী কোন দিনও এমন জবাব দেয় না, তাই ঈর্ষা আশ্চর্য হয়ে চেয়ে থাকে ব্রাইট। পরে শীঘ্র দিয়ে বলে—আচ্ছা।

সেদিন ব্রাইট রাত্রির জন্তে অপেক্ষা করে না। যেমন পুরুষ, তেমনই বর্ষা হয় সে। আজ বলে কি, যেদিন, যখনই ত্রিভুজলারীর মধ্যে সে কোন ব্যক্তিগতভাবে কোন নিজস্ব মতামত, কোন স্বতন্ত্র সন্তান আভাসমাত্র দেখেছে, সেদিনই সে এমনই বর্ষা হয়েছে। মনটাকে তো হাতে ধরা যায় না। হুই হাতের মধ্যে ধরা যায় যে যেহটাকে, তাকেই নিষ্পিষ্ট করে ব্রাইট গোটা মাছুবটাকে ভেঙে-চুরে দেয়। আর সত্যি-সত্যিই দেখে-মনে পরাজিত হয়ে অবসর পড়ে থাকে ত্রিভুজলারী। মনে হয় ভেঙে চুরে মরে গিয়েছে সে। এর চেয়ে কোনো যত্ন তরফর হতে পারে না।

এখন ত্রিভুজলারী যেন তবু সাধনা পায়। মনে হয় চম্পার সঙ্গে মিশে সে এতটুকু আলোর সন্ধান পেয়েছে। একেবারে সে একাকী নয়।

চম্পার প্রাঙ্গণে তাই আবার একদিন এসে নামে ত্রিভুজলারীর পালকী। ত্রিভুজলারী স্বল্প কুণ্ঠিত, হেসে বলে,—আজ আমার উপবাসের দিন। তাই দুই প্রহর সময় কাটাতে এলাম।

সম্পূর্ণ চম্পার কুতিঘ ঘেঁধে বড় খুসী হয়। ব্রাইটের বিবিকে একেবারে মাটির উঠানে এনে ফেলেছে সে! পাগড়ী বাঁধতে বাঁধতে সে নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

নিভুতে চম্পার কাছে বসে ত্রিভুজলারী নিজের মনখানি মেলে ধরে। চম্পার উঠানে একটা আমগাছ। কোনো প্রতিবেশীর ছাগলছানা সেখানে আলোছায়ার লাফালাফি করে। কাজ করতে করতে চম্পা সুডোল হাতটি বাড়িয়ে এক বুঠো ব'ব' বাজরা ছিটিয়ে দেয় মাটিতে। নেমে এসে কটা পায়রা সেই খাবার খায় খুঁটে খুঁটে। চম্পার ঘরের পাকা দেয়াল, শানের মেঝে আর উঁচু খড়ের চাল। সেই চাল দিয়ে দুটো কাঠবেড়ালী ওঠে আর নামে। ত্রিভুজলারীর মনে হয়, এমন শান্তি সে অনেক দিন দেখেনি। এত অবসর কোথাও নেই। কেন যেন তার চম্পাকে বিশ্বাস করতে সাধ যায়। বলতে শুরু করে তার কথা। বলে—খুব ছোট গ্রাম আমাদের সিংগার। আর ছোট গ্রামের ঠাকুরসাহেব আমার বাবা। শুনেছি আমার শৈশবে বিয়ে হয়েছিল। আমি বিধবা। তবে সে আমার মনে পড়ে না। বলে—দাদা পরদাদা সবাই সাহেবদের নিমক খেয়েছে। বাপও তাই বড় সাহেবদের ভক্ত। বেশ কেটে বাচ্ছিলো আমার জীবন। এমন সময় গ্রামে সাহেব তাঁর ফেললো। সে তিন বছর হলো।

তার পর ঢোক চেপে গলা পরিষ্কার করে। চম্পার দিকে চেয়ে যেন কৈফিয়ৎ দিচ্ছে এমন সাহুনের স্বরে বলে—আমি বড় সুলভ ছিলাম। আর জওয়ারানীর অল্প বৃদ্ধি ছিলো। বিপদ দেখেও আমি বুঝতে পারিনি।

তার পর আর কিছু বলে না। কেমন যেন হয়ে যায় ত্রিভুজলারী। পান ও তামাকে কালো টোট দংশন করতে থাকে। বা বলে না তা যেন চম্পাকে বুঝে নিতে অসুস্থ করে। আর সেই অব্যক্ত কথা যেন চম্পাও শুনতে পায়। বুঝতে পারে। বুঝতে পারে, এক অনভিজ্ঞ কিশোরীকে ছিঁড়ে উপড়ে এনেছে ব্রাইট। ছিন্নমূল সে গ্রামের মেয়ে এখানকার জীবনে বঁচে আছে মাত্র—কিন্তু বাঁচবার আনন্দ তার হারিয়ে গিয়েছে। কিন্তু তাই কি? এত অলঙ্কার, এত ঐশ্বর্যেও কি কিছুই ভরেনি তার? না, আরো কথা আছে?

ত্রিভুজলারী বলে—আমার বাপ তাই খুব খুসী। কোঁজে তাদের সুযোগ সুবিধে আছে। অস্ত্র ফোঁকী সিপাহী তাদের মানে। সাহেবও তাদের দিয়েছে অনেক।

—আর তুমি?

ঢোকা আলিয়ে আগুনটা দেখে চম্পা। বলে—তুমি সুখী হয়েছ? ছোট একটি ছুরি নিয়ে ত্রিভুজলারী স্ননিপুণ হাতে কুচিয়ে কাটে শাক-শবজী। বলে, হয়েছি তো!

চম্পার বলতে ইচ্ছে যায়, তবে কেন তোমার স্বভাবগৌরব বর্ণ এমন পাণ্ডুর? কেন তোমার চোখের নিচে নিরন্তর কালিমা? কেন এক শোকের বিবর বিজ্ঞান্ডি তোমার মুখে? দুটি যেন সর্বদা আহত। তবে সে কথা মুখে কিছু বলে না। বলে—তবে গ্রামে বেতে বাধা কি?

—তুমি বুঝবে না। আমার সঙ্গে তারা কি খাওয়া-দাওয়া করবে? আমাকে শাদী, গাওনা, ফিরাচোমার ডাকবে?

না ডাকবে না। তা জানে চম্পা। খারো দুটো-একটা কথা বলে উঠে পড়ে ত্রিভঙ্গারী। চম্পা বলে—ভালো লাগে তো বসো না। ভয় কি?

—তুমি বুঝবে না। বলে জ্বন্তে চলে যায় সে।

ত্রিভঙ্গারীর সঙ্গে কথা করেই এক দিন চম্পার ডেরাপুরে বাবার ইচ্ছে হলো। আসলে মনে মনে ছিলো চন্দনের খবর নেবার ইচ্ছা। ত্রিভঙ্গারীর সঙ্গে তখন তার খুব ঘনিষ্ঠতা। আরো অনেক কথা বলেছে ত্রিভঙ্গারী। বলেছে—আমার জীবনটার সবটাই পাশের। তবু তারই মধ্যে একটা খাঁটি মানুষ আমি দেখেছিলাম চম্পা। মুক্তি পাবার একটা সুযোগ আমার হাতের মধ্যে এসেছিলো। বড় দয়ার শরীর তার, মনে বড় দয়া-মায়া। আমাকে দেখে সে হৃৎ পেয়েছিলো। কেন কে জানে?

অথাক হয়ে চেয়ে থাকে সে। বলে—আমি আজও বুঝতে পারি না যে সে কেমন করে বুঝেছিলো। অথচ তখন আমার কুঠি, দাসী, সোনা-চাঁদি কিছুই অভাব নেই। তবু দেখ চম্পা, সে ঠিকই বুঝেছে যে আমার স্বপ্ন নেই। আমি সাহেবকে বলেছিলাম যে আমি তার কাছে উর্দু শিখবো। সেই সময়ই সে একদিন বললো, এত দুঃখের মধ্যে থাকবার দরকার কি? কেন থাকবে তুমি? চলে এসো। আমি তোমাকে সাহায্য করবো। সে তৈরী ছিলো। কিন্তু আমি সাহস পাইনি চম্পা। সাহস পাইনি আর সেই একটা ভুলের জন্তে জীবনটা আমার বরবাদ হয়ে গেল। একেবারে।

—আর কিরে যেতে পারো না? আবার ফিরে গেলে হয় না? চম্পার সম্বন্ধী প্রেমেব জবাবে ত্রিভঙ্গারী মাথা নেড়েছিলো। না তা হয় না। আর সেই বিষয় মুখখানার দিকে চেয়ে চম্পার মনে হয়েছিলো হতাশার বেননা এত গভীর, এমন সর্বব্যাপী, যে তার কৃষ্ণ-কিনারা নেই। শুভ মুহূর্ত্ত একবার এসে চলে গেলে কি তাকে আর পাওয়া যায় না?

সম্ভবতঃ তার পক্ষেই তার মনও খারাপ হয়ে গেল। সেই ভাঙাঘর আর সেই ছোট নদী তার জীবনের অনেক দিনের স্মৃতিবিজড়িত সেই গ্রামখানি দেখতে বাসনা হলো।

সম্পূর্ণরূপে তাই একদিন বললো সে—চল বুঢ়া। তোর চম্পা কোন্ বাগানের ফুল, দেখিয়ে নিয়ে আসি।

ডেরাপুর গ্রামে ফিরে এসেছে চম্পা, ফিরে এসেছে রাগী হয়ে, শাসী সঙ্গে নিয়ে, টাকা পরসী ধররাত করতে এসেছে, এ কথা কেন আশ্চর্য হয়ে গেল সবাই। এ বেন রূপকথার গল্প হয়ে গেল। যে মানুষ বেঁচে আছে কি মরে আছে, তাই কেউ জানতো না। সে এসেছে এমন অাঁকজমক দিয়ে?

চম্পার ভাঙাঘরে এখন বুড়ী কৌশল্যার পরিবার পরিজন শুধু আছে। সেখানে কেমন করে থাকবে চম্পা? গ্রামের মানুষ তেঁকে এলো সেই ভাঙা উঠানে। হ্যাঁ, চম্পাই বটে। কৌশল্যার নাতিকে টাকা দিচ্ছে তার মায়ের ভাঙাঘরখানি সেয়ে নিতে। ছোটবেলার সাবীলহলীর খবর নিচ্ছে। বসেছে জোনপুতী গালিচার আসনে। পান খাচ্ছে খাঁটি চাঁদির ডিবে থেকে। দই চন্দে

সাত আটটা আটকি বলকাচ্ছে। পায়ে নাগরা জুতো। নাগরার ওপর ভানী চাঁদির তোড়া।

আর কথার বর্ডায় বা কি রইস তার! দেখে-শুনে মানুষের তাচ্ছব লেগে গেল। তাচ্ছব দেখতে বেশবরাম নিভেই এলো। মায়ের নাম করে গৈবীনাথের মন্দিরে মোহর দিলো চম্পা। গাঁয়েব দশ জনে টাকা দিয়ে বাধিয়ে দিচ্ছে পণ্ডিতজীর খব। সেখানে ছেলেরা পড়বে সকালে আর সন্ধ্যায় পূরণ পড়বেন পণ্ডিতজী। ছোটবেলার পণ্ডিতজীর বেত চুরি করে তেঁকে নদীদ জলে ভাসিয়ে দিয়েছে চন্দন কত বার, আর চম্পা তাকে সাহায্য করেছে। আজ সে কথা ভুলে চম্পা এক মোহর প্রণামী দিলো এই শুভকাজ।

আর অনেক দিন আগে, তারের সকল সম্পত্তির সঙ্গে যে বাঁধানো ইঁদারা কিনে নিয়েছিল লাগা, সেই ইঁদারা ফিরে কিনলো চম্পা। গ্রামের দশজনের সামনে সে মোহর দিলো দুটি কেশবরামের হাতে। বললো—একটুকু পিয়ারের জল ভরতে যা আমার বড় কষ্ট পেয়ে গিয়েছে। এই ইঁদারা দেখব আমার খরভাই। কৌশল্যা নানীর নাতি! দেখবে কি, যে কোনো ছবিয়ারী বেন জল নিতে কষ্ট না পায়।

সব হলো, শুধু যাব ভজ্ঞে আসা, তার কোনো খবর পেল না চম্পা। আর যাকে দেখাবে বলে আসা, সেই দুর্গার সঙ্গে দেখা হলো না। প্রতাপসিংহের বৌ দুর্গার গর্ভ কি আজও ভাঙে নি?

দেখা হলো। দেখা হলো এমন পরিবেশে, এমন করে, যে তেমন করে দেখতে চম্পা চায়নি। চন্দনের বাপকে দেখলো বটে রাস্তায়। অকালে বাবাকোর ছাপ পড়েছে। বগের দুই পাশে পাক ধরেছে চুলে। কিন্তু শুধু তাই-ই নয়। কোথায় বেন হেরে গি-হছে মানুষটা। পায়ে সে পেতলের ফুলবসানো ভানী নাগরা আজও আছে। কিন্তু সে মদগবিত ভদ্রী কোথায় চলে? কিসে, কেমন করে হেরে গেল মানুষটা?

কৌশল্যার নাতির বাচ্চা মেয়ে ছিলো চম্পার সঙ্গে। সম্পূর্ণরূপে লুকিয়ে তার হাত ধরে বেরিয়েছিলো চম্পা। কৌশল্যার নাতি বলে গিয়েছে—চম্পাবহিন, প্রতাপ সিং রেগে গিয়েছে জানো? তার ইঁদারা থেকেই জল নেয় মানুষ। তুমি ইঁদারা দিচ্ছ গ্রামকে, তাতে তার অপমান হয়েছে।

—হ্যাঁ, ত্রিভঙ্গার জলের সঙ্গে তার বৌ ভিড় দিয়ে আগুনের হলকা দিয়ে দিতো, সেটা তো আর হচ্ছে না। রাগ তো হবেই।

ঘুরতে ফিরতেই চোখে পড়লো আকাশের শরীর মতো এই চম্পা এসেছে তাদের গেরস্থালীতে। বাচ্চা মেয়েটির মনে হচ্ছিলো এই শ্রমের মেয়েটির আঙুল ধরে হাঁটতেও না জানি কত গরব। মনের খুশীতে সে কথা কইছিল আর দেখছিল চম্পার গহনা। এমন সময় চোখে পড়লো চম্পার।

সেই বটগাছ। তার গায়ে হেলান দিয়ে কপালে হাত রেখে ওপারের দিকে দিশা করে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে কে! মাথায় কাপড় নেই। রক্তচুল উড়ছে। পাশে গামছা নিয়ে ঘড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটি বালক তৃত্য।

অনেক দিন বাড়ে দেখা। তবু চিনতে ভুল হয় না। ছোট মেয়েটি বলে—ঐ হলো! প্রতাপসিংহের বৌ! চলেছে চন্দন জিলায়।

সেই কবে। বোজ আসে আর এমনি করে চেয়ে থাকে। চেয়ে চেয়ে ঘরে চলে যায়। ওব ছেলে আর ঘরে আসবে না জানো ?

মাহুঘের গলা শুনে দুর্গা এদিকে তাকাল কি ? চকিত পিছু কিলো চম্পা। তবু এক হুহুত হুহুনে হুহুনকে দেখল। দুর্গার বিমিত দৃষ্টি বেদনার ভারী। যুখে-চোখে কপালে সুগভীর দুঃখের রেখা। হতাশা আর দুঃখের কালিমা। কোথায় সে গবিত নিষ্ঠর দুর্গা ?

দুর্গা দেখলো একখানা তরুণ স্তম্ভর মুখ। সমব্যথার কাতর, ঠোঁট ঈষৎ কঁক। বৃষ্টি বা কিছু বলতে চায়।

হায়, কোথায় গেল চম্পার পূর্বসঙ্কল্প ? সে না বলতে চেয়েছিলো, চেয়েছিলে যে দেখ দুর্গা আমি রমজানী হয়েছি। তুমি পুণ্যবতী, সকল হয়েছ তোমার কথা। দেখ আজ আমিও ঐশ্বর্ষে তোমার সমতুল হয়েছি। আজ কি তোমার গর্ব করা সাজে ?

সে কথা বলতে পারছে না চম্পা। সে চলে যেতে চাইছে এই হতাশ বিজ্ঞতার সামনে থেকে। কিন্তু পারছে কই ?

—চম্পা !

কানে হাত চাপা দেয় চম্পা। এমন গলায় তাকে যদি ডাকে চম্পনের মা তবে সে কেমন করে চলে যায় ?

—চম্পা শোন !

ছুটে নেমে এসেছে দুর্গা। মৃগাবান ছাপা শাড়ীর অঁচল মাথা ছেড়ে খুলোর পড়েছে চম্পার সামনে, দাঁড়ায় দুর্গা। বলে—চম্পা, আমার চন্দন কোথায় ?

মাথা নাড়ে চম্পা। বলে—চাচী, আমি জানি না।

—তুই জানিস চম্পা !

দুঃখাচার জল-জল করে দুর্গার চোখ। বলে—তুই এসেছিস শুনে থেকে আমি একটি বার দেখা করতে চাইছি। তুই বল চম্পা। কোথায় আছে সে ?

—আমি জানি না।

—জানিস না ?

এবার হাহাকার করে ওঠ দুর্গার বিজ্ঞ কণ্ঠ। বলে—কিরে দে চম্পা, মায়ের ছেলে মার কাছে কিরে দে, তারপর আমিই ছোর হাতে আবার দিবে দেব তাকে। আমি ঘরে রাখব না।

সব সঙ্কল্প ভেঙ্গে গিয়েছে। চম্পা দুর্গার হুট হাত ধরে। বলে—চাচী, তুমি তার মা। আমি তার নাম করে কসম খাচ্ছি, আমি তোমার ছেলের কোন খবর জানি না। যদি জানতাম—

রুচ ছাচ্ছে জেনেও না বলে পারে না চম্পা। বলে—যদি জানতাম তুমিও ঘরে রাখতে পারতে না, তা হলে হয়তো বা নিয়ে যেতাম। কিন্তু আমি জানি না।

এবার দুর্গা জলে ওঠে। সেই তীব্র জ্বালা ছড়িয়ে দেয় তার কণ্ঠ। সে বলে—মিথ্যা কথা বলছিস তুই ! আমি জানি না, যে তুই বাকারে নেমেছিস আর তাকে-ও টেনে নামিয়েছিস সেই সজ্ঞ ? কোন মন্তরে বাহু করেছিস সর্বনাশী। যে সে ছেলে মা ভুলে গেল, বাপ ভুলে গেল, আর এলো না ?

তবু চম্পা জলে ওঠে না। আর আবার দেয় না। আজ বড় দুঃখে তার কণি হাসি আসে। সে বলে—দুর্গাচাচী, তুমি পুণ্যবতী। তোমার কথা সত্যি হয়েছে। হ্যাঁ, আমি ভেসে গিয়েছি, বে-দিশা হয়ে গিয়েছি। কিন্তু বা ক্ষতি করেছি, নিজের করেছি। কোনো দুঃখিয়ারীর ছেলেকে আমি কেড়ে নিইনি। সে পাপ আমি করিনি।

চলে আসে চম্পা। এত দিনের মধ্যে আজকে প্রথম সে শূন্যবরের মেঝেতে শুয়ে কঁদে নেয় ঝানিক। কঁদে তার চিরদুঃখিনী মায়ের জন্তে। কঁদে আর এক হতভাগিনীর জন্তে, যে দুঃখ অহঙ্কারে অন্ধ হয়ে ছেলেকে দেশান্তরী করে পলে পলে তিলে তিলে পুড়ে মরছে। আর কঁদে নিজের দুঃখে। এইখানেই শেষ হলো এক অব্যায়। আর কোন দিন ফিরে দেখবে না সে চম্পনকে। শৈশব থেকে বৌবন অবধি চম্পার সবটুকু যে নিয়ে গিয়েছে, আর যে খেয়ালী ছেলে আবার বে-দিশা হয়ে হারিয়ে গিয়েছে।

কঁদে-কঁদে সে উঠলো। পরদিন শত্ৰুচরণকে বললো—বুঢ়া চল।

—কাজ খতম ?

—খতম না সুর, জানি না।

বাবার কালে প্রামাণ্যনিকে বত দূর দেখা গেল কিরে কিরে দেখলো চম্পা। বেন মনে মনে জানলো এই হলো শেষ দেখা।

কিন্তু এখানেই শেষ হলো না। তারও পরে সহসা অপ্রত্যাশিত ভাবে ষ্ট্রুঁরে দেখা হলো আবার চম্পনের সঙ্গে। চম্পা ও চম্পনের সে বিচিত্র সাক্ষাৎকার দিয়েই এ কাহিনীর সুখবন্ধ। কিন্তু শুণ্য পুনর্মিলনে নয়। সেই দিনেই নিজের অজ্ঞানতে ইভনুস আকুট হলো তার প্রতি। নানার প্রাসাদে সে উৎসব ফুরোল। কিন্তু আসবে প্রবেশ করেছিলো চম্পা মশাল হাতে, প্রদীপ জ্বালাতে।

আঃবেব সে বাতি শুণ্য সন্ধ্যার, শুণ্য প্রমোদের। কিন্তু অনভিজ্ঞ দর্শক ইভানুস নিজের স্বদয়েও সেই প্রদীপ ঘরে জালিয়ে নিলো একটি শিখা। সে জানতো না যে আগুনের খেলায় যেতে যদি নিজের জ্বলতে শুরু করে কেউ, তবে সে আগুন নেবানো যায় না।

বিটুর থেকে কিলো চম্পা। আর তাকে অনুসরণ করে কানপুরে এলো ইভানুস। সুর হলো আর এক অব্যায়। অগ্নিগর্ভ লতাবনের পটভূমিকায়।

[ক্রমশঃ]

"Europe, the centre of the manifestation of material energy, will crumble into dust within fifty years, if she is not mindful to change her position, to shift her ground and make spirituality the basis of her life and what will save Europe is the religion of the Upanishads."

—Swami Vivekananda

অত্যাশ্চর্য
কাপড় কাচার
পাউডার



মূল্য:
বড় সাইজ ২ টাকা ১৯ ন.প.
সাধারণ সাইজ ১ টাকা ১২ ন.প.
(স্থানীয় কয় ছাড়া)

সার্ফ

অপূর্ব সাদা করে জামাকাপড় কাচে

অত্যাশ্চর্য কাপড় কাচা পাউডার সার্ফ কাচা জামাকাপড়ের অপূর্ব শুভ্রতা দেখলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন। এক প্যাকেট ব্যবহার করলে আপনাকে মানতেই হবে যে

আপনি কখনও কাচেননি জামাকাপড় এত ঝকঝকে সাদা, এত ফুলের উজ্জ্বল করে! সার্ট, চামর, শাড়ী, তোয়ালে—সবকিছু কাচার জেই এটি আদর্শ।

আপনি কখনও দেখেননি এত ফোঁ—ঠাণ্ডা বা গরম

জলে, ফোঁর পক্ষে প্রতিকূল জলে, সঙ্গে সঙ্গে আপনি পাবেন ফোঁর এক সমুদ্র!

আপনি কখনও জানতেন না যে এত সহজে কাপড় কাচা যায়! বেশী পরিশ্রম নেই এতে! সার্ফ জামাকাপড় কাচা মানে ৩টি সহজ প্রক্রিয়া: ভেজানো, চেপা এবং ঘোঁরা মানেই আপনার জামাকাপড় কাচা হয়ে গেল।

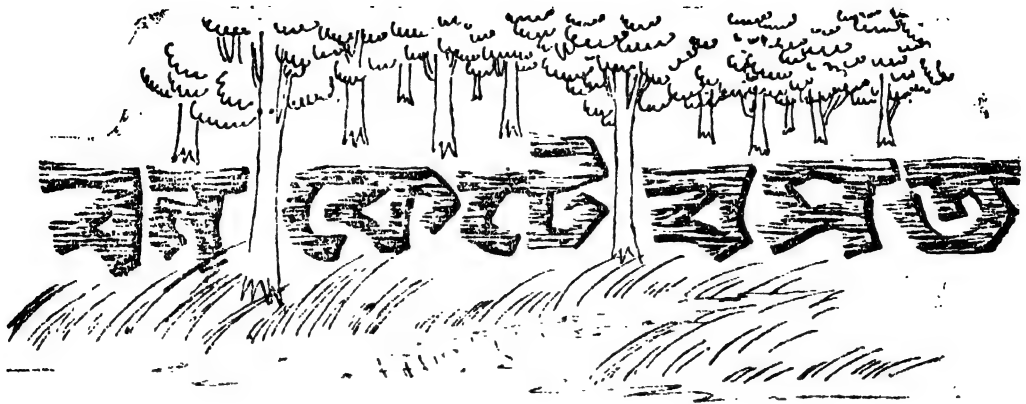
আপনি কখনও পাননি আপনার গয়নার মূল্য এত চমৎকারভাবে ফিরে। একবার সার্ফ ব্যবহার করলেই আপনি এ কথা মনে নেবেন! সার্ফ সব জামাকাপড় কাচার পক্ষেই আদর্শ!

আপনি নিজেই পৰ্য্যক করে দেখুন

সার্ফ জামাকাপড় অপূর্ব সাদা করে কাচা যায়!

বিশ্ববাস লিমিটেড কর্তৃক প্রস্তুত

৪৩৭, ২৫-২৬৬ ২৬



[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

মনোহর বসু

যোল

যাঁ বলেছিল অন্নদাসী—যর করছে এতকাল, মাছুষটা চিনবে না ? বাধেগামের গায়ের ব্যথা কিছুতে মরে না। খোঁড়া ভান পা খানিও ভাল হচ্ছে না। ঘরে বসেই যখন দু-বেলা দু-পাখর জুটে থাকে, ব্যথা মরতে বাবে কেন ? ভাল হয়ে গেলেই তো ভাল-হাতে বেরতে হবে রাত্রিবেলা। মাছ যাবে, মাছ না মিলল তো উপোস করে। সেই পুরানো বামেলা। দিবি আভে এখন। অন্নদাসী সকালবেলা বাড়ির পাট সেবে ছেলটাকে রাতের জল-দেওয়া ভাত চাউ খাইয়ে দিয়ে চৌধুরিগঞ্জের আলায় চলে যায়। ভরষাঘের খাওয়া-দাওয়ার পর নিজে খেয়ে কাঁসরভতি ভাত-তরকারি নিয়ে ঘরে আসে। সন্ধ্যার পর বেয়োর, রাতে আবার ভাত নিয়ে আসে ছপুবলোর মতো।

আছে ভালো বাধেগাম। একটা মুশকিল, অন্নদাসী চলে যাবার পর একেবারে চূপচাপ বসে থাকে। বাচ্চাটা চ্যা-ভ্যা করলে তাকে একটা-দুটো চড়াচাপড় দেওয়া ছাড়া অন্য কোন কাজ নেই। মন টেকে না ঘরের মধ্যে এমন ভাবে। ভেবেচিন্ত এক কাজ করে। বাচ্চাটাকে ঘুম পাড়িয়ে বেধে সেও বেরিয়ে পড়ে চুপি চুপি। বউ টের পাবে না, ফিরে আসতে তার অনেক রাত্রি হয়। পায়ে-পায়ে বাধেগাম চলে গেল গগনের আশায়। নাম-গানের আসরে গিয়ে বসল। অঝাক! বুড়ো হর ঘুট্ট অঝি ইতিম'খা গৌরভক্ত হয়ে পড়েছে। 'হরেক্ষ হরগাম গৌরনিতাই বাধেগাম'—বলছে সকলে বিভ্রিভি করে। হারিকেন-লঠন মসছে আসরের একদিকে—এও ভাবি ভাজব। গগন কত বড়লোক হয়েছে বোঝ তবে—অবহেলায় অকারণে কেবোসিন পোড়ানো। আর সেই আলোয় দেখা যায় ভাববিহীন গগন এবং আশেপাশে একগাদা মাছুষ। বনরাজ্যে হালমা তো কথার কথার। মেছোঘেরি হবার পরে কোন আলা অরক্ষিত দেখলে রে-রে করে আলায় পড়ে লোকজন পিটিয়ে শড়কিতে এ-কোড় ও-কোড় করে এখনো মাছ লুঠ করে নিয়ে যায়। আর সেদিকে তত সুবিধা হচ্ছে না বলেই নিশিরাঙে টিপিটিপি তেড়ির খোলে জাল ফেলে। ভাকাত না হতে শেরে চোর। সেই সব লোকই পরম শান্ত তাবে গৌরাল-ভজন করছে কেমন দেখ : ভজ গৌরাল, ভজ গৌরাল, লহ গৌরালের নাম—বাধেগাম ভাষছে, ভা মন্দি কি।

ঘরেও তো একলা চূপচাপ থাকা, এখানে আর্থেক চোখ বুজে চূপ করে থাক, পরকালের পুণ্য লাভ হবে।

তাহাড়া নগদ লভ্যও কিছু আছে, আসর ভাঙবার মুখে সেটা জানা গেল। গুড়ে-ঢালা চিড়ে-ভাজা, কোন দিন বা ছুড়ি-ফুলুরি। আবার এক একদিন হরির লুঠ দেয়, লুঠের বাতাসা কুড়িয়ে কনিকা পরিমাণ মাথার দিয়ে দিবি কুড়মুড় করে চিবানো যায় অনেকক্ষণ। শুধুমাত্র পরলোকের আশাতেই, অতএব, ভক্তদল এলে জমায়েত হল না। কিন্তু গগন দাস বরলত্ব হয়ে দু-হাতে টাকা উড়াতে লাগল, পোড়ো-টাকা পেল নাকি কোনখানে ? মা রটন্তী-কালিকা নতুন-আলায় চাল ফুড়ে টাকার বুদ্ধি করে গেছেম ?

আ'খা থেকে ঘরে ফিরে গিয়ে বাধেগাম বধারীতি মাছুষের উপর গিয়ে পড়ে। অন্নদাসীর ফিরবার দেখি আছে তখনো। ফুলতলার নৌকো রওনা করে নিয়ে তবে ভরষাঘ রাঁধতে বসেন। রাঁধাবাড়া শেষ করে তিনি থাকেন, উজ্জিষ্ট বুদ্ধি করে এঁটা-বাসন সরিয়ে বেধে রান্নাঘর গোবরমাটি দিয়ে পেড়ে তবে তো ফিরবে বাড়িতে। বাধেগাম ঘুমোয় ততক্ষণ। বড় সজাগ ঘুম—বউয়েব পায়েব লক্ষ পেলেই জেগে উঠে কাতরাতে আরম্ভ করে। অন্নদাসী এসে কাঁসরের ভাত-তরকারি পাখরে বেড়ে বাধেগামকে দেয়। অন্ন চাউ কাঁসর থাকে, সেগুলো ব্যঞ্জন দিয়ে মেখে ঘুমন্ত ছেলেকে তুলে বসিয়ে গালে পুরে পুরে খাওয়ার।

একদিন গগুংগাল হল। ভাত মেখে বাচ্চাকে তুলতে গিয়ে দেখে, নেই। কোথায় গেল ? বাধেগামকে জিজ্ঞাসা করে, ডুট্ট কোথা গো ?

আঁা, ছিল তো শুয়ে—

অন্নদাসী এদিক-ওদিক উঁকি দিয়ে দেখে বলে, কোথাও তো নেই। ছেলের খোঁজ জানো না—তুমি ছিলে কি জন্তে তবে ঘরে ? বাধেগাম বলে, ঘুম এসে গিয়েছিল। বুঝি কি করে যে হারামজাদা সেই কীকে অমনি কানে হেঁটে রওনা দেবে।

বাদারাজ্যে শিয়াল নেই যে ঘুমন্ত বাচ্চা শিয়ালে মুখে করে নিয়ে যাবে। আর হল বড়-শিয়াল—কিন্তু পাড়ায় মধ্যে এসে টুপ না করে ছেলের টুটি ধরে সরে পড়বে, তেমন চোরাই স্বভাবের জাবা নয়। গেল কোথায় তা হল ?

রাধেষ্ঠামও খোঁজাখুঁজি করতে লাগল। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে—বিষম কষ্ট হচ্ছে নিশ্চয়—ঘরের বাইরেও উঁকিঝঁকি দিয়ে এলো একবার। অন্নদাসী চরকির মতন পাক দিচ্ছে ঝগড়াঝাঁটির সময় আশাতত নয়, তাঁটার মতন বড় বড় চোখ বুলিয়ে ভবিষ্যতের আভাস দিয়ে যাচ্ছে শুধু। বাঁধ অবধি চলে গিয়ে হাঁক পড়েছে, তুই তুই—

শিরোমণি সর্দারের বউ সুরোধবালা সাড়া দিয়ে উঠল : কিগলি নাকিরে বউ ? কী কাণ্ড, ওরে সে কী কাণ্ড !

বলতে বলতে এদের উঠানে চলে এলো। কাঁধের উপর তুই। ঘুমুচ্ছে। নেতিয়ে আছে একখানা শাকড়ার মতো।

তুই তোমার কাছে দিদি। তুমি নিয়ে গিয়েছিলে ? আর দেখ, আমরা দাশাদাশি করে মরি।

সুরোধবালা গালে হাত দিয়ে বলে, বক্তিতারি আক্কেল তোরের দিদি। ঘরের মধ্যে বাচ্চা রেখে হুঁজনে বেরিয়ে পড়েছিল। ছুরোর হা-হা করছে।

অন্ন বলে, ছুঁজনে বাব কেন ? তোমার দেওর ছিল। তার জিম্মার বেধে আমি চৌধুরি-আলায় বাই। পেটের আলায় না গিয়ে উপার তো নেই ?

শিরোমণি আর রাধেষ্ঠামে ভাই ডাকাডাকি। বসে কে বড় কে ছোট এই নিয়ে বিরোধ আছে। হিসাব ও তর্কাতর্কি হয় মাঝে মাঝে। অন্নদাসীর স্বার্থ, নিজের মরদের কম বয়স বলে জাহির করা। রাধেষ্ঠাম তাই হল সুরোধবালার দেওর।

অন্নদাসী বলে, তোমার দেওর সেই থেকে নড়ে বসতে পারে না। আমিও ছাড়ুন-পাড়োর নই দিদি। ঝালে বাবে না তো ছেলে ধরো।

সুরোধবালা বলে, নড়তে পারে না তো ঘব ছেড়ে চলে গেল কেমন করে ? তুইও যেমন দিদি—পুরুষ বলল, আর সেই কথাই অমনি গেরো দিয়ে বললি।

রাধেষ্ঠাম না-না—করে ওঠে : ছিলাম বই কি ! আলবৎ ছিলাম, তুমি দেখনি। ঘুমুছিলাম।

সুরোধবালা ক্রুদ্ধ হয়ে বলে, বা চাঁচান চাঁচাছিল, মরা মানুষও খাড়া হয়ে উঠে বসে। বিচ্ছেদ কামড়েছিল পাছাতে—কান্না শুনে ছুটে এসে দেখি এই বুভাভ। বাড়ি নিয়ে গিয়ে পাছার উপার মাথা-তামাক ডপে ডপে তবে জ্বালাটা কমল। তার পরে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘরের মধ্যে তুমি ঘুমিয়েছিলে—আমি কানা কি না, পর্বতের মতন দেহখানা আমার ঠাহরে এলো না।

ছেলে দিয়ে সুরোধবালা চলে গেল। এইবারে এতক্ষণে বোকা-বুঝি ঝোল-ঝানা—রাধেষ্ঠাম সেটা বুঝতে পারছে। মানুষের উপর পড়বে না কি বণাল করে, পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চোখ বুজে মোক্ষম ঘুম ? তাতে খুব সুবিধা হবে বলে মনে হয় না। আঁজাঝুড়ে গিয়ে দাঁড়ালে ঘমে বেহাই করে না, টেনে ঝাড়া তুলে বসিয়ে অন্নদাসী কথা শোনাবে। তার চেয়ে উন্টো চাপ দিয়ে সেই আগেভাগে শুনিয়ে দিক।

পাতখুঁষ ঝিঁটিয়ে রাধেষ্ঠাম বলে, এত রাত অবধি কোনখানে থাকা হল ঠাক্কনের ? কি কর করা হচ্ছিল ?

অন্নদাসী এক মুহূর্ত হকচকিয়ে যায়। শেষে বলে, ভাত এনে এনে খুঁধর কাছে বসি কিনা, খুঁধে তাই ট্যাঙস-ট্যাঙস বুলি হয়েছে। আর ভাত এনে খাওয়াই, সে মানুষটার খাওয়া শেষ না হলে চলে আসি দেখন করে ?

রাধেষ্ঠাম বলে, সাত জন্মের ভাতার কি না তোর, সামনে বলে জাদর করে খাওয়াস। সেই শোভাটা দেখবার জন্য মরি মরি করে বেরিয়ে পড়েছিলাম। পায়ের দরদে বেশি দূর পারলাম না। ফিরে এলাম। ফিরতে হল ভিড়িয়ে জিরিয়ে। তার ভিতরে এত সব কাণ্ড।

মোটামুটি একটা কৈফিয়ৎও হয়ে ঠাড়া। অন্নদাসী বিশ্বাস করল। রাতটা বেশি হয়েছে বটে, পুরুষমানুষের ফ্রোশ অসঙ্গত নয়। দোষ ভরবাজের, গড়িমসি করে রাত করলেন। উন্নয়ন বরিয়ে অন্নদাসী ডাকাডাকি করছে—কাজকর্ম নেই, বসে রয়েছে, তবু রাগাধরে আসেন না। মতলব করে কি না কে জানে ? রাগা শেষ হবার পর খেতে বসতেও যেন অকারণ দেখি করলেন। আসা নিবম তখন, সবাই ঘুমুচ্ছে। গা ছমছম করছিল অন্নদাসীর। ভয় ঠিক নয়। অতগুলো মরদ কৈতোর মতন পড়ে রয়েছে, চোঁচালে তড়াক করে লাকিরে উঠবে—ভয়ের কি আছে ? তবু যেন কী রকম ! সতর্ক নজর রেখে নিজের ভাতগুলো গবাগব গিলেছে তার পর। বাকি ভাত-তরকারি কীসারে তুলেই সাঁ করে বেরিয়ে পড়েছে। এসেছে বাতাসের বেগে। এসে তো এই সমস্ত এখন।

চোঁচামেটিতে নিজের রাত করে ফেরাটা পাড়ার মধ্যে বেশি চাউর হবে। অন্নদাসী চোঁচাল না। ভাত টিপে টিপে তুষ্টকে খাওয়াচ্ছে। এর মধ্যে একবার ছড়া কেটে উঠল :

একগুণ ব্যাঘ্রোনের স্তিন গুণ কাল,

নির্গুণ পুরুষের বচন সার।

বাসবী বন্ধুর

বন্ধনহীন গ্রন্থি

দাম ছ' টাকা মাত্র।

‘বন্ধনহীন গ্রন্থি’ একখান স্বল্প পৃষ্ঠার উপন্যাস। কিন্তু এই উপন্যাস-খানির মধ্যে লেখিকা এমন একটি ঘটনার অবতারণা করেছেন যাঃ মধ্যে এতটুকু শিল্পিতা ও শালীনতার অভাব প্রকাশ পেলো বক্তব্যটি সম্পূর্ণ বাস্তবায় পধবাসিত হ’ত। সাহিত্যক্ষেত্রে একজন নবাগতা লেখিকার পক্ষে আশ্চর্য্য সুলভ লিখন শাস্ত্রের পরিচয় পাঠকমাত্রকেই মুগ্ধ করবে। যে কাহিনীর তিনি অবতারণা করেছেন, সংসারে এমন কাহিনী বিদ্যল সম্ভব নেই, কিন্তু তা অবাস্তবও বে নয়, লেখার মানুষী দিয়ে, মনতঃ দিয়ে আর বক্তব্যের দৃঢ়তা নিয়ে তা প্রমাণ করে দিয়েছেন তিনি। এই প্রমাণের সাক্ষ্য নায়ক নায়িকা অজয় ও কণিকার চরিত্র হ’টি অত্যন্ত জীবন্ত হয়ে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেছে। এই অজয় ও কণিকা স্বামী-স্ত্রী। দীর্ঘদিনে শাস্ত্রপূর্ণ বিবাহিত জীবন বাপনের পর হ’টি সন্তানের মা কণিকা একদিন স্বামী অজয়ের কাছে প্রকাশ না করে পারে না, বিবাহ-পূর্ব-কালে তার অনিচ্ছাকৃত পদাশ্রয়নের কথা ; শুধু পদাশ্রয়ন নয়, তার এক মেসোমহালয়ের ঔরসজাত জীবিত এক কস্তার কথা। অকস্মাৎ মর্মান্তক এই কথা ডাক্তার স্বামী অজয়কে কি ভাবে যে আঘাত করে তা সহজেই অনুমেয়। স্ত্রী কণিকাও যে অবস্থার মধ্যে হ’টি সন্তানের গর্ভধারিণী হয়েও প্রাণপ্রিয় স্বামীর কাছে এই স্বীকারোক্তি করতে বাধ্য হয় তা যেমন গুরুত্বপূর্ণ ও উত্তেজনামূলক, তেমনি হৃদয়স্পর্শী।—বন্ধুভাষ্য ১৮.১.৫৯

প্রকাশক : বলাকা প্রকাশনী, ২৭সি, আমহাট্ট ষ্ট্রিট, কলিকতা-২

এই সামান্য কথার রাধেগ্রামের নিজার ব্যাখ্যাত হওয়ার কথা নয়। শুয়ে পড়ে সে পাশ ফিরল। পাশ ফিরতে নজর পড়ল, বাড়ী-ভাঙ পড়ে আছে, ভাতের ছ-পাশে তরকারি ছ-খানা। গগনের আলার মুড়ি-ফুলুবি অনেককণ হজম হতে গেছে। ভাত দেখে রাগের নিবৃত্তি করে সে উঠে বসে। দাওরায় নিয়ে গিয়ে তুইর মুখ ঘোরাচ্ছিল অন্নদাসী। ভিতরে এসে সে চোখ পিটপিট করে দেখে। ছেলে শোয়াতে শোয়াতে মধুর এক মন্তব্য ছাড়ল : অন্নদাসীর পুরুষ অন্নদাস।

সেই রাত্রেই। আরও অনেককণ কেটে গেছে। বেড়ার গায়ে আন্তে আন্তে টোকা দেয় কে যেন। ছ-বার এক সঙ্গে। একটুখানি খেমে রইল। আবার। রাধেগ্রাম একবার ঘুমালে তারপর ঠ্যাং ধরে টেনে নিয়ে গেলো বোধ হয় জাগবে না। অন্নদাসীর ঠিক উল্টো, গাছের পাতাটি পড়লে চোখ মেলে উঠে বসবে। উঠে পড়ে সে বাইরে চলে এলো।

কে রা? কোন ডাকরা, হাড়হাবাতে—

কিসকিস করে ভরষা বলছে, আমি যে আমি। একটা দরকারে পড়ে এসাম।

রাতিটা সুস্থ-আঁধারি। এইবারে চাঁদ দেখা দিচ্ছে আকাশে। বাবলাতলার গাছের গুঁড়ির সঙ্গে একেবারে সঁটে গোপাল ভরষা পড়িয়ে আছেন।

অন্ন বলে, আপনি যে সালতি ছাড়া চলেন না ঠাকুরমশায়। পারে মাটি কোটে। পারে হেঁটে কষ্ট করে এসেছেন, বলে ফেলুন দরকারটা।

রাধেগ্রাম আছে কেমন?

বড় ভালবাসেন মানুষটাকে! আমার সঙ্গে মোটেই তো দেখা-সাক্ষাৎ হয় না, রাত দুপুরে তাই খবর নিতে ঘর-কানাটে এসে পড়িয়েছেন। বলতে বলতে অন্নদাসী ফিক করে হেসে ফেললে। বলে, ভাড়াভাড়ি সেরে মিন। মানুষটা এমনি ভালো। ভস-ভস করে ঘুচ্ছে। জাগলে কিন্তু কুস্তকর্ণ।

ভরষা সকাঁতে বলেন, তোর যেমন মতি হয় যে অন্ন—আমি কিছু বলতে যাবো না। কাঠ-কাঠ উপোস দিচ্ছিলি, আমার কে কোন কথা বলতে গিয়েছিল? কানে শুনেই আমি মানুষ নিয়ে চাল পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। এই বাজারে ফেলে ছড়িয়ে নিজে তুই ভরপেট খাচ্ছিল, বতগুলা খাস তার বেড়া বাড়ি নিয়ে আসিস। চাল এত দিস যে হাড়ি উপছে পড়ে যায়। বিনা ওজর-আপত্তিতে আমি বেঁধেবেড়ে দিয়ে বাচ্ছি। বল সে সমস্ত কথা।

অন্ন বলে, আপনার বড় দয়া ঠাকুর মশায়।

কিন্তু দয়া শুধু একতরফে হলে তো হবে না! বিবেচনা করে দেখ। ব্রাহ্মণ-সন্তান বউ-ছেলেপুলে ছেড়ে পাণ্ডববর্জিত জায়গায় নোনা জল খেয়ে পড়ে আছি। আমিই কেবল সকলের দেখব—আমার মুখ পানে কেউ তাকিয়ে দেখবে না?

অন্নদাসী বলে, সরে পড়ুন ঠাকুর মশায়। ঐ বা বললাম—আমাদের মানুষটা ভালো, কিন্তু বড় সন্দেহের বাস্তবিক। আমি রাত করে আদি বলে আপনাকে জড়িয়ে আজকেই নানান কথা বলছিল। উঠে এসে আমাদের ছ'জনকে এক সঙ্গে বসি দেখতে

পায়, বন-কাটা হোসো দিয়ে মুহু মুহু। কক্ষ থেকে নামিয়ে নেবে উঃ, পাড়ার মধ্যে এসে ঢুকেছেন—এত সাহস ভাল নয়।

পাড়ায় হবে না, আলার মধ্যে নয়, তা কোন দিকে যাবো সেটা তো বলে দিবি—

অন্নদাসী দ্রুত পারে চলে বাচ্ছে।

ভরষা অধীর হয়ে বলেন, আহা, বলে যা একটা কথা। কষ্ট করে এদ্র থেকে এসাম।

অন্নদাসী বলে, মাছ-মায়া লোক কিরছে ঐ। গৈরোবনের ভিতর ঢুকে বান, শিগগির। নয় তো দেখে ফেলবে।

গোপাল ভরষা সন্তুষ্ট হয়ে বাঁধের দিকে তাকান। অস্পষ্ট জ্যোৎস্নার অনেক'দূর অবধি নজরে আসছে। কই, মানুষ কোথা? হয় তো বা এই সময়টা মানুষ বাঁধের নিচে নেমে পড়েছে। নায়েব মানুষ, সর ফুলতলা থেকে আসছেন—চিনে ফেললে নানান কথা উঠবে। ফুডুং করে জঙ্গলের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালেন। সাপখোপ থাকা আশ্চর্য নয়। কিন্তু উপায় কি?

অন্নদাসী ঘরে ঢুকে পড়েছে ওদিকে।

সভের

শীত পড়ি পড়ি করছে। শ্রুগময় এখন মানুষের। ক্ষেতে ধান পাকে। গাই বিরোর ঘরে ঘরে। নতুন গুড় ভালকলাই রকমারি তরিতরকারি পাইকাবেয়া দু-দুস্তর থেকে নিয়ে এসে কুমিরমারির হাটে নামায়। কাঠুরে আর বাড়িলেরা দলে দলে জঙ্গলে ঢুকে বোকাই কিন্তি নিয়ে ফেরত আসে। মাল ছাড় করে নিয়ে রমায়ম খরচ করে ছ-হাতে। ভারি জমজমাট হাট এই সময়টা।

হাটের মধ্যে ঘুরছে জগা, কিনছে এটা-ওটা। হঠাৎ তৈলকের সঙ্গে দেখা। বরায়খালার সেই তৈলক। বলে, তোমায় খোঁজাখুঁজি করছি জগরাখ। কোন বনবাসে গিয়ে রয়েছ, কেউ সঠিক বলতে পারে না। বাত্রার দল খুলছি, মনের মতো বিবেক জোটাও বাচ্ছে না। কী গাঙে গাঙে বোটে বেয়ে মরছ! চলে এসো। এইনা গলা তোমায়—গেকরা আলখান্না পরে বিবেক হয়ে আসরের উপর দাঁড়ালে ধস্ত-ধস্ত পড়ে যাবে।

জগার হঠাৎ জবাব জোগায় না। পুরানো দিন মনে পড়ে। বাপমা-মরা ছেলে গানের নেপায় বেরিয়ে পড়েছিল বাড়ি থেকে। কচি-কচি চেহারা তখন, রাধা সাজত। আসর ভাঙবার পর একবার এক গৃহস্থাড়ির বউ তাকে দোতলার উপর ডেকে নিয়ে পায়ের খাইয়েছিল। তারপর এক নতুন পালা খুলল অভিমহা বধ। উত্তরার পাঠ দিল জগাকে। অভিমহা সময়ে বাচ্ছে, সেই সময়টা তার হাত ধরে ফেলে গান :

বেও-না বেও-না নাথ করি নিবেদন

দাসীয়ে বধিয়া বাও, বিচার এ কেমন—

অভিমহার হাত ছেড়ে দিয়ে তারপরে উত্তর-দক্ষিণ পূব-পশ্চিম চতুর্দিকে ফিরে ফিরে গানের একটি মাত্র কলি কঁদে কঁদে গাওয়া : ও তুমি বেও না বেও না, ও তুমি বেও না বেও না...। আসরের মধ্যে সেই সময় একটা শূঁচ ফেলে দিলে বোধ করি শব্দ পাওয়া যেত।

তৈলক বলে, তাই বলছিলাম। চলো জগা আমাদের

বরাবরখোলায়। কারেমি হয়ে না থাকতে চাও, একজন বিবেক তৈরি করে দিবে তারপরে তুমি চল এসো। আটকে রাখব না। হুঁবেলা ছুটো বোল আনা দিবে, তেল-ভাতাক আর নগদ পনের টাকা। গারে ফুঁ দিয়ে এমন যোজগার ছুনিয়ার মধ্যে কোনখানে হবে না।

জগা এর মধ্যে সামলে নিয়ে বলে, ক্লেপেছ? সকলে মিলে খেঁচি বানালাম। অজ্ঞানি বনে মানবেলা হয়েছে। জ্ঞান-জানোয়ার আগে চরকিরে বেড়াত, এখন মাছুষ। বতাই হোক, নিজের কোট—জোর কত ওখানে আমার! কোট ছেড়ে কোনও জায়গায় থাকিনে। তবে একদিন গিয়ে দল কেমন হল দেখে আসতে পারি।

ফেরার পথে ডিঙির উপর বসে ঐ বাত্মাদলের কথা হচ্ছে। বলাই বলে, গান-পাগলা মাছুষ তুই। একটু যেন মন পড়ে গেছে।

জগা বলে, হু! আরও কিছু মাছুষ জমুক—দল করতে হলে আমরা সাঁইতলাতেই বরব। তৈলককে বললাম, নেহাৎ যদি দার ঠেকে যায় তো একদিন দু-দিন থেকে তালিম দিয়ে আসতে পারি। তার বেশি হবে না।

সাঁইতলার ঘাটে ডিঙি লাগল। ডিঙিতে কখনোসখনো শোওয়ার প্রয়োজন হয়, ছুইয়ের নিচে সেজ্ঞ একটা মাহুর গোটানো থাকে। কাঁধে সেই মাহুর এবং হাতে পোটলা পচা তরতর করে নেমে পড়ল।

জগা দেখল পাছ-গলুই থেকে : মাহুর নিয়ে চললি কোথা যে? নৌকোর মাহুর?

ও, তাই তো! এতকণে যেন হুঁস হল পচার। মাহুর যেন হুঁটে গিয়ে তার কাঁধে উঠে পড়েছে। বেকুবির হাসি হেসে মাহুর নামিয়ে বাঁধের উপরে পচা দাঁড় কতাল। আঁটি-বাঁধা বাঁটার শলা ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়ে। আড়াল করে বস্তুটা বের করে নেবার মতলব ছিল, কিন্তু জগার নজরে পড়ে যায়।

উ, এই তোর কাণ্ড! বা মানা করলাম, তাই। বাঁটা কিনে তাই আবার মাহুর জড়িয়ে রেখেছে, আমি বাতে না দেখতে পাই।

পচা আপাতত নিরাপদ। দুখ ফিরিয়ে আসাঃ দুহুটা দেখেও নেয় একবার বুঝি। তাড়া করলে ছুটবে।

জগা বসে, আমরা হাতে ঘুচ্ছি, সেই কাকে তুই চাকবালার কনাকাটা করছিলি। আমার লুকিয়ে আমারই নৌকোর তার গণা নিয়ে এলি।

বলাই বলে, কি করবে? তুমি যে ভয় দেখালে, থাকা ঘেরে গাড়ে ফেলে দেবে। সামান্যামনি পারে না বলে গোপন করে।

নিরজ্ঞ পচা দু-পাটি দাঁত বের করে হাসতে হাসতে বলে, আমার ফেললে ক্ষতি নেই। কুমিরে কামটে না খায় তো সাঁতরে ঠিক ডাঙায় উঠে বাবো। বাঁটা ফেললে শুলকিল। সারা হাট বুঁজেপেতে এই কটা নারকেলের শলা পাওয়া গেল। ফেলে দিলে আবার কোথা পেতাম এ মিনিস?

জগা বলে, ঐ বাঁটা জোর পিঠের উপর দেয় বেড়ে! সাঁইতলার সেদিন আমি পাঁচ পরসার ভোগ দিয়ে আসব। আছে তাই তোর অদৃষ্টে। কামরূপের কথা বলছিনি বলাই, আমাদের সাঁইতলাতেও ভেড়া বানিয়ে ফেলেছে। যেরেমানবের ভেড়া দেখে ঐ একটা। ঐ পচা।

পচা দুকপাত করে না। কাঁধে বাঁটার আঁটি, হাতে পোটলা—

চাকর হাতা-বুড়ি সম্ভবত পোটলার মধ্যেই—বীরদর্পে সে আলার অভিমুখে চলল।

অনতিপরে জগাদের ঘরের সামনে পচা এসে ডাকে, বলাই—
হাটের ঘোরাঘুরিতে কিবে আজ প্রচণ্ড। রাতও হয়ে গেছে। উমুন ঘরিয়ে বলাই ভাত চাপিয়ে দিয়েছে।

জগা বলে, পথে দাঁড়িয়ে কেন রে পচা? ঘরে উঠে আয়।
পচা বলে, না, তুমি গাল দেবে।

ডাকিনী গুণ করেছে, মরণশা ঘরেছে জোর। গাল দিয়ে আর কি করব? বোস ঘরে এসে।

পচা ঘরের ভিতরে এলো, বসল না। বলে, খোল বাজাবার মাছুষ নেই। একবার আয় বলাই। বিনি খোলে নাহগান খোলতাই হয় না।

জগা বলে, কাল দিয়েছিল খেয়ালখুশি মতো, তা বলে যোজ যোজ বেতে বাবে কেন? তুই দামখত দিয়েছিস, তুই পা চেটে বেড়া ওদের—অন্ত মাছুষ ডাকিস কেন?

বউঠাকরন বলে পাঠালেন, গৃহস্থর একটা ভাল-মন্দ আছে। বাদা জায়গা—শুধুমাত্র জ্ঞান-জানোয়ার নয়, কত লোক এসে বেঘোরে মাগা পড়ে, তাঁরাও সব হয়েছেন। ঠাকুরের নামে দোষদুষ্টি ছেড়ে যায়। তাই বললেন, আন্ত হয়েছ বখন, কামাই দেওয়া ঠিক হবে না। রাত হয়ে গেছে বলে আজ না হয় কম করেই হবে।



রেজিষ্টার্ড ট্রেডমার্ক

বিখ্যাত
'শঙ্খ ও গদা'

মার্কী গেঞ্জী

ব্যবহার করুন

ডি, এন, বসুর

হোসিয়ারি ফ্যাক্টরী

কলিকাতা—৭

—রিটেল ডিপো—

হোসিয়ারি হাউস

৫৫১, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

কোন : ৩৪-২৯৫

বলাই বলে, আজকে তুই যা জগা। ওনিরে আর বাজনা কাক বলে। আমার ঐ হাত খাবড়ানোর ওদের মুখে সুখাতি ধরে না। তোর বাজনা শুনেল দশা পেয়ে পটাপট ওরা উগড় হয়ে পড়বে।

জগা বলে, রকম করো! সুখের আলা বীথলাম সকলে মিলে, আলায় মটকার বাজ পড়ল। বজ্জাতগুলো উড়ে এসে জুড়ে বসছে।

পটা রাগ করে বলে, বাজ পড়েছে, না আর-কিছু হচ্ছে, চোখে দেখ এসো গিয়ে। ন-মাস ছ-মাসের পথ নয়, পথের হুখ বাল খাবে কেন? দৌছুখো বলাইটা—ওখানে ভাবে গদগদ, এখানে তোমার কাছে কিবে এসে কুজ্জা করে। এসেছে মেয়েরা ছুটো-তিনটে দিন, জীছাঁদ এর মধ্যে এফেবারে আলাদা হয়ে গেছে। বকবকে তরতকে ঘর-উঠান—এক কণিকা ধুলোময়লা থাকতে দেয় না। ইত্থে মাটি তুলে উঠি করেছিল, সেই উঠান লেপেপুঁছে কী রকম করে ফেলেছে—নিষ্ঠরটুকু পড়লে কুড়িয়ে নেওয়া যায়। পানের পিক পোড়া-বিড়ি আগে তো বোঝানে-সেখানে ফেলতাম, এখন মালসা পেতে দিয়েছে, ষা-কিছু ফেলবে মালসার ভিতরে।

জগা বলে, বজ্জি তো তাই। বিড়ি খাবো না, পানের পিক ফেলব না, হাসিমুখ করাব না, চোখ বজ্জি খালি হরেকৃক হরবাম করব—সে কাজ আমার দ্বারা হয়ে উঠবে না।

বলাইকে বলে, যেহে মাহুঘের সামনে গিয়ে তুই গদগদ হোস, এখানে আর চকুলজ্জা কিসের? চল যা তুই।

বাবার মুখেও পটা বলে, গেলে পারন্তে কি জগা! দেখে খুব ভাল লাগবে।

জগা কালোমুখ করে বলে, চেপে এসে বসেজ্জ, সজ্জ নড়বে না। একে একে সফলকে নিয়ে নিচ্ছে। বাবোটা তো বটে। গিয়ে পড়ব একদিন। ভেজ্জুহের সমস্ত তছনছ করে দিয়ে আসব।

ঐ একটা দিনেই বলাইর চকুলজ্জা ভেঙেছে। ডিডি ঘাটে বাঁধা হলে সে লোজা গিয়ে ওঠে আলায়। জগা একলা পাড়ার মধ্যে ঘরে গিয়ে ওঠে। পটা সেই একটা দিন বার করেক বলেই দার সেবে গেল। এক সঙ্গে তো ঘোবাকেরা—ইতিমধ্যে মত পালটাল কি না, একটা মুখের কথা জিজ্ঞাসা করার পিত্যেশ নেই। আনাড়ি লোকগুলোর আসবে বলাই বাজিয়ে মত্ত হয়েছে। বন-গাঁয়ে শিয়াল রাজ। সেই আমোদে মত্ত হয়ে আছে। জগনাথকে নিয়ে বাওয়ার কি গরজ আর এখন? সে হাজির হলে বরক পশার-হানি ওদের।

নামগান আগে মিনমিন করে হচ্ছিল, গানের ভিতরে হুকার ফুটে ওঠে ক্রমশ। স্বর্বাং দল ভারী হয়ে ঝাঁড়িয়েছে, এবং গানের সম্পর্কে ভয়-ভয় ভাবটা কেটে গেছে। গানের পরে এক একদিন বারবার হরিধ্বনি। তরির লুঠ—হরিধ্বনির পর উঠানে বাতাসা ছড়িয়ে দেয়, কাড়াকাড়ি করে লোকে বাতাসা কুড়ায়। বলাই ক'থানা বাতাসা হাতে ঘরে ফিরে বলে, নাও জগা, প্রসাদ নাও বাদাবনে বসত, বড়-মেজ-ছোট কোন দেবতাকে চটানো চলবে না। হাত পেতে একখানা বাতাসা নিয়ে—একটু শুঁড়া মাথার দিয়ে এক কণিকা জিতে ঠেকিয়ে বাতাসাখানা জগা ফিরিয়ে দেয় আবার।

মজা দিনকে দিন বেড়েই চলেছে। আলা থেকে ঘরে ফিরে এখন রাত দুপুর। নামগানের পর গরুগরু চলে বোধহয়। রাত শেষ করে জগা বলে থাকে, আর গজায় মনে মনে। তাকে গড়ে-তোলা সাঁইজলা ঘেরিতে একঘরে করেছে তাকে সকলে এমন কি বলাই অবধি। সকল গোলমালের মূলে চাকুবালা সর্বনেশে মেয়ে যে বাবা।

শেষটা একদিন জগা রাগ করে বলে, ভক্ত হয়ে পড়েছি! ঠাকুরের নামে তো রাত কাবার করে ফরিস। কাঁহাতক বলে আমি ভাত পাহারা দিই? এবার থেকে আমি খেয়ে নেবো।

বলাই সঙ্গে সঙ্গে হাক ছু-খানা ধরে বলে, তাই কোরো খেয়ে নিয়ে তুমি গুয়ে পোড়ো। নয়তো আমার মরা মুখ দেখবে জগা। ঐড়িতে ভাত রেখে দিও। নিয়ে থায়ে আমি খাব।

নতুন ব্যবস্থার ভাল চল বলাইর। জগা না খেয়ে আছে আগে তাই তাড়াতাড়ি ফেরার চাড়ি চল একটা। এখন নির্ভাবনা। জগা ঘুমিয়ে থাকে। খুৎখাট আওয়াজ হল একটু ভেজানো বাপ খোণার। ভিতরে এসে কপকপ করে ভাত থাকে। বাইরে গিয়ে জগা ঢেলে আঁচিয়ে এলো। ঘুমের মধ্যে এই সমস্ত জগা স্বপ্নের মতন টের পার। সমস্তটা দিন গাড়ে খালে আর কুমিরমারি গজ্জ কাটে। বড়দাকে জপিয়েজাপিয়ে এই বাদা এসাকার নিয়ে এলো—সেই বড়দার পক্ষেও কি উচিত নয় বাজ্জ জগার ঘরে একটিবার এসে খোঁজখবর নেওয়া! গাঁর অঞ্চল থেকে বড়দার আপনজনরা এসে মিলেছে—আমে-দুখে মিলেছে, আঁচি আর কি গরজ এখন? শেষ বারে উঠে চোখ মুছতে মুছতে মাহের ডিডি নিয়ে কুমিরমারি ছুটুক, এই ছাড়া অন্য কোন গরজ নেই।

সেরিন ঘাটে ফিরে ডিডি বাঁধতে বাঁধতে জগা ওরাক-ওরাক করে। বমি করে ফেলবে এমনি ভাব। ঝড় বাঁধে উঠতে উঠতে জগা পিছন ঘুরে তাকায়।

ঐ যে ওল-চিড়ি খাওয়ার গদা ঠাকুর, ক-দিনের পটা মিড়ি, আর কি রকমের ওল কে জানে? পেটের মধ্যে পাক দিচ্ছে সেই থেকে।

বলাই বলে, ওল-চিড়ি আমিও তো খেলাম—

বলেই তাড়াতাড়ি ঘুরিয়ে নেয়। অবিশ্বাস করা হচ্ছে, দেখে উঠবে জগা। কথা ঘুরিয়ে নিয়ে বলাই বলে, শুকের খেতে গেলে কি জজ্জ? আমি ডাল দিয়ে খেয়েছি, ওল খেতে পারি নে, ওলের নাম শুনেল আমার গাল ধরে। তুমি ওক টেনো না অমন করে, গলার নলি ছিঁড়ে বাবে। ঘরে গিয়ে গুয়ে পড় একুণি।

আজকে আর বাসনে তুই। আমি বাঁধতে পারব ন এই অবস্থায়।

বলাই বলে, রান্না আবার কি। তোমার খাওয়ারাওয়া নেই। একলা আমি। গদাঘরের খাওয়ারানোর চোটে তোমার ঐ অবস্থা। আমারও গলায় গলায় হচ্ছে। চাটি মুড়ি-চিড়ে চিরিয়েও থাকতে পাছি। আমাদের ঘরে না হোক, বড়দা ওখানে মুখের কথা বললেই সঙ্গে সঙ্গে অমনি বাটি ভরে এনে দেবে।

জগা আগুন হয়ে বলে, খাওয়ারটা ভাবলি শুধু, আমার দশা দেখছিল নে। বমি করতে করতে মরে যাচ্ছি—



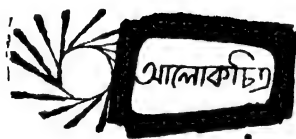
দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির

—বতন দে



খোকা-খুকু

—ডাঃ রামজীবন ঘোষ
—মালিক বাবু



—বধু বসাক





শিষ্টমুখ

—বিত চক্রবর্তী



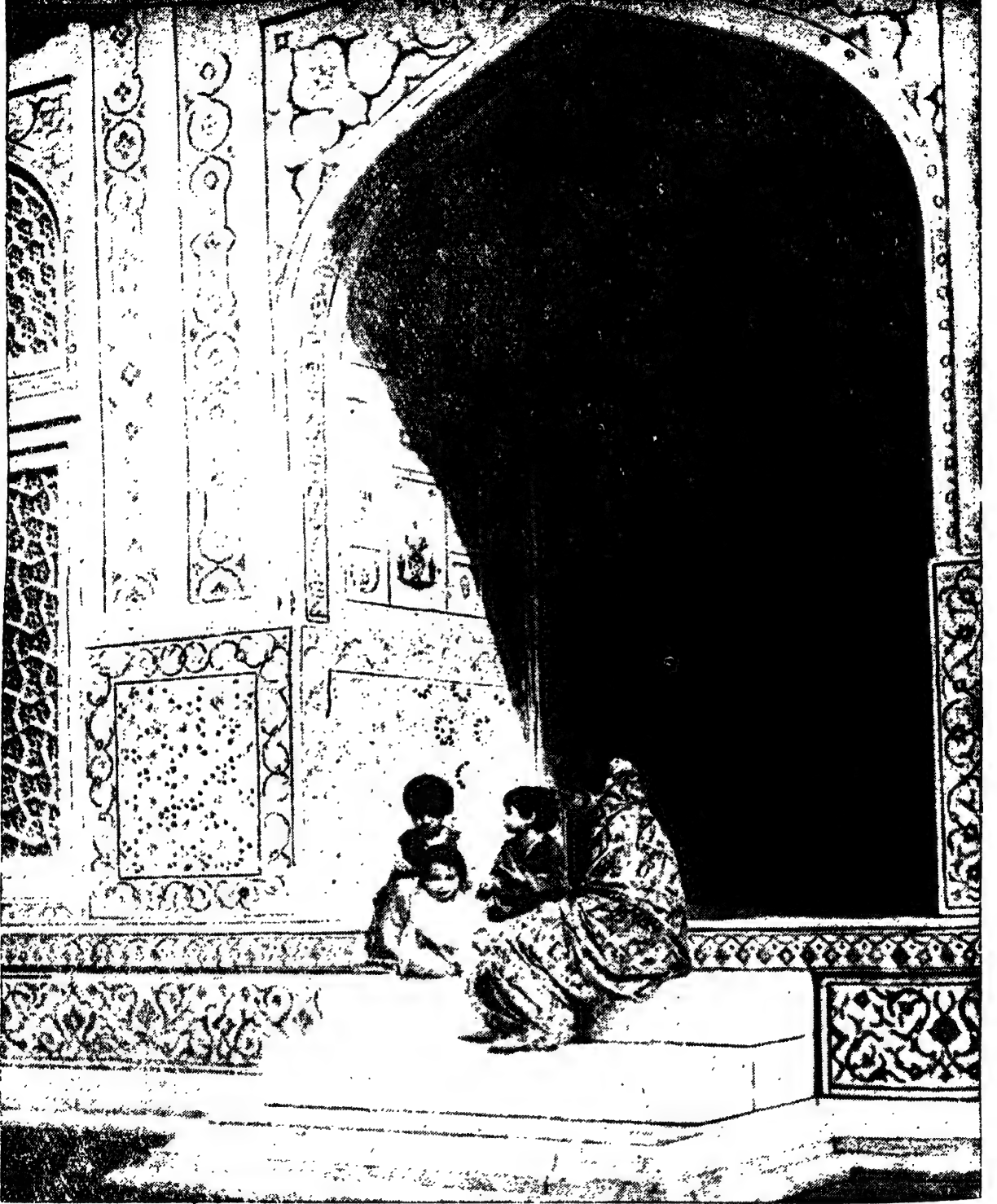
দিন আগত ঐ

—বি দাশ



—শক্তিভূষণ চট্টোপাধ্যায়

বাণুকাবেলায়



সমাধি (ইদ-মুদ-উল্লাহ)

—অসিত রায়

বলাই বলে, আমি যেতাম না। মাইরি বলছি। বাঁওয়া যায় না হেন অবস্থার একলা মানুষ ঘরে ফেলে। কিন্তু না গেলে ঠাকুরের ঈশ্বর বন্ধ। বাব আর চলে আসব। রীতরক্ষ করে আসি। রোজ ইয়ম মতো করে এসে মাঝখানে একদিন বন্ধ করা যায় না। কোন রই নেই, শুয়ে পড়গে জগা। ঠাকুরের কাছে বাড়ি তো,— ভিনিই ভাল করে দেবেন।

বুঝিয়েবুঝিয়ে বলাই বখারীতি আলাহুখো হাঁটল। ছাই হয়েছো গার, অস্থখের ভান করে বলাইটাকে পরখ করে দেখল। পরীক্ষার লে দেখে বিম হয়ে গেছে। অভ্যাস বশে তামাক সেজে নিয়েছে, কিন্তু টানবার মেজাজ নেই। কলকে নিভে গেল না টানার দরুন। কাস করে উপুড় করল কলকে মেজের উপরে। বাদা অঞ্চল ড় বড় গুণীন আছে—মস্তুর পড়ে আঁকচোখ কেটে বাধবন্ধন করে। কিন্তু মেয়ে জাত বেন তাদেরও বড় গুণীন—মস্তুর পড়ে গা, আঁকচোখ কাটে না, এমন-এমন মায়ী করে ফেলে।

আসি বলে তো বলাই চলে গেল। নামগানও আজ তাড়াতাড়ি মাথা হয়ে গেছে, তবু কিয়ৎ না কেন? কি করে না জানি বৈশ্বক আবার ভিতর বসে বসে? পেটের মধ্যে পাক দিচ্ছে, জগা লেছিল। ঠিক উণ্টো, কিথের পেটের নাড়ি চনমন করছে। সে গাত বেঁধে রাখে, রাতদুপুর অবধি প্রাণ ভরে আড্ডা দিয়ে এসে রাঁধা জাত করতা দেন। রোজ রোজ কেন এ রকম হবে? আড্ডা নামাই দিয়ে বলাই আজ রাঁধাবাড়ী করুক, এই সব ভেবে লেছিল অস্থখের কথা। রাত বাড়ছে। শিছনের বনে রাজিচর কোন গাধির হল হটোপাটি লাগিয়েছে, রপাস-রপাস করে পড়ছে ডালের উপর। দুস্তোর, কত আর দেরি করব,—উম্মন ধরিয়ে জগা ভাত গণিয়ে দিল। ভাত আর বিঙে-ভাতে। জ্বাকড়ার বেঁধে চাট্টি ভালও ছেড়ে দিল ওর ভিতরে। ভাত ঢেলে নিয়ে খেতে বসল, বলাইয়ের তবু নিশানা নেই। মরেছে নাকি? অস্থখ জেনে গেছে, তাড়াতাড়ি ফিরে আসবার কথা,—তা দেখি অল্প দিনের চেয়ে বেশি গরি আজকে। তাই দেখা গেল, জগা যদি সত্যি সত্যি মরে যায়, তিলকের তরে ওদের আড্ডা বন্ধ হবে না। গ্রাসে গ্রাসে খেয়ে নিচ্ছে, বলাই আসার আগেই খাওয়া শেষ করে শুয়ে পড়বে। রাত্রের মধ্যে কথা বলবে না, সকালবেলাও না—এক ভিত্তিতে বাবে, তবু মুখ তুলে তাকাবে না তার দিকে।

খাওয়া শেষ হবো-হবো, হঠাৎ শোনা যায় শাঁখের আওয়াজ। ঘোর জল্লের ভিতরে শব্দধ্বনি শুনে পাবে ভর সন্ধ্যাবেলা। বাদার নৌকোর গৃহস্থর রীতরক্ষ করে। গাঁয়ে-ঘরে দারে-বেদায়ে নিয়মের তবু ব্যত্যয় আছে, কিন্তু বনবিবি দক্ষিণারয়ের এলাকার নীতিনিয়ম মেনে বোলজানা শুদ্ধাচারে থাকতে হয়। যা এবং বাবা কোণের কোন কারণ খুঁজে না পান। কিন্তু মেছোঘেরির আবার মধ্যে শব্দধ্বনি—হেন কাণ্ড কে কবে শুনেছে? মেয়েমানুষ এসে পড়ে কটা দিনের মধ্যে নিজস্ব গাঁ-ঘর বানিয়ে তুলল।

শাঁখ বাজিয়ে নতুন কি একটা শুক হল এই রাত্রে। চুলোর থাকগে। বলাইয়ের যে ভাত বেঁধেছিল, জগা সেগুলো ঘেরির জলে ফেলে দিয়ে এস। আছে থাক। ভাত রাঁধবার চাকর-নকর কে মরেছে, খাবে তো কিরে এসে কষ্ট করে বেঁধেবেড়ে থাক।

ভাত ফেলে এসে জগা শুয়ে পড়ল। শাঁখ বাজছে, আর উলু পড়ছে

তাং সই। উলু দেবার মানুষ দুটেছে বাদার। উলু-উলু, উলু-উলু— দীর্ঘ ভীষণ কষ্ট জলের উপরে জল্লের ভিতরে ছড়িয়ে যাচ্ছে। বিশ্বর জাঁক আজকে আলায়, রাত কাবার করে দেবে মনে হচ্ছে। আবার উঠে পড়ল জগা। উম্মনে জল ঢালল, রাত্রার কাঠ বা আছে জল ঢেলে আছা করে ভিজিয়ে দিল। রাঁধবে তো বন থেকে শুকনো কাঠ ভেঙে নিয়ে এসো বাছমশি। ভিজ্ঞে উম্মনও ধরানো যাবে না, ডেলা সাজিয়ে তার উপরে হাঁড়ি রেখে কাজ সারবে। এত অধ্যবসায় থাকে তো পেটে পড়বে ভাত। নইলে উপোস।

শুয়ে পড়ে ভাবছে এই সব। জ্যোৎস্না ফুটফুট করছে, ঘরের মধ্যে এসে পড়ছে জ্যোৎস্না। বাঁধের উপরে মান্নবজন কলবব করত করত যাচ্ছে, বাড় তুলে জগা তাকিয়ে দেখল। পাড়া বেঁটিয়ে গিয়েছিল যে আলায়! জালে বেরবে আজ কখন—আবার ফুটিতে কালকের দিন অবধি পেট ভর থাকবে তো?

বলাই ফিরছে! আর সর্বনাশ, মেয়েটাকে গর্বে নিয়ে এসেছে যে।

ও লোকটা, তুমি গেলে না কেন? লক্ষ্মীপুজো হল, সমাই গিয়েছিল। ওঠো, মা-লক্ষ্মীর প্রসাদ নাও উঠে।

বয়ে গেছে শত্রুর কাছ থেকে হাত পেতে প্রসাদ নিতে। জগা তো ঘুমিয়ে আছে। ঘোরতর ঘুম। বলাই তাড়াতাড়ি বলে, অস্থখ করেছে, ভেবো না। বেঁধে বাও, পাত্তোহটা কাল দিয়ে আসব।

ঘুম থেকে জগাকে ডেকে তুলতে চায় না বলাই। সম্ভবত জগা বেন দৈত্যদানো বিশেষ, উঠেই অমনি তোলপাড় লাগিয়ে দেবে চাকরবারা সঙ্গে। চোখ বুঁজে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে জগা দেখছে। পিতলের

THE JEWELLERIES, WATCHES & GUARANTEED WATCH REPAIRING



OMEGA, TISSOT
& COVENTRY WATC. --
ROY COUSIN & CO.
4, DALHOUSIE SQUARE, CALCUTTA-1

রেকাবিতে পুষ্কার প্রদান রেখে চাকবালা চলল, পিছু পিছু বলাই আলা অবধি এগিয়ে দিতে চলল। তা বেশ হয়েছে। বলাই আবার বধন ঘরে ফিরবে, তাকে এগুতে আসবে না চাকবালা? এবং তারপরে চাকবালা বধন বাবে? চলুক না সাবরাত্রি ধরে এই টানাপোড়েন!

বলাই কিরেন? এসে এক ঘটি জল ছড়ছড় করে পায়ে ঢেলে জগার পাশে একটা চাদর বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। ভাত রাঙ্গা করা আছে কি না, দেখল না একবার তাকিয়ে। ভাতের গরজই নেই তার। শোওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়েও পড়ে বুরি।

তখন জগাকেই কথা বলতে হয়: শাঁখ পেলো কোথা রে?

জুটিয়ে নিয়েছে। কাঠুরের নৌকো কালীতলায় নেমে মানসিক শোধ দিচ্ছিল। শাঁখের কুঁতন চাকবালাও গিয়ে পড়েছে। অনেক বলকরে কিছু লাম ধরে দিয়ে শাঁখটা তাদের কাছ থেকে নিয়ে নিল মানবেলার গিয়ে তারা আবার কিনে নেবে। শাঁখ জুটে গেল, তখন ঝাঁক হল, গেরস্তঘরে লক্ষ্মীপূজা করলে তো হয়। দিনটাও আজকে বিস্মৃৎবার। এর পরে হস্তায় হস্তায় কী বিস্মৃৎবারে পূজা করবে।

জগা বলে, শাঁখ হল, ফুল-নৈবিজিতও না হয় জুটিয়েছে। কিন্তু বায়ুন নইলে তো পূজা হয় না। বায়ুন পেল কোথা? তুই গলার জালের নুতো ঝুলিয়ে পৈতে করে নিলি নাকি?

বলাই বলে, লক্ষ্মীপূজা শিবপূজা বিনি বায়ুনে হলে দোষ নেই। হস্তায় হস্তায় বায়ুন পাবে কোথা? কিন্তু পরলা দিন আজকে বায়ুনের হাত দিয়েই ফুল ফেলেছে।

হেসে উঠে বলে, জাত-বায়ুন রে ভাই। একেবারে জাত-গোখরো। চাকবালা খবর রাখে সব, ওর সঙ্গে ঢালাকি চলে না। বলে, কাছেই তো বায়ুন রয়েছে—চৌধুরিগঞ্জের গোপাল ভরদ্বাজ। বলে-করে তাঁকেই এনে দাও তোমরা। সে কী কম হাসামা! প্রথমটা রাজি হয়ে শেষে বিগড়ে গেল: জরুরি কাজ আছে, ভেড়ি সক্রান্ত ব্যাপার। এক পা নড়তে পারব না এখন আলা ছেড়ে। পটা তুই পা জড়িয়ে একেবারে ঠুঁশ হয়ে পড়ল তো তখন অস্ত্র এক ছুতো; বলি, নৈকবা কুলীন আমি, সেটা জানিস? কার নামে পূজার সক্রান্ত হবে, কোন্ জাত কি গোত্র, কিচ্ছু জানিনে। গেলেই হল অমনি। মুখ চুপ করে সবাই ফিরল। চাকবালাও তেমনি মেয়ে। বলে, আমি বাচ্ছি নিজ—গিয়ে মুখোমুখি জবাব দেবো। সকলে মিলে দল হয়ে গিয়ে পড়লাম চৌধুরি-আলায়। চাক বলে, ঠাকুরমশায়, জাতজন্ম বত-কিছু মানবেলার গিয়ে। বাব হরিণ সাপ ওয়ারের মধ্যে জাত-বেজাত নেই, বাদাবনে মাহুঘেরও তেমনি জাত নেই। বলতে পারেন, পৈতেওলা খুঁজি কেন তবে? সে আমার বউদিদির জন্তে, আর কাছে-পিঠে আপনি রয়েছেন বলে। বউদিদি সারা দিন উপোসি আছে, আপনি পূজা করে এলে খুঁতখুঁতানি গিয়ে মনের সুখে সে প্রদাদ পাবে। রাতের বেলা সেই জন্তে আপনাকে কষ্ট দিচ্ছি ঠাকুরমশায়! মেয়েটা যা তুখোড়, তাকে কী বলব জগা! মিষ্টি কথাই নামেবকে একেবারে জল করে দিল।

শালতি নিল না, বাঁধ ধরে পায়ে হেঁটে নতুন আলায় এসে পূজোজাজা করল। এর পরে কী বিস্মৃৎবারে এসে এসে পূজা করে বাবে, কথা দিয়ে গেছে।

জগা বলে ওঠে, কী কাণ্ড রে বাবা! আলা তবে আর রইল কোথা? আমাদের সাধের আলা বোলজানা এখন গেরস্তবাড়ি।

জগন্নামের উম্মা বলাই ধরতে পারে না। পুলকিত বঠে আরও সে ফলাও করে বলে, বিস্তর কমতা ধরে মেয়েটা। অমন দেখা যায় না। এই ধরো বাদা-জায়গা—পূজার কোন অঙ্গে তা বলে খুঁত রাখেনি। মালসার মধ্যে টিকে ধরিয়ে ধুনো দিয়েছে। সেই বরাপোতা থেকে গাঁদাফুল জোগাড় করে এনেছে। ঘর ভরে আলপনা দিয়েছে—পদ্ম আর লক্ষ্মীর পা। লক্ষ্মীঠাকরুন পা ফেলে ফেলে উঠান থেকে ঘরে উঠে বসেছেন, তারই বেন ছাপ পড়ে গেছে।

বিরক্তিতে জগার মুখে জবাব আসে না। বলাই ঘুমে লাগল। জগা ভাবছে। তারি বিপদের কথা হল যে। ভাবতে গিয়ে দিশা পায় না। একচক্ষু হরিণের মতো এককাল শুধু একটা দিকের বিপদ ভেবে এসেছে। চৌধুরিগঞ্জের শক্ততা। অনেক আগে থেকে জমিয়ে আছেন তাঁরা—মাছের এলাকার শাহান-শা বলা যায়। অস্ত্র কারও আসার পথে কাঁটা ছড়ান। কিন্তু এটা ছিল জানা ব্যাপার—এবাও সমাসতর্ক এইজন্ত, কাঁটা বহুই ছড়িয়ে দিক খুঁটতে খুঁটতে এগিয়ে বাবে। চৌধুরিদের ডরায় না, কিন্তু গাঁ-গ্রাম থেকে মেয়েছেলেরা এসে পড়ে ঘরগৃহস্থালী বানিয়ে গগনকে সবলের থেকে আলাদা মাহুব—ভয়মাহুব করে তুলবে, 'এটা কে কবে ভাবতে পেরেছে?'

দম হয় না, হটকট করছে। নানান রকম মন্তলবের ভাড়াগড়া। ভাবতে ভাবতে মাথা গরম হয়ে যায়। সন্ধ্যারাজে মিথ্যা করে অনুষংের কথা বলেছিল, রাতত্বপূরে অনুষং করেছে সত্যিই। সর্গদ জলছে রাগে। রাগ মেয়েলোক ছোটোর উপর। বিশেষ করে এ চাকবালা—সকলের বড় প্রতিপক্ষ সে-ই এখন। অল্পকূল চৌধুরি চেরেও বড়। রাগে রাগে বাইরে চলে এলো। বাঁধ ধরে চলল কয়েক পা।

নতুন আলা নিঃশব্দ। ঘুমে ওরা বিভোর হয়ে। জগা চোরের মতন টিপিটিপি এগোয়। বাবে আলায় উঠান অবধি—লক্ষ্মীর পা এঁকেছে বেসব জায়গায়। পা ডলে ডলে মুছে দিয়ে আসবে আলপনা। রাগের খানিকটা শোধ দিয়ে তার পরে বদি ঘুম হয়।

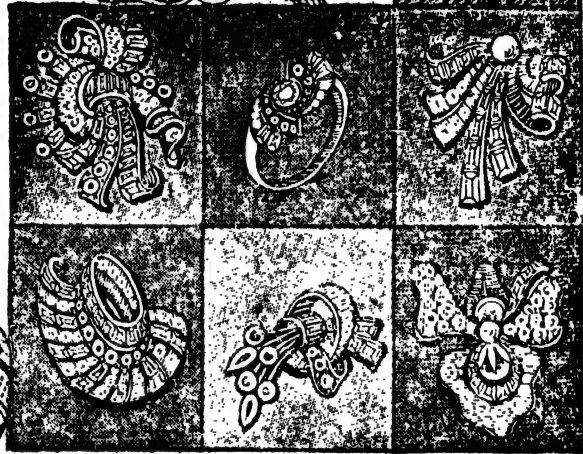
বাঁধের উপর রাখেজাম। আশ্চর্য, খোঁড়া পা দেখি পরিপূর্ণ আরাম হয়ে গেছে। হনহন করে চলেছে। খানিকটা পিছনে অন্নদাসী। অন্নদাসী হেঁটে তার সঙ্গে পারছে না।

জগাকে দেখতে পেয়ে রাখেজাম বলে, ভাল হয়েছে। চলে দিকি আমাদের সঙ্গে। হাতে লাঠি? বেশ হয়েছে, নিঃসবলে বেরুতে নেই। বউকে বললাম, বাড়ি থাক। তা শুনল না। পুলক কত। বাজাটাকে সেই সন্ধ্যাবেলা সুবোধবালার কাছে দিয়ে রেখেছে। রাতত্বপূরে এখন মজা দেখতে চলল। [ক্রমশ:]

[বিজ্ঞাপনদাতাদের পত্র দেওয়ার সময় মাসিক বসুমতীর উল্লেখ করবেন]



আদর্শ মাধুর্য



গিনিজাল্ড জুয়েলারী স্পেশালিস্ট

এম.বি.সরকার
এও সন্স

ম্যানুফ্যাকচারিং জুয়েলাস্

ফোন-৩৪-১৭৬১ ১৩৭/সি ১৩৭ সি/১ চব্বাজার টুই কলিকাতা-১২ গ্রাম-পুণ্ড্রিয়াপুত্র
ব্রাঞ্চ-হালি গল্ড-২০০/সি গ্রামবিহারী এভিনিউ কলিকাতা-১২ ফোন-৪৬-৪৪৬৬
মোরামের পুরাতন চিত্রনা ১২৪, ১২৪/২, বঙ্গবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১২
কেবলমাত্র রবিবার খোলা থাকে
ব্রাঞ্চ-জামসেদপুর ফোন- জামসেদপুর- সিটি-২৫৫৮৫

D.B.

শ্রেতনিন্সি

রক্ত সেন

হেমন্ত আর একবার আয়নার তার গিলে-করা পাঞ্জাবী আর কৌচানো ধুতি পরীক্ষা করল, ক্রমালে আর একটু এসেল ভড়ালো, তরল গৌফে আঙ্গুল বুলালো, ভাবল : বোধ হয় বার করে কামালে যেন হবে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে টুনকী তাকে পরীক্ষা করছিল। হেমন্ত জিজ্ঞাস করল, কি রে! বাবি নাকি?

ফ্রকের শ্রান্তটা আঙ্গুল দিয়ে গুটাচ্ছিল টুনকী, চোখ ছিলছিল করে উঠল, বলল, আমার নিয়ে যাবে দাদা? নিয়ে চল না, মা-কে বলে আসব?

তবে চ, কিন্তু তাড়াতাড়ি কর, পাঁচ মিনিট সময় দিলাম, তৈরী হয়ে আর।

টুনকী দৌড়ে গেল মা'র কাছে।

অনেক কষ্টে কার্ট ইয়ার থেকে সেকেন্ড ইয়ারে উঠেছে হেমন্ত, কলেজের এক প্রোফেসরের কাছে ইংরেজী পড়তে যায়। দিন করে ক আগে তার বাবা প্রোফেসরের মাইনেটা তার হাতে দিয়েছিলেন ওকে দেবার জন্তে, হু'দিনেই টাকাটা কেমন করে যে উড়ে গেল কিছুতেই হিসেব করতে পারছে না সে। হরত ভয়লোক তার বাবার কাছেই হাজির হবেন, বলা যায় না! হেমন্ত অস্থির হয়ে উঠল, একটা সিগারেট ধরিয়ে ফেলল, দরজার দিকে কান আর চোখ রেখে যেন যেন টান দিতে লাগল।

বাইরে পায়ের শব্দ শুনেই সিগারেটটা জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলল সে। ঘরে ঢুকল আগে তার মা-স্বরবালা, পিছনে টুনকী।

কোথার বাবি তোর? জিজ্ঞাস করল স্বরবালা।

আমি ত বাচ্ছলাম আমার এক বন্ধুর বাড়ি।

মিথো কথা। বলল টুনকী তার লম্বা বেণী হুলিয়ে, দাদা বাচ্ছ কাটলেট খেতে।

সে তোকে ক্ষাপাচ্ছলাম!

স্বরবালার ছোটোখাটো গড়ন, শরীরের শক্ত বাঁধুনি; কমনীয়, স্নেহময় মুখ, বুদ্ধিতে উজ্জ্বল দুটি চোখ, ঘরের চারদিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাস করল, সিগারেটের গন্ধ পাচ্ছি?

বাবার বৈঠকখানা থেকে আসছে! আচ্ছা মা, সব সময়ে একটা দামী নেকলেস পরিয়ে রাখ কেন? রান্ডার ঘাটে—

তুই ত সংগে আছিস।

চল রে টুনকী, বলল হেমন্ত।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে সত্যিই হেমন্ত ওকে রেস্তোরাঁ নিয়ে গেল। কি খাবি বল?

মাংসের কাটলেট, বলল টুনকী। অনেক কষ্টে আনন্দ চেপে রাখল সে, দশ থেকে এগারোয় পড়েছে; এটুকু বোঝে—বেশী হাসলে দাদা তাকে বেকুব বা লোভী ভাবতে পারে; বাতির আলোর হীরে-বসানো লকেট ঝলমল করতে লাগল।

কাটলেট এসে গেল, আড়চোখে তাকাত্তে লাগল টুনকী।

নে, আর দেয়ী কিসের?

ছুরি-কাঁটা চলতে লাগল।

কাটলেট শেষ হবার পর হেমন্ত জিজ্ঞাস করল, আর কি খাবি? একটা চপ।

চপ এল, আবার চলল ছুরি-কাঁটা।

বিল চুকিয়ে ওরা এল রান্ডার। হেমন্ত জিজ্ঞাস করল, পার্কে বাবি? দুটো আইসক্রীম খেয়ে বাড়ি—

চল।

বড় পার্ক। চারিদিকে লোকের তীড়; দুটো আইসক্রীম কিনে ওরা পার্কের মাঝখানে এগিয়ে গেল। পাঁচ মিনিট বসা যাবে, আইসক্রীম খেতে খেতে ওরা কোন্ জায়গায় বসবে তাই ভাবছিল, হেমন্ত একটু জোরে পা চালাল, টুনকী পিছনে; হঠাৎ হেমন্তর বয়েসী একটি ছেলে কোথা থেকে একেবারে টুনকীর কাছে এসে পড়ল, মুখ ফিরাবার আগেই ছেলেটি দুটি হাত বাড়িয়ে চোখের নিম্নে ওর নেকলেস খুলে নিয়ে দৌড়, টুনকীর হাত থেকে আইসক্রীম-লাগানো কাটিটা মাটিতে পড়ে গেল, চীৎকার করে উঠল সে, কি হল? কি হল? হেমন্ত এগিয়ে এল, টুনকী তখনও চ্যাচাচ্ছে; কি হল বল না?

ঐ বে! ঐ লোকটা পালাচ্ছে আমার নেকলেস নিয়ে। এতক্ষণে কেঁদে ফেলেছে সে।

হেমন্ত তাকিয়ে দেখল—ছেলেটি দ্রুত পায়ে পার্কের গেটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, চোর, চোর! বলে জোরে চীৎকার করে উঠল সে। লোক জড় হয়ে গেল অনেক; আরও অনেক হৈ-চৈ বিশ্বংখল। হেমন্ত হঠাৎ ছুট দিল গেটের দিকে, তার সংগে ছুটল আরও কয়েকজন; টুনকী চোখের জল সামলে অজস্র প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করল।

হেমন্ত কিরে এল, বলল, পালিয়েছে!

পুলিশে ডাইরী করে এসো হে! একজন বয়স্ক লোক উপদেশ দিল।

কি হবে বলুন? বলল হেমন্ত।

তা অবশ্য বলতে পারি না; তবে হতে পারে কিছু! দামী নেকলেস, বিক্রি করতে গিয়ে ধরা পড়তে পারে।

টান্ধী করে থানায় গেল হেমন্ত, সেখানে ডাইরী করে বাড়ি ফিরল; নিচের বৈঠকখানায় তার বাবা তাকিষ্টী বাবু মজলদেব সংগে কথা বলছিলেন; তাঁকে খবরটা দেবার সাহস হল না তার, উপরে এসে মা-কে বলল; স্বরবালা একবার মাত্র ছোট একটি আন্তর্দান করে চুপ করে গেল। সত্যিই, আমারই ভুল হয়ে গেছে—ওটা পরতে দিয়ে ওকে; লকেটের হীরের দামই আর হাজার দেড়েক টাকা।

ইস! ও কি আর পাওয়া যাবে? বলল হেমন্ত।

টুনকী আর এক পশলা চোখের জল ফেলল।

কাঁদিল না! কাঁদলে কি কিরে আসবে? আর একটা গড়িয়ে দেব'খন, আমার নেকলেসটা পরতে দেব তোকে, খবরদার! বাবুকে বলিস না যেন।

মা, আমি বাচ্ছি প্রোফেসরের বাড়ি।

যা।

হেমন্ত বই গুলিয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

লেকের কাছে এসে বাস থেকে নেমে পড়ল সে, চায়ের দোকান ক'টা পেরিয়ে একটু নির্জন জায়গায় জলের ধারে এসে বসল হাত-পা ছড়িয়ে, আঙুলে আঙুলে একটা সিগারেট ধরাল।

প্যাট আর ছিটের সার্ট-পরা একটি ছেলে এসে দাঁড়াল হেমন্তের পিছনে, কাঁকড়া চুলের মধ্য আঙ্গুল ক'টা চুকিয়ে বলল, কতক্ষণ?

মুখ তুলে তাকাল হেমন্ত, হাসল; এই ত! মিনিট পাঁচেক, ঘোঁস।

ছেলেটি বসল; বয়স উনিশ-কুড়ি হবে; সাঁটের আঙিনা গুটানো, ডান হাতে ঘড়ি; বুকপকেট থেকে চিরুণী নিয়ে মাথা আঁচড়ালো।

হেমন্ত সিগারেটের প্যাকেটটা এগিয়ে দিল; অন্য ছেলেটি একটা সিগারেট টোটে লাগিয়ে বাঁ হাতে দেশলাইটা একবার কাঁকুনী দিল। ডান পা-টা লম্বা করে পকেট থেকে নেকলেসটা বার করে হেমন্তের কোলের উপর ছুঁড়ে দিল, অস্পষ্ট বাস্তির আলোর সোনা আর পাখর চকচক করে উঠল; ছ'হাতে নেকলেসটা চেপে ধরল হেমন্ত।

অন্য ছেলেটি অল্প গলায় হেসে উঠল, জিজ্ঞেস করল, কি রে বাবড়ে গেলি না কি?

না, আমার দিলি কেন? নে, রাখ ভোর কাছে।

ছেলেটি নেকলেস হুকিয়ে রাখল পকেটে, পা গুটিয়ে নিল, সিগারেট ধরাল।

একটু দূরেই ছেলে আর মেয়ের মিলিত হাসির শব্দ শোনা গেল; লেকের জলে বাঁই মারল একটা বড় মাছ, ভাসা চাঁদের ছায়া ডেউ-এর ধাক্কায় টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে গেল জলের চারদিকে।

চাই-ই-ই গরম হুড়ি! হুড়ি দেব না কি বাবু?

মোটর ছুটছে, আর হাওয়া ছুটল।

কাছ!

কি বলছিস?

কাল ওটাকে ঝেড়ে দিতে পারবি ত?

তবে কি?

দেখিস যেন—

চপ কর।

বাড়ি চুকবার আগে হেমন্ত দেখতে পেল ইংরেজীর প্রোফেসর হিমাংশু রক্ষিত উঠে। দিক থেকে এগিয়ে আসছেন তাদেরই বাড়ির দিকে। লম্বা লম্বা পা ফেলে সে সামনে গিয়ে দাঁড়াল;

মাইনের জন্তে একেবারে বাড়ি বাওয়া করতে হল স্তর? টাকটা মারা বাবে ভাবছিলেন না কি?

চাকরটা গুটিয়ে নিয়ে প্রোট অধ্যাপক কি একটা বলতে বাচ্ছিলেন, কিন্তু সুরোণ পেলেন না।

মাষ্টারদের অবস্থা কি আজ-কাল এতই খারাপ হয়ে গেছে?

বদি বলি টাকার অভাব আসিনি, তোমার খবর নিতে এসেছি, এক সপ্তা তোমার কলেজে দেখিনি, বাড়িতেও পড়তে আসিনি, ভাবলাম—হয়ত—

চপ করুন, মশাই, আমার এমন গভীর তালবাসবার কোনো কারণ নেই,—বদি না আপনার অভাব কোনো মতলব থাকে; বদি বাড়ি বান, বাড়িরোই টাকার জিনিস থাকবে।

একটু ইতস্ততঃ করে প্রোফেসর রক্ষিত বললেন, ভুললোকেই ছেলে মনে-প্রাণে যে এমন অগঃপাতে যায়—সেটা তোমাকে দেখেই বুঝতে পারলাম। কয়েক মাস লক্ষ্য করেছি তোমায় ভিতরটা তোমার পোকার খেয়ে গেছে! এক পা সরে দাঁড়ালেন তিনি, চাঁদর দিয়ে নাক ঢাকলেন—বেন কোনো অকথ্য দুর্গন্ধ নাকে এসে লাগছে; তোমার বাবাকে বলতে এসেছিলাম—তোমার পেছনে বেন অথবা আর পরসাদ নষ্ট না করেন, পড়াগুলো তোমার হবে না।

গলায় শব্দে ভেতন জোর ছিল না, উদ্বেজনাও নয়; কিন্তু হেমন্ত আজ এই প্রথম অনুভব করল—একজন মানুষ আর একজন মানুষকে কি গভীর ঘৃণা করতে পারে। এমন ঘৃণা তাকে সাপের মত জড়িয়ে ধরল, দংশন করল তার সমস্ত শরীরে; বুদ্ধিমান, শিক্ষিত লোকের ঘৃণা এমনই, যে-লোককে তুমি হত্যা করতে পার, কিন্তু তবু সে-ঘৃণার হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই, মুক্ত নেই। মুখ তুলে দেখল হিমাংশু রক্ষিত চলে যাচ্ছে আর একটি কথাও না বলে, আর একবারও তার দিকে না তাকিয়ে।

আজ্ঞে আজ্ঞে বাড়ি চুকল সে, বৈঠকখানার তখনও কয়েকজন মজল, কাজ সেবে তার বাবার উপরে যেতে এগারোটা বাজে। খাবার-বারে উঁকি দিয়ে দেখল টেবিল খালি। উপরে এল সে; টুনকী তখনও পড়ছে শিক্ষাবিদীর কাছে, তাকে স্থলে দেওয়া হয়নি, মেয়ে বড় হচ্ছে, চোখের বাইরে অনেক কিছুই ঘটতে পারে, আজকাল ঘটছেও। পর্দার বাইরে এক হুহুত অপেক্ষা করে হেমন্ত ঘরের মধ্যে চুকল। বাইশ-তেইশ বছরের পরিচ্ছন্ন মেয়েটি চোখ খুলে তাকাল; হেমন্ত বলল, নমস্কার।

নমস্কার।

কেমন আছেন?

ভাল। এমন সুন্দর হাসতে হেমন্ত কোনো মেয়েকে দেখেনি।

প্রায় ন'টা বাজে, আজ অনেকক্ষণ পড়াচ্ছেন?

কালো ফিতে-বাঁধা নিকেলের হাত-ঘড়িটা একবার দেখল মানসী, বলল, হ্যাঁ, এবাবে উঠতে হবে। অংকগুলো করে রাখবে সব, কেমন? টুনকী বাড় নাড়ল।



ফোন: ৩৪-৫০০২

কি. এল. সিংহ এণ্ড সন্স

১৬৭ বি. বহুবাজার স্ট্রীট কলিকাতা-১২

মানসী দাঁড়াল, হাত-ব্যাগটা তুলে নিল টেবিল থেকে ; পিঠের উপর আঁচলটা তুলে দিল ; জামার নিচে ফিতে দেখবার বিতীৰ্য্যবাস সুরোগ পেল না হেমন্ত ; দীর্ঘ-দেহ, স্তম্ভ শরীর আর পুঞ্জের প্রাঙ্গণে ধূপ আর ফুলের গন্ধের মত মধুর অঞ্চল বিচ্ছিন্ন, অমৃতব কণা বার, স্পর্শ করা বার না ; একবারও অল্প কোনো দিকে না তাকিয়ে পদাট্টা সরিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল সে ।

সিঁড়ির কাছে হেমন্ত ডাকল, দাঁড়ান ।

প্রথম ধাপে পা দেবার আগেই ঘুরে দাঁড়াল মানসী । আর হেমন্তর মনে হল এ একটি আসল মেয়ে, তাই তাদের ব্যবধান এত ছুস্তর, এত দূরত্ব ; রাস্তার কুড়ানো ঘুগা তাকে আবার আকর্ষণে ধরল ; আশাকে দেখছি আপনি মানুষ বলেই গণ্য করেন না !

কথাগুলি নিঃশব্দ হবার আগে তার জিভটা পুড়ে গেল ; কিন্তু বুঝতে পারল কাছে বাবার রাস্তা এটা নয়, এটা ভুল পথ, দূর-পথ । কোনো দিন আপনি আমার সঙ্গে একটি কথা বলেন নি, একটিবার তাকাননি আমার মুখের দিকে, আমি কি এতই ঘৃণ্য ?

মানসীর চোখে বিষয় দেখা দিল, আর কিছুই নয় ; তেমনি প্রশান্ত হাসল সে । তেমনি দূর, তেমনি বিচ্ছিন্ন হাসি ; আপনি ঘৃণ্য কি প্রশংসার বোধ্য—সেটা বিচার করবার আমার কোনো দিন প্রয়োজন ঘটেনি, এ কথা আপনি বিশ্বাস করতে পারেন, আপনার সঙ্গে কথা বলবার বা মুখের দিকে তাকাবার কোনো প্রয়োজনও নয়, চাকরীর নিয়ম-কানুনের মধ্যে ওগুলো পড়ে না, আচ্ছা ! মানসী নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে ; আর হেমন্তর বুকের মধ্যে অল্প একটা মানুষ নিঃশব্দে চীৎকার করে উঠল, বাবেন না । দাঁড়ান এক মিনিট ।

মানসীর পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল ; হেমন্ত আচ্ছন্ন মন দিয়ে অসুস্থ ভাবে বুঝতে পারল, তার পোষাক, চেহারা, বাবার টাকা এবং প্রতিপত্তি, তাদের বাড়ি এবং গাড়ি—এ-সব-কিছু সম্বন্ধে হিম্মত রক্ষিত আর মানসী মিজের ব্যবধান সে সংকল্প করতে পারবে না ।

অনেকক্ষণ সিঁড়ির বেলিং আঁকড়ে দাঁড়িয়ে রইল সে ।

দাদা, তুমি খেতে যাবে নাকি ? আমি বাছি ।

আমি পরে যাব, তুই খেয়ে নে ।

তুমি এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন ?

খেতে বা না ।

টুনকী নেমে গেল নীচে । সে গেল তার ঘরের দিকে ; মা'র ঘরের দরজা বন্ধ, আফরীর ছিন্ন দিয়ে নীল আলো দেখা যাচ্ছে । হঠাৎ একটা অসহ্য ঘুগা আর রাগে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল তার, পাগলা কুকুরের মত লাফাতে লাগল স্তম্ভিত । আজও বাধিকা বাবু আর তার মা প্রানশেটে আচ্ছন্ন সঙ্গে কথা বলছে, দরজার কান পাতল সে । অস্পষ্ট হাসির শব্দ শোনা গেল ; তার গালে বেন চাবুক মারল কেউ । বাধিকা বাবু তার বাবার তাত্ত্বিক বন্ধু, হেমন্তর পিঠ চাপড়ে একদিন বলেছিল, তুমি বাচ্চা ছেলে, এ সব তুমি কি বুঝবে হে ! একে বলে প্রেতলিপি ।

বাধিকারমণকে সে পাঠিয়ে দেবে প্রেতলোকে । ঘুগা আর নপুংসক রাগে তার সমস্ত শরীরটা কাঁপতে লাগল ।

লেকের অন্ধকারে জলের ধারে হেমন্ত জিজ্ঞেস করল, কত শেলি ?

—বাইশ শ, তাহলে তোর ভাগে পড়ল এগারোশ, দশ টাকা ট্যান্ডী-ভোড়া, কাছ তার পাতলুনের পকেটে হাত ঢুকিয়ে নোটের বাণ্ডিলটা বার করল, নে এগারো শ নব্বই টাকা । সব এক শ টাকার নোট ।

ফিতেঘ-বাঁধা টাকাটা হেমন্ত ঢুকিয়ে রাখল পকেটে ।

লেকের শান্ত জল, বৃহৎ বাতাস, পশ্চিম আকাশে ভাঙ্গা চাঁদ ; আর পকেটে অনেক টাকা, এবার ? এবার কি করা বার ?

কাছ বলল, বাবি এক জায়গায় ?

কোথায় ?

চল না, কত দিন আর বোকা হয়ে থাকবি ? একটু অভিজ্ঞতা হোক ।

কিসের অভিজ্ঞতা ? হেমন্ত সিগারেট বার করল ।

চল না ।

ট্যান্ডীতে হেমন্ত বলল, একটা লোককে মারতে হবে ।

কোন লোক ? খুলে বল ।

বলব, ফেরবার সময় ।

কেমন মার ?

বেন আর হেঁটে আমাদের বাড়ি না আসতে পারে ।

এক সফ গলিতে ট্যান্ডী ধামানো হল । হেমন্তর সমস্ত শরীরটা শক্ত হয়ে গেল, কাছ ধাক্কা দিয়ে তাকে নামালো ট্যান্ডী থেকে ।

এর দু'মাস পরে ঠিকানা খোঁজ করে করে একটি পশ্চিম দিশ বহরের মেয়ে একেবারে তারিগী বাবুর বৈঠকখানার ঢুক পড়ল ; রাত্রি আটটা হবে, দু'-একজন লোকও রয়েছে ঘরে ।

মেয়েটি নমস্কার করল হাত তুলে, বলল, আপনার নামই কি তারিগী বাবু ?

সবাই তাকাল এক সংগে ; পোষাকটা বথাসম্মত ভঙ্গ করবার চেষ্টা রয়েছে, তবু কোথায় বেন একটা অসম্পূর্ণতার ইংগিত থেকে গেছে, চুলের বাঁধনটা আর একটু আলগা হলে বেন ভাল হত ; সাড়িটা জমকালো নয়, তবু বেন ওকে ঠিক মত মানায় নি ; রং বুয়ে কেলার পর পাভলা টোট দুটি বিবর্ণ দেখাচ্ছে ; পাউডারের প্রলেপেও চোখের চার-পাশের কালো দাগ ঢাকা পড়েনি ; চোখে ক্লান্তি, শরীরের ক্লান্ত ভঙ্গিতে ঘোঁরনের কিছু আভাস, ধূসর পর্বে তখনও কিছু ক্ষরিত মাধুর্য ।

আপনার নামই কি তারিগী বাবু ? গলায় স্বরে কোনো সন্দেহ নেই, বিধা নেই ।

হ্যাঁ, বলুন ।

না, বসব না, একটু দরকার ছিল আপনার সঙ্গে ।

তারিগী বাবু অপেক্ষা করতে বললেন ।

মেয়েটি সারি সারি আলমারির বই দেখতে লাগল ।

চেনার সরাবার শব্দ হল, তারিগী বাবু দাঁড়িয়েছেন ; গারে কতুয়া, কৌণ্টা পেটের কাপড়ে হুকানো ; মাঝারি আকারের লোক, মাঝারি পাভলা চুল—রঙ্গের দু'পাশে প্রায় সবই সাদা ; মোটা, কালো ফ্রেমের চশমার ভিতরে অসামান্য ধূর্ত চোখ দুটি অনেক কিছুই দেখতে পেল, অনেক কিছুই বুঝতে পারল ; চলুন, আমরা বাইরে বাই !

সেই ভাল । সপ্রতিভ গলায় উত্তর দিল মেয়েটি ।

বারান্দার প্রান্তে অস্পষ্ট আলো-অন্ধকারে নিভান্ডা পরিষ্কার গলার মেয়েটি বলল, আপনার ছেলে হেমন্ত কাল রাতে আমার দু'হাজার টাকার গরনা চুরি করে নিয়ে গেছে, আমার গ্রামে ঘুমের ওষুণ মিশিয়ে দিয়েছিল সে; আমার গরনা ফেরৎ চাই, না হয় টাকা।

গজটা কিসের বুঝতে পারলেন না তারিণী বাবু, বাগান থেকে ফুলের না মেয়েটি কোনো এসেন্স ছড়িয়েছে তার জামায়। বললেন, টাকা পেলেই তোমার সুবিধে হয়, না? আবার নতুন ডিক্রাইনের গরনা গড়াতে পার। তোমার নাম কি?

সুভদ্রা।

ঠিকানা?

সত্যেরো নম্বর দুর্গাচরণ মিত্র রোড, চীৎপুর থেকে বেরিয়েছে, খাবারের দোকানের পাশ দিয়ে ডানহাতি রাস্তা।

কাল সন্ধ্যাবেলা ব্যবস্থা করব।

ঠিক ত'?

তারিণী বাবু তার কাঁধে হাত রাখতে বাচ্ছিলেন, মেয়েটি সরে পড়াল।

ট্রাম থেকে নেমে প্রথম রাস্তাটা বাধিকা বাবু নির্বিবাদে পার হয়ে এলেন, দ্বিতীয় রাস্তাটা অপেক্ষাকৃত নির্জন, গ্যাসের অমুজ্জল আলোর রাস্তার অন্ধকার সম্পূর্ণ দূর হয়নি। পকেট থেকে ছোট শিশি বার করলেন তিনি, মোদকের একটা গুলি, হাতের তালুতে নিয়ে মুখে পুরে দিলেন, তারপর বলে উঠলেন, কালী, কালী! মনটা তাঁর খুই ভাল আজ, বরানগর কালী-মন্দির তৈরী করছেন তিনি, সুরবালা প্রতিজ্ঞাতি দিয়েছিল পাঁচ হাজার টাকা দান করবে; আজই টাকাটা পাওয়া যাবে, মাটিতে পা পড়ছে না তাঁর, তিনি যেন হাওয়ার ভেলে চলেছেন; মন্দির প্রতিষ্ঠা হলেই তিনি বৃত্তি ত্যাগ করবেন, গেকরা পরবেন, আর গলার রক্তাক্তের মালা, নাম হবে রাধিকানন্দ গিরি-মহারাজ, কিছু মড়ার খুলি ভোগাড় করতে হবে, টুনকী মেয়েটা দেবী করছে বড় হতে, আর দুটো বছর; তিনি আর একটা গুলি মুখে পুরলেন, কালী, কালী, তোমার ইচ্ছে যা।

দেখুন ত! এই ঠিকানাটা চেনেন না কি?

প্রায় ছ'ফুট লম্বা একটা জোয়ান ছেলে রাধিকারমণের সামনে এক টুকরো কাগজ মেলে ধরল।

কাগজটা হাতে নিলেন তিনি, কালী, কা—

পিছনে বাড়ি আর গলার মাঝখানে প্রচণ্ড আঘাতে শব্দটা তাঁর গলার আটকে রইল; সামনের ছেলেটি ছ'পা সরে এসে চিবুক ঘুবি মারল, তিনটি দাঁতের বাঁধানো পাটি মুখ থেকে ছিটকে পড়ল রাস্তায়, মাটিতে চলে পড়ছিলেন তিনি, কোমরে শক্ত লাধি খেয়ে আবার সোজা হলেন, চিবুক আর একটা ঘুবি; মুখ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়তে লাগল; চীৎকার করে উঠতে গেলেন তিনি, এবারের ঘুবিটা পড়ল নাকের উপর, বড় নাকটা দুমড়ানো টোমারের মত খেঁতলে গেল, মুখ দিয়ে একটি শব্দ বার করতে পারলেন না তিনি। চোখের জুই তাঁর বাপসা হয়ে গেল, খানিকটা নোণা রক্ত গিলে ফেললেন, চোয়ালটা বাঁকা হয়ে রইল; মাথার আবার আঘাত

লাগল, কাগড়-জড়ানো মাটির আঘাত, খুলি কাটলো না, সমস্ত ঘিলু গুলট-পালট হয়ে গেল; হাঁটু ভেঙ্গে মাটিতে পড়ে গেলেন রাধিকা বাবু, পড়বার আগে কেউ ছুতোপারে লাধি মারল মুখে, চোয়ালটা সোজা হল বটে, কিন্তু গাল কেটে মাড়ি বেরিয়ে গেল।

সব চূপচাপ; চারটি ছেলে খুঁকে পড়ে রাধিকা বাবুকে পরীক্ষা করল।

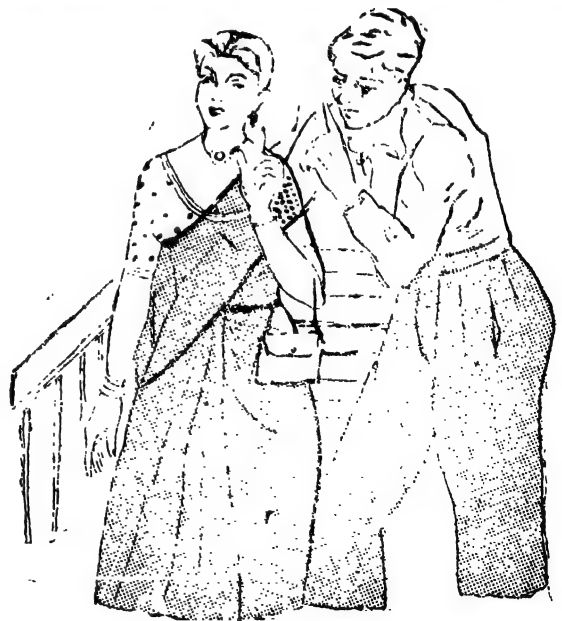
একটা কান কেটে নেব না কি?

ডান হাতটা ভেঙ্গে দে।

হেমন্ত হাত লাগারনি, কেমন যেন মেকদণ্ডের মধ্যে তাঁর শিরশির করছিল, সে বলল, এবার ছেড়ে দে কাহু, ছেড়ে দে!

রাধিকা বাবু তেমনি নিঃশব্দে পড়ে রইলেন রাস্তায়, তাঁর সোনার আংটি আর মনিষ্যাগ তাঁর কাছে রইল না।

চার বছর এমন কিছু একটা সময় নয়। হেমন্ত মার কিছু গরনা আর বাবার নগদ কয়েক হাজার টাকা নিয়ে বাড়ি থেকে পালিয়েছে, তারিণী বাবু খোঁজ করেননি; তবে সুরবালার শোকে হেমন্তের বন্ধু কাহু তাকে অনেক সাহায্য আর সাহায্য করেছে; পরিবারের সংগে অনেক অন্তঃসং হয়ে উঠেছে সে, সুরবালাকে মা বলে, আর পঞ্চদশী টুনকী কাহুনা' বলতে অজ্ঞান! তারিণী বাবুকে শ্রদ্ধাভরে কাকাবাবু বলে, কিন্তু তারিণী বাবু কাহুকে সন্তোষে পরিহার করেন। কাহুই একদিন হেমন্তের খোঁজ নিয়ে এল, সে বোঝাইতে আছে, ব্যবসা করছে! তারিণী বাবুর অনেক পসার বেড়েছে, গাড়ির আকারটাও বৃদ্ধি পাচ্ছে টাকার সংগে; চার বছরে মাথার চুল আরও পাতলা আরও সাদা হয়ে এসেছে। সুভদ্রা বালীগঞ্জে ছোট একটা বাড়ি কিনেছে, সামনের বছর একটা ছোট গাড়ি



আপনি বুঝা কি প্রশংসার বোগা—সেটা বিচার করবার আমার কোন দিন প্রয়োজন হবেনি.....

কিনবারও প্রতিশ্রুতি পেয়েছে সে। রাধিকা বাবু তাঁর বরানগরের বাড়িতে আছেন, কালীর মন্দির তাঁর হয়ে ওঠেনি, সামান্য একটু মাথার দোষ দেখা দিয়েছে, সেটা আর সারবার নয়।

রাধিকারমণ গেছে, সুরবালার তাতে ক্ষতি নেই, কান্না মল্লিককে পাওয়া গেছে; কিন্তু সেদিন হেমন্ত ছিল, আজ আর হেমন্ত নেই। আর সুরবালাও কোনো দিন প্রেতাচার প্রভাব থেকে মুক্তি পাবে না।

সেদিন সুরবালা বলল, কান্না, হাওড়া বাচ্ছি, বাবে আমার সংগে ? হাওড়ায় কেন যা ?

টুনকীর একটা বিয়ের সখক এসেছে, ছেলেটি বড় ভাল শুনেছি, বড় বংশ, তিন পুরুষ জমিদার, কথাবার্তা পাকা করে আসি। বাবে ? আমি আর যেতে পারলাম না তোমার সংগে, বলল কান্না, বিকেলে বর্ধমান যেতে হবে, আমার বাড়ি ; কালই ফিরব।

কৈ আমার ত একবারও বলনি ?

হঠাৎ আজকে ঠিক হল।

বেশ !

তারিণী বাবু আকাসত থেকে গাড়ি পাঠিয়ে দিলেন, কান্না মল্লিককে নিয়ে সুরবালা হাওড়া গেল এগারোটার সময়, ওকে নিয়ে দিল ষ্টেশনে, ষ্টেশন থেকে আরও এক ঘণ্টার পথ যেতে হবে সুরবালাকে।

জমিদার-বাড়ির কাছাকাছি এসে সুরবালা ডাইভারকে বলল, গাড়ি ধামাও।

বিরাট, স্বকণ্ঠে মোটর গাড়ির ছায়ার খামল, হাওড়া থেকে বাইশ মাইল দূরে, গাড়ির আশে-পাশে লোক জমতে লাগল; এমন বড় একটা হয় না, যদি বা এমন গাড়ি দৈবাৎ চোখে পড়ে, ঘরের দরজার খাকে কৈ ? কে জানে হয়ত গাড়ির মধ্যে মধুবালা কিংবা দিনীপকুমার।

সুরবালা চোখ বন্ধ করে বলল, আমার মাথা ঘুরছে, আমি বোধ হয় অজ্ঞান হয়ে যাব।

ডাইভার ব্যস্তসমস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল, একটা ঠাণ্ডা কোকো-কোলা দেখব ?

দেখ।

গাড়ি থেকে প্যাঁক-পর্যন্ত ডাইভার নেমে পড়ল; কিন্তু ওরা শুনে বলল, এখানে কোকোকোলা কি মহার ? কলসীর ঠাণ্ডা জল হতে পারে, বড় জোর নেয়াপাতী ডাব।

না, ডাবের দরকার নেই, ঠাণ্ডা জল নিয়ে এস তাড়াতাড়ি।

ঘটির জল মাথার ঢালল সুরবালা, গলায় ঢালল; হাত-পাখার হাওয়া করল ডাইভার।

একটু সুস্থ হয়ে সুরবালা বলল, বাড়ি ফিরে চল।

খুলো উড়িয়ে, হর্ণ বাজিয়ে গাড়ি দৌড় দিল। একটা হাড়-জিরজিরে কুকুর চীৎকার করে গাড়িটাকে তাড়া করল কয়েক কদম। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আবার রাস্তা কঁাকা।

এমন গাড়ি যে দরজা বন্ধ করবার শব্দ পর্যন্ত হল না। গাড়ির মধ্যে তন্দ্রা এসেছিল সুরবালার, অনেকটা স্বাভাবিক বোধ করছে সে; একবার মনে হল কাজটা চুকিয়ে এসেই হত।

গাড়ি চলে গেল আদালতে; ছোট বাগানটা পার হয়ে সুরবালা দোতলার উঠে এল। নিজের ঘরে চুকতে গিয়ে বাইরেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে, টুনকীর ঘরের দরজাটা বন্ধ কেন ? দ্রুত পায়ে এগিয়ে গিয়ে দরজাটা ঠেলে দেখল, ভিতর থেকে বন্ধ। বুকের মধ্যে থক করে উঠল তার, দরজার বাঁকা মারল কয়েক বার, লাড়া নেই। জোরে লাথি মারল কয়েকটা, বলল, শীগগির দরজা খোল, টুনকী।

ভিতর থেকে টুনকী বলল, খুলছি, দাঁড়াও।

কিন্তু একটা মুহূর্তও দাঁড়াবার বৈধ নেই সুরবালার, ছুরির ঘায়ে স্থম্পিও হেন টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে।

দরজা খুলে দিল টুনকী; ঘরে চুকে সুরবালা একবার ভাকাল টুনকীর দিকে, আর একবার কান্না মল্লিকের দিকে। কান্না মল্লিক দাঁড়িয়েছিল চেয়ারের পিঠ ধরে, সাঁটটা মাটি থেকে তুলে কাঁধের উপর ফেলল সে। হিংস্র বাঘিনীর মত সুরবালা কাঁপিয়ে পড়ল টুনকীর গায়ের উপর।

টুনকী এটা আশ্চর্য করেছিল, খপ করে মা-র হাত দুটো ধরে ফেলল সে, হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল সুরবালা, পারলো না। টুনকী তার মা-র চাইতে প্রায় আড়াই ইঞ্চি লম্বা, আর তেমনি নির্ধৃত স্বাস্থ্য। টুনকীর হাত কারডাবার চেষ্টা করল সুরবালা, টুনকী কল্লই দিয়ে জোরে আঘাত করল সুরবালার মুখে, সুরবালা ঝরঝর করে কঁদে ফেলল।

হাত ছাড় বলছি।

না ছাড়ব না, আগে তুমি শাস্ত হও।

সুরবালা তার পেটে লাথি মারল, টুনকী তার মা-র একটা হাত জোরে মুচড়ে দিল; চীৎকার করে কঁদে উঠল সুরবালা, বসে পড়ল-মাটিতে, জাঁচলে মুখ চাপা দিয়ে কান্ধতে লাগল, পিঠটা তার বার বার কঁপে উঠছিল।

কান্না মল্লিক প্যাঁকের বোতাম ক'টা এঁটে নিয়ে একটা সিগারেট ধরাল।

সিগারেটটা শেষ করে বাবার সময় সে দেখল হুঁহাতের মধ্যে মুখ গুঁজে সুরবালা তখনও পড়ে আছে মাটিতে, হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছে, টুনকী বসেছে খাটের উপর পা খুলিয়ে, দৃষ্টি তার জানালার বাইরে।

পরদিন ঘুম থেকে উঠে জানালার নিচেই চিঠিটা পেল সুরবালা।

“এ-বাড়ির সমস্ত দেওয়াল, জানালা দরজা, সমস্ত জিনিষ, আসবাবপত্র—বিবে জর্জরিত, তার ওপর আর এক কৌটায় কি এমন এসে-বাবে ? আমার খোঁজ কোরো না। টুনকী।”

এই তো জীবন, মানব-জীবন, কুল কোটা, কুল ঝরা

সমুখে হাত, পিছনে অঙ্গ, লম্বাশাখিনী জরা।

—কল্পানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়।

বৃহত্তম ও উৎকৃষ্টতম উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের অভূতপূর্ব সর্বভারতীয় মহোৎসব

—শ্রীঅরবিন্দ জয়ন্তী সঙ্গীত সম্মেলন—

নবজীবন আন্দোলনের (শৃঙ্খল) সাহায্যকরে

—স্থান—

মনোরম পরিবেশ

পার্ক সার্কাস ময়দান,

কলিকাতা

—তারিখ—

১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ও ১৮ই

আগষ্ট—১৯৫৯

সিঙ্কম টিকিটের হার :

০১, ২৫১, ৩৫১, ৫০১, ৭৫১,

১০০১, ২০০১ ও

১০০০১ টাকা

—যোগদান করছেন—

—কণ্ঠ সঙ্গীতে—

ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলী খাঁ (বম্বে);
ওস্তাদ আমীর খাঁ (বম্বে); ডাগর ভাট্টওয়
(দিল্লী); শ্রীভীমসেন যোশী (পুণা);
শ্রীমতী হীরাবাই বরোদেকর (পুণা);
শ্রীমতী সুনন্দা পট্টনায়ক (উড়িষ্যা); শ্রীমতী
লক্ষ্মী শঙ্কর (বম্বে); শ্রীমতী গিরজা দেবী
(বেনারস); শ্রীতারাপদ চক্রবর্তী (কলিকাতা)
ও আরও অনেকে।

এ ভিন্ন

বাংলার প্রসিদ্ধ

শিল্পীবৃন্দ

—নৃত্যে—

শ্রীমতী রোশন কুমারী (বম্বে)

শ্রীমতী দময়ন্তী যোশী (বম্বে)

শ্রীমতী নন্দনা জাভেরী ও সম্প্রদায় (বম্বে)।

শ্রীমতী মঞ্জু ব্যানার্জি (কলিকাতা)

—আরও অনেকে—

টিকিট প্রাপ্তিস্থান : শৃঙ্খল কার্যালয়, ৬৩, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২ ফোন :—৩৪-১৩৫১

নবজীবন আন্দোলন (শৃঙ্খল) কার্যালয়—৫২বি, ইণ্ডিয়ান মীর ষ্ট্রীট (ফোন :—২৪-৩৩১২)

নবজীবন আন্দোলন কার্যালয়—৪-এ, মহানির্বাণ রোড, কলিকাতা—২৯।

বসুমতী সিনেমা ফোন :—৪৬-৪৮০৮

বীণা সিনেমা ফোন :—৩৪-১৫২২

মহার্গ ডেকরেটারস্ ৬৫এ, ডব্লু, সি ব্যানার্জি ষ্ট্রীট, ফোন :—৫৫-২৫৪৯

ভীমচন্দ্র নাগ ৬-৮, নির্মলচন্দ্র ষ্ট্রীট, ফোন :—৩৪-১৪৬৫



শ্রীবিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য

মেমটির নাম গোলাপ। তাকে দেখতেও ঠিক গোলাপের মতন। সবাই শুধু ভাবে ঐ বস্তীর ভিতর অমন রূপ এলো কোথেকে? চোখ যেন ফেরানো যায় না। তবুও তো একদিনও বেচারী একখানা ভালো শাড়ী পেলো না ভালোভাবে সাজবার। ছেঁড়া টুকরো টুকরো শাড়ীর ফাঁক দিয়ে উজ্জল যৌবন যেন ঠিকবে পড়ছিল।

রুক্ষকেশ শুকনো মুখে ও আজকাল সারাটা দিন বসে থাকে। মুহূর্ত মাত্র বার কোনোদিন অবসর ছোটেনি আজ কর্মরূপের সেই মেয়ে এত শাস্ত কেন? লক্ষ লক্ষ নয় নারীর কলরব মুখরিত এ বিরাট শহরে এ ঘটনা কাকুর মনে কি বিলুপ্ত হতে পারে? রোখপাত করেছে? সবই ঠিক চলেছে। অদূরের ঐ বাসগলো। কারখানার এক ঘরে ঠকাঠক আওয়াজ। টাঙ্গাওয়ালাদের হাতী সন্ধ্যার প্লোগান। ফেরিওয়ালাদের মিষ্টি ও কর্কশ কণ্ঠ। পথচারীর আনাগোনা। সামনের বেকারীর টুকটাক আওয়াজ। হারমোনিয়ম মেয়ামতের দোকানের টু-টাং শব্দ। এ বিরাট শহরের দৈনন্দিন প্রোপ্রামের কোনো আয়গায় বিলুপ্ত পরিবর্তন ঘটে নি। তবুও কেন ঐ রুক্ষকেশ আলুলায়িত বসনা গোলাপের সব কাজ কর হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেছে? গোলাপের দিবা বামিনী কাজের মাঝে যে দরিদ্র জীবন প্রতিক্রিয়া সংগ্রাম করে চলেছে তার হঠাৎ কি অপমৃত্যু ঘটলো?

—এই ত দৈনিকের কথা। সকাল নেই সন্ধ্যা নেই মেয়েটি বসে বসে মাটির পুতুল তৈরী করে যায়। ছোট শিশুটি তাকে পাশে বসে সাহায্য করে। নাম তার ঝুলন। ওরই ছেলে।

সকালে উঠে গোলাপ মাটির পুতুল বানায়। তারপর পাহাড় থেকে সংগৃহীত কাঠের আঙনে পুতুলগুলোকে ফেলে মাথায় সাজি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে পুতুল বিক্রীর আশায়। ছোট ছেলেটিকে দরজায় বন্ধ করে যায়। দরজা ঠিক নয় বাঁশ, লতাপাতা দিয়ে ঘেরা একটা বেড়া মাত্র। তাই যথেষ্ট।

বিকেল বেলায় প্রান্ত গোলাপ মাথায় বৃড়ি ফিরিয়ে এনে মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকে। তার ঐ পোড়ামাটির সস্তা পুতুল কেউ কেনে না। শহরের লোকের রুচি বদলেছে। ওর আদ্যক দামে তার বিলিতি পুতুল পায়। তার পুতুলের চোখ কান নাক নাকি বোঝাই যায় না। গোলাপের কি দোষ? পুতুল বানানো কি চারটি কথা? না আছে ভালো মাটি। না আছে তুলি, রঙ। না আছে সাজাবার স্তম্ভর স্তম্ভর কাগজের বাস। তার বাপ—নকুল কুমার কেমন স্তম্ভর প্রতিমা গড়ত। ঠিক যেম জীবন্ত মানুষ। নকুল আজ বেঁচে নেই। বেঁচে থাকলে

কি তার গোলাপকে অমন অসহায় দিন বাপন করতে হত শহরের ঐ ছোট বস্তীতে। নকুলই গোলাপকে পুতুল তৈরী শিখিয়েছে। সে শেখা সেদিন ছিল কেবল সন্ধ্যার পুতুল খেলা। এতদিন সেই পুতুল তৈরী করেই গোলাপ তার ছোট সংসারটুকু বাঁচিয়ে রেখেছে। আজ সেই ছোট সংসারেই যেন একটা কিসের ঝড় উঠেছে। যেন কোন মহাকাশের প্রলয় নৃত্যে বেচারীর বস্তীর কুটীরখানা চূর্ণ বিচূর্ণ হতে চলেছে। কিন্তু কেন? বস্তীর প্রায় সব মেয়ে পুতুলই সকাল সকাল কাজে বেরিয়ে পড়ে। সকালের দিকে কলতলায় ভারি ভীড়। সকালে উঠলেও গোলাপ কলতলায় একটু দেরীতেই যায়। অল্প মেয়েদের মতন ঝগড়াটা সে পছন্দ করে না। তা ছাড়া আরও একটা কারণ আছে। সেটা খুব কম লোকই জানে। লোকজন একটু হাফা হলে পরিধানের শাড়ীটুকু বোজ সে পক্ষিকার করে। ভীড়ের ভিতর সেটুকু করায় অসুবিধে আছে। তার দ্বিতীয় শাড়ী নেই।

গোলাপ টুকটুক করে অষ্টপ্রহর কাজ করে। ঝুলন সারাদিন বস্তীটা চরে বেড়ায়।

মাঝে মাঝে গোলাপ উচ্চকণ্ঠে তাকে ডাকে, ঝুলন, লক্ষ্মী বাবা ঝুলন। ছুটে আয় বোদে ঘোরে না। লক্ষ্মী সোনার ছেলে ঝুলন। ঝুলন বলে, খেতে দিবি? বল আজ ভাত খেতে দিবি? তিন দিন শুধু মুড়ি খেয়ে আছি। বল ভাত দিবি?

ছ'প্রহর ভাতের আশায় ঝুলন বস্তীর এদিক ওদিক ঘুর ঘুর করে। যদি কেউ ডেকে হঠাৎ কিছু দেয় খেতে।

এই ছালামিটুকু ঝুলনের ছিল না। মা ছাড়া অল্প কেউ যে খেতে দিতে পারে এ ধারণাটুকুও তার ছিল না। সেদিন বোধ হয় নবান্নই হবে। শুকনো মুখে ভাঙা লাটিম হাতে স্তম্ভর ফুটফুটে ছেলেটিকে ঘুরতে দেখে বস্তীর বাতাসীর মা তাকে ডেকে পেট ভরে খাইয়ে দিয়েছে। গোলাপ শুনে থম্বীই হয়েছিল। নবান্নর দিন। সবাই দোনালী ধান ঘরে ভুসছে প্রায়ে। শহরের জীবনে তার ছোঁয়া লেগেছে দেখে থম্বীই হল। তবুও মনটাকে প্রবোধ দিতে পারে না। ঝুলন ভিক্ষে চাইতে যায় না তো আজকাল? শহরের লোক এত দয়ালু ত নয় যে ডেকে খেতে দেবে। শিশুও না। ও সব বোঝে না। এদিক ওদিক উঁকি বুকি মাঝে। যদি কেউ ডেকে কিছু খেতে দেয়। মনের আশা মনেই থাকে। শিশুকে কেউ ডাকেও না। কেউ খেতেও দেয় না।

ঝুলন আবার বলে, বল, খেতে দিবি? মা সত্যি বলছি ভাবী বিদে পেরেছে।

গোলাপ মাটির হাঁড়ি থেকে হুঁ হুঁ হুঁ এনে ঝুলনকে ধাঁওতে বসে। ছেলে কিছুতেই ধাবে না। গোলাপ বলে, লক্ষী সোনা আঁখ শুধু ধাঁও। সামনের মেলাতে কত পুতুল বেচবে। কত দীপ গড়ব। কত টাকা পাব। সকাল বিকেল তুমি আর আমি পেট ভরে ভাত খাব। শুধু ভাত নয়। কত মিষ্টি। কত মোর। কত কি—চোখ দুটো আশায় ভরে যায়। শিশু ঝুলন আবিদার করে নতুন জামা দিবি? লাল—নীল পুলিশ দিবি? বাঁশি—বেলুন দিবি—গোলাপ বলে নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই। আমার ঝুলনকে দোবো না? ঝুলনের পুলিশ নতুন পাগড়ী পরবে। নীল জামা পরবে। আশুক না মেলাটা একবার।

ঝুলন সত্যি কথাটি বলেছে। ঐ গেকুয়া রঙের পুলিশ কাকুর ভালো লাগে? গোলাপ কি করবে? হুঁ পরসার গেকুয়া রঙ কিনলে জলে ভিজিয়ে তাই দিয়ে মৃৎপাত্রগুলি যেমন রঙ করা চলে, তেমনি পুতুলও গেকুয়া-রঞ্জিত করা যায়। শুধু পোড়া মাটি কেউ কখনো কেনে? সত্যি বলেছে ঝুলন—মেলায় পরে কিছু রঙ কিনতে হবে। পুলিশগুলো শুধু গেকুয়া রঙেই নয় এবার তাদের রঙীন পাগড়ী দিয়ে স্কন্ধর সাজিয়ে বাজারে ছাড়তে হবে।

হুঁ হুঁ হুঁ থেকে ঝুলন পাড়া বেড়াতে চায়। গোলাপ কিছুতেই তাকে ছাড়বে না। বুড়ো মিস্ত্রীটা আজকাল আবার কাঁছে যায় না। কে জানে ওর কি হয়েছে? সেদিন ঝুলনকে ডেকে সে তার বাপ হবার ইঙ্গিত দিয়েছে। হিঁ হিঁ, লক্ষ্মীর মাথাটা হেঁট হয়ে গেল। ঝুলন বলল, বল না মা কেন তুই রাগ করলি? বুড়োটা তো বেশ ভালো লোক। বল মা—

এমনি ভাবেই দিন কাটে।

গোলাপ অদীর আগ্রহে প্রতিদিন প্রহর গোণে—কবে আসবে মেলা। কবে তার পুতুলগুলো বিক্রী হবে। মাটির প্রদীপ আজকাল কেউ বড় একটা আলায় না। মোমবাতি চলে বেশী কেউ কেউ আবার ছোট ছোট রঙীন ইলেকট্রিক বালব দিয়ে ঘর সাজায়। শত আধুনিকতার মাঝেও মেলায় উৎসবটুকুই আজ শুধু পুরোনোর ছোঁয়া নিয়ে দেখা দেয়। গোলাপ সমস্ত বছর ধরে মেলায় দিন ক'টির স্বপ্ন দেখে। মেলায় সবাই তার জিনিষ কেনে, পুতুল, প্রদীপ, কাপড়ের খেলনা কিছুই কিরিয়ে আনতে হয় না গোলাপকে।

কবে আসবে সেই মেলা?

গ্রাম গ্রামান্তর থেকে লাল হলদে ঝাংরা পরা মেয়ের দল গল্প গাড়া চপে গান গাইতে গাইতে আসবে। সাথে তাদের স্বামী, দেবর অথবা স্বস্তর। গড়গড়া হাতে মাথার পাগড়ী লোকটা গ্রামের ঘোড়লও হতে পারে। গোলাপ তাদের ভাষা ঠিক বুঝতে পারে না। তাদের পোষাক পরিচ্ছদে, মুখের ভাব ভীতে মনে হয় তারা নিশ্চয়ই সুখী। না হলে কখনো এমন প্রাণখোলা হাসি হাসতে পারে। মনে হয় যেন জলের ঘড়া থেকে কল কল শব্দে জল গড়িয়ে পড়ছে। গাঁয়ের মেয়েগুলিই গোলাপের পুতুল কেনে বেশী।

কত লোক আসে দু' দেশ থেকে তার পুতুল কিনতে। তারা গোলাপের পুতুল কেনে। কেউ কেউ আবার ঘাড় তেলানো বুড়োটা দেখিয়ে বলে, আরে বহিনি এই পুতলিটাও তুই নিজের হাতে গড়েছিল?

বহিনি—আহা কি মিষ্টি লোকগুলো। গোলাপ বলে, হুঁ।

কত দাম বললি?

হুঁ আনা?

দে দে চারটে বেঁধে দে।

শহরে হুঁ পরসার দামেও কেউ একটা পুতুল কেনে না। তারা কেনে সস্তা বিদেশী প্রাটিকের খেলনা।

পুতুলগুলো তাড়াতাড়ি বিক্রী করে গোলাপ এদিক ওদিক হরিণীর মতন ছুটে বেড়ায়। ঝুলনকে মেলায় নিয়ে আসতে সাহস হয় না। এদিক ওদিক ছোটো।

বাঃ! কি স্কন্ধর চর্কিবাজীর মতন ঘুরছে ছেলেমেয়েগুলো। ওগুলোকে নাগরদোলা বলে। মাত্র দু'টো পরসার দিলেই দু' মিনিট ঘোরাবে তোমাকে। ঝুলনকে নিয়ে এলে মন্দ হত না। ওকে কোলে নিয়ে বসলে বেশ হত। একবার ঐ উপরে ওঠো। আবার নীচেতে নামো। সে কিন্তু বিনি পরসাতেই রোজ বেশ চর্কিবাজীর মতন ঘুরছে। কিছুই চায় না সে। ঐ কোণের দোকানীর চা। বনমালী মিশ্রের পাঁপের। মাংসের ঘুগনি। ওসব সে চায় না। তার দরিদ্র জীবনে সে চায় হুঁ হুঁ অন্ন। ছেলোটোর হুঁ বেলা দুটি ভাত। তার লজ্জা এক বেলা হলেই যথেষ্ট। এই বিরাট শহরের কেউ কি জানে অমন স্কন্ধরী মেয়ে গোলাপের জীবনে এক দিনে হুঁ বেলা আহা আর একটা কত বড় বিলাস? সমস্ত বছরে মাত্র মেলায় দিনকটি গোলাপ হুঁ বেলা পেট ভরে খায়।

মেলায় সার্কাস পাটি আসে। বাঘ আসে, হাতী থাকে, ভালুক নাচে, সিংহ গান গায়। লোকগুলোর কথাও শোনে একবার। বলে কিনা, বাঘ হাতীর শিঠে চড়ে নাচবে। এক আনার পরসার দাঁও। তারপর ঐ ত্রিশলার ভিতরে চুকে দেখো সত্যি সত্যি বাঘ হাতীর শিঠে চড়ে নাচছে। এও কখনও হয়?

নাচের দলও একটা আসে প্রতি বার। ঠিক সন্ধ্যার তাদের প্রোগ্রাম শুরু হয়। সারাটি দিন স্কন্ধর সৌকণ্ডালা একটি লোক

পেটের যন্ত্রণা কি মারাত্মক তা ভুক্তভোগীরাই শুধু জানেন! যে কোন রকমের পেটের বেদনা চিরদিনের মত দূর করতে পারে একমাত্র

বহু গাছ গাছড়া
দ্বারা বিশুদ্ধ
মতে প্রস্তুত

বাকলা

ভারত গণ্ডা রোজি: নং ১৬৮৩৪৪

অম্লশূল, পিত্তশূল, অম্লপিত্ত, লিভারের ব্যথা, মুখে টকভাব, ঢেঁকুর ওঠা, বমিভাব, বমি হওয়া, পেট ঝাঁপা, সন্দাঘি, বুকজ্বালা, আহায়ে অরুচি, স্বপ্নানিদ্রা ইত্যাদি রোগ যত পুরাতনই হোক তিন দিনে উপশম। দুই সপ্তাহে সম্পূর্ণ নিরাময়। বহু ডিকিৎসা করে মারা হতাশ হয়েছেন, তাঁরাও বাকলা সেবন করলে নবজীবন লাভ করবেন। বিশ্বলে মূল্য ফেরৎ। ৩২ ডোজার প্রতি কৌটা ৩৮ টাকা, একট্রে ৩ কৌটা — ৮৮০ আনা। ডায়. মাং. ও পাইকারী দর পৃথক।

দি বাকলা ঔষধালয়। হেড অফিস—স্বাধীনশাল (পূর্ব পাকিস্তান) ব্রাঞ্চ—১৪৮৮, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি: - ৭

ব্যবহারে লক্ষ লক্ষ
রোগী আরোগ্য
লাভ করেছেন

মেয়ের পোষাক পরে ছোটো আঙ্গুল দিয়ে গৌণটাকে চেপে, পায়ে ঘুঘুর বেঁধে হেলে চলে নাচে। গান গেয়ে গেয়ে লোকটা মাঝে মাঝে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। গৌণ থেকে আঙ্গুল সরিয়ে তখন সে একটা বিড়ি ধরায়। হু পাশের লোকগুলো তখন হি হি করে হাসতে থাকে। গৌলাপও হাসে। ঝুলনটা বড় হোক। সে চাকরী করে টাকা আয় করুক। তখন গৌলাপ একদিন ঐ নাগর-দোলাতেও চাপবে। কিন্তু তখন কি তার বয়স থাকবে?

কত বকমের বেগুন দেখে। একটা বেগুনে আবার বাঁশি লাগানো। হুঁ দিয়ে বড় করে ছেড়ে দাও। আপনা থেকেই বাজতে থাকবে। আবার ঐ দেখো গ্যাস বেগুন। নিজে থেকে উপরে উঠবে। হুতো নিয়ে তুমি ঘুঁড়ির মতন ঝাড়িয়ে থাকো। ভারী দাম। হু আনা দিয়ে কেনা যায়? হু'পরসার একটা লাল বেগুন কিনে গৌলাপ ঘরে ফেরে। সুমন্ত ঝুলনকে তুলে গৌলাপ তার হাতে বেগুনটি দিল।

সে আজ তিন বছরের কথা।

ঝুলনের জন্মই বোধ হয় মেলাটা একটু তাড়াতাড়ি বসছে এবার। এগারো দিনের মেলা। গৌলাপের মরবার ফুরসতটুকু নেই এবার আর প্রাণীপ বানাতে না। শহরে মাটিটুকু পর্যন্ত পরসাদা করে কিনতে হয়। পুতুলগুলো সাজিতে সাজিয়ে ঝুলনের হাত ধরে গৌলাপ বেরলো। শাড়ীখানা স্নানর মানিয়েছে। সজ্জা নকল সিঁড়ি হয়ত হবে। বাতাসীর মার কাছ থেকে ষট্টা তিনেকের জন্ত শাড়ীখানা সে ধার নিয়েছে। শত ছিন্ন মলিন শাড়ী পরে কি মেলায় যাওয়া যায়?

ঝুলনের ভারী আনন্দ। আজ নিশ্চয়ই সে পেট ভরে খেতে পাবে। গৌলাপ তাকে একটা বাঁশীও কিনে দিয়েছে। আজকাল সে ভারী আশ্বাস করতে শিখেছে।

কিন্তু কোথেকে কি বেন হয়ে গেল। জন্ত বছরের চেয়ে মেলায় এবার ভীড়টা একটু বেশী হয়েছে। নিমেষের ভিতর গৌলাপের পুতুলগুলো বিক্রী হয়ে গেছে। এদিক ওদিক হাঁ করে করে চলতে চলতে ঝুলন কখন হাত ছাড়া হয়ে গেল। এদিক ওদিক খুঁজেও গৌলাপ তার কোনো সন্ধান পেলো না।

সন্ধ্যা সমাগমে রাস্তার মোড়ে ভীড় দেখে গৌলাপ একটু দুঃস্থির হয়েই চলছিল। বস্তীর হরলাল হঠাৎ তাকে দেখে হিড় হিড় করে টানতে টানতে টানতে নিয়ে বলল, দেখ দেখ, শহরের লোকগুলোর কাণ্ড দেখ। হু বেলা পেট ভরে খেতে দেবে না। রাস্তা দিয়ে পায়ে হেঁটে চলব তাও দেবে না। দেখ এসে কাণ্ডটো দেখ। লোকটাকে কেউ ধরতে পারল না। হুস করে গাড়ি চালিয়ে-চলে গেল।

গৌলাপ গিরে দেখলো একটি মৃত শিশুকে বেস্ত করে রাস্তা জনতা ভীড় করে ঝাড়িয়ে। ছেলেটির হাতে একটি বেগুন-বাঁশি গৌলাপের এক বিন্দু চোখের জল পড়ল না।

গৌলাপের স্তব্ধতার কেউ তাকে বলল, ডাইনি, কেউ বলল, মৃতশব্দ বিহীন রূপোপজীবনী।

সে শুধু ক্লক কেশে শুকনো মুখে দিবা বামিনী বসে থাকে।

বস্তীর বুড়ো মিত্রীটা হু' একবার এদিক ওদিক ঘুরে ফিরে গেছে।

দিন এলো। দিন গেল। বছর ঘুরে আবার মেলা এলো। গায়ের বধূরা গল্পর গাড়ীতে চেপে গান গেয়ে গেয়ে মেলা এলো। সার্কাসপার্টি এলো। নাচের দল এলো। বেগুনওয়াচ এলো। নাগরদোলা এলো। কোণের দোকানের চা-ওয়াচ এলো। বনমালী মিশ্র পাঁপের নিয়ে এলো। মেলায় এবার কেউ শুধু দেখতে পেলো না কোনো অপটু হাতের পোড়া মাটি সেকরা রক্তের পুতুল।

দামোদর

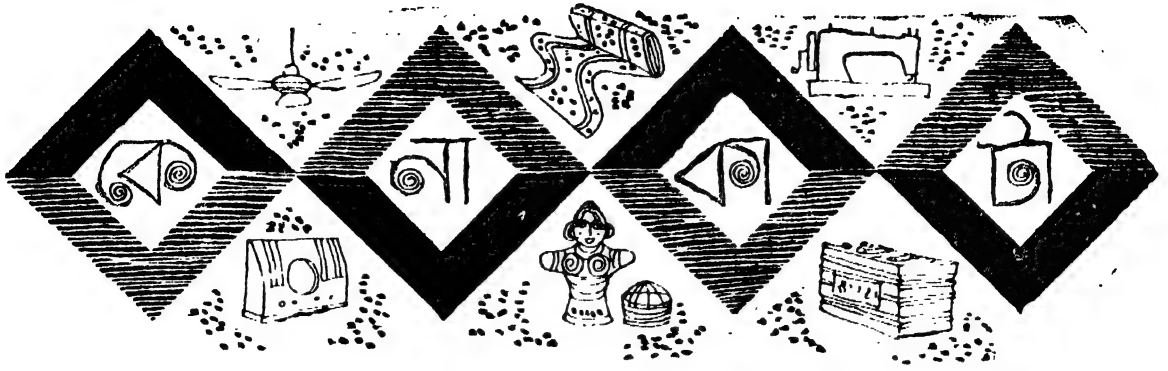
অধীর সরকার

লজ্জায় ঢেকেছে বুক; কখনো বা আলোকের থেকে নিজেকে আড়াল করে সজোপনে রেখেছে লুকিয়ে, কুণ্ঠিত সলজ্জ পায়ে কখনো বা ভীক চিহ্ন রেখে একে-বৈকে গেছে চলে কে জানে সে কোন্ পথ দিয়ে।

কখনো যুবতী সে যে বোঁবনের ক্রন্দন বদনার আপনাকে দীর্ণ করে, যুক্ত করে, ব্যাপ্ত করে দিক; কী কঠিন যন্ত্রণায় অবশেষে দিবিদিক যায়— কী যে ব্যথা যুবতীর!—অসহায় আশ্রয় প্রেমিক।

অবশেষে বধূ হল, অভয়ের দুর্দম প্রকাশ বেন কোন নীড়ে-বাঁধা আনন্দিত আসক্তের মাঝে প্রেমর কোমল হাতে ভরে দিল বুঝি বারো মাস অশ্রুর স্রোতাম যন্ত্রে সঙ্গারের নানাবিধ কাজে।

কোলাহল ছিল বাহা, এতদিনে আজ হল বাণী যুবতী সে বধূ হল নবনীতা অশ্রুহীন কল্যাণী।



সিমেন্টশিল্প ও ভারত

আধুনিক যুগে সিমেন্টশিল্পের গুরুত্ব ও উপযোগিতা অপরিণীম। দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে ইম্পাতের ভার এসে রয়েছে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা। বলতে গেলে, যে কোন নির্মাণ কার্যেই (পূর্তকার্য ও গৃহ নির্মাণাদি) আজিকার দিনে সিমেন্ট না হলে নয়, দীর্ঘস্থায়ী মজবুত গাঁথুনির জন্যই এইটি অত্যাবশ্যক।

ভারতে পরিকল্পিত ভাবে সিমেন্ট উৎপাদন শুরু হয়েছে, খুব বেশী দিন নয়। এখানকার সর্বপ্রথম সিমেন্ট তৈরীর কারখানা স্থাপিত হয় মাদ্রাজে আর সেটি মাত্র চলিত শতাব্দীর প্রথম পাদে। উৎপাদন-ব্যয় বেশি পড়তে থাকায় কারখানাটি বন্ধ হয়ে যায় অল্পকালের ভেতরেই। তারপর আবার এক একটি করে কারখানা (সিমেন্ট) গড়ে উঠতে থাকে দেশের এখানে সেখানে। ১৯২৫ সালের মধ্যেই ভারতে সিমেন্ট উৎপাদনের কারখানার সংখ্যা দাঁড়িয়ে যায় ১২টি এবং উহাদের মিলিত উৎপাদন ক্ষমতা হয় ছয় লক্ষ টনের মতো।

অত্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সিমেন্টের চাহিদা বেড়ে যেতে থাকে দেখতে দেখতে। চাহিদা মেটাবার জন্য কারখানার সংখ্যাও কিছু বাড়তে থাকল ক্রমেই। ১৯৪০ সালের ভেতর দেশে প্রায় ২০টি সিমেন্ট উৎপাদন কারখানা ভাল রকম দাঁড়িয়ে যায়। বিদেশী শাসনযুক্ত হবার (১৯৪৭) পর ভারতে কয়েকটি নতুন সিমেন্ট কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ভাবে ১৯৫৭-৫৮ সাল মধ্যে সমগ্র দেশে প্রায় ৩০টির অধিক কারখানার পুরাদমে কাজ চলে। উৎপাদনের পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়ে বিগত বর্ষে অর্থাৎ ১৯৫৮ সালে দাঁড়ায় ৬০ লক্ষ ৬০ হাজার টন।

এখন অবধি বস্তুগুলো সিমেন্ট কারখানা এদেশে স্থাপিত হয়েছে, তাদের প্রায় সব ক'টিই বেসরকারী শিল্পসংস্থা। সরকারী উদ্যোগেও দুইটি বৃহৎ কারখানা চালু হয়েছে এর ভেতর—একটি উত্তর প্রদেশ সরকারের পরিচালনাধীন ও অপরটি মহীশূর রাজ্য সরকারের। বহির্ভারত থেকে সিমেন্ট আমদানীর বাতিল প্রয়োজন না হয়, সেদিকে জাতীয় সরকারের সজাগ নৃষ্টি রয়েছে। তাঁরা তাই প্রতিটি অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সিমেন্ট কারখানার সংখ্যা বাড়ানো ও উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির লক্ষ্য গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় পাঁচ-সাল পরিকল্পনা কালে দেশে অন্ততঃ ৪৪টি সিমেন্ট কারখানার ব্যবস্থা ও এক কোটি ৩০ লক্ষ টন সিমেন্ট উৎপাদনের স্কল তাঁদের রয়েছে।

সিমেন্টশিল্পে ভারত স্বয়ং-সম্পূর্ণ হতে পেরেছে সকল দিক থেকে—এমনটি জোর করে বলা যায় না। যুক্তি, আমেরিকা, জার্মানী, সুইডেন, ডেনমার্ক প্রভৃতি রাষ্ট্র থেকে এখনও সিমেন্ট কারখানার উপযোগী ২৫ যন্ত্রপাতি আমদানী করতে হয়। অবশ্য দেশের অভ্যন্তরেও এই শিল্পের পক্ষে অত্যাবশ্যক যন্ত্রপাতি ও কল-কজা তৈরী আরম্ভ হয়েছে আর সেটি জাতীয় সরকারের ব্যবস্থারীনেই। এইরূপ আশা করা হচ্ছে, ১৯৬২ সালের ভেতর দেশের সিমেন্ট কারখানাগুলোর প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির বেশীর ভাগই নিশ্চিত হবে দেশের ভেতরেই।

সিমেন্ট উৎপাদনে করলা ও কর্ণম ছাড়া বিশেষ ভাবে প্রয়োজন হয় চূর্ণাপাথর ও জিপসাম। এখন অবধি ভারতে বস্তুগুলো সিমেন্ট কারখানা চালু রয়েছে, সেগুলোর জিপসাম ও চূর্ণাপাথরের চাহিদা দেশের অভ্যন্তর থেকেই মেটানো চলেছে। কিন্তু এই শিল্প আরও সম্প্রসারিত হলে, সিমেন্ট উৎপাদন অবিকল্পিত বর্ধিত করতে চাইলে, উক্ত দুটি উপাদান পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া হতে সম্ভব হবে না। সেজন্য আগে থেকেই এ অপরিহার্য প্রয়োজন কিতাবে মেটানো যায়, ভেবে রাখা দরকার। দেশের ভেতর অল্পসংখ্যক চালিয়ে জিপসাম ও চূর্ণাপাথরের সরবরাহ যদি বাড়ানো না গেল, সেক্ষেত্রে বিকল্প ব্যবস্থা কি হতে পারে, আগে থেকেই ঠিক রাখা চাই।

কিছুকাল থেকে দেশে সিমেন্টের চাহিদা অতিমাত্র বেড়ে চলেছে দেখে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে উৎপাদন বৃদ্ধির এক অভিনব পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। নতুন নতুন কারখানা গড়ে তোলা অপেক্ষা এক্ষেপে সরকার যে কারখানাগুলো চালু রয়েছে, সেগুলোর কাজ সম্প্রসারিত করতে চাইছেন। নির্ধারিত ব্যবস্থামতো উৎপাদন সত্যি যদি সম্ভবপর হয়, সেক্ষেত্রে দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালে সিমেন্ট উৎপাদনের মোট পরিমাণ দাঁড়াবে ১ কোটি ৪৪ লক্ষ ১০ হাজার টন। এই পরিমিত সিমেন্ট সরবরাহ মারফৎ দেশের দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালীন চাহিদা মেটানো যাবে—অন্ততঃ কেন্দ্রীয় শিল্পমন্ত্রী ঐয়ামুতাই শাহ, দাবী বেখেছেন এমনটি।

ইম্পাত সরবরাহ প্রয়োজন মত না হওয়ার সিমেন্ট উৎস হ্রাসে ভারতেই, সম্প্রতি এরূপ একটি অবস্থা লক্ষ্য করা গেছে। অবশ্য এই ধরণের পরিস্থিতি সাময়িক মাত্র, ইম্পাত সরবরাহের মাত্রা বেড়ে গেলেই এদেশে এখন সে অবস্থা থাকতে পারে না। আর একান্ত যদি উৎস হয়, সেক্ষেত্রে বিদেশী বাজার খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে না ভারতীয় সিমেন্টের, এ ঠিক। এর ভিতর ভারতে উৎপাদিত সিমেন্টের একটি অংশ (প্রায় ১০ লক্ষ টন) অবশ্য বর্তমানীয় ব্যবস্থাও

হয়েছে। কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট সংসদীয় উপদেষ্টা কমিটি সিমেন্ট রপ্তানী বৃদ্ধির ওপরই অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অত্যাধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এর প্রধান লক্ষ্য, সহজেই অল্পমান করা চলে। সিমেন্ট উৎপাদকগণ রপ্তানী ব্যাপারে যাতে অনুবিধায় না পড়েন এবং দেশে যাতে সিমেন্ট উৎপাদন অব্যাহত পতিতে বেড়ে চলতে পারে, সংশ্লিষ্ট সরকারী দপ্তরের দৈনিক দৃষ্টি ও মনোযোগ না থাকলে নয়।

চাকরি প্রসঙ্গ—কয়েকটি কথা

বসে থাওয়া কিছুতেই চলবে না, কাজ করে খেতে হবে—এই নিয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই। জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য সাধারণ অবস্থায় চাকরি বা উপজীবিকা চাই-ই একটা না একটা। কিন্তু প্রশ্ন থাকছে এর পরও—কি ধরণের কাজ করবে, কোন কাজ বা চাকরিটি সত্যি কার উপযোগী হবে? এর সত্ত্বের ও মীমাংসা আগে ভাগে মিলে গেলে কোন কথা নেই। যেখানে সে-টি না হ'ল, কাজ সেখানে স্তূর্ভ ভাবে সম্পাদিত হবার আশা কম। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে—এরূপ ক্ষেত্রে অসন্তোষের আবহাওয়া একটা থেকে গেছে কোথাও।

সোজা কথা যেটি ঠাঁড়াচ্ছে এই থেকে—মনঃপূত কাজ বা চাকরিটি খুঁজে পাওয়া চাই গোড়াতেই। এমন কার্যক্রম যেন না গ্রহণ করা হয়, যাতে করে পরে আকোষের কারণ হবে। উপযুক্ত লোকের জন্য উপযুক্ত কাজের যদি ব্যবস্থা হল অর্থাৎ যিনি যে কাজের যোগ্য, বাস্তবক্ষেত্রে তিনি যদি পেয়ে গেলেন সেই কাজটি, সব দিক থেকে সন্ত। সেক্ষেত্রে সহসা চাকরি বদলদলের প্রশ্ন ওঠে না, কর্তৃপক্ষ-কর্মচারী তথা মালিক-শ্রমিক অসন্তোষের অবকাশও খুব কম থাকে।

অনেক স্থলেই দেখা যায়, অন্ততঃ এই দেশে, কর্মজীবনে ঠিক লোকটি এসে ঠিক ব্যয়গার পড়লো না। বার যেখানে থেকে কাজ করার কথা নয়, কার্য-কারণে তাই হয়ত করতে হচ্ছে বহু চাকরি-জীবিকে। যিনি শিক্ষকতা করলে সত্যি ভাল হয়, তাঁর চললো বরাবর কেরানীর জীবন, এমন অনেক দেখা যায়। আবার, এমনও পরিদৃষ্ট হয়—ব্যবসায়ীদ্বিসম্পন্ন কোন লোকের ব্যবসায়ের সুযোগ হয়তো মিললোই না, তাকে গ্রহণ করতে হলো জীবিকার সূত্রহিসাবে শিক্ষকতা কিংবা অপর কোন বেমানান (তার পক্ষে) বৃত্তি।

সাধারণতঃ চাকরি বদলদলের প্রশ্ন ওঠে, কোথায় এবং কেন? যেখানে থেকে থেকে দেখা যায় যে, পদোন্নতি বা আর্থিক অগ্রগতির কোন সম্ভাবনাই নেই, সেক্ষেত্রে চাকরির ওপর বিভ্রাট আসতে পারে। অপর পক্ষে, কাজের ধারা ও মাসমাহিনার

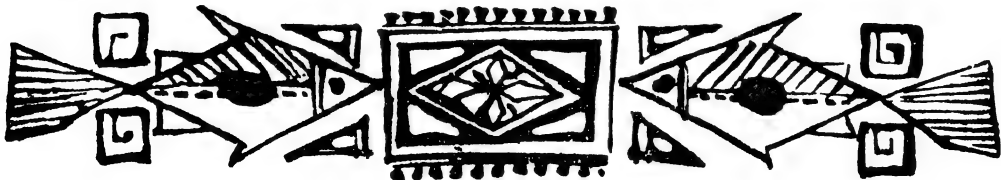
দিক থেকে পছন্দসই চাকরি যেখানে হল না, সেখানেও চাকরি বদলদলের প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক।

আরও একটি কথা—মনোমত চাকরি পেলে কর্তৃক্ষেত্রে উন্নতিসাধ ও দক্ষতা প্রমাণের জন্য চাকরিজীবী অবশ্য সচেষ্ট হবেন। অপরিদ্রিক এ ও ঠিক যে, অসন্তুষ্ট বা অনিচ্ছুক মন নিয়ে কারো পক্ষেই কর্ম-জীবনে খুব বেশি দূর এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। চাকরি বদলদল করেও যদি নিশ্চিত অবস্থাস্থির ঘটানো যায়, অন্ততঃ যাবে বলে বিশ্বাস থাকে, তবে সেদিকে পা বাড়ানো সমীচীন বলতে হবে। কিন্তু এইখানে স্মরণ রাখবার—যা কিছু করতে হবে, বয়স থাকতে থাকতেই, যৌবন ও উত্তম বিনষ্ট হবার আগেই। বয়স যদি পেছিয়ে গেলো, উৎসাহ-উত্তমে যদি পড়লো ভাঁটা, তবে নতুন জীবন গড়া তথা প্রতিষ্ঠা অর্জনের স্বপ্ন বুধা।

সেই সঙ্গে এ-ও অবশ্য বলতে হবে—যেকারী যেখানে ব্যাপক, কর্মসংস্থান যেখানে কর্মপ্রার্থীর তুলনায় স্বল্প বা সীমিত, সে ক্ষেত্রে চট করে চাকরি পেয়ে চাকরি ছাড়তে বাওয়া কঠিন। বিপদ বা অনিশ্চয়তার খুঁকি সেখানে অনেকটা থেকে যায়, এ অতি সহজেই অল্পমেয় সে জগতই একটা কোন কাজ বা চাকরিতে চুকবার মুহূর্তেই যেমন ভাবতে হবে ভালরকম, তেমনি সেই কাজটি (যতই অপছন্দ বা বেমানান হোক) ছাড়বার প্রশ্নও পূর্বাভাস বেশ নিবিড় ভাবে না ভাবলে নয়।

চাকরিজীবীদের মানসিক গঠন সম্পর্কে বিলেতের পেশা বিশেষজ্ঞরা গবেষণা ও আলোচনা চালিয়ে এসেছেন প্রচুর। তাঁরা দেখেছেন যে, মাঝামাঝি বয়সে পা দেওয়ার সময়ই চাকরি বদলদলের প্রশ্নটি সাধারণক্ষেেত্রে মনকে আলোড়িত করে বেশি। চল্লিশের কোঠায় যারা পৌঁছলেন, একটি জিনিষ লক্ষ্য পড়ে তাদের অনেকেই বলেন—যে পেশা বা উপজীবিকায় তাঁরা নিয়ে আছেন, তার জন্য তাঁদের বতটা অসন্তুষ্ট নয়, তার চেয়ে ঐ পেশা থেকে সারা মাস খাটার পর বা তাঁরা পাচ্ছেন, তাই নিয়ে। এর কতকগুলো সঙ্গত কারণ বেনা আছে, তা নয়। কেন না, সেই সময় মধ্যে পরিবার সম্প্রদায়িত হয়, সংসারের আর্থিক দায়ও আগের চেয়ে স্বভাবতঃই বেড়ে যায়।

কর্মজীবনে আত্মপ্রতিষ্ঠা হবার জন্য বা কিছু করতে হবে, প্রথম ভাগেই হওয়া চাই—এইটি একটি মূল নীতি ধরে নেওয়া চলে। প্রকৃত প্রস্তাবে, প্রথম বয়সে বতটা উত্তম থাকবে, দম থাকবে এগিয়ে যাবার, বয়স বাড়তির সঙ্গে সঙ্গে তা হ্রাস পাবে, এ খুব স্বাভাবিক। সর্বোপরি, জীবনযাত্রা বতটা খুঁকি লওয়া যায়, পারিবারিক দায়িত্ব বর্ধিত হলে পর সাধারণ অবস্থায় ততখানি খুঁকি লওয়া সম্ভব নয়। চাকরির ক্ষেত্রে অজ্ঞাত বিষয়ের সহিত একথাগুলো স্মরণ রেখে কাজ করা যেতে পারে এবং এতে অনেক ক্ষেত্রেই সফলও বেনা মিলবে, এমন নিশ্চয়ই নয়।



বিপ্লবের সঙ্কট

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার ব্যবসার দৌড় দেখে এতক্ষণ আপনারা মুখ টিপে হেসেছেন, কিন্তু এইবার আপনারা গম্ভীর না হয়ে পারবেন না। ডেকোরেশনের ব্যবসাটা একটা পূর্ণাবয়ব বৃত্ত ব্যবসাই হয়ে উঠছিল। কিন্তু সে বিবরণের আগে স্বদেশী হাঙ্গামার বিকাশের বিভিন্ন দিকের বিবরণ কিছু দেওয়া দরকার।

বুটশ সাম্রাজ্য বক্ষার অস্ত্র যুদ্ধে যোগ দিয়ে প্রাণপাত করলে ভারতবাসীর স্বায়ত্তশাসনের দাবী জোরদার হবে, এবং সে দাবীর সম্মান রেখে বুটশ সরকার যে ভারতবাসীকে নিশ্চয়ই স্বায়ত্তশাসন পুঙ্খানুপুঙ্খ দেবে, একথা প্রচার করে যে নির্ভাবান বিক্রুটিং এজেন্ট গান্ধী, তিলক, অ্যানী বেসান্ট প্রভৃতি কংগ্রেসী গরম দলের থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছিলেন, রোলট আইন বিবিধ হওয়ার সেই গান্ধী বিগড়ে গিয়ে বললেন, এই সরকার আমার সকল বিশ্বাসের গোড়া কেটে দিয়েছে। কিন্তু বুটেশ বা বুটশ সাম্রাজ্যের ওপর বিশ্বাস তাঁর শিথিল হয়নি। তাই সশস্ত্র বিপ্লবের আশঙ্কাকে তিনি অহিংস অসহযোগের পথে পরিচালিত করলেন।

মডারেট কংগ্রেস নেতা প্রভাস মিত্র ছিলেন রোলট কমিটির অস্ত্রতম সদস্য। ১৮ সালের শেষেই কংগ্রেসের এই মডারেট নেতারা কংগ্রেস ছেড়ে পৃথক নতুন লিবার্যাল ফেডারেশন গঠন করেছিলেন।

২০ সালের আগষ্ট মাসে মটেগ-চেমসফোর্ড শাসন সংস্কার প্রবর্তিত হয়, এবং সেপ্টেম্বরে কলিকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে অসহযোগ প্রস্তাব পাশ হয়। সংস্কার প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আন্দামান থেকে মাদিকতলা বোমার আসামীর—বারীন ঘোষ প্রভৃতি মুক্ত হন। ২১ সালে বারীন ঘোষ “বিপ্লবী” নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন।

শাসন সংস্কার প্রবর্তিত হলে প্রথম নির্বাচনে কংগ্রেস অবতীর্ণ হবে বলে নেতারা স্থির করেছিলেন, এবং বাংলা দেশে নির্বাচন-প্রার্থীদের নাম পর্বত ঠিক হয়ে গিয়েছিল,—কিন্তু অসহযোগ প্রস্তাব অল্পসারে নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত করা হয়, এবং লিবার্যাল ফেডারেশন প্রভৃতি অস্ত্র দলের নির্বাচনের পথ নিষিদ্ধ হয়।

শাসন সংস্কার পরীক্ষা করে দেখা গেল,—কয়েকজন মিনিষ্টার করার ব্যবস্থা করলে

জন্মে—যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, কৃষি শিল্প প্রভৃতি। রাজস্ব, অর্থ, পুলিশ, প্রভৃতি প্রধান বিভাগগুলো সরকার নিজের হাতেই রেখেছে,—আগেকার মত এল্‌কিউটিভ কাউন্সিলের খেতাবদের সম্মানের হাতে।

প্রথম বিভাগগুলোর নাম ট্রান্সকার্ড সার্ভিস, আর দ্বিতীয় বিভাগগুলোর রিজার্ভ সার্ভিস—তাই এই শাসন ব্যবস্থাকে বৈতশাসন বা ডায়াকি বলা হত। নির্বাচিত কাউন্সিল সদস্য কিছু বাড়ানো হয়েছিল।

ব্যবস্থা হয়েছিল, জাতি গঠনের বিভাগগুলোর ব্যয় বরাদ্দ করার দায়িত্ব অর্থ বিভাগের ওপর থাকবে না,—তাঁদের সংরক্ষিত বিভাগগুলোর ব্যয় নির্বাহ করে যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকে, তাহলে হস্তান্তরিত বিভাগগুলোকে কিছু কিছু বেঁটে দেওয়া হবে,—অল্পখা হস্তান্তরিত বিভাগের মন্ত্রীদের নিজ নিজ বিভাগের ব্যয় নির্বাহের ব্যবস্থা নিজেদেরই করতে হবে—দরকার হলে তাঁরা সেজন্তে নতুন ট্যাক্স আদায় করতে পারবেন।

প্রথম মন্ত্রী হয়েছিলেন সুরেন বাঁড়াজ্যে, প্রভাস মিত্র এবং নবাব আলি চৌধুরী (বগুড়ার নবাব)। সুরেন বাঁড়াজ্যের হাতে ছিল স্বাস্থ্য ও স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন বিভাগ। অর্থাভাবে তিনি দান্তব্য চিকিৎসালয়গুলো থেকে কিছু টাকা ভোলার ব্যবস্থা করেছিলেন—প্রথম দিন নাম লেখানোর সময় রোগীদের কাছ থেকে চারটে করে পরসী নেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল—কলে “দিনী” মন্ত্রীদের ওপর সাধারণ লোকের অশ্রদ্ধা হয়েছিল।

কিন্তু সেই প্রথম চাল পেয়েই সুরেন বাঁড়াজ্যে কলকাতার মিউনিসিপ্যাল আইন বিবিধ করেন—কলকাতা কর্পোরেশনের উপর মেয়রের শাসনের ব্যবস্থা করেন, যে ব্যাপারটাকে কংগ্রেস সম্মত সারা দেশ তাঁর জীবনের একটা বিরাট সাফল্য বলে অভিনন্দিত করে।

বাই হোক, ডায়াকির সঙ্গে ভারতবাসীদের আর কয়েকটা বড় চাকরী-ঘুস দেওয়ারও ব্যবস্থা বুটশ সরকার করেছিল। কেন্দ্রে আর একজন ভারতীয় এল্‌কিউটিভ কাউন্সিলার—বিলাতে ভারতসভার একজন ভারতীয় সভ্য,—বিলাতে একজন ভারতীয় হাই কমিশনার প্রভৃতি। কলকাতা শাসন সংস্কারের অন্তঃসারণ্যতা প্রচারে কংগ্রেসকে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি।

(পোয়ার নিহত ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় বাদে) তাঁরা কিরে না এলে সরকারও নিশ্চিন্ত হতে পারেন না,—আর বিপ্লবীদেরও বর্তমান অবস্থার পরিসমাপ্তি হয় না। সুতরাং বারীনা' প্রভৃতি সরকারের সঙ্গে কথাবার্তা চালাতে লাগলেন। একদিকে বিজলীতে বিজ্ঞাপন বেকতে লাগলো,—“ভাই অমর, বা ভাই অতুল, তোমরা যেখানেই থাক, আমাদের সঙ্গে পত্রালাপ কর”—আর একদিকে চন্দননগরের মতি বায়ের সঙ্গে অতুলনা'র গোপনে কথাবার্তা চলতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত স্থির হল, চন্দননগর ফেরারী বিপ্লবীদের সঙ্গে বুটিশ সরকারের প্রতিনিধিদের সাক্ষাৎকার হবে, এবং কথাবার্তার পর বিপ্লবী নেতাদের নির্বিঘ্নে কিরে যেতে দেওয়া হবে।

শুধুমুদারে বাংলা সরকারের সেক্রেটারী এবং পোয়েন্টাকীফের সঙ্গে অতুলনা'র সাক্ষাৎকার ও কথাবার্তা হয়ে স্থির হল, ফেরারীদের বিরুদ্ধে সকল চার্জ তুলে নেওয়া হবে,—অস্ত্রশস্ত্র সমর্পণের কথা তোলা চলবে না,—এবং আবার কখনো তাঁদের গ্রেপ্তার করতে হলে, আগে তাঁদের বিরুদ্ধে রিপোর্ট জানিয়ে তাঁদের বক্তব্য বলার সুযোগ দিতে হবে।

এই বন্ধোবস্তুর পর কিরে এলেন অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বাহুগোপাল মুখোপাধ্যায়, অতুল ঘোষ, সত্যীশ চক্রবর্তী (খুলনা) পাঁচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নলিনী কর। বাহুনা মেডিক্যাল পড়তে পড়তে গা ঢাকা দিয়েছিলেন, ফেরারী অবস্থার প্রয়োজন হলে ডাক্তারীও কিছু কিছু করতেন,—এখন হঠাৎ ডাক্তারী (এম. বি) পরীক্ষা দিয়ে কাষ্ট হয়ে স্বর্ণপদক পেলেন।

জীবনের সঙ্গে উত্তরপাড়ার গিরে অমরনা'কে প্রথম দেখলুম। উজ্জল গৌরবর্ণ, দীর্ঘাবয়ব, অপূর্ণ স্বাস্থ্যবান এক বিরাট পুরুষ, দেখলে মনে হয়—জয়ন্ত পাণ্ডুরানাং বেবাং পক্ষে জনার্দন—এমন মানুষ বাদের সহায়, তাদের জয় অনিবার্য।

দাদারা কোন কর্পশক্তি অবলম্বন করবেন, তার আলোচনা হল। দেশজোড়া প্রকাশ্য গণ-আন্দোলন শুরু হয়েছে,—সমস্ত বিপ্লবের আন্দোলন বা কর্পশক্তির ক্ষেত্রেও নেই,—অহিংসার আদর্শ সামনে না রেখে “এই পরতানী শাসন ব্যবস্থাকে হয় সংশোধন, না হয় ধ্বংস” করার প্রকাশ্য আন্দোলন চলতেও পারেনা,—এবং এতবড় আন্দোলন থেকে ঘুরে সরে থাকতেও ভবিষ্যৎ বিপ্লব আন্দোলনের পক্ষে সমীচীন হবে না।—সুতরাং তাঁরা ঠিক করলেন,—কংগ্রেসে যোগ দিতে হবে। কিন্তু গান্ধীর অহিংস সংগ্রামের এক বছরে স্বরাজের আইডিয়াটা সঘনো আর একটু ভাল করে জানা দরকার।

সুতরাং বাহুনা' অমর বহুকে গান্ধীর কাছে পাঠিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের বন্ধোবস্ত করলেন,—এবং সাক্ষাৎ করে আলোচনা করে এলেন। গান্ধী বললেন, একটা বছর তোমরা আমার কর্পশক্তি নিয়ে আমাকে একটা চান্স দাও। সুতরাং দাদারা কংগ্রেসে যোগ দিলেন।

আমি তার আগে থেকেই, ১৯২১ সালের গোড়া থেকেই, ব্যবসার সঙ্গে সঙ্গেই, ব্যক্তিগতভাবে আন্দোলনের দিকে ঝুঁকেছিলুম। হিংসা-অহিংসার কথা একটা বছর পরে ভেবে দেখা বাবে। সমস্ত বিপ্লবের আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা বৃক পূর্বে রেখেও তো হয়ত এখনো বহু বৎসর অহিংসই থাকতে হবে। ইতিমধ্যে একটা বছর সারাদেশে প্রকাশ্যভাবে সরকার-বিরোধী মনোভাব গড়ে তোলার

সুযোগটার সদ্যবহার করলে কি ভবিষ্যতের সমস্ত বিপ্লবের প্রভৃতির ক্ষেত্রেই প্রশস্ত হবে না ?

যুদ্ধের ক'টা বছর বিলাতী কাপড় আমদানীর অসুবিধা হওয়ার দেশে বস্ত্রাভাব হয়েছিল, দর চার গুণ বেড়েছিল। কিছু জাপানী কাপড় এবং কিছু দেশী মিলের কাপড়ের ব্যবসার সুযোগ এসেছিল, কিন্তু দর বৃদ্ধির জন্য গরীব লোক কাপড় কিনতে পারতো না—বস্ত্রাভাবে গরীব ঘরের মেয়েরা ঘরের বার হতে পারতো না—বস্ত্রাভাবে গলার দড়ি দিয়ে ঘরের খবরও কাগজে প্রকাশ হচ্ছিল। একটা অর্থনৈতিক জাতীয়তার ভাবও বীরে বীরে গড়ে উঠছিল। বিলাতী কাপড় আবার আমদানী শুরু হয়েছিল।

এই সময়ে বিলাতী কাপড় বরকট করা, এবং খদ্দর উৎপাদন করে বস্ত্রসমস্তার আংশিক সমাধানের পরিকল্পনা অভ্যন্তর সময়োপযোগী হয়েছিল। বারা নতুন উৎপন্ন মোটা খদ্দর পরতে পারবে না,—তারা যাতে অন্তত মিলের মোটা কাপড়ই পরে, তার জন্য একদল লোকের খদ্দর পরা প্রয়োজন। সেটা হবে দেশ-প্রেমিকের কর্তব্য। এই একটা কাজের খাতিরেই তো আন্দোলনে সামিল হওয়া চলে। চিন্তা এই লাইনে চললো।

এদিকে ডেকরেশনের ব্যবসার জন্যে নিলাম থেকে বড় বড় সতরফি, কার্পেট বড় বড় কয়েক জোড়া করে ফুলদান শাখাগান, পরমা প্রভৃতি কেনা হল,—কয়েকটা হাঁড়িবাতি (Punch light) এবং কিছু অ্যান্টিটিলিন গ্যাসের আলো কেনা হল। বিয়ের প্রসেশনের আলো তৈরীর জন্যে একজন মিস্ত্রীও রাখা হল এবং মোটা দামে একগাड़ी পাইপ কেনা হল। দোকানে থাকে ভাগনী-ভামাই এবং একজন ছোকরা। আমি out door কাজ করার অল্পহাতে বাইরে বাইরেই থাকি এবং নানা আড্ডায় ঘুরে সমস্ত কাগজ ও ম্যাগাজিনগুলো পড়ি এবং বিকালে কলেজ স্কয়ারে মিটিং দেখি। সেখানে পদমুখাজ জৈন, জে, এল, বানার্জি, হরিদাস হালদার, ললিত ঘোষাল, মৌলবী আহমদ আলী প্রভৃতি অসহযোগ আন্দোলনের প্রচার ও ব্যাখ্যা করেন। আহমদ আলী তার মধ্যে “নব্য ইটালী”র ম্যাটসিনীর বক্তৃতা মুখস্থ করে অসহযোগ ব্যাখ্যার নামে চালাতে শুরু করেছিলেন—পরে সেটা কোনো অন্ত্যস্ত কারণে বন্ধ হয়েছিল।

হরিদাস হালদার বলতেন, যে সরকারী বস্ত্রা আমাদেব হাতের জোরে চলে, হাত সরিয়ে নিয়ে সেটাকে অচল করে দিতে হবে। কাজটা অতি সহজ,—একটা negation, inaction যাত্র। বস্ত্রা চালাবার লোকের অভাব যে এদেশে হবে না—৩২ কোটি লোকই যে অসহযোগ করবে না,—অচল হওয়াটাই যে শেষ নয়, সেটাকে দখল ও সচল করাই শেষ লক্ষ্য হওয়া উচিত,—এ সব কথা মনে হত না কারো,—মনে হওয়াটা যেন তখন দেশপ্রেমের পরিচয় নয়। বক্তৃতা শুনে সকলেরই ভালো লাগতো।

সত্যর শেষে স্বতঃ-সংগঠিত এক প্রসেশন বেত ওয়েলিংটন স্কয়ারের পূর্বদিকে Forbes mansionএ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অফিসে—নতুন অফিস। জালালউদ্দীন হাসেমী থাকতো প্রসেশনের সাহায্যে। এক পা কাটা—crutchএ ভর দিয়ে চলা—বেশ একটা show হত। স্লোগান ছিল,—বন্দে মাতরম্, ভারতমাতা কি জয়, হিন্দু মুসলমান কি জয়।

টালা-বরানগর ছিল ২৪ পরগণার অন্তর্গত। ২৪ পরগণা জেলা কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন ইংরাজী সাপ্তাহিক মুসলমান পত্রিকার মালিক ও সম্পাদক সর্বজনপ্রিয় জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতা ধৌলবী মজিবর রহমান। কড়োয়াতে তাঁর বাড়ীতে ছিল অফিস।

আমরা কংগ্রেস অফিস থেকে নতুন-ছাপানো রসিদ বই এনে মেবার করতে শুরু করলুম। টালার কংগ্রেস কমিটি সংগঠন করলেন পাটু বাবু, তাঁদের বাড়ীতেই অফিস (পর্যাপ্ত স্থলজোর বাড়ী)। তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁর দাদা সুলীল বাবু (ভায়া)।—হাটবেড়ের (নড়াল) জমিদার জিতেন বাবের ছোট ছেলে, পাটু বাবুর বন্ধু কটু,—আর ছিলেন জাপান প্রত্যাগত “জাপান” লেখক সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় (সুরেশদা)—তাঁর মামার বাড়ী ছিল টালার। আমিও তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়ে কিছু মেবার করলুম টালাতে।

কিন্তু বরানগরেও তো একটা কংগ্রেস কমিটি করা দরকার। আমি প্রথমে গেলুম বিপিনদা'র চেলা, ভূতপূর্ব আটকবন্দী বিত্ত সেনের বাড়ীতে। তিনি বরসে আমাদের চেয়ে বড়,—তাঁর ছোট ভাইকে নিয়ে পড়লুম। তাঁরা বিশেষ আমল দিলেন না। কিন্তু সেখানকার আড্ডা থেকে একটা হদিস সংগ্রহ করলুম। বড়বাজারের লোহাবাসিন্দারী প্রোট-ভক্তলোক হরিশঙ্কর দে, এবং তাঁর ভ্রাতৃপুত্র কৃষ্ণদেব দেক গাঁথতে পারলে অনেক লোক আসবে,—কংগ্রেস কমিটি করা বাবে।

কৃষ্ণদেবের সঙ্গে দেখা করে অনেক প্রস্তাব জবাব দিয়ে তাঁকে বোঝালুম, রাজী করালুম,—এবং তাঁকে সঙ্গে নিয়ে হরিশঙ্কর বাবুর সঙ্গে দেখা করে বললুম, আপনি সভাপতি না হলে তো এখানে কংগ্রেস কমিটিই হয় না,—বরানগরের বদনাম হয়ে যায়।

ভক্তলোক, থাকে বলে hard not to crack, কিন্তু কয়েকদিন ক্ষতক্ষতির পর রাজী হলেন। তিনি প্রেসিডেন্ট এবং কৃষ্ণদেব বাবু সেক্রেটারী—হল বরানগর কংগ্রেস কমিটি।

অলমবাজারে বিপিনদা'র আর এক চেলা, ভূতপূর্ব আটকবন্দী ছিলেন তুলনী দোব—তাঁর কাছে গেলুম আলমবাজারে কংগ্রেস কমিটি করার জন্তে। তিনি রাজী হয়ে গেলেন। তাঁর দোসর (জুনিয়ার) লেকট্রাণ্ট ছিলেন ধীরেন চাটুজ্য (বিনি এয়ুগে বরানগর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান হয়েছিলেন)—তিনিও থাকলেন। শরৎ বাবু (বোধ হয় চাটুজ্য) নামক একজন গড় এম-এ পাশ ভক্তলোককে সেক্রেটারী করে আলমবাজারেও এক কংগ্রেস কমিটি হল।

বরানগরের বিত্ত সেনের বাড়ীতে শুনলুম, তুলনী দোবের বদনাম। বললুম, কংগ্রেস বা অসহযোগ আন্দোলন ও-সব কথার ধার ধারে না,—কংগ্রেসের কাজ ভালই চলবে এবং সেই যথেষ্ট।

বরানগরের খগেন চাটুজ্যেরও (খগেন বাঁড়ুজ্য বা বাঁটল বাবু নয়) বদনাম শুনছিলুম—তিনি ছিলেন গরীব গৃহস্থ, অথচ অন্তরীণ থেকে কিয়ে আগার পরে নতুন বাড়ী তৈরী করেছিলেন। Theoryটা হচ্ছে, তাঁর কাছে নাকি কোনো ডাকাতির টাকা ছিল, ধরা পড়ার সে টাকা আর পাওয়া যায়নি।

এ ধরনের কথা প্রভাস দে সবদেও কিছু দিন বাজারে চলেছিল তারপর আপনিই খেমে গেয়ো।

কিন্তু আর্থিক যত্নবশত গভীর ভাবে সংশ্লিষ্ট চক্রকাণ্ড চক্রবর্তী,—ধীর কথা আগে লিখেছি,—তিনি হুজুর পর আমেরিকা থেকে কিয়ে এসে বিবেকানন্দ রোডে গিরীশ পার্কের কাছে এক বিরাট পাঁচতলা বাড়ী তৈরী করেছিলেন এবং এতদিন সেখানেই আছেন। তাঁর আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে কোন মেলামেশা নেই।

বাই হোক, Forbes mansion থেকে একটা চরকা কিনে এনে দিদির দিচ্ছেলুম,—তিনি বাড়ীতে চরকা কাটতেন। আমি সকালে একটা চরকা কেটে পাড়ায় বেড়িয়ে একবার সেক্রেটারী কৃষ্ণদেব বাবুর বাড়ীতে কংগ্রেস অফিসে গিয়ে তাঁকে একটু তাকিয়ে এসে খেয়ে দেয়ে কলকাতায় চলে আসতুম। একবার দোকানে পদমূলি দিয়ে সবে পড়তুম। খদ্দের প্রচারের জন্তে টালা-বরানগরে খদ্দেরের প্রতি ও শাড়ী ছাড়ে করে লোকের বাড়ী পৌঁছে দিতুম। পাটু বাবু তো খদ্দের প্রচারের জন্তে গায়বাজার ট্রাম ডিপোর কাছে এক খদ্দের দোকানই করে বসলেন।

দোকানে তিনি বসিয়েছিলেন সিঁহদেব গাঙ্গুলীকে (বিনি এয়ুগে নারী আন্দোলনের সেক্রেটারীরূপে rape case-এ জেল খেটেছেন)—এবং সেই সিঁহদেবই শেষপর্যন্ত পাটু বাবুর খদ্দেরের দোকান ভাঙিয়ে ফেঁদে দিয়েছিলেন। কিছু অর্থনৈষ্ট এবং কিছু মনঃকষ্ট হয়েছিল তাঁর নীট লাভ।

বরানগর ও আলমবাজার কংগ্রেসে উৎসাহ সফারের জন্তে কলকাতা থেকে বক্তা নিয়ে হাওড়ার চৌরী করলুম। উত্তর কলিকাতা কংগ্রেস কমিটিতে বক্তা খুঁজে কোন বয়ঃকোষ্ঠ নেতাকে পাওয়া গেল না—শেষে নিয়ে গেলুম ভগবতী সোমকে। আমার বয়সী বক্তা দেখে কৃষ্ণদেব বাবু হতশ হইলেন—তবু একটা বৈঠক হল। আলমবাজারে ফুটবল গ্রাউণ্ডে বড় মিটিংএর ব্যঙ্গাবস্থা হল। প্রাদেশিক ভাইস-প্রেসিডেন্ট আক্রাম খাঁকে সকলের পছন্দ, কারণ Jute mill এর অনেক মুসলমানকে আকৃষ্ট করা বাবে। গেলুম আক্রাম খাঁর কাছে; তিনি ঠেকিয়ে দিলেন এক রোগা লম্বা ছোকরা নেতাকে—বোধ হয় তাঁর জামাই আব্দুল রেজাক খাঁ—বর্তমান কমিউনিষ্ট নেতা। বড় নেতা না পেয়ে উৎসাহ জমলো না।

এই রকম চলতে চলতে ফেব্রুয়ারী মাসে খ্রিস্ট অফ ওয়েলসকে ভাঙতে এনে সরকার জনগণের রাজত্বের উল্লেখের ব্যবস্থা করলেন। বোধ হয় ২০ সালের শেষে এই উদ্দেশ্যে ডিউক অফ বন্টকে (রাজার ভাই) আনা হয়েছিল এবং কলকাতার আগমন উপলক্ষে বিক্ষোভ প্রদর্শন ও আত্মবলিক কিছু মারামারি, পুলিশের লাঠিবাজী ও ধরপাকড় হয়েছিল। স্ত্রুতরাং খ্রিস্ট অফ ওয়েলস বেঁদন কলকাতার আসেন, সেদিন লোক বাতে দেখতেই না যায়, হাওড়া থেকে গভর্নমেন্ট হাউস পর্যন্ত রাস্তা বাতে কাঁকা থাকে, তার জন্তে কলকাতার সমস্ত পার্ক আটটা সভার বন্দোবস্ত হয়েছে, এবং নিখিলভারত নেতারা এসেছেন। ঐ আটটা সভাতেই তাঁরা বক্তৃতা করবেন—মতিলাল নেহরু, গান্ধী, মহম্মদ আলী, সৌকত আলী, ডাঃ সত্য পাল, কিচলু সেরওয়ারী প্রভৃতি। পার্কে পার্কে বিরাট জনসমাগম হুপুথ থেকেই শুরু হয়েছে—ষ্ট্রীট রোড কাঁকা, বয়স্কট সম্পূর্ণ সফল, বিনা গণ্ডগোলেই।

নেতারা এক এক সভার বক্তৃতা করেই অল্প সভার রওনা হচ্ছেন, শেষে সন্ধ্যা বাজেবাটা পার্কে সজা চলতে। আমিত্তি এবং লক্ষ্যে

অন্ত পার্কে চলেছি মিটিং দেখতে। রাত আটটা পর্বন্ত এমনি চলে' সব মিটিং শেষ হ'লে আমি ইডেন হাসপিটাল রোডে এক মেসে ফুটপাথের বতীন দস্তুর ঘরে গিয়ে আড্ডা মেয়ে সেখানেই খাওয়া-দাওয়া করে শুয়ে পড়েছি। তার আগের দিনও বাড়ী বাঙরা ঘটেনি।

সকালে উঠে টালা হায়ে কাশীপুর দিয়ে ষ্ট্রিমারে বাড়ী যাবো,—টালায় পোল পার হয়েই দেখা একদল মহিলা গজানানারীর সঙ্গে—টালায় গিন্নীবায়ীর দল। আমাকে দেখে এক দিদি জিজ্ঞাসা করলেন—“হ্যাঁরা, তোর দিদির কি হবেছিল?” বললুম, কিছু হয়নি তো! তিনি বুঝলেন, আমি বাড়ীর খবর রাখি না,—চেনে গেলেন। আমি মনে করলুম, কথার ছিঁরি দেখ,—যেন দিদি মারা গেছে।

কাশীপুরে র্যালী ব্রাদার্সের গুমটিতে গোপাল বাবুর সঙ্গে দেখা করলুম—তিনি তখনও সে চাকরী ছেড়ে বেরোতে পারেননি। তিনি বললেন, বাড়ী বান শীগগির। বুকটার মধ্যে ধড়াস করে উঠলো। বাড়ী চলে গেলুম। উঠানে পৌঁছেতেই ভাগ্নী এসে হাঁউমাউ করে চাৎকার করে পায়ের কাছে আছড়ে পড়লো—পাশের বাড়ীর গিন্নী “লক্ষ্মীর মা” তাকে টেনে তুলে ঘরে নিয়ে গেলেন। আকস্মিক করে বলতে লাগলেন,—“আহা, মেয়ে-জামাইয়ের কথা কিছু না বলে” শুধু কেঁদেছে,—খোকার সঙ্গে দেখা হল না।” দিদি আমাকে থোকা বলে ডাকতেন।

ছুটলুম রতন বাবুর ঘাটে—শ্রমশানঘাটে—এবং দেখলুম দাহ হয়ে গেছে—চিতায় জল দিলুম, এবং বাড়ী ফিরে বেকুবের মতন বিছানায় উপুড় হয়ে পড়লুম।

ঘটনাটা হয়েছে,—আমি যখন বতীন দস্তুর মেসে হৈ হৈ করে—সভার বিবরণ দিয়ে মাতকরী করছি,—ঠিক সেই সময়ে কলোয়ার আক্রান্ত হয়ে দিদি আমার জন্তে ধড়ফড় করছেন, আর ভাগ্নীজামাই সারা কলকাতার সব জানা ঠিকানার আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে—বতীন দস্তুর মেসটা তার জানা ছিল না। তোরে দিদির মৃত্যু হয়েছে,—ভালাইন ইন্জেকশন দেওয়ার ব্যবস্থার আগেই। অপূর্ব ঘটনাটক।

হুদিন বিছানায় পড়ে নিঃশব্দে কাঁদলুম, আর ভাবলুম, কি হবে। চারদিকে যেন একটা শূন্যতা, রিক্ততা, সহায়হীনতার অন্ধকার নেমে এসে সবকিছু বাপসা করে দিয়েছে। দিদি যে কি ছিল, কেমন ছিল, সে কথা এখানে বসার অবকাশ নেই—সে একটা বৃহৎ উপভাসের কাহিনী হতে পারে। অতি সংক্ষেপে মাত্র দু'একটা কথা এখানে বলবো।

আমি জন্মাবার বছর খানেক আগে দিদির একটা ছেলে হয়ে অন্নদিন বাড়েই মারা গিয়েছিল। স্মরণ্য আমি জন্মের পর সমানে মা ও দিদির মাই খেয়েছি, এবং শেষ পর্বন্ত দিদিই আমাকে ছেলের মতন করে মানুষ করেছিলেন। মার কাছে তাড়া খেলে দিদির কাছে পালাতুম, কিন্তু দিদির কাছে তাড়া, এমন কি মার খেলেও মার কাছে কখনো পালাইনি। তারপর মা মারা গেছেন, আমার বয়স যখন আট বছর। তার পর থেকে মানুষ হয়েছি দিদির হাতেই। ভগিনীপতি নেশাখোর হয়ে গিয়ে শেষ পর্বন্ত নিক্রমণ হয়ে গিয়েছিল।

আমার বারো বছর বয়সে বাবা মারা বান। মৃত্যুর পূর্বে তিনি বাড়ীর অধ্যক্ষ দিদির নামে লেখাখণ্ডা করে দিয়ে বাঙরার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু দিদিই তাঁকে নিবৃত্ত করেন এই বলে যে, আপনি যদি এই ভাবে খোকার সঙ্গে আমার একটা “দেইজি” সম্পর্ক করে দিয়ে বান, তাহলে শেষ পর্বন্ত তার সঙ্গে আমার বিরোধ বাধবেই, আজ সে-বিরোধের কোন সম্ভাবনাই নেই। এই ছিলেন আমার দিদি।

বাই হোক, হুদিন পড়ে থেকে উঠলুম, চাক্সা হলুম, এবং সংসার ও ব্যবসার দিকে একটু মনোযোগ দিতে মনস্থ করলুম। ব্যবসার একটা সুযোগও এসে গেল।

টালায় খালধারে কাঁড়ির পাশে গুড়ের আড়তে একটা বড় বাগোয়ারী হত, সেখানে অনেকদিন ধরে বাজা পুতুলনাচ প্রভৃতি হত। সেট বারোয়ারীর কতৃপক্ষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ম্যারাপ প্রভৃতির কন্ট্রোল নিয়ে ফেললুম। একটা রীতিমত খাটুনির প্রয়োজন এবং কেরামতি দেখাবার scopc সামনে পেয়ে যেতে উঠলুম। ১০ গাড়ী বাঁশ, ১৬০০ হোগলা, ৩ গাড়ী শালের খুঁটি, তিনটে বড় খুঁটি ৪০ ফুট করে, এইসব কিনে ফেললুম ম্যারাপের জন্তে। সফ্র খেলো খান একগাদা কিনে লাল, নীল, হলদে রঙে ছুপিয়ে ফেস্টুন হল, বড় চঙা খান একগাদা কিনে তৈরী হল বড় বড় চাদর এবং ফুলকাটা রঙীন Ceiling-এর কাপড়। বাড়ার আসরের খুঁটিতে খুঁটিতে পরদার ওপর জোড়া জোড়া আশাভাল স্লাগ এবং আতীর নেতাদের ত্রিধ্ব ছবি—গ্রীন বোর্ড Oval কবে কেটে আমেরিকান সাদা নক্সাদার ফ্রেমে বাঁধানো। সকলে দেখে খুসী হস, আমার স্বদেশিতার সখও একটু মটলো। সব মিসে ফাজটা প্রকাশ্য, এবং বেশ সুশৃঙ্খলে সুসম্পন্নও হল। টাকা পেতেও বেগ পেতে হল না।

এই কাজের মায়কৎ বে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হল, তাও সাহাজ্য নয়। চারটে বিদ্যুটে জেঞ্জীর লোক নিয়ে কাজ—হুটে, গাড়োয়ান, ঘরামী আর মিট্রী—প্রায় একটা যুদ্ধ ম্যানেজ করা। পরীক্ষার উত্তীর্ণ হলুম।

স্বকর্মাবির একটা উদাহরণ দেবার লোভ সঞ্চার করতে পারছি না। ধরণ আমার মিট্রীর কথা। সে প্রতি সপ্তাহে শনিবারে টাকা নেয়, এবং মদ খেয়ে এক খোলার বস্তীতে পড়ে থাকে, তাকে খুঁজে ধরে আনতে হয়। একদিন টাকা পেয়ে মদ খেয়ে ফুটপাথের ওপর আড়াআড়ি রাস্তা বন্ধ করে তুলে,—কিছুতেই উঠবে না। চ্যাংদোলা করে তুলে তাকে দোকানের ভেতরে এক তক্তপোষের ওপরে বড় একখানা সতরঞ্চি ভাজ করে শুইয়ে দেওয়া হল। সকালে দেখা গেল, প্রমোদ করে সতরঞ্চি ভাসিয়ে রেখে দিয়েছে।

ভয়ে কিছু বললুম না। অনেক বেলায় উঠে ছোকরাটাকে সঙ্গে নিয়ে কলতলার সতরঞ্চিখানাকে কাচার নামে ভিজিয়ে নিয়ে ছাতের ওপর ফেললে। সন্ধ্যার পর তাকে মিট্রী কথার কিছু সত্বপদেশ দিলুম। চুপ করে খানিক শুনে, তারপর চটে গেল—বললে, কি আপনি উপদেশ দিচ্ছেন মশাই? এই করে আমার এককাল কাটলো, বুড়ো হয়ে গেলুম। ভয়ে ভয়ে কাঠহাসি হেসে রং জল দিলুম। ভাল মিট্রী, চটালে চলবে না। বিষয় প্রমোদনের আলো তৈরী হতে লাগলো।

এদিকে এসে গেল বরিশাল কনকারেন্স। চল্লুম বরিশালে, বহুকে সঙ্গে নিয়ে গেলুম। সেখানে গিয়ে পাটুবাবু এবং ফটুবাবুর সঙ্গে দেখা হল। বহুও ভারি ফুটি—এত বাজাল একসঙ্গে কখনো দেখিনি।

গান্ধীজি তখন মহাশা হয়েছেন, এবং আমার মুখে গতিয়েছে এক প্রকাণ্ড চাপ দাড়ি, plain living এর রূপায়ণ! high thinking এরও বটে।

কনকারেন্সের নির্বাচিত সভাপতি বিপিন পাল। তিনি অসহযোগ আন্দোলনের বিরুদ্ধ সমালোচনা করতেন এবং আন্দোলন থেকে স্বভাবতই দূরে সরে যাচ্ছিলেন। প্রতিনিধি ও দর্শকে বিরাট প্যাণ্ডাল পরিপূর্ণ,—বাইরেও বিশাল জনতা। সি আর দাশ, অখিল দত্ত প্রভৃতি নেতারাও উপস্থিত। সভাপতির ভাষণ শ্রুত হল। যেমন দরাজ কঠোর, তেমনি অকুণ্ঠ ওজস্বিনী ভাষা। বক্তৃতার মধ্যে তিনি যেই বলতেছেন মিষ্টার গান্ধী, আমি চারিদিক থেকে আগরাজ উঠলো মহাস্বা বলুন।

গোলমাল খামলে তিনি আবার শুরু করলেন, আরো দৃঢ়কণ্ঠে বললেন মি: গান্ধী। আবার আগরাজ উঠলো মহাস্বা বলতে হবে। গোলমাল বেশ কিছুক্ষণ চলার পর একটু খামলে বিপিন বাবু বক্তৃতা নির্ঘোষে বললেন, বলবো না—বলে তিনি সভাপতির আসন ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। প্যাণ্ডালের মধ্যে এবং বাইরে উদ্‌যমি ধ্বনি চলতে লাগলো মহাস্বা গান্ধী কি জয়! কনকারেন্স প্রায় ভেঙ্গে যায়।

তখন বরিশালের জনপ্রিয় জুনিয়ার নেতা শ্রীশরৎ ঘোষ (যিনি পরবর্তীকালে স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ হয়েছিলেন) উঠে মহাস্বার স্তুতি করে বক্তৃতা শুরু করলেন, এবং হু ঘটাব্যাপী বক্তৃতা করলেন, ধিওজকি ও নন কো-অপারেশনের অপূর্ব মিশ্রণ। স্বরাজ পাওয়ার অর্থ, তাঁর মতে, নিজেকে মারামর বহিবিষয় থেকে সরিয়ে এনে সংহত করে আত্মহু হওয়া, স্বরাট হওয়া। মহাস্বা গান্ধীকি জয় হবে আকাশ-বাতাশ প্রেক্ষিপিত করে সভা ভঙ্গ হল। আবার বধন সভা বললো তখন সভাপতিত্ব করলেন শ্রীঅখিল দত্ত। তিন মাসের জন্তে আদালত বর্জন করে অসহযোগ আন্দোলনের কার্যক্রমে যোগ দিতে উকীলদের আহ্বান করে প্রধান প্রস্তাব পাশ হ'ল।

সাবজেক্টস কমিটির সভার পর সি আর দাশ ও অখিল দত্ত কথা কইছেন, একটু তফাতে দাঁড়িয়ে গুনলুম। অখিল দত্ত বলছেন, তিন মাস আদালত ছাড়লে কীই বা হবে। দাশ মহাশয় বললেন,—একবার সবাই আদালত ছেড়ে বেরিয়ে আসুক, তারপর তিন মাসে আমরা এমন অবস্থা করে তুলবো যে, কেউ আর ফিরে যেতেই পারবে না।

কার্যভণ্ড হয়েছিল কতকটা ঐ রকমই—অনেকে আদালত ছেড়েছিলেন, এবং তিন মাস পরে অনেকেই আর ফিরে বাননি। অবশ্য একখাটা মনে রাখা দরকার,—উকীল ননকোঅপারেটরদের অধিকাংশই ছিলেন উপার্জনহীন বুদ্ধহু শ্রেণীর,—এবং তাঁদের অধিকাংশকেই মাসিক ১০০ টাকা পঞ্চ অ্যালাউন্স দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন দাশ মহাশয়।

তিনি বধন প্রথমে ব্যারিষ্টারী ভ্যাগ করার ঘোষণা করলেন, এবং ডুমরাও রাজার মাথলা ভ্যাগ করে তাদের অগ্রিম বেওয়া ১০,০০০ টাকা ফেরৎ দিলেন। তখন বাজারবাটী রাস্তা প্রজ্ঞা জরায়

বিশ্বয়ে ধক্ত ধক্ত করতে লাগলো। এমন একটা ভাবাবেগের সৃষ্টি হল যে, অসংখ্য লোক আদালত ছেড়ে, কলেজ ছেড়ে, ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লো—কলেজ বরকট মোটাবুটি সকল হল, অসংখ্য আন্দোলনের কাজ হু হু করে সাফল্যের পথে এগিয়ে চললো। অনেকের বিশ্বাস, সি আর দাশ ব্যারিষ্টারী না ছাড়লে বাংলা দেশে গান্ধীর আন্দোলন সকল হত না। বস্তত আমরাও আরো আকৃষ্ট হলুম সত্যিকারের দেশপ্রেম, ভ্যাগ ও নিষ্ঠার বাস্তব উদাহরণ দেখে।

বরিশাল থেকে ফেরার পরই এলো নিমিত্ত ভারত কংগ্রেস কমিটির বেকোরাদা প্রোগ্রাম—যে এবং জুন এই হু' মাসের মধ্যে সারা দেশে এক কোটি কংগ্রেস সদস্য সংগ্রহ করতে হবে, তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডারে এক কোটি টাকা তুলতে হবে, এবং ২০ লাখ চরখা চালু করতে হবে। এই প্রোগ্রাম সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সারাদেশে এক স্বতঃস্ফূর্ত বিরাট কর্মোদ্যমানার বজা বয়ে গেল। সব কাজ ছেড়ে দিনরাত ভুতের মত খাটতে লাগলুম—প্রোগ্রাম সকল হল।

বুঝলুম ব্যবসা এবং সংসারের মারা কাটাতে হবে। ব্যবসাটা ঠিক বধন দাঁড়িয়ে গেছে,—তখনই আবার সেটা তুলে দিলুম মালপত্র বাড়ীতে নিয়ে গেলুম। বাড়ী থেকে ভাগনীজামাই বেটুকু পারে তাই চলতে লাগলো। ভাবতে লাগলুম,—বদি বাড়ী ছেড়ে বেরোতে হয়, তাহলে অপোগণ্ডলোকে দেখবে কে?

গোপাল বাবু তখন বোস ইনষ্টিটিউটে যোগ দিয়েছেন, এবং ফ্যামিলি আনার জন্তে ঘর খুঁজছেন। আমি বললুম, আমাদের বাড়ীতে একটা ঘরে থাকতে পারেন তো ভাড়াটা লাগবে না। তিনি বললেন বরানগর থেকে অফিসে বাতায়াত বড় অনুবিধা, একখানা সাইকেল থাকলে চলতে পারে। তদনুসারে ১১০ টাকা দিয়ে একখানা সাইকেল কেনা হল, আমি টাকা দিলুম, পরে গোপাল বাবু সেটা শোধ করলেন। মোটের উপর গোপাল বাবুকে বাড়ীতে বসিয়ে একটু নিশ্চিন্ত হলুম, অন্তত একটা আক্কেলগুয়লা লোকতো বাড়ীতে থাকলো।

একটা কথা এখানে বলে রাখতে চাই। স্বংয়ের কাগজে নেতাদের সিদ্ধান্ত প্রকাশ হওয়া মাত্র দেশসুস্থ লোক বে স্বতঃপ্ররোধিত ভাবে সে সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করতে উঠে পড়ে লেগে যায়, এমন কর্মোদ্যমানা আমরা বারা ২১ সালে দেখছি, আজকের চীনের কর্মোদ্যমানা তাদের কাছে একটুও অসম্ভব বা চুর্যোধ্য নয়। বারা ২১ সাল দেখিনি, তারা হরত আজকের চীনের কর্মোদ্যমানা বুঝতে পারে না। তারাই চীনের শত্রুদের এই অপপ্রচার বিভ্রান্ত হয় যে, লোকগুলোকে জোর করে খাটানো হচ্ছে।

জুনের পরেই এল বি পি সি সির ইলেকশন। সিঙ্গল ট্রান্সফারবেল ভোট প্রথম প্রবর্তিত হল। অস্তান্ত প্রবান কর্মী ও সংগঠকদের সঙ্গে আমিও নির্বাচিত হলুম।

প্রথম বি. পি. সি সির মিটিং হল Forbes mansionএ। সেখানে দাশ মহাশয় ঘোষণা করলেন স্বভাব বহু আই-সি-এস পাশ করে সরকারী চাকরী না নিয়ে দেশে ফিরছেন অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্তে। তাঁকে বি. পি. সি. সিতে নেওয়া দরকার,—সুতরাং একটা সীট খালি করার জন্তে একজন সভ্যের পদত্যাগ প্রয়োজন। শোনারাত্র কয়েকজন উঠে দাঁড়ালো,—আমিও—বিত্ত

২৪ পরগণা কংগ্রেস কমিটিতে কয়েকজন যাতকর ছিলেন,— প্রকৃজ বানার্জি (পরবর্তীকালে জেলাবোর্ডের ডাইর), দ্বিতীয় দাশগুপ্ত (বেঙ্গল কেমিক্যাল-খাদি প্রতিষ্ঠান) প্রভৃতি, যাদের কাজ ছিল জেলা কমিটির সভার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ব্যাপারে হস্তক্ষেপ, বক্তৃতাধর্মণ, সম্পাদনীয় প্রস্তাব প্রভৃতি । জেলা কংগ্রেস কমিটি বলা হবে, না জেলা রাষ্ট্রীয় সমিতি বলা হবে, তাই নিয়েই তিন ঘণ্টা লড়াই ।

কাজে কোন সুখ পেতুম না । বেজওয়ারী প্রোগ্রামে কংগ্রেসের আসল কাজ হয়ে গেছে । তার জের চলছিল সভা-সমিতিতে অসহযোগের ব্যাখ্যা প্রভৃতি । কলেজ স্কয়ার ছিল ৩০ দিনই সবগরম । অনেক নতুন বক্তা গজিয়েছিল । বক্তৃতার পর কয়েকটা ছোট ছোট গুণ তর্কবিতর্ক করতো এবং একখানা বেকিতে কয়েকজন বারোমাসে দিনিরর বসে অসহযোগ আন্দোলনের বিবৃদ্ধ সমালোচনা করতো । ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর অ্যাসিস্ট্যান্ট লাইব্রেরিয়ান, নাম উপেন বাবু,—চন্দ্রনগরে বাড়ী, হঠপুটে, কৃষ্ণবর্ণ, ছোট করে চুল ছাঁটা,—তিনি নরম ভাবে প্রতিবাদ করে আন্দোলন সমর্থন করতেন ।

আমি থাকতুম বিতর্কের একটা গুপের মধ্যে । বহুও ডালহাউসী থেকে এসে জুটতো মাঝে মাঝে । একদিন এক ভদ্রলোক খুব ইংরিজী ঝেড়ে তর্ক করতেন । বহু ইংরিজী জানে না মনে মনে চটে গেছে । এমন সময় তাকে লক্ষ্য করেই সাক্ষী মানার ঢং ভদ্রলোক কিছু ইংরেজী বলেছেন । বহু কটমট করে তাকিয়ে বললে,—তা 'অত ইংরিজী বলেছেন কেন ? আগে বাংলায় বলুন,—না বুঝতে পারি, তখন ইংরিজীতে বলবেন । বিকল্পপক্ষ হো-হো করে হেসে উঠে ভদ্রলোককে তর্কে হারিয়ে দিলে ।

স্বরাজের ব্যাখ্যা নিয়ে সমালোচনা চলতো সর্বত্রই । শ্রীনগেন গুহ রায় (নোরাখালী) এক বই লিখেছিলেন "স্বরাজ সাধনায় বাঙ্গালী"—তাতে কতকগুলো প্রশ্ন ও নেতাদের জবাব ছাপা হয়েছিল । দ্বিতীয়শ্রেণীর নেতাদের জবাব । একটা প্রশ্ন ছিল "আপনি কি বিশ্বাস করেন, আন্দোলনের সাফল্য হিসেবে এক বছরে স্বরাজ হবে ?"—জবাবে প্রশ্ন সকলেই বলেছিলেন "হ্যাঁ" । বোধ হয় ক্রিয়াকর্মী রায় এবং আবুল কালাম আজাদ বলেছিলেন "না" ।

হিন্দু মুসলমান ঐক্যের প্রচারের সহায় ছিল প্রধান প্রোগ্রাম "হিন্দু-মুসলমান কি জয়" । মাঝে মাঝে কোন হিন্দু নেতার সঙ্গে মৌলবী ওয়াহেদ হোসেন বক্তৃতা করে বুঝিয়ে দিতেন, বেদ আর কোরাণ একই কথা বলেছে । হিন্দু আর মুসলমান ভারতমাতার ছুটি চক্ষুর মত । ইত্যাদি—

আন্দোলনের ব্যাখ্যা ও সমালোচনা শুনে জ্ঞানার্জন করি, সুখ পাই না । ঠেসে পড়াশুনা করি । বঙ্কিমের গ্রন্থাবলীর সাহিত্য-খণ্ডগুলো ভালো করে পড়লুম, এবং মননশীল পেলুম । সবচেয়ে আনন্দ পেলুম ধর্মতত্ত্ব পড়ে । ছোটবেলার পড়েছিলুম এগুলো বাদ দিয়ে শুধু উপন্যাসগুলো ।

একখানা বই পেলুম "বোগসাধন" । বড় ভাল লাগলো । বহুসময় বিতর্ক-ভাববাদী কথা একেবারে নেই,—বোগ করবে কোথাল,

এটাই প্রতিপাত । বোগের অষ্ট ভঙ্গ—বম, নিরম, আসন, প্রাণারাম প্রতাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি । প্রথম ভঙ্গ বম হচ্ছে—অহিংসা সত্য, অন্তেষ (অচৌর্য) ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ (বিলাস বর্জন) । ব্রহ্মচর্যের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, 'শ্রবণঃ কীর্তনঃ কেলি প্রেক্ষণঃ গৃহভাবণঃ, সঙ্কল্পোহধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়া নিষ্পত্তিরেবচ—এতদগ্নেধ্বনমষ্টাঙ্গঃ প্রবলন্তি মনোবিঃ' । বিপরীতঃ ব্রহ্মচর্যমষ্টাঙ্গঃ সুবিস্তুতিঃ ।' হিংসা তিন প্রকার—কৃত, কারিত এবং অমুমোদিত । দোষ তিনটাত্তই সমান ।

একখানা এল্ফার্টাইজ বকে এক কটন লিথলুম,—বম সাধনের প্রত্যাখিক বেকর্ড—অহিংসা, সত্য, অন্তেষ, ব্রহ্মচর্য, অপরিগ্রহ, এই পাঁচ খাতের সাফল্য ও ব্যর্থতার পরিমাণ বোঝ লিখে রাখতুম ।

দাখা কংগ্রেসে যোগ দিইনি, অন্ত-শত্রু শিকের তোলার ব্যবস্থা হয়েছে । জীবন কিছু মাস বেখেছিল এক খুলে, চেডমাষ্টার দ্বাবী বাবু আমাদের লোক । শ্রামবাজারে দীনেন্দ্র ক্রীটের মোড় দেখানে, এখানে তখন ছিল "গাঁজার গলি" । তার মধ্যে একটা হাফবস্তিতে ছিল ঐ খুল । মালের মধ্যে একটা রাইফেলও ছিল—বাঁট আর ব্যারেল খুলে পৃথক করে রাখা ছিল । সেগুলো চন্দ্রনগরে সরাতে হবে । জীবনের ব্যবস্থার বোহাগী মুখুজ্যে আর আমি সেগুলো নিয়ে গেলুম চন্দ্রনগরে ঘোড়াপুকুরের পাশে কুতু বাবুর বাড়ীর পিছনে বলাই কর্মকারের বাড়ী । তিনি ছিলেন টালার পকাননের মাতুল, আর পকাননই রাইফেলটাকে খুলে দু'টুকরা করে দিয়েছিল ।

বোহাগী মুখুজ্যের বাড়ী জীবনদের গ্রামে, বিক্রমপুরে পঞ্চসার গ্রামে । সেও আমাদের সঙ্গে প্রেশুর ও অন্তরীণ হয়েছিল । কিয়ে এসে খিজাপুর ক্রীটে সাবিজী এজেন্সী নামে এক ষ্টেশনারী দোকান কমেছিল, যে দোকান ২৪ সালের কাণপুর বলশেভিক বড়বস্ত্র মামলার আসামীদের তরফের এক পোষ্ট-অফিস বলে' বর্ণিত হয়েছিল । আসামীদের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে জীবনের নামও ছিল । ২৪ সালে জীবন ছিল দ্বিতীয়বার জেলে, ষ্টেট প্রিজনার ।

বাই হোক, ২১ সালের মাঝামাঝি জীবন দৌলতপুরে (খুলনা) কিরণদা (কিরণ মুখার্জি) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সত্যাপ্রসঙ্গে বাতায়িত করতো । তার সঙ্গে আমিও একবার সত্যাপ্রসঙ্গে বুরে এলুম । তখন শতীন ঘোষ (পরে অমৃতবাজার পত্রিকার অ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটর) সবেমাত্র ম্যাটিক পাশ করেছে—সত্যাপ্রসঙ্গে বাতায়িত শুরু করেছে—দৌলতপুর কলেজের ছাত্র ।

ইতিমধ্যে বরিশাল শব্দরমঠের বন্দোবস্তে বরিশাল থেকে কলকাতার প্রেস আনা হয়েছে জাতীয় সাহিত্য প্রচারের জন্ত এবং সবমুখী লাইব্রেরীও স্থাপিত হয়েছে মনোরঞ্জননা-অরণ গুহর পরিচালনায় । শব্দরমঠ ছিল বিপ্লবীদের খাঁটি—বামী প্রজ্ঞানানন্দ (তৃতপূর্ণ মুসলমানের সতীর্ণ মুখুজ্যে) ছিলেন নেতা । নিমি গাজুলী সেখানেই থাকতেন (এখন কলকাতার হোমিওপ্যাথি প্রাকটিস করেন) আর মনোরঞ্জন-না (গুপ্ত বর্তমান এম এল সি) এবং অরণ গুহ বাতায়িত করতেন ।

দ্বাবী প্রজ্ঞানানন্দের কি একটা বই পড়েছিলুম, মনে নেই; শুধু একটা কথার একটা টুকরা মনে আছে—"ধর্মপুত্রের হত্যা করিবে"—একটা সংকট প্রকের ব্যাখ্যা । আমবা যে "অভিলাপ"

নাটক অভিনয় করেছিলেন, তার শেষ দৃষ্টে বাসুদেব (সত্যাবাসু) কুক (করাসী) এবং অজুনের (পুলিন) সম্বন্ধে নিষেধ কাছ ধরবুকের ব্যাখ্যা করেছিলেন—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের বউটাও সেই ধরবুকের ব্যাখ্যা। আমাদের চোখে অহিংসার বিপ্লববিরোধী ভূমিকা ছিল সুস্পষ্ট।

বরিশাল থেকে প্রেসটা এসেছিল ষ্ট্রীমারে আর্থানীবাটে এবং সেখান থেকে এক গরুর গাড়ীতে এল বেনেটোলা লেনের বাড়ীতে। বাড়ীর উঠানে প্রেসটা নামাবার জন্তে দুটে ডাকা হল, তারা হাকলে ৬ টাকার কমে হবে না। তখন ছ'টাকা একটা বুৎ ব্যাপার। আমি উপস্থিত ছিলাম—মনোরঞ্জনদা'কে বললাম, আমরা দুটোকে চেয়ে গায়ের জোরে খাটো, কিন্তু বুদ্ধিতে বড়,—আমরাই নামাতে পারবো,—যদি আপনিও হাত লাগান। তিনি বললেন, বাজী। আমি বললাম দুটো টাকা খরচ করতে হবে, রসগোল্লা। তিনি বললেন, বাজী। আর কে কে ছিল মনে নেই—প্রসের সঙ্গে এসেছিল বোঁগা লিকলিকে মহেন্দ্র দত্ত—তিনিও হাত লাগালেন। একটা বড় পিসই বেশী ভারী—প্রেস নামিয়ে ফেললাম উঠানে। তারপর হল ছ' টাকার রসগোল্লা খাওয়া।

হারিসন বোডের কাছে বমানাধ মজুবদারের স্ট্রীটের মোড়ে সরষতী লাইব্রেরী হল। কিরণদাকে এনে চার্জ বদলানো হল। দু'জন তত্ত্বকে সর্বস্বত্বের জন্তে রাখা হল, লাইব্রেরীতে বই বিক্রীর জন্তে। তারই মধ্যে একজন ছিল গোপী শা—ডে সাহেবকে টেগার্ট প্রমে হত্যা করে বার কীসী হয়েছিল।

এই সময়ে মুন্সীগঞ্জ (বিষ্ণুপুর) থেকে জীবন প্রভুতির ডাক এল, শাশাভাল স্কুলের ভার নেওয়ার জন্তে। প্রাথমিক

সংগঠন করেছিলেন রত্ন “মাষ্টার মতাম্বর” শ্রীশচীন বোব, বাহেরকের জিতেন কুশারী প্রভৃতি। প্রথমে হাই স্কুল খালি হয়ে গিয়েছিল, তারপর আবার হাইস্কুলও চালু হল। শাশাভাল স্কুলে আড়াইশো ছাত্র, আর হাইস্কুলে ২০০র মতন। কালীবাড়ীর সামনে প্রকাণ্ড টিনের চালানবের কাঁপ বেঁধে বেঁধে ক্রাশের বর প্রভৃতি ভাগ করা হয়েছিল।

ষতীন দত্ত হারিসন বোডে graduates' union নামক sporting goods-এর দোকান করেছিলেন, পাটনার ছিলেন বোহিগী নন্দী—উভয়েই শঙ্কসারের লোক। বোহিগী বাবুর হাতে দোকান ছেড়ে ষতীন দত্ত মুন্সীগঞ্জে গিয়ে শাশাভাল স্কুলের হেডমাষ্টার হলেন। জীবনও টিচার হয়ে গেল। কামারখারার পরেশ সেন মুন্সীগঞ্জের সবকারী উকীল উমাচরণ সেনের জামাতা—তিনি চটগ্রাম কালেকটরেটে অ্যাকাউন্ট্যান্ট ছিলেন—এখন চাকরী ছেড়ে শাশাভাল স্কুলে বোঁগ দিলেন। এমনি আরো অনেকে এসেছিলেন,—সে কথা পরে বলা যাবে।

জীবনকে এখানকার কাজের অবস্থার কথা বলেছিলেন। মুন্সীগঞ্জে বাওয়ার আগে আমাদের বলে গেল, আমাদের ওখানে কমীর প্রয়োজন হলে তোমার লিখবো,—লিখলেই তুমি চলে এসো। তাই স্থির হলো।

গোপাল বাবু আমাদের বরানগরের বাড়ীতে বোঁমাকে এনেছেন,—বড় ছেলে পটলও (স্বধীর ?) এসেছে। তার তখন এতটা বয়স হয়েছে যে, সে ছড়া বলতে শিখেছে—“সীত কলেলে দাণাবাই কাখা কিভা দে,—কাখাল মইদে বউ হইব, বউ কিভা দে।”

[ক্রমশঃ।

বৃন্দাবন

শ্রীদেবপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

বৃন্দাবনের শূন্য দেউলে মিলিল না তব দেখা,
 ব্রজের দুলায় আছে বটে সখ', তব পদরেণু মাখা ;
 শৈশব ও কৈশোরের লীলাভূমি এই বৃন্দাবন,
 বেদনা মুক্তি আজ নাহি ভার প্রাণের স্পন্দন।
 গোধনশূন্য গোচারণভূমি বিরহ বেদনে কান্দে,
 ব্রজবালা আর ছোটো না সেখায় সাজিয়া বিবিধ ছাঁদে,
 রাধালরাজারে নাহি দেখা যায়, মনুহপুচ্ছ মাখে,
 হাত লাগু লয়েছে বিদায় ব্রজের কাছুর সাথে,
 যমুনা-পুলিনে বাঁশরী বাজারে কেহ ডাকে না ক' অভিসারে,
 নীপতরুতলে মিলনের মেলা ফুগিয়েছে, চিরন্তরে ;
 কোথায় গোপিকা কোথায় রাধিকা তোমার পরাণ প্রিয়া ?
 কত মধুমাগ আসে আর যায় আকুল করিয়া হিয়া,
 নাই শ্রামচাঁদ, নাই সে রাধিকা, নাহিক বশোদা মাতা,
 শূন্য দেউলে বিরহবেদনে পথিক লুটায় মাথা,
 কোথায় কুক কোথা রাধানাথ কোথায় লুকালে তুমি ?



লীগ আসরে ছন্দপতন

কলকাতা মহানগরে সিনিয়র ডিভিশন ফুটবল লীগের পালা প্রায় শেষ হয়ে এলো। আর কয়েকটি মাত্র খেলা সাজ হলেই লীগ মরশুমের ওপর বহনিকাণ্ড ঘটে আর সেই সঙ্গে বহুজনের জল্পনা-কল্পনা, আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বেরও অবসান হবে। এবার কিন্তু লীগ খেলার আসর কোন সময়েই জমে উঠলো না। নিত্যন্ত উদ্দীপনাহীন অবস্থার মধ্যেই এবারের লীগ মরশুম শেষ হলো। বিভিন্ন দলের উত্থান-পতনকে কেন্দ্র করে অমুহুরাগী ও সমর্থকদের মধ্যে যে প্রাণ-চাঞ্চল্যের বজ্র বয়ে থাকে, এবার তার কতকটা ব্যতিক্রম হয়েছে বলা যায়। অবিশিষ্ট এ ব্যতিক্রমের কারণও আছে। এবারের লীগ খেলার অপ্রত্যাশিত ফলাফলই লীগ প্রতিদ্বন্দ্বিতার আকর্ষণ অনেকখানি কুণ্ণ করেছে।

অনিশ্চয়তা ক্রিকেট খেলার বৈশিষ্ট্য বলে জানা ছিল। এ উক্তিটি যে ফুটবল খেলার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, তা চলতি মরশুমের কয়েকটি খেলা দেখে এ প্রতীতি জন্মেছে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের খ্যাতনামা খেলোয়াড় নিয়ে কলকাতার কয়েকটি প্রখ্যাতনামা দল তাদের শক্তি বৃদ্ধি করে থাকে। মুখ্যতঃ এই সব খেলোয়াড়দের কৃতিত্বে ও নৈপুণ্যে সফল দলগুলি গৌরব অর্জন করে থাকে। কিন্তু এহেন শক্তিশালী ও খ্যাতনামা দল যদি স্থানীয় খেলোয়াড় নিয়ে গঠিত অল্পখ্যাত অথবা অখ্যাত দলের বিরুদ্ধে পরেট বিসর্জন করে অথবা পরাজিত হয়, তাহলে সমর্থক ও দরদীরা যে উম্মা প্রকাশ করবেন, তাতে আর আশ্চর্য কি? এবার সত্যিই তাই হয়েছে।

লীগ তালিকার ওপর তলার যে কয়টি খ্যাতনামা দল আছে তাদের কথা বলতে হয়। এর মধ্যে একটা দলকেও জয়লাভে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং নিশ্চিত আস্থা ও জয়লাভে অটুট মনোবল নিয়ে খেলতে দেখা যায় নি। অপেক্ষাকৃত দুর্বল দলের বিরুদ্ধে যে ভাবে কষ্ট করে এরা পরেট সংগ্রহ করেছে তাতে অতি বড় গোঁড়া সমর্থক নিরাশ হয়েছেন। আবার যখন এই সব খ্যাতনামা দল দুর্বল দলের বিরুদ্ধে পরেট নষ্ট করেছে অথবা পরাজয় স্বীকার করেছে তখনই সমর্থক ও দরদীদের বৈধাচ্যুতির কারণ ঘটয়েছে। মনধারাপ খেলোয়াড়দের উদ্বেজিত (সময় সময় মারমুখী) দর্শকদের সামনে পড়তে হয়েছে। ক্লাবের কর্মকর্তাদের জবাবদিহি হতে হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে নিগৃহীত করার ছোটখাটো ঘটনাও হয়েছে।

অবিশিষ্ট কলকাতা মহানগরের এ হোল-নির্মিত ঘটনা। এধরণের ঘটনা-দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করেই কলকাতা মহানগরে ফুটবল মরশুম যেতে ওঠে। এ সমস্ত কিছুকে হাপিয়ে একটি প্রশ্ন নিরপেক্ষ এবং সত্যিকারের ক্রীড়ামোহীকে ভাবিয়ে ফুলেছে। ফুটবলের মান কোথায়?

ক্রীড়ামূল ও সফল অমুহুরাগীমহলে সর্বত্রই একই প্রশ্ন। ফুটবল খেলার বাংলা দেশের ক্রীড়ামান উন্নত না হয়ে ক্রমশঃ নিয়গামী হচ্ছে এটা সর্বজনস্বীকৃত। এ নিয়ে প্রচুর আলোচনা আলোচনা হয়েছে বা হচ্ছে কিন্তু উপায় নির্ধারণ করা হয় নি। বাংলাদেশের ফুটবল খেলার ভাগ্যান্বিতা হোল ইন্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশন বা আই, এফ, এ। ফুটবলের মান উন্নত করার এবং খেলোয়াড়দের শিক্ষাদানের জন্য উপযুক্ত পরিকল্পনা রচনা করার দায়িত্ব মুখ্যতঃ এই সংস্থার ওপর। কিন্তু ফুটবল খেলা পরিচালনার প্রশাসনিক কাজটুকু করেই এরা ক্ষান্ত। এর বাইরে এদের স্মৃষ্টি পরিকল্পনার কোন পরিচয় আজ অবধি পাওয়া যায়নি। হয়ত এরা একাজে সহকারী উত্তমের অপেক্ষার বসে আছে। তাই যদি সত্যি হয় তাহলে মস্ত ভুল করা হবে।

লীগবিজয়ের পথে মোহনবাগান

এ বৎসরের লীগ খেলার শুরু থেকেই জনপ্রিয় দল মোহনবাগান জয়লাভের একচেটিয়া অধিকার নিয়ে লীগ অভিযানে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যায়। সমর্থকসুল দৃঢ় আশার উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে যে মোহনবাগান অপরাধিত আখ্যা নিয়েই লীগবিজয় করবে। কিন্তু চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইষ্টবেঙ্গল দল সে আশার বাদ সাধলো। লীগের ফিরতি খেলার তারা মোহনবাগানকে ১—০ গোলে হারিয়ে দিয়ে অপরাধিতের গৌরব স্নান করে দেয়। কারণ তখন পর্যন্ত মোহনবাগানই ছিল লীগ তালিকার একমাত্র অপরাধিত দল। লীগের পালা শেষ করতে মোহনবাগানের যখন আর ছটা খেলা বাকী তখন এই বিপর্যয় তাদের সামনে এসে হাজির হয়। এই বিপর্যয় মোহনবাগানের গতির পথে কিছুটা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করলেও তাদের লীগ জয়যাত্রার বতির চিহ্ন টানতে পারবে না বলেই মনে হয়। কেননা বর্তমান পর্যায়ে মোহনবাগান তাদের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীর থেকে লীগ তালিকার যে অবস্থানে রয়েছে তাতে নিত্যন্ত অস্বাভাবিক ধরনের কোন অবতন না ঘটলে তারা যে শেষ পর্যন্ত লীগবিজয়ী হবে, তা একরকম নিশ্চয় করেই বলা যায়। লীগ পাল্লার দৌড়ে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইষ্টবেঙ্গল দল, খ্যাতনামা মহম্মদান স্পোর্টিং এবং গতবারের লীগবিজয়ী ইষ্টার্ন রেলওয়ে দল অনেক পিছিয়ে পড়েছে। স্তত্রার বাকী পথটুকু বিপর্যয় এড়িয়ে পার হলেই মোহনবাগানের লীগ জয়যাত্রা সফল হবে, সার্থক হবে। দরদী ও অমুহুরাগী দলও তাই গভীর আশায় উদ্দীপ্ত হয়ে অপেক্ষা করছে সেই চরম ক্ষণটির জন্য, এদের আশা নিশ্চয়ই নিরর্থক হবে না।

ইংলও দলের “রাবার” লাভ

বর্তমানে ইংলও সফররত ভারতীয় ক্রিকেট দল উপর্যুপরি তিনটি টেস্ট খেলাতেই পরাজিত হওয়ার ইংলও দল রাবার

লাভের কৃতিত্ব অর্জন করেছে। এখনও দুটো টেট খেলা বাকী রয়েছে। “রাবার” প্রব্রের মীমাংসা হওয়ার অবশিষ্ট দুটো টেট খেলারও আকর্ষণ অনেকটা কমে গিয়েছে। অবিকার্য তরুণ এবং উদীয়মান খেলোয়াড় নিয়ে গঠিত ভারতীয় দল অল্পকয়েকই নৈপুণ্য প্রদর্শন করতে সমর্থ হয়েছে। শক্তিশালী ইংলণ্ড দলের বিরুদ্ধে ভারতীয় দল মোটেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেনি এবং শোচনীয় ভাবেই তাদের পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে। ভারতীয় দলের অসাক্ষ্য উপলক্ষ্য করে ইংলণ্ডের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা অতি রূঢ় এবং নির্মমভাবে সমালোচনা করেছে।

কোন কোন সংবাদপত্র আবার বেশ চড়া সুরেই সমালোচনা করেছে যে ভারতের সঙ্গে টেট খেলার ইংলণ্ডের সময়ের অপচয় হয়েছে। শুধু ভারতই না, পাকিস্তান ও নিউজিল্যান্ডের টেট খেলার যোগ্যতা সংকেতও সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। ভারত, পাকিস্তান ও নিউজিল্যান্ড এখনও টেট খেলার যোগ্যতার অধিকারী হয়নি বলে মন্তব্য করা হয়েছে। এদের সংগে খেলার ইংলণ্ড নিজেই জয়লাভ করে বলে এদের বিরুদ্ধে টেট খেলার সময় পাঁচদিনের বদলে তিনদিন স্থির করার জন্য আবার ভানানো হয়েছে। মনে হয় ইংলণ্ডের পত্র-পত্রিকাগুলো অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক টেট খেলার ইংলণ্ডের শোচনীয় পরাজয়ের কথা ভুলে গেছে। গত বৎসরের শীতকালে পাঁচটি টেট খেলার মধ্যে ইংলণ্ড দল চারটিতেই শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে দেশে ফিরে আসে।

সেদিন অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের টেট খেলার মেয়াদ কমিয়ে আনার কোন প্রসঙ্গই ওঠেনি। স্বীকার করার উপায় নেই যে বর্তমান ইংলণ্ড সর্বত্র ভারতীয় দল বার্ষিকতার পরিচয় দিয়েছে। কয়েকজন খেলোয়াড় আহত ও অসুস্থ থাকায় তাদের বিপর্যস্ত অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতার আসরে ভারতীয় দলের তরুণ খেলোয়াড়গণ মনোবল হারাননি।

আজকের এই পরাজয়ের মার থেকেই ভারতীয় দলের খেলোয়াড়গণ যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে ফিরবেন তা বখাণোগ্যভাবে কাজে লাগালে আগামী দিনের খেলোয়াড়রা তৈরী হবার প্রয়াস পাবেন। তাঁদের অভিজ্ঞতা সম্পদ ভারতীয় ক্রিকেটের কল্যাণে নিয়োজিত হোক এই কামনা করি।

ভারত-ইংলণ্ড টেট খেলার ফলাফল

প্রথম টেট—নটিংহাম

ইংলণ্ড এক ইনিংস ও ৫১ রাণে জয়লাভ করে। পাঁচদিনের খেলা চতুর্থ দিনেই মীমাংসা হয়। ইংলণ্ডের অবিনায়ক পিটার মে এই খেলায় ১০৬ রাণ করেন। ইংলণ্ড প্রথম ইনিংসে ৪২২ রাণ করে। প্রত্যুত্তরে ভারত প্রথম ইনিংসে ২০৬ রাণ এবং ফলো অনে বাধ্য হয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে ১৫৭ রাণ করে।

দ্বিতীয় টেট—সর্ডস

ভারতের অবিনায়ক দাতাজীরাও গায়কোয়াড় অসুস্থতার জন্য দ্বিতীয় টেটে খেলেননি। তাঁর পরিবর্তে সহ-অবিনায়ক পঙ্কজ রায় দ্বিতীয় টেটে ভারতের নেতৃত্ব করেন। চাঁহ বোড়ে ও নারকার্নি

করে ১৬৮ রাণে প্রথম ইনিংসের খেলা শেষ করে। প্রত্যুত্তরে ইংলণ্ড প্রথম ইনিংসে ২২৬ রাণ করে। দ্বিতীয় ইনিংসে ভারত ১৬৫ রাণে সকলে আউট হয়। ইংলণ্ড জয়লাভের ‘ভক্ত প্রয়োজনীয়’ রাণ করলে তৃতীয় দিনে খেলার মীমাংসা হয়। বিপর্যয় গোঁষে মঞ্জুরেকার (৬১ রাণ) ও কুপাল সিং (৪১ রাণ) প্রথমসরীর ভূমিকা গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় টেটে ইংলণ্ড ৮ উইকেটে জয়ী হয়।

তৃতীয় টেট—লীডস

তৃতীয় টেটে ভারত এক ইনিংস ও ১৭৩ রাণে পরাজিত হয়। এই খেলাটিও তৃতীয় দিনে শেষ হয়। ভারত প্রথম ইনিংসে ১৬১ রাণ করে। প্রত্যুত্তরে ইংলণ্ড ৮ উইকেটে ৪৮৩ রাণ করে প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে, কলিন কান্ট্রে ১৬০। দ্বিতীয় ইনিংসে ভারত ১৪১ রাণে খেলা শেষ করে।

রামনাথন কৃষ্ণাণের অপূর্ব সাফল্যে টেনিস-জগতে বিস্ময়

দক্ষিণ আমেরিকার তরুণ খেলোয়াড় অ্যালেক্স অলমেডো এ বৎসর বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ টেনিস প্রতিযোগিতা উইম্বলডনে বিজয়ী কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। তিনি পুরুষদের সিঙ্গেলস ফাইনালে কুইন্সল্যান্ডের (অস্ট্রেলিয়ার) লেভারকে ৬-৪, ৬-৩, ৬-৪ সেটে পরাজিত করে এই সম্মানের অধিকারী হয়েছেন।

মহিলা বিভাগেও দক্ষিণ আমেরিকার প্রতিযোগিতা মারিয়া এস্তার বুনো চ্যাম্পিয়নশিপ অর্জন করেন। দুটো বিভাগেই দক্ষিণ আমেরিকার সাফল্য এবারের উইম্বলডনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। অলমেডোর পূর্বে দক্ষিণ আমেরিকার কোন খেলোয়াড় উইম্বলডনের চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেননি।

ভারতের পয়লা নম্বর খেলোয়াড় রামনাথন কৃষ্ণাণ তৃতীয় রাউন্ডের খেলায় অলমেডোর কাছে পরাজিত হয়ে উইম্বলডন থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। তরুণ খেলোয়াড় রামনাথন কৃষ্ণাণ যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেই পরাজয় স্বীকার করেন।

উইম্বলডনে পরাজিত হলেও কৃষ্ণাণ এই বছরই অলমেডোকে হুঁ হুবার পরাজিত করে ক্রীড়াঙ্গণতে বিশ্বের সঞ্চার করেন। লণ্ডন গ্রাসকোর্ট টেনিস প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালে কৃষ্ণাণ ৮-৬, ৬-১ সেটে অলমেডোকে পরাজিত করেন। এই প্রতিযোগিতারই ফাইনালে তিনি বিশ্বের আর একজন শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় নীল ফ্রেজারকে ৬-৩, ৬-০ সেটে পরাজিত করে লণ্ডন টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপের কৃতিত্বপূর্ণ সম্মানলাভ করেন। উইম্বলডনের বাছাই তালিকার অলমেডো পয়লা নম্বরের এবং অস্ট্রেলিয়া নীল ফ্রেজার (ইনি গতবারের উইম্বলডন রাণার-আপ) দুই নম্বরের খেলোয়াড়। বিশ্বের দুই শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে ভারতের তরুণ খেলোয়াড়ের এই সাফল্য ভারতকে নতুন আশার সন্ধান দিয়েছে। পুনরায় সুইডেনে সুইডিশ হার্ডকোর্ট টেনিস প্রতিযোগিতার সিঙ্গেলস সেমি-ফাইনালে কৃষ্ণাণ আর একবার উইম্বলডন বিজয়ীকে পরাজিত করেন। কৃষ্ণাণের এই অভূতপূর্ব সাফল্য বিশ্বের ক্রীড়াঙ্গণতে বর্তমান বৎসরে এখনকার মত সবচেয়ে বড় সংবাদ। কৃষ্ণাণ ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেছেন। বিশেষ পত্র-পত্রিকাও তাঁর নৈপুণ্য সন্মোহন উল্লসিত করেছেন।



বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে স্বরসাধনা

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে স্বরসাধনা ভারতে ভারতীয় সঙ্গীতের

ভার পুরাতন নয়। ভারতীয় সঙ্গীতে গীত, বাজ, নৃত্য ও নাট্যাংশের প্রচুর আলোচনা ও বিষয়বস্তুর নির্দেশ আছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে স্বরসাধনা, শারীরিক সম্বন্ধ বজায় রেখে এবং পারিবেশিক অবস্থার দিকে নজর রেখে কোন শারীরিক কোন শাস্ত্র রচনা করেছেন কিনা তার নজির নাই। তবে সঙ্গীতজ্ঞের বা গায়কের কণ্ঠের বিশেষত্ব গুণ প্রভৃতির আলোচনা কখন কখন হয়েছে।

পরবর্তী যুগে ওস্তাদ ও পণ্ডিত মহলে স্বরসাধনার কিছু পদ্ধতির কথা শুনা যায়। তাঁদের মতামতমূলে কণ্ঠসাধনা বা স্বরসাধনার প্রথম এবং প্রধান পদ্ধতি হ'লো 'মরজ-সাধনা'। অর্থাৎ উদার বা মস্ত-সঙ্গকে গলার অভ্যাসই কণ্ঠসাধনা বা স্বরসাধনা। ঠিক এই প্রকার গলার অভ্যাস দ্বারা গলার কিছু উন্নতি পরিদৃষ্ট হয়তো হ'তো কিন্তু এই প্রকার ক্রমাগত অত্যধিক অভ্যাস গলার স্বর স্রমধুর ও লাগিতাপূর্ণ হওয়ার বদলে ধরা, ভারী ও কর্কশ আওয়াজেরই উৎপত্তি হ'তো। এই সব কারণে, অবশ্য সমস্ত গায়ক মাত্রেই নয়, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতশিল্পীর অনশ্রিত্য লাভে বঞ্চিত হওয়ার নানা কারণের মধ্যে ইহা একটি প্রধান কারণ বলা যেতে পারে।

যান্ত্রিক যুগে বস্ত্রের আবিষ্কারের সঙ্গে রেডিও মাইক্রোফোন প্রভৃতি আবিষ্কৃত হওয়ার গায়ক মহলেও তার প্রতিফলন দৃষ্ট হয়। বস্ত্রের প্রয়োগের উদ্দেশ্য হয়তো সঙ্গীতকে অনায়াসে বেশী সংখ্যক শ্রোতার নিকট পৌঁছে দেওয়া। কিন্তু গায়ক মহলে তার প্রতিক্রিয়া হিসাবে "মাইক-টেকনিক" নামক ভয়েসের উদ্ভব হয়। এই পদ্ধতি হ'লো প্রধানতঃ গলাকে দাবিয়ে ও তার স্বরকে বধাদম্বন সংঘত করে গান গোওয়া। আর বস্ত্রের সাহায্যে তা পরিবর্তিত হ'য়ে সবার নিকট উচ্চ আওয়াজে পরিণত হয়।

কোন কোন ক্ষেত্রে বস্ত্রের গুণাগুণ হিসেবে আওয়াজও সে রূপ ধারণ করে। আর শিল্পীর আসল পরিচয় চাপা পড়ে যায়। এরূপ ক্রমাগত অভ্যাসে কণ্ঠ ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর হ'তে থাকে। কণ্ঠবস্ত্রের আয়ুও এতে কমে যায়। চলচ্চিত্রশিল্পী ও কিছু সংখ্যক বৈজ্ঞানিক শিল্পীর মধ্যে ইহা বিশেষভাবে পরিদৃষ্টমান। তাদের ধারণা, এই প্রথা গানে ভাব সংযোজন করতে বেশী সহায়ক ও অল্প পরিশ্রম হয়। কিন্তু আসল দিকটার কথা তাঁরা ভুলে যান। কলমরূপ আসল স্বরসাধনার পথ হ'তে বিপথগামী হয়। প্রকৃত স্বরকণ্ঠ হ'তে নির্গত না হ'লে সঙ্গীতের ও তৎসংশ্লিষ্ট সাহিত্যের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকটিত হয় না।

ভারতীয় সঙ্গীতে ঘরোয়ানার চলন বিশেষ ভাবে দৃষ্ট হয়। ঘরোয়ানার উদ্দেশ্য কি এবং তার কি কি বিশেষত্ব থাকলে একটি ঘরোয়ানার সৃষ্টি হয়, তার দিকে দৃষ্টি না রেখেই ভিন্ন ভিন্ন ঘরোয়ানার সৃষ্টি হয়েছে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে। বনেন্দ্রী পরিবারে ঘর বা বাড়ী ভাগাভাগী হ'লেই পরিবারের বংশজাত পরিচয় যেমন আলাদা হয় তেমনি গায়কের সামান্য মতভেদ ভিন্ন ঘরোয়ানার সৃষ্টি অনুসক। আর নিছক গায়কের মত ভেবে ভিন্ন ঘরোয়ানার নিদর্শন হওয়া উচিত নয়।

সঙ্গীত সমাজে প্রকৃত কণ্ঠের বিনাশ সাধন হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে ঘরোয়ানার গায়কের বিশেষত্ব দেখাতে গিয়ে। গুরুত্বীয় হয়তো যে কোন কারণে হোক তাঁর গলার স্বর মিষ্ট বা স্বরলালিত্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতে পেরেছেন বা পারেননি, কিন্তু তাঁর পাণ্ডিত্য ও শিল্পকুশলতার দ্বারা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। কিন্তু শিধ্য তার ঘরোয়ানার বিশেষত্ব দেখাতে গিয়ে তাঁর নিজের স্বকণ্ঠের অপব্যবহার করেছেন, এরূপ দৃষ্টান্ত বহু দৃষ্ট হয়। যে কোন বিষয়েই হোক গুণ অর্থাৎ ভাল জিনিষ নকল করা বড়ই শক্ত; কিন্তু ধারণাটা নকল করতে বেশী সময় লাগে না। তাই গুরুত্বীয় শিল্পকুশলতা ও পাণ্ডিত্য অর্জন করার চেয়ে তাঁর দোষ-ত্রুটিগুলি বেশী বিতর্কিত দেখা যায় পুরুষাভুজের।

আমাদের দেশে ও অন্যান্য দেশে সঙ্গীতের জনপ্রিয়তা দিনের দিন বেড়েই চলেছে। সাধারণের দৃষ্টি শিল্পীর কণ্ঠের স্বরলালিত্য ও স্বরসাধনার দিকে সচেতন হ'চ্ছে। এই স্বরসাধনার বিষয়বস্তুর নিয়ে পাশ্চাত্য দেশে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যথেষ্ট গবেষণা হয়েছে এবং আজও হ'চ্ছে। এ সম্বন্ধে তাঁরা বহু নির্দেশ পুস্তিকাকারে দিয়েছেন ও দিচ্ছেন। ধারা এ বিষয়ে গবেষণা করেছেন তাঁরা অবজ্ঞিত পুস্তিকার পুস্তিকারূপে বিনা দ্বিধায় শিক্ষা দিচ্ছে পরবর্তী যুগের কর্মীদের প্রতি। পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ ও তাঁদের চিকিৎসার পেশা এই বিষয়বস্তুর উপর নিবদ্ধ রেখে তাঁরা গায়কদের কণ্ঠসাধনার কাজে সহায়তা করেন। এই ভাবে অল্পসংখ্যক শিক্ষাবিদগণ বিশিষ্ট শিল্পীগণ ও কণ্ঠসাধনার শিক্ষকগণ, ধারা নিজে গলার শারীরিক, বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসা বিষয়ক শিক্ষা পূর্ণভাবে নেননি, তাঁরা চিকিৎসকের সাহায্যে প্রত্যেক কণ্ঠসঙ্গীতের সাধনার পথ ও পদ্ধতি অনুসন্ধান ক্রমে লিপিবদ্ধ করেছেন ও শিক্ষা দিয়েছেন। ফলতঃ কণ্ঠসাধনার বিশেষ উন্নতি পরিলক্ষিত হয়েছে।

আমাদের দেশে এই স্বরসাধনার পদ্ধতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করলে জানা যায় যে, ত্রুটিপূর্ণ গলার স্বর ত্রুটিপূর্ণ হয়েছে শিক্ষা-গুরু উন্নত ধরণের শিক্ষকতার। তাঁরা বলেন, কোন এক বিশেষ

ধরণের শিক্ষা পদ্ধতি আছে বার বার। এই দোষটি যুক্ত গলার স্বর শুদ্ধ স্বরে পরিণত হয়। কিন্তু সে সব শিক্ষাগুলির নিকট গিরে অল্পসন্ধান করলে তাঁদের নিকট হ'তে গলার স্বরজ্ঞ সাধনার পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোন, বিশেষ ধরণের পদ্ধতির আভাস পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে আরো বিশেষভাবে অল্পসন্ধানের পর জানা যায় যে, মুকঠ ভগবানের দান। যে 'সব স্বর ক্রটিযুক্ত তা মুকঠ হতেই এবং তা ভবিষ্যতে ঠিক হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না। তবে ব্যতিক্রম হিসাবে কোন কোন ক্ষেত্রে কোন শিল্পীর গলার শিরকুশলতা সাধনার দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু ঠিক কি পদ্ধতিতে তা সম্ভব হয়েছে সে বিষয়ে সেই শিল্পী নিজেই জানেন না। অনেক সময় আমরা শুনি যে ওস্তাদরা তাঁদের বিশেষত্ব বজায় রাখার জগ্য তাঁরা তাঁদের পদ্ধতি কাকো জানতে দেন না। কেবলমাত্র তাঁদের নিজের পুত্র বা পুত্রবৎ শিষ্য ছাড়া। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে পিতার কঠে যে শিরকুশলতা স্বরচাতুর্যতা তাঁর পুত্র কিংবা পুত্রবৎ শিষ্যের কঠেও নাই। অবশেষে তাঁরা স্বীকার করতে বাধ্য হন তাঁদের স্বরসাধনার দূরদৃষ্টির অভাব এবং মনে করেন মুকঠ ভগবানেরই দান। পাশ্চাত্য সঙ্গীতবিদ সম্বন্ধেও তাঁরা এতই মত পোষণ করেন।

পাশ্চাত্য দেশে একটি গবেষণাকারীর দল বীদের মধ্যে বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ, কঠরবিন শাস্ত্রো বিশেষজ্ঞ, শ্রবণশাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ শরীর-ব্যবচ্ছেদ বিভাগবিদ শারীরিক বিভাগবিদ প্রভৃতি বিশেষজ্ঞের সাহায্যে গবেষণার দ্বারা কঠসাধনার ও স্বরসাধনার যে সব তথ্য আবিষ্কার করেন, তার দ্বারা ভগবান প্রদত্ত কঠস্বরের যুক্তি হ্রাস হয়ে যায়। তবে কঠস্বরের যে গুণাগুণ থাকে তা ভগবান প্রদত্ত বলা যেতে পারে। তাহেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতেও কঠের ধ্বনিশাস্ত্রের দিকে নজর রেখে শিক্ষিত করতে পারলেই সুন্দররূপে ও স্পষ্টভাবে মুকঠ অর্জন করা যায়; বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলস্বরূপ এই সিদ্ধান্তই আজ প্রতিষ্ঠিত।

এখন প্রশ্ন উঠে, ভারতীয় কঠসঙ্গীতের স্বরসাধনার পাশ্চাত্য—বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করা যায় কিনা। কারণ এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি পাশ্চাত্য সঙ্গীতের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। তাই সেই পদ্ধতি ভারতীয় কঠসঙ্গীতের স্বরসাধনার গ্রহণ করলে ভারতীয় কঠসঙ্গীতে পাশ্চাত্য কঠসঙ্গীতের প্রভাব এসে যাবে এবং ভারতীয় কঠসঙ্গীতের আসল রূপ বিনষ্ট হ'বে, একরূপ ধারণা অনেকেই পোষণ করেন মনের মধ্যে। আর ভারতীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে ঠিক ঐরূপ কোন গবেষণা হয়নি পূর্বে। তবে আজ কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্কৃতি ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা-দপ্তর ভারতের বিশিষ্ট মেধাবীযুক্ত সুবক শিল্পীদের ছাত্রবৃত্তি দানের দ্বারা এই গবেষণার সাহায্য করছেন অভিজ্ঞ শিক্ষকের সম্পূর্ণ রেখে এবং তবেই আজ ঐ বিষয়ে অল্পসন্ধান আরম্ভ হয়েছে। পাশ্চাত্য দেশে অস্ত্রায় বিষয়ের উন্নতির সঙ্গে সমতা বজায় রেখে কঠসঙ্গীতেরও বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারা উন্নতি সাধন করা হয়েছে। তাই ভারতীয় কঠসঙ্গীতে স্বরসাধনার ক্ষেত্রেও উন্নতি সাধিত হওয়া দরকার।

এ বিষয়ে অল্পসন্ধান দ্বারা জানা যায় যে, আমাদের ভারতীয় কঠসঙ্গীতের স্বরসাধনার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বনে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের প্রভাব আমরা নিজে প্রবেশ না করলে আশার কোন

সম্ভাবনা নাই। এ বিষয়ে অস্ত্রায় যুক্তি ছাড়াও সাধারণ বুদ্ধি দিয়া আমরা দেখতে পাই যে কোন প্রকার শারীরিক অনুশ্রুতি পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক চিকিৎসায় তার শরীরের রূপ বদল হয় কিনা। আর যে বিষয়ে যে দেশে গবেষণা বেশী হ'য়ে তার উন্নতি সাধিত হয়েছে ঠিক সেই বিষয়ে সেই দেশের নির্দেশ বা পরামর্শ পৃথিবীর সর্বদেশের সর্বলোকই গ্রহণ করে থাকে। তবে এই কঠসঙ্গীতের স্বরসাধনার ক্ষেত্রেও তাঁদের নির্দেশ কোন ক্ষতির কারণ হওয়া উচিত নয়। মানুষের দেহের আভ্যন্তরীণ গঠন ও খাস-প্রখাস প্রণালী প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য ভেদে ভিন্ন নয়। যে প্রখায় পাশ্চাত্য শিল্পীর কঠস্বর সমৃদ্ধ হয় ঠিক সেই প্রখায় প্রাচ্যের শিল্পীর কঠস্বর সমৃদ্ধ না হবার কোন কারণ নাই। তবে প্রত্যক্ষ ভাবে অভিজ্ঞ স্বরসাধনার ও ধ্বনি শ্রবণশাস্ত্রের শিক্ষকের নিকটেই শিক্ষা গ্রহণ সহায়ক, অস্ত্রায় বিপরীত ফল দৃষ্ট হয়। —নিমাইচাঁদ বড়াল।

রেকর্ড-পরিচয়

“হিঙ্গ মাষ্টার্স ভয়েস” ও “কলবিয়া”র প্রকাশিত নতুন রেকর্ডের পরিচয় :—

হিঙ্গ মাষ্টার্স ভয়েস

N 82831—সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া নতুন ধরণের আধুনিক গান—“তুমি মেঘলা দিনের” ও “হুটি ঐ কাকনের ছক।”

সঙ্গীত-যন্ত্র কেনার ব্যাপারে আগে

মনে আসে ডোয়ার্কিনের



কথা, এটা
খুবই আভা-
বিক, কেননা
সবাই জানেন
ডোয়ার্কিনের
১৮৭৫ সাল
থেকে দীর্ঘ-
দিনের অতি
জ্ঞতার কলে

তাদের প্রতিষ্ঠা যন্ত্র নিখুঁত রূপ পেয়েছে।

কোন কল্পের প্রয়োজন উল্লেখ ক'রে মূল্য-তালিকার
দত্ত লিখুন।

ডোয়ার্কিন এণ্ড সন্ প্রাইভেট লিঃ

শো-রুম :—৮/২, এল্ফগামেনড ইন্সট, কলিকাতা - ১

N 82832—সুধধর হু'খানি আধুনিক গান “জনপদের ছাড়িয়ে সীমা” ও “স্বপ্ন রাঙাতে কেন এলে”—গেয়েছেন তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

N 82833—সুধধর রায়ের জনপ্রিয় দু'টি কবিতা “বাবুমা সাপুড়” ও “এই দুনিয়ার সকল ভালো”—সুধের মায়াজালে পরিবেশন করেছেন সনৎ সিংহ।

N 82834—জামল মিত্রের কণ্ঠে হৃদয়ময় দু'টি আধুনিক গান—“হয়তো সেদিন আগের মত” এবং “ডালোবাস তুমি ওনেছি অনেক বার।”

N 82835—চণ্ডীদাস ও জগদানন্দ দাস রচিত দু'খানি মধুর কীর্তনগান “সখি, কহিও নিচুঁর আগে” ও “কেন গোলাম বহুনার”—গেয়েছেন শ্রীমতী সুপ্রীতি ঘোষ।

N 76086 এবং N 76087 রেকর্ড দু'খানিতে “শশীবাবুর সংসার” বাণীচন্দ্রের গানগুলি পরিবেশিত হয়েছে।

কলহিয়া

GE 24957—শৈলেন মুখোপাধ্যায়ের পাওয়া দু'খানি আধুনিক গান—“সাগরের তট চড়ে” ও “ওগো লজ্জাবতী।”

GE 24958—“এই রাত এই গান এই সন্ধ্যা” ও “নীল প্রজাপতি”—আধুনিক গান দু'খানিকে পরিবেশন করেছেন কুমারী গায়ত্রী বসু।

GE 24959—শ্রীমতী বেলা মুখোপাধ্যায়ের মধুর কণ্ঠের আধুনিক গান—“কেন চলে বাবে” ও “ফুলের কানে কানে।”

GE 30422—“ঠাকুর হরিদাস” বাণীচন্দ্রের দু'খানি গান গেয়েছেন ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এবং অভ্যন্ত শিল্পীরা।

GE 30425—মাত্রা দে ও লতা মঙ্গেশকরের কণ্ঠে “দীপ জ্বলে বাই” বাণীচন্দ্রের দু'খানি জনপ্রিয় গান।

আমার কথা (৫৪)

কুমুম গোস্বামী

গানের কুমুমকলি জীবনশৈল্যের সহজ হাসির দিনগুলিতে ফুটে উঠছিল পরিবারের একটি রসমধুর পরিবেশের প্রভাব। জন্ম হয় বাংলা ১৩৩১ সালের ২৮শে ফাল্গুন ঢাকায়। পিতামহ শরৎচন্দ্র গোস্বামী ছিলেন ঢাকার সুপরিচিত সেতারী। তাঁর কাছেই প্রথম সংগীত শিক্ষার গোড়াপত্তন। পিতা হরিপ্রসন্ন গোস্বামী ভাল কীর্তন গাইতেন, তাই সংগীত চর্চার আদিপর্বের কীর্তন নামগান দিয়েই আরম্ভ। এদিকে আবার মাতা লাবণ্যপ্রভা গোস্বামীও খুব ভাল গাইতে পারতেন কীর্তন ভজন। কিন্তু তৎকালীন বন্ধুশীল পরিবারের পরিবেশে থেকে আসরে গান করার বেওয়ার্জ ছিল না, তাই কতাকে শিক্ষার মধ্যে দিয়েই মাতার সংগীতচর্চা সীমিত হয়েছিল। আটশতাব্দী বৈষ্ণব সাহিত্য ও কীর্তন সংগীত পারিবারিক প্রাচীন ঐতিহ্য-সূত্রে স্বভাবতই মানস গঠনে বিশেষ সহায়তা করে। আজও মাঝে মাঝে স্মৃতি-রোমন্থনে মনে পড়ে পিতামহ থরেছেন সেতারে তান আর পিতা মন্দিরা হাতে গাইছেন কীর্তন গান।



কুমুম গোস্বামী

বাল্যশিক্ষার সূত্রপাত হলো ঢাকার বাবাসুন্দরী গার্লস হাইস্কুলে। এখানে পরিচয় হয় বিজ্ঞানবালা ঘোষ দত্তদ্বারা সঙ্গে। ঢাকার বছর চারেক লেখাপড়া করার পরে পরিজনদের সঙ্গে চলে যেতে হলো তখন নারায়ণগঞ্জে। এখানে মরগাতি গার্লস হাইস্কুলে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ার সুযোগ হয় ইংরাজী ১৯৩৭ সালে পরিবারবর্গের সঙ্গে চলে আসতে হলো কলকাতার বাগবাঁজারে মাতুলালয়ে। দু' বছর পাঁচ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার উত্তীর্ণ হওয়ার সৌভাগ্য লাভ হয়। যদিও লেখাপড়ার মধ্যে সংগীতচর্চাও বা বাধনি, তবুও এর পর থেকে বাসন্তী বিজ্ঞানবাঁধি সংগীত বিভাগে ঠিক ধারাবাহিক শাস্ত্রীয় পদ্ধতিতে সংগীত শিক্ষার সুযোগ হয়েছে। বাসন্তী বিজ্ঞানবাঁধিতে ভর্তি হওয়ার পরীক্ষা সংগীতবিদ রামকৃষ্ণ মিশ্র গ্রহণ কালে অভ্যস্ত সন্তুষ্ট হয়ে একেবারে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি অল্পমতি দান করেছিলেন। এ সময়ে অস বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্স, বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্স প্রভৃতি বহু সংগীত প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে প্রথম শ্রেণীর সম্মান ও পুরস্কার লাভ করার সুযোগ ঘটে।

ব্যক্তিগত ভাবে গিরিজাশংকর চক্রবর্তী, উমাশঙ্কর ভট্টাচার্য বামিনী মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, তানসেন পাণ্ডে প্রমুখ

বহু সংগীত-শিল্পকের কাছে তালিম নেওয়ার সুযোগ আসে, কিন্তু সঙ্গীতিকার বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল যে দিন নিজে গান লিখে, স্বয়ং দিয়ে শিখিয়ে দিয়েছেন তাঁর স্বরচিত গান, সে কথা ভোলার নয়। হিন্দুস্থানি রেকর্ডিং কোম্পানীতেই নজরুলের সম্পর্কে আসার সুযোগ হয়। ১৯৩৮ সালে প্রথম হিন্দুস্থানে 'সই লো আমি করি কী উপায়' এবং 'তোমায় যে বঁধু আমি বাসিয়াছি ভাল' গান দু'খানি রেকর্ড হয়েছিল। প্রথম বছরে আটখানার মত রেকর্ড প্রায় পাঁচ শত টাকা পারিশ্রমিক লাভ হয়। এই সময় শতাব্দী ধ্রুবরূপের সঙ্গে বিশেষ পরিচয় হওয়ার পরগীতিব প্রতি পূর্বের দৃঢ় অঙ্গারো প্রসারলাভ করে। নজরুলের চেষ্টায় মেগাফোন রেকর্ড কোম্পানীতেও যোগাযোগ হয়। 'মোর ছুশনিশি কবে হবে ভোর' ও 'সন্ধ্যা ঘনালো আমার বিজন ঘরে'—সে সময়ের দু'টি জনপ্রিয় কাব্যসংগীত রেকর্ড হয়েছিল। এই সময়ে ভগানী দাসের সঙ্গে নীলিমা দাস ছদ্মনামেও কয়েকটি রেকর্ড হয়। দিলীপকুমার রায়েবর স্বয়ং সংযোজনায়ও অনেক রেকর্ড হয়। হিন্দুস্থানি, মেগাফোন, হিজ মাষ্টার্স ভয়েস প্রমুখ রেকর্ড কোম্পানীর শিল্পরূপ ফীর্ডন, পরগীতি, নজরুলগীতি, আধুনিক, ব্রুহর, রাগপ্রধান, ভক্তিপ্রধান, ধর্মসংগীত, ভাটওয়ালী, বাউল, গ্রামাসংগীত, ভজন, গজল, গীত, সারি ও অনেক ধারার বাংলা হিন্দী গানের রেকর্ড হয়েছে।

সর্বপ্রথম যেভাবে গান প্রচারিত হয় নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত গল্পগাহুর আসরে; তখন বিভাবীধির ছাত্রী। এর পর গীতছবি প্রভৃতি 'মহুষ্ঠান ছাড়া' নিয়মিত যেভাবে সংগীত পরিবেশন চলেছে।

বর্তমান সংগীতশিল্পীজীবনের আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে চলচ্চিত্রে নেপথ্য (প্লে ব্যাক) সংগীতশিল্পিরূপে সুনাম অর্জন। সে সময় 'বন্দী' কথাচিত্রের 'চোখে চোখে রাখি হার রে, তবু তারে ভুলে থাকি বার রে'—গানটি এতটাই লোকপ্রিয় হয়ে ওঠে যে পথে ঘাটে তরুণদের মুখে বিশেষ ক'রে বা অলস বিছানায় শুয়ে তরুণীদের গাইতে শোনা যেতো। এটি গিরীন্দ্র চক্রবর্তীর স্বয়ং জগন্নাথ মিত্রের সঙ্গে যৈত কণ্ঠে গীত। চলচ্চিত্রে প্রথম অবস্থা 'শকুন্তলা' চিত্রে মীরা দেবীর হয়ে নেপথ্যে গান করার সুযোগ হয়। এর পর থেকে রাইচাঁদ বড়াল, অনিল বাগচী, দক্ষিণামোহন ঠাকুর প্রমুখ বহু বিশিষ্ট সংগীত পরিচালক তত্ত্বাবধানে এপার ওপার, বন্দী, আহুতি, কবি, রামের স্মৃতি, বিরাট বো প্রভৃতি অসংখ্য ছায়াচিত্রে নেপথ্য সংগীতে অংশ গ্রহণ করার সুযোগ্য হয়েছে।

সোদপূরে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে একবার সাক্ষাতে তিনি তাঁর প্রার্থনা-সভায় ভজন গানের জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন কিন্তু কার্যক্ষেত্রে যেতে পারা যায়নি। পশ্চিমবঙ্গের "মা" একবার গান শুনে তখনই হয়ে পড়েন। ১৯৪৭ সালে মহারাজা কুচবিহারের জ্যোৎসব-সভায় আমন্ত্রিত হয়ে যে সন্মান ও সমাদর লাভ ঘটেছে তা একজন বাঙালী মহিলা শিল্পী হিসেবে অভাবনীয়। ভারতের বিভিন্ন স্থানে যথা বিলাসপুর, নাগপুর, পশ্চিমবঙ্গ, দ্বারকা, বোম্বাই, মধুরা, বৃন্দাবন, নবদ্বীপ, দিল্লী ও কলকাতার বিচিত্রাযুগ্মানে সংগীত পরিবেশনের প্রভূত প্রশংসা ও অভিনন্দন আজও প্রতিদিনের জীবনযাত্রার পথে সংগীত সাধনায় ও ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণীর পর্যালোচনার সঙ্গীত ব্যাপ্ত রেখেছে। সংগীতের সুরলোক জীবনকে আলোক-উজ্জ্বলিত ক'রে অজানা একটি সুবর্ণ-সিংহদ্বার খুলে দিয়েছে।

সেই প্রাগৈতিহাসিক মেয়ে

বিমলচন্দ্র সরকার

অন্ধকার গলিটায় রয়েছে দাঁড়িয়ে
জানি তুমি প্রাগৈতিহাসিক সেই মেয়ে
কামনার বহ্নিশিখা নয়নের ছায়ে
প্রতীক্ষিতা আজ রূপের বেসাতী নিয়ে
আহা! কামার ত্যাগে মূর্তিমতী প্রতীক্ষা
নিজেরে বিলিয়েও ঘুণাই করো কমা!
তুমি ঢাকার সেই ছাত্রী মালতী সেন
নিগত দাক্ষ্য কি হ'ল কি করে যেন।

ছয়ছাড়া ভেসে এসে এই ক'লকাতা
হলে বাস্তবহারা মানুষেরই আশ্রিতা
বৈচিত্র্যে মরলে তুমি ওদের চক্রান্তে
পসারিণী গো দাঁড়ালে আসি পথপ্রান্তে!
নিজেরে আহুতি দিয়ে পাশব কামনার
সেবিছা সমাজ তুমি আজ মমতার
তবুও তোমায় ওরা করে শুধু ঘণা
জানি মূল্যে শোধ হবে না তোমার দেনা।

অমৃত ছড়িয়ে পাও শুধু অত্যাচার
হে কামার প্রতীক! তোমায় নমস্কার।
তোমায় ধমনী শিরা ও উপশিরা
জানি সীতা-সাবিত্রীর রক্ত আঁজো বর
শক্তির অংশ তুমি দেবী মমুমিতা
সমাজকল্যাণী গুণো ত্যাগের সবিতা!
দীপাধিতা তুমি গো মহিমার ভাষতী
জানাই তোমারে শত সহস্র প্রণতি।



সাহিত্য পরিচয়

উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক বই

ঢাকাই গল্প

ঢাকাই গল্প চলতি গল্প নয়—খোঁশ গল্প। অপবাদ আছে, বাড়ালী শুধু কাঁদতেই জানে, হাসতে জানে না। কিন্তু ঢাকাই গল্প প্রমাণ করবে বাড়ালী শুধু কাঁদতেই জানে না, হাসতেও জানে এবং সঙ্গে সঙ্গে হাসতেও জানে। ঢাকাই অমৃতি, ঢাকাই গহনা, ঢাকাই শাড়ী, এর সব কিছুই মধ্যই রয়েছে বৈশিষ্ট্যের ছাপ। ঢাকাই গল্প—এর মধ্যেও ফুটে উঠেছে সেই বৈশিষ্ট্য। পাঠক রুদ্ধ নিঃশ্বাসে পড়তে পারবেন। লেখক শ্রীঅবিনাশ সাহাও বাড়লা সাহিত্যে অপরিচিত নন এমন কি নবাগতও নন। তাঁর রচনার সঙ্গে বাংলাদেশের পাঠক-পাঠিকার পরিচয় নেই! লেখার মধ্যে লেখকের বর্ণনাত্মক, রসস্থিতি ও বিভাসচাতুর্ষ প্রকাশের দারী রয়েছে। প্রকাশক ভারতী লাইব্রেরী, ৬ বক্স চট্টোয়ী স্ট্রীট। দাম দুই টাকা মাত্র।

রোদ-জল-ঝড়

মানবজীবনে ক্ষয়রোগকে একমাত্র জ্বলনা করা চলে শনির দৃষ্টির সঙ্গে। এই রোগের আক্রমণ মানুষের জীবনকে কতখানি যে বিঘ্নিত দিতে পারে সে বিষয়ে কেউই অবদিত নন। এর স্পর্শে মানুষের জীবনীশক্তি তিলে তিলে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যায়। বিশেষতঃ মধ্যবিত্ত পরিবারে এই রোগের আবির্ভাব বিধাতার চরম অভিশাপেরই নামান্তর। আজকাল চিকিৎসাশাস্ত্রের ক্রমোন্নতির ফলে এই রোগ দূরীকরণের নানা পন্থা উদ্ভাবিত হয়েছে সত্য, কিন্তু এর ফলে মধ্যবিত্তদের যে খুব বড় রকমের কোন উপকার হয়েছে এমন কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। কেন না, এর ব্যয়ভার বহন করা সাধারণ মধ্যবিত্তদের পক্ষে প্রাণান্তক ব্যাপার। তাই মধ্যবিত্ত পরিবারে এর আবির্ভাব এক বিরাট ক্ষিত্তিসা চিন্তের মত, এই রোগ আসে অপ্ৰতিরোধ্য, এক চরম সর্বনাশের বার্তাবহ রূপে, এই রোগ বিধায় নেয় অশেষ বিপর্যয়কে সংসারে সুপ্রতিষ্ঠিত করে—উপরোক্ত পটভূমিকা অবলম্বনে রোদ-জল-ঝড় উপন্যাসটির সৃষ্টি। প্রসিদ্ধ সাংবাদিক দক্ষিণারঞ্জন বসু এর স্রষ্টা। সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের এই অনন্ত প্রহাতি বখেট দক্ষতার সঙ্গে পাঠক সাধারণের সামনে তুলে ধরেছেন দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী ও মঞ্জুশ্রীকে কেন্দ্র করে। পঞ্চানন ও ফুল্লতার চরিত্র দুটি সৃষ্টি করে বোধোচিত দৃঢ় বলিষ্ঠ ও অভিনন্দনযোগ্য মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন দক্ষিণারঞ্জন। চিকিৎসালয়ের পারিপার্শ্বিক পরিবেশটিও লেখনীর মাধ্যমে সুচিত্রিত হয়েছে। গ্রন্থটির পাতায় পাতায় লেখকের মানবদরদী মনের আভাস

পাওয়া যায়, মানুষের অসহায় করুণ অবস্থা লেখকের মনে ব্যথার সৃষ্টি করে। দুঃখের ত্রিধার রাতি অতিক্রম করে আনন্দের প্রভাত-সুখ আলোকরশ্মি মানব সমাজ প্রাণ ভরে উপভোগ করুক—লেখকের এই মনোবাশনাই গ্রন্থটির পাতায় পাতায় ফুটে উঠেছে। প্রকাশক—পপুলার লাইব্রেরী ১১৫। ১-বি কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট। দাম সাড়ে চার টাকা মাত্র।

বাঙলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

অধ্যাপনার ক্ষেত্রে শ্রীজগদেব চৌধুরী একজন যশস্বী পুরুষ। সাহিত্যের দরবারেও তিনি আগন্তুক নন। সাহিত্য বিষয়ক তাঁর বহু রচনা বাঙলা সাহিত্যকে বখেট সমৃদ্ধ করেছে। বাঙলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাবলীর সাম্প্রতিক নিদর্শন। সাহিত্যের সঙ্গে মানুষের অবিচ্ছেদ্য যোগ। সাহিত্যের ইতিহাস মানুষেরই ইতিহাস। মানবসভ্যতার সূচনাকাল থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত ব্যাপক জয়যাত্রার ও ক্রমাগতির পূর্বদিক ইতিহাস ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে সাহিত্যের ইতিহাসে সঙ্গে। এক-একজন সাহিত্যিকার আপন আপন যুগকে—যুগ সভ্যতাকে ফুটিয়ে তোলেন আপন আপন সাহিত্যে, বিভিন্ন কালে সাহিত্যিকদের লেখনীর কল্যাণে বিভিন্ন যুগের, বিভিন্ন সভ্যতা ছবি ধরা পড়ল সাহিত্যে, এমনি করেই বহু শতাব্দীব্যাপী জয়যাত্রা এবং নব নব সৃষ্টির ফলে যে ইতিহাস গড়ে উঠেছে—সেই ইতিহাসে মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠল সভ্যতার সর্বকালের এক সার্বিক আলোখা মানুষের ভাব-ভাবা, আনন্দ-বেদনা, চিন্তা-কল্পনা প্রকাশ করতে সর্বশ্রেষ্ঠ সহায়ক হচ্ছে। আলোচ্য গ্রন্থে অধ্যাপক চৌধুরী বাঙলা দেশ বাঙলা ভাষা, চর্চাপদ বাঙলা সাহিত্যের আদিম যুগ থেকে স্বকান্ত ভট্টাচার্য পর্যন্ত বাঙলা সাহিত্যের এক আলোকোজ্জ্বল যুগের বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গেলেন। গ্রন্থটি যুগপৎ পাঠক সমাজে ছাত্র সমাজের উপকার সাধন করবে। সাধারণ সাহিত্য পাঠকে দরবারে আদ্যদের সাহিত্যের সুদীর্ঘকালের ইতিহাসের আলোচন বত প্রচারিত হয় ততই মঙ্গল। সমগ্র গ্রন্থটি গ্রন্থকারের নৈপুণ্যে স্বাক্ষর বহন করেছে। গ্রন্থটি অসংখ্য তথ্যের আকর, বাঙলা সাহিত্যের বিরাট ইতিহাস অনন্তসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে পরিবেশিত হয়েছে। লেখকের আলোচনা বখেট গুরুত্বপূর্ণ সারগর্ভ ও মনোরম এই গ্রন্থের বহুল প্রচার ও প্রচাৰ আমরা কামনা করি। প্রকাশক—

বুকলাও প্রাইভেট লিমিটেড। ১ শতক বোষ লেন, কলকাতা-৬।
দাম সাত টাকা মাত্র।

প্রেমতারা এবং এতটুকু আশা

হাজার হাজার মানুষকে অক্লান্ত আনন্দ দিয়ে চলেছে একদল শিল্পী বিপদের সম্ভাবনাকে চোখের সামনে রেখে। সার্কাসের শিল্পী। প্রতি মুহূর্তে এরা জীবন-মুখোগের মুখোমুখি ঝাড়িয়ে কিন্তু সেই অবস্থায় দর্শক দরবারে এদের আনন্দরস পরিবেশনে এতটুকু ছেদ পড়ে না। শিল্পী হিসেবে এদের কৃতিত্ব কোন অংশে কম নয় এবং অনেকের থেকেই বেশী। কেন না চরম বিপদের সামনে ঝাড়িয়ে 'অসংখ্য মানুষের মনে বার নিয়ত আনন্দ ভূগিয়ে চলেছে তারা যে কতখানি শক্তিশালী, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না। কিন্তু তার বিনিময়ে এরা কি পায়? এতখানি হুর্জর সাহস কঠোর পরিশ্রম পরিপূর্ণ নিষ্ঠা দিয়ে এরা যে কাজ করে থাকে তার জন্তে এদের জীবনে কোন নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতিটুকু পর্বন্ত নেই, যে মুহূর্তে এরা ক্রীড়ামঞ্চ থেকে বিদায় নেয় সেই মুহূর্তেই তো এরা মুছে যায় মানুষের স্মৃতি থেকে, এদের অসামান্য শিল্পনৈপুণ্য মানুষের স্মৃতির ইতিহাসে পায় না এতটুকু স্থান। এই পটভূমির ভিত্তিতে প্রথমোক্ত উপন্যাসটি রচিত হয়েছে বাঙাল্য প্রতিভাময়ী সাহিত্যশিল্পী জীমতী মহাশয়ের ভট্টাচার্যের লেখনী থেকে। দ্বিতীয়োক্ত উপন্যাসটিও তাঁর লেখনীজাত। প্রথম উপন্যাসটিতে লেখিকা সার্কাসশিল্পীদের জীবনের উপান-পতন চাওয়া-পাওয়া লাভ-লোকসান এবং সর্বাঙ্গের তাদের জীবনবৈশিষ্ট্যকে লেখনীর মাধ্যমে রূপ দিয়েছেন। সার্কাস-জগতের পূর্ণাঙ্গ এক আভ্যন্তরীণ চিত্রও গ্রন্থটিতে যথেষ্ট নৈপুণ্যের সঙ্গে পরিবেশিত হয়েছে।

দ্বিতীয় উপন্যাসটিতে দেখা যাচ্ছে যে এই যাত-প্রতিযাতময় জগতের কণ্টকাকীর্ণ পথ দিয়ে মানুষ হাসিমুখে এগিয়ে চলেছে আশার একটুখানি আলো অঙ্গসরণ করে। মানুষের জীবনীশক্তির বৃদ্ধি প্রাপ্তিতে এই একটুখানি আশারই প্রভাব অবর্ণনীয়। কিসের আশা? বাঁচবার আশা। জগতের বিরাটই আজ আর মানুষের কাছে অঙ্গপল্লব নয়। জগতের মানুষ জগতের সঙ্গে ভালে ভাল যেনে চলতে চায়, গড়ে তুলতে চায় তারও একটি নিজস্ব জগৎ। ছোট হোক ক্ষতি নেই, কোণ হয় তো হোক না, তবু তো তার নিজস্ব, যেখানে তার সঙ্গে একত্রে বাসা বাঁধার আনন্দ, প্রশান্তি, নিশ্চিন্ততা এই সৃষ্টির স্বপ্ন অধিকার করে আছে মানুষের মন, মানবচিন্তা গঠনব্যাকুল। ঐ একটুখানি আশাকে অবলম্বন করেই মানুষ গড়ে তুলতে চায় তার আপন জগৎ। দেখা যাচ্ছে যে জীবনের বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে ঐ এতটুকু আশার আনন্দ অসামান্য। জীবনযাত্রার এক নিখুঁত বাস্তব চিত্র উপন্যাসটির পাতার পাতায় ফুটে ওঠে।

উভয় উপন্যাসই আপন আপন বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর। ঘটনাবিন্যাস, চরিত্রসৃষ্টিতে, বর্ণনার প্রঞ্জলতার লেখিকা অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। বঞ্চিত শিল্পিকুলকে সাহিত্যের মাধ্যমে তাদের বখাপ্রাপ্য সম্মান দিয়ে লেখিকা বহুজনের বক্তব্য লাভ করবেন। লেখিকার বিন্যাসভঙ্গী অপূর্ব, প্রকাশ-দক্ষতা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, আন্তরিকতা সাধুবাদার্থ। এই দুটি সুগোপযোগী যথেষ্ট আবদান বহন করে। প্রচ্ছদশিল্পের

দক্ষতার কয় পরিচয় দেন নি। প্রেমতারার প্রচ্ছদশিল্পীর নাম জানা গেল না। এতটুকু আশার প্রচ্ছদ একেছেন জীর্ণগণ বস্ত্র। প্রেমতারার প্রকাশক এম. সি. সরকার স্নাও সল প্রাইভেট লিমিটেড, দাম—চার টাকা মাত্র। এতটুকু আশার প্রকাশক—কল্পণা প্রকাশনী, ১১ গ্রামাচরণ দে স্ট্রীট। দাম—তিন টাকা মাত্র।

ক'টি কবিতা ও একলব্য

বর্তমান বাঙাল্য কবিদের মধ্যে মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় এক বিশেষ আসনের অধিকারী। বাঙলা দেশের শক্তিশালী কবিদের মধ্যে তিনি অন্যতম। বাঙলা কবিতার মানোন্নয়নের ক্ষেত্রেও তিনি করেছেন যথেষ্ট সহায়তা ক'টি কবিতা ও একলব্য তাঁর বর্তমান কাব্যগ্রন্থ। ক'টি কবিতা এবং "একলব্য" চরিত্রকে কেন্দ্র করে একটি কাব্যনাট্য এই গ্রন্থের অঙ্গ। কবিতাগুলি তাঁর বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর বহন করছে, স্বকীয়তার আলোর উজ্জল, ভাব-প্রাচুর্যের দিক দিয়েও অসাধারণ। কবিতাগুলি বেন কবির অন্তরের কোমলতা। পৃথিবীর প্রতি বিপুল ভালোবাসার বৈচিত্র্যের প্রতি অনীম আকর্ষণের এক-একটি অঙ্গস্ত সূচী, একলব্যের জীবন প্রব্দের সম্যক প্রচ্ছটন ঘটেছে একলব্যের মধ্যে। ভাবের দিক থেকে বাঙাল্যের দিক থেকে প্রকাশের দিক থেকে গ্রন্থখানি সর্বতোভাবে এক অভিনবত্বের স্পর্শ বহন করছে। প্রচ্ছদপটটি সুঅঙ্কিত, প্রচ্ছদশিল্পী স্বনামধন্য জীথালদে চৌধুরী। প্রকাশক—জ্ঞানানন্দ বুক এক্সেন্সি প্রাইভেট লিঃ, ১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট। দাম—দু'টাকা মাত্র।

রবীন্দ্রসাহিত্য সমালোচনার ধারা

সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে জাতির জন্তে অনন্ত ঐর্ষ্য রেখে গেলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রসাহিত্য সারা জগতের সাহিত্যের বক্তৃতাভারকে করে তুলেছে সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর। রবীন্দ্রনাথের অঙ্গগম সাহিত্যকে বেঙ্গ করে দীর্ঘকাল ধরে যে সমালোচনার বিরাট ধারা বয়ে গেছে তার দ্বারাও সাহিত্য বিশেষ ভাবে উপকৃত হয়েছে, তার ফলে সাহিত্যের একটি বিশেষ দিকের হয়েছে দারোহাটন। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের আলোচনা করে বহু জন লেখনী ধারণ করে পরবর্তীকালে অভিজ্ঞ সমালোচক হিসেবে সাহিত্যের দরবারে বিশেষ ভাবে সমাদৃত হয়েছেন। বিদেশে এই জাতীয় গ্রন্থের নমুনা আমরা পেয়েছি (Shakespeare Criticism ও Chanecr Criticism) কিন্তু বাঙলা দেশে ঠিক এই ধরনের গ্রন্থ এই প্রথম জন্মাল। এ জন্তে গ্রন্থকার প্রাবন্ধিক ডঃ আদিত্য ওহদেয়ার নিঃসন্দেহে আমাদের ধন্যবাদার্থ। বিভিন্ন যুগে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন সাহিত্য কোন রূপ নিয়ে ধরা পড়েছে বিভিন্ন সমালোচকের সামনে, ঐ সাহিত্য সমূহ কি প্রতিক্রিয়া সঞ্চার ক'ল সমালোচকের মনে, সমালোচনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রসাহিত্য সঙ্ক্ষে সমালোচকের কি মনোভাবের প্রকাশ পাওয়া গেল, তদুপরি রবীন্দ্রসাহিত্য মূল্যস, ভাব, বঙ্গনা, স্বরূপ, সারবত্তা, চিন্তাধারা কোন কোন সমালোচকের দ্বারা কি ভাবে বিব্রলিত হ'ল, বাধ্যত হ'ল, আলোচিত হ'ল, এই সকল বিষয়ে আলোচ্য গ্রন্থটি পাঠ করলে পরিপূর্ণরূপে আলোকিত হওয়া যায়। গ্রন্থটি প্রথমই গ্রন্থকার

যথেষ্ট আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন, গ্রন্থকারের প্রভূত শ্রম স্বীকার গ্রন্থটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তুলেছে। ১২৮০ থেকে শুরু ১৩৬০ পর্যন্ত এই দীর্ঘ আত্ম-বহুর ধরে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকে কেন্দ্র করে যে বিরাট সমালোচনা সাহিত্য গড়ে উঠল তার ইতিবৃত্ত এই একটি গ্রন্থের মাধ্যমে যথেষ্ট স্পষ্টভাবে পরিবেশন করে গ্রন্থকার শক্তির স্বাক্ষর রেখে গেলেন। প্রচ্ছদছবি অঙ্কন করেছেন সীমতা মৈত্রেয়ী দেবী। প্রকাশক—এভারেস্ট বুক হাউস, ১৪ সাউথ সিঁধি রোড। দাম—সাত টাকা মাত্র।

সৌখীন নাট্যকলার রবীন্দ্রনাথ

সাহিত্য সংস্কৃতির যে বিভাগে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিধর্মী হাতের ছোঁয়া লেগেছে সঙ্গ সঙ্গ সেই বিভাগ সমর্থ হয়েছে পূর্ণতার রসান্বাদনে, সংস্কৃতির সকল দুয়ারই সর্বাঙ্গ সম্মানে উন্মুক্ত ছিল কবিগুরুর হস্তে, দেশীয় নাট্যকলার ইতিহাস সৃষ্টিতেও রবীন্দ্রনাথের অবদান অসামান্য। সৌখীন নাট্যকলার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের জীবনব্যাপী যোগাযোগের এক অনবদ্য আলোচ্য লেখনীর মাধ্যমে এই গ্রন্থে অঙ্কিত করেছেন হেমেন্দ্রকুমার রায়। রবীন্দ্রনাথের নাট্য-জীবন সম্বন্ধে তাঁর সুসভীর আলোচনা এই গ্রন্থটির আকারে রূপ নিয়েছে। হেমেন্দ্রকুমার রায় কেবলমাত্র শিশুসাহিত্যের বাহুরই নন, রবীন্দ্রবোদ্ধাদের মধ্যেও তাঁর আসন প্রথম সারিতে; এ ক্ষেত্রে তার চেয়েও বড় কথা যে আমাদের নাট্যশালার এই সুদীর্ঘ কালের ইতিহাস সম্পর্কে তিনি বিশেষজ্ঞ অর্থাৎ অধিষ্ঠিত তৎসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ঘটনাবলী এবং কাহিনীর সঙ্গে তিনি সুশরীতিত, নাট্যশালার সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন ব্যক্তিবৃন্দের বিবরণীও তাঁর অজানা নয়—সেইজন্মই আমাদের মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের নাট্যজীবন সম্বন্ধে হেমেন্দ্রকুমারের আলোচনা যেমনই মূল্যবান তেমনই গুরুত্বপূর্ণ। আলোচ্য গ্রন্থে আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে হেমেন্দ্রকুমারের অবর্ণনীয় প্রজ্ঞা ও অসংখ্য তথ্যের মিলন ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথের নাট্যজীবন সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা ছাড়াও এ দেশে নাট্যকলার ও নাট্যশালার উদ্ভবকাল থেকে শুরু করে বর্তমানকাল পর্যন্ত তার ক্রমবর্ধন, প্রভূত প্রসার ও ব্যাপক জয়যাত্রার এক প্রামাণ্য ইতিহাস পরিবেশনের ক্ষেত্রে হেমেন্দ্রকুমার যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। "নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্ব" অধ্যায়টি মনে বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। নাট্যজগতে রবীন্দ্রনাথের স্তম্ভ আবির্ভাব বাঙলাদেশের নাট্যলোককে সমৃদ্ধির সিঁহদ্বার অভিযুগ্মে আগুয়ান হ'তে যে কতখানি সহায়তা করেছে, সে বিষয়ে সম্যক জ্ঞানলাভ করা যায় হেমেন্দ্রকুমার রায়ের এই গ্রন্থটি পাঠ করলে। বসিক মহলে এই গ্রন্থ তাঁর যথাপ্রাপ্য সমাদর লাভ করবে বলে আমরা অন্তরে বিশ্বাস পোষণ করি। প্রকাশক—ইন্ডিয়ান র‍্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লি., ১৩ গান্ধী রোড। দাম—তিন টাকা পঞ্চাশ নয় পয়সা মাত্র।

ভেলকি থেকে ভেবজ

ভেলকিতে বার খুঁচনা ভেবজে তারই গৌরবময় পরিণতি— আজ বিশ শতাব্দীর আলোর ভেবজশাস্ত্রের যে রূপটি আমাদের চোখের সামনে প্রতিভাত হচ্ছে, সুপ্রাচীন কালে এতখানি

আলোকোজ্জ্বল রূপ নিয়ে তখনকার মানুষের সামনে এই শাস্ত্র ধরা দেয় নি। কালের বর্জিত পদক্ষেপের সঙ্গে তালে তাল রেখে মানুষ যেমন ধীরে ধীরে তার আদিম বস্ত্র, অসভ্য, পশুভাব কাটিয়ে ক্রমে রূপান্তরিত হল সুসভ্য, শিক্ষিত, আলোকপ্রাপ্ত মানব, তেমনই তাকে কেন্দ্র করে যে সব শাস্ত্র গড়ে উঠেছে তাদের ইতিহাসও অম্লরূপ। আজকে ভেবজশাস্ত্রের যে মহিমামণ্ডিত রূপটি আমাদের সামনে প্রতীয়মান তার ইতিহাসের প্রস্তরযুগের বর্ষরতার অধ্যায় থেকে শুরু করে তার বর্তমানকালের ব্যাপক জয়যাত্রার খুঁটিনাটি বিষয়ক সারবান আলোচনা গ্রন্থটির প্রধান উপজীব্য। মানুষের চেতনা কেমন করে সজীব হয়ে উঠল, কবে, কোথায়, কি পরিবেশে মানুষ প্রথম অম্লভব করল যে ভেলকিযাত্রীর কাজ শেষ হয়েছে, জীবনটা পুতুলখেলা নয়, তারপর বহুকালের সেই বন্ধ দুয়ার কেমন করে খুলে গেল, তার ফলে মানুষের মনোমন্দিরে প্রবেশ করল মুঠো মুঠো স্বপ্ন-সন্তাবনা, প্রাণজরী প্রত্যাশা, অগ্রগমনের অপ্রতিরোধ্য অভিলাষ তারই পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা গ্রন্থের অঙ্গপুষ্টি করেছে। বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন সমাজের বিভিন্ন রোগের অভিনব আবিষ্কার, ভেবজশাস্ত্রের ইতিহাসে দিকপাল আবিষ্কারকদের আবির্ভাব তাঁদের সাধনায় অনন্তসাধারণ কাহিনী, ইতিহাসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একাধিক কাহিনীর উল্লেখ, অসংখ্য চিত্রের সাংযোজন সর্বতোভাবে গ্রন্থটির মর্যাদাবৃদ্ধি করে। লেখক আনন্দকিশোর মুন্ডারী অনবদ্য বর্ণনা যেমনই রসসমৃদ্ধ, যেমনই তথ্যপূর্ণ, তেমনই সূক্ষ্মগ্রাহী। চিকিৎসাশাস্ত্রের অতুলনীয় আবিষ্কারগুলির সরস, মধুর ও প্রাঞ্জল বর্ণনায় তিনি আশাতীত নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। পরম সুখপাঠ্য এই গ্রন্থটি সকল শ্রেণীর পাঠকদের মুগ্ধ করতে সমর্থ হবে, এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। পাঠকসংসারণ এই গ্রন্থ পাঠে শুধু পড়ার আনন্দই পাবেন না, প্রভূত জ্ঞানলাভও সমর্থ হবেন। গ্রন্থটির বহুল প্রচার আশ্রয় কামনা করি। প্রকাশক—বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বক্সিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট। দাম—ছ' টাকা মাত্র।

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে

অপরাজেয় কথালিঙ্গী শরৎচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে বীরা বীরা এসেছেন বাঙলার বীরান-সাহিত্যিক অসমমজ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁদেরই একজন। খুব কাছের একটি কোণ থেকে শরৎচন্দ্রকে বীরা প্রত্যক্ষ করেছেন, শরৎচন্দ্রের জীবনে ঘটে যাওয়া বহু কাহিনীর সাক্ষিরূপ আজও বীরা আমাদের মধ্যে আছেন, এমন ঘটনা আছে বার বার শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁদের উপর দিয়েও যুগপৎভাবে বয়ে গেছে, অসমমজ মুখোপাধ্যায় তাঁদেরই একজন। মাসিক বহুমতীর পাঠক-পাঠিকাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে যে বছর তিনেক আগে শরৎচন্দ্র সম্পর্কিত অসমমজ বাবুর স্মৃতিকথা ধারাবাহিক ভাবে মাসিক বহুমতীতে প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে তারই গ্রন্থরূপ আত্মপ্রকাশ করেছে। গ্রন্থটিতে লেখক শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠতার এক চিতাকর্ষক বিবরণী যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে লিপিবদ্ধ করেছেন। সাধারণ্যে অজানা বহু তথ্যের সমাবেশ ঘটেছে এই গ্রন্থে। অসমমজ বাবুর আন্তরিকতাপূর্ণ, দরদরতা বর্ণনা দৃষ্ট আকর্ষণ করে। তাঁর আন্তরিকতাপূর্ণ ও

দয়দত্তরা বর্ণনায় এবং সর্বোপরি তাঁর রচনানৈপুণ্যে অতীতের অল্পস্বল্পটনা নতুন করে বেশ জীবন্ত হয়ে ওঠে। তাঁর লেখনীর মাধ্যমে মানুষ শরৎচন্দ্রের যে ছবি ফুটে উঠেছে তা যেমনই অনবদ্য। তেমনই মনোজ্ঞ এবং তেমনই বৈশিষ্ট্যবান। বলা বাহুল্য, তাঁর স্মৃতিকথা রচনায় তাঁর লেখনী যথোচিত শক্তির পরিচয়ই প্রদান করেছে। যে শরৎচন্দ্রের নিবিড় সান্নিধ্যে আপন জীবনের অনেকগুলো দিন কেটে তাঁর বিয়োগব্যথা! যে লেখকের মনকে কতখানি বিয়গ করে তুলেছে তার সম্যক প্রতিক্রিয়াও গ্রন্থটি থেকে অনুপস্থিত নয়। প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান স্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লি., ১৩ গান্ধী রোড। দায়—৬ টাকা পকাশ নয়! পয়সা মাত্র।

ভূস্বর্গের অভ্যন্তরে

আচার্য শ্রীমাদ্রসাদেব অকাল প্রয়াণ বাঙালীকে কতখানি শূন্য করে দিয়েছে তার তুলনা মেলে না। মৃত্যু মানুষের জীবনের সার্বিক পরিণতি, মৃত্যু আছে বলেই জীবন পূর্ণ, স্মৃত্যু কোত সেক্ষেত্রে নয়, কোত এষ্ট ক্ষেত্রে যে, শ্রীমাদ্রসাদেব জীবনে মৃত্যু ভেঁতাবে এল তা যেমনই কল্পন, তেমনই মর্মান্তিক! বিচক্ষণ ও সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তিত্বেরই আশা করি এ বিষয়ে একমত হবেন যে শ্রীমাদ্রসাদেব মৃত্যু এক কুৎসিত বৃদ্ধান্তের মর্মবাণী পরিণতি। বিভ্রান্ত, বিবেচনাহীন অদৃশ্য ভরত সৎকার জনস্বার্থবিরোধী ভ্রাম্যন্তক নীতির তীব্র প্রতিবাদ করার ক্ষেত্রেই শ্রীমাদ্রসাদকে সূত্র কাশ্মীরে স্বজনহীন অবস্থায় অচেনা পরিবেশে সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থায় মৃত্যুবরণ করতে হল। প্রবল ব্যক্তিত্বের অধিকারী এই প্রচেষ্টা জননেতার যুক্তিধর্মী সমালোচনার প্রমাণ গুলেন ভারত সরকার—তার পরবর্তী কালের ইতিহাস কারো অজানা নয়। পদত্যাগী মন্ত্রী শ্রীমাদ্রসাদেব জীবনের শেষ অধ্যায় এবং প্রধানতঃ তাঁর কাশ্মীরে থাকাকালীন ঘটনাবলীর বিশদ বিবরণ ধারা খুঁটিয়ে জানতে চান এই গ্রন্থ পাঠে তাঁরা উপকৃত হবেন। সংসদে শ্রীমাদ্রসাদেব বিতর্ক, তারপর তাঁর কাশ্মীরে বাতায় প্রস্ততি থেকে শুরু করে কলকাতায় তাঁর মৃতদেহ আনয়ন পর্যন্ত প্রতিটি বিষয়ের খুঁটিনাটি বিবরণ পর্যন্ত গ্রন্থের পাঠ্য পাঠ্যর বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ করে গেলেন লেখক শ্রীজ্যোৎস্নাময় চৌধুরী। গ্রন্থটিকে শ্রীমাদ্রসাদেব জীবনের শেষাংশের একটি প্রামাণ্য ভাষণপ্রাণী অনায়াসে বলা চলে। তাঁর শেষ জীবনের এক পূর্ণাঙ্গ প্রতিক্রিয়া বলে গ্রন্থটিকে অভিহিত করলেও ভুল হয় না। কাশ্মীররাজ্যের সকল বিষয়ক সংশ্লিষ্ট ইতিহাস, আবদুল্লাহ জীবনের পরিচয় এবং আরও বহুবিধ জ্ঞাতব্য তথ্য এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। লেখকের বলবার ভঙ্গি অসুবিধে, আগাগোড়া ইতিহাসকে তিনি গল্পের রূপ দিয়ে সকলের সামনে তুলে ধরেছেন। আয়তনের দিক দিয়েও গ্রন্থটি নাতিশীর্ণ। জল্প পরিসরে এত বড় একটি বিরাট বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা ও হৃদয়গ্রাহী বর্ণনায় লেখক অনন্তসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। গ্রন্থের ভূমিকা রচনা করছেন পরম প্রজ্ঞাপূর্ণ শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ বোষ মহাশয়। এই যুগোপযোগী গ্রন্থটির ব্যাপক প্রচার আমাদের কার্য। প্রকাশক—শ্রীকানীপ্রসাদ দাশগুপ্ত, ২-এ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা-১২। দায়—তিন টাকা মাত্র।

অভিষেক

বিজ্ঞোহের ইতিহাস স্মৃতিতে খারাপাতী বিজ্ঞোহের অবদান কম নয়। এর ভগ্ন ছিল ব্রহ্মদেশ। এতে ইন্দ্রন জোগাল সাইমন কমিশনের ঐতিহাসিক কুরু জনগণ আর সুশোষিত কৃষকসম্প্রদায়। এই বিজ্ঞোহের প্রধান নায়ক ছিলেন শেরা শান। সাধারণ মানুষের মনোবাক্সে এই বিজ্ঞোহ কম প্রভাব বিস্তার করে নি। বর্তমানে ঐ বিজ্ঞোহের পটভূমিকা অবলম্বন করে পূর্বোক্ত উপন্যাসটি রচনা করেছেন শক্তিমান সাহিত্যিক হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়। ব্রহ্মদেশের সঙ্গে হরিনারায়ণ বাবুর প্রত্যক্ষ পরিচয়ও অগভীর নয়। ব্রহ্মদেশের হরিনারায়ণ বাবুর জীবনেও ঘটছে। বিজ্ঞোহের পটভূমিকার উপন্যাসটি স্মৃতি—স্বভাবতই রাজনীতিও উপন্যাসের মধ্যে এসে গেছে অবশ্য, তাই বলে সমগ্র উপন্যাসটি কেবলমাত্র রাজনীতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। সাধারণ মানুষ তার জীবন, তার স্বপ্ন-কল্পনা, তার আশা, আকাঙ্ক্ষা, সুখ, দুঃখ, আনন্দ-বেদনাও উপন্যাসের পাতায় তাদের যথাপ্রাপ্য স্থান পেয়েছে। ঐ সমাজের ওখানকার মানুষের মনের এক অনবদ্য চিত্র ফুটে উঠেছে হরিনারায়ণ বাবুর লেখনীর বস্তুতায়। উপন্যাসের নামকরণও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। উপন্যাসের মধ্যে বহু জ্ঞাতব্য তথ্য সন্নিবেশিত করে লেখক যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। সমগ্র উপন্যাসটি বহুপ্রতিষ্ঠা প্রাপ্য সুখম বর্ধনে প্রভূত সহায়তা করবে বলে আমরা বিশ্বাস রাখি। প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান স্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লি., ১৩ গান্ধী রোড। দায়—পাঁচ টাকা পচাত্তর নয়! পয়সা মাত্র।

রবীন্দ্র-সাহিত্যে প্রেম

প্রেম রবীন্দ্র-রচনার এক প্রধান অঙ্গ। প্রেমকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য, ভাবধারা, কল্পনা রূপ পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বরদত্ত লেখনীর কল্যাণে তাঁর সৃষ্ট অনবদ্য চরিত্রগুলির মাধ্যমে সাহিত্যের মধ্যে প্রেম এক মহিমময় দীপ্তিতে ফুটে উঠেছে। প্রেমবাদ রবীন্দ্রনাথের চোখে ধরা পড়েছে এক অভিনব মূর্তিতে, তার ফলেই রবীন্দ্র-সাহিত্যের কোষাগারে প্রেম এক মহার্ঘ বস্তু হিসেবে পরিগণিত। শ্রীমতী মলয়া গঙ্গোপাধ্যায় বহুমতীর পাঠক-পাঠিকার কাছে অপরচিতা নন। ইতিপূর্বে মাসিক বহুমতীতে তাঁর একাধিক রচনা প্রকাশিত হয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থে রবীন্দ্র-সাহিত্যে প্রেম সম্পর্কে আলোচনায় তিনি শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। রবীন্দ্র সাহিত্যে প্রেমের বিশিষ্টতা, বিপুলতা ও বিচিত্রতা সঙ্ক্ষেত্রে তাঁর আলোচনা যেমনই সারগর্ভ, তেমনই মনোহর। রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রেমের স্বরূপ সঙ্ক্ষেত্রে তাঁর মনোজ্ঞ আলোচনা হস্তবাদের দাবী রাখে। রবীন্দ্রনাথের প্রেমবাদের নিখুঁত বিশ্লেষণকর্ম লেখিকা কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। প্রসঙ্গতঃ রবীন্দ্রপূর্ব বাঙলা-সাহিত্যে প্রেমের রূপ ও রবীন্দ্র-পরবর্তী প্রেম সাহিত্যের সূচনা সঙ্ক্ষেত্রে লেখিকার আলোচনায় ফলে রবীন্দ্র-সাহিত্যে প্রেমের যে প্রতিক্রিয়া আমরা পাই, সেই সম্পর্কে লেখিকার বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যান ও ভাব্যকরণ আরও স্পষ্ট জোরালো ও বিশেষত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে বাঙলার অগ্রতম প্রথম শ্রেণী মুদ্রণশিল্পী নাতানা প্রিন্টিং ওয়ার্কস মুদ্রণকর্মে যথেষ্ট নিপুণতার পরিচয় দিয়েছেন। প্রকাশক—নাতানা, ৪৭, গণেশচন্দ্র এডিনিউ। দায়—তিন টাকা মাত্র।

● দেশে-বিদেশে ●

আষাঢ়—১৩৬৬ (জুন-জুলাই, '৫৯)

অন্তর্দেশীয়—

১লা আষাঢ় (১৬ই জুন): ছয় দিবস ব্যাপীসিংহল সফর উদ্দেশ্যে ভারতীয় রাষ্ট্রপতি ডা: রাজেন্দ্রপ্রসাদের সদলবলে কলকাতা উপস্থিত।

২রা আষাঢ় (১৭ই জুন): কলিকাতা পৌরসভার বিশেষ অধিবেশনে পশ্চিমবঙ্গের উৎসবজনক ঋতু পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা।

৩রা আষাঢ় (১৮ই জুন): প্রবল বর্ণে আসাম ও ইন্দোর বিভীর্ণ অঞ্চল প্রাবৃত—বহু নদীতে জলোচ্ছাস।

৪ঠা আষাঢ় (১৯শে জুন): করিমগঞ্জ সীমান্তে পুনরায় সশস্ত্র পাক সৈন্যের হানা—পাথারিয়া অঞ্চল গুলীবর্ষণ অব্যাহত।

৫ই আষাঢ় (২০শে জুন): মুম্বাইতে সাংবাদিক বৈঠকে দালাই লামা কর্তৃক তিব্বত প্রান্তের সমাধানকল্পে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু (ভারত) ও চীনা প্রধানমন্ত্রী চৌ এন-লাই-এর বৈঠকে আগ্রহ প্রকাশ।

৬ই আষাঢ় (২১শে জুন): জব্বলপুরে শ্রীনেহরু কর্তৃক সাময়িক বান নিষ্কাশন কারখানার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন।

৭ই আষাঢ় (২২শে জুন): পশ্চিমবঙ্গে লেভী প্রথা ও ঋতুশস্যে ম্যুনিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা প্রত্যাহার—সাংবাদিক বৈঠকে রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী ডা: বিধানেন্দ্র রায়ের বোষণা।

৮ই আষাঢ় (২৩শে জুন): নূনতম বেতন আদায়ের জ্ঞে বিভিন্ন অঞ্চলে পৌর কর্তৃকারীদের ধর্মঘট।

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের চলিত ১১৫৯ সালের ফুল-ফাইভাল পরীক্ষার নিয়মিত ছাত্রদের শতকরা ৪৪.৬৭ জন এবং আইভেট পরীক্ষার্থীদের ২৬.৬৬ জন উত্তীর্ণ।

৯ই আষাঢ় (২৪শে জুন): দিল্লী পৌরসভার মেয়র পদে কংগ্রেসপ্রাণীক পরাজিত করিয়া প্রোগ্রেসিভ দলের নেতা শ্রীত্রিলোকচাঁদ নির্বাচিত।

১০ই আষাঢ় (২৫শে জুন): মৃগা বৃদ্ধি ও ভূমিক প্রতিক্রিয়া কমিটির আহ্বানে রাজ্য সরকারের জনস্বার্থ-বিরোধী ঋতুনীতির প্রতিবাদে কলিকাতা ও মক্কা অঞ্চলে সর্বাস্ত্রক হবতাল।

১১ই আষাঢ় (২৬শে জুন): নয়াদিল্লীতে কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পার্টির বৈঠকে কেবল পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা—প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু কর্তৃক অবস্থা বিশ্লেষণ।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ফরাসী বাঁধ অন্তর্ভুক্ত করা হইবে বলিয়া কেন্দ্রীয় পরিবহন ও যোগাযোগ সচিব শ্রী এস কে পাতিলের প্রস্তুত আশাস দান।

১২ই আষাঢ় (২৭শে জুন): ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি কর্তৃক কেবলে নূতন নির্বাচন (মধ্যবর্তী) আনুষ্ঠান সম্পর্কে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু প্রস্তাব প্রকাশ।

১৩ই আষাঢ় (২৮শে জুন): পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রথম দপ্তরের আধাসে পশ্চিমবঙ্গ পৌরসভা কর্তৃকারীদের ৮ দিন ব্যাপী ধর্মঘট প্রত্যাহার।

দিল্লীতে কেবল পরিস্থিতি সম্পর্কে কংগ্রেস হাই কমিটির সহিত কেবল কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের জরুরী বৈঠক।

১৪ই আষাঢ় (২৯শে জুন): নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাট্টার (৭০) স্বদরোগে বরাহনগরে জীবন-দীপ নির্বাণ।

দিল্লীতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস পার্লামেন্টারী বোর্ডের বৈঠকে প্রস্তাব—সাধারণ নির্বাচনেই কেবল সমস্ত সমাধানের একমাত্র গণতান্ত্রিক উপায়।

১৫ই আষাঢ় (৩০শে জুন): কাশ্মীর-সীমান্তে দুই জন ভারতীয় পাকিস্তানীদের দ্বারা অপহৃত।

পাঞ্জাব ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ কর্তৃক মহাশ্মে ৪টি রকেট উৎক্ষেপণ।

১৬ই আষাঢ় (১লা জুলাই): জুব মাসে (১২ই জুন হইতে ৩০শে জুন) কেবলে সরকার বিরোধী আন্দোলন সম্পর্কে ২৪,১৬১ জন গ্রেপ্তার—কেবল সরকারের ইচ্ছাচার।

১৭ই আষাঢ় (২রা জুলাই): দ্বিভাষিক বোম্বাই রাজ্য গঠন আন্দোলন কালে আমেরিকাদে বিগত বর্ষ পুলিশ বে গুলীচালনা করে, তাহা সঙ্গত হইয়াছে বলিয়া সরকারী তদন্ত কমিশনের (বিচারপতি শ্রী এস টি কোটওয়াল কমিশন) রিপোর্টে মন্তব্য।

১৮ই আষাঢ় (৩রা জুলাই): নিকট ধরণের চাউল সরবরাহের অভিযোগে দমদম সেন্ট্রাল জেলে কয়েদীদের অনশন ধর্মঘট।

১৯শে আষাঢ় (৪ঠা জুলাই): দিল্লীতে রাষ্ট্রপতি ডা: রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর সহিত অষ্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী মি: আর্থ জি মেঞ্জিসের পর পর বৈঠক।

২০শে আষাঢ় (৫ই জুলাই): অবিরাম বর্ষণের ফলে অবশিষ্ট ভারত হইতে কাশ্মীর উপত্যকা একরূপ বিচ্ছিন্ন।

উপরাষ্ট্রপতি ডা: সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের ফিলিপাইন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম জার্মানী সফর বাতলা।

২১শে আষাঢ় (৬ই জুলাই) পশ্চিমবঙ্গের ঋতু পরিস্থিতি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় ঋতুসচিব শ্রীঅজিতপ্রসাদ জৈনের সভাপতিত্বে দিল্লীতে সর্বদলীয় বৈঠক।

২২শে আষাঢ় (৭ই জুলাই): সাংবাদিক বৈঠকে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর বোষণা—ভারতে কোন তিব্বতি সংস্কারের অস্তিত্ব স্বীকার করা চলিতে পারে না।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের (অধ্যাপক শ্রীনির্মল-কুমার সিঙ্ঘ) হস্তক্ষেপের পর মহারাজা মনীন্দ্রেন্দ্র কলেজের (কলিকাতা) ছাত্র ও অধ্যাপকদের অনশন ধর্মঘট প্রত্যাহত।

২৩শে আষাঢ় (৮ই জুলাই): আসাম সীমান্তের নূতন নূতন অঞ্চল পাকসৈন্যের গুলীবর্ষণের সংবাদ।

২৪শে আষাঢ় (৯ই জুলাই): কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কমিশন নিযুক্ত সমাজকল্যাণ ও অল্পহস্ত শ্রেণীর কল্যাণ সংক্রান্ত কমিটির রিপোর্টে সমাজকল্যাণ-কর্মী সংস্থা গঠনের সুপারিশ।

২৫শে আষাঢ় (১০ই জুলাই): রাষ্ট্রপতির নিকট কেবল প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ হইতে কেবল সরকারের (কম্যুনিষ্ট) বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র (চার্জশীট) পেশ।

মিষ্টি সুরের নাচের তালে মিষ্টি যুথের খেলা
আনন্দ-ছন্দে আজি, —হাসি খুসির মেলা



সুপ্রসিদ্ধ কোলে



বিস্কুটের

প্রস্তুতকারক কর্তৃক

আধুনিকতম যন্ত্রপাতির সাহায্যে প্রস্তুত

কোলে বিস্কুট কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১০

কেরল পরিস্থিতি প্রসঙ্গে দিল্লীতে রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের সহিত কেরলের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী. এম. এস. শ্রীনাথস্বামিপাদের বৈঠক।

২৬শে আষাঢ় (১১ই জুলাই) : মণিপুরের তামেঙলঙ-এ নাগা বিদ্রোহীদের তৎপরতা বৃদ্ধি পাওয়ায় মণিপুর চীক কমিশনার কর্তৃক সশস্ত্র এলাকা 'উপদ্রুত অঞ্চল' বলিয়া ঘোষিত।

সিমলায় প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর সহিত কেরলের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনাথস্বামিপাদের (কম্মুনিষ্ট) সাক্ষাৎকার।

২৭শে আষাঢ় (১২ই জুলাই) : কেরলে সরকার-বিরোধী আন্দোলন প্রত্যাহত হইলে নির্বাচন সম্পর্কে বিবেচনা করা হইবে— দিল্লীতে সাংবাদিক বৈঠকে কেরল মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনাথস্বামিপাদের ঘোষণা।

২৮শে আষাঢ় (১৩ই জুলাই) : কেরলে সরকার-বিরোধী আন্দোলনে ১২ই জুন হইতে এক মাস মধ্যে ১৮০৪ জন দণ্ডিত।

জনকল্যাণমূলক সংস্থাসমূহ (বিশেষতঃ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতাল) ধর্মঘট নিষিদ্ধ করার ব্যবস্থা—পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক বিল প্রণয়ন।

২৯শে আষাঢ় (১৪ই জুলাই) : প্রবল বর্ষণ ও ধ্বংস নামার ফলে কালিম্পাং মহকুমায় ১ জন ফুটবল খেলোয়াড় সমেত মোট ৩২ জন নিহত হওয়ার সংবাদ।

৩০শে আষাঢ় (১৫ই জুলাই) : কেরল মন্ত্রিসভার পদচ্যুতি ও সাধারণ নির্বাচনের দাবীতে কেরল রাজ্যপালের নিকট বিরোধী দলগুলির প্রতিনিধিগণ ও বিমোচন সমন্বয়-সমিতির নেতা শ্রীমাদ্রাধ পরনাতনের স্মারকলিপি পেশ।

প্রবল ঝড় ও বৃষ্টিতে কচ্ছের সদর ভূগ্ন বহির্বিধ হইতে শিঞ্জির।

৩১শে আষাঢ় (১৬ই জুলাই) : ২৪-পরগণা জেলায় বাগদা থানার একটি স্থলে পাকিস্তানী হানা—২জন ভারতীয়কে বলপূর্বক অপহরণ ও তিনজন লুণ্ঠ।

৩২শে আষাঢ় (১৭ই জুলাই) : কেরল পরিস্থিতি প্রসঙ্গে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক কেরলের রাজ্যপাল জীয়ামত্য়ক রাওকে দিল্লীতে আহ্বান।

বহির্দেশীয়—

২য় আষাঢ় (১৭ই জুন) : বার্লিন সম্পর্কে ৩৮ দিনব্যাপী জেনেভা সম্মেলনের অচলাবস্থা দূরীকরণে বৃহৎ চতুর্শক্তি (রুশিয়া, মার্কিন, যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্স) পররাষ্ট্র সচিবদের জরুরী গোপন বৈঠক।

৩য় আষাঢ় (১৮ই জুন) : ডারবানে একদল আফ্রিকান নারী বিক্ষোভকারীর উপর পুলিশের রাইফেল ও স্টেনগানের গুলি চালনা।

আইরিশ প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট পদে মিঃ ইয়ন ডি জ্যালেয়া (কিরেন ফেল দলের নেতা) ভোটাধিক্যে নির্বাচিত।

৪ঠা আষাঢ় (১৯শে জুন) : জাঙ্গাণী প্রসঙ্গে পশ্চিমী ত্রিশক্তির প্রস্তাব রূপ প্রধান মন্ত্রী মঃ ক্রুশ্চভ কর্তৃক প্রত্যাখ্যান।

৫ই আষাঢ় (২০শে জুন) : বার্লিন ও জাঙ্গাণী প্রসঙ্গে চতুর্শক্তি পররাষ্ট্র সচিবদের জেনেভা বৈঠক ১৩ই জুলাই পর্যন্ত স্থলভূবি।

১ই আষাঢ় (২৪শে জুন) : মার্কিন সামরিক ও পররাষ্ট্র নীতি না মানিলে সামরিক সাহায্য দেওয়া হইবে না—আমেরিকান কংগ্রেসে প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের রিপোর্ট।

১০ই আষাঢ় (২৫শে জুন) : শ্রমিক ধর্মঘটজনিত অচলাবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কলম্বো বন্দরের কাজ চালু রাখার সৈন্তবাহিনী আহ্বান।

১৩ই আষাঢ় (২৮শে জুন) : হুনীতি; অসমচারণ ও অযোগ্যতার দায়ে পাকিস্তানে এ যাবত ২৭০ জন সরকারী কর্মচারী (অধিকাংশই অফিসার) দণ্ডিত হওয়ার সংবাদ।

১৪ই আষাঢ় (২৯শে জুন) : ওয়াশিংটনে প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার ও মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব মিঃ ক্রিস্টিয়ান হ্যাটারের সহিত সোভিয়েট প্রথম সহকারী প্রধান মন্ত্রী মঃ কোজলভের বৈঠক।

১৫ই আষাঢ় (৩০শে জুন) : দীর্ঘকালব্যাপী রাণা শাসনের পর নেপালে নূতন সংবিধান প্রবর্তন—গণতন্ত্রের পথে নেপালবাসীদের জয়যাত্রার সূচনা।

প্রতিরক্ষাধাতে ১৯৫১—৬০ সালের জন্য পাকিস্তানের ৮৬ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ।

১৭ই আষাঢ় (২রা জুলাই) : ফিলিপাইনের কারাগারে রুদ্ধ কর্তৃক অগ্নিকাণ্ডের ফলে ১৬ জন কয়েদী জীবন্ত দহ।

২০শে আষাঢ় (৫ই জুলাই) : গণপরিষদ বাতিল করিয়া ইন্ডোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট সোয়েকার্নো কর্তৃক ডিক্টেটরী ক্ষমতা গ্রহণ।

ফরাসী-পশ্চিম জাঙ্গাণী চুক্তি অনুসারে সার অঞ্চল পশ্চিম জাঙ্গাণীর অন্তর্ভুক্ত।

২১শে আষাঢ় (৬ই জুলাই) : দুইটি কুচুর ও একটি খরগোশ লইয়; মহাশূন্যে উৎক্ষিপ্ত সোভিয়েট রকেটের নিরাপদে প্রত্যাবর্তন।

করাচীর আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর সম্প্রসারণকল্পে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৪৮ লক্ষ ডলার ঋণদানের সিদ্ধান্ত।

২৩শে আষাঢ় (৮ই জুলাই) : আমেরিকা ও রুশিয়ার মধ্যে বন্ধুত্ব পৃথিবীতে যুদ্ধ বন্ধ করিবে—মস্কো-এ সফররত মার্কিন গভর্নরদের নিকট সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রী মঃ ক্রুশ্চভের উক্তি।

২৪শে আষাঢ় (৯ই জুলাই) : প্রেসিডেন্ট সোয়েকার্নো কর্তৃক নিষেধে ইন্ডোনেশিয়ার প্রধানমন্ত্রী রূপে ঘোষণা ও নূতন ইন্ডোনেশীয় মন্ত্রিসভা গঠন।

২৭শে আষাঢ় (১২ই জুলাই) : বাগদাদে অনুষ্ঠিতব্য ইরাকী বিপ্লবের প্রথম বার্ষিক উৎসবে বোগদানে সম্মিলিত আরব প্রজাতন্ত্র কর্তৃক ইরাকের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান।

৩০শে আষাঢ় (১৫ই জুলাই) : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইম্পাত কারখানাসমূহে ধর্মঘট—পাঁচ লক্ষ শ্রমিকের বোগদান।

বিশ্বব্যাপক কর্তৃক ভারতকে দুই দফায় ছয় কোটি ডলার ঋণদানের ব্যবস্থা।

৩১শে আষাঢ় (১৬ই জুলাই) : জেনেভা পররাষ্ট্র সচিব বৈঠকে সারা জাঙ্গাণী কমিটি গঠনের সোভিয়েট প্রস্তাব পশ্চিমী শক্তির (বৃটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকা) কর্তৃক অগ্রাহ্য।

৩২শে আষাঢ় (১৭ই জুলাই) : কিউবার বিপ্লবী প্রধানমন্ত্রী ডাঃ ফাইডেল কাস্ত্রো ও কিউবার প্রেসিডেন্ট ডাঃ উর্তুগার পদত্যাগ।

নটগুরু দেহরক্ষা

নটগুরু শিশিরকুমারের আকস্মিক দেহান্তর সমগ্র জাতির পক্ষে এক অপূরণীয় ক্ষতি। শিশিরকুমারের মহাপ্রয়াণে কেবলমাত্র অভিনয় জগতই নয় বাঙালার সংস্কৃতির জগতও হারাল একজন দিকপাল মহারথীকে। শিশিরকুমারের মৃত্যু জাতীয় জীবনে যে কতখানি শূন্যতা এনে দিল তা ভাবার প্রকাশ করা সাধ্যাতীত। বাঙালার যে সকল কালজয়ী সন্তানদের কল্যাণে সংস্কৃতির ইতিহাসে এক-একটি যুগের সৃষ্টি হয়েছে, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নতুন ইতিহাসের হয়েছে সূচনা, সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে বাঙালী পেয়েছে নতুন পথের সন্ধান সেই পথস্রষ্টা, ইতিহাসস্রষ্টা, যুগস্রষ্টাদের শেষ পুরুষ শিশিরকুমার। নব নব চেতনার, চিন্তাধারার, স্বপ্নে জাতিকে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে জাতীয় জীবনের বিরাট প্রাঙ্গণে প্রতিভা-মনীষা-মেধার রাজ্য থেকে যে নমস্ত্র প্রতিনিধিদের হয়েছে আবির্ভাব সেই প্রণম্য প্রতিনিধিকূলের শেষ প্রতিনিধি শিশিরকুমার। অসংখ্য মনীষীর স্নেহমহান অবদানে যে বিরাট ঐতিহ্যের সৃষ্টি হ'ল শিশিরকুমার সেই গৌরবময় ঐতিহ্যের শেষ দীপশিখা।

শিশিরকুমারের স্বজনীপ্রতিভা কেবলমাত্র অভিনয়কলার উন্নতি সাধনে বা নাট্যজগতে এক নতুন ধারার প্রবর্তনই সীমাবদ্ধ নয়, সমগ্র অভিনয় জগতের পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার আমূল পরিবর্তন শিশিরকুমারের সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব, জাতীয় দরবারে তাঁর অনবদ্য অবদান।

গিরিশচন্দ্র অধ্বন্যেশ্বর তখন লোকান্তরিত। অমরেন্দ্রনাথ দত্তও তখন জীবিত নেই, অমৃতলাল বসুও তখন বিদায় নিয়েছেন সাধারণ রঙ্গালয় থেকে। বলতে গেলে তখন একমাত্র দানীয়াবু। অভিনেতা হিসেবে তিনি অসাধারণ ছিলেন, এ কথা বলাই বহুলা কষ্ট নতুন সৃষ্টি করার ক্ষমতা তাঁর একেবারেই ছিল না। সাম্প্রতিক অবস্থা তখন বাঙলাদেশের রঙ্গালয়ের। প্রসন্নকুমার ঠাকুর, নবীনচন্দ্র বসু, দত্তপ্রমোদন ঠাকুর, কালীপ্রসন্ন সিংহ, প্রতাপচন্দ্র সিংহ, ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের পৃষ্ঠপোষণায় ও মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, রায়নারায়ণ সর্কর্ভ, জ্যোতিষিন্দ্রনাথ ঠাকুর, মনোমোহন বসু, প্রভৃতির স্পর্শ প্রভাবে বাঙালার নাট্যজগতের যে বিরাট ধারার সৃষ্টি হয়েছিল সেই ধারা তখন নিরতিশয় ক্ষীণ হয়ে এসেছে, এ হেন সময়ে অসাধারণ প্রতিভার আধার অধ্যাপক শিশিরকুমার এই অজম্মা রঙ্গভূমিতে পরার্ণব করলেন। বিস্ময়ের এখানেই শেষ নয় নিজেই শুধু এলেন না, সঙ্গে নিয়ে এলেন অসংখ্য প্রতিভাধর শিল্পীকে, যারা তাঁরই পদ-প্রান্তে বসে অভিনয়ের অ-আ-ক-ষ সন্ধে পাঠ নিয়েছেন, নিয়ে এলেন অনেকানেক গুণী বাদ্যের স্ব স্ব অবদানে রঙ্গমঞ্চের মর্যাদা বৃদ্ধি পেল বহু গুণ রঙ্গমঞ্চ সাদর আহ্বান জানাল বহু স্বরীজনকেও নাটক সন্ধে তাঁদের মূল্যবান মতামতের জন্মে, শিশিরকুমারকে কেন্দ্র করে বহু জগতে গড়ে উঠল জ্ঞানী গুণীর এক বিরাট সমাবেশ। হাওয়া গেল বদলে, নটগুরু এনে দিলেন নতুন সস্তাবনা, নতুন স্বপ্ন, নতুন উপহার। প্রথম আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে জনতা জয়মালা পরিয়ে দিল নাট্যাচার্যকে। শিশিরকুমারের জীবনেও ঘটল VINI—VIDI—VICI। বাঙালার রঙ্গালয়ের হ'ল এক স্বর্ণ যুগের শুভ উদ্বোধন।

শিশিরকুমার অভিনয়কলার সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন করলেন, নাট্যজগতের আবহাওয়া দিলেন একেবারে বদলে, গতানুগতিকতার মূল করলেন কুঠায়াঘাত, নতুন নতুন অভিনেতা-অভিনেত্রী



সৃষ্টি করলেন নাটক রচনা করালেন, নতুন নতুন নাট্যকার সৃষ্টি করলেন। সুর বোজনায়, শিরসজ্জায়, প্রয়োগ-নৈপুণ্যে সব দিক দিয়ে তাঁর নাট্যোপহার যুগান্তর সৃষ্টি করল। তাঁর কল্যাণে বাঙলাদেশ পেল বিশ্বনাথ ভাট্টা, বোগেশ চৌধুরী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, রবি রায়, জীবন গাঙ্গুলী, শৈলেন চৌধুরী, অমিতাভ বসু, ঈতল গাল, তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায়, অমলেন্দু লাহিড়ী, বঙ্কা, প্রভা, মালিনী শেফালিকা প্রমুখ দিকপাল শিল্পীদের, শিশিরকুমারের কল্যাণে বাঙালার রঙ্গমঞ্চ পেল দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, হেমেন্দ্রকুমার রায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সুরকার গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, শিল্প নির্দেশক চাক রায় ও রমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণচন্দ্র দে, এম, ভূব প্রমুখাং গুণীজস্যেয় সেবা।

অটল ব্যক্তিত্বের অবিকারী, প্রবীর পাণ্ডিত্যের আধার, সারস্বত সমাজের গর্ব ও গৌরব এই বিরাট পুরুষের মৃত্যুতে ইতিহাসের একটি গৌরবময় অধ্যায়ের ববনিকা পতন ঘটল। শিশিরকুমারের মৃত্যুতে বাঙালী যে সম্পদ হারাল বহু বছরের মধ্যে সেই শূন্যস্থান পূর্ণ হবে বলে মনে হয় না। দেশ হারাল তার বর্তমানকালের শ্রেষ্ঠ সন্তানকে, মাসিক বহুমতী হারাল তার একজন অশেষ শুভাকাঙ্ক্ষীকে, তার একজন অকৃত্রিম কল্যাণকামীকে, তার মতবাদের একজন বিশেষ সমর্থককে।

বর্তমানে, সারা জাতির কর্তব্য নাট্যাচার্যের উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষার তার গ্রহণ করা। অল্প দেশ হ'লে এ বিষয়ে আমরা সরকারের কাছে প্রস্তাব পেশ করতুম, কিন্তু এ দেশে সরকার কই? এখানে সরকার বলতে বা বিদ্যমান, তা প্রকৃতপক্ষে সরকার শব্টির ব্যঙ্গ। তাই এদেশের সরকারের কাছে কি আবেদন করব? যে কাপ্তানজানশুজ, চকুলজ্জাহীন সরকার অতবড় বিরাট পুরুষের জীবদ্দশায় তাঁকে কোন সম্মানই দিল না, অত বড় প্রতিভাকে বধাবধ সমাদর করতে পারল না—যে জায়নিষ্ঠ, আদর্শসেবী, তেজস্বীপুরুষের মৃত্যুতে সরকারপক্ষ থেকে কোনরকম শোক পালন করা হ'ল না, তাঁরই স্মৃতিরক্ষার জন্মে সেই সরকারের কাছে আর্জি জানিয়ে মাসিক বহুমতী তাঁর বিরাট আত্মার অসম্মান কোনও দিনই করবে না। আমাদের সনির্বন্ধ আবেদন জনসাধারণের কাছে, বাদের সেবার তাঁর জীবন উৎসর্গিত, বাদ্যের শ্রদ্ধার উত্তম আসনে

তিনি সমান। অল্প বেশ হ'লে শিশুকুমারের মত অসামান্য শিল্পীর স্মৃতিরক্ষার ব্যাবাণ্য ব্যবস্থা সরকার পক্ষ থেকেই অবলম্বন করা হোত। এ সম্বন্ধ আমাদের ভাববার কিছু থাকত না, কিন্তু এই স্বাধীন দেশে তা তো হবার নয়, সেইখানেই তো আমাদের সব চেয়ে বড় বাধা, সব চেয়ে বড় বেদনা, সব চেয়ে বড় হতাশা। তাই জনসাধারণ ছাড়া এ দুঃখ কার কাছে জানাব, জনগণ ছাড়া এ বাধা উপলব্ধি করবে কে—কারণ তারা প্রত্যেকেই সমান অংশে এই বাধার ভাগীদার। শিশিরকুমারের জন্মস্থান ও মৃত্যুস্থান জাতীয় সম্পত্তির তালিকাভুক্ত হওয়া উচিত। বিশ্ববিদ্যালয়ে, ইনষ্টিটিউটে, বিজ্ঞানাগর কলেজে তাঁর ব্যাবাণ্য স্মৃতিরক্ষা হওয়া উচিত, মহানগরীর প্রেক্ষাগৃহগুলির অর্থলোভী পরিচালকবর্গের কাছ থেকে প্রকাজে কৈফিয়ৎ দাবী করা উচিত যে কোন সাহসে সেদিন তাঁদের প্রেক্ষাগৃহগুলি চালু রেখে এতখানি অকৃতজ্ঞতার ততোধিক অমানুষিকতার পরিচয় তাঁরা দিতে পারলেন। মিনার্ভা থিয়েটারের তনুছি নটগুরু নামাঙ্কসারে নতুন নামকরণ হবে, কর্ণওয়ালিশ থ্রীটের নাম বদলে এ বাস্তার নামকরণ শিশিরকুমারের নামাঙ্কসারে হবে অনেকে বলবেন—ও রাস্তা রবীন্দ্রনাথের নামে হচ্ছে যে, আমরা বলব হোক না, ভ্রামবাজারের মোড় থেকে বিবেকানন্দর মোড় পর্যন্ত শিশিরকুমারের নামে হোক, সেখান থেকে কলেজ থ্রীট সহ বউবাজারের মোড় পর্যন্ত অর্থাৎ বাড়সার সাহিত্যপল্লী হোক রবীন্দ্রনাথের নামে, আর একটি বেধার উপর রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর অন্ততম প্রধান ভাবশিষ্য শিশিরকুমারের নামাঙ্কিত রাস্তা দুটির পাশাপাশি অবস্থান হবে সকল দিক দিগেই শোভন। শিশিরকুমারের নামাঙ্কসারে ত্রিপুরার অঙ্গুরে নির্মাণমান একটি পার্কের নামকরণের ও সেখানে তাঁর একটি মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব উঠেছে। জনসাধারণের দরবারে এই আমাদের বিশেষ অনুরোধ যেন তাঁরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এসিয়ে এসে তাঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই প্রতিটি প্রস্তাবকে কার্যে পরিণত করে তুলুন বা নটগুরু স্মৃতিরক্ষার জন্তে আরও বা বা ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন সে সব বিষয়ও তাঁরা স্বরূপান হয়ে এই 'উপেক্ষিত, অনাদৃত, অভিমানী অধত বাড়সার রাজ্যের নতুন প্রাণের অমর প্রতিষ্ঠাতার উদ্দেশে প্রণাম নিবেদন করুন।

মৃত্যুকরী শিল্পীর অমর আত্মার উদ্দেশে আমাদের প্রাণের প্রণাম নিবেদন করে কবিগুরু ভাবার বসি—

মরণ-সাগর পারে তোমরা অমর

তোমাদের স্মরি—

স্মৃতির টুকরো

[পূর্বপ্রকাশিতের পর]

সাধনা বসু

আসন্ন-হিমালয়গামী যে বিরাট ভারতবর্ষ—আমার জন্মভূমি, আমার মাতৃভূমি, আমার পিতৃপুরুষের পুণ্যপবিত্র ভূমি—তার বিশিষ্টতার যেন শেষ নেই, সীমা নেই, ইতি নেই। ভারতবর্ষের মাটিতে মাটিতে বৈশিষ্ট্যের বীজ। ভারতবর্ষ শিল্প-সৌন্দর্যের 'দেশ এক কথায় (বিশেষ্য কাছের বিশেষ করে) সব পেয়েছির দেশ।

ভারতের প্রতিটি নগর-জনপদ-গ্রাম শিল্পসত্তার ভরপুর। ভারতের শিল্পপ্রাচুর্য বিদেশীর মনে জুগিয়েছে ইঁদ্রী অন্ধদিকে বিশ্বর ও সম্ভব। ভারতের এই শিল্পরূপী মনিমানিকা বিদেশের দরবারে ভারতকে এক প্রধান আসনে অধিষ্ঠিত করেছে (অবশ্য এক্ষেত্রে ভারতীয় সংস্কৃতির অজ্ঞাত অঙ্গগুলির অবদানও কম নয়)। অজ্ঞাতা ও ইলোরার নাম এই প্রসঙ্গে দাবী রাখে বিশেষ উল্লেখের। অজ্ঞাতা ও ইলোরা, যেখানে সৌন্দর্য শব্দটি অভিধানের বহু আবহাওয়া কাটির জীবন্ত হয়ে উঠেছে, ভারতের ঐতিহ্যের এক মহিমাযিত রূপ যেখানে পরিদৃশ্যমান, ভগবৎশক্তি শক্তির অধিকারী শিল্পী ও ভাস্করদের কর্মকৃতিত্বের যেন অমলিন স্বাক্ষর। এই শিল্পীরা কালজয়ী ভাস্কর্যও নমস্ত।

সুইর বাড়লা দেশের মেয়ে আমি। মাইলগত দুবছর বিরাট ব্যাঘাণ, কিন্তু যেখানে ছনয়ের যোগ সেখানে সে একান্ত নিকটে। ছেলেবেলা থেকেই শুনে আসছি অজ্ঞাতার গল্প, ইলোরার কথা। কত গল্পে দেখতুম অজ্ঞাতা-ইলোরার উল্লেখ, কত জনের মুখে শুনতুম অজ্ঞাতা-ইলোরার মাধুর্যের বর্ণনা, কত গ্রন্থে, কত পত্রিকায় দেখতুম অজ্ঞাতা-ইলোরার অনবদ্য শিল্পসত্তার নিদর্শনবিশেষ। এইভাবে হঠাৎ একদিন অজ্ঞাত করলুম যে অজ্ঞাতা-ইলোরা দেখার প্রবল এক ইচ্ছা ধীরে ধীরে বেড়ে উঠেছে আমার মনে। বছরের পর বছর কোট বায়, নিজের জীবনের ইতিহাসও কত বিভিন্ন পরিবেশে কত বিভিন্ন রূপ নেয়, কত কিছু গুলটপালট হয়ে বায় চোখের সামনে দিগে কত নতুন নতুন অভিজ্ঞতার ভরে উঠতে থাকে এ জীবন, কত ঘটনা-কাহিনী অধিকার করে নেয় স্মৃতির মঞ্জুর। তবু সেই ছেলেবেলা থেকে যেন যে হৃদয় বাসনা জেগেছে অজ্ঞাতা, ইলোরা নিজের চোখে দেখার, সেই বাসনার এতটুকু ভাঁটা পড়ে না বরং বত দিন বায় অজ্ঞাতা ইলোরা দেখার অভিপ্রায় যেন প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে ওঠে, তীব্র ভাবে যেন আমার আকর্ষণ করতে থাকে দূর থেকে অজ্ঞাতা আর ইলোরা, মানসচক্ষে যেন স্পষ্ট দেখতে পাই অজ্ঞাতা আর ইলোরার হাতছানি।

ছায়াছবির জগতে নিজেকে যুক্ত করেছি, সেই ছায়াছবিকেই উপলক্ষ্য করে আমাদের বেতে হয়েছে বোঝাই। সেখানে কাজ করতে হয়েছে, সেখানে বাসা বাঁধতে হয়েছে। চিরকালের জন্তে না হলেও কিছুকালের জন্তে বোঝাইয়ের বাসিন্দা হতে হয়েছে।

অজ্ঞাতা ইলোরা দেখার বাসনা এই সময় আরও তীব্র হয়ে উঠল, যেন পড়ে, ঐ সময় কাজে অকাজে প্রায় সকল সময়ই কথার কঁকে কঁকে প্রকাশ করে থাকতুম আমার বাল্যকাল থেকে অন্তরে লালিত এই ইচ্ছাটি।

কুমকুম শেষ হল। কাজের পর কিছুটাতো বিরতি, সাময়িক অবকাশ শুধু বিগ্রামই আনে না সঙ্গে সঙ্গে আনে এক অদূত আনন্দও। এই আনন্দকে উপভোগ করা চলেও নানারকমে। বঙ্গুর বুলবুল (সুরেন্দ্র দেশাই) তখন জানালেন অজ্ঞাতা ইলোরা দেখার ব্যবস্থাদি তিনি করতে পারেন না তাঁর এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু ত্রীমতীণ হোগালি তখন জলগাঁওয়ের (আরকবাদের কাছে) ডি, এস, পি অর্থাৎ Deputy Superintendent of Police- তাঁর কাছ থেকে অজ্ঞাতা-ইলোরা দেখার আমন্ত্রণ এল। বাবা! শু-

গভীণ এবং আমি ভলগাঁও-র সতীশের বাড়ীলোতে কিছুদিন ছিলুম। ঐ সময় সতীশ আমাদের প্রতি যে কি বড় নিয়েছেন এবং আমাদের সুখ সুবিধের দিকে যে কতখানি লক্ষ্য রেখেছেন তার তুলনাই হয় না।

সতীশের বাড়ীলো থেকে আমরা বাত্ৰা শুরু করলুম অজন্তা-ইলোরা অভিমুখে অর্থাৎ প্রকৃত গুপ্তবাহুল্যের দিকে, কবিগুরুর ভাবার পুনরাবুত্তি করে বলতে হয়—আমাদের বাত্ৰা হল শুরু। আমাদের সকলের দৃষ্টি বা প্রবল ভাবে আকর্ষণ করেছিল—বিশ্বের বা হতবাক করে দিয়েছিল আমাদের—বা আমাদের একেবারে আশ্চর্য করে দিয়েছিল, তা হচ্ছে এই অভিযানে বাবার অসাধারণ আগ্রহ, উৎসাহ, উদ্দীপনা, বাবার সে কি ক্ষুভি। প্রাণপ্রাচুর্য, স্পন্দনে, উল্লাসে বাবা যেন ভরে আছেন, অনেক বছর পিছনে ফেলে আসা দিনগুলোকে যেন আবার হাতের মুঠোর তিনি পেয়ে গেছেন, অতীতের তারুণ্য যেন আবার নতুন করে বাগা বেঁধেছে তাঁর মধ্যে। বাবার সে বৌবনোচিত চাকল্য আমি কোনও দিন ভুলতে পারব না। এক অবর্ণনীয় গতিবেগে আমাদের অনেক পিছনে পিছনে ফেলে রেখে তিনি এগিয়ে চলেছেন, বাস্তবিক—আমরা উঠতে উঠতেই দেখি, সে জারগা পেরিয়ে আরও অনেকখানি তিনি এগিয়ে গেছেন। সেদিন আনন্দের এক অপূর্ণ ঔজ্জ্বল্যের অভিনব প্রকাশ দেখলুম বাবার মধ্যে।

অজন্তা-ইলোরা দেখলুম। দেখলুম চর্মক্ষে, এতদিন বাক্য মনশ্চক্ষে দেখেছি, আজ তাকে প্রত্যক্ষ করলুম চর্মক্ষে, আবার প্রথম বৃহত্তে বাক্য চর্মক্ষে প্রত্যক্ষ করলুম, তার পরবৃহত্তেই তাকে দেখতে পেলুম মর্মক্ষে। এতদিনের স্বপ্ন আজ দেখা দিল সার্বিকতার রূপ নিয়ে। আশা পূর্ণ হল, চোখ খল হল, মন মুক্ত হল। দেখলুম ভারতের অসামান্য শিল্পসম্পদ, শিল্পের মায়াপুরী, শিল্পের নন্দনকানন, শিল্পের মহাতীর্থ। আমাদের অকৃত ভাবে আকৃষ্ট করেছিল বৌদ্ধ ভিক্ষুদের দেওরাল চিত্রগুলি, ঐ দেওরাল চিত্রগুলি আমার মন এতখানি অধিকার করেছিল তা বল বোঝাতে পারব না ঐ দেওরাল চিত্রগুলির প্রভাব আমার নতুন নতুন নৃত্যনাট্য রচনা করার সঙ্কল্পে উদ্গুহ করে, আমার চোখে আবার নতুন স্বপ্নের জন্ম দেয়, আমার জোগাতে থাকে অকুণ্ঠ অল্পপ্রেরণা আর আমি তা করেও ছিলুম পরবর্তী বছরগুলিতে।

১৯৪০ সালটি আমাদের জীবনের একটি স্মরণীয় বছর।

শিশিরকুমার

করঞ্জাক বন্দ্যোপাধ্যায়

দূর সেই অতীতের বছর মাঝারে
গিরিশ অধেন্দু আদি জ্যোতিষর আলো
প্রাকৃতিক নিয়মেতে গেলে পরপারে
অহানিশা দেখা দিল রক্তরঞ্জে কালো।
সেদিন ভাবেনি কেহ দীপ্তরবি নব নব
দেখা দিবে আর বার প্রদীপ্ত প্রভার
বজ্রভূমি মুক্ত বার দানে অভিনব

আমাদের জীবনে এসে প্রভাব অমলিন, আমাদের জীবনের বহমান ধার! এক ভিন্নতর শ্রোতে বইতে থাকল এই ১৯৪০ থেকেই, আমাদের জীবনের ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়ের সৃষ্টি হল এই ১৯৪০ এর কল্যাণে। ভাগ্যদেবতার মুঠো মুঠো আশীর্বাদে আমরা ভরে উঠলুম, প্রথম কাঙ্ক্ষিকের অপার করণায় আমরা ধন্য হলুম, জীবনের চলার পথের নির্ধারিত সীমানা পেরিয়ে এসে আরও বৃহত্তর পথে পদার্পণ করে আমরা পূর্ণ হলুম। জীমিনলাল দেশাই প্রভাব আনলেন যে এমন একটা ছবি করা থাক বার পরিধি, বার ব্যাপকতা, বার প্রসার হবে জগৎজোড়া। এবার শুধু ভারত নয়—সারা জগৎ, এতদিন শুধু ভারতের দরবারে চিত্রাঞ্জলি দিয়ে আসা হয়েছে। এইবার সেই অঞ্জলি পাঠাতে হবে জগতের দরবারে—এক কথার বার পরিধি হবে আন্তর্জাতিক। ঠিক এই জাতীয় ছবি করার বাসনা মধুর মনে দীর্ঘকাল ধরেই বাসা বেঁধেছিল। বাড়ালীর ছেলে মধু, অল্পপূর্ণা বাঙলা মায়ের সন্তান সে, স্বভাবতঃই দেশীর সন্তান সে সর্বদেশের দরবারে উজাড় করে দিতে উৎসুক, ব্যাগ্র, উন্মুখ। আর কুলকুলের সঙ্গে তো আমাদের মধ্যেই বনিষ্টতাই ছিল সেই জন্মেই এই প্রভাবে সেও সম্পূর্ণরূপে সার দিল। ছবির প্রযোজনায় তার গ্রহণ করলেন বোম্বাইয়ের ওয়াদিয়া মুভিটোনের মিঃ জে. বি. এইচ, ওয়াদিয়া। ছবির নির্মাণ কণ্ঠে অনেক কীতিমান কুশলীজের নিপুণ হাতের স্পর্শ পড়ল। আলোকচিত্রের তার গ্রহণ করে ছবির গল্পাংশকে রূপালী পদার জীবন্ত করে ফুটিয়ে তুললেন বাংলা দেশের দুই বিখ্যাত ও প্রবীণ চিত্রকর—একজন শ্রীমতী দাস অপরজন শ্রীপ্রবোধ দাস, দুজনের মায়াজাল বুনে ছবির সারাটি সঙ্গে এক অনবদ্য রসসংকার করলেন প্রখ্যাত সুরকার ভিন্নিরবরণ, সম্পাদনার হুজুর দারিদ্রতার গ্রহণ করলেন শ্যাম দাস, ছবির শিল্পের অলঙ্করণ ও শিল্পসজ্জার ভার নিশেন সুরাংগ চৌধুরী। ওয়াদিয়া মুভিটোনের মিঃ টাটাকে পাওয়া গেল রেকর্ডিং-এর কাজে। প্রযোজক মিঃ ওয়াদিয়া এবং মিসেস ওয়াদিয়াও এগিয়ে এলেন স্বতঃপ্রসূত হয়ে তাঁদের প্রগতিধর্মী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে, গোষ্ঠীর প্রতিটি কর্মীর জন্তে প্রাণতরা-সহযোগিতা নিয়ে, উৎসাহ নিয়ে, অল্পপ্রেরণা নিয়ে। এই বিবর্তী পরিকল্পনার বাস্তব রূপদানরত প্রতিটি কর্মীর মনকে ওয়াদিয়া সম্পত্তির এই সহায়দৃষ্টিশীল মনোভাব যে কত গভীর ভাবে স্পর্শ করেছিল—তার উল্লেখ নিশ্চয়োজন, সে কথা বলাই বাছল্য। [ক্রমশঃ।

অভিবাদ : কল্যাণাক বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাবি এক, হয় আর

দিলীপকুমার রায়

ইতালি

এক

কুপেতে উঠেই পল্লব দেখে যুবক। যুবক বলে জর্জনে : Gott
sci dank, mein Freund !^১ ভাবছিলাম কত কী ?

মানে ? আমি জানব না ?

কে জানে ভাই ? সাক্ষাৎ শেক্সপীয়ার যখন বলেছেন :
সাধনান, প্রেমিক, পাগল ও কবি এদের মধ্যে চেনা যায় না কোনটা
কে।

পল্লব হাসে : বলে থাকতে পারেন, কিন্তু আমি আসব বলে
যখন কথা দিয়েছি, তোমাকে দিয়ে, টিকিট কিনিয়েছি।

যুবক এবার ধরে ইতালিয়ান বুকনি : L'amore é divina,
ma terribile^২ কথা দিয়ে কথা ভাঙা কোন কথা যে হৃদয় দিয়ে
হৃদয় ভাঙে দাদা ! কিন্তু ঠাটা থাক। তোমার কাছে আমার
একটি মিনিতি আছে।

ট্রেন ছাড়ল...

মিনিতি ?

হ্যাঁ। তুমি তোমার তাঁকে লিখে দাও যে আমি জানতাম না।
কী ?

যে এরি মধ্যে তোমার হৃদয় তাঁর হয়েছে—তাঁর হৃদয় তোমার।

পল্লব ঈষৎ লজ্জা পেয়ে বলে : খবরটা দিলেন কিনি, তুমি ?

যুবক এবার ফরাসি বুকনি ঝাড়ে : Que vous êtes
indiscrét, moncher !^৩

নাভালা নিশ্চয়ই ?

তবু জেরা ? শোনো, আমি সত্যিই দুঃখিত, বিশ্বাস করো।

দুঃখিত কেন ?

তোমাকে তাঁর কাছছাড়া কয়লায় বলে।

তাতে কী ? দুদিন বাদেই তো ফের দেখা হবে।

কে বলতে পারে ভাই ? ঐ হৃদয় কবিতাই কি ফের কুড়াক
ভাকেন নি—there is a tide in the affairs of men...?

পল্লবের বুকের মধ্যে ফের ধক করে ওঠে। মনে পড়ে বিকেল
বেলা আইরিশের একটা কথা : যদি আর দেখা না হয় ?

যুবক কটিতি হেসে বলে : ও কী ? আমি স্বভাবে অগলুত
জানোই তো—হুমদাম করে কখন কী বলি ! না না, বিরহিণীর
সঙ্গে বিরহীর দেখা হবে বৈ কি যখন ভরসা দিয়েছেন অকুতোভয়ে
যে সে কবি নয়, কবিরাজ রাজরাজ দাস্ত আলাগিয়েরি :

L'amor che move il sole e l'altre stelle^৪

১। ভগবানকে যত্ববাদ, বন্ধুত্ব।

২। প্রেম স্বর্গীয় বটে, কিন্তু ভয়ানক।

৩। এমন প্রশ্ন কবে, বন্ধু ?

৪। যে প্রেমের চির নির্দেশে ধায় ভ্রমণ ও ভাবাদল।

কেবল তবু তুমি তাঁকে লিখে দিও যে প্রেমের এ কমতা 'জান্না
সবেও আমি তাঁর পথের কাঁটা হয়েছি শুধু না জানার দরুণ।

পল্লব হাসে : ভর নেই—সে নিজেই বলেছে আমাকে ইতালি
যুরে আসতে।

খাঁচায় চুকতে না চুকতে দোর খুলে দেওয়া ?

খাঁচাতত্ত্বের সে কী জানে তুমি যে তিরদিন গাছে গাছে কুকু
করেই বেড়ালো ?

যুবক ওর দিকে একটু চেয়ে বলে : একটু কোণঠেসা করেছ
মানছি। বলেই হাই তুলে : একটু কফি আনানো থাক, কী
বলো ? সারাদিন যে ছুটোছুটি করিয়েছ ! বলেই বোতাম টিপল।

উন্টো চাপ ? কব কারদা বুঝি ?

অথ পড়িচারকের অভ্যাস।

যুবক জর্জনে বলে : Bitte eine kaffekanne und Zwei
tasse !^৫

Sofort, mein Herr !^৬ বলেই অভিবাদন করে
প্রস্থান।

যুবক অভিজ্ঞ হাসি হেসে বলে : একটি কফিপট তিন পেয়াল
ভরিয়ে দেয়, বন্ধু। অথচ দাম দিতে হয় দু পেয়ালার মাত্র। বলেই
খেমে : কিন্তু জর্জন ট্রেনের এই দাক্ষিণ্যের কথা জানে কেবল—
নিজের বুক হাত রেখে—The duffer that has been
taught to roam but not—পল্লবের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে
—The duffer who sighs for home, sweet home !

পল্লব হেসে বলে : But who still entrains for Rome.
যুবকও হাসে।

দুই

ওঃ যখন রোমে পৌঁছল তখন সন্ধ্যা আকাশে মেলে ধরেছে তার
ঝিকঝিকে পাখা। ট্রেন রোমের ষ্টেশনে থামতেই একটি সুরঙ্গা
সুবেশিনী মধ্যবয়স্ক ছুটে এসে যুবকের দুই গালে চুম্বন করলেন।
যুবক পল্লবকে তাঁর সামনে পেশ করে যথাবিধি হাঁকল : সিজোর
পল্লব বাকচি—সিজোরীনা এলিওনোরা জেনোনি—আমার বর্তমানের
বাক্তরী তথা দুদিনে আশ্রয়দাত্রী—I' attrice famosa e
graziosa^৭।

পল্লব যথাবিধি অভিবাদন করে ট্যান্স নিল।

Albergo Luna, per favore !^৮

পথে মন ওর একটু প্রফুল্ল হয়ে উঠল ভাবতে যে মোহনলাল
ও রিতা হরত ইতিমধ্যে এসে পড়েছে।

* * * *

হোটেলটি বড় নয় কিন্তু ছবির মতন সুন্দর। শহর থেকে একটু
দূরে। সামনে একটি ছোট বাগান লতায়-পাতায় ফুল ভরা।
জর্জবির কোলাহল ও শীতের পরে এ মনোরম উদ্যানবাটিকায় এসে
পল্লবের কী যে ভালো লাগল—বিশেষ করে ইতালির নিবেশ আকাশ
আর স্নিগ্ধ হাওয়ার দাক্ষিণ্য।

৫। একটি কফিপট ও দুটি পেয়াল, দয়া করে।

৬। এফুগি, মহাশয়।

৭। প্রখ্যাতা ও কমন্সের অভিনেত্রী।

৮। লুনা হোটেল, দয়া করে।

কেবল কোথায় মোহনলাল? লুনা হোটেলের অধ্যক্ষ কোনো
ধবরই দিতে পারল না। একলা পড়ে ফের ওর মন কেমন করে
ওঠে আইরিশের জন্তে।

* * * *

ক্লান্ত হয়ে বিছানায় শুতে না শুতে ঘুম। স্বপ্ন দেখল:
আইরিশ নাভাশার ওখানে শিয়ানো বাজিয়ে গান গাইছে, মাশা ও
কাতিয়া সামোভার থেকে চা ঢালছে, আর নাভাশা এক কোণে হ'
হাতে মুখ ঢেকে বসে।

ঘুম ভেঙে গেল। আইরিশের কথা ভেবে ওর বুকের মধ্যে টন
টন করে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে নাভাশার কথা: আইরিশের
ঘরে দুহাতে মুখ ঢেকে তার সেই কান্না, আর আইরিশের উক্তি:
পারো তো ওকে ক্ষমা কোরো, ও বড় দুঃখ পেয়েছে। পল্লবের মনে
বিবাদ ছেয়ে আসে—বোটারি নাভাশা!

তিন

পল্লব কুসুমকে রোমের ঠিকানা দিয়ে তার করল: মোহনলাল
রওনা হয়েছে কি না জানিও, আমি তার জন্তে রোমে অপেক্ষা
করছি। দু-দিন বাদে তার এল মোহনলালের কাছ থেকে:
ইতালী বাওয়া পেছিয়ে গেল। চিঠিতে সব লিখছি।

কিন্তু চিঠি আসতে তো অন্তত এক সপ্তাহ। কী করা যায়?
ভেবে-চিন্তে স্থির করল: অপেক্ষা করাই পছন্দ। যখন এসেই পড়া
গেছে। রোজই ইচ্ছা হয় বার্লিনে ফিরতে, কিন্তু আইরিশকে ব'লে
এসেছে যে নিজের মনের সঙ্গে সুখোমুখি হ'তে হবে একেবারে
একলা। এখন সাত ছাড়া ছাড়া ফিরলে মুখ থাকবে না। মনে
মনে আঙড়ার বিষয় হ'লে: নিয়তি: কেন বাধ্যতে?

* * * *

কিন্তু মাতৃয়ের মন তার উপর যৌবনের আরোগ্য শক্তি: পল্লব
দু-তিন দিনের মধ্যেই খানিকটা ফিরে পেল ওর সহজ প্রকৃতি।
কেবল একটি চিন্তা ওকে বেঁধে ক্রমাগতই: কুসুমের চিঠির উত্তর
দিতে এত দেরি ও কখনো করে নি—চার পাঁচ দিন হ'য়ে গেল।
একবার ভাবল আইরিশের কথা সব জেখে—কিন্তু তার পরেই
আসে কুঠা: থাক এত ভাড়া কী? মনটা আগে একটু স্থিরই
হোক। তাছাড়া কুসুম সবে জেল থেকে বেরিয়েছে, তার উপর
অসুস্থ—এ সময়ে কাজ কি ওকে 'শুক' করে?

* * * *

একলা একলা মন লাগে না। দু-চার দিনের মধ্যে ওর মন
আরো একটু সহজ হ'য়ে আসতে জনাবণ্যের মধ্যে নিঃসঙ্গতার রস
যেন আরো বেশি ক'রে পায়। তবে একেবারে নিঃসঙ্গ বলা যায়
না—বেহেতু প্রত্যাহ বণ্টা তিন-চার ক'রে কাটে কুসুমের সাহচর্যে।
এলিওনোরার ভিলা রোম থেকে মাইল পনের দূরে, কিন্তু সে ভয়ে
কম্পিত হয় কুসুমের স্বর বলত কুসুম ওর স্বভাবসিদ্ধ প্রসঙ্গ তুলে।
ব'লেই মুখে মুখে ছড়া কাটত গৈরিশী ক্রন্দে (বহু ভাবাবিৎ হ'লে
হবে কী—ওর মাতৃভাষা তো বাংলাই বটে):

এলিওনোরার ববে আছে বহু, দুইটি মোটর,

ভর কাবে আর?

সিনেমায় প্রাক্কালে যায় সে দিনের পরে দিন

একটি মোটরে যায় বান্ধবী যখন—

বান্ধবের দেয় ধার দ্বিতীয় শুশুন খুশি মনে,

যায় যে পেট্রোল বেগে সাড়ে সাত ক্রোশ

অবলীলাক্রমে সখা, অবলীলাক্রমে।

সব চেয়ে ভালো গণি এই ব্যবস্থায়

পরের মোটর বানে হওয়া ভ্রাম্যমান:

মোটরের স্বক্তি নাই, আছে শুধু ভ্রমণ বিহার!

চলো তাই চলো

ইতিউক্তি—যথা প্রায় চায়।

ঘণ্টা দুই প্রতিদিন করা বাক রোম-পরিক্রমা,

দেখি' রাশি রাশি ধ্বংসস্থাপ, কাটাকোষ,

জাকালো ঐতিহাসিক চিত্রশালা, গির্জা, ভ্যাটিকান

গণিক চ্যাপেল-আদি—যাহা পেশাদার টুরিষ্টের

স্বপ্ন লক্ষ্য ভবে—

বা দেখি' সে হয় কালচার্ড, লভে জ্ঞান,

যদিও কী মূল্য সেই কালচারের অর্থবা জ্ঞানের

জানে না কেহই অজ্ঞো হার।

তথাপি হবেই হবে দেখিতে সে-সবই,

বেহেতু এ সব দেখি' তবেই না বাবাবর উৎকৃষ্ট ডাকার

মহাগর্বে ওঠে ফুলি, ভাবিয়া—'দেখনি

এ সব তো গৃহাঙ্গী নিকৃষ্ট ডাকার।'

পল্লব যতই কুসুমের সঙ্গে মেশে ততই বেন বোঝে বেশি ক'রে
একটি কথা: হাসতে ও হাসতে পারা জীবনে প্রায় একটি
প্রতিভার সামিল। অথচ কেন বেন ওর মনে হয় কুসুমের হাসি
একটা সুখোষ—Laughter veiled in tears—আর তাই
জন্মেই ওর হাসি, রসিকতা হ'য়ে উঠেছে এমন সমৃদ্ধ।

চার

কুসুমের সঙ্গে মোটরে ঘুরে ঘুরে পল্লবের বাঁটি উৎকৃষ্ট ডাকারের
পদবী লাভ হোক বা না হোক এই একটা লাভ হ'ল যে রোমের
পঞ্চাট অনেকটা জানা হ'য়ে গেল। এছাড়া প্রত্যাহ দু' তিন ঘণ্টা
ক'রে ইতালিয়ান পড়তে পড়তে ইতালিয়ানে ফরাসি ভাষার মতন
স্বচ্ছন্দে কথাবার্তা চালাতে না পারলেও এ প্রতিভার সাক্ষাতিক
ভাষাটির মার্ভরসে ওর মন রসিয়ে উঠল। এখানে ওখানে
ইতালিয়ানদের কথাবার্তা শুনে শুনে ওর কানও ক্রমশই খুশি
হ'য়ে উঠতে থাকে—আর সঙ্গে সঙ্গে অসুখপ্রিয় গান পাগল
জাতিটির গুণাগুণ সবক্ষেত্রে ওর অনেক কিছু জ্ঞান লাভ হ'তে থাকে
যার মধ্যে শুধু তথ্যই নেই, রসও আছে। কুসুম মিথ্যা কলেনি:
এক একটা ভাষা দেখা মানে মনবিহ্বলের একটি ক'রে নতুন
আকাশের খবর পাওয়া। তাছাড়া শহর হিসেবে রোমের সৌন্দর্যও
সত্যিই মুগ্ধ হ'ল। এখানে নেই বটে লণ্ডনের বা বার্লিনের
পরিস্ফুটতা, পকেট কাটার উপজব এখন দারুণ, রাস্তাঘাট পার
হ'তে বেগ পেতে হয়, ট্রাফিক পুলিশের চিহ্নও কোথাও নেই,
রেলস্টাণ্ডে পরিচারকের স্বপ্নস্বপ্নতার একান্ত অভাব, যেখানে সেখানে
পথিকদের বগড়া—এক কথায়, গোলমাল, বিশৃঙ্খলা, অসুবিধা—

যেমনি সানানন্ড তেমনি সৌন্দর্যবিলাসী; যেমন মঞ্জুবাক তেমনি সহজিয়া। আইরিশের তাড়না না থাকলে এখানে ও সহজেই ছুতিন বৎসর পরম সুখে কাটাতে পারত—নিশ্চয়ই পারত।

কিন্তু তবু আট মশ দিন বেতে না বেতে ওর কেমন বেন মনে হ'তে থাকে—কী করছি এখানে? ছুটি? কিন্তু ছুটি বখন দীর্ঘায়িত হ'তে হ'তে লক্ষ্যহীন আলসেমিতে পরিণত হয় তখন বিবেক ওঠে মাথা চাড়া দিয়ে। ও স্থির করল—বদি এখানে মোহনলালের আসা পর্যন্ত থাকতেই হয় তাব অন্তত একটু ইতালিয়ান গান শিখলে মন্দ কি? কয়েকটা ইতালিয়ান গান ও বার্লিনেই শিখেছিল ওর শিক্ষক ও আইরিশের কাছে কিন্তু সে তো উপর উপর দেখা। এখানে একটু রীতিমত শিখলে এক টিলে দুই পাখি মারা যায়—ছুটির রসও সমৃদ্ধ হ'রে ওঠে, বিবেকেরও সুখ চাপা দেওয়া হয়। সকালটা ইতালিয়ান পড়ে, দুপুরটা সুস্থকের সঙ্গে ভ্রমণে কাটে, কিন্তু বিকেল আর সন্ধ্যায় করে কি? এর একটা বিহিত না করলেই নয়।

রোজ সন্ধ্যাবেলা পল্লব সূনা হোটেলের একাই খেতে বসত ভাইনিং ক্রমের এক কোণে। সেখানে পাশের টেবিলে দেখত একটি দীর্ঘাকৃতি, অক্ষয়ান, সৌরবর্ণ যুবককে। ওর সুখে কমবীরতার সঙ্গে ছিল তেজস্বিতার আভা। পল্লবের ওপর সঙ্গে আলাপ করবার ইচ্ছা হয়। কিন্তু ও পল্লবের সঙ্গে চোখোচোখি হলেই এমনভাবে চোখ ফিরিয়ে নেয় যে পল্লব ভরসা পায় না এগোতে। একদিন হোটেল ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করার সে বলল : সিন্তোরের নাম পাপিরো, এর বেশি কেউ কিছু জানে না—E molto riservato।

দিনকয়েক বাদে সুস্থক নিরে ভোজনককে চুকতেই চোখে পড়ে—'সিন্তোর পাপিরো' দুপুর বেলায়ও হোটেলেরই খাওয়া শুরু করেছে। সুস্থক ওকে দেখেই চাপা সুরে পল্লবকে বলে : কব।

স্বকটি নিশ্চয় শুনেতে পেরেছিল, কারণ তৎক্ষণাৎ ওদের দিকে একবার তাকালো, তারপরে ভাড়াটাড়ি আহাির সমাধা করে উঠে চলে গেল। সুস্থক ওর পাইপ ধরিয়ে হেসে বলে : বেশ চোহারা না? বেশ? Damning with taint praise? আমার তো মনে হয় ওর সুখ হ'ল তাই বাকে করাসীয়া বলে distingue, নয়?

সুস্থক ভেবে বলে : তা বলা যায়। কিন্তু—

তুমি যে কী! সব ভাতেই কিন্তু!

সুস্থক হাসে : বলে না—ঘরপোড়া গরু সিঁহরে যেখ দেখলেও ডমার?

আমার ঘর পোড়েনি। স্ততরাং আমি চাই ওর সঙ্গে তাব করতে! উঃ, ও ঘর-ছোঁওয়া দেবে বলে মনে হয় না। বলেই একটু খেমে : জোর করে বলতে পারি না, তবে আমার মনে হয়—ও হয় কোনো দারুণ কাজ নিরে আছে, নয় তোমার মতন কোনো সমস্তার পড়েছে।

আমি সমস্তার পড়েছি—কে বলেছে? নাভাশা?

কে?

না বলতেই হবে, আসি ছাড়ব না আজ।

সুস্থক একটু চুপ করে থেকে বলে : তুমি বখন ঘরেই ফেলেছ—আর লুকিয়ে কী হবে? হ্যা—বলেছে সেই যে সইতে পারে নি—তোমারই গান ভাই—'আপন বঁয়্যা আন ঘরে বার আমারি আড়িনা দিয়া।'—না?

কী যে বলে বা তা। বলে—নাভাশা কী বলেছে?

অকথ্য কথা কিছু নয়। বা বটেছে তাই, আর কী?

বলল কবে? কখন?

আইরিশের শয়ন কক্ষে যে সীনটি হয়ে যায়—তার পরেই। বিকেল চারটের ও আমাকে টেলিফোন করে দেখা করতে বলে আসতেই হবে—অত্যন্ত জরুরি ইত্যাদি। কী করি? বেতে হল। কী বলল?

এ ঠিক তোমারি মতন কথা হল। আমাকে বা বলেছে তোমাকে বলতে পই পই করে মানা করে দেয়নি নাকি? বলেই হেসে :

এই আর এক রীতি মেয়েদের সার্বজনীন। তোমাকে বা বলবে যেন ঘৃণাকরেও আমি না জানতে পারি, আমাকে বা বলবে তোমার কাছে উঠলেই সর্বনাশ। জানো না কি এখনো, হে ভুক্তভোগী?

জানি হে সবজ্ঞা! কেবল এইটুকু জানতেই বাকি তুমি এইমাত্র আমার সমস্তার কথাটা তুললে কেন? নাভাশার কাছে শুনে, নিজেরি আশ্বাস?

সুস্থক একমুখ ধোঁরা ছেড়ে হেসে বলে : কী নাছোড়বান্দা! কী হবে বলে তো এসব কালতো কথার? বল একটু হেসে : তুমি নিজেই বুঝবে একদিন।

কী? না, ছাড়ব না। অমন আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে চলবে না।

আরে তাই, আড়াল আছে বলেই তিন ভূবন চলছে।

বাও। তোমার সঙ্গে আড়ি। এরই নাম বন্ধু বটে।

সুস্থক পল্লবের হাতের উপর হাত রেখে বলে : আমি অনেক কিছু শিখেছি যে ঠেকে তাই। আর একবার নয় বারবার। অনেক পোড় খেয়ে তবে বুঝছি যে, পারে প'ড়ে বন্ধু তো বন্ধু শ্রিয়তমা বান্দবীকেও কিছু বলতে বাওয়া তুল : তাতে লাভের চেয়ে লোকসানই বেশি—তবু যে বলে তার নয় বাকে বলবে তারও।

না। বলতেই হবে আজ। আমার লোকসান হয় হোক সুস্থক একটু চুপ করে থেকে নিচু সুরে বলে : আমার মনে হয় তুমি তুল করেছ আইরিশকে ছেড়ে এসে। তাই তো সেদিন ঠাণ্ডে তোমাকে বলছিলাম আমার খেদের কথা—মানে তোমাকে ছিনিয়ে আনার জন্তে।

কিন্তু ছিনিয়ে আনলে বলছ কেন? আমি তো এসেছি দুদিনের জন্তে বেড়াতে। নাভাশা বলে নি?

বলেছে, কিন্তু ভাই—বলব?

না বললে—

আচ্ছা আচ্ছা বলছি। বলে ফের পাইপে টান দিয়ে : আমার মনে হয় মানুষের জীবনে এক একটা লগ্ন একবারই আসে—হ'বার না জানি বলেই তাকেই যে সে-লগ্ন দেখলেই চিনতে পারে। এ সময়ে দুদিনের জন্তেও তোমার ওকে ছেড়ে এক ঘুরে আসা উচিত হয়নি।

পল্লবের মনে ফের সেই অনামা শব্দার দ্বারা ঘনিষে আসে, সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়—আজ সাত আট দিনের মধ্যে আইরিশের একটি চিঠিও পারিনি, অথচ ও তাকে লিখেছে প্রায় প্রত্যহ! ও যুগ্মকে বলে একথা।

যুগ্মক শুনে : হ' বললই ফের পাইপ টানা শুরু করে।

হ'—মানে কী বলি তাই ভাবছি। তবে একটা কথা বলতে পারি যদি কথা দাঁও—কিছু মনে করবে না।

নিচ্ছি।

আমার মনে হয়, বলে যুগ্মক খেমে খেমে, যে, তোমাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা যে-স্তরে পৌঁছেছে সে স্তরে হৃদয়ের পরামর্শ চাওয়াই ভালো—বিস্তৃত বুদ্ধির নির্দেশে চলতে বাওয়া বোকাশি।

বোকাশি।

Folie, folie mon ami ! ক্যাসী ভাষায় folie pure et simple. জর্জনরা বাক্য বলে—Nartheit, Dummheit, ক্যাপিটাল হরফে, এদেশের ভাষায়—folia—আরো ভাষা করব কি ?

পল্লব গুম্। যুগ্মক ওর পিঠে হাত রেখে কোমলকণ্ঠে বলে :—তাই তো বলছিলাম তাই—জীবন এমন সময় আসে যখন প্রিয়তম বন্ধুর কথায়ও উটো উৎপত্তি হয়। আমি তো বলতে চাইনি।

না না। তোমার তিরস্কার আমি মাথা পেতে নিচ্ছি। কেবল আমি কী করতে পারতাম বলা তো যখন—যখন আইরিশ নিক্সে জোর করল তার আদর্শের কথা বলে।

যুগ্মক আরো নরম সুরে হেসে বলল : তাই, তোমাকে দেখে সময়ে সময়ে আমার বড় মায়া হয়। আর কেন জানো ? কারণ—বললে হয়ত বিশ্বাস করবে না, তবু এ সত্যি যে আমি এক সময়ে ছিলাম প্রায় তোমারই বয়স—মানে হিরো, আইডিয়াল, আর্ট এই সব বুলিকেই মনে করতাম পথের পাথর, তুচ্ছনে দিশারি।

পল্লব আহত সুরে বলে : বুলি ? তুমি কী বলছ যুগ্মক ?

যুগ্মকের মুখে স্নান হাসি ফুটে ওঠে ; বলছি তাই, অনেক যা খেয়েই। কিন্তু এ যা খাওয়াই আমার দরকার ছিল, নৈলে আমার হয়ত কোনো দিনই চোখ খুলত না—মানে, আমি এই পরম সত্যকে সত্য বলে চিনতে পারতাম না যে, ঘোঁরায চেরে বাস্তব বড়—নীতিবাদের চেরে মাছ। শোনো বলি আজ বা এতদিন বলি বলি করেও তোমাকে বলতে পারিনি—এই দ্বিধায় যে তুমি বুঝবে না বা তুল বুঝবে। আজ হয়ত বুঝলেও বুঝতে পারো—আমি কী বলতে চাইছি।

ব'লে নিবস্ত পাইপ ফের ঘরিয়ে ব'লে চলে :—বহুর দেশক আগে যখন আমি তোমারই মতন 'সবুজ' ছিলাম এই ইতালিতেই ভালোবাসি একটি অর্ডারশী সরলাকে। সে যথেষ্ট ক্যাথলিক—দেখতে সুন্দরী, নাখটিও তেমনি মিষ্টি—মারিরা।

তখন আমার বয়স বাইশ তেইশ—ঠিক তোমার বয়স। তাই ভাবতাম—'সবুজ'দেরই মতন—যে জরাজীর্ণ পুরোনো পুঁথির পাতায় বা বা লিখে গেছেন তাইই নাম জান দূরদর্শিতা—জীবনের অন্ধকারে আলোর এজাহার, আর এ সবের মধ্যে সেরা এজাহার—কোরাণের বাণী। কলে আমি মারিয়াকে বলি ও মুসলমান না হলে আমাদের বিবাহ অসম্ভব। বিবাহের সেরা পাত্রী ছিল।

সবুজ। কাজেই মনে করত বাইবেলই একমাত্র সত্য। পরিণাম বা হবার আমাদের প্রেমের নর্থ ধর্ম এসে হানা দিল, মারি মারিয়াকে ছেড়ে চলে গেলাম অক্সফোর্ডে দর্শন প'ড়ে অশান্ত মনকে শান্ত করতে।

দর্শন পড়তে পড়তে মন আমার উঠল জেগে, কিন্তু দর্শনের কোনো বাণীর দৃষ্ণ নয়, তার মধ্যে কোনো বাণী খুঁজে না পাওয়ার দৃষ্ণ। হ'ল কি, দর্শন পড়তে গিয়ে দেখলাম দর্শন তা নয় তাকে যা ভেবেছিলাম—অর্থাৎ তার মধ্যে সত্য নেই আছে শুধু সত্য নিয়ে মারামারি, কাটাকাটি, হানাহানি।

এ ছুনি বলছেন জগত বিকাশ পেয়েছে একটা আইডিয়া থেকে, ও-ছুনি বলছেন জগত একটা নাম-না-জানা আলোর দ্বারা, সে ছুনি বলছেন এর সংগে ৩৩ সংঘতে থেকে জীবনের বিকাশ—ইত্যাদি। এক কথায় শুধু কথা—কথা—কথা! কলে আমার মন ক্লান্ত হ'য়ে হাল ছেড়ে দিল যখন দেখলাম এককথার ফলস্বরূপ ঠাণ্ডা ফিনকিতে না আছে জীবনের তাপ, না পথ দেখাবার আলো। তখন বুঝলাম—হৃদয়কে ধর্মের বুলির চাপে পিষে মেরে কী দারুণ ভুল করেছি। মারিয়াকে অমৃতপুত্র হয়ে লিখলাম যে আমি অজ্ঞান জ্ঞানি বশে, যদি সে আমাকে ক্ষমা করে তবে তার কাছে ফিরে যাব। কিন্তু তখন ঐ যে বললাম, লগ্ন উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। সে লিখল—সেও ভুল করেছে বাইবেলকে গুরু মনে করে, কিন্তু আর হয় না, তার শরীর মন ভেঙে গেছে—এক লম্পটকে বিয়ে ক'রে। শেষে পুনশ্চ দিয়ে লিখল : তোমাকে যদি বিবাহ করতাম তাহ'লে মুসলমান হয়েও সুখী হ'তাম, কারণ তাহ'লে ধর্ম থাকত বুলি হয়ে মনের নেপথ্যে—অন্ধকারে, সামনের অসন্ত প্রেমের মিলনের পাদপ্রদীপ। আমি তৎক্ষণাৎ রোম রওনা হলাম, গিয়ে শুনলাম এলিও নোরার মুখে—যে মারিয়া টাইবারের জলে ডুবে আত্মহত্যা করেছে।

এলিওনোরা।

হ্যাঁ—এলিওনোরা মারিয়ার দিদি। তাই আরো ওর কাছে মাঝে মাঝে ছুটে আসি। এ লক্ষ্যহীন খুঁটিহীন জীবনে কেবল ওর দরদে ও প্রেমে বা একটু সাময়িক শান্তি না হোক—সান্ত্বনা পাই।

পল্লব একটু চূপ ক'রে থেকে কিন্তু বলেই খেমে যায়। যুগ্মক বলে : তুমি কী বলতে যাচ্ছিলে আমি জানি। না, আমি বলি না দেশও ধর্মের মতনই ছায়াবাজি। কারণ ধর্মের পনের আনা কবিকল্পনা হ'লেও দেশ ঠিক তা নয়, তার অন্তত কারা আছে—বাক্যে চোখে দেখা যায় দিনে দিনে, পলে পলে। কিন্তু তবু বলব জগৎজোড়া মানুষের প্রাণস্পন্দিত সত্যের তুলনায় দেশাত্মবোধের সত্য একেবারে ছায়া না হ'লেও সে-ধরণের প্রত্যাক-গোচর সত্য নয়—বাক্যে বলা যেতে পারে 'কাকীট'—অপ্রতিবাস্ত। অন্ততঃ মারিয়ার অকাল মরণের পর থেকে আমার কেবলই মনে হয়েছে, উঠতে বসতে, যে মাত্র একটি মানুষকে সুখী করার জন্তে যদি দেশকেও ছাড়তে হয়, তবে দেশের চেয়েও যে বড়, সবার বড়—মানে আমাদের অন্তরাষ্ট্র, যে আছে বলেই জগৎ আছে—সে প্রসন্ন হ'য়ে আমাদের আশীর্বাদ করবেই করবে। আমি তার

কিছুই আসে বার, থাকে কেবল একটি জিনিষ—স্বপ্ন। ব্যক্তিগত প্রেমের কেন্দ্র হ'ল এই স্বপ্ন, তাই ব্যক্তিগত প্রেমের চেয়ে বড় এ-সংসারে কিছুই নেই। অন্ততঃ এই হ'ল আমার জীবনের সবচেয়ে বড় উপলব্ধি—এখন পর্যন্ত। পবে এর চেয়ে বড় উপলব্ধিকে আরও করব কিনা বলতে পারি না। তবে যেটুকু জানি বললাম—মানে আমার আজকের credo:

শুনতে শুনতে পল্লবের মনে বিবাদ ছেয়ে আসে। সে একদৃষ্টে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে—বুড়ি নেমেছে...পাতার পাতার জেগে উঠেছে বর-বর শব্দ...যেন ওর হৃদয়ের দীর্ঘশ্বাসের প্রতিধ্বনি। সুস্থক ও খানিক বাইরের আকাশে ঘনঘটাং দিকে চেয়ে থাকে শূন্য দৃষ্টিতে। তার পর পল্লবের দিকে তাকিয়ে বলে: ও কী? কী হয়েছে?

পল্লব হাসতে চেষ্টা করে: হবে আবার কী?

সুস্থক কোমল কণ্ঠে বলে: এই জেগেই বলতে চাইনি তাই। কী হবে হৃদয়ের কথা বলে? আঁধার দিয়ে আঁধার কাটে না। তাছাড়া—বলে একটু খেমে—

পরের অভিজ্ঞতা বার ক'রে এমন মূলধন জোগাড় করা যায় না তাই, থাকে জীবনের বাজারে খাটিয়ে হুঁশা মিলতে পারে।

কিন্তু কাজে আসে—অন্ততঃ কোনো কোনো সময়ে।

সুস্থক চিন্তিত সুরে বলে: আসে কি? জানি না। হয়ত কিছু কাজে আসতে পারে দৈনন্দিন লেনদেনের বেলায়—কিন্তু বখান আমাদের মূল শিকড়ে টান ধরে তাই, তখন সে বেকনার সত্যিকার আলো দিতে পারে এক আমাদের অন্তরাখ্যা—অন্ততঃ আমি শুধু তাকেই মানি দিশারি বলে—বাইরের কাউকে নয়। বলে একটু খেমে:

বুড়ি খামল—আজ উঠি। হ্যাঁ, আমি এলিওনোয়াকে বলব তোমার গান শেখার কথা। ওহো, দেখ দেখি—ভুলেই ব'লে আছি: কাল বিকেলে সে তোমাকে চারে নিমন্ত্রণ করেছে। চারটের তার মোটর আসবে তোমাকে নিতে। মনে রেখো, কেমন? কারণ কাল রবিবার, ওর ছুটি—আমি লাঞ্জে আসতে পারব না।

[ক্রমশ:]

উন্মনা মেয়ে

শেফালি সেনগুপ্তা

উন্মনা মেয়ে নীল ঝিলঝিল আকাশের দিকে চেয়ে
ভাবে দিনগুলো কিশোর বেলার অবসর কিছু পেয়ে।
এ সংসারের রুটিনে অবলম্বন অবসর মেলো তার
মিলেছে আজকে কি জানি কেন যে অনেক ভাগ্য তার।
ছন্দবিহীন নীরস কাজেতে বাঁধা সে যে দিনে রাতে
কাজের পরিধি বার শুধু ঘর কলতলা উঠানেতে।
কাজ করছে তো জগতে সকলে কাজের অন্ত নাই
শুধু দেখা চাই সে কাজ কেমন খাদ কতটুকু পাই।
শত ব্যস্ততা তার মাঝেও তো অবাক পৃথিবী জাগে,
রূপ-রস-আশা-রং বাসনার চেউ অন্তরে লাগে।
একদা অতীতে জেগেছিল চেউ বধূর হৃদয়তটে—
পূর্ণ সে হিয়া শূন্য আজকে জোয়ার আসে না মোটে।
ঘর বাড়ামোছা, রাগা বাটনা, এঁটো বাসনের তলে
হৃদয়ের নদী হারিয়েছে গতি পাক ঘোলা কাদা জলে।
এই সংসার একখানি দাঁওরা ঘর-বাসী-ছেলেপুলে
অনেক অত্যাচার ব্যাধি-লোভ-দোষ সব কিছু অবহেলে।
অলস ভাবনা ভাববে আরামে সে সময় কি সে পায়?
ভোর রাতে উঠে করলা ভাঙার কাজ কে বা বলো নেয়।
আরো আছে তার নিত্য ভাবনা অর পাবো কোথায়?
জোড়াতালি মারা এত হারিহর্য। তবুও বাঁচতে হয়।
সে আছে বলেই এখনো এ ঘরে স্মৃতির খেলা চলে
বিকৃত কামনা: তার স্বাক্ষর শুটি হয় সাত ছেলে।
মনে করতে সে চারনাকো তবু স্মৃতির কীক কীকে
মনে পড়ে তার শত স্মৃতিভরা মধুর অতীতটাকে।
হৃদক হাওয়ার উড়ে আসে বেম স্মৃতির ছিন্নপাতা
সেই রূপারীষি হারান্ন গ্রাম কিশোর কালের কথা।

উপকারী ইংরাজ

“সম্প্রতি কলিকাতা গড়ের মাঠে হইতে লর্ড রিপনের যে মূর্তি স্থানান্তরিত করা হইয়াছে, তাহার সম্পর্কে কোন পত্রলেখক কোন সহযোগীকে লিখিয়াছেন—সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লর্ড রিপনের জনপ্রিয়তার কারণ উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন—তিনি যে ভারতীয়দিগের জন্য বিশেষ কিছু করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা নহে, কিন্তু—The purity of his intentions, the loftiness of his ideals, the righteousness of his policy and his hatred of racial discriminations were an open book to the people of India. এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। লর্ড রিপনের মূর্তিটি যুরোপীয়দিগের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই—ভারতবাসীর অর্থে ভারতীয়দিগের দ্বারা উহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। লর্ড রিপন এ দেশ হইতে চলিয়া বাইবার কয় বৎসর পরে ‘সঞ্জীবনী’, পত্রে একখানি পত্র প্রকাশিত হয়—ভারতবাসীরা লর্ড রিপনের প্রতি কৃতজ্ঞতার কোন নিদর্শন দেন নাই। সেই পত্র উন্মেষচক্রে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বিধবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তিনি দেখেন তাঁহার স্বামীর হিসাবে রহিয়াছে—লর্ড রিপনের মূর্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সংগৃহীত কয় হাজার টাকা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে ছিল। তিনি এই টাকা—চক্রবর্তী হারে সুরেন্দ্রের সহিত তাঁহার এটর্নির নিকট বখাওয়ানে প্রেরণ করা পাঠাইয়া দেন। এটর্নি তাহা জানাইলে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিরা উত্তোষী হইয়া এই মূর্তি প্রস্তুত করাইয়া আনেন। কোন বাঙ্গালী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান এই মূর্তির বেদীটি উপহার দিলে—সরকারের অমুখমতি লইয়া মূর্তিটি কলিকাতার গড়ের মাঠে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। কিন্তু লর্ড রিপন ইংরেজ বড়লাট ছিলেন আজ যখন ইংরেজদিগের মূর্তি অপসারিত হইতেছে তখন—

নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায় ?

বিশ্বের ধার্মিক লোক ঠেকে পেল দায়।”

—দৈনিক বঙ্গমতী।

বিশ্বভারতী

“রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর আজ অনেক কিছু পরিবর্তন হইয়াছে, কিন্তু বিশ্বভারতী পরিচালনার যে মূল পদ্ধতি ছিল, তাহারও বহিঃ ব্যতিক্রম দেখা যায়, তবে তাহা কবিগুরু দেশবাসীর পক্ষে সত্যই খুব বেদনার কারণ হইয়া উঠে। কবিগুরু নিয়মকে নিশ্চয়ই উপেক্ষা করিতেন না, নিয়মাহুগতের গুরুত্ববোধও তাঁহার কাহারও অপেক্ষা কম ছিল না। কিন্তু নিয়ম অপেক্ষা হৃদয়বৃত্তাকে আরও ব্যাপক অর্থে বলা চলে মানবতাকে তিনি উপরে স্থান দিতেন। তাহার কলে নিয়মতান্ত্রিক কাঠিন্যবৃত্ত হইয়া আবদ্ধতার মধ্যেও একটা মুক্তির আবহাওয়া সৃষ্টি করিত। বিশ্বভারতীর পরিচালনে সেই বিশেষত্বটুকু বজ্জিত হইবে না ইহা স্বভাবতই দেশবাসীর কাম্য। কিন্তু বিশ্বভারতীর যে সব সংবাদ মাঝে মাঝে প্রকাশিত হয়, তাহাতে সে বিশেষত্বের পরিচয় পাওয়া বাইতেছে, সে কথা অকুণ্ঠভাবে বলিতে পারিলে আমরা স্তবী হইতাম। বিশ্বভারতীর বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে রীড়ার নিয়োগের ব্যাপারেও অপরকী মনের রূপ প্রকট হইতে দেখিয়া ব্যথিত হইরাছি।

সাময়িক প্রসঙ্গ

অস্থায়ী তাহার উল্লেখ না করার মধ্যেই প্রার্থীর অসুবিধার প্রতি অমনোযোগের ভাব রহিয়া গিয়াছে। তদুপরি নির্বাচিত প্রার্থীর সমস্ত অসুবিধার কথাও সহনশীলতার সঙ্গে বিবেচিত হইবে না, কবিগুরুর পুণ্য স্মৃতি জড়িত প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে একথা ভাবিয়া শুধু দুঃখিত নহে বিস্মিতও হইতে হয়। বিশ্বভারতী বর্তৃপক্ষ বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, ইহা কি আশা করা চলে না ?”

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

জুয়াচুরি

“জুয়া লাইসেন্স বা পারমিট লইয়া লোক অসামু্য ব্যবসা করে, মিথ্যা বিবরণ দিয়া কেহ কেহ নানা ব্যাপারে সরকারী ঋণ গ্রহণ করে, ঘরবাড়ী নির্মাণের জন্য টাকা আদায় করে, কিন্তু পরে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কোন খোঁজ পাওয়া যায় না, এরূপ ব্যাপার ইতিপূর্বে অনেক ঘটিয়াছে, এখনও ঘটিতেছে। বাহাদুর খোঁজ পাওয়া যায়, তাহাদের কেহ কেহ হয়তো ঘর পাড়ে এবং তাহাদের বিরুদ্ধে মামলাও করা হয়। কিন্তু এই সকল প্রত্যারণা বা বড়বস্ত্র নিবারণের দায়িত্ব বাহাদুরের হাতে তাহাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতে কমই দেখা যায়। বিভাগলয়ে উদ্ধৃত ছাত্রদের নামে বস্ত্র সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে, কোন কোন স্থলে তদন্তে ঘর পাড়িয়াছে /ব, তত প্রকৃত উদ্ধৃত সে বিভাগলয়ে নাই। জুয়া লাইসেন্স পারমিটই হউক বা ঋণ অথবা সাহায্যের টাকাই হউক, সহজেই বুঝা যায় যে, সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মচারীগণ যথেষ্ট তদন্ত না করিয়াই উহা মঞ্জুর করিয়াছেন। যদিও সম্প্রতি এই সব ব্যাপারে কিছু সতর্কতা অবলম্বিত হইতেছে, তথাপি দুর্নীতিপরায়ে কর্মচারী বা লোকের অভাব নাই। এজন্য বাহাদুরের মারকতে অত্যাচারভাবে অর্থ, লাইসেন্স বা পারমিট বাহির হয়, তাহাদেরও উপযুক্ত তদন্তের পরে কঠোর শাস্তিবিধানের ব্যবস্থা হওয়া উচিত।”

—বৃগান্তর।

আবার শিক্ষা-কমিশন

“পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক সম্মেলনে আবার একটি শিক্ষা-কমিশন গঠনের প্রস্তাব হইয়াছে। এই প্রস্তাব শুধু নিরর্থক নয়, প্রকৃত শিক্ষাব্রতীদের পক্ষে অপমানজনক বলিয়া আমরা মনে করি। রাষ্ট্রায়ত্ত্বাধীন কমিশনের মত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিভিন্ন দেশের শিক্ষাবিদ লইয়া গঠিত কমিশন আধুনিক কালে খুব কম হইয়াছে। এই কমিশনের রিপোর্ট ভারত সরকারের রাজনৈতিক নেতারা হৃদয়ন করীরকে দিয়া পদললিত করাইয়া ছাড়িয়াছেন। যে শিক্ষানীতি সারা ভারতে আজ প্রবর্তিত হইতে চলিয়াছে তাহা উচ্চশিক্ষা-সংস্কারের নীতি এবং রাষ্ট্রায়ত্ত্বাধীন কমিশনের সুপারিশের

সিউকেট অতিরিক্ত উৎসাহের সঙ্গে সরকারী নীতি মানিয়া নিয়াছেন, বাণ্যকল্প কমিশনের রিপোর্টের মৰ্যাদা তাঁহারাও দেন নাই। কোন প্রতিবাদও শোনে নাই। এ বিষয়ে অধ্যাপক সমাজের যে দাবি ছিল তাহা পালনে ঐ সম্মেলনের কর্তৃকর্তারাই বাধা দিয়াছেন। সিনেট কমিটিতে সরকারী শিক্ষা ক্রমের প্রতিবাদে যে আপত্তিপত্র (note of dissent) দিয়াছিলাম সেইটুকুও বাতিল করিবার জন্য ঐ সম্মেলনের বর্তমান সভাপতি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। এঁদের উপর অধ্যাপকদের বিরুদ্ধে আস্থা আছে তাহাও ঐ সম্মেলনের কর্তৃকর্তা নির্বাহনে সাদা ব্যালট পেশার পড়ায় বুঝা গিয়াছে। অধ্যাপক সমাজের একাংশ সক্রিয় ভাবে কেন্দ্রীয় শিক্ষাসংস্থার নীতিতে সাহায্য করিয়াছেন আর এক অংশ নিষ্ক্রিয় রহিয়া উহাদেরই সুবিধা করিয়া দিয়াছেন—ইহাই আমাদের অভিযোগ। নূতন কমিশন গঠন ইহার সমাধান নহে। ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনে প্যাটেলের বলহীনালনে যিনি ঢেঁড়া সহি দিয়াছেন তাঁহাকে ঐ সম্মেলনের উদ্বোধন করিতে আনা উহার কর্তৃকর্তাদের উপযুক্ত কাজ হইয়াছে।

—যুগবাণী (কলিকাতা)।

কেরালার বিরোধী পক্ষের রূপ

“কেরালার কংগ্রেস, ক্যাথলিক গীর্জা, নায়ার সেবাসমিতি, পি-এস-পি, আর-এস-পি ও মুসলিম লীগ সংগ্রামীচক্র তড়িৎগতিতে কমিউনিষ্ট মন্ত্রিসভার অবসান ঘটাইবার প্রাথমিক লক্ষ্যসাধনে ব্যর্থতার আক্রোশে নিজের বর্ধিত ভরবেশ খুলিয়া ফেলিয়া আজ নিলজ্জ হিংসাত্মক মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। বিমোচন সমিতির নেতৃত্ব লাভ করিয়া স্পষ্টতরুরতার বীভৎস চিংকার ছাড়িয়াছেন—অহিংসা, শান্তি প্রভৃতির কোনও আশ্রয় রাখিবার কোনও প্রয়োজন নাই; যে কোন প্রকারে সরকার দখলে অগ্রসর হও! এই নূতন নির্দেশ অহুসারে কাজও আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। এই গত কয়দিন সংগ্রামীদের কার্যকলাপে তাহাদের এতদিন গোপন করিয়া রাখা বিষয়গুলির বিকট রূপটি দিবালোকের মত স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। তাহারা যুগ উন্নতির যে সমস্ত কাজকর্ম করিতেছে তাহার উল্লেখ করিয়া কেরালার মুখ্যমন্ত্রী জীনাগুদিরিপাদ কংগ্রেসের সর্বভারতীয় নেতৃত্বের নিকট প্রশ্ন করিয়াছেন যে, যদি অন্য কোনও রাজ্যের বিরোধী দলগুলি এই ধরনের হিংসা ও হিংসাত্মক কার্য করিতেন তাহা হইলে তাঁহারা কী করিতেন? সকলেরই জানা আছে যে, ভারতের অন্য যে কোন রাজ্যসরকার যদি কেরালা সরকারের মত আইন-শৃঙ্খলার গুরুতর বিপদের সম্মুখীন হইতেন তবে কেন্দ্রীয় সরকার তাঁহাদের সাহায্যে অগ্রসর হইতেন। সংবিধানের নির্দেশও ইহাই। কিন্তু কেরালার সম্পর্কে তাঁহাদের আচরণে আগাগোড়া এমন কিছু দেখা যায় নাই বাহ্যতে মনে এই নিশ্চিন্ততা আসিতে পারে যে, দেশের সংবিধানের অধবা গণতন্ত্রের ও পার্লামেন্টারী প্রথা মৰ্যাদা রক্ষার জন্য তাঁহাদের মনে এতটুকু উৎসাহ রহিয়াছে।” —বাহীনতা।

বর্তমান পৌরসভার নানা কীর্তি

“বর্তমান পৌরসভার অবহেলিত অঞ্চলগুলিতে উপযুক্ত পানীয় সরবরাহ, রাস্তা নির্মাণ ও ড্রেন ইত্যাদির কোন ব্যবস্থা পৌরসভা করিতেছেন না। এই অঞ্চলগুলি পৌর এলাকাভুক্ত হইয়া কেবল

মাত্র ট্যাক্সের বোঝাই বহিয়া আসিতেছে। এতদঞ্চল হইতে নির্বাহিত সমস্ত গণেরও কোনরূপ ধাচা নাই। দলীয় রাজনীতির পোষণ ও দল রাশিতেই পৌরসভার অধিকাংশ সময় ব্যয় হয়। পৌরসভার এই অঞ্চলগুলির করদাতাগণের পক্ষ হইতে পৌরসভার এই নিক্রিয়তা ও গল্পপাতিত্বের বিরুদ্ধে আন্দোলন হওয়া বাঞ্ছনীয়। আমরা এই এলাকাগুলির করদাতাগণকে সংঘবদ্ধ হইবার জন্য আবেদন জানাইতেছি।” —বর্তমান।

রাতারাতি বাড়ী উঠাও।

“সিউড়ী সহরের উপকণ্ঠে সিউড়ী-দুবরাজপুর পাকা রাস্তার পাশে একটি পাকা বাড়ী পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক (P. W. D.) নিৰ্ম্মিত হয়। বাড়ীটি রাস্তার পাশে, স্তরতরাং এই পথে বাহারা সদা-সর্বদা বাতায়নত করেন, এই নবনিৰ্ম্মিত স্মৃদ্ধ সরকারী ভবনটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু হঠাৎ জানা গেল, এই বাড়ীটি রাতারাতি উঠাও হইয়াছে। যে ঠিকাদার ইহা নিৰ্ম্মাণ করেন—তিনিই রাতারাতি স্থানীয় বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের বোংসাজসে তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলেন। কিন্তু এই বাড়ী সলয় কুয়াটি এখনও রহিয়াছে দেখা গেল। তাহা কেন উঠাও হইল না বুঝা গেল না। জানা গেল, পূর্বাভাসে স্থান নির্বাহনের অল্পমতি উদ্ধতন মহল হইতে না লইয়া স্থানীয় বিভাগীয় কর্তারা ইহা নিৰ্ম্মাণের আদেশ দেন। উদ্ধতন কর্তৃপক্ষ ইহাতে অসম্মতি প্রকাশ করেন ও চাপিয়া ধরেন। কলে ঠিকাদার বিভাগীয় কর্তাদের সহিত বোংসাজসে রাতারাতি ইহা ভাঙ্গিয়া ফেলে। এই দৃষ্ট দেখিয়া সাধারণ মানুষ বিস্মিত হইয়া ভাবিতেছে—ইহা কি হইল? সরকারী বাড়ী বধন রাতারাতি উঠাও হইতে পারে, তখন এই রাজ্যে সবই সম্ভব। এই বাড়ী তৈরী ও ভাঙ্গার খেসারত কাহার পকেট হইতে বাইবে তাহা জানা না গেলেও গাই-বাছুরে মিল থাকিলে নাকি মাঠ গিয়াও গুরুত্ব দৃষ্ট দেয়। এইরূপ প্রবাদ আছে। এখানেও ঠিক তাহাই হইয়াছে বলিয়া শুধু শুনা বাইতেছে। জেলা-শাসক মহাশয় এই সম্পর্কে অহুসান করিলে সমস্ত রহস্য প্রকাশ হইতে পারে।”

—বীরভূম বার্তা।

অসহায়তার সুযোগ

“আসানসোলের নিকটস্থ বগুড়া উদ্যান শিবিরের চতুর্দিকে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা না থাকার স্পষ্ট প্রমাণ একদল গুপ্ত প্রকৃতির লোক নিৰ্ম্মিত রাস্তাতে ক্যাম্পে হানা দিয়া অসহায় মহিলাদের ভয় দেখাইয়া সর্বস্ব অপহরণ করিয়া লইয়া বাইতেছে। কয়েকটি পরিবার এইভাবে সর্বস্ব নিঃস্ব হইয়াছে বলিয়া সংবাদে জানা গেল। প্রকাশ, ক্যাম্পের প্রহরারত দারোয়ান মহিলাদের আবেদন সত্ত্বেও গুপ্তদলের আক্রমণ প্রতিহত করিতে উদ্যোগী হয় না। ক্যাম্পের মহিলারা অসহায়তার হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সজিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিয়াছে। অন্য এক সংবাদে প্রকাশ, সরকারী নিয়ম উপেক্ষা করিয়া স্থানীয় কর্তৃপক্ষ প্রায় ৩০টি পদবিরের ডোল বন্ধ এবং কয়েকজনকে ইনসিটি ক্যাম্পে প্রেরণের নির্দেশ দিয়াছেন। কয়েকজন মহিলা জানান যে, স্থানীয় রিপল

জকিসার মহিলাদের প্রতি সর্বসময় অসৌজন্যমূলক ব্যবহার করেন। প্রকৃতপক্ষে ক্যাম্পের মহিলারা অসহায় অথবা আপন ভাগ্যের উপর নির্ভর করিয়া দিন কাটাইতে বাধ্য হইতেছে।”

—আগানসোল হিঠেবী।

গণতন্ত্র না পাপতন্ত্র ?

“বোটারিক্যাল গার্ডেনের মধ্যস্থত্রে বড় বড় রাজকর্মচারী জড়াইয়া পড়িবার পর নানাহানে অশস্ত্রন কর্মচারীদেরও তুল্য ব্যভিচার কাহিনী শুনিতে হইতেছে। কামিনী ও কাকুন হইয়া সর্বত্র যে পাপচক্র গড়িয়া উঠিয়াছে, অসহায় দেশবাসী শুধু তাহা ভুল ভুল করিয়া চাহিয়াই দেখিতেছে। প্রতিকার কহিতে সাহস নাই, হয়ত সদিচ্ছাও নাই, আছে শুধু আন্দোলন ও রোগান—ইনক্লার জিন্দাবাদ। বিজ্রোহ করিবে? কর, সে তো খুবই ভাল কথা। কিন্তু কিসের বিজ্রোহ? কাহার বিরুদ্ধে? বলিতে পার? পাপের বিরুদ্ধেই বিজ্রোহ করিতে হয়। সমাজ হইতে দুর্নীতি বহুজনপোষণ চুরি জুয়াচুরি মুনাফাখোরী কালোবাজারী—এই সব পাপ নির্মূল করিতে হইলে ধর্মবিশ্বাসী হইতে হইবে—পার্টিপলিটিক্স এ পাপ দূর করিতে পারিবে না। কেবলে আজ যে অষ্টবঙ্গ এক হইয়া কমুনিষ্টদের ত্রাহি মধ্যস্থদন ডাক ছাড়ানো হইতেছে, উহারও মূলে তো ঐ রাজনীতির খেলা! আজ যদি পাপের বিরুদ্ধে এই সংগ্রাম প্রমাণিত হয়, তবে ধার্মিক জনতা পাপশাসনের অবসান নিশ্চয়ই চাহিবে। কিন্তু তৎপূর্বে যে সব দল সংগ্রামে কাঁপিয়াছেন, তাহাদের প্রত্যেককেই বলিতে হইবে—আমরা সারা দেশ হইতে পাপের রাজত্ব দূর করিতে বদ্ধপরিকর। সর্বত্র পাপ রুদ্ধ রুদ্ধ প্রবেশ করিয়াছে। উপর হইতে নীচে পর্যন্ত পাপের প্রবল প্রতাপ। আন্দোলন করিতে তো হইবেই—সারা দেশব্যাপী প্রবল আন্দোলন কর। যু, চোরাকারবার, ব্যভিচার—নির্মমহস্তে বদ্ধ কর।”

—পল্লীবাসী (কালনা)।

টেস্ট রিলিফ, মন্ত্রী, এম-পি, জেলাশাসক

“প্রচার দপ্তর, সরকারী দপ্তর থেকে আরম্ভ করে শ্রম জেলা শাসকমণ্ডার পর্যন্ত সকলে প্রচার এক সুরে এ সম্পর্কে একটা অদ্ভুত বহুতলক মনোভাব দেখিয়েছেন। টেস্ট রিলিফ সম্পর্কিত কোন খবর জেলাশাসক সরাসরি আমাদের দিতে চাননি। সারা জেলা ঘুরে এসম্পর্কে খবর নেবার জন্যে তিনি আমাদের সহপদেখ বিলিয়েছেন। কিছুদিন আগে আনন্দবাজার পত্রিকার জেলা পরিচরিত ষ্ট্রাক রিপোর্টার সরকারী দপ্তর থেকে অস্বাভাবিক ব্যবহার পেয়েছিলেন বলে আমরা জানি। জেলাশাসকের মতে এসব খবর নাকি কাগজে সরকারী ভাবে দেওয়া যায় না। অথচ অত্যন্ত বহু টেস্ট রিলিফের কাজের প্রতিরোধ দিয়ে এত ইচ্ছার আমাদের কাছে এসেছে যে তো আমরা ছাপিয়ে দেব কোরতে পারিনি। আমরা জানি না এবছর বহুতলক টেস্ট রিলিফ কোন স্তরপথে অথবা শ্রমার্গে হচ্ছে কি না—প্রকাশ দিবালোকে উল্লুত প্রোডারে সে কাজ হবার খবর আমরা এখনও সংগ্রহ করে উঠতে পারিনি। টেস্ট রিলিফের কাজ আজকাল মিলিটারী সিক্রেনীর মধ্যে গণ্য হচ্ছে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ হবার কারণ বহুই হয়েছে, তা না হলে সে খবরটুকি

লুকোচুরি মনোভাব কেন? এই অবস্থার আমরা কার কথায় বিশ্বাস করবো? মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়ের প্রতিশ্রুতিকে বিশ্বাস ভাষণ বলে অভিহিত না করলে জেলাশাসকের ওপর উদ্ভটন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ প্রতিপালনে গড়িমসি মনোভাবের তীব্র প্রতিবাদ করতে হয়। কিন্তু নির্দেশ থাকে দেওয়া হয়েছে তিনি নির্দেশ পেয়েছেন কি না কিংবা পেলে প্রতিপালনে বাধা কোথায় অথবা ওপরতলা থেকে নির্দেশ না পৌঁছানোর কারণ কি, বহুক্ষণ না জানতে পারা যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত স্পষ্টভাবে কোনও মন্তব্য করা সমীচীন হবে না। প্রতিশ্রুতি এবং কাজের সামঞ্জস্য যেথেকে বিন্দুমাত্র বিলম্ব না করে টেস্ট রিলিফের কাজ চালু করা হোক, এটাই আমাদের মূল বক্তব্য।”

—জনমত (মুশিরাবাদ)।

ক্যানাল ট্যাক্স

“সরকারের ক্যানালের জলের ট্যাক্স ধার্য্য করিবার একটি বাধা-ধরা নিয়ম আছে। ক্যানালের জল পাইবার পূর্বে চাষী বিধা-প্রতি যে হারে ফসল পাইতেন তাহার উপরে ক্যানালের জল পাইয়া যে উৎকৃষ্ট ফসল পাইতেছেন সে উৎকৃষ্ট ফসলের বাজার-দর হিসাব করিয়া বহু টাকা হয় তাহার শতকরা ৫০ ভাগ পর্যন্ত সরকার ট্যাক্স ধার্য্য করিতে পারেন। বর্তমানে ফসলের দর এত বেশী হইয়াছে যে ঐ রূপ বাধা-ধরা হিসাবে ট্যাক্স ধার্য্য করিলে চাষীকে আরও বেশী টাকা ট্যাক্স দিতে হয়—সেই জন্য সরকার হইতে প্রতি বৎসর এক একটি এলাকার জন্যে বিভিন্ন ভাবে ট্যাক্স ধার্য্য করিতে হয়। কোথাও একর-প্রতি ৫।০ টাকা কোথাও ৭ টাকা আবার কোথাও ৭।০ টাকা পর্যন্ত ট্যাক্স ধার্য্য হইয়াছে। অবশ্য এই ট্যাক্স প্রতি একর বা ৩/০ বিঘা ভূমির জন্য ধার্য্য হইয়াছে। যে সমস্ত চাষী মৌরাকী নদীর জল-ধারার সুযোগ পান এবং বাঁহারা এই জলের সুযোগে ঠিক সময় মত চাষের জল পাইয়া উৎকৃষ্ট ফসল চাষ-আবাদ করে বাহাদিগকে কেতোরার জন্য কোন চিন্তা করিতে হয় না—বাহারা গাভ উৎপাদন জন্য বহু বার ইচ্ছা ততবার জল পাইয়া থাকেন, তাহারা এই ট্যাক্স দিতে কাতর নহে। সময় মত সরকারের এই ট্যাক্স আদারে অব্যবহার জন্যই বহু এই সমস্ত চাষীরা বিশেষ ব্যগ্র হইয়া থাকে এবং এককালীন আদায় দিতে কষ্টকর হইবে মনে করে।”

—সেবা (দিউড়ী)।

ধর্মাদায় বা বৃত্তির টাকা অনাদায় ?

“বিশ্বস্ত্র প্রকাশ যে, এখানকার ব্যবসায়ী মহল নাকি বিগত কয়েক বৎসর বাবৎ ধর্মাদায় বৃত্তির টাকা দেন নাই। উক্ত টাকাটা তাহারা নাকি নিজ নিজ মূলধনে নিয়োগ করিয়া আসিতেছেন। ইহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে ইহা অত্যন্ত অজ্ঞান এবং ক্রোড়ের বিষয়। বলা বাহুল্য যে, বৃত্তির টাকা কাহারো ব্যক্তিগত ধন নয়, উহা সম্পূর্ণ জনসাধারণের প্রদত্ত অর্থ। অতএব উক্ত অর্থ জনকল্যাণমূলক কার্যে ব্যয়িত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এখানকার ব্যবসায়ী মহলে দৈনিক প্রায় লক্ষ টাকার লেন-দেন চলে বলিয়া প্রকাশ, স্মরণীয় বিগত কয়েক বছরের হিসাব ধরিলে একটা মোটা রকম অর্থ অজ্ঞান ভাবে আটকাইয়া রাখিয়াছে। ব্যবসায়ী মহলে

কাণ্ডে জমা দিয়া মানবতাবোধের পরিচয় দেন। এবিষয়ে আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গিষ্ট কর্তৃপক্ষের ক্রিপ্রাণী আকর্ষণ করিতেছি।”

—মালক (আসানসোন)।

শিক্ষা ও শিক্ষকত্ব

“এককালে খুটান মিশনারী শিক্ষকদের আন্তরিক চেষ্টায় ভারতবাসী শিক্ষার সুযোগ লাভ করিয়াছিল। বেলুড়ের জি.জি.রামকৃষ্ণ বিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষক ও অধ্যাপকগণের আন্তরিক চেষ্টায় কলেই বেলুড় দেশবাসীর চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছে। উন্নত ধরনের শিক্ষার জন্য কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের এতদিন যে সুনাম ছিল সামান্য নয় বহুরের মধ্যে বেলুড়ের নিকট প্রেসিডেন্সি কলেজের সে গৌরব স্থান হইতেছে। সমাজের দুর্নীতি অথবা রাষ্ট্রের অব্যবস্থা বেলুড়ের শিক্ষাক্ষেত্রের আন্তরিকতার নিকট পরাভব স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষক সমাজ বেলুড়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া স্বীয় কর্তব্য বশাবশ পালন করিলে রাষ্ট্র ও জনসাধারণ শিক্ষকের যোগ্য মর্যাদা দান করিতে এবং তাঁহাদের দারী মানিয়া লইতে পশ্চাৎপদ হইবে না। রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্র বা অজ্ঞাত রাজ্যের শিক্ষকদের বেতনের হার কত তাহাও বিবেচনা করা দরকার। আশা করি, সব দিক বিবেচনা করিয়া শিক্ষক সমিতি উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।”

—বীরভূমবাসী।

শোক-সংবাদ

শিশিরকুমার ভাট্টা

বর্তমান বাঙালার তথা ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা, বাঙালার নাট্যজগতের নবযুগের স্রষ্টা, প্রতিভা-মনীষা-মেধার দিকপাল বরপুত্র পূরম প্রদেয় নটগুরু শিশিরকুমার ভাট্টা গত ১৪ই আষাঢ় সোমবার রাত ১-২০ মিনিটে ৭০ বছর বয়সে দেহান্তিত হইয়াছেন। ১২১৬ সালের ১৬ই আশ্বিন মাতুলালয়ে সাত্তরাগাছির স্বর্গীয় হরিন্দাস খাঁ ভাট্টাভীর ছয় পুত্র ও এক কস্তার মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ শিশিরকুমারের জন্ম। ১১১৩ সালে ইংরাজী সাহিত্যে এম, এ পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া বিভাগের কলেজে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপকরূপে যোগ দেন। অল্পকালের মধ্যেই এই বিভাগের সিনিয়র অধ্যাপকরূপে পরিগণিত হন। ১১২১ সালের ১০ই ডিসেম্বর সাধারণ রক্তালয়ে পেশাদারী অভিনেতা হিসেবে তার প্রথম আত্মপ্রকাশ। তাঁর প্রথম অভিনয়বস্ত্র নাটক আলমগীর (তখন নাম ছিল ভীমসিংহ)। ১১৩০ সালে সঙ্গীতলায়ে শিশিরকুমার আমেরিকা যাত্রা করেন, সেখানে “সীতা” নাটকটি তিনি মঞ্চস্থ করেন। শিশিরকুমারের প্রতিভার স্পর্শস্বত্ব যে অসংখ্য নাটক নাট্যজগতে যুগান্তর এনেছে, তাদের মধ্যে সীতা, আলমগীর, দিগ্বিজয়ী, নরনারায়ণ, মাইকেল মধুসূদন, রীতিমত নাটক, প্রহসন, বোড়শী, সাজাহান, চিরকুমার সভা, বিবাহ বঁা, রত্নীর, জীবনরঙ্গ, শেষরক্ষা, পরিচয়, বিজয়া, সিংহাজোলা, সধবার একাদশী, চন্দ্রগুপ্ত, দুঃখীর ইমান, মিশরকুমারী, রমা, তথ্য-এ-তাউল প্রমুখ

নাটকগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চলচ্চিত্রের আদিযুগ থেকেই এই জগতের সঙ্গে শিশিরকুমারের যোগাযোগ, নির্বাক যুগে মোহিনী, কমলে-কামিনী, আঁধারে আলো, বিচারক এবং সবাক যুগে পল্লীসমাজ, সীতা, দম্ভরমত টকী, চাণক্য, পোষাপুত্র প্রভৃতি ছবিগুলিতে তাঁর অভিনয় দেশবাসী দেখতে পেয়েছেন—এদের মধ্যে আঁধারে আলো, পল্লীসমাজ, সীতা, দম্ভরমত টকী, চাণক্য ছবিগুলির পরিচালকও তিনিই ছিলেন। ১১৫৬ সালে পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় গ্রহণ করেন এবং গত ১০ই মে মহাজাতি সদনে নাট্যাচার্যের জীবনের শেষ অভিনয়। বর্তমান বছরে নটগুরুকে ভারত সরকার পদ্মভূষণ উপাধিতে ভূষিত করেন। বলা বাহুল্য, চিরউন্নতশির নাট্যাচার্য “খেতাব” এই সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করে সারা বাঙালার মুখ উজ্জ্বল করেন। শিশিরকুমারের লোকান্তরে দেশ তবু যে একজন বিরাট অভিনেতাকে হারাল, তাই নয়—তাঁর দেহত্যাগে বাঙলা দেশ এক বিরাট ব্যক্তিত্বকে, প্রথম পাণ্ডিত্যের অধিকারী এক পুজনীয় পুরুষকে, বাঙালার রঙ্গমঞ্চের এক অনন্তসাধারণ যুগপ্রবর্তককে হারাল। এই জাতীয় ক্ষতি পূর্ণ হবার নয়। (নটগুরু সম্বন্ধে আরও বিস্তৃত আলোচনা রঙ্গপট বিভাগে দ্রষ্টব্য)।

তুলসী লাহিড়ী

বাঙালার বিখ্যাত নট ও নাট্যকার তুলসী লাহিড়ী গত ৭ই আষাঢ় ৬৩ বছর বয়সে পরলোক গমন করেছেন। বাঙালার নাট্য ও চিত্রজগত স্মরণীয়কাল ধরে তাঁর সেবা পেয়ে এসেছে ও তাঁর অবদানে রঙ্গজগতের নানাদিক ভরে উঠেছে। নলডাঙার বিখ্যাত জমিদার-বাংশে এঁর জন্ম। তুলসীবাবুর কর্মজীবন শুরু হয় যুগপূর্ব কাছারির আইন ব্যবসারী হিসেবে, আলীপুর আদালতে কিছুকাল তিনি ওকালতী করেন। ১১৩০ সালে শিল্পজগতে প্রবেশ করেন সঙ্গীত-পরিচালক হিসেবে (এইচ, এম, ভি) রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ আর্ট থিয়েটারের “পোষাপুত্র” নাটকের সুরকাররূপে। অভিনেতারূপে তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ চিরকুমার সভায় অক্ষয়ের কৃমিকার। তারপর তাঁর প্রতিভা নানাভাবে বিকশিত হতে থাকে, চিত্র-কাহিনীকার, নাট্যকার, অভিনেতা, সঙ্গীতশিল্পী, চিত্রপরিচালক ও নাট্যপরিচালকরূপে। বাঙলাদেশের অসংখ্য নাটক ও ছায়াছবি এঁর প্রতিভার স্পর্শ বহন করেছে।

প্রতাপ মুখোপাধ্যায়

তুলসী লাহিড়ীকে বাঙলা দেশ যেদিন হারাল সেই দিনই আরও একজন শক্তিশালী অভিনেতা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। তাঁর নাম প্রতাপ মুখোপাধ্যায়। ইনি তুলসী লাহিড়ীর মতই প্রথমে সুরকাররূপে চলচ্চিত্র জগতে যোগ দেন ও পরে অভিনেতারূপে আত্মপ্রকাশ করেন। বোম্বাই চিত্রজগতেও সুরকাররূপে ইনি যথেষ্ট প্রসিদ্ধিলাভ করেছিলেন এবং ছবির কাহিনীকাররূপেও বাঙালার চিত্রলোক তাঁর প্রতিভার পরিচয় পেয়েছে। স্বতন্ত্র পূর্বদিন তিনি জীবনের অধর্শতাকী পূর্ণ করেছিলেন।

সম্পাদক—প্রাণতোষ ঘটক

কলিকাতা ১৬৬ নং কিনিংহামেরী গাজুলী স্ট্রীট, “বস্তুমতী রোটারী বেসিনে” ঐতারকমাণ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত



বৌদ্ধ পঞ্চশীল

গত চৈত্র সংখ্যায় শ্রীমতী আশা রায়ের 'বৌদ্ধ পঞ্চশীল' প্রবন্ধ প্রসঙ্গে চৈত্র সংখ্যায় শ্রীহেম সমাজদার মহাশয়ের সমালোচনা পাঠ করলাম। তাঁর সমালোচনা ঐতিহাসিক সত্যকে বর্জন করে ধর্মাত্মতার আশ্রয় গ্রহণ করেছে। এ ক্ষেত্রে পুনরালোচনা কতদূর সমীচীন হবে জানি না। তবুও কিছু বলা আবশ্যিক মনে করি। সমাজদার মহাশয়ের দৃষ্টিতে যাই প্রতিভাত হোক না কেন, বিশাল হিন্দুশাস্ত্র এক দিনে গড়ে ওঠেনি। বিশ্ববিধানের নিয়মানুযায়ী তার রচনার দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়েছে। 'বুদ্ধ-জন্মের হাজার হাজার বছর আগে হিন্দুধর্মের ঋতি ও স্মৃতিগ্রন্থ রচিত হয়েছে' সমালোচকের এ উক্তি পাঠ করে বিজ্ঞ পাঠকবর্গ হাত সংবরণ করতে পারবেন না। ভারতে আর্য অভিযানের আরম্ভ খৃঃপূঃ ষোল্ শতকের আগে নয় এবং বুদ্ধের আবির্ভাব খৃঃপূঃ পঞ্চ বর্ষ শতকে! আর্য ঋষিরা ভারতের মাটিতে বেদ রচনা করেন। ঐতিহাসিকগণ বৈদিক যুগের বয়ঃক্রম নির্ণয় করেছেন খৃঃপূঃ ১৫০০ হতে খৃঃপূঃ ৫০০ শতক। বেদে আছে ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ ও মিত্র বা সূর্যের উদ্দেশ্যে স্তব-স্তুতি, পূজা-বজ্র ও বলিদানের নির্দেশ। শীলচারের উল্লেখ তাতে নেই। উপনিষদই সর্বপ্রথম বৈদিক স্তুতি ও প্রার্থনার সীমা অতিক্রম করে অতীন্দ্রিয় সত্তার কথা বলে এবং উপলব্ধির জন্ত শব্দ মম তিতিকার নির্দেশ দেয়। কিন্তু সে নির্দেশ সীমিত হয় বিজ্ঞ আত্মসন্ধানীদের মধ্যে, গণমানসে তার রেখাপাতের কোন প্রমাণ নেই। সূর্য অতীতে কালের বিবর্তনে যখন ভারতের ধর্মজীবনে ও সমাজ-জীবনে গ্রানি নেমে আসে, ধর্মের নামে অধর্মের এক বিভৎস রূপ আত্মপ্রকাশ করে, অবাধ পতনভায়ায় এবং শিথিল হয়ে আসে নীতির বাঁধন। অন্যচারের আঘাতে, তখন ভারতের নিপীড়িত আত্মা তুষিত চাতকের মত সে হৃদয় আর অসান প্রার্থনা করে। সেই যুগসন্ধিক্ষণে বুদ্ধ প্রবর্তন করেন পঞ্চশীল মন্ত্র। বলা বাহুল্য, এ মন্ত্র ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং সামাজিক ও বৈজ্ঞানিক জীবনে কল্যাণের উৎসরূপে পরিণত হয়। এ সম্বন্ধে শ্রীমতী রায়ের উক্তি একটুখুও অসংগত নয়। প্রাক-বুদ্ধযুগের শীল-তত্ত্বের ইঙ্গিত দিতে গিয়ে শ্রী সমাজদার মহাশয় পাতঞ্জল দর্শনের অষ্টাঙ্গ বোগমার্গের কথা উল্লেখ করেছেন। অষ্টাঙ্গ বোগমার্গের প্রণেতা মহর্ষি পতঞ্জলির জন্ম হয় খৃঃপূঃ দ্বিতীয় শতকে। তাঁর তিন শ' বছর আগে জন্মগ্রহণ করে বুদ্ধ কি ভাবে পঞ্চশীলের জন্ত তাঁর কাছে খণ্ডী হলেন সমালোচক বলতে পারেন কি? প্রসিদ্ধ দার্শনিক গ্রন্থ বোগবোধিষ্ট বায়ারণে ও পুরাণ শিরোমণিরূপে সম্মানিত শ্রীমতাপ্রবর্তে ঐতিহাসিক বুদ্ধ প্রসঙ্গে উক্তি রয়েছে। এ সব উক্তিকে উড়িয়ে

দিয়ে এদের রচনাকাল বুদ্ধজন্মের হাজার হাজার বছর আগে কি ভাবে নির্ণয় করলেন তা সমালোচক বলবেন কি?

কেবলমাত্র শীলসাধনার অতীন্দ্রিয় জ্ঞান আরও হয় এবং সত্যের উপলব্ধি হয়—এ কথা বৌদ্ধধর্মের কোথাও বলা হয় নি। শীল চারিত্রিক শুদ্ধির জন্ত। শীলের সাধনার চারিত্রিক উৎকর্ষ লাভ হলে চিত্ত সমাধিবান্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। সমাধিবান্যের অগ্রসর হলে লোভ ঘেব মদ মাংসখাদ্যাদি রিপু মনে স্থান পায় না এবং মন কলকলিত হয়ে সৌন্দর্যে সুসমার পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। এতদূর মনে প্রজ্ঞানের জ্যোতি বিকীর্ণ হয়, তার শুভ্র আলোর জাগে স্তরে স্তরে নির্বাণের উপলব্ধি। এর বিশদ আলোচনা অন্ততঃ নিকায়ের বোধিসত্তস বগ্গে না, রয়েছে বিশেষভাবে নিকায় গ্রন্থসমূহের মধ্যে। সমালোচকের উক্ত বিভ্রান্তিমার্গ পরবর্তী যুগের রচনা, পিটকের অন্তর্ভুক্ত নয়। বৌদ্ধধর্মে গুরুবাদের স্থান নেই। ভগবান বুদ্ধ স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন—তথাগত নিজেকে সত্যের পরিচালক ভাবেন না এবং তাঁর কাছে সত্যের আত্মনিবেশনও কামনা করেন না। তিনি আরও বলেছেন—অশুদীপা বিহরণ অন্তসরণা অনঞঞ সংগা। বৌদ্ধশাস্ত্রে নিবৃত্তির পরে আর কোন উল্লেখ নেই, সমালোচকের এ উক্তি নিতান্ত অবান্তর। 'নিকায়ঃ পিরমং স্তবং অজাতং অজরং অমতং বোগকথমং নিকায়ং' ইত্যাদি উক্তিসমূহ সমালোচককে অস্বাভাবন করতে অহরোহ করি। মহামানব বিবেকানন্দ যে তাঁর চিকাগো বক্তৃতার উদ্বোধন কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন—Buddhism is the fulfilment of Hinduism, সে বাণীকে সমালোচক ব্যাভাষার ভাবপ্রবণ উজ্জ্বাস বা কৈন্তববাদ বলে অভিহিত করেছেন। এ উক্তি স্বামীজীর উদার বাণীর উদ্দেশ্যে ধর্মিক মনের বিবোধগার ছাড়া কিছুই নয়। 'স্বামীজী দিব্যদৃষ্টিতে দেখেছিলেন উপনিষদের সর্বভূতে ব্রহ্মলক্ষণের চিত্রা বাস্তব রূপ গ্রহণ করেছে বুদ্ধের মৈত্রী করুণার উদার আদর্শে। বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না, বুদ্ধকে কেন্দ্র করে ভারতের বুদ্ধে সত্যজ্ঞানের যে বিরাট আশবিক বিস্ফোরণ হয়েছিল, তা শূন্যে মিলিয়ে বায়নি। ভারতে তথাবিকিত বৌদ্ধধর্মের সমাধি হয়েছে বটে, কিন্তু সেই বিরাট সত্যজ্ঞান অস্তিত্বিত হয়নি, তার ভাবধারা ভারতবাসীর অংশবিশ্ত ধর্মের সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছে। সমালোচকের কাছে তা স্বর্বাধ্য হলেও সত্যসত্ত্ব দৃষ্টিসম্পন্ন লোকের কাছে দিনের মত উজ্জ্বল। আর অধিক আলোচনার পত্রের কলেবর বৃদ্ধি করতে চাই না। সমালোচককে উদার দৃষ্টি নিয়ে অনাড়ম্বর মনে ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করতে - অহরোহ করি।—শ্রীলানন্দ ব্রহ্মচারী বসুদেবগুপ্ত, বনমগ্নায়।

পত্রিকা সমালোচনা

১৩৬৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের বসুমতী পাইলাম। অশেষ ধন্যবাদ গ্রহণ করিবেন। আমরা দীর্ঘদিন হইতে বসুমতীর ভক্ত পাঠিকা। বসুমতী ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর হইতে মায় আমার জন্মের পূর্ব হইতেই তাহার সহিত এবাড়ীর যোগাযোগ চলিতেছে। আমরা বোধ হয় বর্ণপরিচয়-এর সঙ্গে সঙ্গেই মাসিক বসুমতীর সহিত পরিচিত। প্রথম ভাগের সঙ্গে সঙ্গে মা-সি-ক-ব-সু-ম-তী, বানান করিয়া পড়িয়াছি এবং প্রতি মাসেই মা-কাকিমার বসুমতীর অপেক্ষার উৎকণ্ঠা দেখিয়া ভিতরে ভিতরে নিজেরাও উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছি। নিওনের কাছ হইতে এই বই কে মা-কাকিমার হরবারে পৌছাইয়া দিবে এই লইয়া তাইবোনদের মধ্যে রীতিমত লক্ষ্যজ্ঞ বাখিয়া বাইত। মাসিক বসুমতী তাহার জন্মকাল হইতে এ তাৎকাল পর্যন্ত আমাদের গৃহে শুধুমাত্র আমাদের গৃহেই বা কেন সমস্ত ভারতবর্ষের পাঠক-পাঠিকার কাছে এইরূপ সমাদরের পাত্রী। স্মরণ্য বৃত্তিতেই পারিতেছেন, সেই বই-এর আগমন বন্ধন অকারণেই হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেল তখন মনের অবস্থা কি শোচনীয় হইয়া উঠিল। বিশেষ আপনার পরিচালনার ইহা আরও মনোজ্ঞ আর চমৎকার হইয়া উঠিয়াছে। এবছরের 'বর্ণালী' প্রতি মাসেই মনের পরতে পরতে নানা বর্ণের ছটায় আলোকিত করিয়া তোলে। এক এক সময় মনে হয় মেয়ের কলমে এত জোর এত রস? কি অপূর্ণ ভাব। স্বচ্ছ নয় কিন্তু স্নান স্নলেনা দেবীকে আমার ধন্যবাদ জানাইবেন। তাহার 'জিজ্ঞাসা' খুব ভালো লাগিয়াছিল, তাহার পর 'মিঞাও' মনের কোণার চিরস্থায়ী দাগ রাখিয়া গিয়াছে, আর বর্ণালী? বর্ণালীর ত কথাই নাই স্নলেনা দেবীর সোনার দোয়াত-কলম হোক, আমরা যেন তার আরও লেখা পাই এই কামনা। এমাসে বর্ণালী নাই দেখিয়া আমাদের মনের আকাশেও বর্ণাভাব ঘটিয়া কিঞ্চিৎ মেঘ দেখা দিয়াছে। আগামী মাসের অপেক্ষার উদগ্রীব হইয়া আছি। এছাড়াও আছে 'ইন্দ্রাবীর প্রেম' অপরূপ ইনা মীনা যেন চোখের সামনে তাহাদের নব প্রেমের আনন্দ-বেদনা লইয়া চোখের সামনে নাচিয়া বেড়ায় আরও আছে 'বন কেটে বসন্ত' 'চম্পা তার নাম' কোনটা বাদ দিয়া কোনটা লিখিব? শুধু কি আমাদের? বাড়ীর কর্তা ব্যক্তিরও উদগ্রীব কম নয় 'আনন্দ বৃন্দাবন' 'অখণ্ড নিমাই' এবং চারজন মানে প্রথম হইতে শেষ পাতার বেঙ্গল কেমিক্যাল পর্যন্ত সবটা পড়িয়া তবে ক্ষান্ত হই। কাহার ঘর হইতে কে বইখানি চুরি করিয়া আগে পড়িবে তাহার প্রতিযোগিতা চলে। মায় এ বসুমতীর দৌলতে পাড়ার বিস্তার বান্ধবীও যোগাড় করিয়াছি বসুমতী পড়িতে দিবার লোভ দেখাইয়া। কি অল্পবয়সী সকলেরই এই বইখানির প্রতি। প্রথমে B. K. Banerjee নামে এবং পরে P. K. Banerjee মানে আমার স্বামীর নামে এই বই আমার শ্বশুরবাড়ীতে বোধ হয় বসুমতীর প্রথম খণ্ড প্রথম সংখ্যা হইতে এবাড়ীতে আসিতেছে। তাই গত মাসে না পাইয়া বিশেষ বিচলিত হইয়া পড়ি, আবার তেমনি এমাসের পুনরায় বন্ধন পাঠাইলেন তখন যেন আনন্দের অবধি রহিল না। সেই আনন্দরই কিছু অংশ কৃতজ্ঞতার সহিত আপনাকে জানাইলাম। নমস্কার গ্রহণ করিবেন। বিনীতা, মায় বন্দ্যোপাধ্যায়। C/o. P. K. Banerjee. M- 46192. Hakim para, Jalpaiguri.

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে ছয় মাসের জন্য চান। পাঠাইলাম।—S. S. Basu, Bombay.

বৈশাখ—আখিন এই ছয় মাসের মাসিক বসুমতীর চান। ৭-৫০ নং পঃ পাঠাইলাম।—Tripti Basu, Aminabad, Lucknow.

গত বৈশাখ ১৩৬৬ সাল হইতে মাসিক বসুমতী নিয়মিত পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।—সুজাতা মায়, মালদহ।

১৫ টাকা পাঠাইলাম, এই বছরের গ্রাহক করিয়া লইবেন।—Mira Choudhury, Calcutta.

বৈশাখ হইতে আগামী চৈত্র মাস পর্যন্ত এক বৎসরের চান পাঠাইলাম।—বকুলরানী দেবী, Bombay.

Please accept subscription for Monthly Basumati for 6 months from Jaistha 1366 B. S. —Manjusree Ghose, Bombay.

মাসিক বসুমতীর আরও ৬ মাসের চান পাঠাইলাম।—বাসন্তী ভট্টাচার্য, United Mikir & N. C. Hills.

বৈশাখ—আখিন ৬ মাসের চান পাঠাইলাম। পত্রিকা অবশ্যই পাঠাইবেন।—A. C. Chakravorty, Mongher.

ছয় মাসের চান বাবদ ৭-৫০ নং পঃ পাঠাইলাম। আশা করি সবার বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসের তিন সংখ্যা পাইব।—ঐশ্বর্যবতী দেবী, দিনাজপুর।

বৈশাখ হইতে আখিন পর্যন্ত চান পাঠাইলাম।—Mrs. Purnima Chakravorty, New Delhi.

Herewith Rs. 15/- being the subscription for Basumati for the current year. Please send the Baisakh, Jaistha and Ashar issue of Basumati. Mrs. Anjali Ghose, Patna.

I am sending Rupees fifteen only as the annual subscription for Masik Basumati.—Mrs. Bani Guha, Nagpur.

Subscription for Monthly Basumati from Baisakh to Aswin. Please send the magazine regularly.—Mohammad Hydar Ali, Murshidabad.

১৩৬৬ সন বাংলা মাসিক বসুমতীর বার্ষিক চান বাবদ ১৫ টাকা পাঠাইলাম। পত্রিকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।—Hiranmoyee Kundu, Cachher.

Subscription for 1366 B. S. amounting Rs. 15/- is sent herewith.—Rekha Banerjee, Calcutta.

বসুমতীর বার্ষিক চান বাবদ ১৫ টাকা পাঠাইলাম। পূর্ণ সেট মাসিক বসুমতী পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।—Sudharani Choudhury, Cachher.

জ্যৈষ্ঠ হইতে কার্তিক সংখ্যার সডাক মূল্য বাবদ ৭-৫০ টাকা পাঠাইতেছি। নিয়মিত মাসিক বসুমতী পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।—Sm. Anima Banerjee, Calcutta.



মাসিক বহুমতী
॥ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৬ ॥

(একটি দুঃখাপ্য পৌরোহিত্য)

ভক্তি-পরীক্ষা
— স্বর্গত অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায় আঁকিত —



সামিক বসুমতী

৩৮৭ বর্ষ—শ্রাবণ, ১৩৬৬]

৥ স্থাপিত ১৩২২ ॥

[প্রথম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা

কথামৃত

১৯১৬ খৃঃ, মঠে দুর্গাপূজা। শ্রীশ্রীমা সপ্তমী পূজার দিন দুপুরে মঠে আসিয়া উত্তর পাশের বাগানবাড়িতে আছেন। অষ্টমার দিন সকাল বেলা অট্টা-নরটীর সন্যাস মঠ ও প্রাচীনা দর্শন করিতে আসিয়াছেন। বাগানবনের পাশের 'হলে' ভক্তগণ ও সাধু-এক্সটারিগণ অনেক কুটনো কুটিং-তছিলেন। মা দেখিয়া বলিতেছেন, "ছেলেগা ত বেশ 'কুটনো কুটিং'।" জগদানন্দজী বাসলেন, "ব্রহ্মচার প্রদত্ত লাভই হল 'সুন্দর', তা সান-ভজন করেই হোক, আর কুটনো কুটিংই হোক।"

এই দিনে বহু লোকে শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করিতেছিলেন। শ্রীশ্রীমাকে বার বার গঙ্গাজলে পা ধুইতে দেখিয়া যোগীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, "মা, ভক্তি হচ্ছে? সদ্ধি করে বনবে যে।"

মা বলিলেন, "লোপেন, কি বলবো, এক একজন প্রণাম করে যেন গা ঠাণ্ডা হয়, আবার এক একজন প্রণাম করে যেন গায়ে আগুন টলে দেয়। গঙ্গাজলে না ধুলে বাঁচেন।"

পরে একদিন কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "মা, এক একজন প্রণাম করলে তোমার খুব কষ্ট হয়, একবার পূজার সময় তোমার এই কথা শুনেছিলাম।"

মা বলিলেন, "হাঁ, বাবা, এক একজন প্রণাম করলে যেন বোলভায় হল কুটিং দেয়। কাউকে কিছু বলিনে।" এই কথা বলিয়াই সবেহ দৃষ্টিতে বলিলেন, "তা বাবা, তোমাদের বলছি না।"

আমি বললাম, "মা, ভয় হয়, তোমার মত মা পেয়েও কিছু যেন হল না মনে হয়।"

মা—"ভয় কি বাবা, সর্বদা তব জ্ঞানবে যে ঠাকুর তোমাদের

পেছনে বয়েছেন। আমি রয়েছি—আমি মা থাকতে ভয় কি? ঠাকুর বে বলে গেছেন—'বাবা তোমার কাছে আসবে, আমি শেষ কালে এসে তাদের হাতে ধরে নিয়ে যাব।"

"যে যা খুসী কর না কেন, যে যে ভাবে খুসী চল না কেন, ঠাকুরকে শেষ কালে আসতেই হবে তোমাদের নিতে। ঈশ্বর হাত-পা (ইঞ্জিয়া) দিয়েছেন, তাবা ত ছুড়বেই, তাবা তাদের খেলা খেলবেই।"

একবার ঠাকুরকে ভোগ দিতে গিয়ে দেখি—ছবি হইতে একটা আলোব স্রোত নৈবেদ্যের উপর পড়িয়াছে। তাই মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "মা, যা দেখি সে কি মাথার ভুল, না সত্যি? যদি ভুল হয় তবে যাতে মাথা ঠাণ্ডা হয় তাই করে দাও।"

মা একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "না বাবা, ও সব ঠিক।"

আমি—"তুমি কি জ্ঞান, কি দেখি?"

মা—"হাঁ।"

আমি—"ঠাকুরকে ও তোমাকে যে ভোগ দিই তা কি ঠাকুর পান? তুমি কি তা পাও?"

মা—"হাঁ।"

আমি—"বুঝবো কি করে?"

মা—"কেন গীতায় পড় নাই—ফল, পুষা, জল ভগবানকে ভক্তি করে যা দেওয়া যায়, তা তিনি পান।"

এ উত্তরে বিস্মিত হইয়া বললাম, "তবে কি তুমি ভগবান?" এই কথায় মা হাসিয়া উঠিলেন। আমরাও হাসিতে লাগিলাম।

—শ্রীশ্রীমাদের কথা হইতে।

বৌদ্ধ দেবী

ত্রিশভূষণ দাশগুপ্ত

বাংলা দেশের দেবী-পূজা বা দেবী-সাধনার ক্ষেত্রে বৌদ্ধ প্রভাবের কথা আমরা নানা ভাবে বলিয়া থাকি। হিন্দু তন্ত্র-পুরাণাদিতে গৃহীত বহু দেবীকে আমরা বৌদ্ধ দেবী বলিয়া সন্দেহ করিতেছি। হিন্দু দেবী তারাকে আমরা বহুরূপে হিন্দু উপপুরাণ-তন্ত্রাদির মধ্যে পাই; এই তাবা দেবী যে বৌদ্ধ তাবা বা উগ্রতাবা বা একজটা দেবী, সে-কথা আজ প্রায় স্বীকৃত। হিন্দু উপপুরাণ-তন্ত্রে এবং বৌদ্ধ তন্ত্রাদিতে এই দেবীর বর্ণনা সাদৃশ্য লক্ষ্যীয়। সরস্বতী হিন্দুধর্মে পুজিতা প্রসিদ্ধা দেবী; কিন্তু বৌদ্ধতন্ত্রে এই দেবীর বিভিন্ন রূপের বর্ণনা আমরা দেখিতে পাই। পর্ণশবরী দেবী দুর্গার একটি প্রসিদ্ধ নাম—পর্ণ (চন্দ্র পাতা) পরিহিতা পর্ণশবরীর কথা আমরা বৌদ্ধ 'সাধন-মালায়'ও দেখিতে পাই। সুবন্ধুর 'বাসবদত্তা'য় আমরা বেতাল-দেবীর মন্দিরের উল্লেখ পাই; বৌদ্ধ তন্ত্রেও বজ্র-বেতালীর সন্ধান পাই। মার্কণ্ডেয় 'চণ্ডী'তে শক্তির মায়ুদী, অপরাজিতা, বারাহী, ভোমা, কপালিনী, কৌবেরী প্রভৃতি নাম পাই, বৌদ্ধ 'সাধন-মালা'র মধ্যেও মহামায়ুদী, অপরাজিতা, বজ্রবারাহী, ভোমা কপালিনী, কৌবেরী দেবীর উল্লেখ পাই। চণ্ডীতে শিবকে দূতরূপে পাঠাইয়াছিলেন বলিয়া দেবী 'শিবদূতী' নামে খ্যাতা, বৌদ্ধতন্ত্রে মহাকালের সহিত যুক্তা দেবীকে 'কালদূতী' নামে দেখিতে পাইতেছি।^১ প্রসঙ্গক্রমে বৌদ্ধতন্ত্রের 'মমদূতী'র কথাও স্মরণ্য। ছিন্নমস্তা হিন্দু দশমহাবিজ্ঞার এক বিখ্যাত মহাবিজ্ঞা, ছিন্নমস্তা দেবীকে বৌদ্ধতন্ত্রের মধ্যেও পাইতেছি। বৌদ্ধতন্ত্রে কালিকা দেবীরও সন্ধান পাইতেছি। ইনি মহাকালের সহিত সংশ্লিষ্টা; ইহার বর্ণনায় দেখা যায়, ইনি ভয়ঙ্করী, নীলবর্ণা, বিভূজা, অগ্নিকোণস্থিতা, একহাতে কঙ্কাল ও অস্ত্রহাতে অস্ত্র। আলাদা ভঙ্গিতে ইনি শাবর উপর দণ্ডায়মান।^২

এইভাবে বৌদ্ধতন্ত্রাদিতে যে-সকল দেবীর নাম পাঠিতেছি, হিন্দু ধর্মে তাহাদিগকে গৃহীত হইতে দেখিলেই আমরা সাধাবণভাবে একটা কথা বলিয়া থাকি—এই দেবী মূলতঃ বৌদ্ধ দেবী—বৌদ্ধধর্মে হইতেই হিন্দুধর্মে তাহারা গৃহীত হইয়াছেন।

কিন্তু এই বৌদ্ধদেবী শব্দের অর্থ কি? বৌদ্ধতন্ত্রে উল্লেখ পাইলেই কি সে দেবী বৌদ্ধ দেবী হইয়া যান? বৌদ্ধতন্ত্রগুলিকে বৌদ্ধ বলিবারই বা তাৎপর্য কি? দেবদেবী সাদৃশ্য, বর্ণিত সাধনার সাদৃশ্য এবং গুহ্য যোগবিধির সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া এবং প্রচলিত হিন্দুতন্ত্রগুলি হইতেই নবাবিকৃত বৌদ্ধতন্ত্রগুলির রচনাকাল প্রাচীনতর মনে করিয়া বৌদ্ধতন্ত্র হইতেই হিন্দুতন্ত্র গড়িয়া উঠিয়াছে এইরূপ একটি মতও কেহ কেহ পোষণ করিয়াছেন। কিন্তু গ্রন্থান্তরে^৩

আমরা এ ভিনিসটি স্পষ্ট করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছি যে মূল হিন্দুতন্ত্র এবং বৌদ্ধতন্ত্র বলিয়া কোনও ভিনিস নাই, মূল দর্শনে এবং সাধনায় এই উভয়বিধ তন্ত্রের মধ্যে কোনও বিশেষ পার্থক্য নাই। তন্ত্র-বহু প্রাচীন কাল হইতে প্রবাহিত একটি স্বতন্ত্র সাধনার ধারা; এই সাধন-ধারার সহিত বিভিন্ন কালে হিন্দু দর্শনের বিভিন্ন তত্ত্ব যুক্ত হইয়া ইহাকে হিন্দুতন্ত্রের রূপ দান করিয়াছে, আবার পরবর্তী কালের মহাযান বৌদ্ধধর্মের কতকগুলি চিন্তাধারার সহিত যুক্ত হইয়া ইহা বৌদ্ধতন্ত্রের রূপ গ্রহণ করিয়াছে। আর এই মূল সাধনার কথা ছাড়িয়া তন্ত্রাদিতে বর্ণিত দেবদেবী ও পূজা-অর্চনাবিধির কথা যদি ধরা যায় তবে দেখিব—উভয়ক্ষেত্রেই দেবদেবী, উপদেবী, ডাকিনী-যোগিনী, যক্ষ-রক্ষ প্রভৃতির বর্ণনা, পূজা-বিধি বা ধ্যান-অর্চনাবিধি স্থান পাইয়াছে। এই সব দেবদেবীগণ কোনও ক্ষেত্রেই কোনও গভীর হিন্দু-দার্শনিক তত্ত্ব বা বৌদ্ধ দার্শনিক তত্ত্বকে রূপায়িত করিবার জন্তই আস্তে আস্তে বিশদবর্ণনায় বিভ্রবর্তী হইয়া উঠিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে সে-কথা আমরা স্বীকার করি না, একথা পূর্বেই বলিয়াছি। উভয়ক্ষেত্রেই বিভিন্ন সমাজস্তরের মানসিক প্রবণতার বিভিন্নভাবে পবিকল্পিত স্থানীয় দেবদেবীগণ এবং প্রচার ও প্রসিদ্ধি হেতু সাধারণীকৃত দেবদেবীগণের উল্লেখ বর্ণনা ও সাধনার কথা দেখিতে পাইতেছি। বৌদ্ধ সাধন-মালায়^৪ যে সকল দেবীগণের উল্লেখ পাইয়াছি দেবী হিসাবে বজ্র, শূন্যতা, ককণা, বোধিচিন্তা, প্রজ্ঞা প্রভৃতি কতকগুলি চিহ্নাকর ব্যতীত প্রচলিত হিন্দুদেবীগণ হইতে তাঁহাদের পার্থক্য কি? সাধনার ক্ষেত্রে অবশ্য বিবিধ মন্ত্র-প্রয়োগের সঙ্গে যে ধ্যান-পরিকল্পনা দেখিতে পাই তাহার সহিত পরোক্ষ ভাবে প্রাচীন বৌদ্ধধর্মের 'ধ্যান'-পরিকল্পনা এবং বোগাশ্রিত মহাযানের ধ্যান-পরিকল্পনার কিছু কিছু যোগ লক্ষ্য করিতে পারি। কিন্তু আসলে হিন্দু দেবীগণের উৎপত্তির ইতিহাস বেরূপ, বৌদ্ধ দেবীগণের উৎপত্তির ইতিহাসও একান্তই অমূরূপ।

আমরা ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে এখানে একটি তথ্য লক্ষ্য করিতে হইবে। এই বৌদ্ধতন্ত্রের প্রচুর প্রচার ঘটয়াছিল মহাচীনে—অর্থাৎ বিহার-বঙ্গ-আসামের কিছু অঞ্চল এবং নেপাল-তিব্বত-ভূতান প্রভৃতি অঞ্চলে; ফলে এই অঞ্চলের প্রসিদ্ধা কিছু কিছু দেবীগণ বৌদ্ধতন্ত্রে স্থান পাইয়াছেন, তাহারাই সম্ভবতঃ বৌদ্ধতন্ত্রের মারফতে হিন্দু তন্ত্রাদিতেও দেবী বলিয়া গৃহীতা এবং স্বীকৃতা হইয়াছেন। তাবা বা উগ্রতাবা বা একজটা দেবী মূলতঃ তিব্বতের দেবী বলিয়া ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচীর বিশ্বাস।^৫ পর্ণশবরী দেবীও এইভাবে বৌদ্ধতন্ত্র হইতেই গৃহীত বলিয়া কাহারও কাহারও মত।^৬ হিন্দুতন্ত্রে বর্ণিত যটক্ষেত্রের অধিষ্ঠাত্রী ডাকিনী, হাকিনী, লাকিনী, রাকিনী, শাকিনী দেবীগণের সকলে না হইলেও কেহ কেহ মহাচীনাঞ্চল হইতে গৃহীতা বলিয়া আমরা মনে করি।

বর্তমানে আমরা বহু সংখ্যক বৌদ্ধতন্ত্রের সন্ধান পাইতেছি;

১। ডক্টর বিনয়তোষ ভট্টাচার্য-লিখিত **Buddhist Iconography** গ্রন্থখানি দ্রষ্টব্য।

২। ঐ, ১২২ পৃষ্ঠা।

৩। এই লেখকের **An Introduction To Tantric Buddhism** গ্রন্থখানি দ্রষ্টব্য।

৪। গাইকোয়াড় ওরিয়েন্টাল সিরিজ প্রকাশিত ডক্টর বিনয়তোষ ভট্টাচার্য-সম্পাদিত, দুই খণ্ড।

৫। **Cultural Heritage of India**, চতুর্থ খণ্ডে ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী লিখিত **Evolution of the Tantras** প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য। ৬। ডক্টর বিনয়তোষ ভট্টাচার্য লিখিত 'সাধন-মালা'র ভূমিকা এবং **Buddhist Iconography** বইখানি দ্রষ্টব্য।

তিনতী অম্বাধ হইতে আরও অনেক পাইবার সম্ভাবনা। মূলতঃ উপরে টীকা-টিল্লনীর সংখ্যাও কম নয়। বাঙলা দেশে তাত্ত্বিক বৌদ্ধধর্মের একটি প্রধান ঘাঁটি ছিল, এ সত্য আজ ঐতিহাসিক তথ্যের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। এই তত্ত্বসমূহ এবং তাঁহাদের উপরে রচিত অনেক টীকা-টিল্লনীর বাঙলা দেশে এবং তৎসংলগ্ন দেশেই রচিত হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু এ বিষয়ে একেবারে নিশ্চিত হইবার তথ্য আমাদের বশেষ্ট নাই। কিন্তু পরবর্তী কালের যে বৌদ্ধসাহিত্য বাঙলা দেশেই লিখিত বলিয়া আমরা একেবারে নিশ্চিত হইতে পারি তাহা হইল বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্গণ রচিত দোহা ও চর্চাগীতিগুলি। এই দোহা ও চর্চাগীতিগুলি যদিও প্রধানতঃ সহজিয়া বৌদ্ধ মতবাদ ও সাধন পন্থা অবলম্বনেই লিখিত তথাপি পরোক্ষ ভাবে ইহার ভিতরে তৎকালীন দেবীবাদ সম্বন্ধে কিছু কিছু লক্ষণীয় তথ্য লাভ করা যায়। এই দোহা ও গীতিগুলি মোটামুটি ভাবে খৃষ্টীয় দশম শতক হইতে দ্বাদশ শতকের ভিতরে রচিত বলিয়া গৃহীত; স্তরতঃ এইগুলির ভিতরে প্রাপ্ত তথ্যের ভিতর দিয়া তৎকালীন প্রচলিত দেবীবাদ বা শক্তিবাদের একটি বিশেষ দিককে আমরা গভীর এবং ব্যাপক ভাবে বুঝিতে সমর্থ হই।

বৌদ্ধ দোহা ও গীতিগুলির মধ্যে আমরা এক 'দেবী'র উল্লেখ দেখিতে পাই; এই দেবী বহু স্থানে নৈরাঙ্কা, নৈরামণি, ডোহী, চণ্ডালী, মাতঙ্গী, শবরী নানারূপে অভিহিত। সাধনতত্ত্বের মধ্যে এই দেবীকে রূপকচ্ছলেই ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করা যাউতে পারে; কিন্তু সেই ব্যাখ্যা দ্বারা সিদ্ধাচার্গণের মনোসংগঠনের সবখানি পরিচয় পাওয়া যায় না। তৎকালে প্রচলিত ভারতীয় দেবীতত্ত্ব বা শক্তিতত্ত্বের সহিত এই বৌদ্ধদেবীর নিগূঢ় যোগ আছে বলিয়া মনে করি। সহজিয়া বৌদ্ধগণের এই দেবীতত্ত্বকে ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে তাত্ত্বিক বৌদ্ধধর্মে এই দেবীবাদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের একটি সঙ্ক্ষিপ্ত পরিচয় দিবার প্রয়োজন মনে করি।

তাত্ত্বিক বৌদ্ধধর্মের মধ্যে দেবীবাদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস লক্ষ্য করিতে গিয়া প্রথমতঃ দেখিতে পাই, উত্তরাঞ্চলে প্রচলিত বৌদ্ধধর্মে—অর্থাৎ নেপাল-ভূটান-তিব্বত এবং কতক ভাবে চীনদেশের কিছু কিছু অংশে আমরা এক আদিবুদ্ধ এবং তাঁহার নিত্যশক্তি আদিদেবী বা আদিশক্তির কথা জানিতে পারি। এই আদিবুদ্ধের ধারণা বহু স্থলে পরবর্তী মহাব্যানের ধর্মকায়-বুদ্ধ হইতে উৎপন্ন। যে রূপে বুদ্ধ সমস্ত প্রপঞ্চাস্থক বহুর পরমাধিষ্ঠান কারণাস্থক একরূপে বিরাজিত, সেই কারণাস্থক অদ্বয়তত্ত্বই পরিকল্পিত হইয়াছে আদিবুদ্ধরূপে। তিনি নিজে নির্বিশেষ, নিগুণ, নিরাকার—কিন্তু সকল বিশেষ, গুণ ও আকারের তিনিই পরমাধিষ্ঠান—অতএব তাঁহা হইতেই নিখিল বিশ্ব প্রসূত। কিন্তু সকল বিকারের মূল কারণ হইয়াও তিনি নিজে নিত্য অবিকারী। কোনও কোনও স্থলে আবার দেখিতে পাই, ধর্মকায়-বুদ্ধই আদিবুদ্ধ নহেন; মহাব্যানের ত্রিকায়ের শেষকায় ধর্মকায়কেই তাত্ত্বিক বৌদ্ধগণ বুদ্ধের চরমকায় বলিয়া স্বীকার করে নাই—ধর্মকায়-বুদ্ধও যেন ধানিকটা অব্যক্ত হিরণ্যগর্ভ-তত্ত্ব; তাঁহারও উর্দ্ধে হইল বুদ্ধের চরম স্থিতি—তাহাকে বলা হইয়াছে স্বভাবকায় বুদ্ধ; এই স্বভাবকায়ই হইল অবিকারী শূন্যকায়—ইহাই বুদ্ধের বজ্রকায়। এই স্বভাবকায় বা বজ্রকায় বুদ্ধই আদিবুদ্ধ, তিনিই হইলেন তত্ত্বের

পরমেশ্বর। এই পরমেশ্বরের শক্তি যেমন পরমেশ্বরী—তেমনিই আদিবুদ্ধের নিত্য শক্তি হইলেন আদিদেবী। একেত্রে হিন্দুতত্ত্বগুলি তাঁহাদের পরমেশ্বর পরমেশ্বরীকে আদিবুদ্ধ বা আদিদেবী বা আদিপ্রজ্ঞা হইতে গ্রহণ করিয়াছে না বৌদ্ধ আদিবুদ্ধ ও আদিদেবী হিন্দুতত্ত্বের পরমেশ্বর পরমেশ্বরীর আদর্শ লইয়া বৌদ্ধরূপে রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছেন? এই জিজ্ঞাসা এবং এ সম্বন্ধে এ পক্ষে বা সে পক্ষে সিদ্ধান্তকে মূলেই ভুল বলিয়া মনে করি। অতি প্রাচীনকাল হইতেই শক্তিমান ও শক্তির অভেদত্বের মধ্যেই একটা ভেদ-কল্পনা করিয়া যে শক্তিতত্ত্বের উদ্ভব দেখিতে পাই, হিন্দুতাত্ত্বিক পরমেশ্বর-পরমেশ্বরী এবং বৌদ্ধ আদিবুদ্ধ-আদিপ্রজ্ঞা বা আদিদেবীর পরিকল্পনায় আমরা সেই একই প্রাচীন শক্তিতত্ত্বের বিভিন্ন কালে বিভিন্ন ক্ষেত্রে গ্রহণ মাত্র দেখিতে পাই।

প্রাচীন বৈষ্ণব ও শৈবশাস্ত্রে যে শক্তিতত্ত্ব দেখিতে পাই, তাহাতে দেখি প্রপঞ্চাস্থক যে বচিঃসৃষ্টি তাহা পরমেশ্বরের স্বরূপের সহিত অভিন্ন। সমবায়িনী শক্তি হইতে হয় না; সৃষ্টি হয় বিক্ষেপ-শক্তি বা পরিগ্রহা শক্তি হইতে। এই তত্ত্বটি তাত্ত্বিক বৌদ্ধধর্মে রূপান্তর গ্রহণ করিয়াছে অল্পরূপে। আদিবুদ্ধ ও আদিদেবী হইতে সৃষ্টি হয় না; সৃষ্টি হয় সশক্তিক ধ্যানিবুদ্ধ বা পঞ্চ তথাগত হইতে। আদিবুদ্ধের সৎসংস্কৃত পঞ্চ প্রকারের ধ্যান আছে, ইহার প্রত্যেকটি ধ্যান হইতে প্রসূত হন এক এক জন ধ্যানিবুদ্ধ, ইহারাই হইলেন বৈরোচন, রত্নসম্ভব, অমিতাভ, অমোঘসিদ্ধি এবং অকোভা। এই পঞ্চ ধ্যানিবুদ্ধই হইলেন যথাক্রমে রূপ-বেদনা-সংজ্ঞা-সংস্কার-বিজ্ঞান এই পঞ্চস্কন্ধের দেবতা; সৃষ্টি এই পঞ্চস্কন্দাস্থক। এই পঞ্চ ধ্যানিবুদ্ধের পঞ্চশক্তি; তাঁহারা হইলেন যথাক্রমে তারা বা বজ্রধারীশ্বরী, মামকী, পাণ্ডুরা, আর্ধতারি এবং লোচনা। সশক্তিক পঞ্চতথাগত মহাব্যাদেহের মস্তক, মুখ, হৃদয়, নাসী ও পাদদেশ এই পঞ্চস্থানে অধিষ্ঠান করেন। দেহ-অবলম্বনে বৌদ্ধতাত্ত্বিক সাধনার প্রারম্ভে দেহতত্ত্বের দ্বারা যোগদেহ লাভ করিতে হইলে প্রথমে এই সশক্তিক পঞ্চতথাগতকে দেহের বিভিন্ন দেশে অধিষ্ঠিত করিতে হয়—তাহা দ্বারাই তথাগত-দেহ লাভ হয়—তথাগত-দেহ ব্যতীত সাধনা হয় না।

বৌদ্ধতত্ত্ব আদিবুদ্ধকে অবলম্বন করিয়া একবার এই সর্বেশ্বরী মহাদেবী আদিদেবীকে পাই। অজ্ঞাতাবেও আমরা এই সর্বেশ্বর ভগবান এবং সর্বেশ্বরী ভগবতীকে পাই—তাহারও একটু বিস্তারিত আলোচনা আবশ্যক।

বৌদ্ধতত্ত্ব মহাব্যান-বৌদ্ধধর্মেরই একটি বিশেষ পরিণতি। মহাব্যানী বৌদ্ধেরা বাহাদিগকে হীনযানী বৌদ্ধ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, তাঁহাদিগের যান বা মত এবং পথকে হীন বলিবার কারণ এই, তাঁহারা শূন্যতার উপরেই একমাত্র জোর দিয়াছেন এবং শূন্যতা-জ্ঞানের সাধনার দ্বারা ব্যক্তিগত মুক্তি—অর্থাৎ অর্হন্ত লাভের আদর্শ প্রচার করিয়াছেন। মহাব্যানীরা সেখানে আনিলেন বিশ্বযুক্তির প্রশ্ন—স্বতরাং যুক্তিলাভী শূন্যতার সহিত তাঁহারা যুক্ত করিলেন কুশলকর্মের প্রেরণাদায়ক মহাকরুণা। এই শূন্যতা হইল নেতিবাচক প্রজ্ঞা, আর করুণা হইল ইতিবাচক উপায় তর্কীয় কুশলকর্ম-প্রেরণা। তাত্ত্বিক বৌদ্ধগণ মহাব্যানের এই শূন্যতা-করুণার মিলনের উপরেই সমস্ত সাধনা প্রতিষ্ঠিত করিলেন; তাঁহাদের সাধনা হইল বোধিসত্ত্ব হইয়া বোধিচিন্তা-লাভের সাধন, আর বোধিচিন্তার

তাহারা সংজ্ঞা নির্ণয় করিলেন, 'শূন্যতা-করণাভিন্নং বোধিচিহ্নং তদুচ্যতে'—শূন্যতা এবং করণার অভিন্নতাই হইল বোধিচিহ্ন। তাত্ত্বিক বৌদ্ধগণ ধর্মমত ও সাধনার ক্ষেত্রে এই বোধিচিহ্ন এবং শূন্যতা-করণাকে নানাভাবে বহুদূরে টানিয়া লইতে লাগিলেন। বোধিচিহ্ন-তত্ত্বই হইল তত্ত্বের যুগল বা বামল-তত্ত্ব; ইহাই মূল সামরস, ইহাই মিথুন-তত্ত্ব। শূন্যতা প্রজ্ঞাকপিণী ভগবতী—উপায় নিখিল ক্রিয়াস্বক ভগবান—এই ভগবান ভগবতী সামরস-রূপ মিথুনতত্ত্বই হইল অদ্বয় বোধিচিহ্ন-তত্ত্ব। প্রজ্ঞারূপে শূন্যতা নিবৃত্তি-লক্ষণা, শূন্যতাই পরম-সম্বৃত্তি, শূন্যতাই বিন্দু; কর্মচোদনারূপে উপায় প্রবৃত্তি-লক্ষণ—উপায় পরম-প্রকাশ—উপায়ই নাদতত্ত্ব। শূন্যতারূপিণী প্রজ্ঞাই নৈরাশ্ব্যরূপিণী নির্বাণ—উপায়ই সর্ববুদ্ধরূপ ভব। এই ভব এবং নির্বাণের সামরসই হইল যুগল তত্ত্ব—সেই অদ্বয় যুগলই হইল পরম কাম।

তত্ত্বশাস্ত্রের (তাহা হিন্দু হোক বা বৌদ্ধ হোক—অথবা হিন্দু বা মধ্যে বৈষ্ণব হোক বা শৈব হোক বা শাক্ত হোক) মূল দার্শনিক দৃষ্টি হইল অদ্বয়বাদ। পরম সত্য অদ্বয়-স্বরূপ। কিন্তু এই অদ্বয়তত্ত্ব শুধু স্বয়ের অভাব নয়—তাঁতা স্বয়ের মিথুনতত্ত্ব—স্বয়ের নিঃশেষ সমন্বয়তা। যে স্বয়ের সমন্বয়তায় অদ্বয়মিহি হিন্দুতত্ত্ব মতে সে স্বয়তত্ত্বই হইল শিবতত্ত্ব এবং শক্তিতত্ত্ব—একই উৎসের যেন দুইটি ধারা; একটি জ্ঞানমাত্র তত্ত্ব নিবৃত্তিমূলক—অপরটি ত্রিগুণাত্মিকা প্রকাশাত্মিকা প্রবৃত্তিমূলক। দার্শনিক ভাষায় শিবতত্ত্বই জ্ঞাতৃত্ব—শক্তিতত্ত্বই জ্ঞেয়ত্ব; শিবই পরম সঙ্কুচিত বিন্দু—শক্তিই পরম প্রকাশিতা নাদরূপিণী।

তত্ত্বের এই যে অদ্বয়তত্ত্ব এবং তত্ত্বের মধ্যে অনিনাভাবে মিথুনীকৃত স্বয়তত্ত্বের দ্বি-ধারা এই মৌলিক তত্ত্বটি বৌদ্ধতত্ত্বে প্রকাশ লাভ করিয়াছে বোধিচিহ্ন এবং শূন্যতা-করণাকে লইয়া। 'শুধু তকং এই—বৌদ্ধতত্ত্বে ভগবতী-ই হইলেন নির্বাণরূপিণী বা বিন্দুরূপিণী প্রজ্ঞা আর সর্ববুদ্ধাত্মক ভগবানই হইলেন ক্রিয়াস্বক এবং প্রকাশাত্মক। প্রজ্ঞাই গ্রাহক-তত্ত্ব, আর উপায়াত্মক করণাই হইল গ্রাহ্যতত্ত্ব। এই ভাবে দেখিতে পাই, হিন্দু তত্ত্বেও যেমন শিব-শক্তিকে অবলম্বন করিয়া মিথুন সাধনা গড়িয়া উঠিয়াছে, তেমনই বৌদ্ধতত্ত্বেও করুণারূপি ভগবান ও প্রজ্ঞারূপিণী দেবী ভগবতীকে লইয়া তাত্ত্বিক মিথুন-সাধনা গড়িয়া উঠিয়াছে। বোগ-সাধনার এই ভগবতী এবং ভগবান ইড়া-পিঙ্গলা গঙ্গা-যমুনা, বাম-দক্ষিণের রূপ গ্রহণ করিয়াছেন। অদ্বয়তত্ত্বই ত অর্থনারীশ্বর-তত্ত্ব—বামে দেবী ভগবতী, দক্ষিণে ভগবান—দুই মিলিয়া এক। একে দুই—দুইয়ে এক; হিন্দুতত্ত্বেও এই কথা—বৌদ্ধতত্ত্বেও সেই একই কথা। ৭

তত্ত্বসাধনার এই ভগবান এবং ভগবতী পূর্বালোচিত আদিবুদ্ধ ও আদিদেবীর সহিত মিলিয়া মিশিয়া গেলেন; ফলে বৌদ্ধতত্ত্বেও আমরা এক সর্বেশ্বর ভগবান এবং সর্বেশ্বরী ভগবতীর কথা প্রচুরভাবে দেখিতে পাই। এই সর্বেশ্বর দেবতা সাধারণতঃ ত্রিহেবজ্জ ত্রিহেজ্জক ত্রিবজ্জধর, ত্রিবজ্জেশ্বর, ত্রিবজ্জস্ব, মহাস্ব ত্রিমুমহাস্বত্ব, ত্রিচণ্ডরোধণ প্রভৃতি রূপে দেখা দিয়াছেন, সর্বেশ্বরী দেবী দেখা দিয়াছেন তাহারই অকবিচারিতরূপে—অথবা মিথুনাবস্থায় তাঁহার সহিত যুক্তরূপে তিনি

কোথাও বজ্রধাতীশ্বরী, বজ্র-বারাহী, কোথাও ভগবতীপ্রজ্ঞা বা প্রজ্ঞা-পারমিতা, অথবা দেবী নৈরাশ্বা। স্বাভাবিক ভাবেই হিন্দু মহেশ্বর—মহেশ্বরী এবং বৌদ্ধ। সর্বেশ্বর-সর্বেশ্বরী বহু স্থানে মিলিয়া মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছেন।

মহাভারতের মধ্যে আমরা পার্বতী-মহেশ্বর সংবাদের কথা দেখিতে পাই। সেখানে দেখিয়াছি, জগজ্জীবের প্রতি করুণায় বিগলিতা জগজ্জননী পার্বতী সর্বজ্ঞানের অধীশ্বর মহাদেবের নিকটে একটির পর একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া জীবের হিতকর সমস্ত তত্ত্ব জানিয়া লইয়াছেন। সমগ্ৰ হিন্দু আগম-শাস্ত্র এই ভাবেই রচিত হইয়াছে; এখানে জগন্মাতা মহাদেবী স্বয়ং প্রশ্নকর্তা এবং শ্রোতা এবং জ্ঞানধর স্বয়ং মহাদেবী হইলেন এখানে বক্তা। তাবৎ হিন্দু তত্ত্বগুলির মধ্যে আমরা এই রীতিই লক্ষ্য করিতে পারি। প্রত্যেক তত্ত্বেই দেখি, দেবী জীবের দুঃখে বিগলিতা হইয়া তাহাদের আত্মনাশ, মঙ্গল ও মুক্তিবিধানের জগ্গ মহাদেবকে অনুনয় বিনয় করিয়া তাঁতার স্বয়ং হইতে সকল তত্ত্ব জানিয়া লইতেছেন। প্রসিদ্ধ অনেকগুলি বৌদ্ধতত্ত্বেও আমরা এই রীতি অনুসৃত হইতে দেখি। বৌদ্ধতত্ত্বের মধ্যে অতি প্রসিদ্ধ গৃধ্ৰ তেবজ্জ-তত্ত্বে দেখিতে পাই,—

কপাল-মালিনঃ বোব' নৈরাশ্ব্যল্লিষ্টকঙ্করম্।

পঞ্চমুদ্রাপবঃ দেবঃ নৈরাশ্বা পৃচ্ছতি স্বয়ম্ ॥

এখানে 'দেবের' বিশেষণ 'কপাল-মালিনঃ বোবঃ' কথাটিও বিশেষ করিয়া লক্ষণীয়। উক্তরে দেখিতে পাই,—

চুখ্মিয়া হু নৈরাশ্বা:—

—দেবো মণ্ডলঃ সম্প্রকাশতে ॥৮

বজ্রবারাহী-কল্প-মহা তত্ত্ব, একলবার-চণ্ড-মহারোধণ-তত্ত্ব, ডাকার্ণব তত্ত্ব প্রভৃতি বৌদ্ধতত্ত্বগুলি এই ভাবে আগাগোড়াই দেব এবং দেবীর প্রশ্নোত্তরে লেটে বর্ণিত হইয়াছে।

এই বৌদ্ধতত্ত্বগুলিতে আরও একটি বিষয় প্রাধান্যযোগ্য। হিন্দুতত্ত্বে পরম-সামরস জনিত কৈবল্যানন্দ লাভের জগ্গ নর-নারী মিলিত সাধনার ব্যবস্থা রহিয়াছে। ঠিক এই একই সাধনা বৌদ্ধতত্ত্ব-গুলিতেও দেখিতে পাই। হিন্দুতত্ত্বগুলিতে এই-জাতীয় সাধনার ক্ষেত্রে সাধককে তাহাণ শিব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে, সাধিকাকে বিস্কন্দ শক্তিস্বরূপা হইতে হইবে। বিস্কন্দস্বরূপে প্রতিষ্ঠা ব্যতীত কখনও বামল-সাধনা সম্ভব নহে। স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সাধনাই হইল প্রচলিত ভৈরব-ভৈরবী সাধনার গুঢ়ার্থ। বৌদ্ধতত্ত্বগুলিতেও আমরা বহু ভাবে এই তত্ত্বই ব্যাখ্যাত দেখিতে পাই। নারী মাত্রই প্রজ্ঞারূপিণী—পুরুষ বজ্রধর বা বজ্রস্ব; এই স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত সাধনাই হইল প্রজ্ঞোপায় সাধনার তাৎপৰ্য। কোনও কোনও বৌদ্ধতত্ত্বে এই তত্ত্বটি অতি স্পষ্ট ভাবেই প্রচারিত হইয়াছে। ৯ একলবার-চণ্ডমহারোধণতত্ত্বে স্পষ্ট দেখিতে পাই—

'নরাঃ বজ্রবাক্যারাঃ বোধিতঃ বজ্রমোহিতঃ ॥'

নাগার্জুনপাদেব 'পঞ্চক্রম' গ্রন্থে শূন্যতা-রূপিণী প্রজ্ঞা সহদেবী বলা হইয়াছে, 'স্ত্রী-সংজ্ঞা চ তথা প্রোক্তা।' একলবার-চণ্ডমহারোধণ তত্ত্বে এক স্থলে স্বয়ং বজ্রধর চণ্ডরোধণ দেবীকে বলিতেছেন—

ভাবাভাববিনিমু'ক্শচতুরানন্দ-তৎপরঃ ।
নিম্পপঞ্চ-স্বরূপোহং সর্বসকলবর্জিতঃ ॥
মাং ন জানন্তি যে মূঢ়াঃ সর্বপুংবপুষি স্থিতম্ ।
তেষামহং হিতার্থায় পঞ্চাকারেণ সংস্থিতঃ ॥

আবার দেবীর দিক হইতে দেখিতে পাই—

অথ ভগবতী ধ্বংসজ্ঞী সমাধিমাগতেন্দ্রম্ উদাজ্জহার—
শূভ্রতা-করুণালিন্না দিবা-কাম-সুখ-স্থিতা ।
সর্ব-কল্ল-বিত্তানাতঃ নিম্পপঞ্চা নিরাকুলা ॥
মাং ন জানন্তি যে নার্যঃ সর্বত্রৌদেহ-সংস্থিতাম্ ।
তেষামহং হিতার্থায় পঞ্চাকারেণ সংস্থিতা ॥

এই তন্ত্রের এক স্থলে এমন কথাও দেখিতে পাই যে, মায়াদেবী-সুত বৃদ্ধদেবী চণ্ডোরোষণতা রূপ গ্রহণ করিয়াছেন, আর প্রজ্ঞা-পারমিতাস্থিকা দেবীই হইলেন বৃদ্ধপত্নী গোপা । বিশ্বের সকল স্ত্রী হইলেন এই প্রজ্ঞাপারমাস্থিকা দেবীস্বরূপা এবং দেব চণ্ডোরোষণ স্বরূপই হইলেন বিশ্বের সকল পুরুষ ।

মায়াদেবীসুতচ্যাতঃ চণ্ডোরোষণতাং গতঃ ।
অমেব ভগবতী গোপা প্রজ্ঞাপারমিতাস্থিকা ॥
যাবন্তস্ত স্ত্রিয়ঃ সর্বা স্বরূপেণৈব তা মতাঃ ।
মদ্রূপেণ পুমাংসস্ত সর্ব এব প্রকীর্তিতা ॥

এই সকল ক্ষেত্রে হিন্দুতন্ত্র হইতে এই এই ধারণা বৌদ্ধতন্ত্রে গৃহীত হইয়াছে বা বৌদ্ধতন্ত্র হইতে এই এই ধারণা হিন্দুতন্ত্রে গৃহীত হইয়াছে, এইরূপ কতকগুলি কাটাছাটা কথা বলিয়া দিলেই সবখানি কথা বলা হইল না । আসলে তন্ত্রসাধনাকে অবলম্বন করিয়া এই জাতীয় কতকগুলি ধারণা সমাজ-মানসে অত্যন্ত দৃঢ়বদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল—হিন্দুতন্ত্র ও বৌদ্ধতন্ত্র উভয় ক্ষেত্রেই আমরা সমভাবে তাহার প্রকাশ দেখিতে পাই ।

বৌদ্ধ সহজিয়াগণের তাত্ত্বিক-সাধনায় আবার দেখিতে পাই, এই ভগবান ও ভগবতী বাহিরের কিছু নহেন—সাধকের ভিতরেই তাঁহাদের অবস্থান । সাধক-চিত্তই স্বয়ং ভগবান—নৈরাশ্বা ই গৃহিণী । ১০ সেই নৈরাশ্বার সঙ্গে সাধক-চিত্ত নিঃশেষে মিলিয়া যায়—যেমন মিলিয়া যায় লবণ জলের সঙ্গে ।

জিম লোণ বিলিজ্জই পানিয়েহি
তিম ঘরিনী লেই চিত্ত ।
সমরস জাই তক্খণে
জই পুণু তে সম নিত্ত ॥

অম্বয়-সিদ্ধি নামক বৌদ্ধ-তন্ত্রে বলা হইয়াছে—
ভগবানিতি নির্দিষ্টঃ চিত্তস্রাধিপতিঃ প্রভুঃ ।

তিল্লোপাদ তাঁহার দোহায় বলিয়াছেন—

চিত্ত খসম জহি সমসুহ পলট্টই ।
ইন্দ্রিয়-বিসম তহি মত্ত ৭ দীসই ॥

চিত্ত এবং আকাশ স্বরূপা (শূভ্রতাক্রপিনী প্রজ্ঞা) যখন সমসুখে অবিষ্ট হয় তখন ইন্দ্রিয়-বিষয় তাহাতে কিছুই দৃষ্ট হয় না ।

আবার— মণহ ভঅবা খসম ভঅবদী ।
দিবারান্তি সহজ্ঞে রহিঅই ॥

মন ভগবান—শূভ্রতাক্রপিনী প্রজ্ঞা ভগবতী ; ইহার দিবারান্তি সহজ্ঞে (মিলিত) থাকে ।

চর্চাগীতিকার কুক্কুরীপাদ একটি গীতিতে বলিয়াছেন—

ইউ নিরাসী খমণততারা
মোহোর বিগোআ কহণ ন জাই ।

এখানে দেবী নিজে বলিতেছেন, আমি হইলাম, আশারহিতা বা আসঙ্গরহিতা, খ-মনই আমার ভর্তা বা স্বামী ; আমাদের মিলনানন্দের কথা কহা যায় না । খ-মন শব্দের অর্থ শূভ্র মন—অর্থাৎ তাত্ত্বিকগণের চতুর্থ শূভ্র বা সর্বশূভ্র স্তরের প্রকৃতি-প্রভাষর মন ।

চর্চাপদের মধ্যে এই এক দেবীর কথা নানা ভাবে পাইতেছি ; কোথাও তিনি দেবী বলিয়া আখ্যাতা—কোথাও যোগিনী বলিয়া, কোথাও 'ঘরিনী' (গৃহিণী) বলিয়া, কোথাও আবার ডোহী, চণ্ডালী, মাতঙ্গী, শবরী প্রভৃতি বলিয়া । বজ্রধরস্বরূপ সাধকের ইহার সহিত নাচ-গানের কথা দেখি, ১১ কোথাও জীকজমক করিয়া ডোহীকে বিবাহ করিতে যাইবার দৃশ্য দেখিতে পাই এবং সেখানে দিন-রাত্রি তাঁহার সহিত সুবত-প্রসঙ্গে কাটাইবার বর্ণনা পাই । ১২ কোথাও আবার বজ্রধর সাধক বলিতেছেন—

জোইশি উই বিপু থণহি ৭ জীবমি ।

তো মৃত চুখী কমলরস পীবমি ॥

'যোগিনি, তোমাকে বিনা ক্ষমাত্রও বাঁচিব না, তোমার মুখ চুষন করিয়া কমল-রস পান করিব ।'

কোথাও আবার ডোহীর 'ভাভরিআলী' অর্থাৎ চতুরালী দেখিয়া বজ্রধর সাধক তাঁহাকে কামচণ্ডালী বলিয়াছেন, তাঁহাকে 'ছিনালী'র অগ্রগণ্য বলিয়া গাল দিয়াছেন ।

'অদম্ব বঙ্গালে' গিয়া এই চণ্ডালীকে 'নিজ ঘরিনী' করিয়া বজ্রধর সাধক একদম 'বঙ্গালী' ('বাঙাল' ?) হইয়া গিয়াছেন । ১৩ কোথাও এই দেবীকে মাতঙ্গীরূপে পাটনীর বেশে গঙ্গা-স্বমূনার মধ্যে নাও চালাইয়া যোগীকে লীলার পার করিয়া দিতে দেখি । ১৪ কোথাও দেবীকে নৃত্যকুশলা নৌকাবিহারিণী বেদেনীরূপে বাশ-বেতের চূপড়ি-চাক্কাড়ি বিক্রী করিতে দেখি । ১৫ কোথাও তাহাকে দেখি উঁচু পর্বতের শিখরে ময়ূরপুচ্ছে সজ্জিত হইয়া গুজ্জার মালা গলার শবরীরূপে—উন্নত শবরকে লইয়া তাঁহার ঘর-সংসার । ১৬

চর্চাপদে নানা রূপকে এবং কবিকল্পনা যোগে বিচিত্র রূপে বর্ণিত এই দেবী কে ?

১১। নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী

বুদ্ধনাটক বিসমা হোই ॥ (১৭ সং)

১২। ডোহী বিবাহিআ অহারিউ জাম

জউতুকে কিঅ আতু বাম ॥

অহণিসি স্তরঅ পসঙ্গে জাঅ

জোইনিজালে রএণি পোহাঅ ॥

ডোহীএর সঙ্গে জো জোই বস্তো

খণহ ৭ ছাড়অ সহজ উয়াস্তো ॥

১৩। ১৮ সংখ্যক পদ ।

১৪। ৪১ সংখ্যক পদ । ১৫। ১৪ সংখ্যক পদ ।

১৬। ১০ সংখ্যক পদ ।

সাধকগণ বর্ণিত এই দেবীকে বৃত্তিতে হইলে হিন্দুতান্ত্রিক সাধকগণ কর্তৃক বর্ণিত দেবী বা শক্তিকেও একটু ভাল করিয়া বৃত্তিতে হইবে। হিন্দুতন্ত্রের মধ্যে এবং বিবিধ যোগ-গ্রন্থের মধ্যে আমরা কুলকুণ্ডলিনী শক্তির কথা জানিতে পারি ; এই শক্তি সর্বনিম্ন চক্র বা পদ্ম মূলাধারে সর্পাকারে কুণ্ডলিত হইয়া নিদ্রিতা আছেন ; সাধকের সর্বপ্রথম কাজ হইল এই সুপ্তা শক্তিকে জাগ্রত করিয়া তোলা। দেবী মূলাধারে জাগ্রত হইয়া উঠিবার পূর্ব পর্যন্ত সাধনায় সাধকের কোনও অনুভূতির স্পন্দনই নাই—দেবীর বা শক্তির জাগরণের সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হয় আনন্দময় অনুভূতির স্পন্দন। শক্তির জাগরণের পরেই আরম্ভ হয় তাঁহার উদ্ভবগতি—একটি একটি করিয়া চক্রকে ভেদ করিয়া শক্তি উর্ধ্বে উদ্ভিত হন—সর্বোচ্চধামে সহস্রারে গিয়া শক্তির পরমাস্থিতি। শক্তির একটি একটি চক্রভেদের সঙ্গে সঙ্গে সাধকের নূতন নূতন আনন্দানুভূতির স্পন্দন লাভ হইতে থাকে ; সেই আনন্দানুভূতির স্পন্দন চরমবিস্তৃতি এবং পরমপূর্ণতা লাভ করে সর্বোচ্চধামে শক্তির স্থিতির সহিত। এই কুলকুণ্ডলিনীশক্তির অধ্যাত্ম-রহস্যের গভীরে প্রবেশ না করিয়া সহজে দেখিতে পাই যোগ-তত্ত্বাদিতে এই শক্তির উপান ও গতি একটি বিচিত্র-স্পন্দনাত্মক বিদ্যুৎ-প্রবাহের জ্বালা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এই প্রবাহের প্রতিক্ষেপে সাধকের বিচিত্র দিব্যানন্দের অনুভূতি। বৌদ্ধতান্ত্রিক সাধনায়ও এই জাতীয় একটি বিদ্যুৎ-প্রবাহবৎ স্পন্দনাত্মিকা শক্তির বর্ণনা দেখিতে পাই। এই শক্তির ব্যুৎপানের সঙ্গে যে আনন্দানুভূতির আরম্ভ, মস্তকস্থিত উকীষকমলে পৌছিয়া তাহারই পরিণতি বৌদ্ধতান্ত্রিকগণের পরমকাম্য মহাসুখ। এই মহাসুখই সহজানন্দ। ‘সহজ’ই হইল প্রত্যেক প্রাণীর—শুধু প্রাণীর নয়—সকল ধর্মের স্বরূপ ; আর এই স্বরূপ হইল নিশ্চয় আনন্দ—তাহাই মহাসুখ ; স্মরণ্য আনন্দই হইল সহজের নিত্য স্বভাব। বৌদ্ধতন্ত্রমতে দেহমধ্যে চারিটি চক্র বা পদ্ম অবস্থিত, নিম্নতম হইল নির্মাণচক্র, ইহা নাভিদেলে অবস্থিত ; তদুর্ধ্বে হৃদয়ে হইল ধর্মচক্র, কণ্ঠে হইল সন্তোগচক্র—আর মস্তকে উকীষকমলে হইল মহাসুখ-চক্র। ১৭ নির্মাণচক্র শুধু নিম্নতম চক্র নয়—ইহাই স্থূলতম তন্ত্রের ক্ষেত্র। কিন্তু শক্তির জাগরণ প্রথমে এই নির্মাণচক্রের চৌষটি দলযুক্ত পদ্মে ; এখানে এই শক্তির জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের উদ্বোধ। কিন্তু তখন পর্যন্ত এই স্পন্দনাত্মক আনন্দ বিস্তৃত নহে—বিষয়ানন্দের সঙ্গে তাণ্ড জড়িত ; উর্ধ্বে গতিতে এই আনন্দ পরমানন্দে, পরমানন্দ বিদ্যমানন্দে, বিদ্যমানন্দ সহজানন্দে পরিণতি লাভ করে ; সহজানন্দের পরিপূর্ণ অনুভূতি উকীষকমলে। এই সহজানন্দদায়িনী শক্তিই হইলেন বৌদ্ধসহজিয়া—তথা বৌদ্ধতান্ত্রিকগণের দেবী ; এই জগৎ তিনি সর্বদাই সহজ-স্বরূপা বা সহজানন্দরূপিণী। এই সহজানন্দের মধ্যে চিত্তের সম্পূর্ণ বিলোপেই যথার্থ নৈরাশ্র্যে প্রতিষ্ঠা। তাই এই শক্তি নৈরাশ্র্যরূপিণী বা আদরিণী ‘নৈরাশি’। এই আনন্দরূপিণীর প্রথম উদ্বোধের পরে তাঁহাকে ক্রমে হৃদয়ে (ধর্মচক্রে) ধারণ—সেখান হইতে তাহাকে কণ্ঠে ধারণ (সন্তোগচক্রে)—এই সমস্তের ভিত্তর

দিয়াই দেবী বা যোগিনীর সহিত বজ্রধর সাধকচিত্তের সুরভযোগ ; এই সুরভযোগের পরিণতি দেহ-পর্বতের উচ্চশিখর উকীষকমলে অচ্যুত সহজানন্দের পূর্ণানুভূতিতে—সে অনুভূতিতে সাধকচিত্তের সহজ-স্বরূপীণীর ভিতরে সম্পূর্ণ বিলোপে অদ্বয় সামরস্ত্রের উদ্ভব—তখনই দেবীসঙ্গে সর্বতোভাবে যুক্ত বজ্রধরের যুগলদ্ব্যস্তিতি।

এই আনন্দসন্দোহরূপিণী শক্তির যখন প্রথম নির্মাণচক্রে জাগরণ তখন সহসা জ্বলিত অগ্নির জ্বালা তাঁহার প্রচণ্ড দাহন ; সেই চণ্ডস্বভাবা দেবীকেই বলা হইয়াছে ‘চণ্ডালী’। ১৮ আবার এই অতীন্দ্রিয় অনুভূতিরূপা দেবী ইন্দ্রিয় দ্বারা সর্বথা অস্পর্শা—এইজন্তই দেবী ‘ডোষী’। ১৯ দেহরূপ নগরের বাহিরে অবস্থিত হইল এই ডোষীর কুণ্ডেবর—‘ব্রাহ্মণ-নাড়িয়া’র দল তাহাদের সকল আচার-বিচার ও পাণ্ডিত্যভিমান লইয়া ইহাকে যেন ছুঁইয়া ছুঁইয়া যায়—ঠিক সঙ্গলাভ করিতে পারে না ; সঙ্গলাভ করিতে পারে নিয়ুগ ‘নাগ’ (অর্থাৎ সর্ববিধ আবরণ রহিত) কাপালিক যোগী। একটি হইল পদ্ম, চৌষটি টি তাহাতে পাপড়ি (নির্মাণচক্রস্থিত চৌষটিদলযুক্ত পদ্ম), তাহাতে চড়িয়া নাচে এই ‘ডোষী বাপড়ি’। ২০ যে পর্যন্ত এই নির্মাণচক্রের পদ্মেই ‘ডোষী’র আনন্দ-স্পন্দনের নৃত্য সে পর্যন্ত ‘ডোষী’ খুব ভাল নহে—কারণ তখনও বিষয়ানন্দের সঙ্গে বজ্রধর সাধকচিত্তের যোগ আছে ; তাহার পরে নৃত্যের তালে তালে যখন উকীষন আরম্ভ হইল ততই ডোষী আদরিণী হইয়া হৃদয়ে—পরে কণ্ঠে স্থান পাইল ; উকীষকমলে গিয়া—

ডোষীএর সঙ্গে জো জোঁট রত্তো

খনহণ ছাড়অ সহজ উন্নত্তো ॥

চর্চাপদাদিতে বর্ণিত এই সহজানন্দরূপিণী শক্তিরূপিণী দেবীর প্রসঙ্গে আরও ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে আরও কিছু কিছু তথ্য লক্ষ্য করিতে পারি। দেবী এখানে ‘মাতঙ্গী’, ‘চণ্ডালী’, ‘শবরী’। দেবীর ‘মাতঙ্গী’ নামটি শমভাবিদ্ধার মধ্যে গৃহীত দেখিতে পাই। ‘শ্রীশ্রীচণ্ডী’র সপ্তম অধ্যায়ের আরম্ভে দেবী-ধ্যানের মধ্যেও দেবী ‘মাতঙ্গী’। পুরাণাদিতে দেবীকে ‘কিরাতী’, ২১ ‘শবরী’ প্রভৃতি রূপে বর্ণিত দেখি। চর্চাগীতিতে বর্ণিত শবরী দেবীও কিন্তু উচ্চপর্বতবাসিনী, অতএব এই ‘শবরী দেবীও পর্বতস্থা পার্ৱতী। এই ‘শবরী’ বর্ণনায় বলা হইয়াছে—

উঁচা উঁচা পাবত তঁহি সিই সবরী বালী

মোরঙ্গি গাঁছ পরহিণ সবরী গিবত গুজরী মালী ॥

শবরী দেবী শুধু পর্বতের উচ্চশিখরবাসিনী নন, ময়ূরপুচ্ছ পরিহিতা শবরী, গলায় গুজার মালী। সম-বিধান-ব্রাহ্মণে কুমারী রাত্রিদেবীকে আমরা ‘কঙ্গা শিখণ্ডিনী’ রূপেই দেখিতে পাই। এই শবরীর বর্ণনায় আরও দেখিতে পাই—

নানা তরুণর মৌলিল রে গঅণত লাগেলী ডালী।

একেলী শবরী এণ হিওই কর্ণকুণ্ডলবজ্রধারী ॥

‘নানা তরুণর মুকুলিত হইল, গগনে লাগিল ডাল ; একেলা শবরী এ বনে খুঁজিয়া বেড়ায়—সে কর্ণকুণ্ডলবজ্রধারী।’ পার্ৱত্যবনে একাকিনী ঘিয়া বেড়ায় এই শবরী বালিকা—কর্ণকুণ্ডলবজ্রধারী

এই শবরী। কর্ণকুলবজ্রধারী দেবীর বর্ণনা তত্ত্বপুৰাণে
দ্রুত নহে ।

শুধু তাহাই নয়, এই শবরীর স্বামী যে শবর সে নেশায় উন্মত্ত
পাগল, বাড়িতে বাধ্য হই-ট, নিজের ঘরের স্ত্রীর স্ত্রীকেই সে
নেশার ঘোরে চেনে না ; তাহাকে সামলানই যে শবরীর এক বিষম
দায় ! তাই অন্নয়-বিনয় করিতে হয়—

উমত সবরো পাগল সবরো মা কর গুলী গুহাড়া তোহোরি ।

নিম্ন ঘরিনী নামে সহজ স্ত্রীনারী ॥

শবরী খাট পাড়ে—মহাস্তম্বে শয্যা বিছায়—তাহার পরে সেই
শবর-ভুজঙ্গের সহিতই এই নৈরামণি শবরী স্ত্রী ভাবে প্রেমের রাত্রি
পোহায় । শবরকে আদর করিয়া খাইতে দেয় তামুল—আর কপূর ;
ক্ষণিকের জন্ত পোষ মানে মাতাল স্বামী—শবরীকে কণ্ঠে লইয়া
মহাস্তম্বে রাত্রি পোহায় ।

তিম্ম ষাট খাট পড়িলা মহাস্তম্বে সেজি ছাইলী ।

সবরো ভুজঙ্গ গইরামণি দারী পেক্স রাতি পোছাইলী ॥

হিম্ম তাঁবোলা মহাস্তম্বে কাপূর খাই

স্তন নিরামণি কণ্ঠে লইয়া মহাস্তম্বে রাতি পোছাই ॥

কিন্তু খেয়ালী মাতাল স্বামীর কি আর কিছু ঠিক আছে, এই
শাস্ত্রখুশি দিবা মানুষ, আবার কখন গুরুরোষে উন্মত্ত ; গুরুরোষে
ঘর ছাড়িয়া সে প্রবেশ করে গিয়া পর্বতের শিখরসঙ্কিতে—কি করিয়া
আবার তাহাকে খুঁজিয়া ফিরাইয়া আনা যায় !

উমত সবরো গুরুয়া রোষে ।

গিরিবর সিংহর সন্ধি পইসস্তে সবরো লোড়িব কইসে ॥

সমস্ত ছবিটি তুলিয়া ধরলাম । ইহার মধ্যে পরবর্তী কালের
লৌকিক ভাবে বর্ণিত হর-পার্বতীর গাহ-স্থ্য জীবনের আভাস মিলিতেছে
কি ? পার্বতীর স্বামীকে পরবর্তী বাঙলা সাহিত্যে দেখিতে পাইতেছি
নেশাখোর পাগলা ভোলা—বাড়িতে বাধান কোন্দল—নেশার ঘোরে
ঘুরিয়া বেড়ান কুচনী পাড়া, চেনেন না নিজের ঘরের স্ত্রীর স্ত্রীকে । কত
কণ্ঠে কত অন্নয়-বিনয়ে এই ভোলাকে খুশি রাখিয়া তাহার সঙ্গে
দাম্পত্য প্রেম রক্ষা কবিত্তে হয় পার্বতীকে । তাহাতেও কি মানেন,
কখন আবার গুরু রোষে চলিয়া যান পর্বতের কোনো শিখর-সঙ্কিতে—
কে করে আবার তাহার সন্ধান । চর্যাপদটির বর্ণনায় কি
ভাষা-সাহিত্যে বর্ণিত লৌকিক শিব-পার্বতীর সন্ধান পাওয়া
যাইতেছে ?

চতুর্দশ শতকের শেষ ভাগে বা পঞ্চদশ শতকে মিথিলায় বিজ্ঞাপতি
মৈথিলী ভাষায় হর-গৌরী বিষয়ক পদ রচনা করিয়াছেন ; লোকমুখ
হইতে এই জাতীয় কিছু কিছু পদ আবিষ্কৃত হইয়াছে । তাহার
কয়েকটি পদ এখানে উল্লেখ করিতেছি—চর্যার আলোচিত পদটির
সহিত বর্ণনায় আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষিত হইবে । মহাদেব গৌরীর প্রতি
বাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন ; গৌরী বলিতেছেন—

হমসৌ রুল মহেসে ।

গৌরী বিকল মন করখি উদেসে ॥

পুছিম পখুক জন তোহী ।

এ পথ দেখল কহু বুড় বটোহী ॥

অজমে বিভূতি অনুপে ।

কতক কহব ছনি জোগিক সঙ্গপে ॥

বিজ্ঞাপতি ভন তাহী ।

গৌরী হর লঞ ভেলী বতাহী ॥ ২২

‘আমার উপরে রোষ করিয়াছেন মহেশ । গৌরী বিকল মন,
উদ্দেশ্য করিতেছেন । তে পথিকজন, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, এ
পথে দেখিলে কোনও বুদ্ধ পথিককে ? অঙ্গে তাঁহাব অল্পপম
বিভূতি, কত আর বলিব, সেই সেই যোগীর স্বরূপ ? বিজ্ঞাপতি বলে
তাহাতে—হর লইয়া গৌরী হইলেন পাগলিনী ।’

অপর একটি পদে দেখি—

উগনা হে মোর কতয় গেলা ।

কতয় গেলা সি কি দহ ভেলা ॥

ভাঙ নহি বটুয়া কসি বেসলাচ ।

জোহি তেরি আনি দেল হসি উঁলাচ ॥

জে মোর কহতা উগনা উদেস ।

তাহি দেবও কর কঙ্গনা বেস ॥

নন্দন বনমে ভেটল মহেস ।

গৌরি মন হরসিত মেটল কলসে ॥

‘আমার উগনা (উলঙ্গ) কোথায় গেল ? কোথায় গেল,
তাহার কি হইল ? বটুয়াতে ভাঙ নাই, কসিয়া ‘বসিল ; যেমনই
খুঁজিয়া আনিয়া দিলাম—হাসিয়া উঠিল । যে মোরে বলিবে আমার
উগনার উদ্দেশ্য তাহাকে দিব কর-কঙ্কণের বেশ । নন্দনবনে দেখা
হইল মহেশের সঙ্গে ; গৌরীর মন হরবিত—মিটিল ক্লেশ ।’

আর একটি পদে দেখি—

গীসল ভাগ রহল এহি গতী ।

কথি লই মনাইব উমতা জতী ॥

আন দিন নিকহি ছলাচ মোর পতী ।

আই বঢ়াএ দেল কোন উদমতী ॥

আনক নীক আপন হো ছতী ।

গীমে এক ঠেসতা পড়ত বিপতী ॥

ভহি বিজ্ঞাপতি স্তন হে সতী ।

ঈ থিক বাউর ত্রিভুবন পতী ॥ ২৩

‘পেয়া ভাঙ এমন ভাবে রহিল ; কি করিয়া মানাইব এই উন্মত্ত
যতিকে ? অজ্ঞান ভাল ছিল মোর পতি, আজ কে বাড়াইয়া
দিল তাহার উন্মত্ততা ? অপর ভাল, নিজের হয় ক্ষতি ;
কোথায় এক ঠাকুর লাগিবে—পড়িবে বিপত্তি । বিজ্ঞাপতি বলে,
স্তন হে সতি,—এ নহে পাগল—এ যে ত্রিভুবনের পতি ।’

২২ । অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও উল্লের বিমানবিহারী
মজুমদার সম্পাদিত বিজ্ঞাপতি ।

২৩ । ইহার সহিত পরবর্তী কালের কবি ঈশনাখের এই
পদটির তুলনা করিতে পারি ।

বসহা-চড়ি কসিকত ভাগি পড়এলা, ত্রিভুবনপতি শিবদানী ॥ ১৬ ॥

ভাঙ ধখুর গীসি জাবে হম, আনক ঘরস আনী ।

তাবে অনট-বিনট বজ্জইত কসি, কতএ গেলা নহি জানী ॥

কতবও কুবচন কহখি তদপি হম, কনিও খেদ ন মানী ।

তেহন বতাহ স্বামি মোর ভেলা, হোইছ মন জে কানী ॥ ইত্যাদি ।

গীতমালা, শ্রীউমানন্দ বা কর্ণক সঙ্কলিত ।

তথু বিভাপতির পদে নয়, মৈথিলী লোকসঙ্গীতের মধ্যেও হরপার্বতীর গাথি জীবনের এত দৃষ্ট দেখিতে পাই। নিয়ে এই জাতীয় একটি গান উদ্ধৃত করিতেছি।

সবকে দৌরি দৌরি পুছকিন ব্যাকুল গোবী
এহি পং দেখল দিগম্বর বে কী।
তোহর দিগম্বর কে কৈসন রূপ
হমরো দিগম্বর কে সন সন কেস ছেছি।
জীর সন দাঁত ছেছি
অংগ মে ভসম রমাংখি রে কী।
সবকে দৌরি দৌরি
হাথ মে ডমরু বগল মে ত্রিশূল ছেছি
জটা মে গজা বিরাজখি রে কী—
আহো রামা এহি পং দেখল দিগম্বর বে কী ॥ ২৪।

“সকলকে দৌড়াইয়া দৌড়াইয়া জিজ্ঞাসা করে ব্যাকুল গোবী—
'এই পথে দেখিলে কি দিগম্বরকে?' (লোক জিজ্ঞাসা করিল)—
'তোমার দিগম্বরের কি রকম রূপ?' 'আমার দিগম্বরের শবের মত
কেশ। দাঁত আছে—আর অঙ্গে আছে ভয় মাথা।' সকলকে
দৌড়াইয়া দৌড়াইয়া জিজ্ঞাসা করে ব্যাকুল গোবী, 'এই পথে
দেখিলে কি দিগম্বরকে? হাতে তাহার ডমরু, বগলে ত্রিশূল;
জটায় বিরাজ করে গজা।' 'ওহে মেয়ে—এই পথে দেখিয়াছি
দিগম্বরকে।'

সভকে দৌড়ি দৌড়ি পুছখি বিকল গোবী,
আছে এহি পং দেখল দিগম্বর বে কী।
দেখইত বুঢ় সন বসখি সভক মন,
আছে লখইত পুরুষ পুরুষ বে কী।
অপনে নে অএলা শিব ঘর নহি কোড়া থিক,
আছে গরপতি অভিরি পসারল কে কী।
বসতা চড়ল শিব ফিরখি আনন্দবন,
আছে ঘুমি ঘুমি ডমরু বজাবখি বে কী।
ভনই বিভাপতি স্নমু গৌরা পারবতি,
আছে ইতো থিকা ত্রিভুবন নাথ বে কী।
গীতিমালা, শ্রীউমানন্দ আ কতৃক সঙ্কলিত।

আমরা আদিবুদ্ধ এবং আদিপ্রজ্ঞার আলোচনা প্রসঙ্গে দেখিয়া
আসিয়াছি যে আদিবুদ্ধ এবং আদিপ্রজ্ঞা এবং হিন্দু পুরাণ-তন্ত্রের
হরপার্বতী বা শিব-শক্তি লোকায়ত ভাবে মিলিয়া মিশিয়া এক
হইয়া গিয়াছে। পরবর্তী কালের বৌদ্ধতন্ত্র স্থানে স্থানে আদিবুদ্ধ ও
আদিপ্রজ্ঞা শিবশক্তিরূপেও বর্ণিত হইয়াছেন। কোনও কোনও
বৌদ্ধতন্ত্রে আদিপ্রজ্ঞার ত্রিকোণাকৃতি মন্ত্রেরও উল্লেখ পাই।
বাঙলা সাহিত্যের মধ্যে এই আদিবুদ্ধ এবং আদিপ্রজ্ঞার প্রভাব
সর্বাঙ্গেক্ষা স্পষ্ট করিয়া লক্ষ্য করিতে পারি, বাঙলা বিবিধ
প্রকারের সাহিত্যে বর্ণিত আদিদেব এবং আদিদেবীর কল্পনায়।

এই আদিদেব আদিদেবীর সাক্ষাৎলাভ করি বাঙলা-সাহিত্যের সৃষ্টি-
প্রকরণ বর্ণনা প্রসঙ্গে। মধ্যযুগের প্রায় সকল সাহিত্যের মধ্যে আমরা
এই সৃষ্টির বর্ণনা পাই। শৃঙ্গপুরাণ, ধর্মপূজা-বিধান এবং ধর্ম-
মঙ্গলগুলিতে এই সৃষ্টি-প্রকরণেই বিশদ বর্ণনা পাঠ। নাথ-সাহিত্যেও
'গোবন্ধ-বিজয়ে' সৃষ্টি-আরম্ভের বর্ণনা আছে। মাণিক দত্তের ও
মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গলে' এবং দ্বিজ মাধবের 'মঙ্গলচণ্ডীর গীতে' সৃষ্টি-
কাহিনী বর্ণিত আছে। কিছু কিছু মনসা-মঙ্গলেও এই কাহিনীর ছায়া
দেখিতে পাই। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদা-মঙ্গলে'ও এই সৃষ্টি-কাহিনী বাদ
পড়ে নাই। মধ্যযুগের হিন্দী-সাহিত্যে এবং ওড়িয়া-সাহিত্যেও নানা
ভাবে অনুরূপ সৃষ্টি বর্ণনা দেখিতে পাই। এই সৃষ্টি-তত্ত্বের বর্ণনা
এবং সেখানে বর্ণিত তত্ত্ব ও কাহিনী সমূহের উদ্ভবের ইতিহাস সম্বন্ধে
অন্ত গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। ২৫

বাঙলায় বর্ণিত এই সৃষ্টি-কাহিনীর মধ্যে এখানে-সেখানে কিছু
কিছু তফাৎ সত্ত্বেও বর্ণনার মধ্যে মোটামুটি একটা ঐকমত্য দেখিতে
পাওয়া যায়। সর্বত্রই দেখি, সৃষ্টির পূর্বে নিখিল নাস্তিহের অন্ধকার
(ধূস্কার); শৃঙ্গপুরাণের মধ্যে ছিলেন শুধু এক দেবতা—তিনি সর্বত্রই
'নৈরাকার নিরঞ্জন'—তিনিই আদিদেব। সিম্ফু এই আদিদেব শৃঙ্গ-
মূর্তি নিরঞ্জন হইতেই এক আদিদেবীর সৃষ্টি হইল। 'শৃঙ্গ-
পুরাণে' দেখি, শৃঙ্গ নিরঞ্জন ধর্মের ঘর হইতে এই 'আত্মশক্তি'র জন্ম;
বর্ণনায় তিনি 'আত্মা' নামেই খ্যাত। সহদেব চক্রবর্তীর 'ধর্ম-মঙ্গলে'ও
এই কথাই দেখি। সীতারাম দাসের 'ধর্ম-মঙ্গলে' দেখি, নিরঞ্জন নিজেই
এক স্তম্ভরী কন্টার রূপ ধারণ করিয়া নিজেই আবার তাঁহার সহিত
মিলিত হইলেন। অত্যাগ 'ধর্ম-মঙ্গলে' দেখি, সৃষ্টিকাম নিরঞ্জন আদি-
দেবের বামপার্শ্বে 'আচম্ভিতে' দেবীর আবির্ভাব ঘটিল। রামদাস আদ্যের
'অনামি-মঙ্গল' অনুসারে মহামারা ধর্ম-নিরঞ্জনের বামপার্শ্বে হইতে উৎপত্তা
হইলেন। নরসিং বসুর 'ধর্মায়ণ' মতে নিরঞ্জন দেবের ইচ্ছা হইতেই
প্রকৃতি-পা আত্মার উৎপত্তি। নাথ-সাহিত্যের গৌরব-বিজয়ে দেখি,
সৃষ্টির পূর্বে ধর্ম নিরঞ্জন নিদ্রাভিত্ত ছিলেন, সৃষ্টিকাম হইয়া জাগরণের
সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পার্শ্বে এক ছায়া-মূর্তিকে দেখিতে পাইলেন,
এই ছায়ামূর্তিই দেবী আত্মা। নাথ-সাহিত্যের কোথাও
কোথাও দেখি, 'অলেকনাথ নিজদেহের শক্তি হইতেই কাকেতুকা
দেবীকে সৃষ্টি করিয়া লইয়াছিলেন; এই কাকেতুকা দেবী হইলেন
আদিদেবী।

চণ্ডীমঙ্গলগুলির মধ্যে দ্বিজ মাধবের 'মঙ্গলচণ্ডীর গীতে' দেখি, 'সৃষ্টি
সৃজিতে হাসে, দেবী জন্মিল নিঃশ্বাসে'। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের
মতে—

আদি দেব নিরঞ্জন ধীর সৃষ্টি ত্রিভুবন
পরম পুরুষ পুরাতন।
শৃঙ্খতে করিয়া স্থিতি চিন্তিলেন মহামতি
সৃষ্টির উপায় কারণ ॥

তখন— চিন্তিলে এমত কাজ এক চিন্তে দেবরাজ
তন্ন হইতে হইল প্রকৃতি।

২৪। শ্রীমতী অগ্নিমা সিংহের সংগ্রহ। বিভাপতির নামেও
এইরূপ একটি পদ প্রচলিত আছে।

২৫। এই লেখকের Obscure Religious Cults গ্রন্থখানি
দ্রষ্টব্য।

এই আদিদেব নিরঞ্জনর তন্তু হইতে উৎপত্তা প্রকৃতিই হইলেন আদিদেবী।

আদি দেবরাজ-শক্তি ত্বন-মোহন-মূর্তি
উরিলেন সৃষ্টির কারিণী।
রচিয়া সম্পূট পাণি মুহু মন্দ স্রভাবিণী
সমুখে রহিলা নারায়ণী ॥

একটা জিনিস বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিতে পারি। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যগুলিতে এবং কিছু কিছু ধর্ম-মঙ্গলেও শিব এবং চণ্ডীর পৃথক বর্ণনা দেখিতে পাই—সে সব বর্ণনার পরে সৃষ্টি-প্রকরণকে অবলম্বন করিয়া দেখিতে পাই আদিদেব আদিদেবীর বর্ণনা। তাহা হইতে

বেশ বোঝা যায়, এই সব ভাষা-সাহিত্যের কবিগণ ২৬ শিবপার্বতীর পাশাপাশি আর একটি যুগলের পৃথক ধারা একটি সামাজিক ঐতিহ্যরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই ধারা বৌদ্ধতন্ত্র অবলম্বনে আদিবুদ্ধ ও আদিপ্রজ্ঞার ধারা বলিয়া মনে করি।

আদিদেবীর উৎপত্তির পরে সর্বত্রই সাংখ্য মতবাদের প্রবল প্রভাবে আদিদেবী আদিপ্রকৃতি রূপ গ্রহণ করিলেন। আদি-প্রকৃতিরূপে তিনি প্রসিদ্ধ ত্রিমূর্তিকে (ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব) প্রসব করিলেন; এই ত্রিমূর্তি হইলেন আদিপ্রকৃতির সন্ত, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণেরই ত্রি-বিগ্রহ।

২৬। সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণ।

একটি কবিতা অবস্খী সাম্রাজ্য

আমি বলেছিলাম আসব।
আমি আসব, যখন খাঁ-খাঁ রোদুরে
পিচ গলবে, পাতা উড়বে
ঘুরী হাওয়ায়, কৃষ্ণচূড়ার ডাল
সে কি দাউ-দাউ জ্বলবে, যখন
ঘাম ঝরবে, বুক ফাটবে
তেষ্টায়।
আমি আসব।

আমি আসব, যখন আকাশের অ্যাসফল্ট
পৃষ্ঠের মতন বিধবে। পথের কুকুর
লকলকে জ্বিজে ক্লাস্তি বরাবে।
তির্যক ছায়া
গাছে গাছে মুখ গুঁজবে।
আমি আসব।
আহা, এই রোদুর, আগুন ছপুর, পাখির গান
বন্ধ।
এখন মধ্যদিন।
ঘাম-দরদর মুখ,
গুঁড়ো-গুঁড়ো রুখু চুল
হাওয়ায় উড়ছে।
তপ্ত আঁচলে একটু বাঁচানো ছায়া
রেখে দিলে বুঝি, আসব যখন
আড়ালে আমাকে ঢাকবে।
আমি আসব।

কত দূর, বলো, কত দূর! এই পথ
বাঁকে বাঁকে জট খুলছে।
অফুরান পথ,
পথ হেঁটে হেঁটে কাটছে। কখন
মোড়ে পৌঁছুব। শ্রান্ত ললাট
ঘাম মুছে নেওয়া মিটে নিঃশ্বাসে
ছায়ার স্পর্শ মাথবে।
আমি আসব।

আহা, এই রোদুর, হ-হু করা মন
তুমি ঝাঁড়িয়ে।
গগণগে নীল আকাশ পুড়ছে, পাতারা
উড়ছে।
মধ্যদিন।
তেষ্টায় বুক ফাটছে
তুমি ঝাঁড়িয়ে।

আমি বলেছিলাম, আসব,
তুমি ঝাঁড়িয়ে।

জননী জগদ্ধাত্রী ও জননী শ্রীশ্রীসারদামণি দেবী

অধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

“জয়দে জগদানন্দে জগদেক-প্রপূজিতে ।
জয় সর্বগতে দুর্গে জগদ্ধাত্রি নমোহস্ত তে ॥
দয়াকরপে দয়াদৃষ্টে দয়াক্ষে হংগমোচনি ।
সর্বাপত্তারিকে দুর্গে জগদ্ধাত্রি নমোহস্ত তে ॥”

জগদ্ধাত্রীকল্পে জগদ্ধাত্রীস্তুবঃ ।

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে ব্রহ্ম জননীকে স্তুতিমুখে বলেছেন—

“যচ্চ কিঞ্চিৎ কচিবন্ত সদসদ্বাখিলাস্ত্রিকে ।

তন্ত্ৰ সর্বস্ত যা শক্তিঃ সা হং কিং স্ত্বয়সে তদা ॥”

অর্থাৎ হে বিশ্বাস্ত্রিকে, যা কিছু বস্ত, সং হোক বা অসং হোক, আছে, সেই সমস্ত বস্তুর ‘তুমিই’ শক্তি; সেই তোমাকে কি করে স্তুতি করা যায় ?

একই ভাবে জগদ্ধাত্রীকল্পে ঋষিস্তুবে জননী জগদ্ধাত্রীকে সার্বোদয় করে বলেছেন—

“দ্বিসপ্তকোটিমন্ত্রাণাং শক্তিরূপে সনাতনি ।

সর্বশক্তিস্বরূপে চ জগদ্ধাত্রি নমোহস্ত তে ॥”

অর্থাৎ ১৪ কোটি মন্ত্রের শক্তিরূপা সনাতনী তুমি সর্বশক্তির স্বরূপভূতা; তে জগদ্ধাত্রি! তোমার নমস্কার। উভয় মন্ত্রেই জগজ্জননীকে সর্বশক্তিস্বরূপা বলা হয়েছে। যিনিই শ্রীশ্রীচণ্ডী—দুর্গা, তিনিই শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী—মন্ত্র বলে তাই প্রমাণিত হচ্ছে। কল্যাতঃ স্বস্তিবাচন, সঙ্কল্প প্রভৃতি সর্বত্র “জগদ্ধাত্র্যাঃ দুর্গায়াঃ” কল্যাতঃ হ্রস্ব। ব্রহ্মাণ্ডপুণ্য বলেছেন, “বিশ্বমাতা জগদ্ধাত্রী বিশালাক্ষী বিরাগিনী।” দেবীপুণ্য স্পষ্ট করেই বলে দিয়েছেন—যেতদু জননী লোক সকল ধারণ করেন—এবং তাদের পরিপালনোদ্দেশ্যে জীবিকার ব্যবস্থাও করে দেন, সেজন্তই দ্বিবিধানকৃত ‘ধা’ ধাতুনিম্পাদ্য পত্র জগদ্ধাত্রী জননীর নাম। “বয়াম্কারয়তে লোকান্ বৃত্তিমৈবা দদাতি চ।

তু ধাঞ্চ ধারণে ধাতুর্জগদ্ধাত্রী মতা বৃধিঃ ॥”

মার্কণ্ডেয় পুণ্যও বিশ্বমাতাকে জগদ্ধাত্রী বলেছেন—“বিশ্বেশ্বরী জগদ্ধাত্রী হিতসংহারকারিণী।”

দশপ্রহরধারিণী দুর্গতিনাশিনী জননী দুর্গাকে দেবীপক্ষে আরাধনা করে আবার ঋগ্বেদপর্বতী শ্বেতপক্ষে কাণ্ডিকী নবমী ত্রিখিতে জগদ্ধাত্রীরূপে আরাধনা করার বিধি-বিধান কি ছেড় থাকতে পারে, তা স্বভাবতই মনে জাগে। ঋগ্বেদের দেবীসূক্ত পরম্পরায় সনাতন ক্রমে আশ্বিনী শুক্লপ্রতিপদ বা সপ্তম্যাদিকল্পে জননীর পূজার বিধান, রাত্রি-সূক্তের ক্রমানুসারে মহানিশায় বা কাণ্ডিকী কৃষ্ণ ত্রয়োদশাদিকল্পে শুক্লপক্ষের দ্বিতীয় পর্যন্ত যা কালীর পূজা, তদ্ব্যবর্তী কোজাগরী পূর্ণিমা তিথি জননী লক্ষ্মীপূজার কারণ সব শাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে। আমরা যথাসময়ে যথাস্থানে তার আলোচনা করেছি। কিন্তু জগদ্ধাত্রীপূজা কে, কবে, কি কারণে কোথায় আরম্ভ করলেন, তার প্রমাণ পাইনি। কাত্যায়নীতন্ত্রে যে উপাখ্যান আছে, তা একান্তভাবে কেন উপাখ্যানের “উমা হৈমবতী” উপাখ্যানের নামান্তরপূর্বক পুনরুক্তি মাত্র। তাতে চিন্তের স্থধা মিটে না। তবে একটি কথা নিরন্তর মনে হয় এ বিষয়ে—সেটি হচ্ছে, মহালয়ার পিতৃশ্রাদ্ধ কোনও কারণে প্রদত্ত না হলে দীপাবিত্তা অমাবস্যাতে সে শ্রাদ্ধকৃত্য সম্পাদনের বিধান আছে

শাস্ত্রে। যদিও জগদ্ধাত্রীপূজার বিষয়ে সে রকম কোনও শাস্ত্রীয় বিধানের উল্লেখ দেখতে পাই না, তথাপি যেন বারংবার না হয়—যে সাধক ভক্ত কোনও কারণে দেবীপক্ষে জননী দুর্গার বা কৃষ্ণপক্ষে জননী কালী বা লক্ষ্মী দেবীর চরণ কদনা করতে পারেননি, তাঁদেরই জন্ত এ জগদ্ধাত্রী পূজার বিধান। অবশ্য এটি একটি বিশেষ বিধানরূপে বিবেচনা করার কথা উপস্থাপন করছি। যারা উক্ত তিন ভাবে মাতৃদেবীর উপাসনা করেছেন, সামর্থ্য ও সুযোগ অনুসারে তাঁরা এই পূজাও সম্পাদনা করবেন, সে বিষয়ে অন্তথা করবার কি আছে ?

আমার এই বিশেষ বিবেচনার মূলে দুইটি কারণ উল্লেখ করছি। প্রথমটি হলো এই যে, জগদ্ধাত্রীপূজার ক্রম একেবারে ত্রিদিবসনিম্পাত জননী দুর্গার পূজার একদিবসসাধ্য অনুক্রম, সপ্তমী অষ্টমী নবমী তিথির পূজা এখানে দিনোদয়—মধ্যাহ্ন—সায়ংসন্ধ্যায় সমাপন করে একই শ্রীগ্রন্থ শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, হোমপ্রয়োগ প্রভৃতি করতে হয়। মন্ত্রেও সর্বত্র “জগদ্ধাত্রী দুর্গা” বলতে হ্রস্ব—স্বস্তিবাচন, সঙ্কল্প, প্রভৃতি সর্বত্রই এই নিয়ম। বর্তমান যুগে প্রয়োগ পদ্ধতির দিক থেকে অকাটা একটি প্রমাণ আমি উপস্থাপিত করছি। সেটি হচ্ছে বর্তমান যুগের অবতীর্ণ ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সহধর্মিণী নিজে স্বয়ং অবতীর্ণ জগদ্ধাত্রী হয়েও প্রতি বৎসর জননী জগদ্ধাত্রীর ত্রিদিবসব্যাপী অর্চনা করতেন। জননীর জননী শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরী দেবী জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের পূজা যথাসাধ্য উপচারে সম্পাদন করতেন। কোনও বছর বাদ দেননি। পরবর্তী যুগে জননী সারদামণি নম্বর দেহ পরিত্যাগের সময় পর্যন্ত কেবল এক বৎসর বিশেষ কারণে জগদ্ধাত্রীপূজা সম্পাদন করতে পারেননি। তজ্জন্ত পরের বৎসর বহু কাল আগে থেকে জয়রামবাটীতে উপস্থিত ঘোড়শোপচারে জননী জগদ্ধাত্রীর অর্চনা করিয়েছিলেন। জননী পূজার সময়ে তাঁর মাতৃদেবীর দেহাবসানের পরে সর্বদাই আমার মা এই সময়ে এই করতেন, এই উপায়ে জননীর পূজার সামগ্রী মজুত রাখতেন—কালীপূজার তারিখ থেকে সলতে পাকাতেন, পৃথিবী কত শত জগদ্ধাত্রীপূজার গল্প পূজাপাদ শরৎ মহারাজ (স্বামী সারদানন্দ), যোগীনমা প্রভৃতিদের কাছে করতেন। সে সময়ে জননীর ভক্ত সন্তানেরা অনেকেই পূজামণ্ডপে উপস্থিত থেকে জননীর কর্মে সহায়তা করতেন। জননীর মাতৃপূজায় এত ছিল আনন্দ ও উৎসাহ। কিছুতেই তিনি ঐ সময়ে কলিকাতায় বা অল্প স্থানে থাকতেন না; জয়রামবাটীতে পিতৃগৃহে গিয়ে যে কোনও রকমে উপস্থিত হতেন, এবং স্বয়ং উপস্থিত থেকে জননী জগদ্ধাত্রী পূজা সম্পাদন করেন।

যা হোক—আমরা আমাদের বিশেষ বিবেচনার কথা এখন বলি, যে কারণে মায়ের মাতৃ-পরিবারে সর্বপ্রথম জননী জগদ্ধাত্রী পূজার প্রথম অবতারণা হলো, সে কারণটিই বলা প্রয়োজন। একবার জয়রামবাটীর নব যুগ্যে গ্রাম্যসঙ্কীর্ণতা বশতঃ মায়ের মা অর্থাৎ শ্যামসুন্দরী-চাল কালীপূজার জ্ঞান নিলো না। শ্যামসুন্দরীর পরম ভক্তি ও ভগ্নরসীয় রক্তে স্রবক্ষিত চাউল মায়ের পূজার লাগলো না।

এই হুখে জননী-জননী শ্রামাস্ত্রন্দরী নিরন্তর অঙ্গবিসর্জনে ধরনী সিক্ত করতে লাগলেন। একদিন রাত্রে স্বপ্নে দেখলেন, রক্তবর্ণী এক দেবী পায়ে উপর পা দিয়ে বসে আছেন এবং মাকে সাধনা দিয়ে বলছেন—“তুমি কাঁদছ কেন? কালীর ঢাল আমি খাব। তোমার ভাবনা কি?” শ্রামাস্ত্রন্দরী জিজ্ঞাসা করলেন—“কে তুমি?” দেবী উত্তর দিলেন—“আমি জগদম্বা, জগদ্ধাত্রীরূপে তোমার পূজা গ্রহণ করব।” পরের দেবীর বর্ণনা করতেই মা সারদামণি জননীকে বলতেন—“ঐ তো, উনিই তো জগদ্ধাত্রী।” সেই পূজার শুরু হলো মা সারদামণির পিতৃ-পরিবারে। পূজার সময় সে সংবাদ জননী জগদম্বা করেকটি বিভূতিও প্রদর্শন করালেন। অল্প চাউলে চতুর্পার্শ্ব সমস্ত গ্রামের লোকেরা প্রসাদ পেল। জননী শ্রামাস্ত্রন্দরী মা জগাই-য়ের কানে কানে যাওয়ার সময় বলে দিলেন—

“মা জগাই, আবার আঁব বছর এসো। আমি তোমার জন্ম সমস্ত বছর ধরে সব জোগাড় করে রাখবো।” শাস্ত্রের মত—“মহাজনো বেন গত্যঃ স পত্নাঃ”। কাজেই বর্তমান যুগের স্বয়ং অবতীর্ণা জগজ্জননী জগদ্ধাত্রীকৃপা শ্রীশ্রীসারদামণির জননী যে শিষ্টাচার পালন পূর্বক লোকশিক্ষার পথ অব্যাহত করে গেছেন, সে মত যে ধর্মাস্ত্রশাসিত, সে বিষয়ে সন্দেহ কি? তাঁর আচরিত পথ বলেই তো এটি শাস্ত্রসিদ্ধ পথ।

জননীর পিতৃপরিবার এত দরিদ্র ছিলেন যে, তাঁদের পক্ষে অতি অল্প ব্যয়েও জননী জগদ্ধাত্রীপূজা প্রতি বৎসর চালানো কষ্টসাধ্য হয়ে উঠেছিল। তাই জননী পরের বছর “জগাই-”য়ের পূজার আপত্তি করেন। স্বপ্নে জগাই সখী জয়া বিজয়াকে নিয়ে মাকে জিজ্ঞাসা করেন, সত্যি ঠাঁর তা হ’লে যাবেন কি না। জননী অমনি বললেন—“না, না, তোমরা যাবে কেন?”

প্রথম বছর বিসর্জনের দিন বৃহস্পতিবার ছিল। শ্রীমা আপত্তি করলেন যে লক্ষ্মীবারে মাকে বিদায় দেওয়া যায় না। পরের দিন সংক্রান্তি, তার পরের দিন শনিবার থাকায় মায়ের বিসর্জন হয়েছিল রবিবারে—চতুর্থ দিনে।

বাব বৎসর পর পর জগদম্বা জননীর পূজা করে জননী ভেবেছিলেন আঁব জগদ্ধাত্রী পূজা করবেন না। প্রথম চার বৎসর জননী-জননী শ্রামাস্ত্রন্দরী, পরের চার বৎসর মা সারদামণি নিজের এবং তার পনের চার বৎসর খুল্লতাত নীলমাধবের নামে পূজা হয়ে গেছে। কাজেই তিনি দরিদ্র পরিবারে আর পূজা চালাতে চাইছিলেন না। জননী সারদামণি যেদিন এই অভিপ্রায় প্রকাশ

করলেন, সেদিন রাত্রেই জননী জগদ্ধাত্রী স্বপ্নে মা সারদামণিকে জিজ্ঞাসা করলেন, সত্যি তিনি তা হ’লে মধু মুখজ্জের পিসীমাদের ওখানে চলে যাবেন কি না। জননী সারদামণি জননী জগদ্ধাত্রীর শ্রীচরণকমল জড়িয়ে ধরে বললেন—“আমি আর ছাড়ব না তোমাকে, আমি বছর বছর তোমাকে আঁব”। এই সঙ্কল্পানুসারে পূজা চালাবার জন্ম জননী সাড়ে দশ বিঘাব কিছু বেশী জমি দেবোত্তর করে গেছেন। এ জমির আর ও সংগৃহীত অর্থের সাহায্যে আজও জয়রামবাটাতে মাতৃমন্দিরে প্রতি বৎসর শ্রীজগদ্ধাত্রীপূজা সম্পাদিত। অত্যন্ত আনন্দের বিষয়, বিগত কয়েক বছর ধরে পূজাপাদ স্বামী শ্রীযুক্ত বিয়ুক্তানন্দজীও বেলুড় মঠে সারদাতত্ত্ব মন্দিরে জগদ্ধাত্রী পূজার অনুষ্ঠান করছেন।

প্রথম বারের মত প্রতি বৎসর জননীর পিতৃবাটাতে তিন দিনে জগদ্ধাত্রী পূজা করা হয়—প্রথম দিন ষোড়শোপচারে এবং পরের দুই দিন সাধারণ ভাবে। দেবীর উভয় পার্শ্বে জয়া বিজয়ার মূর্তি স্থাপিত ও পূজিত হয়।

জননী দেখতে জগদ্ধাত্রীর মত ছিলেন। একবার জগদ্ধাত্রী পূজার সময় হলুদ পুরুষের রামহৃদয় ঘোষাল উপস্থিত হলেন। উভয় জননীকে বারংবার নিবীক্ষণ করেও কোনও পার্থক্য বুঝতে না পেরে পালিয়ে গেলেন।

শেষের দিকে জননী যখন জয়রামবাটাতে যেতেন ও ভক্ত সন্তানগণ জননীকে জগদ্ধাত্রীর মত পূজা করতেন, জননী শ্রামাস্ত্রন্দরী আর অঙ্গসংবরণ করতে পারতেন না। একবার তিনি বলেছিলেন—“হী গো! তখন সকলেই জামাই কেশা বলতো, সারদার অদৃষ্টকে ষিকার দিত, আমার কত কথা সুনাত, মনের হুখে মরে যেতুম। আঁব আজ দেখ, কত বড় ঘরের ছেলেমেয়েরা দেবীজ্ঞানে সারদার পা-পূজা করছে!”

জননী জগদ্ধাত্রীর পূজার সময় জননী সারদামণি ঠাকুরকে সকাল সকাল ভোগ দিতেন এবং বলতেন যে, এখন পূজার জায়গায় যেতে হবে। সন্ধ্যারতির কয় দিন এবং মহাষ্টমীর সন্ধ্যাপূজাক্ষণে জননী জগদম্বাকে দর্শনপূর্বক চামরব্যাজন করতেন, ভক্ত সন্তানগণ উভয় জননীর মধ্যে কোনও প্রভেদই খুঁজে পেত না।

ফলতঃ—এ রকম বহু প্রমাণ আছে—যাতে প্রমাণিত হয়, জননী সারদামণি জননী জগদ্ধাত্রীরই বর্তমান যুগের অবতীর্ণা আত্মরূপ। উভয় জননীকেই আজ এই পূণ্য জগদ্ধাত্রীপূজারূপে যুগপৎ ভাবে প্রণাম নিবেদন করি।

প্রেমের আদর জানি গো আমার জ্ঞানের মূল্য জানি,
শক্তি স্বপ্ন শিবের সেবিকা তখনি তাহারে মানি,
আমরা মানি না শিক্ষা জিপুণ্ড উপবীত তরবারি,
জানি খাতার ধারি না কো ধার মোরা শুধু মমতারি।
মাংসপেশীর শাসন মানি না, মানি না শুধু নীতি,
নূতন বারতা এসেছে জগতে মহামিলনের গীতি।

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

প্রাচীন ভারতে গণিকা

বৈষ্ণবনাথ ভট্টাচার্য

বিশেষ একটি সামাজিক শ্রেণী হিসাবে বারবনিতার উল্লেখ

না করলে প্রাচীন ভারতের সমাজ ব্যবস্থায় নারীজাতির স্থান নির্ধারণ অসম্পূর্ণ হয়ে যাবে। কেলিকলা-নিপুণা সূচাক-দেহিনী সূধাকষ্ঠী নৃত্যপরা যৌবনবতী গণিকাকুল প্রাচীন ভারতের নাগরিক সভ্যতায় বৈরাগ্য উচ্চ সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল, তার তুলনা একমাত্র প্রাচীন গ্রীসদেশ ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। চরম বৈদ্যুতনের দেশ এই ভারতবর্ষ! এর একদিকে পবিত্র শাস্ত্র আরব্য পরিবেশে সমস্ত পার্থিব আকর্ষণ থেকে নিজেদের মুক্ত করে জিতেন্দ্রিয় তপস্বীরা ধর্মীয় বিধি-নিষেধ-সম্মত গভীর তপশ্চর্যায় অকলঙ্ক পরমার্থের সন্ধান নিমগ্ন হতেন। অন্যদিকে নগরীর পথে পথে বিজয়নিপুণা, লুকা, লুঠকী, মদালসমুদ্রা, স্তম্ভকুকা নগরমোহিনীরা পুরুষ-হৃদয় সংহারের নিষ্ঠুর ছলপ্রণয়-বিলাসে মত্ত হত। দণ্ডীর দশকুমারচরিত, ক্ষেমেশ্বরের সময়মাহতুকা, বাৎস্তায়নের কামসূত্র, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, দামোদর গুপ্তের কুটনীমতম্ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থের বহু স্থানে নিখুঁত নারীদের প্রতীকরূপে এই প্রমদা পণ্যাংগনাদের প্রশংসা করা হয়েছে। ভারতীয় প্রেম-জীবন ও লাম্পট্য-লীলার প্রাণময়ী প্রতিমারূপে গণিকাকে চিত্রিত করা হয়েছে। বহুবলভা ও কামদা হয়েও তারা স্বেচ্ছাক্রমে পরিত্যক্তা হয়নি, বরং অপার কলা-কুশলতার জগৎ বিশেষ ভাবে আদৃত হয়েছে।

প্রাচীন ভারতের নগরজীবনে গণিকাদের একটি বিশিষ্ট সম্প্রদায় রূপে গণ্য করা হত। সুশিক্ষিতা ও সুরচিসম্পন্ন বরারোহা গণিকারা সাধারণ্যে সমাদর লাভ করলেও, প্রত্যেকটি বারবনিতাই এই সামাজিক, সম্মানের অধিকারিণী ছিল না। ‘কামসূত্র’ ও ‘উপমিত্তিব্যপ্রপঞ্চকথায়’ সাধারণ ও অসাধারণ দু’ শ্রেণীর গণিকার উল্লেখ দেখা যায়। দশকুমার-চরিতে বর্ণিত রাগমঞ্জরীর অগ্রজা কনকমঞ্জরীর চরিত্র থেকে আমরা সাধারণ গণিকা সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা করতে পারি। প্রভূত লোভ আর পুরুষ-সুগরার ছলকলার জগৎ সাধারণ গণিকাদের যথেষ্ট দুর্গম ভোগ করতে হত। শুধুমাত্র একটি উদ্দেশ্য নিয়েই তাদের শিক্ষিতা করে তোলা হত। সেটি হচ্ছে, প্রণয়াসক্ত পুরুষের কাছ থেকে মিথ্যা প্রণয়ে অর্থ নিশ্চেষণ।

তত্ত্বসাহিত্যে, বিশেষ ভাবে মহানির্বাণতন্ত্র বারবনিতাদের পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে।

(১) রাজবেশা (নৃপতির উপভোগ্য)। নৃপতির আমোদ-প্রমোদের জগৎ তারা নিযুক্ত হত এবং রাজ-অন্তঃপুরের একাংশেই অবস্থান করত। জাতক থেকে জানা যায় যে, কোন কোন নৃপতির বোল সহস্র নর্তকী ছিল। কৌটিল্যও রাজবেশার উল্লেখ করেছেন। রাজ-অন্তঃপুরে অবস্থান করলেও রাজা এদের মোটেই বিশ্বাস করতেন না। এদের গতিবিধি লক্ষ্য করবার জগৎ নারী-গুপ্তচর ও নর্তকী নিযুক্ত করা হত। এদের আত্মীয়-স্বজনকে পর্যন্ত এদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সুযোগ দেওয়া হত না। এদের সম্পদের অভাব না থাকলেও ব্যক্তিবাহীনতার অভাব ছিল।

(২) নাগরী বা নগরবেশা। এরা সাধারণতঃ নগরের একাংশে

বাস করত এবং নাগরিকেরা এদের গৃহে গমন করত। বিশেষ বিশেষ সামাজিক অমুঠানে বা প্রমোদ-বিহারে এদের আমন্ত্রণ জানান হত। রামায়ণ মহাভারত মহাকাব্যসহ ও ‘মুক্তারাক্ষস’ নাটক থেকে জানা যায় যে, উৎসব উপলক্ষে নগরীর পথে বারাগনা সমাবেশ ঘটতো। বাৎস্তায়নের ‘কামসূত্র’ ও ‘রতিরহস্তে’ বিভিন্ন প্রমোদভ্রমণে বারনারীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের প্রভূত সাক্ষ্য মেলে। সাধারণ নগরবেশার আর্থিক স্বচ্ছলতা সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব না হলেও ‘মুচ্ছকটিক’ নাটক বর্ণিত বসন্তসেনার প্রাসাদের সমুচ্ছল সমৃদ্ধি থেকে রূপসী কলাবতী নগরবেশার বিলাস-উচ্ছল জীবনযাত্রা সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা করা চলে। বসন্তসেনার আবাসগৃহের গজদন্তশোভিত সু-উচ্চ তোরণদ্বার, মণিখচিত্র স্বর্ণময় দ্বারকপাট, মুক্তাশোভিত কঙ্কাবলী, সুবর্ণলিপ্ত সোপানশ্রেণী, ফটিক-নির্মিত বাতায়নরাজি, মণিময় অক্ষ-সমবিত্ত ক্রীড়া-পীঠিকা—সর্বত্রই চরম ঐশ্বর্য প্রকাশিত হয়েছে।

(৩) গুপ্তবেশা। ভদ্রপরিবারভুক্ত নারীরাও সমগ্র-বিশেষে গোপনে দেহবিক্রয় ব্যবসারে লিপ্ত হত। এই প্রসঙ্গে আমরা ‘কাদম্বরীতে’ রেশমী ওড়না-আবৃত মুখে তরুণীকুলের পূর্ণিমা রাত্রে প্রণয়-সম্মিলনে গমনের উল্লেখ দেখতে পাই। বাৎস্তায়নও উত্তানযাত্রা পানযাত্রা প্রভৃতি প্রমোদ বিহারে ব্যতিচারিণী পুরনারীদের পরপুরুষ-মন্তভার কথা উল্লেখ করেছেন। ‘রতিরহস্তেও’ ভট্টা পুরস্কৃত নৈশাভিচারের কথা বলা হয়েছে। ‘অভিধানরত্নমালায়’ একশ্রেণীর জায়াজীব নটের উল্লেখ আছে। স্ত্রীকে ব্যতিচারিণী করে তার উপার্জনের উপর এই শ্রেণীর নটেরা অল্পসংস্থান করত। ‘রতিরহস্তেও’ এই অদ্বুত পাঁচচরণের অন্তিম সমর্থিত হয়েছে। মেধাতিথি বলেন, বহু গায়কের পত্নী পরিপূর্ণ বেশাবৃত্তি গ্রহণ না করলেও স্বামীসঙ্গে জাতসারে ও পরিপূর্ণ সমর্থনে নিজেদের গৃহেই উপপতিদের আমন্ত্রণ জানাতে কুষ্ঠাবোধ করত না।

(৪) দেববেশা (দেবদাসী বা দেবমন্দিরের নর্তকী)। গণিকা বৃত্তির সঙ্গে সমভাবে যুক্ত দেবমন্দিরে দেবদাসী নিয়োগের প্রথা প্রাচীন ভারতে যথেষ্ট পরিমাণে প্রচলিত ছিল। বাহুদৃষ্টিতে দেবনর্তকীরা দেবভোগ্যরূপে পরিগণিত হলেও, কার্ষক্ষেত্রে এদের বিগ্রহ-পূজারীদেব আসক্তলিপ্সা চরিতার্থ করবার জগৎ অস্পন্দী-বৃত্তি গ্রহণে বাধ্য করা হত। কালিদাসের সময়ে উজ্জয়িনীর বিখ্যাত মহাকাল-মন্দিরে দেবদাসী নিযুক্ত ছিল। হিউয়েন-সাঙয়ের সময়েও পূর্ব-সিন্ধুর এক নগরের সূর্য-মন্দিরে দেবদাসীর অস্তিত্ব দেখা যায়। গুপ্তোত্তর যুগেও দেবদাসী প্রথার বিলোপ ঘটেনি। মেধাতিথি ও তৎকালীন শিলালেখন থেকে এর যথেষ্ট সমর্থন মেলে। আবু জয়িদও ভারতীয় মন্দিরের সঙ্গে গণিকাকে যুক্ত থাকতে দেখেছেন। রাণী চিত্রলেখার বায়ানা স্তম্ভলিপি, পশ্চিম চালুক্যরাজ সত্যশ্রয়ের তুঙ্গগি শিলালিপি ও দাক্ষিণাত্যের চোলনৃপতি প্রথম পরাস্তক এবং প্রথম রাজরাজের শিলালেখন প্রাচীন ভারতে দেবদাসী-প্রথার অস্তিত্ব সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোকপাত করেছে।

(৫) ব্রহ্মবেশা বা তীর্থগা। এরা প্রধানতঃ তীর্থক্ষেত্রের গণিকা। নারী ও ধর্মামুরাগ পরম্পর সংযুক্ত থাকায় ভারতে তীর্থস্থানগুলি সাধারণতঃ প্রেমের লীলাক্ষেত্ররূপে পরিচিত হত এবং তীর্থক্ষেত্রে প্রভূত জনসমাগম হত গণিকাকুলও তাদের দেহ বিক্রয় বৃত্তি অবাধে অনুসরণ করবার সুযোগ পেত। এই প্রসঙ্গে ব্যাস তাঁর ‘কাশীখণ্ড’ গ্রন্থে রত্নেশ্বর লিঙ্গ মহাত্ম্য বর্ণনায় কলাবতী নামে

এক সুপণ্ডিত, নৃত্যগীত-বাদননিপুণ নর্তকীর উল্লেখ করেছেন। জাতকেও বারানসী-তীর্থে শ্যামা, সুলসা অর্ধকালী প্রভৃতি গণিকার অবস্থানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে প্রব্রজিতা বা ভিক্ষুকী নামে এক শ্রেণীর সন্ন্যাসিনীর উল্লেখ দেখা যায়। কামসূত্রে এদের নৈতিক চরিত্রে উচ্চসম্মানের অধিকারিণীরূপে চিত্রিত করা হয়নি। বিবাহিতা নারীদের এদের সংস্রব বিষয় পরিভ্রাণ করবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কোন কোন সন্ন্যাসিনী কলাবিজ্ঞায় যথেষ্ট পারদ্রব্য ছিল এবং প্রেমঘটিত ব্যাপারে কামোপহৃত নাগরিকেরা এদের সাহায্য নিতে কুণ্ঠিত হ'ত না। বহু ক্ষেত্রে এরা কুটনীযুক্তি অবলম্বন করত এবং এদের কুটীর প্রেমিকদের অভিসার ক্ষেত্র ও স্রবতস্থলীরূপে পরিগণিত হত। অবশ্য সমস্ত প্রব্রজিতাই এই ছূর্ণামের অধিকারিণী ছিল না। কোটিল্যের অর্থশাস্ত্রে ও ভবভূতির মালতীমাধব নাটকে জনসাধারণের কাছ থেকে এদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও সম্মান আকর্ষণ করতে দেখা গেছে।

বাংলায়নের কামসূত্র ও কাত্যায়নের ভাটকসূত্রে গণিকা-সংঘের উল্লেখ দেখা যায়। দশকুমারচরিতে গণিকাদের লালন-পালন ও শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। একটি গণিকাকল্পকে জগ্ন থেকেই নৃত্য, গীত, বাদন, অভিনয় ও চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি সূক্ষ্মাব কলা, মালা ও সুগন্ধী পুষ্পসার প্রস্তুত প্রণালী, পঠন, লিখন ও কথনবিজ্ঞা, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ শাস্ত্রাদিতে সুশিক্ষিতা করে তোলা হত। সঙ্গে সঙ্গে গণিকাসুলভ ছল প্রণয়কলায় তাকে লাভ করতে হত প্রত্যক্ষ শিক্ষা, গণ-উৎসবে তাকে যোগদান করতে হত, মুগ্ধ নাগরিকদের মধ্যে তার উদ্ধত দেহজী ও গুণাবলী বিজ্ঞাপিত করতে হত এবং তার প্রণয়-লাভের উপর উচ্চ দর্শনী নির্ধারিত করতে হত। কোটিল্যও এই শিক্ষাপদ্ধতি সমর্থন করেছেন এবং রাষ্ট্রকে শিক্ষিকাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিতে নির্দেশ দিয়েছেন। কুটনীমতমের একটি কাহিনী থেকে আমরা গণিকাদের দৈহিক ও মানসিক উৎকর্ষ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করতে পারি। মালতী তার প্রেমিকের কাছে যে দূতী পাঠিয়েছিল, সে শুধুমাত্র তার বিকশিত যৌবনশ্রীর বর্ণনা দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, মালতীর আরও অনেক গুণের উল্লেখ করেছিল। গণিকা হিসাবে মালতীর বাংলায়ন ও দন্তক বিরচিত কামশাস্ত্রে পরিপূর্ণ জ্ঞান ছিল, প্রণয়-অভিনয়ের ছলাকলায় ছিল তার অনন্তসাধারণ নৈপুণ্য, ভেজবিজ্ঞান, সূচীকর্ম, শ্লেষ-বঙ্গন, মূর্তি রচনা, নৃত্য, গীত ও যন্ত্র বাদনে তার বহুমুখী প্রতিভার বিকাশ ঘটেছিল।

কুটনীমতমের অপর এক স্থানে প্রণয়ীর সঙ্গে মিলনক্ষেণে গণিকার সাজসজ্জা সম্বন্ধে সুন্দর বর্ণনা দেওয়া আছে। গণিকার পরিধানে থাকবে ধৌত, সুরভিত, কোমল ও সূক্ষ্ম পরিচ্ছদ, দেহে থাকবে সূক্ষ্ম অলংকার, চোখে থাকবে কজ্জল, অধর হবে রঞ্জিত, মুখ-গহ্বর সুগন্ধিত হবে সুসিদ্ধ মুখশুদ্ধিতে। কামসূত্র থেকে জানা যায় যে, একজন গণিকা হবে চৌষটি কলায় সুশিক্ষিতা, তার ব্যবহার হবে বিনয়নম্র, দেহজী হবে মনোমোহন ও পুরুষ-চিত্ত বিজয়ের অমূল্য। তার প্রসন্নতা, তার সংগ সকলের কাম্য হবে, আর সে হবে সকলের দর্শনীয়। ললিতবিস্তার গ্রন্থে মহারাজ শুদ্ধোধন কর্তৃক

যুবরাজ সিদ্ধার্থের জগ্ন সূর্যশাস্ত্রজ্ঞা ও গণিকাসুলভ কলাবিজ্ঞার পারদর্শিনী বধু কামনার কথা লিখিত আছে। গণিকার বর্ণনা প্রসঙ্গে ভরত বলেছেন, গণিকা হবে সহস্রময়ী, শক্তিরূপা, বিনয়নম্র ও সূচতুরা। সে হবে সূক্ষ্মবেষ্ণা, সূচমুকা, কলাবতী, অপার রূগপাংগমা নারীরত্ন। তাকে ঘিবে সৃষ্টি হবে একটি রতন-ব্যাকুল উৎসব, উজ্জলিত হবে কামাহুর মন্ত-মধুপের গুণগর।

মহাকাব্যের যুগ থেকেই গণিকারা নগরজীবনে একটি বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করে আছে। কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধযাত্রার পূর্বে মহারাজ যুধিষ্ঠির নগরীর যৌবনরঞ্জিতা রূপাতিশালিনী গণিকাদের স্তভেজ্ঞা জানিয়েছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রেও গণিকারা উপস্থিত থাকত। দুর্ধোধনের সৈন্যদলে শিল্পী, গায়ক, গুপ্তচর ও বারনারীরা অংশ গ্রহণ করেছিল। রামায়ণে নৃপতি দশরথ পুত্র রামচন্দ্রের সৈন্যগঠনে গণিকাদের সৈন্যদলের শোভাবর্ধনের জগ্ন আহবান জানিয়েছিলেন। কেবলমাত্র যুদ্ধাভিযানেই বারংগনারা স্থান পেত না, তারা ছিল নগরের প্রত্যেকটি উৎসব অনুষ্ঠানের মধ্যমণি। রামের যৌবরাজ্যে অভিব্যেককালে মহর্ষি বশিষ্ঠ বারনারীদের উৎসব-আনন্দে যোগ দিতে আদেশ দিয়েছিলেন। রামচন্দ্রের বনবাসের পর সমগ্র অযোধ্যা নগরীতে উৎসব নিবন্ধ হয়েছিল। কিন্তু তাঁর অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন কালে ভাতা ভরতও গণিকাকুল সহ সমস্ত নগরবাসীকে রামচন্দ্রের মুখচক্রিমা দর্শনের জগ্ন আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। রাজা বিরাটের পাণ্ডব-সহায়তার ফলে যুদ্ধজয়ের শেষে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন কালে নগরের সমস্ত যুবতীবৃন্দ বারবনিতা সহ বিজয়ীদের অভ্যর্থনার জগ্ন উপস্থিত হয়েছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন শাস্তিহাপনার্থে কৌরবশিবিরে যাত্রা করেছিলেন, তখন মহারাজ দ্রুতরাষ্ট্রের আদেশে নগর-মোহিনীরাও নগ্নপদে, মনোহরবেশে তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল।

উত্তানযাত্রা বা যুগয়াকালেও বারবনিতারা নৃপতির অনুসরণ করত। দুর্ধোধনের যুগয়াকালে দ্রাকুল, নর্তক, গায়ক এবং আনন্দনায়িনী নারীরাও অংশ নিয়েছিল। মেগাস্থিনিস ও কোটিল্য নৃপতির স্ত্রী-দেহরক্ষী হিসাবে গণিকাদের নিয়োগের কথা উল্লেখ করেছেন। বারহুত ভাষ্যে এইরকম একজন অশ্রাব্য পতাকাধারিণী দেহরক্ষিনীর মূর্তি চিত্রিত হয়েছে। মৌর্যযুগে একজন কলাবতী সুধৌবনা গণিকাকে উচ্চ পারিশ্রমিকে গণিকা সম্প্রদায়ের তত্ত্বাবধায়িকারূপে নিযুক্ত করা হত। আবার তাব ক্রিয়াকলাপ পর্যবেক্ষণের জগ্ন অর্থ পারিশ্রমিকে একজন প্রতিদ্বন্দ্বিনী গণিকার নিয়োগের ব্যবস্থা ছিল। রাজনৈতিক সুবিধার্থে গণিকাদের স্ত্রী-গুপ্তচর হিসাবেও নিযুক্ত করা হত। রাজ-অন্তঃপুরেও উচ্চ পারিশ্রমিকে তারা কর্ম গ্রহণ করতে পারত। তারা রাজ-ছত্র, স্বর্ণময় জল-পাত্র ও ব্যজনী ধারণ কবত, ভাণ্ডারকক, রন্ধনশালা ও স্নানাগারের বিভিন্ন কর্মে নিযুক্ত হত। 'উপমিত্তভবপ্রপঞ্চকথা' থেকে জানা যায়, রাজকুমার নন্দাবধনের সঙ্গে রাজকুমারী কনকমঞ্জরীর স্তভ-পরিণয়ে গণিকারা নন্দাবধনকে স্থান করিয়েছিল। আবু জরিদ ও ইবন অল ফাকী বিশ্রামাগারে পথিকদের আনন্দদানের জগ্ন গণিকা নিয়োগের কথা বলেছেন।

সম্মানিত অতিথিদের সেবার জগ্ন গণিকাদের নিযুক্ত করার

প্রথা প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত ছিল। ব্যাসপুরে জিতেন্দ্রিয় শুকের কাহিনী থেকে জানা যায় যে, বিদেহ-রাজ জনকের উজ্জান-কুঞ্জে প্রবেশকালে পঞ্চাশটি সুন্দরী, খরযৌবনা, রম্ভাক ও গুহনিতম্বিনী গণিকা তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল। সুরত-লিপ্সা জাগিয়ে তোলবার জন্য তারা ঋষিকুমারকে নিবেদন করেছিল সুবাহু খাঙ, বিলাস শয়নের জন্য প্রস্তুত করেছিল কোমল শয্যাসন। রামায়ণে উল্লিখিত লোমপাদ রাজ্যে অনাবৃষ্টি নিবারণার্থে বিভাওকুমারি পুত্র ঋষাংগকে আনয়নের জন্যও কোঁতুময়ী যুবতী বারবনিতাসের সাহায্য নেওয়া হয়েছিল। মহারাজ যুধিষ্ঠিরও ব্রাহ্মণ, মন্ত্রী ও রাজক-বর্গের চিত্তবিনোদন ও সাময়িক উপভোগের জন্য সহস্রাধিক নবযৌবনা গণিকাকে নিযুক্ত করেছিলেন। দ্বারকায় অর্জুনের মনোবঞ্চার্থে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক বারবনিতা নিয়োগও দৃষ্ট হয়। জর্নৈক রাজকুমারের ঔদাসীভ্য দূর করবার জন্য নর্তকী নিয়োগের কথা 'কুল্লপলোভন' জাতকে লিখিত রয়েছে। যৌবনের প্রারম্ভে গৌতমকেও এই ভাবে নর্তকীর ছলাকলার সাহায্যে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছিল।

'কামসূত্রে' বর্ণিত 'নাগরকের' জীবনযাত্রা প্রণালী থেকে জানা যায় যে, গৃহে অধুগত প্রেমময়ী পত্নী থাকার সত্ত্বেও নাগরিকেরা বিহারযাত্রায়, উজ্জানভ্রমণে, পানযাত্রায় ও গণিকালয়ে বারনারীদের সঙ্গে মিলিত হত।

'রতিরহস্য' থেকে জানা যায় যে, নিশাকালে প্রমোদবিলাসী যুবকেরা আলোকোজ্জ্বল পুষ্পসার-সুরভিত কক্ষে নর্তকীদের সঙ্গে নিলজ্জ নর্মলায় মত্ত হত। 'উপমিত্তিবপ্রপঞ্চকথায়' দেখা যায় যে, বসন্ত সমাগমে পানোয়ন্ত নাগরিকেরা গণিকাদের সঙ্গে নগরের বহির্ভাগে উজ্জানসমূহে যাত্রা করত। সেখানে তারা বকুল 'কুশোক' প্রভৃতি বৃক্ষতলে কামোদ্দীপক ক্রীড়াকৌতুকে মত্ত হত, বহুগতিত আধার থেকে স্তম্ভকী সুরা পানপাত্রে ঢেলে নিয়ে তারা ভণ্টী পণ্যাংগনাদের রক্তিম অধরে তুলে ধরত। 'মেঘদূতে' বিদিশা নগরীর যুবকবৃন্দকে নিকটবর্তী শৈলদেশের শিলাগৃহে গণিকাদের সঙ্গে কাম-ক্রীড়ায় উন্মত্ত হতে দেখা গেছে। কবি রাজশেখর বিবচিত 'কাব্যমীমাংসা' ও 'বিদ্যশালভঙ্গিক' গ্রন্থদ্বয়েও কেলিশয়ন-সুশোভিত লীলাগৃহ সমূহের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, নৃত্যস্থলীতে নর্তকীর লাভময় নৃত্যানুষ্ঠান ক্ষণে ক্ষণে যুবকবৃন্দের চিত্তচাক্ষু্য ঘটিয়েছে। মুদ্রারাক্ষস, কুমারসম্ভব ও কাদম্বরী গ্রন্থ থেকেও গণিকাসক্ত যুবকদের ক্রীড়ামত্ততার পরিচয় মেলে।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, তৎকালীন সমাজ ছিল স্তম্ভচিত্র সমাজ। এক শ্রেণীর গণিকার অপরূপ দেহলাবণ্য, বিনয়-নম্র আচরণ ও বিভিন্ন কলাশাস্ত্রে অসাধারণ প্রজ্ঞার জন্য সমস্ত কলারসিকেরাই তাদের সংগ কামনা করত। বিস্তারিত ও পরিপূর্ণ শিক্ষালাভের মধ্য দিয়ে গণিকারা চৌষটি কলায় যেরূপ ব্যুৎপত্তি লাভ করত, অন্তঃপুচ্চারিণী বিবাহিতা নারীদের পক্ষে তা করা সম্ভব হত না। কারণ, তাদের উপরে ছিল সসার প্রতিপালন ও গৃহস্থালী স্নেহকর্ণের গুরু দায়িত্ব। তাছাড়া যে সমস্ত কলাগৃহ বা গুরুবশালায় গণিকাকল্পার্য বিবিধ কলায় শিক্ষালাভ করে ধনী সম্ভানদের মাঝে মক্ষিরাণীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হত, সে সমস্ত শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষাগ্রহণ করাকে বিবাহিতা নারীরা স্বক্চিসম্মত ও ভদ্রজনোচিত বলে মনে করত না। সে যুগে বিবাহিতা স্ত্রীর পবিত্রতা স্নেহকর্ণকে উচ্চ

মর্যাদা দেওয়া হত এবং তার স্বভাব ও প্রবৃত্তিকে স্ত্রী পরিচালনার জন্য বহুবিধ বন্ধি-নিষেধের ব্যবস্থা ছিল। যার ফলে এক স্বামী ছাড়া সে আর কারও কাছ থেকে কলাবিদ্যায় শিক্ষাগ্রহণ করতে পারত না। আর নাগরিক স্বামীও সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে এত ব্যস্ত থাকত যে তার পক্ষে স্ত্রীকে কলারসিকা করে তোলবার অল্পই সুযোগ মিলত। সেই কারণে বিবাহিতা স্ত্রীদের চেয়ে গণিকারাই ছিল অধিকতর শিক্ষিতা, মার্জিতা ও কলাবতী। নগরবাসী পুরুষেরাও সেজন্য গৃহে পতিপ্রাণ ঘরবী থাকলেও শিক্ষিতা বারবনিতার সংগ অধিক কামনা করত। উদাহরণস্বরূপ চারুদত্ত বসন্তসেনার উপাখ্যান উল্লেখ করা যেতে পারে। নগরবাসী পুরুষদের গৃহে অশান্তি ছিল না, অসহনীয় ছিল না গৃহ-পরিবেশ। তবু তারা গণিকার সম্পর্কে আস্ত তাদের রুচিসম্মত জ্ঞাবলীর জন্য। সাধারণ মানুষে গণিকা-জীবনকে ঘূর্ণার দৃষ্টিতে দেখলেও, তার উচ্চ কলাজ্ঞানের জন্য তারা তাকে সহ্য করত ও সময় বিশেষে সমাদর করতও কুণ্ঠিত হত না। গণিকাদের অপার কলারসের পরিচয় পাওয়া যেত বিশেষ বিশেষ উৎসব অনুষ্ঠানে। ঐ সমস্ত অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে জনসাধারণও আনন্দ উপভোগ করবার সুযোগ পেত। দশকুমারচরিতে বর্ণিত রাগমঞ্জরী নাগরিকদের আনন্দবর্ধনের জন্য প্রকাশ্যে সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। মহাভারত ও ক্ষেমেন্দ্র রচিত 'কলাবিলাসের' একটি কাহিনী থেকে জানা যায় যে, সম্ভ্রান্তবংশীরা নারীরা পর্যন্ত বিকচযৌবনা আসক্তপ্রিয়া, স্তবেশা রূপাজীবাদের সমাদরকে ঈর্ষার চোখে দেখতেন।

পুরুষের বিলাস বাসনা চরিতার্থ করবার জন্যই গণিকার স্ত্রী। মনোহারী দেহসুধমা, কপট প্রেমের ছলাকলা ও চটুলতার সাহায্যে তারা দুর্বলচিত্ত পুরুষকে প্রলুব্ধ করে। সাধারণভাবে তারা লুকা, লুঠকী ও স্বাধিপত্নী! পুরুষ-মুগ্ধায় তারা পায় অপার আনন্দ, কামুক সম্পদশালীকে নিগূঢ় করাই তাদের স্বভাব-বিলাসিতা। অসম্মত সমস্ত গণিকাই কপটিনী অসৎ ও অর্থালোপা ছিল না। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও জাতক কাহিনীগুলিতে বহু গণিকাই তাদের দেহকী, বুদ্ধিমত্তা ও ভাগবতের-জন্য অকুণ্ঠ প্রশংসা ও উচ্চ সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। বহু বারবনিতাই নৌদ্ধধর্মের সম্পর্কে এসে প্রবৃত্তিকে বিসর্জন দিয়ে আদর্শ জীবন যাপন করেছে এবং অবশেষে অহঙ্কৃত লাভ করেছে। জনসাধারণও তাদের শ্রদ্ধা অর্থ নিবেদনে দ্বিধাবোধ করেনি। ভগবান বুদ্ধ তাঁর সংস্রব থেকে ছিন্নমূল ও নপুংসকদের বর্জন করলেও গণিকাদের বর্জন করেননি। এই প্রসঙ্গে 'মহাভাগ' জাতকে বর্ণিত অধিপালী বা আত্মপালীর জীবনকথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বৈশালী নগরীর এক বিস্তবান নাগরিকের কন্যা এই আত্মপালী। সে ছিল রূপসী, কলাবতী, স্নক্চী ও নৃত্যপটীয়া। বহু যুবক আত্মপালীকে স্ত্রীরূপে লাভ করতে উদ্যোগী হওয়ায় তার পিতা তাকে লিচ্ছবী-সংঘের সামনে উপস্থিত করেন। বিস্তারিত আলোচনার পর আত্মপালী স্ত্রীরূপে অভিহিতা হয় এবং প্রচলিত প্রথাযুসারে তাকে সমগ্র সংঘের উপভোগ্য সভা-নর্তকীরূপে গ্রহণ করা হয়। আত্মপালীও এই বার্যাংগনা-জীবন গ্রহণে স্বীকৃত হয়। তার অবস্থান বৈশালী নগরীকে সমৃদ্ধি ও সম্মানে উজ্জ্বল করে তোলে। এরূপ একটি স্তম্ভযৌবনা কলাশীলা গণিকাকে প্রতিষ্ঠিত করে রাজধানী রাজ্যগৃহের গৌরববর্ধনের জন্য জর্নৈক বণিক নৃপতি বিধিগারকে

অনুরোধ জানিয়েছিল। মগধাধিপ বিদ্বিসারও বৈশালী গিয়ে আত্মপালীর প্রণয়সম্পন্ন হন। 'অবদানকল্পলতায়' 'আত্মপাল্যাবদান' কাহিনী অনুসারে বিদ্বিসারের ঔরসে আত্মপালীর গর্ভজাত পুত্র অভয় সামাজিক ঘৃণা লাভ না করে রাজসভায় সম্মানিত আসন লাভ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে 'ছান্দোগ্যোপনিষদের' সত্যকাম ও জবালার উপাখ্যানও উল্লেখযোগ্য। বহুব্রাহ্মণ্য ভূতৃতীনা জবালার পুত্র সত্যকামকেও ঋষি গোঁঠম সত্যকুল-জাত দ্বিজোত্তমরূপে স্বীকার করে ব্রহ্মবিজ্ঞা শিক্ষালাভে অধিকার প্রদান করেছিলেন।

যখন ভগবান বুদ্ধ বৈশালী নগরীর উপকণ্ঠে উপনীত হন, তখন নর্তকী আত্মপালী তাঁর ধর্মোপদেশ শ্রবণে যুক্ত হয়ে সশিষ্য তাঁকে তার গৃহে অন্নগ্রহণে আমন্ত্রণ জানান। ভগবান বুদ্ধও তার অনুরোধ রক্ষা করেন। 'বিনয়পিটক' থেকে জানা যায় যে, আত্মপালী স্বীয় নামের একটি প্রমোদকানন বুদ্ধের তিকুসংঘকে উৎসর্গ করে। এই আত্মপালীই পরে দিব্যজ্ঞান অর্জনের দ্বারা অর্হৎ লাভ করে গতা হয়।

খেরী গাথায় উল্লিখিত অনেক খেদী গণিকার জীবনও বুদ্ধের সম্পর্কে এসে পরিশোধিত হয় এবং তাবা অর্হৎ লাভ করে। 'মহাবংশ', 'ধম্মপদকথা', 'সুত্ত-নিপাত', 'বোধিসত্তাবদান-কল্পলতা', 'মহাবুদ্ধবলন' প্রভৃতি বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থে বহু নর্তকীর উল্লেখ রয়েছে। উচ্ছিন্নীর সন্তান-নর্তকী পদ্মবতী ধার্মিক সন্ন্যাসী-পুত্রের মুখে ধর্মবাণী শুনে গণিকার ঘৃণা জীবন পরিত্যাগ করে ও পবিত্রাশ্রমে অর্হৎ অর্জন করে। বাজগুহের অপরূপ লাবণ্যময়ী নর্তকী সিরিমাও ভগবান বুদ্ধের শুভ সম্পর্কে এসে পরিবর্তন প্রদান স্তরে উপনীত হয়। বারাগমীর গণিকা শামা দম্ভ্য বজ্রসেনের প্রণয়সম্পন্ন হয়ে গণিকা-বৃত্তি পরিত্যাগ করে। পরে দম্ভ্যব পাশব প্রবৃত্তি ও অর্থলোলুপতা দূরে ত্যজ মোহভগ্ন হয় এবং সে তার পূর্বের জীবনে ফিরে যায়। বারবনিতা সুলসার জীবনও শামার মত। একদিনাশ পুত্রকে আশ্রয় করে সাধুজীবন কাটাতে চাইলেও সুলসাকে আবার তার ঘৃণা জীবনে প্রত্যাবর্তন করতে হয়েছিল। যৌবনমতে মত্তা নটী বাসবদত্তার লাগ্না আত্মবান সন্ন্যাসী উপগুপ্ত প্রথমে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। পরে বসন্তরোগাক্রমণে বাসবদত্তা যখন নগর-পরিখায় পবিত্রাশ্রম হয়েছিল, তখন একমাত্র উপগুপ্তই তাকে সেবা দ্বারা বাধ্যমুক্ত করেছিলেন। কালীর বারবধু অধর্কালীও বৌদ্ধধর্মের প্রচারে ধর্মপথ গ্রহণ করেছিল এবং অর্হৎ লাভে গতা হয়েছিল।

'মুচ্ছকটিকের' বসন্তসেনা, দশকুমারচরিতের রাগমঞ্জরী, চন্দ্রসেনা প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর গণিকা স্বেচ্ছায় তাদের দেহ-বিক্রয় বৃত্তি পরিত্যাগ করে অজস্র নিগ্রহ স্বীকারের পর নিজদের পছন্দমত প্রেমিকদের সহিত মিলিত হয়েছে। 'মাধবানল-কামকন্দলা-কথা' থেকে জানা যায় যে, ব্রাহ্মণকুমার মাধবানল নর্তকী কামকন্দলার প্রণয়সম্পন্ন হয়ে সুদীর্ঘ যজ্ঞময় বিচ্ছেদের পর রাজ্য বিক্রমাদিত্যের আত্মকুল্যে কামকন্দলাকে বিবাহ করেন। 'দশকুমারচরিতে' চম্পা নগরীর এক গণিকা-কন্ডার সঙ্গে রাজপুত্রের বিবাহের উল্লেখ করা হয়েছে। বিজাপুর জেলার নগরকূট মন্দিরের একটি শিলালেখনে বাদামীর চালুক্যরাজ বিজয়াদিত্যের 'সদয়ৈশ্বরী' গণিকা বিনাপটির দান-কর্মের কথা লিখিত আছে।

উপরোক্ত কাহিনীগুলি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, প্রাচীন ভারতে গণিকারা মোটেই ঘৃণার পাত্রী ছিল না বরং শৌর্যবান নৃপতিকুল ও

সুবিখ্যাত ধর্মগুরুগণ তাদের যথেষ্ট সমাদর করতেন এবং বহু ক্ষেত্রে তাদের অনুগ্রহ করতে বিদ্বা করতেন না বা তাদের উপহার গ্রহণে লাজিত হতেন না।

দেবায়তন নির্মাণ, পুষ্করিণী খনন, উদ্ভান রচনা, সেতু নির্মাণ, উৎসর্গ ও উৎসব মণ্ডপ নির্মাণ প্রভৃতি সংকর্মে অর্থ নিয়োগকে গণিকারা জীবনের পরম সার্থকতা বলে মনে করত। ব্রাহ্মণকে গোদান পরম পুণ্যকার্য বলে স্বীকৃত হত এবং পতিতারা এই দান-কর্ম ভূতীয় ব্যক্তির মাধ্যমে সমাধা করত, কাবণ শাস্ত্রীয় মতে কোন ব্রাহ্মণই গণিকার দান গ্রহণ করতেন না। 'বিকৃশ্মতি' অনুসারে বিদেশ যাত্রার সময় গণিকার মুখদর্শন শুভ বলে গণ্য হত।

প্রাচীন ভারতে গণিকাদের কর্তব্য ও অধিকার (বেত্তাধর্ম) সম্বন্ধে একটি বিস্তারিত বিবরণ 'মন্তপুরণে' লিখিত আছে। তৎকালে গণিকা-বৃত্তিকে একটি আইন-সম্মত বৃত্তি বলে গণ্য করা হত এবং বিশেষ সর্ব-যুক্ত কতকগুলি বিধি-নিষেধ গণিকাদের প্রতি প্রয়োগের ব্যবস্থা ছিল। কোটিল্যও গণিকাবৃত্তিকে সুনিয়ন্ত্রিত করার জন্য কতকগুলি নিয়মের উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, প্রত্যেক গণিকাকে তার দু' দিনের উপার্জন মাসিক কব হিসাবে রাজকোষে জমা দিতে হবে। উপপতিদের সঙ্গে তাদের মতানৈক্য-ঘটলে প্রধানা গণিকা তার সহজ নিষ্পত্তি করে দেবে। গণিকাদের উত্তরাধিকার সম্পর্কিত প্রশ্ন, তাদের অভাব অভিযোগ ও শ্রেণীগত দর্শনের হারা গণিকাধ্যক্ষের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে মীমাংসিত ও নির্ধারিত হবে। নর্তকীর বিনা সম্মতিতে তার উপর বলাৎকার করলে বা গণিকাকন্ডার সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হলে অপরাধীকে রাজদ্বারে অভিযুক্ত হতে হবে। নারদ বলেছেন, গণিকার অস্ত্রাশ্রয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা চলবে ও তাব ব্যবসায়ের সহায়ক অলংকারাদি কখনও রাষ্ট্র কর্তৃক অধিগত করা চলবে না। যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন, কোন গণিকা যদি কোন ব্যক্তির শয্যাসংগিনী হবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে অগ্রিম অর্থ নেয় এবং পরে তাতে অসম্মত হয়, তবে সে অগ্রিমদাতাকে দ্বিগুণ অর্থ প্রত্যর্পণ করতে বাধ্য থাকবে। অগ্নিপূরণে যাজ্ঞবল্ক্যের নির্দেশ সমর্থিত হয়েছে। কোটিল্যের মতানুসারে বেত্তাধর্মগুলিকে তালিকাভুক্ত করা হত। বিগতসৌবনা গণিকাদের কর্ম-সংস্থানের ব্যবস্থাও ছিল।

শিক্ষিতা ও সূক্ষচিসম্পন্ন বারনারীদের সাধারণ ভাবে যথেষ্ট সমাদর করা হলেও মহাভারতের উপদেশাত্মক অংশ, বিভিন্ন পুবাণ ও সাহিত্যের জনসাধারণকে এদের সম্পর্শ থেকে দূরে থাকবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মহাভারতে বলা হয়েছে, দশটি হত্যাগৃহ থেকে একটি তৈল-নিষ্পেষক চক্র অধিক মন্দ; একটি অতিথিশালা দশটি তৈল-নিষ্পেষক চক্র থেকে নিকৃষ্ট; একজন বেত্তা দশটি অতিথিশালা থেকে মন্দ, আবার একজন নৃপতি দশ জন গণিকা থেকে নিকৃষ্ট। প্রত্যেক প্রজাপুত্রকে নৃপতিকে পানশালা, বরাংগনা, জুয়াড়ি, ব্যবসারী ও বিদূষকদের অস্ত্রায় প্রভাব থেকে নিজরাজ্যকে মুক্ত রাখণাব কঠোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নইলে রাজ্যের ও প্রজাপুত্রের ধ্বংস অনিবার্য।

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের বহু স্থানে অক্ষকৌড়ী ও বরাংগনাকে পরস্পর সংযুক্ত দেখান হয়েছে। দশকুমারচরিত থেকে জানা যায় যে, তত্ত্বর ও অপরাধীদের সঙ্গে গণিকাদের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বর্তমান থাকে। যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন, তত্ত্বরের চৌর্যপরাধের চারটি প্রমাণের মধ্যে একটি হচ্ছে বেত্তাগৃহে বাস। জৈনকাহিনী 'অগলদত্তে' তত্ত্বরের উদ্দেশে বেত্তাগৃহই প্রথম অসুস্থদান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মহাত্মারত থেকে জানা যায় যে মন্ত্রশালা ও গণিকালয় পরস্পর সংযুক্ত। নারদ, মনু, বৃহস্পতি প্রভৃতি শাস্ত্রকার 'প্রকাশবন্ধকদে'র মধ্যে জুয়াড়ি, অসাধু ব্যবসায়ী ও উৎকোচগ্রহীতার সংগে গণিকারও উল্লেখ করেছেন। বাংসায়ন, বশিষ্ঠ, বিষ্ণু প্রভৃতি শাস্ত্ররচয়িতা একবাক্যে ব্রাহ্মণকে গণিকার দান ও গণিকাগৃহে অন্নগ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। পরাশরসংহিতা ও মহানির্বাণতন্ত্রে গণিকার সহিত ব্রাহ্মণের সুরতক্রিয়াকে জঘন্যতম অপরাধ বলে গণ্য করা হয়েছে। অগ্নিপূরণেও এর সমর্থন রয়েছে। গৌতমের অভিমতানুসারে গণিকা-হত্যা অপরাধ বলে গণ্য হত না।

জাতককাহিনীগুণির উপদেশাঙ্ক অংশগুলিতেও গণিকাদের সংস্পর্শ বিষয় পরিচয় করতে বলা হয়েছে। কেন না, মায়াবিনী প্রযুক্তি ও অপ্সরা বৃত্তিই বারাগনার উপজীবিকা। পুরুষ-চিত্ত বিজয়ের অভিধানে আয়ুধ তাদের মনোহরা মদালসমস্তর যৌবনশ্রী, সুরধকঠ, স্পর্শন, পরিচরিত প্রভৃতি ছল-প্রণয়ের লীলাকলা। তাদের প্রকৃতি বেগীবন্ধ তরুণের মত, গরলমিশ্রিত পানীয়ের মত, আশ্রয়প্রার্থী-পরায়ণ পণ্যজীবীর মত, সর্বভুক ছতালনের মত, সর্বগ্রাসী শ্রোতবিনীর মত, কুরঙ্গের বাকিম শৃংগের মত, চির-বুড়ুকিত কৃতাস্ত্রের মত, অনবরুদ্ধ-গতি স্বেচ্ছাসঞ্চরমান ঝটিকার মত, হস্তর কলুষ-তমিস্র নরকের মত এবং চির-অতৃপ্ত নিশাচরীর মত। এদের নিরাজ্ঞ কেলিকপটভায় পতঙ্গবৃত্ত ধনোপভোগ সম্পদহীন ভিক্ষুকে, দুঃচরিত্র মস্তকে পরিণত হয়। অর্থলোলুপা কামুকী এই নারীদের চরিত্রে

শুধুমাত্র ছলনা আছে, অসন্তোষ আছে, কৃতজ্ঞতা নেই, মমত্ববোধ নেই, নেই প্রকৃত প্রণয়ের মধুরতা।

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে গণিকাদের সম্বন্ধে পরস্পরবিরোধী অভিমত ব্যক্ত হলেও, এদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। তাছাড়া সাধারণ গণিকা সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য থাকলেও, আম্রপালী, বসন্তসেনা, রাগমঞ্জরী, চন্দ্রসেনা, কামকন্দলা প্রভৃতি নর্তকীর চরিত্রের মধ্য দিয়ে উন্নতশ্রেণীর রূপাতিরম্যা, বিহুদী, ঐশ্বর্যশালিনী গণিকাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও জন-সমাদর সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এদের সংখ্যা অল্প হলেও অল্পসংখ্য নয়। এদের কেউ বা স্বেচ্ছায় দেহ-বিক্রয় বৃত্তি পরিত্যাগ করে মনোমত প্রণয়ীর সংগে মিলিত হয়েছে, আবার কেউ বা প্রচণ্ড ভোগের পর সাধুসংসর্গে পরম-মুক্তির সন্ধান পেয়েছে।*

* এই প্রবন্ধ রচনার নীচের পুস্তকগুলির সাহায্য নেওয়া হয়েছে :

1. History & Culture of the Indian people Volumes II, III & IV—Majumdar & Pusalkar.
2. Position of Women in Ancient India—Altekar.
3. Sexual Life in Ancient India—J. J. Meyer.
4. Kautilya's Arthashastra—Meyer.
5. Social Life in Ancient India—Chakladar.

প্রভু-শিষ্য-সম্ভাষণ

বিমলচন্দ্র ঘোষ

প্রভু যখন হাই তোলেন
শিষ্যেরা দেয় তুড়ি,
এমনি ক'রেই বছর বছর
প্রভুর বাড়ে তুড়ি।

প্রভুর হাতে লাটাই যখন
শিষ্যেরা হয় ঘুড়ি,
শূন্যে উড়ে ছুই পায়ে দেয়
নাক ঘষে' শুভুতুড়ি।

চালের কাঁকর যক্ষুণি হয়
বিষ-পাথরের ঘুড়ি,
শিষ্যেরা দেয় সোনার মুড়ে
প্রভুকে শুভুতুড়ি।

অভিধান তৈরী করার মত সহিষ্ণুতার কাজ আর নেই।

পৃথিবীর মধ্যে নানা লোক নানা বিষয়কে পরম সুখ বলে বর্ণনা করেছেন। কেউ বা অর্থসঞ্চয় করাকে পরম সুখ, কেউ বা বৃক্ষমূলে বসে নতুন কাব্য পড়াকে পরম সুখ, কেউ বা প্রথম ছেলের মুখের আধ-আধ বুলি শোনাকে পরম সুখ—আবার কেউ বা সমুদ্র-তটে বসে তরঙ্গরাশি দেখাকে পরম সুখ বলেছেন—কিন্তু অভিধান তৈরী করার যে কত সুখ তা ধারা না করেছেন—তারা তা অনুভব করতে পারেন না।

অভিধান তৈরী করার মত পরিশ্রমও বুঝি আর কোন কাজে দেখা যায় না—কেউ বলেন, ধারা অভিধান তৈরী করেন তাঁরা যেন বিজ্ঞার মজুর—তাঁরা মাল-মসলা তৈরী করে দেন—অন্তেরা সেই মসলা দিয়ে ঘর গাঁথেন। আবার কেউ বলেন—একটা সুবিশাল সৌধ। প্রবেশদ্বার তার তালাবন্ধ। সেই সৌধের প্রতিটি ঘর অগণিত শব্দ আর ভাষার ভাণ্ডার। কিন্তু প্রবেশদ্বার উন্মোচন করা চাই তো—তা করতে হলে চাই চাবি। এই শব্দ ও ভাষাভাণ্ডারের চাবিই হচ্ছে অভিধান।

এক শব্দের অনেক মানে, এক মানের অনেক শব্দ। সেগুলি সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে হলে মুখস্থ করা দরকার। বেসের যুগে এরকম শব্দ মুখস্থ করার প্রথা ছিল। এই শব্দগুলিকে সন্নিবেশিত করা হয় যে বই-এ, তাকে কোষগ্রন্থ বলা হয়।

ভাষাকে সৃষ্টভাবে আয়ত্তে আনতে গেলে বিদ্যার্থীদের বহু বছর ধরে মুখস্থ করতে হত এই সব কোষগ্রন্থ, সে কোষগ্রন্থ আজকের কালের বর্ণালীক্রমে লেখা নয়। স্থূললিত ছন্দে শব্দ, শব্দার্থ ও লিঙ্গ প্রকরণে সজ্জিত। ভেবে দেখুন ব্রহ্মচারী শিক্ষার্থী গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়ে শাস্ত্রানুশীলনের মাঝে মাঝে আহরণ করতে থাকে শব্দার্থ-সম্ভার। এমনি করে তার মোটামুটি শব্দ প্রভৃতি সঞ্চয় করতে লেগে যেত প্রায় সাতটি বছর।

কালে সেই সব কোষগ্রন্থ রূপান্তরিত হতে থাকে। প্রাচীন কালের কোষগ্রন্থ হয়ে ঐড়ায় আধুনিক কালের অভিধান। অভিধানগুলিকে মুখস্থ করার আর প্রয়োজন হয় না, সম্ভবও নয়। মত দিন যায় শব্দসম্ভারও বাড়ে, অভিধানের কলেবরও দীর্ঘ হয়। ধীরে ধীরে প্রাচীনকালের কোষগ্রন্থগুলির প্রচলন রহিত হতে থাকে। অনেকগুলি কোষগ্রন্থের নামও আজ শোনা যায় না অথবা সম্পূর্ণরূপে হুম্রাপ্য অবস্থায় আছে। তাদের কোন প্রাচীন মঠ বা মন্দিরে, টোলে বা যাত্রঘরে অলুসন্ধান করলে পাওয়া যেতে পারে কিন্তু তা সাধারণের নাগালের বাইরে। আধুনিক ভাবে সজ্জিত অভিধানের কথা বলার আগে আগেকার কালের অভিধান কি রকম ছিল দেখা যাক। এতে দেখা যাবে বাঙলাদেশই আধুনিককালের অভিধান সঙ্কলনের এক কেন্দ্র। এই কেন্দ্রভূমিতে ছোট, বড় অনেকগুলি অভিধান তৈরী হয়েছে, সেগুলি সম্বন্ধে বলার আগে প্রাচীনকালের কথকগুলিকে অভিধানের কথা বলা দরকার।

অভিধান কথাটির সাধারণ অর্থ নাম। সুতরাং নামের সংগ্রহ আর তার পরিচয়ই হচ্ছে অভিধান। একই জিনিষের অনেকগুলি নাম আছে আর একই শব্দের অনেকগুলি মানে আছে। ভাষার মধ্যে শব্দের ব্যবহারকে সুনিয়ন্ত্রিত করতে হলে এ সম্বন্ধে সচেতন হওয়া দরকার। বৈদিক যুগে এ সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন ছিল দেখা যায়। শুধু অর্থ নয়, লিঙ্গ সম্বন্ধেও প্রাচীন যুগের ভাষানিয়ন্ত্রণ সচেতন

বাঙলা অভিধান সঙ্কলন

ঐশ্বরীন্দ্রকুমার ঘোষ

ছিলেন। সংস্কৃতে প্রত্যেক শব্দেরই কোন না কোন লিঙ্গ হয়—বেদান্তে এটা সুপরিপুষ্ট হয়। তাই পার্থিব আগে থেকে ব্যাকরণ বেদান্ত নামে অভিহিত হয়। ব্যাকরণ ভাষাকে নিয়ন্ত্রিত করে। কিন্তু ব্যাকরণের কাজ আর অভিধানের কাজ এক নয়। সংস্কৃত অভিধানে তিনটি বিষয়ের পরিচয় পাওয়া যায়, যেমন পর্যায়, নানার্থ ও লিঙ্গ। পর্যায় মানে এক জিনিষের অনেক নাম; নানার্থ একই শব্দের নানা মানে আর লিঙ্গ অর্থে কোন কোন শব্দের কোন কোন লিঙ্গ বুঝায়। প্রাচীন কালে এই তিনটি বিষয়ের পরিচয় এক সঙ্গে একই গ্রন্থে পাওয়া যেত না। এক একজন এক একটা বিষয় নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। যেমন পর্যায়ের (বিভিন্ন নামের) সুপ্রাচীন পুথির নাম নিঘণ্ট। নিঘণ্টু বেদেরই অঙ্গ। বেদেরই মত মুগস্থ রাখতে হয় বলে এর নাম আশ্রয় বা সমাশ্রয় (বেদান্তের অভ্রাস)। নানার্থের প্রাচীন পুথিগুলির মধ্যে কালিদাসের নানার্থ-শব্দরত্ন, লিঙ্গের পুথিগুলির মধ্যে সম্ভবতঃ বরফটিচি সুপ্রাচীন বলে মনে হয়। ব্যাকরণ শাস্ত্রে যেমন পার্থিনি, তেমনি অভিধানে অমরসিংহের নাম সংস্কৃত ভাষায় সুবিদিত। অমর সিংহ সম্ভবতঃ অভিধানের তিনটি বিষয় বা কাণ্ড একত্রে সঙ্কলন ও গ্রন্থিত করেন। আর এই ভগ্নটুকুই তাঁর অভিধান 'ত্রিকাণ্ড' নামে খ্যাত। সাধারণতঃ অমরসিংহের 'অভিধান অমরকোষ' নামে সুবিদিত।

অমরসিংহকে ৫ম-৬ষ্ঠ শতাব্দীর লোক বলা হয়। প্রবাদ আছে—ইনি মহারাজা বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার এক রত্ন। সম্ভবতঃ “ধ্বস্তরিকপণকামরসিংহশঙ্কুঃ” এই শ্লোক হতে অনুমান করা হয়েছে। প্রসিদ্ধি আছে, ইনি বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। এবং গয়ার প্রসিদ্ধ বৌদ্ধমন্দির, যা উর্কবিষা গ্রামে (বোধগয়া) আছে, তা ইহার দ্বারা নির্মিত বলে ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিশ্র প্রভৃতি প্রত্নতাত্ত্বিকগণ অনুমান করেন। জেনারেল কানিংহাম সাহেবের মতে এই বৌদ্ধ মন্দির খৃঃ ৪র্থ হতে ৬ষ্ঠ শতকের মধ্যে নির্মিত হয়েছিল। উক্ত মন্দিরে ক্ষোদিত আছে, ইনি ৫ম শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন।

আরও প্রবাদ আছে, ইনি হেম সিংহের শিষ্য। এঁর রচিত অমরলালা ও অমরকোষ ব্যতীত বৌদ্ধবিদেবী শঙ্করাচার্য এঁর সমস্ত বই পুড়িয়ে দেন।

অমরসিংহ তিনটি অংশ নিয়ে নামলিঙ্গাংশাশন এবং ত্রিকাণ্ড নামে যে কোষগ্রন্থ লেখেন তাহাই অমরকোষ নামে খ্যাত। বইখানি হচ্ছে গ্রন্থিত ও মুগস্থ করা সহজ।

বিভিন্ন কোষকার বিভিন্ন প্রাচীন কোষকারের নামোচ্চারণ করেছেন। ঐ সকল কোষকারগণের মধ্যে কাত্যায়ন, বাচস্পতি, বিশ্বরূপ, মঙ্গল ভোগীন্দ্র, সাতসাহু, শুভাক্ষ, বরফটিচি, রত্নদেব, বিক্রমাদিত্য, রুদ্র, মাধব, গোবর্ধন, ব্যাঙ্কি, ভাণ্ডারি, গঙ্গাধর, তারপাল, রত্নপাল, বাভট, ধর্ম, বামন প্রভৃতির নামই বেশী পাওয়া যায়। এদের মধ্যে অমরকোষই অধিক প্রচলিত ও লোকপ্রিয় হওয়ায় ভারতের সর্বত্রই এর আদ্য দেখতে পাওয়া যায়।

অমরকোষ তিন কাণ্ডে ও আঠার বর্গে বিভক্ত। কেহ কেহ এই কোষকে ত্রিকাণ্ড বা নামলিঙ্গাঙ্কুশান বলে। অমরকোষের বর্গগুলি এই—

১। স্বর্গবর্গ, ২। পাতালবর্গ, ৩। ভূমিবর্গ, ৪। পুরবর্গ, ৫। শৈলবর্গ, ৬। বনৌষধিবর্গ, ৭। সিংহাদিবর্গ, ৮। মনুষ্যবর্গ, ৯। ব্রাহ্মণবর্গ, ১০। ক্ষত্রিয়বর্গ, ১১। বৈশ্যবর্গ, ১২। শূদ্রবর্গ, ১৩। প্রাণিবর্গ, ১৪। বিশেষ্যবর্গ বা নিম্নবর্গ, ১৫। সংকীর্ণবর্গ, ১৬। নানার্থবর্গ, ১৭। অব্যয়বর্গ, ১৮। লিঙ্গাদিসংগ্রহবর্গ।

কেউ কেউ বলেন, অভিধানের আদি অগ্নিপুরণ ‘সর্বেষাং কোথানামাদি অগ্নিপুরণোক্তাভিধানঃ’ কিন্তু এটি ঠিক নহে। কারণ অগ্নিপুরণ খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ হতে ৯ম শতকের মধ্যে রচিত হয়েছিল। বাংলাদেশ অথবা বিহারের কোন স্থানে এই পুরণ লিখিত হয়। অভিধান সকলনে অমরকোষ থেকে বহু বিষয় অগ্নিপুরণ গ্রহণ করেছেন। এটাকে অমরকোষের একটা সংক্ষিপ্ত সংস্করণ বলা যেতে পারে। বিশেষতঃ উভ্যদের মধ্যে অনেকগুলি শ্লোকের সমতা দেখা যায় আর অধ্যায় বিভাগ-রীতিও একরূপ। অমরকোষের বর্গগুলির সঙ্গে মেলানো দেখা যায়, অগ্নিপুরণে অনেকগুলি বর্গ এক। যথা— ১। স্বর্গবর্গ। ২। পাতালবর্গ। ৩। অব্যয়বর্গ। ৪। ভূমিবর্গ। ৫। বনৌষধিবর্গ। ৬। মনুষ্যবর্গ। ৭। ব্রাহ্মণবর্গ। ৮। ক্ষত্রিয়বর্গ। ৯। বৈশ্যবর্গ। ১০। শূদ্রবর্গ। ১১। সামান্ত্যনামলিঙ্গাদিবর্গ। ইত্যাদি—

অমরকোষের প্রায় ৪০খানি টীকাগ্রন্থ পাওয়া যায়। ক্ষীর-স্বামী (৮ম শতাব্দী) টীকা, ভাস্করীকৃত কৃত ব্যাখ্যান্ধা, অচ্যুত উপাধ্যায়ের ব্যাখ্যা প্রদীপ, ভরতমল্লের মুক্তবোধিনী প্রভৃতি।

এই টীকাকারদের মধ্যে একজন প্রসিদ্ধ বাঙালী টীকাকার আছেন। তাঁর নাম সর্বানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি ১২ শতাব্দীর লোক। তাঁর পিতার নাম—জ্ঞানিহর। গ্রন্থের নাম টীকার্শব। ১১৫৯ খৃঃ রচিত হয়। তিনি অল্প দশখানি টীকা আলোচনা করে এই টীকা রচনা করেন। তাঁর টীকায় ৩০০ সংস্কৃত শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ দেওয়া আছে। ত্রিবাঙ্করের মহারাজার আদেশে এই টীকাখানি মুদ্রিত হয়। এই বইখানি বাঙলাদেশ থেকে লুপ্ত হয়ে মালাবারের কোন অঞ্চলে রক্ষিত ছিল। বইখানি সম্বন্ধে রায় বাহাদুর বোগেশচন্দ্র বিজ্ঞানিধি ও বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্যমল্লভ সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় ১৩২৬ বঙ্গাব্দের ২য় সংখ্যায় স্বাক্ষর ‘সাড়ে সাত শত বছর পূর্বের বাংলা শব্দ’ ও ‘দ্বাদশ শতকের বাংলা শব্দ’ শীর্ষক প্রবন্ধদ্বয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

১৪৩১ খৃষ্টাব্দে বৃহস্পতি মাহিন্দ্রা (মতিলাল) ‘পদার্থচক্রিকা’ নামে অমরকোষের একখানি টীকা লেখেন, এই টীকায় তিনি মেদিনীকোষ থেকেও প্রমাণ সংগ্রহ করেছিলেন। গ্রন্থকার নিজের বলেছেন—তিনি প্রাচীন ১৬টি কোষগ্রন্থ যেমন, ক্ষীরস্বামী, স্রুতি, কলিঙ্গ, কঙ্কট, সর্বধর, ব্যাখ্যামৃত টীকার্শব থেকে বহু তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। ইনি রাজা গণেশ (১৪০৫) ও তাঁর মুসলমান পুত্রগণের সভাসদ ছিলেন। এই টীকা লিখে গোড়ের মুসলমান সুলতানের কাছ থেকে তিনি ‘রায়মুহুট’ উপাধি পান। সেই হতে তিনি রায়মুহুটমণি নামেও পরিচিত ‘পদার্থচক্রিকা’ বা ‘অমরচক্রিকা’ তাঁর এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়—তাঁর পিতার নাম গোবিন্দ,

মাতা নীলমুখারী দেবী এবং স্ত্রী রমা দেবী। তিনি বাঙ্গালী ছিলেন। মহাশয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সা-প পত্রিকায় (১৩৩৮) সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন।

অমরকোষের পরিশিষ্টকারদের মধ্যে পুরুষোত্তমদেবের (১২-১৩শ খৃঃ) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পুরুষোত্তম একজন বড় শাস্ত্রিক ছিলেন। তিনি অমরকোষের পরিশিষ্ট ‘ত্রিকাণ্ডশেষ’ প্রণয়ন করেন। এ ছাড়াও তিনি একাক্ষরকোষ, দ্বিাক্ষরকোষ, হারাবলী নামে তিনখানা অভিধান সঙ্কলন করেন। ‘হারাবলী’ একখানি ছোট অভিধান। আমাদের পক্ষে অভিধানের মত। এখানি লেখবার জন্তে তিনি প্রায় ২ বছর খাটেন। অনেক বড় বড় পণ্ডিতের বাড়ীতে যাতায়াত করেন নতুন নতুন শব্দ সংগ্রহের জন্ত। যে শব্দ চলিত ছিল অথচ উঠে যাচ্ছে, সেই শব্দের অর্থ দেওয়া এই অভিধানের উদ্দেশ্য। ত্রিকাণ্ডশেষে কোন কোন স্থানে যেখানে অমরকোষ এক পর্ধ্যায়ে ১৭টি শব্দ আছে, পুরুষোত্তম সেখানে ৩৭টি শব্দ দিয়েছেন। এ রকম ভাবে তিনি অমরকোষের পরবর্তী অনেক চলিত শব্দ তাতে সংযোগ করেছিলেন।

নানা কারণে পুরুষোত্তমের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি পানিনির বৈদিকসূত্র ছেড়ে দিয়ে ভাষাসূত্রগুলির বৌদ্ধমতে এক বৃত্তি লিখে যান। তার নাম ‘ভাষাবৃত্তি’। বানান সম্বন্ধেও সেই প্রাচীন যুগেও তাঁর মন আকৃষ্ট হয়েছিল। সাধারণতঃ ব-কার (অন্তঃস্থ ও বর্গীয়), য-কার (অন্তঃস্থ ও বর্গীয়), স-কার (শ, ষ, স), ন-কার (ন, ণ) প্রভৃতি ভেদ করা শব্দশাস্ত্রে এক দুরূহ ব্যাপার। ভিন্ন প্রদেশের উচ্চারণ ভেদে এইরূপ বানান বিভ্রাট সে যুগেও আরম্ভ হয়েছিল। অনেকে উচ্চারণ ধরে বানান করত আবার অনেকে বেদ-পুরাণাদির বানান ধরে চলত। আবার লিখা; পদ্ধতির দোষেও র ও ক, খ, ক্ষ ও ব প্রভৃতি অক্ষরকে একরূপ দেখাত। পুরুষোত্তম এর সমাধান করেন ‘বর্ণযোজন’ নামে এক বই লিখে। পরবর্তীকালে অমরকোষের টীকা আরও অনেকে লেখেন, তাঁদের মধ্যে বাঙালীদের নাম পরে উল্লিখিত হবে।

অমরকোষের পরে বহু উল্লেখযোগ্য অভিধান রচিত হয়—তার মধ্যে কতকগুলির উল্লেখ করা হল—শব্দচক্রিকা (১০-১১শ খৃষ্টাব্দ; এই গ্রন্থ চক্রপাণি দত্ত রচনা করেন। ইহার পিতা নারায়ণ কবিরাজ পালবংশীয় রাজা নরপাল দেবের পাকশালার মন্ত্রী ছিলেন); নানার্থসংগ্রহ (অজয় পাল কৃত—১১৪০ খৃঃ ইহার আবির্ভাবের কথা উল্লেখ আছে); বিশ্বপ্রকাশ (মহেশ্বর বৈষ্ণ, বঙ্গদেশ, ১১১১ খৃঃ); অভিধানচিন্তামণি (হেমচন্দ্র সুরি। ইনি ১১-১২শ খৃষ্টাব্দের লোক। অর্ধাষ্টম (আমেদাবাদ) প্রদেশের ধলুক গ্রামে চাচিকের গুরসে ও পাহিনীর গর্ভে ১০৮৮ খৃঃ জন্ম। শৈশবে হেমচন্দ্র ‘চন্দেব’ নামে অভিহিত হতেন। ইনি জ্ঞাতিতে বৈষ্ণ ছিলেন। জৈনাচার্য দেবচন্দ্র সুরি ১০৯৬ খৃষ্টাব্দে চন্দেবকে জৈনধর্মে দীক্ষিত করেন। ২১ বছর বয়সে বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করার পর জৈনাচার্য তাঁকে “হেমচন্দ্র” অর্থাৎ সোনার চাঁদ বলে সুরি উপাধি দেন। সেই সময় হতে চন্দেব হেমচন্দ্র সুরি নামে প্রসিদ্ধ। জৈনধর্মাবলম্বী হলেও তাঁর হিন্দুধর্মের প্রতি আস্থা ছিল। তিনি সিদ্ধরাজ ও পরে কুমারপাল রাজার সভাপণ্ডিত হন। ১১৭৪ সালে তাঁর মৃত্যু হয়; কবিকল্পদ্রুম (বোপদেব মিশ্র

১৩শ শতাব্দীতে দৌলতাবাদে আবির্ভূত হন। পিতা—কেশব। ইনি ধর্মশাস্ত্রের নিকট শিক্ষালাভ করেন। বাদশরাজ মহাদেবের সভাপণ্ডিত। ইহার ‘মুক্তবোধ’ ও ‘কবিকল্পদ্রুম’ বাঙলাদেশে বিশেষ আদৃত; অভিধানরত্নমালা (হলায়ুধ ভট্ট। ১০-১১শ খৃঃ। ইনি রাজা লক্ষ্মণসেনের সভাসদ হলায়ুধ হতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি); ভূরিপ্রয়োগ (পদ্মনাভ দত্ত দ্বিজ। হলায়ুধ বংশধর জীদন্তের প্রপৌত্র, দামোদর দত্তের পুত্র। মিথিলায় ইনি ১৩-১৪শ খৃষ্টাব্দে আবির্ভূত হন); ধরণী (সারসংগ্রহনামাকানেকার্থসমুচ্চয়, ধরণীদাস ব্রাহ্মণ কৃত); শব্দমালা (রামেশ্বর শর্মা); বর্ণাভিধান (নন্দ ভট্টাচার্য); ভাবপ্রকাশ (ভাবমিশ্র); শব্দরত্নাবলী (মথুরেশ পণ্ডিত); রাজবল্লভ (নারায়ণ দাস কবিরাজ); নামমালা (ধনঞ্জয় কবি), নানার্থরত্নমালা (দণ্ডাধিনাথ); পর্যায়নানার্থকোষ (জটাবধাচার্য)। নানার্থধ্বনি-রঞ্জরী (গদসিংহ), নিষণ্টু অর্থাৎ রাজনিষণ্টু (নরসিংহ কাম্বীর পণ্ডিত); উদ্যাকোষ (রাম শর্মা); আয়ুর্বেদার্থবোধিত পর্যায় রত্নমালা (রত্নমালাকর বৈজ্ঞ) ইত্যাদি। উপরি-উক্ত কোষ-গ্রন্থগুলির অধিকাংশেরই প্রচলন নেই বললে অতুক্তি হয় না।

বাঙালী কোষকারের মধ্যে সর্বানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম আগে উল্লেখ করেছি। বাঙালী কোষকার মহেশ্বর বৈজ্ঞ ১১১১ খৃঃ বিষ্ণুপ্রকাশ রচনা করেন। এর পর মেদিনীকোষ। এই কোষটি রচিত হয় ১২০০-১৪৩১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। এই গ্রন্থের রচয়িতা মেদিনীকর। ইনি দ্বাদশ শতকের শেষ পাদে বর্তমান ছিলেন বলে অনুমিত হয়। মহামাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় শিখরভূমির রাজা বামচন্দ্রকৃত পুঁথিখানি হতে আবিষ্কার করেন যে প্রাণকর নামক জটনক রাজা কর্ণগড় প্রদেশে রাজত্ব করতেন। তাঁর পুত্র মেদিনীকর কর্তৃক মেদিনীপুর নগর প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মেদিনীকরই মেদিনীকোষের রচয়িতা। মেদিনীকোষেই ইনি নিজ পিতার নাম উল্লেখ করেন। (১৮৬১ খৃঃ সোমনাথ মুখোপাধ্যায় মেদিনীকোষ সম্পাদনা করেন। মেদিনীকোষ সম্বন্ধে পরে আলোচিত হবে)। পুরুষোত্তমদেব, যার সম্বন্ধে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি বঙ্গদেশীয় কোন রাজা বা মহারাজা ছিলেন—সম্ভবতঃ ১২শ-১৩শ খৃষ্টাব্দে। ইনিও বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। বাঙালী এর পরে আরও অনেক অমরকোষের টাকা রচনা করেন। যেমন অমরকোষ টাকা—নয়নানন্দ শর্মা ও তৎছাত্র রামচন্দ্র শর্মা। পলার্থকৌমুদী—নারায়ণ চন্দ্রবর্তী, ত্রিকাণ্ডবিবেক—রামনাথ বিজ্ঞাবাচস্পতি, অমরকোষ টাকা—রমানাথ চক্রবর্তী, ত্রিকাণ্ডচিন্তামণি—রঘুনাথ চক্রবর্তী, রামলিঙ্গ কৌমুদী—রামকৃষ্ণ, মালাখ্যা—পরমানন্দ শর্মা ইত্যাদি। এগুলি সবই বঙ্গাকরে মুদ্রিত।

পুরুষোত্তমদেবের অভিধান প্রায় ৮০০ বছর আগেকার লেখা। এর পর এদেশের ইতিহাসে অনেক ওলোট-পালোট হয়েছে। এখন

আর কেউই অভিধান মুখস্থ করে না; অকারাদি বর্ণক্রমে শব্দমালা সাজিয়ে অভিধান সঙ্কলন করা হয়। কিন্তু ঊনবিংশ শতকের আগে শব্দগুলিকে বর্ণমালা অনুসারে সাজাবার নিয়ম প্রচলিত ছিল না। ইংরেজরাই এই প্রথাটির প্রবর্তক বলে আমাদের মনে হয়। কারণ ১৮০৭ খৃঃ কোলব্রুক সাহেব (H. T. Colebrooke, ১৭৬৫-১৮৩৭) ‘অমরকোষ’কে সুসজ্জিত করে সম্পাদন করেন। তাতে তিনি পরিশিষ্টে বর্ণমালা অনুসারে অমরকোষের শব্দগুলি সাজিয়ে দেন। ইংরেজ যুগের আদিপর্বে কোলব্রুক সাহেবের অভিধান সম্পাদনের প্রীতি জন্মাল কেন? তিনি ১৮৮২-৮৩ খৃষ্টাব্দে ভারতে ত্রিহত পূর্ণিয়ার এসিষ্ট্যান্ট কালেক্টর হয়ে আসেন। তরুণ বালক বললেই হয়, ১৭ বছর বয়স তখনও হয়নি—তিনি আকৃষ্ট হলেন সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি।

সংস্কৃত শাস্ত্র ভালতালেই শিখলেন, হিন্দুর আটন সম্বন্ধে, হিন্দু বিশ্ববাদের কর্তব্য সম্বন্ধে, জাতি, শ্রেণী সম্বন্ধে বই লিখলেন। এর পর তিনি সদর আদালতের জজ হন। পরে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের আইন ও সংস্কৃতের অধ্যাপক হন। এসিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গলের সভাপতি হন (১৮০৭—১৮১৪)। এই সময় কয়েকখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন—তার সঙ্গে সম্পাদনা করেন অমরকোষ। তার (৩য় সং নামপত্রে এইরূপ লেখা আছে—Kosha. or. Dictionary. of the. Sanskrit Language. by. Umura Singha. with an English Interpretation and Annotations. by. H. T. Colebrooke, Esq. Calcutta. Dec. 1883 কোলব্রুক একাধারে হলে পাড়ালেন—গণিতজ্ঞ, জ্যোতির্বিদ, সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। তিনি গ্রন্থ আর প্রবন্ধ রচনা করলেন—বেদ সম্বন্ধে, সংস্কৃত অভিধান, ব্যাকরণ, জৈন ধর্ম, আইন, হিন্দুধর্ম, ভারতীয় বীজগণিত, উদ্ভিদতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি। তাই অধ্যাপক গোষ্ঠীকর একে Prince of Orientalists (প্রাচ্যবিজ্ঞাবাদের অধিরাজ) বলেছেন।

অমরকোষের সঙ্গে সঙ্গে বাঙলা অভিধানিকদের কাছে তিনি হয়ে রইলেন অমর।

প্রায় এই সময় থেকেই বাংলা ভাষার অভিধানের আবির্ভাব হয়। ইংরেজদের অনুকরণে বাংলা অভিধানের অ-কারাদিক্রমে সাজানর রীতি এই সময় থেকেই দেখা যায়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্ব কয়েকটি বাংলা ইংরেজি অভিধান তৈরী হয়। সেগুলি দৌলতাবাদ ইংরেজদের লেখা। পটুগীজেরাও তাদের স্ববিধার জন্য অভিধান তৈরী করেছিলেন। তখনকার বাংলা অভিধান মানেই মূলগত সংস্কৃত অভিধান—কারণ শব্দগুলির মধ্যে ১০ ভাগ-সংস্কৃত শব্দ ও ৬ ভাগ বাংলা অথবা অল্প শব্দ থাকত। [ক্রমশঃ।

আসিছে সেদিন, আসিছে সেদিন,

চারি মহাদেশ মিলিবে ধবে,

যেই দিন মহামানব ধর্ম

মমুর ধর্মে বিলীন হবে।

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

আলোচনা নিফল করার আলোচনা

তরুণ চট্টোপাধ্যায়

সেই ইউরোপের কথা বলছি না, নেপোলিয়ন বিসমার্ক,

মেটর্নিক বা হিটলার 'ইউরোপ' শব্দটি বলতে যা বুঝতেন।

বিসমার্কের মতে যাদের নিজস্বের নামে যে জিনিসের দাবি করা সম্ভব নয় তাদেরই সব সময় ইউরোপের দোহাই দিয়ে সেই জিনিস দাবি করতে দেখা গিয়েছে। জার্মান ভূমি দখল করে নেপোলিয়ন বলেছিলেন, তিনি শুধু ইউরোপের সীমান্ত সম্প্রসারিত করছেন মাত্র। রুশিয়া আক্রমণ করার সময়ও তিনি ইউরোপ বক্ষা করার দায়িত্বের কথা বলে রুশিয়ার প্রাণকে গ্রান মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেন। ইউরোপের নামেই তিনি ইউরোপের অগাধ দেশ আক্রমণ করেন। নেপোলিয়নের কাছে ফ্রান্সই ছিল ইউরোপ। মেটর্নিকের ইউরোপও ছিল জার, কাইজার ও জাপসবার্গ বংশের ইউরোপীয় রাজত্ব। নেপোলিয়নের অক্ষম ইউরোপাধিক হিটলার-হিমলার-গোয়েবেলস-রোজেনবার্গ কোম্পানীও ইউরোপের দেশের পর দেশ দখল করে লক্ষ লক্ষ লোককে বন্দিশালায় জীবন্ত অবস্থায় হত্যা করেছিলেন সেই ইউরোপেরই দোহাই দিয়ে। তাঁদের চেলারা আজ সেই ইউরোপীয় ঐতিহ্য বজায় রাখবার জন্তে ইউরোপের স্বার্থের নামে ইউরোপের অংশ-বিশেষের দেশগুলিকে একত্রোত্তীর্ণ করে, 'ঐক্যবদ্ধ ইউরোপ' মার্কা ঘেরে সেই ইউরোপেরই অল্প অংশটির বিরুদ্ধে 'যুদ্ধ ঘোষা' বলে হুংকার ছাড়ছেন। সেই ইউরোপের অস্তিত্ব বজায় রাখবার জন্তেই ঠাণ্ডা লড়াই এবং সেই ঠাণ্ডা লড়াইয়েরই সম্ভাব্য পশ্চিম-জার্মানীর আদেশনাউয়ের সরকার। ঠাণ্ডা লড়াইয়েরই উত্তম জমি যদি সত্যিই ঠাণ্ডা হয়ে যায় তাহলে আদেশনাউয়ের সরকারের দেহে জমি থেকে রস পৌঁছানো থেমে যাবে। ঠাণ্ডা লড়াইকে গরম লড়াই-এ নিয়ে যাবার অগ্রবর্তী ষাঁটি হিসেবে পশ্চিম-জার্মানিতে এবং অগ্রবর্তী ষাঁটির সবচেয়ে সামনের ডগা পশ্চিম-বাল্টিক জঙ্গীবাদের গায়ে বাতে আঁচড় না লাগে এবং ঠাণ্ডা যুদ্ধ বাতে নির্বিবাদে চলতে পারে তার জন্তেই না হচ্ছে অস্ত্রহাস বা পারমাণবিক অস্ত্রপরীক্ষা বন্ধ করার চুক্তি, না হচ্ছে যুদ্ধ শেষ করার ১৪ বছর পরে জার্মানীর সঙ্গে সন্ধিচুক্তি। পশ্চিমী গোষ্ঠী পশ্চিম-জার্মানীর সঙ্গে সমস্ত ব্যাপারে একেবারে পেয়ারের বন্ধুর মত মেলামেশা করছেন কিন্তু এত গলায় গলায় ভাব হলেও তার সঙ্গে সন্ধিচুক্তি করতে তাঁরা রাজী নন। বন্ধুত্ব হয়েছে কিন্তু শত্রুতা শেষ হয়নি।

দশ বছরের ঠাণ্ডা যুদ্ধের ফলে পাঁড়িয়েছে কী?

প্রথমতঃ, ইউরোপের দেশে দেশে মারণাস্ত্রের গাদা হয়েছে পর্বত প্রমাণ এবং সেগুলোর মারণশক্তি প্রচণ্ড ও দীর্ঘকাল স্থায়ী। কথায় বলে আজ হোক আর কাল হোক, কামানোয় নিজেরাই গোলা উগরোতে আবদ্ধ করে। এমন কি, কোথাও কোন যান্ত্রিক গলদ বা ভুল কিংবা কোন উদ্ভাদ বৈজ্ঞানিকের খেয়াল বশে যদি একটা অ্যাটম বোমা বা রকেট গিয়ে পড়ে তাই থেকেই পারমাণবিক বিশ্বযুদ্ধ বেধে যেতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, ইউরোপের বিভিন্ন দেশে মার্কিন অ্যাটম বোমা ও রকেট অস্ত্রের ষাঁটি বানানোর ফলে যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্ন মীমাংসা করার দায়িত্ব সেই দেশগুলির হাত থেকে আজ আমেরিকার হাতে

চলে গিয়েছে। সুতরাং যে কোন সময়ে নিজস্বের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও তারা যুদ্ধের জালে জড়িয়ে পড়তে পারে।

তৃতীয়তঃ, মার্কিন, ব্রিটিশ ও ফরাসী সশস্ত্র বাহিনী পশ্চিম-জার্মানিতে রাখা হয়েছে বলে পূর্ব-জার্মানিতে সোভিয়েত দেশ তার সৈন্য রাখতে বাধ্য হয়েছে। এই ভাবে জার্মান ভূমিতে বিভিন্ন দেশের সশস্ত্র বাহিনীর উপস্থিতি জার্মানী ও ইউরোপে উত্তেজনা বাড়িয়ে চলেছে।

চতুর্থতঃ পশ্চিম-জার্মানীর সেই সব জঙ্গীবাদী ধনিকগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের হাতে পারমাণবিক অস্ত্র তুলে দেওয়া হচ্ছে যারা বর্তমান শতকের মধ্যে দু'টি মহাযুদ্ধ বাধিয়েছে। সেই সঙ্গে ইউরোপের ধনতান্ত্রিক দেশগুলিকে এই বলে ভাঁওতা দেওয়া হচ্ছে যে, এসব ব্যবস্থা শুধু কমিউনিস্ট দেশগুলির দিক থেকে আক্রমণের বিরুদ্ধে, বিশেষ করে তাদের 'সীমাবদ্ধ' যুদ্ধের বিরুদ্ধে। প্রথম কথা, প্রথম লক্ষ্য সনাত্তাত্ত্বিক দেশগুলি হলেও সে যুদ্ধ শেষ পর্যন্ত মহাযুদ্ধের রূপ নিতে বাধ্য। আজকের দিনে সীমাবদ্ধ যুদ্ধ বলে কিছু নেই। ইতিহাসই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, ইউরোপের দুটি মহাযুদ্ধই বেধেছিল দুটি ক্ষুদ্র ঘটনাকে উপলক্ষ করে (সার্বিয়ার সঙ্গে অস্ট্রো-হাঙ্গারীর সংঘর্ষ এবং জার্মানীর পোলাও আক্রমণ)। তবে হ্যাঁ, যে আমেরিকান কূটনৈতিক পাণ্ডারা তাঁদের রণ পরিকল্পনার প্রথম বাহুর তরোয়াল হিসাবে মার্কিন সশস্ত্র বাহিনীকে এবং ঢাল হিসাবে পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলিকে দেখেন তাঁদের কাছে ইউরোপের যুদ্ধ 'স্থানীয়' বা 'সীমাবদ্ধ' মনে হতে পারে। কিন্তু সে যুদ্ধের আশ্রয় যে ধনতন্ত্র সমাজতন্ত্র নির্বিশেষে ইউরোপের সমস্ত দেশে ছড়িয়ে পড়বে এবং মার্কিন আক্রমণের অগ্রবর্তী ষাঁটি হিসেবে অ্যাক্রান্ত পক্ষের অ্যাটম ও হাইড্রোজেন বোমা এবং রকেট যে সেই দেশগুলির মাথায় আগে পড়বে, তাতে সন্দেহ নেই।

এই বিপদ আজ এমন কি জর্জ কেনানের মত যুনো সোভিয়েত-বিরোধী মার্কিন কূটনৈতিকও উপলব্ধি করতে পারছেন। তিনি শান্তিরক্ষার যে পরিকল্পনা দেন, তাতে বলা হয়েছে, পারমাণবিক অস্ত্র আফালনের ভিত্তিতে কূটনীতি পরিচালনা বন্ধ করা দরকার; কারণ আজকের যুগের অস্ত্রশস্ত্রের মারণশক্তি এত প্রচণ্ড যে সশস্ত্র শাসনিকে রঙের টেকা হিসাবে ব্যবহার করতে যাওয়া বাতুলতা। মিঃ কেনান (যিনি মস্কোয় মার্কিন রাষ্ট্রদূত হিসাবে কাজ করার সময় গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে সোভিয়েত সরকার তাঁকে 'অবাস্তবিক ব্যক্তি' ঘোষণা করেন) বলেছেন যে, বৃহৎ শত্রুরা পশ্চিম ও পূর্ব ইউরোপ থেকে তাঁদের সৈন্য-সামন্ত ও অস্ত্রশস্ত্র সরিয়ে নিয়ে গেলে শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দুই রকম সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে প্রতিযোগিতা চলবে এবং তাতে শান্তির কোন বিষ হবে না এবং জাতিগুলিও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার বিপদ থেকে বেহাই পারে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন আজ বহু দিন বাবং ঠিক এই প্রস্তাবই করে আসছে, অস্ত্রহাসের বৈঠকে এবং জেনেভার পররাষ্ট্র সচিব-সম্মেলনেও এই প্রস্তাবই করেছে। কিন্তু সে প্রস্তাব গ্রাহ্য হয়নি।

ব্রিটিশ লেবার পার্টির নেতা হিউ গেইট, স্কসের প্রস্তাবও গঠনমূলক। তিনি পূর্ব ও পশ্চিম-জার্মানী, পোলাও, চেকোস্লোভাকিয়া

ও হাক্কারী থেকে চুক্তি করে ক্রমে ক্রমে বিদেশী সৈন্য সরিয়ে নিতে এবং ঐ সব দেশকে পারমাণবিক অস্ত্র দেওয়া বন্ধ করতে বলেছেন এবং পশ্চিম ও পূর্ব-জার্মানীর নাটো ও ওয়াশ' চুক্তি থেকে বার হয়ে এসে একতাবদ্ধ হবার প্রস্তাব করেছেন।

পশ্চিম-জার্মান প্যারলিমেন্টের সদস্য হের ফ্রেইডার (শান্তি পরিকল্পনা দেবার অপরাধে যাকে দেশ ছাড়তে বাধ্য করা হয়) যে পরিকল্পনা দেন তাতেও জার্মানী থেকে বিদেশী সৈন্যের অপসারণ, কতকগুলি সশস্ত্র পশ্চিম-জার্মানীর নাটো চুক্তি ত্যাগ এবং পশ্চিম-জার্মান বাহিনীকে পারমাণবিক অস্ত্রে সজ্জিত না করা ও বিদেশী সৈন্য অপসারণের প্রস্তাব ছিল।

ভারতে নিযুক্ত ভূতপূর্ব মার্কিন দূত মি: চেষ্টার বোলসও এই ধরনের পরিকল্পনা দিয়েছেন।

পশ্চিম-জার্মানীর সুপরিচিত ভাষ্যকার পল সেথে, কেনান, বোলস, গেইট স্কেল ও ফ্রেইডারের যুক্তিসঙ্গত পরিকল্পনার প্রশংসা করে দেখিয়েছেন যে কুটনীতির ইতিহাসে বরাবরই দেখা গিয়েছে কোন জটিল আন্তর্জাতিক সমস্যারই মীমাংসা একসঙ্গে বা রাতারাতি হয় না। শান্তিপূর্ণ আপোষ আলোচনার দ্বারা ধাপে ধাপে আংশিক ভাবে মীমাংসা হতে হতে শেষ পর্যন্ত চরম মীমাংসায় পৌঁছানো যায়।

আন্তে আন্তে সৈন্য সরানো, আংশিক ভাবে অস্ত্র হ্রাস করা, প্রথমে পারমাণবিক অস্ত্রপরীক্ষা বন্ধ করা, নাটো ও ওয়াশ' চুক্তিভুক্ত দেশগুলির মধ্যে অনাক্রমণ চুক্তি করা, সর্বপ্রথমে পশ্চিম-জার্মানীতে পারমাণবিক অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করা এবং নির্দিষ্ট এলাকাকে পারমাণবিক অস্ত্র বর্জিত অঞ্চল হিসাবে স্বীকার করে নেওয়া, এই সব সোভিয়েত প্রস্তাব সারা দুনিয়ার শান্তিরক্ষার কর্তব্যের প্রথম ধাপ মাত্র। কিন্তু পশ্চিমীরা সেই প্রথম ধাপটুকু কিছুতেই এগোতে রাজী নয়, কারণ প্রথম পা বাড়ালেই দ্বিতীয় পা-ও বাড়তে হবে। জার্মান জঙ্গীবাদ এবং পারমাণবিক অস্ত্র এই দুটিই আজ মানুষের সবচেয়ে বড় বিপদ। জার্মান জঙ্গীবাদের অগ্রবর্তী খাঁটি বা ব্রেস্তানা-ট্রেন-ব্রাণ্ডের ভাষায় Front Line City পশ্চিম-বালিনের বিধ দাঁত ভেঙ্গে দেওয়ার (নিরস্ত্রীকৃত মুক্ত নগরী ঘোষণা করা) কতব্যটি তাই আজ প্রথম পালনীয়। পারমাণবিক অস্ত্রের সমস্ত মীমাংসা করার প্রথম ধাপ হচ্ছে ঐ সব অস্ত্রের পরীক্ষা বন্ধ করা এবং অত্যন্ত আক্রমণ প্রতিরোধ করা, এই দুটি ব্যাপার নিয়েই জেনেভায় হুটি আলাদা সম্মেলন বসে।

প্রথমে ধরা যাক পারমাণবিক অস্ত্রের প্রশ্ন। সমস্তাটির মীমাংসা যে সোভিয়েত ইউনিয়ন সত্যিই চায়, তার প্রমাণ দেবার জন্তে সে একাই পারমাণবিক অস্ত্রপরীক্ষা বন্ধ করে সারা দুনিয়ার সামনে এক দৃষ্টান্ত রাখে। কিন্তু সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা দূরে থাক, আমেরিকা প্রশান্ত মহাসাগরে তার পরে আরো বেশী করে পরীক্ষা চালাতে আরম্ভ করে এবং বুটেনও বাদ যায়নি। সেই সঙ্গে চলতে থাকে সোভিয়েত সীমান্তের চার দিকে আমেরিকার যে সব বিদেশী খাঁটি আছে সেগুলিতে অ্যাটম ও হাইড্রোজেন বোমাবাহী বিমানের মহড়া এবং পশ্চিম জার্মানীর পারমাণবিক অস্ত্রসজ্জা। এই অবস্থার সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে একা অস্ত্রপরীক্ষা বন্ধ রাখা আর সম্ভব ছিল না; কারণ তা রাখলে পশ্চিমীরা ঐ সব অস্ত্রপরীক্ষার সোভিয়েতের চেয়ে এগিয়ে বাবে এবং এগিয়ে গেলেই সোভিয়েতকে আক্রমণ করবার চেষ্টা করবে।

যার ফলে বেধে যাবে মতামত। সন্তরাং সোভিয়েতের একা পরীক্ষা বন্ধ রাখা শুধু যে তার পক্ষে বিপজ্জনক তা নয়, সারা দুনিয়ার পক্ষে বিপজ্জনক। বিশ্বশান্তি একপক্ষীয় চেষ্টার ওপর নির্ভর করে না। কারণ 'শান্তি অবিরাজ্য' রাজ্যজী যখন মি: ক্রুশ্চফকে একাই অস্ত্রপরীক্ষা বন্ধ করার উপদেশ দেন তখন মি: ক্রুশ্চফ ঠিক এই কথাটাই তাঁকে জানিয়েছিলেন।

পারমাণবিক অস্ত্রপরীক্ষা বন্ধ করার অজুহাত পশ্চিমীরা দেবার চেষ্টা করেন নানা ছলে। প্রথমে তাঁরা বলেন, সোভিয়েতের একা বন্ধ করাটা প্রচারের খেলার একটা চাল মাত্র। জবাবে বলা যায়, বেশ তো তাই যদি হয় তো সেই প্রচারের ব্যাপারে সোভিয়েতের সঙ্গে তাঁদের পাল্লা দিতে আপত্তি কেন? তাঁরা নিজেরদের "মুক্ত গণতন্ত্রের" কথা ঢাক পিটিয়ে প্রচার করেন, সোভিয়েতের "অমানুষিক" শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এত প্রচার করেন কিন্তু পারমাণবিক অস্ত্রপরীক্ষা বন্ধ করে নিজেরদের মানব হিতৈষণা প্রচার করতে তাঁদের বাধলো কেন? এই প্রচারকার্য করলে পৃথিবীর মানুষ তেজস্ক্রিয়তার বিপদ থেকে অন্তত কিছুদিনের মত রেহাই পেতে পারত। তাতে বখন তাঁরা রাজী নন, তখন মনে হয় পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারই তাঁদের সামরিক পরিকল্পনার মেরুদণ্ড।

আর একটি অজুহাত দেওয়া হোল যে, একপক্ষীয় কাজের কোন অর্থ হয় না। কারণ সেটা আন্তর্জাতিক চুক্তির দ্বারা করা হয়নি। তাছাড়া সত্যিই পরীক্ষা বন্ধ হোল কি না তা যাচাই করবার কোন উপায় নেই। এই অজুহাত ধোঁপে ঢেকে না, কারণ আমেরিকা ও বুটেন যদি নিজেরা একপক্ষীয় ভাবে পরীক্ষা বন্ধ করত, তাহলে তিন পক্ষ মিলে চুক্তি করার পথে কোন বাধাই হোত না। আর পরীক্ষা ধরা পড়ার প্রশ্নে এইটুকু বললেই যথেষ্ট যে, যে কোন পরীক্ষা আজকাল বন্ধে ধরা পড়ে। পরীক্ষা বন্ধ আছে কি না সেদিকে লক্ষ্য রাখবার জন্তে ১১৫৭ সালের জুন মাসেই তো কনট্রোল কমিশন গঠন এক সোভিয়েত, আমেরিকায়, বুটেনে এবং প্রশান্ত মহাসাগরে কতকগুলি চৌকিদার-কাঁড়ি তৈরী করার প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু সেই প্রস্তাব সেদিন ধারা গ্রাহ্য করেন নি আজ ঠিক তাঁরাই বলছেন যে একা পরীক্ষা বন্ধ করা কনট্রোল এড়িয়ে বাবার একটা কৌশল মাত্র।

এই মিথ্যেও জাহির করা হয়েছিল যে, সোভিয়েত আমেরিকার চেয়ে বেশি বার পরীক্ষা চালিয়েছে বলে সামরিক ভাবে পরীক্ষা বন্ধ রাখলে তাই কোন অসুবিধা নেই। পরে জানা গেল যে, আমেরিকা ও বুটেনের পরীক্ষাগুলি এক সঙ্গে যোগ করলে যে সংখ্যা পাড়ায় সোভিয়েতের পরীক্ষার সংখ্যা ছিল তার চেয়ে বেশ কিছু কম। অর্থাৎ পরীক্ষার সংখ্যার দিক থেকে পশ্চিমের চেয়ে পেছিয়ে থেকেও সে নিজের সদিচ্ছার পরিচয় দেবার জন্তে একাই পরীক্ষা বন্ধ করেছিল।

শেষ পর্যন্ত জেনেভায় পারমাণবিক অস্ত্রপরীক্ষা বন্ধ করার ঐক্য আৱস্ত হবার পর প্রায় ৬ মাস কেটে গেল। ৬-৭-৬৭ বার প্রতিনিধিরা এক টেবিলে বসে আলোচনা করলেন। কিন্তু কোন চুক্তিই আজ পর্যন্ত হোল না। সোভিয়েত পক্ষ প্রথমেই যে খসড়া চুক্তি দাখিল করে, তাতে পরীক্ষা বন্ধ করা এবং সর্ববাদিসম্মতিক্রমে নির্দিষ্ট সংখ্যক চৌকিদার-কাঁড়ির সাহায্যে পারমাণবিক শক্তির অধিকারী দেশগুলিতে কন্ট্রোল ব্যবস্থা প্রবর্তন করার প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু তিন সপ্তাহ ধরে পশ্চিমীরা এই বলে টাঙ্গাবাহানা করতে লাগলেন যে, অস্ত্রপরীক্ষা

বন্ধ করা বৈঠকের উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য হচ্ছে কন্ট্রোল ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা। ব্যাপারটা বোড়ার সামনে গাড়ী জুতে দেওয়ার মত। কারণ, পরীক্ষাই যদি বন্ধ করা না হয় তো কন্ট্রোল করা হবে কী? যাই হোক, শেষ পর্যন্ত যখন তাঁদের বাধ্য হয়ে মেনে নিতে হোল যে বৈঠক বসেছে আসলে অন্ত্রপরীক্ষা বন্ধ করার জন্তে, তখন তাঁরা অজুহাত দিলেন যে সোভিয়েত প্রস্তাবে কার্যকরী কন্ট্রোল ব্যবস্থার ভাল গ্যারান্টি নেই। সুতরাং কন্ট্রোল ব্যবস্থার সর্বশুলি ঠিক করে সেগুলি অন্ত্রপরীক্ষা বন্ধের চুক্তির মধ্যেই লিখতে হবে, না হয় আলাদা একটা ক্রোড়পত্র হিসাবে জুড়ে দিতে হবে। সোভিয়েত যখন ক্রোড়পত্রের প্রস্তাব মেনে নিল তখন পশ্চিমীরা নিজেদের কথা উড়িয়ে দিয়ে জিদ ধরলেন যে ক্রোড়পত্র নয়, চুক্তির মধ্যেই কন্ট্রোল ব্যবস্থাকে স্থান দিতে হবে। সোভিয়েত যখন তা-ও মেনে নিল তখন মার্কিন সরকার আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন। শেষ পর্যন্ত নতুন এক যুক্তি বার হোল। তাঁরা বললেন, মাটির নিচে পারমাণবিক বিস্ফোরণ সহজে ধরার উপায় নেই, বিশেষ করে সেগুলি যদি ছোট ধরনের হয়। সুতরাং মাটির নিচে ২০ কিলোটন পর্যন্ত ক্ষমতার বিস্ফোরণ চুক্তির আওতায় পড়া উচিত নয় অর্থাৎ হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে যে মাপের বোমা পড়েছিল সেই মাপ পর্যন্ত পরীক্ষা করা চলবে নির্বিবাদে।

এই সঙ্গে মিঃ আইসেনহাওয়ার ঘোষণা করলেন যে, অন্ত্রপরীক্ষা বন্ধ করার আগে বিশেষজ্ঞরা একসঙ্গে বসে ঠিক করুন কন্ট্রোল ব্যবস্থা কি রকম হওয়া উচিত। অর্থাৎ অন্ত্রপরীক্ষা চলতে থাকুক, সেই সঙ্গে চলতে থাকুক কন্ট্রোল ব্যবস্থার কচকচানি। কন্ট্রোল নিয়ে মাতামাতির আসল উদ্দেশ্য বুঝে সোভিয়েত মার্কিন রাষ্ট্রপতির বিশেষজ্ঞ বৈঠকের প্রস্তাব মেনে নিল। সোভিয়েতের এই মনোভাবের প্রশংসা করে নিউইয়র্ক টাইমস-এর ওয়াশিংটন সংবাদদাতা কেনওয়ার্থ লিখলেন যে, এবার আমেরিকা ও তার মিত্ররাষ্ট্রগুলির জায্যতই অন্ত্রপরীক্ষা বন্ধ করার আলোচনার বস উচিত।

সোভিয়েত যখন বিশেষজ্ঞ বৈঠকের প্রস্তাব মেনে নিল তখন পশ্চিমীরা আর একটি সর্ব অর্থাৎ বাধা খাড়া করলেন। তাঁরা বললেন যে, সামরিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার্য কোন পারমাণবিক যন্ত্র পদার্থ উৎপাদন না করার প্রতিশ্রুতি দিলে তবেই অন্ত্রপরীক্ষা বন্ধ করার কথা উঠতে পারে।

সোজা কথায় পশ্চিমীরা প্রশ্নটি এমন আর একটি সমস্যার সঙ্গে গেয়ে বেঁধে দিলেন, যেটি সহজে মেটবার নয়। কায়দা কিছু নতুন নয়। জেনেভার পররাষ্ট্র সচিব-সম্মেলনেও একগাদা সমস্যার বাণ্ডুল তাঁরা হাজির করেছিলেন, যাতে কোনটিরই মীমাংসা করা না যায়। সেই সঙ্গে কন্ট্রোলের প্রশ্ন নিয়ে হৈ-চৈ চলতে লাগল। মাটির নিচে ছোট ধরনের বিস্ফোরণ ধরা না পড়ার অজুহাত নিয়ে মার্কিন খবরের কাগজগুলো বলতে লাগলো, ঐ-সব বিস্ফোরণ ধরা না গেলে পরীক্ষা বন্ধ করার চুক্তির কোন পথ হয় না। প্রথম কথা, মার্কিন পরমাণু বৈজ্ঞানিক ডাঃ হাল বেথে বলছেন যে, ১৮০টি কন্ট্রোল-কাঁড়ি নিয়ে যে কন্ট্রোল ব্যবস্থা খাড়া করার কথা বলা হয়েছে, তাতে ভূগর্ভের অন্ত্রপরীক্ষাও ধরা পড়বে। দ্বিতীয়ত, ধরা যদি না-ও পড়ে তাহলে মাটির নিচে পরীক্ষা চালাবার স্বযোগ তো আমেরিকারও আছে। তবে চুক্তি না করার কারণ কী? কারণটা মার্কিন পারমাণবিক শক্তি

কমিশনের চেয়ারম্যানের মুখেই শুধু। তিনি গত ২১শে জানুয়ারী বলেন:—“জেনেভার চুক্তি হোক বা না হোক, আমেরিকা তার ‘শান্তিপূর্ণ’ পারমাণবিক অন্ত্রপরীক্ষা চালিয়ে যাবে।”

সেনেটের গোর বলেন যে, “প্রস্তাব মত এশিয়ায় ৩৭টি কন্ট্রোল-কাঁড়ি হবার কথা। প্রত্যেক কাঁড়িতে যদি ১০০ জন করে কন্ট্রোলী থাকে, তাহলে সেই ৩৭০০ লোকের সেই বিরাট অঞ্চলের যে কোন জায়গার যাবার ও তদন্ত করার অধিকার থাকা চাই। সেই অঞ্চলের মধ্যে চীনও থাকবে। আমেরিকা চীনকে স্বীকার করে না বলে অন্ত্রপরীক্ষা বন্ধ করা সম্পর্কে সে চীনের সঙ্গে কোন রকম চুক্তি করতে রাজী নয়, একথা বললেই ত সে অন্ত্রপরীক্ষা বন্ধ করার চুক্তি এড়িয়ে যেতে পারে।”

এই চুক্তি এড়িয়ে যাবার জন্তেই মিঃ হারল্ড ঠাসেনকে পারমাণবিক অন্ত্র সম্পর্কিত আলোচনা থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়। কারণ তাঁর আলোচনার বোগ দেবার ফলে উভয় পক্ষের মত অনেকটা কাছাকাছি এসেছিল।

আলোচনা যাতে নিষ্ফল হয়, সেজন্ত পশ্চিমীরা অন্ত্রপরীক্ষা বন্ধ করার প্রশ্নটি থামা চাপা দিয়ে কন্ট্রোলের প্রশ্নটি সামনে তুলে ধরে যখন দেখলেন যে তাতেও বিশেষ সুবিধা হচ্ছে না, তখন কন্ট্রোলের ব্যাপারটা এমন ভাবে দাঁড় করালেন, যাতে নিজের সার্বভৌম অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে কোন দেশ সেই ধরনের কন্ট্রোল মেনে নিতে পারে না। পশ্চিমীরা প্রস্তাব করলেন যে, কন্ট্রোল কমিশনে সাত জন সদস্য থাকবে। তাদের তিন জন স্থায়ী সদস্য হবে মার্কিন, ব্রিটিশ ও ফ্রান্স। বাকি চার জন অস্থায়ী সদস্য চুক্তিকারীরা নির্বাচন করে নেবে। সেই সাত জন সদস্যের সাধারণ ভোটভূঁটির দ্বারা প্রত্যেকটি কাজের ব্যবস্থা হবে। এই চতুর প্রস্তাবের আসল মানে হচ্ছে, চুক্তিকারী তিনটি প্রধান রাষ্ট্রের মতৈক্যের অর্থাৎ সমতার ভিত্তিতে কাজ হবে না এবং সোভিয়েতের একটি ভোটের বিরুদ্ধে ইঙ্গ-মার্কিনদের দু’টি ভোট সব ব্যাপারেই জিতবে এমন কি অস্থায়ী সদস্য নির্বাচন করার বেলাতেও। এই মতলব বুঝে সোভিয়েত চুক্তির চেষ্টা যাতে সফল হয় সেজন্ত বললেন যে, কন্ট্রোলের সবচেয়ে প্রধান বিষয়গুলিতে ত্রি-শক্তির মতৈক্যের ভিত্তিতে কাজ করার প্রস্তাব যদি মেনে নেওয়া হয় তাহলে অন্ত্র ব্যাপারে পশ্চিমীদের প্রস্তাব মানতে সে রাজী আছে। পশ্চিমীরা তাতে রাজী না হয়ে বুঝিয়ে দিলেন কন্ট্রোল কমিশনে সোভিয়েতকে কোণঠাসা করার স্বযোগ পেলে তবেই তাঁরা চুক্তি করবেন, নাহলে নয়।

কন্ট্রোল-কাঁড়িতে কারা কাজ করবে? এই প্রশ্ন সম্পর্কে সোভিয়েত প্রস্তাব করলে যে, প্রত্যেকটি কাঁড়ির রূপ হবে আন্তর্জাতিক অর্থাৎ যে দেশে কাঁড়ি থাকবে সেই দেশের এবং চুক্তিকারী অন্ত্র দেশ দুটির থেকে করেকজন করে অভিজ্ঞ লোক নিয়ে প্রত্যেকটি কাঁড়ির কর্মিদল গঠিত হবে। আমেরিকার দাবি হোল যে তা হবে না। কারণ, সোভিয়েত দেশের কাঁড়িতে যদি সোভিয়েত কর্মী থাকে তারা ঠিক মত তদন্ত না-ও করতে পারে। সেই জন্তে সোভিয়েত দেশের কাঁড়িগুলিতে যে সব কর্মী থাকবে তারা হবে অন্ত্র দেশের লোক এবং তাদের বেখানে খুসি যাবার অবাধ স্বাধীনতা থাকবে। সোজা কথায় সেই কাঁড়িগুলিতে নাটোপোষ্টার কিছু দালাল ভর্তি করে সোভিয়েত দেশ সম্পর্কে সমস্ত রকমের গোপনীয় তথ্য সংগ্রহ

করা। এই হচ্ছে আমেরিকার উদ্দেশ্য। সুতরাং এই রকম প্রস্তাব সোভিয়েতের পক্ষে মান্য সম্ভব নয়। এইখানেই শেষ নয়। সোভিয়েতের মতে কন্টোল কমিশনের অধীনে যে তদন্তকারী দলগুলি থাকবে, সেগুলির মধ্যেও তিনটি দেশেরই লোক থাকা চাই এবং কমিশনের স্থায়ী সদস্য তিন জন একমত হলে তবে সেই দলগুলিকে কোন কিছু তদন্ত করতে পাঠান চলবে অর্থাৎ তদন্তকারী দলগুলিকে কন্টোল কমিশনের অধীনে কাজ করতে হবে এবং কন্টোল কমিশন ত্রিশক্তির একমতের ভিত্তিতে কাজ করবে। তা ছাড়া তদন্তকারী দলগুলিকে পাকাপাকি ভাবে মোতামেন রাখার দরকার নেই। দরকার পড়লে সেগুলি গঠন করা হবে। আমেরিকা তাতে রাজী নয়। তার মতে প্রথমত তদন্তকারী দলগুলি বরাবরের মত জেঁকে বসবে এবং কন্টোল কমিশনের হুকুম মত তারা চলবে না। যে দেশে যে দল থাকবে, সেই দেশের কোন লোক সেই দলে থাকতে পারবে না। একজন পরিচালক নিযুক্ত করা হবে, ধীরে হুকুম মত দলগুলি যে কোন জায়গায় তদন্ত করতে যাবে। এমন কি, পারমাণবিক বিক্ষোভ ঘটছে এমন সন্দেহ না হলেও। অর্থাৎ কমিশনের মধ্যে ইঙ্গ-মার্কিনরা দলে ভারী থাকবে এবং তার দক্ষণ তারা যে সব লোককে পরিচালক নিযুক্ত করবে সাধারণ ভোটের দ্বারা তারা তাদেরই তাঁবেদার। সেই তাঁবেদারের দল সোভিয়েত দেশের কন্টোল-কাঁড়িতে বসে রুশবিবর্তিত তদন্তকারী দলকে দিয়ে যেখানে খুসি এবং যা খুসি পরীক্ষা করা হবে এবং সত্যি মিথ্যে যা খুসি বিবৃতি দেবে। কিন্তু আমেরিকা বা বুটনের বেলায় তারা মুখ খুলবে না। এই হচ্ছে পশ্চিমীদের কনট্রোল প্রস্তাবের স্বরূপ। এই প্রস্তাব সোভিয়েত মেনে নেবে না, নিতে পারে না। সুতরাং পশ্চিমীরা আওয়াজ তুলবে আমরা তো চুক্তি করতে চেয়েছিলাম কিন্তু সোভিয়েত তার বেয়াড়া গোঁ কিছুতেই ছাড়তে রাজী নয়। আলোচনা সফল না হওয়ার জন্তে সোভিয়েতই দায়ী।

নিরস্ত্রীকরণের অন্ত্যান্ত বিষয়গুলির দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, সৈন্যবাহিনী ও অন্ত্রশস্ত্র হ্রাস ইত্যাদির ব্যাপারেও পশ্চিমীরা একই মনোভাবের পরিচয় দিয়ে আসছে আজ ১৩ বছর ধরে। সম্মিলিত জাতিসংঘের নিরস্ত্রীকরণ কমিশন এবং কমিশনের অধীন সাব কমিটিগুলি যুদ্ধ শেষ হবার পর ১৩ বছরে নিরস্ত্রীকরণ সমস্তার মীমাংসার দিকে এক পা এগোন তো দূরের কথা বরং পদে পদে বাধা সৃষ্টি করেছে। নিরস্ত্রীকরণ কমিশনের ভাঁওতাবাজী করা ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য নেই, এটা বুঝতে পেরে সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন সেই কমিশন থেকে বার হয়ে আসে তখন পশ্চিমী মহলে সোরগোল ওঠে যে সোভিয়েত আসলে নিরস্ত্রীকরণ চায় না, তাই সে সম্পর্কে বাতে কোন চুক্তি হতে না পারে সেজন্তে সে কমিশন থেকে বার হয়ে গেল। বারায় অন্ত্র ত্যাগের চেয়ে অন্ত্র গ্রহণ বেশি পছন্দ করে, বারায় মানুষ মারার অন্ত্র উৎপাদন করে ও বিক্রী করে কোটি কোটি টাকা কামায়, তারা সেই সোভিয়েতের ঘাড়ের সমস্ত দোব চাপালে যে সোভিয়েত অপেক্ষাকৃত অন্ত্রসংখ্যক পারমাণবিক পরীক্ষা চালিয়েও একাই পরীক্ষা বন্ধ করেছিল যে তার সমস্ত বাহিনী থেকে করেক লক্ষ সৈন্য কমিয়ে দিয়ে নিজেই হাজারী, কমানিয়া, পূর্ব-জার্মানী ইত্যাদি দেশ থেকে ক্রমশই কিছু কিছু করে সৈন্য দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। নিরস্ত্রীকরণ কমিশনে নাটো এবং অন্ত্যান্ত সাময়িক জোটের দেশগুলিরই প্রাধান্য। শতকরা ৫০ জন সদস্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি থেকে নেওয়া হোক,

এ্যালবেনিয়ার এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করা হয়। সোভিয়েত কমিশন থেকে বার হয়ে গেল বলে ধারা হা-হুতাশ করছেন তাঁদের জিগ্যাস করা যায় :—

প্রথমত তাঁরা যদি সত্যিই অন্ত্রহ্রাস কামনা করেন তাহলে পারমাণবিক অন্ত্রপরীক্ষা বন্ধ করার প্রস্তাব কেন তাঁরা মানলেন না? তবে কি কমিশনের বাইরে তাঁরা চুক্তি করতে নারাজ এবং সোভিয়েত কমিশনের ভিতরে থাকলে তাঁরা চুক্তি করতেন? হয়ত বা তাঁরা 'অবজারভার' পত্রিকার মতই ভেবেছেন যে 'দুনিয়া এখনই তো বিপজ্জনক অবস্থায় এসে পড়েছে। কিন্তু বুটন ক্রান্ত এবং আরো গোটা পাঁচ-ছয় দেশের হাতে যখন অ্যাটম বোমা আসবে তখনকার বিপদের তুলনায় এখনকার বিপদ সামান্য?' মিঃ ডালসের ঘোষণা থেকেই আসল কথা জানা যাবে। তিনি কিছু দিন আগে বলেন যে বিশেষজ্ঞদের বৈঠকে ফলে সারা পৃথিবীর সব জায়গায় অন্ত্রপরীক্ষা বন্ধ হবে এমন কোন কথা নেই এবং বৈঠকের সাফল্য পশ্চিমী শক্তির পরীক্ষা বন্ধ করতে বাধ্য করতে পারে না। নিউ ইয়র্ক টাইমস পত্রিকা মন্তব্য করে : "আইসেনহাওয়ার ও ডালস মন্তব্যকে যুখে এবং লিখে জানিয়েছেন যে জেনেভার বিশেষজ্ঞ বৈঠকে (যে বৈঠক তাঁরাই ডেকেছেন) পশ্চিমী শক্তির ষোগ দিচ্ছেন বলেই যে আমেরিকা-অ্যাটম ও হাইড্রোজেন বোমা পরীক্ষা নিষিদ্ধ করার চুক্তি করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, তা নয়।"

দ্বিতীয়ত পারমাণবিক অন্ত্র ব্যবহার করার উদ্দেশ্য ধাঁদের নেই তাঁরা নিশ্চয়ই অত্যন্ত আক্রমণ প্রতিরোধ করার ব্যাপারে চুক্তি করতে নারাজ হবেন না। সেই রকম একটা চুক্তি করার জন্তে জেনেভা সহরেই নভেম্বর ও ডিসেম্বরে দেড় মাস ধরে নাটো ও ওয়াশ চুক্তির দেশগুলির আলোচনা চলে। তারপর পশ্চিমীরা বৈঠক ভেঙ্গে দেন। অত্যন্ত আক্রমণের সম্ভাবনা প্রতিরোধ করার প্রস্তাব সোভিয়েতের দিক থেকেই আসে। কারণ সে দেখলে যে পশ্চিমীরা অন্ত্র হ্রাস বা পারমাণবিক অন্ত্র নিষিদ্ধ করতে রাজী নয়। উটে অ্যাটম-বোমা-বোঝাই মার্কিন বিমান বিভিন্ন দেশের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে বেড়ায়। সোভিয়েত পক্ষ থেকে বলা হোল যে, এই ধরনের ওড়া সবচেয়ে আগে বন্ধ করা দরকার। পশ্চিমীরা তা মানতে রাজী হলেন না। সোভিয়েত প্রস্তাব করলে যে নাটো ও ওয়াশ চুক্তির সৈন্যবাহিনী যেখানে যুখোযুখী দাঁড়িয়ে সেখানে পূর্ব ও পশ্চিমে ৮০০ কিলোমিটার পর্যন্ত জায়গা হাওয়াই-ফটোগ্রাফি করে বড় বড় রেলকেন্দ্র, বন্দর ও সড়কে কনট্রোল-কাঁড়ি বসিয়ে, কোথাও হাতে আক্রমণের তোড়জোড় হতে না পারে সেদিকে সজাগ থেকে সেই সঙ্গে বিপজ্জনক এলাকাগুলিতে বেশি অন্ত্রশস্ত্র ও সৈন্যসামগ্রী জমা হতে না দিলে, সেই জায়গাগুলিকে পারমাণবিক অন্ত্রমুক্ত এলাকা হিসেবে মেনে নিলে এবং ইউরোপের সমস্ত দেশ থেকে বিদেশী সৈন্যের অন্ত্রত এক-তৃতীয়াংশ সরিয়ে নিলে অত্যন্ত আক্রমণের সম্ভাবনা বেশ কিছুটা কমে যায়। কিন্তু পশ্চিমীরা এর একটাতেও রাজী হননি। তাঁরা এই সব বাস্তব কর্তব্য এড়িয়ে কনট্রোলের পদ্ধতি নিয়ে কথার তুবড়ী ফোটাতে লাগলেন। কনট্রোল ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁদের আসল মতলবটা যে সোভিয়েতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার তথ্য সংগ্রহ করা, সে কথা আগেই বলেছি। সোভিয়েত আন্তর্জাতিকীয় রকেট নিয়ন্ত্রণ করার দিকেই তাঁদের ঝোঁক দেখা গেল সবচেয়ে বেশি। যদিও যে পারমাণবিক

অস্ত্রটির (war-head) দৌলতে রকেটের মারণশক্তি সেই অস্ত্রটি সম্পর্কে বিহিত করতে তাঁরা রাজী হলেন না।

কনট্রোল বলতে মার্কিন নেতারা কী বোঝেন, সে সম্পর্কে মার্কিন প্রতিনিধি দলের নেতা মিঃ ফষ্টার বেশ খোলসা করেই বলেছেন ; কন্ট্রোল ও তদন্তের মধ্যে দিয়ে প্রতিপক্ষের সামরিক ক্ষমতার খুঁটিনাটি তথ্য জোগাড় করতে পারলে সেই সব তথ্যের ভিত্তিতে প্রচণ্ড পান্টা আঘাত হানার জন্তে আমরা তৈরি হতে পারব। সেই আঘাতের ভয়ে কেউ আর যুদ্ধ করতে সাহস পাবে না বলে শান্তি বজায় থাকবে।

মন্তব্য নিম্নয়োজন ! মিঃ ফষ্টার 'ডেট্রয়েট এডিসন' পারমাণবিক অস্ত্রোৎপাদন প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ। মার্কিন পত্রিকা 'টাইমস' এর মতে পারমাণবিক অস্ত্রপরীক্ষা ও ব্যবহার বন্ধ হলে যে সব কোম্পানী এই সব অস্ত্র তৈরি করার বায়না পেয়েছে তারা মার খাবে বলে 'পেন্টাগন' বা মার্কিন সমর দপ্তর পরীক্ষা বন্ধের বিরুদ্ধে। ব্রিটিশ পত্রিকা 'ইকনমিস্ট' বলেছেন যে পেন্টাগনের হর্তাকর্তাদের পারমাণবিক অস্ত্রোৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। প্রমাণ হিসাবে ফষ্টার এবং মার্কিন পরমাণু শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান জন ম্যাকোনের নাম করা যেতে পারে। শুধু এঁরাই নয়। 'ষ্টোন উইকলি' পত্রিকায় কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ওরিয়ান লিখছেন যে বহু মার্কিন সেনাপতিরও পারমাণবিক অস্ত্রের সঙ্গে মধ্যে ব্যবসায়িক স্বার্থ আছে ; যেমন সতকারী দেশরক্ষা সচিব জেনারেল লোপার এবং পরমাণু কমিশনের সামরিক প্রয়োগ বিভাগে অধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ষ্টার্বার্ড। জেনারেল ম্যাক-ওয়েল টেলার, অ্যাডমিরাল বার্ক ইত্যাদি।

এই সব দেখে-শুনে আজ আবার 'লীগ অফ নেশন্সের' কথাই মনে পড়ে। চোখের সামনে আমরা ইতিহাসের এক মারাত্মক পুনরাবৃত্তি দেখতে পাচ্ছি। 'লীগ অফ নেশন্স'-এ সোভিয়েতের নিরস্ত্রীকরণের সমস্ত রকমের প্রস্তাব নিরর্থক বাস্তবিত্বগুণের সমুদ্রে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং আসল সমস্যা এড়িয়ে সমস্ত আলোচনাকে আজ্ঞবাজে ছোটখাটো দিকে, পদ্ধতিমূলক প্রশ্নের দিকে পরিচালিত করা হয়েছিল। আজ যেমন অস্ত্রহাস, পারমাণবিক অস্ত্রপরীক্ষা

বন্ধ করা ইত্যাদি জরুরী প্রশ্ন নানা 'হল ও অছিলায় এড়িয়ে গিয়ে কনট্রোল ও চৌকিদারী, চুক্তির ও পদ্ধতি নিয়ে তর্কের ঝুড়ি পরিবেশন করা হচ্ছে, ঠিক তেমনি লীগ অফ নেশন্স-এও অস্ত্রত্যাগের প্রশ্ন এড়িয়ে অস্ত্রশস্ত্রের শ্রেণীবিভাগ করা ও যুদ্ধের হাতিয়ারগুলি সেবরেটরীতে পরীক্ষা করে দেখার হাজারো রকমের প্রস্তাবের আড়ালে যে অস্ত্রসজ্জার হিড়িক লাগানো হয়, তারই পরিণতি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ।

কিন্তু তৃতীয় মহাযুদ্ধ যদি বাধে, তার সর্বনাশা রূপের কাছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যে ছেলেখেলা মাত্র সে কথা পরিষ্কার ভাবে বোঝা যাবে—যদি অবশ্য ঠাণ্ডা লাড়াই-এর ঝাঁপসা চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে না যায়।

একথা কেউ স্বীকার না করে পারবেন না যে কোন অস্ত্রের উত্তরোত্তর উন্নতিসাধন অর্থাৎ তার সংহারশক্তি ঝাড়াবার জন্তেই সোঁট নিয়ে পরীক্ষা চালানো হয়। অস্ত্রের মারণ শক্তি আরো শাণিত করার শেষ লক্ষ্য যে সেই অস্ত্র ব্যবহার করা সে সম্পর্কেও সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। সেই অস্ত্র ব্যবহার হলে ফল কী হবে সে সম্পর্কে ৭ জন ওলন্দাজ বৈজ্ঞানিক বলেছেন যে, একটিমাত্র তাপ-পারমাণবিক বোমা রটারডাম থেকে দি হাগ সহর পর্যন্ত সমস্ত জায়গাটা এক মহাশ্মশানে পরিণত করবে এবং সেখানে একটি ঘাসও বেঁচে থাকবে না। এখানেই শেষ নয়। সেই একটি বোমা থেকে তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ ঠাঁড়াবে ৫০০ বস্টজেন। ১৯৫৬ সালে আইনষ্টাইন পারমাণবিক অস্ত্রের বিরুদ্ধে পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকদের সম্মিলিত হবার জন্তে যে আহ্বান জানান, তারই ফলে কানাডার পুগওয়াশে এক আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক-সম্মেলন হয়। সেই সম্মেলনে জানা যায় হিরোশিমায় ৫০ হাজার লোক তেজস্ক্রিয়তার প্রভাবে তিলে তিলে মারা যায়। পারমাণবিক অস্ত্রপরীক্ষা সারা দুনিয়ার মানুষকে শান্তিকালেই ক্যান্সার ও লিউকিমিয়ার কবলের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। সারা দুনিয়ার আবহাওয়া দূষিত হওয়া যদি এই মুহূর্তে বন্ধ করা না যায় তাহলে আমাদের যুগের কথা বাদ দিলেও উত্তরকালে এবং উত্তরাধিকার সূত্রে প্রত্যেক পুরুষে গড়ে ৭০ লক্ষ লোক তেজস্ক্রিয়াজনিত রোগে অকালে ইহজগৎ থেকে বিদায় নেবে।

সঞ্জিতকুমার চট্টোপাধ্যায়

তখনো ছিল আরক্তিম আকাশ গোধূলিতে
ক্র-ধ্বংস আঁকা কাজল-কালো সে তার হুই চোখে
দেখল চেয়ে, সে-চাঁওয়া যেন ছড়িয়ে দিতে দিতে
মনে, মনের গভীরে আরো ! আবার ধীরে ধীরে
দৃষ্টি তার চাঁপার কলি আঙুলে সাদা নখে
আনত হল। দোললো হাওয়া কয়টি যেন শাখা
ওড়ালো তার চূর্ণ-চুল, আর সে ঝির-ঝিরে
স্বপ্ন-ভরা মুহূর্তটি রইল মনে আঁকা।

তেমনি ক'রে গোধূলি আসে তেমনি ক'রে যায়
হাওয়ার হাতে হরত আজও স্বপ্ন বৃষ্টি করে
সেখানে সেই নিরাসা নীল ভ্রূষের কিনারায় ;
সে নেই তবু, নীলাত জলে যে ছায়া চেষ্টানাট
ছড়িয়ে রাখে সেখানে আজও—তাকে যে মনে পড়ে—
মনে যে পড়ে সে ছায়া শুধু ছিল যে তারই চোখে,
শ্রুতির প্রেমে যে আজ ছবি : লাজুক পায়ে হাটে
—দৃষ্টিনত চাঁপার কলি আঙুলে সাদা নখে !!

বিপ্লবের সঙ্কাতে

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯১৯ সালের শেষ ও ২০ সালের প্রথম যখন আটকবন্দীরা এবং ক্রমশ রাজবন্দীরা অন্তরীণ ও জেল থেকে ফিরে আসতে লাগলো, তখন অনেকেরই অবস্থা ভয়েছিল যেন জল-পড়া। জেলে বা অন্তরীণে তবু একটা "হিলে" ছিল, কিন্তু মুক্ত হয়ে আসার পর দেখা গেল, অনেকেরই আশ্রয় বা জীবিকার কোন সংস্থান নেই—বাড়ী গিয়ে বসে থাকার অবস্থাও অনেকের নেই, আর নানাকারণে তাঁর অন্তর্বিদ্যাও প্রচুর। সরকার থেকে অনেকের ফ্যামিলি আলাউয়েন্স দেওয়া হত,—একজন উপার্জনশীল ব্যক্তিকে বিনাবিচারে আটক রাখলে ফ্যামিলি আলাউয়েন্স দিতেই হয়,—সে আলাউয়েন্সও বন্ধ হত। ফলে এই সব মুক্ত দেশকর্মীদের নিয়ে একটা নতুন সমস্যা দেখা দিল। ২০ সালের শেষ দিকে বহু মুক্ত কর্মীর এমন অবস্থা।

এরকম আসন্ন অবস্থা বুঝে দেশের নেতারাও উদ্ভ্রাণ, কেউ কেউ কারো কারো জন্তে কিছু চেষ্টাও করতেন। সরকারও দেখতেন, এদের জন্তে কিছু না করলে এরা আবার কোন পথ ধবে, কে জানে—তাই তাঁদেরও মাথাপিছু কিছু মতলব ঘুরছে। তাঁর ওপর অসহযোগ আন্দোলন একটা আসন্ন ঝড়ের মতন এগিয়ে আসছে—“ঈশান কোণে মাঘ উঠেছে, করতছে গৌ গৌ—ওরে, ডিঙ্গা বেঁধে থো।”

এই অবস্থার সরকারেব পৃষ্ঠপোষকতায় এবং Y. M. C. A.র নেতা O. R. Raha এবং বি. সি. চ্যাটার্জি, এস আর দাশ প্রভৃতি মহারত নেতাদের নেতৃত্বে মুক্ত বন্দীদের জন্তে ইটালী-বেনেপুরুষের একটা বড় বাড়ী নিয়ে একটা ফ্রি মেন্সের মতন ব্যবস্থা হল। ঢাকা অংশীলন পার্টির একজন নেতৃস্থানীয় সদ্যমুক্ত রাজবন্দী নলিনীকিশোর গুপ্তকে সেখানে বসানো হল পরিচালক হিসাবে।

জীবন জেল থেকে মুক্ত হয়ে আসার পর, কার যেন খোঁজ করতে ঐ মেসে নলিনী বাবুর কাছে গিয়েছিল,—আমিও সঙ্গে গিয়েছিলুম—সেই প্রথম আমি নলিনী বাবুকে চিনলুম,—হয়ত তাঁর মনে নেই।

সেখানে গিয়ে জমতে লাগলো অংশীলন পার্টির লোকেরাই। যুগ্মস্বপ্ন পার্টির ছোটকো ২১১ জনও জুটেছিল, কিন্তু ওটা হয়ে উঠেছিল, অংশীলন পার্টিরই আড্ডা। অবশ্য অংশীলন পার্টিরও ২১১ জন লোক ওদিকে যাওয়াটা পছন্দ করেননি।

ঐ আড্ডা থেকেই নলিনী বাবু ‘শব্দ’ নামে সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন। তারপর পুলিন দাসের নেতৃত্বে ওখানেই ভারত-সেবক-সংঘ

সংগঠিত হয়, এবং তাঁর মুখপত্র “হক কথা” প্রকাশিত হয়। ঐক্য কথারও সম্পাদক হয়েছিলেন নলিনী বাবুই। অসহযোগ আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রচারই ছিল এই সংঘ ও পত্রিকার কাজ। এ বিষয়ে পরে অনেক ভিত্তিকার কথা আসবে।

এখানে আর কয়েকটা ভিত্তিকার কথা বলা দরকার শোধ করছি, যা আগে দরকার বোধ করিনি। ‘যাদুদা’ তাঁর বইয়ে লিখেছেন, “বাংলার মগনদে তিনজন মন্ত্রী জাতিগঠনের বিভাগ নিয়ে দিল্লীকে লাঙল চুষতে লাগলেন।” এই অশ্রদ্ধাপূর্ণ মন্তব্য শ্রুতেন্নাথ সর্দারও বলা হয়েছে,—অথচ এই শাসন সংস্কার মেনে নিয়ে নিপাতেন দাঁড়ানোর ব্যবস্থা কংগ্রেস থেকেও হয়েছিল, অসহযোগ প্রস্তাব পাশ হওয়ায় যে নির্বাচন পরিণত হয়।

তা ছাড়া আগে গান্ধিজি নিজে তিলক, আনি বেশান্ত প্রভৃতি কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের বিরোধিতা সত্ত্বেও শাসন সংস্কার মেনে নিয়ে তাব সংশোধনের জন্য চেষ্টা করার পক্ষপাতী ছিলেন।

আবার, তাঁর অসহযোগের প্রস্তাবের মূলও হচ্ছে খিলাফত কমিটির অসহযোগ প্রস্তাব। মোলানা মহম্মদ আলী খিলাফত সংকে সুরবিচারের দাবাব করতে বিলিতে গিয়ে বার্থ হয়ে ফিরে আসার পর সেই অসহযোগ প্রস্তাব খিলাফত কমিটির সভায় বর্তিত হয়। মহাত্মা গান্ধী আগে থেকেই হাওয়া বুঝে খিলাফত কমিটির বন্ধু ও পরামর্শদাতার ভূমিকা নিয়ে বিক্ষুব্ধ মুসলমান সম্প্রদায়কে কংগ্রেস সহযোগিতা দিয়ে বাগ মানাবার মতলব করেছিলেন। ১৯২০ সালের ১৯শে মার্চ খিলাফত কমিটির এক সভায় তাঁদের অসহযোগ-প্রস্তাব সর্দার বহুতায় গান্ধিজী বলেন,—“প্রস্তাবটাতে অতি সম্মানজনক ভাবে ও স্বাধীন ভাষায় আন্দোলনের কয়েকটা স্তর নির্দেশ করা হয়েছে,—যার শেষ পর্যায়ে তবে সশস্ত্র বিপ্লব। ভগবান করুন, এদেশকে যেন এমন সশস্ত্র বিপ্লব ও তার আনুষঙ্গিক বিভীষিকার মুখ দেখতে না হয়। কিন্তু খিলাফত প্রশ্ন সম্পর্কে মানুষের মনোভাব এত তীব্র যে, এ সমস্যার যথোচিত সমাধান না হলে, বা শান্তিপূর্ণ আন্দোলন ব্যর্থ হলে এমন এক সশস্ত্র বিপ্লব আসবে, যা এদেশ কখনো দেখেনি। আমি আশা করি, ক্রোধোন্মত্ত নির্বাসিত দাবা সরকার সে অবস্থা টেনে আনবেন না।”

এই বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, কেন মহাত্মাজী অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে অহিংসকে মূলনীতিরূপে জুড়ে দিয়েছিলেন,—এবং

কেনই বা বেপরোয়া ভাবে ১৯২১ সালের নভেম্বর পর্যন্ত বলেছিলেন, “হ্যাঁ, আমি বিশ্বাস করি এক বছরের মধ্যেই স্বরাজ হবে।”

তঁার অহিংস অসহযোগের প্রস্তাব ধীরে ধীরে গড়ে উঠছিল খিলাফ কমিটিরই কাজের দ্বারা। ১৯২০ সালের ২২শে জুন খিলাফ কমিটি বড়লাটকে লেখেন,—এলা আগষ্টের মধ্যে তুরস্কের প্রতি সুবিচারের ব্যবস্থা না হলে তঁারা অসহযোগের কার্যক্রম শুরু করবেন। গান্ধিজীও বড়লাটকে চিঠি লিখে ব্যাখ্যা করেন,—কেন তিনি খিলাফ কমিটিকে সমর্থন করছেন। এলা জুলাই আবার গান্ধিজী হিন্দু ও মুসলমান, উভয় সম্প্রদায়ের তরফ থেকে বড়লাটকে এই কথা জানিয়ে দেন।

তারপর এলা আগষ্ট পায় হলে হাকিম আজমল খাঁ তঁার সরকারী সম্মান উপাধি বর্জন করেন। ৩১শে আগষ্ট খিলাফ কমিটির অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়, এবং গান্ধিজী তঁার কাইজার-ই-হিন্দ পদক বর্জন করেন। সেপ্টেম্বরে কলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে “অহিংস” অসহযোগ প্রস্তাব গৃহীত হয়। তাতে খিলাফ কমিটির কার্যক্রমের সঙ্গে থাকলো অহিংসা, আর সেটাকে মানানো হল “এক বছরে স্বরাজ”-এর “প্রতিশ্রুতি” দিয়ে। বাহাদুর বইয়ে “মহাত্মাজী”র প্রতি ভক্তির অপ্রতুল নেই।

বাহাদুর প্রভৃতি ফেরারী বিপ্লবী নেতাদের মুক্তি সম্পর্কেও সুরেন্দ্রনাথ এবং গান্ধিজীর তুলনার অবকাশ আছে।

কলিকাতা কংগ্রেসের সময়েই সন্তমুক্ত রাজবন্দী অমরকৃষ্ণ ঘোষ (অতুলদার ভাই) এবং অরুণ গুহ প্রথমে পণ্ডিত মদনমোহন মালবের সঙ্গে এই সম্পর্কে সাক্ষাৎ করেন, এবং তঁার সাহায্য চান। তিনি প্রথমে যথেষ্ট আপায়ন করে পরে যখন ভুললেন, তেঁাঙ্গরী নেতাদের নামে সরকারের ঘোষণা আছে, যবে দিতে পারলে ১০১০ হাজার টাকা করে পুরস্কার দেওয়া হবে, “তখন তিনি পাশ কাটালেন।

তার পর তঁারা গেলেন গান্ধিজীর পরামর্শ নিতে। তিনি পরামর্শ দিলেন, ফেরারীরা যদি তঁার কাছে অন্ত্রশস্ত্র সমর্পণ করে সবরমতীতে থাকতে চান, তিনি তাঁদের গ্রহণ করবেন।

শেষে অমর বাবু এবং অরুণ বাবু গেলেন সুরেন্দ্রনাথের বাড়ীতে, ব্যারাকপুরে। তিনি ওদের বৃক করে ভড়িয়ে যবে আশ্বাস দিলেন, এবং সরকারের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করলেন, এবং শেষ পর্যন্ত তাতেই চন্দননগরে সেক্রেটারী নেলসন ও ডি আই জি আই বি গোবিন্দর সঙ্গে অতুলদার সাক্ষাতের ব্যবস্থা হল।

ইতিমধ্যে নাগপুর কংগ্রেসে জুগেন্দ্রকুমার দত্ত এবং কুন্তল চক্রবর্তী গান্ধিজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, এবং তিনি তাঁদের বলেন অন্ত্রসহ আত্মসমর্পণ করতে।

যাই হোক,—আমরা তখন এ সব কথা জানতুমও না, আর আন্দোলনে যখন যোগ দিয়েছি এবং এক বছর পরে পুনর্বিবেচনারও কথা আছে, তখন বিশ্বস্তভাবে প্রাণপণে আন্দোলনের কার্যক্রম নিয়ে খোঁজ চলেছি।

দ্রাবন ব্যক্তিগত ভাবে গান্ধাজীর কাছে এক দীর্ঘ পত্র লিখে নিজের গণপু বিশ্ববে বিশ্বাস প্রকাশ করে পরামর্শ চেয়েছিল, কি করবে। তিনি স্বস্তি জবাব লিখে দিয়েছিলেন,—অসহযোগ আন্দোলনের কার্যক্রমের একটা কিছু বেছে নিয়ে একটা বছর কাজ করে যাও। সে চিঠিটা

জীবন রেখে দিয়েছিল এবং পরে একদিন সেটা বিশেষ ভাবে কাজে লেগেছিল। সে কথা যথাসময়ে আসবে।

১৯২১ সালের শেষার্ধ্বে সারা দেশে চরকা চলিতে শুরু করেছে—মোট খদ্দের নানা রকমের কাপড় তৈরি চলছে—কলিকাতা সহরেরও পাড়ার পাড়ায়,—২১০ খানা তাঁতও বসে গেছে। টালার ব্যায়ামবীর প্রোফেসর কে, ডি শীল বাইরের ঘরে দু’খানা তাঁত বসিয়েছিলেন। কবি সত্যেন দত্তের বিখ্যাত কবিতা ‘চরকার ঘর্ষ পড়লীর ঘর ঘর’ টালায় পাটুবাবুদের বাড়ীতে বসে তিনি লিখেছিলেন। “জাপান” লেখক সুরেশদা’র সঙ্গে তিনি টালায় যেতেন। একদিন পাটুবাবু ও তঁার দাদা ভানুদা’ একসঙ্গে চরকা কাটতে বসলেন, আর কবি সত্যেন দত্ত কবিতা লিখলেন।

অনেক ছেলে স্কুল কলেজ ছেড়ে বেরিয়েছে,—তাদের জন্তে গ্রামাঞ্চাল কলেজ হল, গৌড়ীয় সর্ববিজ্ঞানতন (গ্রামাঞ্চাল ইউনিভারসিটি)—সেখানে অধ্যাপক করে বসানো হল সুরভাচন্দ্রকে। কিরণশঙ্কর রায় প্রভৃতি কয়েকজন হলেন প্রোফেসর।

মাখন সেন এবং এক শৈলেন ঘোষ বোধ হয় ছিলেন মানোজমোটে। সুরভা বাবু জেলে যাওয়ার পর (২১ সালেই) সেখানে কিছু টাকার গোলমাল ঘরা পড়ে এবং শৈলেন ঘোষ উধাও হয়। পরে তিনি ভোটরঙ্গ নামে কাগজ বার করেছিলেন।

শ্রামসুন্দর চক্রবর্তী সম্পাদনায় সার্ভেন্ট নামে ইংরাজী দৈনিক কাগজ বেরোয়। সুরেশ মজুমদারের গৌরাজ প্রেস প্রাথমিক কংগ্রেস কমিটির ছাপার কাজ করে কিছু পয়সা পেতো। সেখান থেকে মাখন সেন ও সত্যেন মজুমদারের সহযোগিতায় বেফলো আনন্দবাজার পত্রিকা।

সার্ভেন্ট ও আনন্দবাজার হল পুরোপুরি কংগ্রেসী কাগজ। মহাত্মাজী এবং অসহযোগ আন্দোলনের প্রচার এবং প্রাসঙ্গিক সংবাদই ছিল কাগজের প্রধান উপজীব্য! মহাত্মাজীর ইয়ং ইণ্ডিয়া কাগজও বেরিয়েছিল—সে ছিল আন্দোলন পরিচালনের গাইড। পড়ে তারিফ করতে হত—চমৎকার! কিন্তু মহাত্মাজীব রাজনীতির অভিনব, অবিশ্বাস্য প্রকৃতিও তাতে প্রকট হত।

সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপীয়ান অ্যাসোসিয়েশন ও মডারেট দল তাদের কাগজগুলোতে অ্যাণ্টি ননকোপারেশন প্রোপাগান্ডা করে চলেছিল। কিন্তু জনগণের মধ্যে তাদের প্রচারের উপযোগী কাগজ, সংস্থা বা কর্মীদল ছিল না। ফলে আন্দোলন বেড়েই চলেছিল, এবং সরকারও ক্রমশ নির্ধাতন ব্যবস্থার দিকে ঝুঁকছিল। ফলে আন্দোলন দমার পরিবর্তে আরো জোরালো হয়ে চলেছিল।

২১ সালের সেপ্টেম্বর অক্টোবরে গভর্নমেন্ট সভা বন্ধ করার জন্তে ১৪৪ ধারা জারি করতে শুরু করলে। সে বাধা গ্রাহ্য না করে সভা করে লোকে গ্রেপ্তার বরণও শুরু করলে। কলেজ কোয়ারে এই রকম নিষিদ্ধ সভা ও গ্রেপ্তারের একটা চিত্র আমি আগে লিখেছি, গত শৌষ মাসের বহুমতীতে।

খদ্দের প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে খিলাতী বস্ত্র বরকটের জন্তে শিকিটি এবং ধরপাকড়ও শুরু হয়েছিল। দেশী মিলওয়ালারা টালাও দিচ্ছিল। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে দেশী মালিকদের স্বার্থের সঙ্গে কংগ্রেসের একটা মিলনও লোকচক্ষুর অগোচরে ধীরে ধীরে গড়ে উঠছিল

পরবর্তী যুগে নেতার পরিণতি হয়েছিল দেশী ধনিকদের স্বার্থের সঙ্গে কংগ্রেসের স্বার্থের পরিপূর্ণ মিলনে।

পুলিশ পিকেটারদের মাঝে শুরু করলে সি, আর, দাশ নিজের একমাত্র পুত্র চিরঞ্জন, স্ত্রী বাসন্তী দেবী ও ভগিনী উর্মিলা দেবীকে পিকেটিং পাঠালেন—পরের ছেলেরদের বিপদের মুখে পাঠাবার আগে আপনার প্রিয়জনদের পাঠালেন। তাঁরা গ্রেপ্তার হয়ে জেলে গেলেন। আন্দোলন আরো জোর হল।

তখন সরকার ১৪৪ ধারা অমান্য করে সভা করার জবাব দিতে শুরু করলে লাঠি চার্জ করে সভা ভেঙ্গে দিয়ে। ফল হল না, মেয়েরাও সে সব সভায় বক্তৃতা শুরু করলেন। তখন হেমপ্রভা মজুমদার সভায় বক্তৃতা দিতে শুরু করেছেন। একদিন এমনি এক সভায় লাঠি চার্জ হল, হেমপ্রভার একটা হাত লাঠির ঘারে জখম হল। তিনি ব্যাণ্ডেজ করা ভাঙ্গা হাত নিয়েই সভায় সভায় বক্তৃতা করে বেড়ালেন।

প্রথমে মেয়ে বক্তা বেশী ছিল না। বুদ্ধা মহিলা কংগ্রেস নেত্রী মোহিনী দেবী গোড়া থেকেই ছিলেন (ক্যালকাটা কেমিক্যাল ওয়ার্কসের অন্ততম প্রতিষ্ঠাতা থগেন দাশগুপ্তের জননী—আমরণ একনিষ্ঠ গান্ধীভক্ত) আর ছিলেন বাসন্তী দেবী, উর্মিলা দেবী, জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী, হেমপ্রভা মজুমদার প্রভৃতি। ক্রমশঃ নতুন নতুন মেয়ে-বক্তা তৈরী হচ্ছিল।

ভেলও ছিল, যেমন সর্বত্র থাকে। একটি যোগান মেয়ে দিনকতকের জন্তে ধুমকেতুর মতন উদয় হয়েছিল—চমৎকার ওজস্বিনী ভাবায় উপযুক্ত অঙ্গসঞ্চালন সচযোগে লম্বা বক্তৃতা গড়গড় করে আউড়ে যেতেন। এক লীডারের কন্ঠা। তাঁর সভায় তিনিই সাধারণত একমাত্র মহিলা বক্তা থাকতেন। তার পিতাও বক্তৃতা করতেন। সভার শেষে চাদর পেতে কংগ্রেস কাণ্ডের জন্তে অর্থ সংগ্রহও চলতো। একটা কথা বাজারে ক্রমশ চালু হয়েছিল, মেয়েটি বাপের লেখা বক্তৃতা মুখস্থ করে ঘরে বড় আয়নার সামনে ঠাঁড়িয়ে রিহাস্যাল দিয়ে তৈরী হয়ে আসে। নামে বোধ হয় স্বর্ণলতা। যাক—

শেষ পর্যন্ত বোধ হয় ২১ সালের নভেম্বরে গভর্ণমেন্ট কংগ্রেস ডলক্টিয়ার দলকে বে আইনৌ ঘোষণা করলে, এবং ডলক্টিয়ারদের লীডাররূপে কংগ্রেস নেতাদেরও গ্রেপ্তার শুরু করলে। সি আর দাশ গ্রেপ্তার হলেন, তাঁর স্থলে একে একে অনেক নেতা বসেন আর গ্রেপ্তার হন, শেষ পর্যন্ত সভায় বাবুও গ্রেপ্তার হলেন।

এদিকে ২১ সালের ডিসেম্বর এবং আইনমবাদ কংগ্রেস এসে গেল। গেলুম আইনমবাদে। বাংলার ডেলিগেট ক্যাম্পে বেদের পণ্ডিত মোক্ষদা সামাধ্যারী প্রমুখ কয়েকজন স্বরাজ ঘোষণার প্রস্তাব চাই বলে হেঁচটে শুরু করেছিলেন। কোথায় স্বরাজ?

নির্বাচিত সভাপতি সি আর দাশের অল্পপস্থিতিতে হাকিম আজমল খাঁ হলেন প্রেসিডেন্ট। মূল প্রস্তাব উপস্থাপিত করলেন স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী, কংগ্রেসের সমগ্র ইতিহাসের মধ্যে সব চেয়ে ছোট মূল প্রস্তাব। জেল ভর্তি করে দিতে হবে, এমন কি বাঁরা গঠন মূলক কাজ নিয়ে আছেন, দরকার হলে তাঁরাও কাজ ছেড়ে জেলে যাবেন। **The battle may be prolonged**—এই হল মহাত্মাজীর বক্তব্য।

হজরৎ মোহানী চরমপন্থী, তিনি সম্প্রদায়ী প্রস্তাব এনেছিলেন

সম্পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ গ্রহণ করার, সে প্রস্তাব ভোট টিকলো না। কংগ্রেসের পাশেই চলছিল মোসলেম লীগের অধিবেশন। হজরৎ মোহানীই ছিলেন সে অধিবেশনের সভাপতি। তিনি সেখানেও ইথিওপেয়ান রেজলিউশন এনে পরাজিত হলেন। কংগ্রেসের মধ্যকার খিলাফ ওয়ালারাই সেখানে ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ, কাজেই তারা কংগ্রেসের লাইনেই চললো। তখন মুসলমানেরা কংগ্রেস এবং মোসলেম লীগ, উভয় সংস্থারই সভ্য হতে পারতো।

এই উপলক্ষে মহাত্মাজী তাঁর ইয়ং ইণ্ডিয়া কাগজে বা লিখেছিলেন, সেটা আজও কংগ্রেসের ইতিহাসের পাতা কালো করে অঙ্কন হয়ে আছে। তিনি লিখেছিলেন,—“Moulana Hasrat Mohani put up a plucky fight for independence on the Congress Platform and then as president of the Muslim League, and was happily each time defeated. He wants to sever all connections with British People even as partners and equals, and even though the Khilafat question is satisfactorily solved....It is Common cause that if the Khilafat question cannot be solved without complete independence....there is nothing left for us to do but insist on independence....But assuming that Great Britain alter her attitude, as I know she will when India is strong, it will be religiously unlawful for us to insist on independence.”

অর্থাৎ মোলানা হজরৎ মোহানী কংগ্রেস এবং মোসলেম লীগের সভাপতিরূপে স্বাধীনতার প্রস্তাব তুলে রীতিমত লড়াই করেছিলেন, কিন্তু সত্বের বিষয়, তিনি হুঁজারগাতেই পরাজিত হয়েছেন। তিনি বৃটিশের সঙ্গে সর্বপ্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করতে চান, এমন কি সমান অংশীদার হিসাবেও, এবং খিলাফ সমস্যার শ্রাঘ্য সমাধান হলোও। অবশ্য সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভিন্ন যদি খিলাফ সমস্যার সমাধান না হয়, তাহলে স্বাধীনতার দাবী করা ছাড়া আমাদের আর উপায় নেই। কিন্তু বৃটেন যদি তার বর্তমান মনোভাবের পরিবর্তন করে, আমি জানি, ভারত শক্তিশালী হলে তারা তা করবেই, তাহলেও স্বাধীনতার জন্ত গীড়াপিড়ি করাটা আমাদের পক্ষে একটা ধর্মবিরুদ্ধ কাজ হবে।

স্বরাজ যে স্বাধীনতা নয়, অসহযোগ আন্দোলন যে স্বাধীনতার সংগ্রাম নয়, তার আরো অনেক প্রমাণ ইতিপূর্বেই পাওয়া গিয়েছিল। নাগপুরের কংগ্রেসের পর থেকেই লোকে জিজ্ঞাসা করতে শুরু করেছিল, স্বরাজ কথাটার সঠিক অর্থ কি? মহাত্মা জবাব দিয়েছিলেন, যখন স্বরাজ পাওয়ার সময় আসবে, তখন ভারতবাসীই সেটা স্থির করবে, আমি নয়। কিন্তু স্বরাজের ব্যাখ্যার দাবী নিস্ক্র হচ্ছিল না। বোম্বাইয়ে পার্শী এসোসিয়েশনে বক্তৃতা কালে মহাত্মাজী বললেন,—তিনি নিজে সন্তুষ্ট হবেন ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস পেলেই। অসহযোগের বিরোধীরা প্রচার চালাচ্ছিল, আন্দোলনটা অবৈধ। তার জবাবে মাত্রাজ মেলের প্রতিনিধির কাছে তিনি বললেন,—“I do not consider non-cooperation to be unconstitutional, but I do

believe that of all the constitutional remedies now left open to us, non-cooperation is the only one left for us." অর্থাৎ আমি অসহযোগ আন্দোলনকে অবৈধ মনে করি না। আমি মনে করি,—অজ্ঞানের প্রতিকার আদায় করার সর্বপ্রকার বৈধ উপায়ের মধ্যে এই একটা মাত্র উপায়ই আমাদের হাতে অবশিষ্ট আছে।

গভর্নমেন্ট কেন কংগ্রেসকে বে-আইনী বলে ঘোষণা করছে না,—এ কথাই উদ্ভূত পাল্লার্মেন্ট কর্ণেল ওয়েজউড বলেছিলেন যে, কংগ্রেসের স্বরাজের অর্থ স্বায়ত্তশাসন, সুতরাং কংগ্রেসে বে-আইনী করার কোন কারণ নেই।

অনেক জনসাধারণ-শিল্পপতিও যে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন, তার কারণও এই। ভারতের তুল্য ব্যবসায়ের রাজা দয়ানীলাল বাকসজ ছিলেন কংগ্রেসের ফিলক স্বরাজ্য আন্দোলনের পোষাক, স্বাধীনতার পথ তত্ত্ব। তিনি ওয়ারী কটমের একচেটিয়া কারবারী হয়ে উঠেছিলেন কংগ্রেস-চরকা-বন্দনের মৌলভে। কংগ্রেস ওয়ারী তুলা সম্বন্ধে সুপারিশ করেছিল, সারা ভারতে গ্রামাঞ্চলের কোণা কোণায় পর্যন্ত বন্দর উৎপাদন কেন্দ্রে কেন্দ্রে ওয়ারী তুলা বিক্রি হত,—দু' টাকা সের পর্যন্ত উঠেছিল। বাকসজ কোটির অঙ্কে টাকা রোজগার করে লাভের অঙ্কে কংগ্রেসকে চালা দিয়েছিলেন। জাশান্নাল এডুকেশনের পাশ কাটিয়ে তিনি নিজের ছেলেকে পড়তে পাঠিয়েছিলেন বিলেতে।

আমরা এসব লক্ষ্য করেও একটা লড়াই চলছে এবং এগোচ্ছে দেখে প্রাণপণে খেটে চলেছিলুম। অন্ন বস্ত্র, শিক্ষা, মামলা-মোকদ্দমা প্রভৃতি ব্যাপারে সরকারী সাহায্য বর্জন করে, নিজেরাই নিজস্ব ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারলে সরকারকে খাজনা-টেক্স দেওয়ার কোন যৌক্তিকতা বা দায়িত্ব থাকবে না,—এবং তখন খাজনা বন্ধ করা হবে, এই ভাবে একটা State within State গড়ে তোলা হবে, এ ধরনের প্রচারণা চলছিল, কাজেই খেটে যাওয়ার একটা প্রেরণাও বর্তমান ছিল।

ইতিমধ্যে আর একটা বৃহৎ ব্যাপার ঘটে গিয়েছিল, বলা হয়নি। অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম জোয়ারের মুখে আসামের চা-বাগানের চির-নিগাহিত কুলীরা ধর্মঘট করে একযোগে,—এবং মালিকেরা তাদের ঘরছাড়া করে তাড়িয়ে দেয়। তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন হিসাবে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের কর্মীরাও ধর্মঘট করে,—শেষ পর্যন্ত সে ধর্মঘট বিস্তৃত হয় গোয়ালন্দ, চাঁদপুর প্রভৃতি ষ্টিমার কর্মীদের মধ্যেও। ফলে রেলও ষ্টিমার চলাচল বন্ধ হয়, এবং চা-কুলীর দল পদব্রজে বাড়ীমুখো যাত্রা শুরু করে। পথে তাদের বিশ্রাম ও খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা জগু স্থানীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে জনসাধারণ স্থানে স্থানে লঙ্গরখানা স্থাপন করে। এক এক স্থানে হাজার হাজার কুলী জমে যায়, একটা প্রকাণ্ড সমস্ত্রা দেখা দেয়। স্বভাবতই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে টেলিগ্রাম আসতে থাকে।

সি আর দাশ স্বচক্ষে অবস্থা পরিদর্শনের জন্তে রওনা হন, এবং গোয়ালন্দে পৌঁছে দেখেন ষ্টিমার বন্ধ। বর্বার পদ্মা-মেঘনা সমুদ্রের আকাশ দাবণ করেছে। সেই অবস্থায় তিনি নৌকায় পাড়ি দিলেন গোয়ালন্দ থেকে চাঁদপুরে—কারো নিষেধ মানলেন না। ধর্মঘট ও

সাধারণ জনগণের সাহস ও উৎসাহ কতখানি বেড়ে গেল, তা সহজেই অনুমেয়।

ওদিকে চট্টগ্রামে স্বতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ব্যারিষ্টারী ছেড়ে কংগ্রেসের হাল ধরেছেন। তাঁর স্ত্রী বিলাতের মেয়ে নেলী সেনগুপ্তা বিলাতী কাপড়ের দোকানে পিকেটিং করে গ্রেপ্তার হয়েছেন, জেলে গেছেন। ধর্মঘটের জন্তেও সেনগুপ্তের প্রায় ৫০ হাজার টাকা খরচ হয়ে যায়। পরে সেনগুপ্ত ও নেলী কলকাতায় চলে আসেন, এবং তাঁদের কলকাতার লোক এক মিটিং প্রোসেসশন করে অভ্যর্থনা করে। এই সব ঘটনার ফলে আন্দোলনের জোর বেড়েই চলেছিল।

কংগ্রেসের ডাববন্ডার মধ্যে বিপ্লবী বিবেককে ধাঁচিয়ে রাখার জন্তে বিপ্লবীরা নানা স্থানে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিল,—মাঝে মাঝে উৎসব উপলক্ষে সেখানে বিপ্লবীদের জমায়েত হত,—স্থানীয়ভাবে বিকুটিংও চলতো। আজমদাবাদ কংগ্রেসের পর '২২ সাপ্তাহে যেক্ষণাবর্তে কি মাঠে' বোলের দিনে বোধ হয়, ভারমণ্ড হাথবায়ের কাছে আবদালপুরে গঙ্গার কাছেই এক আশ্রম প্রতিষ্ঠা হয়, এবং সেখানে বসানো হয় রসিক দাসকে, যিনি ৩০ সালে ড্যালহাউসী কোয়ার বোমার মামলার স্বীপাত্তর দণ্ডপ্রাপ্ত করেন এবং আন্দামানে নির্বাসিত হন।

আশ্রম প্রতিষ্ঠার দিন নেতৃত্ব দেন মনোরঞ্জন দা' (মনোরঞ্জন গুপ্ত—বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের এম-এল-সি)—এবং আমার রচিত একখানা গান গেয়ে গ্রাম প্রদক্ষিণ করা হয়। গানটা এই :

আজ হোলীর রাাত্রা উৎসবে
উঠলো মেতে রক্ত-পাগল প্রাণ
তোরা আয় সবে
ফাগুনের এই রঙীন গানে
জাগলো সাদা বনে, মনে
শুকনো ডালে ফুটলো রে ফুল
নবীন শোভা সৌরভে।

আনন্দের এই পাগলা কোরা
ভাসিয়ে দিল সকল ধরা
বাঁধন ছিঁড়ে কাদন ছেড়ে
উল্লাসে আয়, আয় সবে

খুনখারাপীর রক্ত সুরে
বিষটাতে রাভিয়ে দে রে
যর ছেড়ে আজ আয় বাহিরে

অবাধ পানে চলবি কে।

আবদালপুরে নানা দিক দিয়ে অবস্থা এমন প্রতিকূল ছিল যে, আর কেউ গিয়ে সেখানে থাকতে পারতো না। অর্থাৎ আন্দামানে নির্বাসিত হওয়ার আগে রসিক দাসের প্রকৃতপক্ষে বছর সাত-আট আবদালপুরে নির্বাসিতের জীবনই বাপন করা হয়ে গিয়েছিল।

আজমদাবাদ কংগ্রেসের পর "জেলে ভর্তি করে দাও" হল প্রধান কর্মসূচী। সর্বত্র সভা এবং ধরপাকড়, পিকেটিং এবং ধরপাকড় অনেক বেড়ে গেল এবং জেলে ভর্তি হতে দেবী লাগলো না। জেলের কর্মচারীরা সভাপ্রার্থীদের ভিড়ে এবং ছকোড়ে উদ্ভাসিত হওয়ার জোগাড়। সরকার বাহাদুর খিদিরপুর মেটিয়াবুরুজে বড় বড় গুদামে নিয়ে সভাপ্রার্থীদের পুরতে লাগলো। সভায় লাঠি চার্জ করে কতক

লোককে তাড়িয়ে তড়িয়ে বাকি লোকদের ধরে নিয়ে বার, এক অনেক ঘুরে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেয়। রক্তবীজের ঝাড় নির্মূল হয় না, আবার দেখা দেয়।

এক দিকে এই অবস্থা, আর দিকে খাজনা বন্ধের মংলর পক্ষে উঠছে। ইউরোপীয়ান আসোসিয়েশন এ্যান্টি-ননকোঅপারেশন প্রোপাগান্ডার জন্তে টাকা ঢেলেও কূল পাচ্ছে না। পণ্ডিত মনফারেলের প্রস্তাব মিলে এলেন। কংগ্রেস নেতাদের বিভিন্ন স্কেল থেকে এক লোককে আসা জ্বলে জড়ো করার সরকারি স্বাক্ষর হল। মহানন্দ আসা, তখন করাচীতে এক থিলাফান্ড লভার রাজস্বপ্রদায়ক বক্তৃতা ও প্রস্তাব পাশ করে কারারাগ ভোগ করেছিলেন। মহানন্দাও মসলেন, তাঁদের সভায় আনতে হবে। সরকার স্বাক্ষর হল না। আপোষ প্রস্তাব ফেঁসে গেল। সি আর দাশ চটলেন।

কংগ্রেসের থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল সাগা দেশে সর্বত্র সভা করে ঐ করাচী প্রস্তাব পাশ করতে হবে। মাদারীপুরের বিপ্লবীনেতা পূর্ণ দাশ ঐ করাচী প্রস্তাব পাশ করিয়ে তিন বছর কারাদণ্ড পেয়েছিলেন। অনেক দাশ কাজটা সমর্থন করেননি। কিন্তু পূর্ণ দাশ বলেন, জেলে অসুখা নতুন নতুন জোয়ান ছেলের ভিড়,—রিকুটিংয়ের বিরাট ক্ষিত। বাইরে থাকার চেয়ে কাজ বেশীই হবে। তখন দাদারা পূর্ণ দাশের “বৃষ” আর একবার নতুন করে আপ্রিসিয়েট করলেন। ইতি পূর্বেই পূর্ণ দাশ এক “শান্তি সেনাদল” গঠন করে কংগ্রেসের নামের আড়ালে নিজস্ব এক সংগঠন খাড়া করে ফেলেছিলেন—তার স্বদেশী গান গেয়ে সারা জেলার গ্রামে গ্রামে রুট-মার্চ করে ফিরতো।

টাকার অনুশীলন পার্টি প্রথমে অসহযোগ আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রচার সূত্র করেছিলেন প্রধানত অতিসার বিপ্লববিরোধী ভূমিকার বিরুদ্ধে প্রচারের জন্তে—তাঁদের কথা ছিল, বৈপ্লবিক প্রগতির মুখে এই গান্ধীবাদ দেশটাকে ক্লীবে পরিণত করবে নতুন করে। কিন্তু শুধু এই নেতিবাচক প্রচারের জোরেই বৈপ্লবিক সংগঠনের বাস্তব কাজ চলে না। সপত্নী-প্রতিম যুগান্তর দল গান্ধী এবং কংগ্রেসের নামের জোরে সারা দেশে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে, টাকারও অভাব নেই, কংগ্রেসের স্থানীয় ফাণ্ডও তাদের হাতেই সর্বত্র কংগ্রেস কমিটি করে নিজেদের লোক বসচ্ছে, ধীরে অথচ নিরবচ্ছিন্নভাবে দলের রিকুটিং-এর কাজও চলেছে। এ অবস্থার সঙ্গে পারা দেওয়া অসম্ভব। মন তাদের আরো বিধিয়ে উঠতে লাগলো যুগান্তর পার্টির ওপর।

এই অবস্থায় পুলিশ দাসের সঙ্গে এস আর দাশের বন্ধোবস্ত হল, তাঁর সঙ্গে (তিনি তখন অ্যাডভোকেট জেনারেল) ইউরোপীয়ান আসোসিয়েশনের বন্ধোবস্ত হল, তারা প্রচুর টাকা ছাড়তে লাগলো, সে টাকা এস আর দাশের মারফৎ পুলিশ দাসের হাতে আসতে লাগলো, ভারত-সেবক-সংঘ গঠিত হল, মুখপত্র ‘হক কথা’ সারা দেশে ছড়াবার ব্যবস্থা হল, সর্বত্র ভারত-সেবক-সংঘের প্রচারকেন্দ্র গড়া হতে লাগলো সর্বত্র স্থানীয় কংগ্রেসের এবং যুগান্তরদলের কর্মীদের সঙ্গেও তাদের চাপা ঠোকাঠুকিও চলতে লাগলো। কিন্তু গান্ধী, কংগ্রেস, যুগান্তর দল এবং আন্দোলনের ভাবাবেগের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে স্বাভাবিকই তারা হ’টে যেতে লাগলো। যুগান্তর দলের বিশেষ বিশেষ কর্মী হল তাদের চম্পুল।

বাই হোক, ‘২২ সালের গোড়ার দিকেই ১৪৪ ধারী ডল করে সভা করে গ্রেপ্তার হওয়া মুন্সীগঞ্জ (বিক্রমপুর) চলছিল। একদিন এমনি এক সভায় মুন্সীগঞ্জ জাশাফাল স্কুলের প্রথম তিন শ্রেণীর ২৭ জন ছাত্র, ৪জন শিক্ষক, এবং শেষ পর্যন্ত “বড়দি” (মুন্সীগঞ্জের সরকারী উকীল উমাচরণ সেনের বড় মেয়ে, রেণু সেনের মা) একে একে নিষিদ্ধ সভায় বক্তৃতা করে গ্রেপ্তার হলে জীবন আমাকে টেলিগ্রাম করলে—অবিলম্বে চলে এসো। আমিও অনিচ্ছাপূর্ণ মুন্সীগঞ্জ চলে গেলাম, সংসার-ধর্ম শিকের উঠলো। একটু হাতা শেষ করলাম।

মুন্সীগঞ্জের অভিজ্ঞতা আমার রাজনৈতিক জীবনে এক মহাদুর্ভাগ্য এবং বিচিত্র অভিজ্ঞতা। বসন্ত, সেখানকার প্রায় সকল কর্মীরই জীবন সে সময় ছিল নিত্যশূন্য রাজনৈতিক জীবন। ২৪ জন বিরাহিত, এবং যে ২৪ জনের পরিবারের সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল, সে সম্পর্কটা যেন নিত্যশূন্য গোঁণ—একবার লগ্না কবে ভাত খেয়ে আসা মাত্র। অবিকালেরই অবস্থা ভোজনং বহু তত্র শব্দং ইতি মিলিয়ে। দিনরাত ভুতের মত খাটুনি।

এক মাইলটাক লব্ধ এবং অধমাইলটাক চণ্ডা মুন্সীগঞ্জ মহর, তার মধ্যে আছে সাব-ডিভিশনাল হেড কোয়ার্টার, আদালত, থানা জেলখানা, পোষ্ট অফিস, উকীল-মোক্তার সরকারী কর্মচারীদের বাসা, একটা বাজার, কালীবাড়ী, মসজিদ,—আব ছুটো হাট ছিল, মেয়েদের স্কুল প্রভৃতি।

আন্দোলনের প্রথমে একটা মাত্র হাট ছিল, এবং সেটাই ভেঙ্গে হয়েছিল জাশাফাল স্কুল,—পরে আবার হাট স্কুলটাও পুনর্গঠিত হয়—হাট স্কুলে ২০০ ছাত্র, জাশাফাল স্কুলে ২৫০। এই রকম জাশাফাল স্কুল—হাট স্কুল ষাণ্ডার্ডের—এ এক সাব-ডিভিশনে ১৭টা!

কালীবাড়ীর সামনের প্রকাণ্ড টিনের ঢালাঘরে হয়েছে জাশাফাল স্কুল, বাজারের পিছনে আর একটা প্রকাণ্ড টিনের ঘরে কয়েকটা তাঁত বসেছে, সেখানে ছেলেরা তাঁত সোনা শেখে,—বাস্তার ধারে আর একটা ঘরে কংগ্রেস অফিস। কংগ্রেসের ফাণ্ড প্রধানত মুন্সিভিকা—সকল বাড়ী থেকে নিয়মিতভাবে আদায় হয়। স্কুলের ছাত্রবেতনও নিয়মিত ভাবে আদায় হয়—ফ্রি-হাকফ্রি ছাত্রও অনেক আছে। স্কুলের আয় যথেষ্ট নয়।

বতীন দত্ত হেড মাস্টার বোধ হয় ৪০টি টাকা পেতেন সর্বোচ্চ বেতন। পরেশ সেন স্বত্তরবাড়ীতেই (উমাচরণ সেনের বাড়ী) থাকতেন এবং স্কুল থেকে পেতেন ৩০টি টাকা। জীবনও টিচার—তাঁর বাড়ীর জন্তে দেওয়া হত ২৫টি টাকা। হারান যানাজি আগে এক জেলাবোর্ডের সেনিটারী ইন্সপেক্টর ছিলেন,—তিনি তাঁর কাকা গিরীন্দ্র ব্যানাজির বাড়ী থাকতেন, স্কুল থেকে নিতেন মাত্র ৮টি টাকা। অন্তান্ত টিচার এবং এক পণ্ডিত ও এক মোলবী ২০, ১৫, ১২, ১০—এমনি পেতেন। উমাচরণ বাবু এক ছেলে সুরবিন্দু ল পাশ করে বসেছিলেন—তিনি ছিলেন এক অনারারী রিলিভি টিচার—মাসের মধ্যে ১৫১২০ দিন তাঁকে টিচারী করতে হত।

পরেশ সেন ছিলেন কংগ্রেসের থানা অফিসার—অর্থাৎ মুন্সীগঞ্জ থানা এলাকায় যতগুলো লোক্যাল কংগ্রেস কমিটি ছিল, তিনি সেগুলোর তত্ত্বির করতেন, অর্থাৎ প্রয়োজনীয় সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন। প্রথমে আমাকে সেই পদ দেওয়া হল। জীবনদেয় গ্রাম পঞ্চসারে বতীন দত্তের বাড়ীতে বাইরের ঘরে ছিল গ্রামের কংগ্রেস

অফিস। আমি প্রথম দিনকতক সেইখানে থাকতুম, বতীন দত্তের বাড়ীতেই খেতুম। সভা হত জিওচতলার মাঠে।

জীবন মুন্সীগঞ্জেই বহু তরু থাকতো,—এক একদিন গ্রামে এসে শুভো আমার কাছেই—বতীন দত্তের বাইরের ঘরে। সারারাত চলতো জল্পনা-কল্পনা ও তর্ক-বিতর্ক। সেইখানেই সে গান্ধীকে সত্যিকারের খাটমল খিলানেওয়াল, অহিংসাপন্থী, বিপ্লব-বিরোধী বলে আমার আগে ব্যথা দিয়েছিল। আমি তখনও খাজনাবন্ধ ও স্বরাজের বৈপ্লবিক পরিণতি কল্পনা করে সুখ পেতুম। বক্তৃতা "এক বছরে স্বরাজ" ব্যর্থ হল দেখে দাদারা কংগ্রেসের ভেতরে থেকেই কংগ্রেসকে বিপ্লবের পথে টেনে নিয়ে যাওয়ার প্ল্যান নিয়েই কাজ করছিলেন।

হাই হোক, কিছুদিন পরেই বঙ্গযোগিনী থেকে জাশাগাল স্কুলের সেক্রেটারী পূর্ণ গুহ, বেড়াগাঠার রমানাথ মিত্র এবং টিচার ও কংগ্রেসের সেক্রেটারী ফণী বাবু গ্রেপ্তার হয়ে মুন্সীগঞ্জে এসে খবর দিলেন,—সেখানে সেক্রেটারী হবার মতন লোক পাওয়া যাচ্ছে না, মুন্সীগঞ্জ থেকে একজন লোক অবিলম্বে পাঠানো দরকার।

মুন্সীগঞ্জ থানার অন্তর্গত প্রাচীন ইতিহাসে বিখ্যাত এক গওগ্রাম এই বঙ্গযোগিনী। তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম-প্রচারের জন্তে যে বাঙ্গালী পণ্ডিত দীপঙ্কর ক্রীড়ান ইতিহাসে বিখ্যাত, তিনি জন্মেছিলেন এই বঙ্গযোগিনী গ্রামেই। মুন্সীগঞ্জ থেকে মাইল পাঁচেক দূর—ইতিহাস-বিখ্যাত রামপাল গ্রামের মধ্য দিয়ে বেতে হয়—রামপাল দাবির পাশ ঘুরে। দাবি এখন মজ্ঞে জঙ্গল হয়ে গেছে।

সেখানে কংগ্রেস সেক্রেটারী করে পাঠানো হল আমাকে। সাবাব সময় স্থানীয় রাজনীতি একটু বুঝিয়ে দেওয়া হল। পর পর কয়েকজন সেক্রেটারী গ্রেপ্তার হয়ে জেলে গেছে। ময়মনসিং-এর কংগ্রেস নেতা ও উকীল সূর্য সোমের বাড়ী এই বঙ্গযোগিনী গ্রামে, তিনি গ্রামের কংগ্রেসেরও একটু খবরাখবর করে থাকেন। তাঁর ছেলে শিশির সোমও সেক্রেটারী হয়ে জেলে গেছেন। তাঁর পর আর একজন কংগ্রেস কর্মী কালীজীবন বোম সেক্রেটারী হয়ে জেলে গেছেন। তাঁর পরে জাশাগাল স্কুলের টিচার ফণী বাবু সেক্রেটারী হয়েছিলেন। জাশাগাল স্কুলই এখন কংগ্রেসের প্রধান ঘাঁটি।

ছিল হাই স্কুল, সেটাই হল জাশাগাল স্কুল, ছাত্রসংখ্যা ২০০ মতন। জমিদার রায়বাহাদুর অনারারী ম্যাগিষ্ট্রেট রমেশ গুহ ছিলেন সেক্রেটারী—তিনি বাধা দেন নি। কিন্তু তাঁর জাতি পূর্ণ গুহের সঙ্গে ছিল। তাঁর বহুকালের মামলা মোকদ্দমা। সেই পূর্ণ গুহ জাশাগাল স্কুলের সেক্রেটারী হয়ে কংগ্রেস কমিটির সাহায্যে রমেশ গুহকে নানা ভাবে জঙ্ক করার চেষ্টা করেন। রমেশ বাবুর মুন্সীগঞ্জে আসা বন্ধ হয়েছে ডুলির অভাবে, পূর্ণ বাবুর ব্যবস্থায়। রমেশ বাবুর একটা পা একটু ছোট, খুঁড়িয়ে হাঁটেন, হেঁটে মুন্সীগঞ্জে আসতে পারেন না। পূর্ণ বাবু তাঁকে বেশ জঙ্কই করেছেন।

হাটে একটা ঘরে কংগ্রেস অফিস, অফিসের বাইরে একটা বড় বোর্ডে রাজকার সংবাদপত্রের খবর, কংগ্রেস সংক্রান্ত খবর সংক্ষেপে হাতে লিখে স্টেটে দেওয়া হয়—সাধারণ লোক ভিড় করে পড়ে যায়।

আমি গিয়ে কংগ্রেস অফিসে উঠলুম, খাওয়ার ব্যবস্থা হল জাশাগাল স্কুলের পণ্ডিত মশায়ের সঙ্গে। তিনি রোঁধে খেতেন।

সর্বকণের ভলান্টিয়ার কর্মী চন্দ্রভূষণ, ডাকনাম গৌরা, অমাবস্তার নিশির চেয়ে কালো, সত্যিকারের কর্মী। ভোরে দৌড়তে দৌড়তে পাঁচ মাইল দূরে মিরকাদিম ষ্ট্রীমার ঘাট থেকে খবরের কাগজ এনে বাড়ী বাড়ী বিলি করে, রান্না খাওয়ার ব্যবস্থা করে পণ্ডিত মশায়ের সঙ্গেই খায়, এবং সারাদিন কংগ্রেসের তরফ থেকে সর্বপ্রকার লোককে ধমকধামক দিয়ে কংগ্রেসের কাজ করে।

আমি গিয়েই চন্দ্রভূষণের সাহায্যে একখানা প্রকাণ্ড নোটিশ লিখে বোর্ডে স্টেটে দিলুম—আমি অমুক, মুন্সীগঞ্জ থেকে বঙ্গযোগিনীর কংগ্রেসের ভার নিয়ে এসেছি—আমি শুনলুম, কোন কোন কংগ্রেস কর্মী কংগ্রেস সংগঠনকে তাঁর ব্যক্তিগত বিবাদে ছাতিয়ার স্বরূপ ব্যবহার করে প্রতিপক্ষের উপর অত্যাচার করেছেন। এ রকম কাজ কংগ্রেসের নীতির বিরোধী। অন্তঃপর এ রকম কোন ঘটনা ঘটলে কংগ্রেস অফিসে জানালে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা হবে।

"লোকটা কোলকাতা থেকে এসেছে" এটা প্রচার হয়ে গিয়েছিল। এখন তারা ভাবলে "লোকটা জবরদস্ত"—কাজেই সবাই হয়ে গেল সাধু। রমেশ গুহের বাড়ী নিকটেই—তিনি বিকেলে হাটে এসে নোটিশ দেখে আমার সঙ্গে আলাপ করলেন এবং চায়ের নিমন্ত্রণ করলেন। গেলুম এবং অনেক কথা শুনলুম ও জানলুম।

কলকাতায় ও দাদা দেশে সভা-সমাবেশে স্বদেশী গান গায় বিখ্যাত হরেন বোয়ের বাড়ী বঙ্গযোগিনী গ্রামে। তিনি এলেন, আলাপ হল—তাঁর বাড়ী একদিন নিমন্ত্রণ গেলুম।

কংগ্রেসের সব কাগজপত্র পুলিশ নিয়ে গেছে। কাজেই আমি নতুন খাতাপত্র তৈরী করলুম দু সেট—এক সেট থাকবে কংগ্রেস অফিসে, আর সেট থাকবে গোপন। বিদ্রাব্যু (বোম হয় মুখার্জী) হলেন গোপন দপ্তর রক্ষক। তাঁর ছেলেরা এখন কলেজ স্কোয়ারে বই-এর কারবার করছেন।

অল্পদিন পরেই জীবন গ্রেপ্তার হল—ভলান্টিয়ার আইনে। তখন পেড়ির স্থলে সাব ডিভিশনাল অফিসার এসেছেন ফণী মুখার্জী—উত্তরপাড়ার অমরদার পিসতুতো ভাই—আগে আমাদের দলেব সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। মুন্সীগঞ্জেও তিনি ছিলেন আমাদের বন্ধুই।

জীবন গ্রেপ্তার হতেই আমাকে বঙ্গযোগিনী থেকে সরিয়ে গুন জুড়ে দেওয়া হল স্কুলে, জীবনের জায়গার। আমি পড়াচুঁম ১ম, ২য় ওয় শ্রেণীতে বাঙলা, এবং ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভূগোল। তা ছাড়া সপ্তাহে একদিন এক ঘণ্টা "সাধারণ" ক্লাস—সব ছেলেই এসে বসতে পারতো এবং যার যা খুসী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতো—সে প্রশ্নের জবাব তাদের বুঝিয়ে দেওয়া হত।

জীবনের মামলা উঠলো কোর্টে—জীবন বললে, I take no part in the proceedings—কোন কথাই জবাব দেবো না। প্রধান সাক্ষী গ্রামের দফাদার বললে, আমি জানি, জীবন বাবু কংগ্রেসের ভলান্টিয়ার। কোর্ট প্রশ্ন করলে, কেমন করে জানলে? দফাদার বললে,—উনি লোকের বাড়ী বাড়ী বিনা পয়সায় চরকা দেন, কলেরা হলে লোকের সেবা করেন। জীবনকে খালাস দেওয়া হল। কিন্তু জীবন আর স্কুলে যোগ দিলে না,—উত্তরপাড়া বিজ্ঞাপীঠে চলে এল সুপারিন্টেন্ডেন্ট হয়ে। বিপ্লবীদের আড্ডা-আশ্রমের অগ্রভূমি ছিল উত্তরপাড়া বিজ্ঞাপীঠ। খরচ বোগাতেন অমরদার।

মুন্সীগঞ্জেও একটা ছোট পৃথক আড্ডা করা হয়েছিল আমাদের

দলের মিজব—মুন্সীগঞ্জ জেলার নামে একটা ছোট ষ্টেশনারী দোকান ছিল সামনের ক্যামোফ্রেজ—সেখানে বসতেন জীবনের তগিনীপতি হীরালাল বাবু—আর পিছনে চলতো আমাদের আড্ডা। দলের ছেলেরা স্থানীয় এবং বাইরেরকার, ওখানে আসতো।

আমি কাজ করতুম আপ গোরা কী। দরকার মত কিছু পয়সা-কড়ি খরচও করতুম। স্কুলে প্রাইজ দেওয়া হবে, কিছু ভাল চাদা দিলাম। স্কুলের ছেলেদের তৈরী খন্ডরের গামছা চাদর—সব মোটা ডায়মণ্ড কাটা, পিপড়ী-পড়া স্ত্রীতোর প্রথম ব্যবহার রিজেক্ট মাল—একগাল জমে গেছে কংগ্রেস অফিসে—কেউ কেনে না—আমি কিছু টাকা দিয়ে সেগুলো নিয়ে বাড়ীতে দিলাম—“যা খুসী কর” বলে। একটা মেস করা হল, ডাল আর ভাত—সস্তার মাছও বাদ। আমি মাঝে মাঝে মাছ কিনে নিয়ে গিয়ে ভজকট করতুম। রসগোল্লা আট আনা সের,—মাঝে মাঝে কিছু খেতুম ও খাওয়াতুম।

মাইল দু-আড়াই দূরে রেকাবীবাজার, বেশ বড় বাজার,—কয়েক শত মুসলমান কলুর বাস,—তাদের ডাকাত বলে ডাকনাম ছিল,—নদীতে কিস্তী মারা যেত আগে—এখন সেখানে হয়েছে কংগ্রেস ও খিলাফত কমিটি—একসঙ্গে একত্রে—সেক্রেটারী একজন মুসলমান—সংগঠক ও নেতা আমাদের দলের সুরেন মজুমদার—২৫০ জন কলু ভলান্টিয়ার এক কথায় ওঠে বসে,—সব অহিংস। কংগ্রেসের সস্তা সংগঠন সব জায়গায় চেয়ে বেনী। বরাবরই সমানে বিলাতী কাপড়ের দোকানে পিকেটিং, বিবাদ রিসম্বাদ, মামলা মোকদ্দমার সালিশী বিচার প্রভৃতি সব জায়গায় চেয়ে গফল। দোকানের সামনে খন্ডরের হাক প্যাণ্ট কুর্তা-টুঙ্গী পরিহিত কলু ভলান্টিয়ার বসলেই হল, দোকানে কেউ যাবে না। পিকেটিং তুলে নেওয়ার ব্যবস্থা হল, বিলাতী কাপড়ের গাঁট বেঁধে কংগ্রেসের ছাপ মেরে দেওয়া হবে, সে গাঁট

আর খোলা চলবে না, কংগ্রেস অফিসে কিছু জরিমানা দিতে হবে, আর, যে কদিন পিকেটিং করতে হয়েছে, ভলান্টিয়ারদের মাথা-পিছু আট আনা হিসাবে রোজ দিতে হবে। সুরেন মজুমদারের প্ল্যান।

সালিশী বিচারেও দু পক্ষই সম্মত হয়ে কংগ্রেস অফিসে কিছু কিছু সেলামী দিয়ে যেত। সব চেয়ে স্বচ্ছল কংগ্রেস খিলাফত কমিটি।

আমার হাতের টাকা-কড়ি ফুসিয়ে এল; একবার বাড়ী গিয়ে দেখে শুনে আসারও দরকার। ওদিকে জীবনেরও একবার মুন্সীগঞ্জে আসা দরকার। বন্দোবস্ত হল, আমি উত্তরপাড়া বিজ্ঞাপীঠে গিয়ে জীবনের জায়গায় দিন পনেরো বসবো, জীবন মুন্সীগঞ্জ ঘুরে যাবে।

গেলুম উত্তরপাড়া বিজ্ঞাপীঠে। সেখানে কিছু ছেলে লেখাপড়াও শেখে, অমরদার ছেলেরাও সেখানেই পড়তো, আর নানা জায়গার বিপ্লবী রিক্রুট কতকগুলি ছেলে সেখানেই থাকতো। সকালে খবরের কাগজ পড়ার মধ্য দিয়ে তাদের বৈপ্লবিক শিক্ষার কাজ চলতো। তখন সেখানে বরিশালের অনন্ত চক্রবর্তী, চট্টগ্রামের রাখাল দে প্রভৃতি ছিল, যারা পরবর্তীকালে দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলায় দণ্ডিত হয়েছিল।

একবার বাড়ীতে গিয়ে সবাইকে আপ্যায়িত করে এলুম, এবং গোপনে ব্যবস্থা করে বাড়ী ও জমি বন্ধক দিয়ে ৮০০০ টাকা সংগ্রহ করে ফেললুম। সর্গাদি মহাজন যা খুসী লিখে নিলে, আমি নির্বিবাদে সই করে দিলাম। খুব গোপনে ভাণ্ডারী কাছে টাকাগুলো রেখে, কিছু বাণী-টানী দিয়ে কিছু টাকা নিয়ে মুন্সীগঞ্জে ফিরে এলুম। ভাণ্ডার পড়াশুনো বন্ধ হয়েছিল, তাকেও নিয়ে এলুম মুন্সীগঞ্জে। জীবনের বাড়ীতে থেকে সে দ্বাশাক্তাল স্কুলে পড়তে লাগলো।

হুদিন বাদে শেষ সংগ্রাম আসবেই, কে কোথায় থাকবে বা মরবে কিছুই ঠিক নেই, কিসের বাড়ী? কিসের সংসার? মনটা চাঙ্গাই হল।

[কমশ:]

প্রতীক্ষা

হুদীন চট্টোপাধ্যায়

বিমর্ষ বসন্ত কত বিপ্রলঙ্কা-ময়ূরী-ডানায়
আমার আকাশে বসে উৎকর্ষ হতাশাস ভিড়
জমিয়ে তুলেছে স্নান অবসন্ন সন্ধ্যার কিনারে
কত মরা কোকিলের শব্দে ভরে আছে মহুয়ার নীড়।

কত মীড় হারিয়েছে, কত গান হয়েছে ক্রন্দন
অনাচ্ছাত ফুল ধরে শুকতার কত হলো স্নান
দ্রাবিড় আকাশে কত দগ্ধকাম অতম্বু বৈদে ফেরে
কত দিন নীরব সেতারে ওঠেনি কো ভৈরবের তান।

সেদিন দেখেছি কত বালবুধ্য নব আশা-বাসনা রক্তিম
কত ফুল, আহা, কত সুর—জানি, তুমি এনেছিলে মুঠোভরা প্রাণ।

এ শ্রাবণের মরা সাঁঝে অতীতের স্মৃশান জাগিয়ে
শবরী-প্রতীক্ষা যদি স্বরা শিউলির পথে আসে কোন বসন্তের গান।

অচ্যুত অক্ষয়
শ্রীমদ্রামানন্দ
অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়

১৩

নবদ্বীপে ঈশ্বরপুরীর আবির্ভাব হল।

কে ঈশ্বরপুরী?

পূর্বাশ্রম কামারহাটি, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ। আর কিছু পরিচয় নেই? আছে। মহাপ্রেমনিকেতন মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য।

কে মাধবেন্দ্র?

চেননা তাকে? মাধবেন্দ্রই তো লৌকিক লীলায় শ্রীগৌরঙ্গের দীক্ষাগুরু।

থাকবার স্থায়ী কোনো স্থান নেই, তীর্থে-তীর্থে ঘুরে বেড়ায় মাধবেন্দ্র। অযাচক। অযাচিত ভাবে ফল-দুঃ পেল তব খায়, নচেৎ নিরুপ উপবাস।

ব্রজমণ্ডলে এসেছে মাধবেন্দ্র। গোবর্ধন প্রদক্ষিণ করে সঙ্কায় বসেছে গোবিন্দকুণ্ডের ধারে। আপনা-আপনি কিছু জোটেনি, তাই রয়েছে অনাহারে। না জুটুক, বসে বসে নামকীর্তন করি।

কোথা থেকে এক গোপবালক এসে হাজির। বললে, ‘আমি এই গ্রামেই থাকি, আমি অযাচকদের খাবার জোটাই। এই নাও, একভাঁড় দুধ এনেছি তোমার জন্যে। নাও, খেয়ে ফেল। ভাঁড় আমি পরে এসে নিয়ে যাব।’

কি মিষ্টি দুধ। মাধবেন্দ্র খেয়ে নিল এক চুমুকে। ফিরে এসে ভাঁড় নিয়ে যাবে বালক, তারই প্রতীক্ষায় বসে রইল। কীর্তন করতে লাগল।

কিন্তু, কই, বালকের আর দেখা নেই।

শেষরাতে স্বপ্ন দেখল মাধবেন্দ্র। এসেছে সেই বালক, মাধবেন্দ্রের হাত ধরে—তাকে নিয়ে এসেছে এক কুঞ্জ, বলছে, আমি কে জানো?

কে?

মধুর হেসে বালক বললে, আমি গোবর্ধনের অধিপতি। আমি গোপাল।

তুমি? ভগ্নন হয়ে তাকিয়ে রইল মাধবেন্দ্র।

জানো, আমার সেবক য়েছে ভয়ে আমাকে এই কুঞ্জে লুকিয়ে রেখে চলে গিয়েছে। আর ফিরে আসেনি। আমার ভারি কষ্ট হচ্ছে এখানে।

কষ্ট? কিসের কষ্ট?

একা থাকার কষ্ট। রোদ বৃষ্টি শীত দাবানলের কষ্ট।

আমি—আমি কী করতে পারি?

তুমিই তো পারো, তোমার জন্মেই তো আমি বলে আছি। তুমি আমাকে এই কুঞ্জ থেকে মুক্ত করো, সেবা-প্রতিষ্ঠা করো আমার।

ঘুম ভাঙল। ব্রজবাসীদের ডাকল মাধবেন্দ্র। তাদের নিয়ে গীতি-পাঁতি খুঁজতে বেরুল। অনেক সন্ধানের পর দেখা পেল গোপালের।

আর কথা নেই, গোবর্ধনের উপর বসিয়ে তার সেবা-প্রতিষ্ঠা করল।

কিছু দিন পরে স্বপ্নে আবার দেখা দিল গোপাল। মাধবেন্দ্রকে বললে, তুমি আমার অঙ্গের তাপ দূর করার জন্যে অনেক সেবা করেছ, কিন্তু জানো, এখনো আমি শীতল হইনি।

কিসে শীতল হবে বলো?

মলয়জ চন্দন লেপন করলে বুঝি শীতল হই। আনবে সে চন্দন?

সে চন্দন কোথায়?

নীলাচলে।

তখুনি যাত্রা করল মাধবেন্দ্র। প্রথমে এল শান্তিপুরে, অদ্বৈতের ঘরে। পুরীগোস্বামীর প্রেমাবেশ দেখে অদ্বৈতের আনন্দ আর ধরে না। বলে, আমাকে দীক্ষা দিয়ে যাও।

অদ্বৈতকে দীক্ষা দিয়ে মাধবেন্দ্র যাত্রা করল দক্ষিণে। এল বেণুগায়, বালেশ্বরের এক গ্রামে। বেণুগায় গোপীনাথকে দর্শন করল, কি কি তার ভোগ লাগে জানতে চাইল সবিস্তার। তেমনি ভোগ লাগাব গোপালের। জানতে পেল সঙ্কায় যে ভোগ দেওয়া হয় গোপীনাথকে, তার নাম অমৃতকেলি। সে আবার কী জিনিস? সে এক অপূর্ব ক্ষীর, গোপীনাথের ক্ষীর বলেই সবাই জানে। দ্বাদশ পাত্রে তা নিবেদন করা হয়। আহা, তেমন একটু ক্ষীর যদি পেতাম

আলোকচিত্র

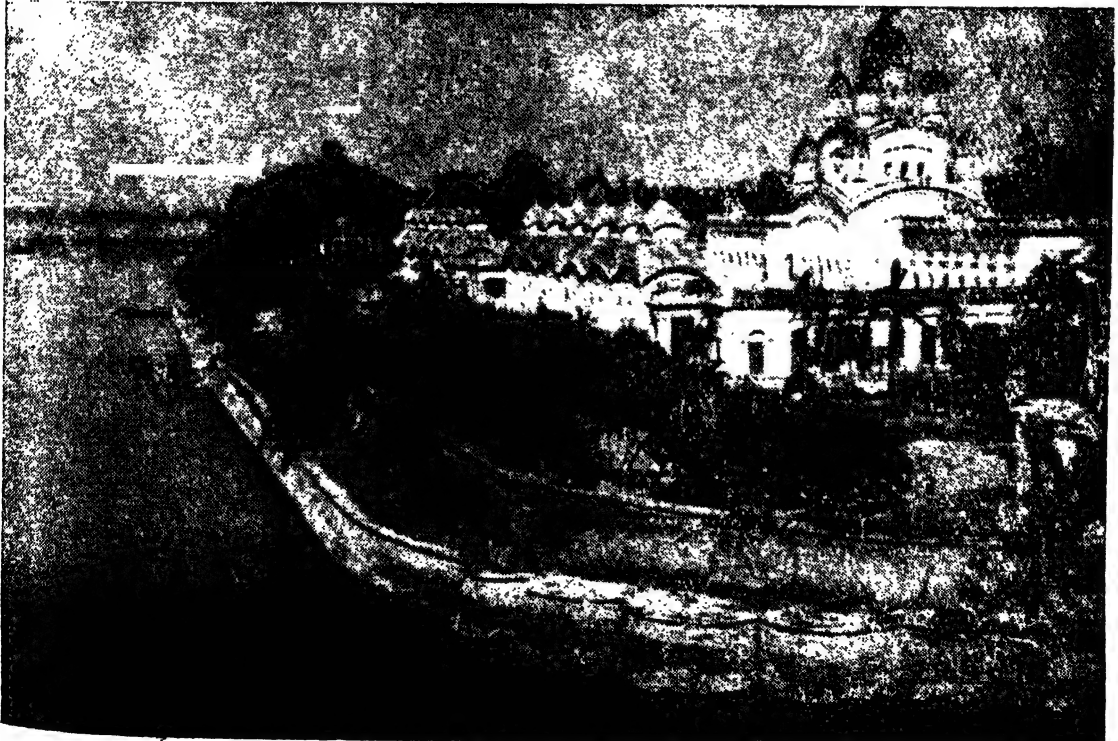
[ছবি পাঠানোর সময়ে ছবির পিছনে নাম থাম ও
ছবির বিষয়বস্তু যেন লিখতে ভুলবেন না ।]

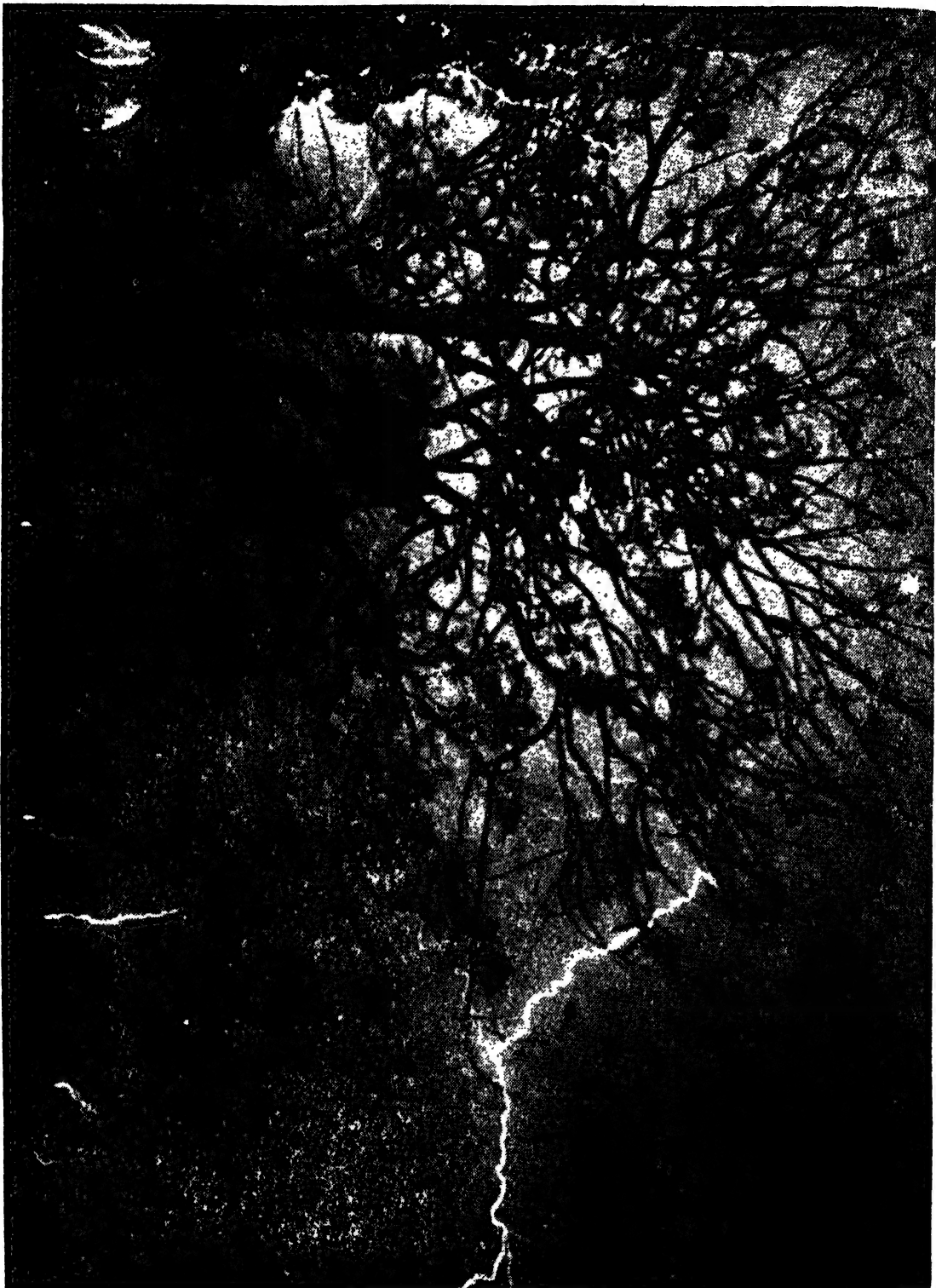
প্রতীক্ষা

—বহু বন্দ্যোপাধ্যায়

দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির

—মিহির বন্দ্যোপাধ্যায়







বেয়াই-বেয়ান

—জানকী সুখোপাধ্যায়



ব্যাগ-পাইপ (নেপাল)

—রঞ্জিত মিত্র

অযাচিত, দেখতাম খেয়ে কেমন তার স্বাদ-গন্ধ। যদি ভালো হত অমনি করে রেঁধে খাওয়াতাম আমার গোপালকে।

ছি, ছি, আমি না অযাচক-বৃত্তি গ্রহণ করেছি? তবে আমার মনে ক্ষীর পাওয়ার, ক্ষীর খাওয়ার বাসনা কেন? নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগল, কাউকে কিছু না বলে মন্দিরপ্রাঙ্গণ ছেড়ে চলে গেল অন্তমনে। গ্রামের শূণ্যহাটে বসে কীর্তন করতে লাগল।

এদিকে পূজারী গোপীনাথের শয়ন দিয়ে ঘরে গিয়ে ঘুমিয়েছে, স্বপ্ন দেখল। গোপীনাথ বলছে, ওঠ, দরজা খোল। আমার ভক্ত মাধবেন্দ্রের জন্তে একভাঁড় ক্ষীর লুকিয়ে রেখেছি। যাও তাকে দিয়ে এস। সে শূণ্য হাটে বসে আছে একা-একা। কোথায় ক্ষীর, কোথায় লুকিয়ে রেখেছ? পূজারী অবাক মানল। আমার মায়ায় তোমার তা চোখে পড়েনি, সেই ক্ষীর আমার খড়ার ঝাঁচলে লুকানো আছে।

পূজারী ছুটে গিয়ে মন্দিরের দ্বার খুলল। কি আশ্চর্য, গোপীনাথের বস্ত্রাঞ্চলের নিচে ক্ষীরভাণ্ড।

ক্ষীরের ভাঁড় নিয়ে ছুটল পূজারী। কিন্তু কে মাধবেন্দ্র, এত রাতে কোথায় কোন ভাঁড়ে লুকিয়ে আছে? হাটে ঢুকে ডাকতে লাগল চাঁচিয়ে, কে মাধবপুরী, কোথায় আছ, বেরিয়ে এস শিগগির। তোমার জন্তে গোপীনাথ ক্ষীর চুরি করেছেন। চুরি করে পাঠিয়ে দিয়েছেন আমার হাতে।

সাড়াও নেই শব্দও নেই, কোথায় মাধবেন্দ্র? গোপীনাথের স্বপ্ন কি তবে মিথ্যে?

বিহ্বলের মত বেরিয়ে এল মাধব। এই যে আমি, কোথায় আমার গোপালভোগ?

প্রেমশ্রবণবিগলিতনেত্র মাধবকে দেখে পূজারী গিমুগ্ধ হয়ে গেল। প্রণাম করল দণ্ডবৎ। এমনটি না হলে কি গোপীনাথ নিজ চোর সাজেন! চুরি করেন ভক্তের জন্তে, ভক্তপরিবশ হন।

মাধবের হাতে ক্ষীরভাণ্ড তুলে দিয়ে চলে গেল পূজারী। মাধব সেই ক্ষীরপ্রসাদ গ্রহণ করল। সর্বান্তে অমৃতায়িত হয়ে উঠল।

ভাণ্ডটা ভাঙল টুকরো-টুকরো করে, টুকরোগুলো বেঁধে নিল বহির্বাসে, ইচ্ছে একেক টুকরো খাবে প্রত্যহ। কিন্তু ভয় হল, রাত ভোর হলেই ভিড় জমবে হাটে, দিকে-দিকে স্তুখ্যাতি কীর্তন শুরু হবে।

পূজারী কি চ্যাঁটরা পিটোতে বাকি রাখবে? সবচেয়ে ভয়, আর কিছু নয়, প্রতিষ্ঠার। ভক্তির শত্রুই হল খ্যাতি। সুতরাং এ স্থান ত্যাগ করো, কেউ যেন তোমার না যজ্ঞনা বাড়ায়।

রাত্রি প্রভাত হবার আগেই মাধবেন্দ্র রেমুণা ত্যাগ করল। কিন্তু যে প্রতিষ্ঠা চায় না, প্রতিষ্ঠা যে তারই অগ্রপামিনী।

অন্তত গোপীনাথের তো প্রতিষ্ঠা হল। তার নাম হল “ক্ষীরচোরা গোপীনাথ।”

মাধবেন্দ্র নীলাচলে এল, প্রেমবিহ্বল হয়ে দর্শন করল জগন্নাথ।

পালাবে কোথায়? গোপালের জন্তে চন্দন নিয়ে যাবে না? চন্দনই তো এখন তোমার বন্ধন হয়ে দাঁড়াল। উপায় কি, নিজে ঠাণ্ডা না হই, গোপাল তো ঠাণ্ডা হোক। জগন্নাথের সেবকাদর বললে স্বপ্নবৃত্তান্ত। তারা রাজার লোকদের গিয়ে ধরলে। রাজপুরুষদের আত্মকূল্যে জোঁগাড় হল এক মণ চন্দন আর বিশ তোলা কপূর। বহন করে নিয়ে যাবে কে? রাজপুরুষরাই হুঁজুন বাহক দিয়ে দিল। চন্দন আর কপূর নিয়ে মাধবেন্দ্র ফিরে এল রেমুণায়। যাবার আগে আরেক বার দেখে বাই গোপীনাথকে।

রাত্রে আবার স্বপ্ন দেখল মাধব। দেখল গোপাল এসেছে। মুখে মদিরমধুর হাসি। বলছে, মাধব, তোমার প্রেমচন্দন কত গাঢ় তা পরীক্ষা করবার জন্তে তোমাকে বৃক্ষচন্দন আনতে বলেছিলাম। এ বৃক্ষচন্দন আর তোমাকে বয়ে নিয়ে যেতে হবে না। তুমি এ চন্দন গোপীনাথের অঙ্গেই লেপন কর। তাতেই আমার তাপক্ষয় হবে।

গোপীনাথকে মাথালেই তুমি শীতল হবে?

হব। গোপীনাথের আর আমার একই অঙ্গ।

পূজারীকে ডাকল মাধবেন্দ্র। শোনাল গোপালের প্রত্যাদেশ। হুঁজনে চন্দন ঘষতে বসে গেল আর হুঁজুন লাগল গায়ে মাখাতে। প্রত্যহ চলল এমন বর্ষণ-অক্ষণ। যত দিনে না চন্দন শেষ হল মাধবেন্দ্র থেকে গেল রেমুণায়।

যখন দেহ রাখছে মাধবেন্দ্র, এই বলে কাঁদছে, পেলাম না, পেলাম না, কৃষ্ণ পেলাম না, মধুরা পেলাম না, কিছুই পেলাম না। হে দীনদয়াজি, হে করুণাকর্তন, তোমার অলোককাতর হয়ে ফুরে

বেড়াছি পথে-পথে, কবে তোমার দর্শন পাব ? আর
যত দিন তুমি থাকবে অদর্শনে, কি করব আমি,
কোথায় যাব, কেমন করে আমার দিন কাটবে ?

সেই মাথবেস্তের আশীর্বাদধ্বজ ঈশ্বর। সর্বদা
কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা। একথানা আবার কাব্যগ্রন্থ
লিখেছে, নাম শ্রীকৃষ্ণলীলায়ত। চাদরের নিচে
সবসময়ে রয়েছে সে পুঁথি। অন্তরে-বাহিরে সর্বত্র
অক্ষরকৃষ্ণস্পর্শ।

অলঙ্কিতে আছে নবদীপে। আর কেউ না
পারুক চিনতে পেরেছে গৌরহরি। অন্তত ভক্ত বলে
চিনতে পেরেছে।

কৃপানুধাসরিৎ শ্রীগৌরাজ। নদীর জল যখন কূল
ছাপিয়ে মাঠে এসে পড়ে তখন কী হয় ? সমস্ত
মাঠ জলে ভেসে যায়, ডুবে যায়। কিন্তু কতকণ
দাঁড়ায় জল, কোথায় দাঁড়ায় ? যে সব জায়গা উচু বা
সমতল সেখানে দাঁড়ায় না, সেখান থেকে সরে পড়ে
আন্তে-আন্তে। কিন্তু যে জায়গা নিচু, যে জায়গায়
গর্ত বা খোদল সেখানেই জল দাঁড়ায়, সেখানেই জল
জমে।

গৌরকৃপা সর্বত্র সমান ভাবে বণিত হচ্ছে, কিন্তু
অভিমানের স্বীতি, বা অহমিকার ঔকত্য তাকে ধরে
রাখতে পারছে না। ধরে রাখতে পারছে কে ? ধরে
রাখতে পারছে শূণ্যতা, দীনতা, নিরতিমানতা। এ নয়
যে ভগবান শুধু ভক্তকেই কৃপা করেন। ভগবানের
কৃপা অচ্ছিন্নপ্রবাহা, নিরন্তর তার বর্ষণ হচ্ছে সর্বত্র।
ভক্তই একমাত্র পাত্র যার মধ্যে কৃপা থাকতে পারে,
জমতে পারে। যেমন গর্তের মধ্যে বৃষ্টির জল তেমনি
ভক্তির মধ্যে, দৈন্তের মধ্যে, অহঙ্কারশূণ্যতার মধ্যে
ভগবানের কৃপা।

পড়িয়ে ফিরছে একদিন নিমাই, পথে ঈশ্বরপুরীর
সঙ্গে দেখা। দ্বিধা-কুণ্ঠা নেই, ঈশ্বরকে প্রণাম করল
নিমাই।

‘তুমি কে ?’ জিগগেস করল ঈশ্বর।

‘আমি নিমাই।’

‘কোন নিমাই ?’

‘পড়ুয়াদের পুঁথি পড়াই, আমি নিমাই পণ্ডিত।’

‘তুমি ?’ কত নাম-ডাক শুনেছে, সেই লোক
চোখের সামনে, ঈশ্বর নিনিমেষ তাকিয়ে রইল। তাই
সিদ্ধপুরুষের মত তোমার এমন পরম গম্ভীর শরীর,
এমন প্রেমপরিপূর্ণ চোখ—’

‘আপনি ?’

‘আমি এক কৃষ্ণকথক। কৃষ্ণপ্রস্তাবই আমার
একমাত্র প্রসঙ্গ।’

‘তবে আর কথা নেই। চলুন আমাদের ঘরে।
সেখানেই আজ ভিক্ষা করবেন প্রসাদ।’ সনির্বন্ধ
নিমন্ত্রণ করল নিমাই।

‘তাই চলো। তোমাদের ঘরে গেলে সর্বক্ষণ,
বহুক্ষণ তোমাকে দেখতে পারব চোখ ভরে। তোমার
চোখের দৃষ্টিই তো আমার পরম প্রসাদ।’

প্রহ্লাদকে তার বন্ধুরা জিগগেস করলে, প্রহ্লাদ,
সুখ কিসে ? প্রহ্লাদ বললে, স্বার্থপর হয়ে যদি শুধু
নিজের সুখ খুঁজে বেড়াও, সুখ নেই, পাবে না সুখ।
কিসে পাব তবে ? প্রহ্লাদ বললে, আমাদের একজন
শ্রিয়জন আছে তার নাম আত্মা। সে পূর্ণতৃপ্ত,
নিত্যসুখী, তার কোনো অভাব নেই আকাজক্ষা নেই।
আমাদের কী এমন সেবা আছে না শ্রীতি আছে যে
তাকে আমরা সুখী করব। কিন্তু মজা কী জানে,
যদি আমরা তাকে সুখী করবার জন্তে চেষ্টা করি
তা হলেই আমাদের সুখ হয়। আমাদের সুখ শুধু
সেই আত্মাকে সুখী করবার উত্তম। আর কোনো
উপায়েই, কোনো রহস্যেই, আমাদের সুখ নেই।

দর্পণ দেখ, দর্পণে দেখ তোমার মুখচ্ছায়া। তোমার
ইচ্ছে হল তিলকচন্দনের ফাঁটা কেটে ঐ প্রতিবিম্বকে
সুখী করি। দর্পণের পিছনে হাত বাড়িয়ে প্রতিবিম্বকে
ধরতে গেলে, নিখল সেই ছশ্চেষ্টা। তখন কী কর।
বিশে অর্থাৎ নিজমুখো তিলক চন্দন রচনা করো, তাই
তখন ফুটে উঠবে প্রতিবিম্ব। তুমি হাসলেই প্রতিবিম্ব
হাসে, তুমি সুখী হলেই প্রতিবিম্ব সুখী। তোমার
মাধ্যম ছাড়া প্রতিবিম্বকে ধরাছোঁয়া যাবে না, তোমার
মাধ্যম ছাড়া পৌঁছানো যাবে না প্রতিবিম্ব। তাই
আত্মার সুখেই আত্মসুখ। তাই কৃষ্ণসুখে সুখী—এ
ছাড়া আর পথ নেই, কোশল নেই।

সুতরাং বিচিত্র বাসনা স্বীকার করে কৃষ্ণসুখসাধনে
তৎপর হও। যারা গোবিন্দকে ভালোবাসে তারা
বাসনাকে হেয় করে না, নষ্ট-দম্ব করে না, পূর্ণমাত্রায়
বাঁচিয়ে রাখে। তারা কৃষ্ণের জন্তে ফুল তোলে, মালা
গাঁখে, চন্দন ঘষে, সে মালাচন্দন কৃষ্ণের গলার ছলিয়ে
দেয়। কৃষ্ণের জন্তে তারা গরু দুইয়ে দুধ জাল দিয়ে
ক্ষীর তৈরি করে। কৃষ্ণ দেখে পুঁথি হবে বলে
নয়নে কাজল দেয়, অধরে তাম্বুল লেপে। কটা

আর হাসিকে যুগপৎ উজ্জল করে। লাংগের ক্ষুতির জন্তে গাত্রমার্জনায় তৎপর হয়। অশাসনের চেউ আনে বসনে। সকল বাসনা কৃষ্ণের তৃপ্তির জন্তে উৎসর্গ করে। কা'কে তুমি শারীরিক ক্লেশ বলছ, এ কৃষ্ণভোগ, এ কৃষ্ণস্বাদ, এ কৃষ্ণস্পর্শ। এই আমার আনন্দসন্দোহ। শীতে কি করল গোপী? গায়ের উত্তরায় কৃষ্ণকে দিয়ে নিজে রইল রিক্তগাত্র—কৃষ্ণ যদি উত্তাপে থাকে তাহলে আর আমার শীত কোথায়? কৃষ্ণ যদি আরামে থাকে তাহলে আমার আর ব্যাধি কি।

শান্তি শান্তি—শান্তি তো সুখ নয়। আমি স্বস্তি চাই না, আমি সুখ চাই। শান্তি মানে কি? শান্তি মানে দুঃখনিবৃত্তি, দুঃখ পরিহার। দুঃখ যাতে না ছুঁতে পারে তেমনি একটা সুরক্ষিত অবস্থায় আসা শান্তি। কিন্তু আমার ইষ্ট, আমার উদ্দেশ্য তো নগুৎক নয়, সদর্থক। আমার ইষ্ট, আমার উদ্দেশ্য সুখ। ঘুমিয়ে পড়া নয়, জেগে থাকা।

আর এ সুখ আমার নিত্যসুখ। এ সুখে বয়স নেই করা নেই মৃত্যু নেই, নেই দুর্ধর্ষ কালপ্রতাপ। আমার পাঁচ বছরের গোপাল পাঁচ বছরেরই থাকে। আমার কিশোরকৃষ্ণ নওলকিশোরই থাকে, নিত্য-কিশোর, কোনোদিন সে বড়ো হয় না। আর তুমি যদি তার ষোড়শী সখী হও তুমিও থাকবে তেমনি চিরন্তনৌ স্থিরদেহী। জাগতিক সুখ গোয়ালার ছুধের মত, জল-মেশানো। স্বার্থদোষ কামদোষের হোঁরাচ লাগা। আর ব্রজের সুখ? ব্রজের সুখ খাটি দুধ, শুদ্ধ-শুদ্ধ-মধু স্বাদ, নেই একবিন্দু কামস্বার্থের গন্ধ। নিজসুখে তাৎপর্য নেই, রাধাকৃষ্ণ সুখী হলেই আমার অনিবার্য সুখ। আমার অনিবার্য জাগৃতি।

নিমাইয়ের ঘরে আতিথ্য নিল ঈশ্বর।

তারপর কিছুদিন বাসা নিল গোপীনাথ আচার্যের ঘরে। রোজ সেখানে তার কৃষ্ণলীলায়ুত পুঁথি পড়িয়ে শোনায় গদাধরকে। একদিন নিমাই এসে হাজির। নিমাইকে দেখে ঈশ্বরের যেমন কুণ্ঠা তেমনি উৎসাহ। তুমি জগৎখ্যাত পণ্ডিত, তুমি শুনবে আমার পুঁথি? কেন শুনব না? কৃষ্ণকথার কি তৃষ্ণা মেটে?

‘তাহলে শোনো। কিন্তু এক কথা।’

‘কি কথা?’

‘কোথায় কি দোষ-ত্রুটি হয়েছে বলবে সব সরল ভাবে।’

‘দোষত্রুটি?’ নিমাই উত্তেজিত হয়ে বললে, ‘ভক্ত কৃষ্ণের কথা লিখছে তাতে আবার দোষত্রুটি কি। কার সাধ্য কৃষ্ণকথার দোষ ধরে। ভক্তবাক্যে যে দোষ দেখে সেই পাণ্ডী, সেই দোষী। ভক্তের বেরকমই ছন্দ-কবিত্ব হোক, কৃষ্ণের অখণ্ড বিনোদ।’

ঈশ্বরপুরী চূপ করে রইল।

‘যে মূর্থ সে ‘বিষ্ণায়’ বলছে আর যে পণ্ডিত সে ঠিক-ঠিক বলছে ‘বিষ্ণবে’।’ নিমাই বলছে হাসিমুখে, ‘কিন্তু বিষ্ণু কি তারতম্য করছেন? দুই-ই তিনি সমান ভাবে গ্রহণ করছেন। কেন করবেন না? তিনি যে ভাবগ্রাহী জনার্দন।’

মূর্থে বোসে বিষ্ণায়, বিষ্ণবে বোলে ধীর।

দুই বাক্য পরিগ্রহ করে কৃষ্ণ বীর।

ইহাতে যে দোষ দেখে তাহাতে সে দোষ।

ভক্তের বর্ণনামাত্র কৃষ্ণের সম্ভোষ।

আরেক দিন ব্যাকরণের কথা উঠল, আত্মনেপদী না পরস্মৈপদী। নিমাই বললে, ‘যে ধাতুর কথা বলছেন সে পরস্মৈপদী।’

বিচারস-বিচারে ঈশ্বরও পশ্চাৎপদ নয়। সে দেখিয়ে দিল ভুল হয়েছে নিমাইয়ের। ধাতু পরস্মৈপদী নয়, আত্মনেপদী।

হার মানল নিমাই। ভক্তের কাছে ভূত্যের কাছে হার মানতে তার বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা নেই। কিন্তু, যাই বলো, আত্মপদ, অহংকারের পদ নয়; পরপদ, পরমপদই নিভুল। পরমপদই স্থিরতম আশ্রয়।

ঐক্য আবার অবতীর্ণ হলেন কেন? তার মুখ্য বা অন্তরঙ্গ কারণ কি? শুধু প্রেমরসনির্ধাসের আশ্বাদন আর রাগমার্গ ভক্তিপ্রচার।

ভূভারহরণের জন্তে নয়, ভক্তিয়োগবিধানের জন্তে তাঁর আসা।

কি রকম ভক্তি? রাগমার্গের ভক্তি। আত্মসুখ চাই না পরসুখেই পরমসুখ—এই হল প্রেমসার।

[ক্রমশঃ।

[মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন বিশ্বাস ও নির্ভরযোগ্য]

শি শি র=সা নি ধ্যে

রবি মিত্র ও দেবকুমার বসু

২

শিশিরকুমারের কথা বলতে গেলেই হু'টি জায়গার কথা আমাদের মনে পড়ে—৬নং বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীটে গ্রন্থজগতের ঘর আর ২৭৮নং ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের বাড়ীতে তাঁর নিজস্ব ঘর। এ ছাড়া শ্রীরঙ্গম রঙ্গমঞ্চের বা ওখানে যে ঘরে তিনি থাকতেন, তার কথাও হয়ত বলা চলত, কিন্তু অকারণে কথার জাল বুনে সময় কাটানোর প্রয়োজন কি? তবে প্রথম দুটি ঘরে পরিবেশেই তাঁর কথা আমরা শুনেছি বলে, পরিবেশ বর্ণনা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না আশা করছি।

গোলদাঘির আশে-পাশে নানা আকর্ষণ পথচারীদের জন্যে অপেক্ষা করছে, কাজেই তাদের মধ্যে ৬নং বাড়িটির নজরে পড়বার মত কোন স্থানই নেই। একেবারে সেকলে প্যাটার্ণের দোতলা বাড়ি, বাইরের দিকে কাঠের বারান্দা, তার কাঠগুলোও নড়বড়ে হয়ে গেছে, নীচের ঘরগুলোয় সারি সারি বই-এর দোকান—অবশ্য নামকরা কোন কোম্পানী নয়, তাই সাধারণের সঙ্গে পরিচয় এদের অল্প। উপযুক্ত সজ্জা না পাওয়ার দরুনই বোধ হয় বাড়িটা সাধারণের চোখে অপরিস্কার হয়ে গেছে। অথচ বাঙালীর চিন্তাক্ষেত্রে যে সব মনীষীর দান আমরা সর্বদা স্বীকার করি তাঁদের অনেকেই এ বাড়িতে বড় বার এসেছেন।

বাড়ির প্রথম মালিক ডেভিড হেয়ারের নাম আজকের দিনে কোন বাঙালীকেই বোধ হয় বলতে হবে না। এ বাড়ির প্রতিটি কক্ষপত্র সেদিন উনবিংশ শতকের নব জাগরণের অগ্রদূতরা এসে যে রীতিমত সোরগোল তুলতেন তা এই দীর্ঘদিনের বানধানেও আমরা কল্পনা করতে পারি। হিন্দু কলেজের মাতঙ্গরবা ছাত্রদের সঙ্গে এসে ড্যাম-নেটিভ দশা থেকে কি করে মুক্তলাভ করা যায়, তার উপায় নির্ধারণ করান আর নাই করান, কুসংস্কারাচ্ছন্ন বাঙলা দেশবাসীদের আলোকের রাজ্যে আনার পন্থা নিয়ে তুলত তর্ক-বিতর্ক যে করতেন তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। ভবিষ্যৎ জীবনের বিকাশের সম্ভাবনার প্রথম অঙ্কুরোদগম কার কার এ বাড়ীতেই হয়েছিল তার খবর আমাদের জানা নেই; জানলে সে যুগের বহু বিখ্যাত মনীষীর নামই সে নক্ষত্র পড়ত তাতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই আমাদের।

ডেভিড হেয়ারের যুগ কাটিয়ে বিংশ শতকের প্রথম দিকে এ বাড়িতে দেখতে পাই আমরা আর একজন বিখ্যাত বাঙালী মনীষীকে। কৃষ্ণকুমার মিত্রের 'সঞ্জীবনী' সে সময়ে বাঙলা দেশে বীতিমত আলোড়ন তুলত। 'সঞ্জীবনী' পত্রিকার বহু বিখ্যাত রচনাই হয়ত তৎকালীন বিদগ্ধ জনসমাজের সামনে পড়া হয়েছিল এবং ফরাসের ওপর বসে পান-তামাক খেতে খেতে সে সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যক্তির স্ফুটন্ত মতামতও হয়ত দিয়েছিলেন।

মোসামশায়ের কাছে শ্রীঅরবিন্দ বা বাবীন্দ্রকুমার বোস এসে অনেক দিন কাটিয়ে গেছেন, আর সেই সময় তাঁদের বন্ধু ও পরিচিত লোকদের সঙ্গে আলোচনা করে বাঙলা দেশে স্বাধীনবাদের জন্মও বোধ হয় এই বাড়িরই কোন ঘরে বসে দিয়েছিলেন তাঁরা।

এমনি বহু মনীষীর আনাগোণার একশ' বছরের ওপর মুখর থেকেছে ৬নং বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীটের বাড়িটি। অথচ সেখানকার বোবা মাটিতে কারো পদচিহ্নই আজ দেখা যায় না। আজ বাস্তব সমস্ত খরিদারের দল লিষ্ট মাসিক বই কিনতে দোকানে দোকানে হানা দিচ্ছে। তাদের প্রয়োজনের গুণ্ডার বাইরে নজর দেবার মত অবকাশ তাদের কোথায়? অবশ্য সে অবকাশ থাকলে এই বাড়ির একটি ঘরের বৈশিষ্ট্য তাদের নজরে পড়ত।

দরজা দিয়ে ঢুকে হু'পাশের কাঠ দিয়ে ঘেরা দোকানঘরগুলো পেরিয়ে, ওপরে ওঠার সিঁড়ি বায়ে রেখে, ডাইনের কাদা-প্যাচপেচে উঠানটা পেরিয়ে যে ঘরের সামনে দাঁড়াতে হয় তার সাজসজ্জা সাধারণ দোকান-ঘরের মত নয় ঠিক। সামনের দরজার প্যাডেলগুলোতে সুন্দর মাতুরের টুকরো বেত দিয়ে আটকানো। দরজার ঠিক ওপরে চৌকো ভেন্টিলেটরের গায়ে শোলার চাঁদমালা, তার নীচেই সুদৃশ্য কাপড়ের ঝালর।

ঘরের ভেতরে ঢুকে একটু এগিয়ে এলেই, কাঠের ওপর বেত দিয়ে আটকানো মাতুর মোড়া কাউটার। কাউটারের পেছনে গোটা দুই তিন বই ঠাসা আলমারী—এইটুকুতেই দোকানের লক্ষণ। ঘরের বাকী অংশের বেশীর ভাগ জুড়ে একজোড়া তক্তাপোলের ওপর ফরাস পাতা আর তার চার পাশে কতকগুলো মোড়া পাতা। পশ্চিম দিক ছাড়া বাকী তিন দিকে বুকসমান উঁচুতে কাঠের রাক-প্রদর্শনীর কাজে লাগানো হয়। ঘরের এখানে ওখানে শোলার ময়ুর ও অন্যান্য শোলার কাজ। সবটা মিলিয়ে বৈকুণ্ঠখানার চেহারাই ফুটে ওঠে। এখানে প্রায়ই আসতেন শিশিরকুমার। আসতেন রিহার্সাল দিতে, আসতেন নাটক পড়তে, আসতেন আসর জমাতে।

এখানেই হ'ত নব্য বাঙলা নাট্য পরিষদের সাপ্তাহিক অধিবেশন, সেখানে আসতেন, অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পী ভোলা চট্টোপাধ্যায়—বীর আঁকা 'নিউ জেনারেশন' পশ্চিমের দেওয়ালের মাঝখানটা জুড়ে ঝুলছে, তার ডাইনে রয়েছে শিশিরকুমারের বস। একটা ছবি আর বায়ে ফরাসী শিল্পী তুলু লোত্রেকের 'নিজের চেহারা' আর তাঁর জীবনীকার পেয়ের লা মুরের ছবি—রসজ্ঞ পণ্ডিত বিনয়কৃষ্ণ দত্ত, ডাঃ রামচন্দ্র অধিকারী লেখক ও শিল্পী দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, চিত্র ও নাট্য-সমালোচক পঙ্কজকুমার দত্ত, জ্যোতির্ষ বসু-বায়, মহুজেন্দ্র ভট্ট, সাহিত্যিক শিবনারায়ণ বায়, কুমারেশ ঘোষ, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, গৌরকিশোর ঘোষ, অধ্যাপক তারক গঙ্গোপাধ্যায়, ভ্রাণ চক্রবর্তী, কাউন্সিলার তারাপ্রসন্ন মিত্র, কবিরাম বসু, অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অভিনেত্রী করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রামলী চক্রবর্তী প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি। তাঁদের মধ্যে রত্নমালায় মধ্যমণির মত উজ্জল ভাস্কর হয়ে বিবাজ করতেন শিশিরকুমার।

২৭৮ নং ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের বাড়িটার সর্বক্ষে বেন মাখানো আছে একটা শাস্ত্র বিবাদ। সামনের অস্থগাছটার ভেতর খোলা হাঙলা সেন সেই বিবাদের সুরটাই বাজে নিয়ে যায়।

বাড়িটার অবস্থা খুব ভাল নয়, দেখলে মনে হ'ত এই বৃষ্টি ধরলে পড়ে। খোলা নর্দমার ওপর বাঁধানো সাঁকোজাতের জিনিষটার এক পাশে ছড়ানো এক বাশ পাথরের খোয়া। কোন দিন হয়ত রাস্তাটা সারানো হবে তারই প্রতীতিপূর্ব হিসাবে ঢালা হয়েছে তাদের। কিন্তু প্রতীতির চাপে হতভাগ্য পথের অবস্থা হয়ে ওঠে শোচনীয়। কোনরকমে পাশ কাটিয়ে বাড়ির সড়ের এসে দাঁড়ালে প্রথমেই নজরে পড়ে ছ' পাশের দুটো লোকান।

কয়েকটা সিঁড়ি বেয়ে বাইরের ঘরে গিয়ে দাঁড়ালে দেখা যায়, প্রাগৈতিহাসিক গোটা দুই তিন চেয়ার আর রঙচটা একটা চৌকো টেবিল। সাধারণ মধ্যবিত্তের বসার ঘর। এখানে শিশিরকুমারের কোন স্পর্শ আমাদের নজরে পড়েনি।

বাইরের ঘর পেরিয়ে দোতলায় ওঠার সিঁড়ি—সরু সরু উঁচু উঁচু ধাপগুলো গোটা দুই বাঁক নিয়ে শেষ হয়েছে ছোট্ট একটা ছাদে। ছাদের ওপাশেই শিশিরকুমারের ঘর। সে ঘর থেকে বাইরের বড় রাস্তার জীবনের প্রায় কিছুই চোখে পড়ে না। ঘরের মধ্যেও তাই অতীতের স্তব্ধ প্রতীকা, ভবিষ্যতের পথনির্দেশের অপেক্ষায়।

ঘরের একটা দিক ছুড়ে একটা জোড়া খাট, মাঝখানে একটা সোফা, তার পাশে উপরে খানকতক বই আর অ্যাশট্রে। অল্প দিকে ছোট্ট একটা খাট—উনি ঐ খাটেই শোন। ঘরে একখানি মাত্র চেয়ার—কেউ এলে বসতে দেওয়া হয়, লোক বেশী এলে জোড়া খাটে বসে। ঘরের বাকী অংশে শুধু বই—অবিকান্ধাই নাটক, মঞ্চ সম্বন্ধীয় বা সমালোচনা, তার মধ্যে সেক্সপীয়রের গ্রন্থাবলী আছে, আছে অল্প বিদেশী নাট্যকারদের নাটক, নাটক ও মঞ্চ সম্বন্ধীয় বিভিন্ন যুগের লেখা বই, বহু বিখ্যাত ইংরাজ সমালোচকের রচনা সংগ্রহ, বাংলা নাটকের প্রায় সব কাঁটি বই আর কিছু সংস্কৃত কাব্য ও নাটক।

ঘরের তিন দিকের দেওয়ালে তিনটি ছবি—নিউইয়র্কে পৌঁছানোর পরেই তোলা শিশিরকুমারের ছবি। মাইকেলের রূপসজ্জায় শিবিরকুমার—ছবির পাশে বোঝা হয় 'বঙ্গভাষা' কবিতাটি হাতে লেখা আর সমরনাথের সাজে স্তম্ভাচন্দ্র।

ঘরটির সর্বাসঙ্গে শিশিরকুমারের ব্যক্তিত্বের ছাপ। কিন্তু এ শিশিরকুমার গ্রন্থজগতের আসরের মধ্যমণি শিশিরকুমার নন ইনি, এ অনাদৃত কমল হারা যার হাতি একদিন দিগন্ত উল্লাসি ছিল কিন্তু যা ইতিমধ্যেই মৃত্যুতে পর্যবসিত হয়ে পড়েছে।

৩

প্রথম বৈদ্যের কথা আমাদের খাতায় লেখা আছে, দেখা যাচ্ছে সেটা ১৯৫৬ সালের ৩-শে ডিসেম্বর, কয়েক দিন পরেই এটালী কালচারাল কনফারেন্সে (এর আর এক নাম কলিকাতা সংস্কৃতি সম্মেলন, প্রধান শিরী দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের দেওয়া। দ্বিতীয় নামটিতেও বিশেষভাবে পরিচিত উল্লিখিত সাংস্কৃতিক সংস্থাটি) নাট্যাচার্জের অভিনয় করার কথা মাইকেলের ভূমিকায়, তাই রিহাসিয়াল দিচ্ছেন আব অগ্নায় সমস্ত চরিত্র অভিনেতা ও অভিনেত্রীকে দেখাচ্ছেন। কে একজন তাঁর নিজের ভূমিকা বলতে গিয়ে কথাগুলো অস্বস্তিক একটু টেনে বলার নাট্যাচার্জ সেটি সংশোধন করে দিয়ে বলেন—প্রত্যেক লোকেরই একটি না একটি যুগ্মাংশ থাকে।

আকাজ্জার 'আ'টির এইটান আমার মুখে মানায়, অল্প লোকে কপি করতে গেলে মানাবে কেন? সে যে চৌধুরী!

অল্প একজন অভিনেতার কথা উঠলো, মাইকেলে কোনো একটি চরিত্রের জগ্ন তাঁর নাম করা হ'লো। একটু ভেবে নাট্যাচার্জ বললেন—অনেক দিন করেনি, সেই ১৯৪৩ আর এটি ১৯৫৭ হ'লো বলে।

মাইকেলের মন খাওয়ার কথা হচ্ছিল। কথায় কথায় বললেন—Rosy wine কেন বলে? Rosy condition হয় বলে? লাল রঙের এক মদ আছে বটে, কিন্তু সে তো বাচ্চা বাচ্চা ছেলেদের মদ ধরতে শেখানোর জন্তে ব্যবহার হয়।

এই সময় চা এসে পড়লো, ঠুকে দেওয়া হ'লো এক কাপ, একটা চুমুক দিয়েই বললে কী দিলে হে, গরম চিনির সরবৎ?

ব্যস্ত হলাম—সে কি! খুব চিনি দিয়েছে বৃষ্টি?

চিনি তো বেশি দিয়েছেই, তার উপর চা একদম দেয়নি।

ইতিমধ্যে মাইকেলের সম্বন্ধে কে প্রশ্ন করেছেন, তাকে উত্তর দিলেন—মিশ্র ছন্দে প্রথম এলো ব্রজাঙ্গনা কাব্যে। তার আগে পর্যন্ত বাংলা কবিতায় ছিল আইনমাফিক ছন্দ। এই লোকটাই প্রথম নিগড় ভেঙে ফেললো। বাংলা দেশে বিশেষ করে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁকে রেনাসাসের ফাদার বলতেই হবে।

চায়ে চিনি বেশি হয়েছে বলে আমরা ঠুকে চা-টি খেতে ব্যর্থ করলাম, তাতে বললেন—খাওয়ার দিকে মন দিলে রিহাসিয়াল দেওয়া হবে না। তবু কিছুটা চা দিতে যাওয়ায় বললেন—আচ্ছা, দাঁও আধ কাপ, এখন আমার স্বাস্থ্যের দিকে তোমাদেরই নজর রাখতে হবে, আমার এখন কেউ নেই I am all alone একটু থেমে আবার বলতে শুরু করলেন—আমার যে কর্মকর্তা ছিল, সে এখন mentally as well as physically paralysed যা করতে হবে তোমরা নিজেরাই plan করে ঠিক করে নাও।

এই সময় ঢাকা-পরসার কথা উঠল, তাতে বললেন—ঢাকা-পরসা হলে মানুষ মস্ত বড় একটা ভুল করে। ভাবে, তারা একটা মস্ত বড় কিছু হলো। কিন্তু বোঝে না মরলে কেউ তাকে মনেও রাখবে না, সংসারকে কিছু দান করলে তবেই তাকে মানুষ মনে রাখে।

বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন উঠল এবার, বললেন—কোনো বিশ্বাস সত্য নয়। সত্য হচ্ছে আপেক্ষিক, সত্য grow করছে। কেউ কেউ বলে ভগবানও grow করছে। সবাই মনে মনে একটি ঔরঙ্গজের। যে যাব বিশ্বাস জাঁকড়ে ধরে বসে আছে। আর বা হওয়া উচিত নয় তাই হচ্ছে—গোড়া হচ্ছে।

তারপর অভিনয়ের প্রসঙ্গে গেলেন, বললেন—আমার স্তব্ধ বছর বয়স হতে চললো। এ তো আর মিথ্যা কথা নয়! স্তব্ধ বছর সত্য হতে চললো। আমি চাই Playটি ভালো করতে। তোমরা সবাই ঠিক সময়ে দৃক্সে আর বেরোলেই হবে। আমি আবার গৌরদাস তো ভালোই করেছিলাম, লোকেও মন্দ বলেনি।

চা আর দেবো কি না প্রশ্ন করায় বললেন—না, আর চা দিয়ে না। আমি অসুস্থ, মনেও শ্রু হয় নই। তবে লোককে বলতে ভালোবাসি না যে অসুস্থ আমি।

কথা বলতে বলতে হাত থেকে চা-টা চলক গায়ে পড়লো, হাসলেন—দেখেছ, অসুস্থতার মতো কেমন গায়ে এসে পড়লো চা-টা।

‘মাইকেল’ বইটা পাওয়া যায় না এই অমুযোগের উত্তরে বললেন—হ্যাঁ, বইটি ছাপাতে হবে। তারপর জানতে চাইলেন ক’টা বেজেছে, আটটা ?

বললাম—সাতটা ন’টা।

চমকে উঠলেন সময় শুকে, বললেন—এতো সময় কেটে গেল, অথচ কই, রিহাস্যাল তো তেমন হলো না ! উঠে পড়লেন।

বাবার সময় বললেন—আর কিছু গোলমাল না হয় তো আগামী এপ্রিল মাসে we shall meet under এ ছাউনী। তবে সবই ভাগ্য।

পাড়ীতে বেতে বেতে কলকাতার থিয়েটারের ‘বি-মডেলিং’এর কথা হচ্ছিল, তাতে উনি বললেন—আজ তো দেখলাম ; কোন একটা থিয়েটারের বাড়ি তো খুব ভালো করেনি, ঐ রকম হলো বড় হবে ? ও যে পারখানার রং। ট্রেনের কি কিছু Improvement করেছে ? তা যদি না করে থাকে, এতো হৈ-চৈ কেন ? শ্রেফ হুজুগ ?

পরের দিন আবার এসেন রিহাস্যালে। কে একজন হঠাৎ হেসে উঠেছিল, শুনে বললেন—১৮৯১ সালে আমি তখন আট ন’বছরের ছেলে। একদিন এক গৃহীয় সভায় গেছি, সেগানকার এক পাত্রের প্রার্থনার সময় তার অভূত স্বর শুনে থুঁক করে হেসে উঠেছিলাম। তোমরা সে রকম অভূত শব্দ কেউ করে না।

মাইকেলের জীবন প্রসঙ্গে এক সময় বললেন—দেবকী বলে কেউ নেই। ও যে কি করে মাইকেলের জীবনে এলো তা-ও জানি না। আবার এক সময় একজনের কথা সংশোধন করে বললেন—মোসা অর্থাৎ মাসির বর। আমি সেকেন্দ্রলোক, সেকেন্দ্র কথাই বলি। তারপর ছ’নব্ব্ব বাড়ির কথায় বললেন—বাড়িটি তো ঐতিহাসিক বাড়ি।

শ্রীঅরবিন্দ আসতেন শুনে বললেন—আসবেনই তো। না এসে উপায় আছে ? কেউ বাবু তো ওঁর মেসো ছিলেন।

আবার একজন রাজনারায়ণের পাঠ বলতে গিয়ে ভুল উচ্চারণ করেছেন, তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন—বড়কতা নয়—বড়তা। তুমি মধুর বাবা, হিন্দু-লাভিন জানো, পণ্ডিত লোক। অথচ বড়তা উচ্চারণ করতে পারো না। নীচেকার দাঁতের পাটিতে আঙুল দিয়ে চেষ্টা ধরো।

ইতিমধ্যে একজন একটু স্বর করে কথা বসেছে, তাকে বললেন স্বর টেনে বলছো কেন ?

স্বর টেনে বলে বাত্রার, কারণ, সেখানে দৃশ্যপট নেই। কাজেই স্বর করে না বললে আসত না। ট্রেনে স্বাভাবিক স্বরে বলা দরকার।

এবার বললেন—দেবার চোখ সকলের থাকে না। শার্লক হোমসের ছিল। আর কিছু কিছু লোকের ছিল। আর থাকে সাহিত্যিকদের।

নিজের পাঠ বলতে গিয়ে গোঁরের জায়গায় গোকুল বললেন। ভুলটি ধরিয়ে দিতে বললেন—কথাটি ট্রেনে বললেও ক্ষতি হয় না। মধু খাতাল অবস্থায় বলে। তারপর স্বীকার করলেন—বয়েস হয়েছে সব কিছু ভুলে যাচ্ছি। স্মৃতিশক্তিও কমে গেছে।

এর পর মধুর সংস্কৃত কাব্য আবৃত্তির প্রসঙ্গে বললেন—সংস্কৃতে মজা হচ্ছে যে, কোথায় গিয়ে ক্রিয়াপদ পাওয়া যাবে তার ঠিক নেই।

কথা প্রসঙ্গে অতীতের অভিনেতৃত্বের কথা ওঠার উনি বললেন—১৮৮১ সালে তারাবন্দীর বয়স সাত বছর। তারা প্রথম ‘চৈতন্যলীলা’র ম্যাপ ওড়ায়। এগারো বছর বয়সে প্রফুল্ল নাটকে প্রথম বাবু করে।

দানী বাবুর সম্বন্ধে বললেন—দানী বাবুর—গলা ! Wonderful গলা, ও রকম গলা যদি আমার দিতেন ! কিন্তু দিলেন না।

এর পর এলো ২য় জাহ্নবীর। প্রথমে সব লোকজন আসেনি, কাজেই রিহাস্যাল না দিয়ে নানা রকম কথা হতে লাগল। কি যেতে ভালো লাগে না লাগে সেই প্রসঙ্গে বললেন—বাঁধাকপি-ভাতে খেতে বেশ ভালো লাগে। তবে ঈষৎ কাঁচা থাকা চাই। ফুলকপি নেহাৎই অসভ্য। দাঁতে আর জোর নেই। চারটে দাঁত বাঁধানো, তাতে নাকি বেশ শোভা হয়।

অল্প একটি কথা প্রসঙ্গে বললেন—চোন্দো রথীর কথায় আর একটি কথা মনে পড়লো। তখনও মনোমোহন থিয়েটারের Possession ছাড়িনি, তঠাৎ বার্লিজ দামী লুজিশরা এক ভদ্রলোক হাজির। বললেন থিয়েটারের পোষাক করাচ্ছেন, আমাকে দেখে দিতে হবে। তাতে কোনো কাজ ছিল না, রাজী হয়ে গেলুম, ভদ্রলোক বিপণ ষ্ট্রীটের একটি বাড়িতে নিয়ে গেলেন। তেতলার ঘর, তখনও সাজানো হয়নি, শলমা চুমকির কাজ করবার লোকেরা বসে। চারদিকে অনেক ভেলভেট পড়ে রয়েছে। তখন সবচেয়ে ভালো ভেলভেটের দাম ‘গজ-প্রতি এক টাকা চোন্দো আনার বেশি নয়। সব জিগোস করতে একশ, একশ একশ এইরকম বা খুশি বলে গেল। আমাকে অবাক হতে দেখে তিনি বললেন—হ্যাঁ, এগুলো সবচেয়ে ভালো পোষাক, পাবলিক থিয়েটারের পক্ষে অত দাম দিয়ে কেনা সম্ভব নয়। বললুম—সম্ভব হ’ত নয়ই। কারণ সবচেয়ে ভালো ভেলভেট এক টাকা চোন্দো খানা গজ অত দাম হবে কেন ? দর আপনি জানানো না, তা টাকা আপনার হতই থাক। কথাটা তাঁর ভালো লাগল না।

এর পর কথায় কথায় স্বদেশীযুগের কথা উঠল। বললেন—রাজা সুবোধ মল্লিক ছিলেন a Prince among men, ১১-৫ সালের কথা National University হবে, পাঁচ লাখ টাকা পাওয়া গেছে। গোলদীঘিতে সতীশ মুখোজ্য মণ্ডার সুবোধ মল্লিকের টেলিগ্রাম পড়লেন—Another five is to follow.

গান শেখার কথায় বললেন—সন্ধ্যার মুখেই গান গেয়ে নেওয়া ভালো। যার লজ্জা নেই তার যদি শেখবার ইচ্ছে থাকে তো তারা ভালো শিখতে পারে।

সংস্কৃতি সম্মেলনের কথা উঠলে বললেন—সংস্কৃতি সম্মেলন এখন সার্বজনীন দুর্গোৎসবের মত পাড়ার পাড়ায় হচ্ছে। ও সব না করে একটা সংস্কৃতির পত্রিকা বের করো, কাজ হবে। এর পর পত্রিকা প্রসঙ্গে বললেন—বাংলা দেশের এক শ্রেষ্ঠ ইংরাজী দৈনিকের সম্পাদকের নাম করে বললেন, ওকে বলেছিলুম বাঁধা মাইনে দিয়ে একজন ভালো ক্রিটিক রাখো।

মদ খাওয়ার কথায় বললেন—রাম মদ খেতেন, সীতা মদ খেতেন, কেউঁচুও মদ খেতেন ; আর ‘বায়বাজ্যে’ এঁরা মদ খাওয়া বন্ধ করতে চাইছেন। গাঙ্গীজির Sense of humour ছিল না।

এবার রিহাস্যাল শুক্ক হলো। উনি বললেন—লোকের কথা শুনে

কথার ওপর কথা বলবে Prompting এর দিকে কান দেবার ততো দরকার নেই।

আবার ঠর সঙ্গে দেখা হলো ঠর বাসায়—৩১শে জানুয়ারী। একজন কবি নাট্যকারের নাটক পড়াতে নিয়ে গিয়েছিলাম। কথাকে খার শিশিরকুমার বললেন—একটা জিনিষ হয়ত তুমি লক্ষ্য করেছ, আমি কখনো মেক-আপ করে আয়নার মুখ দেখি না। ইচ্ছামিয়ারে জিজ্ঞাসা করি—দেখ, সব ঠিক আছে কি না। ব্যস! নিজের যা চেহারা আছে তার থেকে মেক-আপ করে কি রঙ মেখে কী সন্দেহ লাগবে! আমার তো মনে হয় তা লাগবে না। অবশ্য অস্ত্র সবাই থেকে থেকে মেক-আপ করা অবস্থায় আয়নার সামনে মুখটা একবার দেখে নেয়—কেমন হয়েছে নিজেকে দেখতে।

৮ই ফেব্রুয়ারী শিশিরকুমার এলেন গ্রন্থজগতে। তার ক'দিন আগে থেকে তিনি গিরিশ বাবু না অর্ধেন্দু বাবুর শিষ্য, এই নিয়ে খবরের কাগজে খুব লেখালেখি হয়েছে। তাঁকে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় বললেন—আমি গিরিশ বাবুকে জীবনে তিন-চার বার মাত্র দেখেছি সামান্যসামান্য। কথাবার্তাও বলেছি। অর্ধেন্দু বাবুর সঙ্গে কোন দিন দেখাই করিনি।

অভিনেতা হিসেবে অর্ধেন্দু বাবু গিরিশ বাবুর চেয়ে অনেক বড়। কিন্তু গিরিশ বাবুর ছিল realism, ছিল দর্শক-বিচারের ক্ষমতা আরও একটি কথা, গিরিশ বাবুই বাংলা মঞ্চকে লাইফ দিয়েছেন, মঞ্চকে বাঁচাবার জন্তে সবরকম compromise করেছেন।

প্রত্যেক বড় অভিনেতাই অভিনয় কালে gag ব্যবহার করেন অবশ্য playকে disturb না করে। অর্ধেন্দু বাবু কিন্তু playকে disturb করতেন।

দক্ষ্যজগতে গিরিশ বাবুকে প্রথম দেখি, কিন্তু তখন নাটক দেখার চোখ আমার কোথায়? তবে তাঁর সেই অদ্ভুত চোখ দুটির কথা আজও মনে আছে।

অর্ধেন্দু বাবু কিন্তু ছিলেন অসাধারণ পণ্ডিত।

[এর পর এক বছরের ওপর কোনো কিছু লেখা আপাততঃ পাওয়া যাচ্ছে না।]

১৯৫৮ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখে আবার এলেন গ্রন্থজগতে। সেই সময় পিয়ার্সনের লাইফ অফ ডিকেন্স পড়ছেন। এসেই বললেন—ওহে ডিকেন্স তো লোক সুরিখের ছিলেন না। তারপর নিজেই হেসে বললেন—স্বাভাব পড়তে ভালই লাগে।

নাটক পড়ার কথা ওঠায় বললেন—এলিজাবেথীয় যুগের নাটকগুলো পেলো ভাল হয়। গ্রীক নাটকও পড়া দরকার। তারপর ইবসেন, ইভান্সন এ সব সেনফেনের বই পড়বো।

এই সময় রিহাস্যালের জন্ত লোক জন এসে পড়লো। ক'দিন পরেই বেলেঘাটার সংস্কৃতি সম্মেলনে আলমগীর হবে। রিহাস্যাল শুরু হবার আগে বললেন যে, নিকোলাই মালুচির story of Mughal থেকে আলমগীরের অনেক কিছু নেওয়া। তারপর শুরু হলো রিহাস্যাল।

একজনকে পাঁচ বলতে গিয়ে বললেন—থাম না কেন? Life of acting হচ্ছে pause। জীবনে বতটা থামো, ট্রেন্স থামবে তার চেয়ে বেশি। নইলে লোকে বুঝবে না। লোককে বোকাবার জন্তে revive pause,

আবার পুরোনো যুগের কথা উঠলো। বললেন—দক্ষ্যজগতে দেখেছি, জাস্টি দেখেছি। আরো বললেন—কথা বলতে বলতে আমার মাথায় ছবিগুলো ভেসে ওঠে। শব্দে চিত্র হয়। অবশ্য সে চিত্র definite হয় না। এক এক রকম চিত্রকারে এক এক রকম রঙও ফুটে ওঠে। খুব চিত্রকার করলে লাল রঙের effect আসে।

তখন গিরিশ বাবুর কথায় বললেন—উনি তো রামায়ণ মহাভারত উগরে দিয়েছেন।

আবার আগের কথায় ফিরলেন—কথা দিয়েও ছবি কোটানো যায়। যাত্রাও তাই ওয়ার্ড পেইন্টিং।

নিজেকে কথায় বললেন—আমরা যা কিছু করেছি, মনে মনে অর্ধাৎ কল্পনার বা ভেসে এসেছে তাই করেছি। প্রথম open sky ব্যবহার করি সীতাতো। আলোতে shadow পড়াও বন্ধ করি। কেবল নাচের সময় shadow পড়ে।

ইংলণ্ডের অভিনেতাদের সম্বন্ধে বললেন—অলিভিয়ার হাড়া সত্যি সত্যি নামকরা ভালো অভিনেতা কেউ নেই। ১৯২২ সালের পর ভালো অভিনেতা আর কেউ হয়নি।

দেখী অভিনেতাদের সম্বন্ধে—গিরিশ বাবু, অমৃত বাবু আর দানী বাবু অভিনয় ধারা দেখেছেন তাঁরা জানেন কত বড় অভিনেতা ছিলেন তাঁরা। অমৃত বাবুর বই সম্বন্ধে আলোচনা করা বিশেষ প্রয়োজন।

রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধে একজনের বিরূপ মন্তব্যের উত্তরে বললেন—রঙ্গমঞ্চকে ঘুরার চোখে দেখলে রঙ্গমঞ্চ আপনাকে দেবে কি?

তারপর বললেন—অমর দত্তের জীবনী তাঁর ভাইপো লিখেছেন, তার মূল্য আছে। যুগটাকে ভালো করে চেনা যায়, অমৃত বাবু খুব খারাপ নাট্যকার ছিলেন না। গিরিশ বাবুকে তাঁর যুগ দিয়ে বুঝতে হবে। ওঁরা যদি যাত্রাকে উন্নত করবার চেষ্টা করতেন, ইংরেজী নাটকের মোহে চোখ বুলসে না যেত তাহলে বাংলা নাটকের চেহারা অন্য রকম হতো।

সিরাজদ্দৌলা প্রসঙ্গে বললেন—গিরিশ বাবুর সিরাজ হিরো নয়। রাণী নিতাস্ত ছিলেমামুদ।

পরের দিন আবার রিহাস্যাল। বইটা তখনও শেষ হয়নি। এসেই বললেন—ডিকেন্স মানুষটা ভালো ছিলেন না। জী সন্দেহী ছিলেম, কিন্তু 'তবু এদিক-ওদিক ছিল। ঐ যে কে একটি অভিনেত্রী, তার সঙ্গে খুব গভীর প্রণয় ছিল।

তারপরেই বললেন—সবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধীয় অধুনা প্রকাশিত বই সম্বন্ধে—আমল কথা কিছু নেই তবে কণ্ঠিনেটাল নাট্যকার, ইবসেন থেকে শুরু করে আজকালকার আমেরিকান নাট্যকার, আমার আবার নাম মনে থাকে না, পর্যন্ত সবায়ের কোর্টেশন-কটকিত, অনুবাদ 'অংশটাই ভালো হয়েছে। তবে হোকয়ার ক্ষমতা আছে, অতগুলো বই তো পড়ছে।

ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের কথা উঠল, বললেন—আমাদের সময় ইনস্টিটিউটের কি দিনই ছিল। আমি আর নরেশই ছিলাম best actor আর আমরাই সাধারণ রঙ্গমঞ্চে বোগ দিলাম।

আমাদের মধ্যে আর একজন ছিল, তার নাম ছিল জ্ঞানপ্রিয়। আমরা বলতাম গুরু। বড় মিষ্টি ব্যবহার ছিল। কখনও দলাদলি

হাতে দিতে না। তাঁর অপূর্ণ কণ্ঠ ছিল। খুব যে একটা সাধা-গলা ছিল এমন নয়, তবে স্তন্যভালে লাগতো। একবার সেক্সপীয়রের নাটকের আগে মঙ্গলাচরণ গিয়েছিল, তাই শুনে ও দেশের এক ডব্ললোক বললেন—ও ছেলেটি কে? এখানে পড়ে আছে কেন? ও-দেশে গেলে হস্তায় একশ' কুড়ি ডলার পাবেই।

রবীন্দ্রনাথের 'তপতী'র কথা উঠতে বললেন—তপতী কবে আমার কোনো হৃৎ নেই। কবি অভিনয় দেখেন নি তবে নাটক পাঠ করেছেন। সাজ-পোষাক কেমন হবে তা নিয়ে খড়ো-ভাইপোয় ঝগড়া; কবি বললেন—এই তো ওঁদের জন্তে ঐ রকম পোষাক পরতে হলো। তাতে অবনী বাবু বললেন—তুমি যা দেখো তাই পরবে বল তো, কি করবে বলো?

দৃশ্যপটের কথা জিজ্ঞাস্য করতে কবি অবনী বাবুকে দেখিয়ে বললেন—এদের অক্ষমতার জন্তেই দৃশ্যপট বাদ দিয়েছি। এঁদের তো ধারণা অভিজ্ঞতার পর পৃথিবী আর এগোয়নি, তোমরা নিশ্চয়ই দৃশ্যপট করবে, আমি এসে দেখবো।

তা জহর এমনই দৃশ্যপট করেছিল যে, কি বলবো। শেষ দৃশ্যের দৃশ্যপট এমনি এঁকেছিল যে সীত করতো। আমায় এসে বলল—বড়বাবু আখরোট গাছ তো দেখিনি, তাই আপেলগাছ এঁকেছি। অথচ দেখো, তাঁর আঁকার নাম কেউ দেয়নি এদেশে! তবে 'সীতা'র ভাঙাচোরা দৃশ্যপট দেখেই আমেরিকানবা অবাক হয়েছিল, বিশ্বাসই করতে চায়নি যে কোনো হিন্দুর আঁকা। বলেছিল—এ নিশ্চয় কোনো পশ্চিমী শিল্পীর আঁকা। কিন্তু তারা অত্যন্ত সহজ কথাটি ভুলে গিয়েছিল যে, তাদের দেশে তখন শুধু সমুদ্রের ঢেউ আর জঙ্গল, আমাদের দেশে তখনও ছবি আঁকা হচ্ছে।

তবে একটা কথা বলবো, ওদের উৎসাহ আছে। সীতার নাচ নাচতে চল্লিশ ডলার নিয়ে অনেকগুলো মেয়ে নাচতে এসেছিল। রাধাচরণ আর—(নামটা বুঝতে পারা যায়নি) শেখাতো। ন'টার সময় আসার কথা, ন'টা বাজতে পাঁচ পর্যন্ত কারো দেখা নেই, আর ন'টা বাজতে না বাজতে ঝপাঝপ বাথরুমে পোষাক খুলে ছোটো পোষাক পরে নাচার জন্তে তৈরী। আবার বলতো—নাচ শিখবে কখন। এঁদের এক একজনের সিগারেট খেতে বিশ মিনিট, বাকি সময় হুঁজনে ঝগড়া করবেন তো শেখাবেন কখন আর আমরা শিখবোই বা কী?

ধনগোপাল ভারতীয় অথচ মেলাটে দেখা হতে বলল—আপনার খোঁজ পাইনি বলে দেখা করতে পারিনি। দেশে ফেরার পর অমৃতবাজারে লিখেছে দেখলুম—শিশির বাবু প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা বা পরিচালক হতে পারেন, কিন্তু তাঁর সঙ্গীরা দ্বিতীয় শ্রেণীর ছিল বলেই তাঁর নাটক সার্থক হয়নি।

ভারতীয়দের কাছে বিশেষ কোনো সাহায্যই পাইনি আমরা। Crowd scene এ যারা অভিনয় করেছিল, তাদেরও দু' ডলার করে দিতে হয়েছিল, অথচ চীনা অভিনেতা—(নামটা বুঝতে পারিনি) যখন এসেছিল, তখন ওখানকার চীনারা কী সাহায্যই না করেছিল!

ওদের দেশে জাপানীদের তাড়ালেও চীনাগের অবস্থা ভাঙাই। যে জিনিষ কোথাও মেলে না, তাও China town এ পাওয়া যায়।

কলকাতার China town এরও সেই একই অবস্থা। Canton Hotel ১৯০৮ সালে প্রথম আবিষ্কার করে আমাদের শিবু বড়াল।

এবার আলমগীরের বিচার্যাল শুরু হ'ল। স্বীরোদপ্রসাদ সব্বকে বললেন—স্বীরোদ বাবুর লেখার balance বড় ভাল, একটু ছোট হলেই কানে লাগে। তিনি লিখতে শিখেছিলেন

তবে ওঁর একটা অনুবিধে হয়েছিল, শরীরে কিছু ক্ষীণ ছিলেন ও তাই বীরত্বের কল্পনা কিছু প্রখর ছিল। একজন লোকের ক্ষমতা পাঁচ লক্ষগুণ না বাড়াতে তাঁর আনন্দ হয় না। রক্তেবীরের মন্দিরে রক্তেবীর এক দলকে ঠাণ্ডালো, তার পর দুজনকে দু' বগলে দু' জনকে দুহাতে, আর আর একটাকে দাঁতে করে ধরে চললো।

তার পর রূপনগরের রাজসভায় খামসিংহ যেখানে রামসিংহকে 'কছোয়া' বলে টিটকারী দিচ্ছে সেখানটা বোঝাতে বললেন—কছোয়ারা আসলে কচ্ছ থেকে এসেছিল, হস্ত রাজপুতই নয়। তবে রাজপুতরাও mixed জাতি; কালোও আছে, ফরসাও আছে। ওরা বোধ হয় শকদের (Seythian) বংশধর।

২৩ তারিখেও রিহাস্যাল দিতে এলেন। প্রথমেই কে একজন বুঝি বলেছে আমাদের গভর্নমেন্টকে দেশের কেউ দেখতে পারেন না।

সঙ্গে সঙ্গে চেপে ধরলেন—কেউই যদি দেখতে পারে না ও গভর্নমেন্ট জেতে কি করে?

আর একজন বলল—বোধ হয় রাস্তা করেছে বলে গ্রামাঞ্চলেব লোকদের সুরিধে হয়েছে, ভাই তারা সরকারকে জিতিয়েছে।

সায় দিলেন—তাই হবে, স্রেফ রাস্তা করেই জিতছে ওরা। তার পরেই প্রসঙ্গান্তরে গেলেন Picture-goer বড় ভাল কাগজ ছিল, তবে আজকাল সে ফর্সাও নেই, সে জিনিষও নেই। আবার হৃৎ করে বললেন—আজকাল নিউ মার্কেটে সেক্সপীয়রের বড় বড় প্রডিউসারদের ২১।২২টা দৃশ্যের ছবিওয়ালা বই পাওয়াই যায় না।

বাংলায় কোনো ভালো থিয়েটার সম্বন্ধীয় পত্রিকা ছিল কি না প্রশ্ন করতে বললেন—একটি পত্রিকা কিছুদিন বড় ভালো চলেছিল—নাট্যভারতী, মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় চালিয়েছিলেন। ওতে (হরপ্রসাদ) শাস্ত্রী মশায়ের লেখা ছিল, গিরিশ বাবুর লেখার reprint ছিল।

হৃৎ করে বললেন—আমরা বেশি ইংরেজী শিখে বিপদে পড়েছি! গিরিশ বাবুদের মাটির সঙ্গে যোগ ছিল; সমালোচনা, টমালোচনা পড়েন নি; সেকলে এডিশনে সেক্সপীয়র পড়েছিলেন, কাজেই বুঝে পড়েছিলেন। ম্যাকবেথের অপূর্ণ অনুবাদ করেছিলেন। তবে শিক্ষিতরা তাঁকে চেপে দিয়েছে। প্রমথ চৌধুরী মশায় প্রফুল্ল দেখে বললেন—এই সব 15th class বই নিয়ে শিশির কেন যে মাতামাতি করছে। রবিবাবুই তাঁকে চেপে দিলেন।

পুরোনো কোন কোন অভিনেতা-অভিনেত্রীর অভিনয় দেখেছেন প্রশ্ন করার বললেন—পুরোনো দিনের মধ্যে তিনকড়ির অভিনয় দেখেছি জনায় প্রবীর আর সুভদ্রার ভূমিকায়। আর ক্ষেত্রমণি—ইতিহাসে তার নাম নেই, কিন্তু অমন গয়লা বোঁ—অমন করে 'বুক অঙ্গে যায়' বলা এমনটি আর দেখিনি। বিনোদিনীর অভিনয় দেখিনি।

অপরেশ বাবুর গলা বড় মিষ্টি ছিল—সুরও ছিল।

আমাদের দেশে convention বড় বেশি চলে। তারাসুন্দরীর গলায়ও সুর ছিল, তবে বয়স হতেই মিষ্ট গেল। হাড় বেয়িয়ে লাগাও চলে গেল। আমি বলতুম—তারা মা, ও-সব ছাড়ো।

তা বলতো—বাবা, আমি সেকলেই থাকবো, (মুস্তাফি) সাহেব যা শিখিয়েছেন তাই বলবো।

আমি বলতুম—সাহেব তো শেখারনি, শিখিয়েছেন গির্গিশ বাবু।
তাবাব সঙ্গে অনেক দিন কাটিয়েছি। থিয়েটারে বাইরে তাকেই
সবচেয়ে বেশি টাকা দিয়েছি, মরবাব সমরও টাকা দিয়েছি। তবে
নেয়েবা বলবে কিনা জানি না। তাবা খুব বুদ্ধিমতী ছিল, বাংলা
বই সব পড়েছিল, আর **Problem** তুললে এমন সব কথা বলতো
যে অবাক কবে দিতো।

ইনষ্টিটিউট প্রসঙ্গে বললেন—ইনষ্টিটিউটের ব্যাপারে আগে
গোলমাল কলেজে বিপোর্ট পাঠানো হ'তো, নাম কাটানোর
কলো। আশু বাবুকে বললুম,—থিয়েটার, খেলাধুলো কবতে আসে
গপানে, তা'ব কলো যদি কলেজ থেকে নাম কাটা যায়, ভবিষ্যৎ নষ্ট
হ'ল আর কি মেসাব পাওয়া যাবে?

উনি কললেন—তবে যে ওবা বললে প্রত্য ভালো হবে?

যাদের বাঁচালুম তাবা কিছ্র কোমব বেঁবে আমার বিকলচরণ
বলে লেগে গেল।

শেখানোর কথা'ব বললেন—এখন আর আমার মনের জোব নেই,
অথচ একদিন অনেককেই ত তৈরী করেছিলাম।

সাতা কত দিন বিহার্গাল দিয়েছেন? প্রশ্ন কবাব বললেন—মাসের
পর মাস। মাঠে বিহার্গাল দিতে গিয়ে বই চুবি গেল। লোকে যোগেশ
বাবুকে দোষ দেয়, জানে না তো কত অসুবিধে'ব মধ্যে বই লিখেছেন।
পুবোনো কাঠামোর মধ্যে বাপ'ত হয়েছিল, তবু যা লিখেছিলেন
অপূর্ণ! শাস্ত্রানুগায় বলেছিলেন—সবকিছ্র আনা খুবই সুন্দর হয়েছে।

হঠাৎ কেমন আনমনা হয়ে পড়লেন, বললেন—একটি জায়গা
দাও, আর বছর তিনেক বোব ত'ব বাঁচবে, পুবোনো সমস্ত বছরের
কথা ভুলে নতুন উজ্জমে কাজ করি।

আবাব প্রসঙ্গান্তবে গেলেন—আনি, আজাদ আর জহরলাল
একবয়সী। জহব আমার চেয়ে এক মাস কুড়ি দিনের ছোটো আর
আজাদ ক'মাসে'ব বড়। কাশ্মীরী তলো কাপুরুষ আর বিশ্বাস-
ঘাতকে'ব জাত। হরিশঙ্কর কাউল আর তা'ব 'ভাই- দেওয়ান হয়ে
নানা বাজ্যে'ব খবর দিয়েছে। আর হবি সিন্কে মেয়ে' কলেজে কেউ
দেখতে পাওতো না। সে ছাত্রদে'ব কথা মাষ্টাবদের বলতো, পণ্ডিতের
বাজ্তবঙ্গীব অলুবাদ দেখ, বুঝবে আমার কথা ঠিক কি না।

[ক্রমশঃ।

রাজধানীর পথে পথে

উমা দেবী

ডালে-লটকানো লাল ঘুড়ি

উদার আকাশে'ব অনন্ত নালিমা'ব নয়,

ঘনবিশস্ত পবপুঞ্জ'ব গা'ব শ্রামলিমা'ব নয়,

দৃষ্টি ওদে'ব আসক্ত দেওদাবে'ব ডালে-লটকানো এক লাল ঘুড়িতে।

কোনো দশন গড়ে'নি ওদে'ব একান্ত'ব আকাশ ও পৃথিবী'ব সঙ্গে,

কোনো কাব্য ঘনিয়ে তোলেন ওদে'ব ঢোকে'ব ঐ বিভাব দৃষ্টিকে,

কোনো বিজ্ঞান আনেন ওদে'ব আকাশে'ব কোনো অলুসঙ্কিৎসা।

ওদে'ব হৃদয় চকল—ওদে'ব দৃষ্টি বিহবল

ঐ দেওদাবে'ব ডালে-লটকানো একটা লাল ঘুড়িতে।

শিতাব ক্রোমে আবস্ত নমনে'ব কোনো ইঙ্গিত নেই ঐ লালে'ব মধ্যে—

মাথা'ব শাসনে'ব ভঙ্গিতে উগ্রত হাতে'ব লাল শাখা'ব কোনো আভাস

নেই ঐ লালে'ব মধ্যে—

সঙ্গিনী'ব লাল চাঁদ আর লাল ফিতে'ব কোনো স্মৃতিও নেই

ঐ লালে'ব মধ্যে,—

ও শুধুই লাল ঘুড়ি—দেওদাবে'ব উঁচু ডালে আটকে-যাওয়া

চিব-অগ্রাপ্য তবু চিব-আকাজকা'ব ভুল'ভতায় সুন্দর,

ঐ শিশুচিত্তে'ব মনোহাবিণী ভঙ্গিমা'ব সংলগ্ন—

ঘনবিশস্ত দেওদাবপুঞ্জ'ব ঘন-আন্দোলনে বিভগ্ন,

একটি উথড়ে-আসা কিংবা কেটে-যাওয়া লাল ঘুড়ি

এক হাত লগ্না আর চওড়া শিশুমনে'ব একটি ক্ষুদ্র স্বর্গ—

যার মাজা-দেওয়া সূতোয় বিকবিক করছে কাচের গুঁড়ো

সন্ধ্যাকালীন বস্ত্রিম আলোকের স্পর্শে।

গুবপাঠে নয়—কলকোলাহলে ব্যস্ত ঐ বালখিল্য সন্ন্যাসী'ব দল

অন্ধনয়—ছিন্ন দেহাবরণ—

দে'ব কাক'ব পায়ে নেই জুতো, মাথা'ব কক্ষ চুলে নেই সঁখির

পারিপাট্য,

গায়ে নেই বোতাম-পবা জামা—

ওবা কেউ বা ব্যস্ত ঘুড়ি'ব বড়ো গুণপণ্য'ব, কেউ বা মাজাব—

সেই অন্ধভুক্ত অন্ধনয় কক্ষকার বালখিল্য সন্ন্যাসী'ব দল—

পথই যাদের তপোবন আর দুনিয়া'ব সমস্ত নব-নারীই পয়সা চাওয়ার
মা আর বাপ।

হঠাৎ উঠল হাওয়া—মেঘ এল ঘোরালো হয়ে

বিকেলের সূর্যকে ভুবিয়ে দিল সন্ধ্যাব অন্ধকারের সমুদ্রে—

শনশনে তাব-বেধা হাওয়া'ব কাপতে কাপতে চিড় খেয়ে গেল ঘুড়ির

লাল কাগজ,

হঠাৎ আঘাতে চিড় ধবে যাওয়া বস্ত্রিম হৃদয়ে'ব মতন।

ওরা পালাল উজ্জ্বল'বে বড় বড় বৃষ্টির কোঁটায় নাচতে নাচতে,

ঐ অন্ধভুক্ত, অন্ধনয় মানব-শিশু'ব কষেকটি কল্প আকৃতি'ব উপহাস,

যাদের সব আশাই ঐ লাল ঘুড়ি'ব মতন থাকবে অপ্রাপ্যে'ব উঁচু

শাখায় আটকানো,

যাদের সমস্ত উজ্জমই নষ্ট হবে তল'ভকে পানাব পঙ্ক বাসনা'ব,

যাদের জীবন হঠাৎ একদিন এক ঝড়ে'ব বাড়ে

সব চেয়ে আগে ছিঁড়ে যাবে ঐ ঘুড়ি'ব কাগজ'ব মতন,

ক্ষয়'ত সমাজবন্ধে'ব ছিন্ন ফুসফুসে'ব বস্ত্রিম টুকরো'ব মতন—

উড়ে যাবে অনির্দিষ্ট পথে—কেউ জান'বেও চাইবে না কোথায়।

ঐ ভাবাই নিবে যাদের সব চেয়ে আগে

যাদের মন প্রাণশান্তিতে 'তবঙ্গিত হ'ত—

ঐ দেওদাবে'ব ঘনবিশস্ত পত্র আন্দোলিত শাখা'ব মতন,

আব আকাশ ও পৃথিবী'ব যোগসূত্র যারা রচনা করতে পারত

ঐ বিকবিকে রঙিন মাজা সূতোয় মতন—

ঐ অন্ধনয়, অন্ধভুক্ত পথে বুঝে-বেড়ানো বালখিল্যের দল।

বিদেশিনী

(সিন্ধুপারের উত্তর প্লক)

নীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত

[স্বশাস্ত্র-সার পৌত্র বিকাশ এদেশে ডাক্তারী পাশ করে, স্ত্রী সুখা ও শিশুপুত্রকে রেখে অতিরিক্ত পড়াশুনা করার জন্ত বিলেত চলে গেল, আর ফিরল না—এসব খবর 'নীল শাড়ি' উপন্যাসে লেখা হয়েছে। বিলেতে বিকাশের ছাত্র-জীবনের কাহিনী নিয়েই "সিন্ধুপারে" লেখা। তার পরবর্তী জীবনের ঘটনা এই উপন্যাসস্থানির বিষয়বস্তু। কোনও বিশেষ কারণে বিকাশ তার বিলেতের জীবনের কাহিনী তার ছোট বোন ব্লাকে চিঠি লিখে বিস্তারিত অকপটে দিচ্ছে জানিয়ে।—লেখক]

এক

সেট জন ডোটেল

সলিহল।

ওয়ারউইক শায়ার

ফ্যাণীয়াস

মেহের বোন ব্লা !

এদেশে আমার ছাত্রজীবনের কাহিনী লিখে তোমাকে পাঠিয়েছি। এত দিনে নিশ্চয়ই পেরেছ। এইবার পরিণত বয়সের কাহিনী আরম্ভ করি। ছাত্রজীবনের কাহিনীটি যতটা সম্ভব বিস্তারিত করেই লিখেছি। পড়ে জেনেছ—সে জীবনে এ দেশের কাজ শেষ হলে দেশে ফিরে যাওয়ার সব ব্যবস্থাই হয়েছিল, কিন্তু সহসা কি রকম পড়ল বাধা। তার পরেও দেশে ফিরে যাওয়ার কথা ভেবেছিলাম কিন্তু শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠেনি—কেন, সবই ত জান।

আজ জীবনের অপরাহ্নে ঝাড়িয়ে সমস্ত জীবনটার দিকে চেয়ে একটা জিনিষ মগ্নে মগ্নে উপলব্ধি করেছি যে, আমাদের কোনও কৰ্মই আমাদের ইচ্ছাধীন নয়। আগেই এক জায়গায় তোমাকে লিখেছিলাম—জীবনশ্রোতের কোন সে অতল গভীরে কী যে তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাত চলে উপরে ভেসে ভেসে আমরা কিছুই জানি না। কোনও প্রতিরোধ করার শক্তিও নাই আমাদের, অথচ উপরের তাক্সা-গড়া সবই হয় তারই ফলে, আমরা শুধু হাবুডুবু খেয়েই মরি। এ কোন শক্তির মহালীলা ! আজও সেই কথাই বলি। আমার সে যুগের জীবনটার দিকে চেয়ে ভেবে দেখ—যেদিন দেশের জন্ত রওয়ানা হতে গিয়েও যে আমার যাওয়া হল না, সে কী আমার ইচ্ছারই হয়েছিল ? আমি ত যাওয়ার জন্ত প্রস্তুত হয়ে ট্যান্ডিতে উঠতে বাচ্ছিলাম। হঠাৎ পড়ল বাধা। আমি ত স্বপ্নেও ভাবিনি—ও ভাবে বাধা আসবে। মার্লিনও যে তখন আমার দেশে ফিরে যাওয়ারটাই চেয়েছিল সেটা

সে যুগের কাহিনী পড়ে মার্লিনের চারিত্রের দিকে একটু লক্ষ্য করলেই সহজে বুঝতে পারবে। মনে আছে ত—শেষ পর্যায়ে আমি যখন মার্লিনকে ছেড়ে দেশে যেতে একান্ত কাতর হয়ে পড়েছিলাম, মার্লিনই আমাকে ফিরে যাওয়ার জন্ত উৎসাহ দিয়েছিল, অনুপ্রেরণা দিয়েছিল। তবে ?

চ্যাত তুমি বলবে—তুমি মার্লিনের সঙ্গে প্রেম করতে গিয়েছিলে কেন ? তুমি ভারতবর্ষের সম্ভ্রান্ত, দেশে তোমার সাধনী গুণবতী স্ত্রী বর্তমান, তা সত্ত্বেও বিলেত গিয়ে মার্লিনের সঙ্গে প্রেম করার ফল ত তোমাকে পেতেই হবে। কিন্তু ব্লা ! আমি তোমাকে কথটা আরও একটু তলিয়ে ভেবে দেখতে বলি।

আমার ছাত্রজীবনের সমস্ত ব্যাপারটাই ভেবে দেখ। ডড্‌জনে, মার্লিনের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হল। আমি যে ডড্‌জনে গিয়েছিলাম সে ত মার্লিনের সঙ্গে দেখা করতে নয় ? মার্লিনের অস্তিত্বই আমি তখন জানতাম না। এম্, লগুন ছেড়ে ডড্‌জনে আমি যে খুব খুসী মনে গিয়েছিলাম—তাও ত নয়। লগুনে কাজ শেষ হলে, আমি প্রায় এক মাস বসে ইংল্যান্ডের নানা হাসপাতালে চাকুরীর দরখাস্ত করেছি—ডাক্তারী পরীক্ষা দেওয়ার আগে ছয় মাস হাসপাতালে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার জন্ত। কোন না, ডাক্তারী পরীক্ষা দেওয়ার জন্ত সেটা প্রয়োজন ছিল। আমার ইচ্ছা ছিল লগুনে কিংবা তার কাছাকাছি কোনও হাসপাতালে চাকুরী করি। কিন্তু কই—কোথাও ত কিছু জুটল না ! শেষ পর্যায়ে স্ক্রুর্ন কেম্ব্রিজমায়ারের গ্রাম ডড্‌জনে, সেইখানে হাসপাতালে একটা চাকুরী পেলাম। কাজেই চাকুরীটি আমাকে নিতেই হল।

ব্লা ! এখন তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, ইংল্যান্ডের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন হাসপাতাল থাকতে, কোন শক্তির নীলায় আমাকে ডড্‌জনেই বেতে হল—যেখানে ছিল মার্লিন ? অল্প কোথাও গেলে হ মার্লিনের সঙ্গে আমার জীবন দেখাই হত না।

তার পর ডিভিটনে থাকাকালীন মালিনের সঙ্গে আমার দেখা এবং তার সঙ্গে আমার প্রেমের কাহিনী—সবই জান। কিন্তু আমার একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। মালিনের সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে এমি জনসনের সঙ্গে আমার লগুনে দেখা হয়েছিল। এমি জনসনও স্মরণীয় ছিল। মিশেছিলামও তার সঙ্গে খুব। কিন্তু কই, তার সঙ্গে ত প্রেম হয়নি? মালিনের সঙ্গেই বা প্রেম হল কেন? কোথায় কোন সে গভীরে কি যোগাযোগ ছিল আমার সঙ্গে মালিনের? আমি না হয় দুর্বল চরিত্রের লোক—সহজে অভিভূত হই। কিন্তু মালিন? সে ত খুব দুর্বল চরিত্রের মানুষ ছিল না? তার সেই কথাটা মনে আছে ত? আমার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার আগেই সে তার অন্তরঙ্গ বান্ধবী ডোরোথীর কাছে একদিন চুপি চুপি বলেছিল—আমি জগতে এমন একটি মানুষ খুঁজে নিতে চাই যে, বিশেষ করে তৈরী হয়েছে আমারই জন্য। আমিই বা সেই বিশেষ মানুষটি ইলাম কেন? যখন মনে মনে সে আমাকে সেই মানুষটি বলে বরণ করে নিয়েছিল তার ত কোনও অপরাধ ছিল না? সে ত জানত না আমি বিবাহিত?

আরও ভেবে দেখ—মালিন যেদিন সুনল আমি বিবাহিত, তারপর থেকে সে আমার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করেছিল—মনে আছে ত? যতদূর মনে পড়ে, তারপর দু'মাসের উপর তার সঙ্গে দেখা হয়নি—সে আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়ওনি। সে সময়ের আমার মনের অবস্থার কথা ছেড়েই দাও, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমার যে আমার সঙ্গে মালিনের দেখা হল—সেটা কি আমার ইচ্ছায় না মালিনের ইচ্ছায়? যে ভাবে আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল সবই জান—এ কোন শক্তির লীলা? যদি ওভাবে দেখা না হত সবই যেত চুকে। আমিও এগিয়ে গিয়ে মালিনের সঙ্গে দেখা করতাম না, মালিন ত নয়ই।

হয়ত বলবে—মালিন, ভগবান কখন ক'কে কি অবস্থায় ফেলেন সেটা তিনিই জানেন, তার উপর আমাদের কোনও হাত নেই। কিন্তু যখন যে অবস্থায়ই আমরা পড়ি না কেন, নিজেকে অজ্ঞাতের হাত থেকে বাঁচিয়ে চলা আমাদেরই কর্তব্য। নইলে তার ফল ভোগ করতে হবেই। কিন্তু বৃন্দা! কোনটা জ্ঞান এবং কোনটা অজ্ঞান? এর কি একটা সঠিক মাপকাঠি আছে? অবস্থা-বিশেষে জ্ঞান-অজ্ঞানের রূপ পরিবর্তন হয় না কি?

নরহত্যা ঘোষণা অজ্ঞান, কিন্তু অবস্থা-বিশেষে সেই হত্যাই হয়ে দাঁড়ায় শুধু জ্ঞানই নয়—পুণ্য। এর দৃষ্টান্তের ত অভাব নাই? আরও ভেবে দেখ—মানুষের জ্ঞান অজ্ঞানের মাপকাঠি যুগে যুগে বদলে যায়। স্বয়ং ভগবান রামচন্দ্র যে ভাবে শূদ্রকে হত্যা করেছিলেন, আজকের দিনে কি তুমি প্রাণ-মন দিয়ে সেটাকে সমর্থন করতে পার? অথচ সে যুগে সে কাজের গুরুত্ববোধই করা হয়েছিল।

হাক। ওসব যুগের বড় বড় মহাসমস্তার কথা যদি ছেড়েও দিই অবস্থা-বিশেষে জ্ঞান-অজ্ঞানের রূপ বদলে যায় না কি?

মালিনের জীবনের দিক দিয়েই প্রশ্নটা করি। জমিদারের ছেলে, সুবেশ, সুদর্শন, সুশিক্ষিত রোলাও মালিনকে বিবাহ করতে চেয়েছিল—মনে আছে ত? মালিন তখন আমার প্রেমে ভরপুর মালিন তখন জান—আমি বিবাহিত, আমার সঙ্গে বিবাহের কথা

তখন সে করনাও করে না। তবুও রোলাওকে বিবাহ করতে অস্বীকার করল। মালিন জ্ঞান করেছিল না অজ্ঞান? তার মা—সমসার তখন তার একমাত্র সখল—বব্বীদেবী, বাতে পলু তার মা—তিনি প্রাণ-মন দিয়ে চেয়েছিলেন, এই বিবাহটি হোক, তাহলে তিনি শান্তিতে মরতে পারেন। তবুও মালিন বিবাহ করতে রাজী হয়নি। রোলাওকে বলেছিল—অজ্ঞান কোনও পুরুষের বৃকে আশ্রয় নেওয়ার কথা আমি ভাবতেই পারিনি। আমাকে ক্ষমা করুন। নিজের কাছে সে খাটা থাকতে চেয়েছিল, তাই মায়ের মনে শান্তি দিতে পারিনি সে—অজ্ঞান করেছিল?

আমার দিক দিয়েও কথাটা ভেবে দেখ। মালিনকে ছেড়ে আমি দেশে যাওয়ার জন্য তৈরী হয়েছিলাম, তখন তার প্রধান কারণ বাবা দেশে অনুস্থ, তিনি বেশী দিন না-ও বাঁচতে পারেন, তিনি আমাকে দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়েছেন—এই বকম চিঠি দাদার কাছ থেকে প্রায়ই পাচ্ছিলাম। দেশে যাওয়াতে কি ভাবে বাধা পড়ল জানই ত? দেশে যাওয়া বন্ধ করে আমি কি অজ্ঞান করেছিলাম? রিউম্যাটিক ফিবারের দরুণ মালিনের হাটটা বিশেষ সবল ছিল না; সবই ত জান। তবে, উত্তর দাও। আমি অনেক ভেবেছি—এ সব প্রেমের কুল-কিনারা পাওয়া যায় না।

আরও ভেবে দেখ—উইসবীচের কাজ শেষ হলে আবার ত দেশে ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলাম, কেন বন্ধ হল জানই ত। এখন শুধাই—মালিনকে ইংলণ্ডের জীবনশ্রোতে ও অবস্থায় একলা ভাসিয়ে দিয়ে আমার দেশে চলে যাওয়াটা কি ঠিক হত? আমি কালো, আমি বিবাহিত—আমাবই জন্য সবাই মালিনকে ছেড়েছিল, আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব, সমাজ। কেউ ছিল না আর তার। তখন আমার কি করা উচিত ছিল—তুমিই বল।

বৃন্দা! আজ জীবনের অপরাহ্নে দাঁড়িয়ে এইটেই বুঝছি—জগতে জীবনের যাত-প্রতিযাত, এমন কি আমাদের তথাকথিত কর্তব্য কিছুই আমাদের ইচ্ছাধীন নয়। সবই নির্ভর করে অবস্থাবিশেষের উপরে, আমাদের মনের গঠনের উপরে, বার কোনটার জন্যই আমরা দায়ী নই। আমি অবস্থা সাধারণ মানুষের কথাই বলছি—তপস্বাসিদ্ধ মহামানবদের কথা বলছি না। কেন? আমাদেরই দেশের মহাশাস্ত্র কেনোপনিষৎ-এর গরুটি জান ত? অগ্নি-বরুণের মত দেবতাদের পর্যন্ত একটি তুণখণ্ড নড়াবার শক্তি নাই—তার ইচ্ছা ছাড়া। আমি materalist নই। আমি ভগবানে বিশ্বাস করি, মানুষের মনকে অবিশ্বাস করি না। কিন্তু 'মনসো মনো বদ'—মনের মন যিনি, কথের কথা যিনি, সেইখানেই লীলা। আমরা নিমিত্ত মাত্র! অন্তত আমার ত তাই মনে হয়; আমি অবস্থা এ সব মহাসমস্তার কতটুকুই বা বুঝি? আমার নিজের জীবনের কর্তব্য সম্বন্ধে আমি এ সব কথা বলছি না বৃন্দা! তা যদি মনে কর আমাকে ভুল বুঝবে। আমার ছাত্র-জীবনের কাহিনীর গোড়ায়ই আমি তোমাকে লিখেছিলাম, আমি তোমার কাছে বিচারপ্রার্থী নই। লিখেছিলাম পৃথিবীর স্রষ্টা সা মানুষের আদালতে সুবিচার না পেয়ে তাঁরই বড় আদরের গল্পর কাছে বিচারপ্রার্থী হয়েছিলেন। তাই লিখেছিলেন 'এত বড় দীর্ঘ আত্মজীবনী।

কিন্তু আমি তোমাকে লিখেছিলাম, আমার বিচারের ভার রইল ভবিষ্যতের গর্ভে তোলা। আজও সেই কথাই বলি।

দুই

আমার এ দেশে ছাত্র-জীবন শেষ হয়েছে—প্রায় বারো বৎসরেরও বেশী। আমি এখন ম্যানচেষ্টারের সম্মিলিত সহর সেল-এ ডাক্তারী করি। সেলের ওস্ত হল লেনে আমার নিজেরই বাড়ী এবং সেল রেলওয়ে স্টেশনের কাছাকাছি আমার বাড়ী থেকে মাইলখানেক দূরে মরদেনডেন রোডে আমার সাক্ষারী।

আমার এখানকার দৈনন্দিন জীবনের মোটামুটি একটা বিবরণ দিই। সকালবেলা নিজের বাড়ীতে ব্রেকফাস্ট খেয়ে এই বেলা সাড়ে নটা আন্দাজ আমি সাক্ষারীতে যাই। সেখানে আমারই তালিকাভুক্ত রোগীর দলের মধ্যে অনেকে এসে অপেক্ষা করে আমাকে দেখাবার জন্য। একে একে তাদের দেখে কিবে আসতে আমার বোজই প্রায় একটা বাজ। বাড়ীতে ফিরে এসে লঞ্চে (মধ্যাহ্ন ভোজন) খাই। তারপর দুই তিন ঘণ্টা বিশ্রাম করি। বিকালে সাড়ে পাঁচটা আন্দাজ 'চা' খেয়ে আবার যাই সাক্ষারীতে। দশটা দুই সাক্ষারীতে থেকে বাড়ীতে আসি ফিরে। বিকালের দিকে সাধারণত রোগীর ভীড় কম হয়। সাক্ষারীতে আমার একজন সেক্রেটারী থাকেন—মিস হলওয়েল। বয়সী মহিলা কিন্তু বিশেষ কণ্ঠনিপুণ। সাক্ষারীতে একজন লোকের থাকার ব্যবস্থা আছে—তিনি সেইখানেই থাকেন। মিস হলওয়েলের বাড়ী ম্যানচেষ্টারে। প্রত্যেক শনিবার কাজের পরে তিনি বাসে ম্যানচেষ্টার চলে যান এবং সোমবার প্রত্যুষে এসে কাজে যোগ দেন। তাঁর প্রধান কাজ রোগীদের সঙ্গে টেলিফোনে কথাবার্তা বলে আমার সঙ্গে দেখা করাবার ব্যবস্থা করা এবং তার হিসাব রাখা। প্রয়োজন মত তিনি সাক্ষারী থেকে বাড়ীতে আমাকে টেলিফোন করে আমার পরামর্শ নেন।

রবিবার দিনটা আমার ছুটি—অর্থাৎ সাক্ষারী বন্ধ থাকে। বিশেষ কোনও জরুরী রোগীর একান্ত প্রয়োজনে হয়ত তাকে বাড়ীতে গিয়ে দেখে আসি। এছাড়া সপ্তাহে আর এক দিন—বৃহস্পতি—বিকেলের দিকেও সাক্ষারী থাকে বন্ধ—মিস হলওয়েলের ছুটি। তিনি মাঝে মাঝে বৃহস্পতি দুপুরেও ম্যানচেষ্টার চলে যান। সেল থেকে বাসে ম্যানচেষ্টার যেতে মিনিট পঁয়তাল্লিশ লাগে।

* * * *

সেলের ওস্ত হল লেনে আমার বাড়ীখানির একটু পরিচয় দিই। লাল রংয়ের ছোট একটি স্থিতল বাড়ী—ছবির মত দেখতে। বাড়ীর সামনে রাস্তার দিকে একটি বাগান এবং তার পাশ দিয়ে বাড়ীর গা-বেঁধে একটি লাল ঘোরান রাস্তা শেষ হয়েছে রাস্তার দিকে দুটি ফটকে—গাড়ী ভিতরে এসে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য। এই দুটি ফটকের মধ্যে রাস্তার রেলিংয়ের ধারে তিনটি নাস্তিনীর্থ লার্ক গাছ—কতকটা আমাদের দেশের ঝাউ গাছের মত দেখতে। বাড়ীর দু'পাশে সারি সারি কয়েকটি স্প্রুস (Spruce) গাছে বাড়ীটির শোভা বাড়িয়ে দিয়েছে। বাগানে সবুজ ঘাসের উপর ছড়ান নানা ফুলের বিছানা। একটা মালী আছে—সপ্তাহে তিন দিন বাগানের কাজ করে দিয়ে যায়।

বাড়ীটির মাঝখান দিয়ে সিঁড়ি—এক তলায় এক পাশে একটি বড় ঘর, আর এক পাশে দুটি। বড় ঘরটি লাউজ অর্থাৎ বসবার ঘর—পুরু কার্পেট পাতা এবং খানকরের গদিজাঁটা কোচ দিয়ে সাজান। ওপাশের দুটি ঘরের মধ্যে একটি

খাবার, এক অপরটি ভাঁড়ার ইত্যাদির জন্য ব্যবহার করা হয়। এই ঘরটির সলয় রান্নাঘর। দোতলায়, একতলায়ই অল্পরূপ—এক পাশে একটি বড় ঘর এবং অন্য দিকে দুটি। তিনটিই শোবার ঘর বড় ঘরটা আমাদের, এবং ওপাশের দুটি সাধারণত: পড়েই থাকে, কখনও কোনও অতিথি এলে থাকতে দেওয়া হয়।

আমাদের! হ্যাঁ, মার্লিন এখন আমার বিবাহিতা স্ত্রী। আজ প্রায় বারো বৎসর হল আমাদের বিবাহ হয়েছে।

এই বারো বৎসরের কথা মোটামুটি বলি। মার্লিনকে যখন বিবাহ করি তখন আমার উইসবীচ হাসপাতালের কাজটি শেষ হয়েছে। মনে আছে ত কেশিক্সারারের ছোট সহর উইসবীচের নর্থ কেমব্রিজসায়ার হাসপাতাল? মার্লিনকে বিবাহ করে চলে গেলাম, গ্রাষ্টারসায়ারের একটি সহর লিডনী—সেখানকার হাসপাতালে একটা চাকুরী নিয়ে। একে ভারতবর্ষের M. B. তার উপর এখানে এসে L. R. C. P. M. R. C. S. পাশ করেছি, হাসপাতালে কাজ করার অভিজ্ঞতাও ইতিমধ্যে হয়েছে অনেক। তাই হাসপাতালে চাকুরী পাওয়া আমার পক্ষে মোটেই কঠিন হয়নি। লিডনীর চাকুরীটি পাকা ছিল, তাই মার্লিনকে নিয়ে সেখানে প্রায় তিন বৎসর ছিলাম।

সেখান থেকে চলে যাই ম্যানচেষ্টারের একটি বড় হাসপাতালে আরও বেশী মাইনের একটি ভাল চাকুরী নিয়ে। সেখানে বছর তিনেক কাজ করার পরে সেল-এর ডাঃ ম্যাকডোনাগের কাছ থেকে তার ডাক্তারী ব্যবসায়িক কিনে নিয়ে স্বাধীন ভাবে সেল-এ ডাক্তারী করতে শুরু করি।

সেল এ ব্যবসায় আমার উন্নতিই হতে লাগলো—ডাঃ ম্যাকডোনাগের রোগী ছাড়া অনেক রোগী ক্রমে এসে যোগ দিল আমারই তালিকায় এবং সেল-এ যাওয়ার বছর তিনেকের মধ্যে ওস্ত হল লেনের বাড়ীখানি কিনে ফেললাম—মার্লিন তাকে সাজাল মনের মতন করে। সামনের বাগানটি মার্লিনেরই পরিকল্পনায় ক্রমে সুন্দর হতে সুন্দরতর হয়ে উঠতে লাগল। বাড়ীটি কেনার পর বাড়ীর কি নাম দেওয়া হবে, এই নিয়ে মার্লিনের সঙ্গে প্রায় মাসখানেক আমার আলোচনা চলেছিল কিন্তু কিছুতেই যেন একমত হতে পারিনি। মার্লিন যেটা বলে আমার সেটা ঠিক মনে লাগে না এবং আমার দেওয়া নামও মার্লিন যেন তেমন উৎসাহের সঙ্গে নিতে পারে না। আমি অবশ্য ভারতীয় নাম দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলাম। ভারতীয় নাম দিতে মার্লিনের যে কোনও আপত্তি ছিল তা নয়, কিন্তু কোনটাই যেন তেমন তার মনে লাগেনি। শেষ পর্যন্ত মার্লিন এক দিন শুধাল তোমার নামটা ঠিক যেন কি বিকো?

বললাম, বিকাশ।

শুধাল—বিকাশ কথাটার মানে কি?

একটু ভেবে বললাম, যা আপনা থেকেই নিজেকে প্রকাশ করে।

বলল তা বেশ। বাড়ীর নাম দেওয়া যাক—বিকাশ, সে বেশ হবে।

হেসে বললাম, না—না। নামটার মধ্যে না আছে ছন্দ, না

আছে সুর। তার চেয়ে নাম রাখ লীনা। ভারি মিষ্ট শোনাবে।

মনে আছে ত মার্লিনকে আদর করে আমি লীনা বলে ডাকতাম।

তাড়াতাড়ি বলল না—না। ছিঃ! লোকে বলবে কি!

সেদিন কথাবার্তা এট পধ্যস্তই হয়ে রইল। পরের দিন সকাল বেলা ব্রেকফাস্ট খেতে-খেতে মার্লিন বলল, বাড়ীর নাম আমি ঠিক করে ফেলেছি—আব কোনও কথা চলবে না।

শুধালাম, কি?

বলল, বিকোলীনা।

হেসে বললাম, লোকে বলবে কি?

বলল, বলুকগে।

সেই নামই রাখা হল।

* * * *

এই বছর বারোটা কথা আমার মনের দিক দিয়েও একটু বলি। মার্লিনকে বিবাহ করার পর থেকে মার্লিন যেন সুখা ঢেলে দিল আমার জীবনে। মোটের উপর কি আনন্দ কি শান্তিতে এই কটা বছর কাটিয়েছি, বুঝা! আমি ঠিক তোমাকে বোঝাতে পারব না এবং এতটুকুও অতিরঞ্জিত করে বলছি না। ঘর-সংসারের কাজে মার্লিন যে এত সুনিপুণ—বিবাহের আগে মার্লিনের এ দিকটা আমার একেবারেই জানা ছিল না। সংসারের প্রত্যেক কাজটি মার্লিনের দৃষ্টির সামনে যেন আপনা থেকে নথুঁত ভাবে নিঃশব্দে হয়ে যেত—কোনও দিকে কোনও ত্রুটি ধরাব উপায় ছিল না। মার্লিন নিজেব হাতেই রান্না কবত, কখনও রান্নার জন্ত লোক রাগেনি, যদিও আমি অনেকবার তাকে সে কথা বলেছি। আজও এ কথা জোর করে বলতে পারি—সে যুগে তার হাতের রান্না খেতে বিশেষ তৃপ্তি পেতাম—কোনও দিন এতটুকুও অরুচি বোধ করিনি। এটুকুও আমার লক্ষ্য এড়ায়নি—যে আমার পছন্দসই খাবারগুলি সে যেন সবই জানত এবং পর পর দু’দিন কখনও সে একই খাবার আনাকে দিত না, কিছু না কিছু পরিবর্তন আনতই।

বসবাসেব বাড়ীখানিকে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখার দিকে তার দৃষ্টি সব সময়ই ছিল প্রথর এবং সে দিক দিয়ে তার কটকে আমি সহজেই মেনে নিতাম। কখন এদিক দিয়ে কিছু বলার কোনও কারণ ঘটেনি। শুধু তাই নয়, এক একদিন সাজ্জারা থেকে বাড়ী ফিরে গিয়ে অবাক হয়ে দেখতাম—হয় শোবার ঘরের কিংবা বসবার ঘরের সাজ্জার ধরণটিতে সে কিছু পরিবর্তন এনে ফেলেছে; হ্যাঁ, এই পরিবর্তনটুকু করার কারণ যে কি তা আমি কোনও দিনই বুঝিনি।

গুণ্ড হল লেনের বাড়ীতে একদিন এই রকম পরিবর্তন দেখে হেসে বললাম লীনা! তোমার মাথায় কিঞ্চিৎ গোলমাল আছে।

মুহু হেসে শুধাল কেন?

বসবার ঘরে বসেই আনন্দের কথাবার্তা হচ্ছিল। বললাম, বড় কৌচটাকে আবার এদিকে এনে কোণাকুণি ভাবে রেখেছ কেন? আগে মন্দ ছিল কি?

বলল, তুমি হুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর ত এই ঘরেই বিশ্রাম কর। আমি দেখেছি—আঙনের ধারে ত ছোট কৌচটা ছিল—তুমি এটোতে বসে পা ছটিকে লম্বা টেনে দাও আঙনের দিকে। কখনও কখনও ঐ ভাবে একটু ঘূমিয়েও পড়। তাই বড় কৌচটাকে আঙনের কাছে দিলাম—দরকার হয় পা তুলে দিয়ে ওটার উপর একটু শুয়েও পড়তে পারবে।

শুধালাম আচ্ছা, তা যেন হল, কিন্তু বড় ফুলদানীটাকে আবার ওদিক থেকে এ কোণে এনেছ কেন?

বলল, নইলে কৌচের পরিবর্তনের সঙ্গে মানায় না যে।

শুধালাম, ফুলদানীর ফুলের রং বদলে গেল কেন? ওটাতে ত বরাবর লাল ফুল রাখ তুমি।

বলল, লাল ফুলটি এ ঘরে অনেক দিন থেকে ছিল ত—বড় একঘেয়ে হয়ে যাচ্ছিল। আমাদের দেওয়ালের রংয়ের সঙ্গে মানাত বলেই এতদিন রেখেছিলাম। আজ বদলে নীল ফুল দিয়ে দেখলাম—কি রকম হয়। কি সুন্দর মানিয়েছে বলত—নীচের কার্পেটের সঙ্গে। তার উপর বড় কৌচটাতে যদি তুমি শুয়ে পড়—সামনেই দেখতে পাবে থোকা-থোকা নীল রংয়ের ফুল। তোমার চোখ ছুটি সহজেই বিশ্রাম পাবে।

হেসে বললাম, লীনা! আমি চলে গেলে তুমি কি খালি এই সবই ভাব?

আমার কৌচের হাতটির উপর বসে এক হাত দিয়ে আমার গলাটা জড়িয়ে ধরে বলল, বুঝলে না—বাড়ী-ঘর-দোর সুন্দর করে সাজিয়ে রাখলে মনটাও সুন্দর থাকে।

হেসে বললাম—কিন্তু মাঝে মাঝে পরিবর্তন কর কেন?

মুখখানা আমার মাথার উপর রেখে একটু চাপা রকমের হাসি হেসে উঠল। বলল, তোমার মনটাকে তাজা রাখবার জন্ত—একঘেয়ে না হয়ে যায়।

বললাম, ওঃ! তাই বুঝি তুমি প্রায়ই বেশভূষার পরিবর্তন কর—বোজই সকালে দেখি, পরিধানে কিছু না কিছু নতুনত্ব আছেই।

এইবার পরিষ্কার খিল-খিল করে হেসে উঠল—মুখখানি যেন লজ্জায় লুকিয়ে ফেলতে চায় আমার মাথার উপর। [ক্রমশঃ।

জ্ঞানের নিধান আদিবিশ্বান কপিল সাংখ্যকার
এই বাঙলার মাটিতে গাঁথিল সূত্রে হীরকহার।
বাঙালী অতীশ লজ্জিল গিরি তুবারে ভয়ঙ্কর
আলিল জ্ঞানের দীপ তিব্বতে বাঙালী দীপঙ্কর।
কিশোর বয়সে পক্ষধরের পক্ষশাতন করি
বাঙালীর ছেলে ফিরে এল ঘরে ঘরের মুকুট পরি।
—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

পাগলা হত্যার মামলা

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ড: পঞ্চানন ঘোষাল

মনিবাবুর নিকট হতে এই তদন্ত সম্পর্কে নাকি-বীণার নামটা আমাদের শুনা ছিল। এই মেয়েটি তার টিকলা নাকের জন্ত এ'পাড়ায় বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছিল। নাকি-বীণা ২নং নীলমণি মিত্র স্ট্রীটের একতলার দুইখানি ঘরে বাস করে। আমরা দুই জন জালবানুর ভূমিকায় অভিনয় করে ঐ বাটীতে প্রবেশ করি। প্রথমে নাকি-বীণার বাড়ীর দুইজন ভৃত্যের সহিত সংলাপ শুরু করে দিলাম। ভৃত্যদ্বয় 'আমরা ইতিপূর্বে তাদের মনিবনী নাকি-বীণার নাম শুনিনি' শুনে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমরা তাদের হাতে একটি করে টাকা গুঁজে দিলে তারা খাতির করে আমাদের ঐখানকার একটি ঘরে বসিয়ে জানালো যে আমাদের কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে, কারণ তাদের গৃহকর্ত্রীর কক্ষে একজন ধনী জমিদার তখনও পর্যন্ত আলোপন্নত আছেন। আমরা এইবার আশ্বস্ত হয়ে ভূত কয়জনের সহিত আলোপ পরিচয়ে জেনে নিলাম যে সত্যিই ঐরূপ একটি ঘটনা ঐদিন ঐ বাটীতে ঘটেছিল। তাদের বিবৃতির সাক্ষিপ্ত সারবাস্তা নিয়ে উদ্ভূত করা হলো।

: ৪ঠা সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা প্রায় ৮-৩০ সময় তারা দিদিমণির নির্দেশমত ছাদের উপর রহস্যকাণ্ড করছিল, এমন সময় একটা বিরাট হাঙ্গা শুনে তারা নোচে নেমে এসেছিল। প্রথমে তারা মনে করেছিল উহা পুলিশের হাঙ্গা, কিন্তু নোচে এসে তারা দেখল তা নয়। প্রায় নগ্নজন গুণ্ডা প্রকৃতির লোক দিদিমণির ঘরে ঢুকে পড়েছে। এদের মধ্যে একজন লোককে তারা ভালো করেই চিনতো। সেই লোকটি হচ্ছে এ পাড়ার নাম করা 'তবলটাবাবু, পাগলাদা'। তাদের মনিবনীর পা দুটো জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠে বলছিল, নাকি! 'যদি পারিস তো বাঁচা আনাকে।' পাগলাবাবুর কথায় দিদিমণি নিশ্চল মূর্তিতে দাঁড়িয়ে রইলেন। একটি মাত্র কথাও তাঁর মুখ হতে বার হলো না। পাগলা কতো কারাকাটি এবং কতো আছড়া-আছড়ি করলো, কিন্তু কেউ তাকে রক্ষা করতে এগিয়ে এলো না। পাগলা নাচার হয়ে ঘরের জানালার একটা রেলিং জড়িয়ে ধরে শুয়ে পড়লো। কিন্তু ঐ লোকগুলো জোর করে তার হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে তাকে চেপে ধরে তুলে বাইরে এনে একটা ট্যান্ডির ভিতর বসিয়ে দিলে। আমরা মনে করছিলাম এদের ঐ অপকার্যে প্রাপণে আমরা বাধা দেবো। এইজন্য মনিবনীর মুখের দিকে আমরা তাকিয়েও ছিলাম। কিন্তু উনি ইসারায় এইরূপ কার্য হতে আমাদের বিরত থাকতে বললেন। এর পর ট্যান্ডিখানা ঐ স্থান ত্যাগ করে চলে গেলে আমাদের গৃহকর্ত্রী তাড়াতাড়ি সদর দরজাটা বন্ধ করতে বলে জানালেন যে 'ওদের সঙ্গে থোকা গুণ্ডা নিজে ছিল। এইজন্য আমরা তাদের বাধা না দিয়ে ভালো কাজই করেছি।

রূপোপজীবনী নাকি-বীণা তখনও পর্যন্ত আপনায় অর্জলবন্ধ কক্ষে

পেশারতা ছিল। এই অসময় তাকে আমরা বিরক্ত করবো কিনা ভাবছি, এমন সময় নাকি-বীণা নিজেই তার কক্ষ হতে বার হয়ে এলেন। বলা বাহুল্য যে, পরিশেষে তাঁর উন্নত নাসিকা আরও উন্নত করে তাকে তাঁর ভৃত্যদেরই অমূল্য একটি বিবৃতি দিতে হয়েছিল। এ ছাড়াও নাকি-বীণার উপদেশানুযায়ী—আমরা ঐ অক্ষয়ে দিদিভাই নামে পরিচিতা অপর আর এক জটনকা মহিলাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্ত ঐ বাটীর দ্বিতলের একটি কক্ষেও গমন করি। ঐ কক্ষে প্রবেশ করা মাত্র দেওয়ালে ঝুলামান বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের একটি স্মৃতিস্মৃৎ আলোকচিত্র আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। এছাড়া ঐ ঘরটি সুদৃশ্য কোচ এবং অস্ত্রাস্ত্র আসবাবপত্রের সম্বিতও ছিল। তথাকথিত দিদিভাই নাম্নী মহিলাটি একজন শিক্ষিতা নারী। ইনি শ্রে স্ট্রীটের একটি বাটীতে পুত্র-কন্তাসহ বসবাস করলেও প্রতিদিন এই কক্ষে সন্ধ্যা ছয়টা হইতে রাত্রি দশটা পর্যন্ত কালাপহরণ করে থাকেন। বহু বৃষ্টিমন্ডল যুবক ঐ সময় এখানে এসে তাঁর সঙ্গে সদালাপ করেন। এই জন্ত এ'পাড়ায় তাঁর এই কক্ষটি এ'পাড়ার 'ওয়েসিস' নামে পরিচিত।

দিদিভাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করে নাকি-বীণা এবং তাঁর ভৃত্যদের বিবৃতির সমর্থনশূচক একটি বিবৃতি লিপিবদ্ধ করে নিই। উপরন্তু তাঁর নিকট হতে ঐ সময়ে ঐখানে উপস্থিত ছিলেন এমন কয়েকজন কৃষ্টি-শ্রী অভিজাত্য সম্পন্ন ভদ্রসন্তানেরও নামধাম সংগ্রহ করে নিই। দিদিভাই-এর মতে ভদ্রসন্তান বিধায় লজ্জাবশতঃ তাঁদের পক্ষে এ'পাড়ার কোনও ঘটনা বাহিরের কাউকে জানানো সম্ভব ছিল না। এর পর এইখানে অবধা আর কালহরণ করা আমাদের পক্ষে উচিত মনে হয়নি। কারণ এখানকার অস্ত্রাস্ত্র সাক্ষীদের বিবৃতি পরবর্তীকালে কোনও এক সময় লিপিবদ্ধ করলে কোনপ্রকার ক্ষতি হবার সম্ভাবনা নেই। এইজন্য ঐ স্থান আর একটুমাত্রও অপেক্ষা না করে আমরা মলিনা নাম্নী অপর এক নারীর বাসস্থান অভিমুখে রওনা হলাম। সাক্ষী মণীন্দ্রবাবু তাঁর বিবৃতিতে ঐই মলিনার নাম বিশেষরূপে উল্লেখ করেছিল।

আমরা এর পর দ্রুতগতিতে ৩২ নং ইমামবল্ল খানাদার লেনে শ্রীমতী মলিনামুন্দরী দেবীর বাড়ীতে এসে উপস্থিত হলাম। আমরা দেখলাম যে, ঐ বাড়ীর বাসিন্দা প্রত্যেকটি নারী তখনও পর্যন্ত ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে রয়েছে। এমন কি, থোকাবাবু নামটা পর্যন্ত তাদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করে থাকে। দেখা গেল যে এরা মলিনা দেবীর কক্ষটি পর্যন্ত দেখিয়ে দিতেও ভয় পায়। বেশ বুঝা গেল যে থোকাবাবু এ পাড়ায় সাক্ষার যমরাজ অপেক্ষাও ভয়াবহ। আমাদের অবস্থান মলিনা দেবীর কক্ষটি খুঁজে বার করতে একটুমাত্রও দেরী হয় নি। কারণ আমাদের নিযুক্ত এ'পাড়ারই কয়েকজন ছদ্মবেশী প্রাইভেট গোয়েন্দা প্রয়োজন মত আমাদের পোশাৎ সংবাদ

সববরাহের জন্ত আমাদের আশে-পাশে ঘোরা-ফিরা করছিল। তাদের ইসারা পাওয়া মাত্র আমরা সদলে মলিনা দেবীর নির্দিষ্ট কক্ষে ঢুকে পড়লাম। কিন্তু সেখানে মলিনা দেবীকে কোথায়ও পাওয়া গেল না। তবে মলিনা দেবীকে না পাওয়া গেলেও সেই কক্ষে তাঁর মাতা সরোজিনী দেবীকে পাওয়া গেল। ঐ ঘরে তখন মলিনার মাতা সরোজিনী দেবী ট্রান্স বান্স গুছিয়ে পুঁটলি-পোটলা বেঁধে ঐ সকল দ্রব্যসহ অন্য কোনও এক স্থানে সরে পড়বার জন্ত প্রস্তুত হচ্ছিল। লগাক্রমে আমরা ঠিক সমগ্রই ঐ স্থানে উপস্থিত হয়েছিলাম, তা না হলে আশ ঘটীর মধ্যে ঐ মতিলাটি কোনও এক অজ্ঞাত স্থানের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গিয়েছিলেন আর কি! ঐইজন্ত ত্বরিত মামলা সম্বন্ধে তদন্তকার্যে সফলতা লাভ করতে হলে সর্বাগ্রে শিপিং বা গতির প্রয়োজন হয়ে থাকে। এর পর আমরা মলিনাস্বন্দরীর মাতা সরোজিনী দেবীকে একটি পীড়াপীড়ি করে নিম্নলিখিতরূপ জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে দিই।

প্রঃ—তুমি তা'হলে মলিনার গর্ভধারিণী মা নও? তা'হাতা'হাতি এখন চলেছে কোথায়? ঐই সব পুঁটলি-পোটলা মেয়ের ঘর হলে তুমি চুরি করে পালাছ? সত্যি সত্যি সব কথা'র জবাব দাও, তা না হলে তোমাকে আমরা গেল্পার কবব। তোমার উপর আমাদের ভ্যানক সন্দেহ হচ্ছে। ঐই সব দ্রব্য সবিয়ে নিয়ে বাবার অধিকার কে তোমাকে দিলে? তুমি তো দেখছি একজন মহা চোর। মেয়েটা কোথায় বেড়াতে গেছে আর ঐই সুযোগে তুমি তার জিনিসগুলো সবিয়ে ফেলাছো, এঁা?!

উঃ—এঁা! কি বলছেন আপনারা? আমি গর্ভধারিণী না হ'লেও আমি তা'হাই মা, বাবা! ঐই এতটুকু বোলা থেকে তাকে আমি মানুষ করেছি। মা কি মেয়ের জিনিস কখনো চুরি করে, বাবা! আমি মেয়ের কাছেই ঐই সব নিয়ে চলেছি। সে এখন আমার উত্তরপাড়ার বাড়ীতে কিছুদিন থাকলে কি না। ধকলে ধকলে বাছার শরীফটা বড় কাড়িল হয়ে গেছে। তাই গাঁয়ে-ঘরে গিয়ে বাছা একটু বিশ্রাম করবে।

প্রঃ—কি করে বুঝবে যে তুমি সত্যি কথা বলছো? মেয়ের জিনিস তো মেয়েই বাবার সময় নিয়ে যেতে পাবত। এ নির্ধাৎ কোনও প্রকারে চাবি সংগ্রহ করে বা খুঁটা চাবি তৈরী করিয়ে ওর নকল মা সঙ্গে তুমি এখানে জিনিসপত্র চুরি কবতে এসেছ। তোমাকে ঐই সব জিনিসপত্র স্বদ্ধ আমরা একুণি থানায় নিয়ে যাব। তবে তোমার মেয়ে যদি বলে এ সব জিনিস তোমাকে সে নিয়ে যেতে বলেছে, তাহলে অবগু তোমাকে আমাদের ছেড়েই দিতে হবে।

উঃ—তা বাবা, এতোই যখন তোমাদের সন্দেহ হচ্ছে তখন তোমাদের একজন না হয় আমার সঙ্গে চलो। আমি তো এখান থেকে দোজা উত্তরপাড়ার আমাদের বাড়ীতেই যাবো। ওখানে গিয়ে আমার মেয়েকে না হয় কেউ জিজ্ঞেস করেই আসুন না—এ সব বা আমি বলছি তা সত্যি কথা, কি না।

উপরে প্রস্তাবের হতে বুঝা যাবে, ঐই জিজ্ঞাসাবাদ ভাষায় বকীদের নিজস্ব পদ্ধতি অনুযায়ী করা হয়েছে। ঐই বিশেষ পদ্ধতিতে সবসরি মূল ঘটনা সম্বন্ধে কখনও প্রশ্ন করা হয় না। বরং মানুষের মনকে বাচ্চাতৃষ্ণ্য সহযোগে কৃত্রিম উপায়ে অজ্ঞত বিক্ষিপ্ত করে, পরে প্রকৃত বিষয়ের অবতারণা

করে তাদের মনের কথা টেনে বার করে আনা হয়ে থাকে। এইরূপ বাক্যজাল সাক্ষীদের স্ব-স্ব কৃষ্টি অনুযায়ী পরিকল্পনা করা হয়ে থাকে। কারণ যে বাক্য-প্রয়োগ স্বল্পশিক্ষিত ব্যক্তিদের প্রতি প্রযোজ্য, তাহা উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিদের প্রতি প্রযোজ্য হয় না। ঐই ক্ষেত্রে মলিনার মাতা চুরির অভিযোগের কথাই ভাবছিল। ঐ সময় খুনের কাহিনী তার মনের মধ্যে স্থান পায়নি। তা না হলে এতো সহজে মলিনার মা আমাদেরকে মলিনারঠিকানা না দিতেও পারত।

উপরোক্ত মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতিতে মলিনার মা সরোজিনীর মনের প্রতিরোধশক্তির হানি ঘটিলে তার স্বাভাবিক মনোবল ভেঙে দিয়ে তার নিকট হতে নিম্নোক্তরূপ একটি বিবৃতিও আমরা আলায় করে নিই।

: আমি মলিনা দেবীর পালিকা মাতা। কিছুকাল যাবৎ আমি উত্তরপাড়ার ঘর বেঁধে বাস করছি। আমার ঐই মেয়ের রূপের খ্যাতি আছে। সে নাচ-গান ভালো জানে। ছিনেমাতেও সে নাম করেছে। আজকাল আমার সে ভাল নামসারা দেয়। তাই এখন উত্তরপাড়ার গাঁয়ে-ঘরে বসে আমি শুধু ভগবানরই নাম করি। তবে সে ব্যবসার জন্তে কোলকাতাতেই থাকে। মঠা সেপ্টেম্বর সকাল সাঁতটায় সে তার মানুষকে নিয়ে হঠাৎ উত্তরপাড়ার আসে এক স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্ত সেখানে সে কিছু দিন থাকতে চায়। কিন্তু সে তার জিনিসপত্র উত্তরপাড়ার নিয়ে যেতে ভুলে গিয়েছিল। তাই আমাকে তার জিনিসপত্র আনবার জন্তে সে আমাকে তার চাবি দিয়ে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে। না, না বাবা! মনের মানুষ কে কার কখন কি করে হয়, তা মা হয়ে আমি জানতে চাইব কেন? আজ্ঞে না, খোকাবাবু নামে কাউকে আমি চিনি না। তবে যে ভদ্রলোক মলিনাকে আমার বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে গিয়েছে তাকে আমি নিশ্চয়ই চিনিতে দিতে পারবো। আজ্ঞে হাঁ, সে কথা ঠিকই বলেছেন আপনারা। মলিনা মাস ছয় হ'লে আমার মাসসারা আশাতীতরূপে বাড়িয়ে দিয়েছে। এছাড়া পত্র দ্বারা সে এ-ও জানিয়েছিল যে ঐ সময় হতে তার আয় ঈশ্বরের কৃপায় তিন চার গুণ বেড়ে গিয়েছে।

এর পর আর কালক্ষেপ না করে আমি উত্তরপাড়া অভিমুখে রওনা হয়ে যাওয়াই শ্রেয়ঃ মনে করলাম। ইন্সপেক্টর সুনীলচন্দ্র রায়কে অকুস্থলে আরও তদন্ত করার জন্ত রেখে আমি একাকী মলিনার মা সরোজিনী সমভিব্যাহারে একখানি ট্যাক্সিযোগে উত্তরপাড়া অভিমুখে রওনা হলাম। উত্তরপাড়ার বাড়ীর দালানে বসে মলিনা বিষয় মনে কি চিন্তা করছিল। এমন সময় তার মাকে নিয়ে আমি সেখানে উপস্থিত হলাম। প্রথমে মলিনা খুন সম্পর্কে কোনও কথা বলতে চায় নি। কিন্তু পরে পীড়াপীড়ি করার পর অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে নিম্নোক্তরূপ একটি বিবৃতি প্রদান করে। তবে তার কখন-ভক্তি এবং মুখাবৃতি হতে বুঝা যায় যে, সে সত্য কথাই বলেছে।

: আজ্ঞে হাঁ! আমি একজন রূপোপজীবিনী নারী। আমার বর্তমান মাসিক আয় এগার বা বার শত টাকা। বর্তমানে ঐই টাকাটা আমার বর্তমান দায়িত্ব খোকাবাবু একাই দিয়ে থাকেন। এছাড়া সিনেমা করে বা আমি পাই তা আমার ফালতু লাভ। খোকাবাবু আসলে কে এবং তিনি থাকেন কোথায় কিংবা বর্তমানে ঈর পেশা কি, তা আমি জানি না এবং কোনও দিন আমি তা জানবার চেষ্টাও করি না। আমার সঙ্গে তার টাকা নিয়ে সম্পর্ক।

দেখ টাকা বন্ধ না করলে এসব প্রশ্ন আমাদের মনে উঠে না। কে ভালো আর কে মন্দ আমাদের মনে এসব প্রশ্নের ঠাই নেই। তবে এ'কথাও ঠিক যে, ভাল লোক আমাদের নিকট কমই আসেন। ও-রকম মানুষ দু'-একজন এলেও তাঁরা বেশীদিন ভাল থাকতে পারেন না। আজ্ঞে হী, মাত্র ছয় মাস হলো খোকাবাবু কেবল আমার ঘরেই আসছে। তাঁর সঙ্গে আমার সন্ত আছে এই যে আর কেউ আমার কাছে আসতে পারবে না। ওঁর সঙ্গে বারা আমার ঘরে গান শুনতে আসেন, তাঁরাই ওঁকে 'খোকাবাবু খোকাবাবু' বলে ডাকেন। এইজন্য আমার কাছেও উনি ঐ নামে পরিচিত। আজ্ঞে হী, মাঝে মাঝে আমার ঘরে গানের মহড়া হলে পাগলাবাবু বলে একজন তবলটী সেখানে তবলা বাজিয়ে যায়। হী, খোকাবাবুর জামানতেও কয়েক বার তিনি আমার ঘরে তবলা বাজিয়ে গেছেন। হী, এ কথা সত্য যে, খোকাবাবু মধ্যে মধ্যে কয়েক দিন পর্যায় উপাও হয়ে থাকতেন। ঐ সময় চেষ্টা করলেও তাঁর কোন খোঁজ বা খবর পাওয়া যেত না। জিজ্ঞাসা করলে তিনি জানাতেন কাজকর্মে তাঁকে প্রায়ই বাইরে যেতে হয়। আজ্ঞে হী, চার দিন উপাও হয়ে থাকার পর ঠাঠ সেন্টেশ্বর ভোর ছয়টার সময় তিনি হঠাৎ আমার নিকট এসে বললেন যে সেই দিনই তাঁকে বিদেশে যেতে হবে। ফিরতে তাঁর প্রায় দুই মাস সময় লাগবে। এই জন্য তিনি আনায় আমার মার কাছে রেখে যেতে চাইলেন। বিশেষ পীড়াপীড়ি করায় আমি তখনই তাঁর সঙ্গে মার কাছে চলে আসি। পরে খোকাবাবুর উপদেশ মত মাকে আমার ব্যবহার্য জিনিসপত্র আনতে কোলকাতায় পাঠাই। পাছে খোকাবাবুর অবর্তমানে আমি আর কাউকে কাননা করি, এইজন্যই বোধ হয় তিনি আমাকে আর একটুখনও ভাণে থাকতে দিলেন না। আমি খোকাকে ভালবাসি কি না তা আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন না। তবে খোকা আমাকে অন্তরের সহিত ভালবাসে বলে মনে হয়। আজ্ঞে হী, ঠিকই বলেছেন। আমরা ভালবাসা বিক্রিই করে থাকি। তবে কখনও কখনও ওটা দান যে একেবারেই করি না, তা'ও নয়। না না না, আমাকে আপনারা মাপ করবেন। এ'ছাড়া আর আমি কিছু আপনাদের বলতে পারব না।

বেশ বুঝা গেল যে মলিনাসুন্দরী প্রকৃত তথ্য গোপন করছে এবং সে ইচ্ছা করেই সত্য কথা বলতে চায় না। এ অবস্থায় মনস্তাত্ত্বিক উপায়ে জিজ্ঞাসাবাদ দ্বারা প্রকৃত সত্য তার কাছ হতে বার করা ভিন্ন উপায়ও ছিল না। পরিশেষে আমরা তাকে নিম্নোক্তরূপে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে দিই। একটা কিছু অঘটন ঘটায় জগুই যে খোকাবাবু মলিনাকে সহর হতে সরিয়ে দিয়েছে, এটুকু বুঝবার মত বুদ্ধি মলিনাসুন্দরীর নিশ্চয়ই আছে। এইরূপ মানসিক অবস্থার মধ্যে পুলিশের উপস্থিতি তাকে যে ভীতা ও সন্ত্রস্ত করে তুলবে তাতে আর বিচি্র কি? এইজন্য পরামর্শদাতার অভাবে তার মত একটি নারীর মনোবল যে সহজেই ভেঙ্গে পড়বে তাতে আর আমার সন্দেহ ছিল না। নিয়ে উদ্ভূত প্রশ্নোত্তর হতে আমার আশা যে অমূলক ছিল না তা নিশ্চিতরূপে বুঝা বাবে।

প্রঃ—খোকাবাবুর দোস্তদের জিজ্ঞাসাবাদ করার পর তবে আমি কোমার কাছে এসেছি। কোলকাতায় খোকাবাবু কি করেছেন

বা না করেছেন তা তুমি যে একটুও জানো না, তা নয়। তবে খুনের সঙ্গে তুমি যে সাক্ষাৎ ভাবে জড়িত নও, তা আমি বিশ্বাস করি। উঃ—এ'য়া খুন? কি বলছেন আপনি। কে কা'কে খুন করলো? বলুন না বলুন না, কে খুন হয়েছে। আমি খুনের কথা কিছু জানি না।

প্রঃ—জানো না মানে? খোকাই তো পাগলাকে খুন করেছে। খোকাকে তুমি কতটুকু ভালবাস তা জানি না। কিন্তু তুমি যে পাগলাবাবুকে সত্যসত্যই ভালবাসো তা আমরা ভালরূপেই জানি। জানো, আজ তোমার জগুই পাগলাকে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হলো। তার একমাত্র অপরাধ ছিল, সে তোমাকে ভালবাসতো। এখনও যদি তুমি মিথ্যা কথা বলো কিংবা সত্য গোপন করো, তা'হলে পাগলার অমর-আত্মা তোমাকে ক্ষমা করবে না।

আমরা খুনের কারণ সম্পর্কে কেবলমাত্র যা অনুমান করেছিলাম, তাই কেবল আমি মলিনাকে বলেছিলাম। কিন্তু আমাদের এট বাখ্যা বাকদের স্তূপে যেন অগ্নিসংযোগ করে দিলে। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, মলিনা অঝোরে কাঁদতে শুরু করে দিয়েছে। লৌহ তপ্ত থাকতে থাকতেই তাতে ঘা দেওয়ার রীতি আছে। তাই আর দেয়া না করে আমি মলিনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে নিম্নোক্তরূপ একটি বিবৃতি লিপিবদ্ধ করে নিলাম।

: আজ্ঞে, আজ আমি কোনও কথাই আর গোপন করবো না। এ কয় দিন আমি কিছুতেই বুকে উঠতে পারছিলাম না যে, প্রকৃতপক্ষে কা'কে আমি ভালবাসি, নির্দানী সত্য-সম্বলহীন পাগলাবাবুকে, না ধনী-সুপুরুষ খোকাবাবুকে? আজ আর স্বীকার করতে বাধ্য নেই যে, আমি পাগলাকেই বেশী ভালবাসতাম। আমি যদি জানতাম যে খোকা এ'ই ভাবে তাকে খুন করবে, তা'হলে কি খোকাকে আমি আমার ঘরে স্থান দিই? তবে এ ছাড়া আমার অন্য কোনও উপায় ছিল না। খোকাকে আমি স্থান না দিলে পাগলাকে সে এর আরও আগে খুন করে আসতো। তার পথের কোনও বাধা বা কাঁটাকে সে কোনও দিনই ক্ষমা করেনি। এ'বার হয়তো সে আমাকেই পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবে। খোকাবাবু যে কী ভীষণ দুর্দান্ত লোক, তা আমার চেয়ে বেশী আর কেউই জানে না।

আজ্ঞে হী, আমি যা জানি নিশ্চয় বলবো। মাঝে মাঝে খোকার ভয়ে পাগলা যে গোপনে আমার সঙ্গে দেখা করতো এ কথা সত্য। প্রকৃতপক্ষে তারই চেষ্টায় আমি গান-বাজনা শিখতে পেরেছি। মাত্র কয়েক দিন আগে খোকা আমার ঘরে পাগলাকে দেখে তাকে ঘাড় ধরে বার করে দেয়; আর তামাশ সাবধান করে দিয়ে বলে যে আমি যেন আর একটা দিনও তাকে আমার ঘরে আসতে না দিই। পাগলা এই দিন একটু মদ খেয়েই এসেছিল। অপমানিত হয়ে চলে যেতে যেতে সেও খোকাকে শাসিয়ে যায় এই বলে—'তুমি যে একজন জেলাখারিজ গুণ্ডা তা আমি জানি। দেখো, কালই আমি তোমাকে গোয়েন্দা পুলিশ দিয়ে ধরিয়ে দেবো।' এর কয় দিন পর একদিন রাত্রে খোকা আমার ঘরে বসেছিল। এমন সময় সালা গোবাকে দুইজন পুলিশ আমার দরজায় এসে খোকার খোঁজ করতে থাকে। আমি দরজার ফুটো দিয়ে সিপাই দু'জনকে দেখে খোকাকে তাদের আগমন-বার্তা জানিয়ে দিই। খোকাবাবুও তৎক্ষণাৎ বিতলের জানলার গরাদ সরিয়ে একলাকে নীচের রাস্তার উপর নেমে চক্কর পলকের মধ্যে উপাও

হয়ে যায়। পরে আমি শুনেছি পাগলা পুলিশে খবর দেয় নি। সিপাই দু'জন অস্ত্র হস্তে সংবাদ পেয়ে সেখানে এসে গিয়েছিল। কিন্তু খোকাবাবু এজ্ঞ একমাত্র পাগলাবাবুকেই পুলিশের সংবাদদাতারূপে সন্দেহ করেছিল।

এর পর তেসরা সেপ্টেম্বর রাত্রি নয়টার সময় আমার ঘরে বসে আছি, এমন সময় খোকাবাবু বন্ধু কালী এসে বললো, 'বৌদি! খোকা এখনি তোমাকে আমার সঙ্গে আসতে বললো।' এই বলে কালী বাবু আমাকে নিয়ে গিয়ে সোনাগাছির উষা নামে একটি মেয়ের বাড়ীতে তুললো। এর পর রাত প্রায় দশটার সময় খোকাবাবু তার বন্ধু কেঁঠ বাবুকে সঙ্গে করে উষার বাড়ীতে এসে উপস্থিত হলো। এই সময় আমি খোকার নীল রঙের সার্টের উপরে দু'এক জাম্বা লাল রঙে রঞ্জিত দেখি। আমি ঐ লাল রঙের দাগ সন্ধ্যাে জিজ্ঞাসা করলে খোকা বললো, 'ও, না না, ও কিছু না রে। ও পানের পিচ লেগেছে।' এই কথা বলে খোকাবাবু তার বন্ধু কেঁঠাবাবু এবং কালীবাবুকে নিয়ে পুনরায় কোথায় চলে গেল। তার পর রাত্রি প্রায় দেড়টার সময় খোকাবাবু পুনরায় আমাদের নিকট ফিরে আসে। এই সময় আমি লক্ষ্য করি যে খোকাবাবু চান করে মাথায় গন্ধ তেল দিয়েছে। এ'ছাড়া সে তার নীল সার্টটা বদলে একটা ছাই রঙের পাটভাড়া নুতন সার্ট পরে নিয়েছে। এর একটু পরে খোকার অপর এক বন্ধু ভূপেনবাবুও সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। ঐ উষা নামের মেয়েটি ছিল ভূপেনেরই রক্ষিতা। এর পর সাঁা রাত ধরে বসে বসে আমরা সেখানে বিয়ার খাই। এবং সেই সঙ্গে বহু গল্প-গুজবও করি। পরদিন প্রত্যুষে ছয়টায় খোকাবাবু আমাকে জানালো যে তার নামে একটা গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বেরিয়েছে। এইজন্ত কিছুদিনের মত সে কলকাতার বাইরে গিয়ে গা-ঢাকা দেবে। এই বলে সে আমাকে সোজা উত্তরপাড়ায় এনে আমার মা'র কাছে রেখে দিয়ে যায়। আমি সময়ের অভাবে আমার বাড়ী হয়ে আসতে পারিনি। এইজন্ত আসবাবপত্র আনার জন্ত মাকে কলকাতার পাঠাতে হয়েছিল। খোকাবাবু এখন কোথায় আছেন তা আমি জানি না। তবে আমি আপনাদের সোনাগাছিতে উষার বাড়ীটা দেখিয়ে দিতে পারবো।

এর পর আমি যে টান্মিতে উত্তরপাড়ায় গিয়াছিলাম সেই টান্মিতেই মলিনাকে নিয়ে কলিকাতায় উষার বাড়ীতে এসে উপস্থিত হই। এই সময় উষার দয়িত ভূপেনবাবুকেও উষার ঘরে আমি দেখতে পাই। আমাদের দেখামাত্র ভূপেন সরে পড়বার চেষ্টা করছিল, কিন্তু পালাবার পূর্বেই আমরা তাকে গ্রেপ্তার করে ফেলি। তাকে গ্রেপ্তার করতে আমাদের বেশী বেগ পেতে হয় নি। এইজন্ত তাকে একজন দুর্দান্ত প্রকৃতির ব্যক্তি বলে আমাদের মনে হলো না। ভূপেনের রক্ষিতা উষাকে জিজ্ঞাসাবাদ করায় সে মলিনা দেবীর অনুরূপই এক বিবৃতি দিয়েছিল। এর অধিক তার পক্ষে এই হত্যা সম্পর্কে অবগত থাকার সম্ভাব ছিল না। তবে তার দয়িত ভূপেনের নিকট হতে খুন সম্পর্কে একটি উল্লেখযোগ্য বিবরণ পাওয়া গেলেও যেতে পারে বলে আমাদের মনে হয়েছিল। এইজন্ত বিশেষ করে ভূপেনকেই এই হত্যা সম্পর্কীয় একটি বিবৃতি দিবার জন্ত আমি পীড়াপীড়ি করতে থাকি। এই সম্পর্কে ভূপেনের নিকট হইতে প্রাপ্ত বিবৃতিটি নিয়ে উদ্ধৃত করা হলো :

আমি আমার বক্তিতা উষার সহিত তার ঘরেতেই বাস করি এবং বাজারে পাটের দালানী দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করি। খোকাবাবু এবং তার বন্ধু কেঁঠ, গোপী, কালী এবং সুবলবাবুর সঙ্গে আমার এই পাড়াতেই আলাপ হয়। আমরা ক'জন প্রায়ই সন্ধ্যাকালে নিকটস্থ ব্রাহ্মস্কোয়ারে ব'সে আলাপ আলাচনা করতাম। কিন্তু এই কয় ব্যক্তি'য়ে কোথায় থাকে এবং তা'রা যে কি করে তা তারা কোনও দিনই আমায় বলে নি। তবে মধ্যে মধ্যে তারা আমার রক্ষিতা উষার ঘরে এসে বিয়ার খেয়ে গিয়েছে। আচ্ছা হাঁ, তেসরা সেপ্টেম্বরও রাত আন্দাজ নয়টার সময় এদের কয়েকজন উষার ঘরে বসে বিয়ার খেয়ে গিয়েছে। কিন্তু ঐ সময় তারা খোকার রক্ষিতা মলিনাকে কেন উষার ঘরে এনেছিল তা আমার জানা নেই। ঐদিন অনেক রাতে বাড়ী ফিরে দেখি খোকা, কালী এবং কেঁঠ আমার ঘরে বসে জটলা করছে। ঐ রাতে একটু বেশী মদ খাওয়ার আমি আক্লান্ত হসে ব্রাহ্মস্কোয়ার মাঠেই ঘুমিয়ে পড়ি। এই জন্তই সাড়ী ফিরতে আমার অতো বেশী রাত হয়ে গিয়েছিল।

মলিনা দেবার বিবৃতি অনুযায়ী আমরা তদন্ত করে জানতে পারি যে, কলিকাতা পুলিশের ডিটেকটিভ বিভাগের গুপ্তা শাখার দুইজন সিপাই কোনও এক সংবাদ অনুযায়ী খালা নামে একজন জেলা-বারিজ (Externed) গুপ্তার খোঁজে সত্য সত্যই মলিনার ঘরে ঐ দিন হানা দিয়েছিল। তবে ঐখানে ধাঁদার অবস্থান সন্ধ্যাে কোনও সংবাদ পাগলাবাবু তাদের দেয়নি। এ'ছাড়া এ'ও জানা যায় যে, ঐ সময় বরাবর খোকাবাবুর বন্ধু কেঁঠকেও মাতাল অবস্থায় রাস্তা হতে বটল্লা ধানার জৈনেক কনেষ্টবল পাকড়াও করে নিয়ে যায়। কেঁঠকে একটি পোটেকসে আদালতে সোপান্দ করাও হয়েছিল। আদালতের বিচারে কেঁঠের দশ টাকা জরিমানা হয়। এই দুইটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা পাগলাবাবুর সহিত সম্পর্ক রহিত হইলেও খোকাকে যেদিন সে ধরিয়ে দেবে বলে শাসিয়েছিল তার একদিন পরেই সংঘটিত হয়। এইজন্তই বোধ হয় খোকাবাবু এবং তার বন্ধু কেঁঠবাবুর ধারণা হয়েছিল যে পাগলাই তাদের উপর প্রতিশোধ নেবার জন্ত তাদের সন্ধ্যাে বা'রে বা'রে পুলিশে সংবাদ দিচ্ছে।

কোনও একটি হত্যার মামলা প্রমাণ করতে হলে প্রথমেই প্রমাণ করতে হয় যে, ঐ হত্যাকাণ্ডটি কি উদ্দেশ্যে সংঘটিত হয়েছে। ইংরাজীতে একে বলা হয় মোটিভ। এই মোটিভ বা উদ্দেশ্য প্রমাণ করতে না পারলে মূল হত্যাকাণ্ডটিও প্রমাণ করা শক্ত হয়ে পড়ে। এক্ষেপে উপরোক্ত দুইটি বিভিন্ন ঘটনা হতে আমরা বুঝতে পারি যে পাগলা খোকাবাবুকে পুলিশে ধরিয়ে দেবে বলে শাসিয়ে আসার একদিন পরে খোকার ঘরে গোয়েন্দা পুলিশ হানা দেওয়ার খোকাবাবুর ধারণা হয়েছিল যে তাহলে পাগলাবাবুই তাদের উপর প্রতিশোধ নেবার জন্ত খোকাবাবুর আস্তানা সন্ধ্যাে পুলিশকে খবর দিয়েছে। এ'ছাড়া প্রথম ঘটনার দুই একদিন পরে খোকার অকৃত্রিম বন্ধু কেঁঠবাবুকে বটল্লার পুলিশ অস্ত্র এক কারণে রাস্তা হতে ধরে নিয়ে গেলেও খোকাবাবু ও কেঁঠবাবুর ধারণা হয়েছিল যে কেঁঠবাবুর এই গ্রেপ্তারের পিছনেও পাগলাবাবুই কারদাসী ছিল।

এর পর আমরা সন্দেহক্রমে উষার দয়িত ভূপেনকে গ্রেপ্তার করে ধানায় আনি। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও অস্ত্র কোনও আসামীকে আমরা ঐ রাতে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়নি। এই সময় আমরা

বুঝতে পারি এই কালী ও ভূপেনও এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সহিত সংশ্লিষ্ট আছে। তবে এদের চাইতেও অধিকতর দুর্দান্ত প্রকৃতির আরো কয়েকজন ব্যক্তি যে এই হত্যাকাণ্ডে খোকাবাবুর সহকারী ছিল, তাও আমরা সহজে বুঝে নিতে পেরেছিলাম।

এই দিন অধিক রাত্রি হয়ে যাওয়ার আমবা মলিনাকে তার কলিকাতার নিজ বাড়ীতে রেখে আমরা আমাদের থানায় ফিরে আসি। কিন্তু পাছে মলিনাকে খাঁদা পুনরায় সেখান থেকে সরিয়ে নেয়, এইজন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থাস্বরূপ মলিনাস্বন্দরীর গৃহে আমরা সাদা পোষাকে দুইজন পুলিশ মোতায়েন করতেও ভুলিনি। কারণ যে নারীটিকে নিয়ে এই হত্যাকাণ্ড সমাধা হয়েছে তাকে খোকাবাবু সত্য সত্যই অন্তরের সহিত ভালবাসতো। এই অবস্থায় খোকাবাবুর পক্ষে পুলিশের অবর্তমানে তাহার সহিত মিলিত হবার চেষ্টা করা খুবই স্বাভাবিক ছিল।

এর পরদিন ১ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৬, তারিখে প্রত্যয়ে আমরা স্ব স্ব নির্দিষ্ট কোয়ার্টারস থেকে নেমে থানার অফিসঘরে এসে সমবেত হলাম। বস্ততপক্ষে ভোর রাতে বাড়ী ফিরলেও আমরা কেহই ঘুমতে পারিনি। বরং ঘুমের আমেজের ঝাঁকে ঝাঁকে আমরা এই হত্যাকাণ্ডটি সম্বন্ধেই চিন্তা করেছি। কিছুক্ষণ আলাপ আলোচনার পর সুনীলবাবু প্রস্তাব করলেন যে আমাদের এখন উচিত হবে পুনরায় সোনাগাছির বেজাপল্লীতে উপস্থিত হয়ে সেখানকার বাড়ীতে বাড়ীতে আরও তদন্ত চালিয়ে যাওয়া। এইরূপ তদন্ত দ্বারা যে কয়টি বেজানারী কোনও দিন না কোনও দিন পাগলাবাবুর সংস্পর্শে এসেছে তাদের খুঁজে বার করার আশু প্রয়োজনও আমাদের ছিল। সুনীলবাবুর উপদেশ মত আমরা পুনরায় সোনাগাছি অঞ্চলে উপস্থিত হয়ে সেখানকার বাড়ী বাড়ী তদন্ত করে প্রায় বাইশজন কুলটা নারীকে সংগ্রহ করলাম। তদন্ত দ্বারা জানা গেল যে, ওরা সকলেই ভালরূপে পাগলাবাবুকে বহু বার দেখেছে। এদের সহিত আমরা উষা, মলিনা এবং মৃতের অন্ত্যস্ত পরিচিত ব্যক্তিদেরও সঙ্গে নিলাম। এদের সকলকে সঙ্গে করে কলিকাতার পুলিশ-মর্গের বরফ ঘরে এনে তাদের একে একে পাগলার মৃতদেহটি দেখাতে সুরু করলাম। সোনাগাছির বিষয় যে, ঐ মুণ্ডবিহীন দেহটি পাগলার বলে এরা সকলেই সনাক্ত করেছিল। মুণ্ডবিহীন দেহ সনাক্ত করা যে খুবই কঠিন তা সর্বদাই স্বীকার্য। কিন্তু নিয়োক্ত কয়টি বিশেষ চিহ্ন হতে তাদের পক্ষে ঐ মৃতদেহটি বিশ্বাসযোগ্যরূপে সনাক্ত করা সম্ভব হয়েছিল।

(১) মৃতদেহটির বুকে ও পিঠে প্রচুর চুল ছিল। দারুণ মাতাল অবস্থায় তাকে তারা প্রায়ই নগ্ন অবস্থায় পথে-ঘাটে পড়ে থাকতে দেখতো। এইজন্য এই সৈব বৈশিষ্ট্য দেখার সুবিধা তাদের হয়েছিল।

(২) মৃতদেহটির বাম হাতে একটি কুলের কুঁড়ি উন্মুক্ত সহযোগে অঙ্কিত ছিল। এছাড়া তার বাম কাঁখে একটা গভীর ক্ষতও দেখা যেতো। পাগলাবাবুর দেহের এই সব চিহ্নগুলি এরা প্রায়ই দেখেছে।

(৩) মৃতদেহের বাম পাশটি কুশ-পা ছিল এবং উহার ডান পায়ে ত্রিশুলের মত একটি দাগ ছিল। এই রকম পা সাধারণত মাদ্রবের মধ্যে দেখা যায় না।

(৪) মৃতদেহের মাপ, আকৃতি এবং গায়বর্ণ হতেও টাঙ্গ পাগলাবাবুর মৃতদেহ বলে তারা সনাক্ত করতে পেরেছিল। এই পাগলাবাবুকে বারে বারে তারা দেখেছে। এইজন্য এই সম্বন্ধে তারা কোনওরূপ ভুল বা ভ্রান্তি করতে পারে না।

এতদ্ব্যতীত আমরা পাগলার মৃতদেহের ওজন ও মাপও নিয়েছিলাম। কারণ কোনও দর্জির কাছে জামার মাপ দেওয়া কিংবা কোনও স্থানে তার দেহ ওজন করানোও তার পক্ষে অসম্ভব ছিল না। উপরন্তু তার পদ-চিহ্ন এবং হস্তাঙ্গুলীর চিহ্নও আমরা গ্রহণ করেছিলাম। কারণ কোনও থানায় ধরা পড়ার পর জামিনের কাগজে তার পক্ষে টীপ দেওয়াও অসম্ভব ছিল না। কিন্তু হর্তাগ্যের বিষয়, এই কয়েকটি সূত্র অনুযায়ী তদন্ত করে আমরা কোনও সফল পাইনি।

ইতিমধ্যে আমাদের একজন অফিসার পাগলাবাবুর এক ভাইকেও খুঁজে বার করতে পেরেছিল। এই ভ্রাতৃলোক বনগাঁয়ে ডাক্তারী করতেন। এই দিন ইনিও এসে মৃতদেহটি তাঁর বিগতপ্রাণ কনিষ্ঠ ভ্রাতার বলে সনাক্ত করে গেলেন। ভ্রাতৃলোকটির নিকট হতে আমরা জানতে পারি যে, পাগলাবাবুর প্রকৃত নাম প্রতুলবাবু এবং সে সত্যি একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান। কিন্তু কুলটা নারীদের গানবাজনা শোনাতে এসে সঙ্গ দোষে ধীরে ধীরে সে অধঃপাতের শেষ সীমায় নেমে এসেছে।

এক্ষণে আমাদের বিবেচনার বিষয় হলো যে, উপরোক্ত কয়টি মাত্র চিহ্ন হতে ঐ মৃতদেহ পাগলা, ওরফে প্রতুলবাবু নামে এক ব্যক্তির মৃতদেহরূপে সনাক্ত করা সম্ভব হতে পারে কি না। এই বিষয়ে শেষ বিচারের ভার জজ ও জুরীদের ধ্যান-ধারণার উপর পরিপূর্ণভাবে নির্ভর করে। এইজন্য এই বিষয়টি নিয়ে আর অধিক মাথা ঘামানোর আমরা প্রয়োজন মনে করিনি।

ইতিপূর্বেই আমরা পুলিশ সার্জেন্টের নিকট লাস চেরাই-এর বা পোষ্টমোর্টেম পরীক্ষার রিপোর্ট পেয়েছিলাম। রিপোর্টটিতে অস্বাভাবিক বিষয়ের সহিত নিয়োক্তরূপ তথ্যটিও লিপিবদ্ধ ছিল। এই বিশেষ তথ্যটির পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তীকালীন তদন্ত করবার জন্য ঐ রিপোর্টের এই অংশটি আমরা মনযোগ সহকারে আর একবার পাঠ করে নিলাম।

আমি পরীক্ষা দ্বারা আরও জেনেছি যে, রাত্রি প্রায় নয় ঘটিকা আন্ধার সময়ে প্রথমে এই ব্যক্তিকে ছুরিকা দ্বারা বার বার আঘাত করে মৃতপ্রায় করে ফেলা হয়। কিন্তু তখনও এই ব্যক্তির প্রাণ দেহ হতে বিচ্যুত হয়নি। এর কিছু পরে তার জীবিত অবস্থায় তার দেহ হতে মুণ্ডটি খারালো অস্ত্রের সাহায্যে বিচ্ছিন্ন করে তাকে নিহত করা হয়েছিল।

সব দিক বিবেচনা করে আমরা প্রায় সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে সমর্থ হই যে—কোন ব্যক্তি কোন সময় কার দ্বারা কি কারণে এবং কবে ও কি কি উপায়ে কোথায় নিহত হয়েছিল। বস্ততপক্ষে এই ভাবে আমরা এই হত্যা-রহস্যের উপর প্রচুর আলোকপাত করতে পারার আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠেছিলাম। এই অবস্থায় আমাদের দলের কোনও কোনও অফিসার মতপ্রকাশ করলেন যে আজকের মত তদন্ত এইখানেই সমাপ্ত করা যাক। কারণ আমরা সকলে এই দুই দিন যাবৎ বোরাচুরি করে সত্যসত্যই ক্লান্ত হয়ে

পড়েছিলাম। প্রকৃতপক্ষে মানুষের দেহ যতটা সহিতে পারে তাকে তার বেশী সওয়াতে গেলে তা সহজেই ভেঙ্গে পড়তে পারে। একথা নিশ্চয়ই সত্য যে, নিজের দেহ ও মনকে সুস্থ না রাখলে কোনও হুহু কার্যে সফলতা লাভ করা অসম্ভব। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি আমার সহকারী তদন্তকারীদের সহিত একমত হতে পারিনি। আমার মতে তদন্তের সাফল্য একান্তরূপে নির্ভর করে স্পিড বা গতির উপর। অত্যাধিক বহু সাক্ষ্য প্রমাণ ইতিমধ্যেই বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে। এ ছাড়া বিলম্বের কারণে মূল হত্যাকারী পুলিশের নাগালের বাইরে চলে গেলে কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত তার পক্ষে ফেরার জীবন অতিবাহিত করা সহজসাধ্য হয়ে পড়বে। ইতিমধ্যে বহু প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীকেও নানা কারণে আর খুঁজে পাওয়া না-ও যেতে পারে। এইজন্য আসামী বহু বৎসর পরে ধরা পড়লেও তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যের সহিত আর মাথলা পরিচালনা করা সম্ভব হয়নি। এই বিষয় কয়টি ছাড়া আমার সহকারী অফিসারদের সহিত ঈশ্বরিত হওয়ার অপর আর একটি কারণও ছিল। এই কারণটি হচ্ছে এই যে, আমার স্থির বিশ্বাস ছিল খোকাবাবু এইদিন গভীর রাত্রে তার রক্ষিতা মলিনাসুন্দরীর কক্ষে নিশ্চয়ই একবার হানা দেবে। এইজন্য আমার সহকারীদের বিশ্রাম করবার সুযোগ দিয়ে আমি একাই কয়েকজন সিপাহীসহ মলিনাসুন্দরীর বাটার নিকট গোপনে অবস্থান করতে মনস্থ করলাম। বলা বাহুল্য যে, আমাদের অভিজ্ঞ পুরাতন ইনস্পেক্টার সুনীলবাবু আমার মতেই মত দিয়েছিলেন। অগত্যা এই হুহু কার্য সম্পন্ন করার ভার স্বেচ্ছাকৃতভাবে আমি নিজের স্বন্ধে তুলে নিয়েছিলাম। কিন্তু এতে যে নিজের জীবন কতদূর বিপন্ন হয়ে উঠতে পারে, তা তখনও আমি অনুমান পর্য্যন্ত করতে পারিনি।

আমি কয়েকজন মাত্র সিপাহী সমভিব্যাহারে সাদা পোষাকে মলিনাসুন্দরীর বাটার নিকট যখন পৌঁছিলাম, তখন রাত্রি প্রায় দুইটা বাজতে চলেছে। হঠাৎ আমরা সন্ত্রস্ত হয়ে লক্ষ্য করলাম, দিকে দিকে ঐ অঞ্চলের নিশাচর লোকেরা এবং স্থানীয় দোকানদাররা ভীত-ত্রস্ত হয়ে ছুটাছুটি করছে। সকলের মুখে সেই একই কথা “খোকা খোকা খোকা!” এই সময় তাদের সমবেত কণ্ঠস্বরকে ডুবিয়ে মলিনাসুন্দরীর ঘর থেকে করুণ আর্ন্তনাদ শোনা গেল,

“ওরে বাবা রে মেরে ফেললে রে। ওগে তোমরা কে কোথার আছো-ও। শীত্র এসে আমায় রক্ষা করে। গো”—মলিনাসুন্দরীর বাটার ‘নীচের ঘরে দুই জন পাহারাদার পাহারার জগ্ন পূর্ব হতেই মোতায়েন ছিল। ইতিমধ্যে কে বা কাহারো বাতির হতে তাদের দরজা শিকলের সাহায্যে বন্ধ করে দিয়েছিল। ঐ ঘরের ভিতর হতে তারাও প্রাণপণে ‘চীংকার করে সাহায্য-ভিক্ষা করছিল। এই সময় বটতলা থানার সেকেন্ড অফিসার আসিফুল হক সাহেব এলাকায় রৌদ দিতে দিতে ওইখানে এসে পড়েছিলেন। তিনি অকুস্থলে জমায়েৎ ভীড়ের ওপার থেকে প্রাণপণে এগিয়ে আসবার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু ভীত-সন্ত্রস্ত লোকের চাপে কিছুতেই তিনি এগিয়ে আসতে পারছিলেন না। এমন সময় হঠাৎ আমি লক্ষ্য করলাম, মলিনা দেবীর বাড়ীর দোতলার কার্ণিশ থেকে এক ব্যক্তি পিস্তল হাতে লাফিয়ে রাস্তায় পড়ে চতুর্দিকের জনতাকে লক্ষ্য করে উপযুঁপরি গুলীবর্ষণ শুরু করে দিলে। দোভাগোর বিষয় যে, আমারও জামার নীচেকার পেটিকায় গুলীভরা একটি পিস্তল ছিল। আমিও তৎক্ষণাৎ উহা বার করে ঐ লোকটিকে লক্ষ্য করে উপযুঁপরি কয়েক বার গুলী ছুঁড়লাম। কিন্তু সমুখের জনতার জীবন পাছে অকারণে বিপন্ন হয়, সেই জগ্ন আমাকে শীঘ্রই সংবত হয়ে গুলীবর্ষণে বিরত হতে হলো। এই সুযোগে লোকটি পাশের অপবিসর গলি দিয়ে কোথায় যে উধাও হয়ে গেল, তা জনতার আর সকলের মত আমিও বুঝতে পারলাম না। ইতিমধ্যে খবর পেয়ে বটতলা থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার যতীন্দ্র মুখার্জী বহু সিপাহী-শাস্ত্রীসহ সেখানে পৌঁছে গিয়েছেন। এই খবর শ্রামপুত্র থানাতেও পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল। সেইখান হতে ইনস্পেক্টার সুনীল বাবুও তাঁর অজ্ঞাত সহকারীদের সহিত দ্রুত গতিতে অকুস্থলে এসে উপস্থিত হলেন। আমরা সকলে মিলে দ্রুতগতিতে সারা সোনাগাছি অঞ্চলটিই ঘেরাও করে ফেলে সেখানকার প্রতিটি বাটার প্রতিটি কক্ষ এবং তৎসহ চতুর্দিককার মেথরগলি ও রাজপথ সমূহে তন্ন তন্ন করে ঐ আততায়ীর জগ্ন খোঁজাখুঁজি করলাম। কিন্তু কোথাও তাকে খুঁজে পাওয়া তো গেলই না; এমন কি কোন পথ দিয়ে যে ঐ ব্যক্তি অন্তর্ধান হয়ে গেল, তার সামান্য হদিস পর্য্যন্ত কেউই আমাদের জ্ঞানাতে পারলো না।

[ক্রমশঃ]

সকলই কবিতা

তীনন্দলাল বেরা

এই পৃথিবীতে বা কিছু ঘটিছে সবই কবিতার ছন্দ।

ছোট-বড় আর মান-অপমান ভালো হোক কিবা মন্দ।

কবির মানসে জাগে তারি ছবি তুলিয়া বিভ্রম রঙ্গ।

ক্ষুদ্র তুচ্ছ, কিবা ছোট-বড়ো,

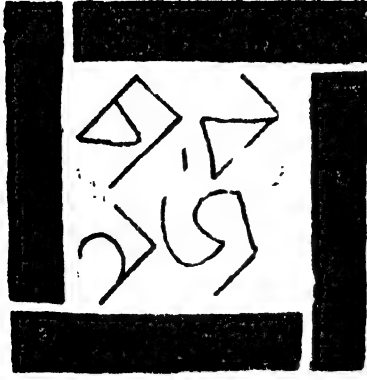
গাঁথিতে তাহারি করি সব জড়ো,

একই সূত্রে গাঁথা সে মালা—কেবল নানান ছন্দ।

কিন্ধাভ-রোষ, প্রেম-ভালোবাসা,

তারো মাঝে - ছ কবিতার ভাষা,

কবির বীণায় বাজে তারি সুর হয়নি তা কভু বন্ধ।



শ্রীহরিচরণ ভট্টাচার্য্য বিজ্ঞান শ্রুতিতীর্থ

[জ্যোতির্বিদ ও শাস্ত্রবেত্তা সুপণ্ডিত]

“যুগে যুগে চ বে নন্দা যুগে যুগে চ বে দ্বিজাঃ ।

তেষাং নিন্দা ন কন্তুয়া যুগরূপা হি তে মৃত্যুঃ ॥”

বেদের চৈতন্যরূপ সিদ্ধান্ত জ্যোতিষ শাস্ত্র (Astronomy)

অমূল্য আত্মতত্ত্ববিদ্যা—ইহাতেই লক্ষদর্শন লাভ সম্ভব। কারণ গণিত জ্যোতিষশাস্ত্র পূর্ণ বিজ্ঞান সত্তা প্রতিষ্ঠিত আর ফলিত জ্যোতিষ-বিজ্ঞান কলনার উপর নির্ভরশীল। সংপথবাহী ও নির্লোভী শ্রদ্ধেয় জ্যোতির্বিদ শ্রীহরিচরণ ভট্টাচার্য্য বিজ্ঞান শ্রুতিতীর্থ মহাশয়ের প্রসঙ্গে এই কথাগুলি মনে হয়েছিল।

গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার প্রধান পরিচালক পণ্ডিত ৬৪মেশ্বর বিজ্ঞান ও পরলোকগতা ৬শাকম্বরী দেবীর পুত্র হরিচরণ ভট্টাচার্য্য স্বর্গতে ১৮৮৯ সালের ২৫শে নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতামহ ছিলেন বিগত শতাব্দীর অন্ততম পণ্ডিত ৬৪মদয়াল তর্কবত্ত। ভট্টাচার্য্য মধ্য-ইরাজী বিজ্ঞানপ্রেমী পাঠকালে তিনি একবার বসন্তবোগে মৃতপ্রায়



শ্রীহরিচরণ ভট্টাচার্য্য

ইনর্কিষ্ট চন্দ্রনগরের বিশিষ্ট চিকিৎসক ৬৬শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবিষ্কৃত ‘পঞ্চানন্দ রস’ সেবনে নিরাময় হন। চৌদ্দ বৎসরে হুগলী সরকারী বিজ্ঞানপ্রেমী হন, কিন্তু ম্যালেরিয়ার প্রকোপে এন্টাল পরীক্ষা দিতে পারেন নাই। সেই সময় পিতার নিকট কুলবিজ্ঞা জ্যোতিষশাস্ত্র পড়িতে থাকেন। সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছাশক্তির সাধনা করিয়া তিনি ‘ধান-ধারণা’ স্তরে উপনীত হন। তিন বৎসর পণ্ডিত চন্দ্রনারায়ণ বিজ্ঞান মহাশয়ের নিকট গণিত ও ফলিত জ্যোতিষশাস্ত্রের পূর্ণাঙ্গ অমূল্যলীল ও ৬সিদ্ধেশ্বর চক্রবর্তীর নিকট পাশ্চাত্য জ্যোতিষবিজ্ঞা আয়ত্ত করেন। ১৩২১ সালে গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার গণনা, ৬৪বীরেশ্বর শ্রুতিতীর্থ মহাশয়ের টোলে নব্যশ্রুতিশাস্ত্র অধ্যয়ন ও ১৩৩৫ সালে নারায়ণচন্দ্র শ্রুতিতীর্থ মহাশয়ের নিকট হইতে শ্রুতির উপাধি পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করেন।

১৩২৫ সালে পিতৃবিয়োগ হইলে তিনি পঞ্জিকার গণনা ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করেন এবং ১৩৫৩ সালে চক্ষুগোড়ার দক্ষিণ উহা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। এই সময়ের মধ্যে ‘পুণাতন পঞ্জিকা’ ‘সংগ্রহ’ নামে গ্রন্থ সংকলন এবং ‘পঞ্জিকা সংস্কার প্রদীপ’ ‘পঞ্চাঙ্গ প্রভাকরের প্রভাহরণ’ নামক ৭ খণ্ড পুস্তিকা তৎকর্তৃক প্রণয়ন উল্লেখযোগ্য। ‘বসুমতী সাহিত্য মন্দির’-এর স্বত্বাধিকারী ৬সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের আহবানে শ্রুতিতীর্থ মহাশয় তথা হইতে প্রকাশিত “স্ববকবচমালা” আংশিক সম্পাদনা করেন। সতীশ বাবু তাঁহাকে প্রীতি-উপহারস্বরূপ এক খণ্ড মনুসংহিতা, প্রাণতোষিণীতন্ত্র ও স্ববকবচমালা প্রদান করেন। পরে বগীয় ভবতোষ ঘটক মহাশয়ের সহিত তাঁহার প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হয়। জ্যোতিষশাস্ত্রের স্বগভীর জ্ঞানের জগৎ ভারত সরকার ১৯৫৭ সাল হইতে হরিচরণ বাবুর উপর Indian National Almanac প্রণয়নের ভারার্পণ করেন। ইহা ছাড়া ১৮৮০-৮১ শক হইতে রাষ্ট্রীয় পঞ্চাঙ্গ-এর সংস্কৃত ও বাংলা অনুবাদের তদারক করিতেছেন। ১৩৫৭ সালে কলিকাতায় পঞ্জিকা সংস্কার সভার যে অধিবেশন হয়, বিজ্ঞান মহাশয় তাহাতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। উক্ত বৎসরে তিনি ভট্টপল্লীতে “ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞান পরিষদ” নামে জ্যোতিষশাস্ত্রের একটি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপনা করেন। বিভিন্ন প্রান্তের বহু ছাত্র উহাতে শিক্ষালাভ করিয়া থাকেন।

১৩৩০ সালে ভট্টপল্লীতে উক্ত বৎসরের রাজনৈতিক সম্মেলনের নির্বাচিত সভাপতি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়কে পণ্ডিত সমাজ এক অভিনন্দন দেন। তন্মধ্যে তিনি অগ্রণী ছিলেন। ১৩৫৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ সংস্কৃত মহাসম্মেলনে জ্যোতিষ শাখার সভাপতি, ১৯৫৭ সালে ঠাকুর ক্রীষ্ণীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও ভগবতী ক্রীষ্ণীমার জীবন-দর্শন আলোচনা সভার সভাপতি, ভবতারিণী পীঠ প্রতিষ্ঠা, বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদের পরীক্ষক, স্থানীয় সর্বার্থসাদক বিজ্ঞানপ্রেমী অন্ততম পরিচালক, ১৩৬০ সালে “স্বপ্নের সন্ধান” নামক জ্যোতিষগ্রন্থ প্রকাশ, ১২৭৩ সালে প্রথম প্রকাশিত ক্রীনারায়ণচন্দ্র শ্রুতিতীর্থ সম্পাদিত নারদ-শ্রুতির বঙ্গানুবাদ সমাপ্তি, ভট্টপল্লী পরীক্ষা সমাজের সহঃ সম্পাদক “জ্যোতিষচতুষ্পাদী”র অধ্যাপক ও অধ্যক্ষরূপে কার্য-সম্পাদন প্রভৃতি ক্রীভট্টাচার্য্য মহাশয়কে বাংলা তথা ভারতের সংস্কৃত শিক্ষিত সমাজে এক স্থায়ী উচ্চ আদর্শ প্রদান করিয়াছে। তিনি বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ পরিষদের সম্পাদক ছিলেন।

১৩১৭ সালে ভট্টপল্লীর ক্রীষ্ণকধন ভট্টাচার্য্যের কনিষ্ঠা কন্যা ক্রীমতী স্বকুমারী দেবীকে শ্রুতিতীর্থ মহাশয় বিবাহ করেন।

দ্বাদশ বৎসরে উপনয়নের পর হইতে তিনি ধর্ম সাধনার মগ্ন হন। এই পর্য্যন্ত তিনি উত্তর-ভারতের বহু তীর্থস্থান পরিভ্রমণ করিয়াছেন। নবগ্রহ সাধনার তিনি সার্থকতা লাভ করিয়াছেন।

পরিণত বয়সেও তিনি জ্যোতিষশাস্ত্র লইয়া স্বগভীর আলোচনা ও গবেষণায় নিজেকে নিমজ্জিত রাখিয়াছেন দেখিয়া কণ্ঠকম বর্ষায়ান ভ্রাক্ষণ-পণ্ডিতকে প্রশংসা জানাইয়া বিদায় লই।

ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

[বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও মূলেখক]

ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যে সুপণ্ডিত হইয়াও মাতৃভাষা বাঙ্গালার মাধ্যমে লেখায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন কেন? এই প্রশ্নের জবাবে ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, “ইংরাজীতে লিখে কোন স্বামী ছাপ রাখা যায় না বলে আমার ধারণা।” এই প্রখ্যাত শিক্ষাবিদেব পরবর্তী জীবনধারা লক্ষ্য করিলে উহার যথার্থতা প্রমাণিত হয়।

ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় ১২১১ সালের আশ্বিন মাসে বীরভূম জেলার হাতিয়া গ্রামে (মাতুলালয়) জন্মগ্রহণ করেন। বাবা ওমধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায় বিগত শতাব্দীর অন্ততম ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। আইনজীবী না হইয়াও আইন শাস্ত্রের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জ্ঞান তিনি অর্জন করেন। মাতা ওরাজবালা দেবীকে পুত্র শ্রীকুমার মাত্র চারি বৎসর বয়সে হারান। স্বগ্রাম বীরভূম জেলার কুমার গ্রাম। প্রাথমিক শিক্ষা বাবার নিকট গ্রহণ করিয়া ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় বাঁকুড়ার সি. এম. ভায়িবি বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হন। মামা আন্তোভার রায়চৌধুরী তখন উহার প্রধান-শিক্ষক ছিলেন। ১৯০৬ সালে তথা হইতে মাত্র বার বৎসর বয়সে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া জেলা স্কলারশিপ পান। দুই বৎসর পরে হেতমপুর কলেজ হইতে ত্রয়োদশ স্থানধিকারী হিসাবে এফ. এ. পাশ করিয়া কলিকাতা স্কটিশচার্চ কলেজে প্রবেশ করেন এবং ইংরাজী সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থান অধিকার করিয়া গ্রাজুয়েট হন। এ পর্য্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী সাহিত্যে “ঈশান স্কলার” হয়েছেন একমাত্র ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায়। নাট্যাচার্য্য সঙ্গ-লোকান্তরিত শিশিরকুমার ভাট্টা মহাশয় তাঁহার অগ্রতম সহপাঠী ছিলেন। বর্তমানে তিনি শিশিরকুমার সর্বক্কে একটি রচনার ব্যাপ্ত আছেন। ১৯১২ সালে তিনি ইংরাজীতে প্রথম শ্রেণীর প্রথম হইয়া এম. এ. পাশ করেন। উহার ফলাফল বাতির হওয়ার পূর্বে রাষ্ট্রপুত্র স্বরেন্দ্রনাথ ও অধ্যক্ষ জনকী শাস্ত্রী মহাশয়ের আহ্বানে তিনি তিন মাস রিপণ কলেজে অধ্যাপনা করেন। উক্ত বৎসরের নভেম্বর মাসে প্রেসিডেন্সী কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ মিঃ এচ. আব. জেমস-এব আহ্বানে তিনি উক্ত কলেজে অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করিয়া ১৯৩৫ সাল পর্য্যন্ত অবস্থান করেন। ১৯৩৫-৪০ সাল পর্য্যন্ত রাজশাহী কলেজে সহাধ্যক্ষ ও অধ্যক্ষ হিসাবে কাব্য করিয়া পুনরায় প্রেসিডেন্সী কলেজে ফিরিয়া আসেন এবং ১৯৪৬ সালে তথা হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৪৬-৫৫ সাল পর্য্যন্ত তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রায়ভট্ট লাহিড়ী অধ্যাপক হিসাবে কাব্য করেন। “Critical Theories & Poetic Practice in

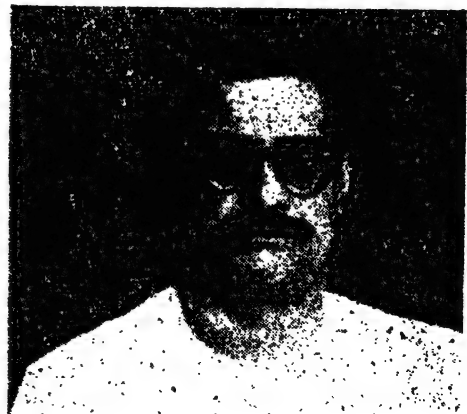
Lyrical Ballads” এর উপর তিনি ১৯২৯ সালে “ডক্টরেট” উপাধি পান।

প্রথম জীবনে শ্রীকুমার বাবু বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ যত্ন রায়ের (মহুগুজ ট্রেটের সভাপাদক) ভ্রাতৃপুত্র ও আন্তোভার রায়ের নিকট নিরমিত সঙ্গীত শিক্ষা করেন। বিলম্বিত স্নেহে রূপদ গানে আন্তোভার বাবু অধিতীয় ছিলেন।

১৯১১ সালে ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীমতী শৈলবালা দেবীর সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন।

১৩২১ সালে হাতিয়া গ্রামে এক সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, ওজলধর সেন, ওঅপদেশ মুখার্জি প্রভৃতি সাহিত্যিকগণ উহাতে যোগদান করেন। সেই সভায় শ্রীকুমার বাবু “রূপকথা” নামে একটি স্ব-লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। উহা উচ্চপ্রশংসিত হওয়ার “প্রবাসী” পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং বর্তমানে আই-এর বাঙ্গালা পুস্তকে উহা সন্নিবেশিত আছে। ইহার পর ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় হয়। ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় ক্রমশঃ বাঙ্গালা রচনা লিখিতে আরম্ভ করেন। তন্মধ্যে “বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা” সর্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ হিসাবে আদৃত। তাঁহার লেখা “উনিবিংশ শতকের গীতি-কবিতা সঙ্কলন”—এ আমরা পাই ১৮৫০ সালের পর হইতে ১৯১০ সাল পর্য্যন্ত বাংলার বহু জানা-অজানা কবির কবিতা সংগ্রহ। তিনি বহু পুরাতন ও অধুনালুপ্ত মাসিক পত্রিকা হইতে কবিতাগুলি সংগ্রহ করেন। এছাড়া তাঁহার ‘সমালোচনা-সংগ্রহ’ ও ‘বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা’ পুর্কোক্ত দুইটি পুস্তকের সহিত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পাঠ্য হিসাবে নির্ধারিত হইয়াছে।

বাল্যকাল হইতে শ্রীকুমার বাবু খেলাধুলায় অমুরক্ত ছিলেন এবং পরবর্তীকালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টস কন্ট্রোল বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসাবে কার্য্য করেন। তাঁহারই প্রচেষ্টায় কলিকাতার



ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বিভিন্ন কলেজ কর্তৃপক্ষ মহাদানে নিজস্ব খেলার মাঠ সংগ্রহ করিতে সক্ষম হন। রাজ্য সরকারের খেলাধুলা স্তিমিত করার উদ্দেশ্যে রচিত বিলের উপর তাঁতার মতানত লিপিবদ্ধ আছে।

১৯৫২ সালে তিনি রামপুরহাট কেন্দ্র হইতে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার সদস্য নির্বাচিত হন। সেই সময় তিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজনৈতিক দলসমূহের একীকরণ প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন। 'রবিবাসর,' 'নিখিল-ভারত বঙ্গ-সাহিত্য-সংমেলন,' 'বোর্ড অব ষ্টাডিজ ইন মিউজিক' এর চেয়ারম্যান, আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি এখনও সক্রিয় ভাবে জড়িত আছেন।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্যে শক্তিশালী সাহিত্যিক অনেককেই আছেন কিন্তু শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু শক্তিশালীই নন নিঃসন্দেহে নিজের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য উজ্জ্বল।

উত্তর প্রদেশের জোনপুরে ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ৩০শে মার্চ তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতা ৬তারাভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিহারের অন্তর্গত প্রাচীন সহর মুঙ্গেরের লক্ষপ্রতিষ্ঠ ব্যবসায়ক ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এঁদের আদি নিবাস ছিল চব্বিশ পরগণার বরানগরে। তারপর সেখান থেকে পূর্ণিয়া এবং পূর্ণিয়া থেকে নিজের কর্মক্ষেত্র মুঙ্গেরে চলে আসেন সপরিবারে শরদিন্দুর পিতা। তিনি বিহারের অল্পতম শ্রেষ্ঠ উকিল ছিলেন। খ্যাতি, অর্থ ও প্রতিপত্তি কিছুই অভাব ছিল না। তাই সমৃদ্ধ পারিবারিক পরিবেশে শরদিন্দুর বাল্যকাল কেটেছে। লেখার আগ্রহ তাঁর ছোটবেলা থেকেই। মা বিজলীপ্রভা দেবীর তসত্ত্ব বই পড়ার ফাঁক। বালক শরদিন্দু মাতের সংগ্রহ



শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

করা বইগুলি পড়তেন। একদিন বঙ্গিমচন্দ্রের আনন্দমঠ পাড় তাঁর মনে অদ্ভুত প্রেরণা এল। তিনি গল্প লিখবেন ঠিক করলেন। এই ভাবে ভাবী সাহিত্যিকের হাতেখড়ি হল। স্থানীয় জেলা স্কুল থেকে ১৯১৫ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতায় পাড়তে এলেন বিজ্ঞানাগর কলেজে। ছোটবেলা থেকেই খেলাধুলার অনেক বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন তিনি। বিশেষ ফুটবল ও টেনিসে। কলকাতায় কেশব সেন স্ট্রীটের ওয়াই, এম, সি-এতে তিনি থাকতেন। এবং সেখানেই বাস্কেট বলের একটি দল গঠন করেন। তাঁর নেতৃত্বে এই দলটি একাধিকবার ইণ্ডিয়া চ্যাম্পিয়ানশিপের সম্মান অর্জন করে।

কিন্তু এই সবের কঁাকেও 'সাহিত্যচর্চা' তাঁর সমানে চলছিল। এই সময়েই তিনি নিজের উদ্যোগে 'যৌবনস্মৃতি' নামে একটি ছোট কবিতার বই প্রকাশ করেন। তখনকার শ্রেষ্ঠ জনপ্রিয় পত্রিকা প্রবাসীতে এর দীর্ঘ সমালোচনাও বেরিয়েছিল। মাত্র ১৮ বছর বয়সে তাঁর বিবাহ হয়। তিনি তখন তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। মুঙ্গেরের অল্পতম উকিল শ্রামদাস চক্রবর্তীর নাতনী পারুলবালা দেবী শরদিন্দুর সহধর্মিণী হয়ে আসেন।

কলকাতা থেকে বি-এ পাশ করার পর তিনি পাটনা থেকে ল' পাশ করেন। পিতা বিখ্যাত উকিল, সমস্ত রকম সুবিধা থাকা সত্ত্বেও তিনি ওকালতি করেননি। কিছুদিন বার লাইব্রেরীতে ঘোরা-ফেরা করে পুরোপুরি ভাবে সাহিত্য সাধনায় মনোনিবেশ করলেন এসে। কয়েকটি পত্রিকায় তখন তিনি লিখছেন। একদিন বঙ্গমতীতে গল্প (উড়োমেঘ) পাঠালেন তিনি। প্রকাশও পেল কিন্তু গল্পের শেষের দিকে সম্পূর্ণ বদলে দেওয়া হয়েছে। তিনি কিছুটা রাগত ভাবেই সম্পাদক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে পত্র দিলেন। উত্তর এল যথাসময়ে। সুন্দর প্রেরণাময় চিঠি। সম্পাদক জানিয়েছেন, লেখার অদলবদল করা হয়েছে লেখককে ছোট করার জন্যে নয়—রচনাটিকে আরো গাভীলী করার জন্যেই। এর পর বঙ্গমতীতে তিনি প্রচুর লিখেছেন। এমন কি তাঁর বিখ্যাত ব্যোমকেশের প্রথম আত্মপ্রকাশ এখানেই।

১৯৩৮ সালে তাঁর বংশে ঘাওয়ার আহ্বান আসে। বংশ টকিজেব তিমাংস রায়েব একজন বাঙ্গালী কাহিনীকারের প্রয়োজন ছিল। ওই সঙ্গে তারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়কেও আহ্বান জানান হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তাঁদের মধ্যে শরদিন্দুই নির্বাচিত হন। সেই থেকে তিনি পশ্চিম-ভারতেরই আছেন। উপস্থিত তিনি আর কন্ট্রাস্টের বাধাবিধির মধ্যে নেই। স্বাধীন ভাবে সাহিত্য সাধনায় ব্যাপৃত আছেন। তাঁর বহু কাহিনী চিত্রায়িত হয়েছে। তার মধ্যে ভাবী, নবজীবন, দুর্গা, পুনর্মিলন, আজাদ, মুকাদ্দার ইত্যাদি ছবি দর্শকদের চিত্তক্লান্ত করেছে।

সাহিত্যেব ক্ষেত্রে শরদিন্দুর স্থান একক এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। তাঁর ঐতিহাসিক উপজ্ঞাসগুলি সাহিত্যের দরবারে যুগান্তর এনেছে। জাতিস্মর, বিধকল্পা, কালের মন্দির, গৌড়মল্লার, হুমি সন্ধার মেঘ ইত্যাদি যে শুধু রচনাশৈলীর উৎকৃষ্ট উদাহরণ তাই নয় বরং ভারতীয় সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। ডিটেক্টিভ কাহিনী রচনায় তিনি ভারতের কোনেদ ডায়াল। তাঁর অমর সৃষ্টি ব্যোমকেশের কাহিনীকলাপে পাঠক-সমাজ চমৎকৃত। ব্যক্তিগত জীবনে শরদিন্দু অত্যন্ত

সদালাপী ও রসিক। উপস্থিত তিনি পুণায় বাড়ী কবে বসবাস করছেন। তাঁর একমাত্র কনিষ্ঠ ভাতা অমরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভগিনী মান্নগণী মুখোপাধ্যায় স্ব স্ব জীবনে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর তিন পুত্র—সকলেই কৃতিমান। তাঁর মধ্যম পুত্র শাহু বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গের একজন উদীয়মান চিত্রপরিচালক।

প্রকৃতপক্ষে শরদিন্দু সারা জীবন সাহিত্যই করে- চলেছেন। সাহিত্যকে তিনি ভালবাসেন। গত বছর আনন্দবাজার তাঁকে সাহিত্য পুরস্কার দিয়ে সম্বর্ধিত করেছেন। আমরা তাঁর দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

শ্রীপ্রসাদকুমার বসু

[পশ্চিমবঙ্গের গোয়েন্দা বিভাগের ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল]

অপূর্ব কর্মতৎপর, সাহসী ও কর্মদক্ষ এ পুরুষটি। মুখে সর্বদাই হাসি। এঁকে ঠিক পুলিশ অফিসার হিসেবে বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজন দেখেন না। সাংবাদিক হিসেবে এই পদস্থ পুলিশ অফিসারটির সঙ্গে মেশবার সুযোগ পেয়েছি দীর্ঘকাল। কিন্তু একটি দিনও তাঁকে গম্ভীর হতে কিংবা মেজাজ খারাপ করতে দেখিনি। কঠোর দায়িত্ব সম্পাদনের কার্যে লিপ্ত থাকা কালে দেখেছি তাঁর সদাশাস্ত্রময় মুখখানি। কিন্তু এঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—যখনই যে কাজের আহ্বান এসেছে তাঁর কাছে, যত কঠিনই হোক না কেন, স্তম্ভভাবে ও অতিশয় দক্ষতার সঙ্গে তিনি তা সম্পন্ন করে আসছেন অক্লান্ত ভাবে কোন নিন্দা বা স্তুতির অপেক্ষা না করে। যখনই প্রয়োজন হয়েছে নিজের জীবন তুচ্ছ করে তিনি এগিয়ে গেছেন কর্তব্যের কঠোর আহ্বানে। অসাধারণ সংগঠনী শক্তি নিহিত আছে এঁর কর্মধারার আর তার সাথে রয়েছে বিচক্ষণতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব। এই মূলধন নিয়েই শ্রী বসু এগিয়ে চলেছেন তাঁর কর্মজীবনে এবং এ কয়টি মূলধনের সহায়তায় আজ তিনি পুলিশ বিভাগে এতখানি উচ্চ আসন ও মর্যাদা লাভ করেছেন। আর একটি মহান আদর্শ রয়েছে শ্রী বসুর জীবনে। তিনি নিজেকে সর্বদাই জনগণের সেবক বলে মনে করেন। শুধু পুলিশ অফিসার হিসেবেই নয়, স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে। নিজের কর্মময় জীবনধারায় তিনি এই আদর্শেরই একনিষ্ঠ পূজারী।

‘পুলিশ বিভাগে চাকরি করতে হবে এ কখনই ভাবিনি। শুধু আমিই নয় আমার পুত্র্যপাদ পিতৃদেব কিংবা অন্য কোন আত্মীয়-স্বজন কোন দিন মনে করেন নি। আমার বরাবরই ইচ্ছে ছিল যে আমি শিক্ষা বিভাগে শিক্ষাব্রতী হয়ে কাজ করি। আমার পিতৃদেবের ইচ্ছা ছিল অক্সফোর্ড-এর ডিগ্রি নিয়ে এসে শিক্ষা বিভাগে আত্মনিয়োগ করি। কিন্তু লোকে ভাবে এক, আর হয় এক। ঠিক এমনই দিনেই আমার পিতৃদেবের টাকা যে ব্যাঙ্কে ছিল, সেই ব্যাঙ্ক ফেল হলো। এদিকে আমার পিতৃদেবও তখন বৃদ্ধ। এই পরিস্থিতিতে আমার কর্মগ্রহণ। নতুবা আজ আমি পুলিশ অফিসার না হয়ে শিক্ষাব্রতী হিসেবেই পরিচিত হতুম।’—এ কয়েকটি কথা শ্রী বসু আমাকে বললেন আলোচনা প্রসঙ্গে।

শ্রীবসুর পৈত্রিক বাসভূমি পূর্ববঙ্গের (বর্তমান পূর্ব-পাকিস্তান) বশোর জেলার বিনাইদাতে হলেও তিনি কখনও নিজের পৈত্রিক বাসভূমিতে যাননি। ১৯১৩ সালের আগষ্ট মাসে কলকাতার বাগবাজারে তাঁহার মাতামহ স্বর্গীয় সনৎকুমার ঘোষের বাড়ীতে শ্রীবসুর জন্ম। পিতা ছিলেন স্বর্গীয় ডাঃ দুর্গাপদ বসু। দুই বৎসর বয়সে শ্রীবসু তাঁহার স্নেহময়ী জননীকে হাবান। সেই থেকে তিনি মামার বাড়ীতে লালিত-পালিত। তার পর তাঁর বাবা, শৈশব ও ছাত্রজীবন কাটে এ ক’লকাতা মহানগরীতেই। ১৯২৯ সালে সাউথ সুবার্বান স্কুল (মেন) থেকে তিনি চারটি ‘লেটার’সহ প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৩১ সালে ক’লকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে আই, এ, পরীক্ষায় পঞ্চদশ স্থান অধিকার করে উক্ত কলেজেই ইতিহাসে অনার্স নিয়ে বি, এ, পড়তে থাকেন এবং ১৯৩৪ সালে ইতিহাসে প্রথম শ্রেণীতে ১ম হয়ে সসম্মানে বি, এ, ডিগ্রী লাভ করেন। তার পর শ্রীবসু এম, এ, কোর্স ও দুই বৎসর আইনও পড়েন। কিন্তু ১৯৩৭ সালে বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় এবং ইণ্ডিয়ান অডিট ও একাউন্টস সার্ভিসে পরীক্ষা প্রদানের জন্য তাঁর এম, এ, ও আইন পরীক্ষা দেওয়া হলো না। হাতের লেখা খারাপের অভুহাতে ৫ নম্বর কাটা যাওয়ার জন্যে শ্রীবসুর শেষ পর্যন্ত অডিট ও একাউন্টস সার্ভিসে যোগ দেওয়া হলো না।

বি, সি, এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ’য়ে তিনি ডেপুটি সুপার হিসেবে সরকারী কাজে যোগদান করলেন ১৯৩৮ সালে। ট্রেনিং কলেজে শিক্ষা গ্রহণান্তে প্রথমে নদীয়ায় তার পর সাব ডিভিশনাল পুলিশ অফিসার হিসেবে ১৪ পরগণা জিলার ডায়মণ্ড হারবার মহকুমায় যোগদান করেন। এর পর শ্রী বসু রাজসাহী, ময়মনসিংহ এবং ঢাকায় সহকারী পুলিশ সুপার হিসেবে কাজ করেন। তিনি মেদিনীপুরে পুলিশ সুপার থাকাকালীন ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন



শ্রীপ্রসাদকুমার বসু

হাঁবার সঙ্গে সঙ্গে ১৫ই আগষ্ট তারিখের শ্রেষ্ঠ মহানগরী কলিকাতায় পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডেপুটি কমিশনার হিসেবে কার্যে যোগদান করেন। এই কাজে তিনি প্রশংসার সঙ্গে ১৯৫২ সাল অবধি কাজ করেন। তারপর অল্প কিছুদিনের জন্যে ২৪ পরগণা জিলার আলিপুরে পুলিশ সুপার হন। ১৯৫৪ সালে শ্রী বসু পুনরায় কলকাতা পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডেপুটি কমিশনার হ'য়ে আসেন। ১৯৫৫ সালে কলকাতা পুলিশের সদর কার্যালয়ের ডেপুটি কমিশনার হন। ১৯৫৬ সালে পুলিশের নদীর্ঘ রেঞ্জের (জলপাইগুড়ি সদর কার্যালয়) ডেপুটি ইন্সপেক্টার জেনারেলের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ১৯৫৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি পশ্চিমবঙ্গের গোয়েন্দা বিভাগের ডেপুটি ইন্সপেক্টার জেনারেল হিসেবে কলকাতায় বদলী হন এবং তখন হ'তে অজ্ঞাবধি ডেপুটি ইন্সপেক্টার জেনারেলের দায়িত্বভার বহন করে চলেছেন নিরলস ভাবে।

পুলিশ বিভাগে কাজ করবার সময় শ্রী বসু কয়েকটি হুসাহসিক কাজ করেন তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু স্থানান্তরে এখানে মাত্র দু'টি ঘটনার উল্লেখ করছি। প্রথমটি হচ্ছে ১৯৪৭ সালে। শ্রী বসু তখন মেদিনীপুরে। সেই সময় গড়গপুরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়। পরে ঐ দাঙ্গা ভীষণ আকার ধারণ করে। দাঙ্গাকারীরা উভয় পক্ষেই বন্দুক, ছোরা, তরবারি, বোমা ও গোলাগুলী ব্যবহার করে।

এই বিধ্বংসী দাঙ্গার মাঝে সহসা কোন লোক যেতে চায় না। শ্রীবসু নিজের জীবন বিপন্ন করে স্বেচ্ছায় দাঙ্গা দমনে এগিয়ে গেলেন এবং আগ্নেয়াস্ত্রের সহায়তা গ্রহণ না করেই দাঙ্গা প্রশমিত করেন। শ্রীবসুর উপস্থিতিতেই দাঙ্গাকারীরা পলায়ন করে। তারপর ১৯৪৮ সালে ক'লকাতার আপার সারকুলার রোডে শ্রীবসুর জীবন বিপন্ন হয়। অবশ্য শেষ পর্যন্ত তাহার অসীম সাহস ও প্রত্যাশপূর্ণমতিতে তাহার জীবন রক্ষা পায় ও তিনি বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হন এবং দাঙ্গাকারীরা পলায়ন করে। ঘটনাটি ঘটে মহরমের শোভাযাত্রার সময়। শোভাযাত্রাটি যখন আপার সারকুলার রোডস্থ বিজ্ঞান-কলেজের সম্মুখে উপনীত হয় তখনই ঘটনাটি ঘটে। জনৈক ভ্রমলোক সারকুলার রোডে ফুটপাথ ধরিয়া অগ্রসর হইতেছিলেন। ইতোমধ্যে শোভাযাত্রাকারীরা ভ্রমলোককে আক্রমণ করে এবং ভ্রমলোকের মস্তকে আঘাত করে। ভ্রমলোক রক্তাক্ত অবস্থায় ফুটপাথে পড়িয়া যায়। শ্রীবসু ঘটনাস্থলের অনতিদূরে দাঁড়াইয়াছিলেন, তাহার সঙ্গে সাধা পোষাক পরিহিত কয়েকজন মাত্র

কনষ্টেবল ছিল। এই করুণ দৃশ্য দেখিয়া তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না। নিজের জীবনের মাত্রা ত্যাগ করিয়া তিনি একাকী ভ্রম ও নৃশংস জনতার মধ্যে কাঁপাইয়া পড়িলেন ভ্রমলোকটিকে রক্ষার জন্যে। সেদিন শ্রীবসু ঐ ভাবে অকুস্থলে না গেলে ভ্রমলোকের জীবন রক্ষার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। শ্রীবসু ভ্রমলোকটিকে ধরে তোলবার সঙ্গেই ক্রোধাক্ত জনতা তাঁকে আক্রমণ করলো। তিনি গতাত্তর না দেখে জীবন রক্ষার জন্যে তাঁর রিভলভার থেকে ১ রাউণ্ড গুলী করেন জনতার পা লক্ষ্য করে। ফলে ১ জন পায়ের আঘাত লাগে পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার মুসলমান পলায়ন করে। ক্রমে শ্রীবসু ভীষণ দাঙ্গা প্রশমিত করেন সেদিন। সবাই মনে কবেছিলেন, শ্রীবসু বেঁচে আসতে পারবেন না। কিন্তু নিজের কর্তব্যের কাছে কোন শক্তিই সেদিন তাঁকে বাধা দিতে পারেনি।

খুব সম্ভবতঃ একথা অনেকেরই জানেন না যে, বাল্যকাল থেকেই শ্রীবসু সাহিত্যচর্চা করে আসছেন। “বঙ্গভী” “বিচিত্রা” ও “শ্রীধর্ম” মাসিক পত্র-পত্রিকাগুলিতে তাঁহার বহু গল্প প্রকাশিত হয়েছে। অজ্ঞাবধি তিনি সাহিত্যচর্চা অকুণ্ণ রেখেছেন। একদিন স্বর্গত কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মশাই শ্রী বসুর গল্পের প্রশংসা করেছেন।

শ্রী বসু ১৯৪১ সালে গৌরী দেবীকে বিবাহ করেন। তাঁহার সহধর্মিণী একজন বিদ্যাবী মহিলা ও প্রখ্যাত শিল্পী। তিনটি সন্তানের জননী হয়েও ১৯৫৩ সালে শ্রীমতী বসু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. পরীক্ষার উত্তীর্ণ হন। সন্দেহেও তিনি বিশেষ পারদর্শিনী। শ্রী বসুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান অশোককুমার ১৯৫৮ সালে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় পশ্চিমবঙ্গে প্রথম স্থান অধিকার করে। তার সাক্ষ্যেব মূলে রয়েছে শ্রীমানের মাতা গৌরী দেবী ও শ্রীবসু। তাঁরা উভয়েই ছেলের লেখাপড়ায় সাহায্য করেছেন সক্রিয় ভাবে।

ব্যক্তিগত জীবনে শ্রী বসু অনাড়ম্বর জীবন অতিবাহিত করেন। ক্লাব, খেলাধুলো হৈ-ছড়োড় তাঁর ভাল লাগে না। অবসর সময়ে তিনি সাহিত্যচর্চা, পড়া ও গানবাজনা নিয়েই সময় অতিবাহিত করতে ভালবাসেন। নিরহঙ্কার, সদালাপী, বন্ধুবৎসল প্রভৃতি বহুগুণে তিনি বিভূষিত। জনগণের সেবাই তাঁর জীবনের চরম লক্ষ্য। আমরা এই গুণী, বিদ্বান ও সং অফিসারটির দীর্ঘজীবন কামনা করি এবং প্রার্থনা করি, তিনি বহুদিন জীবিত থেকে দেশের ও জনগণের কল্যাণ-সাধন করুন।

রমণী

শ্রীমতী তৃপ্তি সোম

তুমি যে রমণী

তোমার পূর্ণতা নহে রক্ত-কাঁকনে

রূপের প্রবে তুমি নহে বিজয়িনী।

নারীত্বের মাহাত্ম্যের অনন্ত সৌরভ

তোমাতে নিহিত : তব অনন্ত সৌরভ।

সে সুরভি জয় করে সবাকার মন—

মমতা ও সেবা-হৃদয়, মিষ্ট আলাপন।

ঈশ্বর-কান্ত-বিন্দু-চিত্তে মেহ-সন্ধারিণী

তুমি পূর্ণ তুমি স্বত তুমি বিজয়িনী।

শ্রীকৃষ্ণাবনে গিরিও গোবিন্দী

দর্শন কয়েদি তপন। অথচ
তাকেই গিরে ধরলেন মোক্ষদা
ঠাকুরাণী : আমাকে হরিদ্বারে গিরে
বাঁধি বাবা ?

আমি ?

তুই না নিয়ে গেলে আমার
আর বাঁধাই হয় না।

কিন্তু আরও গুরুতর কারণ আছে
তপনের বিমিত্ত ভাব। এখানে ত ই
প্রকাশ হয়ে পড়ল তার প্রাণে।

এতদিন বাঁধা তরুণি কেন,
মাসীমা ? তীর্থ তো কম করনি
তুমি ?

আসল কারণটা জানা গেল
মোক্ষদার বাট বছর বয়সের ছোট
পুত্র ত্রৈলোক্যনাথের কাছ থেকে।
কবল হরিদ্বার কেন, মাকে সঙ্গে নিয়ে
একেবারে কেনারবরী পর্যন্ত বাবার
একটা ইচ্ছা অনেক দিন বাঁধে তিনি মনে মনে পোষণ করে আসছেন
বলে দু-একবার স্রবোগ থাকলেও জননীকে তিনি হরিদ্বার যেতে
দেননি। কিন্তু বিধি তার উপর বাম বলেই বুঝি চাকরি ছেড়ে অবসর
নেবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি নিজের বাতে একেবারে অচল হয়ে পড়েছেন।
এরকম অবস্থায় আর একজনের সঙ্গে এটি সময় মোক্ষদাকে
পাঠাতে না পারলে এ জীবনে বৃদ্ধার আর হরিদ্বার দর্শন
হয় না।

আশীর কোঠার পড়েছেন মোক্ষদা ঠাকুরাণী। তাঁর স্নায়ুজীর্ণ
দেহখানির দিকে চেয়ে তপন মুহূর্তে হেসে বললে, তুমি সচল আছ
নাকি মাসীমা ? হরিদ্বার পাহাড় ভেঙ্গে ভেঙ্গে উপরে উঠে ঠাকুর
দেখতে পারবে তুমি ?

খুব পারব বাবা।

বেশ দৃঢ় কঠোর বৃদ্ধার। কাতরতা যেটুকু তা কেবল তার
চোখের দৃষ্টিতে। সে দৃষ্টি অমনুষ্যের।

তবু সশরীর হয় না তপনের মন থেকে। কিছুক্ষণ পর সে
আবার সজ্ঞাসা করল, অত দূরে তুমি কেন যেতে চাও মাসীমা ?
কি দেখবে তুমি হরিদ্বারে গিরে ?

তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন মোক্ষদা, হরগৌরী দর্শন করব বাবা।

সে তো কালীভোগে দেখেছ তুমি। দেখ নি ?

সে তো বিশ্বনাথ আর অন্নপূর্ণা।

হরগৌরী আলাদা নাকি ?

তা কেন ? তবু—

বলতে বলতে ধেমে গেলেন মোক্ষদা; কিন্তু একটু পরেই
তিনি গাঢ়স্বরে আবার বললেন, ছেলেবেলা থেকেই আমার সৌরী
দর্শন করবার সাধ। পূজা হত তো আমাদের বাড়ীতে। তখন
আগমনীর পান চুনতাম আর মনে হত যে হিমালয়ে গৌরীর বাণের
বাড়ীতে গিরে সেই কুমারীরূপে মাকে দর্শন করব।

ত্রৈলোক্যনাথ খপ করে তপনের ডান হাতখানা চেপে ধরে



শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ রায়

বললেন, তুমি তপন, কথা রাখ আমাদের, মাকে নিয়ে বাঁও
হরিদ্বারে। ঘুরে ঘুরে বেড়ানোই তো তোমার অভাব। আর
হরিদ্বার হো তোমার বেশ চেনা জায়গা।

সেই জগত তো আপত্তিও আমার বেশী, উত্তর দিল তপন :
হরিদ্বার তো বাংলাদেশ নয়, দালা। মাসীমার এ সাধ মিটেবে না
সেখানে গিরে। মাঝে থেকে আমারই বদনাম বাড়বে। মাসীমা
হয়তো শেষে বলবেন যে আমার মত পাষণ্ডের সঙ্গে গিয়েছেন বলেই
গৌরী দর্শন দিলেন না তাকে।

কিন্তু কোন গুরু, কোন আপত্তিই খাটল না তপনের। শেষ
পর্যন্ত রাজী হতে হল তাকে। তারপর পাকি দেখে এক শুভ দিনে
দেবাহন এক্সপ্রেস যোগে হরিদ্বার যাত্রা।

ভোর হল লাকসার ষ্টেশনে। তপনের চেনা পথ, পরিচিত
দৃশ্য। সবুজ মারাকাজল লেগেছে তার চোখে।

বাঁ দিকে বিচিত্র দৃশ্য সব। দিগন্ত অদৃশ্য হয়েছে। বতবু
চোখ বার দেখা যায় শুধু পর্বতশ্রেণী। অতুলনীর তার রূপ।
নাই বা বলকে উঠল ভূবাবের মুকুট, নাই বা মেঘ মেঘলোক
ছাড়িয়ে উঠল তার উজ্জ্বল শৃঙ্গ। তথালি সে হিমালয়। বিরাট
তার গঠন, বিপুল সমৃদ্ধি। অব্যাসম্পদের আংশিক প্রকাশেও
অপরিসেরতার ইঙ্গিত। শেষ বর্ষার প্রকৃতি। বিজয়ী প্রাণের
স্বভা উঠেছে বেন নিস্তাণ পাষণ্ডের কঠিন বন্ধ বিদীর্ণ করে। ঢাকা
পড়ে গিয়েছে পাহাড়ের শিলাময় রূপ। গাছে গাছে পাতার ঠাস
বুননি। শ্রাম আর সবুজের নিবিড় কোলাকুলি। শুবের পর শুব এই
ঘন সবুজের সমারোহ। উত্তাল তরঙ্গ-বিন্দু সবুজের সমুদ্রে বেন
অকস্মাৎ কোন দেবাদিদেবের দর্শন লাভ করে সঙ্গ্রাম বিষয়ে নির্বাক
ও নিশ্চল হয়ে গিয়েছে।

ভোর থেকেই দালা ভপছিলেন মোক্ষদা ঠাকুরাণী। তথালি
তাকেই সন্ধান করে তপন বললে, দেখ মাসীমা, কি দৃশ্য।

অপ বন্ধ করে কিছুক্ষণ ভাকিয়ে দেখলেন মোক্ষদা ; তারপর বললেন, কি দেখতে হলছিল ? এ তো বোপ।

ক্লান্ত তপন ; কিন্তু হেসেই সে বললে, রাজার বাড়ীকে বলছ বোপ ? কোন সেপাই কোটালের কামে গিয়ে থাকলে হাতে মাথা কেটে নেবে তোমার। এই তো হিমালয় ভোমাদের গৌরীর বাপের বাড়ী।

আঁ।—চমকে উঠলেন মোক্ষদা।

তপন বললে, হ্যাঁ মাসীমা, হরিবার এসে গেল আর কি।

তবে হুই হাত জোড় করে উদ্দেশে প্রণাম করলেন মোক্ষদা, তখানি বিহ্বল তাঁর ভাব।

গাড়ী তখন গজেন্দ্র গমনে একটি পুলের উপর উঠছে। নীচে ধালের মত একটি নদী। তবু তাই দেখেই বুকি সহযাত্রী একদল রাজপুতানী সমন্বয়ে সন্ধ্যার বন্ধার কুলে জয়ধ্বনি দিল : জয় জয় গঙ্গা মাদ্রীকী জয়।

মোক্ষদা চমকে উঠে ভিজ্জাসা করলেন, এই গঙ্গা নাকি রে তপু।

তপন উত্তরে বললে, স্বয়ং গঙ্গা না হলেও তাঁরই কোন বোন হয়েন।

কি বলছিল তুমি ?

তাই বই কি মাসীমা ! ইনিও তো শিবের জটা থেকেই নেমে আসছেন।

উত্তর মনঃপুত হল না মোক্ষদার, হবার কথাও নয়। কিন্তু আবার তিনি তাকালেন নীচের সেই নদীর দিকে। গাড়ী পুল পার হয়ে খানিকটা এগিয়ে বাবার পর তা বন্ধন আর দেখা গেল না, তখন ফিরে তপনের মুখের দিকে চেয়ে তিনি বললেন, ভেরাতাড়ার কথা আগে নয় রে তপু। গাড়ী থেকে নেমেই আমার গঙ্গার ঘাটে নিয়ে বাবি। কলুবনানিনী গঙ্গা। সত্যই তো, শিবের জটা থেকে নেমে এই হরিবারেই তিনি প্রথম মর্তের মাটি ছুঁয়েছেন আমার মত পাণী-ভাগীর কলাণ ও মুক্তির জন্ত। আগে গঙ্গার ডুব না দিয়ে আর কোন কাজ নয়।

বিজ্ঞা গিয়ে খামল ভোলাগিরির আশ্রমের কাছে। বিজ্ঞাওয়ারা ভাঙা বাংলার মোক্ষদাকে বুঝতে চেষ্টা করল যে নিকটেই যে ধর্মশালা আছে সেখান থেকে তিনি রাত-দিন গঙ্গা দর্শন করতে পারবেন বলেই বিশেষ করে ঐ জায়গাতেই মাদ্রীকীকে নিয়ে এসেছে সে।

ততকালে দর্শন পেয়ে গিয়েছেন মোক্ষদা। একেবারে কুলে কুলে পরিপূর্ণ বাঁধা ঘাটের প্রায় সব ক'টি সিঁড়ি অতিক্রম করেছে জল—পথে ঠাঁড়িয়েই নীচ দেয়ালের উপর দিয়ে বেশ দেখা যায়। এতদে তেমন বিশালতা না থাকুক, পরিপূর্ণতার কঁক বা কঁকি একেবারেই নেই। ওপায়ে কনখলের দিকে সবুজ-রোপিত তরুশ্রেণীর নিবিড় ভায়লতার অন্তরালে সিমেন্ট-কংক্রিটের পাকা গাঁথুনি চোখেই পড়ে না। মাঝে শুষ্ক জল আর জল। তবুও নেই, কুটিল আবর্ত নেই। আছে শুষ্ক গতি—বিপুল, বিশাল জলধারার অবিচল স্রবণের গতি। আর আছে বেন নির্ভূত, তানলয়সম্বিত অসংখ্য জলতরঙ্গের সমাপ্তিহীন স্তললিত ঐকতান সঙ্গীত।

একরকম ছুটেই ঘাটে গেলেন মোক্ষদা। অজলি তরে জল কুলে কুলে মাথার, মুখে সিকন করতে করতে তপনকে ডেকে বললেন,

তোমার মন না চায় তো ওখানেই ঠাঁড়া তুমি। আমি হুটি ডুব দিয়ে সকল ঝালা জুড়াই।

তবে কিন্তু রীতিমত তর পেয়ে গেল তপন। ওটি শ্রানের ঘাট হলে কি হবে, শ্রোত এত প্রবল যে তার নিজেরই সাহস হয় না ঐ ঘাটে জলে নেমে শ্রান করতে। সে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বললে, সে কি মাসীমা, এই গঙ্গার নেমে ডুব দেবে তুমি ? মনে নেই ঐরাবতের কি দশা হয়েছিল ?

হেসে উত্তর দিলেন মোক্ষদা, ঐরাবতের মনে পাপ ছিল বলেই অমন দুর্দশা হয়েছিল তার। আমি হলেম গিয়ে মায়ের বেটা। আমি তো গঙ্গার কোলে গিয়ে বসব। আমার ডর কিসের ?

হঠাৎ বুদ্ধি খেলে গেল তপনের মাথার। সে বললে, তাই বলে তীর্থ করতে এসে এই অস্থানে ডুব দেবে তুমি ? এ তো গঙ্গা নয়, নহর—মানে খাল। মাছুষে কেটেছে গঙ্গার জলকে তাদের চাবের কাজে লাগাবার জন্ত।

আঁ।—চমকে উঠলেন মোক্ষদা।

হাসি চেপে আরও গভীর স্বরে তপন বললে, হ্যাঁ মাসীমা, এটি খাল। আসল তীর্থ হল গিয়ে ব্রহ্মকুণ্ড। সেখানে গঙ্গা আহেন স্বয়ং ব্রহ্মার কমণ্ডলুর মধ্যে। সেখানেই যদি ডুব না দেবে তবে ঘরে কাছের কলকাতার গঙ্গা ছেড়ে এত দূরে এলে কেন তুমি ?

বুদ্ধি খণ্ডন করবার চেষ্টা করলেন না মোক্ষদা। কিন্তু জেদ করে বললেন, তাহলে সেখানেই চল। মোট কথা, গঙ্গার ডুব না দিয়ে আমি জলগ্রহণ করব না।

অগত্যা আবার চলতে হল তপনকে ; জিনিসপত্র থাকলো ধর্মশালায়।

সন্ধ্যা নয়, কিন্তু বিভক্ত হবার পূর্বের অবস্থা ওখানে গঙ্গার। স্তব্ধতা আরও বিপুল তার আয়তন, প্রবল তার উচ্ছ্বাস, ধরতর তার গতি। কিন্তু সে তো অনেক দূর—হরকি পৌড়ীর প্রশস্ত ও স্রষ্ট বলয়বেষ্টনী অতিক্রম করে অত দূরে দৃষ্টি চলে না মোক্ষদার। সন্ধ্যায়তন ব্রহ্মকুণ্ডের ঘাটে এসে তিনি বেন থ হয়ে গেলেন—এই গঙ্গা নাকি।

ততকালে পাণ্ডা জুটে গিয়েছে। সে-ই হাত-মুখ নেড়ে বুঝিয়ে বললে, সবুজ-মহুনের অন্তর দেবতাদের তাও থেকে ঠিক এই জায়গাতেই উপচে পড়েছিল। এখানে ডুব দিয়ে শ্রান করতে পারলে মোক্ষদার স্বর্গলাভ ঠেকার কে।

কিন্তু ডুব দেওয়া কি অত সহজ। সেটি বোগশ্রানের দিন না হলেও শ্রানের সময় তো বটেই। শ্রানার্থীর ভিড় মন্দ জমেনি। তাদের সঙ্গে আছে আবার পাণ্ডা, দোকানদার, কেরিওয়ারা ও ভিখারীর ভিড়। ঠেলে এগুনো যায় না জলের দিকে।

অনেক চেষ্টার পর জলে যখন পা ফেলা গেল, তখনই আর এক ফালাদ। হস করে মোক্ষদার প্রায় পায়ের কাছেই ভেসে উঠল পোটা হুই মাছ। অস্টু আর্তনাদ করে হাত কুলে, পা টেনে নিয়ে দূরে সরে গেলেন তিনি।

হৈ হৈ করে উঠল একটি বাতালী বুঝকের দল। অনেক চার নষ্ট করেও শেষ বর্ষার ঘোলা জলে এতরূপ একটি মাছও দেখতে পায়নি তারা। এখন দেখে তাদের আনন্দের আর সীমা নেই।

কিন্তু নির্ভাবতী ব্রাহ্মণের বিধবা যোদ্ধা। বাড়ীতে মাহ তিনি স্পর্শও করেন না, দেখলেও বোধ করি নিজেকে অশুচি মনে করেন। আর এই মহাতীর্থ হরিধারে গঙ্গার বাটেই কিনা—

বুঝতে পেরে হেসে ফেলল তপন। সে বললে, এ মাহ অশুচি নয় মাসীমা! কেউ তো ধার না এ মাহ—দেখছ না, বরং খাওয়ার মাছেদের।

তাই বলে ছুঁয়ে দেবে আমার? আর এই জলে আমি ডুব দেব?

বুঝতে পেরে পাণ্ডাও অতঃ দিল যোদ্ধাকে; আরও একটু বাড়িয়ে সে বললে, ওরা তো গঙ্গাজীর সন্তান—পরম পবিত্র জীব। এ তাঁর গঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে মহলিরও পূজা করতে হয়। তুমিও ভোগ লাগাও মাসীমা, ভাল কিলে জলে ছিটিয়ে দাও।

আটার সঙ্গে হয়তো আরও কি কি মিশিয়ে ছোট ছোট নাড়ুর আকারে তৈরি হয়েছে মাছেদের মিঠার। ও-জিনিস বাবা বেচছিল তাদেরও কয়েকজন ভক্তকণে যোদ্ধার কাছে এসে পাড়িয়েছে। দেখে তপন বেন মজা পেয়ে গেল। সে বললে, তাই তো মাসীমা, হরিধার-খবীকেশে এসে মাছের পূজা না করলে কি চলে? এস, আমরা দুজনেই ভোগ লাগাই।

আট আনার নাড়ু কিনে নিয়ে এসে সে; অনেকগুলি গুঁজে দিল যোদ্ধার হাতে; তার হাত দিয়ে নিজেই সে অনেকগুলি নাড়ু জলে ছিটিয়ে দিল।

এত বড় ভোজের নিমন্ত্রণ বুঝা বাবার নয়। ভেসে উঠল মাহ। হুট-একটি নয়, এক বাঁক। সিঁড়ি পর্যন্ত ছুটে এল কয়েকটি মাহ—যোদ্ধার পায়ের ঠিক নীচেই।

বড় বড় মহাশোল সব। পায়ের রং কালচে—শেওলাই জমেছে বোধ করি। কিন্তু লেজের দিকটা হলুদবর্ণ। সবটা মিলে খোলা জলেও চিক-চিক করছে। পাখনা মেলে, গা ভাসিয়ে, নির্ভয়ে সাঁতার কাটছে ওরা। মাঝে মাঝে হাঁ করছে। বেন একদল অবোধ শিশু হঠাৎ জলে পড়ে গিয়ে হাত-পা ছুড়ে আঁকু-পাঁকু করছে।

আবার হৈ-হৈ করে উঠল সেই বাঙালী বুকের দল; তপনও উৎসাহ হয়ে পরিহাস-ভরল কণ্ঠে বললে, তোমার পূজা ওরা গ্রহণ করেছে মাসীমা; দেখছ না, আরও ভোগ চাচ্ছে তোমার কাছে।

ভক্তকণে অনেক বদলে গিয়েছিলেন যোদ্ধা। তাকিয়ে দেখছিলেন মাছেদের খেলা। কিন্তু তপনের কথা শুনে একটু বেন লজ্জা পেলেন তিনি। বললেন, নে বাপু, এখন ওদের সরিয়ে দে বাট থেকে। একটা ডুব দিয়ে শুভ হই আমি।

কিন্তু স্থান শেষ হতেই আর এক গৌ তার—তখনই হরসৌরী দর্শন করবেন তিনি।

অগ্নিতে ইচ্ছন দিল পাণ্ডা। সে বললে, চল বুড়ী মারী, বিধবেশ্বরের মন্দিরে নিয়ে বাই ভোমাকে; কাছেই সতীকুণ্ড। বরষ শিব আর জাগ্রত সৌরী। দর্শন করলে জনম সার্থক হোবে।

দ্বিতীয় গৌ যোদ্ধার—তিনি পদ্মজ্ঞে মন্দিরে যাবেন।

তুনে অমন বাছ পাণ্ডাও শঙ্কিত হয়ে বললে, অত দূরের পথ কি হেঁটে বাওয়া যায়? আত্মরে নিয়মো নাড়ি। রেলগাড়ীতে এলে যেমন গৌ হয় না, টাকার চাপলেও ভেমন।

তবে পদ্মজ্ঞে বাবার সাধও মিটল যোদ্ধার। মন্দিরের কাছাকাছি এসে টাঙ্গা খেয়ে গেল। সামনে চড়াই, গাড়ী আর বাবে না।

একটি টিলার উপর বিধবেশ্বরের মন্দির। তেমন খাড়া বা খুব দীর্ঘ পথ না হলেও উপরে উঠা বেশ বষ্টকর। দম নেবার জন্য ছুঁবার খামতে হল যোদ্ধাকে। তাঁর কান্দির চেয়ে প্রত্যাশাই তার বেশী—যতাবিনিস্তত চোখ ছুটিও তার জল-জল করছে বেন।

কিন্তু দেখলেন কি। উঁচু পাহাড় ও সবুজের সমারোহ বা তা ঐ টিলার পিছনে। ততদূর পর্যন্ত দৃষ্টি চলে না বুঝার। যে শিখরে বিধবেশ্বরের মন্দির সেটি নেড়া পাহাড়। ছুঁ-তিনটি মোটে পাহাড়, তা-ও শাখাসর্ব্ব। ওদের মুখে ও মাথার বিগত বসন্তে মলয়ানিলের সপ্রেম চূখন কোন শিহরণই বেন জাগাতে পারেনি, ব্যর্থ হয়েছে ওদের মূলে গতবর্ষার অবিরাম বারিসিকন। ঠিক যে পাহাড়ের নীচে মন্দির তার পাতা দেখে বোঝবার জো নেই যে তা বেলগাছ না নিমগাছ।

নেড়া-নেড়া দেখায় মন্দিরটিও। পাথরের দেয়াল, পাথরের চূড়া, শিলাস্তম্ভের উপরেই নাটমন্দির বা বাবান্দার ছাদ। সব নিয়েও মনে হয় বেন ছোট একখানি কুটির। পারিপাট্যহীন গঠন, বিবর্ণ। প্রাঙ্গণ মস্তণ মোটেই নয়। পাথরের কোণগুলি মাঝে মাঝে বর্শাকলকের মত উঁচু হয়ে রয়েছে।

বিস্তারের মত চারিদিকে তাকাতো তাকাতো যোদ্ধা বললেন, এই মন্দির নাকি?

হ্যাঁ, বুড়ী মারী, পাণ্ডা উত্তরে বললে, মন্দিরে আছেন বিধবেশ্বর, আর এই হল গিয়ে কালভৈরব। একে আসে পূজা করে খুশী করতে পারলে তবে মহাদেবের দর্শন মিলবে।

বাড়ীতে কুলুশিতে যেমন বসানো থাকে সাধারণ গৃহস্থের গৃহ-দেবতা তেমনই ভৈরবের বিগ্রহ। ফুল-পাতার ছড়াছড়ি ওর চারিদিকেই, চাপ চাপ সিঁহরের কোঁটা ওর সারা পায়ে। পাথরের মূর্তি ভাল করে চোখেই পড়ে না। যোদ্ধা অসহায়ের মত বললেন, কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি নে বাবা!

বিগ্রহের পায়ের কাছে ফুলপাতা কিছু কিছু সরিয়ে দিয়ে পূজারী বললে, ভৈরব বড় ভয়ঙ্কর আছে। তুমি এই তার চরণ দর্শন কর, গড় কর, দক্ষিণা দাও। তাহলেই ভৈরবজীর হুকুম পেয়ে বাবে তুমি।

নির্দেশ পালন করলেন যোদ্ধা। সাক্ষিপ্ত অহুষ্ঠান শেষ হবার পর একটি সিকি রাখলেন বিগ্রহের পায়ের কাছে; পূজারী ও পাণ্ডাকে দিলেন এক একটি ছুঁআনি।

ভাতেই খুশী ওরা। পূজারী বললে, বা আপকী ইচ্ছা। যেমন প্রভু তেমনি তার ভৈরব। অল্পেই তুষ্ট। লেकिन হ্যাঁ, ভক্তি চাহিয়ে। কিন গড় করো।

মূল মন্দিরের কাছে গিয়ে আবার বুখর হয়ে উঠল পাণ্ডা: এই বিধবেশ্বর ষড়্ভু শিব। এইখানে সতীর তপস্তার তুষ্ট হয়ে তাঁকে দর্শন দিয়েছিলেন তিনি। তুমিও ভক্তি করে পূজা চড়াও মারী, তোমারও পরমগতি হোবে। বলতে বলতে বৃন্দ বটীর নিকল টেনে দিল সে। ঢা ঢা করে খটা বাজল। প্রাতিপদী বললে—
শুভ শুভ শুভ—

পারে কাঁটা দিল মোক্ষদার। কিন্তু দিব কোথায় ?

কালো পাথরের বাতায়নহীন মন্দিরের ভিতরটা প্রায় অন্ধকার। জ্বলন্ত বেন গাঢ়তর করেছে তেমনি কালো পাথরের এক ঘরঘেঁটনী। তার মধ্যে শিবলিঙ্গ। কীদৃষ্টি মোক্ষদার চোখে পড়বার কথা নয় তা।

তাই অহমান করে পাণ্ডা মোক্ষদার ডানহাতখানি নিয়েই ঐসে নিয়ে শিবলিঙ্গের উপর স্থাপন করে বললে, বাবার খুব তৃপ্তা চরেছে তোমার উপর বুড়ী মারী—আপন হোঁয়া তোমাকে আগে দিতে চাইতেন। এই তো দিব,—সেবাদিরেব যহানের। এখন স্ত্রীর দিকে চাও, দর্শন কর।

স্বর্ণপাশ অশ্রুজালিত; কাঁপতে কাঁপতে হাঁটু গেড়ে বসলেন মোক্ষদা, তারপর একবারে সাতাশ অধিপাশ। কল্যাণটা ঠিক করে পড়ল বৃষ্টি গৌরী-পটের উপর। কিন্তু উঠে দ্বিঃ হয়ে বসবার পর আবারও তিনি ব্যাকুলকণ্ঠে বললেন, কিন্তু মহাদেব কোথায়, বাবা ? আদি যে হরগৌরী দর্শন করব বলে এতদূরে এসেছি।

আশাত্তের বেনদার স্বাক্ষর মোক্ষদার কণ্ঠধরে। তাঁর মনের অবস্থা কিছু কিছু অহমান করে তপন এগিয়ে এসে তাঁকে বললে এই তো মহাদেব, মাসীমা,—এই তো তাঁর নির্বাণ রূপ। কান্ধিতেও তো তাই।

পাণ্ডাও বললে, ছা মারী, হর হর মহাদেব এই তোমার সামনে। আর সৌরী আছেন নীচে সতীকুণ্ডে। নাও, এখন পূজা শেষ কর।

পূজার অমুষ্ঠান সংক্ষিপ্ত। ঘটভরা জল শিবলিঙ্গের উপর ঢাললেই হল। ফুল-বেলপাতা ইচ্ছা হয় নাও, না দিলেও পূজার অমুষ্ঠান হবে না। ভোগ বা ভোগমূল্যও যাত্রীর সাধ্য বা ইচ্ছারূপ। কোন দিকেই তেমন দাবী-দাওয়া নেই।

কিন্তু মোক্ষদা পূজা করলেন যত্নশালিতার মত। মন্দির-পরিক্রমা শেষ করবার পরেও ভূপতির প্রসন্নতা ফুটে উঠল না তাঁর মুখে। দুটি চোখ তাঁর চঞ্চল হয়ে বেন তখনও তাঁর বাহিত দেবতাকে খুঁজছে।

সৌরী কোথায় বাবা ? আবার পাণ্ডাকে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি।

নীচের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে পাণ্ডা বললে, ঐ সতীকুণ্ড।

কেন খানিকটা উত্তরাই ডাঙবার পর ছোট-খাটো একটি উপভ্যকার কেন্দ্রস্থলে দ্বিতীয় তীর্থ। তেমন নেড়া আর নয়। চারিদিকেই সবুজ পাহাড়, নীচেও বড় বড় গাছ। ওদের কাঁকে কাঁকে চোখ পড়ে ভাঙা-চোরা কুটিরের মত একটি মন্দির আর সেই মন্দিরেরই প্রাঙ্গণে ছোট একটি পাতকুরোর মত সতীকুণ্ড। পাহাড় আর গাছের ছায়ার মধ্যস্থলে কেমন বেন অন্ধকার মনে হয়। পাথর ডাক নেই, শূণ্যতার গন্ধ নেই। মন্দিরে পূজারী ও পথে একটি ফুলের দোকান থাকলেও কেমন বেন থমথম করছে জায়গাটি।

থমথম করছে মোক্ষদার মুখখানিও। কিন্তু তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ ঐ পড়োবাড়ীর মত মন্দিরের গারেই। সেই দিকেই এগিয়ে চললেন তিনি।

ফুলের দোকান থেকে একটি ঘেয়ে ডেকে বললে, ফুল লিগা নেহি, ফুল ?

মোক্ষদার হয়ে তার পাণ্ডাই নিজের গামছাখানা প্রদানিত করে মেয়েটির কাছ থেকে কিছু ফুল কিনে নিল। প্রায় এক সাজি ফুল মায় পাটার দায় সে নিল দু'পরসা। তাতেই বেন খুশীতে ডগোমগো মেয়েটি। এবার সে তপনের দিকে চেয়ে বললে, তুমি জি লেও।

মাথা নেড়ে অস্বীকার করল তপন, কিন্তু পকেট থেকে একটি স্বকস্বক নম্র নম্রা পরসা বের করে সেটি সে ছুঁড়ে দিল মেয়েটির জায়গা পাথরের উপর।

দুহুর্ভেঃ জন্ম বেন বিহ্বল হল মেয়েটির দৃষ্টি ; কিন্তু থরথরনেই আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠল তা। মাত্রহে হাত বাড়িয়ে দুটোটি ফুল নিল সে—দুহুর্ভেঃ চেপে ধরে একেবারে বুকের কাছে।

হাসল তপন, তারপর সেও তরতর করে উপরে উঠে গেল।

কুণ্ড থেকে জল তুলতে হবে—পাণ্ডা বখাটীতি নির্দেশ দিচ্ছেল মোক্ষদাকে। কিন্তু তিনি ততক্ষণে এগিয়ে গিয়েছেন মন্দিরের দোরের কাছে। শুধু এগিয়ে যাওয়া নয়, হাঁটু গেড়ে বসেছেন চৌকাঠের এখানে। কিন্তু সমস্ত মন দুই চোখের দৃষ্টিতে একত্র করেছে কিছুক্ষণ পর নিরাশ হয়ে তিনি বললেন, কৈ বাবা, গৌরী তো দেখতে পাচ্ছি নে ?

ঐ তো সামনেই, উত্তর দিল পাণ্ডা, কেবল সৌরী কেন, মহাদেবজীও আছেন।

হরতো আছেন। কিন্তু ফুলপাতার সূপ আর চাপ চাপ চন্দন-সিন্দূরের আবরণের মধ্যে তপনের স্রুহ চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতেও পরিচিত হরগৌরীর মূর্তি একত্র বা স্বতন্ত্রভাবে ধরা পড়ল না। মোক্ষদা অনেকক্ষণ চেয়ে থাকবার পর আবার বললেন, এই গৌরী নাকি ?

সতীকী, পাণ্ডা নিবিকার হয়ে উত্তর দিল, ষিনি সতী তিনিই গৌরী। তাঁরই এই কুণ্ড—এও স্বতন্ত্র। উঠ, জল তোলা, পূজা কর।

সেই একই অমুষ্ঠান, তেমনই সংক্ষিপ্ত। অক্ষরে অক্ষরে পালন করলেন মোক্ষদা, মন্দির পারিক্রমাও বাদ গেল না। কিন্তু সবই বেন কলের পুতুলের মত। বেশ বৃষ্টিতে পারল তপন যে বাংলা দেশের দেবদেবীর নয়নাভিরাম মূর্তি দর্শনে অভ্যস্ত চোখ দুটি মোক্ষদার মোটেই তৃপ্ত হয়নি। হাসি গেল তপনের; বেশ একটু তীক্ষ্ণ কণ্ঠেই সে বললে, দর্শন পেলে মাসীমা,—তোমার হরগৌরীর ?

মন্দির প্রদক্ষিণ শেষ করে মোক্ষদা তখন ফিরতি পথে। পূজা শেষ করেছেন তিনি, ঐ সঙ্গে খোঁজাও শেষ হয়ে গিয়েছে। উত্তেজনার অবসানে এখন বৃষ্টি অবসাদ। তারই প্রতিকলন মোক্ষদার মুখে, চোখে, গতিতে। মন্দিরের পূর্ব দিকে উঁচু পাহাড়টির গা বেঁয়ে যে সন্ন্যাস-চলা পথটি একে-বেঁকে নীচে নেমে গিয়েছে সেই পথে পাণ্ডার পিছনে পিছনে পা টিপে টিপে চলেছেন তিনি। থমথমে গভীর মুখ তাঁর, চোখের দৃষ্টি মাটির দিকে—আর তো কিছুই দেখবার নেই।

তপনের প্রস্নেহ উত্তর দিলেন না তিনি। দেখে খোঁচা দেবার প্রবৃত্তি আরও বেন বেড়ে গেল তপনের মনে। আরও খানিকটা গ্রেব ওর মধ্যে ঢেলে দিয়ে প্রাপ্তি মোক্ষদার ঠিক কানের কাছে পুনরাবৃত্তি করবার উদ্দেশ্যে উপর থেকে বেশ জোর পা চালিয়ে দিয়েছিল সে। কিন্তু তখনই ঐ ঘটনাটা ঘটে গেল।

হঠাৎ বেশ বিদ্যুতের ঝিলিক—আলোরয়, ধর্মির বিদ্যুৎ।

পরসাদী লেও—

বাঁধির মত মিঠি মিঠি সুরের সাদর আমন্ত্রণ শুনে চমকে উঠল তপন। চমকে উঠলেন মোক্ষদাও। এধিক-ওধিক তাকাত্তেই প্রায় একটু সঙ্গে দু'জনেরই চোখে পড়ল সেই দৃশ্যটি।

গাছপালার মোড়া বামদিকের পাহাড়ের গারে। অনেক উপরে কেবল পাভা আর পাভা—যেন ঘন সবুজ রংএর একখানি ঠানবুননের চিত্রাভাস। নীচে কোপঝাড়—ছোট ছোট গাছ আর বড় বড় লতার ভড়াভড়ি। কিন্তু একঘেরে সবুজ আর নয়। গাঁটে গাঁটে ফুল। সবুজ পাতার কাঁকে কাঁকে টুকি দিচ্ছে লাল, নীল আর হলুদের বিভিন্ন সন্ধ্যা। লগ-বাবো ধাপ উপরে ছোট একখানি কুঠীর। তার নীচে বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে এই উপবন বা উভান। দু'খেকে অনেক পাখির আর অনেক গাছপালার আড়ালে একজন বা চোখে পড়েনি, তাই এখন দেখা গেল। পাভা আর লতার সঙ্গে ফুলই কেবল নয়, যেন পুশিতা-লতার ঝালর-জাঁটা একখানি ছবিও। ফুলের মতই কোমল, স্নানের একখানি মুখও তার, বার কঠোর সাদর আমন্ত্রণ কানের ভিতর দিয়ে বোধ করি বা মোক্ষদার মধেই প্রবেশ করেছে।

পরসাদী লেও—

একটি মেয়ে। বেঁটে গড়নের কিশোরী। কবলের মত কালো, মোটা একখানি শাড়িই তার কোমর থেকে জাছু পর্বন্ত ঝাগরা ও উপরে বুক, শিঠ, ঝাড় ও গলা জড়িয়ে জড়িয়ে ঢোলিই হয়েছে যেন। নিটোল সুগোল বাহু দুটি ঢাকা পড়েনি তাতে। মাথায়ও কোন আবরণ নেই। একমাথা চুল। বর্ণী নয়। অবভববর্ষিত, অসংস্কৃত কেশরাশি জটার মত ঝুলছে তার শিরে, কাঁধের উপর দিয়ে বকের কাছে; সাপের মত কণা তুলে আছে তার ললাটের উপর। অমার্জিত মুখে বেশ দেখা যায়, চাপ চাপ ময়লা। তবু, বোধ করি সেইজন্যই আরও বেশী চোখে পড়ে তার কাঁচা সোনার মত রং, আপেলের মত গাল, কাকাতুরার ঠোঁটের মত টুকটুক লাল দুটি ওষ্ঠ, মুক্তার মত বকবকে ক'টি দাঁত আর নৃত্যচট্টা পার্বত্য নির্ঝরিতীর মতই তার হাসি-বলমল চকচকে চোখ দুটির চঞ্চল দৃষ্টি।

তধু মুখের আমন্ত্রণই নয়, হাতও বাড়িয়েছে মেয়েটি প্রসাদ দেবার জন্য। বাম হাতে পিছনের গাছটির একটি ঝুলে-পড়া ডাল শক্ত ঘুঠার চেপে ধরে, সামনের দিকে একটু ঝুঁকে, চুলচুল মাথাটিকে ছলিয়ে ছলিয়ে বলছে, পরসাদী লেও।

বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটি কেটে যেতেই তপন মুখ কিরিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ডান দিকে তাকাল যেখানে সত্যিকুণ্ডে বাবার পথে মোক্ষদার হয়ে পাণ্ডা পূজার ফুল কিনে নিয়েছিল। দেখলে তপন—প্রকাণ্ড শিলাখণ্ডখানি এখন শূন্য, ফুলওয়ালী সেখানে নেই। দেখে সহজ ভাবে নিশ্বাস কেলেল সে।

কিন্তু মোক্ষদার চোখে বিহ্বল দৃষ্টি। শুক হয়ে পাঁড়িয়েছেন তিনি।

মেয়েটি তখন গাছের ডাল ছেড়ে দিয়ে ক্ষিপ্ৰপদে আরও দু'ধাপ নীচে নেমে এল। প্রায় মোক্ষদার পথ বোধ করে পাঁড়িয়ে আবার বললে সে, পরসাদী লেও।

একটু থেমে আবার : পূজা কিয়া, পরসাদি নেহি লেওগী ? লেও—

ততক্ষণে পাণ্ডাও তার বসমানের দেহী দেখে কিয়ে এসেছে। এখানে মেয়েটিকে দেখেই মোক্ষদার মুখের দিকে চেয়ে হেসে সে বললে, লেও বুড়ী মারী। কোই হরজা নেহি। ওই হৈ মালীকী লড়কী—পারবতিয়া।

মোক্ষদা অস্বুটখরে বললেন, জ্যা।

কিন্তু পরক্ষণেই আবার ভাকালেন তিনি মেয়েটির মুখের দিকে। তার পর খেঁচের মাঝখানেই ঐ পারবতিয়ার পাঘের কাছে হাঁটু পেড়ে বসে মুক্ত করতল প্রসারিত করে গদগদকণ্ঠে তিনি বললেন, হাও হা, নাও।

এক রকমের ডালিই হয়তো হবে—ভকিয়ে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে। সঙ্গে কিছু ফুলের পাণড়ি ও কয়েকটি পাভা। অজলিপুটে গ্রহণ করে ভক্তিভাবে সে প্রসাদ মাথায় ঠেকালেন মোক্ষদা। তারপর কিছু মুখে দিলেন, অবশিষ্ট বাঁধলেন জাঁটলের খুঁটে।

মেয়েটি ততক্ষণে তপনের কাছে এসেছে। তার মুখের দিকেও তেমনি হাসিমুখে চেয়ে সে বললে, তুমি জি লেও।

ঠোটে হাসিই কেবল নয়, মেয়েটির চোখে বিদ্যুৎ বলকাত্তে। কয়েকটি টোল পড়েছে গালে। কঠখরে কেবল অস্থির নয়, একটু যেন বিজ্ঞপেরও আভাস পাওয়া যায়।

চকিতে মনে পড়ে গেল তপনের যে কিছুক্ষণ পূর্বে পূজার ফুল হাতে নিয়ে মেয়েটি ঠিক ঐ ভাবাতেই সেয়েছিল তাকে, কিন্তু তখন ফুল সে নেয় নি। সেই কথা মনে করে বেখেছে বলেই ঐ অতিরিক্ত অভিব্যক্তি নাকি মেয়েটির মুখের ভাবে।

এবার আর অস্বীকার করতে পারল না তপন; হাত পেতে সে-ও গ্রহণ করল ঐ প্রসাদ। তার পরেই পার্বত্য হরিণীর মত ছুটে ধাপে ধাপে উপরে উঠে গাছপালার পিছনে অদৃশ্য হয়ে গেল মেয়েটি।

অনেকক্ষণ পর্বন্ত কারও মুখেই কোন কথা নেই। কিন্তু নীচে নেমে আসবার পর তপনের কৌতুক প্রবৃত্তি আবার যেন মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। দুটামির হাসি সবচেয়ে ঠোঁটের কোণে ঢেপে বেখে আবার সে মোক্ষদাকে জিজ্ঞাসা করল, হরগৌরী কেমন দর্শন করলে মাসীমা ? বলছ না বে।

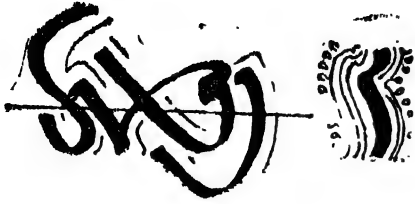
উত্তর দিলেন মোক্ষদা এবং তাও তপনের মুখের দিকে চেয়েই। বললেন, ছিঃ তপু, ঠাকুর-দেবতার কথা নিয়ে কি ফাল্গল্যামি করতে আছে ?

ভৎসনার ভাব। কিন্তু সবিস্ময়ে লক্ষ্য করল তপন যে কিছুক্ষণ পূর্বেই নৈবান্তের যে স্নান দ্বারাখানি মোক্ষদার শীর্ণ কিন্তু গৌরবর্ণ মুখের উপর ভেসে বেড়াতে দেখেছিল তার চিরুমাড়ও আর অবশিষ্ট নেই। বরং এখন যেন তৃপ্তিতে স্নিগ্ধ সে মুখখানি।

তথাপি আরও একটু কৌতুক করবার ইচ্ছা ছিল তপনের। কিন্তু সে সুযোগ আর পেল না সে।

বিস্মাতে উঠে বসবার পর তপনের মুখের দিকে চেয়ে মোক্ষদা আবার বললেন, তাছাড়া মন্দিরে কার কি দর্শন হল তা কি বলতে আছে বে। পাণ মুখে বলতে নেই।

গভীর কঠখর, কিন্তু শান্ত। তপনের মনে হল যেন ওষ্ঠপ্রান্তে সলজ্জ হাসির ক'টি রেখা গোপন করবার চেষ্টা করছেন মোক্ষদা ঠাকুরাণী।



অরুণ সেনগুপ্ত

এই নাম 'মেরিন ড্রাইড'। বিলাস আর প্রাচুর্যের ক্ষোভের মাঝখানে কোথায় হারিয়ে যাওয়ার বন্ধনার কাছে বা বাঁওয়া ভোর জীবনের স্বপ্ন, মিতান্ত্র কাগজের রংয়ের অভাবেই শিল্পীর আত্মনিগ্রহ।

বুধবার প্রান্তরান সেবে যোজকার নিয়মমত একবার ও ঘেঁষিয়েছিল বাইরে। সংকীর্ণ কাজের পরে তরতর করে উঠে গেছে চারতলা ল্যাটবাড়ীটার মিসেস উপাধ্যায়ের কাছে। তার ছোট ছেলে বাবলুর ট্রাম্পখাতা দেখেছে, আর শিকাসোর আলবাম। তারপর কাল ঠোঁপে চড়েছে। এখন এই কলকাতার আবার।

হাটছিল অঞ্জনা, ট্রামবাসগুলোকে বেপরোয়া মনে হয়। হাওয়ার দেয়াল কেটে ছুটে চলেছে। কোন এক বাজীর নিল'জ অতঃকালে অগ্রাহ্য করেও বুধ কিরিয়ে নেয়। চোখে পড়ল খানিক ওদিকে কারা বেন ব্যায়াম করছে।

ফুটপাথের ওপর উঠে হাটতে লাগল অঞ্জনা। এই ন' মাসের মধ্যে চাকরীর খাতিরে হু' জারগার বুরেছে—বোম্বাই, মাদ্রাজ। লানাপুরে জাকে বাওয়ার প্রভাবে রাজী হয়নি, সম্মান আর সম্মানী বেশী পাওয়া মেলেও। কলকাতাতেই স্থায়ীভাবে থাকার জন্ম দরখাস্ত দিয়েছে। বিধবা মা ও ছোট ভাইবোন দুটো রয়েছে ভায়বাজারে। এখানে থাকলে অনেক সুবিধে হবে।

বেশ ওড়িয়ে বসেছে ছোট ছোট ট্রেননারী দোকানগুলো।



হাটুঘের তীড় এখানে বহু ময়। সকাল পাঁচটার যে প্রাণ বলে ওঠে, রাত বাবোটার তার সমাপ্তি। সকালে আবার হবে শুরু।

পরজ সারাটা দিন ও কাটিয়ে এসেছে অনীতার বাড়ীতে। কবে তুলে পড়েছে, এখনও সে ভোলেনি। জানতে পেবে জঘতিখিতে জোর করে নিয়ে গিয়েছিল। অনীতার মাঝাত ভাই বিকাশ লিফট দিতে চেয়েছিল। ও রাজী হয়নি।

কর্ণজীবনের তাগাদার মাঝখানে ওর জীবনের হাবি এখন অচল। বি, এ পাশের পর গল্প, কবিতা পড়বার সময় খুব কম পেয়েছে অঞ্জনা। জীবনের সব চেয়ে বড় সাধ সেই গানই বন্ধ। তবু হুঃখিত নয় সে। সন্সারের বন্ধনকে জিইয়ে রাখাটাই আজ ওর প্রধান কর্তব্য। তাই গানের জন্ম অবসর না পেলেও আজ ও কাতর নয়।

আরও একটু হেঁটে দাঁড়াল সে। এক গান! মাসিক সাহিত্য আর সিনেমার পত্রিকা নিয়ে বসেছে একজন। অঞ্জনা হাতে তুলে নিল মোটা একটা পত্রিকা। জলতরঙ্গ। অনামী। কে চেনে এর সম্পাদক অধিলেশকে? তবু এক টাকা শান্তিনিকেতনী ব্যাগ থেকে বার করে কিনল। রবিবারে অনেক দিন পরে পড়া যাবে। আর কিনল কিছু লজ্জেল ভাইবোনের জন্ম।

অনেক দিন বাদে নিজের জগতে ফিরে এল অঞ্জনা। তাইকে রাগানোর শেষ ডিগ্রীতে ওঠায় মায়ের কৃত্রিম উৎসর্গনা পেল—এতদিন পরে এলি, কোথায় একটু বসবি না—

হুপরে ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছিল বার বার। কিন্তু সকালের কেনা পত্রিকাটা পড়তে হবে আজকেই।

বিদ্যাহু!

খানিক পরে আশস্ত হল অঞ্জনা কারোর কোন সাড়া না পেয়ে। ওর হেঁচিয়ে ওঠাটা নীচু পর্দায়ই ছিল।

পাঁচ বছরের স্মৃতিটা আর্জনাৎ করে উঠল। অখ্যাত পত্রিকা জলতরঙ্গ গল্প বেরিয়েছে বিদ্যাহু সোমের। কোন এক সময়—এক সময় গল্পের মাঝখানে খুঁজে পেল অঞ্জনা হারিয়ে বাঁওয়া বিদ্যাহুকে।

পানের আগরে আলাপ। পাটনার তখন অঞ্জনা'দের বাসা ছিল। চমৎকার গাইত অঞ্জনা। ওর স্রবমূর্চ্চনায় চমৎকৃত হয়েছিল সবাই। আবেগ-বিস্ফল সবাই। আবেগ-বিস্ফল করে তুলেছিল ওর কাককার্য-করা গলার উপস্থিত সকলকে।

—মেঘ-মেঘুর বরষায়—

সেই আলাপ অঞ্জনার বাবা প্রবোধবা বুঝ কাছে শুধু সামান্য পরিচয় হয়েই থামেনি। আন্তরিক ভালবাসায় তার পরিবর্তন ঘটেছিল ধীরে ধীরে।

কার্পণ্যের পরিচ্ছন্ন মায়াবী ছায়ার বিদ্যাহু'দের করেকটা কথা বড় মধুর মনে হয়েছিল অঞ্জনার।

—সত্যি মাঝে মাঝে অবাক হয়ে বাই মাঝু'দের প্রকৃতি দেখে। কি করে তারা নকল আভিজাত্যের বেড়ার নিজেদের নিয়ে চলে স্বস্ত্র ভাবে। কি ভাবে তাদের চোখের মাঝখানে চুকতে পার না মাঝু'!

খানিকটা নীরবতা। বাতাসে বয়ে চলেছিল গভীর প্রশান্তি।

—তোমার গলার বেন জন্ম-জন্মান্তরের তপস্তার আশীর্বাদ। একটা স্বপ্নের পুণীতে বেন থাকে তোমার গানের সময়।

লাজুক চোখে হেসে তাকিয়েছিল অঞ্জনা।

—জান্নাখানের সানাই কবে থেকে বাজাতে শুরু করছে ?
—জান্নার থেকে জান্নাখান বড় নয় নিশ্চয়ই।
—খুব দার্শনিকের মত কথা বলে। নিশ্চয় মত হেসে উঠল
বিদ্বাং।

—আমাদের কলেজে একটা ফাংশন আছে। বাবে ?
—আমি কেমন করে—
—সেটুকু কমতা আমার আছে কলেজে।
—বেশ ভাল।

সেও আর একটা দিন। বহু প্রোতার মাঝখানে হয়ত প্রকৃত
শুণীও কত আছেন। কিন্তু নিজের নৈপুণ্যের প্রতি সন্দেহ রইল না।
প্রথমে একটা মীরার ভজন। বহুজনের উচ্ছ্বাসিত প্রশংসায় ভরে
গেল ওর সাধনা-বহুল সঙ্গীত-জীবন। তারপর অধ্যক্ষের কথায়
অজনা গিয়েছিল তার জীবনের শ্রেষ্ঠ গান।

চলো সখী, কুঞ্জধামে খেলত...

গান শেষে একটু আড়ালে নিয়ে গিয়েছিল বিদ্বাং। হাতে
একটা রাখী।

—এই রাখীর মত চির-পবিত্র আর অমর হয়ে থাকুক তোমার
আমার ভালবাসা।

এর চেয়ে আর আনন্দ কি আছে ? এ প্রেম স্বীকৃতির কুরাণা
নয়। রাত্রিশেষেই শুভ হেসে বিদায় নেয় না। গভীর তক্তিতরে
প্রণাম করেছিল অজনা বিদ্বাংকে।

কিন্তু বসন্ত আসেনি। দিগন্ত-কপোলে পূর্ণ হেসে আবির্ভূত
হয়নি লাজবস্ত্রিমা আলোরখা। কমনীয় সানাইয়ের সুরে আনন্দ-
চন্দনে মুগ্ধ হয়নি প্রবোধ বাবুর নির্জ্বল নিকেতন 'পথের শেষে'।

অজনার জন্মতিথিতে বিদ্বাংয়ের কাছে পাকা কথাটা বললেন
অজনার বাবা। এই যেন ঠিক ছিল আগে হতে। বাবার গলা
ওনে মনে হল অজনার, এ যেন হবেই, কোন বাধা নেই।

সকালে খাওয়া হল। দুপুরে ওপরে নিয়ে গেছিলেন অজনার মা
মাত্র বিদ্বাংকে।

—তোমার হাতে অজনা কে দেওয়া সৌভাগ্যেরই বিষয়। কথা
সবই ঠিক, সন্দেহ নেই। তোমার ইচ্ছাও আমি জানি। কিন্তু
আমি মা। তোমাকে পেটে না ধরলেও মায়েই সমান। তাই

সন্তানের জন্যে জেনে রাখা আর দরকারে অটকে জানান ধর্ম মনে
করি। তারই কল্যাণের জন্ত। ফাট্ট ইয়ারে পড়বার সময় অজনার
একবার ক্ষয়রোগের পুত্রপাত হয়। ডাক্তারের পরামর্শে গান বন্ধ
করে দেওয়া হয়। কিন্তু ও আবার আরম্ভ করেছে। এখন অবশ্য
ভালই আছে। যদি তাকে সত্যিই জীবনের সাথী হিসেবে চাও, তবে
এখন থাক, আর ক'টা বছর থাক।

বোধ হয় আশাতন্ত্রের ঝাপটা সেদিন সইতে পারেনি স্কলার
বিদ্বাং সোম। খুব সকালেই এসেছিল ওদের বাড়ীতে। একটা
নমস্কার করে কোন কথা বলার অবসর না দিয়েই সে আঁচাটি হাতে
বেগিরে গিয়েছিল প্রবোধ বাবুর কাছ থেকে।

—থুং ইউনিভার্সিটিতে একটা চাল পেয়েছি। আজই রওনা
হছি।

দুপুরবেলা সকল কথা বললেন মা নিজেকে থেকেই। অজনা
জানলার কঁাক দিয়ে তাকিয়েছিল থুং। অস্পষ্টভাবে কানে
আসছিল ঝাউবনের দীর্ঘশ্বাস। অজনার মনে হল, মাতৃশ্বের
চরম পরীক্ষা দিয়েছে মা। তার যোগ হওয়ারটা ত মিথ্যা নয়।

মাস ছয়েকের মধ্যেই থুংসিমে মায়া গেলেন স্নেহময় বাবা।
তারপর সংসারের চাকার চলে গেল পাঁচটি বাস্তব। জীর্ণতা ওর
দেহবস্ত্রীকে অবশ্য গ্রাস করতে পারেনি। বিদ্বাং আর কোন
খবর দেয়নি। তার ঠিকানা অবশ্য ওদের জানা আছে।

একেক্রে চিত্রিতা আর অমিত। ঠিক সেই পাটনার বয়সকালের
ইতিহাস। গল্পটার শেষের দিকে একটা দার্শনিক ব্যাখ্যা দেবার
প্রয়াস করেছে বিদ্বাং, নিপুণ তুলির সংস্কৃত টানে।

ওই সুর, যে সুর নিবিড়ভাবে বেজেছিল একদিন মনে-প্রাণে,
তা বেঁচে থাকবে চিরদিন। তার ভালবাসা সাগরের ঢেউয়ের
মতই বন্ধুর তুলবে অমিতের বুকে। ভাল থাক চিত্রিতা। তার
কালো চোখের প্রতীক্ষা করবে সে, বত দিন হোক।

অজনা চাপ দিলে বিদ্বাং ছুটে আসত তাকে গ্রহণ করতে।
কিন্তু না—বিদ্বাংয়ের জীবনকে পঙ্কু করে দেবার সম্ভাবনা ঘটতে রাজী
নয় অজনা।

চিত্রিতা। দীর্ঘকাল পরে একটা ভাল গল্প পড়ল বলে মনে হল
অজনার।

তুমি আছ

প্রীতিয়ুমা বন্দ্যোপাধ্যায়

তোমার ঠিকানা পেলাম আজকে হঠাৎ
প্রভাতের রোদ-বরা আরাম সকালে,
পড়ে দেখি প্রতি ছত্রে অনেক তফাৎ
আমার নিকট হতে বহু দূরে তুমি তো জগ্মালে।

গোলাপের বুক দেখি আর ঐ সুই-মল্লিকার
উড়ে এসে বসে কত যথুলোভী মৌ,
তাই দেখে কত লোক নিরাশ তাকার
ওঠে নিয়ে যথুহাসি হাসে কত বৌ।

তোমার ঠিকানা পেয়ে বাত্মার উদ্দেশে
গৃহ ছাড়ি ধূলি-পথে বাহির হগেম,
চলিলাম বহুদূর তবু অবশেষে
আমারই আবাস-মার্কে ঘিরিয়া এলেম।

এসে দেখি তুমি আছ ঠিক বখাওয়ানে
দূরে যদি থেকে থাক বহুদূরে আর
তবু তুমি জেগে আছ আমারই তো প্রাণে
তুমি আছ বখাওয়ানে স্বপ্নেরে আমার।

ভাবি এক, হয় আর

ঐদিলীপকুমার রায়

পাঁচ

সুখ বিলাস নেওয়ার পর পল্লবের মন আরো খারাপ হয়ে গেল। ফিরে ফিরে মনে হ'তে লাগল ওর একটা কথাই—

সুখের মতন : ওর বখান বাজে তখন তাকে কিরিয়ে দিলে সে আর ফিরে আসে না। ভাবতে ভাবতে ওর মনে হ'ল—আর দেখি করা নয়—কী হবে এখানে বাজে গান শিখে? নিজের মনের সঙ্গে সুখোমুখি হ'য়ে তো লাভ হ'ল সমূহ—এবার বালিনে কেয়াই পড়া। আর শুভ্র শীতল—কিন্তু কাল এলিওনোরার নিমন্ত্রণ স্বীকার ক'রে ফেলেছে, কাজেই ওখানে চায়ের পরেই বালিন রওনা হবে। মোহনলালের জন্তে আর অপেক্ষা করা নয়। ওর নামে একটা চিঠি লিখে লুনা হোটেলের ম্যানেজারের কাছে রেখে যাবে—ও যেন রিতাকে নিয়ে সোজা বালিনেই আসে—সেখানেই দেখা হবে। সেই ভালো। ভাবতেই ওর মন অনেকখানি হালকা হ'য়ে যায়। আইরিশকে কাল সকালেই ভাব ক'রে দেবে।

সন্ধ্যাবেলা ফের দেখা সেই কয় বুকের সঙ্গে। ওর সঙ্গে আলাপ করা হ'ল না। না হোক। ওর মন আইরিশের জন্তে উঠেছে উগ্র হ'য়ে—খাওয়া শেষ ক'রেই নিজের ঘরে গিয়ে বসল মোহনলালকে চিঠি লিখতে :

তাই মোহনলাল,

আমি তোমার জন্তে এখানে দিন মশেক অপেক্ষা ক'রে ফিরে যাচ্ছি বালিনে কাল রাতের ট্রেনে—

ক্রি—ক্রি—ক্রি—

Avanti ?

পরিচায়িকা ছুটি চিঠি দিয়ে গেল।

ওর বুকের রক্ত দ্রুত বয়—আইরিশের চিঠি—কিন্তু এ কী!

এতদিন পরে চিঠি লিখল তাও ছবি পোষ্টকার্ডে।

কুহু হরে পড়ে—চিঠি জেনেভা থেকে লেখা :

প্রিয় পল,

কাল কান্তিয়া বাসা ও আমি এখানে এসেছি। আমাদের শরীর ভালো। যাচ্ছিল না বলে হাওয়া বদলাতে এসেছি। সুইজারল্যান্ডে মাসখানেক এখানে ওখানে একটু ঘুরব, তাই তোমাকে ঠিকানা দিতে পারলাম না। তুমি ফ্রাউ ক্রামারের ঠিকানায় আমাদের লিখলে তিনি আমাদের পাঠিয়ে দেবেন—বখান বেখানে থাকি। এখনি যাব লসানে। তাই ইতি করি। আশা করি ইতালিতে সুখের সঙ্গে আনন্দেই আছ।

তোমার আইরিশ।

এ কী! দশ দিনের পরে প্রথম চিঠি তাও শুধু পোষ্টকার্ড, তার উপর এমন শুক চিঠি। আইরিশ নিশ্চয় রাগ করেছে। কিন্তু কেন? ও আবার পড়ে : আশা করি ইতালিতে সুখের সঙ্গে আনন্দেই আছ। এ-সব চিনতে কি ভুল হয়? অভিমান-হুজুঁর অভিমান। তা ছাড়া আর কী?

কিন্তু তা হলে কী করবে এখন বালিনে ফিরে গিরে আইরিশই বখান সেখানে নেই? ও অত চিঠিটা পড়া হুগিত রেখে লিখল :
প্রিয় আইরিশ,

তোমার জেনেভা থেকে লেখা চিঠি প্রথম চিঠি এইমাত্র পেয়েই উত্তর দিচ্ছি। পত্র পাঠ জানাবে কি কবে বালিনে ফিরবে?

লিখতে লিখতে ওর মনও হুজুঁর অভিমানে ছেয়ে যায়, লিখল :
আশা করি তিন বোনে মিলে সুন্দর সুইজারল্যান্ডে আনন্দেই আছ।
ইতি।
তোমার পল।

লিখেই মনে হল—ছি ছি! ওর শরীর খারাপ, এমন শুক চিঠি পেলে হয়ত—ভেবেই চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলল, স্থির করল আইরিশ জমণ শেষ করে বালিন ফিরে ওকে বখান জানাবে তখন ওকে লিখবে, তার আগে না। কেন লিখবে? এই কয় দিনে ওকে পাঁচ-ছয়খানা চিঠি লেখেনি কি? অভিমান শুধু ওই করতে পারে না কি?

অত চিঠিটা মোহনলালের বালিন ঘুরে এসেছে। কিন্তু ওর মনে কই আজ আর কোনো আনন্দ জাগে না তো? সে আসে আসবে, না এলেই বা কী? বিমনা হ'য়ে খুলল চিঠি, কিন্তু এ কী!

তাই পল্লব,

আমাদের আপাতত ইতালি যাওয়া হুগিত রাখতে হ'ল। কারণ, কুহুমকে তরুণ দিন কের পুলিশে ধরেছে। ওর বিকছে এবার কী অভিযোগ তা ওরা প্রকাশ করেনি, তবে গুজবও না কি বিদেশের বিদ্রোহীদের সঙ্গে চিঠি লেখালেখি করছে। এবার তখনই ওর কোনো প্রকণ্ড বিচারই হবে না, কেন না ও আজ দেশের হিরো, কোনো কোর্টে ওর প্রকণ্ড বিচার হ'লে আন্দোলন আরো কঁপে উঠবে। দেশবন্ধু বললেন : তিনি খবর পেয়েছেন ওকে না কি এবার বিদেশে পুলিশপোলাও চালান দেওয়া হবে—হয় আন্দামানে, নয় মালদায়ে। তিনি আমাদের অস্বস্তি করলেন কুহুমের কারাযুক্তি না হওয়া পর্যন্ত বিদেশে না যেতে কয়েকটি কাজের ভারও নিতে হ'ল কুহুমের অবস্থানে। কাজেই ঠিক এ সময়ে কোন মুখে জীব স্বাস্থ্যরক্ষার জন্তে বিদেশে পাড়ি দিই বলো? একেই আমাদের স্বপ্ন নানা লোকে যে সব মন্তব্য করছে সে থাক। কী আর হবে কীহুনি গেরে?

শুধু একটা কথা : যদি মাস খানেকের মধ্যেও কুহুমকে না ছাড়ে তবে ভাবছি রিতাকে একাই পাঠাব, তবে সুইজারল্যান্ডে নয়—সোজা বালিনে। তোমার সঙ্গে দেখা হ'লে সে তবু একটু ভরসা পাবে। তারপর বাবে সুইজারল্যান্ড। কিন্তু সে পয়ের কথা—এখন শুধু ব'লে রাখলাম জানতে চেয়ে তুমি আর কত দিন বালিনে থাকবে, আর ওর একটু দেখাভদ্রা করতে পারবে কি না?

রিতার জন্তে আমার সময়ে সময়ে সত্যিই দুঃখ হয় আজকাল। আমি বড় গলা করেই বলতাম একদিন যে আজকের মাহুঘের গৃহ স্বদেশ নয়—স্বদেশ। কিন্তু এখন দেখছি এ-জাতীয় বুলিতে মন মালনেও প্রাণ মানে না, ঠেক শিখছি উঠতে বসতে যে, যে-বিধমানব সর্বান্তঃকরণে বলতে পারেন যে, তাঁর কাছে স্বদেশের চেয়ে বিধ বড় : আমাদের মনে দাগ কাটতে পারেন হয়ত, কিন্তু প্রাণে ঠাই পারেন না—অন্তত এমুগে। হয়ত হুশো পাঁচ শো বৎসর পরে বিধমানবতা : বাগী সর্বমানবের স্বর্থ হ'য়ে উঠতেও পারে—বলতে পারি না, কিন্তু একথা বলতে পারি খুব জোর ক'রেই যে, এ-মুগের মাহুঘে কাছে আজকের দিনে সবচেয়ে বড় বাগী হ'ল জাতীয়তা—সবদেশেই আমি দেশবন্ধু বা কুহুমের মতন দু-একজন আমাদের মাহুঘের ক

বলছি না, বান্ধব দেশভক্তি বিশ্বশ্রদ্ধার অস্তরায় না হ'য়ে সহায় হয় : কিন্তু অসাধারণ ব্যক্তিক্রমের কাছে বা স্বার্থ সাধারণের কাছে সে পরম্পর হ'য়েই থাকবে ; বতদিন না তারা সাধারণ চেতনার চলাফেরা করা ছেড়ে অসাধারণদের চেতনার উঠতে শিখবে। না, শিখবে বলি কেন, এ তো বুদ্ধি দিয়ে গ্রহণ করার ব্যাপার নয় ভাই। বিকাশ লাভ করে হয়ে ওঠার ব্যাপার আর যে কোন বড় বিকাশ সাধারণের নাগালের বাইরে। যেহেতু সাধারণ মানেই হ'ল অসাধারণের উল্টো অর্থাৎ অসাধারণের কাছে বা প্রত্যক্ষ, অপ্রতিভাত সাধারণের কাছে তা অদৃশ্য, না-মঞ্জুর। বিশ্ব-মানবতার বাণী হ'ল এই অসাধারণদের উপলব্ধ চেতনার আলো। সুতরাং এ আলোকে সাধারণ চেতনার আলো-অঁধারী মন বুঝবে কেমন করে ? তাই রিতাকে খুব অপরাধিনী মনে করতেও বাধে। বিশ্বমানবতার বাণী ওর বুদ্ধি গ্রহণ করলেও ওর হৃদয় আজো বরণ করতে পারেনি, অদূর ভবিষ্যতে পারবে কি না বলা কঠিন। কেন না কোনো মানুষের বিকাশ কখন কোন্ খাতে পথ কেটে চলবে কেউই জোর করে বলতে পারে না। আমি কেবল এইটুকু বলতে পারি যে আজকের রিতা ফ্রান্স ছাড়া আর কোন দেশকে স্বদেশ মনে করতে পারেনি বলে ভাবে যে, ভারতবর্ষকে ফ্রান্সের মতন ভালোবাসলে সে হবেই হবে দ্বিচারিণী।

তাছাড়া আজকের ভারতবর্ষের—মানে ভারতবাসীর বা অবস্থা ভাতে ও যদি আমাদের মনে প্রশ্নে শ্রদ্ধা করতে না-ই পারে, তবে তার জন্তে ওকে খুব দোষ দেওয়া যায় কি ? কিছুদিন আগে মহাপ্রাণ দেশবন্ধু করুণ হেসে কুহুমকে বলেছিলেন (তাঁর এ বক্তব্যটি এখন সারা বাংলার চাপু হয়ে গেছে) ; মাত্র এক বৎসর দেশবন্ধু অসহযোগীদের সঙ্গে মিশে থ' হ'য়ে গেছি বাবা, থ' হ'য়ে গেছি যে-কল্লভতা তাদের মধ্যে দেখলাম পঁচিশ বৎসরের ক্রিমিনাল প্রাকটিসে দুর্ভাগ্যবাদের মধ্যেও দেখিনি। নিল'জ্ঞ মানুষ দেশভক্তির নাম নিয়ে কী যে করে বেড়াচ্ছে দেখে শুনে সত্যিই হকচকিয়ে যেতে হয়। ভাবতে পারো কি কুহুমের এক বিখন্ত (?) বন্ধুই পুলিশের গুপ্তচর হ'য়ে তার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করেছে ? নিলে হয়ত সি-আই-ডি ওকে ফের ধরত না এত তাড়াতাড়ি।

রিতা এই সব কারণে আরো বিমর্ষ হয়ে পড়েছে। তাছাড়া নিতা চোখে দেখছে আমাদের 'দারিদ্র্যদোষো গুণবোধিনাশী', দেখছে আমাদের নোংরামি, ভাষিকতা, কাপুরুষতা আরো কত কী। এক আঘাট তিলক, গান্ধী, দেশবন্ধু, কুহুমে কী হবে ? এ বেন ছ' চার খাট জলে মল্লভূমিকে উর্বর করার প্রয়াস।

আমি ভারতের আত্মার মহিমা অস্বীকার করি না। কুহুমের মতন আমিও বিশ্বাস করি যে স্বাধিকার তপশ্চক্রে এখনো এ-দেশের আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু থাকলে হবে কি ?—ভারতের সে গহন আত্মশক্তিকে তো চর্চাচক্ষে দেখা যায় না ভাই—দেখা যায় কেবল প্রেমের শিবনন্দে। এইখানেই হয়েছে রিতার হুশকিল—ও আমাদের দেশের বাইরের অবস্থা দেখে এত খা খেয়েছে যে ভারতের অন্তলীন সনাতন মহিমার জয়ধ্বনিতে সাড়া দিতে পারছে না। এ রকম মনের অবস্থার ও কেমন করে ভারতকে ভালোবাসবে বলা তো ? আর যদি ভালো না বাসে তবে কেমন করে টিকবে

এ দেশে ? ওর শরীর খাটান হওয়ার মূলে রয়েছে এই মন:কষ্ট, বগ্নভঙ্গ। ও বড় আশা করে এসেছিল যে আমাদের দেশে ও এমন আত্মিক শক্তির দেখা পাবে যার দেখা যুরোপে পায় নি ? সে আশা ওর প্রায় নিমূল হল বৃষ্টি। তাই ও দিন গুণছে—কবে অন্তত কিছুদিনের জন্তেও ওর স্বদেশে ফিরে গিয়ে একটু জুড়াবে।

এছাড়া আর একটা কারণও রয়েছে যেটা সাময়িক হলেও এত দুঃস্বপ্ন ও জাঙ্গল্যমান যে মনে হয় বৃষ্টি চিরন্তন। সেটা হল আমাদের বিজ্ঞাতি-বিদ্বেষ। এর জন্তে আমি আমাদের দেশবাসীকে খুব বেশি দোষ দিতে পারি না। ইংরাজের অত্যাচারে আমরা আজ অস্থিরচরসার, এ অবস্থার বিশ্বমানবতার দোহাই দিয়ে উৎপীড়িতকে বলা বুধা যে তোমরা উৎপীড়কদের বৃকে তুলে নাও। তাছাড়া এ অসহযোগ আন্দোলন আমাদের রুদ্ধ আক্রোশকে মুক্ত করে দিয়েছে যার ফলে আমরা সাহেব বা মেমসাহেব নাম শুনে না শুনে না শুনে আশুন হয়ে উঠি। এ আক্রোশের আঁচ রিতাকে যেহাই দেয় নি একথা বলাই বাহুল্য। তাই ও আরো হুড়ড়ে পাড়ছে। একেত্রে ওকে কী করে সুখী করব ভেবে পাই নে। আজকাল আমার মনে সময়ে সময়ে সত্যিই গভীর সংশয় জাগে কেউ কাউকে সুখী করতে পারে কি না ?

ওর আর এক কষ্ট—কষ্ট কি ওর একটা ? এখানে ইউরোপীয় অপেরা, সিমফনি, চেম্বারমাসিক প্রভৃতি শুনে পায় না। যুরোপীয় সঙ্গীত ও কি রকম ভালোবাসে জানেই তো। ওর কাছে সঙ্গীত বিলাস নয়—তৃষ্ণার জল, চোখের আলো, বৃকের নিশ্বাস। তাই কালই বলছিল তোমাকে লিখে দিতে—তুমি শীপগির ফিরে এসো তোমার মুখে শুভে শুভে, শূন্য, শোপা, তবুসি, ব্রাহ্ম, বাথম্যানিক, পুচিনি, ভেড়ি প্রভৃতির গান। তুমি এ সব সুরকারের গান নিশ্চয়ই শিখেছ ? ও জিজ্ঞাসা করছে। হয়ত দু-চারদিনের মধ্যে ও নিজেই তোমাকে লিখবে ওর শরীর একটু সুস্থ হলে।

আর কী ? চিঠি মস্ত হয়ে গেল—হাতে অনেক কাজ পড়েছে কুহুমের জেলে বাওয়ার দরুন। ভাই এবার আসি।

এ চিঠির উত্তর পারো তো একটু তাড়াতাড়ি দিও, আর আমাকে না লিখে রিতাকেই লিখো, ও খুব খুশি হবে। কারণ তোমাকে ও আগের মতনই স্নেহ করে। ইতি স্নেহার্থী

মোহনলাল।

ছন্দ

পল্লবের বৃকের রক্ত বেন জল হ'য়ে গেল। ঠিক এ সময়ে এ কী চিঠি ? চিঠিটা ও হ'বার পড়ল। বতই পড়ে ততই বেন ও চোখে অন্ধকার দেখে। এ অবস্থার আইনিগকে নিয়ে দেশে ফিরতে চাচ্ছে কোন ভরসার—বিশেষ বধন কুহুম জেলে ? নাঃ কুহুম বাইরে থাকলেই বা এমন কী মস্ত সুবিধা হ'ত ? হয়ত সে মুখ ফেরাত—কে বলতে পারে ? কে না জানে—যেখানে মানুষের প্রত্যাশা বেশি সেখানে আঘাতও বাজে বেশি ? মোহনলালকে কমা করতেই বধন কুহুমকে এত বেগ পেতে হয়েছিল তখন পল্লবকে কমা করতে—এ চিন্তাকে ও ঠেলে দেয়। না, না, এখানে কমান প্রাণ আসে কোথেকে ? কুহুম কি নিজেই লেখেনি সহদেবিনীকে বিবাহ করার কথা ?

কিছু সেখানেই বা ভরসা কোথায়? আইরিশ তো অকুণ্ঠেই কবুল করেছে—দেশ বলতে ওর বুকের তার বেজে ওঠে না, ও চায় শিল্পীর জীবন—দেশসেবিকার জীবন নয়। তবে? কী করবে ও? আইরিশকে সব খোলাখুলি জানিয়ে বিদায় নেবে? কমাগতই মনে হয়—এই-ই তো স্রুষ্টি।

কিন্তু হায় যে স্রুষ্টির জাঁক। স্রুষ্টি তো হ'ল মনেন দিশারি—প্রাণ তাকে কবে মেনে নিয়েছে গুরু বলে? আর প্রাণকে উপবাসী রেখে স্রুষ্টির আশ্রয় খেয়ে কে কবে অসাধ্য সাধন করেছে? ওর মনে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ঘনিয়ে ওঠে, মোহনলালের খেদ ওর হৃদয়ের তারে তারে অল্পবলন তোলে : মানুষ কি মানুষকে স্তম্ভী করতে পারে? অথচ তবু এই স্তম্ভের জন্তেই আবহমান কাল মানুষ হাত পেতে এসেছে তো মানুষেরই কাছে। শূন্য হৃদয় আর কাব কাছেই বা হাত পাতবে পূর্ণতার বর পেতে? ভগবান? তাঁর কাছে দরবার করতে পারে তারাই বারা শুনেছে তাঁর ডাক। পল্লবের মনে পড়ে ওর কৈশোরের কথা—বখন জীৱামকুলদেবের কথায় ওর হৃদয় সাড়া দিত। কিন্তু সে-ডাক আজ ওর অন্তরের কানে কই আর তো বেজে ওঠে না তেমন ক'রে? আজ ওর মন-প্রাণ সাড়া দেয় শুধু আইরিশের ডাকে। তাকেই ও আজ চায় সর্বাঙ্গতঃ করণে—চায় তাকে ভালোবেসে স্তম্ভী করতে, নিজেও কৃতার্থ হ'তে। কিন্তু দেশের যে অবস্থা—তাতে ও কেমন ক'রে আশা করতে পারে যে আইরিশ ভারতবর্ষে গিয়ে স্থায়ী হবে?

বৌকের মাথায় ও যুসুফকে টেলিফোন করে।

কে?

আমি—পল্লব।

পল? কী ব্যাপার?

স্রুষ্টি পারছি না ভাই! তাই তোমাকে বিরক্ত না ক'রে পারলাম না।

না না, বিরক্ত কেন? এলিগনোরা শুতে গেছে। আমি আমার ঘরে একটা বই পড়ছিলাম। অথচ অবসর এখন। কিন্তু কী ব্যাপার?

মোহনলালের এক চিঠি পেয়েছি। আইরিশেরও। মন বড় অশান্ত হ'য়ে উঠেছে।

অশান্ত?

শোনো মন দিয়ে—বিরক্ত হবে না তো?

টেলিফোনে যুসুফের হাসি বেজে ওঠে। কী পাগল? তোমার যদি কোনো কাজে আসতে পারি, অন্তত নিজেকে বসার একটু ফুস'ব তো পাবো—বা যে আমি।

পল্লবও হাসে : ধর্মবাদের প্রিয়জন। তবে শোনো। ব'লে প্রথমে আইরিশের চিঠি প'ড়ে শোনালো, তারপরে মোহনলালের পড়া শেষ হ'লে একটু চুপ ক'রে থেকে পল্লব বলে : কী? কথা ক'হ না যে?

ভাবছি।

শুধু ভাবলে চলবে না। বলতে হবে—কী করব? এক দিকে আইরিশ রাগ করেছে—

না, আমার মনে হয় এ রাগ নয়।

তবে?

ভেবে কাল বলব।

না। কাল অনেক দূরে। তা ছাড়া আমি ভাবছিলাম কাল রাতের ট্রেনেই বালিনে ফিরে যাই।

কিন্তু বালিনে ফিরে গিয়ে কী করবে তুমি বখন আইরিশ স্রুইজল'গে।

তবু—

তবু না। শোনো। কষ্ট বাড়ানো কেন? মানুষ কত কষ্ট পায় কাকর আসার আশায় থাকলে আমি জানি। এখানে অন্তত এক বাঁচোয়া, আইরিশের অভ্যাসের আশা নেই। অপেক্ষা যদি করতেই হয় এখানেই করা ভালো। আইরিশ বালিনে ফিরলে তখন ফিরে যেও সেখানে। এইই হ'ল স্রুষ্টির কাজ।

একটু ভেবে পল্লব বলে হয় তো ঠিক বলেছি। কিন্তু ও কবে বালিনে ফিরবে জানাব কী ক'রে? ধরো যদি ও না জানায়?

কী পাগলের মতন কথা বলছ?

পাগল কেন? ধরো যদি ও ইতিমধ্যে আর কাউকে ভালোবেসে থাকে?

দূর পাগল!

তবে চিঠি না-লেখার কারণ কী?

আমি কি অন্তর্ধামী?

তবু—

না, তবু-টবু নয়। শোনো ভাই! এ ক্ষেত্রে বাস্তব হ'ল স্রুষ্টির চেয়ে কুফল ফলবারই সম্ভাবনা বেশি। একটু বিস্তারিত যেতে দাও—তুমি নিজেই তো সময় চেষ্টা করেছ।

চেষ্টা তো ভুল করেছিলাম—তোমার মতে।

কিন্তু আমার মত তো আর অজান্ত নয়। তাছাড়া আমি একথাও বলি নি কি যে খতিয়ে প্রত্যেককে পথ খুঁজতে হয় নিজের অন্তরের কাছে?

আমার অন্তর যে একবার বলে এ-পথে চলো, একবার বলে ও-পথে।

তাই তো বলছি—খতিয়ে যেতে দাও। তখন পাবে ঠিক পথের নির্দেশ। ব'লে একটু থেমে : আমিও ইতিমধ্যে একটু ভেবে দেখি কিছু করা যায় কি না।

পল্লব খুশি হ'য়ে হেসে বলে : বার যুসুফ আছে তার সবই আছে।

যুসুফের হাসির সাড়া বেজে ওঠে : এই-ই তো চাই, সাবাস জোয়ান! কিন্তু শোনো এবার একটা কাজের কথা বলি। এলিগনোরা বলছিল তোমার এখানে গান শেখার ব্যবস্থাও করে ফেলেছে। যিনি তোমাকে শেখাবেন তিনি কাল চা-য়ে আসছেন। তুমি বিরহের দাহনে জ্বলে যেও না কাল আসতে।

ভুলব না। কিন্তু তুমিও জ্বলো না তোমার আশাস।

না জ্বলব না। কেবল একটু বৈধ্ব্য ধরে চুপ করে বসে থাকো এখানে। তুমিই তো একটা কীর্জন গাও মনে নেই : 'বাই বৈধ্ব্য, রহ বৈধ্ব্য?' বাই এ উপদেশে কান দিয়েছিলেন বলেই না তাঁর কৃৎপ্রাপ্তি হয়েছিল।

পল্লব হেসে বলে : আমারও হ'ল ব'লে। যা তৈঃ।
Grazie, amicono mio ! ২

সাত

পল্লবের মন খানিকটা শান্ত হ'য়ে এল। মনে মনে যুহুকের সাধুবাদ ক'রে ও ঘুমিয়ে পড়ল। স্বপ্নে দেখল : আইরিশ গাইছে ওরই শেখানো গান : “প্রিয়, তোমার কাছে যে-হার মানি-...” আনন্দের শিহরণ ব'য়ে বার ওর দেহে—এত আনন্দ যে ওর ঘুম ভেঙে গেল। এর পরে সাঁরা রাত আর ঘুম হ'ল না—কেবলই বাজে আইরিশের কণ্ঠে বাংলা গানের মীড়-চোখের সামনে ভেসে ওঠে তার জলভরা কালো চোখ দুটি।...

* * * * *

যুহুক টেলিফোন করল দুপুরবেলা : “এলিওনোরা তোমাকে টেলিফোন করতে বলল যে ওর মোটর তোমার হোটেলের পৌঁছবে ঠিক বেলা সাড়ে তিনটোর।”

না না, মোটরে কী হবে ?

খুব ভালোই হবে, amico sciocco ! ও ওর হু'-দুখানা মোটর পাঠাতে চায়—পাঠাক না ! বলে না—জো আপসে আয়া, উকো আনে দো ? ৪

পল্লব হেসে বলে : জানি সবই—তবে—

জানো না কিছুই, অন্তত জানো না সিনেমা তারকাদের মতিগতি। ওরা চায় ওদের ঐশ্বর্য একটু জাহির করতে। করতে দাও না। You must humour the charming, amico intelligente ! ৫

পল্লব হেসে বলে : Concesso, amico insistente !

* * * * *

বধাকালে তারকার বধ এসে হাজির। উর্দীপরা সারথি পল্লবের হাতে দেয় একটি চমৎকার সুগন্ধি লেফাণা। পল্লব খুলে দেখে একটি ফুল-আঁকা কার্ড, উপরে লাল হরফে ছাপা : এলিওনোরা জে নোনি। নীচে লেখা নীল লোহিত কালিতে : Wel Come E leonora.

* * * * *

এলিওনোরার ভিলাটি, রোম থেকে প্রায় পনেরো মাইল দূরে অবস্থিত একটি মনোরম হ্রদের উপরে পোপের বসন্ত নিলয় Castel gondolfar কাছেই। কী সুন্দর ভিলা ! মোটর থামলেই চতুষ্টয় জাপানি পুড়ুল এসে ছুটে। ও নামতেই তাদের সে কী পুলক ! পল্লব একটি কোলে তুলে নিতে না নিতে এলিওনোরার আবির্ভাব।

পল্লব কুহুবটিকে মাটিতে রেখে দিতেই এলিওনোরা পরিষ্কার ইংরাজীতে বলল : আহুন। আপনি কুহুর ভালোবাসেন দেখে কী যে ভালো লাগলো !

সঙ্গে সঙ্গে যুহুকের অভ্যাদয়, বলে ইতালিয়ানে : বন্ধু আমার বিশ্বপ্রেমিক—কুহুর বেড়াল কাকাতুরা—ভালো না বাসে কী ?

এলিওনোরা স্মিট হেসে ইংরাজীতেই বলে : তাহ'লে আমাদের বনবে ভালো।

যুহুক বলে : ও কি ? ও ইতালিয়ান জানে।

পল্লব তাড়াতাড়ি বলে : না, ইতালিয়ানে এখনো বাকসিদ্ধি হয়নি কাজ চালাতে পারি মাত্র। ইংরাজীতেই কথা চলুক। ব'লে হেসে : বন্ধু আমার একজন বিশ্বাস্য লিঙ্গুইট—কাজেই বোঝেন না আমাদের মতন নিরীহ মানুষের অবস্থা।

এলিওনোরা হেসে বলে : হ্যাঁ, ও ভাবে—ওর কাছে যা সহজ তা বুরি সবার কাছেই সহজ ! কিন্তু চলুন—ভিতরে।

সিনেমার পূর্ণাঙ্গিতা তারকার যোগা সাল' বটে। এর কাছে কোথায় লাগে ফ্রাউ ক্রামারের সেকেন্দা সাল'। সোফা, ডিভান, পারশ-কার্পেট, বটিন মাছ, বিচিত্র নীপমালা—ফিসের অভাব ? ওরা তিনজনে আরাম ক'রে বসল। এলিওনোরা হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলে : গিদো এত দেরি করছে ! ব'লেই হেসে : আমরা ভরশা কি মার্কিন নই—সময় আমাদের কাছে টাকা নয়—বয়স বিহারের অন্তরীক্ষ। তাই কিছু মনে করবেন না মিষ্টার বাক্টি।

যুহুক বলল : ওকে পলই বোলো। ও তোমার আমার চেয়ে অনেক ছোট।

এলিওনোরা কৃত্রিম কোপে বলল : কি সাংঘাতিক মানুষ তুমি ! পাঁচ বৎসর অক্সফোর্ড থেকে তবু শিখলে না—a woman is as old as she looks ?

যুহুক হেসে বদে : And a philosopher is as old as he feels ! তাহ'লে পল, তুমি মারা পড়লে, কারণ প্রাচীন দর্শনে তুমি সিদ্ধ। কাজেই You are as old as the hills.

এলিওনোরা বলল : সে কি ? মিষ্টা—পল তো গায়ক।

যুহুক হাসে : ও বহরঙ্গী। বধন যে-বন্ধুরই কাছে থাকে, তারই ছোঁপ গায়ে লাগে।

এলিওনোরা বলে : এটা কি হিরো-ওয়ার্ল্ডশিপেরই ধর্ম নয় ?

যুহুক হেসে গড়িয়ে পড়ে : ওকে এক আঁচড়ে চিনেছ এলিওনোরা !

এলিওনোরা কৃত্রিম কোপে বলে : বন্ধুকে নিয়ে হাসাহাসি ? Zola-র তিরস্কার মনে পড়ে : J'accuse ! (ধিক্, ধিক্ !)

পল্লব প্রসঙ্গান্তরের অবতারণা করতে বলে : আপনি ক'টা ভাষা জানেন সিন্জোদিনা—

এলিওনোরা বাধা দিয়ে বলে : আমাকে এলিওনোরাই বলবেন। আপনি যুহুকের বন্ধু, কাজেই আপনার অধিকার আছে। কি জিজ্ঞাসা করছিলেন ? আমি ক'টা ভাষা জানি ? বেশি না—ব'লে যুহুকের দিকে চেয়ে : তবে ওর চোখে ছোট হই কি করে ? তাই চার-চারটি বিদেশী ভাষা শিখতে হয়েছে—ফরাসী, স্প্যানিশ, ইংরাজি আর জার্মান। কিন্তু ও এর উপরেও শিখে নিল আরো দু'হুটো ভাষা। ও সোজা লোক নয়। জানেন তো ওকে ?

পল্লব উত্তর দিতে বাবে, এমন সময়ে এক সুদর্শন প্রকৃষ্ট প্রৌঢ় ভ্রমলোক ছুটে এসেই এলিওনোরার হুই গালে চুষল।

এলিওনোরা ওর চুষনের প্রতিদান দিয়ে পল্লবকে বলে : ইনি হলেন আমার মামা—গিলো বিরাঙ্কি। রোমের একজন মস্ত গায়ক

২। বন্ধুবান্ধব, পরস্পর।

৩। অবোধ বন্ধু।

৪। বুদ্ধিমত্তা বন্ধু।

৫। মেনে নিলাম, নাছোড়বান্দা বন্ধু।

—আমাদের সিনেমার গানের ডিরেক্টর। ব'লেই তাকে : তোমাকে ভো বলেছি মিটার বাকটির কথা ?

হ্যাঁ। উনি হিন্দু গান করেন, না ?

বুহুক হেসে বলে : ঠিক নয়। ও মুসলমানি গানও করে—
হিন্দু মুসলমান দুজাতের ওস্তাদের কাছেই শিখেছে কিনা।

সিন্ডার বিয়াকির বললেন : Scusi, Signori ? ৬

পল্লব ইংরাজিতে বলে : আমাদের দেশে রাগ সঙ্গীতের জন্মদাতা হিন্দু হলেও, তার পালনকর্তা এ-যুগে মুসলমান গায়কেরাও বটে। তাই আমাদের দেশের উচ্চসঙ্গীত শিখতে হলে মুসলমান ওস্তাদের কাছেও তালিম নিতে হয়।

মামা ভাগবীর পাশে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে ব'সে তাড়া ভাড়া ইংরাজিতে বললেন : উচ্চসঙ্গীত ? আপনাদের সঙ্গীত তো লোকসঙ্গীত, Primitive—নয় কি ?

পল্লব বিরক্ত হয়ে বলল : সেটা নির্ভর করে যে বিচার করছে তার উপরে। খুঁট যে খুঁট একদল ফারিসী তাঁকেও বলেছিল—
তিনি শরতানের সাহাবোই শরতানকে ভাড়া।

এলিওনোরা ব্যস্ত হয়ে বলে : গিলো কিছু মনে করে বলে নি। অমনি হুমদাম ক'রে কথা বলা ওর স্বভাব। তবে কি জানেন ? আমরা ভো শুনি নি কখনো হিন্দু কি মুসলমানি গান ? এখনো মাহুব মাহুবের খবর সত্যি কত কম রাখে জানেন তো ?

সিন্ডার বিয়াকি বললেন : আমার কথাটা একটু—malaccorto ৭ হয়ে গেছি—কিছু মনে করবেন না। ব'লেই হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন : ইংরাজিতে বলে জানেন তো—dont take offence when no offence is meant.

পল্লব হাসিমুখে করপীড়ন করে বলে : ধন্যবাদ।

এই সময়ে তিনটি পরিচারিকার চা কেক প্রেছতি নিয়ে প্রবেশ।

এলিওনোরা চা ঢেলে পল্লবকে বললেন : চিনি ?

হুঁ চামচ।

চাপর্ধ স্নক হল—একথা সেকথা...অকারণ হাসি নানা প্রসঙ্গের আলোচনা—কখনো ইংরাজিতে কখনো বা ইতালিয়ানে।

* * * *

সন্ধ্যা হয়ে এল। এলিওনোরা আলোর স্নাইচ টিপতেই ঘর আলোর আলো, অথচ স্নিক্ত আলো, চোখে লাগে না।

পল্লব বলল : চমৎকার সাল আপনার সিন্ডোরিনা—

এলিওনোরা বাধা দিয়ে বলে : ফের ? বলিনি বৃহস্কের বহুর অধিকার আছে আমার নাম খ'রে ডাকবার।

পল্লব খুশি হয়ে বলে : প্রোৎসিয়ে, এলিওনোরা। তবে আমি বিদেশী তো—তাই একটু ভয়ে ভয়ে থাকতে হয় বৈ কি।

বুহুক বলল : তোমার মুখে এ কী কথা বহু ? তোমার হিরো না নির্ভীকতার অবতার—বাংলার গ্যারিবল্ডি ?

এলিওনোরা বাধা দিয়ে বলল : বাজে কথা অনেক হ'ল, এবার একটু কাজের কথা হোক। ব'লেই সিন্ডার বিয়াকিকে : গিলো।

উনি বালিনে বহুর খানেক জর্জন গান শিখেছেন, এখন ভালো ইতালিয়ান গানও কিছু শিখতে চান।

সিন্ডার বিয়াকির মুখ গভীর ক'রে মুহুরিয়ানা সুরে বললেন : জর্জনরা রটরেছে—ইতালিয়ান গান শেখা খুব সোজা কিন্তু আসলে, জগতের সব গানের মধ্যে ইতালিয়ান গানই সব চেয়ে কঠিন। ইণ্ডিয়ান গানের মতন সাদামাটা নয়।

পল্লবের রক্ত গরম হ'য়ে উঠল : আপনি কি জানেন আমাদের গান—যে এ কথা বলছেন ?

সিন্ডার বিয়াকির চোটে অবজার হাসি ফুটে উঠল : না, তবে নিছক মেলডি তো—তাছাড়া, কিছু মনে করবেন না মিটার বাকটি, আমাদের কঠসাধনার রীতি এত কঠিন যে বিদেশীর পক্ষে আয়ত্ত করা কঠিন।

পল্লবের মেজাজ আরো ধারাপ হ'য়ে গেল এ-ইজিতে, বলল : কঠসাধনার কথা যদি বললেন তবে আমাকেও বলতে হচ্ছে—কিছু মনে করবেন না সিন্ডারে—যে আমাদের বঠসাধনার পদ্ধতি থেকে আপনাদেরও হয়ত কিছু শেখার থাকতে পারে।

সিন্ডার বিয়াকি হুই ভুক তুলে একটু বাঁকা হেসে বললেন : Patroismo è ammirabile—ma—Signore, ৮ আমাদের স্বসাধনা এত জটিল যে বিদেশীর পক্ষে—বিশেষ ক'রে ওরিয়েন্টাল গায়কের পক্ষে—স্বসিদ্ধি—তবে আপনি যদি বহুর দেশক আশ্রয় সাধনা করেন তবে হয়ত একটু গাইতে পারতেনও পারেন। কার আমাদের গানে যে-সব ইন্টারভাল নিতে হয় সে অত্যন্ত কঠিন।

পল্লবের মুখ ঈষৎ লাল হয়ে উঠল, বলল : ইন্টারভাল? বিভীষিকার আমরা ভয় পাই না সিন্ডারে। কারণ, কিছু মনে করবেন না—আমাদের গানের নানা ভানালাপে যে-ধরণে ইন্টারভাল আমাদের সাধতে হয়, সে-ধরণের ইন্টারভাল আপনাদের হাজার চেষ্টা করলেও নিতে পারবেন না।

সিন্ডার বিয়াকির মুখ লাল হয়ে উঠল, ব্যঙ্গভরে বললেন কিছু মনে করবেন না। সিন্ডারে, আপনাদের গান তো নিছক লোকসঙ্গীত—সহজ মেলোডি—আমাদের গান উঠেছে বিকাশে এমন একটা শিখরে—

বুহুক বিরক্ত হয়ে বাধা দিয়ে বলল : আমাদের গানের বিক' কোথায় উঠেছে, তা তো জানেন না আপনি—বলেই পল্লবকে তুমি একটা জাঁকালো রাগ শুনিয়ে দাও না সিন্ডার বিয়াকিকে।

পল্লব তৎক্ষণাৎ উঠে পিয়ানোর কাছে গিয়ে টুলে বসে বলল সিন্ডারে, শুধুন তবে আমাদের একটি—বাক আপনি বলছেন স্ মেলডি : এ রাগটির নাম মালকোব—যদি এর একটিমাত্র তান গমক গলার তুলতে পারেন, তাহ'লেই আমি হার মানব। ৯ প্রথমেই বলে রাখি—মেলডি বলতে আপনারা বা বোঝেন, আমা রাগ তা নয়। রাগ বলতে কি বোঝার হু'কথার বোঝা অসম্ভব—তবে একটু শুনলে হয়ত টের পাবেন মেলডির বিক' কোথায় পৌছেছে আমাদের রাগ। ব'লেই পিয়ানোর পাঁচটা ১ পর পর বাজিয়ে : শুধুন মন দিয়ে—যাত্র এই পাঁচটি পদ্য ২ রাগটি গাইছি—সি, ই স্ল্যাট, এক, এ-স্ল্যাট আর বি-স্ল্যাট। এ

আপনাদের কল্পনারও অতীত, কিন্তু আমাদের শিখতে হয় প্রথমেই। ব'লে ঠাট্টা গলার গেয়ে : এবার এ-ঠাটে নানা রকম তান শুনুন—মাত্র এই পাঁচটি পদ্য, মনে রাখবেন। কোথাও যদি এর বাইরে একটি পদ্যও লাগাই ধমকে দেবেন, আমি হার মানব। ব'লে 'উমড ঘুমড ঘন গরজে' ব'লে একটি মালকোবের অদ্বারীটুকু গেয়েই রকমারি তান ও গমক দেওয়া শুরু করল। কসরৎ-এর শেষে বলল : এটি গাইলাম আপনাদের চতুর্মাঙ্গিক হুন্দে। কিন্তু এবার এই রাগেই আর একটি গান গাই শুনুন এমন একটি তালে যা আপনি ধরতে পারবেন না—মানে হাতে তাল দিতে পারবেন না পারেন তো করজোড়ে ক্ষমা চাইব বলেই উত্তেজিত হয়ে বাঁপতাল ধরে দিল পঞ্চমাঙ্গিক হুন্দে :

পক্ষা তরে বন্ধু নহে—প্রেমের ডাকে চাই শরণ,

সিদ্ধু তরি' অকুলে কুল লভিব বরি রাজা চরণ।

বাঁপতাল শেষ করেই তাল ফের ধরল সপ্তমাঙ্গিক ধামারে :

'বেসেছি যদি ভালো, বার না এ তব্বর প্রতিটি অণু কেন তোমার পানে—তোমার মত প্রিয় কেহ যে নাই বঁধু, একথা অন্তর বন্ধন জানে ?'

গেয়েই খেমে বলে : এ তাল হল বিষমপদী, দেখুন আগের তাল ছিল দুই তিনের হুন্দ, এ হল তিন দুই দুই কিনা সাতের হুন্দ—এ তাল আরম্ভ করতে আপনাদের অন্তত দশটি বৎসর সাধনা করতে হবে যদি সুরের সঙ্গে সুরবিহার করতে চান। বলেই উদ্দীপ্ত কণ্ঠে গেয়ে চলে :

'তোমার ত্রিচরণে আমার আমি যদি অর্থ সম হয় আপনি নত,

জানি এখনি তব পরশে পক্ষজ ফুটিবে কঙ্করে আমার বত।

ডুব না তবু কেন সাগরে তব ? চল আজিও ভেসে ভেসে

কিসের টানে ?

তোমার মত প্রিয় কেহ যে নাই বঁধু, এ কথা অন্তর বন্ধন জানে ?'

গান শেষ করে বলে : আমি এই যে সব তান বাঁট দেখালাম, আমাদের দেশের গুস্তাদের কাছে তা ছেলেখেলা। সুরকে নিয়ে তাঁরা যে কাণ্ড করেন শুনলে আপনারা স্তম্ভিত হবেন। শুনুন সিন্তোরে। আপনারা যুরোপে কথার কথার আমাদের ওরিয়েন্টাল বলে অবজ্ঞা করে থাকেন। আমরা যদি পেট্রিফাইট হই, তবে আপনারা অন্ধ তথা আন্ধাঙ্গরী। কিন্তু দার্শনিক মানুষ পার না সত্যের দেখা, বিনয়ী না হলে চোখের ঠুলি খসে না। আমি এক কথা বলতাম না—কিন্তু আমি এসেছিলাম শিখতে। আপনাদের কাছে আমাদের নিশ্চয়ই অনেক কিছু শিখবার আছে। কিন্তু আপনি আমাদের সঙ্গীতকে প্রিমিটিভ বলে ডিমশিম করে দিলেন তার কিছুই না জেনে।

সুহৃৎ উঠে ওর কাঁধে হাত রেখে বলে : হয়েছে, হয়েছে—আর থাক।

এলিওনোরা বলে ওঠে : না না বলুন আপনি। গিগোর একটু শিক্ষা হবে—ভালোই হবে।

পল্লব ঈষৎ লজ্জিত হয়ে সুর নামিয়ে নিয়ে বলল : মাক করবেন সিন্তোর বিষয়াকি। আমি তর্কাতর্কি কি জাঁক করতে সাত সাগর পেরিয়ে আসি নি। এসেছি সত্যি শিখতে। কিন্তু আমাদের

দেশের বহু বিকশিত ঐতিহ্যের কিছুই না জেনে বন্ধন তাকে আপনারা হুকখার নস্ত্রাং করে দিতে এগিয়ে আসেন, তখন একটু বিরক্ত হতে হয় বৈ কি। আর একটা কথা : আমাদের দেশের সঙ্গীতের আমি বেশি জানি না, সামান্যই শিখেছি। ইচ্ছা আছে : দেশে ফিরে রীতিমত শিখব। আপনাদের গানে কিছু তামিল নিতে এসেছি আপনাদের সঙ্গীতের সুস্থ করে এদেশে নাম কিনতে নয়—আপনাদের সঙ্গীতের বিশেষ করে নানা বিস্তার ও উদ্ভাবন থেকে বতটা পারি গ্রহণ করে আমাদের সঙ্গীতকে আরো সমৃদ্ধ করতে। কারণ আপনাদের যন্ত্রসঙ্গীতে আমি মুগ্ধ হলেও আপনাদের কণ্ঠসঙ্গীত আমার তেমন ভালো লাগে না। কণ্ঠসঙ্গীতে আপনারা আমাদের কাছেও আসতে পারেন না জানবেন, যেমন অভাবনীয় সুরসম্পাতে আমাদের যন্ত্রসঙ্গীত, অর্কেস্ট্রা, আপনাদের সঙ্গীতের কাছে আসতে পারে না। তাই দেখছেন পেট্রিফাইট আমার উপাধি নয়, আমার সত্য উপাধি—সত্যাক্ষেপু, জিজ্ঞাসু। সত্যকে জানতে হলে চাই বিনয়—তাই আমি নস্ত্র ভাবেই আপনাদের সঙ্গীতকারদের কাছে শিখতে এসেছি। কিন্তু আপনাদেরও ঠিক এমনি নস্ত্র হ'য়ে আমাদের সঙ্গীতকারদের কাছে শিখতে যাওয়া দরকার। আর যদি যান, দেখবেন—আমাদের ভজন, কীর্তন, নাট্যসঙ্গীত, রাগসঙ্গীত, তাল ও তানের বৈচিত্র্য, অলঙ্কারের ঐর্ষ্য এসব থেকে আপনাদের অনেক কিছুই শিখবার আছে। বলে একটু খেমে : যদি অন্তর কিছু ব'লে থাকি ক্ষমা করবেন এই ভেবে যে গায়-পড়ে আঘাত দিতে চেয়ে আমি আজ এসব কথা বলি নি।

সিন্তোর বিষয়াকি মাথা নিচু করে বললেন : না সিন্তোরে, আপনি অন্তর কিছুই বলেন নি, তাই ক্ষমা করবার প্রস্তুতি ওঠে না। বরং আপনাকে আমার যন্ত্রবাদই দেওয়ার কথা যে আমাকে বুঝিয়ে দিলেন যে আমরা অনেক বিষয়ে আজো কী রকম অজ্ঞ আছি। আপনিই আমাকে ক্ষমা করবেন যে আপনাদের এ আশ্চর্য সঙ্গীত সম্বন্ধে কিছু না জেনে চলতি মতামতকেই প্রামাণ্য ক'রে বা তা বলেছি।

পল্লব বৃহত্তে প্রসন্ন হ'য়ে ঈষৎ লজ্জিত ভঙ্গিতে বলল : সে কি কথা ? আমিও কি কম বা তা বলেছি না কি ? তাই আপনিও কিছু মনে করবেন না, সিন্তোরে।

সিন্তোর বিষয়াকি বললেন : No, niente ignore। ১

কেবল একটা কথা বলব কি ? যদি বিশ্বাস করেন অবজ্ঞা—

এলিওনোরা বাধা দিয়ে বলে : না করবেন না বিশ্বাস। তুমি ধামো। বার বার বলি যেখানে সেখানে হুমদাম ক'রে কথা বোলা না—

পল্লব বলে : না না, সে কি কথা ? আপনি বলুন—ব'লে সুহৃৎকে দেখিয়ে : আমার এই অতি বিজ্ঞ বন্ধুটিকে যদি জিজ্ঞাসা করেন তা হলে খবর পাবেন যে বিশ্বাস না করা আমার স্বভাব নয়—বরং উন্টো। অন্তত ও ত আমাকে উঠতে বসতে ধমকায় যে, আমি এখনো সাবালকই হইনি—তাই এক কথার সবাইকেই বিশ্বাস করে যা খাই—taking them at their face-value.

এলিওনোরা বলে : আপনি ওর কথা শোনেন কেন ? নিজের

বভাবেই চলবেন। যা খান তাতে কী? তাছাড়া—বলে একটু
ধেম : বিশ্বাস না করে ঠকার চেয়ে বিশ্বাস করে ঠকা দেয় বেশি
ভালো।

বুহুক আত্ম্মি প্রথম অভিব্যক্তি করে বলে : একজন জানী
বলেছিলেন, হায়রে হায় : Je me presse de rire de tout,
de peur d'être obligé d'en pluerer ১০. মরুকগে
আমি কাদি কাদব, আপনি বলুন সিন্তোরে, আপনার অবিস্মৃত কথা
আজ আমিও বিশ্বাস করব, কথা দিচ্ছি।

সিন্তোর বিরাগি হাসলেন না, পল্লবকে বললেন : কথাটা এই
যে, আপনাকে কয়েকটি শ্রেষ্ঠ ইতালিয়ান আমি শেখাতে চাই
নিজেরি গরজে—আর কেন গরজ তুলবেন? কারণ এরকম আশ্চর্য
কণ্ঠ আমি ইতালিতেও বেশি শুনি। তাই শুনে চাই ভালো
ইতালিয়ান গান আপনার কণ্ঠে কী রকম শোনার।

বুহুক এলিওনোরাকে টেনে ধরে দাঁড় করিয়ে বলে : বলো
হিপ হিপ,—

এলিওনোরা ভর্সনার মূরে বলে : শ—শ। How vulgar
এ সময়ে শুধু চাই শান্তি পাঠ—মহাকবি দান্তের 'E la sua
volontate è nostra pace. ১১

আট

সিন্তো প্রস্থান করতেই এলিওনোরা পল্লবকে বলে : শুধুন,
আপনার কণ্ঠ শুনে কী যে বলব ভেবে পাচ্ছি না।

বুহুক হেসে বলে : ওকে কেন এসব বলছ? ও হয়ত
কের বিশ্বাস করে বসবে।

এলিওনোরা বলল : তুমি ধামো : ব'লেই পল্লবকে :
আমার একটা কথা মনে হচ্ছিল বলবো?

কী?

সালভিনির সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দেওয়া। এরকম
কণ্ঠ তাঁকে না শোনালেই নয়।

পল্লব সত্তরে বলে : না না, তিনি ইতালির শ্রেষ্ঠ গায়ক—
তাঁর সামনে আমি গাইব কি? পাগল!

এলিওনোরা ফরাসি কেতার কম্প্রিমেন্ট দেয় : পাগল করবার
মতনই কণ্ঠ আপনার—ব'লে হেসে—কিন্তু ভয় নেই—সালভিনি
কুমারী নন—পুরুষ, তার উপরে বৃদ্ধ—তিনি টাল সামলাতে
পারবেন।

পল্লব সক্রোঁ বলে : কী যে বলেন—

এলিওনোরা হেসে বলল : আমার বলা সহজ—কারণ বুহুক
তো ঝাঁপাই করে দিয়েছে যে আমার বয়স বিপদের কোঠা পেরিয়ে
গেছে। কিন্তু ঠাট্টা না। আপনাকে বলছি আমি—তিনি অস্বস্তত:
খুশি হবেন এমন অপরূপ কণ্ঠ শুনে। তাঁর গানও আপনাকে
শোনাতে চাই।

পল্লব বলল : আমি শুনেছি তাঁর গান।

কোথায়?

বার্নিনে।

এলিওনোরার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে : বটে! কেমন লাগল
তাঁর কণ্ঠ?

পল্লব বলল : অপূর্ব! যেমন উদাত্ত তেমনি মধুর। যুরোপে
এ পর্যন্ত এমন কণ্ঠ আমি শুনি।

এলিওনোরা সগর্বে বলল : গলায় ইতালিয়ানদের কাছে
কে? আর ভাবুন—এখনো ওই গলা—বাটি বৎসর বয়সে।
দু-হাজার লোক শুনে পার!

পল্লব বলল : তা সত্যি। আর কণ্ঠস্বরের এই বোলন্দ,
আওয়াজ বার করবার কৌশলটাই আমি ভালো করে শিখতে
চাই এদেশে।

তাই তো আরো তাঁর সঙ্গে আপনার দেখা হওয়াই চাই।

কিন্তু সালভিনি তখন যুরোপে কল্যাট-টুরে ভ্রাম্যমাণ।
তাই অনেক আলোচনার পরে স্থির হ'ল যে তিনি তাঁর ভ্রমণান্তে
রোমে ফিরলেই পল্লব তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাবে এলিওনোরার
সঙ্গে।

* * * *

পল্লবের বিদায় নেবার সময় হ'ল। এলিওনোরা ওকে মোটরে
তুলে দেবার সময়ে হাসিমুখে বলল : এখন থেকে কিছু এখানে
মাকে মাকে আসতেই হবে। একদিন গান শুনিয়েই পালালে
চলবে না।

পল্লব খুশি হয়ে বলে : এ তো আমার সৌভাগ্য, সিন্তো—
কের? তোমাকে পল ব'লে ডাকব আর তুমি আমাকে
ডাকবে এলিওনোরা, আর ভুল হবে না তো?

না, প্রাংসিয়ে—এলিওনোরা!

এলিওনোরা হাততালি দিয়ে বলে : পাশ।

বুহুক বলে : এলিওনোরা! তোমার তো আজ সারারাত
শুটি—আমি এই সুযোগে পলের সঙ্গে একটা থিয়েটার দেখে
আসি?

কী?

গিরাক্সেলোর Sei Personaggi in Cerca d'
Autore. ১২

এলিওনোরা পল্লবকে হেসে বলে : হাসতে যদি ভালোবাসে
তবে এ-নাটিকাটি দেখলে খুশি হবেই হবে—আমার আজ শূটি
না থাকলে আমিও যেতাম।

বুহুক বলল হেসে : এখন তো পল তোমার ঘুর্তার
মধ্যে—ওকে নিয়ে যেও কাপ্রিতে—ওর মন খারাপ—এ
যা : ভুলে, ব'লেই এলিওনোরার দিকে চেয়ে চোখ মিট-মিট
ক'রে : মন খারাপ হলেও দান্তের মতন অবস্থা ওর এখনো
হয় নি, তাই বলা না ওকে, লক্ষ্মীটি : 'Tu mi Segui ed
io Saro tua guida.' ১৩

[ক্রমশঃ।]

১০। আমি সব তাতেই হাসি এই ভয়ে—নৈলে পাছে সব
তাতেই কাদতে হবে।

১১। তাঁর (ভগবানের) ইচ্ছাই আমাদের শান্তির একমাত্র
আজর।

১২। ছটি মাহুর প্রহকারের বোঁজে।

১৩। এসো আমার সঙ্গে, আমি হব তোমার দিশাবিনী।



স্পেনসার শ্রুত দত্ত

তাঁই স্থির হল অবশেষে। আবার নতুন করে আরম্ভ করতে হবে, বর্তমান জীবনকে ইতিহাসের একটা অধ্যায় করে, নতুন অধ্যায়ের গোড়াপত্তন। একশ' সাতষাট টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা। সওদাগরী অফিস পুরো একশ' আটষাট দেবে না। কি ধরকার অমন কাজে ?

ভাগ্য মেরেছে অশান্তকে। চোখের পাওয়ার—মাইনাস আট। কমপিটিভ পরীক্ষায়ও সুরিষে হবে না। বেগীনন্দন স্ট্রীটে বীরেশ বাবুর মেসের বোর্ডার হয়ে সে সারাজীবন কাটাতে পারবে না। না হয় ভগবানে মেরেছে—তবু এই তিনশ' কুড়ির বেড়ালালে ও নিজেকে বেঁধে রাখতে পারবে না। এ জীবন ওর নয়—ওর নয়। তিনতলার ঘরের ছ' নম্বর ঘর। তার দক্ষিণ দিকের বেড়টা ওর। ঘরের আর ছয় বোর্ডার কেন জানি না ওকে খাতির করে দক্ষিণ দিকের বেড়টা ছেড়ে দিয়েছে। তবু সন্ধ্যার সময় অশান্ত পশ্চিম দিকের জানলার সামনে এসে দাঁড়াবে। নীল আকাশ, ধূসর পৃথিবী। কোলকাতার আকাশে পানকোড়িয়া সার দিয়ে উড়ে চলে যার অনেক দূরে। কোথায় যার ওরা পশ্চিম-আকাশে ? অনেক দূরে ? অনেক দূরে।

পশ্চিম দিকের বেড়টা অসিত রাসের। সে কি করে কোথায় থাকে অশান্ত খোঁজ নেয় না, তবে জানা আছে যে সে দশটা-পাঁচটার কেরানী নয়। অস্ত্র বেড়ে থাকে অতুল নিয়োগী, সে ভেবেছিল অশান্ত বৃষ্টি মেয়ে দেখে, পশ্চিমের জানলায় একদিন মুখ বাড়িয়ে দেখে সারি সারি বস্তীর চালা আর গ্যারাজ। কি দেখে অশান্ত ?

এই পশ্চিম দিকের অনেক দূরে এক দীপ আছে, সে দীপ লবঙ্গ-দারুচিনির বাতাসে মন্থর নয়, সন্ধ্যা সেখানে অসংখ্য তারার আলোর উদ্ভাসিত নয়। সেই দীপের বন্ধরে জাহাজ আসে পণ্য নিয়ে, আর আশা নিয়ে সেই বন্ধরের স্বপ্ন দেখে অশান্ত, কোন বন্ধর ? টিলবারী না সাদাম্পটন ? ও ঠিক জানে না। ওর পরিচিত কয়েকজন এসেছে নীল রংএর air letter এসেছে ওর নামে একাধিক বার। তবে তাদের কেউ নেমেছে টিলবারীতে, কেউ সাদাম্পটনে। মেসের ঠাকুর তখন ওকে প্রশ্ন করেছে বাবু বৃষ্টি বিলেত যাবেন ? আপনায় দেখি রাণী ব ছাপমারা নীল কাগজে চিঠি আসে। অশান্ত জবাব দেয় না, অতুল নিয়োগী একদিন

কলঙলায় দাঁতন করতে করতে আলোচনা করছিল ওর বিলিভী চিঠির কথা। অশান্ত কিছুই বলে না এদের। ওর আরোজন যদি মিথো হয় ? তবু আরোজন সে এগিয়ে এনেছে অনেকখানিই।

তোমাকে তাহলে একটা কাজ বোগাড় করতে হবে—সন্ধ্যা বলে, নয়তো চলবে কি করে ? তোমার বাবা যদি হঠাৎ সরকারী কাজটা না ছেড়ে দিতেন তাহলে হয়তো কিছু টাকার আশা থাকতো।

না, বাবার কাছে কিছু আশা নেই। বাবার নিজের সক্ষম আছে কি না তা-ও জানি না। বাবার মনে বৈরেগীর রং লেগেছে, আর তা অনেক দিন। মা বাবার পরেই, আমার নিজের সজ্জের ওপর ভরসা করতে পারি না। যদি বাই তো কাজ বোগাড় করতেই হবে। না গেলে কি হবে অশান্ত ? বিদেশ-বিভূরে ? সেখানে তো কেউ চেনা নেই ?

জানি না সন্ধ্যা—তবু আমাকে যেতেই হবে। কাজ কি বোগাড় হবে না ? কত ছাত্র তো সেখানে কাজ করে পড়াশুনো করছে। আমার বোগ্যতা বেশী না হলেও কেমিষ্ট্রিতে অনার্স ডিগ্রী তো আছে ? আমারও কি কাজ হবে না ?

আচ্ছা অশান্ত, তুমি যদি বাও তবে কবে ফিরবে ? ক'-বছরের জন্ত বাচ্ছ ?

জানি না তো। তিন বছর চার বছর—হয়তো অনেক বছর। অনেক বছর না ? তারপর এই অনেক বছর পরে ঘরে—তোমার আমার আবার দেখা হবে তখন ?

তখন কি ? অশান্ত বলে। তখন সেই তুমি আর এই তুমি কি এক থাকবে ? যে পথে পথ চলা হয় না—ঘাসের অংকুর জন্মায় সেখানে, পথের রেখা মুছে যায়, একদিন সূর্যও নিবে যাবে।

যাবে বোধ হয় সন্ধ্যা, তবুও। আচ্ছা অশান্ত, তোমার চোখের পাওয়ার কত ? মাইনাস আট, তাই না ?

হ্যাঁ মাইনাস আট। জান অশান্ত, তোমার চোখের চশমা খুলে নিলে তোমাকে আমার কেমন লাগে ?

কেমন লাগে কি করে বলব, আমি তো কিছুই দেখি না।

আমি দেখি তুমি বড় অসহায়, তোমাকে কেউ দেখায় নেই। আমারও সাহস নেই তবু যদি পারতাম।

অশান্ত চূপ করে থাকে, সন্ধ্যা ওর দয়িতা নয় বান্ধবী। সন্ধ্যাকে তার ভালো লাগে, সন্ধ্যার সংগে সে চায় হয়তো কিছুক্ষণ বা কিছুদিন, কিন্তু সারাজীবনের কথা ও আজও ভেবে দেখেনি। অশান্তর নীরবতা অনেক কথাই বলে। তাই সন্ধ্যা খুব সন্তপ্ণে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। অশান্তকে সে ভালবাসে, অশান্ত তাকে ভালবাসে কি না সে জানে না। বোধ হয় না। তবু সে আশা রাখে, আর অশান্ত যদি চলে যায়—তাহলে ওর কোন আশাই থাকে না, সাতাশ বছর বয়স ওর, জন্মের আবেগ তাকিয়ে এসেছে বকুলতলা স্থলে এগারটা-পাঁচটা চাকরী করে, ভালবাসা তার প্রয়োজন—তার জীবনে অপূর্ণতার সমাপ্তি আনবে অশান্তর ভালবাসা—এ তার স্বপ্ন, চূপচাপ স্বপ্নভাবী অশান্ত ওর কাছে এসে বত কথা বলে। একদিন হয়তো ও সেই কথাই বলবে বার জন্ম সন্ধ্যা বসে আছে, কবে তুমি বলবে সে কথা অশান্ত ?

অশান্তও বোঝে। সাতাশ বছর বয়স তার। ওর মাকে বলে সে ভুলে গেছে অনেক দিন, যা গেছে অনেক দিন—তখন ওর পনের বছর বয়স। মার অনেক ইচ্ছা ছিল—অনেক সাধ ছিল অপূর্ণ—তাই অশান্তর পৃথিবীও অপূর্ণ রইলো। কলেজে পড়তে আসার সংগে মেসজীবন সূত্র—মায়ের মৃত্যুর কিছুদিন পরে। তাতে সুর নেই, আছে দোষারতির ফির আসা লাইনে বায়ে বায়ে আবৃত্তি, গতি আছে—হুম নেই। এ জীবনে অভ্যস্ত হতে দেয়ী হোল না। আবার বৈচিত্র্য আনলো সন্ধ্যার সংগ। আজ সে সন্ধ্যার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ নিজেকে দোষী মনে করতে লাগলো। এই যে অতি-সাধারণ জামলা রং-এর মেরে এর সংগে ওর প্রতিটি শনিবার নিয়ম করে দেখা করার নিশ্চয় কোনও মানে আছে—অন্ততঃ সন্ধ্যার মা-বাবার কাছে। আইবুড়ো ছেলেটি প্রতি সপ্তাহে নিয়ম করে তাঁদের বাড়ীতে চায়ের আসরে হাজিরা দেয়—ছেলেটি পাত্র হিসাবে সুশাস্ত্রই, তার ওপর স্বজাতি, মেয়ের বয়স বাঙালী ঘরের হিসাবে কম নয়—আর মেয়ে সুরূপাও নয়, অতএব বোস-দম্পতির অল্পমোদন অতি স্বাভাবিক, অশান্ত এ সুযোগ নিয়েছে—কিন্তু তার অপব্যবহার করেনি। সন্ধ্যাকে ও আজ আবার বুঝতে চায়। কিন্তু এতে বোঝার আর কি আছে ? সন্ধ্যার সে অবলম্বন ছিল—সন্ধ্যার সে ভবিষ্যৎ ছিল—সন্ধ্যার সে স্বপ্ন।

অনেকক্ষণ ওরা বসে থাকে—অশান্ত ভদ্রা পায় না কিছু বলার। দিনের আলো ত্রান হয়ে আসে। সন্ধ্যার শাঁখ বাজে আশে-পাশের বাড়ীতে। শনিবারের বিকেল কুরিয়ে যায়, একটু পরে অশান্ত বলে—আজকে আসি।

দীর্ঘে দীর্ঘে অশান্ত এগায়, রাইটার্স বিল্ডিং-এর হাংগামা,—বিরিট হাংগামা। প্রথম বেদিন ও পাসপোর্টের ফর্ম নিয়ে আসে তা ওর মনে আছে। কি এক বিরিট উত্তেজনা, বিলাত-বাজার প্রথম আয়োজন। ওর মাথা থেকে পা অবধি বিদ্যুৎ-সিঁহরূপ খেলে, না ওর ঘুম ভেঙেছে। আয়োজন সূত্র হয়েছে। বতদিন না পাসপোর্টের স্বাক্ষর শেষ হয়েছে ততদিন ওর বড় অনিশ্চয় গেছে, ইনকোয়ারী হবে পুলিশ থেকে, লোক আসবে ওর খোঁজবদর নিতে। তখন তো যেসে জানাজানিই হবে, উপায় কি ? জানাতেই হবে।

আপনার খোঁজে পুলিশ-অফিস থেকে একজন এসেছিল। অতুল নিয়োগী ওকে বলে, কি ব্যাপার—খুঁজি করছেন নাকি ?

তারপর হেসে বলে, না তাও বা কি করে হয়, দেশ তো এখন স্বাধীন। তাহলে কি নোট-জাল-টাল করছেন ?

আপনার মত কমমেন্ট বার, তার কি তাই করা উচিত নয় ? অশান্ত আহত-স্বরে বলে।

চটেন কেন মশাই ? রসিকতাও বোঝেন না ? আপনাকে বোঝা সত্যি কঠিন, মাপ চাইছি। বলুন—কবে বিলেত যাচ্ছেন ?

একটা কথায় যেন ভেলকি খেলে। মুহূর্তে অশান্ত সম্পূর্ণ বদলে যায়। ওর মায়ের কথা মনে পড়ে—রাগ মনে রাখিস নে ছোটখোকা, কেউ যদি মাপ চায় তো সব ভুলে বাস। অশান্ত নিজেকে সামলে নেয়। সহজ হয়ে আসে ওর ব্যবহার।

চেষ্টা করছি অতুল বাবু, তবে জানেন তো—বাওরা বড় কঠিন, অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হবে, তবে যদি সম্ভব হয়, ভাল কথা, আমার সন্ধান কখন লোক এসেছিল পুলিশ-অফিস থেকে ? আবার কবে আসবে—কিছু বলে গেছে ?

হ্যাঁ, লোক এসেছিল কাল সকালে। আবার আসবে আজ রাত্রে, আপনাকে জানাতে বলেছে।

শেষ হোল একের পর এক জট খোলা, সবচেয়ে বড় হাংগামা পাসপোর্ট পাওয়া, তা যেদিন চুকলো সেদিন অশান্তর যেন রাহ-মুক্তি হোল।

কবে বিলেত যাচ্ছেন ? গলির মোড়ের ষ্টেশনারী দোকানের জগদীশ বাবু জিগ্যেস করে, ছাপোষা জগদীশ সরকার—বাড়ীর সামনের ঘরে ষ্টেশনারী দোকান, অশান্ত ওর কাছে বাড়ি কামাবার ব্লড, সাবান-টাবান কেনে, একবার সে সন্ধ্যার প্রসাধনের কি যেন সুরগন্ধি এসেছিল কিনেছিল, কেন জানে না, তবে তা আর সন্ধ্যাকে দেওয়া হয়নি, ওর হাতবাক্সেই আছে, বিলেত যাবার আগে সন্ধ্যাকে তা দিয়ে যাবে—মনে মনে ঠিক করে রেখেছে অশান্ত।

এখন তারিখ ঠিক হয়নি জগদীশ বাবু। এই পাসপোর্টের হাংগামা সবে চুকেছে—এখন পাসপোর্টের ব্যবস্থা করতে হবে।

বান মশাই চলে, এদেশে থাকলে কিস্তি হবে না, আপনার মত ইয়ং-ম্যানরা যদি ঘুরে এসে কিছু করে।

অশান্ত বিশেষ কিছু বলে না, শুধু একটু হাসে। কি-ই বা বলার আছে।

কদিন থাকবেন বিলেতে ? আবার প্রশ্ন হয়।

বছর তিনেক—অশান্ত বলে।

তা একা কিরবেন তো, না হেঁ হেঁ—জগদীশ সরকার দস্তপাতি বিকশিত করে তারপর আবার বলে না না, তাই বা কেমন করে হয় ? আপনার তো ঐ বকুলতলা স্থলের দিদিমণিটি বার জন্ম আপনি আমার দোকান থেকে সুরতি পুষ্পসার এসেছেন কিনলেন। তা বে-খা করেই যাবেন তো ?

কে বলেছে আপনাকে এসব কথা ?—অশান্তর মেজাজ ধারণ হয়ে যায়।

হেঁ হেঁ হেঁ—জগদীশ সরকার আবার কান-সকড়ি হাসি হাসে আমাদেরও তো বরসকাল ছিল অশান্ত বাবু। মেসবাড়ীতে আপনার অন্তরের সময় ওনার বাতায়নের কথা কে জানে না। আর আমার ছোট মেয়ে টিরা তো ঐ স্থলেরই, সেই তো বলে বাবা সন্ধ্যাদিকে দেখলুম বীবেশ বাবুর মেসবাড়ীতে। এবারে বুঁ

যেসে ঘেরেছেলেনা থাকবে? তা এ আর এমন কি ব্যাপার যে এই নিয়ে আপনি রাগাণাগি করছেন?

না গুরুদেব আর কি? তবে আপনারা বোধ হয় গুরুতর হলে খুসী হতেন—অশান্ত দোকানে আর ঠাড়ায় না। হুঁ বাস আগে ও নৈহাটিতে গিয়েছিল এক বন্ধুর বিয়েতে। সেখান থেকে ফেরার পরে ওর সেপটিক ফিভার হয়, আর তখন সন্ধ্যা আসে ওকে দেখতে। সন্ধ্যার সেদিন আসাটা ও খুব অসুখমোদন করেনি। যেস-বাড়ীতে অনাফ্রীর পুত্র বন্ধুকে কোনও তরুণীর দেখতে আগার একাধিক মানে নেই। সেই শনিবারের ঠৈঠকে অশান্ত হাজির হয়নি বলে সন্ধ্যা তার পরের দিনই এসেছিল ওর খোঁজে।

রবিবারের বিকেল সেদিন, সদর দরজা খোলা থাকা সত্ত্বেও সন্ধ্যা কড়া নাড়ে, যেসের ঠাকুর রান্নাঘরে আর চাকর শ্রীহরি কিম্বোছিল। একটু অবাক হয়ে শ্রীহরি এগোয়, বেগীনন্দন ষ্ট্রীটের বীরেশ বাবুর মেসে সুরেশা তরুণী? নিশ্চয়ই ভুল হয়েছে অস্ত্র বাড়ীর।

কাঁকে চাই আপনার? শ্রীহরি প্রশ্ন করে।

এটা কি বীরেশ বাবুর মেস? এখানে অশান্ত মিত্র থাকেন?

হ্যাঁ এখানে অশান্ত বাবু থাকেন তিনতলার হুঁ নম্বর ঘরে। কিন্তু বাবু তো অরে বেহঁশ, অতুল বাবু গেছেন ডাক্তার ডাকতে, আপনি?

কোন রকম উত্তর না দিয়ে সন্ধ্যা ওপরে আসে। ছেলেটার অর তাই সে হাজির হয়নি।

এই অশান্তর ঘর। তিন দিকে তিন চৌকী পাতা, দড়ির আলনার খুঁটি পাঞ্জাবী এলোমেলা, করেকটা বাস্র-তোরাংগ ইত্যন্ততঃ ছড়ান এক কোণে জুপাকার বই আর খবরের কাগজ। তিজে গায়ত্রী পড়ে আছে আর এক কোণে, চৌকীতে অশান্ত শুয়ে, বোধ হয় বেহঁশ।

হাত দিয়ে সন্ধ্যা ওর কপালের তাপ দেখে, গা হয়ে পুড়ে যাচ্ছে। কোনদিন অশান্তর ও কপাল ছোঁয়নি। এই প্রথম হোঁওয়া তার কপাল, আলগোছে সন্ধ্যা ওর মুখে গালে হাত দেয়, মুখের একপাশ একটু ফোলা কেন ও বোঝে না। হু চোখ জরে সন্ধ্যা অশান্তকে দেখে, এমন কবে ও কখনও অশান্তকে দেখেনি। একবার ইচ্ছে হয়েছিল অশান্তর ফটো চাইতে, কিন্তু কাউলপনারও সীমা আছে, তাই আর চাওয়া হয়নি, হু চোখ সন্ধ্যার জলে ঝাপসা হয়ে আসে। ইচ্ছে হয় অশান্তর মাথা কোলে নিয়ে বসে থাকে। উপায় নেই তার, হায় অতৃপ্ত। থাকে সে ভালবাসে থাকে সেবা করবারও ওর অধিকার নেই? চোখ মুছে সন্ধ্যা আবার দেখে। বকুলতলা ছুলের অংকের টাচার সন্ধ্যা বাস, যে হোম-টাসিক না আনলে কোন হাতীকে কমা করেনা, আজ তাহ হু চোখ জরে জগতের কাছে মার্জনা-ভিক্ষা। যদি সে হুঁদও অশান্তর মাথা ওর কোলে রাখে—ওকে কি পৃথিবী কমা করবে না?

একটু পরে অতুল নিয়োগীর সঙ্গে ডাক্তার আসে। সেপটিক ফিভার। গলার গ্র্যাণ্ডে আর ঠাণ্ডে সক্রামিত রোগ, সন্ধ্যাকে নীরব-বিস্ময়ে দেখে। যেসবাড়ীতে অবিবাহিতা তরুণী। বন্ধুস্মিতে যেখের ছায়া। সেট দিন অশান্ত হাসপাতালে বাবার পরে জলসা বসে হজুগের। কে এই অয়েটি? বাস সমাধান করেছিল জগদীশ সরকারের অকালপক মেয়ে টিরা। হুই আর হুইএ

চার হোল। এই সব ছেলে মশার, বিধাস হর না এমন ভালমাহুয়ের মত দেখতে, বিশ বীণ্ড জল। অশান্তকে অবজ্ঞা এ নিয়ে অসিত বাস প্রশ্ন করেনি, সে সাতো পাঁচ থাকে না। অজ্ঞের জ্ঞতা তার মাথা বাধা নেই। অতুল নিয়োগী একদিন টিল ফেলেছিলেন, আপনারা ভাগ্যবান অশান্ত বাবু, সেপটিক ফিভারেই বাকবী ছুটে আসে, আর আমাদের ঘরে নোটিশ দিলেও কেউ আসবে না। নিজের স্বভাব অনুযায়ী অশান্ত চুপ করে থাকে।

আজ জগদীশ সরকারের কথা শুনে অশান্ত সন্ধ্যার কথা আবার ভাবে। কবে কথায় কথায় ও বলেছিল বেগীনন্দন ষ্ট্রীটে বীরেশ বাবুর মেস বিখ্যাত। এর নম্বরের দরকার করে না। একটা শনিবার ওর সন্ধ্যাদের বাড়ীর অল্পপস্থিতিকে তাকে এত উতলা করেছে যে সে তার পরের দিনই হাজির হয়েছে বীরেশ বাবুর মেসে। সন্ধ্যা কি ওকে ভালবাসে? কিন্তু ওর তো কিছু করার নেই? ভালবাসার জ্ঞতা সময় দরকার, অবসর দরকার, অশান্তর অবসর নেই অনেক ভাড়া, তাহাড়া অনিশ্চিতের পথে ওর যাত্রা। এ বিলাস ওর সাজে না। হয়তো একদিন ওর অবসর আসবে, এ বিলাস সেদিনের জ্ঞতা থাক।

সেজমানীর বাড়ী যেতে হবে। ছোট বোন লীলা ওকে বড় ভালবাসে। অশান্তর নিজের বোন নেই। লীলা সহোদরার মত। আর ক'দিন পরে তো ও চলে যাবে। 'কারগো' জাহাঙ্গীর ব্যবস্থা হয়ে গেছে ভিজগাপটম থেকে ছাড়বে জুলাই মাসের শেষে। এখন যে মাসের শেষ। বোনটার জ্ঞতা একটা কিছু কিনতে হবে বাবার আগে। কবে কিরবে তার স্থির নেই, হয়তো ততদিনে ও স্বস্তরবাড়ী চলে যাবে, কি কিনবে অশান্ত? সন্ধ্যার জ্ঞতা আবার কিছু কিনতে হয়, ওকেও দেবে একটা অভিজ্ঞান—স্ব্যভেনীয়র, কিছু টাকা খরচ হবে, তা হোক।

আপার সাকুলার বোডে বাবার বাসে অশান্ত চেপে বসে, সেজ মানীর বাড়ী বাবার পথে নেমে লীলার জ্ঞতা এক ভাঁড় দই আর রাবড়ী নিয়ে যাবে, বেচারী মিষ্টি খেতে বড় ভালবাসে, গত বছরের কথা অশান্তর মনে আছে—পূজার বোনাস পেয়ে সেজমানীর বাড়ীতে গিয়েছিল শীশর জ্ঞতা একবাস্র কড়াপাক সন্দেশ নিয়ে, রবিবারের দুপুর—লীলা তখন ঘুমিয়ে ছিল মেঝেতে মাহুর শেতে। অশান্ত চুপি চুপি ওর এক পাশে বাস্রটা বসিয়ে লিখে রেখেছিল—সাকুলার জ্ঞতা, ঘুম ভেঙে উঠে ওর আনন্দ ভোলায় নয়।

বাসে লোকে ওঠা-নামা ক'রতে বড় সময় নিচ্ছে, অশান্ত বাবে বাবে বড়ি দেখে। শোনে তিনটে, গেকরা-দুপুর।

দেখাশোনার পালা পড়েছে। আর নেমস্তর খাবার পালা। যে মাস শেষ, জুনও শেষ হ'তে চললো, ওর 'কারগো' ছাড়বে জুলাই-এর মাঝামাঝি, সন্ধ্যাদের বাড়ীতে প্রতি শনিবার হাজির। বেওয়ারী বন্ধ হয়েছে অনেকদিন, সময় কখন, অকিস করার পর কত কাজ। কেনা-কাটা আছে—দজীর বাড়ী বাঁধা আছে, তারপর কত টুকিটাকী হাংগামা।

আর আছে কোটালপুকুরে বাঁধা বেখানে ওর বড় মামীমা আছেন। বড় মামীমা আঠার বছর বয়সে বিধবা হয়েছেন নিঃসন্তান, এখন তাঁর বয়স পঁয়ষাট ছেবাট। একরাশ মজিকার মত সালা

ধবধবে রঙ, তাই তাঁর নাম সালা-মামীমা, কোটালপুকুরের ট্রেনে কি এখন ভেতনি আছে? সেড পেরিয়ে একটু দূরে টিনের চালার এনে গালা করে খড় জমান। অশান্ত প্রথম যে বার মামার বাড়ী বার এই খড়ের গালায় সামনে দাঁড়িয়ে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়েছিল—নতুন খড়ের গন্ধ। কেমন কেমন যেন? ওর বেশ লাগছিল। যা ওর এগিয়ে গেছে বড়দার সংগে, বাবা আসতেন না কখনও কোটালপুকুরে, অশান্ত পেছিয়ে পড়েছে, ট্রেনের পানি-পাঁড় অবাক হয়ে দেখছিল একটা ছেলে খড়ের গালায় সামনে দাঁড়িয়ে যেন কি করছে, একটু পরে মা আবিষ্কার করলেন ছোট খোকা আসেনি। মার ডাকে অশান্ত এলে নতুন ধানের গন্ধ গায়ে যেনে, সালা-মামীমা যেন দ্বিতীয় মা। এতো স্নেহ ও কোন দিন ভুলবে না। তার সঙ্গে দেখা করতে হবে বিলত বাবার আগে, আর একবার ওরা সাহেবগঞ্জ বাচ্ছিল লুপ-সাইনে। ভোর রাত্তিরে ট্রেনে কে যেন নীল আলো উঁচিয়ে বলছিল কোটা-ল-পু-কু-র। সেই ডাকে ওর ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। এখানে নামবে না মা সালা-মামীমার বাড়ীতে? ও মাকে বলেছিল, না ছোট খোকা তোমার বাবা যাচ্ছেন সাহেবগঞ্জে, এবারে নামা হবে না, জানলার মুখ বাড়িয়ে অশান্ত দেখে ভোরের আলো যেন হামাগুড়ি দিয়ে আসছে শালগাছের মাথার ওপরে। সেই টিনের সেড খালি পড়ে আছে—খড় নেই। সালা-মামীমার জন্ত ওর মনটা হ-হ করে উঠেছিল, সে তো অনেক দিন হোল? এবারে দেখা না করলে নয়।

সন্ধ্যার নেমন্তন্ন করছে—এবারে সন্ধ্যার মা নিজে বসেছেন অনেক দিন তো দিশী খাওয়া থাকে না বিলত গেলে, সামনের শনিবার মামীমার হাতে দুটি ঝোল-ভাত খেয়ে বেও। সামনের শনিবার মানে জুন মাসের ঊনত্রিশ তারিখ, আজ বাইশে, ওরা সকাল সকালই বলেছে, জাহাজ তো জুলাই-এ।

বোস-গিন্নী ঠিক জানেন না কতদূর কি ব্যাপার, মেরেকে জিপ্সো করতেও বাধ-বাধ ঠেকে, একবার ঠাণ্ডে-ঠাণ্ডে মেরেকে বলেছিলেন যে কর্তাকে দিয়ে কথা তুলবেন কি না। কিন্তু মেরে তাতে এত রাগ করে যে তিনি আর কিছু বলার সাহস পান নি, কে জানে। আজকালকার ছেলে-মেরে। কি যে ভাল কি যে মন্দ কিছুই বোকা বার না, তার ওপর মেরে স্বাধীন—নিজের তাতে আছে। মাস গেলে সংসারে পরিত্রাশি টাকা ধরে দেয়, কর্তা প্রথমে ঘোরতর আপত্তি করেছিলেন, পরে তা টেকেনি, তাঁরই বা এমন কি আর? সওদাগর অকিসের কেরানী, প্রথম দুই মেরের বিয়ের দেনা এখনো শোধ হয়নি। জামাই দুটিই রেলের চাকুরে, কোলকাতার বাইরে থাকে, সে মেরে ছটির রং আর একটু ফর্সা ছিল, কিন্তু সন্ধ্যার রং প্রায় বাপেরই মত। যদি মেরেটার একটা রিলে হয়—কর্তা-গিন্নী ভাবেন, অশান্ত তো পাত্র হিসাবে স্পঞ্জই!

সারা দিন ধরে রাত্রির আয়োজন চলে বোসবাড়ীতে, বোস-গিন্নী অবশ্য বলেছিলেন—ঝোল-ভাত, কিন্তু আয়োজন হোল মোগলাই খানদানী ব্যাপার। অশান্ত খেতে ব'সে অবাক হয়েছিল। এত কেন মামীমা?

এ তো সামান্য বাছা—বোস-গিন্নী বলেন।

খাওয়া শেষ হ'লে অশান্ত তিনতলার ছোট ঘরটার ব'সে থাকে। সন্ধ্যার ঘর, এই ঘরেই চাঁদের আসর বসে, আজই হয়তো শেষ

দেখা তোমাদের সংগে সন্ধ্যা—বিলত বাবার আগে অশান্ত বলে। ধূপছায়া রং-এর শাড়ী পরে সন্ধ্যা একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকে। ক্ষয়র কোণে বজ্রনীপঙ্কজ গুচ্ছ—তার সৌরভে বাতাস ময়ূর, সন্ধ্যার কপালে কুমকুমের টিপ, চুল আলগা করে বাঁধা, অশান্ত কথাটুকু বলার পর সন্ধ্যাকে দেখে, এই কি সেই সন্ধ্যা—বাকে সে প্রতি শনিবারে দেখে?

আজ কেন অশান্ত, তোমার তো জাহাজ ছাড়বে জুলাই-এর শেষে, এখনো তো তিন সপ্তাহ হাতে, তোমার কি অনেক কাজ?

তারিখ বদলে গেছে সন্ধ্যা, ২১ তারিখের 'কারগো' ছাড়বে আরো দেড়তে, ৮ তারিখে একটা 'কারগো' আছে—সেটার বেতে পারি। ইণ্ডিয়া স্টীম সীপকে লিখে বিলম্ব আট তারিখেই বাব। ওরা ভাতো বাজি আছে। এতে প্যাসেঞ্জার ছিল না।

সন্ধ্যার হু'চোখ জলে ভরে আসে। এ তো তার জানাই ছিল যে অশান্ত চলে যাবে—আজ না হয় কাল, তবু কিসের প্রত্যাশা 'তার'? অশান্তকে কি সে বখেট জানে না? যে কথা শোনবার স্তম্ভ সে আকুল আগ্রহে প্রতিটি শনিবার বসে থাকে অশান্ত তা কোন দিনও বলবে না, অথচ আজ তার শেষ সুযোগ। আজকে স্বীকৃতি না পেলে ও কোন দিনই পাবে না। শাড়ীর আঁচল দিয়ে সে চোখের জল মোছে।

তোমার চোখে জল কেন সন্ধ্যা?—অশান্ত প্রশ্ন করে।

তুমি কি বোক না অশান্ত!—অশান্তর হাত দুটো সন্ধ্যা হু'হাত দিয়ে ধরে, তারপর টেবিলে মাথা রাখে। ওর সারাটা দেহ ফুল গুঁঠে বায়ে বায়ে, যেন বৃষ্টি সেও খান-খান হয়ে গেছে।

হু'হাত ভরে অশান্ত ওর মুখটা তোলে, চোখের জলে কুমকুমের দেখা হুছে গেছে, বুকের আঁচল পড়েছে খসে। অশান্ত হঠাৎ সন্ধ্যার বনিষ্ঠ সম্পর্কে আসে।

এ তুমি কি করলে অশান্ত?—সন্ধ্যা অসুস্থ হয়ে বলে। অশান্ত জবাব দেয় না—মনে হয় সে বুঝি ভুলই করেছে, কিন্তু ভুল কি? কি এমন দোষ! সন্ধ্যার দিকে সে তাকায় আবার। সে চাহনি কিসের, সন্ধ্যা বোঝে না। সদর দরজার দিকে অশান্ত অগ্রসর হয়। আর একটু বসে অশান্ত, এখনো বেশী রাত হয়নি, আর একটু বসে।

না সন্ধ্যা, আজ বাই। আবার আসবো বাবার আগে। সেদিন না হয় বসবো।

সালামামীমার সংগে আর দেখা করার সময় নেই, জাহাজের তারিখ এগিয়ে আসায় কোটালপুকুর বাঙরা হোল না। গেলে দু'দিন থাকতেই হবে, অন্ততঃ একদিন। তার আর সময় নেই।

আজ দেখা করতে হবে মামের সংগে। মাকে অশান্ত বারো বছর আগে রেখে এসেছে কেওড়াতলার শ্রমশানে। দক্ষিণ দিকের চিত্তার, মার সংগে দেখা করতে হবে অশান্তর। শ্রমশান ওর ভাল লাগে না—মনে হয় কেমন যেন নোংরা। লোক বলে শ্রমশান পবিত্র, হয়তো হবে।

তবু মামের কথা মনে হোলোই মনে হয়, মা আছে সেখানে। যেখানে ও একদিন অনেক জনের সংগে মাকে নিয়ে গিয়েছিল হরিদ্বনি দিয়ে। একটু আস্তে আস্তে তোমরা হরিদ্বনি দাও ন

কেন মেজদা—ওর পাশে ওর মেজদা' বাড়িলো, ও তাকে বুল।
এঁদের একটু আস্তে চলতে বলো মেজদা'।

বাড়ী থেকে অশান-বাট খুব দূরে নয়, অশান্ত একটুও কাঁদেনি।
কেন কাঁদবে সে? তার মামার বাড়ীর অনেক পরমা, মা মাহুব
হয়েছিলেন বন্ধে, বিলাসিতার মধ্যে। বাবা বাউতুলে বৈরাগীর মত,
তাই মা'র কোন আশাই পূর্ণ হয়নি। মামাতো ভাইয়েরা সাহেবী
বুলে গেছে, মা'র ইচ্ছে ছিল ওরা বার। কিন্তু পরমা কোথায়?
আনিমিয়ার মা মারা গেলেন—অশান্তর মনে হয়, বোধ হয় তাঁর
ভাল চিকিৎসা হয়নি। তাই অশান্ত সেদিন একটুও কাঁদেনি,
বুক-কাটা কাঁদলো ওর বড়দা, ওর চেয়ে বারো বছরের বড় সে।

চিত্তা সাজাচ্ছিল কারা, ওর মনে পড়ে না। মা'র পায়ে মাথা
য়েখে ও বসেছিল, আলতা-রাঙা পা, আনিমিয়ার সাধা পা। চিত্তার
তোলার আগে সেই পায়ে চুঁ খেয়েছিল ও। ওকে সরিয়ে নিয়ে
বাও কাছা—মড়ার অত বাঁধুনী ভাল নয়। কে বেন বলেছিল,
অশান্ত মুখ তুলে দেখে, গেরুয়া-পরা এক অশানচারিণী। মেজদা'
ওকে সরিয়ে নিল মার কাছ থেকে। ওঠ হোট খোকা, মা তো
বাড়ী গেছে।—টোটা মেজদার ভেঙে গেল, মুখটা অভদিক নিয়ে
বিকৃতভাবে মেজদা' বলেছিল, তুই কি একটুও কাঁদবিনে হোট খোকা?

কেন কাঁদবে অশান্ত? মা যে তাকে কত সাধ-আজ্ঞাদের কথা
বলেছে তা ওই জানে। মার কোন আশাই পূর্ণ হয় নি। তুই বড়
হয়ে বিলেত বাবি হোটখোকা—দাদার ছেলেরা সাহেব-ই বুলে বার,
আমার হোটখোকা বিলেত বাবে, তারপর সে বখন কিরে আসবে মন্ত
বড় লোক হয়ে তার মার কাছে তখন? তুই কি হবি রে হোট
খোকা?

দক্ষিণ দিকের চিত্তার সামনে অশান্ত কাঁড়িয়ে। বারো বছর পর
চিত্তা অলছে না নেবা। আকাশ ঘনবটা করে এসেছে, দূরের হুটো
চিত্তা অলছে, ধু ধু করে। তোমার কাছে ছুটি নিতে এলুম মা,
অশান্ত অকুণ্ঠভাবে বলে, কাল তোমার হোট খোকা বিলেত বাবে।
তুবি বলেছিলে হোট খোকা তুই বিলেত বাবি, দাদার ছেলেরা সাহেব
ই বুলে বার, আমার হোট খোকা বিলেত বাবে একদিন। যেদিন
তোমার এখানে রেখে গেছি সেদিন আমি কাঁদিনি, কিন্তু আজ যে মা
পারছি না। হু চোখ বেয়ে দর-দর ধারে জল নেমে এলো, মুখ বুক
জেসে গেল। তোমার হোট খোকা আমার বখন কিরে আসবে তখন
কার কাছে আসবে মা?

অশানবাটে এমন করে একলা কাঁড়িয়ে চোখের জল কেলছিল
বাছা। অকল্যাণ হবে। অশান্ত বাড়ি কিরিয়ে দেখলো সেই
অশানচারিণী বাকে ও বারো বছর আগে দেখেছিল। গেরুয়াপরা
গলার রক্তাক্ত। আশ্চর্য। তার চেহারার একটু পরিবর্তন হয়নি।
চোখের জল মোছে অশান্ত। বাইরে বেরোর, নতুন বাড়ী আসছে,
শব্দবাহীর সঙ্গে। এও এক বাড়ী।

হাওড়া ঠেপনে গাড়ী ছেড়ে দেবার পরেও অশান্তর উত্তেজনা
আসে না বিলাত রাজ্যের, খুব বেশী লোক আসেনি ওকে তুলে দিতে।
বড়দা আর বড় মৌকি এসেছিলেন কোরপার থেকে, বড়দা সেখানেই
থাকেন। মা বাবার পরে কোলকাতার সঙ্গার খান খান হয়ে বার।
মেজদা' জলপাইগড়ি, সে চা বাগানের চাকুরে, তার আসা হয়নি।

সেজমাসীর সঙ্গে লীলা এসেছিল, এক বার গিরীশের কড়াপাক সম্বোধন
নিয়ে। সন্ধ্যা আসেনি। তার আসার কথাও ছিলো না, অশান্ত
অবশ্য তার কথামত আর একদিন ওদের বাড়ী গিয়েছিল। কিন্তু
সে বাওয়ার বিশেষ কোনও মানে ছিল না। সন্ধ্যার সঙ্গে একান্তে
ও দেখা করেনি। সন্ধ্যার মা, মেয়ের সঙ্গে একা থাকার সুযোগ
ওকে দিয়েছিলেন কিন্তু অশান্ত তা গ্রহণ করেনি। ও জানে সন্ধ্যাকে
ও কোন কথাই দিতে পারবে না, ওর নিজের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত,
কেন মিথ্যে আর একটা মেয়েকে এই অনিশ্চয়তার সঙ্গে
জড়ান? শেষ দিনের ঘটনা যে কেন হ'রে গেল ও ঠিক জানে
না, অশান্ত যে তার সঙ্গে একা দেখা করতে চায় না সন্ধ্যা তা
বোকে, তাই প্রথমে ও জান চোখে তাকিয়ে রইলো অশান্তর
দিকে, এই তার অশান্ত! বাকে সে চিরদিন ভালবেসেছে এই
তার স্ত্রী? তারপর হেসেছে মর্ম-বৈধা বিজ্ঞের হাসি।

কুমমট আসিত রায় অবাক করেছিল। এ যেস ছেড়ে দিছি
অশান্ত বাবু।

সে কী মশায়, যেস তো আমাদের ভালই। ছাড়বেন কেন?

বার-তার সঙ্গে তো থাকা চলে না অশান্ত বাবু। কে
আসবে এ ঘরে কে জানে। তার চেয়ে কোন জায়গায় সীংগল বেড়ে
চলে বাব—

আর অবাক করেছে টোটকাটা অতুল নিরোগী, এ
ক'দিন চুপচাপই ছিল, হঠাৎ হাওড়া ঠেপনে হাজির, হাতে
একগুচ্ছ রজনীগন্ধা। বেশ কয়েক ডজন হবে। আপনি মশায় ভাবুক
লোক, সয়েল তুল করে পড়েছেন। এই আপনার উপযোগী।
অশান্ত অভিভূত হ'য়েছিল।

কার্ট' ক্লাসের বাড়ী, জীবনে এই প্রথম কার্ট' ক্লাস-এ বাচ্ছে ও।
সেকেণ্ড ক্লাসের বার্থ রিজার্ভ করার সময় ছিলো না, সব রিজার্ভ হয়ে
গেছে, তাই বাধ্য হয়ে কার্ট' ক্লাসে আসা, চিরকাল একশ' এগারোয়
চড়েছে অশান্ত—কদাচ নেড়ী ক্লাশ মানে ইনটারে। সে তো
ছেলেবেলার কথা। এতগুলো পরমা খরচ করতে হাত কবর
করছিল, কী আর করে? বিলেত বাচ্ছে। লীলা ওকে জড়িয়ে
ধবে কাঁদলো। আবার কবে আসবে মতুনদা'? কতদিন পরে—

আসবে যে তাড়াতাড়িই, ভাবিসনে।

গাড়ী ছাড়ার কিছু পরেও সহবাত্রী-বাত্রিণীদের ভাল করে দেখে।
আপার বার্থে এক ভয়লোক—বাঙালীই হবে। বয়স প্রায় পঞ্চাশ।
চুলের রং তাম্রাটে, গৌরবের রংও তাই, সামনের বার্থে এ্যাংলো
ইণ্ডিয়ান-ম্পতি,

'কতদূর বাওয়া হবে আপনার'—আপার বার্থের ভয়লোকটি
আপ্যায়িত করার চেষ্টা করেন।

ওয়ালটেরর—অশান্ত বলে।

ওয়ালটেরর তো আমিও বাছি। তা চেজ বুঝি? বেশ তো
মাল নিয়েছেন ভারি ভারি। অথচ বেড়ি নেই!

অশান্তর রাগ হোল। গারে পড়ে ভাব করা, আবার
অবাচিত মতামত দেওয়া। ও বতাব অল্পবায়ী জবাব দিলো না।
স্ট্রাকেলের গারে তখনও জাহাজ কোম্পানীর লেবেল মারেনি
ও, তাই ওপরভলার বাবুটি বুঝলো না ও বিলাতবাত্রী।
একটু বাত হলে বাবুটি বোধ হয় জলবোগ করলেন কিছু তার পর

নীচে নেমে এগে ওর সীটের এক প্রান্তে বসে বোতল খুলে কী যেন খোলেন, বোধ হয় মদ বেশ কয়েক পাত্র খেয়ে একটা মোটা বর্ষা চুপট ধরালেন। তার পর অশান্ত বসলেন, বসতে পারি একটু? অশান্ত তো অশান্ত! ভ্রমলোক তো ওর সীটে বসেই আছেন। আবার জিজ্ঞেস করা কেন এত পরে?

ও বললে, হাঁ নিশ্চয়ই, তা ওয়াসটেরে কোথায় উঠবেন, ঠিক করেছেন কিছু? ভ্রমলোকটি প্রশ্ন করে,

হোটেল বোগাড় করে নেব'খন—অশান্ত বলে।

ও বললে, হোটেল মেল না মশাই এখন ওয়াসটেরে। আমি অনেক বার যাতায়াত করছি—ওয়াসটের আমার নখদর্পণে। আপনি জিমি সাহেবের হোটেলে চেষ্টা করতে পারেন। আমার ব্যবস্থা করা আছে। হোটেল ভালই, চার্জ একটু বেশী হবে। ভ্রমলোকের নেশা হয়েছে বলে মনে হয় না। তবে একটু বেচাল হয়তো হবেন। তা মশাই তখন তো বললেন না কি কাজে যাচ্ছেন? আমি? আমি রবার্ট কোম্পানীর সেল-এর লোক। হরিনারায়ণ মিস্ত্রির। আমাকে তো হরম তেলের দেশে যেতে হয়, একলা পথ—কথা না বলে সুখ নেই। কই আপনার নাম তো বললেন না?

আমার নাম অশান্ত মিত্র। অশান্ত বলে।

আরে ভাদ্রা, আপনি মিস্ত্রি? কোথাকার বলুন তো? বি, এন, আব-এ কত বার ওয়াসটের গেছি। তা এই প্রথম মিস্ত্রির সঙ্গে সাক্ষাৎ। তা ওয়াসটেরে?

আমি ভিজগাপটম থেকে বিলেত যাচ্ছি আট তারিখে, তাই ওয়াসটেরে যাচ্ছি—

আ—হ্যাঁ? তাই এত ফুলের বটা। আমি ভাবি বরষাত্রী ছাড়া একা বর—না কবি সর্দনা? বড় খুশী হলাম। তা যদি একটু আগে জানতাম একা ড্রিক করতাম না। একে ডবল টি মার্কা কয়েত—আর এক ডবল টি মার্কা কয়েতের সঙ্গে দেখা, তার ওপর বিলেত যাত্রী, আপনাকে না হয় এক চুমুক।

আজ্ঞে আমার ওসব চলে না—অশান্ত বলে।

বড় ভাল ভাদ্রা এ জিনিষ, না খেলে বোকা যায় না, তবে আমার বড় দোষ, কয়েক টোক বেশী পেটে পড়লে বাজে বকি। আমি কি এখন বাজে বকছি? মোটেই না। বুঝলেন ভাদ্রা—আমাদের মনের মধ্যে একটা দরজা আছে, যেটা আমরা বন্ধ করে রাখি—এই কয়েক পাত্র পেটে পড়লে সে দরজা খুলে যায়—তখন রেলগাড়ী মোটর ইঞ্জিনের—হেলিকপটার অবধি চলে যায় সে দরজা দিয়ে, এই দরজা পেরিয়ে আর একটা দরজা আছে, সে দরজা—খাক ভাদ্রা।

রবার্ট কোম্পানী কি কোম্পানী অশান্তর জানা নেই, তবে নাম শুনে মনে হয় বিলিভী কোম্পানী। ভ্রমলোক নিশ্চয় মোটা মাইনে পান—নরতো কার্ট্রাশে যাচ্ছেন, আবার পানদোবও আছে। ওর মনের ভেতরের দরজার খবর অশান্ত জানে না, তবে ওর পরিচয়ের অগৎ বড় হয়েছে ও জানে, কোথা থেকে কত কি আসছে, কত আসবে বড় উড়ে বাওয়া পাত, কোনটা হয়তো বাদামী হয়ে গেছে বেনারস, কেউ বা কুঁকড়ে গেছে অকালে। আবার কোন কিশোর প্রাণোন্মাদনার উবেল।

তবে পড়ুন ভাদ্রা, ওপর থেকে মিস্ত্রির মশাই বলেন, অনেক দূরে যেতে হবে। আমিও বাব একদিন—অনেক দূরে। বিলেত নয়—বিলেত পেরিয়ে—জল-জ গল মাটি পেরিয়ে অনেক দূরে, অ-নে-ক-দূরে। হরিনারায়ণ মিস্ত্রির বোধ হয় নেশা জমে আসছে, অশান্ত একটু ভয় পায়, তার পর ওরে পড়ে।

ওয়াসটেরে হোটেল খোঁজা সত্যি ঝামেলা, এক রাতের তো মাথলা—তাও মিললো না, জিমি সাহেবের হোটেল বিশেষ বড় নয়, সেখানে মিস্ত্রির মশাই-এর ব্যবস্থা ছিল—অশান্তর আরগা হোল না। জিমি সাহেব কালো কুচকুচে—হাবসীও হার মান রং-এর জেজায়, মিস্ত্রির মশাই কিছু হাল ছাড়লেন না। চলুন মশাই নব্য-বংগে আপনাকে নিয়ে যাই, বাতালী মেস, দু'জনেই ওঠা বাবে সেখানে, সাইকেল-রিজা করে দু'জনে রওনা হয় নব্য-বংগ মেসে, অশান্তর মাল অনেক, মিস্ত্রির মশাই-এর মাল নেই বলতে গেলে, সদর রাস্তা পেরিয়ে বিজি বাজার তার পরে স্ক গলি, সাইকেল-রিজা চলে না সেখানে। মিস্ত্রির মশাই তেলের ভাষার কি যেন বললেন—সাইকেল-রিজার চালক গাড়ী থেকে নেমে হাতে ঠেলে চললো। একটু এগিয়েই নব্য-বংগ-মেস।

কেরোসিন কাঠের ওপরে সাদা বং দিয়ে লেখা, 'নব্য-বংগ-মেস'। বাতালীদের জন্ত, প্রো: জীগোপালকৃষ্ণ সাহা, দোতলার জানলা থেকে একটি মুখ দেখা গেল, তার পর সাদর আপ্যায়ন, আহ্নন আহ্নন মিস্ত্রির মশাই, অনেক দিন পরে এঁা।

তোমার সৈরিক্রীকে পাঠিয়ে দাও হে সাহা, ছুটো বেড চাই আজকের মত—আছে তো?

আপনার জন্ত সদা-সর্বদা অধিনেয় ব্যবস্থা। নিচ্ছি আমি সৈরিক্রীকে পাঠিয়ে, সৈরিক্রী এলো তেলের কি, কুচকুচে কালো রঙ জিমি সাহেবেরই মতন, আট-সাত চেহারা—অল্পে মাল তুলে নিয়ে এল।

বুপসী বাড়ী, অশান্ত তো অনেক দিনই মেসে কাটিয়েছে, কোলকাতার, বীবেশ বাবু মেস—মামুলীই। নব্য-বংগের তুলনায় তাকে রাজকীয় মনে হোল, অশান্তর বেড ছিল তিনতলার দক্ষিণ খোলা জানলার সামনে, আলো-হাওয়া ছিল, এখানে যেন রাজ্যের অন্ধকার বাসা বেঁধেছে—তার ওপরে জুলাই-এর অসহ গরম। মিস্ত্রির মশাই-এর দক্ষিণে অশান্ত মুক্ত হয়েছিল, জিমি সাহেবের হোটেলের চেয়ে শতাংশে ভাল। ওর জন্ত ভ্রমলোক কষ্ট নিলেন, মিস্ত্রির মশাই একটু পরে এসে বললেন—বান নীচে ইঁদারার জলে চান করে আহ্নন, একটু আরাম পাবেন।

বাড়ীর পেছনে রাস্তাঘর—তার লাগাও ইঁদার। সাবান-তোয়ালে-হাতে অশান্ত রান্নার জন্ত আসে, কুয়োভলার আবার সৈরিক্রীর সঙ্গে দেখা। একজন বাবুর সঙ্গে মসকরা হ'চ্ছে তেলের ভাষায়, বাবুটিও রান্না এসেছেন।

আজ এলেন বুঝি? তার পর—ডকেই তো। কবে থেকে লাগবেন? বাবুটি বললেন।

আজ্ঞে আজই সন্ধ্যা ঐনে এসেছি, তবে তকে তো কিছু হয়নি। অশান্ত বলে।

ও হয়নি, তা ভাববেন না। সুরেশ সরকারের হেফসেওসনে

টুর্ক কতো লোক কাজ পেয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। আপনারও হ'রে বাবে, তেলেন্ড-পটীতে হুশা বাঙালী আছি মশাই, বিদেশে বাঙালীকে যদি বাঙালী না করে ?

আজ্ঞে আমি কালই চলে বাব—অশান্ত ভ্রমলোকের কথা শেষ হবার আগেই বলে।

সে কী মশাই, এই তো সব এলেন এখন দু'দিন গোশাস বাবুর মেসের ভাত খান, ওরালটেরের শোভা দেখুন তার পর তেলেন্ড মেয়ে—মাইরী কাঠ' ক্লাপ, আপনার ইদিক-সিদিক হয়তো ?

আজ্ঞে আমার এসব miss করবার একটু ইচ্ছে নেই, কালকের জাহাজেই আমি বিলেত যাচ্ছি। 'sorry'

বিলেত ? আরে মশায় তাহলে তো ফিট্রি দিতে হবে। থাক চান করা। দেখি মোচলমান পাড়ায় মুগী আছে কিনা ?

সুরেশ বাবু তড়িৎ বেগে উঠাও হলেন, রাজে ফিট্রি হোল—দৈবিকীর রাগা মুগীর বোল তিলতেল দিয়ে রাগা। অশান্তর মনে হোল—করোসিন তেলের গন্ধ। মিত্তির মশাই বেরিয়েছেন কোথায়, তবে আর দু'চার জনের সঙ্গে আলোচন হোল—তার মধ্যে হিতেন তাহুড়ীকে ওর মনে থাকবে, অন্ন-বরনী ছেলে, ভাগা-ভাগা চোখ, ভাতে অনেক বগ্ন, অশান্তর সঙ্গে কিছু রজনীগন্ধা ছিল অভুল নিরোগীর দেওয়া, তাই দেখে ও খুব খুসী।

কতো দিন রজনীগন্ধা দেখেনি অশান্ত বাবু, আহা—বড় ভাল এ ফুল।

এটা আমি বাবার আগে আপনাকে দিয়ে বাব—আর আপনাদের পাঁচজনকেও এক বাস্ক কড়াপাক সন্দেশ। আমি মিষ্ট্রি খুব ভক্ত নই, আর এখানে তো ওটা পাওয়া যায় না—আপনারা বোধ হয়—

না না না—তা কি করে হয়, আপনার মিষ্ট্রি—কেউ কেউ প্রতিবাদ করলেন।

দাদাকে বেশ ছাড়ার আগে আর হুঃখ দিও না, উনি ভালবেসে দিচ্চেন। নিরুই নাও হে—কেউ কেউ বললেন।

পরদিন দুপুরের দিকে হিতেন হঠাৎ ওর ঘরে এলো। অশান্ত সকালবেলার ওকে রজনীগন্ধার গুচ্ছ দিয়ে এসেছিল। দুপুরে তার ডকের চাকরীতে বাবার কথা, কিন্তু আজ আর সে কাজে যায় মি।

আপনার কাছে কি শুধু শুধুই রজনীগন্ধা নেব, তার বললে আপনি এই ক্যালেন্ডারটা রাখুন, এতে আমাদের দেশের ছটা খুব ছবি আছে—হু' মাস করে এক এক পাঠ্য—ও বলে।

থাক আপনার ক্যালেন্ডার হিতেন বাবু, আমি আপনাকে রজনীগন্ধা দিলাম বলেই যে কিছু নিতে হবে তার কোনও মানে নেই, আর তা ছাড়া ফুল তো আমার শুকিয়ে এসেছে।

এটা আপনাকে নিতেই হবে, এই দেখুন এতে আমার নাম

লিখে দিয়েছি, হয়তো তাহ'লে আমাকে মনে থাকবে, ক্যালেন্ডারের একটা ঝড় চলে গেছে—গ্রীষ্ম, বাকি আছে আরো পাঁচ, বসন্ত সব শেষে, বসন্তে অনেক আশা মুকুলিত হয়, অনেক মরে যাওয়া গাছে পাতা গজায়—আবার বসন্ত একদিন আসবেই, সেদিন আমিও বাব আপনার মত।

নিশ্চয় আপনার যাওয়া হবে, আমার যাওয়া খুব সোজা পথে হয়নি হিতেন বাবু। আপনি বিবাস রাখুন আর চেষ্টা করুন।

'কারগো' জাহাজ। মাল বোঝাই হবে এ বন্দরে। খালাস হবে অল্প বন্দরে, যে ঘাটে খামবে সে ঘাটে সওদা হবে, পণ্যের অয়ের—অন্তরঃ কতো রকম সওদা হয় খুঁচরো পাইকারী কত রকম দেওয়-নেওয়ার খেলা খেলে বন্দর, জাহাজ এস খামলে নাবিকরা মাটি চায়, মাটির বাসা চায়, মাটির বাসার স্বাদ চায়, মাহুধীর দেখে, মনে, রক্তে, রক্তের স্বাক্ষর সে রেখে যায়—রক্তের স্বাক্ষর সে নিয়েও যায়, সওদাগর নাবিক তার কত রকম সওদা।

সব খামেলা শেষ হয়েছে অশান্তর, কাঠমস-এর বেড়াঝাল হেলখ পারমিটের হাংগামা। মাল একে একে উঠেছে জাহাজে। এবারে তাহ'লে সে যাচ্ছে। নোডর তোলা হ'য়ে গেছে, জাহাজের একমাত্র প্যাসেঞ্জার বলে ওর নাম মিঃ প্যাসেঞ্জার।

অনেক অনেক দিন আগে একজন বগ্ন দেখতো এক বীপের, ছায়াঘন পল্লব দেবদাক পাইন নারিকেলের হিলোল নেই সেখানে—তারার আবহা আলোর ইসারা নেই সেখানে—তবু সে বগ্ন, হিতেন তাহুড়ী বোধ হয় আজ তার বগ্ন দেখে, সেই বীপ তো আর বেনী দূরে নয় ? তবে কেন ভীড় করে আসছে এরা চোখের সামনে ? সন্ধ্যা বোসের রান-বুথ আর বিজ্ঞপ-মাধান হাসি, তাতে অপমান মাধান, সীলার জল-তরা চোখ, অভুল নিরোগীর হাতোজল বুথ, মিত্তির মশাই-এর নেশার ছড়ান চাহনি—আর এ্যানিমিয়ার সাদা মার মরা বুথ।

দমকা বাতাস আসছে বঙ্গোপসাগর থেকে, হিতেন তাহুড়ীর ক্যালেন্ডারের পাতা উড়ে যাচ্ছে—বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ; শীত হুর্জর শীত বেথানে—বেথানে অশান্ত যাচ্ছে, ওর পাথের একটা অনার্স ডিগ্রী আর কিছু পাউণ্ড, এই নিয়ে ওকে লড়াই করতে হবে—শীতের সঙ্গে, যে শীত থাকবে, বত দিন না ওর সুরাহা হয়—একটা কাজ যোগাড় হয়।

আসবে বসন্ত, শীতের পরেই তো তার পালা, এবারও বসন্ত আনবে—স্বাই-লাভ আর ড্যাফোডীল, এবারওর সন্ধ্যা রতীন হবে লাভ-ইন-হি-মিষ্ট্রি স্বাভিত্তে কর্ণাওয়ারের পাণ্ডীতে, প্রিয় রোমের দাক্ষিণ্য আর হামামীনখের বিলাসে।

নতুন ডায়েরীর পাতা আরম্ভ করে অশান্ত, প্রথম লাইন দেখে, আজ সোমবার ৮ই জুলাই, বাক্সা সফ হয়েছে।

[বিজ্ঞাপনদাতাদের পত্র দেওয়ার সময় মাসিক বসুমতীর উল্লেখ করবেন]



[Osamu Dazai's "THE SETTING SUN"-এর অনুবাদ]

চতুর্থ অধ্যায়

পত্রাবলী

চিঠি লেখা উচিত হবে কিনা এ বিষয়ে কিছুতেই মনস্থির করে উঠতে পারছিলাম না। শেষ অবধি আজ সকালে সপ্তের স্নায় বিচক্ষণ ও কপোতের স্নায় নিরীহ বীণের এই বাণী পড়ে বুকে জোর পেলাম, চিঠি লেখাই শেষ করলাম।

নাওজির বোন আমি। আমার কথা যদি তুলে গিয়ে থাকেন, তবে দয়া করে মনে করবার চেষ্টা করবেন।

নাওজি আবার বেয়াদাপনা আরম্ভ করেছে এক আপনাকে উত্থাপ্ত করছে এজ্ঞ হুম্মিত। (বাস্তবিক তার ব্যাপার সেই বুঝ আমার পক্ষে আগু বেড়ে তার হয়ে মাপ চাইতে বাওয়া অসম্ভব)।

আজ নাওজির জন্ম নয়, নিজের জন্ম আপনার কাছ থেকে কিছু ডিঙ্কা করব। তার মুখে শুনেছি আপনার পুরনো বাড়ী যুদ্ধের সময় নষ্ট হয়ে গেছে বলে আপনারা নতুন ঠিকানায় উঠে গেছেন। ভেবেছিলাম সেখানে গিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করব। বাড়ীটা বোধ হয় টোকিওর আশে-পাশে কোন সুরক্ষিত স্থানে; কিন্তু সম্প্রতি মারের শরীর ভাল হচ্ছে না, তাঁকে একা কলে অত দূর বাওয়া চলে না, সেইজন্যই চিঠি লেখা।

আপনার সঙ্গে একটি বিষয়ে পরামর্শ করতে চাই। আমার আলোচ্য বিষয়টি যুবতী নারীর সাধারণ শালীনতার পর্যায়ে তো পড়েই না, বরং উশে গুরুতর অপরাধ বলা যেতে পারে কিন্তু আমি, না, আমরা আর এ অবস্থায় থাকতে পারি না। সুতরাং যিনি আমার ভাই নাওজির চোখে এ ছন্যার শ্রেষ্ঠ মানুষ, তাঁর কাছে আমার অনুরোধ, অনুগ্রহ করে তিনি বোন আমার অত্যন্ত সহজ অনাড়ম্বর অনুভূতির কথা অনুধাবন পূর্বক অপরাধ দিয়ে বাধিত করেন।

আমার বর্তমান জীবন অসহ। পছন্দ অপছন্দের প্রশ্ন নয়, আমাদের (মা, নাওজি ও আমি) এই ভাবে আর বেঁচে থাকা অসম্ভব।

গত কাল শরীরে অসহ এক যাতনা অনুভব করলাম। তার সঙ্গে জ্বরও ছিল; নিশ্বাসের কষ্টে কি করি ভেবে পেলাম না, দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর চাবী-মেয়ে ভিজতে ভিজতে এক বোঝা চাল পিঠে নিয়ে এল। যে কাপড়গুলো তাকে দেব বলেছিলাম, দিয়ে দিলাম। খাবার ঘরে আমার সামনে বসে চা খেতে খেতে সোজানুজি সে আমায় প্রশ্ন করল—এভাবে নিজেদের জিনিষ বেচে আর কদিন চলেবে?

আমি তার জবাবে বললাম—হু-মাস, বড় জোর বছরখানেক। তার পর ডানহাতে মুখখানা আড়াল করে বললাম—যুম! যুমে আমার হু'চোখ ভেঙ্গে আসছে।

তুমি অত্যন্ত ক্লান্ত। এ তোমার মনের অবসাদ।

হয়ত তোমার কথাই ঠিক। চোখে জল আসে-আসে, এই অবস্থায় উঠে দাঁড়াতে, দুটো কথা মনের মধ্যে গুমরে উঠল—‘কষ্টব’ এবং ‘কল্পনা’। বাস্তব সম্বন্ধে কোন ধারণাই আমার নেই। সম্ভবতঃ এই কারণেই বেঁচে থাকার আশঙ্কায় আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসে। মা প্রায় অর্থহীন—বিছানাতে কাটে তার বেশীর ভাগ সময়।

নাওজির মানসিক অন্তরের কথা আমাদের অজানা নেই। এখানে যতক্ষণ থাকে, স্থানীয় এক তাড়িখানায় কাটায়—আর দু’দিন অন্তর আমাদের কাপড়বেচা টাকায় স্তুতি করতে যার। কিন্তু হুঃ আমার সেজ্ঞ নয়। আমার ভর হয়, পাচা পাতা যেমন ঝরে না পড়ে, অনেক সময়ে গাছেই ঝুলে থাকে—তেমনি আমিও দৈনন্দিন জীবনের এই ক্লান্তির বোঝা টেনে টেনে অনন্তকাল বেঁচে থাকব। এ চিন্তা অসহ এবং এর হাত থেকে মুক্তি পাবার আশায়, আমি আজ যুবতী ভ্রমকন্য়ার যাবতীয় শালীনতা লঙ্ঘন করতে প্রস্তুত হয়েছি। এখন আপনার উপদেশের অপেক্ষা।

এবার আমি, আমার মা এবং নাওজির কাছে সব কথা খুলেই বলতে চাই। কিছুকাল যাবৎ এক ভ্রমলোকের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। এখন থেকে আমি তাঁকেই অবলম্বন করে বাঁচতে চাই। তাঁর নামের আশঙ্কর হু’টি এম, সি। হুঃ পেলেই তার কাছে ছুটে চলে যেতে ইচ্ছা করে এবং তার প্রেমে নিজেকে বিসর্জন দিতে বাসনা জাগে।

আপনার মতই এম, সি’র স্ত্রী ও একটি কন্যা আছে। তাঁকে দেখে মনে হয় আমার চেয়ে সুন্দরী, বহু রমণীর সম্পর্কে তিনি এসেছেন। তবু মনে হয়, তাঁকে না পেলে আমার পক্ষে বেঁচে থাকা শক্ত। ভ্রমলোকের স্ত্রীকে আমি দেখিনি, তবে শুনেছি তিনি

এবার কেলবার সম্মান

শেখ মোঃ বিল্লাহ

ইতল

পিলখার-প্রথম ক্যাপ

যুক্ত দেখে কিতবেত

এম. এল, বঙ্গু যোগ্য কোং প্রাইভেট লিঃ কলিকাতা-১

চমৎকার মহিলা। তাঁর কথা চিন্তা করলেই তাঁর তুলনার নিজেকে অত্যন্ত ছোট মনে হয়। আমার বর্তমান জীবন আরও ভয়াবহ। এম, সি'র কাছে আবেদন আমি করবই। কোন বিবেচনা আমার এ সম্বন্ধে বাধা দিতে পারবে না। সর্পের জায় বিচক্ষণ ও কপোতের জায় নিরীহ আমার এ প্রেম চরিতার্থ হবেই হবে। কিন্তু একটি কথা আমি স্থির জানি যে মা বা নাওজি কেউই আমায় সমর্থন করবে না। আপনার মতামত সম্বন্ধে সঠিক ধারণা আমার নেই। মোট কথা, নিজের কর্তব্য স্থির করে সেই ভাবে চলা ভিন্ন গতান্তর আমার নেই।

একথা ভেবে নিজের মনে কঁদে মরি। জীবনে এই প্রথম নিজের বলতে কিছু হবে, কিন্তু পারিপার্শ্বিক সকলের সমর্থনের অপেক্ষা রেখে এ কাজ করা অসম্ভব। আনাজেবাবা কঠিনতম সমস্যার সমাধান করতে যে পরিমাণ মানসিক একাগ্রতার প্রয়োজন, আমি আমার মনের সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে, সেই রকম একাগ্রচিত্তে আমার প্রণের উত্তর খুঁজছি। শেষ অবধি বুঝেছি একটি মাত্র জায়গায় সমস্ত ব্যাপারটার জট খুলে যায় এবং ভেদে শান্তি পেরেছি।

আমার পরমাস্পদ এম, সি কি বলেন? এই একমাত্র হৃদয়বিদারক প্রশ্ন। আমাকে আপনি 'স্বয়ংবরা পত্নী' অথবা 'স্বয়ংবরা প্রণয়িনী' নাম দিতে পারেন। এর পর এম, সি যদি বলেন তাঁর পক্ষে আমায় বরদাস্ত করা অসম্ভব তাহলে আমার বলার কিছু নেই। আপনার কাছে একটি অনুরোধ আছে। আপনি কি তাঁকে জিজ্ঞেস করতে পারেন? ছয় বৎসর আগে আমার মনে রামধনুর হাতা রং লেগেছিল। তার মধ্যে না ছিল প্রেম, না ছিল কাম। কিন্তু দিনে দিনে তার বণ্ড গভীরে মিশেছে, গাঢ় হয়েছে। আমার মন থেকে একবারও সে রং মুছে যায়নি। বৃষ্টি হয়ে যাবার পর আকাশে যে রামধনু, সে স্বভাষ কিন্তু মানুষের অন্তরের রং এত সহজে ধুয়ে যায় না। অল্পগ্রহ করে তাকে জিজ্ঞেস করবেন আমার সম্বন্ধে তাঁর কি ধারণা? হয়ত তিনি আমার বৃষ্টিবরা আকাশের রামধনু ভেবেছেন, এবং তা'কি এরই মধ্যে ধুয়ে মুছে নিঃশেষ হয়ে গেছে?

উত্তর প্রার্থনা করি।

উয়েহার জিরোর উদ্দেশে (আমার শেখব—এস, সি) লিখিত।

সম্প্রতি আমার ওজন বেড়েছে। নেহাৎ জংলীভাব কেটে গিয়ে নিজেকে মানুষের মত লাগে। এই গ্রীষ্মে আমি ডি, এইচ লরেন্স-এর একখানা মাত্র উপক্ৰাস পড়েছি।

আপনার কাছ থেকে কোন উত্তর না পেয়ে, আবার আমি চিঠি লিখতে বসেছি। আমার আগের দিনের চিঠিখানা অত্যন্ত অজ্ঞায় চক্রান্তে পরিপূর্ণ ছিল। বোধ হয় আপনি সমস্তই ধরে ফেলেছেন। হ্যাঁ—সে কথা সত্য। চিঠির ছত্রে ছত্রে আমি ধূর্তামি নিহিত করেছিলাম। বোধ হয় ভেবেছিলাম, আমার জীবন ধারণের জন্ম আপনার কাছ থেকে অর্থ সংস্থান করাই আমার উদ্দেশ্য। বাই হোক, মাপ করবেন, আপনাকে জানাতে চাই যে কেবল মুকুন্দের সন্ধানই যদি আমার লক্ষ্য হ'ত, তবে বিশেষ করে আপনার কথা মনে আসত না। এটুকু বিশ্বাস আছে যে, টাকাওয়ালা বহু বৃদ্ধ আমার ভার নিতে আপত্তি করবেন না। সত্যি বলতে, অল্প কিছুদিন হ'ল আমার কাছে এ ধরনের এক প্রস্তাব আসে। আপনি ভদ্রলোককে

চিনলেও চিনতে পারেন। বয়স হাটের ওপর। সম্ভবতঃ শিল্প প্রতিষ্ঠানের সভা এই মহাপুরুষ (!) আমাদের পাহাড় বেয়ে এসে আমার পাণিপ্ৰার্থনা করেন। আমরা নিশিকাতা ষ্ট্রীটের বাড়ীতে থাকতে—ইনি ছিলেন আমাদের প্রতিবেশী। পাড়ার উৎসবাদিতে মাঝে মাঝে দেখা হত। মনে পড়ে এক শরৎসন্ধ্যার গাড়ী করে এর বাড়ার সামনে দিয়ে মা আর আমি আসছিলাম, ভদ্রলোক অল্পমনস্ক হ'য়ে ফাটকের কাছে ঠাঁড়িয়েছিলেন। মা গাড়ীর ভেতর থেকে ঈষৎ মাথা হেলিয়ে নমস্কার করতেই হঠাৎ ভদ্রলোকের ফ্যাকাশে মুখের ওপর কে যেন আবোর ছড়িয়ে ছিল!

আমি ঠাটা করে বললাম,—মা, বোধ হয় একেই বলে প্রেম। ভদ্রলোক তোমার প্রেমে পড়েছেন।

শান্তস্বরে মা নিজের মনেই উত্তর দিলেন—না, উনি মস্ত লোক।

আমার বোধ হয় শিল্পীর প্রতি শ্রদ্ধা বস্তুটা আমাদের অস্থিমজ্জাগত।

ওয়ারদামামার পরিচিত রাজকুমার, এই চিত্রকর মায়ের কাছে আমার বিয়ের প্রস্তাব পাঠান। তিনি বেশ কিছুকাল বিপত্নীক রয়েছেন—এ তথ্যও জানাতে ভোলেন নি। মা বললেন—যা ভাল বোক, সেই মত সোজা ভদ্রলোককে জানিয়ে দাও। বিশেষ কিছু চিন্তা না করেই আমি লিখে দিলাম—বর্তমানে আমার আদৌ বিবাহে রুচি নেই।

মাকে জিজ্ঞেস করলাম—আমি আপত্তি করলে তোমার খারাপ লাগবে না তো?

এ রকম যোগাযোগ সম্ভব বলে আমার মনেই হয়নি। জাপানী আল্পস এ শিল্পীর কাছে এই মর্মে চিঠি গেল। আমার চিঠি পাঠাব আগে—দিনকয়েকের মধ্যে হঠাৎ ভদ্রলোক স্বয়ং এসে উপস্থিত।

তিনি খবর দিলেন 'ইজু' (Izu)তে গরম জলের স্বর্ণাঘর যাবার পথে একবার আমাদের সঙ্গে দেখা করে যেতে চান। শিল্পীদের যত বরংই হোক না কেন, এধরনের ছেলেমানুষীতে কখনও ক্লান্তি আসে না।

মা'র শরীফা ভাল খাচ্ছিল না, আমি নিজেই চীনাঘরে তাঁকে অভ্যর্থনা করলাম। চা চালাতে চালাতে বললাম,—এতক্ষণে প্রত্যাখ্যান বহন করে আমার চিঠি আপনার বাসায় পৌঁছে গেছে। আপনার প্রস্তাব সম্বন্ধে যথেষ্ট চিন্তা করে দেখলাম, এ অসম্ভব!

তাই নাকি? ভদ্রলোকের স্বরে অর্ধৈর্ষ্য। ঘাম মুছে বললেন—আশা করি, আপনি আর একবার বিবেচনা করে দেখবেন। হয়ত আমি—কেমন করে বলব জানি না—আপনাকে মানসিক আনন্দ দিতে পারব না। কিন্তু অল্প ভাবে বাস্তব জীবনে আপনাকে যথেষ্ট সুখী করার ক্ষমতা আমার আছে। এ বিষয়ে আমি আপনাকে নিঃসন্দেহ করতে পারি। আশা করি, আমার ভাষা অমার্জিত হয়নি।

আপনি যে সুখের কথা বলছেন তাঁর স্বরূপ আমার জানা নেই। খুঁটত মাপ করবেন, এক্ষেত্রে আমার একটিমাত্র উত্তরই জানা আছে—না ধর্মবাদ! নীৎসের (Nietzsche) ভাষায় বলতে গেলে আমার সেই জাতীয়া রমণীর পর্যায়ে ফেলা উচিত, সম্ভানের জননী হওয়াই যাদের একমাত্র কাম্য। আমি সন্তান চাই, সুখে আমার অকুচি। অর্থে আমার আসক্তি নেই, শুধু সন্তানকে মানুষ করার জন্ম

যেটুকু প্রয়োজন। অসিতে বিশ্বাসের ছোঁয়া লাগে। শিল্পী বলেন—
আপনি আমার অবাক করলেন দেখছি! প্রত্যেকে মনে মনে যা
চিন্তা করে, তা আপনি কেমন প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যক্ত করতে পারেন।
আপনার সঙ্গে জীবনটাকে বাঁধতে পারলে নতুন করে কাজে উদ্বীর্ণনা
পাওয়া যেতো।

সাক্ষান কথাগুলি আদৌ বুড়োমানুষের উক্তি বলে মনে হ'ল না।
হঠাৎ এটি ধারবাই হ'ল যে, এত বড় শিল্পীর মনে নতুন অন্তঃপ্রেরণা
জাগানো মত আমার মতো কিছু পদার্থ অবশিষ্ট থাকে, তাহলে সেটা
খানি সাধক। কিন্তু অনেক চেষ্টা করলেও নিজেকে বুদ্ধে বাতপাশে
আবদ্ধ অবস্থার কল্পনা করতে পারলাম না। মুহূর্তে স্টিগেন্স
করলাম—আমার দিক থেকে সম্পূর্ণ প্রেমের অভাব কি আপনার
সহ হবে?

গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলেন ভদ্রলোক—তাও বিশেষ কিছু এসে
যাবে না। নারীর অন্তরের কথা দেবতারও অজানা।

কিন্তু আমার মত নারী প্রেমহীন বিবাহের কল্পনাও করতে পারে
না। পূর্ণ বয়স আমার, আগামী বয়স ত্রিশ-এ পা দেব।

নিজের কথায় নিজেই চমকে উঠলাম। ত্রিশ! উনত্রিশ বয়স
বয়স অবধি নাবীসেই কুমারীসুলভ কোমলতাব কিছু অবশিষ্ট থাকে,
কিন্তু ত্রিশোর্ধ্ব নাবীসেই নিঃস্ব, রিক্ত। ফরাসী উপন্যাসে পড়া এই
কথাগুলি মরণ করে আমার মন অবসাদে এমন ভারাক্রান্ত হ'ল যে
কোন মতেই তাকে মন থেকে দূর করতে পারলাম না। বাইরে চোখ
ফেরালাম। বৌদ্ধধর্ম সমুদ্রের প্রথম ঔজ্জ্বল্য ভাঙ্গা কাচের টুকরোর
মত রিকমিক করছিল। মনে পড়ে গেল উপন্যাসে এট 'হু' লাইন
পড়তে গিয়ে; সত্যি ভেবে মনে মনে মায় দিয়েছিলাম। যে সময়ে
ত্রিশের কোটিয় মেয়েদের নৌকনেব সীমা টানতে পারতাম, সেই
দিনগুলির জগৎ বৃক্কের ভেতর ভ ভ করে উঠল। অবাক হয়ে ভারলাম
এই যে আমার নেকলেস, বেসলেট, দামী দামী পোশাকগুলো বেচে
দিছি, তাদের সঙ্গে সঙ্গে আমার যৌবনের মাধুরী নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছে
না তো? তাই যে ভয় জনয় মধ্যবয়সী রমণী! কিন্তু তবু মধ্যবয়সেও
নাবীসীবনে একমাত্র তারই অধিকার নয় কি? সম্প্রতি এটি ধারবাই
আমার হয়েছে। উনিশ বছর বয়সে আমার এক ইংরেজ শিক্ষয়িত্রী
দেশে ফেরার মুখে আমার সাবধান করে দিয়েছিলেন, কখনও প্রেমের
বাঁধনে নিজেকে জড়িও না। প্রেম তোমার সর্বনাশের মূল হবে।
বাঁধা যদি পড়তেই হয়, অনেক বয়সে, ত্রিশ পেরিয়ে প্রেম করো।

তার কথা নিঃশব্দে হৃদয় করেছিলাম, মন তা গ্রহণ করেনি।
সে সময়ে আমার পক্ষে ত্রিশোর্ধ্ব জীবনের কল্পনা করাও
কঠিন ছিল।

তিন্ত স্বরে শিল্পী হঠাৎ বলে উঠলেন শুনলাম আপনারা
বাড়ীটা বেচে দেবেন? কথাটা সত্যি?

আমি হেসে উঠলাম, মাপ করবেন, আমাদের চেরী বাগানটার
কথা এইমাত্র মনে হল। আপনি ওটা কিনবেন?

কুৎসিত ওষ্ঠপ্রান্ত কুঞ্চিত হ'ল, উত্তর দিলেন না ভদ্রলোক।
শিল্পী মানুষ, আমার কথার ইঙ্গিত ধরতে কষ্ট হয়নি।

বাড়ীখানা এক রাজকুমারকে বেচে দেবার কথা চম্ভছিল—
একথা সত্যি কিন্তু শেষ অবধি কিছুই করা হয়নি। এরই মধ্যে
শিল্পীর কানে পৌঁছে গেছে খবরটা জেনে অবাক হলাম।

কিন্তু সেই বুধকেন ঠীকে চেরী বাগানের ঠীকেদার লোপোখিন
এব সমগোত্রীয় মনে কবি, তখন ভদ্রলোকের মেজাজ বিগড়ে গেল।
এর পর কয়েক মিনিট এটা, ওটা বলে উঠে পড়লেন।

এই লোপোখিন পার্কের পুনরাবৃত্তি হোক, এ অনুরোধ আপনাকে
আমি করব না। সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিত হ'তে পারেন। কিন্তু দয়া
করে মধ্যবয়সী রমণীর অন্তরের ব্যাকুলতার কথা ক্ষণেক অবধান করুন।

প্রায় ছয় বৎসর পূর্বে আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়।
সে সময়ে আপনি আমার ভাই-এব গুরু, শুধু তাই নয়—অসামান্য
এক গুরু, এইমাত্র আপনার সহক্ষে আমার ধারণা ছিল। একত্রে
আমরা গেলান গেলান মন মেয়েছিলাম, এবং আপনার দিক থেকে
হুসাইনের পরিচয় পেয়েছিলাম। উজ্জ্বলের এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা
ভিন্ন আমার বিশেষ কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি হয়নি। আপনাকে আমার
ভালও লাগেনি, মন্দও লাগেনি—আসলে আমার তখন আবেগের
বাসাই মোটে ছিল না। পরে ভাইকে খুশি করতে আপনার কয়েকটি
উপস্থাস চেয়ে নিয়ে পড়েছিলাম, তার মধ্যে কয়েকটি ভালই লেগেছিল,
কয়েকটি লাগেনি। সত্যি বলতে আমি তেমন পড়ুয়া নই।
কিন্তু গত ছয় বৎসরের মধ্যে, ঠিক কোন সময় থেকে বলতে পারব না,
আপনার স্মৃতি আমার সমস্ত অন্তর কুয়াশাছন্ন করে রেখেছে এবং
সেবাত্র একতলা থেকে উঠে আসার সময়ে সিঁড়িতে যে ঘটনা
ঘটেছিল, পরিষ্কার সব আমার মানসক্ষে প্রতিকলিত হচ্ছে।
কেমন যেন মনে ভয় হয়, আমার ভাগ্যপটে ঐ ত্রাক্ষরহুতের দাম
অতুলনীয়। অন্তরের অন্তঃপুরে আপনার অভাব ফিরে ফিরে
বাজে। জানি না একে প্রেম বলে কিনা এবং তাইই সম্ভাবনার
নিজেকে এত নিঃসঙ্গ বোধ হয় যে আপন মনে কেঁদে আকুল
হই। ছুনিয়ার আর সব পুরুষের চেয়ে আপনি সম্পূর্ণ ভিন্ন।
“সাগর-বিতঙ্গ” (The sea gull) উপন্যাসের নায়িকা নীমার
মত উপন্যাসিকের মোহ আমার অভিভূত করতে পারেনা।
লেখকের প্রতি আমার আকর্ষণ কম। আমাকে বিহবী মহিলা
বা ঐ ধরনের কিছু মনে করলে ভুল হবে। আপনার কাছে
আমার একটি মাত্র ভিক্ষা আছে, আমি সন্তান চাই।

হয়ত বহুকাল আগে, যখন আমরা দুজনেই অবিবাহিত
ছিলাম, তখন সাক্ষাৎ হ'লে আমাদের বিয়ে হ'তে পারত। হয়ত
আমার আজকের এই আন্তরিক যাতনার তাত থেকে মুক্তি পেতে
পারতাম, কিন্তু এ-ও জানি যে আপনার সঙ্গে আমার কোন দিনই
বিবাহ হওয়া সম্ভব ছিল না। আপনার দ্রাব স্থান দখল করার
চিন্তা মাত্র বর্ধরতা। আমি আপনার রক্ষিতা হ'তে প্রস্তুত
আছি। (শব্দটি নিজের কাছেই অসহ। প্রেমিকা লিখতে গিয়ে
মনে হ'ল রক্ষিতা লিখলেই আমার মনের ভাব স্পষ্টই হয়; এবং
ব্যাপার পরিষ্কার হওয়াই বাঞ্ছনীয়) শুনাছি রক্ষিতার বরাত মন্দ।
লোকে বলে কাজ ফুরোলেই ছিন্ন কঙ্কার মত তাকে দূর করে
দেওয়া হয়। পুরুষ মানুষ সে যেমনই হোক বাটের কাছাকাছি
এলেই ঘরমুখী হয়। আমাকে নিশিকাতা ষ্ট্রীটের বুড়ো মালীর
সঙ্গে আমার নাসের আলোচনা শুনেছিলাম একদিন। তাদের
শেষ কথা হ'ল এই যে, মেয়েদের কোনরতেই ‘রক্ষিতা’ হওয়া
উচিত নয়। তারা অবশ্য বারবিত্তার কথা বলছিল, আমাদের
ব্যাপার সম্পূর্ণ ভিন্ন।

আমার বিশ্বাস, আপনার কাছে আপনার কাজই দুনিয়ার সবচেয়ে বড় জিনিষ এবং আমার যদি আপনার পছন্দ হয়, ঘনিষ্ঠতা হ'লে সেদিক দিয়ে সুবিধা বই অসুবিধা হবে না। আপনার জীবন পক্ষেও আমাদের সম্পর্ক মেনে নিতে কষ্ট হবে না। অল্পত শোনালেও আমাদের যুক্তিতে কোন ভুল নেই।

সমস্তা আপনার জবাব নিয়ে। আমাকে আপনার পছন্দ হয়, কি হয় না? এ বিষয়ে আপনার মনের ভাব কি? না জানি কি উত্তর দেবেন, কিন্তু একটা উত্তর যে চাই-ই। আগের চিঠিতে : লিখেছিলাম স্বয়ংবরা প্রণয়িনী, এবার লিখলাম মধ্যবয়সী রমণীর অন্তরের ব্যাকুলতার কথা। এখন মনে হচ্ছে আপনার জবাব না পেলে এই ব্যাকুলতাও কারণ অভাবে বাষ্পীভূত হ'য়ে শূন্যে মিলিয়ে যাবে এবং আমার জীবনের অবশিষ্ট কাল অভিশপ্ত হয়েই কাটবে। আপনার কাছ থেকে জবাব না পেলে আমার জীবন মরুভূমিতে পরিণত হবে।

আপনার উপস্থাপনে প্রেমের অভিযানের বর্ণনা করেন। লোকে আপনাকে হৃদয়হীন আখ্যা দেয়, কিন্তু সম্ভবতঃ সাধারণ বুদ্ধির উপর আপনার আস্থা বেশী। ব্যক্তিগত ভাবে সাধারণ বুদ্ধি আমার কাছে অর্থহীন। আমার মতে আস্থার ইচ্ছা পূরণের দ্বারাই জীবনকে সংপথে চালনা করা যায়। আপনার সম্ভানের জননী হওয়াই আমার একমাত্র কামনা। কোন কারণেই অজ্ঞ কোন ব্যক্তির সম্ভান আমার কাম্য নয়। এক্ষণে আপনার উপদেশের অপেক্ষা এর উত্তর জানা থাকলে আমার জানিয়ে বাধিত করবেন। অতঃপর করে সেই সঙ্গে আপনার মনের ঠিকানা দেবেন।

বৃষ্টি থেমে হাওয়া উঠেছে। এখন বেলা তিনটে। আমি আমাদের বরাদ্দ সবচেয়ে ভাল মদের সন্ধানে বেরবো। দুখানি শূকর্গভ 'রাম'-এর বোতল এবং এই চিঠিখানা পকেটে ভরে দশ মিনিটের মধ্যে প্রেমের পথে পাড়ি দেব। এই মদ আমার ভাই-এর নাগালের বাইরে নিজের জন্ত সন্নিবে রাখব। প্রতি রাতে গেলাসে ঢেলে একটু করে মদ আমি খাই। জানেন বোধ হয় 'সাকে' গেলাসে খাওয়াই রেওয়াজ।

একবার এখানে আসুন না?

মিষ্টার এম, সিকে লিখিত।

আজ আবার বৃষ্টি হয়ে গেল। বুয়াশা এবং বৃষ্টির এক বিজী সংমিশ্রণ দেখা দিয়েছে। প্রত্যহ আমি আপনার উত্তরের প্রত্যাশায় থাকি, বাড়ীর বাইরে পা দিতে ভরসা হয়না। কিন্তু এশেষান্ত একটারও জবাব হলনা। কি মনে হয় আপনার? জানিনা এর আগের চিঠিতে শিল্পীর বিষয় লিখে ভুল করলাম কি না। বোধ হয় ভাবছেন আপনার মধ্যে প্রতিযোগিতার ভাব উদ্ভূত করার উদ্দেশ্যেই এই প্রস্তাবের কথা লিখেছি। কিন্তু তারপর থেকে ব্যাপারটা ধামা চাপা পড়ে গেছে। এই তো খানিক আগে মা আর আমি এই কথা নিয়ে হাসাহাসি করছিলাম। কিছুদিন হল মা জিভের ব্যাথাটা কমেছে এবং সম্প্রতি শরীর একরকম ভালই আছে।

কয়েক মিনিট আগে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখছিলাম কেমন করে ছাওয়ার বাশটার বৃষ্টিধারা উড়ে ঘুরে মরছে আর সেই সঙ্গে আপনার

মনের হৃদিশ পাবার চেষ্টা করছিলাম, এমন সময়ে খাবার ঘর থেকে মায়ের ডাক কানে এল,—দুধ জ্বাল দিয়েছি, এদিকে এস।

মিনিট এমন দারুণ ঠাণ্ডা দেখে দুধ একটু বেশীই গরম করলাম। ঘোঁয়ালো দুধে চুমুক দিতে দিতে শিল্পীর প্রশঙ্গ উঠল; আমি বললাম—তার সঙ্গে আমার মিলাতেই পারেনা, কি বল মা?

মায়ের শাস্ত স্বর—সে কথা সত্য।

একে তো আমি বেয়াড়া মেয়ে! তাছাড়া শিল্পীদের ওপর আমার যথেষ্ট আকর্ষণ আছে, এদিকে ভদ্রলোকের রোজগারও ভাল, সব দিক দিয়ে বিচার করলে এ যোগাযোগ নেহাৎ নিম্নের নয়। কিন্তু তবু অসম্ভব।

মা হেসে ফেললেন—কাজুকো, তুমি ভারী দুটু মেয়ে। যদি অসম্ভবই জানতে তবে কেন সেদিন ভদ্রলোকের সঙ্গে অত গোসাগর জুড়ে দিলে? তোমার মতিগতি বোঝা দায়!

বা: কথা বলতে মজা লাগছিল যে। আরও অনেক কথাই বলা যেত। তুমি তো জান—কথা কওয়ার লোক পেলে আমার জ্ঞান থাকে না।

না কাউকে ছেড়ে কথা বলা তোমার স্বভাব নয়। কাজুকো, তুমি বড় জেদী মেয়ে।

আজ মায়ের মেজাজখানা খুব ভাল আছে। গত কাল আমি মাথার ওপর চূড়া করে চুল বেঁধেছিলাম, সেদিকে চোখ পড়তে বললেন—বাদের চুল কম, তাদের জন্ত এইরকম চুল বাঁধার কায়দা। তোমার মাথায় এই চূড়া অসম্ভব জমকালো দেখাচ্ছে। একখানা ছোট সোনার টায়রা হলেই খুলত ভাল। এমন করে না বাঁধলেই পারতে।

মা, তুমি আমার নিরাশ করলে। একবার তুমিই তো বলেছিলে যে, আমার এত সুন্দর ঘাড় ঢেকে রাখার কোন মানে হয় না। বলনি?

হ্যাঁ, সেই রকমই যেন মনে পড়ছে। আমায় কেউ প্রশংসা করলে তার একটা কথাও আমি ভুলি না। তোমারও মনে আছে দেখে নিশ্চিত হলাম।

সেদিন সেই ভদ্রলোক নিশ্চয় তোমার প্রশংসা করেছিলেন। হ্যাঁ তা করেছিলেন। সেইজন্মেই তো অত সহজে তাঁকে হাতছাড়া করতে চাইনি। তিনি বলেছিলেন যে, আমি তাঁর পাশে থাকলে তিনি আবার নতুন কাজে উৎসাহ পাবেন। না আর বেশী বলব না। শিল্পী যে পছন্দ করি না তা নয়। তবে হামবড়া ভাব আমার অসহ্য লাগে।

নাওজির মাঠার কেমন লোক?

আমার শরীরের ভেতর দিয়ে হিমেল শ্রোত নেমে গেল—ঠিক জানি না, তবে নাওজির মাঠারের আর দৌড় কত হবে! শুনেছি ভদ্রলোকের গায়ে 'অনাচারী' লেখা তকমা ঝলছে।

তকমা? মায়ের চোখে কোঁতুকের ছায়া খেলে গেল—ভারী মজার কথা তো! তকমাই যদি রইল তবে আর কিসের? এ যেন বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধার মতই মিষ্টি। তকমাহীন অনাচারীকেই ডর বেশী।

কি জানি।

আমার সর্দাজ জুড়িয়ে কানন্দের জোয়ার নামল। মনে হল

সেইটা খোঁয়ার মত হাডা হয়ে আকাশে উড়ে যাচ্ছে বুঝছেন ব্যাপারটা? কিসে আমার আনন্দ—এ যদি আপনি না বোঝেন তবে আমি আপনাকে আশ্বাস দিয়ে বোঝাব।

আপনি কি কখনও এখানে আসবেন না? আমি নাওজিকে বলব আপনাকে ধরে আনতে। অবশ্য তাকে বলা আমার পক্ষে অশোভন হবে ঠিকই। সবচেয়ে ভাল হ'ত হঠাৎ যদি আপনি এখানে উপস্থিত হতেন, যেন আপনার একটা খোরালের ব্যাপার। নাওজির সঙ্গে এলেও ক্ষতি ছিল না কিন্তু তবু নাওজি টোকিওতে থাকতে থাকতে আপনি একা চলে এলেই সবচেয়ে ভাল হয়। এখানে থাকলে নাওজি আপনাকে দখল করে বসবে, আপনাকে ওসাকির ওখানে মদ খাওয়ারে নিয়ে যাবে ব্যস, তাহ'লেই সব মাটি।

বংশাধিকার আমাদের পরিবারে শিল্পীপ্রীতি বর্তমান। কিওটোতে আমাদের আদি বাসায় কোরিন (Korin) বহু বৎসর কাটিয়ে অনেক সুন্দর সুন্দর ছবি এঁকে গেছেন। সুতরাং আপনি এসে মা খুব খুশি হবেন, আমি জানি। ওপর তলার বিদেশী প্যাটার্নের ঘরটিতে আপনার থাকার ব্যবস্থা করে দেব। দয়া করে আলো নেবাতে তুলবেন না। মোমবাতি হাতে আমি অন্ধকারে সিঁড়ি বেয়ে উঠব। পছন্দ হল না? বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না?

অনাচারী মানুষ আমি ভালবাসি, বিশেষতঃ যাদের নামের সঙ্গে কলঙ্ক জড়ানো আছে। আমি নিজেকে অনাচারী হ'তে চাই। আমার বিশ্বাস, এ ছাড়া বাঁচবার আর কোনও রাস্তা আমার নেই। সারা জাপানের মধ্যে আপনি যথেষ্টাচারিতার উদাহরণস্বরূপ।

নাওজির মুখে শুনেছি, সোকেস ধারণা আপনি অত্যন্ত নোংরা, কদাকার, সবাই আপনাকে ঘৃণা করে এবং মাঝে মাঝে আক্রমণ করতেও ছাড়ে না। এই সব শুনে আপনার প্রতি আমার আকর্ষণ বিগুণ বেড়ে গেছে। আপনার মত ব্যক্তির গুণগ্রাহিত্ব পরিবেষ্টিত হওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু এখন থেকে আপনি শুধু আমারই। এ না ভেবে আমার উপায় নেই। আমার সঙ্গে থাকলে কাজে আপনি নতুন স্বাদ পাবেন। ছেলেবেলা থেকে অনেকের মুখে শুনেছি, আমার সঙ্গে নাহুথকে তার দুখ তুলিয়ে দেয়। জীবনে কাকুর অনাদর পাইনি। প্রত্যেকে একমুখে বলেছে ভাল মেয়ে। এই কারণেই মনে হয় আমার অপছন্দ করার সাধ্য আপনারও নেই।

একবার আপনার দেখা পেলে কি ভালই হ'ত। আর আমার উত্তর বা কোন কিছুই প্রয়োজন নেই। সোজাসুজি দেখা করতে চাই। সবচেয়ে ভাল হ'ত যদি টোকিওর বাসায় গিয়ে দেখা করতে পারতাম; কিন্তু মায়ের আমি একমাত্র নার্স পরিচারিকা—কাজেই তাঁকে ছেড়ে যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। পায়ে পড়ি একবার এখানে আসুন। শুধু একবার আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়া আমার একান্ত প্রয়োজন। তখনই আপনি আমার সব কথা বুঝতে পারবেন। অধর প্রান্তে অস্পষ্ট রেখাগুলি নজর করে দেখবেন। শতাব্দীর অভিশাপবাহী বলিরেখাগুলি দেখে বান, ভাবার চেয়ে মুখের ভাবে আমার মানসিক অবস্থা অনেক বেশী বুঝতে পারবেন।

প্রথম চিঠিতে আমার অন্তরে চিত্রিত এক রামধনুর আভাস

অমিত লাবণ্য আপনারই জন্য বোরোলীন

আপনার লাবণ্যময় প্রকাশেই আপনার সৌন্দর্য। কিন্তু রোদ আর শুকু হাওয়া প্রতিদিন আপনার সে মাধুরী ম্লান করে দিচ্ছে। ওষধিগুণযুক্ত সুরভিত বোরোলীন এই করুণ অবস্থার হাত থেকে আপনাকে রক্ষা করবে। এর সক্রিয় উপাদানগুলি আপনার ত্বকের গভীরে প্রবেশ করে শুকিয়ে যাওয়া স্নেহজাতীয় পদার্থ ফিরিয়ে এনে আপনার ত্বকে মখমলের মত কোমল ও মসৃণ করে সজীব ও তারুণ্যের দীপ্তিতে উজ্জ্বল করে তুলবে। আবেশ-লাগা সুরভিযুক্ত বোরোলীন ক্রীম মেখে আপনার ত্বকের সৌন্দর্য রক্ষা করুন আর নিজেকে রূপোজ্জ্বল করে তুলুন।



পরিবেশক : জি. দত্ত এণ্ড কোং, ১৬, বনফিল্ড লেন, কলিকাতা-১

দিয়েছিল। জোনাকীর কীর্ণ আলো অথবা সূর্য দিগন্তের সন্ধ্যাবাক্ষি আলোকসজ্জাতে সেই রামধনু পঠিত হয়নি। তেমন অশ্রু অথবা ব্যবধানলাপেক হ'লে আমার এমন বস্ত্রাণ ভোগ করতে হ'ত না এবং হয়ত কালে আপনাকে তুলেও যেতাম। আমার ক্ষমত্রে নিহিত এই রামধনু অস্থিগাথায় রচিত। অনুভূতির তীক্ষ্ণতা আমার হৃদয় দৃষ্ট করে। আকিঃ ফুরিয়ে গেলে আকিঃখোর রে যাতনায় ছটফটিয়ে মরে, তাও বোধ হয় এক অসম্ব নয়। আমি নিশ্চিত জানি, এ আমার ভুল নয়, আমি কোন অজ্ঞায় ভ্রমছি না কিন্তু মাঝে মাঝে নিজের মনের তাড়নায় নিজেই চমকে উঠি, এ আমি কি অসম্বদ গতিতে নির্বোধের মত এগিয়ে চলেছি। প্রায় অবাধ হয়ে জাতি, হয়ত আমি পাগল হয়ে গেছি। হাই হোক, এখনও মাঝে মাঝে মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজের কথা ভাবতে পারি। দয়া করে একবার শুধু এখানে আসুন, যে কোনও সময়ে এসেই হবে। এখানে আপনার প্রতীক্ষা করে বসে থাকব, কোথাও যাব না। দয়া করে আমার বিশ্বাস করুন।

আর একবার শুধু দেখুন এবং তারপরেও যদি আমার অপছন্দ হয় তবে অলঙ্কারে বলুন। আপন হাতে আলা আমার হৃদয়ের এই বহুশিখা আপনি স্বেচ্ছায় নিবিয়ে দিতে পারেন। নিঃসঙ্গ প্রচেষ্টায় এ শিখা নির্বাপিত করা অসম্ভব। আমি জানি আমাদের সাক্ষাৎ হলে, শুধুমাত্র সাক্ষাৎ হলেই আমি বেঁচে যাব। হায় ! দি টেল অফ গেন্জি (The tale of Genji) নামক উপন্যাসের দিনগুলি যদি ফিরে পাওয়া যেত ! এর পর আমি যে কথা বলতে চাই, তার মধ্যে নূতনত্ব কিছু নেই। কিন্তু আশ্র, উঃ ! আপনার পাশে ঠাই পাবার, আপনার সম্ভানের জননী হবার শাসনা কি দুর্ভাগ্যই না হয়ে উঠছে ! আমার এ চিঠিগুলি পড়ে যদি কেউ হাসে, তবে বুঝতে হবে সে ব্যক্তি নারীর বেঁচে থাকবার প্রচণ্ড প্রয়াসকে, নারীর জীবনকে ব্যঙ্গ করছে। জাহাজঘাটের চাপা হাওয়ায় আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। আমার মন চায় উন্মুক্ত সাগরবক্ষে পাল তুলে ভেসে যেতে—কড় আসে আশ্রক, তাতে ক্ষতি নেই কিছু। গুটিয়ে-তোলা পাল অপরিষ্কার হ'তে বাধ্য। যারা আমার উপহাস করে তাদের মন অপরিচ্ছন্ন। তাদের সাধ্য কি ভাল কিছু করার ?

নারীজীবনের কলঙ্ক। কিন্তু এক্ষেত্রে ভুক্তভোগী শুধু আমি। 'কি বাতনা বিবে, বুঝিবে সে কিসে, কতু আশীবিবে দংশনি যারে।'

আলস্য করে, অপরিষ্কার পাল নামানোর মত বাইরে থেকে আমার কাজের সমালোচনা করার অপচেষ্টা অর্থহীন। আমার চিন্তাধারার বিশ্লেষণ করার দায়িত্ব, অপরের বাড়ে 'তুলে দেবার আদৌ স্পৃহা আমার নেই। চিন্তায় আমি ধার ধারি না। জীবনে শাস্ত্রবাক্য বা দর্শনের ভিত্তিতে কাজ আমি করিনি।

আমার বিশ্বাস, হুনিয়া যাদের ভাল বলে শ্রদ্ধা করে, তারা সবাই মিথ্যাবাদী, ভণ্ড ! এ হুনিয়ার ওপর আমার আদৌ আস্থা নেই। আমার একমাত্র সুস্থদ সুপরিচিত এক ব্যক্তিচারী পুরুষ। তৎকালধারী ব্যক্তিচারী। একমাত্র এই ক্রমের উপর আমি আত্মবিশ্বাসের দিতে প্রস্তুত। দশ হাজার মানুষ আমার সমালোচনা করলেও আমি তাদের মুখের ওপর এই প্রশ্ন ছেড়ে দিতে পারি—পাণ্ডের স্বরূপ গোপন রাখা আরও অনেক বেশী দারাস্বক নয় কি ?

বুঝেন কিছু ?

প্রেম অর্থহীন। আপনাকে যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখাতে গিয়ে যেন বাড়াবাড়ি করে ফেলেছি। মনে হচ্ছে আমার ভাই-এর বুলি পাখীপড়া আওড়ে। গছি এতকণ আমার একমাত্র বক্তব্য এই যে, আমি আপনার পথ চেয়ে রইলান। আপনাকে আর একবার দেখতে চাই। ব্যস এ পর্যন্ত।

শুধু আপেক্ষা করে থাকা। আমাদের জীবন সুখ দুঃখ, ক্রোধ আদি বহু আবেগে পরিপূর্ণ কিন্তু জীবনের শতকরা এক ভাগ সময় যদি এদের নিয়ে কাটে, বাকী নিরানন্দই ভাগ আশায় আশায় কেটে যায়। সেই পরম ক্ষণটির অপেক্ষা করে আছি। মনে হয় ব্যক্তিত্বের পদধ্বনিত বৃকের ভেতরটা দলিত, নিষ্পেষিত হচ্ছে। সব শূন্য ! হায়, জীবন কি বিসময় ! বুখা জন্ম—এই চিরন্তন সত্য বাস্তবের ভেতর দিয়ে বার বার প্রমাণিত হয়ে আসছে !

এই ভাবে প্রত্যাহ সকাল থেকে রাত অবধি পথ চেয়ে চেয়ে নিরাশ হই। মনে মনে ভাবি এই যে আমি জন্মেছি, বেঁচে আছি, মানব-জীবন আছে, হুনিয়া আজও টিকে আছে—এ নিয়ে যদি সুখী হ'তে পারতাম।

যে ঐনতিক দায়িত্ববোধ আপনার পথে অন্তরায়, তাকে কি ঝেড়ে ফেলতে পারেন না ?

এম, সি। (মাই শেখভ-এর আত্মকর নয়। সাহিত্যিকের প্রেমে আমি পড়িনি। মাই চাইন্ড)। [ক্রমশঃ।

অনুবাদ : কল্পনা রায়।

পরাজিত

ত্রীসন্তোষকুমার দাশগুপ্ত

বাস্তব হুনিয়ার

হায়—

এই শুধু জানলেম :

হৃদয় বিলিয়ে দিয়ে ব্যথা শুধু আনলেম।

:

প্রেমের প্রদীপখানি

সবতনে আমি আনি

ঝড়ের হাত থেকে বাঁচাতে যে চাইলেম,

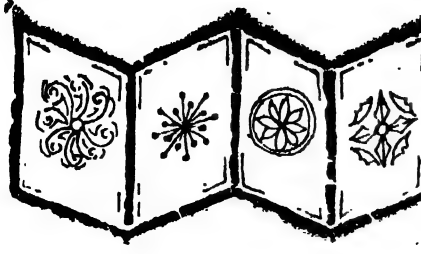
নিবে গেলো তবু শিখা আমি হারলেম।

ভালোবাসা দিয়ে কত

আপন মনের মত

প্রাণের বীণার তারে আহা সুর বাঁধলেম !

সে তার তো ছিঁড়ে গেলো, তাই শুধু কাঁদলেম।



পত্র

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর মধ্যে পত্র-বিনিময়

নেতাজীর পত্র—৭

জিয়ালাগোড়া পোঃ
ফেলা মানজুম, বিহার
১৩ই এপ্রিল, ১৯৩১।

প্রিয় মহাশয়,

জাতিয়াছিলাম ১০ই এপ্রিলের পত্রই আমার শেষ পত্র হইবে কিন্তু তাহা হইবার নয়। আমি খুব সকালে উঠিয়াছি। নিজাদেবী আমাকে তাগ করায়, নিস্তর উষার আলো-আঁধারির মধ্যে আমাদের উভয়ের সমস্যাগুলি সম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিলাম। তারপর উভয়ের পত্রগুলি পুনরায় আদ্যন্ত পড়িয়া দেখিলাম যে, কয়েকটি বিষয়ে আরও ব্যাখ্যা আবশ্যক।

৩০শে মার্চের পত্রে আপনি বলিয়াছিলেন যে, গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী সেবাগ্রামে আমাদের উভয়ের মধ্যে সাক্ষাৎকারের সময় আমরা স্বীকার করিয়াছিলাম যে, মূল বিষয়গুলিতে আমাদের মধ্যে মতভেদ আছে। আলাপ-আলোচনার সময় আমরা বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, আমাদের মধ্যে কোনও কোনও বিষয়ে মতভেদ আছে কিন্তু এ-বিষয়ে আমি জোর করিয়া বলিতে পারি না যে, সেই মতভেদগুলিকে মূলবিষয়ে মতভেদ বলিয়া স্বীকার করা উচিত কি না। আপনার পত্রগুলিতে যে যে বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন তাহাদের অধিকাংশই সে-সময় আপনি উল্লেখ করিয়াছিলেন। উদাহরণস্বরূপ দুর্নীতি, হিংসাত্মক মনোভাব ইত্যাদি সম্পর্কে আপনার অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন; স্বরাজ্যলাভের জন্ত চরমপত্র দান এবং জাতীয় সংগ্রাম শুরু সম্পর্কে আমার অভিমতের বিরুদ্ধে কঠোর মন্তব্য করিয়াছিলেন। আপনার মতে, তখন অহিংস গণ-সংগ্রামের উপযুক্ত আবহাওয়া ছিল না। কিন্তু এই বিষয়ে মতভেদগুলি কি মূলবিষয়ে এবং সেজ্ঞা কি একযোগে কাজ করার সকল আশাই ছাড়িয়া দেওয়া যুক্তিযুক্ত? কর্মসূচী সম্পর্কে একথা বলা যায় যে, উহা স্থির করার ভার কংগ্রেসের। ব্যক্তিগতভাবে আমরা আমাদের অভিমত এবং পরিকল্পনা প্রকাশ করিতে পারি কিন্তু তাহা গ্রহণ বা বর্জন করার ক্ষমতা কংগ্রেসেরই। স্বরাজ্যলাভের জন্ত চরমপত্র দানের এবং জাতীয় সংগ্রামের ভিত্তিতে আমার মূল প্রস্তাবটি ত্রিপুরী কংগ্রেস অগ্রাহ্য করিয়াছিল কিন্তু এজন্য আমার কোনও অভিযোগ নাই। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে এধরণের বিলম্ব স্বাভাবিক। আমি এখনও বিশ্বাস করি যে, আমি ঠিক কথাই বলিয়াছিলাম এবং কংগ্রেসও একদিন তাহা বুঝিতে পারিবে। আশা করি, তখন অত্যন্ত বিলম্ব হইল হইবে না। এখন যদি স্বীকার করিয়া লওয়া যায় যে, উপরিউক্ত বিষয়ে মতভেদ আছে, তাহা হইলেও একযোগে কাজ করার অক্ষমতার

কারণ কি? এই মতভেদগুলি সহসা আত্মকেই গজাইয়া উঠে নাই। উভারা কিছুকাল যাবত আছে এবং তাহা সম্বন্ধে আমরা পরস্পরের সহিত সহযোগিতা করিয়াছি। এই মতভেদগুলি বা অসুস্থ মতভেদ ভবিষ্যতেও থাকিবে কিন্তু তাহা সম্বন্ধে আমাদের ঐক্যই তখন করিতে হইবে (সম-উদ্দেশ্যের জন্ত সহযোগিতা করিতে হইবে)।

অসুস্থ করিয়া মরণ করুন যে, সেবাগ্রামে প্রায় এক ঘণ্টা ধরিয়া আমরা আলোচনা করিয়াছিলাম একটি মাত্র বিষয় লইয়া—সর্বদলীয় বনাম একদলীয় কার্ধ্যানির্বাহক সমিতি গঠন। কিন্তু তখন আমরা ঐ বিষয়ে আমাদের মতভেদ স্বীকার করিয়া লইয়াছিলাম। তিন ঘণ্টাব্যাপী আলোচনার শেষের দিকে আমি বলিয়াছিলাম যে, সর্দার প্যাটেল এবং জ্ঞানান্দের সংগে যখন আমি সাক্ষাৎ করিব তখন তাঁহাদের সহযোগিতা আদায়ের জন্ত শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিব। সম্ভবতঃ আমি যদি অসুস্থ না হইতাম এবং গত ২১শে ফেব্রুয়ারী ওয়াকিং কমিটির সভায় যদি আমাদের সাক্ষাৎকার হইত, তাহা হইলে একযোগে কাজ করা অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়া উঠিত।

আপনার ৩০শে মার্চের পত্রে আব একটি মন্তব্য আছে যাহার সহিত আমি একমত নই। উহা ভাল করিয়া চোখে পড়ে নাই বলিয়া ইতিমধ্যে সে সম্পর্কে উল্লেখ করিতে পারি নাই। আপনি মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিকাংশ সদস্য যদি আমাদের নীতি সমর্থন করে তাহা হইলে, যাহারা আমার নীতিতে বিশ্বাসী, একমাত্র তাঁহাদের লইয়াই আমার পক্ষে ওয়াকিং কমিটি গঠন করা কর্তব্য। আমাদের পক্ষের পরিষ্কার অভিমত এই যে, এ, আই, সি, সিতে অধিকাংশ সদস্যের সমর্থন আমরা পাইলেও সর্বদলীয় ওয়াকিং কমিটি বা কংগ্রেসবিশেষের বিশেষ আবশ্যকতা আছে। কারণ, উক্ত পরিষদের গঠন যখনস্বরূপ কংগ্রেসের সাংগঠনিক প্রতিধ্বনি তওয়া প্রয়োজন। কংগ্রেসের অধিকাংশ সদস্যের সমর্থন উহার পশ্চাতে থাকা চাই। ভারতের মধ্যে এবং বিদেশে আজ আমরা যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হইয়াছি তাহাতে আমাদের মতে, একদলীয় কংগ্রেসগঠন নিবাস্ত ভ্রমাত্মক। আমাদের জাতীয় সংগ্রামের ক্ষেত্র-প্রসারের সময় আগিয়াছে। জাতীয় কংগ্রেসবিশেষকে—ওয়াকিং কমিটিকে সঙ্গঠিত, দলীয় ভিত্তিতে গঠন করিয়া আমরা কি সে কার্ধ্য শুরু করিতে পারি?

দুর্নীতি সম্পর্কে সাধারণ ভাবে আমরা আপনার সহিত একমত যদিও আমি মনে করি যে, ঐ বিষয়ে আপনার আশঙ্কা মাত্রা ছাড়িয়া গিয়াছে। আমি জানি না, সমগ্র ভাবে ভারতের কথা বিচার করিলে কেহ বলিতে পারেন কি না যে, দুর্নীতি বৃদ্ধি পাইয়াছে। সে যাহা হউক, আমি মনে করি যে দুর্নীতি বৃদ্ধি পাইলেও, আমরা এমন অক্ষম

হইয়া পড়ি নাই যে, জাতীয় সংগ্রাম স্বরূপ করা আমাদের দ্বারা সম্ভব হইবে না। হুঁসিতির কারণ অচুসদান করিতে গিয়া আমাদের বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে যে, জাতীয় সংগ্রাম মূলতঃ রাধা এবং সরকারী পলায়িকারের দ্বারা বিলাস-জীবনের আনন্দন এই হুঁসিতির জন্ত প্রদানতঃ দায়ী কি না। আমার পূর্ববর্তী পত্রে যেমন বলিয়াছিলাম এখনও তেমনই বলিতেছি যে, আরও আত্মত্যাগ ও আত্মনিগ্রহের আহ্বান প্রতিবেদকরূপে কাজ করিবে এবং সমগ্র জাতিকে উচ্চতর নৈতিক স্তরে উন্নীত করিবে।

৬ই এপ্রিল রাজেন বাবু অহুগহ করিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। সাধারণ ভাবে শ্রমিক-সমাজ লইয়া আমরা আলোচনা করিবার পর কংগ্রেসের ব্যাপার লইয়া আলোচনা করিয়াছিলাম। যখন আমি আপনার সহিত পত্রালাপ স্বরূপ করি তখন আশা করিয়াছিলাম যে, এই ভাবেই (পত্রালাপের মাধ্যমে) ওয়ার্কিং কমিটি গঠন সমস্যার সমাধান হইবে এবং বড় বড় সমস্যাগুলি আমাদের উভয়ের পরবর্তী সাক্ষাৎকারের জন্ত রাখিয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু পত্রালাপ চলিতে থাকাকালে আমি বুঝিতে পারিলাম যে, উহা কোনওকণ্ঠ সমাধানের দিকে আমাদের দিকে লইয়া যাইতেছে না। যখন রাজেন বাবু দেখা করিতে আসিয়াছিলেন তখন, ডাক্তারের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া আপনার সহিত দেখা করিবার জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিবার কথা ভাবিতেছিলাম। কাণ, আশা ছিল যে, উহার ফলে আমাদের মধ্যে একটা মীমাংসা হইয়া যাইবে। স্তবরা আমার অহুবাধে সাক্ষাৎকারের জন্ত, রাজেন বাবু আপনাকে বিড়লা হাউসে টেলিফোন করিয়াছিলেন। রাজেন বাবু আমাকে উৎসাহবাক্যক কোনও সংবাদ না দেওয়ায় আমি ভাবিয়াছিলাম যে, আর একবার আমি চেষ্টা করিয়া দেখিব। স্তবরা বিকালের দিকে আমার ডাক্তার আবার বিড়লা হাউসে টেলিফোন করেন এবং আমিও একটি এক্সপ্রেস টেলিগ্রাম পাঠাই। উভয়ের উত্তরে আপনি জানান যে, রাজকোটের ব্যাপারে আপনাকে তৎক্ষণাৎ দিল্লী ছাড়িয়া যাইতে হইবে। তখন আমার মনে হইয়াছিল এবং এখনও মনে হইতেছে যে, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকে জলাঞ্জলি দিয়া সম্ভবতঃ উহার চরম ক্ষতিসাধন করিয়া, রাজকোট সমস্যা লইয়া আপনি মাতিয়া উঠিয়াছেন। আমার জায় লোকের নিকট কংগ্রেসে বিষয়সমূহ—বিশেষ করিয়া এই সঙ্কটমুহূর্ত্তে—রাজকোটের আহ্বান অপেক্ষা সতঃপ্রাণ মূল্যবান। ইহা আপনার ভাবা উচিত ছিল যে, শ্রীর মরিস গায়ানের রোয়েদাদের পর, একা সর্দার প্যাটেলই রাজকোট পরিস্থিতিতে সামলটিতে পারিতেন, দীর্ঘদিন সেখানে আপনার উপস্থিতির কোনও প্রয়োজন ছিল না। যাহা হউক এখন আর উহা লইয়া খেদ করিয়া লাভ নাই; কারণ, ঐ বিষয়ে আপনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন এবং তদনুসারে কার্য করিয়াছেন।

৭ই এপ্রিলের এক তারবার্তায় আপনি শরৎকে বা অজ কোনও প্রতিনিধিকে দ্রুত রাজকোটে বাইয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। আমার বিশ্বাস, উহা কার্যকরী প্রস্তাব নহে। আপনার সহিত সরাসরি পত্রালাপে যদি সম্ভাবজনক ফল না পাওয়া যায় তাহা হইলে প্রতিনিধির মাধ্যমে কথাবার্তায় কি ফল হইবে—বিশেষ করিয়া সমস্যা যেখানে কঠিন এবং গুরুত্বপূর্ণ। না, আমার মনে হয়, রাজকোটে প্রতিনিধি

পাঠাইলে অবস্থার উন্নতি হইবে না। আমাদের উভয়ের মধ্যে সরাসরি আলোচনা হইলে তাহা সম্ভব হইত।

আপনার দশ তারিখের পত্র এইমাত্র হস্তগত হইয়াছে এবং উহার উপর আমাকে কয়েকটি মন্তব্য করিতে হইবে। কংগ্রেসে সচিব বলিতেছি, অধিকাংশ বিষয় সম্পর্কে আপনার উত্তর আমার নিকট নৈরাশ্যকর মনে হইতেছে। আপনার সমগ্র পত্রখানি নিরাশার ভাবে ভরপুর। আমার পক্ষে ঐরূপ মনোভাব সমর্থন করা সম্ভব নয়। সঙ্কোচের সহিত বলিতেছি, আপনি ব্যক্তিগত বিষয়ের উপর অত্যধিক জোর দিয়াছেন। আমাদের দেশপ্রেম্যে আপনার এই বিশ্বাস যথেষ্ট থাকা উচিত যে, জাতীয় সঙ্কট যখন দেখা দিয়াছে তখন এই সকল বিষয় অতিক্রম করিতে আমরা সমর্থ হইব। যদি আমরা কংগ্রেসের মধ্যে ঐক্য সম্পাদন করিতে না পারি, তাহা হইলে সারা দেশের মধ্যে বৃহত্তর ঐক্য কি করিয়া সম্পাদন করিব?

পত্নী-প্রস্তাব সম্পর্কে আপনি প্রকৃতপক্ষে আমাকে কোনও উপদেশই দেন নাই।

দেশীয় রাজ্যগুলি সম্পর্কেও যদি আপনি নৈরাশ্যের মনোভাব পোষণ করেন, তাহা হইলে ঐ রাজ্যগুলির জনগণের জন্ত দায়িত্বশীল সরকার এবং পৌরস্বাধীনতা কি করিয়া আদায় করিবেন? মোটের উপর আমাদের একমাত্র অন্ত হইতেছে অসিস গণ-সংগ্রাম আর তাহা হইতে বঞ্চিত হইলে আমাদের কেবলমাত্র মনোপন্থী নীতি গ্রহণ করিতে হইবে অথবা আপনার খাপছাড়া আত্মনিপীড়নের উপর নির্ভর করিতে হইবে। আপনি লিখিয়াছেন যে, যেখানে সেখানে আপনার প্রভাব আছে, সেখানেই সত্যগত আন্দোলন বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। আমরা জানি রাজকোট আপনি উঠা করিয়াছিলেন এবং তাহার পর নিজের স্বক্ষে সম্পূর্ণ দায়িত্ব লইয়াছিলেন। আপনার জীবনও উহার জন্ত বিপন্ন করিয়াছিলেন। কি আপনার দেশবাসীর পক্ষে, কি রাজকোট রাজ্যে অধিবাসীর পক্ষে ঐ কাজ কি কলাবকর হইয়াছে? আপনার জীবন আপনার ব্যক্তিগত সম্পত্তি নহে যে যখন ইচ্ছা আপনি তাহা বিপন্ন করিয়া তুলিবেন। রাজকোট অপেক্ষা বৃহত্তর ক্ষেত্রে আপনার নেতৃত্বের জন্ত দেশবাসী হায়তঃ দাবী জানাইতে পারে। রাজকোটবাসিগণ সম্পর্কে একথা বলা যায় যে, তাহারা যদি নিজের আত্মত্যাগ ও চেষ্টা ব্যতিরেকে একমাত্র আপনার আত্মনিগ্রহের ফলে স্বাধীন হইত, তাহা হইলে রাজনৈতিক দিক হইতে তাহারা অল্পমতই থাকিয় যাইবে এবং আপনার দ্বারা লব্ধ স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারিব না। পরিশেষে বক্তব্য এই যে, যখন আমাদের দিকে বহু সংগ্রামক্ষেত্রে অসং সংগ্রাম চালাইতে হইবে, তখন কত বার আপনি আপনার মূল্যবান জীবন এই ভাবে বিপন্ন করিবেন?

রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের উভয়ের সহযোগিতা সম্পর্কে আপনি নিরাশা পোষণ করিতেছেন। আপনি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও উল্লেখ করিয়াছেন, কারণ আপনি ভারতের জন্ত আমাদের শিল্পপ্রসারের পরিকল্পনা সমর্থন করেন না, যদিও আমরা শিল্পপ্রসারের সহিত উপযুক্ত কুটিরশিল্পের উন্নয়নের কথা বলিয়া আসিতেছি। রাজনৈতিক মতভেদ সম্পর্কে বক্তব্য এ যে, আমি এখনও বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না, কো

প্রত্যেকগুলিকে আপনি মৌলিক এবং ঐক্যের ও সম্মেলন কার্যের পক্ষে ছরতিফ্রমণীয় বাধা বলিয়া মনে করিতেছেন। আপনি যদি এখনও মনে করেন যে, এইরূপ কার্য (একযোগে কার্য) অসম্ভব, তাহা হইলে কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ—অন্ততঃপক্ষে অদূর ভবিষ্যৎ অত্যন্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন। এতদিন আমি এই আশা পোষণ করিতেছিলাম যে, আপনার মাধ্যমে বিভেদ জোড়া লাগিবে এবং একটা ভীষণ জাতীয় দুর্দৈব এড়ান সম্ভব হইবে।

আপনি যে অসম্ভব ব্যক্তিগুলির কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহারা ভাল, মন্দ বা উদাসীন যাহাই হউক না কেন, উভাদের অস্তিত্ব পাকাপাকি হইয়া গিয়াছে। অতএব এখন যদি একযোগে কাজ করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে কোনও কালেই তাহা সম্ভব হইবে না। উহা অর্থ এই যে, ভবিষ্যতের গর্ভে আমাদের জগৎ নির্দাক্ষ্য নৈবাগ্য বাতাত আর কিছুই নাই। যৌবনোচিত বলিষ্ঠ আশাবাদ এবং ভাবের উজ্জল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনিশ্চয় বিশ্বাস লইয়া আমরা কি করিয়া এই পরিস্থিতি স্বীকার করিয়া লইতে পারি?

কয়েকটি পক্ষে আপনি আমাকে সম্মত নীতি নির্ধারণ এবং কর্মসূচী স্থির করিয়া তাহা নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সম্মুখে উপস্থাপিত করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। কিন্তু কংগ্রেস আমাকে এক বিশেষ পদ্ধতিতে ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করিতে নির্দেশ দিয়াছেন এবং তাহাই আমার বর্তমানের কর্তব্য। ত্রিপুরী কংগ্রেসে রাষ্ট্রপতির ভাষণে আমি আমার কর্মসূচী পেশ করিয়াছিলাম কিন্তু তাহা গৃহীত হয় নাই। ওয়ার্কিং কমিটি গঠন সংক্রান্ত বিষয়টি এখনও অসম্মত থাকায়, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির নিকট আমার কর্মসূচী পেশ করার কোনও প্রয়োজন দেখিতেছি না।

প্রথম পক্ষে আপনি লিখিয়াছিলেন যে, আমায়ই হাতে উত্তোগপর্ষ। তলতুসারে, যে সমগ্রাগুলির সম্মুখীন আমরা হইয়াছি, উৎসম্পর্কে আমার মতামত এবং আমার সমাধানগুলিও আপনার নিকট পেশ করিয়া আসিতেছি। দেখিতেছি যে, হয় সকল অথবা অধিকাংশ প্রস্তাবই আপনি সমর্থন করেন নাই। অতএব এখন আপনারই উত্তোগী হইবার এবং ওয়ার্কিং কমিটির সমগ্র নির্বাচন সম্পর্কে আপনার অভিল্যাস বাস্তব করিবার সময় আসিয়াছে। পঞ্চ প্রস্তাবানুসারে ওয়ার্কিং কমিটিকে কেবল যে আপনার ইচ্ছানুসারেই গঠিত হইত তাহা নহে, উহাকে আপনার পূর্বা বিশ্বাসভাজনও হইতে হইবে।

কতগুলি বিকল্প প্রস্তাব আপনার বিচারের জগৎ উপস্থাপিত করিয়াছিলাম। প্রথমতঃ আমি সমগ্র জাতীয় সংগ্রাম স্তর করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলাম। উহা করিলে আমাদের বর্তমান সঙ্কটগুলির মোচন স্বভাবতই হইত। এই প্রস্তাবটি আপনার নিকট গ্রহণযোগ্য নহে। আমার দ্বিতীয় প্রস্তাব ছিল, আমি যদি একদলীয় কর্মপরিষদ গঠন করি তাহা হইলে আপনি যেন সমর্থন-আপক ভোট দেন। আপনি লিখিয়াছেন যে, তাহাও সম্ভব নহে।

আমার তৃতীয় প্রস্তাবে জানাইয়াছিলাম, আপনার উচিত আগাইয়া আসিয়া ওয়ার্কিং কমিটির প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করা। এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইলে বহু বাধা দূর হইত এবং বহু বিপত্তির নিবসন হইত। আমার এত প্রস্তাবের কোনও উত্তর আপনি লেন নাই। আপনি যদি ইহাও প্রত্যাখ্যান করেন তাহা হইলে কার্যারম্ভের দায়িত্ব আমার হাত হইতে আপনার হাতে চলিয়া যাওয়া উচিত। আপনাকে তাহা হইলে ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে।

একটি বিষয় পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি। ভূষণের সহিত বলিতেছি যে, একমাত্র আমাদের দলের সদস্যদের লইয়া আপনার পরামর্শ মত একটি একদলীয় কর্মপরিষদ, (ওয়ার্কিং কমিটি) আমি গঠন করিতে পারি না। এই পরামর্শ কংগ্রেস প্রস্তাবের বিরোধী, কারণ ঐ প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, ওয়ার্কিং কমিটি আপনার পূর্বা বিশ্বাসভাজন হওয়া চাই। অধিকন্তু আমার ক্ষুদ্রমতে, বর্তমান অবস্থায় একদলীয় কর্মপরিষদ দেশের স্বার্থের পরিপন্থী হইবে। উহা কংগ্রেসের গণ-প্রকৃতির সত্যকার প্রতিনিধিত্বানীয় হইবে না এবং বলিতে কি, উহা গঠন করা হইলে রীতিমত মতবিরোধের সৃষ্টি হইবে এবং সম্ভবতঃ আমাদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ ঘটাইবে।

আশা করি, ত্রিপুরী কংগ্রেস আপনার উপর যে দায়িত্ব চাপাইয়াছে তাহা আপনি যথাযথভাবে পালন করিবেন। আপনি যদি তাহাও করিতে অস্বীকার করেন, তাহা হইলে আমি কি করিব? আমি কি এ, আই, সি-সিকের সমগ্র বিষয়টি জানাইয়া তাহাদিগকে ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করিতে বলিব? অথবা অল্প কোনও পরামর্শ আমাকে দিবেন?

আশা করি বা (কম্বলবা) পূর্বাপেক্ষা ভাল আছেন এবং শীঘ্রই সারিয়া উঠিবেন। আপনার স্বাস্থ্য কেনন—বিশেষ করিয়া রক্তের চাপ? আমি ধীরে ধীরে সস্থ হইয়া উঠিতেছি। সমগ্র প্রণামান্তে—
আপনার স্নেহের
সুভাষ

পুনশ্চ—

আপনার নিকট আত্মজ্ঞাপক ভোটার অনুবোধের উত্তরে গত ১০ই এপ্রিলের পক্ষে আপনি লিখিয়াছিলেন যে, আমি ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করিলে, এ, আই, সি, সি-সি-সি সম্পর্কে নিজ বিচারবুদ্ধিমত কাজ করিতে পারেন, আপনার অভিমত বা আপনার আদেশ দ্বারা ভারাক্রান্ত হইবার প্রয়োজন নাই। আরও ভাল কাজ হইবে যদি তাহারা ওয়ার্কিং কমিটি গঠনে নিজ বিচার-বিরেচনাশক্তির প্রয়োগ করেন। পঞ্চ প্রস্তাবের বিরোধী আপনার পরামর্শ অনুসারে যদি কাজ করিতে আমি না পারি এবং আপনি যদি নিজে ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের দায়িত্ব গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের দায়িত্ব এ, আই, সি, সি-সি-সি অতি অবশ্যই গ্রহণ করা উচিত। আপনি কি অল্প কোনও সমাধান দিতে পারেন?

রাখিও বল জীবনে

রাখিও মনে আশা

নিখিল এই ভুবনে

রাখিও ভালোবাসা। —রবীন্দ্রনাথ

প্রানাজ্জনি

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

[সি, এফ, অ্যাংজ লিখিত 'What I Owe to Christ' গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ]

দক্ষিণ-আফ্রিকা

বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিকে ভারতবাসীদের অজ্ঞতম পরম আত্মজ্ঞান নেতা ছিলেন গোখেল। ১৯১৩ সালের নভেম্বর মাসে তাঁর কাছ থেকে তারযোগে আমি এক জরুরি নির্দেশ পেলাম। দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতবাসীরা চুক্তিবদ্ধ শ্রমদাসত্ব প্রথার কবলে অসহনীয় অত্যাচারে নিপীড়িত হচ্ছে। এই প্রবাসী ভারতীয়দের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছেন মহাত্মা গান্ধী। এদের সাহায্য করবার জন্তে আনাকে অবিলম্বে দক্ষিণ-আফ্রিকা যাত্রা করতে হবে,— এই হোলো গোখেলের নির্দেশ।

নাটালের বিভিন্ন বাগিচার কাজ করবার জন্তে ১৮৬১ সাল থেকে ভারতীয় শ্রমিক চালান করা হোতো চুক্তি প্রথার মাধ্যমে। দিনে দিনে এই প্রথা অতি বীভৎস রূপ ধারণ করেছিল,—জমে উঠেছিল নানা অত্যাচার হরণপনের কলংক। ভারতীয় শ্রমিক সংগ্রহ করার জন্তে পেশাদার আড়কাটি নিযুক্ত করা হোতো,—এরা মালিকের কাছ থেকে শ্রমিকের মাথা-পিছু দান পেত। পুরুষের চাইতে স্ত্রীলোক চালানোর পারিশ্রমিক ছিল বেশি। আড়কাটির নির্বিচারে ছলবলের আশ্রয় নিত। হাজার হাজার ভারতীয় শ্রমিককে তারা চুক্তিপ্রথার সংগ্রহ করে নাটালে চালান দিয়েছিল। ফলে নাটালে ইউরোপীয়ের চেয়ে ভারতীয় সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছিল।

ভারত গভর্ণমেন্টের সঙ্গে যে প্রাথমিক চুক্তি হয়েছিল তাতে সঠিক ছিল এই যে, ভারতীয় শ্রমিকরা নাটালে পাঁচ বছরের জন্ত কাজ করবে। পাঁচ বছরের শ্রমের মেয়াদ সম্পূর্ণ হবার পর ভারতীয় শ্রমিক স্বাধীন ভাবে নাটালে বসবাস করবার সুযোগ পাবে। কিন্তু এই চুক্তিকে বানচাল করবার উপায় উদ্ভাবনে দেরি হয়নি। নাটাল গভর্ণমেন্ট আইন করল যে পাঁচ বছরের শ্রমের মেয়াদ শেষ হবার পর প্রত্যেক ভারতীয় শ্রমিককে হয় তিন পাউণ্ড কর দিতে হবে না হয় আবার আর এক পাঁচ বছরের শ্রমচুক্তি করতে হবে। যে করও দেবে না বা নতুন করে শ্রমদাসত্ব মেনেও নেবে না তাকে নাটাল থেকে বিতাড়িত করা হবে।

নাটাল সরকারের উদ্দেশ্য ছিল অতি সরল। ভারতীয়রা হয় চিরকাল বাগিচার শ্রমদাস হয়ে থাকবে না হয় তাদের রাজ্য থেকে

দূর করে দেওয়া হবে। মাথা-পিছু মুক্তিকর স্ত্রী-পুরুষ ও এমন কি পনেরো বছরের উপবেশ বালকবালিকাকেও নিতে হবে। এমনি মহার্ঘ মান্ডল দিয়ে স্বাধীনতা ক্রয় করতে ভারতীয় দরিদ্র শ্রমিকের ক'জনই বা পারবে?

এই চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক-প্রথা দাসত্বের নামান্তর। বিখ্যাত ঐতিহাসিক সার ডবলু ডবলু হাট্টার বলেছিলেন যে এই প্রথা ও দাসত্ব-প্রথার মধ্যে সীমারেখা টানা দুষ্কর। বাস্তবিক অবস্থা তন্ন তন্ন করে পর্যবেক্ষণ করার পর আমিও দৃঢ়নিশ্চয় হয়েছিলাম যে হাট্টারের এই সিদ্ধান্ত যথার্থ। ভারতীয় শ্রমিকরা নিজের পছন্দমত মালিক নির্বাচন করতে তো পাবতই না,—যদি বা অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে বাগিচা পরিত্যাগ করত, তাহলে যৌজদারী অপরাধে শাস্তি পেত।

সরকারী পর্যবেক্ষণের একটা তথাকথিত ব্যবস্থা যে অবশ্য ছিল না তা নয়। কিন্তু তাতে মালিকের নিষ্ঠুরতা বিন্দুমাত্রও লাঘব হোতো না। প্রভুর বিরুদ্ধে অভিযোগ করার সাহস দাসের মনে মোটেও ছিল না। এই প্রথার সব চাইতে বীভৎস রূপ ছিল এই যে, প্রতি একশো জন পুরুষ-শ্রমিকের অল্পপাতে চল্লিশ জন করে নারী-শ্রমিক সংগ্রহ করা হোতো। বিবাহিত দম্পতি অতি অল্পই ভারতবর্ষ থেকে আসত। অতএব পুরুষ ও নারী-শ্রমিকের সংখ্যার এই বিপজ্জনক তারতম্যের ফলে নাটালের ভারতীয় সম্প্রদায় দুর্নীতিতে ছেয়ে গিয়েছিল।

১৮৩৪ সালে দাসত্বপ্রথা রদ হয়! দাসত্বপ্রথার পরিবর্তে চুক্তিবদ্ধ শ্রমপ্রথার উদ্ভব হয় এবং এই প্রথা অল্পসারে মনিশাস ট্রিনিডাড, জামাইকা, গ্রেনাডা, ব্রিটিশ গায়ানা প্রভৃতি উপনিবেশে ইচ্ছুবাগিচার দলে দলে ভারতীয় শ্রমিক আমদানি করা হয়। প্রাক্তন দাসত্বপ্রথার অধিকাংশ অনাচার এই নতুন প্রথাতেও ফুটে উঠতে থাকে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে নতুন প্রথাও কলংক পূর্বত প্রথার কলংককে ছাড়িয়ে যায়। মালিক যেখানে ভালো হোতো সেখানে ভারতীয় শ্রমিকরাও ভালো ব্যবহার পেত। কিন্তু মালিক যেখানে নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী, সেখানে শ্রমিকদের অবস্থা লাগামে-বাঁজন্তর মতো। এমনি অত্যাচার ও নিপীড়নের ফলে কতো হতভাগ্য শ্রমিক যে আত্মহত্যা করে মুক্তিলাভ করত তার ইয়ত্তা নেই। বাগিচা-জীবনের দুর্নীতি হুর্ভাগ্যকে আরো গভীরতর করে তুলত

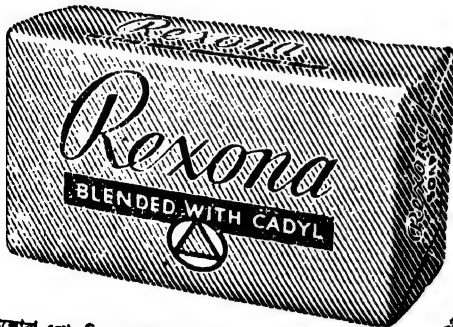
দিনের পর দিন প্রতিদিন...

রেক্সোনা সাবান

আপনার ত্বকে
আরও সুন্দর করে

যতবারই আপনি রেক্সোনা সাবান দিয়ে মুখ
পোষেন—আপনার ত্বক আরও নরম, আরও মোলায়েম
দেখাবে। তার কারণ, রেক্সোনায় থাকে ক্যাডিল—অর্থাৎ
কয়েকটি তেলের এক বিশেষ সংমিশ্রণ যা আপনার লাগণাকে
হৃদয় করে এবং আপনার ত্বককে সুস্থ রাখে। রেক্সোনার
সরের মত ক্ষেণা মাখুন দেখবেন আপনার ত্বক
প্রতিদিন আরও হৃদয় হয়ে উঠছে।

আপনার সৌন্দর্যের জন্মে... রেক্সোনা



রেক্সোনা প্রো, লিঃ, অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে হিন্দুস্থান লিটার লিঃ, কর্তৃক ভারতে প্রদত্ত

RP. 100-118 BQ

কখনো বা পৌছতো নারীহত্যা ও পুরুষের আত্মহত্যার ভয়ঙ্কর পরিণতিতে। এই সমস্ত হত্যানীলার আখ-কাটা ধারালো ছুরি সাধারণত ব্যবহৃত হতো। সরকারী তথ্য থেকেই জানা যায় যে বিভিন্ন ব্রিটিশ উপনিবেশে চুক্তিবদ্ধ শ্রমপ্রথার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে হত্যা ও আত্মহত্যার সংখ্যাও বেড়ে গিয়েছিল।

ভারতীয় শ্রমিককে বাগিচার দাসত্বে শৃংখলিত রাখার জন্তে নাটাল সরকার যে তিন পাউণ্ড মুক্তিকর প্রবর্তন করেছিল এই কর অশ্রায় ও মানবতাবিরোধী বলে সর্বত্র স্বীকৃত হয়েছিল। কিন্তু এই করের প্রধান সমর্থক ছিল ইউরোপীয়ানরা। জেনারাল বোথা বা জেনারাল স্মার্টস, ক্ষমতাব্যবহীন থাকার সত্ত্বেও উভয়ের কেহই ইউরোপীয়ানদের চটিতে এই কর রদ করবার নির্দেশ দিতে পারেননি। মনে মনে তাঁদের অবস্থা ঠিক ছিল, গোখেল যখন দক্ষিণ-আফ্রিকায় যান তখন তাঁরা গোখেলকে মৌখিক প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন, কিন্তু সে প্রতিশ্রুতি তাঁরা রাখতে পারেননি।

এই অশ্রায় করকে রদ করবার জন্তে সমস্ত প্রকার আবেদন নিবেদন যখন ব্যর্থ হোলো তখন মহাত্মা গান্ধী ও তাঁর সঙ্গীরা অহিংস অসহযোগের পন্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন। উত্তর নাটালের কয়লা খনি অঞ্চল থেকে একদিন চুক্তিবদ্ধ শ্রমিককে সংঘবদ্ধ করে গান্ধিজী তাঁর সত্যগ্রহের বাহিনী গঠন করলেন। ভারতীয়দের দুঃখ দুর্দশার প্রতি কতৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য এই বাহিনী নিয়ে তিনি ট্রান্সভাল যাত্রা করলেন। দু'হাজারের অধিক ভারতীয় পুরুষ নারী ও শিশু গান্ধিজীর নেতৃত্ব বরণ করে নিল, তাঁর পিছু পিছু ডাকেন্স বার্গ পর্বতমালা পার হয়ে ট্রান্সভাল অভিমুখে যাত্রা করল। আরো হাজার হাজার ভারতীয় নেতারা পরবর্তী নির্দেশের জন্য প্রস্তুত হয়ে রইল। কয়লা খনি পরিভ্রমণ করা এবং ট্রান্সভালে প্রবেশ করা দুই কাজই বে-আইনি, উভয় কারণেই সশ্রম কারাদণ্ডের কঠোর শাস্তি। প্রতিটি চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক ও তাদের অশ্রায় আত্মীয়বন্ধুগণ এই শাস্তির কথা জানত কিন্তু তারা ভয় পেল না। দুর্গম পথযাত্রার কষ্টের সোনা নেই, কিন্তু গান্ধিজীর অনুবর্তিগণের একজনও পিছন ফিরল না।

শেষ পর্যন্ত অধিকাংশ সজিসহ মহাত্মা গান্ধী কারাবরণ করলেন। আন্দোলনের প্রতিটি নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি কেউ বা জেলে কেউ বা হাজতে আবদ্ধ হোলো। নাটাল থেকে আরো ভারতীয় শ্রমিক বাগিচা ছেড়ে আন্দোলনে যোগ দিতে অগ্রসর হলে তাদের উপর শারীরিক অত্যাচার শুরু হোলো, গুলী চলল নিরস্ত্র অভিযাত্রীদের উপর। ভারতবর্ষে যখন এই সব সংবাদ পৌছলো, তখন উত্তেজনা চরমে উঠল। প্রবাসী ভারতীয়দের দাবী সমর্থন করে ভাইসরয় লর্ড হাডিঙ্গ বিখ্যাত বক্তৃতা দিলেন।

দক্ষিণ-আফ্রিকায় যখন এই সংকটজনক পরিস্থিতি, গান্ধিজী ও অশ্রায় নেতারা যখন প্রত্যেকে কারাক্ষত, তখন গোখেল আমাকে তারবোণে অনুরোধ করলেন অবিলম্বে দক্ষিণ-আফ্রিকায় যাবার জন্তে। স্বদেশে আমার মা তখন অস্তিম্য রোগশয্যায়, আমি ইতিমধ্যে তাকে চিঠি লিখে জানিয়েছি যে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্য দেশে রওনা হচ্ছি। আমার মার জীবনে স্বার্থপরতার লেশ ছিল না। এবার তিনি তাঁর শেষ স্বার্থত্যাগের নিদর্শন দিলেন—আমাকে বললেন,

তাঁর কাছে না গিয়ে নাটালেই যেন আমি যাই, সেখানে তাঁর ভাগ্যহত ভারতীয় ভগিনীদের পবন প্রয়োজনের ক্ষণে তাদের যেন আমি সেবা করি। মার সঙ্গে আর আমার দেখা হোলো না, আমি দক্ষিণ-আফ্রিকায় পৌছবার কিছুদিন পরেই তিনি চিরশান্তির কোড়ে আশ্রয় নিলেন।

ম্যাগেস্তারের প্রসিদ্ধ ধর্মযাজক ডাক্তার স্যামুয়েল পিয়াস'নের পুত্র উইলি পিয়াস'ন নাটাল যাত্রায় আমার সাথী হোলো। উইলির মা কোয়েকার ছিলেন। দিল্লীতে উইলি আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। তার আশ্চর্য ব্যবহারে সে আমাকে এবার চমৎকৃত করে দিল। তাড়াহুড়ো করে জিনিষপত্র গুছিয়ে নিচ্ছি,—কেন না দেখি করবার সময় নেই, সেদিন মধ্যরাতেই দিল্লী থেকে যাত্রা করতে হবে, নইলে জাহাজ পাব না। উইলি আমার কাছে এসে বললে,—তোমার যাওয়ার আগে একটি উপহার তোমাকে দিতে চাই। আমি প্রশ্ন করলাম,—উপহার?

উইলি বললে,—এই যে, উপহার তোমার সামনেই উপস্থিত—আমি।

তারপর তার সে কী উল্লাসভরা হাসি!

তার এই কৌতুকভরা আত্ম-উপহার তার উজ্জল চরিত্র-মাধুর্যেরই প্রতীক। তার মতো অকপট বন্ধু ও বিশ্বস্ত অনুচর আমি ইতিপূর্বে পাইনি। নাটালে পৌছনো মাত্র সে মুহূর্তে সেখানকার ভারতীয়দের অন্তর জয় করে নিয়েছিল। তাঁদের আশ্রয় পরিভ্রমণ করে বিভিন্ন সমুদ্রযাত্রা আমার আরম্ভ হোলো,—এই সব যাত্রায় উইলি ছিল আমার প্রধান সহায়। আমার জীবনের গভীরতম আঘাত আমি পাই যখন ১৯২৪ সালে ইটালিতে এক চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে উইলি মারা যান। তার এই আকস্মিক অপমৃত্যুর জন্তেই এই শোক অশ্রুস্রাব হয়েছিল।

কলকাতা থেকে ডারবান যাত্রার পথে অধিকাংশ দিন আমাদের জাহাজ প্রবল ঝটিকার পিছনে পিছনে চলল। ফলে ডারবান পৌছতে আমাদের পাঁচ দিন দেরি হয়ে গেল। তীরে পৌছতে পরম বিশ্রামের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম, জাহাজঘাটে মহাত্মা গান্ধী আমাদের জন্তে অপেক্ষা করছেন। জেনারেল স্মার্টস মীমাংসা চান, তাই তিনি বিনা সর্ত্তে গান্ধিজীকে মুক্তি দিয়েছেন। বুকলাম, অসমর্থনীয় পোল-ট্যান্সের বিরুদ্ধে সারা পৃথিবীর আপত্তিকে উপেক্ষা করা আর সম্ভব নয়।

দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতীয় নিগ্রহের মূল রহস্য কী, তা বৃকতে আমাদের কিছুমাত্র দেরি হোলো না। মূল কারণ জাতিভেদ আর বর্ণবিশেষ। ভারতীয়রা বৃককায় জাতি ;—একমাত্র বাগিচার মালিকরা ছাড়া দক্ষিণ-আফ্রিকার অল্প সমস্ত ইউরোপীয়ানরা চাইত ভারতীয়দের দক্ষিণ-আফ্রিকা থেকে দূর করে দিতে। ভারতীয় শ্রমিকদের কেন যে আমদানী করা হয়েছিল, এই ছিল তাদের মহা দুঃখ। আফ্রিকার অশ্রায় বৃককায় জাতিদের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক হীনতার মধ্যে জীবন কাটাতে হতো,—ইউরোপীয়ানদের উদ্দেশ্য হোলো ভারতীয়রাও যতোদিন দক্ষিণ-আফ্রিকায় থাকবে, ততোদিন তাদেরও বর্ণমালিন্তের হীনতা মেনে নিয়ে নিরুপস্থ অবস্থায় থাকতে হবে।

দিল্লীতে অথবা ট্রান্সবালের সঙ্গে শিমলা পাহাড়ে যখন আমি ছিলাম

তখন খৃষ্টান-সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতিভিমান ও বর্ণবিদ্বেষের প্রেতর্য আমাকে অত্যন্ত বাধিত করে তুলেছিল। জাতির বাধা আর বর্ণের বাধা মানুষ আর মানুষের মধ্যে প্রাচীর তুলবে,— আমি ভাবতাম প্রকৃত খৃষ্টান হয়ে এই বাধাকে আমি মেনে নেব কেমন করে? এই বাধার ফলে পৃথিবীতে এমন এক জাতিভেদ প্রথাও সৃষ্টি হবে যা আমার প্রভু যীশুখৃষ্ট চাননি। তিনি বলেছিলেন, মানুষের মানুষেরে ভাই ভাই আর সর্বমানবের পরমপিতা ঈশ্বর। এই জাতিভেদের ফলে খৃষ্টীয় বিশ্বসমাজ টুকরো টুকরো হয়ে যাবে, ধর্মের ঐক্যকে খান ফান করে দেবে জাতিভিমানের অস্ত্র। সর্বমানবের ভ্রাতৃত্বের মৌলিক দাবীর জঙ্ক ক্রমে আত্মবিসর্জন করেছিলেন খৃষ্ট। কিন্তু খৃষ্টান হয়েও হুই জাতি পাশাপাশি বসে উপাসনা করতে পারে না। আমি ভাবতাম এ কী আমরা করছি, কোন সর্বনাশা পথে আমরা চলেছি। খৃষ্টান হয়ে খৃষ্টের মুখে কলংকলপন করে নুতন করে কি আবার তাঁকে ক্রুস-বিন্দু কবব?

ধর্মগ্রন্থ পাঠ করেও আমি স্পষ্ট উপলব্ধি করেছিলাম— ইহুদীদের জাতীয় কুশলগুণত্বা যখন প্রাথমিক খৃষ্টীয় সমাজকে দ্বিগুণিত করতে উদ্বৃত্ত হয়েছিল, তখন এটি বিপদকে প্রতিহত করবার জন্তে খৃষ্টশিষ্য পল এমন কি সাধু পিতারেরও মুখোমুখি দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছিলেন। জাতিভেদের বিরুদ্ধ সাবধানবাণী পলের পত্রাবলীর ছত্রে ছত্রে লিখিত আছে।

নিউ-টেটামেন্টের অত্যন্ত প্রধান ও প্রত্যক্ষ শিক্ষা জাতিভেদকে পরিত্যক্ত করার শিক্ষা। জাতি মিলনের বাণী খৃষ্টের দ্বার্বিহীন সম্প্রদায় বাণী। সাধু পল লিখেছেন,—“যীশুর দৃষ্টিতে ইহুদীও নেই, গ্রীকও নেই, আর্য নেই, অনার্য নেই,—প্রভু নেই, দাস নেই, খৃষ্টই সর্বধর্ম এবং সকলের মধ্যেই তিনি বর্তমান।”

কিন্তু যখন আমি নাটালে পৌঁছলাম তখন দেখলাম যে মানুষের মানুষেরে যে বৈষম্যকে আশ্রয় প্রাপ্ত করে সাধু পল চেষ্টা করেছিলেন, ঠিক সেই বৈষম্য নাটালের খৃষ্টীয় সমাজকে কলংকিত করে রেখেছে। খৃষ্টীয় সমাজের মধ্যে জাতিভেদ যে কেবলমাত্র সরকারী কাজে করে প্রেতর্য পাচ্ছে তাই নয়, এই অজ্ঞায়কে আইনের সাহায্যে পরিপুষ্ট করা হচ্ছে। জাতিবৈষম্যের ভিত্তিতে পৃথক পৃথক গির্জা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। জাতিতে জাতিতে সামাজিক গণ্ডিবদ্ধতা গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে, জনমতও এই ভেদবুদ্ধির ভিত্তিতে গঠিত হচ্ছে।

এই ভেদবুদ্ধির বীজ উগ্ঠ হয়েছিল অতীতে, যখন বুয়র শাসনের যুগে আইন ছিল যে রাষ্ট্রে বা ধর্মে খেতকার কৃষকায়দের মধ্যে পার্থক্য থাকবেই, উভয়কে কিছুতেই সমদৃষ্টিতে দেখা হবে না। সেই অতীত কলংকের দায়ভার গ্রহণ করে সেই একই নীতিহীন পন্থা নাটালের ব্রিটিশ অধিবাসীরাও বহন করেছে এবং একই প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে।

প্রথম যেদিন আমরা ডারবানে পৌঁছলাম সেই দিনই এই জাতিভেদের কুসংস্কার আমাদের চোখে স্পষ্ট ধরা পড়ল। তারপর অবিলম্বে দিনে দিনে এই সংস্কারের বানা কুৎসিত অভিব্যক্তির সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত পরিচয় হতে লাগল। এই পাপ বিবাস্ত সঙ্কমণের মতো সূক্ষ্ম সমাজদেহের সঙ্গে সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। এই

সংক্রমণ দক্ষিণ-আফ্রিকায় অনেক দিন থেকে শুরু হয়েছিল এবং এই ব্যাধিকে রোধ করবার চেষ্টাও কলংকিত গেলো কিছুই হয়নি। খৃষ্টান সমাজের বিভিন্ন শাখায় গভীরে এই বিষ বাসা বেঁধেছিল।

এ ব্যাপারে ইসলাম ধর্মের নির্দেশ অতি স্পষ্ট,—ইসলাম-ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে জাতিভেদের কোনো স্থান নেই। আমাদের পক্ষে অতি লজ্জার কথা যে খৃষ্টীয় ধর্মসমাজ এ পর্যন্ত এই জাতিভেদের বিরুদ্ধে নিত্যন্ত সশীলকণ্ঠে প্রতিবাদ জানিয়েছে। মৌখিক ধর্মকথার সঙ্গে ব্যবহারিক আচরণের কোনো সম্বন্ধ না থাকার জন্তে এই দুর্বল আত্ম-অবিশ্বাসী প্রতিবাদ কার্যকরী হয়নি।

এক খৃষ্টান গির্জায় যাজনা করার নিমন্ত্রণ আমি পেরেছিলাম। মহাত্মা গান্ধী আমার যাজনা শুনে চেয়েছিলেন বলে উইলি পিয়াসন তাঁকে গির্জায় নিয়ে এসেছিল। পলে আমি জানলাম যে গান্ধীজী কৃষ্ণকায় এসিয়াবাসী বলে তাঁকে গির্জার মধ্যে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। এই ঘটনার আমার লজ্জার পরিসীমা ছিল না। আমার মনে হয়েছিল স্বয়ং যীশুখৃষ্টকে যেন তাঁর আপন মন্দিরদ্বার থেকে ওরা দূর করে দিয়েছে। কিন্তু এমনি ঘটনাই দক্ষিণ-আফ্রিকার খেতকার খৃষ্টানদের পক্ষে ছিল স্বাভাবিক।

কিছুদিন পরের আর একটি ঘটনার কথা বলি। তখন আমি কেপ টাউনে গিয়েছি। শুনেছিলাম, নাটাল অপেক্ষা কেপ টাউনে বর্ণবিদ্বেষের উন্মাদ অনেক কম। আমার ব্যক্তিগত প্রয়োজনে

কলিকাতায় এই সর্বপ্রথম

আর্যের “স্লাইসড ব্রেড”



প্রতি প্যাকেট
২৪ টি
স্লাইস ব্রেড

- কলমে প্রস্তুত
- স্ট্রোমে সেকা
- মোসিনে প্যাক
- ও ফালি করা

আপনার স্বাস্থ্য, তৃপ্তি
ও সর্বস্ব রক্ষা করিতে

আর্য বেকারি অ্যান্ড কন্ফেকশনারি

কলিকতা - ২৯

আমাকে দেখানো করবার জন্তে গাঙ্গিজী তাঁর পুত্র মণিলালকে আমার সঙ্গে দিয়েছিলেন।

মণিলাল যে কী ভাবে আমার সেবা-যত্ন করেছিল তা বলবার নয়। আমিও তাকে পুরাতন গ্রেহ করতাম। এক দিন মণিলাল অতি উদগ্রীবভাবে আমাকে বলল, এক দিন কোনো গির্জায় বসে আমার উপদেশ সে শুনবে এই তার বড়ো সাধ। সহরের উপকণ্ঠে একটি গির্জা ছিল, সেখানকার ধর্মযাজক ছিলেন ভারতীয়দের স্নহদ। সেই গির্জায় আমি মণিলালকে নিয়ে গেলাম।

এই গির্জায় যাজক আমাদের সাগ্রহে আমন্ত্রণ করলেন। প্রার্থনা-সভা আরম্ভ হবার আগে তিনি ও তাঁর স্ত্রী আমাকে ও মণিলালকে চা খাওয়ালেন। এ পঞ্চস্ত ভালোয় ভালোয় কাটল দেখে আমি প্রস্তাব করলাম প্রার্থনাসভায় মণিলালকে নিয়ে যাব। ধর্মযাজকের মুখ তার হোলো এ কথা শুনে। তার কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু আপত্তি করলে উপাসকগণের। স্বেতকার উপাসকদের পাশাপাশি গির্জার মধ্যে বসে কোনো ভারতীয় বালক যন্ত্র বাণী শ্রবণ করবে,—অসম্ভব এ প্রস্তাব! কিন্তু বেচারী মণিলালের আকাঙ্ক্ষা আমি মিটাই কী করে? শেষ পর্যন্ত একটা আপোস মীমাংসা হোলো। মণিলাল গির্জায় ঢুকবে না, গির্জার দোরগোড়ায় বসে কান পেতে ধর্মোপদেশ শুনবে।

একের পর এক এমনিধারা নানা ঘটনার অভিজ্ঞতা আমার হতে লাগল। একটি ঘটনার কথা বলব, কারণ ঘটনাটি আমার মনে গভীর রেখাপাত করেছিল।

কেপ টাউনের সেট জন গির্জায় কোনো বর্ণবিভেদ ছিল না। এক রবিবার প্রত্যুষে আমি সেই গির্জায় হোলি কমিউনিয়নে যোগ দিলাম। খুষ্ঠির পূর্তবশেষ সমস্ত উপাসক গ্রহণ করেছেন, এবার আমার ধর্মোপদেশ দানের পালা। হঠাৎ চোখে পড়ল এক বিশীর্ণা বৃদ্ধা নিগ্রো মহিলা প্রার্থনাসভার শেষ প্রান্ত থেকে স্তম্ভ চরণে আমার দিকে এগিয়ে আসছেন। সমস্ত ইউরোপীয়ান উপাসকরা যতোকণ না নিজের নিজের আসনে গিয়ে বসেন ততোকণ ঐ কৃষকায়ী বৃদ্ধা সকলের পিছনে অপেক্ষা করছিলেন। আমি তাড়াতাড়ি তাঁর সামনে পূর্তবশেষ নিয়ে এগিয়ে গেলাম। গভীরতম ভক্তিতে মাথা নিচু করে তিনি হাঁটু গেড়ে আমার সামনে বসলেন। সহসা আমার মনে হোলো ঐ নতজান্না নিগ্রো বৃদ্ধার মূর্তি যে সনস্ত আফ্রিকা মহাদেশের আত্মার প্রতীক,—যে আত্মা ইউরোপের অগণিত অজ্ঞায়ের বেদনায় মুহম্মান নতশির। বিনম্র সহিষ্ণুতার অনন্ত শক্তি দিয়ে স্বেত জাতির ঐ অশেষ অজ্ঞায়কে আফ্রিকা আপন শিরে ধারণ করেছে, এই নির্ধাক নিরুদ্ধ শক্তির মধ্যেই নিহিত রয়েছে আফ্রিকার আসন্ন মুক্তির শ্রেষ্ঠ অঙ্গীকার।

এই গির্জায় ধর্মোপদেশ দানের জন্তে এখানকার ডীন আমাকে অমরোধ করেছিলেন। কিন্তু চারিদিকে দিনে দিনে যে সব নিষ্ঠুর দৃষ্ট আমি দেখছি তাতে আমার সমস্ত অন্তর তখন ঝলছে। আমি বললাম, এই আফ্রিকা পরমপিতা একেশ্বরকে ভুলেছে, তার বদলে এখানে দুই দেবতার পূজা। এক দেবতার নাম স্বর্গত্বা, আর এক দেবতার নাম বর্ণবিষেব। বর্ণবিষেব সশব্দে বলতে গিয়ে এই উপাসনা-সভায় আমার মনের সমস্ত পূজীভূত অমুভূতি সেদিন আমি প্রকাশ করে ফেললাম।

পরে আমার সমস্ত মন এক গভীর হতাশায় ভরে গেল। মনে হোলো, এই উপাসনাসভা, এ যেন এক স্বেতপাথরের কঠিন দেয়াল, এই দেয়ালে একটি মাত্র রেখাপাতও আমি করতে পারিনি। তবে একটি লাভ হোলো আমার। বিধান-সভায় সন্ত-অবসরপ্রাপ্ত সদস্য জে, এন্স, মেরিয়াম আমাকে একটি স্নহদয় পত্র লিখে ধন্যবাদ জানালেন। তিনি লিখলেন,—আপনি জেনে রাখুন যে, এই আফ্রিকাতে এখনো দু-একজন আছেন যারা ঈশ্বরের নামে শয়তানের কাছে মাথা পাতেননি। এই মুষ্টিমেয়দের মধ্যে একজন সাধু আছেন, যার সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ হলে আমি খুসী হব। তাঁর একটি কাব্যগ্রন্থ আপনাকে পাঠালাম।

এই কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা মারশোনাল্যাণ্ডের আর্থার শার্লি ক্রিপস। অক্সফোর্ডে তাঁর শিক্ষা, তরুণ বয়স, অপূর্ণ কাব্য-প্রতিভার অধিকারী। আফ্রিকার আদিবাসীদের মধ্যে সরল অনাড়ম্বর ধৃষ্টীয় জীবন তিনি যাপন করেন। ঐ কাব্যগ্রন্থের মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয় ও ক্রমে ঐ পরিচয় নিবিড় বন্ধুত্বে পরিণত হয়।

আফ্রিকার বাস্তু অধিবাসীদের আমি এই সময় সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালোবাসতে শিখি। তাদের শীর্ণজাত মুখে তাদের শতাব্দীপারের বেদনা আমি অনুভব করি। আফ্রিকার মর্মরহস্তের প্রথম পরিচয় আমি লাভ করি অলিত স্রাষ্টনারের কাছ থেকে। তারপর দক্ষিণ-আফ্রিকার আর এক মহিলার কাছে আমার এই শিক্ষা পূর্ণিত হয়। ঐ মহিলা মিস মন্টেনো। অগিড স্রাষ্টনারের মতো ঐ মহিলাও শয়তানের কাছে আত্মসমর্পণ করেননি কোনো দিন। দুর্গত ও উৎপীড়িতের হয়ে সারা জীবন তিনি সংগ্রাম করেছেন। সেই সংগ্রামের চিহ্ন তাঁর স্বেত-স্তম্ভ চুলে, তাঁর মুখের অসংখ্য বলিরেখায়।

ভারতীয়দের এক সভায় আমি তাঁকে বলতে শুনেছি “দক্ষিণ আফ্রিকায় তোমরা থাকতে চাও আমি জানি। কিন্তু এ জন্তে যদি নির্ধাতন বরণে প্রস্তুত না হও তাহলে জননী আফ্রিকার উপযুক্ত সম্মান বলে দাবী করতে তোমরা পারবে না। নির্ধাতন বরণ আমাদের ঈশ্বরদত্ত অধিকার—সহিষ্ণুতার পথই ঈশ্বর-নির্দিষ্ট প্রেমের পথ। আফ্রিকাতে যদি থাকতে চাও, তাহলে ঐ আফ্রিকাকে মাতৃভূমি বলে মানতে হবে, নির্ধাতিতা জননীর সমস্ত বেদনাকে বহন করতে হবে।

ভারতীয়দের কাছে মিস মন্টেনো তাঁর জীবনের কাহিনী বলতে লাগলেন। বুয়র মেয়ে তিনি, বাস করতেন এক নির্জন গোলা-বাড়িতে। চারিদিকে নিশ্চুপ পর্বতমালা, মাঝে মাঝে বেগবতী বরণা, রাত্রির নিঃসীম অন্ধকারে আকাশভরা অসংখ্য নক্ষত্রের আলোক-ইঙ্গিত। মুষ্টিমেয় প্রতিবেশীদের মধ্যে ছিল তাঁর বাওরা-আসা। সেই বৈচিত্র্যহীন দীন পরিবেশের মধ্যে জীবন কাটাতে কাটাতে এই ছায়াভূমি আফ্রিকার আত্মশক্তির ত্রিধারাকে তিনি উপলব্ধি করলেন।

একটি শক্তিদারা সঙ্গীত। এই মেঘুর আকাশ ও শান্ত পর্বত-ছায়ার মহাদেশে বুটিন ও ওলন্দাজের কর্কশ কণ্ঠও কোমল হয়ে যায়। মাহুয়ের কণ্ঠ নিঃসৃত প্রেমসঙ্গীত কেমন ভাবে আফ্রিকার

মানবাত্মাকে নাড়া দিতে পারে, এমন আর কিছুই পারে না। অন্তরের সমস্ত তিক্ততাকে সঙ্গীতের প্রাণন হরণ করতে পারে।

দ্বিতীয় শক্তি বেদনাধারা। আফ্রিকা যতো নির্ধাতন সঙ্ঘ করেছে পৃথিবীর কোনো দেশ কোনো মহাদেশ তা করেনি। কিন্তু এতো নির্ধাতনও আফ্রিকার হৃদয় কঠিন হয়নি, কোমলই হয়েছে। বহু যুগের সহিষ্ণুতার দ্বারা নিখিল তাদের বেদনা-করণ ভাষা এক দিন বিধমানবের মর্মে গিয়ে পৌঁছেছে।

তৃতীয় শক্তি আফ্রিকার নারীজাতির নৈতিক শক্তি। অদূর ভবিষ্যতে এই শক্তিরও পূর্ণ প্রকাশ হবে। মারা পৃথিবীতে সর্বত্র নারীজাতিই স্থিতির বোঝা বহন করে। আফ্রিকার নারীর মতো এতো গুরুভার বোঝাও কোনো নারী বহন করে নি। দুর্বল ভার ও দুর্বিসহ বেদনার অগ্নিপরাক্ষণ আফ্রিকার নারী-চরিত্র নিকষিত স্বর্ণের পবিত্রতা লাভ করেছে।

মিস মন্টেনো যখন এই সব কথা বলছিলেন তখন তাঁর বেদনা-বিধব মুখের দিকে একদৃষ্টে আমি তাকিয়ে ছিলাম। আফ্রিকার ভূমিগলে বসে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে আমি আবার নতুন করে উপলব্ধি করেছিলাম যে খৃষ্টের বাণী সর্বযুগে প্রসারিত, খৃষ্টের আশীর্বাদ সর্বজাতির অধিকার। আরো উপলব্ধি করেছিলাম যে প্রেমই সর্বশক্তিমান, সমুচিত বিক্ষোভের শক্তিও এই শক্তির কাছে ন্মান। এই প্রেমের শক্তি বলেই আফ্রিকার যুগসংকীর্ণ বন্ধনার অবসান সম্ভব।

মিস মন্টেনো বলছিলেন, আফ্রিকাবাসীর নির্ধাতন বরণ ঈশ্বরদত্ত অধিকার। কয়েক দিন পবে নাটালে একটি অন্তরঙ্গপর্শী ঘটনায় মিস মন্টেনোর এই কথাব তাৎপর্য আমি প্রত্যক্ষ করেছিলাম।

ডাববানোর ভানতীয় সমাজ আমার জন্ম একটি বিদায়-সভার আয়োজন করেছিলেন। লক্ষ্য কবলাম, এই সভায় কয়েক জন জুলু উপস্থিত। এর পূর্বেও অজ্ঞাত সভায় কিছু কিছু জুলুকে আমি দেখেছি। আমি যখন বক্তৃতা দিতাম তখন তারা শুক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকত। তাদের হাবভাবের গভীর মর্যাদার প্রকাশ ও মুগ্ধগুণে গভীর বেদনার ছায়া আমাকে আকৃষ্ট করত।

এই বিদায়সভার অবসানে আমি মিঞা খান নামক এক বৃদ্ধ মুসলমানের দোকানে ফিরে গেলাম। এইখানেই আমি থাকতাম। মিঞা খানের সঙ্গে চা পান করতে বসেছি এমন সময় দুজন জুলুনোতা সেখানে এসে উপস্থিত হলো। আমরা তাদের আমাদের সঙ্গে চা পান করতে নিমন্ত্রণ করলাম। তখন একজন জুলু আমার দিকে নির্দেশ করে মিঞা খানকে স্থানীয় ভাষায় বললে, আমরা এঁকে একটা প্রশ্ন করতে পারি?

মিঞা খান আমাকে বুঝিয়ে বলতে আমি বললাম, নিশ্চয়ই, আপনি অকপটে বলুন কী আপনার প্রশ্ন?

আমার দিকে ফিরে সেই জুলুনোতা তখন বললে, ভারতীয়দের সঙ্গে আপনি যখন কথা বলেন তখন আপনার চোখের দিকে তাকিয়েই আমরা বুঝতে পারি যে তাদের জন্তে প্রাণ দিতে আপনি প্রস্তুত। আমাদের জন্তেও প্রাণ দিতে কি আপনি পারেন?

আশ্চর্য এই প্রশ্ন! এই প্রশ্ন এতো বেদনা-উজ্জ্বল যে সোজা হৃকের মধ্যে গিয়ে বেধে। এই প্রশ্ন এতো সহজ যে সহজ উত্তর

ছাড়া এর কোনো উত্তর নেই। হৃদয়ের সমস্ত আন্তরিকতা দিয়ে এ প্রশ্নের উত্তর কেমন ভাষায় দেব, তাই ভাবতে আমার এক মুহূর্ত দেরি হলো। তারপর দ্বিকল্পিত না করে সহজ প্রশ্নের সহজ উত্তর দিলাম। বললাম, হ্যাঁ পারি। সময় যেদিন আসবে সেদিন আপনাদের জন্তেও প্রাণ দেবার জন্তে আমি প্রস্তুত।

উত্তর দিতে মুহূর্তমাত্র দেরি করেছিল আমার। সেই মুহূর্তে চকিত বিহ্বল-বিকাশের মতো এই সত্য আমার অন্তরে উদ্বাটিত হয়েছিল যে, যিশুর সেবার জাতিভেদের স্থান নেই, তাঁর দৃষ্টিতে সব মানুষই সমান। তাঁর অনন্ত প্রেমসমুদ্রে সর্বজাতির সর্গদারা এসে মিশেছে।

আর একজন মহাপ্রাণবতী মহিলার সঙ্গে আমার এখানে পরিচয় হয়েছিল। তিনি ডবলু ই গ্র্যাডপ্টানের কন্যা মিসেস ডু। তাঁর ভ্রাতা লর্ড গ্র্যাডপ্টান ছিলেন তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল। ভারতীয় সমাজের এই সংগ্রামে তাঁর আন্তরিক সমর্থন ছিল এবং তিনি নীরবে তার ভ্রাতাকে সাহায্য করতেন। হৃগত মানবাত্মার গভীর বন্ধনাকে তিনি সমস্ত অন্তর দিয়ে অনুভব করেছিলেন,—তাঁর পবিত্র দৃষ্টিতে করুণাধারা করে পড়ত। মহাত্মা গান্ধী ও গান্ধী-পত্নীর প্রতি তাঁর সত্যভক্তিপূর্ণ কথাবার্তায় আমি অত্যন্ত আনন্দ লাভ করতাম।

মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় এই দক্ষিণ-আফ্রিকায়। সেই প্রথম দর্শনেই আমাদের উভয় হৃদয় এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা পড়ে যায়,—সে বন্ধন এ জীবনে কখনো শিথিল হবে না। আমাদের দুজনের হৃদয়ের মাঝখানে যে প্রেম-মন্দাকিনী প্রবাহিত,—সে স্রোতে কোনো ভাঁট নেই।

মহাত্মা গান্ধীর বেদনান্বিত কঠোর জীবনের মধ্যে আমি প্রত্যক্ষ করেছি নির্ধাতন-সহিষ্ণুতার সর্বজয়ী পরমশক্তি। গান্ধীজীর সম্পর্কে এসে আমি ভয়ে ভয়ে জয় করতে শিখেছি। অগ্নিকুলিঙ্গের স্পর্শে প্রদীপ যেমন জলে, আমার চরিত্রের যা কিছু নিষ্পত্ত শুভবোধ তাঁর চরিত্রস্পর্শে তেমনি জাগ্রত হয়েছে, উজ্জীবিত হয়েছে আমার প্রেরণা। সামান্ততম প্রাণ যেখানে নির্ধাতিত,—সেখানেই তাঁর অনন্ত মমত্বের প্রাণ ছুটে গেছে। এমনি ভাবে আব্রাহাম ছুটে ছুটে তাঁর হৃৎ-সন্ধানী আত্মা বিরামহীন আবেগে সেই অনির্বচনীয়েরই সন্ধান করেছে,—যাঁর নাম সত্য, যাঁর অপর নাম ঈশ্বর।

ডাঃ বসুর

মেমোরি কার্ডিয়েল

নারীর স্বাস্থ্য, শক্তি
ও সৌন্দর্য বর্ধন করে

প্রথম প্রস্তুতকারক:

ডাঃ বসুর ল্যাবরেটরী লিঃ
কলিকাতা-৯

একটি উষ্ণ দিনের কথা মনে পড়ে। ট্রান্সভালে প্রিটোরিয়া শহরের কাছে একটি নদীতীরে মহাস্থান সঙ্গে আমি বসে আছি। আমি তাঁর সঙ্গে তর্ক করছিলাম এই বলে, সৃষ্টির উন্নততর প্রাণী নিম্নতর প্রাণীকে ভক্ষণ করে বেঁচে থাকে, এটা প্রকৃতির নিয়ম,— অতএব মানুষ যে পশুপক্ষী গায়, সেটা নীতিবিরুদ্ধ নয়।

গান্ধিজী আমার চোখের উপর চোখ রেখে বললেন,—কিন্তু খৃষ্টান হয়ে তুমি এই যুক্তি কী করে দাও? তুমি তো বিশ্বাস করো যে পরমপ্রভু মানব-জন্ম নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন জীবনকে রক্ষা করবার জন্তে, ধ্বংস করবার জন্তে নয়। তোমাকে আমাকে সকলকে রক্ষা করবার জন্তেই যীশুখৃষ্ট আত্মবলিদানকে সত্য বলে গ্রহণ করেছিলেন। তবে? জীবন নেওয়া নয়, জীবন দেওয়া,—এই কি জীবনের শ্রেষ্ঠ সত্য নয়?

তাঁর এই কয়েকটি কথার মতোই গান্ধিজীর জীবনসত্যকে আমি উপলব্ধি করেছিলাম। গান্ধিজীর জীবনের ব্রত শুধু দেওয়া,—কিছু নেওয়া নয়—চরম আত্মদানের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অবিরাম অবিশ্রাম শুধু দেওয়া,—এই দেওয়ার মধ্যেই অনিবাণ আনন্দ। প্রথম থেকেই অন্তরের স্ফূর্তি দিয়ে আমি উপলব্ধি করেছিলাম যে গান্ধিজী একজন অশেষ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ধর্মমতাত্ত্বিক নৈশ্চর্য্যই, ধীর আস্থানে অসংখ্য নরনারী বিগলিত চিত্তে অসহনীয় দুঃখ-বিপদকে বরণ করে নেন,—কিন্তু এটুকুই গান্ধিজীর পরিচয় নয়। ঐ আকাশের তারাকুল যেমন সত্য, ঐ নিত্যস্থায়ী পর্বতমালা যেমন সত্য, ঐ অবিনশ্বর চিরন্তন চিরন্তন সত্যের মূর্ত প্রকাশ মহাত্মা গান্ধী। সমস্ত বাধা-বেদনাকে অতিক্রম করে কে? সমস্ত অসুখকে হরণ করে কে? সমস্ত শক্তির অধিকার পরম শক্তি তা? অনন্ত সহিষ্ণু প্রেম। গান্ধিজীর এই একমাত্র বাণী। এই বাণী পরম সত্যের বাহ্যিক রূপ। মিস মন্টেনোও গভীর হৃদয়বেগের সঙ্গে এই একই সত্যের প্রতিধ্বনি করতেন যখন তিনি বলতেন, সহিষ্ণুতার পথই ঈশ্বর-নির্দিষ্ট প্রেমের পথ।

এই সত্যের ব্যবহারিক পরীক্ষা আমি দক্ষিণ-আফ্রিকার সংগ্রামের মধ্যে নিত্য প্রত্যক্ষ করেছিলাম। সেখানকার নিত্য-নিষাতিত ক্ষুদ্রকায় ভারতীয় সমাজের অবস্থা দেখে প্রথম শতাব্দীর খৃষ্টলভ-সম্প্রদায়ের কথা আমার মনে পড়ত। সহজ সরল অন্তর মাধুর্য ভরা সামান্য একটি গোষ্ঠী, তাদের ঘিরে বিদেহ ও ভেদাভেদের বিকল হলাহলবস্থা।

মহাত্মা গান্ধীর ফিনিশ আশ্রমে গিয়ে প্রথম দিনই এই চিত্র স্পষ্ট প্রতিভাত হলো। গান্ধী ও তাঁর ঘনিষ্ঠ অনুবর্তীরা এই আশ্রমে তাঁদের ধর্মজীবনের সূচনা করেছিলেন। শিশুদের মহাত্মা বড়ো ব্রহ্ম করতেন। শ্রীযুক্তা গান্ধী ও তাঁর পুত্ররা তখনো কারাক্ষ। আমি গিয়ে দেখলাম, এই নিরাস্বীয় মানুষটিকে প্রিয় শিশুর দল ঘিরে

রয়েছে। ভারতের অচ্ছন্ন সমাজের একটি শিশুকন্যাকে কোলে নিয়ে তিনি বসে আছেন; আর একটি কণ্ঠ পঙ্খ মুসলমান বালক তাঁর কোলের একটি কোণ দখল করবার চেষ্টা করছে। আমাকে সঙ্গে আহার করবার জন্তে নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছে একটি জুলু খৃষ্টান রমণী।

সেদিন সন্ধ্যায় অনেক আলোচনা হলো। ব্রিটিশ ও বুররদের সম্বন্ধেও অনেক কথা হলো, কিন্তু কোনো কথায় হিংসা নেই উদ্বেগ নেই, ছালা নেই। দিনান্তের সেই অবসর অন্ধকারে ধর্মগ্রন্থে কয়েকটি কথা কেবলই আমার মনে পড়তে লাগল,—

“যারা বিশ্বাস করে, তাদের এক প্রাণ এক আত্মা; তার একসঙ্গে আহার করে; প্রভুর নামে হৃৎস্বরণের জন্তে তার নির্বাচিত হয়েছে সেই একই আনন্দে তারা বিভোর হয়।” সবকিছু পরিসরক্ষণ সম্বন্ধেও চুক্তিদাস-প্রথার বীভৎস রূপের সঙ্গে পরিচিতি সকলোই আমার পবিচয় হলো। মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে আমি বেড়াতে বাঁচ হয়েছিলাম। হঠাৎ একটা ইক্ষু-বাগিচার ধারে একটি মূর্তি আমাদের চোখে পড়ল। পথের পাশে গুঁড়ি মেয়ে রয়েছে একটা লোক। মহাত্মা গান্ধীর কাছে এসে সে তাঁর পদ ধূলি নিল ও নিজের নগ্ন পিঠটা খুলে তাঁকে দেখাল। চাবুক আঘাতে আঘাতে সমস্ত পিঠটা ক্ষতবিক্ষত। বুরলান, অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে লোকটা বাগিচা থেকে পালিয়ে এসেছে ও মহাত্মা গান্ধীর আশ্রয় চাইছে। আমি কিছুটা পিছনে ছিলাম, এখন লোকটির পিঠের ক্ষতগুলি পরীক্ষা করবার জন্তে সামনে এগিয়ে এলাম। লোকটি যখনই দেখল আমি ইউরোপীয়ান, তখনই সে আতকে কঁকড়ে গেল, এই বৃষ্টি আবার তাকে আমি মারব আমি ধৈর্য্যকায় হলেও তার শত্রু নই, বন্ধু, এ কথা তাকে বুঝিয়ে দাওয়া সহজ হলো না। আমি যখন প্রথম তার সামনে গিয়ে দাঁড়াই তখন তার চোখের সেই ভয়াবহ বিহ্বল দৃষ্টি বহু দিন আমি মন থেকে মুছে ফেলতে পারিনি।

চারিদিকের এই সব ঘটনা ও দৃশ্যের মাঝখানে দেশ থেকে সেই তারবারাটি এসে পৌঁছলো, যেটি আসবে বলে সমানে আমি ভয় করছিলাম। আমার মা আর ইহজগতে নেই। নিরাস্বীয় বিদেশে বসে এই সংবাদ আমি পেলাম। তখন শ্রীযুক্তা গান্ধীর সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন ভারতীয় জননী আমাকে মাতৃবিয়োগ-শোকে সাহায্য দিতে এলেন। ভারতীয় জননীবৃন্দ, প্রেমময়ী সাহসানাদাত্রী তোমরা, বিদেশী সম্ভ্রান্তকে কী পবিত্র ব্রহ্মহৃদয়দানে তোমরা ভূপ্ত করছ। শোকের মর্মান্তিক আঘাতে যে করুণ সাহসানাম্পর্শে যে অকপট ভালোবাসায় তোমরা আমাকে অভিযুক্ত করছ, সে অপরিণাশয় ঋণ সারাজীবনে আমি ভুলব না। [ক্রমশঃ।]

অনুবাদক : নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

ভুল
বন্ধু

ফুলের কুঁড়ি যেমন থাকে নিলীন হোয়ে মত্ত আপন গাছে,
তেমনি তুমি নীরব হোয়ে গুঞ্জরিত তোমার হৃদয়-মাঝে।

ভুলের 'পরে' ভুল জমেছে তাই তো তোমায় গভীর কোরে চাই,
আমায় তুমি ফমা কোরো—ভুলকোরেছি বুঝতে পারি নাই।

আবার **আশ্চর্য্যজনক** সুস্থবোধ করুন!



ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড একটি সুপরীক্ষিত স্বাস্থ্যপ্রদ টনিক। পৃথিবীর সর্বত্র স্বাস্থ্যসচেতন ব্যক্তির নিয়মিত এটি নিজেরা ব্যবহার করেন ও তাঁদের ছেলেমেয়েদেরও খাওয়ান।

ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড এমনসব প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর উপাদান দিয়ে তৈরী যা আপনার ও আপনার পরিবারের সকলের বল, স্বাস্থ্য ও আনন্দোজ্জ্বল জীবনের জন্ত বাড়তি শক্তি যোগায়।

ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড অবিরাম কাশি, সর্দি ও বৃকে শ্লেষ্মা থামায়। রোগমুক্তির পর হ্রতস্বাস্থ্য দ্রুত পুনরুদ্ধারের জন্ত চিকিৎসকেরা অনুমোদন করেন।



এখন চুরি-নিরোধক কাপ এবং নূতন লাল সেবেলবুজ বোতলে পাওয়া যায়।

এক্ষেণে লাল বোডক বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

চমৎকার সুস্বাদু

ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড

সেবন করে নিজেকে সুস্থ রাখুন



১

যক্ষপুরী

যদিও বিকেল থেকেই আকাশের চেহারা ভাল ছিল না, কেমন যেন মুখ ভার করে গম্ভীর হয়ে বসেছিল, তবু সন্ধ্যা না হতেই যে এরকম ভড়বড় করে বৃষ্টি এসে পড়বে তা কমলেশ মোটেই ভাবেনি। তাবলে অসম্ভব এই দুর্ঘটনার মধ্যে একলা ছোট্টলৈ ফেরবার চেষ্টা করত না। বিশেষ করে এ অঞ্চলে ও যখন নতুন লোক, পথঘাটও ভাল করে চেনা নেই।

সহর থেকে চার মাইল দূরে নতুন গড়ে উঠেছে এক কলোনী। অনেকগুলি পরিবার যারা গ্রামের সহজ সুন্দর জীবন ভালবাসে, সহরের মধ্যে বাস করতে যাদের প্রাণ ঝাপিয়ে ওঠে, তারাই শুধু এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছে। জমি অনেকখানি, তারই মধ্যে ছোট ছোট সব বাড়ী, কম করে পঞ্চাশটি সংসার এখানে থাকে। এখানকার ছেলে বড়ো সবাই কাজ করে কলোনির জন্তে, যার যেসকল ক্ষমতা। গাঁদের ছেলেদের পড়বার সুবিধের জন্তে এই কলোনী থেকেই করা হয়েছে স্কুল, আর তার সঙ্গে লাগোয়া হোটেল। কমলেশ এই ছোট্টলৈই থাকে।

কমলেশের বয়স বছর চোদ্দ। মামার বাড়ীতে থেকে পড়াশুনা করছিল কলকাতায়। বাবা কাজ করেন মফঃস্বলে, তার

উপর বদলির চাকরি, এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হয়। কমলেশেরই মুশ্কিল হত সবচেয়ে বেশী কতবার সে স্কুল পালটাতে? কলকাতায় থেকে তার সেই সুবিধা হয়েছে বেশ কয়েক বছর একই স্কুলে পড়তে পারছে। কিন্তু তা হলে হবে কি, কলকাতায় স্কুলে আর যা কিছুই হোক না কেন পড়াশুনাটা হয় না। ছেলেরা সব তৈরী হয়ে থাকে কোনরকম ছুতো পেলে হয়, তাহলেই ওরা ঠাইক করে স্কুল থেকে বেরিয়ে যাবে। বেচারী মাষ্টার মশাইরা আর কি করবেন, ইচ্ছে থাকলেও পড়াবেন কাকে? প্রথম প্রথম কমলেশও অন্যদের সঙ্গে ঠাইক করেছে, তৈ তৈ করে আনন্দ পেয়েছে, ঠাইক করে বাড়ী এসে গরম গরম বড়ুতা দিয়েছে। কিন্তু তার মতামত ক্রমশ বদলে গিয়েছিল সদাশঙ্করের সঙ্গে আলাপ হবার পর থেকে। সদাশঙ্কর বুঝি কোন কলেজে পড়তো কিন্তু তার বুদ্ধি কলেজের সীমা ছাড়িয়ে ঘুরে বেড়াতো বড় দূরে। তখন থেকেই নিজের মতামত লিখতো, বিভিন্ন কাগজে প্রকাশ করতো। কমলেশের সদাশঙ্করকে খুব বেশী ভাল লাগত। সব জিনিসকে এত সহজ করে বুঝিয়ে দেবার ক্ষমতা সে আর অন্য লোকের মধ্যে দেখেনি।

সদাশঙ্করের অনেকগুলো কথা সে আজও তুলতে পারে না, কত সময় মিটি হেসে বলতেন, স্কুল ঠাইক করে কি লাভ? গোমরা এখন ছাত্র, যদি পড়াশুনা না কর, দেশের কি কাজে লাগবে বলতে পারো?

কমলেশ হয়ত কখনও তর্কের খাতিরে বলেছে, তা বলে অন্যদের বিরুদ্ধে আমরা প্রতিবাদ করব না?

—তা করবে না কেন? কিন্তু ইস্কুল কি দোষ করল, ঠাইক করে ছেলেরা তো সিনেমায় গিয়ে ভীড় করে। তাতে কি লাভ? চল তুমি আমার সঙ্গে একদিন, আমরা যে কলোনীতে থাকি, সেখানে একটা স্কুল খুলেছি, ছেলেরা কি বকম পড়াশুনা করে দেখলে তুমি খুসী হবে। এর নাম দিয়েছি বিজ্ঞাপীঠ।

কমলেশ সেই প্রথম শুনেছিল বিজ্ঞাপীঠের কথা। একদিন শঙ্করদা'র সঙ্গে গিয়ে দেখেও এসেছিল। ভাল লেগেছিল। তাব কিন্তু এখানে এসে যে পড়াশুনা করবে তা সে মোটেই ভাবেনি। বাবা মাকে অল্প সে উচ্ছাসভরে চিঠি লিখে জানিয়েছিল, শঙ্করদা'র এই আদর্শ স্কুলের কথা, কিন্তু কোন জায়গায় লেখেনি সেখানে গিয়ে একলা ছোট্টলৈ থেকে তার পড়বার ইচ্ছে আছে। বরং তার বাপট লিখেছিলেন, তোমার শঙ্করদা'র বড় ভাল ছেলে, যদি চাও, তুমি এদের বিজ্ঞাপীঠে পড়তে পার, আমি সব ব্যবস্থা করে দেব।

দিন আগত ঐ

যক্ষপুরী

বিজ্ঞাপীঠে যাবার কথা তখন না উঠলেও কয়েক মাসের মধ্যেই কমলেশ স্থির করল সে ওখানেই চলে যাবে। তার প্রধান কারণ অবশ্য প্রশান্ত আর তার দিদি রেণুকা। কলকাতায় এসে স্থলে ঢোকার পর থেকে যার সঙ্গে তার সবচেয়ে বেশী বন্ধুত্ব হয়েছে, সে প্রশান্ত। ওরই বয়সী ছেলে, ফর্সা রঙ, টানা-টানা চোখ, কেমন যেন নরম চেহারা। পড়াশুনোর খুব ভাল না হলেও স্বভাব বড় চমৎকার। কমলেশ কত দিন ওদের বাড়ীতে গেছে। ছোট্ট দু'খানা ঘরের বাসা-বাড়ী, অভাবের চিহ্ন চারিদিকে সম্প্রসৃত। প্রথম যেদিন কমলেশ ওদের বাড়ী যায় প্রশান্তের মুখে সে কি হাসি, বলেছিল, আমি জানতাম তুই ঠিক আসবি। ক্লাশের সকলকেই তুই ভালবাসিস—

নিজের প্রশংসায় লজ্জা পেরেছিল কমলেশ, দেয়ালে আঁকা একটা ছবির দিকে চেয়ে থাকে, বাঃ বড় সুন্দর তো, কেনা বুঝি?

—কেনা নয়, দিদির আঁকা।

—তোর দিদি আছে?

—হ্যাঁ, আমার চেয়ে দু'-তিন বছরের বড়, ওর এবার ফার্স্ট ক্লাস।

হাতে খাবারের থালা নিয়ে তাদেরই বয়সী একটি মেয়ে ঘরে ঢোকে।

প্রশান্ত আলাপ করিয়ে দেয়, এই আমার দিদি।

রেণুকা হেসে জিজ্ঞেস করে কেন, আমার কথা হচ্ছিল বুঝি?

—কি সুন্দর আপনি ছবি আঁকেন?

—আমাকে আর আপনি কেন ভাই, তুমি বল।

সেই ওদের সঙ্গে প্রথম আলাপ। তারপর কত দিন কমলেশ ওদের বাড়ী গেছে, প্রশান্তের দিদি সত্যিই ভাল ছবি আঁকে। শ্রামল বাংলার কত অপূর্ণ ছবি, জীবনের কত দৃশ্য। রেখায় কত অমর মুহূর্তকে ধরে রেখেছে। এত ছবি, এত সুন্দর, অবাক হয়ে চেয়ে থাকে কমলেশ। জিজ্ঞেস করে, এগুলো প্রকাশ করা হয় না কেন?

দিদি উত্তর দেয়, কি করে করব, আমাদের জানা-শুনো তো কেউ নেই? কমলেশ ভাবে সত্যিই তো, জানা-শুনো না থাকলে এদেশে কিছুই করা যায় না। প্রশান্তদের বাড়ীতে এসেই কমলেশ সত্যিকারের জীবন দেখতে পেরেছিল, প্রশান্তরা বই পড়তে চায়, কিন্তু বই পায় না। রেণুকারি'র ছবি আঁকার সুন্দর হাত, কিন্তু তার সুযোগ কই? অভাব এদের সব নষ্ট করে দিচ্ছে। এদের বাড়ী বার বার এসে কমলেশের শুধু মনে হয়েছে, এখানে যেন 'নেই'-এর একটা মিছিল চলেছে। কাগজ নেই, বই নেই, সুযোগ নেই। কমলেশের কত সময় মনে হয়েছে এদের যদি সে সাহায্য করতে পারত কিন্তু তার শক্তি কতটুকু, কি করতে পারে সে?

আরও ব্যথা পেত যখন সে দেখত, তারই ক্লাশের ছেলে সুধান্তদের বাড়ী। কি বিশাল ইমারত, আসবাবের বাহুল্য, অথবা বিলাসের স্পষ্ট আভাস। সবচেয়ে মজার কথা, সুধান্তও ছবি আঁকে, কিন্তু ছবির তলায় লিখে না দিলে বোঝা যায় না, কি সে আঁকতে চেয়েছিল। অথচ এরই জন্তে তার আঁকবার আলাদা ঘর আছে, শেখাবার মশাই আছে, কত রং, কত তুলি। সুধান্তদের লাইব্রেরীতে প্রচুর বই, সব বই-এর দোকানে বলা আছে, নতুন ভাল বই বেরুলে পাঠিয়ে দিতে। কাচগুলোর ওপর ধুলো পড়েছে, কেউ এসব নাড়াচাড়া করে বলেও বিশ্বাস হয় না। কমলেশ জিজ্ঞেস করেছিল, তোরা খুব পড়াশুনো করিস?

সুধান্ত হেসে উত্তর দেয়, আমাদের সময় কোথায়? মাস্টার মশাইরা মাঝে মাঝে এসে বই নিয়ে যান।

প্রচুর বই, অথচ পাঠক নেই। আর ওদিকে প্রশান্তরা চার পড়তে অথচ বই নেই, কি সুন্দর বিচার!

সদাশঙ্করের সঙ্গে আলোচনা হয় কমলেশের, সে প্রাণ খুলে বলে তার কিশোর মনের কথা, সে ভেবে পায় না কেন টাকার অভাবে রেণুকারি'র প্রতিভার অপমান হয়, আর প্রতিভার অভাবে সুধান্তদের টাকার অপমান হয়। কেন দু'দিকেই অভাব? কেন কেউ সম্পূর্ণ নয়?

সদাশঙ্কর তাকে বুঝিয়ে বলত, এই যে সমাজের নিয়ম! তুমি আমি কি করতে পারি বল? তবে চেষ্টা আমাদের করতে হবে, যাতে সবাইকে সমান সুযোগ দিতে পারি।

প্রায় মাসখানেক বাদের কথা, বলা নেই, কওয়া নেই হঠাৎ পাঁচ দিনের অন্তরে ভুগে মারা গেলেন প্রশান্তের বাবা। ভাল করে চিকিৎসাও করান গেল না। এই দু'টি ছোট্ট কিশোর-কিশোরীর আত্মীয়-স্বজন যারা ছিল এই বিপদের সময় সবাই ঘুরে সরে গেল, পাছে এদের ভার নিতে হয়। সেই সময় কমলেশ 'দিন-রাত' এসেছে এদের বাড়ী, যতরকম ভাবে সম্ভব সাহায্য করার চেষ্টা করছে। রেণুকা ওর হাত ধরে বলত, তুই না থাকলে আমাদের কি হ'ত বলত কমল, বাবা যে এভাবে হঠাৎ চলে যাবেন, বেচারী প্রশান্ত, ওকে এই বয়স থেকেই কাজ করতে হবে। তা না হলে আমাদের চলবে কি করে।

কমলেশ সাঙ্কনা নিয়ে বলেছে, তা হবে না, তোমাদের পড়াশুনো করতে হবে।

কি করে করবো? এ বাড়ী ছেড়ে দিতে হবে তো? তিন মাসের বাড়ীভাড়া বাকী পড়ছে। আমিও চেষ্টা করছি, যদি মেয়ে ছবি আঁকা শিখতে চায়—

কমলেশ আর কোন কথা না বলে সোজা গিয়েছিল সদাশঙ্করের বাড়ী। প্রশান্তদের সব কথা খুলে বলে সজ্ঞা চোখে জিজ্ঞেস করেছিল, কি হবে শঙ্করদা? এদের জন্তে কি কিছুই করতে পারব না?

শঙ্করদা' সম্মুখে বলেন, বোকা ছেলে, ওদের এ বিপদের কথা আমাকে এত দিন বলনি কেন?

—কি যে করব বুঝে উঠতে পারছিলাম না।

—প্রশান্ত আর রেণুকারি'র বোকা এখানকার ওদের যা দেনাপত্তর আছে, হিসেব করে রাখতে, আমি কাল গিয়ে সব মিটিয়ে দিয়ে ওদের নিয়ে যাব আমাদের বিজ্ঞাপীঠে, সেখানেই লেখাপড়া করবে।

শঙ্করদা' যে এত সহজে এত বড় সমস্যার সমাধান করে দেবেন, তা কমলেশ ভাবতেই পারেনি। ধরাগলায় বলে, ওরা বড় ভালো শঙ্করদা', আপনি দেখলে খুব খুশী হবেন।

সদাশঙ্কর কোন উত্তর দেয়নি, নীরবে কমলেশের কাঁধের ওপর একটা হাত রেখেছিল, সেই গাঢ় স্পর্শ থেকে কমলেশ বুঝতে পারে তার ওপর শঙ্করদা'র ভালবাসা আর বিশ্বাস কতখানি।

কমলেশ নিজে থেকেই বলে, প্রশান্তরা চলে গেলে, আমিও আর একলা কলকাতায় পড়ে থাকব না। বিজ্ঞাপীঠেই পড়াশুনো করব।

—সে তো খুব ভালো কথা, তোমার বাবাকে চিঠি লিখ, উনি যদি মত দেন—

বাবার মত আছে, সে আমি জানি।

এর পরের ইতিহাস ঠোট। ক'দিন বাদেই সদাশঙ্করের বিজ্ঞাপীঠে এসে তাজির হয় কমলেশ, প্রশান্ত আর রেণুকা। কলকাতা থেকে জারগাটা প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে, ট্রেন লাইনের উপর। বিশাল ধানক্ষেত, চার দিকে শুধু সবুজের ইসারা। সতরের দমবন্ধ-করা সভ্যতা এখানে নেই। এখানে প্রকৃতির গেলা, স্বাভাবিক জীবন।

কমলেশ আর প্রশান্ত উঠেছে হোষ্টেলে। সুন্দর থাকবার ব্যবস্থা, চম্পিটি ছেলে থাকে। কিন্তু ঝেয়েদের হোষ্টেল এখনও তৈরি হয়নি। 'তাই রেণুকা! উঠল মণিকান্দি'র বাড়ী। মণিকান্দি ছেলেমেয়েদের ছবি আঁকা শেখান আবার অবসর সময় গানও। বড় মিষ্টি স্বভাব মণিকান্দি'র, কত সতজে এদেব আপনায় করে নিয়েছেন। এতটুকু দূরই যেন নেই।

এই ক'দিনের মধ্যেই বিজ্ঞাপীঠেব মানা কাজেব ভাব নিয়েছে এরা। রেণুকা মণিকান্দি'র সঙ্গে সারাদিনই কাটায় শিল্পভবনে। এখানকার সবকিছু ভট্টে গুছিয়ে রাখে। 'মণিকান্দি' খুশী হয়ে বলেন, ভাগ্যিস রেণুকা এসে পড়েছিলো, আমি তো একলা সামলে উঠতে পারছিলাম না।

প্রশান্তর খেলোয়াড় হিসেবে নাম ছিল কলকাতায়। স্কুলের টিমে ফুটবল খেলত। এখানে এসে ও খেলা নিয়ে যেতে উঠেছে। সারাদিন স্কুলের পর সোজা চলে যায় খেলার মাঠে, তৈরি আনন্দের মধ্যে কোথা দিয়ে দিন কেটে যাচ্ছে তা সে বুঝতেই পাবে না।

কমলেশ ডার নিয়েছে লাইব্রেরীর। লোভলার কোনের ঘরে বেশ কিছু বই থাকলেও তা যত্ন করে এতদিন সাজান হয়নি। সদাশঙ্কর সেই ভারটাই দিয়েছে কমলেশের ওপর। একদিন কমলেশ বইগুলো আলমারীতে বিবর অল্পযায়ী সাজিয়ে রেখেছে, নতুন লিট তৈরী করেছে, এবার তার বই কেনার পালা। বিজ্ঞাপীঠ থেকে চার মাইল দূরে সহর। সেখানেই দোকানপত্র। কমলেশ আজ গিয়েছিল সাতখানা নতুন বই-এর অর্ডার দিয়ে আসতে। মনে করেছিল কাজ সেরে বিকেলের মধ্যেই ফিরে আসবে। ফিরেও আসত ঠিক যদি না হঠাৎ এত জোরে বৃষ্টি নামত। সহর থেকে বিজ্ঞাপীঠে বাবার অনেকখানি পথই বাস-এ যাওয়া যায়। ইচ্ছে করেই কমলেশ বাসে চাপেনি। হেঁটে আসবে বলে। কিন্তু অর্ধেক পথ না আসতেই, কালবৈশাখীর ঝড়ে চারদিক অন্ধকার করে ধুলো উড়িয়ে ঝমঝম করে বৃষ্টি শুরু হল। কিছুক্ষণের জন্তে কমলেশ ভেবে পেল না কোন দিকে যাবে! একটা বড় গাছের তলায় গুটিমুটি মেয়ে বসেছিল কিন্তু বৃষ্টির প্রকোপ ক্রমাৎ বাড়ছে দেখে তার ভর হল, এ রাস্তা দিয়ে সে খুব বেশী হেঁটে যাতায়াত করেনি। ভাব মনে পড়ল এইই কাছ বরাবর কোথায় যেন নদীর ধারে একটা বিশাল বাড়ী আছে, বা সে বাসে যেতে যেতে দেখেছে। অন্ধকারের মধ্যেও চারদিকে তাকাতে লাগল কমলেশ, মনে হল কিছু দূরে যেন একটা আলো দেখা যাচ্ছে। এই ছুঁকোণের রাতে অস্বস্তি: একটা আশ্রয় পাওয়া যাবে, এই আশায় বুক বেঁধে কমলেশ

প্রাণপণ শক্তিতে ছুটল সেই আলো লক্ষ্য করে। দূর থেকে দেখে বতী কাছে মনে হয়েছিল, তত কাছে নয়। যখন কমলেশ সে বাড়ীর সামনে এসে পৌঁছল, তখন তার জামা-কাপড় সবই ভিজে ছপ-ছপ করছে। কমলেশ জোরে-জোরে দরজার ধাক্কা দেয়, দরজা খুলুন, দরজা খুলুন, কে আছেন?

অনেকক্ষণ ভেতর থেকে কোন সাড়া পাওয়া যায় না। কমলেশ তখনও ধাক্কা দিয়ে যাচ্ছে, হঠাৎ ভেতর থেকে দরজা খুলে দিল।

কমলেশ একটু রেগেই বলে, কি মশাই, এতক্ষণ জলে দাঁড়িয়ে আছি শুনে পাচ্ছেন না? কিন্তু এই পর্যন্ত বলে আর কথা শেষ করতে পারে না। দেখে সামনে এক অতি বৃদ্ধ ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ফর্সা রঙ, সাধা চুল, একমুখ সাধা দাড়ী। সাধা মুখে বয়সের গভীর রেখা পড়েছে। ভদ্রলোক সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারেন না, বেশ কুঁজো। পরনে সাধা ধুতির ওপর একটা সাধা ফড়িয়া। কমলেশের আপাদ-মস্তক একবার ভাল করে দেখে ঘরের কোণে রাখা একটা ভাসা চেয়ারের ওপর গিয়ে বসেন।

কমলেশ ভাল করে ঘরটা চারদিকে তাকিয়ে দেখে। পুরোন ঘর, চারদিকে বালি খসে পড়ছে। ঘরের এক কোণে যে লঠন ঝুলছে তাতে আলো খুব কম। চিমনির কাটাটা কালো হয়ে গেছে। যে তক্তাপোষটা বুড়োর সামনে রয়েছে তার একটা পায়াল নেই। খান কয়েক ইন্টারেক্টোর ওপর দাঁড় করানো।

বুড়ো জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল। হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে, এখানে কোথায় থাকো?

গলার স্বরটা কেমন যেন অস্বাভাবিক! কমলেশ মুহূর্তে বলে, বিজ্ঞাপীঠ থাকি।

—ওখানে কি হয়?

—লেখাপড়া, খেলাধুলো, আর কি।

—তোমার নাম?

—কমলেশ বসু।

—বুড়ো ছপ কবে যায়, আর কোন কথা বলে না। কমলেশ কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করে, তাছাড়া শীত করছিলও বেশ, সহর গলার জিগ্যেস করে, একটা গামছা দেবেন? গা-হাতটা মুছে ফেলতাম। বুড়ো কিন্তু শুনেও শুনলো না। ইচ্ছে করে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে। কমলেশ আবার বলে, বড় শীত করছে, একটু শুকনো কাপড় যদি দেন, কালই আমি ফেরৎ দিয়ে যাবো।

ভদ্রলোক এইবার ফিরে তাকান। চোখ দুটো যেন ঝল-ঝল করছে। সোজা উঠে গেলেন দরজার কাছে, খুলে দিয়ে বললেন এবার বাড়ী যাও, বৃষ্টি কমে গেছে।

কমলেশ আর কথা বলার সুযোগ পান না। অন্ধকারের মধ্যে আবার রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। তখনও অল্প অল্প বৃষ্টি পড়ছে। বারি রাস্তাটুকু জোরে জোরে হেঁটে কমলেশ যখন হোষ্টেলে এসে পৌঁছল তখন সাতটা বেজে গেছে। সকলেই তার জন্তে ব্যস্ত হয়ে বসে ছিল মণিকান্দি'র সব কথা শুনে বললেন, খুব সাবধান কমল, খবরদার ও-বাড়ীতে যেও না।

—কেন মণিকান্দি' "

—জান না বুঝি? ও-বাড়ীর আমরা নাম দিয়েছি যক্ষপুরী। ঐ যে বুড়োকে দেখেছো, ঐ তো যক্ষবুড়ো।

কমলেশ অবিশ্বাসের হাসি হাসে, আপনি ঠাট্টা করছেন আমার সঙ্গে, তাই কখনও সত্যি হয়?

মণিকাদি' হেসে বলেন, বেশ তো, যাকে খুশী জিগ্যেস করো। ও-বাড়ীতে যে কারা থাকে, আমরা কেউ দেখিনি। মাঝে মাঝে ওখান থেকে একটা গাড়ী বার হয়, তার চারদিকে পর্দা, পাছে কেউ দেখে ফেলে। একমাত্র ঐ বুড়োকে দেখা যায়, সে যে কে, কত ভাব বয়স, কেউ বলতে পারে না, তাই আমরা ধরে নিয়েছি ঐ নিশ্চয় যক্ষবুড়ো। তোমার সঙ্গে তো তবু হ'চারণে কথা বলেছে, অল্প কাকুর সঙ্গে কোন কথাই বলে না। চুপ করে বসে থাকে।

সে রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর সারাক্ষণই ওই যক্ষপুরীর কথা নিয়ে হাসি-ঠাট্টা হল। কমলেশ কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারল না মণিকাদি'রা কি বলতে চাইছে। ঘুমোবার সময় প্রশান্তকে ডেকে নিয়ে বলল, কি ব্যাপার বলতো? ওরা সবাই ওই বড় বাড়ীটার নাম যক্ষপুরী দিয়েছে কেন? কেনই বা যেতে আমাদের বারণ করছে?

প্রশান্তর ঘুম পেয়েছিল, হাই তুলে বলে, অত ভাবনা-চিন্তার দরকার কি? বারণ করছে যখন, না গেলেই তো হয়।

—আমি কিন্তু আবার যাব।

—কেন? ওখানে কি আছে?

—ওই বুড়োর সঙ্গে আলাপ করতে হবে। লোকটা অদ্ভুত! কেমন যেন কথাবার্তা।

প্রশান্ত তুর কুঁচক বলে, তবে আর ওখানে গিয়ে কি লাভ হবে? কমলেশ দীর্ঘশ্বাস চেপে বলে, ওই বুড়োর চোখ দুটো আমার বড় ভাল লেগেছে, যখন চুপচাপ বসে থাকে কেমন যেন মিসেস একলা চাহনি। নিশ্চয় ও কিছু বলতে চায়।

প্রশান্ত থামিয়ে দিয়ে বলে, কি সব আবোল-তাবোল বকছিস? কিন্তু একলা আর হাস না, আমাকে বলিস।

দিন কয়েক পরের কথা। কমলেশ গিয়েছিল সহরে অজ্ঞের মেওয়া বইগুলো নিয়ে আসার জন্তে। বইগুলো হাতে করে ফেরবার সময় একবার যদিও ভেবেছিল বাসে করেই আসবে, কিন্তু কে যেন তার মন পাটে দিলে। কমলেশ হেটেই চলল হোটেলের দিকে। বিকলের পড়ন্ত রোদ, নিস্তেজ হয়ে এসেছে। হাওয়া আছে, তাই হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে না। গুমোটি ভাবটা নেই। কমলেশ অনেক কথাই ভাবতে ভাবতে আসছিল। তার হাতে গড়া লাইব্রেরীর কথা, বিজ্ঞাপিতের অজ্ঞান কার্যক্রমের কথা, আবার কলকাতার হ'চারণে টুকরো কথাও যে মনে আসছিল না তা নয়। আজ সকালের ডাকেই বাবল একটা চিঠি এসেছে। উৎসাহ দিয়ে লিখেছেন, যদি তোমার শঙ্করদা'র আদর্শের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দিয়ে কাজ করতে পার তবে সবচেয়ে খুশী হব আমি।

ভাবতে ভাবতে কখন যে কমলেশ সেই যক্ষপুরীর সামনে এসে পড়েছে তা তার নিজেরই খেয়াল হয় নি। এ পর্যন্ত এসে তার পা শুষ্ক আপনা হ'তেই থেমে গেল। দেখল, সেদিন হুজুগের রাতে বুড়ার সঙ্গে যে ঘরে বসে গল্প করেছিল, সেটা একটা দরওয়ানের

ঘর। গেটের সঙ্গে লাগোয়া ছোট ঘর। গেট পেরুলেই বিশাল মাঠ, তার ওপর কি বিরাট প্রাসাদ! সমস্ত জানালা-দরজা বন্ধ, লোক বাস করে বলে তো মনে হয় না। তখনও সন্ধ্যা নামেনি। তাই বুকে ভরসা করে কমলেশ গেট পেরিয়ে সেই প্রাসাদের দিকে এগিয়ে চলল। মণিকাদি'র কথাগুলো তার কানে ভাসছে, সেই সঙ্গে প্রশান্তর সতর্কবাণী। একবার মনে করল এখান থেকে ফিরে গেলেই হয়, কিন্তু পারলো না। কে যেন তাকে সামনের দিকেই টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

সেই প্রাসাদের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কমলেশ চারদিকটা ভাল করে দেখল। কি ভারী দরজা! তার ওপর বড় বড় তালা লাগান। মরচে পড়েছে। বোঝা যায় অনেক দিন ব্যবহার হয় নি! বাড়ীটা পুরোন, দেখলে মনে হয় মস্ত বড় জমিদারের, এখন আর আগের বোলবোলা নেই। অনেক জায়গায় বালি খসে পড়েছে, দরজা-জানালাতেও রঙ পড়েনি বহু দিন। কমলেশের নজরে পড়ল নদীর দিকে একটা ছোট দরজা খোলা রয়েছে, খিড়কীর দরজা। কোন রকম দ্বিধা না করে সে বাড়ীর মধ্যে ঢুকল। কি আশ্চর্য, অবাক হয়ে দেখল কমলেশ বাড়ীর বাইরে ভান্সা-চোরা হলেও ভেতরটা ঝকঝক তকতক করছে। আয়নার মত পরিষ্কার মার্বেলের মেঝে, বড় বড় খামের ওপর কি নিখুঁত কারুকার্য! বারান্দা ধরে বেশ খানিকটা এগিয়ে যায় কমলেশ। চোখে তার বিষয়ের শেষ নেই। তার মনে হয় মণিকাদি'র কথাই যেন সত্যি, গল্পের বই-এ যক্ষপুরীর যে বর্ণনা পড়েছে তারই সত্যিকারের চেহারা দেখছে এই বাড়ীর মধ্যে। পাশের একটা হলঘর থেকে অনেকের গলার স্বর ভেসে আসছিল। কমলেশের ইচ্ছে হ'ল তাদের সঙ্গে আলাপ করার। কিন্তু যেই দরজায় হাত দিতে যাবে, পেছন থেকে হঠাৎ কঠোর স্তনে সে চমকে উঠল।

—কে তোমাকে এ বাড়ীতে আসতে বলেছে?

কমলেশ ফিরে দেখে সেদিনকার সেই বুড়ো জলন্ত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

কমলেশ ভয় পেয়ে বলে, দরজা খোলা ছিল, ভাবলাম আপনাদের সঙ্গে একটু আলাপ করে যাই।

—খবদার আর এ বাড়ীতে ঢোকবার চেষ্টা করবে না। আজ আমি তোমাকে কিছু বলব না। কিন্তু এর পর এলে আর ফিরে যেতে পারবে না।

কমলেশ ভয়ে শিউরে ওঠে। না, না, আমি এখনি চলে যাচ্ছি। কমলেশ আর কথা না বাড়িয়ে খিড়কীর দরজা দিয়ে মাঠে বেরিয়ে আসে। পেছন ফিরে না তাকিয়েও বুঝতে পারে বুড়ো তার পেছন পেছন আসছে। অঙ্কুর নেমে এসেছে, কমলেশের গা ছমছম করে। বুড়ো হঠাৎ জিগ্যেস করে, হাতে তোমার ওগুলো কি?

—গল্পের বই। লাইব্রেরীর জন্তে কিনে নিয়ে যাচ্ছি।

—কিসের গল্প?

কমলেশ সাহস করে ফিরে তাকিয়ে বলে, ছোট ছোট ছেলেরা কি রকম করে একটা সুন্দর সহব গড়ে তুলেছে তারই কাহিনী।

—সে তো আজগুবি গল্প।

কমলেশ জোর দিয়ে বলে, আজগুবি নয় সত্যি, বইটা পড়ে দেখবেন?

—ওসব বাজে জিনিষ আমি পড়ি না।

কমলেশ আর কথা বাড়ায় না, তাড়াহাড়ি পা চালিয়ে এগিয়ে চলে। ঠিক গেটের মুখে ঘেঁষে এসে পৌঁছেছে বুড়ো আবার কথা বলে, তোমার একলা এ বাড়ীতে আসতে ভয় করে না?

—একটু একটু ভয় করে।

—তবে এসেছিল কেন?

কমলেশ মুহূর্তের বলে, আমার মনে হয়েছিল আপনি বোধ হয় আমায় কিছু বলতে চান।

বুড়ো এবার হাসে, আচ্ছা পাগল তো তুমি, আর লোক পেলাম না, তোমার সঙ্গে স্নেহ-দুঃখের গল্প করব। খবদার আব গেট পেরুবে না। তাহলেই ঠাণ্ডা ভেঙ্গে দেব।

কমলেশ আর কোন কথা না বলে চূপ করে বেরিয়ে আসে। সারা রাত্তর মনে হয় ওই বাড়ীতে না চুকলেই বোধ হয় ভাল হ'ত। মণিকান্দি'রা ঠিকই বলেছে এ হোল যক্ষপূরী। আর ঐ বুড়ো নিশ্চয়ই যক্ষবুড়ো। [ক্রমশঃ]

বোতামের বাহু ফুল

বাহুরস্বাক্ষর এ, সি, সরকার

প্রদর্শনীয় প্রারম্ভিক খেলা হিসাবে আলোচ্য 'বোতামের বাহু ফুল' অতুলনীয়। আমি বহু বার এই খেলাটি বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে দেখিয়ে খুব ভাল ফল পেয়েছি। বিশেষ করে পশ্চিমের দেশগুলোতে এ খেলাটি দর্শকদের যে আনন্দ দেয় তার তুলনা মেলা ভার।

ফিফট 'সাক্ষ্য-পোষাক' পরিহিত অবস্থায় বাহুর প্রবেশ করেন রঙ্গমঞ্চে। সকলকে অভিবাদন জানাবার পরে হঠাৎ তার নজর পড়ে তার কোটের 'বটন হোল' বা বোতামের গর্তের দিকে। তাই তো সেখানে কোনও ফুল নেই এবং তার ফলে তার পোষাক অসম্পূর্ণ। এজ্ঞে দুঃখ প্রকাশ করে বাহুর তার বাহুকৌশল প্রয়োগ করলেন। খালি ডান হাতখানা একবার বোতামের গর্তের

উপর দিয়ে বুলিয়ে নিতেই দেখা গেল, সেখানে রয়েছে এক শ্বেত-গোলাপ। এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখে দর্শকেরা যে কত খুশী হলেন তার প্রমাণ পাওয়া গেল স্বতঃস্ফূর্ত হর্ষধ্বনির মধ্যে। কেমন করে এই অদ্ভুত ব্যাপারটা সেখানে যায় তাই এবার শোন।

এই খেলা দেখানোর জন্তে চাই কাপড়ের তৈরী একটি সাদা গোলাপ আর এক খণ্ড সূত্র কালো 'ইলাস্টিক'। এই ইলাস্টিকের এক প্রান্তে লাগানো থাকবে নকল গোলাপ আর অন্য প্রান্তটি ফুল বাখার জন্ত নির্দিষ্ট

বোতামের গর্তের ভেতর দিয়ে যুক্ত হবে কোটের 'ল্যাপেলের' ধারের বোতামে। ইলাস্টিকের দৈর্ঘ্য এমন হবে যেন স্বাভাবিক অবস্থাতেই এ ফুলটিকে বোতামের ঘরে ঘরে রাখতে পারে। এর পরে ফুলটিকে টেনে নিয়ে যদি বা বগলে চেপে ঘরে রাখ তবে ইলাস্টিক আপন ধর্মে লম্বা হবে। বগলের চাপ কম হলে আপনা থেকেই ইলাস্টিক ফুলটিকে টেনে এনে বোতামের ঘরে বসাবে। এই খেলা দেখানোর সময়ে গায়ে থাকবে কালো কোট, কান্ডেই কালো ইলাস্টিক এই কালো কোটের রঙের সঙ্গে সহজেই মিশে থাকবে। বেশ অভ্যাস করে তবেই কিন্তু দেখাবে এ খেলা। ম্যাজিকে উৎসাহী যারা তারা আমার সঙ্গে জবাবী কার্ডে পত্রালাপ করতে পার। A. C. Sorcer. Magician. Post Box 16214, Calcutta 29 ঠিকানায়।

বাহুর সরকার

বীণাদেবী সেন

আমার ছোটো বন্ধুরা,

আজ তোমাদের আমি একজনের বিষয় গল্প বলবো যা কাহিনী হলেও সত্য। আমি গত বিশ বৎসর ধরে শিক্ষকতা কার্যের মাধ্যমে আমার ছাত্রীদের গল্প শুনিয়েছি, যেডিঙতে শিয়াল-বাসরের গল্প বলেছি, গল্প লিখেছি মহাপুরুষদের বিষয়ে যারা পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন। আজ কিন্তু এমন একজনের বিষয় বলবো যিনি বাল্যে এবং কৈশোরে নানারূপ অচল অবস্থা এবং দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাঁর শক্তিসাধনা এবং প্রতিভাবলে স্বীকৃত হয়েছেন, ডানতবর্ষকে গৌরবান্বিত করেছেন দেশের মুখ উজ্জ্বল করে। গোমরাই বলতো এ কথা শুনে তোমাদের বুক ফুলে দশ হাত হচ্ছে কি না? তোমরা কবি সত্যেন দত্তের 'আমরা' কবিতা পড়েছো? সে কবিতাতে লেখা আছে বাঙ্গালীর যশ এবং প্রতিষ্ঠার বিষয়। আজকে যার বিষয় বলতে সুরু করেছি তিনি সম্প্রতি আমেরিকাতে সদলবলে রওনা হবেন। তিনি হচ্ছেন বাহুরস্বাক্ষর পি, সি, সরকার ওরফে প্রতুল চন্দ্র সরকার। এই অসামান্য খ্যাতিসম্পন্ন বাঙ্গালী তাঁর প্রতিভা দেখিয়ে জগতের নিকট হতে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছেন, বারংবার বিজয়মাল্য কণ্ঠে ধারণ করেছেন, তামাম হুনিয়ার জনগণমনকে বাহুরবিজ্ঞার ভেদে দেখিয়ে চমৎকৃত করেছেন। তিনি শুধু যে বাহুরবিজ্ঞায় সুনিয়ন্ত্রিত তা নয়, তাঁর দৈনন্দিন জীবনের কর্তব্যেও তাঁর সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা, তাঁর স্বজনতা, অমায়িক আবরণ যার সঙ্গে পরিচিত হতে পারলে অমুপ্রেরণা পেতে পারো। অমুপ্রেরণা লাভ করবে এই উদ্দেশ্য নিয়ে আজ বাহুরস্বাক্ষর পি, সি, সরকারের বিষয় লিখছি। তাঁর আদিনিবাস মহম্মদসিহ জিলাতে, টাঙ্গাইল মহকুমায়। তিনি বছরের মধ্যে প্রায় দশ মাস ভারতবর্ষের বাইরে থাকেন, নানারূপ আদব-কায়দা-দ্রুত সেশ বিদেশ ঘুরে, তাঁর বাহুরবিজ্ঞার ভেদী বাজী দেখিয়ে যখন বাংলা দেশে ফিরে আসেন তখন কিন্তু পি, সি, সরকার পুরোভাবে বাঙ্গালী আচরণে, কথাবার্তায় ইত্যাদিতে। ভারতবর্ষের শিক্ষা দীক্ষাকে তিনি শ্রেষ্ঠ মনে করেন এবং গর্ববোধ করেন তার জন্য। সব চেয়ে তাঁর বেশী গর্ব তিনি বাঙ্গাল দেশের ছেলে।



পি, সি, সরকার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কুঠী ছাত্র, অঙ্কে অনার্স নিয়ে বি. এ পড়তে পড়তে ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে বাহুর হয়ে চলে আসেন কলিকাতায়। ভারতে প্রথম প্রদর্শনীর পর তিনি প্রথমে যান শ্রাম, মালয়, ব্রহ্মদেশ। তারপর থেকে আজ সুদীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে চলেছে তাঁর সমস্ত পৃথিবী ঘুরে বেড়ান। বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত কোটি কোটি নরনারীর চিত্ত জয়, শ্রদ্ধা আকর্ষণ, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কোথায় তিনি যাননি? সর্বত্র, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, জাভা, মালয়, জাপান, সিন্ধুপুর, হংকং, ইংলণ্ড, ইটালী, ফ্রান্স, জার্মানী তদ্ব্যতীত অজ্ঞাত বহু স্থানে। তিনি বছর গিয়েছেন ইংলণ্ডে, আমেরিকাতে। তিনি স্বীকৃত হলেন বর্তমান জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ বাহুররূপে। বিদেশের পত্রিকাতে প্রথম পাতায় বাহুর হিসেবে তাঁর ছবি মুদ্রিত হলো, তিনি আমাদের জাতীয় পতাকা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করে বাহুর ভারতের জন্ম বিজয়মালা নিয়ে এলেন। সর্বদেশের পত্রিকাতে তাঁর প্রচুর প্রশংসা, বিদেশে পি, সি, সরকারকে ভারতের ভূমি আখ্যা দিয়ে অভিনন্দিত করেছেন। তাঁর কোটি, কোটি অনুসারীর মধ্যে সুভাষচন্দ্র একজন। ত্রৈলোক্য প্রধান মন্ত্রী থাকেন হু তাঁকে এশিয়ার গৌরব এই আখ্যা দিয়েছেন। কেনই বা দেবেন না?

১৯৩৬ সালে কলিকাতায়, ১৯৫০ সালে গ্যারীতে তারপর ১৯৫৭ সালে পৃথিবীর সব চাইতে জনবহুল রাস্তা নিউইয়র্ক টাইমস স্কোয়ারে চোখ বঁধে সাইকেল চালিয়ে ইনি অসামান্য শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। লণ্ডন নিউইয়র্ক শিকাগোতে এর প্রদর্শনী টেলিভিশন যোগে দেখানো হয়েছে। শ্রীযুক্ত সরকার ইলেকট্রিক করাতে একটি মেয়েকে দুই টুকরো করে যে বাহুর ক্রীড়া দেখিয়েছিলেন তা অতি আশ্চর্যজনক! এই খেলা দেখতে গিয়ে কয়েকজন সজ্জা হারিয়েছিলেন, এমন কি টেলিভিশনের ছবি দেখেও অনেকে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। অতএব বাহুর রাজত্বে অপ্রতিদ্বন্দ্বী সম্রাট পি, সি, সরকারের ভোজবাজী অদ্ভুত! পরলোকগত নেপালধীরের মতে তাঁর বাহুরপ্রদর্শনী সম্ভারে পূর্ণ। জার্মানী তাঁদের সোনার লরেল দিয়ে তাঁকে স্বীকার করেন—বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ বাহুররূপে নিউইয়র্ক পি, সি, সরকারকে দুইবার ফিনিক্স পুরস্কার দিয়েছেন, ম্যাজিকে নোবেল প্রাইজরূপে বরগীর এই ফিনিক্স পুরস্কার এবং পৃথিবীর মধ্যে শ্রীযুক্ত পি, সি, সরকারই একমাত্র বাহুর যিনি দুইবার এই পুরস্কার পেয়েছেন। হল্যাণ্ড এঁকে দিলে ট্রিফ্ল পদক (১৯৪৮ এবং ১৯৫৪), টোকিও ম্যাজিসিয়ান ক্লাবের ইনি সম্মানিত সভ্য, তাঁরা এঁকে উপহার দিলেন একটি পদক। একজন অজাপানীদের মধ্যে ইনিই প্রথম এই সম্মানের অধিকারী (১৯৩৭)। আমেরিকা আন্তর্জাতিক বাহুর ভ্রাতৃত্ব সংস্থার কলিকাতা শাখার নাম—এরই নামানুসারে পি, সি, সরকার চরু রাখা হয়েছে। এ ছাড়া, ইংলণ্ড, জার্মানী, প্যারিস, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশগুলির বড় বড় বাহুর-সংস্থার দ্বারাও ইনি সম্মানিত। আমেরিকা জাতীয় টেলিভিশনে National Broadcasting Company গত বৎসর মে মাসে শ্রীযুক্ত সরকারের বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ঘূর্ণায়মান করাত দ্বারা জীবন্ত তরুণীকে বিখণ্ডিত খেলাটি টেলিভিশনে দেখাবার জন্য পঁচাত্তর হাজার টাকা ব্যয় করে শ্রীযুক্ত সরকারকে লজবল সহ নিয়ে যান। সর্বশ্রেষ্ঠ বাহুরের সম্মান খিটক

ফ্রেগের সুবর্ণ ম্যাজিক ও খণ্ড বাহুরসম্রাটের হাতে পৌঁছাবার জন্য আমেরিকা থেকে বিমানযোগে অস্ট্রেলিয়াতে আনা হয়। আমেরিকাতে যখন তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বাহুরের আখ্যা দ্বিতীয় বার ভূষিত হলেন তখন অজ্ঞাত দেশের মত বৃটিশ প্রতিনিধিরা কিছুটা অসন্তুষ্ট হলেন। বিদেশে গেলে পি, সি, সরকার সেই মহামূল্যবান একটি পোষাক পরেন—পোষাকটি ভারতের বিভিন্ন দেশের উপকরণ দিয়ে তৈরী। তখনকার দিনে রাজপুত্রের মত দামী পোষাকে, দামী জুতো জোড়া পরে তিনি যখন ষ্ট্রেন্ডে দাঁড়িয়ে বাহুরক্রীড়া দেখান সে সব ছবিগুলো দেখলে বিস্মিত হতে হয়। সুপুরুষ পি, সি সরকারকে সুলভ মহামূল্যবান পোষাকে আরও সুলভ দেখায়। বৃটিশ প্রতিনিধি সেই পোষাক লক্ষ্য করে তাঁকে জল্প করার জন্য বলেছিলেন, You have no Royal blood. Then why do you dress like a prince?

বাহুরসম্রাট সহাস্তে উত্তর দিলেন, No I am the prince of Magic.

অপর পক্ষ থেকে কোন প্রশ্ন উঠল না।

বাহুর-বিজ্ঞানের ইতিহাস প্রসঙ্গে পি, সি, সরকার বলেন, অর্থর্ববেদের মতে ভারতেই এই মহাবিজ্ঞানের উদ্ভব। তবে আমাদের ছিলো গুরুমুখী বিজ্ঞা, কাজে কাজেই পূর্বাচার্যদের মহাপ্রস্থানের পর এ বিজ্ঞা প্রায় লুপ্ত হতে থাকে। তবে এখনও বেদে-বেদেনীদের খেলা, ভাষ্যমতী খেলা, ভোজবাজী প্রভৃতির খেলাগুলি সেই আদিম ঐতিহ্যের অপস্রবমান চিহ্ন। হিপনোটিজম এবং মেসমেরিজম সম্বন্ধে তিনি বলেন, গ্রীসের ঘূমের দেবতা হিপনাসের নামানুসারেই এই বিজ্ঞার পরিচিতি। প্রাগৈতিহাসিক যুগে এই বিজ্ঞার উদ্ভব। বিদেশ তাহাকে সম্মান দিয়েছে, যথাযোগ্য সমাদর জানিয়েছে এবং আমাদের দেশ থেকে তাঁকে যে সম্বর্ধনা জানান হয়নি তা নয়, কিন্তু বিদেশের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম। কলিকাতা নাগরিকগণের এবং কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে যে অভিনন্দনপত্র তাঁকে দেওয়া হয়েছে, তার প্রতি অক্ষরের ঔজ্জ্বল্য পি, সি, সরকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছে তা থেকে সামান্য কিছু উল্লেখ করছি: 'কিন্দদস্তাখ্যাত ভোজরাজ্যের সুযোগ্য উত্তরস্রাধক তুমি, অর্থর্ববেদ ও তন্ত্রসার বদিত ইন্দ্রজালকে অলৌকিক অবিশ্বাসী আধুনিক বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের মধ্যেও জরযুক্ত করিয়াছ, তোমার মন্ত্রপুত ইন্দ্রজাল নিখিল জগৎকে স্তম্ভিত ও বিমূঢ় করিয়া জরপত্র ললাটে লইয়া স্বদেশের যজ্ঞভূমে কিরিয়া আসিয়াছ—তোমার ভারতের তীর্থসলিল (গয়াটার অফ ইণ্ডিয়া) পাশ্চাত্য পৃথিবীর গতানুগতিক মুম্বু ম্যাজিককে সঞ্চারিত করিয়া ভারতীয় ভোজবাজীর মহিমা অভ্রুশ্বী করিয়াছ, প্রাচীন ঐতিহ্যের ভিত্তিতে তুমি স্বাধীন নব ভারতের নবীন বাহুর-সৌধ প্রতিষ্ঠা করিয়াছ, অবজ্ঞার ভেড়ি ভোজরাজীকে ইন্দ্রজালের ইন্দ্রধনু বর্ণে রঞ্জিত করিয়াছ।' কলিকাতা মহানগরীর পৌর সম্বর্ধনা অভিনন্দনপত্রে শ্রীযুক্ত সরকারের অমর অবদানের কথা স্পষ্টই স্বীকৃত হইয়াছে।

তাহলে বুঝতে পারছো, আজ আমি কেন পি, সি, সরকারের বিবরণ এসব কথা লিখছি। তোমরা সুখী হবে তখন, গর্বিত বোধ করবে। আমি এ কথা বলছি না যে, তোমরা সবাই একযোগে বাহুর হও, তা নয়—তবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সম্মান অর্জন করে

বিশেষে গিয়ে তোমাদের কৃতিত্ব বিভিন্ন ধারায় দেখিয়ে ফিরে এসে মাভূভূমিতে, আমাদের ভারতবর্ষকে চিন্তা সমস্ত ছুনিয়া। আমাদের বাংলা দেশের বিষয় মহামান্য গোথলে বলেছিলেন **What Bengal thinks to-day India will think to-morrow** আবার যেন বিদেশীরা বলতে পারে। **What India thinks to-day The World will think to-morrow**, একদিন পৃথিবীর মধ্যে আমাদের ভারতবর্ষ জ্ঞানগরিমাতো সভ্য তার আলোকে দীপ্ত ছিল—যখন পাশ্চাত্য দেশকে কেউ চিন্তা না— আবার কি আমাদের অতীত ভারতবর্ষকে ফিরিয়ে আনতে পারবো না? নিশ্চয়ই পারবো।

যাহ্‌কর পি, সি সরকারের প্রতিভার বিষয় তোমাদের বলেছি এখন বলবো তাঁর প্রাত্যহিক জীবনে তিনি তাঁর কৰ্ম পদ্ধতিকে কি ভাবে পরিচালনা করেন। আমরা একবার তাঁর 'ইন্ড্রজাল' 'তাঁর গৃহের নাম সেইখানে গিয়ে পরিচালনা ব্যবস্থা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। তিনি সহকারীদের সুন্দর শিক্ষা দিয়েছেন সর্ববিষয়ে যেমন আদবকায়দা শৃংখলতার সহিত কার্য করা ইত্যাদি। তিন ডলার ঘরটি বাহুসজ্জার অফিসঘর। ঘরে যথারীতি চেয়ার, টেবিল, আলমারী—তার থেকে এ-হেন জিনিস নেই যেমন ক্রাফিং মেশিন পর্যন্ত, তিনি খ্যাতিনামা বাহুকারদের, বিশ্ববিখ্যাত লোকদের বিবরে সংবাদ রেখেছেন। তাঁর বাটীতে ফটো বিভাগ আছে—ডার্করুম তাঁর প্রয়োজন বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য। এমন ভাবে সজ্জিত করেছেন যে প্রয়োজনানুসারে পাওয়া যায় হাতের কাছে। তিনি নানা জনের সহায়তায় নানারূপ পোষাক সংগ্রহ করেছেন—পোষাক, রোপ্য তরবারি সবই উপহার। এমন যে ব্যস্ত মানুষ অবলম্বন মত তিনি সংগ্রহ করেন বিভিন্ন দেশের ডাক টিকিট, পোষ্ট অফিসের থাম টেলিগ্রাম ফর্ম, ট্রামবাসের টিকিট, দেশলাইএর ছবি, ছুদিকোকানের মেনো, চাল ডালের প্যাকেট সব জোগাড় করে এক বেন মিউজিয়ম তৈরী করেছেন। কার্টুনের ছবি, ভিজিটিং Card। ম্যাজিকের বই, সিন সিনারী বিষয় কত যে বই। তাঁর বাহুবিজ্ঞান নয়নে ধাঁধা সৃষ্টি করে। তাঁর সংগ্রহ বিস্তৃত করেছে ধারী দর্শক তাঁদের কিন্তু সর্বোপরি সব চেয়ে মূল্যবান পি, সি, সরকারের সর্জনবিদিত, বিনয়পূর্ণ আচরণ। আধুনিক জগতে, উদাসিন আচরণে ইহা ছলভ। তাঁর সংগ্রহ-নেশা ছাড়া অন্য নেশা নাই, ধূমপান নয়, চা পান নয়। তাঁর ম্যাজিক দেখানো এবং সজ্জনতা উভয়ই পরচিন্তাহারিণী। বাহুকার পি, সি, সরকারের বিষয়ে প্রবন্ধ লেখার উদ্দেশ্য এই যে, এঁর জীবনদ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তোমাদের মধ্য থেকে কয়েকজনও যদি মাভূভূমির গৌরব হয়ে দাঁড়াও তবেই আমার এ লেখা সার্থক হবে। ধারী প্রকৃত গুণী, তাঁরাই মহত্বের অধিকারী এবং শ্রীমান প্রতুলচন্দ্র সরকার ওরফে পি, সি, সরকার আমাদের ভারতবর্ষকে যে দেশের সমুখে দাঁড় করিয়েছেন দেশের মুখ উজ্জ্বল করে আমাদের সবার মুখ উজ্জ্বল করেছেন সে গুণবোধ তোমাদের অন্তরে জাগরুক থাকুক, তিনি যে বহু গুণের অধিকারী সে অনুপ্রেরণা তোমাদিগকে জীবনপথে পরিচালিত করুক—আমি সবত্র মন-প্রাণ দিয়ে তোমাদের সেই আশীর্বাদই করছি।

হুই বোন

(রূপকথা)

পুষ্পদল ভট্টাচার্য

অনেক দিন আগে এক দেশে এক রাজা ছিলেন। তাঁর ছেলে ছিল না। কিন্তু দুটি ফুলের মত ফুটকুটে মেয়ে ছিল। রাজকুমারী চন্দ্রা আর পদ্মার মা মারা গিয়েছিলেন। তাই রাজামশায় তাঁব ছোটরাণীকে ডেকে বললেন, তুমি আজ থেকে পদ্মা আর চন্দ্রাকে মানুয কর।

ছোটরাণীর নিজের ছেলেমেয়ে ছিল না। কিন্তু তিনি ছিলেন ভীষণ আনন্দপ্রিয়। তার উপর চন্দ্রা আর পদ্মা তাঁর চেয়েও বেশী সুন্দর দেখতে ছিল বলে তিনি তাদের হিংসাও করতেন। তাই রাজামশায় বাড়ী না থাকলেই তিনি রাজকুমারীদের দিয়ে রাজবাড়ীর বাসন মাজান থেকে নিজের গা-হাত-পা টেপান পর্যন্ত সব কাজই করিয়ে নিতেন।

রাজামশায় যখন জিজ্ঞাসা করতেন, চন্দ্রা আর পদ্মা অত রোগা হয়ে যাচ্ছে কেন?

ছোটরাণী তখন কৃত্রিম স্নেহে বলতেন, যা হুই, মেয়েরা আমার, সারাদিন সখীদের সঙ্গে বাগানে বাগানে প্রজাপতিদের পেছনে ছুটে বেড়ায়। সময়ে নাওয়া খাওয়া করে না। তাই তো রোগা হয়ে যাচ্ছে।

রাজামশায় এজন্ত মেয়েদের কিছু বলতে গেলেই ছোটরাণী গলায় মধু ঢেলে বলতেন, তাই বলে আপনি যেন ওদের বকবেন না। ছেলেমানুষই তো? একটু বড় হলে আপনিই শাস্ত হবে।

ছোটরাণীর কথায় রাজা যেমন নিশ্চিন্ত তেমনি খুসী হতেন। যাক, মেয়েরা তাহলে তাদের ছোট মায়ের স্নেহে সুখেই আছে।

একবার রাজামশায় দূর দেশে যুদ্ধে গেলেন। সেই সুযোগে ছোটরাণী মেয়েদের উপর এমনই অত্যাচার আরম্ভ করলেন যে তারা আর সহ করতে পারল না।

বড় বোন চন্দ্রা বলল, এ ভাবে না খেয়ে পরিশ্রম করে আর ছোটমার হাতে রাজ রাজ প্রহার সহ্য করে আমরা বেশী দিন বাঁচব না। তার চেয়ে চল বনে চলে যাই, সেখানে বাঘ-ভালুক আমাদের খেয়ে ফেলবে সেই ভাল হবে। সে পদ্মার হাত ধরে কাদতে কাদতে বনে পালিয়ে এল।

সেদিন জ্যোৎস্না রাত। বনের মধ্যে চারদিকে বাঘ-ভালুক হালুম হালুম করে শিকার খুঁজে বেড়াচ্ছে। কিন্তু আশ্চর্য। তারা যেন চন্দ্রা আর পদ্মাকে দেখেও দেখছে না। চন্দ্রার মনে পড়ল তার বাইমার কথা—“রাখে কেঁঠ মারে কে? যারা সং হয় স্বয়ং ভগবান তাদের রক্ষা করেন।”

একথা মনে পড়তেই চন্দ্রার মনে সাহস এল। সে এবার চারদিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখতে দেখতে চলল। কিছু দূর গিয়ে সে দেখে বনের মধ্যে একটা বড় রাজপ্রাসাদ রয়েছে। দেখে হুই বোন সেই প্রাসাদে গেল। কিন্তু সারাটা প্রাসাদ ঘুরেও তারা জনপ্রাণীরও দেখা পেল না। অথচ ঘরে ঘরে আসবাব পত্র, বিহানা সব কিছুই রয়েছে। কেবল ভাঁড়ার সবই একেবারে খালি, এক দান চাও সেখানে পড়ে নেই।

দুই বোনে রাজপ্রাসাদের এই অবস্থা দেখে খুব অস্বস্তি হলেও সেইখানেই থাকবে বলে স্থির করল। কিন্তু খাওয়ার কি করা যাবে? চন্দ্রা ব্যবস্থা করল সকালে পদ্মা আর সন্ধ্যায় সে নিজে বনে গিয়ে গাছতলা থেকে বনের ফলমূল কুড়িয়ে আনবে আর ঝরনা থেকে জল নিয়ে আসবে।

দিন কতক দুই বোনে সেই রাজপ্রাসাদে বেশ আনন্দেই কাটাল। তারপর একদিন বিকালে চন্দ্রা বন থেকে ফল আর জল আনতে গিয়ে আর ফিরল না।

বিকাল গিয়ে সন্ধ্যা হল, তারপর অন্ধকার হয়ে এল। তখনও চন্দ্রা ফিরল না দেখে পদ্মা বেরুল তার খোঁজে। সে দিদি, দিদি, চন্দ্রা, চন্দ্রা ডেকে ডেকে সমস্ত বন তোলপাড় করে বেড়াল সারা রাত ধরে কিন্তু কোথাও চন্দ্রার সাদা পেল না।

সকাল বেলা সূর্য্য উঠলে চন্দ্রা পদ্মা তার দিদির গলার মুক্তোমালার একটা মুক্তো দেখতে পেল। খানিক গিয়ে দেখল আর একটা মুক্তো পড়ে রয়েছে। এই ভাবে পর পর তিন-চারটে মুক্তো পেয়ে পদ্মা বুঝল তার দিদি এই পথেই কোথাও গিয়েছে।

আর খুব সম্ভব কেউ তাকে জোর করে নিয়ে নিয়েছে। কারণ পদ্মাকে না জানিয়ে তার দিদি কখনই কোথাও যাবে না। তাছাড়া ঝরনার ধারে দিদির হাতের জলভরা ঘড়া আর ফলের মূলিটাও ফলভরা পড়ে ছিল।

পদ্মা তখন সেই মুক্তো কুড়োতে কুড়োতে বনের শেষে এক নগরের রাজপ্রাসাদের তোরণদ্বারের সামনে এসে পৌঁছল। তোরণের সামনে ঢাল তলোয়ার হাতে সেপাই-শাস্ত্রী দেখে তার প্রাসাদের ভেতর যেতে সাহস হল না। সে আবার বনের পথে ফিরে চলল।

খানিক দূর গিয়ে সে দেখল প্রাসাদের কাছাকাছি একটা বাগানে একটা কুঁড়েঘর রয়েছে। সে ঘরে লোকজন কেউ নেই দেখে পদ্মা সেই ঘরেই রয়ে গেল। এখানে থাকলে তবু দিদির কাছাকাছি থাকা হবে। সেই বাগানে একটা বড় পদ্মপুকুরও ছিল। পদ্মা পদ্মফুল বড় ভালবাসত। কিন্তু দিনের বেলায় পদ্ম তুললে যদি কেউ বকে, এই ভয়ে সে রোজ ভোর রাত্রে গিয়ে পুকুরে স্নান করে জলের মধ্যকার সব চেয়ে বড় পদ্মগুলি তুলে আনত।

এই বাগানের মালিক ছিল ঐ রাজ্যের ছোটরাজপুত্র কমলকুমার। সেও পদ্মফুল খুব ভালবাসত। রোজ পদ্মপুকুরে স্নান করে জলের সেরা পদ্মগুলি তুলে এনে সে নিজের ঘর সাজাত। কিন্তু কয়েক দিন ধরে সে দেখছিল জলের বেশীর ভাগ টাটকা ফোটা বড় পদ্ম কেউ রাত্রে তুলে নিয়ে যায়।

পর পর কয়েক দিন এই ভাবে তার প্রিয় ফুল চুরি যাওয়ার কমলকুমারের খুব রাগ হল। একদিন রাত্রে সে বাগান পাহারা দেবার জগা পুকুরের কাছে গাছের আড়ালে লুকিয়ে বসে রইল।

পদ্মা তো আর রাজকুমারের পাহারার কথা জানে না। তাই সে যখন অন্ধদিনের মতন স্নান করে জলের সেরা পদ্মগুলি তুলে পুকুরপাড়ে উঠেছে ঠিক তখনই কমলকুমার এসে তার হাত চেপে ধরল। বলল কে তুমি? রোজ রোজ আমার পুকুরের পদ্ম কেন চুরি করে নিয়ে যাও?

পদ্মা মনে মনে ভর পেলেও মুখে সাহস করে বলল, তুমিই বা কে? এ পুকুর যে তোমার, তার প্রমাণ কি?

কমলকুমার বলল, আমি এ রাজ্যের ছোট রাজপুত্র কমলকুমার। চল তোমাকে ধরে রাজসভায় নিয়ে যাবি। সেখানে গেলেই বুঝবে এ পুকুর আমার কি না।

পদ্মা বলল, তাই চল। আমিও রাজ্যমশাইকে বলবো, আমি তো কেবল ফুল চুরি করেছি। আর আপনারা আমার দিদি চন্দ্রাকে চুরি করেছেন। আমাকে যদি শাস্তি দেন তো আমার দিদিকে যে চুরি করেছে তাকেও শাস্তি দিতে হবে।

কমলকুমার অস্বস্তি হয়ে বলল, তুমিই তাহলে আমার বউদি চন্দ্রার ছোট বোন পদ্মা? বউদি রাজবাড়ীতে এসে পর্যন্ত রোজ তোমার নাম করছেন। রাজ্যের সেপাই-শাস্ত্রীরা বনে বনে তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

পদ্মা রাগ করে বলল, সেপাই-শাস্ত্রী আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে কেন? দিদির মতন আমাকেও জোর করে ধরে আনবে বলে?

কমলকুমার উত্তর দিলেন তোমার দিদিকে আমরা জোর করে আনিনি। ঐ বনে একটা রাক্ষস থাকতো। তোমরা যে বাড়ীতে ছিলে তার মালিক ঐ রাজ্যের রাজা, রাণী, রাজপুত্রদের আর সব লোকজন খেয়ে শেষ করে সে এসেছিল আমাদের রাজ্যে উপদ্রব করতে। তারপর আমার দাদার হাতে তীর খেয়ে সে আবার বনে পালিয়ে গিয়ে ঝরনার ধারে তোমার দিদিকে দেখে তাকে খাবে বলে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল। আমার দাদা সে সময় রাক্ষসটাকে তাড়া করে বনে গিয়ে তাকে মেরে তোমার দিদিকে অজ্ঞান অবস্থায় রাজবাড়ীতে নিয়ে আসেন।

সকাল বেলায় তোমার দিদির জ্ঞান হলে তার কাছ থেকে তোমার কথা শুনে বাবা তখনই তোমাকে আনবার জন্তে বনে লোক পাঠান। কিন্তু সারা বন খুঁজেও লোকেরা তোমাকে পায়নি। তোমরা রাজকুমারী জেনে বাবা তোমার দিদির সঙ্গে আমার দাদা অমলকুমারের বিয়ে দিয়েছেন। এখন চল তোমাকে তোমার দিদির কাছে নিয়ে যাই।

তারপর? তারপর তো বুঝতেই পারছ দুই বোনে এক হয়ে কত সুখী হল। তাদের সেই আনন্দ আরও বেড়ে গেল যখন কমলকুমারের সঙ্গে পদ্মরাণীর বিয়ে হল টাক ডুমাডুম ডুম বাজনা বাজিয়ে আর সারা রাজ্যের প্রজাদের ভোজ খাইয়ে।

কিশোর-সাহিত্যে রোমাঞ্চ

শ্রীমতী ছায়া দেবী

সাহিত্য বলতে আমরা বুঝি প্রধানত দুইরকম উপন্যাস,

নাটক, কবিতা এবং রম্য রচনা প্রভৃতি। তেমন ভাবে লিখতে পারলে রসোত্তীর্ণ ভ্রমণ কাহিনীও উচ্চাঙ্গের সাহিত্যের পর্যায়ে পড়ে। কিন্তু বোমাঙ্কর গল্প বলতে আমরা যা বুঝি তাকে উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্য বলতে বোধ করি সব সমালোচকদেরই আপত্তি আছে। উচ্চশ্রেণীর গল্প ও উপন্যাসের তালিকা তৈরী করার সময় সবচেয়ে বোমাঙ্কর গল্পগুলিকে বাদ দেওয়া আমাদের

এক বিশেষ অভ্যাসের অন্তর্গত হয়ে পড়েছে। এর উদাহরণও আমাদের চোখে প্রতি পড়েই পড়ে।

রোমাঞ্চকর সাহিত্য বলতে আমরা যা বুঝি তা শুধু ডিটেকটিভ গল্প কিন্তু ভালো ভাবে বিচার করলে বৈজ্ঞানিক রহস্যের গল্প এবং এ্যাডভেঞ্চারের গল্পকেও স্থান দিতে কারোর ক্ষমতা হবে না। এ হিসাবে আমরা ওয়েলসের 'দি ফাষ্ট মেন ইন দি মুন', 'দি ডোর ইন দি স্ক্যাল', এম, আর জেমসের 'কাষ্ট্রি দি ক্লস', আর এল স্ট্রিডেনসনের 'ট্রেন্সার আইল্যান্ড', উইলকি কলিনসের, 'উওম্যান ইন হোয়াইট' এসবকেই রোমাঞ্চকর সাহিত্যের শ্রেণীতে ফেলতে পারি। শেষোক্ত উপন্যাসটি একটি সফল সামাজিক উপন্যাসও বটে। কারণ যাতে মানবিকতা পূর্ণ ভাবে বিকাশ লাভ করেছে তাকে সামাজিক উপন্যাস বলতে বোঝা হয় না।

এবার রোমাঞ্চকর সাহিত্য সম্পর্কে জনমত কি রকম দেখা যাক। পাশ্চাত্য দেশে রহস্য-উপন্যাসের কাটতি দারুণ। কোনান ডয়েলের চেয়ে শার্লক হোমস অনেক বেশি বিখ্যাত। শার্লক হোমসের নামেও দেশের লোক পাগল। কেবল লেখা পড়েই ওদেশের জনসাধারণ এত উন্মাদ হয়ে পড়েছিল যে তারা শার্লক হোমসকে জীবিত দেখতে চেয়েছিল। এ সম্বন্ধে 'এত কোঁতুককর গল্প আছে যে, তা রহস্য-উপন্যাসের আদর এবং লেখকের কৃতিত্ব সমভাবে এ দুইয়েরই প্রমাণ করে। অজানা রহস্য সম্বন্ধে কোঁতুক মামুষের চিরদিনের চিরকালের এবং এরই উপর ভিত্তি করে মামুষের এত কল্পনা-জল্পনা। তা ছাড়া ভৌতিক কাহিনীর একটা ছায়াময় অস্তিত্ব আছে, মামুষের জীবনে অন্ততঃ একবারে একটা অদৃশ্য অশরীরী অমুভূতির অদ্ভুত সাড়া এসেছে এডলার এ্যালেন পো এবং জেরোম কে জেরোমের কোন ফান রচনা এই কথারই স্বীকৃতি দেয়।

দূর দিগন্তে অসীম আকাশে, পর্বতের পরপারে, মহা সমুদ্রের অতল গভীরে, 'তুহিন' 'হিমমেল-শিখার রৌদ্রদগ্ধ অগ্নিতপ্ত মল্ল-সাহারার বালুঝড়ের আর্দ্রনাশে মামুষের মনে শুধু কাব্যের ব্যঙ্গারই জাগায় নৈ জাগিয়েছে আরো কিছু। মামুষের একটা মন নিরন্তর কর্ককোলাহলে ব্যস্ত থাকতে পারেন তাই একটু কীক পেলেই রহস্যের সন্ধান-পিমাসী মন জাগ্রত হয়ে ওঠে। পঞ্চ ইন্দ্রিয় ছাড়াও মামুষের আর একটা ইন্দ্রিয় আছে, যেমন সূদূর লোক থেকে অজানা অলৌকিক রহস্য রোমাঞ্চকর সন্ধান এনে দেয়, ঐ ইন্দ্রিয় তারই পথপ্রদর্শক। শিশু ও কিশোরদের কল্পনাপিপাসু মন, অজানাকে একান্ত করে জানার আগ্রহ এ্যাডভেঞ্চারের দিকে এগিয়ে দিয়েছে। সর্ব দেশের সর্ব কালের শিশু কিশোরদের এ্যাডভেঞ্চার-পিপাসু মনকে তাদের চিন্তাধারাকে পুষ্ট করেছেন (বহু ক্ষেত্রে বড়দের সাহিত্যেও) বহু খ্যাত অখ্যাত লেখকবৃন্দ। ধীরে লেখা নিয়ে বলবার দিন আজ এসেছে। অহমিকার বশে পরিত্যাগ না করে সমস্ত সে সব রচনার আলোচনা হওয়া উচিত। রচনার নৈপুণ্যে, বিষয়বস্তুর অভিনবত্বে, শব্দচয়নে শিশু কিশোরদের মনপ্রাণকে আকর্ষণ করবার জন্ত বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকরাও কম প্রচেষ্টা করেননি। কাজেই তাকে তুচ্ছ বলে অগ্রাহ্য করবার অবজ্ঞা করবার কোন ঋণ্যসম্পন্ন কারণ খুঁটেনি। কেউ কেউ বলতে পারেন এদেশ আর ওদেশ—অনেক তফাৎ। হতে পারে—কিন্তু প্রত্যেক দেশের নিজস্ব পরিবেশ আছে, সে কথা ভুললে চলবে কেন? বাংলা দেশের শিশু সাহিত্যিকদের

একটা বিশেষত্ব আছে বা অগ্র দেশের রোমাঞ্চ সাহিত্যে কমই চোখে পড়ে, তা হলে এই—অপাতদৃষ্টিতে অতি সাধারণ তুচ্ছ পরিবেশ থেকে ক্রমশ রহস্য-মন আবহাওয়া জাগিয়ে তোলা।

রহস্য রোমাঞ্চের প্রতি আগ্রহ অল্পশিক্ষিত জনসাধারণের কথা ছেড়ে দিলেও অসাধারণদের আগ্রহও এর প্রতি কম নয়। এ বিষয়ে আমরা বাট্টাও রাসেল, স্তার অলিভার লজ্জ এবং চার্লস ডিকেন্সের উদাহরণ দিতে পারি। রাসেল বৃদ্ধ বয়সে নতুন করে ভৌতিক কাহিনী লিখতে শুরু করেছেন। চার্লস ডিকেন্স মৃত্যুর জন্ত এমন একটি রহস্য-উপন্যাস অসম্পূর্ণ রেখে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন যা নাকি তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা বলে স্বীকৃতি পেতে পারতো। এ ছাড়া আমাদের দেশের সম্বন্ধে অনুরূপা দেবীর হেমলক, শ্রীঅরবিন্দের আবলার্ডের দরজার কথাও বলতে পারি। আমাদের দেশেও রসসাহিত্যের চেয়ে রহস্যগল্পই বেশি কাটে, এ কথা সন্দেহ করলে ভুল হবে না হয়ত।

অধিকাংশ পাঠক-পাঠিকাদের হাতে ঘোরে মোহন সিরিজ, যাকে মরিস লেবলাকের ব্যর্থ অনুকরণ বললেও দোষ নেই। খুবই বিমর্ষ হই একথা ভেবে যে আজকাল রহস্য সাহিত্য বলে আমাদের দেশে যা চলছে তার অধিকাংশই রাস্তায় ফেলে দেবার মত। কোথায় ওয়েলস আর জুলভার্ন আর কোথায় শশধর দত্ত আর স্বপনকুমার! এ পর্য্যন্ত আমরা শিশু ও কিশোরদের জন্ত রহস্য ও রোমাঞ্চ সাহিত্য বলতে যা পেরেছি তার মূল্য বড় কম নয় কিন্তু এর মান দিনে দিনে আরও উন্নত হওয়া দরকার। এ বিষয়ে এখনও আমাদের সুসাহিত্যিকের প্রয়োজন আছে। বৈজ্ঞানিক পটভূমিকায় রহস্যময় মৌলিক গল্পেরও আজ খুব প্রয়োজন আছে। কারণ তা না হলে আজকের দিনে কিশোর-মনকে আকৃষ্ট করবে না এবং সে গল্প হবে অচল।

অবশ্য আমাদের দেশে কোনান ডয়েল বা এইচ জি, ওয়েলস না থাকলেও একেবারে কিছুই নেই বলা চলে না। বৈদেশিক সাহিত্যে আমরা যেমন প্রতিভাধর লেখকের সমারোহ দেখতে পাই, এদেশেও তার কিছুটা একেবারে বিরল নয়। উদাহরণস্বরূপ আমরা এইচ জি ওয়েলস এবং প্রেমেন্দ্র মিত্রের তুলনা করতে পারি। অবশ্য প্রেমেন্দ্র মিত্র ওয়েলস হতে পাবেননি কিন্তু তিনি যে বাংলা কিশোর-সাহিত্যকে নতুন কিছু দিয়ে গিয়েছেন একথা কোন মতে অস্বীকার করা যায় না। নীল আকাশ ও নীল সমুদ্রকে উপজীব্য করে সব দেশের পাঠকদের যে কোঁতুক তা যথাসাধ্য নিবারণ করবার চেষ্টা করেছেন ও দেশের ওয়েলস এবং জুলভার্ন। তাঁদের মত উন্নত সৃষ্টি কবা প্রেমেন্দ্র মিত্রের পক্ষে সম্পূর্ণ সম্ভব না হলেও 'পাতালে পাঁচ বছর' 'পৃথিবী ছাড়িয়ে' এবং 'ময়দানবের স্বীপ' পড়লে মনে হয় তার পিছনে দি ওয়ার অব দি ওয়াস্ট স দি আইল্যান্ড অব ডট্টর মোরোর পরিকল্পনা দেখতে পাই। অনেকটা এই রকম ধরণের বৈজ্ঞানিক ভিত্তির পটভূমিকায় অভিনব ধরণের নতুন উপন্যাস 'ধূমকেতু'। শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্যের এই উপন্যাসটির নতুন ধরণের উন্নত মামুষের এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালীর ভবিষ্যতে হয়ত অনুসরণ অসম্ভব হবে না। এইচ, জি ওয়েলসের 'দি আইল্যান্ড অব ডট্টর মোরো'তে যে নরপশুদের নিয়ে বৈজ্ঞানিক রহস্যের সৃষ্টি করা হয়েছে, অনেকটা তারই জ্বালাস দেখতে পাই শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্যের 'রক্সিলা পাহাড়ের নীল কুঠি' নামে ছোটগল্পে। তবে ডট্টর মোরোতে যে নরপশুদের

নিম্নে বৈজ্ঞানিক রহস্যের সৃষ্টি করা হয়েছে অনেকটা তারই আভাস দেখতে পাই ত্রীকিত্তিনারায়ণ ভট্টাচার্যের “রঞ্জিতা পাহাড়ের নীল কুঠি” নামে ছোটগল্পে। তবে ভট্টের মোরোর যে যুগান্তব্যাপী বৈজ্ঞানিক প্রতিভার আন্তরিক প্রচেষ্টা ছিল পণ্ডের মাছুষ করবার, তাব সঙ্গে ভট্টের চিরঞ্জীবের বৈজ্ঞানিক প্রতিভার নামে মাছুষদের নরপণ্ড করে তোলার নৃশংসতাকে মিশিয়ে ফেললে ভুল হবে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং কিত্তিনারায়ণ ভট্টাচার্যের যুগ্ম প্রচেষ্টা ওয়েলসের প্রতিভা পানিকটা বহন করে এসেছে। ফরাসী সাহিত্যিক জুলভার্না যে আদর্শ স্থাপনা করেছেন, বাংলা ভাষাতে তার স্থানে আমরা হুঁজম মাত্র লেখকের নাম করতে পারি, একজন কুলদারজ্ঞন রায় এবং অপবস্তন ব্রহ্মেশচন্দ্র দাস। এঁদের মধ্যে কুলদারজ্ঞন মৌলিক কাহিনী বিশেষ কিছু লেখেন নি অবশ্য। কিন্তু এঁর অশুর অমুখাদ পড়তে পড়তে মনে হয় এ রকম সাবলীল সুলভ অমুখাদ এবং নানা বিষয়ে প্রগতি পানিত্য অমুখাদানী মনের সামনে নূতন জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত করেছে।

সাগরিকা, অজ্ঞাতদেশ এবং আশ্চর্য্য দ্বীপ পড়লে মনে হয় অমুখাদকদের প্রাণের সৃষ্টি ও মৌলিক প্রতিভা অমুখাদ রচনার সাথে মিশে রয়েছে। ঠিক এই রকম ধরনের প্রাণবন্ত লেখা পাই হরকিঙ্কর ভট্টাচার্যের রচনা, যদিও তা অমুখাদ নয়, তথাপি ওয়েলসের ক্ষণ প্রভাব আছে মনে হয়, যাকে অমুখাদ বলা যেতে পারে। “মঙ্গল গতে কারা থাকে” এই রচনাটির বিষয়বস্তুর চমকপন অভিনবতার তিনি যে ভগ্নাবস্থ বিষয় সৃষ্টি করেছেন তা সত্যই আশ্চর্য্য। হরকিঙ্কর ভট্টাচার্যের লেখা “কটা পৃথিবী,” বাস্তবিক বিশ্বাসের এবং কোঁড়ুলের কারণ হটেছে। বাস্তবিক মহাকাব্যে, আমাদের সৌরজগতের বাইরে কত অজানা বিশ্ব লুকিয়ে আছে, তা জানার ইচ্ছে মানুষের চিরন্তন; এই রকম উপাদানে আবে লেখার দরকার। ওদেশে নূতন ধরনের বৈজ্ঞানিক পটভূমিকায় বোনাধকর উপজ্ঞান লিখে এইচ, জি, ওয়েলস যে চাকল্যের সৃষ্টি করেছিলেন এদেশে ঠিক তেমনি ভাবে সাড়া জাগিয়েছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, হেমেন্দ্রকুমার রায় এবং হরকিঙ্কর ভট্টাচার্যের কোন কোন রচনা। মহাসমুদ্রের অতল গভীরে, ভূগর্ভের অপর পিঠে, গগনচুম্বী পর্বত-শিখরে এমন কি পৃথিবী ছাড়িয়ে মানুষের মতই কোন বুদ্ধিমান জীব আছে কি না তা নিয়ে বৈজ্ঞানিকদের গবেষণার শেষ নেই। বাস্তবধর্মী এ্যাডভেঞ্চারের গল্পে কুলদারজ্ঞন রায় এবং ব্রহ্মেশচন্দ্র দাসের জুলনা নেই। একদা ‘রবিনসন ক্রুসো’ ও ‘সুইট ফ্যামিলী রবিনসন’ পাঠক মহলে যে বড় তুলেছিল, সমাদৃত হয়েছিল বোধ হয় তার চাইতেও অধিক সুন্দর এদের রচনা প্রাণসঞ্চার করবার ক্ষমতা। ব্রহ্মেশচন্দ্র দাসের নিজস্ব মৌলিক রচনাগুলিও তাঁর সুনাম বজায় রেখেছে। তাঁর লেখা ‘পাতালনগরী’, ‘লাইট হাউস রহস্য’ এবং ‘আত্মিকার বনে-জঙ্গলে’। ‘লাইট হাউস রহস্য’ বোর্নিও দ্বীপের যে অশুর বিবরণ পাওয়া যায়, তা সত্যই চোখের সামনে ওখানকার দৃশ্যপট উন্মুক্ত করে যায়, তবে শেষ দিকের ঘটনাটি সন্নিবেশিত না হলেই সর্বাঙ্গসুন্দর হতো।

বিচিত্র ধরনের বৈজ্ঞানিক রহস্য এবং অভিব্যক্তির কথা বাদ দিলে থাকি থাকে ডিটেকটিভ ও এ্যাডভেঞ্চার কাহিনী। সাধারণ লোকদের

এই ধরনের বই বত প্রিয় ক্লাসিকাল নভেল ঠিক ভর্তা নয়। বাংলা শিশুসাহিত্যে এই ধরনের বই অনেক বেশি হয়েছে, কিন্তু উন্নত ধরনের বই বেরিয়েছে খুব কম। ধারা এই ধরনের বই লিখেছেন, তাঁদের শীর্ষস্থানীয় হচ্ছেন ত্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়। এ বিষয়ে তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।

ওদেশে রহস্য-সাহিত্যে অধিকারী হচ্ছেন ডিভেনসন। ‘ট্রোয়ার আইল্যান্ড’, ‘কিডনাপড’ প্রভৃতি এ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী লিখে এবং নিউ ‘গ্যারাবিয়ার নাইটস’ প্রভৃতি রহস্য-কাহিনী লিখে তিনি তুলনাতীত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। একত্র তাঁকে পৃথিবীর সেরা রহস্য-কাহিনীর লেখক বলা চলে। এ বিষয়ে দ্বিধার কোনও কারণ নেই, আমাদের দেশের সাহিত্যের মান বিচার করলে সহজেই হেমেন্দ্রকুমার রায়কে ডিভেনসনের আসন দেওয়া যায়।

অবশ্য এর কারণ এই নয় যে, হেমেন্দ্রকুমারের সঙ্গে ডিভেনসনের লেখনভঙ্গীর কোন সাদৃশ্য আছে। তা নয়—এ তুলনার অর্থ পাশ্চাত্যে যেমন ডিভেনসন অধিকারী, ঠিক তেমনি এ-দেশেও হেমেন্দ্রকুমার রায়ের সমতুল্য কেউ নেই। ১৩২১ সালের মৌচাকে যখন হেমেন্দ্রকুমার ‘বকের ধন’ লিখেছিলেন, তখন সমস্ত বাংলা দেশে রীতিমত সাড়া পড়ে গিয়েছিল, কারণ, এমন রোমাঞ্চকর ঘটনাবল্ল উপজ্ঞাস আর ছিল না। অবশ্য ওব অনেক আগে দীনেন্দ্রকুমার রায় ‘লোভার বাজ’ লিখেছিলেন, কিন্তু যে কোন কারণেই হোক তা এমন ভাবে সমাদর পায়নি। বকের ধন এবং তার নায়ক বিমল ও কুমার সম্পূর্ণ ভাবে বাংলা দেশের ছেলেমেয়েদের নিজস্ব সম্পদ হয়ে দাঁড়ালে। তাদের আগ্রহ চরমে উঠলো যখন ‘মেষদ্বতর মর্জে আগমন’ এবং ‘ময়নামত’র মায়াবানন লিখে তিনি আসা উন্নত ধরনের প্রতিভার পরিচয় দিলেন। যদি বুদ্ধদের বস্তু বলেন যে এসব লেখার পেছনে বিদেশী হস্তক্ষেপ রয়েছে,—তবে সবিনয়ে বলা চলে যে—অমুখাদ-সাহিত্য কি প্রতি দেশের সব সাহিত্যেরই একটা বৃহৎ অংশ জুড়ে নেই? আমরা কি তবে বার্ষিক সাহিত্য লেখা ছেড়ে আমাদের দেশের হিরণ বস্তুর লেখা পড়বো?

তাছাড়া হেমন বাবুর লেখাকে শুধু মাত্র অমুখাদ বললে সত্যের অপলাপ হবে সন্নিহিত। হেমেন্দ্রকুমার প্রথম তিনখানা উপজ্ঞাস লিখে খ্যাতি অর্জন করলেও এর মধ্যে কাঁচা হাতের ছাপ অস্পষ্ট নয়। কিন্তু আবার ‘বকের ধন’ থেকে তাঁর হাতের রচনা একেবারে পাকা। আবার যথের ধন পড়তে পড়তে আমরা উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে আশ্চর্য্যের স্বাপদসহুল অবগতির পরিচয় পাই। তাঁর লেখা সূর্যনগরীর ওপরে, যক্ষপতির রত্নপুরী, হিমালয়ের ভয়ঙ্কর এই নৈপুণ্যকে ব্যাপক দক্ষ ছাড়া কমাতে পারে নি।

তাঁর রচিত ডিটেকটিভ কাহিনীও অনবদ্য। ‘অভিনব কণ্ঠহার’ ও ‘জয়ন্তের কণ্ঠি’ পড়তে পড়তে মনে হয় এ বেন ডিনা-মাইটাসের আরেক অংশ। ‘ডাগনের হুঃস্বপ্ন’ বইটিতে তিনি আমাদের মনকে রহস্যে ঘেরা পরিবেশের ভেতর দিয়ে চীনা, তাও বর্ষ সম্পর্কে অনেক তথ্য পরিবেশন করেছেন। তাঁর রচনার মধ্যে যে প্রাণবন্ত ভাব—নানা জ্ঞানগর্ভ বিষয়ের সমারোহ আছে। তাঁর রচনা পাঠককে মনকে আত্মনির্ভরশীল ও সবল করে তোলে। হেমেন্দ্রকুমার রায়ের ডিটেকটিভের জয়ন্ত ও মণিক নিঃসন্দেহে পাঠকদের হৃদয় জয় করেছে। হেমেন্দ্রকুমার রায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ শিশু-উপজ্ঞাস দাকাতার

মুহুর্তে। এমন সফল রোমাঞ্চকর ট্রাজিডি বাংলা দেশে খুব বেশি নেই।

রোমাঞ্চকর নাট্যে ট্রাজিডি আরো অনেকটাই সৃষ্টি করেছেন। শ্রীবীরেন্দ্রলাল রায়ের 'অভিশপ্ত' একটি অদ্বিতীয় রোমাঞ্চকর কল্প উপন্যাস। কেবল এই একটি উপন্যাসেই বীরেন্দ্রলাল রায়কে কিশোর-সাহিত্যে চিরস্মরণীয় করে রাখবে। উপন্যাসটির প্রথম দিক—ভাইবোনের যে উৎসাহদৃশ্য অভিবান শূণ্য পথে এরোগেন নিয়ে,—তা বিশেষ করে পাঠিকাদের মনে সাড়া জাগিয়ে তোলে। উরাব মাহস, ধৈর্য এবং অদনা উৎসাহ এবং রনজিতের ভগিনীগ্নেহ, এবং অজ্ঞের আন্তরিক বন্ধুপ্রাতি নরকে আকর্ষণ করে। প্রথম দিকের একটি দিক এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য, শোকার্ত পিতামাতা যখন সন্তানদের মর্যাদার জ্ঞান বাকুল হয়ে আছেন সে সময়ও তাঁরা যে অদ্বিতীয় সঙ্গ ও ভদ্রতা ও স্ববিবেচনা দেখিয়েছেন, প্রকৃত পক্ষে বাস্তব ক্ষেত্রে তা অমূল্যবোধযোগ্য। উপন্যাসটির শেষ দুই পরিচ্ছেদে কল্পনাভীত বিষয়ে স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়,—অদ্বিতীয় একটা ভীতি-বিহবলতা মনকে আশ্বস্ত করে। এই রকম বিষয়বস্তু নিয়ে বোধ হয় আর কোন উপন্যাস বার হয়নি। মুহুর্তের চেয়ে ভয়ঙ্কর এই নামে ধারাবাহিক ভাবে উপন্যাসটি 'রামধনু'তে প্রকাশিত হয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে বলা যায়, শ্রীবীরেন্দ্রলাল রায়ের আবিসিনিয়া ফ্রেট, প্রেমের পথিক, আঁবার রাতে আর্ভানাদ, কামানের মুখে নানকিও প্রভৃতি অপূর্ণ ট্রাজিডি। রোমাঞ্চকর বীরেন্দ্রবাক্যক বিয়োগান্ত উপন্যাস লেখাই শ্রীযুক্ত রায়ের বৈশিষ্ট্য। বাঙালী যে কোথাও পিছিয়ে নেই জলে, স্থলে, বাক্যক্ষেত্রে সে যে অসাম বাবকে এগিয়ে যেতে পারে বিষমৈত্রীই তার মূল মন্ত্র। আমরা প্রেরণা পাই তাঁর লেখা থেকে। তবে ভাবতরঙ্গ, চান দেশ এবং বৃন্দকেই মিথ্যাবাদ পুরোভাগে দাঁড় করিয়েছেন এবং অনেকক্ষেত্রে তিনি ব্যক্তি ভেদে কোনো তুলিকার ছাপ না দিয়ে কেবল দেশভেদেই দিয়েছেন। ঈশ্বর প্রচারবীর গঙ্গা না থাকলে তাঁর উপন্যাসগুলির কয়েকটি তুলনাবিহীন বলা যেতো।

ধারা অভিযোগ করেন এ্যাডভেঞ্চার উপন্যাস লিখতে গেলেই নায়কদের আফ্রিকাতে নিয়ে যাওয়া লেখকদের প্রবান লোভ। তাহলে তাঁদের বলবো, এ বড়টা কারণ প্রথমতঃ বই পড়ার বিষয়ে তাঁদের অনুসন্ধানী মনের একান্ত অভাব, ভালো বই খুঁজে দেখবার অবসর তাঁদের নেই, দৈন্য হাতের কাছে পেলেন হ্যাঁ পড়লেন এবং তাই থেকেই উৎকণ্ঠা ও অপকণ্ঠতার বিচার হয়ে যায়। দ্বিতীয়তঃ তাঁরা ভুলে যান সমগ্র ভারতবর্ষে উপযুক্ত পটভূমিকার অভাব নেই, বার জগৎ সব সময় অন্ধ দেশের পটভূমিকাকে ধার করতে হবে। বাংলা দেশের সুন্দর বন, আসামের জঙ্গল পাহাড়, পর্বত, নাগপুর ও ছোট নাগপুরের জঙ্গল, হিমালয়ের পাদভূমি উপত্যকা ও অধিত্যাকাংশ, সমগ্র ভারতবর্ষে ছোট বড় অসংখ্য স্থান ছড়িয়ে আছে পাহাড় পর্বত, নদ-নদী, জলাভূমি, বিস্তীর্ণ প্রান্তর, শুষ্ক মরুভূমি কোন কিছুই অভাব নেই।

তাই এই ধরনের সমালোচকদের উচিত দেশীয় পটভূমিকায় লিখিত উপন্যাস ও গল্পগুলি পড়া, হেমেন্দ্রকুমার রায় রচিত অমাবস্তার রাত। 'কে' নামে ছোট গল্পটি, প্রশান্তের অঘিলীলা, বীরেন্দ্রলাল রায়ের বকের জঙ্গল, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের

লাল কুঠি, ছিন্নমস্তার মন্দির, বতীন সাহার সোনার ঘড়া, অচিন্ত্যকুমার লেনগুপ্তর ডাকাতে হাতে ইত্যাদি। দেশী পটভূমিকায় লিখিত বই যে কত সুন্দর হতে পারে এই সব বইগুলিই তার প্রমাণ, অনুসন্ধান করলে এই রকম রচনা আরও পাওয়া যাবে। তাছাড়া ভালো রচনার জগৎ পাঠকদের দাবী জানানো উচিত। তাঁদের আগ্রহ উৎসাহ পেলে সার্থক রচনা সৃষ্টিতে মনোযোগী হওয়া উচিত।

অত্যন্ত নীচদের সস্তার মারপ্যাচে পাঠকদের ভোলাবার চেষ্টা করেন এক শ্রেণীর লেখক, কিশোর-পাঠ্যের নামে কত যে অপাঠ্য চলে যায়। এবার ডিটেকটিভ প্রসঙ্গে আসা যাক; এ সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের প্রশংসনীয় হুকা-কাশি সঙ্গেও বাংলা ভাষায় এখনও সত্যিকার ডিটেকটিভ গল্প হতে পারলো না। শুধু তার বিকৃতি চরমে উঠলো শিশু-সাহিত্যের কুপথ্যশালায়। চরমের বিষয় এ বিকৃতি আমরা দেখতে পাই বুদ্ধদেব বসুর নিজের রচনাতেই, কিশোর-সাহিত্যে রোমাঞ্চ আনার ব্যাপারে তিনি সফলকাম হতে পারেননি। রহস্য ও রোমাঞ্চের নামে অসার বস্তুতে পাতা ভরেছেন, একঘেয়েমীর চূড়ান্ত। এ ছাড়া আর ধারা লিখেছেন তাঁদের মধ্যে স্বপনকুমার, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী এবং রাধারমণ দাস ইত্যাদির রচনা নিয়ে আলোচনা করা নিরর্থক। আগাছার মত বহু রচনার অভাব বাংলা দেশে নেই, কিন্তু তার কোন সার্থকতা আমরা খুঁজে পাই না। ভারতীয় মেয়েদের রহস্য-রোমাঞ্চ বা গোয়েন্দা কাহিনীর নামে অসার্থক ভাবে আনার কোন মানে হয় না। কেন না আজকালকার দিনের মেয়েরা এ্যাডভেঞ্চার বা গোয়েন্দাগিরিতে সম্পূর্ণ অযোগ্য বা অসমর্থ একথা বলতে চাইনা কিন্তু তাদের নিয়ে লিখতে গেলে যে কলাকৌশল সহজ স্বন্দর এসম্পত্তি করা দরকার, সে ক্ষমতা এদের লেখনীতে নেই। কিশোর সাহিত্যে রহস্য ও রোমাঞ্চকর পরিবেশে মেয়েদের এগিয়ে আনা বড় সহজসাধ্য নয়। এ বিষয়ে প্রকৃতই আগ্রহ, ও কৌতুহল জাগিয়ে রাখার মত শ্রেষ্ঠ রচনা প্রবোধচন্দ্র ঘোষের 'আজও তাগা ডাকে', পড়ার পড়েও সহজে ভুলতে না পারার মতো রচনা সার্থক সৃষ্টি। স্মৃতিতা ও চন্দ্রার চরিত্র যেভাবে রহস্যময় পরিবেশের মধ্যে আনা হয়েছে তাতে লেখকের যে রকম নিপুণতা প্রকাশ পায় তা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। আর একটি নারী-চরিত্র মিসেস ডিক্‌জ, অদ্বিতীয় রহস্যময়ী মহিলা মিসেস ডিক্‌জ পাঠক-পাঠিকাদের অরণ্য থাকবে, "বাইরের ঝড়-জলের সঙ্গে সর মিলিয়ে হেসে উঠলেন মিসেস ডিক্‌জ" পড়লে মনে থাকবে। যদিও এটা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়নি "বংশাংশ" ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু আশা করা যায় রচনাটি বই হিসাবে বার হ'লে জনপ্রিয়ও সমাদৃত হবে।

শ্রীনাথরঞ্জন গুপ্ত একজন লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক, রহস্য উপন্যাসিক। কিন্তু সত্য বলতে কি, একমাত্র কালো ভ্রমরই তাঁর সার্থক সৃষ্টি। এই রকম কিশোরপাঠ্য উপন্যাস আর তাঁর খুব কমই আছে। "নাগপাশ" অপূর্ণ একটি ভালো রচনা, সম্ভবতঃ অনুবাদ, তবুও রসোত্তীর্ণ। এই রকম আর দু-একটা ছাড়া আর সবই কিশোরদের অপাঠ্য। তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসের বৌদ্ধিকতা খুঁজে পাওয়া যায় না, তাঁকে প্রথম শ্রেণীর কিশোরপাঠ্য (কোন কোন ক্ষেত্রে বড়দেরও) রহস্য-উপন্যাসিক বলে মানতে দ্বিধা হয়।

তঁার লেখার কিরীটি গোয়েন্দাকে নাইট ক্লাবের গোয়েন্দার বাসিন্দা বললে বোধ হয় অত্যাশ্চর্য্য হবে না।

বাংলা দেশের ছেলেমেয়েদের হাতে প্রকৃত ভালো উপন্যাস তুলে দিয়েছেন স্বর্গীয় মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য। অত্যাশ্চর্য্য বুদ্ধিদীপ্ত রচনা একমাত্র তঁারই হাতে দিয়ে বার হয়েছে। মনোরঞ্জন যে কি রকম রসিক ছিলেন তা তঁার অধিঃস্বরীয় গোয়েন্দা হুক-কাশির নাম শুনেই বোঝা যায়। কোনান ডয়েলের শালক হোমস ও মনোরঞ্জনের মূলগত সুরটুকু এক। সেইজন্য কোন কোন পাঠক তঁার “যোষ চৌধুরীর ছবি” উপন্যাসটির সঙ্গে কোনান ডয়েলের “সিঙ্গ নেপোলিয়নের” টেকনিক সাদৃশ্য আছে মনে করেছিলেন। কিন্তু এ রচনা ছাটি পাঠক মাত্রই জানেন, এ সন্দেহ আসলে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। অতি সুন্দর মাধুর্য্যপূর্ণ সহজ ভাষায় লেখা তঁার প্রত্যেকটি রচনা। আজগুবি, গাঁজাখুরী খুন-জখম, গোয়েন্দার অত্যাশ্চর্য্য অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন অবিখ্যাত ঘটনা অথবা গভীর সমুদ্রের মাঝে পড়ে গিয়েও নায়ক বেঁচে যায়, উদ্ভূত প্লেন থেকেও নায়ক অক্ষত দেখেই নেমে আসে, গায়ে পর পর সাতটা গুলী লাগলেও নায়ক গোয়েন্দার কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়, এ রকম লোমহর্ষক ঘটনা—অর্থাৎ সম্ভার মারপ্যাচ নেই কোথাও, কিন্তু তবুও কি রকম পরিচ্ছন্ন কোঁড়ুলোদ্ধীপক তঁার প্রত্যেকটি রচনা!

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের লেখার প্রধান বৈশিষ্ট্যই হল অদ্ভুত বুদ্ধি-চাতুর্য্য এবং কখন-কৌশল। তঁার প্রথম উপন্যাস “পদ্মরাগ” এই উপন্যাসটিতে কে যে প্রকৃত অপরাধী তা কল্পনা করা প্রায় দুঃসাধ্য! অথচ শেষ পর্য্যন্ত পাঠকমনকে সমান আগ্রহে এগিয়ে নিয়ে চলে। তঁার রচনার নূতনত্ব জানার আগ্রহকে বাড়িয়ে তোলে—এটা যে কত বড় সফলতা তা এক কথায় বলা যায় না। তঁার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস “সোনার হরিণের” অপরাধী যে মিঃ বাহু তা বলে না দিলে দয়া প্রায় অসাধ্য। পাঠকমনকে যথেষ্ট পরিশ্রম সহকারে মস্তিষ্ক চালানার সুযোগ দিয়েছেন লেখক। কিন্তু মনোরঞ্জন যে ততটা জনপ্রিয় হতে পারেননি তার কারণ তঁার লেখা নিয়ে আলোচন করা বর্তমান প্রকৃত সমালোচকের অভাব। অতি অল্পবয়সে তিনি বা দিয়ে গেছেন তঁার স্থান পূরণ করার মত খুব কম শিশুসাহিত্যিক আজ আছেন। বীরা তঁার রচনা পড়েছেন তঁারাই তঁার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে অবগত।

এর পরে আরো কয়েকজন কুশলী লেখকের শ্রেষ্ঠ রচনার নাম উল্লেখ করতে চাই, সেগুলি উৎকৃষ্ট গোয়েন্দা কাহিনী, কিশোরদের হাতে তুলে দেবার মতই। বিশেষ করে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের জয়-পরাজয়, বিজয় অভিযান, রীতিমত এ্যাডভেঞ্চার; হেমেন্দ্রকুমারের বিলীনের জাগরণ, বাত্রির যাত্রী, অন্ধকারের বন্ধু, শুকুমার দে-সরকারের হানাবাড়ী এবং মনটা হু হু করে। প্রকৃত পক্ষে শুকুমার দে-সরকারের লেখা মনটা হু হু করে, একটা প্রশংসার যোগ্য আকর্ষণীয় লেখা, তঁার রচনা পড়লে অগ্ন্যুত্তর সন্দেহ থাকেনা কিশোর-সাহিত্যে লেখক একজন শক্তিশালী রহস্যোপন্যাস লেখক। এখানে বলতে ভুলে গিয়েছি, ছোটদের জন্য কাঞ্চনজঙ্ঘা সিরিজ, অঙ্গকনকা সিরিজ এবং প্রাচেলিকা সিরিজে অনেক নূতন ধরনের গোয়েন্দা কাহিনী এবং রোমাঞ্চ কাহিনী বেরিয়েছিল; বলা বাহুল্য এ প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। কারণ প্রথমোক্ত সিরিজ ছাটি থেকে

অনেকগুলি এবং শেষোক্ত সিরিজ থেকে দু’তিনটে ভাল বই পাওয়া যায় যা প্রশংসার যোগ্য।

অতি উত্তম না হলেও কিশোরপাঠ্য রচনা ও রোমাঞ্চকর যে কয়েকখানি ভালো বই আমরা পাই এই সিরিজে তিনটির থেকে তার মধ্যে কয়েকখানি হয়ত অনুবাদ, কিন্তু কতটা প্রশংসার যোগ্য। এর মধ্যে আমরা হেমেন্দ্রকুমারের সুন্দরবনের রক্তপাগল, কুমারের বাঘা গোয়েন্দা, রক্তপুরের যাত্রী, দেবপ্রসাদ সেনগুপ্তের সকলের তিমালয়, সুবোধকুমার দাশগুপ্ত জীবনের মেঘদ, শেব নিখোঁস ইত্যাদি। এই সিরিজ ছাড়াও আরো কয়েকখানি সুখপাঠ্য বই-এর নাম করা যেতে পারে। শুকুমার দে-সরকারের হলুদকুঠি, নিশাচর, খগেন্দ্রনাথ মিত্রের আফ্রিকার জঙ্গল, হেমেন্দ্রলাল রায়ের দুর্গম পথের যাত্রী, সুবোধচন্দ্র মজুমদারের পাতালপুরী ইত্যাদি। ছোটদের মনকে আকর্ষণ করার মতই লেখা এগুলি। ছোটদের জন্য লিখতে গেলে কল্পনার মাত্রা সহজ সুন্দর স্বাভাবিক হওয়া চাই।

আমরা ছোটদের রহস্যময় ও রোমাঞ্চকর কাহিনীকে তিন ভাগে বিভক্ত করতে পারি—বৈজ্ঞানিক পটভূমিকায় কোন বৈজ্ঞানিক অভিযান বা রহস্যজনক আবিষ্কার। নানাবকমের অভিনব পদ্ধতির গোয়েন্দা কাহিনী, তৃতীয়তঃ প্রেততত্ত্বের উপর ভিত্তি করে নানা রকম ভৌতিক কাহিনী। কিন্তু যে বিষয় নিয়ে যাই লেখা হোক, আন্তরিকতার স্পর্শ না থাকলে সবই অচল। উপযুক্ত ছোটদের কাহিনী বড়দের মনকেও আকর্ষণ করে। যথার্থ রসাতীর্থ ভৌতিক কাহিনীগুলির আদর বড়দের কাছেও কম নয়। নানা রকম বৈজ্ঞানিক পটভূমিকায় লেখা গল্প এবং গোয়েন্দা কাহিনী ছাড়াও কিশোর-সাহিত্যে আর একটা বিশেষ স্থান অধিকার আছে রহস্যময় ও রোমাঞ্চকর ভৌতিক কাহিনী। অজানা ভৌতিক কাহিনী লিখে ওদেশে ব্রায়ান ষ্টোকার যদিও ততটা খ্যাতি পাননি তবুও তাঁর ড্রাকুলা যে সারা বিশ্বে অসাধারণ খ্যাতি লাভ করেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই উপন্যাসটির চিত্ররূপ প্রদর্শিত হয়েছে, নামভূমিকায় অভিনয় করেছেন লন চানী। অত্যাশ্চর্য্য ড্রাকুলা উপন্যাস ও তার চিত্ররূপের মধ্যে পার্থক্য আছে যথেষ্ট। আজ পর্য্যন্ত বিশ্বসাহিত্যে যতগুলি ভৌতিক কাহিনী রচিত হয়েছে, তার মধ্যে ভীষণতম উপন্যাস এই ড্রাকুলা। একে শ্রেষ্ঠতম বললেও বোধ হয় অত্যাশ্চর্য্য হবে না।

বাংলা ভাষার মূল ভৌতিক কাহিনী বলতে আমরা ডক্টর, পেঙ্গুই, শাঁকচুন্নী দে’ড নামদো এবং ব্রহ্মদৈত্য বা ব্রহ্মদেবতার কথাই এছাড়া আর কিছুই পাই না। কিন্তু ভৌতিক কাহিনী অতি চমকপ্রদ ভাষায় বর্ণিত হলে মনকে তা কিছুক্ষণ আচ্ছন্ন করে রাখতে পারে। বাংলা দেশের শিশু সাহিত্যিকদের মধ্যে অনেকেই ভৌতিক রচনার নামে হাতেরদোর সৃষ্টি করেছেন। ভৌতিক কাহিনীর মধ্যেও এমন একটা বাস্তব অথচ ভয়ানক আবহাওয়া সৃষ্টি করা দরকার যাতে পরিবেশটা বিশ্বাসযোগ্য হয়ে দাঁড়ায়। প্রেততত্ত্বের উপর ভিত্তি করে এদেশে ও ওদেশে অনেক কাহিনী রচিত হয়েছে, যেগুলি রহস্যময় পটভূমিকায় বাস্তব অনুভূতির ওপর ভিত্তি করে বলা হয়েছে, সেইগুলি যথার্থ সার্থক হয়েছে, সত্য হোক মিথ্যা হোক ভৌতিক কাহিনীর যে একটা বিশেষ মূল্য আছে তা অস্বীকার করা যায় না। মাঝবের মৃত্যুর পরেও যে কিছু আছে এ নিয়ে গবেষণার অঙ্গ নেই, এক দিবে

যেমন পুনর্জন্মবাদ—আধ্যাত্মিক জন্মের সৃষ্টি হয়েছে, অপর দিকে ঠিক তেমনই প্রেতজন্মবাদ—অশরীরী প্রেতাত্মা এমন কি শরীরী প্রেতেরও সৃষ্টি হয়েছে।

যে দিনা অল্পকৃতি মানুষকে ভগবানের অস্তিত্ব জানিয়ে দেয়, সেই অল্পকৃতিই মানুষকে আগিরে দেয় আমাদের চার পাশে অদৃশ্য অলৌকিক রহস্যময় কিছু আছে। মানুষ মরে গেলেও তার ইচ্ছাশক্তির কাজ করে, কোন কোন মানুষের ভবিষ্যৎ সৃষ্টি থাকে, দূরগত বিশেষের আভাস তারা বুঝতে পারে, মানুষ না থাকলেও তার ছায়াময় অস্তিত্ব থাকে। মৃত্যু, অতীত বাসনা কামনা ইত্যাদি তা অতি উদাহরক, কেউ কেউ তা চিন্তার্ত কল্পে চার অপারের ওপর নিজেদের আরোপ করে। নানান বকম বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে যে সমস্ত ভৌতিক কাহিনী রচিত হয়ে ও তার মধ্যে নিঃসন্দেহ হেমেন্দ্রকুমার রায়ের রচিত লেখাগুলিই শ্রেষ্ঠতম। যদিও তাঁর কয়েকটি বই ডাকুলার খজাণার অম্ববাদ হুবহু তার মধ্যে মৌলিকতার অভাব নেই, নিতান্তই প্রাণহীন আড়ষ্ট অম্ববাদ নয়। তাঁর কিশোরপাঠ্য রচনাগুলির মধ্যে যে লিপি-কুলসত্য আছে তা অতি অদ্ভুত। তাঁর লেখা বিশালগড়ের দুঃশাসন, মোহনপুরের আশান, প্রেতাত্মার প্রতিশোধ এবং ঐন্দ্রজালিক পড়লে চমকিত হই। অম্ববাদ চলেও ডাকুলার সঙ্গে বিশালগড়ের দুঃশাসনের পার্থক্য আছে যথেষ্ট, মিলিয়ে পড়লেই সে কথা বুঝতে অসুবিধে হয় না।

‘বিশালগড়ের দুঃশাসন’র ভাষা এবং ঘটনা-বিত্তাস পাঠকে বিস্মিত করবার মত। বিনয় বখন বিশালগড় অভিযুখে রওনা হইল, সেইখানটা অথবা রাজ্য প্রতাপকন্ডের ঘরে গিয়ে বিনয় বা দেখলো অথবা অবিনাশ বাবু বখন বিনয়কে প্রায় মোহাচ্ছন্ন অবস্থায় গণ্ডির তেতরে টেনে আনলেন তখন, তখন পাঠককেও ভীত, বিস্মিত এবং চমকিত করে। হেমেন্দ্রকুমার রায় কৃত শ্রেষ্ঠতম উপন্যাস বলা চলে ‘মানুষ-পিশাচ’কে। কারণ ‘মানুষ-পিশাচ’র কাহিনীর বিস্তার, অত্যাশ্চর্য্য ভাষার খেলা এবং ভৌতিক অংশ সমস্তই অতুলনীয়। এরকম অদ্ভুত গিপিচাতুর্য্য সাধারণতঃ কোন ভৌতিক কাহিনী রচনার দেখা যায় না। ভগবত্ব অপরাধী নবাব ও তার ছয়জন প্রেত অম্বচরের কথা যে একবার পড়েছে, সে কখনোই ভুলে যাবে না। ‘মানুষ-পিশাচ’র কাহিনীর মধ্যে ‘ডাকুলার’ একটা অল্পট্ট আভাস আমরা অম্বভব করি। যদিও কাহিনীর জোর ‘বিশালগড়ের দুঃশাসন’রই বেশি। ভবু ও রচনা-রকতার জ্ঞান প্রথম স্থান ‘মানুষ-পিশাচ’র।

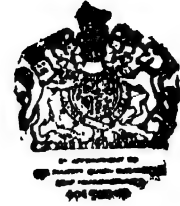
এ ছাড়া জেরের বাবুর আদরও তিনখানি বই ‘সন্ধ্যার পরে সাবধান’, ‘রাত্রে যারা ভয় দেখায়’ ও ‘যাঙ্গের নামে সবাই ভয় পায়’ ছোট ছোট ভৌতিক কাহিনীতে পূর্ণ। এগুলির মধ্যে ‘বাজলে বাঁকী কাছে আসি’ ও ‘মিসেস কুমুদিনী চৌধুরী’ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যে শেষোক্তটি ‘ডাকুলার’ খণ্ডাংশের অম্ববাদ। হেমেন বাবুর ভৌতিক কাহিনীর প্রত্যেকটিই উল্লেখযোগ্য। ‘প্রেতাত্মার প্রতিশোধ’ অদ্ভুত রচনা! এরকম ভৌতিক কল্প রচনা প্রায় দুর্লভ! যে কোন কারণেই হোক মানুষ খুন করে যারা প্রেত-পাহাড়ের উপত্যকায় বাস করে তার এবং বংশধরদের আর কোনও কারণেই রেহাই নেই। পক্ষার পরেও চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রাখবে এই রচনাটি। আমরা একটা বিষয় লক্ষ্য করেছি যে, দৃষ্টতঃ অথবা অদৃষ্টতঃ ‘ডাকুলার’

প্রভাব নিয়ে বত বেশি ভরাবহ রসোত্তীর্ণ গল্প লেখা সম্ভব হয়েছে আর কোনটিই তত নয়। এই জগতই আমরা সারামস্তোফাসকে অভিনন্দন না জানিয়ে পারি না।

ডাকুলার প্রায় হুবহু অম্ববাদ শ্রীমতীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘বিশেষী আত্মা’। ‘বিশালগড়ের দুঃশাসন’ এবং ‘বিশেষী আত্মা’ মিলিয়ে পড়লেই ‘বিশেষী আত্মা’কে অনেক উঁচুতে স্থান দিতে হয়। অনেক বেশি ভরাবহ চিত্তাকর্ষক ঘটনা ‘বিশেষী আত্মা’তে পাই। ‘বিশেষী আত্মা’র মৃত্যু-তুহিনতা, রাজা কৃতান্ত বর্মার অদ্ভুত ভৌতিক-বিজ্ঞান প্রায় স্তম্ভিত করে দেয়। এই লেখকের লিপিচাতুর্য্য ততটা প্রখর না হলেও নিঃসন্দেহে তাঁর ‘বিশেষী আত্মা’ যে কোন ভৌতিক উপন্যাসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলা চলে কাহিনীর রিক থেকে। ‘বিশেষী আত্মা’ পড়লে মনে হয়, কাহিনীর জোর অত্যাশ্চর্য্য বেশি বলেই বইটি যথার্থ প্রশংসার যোগ্য হয়েছে। ছাংখের বিষয়, এই অদ্ভুত সৌন্দর্য্যক উপন্যাসটি এখনও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়নি ‘রামধনু’তে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এই লেখাই প্রমাণ করে দেয়, লেখক ইচ্ছা করলে বিশেষী সাহিত্য থেকে অতি উৎকৃষ্ট ভৌতিক কাহিনী কিশোরদের জ্ঞান উপহার দিতে পারেন এবং এতেই কৃতকার্য হবেন।

এ ছাড়া ছোটদের জ্ঞান আরো কয়েকখানি উৎকৃষ্ট বই-এর নাম করা চলে, যথা—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ‘অসম্ভব’, এই বইয়ের গল্পগুলিতে যথার্থই লিপিচাতুর্য্যের পরিচয় আছে। ছোটদের জন্যে ইনি যা লিখেছেন, তা প্রকৃতই সুন্দর রচনা। কিন্তু ছোটকরের প্রভাব সম্পূর্ণ ভাবে এড়িয়ে উন্নত ধরণের অতি সুন্দর সাবলীল ভাষায় রচিত শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভৌতিক কাহিনীগুলি। তাঁর রচিত কালী কবিরাজের বিপদ, “হুটি মস্তুর” প্রভৃতি গল্পগুলি বাহ্যঃ সাহিত্যে নিশ্চয়ই ক্লাসিক। বিভূতিভূষণের প্রত্যেকটি পাতায় যে অশরীরী পরশ রয়েছে তা সত্যই অতুলনীয়। “আরক” গল্পের বাস্তবিক তুলনা নেই। গভীর রাতে চাঁদের আলোয় আকাশপরীর যখন জল খেতে নেমে আসে, তখন সে দুজ্ঞ যে দেখে সে আর আপনাকে ধরে রাখতে পারে না! এমন উন্নত ধরণের ছোট গল্প খুব বেশি পড়া যায় না। বিভূতিভূষণের ভৌতিক গল্পে কেমন একটা সক্রিয় ভাব দেয়া যায়, মৃত আত্মা সেও গিয়েও এপারক ভুলতে পারে না তাই সে নিয়ত মানুষকে ওপারের ডাক দেয়। শ্রীকামাকীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের “মধুর” এমনই একটি ‘সক্রিয় রহস্যময় গল্প, “আরক” ও মধুরের পেছনে “সুদৃষ্ট পাখানের” প্রভাব আছে মনে হয়।

বড়দের সাহিত্যে রহস্যময় ও রোমাঞ্চকর রচনা লিখে যারা সাংগ সাহিত্যকে প্রকৃতই উন্নত করেছেন, তাদের মধ্যে শ্রীলেন্দ্রকুমার রায়, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, পাঁচকড়ি দে, ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। কিন্তু কিশোর-সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করতে বসে বড়দের সাহিত্যে রোমাঞ্চ ও রহস্য নিয়ে আলোচনা ভালো দেখায় না। পরে স্বত্ত্ব ভাবে করবার ইচ্ছা রইল। যদিও দীনেন্দ্রকুমারের অনেক রচনা এবং শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোন কোন রচনা কিশোরপাঠ্য হিসাবেও অতি উৎকৃষ্ট। কিন্তু এরা কেবল মাত্র বড়দের জ্ঞান লিখেছেন বলেই সে সব রচনার নাম এখানে উল্লেখ করলাম না।



পিয়র্স

... সুন্দরী

নারীদের

ঐতিহ্য

“পিয়র্স” নামটি সারা পৃথিবীর
সুন্দরী নারীদের কাছে অতুলনীয় গুণাবলীর
প্রতীক — মোলায়েম এবং ভাল পিয়র্সে
ভাদের সৌন্দর্য সম্পূর্ণ নিরাপদ।
সেইজন্যই তাঁরা পিয়র্স সাবানের সাহায্যে
তাদের লাবণ্যের যত্ন নেন — পিয়র্স আসল
মিসারিণ যুক্ত সৌন্দর্য সাবান।
এটি স্পর্শকাতর হৃদয়ের পক্ষে এত বিত্তম এত ভাল।
শিশুদের পক্ষে সেইজন্যই এটি আদর্শ সাবান।
মধমলের মত মোলায়েম পিয়র্স ট্যালকম
পাউডারে অপরূপ মুগ্ধ ছাড়াও আছে
সেই একই গুণাবলী এবং বিত্তমতা।



আপনার সৌন্দর্য
চর্চায় নিরবিন্দ
পিয়র্স ব্যবহার করুন

চন্দ্রা তার নাম

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

১

তিম্মান নং বেজিমেন্ট ইঞ্জিনিয়ার ইভাল। দীর্ঘ দেহ। একহারা গড়ন। পঁচিশ বছর বয়সের তুলনায় যেন একটু বালক ভাব আছে চেহারায়। বিশেষতঃ দুই চোখের দৃষ্টিতে আছে একটা বিষ্ময়ের ভাব। যেন বুঝতে চেয়েও বুঝতে পারছে না কিছু মানুষটি। ঈষৎ বিব্রত ভাব, কুণ্ঠিত একটা মিনতির ব্যঙ্গনা এখনও ইভালের মধ্যে দেখা যায়, যা দেখে অন্ত্যান্ত সাহেবরা বিজ্ঞপন করেন। তাঁদের মনে হয় মানুষটা দুর্বল চরিত্রের। দুর্বল হোক না হোক, সে যে কিছুটা স্বল্পভাষী ও স্বল্পদর্শী তাতে সন্দেহ নেই। আর এখনও তার এ দেশ সম্পর্কে অনেক কৌতূহল অনেক জিজ্ঞাসা আছে মনে। সেটাও তাঁদের কাছে কম আশ্চর্য বোধ হয় না। আকর্ষণ ও পাণ্ডার কেবল পাকা জঙ্গী বুড়োরা ইভালকে বোঝাতে ছাড়াই না—এতে স্বল্পদর্শী, এ দেশটাব মাটিতে সোনা-রূপো ছড়িয়ে নেই, আন কলকাতার পাথে যাটে বাঘ সাপ যোগী সাধু কিলবিল করছে না। এ নেহাংই একটা জায়গা। বুদ্ধি থাকলে পেট আর ট্যাক দুই-ই তোমার ভরবে। আর নেটিঙুলোকে দুইশো হাত তফাৎ রেখে চলবে। ওদের অসভ্য পোষাক, বাঁহুরে ভাষা আর আমাদের সম্পর্কে উদ্ভট আজ্ঞাব্যবহার ধারণা—সবগুলোই দূরে বেগে চলা উচিত। কি ছিলো এ দেশে বল? সবই তো আমরা এসে শেখানো। তিগারী, নেহাং তিগারী এরা। এদের সঙ্গে মিশেছি কি মরেছি।

কিন্তু বুঝেও বোঝে না ইভাল। হাজারটা শেখানো কথাও তার মনে থাকে না। আর একটা কথা সে কারকে বোঝাতে পারে না। নিজের সম্পর্কে তার নিজেরই খানিকটা বিভ্রান্তি রয়েছে। জ্ঞান থেকে তার যতটুকু মনে পড়ে, সে যেন সর্বত্রই বেগান্না। নিজের যেন সেই প্রবাদবাক্যের চৌকো পেরেক, যে কোনও গোল গর্তেই খাপ খায় না। আরো কি, সমস্ত দোষগুণ আর অসঙ্গতি ক্ষমা করে তাকে গ্রহণ করবে এ রকম কোনও মনের মানুষ দূরে থাক, কোন বন্ধুও সে পায়নি। ঐ রকমই দাঁড়িয়ে গিয়েছে তার চরিত্রের আদল।

তবে বিটুরের প্রাসাদে এক পৌরালী সন্ধ্যায় চন্দ্রাকে দেখে ভালো লেগেছিল তার। শুনলো সে মেয়ে কানপুরে থাকে। মেয়েটিকে দেখে ভাল লাগলো তার। আর মনটা যেন ঈষৎ উত্তপ্ত হলো। টমশন ও ফ্রেডরিক প্রমুখ বন্ধুরা অবশ্য উপদেশ যা দিলো তা বজ্জনেরই মতো। বললো—এ সব কাজ করে এমন বুড়ো মেয়েছেলে পাবে অনেক। পাঁচিরে দাঁও একটাকে কটা টাকা বা গয়না দিয়ে।

ভালো যেতেও পারে। তবে আমি বলি বন্ধু, ঐ আলগা আলগা করে যাওয়া-আসাই ভালো। বেশী জড়াতে গেলে ড্রাইটের মতো কেসে যেতে হবে।

আর একজন বললো—ড্রাইট হলো হাফনেটিভ। আর যা-ই বলো ড্রাইট পুরুষ বাচ্চা। মেয়েটাকে শায়েস্তা করে রেখেছে। ফৈজাবাদের কালেক্টর কি ক্যাপ্টেন নম্বের মতো একেবারে সবটুকু বিকিয়ে দেয়নি।

মাতৃভূমি আর এই দেশের মধ্যে যেমন সাত সাগরের তফাৎ, নোণাজলের চেউ খেয়ে খেয়ে আইন-কানুনও পালটে গিয়েছে এদেশ কাছে। স্বদেশে এবং এখানে শ্বেতাঙ্গিনীদের সম্মান রাখবার আজও জানকবুল আব মানকবুল রাখতে প্রস্তুত আছে উদ্দমন ফ্রেডরিক, ইভালবা। কিন্তু এ দেশের মেয়েদের দরকার তলে দো বন্ধ করে বাংলা ঘরে ঢাবুক দুই-এক ঘা মারতে দোষ নেই। প্রথম দিলেই এরা মাথায় চড়ে বসবে।

সে বিষয়ে মতবিরোধ হয় না। তবু টাটকা আমদানী ইভাল চট করে অতখানি অধিকার জাহির করবার কথা ভাবতে পারে না। এই হুনিয়াতে তার অবাধ অধিকার থাকতে পারে কোন নিয়মে এ কথা ইভাল ভাবতে পারে না।

খিওড়োর এফ ইভাল পাঁচিশ বছর আগে কোথায়, কোন পরিবারে কোন মায়ের কোলে জন্মেছিলো, তার মনে নেই। তাই এখন যতদূর যায়, মনে পড়ে একটা উঁচু পাঁচিল। সেই পাঁচিলটা যে তার শিশুমনকে শৈশবে কয়েদ করে রেখেছিলো। আর আজ সে কথা মনে করতে গেলেই মনটা গুটিয়ে যায়। থেমে যায়। মনে হয় থাক। ঐ পাঁচিলটার ওপারে স্যাঁতস্যাঁতে একতলা ঘরে লোটা খাটে বসে একটা রোগা ছোট্ট ছেলের কথা মনে করে কাঁদে নেই তবু মনে হয়। মনে হয় সে ছোট্ট ছেলের বয়স হবে নয় কি দশ সুপারের চড়ের দাগ গালে লাল হয়ে ফুটে রয়েছে। আব ঢোং জল চিকচিক করছে। মনে পড়ে ছেলোটাকে শান্তি দি অনাথাশ্রমের সুপার সে দিনকার মতো উপোসী রেখেছেন। জা ওপারে দাঁড়িয়ে সুপারের প্রিয়পাত্র একটা নিষ্ঠুর ছেলে, বয়স হাতের কি চোদ্দ, চেহারা বেশ বলিষ্ঠ—পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে হাফি তারিয়ে একটা আপেল কামড়াচ্ছে। রোগা শান্তি পাওয়া হলে মুখ তুলেও দেখছে না। চুনিয়ার অবিচার আর অত্যাচারের মন তার ভোঁতা হয়ে গেছে। মনটা দিয়ে সহস্র সূচীমুখে পড়ছে।

শৈশবে তার বাপ মা মরে গিয়েছে, আর জন্ম থেকেই যে অনাথাশ্রমে মানুষ, সেই বাচ্চা খিওড়ার তখন শুধু একটা কথাই ভাবতো। ভাবতো, যে এমন কি কেউ নেই যে তাকে এই নরক থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যেতে পারে? এই পাঁচিলঘেরা বাড়ী, সুপারের থেকে শুরু করে প্রত্যেকের হাতে মার পাওয়া, জলের মতো স্থপ আর শক্ত কালো রুটি খেয়েই কি তার দিন কেটে যাবে? মনে হতো কিছু ছেলেকে তার আত্মীয় স্বজন এসে নিয়ে গিয়েছেন। কেউ বাইরে পালিয়ে গিয়ে রুজি-রোজগার করছে। মনে হতো এর চেয়ে কয়লার খনিতে কাজ করা বা চিননা সাক করাও যি ভাল।

এই ছিলো জীবন। আর প্রত্যেক দিন হুমোবার আগে এই জীবনের জন্তোও ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে হতো। বলতে হতো Hallowed be thy name.

হে ঈশ্বর, তোমার নাম জয়দীপ্ত হোক। জয়দীপ্ত হোক হে ক্ষমাময় ঈশ্বর এই স্যাং-স্যাং ঘরে শীতে ঠাণ্ডা লিছানা আর গাওয়া সস্তা গরম শাটের জুতা, ঝর ও কাশিতে মরে যাওয়া ছোট ছোট কান্ধা শায়িত বালকদের জুতা, কদম চারিত্রের বর্কর চাকরদের হাতে বিবিধ নিত্য-মুহুর অত্যাচারের জুতা। জয়দীপ্ত হও তুমি।

ঠাং সম্ভব হলো স্বপ্ন। মুক্তি এলো খিওড়ারের জীবনে। খিওড়ারের মা সঙ্গতিপন্ন এক কাপড়ের ব্যবসায়ীর মেয়ে হয়েও পানির এসে বিয়ে করেছিলেন তার বাবাকে। বাবা নেহাংই সঙ্গতিপন্ন। এক জমি কেনাকাটা দালালের সহকারী ছিলেন তিনি।

তার মায়ের পিসামার ছিলো ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীতে কিছু

শেয়ার। খিওড়ারের এগারো বছর বয়সে একদিন সেই মহিলার তরফ থেকে খোঁজ এলো। তাঁর নোটারী শাবলিকের তরফ থেকে। ভায়োসেটের ছেলের জুতা কিছু করতে চান তিনি। শিক্ষাদীক্ষার খরচ বহন করতে চান।

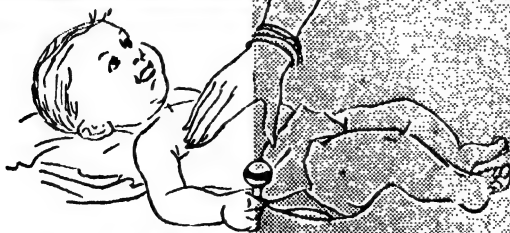
অনাথাশ্রম থেকে লগুনের উপকণ্ঠে এক ফুল। ভয়মহিলার খারাপা ছিলো ইঞ্জিনীয়ার করবেন খিওড়ারকে। তাঁর আশায়ুগুপ হয়ে উঠতে খিওড়ার ক্রান্ত হয়ে পড়লো। তিনি ছিলেন বাতিকপ্রসূ এবং খুঁংখুঁতে। আহার পরিচ্ছদ বা শিক্ষাদীক্ষায় তিনি কার্পণ্য করতেন না। যদিচ বিলাসিতার বিরোধী ছিলেন। তবে অদ্ভুত অদ্ভুত বিষয়ে তাঁর জেদ দেখা যেতো। চেয়ারের সোফায় তিনি শালা ঢাকনী দিয়ে রাখতেন। হেলান দিয়ে বসলে তিনি চটে যেতেন। পিঠসোজা করে বসে থাকতে পারেননি, বা হেলান দিয়ে বসেছেন, এই সব কারণে ষি ও রাধুনীর সঙ্গে তাঁর ঝগড়া হতো। তা ছাড়া অনাথাশ্রমের জন্তো উলের মোজা বোনা তাঁর অস্বস্ত্য বাতিক ছিল। বছরে দুবার করে তিনি একশো জোড়া মোজা দান করতেন অনাথাশ্রমে। আর সেই উলের কাঁটায় মরচে পড়লে বা হারিয়ে গেলে তাঁর মেজাজ খারাপ হয়ে যেতো। তিনি কুকুর পুখতেন না। বেড়ালের ওপর ছিল তাঁর টান। এবং বেড়ালকে তিনি কুকুরের মতো চেনে বেঁধে বেড়াতে বেরুতেন। তাঁর বিবিধ বাতিক সম্পর্কে হাসি-ঠাট্টা করলে তিনি রেগে যেতেন।

পুখমজাতি সম্পর্কে তাঁর অবিশ্বাস এত প্রবল ছিল, যে বাড়ীতে

বেড়াল বা পাখীও পুখবার সময়ে তিনি সময় দেখে কিনতেন।

বুকে সর্দি বাসছে ?

বুকে পিঠে সর্দি বসলে ভয়ের কারণ বৈকি! এ অবস্থায় ভেপোলীন মালিশ করলে সঙ্গে সঙ্গে উপকার পাওয়া যায়। কারণ ভেপোলীন ত্বকের মধ্য দিয়ে এবং নিঃশ্বাসের সঙ্গে শরীরের ভেতরে যেয়ে একযোগে অতি দ্রুত কাজ করে। ঠাণ্ডা লেগে মাথাধরা ও গলাধরায়, ব্যথা ও বেদনায় ভেপোলীন আশ্চর্য্য মালিশ। আজই এক শিশি কিনে বাড়ীতে রেখে দিন।



ভেপোলিন

পরিবেশক : জি. দত্ত এণ্ড কোং
১৬, বনফিল্ড লেন - কলিকাতা-১

বোরোলীন প্রস্তুত কারকের সাক্ষরী

খিওড়ারকে কেমন কঠোর ধৈর্য একটু ধৈর্য করে ফেলেছিলেন। লীডস-এ পাঠাবেন ইঞ্জিনিয়ারদের স্থলে পড়তে সব ঠিক করেছেন। সহসা আবিষ্কার করলেন খিওড়ার কবিতা পড়ে ও লেখে।

সঙ্গে সঙ্গে খিওড়ারের সম্পর্কে ভীত হয়ে পড়লেন তিনি। ভাড়াভাড়া পাঠালেন তাকে লীডস-এ।

হুই বছর বাদে যখন ফিরলো সে, তখন সে লম্বা হয়েছে অনেক। বেশ ঝাড়াঝাপটা চেতারা।

মহিলাব মনে হলো, বাড়ীতে এই একজন পুরুষের নিরন্তর উপস্থিতি তাঁর পক্ষে নেহাৎ অসহ্য। খোঁজ করে তাকে পাঠালেন কল্যাণনিতে চাকরা দিয়ে।

কিন্তু নিজেকে নানাতে পারল না ইভান্স। ইঞ্জিনিয়ার সে নামেই। আসলে মালিক চায় যে সে জবরনস্ত হোক। কাজ আদায় করুক। যে অবস্থায়, যে বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে কাজ করে শ্রমিকরা, দেখে তাব মন প্রথমে ফুট হলো, তারপর ভেঙে গেল। শ্রমিকদের নিষাপত্তার জ্ঞান কিছু করতে-ই নারাজ কর্তৃপক্ষ। ইতিমধ্যেই খনিতে দুর্ঘটনা হলো। ইভান্সকে দোষী খাড়া করলেন কর্তৃপক্ষ। মিটিং-য়ে ইভান্স বার বার বললো, যে সে শ্রমিকদের নিষাপত্তার জ্ঞান যা-ই বলেছে, সেটাই উপেক্ষা করা হয়েছে। এমন কি জল সেচে ফেলবার ব্যবস্থাও করেন নি তাঁরা সময় মতো। এমন পরিস্থিতিতে কাজ করেছে শ্রমিকরা, যে মৃত্যু অনিবার্য, ঠেকানো সম্ভব নয়।

ইভান্সের ধুইতায় চটে গেলেন কর্তৃপক্ষ। সেখান থেকে চলে এলো ইভান্স। বললো—সম্ভব হলো না।

সম্ভব হলো না কি? চটলেন সে মহিলাও। বললেন—অনিদিষ্টকাল ধরে আমি তোমায় পুষতে পারব না।

সে কাজ থেকে তাকে সহকারী নিযুক্ত করেছিলেন এক কাচের কারখানায়। সেখানে বিশেষ সুবিধে তরতে পারল না ইভান্স। তার অসাবধানতায় ক্ষতি হয়ে গেল মালিকের। আবার হাতফিরতি হয়ে ফিরে এল সে।

সম্পর্কিত ঠাকুরা আর কি করতে পারেন? অগত্যা লেখালেখি করে ইভান্সকে ভাবতবর্ষে পাঠানোই স্থির হলো। বিদায় স্বাক্ষার দিনে ভ্রম্মহীলার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো। বললেন—আমি তো তোমাকে সেই বর্ষের অনুরক্ত দেশটার পাঠাতে চাইনি! কে না জানে, যত রাজ্যের নোংবামি কুসংস্কার আর অনুরক্তবিশুখ সেখানে? হয়তো সাপ-ই কামড়াবে তোমাকে, বা অস্ত্র কিছু বিশদে পড়বে, বা আমার ধারণা অতীত।

তার পর নশ্টি টেনে খেলিস্টন্ট শুঁকে তিনি নিজেকে সামলে নিলেন। সোনার চেনে গাঁথা একখানি মুক্তাখচিত ছোট ক্রশ তিনি দিলেন ইভান্সকে। বললেন—আর কিছু দিতে পারলাম না। সর্বদা সঙ্গে রেখো। এটা তোমার মাকে দেবো বলে মনে ইচ্ছে ছিলো। তা তো আর হলো না।

তা ছাড়াও দিলেন বিশ পাউণ্ড। পরম কুণ্ঠিত ও বিব্রত হয়ে ইভান্স বার বার বলতে লাগলো—না, না। কি দরকার। কি দরকার!

ভারতবর্ষে আসবার পরে অবশ্য ইভান্স তাঁর চিঠি পেয়েছিলো। সেও লিখেছিলো। ব্যস, তার পরে আর চিঠিপত্র নেই।

এখানে ইভান্স এলো হুইলারের রেজিমেন্টে ইঞ্জিনিয়ার হয়ে। আর এই সুবুহু উপনিবেশে যেতাদের সমাজজীবন দেখে দিশাহারা হয়ে গেল। এত অবসর, এত স্বচ্ছলতা, এত সুশ্রুচর বাস্তব-পানীয় দাস-দাসী!

এই জীবনের নেশা সবে আমেজ ধরাচ্ছে তার চোখে, তারই মুখে চম্পার সঙ্গে দেখা। আর তারপর রেজিমেন্ট-এর এক সুবুহু জলসার তাড়াছড়ো লাগলো।

চামড়ার জিনপোষ ও জুতোর কারবারী, ধনী ব্যবসায়ী পূরণমল-এর বাগানবাড়ীতে মাছ ধরতে গিয়েছিলো ক'জন। ভোর রাত থেকে বেলা অবধি বসে চাকরদের কাঁধে মাছের বেতের ঝোলা আর হুইল ইত্যাদি দিয়ে ফিরতে ফিরতে ব্রাইট ইভান্সকে চোখ টিপে বললো—কালো আগুন দেখেছ? আসবে এই জলসার!

—কে?

—চম্পা। চম্পা তার নাম।

শুনো ইভান্সের মেজাজ খুসী হয়ে গেল। ব্রাইটও কেন জানি খুসী-খুসী ভাব। চারি পাশে তাকিয়ে ওঁকে বললো,—মনে হচ্ছে এবার জবরনস্ত গরম পড়বে। শুকিয়ে যাবে খালবিল। আর জলের জন্তে ইন্তে হয়ে থাকে কোঁকে পাখী এসে পড়বে। আঃ, কি মজাই না হবে! গরমকালে বসে শীতকালের মতো পাখী শিকার করতে পারবে।

—ব্রাইট, তুমি নাকি শিকার বিষয়ে অনেক জান?

স্বরণ করতে আশ্চর্যসাদে ব্রাইটের মুখ হাসিতে ভরে গেল। বললো—শিখিয়েছিল একটা বদমাইস। জন্মও করেছিলাম তাকে। তবে বুড়ো ম্যাকমোহনের জন্তে লোকটা বেঁচে গেল। বেরিলী আর নৈনীর পাথে ট্রানজিট একটা সাফাখানার কীপার আছে লোকটা। পাঁচটা শিকারী। বলতেই হবে! দেখলে মনে করবে বুড়িরে গিয়েছে। কিন্তু হাড় হাড় শক্তি। আর নজর কি! বাঘের মতো তীক্ষ্ণ।

রেজিমেন্টের জলসা। সিভিলিয়ান যতো সাহেব, ব্যবসায় খাতিরে যারা আছে সে সব সাহেব, তা ছাড়া রেজিমেন্টের বত অফিসাররা সমবেত হয়েছেন। মার্চ মাস শেষ হয়েছে। এখনো লেগে আছে শীতের আমেজ। আর এমন এক জলসার আয়োজন হয়েছে, যা নাকি কানপুরের মানুষ অনেক দিন মনে রাখবে। গালিচা নাকি এমন সুকোমল এমন সুন্দর যে হাঁটতে গেলে পায়ে এক অপূর্ব সুখানুভূতি হবে। খাস পারশ্ব থেকে আমদানী কারিগররা যারা দিল্লীতে বসত করেছে হুইশো বছর ধরে তাদের কোমল ও পাতলা আঙুল এই গালিচা বুনেছে কত দিন ধরে। এর বেশম ও পশম রং করেছে লক্ষ্যে ও কৈজাবাদের সুবিখ্যাত স্বরেজীরা। তাদেরও আঙুলের স্পর্শ মিলবে এতে।

এই গালিচায় কত মন্থন, কত বাগিচা কত নক্সা ফুটে উঠেছে। এর বুক হাঁটতে গেলে এমন মনে হওয়াও অস্বাভাবিক নয়, যে অনেক ভারতীয় কারিগরদের অনেক পুঞ্জীভূত স্বপ্ন ও শ্রমই পায়ের তলে এমন কোমল হয়ে বুক পেতে দিয়েছে।

মাথার ওপরে ছলছে সুবুহু ঝড়। অপক্লপ তার কান্ধকান্ধ, অদ্ভুত এক স্বপ্নলোকের আলোকিত সমারোহ যেন লীপামান।

দেখলে আঁটা শিতলের ও রূপার ফুলদানীতে জ্বরপূরের কারিগরদের হাতের কাজ। বুকে তার গুচ্ছ গুচ্ছ কাশ্মীরী ও শাহারাণপূরের গোলাপ।

পাতলা কাচের গেলসে টলমল টলমল সোনালী খেতাব ও স্বচ্ছ পানীয়। "দুর্মুলা সেই ফরাসী ও বিলেতী পানীয়। অনেক মূল্য তার। উর্দি পরে ঘুরছে যে সব বেরারা তারা সন্তর্পণে বয়ে আনছে ট্রেগুলি। মেমসাহেবরা বসেছেন স্বামীদের পাশে। তাঁদের বেশভূষায়ও আত্মজাঁকজমক। এদেশে এসে কোন খেতাব ললনার সাধ যায়নি হারা, সোনা, মুক্তা পরতে? তাঁরাও কিছু কিছু গহনা পরেছেন। ফরাসী সিল্কের পোষাকে আলো ঝলমল করছে।

অপর দিকে বসেছেন কতিপয় ভারতীয় রিসালা ও ইনফ্যান্ট্রির অফিসাররা। আর সাহেবদের সঙ্গে সহজে কথাবার্তা চালাতে অভ্যস্ত বাঙালী বাবুদেরও দেখা যাচ্ছে।

স্নাববরে সাহেবদের নাচ ও ব্যাণ্ডের আয়োজন আলাদা। এখানে তাঁরা বসে কিছুক্ষণের জন্য এই 'নেটিভ নাচগার'দের নাচ দেখছেন। তারপরে তাঁরা উঠে যাবেন, আর এই রক্তভূমি ছেড়ে যাবেন ভারতীয়দের হাতে।

লক্ষ্মী থেকে এসেছে এক নর্তকী। আজমীরে দরগা শরীফ দর্শন করতে গিয়েছিল সেই পুণ্যাধিনি। প্রত্যাবর্তনের পথে বিজ্রাম করতে করতে এবং আনন্দ বিতরণ করতে করতে চলেছে সে। আসরের একপ্রান্তে বসে সেই বিগতযৌবনা। ফুরীওয়ালী বিড়ক দৃষ্টিপাত করে এদিকে ওদিকে। এই সব আসরে বসে কি গাইবে সে। কে গান বুঝবে এখানে? কদর করবে কে? পিছনে বসে বাঙালীবাবু কথাবার্তা কইছেন তার কানে আসে। একজন আর একজনকে বলছেন।

—এসে পড়েছিলে ভাই, তাই কান আর চোখ সার্থক করে যাবে। লক্ষ্মী-এর নবাব ঘরের সব তওরারেক! পড়ে থাকতে সেই বাঁশবেড়ে আর ভরেখরে, জয়ে সুযোগ হতো না।

জর্জ ও তামাকে কালো টেট কুঁচকে গারিকা পিক্ ফেলে রূপার পিকদানীতে। তাকিয়া ঠেস দিয়ে আঙুলের সাত আঁটটা আঁটির দিকে চেয়ে থাকে। তারপর সারেকীওয়ালাকে বলে।

—লক্ষ্মী-এর তওরারেক! অমনি সম্মতা তারা! এই পরসাতে আর এমন আসরে তারা আসবে কি না। এদের রূপালে আমাদের মতো লো-মেশাল, তাড়াখরাণার মানুষই জুটেবে।

সারেকীওয়ালার খিসখিসে গলায় বলে—রেশমবাঈ! যে দুর্ঘ চন্দনগাছ দেখিনি সে পিপ্পল গাছের ছায়াতে বসেই নিজেকে ভাগ্যবান ভাবে।

ঈষৎ নিম্নলিখিত চোখে মনোহুঃখে রেশমবাঈ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে। মনে হয় লক্ষ্মী-এর মানুষের গানের ঘরাণা চিরকালের মতো ভেঙে গেল, আর সে স্মৃতিহীন হুঃখের কথা রসিকস্বদয় ছাড়া কে আর বুঝবে? নির্বাসনে গিয়েছেন সঙ্গীতরসিক সুরের দরদী নবাব জাঙ্গিন আলি শাহ, আর গানও গিয়েছে বেইজুত হয়ে। কে বুঝবে এই হুঃখ? সনিঃশ্বাসে ঘন ঘন আন্দোলিত হয় এক মায়াবী ফুরীওয়ালীর বুক সাঁকা শিলায়ছড়িতে। মনে হয় ঐ যে আর একজন এসেছে, ঐ রমজামী চম্পা—বার যৌবন ছাড়া অন্য কোনও পুঁজি নেই—ঐ রকম মানুষই ভালো এই সব আসরে।

তারপর বড় সাহেব আসেন। পাকা সাহেব। শিকারী বেড়ালের মতো খোলা পাকা গৌফ। তাঁর অহমতিতে বুক হয় আসর। নানাভাবে আঙুলের মুদ্রার ভঙ্গিমা জাহির করে রেশমবাঈ এক মায়াবী গজল গায়। শুনতে শুনতে মেমসাহেবরা গহনার ঝিলিক দেখেন ও তার দাম সম্পর্কে নানাবিধ মন্তব্য করেন। সাহেবরা একটু শুনতেই নিজেরদের মধ্যে গল্পগুজব করেন। যে হিন্দুস্থানী মুন্সী একে এনেছিলেন তিনি নিচু গলায় সঙ্গীকে জানান পাকা বদমায়েস যেয়েটা। মোটেই দিল লাগিয়ে গাইছে না আজ। আমার মুখটাই হাসলো সাহেবদের কাছে।

দর্শকজন একেবারে খুসী হয় না। সে বিরক্তি যে স্পর্শ করে না রেশমকে তা নয়! তবে শ্রোতার বুঝতে পারে না, যে নানাকথা মনে হয়ে ঐ গায়িকার মনটি আজ ভেঙে গিয়েছে। তারা বোঝেনা, ঐ যৌবনের ফুলকির মতো চম্পাকে দেখে রেশম অহুভব করেছে যে সে চিরতরে যৌবন হারিয়েছে। সেই হুঃখেও যে আজ রেশম বার বার সুরের ঠিকানা হারিয়ে ফেলেছে, সে কথা কেউ বোঝে না।

দরদী মনপ্রাণ সব কোথায় গেল? বোঝে শুধু চম্পা। বোঝে আজ ঐ রেশমের মনে কোন হুঃখ আছে। বুঝে সে সমবেদনার দৃষ্টিতে চেরে থাকে।

তারপর সে যখন দাঁড়ায় আসরে, তখন মাপ চেয়ে বেরিয়ে যায় রেশম। চম্পাকে দেখেই খুসী হয়ে উঠে ভারতবাসীরা। এদিকে ওদিকে চেয়ে কাঁকে বেন খোজো, চম্পা। নজরটা তবুও তার আটকে যায় সামনে।

সেই সাহেব! যে তাকে বিহ্বলপ্রাসাদে তারিফ করেছিলো,

**JEWELLERIES, WATCHES
& GUARANTEED
WATCH REPAIRING**



**OMEGA, TISSOT
& COVENTRY WATCHES
ROY COUSIN & CO.
4, DALHOUSIE SQUARE, CALCUTTA-1**

আর এই কানপুর, ফতেগড় ও ভগবানপুরে বার বার বার সঙ্গে তার দেখা হয়েছে, সেই সাহেব চেয়ে আছে। ত্রিভুজলারী তবে এতই হয়ে দৌড় করতে এসেছিলো? হাসি পায় চম্পার। দেখে সাহেবের চোখে অকৃত্রিম অমুরাগ।

দেখে যে গুটিয়ে যাবে, সে মেয়ে-ই নয় চম্পা। ইচ্ছা করে ওড়না আঙ্গিয়া থেকে আর একটু নামিয়ে নিলাজ হয় সে। ঈষৎ ভাঙা মিষ্টি গলায় সে তীক্ষ্ণ পর্দার ধরে, 'না মারো না মারো মৈয়া'—প্রথম লাইনটি বেশ গেলিয়ে গেয়ে নেয়। তারপর ঠমক দিয়ে নেচে উঠে বলে—'প্রীত কে পিচকারী'।

চম্পার গান যেন গান নয়, কোলাহল। তার দেহ, চরণ, সুর, চোখ, চুল ও ওড়নী—সব মিলে যেন কোলাহল স্রব হয় একটা।

এই কৈটকে করে আসব মা তাতে পারবে বলে-ই চম্পা সকলের স্ত্রিয়। এরা আসব মেতে উঠে। চম্পা বেপারোয়া হয়েই মুঠো মুঠো নজরেন পিচকারী ছুড়ে মারে আসরের সর্বত্র।

রাত বাপোটার আসব শেষ করে ঘরকিরতি চম্পার আগে-পেছনে চার জন সিপাহী চলে। তাদের কাকর ভাতে ঘুড়-জোড়া দিয়ে, আর কাকর ভাতে নাচের পোশাক দিয়ে তাদের ধন্য করেছে চম্পা। গল্প কনছে চম্পা, যেন একটা ঝর্ণা-ই চলেছে কলকল করে। তারা বলছে—'চম্পা বাঈ, তুমি পালকী ফিরিয়ে দিলে কেন?'

—আমার ইচ্ছে।

বলে হাসছে চম্পা। আসলে তাকে কানে কানে একটা খবর দিয়ে গিয়েছে ত্রিভুজলারী। খুব কৌতুক বোধ হচ্ছে চম্পার।

চম্পার কুঠি কিছু কম রাস্তা নয়। পথে জৈরাম চৈরাম ছইভালের কুঠিবাড়ী। কুঠিবাড়ী ঘিরে বাগান। তার পিছন দিয়ে সহজে যাওয়া চলে। যেতে যেতে একজন সিপাহী বলে—

—তাছলে চম্পা বাঈ, কারকে দিয়ে লিখিয়ে দিয়ে আসব আজি।

তুমি আইটের বিবিকে দিয়ে আজি পাশ করিয়ে দিও। তিন সাল ঘরে বাইনি। ভুলেই গিয়েছি দেশঘরের চেহারা।

—এ বার এত তাড়া কেন?

সিপাহীটি বলে—বলেছি তো? বড় মামলা লাগিয়েছে আমার চাচেরা ভাই। একটা লেবুগাছের মালিকানা নিয়ে। আমি না গেলে আমার বুড়ো বাপ কিছু কবতে পারবে না। তার কোন জ্ঞানই নেই।

—একটা লেবুগাছ?

অজানতি সিপাহীটির গলায় উগুন। সুর লাগে। সে বলে—হাঁ। তুমি বুঝবে না। সে গাছের লেবু কি বড়, আর তেমনি মিষ্টি। বাবা চায়া এনেছিল চৌধুরাদের বাগান থেকে। গরমকালে লেবুর সরবৎ গেয়ে শরীর জুড়িয়ে যায়—আর যখন ফুল ফোটে, তখন তার কি গন্ধ! চাই কি সময়কালে ক'টা লেবু বিক্রীও করাতে পারে আমার মা, শেঠদের বাড়ীতে দিয়ে কয় সের ছাতুও আনতে পারে। তুমি বলছ কি চম্পা বাঈ? একটা লেবুগাছ অমনি ছেড়ে দেওয়া যায়?

এবার চোখে পড়ে চম্পার। জ্যোৎস্নাতে চিনতে ভুল হয় না। নিচু গলায় সিপাহীদের বলে—তোমরা চলে যাও। আমার সঙ্গে কথা আছে ঐ সাহেবের। বুড়াকে বলো যে আমি আসছি। যেন চিন্তা না করে।

এগিয়ে যায় চম্পা। আশ্চর্য হয়ে ইভাল ভাঙা হিন্দুস্থানীতে বলে—তোমার সঙ্গীরা?

—এগিয়ে গেছে।

—তুমি?

—একা যাব।

—ভয় করবে না?

চম্পা জ্যোৎস্নায় ঝিলিক দিয়ে হাসে। বলে—সাহেব, তুমি ত'রয়েছ।

ইভাল এই দুঃসাহসী কথা শুনে অধর দংশন করে। তারপর বলে—আমাকে ভয় কর না তুমি?

—না সাহেব! তুমি ভাল।

—কে বললো?

—আমি শুনেছি।

হিন্দুস্থানী শিক্ষাব কথা ইভালের ততখানিই, যাতে 'ফোজা' অথবা 'পড়া' চলে। আর যে হিন্দুস্থানী তাকে পড়ে পাশ করতে হয়। তাতে আর বাই তোফ, এই সব কথা ঠিক ঠিক জোগায় না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ইভাল বলে পুঁথির ভাষায়, থেমে থেমে—

—তুমি কি বিশ্রাম করবে। তুমি কি দ্রাস্ত হয়েছ? তুমি কি ঐ কুঠির প্রাচীরে সামান্য বসতি চাও?

চম্পা আবার হাসে। বলে সাহেব, আমার সঙ্গে অমন করে ব্যস্ত গল্প করলে তোমার অপমান হবে।

—কেন?

—কে-ও করে না।

—কে-ও করুক বা না-ই করুক। চম্পা, তুমি সে কথা আমাকে বলো না।

—হা ছকুম।

কাড়িয়ে থাকে ইভাল। আর চম্পাও কাড়িয়ে থাকে। এবার ঈষৎ নিচু হয়ে ইভাল আঙুলের আগা দিয়ে চম্পার কপাল ও চুল আলতো করে ছোঁয়। অকুটে বলে, সুন্দর! সুন্দর তুমি চম্পা কৌতুকের স্পৃহা চলে গিয়ে চম্পা এবার শঙ্কিত হয়। মনে হ' ভুল করেছে সে। সেখান থেকে এনেছে বিপদ।

ইভাল তার চোখে, চুলে, কপালে আঙুল বুলিয়ে এবার আরো সহজ ও অকৃত্রিম আন্তরিকতায় যেন চঞ্চল হয়ে ওঠে। মুগ্ধ বালক' মতো পুনর্বীর বলে—বড় সুন্দর তুমি। আমার বড় সুন্দর লেগেছে তোমাকে।

চম্পা বলে—সাহেব! আমি যাই।

—নিশ্চয় যাবে। আমি তোমাকে এগিয়ে দেব।

—তুমি? না সাহেব, তা হয় না।

—কেন চম্পা?

চম্পা এবার আত্মনির্ভর খুঁজে পায়। সে অসঙ্কোচে টাললে দিকে চায়, বলে—সাহেব, এখানে আমাকে সবাই জানে। কে আমার অনিষ্ট করবে না। তুমি ফিরে যাও।

তবু ইভাল শোনেনা। বলে—অন্তত তোমার বাড়ী দেখা যাও তত দূর চলে।

—না। শোন, আমি ছুটে চলে যাব।

—কিন্তু চম্পা, আমি যে বলতে চাই।

চম্পা কাছে আসে। বলে—তুমি হুলাবীবিকে খবর দিও।
সে আমাকে জানাবে।

এবার আলো-আঁধারির পথ ধরে ছুটে চলে যায় চম্পা।

ঘরে আসতে সম্পূর্ণ শ্রম কবীর আগেই চম্পা জিজ্ঞাসা করে—
বুঢ়া, কেও আমার খোঁজ করে নি?

—কে, চম্পা?

—কোনো চন্দন?

—না। কোন চন্দন, চম্পা?

—তুমি তাকে চেন? সে ঐ ডাক্তার বাবুর সহকারী।

—না চম্পা।

—ও!

ঘর থেকে পোষাক বদলে ফিরে আসে চম্পা। সম্পূর্ণকে বলে—
বুঢ়া, কথা আছে।

—কি কথা?

—নতুন ইঞ্জিনীয়ার সাহেব ভাব করতে চায় আমার সঙ্গে।

অনেক দিন ধরে আমার পিছু নিয়েছে বুঢ়া।

—সত্যি?

—সত্যি।

—তুমি কি করবে?

—বল, কি করব।

—বলব চম্পা?

—বল।

সম্পূর্ণকে বলে—তবে শোন চম্পা! বলি তোকে।

—বল, বুঢ়া।

সম্পূর্ণকে বলে চলে। বলে—তুই যখন ওখানে ছিলি, আজ
এখানে এসেছিল বিসালার শোভালাল, পত্রেলা বিসালদার কুন্দন
সাহেব, আরো অনেককে তুই চিনিবি, চিনিবিও না। এ কথা নিশ্চয়
জানবি চম্পা, যেখানে সাহেব আছে, তাই বাসে আছে বাকুদের
গোলাব ওপর। একটু এদিক-ওদিক হবে, কি ফাঁটবে গোলা। ধর্ম
নেই, জাত নেই, ইজ্জত নেই, কুটি নেই—আব মানবে না
সিপাহীরা। লক্ষ্মী, বেরিলী, দিল্লী, ফৈজাবাদ, এলাহাবাদ সব
জায়গায় এক কথা চলেছে। তোকে নিশ্চয় বলি চম্পা, তুই এই
কানপুর সহরের আশে-পাশে সব জায়গায় একেবারে একা চলেতে
ফিরতে পারিস। তোকে সম্পূর্ণের লোক জানে সবাই। জানে,
তোকে কেউ কিছু বলবে না।

—সবাই কি তাদের লোক বুঢ়া?

—না বেটি! তবে সহরের হিন্দু মুসলমান সবাই তো কেশে আছে
কি না! কম লোক না।

—এ কথা তো আগেও বলেছিল বুঢ়া!

—তো আবার বলছি। কথা যদি কথার মতো হয়, তাহলে
দশ বার বলতেই বা কি! আর দশ বার শুনেই বা কি, বেটি! বলে,
আর অল্প অল্প হাসে সম্পূর্ণ। বলে—আমি অমোধ্যার কিষণ চম্পা!
তুই জানিস না—তোব বুঢ়া অনেক দেখেছে এই তিন কুড়ি বছর
ধরে। দেখেছে তার দেশঘরের জোয়ান ছেলে রংকট হয়ে চলে যায়।

উজ্জ্বল মোনকে

কে. হোডের

মোমোরন প্রজাপিনী



ক. হোড ২৩ কোং • কলিকাতা-১০



আর তার পর কি জীবন হয় তাদের। আমি অনেক দেখেছি চম্পা ! আমার বাপ মরেছিল সেই পানজ্যাবের লড়াইয়ে। দাদাকে আমার গুলী করে মেরেছিল সেই সময়। সেই ঘটনার একজন আমার দাদা, যারা সিন্ধু পেরবে না বলে বলওয়া লাগিয়ে ছিলো। তুই জানিস না, আমার মা আমাকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলো। বলেছিলো—ভিখ মেঙ্গে খাবি, ডাকাতি করে খাবি—তবু টাকার লোভে ফৌজে নাম লেগাবি না।

সম্পূর্ণকে মনে হয় অন্ধ মানুষ। সিন্ধুর মতো মস্তমাথাটা সে অন্ধ-অন্ধ নাড়ে। বলে—চম্পা, বেইমানী করবি তো মাথাটা কেটে রেখে যাব তোর। খুন করতে ভয় পায় না সম্পূর্ণ।

—বুঢ়া, মৌতির ভয় দেখাস না।

—তো, শোন চম্পা। সাততরুন সঙ্গে ভাব কর। ওদের খবরাখবর জান। তুই পারবি। পারবি না চম্পা ?

এ যেন চম্পার গলা নয়। অন্ধ কাক গলা। চম্পা না চন্দনের সঙ্গে কত প্রেম, কত যুগল জীবনের স্বপ্ন দেখেছে। সে কথা ভুলে বিপদের কথাতেই কেন সাড়া দেয় তার মন। চম্পা বলে—পারব।

—আমি জানতাম।

—কি ?

—যে তুই পারবি।

—বুঢ়া, চুপ কর। কেন আমি বললাম, তা তুই বুঝবি না।

—বুঝব না ?

—না বুঢ়া, তোর জওয়ানী নেই।

—জরুর।

এবার আর অস্বীকার করে না সম্পূর্ণ। তার পর কি কথা মনে করে সে বলে—চম্পা, চন্দন কে তোর ?

—চন্দন আমার গ্রামের মানুষ। আমার শৈশবের সখেল।

—বুঝলাম।

—কিছু বুঝলি না বুঢ়া ! আমি তার থেকে দূরে যাব বলে এখানে এসেছি। তবু সে তো বোঝে না। চন্দন বড় নির্দোষ, বুঢ়া !

—তো সে নির্দোষের জন্ত তুই কেন হুংহে পাস চম্পা ?

—বুঢ়া, তুই বুঝবি না। আর চন্দনের মা—

—কি ?

—চন্দনের মা বড় পুণ্যবতী। সে বলেছিল চম্পা, তুই রমজানী হবি। দেখ, আমি কোন গাঁয়ের মেয়ে—চলে এলাম শহরে। ইলাম রমজানী।

—বুঝলাম।

—চন্দনের মা-ও বড় নির্দোষ, বুঢ়া ! দেখে এসেছি সে দুখিয়ারী, হুংহে মরে যাচ্ছে।

—চম্পা, এসব কথা তুই বলিস না কেন ?

যৌবনমুকুলিত দেহ ঈষৎ ঝুঁকিয়ে কাছে আসে চম্পা। হেসে বলে—বুঢ়া, তুমি এত জান, আর একথা জান না, যে হুংহের ভাগ কারকে দেওয়া যায় না ? সুখের ভাগ আছে, হুংহের ভাগ নেই। বুঢ়া, তুমি সে কথা জান না ?

—না। সে কথা জানে না সম্পূর্ণ। যৌবনের কাছে বার্বাকা এমনি করেই পরাজিত হয়—কি সুখ, কি হুংহে। একটা বাজিও জিততে পারে না সম্পূর্ণ। [ক্রমশঃ]

বোটানিকাল গার্ডেন-এ

অশোক ভট্টাচার্য

উর্ধ্বে আলোর বস্তার ভেসে যায়
মেঘে-মেঘে ঐ পুষ্পত নভোলোক,
নিম্নে কোমল সবুজ বাসের 'পরে
বসেছি আমরা দৌহার নিকটে দৌহা।

পাশে বয়ে চলে বৈরাগী নদী তার
বুসব অঙ্গে কত মাছুষের আশা,
নিঃশেষে লীন—আশান-কুড়ানো ছাউ
কত না চলেছে সাগরের সন্ধানে।

অদূরে হঠাৎ শালবীথিকার গুনি
বুঝক-বুঝতী কলাকোলাহলে মাতে,
তবু হার কই, তোমার আমার প্রাণে
জাগে না তো সেই হুলত ভালোবাসা !

আমরা ছ'জনে বেন এ কালের দুই
নট আর নটী ব'লে আছি পাশাপাশি,
যকের 'পরে নেমে পাঠ তুল ক'রে
সার যেনেছি এ গাল-চোখে রক্ত মাথা।



হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড কর্তৃক প্রস্তুত।

L.P. 1-X43 ৮৩

অন্ধন ও প্রাঙ্গণ



মাহ চূচাক বেগম শিবানী ঘোষ

অন্ধকার কারাগারে বন্দি অবস্থায় ফুঁপিয়ে চলেছে একটি পঞ্চদশবর্ষীয়া কিশোরী। তার গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে অশ্রু। এভাবে আর ক'দিন তাকে রাখা হবে। তার মনে পড়ছে দিন কয়েক আগেও সে চক্কা হরিণীর মত ছুটোছুটি করে বেড়িয়েছে কান্দাহারের পাহাড়ে পর্বতে। এই ঘরে বেড়ানোর ব্যাপারে তার মায়ের কিছুটা আপত্তি থাকলেও তার পিতার দেওয়া ছিল অবাধ স্বাধীনতা; ঐ রকম পিতা খুব কম জনের ভাগ্যেই জোটে। কিন্তু হায়! নিষ্ঠুর রাজনীতির দাবাখেলায় তাঁকে চিরকালের মত বিদায় নিতে হল এই পৃথিবী থেকে।

গুডনাকলে চোখ মোছে মাহ চূচাক। তার মনে পড়ছে সেই দিনটা। বেদিন বাবর বাদশাহ কান্দাহার আক্রমণ করে ছিন্নভিন্ন করে দিলেন দেশটা। প্রতি ঘরে ঘরে সেদিন উঠল করুণ আর্তনাদ। মাহ চূচাক তখনও বুঝতে পারেনি কি বিপদ ঘনিষে এসেছে তাদের ওপর। সেদিনও সে স্থির করেছিল ছুটোছুটি করে বেড়াতে কান্দাহারের পাহাড়ে পর্বতে। কিন্তু হঠাৎ কতকগুলো লোক বেগে প্রাসাদে প্রবেশ করে বেঁধে ফেলল তাদের সকলকে। তারপর তাদের উর্টের শিঠে উঠিয়ে নিয়ে চলে এল কাবুলের এই কারাগারে। তখনই মাহ চূচাক প্রথম জানলো আরবান জাতি পরাজিত হয়েছে মোগলের হাতে। শুধু পরাজিতই নয়, তার পিতা মিজা মোহাম্মদ মোকিম নিহত হয়েছেন আততায়ীর হস্তে।

এই কথাটা শেলের মত এসে বিঁধেছিল মাহ চূচাকের হৃদয়ে। যে পিতার প্রাপ্ত বয়সে দুখ লুকিয়ে সে কত হেসেছে কেঁদেছে, সেই

পিতা আর নেই! এখনও সে বিশ্বাস করতে পারে না তিনি নেই। মনে হয় কান্দাহারে ফিরে গেলেই সে তাঁকে দেখতে পাবে। কিন্তু এখান থেকে সে যাবে কেমন করে? তার মা এবং অজ্ঞাত আত্মীয়রা নাকি সব মুক্তি পেয়ে গেছেন। তাঁরা নিশ্চয়ই এত দিনে দেশে পৌঁছে গেছেন। কিন্তু একমাত্র তাকে এখনও এভাবে আটক রাখা হল কেন?

—এই পোষাকগুলো পরে নিন কুমারী!

মাহ চূচাক চেয়ে দেখে তার সমুখে এসে দাঁড়িয়েছে মোগল রাজপ্রাসাদের এক দাসী। তার হাতে কতকগুলি বিবাহের বস্ত্র। বিস্মিত হয়ে সে প্রশ্ন করে, এ পোষাক কি হবে?

দাসীটি মুহূর্তে বলে—আজ যে আপনার বিয়ে।

—বিয়ে! এ কি আমাকে ঠাট্টা করা হচ্ছে?

—না কুমারী, ঠাট্টা আপনাকে কেউ করেনি। স্বয়ং মোগল সম্রাট বাবর আপনার বিবাহ স্থির করেছেন কাসিম গোকুলতাস নামক তাঁর এক প্রতিভাসম্পন্ন কর্মচারীর সাথে। কাজেই এগুলো পরে নিয়ে উপস্থিত আপনি কারাগারের বাইরে চলুন।

দাসীটির কথা শুনে কিছুটা উত্তেজিত হয়ে মাহ চূচাক বলে, কি! কি বললে? কাসিম গোকুলতাসের সাথে হবে আমার বিয়ে? এতে আমাদের বংশের মর্যাদাহানি হবে না?

দাসীটি পুনরায় মুহূর্তে বলে, মিথ্যে বংশাভিমান জাঁকড়ে ধরে থেকে আর লাভ নেই কুমারী! হরিণী এখন বাবের কবলে পড়ে তখন তার সব দৌরাশ্রয় তাকে মেনে নিতে হয়। এখন যদি আপনি আমার কথা অবহেলা করেন তবে সম্রাটের কোন পুত্র কর্মচারী এসে আপনাকে বলপূর্বক এই পোষাক পরিধান করিয়ে নিয়ে যাবে বাইরে। নারীর পক্ষে সেটা কি চরম অপমান হবে না কুমারী?

মাহ চূচাক ফুঁপিয়ে উঠে বলে—ওগো তোমরা কি নিষ্ঠুর!

দাসীটি বলে—আমাকে ঐ দলের মধ্যে টানবেন না কুমারী! আমি যথার্থই আপনার মঙ্গল চাই।

ক্রন্দিতকণ্ঠে মাহ চূচাক বলে—ওগো, তাই যদি চাও তবে তুমি আমাকে উদ্ধার করে দাও এই পাষণপুত্রী থেকে।

দাসীটি বলে—সে ক্ষমতা আমার নেই কুমারী, থাকলে নিশ্চয়ই করতাম। উপস্থিত আমি যা পারি তা নারীর মর্যাদা রক্ষা করা। এর বিনিময়ে উপস্থিত আপনাকে ছাড়তে হবে জাত্যাভিমান। আর বাস্তবিকই কাসিম গোকুলতাসের বংশমর্যাদা খুব বেশী না থাকতে পারে কিন্তু তাঁর মত নিভীক বিচক্ষণ এবং উদার পুত্র এই পৃথিবীতে কমই আছেন। তাঁকে স্বামিরূপে পাওয়া যে কোন নারীর পক্ষেই ভাগ্যের কথা।

মাহ চূচাক সজোরে ফুঁপিয়ে উঠে বলে—ওগো শুনিও না, আর শুনিও না ও-সব কথা। আমাকে নিয়ে তুমি যা করতে এসেছো করো। আমি আর একটা কথাও সহ্য করতে পারছি না।

দাসীটি আর কোন কথা মা বলে এগিয়ে আসে কুমারীর কাছে। তারপর তাকে একটি একটি করে পরিয়ে দিতে থাকে বিবাহের বস্ত্র এবং অলঙ্কার।

মাহ চূচাকের বিধবা মাতা বিবি জারিফা খাতুন প্রাসাদে আপন নিভৃত কক্ষে বসে শুধু চিন্তা করেন মেয়ের কথা। তাঁরা স্নাত্ত পেলেন সকলেই। কিন্তু বাবর বাদশাহ ঐ কচি মেয়েটাকে কেন যে ধরে রাখলেন তা বুঝতে পারা যায় না! এক এক সময় ভয়

হয় ওর পমিত্র দেহটাকে নিয়ে তিনি আপন বিলাস চরিতার্থ করবেন না তো? কথাটা মনে উদয় হতেই শিউরে ওঠে বিবি জারিফার সর্বাঙ্গ। তিনি নানা উপায়ে জানবার চেষ্টা করেন মেয়ের কথা। কিন্তু কার্যকরী হয় না কোনটাই। অবশেষে দীর্ঘকাল পরে যখন তিনি মেয়ের সংবাদ পেলেন তখন জানলেন, তার বিবাহ হয়ে গেছে এক বংশমর্যাদাহীন পুরুষের সাথে। শুধু তাই নয়, তার ঠিকই মাই চুচাকের কোলে এসেছে একটি কন্যাসন্তান।

শুনে সর্বাঙ্গ জ্বলে যায় জারিফা খাতুন। তাঁর এক মাত্র কন্যার এমন দুর্দশা হয়েছে? দেশে কি এমন লোক নেই যে এর প্রতিকার করে? তাকে কি করে কান্দাহারে ফিরিয়ে আনা যায় তাই তিনি ভাবেন সারাদিন। তাঁর স্নেহের ছালালি কি কষ্টেই না দিন কাটাচ্ছে! একে শত্রুপুরী, তার ওপর এক বংশমর্যাদাহীন পুরুষ তার স্বামী! এ তো সমগ্র আরবান জাতির পক্ষেই অপমানজনক। জারিফা বিবি সময়ে অসময়ে কান্দেন আর ভাবেন, কবে শিউরি থেকে ফিরে আসবেন তাঁর ভাস্কর শাহ বেগ। আজ আর জীবিত নেই তাঁর স্বামী। কাজেই ভাস্করের সহায়তায় উদ্ধার করতে হবে মেয়েটিকে।

শিউরি রাজ্যের বিভিন্ন গোলযোগ মিটিয়ে কান্দাহারে ফিরতে বেশ কিছু বিলম্ব হয়ে গেল শাহ বেগের। দীর্ঘ অল্পস্থিতির পর দেশে ফেরায় তখন চতুর্দিকে চলল আমোদ-প্রমোদ। কিন্তু সেই আনন্দ তখন বিধি ঢেলে দেয় জারিফা বিবির অন্তরে। এই কি প্রমোদ করবার সময়? তাঁর কন্যার উদ্ধারের ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত তিনি দেশবাসীকে এই স্মৃতি করতে কিছুতেই দেবেন না। তিনি এই কথা ভাস্করকে জানাবার উদ্দেশ্যে অন্তঃপুরের দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকেন নিশ্চল হয়ে। সেই পথ দিয়ে শাহ বেগ অন্দর মহলে যাবার সময়ই জারিফা খাতুন ফুঁপিয়ে উঠে জুটিয়ে পড়লেন তাঁর পদতলে। প্রথমটা হতচকিত হয়ে পড়েন শাহ বেগ। তখন তাঁকে মেয়ের সব কথা জানালেন জারিফা বিবি। তাঁর কথা শুনে অন্তরে আঘাত পেলেন শাহ বেগ। বিশেষ করে কোন মোগলের সাথে আরবান জাতির মেয়ের বিবাহ হওয়া অত্যন্ত অপমানজনক। কিন্তু কি ভাবে মাই চুচাককে বাবরের নাগপাশ ছিন্ন করে কাবুল থেকে কান্দাহারে নিয়ে আনা যায় তা তাঁর মাথার আসে না। যা হোক, এর ব্যবস্থা শীঘ্রই করবেন, বেগমকে এই আশ্বাস দিয়ে আপন কক্ষে চলে গেলেন শাহ বেগ।

অবশেষে স্থির হল একটা মতলব। বিভিন্ন বেগমরা এই মত পোষণ করলেন যে তাঁদের এক দাসী ছদ্মবেশে কাবুলে গিয়ে সাক্ষাৎ করুক মাই চুচাকের সাথে। তারপর তাকে সংগে নিয়ে সে চলে আসবে হাজারা দেশে। সেখান থেকে উঠের পিঠে চড়ে কান্দাহারে ফিরে আসতে কিছুমাত্র অসুবিধে হবে না। কিন্তু কথা হল, সেখানে যাবে কে? তখন দৌলত কিতা নাম্নী মিজা মোকিমের এক দাসী রাজী হল তাঁর প্রভুজ্ঞাকে উদ্ধার করতে। সে সেই দিন ছদ্মবেশে রওনা হয়ে গেল কাবুলের পথে।

কাবুল রাজপ্রাসাদের একটি কক্ষে মাই চুচাক বেগম মুখ ভার করে বসে রয়েছে এক পাশে। অদূরে বিছানায় শুয়ে কেঁদে চলেছে তার শিশু-কণ্ঠা নাহিলা, কাঁচক বত পারে কাঁচক। ঐ মেয়েটাকে কোলে নিয়ে তার আদর করতে এতটুকু ইচ্ছে হয় না। তাঁর মনে পড়ছে গত দু

বছরের কথা। সেই যে বাবরের সেনানীর চাতে বন্ধিনী হয়ে এল এই কাবুলে তারপর আর একটি বাবের জন্তেও সে যেতে পারনি কান্দাহারে। একবারও তার সাক্ষাৎ হয়নি মা কিংবা অজ্ঞাত আত্মীয়-স্বজনদের সাথে। উঃ, এরা কি নিষ্ঠুর শয়তান! তাকে জোর করে বিয়ে দিল এক হীনবংশীয়ের সাথে। তারপর তার ঠিকই মাই চুচাকের কোলে এসেছে একটি মেয়েটা।

—এ কি নাহিদ কান্দছে যে? ঘরে এসে খুকীকে কান্দতে দেখে বললেন কাসিম গোকুলতাস।

—কান্দছে তা আমি কি করতে পারি? শিকার দিয়ে কথাটা বলে মাই চুচাক।

তাড়াতাড়ি মেয়েকে কোলে তুলে নিয়ে কাসিম দাসীকে ডাক দেন, খাদিজা!

দুধের বাটি হাতে ছুটে আসে খাদিজা। সে তাড়াতাড়ি তাঁর কোল থেকে নাহিদকে নিয়ে আদর করে বলে—দুঃ, শোনা, এরই মধ্যে ঘুম হয়ে গেল? চল দুধ খাবে চল। বলল খাদিজা তাকে নিয়ে চলে যায় পাশের ঘরে।

কাসিম তখন এসে বসেন তাঁর সতর্কমিথীর সামনে। মাই চুচাক বিরক্তির সাথে মুখটা ফিরিয়ে রাখে অন্ধ দিকে। তিনি তার একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বলেন—চুচাক, মেয়েকে কোন দিনই কি আপন বলে গ্রহণ করবে না?

এর কোন জবাব দেয় না মাই চুচাক। কাসিম একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন—আজ তোমাকে একটা কথা বলতে এসেছিলাম। আজ আমাকে সম্রাটের সাথে যতে হচ্ছে উজবেকদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে। এই যুদ্ধে আজ কি হবে কিছুই বলা যায় না। এমনও হতে পারে যে এই আমাদের শেষ দেখা। এতে অবশ্য তুমি খুসীই হবে। কারণ আমি তোমার জীবনে খানিকটা দুঃখ এবং বোঝা ছাড়া আর কিছুই নই। কাজেই এ থেকে তুমি পরিত্রাণ পাবে। কিন্তু চুচাক, আমার একটা অনুরোধ—ঐ নাবালিকা শিশুটিকে অস্তিত্ব তুমি একটু দেখো।

তবু নিরন্তর হয়ে বসে থাকে মাই চুচাক। কাসিম বলেন—বলো প্রিয়া, এর পরও কি তুমি নাহিদকে টেনে নেবে না বুকের কাছে?

—না। গহ্বর হয়ে জবাব দেয় বেগমসাহেবা।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে পড়লেন কাসিম গোকুলতাস। তারপর যুদ্ধের সাজপোষাকে সজ্জিত হয়ে তখনই তিনি বেরিয়ে পড়লেন বর থেকে।

স্বামী চলে যেতে বেশ খানিকটা স্বস্তি পায় মাই চুচাক। আজ তাকে বেশ খানিকটা আঘাত দেওয়া গেছে। যুদ্ধে বাবে, মরবে, তাতে তার কি? সে তো তাই চায়। আর তার সাথে ঐ মেয়েটাও যদি শেষ হয়ে যায় তবেই তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়।

—শাহজাদা?

—কে? কে তুমি? চমকে ওঠে মাই চুচাক। এ কে এসে দাঁড়াল তার সামনে?

আগন্তুক মুখে আঁচল দিয়ে ইসারা করে—চুপ! তারপর চারদিক দেখে সে সরিয়ে দিল মুখের আবরণটা। মাই চুচাক তখন বিস্মিত হয়ে বলে—এ কি দৌলত কিতা, তুই কেমন করে এখানে এলি?

দৌলত কিতা চাপাগলার জানিয়ে দিল যে কেমন করে প্রবেশ করেছে এই রাজপ্রাসাদে এবং তার আসার উদ্দেশ্যটাই বা কি।

তার কথা শুনে আনন্দে নেচে ওঠে মাহ চুচাকের অন্তর। এইবার সে নিষ্কৃতি পাবে এই নাগপাশ থেকে। এইবার সে আবার দেখতে পাবে কান্দাহারের পাহাড়-পর্বত। এইবার সে চরম প্রতিশোধ নিতে পারবে তার স্বামী কাসিম গোকুলতাসের ওপর। কিন্তু এই জনপূর্ণ রাজপুরী হতে সে বাইরে যাবে কেমন করে?

সে-মতলবও দিল দৌলত কিতা। বললে—বিকলে প্রার্থনার পূর্বে পথে-ঘাটে যখন ভয়ে উঠবে স্নানার্থীদের ভিড় তখন আপনিও আপনার জাকরাণী রঙের বোরখাটা পরে পেরিয়ে পড়বেন স্নানের উদ্দেশ্যে। সে-সময়টা আর কেউই লক্ষ্য রাখবে না আপনাকে। তখন আমি আপনার সাথে সাক্ষাৎ করে নিজে যাব নিরাপদ ভাসগায়।

মাহ চুচাক বলে—তা না হয় হল, কিন্তু এখন তুই থাকি কোথায়?

দৌলত কিতা বলে—আমার জন্মে ভাববেন না শাহজাদী! এখন আমি চলি। সময় হলে দেখা কববো। বলে মুখের আবরণটা টেনে দিয়ে সে বোরিয়ে গেল বাইরে।

বিকেলের দিকে মাহ চুচাক একাকিনী পদচারণা করছে আপন কক্ষে। খাদিজা মেয়েটাকে ঘন পাড়িয়ে রেখে গেছে বিছানায়। অকাতরে সে ঘুমোচ্ছে কটি হাত দুটো মুঠো করে। এইবারেই বেরিয়ে পড়তে হবে স্নান করতে যাওয়ার ছলনা করে। মাহ চুচাক জাকরাণী রঙের বোরখাটা চড়িয়ে দিল দোত। এইবার আ! তাকে রাখে কে! কিন্তু এ কি! যাবার সময় ঘুমন্ত মেয়েটা তাকে এমন আকর্ষণ করছে কেন? সে একবার চেয়ে দেখল নাতিদের মুখের পানে। কি চমৎকার মুখ! এত ভাল কবে মাহ চুচাক কোনদিন দেখিনি মেয়েকে। মুখের আদল কতকটা তার পিতারই মত। কিন্তু না না, আর সময় নষ্ট করলে চলবে না। এখন বেরিয়ে পড়তে হবে। নচেৎ ধরা পড়ে যাবার সম্ভাবনা আছে। ঘুমন্ত মেয়েটিকে ফেলে রেখে মাহ চুচাক একাকিনী দ্রুত বেরিয়ে পড়ে ঘর থেকে।

পথে বেরিয়ে সহজেই দেখা হল দৌলত কিতার সাথে এবং তার সহায়তায় হাজারা দেশে আসতে তাদের অন্তরবিধে হল না কিছুমাত্র। তারপর সেখান থেকে উঠে পিঠে চড়ে কান্দাহারে ফিরে আসে মাহ চুচাক। মেয়েকে ফিরে আসতে দেখে বিবি জারিফা খাতুন ছুটে আসেন তার কাছে। চতুর্দিকে তখন বেজে ওঠে আনন্দমূচক বাজনা।

কিন্তু এ কি! এখন ঐ বাজনা শুনে মাহ চুচাকের তো আর ভাল লাগছে না! কাবুল থেকে কান্দাহারে এসে সে যা আনন্দ পাবে মনে করেছিল তা তো পাচ্ছি না! বরং মনে হচ্ছে কে যেন তাকে গভীর ভাবে আকর্ষণ করছে কাবুলের দিকেই।

মেয়ের বিবাহ মুখের পানে তাকিয়ে জারিফা খাতুন বলেন—আহা, মেয়ে আমার হৃষিক্তার কত বোগা হয়ে গেছে। তুই কিছু ভাবিস না চুচাক, তাকে গুরা জোর করে যে নিয়ে দিয়েছে সে আমি কিছুতেই মানবো না। আমি আবার নতুন করে তোর বিয়ে দিয়ে ঘরসংসার পেতে দেবো। আর সেই সঙ্গে অভিশাপ দিই যেন ঐ কাসিম আর তার মেয়েটার মৃত্যু হয়।

—মা! হঠাৎ শিউরে ওঠে মাহ চুচাক।

—কি? কি হল চুচাক?

—না মা কিছু নয়। এতক্ষণে মাহ চুচাক বুঝতে পারে কাবুল থেকে কে তাকে হাতছানি দিচ্ছে। সেই যে ছোট মেয়েটিকে একলা ঘরে ফেলে রেখে সে চলে এল এ তারই আকর্ষণ! তার বেশমের মত কৌকড়া চুল, কটি হাত দুখানি, কৌপানি কালো এগুলি যেন অত্যন্ত বেশী করে মনে পড়ে মাহ চুচাকের। তাকে বুকে জড়িয়ে ধরবার জন্মে আকুল-বিহ্বল করে ওঠে প্রাণ। সে ডুকরে কেঁদে ওঠে—না!

জারিফা খাতুন মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলেন—কি হল মা? চল ঘরে যাও। আমি বুঝতে পারছি পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে তোর শরীর।

মেয়েকে নিয়ে ঘরে গেলেন জারিফা বিবি। মাহ চুচাক কিন্তু কিছুতেই শান্তি পায় না মনে। এইবার তার মনে পড়ছে স্বামীকে। তাঁর শেষের কথাগুলো বড় বেশী করে বাজছে বুকের মধ্যে। উজবেকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উনি চলে গেলেন। সত্যি যদি সেখানে তার মৃত্যু হয়? উঃ, না না না, এ যেন আর সে ভাবতে পারছে না। অজ্ঞ সময় সে কত বার তার স্বামীর মৃত্যু কামনা করেছে। কিন্তু এখন সে-কথা ভাবলেই চোখে জল এসে পড়ছে।

ক্রমশঃ মনে আসে বার্তা। সকলেই অভিভূত হয়ে পড়ে গভীর নিদ্রায়। শুধু ঘুম আসে না মাহ চুচাকের চোখে। কান্দাহারের এই প্রাসাদ যেন আজ ছল ফোটাচ্ছে তার সর্বাত্মক। কাবুলে ফিরে যেতে আনতান করছে প্রাণ। মনে হচ্ছে নাহিদ যেন আচমকা ঘুম থেকে উঠে কান্দাচ্ছে। তাকে দেখবার জন্মে খাদিজা পর্যন্ত সেখানে নেই। তার ওপর তার স্বামী যুদ্ধ থেকে ফিরেছেন কি না কে জানে। এখনি যে তাঁর খবর নেওয়া দরকার। খড়মড়িয়ে বিছানায় উঠে বসে মাহ চুচাক। আর একবার সে চেয়ে দেখে কক্ষের সকলেই নিদ্রাভিভূত। তখন সে ধীরে ধীরে দরজাটা খুলে বেরিয়ে যায় বাইরে।

নাহিদকে কোলে নিয়ে একাকিনী পদচারণা করছে খাদিজা। মনে মনে সে বলছে হায়, কি কুমাতার গর্ভেই জন্ম নিয়েছিলি থুকা! বুকের দুধ দিয়ে মানুষ করা তো দূরের কথা, আপন মেয়ে বলে কোনদিন কোলে পর্যন্ত নিল না। তারপর তাকে একলা ফেলে রেখে সে চলে গেল আপন আস্তানায়। শুধু তাই নয়, পিতার যেটুকু বা শ্রদ্ধে ছিল তাও আজ শেষ হয়ে গেল জন্মের মত। হায় পোড়া কপালী, পিতৃমাতৃহীন হয়ে এবার মানুষ হবি কার কাছে? বাদী খাদিজার কাছে? হায় যে রাজনন্দিনী!

—খাদিজা!

—কে? বেগমসাহেবা?

—হ্যাঁ খাদিজা, আমার নাহিদ কই?

—নাহিদ তো এই আমার কোলে।

—কই দে দে আমার কোলে দে। মেয়েকে তাড়াহাড়ি কোলে নিয়ে চোখে-মুখে চুষন করে মাহ চুচাক। এই মেয়ের আকর্ষণে সে পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে ছুটে এসেছে এখানে। এর কাছে সে যে বহুদিনের প্ৰাণী। শুধু এর কাছেই নয় আর একজনকে খণ্ড আঁধ

তাকে শোধ করতে হবে। মাই চূচাক খাদিজার পানে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে—উনি কোথায়?

বিস্মিত হয়ে খাদিজা বলে—কার কথা জিজ্ঞেস করছেন বেগমসাহেবা?

—তোর প্রভু, মানে আমার স্বামীর কথা জিজ্ঞেস করছি।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে খাদিজা বলে—তীর কথা আর না-ই বা স্তনতে চাইলেন বেগমসাহেবা!

ব্যস্ত হয়ে মাই চূচাক বলে—ওরে না না, আমাকে শীগগির বল তিনি কোথায়?

খাদিজা বলে—তিনি উজবেগদের সাথে যুদ্ধ করতে গিয়ে আর করেন নি। সেখানে সম্রাট বাবরকে বক্ষা করতে গিয়ে তীর মৃত্যু ঘটেছে।

—এ্যা! সর্বাঙ্গ শিউরে ওঠে মাই চূচাকের। মৃত্যু ঘটেছে তার স্বামীর! উঃ, জেনে শুনেও কেন সে তাঁকে মানা করেনি যুদ্ধে যেতে! কেন সে তাঁকে জোর করে ঢেলে দিল মৃত্যুর পথে? যাবার সময় উনি যে অনুরোধ করেছিলেন তা সে অবজ্ঞা করে কেন দিল! হায় নাহিদ, কেন আমি তাদের আগে বুঝতে পারিনি! বলে অথোরে কঁাদতে থাকে মাই চূচাক।

দেখে অবাক হয়ে বার খাদিজা। মনিব-ঠাকরুণের এই

পরিবর্তন দেখে তার চোখও বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। সে তাঁর পাশটাতে এসে বলে—আপনি শান্ত হোন বেগমসাহেবা!

শরৎচন্দ্রের সমাজ-চেতনা

ও নারীত্বের মূল্যায়ন

অরুণিমা মুখোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের মতো জনপ্রিয় লেখক তাঁর সমসাময়িক কালে তো নয়ই, তাঁর পরেও বোধ হয় জন্মাননি।

তাঁর এ বিপুল জনপ্রিয়তা কালের বিবর্তনবাদকে অস্বীকার করে অটুট থাকতে পারবে কি না, সে বিষয়ে জোর করে কিছু বলা শক্ত। তবে একথা অনস্বীকার্য, শরৎ-সাহিত্যের ভক্ত পাঠকের সংখ্যা-বৈপুল্য বোধ হয় আজ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ রয়েছে। এই মনোহারিতা গুণের পিছনে যে যুক্তিটি প্রধান বলে মনে হয় সেটি হচ্ছে সমরোপযোগিতা। শরৎচন্দ্র আমাদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ-জীবনের নিরলঙ্কার বিচার ভণ্ডামির দৌরাণ্ডো হুসেহ মাহুভের মননশীলতার কাছে প্রকট করে তুলে ধরেছেন সে সমাজের সাহিত্য-বস-মণ্ডিত স্বরূপটি। করেছেন সমাজের তথাকথিত অসার নীতি-স্বাদর্শের উপর সবিশ্রুপ

মনের কথা

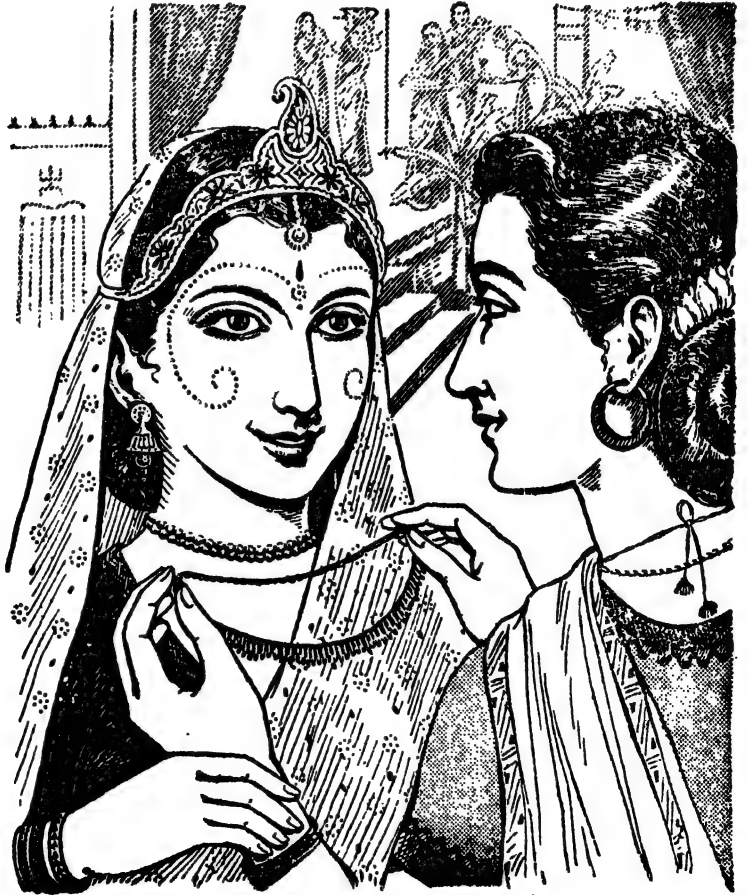
“এমন সুন্দর গহনা কোথায় গড়ালে?”

“আমার সব গহনা মুখার্জী জুয়েলার্স দিয়াছেন। প্রত্যেক জিনিষটিই, তাই, মনের মত হয়েছে,—এসেও পৌছেছে ঠিক সময়। এঁদের রুচিজ্ঞান, সততা ও দায়িত্ববোধে আমরা সবাই খুসী হয়েছি।”

**মুখার্জী
জুয়েলার্স**

সিগি মোনার গহনা নির্মাতা ও রত্ন-সংরক্ষক
রত্নবাজার মার্কেট, কলিকাতা-১২

টেলিফোন : ৩৪-৪৮১০



কটাক্ষপাত। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, এই যথার্থ নীতি-আদর্শ শেখাবার পরিকল্পিত স্বতন্ত্র প্রয়াস নেই সেখানে আর তার সংগে পাঠকমন্দের ক্ষতি বিবোধ ছিল না,—ছিল আনুকূল্য। জন-মানস কোঁচ ছিল বিপ্লবধর্মিতার দিকে। শরৎচন্দ্র হাওয়া বুঝে পাল খাটালেন। যুগের দৃষ্টিভঙ্গীর বিবর্তনকে ফুটিয়ে তুললেন তাঁর সাহিত্যে।

এই অর্থে শরৎচন্দ্র বাংলা সাহিত্যে ‘রিভলিউশনার আর্টিষ্ট’—বিপ্লবী সাহিত্যকার। সাহিত্যে প্রধানত নীতি-আদর্শের নান-সাকীর্ভনের মধ্যে তিনি আনলেন নতুন সুর, নতুন বাণী। অভিনব দৃষ্টির আলোকে তিনি রাঙিয়ে তুললেন অন্তরপ্রকৃতিকে। মানবতা পেলো তাঁর হাতে নতুন মান। হৃদয়হীন সমাজের অন্ধ-কাব্য নিপীড়িত মানব-সত্তাকে তিনি দেখালেন তাঁর অন্তরতম সদস্যের দৃঢ়ভূতিব শাস্ত্র-মিষ্ট প্রদীপ-শিখা। এবং এ অভিনবদৃষ্টি প্রকাশ পেয়েছে চিরন্তন নারীসত্তাকে তাঁর নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণে। অবশ্য বক্ষণশীল প্রাচীনপন্থীদের অনেকেই এ অভিনব সম্বন্ধে নীতি ও শ্রীলতার প্রশ্ন তোলেন। কিন্তু শরৎচন্দ্রের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য তেমন বক্ষণশীল বিচার-বুদ্ধির উর্দ্ধে।

প্রাক-শরৎ-সাহিত্যের বঙ্কিম নীতি-আদর্শের প্রাধান্যের যুগে শরৎ-সাহিত্য এক প্রশংসারী তুঃসাহসিক প্রয়াস সন্দেহ নেই এবং শরৎচন্দ্র বাংলার যে সমাজ-জীবন থেকে তাঁর সাহিত্যের উপাদান নিয়েছেন তাঁর সাহিত্য সেই আচার-সর্বস্ব নির্মম সামাজিকতার এক অনিবার্য, বিপ্লবাত্মক প্রতিক্রিয়া। প্রধানতঃ শরৎচন্দ্র এ ‘রিভল্ট’ আনলেন তাঁর সাহিত্যে নারীত্বের বিশ্লেষণে। অবশ্য প্রথম রিভল্ট হলেও তথাকথিত সমাজের অন্ধ কুসংস্কার, কু-প্রথা অগ্নায় অঁচার সম্মুখে একটা বিরোধমূলক ভাব-বল্লা বয়ে চলেছিল বাংলার দুঃ, বিশেষ এক শ্রেণীর মধ্যে। শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্যে অস্পষ্টতার চোরাবালি সরিয়ে ক্লগ্রাসী, বিরোধী বিপ্লবী এই ফলস্ত ধারটিকে আবিষ্কার করেছেন। প্রকাশ করেছেন মানবতার কাছে মানুষেরই অবমাননা—ঘৃণা তাচ্ছিল্য অ-সহনুভূতি। বসাত্মক ভাবে। শরৎচন্দ্রের নিজের কথাতাই বলি :—‘রিভল্ট আমি আনিনি, তবে যা এসেছে যুগের প্রবাহে এবং আমি শুধু তা প্রকাশ করেছি। আর এ-প্রকাশ সামাজিক কুসংস্কার, অনাচারের নিশ্চল শিলাস্তূপের ওপর আঘাত হেনেছে। সমাজের গণ-মানসে আলোড়ন তুলেছে।’

কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু-সমাজ চিরকাল নারীত্বকে নৈতিকতা দিয়ে গণ্ডীবদ্ধ করে রেখেছিল। সেখানে শুধু নীতি-স্বীকৃতি ছিল না, তা সমগ্র নারীত্বের নৈতিকতা। সেখানে সতীত্ব ও নারীত্ব কোন প্রভেদ নেই। সতীত্বকে বাদ দিয়ে নারীত্বের বিকাশ অসম্ভব। শরৎচন্দ্র এই প্রচলিত সামাজিক ধারণার বিরুদ্ধে আপত্তি তুলেছেন। নারীত্ব এমন একচেতা বিশ্লেষণের অধৌক্তিকতা দেখিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন, অনেকদিন ধরে কোন ধারণা বা বস্তু চলে আসছে বলেই যে তা ঠিক তা নয়। কোন কিছুই চিরকালের জন্তু সমান ভাবে ঠিক নয়। শরৎচন্দ্রের অভিনব হল : তিনি নারীত্ব থেকে সতীত্বকে পৃথক করে দেখেছেন। সতীত্ব ও নারীত্ব নারীচরিত্রের দুইটি সত্তা—এক বৃহত্তর দুটি অঙ্গ—তাহল পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব। সে মনুষ্যত্ব এ দুয়ের প্রত্যেকটি থেকে বড়। তাই পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের সতীত্ব একটা অঙ্গ বই তো নয়। কাজেই মনুষ্যত্বকে সে ছাপিয়ে উঠতে পারে

তা তো হতে পারে না! শরৎচন্দ্রের মতে নারীচরিত্রের বিকাশ শুধু মাত্র সতীত্ব নয়, বা একমাত্র সতীত্বই সমগ্র নারীসত্তা বিচারের মানদণ্ড নয়।

সতীত্ব বাদ দিয়েও নারীত্বের মহিমা গ্রাহ্য হতে পারে। যে নারীর জীবনে তথাকথিত সতীত্ব নেই, বা তেমন সতীত্ব বিকাশের সুযোগ নেই, সে কি নারীচরিত্রের অজ্ঞ গুণে মহিমময়ী হয়ে উঠতে পারে না? তাই বলে সংসারে সতীত্বের প্রয়োজন নেই একথা ঠিক নয়। আবার একমাত্র সতীত্বের গুণ নিয়েও নারীত্ব পূর্ণতা পেতে পারে না। এমন কি, সতীত্বকে বাদ দিয়ে নারীত্বের বিকাশ (যদিও পরিপূর্ণ নয়) সম্ভব, কিন্তু আমাদের বিচারের নারীত্ব—স্নেহ-মমতা সেবা ধর্ম-দরদ-আত্মতাগ প্রভৃতি নারীর কোমল হৃদয়বৃত্তিগুলোকে বাদ দিয়ে, শুধু সতীত্ব নিয়ে নারীসত্তাব বিকাশ সম্ভব নয়। কারণ—নারীত্ব সে মনুষ্যত্বের সংগে অচ্ছেদ্য ভাল, প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত, আর সতীত্ব নিহিত থাকে জীবনের একটা বিশেষ পর্ধ্যায়ে গড়ে ওঠা আত্মগত ও পরিতৃপ্ত মনোদর্মিতার মধ্যে। মনুষ্যত্বের সাথে তার যোগসূত্র কিছু দূরের—পরোক্ষ। অবশ্য সংস্কারাঙ্ক হিন্দু নারীর লোকদেখানো পোষাকী সতীত্বের মধ্যে মনুষ্যত্বের কোন মহৎ বৃত্তি মেই। সে এক ধরনের অন্ধতা, আত্ম-প্রতারণা—যাকে তথাকথিত হিন্দু সমাজ দিয়েছে প্রচুর মূল্য।

জীবনে চলার পিছল পথে কোন নারীর দৈবাৎ পদবলন হল—ভুল করে ফেললো—সতীত্ব হারালো, কিন্তু তাই বলে কি সে সমগ্র নারীত্বকে হারিয়ে ফেললো? হয়তো তার মধ্যে এক মহাপ্রাণ লুকিয়ে আছে—যে পরের ব্যাথাই কাঁদে, পরের এতটুকু ভাল করার জন্তু বাকুল হয়ে ওঠে। পরের জন্তু এই যে কাঁদা, এই যে ব্যাকুলতা তাই তা নারীমনের কোমল বৃত্তি, নারীত্ব, যা ছাড়া নারীচরিত্রের পূর্ণ বিকাশ অসম্ভব!

সতীত্ব নারীর গুণ সন্দেহ নেই, তাই বলে ক্ষবিকের ভুলের জন্তু সে যদি সতীত্ব না রাখতে পারলো তার জন্তু কি সে সমাজ থেকে চিরতরে বহিস্কৃত হবে? নারীত্ব ঐশ্বর্য্যবতী হওয়া সম্ভব? শরৎচন্দ্র কত দুঃখ করে বলেছেন : ‘একটি যুবতী মেয়ে যদি যৌবনে একবার একটা ভুল করে ফেলে তাহলে তার আর রেহাই নেই। তার চরম দুর্গতি করিয়ে তবে লোকে ছাড়বে। কেন? তার ভাল হবার পথ, সমাজের একজন হয়ে ফিরে আসবার পথ কেন খোলা থাকবে না? তার কি প্রাণ নেই? আমি তো জানি তাদের মধ্যে এত বড় প্রাণ আছে বা অনেক গৃহস্থের সতী মেয়েও মধ্যে নেই। সতীত্ব না রাখতে পারাটা অপরাধ ঠিকই, তাই বলে পতিতের উপরে উঠবার সুযোগ করে দেওয়াটা অজ্ঞায়ের প্রশংসা নয়।’ শরৎচন্দ্র মানুষের এই দৈহিক পতনের হুঁত্যাগে সংবেদনশীল হয়ে উঠেছেন। স্বভাষদূর্বল নীতিচ্যুত মানুষকেই তিনি কোনদিনই পাপী বলে হীন চক্ষে ঘৃণার দৃষ্টি দিয়ে দেখেননি। আদর্শবাদী বঙ্কিমচন্দ্র আদর্শ-জাতিভ্রংশকে প্রশংসা দেননি। তিনি সতীত্ব ও নারীত্বকে এক করে দেখেছেন সতীত্বহীন নারীত্ব নেই। সে পাপীয়সীর সামাজিক কর্তব্য। তাই কুন্দনন্দিনী রোহিণীর শাস্তি হল ঐ একই কারণে। কিন্তু মানুষের প্রতি মানুষের ঘৃণা তাচ্ছিল্য শরৎচন্দ্র ভাবতেও পারেন নি।

তার চন্দ্রমুখী পতিতা অসতী পাণীয়সী হয়েও পাঠকের সহানুভূতি আকর্ষণ করলে কোন গুণে? তার সতীত্ববোধ জাগবার জন্তে? না তার নারীত্বের মনোরম বিকাশের জন্তে? শুধু মাত্র সতীত্ব হলে তা সম্ভব হত না। কেননা নারীত্বকে বাদ দিয়ে সতীত্ব কি করে সুন্দর হবে? সতীত্ব একক ভাবে সুন্দর হয়ে উঠতে পারে না। নারীর কোমল চিত্তবৃত্তি সতীত্বকে মহিমা দিয়ে সুন্দর করে তোলে। তা না হলে এমন সতীত্বের অর্থ কি? তাই শরৎচন্দ্রের দবদী মনের প্রশ্ন: 'দৈহিক স্তুতিটাই কি এতবড় গুণ, যে মেসোমাল্লব স্বামী জেলে যায় দেখেও তাকে বাঁচাবার জন্তে গহনা টাকা বের করে দেয় না—সেও সতী! সেরূপ সতীত্বের যে কি মূল্য জানিনে।'

হিন্দুসমাজ তবুও হৃদয়ের ঐশ্বর্য্যে সমৃদ্ধ নারীত্বকে বাদ দিয়ে পোষাকী ফরমাসী সতীত্বকে সমগ্র নারীসত্তা বিচারের মাপ-কাঠি করেছে। কোন নারী চিরাচরিত সমাজ-শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহিনী হয়ে শরৎচন্দ্রের মতো মানবদরদীর সমর্থন পেতে পারে যদি সে সমাজ ভৈরব ভট্টাচার্য্যি বেণী ঘোষালের সমাজ হয়—যে সমাজ প্রকৃত তথ্যকে উপেক্ষা করে কেবল এক নিরর্থক কংকালকে আঁকড়ে ধরে রয়েছে। মানবতাকে অবমাননা করেছে। রম্য-রম্যেশের মত সমাজের প্রকৃত মংগলাকাঙ্ক্ষীর সমস্ত সদিচ্ছাকে চূর্ণ করে দিয়েছে। তাই শরৎচন্দ্রের কত সহানুভূতি মনুষ্যত্বের উদ্দেশ্যে: 'আমার কথা হচ্ছে, আমি যেন কোন দিন মানুষের আত্মাকে আমার লেখার মধ্যে অপমান না করি। মেয়ে মানুষই হোক আর পুরুষ মানুষই হোক তার ওঠার জন্ত পথ যেন একটা খোলা থাকে। হিন্দু সমাজ অত্যন্ত নিষ্ঠুর। তার তুলনায় মুসলমান সমাজ অনেক ভাল। বাইরের জিনিস দেখে আমরা অনেক ভুল করছি। কিন্তু বাহিরটাই তো সব নয়। অন্তরই যে বড়। তাকে তো সত্যি অস্বীকার করা যায় না।' কোমল-শুভ্র নারী-হৃদয়ের ভালবাসা কোমল বৃত্তির পরম উৎস—পরম ধন। সে পাঁপড়টিকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দলিত করে দিতে চায় নিষ্ঠুর সমাজ-শাসন। সমাজ-নিয়ম তার মূল্যায়ন কোন দিন করতে শেখেনি। তার মাধুর্য্য উপলব্ধি করতে শেখেনি। বোঝেনি—ভালবাসা কত বড় শক্তির উৎস—নারীকে কত বড় ভ্যাগের কর্তার মতো দীক্ষিত করে। শরৎচন্দ্র বলেছেন আরও বড় কথা: 'ভালবাসা যে কত বড় জিনিস তা বলে বোঝান যায় না। সব দোষ-ত্রুটি এতে ঢেকে যায়। ভালবাসার মত আত্মভ্যাগের শিক্ষা দিতে আর তো কিছু পারেনা। প্রণয়-পাত্রীকে জয় করবার জন্তে যুবকের যে বিপুল চেষ্টা, যে আন্তরিক সাধনা, এত মাধুর্য্য তা আমি অজ্ঞ দেখে দেখে ভুলতে পারিনি। এই যে পাবার মধ্যে কত সেকরিফাইস, কত চেষ্টা, কত সাধনা, এতে মানুষকে অনেকখানি নোবল, অনেকখানি গ্রেট করে দেয়।'

আমাদের সমাজ-ব্যবস্থা অস্ত্র রকম। রকমটা অবশ্য একান্তভাবে অসমর্থনীয়—অন্ধতায় পটু। অপব্যবস্থায় কটকমর। এ সমাজে যুবক-যুবতীর বিয়ে ব্যাপারটা সম্পূর্ণভাবে বাবা-মায়ের ইচ্ছাধীন ছিল। কয় যুগ আগেও হিন্দু ঘরের কোন মেয়ে ভাবতেও ভয় পেত—সে কখনো কোন যুবককে ভালবেসে বিয়ে করবে। এমন কি তারী বামীর কল্লনাও বুঝি তার কাছে ভয়ের। এই ভয় করতে শিখিয়েছে

তার পরিবেশ—বাবা-মায়ের শাসন ও সমাজের দৃঢ় অনুশাসন। সে জানে বাবা-মা তাকে যার হাতে তুলে দিয়েছে, সেখানে তাকে বাঁধা পড়ে থাকতে। দাম্পত্য-জীবনে অভ্যস্ত থাকলেও সামাজিক-মস্ত্রোচ্চারণ আর যজ্ঞের ধোঁয়ায় যে জীবন একবার বাঁধা পড়েছে, তাকে বিচ্ছিন্ন করে নেবে কি করে? সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহিনী হবে কি করে? বিদ্রোহের ধাতটি তার রক্তে নেই—সে সংস্কারাঙ্ক। সমাজ-শাসনের দাস। শৃংখলিত। শরৎচন্দ্রের অভিমোগ এ ধরণের অন্ধতার বিরুদ্ধে। সমাজের কু-শাসনের বিরুদ্ধে। যে সমাজ নারীর কোমল হৃদয়ের কোন গোপন কোণে যেই ফুটতে যাওয়া একটি যুৎসুন্দর প্রণয়-ফুলকে কর্তার শাসনের রুদ্ধভেজে অকালে বলসে দেয়, শরৎচন্দ্রের মতবোধ সে হৃদয়হীন সমাজের সাপে। যে সমাজ অন্তরের চিরন্তন সত্যকে অস্বীকার করে চরম অন্ধতায় একান্ত অসত্যকে আঁকড়ে ধরে আছে, মানবতায় দৃঢ়বিশ্বাসী মানুষ সে সমাজের নিয়ম-শাসনকে কোন দিনই সমর্থনের দৃষ্টি ফেলে দেখবে না। নারী-হৃদয়ের সেই সত্যানুভূতির প্রতি তথাকথিত সমাজের মনোভাব সম্পর্কে শরৎচন্দ্র বলেছেন: 'আমাদের এখানে বিবাহিত দম্পতির মধ্যে তা কিছুতেই সম্ভব নয়। জয়ের যে একটা আনন্দ, জীবনের ওপর তার যে একটা মহৎ প্রভাব, তা থেকে তারা একেবারে বঞ্চিত থাকে। জয়ের জন্ম কত ব্যগ্রতা, কত ব্যাকুলতাই না দেখেছি। তারা শক্তি সঞ্চয় করে, নিজেদের তারা যোগ্য করে তোলে, দরকার হলে 'ডুয়েল' লড়ে। তারা ভালবাসার মর্যাদা বোঝে, ভালবাসার সম্মান তারা রাখতে জানে। এখানকার সমাজ ধরে-বেরে কতকগুলো মস্ত্র পড়ে হুঁজুনকে এক করে দিল, কিন্তু তারা ভালবাসার একটা জীবন্ত আনন্দ কখনো পায় না।'

শরৎচন্দ্রের এই মতবাদ রক্ষণশীল সমাজের চোখে বিপ্লবাত্মক সন্দেহ নেই। শরৎচন্দ্রের সমর্থিত সে 'ভালবাসা' সম্বন্ধে তাদের বিরুদ্ধ মতবাদ হচ্ছে: 'প্রণয় পাত্র-পাত্রীকে জয়ের জন্তে যে ব্যাকুলতা তা ক্ষণিকের—তার স্থায়িত্ব চিরদিনের নয়।' শরৎচন্দ্রের উত্তর হল: 'যে আনন্দ তাতে আছে, তা হুঁজুঁ। হতে পারে ক্ষণিকের, কিন্তু হুঁ-দশ দিনের যে আনন্দ, তার তুলনা নেই। সে আনন্দ জীবনের অনেক দুঃখ-কষ্টকে ছাপিয়ে বড় হয়ে থাকে। তার ইনফ্লুয়েন্স খুবই কার্যকরী। কল্লোয়েষ্টের আনন্দ—সে কি কম? 'সেলফ-মেড' মানুষ যেমন বড়, যারা হৃদয় কঙ্কার করে তারাও তেমন বড়।'

নারীত্ব মূল্যায়ন সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের এ ধরণের সম্বন্ধ-চেতনা তথাকথিত সামাজিক রক্ষণশীলদের মধ্যে প্রশ্নের উদ্বেক করবে। তারা তুলবে শরৎ-সাহিত্যে নীতির প্রশ্ন। কিন্তু সে অন্ধরা ভুল বুঝেছে। সাহিত্যে শরৎচন্দ্র দুর্নীতি প্রচার করেননি। নীতি-বর্জিত তিনি মোটেই ছিলেন না, ছিলেন উদারনীতিবাদী। মানবদরদী। তিনিই স্বীকার করেছেন: 'নীতি আমি মানিনে, এমন কথা আমি বলিনে। শুধু সৌন্দর্য্যচর্চা করব, কোনও নীতি-কৃতি মানবো না—এতো আর সত্যি সত্যি চলতে পারে না। কেউ কেউ অবশ্য বলেন, সাহিত্যের ভেতর নীতি-টিতি নেই, কৃতি আছে। আমি কিন্তু তা বলিনি, আমি বলি, নীতিও আছে।'

শরৎ-সাহিত্যে নীতিকথা যথেষ্ট রয়েছে, কিন্তু সেখানে কাউকে পরিকল্পিত ভাবে নীতি শিক্ষাদানের প্রয়াস নেই—যে প্রয়াসটুকু খুঁজে পাওয়া যায় কাকিম-সাহিত্যের অনেক জায়গায়। সেখানে নায়ক-নায়িকার কথাবার্তাও যে নীতিজ্ঞান প্রদান পেয়েছে তা

সামাজিক মানুষের সংস্কারের সাথে মিশে যাওয়া স্বভাবসিদ্ধ নীতিবোধের প্রকাশ। একান্ত সাহিত্যোচিত রসাত্মক পন্থায়।

নারীত্বের মূল্যায়ন পথ্যাসে শরৎচন্দ্রের অভিনব সমাজ-দর্শনের ছায়া পরবর্তী বাংলা-সাহিত্যে প্রচুর রয়েছে। তা শুধু অনুকরণ নয়। 'রিভল্ট'র উত্তরাধিকার। বৈদ্য বিপ্লবের দ্বিতীয় ধাপ। আরও এগিয়ে তৃতীয় ধাপে—অর্থাৎ সর্বাধুনিক যুগে সেট অভিনব সমাজ-দর্শনের দৃষ্টি সাহিত্যে আরও উদার হয়েছে। তাই শরৎচন্দ্র বাংলার যে বিপ্লবাত্মক নুতন পথের পথিকৃৎ শরতান্তর বাংলা-সাহিত্যে প্রদানতই সে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সে পথেই এগিয়ে চলেছে, আরও বৃদ্ধি চলেছে বিশ্ব-সাহিত্যের সাথে পা কেলে।

রক্তগোলাপ

গীতা চক্রবর্তী

মিতা,

লক্ষ্যে থেকে তোমায় যে চিঠি দিয়েছি আশা করি তা পেয়েছ। এখন যে চিঠি তুমি পাবে তা যাচ্ছে আশ্রা থেকে। মিতা, ৪ঠা তারিখে আমরা এসে আশ্রায় পৌঁছেছি। সেদিন বিকেলেই আমরা বেরিয়ে পড়লাম। প্রেমিক সাজাহানের 'মথুর স্বপ্ন' তাজমহল দেখতে। আমরা যখন মতি মসজিদের সামনে দাঁড়ালুম, তখন অন্তর্গামী সূর্য্যের রক্তিম আভা এসে পড়েছে মসজিদের উপর। দেখলাম ঘুরে ঘুরে সব। দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে এলো, মনে হোলো এই মহাকাল, যে কালের কবলিত হয় সব প্রতিপত্তি, মান, সম্মান। আস্তে আস্তে সূর্য্য মতি মসজিদের পিছনে বিলীন হয়ে গেলো। আনন্দ মনে হোলো ঠিক এমনি করেই অন্ত গেছে মোঘল সাম্রাজ্যের সৌভাগ্যল্য। সাইপ্রাস বনভূমির মধ্যে দিয়ে বৈকালীন বাতাস বয়ে যাচ্ছে। পাতার মধ্যে আসতে আসতে যে শব্দ শোনা যাচ্ছে তা যেন বনভূমির দীর্ঘনিশ্বাস। আমরা সেইখানে ঘাসের উপর বসে আমাদের জলযোগ সারলাম। ক্রমে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো, ভাগ্যক্রমে সেদিনটা ছিল পূর্ণিমা। আকাশে পূর্ণ চাঁদ। একটু একটু করে জ্যোৎস্না তার রূপালী ফাগ ছুড়ছে তাজমহলের উপর। চমৎকৃত হলাম। যে বেদনার গুরুভার এতক্ষণ বুকেটা চেপে ছিল এতক্ষণ তা যেন নেমে গেল। অবাক হয়ে গেলাম যে তাজমহল এতদিন শুধু গল্পে পড়া রূপকথার রাজ্য ছিল, আজ তা প্রত্যক্ষ করছি। তা এত সুন্দর!

অপূর্ব! অপূর্ব সাজাহানের শিল্পদৃষ্টি! তাঁর প্রেম! তাজমহলের প্রতিটি পাথর যেন মমতাজ আর সাজাহানের প্রেমস্বপ্ন-সিদ্ধান্ত। আর সেই পাথর দিয়েই তৈরী তাদের প্রণয়ের মথুর মূর্তি। আমার মনে হোলো মনের গহনে কোন কবি বলে উঠলেন—

তাজমহলের পাথর দেখেছ দেখেছ কি তার প্রাণ?

অন্তরে তার মমতাজ নারী বাহিরে সাজাহান।

মিতা! আজ বড়ো তোমার কথা মনে হচ্ছে। মুর্শিদাবাদে যেমন হুজ্জনে সিরাজদ্দৌলার কবরে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছিলাম, তেমনি এই দুই প্রণয়ী যারা আজও হুটি কবরে পাশপাশি শুয়ে করছে তাদের প্রেমলাপন যুগ যুগ ধরে, তাদের কর্তৃত্ব আমাদের শ্রদ্ধা-নিবেদন।

মিতা, অনেকে বলে এই তাজমহল নাকি মমতাজের মৃত্যুর পর হয়নি। হয়েছিলো তাঁর জীবিতাবস্থায়। তবে তাঁর মৃত্যুর পূর্বে

শেষ হয়নি। সাজাহানের ছিল 'রক্তমহল' মমতাজের 'তাজমহল'। কোন একটি বিশেষ দিনে যখন বিশেষ বাতি জ্বলবে রক্তমহলে তখন মমতাজ আসবে নৌকা করে যমুনা অতিক্রম করে রক্তমহলে। আর যখন বিশেষ বাতি জ্বলবে তাজমহলে তখন সাজাহান আসবে যমুনা বেয়ে তাজমহলে। কিন্তু বিধাতার অভিশাপ, কল্পনা তাঁদের কল্পনাই রইলো। নিষ্ঠুর নিয়তি ছিনিয়ে নিলো মমতাজকে। তাই প্রেমিকার অভিসার রজনী শেষ হলো। রচিত হলো বাসরশয্যা কবরের কঠিন মাটিতে তাজমহলের বুকে। মিতা! তবু তারা সুখী—

একজন আগে গিয়ে অপেক্ষা করছে আর একজনের জন্তে তারপর মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে পেয়েছে তার দয়িতকে।

দীর্ঘদিন অদেখায় যে বিরহ-যমুনার স্রষ্টি হয়েছে কবে তা পার হোয়ে তোমার দেখা পাব? মন বড় অস্থির হয়ে উঠেছে, আর বেশি দেবী করব না। এবার কিছু গ্রাম ঘুরে মাসখানেকের মধ্যেই বাড়ী ফিরব। এর মধ্যে চিঠি নাও পেতে পার, লক্ষ্যটি রাগ করো না। আমার যাওয়ার দিন আমাদের বাড়ী তোমার থাকা চাই। ইতি

তোমারই অসীম।

চিঠিটা পেয়ে খুশিতে ভরে যায় সুরমিতার মন। অসীম আগ্রহ গেছে, দেখেছে তাজমহল। তারও বড় 'তাজমহল' দেখার সখ। ঠিক আছে বিয়ের পর তারা যাবে। সে শুনেছে তাজমহল দেখতে যায় 'কৌঞ্চ-মিথুন'। ভাবতেই লজ্জায় তার মুখ লাল হয়ে যায়। চিঠিটাকে বার বার পড়ে। ৪ঠা অসীমের বোন সুনন্দার গলা পাওয়া যায়—

বৌদি ভাই! ও বৌদি ভাই—

ছুটে যায় সুরমিতা—এই নন্দা কি করছিস?

—কেন কি করেছি?

—তুই বৌদি ভাই বৌদি ভাই বলে চেঁচামিচি করছিল কেন? মা শুনে কি ভাববেন বল তো?

—ও মা, এতে আমার ভাববার কি আছে! কাল যা হবে আজ তা বলছি, আর তা ছাড়া ত মাসিমা জানেনই।

—জানলেই বা।

আচ্ছা বাবা, অজায় হয়েছে। এবার থেকে মিতাদি' বলবো! যাক দাদার চিঠি পেয়েছো? অবশ্য এ'জিজ্ঞাসা করা অজায়, তবু করছি। মিতা চিঠিটা দেখায়।

—ও বাবা! তোমার চিঠিটা কত বড় আমারটা মাত্র এক পৃষ্ঠা, দাঁড়াও না কেমন ঝগড়া করি ওর সঙ্গে।

সুরমিতা বলে থাক, আসলে ত ঝগড়া করবি আপাততঃ একটু চুপ কর। আয় চা খাবি আয়।

কানপুর এসেছে অসীম আর তার বন্ধুরা। আশ্রয় নিয়েছে এক বাঙ্গালী পরিবারে। অত্যন্ত বন্ধে তারা এদেরকে আপন করে নিয়েছে। অসীমের অপার দুই বন্ধু কয়েক দিন পর তাদের আশ্রয়ের বাড়ী চলে গেছে। অসীমকে বাধ্য হয়ে এখানেই থাকতে হলো।

প্রতিদিন অসীম ভোরে উঠে ক্যামেরা হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে, ছপুর রোদে পুড়ে তবে ফিরে আসে। কানপুরে বড় বড় খান-কেন্তের

মধ্য দিয়ে যখন সে আসে মনে ভাবে, বিয়ের পর 'সে' আর 'মিতা' আসবে। খেলবে লুকোচুরি ধানক্ষেতের মধ্যে।

অসীম অবাক হয়ে যায়, প্রতিদিন তার ঘর কে যেন গুছিয়ে রেখে যায়। ময়লা জামা-কাপড় পরদিন ধোয়া অবস্থায় ভাঁজকরা থাকে টেবিলে। যাক, সে নিয়ে মাথা ঘামাবার খুব বেশী অবসর থাকে না অসীমের। বাড়ীর কর্তা, গিন্নী, অত্যন্ত ভাল। আপন লোকের মতো বস্তু করে তাকে।

অসীমের কানপুর দেখা হয়ে গেছে, এবার বাড়ী যাবার জন্তু অস্থির হয়ে ওঠে। আয়োজন করে যাত্রার। বাড়ীর কর্তা বলেন— বাবা, আমার একটি মেয়ে আছে বোধ হয় জান। সামনের এই তারিখে তার বিয়ে। এটা দিনটি তোমায় থেকে যেতে হবে। ওকে বোধ হয় তুমি দেখনি বড় লাজুক, তবে ও তোমায় বড় ভাইয়ের মতো শ্রদ্ধা করে।

অসীম বলে, তাই বুঝি? আমি ত আপনায় মেয়ে আছে জানতাম না!

জানবেই বা কি করে, বাইরে বাইরেই ত থাক চক্ষিণ ঘটা—যাক লীলা এদিকে আর তো মা!

অসীম ভাবে এটা তবে তার ঘর গুছায়, পরে বলে—আপনার বিয়ের নিমন্ত্রণ না খেয়ে কিন্তু যাচ্ছি না, লজ্জায় লীলা পালিয়ে যাব বাবার সামনে থেকে।

বিয়ের দিন, রাত্রিবেলা বর বিয়ে করতে বসেছে, হঠাৎ একটা গগুগোল শোনা গেলো। বরপক্ষ বর তুলে নিয়ে যাবে, এই মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হবে না। কাবণ অনুসন্ধানের পূর্বেই বর পক্ষ বর নিয়ে চলে গেলো। শোনা গেল। ছেলে পক্ষ মেয়ের চরিত্র সন্দেহে সন্ধিহান আর তার জন্তু অসীমই দায়ী। অবাক হয়ে যান মেয়ের বাবা ভূপেন বাবু। ছিঃ ছিঃ অমন দেবভুল্য চরিত্রের ছেলের নামে এ অপবাদ! কি বলবেন তিনি অসীমকে, অসীম তো চলেই যেত শুধু তাঁর অনুরোধ রক্ষা করে এই কলঙ্কের সঞ্চারিত হতে হলো। মাথায় হাত দিয়ে বসলেন ভূপেন বাবু। স্ত্রী এসে মিনতি করে বলেন, ওগো তুমি একবার অসীমের হাতে-পায়ে ধরে মিনতি করো ও ছাড়া কে রক্ষা করবে আমাদের। মান-সম্মান সবই যায়, ওগো কুলধর্ম সবই যায়। যাও তুমি একবার।

এরই মধ্যে সব ঘটনা গিয়ে পৌঁছেছে অসীমের কানে। স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে সে। ছিঃ ছিঃ এদিক কথা, এমন এদের অবস্থা! আর এ কথা মনে করতেই যার কথা মনে হয় সে একটি শাস্ত্র স্মরণ লাজুক মেয়ে। হয় রে! এই মেয়েরও ভাগ্যবিড়ম্বনা। ভারতে থাকে অসীম, ঘরময় ব্রহ্ম আর অস্থির ভাবে পায়চারি করে।

হঠাৎ ভূপেন বাবু হস্তদস্ত হয়ে অসীমের ঘরে ঢুকে কঁদে ফেলে। বাবা অসীম, তুমি বাঁচাও আমায়, নইলে আমার মান সম্মান সব যায়। শত্রু হাসছে, তুমি আমাদের স্বজাতি আর লীলা আমার দেখতে খারাপ নয় বাবা, ধর্ম রাখো। আমি এখনি তোমার বাবাকে টেলিগ্রাম করে দিচ্ছি। আমারই সব অপরাধ আমি স্বীকার করব।

—না না, এদিক কি বলছেন আপনি, এ কি করে সম্ভব হবে?

বাবা তোমার পায়ে ধরছি, তোমরা যুবক ছেলে, তোমরা না খাঁটালে আমাদের উপায় কি বাবা? তুমি যদি রাজী না হও আমি

একুশি মেয়েকে খুন করে নিজে আত্মঘাতী হবো। তবুও আমি শত্রুর মুখ হাসাব না, কুল রাখব।

নিরুপায় অসীম, সবার উপরে একখানি মুখ বার বার মনে হয়, যে এখনও তার অপেক্ষায় দিন গুণছে, সে হোলো স্মৃতি। তাই হঠাৎ নিরুপায়ের মতো বলে উঠে, না না, ব্যাপার হয়েছে কি আমি বিবাহিত।

বিবাহিত! মুহূর্তের জন্তু থমকে যান ভূপেন বাবু। পরে অসহায়ের মতো বলে ওঠে বাবা, তাতে কি হয়েছে তোমার স্ত্রীর ত দাসীর প্রয়োজন—লীলাকে তার দাসী করে নাও বাবা! তুমি যদি না নিতে চাও তবে শুধু একটু শাস্ত্রমতে সিঁদুর দিয়ে দাও। তারপর আমরাই রাখবো। এটুকু দয়া আমায় করো বাবা, ১১টাই শেষ লগ্ন, এর পর আর ওর বিয়ে হবে না। আর বেশী সময় নেই।

অসীম ভাবে—মিতা, আমায় তুমি ক্ষমা করো, আমি নিরুপায়। তার পরে বলে, ঠিক আছে, আপনারা বিয়ের আয়োজন করুন।

বিয়ে হয়ে গেলো। কিন্তু হলো না কোনো আনন্দোৎসব। যেন বিরাট একটা অমঙ্গল কোন রকমে নির্বিঘ্নে কাটান হোলো।

খবর পৌঁছাল বাড়ীতে। আশ্চর্য হয়ে গেলো সবাই, এ কি! মা বড় আশা করেছিলেন যে স্মৃতি হবে এ-বাড়ীর বধুমাতা। সব আয়োজনই সম্পূর্ণ, শুধু মাত্র অসীমের কথার অপেক্ষা, কি বলবেন তিনি স্মৃতির মাকে?

খবর পেয়ে অসীমের বাবা চলে যান কানপুর, বউ দেখে তার বেশ পছন্দই হয়। তাছাড়া ভূপেন বাবু দিয়েছেন অনেক। তাতেই তাঁর তৃপ্তি। ছেলেমেয়ের মনের খবর তিনি রাখেন না বা তার মূল্যও তিনি দিতে চান না। তাই বাড়ীতে খবর দেন বৌভাতের সব বন্দোবস্ত করতে। তিনি দু'এক দিনের মধ্যেই ছেলে-বৌ নিয়ে বাড়ী ফিরেছেন। সুনন্দা স্মৃতিদের বাড়ী যায় অপরাধীর মতো, কি বলবে সে মিতাদিকে। দেখে খাটের বাজু ধরে চুপচাপ পাঁড়িয়ে আছে মিতা! সুনন্দাকে দেখে মিতা বিছানার উপর পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকে। কি দেবে শাস্তনা তাকে, সুনন্দা নিজেই কাঁদতে থাকে। আসেন স্মৃতির মা, শাস্ত্র সৌম্য একটি দেবী-মূর্তি। যেন আরো বেশী মাত্রায় শাস্ত্র হয়েছেন। সুনন্দা কিছু বলতে পারে না। তিনিও কিছু বলেন না, এসে কিছুক্ষণ পাঁড়িয়ে নীরবে আবার চলে যান।

এসে গেছে অসীম আর লীলা। বাড়ীতে ফুলসজ্জার আয়োজনের কোন ক্রটি নেই। অসীম বার বার বাবণ করেছে এসব আয়োজন করতে কিন্তু তার বাবা ললিত বাবু তার কথা রাখেন নি। স্ত্রী যখন বলতে এসেছে তিনি বলেছেন, কেন? এটা কি আমার শ্রাদ্ধ না কি যে চুপ করে কাজ সারতে হবে? আমার একটি ছেলের বৌভাত, আর তাছাড়া আমার মান জাত কুল সবই বজায় আছে। প্রকাশ করার মতো সন্দেহ হয়েছে আনন্দ করব না কেন? দু'দিন আগে থেকে সানাই আসবে। তোমার অন্ত্রবিধা হলে জন্তু বাড়ী গিয়ে বসে থেকে।

কি বলবেন অসীমের মা, চুপ করেই থাকেন। যথানিয়মে ফুলসজ্জার দিন এসে পড়ে। সকাল থেকে লোকজনের আসার বিরাম নেই। কিন্তু সুনন্দার মন অস্থির হয়ে উঠেছে। মাকে গিয়ে বলে—মা মিতাদি আসবে না মা? মা বলেন কি করে আসবে মা সে? আর আমিই বা কোন মুখে তাকে আসতে বলবো?

হঠাৎ কার গলার স্বর শুনে চমকে যায় মা, মেয়ে—নন্দা! এই নন্দা কোথায় গেলি বলতো, তোর কি কাজের দিনেও ঘুম কমালে চলে না—আর এই ত আমি ভাবছি কোথায় বসে বসে ঘুমচ্ছি—

আয় আয়, এখনও বৌদিকে সাজানি নি, সন্ধ্যা হয়ে গেলে, লোকজন আসতে শুরু হয়েছে। তোর বুদ্ধি কোন জন্মে হবে না। আর মাসিমাও বেশ ওর সঙ্গে এখনও ঝাঁড়িয়ে কথা বলছেন। কি বলবেন মা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন ওর দিকে। কি অপূর্বই না লাগছে আজ মিতাকে। বড় সুন্দর লাগছে মিতাকে—যেন খেতবসনা সরস্বতী পরেছে একখানা শাদা বেনারসী। গায়ে শাদা ব্লাউজ, গলার সাদা মুক্তোর মালা হাতে সাদা বকুনীগন্ধার চুড়ি, খোঁপায় রজনীগন্ধার মালা, কপালে খেত চন্দনের টিপ। শুধু মাত্র একটি রক্তগোলাপ বুকে। সুন্দর বুকে পায়ে না তার সাজের অর্থ। সুন্দর জানে মিতাদির কোন কাজই অর্থহীন নয়। অবাক হয়ে বলে মিতাদি'এর অর্থ?

—কিসের?

—তোমার সাজের?

কিছু না, শোন, বাইরে আমাদের চাকরের হাতে যা আছে নিয়ে আয় বৌদিকে সাজান। সাজান মিতা বৌদিকে লাল বেনারসী লাল ব্লাউজ, খোঁপায় রক্তগোলাপের মালা, কপালে সিঁদুর, পায়ে আলতা। পরায় চন্দন অপূর্ব ভঙ্গিতে। যেন আপন মনের সমস্তটুকু বস নিড়ে রঞ্জিত করেছে সে লালকে।

নন্দা যা না ভাই, অসামকে সাজিয়ে দে। বাড়ীতে লোকজন আসবে, বর সে, তাকেও একটু সাজাতে হবে। যদি না সাধতে চায় বলিস মিতা বলেছে। আমি যাঁই ভদের খাটটা সাজিয়ে দিবে আসি। তুই বৌদিকে একটু পরে নিয়ে আসিস।

মিতা কর-কনের খাট ফুল ফুলে সুন্দর করে সাজিয়েছে। খাটের দু'পাশে শিরের দু'পাশে দিয়েছে তার নিজের হাতে গড়া দু'টি মাটির প্রদীপ, নিজের হাতে আঁকা একখানা হর-পার্বতীর মিলন মূর্তি তার তলায় লেখা রয়েছে তোমাদের শুভমিলনের দিনে মহামিলনের প্রতীক। আর বড় একটা ফুলদানিতে এক ষাঁড় রক্তগোলাপ। যে এসেছে বৌ এবং ফুল-সজ্জার ঘর দেখে সকলেই প্রশংসা করে গেছে। সত্যি যে সাজিয়েছে সাজাবার ক্ষমতা আছে। শিল্পজ্ঞানোচিত দৃষ্টিভঙ্গি আছে।

রাত্রে একে একে সব অতিথি চলে গেছে, আত্মীয়-স্বজন বারা আছে তারা বৌকে নিয়ে খেতে গেছে—কেউ নেই ঘরে। আস্তে আস্তে ঘরে ঢোকে মিতা। দেখে অসাম চোখ বুজে শুয়ে আছে, মুখে একটা ক্লান্ত অবসাদের ভাব। সুমিতা ভাবে ঘুমিয়েছে অসাম। ভাই শেখবাবের মতো চুপি চুপি তাকিয়ে থাকে ঐ ঘুমন্ত মুখের দিকে, তারপর? তারপর আস্তে আস্তে চোরের মত বেরিয়ে আসার সময় জেগে যায় অসাম, ডাকে—মিতা—! ঝাঁড়িয়ে পড়ে সুমিতা, এই ভাককে উপেক্ষা করার ক্ষমতা নেই সুমিতার।

এগিয়ে আসে অসাম, মিতা ভূমি তো জানো যে আমি নিরুপায়। আমার পার তো ক্ষমা করো কিন্তু মিতা, সবইতো তুমি একজনকে দিয়ে গেলে, আমার—আমার কি দিলে মিতা! আমি কি নিয়ে থাকবো? সুমিতা কিছু না বলে আস্তে আস্তে বুক থেকে রক্তগোলাপটা খুলে দেয় অসামকে।

—আমার বেটুকু ছিল সবটুকু দিয়ে যাকে রাক্ষসে দিয়ে পেলাম

দেখো তার যেন কোন অনাদর না হয়। বলে বড়ের বেগে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। না গেয়ে কাউকে কিছু না বলে চলে যায় বাড়ী।

পরের বছর। আজ-কাল কেমন যেন হয়ে গেছে সুমিতা, সব সময় একটা অশ্রুমনস্ক ভাব। দশ বার ডাকলে একবার উত্তর দেয়। একটুতে বেগে যায়। আজ কাল তারা আমার বাড়ীর কাছে এসে বাড়ী ভাড়া নিয়ে থাকে। নিজেদের বাড়ী ভাড়া দিয়ে দিয়েছে। কারণ তাদের নিজেদের বাড়ী অসামদের বাড়ীর পাশে। সেদিনটা ছিল অসামের ফুলসজ্জার দিন। গত বছর এমন দিনে অসামের ফুলসজ্জা হয়েছিল। সুমিতা মাকে বলে অজস্র ফুল আনিয়েছে। আনিয়েছে রক্তগোলাপ, আনিয়েছে ছোট বড়ো বড় যুঁইয়ের মালা। সুন্দর করে সাজিয়েছে তার শোবার খাট। যেমন করে সাজিয়েছিল অসামের ফুলসজ্জার দিন, তারপর সেজেছে নিজে তেননি করে। আজ কিন্তু সাদা নয় আজ সব লাল। যেমন সাজিয়েছিল সেদিন লালাকে।

দেখেছে অসামের দেওয়া অসামের ফটোটা বিছানার উপর, পরিবেছে তাকে মালা। সাজিয়েছে তাকে চন্দন দিয়ে। মা ঘরে চুকে এই ব্যাপার দেখে অবাক হয়ে যায়। দেখেন সুমিতা অসামের ফটোটাকে মালা পরিবেছে, পরেছে নিজে মালা। তারপর বুকের অভ্যন্তর কাছে নিয়ে বলছে—

তুমি ভেবেছিলে আমি তোমার বৌকে হিংসে করবো। দেখলে ত এতটুকুও হিংসে করিনি। নিজেকে রিক্ত করে সমস্তটুকু রক্ত নিড়ে রাক্ষসেছি আমার প্রতিবন্ধীকে। কি বিশ্বাস হচ্ছে না? কিন্তু আজ আমি রিক্ত নয় আজ আমি পূর্ণ। দেখছো তাই আজ আমি লাল। আমি যাচ্ছি আমার মহলে মনতাজের মতো। আমিও অপেক্ষা করবো। তোমার কাজ শেষে যেদিন আসবে সেদিনের জন্ম। তখন আর কেউ থাকবে না থাকবে না কোন প্রতিবন্ধী। শুধু তুমি আর আমি। বলতে বলতে চোখের জল গড়িয়ে পড়ে। তার ফটোটাকে বুকের অভ্যন্তর কাছে নিয়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকে। মা এই অবস্থা দেখে চোখে হাত চাপা দিয়ে পালিয়ে যায় সেখান থেকে। কিছুক্ষণ পর মিতার কোন সাড়া না পেয়ে মা মেয়ে সরে এসে দেখেন খাটের উপর ফুলের উপর চলে পড়েছে যেন কুসুম-কল্যাণ আর নিড় বিড় করে বলছে—

আমার সকল কাঁটা ধরা করে ফুটবে গো ফুল ফুটবে।

আমার সকল ব্যথা রদ্বান হয়ে গোলাপ হয়ে উঠবে।

কিন্তু মুখের অবস্থাটা যেন কেমন! পায়ের কাছে খাটের উপর নিজে পড়ে আছে অসামের ফটোটা টুকরো টুকরো অবস্থায়। এগিয়ে আসেন মা—হঠাৎ দেখেন মিতার হাতে তার আফিমের কোঁটো। তিনি তাঁর বাতের জগ প্রাতি সন্ধ্যায় একটু একটু আফিম খান, সেই আফিমের কোঁটো খালি।

চাঁৎকার করে উঠেন মিতার মা—মিডু—মা, আমার কি সর্বনাশ করলি তুই, ওরে, এই জগ তোর এত সাজ! আমি একটু বুঝিনি। কি করলি মা—

মহলে যাত্রী অভিসারিণী মিতা জড়িত ক্রীণ কণ্ঠ বলে, মা—মা অত চোচামেচি করছ কেন, কাল সারা রাত বাসর জেগেছি, আজ একটু ঘুমতে দাও।

ছুটি রীনা মিত্র

এখন সময় আর আমার মাঝখানে
দুস্তর মরুর ব্যবধান।
ঘড়ির কাঁটার সাথে সাথে,
ঘণ্টার সরব বন্ধারে,
হরিণ-পায়ে ছোটায়ে না আমায়।
মিলের আকাশ-হোঁয়া নলের পাশে,
রক্তরাঙা সূর্যের প্রকাশে,
সময় বললে—‘পাঁচটা দশ’।
ভাকে জগতের সবার দ্বারে
পাঠিয়ে দিয়ে,
পরম নিশ্চিন্ততার কুহেলী-ঘেরা স্বপ্নটাকে
আবার জড়িয়ে ধরলুম।

এখন আকাশ-জোড়া ছুটির রবে
নীল রঙে ভরা দিনগুলি।
বাহ্যসও বেশ মস্তুর,
মা'র কোলের কাছে ঘন হয়ে বসা
নিশ্চিন্ততার মতো।

এখন সময় নেই, ‘গ্রামার’ নেই,
ছুলের টেনেলের সবুজ পাখাটা নেই,
এখন সময় আর আমার মাঝখানে
দুস্তর মরুর ব্যবধান।
ঘড়ির কাঁটার সাথে সাথে,
ঘণ্টার সরব বন্ধারে,
হরিণ-পায়ে ছোটায়ে না আমায়।

মৃত্যুর পরে বিশাখা ঘোষ-রায়

আমাকে ক'র না দাও, বন্ধ রেখো না কফিনের আধারে।
উদার আকাশ-ছায়ায়, মুক্তিকার কবীর কণায়,
আমার দেহের প্রতি অশ্রুতে অশ্রুতে—মিশিয়ে দাও।
সেনোটাকের প্রয়োজন মিটে গেছে;
(কারণ ওটা লোকদেখানো আর জমির অপচয় নাত্র)।
শুধু একটি ফুলের গাছ, পুরোনো বিবাসী ভূতের মত,
উদার সাথে সাথে অজস্র ফুল বরিয়ে দেবে
আমার সমাধির ওপর।
আর কবরের মাটিতে, চির-নিদ্রায় শাবিত থেকেও
আমি দেখব, ক্রৌঞ্চমিথুনের প্রণয়লালা।
এবং শতবর্ষ পরে
তখনকার সেই কৃষকের মুখে কলহাস্ত ফুটে উঠবে।
জমিতে প্রচুর শস্য;
মৃতদেহের সার।

একফালি রোদুর স্বপ্না গুপ্তা

একফালি কাঁচা রোদুর
আবিব মাগিয়ে দিলে কত গুল মনে।
ছোট একফালি রোদুর,
ও-বাড়ীর কাণিশ ঘেঁসে যে এসেছিল
এ-বাড়ীর ছোট উঠানে।
সে এনেছিল দিনের খবর, আর—
জীবনের একটুকু হাসি।
সে এনেছিল এ-বাড়ীর ধোঁয়া অন্ধকারের রাজ্যে
আনন্দে-ভরা ফুল এক রাশি।
তাই—এ-বাড়ীর ছেলোদের নামে,
কাঁচাকাড়ি পড়ে গেল মহা ধূনবামে।
তার পর ছোট রোদুর চলে গেল কঁঠাংই,
বৈকে গেল ও-বাড়ীর খানে।

অব্যক্ত প্রতিমা চট্টোপাধ্যায়

এ মনের প্রাস্তদেশে ছুড়ে
শুধু এক নিঃসীম বিস্তৃত জাগে।
আকাশ টুঙ্গা করে যখন অবিশ্রান্ত বৃষ্টি বারে,
হৃদয়ের শব্দহীন কান্নার মতো।
অস্ত্রের পুঞ্জীভূত ব্যথার সন্ধান রাগিণী বাজে,
যখন প্রভাতের আবেগ কুয়াশা-ঘেরা মাঠে
ঘাসে ঘাসে বিন্দু বিন্দু শিশিরের 'পরে;
ভোরের প্রথম আলো চিক্-চিক্ করে
গোপন তন্ত্রের বেদনাবিষণ প্রকাশের মতো।
হৃদয়ের অতলান্ত দেশে সব
খেলা শেষের চির-বিদায়ের ধনি ওঠে,
যখন ছায়াগান গোথুলি নামে পৃথিবীর 'পরে,
অন্ধকার রাত্রি আসে আকাশের পরে দ্রুত পদসঙ্কারে;
বর্গহীন, বন্ধহীন, হিমালয় মৃত্যুর মতো।

দিন-রাত্রির কাব্য সম্ভবমিত্রা রায়

কবির কথা আর বেদনায়, ওমবে মরে দুঃখের কাব্যখানি
হাসি-কান্নার মাঝে বিদ্রূপের কুটিল ভ্রুকুটি।
জীবনের বাকী ক'টা দিন বিদায়ের শেষ ও জানায়,
এ জীবন স্মরণেই জানি।
তবু হাসি ম্লান হয়ে অম্লান কিছু কাটি ছাঁচি মাঝনা লেখায়
আমায় মানুষের যত কথা জান, স্মৃতি ও শাস্তির বত বাণী
এ সবার অচেনা রাগিণী অজানাব বেড়াঙ্কালে দুঃখের সেই কাব্যখানি,
বাস্তবতা রূঢ় অতি যন্ত্রণাদায়ক।
জীবন-সংগ্রাম করি পেটে ফিঙ্গে কঠোর যন্ত্রণা
লজ্জা পেয়ে কাব্য মানি আরক্তিম মুখটি লুকায়,
কবি লিখেছে শুধু সে কাব্যের সেই কি নায়ক?

বাতিঘর

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

বারি দেবী

ব্যাক ব্যালাল দশ লক্ষ টাকা আর এই লালকুঠি ছাড়া কলকাতায় আরো দুখানি বাড়ী এই হোল তোমার পৈত্রিক সম্পত্তি। শাস্ত মুহুর্তে বলছিলেন সোমনাথ স্মিতাকে—আজ তার একটা সুব্যবস্থা করবার জন্ত আমি এসছি। হলে অপেক্ষা করছেন কয়েকজন সাক্ষী এ্যাটর্নি আর রেজিষ্ট্রার—একটু হেসে আবার বললেন তিনি—তুমিই এ সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী। এর জন্ত কোনো উইল বা দানপত্রের প্রয়োজন নেই। তবে আমি বেঁচে থাকাকালীন সেটার পূর্ণ অধিকার তোমরা পেতে পারো না, সে জন্ত আনাকে আইনতঃ তার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। তবে—নীচব হলেন তিনি।

—তবে কি বাবা? মুহুর্তে শুধোলো স্মিতা।

কম্বলের ওপর পদ্মাসনে বসে চোখ বুঁজে কি যেন চিন্তা করছিলেন সোমনাথ। কপালে ফুটেছে কয়েকটি রেখা, চাপা বেদনার দ্বন্দ্ব ছায়া যেন আজ উঁকি মারছে তাঁর প্রশান্ত সৌম্য বদনে। কন্টার প্রব্লেমের জবাব দিলেন না তিনি, কোন্ গভীর সমস্তার নিবিড় অরণ্যে যেন পথ অন্বেষণ করছেন।

লাইব্রেরীকে তখন আর কারুর প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিলো।

কয়েক মিনিট পরে চোখ খুললেন সোমনাথ। চাইলেন কন্টার দিকে। কোন আলৌকিক দিব্য বিভা ঝলমল করছে ওঁর হুটি চোখে, তার ভীতহুতি সহিতে পাশা যায় না।

—মিতু!

চম্কে উঠলো স্মিতা পিতার ডাক শুনে।

ও কণ্ঠস্বর যেন এ পৃথিবীর নয়, কোন্ দূর-দূরান্তরের দিব্যলোক থেকে ভেসে আসছে ও ডাক।

অত্যন্ত কৃষ্ণার সঙ্গে ক্ষণ কণ্ঠে বললো সে আমায়,—আমায় কিছু বলবেন বাবা?

না। পূর্বের মত সুগম্ভীর কণ্ঠে বললেন সোমনাথ। তোমার যদি কিছু বলবার থাকে নিঃসঙ্কোচে বলতে পারো। কথার শেষে কন্টার মাথায় হাত রেখে নীরবে আশীর্বাদ করলেন যেন।

—বাবা! কেঁপে উঠছে স্মিতার গলার স্বর।

—বলো মা! সঙ্কোচ কোবো না!

বাবা! এ সম্পত্তির দুর্ভেদ্য বোঝাটা আমার ওপর চাপিয়ে দেবেন না। আমি এ বোঝা বইতে পারবো না বাবা! আপনি কোনো সংকাজে এসব দান করে দিয়ে এর সদ্ব্যয় করুন বাবা! আর—কথা থামিয়ে মাটির দিকে চোখ নামালো স্মিতা।

বলে যাও, থেমে না!

দামীদাঁকে সর্ব্বশঃ ঝাঁকি দিয়েছেন ওঁর কাকা। ব্যবসা, বাড়ী কিছু নাকি তার নেই বাবা! কান্নার ভায়ে কেঁপে উঠলো স্মিতার

কণ্ঠস্বর। দু'চোখে জাঁচল চেপে ধরে বাঁখভাড়া অশ্রুবিন্দুকে গোথ করবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে লাগলো স্মিতা।

সব জানি মিতু! পরম স্নেহভরে ওঁর পিঠে হাত বুলিয়ে বলতে লাগলেন সোমনাথ। আমার মা-ঠাকুমার পবিত্র রক্তধারার সম্মান তুমি আজ রক্ষা করেছে। মহা পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হলে আজ তুমি। সামনের অন্ধকার দেখে ভয় পেয়ো না মা! এর পরে আছে অনন্ত জীবন, অনির্ব্বাণ আলো। সে আলোর পথে চলবার অধিকার লাভ আজ করেছে তুমি।

উঠে দাঁড়ালেন তিনি।

গভীর শ্রদ্ধাভরে তাঁর হুটি পায়ে ওপর মাথা রেখে প্রণাম করলো স্মিতা।

ওকে দু'হাতে তুলে ধরে প্রণামে রেখে নিজের বুকে টেনে নিয়ে ওঁর মাথার ওপর হাত রেখে অর্দ্ধনিম্নলিত নেত্রে অশ্রুটস্বরে কি আশীর্বাদবাণী উচ্চারণ করলেন সোমনাথ। কোন এক ঐশ্বরিক মনঃশক্তি দিব্যচৈতন্য যেন ধীরে ধীরে নেমে আসছে স্মিতার সঙ্কুচিত অন্তরে। জাগতিক সত্তা তুলে ধাচ্ছে মহাভাবসাগরের অতল গভীরে।

স্মিতার সর্বাঙ্গে জেগেছে এক পুলক-কম্পন, সে কম্পনে আছে কি এক অনাস্বাদিত রোমাঞ্চ! দুঃখযনে ঝরছে দর-দর ধারায় আনন্দাশ্রু।

কেটে গেলো কয়েকটি হুঁসুট মুহূর্ত।

কন্টাকে সঙ্গে করে হলঘরে এলেন সোমনাথ। একটু পৃথকভাবে বসলেন কম্বলাসনে।

আর সকাল বসেছিলেন সোফায়, চেয়ারে।

—সোমনাথকে নীচে বসতে দেখে সকলে উঠে দাঁড়ালেন সমস্ত্রমে।

আপনারা এখানেই বসুন,—এবং কাক্সের স্তব্ধ করুন, বললেন সোমনাথ।

অসীমও উপস্থিত ছিলো সেখানে, তির্যক দৃষ্টিতে চাইলো স্মিতার দিকে। ক্রোধ আর বিরক্তিতে থমথম করছে ওঁর মুখখানা।

অপমানের আলায় সর্বাঙ্গ জ্বলছে ওঁর। ওকে বাদ দিয়ে মেরেকে নিয়ে গোপনে পরামর্শ করার মানে হচ্ছে সকলকার সামনে ওকে অপদস্থ করা। আচ্ছা, এর প্রতিশোধ কি ভাবে দিতে হয়, সেটাও দেখবে আজকের দর্শকরা। আগে সম্পত্তিটা হাতে আনুক।

করবী আর অনিলও বসেছিলো সেখানে সোমনাথের আদেশে। মায়া দেবী আনাগোণা করছিলেন, আগন্তুকদের চা-জলখাবার ঠিকমত দেওয়া হল কি না তার তদারকে ব্যস্ত হয়ে ঘোরাঘুরি করছেন।

—এবার লিখুন আপনারা—বজ্রগম্ভীর স্বরে আদেশ করলেন সোমনাথ।

—আমি প্রস্তুত! জবাব দিলেন এ্যাটর্নি।

—আমার এত নম্বরের ওস্তাদ বালিগজের পৈত্রিক বসতবাড়ী লালকুঠি ও এক লক্ষ নগদ টাকা আমি দান করলাম আমার কন্টা স্মিতা হালদারকে।

এ্যাটর্নি বিব্রতভাবে একবার চাইলেন সোমনাথের দিকে আর আড়চোখে দেখলেন অসীমের মুখখানা, তারপর লিখতে শুরু করলেন।

—হয়েছে? এবারে লিখুন—আমার অমুক নম্বর এলগিন রোডের বাড়ী ও নগদ এক লক্ষ টাকা আমি দান করলাম—আমার স্বর্গীয় বন্ধু মহিম হালদারের একমাত্র পুত্র শ্রীমান স্বরূপ হালদারকে।

গুরু-গুরু মেঘ গর্জনের সাথে সাথে, রাশি রাশি আগুনের সাপ বিলম্বিলিয়ে উঠলো আকাশে, ঘরশুদ্ধ সকলে একবার নড়ে চড়ে বসলো। পবনস্পর্শে মুখ চাওয়া-চাউরি কবলো। অসীমের দৃষ্টি তখন ঘন মেঘচ্ছন্ন আকাশের দিকে নিবদ্ধ। হু হু করে বইছে এলোমেলো বোড়ো হাওয়া, অত্যাণ মান। শীতের শুরুতেই হঠাৎ এমন বড়-বড় ঝালিয়ে মাঝলে, তাই বোধ হয় ততো খাওয়ার বিকৃতি ওর চোখে-মুখে স্পষ্ট।

—ঐ লিখুন, বললেন সোমনাথ—আমার এত নম্বরের খিয়েটার বোডেব বাড়ী আর সাত লক্ষ টাকা আমি দান করলাম একটি হাসপাতালের জন্য। এই হাসপাতালে আমার দেশের দুঃস্থ জনগণের চিকিৎসা ও সেবা হবে বিনা পরসার। আর এই হাসপাতাল গঠন ও হস্তাধানের ভাব দিলাম শ্রীমান সুনাম হালদারের ওপর। বাকি এক লক্ষ টাকার ভেতর থেকে আমি কুড়ি হাজার টাকা দান করলাম আমার কনিষ্ঠা গালিফা শ্রীমতী করণী চ্যাটার্জিকে। দশ হাজার টাকা দিলাম আমার বুদ্ধ মালী রামভজন সিন্কে, আর কুড়ি হাজার টাকা দিলাম বুদ্ধাবনে শ্রীশ্রদ্ধ গোপী মহারাজের গোপীশ্রমে।

বাকী পঞ্চাশ হাজার বাক্যে থাকবে আমার নামে, আমার মৃত্যুর পর ঐ টাকা গোপীশ্রমে দেওয়া হবে।

নাগর হলেন সোমনাথ। বাইরে তখন প্রবল বেগে বর্ষণ শুরু

হয়েছে। ছরস্ব বাতাসের বাপটা লেগে জলে উঠছে দেওয়ালে বিলম্বিত দীর্ঘাকার অয়েল পেণ্টিং ছবিগুলো। মনে হচ্ছে যেন পূর্ব-পুরুষদের ছবিগুলোর মাঝে অশব্দী আত্মার আবির্ভাব ঘটেছে, তাঁরা দল বেধে দেখতে এসেছেন সুযোগ্য বংশধরের কৌন্তিকলাপ। অভিশপ্ত সম্পত্তির সার্থকতার বিপুল আনন্দোচ্ছ্বাস ভারে জলে উঠছেন ওরা। তাঁদের প্রতিভাদীপ্ত নয়ন থেকে বয়ে পড়ছে নীরব আশীর্বাদ। শান্ত দৃষ্টি মেলে, ছবিগুলোর দিকে চেয়েছিলো সুমিতা। দীর্ঘ প্রশান্তির শান্ত আলোর বলমল করছিলো ওর করুণ মুখখানি।

অনতিদূরে কোথায় কড়কড় শব্দে বাজ পড়লো, থর-থর করে কঁপে উঠলো লালকুঠি। চারিদিক থেকে শীথ বাজতে লাগলো, মতোর লাল সাংবরণ করার মিনতি জানিয়ে।

—আমার কিছু বলবার আছে।

চমকে উঠলো সুমিতা। অসীমের কণ্ঠস্বরে যেন বঙ্গপতনের আওয়াজ।

—ওর দিকে চোখ ফেবালেন সোমনাথ, ধীর কণ্ঠে বললেন, বলো!

—আপনার কথা মানে আমার স্ত্রী সুমিতাকে যেটুকু দান করতে চাইছেন, সেটা ওর প্রয়োজন হবে না, বরং ওটা আপনি আশ্রম-টাশ্রমে দান করলে বাইরে আপনার সুনাম হবে।



ও-আর-সি-এল এর

কুম্ভারেশ

নিজের ও দেউরারীতু

২৫

দি ওবিয়েট্যাল রিসার্চ অ্যান্ড কেমিক্যাল ল্যাবরেটরী লিঃ

কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে একটু হাসলেন সোমনাথ, তারপর প্রশান্ত বদনে জবাব দিলেন—আমার যা করবার তা আমি শেষ করেছি। ভবিষ্যতে স্মৃতিতা যদি ইচ্ছা করে, তবে সেই ওটা জনকল্যাণে উৎসর্গ করতে পারবে।

—ঠিক আছে, অধৈর্য্য ভাবে উঠে দাঁড়িয়ে বললো অসীম—এসো মিতা, আমার আর বসবার সময় নেই, কাজ আছে।

—সে কি? এই বড়-বুড়ি মাথায় করে যাবে কোথায়? বোসো, বোসো, একটু পরেই বুড়ি থেমে যাবে মনে হয়, বললো অনিল।

—ধন্যবাদ! তিন্ত কণ্ঠে জবাব দিলো অসীম। কুলি-মজুর খাটিয়ে খাই আমরা, বড়-বুড়ি থেকে গা ঝাটানোর ক্যাসান করা শোভা পায় না আমাদের মত ইতর জনের।

—মিতাকে কাল আমি খাবার পথে পৌঁছে দিয়ে যাবো, সুরগন্ধীর স্বরে বললেন সোমনাথ।

—চাপা ক্রোধে রক্তবর্ণ হয়ে উঠলো অসীমের মুখখানা। দুটোখে চক-চক করে উঠলো যেন দুই বিদ্রোহিণী আর তার তীব্র আলাভরা উত্তাপ ছিটকে গিয়ে লাগলো স্মৃতিতার সর্বাঙ্গে।

কি, তোমারও তাই ইচ্ছে নাকি? যাবে? না থাকবে? দীপ্ত দীপ্ত ঘসে বললো অসীম।

কান্ট যাবো, কণি কণ্ঠে জবাব দিলো স্মৃতিতা। পিতার আরেকটু কাছে সরে বসে।

ঠিক আছে। মস-মস করে জুতোর শব্দ তুলে দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো অসীম।

অথচ নীরবতার মাঝে কেটে গেলো কয়েক মিনিট। কোন্‌ মুহূর্ত বাতুর হঠাৎ বেন মন্ত্রনলে সকলকে বোবা করে দিয়ে গেছে! শুধু টেবিলের ওপর বসে সোনার খাপের ভেতর থেকে মুখ বাড়িয়ে 'ঠিক ঠিক ঠিক ঠিক' বলে বাজছে সুইজারল্যান্ডের ঘড়িটা।

সামনের বারান্দার এক কোণে রূপোর দাঁড়ে বসেছিলো এ বাড়ীর বুড়ো কাকাতুয়াটা। স্মৃতিতার আবাল্য সাথী সে। অনেকদিন পরে মিতাকে দেখে বিমুনি ছেড়ে আজ হঠাৎ খুসিতে চক্কল হয়ে উঠেছে। জানলার উদ্দেশ্যে বসে বার বার মুখ বাড়িয়ে দেখছে মিতাকে। আপন মনে বক বক করে বলে যাচ্ছিলো এতদিনের না বলা কথাগুলো।

সকলকে অমন চুপচাপ দেখে সে-ও হঠাৎ থেমে গেলো। লাল লাল ক্ষুদ্রে চোখগুলো পিট-পিট করে গলা ফুলিয়ে কি বেন বোঝবার চেষ্টা করলো—তারপর আচমকা হো-হো করে হেসে উঠলো।

সারাদিন ধরে চললো একটানা বড়-বুড়ি। সন্ধ্যার পর মেঘমুগ্ধ নির্মল আকাশে চাঁদের হাসি ছড়িয়ে পড়লো। প্রশান্ত সাদা মার্বেল পাথরের বারান্দায় বসেছিলেন সোমনাথ, নিকটে তাঁর উপবিষ্ট স্মৃতিতা আর করবী।

—আচ্ছা আমাকে অতগুলো টাকা শুধু শুধু দিলেন কেন জামাইবাবু? আর দিলেন যদি, কি ভাবে তার সন্ধ্যার করবো সে উপদেশ আপনার কাছেই চাইছি—বিনীতভাবে বললো করবী।

—ওর দিকে চেয়ে একটু হাসির সঙ্গে জবাব দিলেন সোমনাথ—

বিবাহ যদি না করো তবে নিজের জীবন নির্বাহের জন্য অর্থের প্রয়োজন আছে। তবে ঐকখনও যদি অর্থের প্রয়োজন নেই বোধ করো, তাহলে চিন্তা করে নিজেরই এর সদগতি কোরো।

শেষটা ভাবে চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়েছে লালকুটির মোটা মোটা খামগুলোর গায়ে। সেখান থেকে ধীরে ধীরে গড়িয়ে আলোর বজ্রা নেমে এসেছে শুভ্র মরুর-চত্বরের ওপর। কনকনে উজ্জ্বল হাওয়ায় ভেসে আসছে স্বর্ণচাঁপা, শিউলি, বকুলের গন্ধ। আলো-আধারে মেশামিশি স্তব্ধ নিখুম সাঁঝের মায়া বড় আনমনা করে তুলেছে স্মৃতিতাকে। অকারণে কেন দুচোখ ভরে আসে জল।

ঠিক দু বছর আগে এমনি দিনে চলে গেছে স্ত্রীদাম কোন স্মৃতি সাগরপারে। এমনি চাঁপা বকুলের গন্ধ তখনও ছড়ানো ছিলো বাতাসে। তখন মনটা ছিলো ওর মধুর বিরহ বেদনায় ভরপুর, কিন্তু হতাশার অন্ধকার ছিলো না তো? অনাগত দিনের কত রত্নিন স্বপ্নে ভরা ছিলো সে দিনগুলো।

তারপর? কি যে হল! সব মিলিয়ে গেলো ছায়াছবির মতো, উঃ!

দীপ্ত দিয়ে নিচের ঠোঁট সজোরে চেপে ধরে, উঠে গিয়ে বাগানের দিকে খুঁকে দাঁড়ালো স্মৃতিতা। তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়ে মুছে ফেললো জলে ভরা চোখ দুটো। ঝটপট আওয়াজে মুখ তুলে চাইলো সে—মহাশূন্যে আলোর সারয়ের সাঁতার দিয়ে ভেসে চলেছে একজোড়া দুধ-শাদা বলকা।

বুকভাঙা একটা দীর্ঘশ্বাস ওদর কঁপে কঁপে মিশে গেলো পুষ্পগন্ধী বাতাসের সাথে। চমক ভাঙলো ওর দিদিমার ডাকে।

—দুখটা খেয়ে নাও তো মিহু! ছ'সাত মাস স্বস্তরবাড়ীর ভাত খেয়ে কি ছিরি হয়েছে গো! মরে বাই। গলায় স্বর কঁপে উঠলো ওর।

স্মৃতিতা দিদিমার আদেশ পালন করলো। এঁটো দ্বীপটি ওর হাত থেকে জোর করে দিদিমা কেড়ে নিলে বললেন, এত সন্ধ্যাট কিসের দিদি? সেই একবত্তি থেকে তো এই দিদিমারই বুক ছিলে, পরের ঘরে পাঠিয়ে কেমন করে যে বেঁচে আছি—বাকিটা আর বলতে পারলেন না, কান্নার ভাবে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেলো তাঁর।

কমালে চোখ মুছতে মুছতে সোমনাথের কাছে গিয়ে বসলেন তিনি।—বাবা সোমনাথ! কাঁপা-কাঁপা গলায় বললেন মায়া দেবী—তুমি যে এত মহৎ একথা আগে বুঝিনি বাবা! আমার কণার অদৃষ্টে এত সুখ সহিলো না!—এমন রামচন্দ্র স্বামী এমন রামরাজি ফেলে তাকে চলে যেতে হল বড় অসময়ে। কমালে ঢোক-নাক মুছে, আবার বলতে লাগলেন তিনি, সবই আমার এই পোড়া অদৃষ্টের ফল বাবা, তা না হলে কি এত বড় মেয়ে আইবুড়ো খুঁড়ি হয়ে চোখের ওপর ঘুরে বেড়ায়? না অমন বিধান ছেলে বিয়ে করে একটা সিনেমার নটিকে?

কত আশা ছিলো বাবা, এই ছুটো ছেলে-মেয়ের ওপর কিন্তু সব মিথ্যে হয়ে গেলো।

করবী একটু হাসলো সোমনাথের মুখের ওপর দুটি রেখে।

—অত শত আর নাই বা ভাবলেন, বললেন সোমনাথ, ওরা বড় হয়েছে, যে বার পথে চলুক, বার বা করবীর কাজ তারা নিজেরাই সম্পাদন করুক, এখন, ওদের দিকে নজর না দিয়ে আপনার নিজের চিন্তা করুন, বোধ হয় এতুই শান্তি পাবেন। ফুলকে উৎপাদন করুন

ক' তৈরী করে দেওয়াই গাছের কাজ, কিন্তু সে ফল গাছ কোনোদিকে গাণ করে না, সময় হলেই ফল ফুল চলে যায় যেমন তার জননীর কাছ থেকে, মাছুষের জীবনের তাই হয়, সৃষ্টির রহস্যই এই। মাতা, পিতা, পুত্র, কন্যা, সবাইই প্রয়োজন একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্ত, তারপর স্নেহের স্রোত কে কোথায় হারিয়ে যায়, তার জন্ত শোক কর্তব্য বৃথা। নন্দ মহাকালের মহাসমুদ্রে প্রতি মুহূর্তে ভেসে উঠছে অনন্ত জীবন, দু-চার দণ্ড লীলাখেলার তরঙ্গে ভেসে আবার মিশে যাচ্ছে হাস্যগরের বৃকে। কিন্তু কেন এই আসা-যাওয়া? এই মহা প্রজ্ঞাসার জন্তই যোগী-ঋষিরা কঠোর তপস্যা করেছেন। তারপর সব জানেছেন, পথের সন্ধান দিয়ে গেছেন পথভ্রান্ত মানুষকে। একটু থেমে আবার বললেন সোমনাথ—শোক, দুঃখ, হতাশার জর্জরিত মানব-জ্ঞানদের এ'রাই শুনিয়েছেন আশার বাণী, অভয় বাণী অমৃতের ত্রান তুমি, মৃত্যু তোমার নেই। ধনী, দরিদ্র, স্বরূপ, কুরূপ, পণ্ডিত, ধর্ম, সুখী, দুঃখী, এসব তোমার ক্রণভঙ্গুর খোলস মাত্র। এক মুঠো লা এ'র স্বরূপ। আসল তুমি কি? আর কে? তারই অল্পসন্ধান যো, নিজেকে জানো, সব জানার শেষ হবে। অনন্ত কামনার যে লব্ধ শিখা নিত্য দহন করছে তোমাকে, সাধনার অমৃতধারায় ঘটবে তার চিরনির্বাপণ।

নীরব হলেন সোমনাথ। অলৌকিক জ্যোতিপূর্ণ স্থির দৃষ্টি তাঁর গণ্ডলে নিবদ্ধ। নিবিষ্ট চিন্তে মায়া দেবী গুনছিলেন সোমনাথের খাণ্ডলো। একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলে বললেন—

—আহা, তোমার কথা শুনে বুকটা বেন জুড়িয়ে গেলো বাবা! মন জ্ঞানের কথা আর কেউ শোনায়নি কখনও। এখন মনে হচ্ছে বিনটাকে বাজে খরচ করেছি বাবা! তুমি ঠিকই বলেছো, সব খাঁটি খা, কেউ কান্দুর নয়। তাই এখন হচ্ছে করে এসব ছাই-ভস্ম ফেলে ন কতক তীর্থবাস করি ধর্ম-কন্মো করি; জ্ঞানি না বাবা, কপালে ওসব হবে কি না। সখেদে কপালে হাত দিলেন তিনি।

—প্রবল ইচ্ছা থাকলে অবশ্যই হবে। ধীর কণ্ঠে জবাব দিলেন সোমনাথ।

সব কিছু বেন আজ নতুন ঠেকছে স্মিতার কাছে। রেলিংএ স্থান দিয়ে ঝড়িয়ে সে গুনছিলো ওদের খাণ্ডলো। বিহ্বল দৃষ্টি মেলে দেখছিলো, কপালগণ গিরিকন্দর থেকে কেমন করে ঠাঁই শত ধারে ঝরে পড়ছে মন্ডাকিনীর ইমগারা! মিতভাবী, উল্লাসী, অটল গাছীঘের বন্ধে ঢাকা পিতার যে কঠোর গাট এতদিন সকলকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলো, আজ সে রূপের এ কি দাণ্ডা বিবর্তন! কোথায় লুকিয়েছিলো ঐ রেহপ্রস্রবণ! আর সেই রুঢ়ভাবিনী, প্রকল ব্যক্তিগতম্পরা অতিদাণ্ডিকা দিদিমা! এক বেন স্নেহকরুণাময়ী মুহূর্তাবিনী মহাশয় বিগলিতা!

হায়! আগে কোথায় ছিলো এ জড় বস্তু? যার অভাবে ওর হৃদয়-কলকট পরিপূর্ণ আনন্দের আলোয়

দল মেলে ফুটে উঠতে পারেনি? সঙ্কোচ-কুহেলিকায় সে গেলো বিবর্ণ হয়ে।

না, না, বাবার কথাই ঠিক। যখন বা হবার, তখনই তাই হয়, আগেও নয়, পরেও নয়। যা তার পাওনা ছিলো তাই পেয়েছে সে।

থপ থপ করে ঢেককাটা কালো কবলটা গায়ে জড়িয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালো রামভজন সি। চাঁদের আলোয় মিতাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ঠাঁই বিবম চমকে উঠে স্থির হয়ে দাঁড়ালো। তারপর হাতজোড় করে বললো, উধারে কেন মায়া? রাজলছমী। এ বুঢ়ার শিরমে দাঁড়াও ম! হা-হা করে কঁদে, উপুড় হয়ে দূর থেকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলো রামভজন সি।

—অবাক স্মিতা—ফুটে এসে হু-হাতে বুড়োকে তুলে ধরে বললো—একি একি! ভজনদা, কি হল তোমার?

সোমনাথও বিস্মিত ভাবে চেয়ে রইলেন ওর দিকে।

হু-হাতে চোখ মুছে কাঁপা-কাঁপা স্বরে বললো বুড়ো,—ভীমবধী ধরেছে দিদি ও কিছু না।

জরাজরে হয়েপড়া দেহটাকে টেনে টেনে এগিয়ে নিয়ে সোমনাথের কাছে গিয়ে বসে, হাঁপাতে লাগলো রামভজন। স্মিতাও বসলো ওর পাশে, ওর পিঠে হাত বুলিয়ে স্নেহকোমল কণ্ঠে বললেন সোমনাথ—এতটা সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠলে কেন ভজন সি? মিতাকে দেখে ঠাঁই অমন চমকেই বা উঠলে কেন, বলে ফেলোতো ব্যাপারটা কি?

—বলবো? আচ্ছা রুগছি বাবা! ফুটফুটে আলোর মনে হল, না, না মনে হল না, একেবারে পট্টই বেন দেখলাম দাঁড়িয়ে আছেন বহুরাগী কমলা দেবী।

সেই কত কাল আগে—বাবা তুমি যখন এতটুকু এই বছর খানেকের ছিলে, তখন পেরায় রাত এখানেই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি বহুরাগীকে। একদিন হাতছানি দিয়ে তিনি ডাকলেন আমায়, আমি এমনি করে এসেছিলাম এইখানে। সের্ব ফুটফুটে চাঁদের আলো মেখে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি, আহা

ফোন: ৩৪-৫০০২

কে. এল. সিংহ এণ্ড সন্স

১৬৭ বি, বঙ্গবাজার ট্রাট কলিকাতা-১২



রূপকথার রাজকুমারী

মুন্নি যখন আমার নতুন তৈরী করা
ফ্রক্টা পরলো তখন আনন্দে উচ্ছসিত
হয়ে উঠলো। ফ্রক্টাও আমি অনেক
ঘর করে তৈরী করেছিলাম—সাদা ধবধবে
জামার ওপর ছোট্ট নীল ফুলের পাড়
দিয়ে। আনন্দে ভুলকাতে লাফাতে
মুন্নি আয়নার সামনে গেলো।
যুরে ফিরে চারিদিক থেকে
মুন্নি তার ফ্রক্টা দেখলো তার-



পর ছুটলো তার বন্ধুদের দেখাতে তার নতুন জামা,
তখন বিকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করতে পেরে।
আমি চেঁচিয়ে ডাকলাম ওকে, “মুন্নি, মুন্নি নতুন
ফ্রক্টা খুলে যা—ওটা ময়লা হয়ে যাবে যে ওটা পরে
বিয়ের নেমন্তন্ন যাবিনা?” মুন্নি ততক্ষণে ব্যাড়ীর থেকে
বহুতরে। নতুন ফ্রক্টা পরে মুন্নির দেখে মনে হলো
আমার যেন কোন এক পরীর দেশের রাজকন্যা, ওকে
সত্যিই মানিয়েছিলো, আর সত্যিই এত সুন্দর লাগছিল।
একবার ভাবলাম ডাকি ওকে কারণ ফ্রক্টা ওকে পরতে
দিয়েছিলাম শুধু ঠিক হয় কিনা দেখার জন্য। ইতিমধ্যে
রান্না ঘরের থেকে কি যেন একটা পোড়ার গন্ধ পেয়ে
আমি উঠে গেলাম, তারপর আর আমার খেয়ালই ছিলনা।
আমার হাঁস হল যখন রাধার গলা শুনলাম দরজার সামনে।

রাধাকে দেখে খুব খুশী হলাম এবং ওকে নিয়ে যখন বগার
ঘরে এলাম, দেখি মুন্নি দরজায় দাঁড়িয়ে।
ওকে দেখেই আমি রেগে আশুণ—ফ্রক্টা একদম নোংরা
করে ফেলেছে—বিয়েতে যাওয়ার সময় পরবেই বা কি?
“ফ্রক্টার কি ছিরিই করেছো এখন পরবে কি বিকালে”
বলে আমি ওকে মারতে যাচ্ছিলাম এখন সময় রাধা মুন্নির
সরিয়ে নিয়ে আমার ধমুকালো—” তোর মাথা ধরাপ



হল নাকি' এঁতটুকু বাচ্চাকে মারছিস। "মুনি বাঁচলো আর ফ্রকটা খুলে রাখলো তাড়াতাড়ি।"

ফ্রকটা নিয়ে আমি কলতলায় পরীক্ষার করতে এলাম এবং যখন ফ্রকটাকে আছড়াতে যাচ্ছি, রাধা বললো "মেয়ের ওপর রাগটা কি ফ্রকের ওপর ফলাবি।"

"এটা না কাচলে ও পরবেটা কি? অগ্র ভাল জামা যে আর নেই" আমি বললাম। রাধা বললো, "কিন্তু ওটা আছড়ালে ছিঁড়ে যাবে যে।"

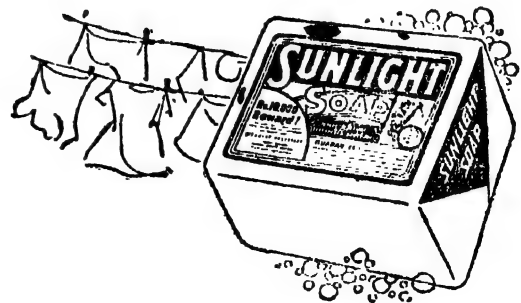
আমি বললাম "না আছড়ালেই বা কাচবো কি করে?"

"আছড়াবার কি দরকার—ভাল সাবান ব্যবহার করলেই হয়। আমি তো সানলাইট ব্যবহার করি।" "কিন্তু সানলাইট কি সত্যিই এত ভাল সাবান?" "সত্যিই সানলাইটে জামা-

কাপড় গাদা ও উজ্জ্বল হয়। এবং এটা এত বিত্ত্ব যে এতে কাপড়ের কিছু ক্ষতি হয় না।"

"কিন্তু সানলাইটে খরচা বেশী পড়েনা?" রাধা তো হেসেই আকুল—"সে কিরে, ভেবে শুখ্ একটু বয়লেই সানলাইটে এত ফেনা হয় যে এক গাদা জামাকাপড় কাচা চলে অল্প সময়েই গাদা ধবধবে করে। এছাড়া পিটে আছড়ে কাপড়ের সূক্ষ্মনাশও হয়না, নিজেরও ঝামেলা বাঁচে কতো—এর পরেও তুই বলবি খরচা বেশী।"

তখন আমি একটা সানলাইট সাবান আনালাম এবং কাচা শুরু করতেই ফ্রকটা ফেনার তুপে ভরে গেলো আর দেখতে দেখতে সাদা ধবধবে হলো। নক্ষ্যেবো নতুন কাচা ফ্রকটা পরে মুম্বিকে সত্যিই পরীদের গল্পের রাজকুমারীর মত লাগছিলো। আমি মুম্বিকে কপালে কাজলের টাপ্ পরিয়ে দিলাম।



মুখখানা কি হুখভরা, আমি শুধোলাম, আমার কেন ডাকলেন বহুরাণী !

—একবার নাচ-ঘরে গিয়ে খবর নাও না ভজন সিং, কুমার সায়েব কেমন আছেন ? কাল থেকে স্বর হয়েছে, কত বারণ করলুম শুনলেন না, নিচে চলে গেলেন, আঁচলে চোখ মুছতে লাগলেন বহুরাণী ! তারপরে বললেন, অত হৈ-ট্টে করছে বজ্রবাকবরা কল্লক, একটু আড়ালে ডেকে ওদের আমার নাম করে বোলো, কুমার সায়েবের বেয়ার আছে, মদ বেন ঠেকে কেউ না খাওয়ার ডাকদানের নিষেধ আছে ।

না লক্ষ্মীকে প্রায়ই দেখতাম এখানে ভর দিয়ে মুখ নিচু করে ঝাঁড়িয়ে থাকতে, ঐ কোণ থেকে নিচের হল কামরাটা নজরে পড়ে কি না তাই । একটু থেমে, দম নিয়ে আবার বললো রামভজন ।

—আজ ইঠাং মিতা দিদিনকে মনে হয়েছিলো একেবারে অবিকল বহুরাণী ! আহা যেন আমার জনম-হুগিনী সীতামাসি ।

ময়লা কাপড়ের খুঁট হ-হাতে তুলে চোখ মুছলো রামভজন সিং ।

—তুল দেখোনি ভজন সিং, ধরাগলায় বললেন সোমনাথ, আমার মাই-দেহ পাটে এসেছেন মেয়ে হয়ে । তাঁর আমার পাপ, এ বংশের পাপের কালি ধুয়ে মুছে এ বংশকে শাপমুক্ত করবার জন্তে যে আসতেই হবে তাঁকে ! বার বার জীবনদান করে সমস্ত অপরাধের স্বর্ণ 'শোধ না করা পর্যন্ত নিষ্কৃতি যে তাঁর নেই ভজনসিং ! তাঁর সন্তানেরও নেই !

মহাশক্তির দিকে উদাস আঁখি মেলে নীরব হলেন সোমনাথ ।

পরম বিশ্বাসে দেখলো স্মৃতিতা, চাঁদের আলোয় তাঁর জলেভরা চোখ দুটো যেন চক-চক করছে !

—অমন অলুক্ষণে কথা বোলা মা বাবা ! কবে কি হয়ে গেছে, সে সব কথা যাক, এখন আশীর্বাদ করো মেয়েটা তোমার যেন সুখী হয় ! বললেন মায়া দেবী ।

জবাব দিলেন না সোমনাথ, কি এক গভীর চিন্তায় যেন মগ্ন রইলেন ।

—একটা কথা শুধাতে যে এসেছিলাম বাবা ! বললো রামভজন দুহাত কচলে !

—বলো ! যেন 'সুদূর থেকে ভেসে আসা সোমনাথের কণ্ঠস্বর !

—এই এতগুলো টাকা দিলে কেন বাবা ঘাটের মড়াটাকে ?

—কতদিন বাঁচবে বলা তো যায় না রামভজন ! না হয় দেশে ফিরে যাও, আরাম করে দু'-চারদিন থাকো গে, তারপর ভালো কাজে টাকাটা দান করে দিও !

—অনেক, অনেক আরাম করেছি বাবা, অনেক ভালো-মন্দ খেয়েছি তোমাদের কাছে ! তেমন আরাম আজকালকার হাল ক্যাসনের বড় লোকেরা কেউ কখনো ভোখেও দেখেনি !

—দিদিমার দিকে একবার আড়চোখ তাকিয়ে—আবার বললো বুড়ো—এই আজকালই না হয় বুড়ো মালী হয়েছি বাবা—কিন্তু তোমার বাবার আমলে তাঁর ইন্সারব্যান্সের সঙ্গে একসঙ্গে খানাপিনা করিয়েছেন আমাকে তোমার বাবা ! আর যাই হোক অমন দরাজ দিল কোথাও কেউ খুঁজে পাবে না বাবা, এ আমি বলে দিলাম ! আর দেশ বুলুক সবই আমাব এই দালকুঠি । সেই কতটুকুন এসেছি

এখানে, সারা জীবনটা তো কাটালুম, আর ক'টা দিন । মিতু দিদিনকে ছোড়কে যে আমার বেহাঙেও যেতে দিল চায় না বাবা !

—তাই নাকি ? হেসে বললো করবী, আমাদের তাহলে তুমি একটুও ভালোবাসো না ?

—আরে না, না কবি দিদি ! তা নয়, তা নয়, এই বক্ষিপূরীর ঐ একটা মণিক কি না তাই বলছিলুম ঐ কথা, ভালো আমি সবাইকেই বাসি ।

রাগে মুখ ঝাড়ি করে বসেছিলেন দিদিমা । উঠে ঝাড়িয়ে বললেন—বাই বাবা, নটী-বৌ হয়তো বেড়িয়ে ফিরবেন এখুনি, রান্নাবান্নার কি করছে বায়ুনটা দেখে আসি । একটা জলস্ত দৃষ্টি রামভজনের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে অমুচ্চকটে বিড়-বিড় করে বললেন, বুড়ো ভান্ডুকটা আবার এখানেও জ্বালাতে এসেছে, আ-মোলো যা । ঘাটের মড়া । হুম হুম করে পা ফেলে চলে গেলেন তিনি ।

করবী মায়ের দিকে চেয়ে জ্ব কৌচকালো । মুহু হেসে বললেন সোমনাথ—মা ভালো বোঝো কোরো ভজনসিং ! আমি তো কালই রওনা হবো । বৃন্দাবনে থাকবো মাস দুয়েক, তারপর মানস সরোবর যাত্রা করবো ।

—কতদিন পরে আপনি আবার ফিরবেন বাবা ? কাতরস্বরে শুধালো স্মৃতিতা ।

—এখানে তো আর ফিরবো না মা ! এ বাড়ীতো এখন আর আমার নয় । গাঢ় স্বরে বললেন সোমনাথ, তবে সময় হলেই আবার দেখা হবে তোমার সঙ্গে ।

নির্ব্যর্থ আকাশের গায়ে ভেসে এলো একখানি ঘন কালো চলন্ত মেঘ, ঢেকে 'দিলো আলোয়রা চাঁদকে । চাপা, বকুলের গন্ধে মাতাল দ্রবস্ত উত্তর বাতাস সকলকার অঙ্গে দিয়ে গেলো হিমশীতল পবন । 'টি' 'টি' শব্দে করুণ আর্দ্রনাদ করে গাছের ভেতর থেকে উড়ে গেলো একটা রাতজাগা পাখী ।

—বাবা ! কান্নার ভাবে কেঁপে উঠলো স্মৃতিতার কণ্ঠস্বর ।

—বলো, মা ! ওর শিঠি হাত রাখলেন সোমনাথ ।

—আবার আপনার সঙ্গে দেখা হবে তো ?

—কিছু বিলম্ব হবে মা ! একটা চাপা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে জবাব দিলেন তিনি ।

—কি যেন একটা ভয় আমার মনটাকে পেয়ে বসেছে বাবা ! কিছুই বুঝতে পারি না । দামোদা' চলে গেলো, আপনি চলে গেলেন, ঠিক তারপর থেকে কেমন ভয়ের ছায়া বেন আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়ায় আর রাত হলে আমি ঘুমের বোরে প্রায়ই দেখি কি ভয়ানক কালো সমুদ্র, শোঁ-শোঁ করে গর্জন করছে আর আমি ভূবে বাছি তার ভেতর ! ঠিক ঐ বাতিঘর ছবিটার মতই একটা আলো জ্বলছে দূরে, আমি প্রাণপণ চেষ্টায় এগিয়ে যেতে চাই তার কাছে, কিন্তু বাবা, সে সরে যায় । উঃ, তখন কি যে কষ্টের ভেতর ফুটো ভেঙে যায় আর শরীর মন সব কেমন অস্থির হয়ে ওঠে । তাই মনে হয় বাবা, আপনি কাছে থাকলে বোধ হয় ঐ ভয়ানক স্বপ্নটা আর দেখতে হবে না, সব ভয়ের ছায়াগুলো আর আমার সঙ্গে ব্যববে না, তখন আবার আমি সুস্থ হয়ে উঠবো বোধ হয় ।

কয়েক মিনিট চোখ বুজে নীরব রইলেন সোমনাথ । হাতের উণ্টো পিঠি দিয়ে বার বার চোখ মুছছিলো বুড়ো ভজন সিং । করবীও

বুধ ফিরিয়েছে অস্ত্র দিকে, চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে তার গাল দুটো। চোখ চাইলেন সোমনাথ। স্মৃতির মাথায় হাত বুলিয়ে গাঢ়স্বরে বললেন—আমি লৌকিক পিতা মাত্র। তোমাকে—ঐ কর্মফল মহাসাগরের করাল গ্রাস থেকে রক্ষা করে সকল শঙ্কামুক্ত করতে পারেন একমাত্র জগৎপিতা। তুমি মনে-প্রাণে তাঁর সহায়তা প্রার্থনা করো মা! এই মহা অন্ধকার দুস্তর সাগর পেরিয়ে সেই অনির্বাণ জ্যোতিকে অবশ্যই লাভ করবে। অনন্তকালের মহাসাগরে জন্ম-জন্মান্তররূপে ডেউয়ে ডেউয়ে ভেসে চলেছি আমরা তাঁরই দিকে। বাসনা কামনার স্বপ্ন-বক্ষা, সদস্য কর্মের বিভাবিকা চারিদিকে। ভয় পোয়ো না, লক্ষ্যজুড়ে হোয়ো না, আলোর সন্ধানে এগিয়ে যাও তাঁকে স্মরণ করে। ভয়

নেই, কোনো ভয় নেই তোমার, আলোর তীর্থে বাবার শক্তি আর অধিকার লাভ করেছে তুমি। নীরব হলেন সোমনাথ। শুধু তাঁর হাতখানি ধীরে ধীরে সঞ্চালিত হতে লাগলো কন্টার মাথায়, পিঠের ওপর। অলৌকিক শক্তি যেন সঞ্চালিত করছেন কন্টার দেহে-মনে।

আবার সেই অনাবাদিত রোমাঞ্চ জাগলো স্মৃতির সর্বাঙ্গে। কোন দিব্যভাবের মুহূর্ণ কল্পনে কেঁপে উঠলো দেহ-মন। দর-দর করে ছুঁ চোখে নেমেছে পুলক-বেদনার অশ্রুধারা। অবনত হয়ে পিতার চরণে মাথা রাখলো স্মৃতি। উদ্ধারায় সিক্ত হতে লাগলো তাঁর চরণ-যুগল। [ক্রমশঃ

শ্রেষ্ঠ উপদেশ

শ্রীঅরবিন্দ দাশগুপ্ত

শ্রদ্ধেয়া বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের নাম আজ দেশ-বিদেশে সুপরিচিত। স্বর্গত মতিলাল নেহরুর কন্যা অথবা শ্রদ্ধেয় প্রধানমন্ত্রীর ভগিনী হিসাবেই তিনি খ্যাতি লাভ করেননি, নিজের কীর্তিতেও তিনি ইতিহাসে স্মরণীয় হবার যোগ্যতা অর্জন করেছেন। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে তিনি একাধিক বার কারাবরণ করেছেন ও স্বাধীনতার পর অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদ যোগ্যতার সঙ্গে পূর্ণ করে মাতৃভূমির গৌরব বৃদ্ধি করেছেন। ১৯৫৩-৫৪ সালে তিনি ইউনাইটেড নেশনস-এর সভাপতি নির্বাচিত হন, তার পর যথাক্রমে আমেরিকা ও রাশিয়াতে চারি বৎসর ভারতের রাষ্ট্রদূত ছিলেন। বর্তমানে তিনি বিলাতে ভারতের হাই-কমিশনার পদে অধিষ্ঠিত আছেন।

কয়েক বৎসর আগে তিনি একটা বিলাতী পত্রিকাতে প্রবন্ধ লিখেছিলেন “আমার শ্রেষ্ঠ উপদেশ।” সে প্রবন্ধটার কিয়দংশের তাৎপর্য নীচে দেওয়া হোল।

“দেশ স্বাধীন হবার কয়েক বৎসর পূর্বে তাঁর স্বামীর মৃত্যু হয়। সে সময়ে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত জগদ্বরলাল নেহরু কারাগারে ও তাঁর কন্টার আমেরিকায় শিক্ষারত। শোকে মুহূর্তমানা হয়ে তিনি শাস্তির অবেশে স্থির করলেন দেশের বাইরে চলে যেতে। যাত্রার দিন-রাত্রি ঠিক করে তিনি এলেন গান্ধীজির কাছে বিদায় নিতে। কথান্তরে গান্ধীজি জিজ্ঞাসা করলেন, “তোমার স্বামীর আত্মীয়দের সঙ্গে সভাব স্থাপন করেছে ত?”

বৈধব্য-শোক ছাড়াও নানান পারিবারিক ব্যাপারে তাঁর মন তখন বিক্ষিপ্ত হয়েছিল। বৈধবিক কারণে স্বামীর আত্মীয়দের উপর তিনি অত্যন্ত অপ্রসন্ন ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে তখনও দেখা করেন নি ও আদৌ দেখা করার ইচ্ছা তাঁর ছিল না। বেশ রুঢ় ভাবে গান্ধীজিকে জবাব দিলেন, “যারা আমার ক্ষতি করতে চেষ্টা করছে তাদের সঙ্গে আমি কিছুতেই দেখা করব না। বাপু, তুমি বললেও না।”

গান্ধীজি বোধ হয় এত রুঢ় উত্তর আশা করেন নি। ধানিকঞ্চণ আনালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে আবার বোঝাতে শুরু করলেন “তোমার উচিত

যাবার আগে তাদের সঙ্গে দেখা করে যাওয়া। এদেশে আমরা এখনও এ সব সৌজন্তে বিশ্বাস করি। তুমি অনুবী, তাই তুমি দেশের বাইরে যাচ্ছ শাস্তির অবেশে। কিন্তু অন্তর যদি তোমার স্বচ্ছ না থাকে তবে তুমি কি দেশের বাইরে গিয়ে শাস্তি পাবে? তুমি অতি প্রিয়জনকে হারিয়েছ। এ গভীর ক্ষত ভুলতে হলে নিজেকে ক্ষম কর। সব অভিমান বিসর্জন দাও। নিজের অন্তর পরিষ্কার কর। তা না হলে তোমার আহত মন শুধু আরও আঘাত পাবে। কেউ তোমার ক্ষতি করতে পারে না, যদি না তুমি নিজে তোমার ক্ষতি কর। (Nobody can harm you except yourself).”

তাঁর মন যতই বিদ্রোহ করুক না কেন, গান্ধীজির কথাগুলি তিনি কিছুতেই মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারলেন না। মনের সঙ্গে অনেক সংগ্রাম করে শেষে তাঁকে পরাজয় স্বীকার করতে হোল। সব অভিমান বিসর্জন দিয়ে তিনি গেলেন তাঁর পরলোকগত স্বামীর আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা করতে। অল্পকণ কথাবার্তা বলেই বুঝতে পারলেন যে তিনি তাঁদের ভুল বুঝছিলেন। তিনি উপবাক্য হয়ে দেখা করতে যাওয়ার সমস্ত আবহাওয়াটাই বদলে গেল। সকলেরই মন হালকা হয়ে গেল। তিনি বুঝতে পারলেন গান্ধীজির উপদেশটা কত মূল্যবান! মস্ত একটা বোঝা মন থেকে দূর করে তিনি রওয়ানা হলেন গম্ভব্য স্থান আমেরিকায়।

সংসারের বাত-প্রতিঘাতে বা অবস্থা বিপর্যয়ে জীবনে এক-একটা সময় আসে যখন আমরা নিজেকে উপর আস্থা হারিয়ে ফেলি ও শতখা জঙ্ঘরিত অন্তরে মনে করি সকলেই আমাদের শত্রু, আমাদের অনিষ্ট করতে চেষ্টা করছে। বিবেচনাপূর্ণ অন্তরে আমরা মনে করি বুঝি বিবেচ দিয়ে বিবেচকে জয় করা যায়—ফলে বিবেচের বহিঃবেগেই চলে আর সে বহিঃতে নিজেরাই সব চেয়ে বেশী মরি জলে-পুড়ে। আমরা ভুলে যাই “অন্তর থেকে বিবেচ দূর না করতে পারলে শাস্তি মিলে না।

বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতকে দেওয়া গান্ধীজীর উপদেশ—“Nobody can harm you except yourself” সর্ব দেশের সর্ব লোকের জুড়েই শ্রেষ্ঠ উপদেশ। আকাশের ঐক্যবতারার মতন সকলের অন্তরে সর্ব সময়ে জাজ্বল্যমান রাখা উচিত।

কবি কর্ণপুর-বিরচিত আনন্দ-স্বন্দাবন

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

অম্ববাদক—শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

২১। সুখ ও চঃখের সমতা উপলব্ধি করতে করতে ব্রজবাসীরা যতক্ষণে এই আকস্মিক ঘটনার মীমাংসায় ব্যাপ্ত, ততক্ষণে সেখানে উপস্থিত হয়ে গেলেন ব্রজবাজ শ্রীনন্দ। তিনিও দেখলেন। দেখতে দেখতে তাঁরও মুখে বিন্দু বিন্দু ফুটে উঠল উনার হাসির অমৃত। পিতৃমুখের সেই উল্লসিত সৌন্দর্য দেখে, আছাদে নেচে উঠল বালকৃষ্ণও মন।

এগিয়ে এলেন ব্রজবাজ, নিজের হাতে বাঁধন খুলে দিলেন লীলাশিশুর। কোলে তুলে নিলেন। তারপর ফিরে চাইলেন ব্রজবাসীর দিকে, ঐ বিনি তাঁর সভা উজ্জ্বল করে থাকেন, এবং ঐ বিনি তাঁর অতিকর্ষকুশলা, তাঁর দিকে। নিশ্চাচ্ছলে বললেন, বড় অনার্য্য কার্য্য করেছেন আপনি। বলেই ব্রজবাজের অকস্মাৎ মনে পড়ে গেল মহাবির্গের বানী “নারায়ণসমো গুণৈঃ”; বুঝতে পারলেন, এ তাঁর মহিমা জানা ছেলেটিরই কীর্ত্তি।

২২। সহচর বালকেরা বলে উঠলেন—আমাদের কৃষ্ণের কোনো দোষ নেই। কোনো পাপ করেনি ও। ও কেবল বাঁধন-গুচ্ছ উদ্বলটাকে একটু ঝিকিয়েছিল। তারপর যেই একটু চাপ দিয়ে না টেনেছে, অমনি মড়মড়িয়ে উপড়ে এল গাছ দুটো। উপস্থিত একজনও কিন্তু বিশ্বাস করলেন না তাঁদের কথা।

বিনি বিশ্ব-বস্তির ব্যাপক, তাঁর কল্যাণার্থ তখন বস্ত্যয়ন করালেন ব্রজবাজ। আদি ও অক্ষত শ্রীনারায়ণের অপেক্ষাও বিনি গুণাবিক গুণসম্পন্ন সেই শ্রীকৃষ্ণের আরাতি করলেন ব্রজবাজ দ্বিধা দূর্য্য ও অক্ষত দিয়ে। গজীর নির্ঘোবে বেজে উঠল মঙ্গলদূর্য্য। তারপরে লীলাবালককে কোলে নিয়ে বস্তবনে প্রবেশ করলেন ধোয়াবিশ।

২৩। আর একদিনের কথা। বস্ত্যবালকদের সঙ্গে নিয়ে ধুলোখেলায় মেতে উঠেছেন বালকৃষ্ণ। এ খেলায় যেন এক নতুন রসের আবাদ। নিজের রেণুতে যেমন ধূসর হয় নীল পদ্ম, ধূলাটী নীলাতেও তেমনি হর্ষণা ঘটে বালকৃষ্ণের অমল তমুর। তবু কত সে স্তোত্রক এ খেলায়!

টাকাটা দান করে দিল; ধলোটখেলা। যেন কত আবেশের খেলা।

—অনেক, অনেক আরাধ্য! ঘুরে খেলা। একরত্তি মেঘের মত খেয়েছি তোমাদের কাছে! তেমখেলা। সময়ের জ্ঞান থাকে না কালনের বড় লোকেরা কেউ কখনো চোখে

—দিদিমার দিকে একবার আড়চোখ সঙ্গ নিয়ে কৃষ্ণ এখনও বুড়ে—এই আজকালই না হয় বুড়ে মালী গায়ের প্রাণ।

বাবার আমলে তাঁর ইদারবস্ত্রদের স্কেট হবারই কথা, তুট হবার করিয়েছেন আমাকে তোমার বাবা! আর যাঁনি দয়ার বেহেতু পূর্ণ, দিল কোথাও কেউ খুঁজে পাবে না বাবা, পাঠিয়ে দিলেন কি হয়েছে, আদ্য দেশ বুলুক সবই আমার এই সালকৃষ্ণ। কাজ হয় না যে বশোমতীর।

বোহিণী বোহী! ভাড়াভাড়ি হাঁটে হাঁটে চললেন। অবসর হয়ে পড়ল অনভ্যন্ত চরণ, পা যেন আর গারে নেই। তাই হুব থেকেই চেঁচিয়ে বললেন—

বলি ও ছলল, সকাল থেকে এ সব কি আরম্ভ করেছিস বলতো? তোর খেলায় বিত্তি যে দিন দিন বেড়েই চলেছে। যবে ফেয়ার নামটি নেই। এ কি ঘরতোলা ছেলে যে বাবা! আকাশের ঠিক মাধ্যমানে সূর্য্যদেব, কপাল থেকে টসটস করে খাম করছে, আর তুই মোদের নদীর ছেলে, ঝাড়িয়ে ঝাড়িয়ে ঠার বোন্ধুরে মার খাচ্ছিস। খেলা খামা। খেলাটি বেধে এবার ছলল ঘরতে এস। দালা বলরামের সঙ্গে একসঙ্গে নেয়ে খেয়ে মায়ের মন জুড়োবে এস।

২৪। শ্রীবোহিণীর এত বলাও বিফলে গেল। কে কার কথা শোনে! খেলেই চলেছেন কৃষ্ণ ছেলে। বলরামের মা তখন হনহনিয়ে ঘরের পানে ফিরে চললেন। তাই না দেখে কেমন যেন দমে গেলেন ব্রজেশ্বরী।

কী বস্ত্রণা—একবার বল তো। ভাড়াভাড়ি ছুটে এলেন ব্রজেশ্বরী। বলরামকে ডাক দিয়ে বললেন—বাছা রাম, শীগগির দৌড়ে এস। হিতকথা কানে নাও। তোমার মুখ চেয়ে ব্রজবাজও না খেয়ে বসে আছেন।

তারপরে বিশেষ করে বললেন—বাছা কৃষ্ণ, আজ তোমার জন্ম-নক্ষত্র যোগ। তোমার এখন মঙ্গলস্নান করতে হবে, ব্রাক্ষণের আশীর্বাদ নিতে হবে, পিতার হাত থেকে সোনা কাপড় কত কি নিয়ে বধারীতি তাঁদের দিতে হবে, বাবার সাথে বসে খেতে হবে—

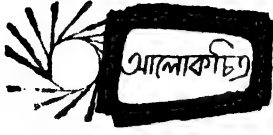
২৫। বলতে বলতে গজেন্দ্রগমনে নিকটে এসেই আর যে ছলল—বলে বশোমতী ধরে ফেললেন কৃষ্ণের পায়ের মত ছুখানি হার।

বলরামকে সামনে নিয়ে কৃষ্ণকে টানতে টানতে, সাবীরা চলেছেন পিতনে, মা বশোদা তখন চললেন ঘরের দিকে। মায়ের বিধান বড় কড়া।

ব্রজবাসীর আদেশে দাসীরা হস্তদস্ত হয়ে হুঁতাইরের জন্ত নিয়ে এল তেল মাখার, গা-মাখার, গা-ঘষার, স্নানের সমস্ত উপকরণ; নিয়ে এল, পর্বনের কাপড়, চন্দন, ভূষণ, মালা। ফুটন্ত নীলপায়ের মত কৃষ্ণের অঙ্গ থেকে তখন ব্রজবাসী নিজের আঁচল দিয়ে বোঁড় দিলেন ধূলা। তিমতিমে ভিজ়ে কাপড় দিয়ে মুছিয়ে তিলেন গা। শেষে মালা-চন্দন পরিয়ে রাম-কৃষ্ণকে নিয়ে উপস্থিত হলেন ব্রজবাজের সমীপে। পুত্রদ্বয়ের প্রতীকার ছিলেন ব্রজবাজ।

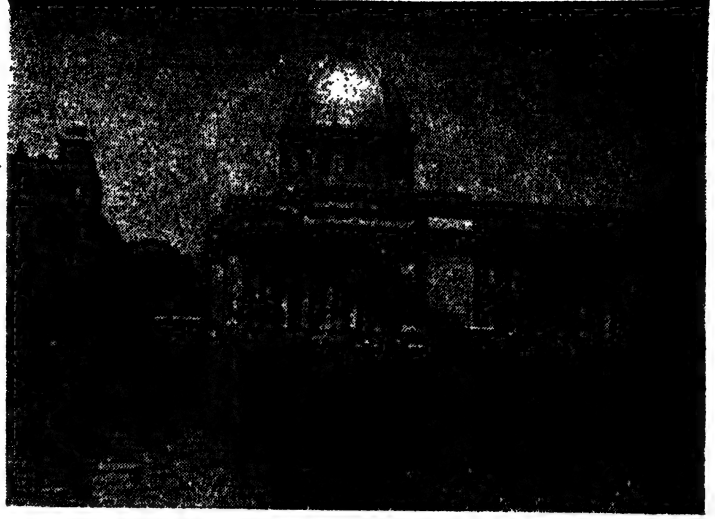
২৬। ছুটিতে ব্রজবাজের কাছে এসে ঝাঁপালেন। ধুশীতে মন ভরে গেল ব্রজবাজের। ফিক করে একটু হাসলেন। ছুটি মুখ দেখলেন। তারপরে ছুটিকেই তুলে নিলেন নিজের কোলে।

২৭। তনয় ছুটিকে নিয়ে আরম্ভ করে দিলেন ভোজন। ভগবজ্ঞাননীও তখন বলরাম ও কৃষ্ণের সখাদের ডেকে পাঠিয়ে গারে তেল মাখিয়ে স্নান করিয়ে কাপড় পরিয়ে দিলেন। তাঁরা সবাই যেন তাঁর নিজের পেটের ছেলে। কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁদেরও খেতে বসিয়ে দিলেন। ভোজন-পর্ব শেষ হলে তাঁদের বাড়ী করার সময় ব্রজবাসী বললেন—দেখ, অভ্যক্ষণ ধরে অত খেলাটা ভাল নয়। আমার ছেলেটি অভ্যক্ষ চকল, খেলা পেলে সব তুলে বার, কিন্তু তোমার!



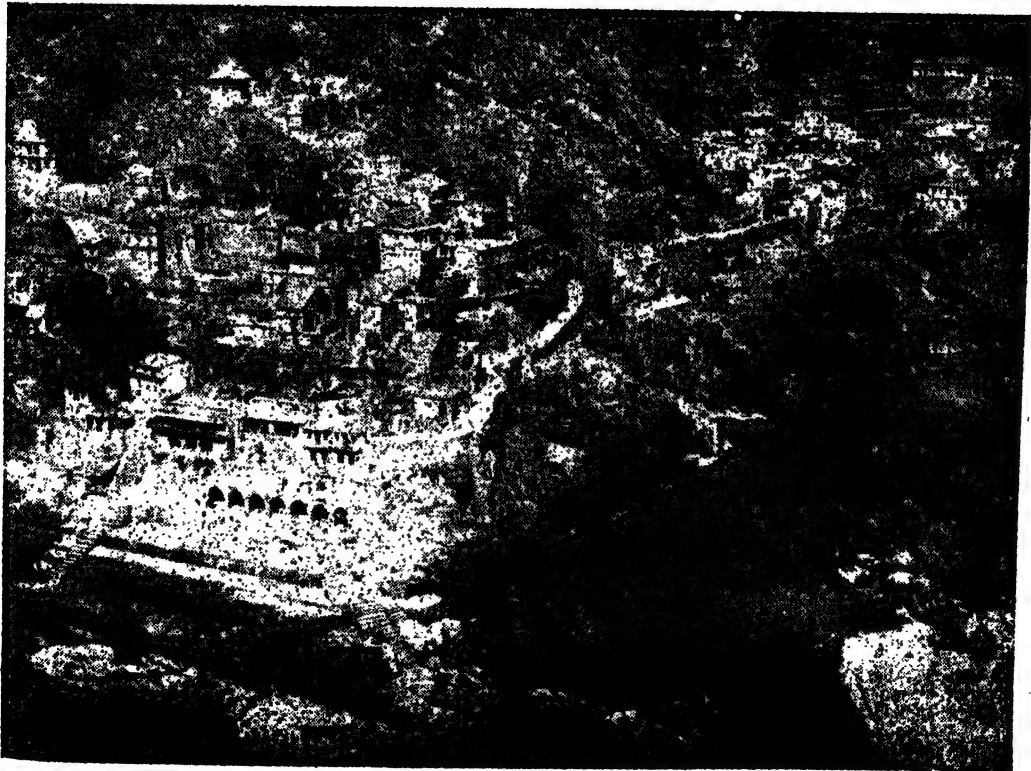
জেনারেল পোস্টাফিস

--আনন্দ বন্দোপাধ্যায়



দেব-প্রয়াগ

—ঐপথিক ব্রজোপাধ্যায়





গেছোমেয়ে

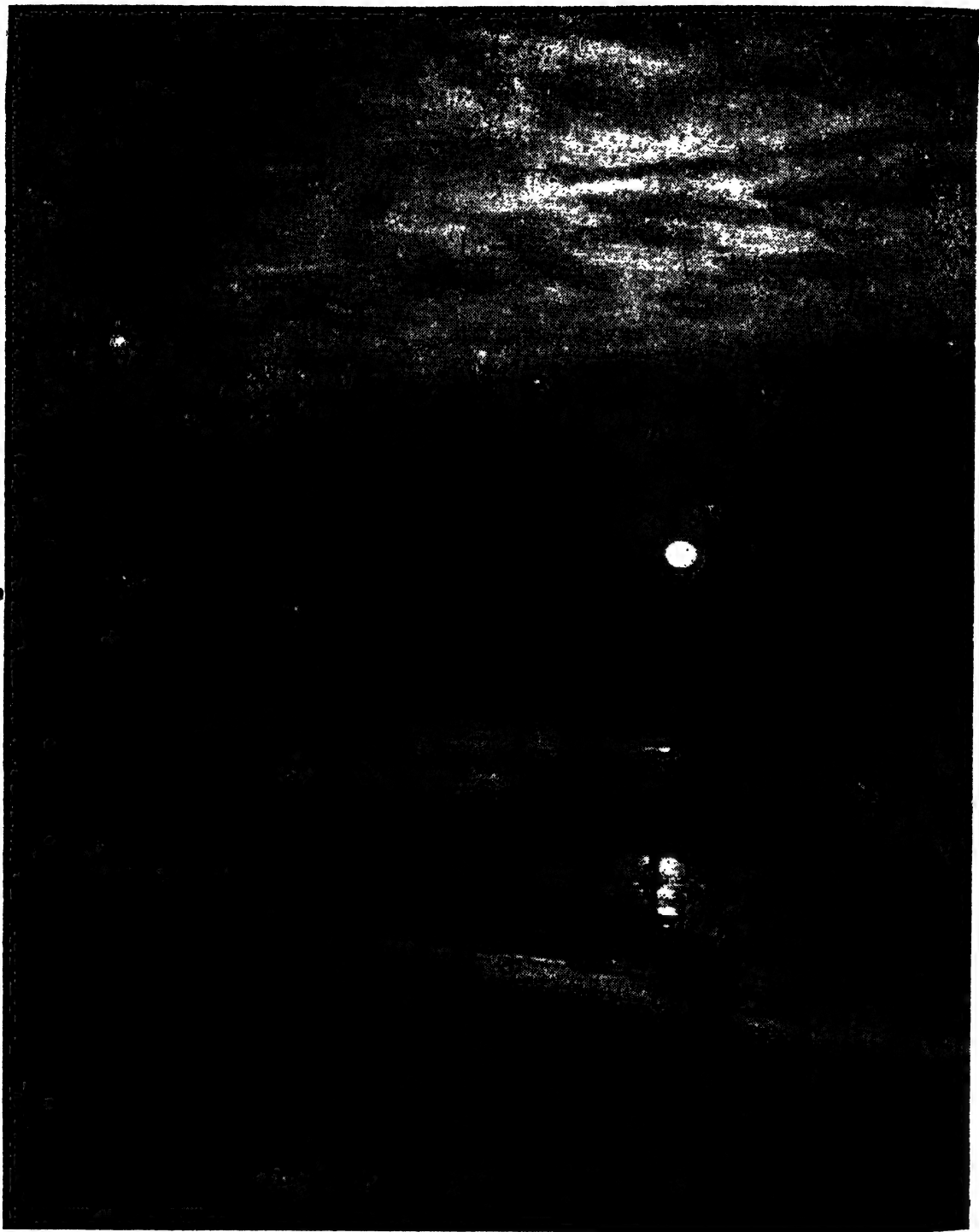
—সত্য পাল



ভুট্টু ছেলে
—সাবন বাব

প্রতিচ্ছবি





যাত্রা হ'ল শুরু

—বাহিনী (বাগপুর)

মিষ্টি সুরের নাচের তালে মিষ্টি মুখের খেলা
আনন্দ-ছন্দে আজি, —হাসি খুসির মেলা



সুপ্রসিদ্ধ কোলে



বিস্কুট এর

প্রস্তুতকারক কর্তৃক

আধুনিকতম যন্ত্রপাতির সাহায্যে প্রস্তুত

কোলে বিস্কুট কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১০

অমনটি তোয়ো না। খানিকক্ষণ খেলবে, তারপরে হয় আমাদের বাড়ী নয় নিজেদের বাড়ী চলে যাবে। দেখি তখন ও ছেলে কেমন করে একলা খেলে। এই বলে ব্রজরাণী যে যার ঘরে পাঠিয়ে দিলেন ছেলেদের।

২৮। এর পর আর একদিনের কথা।

মাথায় ঝুড়ি নিয়ে ফল বিক্রী করতে বেরিয়েছে এক চৌখস ফলওয়ালী। 'কে কিনবে গো ফল, কে কিনবে'—হাঁকতে হাঁকতে হনহনিয়ে হাজির হয়ে গেল ব্রজরাজের প্রাসাদ-দ্বারে।

আওয়াজটি কানে পৌঁছল নন্দহুলালের।

বুকে ছলছে মোতিব মালা, থল-কমলের মত পা দু'খানি খুপখুপ করে ফেসতে ফেসতে, মুগাম-ফুলের মত দু'হাতের আঁজলায় এক মুঠো ধান ভরে নিয়ে, বাড়ীর ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন নন্দহুলাল। সোনার কাকী ঝুমু-ঝুমু নাচাতে নাচাতে যতক্ষণ তিনি ফলবিক্রয়দ্বীপ কাছে এসে পৌঁছলেন ততক্ষণ তাঁর হাতের ধান সব ঝরে পড়ে গেছে মাটিতে, দু'তিনটি দানা মাত্র বাকি।

নন্দহুলালকে দেখে, একরঙা নীল মেঘের মত সেই মর্ত্তানন্দকন্দকে দেখে, কেমন ষেন বিহবল হয়ে গেল ফলওয়ালী, ঘোব লাগল তার হৃদয়ে। যা ছিল মনের মধ্যে, মনে তা আর বইল না। কী করি কী করি, ভাবতে ভাবতে নন্দহুলালের অঞ্জলি ভরে সে বিলিয়ে দিল তার সব ফল। তারপরে ঝুড়ি উঠিয়ে যখন ফলওয়ালী চলে গেল তখন পথের লোকেরা দেখতে পেল, ঝুড়িতে ফল নেই, রয়েছে রক্ত।

২৯। তারপরে একদিন অস্ত্রকরণের মধ্যে যেন সেই অস্ত্রধারীমণিরই প্রেরণা অনুভব করেই, দ্রুতচরণে ব্রজরাজসমীপে উপস্থিত হয়ে গেলেন উপনন্দ সন্ন্যাস প্রভৃতি প্রবীণ আভীরমুখেরা। ব্রজরাজ তখন সমাসীন ছিলেন আহ্বান-মণ্ডপে। দৃষ্ট-বিশ্বাসে সজ্জনন হয়ে তাঁরা তাঁকে বললেন,—

ব্রজেশ্বর, আপনার সম্পদেই আমাদের সম্পদ। আপনার সমুদ্র বিপুলতম সৌভাগ্যশালী মানব অদৃষ্টপূর্বে। আপনিই সত্যই মহাশয় ব্যক্তি। কেন না, আপনার পুত্রটি নিতান্তই বিশ্ববাসীর হৃৎহস্ত। স্থিতিকাগূহ হতে আরম্ভ করে এত প্রকারের শুভাশুভ ঘটনা ঘটতে সত্যরে আজ পর্য্যন্ত কোথাও আমরা দেখিনি।

৩০। প্রথমে এক নিশাচরী নিয়ে এল...ঘনঘোর প্রলয়ের মত অবস্থা। তারপরে ঘটল এক দৈত্য নিপাত—সর্বজনের যেন মনোনিপাত। তারপরে উঠল ভূগাবর্তের ঝড়। কী অনিষ্টই না ঘটল সেই দানব ঝড়ের ঘূর্ণি! সম্প্রতি ঘটেছে ঐ ছুটি অজুঁন গাছের ভীষণপতন। মহান অস্ত্রায় সব ঘটেছে।

৩১। এক্ষেত্রে নিদান কি? কুমারের জয়লঙ্কে ততটুকুও তো কোথাও দোষ নেই? সব গ্রন্থগুলিই তাঁর শুভগ্রন্থ। আপনার অদৃষ্ট বে লোকোত্তর তা প্রত্যক্ষ। তা না হলে কেমন করেই বা আপনি অকস্মাৎ লাভ করবেন এতেন দেবহুল্লভ অপভারত, যিনি জগৎপতি নারায়ণের অংশকলিত এবং ধীর অসীম কৃপায় অকস্মাৎ চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে-যায় ভীষণ সব অনর্থ?

৩২। অতএব আমরা অনুমান করছি, এই স্থলটিতেই কিছু দোষ লেগেছে, এবং সেইহেতু মহারাজ, এই স্থলটি পরিত্যাগ করে বৎসরকালের মধ্যেই আমরা বৃন্দাবনে যেতে চাই। সে বন সর্বদাই

সুখদ, সড়কতুর সমস্ত সমগুণই সেখানে বর্তমান, শ্রামল ভূণের অং নেই সেখানে। বৃন্দাবনে ধীরা বাস করেন তাঁরাও বলেন, বৃন্দাবন তুলনায় ত্রিলোক-সৌন্দর্য্য ভূণবৎ। সেখান চির-নিবাস লক্ষ্মীদেবী সকলেই সেবা করেন তাঁর; এবং সেখানে রয়েছেন গিরি গোবর্দন আমাদের গোপদেবীর শ্রীবুদ্ধির পক্ষে সে স্থল অমুকুল; জ্ঞানি মহারাজের যদি অভিমত হয়, তাহলে বৃন্দাবন-যাত্রা আমাদের সমস্ত কারণ হয়ে উঠবে।

৩৩। আভীরমুখাদের ভাষণ শ্রবণ করে সর্বদিক বিবেচনা ব দেখলেন সোমাদীশ। বিচারগম্ভীর প্রজ্ঞার আত্মকুলো নিজের চি খারকে শোধিত করে নিয়ে শেষে বললেন—

এই বৃহদ্রথের উপর আমার যে মনঃবোধ রয়েছে, আপনাদের তার-নিমিত্ত। এখন আপনারা যদি এই স্থলটিকে দোষমূল্য মনে করেন তাহলে মানুষকে কেমন করেই বা এখানে থাকতে অতএব, আমাব মনে হয়, স্তম্ভতা ও সামঞ্জস্য বজায় রেখে বৃন্দাবন পথেই যাত্রা করা অধুনা বিধেয়।

ব্রজেশ্বরের অনুমতি লাভ করে উপনন্দাদি আভীরমুখেরা সপরি স্তম্ভ হয়ে উঠলেন।

প্রথমেই তাঁদের আশঙ্কা হল, শকটগুলি ক্ষুদ্র হয়ে গেছে কিন কিন্তু তাঁরা যখন দেখলেন শকটগুলি নির্ভরযোগ্য তখন দৃঢ় হয়ে উ তাঁদের চিত্তবল।

৩৪। অনন্তর যা ঘটল সে এক বৃহৎ ব্যাপার। শকটে বলী সংযোজিত হয়েছে সকলেই দেখে থাকবেন, কিন্তু কেউ কি কখন দেখেছেন শুভ্রবর্ণ নব লক্ষ বলীবর্ধের সংযোজন? চার-দাঁতি বলীবর্ধ প্রত্যেকটিই কি ইন্দ্রদেবের শাল হাতীর উপমাগুল? মৌনব বংশীদের মত স্থির দাঁড়িয়ে রয়েছে সহস্র সহস্র নবদলী বলীবর্ধের দল লক্ষ লক্ষ সোনারাধানো শিঙ, যেন সুরেন্দ্রর শিখরগুলো চমকালে লক্ষ লক্ষ ধূবের সে কী প্রখর লীলা। যেন খরখরে নৃত্য শেখাচ্ছে সংগীতাচার্য্যেরা। চার পায়ে বলীবর্ধেরা নাচছে বটে কিন্তু আশ সেই চারিটি পায়েই কি নেচে উঠছেন চতুপদী আদিকন্দ।

যথা, ত্রীনারী মুগী সমালিকা ইজ্রবজা? লক্ষ লক্ষ লতার ম তুলে উঠছে চামরপুঞ্জ। লক্ষ লক্ষ গলায় বাজছে অযুত-নিযুক্তি কিল্লিগী। কিন্তু শকটে সকলকেই যখন জোতা হল, তখন নাবে মস্ত মস্ত ফুটোয় সকলেরই কি দড়ি!

শকটগুলিও দ্রষ্টব্য। প্রতি শকটের মাথায় সটান চারমণ্ডণ ঘেরা টোপের কাপড়ের রক্ত শাদা, সবুজ, লাল, হলদে, কমলা, ধূসর চারদিকে বহু মূল্য পটবস্ত্রের বৃত্তি। চারমণ্ডণের চূড়ায় চূড়ায় কন কলসের শোভা। পত-পত করে বাতাসে কাঁপছে অজস্র পতাকা যেন তারা কলা-পাণ্ডিত্য দেখিয়ে রসনা বিস্তার করে, অমর-বিমানের পরিহাস করে, বারংবার লেভন করে নিতে চাইছে দিনকরের কিরণজল। এদের প্রসঙ্গগুলি নির্দোষ, সাধুদের প্রতি আসক্তির মত; এদের অকগুলি সুন্দর, তরিতন্ত্রদের ইঞ্জিরের মত; এদের চক্রগুলি শোভা চক্রবাক-লাঙ্ঘিত তড়াগের মত; এবং এদের উজ্জ্বল যুগন্ধরগুলি স্ববৎ আনে অলকাপুত্রীর নলকুবরের সান্নিধ্য।

এই মনোহর শকটগুলিতে ব্রজবাসীরা প্রথমে ধীরে ধীরে অগ্রসর করিয়ে দিলেন আপন আপন পরিবারবর্গকে। তারপরে তাঁরা যখন অজ্ঞান শকটগুলিতে বোঝাই করতে লাগলেন স্বর্ণ-রৌপ্য-পিত্তল-তাম্র

ও কাস্ত্রনির্মিত তৈজসপত্র, তখন বিষয়ে বিক্ষারিত নেত্র হয়ে গেলেন সন্তান-জন।

তারপরে উঠল চলার প্রসঙ্গ। গাভীসজ্জকে পুরোবর্তী করে চালিয়ে নিয়া যাওয়া কি সম্ভব হবে? স্থির হল খেঁচুরাই আগে যাবে, তারপরে ধাত্রী করবে শকট-শোভা। কিন্তু গাভীসজ্জের প্রাচুর্য বিধায় ক্রম রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। শেষে পংক্তিধ্বয়ের বিদ্যাস দিয়ে যুগপৎ ধারা করল খেঁচু ও শকটের সমারোহ। কী বিপুল সেই শোভাবাত্রা, গম্যস্থানে পৌঁছলেও তার পা পড়ে রইল ত্যজনীর স্থানে।

৩৫। বৃহদ্বনের মধ্যস্থল থেকে আরম্ভ করে বৃন্দাবনের সীমা পদপূ অবিচ্ছিন্ন ভাবে চলেছে খেঁচু-পংক্তি। যমুনার তীর ধরে যখন চলেছে তখন জনতার মনে হল, না, এরা বৃষ্টি চলেছে না। বিতর্কান্তরের আত্মপদ হয়ে দাঁড়াল খেঁচু-পংক্তি।

৩৬। যমুনার সঙ্গে রহস্যলাপে অভিপ্রায়ে তবে কি এখানে এসে মিলিত হয়েছেন সুরধুনীর ধারা?

বৃন্দাবনের বেণু সংগ্রহের লোভে তবে কি একের পর এক ধরে আসছে ক্ষীরসাগরের অক্ষয় টেউ?

ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণের শয়নভার পরিত্যাগ করে তবে কি শোভে পড়েই বৃন্দাবন দেখতে পড়তিয়ে বেড়েছে অনন্তনাগের দ্রাবীড়সী ফণা?

না, না, এটি ধরিত্রীর মুক্তাবলী মালা ছাড়া আর কিছুই নয়।

এই খেঁচুপংক্তির মত ঐ শকট-পংক্তিটিও সাধারণ মানুষের চোখে বিষয়ের বস্তু হয়ে দাঁড়াল। সকলেরই ধারণা হল, নিশ্চয় তাদের চোখ

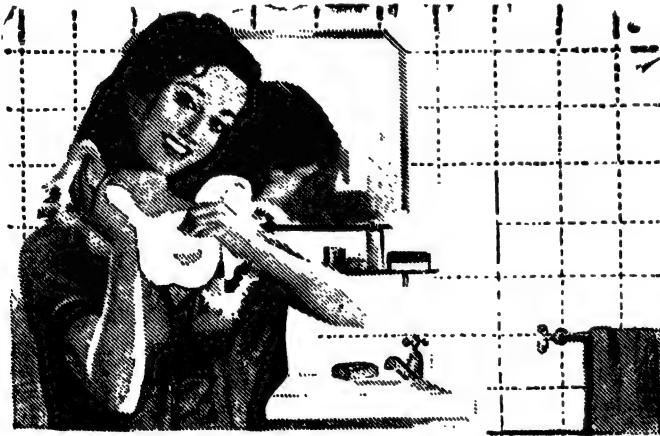
বিরাট একটা কিছু ভুল দেখছে। সত্যিই এটি কি একটি শকটপংক্তি, না, কনককলস-বিলসিত পাতাকা-নিকর করস্থিত ললিতাট্ট-গোপুব-ঘটাঘটিত একটি অশূর স্বন্দর দুর্গপ্রাচীরের কল্পনা?

এ-ও তো হতে পারে...এটি পূর্বতরাজ স্তম্ভের হিমালয় বা কৈলাস প্রভৃতির শিশু কুমারদের পংক্তি, যমুনার তীরে খেলতে নেমেছেন, করুণা করে ইন্দ্র তাঁদের ডানাগুলিকে আর কাটেন নি?

ধীরে ধীরে চলেছে শকটের সমারোহ ও খেঁচুর সমারোহ, আর শ্রেণীর পর শ্রেণী রচনা করে আকাশে উঠছে ব্রজধূলির সমারোহ। শূন্যে যেন ফলিত হয়ে যাচ্ছে নিরালম্ব এক মাতিক দুর্গের কল্পচিত্র।

এ-ও তো হতে পারে এই ধূলির সমারোহই ধরিত্রীদেবীর নব-প্রতিমা? পুরাকালে একদিন দৈত্য-বদন নিবেদন-ব্যপদেশে ধরণীদেবীকে ব্রহ্মলোকে যেতে হয়েছিল দীনতান গো-রূপ ধারণ করে। তিনিই কি আজ তবে কৃষ্ণপাদপঙ্কজ-সঙ্গমস্থল নিবেদনের অধীর লালসায় উদ্ধপবনবিকল্পিত ধূলিশ্রেণী পরম্পরায় ব্রহ্মলোকে পুনর্বার ছুটেছেন স্বরূপে?

৩৭। ক্রমে যাত্রাপথে মাংসল হয়ে উঠল কোলাহল। সহস্র মুখে সহস্র কথা। এস এস, যাও যাও,আনো, নাও চলো, রোথো চালাও। একীভবনত্ব থাকা সত্ত্বেও ক্রমশঃ বহুকেষ্ঠের মিলিত ব্যাহতিতে সর্বাগ্রে বহুতরঙ্গ ঘটল প্রত্যেকটি শব্দের। তারপরে অকস্মাৎ শ্রবণেন্দ্রিয়ের দুর্বিভাবা হয়ে উঠল কে বক্তা, কি বক্তব্য। বাক্যের সমস্ত ব্যবহার কেবল সম্পন্ন হতে লাগল হস্ত-সংজ্ঞায়।



জীবগুণাশক নিমন্তল থেকে তৈরী, সুগন্ধি মার্গো সোপ কোমলতম ত্বকের পক্ষেও আদর্শ সাবান। মার্গো সোপের প্রচুর নরম কেনা রোমকুণের গভীরে প্রবেশ করে ত্বকের সবরকম মালিন্য দূর করে। প্রস্তুতির প্রত্যেক ধাপেই উৎকর্ষের জন্য বিশেষভাবে পরীক্ষিত এই সাবান ব্যবহারে আপনি সারাদিন অনেক বেশী পরিষ্কার ও প্রফুল্ল থাকবেন।

পরিবারের
সকলের পক্ষেই
ভালো



মার্গো সোপ

পরিবারের সকলেরই প্রিয় সাবান

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোম্পানি লিমিটেড, কলিকাতা-২৩

একদিন বা ষটেছিল.....ওদের মায়ে ছেলের ছোট্ট সংসার। মাদুরী এসেছে নতুন বোঁ হয়ে। খান্ কোলকাতার মেয়ে মাদুরী। মাধবপুরের মতো গ্রামে ঠিক সে পুরোপুরি খাপ খাইয়ে নিতে পারেনা। রাত্রি হলে এখনও তার ভুতের ভয় করে। শেরালের ডাকে ঘরে দোর দেয়। হতুম প্যাচার ডাকে তার নিশিথ রাতেও ঘুম ভাঙে। ঝিঁ ঝিঁ পোকাকার শব্দেও নাফি মাদুরীর ভীষন ভয়। গাঁয়ের

তারাপদ মাষ্টার

বোঁ-রা সহরে মাদুরীকে নিয়ে হানাহানি করে। মাধবপুরের মতো অ-জ গ্রামদেশে এসে কোলকাতার লোকও সত্যিই ভবে বোঁকা বনে যায়!.....তবু মাদুরীর গ্রামকে কিন্তু ভাললাগে। ভালবেসে ফেলে মাদুরী ও গাঁয়ের মাটি আর মাহুগুণ্ডলোকে—আগ্রান চেষ্টা করে ওদের আপন করে নিতে।.....

বুঁকা খাণ্ডী সরলাবালার যত্ন নিতে মাদুরী কখনও ডুল করে না। তাইতো তিনি মাদুরীকে এত ভালবাসেন। ফায়ফরমাস মতো তাঁকে মাদুরী ভালটা মন্দটা রেঁধে খাওয়ায়। আর কত দিনইবা বাঁচবেন—এই ভেবে মাদুরী বুঁকায় সব অহুরোধই মেনে চলতে চেষ্টা করে। ওদের ছোট্ট সংসারে মাদুরীকে পেয়ে বোধহয় সব চাইতে বেশী খুশী হয়েছেন তার খাণ্ডী।.....কত অহুনয়ের পর তারাপদ বিয়ে করতে রাজী হয়েছে। বেচারী তারাপদ এই বিয়ের কথা নিয়ে মা'র কাছে কতই না কথা শুনেছে। মাদুরী এসে অবধি তাকে আর সকাল সান্নোঁ মা'র মোকাবেলায় যেতে হয়না।

এম. এ. পাশ করে গাঁয়ের স্কুলের মাষ্টারীর কাজ নিয়েছে তারাপদ। ভাল চাকুরীর আশায় সে গ্রাম ছেড়ে সহরে চলে যায় নি। গ্রামকে সে ভালবাসে। এ গাঁয়ের ছেলে বুড়ো সবার সে আপনারজন—তারাপদ মাষ্টার। এদের নিয়েই তারাপদের দিন কেটেছে।.....মাদুরী আজ তার স্বামীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে তার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে—মাধবপুরকে আদর্শ গ্রাম করে গড়ে তুলতে।..... ইতিমধ্যে মাদুরী সবার প্রিয় হয়ে উঠেছে। সেলাইয়ে রাগায় মাদুরী পাড়া জোড়া নাম। আনাড়ী ভাবলেও আজকাল কাজের ঝাঁকে গাঁয়ের বোঁ-রাই এসে মাদুরীর কাছে ভীড় জমায়। বুড়ীদের আসরে সরলাদেবী বোঁ-মার যা প্রশংসা করে বেড়ান, তাতে সব খাণ্ডীই চায় বোঁ-রা তাদের মাদুরী-বোঁ-র মতো কাজকর্ম শিখুক।.....





২৫/৭, ৪৪-২৫৪ ২০

গায়ের বোঁদের বহু নিয়ে রান্না শেখায়—মাধুরী। অবাক হয়ে তারা দেখে মাধুরীর রান্নার নতুন ঢং। মাধুরী তার সব রান্নাতেই ‘ডাল্‌ডা’ ব্যবহার করে। ওদের কাছে, আজব লাগে। কালু হুদীর দোকান সাজানো খেজুর গাছ মার্কা ‘ডালডার’ টিন তারা অনেকেই দেখেছে। বোঁ-রা জানে ‘ডাল্‌ডা’ দিয়ে মেঠাই-মণ্ডা ভাজাভুজি হয়—সব রকম রান্নার কাজও যে ‘ডালডা’য় হয় এ কথা তারা ভাবতেও পারে না। তাই মাধুরীকে ‘ডাল্‌ডা’ দিয়ে সব রান্না রাখতে দেখে ওদের অত আশ্চর্য লাগে। কোঁহুল বাড়ি—তবু মাধুরীকে জিজ্ঞেস করতে তারা লজ্জা পায় লজ্জার মাথা খেয়ে ‘বেহু-বোঁ’ জিজ্ঞেস করে বসে। মাধুরী কিন্তু ওর কথায় হাসে না, বুঝিয়ে বলে ওকে ‘ডালডার’ কাহিনী। ‘বেহু-বোঁ, পায় তার প্রশ্নের জবাব, কেন মাধুরী সব রান্নাতেই ‘ডাল্‌ডা’ ব্যবহার করে।……

“খাঁটি ভেষজ তেল থেকে ‘ডাল্‌ডা’ তৈরী। আর প্রতি “আউল” ‘ডাল্‌ডা’তেই আছে ভিটামিন ‘এ’র ১০০ ‘ইন্টার স্প্যানাল ইউনিট’ এবং ‘ডি’র ৫৬ ‘ইন্টার স্প্যানাল ইউনিট’—আমাদের শরীর রক্ষার প্রয়োজনীয় দুটি উপাদান। কেবলমাত্র বিশেষ বিশেষ রান্নার কাজেই ‘ডাল্‌ডা’ ব্যবহার হয় না, ‘ডাল্‌ডা’ দিয়ে আমরা সব রকম রান্নাই রাখতে পারি। আর ‘ডাল্‌ডা’ সবসময় সীল করা টিনে পাওয়া যায় বলে ধুলোময়লা পড়বার বা ভেজালের কোন ভয় থাকে না। ‘ডাল্‌ডা’ চেনবার সহজ উপায় হোল—সীল করা টিনের গায়ের ‘খেজুরগাছ’ মার্কা ছাপ” —মাধুরী তার ‘ডাল্‌ডা’র বিপ্লবন পর্ব শেষ করে। গায়ের বোঁ-রা ঘরে ফেরে।……

দিন কতক পরের কথা। বাইরে গনেশ ব্যাপারীর গলা শুনে মাধুরী দাঁড়ায় এসে দাঁড়ায়। দেখে গনেশ ব্যাপারীর হাতে ‘ডাল্‌ডা’র একটা ছোট্ট টিন। আজই হয়ত গনেশ কিনেছে। সত্যতা জেনে নিতে মাঠারের কাছে ছুটে আসা। কিন্তু কেন? নিশ্চয়ই এ সব বেহু-বোঁ-র পরামর্শে। নইলে গনেশ আবার ‘ডাল্‌ডা’ কিনতে যাবে কেন।…… স্বামীর চোখে চোখ পড়ায় মাধুরী ভেতরে চলে আসে। ভেতর থেকে কান পেতে শোনে স্বামীর কথা “হ্যাঁ গনেশ, একেবারে খাঁটি জিনিষ ‘ডাল্‌ডা’ ওতে আর বলার কি আছে। ব্যবহার করলেই বুঝতে পড়বে…… হেঁসে মাধুরী কাজে চলে যায়।

বিশুবার লিটার লিটিটেড বোম্বাই।

হুঁয়ার আরাবে, আভীরদের প্রণামে, শকটের নির্ধোবে, বেগুদের উল্লাসে যদিও নষ্ট হয়ে গেল অল্প সমস্ত শব্দ, তবুও কিম্বদন্ত্যমতঃপংক সেট শব্দভৈরবকেই যেন আলিঙ্গন করে বঁগল মহাব্যোমের সমস্ত গুণ।

৩৮। এদিকে ক্রীষাশোভা ও ক্রীরোচিণী একত্রে আরোহণ করলেন শকট-রত্নে। শকট তো নয়, সেটি যেন একটি ক্রীড়াশৈলের মণিকুহর। নিজের নিজের কুমারটিকে কোলে নিয়ে তাঁরা বসলেন। এঁর আসো পড়ল গিয়ে ওঁর গায়ে। তাঁরা হুটিতে যেন একজোড়া স্তম্ভিত্বরূপা সিদ্ধোমণি লতিকার ছবি, আর তাঁদের উৎসঙ্গ হুটিকে যেন সঙ্গ করে বেগেছে অগ্নয়ঙ্গলেরও মঙ্গল ফল। কুম্ভগীতির কলস্বরে ভাবের ভস্মে উঠল শকটবহু।

৩৯। শোভাযাত্রার সম্মুখে পার্শ্ব পশ্চাতে ইতস্ততঃ চলতে লাগলেন শত শত শত্ৰুপারী শকটে আরোহণ করে, চললেন অনেকে, পদব্রজে চললেন অনেকে। বিপুল পদক্ষেপে যখন অগ্নসর তল ভ্রজবাহিনী তখন মনে হল মহাবন—রাজধানীর লক্ষ্মীদেবীই যেন মুগ্ধমতী হয়ে গতিবোগে যেন গগন লেহন করতে করতাই, নিজেই প্রথমে ছুটে চলেছেন গন্তব্যস্থলটিকে অলঙ্কৃত করতে; সেখানে কেবল ফেলে রেখে যাচ্ছেন জমি।

৪০। সর্বাগ্রে ধীরা যাত্রা করেছিলেন গন্তব্যস্থলের সীমানায় পৌঁছে তাঁরা ফিরে দাঁড়ালেন। লক্ষ্য করলেন অমুখ্যাত্রীদের গতিবিধি। আসছেই তো তারা আসছে, বাড়ছেই তো তারা বাড়ছে। মূলের কেমন যেন সন্ধান রাখা হল দায়। অতএব তাঁরা স্থির করলেন, যমুনা পার হওয়া অসম্ভব, এ পারেই নিশিবাস বিধে।

সকলেই দেশকালজ্ঞ। ভ্রজরাজের আজ্ঞার অপেক্ষা না করেই তাঁরা বিলম্ব করলেন পটমণ্ডপ। ব্যবস্থার সে কী পারিপাট্য! দেখে মনে হল পুরঃপ্রস্থিতা রাজধানী লক্ষ্মীদেবীই যেন স্বয়ং রচনা করে ফেলেছেন স্বসম্মিবেশ।

সন্নিবেশের মধ্যস্থলে গড়ে উঠল হাজার হাজার দীর্ঘপ্রসার পট-গৃহ। চতুর্দিকে বিতানের পর বিতানের শ্রেণী। আকাশ অদৃশ্য করে চৌদিকে উঠল বিরাট বিরাট পট-প্রাচীর। চতুশ্চক্রে মোহানায় মোহানায় ক্রমোন্নতির সৃষ্টি হয়ে গেল বণিকমণ্ডলীর সমস্ত ও সুশ্রেণী বিপণি।

প্রথমেই সে স্থানটিতে সমবেত হয়েছিল কয়েকটি দল, দেখতে দেখতে সেই স্থানটিতেই ভিড় ভরে উঠল বহু গো-সংহতির। যে স্থলটিকে প্রথম দেখতে হয়েছিল এক টুকরো জ্যোৎস্নার মত একটু পরেই সেটি হয়ে দাঁড়াল দুঃসায়ের, তারপরেই একেবারে কীর-সমুদ্র!

৪১। দেখতে দেখতে পটগৃহগুলি বাসোপযোগী হয়ে উঠল। প্রথমাগত পরিজনদের সঙ্গে নিয়ে ক্রীন্দ, সঙ্গ ও উপনন্দপ্রমুখ ধুরন্ধরেরা স্বতঃপ্রবেশ করলেন তাঁদের স্বথানির্দিষ্ট পটগৃহে। বিজ্ঞান করলেন। তারপরে এলেন অন্তান্ত আভীরমুখ্যগণ। তাঁদের প্রমাপনোদনেরও বহু পরে মূল-বিচ্ছিন্ন হয়ে এল ধেমুপাঙ্কি ও শকট-পাঙ্কি।

৪২। দেখতে দেখতে সহস্র সহস্র শকট থেকে নেমে পড়লেন গোপ এক গোপীরা। শকট থেকে তাঁরা শনৈঃ শনৈঃ নামিয়ে নেলেন শুকাল-ব্যবহার্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী। বলীবর্ধগুলিকে

শকটযুক্ত করিয়ে অধিকারীরা তৎপর হয়ে উঠলেন আহার-দানের ব্যবস্থার। ক্রম-বিক্রয়ে লিপ্ত হয়ে পড়ল পরিচারকবর্গ। তারপর এলেন স্থল-পরিচারকেরা, দাঁড়িয়ে থেকে তাঁরা সুব্যবস্থা করে দিলেন রন্ধনাদির। ভগবান মমুখমালীকেও দেখা গেল, যাম-চতুষ্টি-গম্য গমনপথ অতিক্রম করে যেন শ্রান্ত হয়ে পড়েছেন, এবং অধুনা অভিলানী হয়ে উঠেছেন পশ্চিম-দিগ্নাগরীর আতিথ্যের।

৪৩। দেখতে দেখতে কলধ্বনি তুলে আকাশ ছেয়ে উড়ে চলে গেল কুলায়মুখী পাখীর দল। উঁচু-উঁচু ডাল দেখে গাছে চড়ে বসল ময়ূর-ময়ূরী, সর্পদিকে মুখ রেখে মণ্ডলরচনা করে শুয়ে পড়ে রোমস্থ-মম্বর মুগকদম। পদ্মের ঘরে ঘরে ধীরে ধীরে বেড়ান, হঠাৎ বন্দী হয়ে গেলেন সেই সব মধুকরের দল। আর ঐ দিব্যধূরা তিমিরনীর অবগুহনের মহিমায় তাঁরা ধারণ করলেন অভিসারিকাদের ভাবানুভূতি। একদিকে যেমন হান্তমুখী হয়ে উঠল কুমুদিনীর দল, ওরে এসেছে, এবার যেন ওদের মনের মত সুখের সময়টুকু এসেছে। অন্যদিকে তেমনি এপার থেকে ওপার ডাকাডাকি করতে লাগল বিরহ-বিধুর চক্রবাক-মিথুন। হায় রে ওদের বৃষ্টি এবারে ছুঁথের বাতাসথানি বয়েছে! আহা। কী ককণ ওদের আহ্বান, চোখে দেখা যায় না। ঐ দেখ চক্রবাক-মিথুনের কাণ্ড! যুগলের টুকরো দিয়ে এখনও হুটিতে বাঁধছে এ ওর ঠোঁট। রোদ্দ্রাবসানের মালিঞ্জে আকাশে অস্পষ্ট ফুটে উঠল দু-চারটি নক্ষত্র। বিজাতীয় হলেও অতি প্রকট হয়ে মিশে যেতে লাগল মাঘ ও পশুর দীর্ঘ দীর্ঘতর ছায়া। তারপরে যখন প্রত্যেক পটগৃহের অভ্যন্তরে একটি একটি করে জ্বলিয়ে দেওয়া হল দীপ, এবং বাইরের দীপগুলিকেও দেখতে হল সমুদ্রয় ব্যক্তির হৃদয় প্রকাশের মত; এবং প্রত্যেক সরণিতে সরণিতে পাহারার বসে গেল প্রহরীয়া দল, তখন মনে হল, ক্রীভগবানকে তাঁর উপাসিত-সেবা নিবেদন করবার অভিপ্রায়ে প্রদোষলক্ষ্মীর বৃষ্টি শুভাগমন হল।

৪৪। দেখতে দেখতে জমজমাট হল স-বৎসা ধেমুসংহতি। তাদের আহার তৈরী, কোনো আকুলতা নেই, তৃপ্ত হয়ে তারা বিশ্রাম করতে লাগল আনন্দে। ক্রমে ধেমুগুণ্ডার মাঝখান থেকে ভেসে উঠতে লাগল সমুদ্রমহনধ্বনির মত বিপুল ছুগ্ধোহন রব, এবং দোহনপাত্রের গর্ভ থেকে উদ্ভাস্ত হতে লাগল মুগ্ধ-মধুর আরও একটি গম্ভীর ধ্বনি। সে ধ্বনি অতি ভালো লাগল ক্রীকৃষ্ণের। শব্দরস রস হল তাঁর। রসপ্রিয়তা আরো বেড়ে উঠল যখন তিনি দেখলেন ও শুনলেন, নাম ধরে ধরে গাভীদের ডাক দিয়েছে ভ্রজের গোয়ালারা। মুখ থেকে টুপ টুপ করে টপকিয়ে বেরোচ্ছে নাম, আর মণ্ডল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে হাঙ্গাধ্বনি তুলে, ফেরা-জবাব দিয়ে ছুটে আসছে গাই। উত্তমা গাভীটির গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে গোয়ালার সে কী আদর করার ঘটা! কী নম্রকান্তি সব গাই!

দেখতে দেখতে ভ্রজনগরের অনারীদের সুখসম্পন্ন হয়ে গেল পানাহার-বিহার। নিজের জাগরণ কৌশল প্রকাশ করে প্রহরে প্রহরে প্রহরীয়া চীংকার করতে লাগল 'জাগতে রহো', নিশ্চকার নিদ্রামগ্ন হয়ে গেল বিপুল ঠাঁট।

বাক্সিশের আর যখন এক প্রহর বাকি, তখন শরন ছেড়ে গাত্রোথান করলেন গোপললনারা। সুশবিরে বেশভূষার অলঙ্কৃত হয়ে পটগৃহের দীপিত দীপ প্রতি-অলিঙ্গে সন্নিধান করলেন বাতসুহা

তারপরে মন্বন করলেন দধি। দধিমধ্বনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত হতে লাগল ভগবান বালকৃষ্ণের কর্ণরম্য গুণগান। কীৰ্ত্তনের সহচর হল মণিময় কঙ্কণ বলয়ের ও মঞ্জুমঞ্জীরের শিঞ্জা। গর্গরীকুহরে সঞ্চরমান সেই মশ্ণ ধ্বনির গভীরতা, সরসমধুর গীতধ্বনির সেই অনাবিল সুরলালিতা, দিগন্তনাদের দশমুখে সেই সুরলালিতোর পেশল জল্পরণন, যেন সম্মলে নির্মূল করে দিল জাগতিক সমস্ত অমঙ্গল। আর সেইক্ষণে অমর-পতিদের পালঙ্কে সহর জেগে উঠে বসলেন অমরসীমাস্তিনীরা। সত্যিই তো, আর কি এখন ঘুমিয়ে থাকা চলে! একান্ত ভাবে তাঁরা সানন্দে কান পেতে শুনতে লাগলেন ঘোষ-রমণীদের সেই দধিমধ্বন-নির্বোধ।

৭৬। দেখতে দেখতে যখন উদয়াচলের শিখরে সমুথিত হলেন ভগবান শ্রীকিরণমালী, তখন কিরণমালি-দুহিতা শ্রীমতী যমুনাদেবীর অপর পারে অধুনা কেমন করে পৌছনো যাবে তারই বিপুল সমুদ্রোপে বাস্তু হয়ে উঠল ব্রজবাসীদের বিশাল ঠাট। ব্রজরাজ প্রথমেই আদেশ দিলেন—

“অধিকারীরা এবার যে যার ধেনুবন্ধ পারে নিন।” আরম্ভ হয়ে গেল ধেনুবন্ধের পারাপার। সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য!

লক্ষ লক্ষ ধেনু সাঁতারে পার হয়ে যাচ্ছে যমুনা। দু’পাশ দিয়ে তাদের ঠেলে নিয়ে চলেছে শ্রোত। নিঃশ্বাসের বাতাসে ফুলে ফুলে উঠছে তাদের নাঙ্গা; দেহের পুরোভাগ ভেসে চলেছে জলের উপরে। তাদের চালাচ্ছে ভীমের মত বলিষ্ঠবণু গোপ, ঘন ঘন বব তুলছে—হৌঃ হৌঃ; আর হাঙ্গাধ্বনি তুলছে লক্ষ লক্ষ ধেনু—যেন প্রহৃত্তরে জানাচ্ছে “আমরাও যাচ্ছি হ্যাঁ হ্যাঁ।”

লক্ষ লক্ষ বাছুর তারাও সাঁতারে পার হচ্ছে যমুনা। শিঙ গজায়নি, তাই বোধ হয় জলের উপরে জানন্দে নাচিয়ে চলেছে হাঙ্কা-হাঙ্কা হুতু। ছোট ছোট দেহ হলে হবে কি, বেগে তারা লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে জল ভাঙতে ভাঙতে চলেছে। জলে ভিজ্ঞে ভারী হয়ে গেছে ল্যাজ, উঁচিয়ে আর কেমন করে দোলায়? নিজের নিজের মায়ের সামনে গা ভাসিয়ে সাঁতারাতে সাঁতারাতে তারা চলে গেল ওপারে—কুশলে।

চোখের সামনে দিয়ে ছবির মত সাঁতারে চলে গেল হাজার হাজার দক্ষ সাঁতারু। এক হাত খেলিয়ে তারা সাঁতারাল। অল্প হাতে তারা বুকের কাছে চেপে ধরে রইল কচি কচি চারটে ঠাঁও। ষাড়ের উপর লতিয়ে রয়েছে সঙ্গপ্রসূত বাছুর। আর তাদের পিছনে যখন হাঙ্গা দিয়ে সাঁতারে আসছে মায়ের দল। সেই বাছুর নিয়ে যমুনা পার হয়ে গেল তারা।

তারপরে সাঁতারে চললেন বুবপর্বতরা। তাঁদের পরিপুষ্ট বিরাট বকুদের আঘাতে জর্জরিত হতে লাগল যমুনার জলতল। মনের ভিতর কী তাঁদের উম্মা! যাড় বাঁকিয়ে তাঁরা শৃঙ্গাঘাত করতে লাগলেন তরঙ্গের দেহে, আর আশ্চর্য্য, শ্রোতের বেগ অতো তুলি হলেই বা হবে কি, নিঃশ্বাসের রুদ্ধবেগে তাঁরা জল কাঁপাতে কাঁপাতে, মাথা উঁচু করে একটানা সোজা পার হয়ে গেলেন যমুনা।

৪৭। নদী পার হয়ে ওপারের কর্পূর-ধূলিষজ্জ বালুবেলায় যখন নৈচিকী গাভীদেব বিরাট শ্রাস্ত সংহতি শ্রেণীবদ্ধ হয়ে দাঁড়াল তখন মনে হল বিচ্যুতি তুলে গিয়ে একত্রস্থিতির বাসনায় জাহ্নবী বৃষ্টি মিলিতা হয়েছেন কালিন্দীর সঙ্গে।

৪৮। চঞ্চল সমুদ্রবে এই ভাবে যমুনা পার হয়ে গেল গোপন। তারপরে নদীতে হঠাৎ আবির্ভাব হল বহুবহিত্র অসংখ্য তরণি। এত আকস্মিক তাদের আবির্ভাব যে মনে হল, নাগনাগরীদের মণিশৈলের লীলাদ্রৌণিগুলি হঠাৎ বৃষ্টি পাতাল ভেদ করে উপরে উঠে এল; বৃষ্টি বা ব্রজরাজ সমাজের আনন্দবিধানের উদ্দেশ্যে সুবশিষ্ঠী বিশ্বকর্মা নিজেই গগন-গঙ্গার প্রবাহ থেকে তুলে নিয়ে নাতঙ্গনী যমুনার কাছে হঠাৎ পাঠিয়ে দিলেন তাঁর এই বিজ্ঞান মূর্ত্তিগুলিকে। বৃষ্টিবা এই তরণিগুলিই কোনো বহুপদাঙ্কিত বিচিত্র জলজঙ্ঘবিশেষের কুলবধুর দল।

৪৯। এই তরণিগুলির মধ্যস্থলে ছিল একখানি অতিসমীচীন তরণি। এবং তারও ঠিক মধ্যস্থলটিতে ছিল একটি চিত্র-ভবনের পরিকল্পনা। তরণির ললিত পতাকায মুহু পবনের কম্পন। নিজের নিজের তনয়টিকে কোলে নিয়ে সেই ভবনে একত্রে প্রবেশ করলেন সপরিচারিকা শ্রীব্রজরাজ-রাজমহিষী ও শ্রীবসুদেব-রমণী। যমুনার মাঝখান দিয়ে যখন তরণিখানি চলেছে তখন বালকৃষ্ণ ঈষৎ কাঁধ ঝুঁকিয়ে দেখতে পেলেন, আচ্চা কী সুন্দর জল, ছোট ছোট টেউ দিয়েছে জলে, আর জলের রঙও কি ঠিক নিজের পায়ের রঙেরই মত! আর যায় কোথা? নায়ের আঁচল ছেড়ে বালকৃষ্ণ তখনি গুটি-গুটি দৌড়লেন তরণির প্রান্তে। কী যেন এক নিধি দেখেছেন তিনি। তরণি তখন ছলছে। কৃষ্ণেরও টলটল করছে পা। কিন্তু ডান হাতখানি প্রসারিত করে যেই শ্রীকৃষ্ণ নিজের করকমল দিয়ে আলোড়ন করতে যাবেন জল, অমনি তাঁকে ধরে ফেললেন তাঁর মা যশোদা; মা রোহিণীও তাঁকে ধরে ফেললেন। অসংখ্য আভঙ্কে তাঁরা যেন অস্থির! কিন্তু ক্রমশে কি হবে বারণ মানে কি ছেলে? অনিষ্টের আশঙ্কায় ব্রজরাজও তখন দ্রুত উঠলেন সেই তরণিতে। হাসতে হাসতে এক ঝটকায় কৃষ্ণকে উঠিয়ে নিলেন কোলে। তার পর সাবধান হয়ে বসে রইলেন তরণিতে। তরণি-বাহীরা বেয়ে চলল তরণি।

অজ্ঞাত ব্রজবাসীরা সপরিজন নিজদের সুখসুবিধামত আরোহণ করলেন অতি সুলভ অথচ সমান প্রতিমাগুণবিশিষ্ট অজ্ঞাত তরণিতে। আরামে তাঁরা সমকালেই পার হয়ে গেলেন যমুনা।

৫০। তাঁদের পারে পৌঁছিয়ে দিয়ে সেই তরণিগুলি নিয়েই আব’র ফিরে এলেন নাবিকেরা। নিটোল কাঠের সিঁড়ি তাঁরা পাতলেন। তার উপর দিয়ে তাঁরা তরণিগুলিতে তুলে নিলেন ব্রজশকটের সেই বিরাট ঠাট। পার করে দিলেন যমুনা। ব্রজরাজ পারিতোষিক দিলেন নাবিকদের। সজ্জ হুয়ে বিদায় নিলেন সকলে।

ইতি যমলাজ্জুনলঙ্কে নাম যষ্ঠস্তবকঃ।

[ক্রমশঃ।

এই বাঙালী পাহাড় ঠেলি উৎসাহ শিখায়
ঘটিয়েছিল নিরিড তমঃ নিজের প্রতিভায়—
—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।



[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

মূলখা দাশগুপ্তা

দিন দশেক পরের কথা :

অফ শিরিয়ডে কফি-হাউসে কাপ কাপ কফি সামনে করে বসে মঞ্জুরা সব বর্তমান বছরের নোবেল পুরস্কার পাওয়া বইখানা নিয়ে তর্কের ভূমান বইয়ে দিচ্ছিল। উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল আবহাওয়া। নিছক সাহিত্য আলোচনায় সাধাব্যত হাওয়াটা এতোটা উত্তপ্ত হয়ে চলে গেল না, কিন্তু বর্তমানে সাহিত্য পুরস্কারের পেছনে সাহিত্যের মান বিচারের চাইতেও বেশী থাকে রাজনীতি। আর যেখানে রাজনীতি সেখানেই আব না রইল বাকি, না রইল ব্যক্তির বিদগ্ধ মনের নিজস্ব মত। রইল কেবল দল আর দলীয় মত। হোক সাহিত্য হোক শিল্প, যে কোন আলোচনায় চেহারাটা গিয়ে দাঁড়ায় তখন তার দলীয় লড়াই-এর মতো। কফি হাউসের টেবিলের চারপাশ ঘিরে বসে মঞ্জুরার মধ্যেও যা চলছিল তাকে সাহিত্য আলোচনা বলে না—বড়দের এই গোষ্ঠীমতের লড়াই-এরই একটা ছোট সংস্করণের জোর মতলা চালাচ্ছিল ওরা। এমন সময় চঠাং একটা নিতান্ত অপরিচিত ছেলেকে হস্তদস্ত ভাবে উপস্থিত হয়ে এসে একেবারে ওদের টেবিলের পাশে দাঁড়াতে দেখে তর্কের তোড় বন্ধ হয়ে গেল ওদের। একসঙ্গে সবার দৃষ্টি গিয়ে পড়লো ছেলেটির ব্যস্ত-মস্ত মুখের উপর।

—মঞ্জুরি—

অপরিচিতকে ওর দিকে তাকিয়ে ওকেই সম্বোধন করে মঞ্জুরি বলে উঠতে শুনে বিস্মিত ভাবে বুক হাত দিয়ে নিজেকে দেখালো মঞ্জুরি—আমাকে বলছেন?

মাথা নাড়লো সে—হ্যাঁ আপনাকে বলছি। শীগগির উঠে আসুন। ভীষণ জরুরি খবর আছে।

—ভীষণ জরুরি খবর আছে আমার কাছে? বলতে বলতে ছেলেটির মুখের উপর ফেল-রাখা ওর না-চেনা না-বোঝা দৃষ্টিটা সরিয়ে এনে ভবিষ্যতে বই খাতা ব্যাগ গুছিয়ে চেয়ারে ঠেসে উঠে দাঁড়ালো মঞ্জুরি। বেরিয়ে আসতে আসতে ভারতে লাগল, কে ছেলেটি? কে পাঠিয়েছে তাকে ওর কাছে? প্রথমে মুখটা যতটা অদেখা মনে হয়েছিল, এখন যেন ততটা অদেখা মনে হচ্ছে না। ওদের পাড়ার ছেলে? আসতে-যেতে দেখে কিন্তু চেনে না? কথাটা মনে হতেই হাত-পায়ের জোড়াগুলো যেন সব আলগা হয়ে আসতে চাইল মঞ্জুরি—কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে বাড়ীতে। বাবা-দাদা বাড়ী নেই। আকস্মিক হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া নিয়ে পাড়ার ছেলে ছুটে এসেছে ওকে নিয়ে যেতে?

কি হয়েছে না শুনে আর চলতে পারছে না মঞ্জুরি। কফি-হাউসের দরজা আর সিঁড়ির স্বল্পপরিসর জাদুগাটায় পা দিয়ে থেমে পড়লো সে। ভেতর থেকে গলার স্বরটা টেনে বের করে এনে জিজ্ঞাসা কবলো—কি জরুরি খবর? কে পাঠিয়েছে আপনাকে আমার কাছে?

সিঁড়ির দিকেই মোড় ঘুরতে যাচ্ছিল ছেলেটি। মঞ্জুরি দাঁড়িয়ে পড়ে ব্যাপারটা কি জানতে চাইলে দাঁড়িয়ে পড়লো সে-ও। মঞ্জুরি দিকে ফিরে বললো—জগদীশ'র মা পাঠিয়েছেন আমাকে আপনার কাছে। আর পাঠানোর কারণটা বলতে গিয়ে ছেলেটি থেমে পড়ে যে মুহূর্ত সময়টুকু নিল, তারই মধ্যে মঞ্জুরি মনের ভেতর খেলে গেল—হ্যাঁ, ঠিক। জগদীশের বাড়ীর উল্টোদিকের পানের দোকানটার যে ছেলেগুলো সকাল সন্ধ্যা দুপুর কেবল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিড়ি টানে, পান খায়। যাদের এতো বাজে লাগে ওর যে পাছে ওদের উপর দিয়ে চোখ পড়ে এই জঙ্গ পানের দোকানটা পার হয় মঞ্জুরি ছাড়া একেবারে উল্টো দিকে ফিরিয়ে, তাদেরই ভেতর একে ও দেখেছে—না তাকানোর ভেতরও যে তাকানোটুকু হয়ে যায় তারই মতো দেখেছে।

সম্ভবত এই থমকানো মুহূর্তটা নিল ছেলেটি কথাটা এখানে দাঁড়িয়েই মঞ্জুরি বললে না গাড়ীতে গিয়ে বলবে, এটাই ঠিক করে নিতে, তা'পর বললো, জগদীশ' আশ্চর্য্যতায় করতে গিয়েছিলেন। সিরিয়াস অবস্থা—

আশ্চর্য্যতায় করতে গিয়েছিল জগদীশ! সিরিয়াস অবস্থা তার! বিমুগ্ধতার প্রথম ধাক্কাটা কাটিয়ে সিঁড়ির দিকে ছুটল মঞ্জুরি—শীগগির, শীগগির গিয়ে আগে একটা ট্যাক্সি ধরুন আপনি। ও, সঙ্গে আছে ট্যাক্সি। এবার একেবারে ছেলেটিকে পেছনে ফেলে দৌড়ে নেমে চললো সে। এই গাড়ীটা তো। দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ীটা দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করে—জেনে নিয়েই উঠে বলল গাড়ীতে। না, না ওখানে নয় আপনি ভেতরে আসুন। ছেলেটি সামনের আসনে বসতে গেলে ডেকে এনে তাকে বসালো পেছনের আসনে। গাড়ী ছুটে চললো অস্থির করে জিজ্ঞাসা করলো—

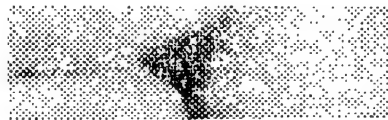
—এ্যাঁ, কি ভাবে আশ্চর্য্যতায় করতে গিয়েছিল জগদীশ? বিষ খেয়ে? কোথায় পেলো সে বিষ? কে দিলে তাকে বিষ যোগাড় করে এনে? কখন কবলে সে এ কাণ্ড? এ্যাঁ, বিষ খায়নি? তবে? হাতের কঙ্কির শিরা সাংঘাতিক ভাবে কেটে দিয়েছে ব্লড দিয়ে? ছেলেটি তার হাতের কঙ্কির উপর আঙ্গুল টেনে জগদীশকে কি গভীর ভাবে হাতের শিরা উপশিরা ব্লডে টেনে কেটে দিয়েছে দেখালো, 'মা গো' বলে 'হু' হাতে চোখ ঢাকল মঞ্জুরি যেন হোস পাইপের জলের তোড়ের মতো জগদীশ ছিন্ন শিরার মুখ দিয়ে রক্তের তোড় ছুটে এসে ছিটকে পড়েছে ওর গায়ের উপর। খানিক বাদে ঘামে ভেজা হাত দুটো নয়তো যেন রক্তভেজা হাত দুটো নামলো মঞ্জুরি মুখ থেকে—কখন একাণ্ড কবলে জগদীশ?

তারপর ছেলেটির মুখ থেকে মঞ্জুরি যে বিবরণ শুনে চললো তা হলো এই, দুপুরের নির্জন অবসরে কখন যে জগদীশ এ কাণ্ড করেছে টের পাননি জগদীশের মা। ঘুমিয়ে ছিলেন তিনি। ছেলের ভীতি-বিহ্বল কণ্ঠের ডাকে জেগে উঠে দেখেন অজ্ঞান জগদীশ পড়ে আছে বিছানার উপর। তার কাটা হাতটা যেখানটার পড়ে আছে সেখানকার চাদর ভিজে উঠে রক্তের কঁটা নীচে গড়িয়ে পড়ে পড়ে একটা রক্তের ধারা সৃষ্টি করে বয়ে চলেছে ঘর থেকে বাইরের



মায়ের
মমতা

ও



অষ্টারমিকে প্রতিপালি

মায়ের কোলে শিশুটি কত সুখী, কত সন্তুষ্ট। কারণ ওর পেছন দিক দিয়ে নিরন্তর অষ্টারমিক খাওয়ান। অষ্টারমিক বিশুদ্ধ উদ্ভূত বাত। এতে মায়ের দুগ্ধে মত উৎকর্ষ সাধারণ উপকরণই আছে। আপনার শিশুর প্রতি আপনার ভালবাসার কথা মনে রেখেই, অষ্টারমিক তৈরী করা হয়েছে।

বিনামূল্যে-অষ্টারমিক পুস্তিকা (ইংরাজীতে) আধুনিক শিশু পরিচর্যার সর্বোত্তম উপকরণ। আপনার ওর জন্য ৫০ নম্বরের ডাক টিকিট পাঠান— এই ঠিকানা—“অষ্টারমিক” P. O. Box No. 202 কোমরা ম

...মায়ের দুগ্ধেরই যতন

ফ্যারেল শিশুদের প্রথম খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করুন। ৩৬ মাসের মধ্যে চার থেকে পাঁচ মাস বয়স থেকে দুধের সঙ্গে ফ্যারেল খাওয়ানও আরোজন। ফ্যারেল পুষ্টিকর স্বাদযুক্ত খাদ্য-দ্রব্য। করতে হয়না—ওধু দুধ আর চিনির সঙ্গে মিশিয়ে, নিশ্চয় চানচু করে খাওয়ান।



OS. 1-X52 BG

দিকে। দেখে তিনি আঁঠুকাঁটার বে চিংকার করে ওঠেন সে কারা সর্বপ্রথম শুনে পায় সে। সেই গিরে ডাক্তার ডেকে আনেন। তারপর জয়ার মার দেওয়া ঠিকানা নেয় মজুর খোঁজে। প্রথমে যায় বাড়ীতে। সেখানে শোনে সে কলেজে। আসে কলেজে। কিন্তু কলেজেও না পেয়ে কি যে সে করবে এই ভেবে না পাওয়া মুহূর্তে একটি ছেলে হৃদয় দেয় তাকে এই কফি-হাউসের। বলে, একবার খুঁজে দেখুন। অফ-শিরিয়ড চলছে, হয়তো সেখানেই পাবেন। তারপর আসে সে এখানে।

—ডাক্তারকে কি বলতে শুনে এসেছে সে ?

সে শুনে এসেছে ডাক্তার বলছেন, একটুও সময় নষ্ট না করে—এক্সপ্লেস হাসপাতালে রিফ্রুজ করে রক্ত দেওয়ার ব্যবস্থা করতে। নইলে বাঁচানো দুষ্কর হবে। ক্রমেই সব রক্ত নিঃশেষে বেশিয়ে যাচ্ছে শরীর থেকে জরাদির।

—ডাইভার জলদি—থুব জলদি—মঞ্জু ডাইভারের আসনের ওপর দুই হাত রেখে সামনে এগিয়ে এসে কনকিনাশে তার অপূর্ণ হিন্দীতে বোঝাতে চাইলে; তার এই তাড়াহাড়া পৌঁছে দেওয়ার ওপর যে একটা জীবনের মরা-বাঁচা নির্ভর করছে সেই কথা।

কিছুই দরকার ছিল না। ডাইভার বাংলা যথেষ্ট বোঝে। সে সব শুনেছে এবং বুঝেছে। হর্ণের উপর হর্ণ বাজিয়ে যেন নিজের গুরুতর দরকার কথা সঙ্কেতে বলতে বলতে এবং একটু পথ ছেড়ে দেবার অনুরোধ করতে করতে গাড়ী ছুটিয়ে নিয়ে চললো সে।

কিন্তু মানুষের ভেতরটা যখন ভরা করার উদ্দেশ্যে ছুটতে থাকে, তখন তার সেই মনের ছোট্টা সঙ্গ যন্ত্রের ছোট্টা তাল বেগ চলতে পারে না। তখন মনে গুঁতে থাকে, রাস্তায় নেমে পড়ে নিজে ছুটে চলতে পারলেই বৃষ্টি বেশী তাড়াহাড়া হয়। মোড়ের মাথার লাল বাতি, চৌমাথার ট্রফিক পুলিশের হাত, মোটরের ভিড় যখন তাবও উপর কেবলই সে চলাকে ও বাব বাব দিতে থাকে থামিয়ে, তখন যে মানুষ গাড়ী থেকে নেমে পড়ে সত্যি নিজে ছোট্টো না, সেটুকুই বৃষ্টি পাগলের সঙ্গে মুহূর্ত ব্যস্তির তফাৎ। আব শুধু এই বিশেষ অবস্থার বিশেষ ক্ষেত্রেই নয়—ইচ্ছে করলেই সব করা যায় না, ইচ্ছে করছে বলেই করতে গেলে যে পাগলামী হয়, এটো বোঝার সম্ভবটুকু নিয়েই ভো সর্বক্ষেত্রে মানুষ পাগলের সঙ্গে নিজের তফাৎটুকু বাঁচিয়ে চলে।

বসে থাকতেই হলো মঞ্জুকে, স্থির হয়েই বসে থাকতে হলো তাকে। শরীরটা গতির উপর নামমাত্র রেখে সমুখের আসনের পিঠটা ধরে শুক-হয়েই বসে রইলো মঞ্জু, যতক্ষণ না গাড়ী জয়ারের বাড়ীর গলিতে প্রবেশ করলে। আশেপাশের কোন বাড়ীতে যে দুঃস্বপ্ন রকমের কোন ছুঁটিনা ঘটে গেছে, তার পরিচয় গাড়ীটা গলিতে ঢোকার পর থেকেই মিলতে লাগলো তার মোড়ের মাথার গভীর জটলায়, জয়ারের বাড়ীর সমুখের রাস্তার এখানে-ওখানে ঝড়িয়ে থাকা ছোট ছোট ভিড়ে, মানুষগুলো পাঁড়ানোর লব্ধ ভঙ্গিতে আর মুখের কাঞ্চ্যে। মুহূর্তপূর্বের নির্মম-উদাসীন প্রতিবেশী মুখগুলো যেন মুহূর্তের মধ্যে মায়ায়-মমতায় উবেগে-উৎকর্ষায় পর্যাবসিত হয়ে উঠেছে পরমান্বীয়ে মুখে।

না থাক চেনা, না থাক জানা, না থাক পরিচয়, তবু তারা তো কেউ কার অপরিচিত নয়। সব কথা না জামুক অনেক কথাই জার জানে পরস্পর পরস্পরের সম্বন্ধে। পানের দোকানের সামনে বাড়ীর মেয়েটিকে পৌঁছে যে ছেলেটি নিত্যদিন বিদায় নিয়ে যায়, তার

খবর বাড়ীর লোক না জামুক, জানে প্রতিবেশী। দোকান দায়, বাড়ী ভাড়া বাকী, পত্রিকার বিল, গোলারায় ধপের খবর মা জানতে পারে আত্মীয়গোষ্ঠী, কিন্তু জানে প্রতিবেশী। পর পর ছদ্মি কুণ্ডলী পাকানো ঘোঁয়া এসে দম বন্ধ করে না তুললে প্রতিবেশী দৃষ্টি তাদের নিজেদের অজ্ঞাতেই গিয়ে থাকে দেয় উপবাসী জানালার উপর। তারা কেউ কাউকে চেনে না কিন্তু জানে সবাইর কথা সবাই। জানে জয়ার সম্বন্ধেও। তারা দেখেছে, এক দিন এক বিষয় সন্ধ্যায় এক বিষয়মুখী মেয়েকে এসে এই বিশ টাকা ভাড়ার ঘরের দরজায় রিক্সা থেকে নেমে পাঁড়িতে, মা-ভাই-এর হাত ধরে সম্বন্ধে নামাতে, ঠেলাগুলার মজুরি মিটিয়ে দিয়ে মলিন ভাঙ্গাচোরা মালপত্রগুলোকে না আর ছোট্ট ভাইটির সাহায্যে টেনে টেনে ঘরে তুলতে। তারপর দেখেছে মোটা ছিট কাপড়ের ভরা থলিতে কি সব নিয়ে তাকে যাওয়া-আসা করতে, তার চোখের তলার কালীকে গড়িয়ে গড়িয়ে গালের উঁচু হাড় বেয়ে নেমে আসতে, তার ফর্সা বকে দিনে দিনে রোদে পুড়ে কালো হয়ে চোখের তলার কালীর সঙ্গে মিশে এক হয়ে যেতে। তারা দেখেছে হুঁপা ভেতরে ঢুকলে যেখানে আর কিছু না হোক অন্ততঃ ঘরের আড়ালের বিশ্রামটুকু মেলে, সেখানে নিজের বাড়ীর খোলা রাস্তারই রকের চিলতেটুকুর উপরই বসে পড়ে তাকে বিশ্রাম করতে, আঁচল দিয়ে মুখ মুছতে। তারপরের দ্রুত পটপরিবর্তনও অদেখা নেই কার। হঠাৎ হঠাৎ করে দেখতে দেখতে প্রায় সবাই দেখা হয়ে গেছে তার রাতের বেকনে আর প্রাতের ফেরা। আর ইদানীং রাস্তার উপর সে যে কাণ্ডকারখানা আরম্ভ করতো, তাকে নিয়ে যে টানা-গেঁচড়া রাস্তার উপরই চলতো তা আর দেখতে বাকি ছিল কার? কুংসা চলছে ওকে নিয়ে। শিশু দিয়েছে পানের দোকানের বিড়িটানা ছেলেগুলো। কিন্তু সেই সব নির্ভর নিম্নক্ষণ মুহূর্তগুলোই আজ মমতায় কি আশ্চর্য্য নরম—কি আশ্চর্য্য করণ।

হায়! মানুষের বৃকে এই মমতাবোধটুকু জাগতে যদি এতো কিছুই দরকার না হতো। যদি 'আহা' শব্দটা যতটুকু হাওয়া নিয়ে তাদের বৃক থেকে বেরিয়ে আসে তাতেই ফুরিয়ে না যেতো!

এতোদিন জয়াকে তারা বিচ্ছিন্ন ঘটনার ভেতর দিয়ে বিচ্ছিন্ন ভাবে দেখেছে, বিচ্ছিন্ন ভাবে বিচার করেছে। রায় দিয়েছে। দাওয়ায় বসে পড়তে দেখে সহানুভূতির সঙ্গে বলেছে, বেচারি মেয়েটা! এই দুর্দিনের সংসার কি এভাবে টেনে চালাতে পারবে? মরবে। আবার গাল দিয়েছে, উঠেছে রাত বিচরণ করা জয়াকে নির্দয় ভাবে। গেছে একবারেই জাহারমে গেছে মেয়েটা! যেমন প্রবৃত্তি তেমনি পথ বেছে নিয়েছে। কাজের সঙ্গে কারণ যোগ করবার সময় কোথায় তাদের। কিন্তু আজ প্রথম তারা প্রথম দিনের সেই বিষয়মুখী মেয়েটির মা-ভাই-এর হাত ধরে এসে দরজায় পাঁড়ানোর দিনটি থেকে আরম্ভ করে তার থলি কাঁধে এ-পাড়ায় ও-পাড়ায়, এর দরজায় তার দরজায় ঘোরা থেকে, তার প্রতিদিনে এক গ্রাম অন্নের জন্ত সংগ্রাম তার পাগলামো, তার উজ্জ্বল হাসি, তার আজকের মৃত্যুর জন্ত প্রস্তুত হয়ে এসে শযায় শোয়া পর্যন্ত প্রতিটি ছিন্ন ঘটনাকে এক সঙ্গে গাঁথলো। প্রবৃত্তির পথে চলে নয় চরম

অগ্রবৃত্তির চলা চলতে গিয়ে আজ সে সেই চলা থাকিয়ে দেবার জন্য দ্বাহতরী কেটে ফেলেছে আপন হাতে। কাদবিনী মরে প্রমাণ করেছিল মরে নাই। এ মরে প্রমাণ করতে চাইছে সে মরেছিল। কাজের সঙ্গে কারণ বোগ করে আজ তাদের হুক থেকে যে দীর্ঘনিশ্বাসগুলো বের হয়ে আসতে লাগল তা কি শুধুই জয়ার জন্য? না। তাদেরই বা কি এমন রমণীয় সমৃদ্ধ জীবন! সেই দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে নিজেদের ক্ষুধিত বঞ্চিত জীবনগুলোও এসে মিশে গিয়ে নিশ্বাসকে টেনে দীর্ঘ করলো।

চোখের কোণে কোণে তাদের যে আলোর কণিকা জ্বলে উঠতে লাগল যদিও তা জোনাকির আলো ব্যতীত কিছুই নয়। তাশ নেই, বিহ্বল নেই, আগুন নেই। জ্বলে উঠতে পারে না জ্বালিয়ে দিতে পারে না—মৃত। তবু সেই মৃত আলোগুলো এখন মোড়ের মাথার জটলার রাস্তার সমুখের ছোট ছোট ডিঙে, একতলা দোতলার বারান্দার দরজার জানালার দাঁড়িয়ে থাকা চোখে চোখে জ্বলে উঠতে লাগল তখন সেই বিলু বিলু মৃত আলোর কণাগুলোর তেজর এক বিস্ফোরণ করে প্রাণ ভরে দেওয়ার জন্য ভগবানের দরজার মাথা কুটতে ইচ্ছে করতে লাগলো মঞ্জুর।

এতক্ষণ মঞ্জু গাড়ীতে বসে বসে কেবল এখানে এসে পৌছানোর তাগিদে ছুটফট করেছে। এখন এসে গিয়ে নিজেকে ভারি নিরবলম্ব মনে হতে লাগলো ওর। কি করে কি করতে হবে, কি করে হাসপাতালে যেতে হবে—কোন হাসপাতালেই বা নিয়ে যাবে। যে অনবধানতার কথা কাগজে পড়ে, তাদের গাফলতি আর উদাসীনতার দরুণ প্রাণহানির যে কলঙ্কজনক সব ঘটনার কথা স্নানতে পায়—যদি সেখানে গিয়েও সঙ্কটকালের ত্বরিত ব্যবস্থা না মেলে। তবু চোখে অন্ধকার যে মঞ্জু দেখছিল না তা সে কোন ব্যাপারেই চোখে অন্ধকার দেখে না বলেই। কিন্তু ছেলোটিকে সঙ্গে রাখতে হবে। তার নাম জানতে চাইলো মন—আচ্ছা, আপনানার নামটা কি?

—অমল।

—আপনি কিন্তু চলে যাবেন না। আমি যে কি ভাবে কি করবো, কিছুই বুঝে উঠতে পারছি নে। আপনি থাকলে তবু আমি জোর পাবো।

যেন কৃতার্থ করল মঞ্জু তাকে, এমনি ভাবে ঘাড় কাত করে সম্মতি জানালো ছেলোটিকে।

কিন্তু এখানে নামা হলো না ওদের। গাড়ী থেকে নামবার মুখেই একটি ছেলে ছুটে এসে বাধা দিলো। বললো, একেবারে এঁকে নিয়ে মেডিকেল কলেজে চলে যা অমল। মিঃ চৌধুরী—মাথা চুলকে বোধ হয় জয়ার নামটা মনে করে নিল সে—জয়দীকে নিয়ে সেখানে রওনা হয়ে গেছেন। তৌদের আসামাত্র সেখানে চলে যেতে বলে গেছেন ওরা।

কেন বন্ধ গলি থেকে গাড়ী পেছু চলতে লাগল। মঞ্জু দেখল, যদিও মস্ত একটা তাল বৃক্ষে জয়দীর দরজার কিন্ত খোলা। হয় দিশাহারা জয়ার মা তালার মুখটা টিপতে ভুলে গেছেন নয়তো হাতে তার এমন জোর এখন নেই যে তার হাতের টিপে তালার মুখ বন্ধ হয়। নেমে বন্ধ করে আসবে? না। মূল্যবান জিনিষ খোঁয়া গেলেও এখন সময় দেওয়া যায় না—আর এতো নেই-ই কিছু। যায় যাবে। রক্তের দেওয়া টাকার বা হাতে আছে জয়ার দাঁর এবং যে

টাকা ক'টা এখন বর্তমান মুহুর্তে ওর একমাত্র ভরসা সে টাকা জে জয়ার মা সঙ্গেই নিয়ে গেছেন।

কতই বা দূর, গাড়ী ছুটিয়ে নিয়ে সারপেটাইন লেন থেকে মেডিকেল কলেজ। হ' মিনিটে পৌছে দিলো ওদের ডাইভার মেডিকেল কলেজের প্রশস্ত সিঁড়ির চব্বরে। মঞ্জু ট্যান্ড্রি-মিটারটার দিকে একবার তাকালোও না। সে বিলম্ব জানে, যে অঙ্কই মিটারে উঠে থাক ওর ব্যাগের সাধ্য নেই তা মিটিয়ে দেবার। এ ছাড়াও দরকারও হতে পারে ট্যান্ড্রি। এমন অবস্থায় একটা ট্যান্ড্রি হাতের কাছে থাকা ভালো। ডাইভারকে ওয়েটিং চার্জের সঙ্গে বকশিস কবুল করে নেয়ে পড়ল মঞ্জু। কিন্তু তার পর? কোথায় এখন ওরা খুঁজবে ওদের, ক'কে জিজ্ঞাসা করবে জয়ারদের কথা?

কি করা যায় জিজ্ঞাসা মিয়ে হুজনে হুজনের দিকে তাকালো।

—চলুন ইমারজেন্সি কেস কোথায় নিয়ে যায় খোঁজ করি। অমল বলতেই মঞ্জু 'চলুন' বলে হাঁটা মিল তার সঙ্গে। কিন্তু খোঁজ করার জন্যও কোন দিকে যেতে হবে সেটা জেনে নেওয়া দরকার। ও মশাই শুধুন, বলেই অমল চেঁচিয়ে উঠল এ তো ওরা মিঃ চৌধুরীরা দাঁড়িয়ে। মিঃ চৌধুরীদেরও অমলের দিকে চোখ পড়ে গেল। ডেকে উঠলেন তাঁরা। একেবারে লাফিয়ে লাফিয়ে হুজনে উঠে এলো চব্বরের সিঁড়ি পার হয়ে উপরে।

না, কিছুই করে উঠতে পারছে না তারা। শুধু ছোটো কুলী এসে জয়দীকে ট্রেচারে করে নামিয়ে নিয়ে ইমারজেন্সি রুমের টেবিলে শুইয়ে রেখে গেছে। ব্যস! কোথায় ডাক্তার! কোথায় নার্স! ডাক্তার নাকি আর একটি ইমারজেন্সি রোগীকে অপারেশন করছেন।

—চলুন।

মঞ্জুকে নিয়ে এলো তারা ইমারজেন্সি রুম। জয়ার মা কখনো কাঁদছিলেন, কখনো ঘর-বার করছিলেন। কখনো মেয়ের কাছে গিয়ে তার হিম্মতুল হাত-পা হাতে নিয়ে ঘবছিলেন গরম করে তুলবার জন্য। কখনো নাকের কাছে হাত ধরে দেখছিলেন খাস বইছে কি না। মঞ্জুকে দেখে ডুকরে কেঁদে উঠলেন তিনি। মুখে আঙ্গুল চেপে থামতে ইসারা করে মঞ্জু এক মুহুর্তের জন্য জয়ার রক্তশূন্য সাপা কাগজের মতো মুখটার দিকে তাকালো। তাকালো জয়ার ব্যাণ্ডেজবান্দা রক্তভেজা হাতটার দিকে। রক্ত যে কেবল বেরিয়েই গেছে সব তাই নয়। যেটুকু অবশিষ্ট আছে অর্থাৎ যে রক্ত ক'বিশুর জন্য এখনও নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বইছে জয়ার, তাও নিঃশেষে বেরিয়ে চলেছে। ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে কোমরে আঁচল গুঁজল মঞ্জু।

বারান্দার বেরিয়েই যে অফিস-পিয়নটার সঙ্গে দেখা হলো তার কাছেই দাঁড়িয়ে পড়লো মঞ্জু। তোমাদের ডাক্তার বাবুকে কোথায় পাওয়া যাবে বলতে পারো?

—কোন ডাক্তার বাবুর কথা বলছে সে? ডাক্তার বাবু তো একজন নয়!

এক-বোকা ওরূপ ব্যাণ্ডেজ হাতে হনহন করে ছুটে চলে গেল একজন নার্স তাদের পাশ দিয়ে। আর ছুটে চলা নার্সের

শেফের বাতাসটা যেন মজুর কানে কানে শ্রবণ করিয়ে দিয়ে
সেই তুমি মমতার খোঁজ করছ না কেন? সে যে মেডিকেল
কলেজের ঠিক নাস' একজন—মনে নেই তোমার? মিস সেন, মিস
লনকে চেন তুমি? নাস' মিস সেন—মমতা সেন? যেন লোকটা মিস
মমতা সেনকে চেনে বলে তবুই সব মুশকিল আসান হয়ে যাবে তার।

চেনো? আমাকে তবে তার কাছে একটু নিয়ে চলো না।
কল্প মিনতি করল মজু।

আঁঠি আবেদন শোঁকাতরতা কোন অলুক্ষণাটী আর এসে
রসে যায় জানায় না। চলতে চলতে জ্বর দিল দে—সে জ্বর
জাগ্রত নিয়ে চলেছে। তার গায়ে নিম্নে মাংস সত্ত্ব হলে
তা। কারন নাস'-কোষাটীর এখান থেকে চল পন্থা মিনটি
পথ। ঘটা খানেক হয়ে দিটুটি শেষ করে যে মিনিয়াণি তার
কোষাটীরে চলে গেছে।

—মমতা সেনেরা মিনিটের পথ। আসতে যেতে আঁঠি ঘটা।
কোম—কোন করা ধার মা একটা? সঙ্গে সঙ্গে চলতে চলতে
জিজ্ঞাসা করলো মজু।

—যার কিন্তু সেখানে কোন করতে হলে সুপারিটেণ্ডেন্টের
কাছে গিয়ে আগে অনুমতি নিতে হবে।

—কোথায় সুপারিটেণ্ডেন্টের ঘর?

আজুল দিয়ে একটা দিক দেখিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছিল সে।
মিনতি করলো মজু—তুমি আমাকে দয়া করে অন্ততঃ অফিসঘরটার
পৌঁছে দেও। আমি তোমাকে বখশিশ দেবো।

এবার কাজ হলো।

অতি বিনয়ের সহিত, সঙ্গে করে নিয়ে এসে সে পৌঁছে দিল
মজুকে সুপারিটেণ্ডেন্টের ঘরের দরজায়। মজু বাগ থেকে ওর
কলেজের বাতায়ত খরচাব টাকাটা বের করে পয়সার হাতে তুলে
দিয়ে গিয়ে অফিসরুম ঢুকল। সামনের চেয়ারটার যিনি বসেছিলেন
মজু জানে না তিনিই সুপারিটেণ্ডেন্ট কিনা, তবু সে তাঁরই কাছে
আবেদন জানালো—তাকে নাস'-কোষাটীরে একটা কোন করবার
অনুমতি দেবার জন্য। মজু জানে না নাস'দের কোন করার এই
অনুমতির নিয়মের কতটা কড়াকড়ি তার মুখে অস্থিততার, তার
গলাব ঘরের ব্যাকুলতা লক্ষ্য করেই এতো অনায়াসে অনুমতি
মিলে গেল কি না। ভুললোকটি নিজে উঠে ডায়াল ঘ্রাতে ঘ্রাতে
জিজ্ঞাসা করলেন, কা'কে চান আপনি?

—মমতা সেনকে।

একেবারে মমতা সেনকে ঢেকে ওর হাতে কোন তুলে দিয়ে
ভুললোক গিয়ে চেয়ারে বসলেন।

—ছাড়া কে? কে আপনি? একটা নিউ গলা ভেসে এলো
মজুর কানে।

—আপনি—আপনি কি মমতা সেন?

—হী। বলুন।

—আমাকে আপনি চিনতে পারছেন কি না বুঝে উঠতে
পারছেন। আমার নাম মজু। আপনাদের বাড়ীতে আমি
গিয়েছি। একদিন আপনার সঙ্গে আমার দেখাও হয়েছিল
কিন্তু পরিচয় হবার সৌভাগ্য হয়নি।

এক বলক নিচু মিষ্টি হাসির সঙ্গে জবাব এলো—আমি

খুব চিনতে পারছি আপনাকে। আপনার কথা আমি দাঁড়
বুঝে শুনেছি। কিন্তু কি ব্যাপার বলুন তো?

—আমার এক বন্ধুকে অত্যন্ত সফলতার অবস্থায় আপনার
মেডিকেল কলেজ-হাসপাতালে নিয়ে এসেছি। তার হাত কেটে
গিয়ে অতিরিক্ত রক্ত পড়ে গেছে। কিন্তু এক ঘণ্টার উপর হয়ে
চলল আপনাদের ইন্টারজেলি রুমের টেবিলের উপর সে পড়ে আপন
অজ্ঞান অবস্থায়—কি যে করবো—

—তাই! আমি একুণি আসছি। আপনি ইন্টারজেলি রুম
চলে যান। কোন রাখাব শব্দ চলো ঠিক করে।

অক্লান্ত মিনিটের কাঁটাটা মজুর জীবিতমান চোখের উপর দিয়ে
যার পাঁচ সাতের বেশী পূবে আসতে পেরে না। পোনোরা মিনিটের
পথ পাঁচ মিনিটে চল এসে ঘরে ঢুকল মমতা। ভোর ছুটা থেকে
বেলা সাড়ে তিনটা পর্যন্ত একটানা দিটুটি দিয়ে—কোষাটীরে যিরে
দিয়ে সে ঘরে প্রান-মাংস দেয় একটা বিছানায় শায়র এলিয়েছিল।
মজুর ফোন পেয়ে যেভাবে ছিল সে তাবুই চলে এসেছে, শুধু ভিজে
চুলের রাশি হাতে জড়ির কয়েকটা কাঁটা গুঁজে। এক ঘণ্টা পরে না
দিয়ে আগেই কেন থরটা মজু ওকে দিল না—মজুকে এক কথাটাই
বলতে বলতে চলে গেল সে একেবারে জ্বর টেবিলের কাছে। প্রথমই
সে জ্বর ডান হাতটা হাতে নিয়ে নাড়ী দেখলো। তারপর দেখলো
কালো হয়ে আসা তার আঙ্গুলের ডগাগুলো। এক নজর তাকালো
তার নীল হয়ে আসা ঠোঁট দুটোর দিকে। তারপর এমন অবস্থার
করণীয়াটা আগে করে নিলো সে; জ্বর হাতের রক্তভেজা
ব্যাণ্ডেজটা খুলে কেলে আটারি করসেপ নিয়ে এসে মুখটা আটকে দিয়ে
নিল রক্ত পড়ার পথ বন্ধ করে। নিতান্তই হাতের স্পন্দ শিরা
উপশিবা। কিছুক্ষণ রক্ত বেরনোর পর রক্ত জমে গিয়ে নিজ থেকেই
থাক, কিছু সময়ের জগ বন্ধ হয়ে ফের রক্ত জমে জমে চাপ সৃষ্টি
হয়ে রক্ত স্রবণ শুরু না হওয়া পর্যন্ত। আর এই ভাবে কিছুক্ষণ
পড়া আর কিছুক্ষণ বন্ধ থাকার ভেতর চলছিল বলেই জ্বর
এই নিঃশ্বাসটুকু এখনও বইছিল। নইলে কখন সব চলা থেমে
যেত তার। কিন্তু আব সময় নেই। একটা গ্লুকোজ সেলাইন
এখন—এই মুহূর্তে দেওয়া দরকার—বাদ মেয়েটিকে বাঁচাতে হয়।
কিন্তু গ্লুকোজ সেলাইন দেওয়া নাস'দের—বিশেষ জুনিয়ার ট্রেণ্ড
নাস'দের পক্ষে একেবারেই আইন-বিরুদ্ধ! তবে তারা যে এ
কাজ না করে বা কোন রকম আইনবিরুদ্ধ কাজ না করে তা
মারও নয়। নিজের হাতে গ্লুকোজ সেলাইনও সে দিয়েছে।
ডাক্তার উপস্থিত থাকতেন এই মাত্র। কিন্তু এখন লোকচক্ষুর
উপর সে কিছুতেই একাজ করতে পারে না। কিন্তু যার অবসর
আছে, যে সময় দিতে পারে নিজের কাজ ছেড়ে আসবার এমন একজন
ডাক্তার খুঁজে পেতে আনতে আঁধ ঘণ্টা সময় পার হয়ে যাবেই—
যে আঁধ ঘণ্টা সময় রোগীর বিপদের কথা ভাবলে কিছুতেই দেওয়া
যায় না। ফের জ্বর নাড়ী দেখল মমতা তার ডান হাতটা তুলে
নিয়ে। তার পর দাঁত দিয়ে পাঁতলা টোঁটো কামড়ে ধরে দ্রুত
হাতে তৎপরতার সঙ্গে ব্যবস্থা করে চলল রোগীকে গ্লুকোজ সেলাইন
দেওয়ার। হী সেই জরাকে সেলাইন দেবে। তারপর যখন এই
আইনবিরুদ্ধ কাজের জবাব তার কাছে চাওয়া হবে, তখন তার
জবাবের কথা ভাবা যাবে। [ক্রমশঃ]

আপনারও -চিএতারকাদের মত উজ্জ্বল লাভন্য হতে পারে

বৈজয়ন্তীমালা বলেন "লাজ টরলেট সাবান
ছাগছাই করে আমার লাবণ্য সর্বদাই মৃদু ও সজল
থাকে। লাজের স্নেহের মত তেঁয়া আমার ত্বকের পক্ষে
ভাল—এর মৃদু সৌরভ আমাকে পরাধীন
করে সন্তোষ করে রাখে।"
আগন্তি বৈজয়ন্তীমালায় মত লাবণ্যবতী হতে
পারেন। লাজ টরলেট সাবান আপনার বৈদ্যমি
মৌল্য চর্চার মতী হোক। মনে রাখবেন
লাজ মানের সময় মতিই আনন্দদায়ক।

বিশুদ্ধ, শুভ্র
লাজ
টরলেট সাবান
চিএতারকাদের সৌন্দর্য সাবান





ভবানী মুখোপাধ্যায় উনত্রিশ

বার্ণার্ড শ'কে প্রশ্ন করা হল, Saint Joan নাটক লেখার পরিকল্পনা কি ভাবে আপনার মনে এল ?

বার্ণার্ড শ' উত্তরে বললেন—আমি অবস্থার দাস, যদি আমাকে নাটক লিখতে বলা হয় আর মাথায় যদি আইডিয়া থাকে, তাহলে সেই অনুরোধ আমি রাখবো কিন্তু দেখা যায় ঠিক সেই জাতীয় নাটক কেউ চায়নি। Saint Joan শুরু করার আগেও এই অবস্থা, যাটা কিছু লিখতে চাই কিন্তু মাথায় কোনো আইডিয়া নেই। আমার স্ত্রী বললেন—Joan of Arc চরিত্র নিয়ে একটা নাটক লেখ না কেন ? আমি তাঁর কথা রেখেছি। আমি জেনের বিচার এবং পুনর্দাসন সংক্রান্ত বিবরণ পড়েছিলাম, তখনই মনে হয়েছিল এর মধ্যে নাটক আছে, শুধু বিচারের প্রয়োজন জেনের উপযুক্ত করে। আমার কাছে এ ছেলেপেলা। প্রাচীন জেন সম্পর্কিত নাটক এবং ইতিহাস রোমান্সের ফাল্গুস আমি সমসাময়িক বিবরণ পড়েছিলাম, কিন্তু সমালোচনা বা জীবনী পড়েছি নাটক রচনা শেষ করে। প্রথম প্রোটেষ্ট্যান্ট হিসাবে জেনের ভূমিকা আমাকে আকর্ষণ করেছে, পথিকৃতের লাঞ্ছনা আমি বুঝি। আমি পরিশেষে জেনের মৃত্যুর পর কি হল তা বলার চেষ্টা করেছি, বাকী আশ সমগ্র ঘটনার ধারাবাহিক বিবরণী। প্রথমে নাটকটা অনেক দীর্ঘ হয়েছিল, পরে কেটেকটে কঙ্কালটুকু রেখেছি মাত্র। তবু অনেক মনে করেন সাড়ে তিন ঘণ্টার অর্থ—কঙ্কালের অনেকটা অংশ।

বার্ণার্ড শ'র Back to Methuselah নাটকের পর সকলে মনে করেছিল তিনি নিঃশেষিত, বিশেষ কিছুই আর দেওয়ার নেই। তাঁর নিজেরও ধারণা এই তাঁর সর্বোত্তম রচনা। তাঁর অনুরাগী পাঠকের অনেকেই বলেন, না Man and Supermanই শ্রেষ্ঠ, এবং Saint Joan যে শ্রেষ্ঠ নাটক এই অভিমত পোষণ করেন যারা তাঁরা সংখ্যায় কম নন। এই নাটক অতি জনপ্রিয়। বার্নার্ড শ' এই নাটক রচনায় অভিজ্ঞত হয়ে পড়েছিলেন, তাই যেখানে ঘাতক যষ্ঠ দৃশ্য শেষে বলেন—You have heard last of her তখন

ওয়ারউইক সহোদে বললেন—The last of her ? Hm ! I wonder

এইখানেই নাটকের শেষ হলে তা সঙ্গত হত। সমালোচকের এই মত, কিন্তু লেখকের মত বিভিন্ন, তাই তিনি Epilogue বা পরিশিষ্ট জুড়ে দিয়েছেন, তার কারণও বললেন।

পুরোহিত আর রাজনৈতিকদের কাছে যদি জেন নতি স্বীকার করে, তাহলে তার প্রাণ বাঁচে, কিন্তু জেন আপোষ-বিরোধী। যা অজ্ঞার মনে করে তার কাছে নতি স্বীকার তার চরিত্র-বিকৃত। সে তার বিশ্বাসে অচঞ্চল। সে বলে—কোথায় থাকতে আজ তোমরা, যদি আমি তোমাদের কথাই মেনে নিতাম ? তোমাদের কাছে কোনো সাহায্য, কোনো উপদেশ আমি পাইনি। হ্যাঁ, আমি এই পৃথিবীতে নিঃসঙ্গ। চিরদিনই এমন একা। আমার বাবা আমার ভায়েদের হুকুম দিয়েছিলেন আমাকে জলে ডুবিয়ে দিতে, যদি আমি তাঁর ডেড়াগুলো না দেখি, ওদিকে তখন জালে যুদ্ধের তাণ্ডব চলেছে। আমাদের ডেড়াগুলো হয়ত নিরাপদ হত, কিন্তু ফ্রান্স ধ্বংস হয়ে যেত। আমি ভেবেছিলাম ফরাসী সম্রাটের রাজসভায় ফ্রান্সের মিত্র আছে, কিন্তু দেখলাম, ফ্রান্সের ছিন্ন মৃতদেহটা নিয়ে নেকড়ের লুকু হানাহানি। ভেবেছিলাম ইংরেজের সর্বত্রই মিত্র আছে, কারণ তিনি সকলের বন্ধু, আর সব মনে ভেবেছিলাম আজ আপনারা ধীরা আমাকে এখন এই ভাবে অপসারণ করছেন, তাঁরা আমাকে সকল অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন, আপনারাই আমার শক্তিশালী দুর্গতোষণ। কিন্তু এখন আমার জ্ঞানচকু উন্মীলিত।

বার্নার্ড শ' এই নাটকে সুদীর্ঘ উক্তি দিয়েছেন, ছাপার অক্ষরে তা অনেকাংশে আড়াই পাতার বেশী এবং উচ্চারণ করতে সাত-আট মিনিট লাগে, তবু এই সুদীর্ঘ বক্তৃতা শ্রোতারা মন দিয়ে শুনছে। বিশেষ : জেনের উক্তিগুলি এত সুন্দর কাব্যাত্মক ভঙ্গীতে রচিত যে, অভিনয় না দেখে এই নাটক পাঠ করলেও আনন্দ পাওয়া যায়।

জেন যেখানে বলে—You promised me my life ; but you lied. You think that life is nothing but not being stone dead. It is not the bread and water I fear—I can live on bread : when have I asked for more ?...Bread has no sorrow for me and water affliction.....

তার পর উত্তেজিত পুরোহিতপোপী উদ্ভা ও ক্রোধে জেনকে ডাইনী ঘোষণা করে প্রকাণ্ড বাজারে জীবন্ত অবস্থায় আগুনে পুড়িয়ে মারে। এমন নাটকীয় বিষয়বস্তু আর বার্নার্ড শ'র বিচিত্র রচনা-কৌশল দর্শককে আকুল করে তোলে।

কঠিন-স্বন্দয় সমালোচকও তাই স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন Saint Joan বার্নার্ড শ'র শ্রেষ্ঠতম রচনা।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দে এই নাটক রচনাকালে বার বার নানা ছোটোখাটো অনুরোধ বার্নার্ড শ'কে প্রত্যাখ্যান করতে হয়েছে। তিনি বলেছেন, এখন আর কোনো কিছু নয় I must get my Joan of Arc play through the press and on to the stage—for the moment, spare me. I will make good later.

ফ্রান্স ছাড়িয়ে সঙ্গ বার্নার্ড শ'র দীর্ঘ দিনের বন্ধু, তিনি বার্নার্ড শ'র একটি জীবনী লিখেছেন। নিছক ভালোবাসার ধাতিরে নয়, অর্পের প্রয়োজনে। এই জীবনীর পরিশেষে The Saint Joan Row

নামে একটি পরিচ্ছেদে, Saint Joan নাটক সম্পর্কে বার্নার্ড শ'র সঙ্গে তাঁর কি পত্রালাপ হয়েছে এবং কোথায় বিরোধ তা বর্ণিত হয়েছে। বার্নার্ড শ'র অপর একজন জীবনীকার আর্কিবাল্ড হেনডারসন বলেছেন—Saint Joan is the greatest play in english since Shakespearc—ফ্রাঙ্ক হ্যারিস বলেছেন, এই কথাতেই বার্নার্ড শ'র মাথা ঘুরে গেছে। এই নাটক ফ্রাঙ্ক হ্যারিসের মতে ঐতিহাসিক ক্রটি, সাধারণ ভুল ভ্রান্তি এবং নাটকীয় দুর্বলতার পরিপূর্ণ। বার্নার্ড শ' বলেছেন, most other writers made Joan an operatic heroine—a grand opera stunt. What she really was did not interest them—

এর পটভূমিকায় আবার একটি কথা বলা প্রয়োজন, ফ্রাঙ্ক হ্যারিসও জোনের জীবন নিয়ে লিখেছিলেন Joan La Romce—বার্নার্ড শ' এই গ্রন্থ নির্দেশের রচনা বসেছিলেন। পশ্চিমের মানুষেরা কিঞ্চিৎ স্পষ্টবাদী, তাই ফ্রাঙ্ক এ কথাও স্বীকার করেছেন—Shaw did not like my play and that, you may be sure, quite obviously influences my judgment of his Saint Joan.

বার্নার্ড শ' তাঁর Man and Superman নাটক তাঁর বন্ধু এ. বি. ওয়াক্লির নামে উৎসর্গ করেছেন। Saint Joan প্রকাশিত হওয়ার পর Times পত্রিকায় ওয়াক্লি এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখলেন, তিনি এই প্রবন্ধে স্বীকার করলেন, তিনি নাটকটি পাঠ করেননি এবং চোখেও দেখেননি, তবু তাঁর মতে বার্নার্ড শ'র মত মানুষের এমন একটি গভীর এবং মহৎ বিষয়বস্তুকে রূপদানের চেষ্টা হান্তকর। সমালোচনা-সাহিত্যে এমন অভূতপূর্ব উক্তির আর নজীর নেই। যাই হোক, পরে কিঞ্চিৎ ওয়াক্লি নিজের কটা বৃত্তে পেরে লাঞ্চিত হয়েছিলেন।

পৃথিবীর সব দেশেই বন্ধুবান্ধব বন্ধুকে আক্রমণ করে অশোভন ভঙ্গীতে।

ঐতিহাসিকরাও বার্নার্ড শ'র রচনার তথ্যগত ক্রটি সম্পর্কে বলেছেন। মধ্যযুগীয় ইতিহাসের অগাধ পণ্ডিত ডাঃ জি. জি. কুলটন নাটকটিকে উচ্চ প্রশংসা করেছেন কিঞ্চিৎ ভূমিকাটির তীব্র নিন্দা করেছেন। তিনি বলেছেন—

মিঃ শ'র Saint Joan নাটক হিসাবে বিশেষ সাফল্য লাভ করেছে, তাঁর পরিকল্পিত জোন চরিত্র ইতিহাসের ভিত্তিতেই সম্পূর্ণভাবে গঠিত ; তবে তাঁর সুদীর্ঘ ভূমিকাটুকু বালকোচিত বিনোদন করা যেতে পারে। তবু স্বীকার করতে হবে এই নাটক বার্নার্ড শ'র সাধক রচনা।

হুইয়ের গ্যারিক থিয়েটারে ১৯২৩-এর ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে Saint Joan প্রথম অভিনীত হয়। অভিনেত্রী উইনিফ্রেড লেনিহান জোন চরিত্রটিতে অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করলেন। এই নাটকটি অতি দ্রুত মার্কিন দর্শকদের মনে লাগল, তাঁরা বুঝলেন যে একটি মহৎ নাটকের প্রথম প্রদর্শন দেখার সুযোগ তাঁদের মিলেছে। কিঞ্চিৎ সংবাদপত্র ও সমালোচকেরা বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করলেন না, বরং কিঞ্চিৎ বিকঙ্ক মনোভাবই প্রদর্শন করলেন।

প্রথম রজনীতে এমন দর্শকের ভীড় হল যে পরদিন অল্প বয়সকে অভিনয়ের ব্যবস্থা করতে হয়। The Shaw Bulletin নামক শ' সোসাইটি'র মুখপাত্র ডাঃ এলিস গ্রিফিন এই প্রথম রজনীর বিবরণ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, হুইয়ের নাট্য-সমালোচকরা যদি এযুগের মতো শক্তিশালী হতেন তাহলে হয়ত হুইয়ের Saint Joan এর প্রত্য সাফল্য সম্ভব হত না। আলেকজান্ডার উলকট অবশ্য বলেছিলেন—beautiful, engrossing and at times, exalting. আর হুইয়ের তদানীন্তন বিখ্যাত সমালোচক মিঃ ওয়ালটাভ প্রিচার্ড ইটন কিঞ্চিৎ অগূর্ব উক্তি করেছিলেন—Shaw is not only one of the keenest minds in the world to-day, he is one of the most religious men—Saint Joan is the work of a religious soul !

সমসাময়িক কালের বিখ্যাত ইহুদীধর্ম সৎক ও নাট্যকার লুইজী পিরান্দেলো এই সময় হুইয়ের ছিলেন। তিনিও উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন।

নাটক লেখার অনেক আগেই নাট্যকার ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য অভিনেত্রী ষ্টিক কং বেথেছিলেন বার্নার্ড শ'। অনেক আগেই সিবিল অর্গডাইক ক্যানডিডা ভূমিকা চেয়েছিলেন, শ' তখন বলেছিলেন, বাড়ি ঘিরে গিয়ে ঘরকন্নার কাজ করো, চারটে ছুটা ছেলে হোক, তারপর গসে ক্যানডিডার অভিনয় করো। এই উপদেশ পালন



ফোন ৩৪-৩২৩২

পি, সি, আড

জুয়েলার

১২৫-বি. বহু বাজার ফীট-কলিকাতা-১২

করে ফিরে এসে ক্যানডিডা অভিনয় করেন। যুদ্ধের পর তাঁর স্বামী লুইস ক্যাসন ও তিনি কয়েকটি জনপ্রিয় নাটক মঞ্চস্থ করেন।

সেই নাটকগুলি কিন্তু ব্যবসার দিক থেকে তেমন সাফল্য লাভ করেনি। থর্গডাইক দম্পতি স্থির করলেন The Cenci নাটকের ম্যাটিনী প্রদর্শনীর বন্দোবস্ত করবেন। সবাই বলেছিল এই নাটক খোবো না, একেবারে ভুল হবে না, বন্ধুণা বলাগেন তোমরা সর্বনাশ ডেকে আনছো। কিন্তু তাঁদের তখন খবরদার মনি আর বাঁচি এই নাটকই যাবা যাক। The Cenciর জনে গেল, এমন কি আগেকার জনপ্রিয় নাটকগুলির ক্ষতিপূরণ হল এই নাটকের সাফল্যে। আর এই নাটকের ভগ্নাই থর্গডাইক পোলন তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ভূমিকা, সিভিললিটি থর্গডাইকের অভিনয় দেখে শ' মুগ্ধ হলেন। তাকেই 'জোনে'র ভূমিকা দেওয়া স্থির করলেন।

সিভিল থর্গডাইক আর তাঁর স্বামী লুইস ক্যাসনকে বার্নার্ড শ' আহ্বান করলেন। এরাই সেট করেছেন বাসভবনে। সেদিন বার্নার্ড শ' তাঁদের কাছে Saint Joan পাঠ করে শোনালেন। এই দিনটি সিভিল থ'র মনে অপরীত হয়ে রইল।

সিভিল বলেছেন—কি অপূর্ণ তাঁর আবৃত্তি, যেন এক আশ্চর্য সুরকারের কণ্ঠে এক মধুর সঙ্গীত শুনছি, তিনি জানেন কোথায় কি সুর, প্রতিটি লাইন সেন এক অপূর্ণ সঙ্গীত। প্রতিটি চরিত্র অকল্পিত বিভিন্ন যন্ত্রের মত সুর সৃষ্টি করেছে। আর যাহুকর বার্নার্ড শ' জানেন কখন কি সুর বাজাতে হবে। সেই সুরতরঙ্গ আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞতা।

এই নাটক বার্নার্ড শ'র কণ্ঠে বার বার তিন বার শুনেছেন সিভিল থর্গডাইক, আর নাট্যকারের কাছ থেকে নিজস্ব ভূমিকাটি আরও করে নিয়েছেন। আর কোনও অভিনয়ীর জীবনে এই সুযোগ আসেনি এবং বার্নার্ড শ'র মতে এমন সাধকভাবে কোনো চরিত্র কেউ এভাবে অভিনয় করে নি।

লণ্ডনের নিউ থিয়েটারে ১৬শে মার্চ ১৯২৪ এই নাটক সর্বপ্রথম অভিনীত হয়। রোমান ক্যাথলিক এবং প্রটেস্ট্যান্ট উভয় দলই এই নাটককে সমান মর্যাদা দান করেছেন, নাট্যকালিনয় দেখে খুসী হয়েছেন। কেউ কেউ প্রশ্ন করেছেন, আপনি রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত হবেন নাকি? জবাবে বার্নার্ড শ' বলেছেন—“রোমান ক্যাথলিক চার্চে ত 'আর দুজন পোপের স্থান হবে না, তাহলে হয়ত তাই হতাম।” লুইসকে উইনিয়র্ড লেনিহান আর লণ্ডনে সিভিল থর্গডাইক (পরে ভেম সিভিল থর্গডাইক), দুজনেই সমান খ্যাতি অর্জন করেছেন জোনের ভূমিকায় অভিনয় করে। এই অভিনয়ের ফলে পুরুষের পক্ষে যেমন 'হামলেট' নাটক হামলেটের ভূমিকা তেমনই মেয়েদের পক্ষে Saint Joan নাটকের জোন চরিত্র। ১৯৩১-এ লণ্ডনে এই নাটক যখন নতুন করে মঞ্চস্থ হল তখন আবার অনেক সপ্তাহ চলেছিল।

বিহার্সেলের সময় বার্নার্ড শ' সিভিল থর্গডাইককে প্রশ্ন করলেন—
জোন সম্পর্কে কোনো বই পড়েছ নাকি?

সিভিল বললেন—হ্যাঁ, যা সংগ্রহ করতে পেরেছি সবই পড়ে ফেলেছি।

উত্তরে শ' বললেন—তাইলে, সব ভুলে যাও, আমি মূগু দলিলকে নাটকায়িত করেছি।

সবাই জোনকে নিয়ে এতদিন রোমাঞ্চ সৃষ্টি করেছে, আমি ঠিক যেমনটি ঘটেছে তাই বলেছি। আমার মনে হয় যা নাটক এতাবৎ লিখেছি এই নাটক সবচেয়ে সহজ। আমি তথ্য সমাবেশ করেছি, জোনকে টেক্সের উপযুক্ত করে পরিবেশন করেছি। বিচার দৃষ্ট আসল বিচার দৃষ্টেরই রিপোর্ট। আমি জোনের প্রতিটি কথাই ব্যবহার করেছি, যেমনটি বলেছে, যেমন করেছে।

বার্নার্ড শ'কে আমেরিকার থিয়েটার গিল্ড, অল্পবোধ করেছিলেন Saint Joanকে কিঞ্চিৎ কাটছাঁট করে ছোটো করতে, কারণ অভিনয় শেষ হতে মধ্যরাত্রি হয়ে যায়। বার্নার্ড শ' জবাবে বলেছিলেন, হয় একটু আগে অভিনয় শুরু করো, নয় রাতের শেষ ট্রেনের সময় কিঞ্চিৎ পিছিয়ে দাও।

বলা বাহুল্য, দর্শকের অভাব ঘটেনি। কি ছাউনেকে কি লণ্ডনে সাধারণ দর্শক Saint Joan অভিনয় দেখে অভিভূত হয়েছে। লুইসী পিবাস্কলো এই নাটকের অভিনয় দেখে তাই বলেছিলেন—
ইতালীয় রঙ্গমঞ্চ যদি Saint Joan এর চতুর্থ আঙ্কর মধ্যে বলিষ্ঠ অংশ অভিনীত হত তাহলে উপস্থিত দর্শকমণ্ডলী উল্টে দাঁড়াইত এবং যবনিকা পতনের পূর্বেই আনন্দে আত্মহারা হয়ে উল্লসের মধ্যে করতালি দিয়ে উঠত।

তিন বার এই নাটক পুনরুজ্জীবিত হয়েছে, তিন বারই তার সাফল্য ঘটেছে অসামান্য। Pygmalion নাটকের সাফল্য এই নাটকের কাছে নান হয় গেছে।

এখন থেকে বার্নার্ড শ' Saint Joan নাটকের নাট্যকার হিসাবেই প্রতিষ্ঠিত হলেন। যখন কেউ প্রশ্ন করতো আপনি জোনের জগৎ এত দূর গেলেন কেন? শ' জবাবে বলেছেন—কারো জগৎ বা কোনো কারণে আমি কখনো কিছু করিনি। আমি কবি, চূর্ণকামের বেপারি নই (I am a poet and not a soot and white wash merchant), যা জোনের প্রাণ্য তাকে দিয়েছি আর যা অপরের তা দিয়েছি তাদের। নাট্যমঞ্চকে এতদিনে তাঁর আপন আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছি।

নাট্যকার হিসাবে তাঁর খ্যাতি ও প্রতিপত্তি এইবার সুপ্রতিষ্ঠিত হল। জর্জ বার্নার্ড শ' এখন মনীষী, মহাপুরুষ, মহাজন। তাঁর পাকানাড়ি, জলন্ত উজ্জল-নীল চোখ এবং স্বচ্ছ স্নানোদেহ সেন যুদ্ধের আবৃত্তি চিরযৌবনের প্রতিমূর্তি। ভলন্তয়র বলেছেন—
'Sages, once acclaimed, retired into solitude to become sapless with ennui—' বার্নার্ড শ' এই উক্তির বাস্তবিক্রম। তাঁর সমগ্র কর্ম সাহিত্য-জীবনের চরম পরিণতিব কাল ১৯২৪। তাঁর মর্যাদার সীমা নেই। যা তিনি বলেন তা লোকে সজ্ঞ চিন্তে শোনে, সপ্তমতঃ তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ লক্ষ্য করে। যা কিছু তাঁর উক্তি সবই সারা পৃথিবীতে তারমোগে প্রচারিত হয়, বিশ্ববাসী তা উপভোগ করে, গ্রহণ করে। তাঁর বসিকতা, তাঁর অমৃত বক্তোক্তি, বিশ্বমানবের মনে জ্ঞানসাধকের বহু চিন্তা ও সাধনা লব্ধ বাণী হিসাবে গ্রহণ করে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে সমর-দপ্তর (ওয়ার অফিস) তাঁকে অল্পবোধ জানার আপনায় তিনখানি শ্রেষ্ঠ নাটক নির্বাচন করে দিন,

সময়ের মধ্যে বিতরণ করা হবে। বার্নার্ড শ' সমালোচকের দ্বিতীয় নটিকারলীর বিচার শুরু করলেন। কিন্তু মন স্থির করা কঠিন। তিনি বললেন, এর কারণ, আমি ত' আর স্ক্রলমাষ্টার ত' যে পরীক্ষার খাতার নথর দেব। বিভিন্ন নটিকের বিভিন্ন দশ ভালো লাগে। তাদের পিছনে আছে ভাবাবেগমিশ্রিত ইতিহাস। Mrs. Warren's profession ও The snewing up of Blanco posnet—নটিক দুটি নিষিদ্ধ হয়েছিল। Candida এবং Man and Superman নটিকে গ্রাণ্ডিল রপ্তারের অভিনয়ের স্থিতি বিজড়িত। Arms and the Man নটিকে প্রিয় বন্ধুদের নিয়ে বসিকতা করেছেন, আর Back to Methuselah নটিকে বার্নার্ড শ' তাঁর সমগ্র জ্ঞানভাণ্ডার উজাড় করে দিয়েছিলেন, 'কঠিন দেবায় হবিধা বিধেয়?' 'কারে রাগি, কামে দেবি কে বেশী স্মরণ?' বার্নার্ড শ'র মনে হল এর চেয়ে সমস্তকণ যদি হস্তবোধ করতো নতুন নটিক লেখার, কাজটা অনেক সহজ হত। তাঁর মতো স্রোযোগ্য ভাবে কে আর সে কাজ পারেন।

অপেক্ষে নিদাচিত হল, Androcles and the Lion। Pygmalion আর Saint Joan। এর কারণ এই তিনটি নটিকেই আছে করণ আবেদন। এই নিদারুণ দুঃসময়ে এই নটিকের আবেদনই সর্বাধিক। তিনি শুধু একটি মাত্র কাজের জ্ঞানলেন এই সব নটিকের 'ভূমিকার' অংশটুকুই বাদ দেওয়া চলবে না। ভূমিকাগুলিই বিচিত্র। Androcles and the Lion নটিকের প্রথম পৃষ্ঠায় আছে—

I am ready to admit that after contemplating the world and human nature for nearly sixty years, I see no way out of the world's misery but the way which would have been found by Christ's will if he had undertaken the work of a modern practical statesman.

আমি শেষ গ্রন্থ Saint Joan নটিকের শেষ কথা সেট জোনের কর্তৃক আবুল প্রার্থনা না আর্ডনান—?

O god that madest this beautiful earth, when it will be ready to receive thy Saints? How long O Lord, how long?

সেই চিরন্তন প্রশ্ন হে ঈশ্বর! কত দিন? আর কত কাল?

Saint Joan এর ফলে খ্যাতির সর্বোচ্চ শিখরে উঠলেন তর্ক বার্নার্ড শ'। এই ১৯২৪-এ তিনি বন্ধুবিয়োগ জনিত নিদারুণ কষ্টে পেলেন। আজীবন সহযোগী বন্ধু উইলিয়াম আর্চার, বিপদে, সম্পদে যিনি বার্নার্ড শ'কে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন তিনি ইং ১৯১৪-এর ১৭ই ডিসেম্বর নার্সিং হোম যাত্রার প্রাক্কালে বার্নার্ড শ'কে লিখলেন—

—তোমাকে চিঠি লেখার পর জানা গেল, ক'দিনের ভেতর একটা অপারেশন করানো প্রয়োজন। কাল নার্সিং-হোমে যাচ্ছি। অপারেশন—তেনন গুরুতর নয়, আমার শরীরও বেশ ভালো। সুতরাং বেশ উন্নত আশা রাখি। তবু বিপদের কথা বলা যায় না, তাই এই ক্ষেত্রে হ-একটা কথা বলাই সুযোগ নিচ্ছি, তুমি ত জানো যে

মাঝে মাঝে তোমার হিতৈষী সংশোধক হিসাবে কিছু বললেও তোমার প্রতি আমার শ্রদ্ধা বা ভালোবাসা কখনও কখনও হ্রাস হয়নি। কখনো এ কথা ছাড়া আর কিছু ভাবিনি যে অদৃষ্টকমে তোমার মত একজন সমসাময়িক বন্ধু লাভ করেছি। সুদীর্ঘ চল্লিশ বছরের বন্ধুত্বের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। ইতি তোমার

ডব্লু. এ—

কিন্তু আর্চার বাই ভাবুন, সে যাত্রা তিনি রক্ষা পেলেন না, ২৭শে ডিসেম্বর নার্সিং-হোমেই তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। বার্নার্ড শ' সে সময় বিদেশে বেড়াতে গেছেন। এমন এক বন্ধুর মৃত্যু সংবাদে ক্ষিপ্ত হলেন বার্নার্ড শ', তিনি বললেন, আর্চারকে হত্যা করা হয়েছে।

উভয়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য অনেক, মতের অমিল অনেকখানি, তবু উভয়ের বন্ধু। গভীর ভালোবাসায় দুজনের জীবনযাত্রা বাঁধা, তাই লগুন ফিরে এসে বার্নার্ড শ' ধরেছিলেন—যাচাঁরহীন লগুন ফিরে এসে মনে হচ্ছে এ মনে এক নতুন যুগে এসেছি, এই পরিবেশে আমি প্রয়োজনাত্মিক উদ্ভব মাত্র। এখনও মনে হয়, আর্চার আমার জীবনের একটা বড় অংশ সঙ্গে নিয়ে গেছে।

উইলিয়াম আর্চারের বিয়োগবেননা বার্নার্ড শ'র মনে যে আনাত করেছিল, ঘনিষ্ঠতম আত্মীয় বিয়োগও তিনি তেমন বিচলিত হননি। চল্লিশ বছরের বন্ধুত্বের মধ্যে কত মান-অভিমান, কত

বাসবী বন্ধুর

বন্ধনহীন গ্রন্থি

দাম ছ' টাকা মাত্র।

'বন্ধনহীন গ্রন্থি' একখানি বহু পৃষ্ঠার উপভাস। কিন্তু এই উপভাস-খানির মধ্যে লেখিকা এমন একটি ঘটনার অবতারণা করেছেন যার মধ্যে এতটুকু শিথিলতা ও শালীনতার অভাব প্রকাশ পেলে বক্তব্যটি সম্পূর্ণ বার্থতার পর্যবসিত হ'ত। সাহিত্যক্ষেত্রে একজন নবাগতা লেখিকার পক্ষে আশ্চর্য্য সূন্দর লিখন শক্তির পরিচয় পাঠকমাত্রকেই বুঝ করবে। যে কাহিনীর তিনি অবতারণা করেছেন, সসারে এখন কাহিনী বিরল সন্দেহ নেই, কিন্তু তা অবাস্তবও যে নয়, লেখার মাধুরী দিয়ে, মমতা দিয়ে আর বক্তব্যের দৃঢ়তা দিয়ে তা প্রমাণ করে দিয়েছেন তিনি। এই প্রমাণের সাক্ষ্য নায়ক নাটিকা অজর ও কণিকার চরিত্র দু'টি অত্যন্ত জীবন্ত হয়ে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেছে। এই অজর ও কণিকা স্বামী-স্ত্রী। দীর্ঘদিনে শান্তিপূর্ণ বিবাহিত জীবন বাপনের পর দু'টি সন্তানের মা কণিকা একদিন স্বামী অজরের কাছে প্রকাশ না করে পারে না, বিবাহ-পূর্বকালে তার অনিচ্ছাকৃত পদাশ্রয়ের কথা; শুধু পদাশ্রয় নয়, তার এক মেসোমহাশয়ের উন্নয়ন জীবিত এক কস্তুর কথা। অকস্মৎ মর্মান্তিক এই কথা ডাক্তার স্বামী অজরকে কি ভাবে যে আঘাত করে তা সহজেই অনুমেয়। দ্বী কণিকাও যে অবস্থার মধ্যে দু'টি সন্তানের গর্ভধারণী হয়ে প্রাণপ্রিয় স্বামীর কাছে এই স্বীকারোক্তি করতে বাধ্য হয় তা যেমন গুরুত্বপূর্ণ ও উদ্বেজনামূলক, তেমনি স্তম্ভস্পর্শী।—বন্ধনহীন ১৮.১.৫৯ প্রকাশক: বলাকা প্রকাশনী, ২৭সি, আমহার্ট স্ট্রীট, কলিঃ-২

ছোটোখাটো স্বপ্ন-ভূষণ, কত ঘনিষ্ঠ ইতিহাস বিজড়িত তা বার্নার্ড শ' বুঝেছিলেন বলেই এত কাতর হয়ে পড়েছিলেন।

উইলিয়াম মরিসের মৃত্যুর পর শ' লিখেছিলেন—**You can loose a man like that by your own death, but not by his** উইলিয়াম আর্চারের মৃত্যুতে এই শোক আরো গভীরভাবে বেজেছে, তার আর একটি কারণ তত দিনে বার্নার্ড শ'র বয়স অনেক বেড়ে গেছে, অনেক আত্মীয় ও বন্ধুজনের বিচ্ছেদ-বেদনা তাঁকে বার বার আঘাত করেছে, তার সব চেয়ে বেশী কারণ হয়ত আর্চারের সর্বশেষ চিঠিখানি। মৃত্যুর পূর্ণ মুহূর্তে হয়ত মানুষ তাঁর অন্তিম মুহূর্ত আসন্ন বুঝতে পারে।

ত্রিশ

সুইডিস আকাদেমির নোবেল কমিটির চেয়ারম্যান ডঃ পার ইলস্ট্রোম ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে সাহিত্যের জন্ম বার্নার্ড শ'কে নোবেল পুরস্কার দানের কথা উল্লেখ করে লিখলেন—

জর্জ বার্নার্ড শ' তাঁর তরুণ বয়সে ত্রিখিত উপজাতি পৃথিবী ও তার সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে যে মনোভঙ্গী প্রকাশ করেছিলেন তাঁর সেই ধারণার তিনি আজও অপর্যাপ্ত আছেন। তিনি গণভক্তের রাজদরবারে পেশাদারী দরবার, এই স্থায়ী অভিযোগের বিরুদ্ধে এই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিবোধ ব্যবস্থা। তাঁর উজ্জ্বল শানিত সরসতা মানুষকে বিভ্রান্ত করে। তিনি যা বলেন তা সবই বসিকতা মনে হবে। সবাই হেসে উড়িয়ে দেয়। বার্নার্ড শ'র এই নিষ্পৃহ ভঙ্গী তাঁর বিচিত্র রসকৌশল, মানুষের হাসিয়ে তিনি বিভ্রান্ত করেন যা তাঁর আসল বক্তব্য তা সত্য দরতে দেন না।

এই সমস্ত পুষ্টির কালে বার্নার্ড শ'র জীবনে অনেক সম্মান এসেছে। প্রায় বসিত হওয়ার উপক্রম হল। সরকারী জগতের কাছে সমস্ত বছরই বোধকরি বিচারের পক্ষে যথাযোগ্য। সাহিত্যের স্বীকৃতিতে প্রদত্ত নোবেল প্রাইজ তিনি প্রত্যাখ্যান করলেন। যে লেবর পাটি গঠনে একদা তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, সেই লেবর পাটি ক্ষমতার আসীন হয়ে তাঁকে পীড়িত দান করতে চাইলেন, লর্ড বার্নার্ড শ' তাঁর পছন্দ নয়, তিনি জবাবে বললেন তোমরা আমাকে ন্যূনপক্ষে হয়ত ডিউকহু দিতে পারো, কিন্তু আমার পোষাবে না, সঠিক না। তখন হাঁবা বললেন, তাহলে Order of merit নাও। বার্নার্ড শ' উত্তরে জানালেন, I have already conferred it on myself। তাঁর বন্ধুরা কিন্তু ভীষণ আহত হলেন এই উক্তিতে।

হুনিভারসিটির অনারারি ডিগ্রীও বার্নার্ড শ' নিতে চাইলেন না, বললেন যে সব মানুষ উপাধি ও ডিগ্রীর জন্ম অপ্রাপ্ত খেটেছেন তাঁদের অপমান করা হবে, কারণ বিনা পরিশ্রমেই নিছক সম্মানের

খাতিরে অপরে বিনামূল্যে ও বিনা মাতুলে উপাধি পাবে, এ কেমন কথা।

বার্নার্ড শ' অনেক বয়সে, নব্বই বছরের প্রান্তে এসে গ্রহণ করলেন Freedom of Dublin, এই তাঁর জন্মস্থানের সম্মান। অথচ আশ্চর্য তিনি এই জায়গাটা অপছন্দ করতেন। যে অঞ্চলে বাস করতেন সেই বরো সেন্ট প্যানক্রাস তাঁকে সম্মানিত করল Freedom of the borough of St. Pancras উপাধিতে, এই বরোতেই তিনি একবার কাউন্সিলর হয়েছিলেন। আরো ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ২০শে জুন গ্রহণ করলেন Freeman of the city of London। লন্ডন করার বিষয় এর সবগুলিই নাগরিক সম্মান, তার জন্মভূমি, বাসস্থান এবং বিচরণ ক্ষেত্রের প্রদত্ত সম্মান।

নোবেল প্রাইজ গ্রহণে আপত্তির কারণ যে কোনো উপাধি বা পুরস্কার নিতেই বিতর্ক। এখন তাঁর যথেষ্ট সম্পত্তি, লেখক হিসাবে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা। ৬,৫০০ পাউণ্ডের চেক ফেরৎ দেওয়ার সময় বললেন, আমার পাঠক এবং নাটকের সমর্থকরাই আমার ভরণ পোষণের ভার নিয়েছে, এই চেক যেন তাঁরে উত্তীর্ণ সঁাতারকে লাইফবেল্ট ছুঁড়ে দেওয়া (a life-belt thrown to a swimmer who has already reached the shore in safety.)

৬,৫০০ পাউণ্ড, সুইডিস ক্রোনা ১১৮,১৩৫। বার্নার্ড শ'কে বহু প্রার্থী এই টাকার জন্ম পত্র লিখতে লাগল, সবাই বলে, তুমি না নাও, নিয়ে আমাদের দাও, আমাদের এত অভাব, এত সংকর্ণ করার আছে ইত্যাদি। ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের চিঠিতে ঘর বোঝাই হয়ে গেল। বার্নার্ড শ' বলেছেন—ডিনামাইট আবিষ্কারকের অজিরা আমাকে নোবেল প্রাইজ দেওয়ার পর প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোক আমাকে চিঠি লিখে বলেছে—টাকাটা নিয়ে আমি যেন তাদের দিয়ে দিই। অথচ আমি দাতাদের টাকাটা ফেরৎ দিলাম। তখন সবাই লিখল যেহেতু যদি দিলাম, ওদের ১৫০০ পাউণ্ড হিসাবে তিন বছর ধরে কর্তৃক দিয়ার না কেন?

যাই হোক বার্নার্ড শ' সুইডিস-সাহিত্যের প্রচারের জন্ম Anglo-Swedish Literary Foundation স্থাপন করলেন, সুইডিশ ক্রাউন প্রিন্স তার পৃষ্ঠপোষক। ১৯২৯ এ আগস্ট ষ্ট্রীওবার্গের চারখানি নাটকের তর্জমা প্রকাশ করলেন এই ফাউন্ডেশন, ১৯৩৯-এ আরো সাতখানি গ্রন্থ অনূদিত হল, তার মধ্যে তিনটি ষ্ট্রীওবার্গের নাটক। যুদ্ধান্তে ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে আরো কয়েকটি গ্রন্থ অনূদিত ও প্রকাশিত হয়েছে। নোবেল প্রাইজ সত্ত্বে বার্নার্ড শ'র বিখ্যাত উক্তি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য:—**I can forgive Alfred Nobel for having invented dynamite. But only friend in human form could have invented the Nobel prize!**

[ক্রমশঃ ।

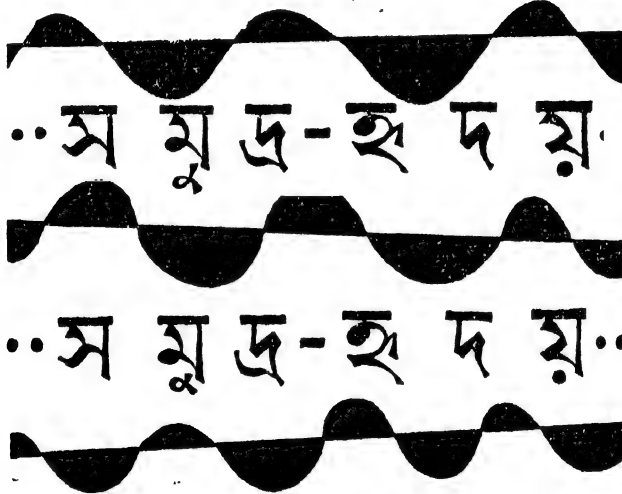
... এ ক্ষেত্রে প্রচুদপট ...

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে পাঠকতা পাঠিকার আলোকচিত্র মুদ্রিত হইয়াছে।

আলোকচিত্রশিল্পী বিত চক্রবর্তী।

প্রতিভা বসুর নতুন উপন্যাস

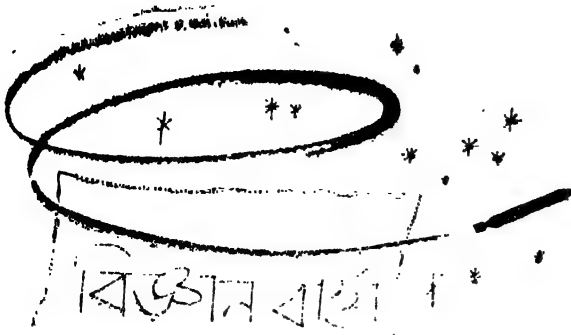
প্রতিভা বসু বাংলা কথাসাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। কোনো গুরুভার তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা নয়, নয়নারীর চিরন্তন প্রেমসত্তাই তাঁর প্রিয় বিষয়বস্তু; জীবনের উজ্জ্বল শুভক্ষণের আনন্দকণিকা আহরণেই তাঁর অক্লান্ত আগ্রহ। আধুনিক প্রেমের পরিভাষায় প্রতিভা বসুর ‘মনের ময়ূর’ ‘মাধবীর জন্ম’ ‘বিবাহিতা স্ত্রী’ ‘তিন তরঙ্গ’ ‘মেঘের পরে মেঘ’ ইত্যাদি গ্রন্থের সরস ও স্বচ্ছ কাহিনীগুলিতে নারী-হৃদয়ের, বিশেষ করে বাঙালী নারী-হৃদয়ের যে কোমল নিখার রূপাঙ্কিত হয়েছে সমকালীন সাহিত্যে তার তুলনা বিরল।



‘স মু দ্র-হৃ দ য়’ প্রতিভা বসুর সর্বাধুনিক উপন্যাস। দুটি বিকল্প হৃদয়ের আশ্রয়গিরি থেকে এই অপ্রত্যাশিত কাহিনীর জন্ম। নবাব সুলতান আমেদের ভালো লাগার আলো কি করে ভালোবাসার আগুনে আহুতি হ’লো আর নবাবের সবুজমহলে বসিনী তেজস্বিনী সুলেখা তালুকদারের চিরসঞ্চিত অন্ধ আক্রোশ অবশেষে কোন অতলাস্ত যমতার আকুল উষ্মে, ‘সমুদ্র-হৃদয়’-এর নিয়তি-নির্দিষ্ট পরিসমাপ্তিতে তা সজল বিধুর রেখায় আঁকা পড়েছে ॥ দায় : চার টাকা ॥

নাতানা

॥ নাতানা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেডের প্রকাশনী বিভাগ
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৩



বৈজ্ঞানিক পাস্তুর

জি তোমাদের কাছে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পাস্তুরের সম্বন্ধে—একটি কথা বলছি। পাস্তুরের নাম তোমরা অনেকই শুনেছো। বড় ভাইয়ের তাঁর সম্বন্ধে অনেক কথা জানতে পারবে। বিজ্ঞানের পুণ্য পাস্তুরের নাম অধিকার লেখা রয়েছে।

পাস্তুরের পুরো নাম হলো লুই পাস্তুর। ফ্রান্সের ডোলে নামক স্থানে ১৮২২ খৃষ্টাব্দে বৈজ্ঞানিক লুই পাস্তুর জন্মগতন করেন। তখন কে জানতো এই ক্ষুদ্র শিশুটিই একদিন ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক হিসাবে পরিগণিত হবেন? লুই পাস্তুরের বাবা ছিলেন একজন সামান্য লোক। তিনি ছিলেন চর্ম-ব্যবসায়ী। এই ব্যবসা করে তিনি সংসার নির্বাহ করতেন। ছেলেবেলা থেকেই লুই পাস্তুরের লেখাপড়ার দিকে ছিল অসীম আগ্রহ। তাঁর পিতা দেখলেন ছেলের তো পড়াশুনার ভারী মন! তিনি মনে মনে উপলব্ধি করলেন যে, ছেলে নিশ্চয়ই একদিন বড় হয়ে উঠবে—তাঁর মুখ উজ্জ্বল করবে। ইংরাজিতে একটা কথা আছে—“Childhood shows the man.” কথাটির আসল অর্থ হচ্ছে যে, কোন্ লোক ভবিষ্যতে কি ধরনের হবে, এটা তাঁর বাল্যকালের স্বরূপ দেখলেই বুঝতে পারা যায়। উপরের কথাটি লুই পাস্তুরের সম্বন্ধে প্রয়োগ করা যেতে পারে। শৈশবেই তাঁর প্রতিভার পরিচয় সকলেই পেয়েছিল। লুই পাস্তুর যে একদিন বিখ্যাত লোক হবেন, এটা তাঁর বাবার মনে একেবারে বসেছিল। তিনি লুই পাস্তুরকে ফ্রান্সের সবচেয়ে ভাল বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দিলেন। বিদ্যালয়টির নাম হচ্ছে—“ইকোলে নর্মাল”। লুই পাস্তুর এখানে খুব ভালভাবে পড়াশুনা শেষ করে ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে স্ট্রাটসবার্গে রসায়নবিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন। রসায়নশাস্ত্রের প্রতি তাঁর ঐক্য ছিল ছেলেবেলা থেকেই। পরে তিনি রসায়নবিজ্ঞানের গবেষণা করে “ডক্টরেট” উপাধি পেলেন। পিতার আশা পূর্ণ হলো। বৈজ্ঞানিক লুই পাস্তুরের নাম ফ্রান্সে ছড়িয়ে পড়লো। ফ্রান্সের অগ্রগত বৈজ্ঞানিক হিসাবে গণ্য হলেন তিনি। পিতা আনন্দে আকুতারা হয়ে উঠলেন। হবারই তো কথা! পুত্রের এ-হেন উন্নতিতে কোন্ পিতা আনন্দিত না হয়ে থাকতে পারেন?

লুই পাস্তুর তাঁর জীবনে অনেক কিছু আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁর সমস্ত আবিষ্কারের কথা এখানে বলা সম্ভব নয়। যে আবিষ্কারের জন্য লুই পাস্তুর সারা পৃথিবীতে সন্মান অর্জন করেছেন, সেই আবিষ্কারের কথা এখানে বলছি। লুই পাস্তুর জ্বালাতন রোগনিবারক সিরাম আবিষ্কার করেছিলেন। তোমরা অনেকই জ্বালাতন রোগের

নাম শুনে থাকবে। ইংরাজিতে এই রোগটিকে বলা হয়—“Hydrophobia”.

পাগলা কুকুরের বা শিয়ালের বিবে জ্বালাতন রোগ হয়। শুধু কি তাই? এই রোগে মৃত্যু অনিবার্য। তাখো, কী ভীষণ এই রোগ! লুই পাস্তুরের আগে এই রোগের কোন ঔষধ বের হয়নি। কাজেই তখন বহু লোক এই রোগে মারা গেছে। লুই পাস্তুর এ-হেন রোগের প্রতিষেধক ইন্জেকশন বের করলেন। পাগলা কুকুরের দাগ আক্রান্ত একটি ছেলের উপর তিনি এই ইন্জেকশন প্রয়োগ করলেন। খুব দ্রুত বস গেলেন তিনি। ছেলেটি শুধু হয়ে উঠলো, ছেলেটির জ্বালাতন রোগ হলো না। ছেলেটি বাঁচল, লুই পাস্তুরের নাম চারমুখে ছড়িয়ে পড়লো। দেশ-বিশেষ থেকে বহু লোক আগ্রহে লাগল তাঁর কাছে। সারা পৃথিবীতে লুই পাস্তুর এক যুগান্তকারী কাজ করলেন। লুই পাস্তুর সারা পৃথিবীর লোকদের বাঁচালেন। তাঁর ভীষণ রোগের হাত থেকে, সত্যিই তিনি মহা!

আজ লুই পাস্তুর নেই। তাঁর দেহ পৃথিবীতে নেই মর্ত্য-লোকে। তিনি জন্মের হোয়ে আছেন বিজ্ঞানের পুণ্যায়। তাই তাঁর মৃত্যু নেই। —ঈশ্বরেশনাথ মৈত্রী

কৃত্রিম উপগ্রহ

গত ৬ই অক্টোবর তারিখে পৃথিবীর সকল দেশের সংবাদপত্রের শিরোনামায় বোধ করি একই সংবাদ পরিবেশিত হইয়াছিল, আর সে সংবাদটি হইতেছে—সোভিয়েট ইউনিয়ন কর্তৃক সর্বপ্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ সৃষ্টি। রাশিয়ার এই সাফল্যে বিশ্বের কোন সংবাদপত্র মন্থন করিল—“Russia wins space race.” কেহ বা লিখিল—“East has beaten West in putting first man made moon.” আমেরিকার New York Herald Tribune মন্তব্য করিল—“A grave defeat for America... The Soviet satellite meant that the U. S. had lost its supremacy in scientific research and development.”

মস্কো বেতার থেকে সর্বপ্রথম এই কৃত্রিম উপগ্রহ সৃষ্টির কথা ঘোষণা করা হয়। সোভিয়েট সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান Tass-এর এক খবরে বলা হয় যে, গত ৪ঠা অক্টোবর তারিখে সোভিয়েট ইউনিয়ন সর্বপ্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ সৃজনে সাফল্যলাভ করিয়াছে। উপগ্রহটি এখন পৃথিবীর ৫৬০ মাইল উপর দিয়া ঘণ্টায় ১৭০০০ মাইল বেগে মাত্র ১৫ মিনিটে পৃথিবীকে “ডিম্বাকার কক্ষপথ” (Elliptical orbit) একবার করিয়া প্রদক্ষিণ করিতেছে। সংবাদ আরও প্রকাশিত হয় যে, কৃত্রিম উপগ্রহটি গোলাকার, ব্যাস ২৩” ইঞ্চি, ওজন ১৮৩ পাউণ্ড এবং উহা বিদ্যুৎবাহক সহিত ৬৫ কোণ করিয়া ঘুরিতেছে। Tass-এর এই সংবাদ যে সত্য তাহা অচিরেই প্রমাণিত হইয়াছে, কেন না, কৃত্রিম উপগ্রহ হইতে প্রেরিত বেতার সংকেত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমগ্র বহু রাজ্যই পাইয়াছে এবং এখনও পাইতেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সোভিয়েট ইউনিয়ন অপেক্ষা মহাশূন্য পরিক্রমা (Space Travel) বিষয়ে পিছাইয়া আছে, এ কথা তাহারা নিজেরাই স্বীকার করিয়াছে।

সোভিয়েট ইউনিয়নের এই সাফল্যে সমগ্র বিশ্ব আজ স্তম্ভিত! মানুষের প্রচেষ্টা, সাধনা ও তিত্তিকা কতদূর ফলপ্রসূ হইতে পারে, বোধ করি ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। বিধাতার সৃষ্ট শ্রেষ্ঠ কীর্তি ক্ষুদ্র মানুষ তাহার বৃহৎ বুদ্ধির ফলে দিনের পর দিন যে অপ্রতীত

ফোন : ৩৪-২৯৯৫

এই ভাবে মানুষ দিনের পর দিন মহাশূন্যে পরিক্রমা বিবরে জ্ঞানলাভের নিমিত্ত চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে। কাজেই আজকের সোভিয়েট রাশিয়ার এই কৃতিত্বের পিছনে রহিয়াছে দীর্ঘদিনের সাধনা আর প্রচেষ্টা।

এইবার উপগ্রহের বিষয় আলোচনা করিব। উপগ্রহ কি? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে সৌরজগৎ সম্বন্ধে আলোচনা করা দরকার। সূর্য্য ও তারার নয়টি গ্রহকে লইয়া আমাদের সৌরজগৎ গঠিত। এই গ্রহগুলি সূর্য্য হইতে ভিন্ন ভিন্ন দূরত্বে থাকিয়া বিভিন্ন সময় ধরিয়া সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। ইহাদের পরিক্রমণকাল বিভিন্ন (different) হইলেও কিন্তু নির্দিষ্ট (fixed)। পরিক্রমণকালে সূর্য্যের সহিত এই নির্দিষ্ট ব্যবধানকে লঙ্ঘন করিবার ক্ষমতা গ্রহগুলির নাই। ইহার কারণ, সূর্য্য বিপুল আকর্ষণবলে গ্রহগুলিকে নিজের দিকে টানিতেছে। ফলে গ্রহগুলি কক্ষচ্যুত হইতে পারিতেছে না। সৌরজগতের গ্রহগুলির অবিকারশেরই আবার এক বা একাধিক উপগ্রহ আছে। উপগ্রহগুলি আবার গ্রহের আকর্ষণে গ্রহেরই চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। পৃথিবীর উপগ্রহ একটি চন্দ্র। যত্নপক্ষে সূর্য্যের সহিত গ্রহের যে সম্বন্ধ, গ্রহের সহিত উপগ্রহের সম্পর্কে অনেকটা অমুরূপ। তবে সূর্য্যেরই একমাত্র আলোকদানের ক্ষমতা আছে, অপরপক্ষে গ্রহগুলি সূর্যালোককেই আলোকিত, ইহাদের নিজস্ব কোন আলোক নাই। মানুষের তৈরীকৃত কৃত্রিম উপগ্রহের সম্বন্ধে এইবার কিছু বলিবার চেষ্টা করিতেছি।

কৃত্রিম উপগ্রহের আকার ও আয়তন

সাধারণতঃ ইহার ব্যাস হইতে ১৪" ২০" ইঞ্চির মধ্যে (সোভিয়েট নির্মিত উপগ্রহটির ব্যাস ২৩" ইঞ্চি) ইহা আপেক্ষা ক্ষুদ্রতর হইলে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি লইয়া বাওয়া সম্ভবপর হইবে না। অধিকন্তু ক্ষুদ্রতর আয়তনের জগৎ ইহাকে দেখিতে পাওয়াও দুঃসাধ্য হইয়া উঠিবে। আবার ইহার আয়তন খুব বড় হইলেও চলিবে না, কেন না, সেক্ষেত্রে রকেটের বতন কষ্টকর হইবে এবং জ্বালানীর খরচ খুব বেশী হইবে। এক্ষেত্রে জালিয়া রাখা দরকার যে, প্রতি কিলোগ্রাম ওজনের জগৎ আরম্ভক হয় ১০০ কিলোগ্রাম জ্বালানীর। নির্দিষ্ট উচ্চতায় নির্দিষ্ট গতিবেগে ঘূর্ণায়মান রকেটের একটি উন্নততর ভারবহন ক্ষমতা আছে। এই ভারবহন ক্ষমতা হইতে জ্বালানীসম্মত রকেটটির ওজন বাদ দিলেই সঞ্চিত ওজনের কৃত্রিম উপগ্রহের পরিমাণ পাওয়া যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১১ট পাউণ্ড ওজনের কৃত্রিম উপগ্রহ ছাড়িবার মনস্থ করিয়াছেন, অপর পক্ষে সোভিয়েট ইউনিয়ন যে উপগ্রহটি সৃষ্টি করিয়াছে তাহার ওজন ১৮৩ পাউণ্ড।

কৃত্রিম উপগ্রহের আকার গোলাকার হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কেন না, তাহা হইলে ইহা গমনকালে যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন, ইহার আকারের কোন পরিবর্তন হইবে না—সম্ভাব্যতাই একাকার থাকিবে। অতঃপর কোন আকারের হইলে কিন্তু তাহা সম্ভবপর হইত না। বস্তুতঃ কৃত্রিম উপগ্রহের আকারের বিষয়টি বিজ্ঞানীদের নিকট কম দরকারী নয়। কেন না, কৃত্রিম উপগ্রহের উপর বায়ুর আকর্ষণের পরিমাণ অনুসারে তাহার অতি উর্দ্ধদেশে বায়ুর ঘনত্ব Density সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ পাইবেন। উপগ্রহের আকার

সকল অবস্থার সমান না হইলে গোলাকার হইবার সম্ভাবনা আছে। কৃত্রিম উপগ্রহের আকার আবার "মুক্ত রকেট" প্রাপ্তিযোগ্য স্থানের উপরও নির্ভর করে।

বহিরাবরণের উপাদান

বহিরাবরণ পাতলা অথচ দৃঢ় হইবে। এ্যালুমিনিয়ামের ব্যবহার এ বিষয়ে প্রশস্ত। তবে ম্যাগনেশিয়ামের উপর ক্রমাগত তামা, দস্তা, নিকেল, রূপা ও পরিশেষে সোনার পাতলা আবরণ দিয়া বহিরাবরণ নির্মাণ করিলে, ইহা একদিকে সূর্য্যের উত্তাপ ও অপরদিকে অত্যধিক শৈত্যের প্রভাব হইতে (যখন উপগ্রহটি ও সূর্য্যের মধ্যে পৃথিবী থাকিবে) রক্ষা করিবে। তবে এ্যালুমিনিয়াম অথবা কোন ধাতু বহিরাবরণ হিসাবে ব্যবহার করিলে একটি অসুবিধা হইবে।

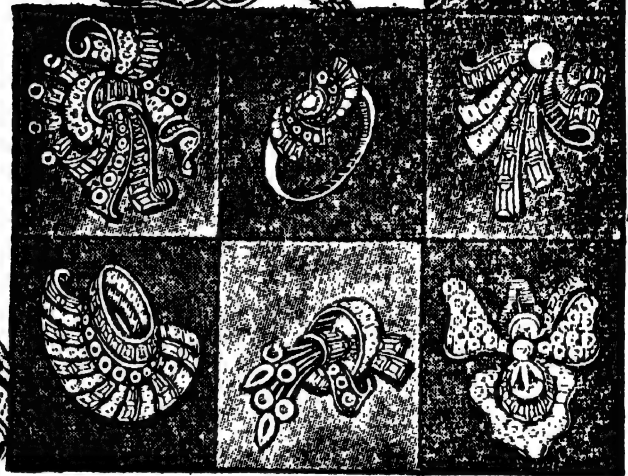
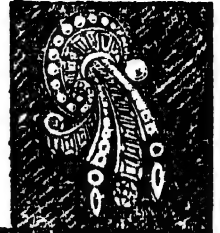
কৃত্রিম উপগ্রহ সৃষ্ণের অগ্রতন একটি উদ্দেশ্য হইতেছে পৃথিবীর বায়ুস্তরের উপরিভাগে Ionosphere-এর মধ্যে এবং ইহার উর্দ্ধে প্রবহমান তড়িৎপ্রবাহের অনুসন্ধান করা (ইহার সম্বন্ধে পরে বলা হইয়াছে)। ইহা সাধারণতঃ Magnetometer দ্বারা নির্ধারণ করা হইবে। কিন্তু সেক্ষেত্রে উপগ্রহের বহিরাবরণ হইতে হইবে চুম্বকশক্তিবিহীন এবং তড়িৎপ্রবাহে অক্ষম। এইজগৎ স্থির হইয়াছে যে, অন্ততঃ একটি ক্ষেত্রের প্রাঙ্টিকের বহিরাবরণ ব্যবস্গত হইবে।

বহিরাবরণের ব্য হইবে দুপের মতন সাদা, কারণ তাহা হইলে ইহা সূর্যালোককে প্রতিফলিত করিয়া এবং ছাড়াইয়া দিয়া (scattering) অধিকতর সুস্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হইবে।

কৃত্রিম উপগ্রহ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য কি? ইহা কি মানুষের নিছক খেয়াল আর প্রকৃতির উপর নিজের আধিপত্য দেখান না অতঃপর কিছু? ইহার উত্তরে বলা যায় যে, পৃথিবীর বহু রহস্যের কার্যকারণ আজও আমরা জানি না। শুনিতে হয়ত আশ্চর্য লাগিবে যে আমরা ২লক্ষ ৩৮ হাজার মাইল দূরে অবস্থিত চন্দ্র সম্বন্ধে যত খবরাখবর জানি, পৃথিবী সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান কিন্তু তাহাপেক্ষা অনেক কম। কিন্তু কৃত্রিম উপগ্রহ কি ভাবে এ বিষয়ে সাহায্য করিতে পারে? আয়তনে ইহার অতিশয় ক্ষুদ্র এবং ইহার মধ্যে মানুষ বাওয়ার প্রশ্নই উঠে না। তবে কি ইহার বাহির্বিধে কিছুদিন ঘুরিয়া সংগৃহীত তথ্য সরবরাহ করিতে পুনরায় পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিবে? না তাহাও নয়। কেন না ইহার গতিবেগ যখন ধীরে ধীরে হ্রাস পাইয়া পুনরায় মাধ্যাকর্ষণের জগৎ মর্ন্তের মাটিতে নামিতে থাকিবে তখন চারিদিকের ঘন বায়ুস্তরের সহিত সংঘর্ষ লাগিয়া উজ্জ্বলিতের মতন জলিয়া নিশিচ্ছ হইয়া যাইবে। তবে উর্দ্ধলোকের সংবাদ সংগ্রহ কি ভাবে সম্ভবপর? সম্ভবপর হইবে বেতার-তরঙ্গের সহায়তায়। ১৯৪৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সংকেত-সংস্থা (signal corps) সর্বপ্রথম চন্দ্র হইতে বেতার প্রতিক্রিয়ার সন্ধান পান (Radio echo) তাহার আবিষ্কার করেন যে বেতার-তরঙ্গ মহাশূন্যেও যথারীতি স্বাভাবিক ভাবেই চলাফেরা করিতে পারে। কৃত্রিম উপগ্রহের মধ্যে যে সকল বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি বা সজ্জাসমগ্র থাকিবে তাহাদিগকে একটি স্বয়ংক্রিয় বেতার-প্রেরক যন্ত্রের সহিত সংযুক্ত করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।



জাদুঘর মাদুর



গিরিচান্দ জুয়েলারী স্পেশালিস্ট

এম.বি.সরকার
এও সন্স

ম্যানুফ্যাকচারিং জুয়েলার্স

ফোন-৩৪-১৭৬১ ১৩৭/সি ১৩৭ সি/২ চব্বাজার ট্রাই কলিকাতা-১২ গ্রাম-দিল্লিয়ারে
ড্রাক-হালি গও-২০০/সি গ্রামবিহারী এভিনিউ কলিকাতা-১২ ফোন-১৬-৪৪৬৬
মোহাম্মদ প্রমোদন সিংহবা ১২৪, ১২৪/১, বঙ্গবাজার স্ট্রিট, কলিকাতা-১২
কেলসমাদ্র রবিয়ার খোলা থাকে
ব্রাঞ্চ-জামসেদপুর ফোন- জামসেদপুর- সিটি-২৪৪৮এ

এই বেতার প্রেরক যন্ত্র হইতে প্রেরিত শব্দ অথবা অঙ্ক কোন যন্ত্রপাতিগুলিকে চালু অথবা বন্ধ করিয়া দিতে পারিবে। হিসাব করিয়া সাংকেতিক ক্রিয়ার বধ্যযোগ্য অর্ধ পৃথিবীতে বেতার-গ্রাহক যন্ত্রের দেখা গিয়াছে, ১০ মিমিটের কক্ষপথে দিনে ১৩ বার ঘূর্ণায়মান ৩০ মাইলো (যাহারা পূর্বেই সাংকেতিক প্রক্রিয়ার সূত্র অর্ধ পাতিও ওজনের উপগ্রহটির যন্ত্রপাতিতে যদি ১৩ বারের প্রতিকার সুবিধাযুগ্মীয় মাত্র ৫ মিনিট করিয়া চালু রাখা যায়, তাহা হইলে তড়িৎকোষাবলীর (Battery) শক্তি সরবরাহ ক্ষমতা ১৫ দিন পর্যন্ত বর্তমান থাকে। ৩০০ মাইল উর্দ্ধে অবস্থিত সেকেন্ডে ৪৫ মাইল গতিতে চলমান কৃত্রিম উপগ্রহের সংবাদ সংগ্রহ ও সরবরাহ করিবার ইহাই উদ্ভূতম সমর। তবে একথা ঠিক যে, ইহার পর যদিও উপগ্রহটি তথ্য সংগ্রহ করিয়া বেতার মারফৎ তাহা সরবরাহ করিতে অক্ষম থাকিবে, তথাপি ইহারা নিজ কক্ষপথে এক বৎসর পর্যন্ত পৃথিবীর চারি দিকে ঘুরিয়ে থাকিতে পারে।

বর্তমানে সূর্য্য হইতে শক্তি সংগ্রহের কথা চিন্তা করা হইতেছে। নিউইয়র্কের 'বেল টেলিফোন ল্যাবরেটরী' সৌর তড়িৎ-কোষাবলীর (Solar Battery) আবিষ্কার করিয়া শুল্ক গমন গবেষণা বিষয়ে বিশেষ ভাবে সহায়তা করিয়াছে। Solar Batteryর গঠন প্রণালী হইতেছে কতকগুলি পাতলা অয়িশস্ত্রের (Silicon) ডিসকে স্বল্প পরিমাণ Boron এর আবরণ দ্বারা আচ্ছাদন করা হয়। যখন ঐ ডিসগুলির উপর সূর্যালোক পড়ে, তখনই বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদিত হয়। যেহেতু সূর্যালোক চারিদিকেই বর্তমান, সেই জন্য তড়িৎ-কোষাবলীর জীবনীশক্তিও অবিনশ্বর। এত ব্যবস্থা চালু হইলে কৃত্রিম উপগ্রহ হইতে প্রেরিত তথ্য বহুদিন যাবৎ পাওয়া যাইবে। তবে এ ক্ষেত্রে কৃত্রিম উপগ্রহটির এক অংশকে বরাবরই সূর্য্যের দিকে মুখ করিয়া থাকিতে হইবে।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্ত।]

—জ্ঞানানন্দনাথ বসু

অথচ

সন্তোষকুমার অধিকারী

ভেঙ্গেছিলো ঘুম সকালের মেঘ-ছড়ানো আবিরে,
প্রভাত চোখে দেখেছি আকাশ পাখীদের ভীড়ে,
দিগন্তনীর শূন্য জলয় উগাও কখন।
অথচ জীবন কাঠ-কেরোসিনে প্রোতাহকের
চিন্তার জ্বলে চুনিরীক্ষা; চতুর্দিকের
রজ্জুপীড়নে কাঁক নেই, বাঁধা অশান্ত মন
মাথা ঠোকে গুলু টেবিলে; বটা টেলিফোন কানে
মাগ্ব মাগ্ব—সামনে-পেছনে মাথা ধঁরে টানে।

কি বস্ত্রণা যে কাঁপে হৃদয়ের রক্তে রক্তে !
দিগন্ত কবে হারালো শূন্যে; মাটির শিবিরে
জেনেছি জীবন সোপানের জোরে নতুন তথ্যে।
নৈশব নেই—হাড-পা ছুঁ ডিহি জনতার ভীড়ে
হায়ার বগ্ন নাচে জনসার শালাকে ঘিরে
আমার বেঁধেছে বগ্ন-বেতাল ক্রীতদাসকে।

কামির
মূলকারণ দূর
করুন



সিরোলিন
খান



নিরাপদ
পারিবারিক
ঔষধ

সিরোলিন কেবল যে কাশি
'খামিয়ে দেয়' তা নয়—
কাশির মূলকারণ ছুঁট-
জীবাণুগুলিকেও ধ্বংস করে।

একমাত্র পরিবেশক : ডল্টাস লিমিটেড



মোহনবাগানের লীগবিজয়

আই, এফ, এ, শীল্ডে ৪০টি দল

বহু ঐতিহ্যের অধিকারী বাঙ্গালা তথা ভারতের অন্যতম জনপ্রিয় দল মোহনবাগান নিত্যন্ত প্রত্যাশিত ভাবেই এ বসন্তের প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বী ফুটবল লীগবিজয়ী হয়েছে। এবার নিয়ে তারা মোট আটবার লীগ জয়ের কৃতিত্ব অর্জন করেছে। কিন্তু ১৯৩৯, ১৯৪৩, ১৯৪৪, ১৯৫১, ১৯৫২, ১৯৫৬ ও ১৯৫৯ এই কয়বাবের জয়ের ইতিহাসে তারা কোনবারই অপরাজিত আখ্যা নিয়ে এই সম্মান লাভ করতে পারেনি। বহু-আকাঙ্ক্ষিত এই আখ্যাতাভেদ স্বর্গে মোহনবাগানের প্রায় সামনে এসেও হাজির হয়েছিল। কিন্তু 'বিশি বান'। লীগ খেলার প্রায় সমাপ্তি পর্যায়ে তারা চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইষ্টবেঙ্গলের কাছে তেবে গিয়ে ভাগ্যের নিদাক্ষণ পরিচায়ক মেনে নিতে বাধ্য হয়। এবারের লীগ মনস্তম্ভ মোহনবাগানের এটাই হোল একমাত্র পরাজয়ের 'ছাপ'। অবশিষ্ট ৬টি অমোদিত খেলায় তারা ৬ পয়েন্ট হারিয়েছে। এতে পয়েন্ট নষ্ট হয়েছে কিন্তু সম্মান নষ্ট হয়নি। প্রথম পরাজয়ের আঘাত তীব্র না হলেও সামান্য উঠতে মোহনবাগানের বেশ সময় লাগলো। চরম লক্ষ্য সম্বন্ধে তারা হতাশ হননি সত্য কিন্তু লীগের সূচনার তারা যে বিরুদ্ধে যাত্রা শুরু করেছিল শেষ পর্য্যায়ের তাদের পরকল্পে সফলিত হয়ে আসে। এতে দরদীকুলের কোন মহলে হয়ত কিছুটা সংশয়েরও লক্ষ্য করতে পারত। কিন্তু মোহনবাগানের লীগজয়ের পথ অবরুদ্ধ ছিল না। বাকী পথটুকু পাড়ি দিয়ে তারা লীগ পরিক্রমা সার্বিক করলো ও সফল করলো। অগণিত দর্শক ও সমর্থককুল জনপ্রিয় মোহনবাগানের সাক্ষ্যে উল্লসিত হয়ে উঠলো। মোহনবাগান যে জনচিহ্নিত কথখানি জারগা জুড়ে বসে আছে তার জাজ্বল্য প্রমাণ পাওয়া গেল খিদিরপুর দলের সঙ্গে তাদের লীগের শেষ খেলায়। খেলা হিসেবে এ খেলাটি নিশ্চয়ই আকর্ষণীয় ছিল না। তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বীতা হবে এ আশাও করা যায়নি। তবে খেলাটির ফলাফলের উপর কিছুটা গুরুত্ব ছিল। এ খেলায় মোহনবাগান এক পয়েন্ট পেলেও লীগবিজয়ী হতো। কিন্তু লীগবিজয়ের চরম ক্ষণটি চাক্ষুষ করে নিজদের মন ভরাতে বিপুল দর্শকশ্রেণী এই দিন মার্চে উপস্থিত থাকে। খিদিরপুরের বিরুদ্ধে মোহনবাগানের জয়লাভে ফলে লীগবিজয়ের মীমাংসা হয়ে যাওয়ায় এই জনসমষ্টি ঐকান্তিক বগার প্রোতের মত আনন্দে ও উল্লাসে মেতে ওঠে। প্রাণচাক্ষুণ্যের যে নজর সেদিন পাওয়া গেছে, তা সাম্প্রতিককালের খেলাধুলোর ইতিহাসে বিরল। এই সঙ্গেই কলকাতা ময়দানে লীগ মনস্তম্ভ সাজ হলো। সামনে পাতা হয়েছে আই, এফ, এ, শীল্ডের আসন। নতুন উৎসাহে, নতুন উদ্দীপনায় খেলবার আশ্রয় দিকে দিকে সাজ সাজ রব।

এবারে আই, এফ, এ, শীল্ড ফুটবল প্রতিযোগিতায় মোট ৪০টি দল প্রতিদ্বন্দ্বীতার অংশগ্রহণ করেছে। এর মধ্যে ১৫টি দল হোল বাংলাদেশের বাইরের। বাইরের খাতনানা দলগুলোব মধ্যে ভারতবাসী স্পোর্টস্, ই, এম, ই, (সেকেন্দ্রাবাদ), বিজয় ক্যান্টনমেন্ট (দেবানু), ওয়েস্টার্ন রেলওয়ে (বোম্বাই), হিন্দুস্তান এয়ারলাইন্স (বাল্মোর) দলের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এদের বিরুদ্ধে কলকাতার প্রখ্যাতনামা দলের খেলা নিশ্চয়ই আকর্ষণ ও উৎসাহের কারণ। লীগ ও শীল্ড প্রতিযোগিতার চেহারা দুটো আলাদা ধরনের। লীগ বেন লম্বা সড়ক বেয়ে দূর লক্ষ্যস্থলে পৌঁছাব একটা প্রয়াসমাত্র। এ পথে চলতে গিয়ে সাময়িক ভাবে পিছিয়ে পড়লেও একেবারে মিলিয়ে যাবার বা নিশ্চিহ্ন হবার ভয় নেই। বাধা-বিপত্তিকে ঠেলে যে আগে গিয়ে চরম লক্ষ্যে পৌঁছবে, জয়ের মাল্য তারই গলে দুলবে। কোন উত্তম পর্বতশীর্ষে আবোহণ করাই যেন শীল্ডে সাক্ষ্যলাভের সাক্ষ্য। চড়াই-উৎরাই বেয়ে উঁচুতে চলতেই হবে—পেছনে ফেরবার অবকাশ নেই। পেছনে ফিরলেই বিপদ। এমন তর দুর্জয় মনোভাব নিয়ে যোগদানকারী দলগুলো এবারের শীল্ড প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে এবং তার নমুনা দেখিয়ে দর্শকমণ্ডলে ক্রীড়াবাসীক অভিব্যক্তির প্রেরণা জোগালে তাতে ভাল ছাড়া মন্দ হবে না, আশা করা যায়।

[ভারত আবার জগৎসভার শ্রেষ্ঠ আসন লবে]

যোম আগামী বিশ্ব অলিম্পিকে ভারত হকি প্রতিযোগিতায় বিশ্ববিজয়ী আখ্যা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারবে বলেই মনে হয়। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ভারতের গর্ব করার একটি স্মিটাই আছে, সেটা হোল হকি।

১৯২৮ সালের বিশ্ব অলিম্পিক থেকে শুরু করে আজ পর্য্যন্ত ভারত হকি প্রতিযোগিতায় তাদের বিশ্ব-জয়ের পতাকা উঁচুতে ধরে রেখেছে। বিজয়-বৈজয়ন্তী অক্ষুণ্ণ থাক—এটা ভারতবাসী মাঝেই কাম্য।

টোকিওতে অনুষ্ঠিত গত এশীয় ক্রীড়ায় ভারত হকিতে দ্বিতীয় স্থান লাভ করার অনেকেই আগামী-বিশ্ব অলিম্পিকে ভারতের সাক্ষ্য সম্বন্ধে কিছুটা নিজেদের ভাব হয়ত বা পোষণ করে থাকবেন। এশীয় ক্রীড়ায় ভারত পরাজিত হয়নি। গোলসংখ্যার হিসেবে তালিকার ক্রমিক অবস্থান নির্ধারিত হয়েছিল। সেই হিসেবেই পাকিস্তান তালিকার শীর্ষস্থান লাভ করেছিল। এর ফলে ভারতের হকি খেলার মান নিম্নগামী হয়েছে বা ভারতীয় দলের শক্তি আগের থেকে ক্ষয় হয়েছে, একথা মনে কবলে চরম ভুল করা হবে। খুবই আশার কথা যে, আসন্ন অলিম্পিকের জন্য ভারতীয় দলকে

বিশেষ শক্তিশালী করে তোলার জ্ঞান ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে।

ভারতে হকি খেলার নিয়ামক-সংস্থা নিখিল ভারত হকি ফেডারেশন এ বিষয়ে যোগ্য দৃষ্টি দিয়েছে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও শুরু করে দিয়েছে। ইতিমধ্যে ভারতীয় হকি দল পূর্ব-আফ্রিকা সফর করে গত মাসে দেশে ফিরেছে। বিশ্ববিজয়ী ভারতীয় হকি দলের প্রাক্তন অধিনায়ক 'বাবু' (কে, ডি, সিং) ছিলেন পূর্ব-আফ্রিকা সফরে ভারতীয় দলের 'কোচ' এবং ম্যানেজার। তিনি বিশেষ করে ৬ জন খেলোয়াড় সম্বন্ধে দৃঢ় আশা প্রকাশ করেছেন এবং ভারতীয় অলিম্পিক হকি দলে অন্তর্ভুক্তির জ্ঞান এই ছয় জনের নাম সুপারিশ করেছেন। "বাবু" নির্বাচনী কমিটিরও অত্যন্ত সমর্থ। সুতরাং তাঁর সুপারিশ যৌক্তিকতা এবং যোগ্যতার পরিপ্রেক্ষিতে গাছ তবে বনেই মনে হয়। অবশিষ্ট ভারতীয় অলিম্পিক হকি দল গঠনে এখনও দেরী আছে। জাভানীর মিউনিকে হকি প্রতিযোগিতার এবং বিদেশের আরও কয়েকটি জায়গায় খেলার পর দল গঠন করা হবে। এ সমস্ত খেলাগুলো হবে বিশ্ব অলিম্পিকের জ্ঞান ভারতের প্রস্তুতি-পূর্ব।

এ ছাড়াও খেলোয়াড়দের বিশেষ শিক্ষা দানেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। হকির যাত্রিকর ম্যানচাঁদ, বাবু এবং হাবুল মুখার্জী শিক্ষাদান করবেন।

এবারের অলিম্পিকে ভারতীয় দলকে আগের তুলনায় অনেকখানি প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হতে হবে বলে মনে হয়। কেন না, পাকিস্তান, যুক্তরাজ্য, ইল্যান্ড ও জার্মানী ইতিমধ্যেই হকি খেলায় যথেষ্ট উন্নতি প্রদর্শন করেছে। ভারতীয় দলের খেলোয়াড়দের অনমনীয় দৃঢ়তা, প্রশংসনীয় ক্রীড়াধারা এবং সর্বোপরি জাতীয়তা ভাব প্রকাশ ভারতের জাতীয় স্তন্য এবং ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ থাকবে এবং সারা বিশ্বে তাঁদের বিজয় পতাকা চির-উজ্জীন থাকবে। জগৎসভায় তাঁরা শ্রেষ্ঠ আসন নেবেন।

কলকাতায় ষ্টেডিয়াম

আবার কলকাতায় "ফুলবল ষ্টেডিয়াম" প্রসঙ্গ। ষ্টেডিয়াম সম্পর্কে কোন মুখরোচক খবর হলেই কলকাতার ক্রীড়ামোদীদের কৌতুহলের শেষ থাকে না। ষ্টেডিয়াম নিয়ে সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগ-আয়োজনের শেষ নেই। কিন্তু সেই একই প্রশ্ন—কবে ষ্টেডিয়াম নির্মাণ আরম্ভ হবে? সম্প্রতি সরকারী দপ্তর থেকে ষ্টেডিয়াম সম্পর্কে কিছুটা আশার আলো নিষ্ক্ষেপ করা হয়েছে। এখন নাকি "এলেনবরা কোর্সে" (কেলা সালয় প্রান্তরে) ষ্টেডিয়াম গঠনের জ্ঞান জমি সংগ্রহের ব্যবস্থা হয়ে গেছে।

"এলেনবরা কোর্সে" ভারত সরকার তেরো একর জমি ষ্টেডিয়ামের জ্ঞান দেবে বলে ঠিক করেছে। একে নাকি দু'ভাগে বিভক্ত করা হবে। সাড়ে ছয় একর অর্ধাৎ কুড়ি বিঘা জমির ওপর ষ্টেডিয়াম নির্মিত হবে এবং বাকি সাড়ে ছয় একর জমির ওপর সুইমিং পুল, ডাবল, কবাডি, জিমন্যাস্টিক প্রভৃতি খেলাধুলার মাঠ প্রস্তুত হবে বলে ঠিক হয়েছে।

বর্ধমানের মহারাজা, ময়ূরভঞ্জের মহারাজা, স্ত্রাব বি, এন,

মুখার্জী ও ক্রীশিবচন্দ্র বানার্জীকে নিয়ে ষ্টেডিয়াম গঠনের জ্ঞান একটা "অস্থিমণ্ডলী"ও গঠন করা হয়েছে। ক্রীশিবচন্দ্র বানার্জী হিন্দুস্থান কমপ্টাকসন কোম্পানীর কর্তব্য। তাঁরই ওপর ষ্টেডিয়াম গঠনের ভার দেওয়া হয়েছে। তিনি সম্প্রতি রোমে গেছেন। রোমে এবং লণ্ডনের নানাস্থানে ষ্টেডিয়াম গঠনের তথ্য সংগ্রহ করে তিনি সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি কলকাতায় ফিরবেন। "কলকাতার ষ্টেডিয়াম" এবারকার প্রসঙ্গ যে দেশে কিছুটা মুখরোচক, তা বলাই বাহুল্য। দেখা যাক ষ্টেডিয়াম নিয়ে আর কতকাল টালবাহানা চলে।

কলকাতায় আমেরিকান সম্ভরণ-শিক্ষক

আমেরিকার খ্যাতিমান স্নাতক-শিক্ষক মন মিলানের শিক্ষাদানে কলকাতায় তরুণ ও উদীয়মান স্নাতকদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হয়েছে। নিম্নার একজন প্রধান শ্রেণীর শিক্ষক। ১৯৫৬ সালে বোম্বাই রাজ্য স্ত্রাইমিং এসোসিয়েশনের আনুষ্ঠান তিনি ভারতে এসেছিলেন। এবার তাঁর আসার ব্যবস্থা করেছেন ইউনাইটেড স্টেট ডিপার্টমেন্ট। তবে এখানকার শিক্ষাদানের সকল উদ্যোগ আয়োজন করবে বেঙ্গল এসোসিয়েশন স্ত্রাইমিং এসোসিয়েশন। মিলার কলকাতায় অবস্থান কালে জাশনাল স্ত্রাইমিং ক্লাবের "রক্ত-জয়ন্তী" উৎসবে যোগদান করবেন। কলকাতার লেক ইণ্ডিয়ান হাউস সেভিং সোসাইটির স্ত্রাইমিং পুলে তিনি শিক্ষাদান করবেন। কলকাতার পর তিনি দিল্লী ও বোম্বাই যাবেন। সেখানেও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হয়েছে।

ফাষ্ট বোলিং ভীতিরোধের চেষ্টা

ভারতের ক্রিকেট-অনুরাগী মায়েই ভেনে ধুসী হয়েছেন যে, ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের খ্যাতিমান "ফাষ্ট বোলার" বর গিলক্রিস্টকে ভারতে এই বৎসরের শেষাংশে "কোচ" হিসাবে আনার প্রচেষ্টা চলেছে। ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড়দের "ফাষ্ট বোলিং" ভীতির কথা সুবিদিত। ভারতীয় খেলোয়াড়দের গিলক্রিস্ট কিছুটা মচায়ক তোলা, এটাই সকলে কামনা করেন।

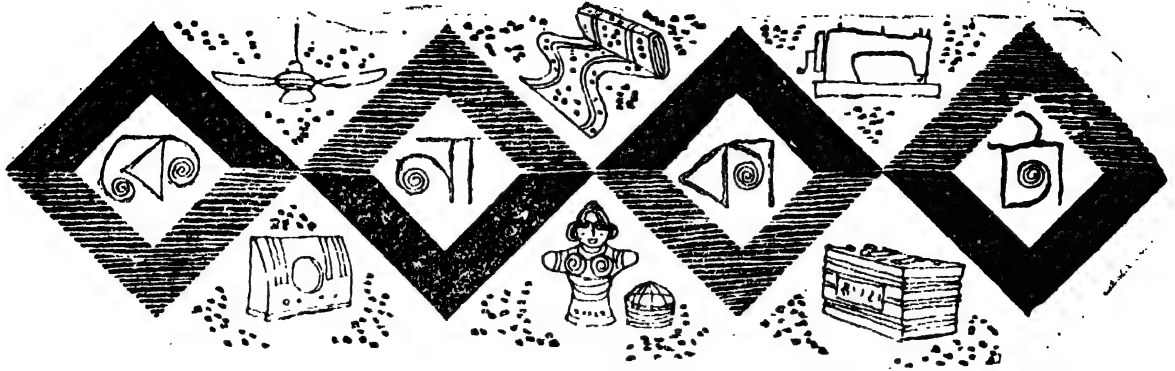
স্ত্রীরোগ, ধবল ও বৈজ্ঞানিক কেশ-চর্চা

ধবল, বিভিন্ন চর্মরোগ ও চুলের যাবতীয় রোগ ও স্ত্রীরোগের বৈজ্ঞানিক চিকিৎসায় পত্রালাপ বা সাক্ষাৎ করুন।

ডাঃ চ্যাটার্জীর ব্যাশন্যাল কিওর সেন্টার

৩৩, একডালিয়া রোড, কলিকাতা-১১

সন্ধ্যা ৬।—৮।। কোন নং ৪৬-১৩৫৮



গবেষণা ও শিল্প-সমৃদ্ধি

মাহুস মে-দিন থেকে এসেছে এত মাটির পৃথিবীতে, সাথে সাথে ছাড়াই হলেও তার বননাও। প্রবনতার করণার পবিধি ছিল নিত্যন্ত সীমিত, কিন্তু যুগে যুগে তা বিস্তার লাভ করে চলে। এই দুরন্ত করণা ও স্বপ্নকে আশ্রয় করেই একদিন বিজ্ঞানী মাহুসের হয় জন্ম—সেই থেকে গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার অঙ্গি নেই।

একথা আজ আর বলবার অপেক্ষা রাখে না, সভ্যতার ক্রমিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের অবদান অপরিমেয়। বিজ্ঞান-সম্প্রদায় আজীবনেই মাহুস পেয়েছে বিচিত্র ধরনের স্বপ্ন-স্বাচ্ছন্দ্য—বাবতাব উপযোগী বকমারী শিল্প-সম্প্রদায় বা শিল্প-ঐশ্বর্য। এমনি দাঁড়িয়েছে—আজকের দিনে কোন লোকের পক্ষেই বিজ্ঞানকে এড়িয়ে চলা সম্ভব নয়, বৈজ্ঞানিক গবেষণার স্বফল কিছু না কিছু ভোগ করছে প্রত্যেকেই।

যেখানকার অধিবাসী এই মাহুস, সেই পৃথিবী সম্পর্কেও জ্ঞান-করন ও গবেষণার অন্ত ছিল কি? কত একম বিচিত্র ধারণাই না করা হয়েছে পৃথিবীর আকার ও অবস্থান সম্বন্ধে। প্রাচীন গ্রীসের অজ্ঞাতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক থেলসেব বিশ্বাস ছিল—পৃথিবীটা দেখতে বেকাবীর মতো—আব সমুদ্রের জলে এটি স্থিতি ভাসমান। দুই হাজার বছরেরও ওপর এই নিষে চিন্তা-আলোচনা করলেন ভাবুক-মহল। গবেষণা শেষে আজকের মাহুস পৃথিবীর আকার ও রহস্য সম্পর্কে একটি সঠিক ধারণা আসতে পেরেছে—বুঝে নিয়েছে সত্যি কতো সব মৌলিক উপাদান ও বাসায়নিক পদার্থ মিলেমিশে এইটি গড়া।

পব পব আবিষ্কৃত এই বহুমূল্য পদার্থগুলো নিয়ে গবেষকরা শিল্প-গবেষণাগারসমূহে গবেষণা চালিয়েছেন, সে-ও বহুদিন। এব ভেতর হাজার হাজার নতুন জিনিস তৈরী হয়েছে—দৈনন্দিন জীবনে যেগুলো অনেক প্রয়োজনে আসছে আমাদের। একদিকে গবেষণা, অপর দিকে শিল্প-সমৃদ্ধি—এই নিয়ম এক্ষণে প্রায় বাধ্যধরা, নিয়মাত্মকীয়ী কাজেরও বিরতি নেই বলা যায়।

শিল্পোন্নত হবার জন্তে আজ ছোট-বড় সকল দেশেই উদ্যম চলেছে মানাতাবে। অগ্রসর রাষ্ট্রগুলিও চার আরও শিল্প-সমৃদ্ধি, আরও শিল্প-সম্প্রসারণ। তাই দেখা যায়—বৈজ্ঞানিক গবেষণাও অবিরাম গতিতে চলেছে সেই সঙ্গে সর্বত্র। বলতে কি, ত্রিশ কি চল্লিশ বছর আগেও শিল্প-গবেষণার গতিবেগ এতখানি তীব্র ছিল না। বাসায়নিক ও পদার্থ বিদ্যার বিজ্ঞানের অগ্রগতি সে পরিমাণে হয় নি তখন অবধি। আজকের মাহুস সেই তুলনায় এগিয়ে গেছে বহু যোজন

পথ—শিল্পক্ষেত্রে বিজ্ঞানের সহায়তার চমক সৃষ্টি করছে প্রতি মুহূর্তে।

প্রসঙ্গত একটি কথা বলতে হয়—বৈজ্ঞানিক গবেষণায় শিল্পের যেমন প্রণয় হচ্ছে অবিরাম, শিল্প-সংস্থা বা কোম্পানীর সংখ্যাও বেড়ে চলেছে প্রায় তেমনি। প্রধানতঃ দুইটি দিকে নজর রেখে শিল্প-গবেষণা বা বিজ্ঞানীরা গবেষণা চালিয়ে থাকেন। এক—যে অভিনব পণ্য বা শিল্প-সামগ্রী সৃষ্টি হলো, কি ভাবে তার চরম উৎকর্ষ সাধিত হতে পারে; দুই—গবেষণা করে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের আর কি জিনিস বের করা যায়। কয়েকটি শিল্প-সংস্থা বা কোম্পানী প্রথমটির ওপর জোর দিয়ে থাকেন, আবার অপর কতকগুলোর বেলায় জোর থাকে দ্বিতীয় দফা ব্যবস্থার ওপর।

আরও একটি কথা বলতে হবে—শিল্প-সমৃদ্ধি ও শিল্প-গবেষণার জন্ত সর্বোপরি থাকা চাই সরকারী তত্ত্বাবধান ও পৃষ্ঠপোষকতা। বেসরকারী উদ্যমের সাথে সরকারী উদ্যমের ঐক্য ঘটলে খুব তড়াতাড়ি স্বফল পাবার স্বতঃই সম্ভাবনা থাকে। অপর দিকে শিল্প-সমৃদ্ধি চাইলে শিল্প-গবেষণা চালাতেই হবে, আর যথারীতি গবেষণা চালালে নতুন শিল্পও আবিষ্কৃত না হয়ে পারে না। অনেক সময় এমনও হয় কিংবা হওয়া বিচিত্র নয় যে, একটি বিশেষ শিল্প-সৃষ্টি করতে গিয়ে, অপর কোন শিল্প (উপজাত) সৃষ্টি হয়ে গেলো, আর সেটিও মূল্যবান। পরমাণু বা আণবিক পদার্থ আবিষ্কৃত হওয়ায় গবেষণা মারফত শিল্প-সমৃদ্ধি ও শিল্প-সম্প্রসারণের পথ আজ যথেষ্ট প্রশস্ত হয়েছে। শিল্প-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মাহুসের নিরলস সাধনা ও দুর্জয় অভিযান আরও কতো অভাবনীয় সাফল্য বহন করে আনবে, সে প্রতীক্ষা আরো অবাস্তব বা বাড়াবাড়ি নয়।

শ্রম-জীবন—কয়েকটি কথা

বাঁচবার জন্ত নিয়মিত শ্রম করতে হবে, খেয়ে-পারে দিন কাটাতে কাজ করতেই হবে কোন না কোন—সাধারণ লোকের কাছে এ নতুন কিছু নয়। শুধু প্রশ্ন কে কি ধরনের শ্রম করবে, কার পক্ষে কতকণ স্নেহ ভাবে খেতে যাওয়া সম্ভবপর। শ্রম-জীবন যদি সবদিক থেকে বিরক্তিকর হলো, কাজ করে সামান্য আরাম বা আনন্দের খোরাকও যদি না পাওয়া গেলো, তা হলেই গোলমাল।

শিল্পায়নের সঙ্গে সঙ্গে এক একটি দেশে কর্ম-সংস্থান বেড়ে যায়। আর কর্ম-সংস্থান বাড়তি হওয়ায় অর্থ শ্রমজীবীর সংখ্যা বৃদ্ধি। শিল্প-শ্রমিকদের অবস্থা-ব্যবস্থা স্বভাবতঃই তখন আলোচনা-গবেষণার বিষয় হয়ে ওঠে। এই থেকেই ক্রমে অবশ্য নানা শিল্প-আইন বা শ্রমিক কাছন তৈরী হয়।

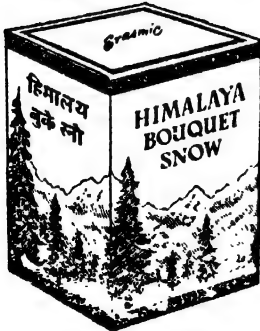


অশ্রু সৌন্দর্যের জন্য...

হিমালয় বোকে

শ্রেষ্ঠ

প্রসাধন



শ্রদ্ধ এবং অগন্ধ হিমালয় বোকে সৌ আপনার

স্বককে মৃদু এবং মোলায়েম রাখে। মখমলের মত হিমালয় বোকে টয়লেট

পাউডার আপনার লাগব্যর স্বাভাবিক সৌন্দর্যকে

বাড়িয়ে তোলে।

হিমালয় বোকে স্নো এবং টয়লেট পাউডার



একটু পেছনের দিকে তাকালেই দেখা যাবে—শিল্পগত মনস্তত্ত্ব বলতে বা বুঝার, তার সূচনা হয় চলিত শতকের গোড়ার দিকে। সূচনায় দুইটো ভ্রান্ত ধারণা মূল বিষয়কে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, প্রথম ধারণাটি ছিল—মানুষের দেহ হচ্ছে নিছক একটি যন্ত্র, একে খুশিমতো কাজে লাগালেই কাজ হাসিল হয়ে যাবে। দ্বিতীয় ধারণা—শ্রমিককে যেখানে কাজ করতে হবে, সেই যন্ত্রগাটি যদি উপযুক্ত আলো ও তাপ সমন্বিত হয় এবং কাছাকাছি কোন হৈট না থাকে, তা হলেই সব ঠিক-ঠাক।

শ্রমজীবীদের ক্ষেত্রে যেটি বড় কথা, পূর্ণ্যালোকদেব কাছে সেটি ধরা পড়ে নি প্রথমটায়। কাজ করে শ্রমিক আসন্ন কি চায় অর্থাৎ তার মনের মূল চাহিদাটি কি, এই দিকে সাদৃশ্য মতনের দৃষ্টি পড়ে বহুদিন নাই। শ্রমিক শ্রমের উপযুক্ত মূল্য চায়, বাঁচবার অধিকার চায় সে-ও মানুষের মতো, এটি সর্বোপরি সত্য। এ সত্য আশু ও লেহানে স্বীকৃতি পায় নি, শ্রমিককে যেখানে মাত্র যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে চাওয়া হচ্ছে, সেখানেই দেখা যাবে অসন্তোষ ও অশান্তি।

শিল্প-শ্রমিক সম্পর্কে গোড়াকার দিনগুলোতে যে যে ধারণা পোষণ করা হতো, সে যে ভুল, তা প্রমাণিত হয়েছে বাস্তব পরীক্ষাতেই। একটি দৃষ্টান্ত—বছর ত্রিশেক আগে চিকাগোর একটি বিখ্যাত কারখানায় কতকগুলো সমস্তার উদ্ভব হয়। সেখানে শ্রমিকদের ভেতর অসন্তোষ বেড়ে চলে এবং কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পায়। অথচ কারখানায় আলো-বাতাসের অভাব ছিল না, বাইরে থেকে দেখতে কাজের উপযোগী পরিবেশ সেখানে ছিল।

গলদ কোথায় বোঝবার জগে ডেকে আনা হলো অষ্ট্রেলীয় অধ্যাপক এলটন মেয়োরকে। তিনি সে সময় অল্প বয়সের শিল্প-গবেষণার কাজেই বাপ্ত ছিলেন। চিকাগোর কারখানাটিতে এসে পরীক্ষা চালানেন তিনি নানা ভাবে। প্রথমতই চিবাচবিত ব্যবস্থা মতে আলোর বহর বাড়িয়ে দেওয়া হলো, যে কোন কারখানাই হোক—উৎপাদনও বাড়লো তখন কিছুটা। স্বতঃই ধরে নেওয়া হলো এর পর আলোকসম্প্রদায় উৎপাদন বৃদ্ধির প্রধান সত্যিক। অধ্যাপক মেয়োর আবার উন্টো দিক থেকে অবস্থাটি পরীক্ষা করে দেখতে চাইলেন। এবারে কমিয়ে দেওয়া হলো কারখানায় সব করটি আলো। চাদের আলোর পরিমিত আলোতে এসে যখন ঈর্ষাচালো, বিশ্বয় যে, তখনও বস্ত্র থাকলো উৎপাদনের। উদ্ভগতি। বরং উৎপাদনের মাত্রা এমনটি কখনও সে কারখানায় দেখাই যায়নি।

তা হলে ব্যাপারটি আসলে কি? অধ্যাপক এলটন যখন পরীক্ষাটি চালাতে থাকেন, তখন কিন্তু শ্রমজীবীদের কাজের অবস্থার উন্নয়নের জন্য কর্তৃপক্ষের কিছুটা চেষ্টা চলে। শ্রমিকরা এইটি বুঝতে পাবা মাত্র সোহসাহে কাজে যোগ দেয় এবং এবই পরিণতিতে উৎপাদন ক্ষমতা এগিয়ে যায় অনেক দূর। গবেষণা করে অগ্রগতির এই মূল সূত্রটি ধরতে পারেন অধ্যাপক এলটনও। তাঁর চোখে স্পষ্ট ধরা পড়লো—কাজ করতে বেগে কর্মীর মনে কিসে স্কৃতি আসে, সেইটো বড় কথা।

শ্রমজীবী ও শ্রম-জীবন সম্পর্কে পথালোচনা করতে যেয়ে আরও একটি কথা বলা চলে—সাধারণ মানুষ মোটেই শ্রমকাতর নয়। কাজে ঈর্ষা দিয়ে পরমা লুঠবার মতলব গড়পড়তা শ্রমিকদের মাঝে নেই। পরম্ব বলা চলে শ্রমজীবী মাত্রই সাধারণতঃ সন্তোষজনক অবস্থার থেকে কাজ করতে চায়। বস্ত্তঃ যে-কাজটি যে করছে, বোল আনা মন ও তৃপ্তি নিয়ে সেটি করার ব্যবস্থা যদি থাকে, সব দিক থেকে মঙ্গল।

আয়—ব্যয়—সঞ্চয়

দৈনন্দিন জীবনে প্রত্যেক মানুষেরই কতকগুলো নিয়ম কাছের মেনে চলবার প্রয়োজন রয়েছে। আয় বুঝে ব্যয় করা আর তাই ফাঁকে কিছু কিছু সঞ্চয়—এই বিশিষ্ট সকলের ক্ষেত্রেই প্রয়োজ্য—সীমাবদ্ধ আয়বিশিষ্ট সংসারী লোকের বেলায় তো বটেই।

বুঝে-সুনে ব্যয় করার বিধি সাবস্থার কথা উল্লেখই একটি উপবিধি দাঁড়ায়—খরচের বাজেট ঠিক রাখতে হবে আগে থেকেই। সরকারী ক্ষেত্রে যেমন বাজেট করার রীতি আছে সর্বত্র, তেমনি কোন না কোন ধরনের বাজেট (বতই ক্ষুদ্র হোক) চাই পারিবারিক ক্ষেত্রেও। খরচের একটা মোটামুটি ধারণা চোখের সামনে না থাকলে অনেক সময়ই আয়ের অতিরিক্ত ব্যয় হবার আশঙ্কা থাকে। আর সে অবস্থায় অতি প্রয়োজনীয় সঞ্চয়ের সুযোগটি সহসা মিলতে পারে না।

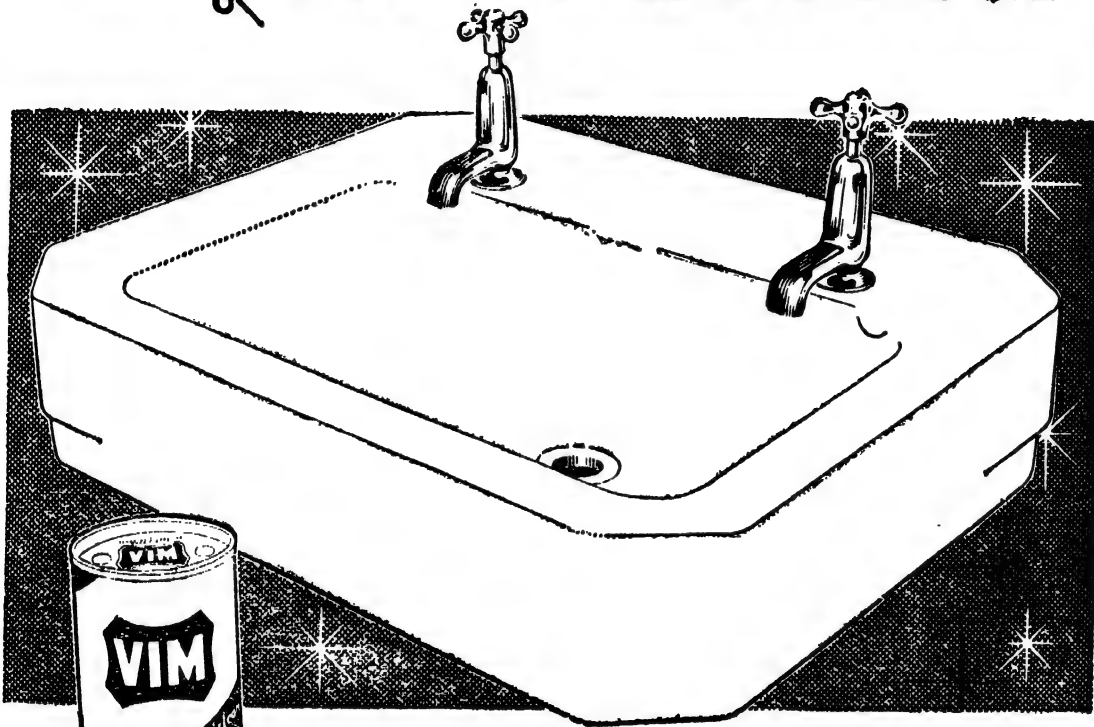
এমন অনেক দোপা যায়—পাঁচ আয়ের দিকে না তাকিয়ে বেপরোয়া খরচ করে চলেন, ভবিষ্যতে যাই ঘটুক না কেন, তার জগে এতটুকু তোরাক্তা রাখেন না। ‘অগ্ন কবেও ঘি খাওয়ার কথা’ এই শ্রেণীর লোকরাই ভাবতে পারেন। নিয়ম আয় বিশিষ্ট সংসারী মানুষের পক্ষে এই পথ অনুসরণ করতে যাওয়া বিপজ্জনক। বলতে কি, বাস্তব জীবনের এই ধরনের পরিক্ষণ অত্যন্ত জটিল পরিক্ষণ—এ গাইস্থা অর্থনীতির বিরোধী।

আয়ের অনুপাতে ব্যয় করার যে বিধান, সেইটি অর্থাৎ মিতব্যয়ী হওয়া সকল অবস্থাতেই শ্রেয়ঃ। বিলাস-ব্যসনে অথবা অর্থব্যয় করে পথে দাঁড়ানো কিংবা খেয়ে-পড়িয়েই সব টাকা পরমা অসঙ্কোচে উড়িয়ে দেওয়া—এই যদি হলো, বুঝতে হবে পড়ে পড়ে বিপত্তি। আয়ের সাম্য এবং ছাড়িয়ে অপরিহার্য কারণ ভিন্ন ব্যয় কোন মতেই চলতে পারে না। বর্তমান সমাজ কাঠামোতে প্রতিটি ব্যক্তি-জীবনের সামনে অনিশ্চয়তা রয়েছে বলেই সঞ্চয়ের কথা বড় হয়ে দেখা দেয়।

খরচের মাত্রা যতদূর সম্ভব কমাতে হবে আর সব খরচই হওয়া চাই আয়ের ভেতর, এই নিয়ে প্রশ্ন তোলা নিরর্থক। কিন্তু তাই বলে পূর্ণাঙ্গ টাকা-পরমা থেকেও প্রয়োজনীয় ব্যয়ের ক্ষেত্রে কাপণ্য দেখানো কিংবা খাওয়া-পরা অহেতুক কষ্টভোগ সমর্থনযোগ্য হতে পারে না। সোজা-সজি বলতে গেলে—মিতব্যয়ী হওয়া যেমন ভালো নয় কিছুতেই, অতিসঞ্চয়ী হবার নীতিটিও তেমনি ক্রটিপূর্ণ ও অযৌক্তিক।

প্রসঙ্গত, আর একটি কথা বলতে হয়—একান্ত প্রয়োজনীয় ব্যয় যেখানে আয়ের সীমা নিয়মিতভাবে ছেড়ে যাবে, সেক্ষেত্রে আয় বাড়ানোর সক্রিয় চেষ্টা ছাড়া উপায় নেই। মোটের উপর, আয়-ব্যয় ও সঞ্চয়ের প্রশ্নটি খুব যত্ন সহকারে ভাবতে হবে সাধারণ বৈবয়িক মানুষকে—তারপর মাঝামাঝি একটা সূত্র স্থির করে তবেই কার্যক্ষেত্রে পা বাড়াতে হবে। আয়ের সীমাবদ্ধতা অথচ খরচের নিত্যমাত্রাধিক্য, এমনটি যাতে না হয়ে পড়ে, তার জন্য যতদূর সম্ভব সতর্ক না থাকলেই নয়। সঞ্চয়ের প্রশ্ন ছেড়ে দিলেও (কারণ, গড়পড়তা পরিবারে সেটি হওয়া স্বতঃই কঠিন), আয় ও ব্যয়—এ দু’এর ভেতর একটি ভারসাম্য রক্ষা করে চলাই একান্ত সমীচীন, নিশ্চয়ই বলতে পারা যায়।

ভিম ব্যবহার করলে পরে দেখুন কেমন ঝালমল করে



ভিম অল্প একটু ব্যবহার করলে পরেই সবজিনিষেরই চেহারা বদলে যায়। কাচের ও চায়ের বাসন, রান্নার জিনিষ, থালা বাটি ও ডেক্‌চী হাঁড়ী থেকে ঘরের মেঝে—সবই এক নতুন রূপ নেবে। আর ভিম দিয়ে পরিষ্কার করলে জিনিষপত্রে কোন রকম আঁচড় লাগে না আর কত সোজা ও কম খাটুনিতে হয় ভেবে দেখুন। ভেজা ন্যকড়ার একটু ভিম ফেলে, আঙুলে আঙুলে ঘষুন আর আপনার চোখের সামনে জিনিষ গুলোর রূপ বদলে যাবে। ভিম ব্যবহার করলে আপনার বাড়ী আপনার গর্বের কারণ হবে।

ভিম সবজিনিষেরই উজ্জ্বলতা বাড়ায়



যাত্রাগানের ইতিকথা।

“গান শুনতে যাব”—গায়ের লোকে বলে, যাত্রা দেখতে

যাবার ইচ্ছা তখনে কাছে প্রকাশ করে। যাত্রাপালা, যাত্রা-গান বা শুধু যাত্রা—যে নামেই ডাকা হোক না কেন, যাত্রা যে নাটকের দেশীয় লৌকিক রূপ, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এই যাত্রার উদ্ভব কি ভাবে হোল, নিকাশ কি ভাবে হোল, এর যথার্থ ইতিকথা কী—বিভিন্ন আলোচকের বিভিন্ন মন্তব্যে এক দুর্ভেদ্য বাতাবরণের মাঝে এসব প্রশ্ন আত্মগোপন করেছে। এসব প্রশ্নের একটা সুস্পষ্ট সমাধান লাভের আশায় এই আলোচনার অবতারণা করছি।

অনেকে বলেন, নৃত্য ধাতু হতে নাটক কথাটির উৎপত্তি। ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত জানিয়েছেন, নৃত্য ধাতু হতে নিস্পন্ন হয়েছে নৃত্ত ও নৃত্য কথা দুটি। নৃত্ত শব্দটির অর্থ তাললয়াদি সহযোগে অঙ্গবিক্ষেপ আর নৃত্য শব্দের অর্থ হাবভাবযুক্ত বিবিধ অঙ্গবিহঙ্গদের সাহায্যে মুক অভিনয়।(১) নৃত্য হতে ভারতীয় নাটকের জন্ম। কীথ বলেছেন—“the origin of the drama in the sacred dance, of course, accompanied by gesture of pantomime character, combined with song and later enriched by dialogue, this would give rise to the drama.”(Sanskrit Drama)। এ মত স্বীকার করলেও, সংস্কৃত নাটক কালক্রমে সুপরিণত রূপ লাভ করেছিল মুচ্ছকটিক বা মৃদারাক্ষস ইত্যাদির মত নাটকে। সংস্কৃত নাটকের বিকাশ ও জীবন অতি সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ ছিল। দেশের ও দেশের জীবনের সঙ্গে এর কোনো সচল যোগাযোগ ছিল না। ম্যাকডোনেল বা মটজিয়াস প্রমুখ ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বলেন, ঐ বৈদিক আদিম গীতিনাট্যের অঙ্কুরিত রূপ জনসমাজে ধারাবাহিক ভাবে এসে যাত্রার পরিণতি লাভ করেছে, জয়দেবের গীতগোবিন্দে তারই প্রকাশ। কিন্তু

ডাঃ সুনীল দে বা কীথ জয়দেবের নাট্যরূপের মাঝে বৈদিক ঐতিহ্যে কোনো লক্ষণ দেখতে পাননি।

অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য্য বলেছেন, ওরাওঁদের ‘জ্যৈষ্ঠযাত্রা’ বা দক্ষিণাত্যের ‘মারীযাত্রা’ বা সাঁওতাল-ভূঞাদের ‘যাত্রাপরব’ প্রভৃতির মাঝে যাত্রা কথাটি একটি উৎসবাত্মকরূপে প্রচলিত দেখা যাচ্ছে। তা ছাড়া, যাত্রার মূলে আদিম সমাজে গ্রহ-নক্ষত্রাদির কক্ষান্তর গমনোপলক্ষে যে sympathetic magic জাতীয় অমুষ্ঠান হতে তার অনুমানও করেছেন।(২) যে নদী তার দীর্ঘ গতিপথ অতিক্রম করে সমুদ্রে মিশে, তার উৎপত্তি বিশেষ একটি ধারা থেকে নয়, ছোট ছোট বিভিন্ন ধারা মিলে মিশে একটি নদীকে গড়ে তুলে; তেমনি যাত্রার উদ্ভবমূলে একটি বিশেষ ধারাই ক্রিয়াশীল, বিভিন্ন ধারা মিলে-মিশে তাকে সম্ভব করে তুলেছে। ভট্টাচার্য্য মহাশয় কথিত ধারাটি তাই যাত্রার উদ্ভবমূলে ক্রিয়াশীল হতে পারে, কিন্তু এই ধারাটিই যাত্রার একান্ত উদ্ভব-মূল নয়।

অতীতে কোন দেবতার লীলা উপলক্ষে লোকেরা এক ভাগ্যগা থেকে অল্প ভাগ্যগায় গমন করে নাট্য-গানের সঙ্গে সেই দেবতার মাহাত্ম্য প্রকাশ করত। একে যাত্রা বলত। কেউ কেউ বলেন, সৌবোৎসব সবচেয়ে আদি-উৎসব। আশুতোষ ভট্টাচার্য্যও এ কথা বলেছেন। মন্মথমোহন বসু বলেছেন, ‘স্বর্গের যাত্রা উপলক্ষ্য করিয়া এই সকল উৎসব হইত এবং উহাদের প্রধান অঙ্গ নাট্যাভিনয় ছিল বলিয়া নাট্যাভিনয়ের নাম যাত্রা হইয়াছে।’ (বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ) স্বর্গদেবতা পুরে শিবঠাকুরের সঙ্গে মিলে বান। শিবপুরাণ, ধর্মসংহিতা প্রভৃতি নানা পুরাণে নৃত্য-গীতাদিসহ শিবশাক্তির উৎসবের কথা বর্ণিত হয়েছে। অধ্যাপক অমিতকুমার ঘোষ গ্রীক-দেবতা ডায়োনিসাসের সঙ্গে এর অনেক সাদৃশ্য দেখিয়েছেন, যে ডায়োনিসাসের উৎসব থেকে গ্রীক ট্রাজেডি ও কমেডির উৎপত্তি। এং; অনেকের সঙ্গে তিনিও দেখিয়েছেন, শিবোৎসবমূলক নৃত্য-গীত ও হাতকৌতুকপূর্ণ বর্তমান গভীরা বা গাঞ্জন উৎসবের মধ্যে যাত্রার আদি উপাদান দেখা যায়। কিন্তু তিনি পরিশেষে বলেছেন, পাঁচালী থেকে যাত্রার উদ্ভব। তিনি বলছেন, প্রথমে পাঁচালীর একজন মাত্র মূল গায়ক গান করত। কালক্রমে পাঁচালীর পয়ার ও পালাগানের দীর্ঘতার ফলে একজনের স্থলে দুই বা ততোধিক গায়ক ও অভিনেতার আগমনী হতে লাগল। এই ভাবে পাঁচালীর বৈচিত্র্য ও বিস্তৃতি ঘটেছিল এবং কালক্রমে পাঁচালী থেকে যাত্রার উদ্ভব হয়েছিল। এই মতটি মনোহারী, কিন্তু সত্যধারী নয়। সচল শিবোৎসবের নাট্যগান আমোদ কৌতুকের ধারা আর একটি আসরে স্থির পাঁচালী গানের ধারাকে তিনি মিলাতে পারেন নি।(৩)

ডাঃ সুরকুমার সেন বলেছেন,(৪) যাত্রা কথাটি চলে এসেছে সুপ্রাচীন কাল থেকে, এর অর্থ ছিল—‘পিছন পিছন যাওয়া, দল বেঁধে বা মিছিল করে যাওয়া।’ যাত্রা ছিল হ’রকম—আমোদ-প্রমোদের জগৎ ‘বিহার যাত্রা’ যার থেকে বর্তমান জেলা অর্থে ‘জাত’ কথাটি এসেছে; আর ধর্মকর্মের জগৎ ধর্মযাত্রা, নাট্যগীতবোধক তৎসম শব্দটিতে এই ধর্মযাত্রার ইঙ্গিত। নাট্যগান করে ধর্মযাত্রা বা বিহারযাত্রার উল্লেখ প্রাচীন সাহিত্যে অনেক জায়গাতেই পাওয়া যায়। হরিবংশে

২। বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস।

৩। বাংলা নাটকের ইতিহাস।

৪। বিচিত্র সাহিত্য ১ম খণ্ড।

এমন এক উল্লেখ পাই। সেখানে সমুদ্রযাত্রা করে কৃষ্ণসীলা বিষয়ক মঙ্গলগানের উল্লেখ আছে, তাতে নাট্যগীতের পরিচয়ও পাওয়া যাচ্ছে। তাই তিনি মনে করেন, একটি অবিচ্ছিন্ন সূত্র থেকে মঙ্গলগান বা পাঁচালীর ধারাও নাট্যগীতের ধারা চলে এসেছে। তিনি দেখিয়েছেন, নেপালের কোন কোন ভাষা নাটকে নাটপালা পাঁচালীর যোগপুত্র অবিচ্ছিন্ন রয়ে গেছে। অন্তত তিনি বলেছেন, যাত্রার সঙ্গে পাঁচালীর এইমাত্র পার্থক্য ছিল যে, পাঁচালীতে মূল গায়ন বা পাঠ একটি মাত্র, যাত্রায় একাধিক—সাধারণত তিনটি। (বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস। ১ম খণ্ড—২য় সং; ১৫১ পৃ:) ডাঃ সেনের মতটি নিশ্চিত বলে মনে হয়। কিন্তু তাঁর মতের প্রমাণ হিসেবে (ত্রিযুক্ত নবীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত) নেপালে ভাষানাটকগুলি অবলম্বিত হয়েছে। মনে প্রশ্ন না জেগে পারে না, কেন ঐ ভাষানাটকগুলি বাংলার ভূমিতে স্থান পেল না নেপালে গিয়ে আগ্রর নিল? নাটক এমন একটা সাহিত্যিক রূপ যেখানে সমগ্র জাতিসত্তার মন্বিত ভাব আন্দোলন রূপ পায়, তা জাতির হৃদয়ের সানগ্রী, জাতির প্রাণের কাছেই তার ঠাই। তাহলে ওগুলি জনসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবে রচিত নয় কি? মনে হয় ওগুলি নিতান্ত শৈল্পিক প্রচেষ্টা। আর আঠারো শতকের শেষ ভাগ থেকে লোকসমাজে যাত্রার যে ধারা পাচ্ছি তার পূর্বসূর হিসেবে এই জনান্তিকে থাকা নাট্যগীতগুলি ইতিহাসের অবিচ্ছিন্ন ধারায় আলোকপাত করতে ততটা পারছে কই?

যাত্রার পূর্বইতিহাস অনুসরণে এত গোলযোগ দেখে ডাঃ সুনীল দে বলেছেন, the old yatra seem to be of indigenous growth, peculiar to itself. তাই বাংলাদেশে যাত্রা বা যাত্রার অনুরূপ কি কি প্রকরণ পাওয়া যাচ্ছে, দেখা যাক।

চর্যাপদেই বাংলার নাট্যরচনার রূপ ও স্বরূপের আভাস পাচ্ছি—
নাচন্তি বাজিল গানান্তি দেঈ।
বুদ্ধনাটক বিসমা হোই ॥

বুদ্ধনাটক অভিনীত হচ্ছে। কেমন ভাবে? বজ্রগুরু নাচছেন ও দেবী গাইছেন—এর উল্টোভাবে, অর্থাৎ বজ্রগুরু গান ও দেবী নাচেন—এভাবে সেই প্রাচীন নাটকের অভিনয় চলে। এর পর গীতগোবিন্দ পাচ্ছি। জয়দেব গাইতেন, পদ্মাবতী নাচতেন, পরাশরাদি ত্রিযুক্ত বজ্র দোহারের মত তাঁকে সাহায্য করতেন। গীতগোবিন্দ নাটের চেয়ে গীতের প্রাধান্য। এর পর পাওয়া যাচ্ছে ত্রিকুস্ককীর্তন। ত্রিকুস্ককীর্তনে যাত্রাপালা রূপটি যেন সুস্পষ্ট আকার ধারণা করে দেখা দিয়েছে।

চৈতন্য আমলে নাট্য গীতাভিনয়ের উল্লেখ পাচ্ছি—স্বয়ং চৈতন্যও তাঁর পরিষদবর্গ কর্তৃক। চৈতন্য বলেছেন, “জাতি নৃত্য করিবাঙ, অঙ্গের বন্ধানে।” তিনি অভিনয়ের যে চূড়ান্ত সার্থকতা—অভিনয়ের বিষয়ীভূত পাত্রপাত্রীর মধ্যে সম্পূর্ণ আত্মবিলোপ—তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। (৫) এমন কি তাঁর অভিনয়ে সাজপোষাকের উল্লেখও আছে। “চৈতন্যভাগবতে” “কৃষ্ণযাত্রা” কথাটির উল্লেখ পাওয়া যায়। (৬)

৫। বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা, ভূমিকা—ত্রিকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

৬। “কৃষ্ণযাত্রা অহোরাত্র কৃষ্ণসঙ্কীর্তন।

ইহার উল্লেখো নাহি জানে কোন জন ॥”

কিন্তু বাংলার অভিনয় গ্রন্থের কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় না একালে। কেবল কয়েকটি সংস্কৃত অভিনয় গ্রন্থ পাচ্ছি—শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দীর ‘ললিতমাধব’ ও ‘বিদগ্ধমাধব’, রামানন্দ রায়ের ‘জগন্নাথবল্লভ’, কবি কর্ণপুরের ‘চৈতন্যচন্দ্রোদয়’ ইত্যাদি। চৈতন্যের আবির্ভাবে বাঙালী জাতির মধ্যে যে একটা ভাব-আন্দোলন জেগেছিল তারই ফল এগুলি। এর পর প্রায় দু’শ বছর বাংলা সাহিত্যে যাত্রার কোন নিদর্শন পাচ্ছি না। এই মধ্যবর্তীকালের গুপ্ত ও সুপ্ত প্রচেষ্টা হিসেবে ভাষা-নাটকগুলিকে ধরা যেতে পারে।

এর পর আঠার শতকের মাঝামাঝি থেকে যাত্রাগানের উল্লেখ পাচ্ছি। কৃষ্ণসীলা বিষয়ক ‘কালীয়দমন’ পালার তখন বিশেষ প্রচলন। তার সবচেয়ে পূর্বনো কবির নাম শিবরাম অধিকারী। শিবরামের নিবাস ছিল কৈতুলিগ্রামে। তাঁর শিষ্য পরমানন্দ অধিকারীও নাম করেছিলেন। পরমানন্দের পর শ্রীধাম-সুদামের যাত্রা বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল। লোচন অধিকারীর ‘অকুর-সংবাদ’ ও ‘নিমাইসন্ন্যাস’ও বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল। এরপর কৃষ্ণকমল গোবামী, গোবিন্দ অধিকারী ও তাঁর শিষ্য নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়; তারপর ব্রজমোহন রায়, মতিলাল রায় ইত্যাদি যাত্রাওয়ালার নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের যাত্রাগুলি বিপ্লবণ করলে তিনটি স্তর সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথম স্তরে পড়ে কৃষ্ণকমল গোবামীর যাত্রাপালাগুলি। এর ভিতর গল্প আছে কয়েক ছত্র মাত্র, এটি মুখ্যত কীর্তন পালারই নাট্যরূপ। দ্বিতীয় স্তরে পড়ে গোবিন্দ অধিকারী ও নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের পালাগুলি; এদের মধ্যে গান ও কথা প্রায় সমান সমান

সঙ্গীত-যন্ত্র কেনার ব্যাপারে আগে

মনে আসে ডোয়ার্কিনের



কথা, এটা
খুবই আতা-
বিক, কেমনা
সবাই জানেন
ডোয়ার্কিনের
১৮৭৫ সাল
থেকে দীর্ঘ-
দিনের অভি-
জতার কলে

তাদের প্রতিটি যন্ত্র নিখুঁত রূপ পেয়েছে।

কোন বছরের প্রয়োজন উল্লেখ করে মূল্য-তালিকার
জন্ম লিখুন।

ডোয়ার্কিন এণ্ড সন্ প্রাইভেট লিঃ

শো-রুম :- ৮/২, এন্ডার্সনেড ইন্সট, কলিকাতা - ১

আংশ গ্রহণ করেছে। তৃতীয় স্তরে ব্রজমোহন, মতিলাল রায় হতে আরম্ভ করে আধুনিক স্বেচ্ছা যাত্রাওয়ালাদের রচনার (প্রায় সাত বৎসর হইতে চলিল, এই স্বেচ্ছা যাত্রা প্রথম আরম্ভ হয়। বঙ্গদর্শন ফাল্গুন, ১২৮১) উচ্ছাসপূর্ণ দীর্ঘ গল্প সংলাপের প্রাধান্য আর প্রত্যেক সংলাপের সঙ্গে একটি করে গান আছে। আবার এই স্তরের রচনার অহেতুক ভাঁড়ামি বা তরল হান্তরস সৃষ্টির প্রচেষ্টা দেখা যায়। কৃষ্ণকমল বা গোবিন্দ অধিকারীর ভক্তিরসও নেই এখানে। এর থেকে বৈজ্ঞানিক শীল মনে করেন, (৭) গীতগোবিন্দ-শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ধারায় সঙ্গীতাত্মক নাট্যগীতের এক ধারা এসে আঠার শতকের শেষ থেকে পরিণতিলাভ করেছে। আশুতোষ ভট্টাচার্য্যও বলেছেন, “বাংলার লোকনাট্যের এই দুই প্রান্তবর্তী দুইটি নিদর্শনের উপর লক্ষ্য রাখিয়াই ইহার মধ্যবর্তী সময়ের ইতিহাস রচনা করিতে হইবে।” আর সেসব নাট্যপালার বিষয়বস্তু ছিল ‘বৈষ্ণবধর্ম সম্পর্কিত এবং কৃষ্ণলীলা বিষয়ক’। বৈজ্ঞানিক শীল দেখিয়েছেন, কাহিনীর ক্রমবিকাশ ও ভাবের পারস্পর্য্য রক্ষা করে পদের পর পদ সাজিয়ে নিবন্ধ কীর্তনের যে সব পালা দোল শতকের শেষ দিকে রচিত হতে লাগল, পরে কবিগণ এই সংগ্রহধর্মের আদর্শে নিজেরা স্বতন্ত্র পালা রচনা করতে লাগলেন। দীন চট্টোপাধ্যায়ের যে পালাগল্প মনীন্দ্রমোহন বসু আবিষ্কার করেছিলেন, তা তোল এই ধরনের নিদর্শন। পরে পালাকীর্তনের নানা দ্রুত দার্শনিক তত্ত্ব সাধারণেরা বাখ্য্য কবচে গিয়ে কথকতা অল্প প্রবেশ করতে লাগল। কীর্তন ও যাত্রার মধ্যবর্তী স্তরে ঢপকীর্তন। ঢপের মধ্যে যাত্রার প্রায় সমস্ত লক্ষণই দেখা যায়। একক অভিনয় না রেখে তাকে ভেঙে বহু পাত্রপাত্রীর দ্বারা অভিনয় করালেই যাত্রা হয়। ঢপে সংলাপের আধিক্য দেখা যায়। মোট কথা, সংলাপ ও সঙ্গীতের সমঝায়ে যে যাত্রার উৎপত্তি, ঢপকীর্তন তারই অন্ততম রূপ (পূর্ববর্তী রূপ)। আর এই ঢপকীর্তন যে নতুন পাঁচালীর উদ্ভব, সে কথা ডাঃ সুকুমার সেন মহাশয় বলেছেন। (৮) তাই পাঁচালীর সঙ্গে যাত্রার সাদৃশ্যও লক্ষিত হয়। আমার মনে হয়, সতের শতকে রামায়ণ মহাভারতের বিভিন্ন খণ্ড খণ্ড পালা রচনার আধিক্য বা রায়বাহার পালা রচনা যে মনোভঙ্গীপ্রযুক্ত সেই একই মনোভঙ্গী থেকে যাত্রাপালা রচনার সূত্রপাত। কীর্তনগানকে নতুন ভোলে উপভোগ করবার প্রয়াস থেকেই যাত্রাপালার প্রবর্তন। আঠার শতকের শেষদিক থেকেই বিজ্ঞানসম্মত পালা রচনার উৎসাহ দেখা দিয়েছিল। এ বিষয়ে বরাহনগরের ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়, বেলতলার প্যারীমোহন, জামবাজারের নবীনচন্দ্র বসু, গোপাল উড়ে প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

বাঙালী সংস্কৃতিতে ও বাংলাসাহিত্যে যাত্রার উদ্ভব ও বিকাশ আলোচনা করা গেল। এবং তাতে দেখা গেল, নাট্যগীতের এক বিশেষ ধারা গীতগোবিন্দ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মাঝ দিয়ে বৈষ্ণব আবেগাত্মক ভাবাকুলতা ও সঙ্গীতকে পালাসংকীর্তনের রূপে প্রতিষ্ঠিত করা থেকে বাংলা যাত্রার উদ্ভব হয়েছিল। তার মূলে বৈদিক নাট্যগীতের ধারা প্রবাহিত হয়নি। আর ডাঃ সেন কথিত প্রাচীন নাট্যগীতের ধারা থাকতে পারে। কিন্তু তাই যাত্রাপালার সরল

প্রবাহকে প্রবর্তিত করে নি। প্রাচীন সৌরযাত্রার উদ্ভবস্বরূপ শিবোৎসবের সঙ্গসঙ্গ ও নাচগানের ধারাও কিছু পরিমাণে থাকতে পারে, এদব প্রাক্তন সংস্কাররূপে মিলেমিশে যাত্রারূপকে কিছু পরিমাণে প্রভাবিত করতে পারে; কিন্তু যাত্রা বাংলাসাহিত্যে indigenous growth, peculiar to itself—এর মূলে মানুষের আদিম নাট্যাকৃতি সক্রিয়, শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলার প্রাক্ আধুনিকের লক্ষণ-সম্বিত ব্রতকথার মাঝে তার সুরণ দেখিয়েছেন। অনেকে মঙ্গলকাব্যের মাঝে বা অল্প কোথাও নাট্যরসের ক্ষণিক ক্ষুরণ দেখিয়ে বলেন, যাত্রার ধারা এদের মাঝ দিয়েও এসেছে। আসলে কিন্তু তা’ এই নাট্যাকৃতির স্বাভাবিক সুরণ। এদের মাঝ দিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে চেয়েছে, যাত্রার পূর্বসূরী বা পটভূমি হিসেবে তা বিবেচ্য নয়, কেননা dramatic element কেবল play-drama-opera-রই একান্ত উপকরণ নয়। বাংলার অধিবাসীরা ছিল রাজনৈতিক অধিকারে বঞ্চিত, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠা থেকে দূরীভূত, তাই মুক্তিকামারী স্বল্প সরঞ্জামে সংগঠিত, বাহুল্য ব্যতীত, নৃত্যের দ্রুততাব, সঙ্গীতের বায়বীয় ধর্ম তার গ্রাম্য নাট্যপ্রয়াস বিলসিত হয়েছে, আর ধর্মমোহে তাব দৃষ্টি আচ্ছন্ন থাকায় বাস্তব সংঘাতে দ্বন্দ্বমুগ্ধর হসে উঠেনি। এজেন্টে যাত্রার আড়ট ও বিলম্বিত বিকাশ ও প্রকাশ।

—দিলীপ চট্টোপাধ্যায়।

আমার কথা (৫৫)

শ্রীমতী রাধাকৃষ্ণী দেবী

শিল্পীজীবনের চরম উৎকর্ষতার উঠিয়া আজও যিনি নিজেকে শিক্ষার্থীনা মনে করেন—অন্ততমা শ্রেষ্ঠ-গায়িকা হওয়া সত্ত্বেও অহংকারকে যিনি দূরে রাখেন—বাংলার নিজস্ব সম্পদ কীর্তন গানকে নিজ অস্থিমজ্জার সাথে যিনি মিশাইয়াছেন—সেই শ্রীমতী রাধাকৃষ্ণী দেবী ব্যক্ত করলেন :

আমি যখন পাঁচ বৎসরের শিশু, তখন থেকে পাড়ার যাত্রা ও কীর্তনের আসরে বসে যে গানগুলি শুনতাম—তা বতরু মনে পড়ত ততরু বাড়িতে গাইতাম। আমাদের জিহ্বাগল্লের লোক ছিলেন জেলা-খাত কীর্তনীয়া হরিমাখন দাস। তাঁর গান প্রায়ই শুনতাম চুপটি করে বসে। তাঁরই জিজ্ঞাসায় একদিন তাঁরই গাওয়া হ’-চার লাইন কীর্তন গাই। তারপরে তিনিই হলেন আমার প্রথম সঙ্গীতগুরু। সাত বৎসর বয়স থেকেই তিনি আমার নানা আসরে নিয়ে যেতেন এবং তাঁরই কোলে বসে গান গাইতাম। এই রকম এত আসরে ছিলেন মুর্শিদাবাদের জেলা-শাসক বাঙ্গালাভাষী ও প্রাচীন বৈষ্ণব ইন্ডিয়া এড্ডি (Eddie) সাহেব। তিনিও হরিমাখন কীর্তনে যোগ দিতেন। আমার গান শুনে নিজে থেকে একটা প্রশংসাপত্র দিলেন—আজও তা রেখেছি বহু করে। পল্লী অঞ্চলে অনেক বৈষ্ণব কীর্তনীয়া, অনেক সত্যকারের বাউল আসতেন। গৃহস্থ হতেন তুই তাঁদের গান শুনে—স্বার তাঁরাও মন-প্রাণ উজাড় করে কীর্তন গাইতেন। সামান্য ‘সিদে’ নিয়ে অনেক জিনিষ শিখেছি এত স নামহীন ভায়ামান কীর্তনীয়া আর বাউলদের কাছ থেকে। তাঁরা আমার গুরু—আমার প্রশংসা। তাঁদের গাওয়া দেহতত্ত্বের গান কোনদিন ভুলতে পারব না। আমার মনে, হয় গান শেখার ক্ষ

৭। বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা।

৮। বাঙ্গালী সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড—২য় স—১৫৮ পাতা।

কান তৈয়ারী করতে হবে। অর্থাৎ কানের ভিতর যে কান আছে তাকে সজাগ রাখতে হবে। নচেৎ জীবনে সুর আসে না—গলায় সুর আসে না—গলায় সুর ঠিক বাজে না। সাধারণ লেখাপড়ার গুরু করতে পারি না—ছেলেবেলা থেকে দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে মনঃসংযোগ বার বার ভেঙ্গে চলেছে—কিন্তু যেটুকু শিখেছি তার অনেকখানি আছে এই কান পেতে রাখার অভ্যাস।

কলিকাতায় এসে পেশাদারী কীর্তন গায়কদের সঙ্গে পরিচয় হয়। জাত-বৈষ্ণব হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের গান গোয়ায় ভুল থাকত। তৎকাল উহা রসিকমহল থেকে নির্বাসিত হয়ে শ্রদ্ধাবাড়ীতে “পেলা” খুঁজে বেড়াত। তবুও তাঁরা ছুংখের দিনে, অনাদরের দিনে কীর্তনগানের ধারাকে শুকিয়ে যেতে দেন নি। তাঁদের অনেকের প্রীতি পেয়ে গল্প হয়েছি। বড় হয়ে বুঝলাম যে কীর্তন গানের অনেক কিছুই শেখা হয়নি। তাই আকুল আগ্রহে খুঁজেছি সেই শিক্ষককে—যিনি নতুন করে আমায় পাঠ পড়াবেন। সৌভাগ্যবশতঃ কীর্তনশাস্ত্র-বিশারদ শ্রীহরিদাস কবীর সঙ্গে পরিচয় হল—কিন্তু শারীরিক কারণে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাঘাত ঘটে। তার পর শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্যের শিষ্য গ্রহণ করে থকা হয়।

কলিকাতায় জীবিকার্জনের জন্ত আসবার আগে মঞ্জু সাহেবের শিষ্য গ্রহণের সৌভাগ্য হয়। এত বড় সঙ্গীতশিল্পীর মধুর কণ্ঠ শ্রীরাম সূর্য কাক ও স্বাচ্ছন্দ্য আলংকারিতা প্রতিটি শ্রোতাকে সমোহিত করত। কাকী নজরুল ইসলাম ও আরও অনেকে তাঁর সাক্ষাৎ শিষ্য ছিলেন। এত বড় সঙ্গীতশিল্পীর শেষ পরিণতি হয়েছিল—হু মূর্খ! অল্পের অভাবে কণ্ঠ হয়ে যায় কণী আর মানিকতলার এক জঘন্য বস্তীর এক ভাঙ্গা ঘরে পথ্যহীন, ঔষধহীন সঞ্চলহীন হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুর কিছুদিন আগে প্রচণ্ড জ্বর গারে এক রিক্সার চেপে আমার বাড়ী এলেন। সর্বস্ব তাঁর কাঁপছে—চোখ দিয়ে জল ঝরছে—জড়ানো গলায় আমায় তানপুরা নিতে বললেন। এই অবস্থায় ওস্তাদজী গান ধরলেন। মুগ্ধ হলুম অপূর্ব প্রতিভায়। তাঁর ধারণা হয়েছিল তিনি ঠিকমত শেখাতে পারেন না। তাই লোকে তাঁকে ত্যাগ করেছে। হিন্দী ও উর্দু গান শেখাবার আগে আমায় তিনি প্রথম শেখান ঠিকমত উচ্চারণভঙ্গী ও ভাষা। অনেক বাঙ্গালী শিল্পী ভুল উচ্চারণের জন্ত অনেক আসরে হাতাম্পদ হন। মঞ্জু সাহেবের শিক্ষার ফলে আমি দিল্লী, লখনৌ, নাগপুর, পাটনা প্রভৃতি বেতার কেন্দ্র থেকে বাৎসরিক আমন্ত্রণ পেয়েছি। শ্রীমুখেশ চৌধুরীও আমাকে হিন্দী শিক্ষার ব্যাপারে বহু সাহায্য করেন। এই ভাষা ছুটি ঠিকমত আয়ত্ত না করলে, নতুন আন্তঃপ্রাদেশিক সংস্কৃতি-গোষ্ঠীতে বাঙ্গালী শিল্পী অনাদৃত-হতে পারে।

কলিকাতায় এসে তদানীন্তন বেতার কেন্দ্রে শিল্পী হিসাবে বোগ সিই এবং আজও আমি উহার শিল্পী। এখনকার প্রধান প্রোগ্রাম পরিচালক শ্রীমুখেন্দ্রনাথ মজুমদারের অপূর্ব ব্রহ্মময় ব্যক্তিত্ব আমার শিল্পীবিনকে গড়ে তুলতে প্রচুর সাহায্য করেছিল। রাইচন্দ বড়াল, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভট্ট, বাণীকুমার, পঙ্কজ-মল্লিক, ঞ্জেন্দ্র সেনের সহিত শিল্প সহযোগিতার কথা বার বার মনে পড়ে। এই সময় বেতারের সঙ্গীত বিভাগের পরিচালক ছিলেন শ্রীমুখেন্দ্র চক্রবর্তী।

তিনি আমার উচ্চ সঙ্গীতের তালিম দেন। এছাড়া বাণীকুমারের বেতার বিচিত্রায় আমার অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য। তাঁর প্রবর্তিত মহালয়ার উষা অনুষ্ঠানে আমি প্রায় বারো বৎসর যোগদান করি। আদর্শ ব্রাহ্মণের মতন তাঁহার শুচিতা আমাদের উদ্দীপিত করত। ইহাকে সার্থক করে তুলেছিলেন শ্রীপঙ্কজকুমার মল্লিক।

সেই সময় কলম্বিয়া গ্রামোফোন কোম্পানীতে যোগদান করিয়া প্রথম গান করি উর্দু-গজল ‘না কিসিকি আঁখ কা নুর হ’। এর পর বহুরকম গানের রেকর্ড করিয়েছি সেখান থেকে। গৃহ প্রবেশের বিখ্যাত গান দুটি ‘অগ্নিশিখা এসো এসো’, ও ‘এ মরণের সাগর পারে’ শ্রীঅনাদি দস্তিদারের সুরে আমি গাই। তাছাড়া, নেপালী মাড়োয়ারী ও নাগপুরী ভাষায় রেকর্ড করাই এখান থেকে। মধু বোসের হিন্দী আলিবারার রেকর্ডাভিনয়ে আমি ‘মর্জিনার’ ও বড়ুয়া সাহেবের ‘জবাব’ (হিন্দী) রেকর্ডাভিনয়ে নায়িকার অংশে অভিনয় করি। ছুংখের বিষয়, গত কয়েক বৎসর আমার কোন রেকর্ড সেখান থেকে হয়নি।

সিনেমায় যোগদানের পর কৃষ্ণ-সুন্দামা, কণ্ঠহার, মানময়ী গার্লস স্কুল, রাডারো, রামায়ণ ও চাণক্যতে বিশিষ্ট ভূমিকায় অভিনয় করেছি। চাণক্যর প্রয়োগকর্তা ছিলেন নাট্যাচাৰ্য্য সত্ত্ব-লোকান্তরিত শিশিরকুমার। ইহার আউটডোর স্টুডিও-এর সময় শ্রীমতী কঙ্কাবতী প্রচণ্ড জ্বরে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন। সে সময় একমাত্র আমিই তাঁর কাছে ছিলাম। শত চেষ্টাতেও তাঁর জ্ঞান কিরে আসে নাই। প্রযোজক হিসাবে বড়ুয়া সাহেব, নীতিন বসু, দেবকী বসু ও মধু বসুকে আমি খুব শ্রদ্ধা করি। এন, টির ছবির কিছু কিছু গান আমি রেকর্ড করি। পঙ্কজকুমার ও আমার দ্বৈত-সঙ্গীত ‘কোন লগনে জনম আমার’ খুবই জনপ্রিয় হয়। এখনকার মতম সেদিনের



শ্রীমতী রাধারাণী দেবী

নেপথ্য-গায়কদের টাইটেলে নাম থাকত না বা এত সম্মান ছিল না। সিনেমায় নাম করতে হলে প্রযোজকের শুভদৃষ্টি পাওয়া চাই শিল্পীর—ইহাই আমার ধারণা।

পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে যখন যোগ দিই, তখন বাংলা রঙ্গমঞ্চের ভয়প্রাণ অবস্থা। অভিনয় শেখার স্বল্প স্বর্গত শিশিরকুমারের মতন আচার্য্য পাওয়া সৌভাগ্যের ঐচ্ছিকা। ছ'-একদিন মহলা দিয়ে তাঁর সঙ্গে পিয়রা, ছায়া, সিতারা, দেবকী প্রভৃতি ভূমিকায় আমার অবতরণ করতে হয়েছে। কালিকায় মীরাবাদী নাটকে নামভূমিকায় ও নাট্যনিকেতনে কালিন্দী নাটকে সারিব ভূমিকায় আমি তৃপ্ত হয়েছি। শেষোক্ত স্থানে শ্রীপ্রবোধ গুহ ও শ্রীমতী নীহারবালা সঙ্গে আমার খুব পরিচয় হয়। নীহারবালা ফিল্ম থেকে বিদায় নিয়ে পণ্ডিতারীর ঐচ্ছিক তাম্রমে স্থান পান ও সেখানেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। ইহার মধ্যে ছিল একটি শিল্পপ্রাণ। সারা বার্গার্ডের বা ইসাডোরা ডানকানের ভাবনী হর কিন্তু

খ্যাতনামা লেখক ও সাংবাদিকদের সহিত শ্রীমতী নীহারবালার এত পরিচয় থাকা সত্ত্বেও তাঁহার শিল্পজীবনী কেহই এ পর্যন্ত লেখেন নি।

বাল্যকাল থেকে রবীন্দ্র সঙ্গীতের প্রতি গভীর আগ্রহ ছিল আমার—কিন্তু শেখার সুযোগ পাই নি। কয়েক বৎসর পূর্বে শ্রীসৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'বৈতালিক' দলে আমার নেন ও রবীন্দ্র সঙ্গীতের অনুশীলন আরম্ভ করান। ভয় ভেঙ্গে গেলে মহানন্দে অস্থির অনুভব করতে লাগলাম শিল্পজীবনের চরম সার্থকতা—রবীন্দ্র সঙ্গীত গেয়ে। এর জন্মে সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট আমি বিশেষ স্বর্গী।

কিছুকাল আগে কর্তৃক গানের একটি ছোট বিভাগ খুলি—আর তাঁর পৃষ্ঠপোষক হয়েছিলেন সত্যিকারের সঙ্গীতরসিক ভূপতিদা' অর্থাৎ রাজ্য সরকারের অগ্রতম মন্ত্রী শ্রীভূপতি মজুমদার। আমার পরিচালনা শক্তির অভাবে সে বিভাগ চলেনি—কিন্তু ভূপতিদার সঙ্গীতপ্রীতিতে যুক্ত হয়েছি।

অজয় নদীর চর

শ্রী আইডি রাহা

ছোট একটি গ্রাম এ দেখা যায়
অজয় নদীর চর,
যেথায় মোরা বেঁধেছি মৌদের
সাধের কুঁড়েঘর।
নদীর বুকেতে বয়ে যেত তরী
উড়িয়ে তাঁদের পাল,
কালের হাওয়ায় হাং সেথায়
নেমে এল মহাকাল।
কত কুঁড়েঘর সমাধি হয়েছে
ঢাল উড়ে গেছে ঝড়ে,
তাঁদের দেখিয়া নয়নের জলে
কত কথা মনে পড়ে।
কিছু দূর গেলে চোখে এসে পড়ে
রায়েদের ভাঙ্গা বাড়ী,
যেতে হয় সেথা মৌদের বাড়ীও
বট গাছ পথে ছাড়ি।
পুকুরের পাড়ে চোখে পড়ে কত
অতীতের ভাঙ্গা ঘাট,
সকালে বিকালে বসে যেত যেথা
"বউঠাকুরাণীর হাট"।
হোসেনেরে যেথা সমাধি দিয়েছে
অজয় বাকের তীরে,

আজিও সেথায় পথিক চলিতে
চেয়ে দেখে ফিরে ফিরে।
শ্রবণের দিনে আগমনী গানে
উঠিত গো আবাহন,
সজীব সবুজ হাসিতে ভরিত
পথ-প্রান্তর-বন।
সোনার বরণ ধানের ক্ষেতেতে
যাইত মলয় বহিরা,
শীতল সব চলিয়া পড়িত
কতই না কথা কহিয়া।
গ্রামবাসী মোরা সরল প্রকৃতি
মুখেতে মধুর হাসি,
সুখে ছুখে মোরা দাঁড়াইতাম সদা
সবার পাশেতে আসি।
ভেদাভেদ নাহি জানিতাম মোরা
হিন্দু-মুসলমান,
আকাশে বাতাসে ভরিয়া উঠিত
রাম-রহিমের গান।
অভাব কাহারো ছিল নাক' হেথা
কেহ পাতেনিক' কর;
নদীর মাঝেতে জেগে আছে আজো
অজয় নদীর চর।

সেকেন্দ্রে

ধারনা নিয়ে

ভালভাবে জীবনযাপনের সুযোগ

নষ্ট করবেন না ?



সেকেন্দ্রে ধারণা ও অঙ্গসংস্থার মানুষের পক্ষে ভালভাবে জীবন উপভোগ করবার এবং আধুনিক জগতের সুযোগ সুবিধে সদ্যবহারের পক্ষে সত্যিই বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, কোনো কোনো লোককে বলতে শুনা যায়, "আমি কখনো বনস্পতি ব্যবহার করি না। শুনেছি, স্বাস্থ্যের পক্ষে জিনিষটা ভাল নয়।" এ হল একেবারেই সেকেন্দ্রে সংস্কার ... কারণ শ্রেহজাতীয় পদার্থ যে স্বাস্থ্যের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়, বিজ্ঞান তা প্রমাণ করেছে। উপরন্তু, বনস্পতি যে সবচেয়ে পুষ্টিকর ও উপকারী শ্রেহপদার্থের মধ্যে অস্তুতম বিজ্ঞান তাও প্রমাণ করেছে।

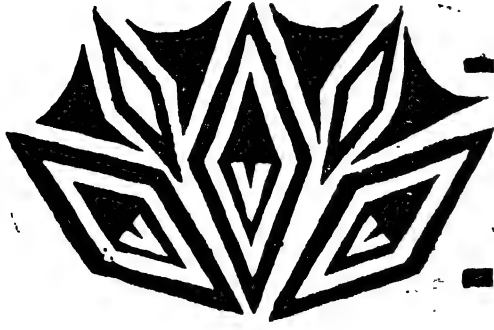
অত্যাবশ্যক ভিটামিনে সমৃদ্ধ

বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে স্বাস্থ্য ও শক্তি বজায় রাখবার জন্তে প্রতিরক্ত মানুষের দৈনন্দিন অস্তিত্ব পক্ষে হু'আউল ক'রে শ্রেহপদার্থ খাওয়া দরকার। শ্রেহপদার্থ আমাদের অস্ত্র খাদ্য হজম করতে ও তার উপকারিতা পেতে সাহায্য করে। তাছাড়া, রোগ ও অবসাদের বিরুদ্ধে যুঝতে এবং আমাদের হৃদয় ও সবল থাকতেও সাহায্য করে।

বনস্পতি বিশুদ্ধ উদ্ভিজ্জ শ্রেহ—চিনাবাদামের ও তিলের তেল পরিিশোধন ক'রে বিশেষ প্রণালীতে তৈরী। এর ভেতরে শ্রেহপদার্থের সব গুণ ঘনীভূত হয়ে আছে বলে বনস্পতি শুধু যে দামে হলভ ও অল্পেতেই অনেক কাজ দেয় তা নয় ... আরো স্বাস্থ্যপ্রদ করবার জন্তে একটি অত্যন্ত আবশ্যকীয় ভিটামিনও এতে মেশানো হয়। বনস্পতির প্রতিটি আউল এ-ভিটামিনের ৭০০ আন্তর্জাতিক ইউনিটে সমৃদ্ধ—যা চোখের ও ত্বকের স্বাস্থ্যরক্ষায়, শরীরের ক্ষয়পূরণে এবং সংক্রমণ প্রতিরোধে অত্যাবশ্যক।

ভাল খাদ্য আপনাকে ভাল স্বাস্থ্য উপভোগ করতে ও ভালভাবে জীবন যাপন করতে সাহায্য করে ... এবং বিশুদ্ধ, পুষ্টিকর ও দামের দিক থেকে সর্বোত্তম বনস্পতির কল্যাণে ভাল খাদ্য খাওয়া সহজ হয়েছে। আপনার কি বনস্পতি ব্যবহার করতে স্বপ্ন করা উচিত নয় ?

বনস্পতি
— বাড়ীর গিল্লীর বন্ধু



সাহিত্য পরিচয়

বাঙলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা

বাঙলা সাহিত্যের দীর্ঘকালব্যাপী গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের আলোচনা এ পঞ্চম বর্ষ সপ্তমী করেছেন, ঐ আলোচনা-গ্রন্থগুলি বলা বাহুল্য, দেশের ও দশের প্রভূত মঙ্গল সাধন করেছে। লক্ষপ্রতিষ্ঠ শিক্ষাত্রতী ও প্রবীণ সাহিত্যসেবী উত্তর শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর উপরোক্ত গ্রন্থে সাহিত্যের ইতিহাস সম্পর্কেই আলোচনা করেছেন—তবে এক ভিন্নতর আঙ্গিক অবলম্বন করে, সাহিত্যের ইতিহাসই গ্রন্থের প্রধান উপজীব্য; তবে আলোচনার ভঙ্গী একটু পৃথক ধরণের। আর এর ফলে গ্রন্থটি যথেষ্ট পরিমাণে বৈশিষ্ট্য বিকশিত হয়েছে। ঠিক কতকগুলি উৎসপঞ্জীর সংকলন বা সাহিত্যবিশেষের সংক্ষিপ্ত বিবরণীর পর্দায় এই গ্রন্থটিকে ফেলা যায় না, এর আলোচনার ভিত্তি আরও গভীর। বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন পরিবেশে সাহিত্যের যে নিত্য নবরূপায়ণ ঘটেছে তার মূল পটভূমিকার প্রতি লেখক আলোকপাত করেছেন, যে মূল ধারাকে কেন্দ্র করে কয়েকটি শতাব্দী যাবৎ বাঙলা সাহিত্যের উপর দিয়ে যে বৈচিত্র্যের বজ্রাঘাত হয়ে চলেছে তার উৎস-সন্ধান লেখক ব্যাপ্ত। নব নব চেতনা ও নব নব চিন্তাধারার সংমিশ্রণ সময়ের অগ্রগমনের সঙ্গে তালে তাল রেখে ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে যে সাহিত্যের উদ্ভব হয়েছে, পুষ্টি হয়েছে, বিকাশ ঘটেছে, সে সখন্দে লেখকের মূল্যবান আলোচনা গ্রন্থটিকে যথোচিত গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্যবান ও অভিনব করে তুলেছে। গ্রন্থটির গঠনকায়ে লেখকের প্রচুর পরিশ্রম নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় ব্যয়িত হয়েছে। আমরা আশা রাখি যে দেশবাসী এর যথাযথ মূল্যদানে কার্ণাধ্য প্রকাশ করবেন না। এই গ্রন্থ পাঠক-সমাজে ও ছাত্রসমাজে সমান সম্মানলাভ করবে বলে আশা করা যেতে পারে, এই জাতীয় গ্রন্থের প্রচার ও প্রসার যত অধিক হয় ততই মঙ্গল। গ্রন্থের শেষাংশে বাঙলা সাহিত্যের একটি কালানুক্রমিক এবং সাহিত্যের ইতিহাসে কয়েকটি মর্যাদার তারিখের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা যুক্ত করে গ্রন্থটিকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলা হয়েছে। প্রচ্ছদচিত্রাঙ্কন অপরূপ হয়েছে, শিল্পীকে অভিনন্দন জানাই। (যদিও সমুদ্র প্রচ্ছদে গ্রন্থের লেখকের নাম লিখিত নেই এবং প্রচ্ছদশিল্পীর নামও গ্রন্থের মধ্যে খুঁজে পাওয়া গেল না) প্রকাশক—ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী। ১ প্রমাচরণ দে স্ট্রিট। দাম—সাত টাকা মাত্র।

সভ্যতা ও আণবিক যুদ্ধ

আজকের দিনে ধর্মের অভিয়ে যে সারা জগতের ক্রমাগতসরণ শান্তিকামী মানুষকে রীতিমত আতঙ্কিত করে তুলছে। ধর্মীয় দিবিদিকে আজ যে ব্যাপক ভাবে বিনষ্টের মহোৎসব চলেছে তার

মধ্যে সৃষ্টির পূজারী মানুষদের পক্ষে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখা এক বিরাট প্রশ্নের তথা সমস্তার রূপ নিয়েছে। বর্তমান কালে আন্তর্জাতিক স্তরী সমাজে বাট্রীও রাসেল একটি বিরাট শ্রদ্ধার আসনের অধিকারী, মনীষার দরবারে এর পাণ্ডিত্যপূর্ণ অবদান অনন্তসাধারণ বিশ্ববন্দিত। এই বহীযান চিন্তানায়ক ও দার্শনিকের অভিমতের মূল্যও অপরিমীয়। জগতের এই ধর্মসম্মুখীনতা স্তরীযরের মানবশ্রেমিক মনকে ব্যাখ্যাত করে তুলেছে, ব্যাকুল করে তুলেছে, বিহ্বল করে তুলেছে। চতুর্দিকে হিংসা হানাহানির যড়যন্ত্র, কুটিলতা, পরস্পরিকাতরতা ও ক্ষমতা-লোলুপতার ভয়াবহ মিছিল তাঁর মনকে পীড়িত করে, তাঁর মতে এ পথ বাঁচার পথ নয়, প্রকৃত পথ নয়, কল্যাণের পথ নয়, এ পথ পরিহার করে শান্তির, মৈত্রীর, শ্রীতির পথে পদাৰ্পণ করলে কল্যাণের স্নিগ্ধ আলোর সারা জগত ভরে উঠবে, নিদারুণ বিপর্যয় থেকে পাওয়া যাবে রক্ষা—মিলবে জীবনদেবতার মুঠো মুঠো আশীর্বাদ। উপরোক্ত মতবাদের উপর ভিত্তি করে আলোচ্য গ্রন্থটি রচিত এবং স্বধীসমাজে পরম সমাদরে গৃহীত। আণবিক যুদ্ধের মারাত্মক পরিণতির দিকে মানুসের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে রাসেল দ্বান্ত হন নি, শান্তির পথে পদক্ষেপের এক পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচীও সেই সঙ্গে সকলের সামনে তুলে ধরেছেন। জীবনসাধকের এই স্ত্রমহান প্রচেষ্টা সফল হোক, এই কামনাই করি। পথভ্রান্ত মানুষকে পথ খুঁজে নিতে আল রাসেলের সূচিস্তিত নির্দেশ প্রভূত সহায়তা করবে, এ বিশ্বাস আমরা রাখি। গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ করেছেন শ্রীমতী করনা রায়। ইতিপূর্বে একাধিক বিদেশী সাহিত্য বাঙলায় অনুবাদ করে প্রভূত যশ ও খ্যাতির অধিকারিনী হয়েছেন শ্রীমতী রায়, মাসিক বসুমতীতে বর্তমানে তাঁর অনুবাদ-উপভাস ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়ে চলেছে। রাসেলের গ্রন্থানুবাদেও অনুবাদিকা যথেষ্ট শক্তির পরিচয় দিয়েছেন এবং আপন স্ত্রনাম অক্ষুণ্ন রেখেছেন, তাঁর অনুবাদকর্ম নিঃসন্দেহে আন্তরিক প্রশংসার যোগ্য। প্রকাশক—আর্ট গ্যাণ্ড লেটার্স পাবলিশার্স। জবাকুস্ত্রম হাউস, ৩৪ চিত্তরঞ্জন স্ট্রাভিনিউ। দাম—দু' টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

মধুমাল্য

বাঙলা সাহিত্যের যুগপ্রচীনের মধ্যে কাজী নজরুল ইসলামের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বঙ্গভারতীয় প্রধানতম সেবকদের মধ্যে এই সৈনিকটির আসনও পুরোভাগে। বাঙলা কবিতার ইতিহাসে নজরুলের নাম চিরকালের মত লেখা থাকবে অমলিন স্বর্ণাকরে। অনেকেই জানেন যে, স্ত্ররলক্ষীর কৃপাও নজরুলের উপর কম পরিমাণে বর্ষিত হয় না। স্ত্ররকার ও গীতিকার হিসেবেও নজরুল জনপ্রিয়তার

অটল আসনে সমাসীন, সুরকার ও গীতিকার হিসেবে তাঁর অবদান যেমনই ব্যাপক তেমনই বিরাট। গীতিনাট্য রচনাতেও তাঁর ক্ষমতা সীমাবদ্ধ নয়, সম্প্রতি উপরোক্ত শিরোনামায় তাঁর একটি গীতিনাট্য দীর্ঘকাল পরে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই গীতিনাট্যটি এককালে সর্গোৎসবে নাট্যভারতীতে অভিনীত হয়েছে এবং এই নাটকটির দ্বারা ই নাট্যভারতীর যাত্রা শুরু। গীতিনাট্য রচনায় নজরুলের কুশলতার ছাপ পাতায় পাতায় ফুটে ওঠে, গানগুলি অত্যন্ত সুকলিত এবং রূপকধর্মী। এই নাটকের কাহিনীর মূল বস্তুব্যাটিও যথেষ্ট হৃদয়স্পর্শী। প্রচ্ছদচিত্র এঁকেছেন শ্রীগণেশ বসু। প্রকাশক—ভারতী লাইব্রেরী, ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট। দাম—হু' টাকা মাত্র।

রক্তের বদলে রক্ত—ও মানুষ নামক জন্তু

রূপ-রস-বর্ণ-বৈচিত্র্য সমন্বিত জীবনের মহিমামণ্ডিত রূপ ধরা পড়ে যাদের চোখে, জীবনকে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে ধরা প্রত্যেক বসতে পারেন, জীবন-রহস্যের উৎস-সন্ধানে তত্পর যে সব সন্ধানীর দল, সেই সার্থকনামা জীবনশিল্পীদের মধ্যে মনোজ বসুও একজন। উপরোক্ত উপন্যাস দু'টিকে তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির অগ্রতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলে অভিহিত করলে অত্যুক্তি হয় না। উপন্যাস দুটির নামকরণের মধ্যে এদের আপন আপন বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটেছে। সাম্প্রদায়িক মতান্তর থেকে জাত দাঙ্গা-হাঙ্গামার আগুনের লেলিহান শিখা মানব-জীবনে যে কতখানি বিপর্যয় আহ্বান করে আনল, হিংসা-হানাহানির মারপ্যাট কত শাস্তির নীড়কে ধূলিসাৎ করে দিল, জগতের মানুষের মিছিল থেকে কতজন যে কোথায় ছিটকে পড়ে চিরকালের জন্যে হারিয়ে গেল, মানুষের জীবন যে কতখানি ওলট-পালট হয়ে যেতে পারে, মানুষের হাসি-আনন্দ-গান কোথায় অবলুপ্ত হয়ে গেল। প্রাণ নিয়ে কি ভীষণ ছিনমিনি খেলা চলতে পারে, প্রথম উপন্যাসটিতে সেই বিভৎস নৃশংসতার কল্পণ প্রতিচ্ছবিই লেখক দুটিয়ে তুলেছেন। মানুষের মুখোসের অভ্যন্তরে জঙ্ঘ ও লুকিয়ে থাকতে পারে, যথাসময়ে তার পাশব প্রবৃত্তির বিকাশের ফলে কয়েকটি নিষ্পাপ সরল জীবনের উপর দিয়ে সর্বনাশের বিধ্বংসী বজ্রাধার বয়ে যায়। পাশব প্রবৃত্তির বিকাশে স্তব্ধ সমাজ কেমন করে বিবিয়ে ওঠে দ্বিতীয় উপন্যাসটিতে মানব-জীবনের ব্যথার, বেদনার, বকনার দিকটির এক সম্যক চিত্র লেখকের লেখনীর কল্যাণে প্রস্তুত হয়েছে। আজকের দুনিয়া যে কতখানি মেকিতে ছেয়ে গেছে লেখক সেদিকে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। জীবনের শূন্যতার বেদনাবিধুর ছবিই কেবল তাঁর লেখনী আঁকেনি, আশার মা ভৈঃ বাণীও তাঁর লেখনী শুনিয়েছে। অন্ধকার রাত্রির ভীষণ ভয়াল রূপের প্রতিচ্ছবিটি তুলে ধরেই লেখক ক্লান্ত হন নি, উজ্জ্বল প্রভাতের স্যোভিধয় আলোকের কল্পনাও তাঁর লেখনীর মাধ্যমে প্রকাশ পায়। পাঠক-পাঠিকা তথা মানুষের দরবারে লেখক কেবলমাত্র হৃৎস্বাদের প্রচার করই থেমে যান নি—শেষে আনন্দলোকের সিংহদ্বারের দিক নির্দেশও তিনি দিয়েছেন, ঘটনা সংস্থাপনে, চরিত্রচিত্রণে, সংলাপ সঙ্কেতে অনন্তসাধারণ দক্ষতা প্রকাশ করেছেন শক্তিশালী কথাসিল্পী শ্রীমনোজ বসু। ব্যঙ্গনায়, বর্ণনায়, বিস্তারিত অতুলনীয় শক্তির পরিচয় দিয়েছে লেখকের লেখনী। মনোজ বসুর সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি গভীর উপলব্ধি ও তাঁর অমূল্য স্পর্শপ্রভাবে গ্রন্থ দু'টি সার্থক

হয়ে উঠেছে। উভয় গ্রন্থের প্রচ্ছদচিত্রাঙ্কনে আশামুরূপ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন শিল্পী আশু বন্দ্যোপাধ্যায়। উভয় গ্রন্থেরই প্রকাশক—বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট। দাম—প্রথমটির দু'টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র এবং দ্বিতীয়টির তিন টাকা মাত্র।

নতুন বাঁকে

বাঙলা সাহিত্যে ছোট গল্প ও উপন্যাসের ইতিহাসে বিশেষ ভাবে স্মরণীয় নামগুলির মধ্যে 'বনফুল' নামটি অগ্রতম। বহু সার্থকনামা ছোট গল্প ও উপন্যাসের তিনি স্রষ্টা, আশা করি, এ কথাও কারো অজানা নয় যে, কবি হিসাবে বনফুল কম যশস্বী নন, বাঙলা কবিতার পুষ্টি সাধনে বনফুলের অবদানও অল্প নয়, বাঙলা কাব্য দীর্ঘকাল ধরে তাঁর দ্বারা সেবিত হয়ে আসছে। বর্তমানে তাঁর কতকগুলি কবিতার একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থে ত্রিশটি কবিতা স্থানলাভ করেছে। কবিতাগুলি বসোত্তীর্ণ, হৃদয়স্পর্শী ও স্বতঃস্ফূর্ত। কবিতাগুলির ভাব অপূর্ণ, ছন্দ মনোরম, ভাষা সাবলীল। কবিতাগুলির আবেদন পাঠকচক্ষে বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। সমগ্র কবিতাগুলির মধ্যে প্রশস্তিবাচক কবিতাগুলি যথা শাক্যসিংহ, পচিশে বৈশাখ, শ্রীশ্রীমা সারদা দেবী, দাদামশাই, (রসস্রাট কেন্দরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়), রবীন্দ্রনাথ (মৃত্যুদিবসে), ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহিতলাল মজুমদার, বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রভৃতি কবিতাগুলি এক অনবদ্য আন্তরিকতার স্পর্শে ভরপুর। প্রচ্ছদচিত্রাঙ্কনের প্রশংসা দেখিয়েছেন শ্রীঅজিত গুপ্ত। প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান ম্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড। ১৩ গান্ধী রোড। দাম—হু' টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

অশেষ গল্প

ডক্টর হরপ্রসাদ মিত্রের কবিখ্যাতি সুবিদিত, যশস্বী শিক্ষাবিদ ও শিক্ষাপ্রচারক হিসেবেও তাঁর দক্ষতার পরিচয় পাওয়া গেছে। কিন্তু ছোট গল্প রচনাতেও তাঁর লেখনী যে সমান পটু, এই বিষয়টি অনেকের কাছেই এখনও অজানা রয়ে গেছে। তাঁর কয়েকটি ছোট-গল্পের সংকলন এই গ্রন্থটি পাঠ করে আমরা এটুকু ধারণা অনায়াসে করতে পারি যে ছোট গল্পলেখকদের মধ্যে হরপ্রসাদের আসনও নিঃসন্দেহে প্রথম সারিতে। গ্রন্থে সাতটি গল্প স্থান পেয়েছে। হরপ্রসাদের গল্পরচনাকেও তাঁর কবিতার যথেষ্ট প্রভাববিস্তার করেছে। গল্পগুলির সৌন্দর্যের প্রতি অসীম অমুরাগের ও এক গভীর অন্তর্দৃষ্টির মধ্যে লেখকের এক প্রখর হৃদয়স্বাভূতির পরিচয় মেলে। গল্পগুলির প্রত্যেকটিই এক বিশেষ আবেদন বহন করে। ঘটনার সংস্থাপনে, চরিত্রসৃজনে, বর্ণনাভঙ্গীতে লেখক অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। সর্বোপরি সমগ্র গ্রন্থটিতে লেখকের এক উদার দরদী ও স্নিগ্ধ মনের আলোখ্য প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে। প্রকাশক—ইষ্ট এণ্ড কোম্পানী, ৩১ নেতাজী সত্যভাষা গ্যাভিনিউ শ্রীরামপুর, প্রান্তিস্থান—ইষ্ট এণ্ড কোম্পানী, ৫২, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট। দাম—হু' টাকা মাত্র।

অপার্টা

পাঠক-পাঠিকাক অমুরোধ যে, উপরের শিরোনামটি যেন তাঁরা আমাদের মন্তব্য বলে মনে না করেন—আমাদের মন্তব্য বরং এর বিপরীতই। রম্যরচনার মাধ্যমে বাঙলা সাহিত্যের ক্রমোন্নতি ঘাঁড়ের দ্বারা হয়ে চলেছে, নীলকণ্ঠ তাঁদেরই একজন। প্রকৃতপক্ষে সাহিত্যের অজ্ঞাত বিভাগগুলির তুলনায় রম্যরচনার লেখকসংখ্যাও নগণ্য, সেই বিবল সংখ্যকদের মধ্যে নীলকণ্ঠ নিঃসন্দেহে একটি বিশিষ্ট আসনের অধিকারী। স্পষ্ট উক্তি, তীক্ষ্ণ মন্তব্য এবং সত্যভাষণ এই ত্রিধারা মিলিত হয়েছে নীলকণ্ঠের সাহিত্যে এবং তার ফলে তাঁর রচনা প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যে পরিণত হতে পেরেছে। বলা বাহুল্য, এই গুণগুলির স্বাধীন প্রকাশ আলোচ্য গ্রন্থটি থেকেও অল্পপস্থিত নয়। যে দুর্নীতির বিববাস্প আজকের সমাজকে বিধাক্ত করে তুলেছে তার বিরুদ্ধে লেখক এক ‘সন্দেশের চাবুক’ ব্যবহার করে প্রবল প্রতিবাদ জানিয়েছেন। রচনাগুলির মধ্যে লেখকের জীবন, মানব ও সমাজ-সচেতন মনের যে পরিচয় ফুটে উঠেছে তা পাঠক সাধারণের অন্তর স্পর্শ করবে বলে আশা করা যায়। ছুটি খোলা চিঠি (একটি সিদ্ধার্থ রায়কে অপার্টা বাটা প্রতিষ্ঠানকে) এবং ছুটি ছবির (পথের পাচালী ও কাবুলিওয়ালা) সমরোপযোগী বস্তু ও ততোধিক নির্ভীক সমালোচনা গ্রন্থের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। পার্শ্বপ্রসঙ্গ এবং পশ্চাদ্ধন্দে লেখা গ্রন্থটির সাক্ষিও পরিচিতি রচনা-কৌশলে উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। প্রকাশক—আশাশুভ পাবলিশার্স, ২০৬ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট। দাম—তিন টাকা মাত্র।

নাট্যগুচ্ছ

সাংস্কৃতিক কালে বাঙলাদেশের নাট্যসাহিত্যের সেবা করে যে তরুণ বাণী-উপাসকের দল সুনাম অর্জন করেছেন ত্রীতরুণ রায় ওরফে ধনঞ্জয় বৈরাগীর দ্বান তাঁদেরই মধ্যে। সার্বিক নাটকের সৃষ্টিকর্মে তাঁর এটোটা সাফল্যলাভ করেছে, এক কথা বললে তুল হয় না। নাট্যশাস্ত্রের কল্যাণকর্মে তাঁর আত্মনিয়োগের বিষয়ও সুবিস্তৃত। বাঙলাদেশের নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসও অসামান্য গৌরবের আলোয় উজ্জ্বল, তার অভিবান যেদিন থেকে শুরু হয়েছে তার পর আজ একটি শতাব্দী পেরিয়ে গেছে। এই ক্রিষ্টাব্দিক একটি শতাব্দীর সাধনার বাঙলার নাট্যসম্ভার যথেষ্ট পরিমাণেই সমৃদ্ধ হয়েছে। সাধারণতঃ নাটকের মাধ্যমে যুগের সমকালীন ছবি, তার প্রসঙ্গ, তার সমস্তার প্রতিচ্ছবি তুলে ধরা নাট্যকারের প্রধান দায়িত্ব। নাটকের প্রধান ধর্ম বলতে বা বোঝা যায় তা হচ্ছে মানুষকে আত্মসচেতন করে তোলা। এই প্রধান দিকগুলিকে কেন্দ্র করে বিচার করলে দেখা যায় যে, তরুণ রায়ের নাটকগুলি আশাহ্নরূপ বসোত্তীর্ণ। পাঠক বা দর্শকের দাবী মেটাতে সক্ষম, আজকের সমাজের বিভিন্ন রূপের পূর্ণাঙ্গ প্রতিচ্ছবি যথোচিত নিপুণতার সঙ্গে তুলে ধরেছে পাঠক তথা দর্শক-সাধারণের সামনে। লেখকের সন্ধানী মনের পরিচয়ও গ্রন্থের নানাস্থানে পাওয়া যায়। নাটকগুলি বাস্তবধর্মী হলেও তাদের মধ্যে রূপ-রস-বর্ণনায় বিচিত্র কল্পনার এক আশ্চর্য অল্পভূতি অনুভূত নয়। গ্রন্থে সবসময়ে নটী নাটিকা স্থানলাভ করেছে, এদের মধ্যে অধিকাংশই আকাশগঙ্গী এবং অজ্ঞাত স্থানে সমারোহে অভিনীত। নাট্যোদ্যোগের দরবারে এই নাটিকা সংকলনটি যথেষ্ট সমাদরের সঙ্গে

গৃহীত হবে বলে আশা রাখি। ত্রীভাঙ্করানন্দ রায়ের প্রোহদ অর্জন প্রশংসার। প্রকাশক—আর্ট হ্যাণ্ড লেটার্স পাবলিশার্স, জবাকুহুম হাউস, ৩৪ চিত্তরঞ্জন স্ট্রাভিনিউ। দাম—ছুটাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস

আজকের দিনে বিশ্বপ্রসঙ্গে স্বাধীন ভারতবর্ষের সঙ্গে তুলনীয় যে ক’টি দেশের নাম উল্লেখ করা চলে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের মধ্যে অন্যতম। জগতের মহাদেশগুলির মধ্যে অ্যামেরিকাই বংশে শব্দে তরুণ। পোনে পাঁচ শ’ বছর আগেও সারা পৃথিবীতে এই মহাদেশের অস্তিত্ব পথস্থ ছিল না। আর একটি কারণে বাঙালীর কাছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্ব যথেষ্ট, বহির্ভারতে যুগাবতার আমন্ত্রণের প্রচারের পুণ্যফল লাভ করে সর্বপ্রথম ধন্য হয়েছে এই অ্যামেরিকা। আজকের এই মানবসভ্যতার ব্যাপক জয়যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবতই মানুষের মনের গতিবিধিও বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে, তার মন ক্রমশঃই স্বীকৃত থেকে স্বীকৃতির হয়ে চলেছে। মানবমনের প্রসঙ্গ আজ হতে চলেছে অনন্ত থেকে অনন্ততর। স্বকীয়তার সীমারেপা অতিক্রম করে প্রসারিতার আহ্বান মানুষকে আকর্ষণ করছে। ক্ষুদ্রতার প্রচার ভেদ করে বিশালতার প্রাক্ষণে পা ফেলতে মানবচিহ্ন উন্মুখ। জানার ইচ্ছা নয় আজ জানার ক্ষুধা মানুষের মন অধিকার করে আছে। আজ মানুষ পরিণত হতে চলেছে এক বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীতে, মানুষ অপরের সহকে আজ বিশদভাবে জানতে চায়, পারস্পরিক ভাবের আদান-প্রদানের মধ্যে দিয়েই এই জানা সম্ভবপর হবে, দেশের ইতিহাসই নিবসন করবে এই জানার কৌতুহল।—ত্রী আর, বি, নাই ও ত্রী জে, ই, মোবপার্স গার লেখা যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে যুক্তরাষ্ট্র সম্বন্ধে অসংখ্য তথ্যে ভরপুর এবং ঐ দেশের ইতিহাস সম্বন্ধে নানা বিবরণ-সমৃদ্ধ। অ্যামেরিকার বিশদ ইতিহাস যথেষ্ট কৃতিত্বের সঙ্গে লিপিবদ্ধ করেছেন লেখকবর্ষ। বাঙলার গ্রন্থটির প্রকাশনার অন্তিমকালে ত্রীতরুণ রায় সরকার, ত্রীনীলরতন দেব ও ত্রীমতী দীপালি মুখোপাধ্যায়। অনুবাদ-কর্ম যথেষ্ট উজ্জ্বল হয়েছে এবং নিপুণতার স্বাক্ষর বহন করেছে। শেবোক্তদের শ্রম সফল হয়েছে এ কথা অনায়াসে বলা যায়। প্রকাশক—এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানী, এঃ ১৩২-১৩৩ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট। দাম—৭শ টাকা মাত্র।

আবিষ্কারের গল্প

আজকের দিনে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানকে পরিচালিত করা হচ্ছে ধ্বংস করণ, বৈজ্ঞানিক শক্তিকে ব্যবহার করা হচ্ছে, বিনষ্ট প্রকৃতির, বিজ্ঞানের ধ্বংস করার শক্তিকে কাজে লাগানো হচ্ছে পূর্ণমাত্রায়, কতকগুলি আত্মসর্গ, ক্ষমতালোভী, নরদানবের হাতে পড়ে বিজ্ঞান আজ প্রতিভাত হয়ে উঠেছে বিধাতার অভিশাপরূপে অথচ এ কথাও কোনমতেই অস্বীকার করা চলে না যে, বিজ্ঞান বিধাতার আশীর্বাদের এক অল্প স্বাক্ষর। সাহিত্যের মত বিজ্ঞানও সভ্যতার একটি প্রধান অঙ্গ। বিজ্ঞান ব্যক্তিরকে সভ্যতা সম্পূর্ণরূপে অসম্পূর্ণ। সভ্যতার উৎকর্ষহীন বিজ্ঞানের অবদান যেমনই গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই সীমাহীন। সেই অসভ্য, বজ্র, বর্ষর জীবন বাপন করেছে যে মানুষ—তার পর বহু শতাব্দী ধরে যে অনলস সাধনার সে আজ পরিণত হয়েছে আলোকপ্রাপ্ত সুসভ্য নাগরিকে, তার হৃদে

বিজ্ঞানের অবদানও কিছু কম নয়। মানুষের ক্রমজাগরণের ইতিহাসে সাহিত্যের মতই বিজ্ঞানের অবদানও সমান মূল্য বহন করে। বিজ্ঞানী ছদ্মনামের অন্তরালে লেখক বৈজ্ঞানিক অসামান্য আবিষ্কারগুলি আলোকোজ্জ্বল কাহিনীর ইতিবৃত্ত ধারাবাহিকভাবে এই গ্রন্থের মাধ্যমে পরিবেশন করে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। বিজ্ঞানের এক-একটি আবিষ্কারের কাহিনী যেমনই আশ্চর্য, তেমনই চমকপ্রদ, যে সকল আবিষ্কারের সফল আজ আমরা প্রত্যেকে ভোগ করছি তাদের জন্ম-ইতিহাস সম্বন্ধে সরস, সুন্দর ও সাবলীল আলোচনা নিশ্চয়ই পাঠক-পাঠিকাকে আনন্দ দেবে বলে আশা করা যায়। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলির কাহিনী ও ইতিহাসগুলি এই গ্রন্থের উপজীব্য। কালানুক্রমিক আলোচনার ফলে প্রসঙ্গক্রমে বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন কাহিনীর প্রতি আলোকপাত করার ফলে গ্রন্থের মর্যাদা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। সাহিত্যসৃষ্টিতেও লেখকের লেখনী অপটু নয়, লেখকের বর্ণনাত্মক, বৈজ্ঞানিকোপলব্ধি লিপিতাত্ত্বিক প্রশংসার দাবী রাখে। এই গ্রন্থ ছোট বড় উভয় সম্প্রদায়কেই যুগপৎভাবে আনন্দ দান করবে। বিজ্ঞানানুরক্তের দল এই গ্রন্থ পাঠে বহুলাংশে উপকৃত হবেন। এই গ্রন্থের যথাপ্রাপ্য সমাদর আমরা কামনা করি। প্রকাশক—ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, ১ আমাচরণ দে স্ট্রিট, দাম—এক টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

চিকিৎসাবিজ্ঞানের নব অবদান

পৃথিবীতে মানুষের বোধ হয় সব চেয়ে বড় শত্রু রোগ, ব্যাধি, জ্বর। এরা শুধু দেহের দিক দিয়েই নয়, মনের দিক দিয়েও মানুষকে ক্ষতিবিক্ষিত করে তোলে। রুদ্রবস্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ার ফলে মৃত্যুর চেয়েও মনের মৃত্যু সকল দিক দিয়েই ভয়ানক সামাজিক, জীবনিক! প্রাচীনকালে ঋষিদের সাধনার প্রভাবে রোগ দূর হত। আজ সে পুণ্যকল্প ঋষির কোথায়? আধুনিককালে যোগের অবসানকল্পে বৈজ্ঞানিকদের অবদান অপরিমিত, তাঁদের অক্লান্ত প্রচেষ্টার উদ্ভাবিত হল অসংখ্য ঔষধ, রোগের নাশকারী। আজকের দিনের চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বেগবান অগ্রগতি লক্ষ্য করবার মত। লক্ষ্যই হচ্ছে, কত জটিল রোগকে কত সহজে মানুষের দেহ থেকে সরিয়ে দেওয়া যায়, আশার কথা, বিজ্ঞানসাধকের দল এই সাধনায় ক্রমেই সিদ্ধিলাভ করছেন। এই নব নব ঔষধাবলীর

ইতিহাস তাদের আবিষ্কারকদের সম্বন্ধে বহু তথ্য, তাদের উত্তর প্রসার ও জয়যাত্রার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ উপরোক্ত গ্রন্থে অতি সুন্দর ভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। গ্রন্থটি 'আর্নেস্ট হার্ডিং ইবার্টসের মডার্ন মেডিক্যাল ডিসকভারিস' নামক গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। অনুবাদকর্তা অনুবাদকও যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। অনুবাদ অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী, সাবলীল ও মনোরম হয়েছে। প্রাঞ্জল বর্ণনাত্মক ও চিত্তাকর্ষক। প্রচ্ছদচিত্রটিও বেশ আকর্ষণীয়। কিন্তু সমগ্র গ্রন্থটিতে অনুবাদকের বা অনুবাদকদের এবং প্রচ্ছদচিত্রীর নাম অনুল্লিখিত রয়ে গেছে। ভিটামিন, পেনিসিলিন, ডি, ডি, টি, প্রাজমা, সালফা ড্রাগস, ট্রেপটোমাইসিন, গামাগ্লোবুলিন, গ্রামিসিডিন, ভেকসিন প্রভৃতি সম্বন্ধে ষাঁরা কৌতূহল পোষণ করেন এই গ্রন্থটিতে তাঁদের কৌতূহল নিরসন করবে। বৈজ্ঞানিক আলোচনার অংশগুলি যাতে সকলের পক্ষে সহজবোধ্য হয়ে ওঠে, সেদিকেও যথেষ্ট যত্ন নেওয়া হয়েছে, এ কথাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রকাশক—শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী, ৭১ গান্ধী রোড। দাম এক টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

কুস্তকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ

সপ্তকণ্ঠ রামায়ণের মধ্যে রাবণাহুজ কুস্তকর্ণের উপস্থিতি বলতে গেলে ষড়সামান্য, খুব অল্প অংশ ছুড়ে থাকলেও রামায়ণের মধ্যে কুস্তকর্ণ যে একটি বিশেষ অর্থাৎ টাইপ চরিত্র, এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশই থাকতে পারে না। কুস্তকর্ণের নিদ্রাভঙ্গের অংশটুকু অবলম্বন করে ছোটদের উপযোগী একটি তিনটি দৃশ্য-সম্বিত নাটক রচনা করেছেন খ্যাতিমান লেখক প্রশান্ত চৌধুরী। সারা নাটকের মধ্যে কৌতুকরস যুক্ত করার নাটকটি বেশ উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। নাটকটি অভিনীতও হয়েছে সর্গোব। নাটকটির মধ্যে কয়েকটি কাল্পনিক চরিত্র যুক্ত করে নাটকটিকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলা হয়েছে। নাটকটি ছোটদের দরবারে সাধারণ গৃহীত হবে বলে আমরা আশা রাখি। নাটকটি সুকলিত ও সুলিখিত, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, সঙ্গোপাংশ যথেষ্ট হৃদয়গ্রাহী, চরিত্রগুলিও অস্বাভাবিক নয়। প্রচ্ছদ এবং গ্রন্থের অন্তর্গত চিত্রগুলি অঙ্কন করেছেন লেখক স্বয়ং। প্রকাশক—বলাকা প্রকাশনী ২৭ সি আমহার্ট স্ট্রিট। দাম এক টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

ভালোবাসা

অঞ্জলি দাশগুপ্তা

আমার চিতা তোমার বুকে ঝলুক ঝলুক,
আমার নৃত্তি তোমার চোখে ঝলুক ঝলুক,
রাত্রিশেষের নিবিড় ক্ষণে
পরলোকের হাওয়ার সনে
আমার স্তম্বে বাধার বীণা
বাতুক মনে বাতুক মনে।

◉ দেশে-বিদেশে ◉

শ্রাবণ, ১৩৬৬ (জুলাই-আগষ্ট '৫৯)

অন্তর্দেশীয়—

১লা শ্রাবণ (১৮ই জুলাই) : কেবলে কম্যুনিষ্ট মন্ত্রিসভার উচ্ছেদের দাবীতে রাষ্ট্রপতির (ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ) নিকট কেবল বিমোচন সমর সমিতির নেতা শ্রীপদ্মনাভন ও কেবল প্রজা-সমাজতন্ত্রী নেতা শ্রীধর পিল্লাই-এর দরবার।

২রা শ্রাবণ (১৯শে জুলাই) : শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল প্রভৃতি জনকল্যাণ সংস্থায় পঞ্চম বর্ষ কবীর উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রস্তাবিত আইন-ব্যবস্থার প্রতিরোধকল্পে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি কর্তৃক পাঁচ দফা আন্দোলনসূচা গ্রহণ।

৩রা শ্রাবণ (১০শে জুলাই) : দাঙ্গিলি-এর সরকারী ওদাম হইতে দশ হাজার টাকার চাউল পাচারের সংবাদ।

কেবলে অবিলম্বে সাধারণ নির্বাচনের ব্যবস্থাকল্পে রাষ্ট্রপতির নিকট কেবল কংগ্রেস কমিটির আরকলিপি পেশ।

৪ঠা শ্রাবণ (২১শে জুলাই) : জম্মু ও কাশ্মীরের ভয়াবহ বন্যায় ১৩৯ জনের প্রাণহানি—১০ কোটি টাকার সম্পত্তি বিনষ্ট।

কেবলের সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে ত্রিবাঙ্কমে রাজ্যপাল ডাঃ বি. রামকৃষ্ণ রাও-এর সহিত কেবল মুখামতী শ্রীই, এন. এস. নাম্মলিপাদের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা।

৫ই শ্রাবণ (২২শে জুলাই) : ভারত-পাকিস্তান বাণিজ্যচুক্তি প্রসঙ্গে নয়াদিল্লীতে সেক্রেটারী পর্যায়ে উভয় রাষ্ট্রের সম্মেলন।

৬ই শ্রাবণ (২৩শে জুলাই) : পাক সৈন্যদল কর্তৃক আসামের জয়ন্তিয়া পাহাড়-সামান্তে আরও দুইটি ভারতীয় গাম (বাকুরটিলা ও বাশা) অধিকার।

১১৬১ সালের এপ্রিল মাসের মধ্যে পূর্ব বেঙ্গলের শিয়ালদহ-রাণাঘাট এবং দমদম-বনগাঁ সেকশন দুইটির বৈজ্ঞানিককরণ—সংশ্লিষ্ট রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীকৃপাল সিং-এর ঘোষণা।

৭ই শ্রাবণ (২৪শে জুলাই) : কলিকাতা পৌরসভার অধিবেশনে পৌরকর্মীদের বেতনের হার পরিবর্তনের প্রস্তাব আলোচনাকালে সভাকক্ষের ভিতরে ও বাহিবে তুমুল হটগোল।

৮ই শ্রাবণ (২৫শে জুলাই) : কেবল পরিস্থিতি প্রসঙ্গে রাষ্ট্রপতির সহিত প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু ও কংগ্রেস-সভানেত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক।

৯ই শ্রাবণ (২৬শে জুলাই) : নয়াদিল্লীতে কেবলের প্রসঙ্গে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থের জরুরী আলোচনা।

১০ই শ্রাবণ (২৭শে জুলাই) : পশ্চিমবঙ্গ খাদ্য উপদেষ্টা বোর্ডের সভায় মুখ্য মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও খাদ্যসচিব শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের সহিত বিরোধী দলভুক্ত সদস্যদের তীব্র বাদামুবাদ এবং সরকারী কার্য-ব্যবস্থার প্রতিবাদে বিরোধী সদস্যদের সভাকক্ষ ত্যাগ।

১১ই শ্রাবণ (২৮শে জুলাই) : কেবল সরকারের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপিত প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সকল অভিযোগ সম্পূর্ণ

ভিত্তিহীন—দিল্লী ও ত্রিবাঙ্কমে প্রকাশিত কেবল সরকারের (কম্যুনিষ্ট) জবাবে স্পষ্ট ঘোষণা।

১২ই শ্রাবণ (২৯শে জুলাই) : কম্যুনিষ্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ শাখায় শঙ্ক হইতে কলিকাতার রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডুর নিকট এক দিল্লীতে রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের নিকট রাজ্যের কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে ১৪ দফা অভিযোগ সম্বলিত আরক-লিপি পেশ।

১৩ই শ্রাবণ (৩০শে জুলাই) : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনস্বার্থ-বিরোধী খাদ্যনীতির প্রতিবাদে মুখ্য মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের বাসভবনের সম্মুখে তিন সহস্রাবধিক নর-নারীর বিক্ষোভ।

১৪ই শ্রাবণ (৩১শে জুলাই) : কেবলে ১৮ মাসব্যাপী কম্যুনিষ্ট শাসনের অবসান—ভারতীয় সংবিধানের ৩৫৬ ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক শাসনভার গ্রহণ।

প্রথম ডিভিশন ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় মোহনবাগান দলের (কলিকাতা) চ্যাম্পিয়ান শিপ (এ বাবং ৮ বার) লাভ।

১৫ই শ্রাবণ (১লা আগষ্ট) : তত্ত্বসমগ্র চুক্তি ভঙ্গ কবিরা জয়ন্তিয়া পাহাড়ের ডাওকি অঞ্চলে পাক-সৈন্যদের পুনরায় গুলীবর্ষণ।

১৬ই শ্রাবণ (২রা আগষ্ট) : কেবলে কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে গতাত্তর ছিল না—নয়াদিল্লীতে কংগ্রেস পার্লামেন্টারী দলের সভায় প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর উক্তি।

১৭ই শ্রাবণ (৩রা আগষ্ট) : লোকসভায় বর্দাকানন অধিবেশনের প্রথম দিনে কম্যুনিষ্ট সদস্যগণ কর্তৃক কেবলে কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে একযোগে সভাকক্ষ ত্যাগ।

১৮ই শ্রাবণ (৪ঠা আগষ্ট) : বিনিয়ন্ত্রণের পর পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র চাউলের মূল্য বৃদ্ধি—লোকসভায় প্রশ্নবাণে জর্জবিত কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রীঅজিতপ্রসাদ জৈনের স্বীকৃতি।

১৯শে শ্রাবণ (৫ই আগষ্ট) : লোকসভায় স্পীকার শ্রীঅনন্ত-শ্যামল আয়েঙ্গার কর্তৃক কেবল (কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ) সম্পর্কে কম্যুনিষ্ট মনোভাবী প্রশ্নাব অগ্রাহ্য—পরিণতিতে লোকসভায় তুমুল হটগোল।

২০শে শ্রাবণ (৬ই আগষ্ট) : লোকসভায় প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর বিবৃতি—তীব্রতত্ত্ব চীনা কর্তৃপক্ষের এক আদেশবলে তিব্বতে ভারতীয় ও তিব্বতী মুদ্রা বে-আইনী ঘোষিত হইয়াছে।

২১শে শ্রাবণ (৭ই আগষ্ট) : ভারতে অনির্দিষ্ট কালের জন্য ইংরেজী ভাষা চালু থাকিবে—লোকসভায় প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর ঘোষণা।

২২শে শ্রাবণ (৮ই আগষ্ট) : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনস্বার্থ-বিরোধী খাদ্যনীতির বিরুদ্ধে ২০শে আগষ্ট হইতে পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র আইন অমান্য আন্দোলন—মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির সিদ্ধান্ত।

২৩শে শ্রাবণ (৯ই আগষ্ট) : নয়াদিল্লীতে রাজ্য শিক্ষামন্ত্রী সম্মেলনের সিদ্ধান্ত—১৯৬৫-৬৬ সালের মধ্যে ৬ হইতে ১১ বৎসর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকার অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইবে।

২৪শে শ্রাবণ (১০ই আগষ্ট) : রাজ্যসভায় কেবলের রাজ্যপালের কেবল সংক্রান্ত রিপোর্ট দাখিলের দাবী প্রত্যাখ্যান হওয়ায় প্রতিবাদস্বরূপ কম্যুনিষ্ট সদস্যদের সভাকক্ষ ত্যাগ।

২৫শে শ্রাবণ (১১ই আগষ্ট) : তিব্বতত্ত্ব ভারতীয়দের স্বদেশে আনয়ন ব্যাপারে ভারত সরকারের অনুপ্রোধ গণচীন কর্তৃক অগ্রাহ্য—লোকসভায় শ্রীমতী লক্ষ্মী মেননের (কেন্দ্রীয় পররাষ্ট্র দপ্তরের সহকারী মন্ত্রী) উক্তি।

নয়া দিল্লীতে দীর্ঘ আলোচনার পর ভারত ও আফগানিস্তানের মধ্যে নতুন বাণিজ্যচুক্তি সম্পাদিত।

২৬শে শ্রাবণ (১২ই আগষ্ট) : সীমানা (পাক-ভারত) নির্ধারণ ব্যাপারে খাসিয়া জয়ন্তিয়া পাহাড় (আসাম) ও শ্রীহট্টের ডেপুটি কমিশনারদের বৈঠক ব্যর্থতায় পর্যাবসিত।

২৭শে শ্রাবণ (১৩ই আগষ্ট) : চীনের সরকারী পত্রিকায় ভারত ও ভারতীয়দের বিরুদ্ধে অপপ্রচার—লোকসভায় প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরুর ঘোষণা।

২৮শে শ্রাবণ (১৪ই আগষ্ট) : পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান সমগ্রাসকুল ঋতুপরিবর্তিতির সঙ্কট নিরসনের নতুন প্রচেষ্টায় অপ্রত্যাশিতভাবে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও রাজ্য প্রজা-সমাজতন্ত্রী দলের নেতা ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের ঘোঁষ বিবৃতি প্রচার।

২৯শে শ্রাবণ (১৫ই আগষ্ট) : দেশের সর্বত্র মাণ্ডুলি পদ্ধতিতে স্বাধীনতার দ্বাদশ বাধিকী উদ্‌যাপন। বহু স্থানে সভা-সমিতিতে অগণতান্ত্রিক কংগ্রেসী সরকারের তীব্র সমালোচনা।

মূল্য বৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি ২০শে আগষ্ট হইতে রাজ্যব্যাপী (পশ্চিমবঙ্গ) আইন অমান্ত আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কর্তৃক বিবৃতি মারফত আলোচ্য কমিটিকে সতর্কীকরণ।

৩০শে শ্রাবণ (১৬ই আগষ্ট) : সুপ্রীম কোর্ট ও ভারতীয় কমিশনের এক্সিকিউটিভ সম্প্রসারণের জন্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে—কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী বক্সী গোলাম মহম্মদের ঘোষণা।

৩১শে শ্রাবণ (১৭ আগষ্ট) : পশ্চিমবঙ্গ মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির প্রস্তাবিত আইন অমান্ত আন্দোলন (রাজ্যব্যাপী) দমনে ১৬ জন এম. এল. এ সহ প্রায় দুই শত বামপন্থী নেতা ও কর্মী গ্রেপ্তার।

বহির্দেশীয়—

১লা শ্রাবণ (১৮ই জুলাই) : পূর্ব-পাকিস্তানের সামরিক কর্তৃপক্ষের আদেশ অনুযায়ী ১৯৫১ সালের ৭ই মে তারিখের সাংগঠনিক বস্তুমতীর সমস্ত কপি বাজেয়াপ্ত।

পেশোয়ারে মার্কিন খাঁটি স্থাপনে পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার সংবাদ।

৩লা শ্রাবণ (২০শে জুলাই) : সমগ্র জাঙ্গাণ সমস্তার মৌমাংসা-কর বৃহৎ চতুঃশক্তি (রুশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্স) পররাষ্ট্র সচিব সম্মেলনকে আধা স্থায়ী সংস্থায় পরিণত করার পশ্চিমী প্রস্তাব সোভিয়েট ইউনিয়ন কর্তৃক সরাসরি প্রত্যাখ্যান।

৪ঠা শ্রাবণ (২১শে জুলাই) : ইরাকের তৈল সহরে কিরকু-এ বিদ্রোহীদের সহিত ইরাকী বাহিনীর সংগ্রাম অব্যাহত।

৫শে শ্রাবণ (২২শে জুলাই) : জাঙ্গাণী প্রসঙ্গে জেনেভায় চতুঃশক্তি পররাষ্ট্র সচিবদের আলোচনায় অচলাবস্থা দূরীকরণের চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যাবসিত।

৭ই শ্রাবণ (২৪শে জুলাই) : আলজিরিয়ার বিদ্রোহ দমনে ফ্রান্স সরকারের বৃহত্তম সামরিক অভিযান আরম্ভ।

মহোদয় ফ্রেমলিনে সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী মঃ নিকিতা ক্রুশ্চেভের সহিত মার্কিন ভাইস-প্রেসিডেন্ট মঃ রিচার্ড নিকসনের সাক্ষাৎকার।

১ই শ্রাবণ (২৬শে জুলাই) : আন্তর্জাতিক আইন-বিশেষজ্ঞ কমিশন কর্তৃক তিব্বতের ঘটনাবলী তদন্তের জন্ত কমিটি গঠন—চেয়ারম্যান : শ্রীপুরুষোত্তম ত্রিকমদাস (ভারত)।

১১ই শ্রাবণ (২৮শে জুলাই) : রুশ কৃত্রিম উপগ্রহ নির্মাণ পরিকল্পনার প্রধান অধ্যাপক এটোনি ব্লাগনরাতভের ঘোষণা—রুশিয়া শীঘ্রই সৌরজগতের অগাধ গ্রহে গবেষণার যন্ত্রপাতি সজ্জিত রকেট প্রেরণ করিবে।

১২ই শ্রাবণ (২৯শে জুলাই) : দুর্নীতিস দায়ে পূর্ব-পাকিস্তানের তিন জন প্রাক্তন মন্ত্রী (আওয়ামী লীগ—কংগ্রেস কোয়ালিশান সরকারভুক্ত) গ্রেপ্তার।

১৩ই শ্রাবণ (৩০শে জুলাই) : বিশ্ব সমগ্রাবলী সমাধানের উপায় বিবেচনার্থ সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী মঃ নিকিতা ক্রুশ্চেভ কর্তৃক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠানের প্রস্তাব।

১৪ই শ্রাবণ (৩১শে জুলাই) : লাওস-এ সরকারী বাহিনী ও প্যাথেন্ট-লাও বাহিনীর (বিদ্রোহী) মধ্যে পুনরায় লড়াই হওয়ার সংবাদ।

১৭ই শ্রাবণ (৩রা আগষ্ট) : পারম্পরিক আমন্ত্রণ অনুযায়ী রুশ প্রধানমন্ত্রী মঃ ক্রুশ্চেভ কর্তৃক সেপ্টেম্বরের (১৯৫১) মাঝামাঝি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার (মার্কিন) কর্তৃক শরৎকালে সোভিয়েট ইউনিয়ন সরকারের সিদ্ধান্ত ঘোষণা।

১৮ই শ্রাবণ (৪ঠা আগষ্ট) : বিদ্রোহী গেরিলা বাহিনীর সহিত রাজকীয় লাও বাহিনীর সংঘর্ষের পর লাওসের পাঁচটি প্রদেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা।

১৯শে শ্রাবণ (৫ই আগষ্ট) : প্রায় আড়াই মাস অধিবেশন চলার পর বিনা সিদ্ধান্তে জেনেভায় জাঙ্গাণী সম্পর্কে বৃহৎ চতুঃশক্তি পররাষ্ট্রসচিবগণের সম্মেলনের পরিসমাপ্তি।

২২শে শ্রাবণ (৮ই আগষ্ট) : কাশ্মীরের পাক-অধিকৃত এলাকায় মঙ্গলাবাধ নিষ্পাণ ব্যাপারে ভারত কর্তৃক রাষ্ট্রসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে তৃতীয় দফা প্রতিবাদ পেশ।

২৪শে শ্রাবণ (১০ই আগষ্ট) : সিঙ্কুনদের জল বিভাগ সম্পর্কে ১৯৬০ সালের প্রথমার্ধে ভারত-পাকিস্তান চুক্তি সম্পাদিত হইবে—লণ্ডনে সাংবাদিক বৈঠকে বিশ্বব্যাংকের সহ-সভাপতি মিঃ উইলিয়াম ইলিকের ঘোষণা।

২৬শে শ্রাবণ (১২ই আগষ্ট) : চীন কর্তৃক লাওস হইতে মার্কিন সামরিক কর্মচারীদের প্রত্যাহার দাবী। লাওসে ফ্রান্স ও আমেরিকার জেনেভা চুক্তি-বিরোধী ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে উত্তর ভিয়েতনাম সরকারের অভিযোগ।

উর্দ্ধিত চীনা কম্যুনিষ্ট নেতৃবৃন্দের পিকিং-এর বাহিনে কোন স্থানে এক গুরুত্বপূর্ণ গোপন বৈঠকে মিলিত হওয়ার সংবাদ।

২৮শে শ্রাবণ (১৪ই আগষ্ট) : জাপানে প্রচণ্ড ঘূর্ণীবাতায় প্রায় ৫ শত লোক হতাহত—১ লক্ষাধিক গৃহ বিধ্বস্ত ও ৪২ খানি মাহুধরা জাহাজ জলে নিমজ্জিত।

৩০শে শ্রাবণ (১৬ই আগষ্ট) : সম্মিলিত আরব প্রজাতন্ত্র ও জর্ডনের মধ্যে পুনরায় কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন এবং জর্ডন-সিরিয়া সীমান্ত উন্মুক্ত করার ব্যবস্থা।

৩১শে শ্রাবণ (১৭ই আগষ্ট) : তিব্বতে নতুন বিদ্রোহের সম্ভাবনা—পাকেন লামার উপর চীন সরকারের আস্থা লোপ পাওয়ার সংবাদ।



[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

মনোজ বসু

উনিশ

চৌধুরির ঘেরি ঠিক করালীর উপরে নয়। করালী থেকে খাল বেরিয়েছে, ঘেরির বাঁধ প্রায় তার সমন্বয়ে চলেছে। একটা জায়গায় এসে খাল থেকে এক ডাল বেরিয়ে সেই ডাল সোজা চুকে পড়েছে ঘেরির ভিতর। বাঁধ দিয়ে মুখ আটকানো। বাইন গৈয়ো ও বনঝাড়ের আচ্ছন্ন ঐ দিকটা। চোত-বোশেখে নদীতে বান কখনো বাঁধের ওপানটা কেটে দেয়। বাঁধ কেটে ইচ্ছা মতো ঘেরির খোলে নোনা জল তোলে। জলের সঙ্গে মাছের ডিম ও গুঁড়ো-মাছ উঠে আসে। তারাই বড় হয় ঘেরির ভিতর। মাছের পোনা কেনার জন্য এক আংলা খরচা নেই এ তল্লাটে। বর্ষাকালে ভেড়ি জলে ভরভরতি হয়ে যায়। জল ছাপিয়ে উঠে বাইরের সঙ্গে একাকার হওয়ার উপক্রম, মাছ ঠেকানো দায়। তখন আবার মরা-কোটাতে বাঁধ কেটে দিয়ে খালের পাখে জল বের করে দেয়। খুব সতর্ক হয়ে এই কাজ করতে হয়, জলের সঙ্গে মাছ বেরিয়ে না যেতে পারে। বাঁধের শলার পাটা বোনা থাকে, বাঁধের কাটা জায়গায় সেইগুলো শক্ত করে বসিয়ে দেয়। জোয়ার আসবার আগেই তাড়াতাড়ি মাটি ফেলে বাঁধ মোরামত করে রেতে হবে। নয়তো খালের জল ভিতরে চুকে জল কঁপে যাবে আবার। অনেক হাঙ্গামা। এবং একদিন একবার করেই হল না। সারা বর্ষাকাল ধরে নজর রাখতে হয়, অনেক বার এমন কাটাকাটির প্রয়োজন পড়ে।

বাঁধের ঠিক নিচে সেই জন্ত একটা ঢালা বানিয়ে রেখেছে। বাঁধ-কাটা লোকেরা ব্রহ্মবাদলার মধ্যে সেখানে আশ্রয় নেয়, কোদাল রেখে তামাক-টামাক খায়। রাত্রিবেলা পড়েও থাকল বা এক একদিন। বর্ষার সময়টা ভিড় খুব, মাহুঘের গতায়ান্তে সর্বদা সরগরম, পায়ে পায়ে জঙ্গলের ভিতর পথ পড়ে যায়। অল্প সময় উঁকি মেরেও তাকায় না কেউ ওদিকে। জঙ্গল এঁটে গিয়ে পাতালতায় মধ্যে ঢালাঘর একেবারে অদৃশ্য হয়ে যায়।

গগন দাসের আলায় ভরষাজকে সেদিন বড় খাতির করল। পূজো-আচ্ছা মিটে গেছে, ভরপেট প্রসাদ পেয়েছেন, তবু ছেড়ে দেয় না। নাছোড়বান্দা চাক বলছে, সে হবে না ঠাকুর শশায়। বউদি বলছে, ছুটো চাল ফুটিয়ে সেবা করে যেতে হবে এবান

থেকে। ভিটেবাড়ি পবিত্র হবে, দোষদিষ্ট কেটে যাবে। বউদি ছাড়বে না, আমি কি করব? ঐ দেখেন, উলুন ধরাতে লোকে গেছে এর মধ্যে।

চাকবালা মেয়েটা হাসে বড় খাসা, আর আঁকার করে। আসাদের পেঙ্কিগুলোর মতন নয়। ছাড়বে না স্বখন, কী উপায়? আসবার সময় অন্নদাসীকে বিদায় দিয়ে এসেছেন। রাত্রে আজ ভাতের পরজ নেই, ওদের ওখানে জলটল খাওয়াবে, তাতেই ঢের হয়ে যাবে। কিন্তু গুরুতর রকমের জলযোগের উপরে আবার এই ভাত ছুটো বাচ্ছে। হোক তবে তাই, মা-লক্ষ্মীকে না বলতে নেই।

ভরপেট খাওয়াদাওয়ার পর গড়াতে ইচ্ছে যায়। কিন্তু না, অনেক রাত হয়েছে, ঘেরি করা চলবে না আর একটুও। গোপাল ভরষাজ ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়লেন। সঙ্গে লোক দিতে চাচ্ছে গগন। ভরষাজ ঘাড় নাড়েন : নাঃ, কী দরকার! এই তো, পৌছে গেলাম বলে।

চাকবালা বলে, শালতিও নিয়ে এলেন না। পায়ে হেঁটে একলা যাবেন এন্দুর?

ভরষাজ বলেন, শালতি আর চাপিনে এখন। কতটুকু বা রাস্তা ফুলতলা থেকে নতুন এসেছি তখন, ছুতো পরে পরে তুলতুলে পা মাটির উপর বড্ড লাগত। এখন কড়া পড়ে গেছে। মুখ্য মারলেও পায়ে সাড় হবে না। আরও ঐ অন্নদাসীকে দেখেই হয়েছে। দেখ না, সাঁইতলা থেকে সে কেমন রোজ ছু-বেলা ফুড়ুং-ফুড়ুং করে যাওয়া-আসা করে। সে আমার লজ্জা দিয়েছে। মেয়েমানুষে পারে তো আমি দশাশই মরদ পারব না কি জন্তে?

গদগদ হয়ে বলেন, খুব খেয়েদেয়ে গেলাম। পূজোআচ্ছা ব্যাপারে কি অল্প রকম দায়ে-বেদারে স্বখনই দরকার হবে, আমার ডেকো। আসব। সত্যিই তো, ব্রাহ্মণ বলতে একলা আমি তল্লাটের মধ্যে—মান টানিয়ে বসে থাকলে হবে কেন, আমারও একটা কর্তব্য আছে বইকি! ডেকো তোমরা, কোন রকম সঙ্কোচ কোরো না।

ইনহন করে চললেন। কয়েক পা গিয়ে ভর-ভর কবছে! একেবারে নিশ্চিতি হয়ে গেছে যে! বাদ্যবনের দিক থেকে ভয়ানক একটা আতর্জন উঠল, এক রকম রাত্রির পাখীর ডাক ঐ রকম,

সর্বদেহ কেঁপে ওঠে। ফিরে এসে ভরদ্বাজ বললেন, খাতির করতে চাচ্ছ। তা বেশ, আলো ধরে একজন কেউ চৌধুরিগঞ্জের বাঁধে তুলে দিয়ে আসুক। এলাকার বাঁধে উঠলেই হল, আমাদের আলা অবধি যেতে হবে না। কে যাচ্ছ, চলে এসো। বড় রাত হয়ে গেছে।

পচা থাকতে অল্প কে যাবে? পচা যেন কেনা-গোলাম। তাই বা কেন, কাজের নামে গা ঝাড়া দিয়ে আপনি উঠে পড়ে, কিছু বলতে হয় না—কেনা-গোলামে এত দূর করে না। ভরদ্বাজের আগে আগে আলো ধরে পচা চলল। চৌধুরিগঞ্জের বাঁধের উপর উঠে গেছে, অদূরে আলা। ভরদ্বাজ বললেন, চলে যা এবারে তুই। আর কষ্ট করতে হবে না। সোজা পথ—জলকান্দা নেই, দিবা চলে যাব এইটুকু পথ।

তবু পচা খাতির কবে বলে, কী দবকার! আমারই কোন পথটুকু এগিয়ে দিলে পায়ে বাধা ধবে!

ভরদ্বাজ চটে উঠলেন: আচ্ছা নেই-চুঙে তুই তো বেটা! বলছি যেতে হবে না, জোর কবে যাবি নাকি? চৌধুরি-আলায় গিয়ে বাঁতরোঁৎ বুকে আসবার মতলব? চরুত্তি কববার?

এত বড় অভিযোগের পর পচা আর এগোয় না। রাগে গর্ভবগ্জর করতে করতে ফিরে চলল।

ভরদ্বাজও এগলেন না আর আলায় দিকে। চুপচাপ ঝাঁপালেন। পচা নজরের বাইরে যেতে ফিরে চললেন আবার। ডাইনে ঘুরে বাঁধ ধরে হনহন করে চলেছেন। বাঁধের মুখে, জঙ্গলের দিকে।

কাছাকাছি এসে বাঁধ থেকে নেমে পড়লেন। রাত অন্ধকার, ঝুপসি-ঝুপসি গাছপালা। বাঁধের উঁচু সোজা সড়ক ছেড়ে জঙ্গলের আঁকাবাঁকা পথে যেতে গা-ছমছম করে। উঃ, সাহস বলিহারি অন্নদাসী! অনেক দিন টালবাহানার পর শেষটা এই জায়গার কথা বলে দিয়েছে। পরিত্যক্ত এই চালাঘরে। ঘরের মধ্যে অপেক্ষা করছে সে। জায়গাটা বেছেছে অবগু ভালই—ষয়: ষমরাজেরও খুঁজে পাবার কথা নয়।

ভরদ্বাজকে দেখতে পেয়ে চালাঘরের ভিতরে নয়—বাইরে বেশ খানিকটা এগিয়ে এসেছে অন্নদাসী। হাঁ, অন্নদাসী বই কি—মানুষ ঠিক চেনা যায় না, কাপড়-চোপড় জড়িয়ে আছে দেখা যাচ্ছে। নিঃশব্দ হবার জন্ত ভরদ্বাজ ডাক দিলেন, কে?

অন্নদাসী হেসে গলে গলে পড়ছে: আমি গো—আমি এক পেত্নী। এত কথাবার্তা—মনের মানুষ পোড়ারমুখো সমস্ত বিম্বরণ হয়ে গেলি?

মাণিকগীরের গান হয়ে গেছে সম্প্রতি গাঙপারে বরাপোতার। গরুর বড় রকমের রোগসীড়া হলে কিবা গরু নিখোঁজ হলে মাণিক-গীরের নামে সিনি মানো, গীরের মহিমা প্রচারে গানও দেয় স্তবধা হলে। এর ফলে গরু নিয়ে আর কোন বামেলা হয় না, মাণিক-গীরের সতর্ক দৃষ্টি থাকে গরুর উপর। গীরের থান থেকে বাদশা নামদারের প্রতি প্রেমসী উক্তি অনেকগুলো অন্নদাসী মনে গেথে রেখে দিয়েছে। বলে, গীরিতের মানুষ একেবারে বিম্বরণ হয়ে গেছে গো। ভাবছে পেত্নী আছে দাঁড়িয়ে।

বলেন, পেত্নী ছাড়া কী আর তুই! মানুষ হলে এখানে আসতে ডর লাগত। কান পেতে দেখ রে—পুরুষমানুষ

হয়ে বুকের মধ্যে আমার খড়াস-খড়াস করছে। একলা মেয়েমানুষ এলি তুই কেমন করে বল দিকিনি।

একা কেনে আসব—

ভরদ্বাজ বলেন, কাকে নিয়ে আবার দল জোটতে গেলি? এত রক্ত জানিস, এমন ঘাবড়ে দিস সময় সময়—

অন্নদাসী বলছে, আসছিলাম একা একা তো—তা মরদ কেমনে টের পেয়েছে। সন্দ-বাতিক কি না—পিছু নিয়েছে কখন থেকে। খোঁড়া হয়ে তো ঘরের মধ্যে পড়ে পড়ে কৌকার, চৌধুরিগঞ্জ থেকে আপনার হাড়ির ভাত এনে খাওয়াতে হয়। হ্যাঁ একবার শিছন ফিরে দেখি, খোঁড়া পা দিবা ভাল হয়ে গেছে; বাতাসের আগে ছুটছে। বলি, অত হিৎসে কিসের শুনি? আপনার দরায় ধরুন গুপ্তিসুদ্ধ পেটে গেয়ে বাঁচছি—কোন দরকারে একটু জঙ্গলে ডেকেছেন, তা নিয়ে ছুটোছুটি অত কিসের শুনি?

রাধেগাম হ্যাঁং কথা বলে ওঠে। ঝোপের আড়ালে ছিল, উদর হল যেন মায়া বলে। বলে, এসেছি তাতে কি দোষ হল? দায়ে পড়ে আসতে হয়। একা তুই আসিস কি করে? জঙ্গলের মধ্যে ধর কোন জন্ত জানোয়ার বেরিয়ে পড়ল।

রাধেগামের পাশে আবার জগা। ফিকফিক করে হাসছে। জগা বলে, আমি মানা করেছিলাম: দল বেঁধে গিয়ে কাজ নেই তুঠুর গা। মেয়েমানুষ তুমিই বা কি জন্ত যাবে—আমরা কেউ গিয়ে দরকারটা শুনে আসিগে। তা নায়েব মশায়, আপনার উপর দেখলাম টান খুব। ছেলে অল্প বাড়ি রেখে রাত্তিরবেলা হোঁচট খেতে খেতে চলে এসেছে।

Amico's
GREEN LINIMENT

আপনি নিশ্চয় দৈহিক ব্যথায় যন্ত্রণা পাচ্ছেন- কোথায়?
কোমবে, হাঁটুতে, কিবা কোন সন্ধিস্থানে?
তুনে খুসী হবেন—

শারীরিক, বুক বা পিঠের পীড়ার, বাতের ইত্যাদি হাবভীর ব্যথায়

এ্যামিকো গ্রীন লিনীমেন্ট
(সহজ মালিশ)
বাস্তবিকই নির্ভরযোগ্য।

মূল্য :- বড় বিনি— ২.৬৫ নং পঃ
ছোট বিনি— ১.৬৫ নং পঃ
*মাপুল বস্ত্র

ব্যবস্থাপকের জন্য লিখুন—

আমিন এণ্ড ইসমাইল (প্রাঃ) লিঃ
৮০ নং কলকাতা স্ট্রিট, কলিকাতা-১



রাধেশ্যাম বলে, টান বলে টান ! চৌধুরী-আলা থেকে ফিরতে এদিকে বিকেল, ওদিকে রাত হুপু।

অন্নদাসী কিন্তু হাসে। রাধেশ্যামের মুখের নিম্নেরমুখ গায়ে মাখে না। হাসতে হাসতে বলে, তা কথাবার্তা কি আছে, বলে দেন নায়েব মশায়। এতখানি পথ আবার তো ফিরে যেতে হবে।

জগা হঠাৎ হুজুর দিয়ে উঠল : এই রাধে, মারধোর দিবি নে—খবরদার ! মানী লোক—ফুলতলা সদরের নায়েব মশায়। গায়ে হাত না পড়ে। সঙ্গে চাকু এনেছি—জাপটে ধর, ক্যাচ-ক্যাচ করে কান দুটো কেটে নিয়ে ছেড়ে দিই।

ভরষাজ আকুল হয়ে কঁদে বলেন, ওরে বাবা ! ধম্বাপ তোরা আমার। অন্ন আমার মা। নাক মলছি, কান মলছি—বারদিগর আর এমন কাজ হবে না।

জগা নরম হয়ে বলে, আচ্ছা, ব্রাহ্মণ মানুষ এমন করে বলছেন—মাঝামাঝি একটা রক্ষা করে নেওয়া থাক। ছোটো কানের দরকার নেই। একটা কেটে নিয়ে বাই, একটা ঠাকুর মশায়ের থাকুকগে।

কান কাটা শেষ অবধি রদ হয়ে গেল অবশ্য। চ্যাংদোলা করে ভরষাজকে আলায় সামনে পুকুর ধারে দড়ান করে এনে কেপল। কেলে দিয়ে জগা আর রাধেশ্যাম সবে পড়ল। ভরষাজ সেখানে থেকে কাতরাচ্ছেন : ওরে, কারা আছিল—তুলে নিয়ে বা আমার এখান থেকে। হাটবার জো নেই।

লোকজন এসে ঘিরে দাঁড়াল। কেউ কিছু বুঝতে পারে না।

হয়েছে কি নায়েব মশায় ?

বলো কেন। পূজা করতে গিয়ে এই দশা। ঠাইর করতে পারিনি, বাধ থেকে গড়িয়ে একেবারে পগারের মধ্যে ! গা-গতর আর আঙ্গ নেই।

হুই জোয়ান মরদ বগলের নিচে হাত দিয়ে একরকম ঝুলিয়ে ভরষাজকে আলায় নিয়ে চলল। আলায় গিয়ে একটা চৌপায়ার গড়িয়ে পড়লেন। ক্লীকঠে জিজ্ঞাসা করেন, মাছের ষোড়া সব উঠে গেছে ? নৌকো ছাড়বার দেরি কত রে ?

এই তো, ভাঁটা ধরে গিয়ে জল থমথমা খেয়ে গেছে। উল্টে টান ধরলেই ছেড়ে দেবে।

ধরে নিয়ে আমার নৌকোর চালির উপর তুলে দে বাপসকল। ফুলতলায় গিয়ে চিকিচ্ছেপতোর হইগে।

নৌকোয় তুলে দিয়ে ব্রাহ্মণের পায়ের ধূলা নিয়ে কালোসোনা জিজ্ঞাসা করে, আবার কবে আসা হবে ঠাকুর মশায় ?

আমি আসি কিবা অল্প যে-কেউ আয়ক। পাশের ওই ছুঁচোর পত্তন নিকেশ না করে কাজ নেই। পৈতে ছুঁয়ে এই দিবি করে বাছি।

কুড়ি

কুমিরমারি থেকে সেদিন সকাল সকাল ফিরেছে। কিন্তু তা বলে ঘুনাফা কিছু নেই—বলাইকে পাওয়া বাবে না। সকাল হোক আর দেরি হোক, ডিঙি থেকে মাটিতে পা দিয়েই চলে বাবে সে গগন দাসের আলায়। আলা আর কি জন্তে বলা, আলায় এখন পুরোপুরি। আলায় কাজকর্ম গিয়ে আচ্ছাদ্যমুখব দেখানে। ওদের আমোদভূতি হৈ-হল্লা—আর জগা দেখ কথার দোসর পায় না একলা ঘরের মধ্যে।

পায়ে পায়ে সে রাধেশ্যামের বাড়ি গেল।

আছ কেমন রাধে ?

আলার দিক থেকে একটু বৃষ্টি খোলার আওয়াজ আসছিল, রাধেশ্যাম উৎকর্ণ হয়ে ছিল সোদকে। জগন্নাথের গলা শুনে চকিতে ফিরে তাকিয়ে আঃ-ওঃ করতে লাগল। তারই মধ্যে টেনে টেনে বলে, ভাল নয় গো বিশ্বাস ভাই। সেই একদিন ছুটোছুটি করে রাগের বশে ব্রাহ্মণ নির্ধাতন করে পায়ের দরদ বড্ড বেড়ে গেল। তার উপরে বউ জ্বরদন্তি করে দুটো দিন আবার জাল ঘাড়ে দিয়ে পাঠাল।

ব্রাহ্মণ না কাঁচকলা ! পৈতের বায়ুন হয় না। একটা শব্দ নিপাত হল, আর একটা ঘাড়ের উপর চেপে রয়েছে। এরা কবে বিদায় হবে, কালীতলায় চাক-ঢোলে পূজা দিয়ে মানত শোধ করে আসব।

রাধেশ্যাম ঘাড় নাড়ে : না বিশ্বাস ভাই, মিছামিছি রাগ তোমার চাকবালার উপর। সকলে যায়, তুমি তো একদিন গেলে না। গিয়ে আগে নিজের চোখে দেখ—

জগা বলে, যা শুনিছ তাতেই আক্কেল-গুডুম হয়ে যায়। দেখবার আর সাধ থাকে না। খুতু ফেলবাব উপায় নেই, খুতু নাকি গিলে ফেলতে হবে। বিড়ি খেয়ে গোড়াটুকু হাতের মুঠোয় ধরে বসে থাক, নয় তো উঠে ফেলে দিয়ে এস সেই বাধের ধারে। জ্বরে হাসবে না, কথাবার্তা হিসেব করে বলতে হবে। পাড়ার বত মরদ সব ভেড়া হয়ে গেছে। ছুঁড়ি কামরায় বসে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে শাসন করে যেমনটা বলবে ঠিক তেননি করতে হবে।

রাধেশ্যাম হেসে উঠে বলে, পরের মুখে ঝাল খেয়েছ তুমি। চোখে দখে তারপরে যা বলবার বোলো। পচা-মাছের গন্ধে ভরা সে পুরানো জায়গা আর নেই, একবারে ভোস পালটেছে। শুধু জায়গা কেন, মানুষগুলোও। বড়দা অবধি যেন আলাদা এক মানুষ। ধবধবে গেঞ্জি গায়ে, পান খেয়ে মুগ রাঙা, মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে বড়দা। অভোস সকলের ভাল হয়ে যাচ্ছে। আমি বলছি, গিয়ে দেখ একদিন। হাতে ধরে বলছি বিশ্বাস ভাই।

জগা বলে, যাব বই কি ! গিয়ে পড়ে বাবুইয়ের বাসা ভেঙে দিয়ে আসব।

বলতে বলতে বিষম উত্তেজিত হয়ে ওঠে : আমার ডান-হাত বাঁ-হাত হল বলাই আর পচা—হাত দুখানা মুচড়ে ভেঙে বোলআনা নিজের করে নিয়েছে। ঘরের মধ্যে একটা কথা বলার দোসর পাইনে। ও ছুঁড়িকে সহজে ছাড়ব ? কুলো বাজিয়ে বিদেয় করে দেব'আমাদের বাবা অঞ্চল থেকে।

গজরাচ্ছে কেউটেসাপের মতো। রাগের কান্ডি হয় না। বলে, তুমি এক দৈত্য মানুষ—নিজেব বউ পিটিয়ে তুলো-ধোনা কর—ও মেয়ের কাছে গিয়ে কঁচো। হাত ধরে তুমি ওর ওকালতি করছ। খবর কোনটা রাখিনে ? পা ভেঙে পড়েছিলে সেই খোঁড়া পায়ে গড়াতে গড়াতে ওদের ওখানে গিয়ে উঠতে। তোমার বউ তাই নিয়ে ক্যারক্যার করে, খেউড় গাধা—ঘরের চালে কাক বসতে দেয় না।

রাধেশ্যাম চটেছে : ক্যারক্যার করে বৃষ্টি সেইজন্তে ? না জেনেভলে তুমি এক একখানা বচন ঝেড়ে বোসো। হুই দিন জালে

গিয়ে ছুপুগা কুচো-চিংড়িও আনতে পারিনি, সেইজন্তে চোয়।
লোভী মেয়েমানুষ। কুকুরের মুখে মাংস ছুঁড়ে দিলে বেউ-বেউ বন্ধ,
ওদের সামনেও তেমন পয়সা ছুঁড়ে দিলে চোচানি খামে। সেটা
শেরে উঠিল—অনেকদিন শুয়ে বসে থেকে অভ্যাস ছেড়ে গেছে।
গতরও নেই। চৌরস বাঁধের উপরেই এক পা ইটতে চিড়িক মেরে
ওঠে, বাঁতবোঁত বুকে ভেড়ীতে জুত করে জাল ফেলি কেমন করে?
মাগি তা বুঝবে না, আজ্ঞে বাজ্ঞে নানান কথা তুলে ঝগড়া করে মরে।
জগা এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলে, বাড়ি যে একেবারে চুপচাপ!
কউ কোথায় গেল তোমার?

গেছে ঐ নতুন আলোয়। ছেলে ঘুম পাড়িয়ে আমার পাহারায়
বেখে সে গিয়ে মচ্ছবে বসেছে।

কী সর্নাশ! অ্যা, অন্নদাসী অবশি ভক্ত হয়ে গেল?

রাধেশ্বান বেজার মুখে বলে, ভক্ত না আরো-কিছু! তিসে—
বুঝতে পারবে না? আমি কখনো কখনো গিয়ে বসতাম, সেটাই আর
হতে দেবে না। আগে থেকে ঘাঁটি করে বসে আছে। কেউকথায়
মন বসাবে তাড়বজ্ঞাত ঐ মেয়েমানুষ? তবে একটা ভাল—
সমস্তটা দিনের পর বাড়ি এভাবে ঠাণ্ড। দিব্যি শান্তিতে আছি
একলা নাহু।

জগা বলে, তুমি তো জালে বাছ না রাধে। জালগাছটা দাঁও
দিকি।

রাধেশ্বান অবাক হয়ে বলে, জালে তোমার গরজ কি জগা?

বাঁইব, কী আবার! পারিনি ভাবছ? ছুনিয়ায় হেন কর্ম
নেই, হোমানের জগা বিশ্বাস যা পারে না। মাছ-মারার কাজ কত
করছি! যতই তোক, কাজটা চুরি-ছাঁচড়ামি তো! এখন
তাই আর ইচ্ছে করে না।

কৌস করে নিশ্বাস ফেলে রাধেশ্বান বলে, জগা তুমি ভটচাজি
হয়ছ। পেটে জুত থাকলে সবাই তদুৎকরকম। মাগি এদিন চাঁট
চাঁট ভাত এনে দিত আলা থেকে—আমিও খুব সচ্চা হয়ে ছিলাম।
এখন ভাত নেই—সেই জন্তে ভোল পালটাবার দরকার। কিন্তু পেরে
উঠছি নে। পা-খানা খারাপ। পা যদিই বা ভাল হয়ে যায়, অভ্যাস
খাপগ হয়ে গেছে। জাল ফেলতে গা ছমছম করে। সামলে উঠতে
বেশ খানিকটা সময় লাগবে।

জগা দেমাক করে বলে, আমার তো
অভ্যাসই মোটে নেই। তবু কিছু না কিছু
হবে। জাল তো নিয়ে যাচ্ছি, দেখো।

গাছুরি মি যেখানে সেখানে জাল
ফেললেই হল না। সমস্ত পনের জায়গা—এ-
লোকের ভেড়ি নয় তো গুলোকের ভেড়ি।
কোথায় ফেলবে, পাহারা কোন দিকে
কমজোরি—আগের থাকতে সমস্ত জেনে
বুকে নিতে হবে। দিনমানে ভালমানুষ
হয়ে যোরাগুরি করতে হয়। গতক বুকে
নিতে ছুটা-তিনটে দিন লেগে যায় অন্তত।
আব তুমি তো কোন দিন ওমুখে হও নি,
পয়সা দিনেই জালগাছটা আক্কেলসেলামি
দিয়ে শুধু-হাতে আসবে।

জগা রাগ করে বলে, জাল কেড়ে নেয় তো জরিমানার পয়সা
দিয়ে খালাস করে এনে দেব। ছিঁড়ে যায় তো নিজ খরচায় মেরামত
করে দেব। মাছ সমস্ত বড়দার খাতায় উঠবে, তার অর্ধেক বখরা
হিসেব করে পয়সাকড়ি নিজের হাতে গণে গণে নিয়ে আসবে। এই
চুক্তি। এর উপরেও মনে সন্দ থাকলে কাজ নেই। ধানাই-পানাই
না করে সোজাতজি বল। অন্য কোথাও চেষ্টা দেখি গে।

এত সুবিধা আর কোথায়? রাধেশ্বান জাল দিয়ে দিল।
অন্নদাসীর গতর যতদিন আছে, ছুপুগা ছুপাখর যেমন করে হোক
ছোটােবেই। তার উপরে হাতে-গাঁটে কিছু যদি নগদ মেলে, সেটা
রাধেশ্বান অন্তভাবে খরচ করবে।

বলে, জাল নিয়ে যাও জগা। একটা কথা, বখরা আমি নিজে
আনতে যাব না। তোমার উপর ধর্মভাব, চোরাগোস্তা তুমি এসে
দিয়ে যাবে। মাগি হল চিলের বেহুদ। টের পায় তো ছোঁ মেরে
সমস্ত নিয়ে নেবে। আমার ভোগে হবে না।

জাল নিয়ে বেরিয়ে এসে তখন খুব বড় ভাবনা ঐ যে ভর
ধরিয়ে দিয়েছে রাধেশ্বান—বেকুব হবার ভয়, ধরা পড়ে আহাশ্বক বনে
যাওয়ার ভয়। জাল ফেলতে জানে সে ঠিকই। অনেক বছর জাল
ফেলে নি, তা হলেও ভরসা আছে, শূড়ায় আর কাঠিতে জড়িয়ে
গিয়ে আনাড়ি হাতে যেমন লাঠির মতন সোজা হয়ে জাল পড়ে
সে অবস্থা হবে না। জায়গা ঘিরে গোল হসেই পড়বে। কিন্তু
ফেলে কোন জায়গায়? যেখানে সেখানে ফেলালেই মাছ পড়ে না।
কোন ঘেরিতে কি বকম পাহারা, তারও কিছু আন্দাজ নেই। রাধেশ্বান
যে ভর করেছে—হুতো বা ধরাই পড়ে গেল। ভগ্নাথ বিশ্বাসকে
ধরে ফেলেছে, বাদি অকলে এর চেয়ে বড় খবর কি? ভক্তলের মধ্যে
এত কাল চরে বেড়াচ্ছে—সরকার বাহাদুর এত নৌকো মোটরলঞ্চ
মানুষজন পিটেল-পুলিশ নিয়েও তার গায়ে হাত ঠেকাতে পারে নি।
আর এখানে কীকা ঘেরির এলাকার পাঁচ-দশটা মানুষ পায়চারি করে
বেড়াচ্ছে—তার ধরলে তো মুখ দেখাবার উপায় থাকবে না।

জাল কাঁধে নিয়ে জগা হন হন করে চলেছে রাস্তা ধরে। কুনিরমারি
থেকে নতুন যে রাস্তা আসছে। নতুন মাটি ফেলেছে—আর ঐ চাক
মেয়েটার অত্যাচারে কিছু অন্তমনস্কও বটে জগা—খোচাট লাগে বারবার।

পেটের যন্ত্রণা কি মারাত্মক তা ভুক্তভোগীরাই শুধু জানেন!
যে কোন রকমের পেটের বেদনা চিরদিনের মত দূর করতে পারে একমাত্র

বহু গাছ গাছড়া
দ্বারা বিশুদ্ধ
মতে প্রস্তুত

বাকলা
ভারত গভঃ রেজিঃ নং ১৬৮৩৪৪

ব্যবহারে লক্ষ লক্ষ
রোগী আরোগ্য
লাভ করেছেন

অম্লশূল, পিত্তশূল, অম্লপিত্ত, লিভারের ব্যথা,
মুখে টকভাব, ঢেঁকুর ওঠা, বমিভাব, বমি হওয়া, পেট ফাঁপা, মন্দ্যায়, বুকজ্বালা,
আহ্বরে অরুচি, স্বপ্ননিদ্রা ইত্যাদি রোগ যত প্রকৃতিই হোক তিন দিনে উপশম।
দুই সপ্তাহে সম্পূর্ণ নিরাময়। বহু চিকিৎসা করে যারা হতাশ হয়েছেন, তাঁরাও
বাকলা সেবন করলে নবজীবন লাভ করবেন। বিশ্বলে সুল্য ফেরলং।
৩২ ডোলের প্রতি কৌটা ৩ টাক, একডো ৩ কৌটা — ৮।।। আনা। ডঃ. মাঃ ও পাইকারী দ্রুত গ্রহণ।

দি বাকলা ঔষধালয়। হেড অফিস—ব্রিটিশালা (পূর্ব পাকিস্তান)
ব্রাঞ্চ—১৪৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

তা হোক, রাস্তা তবু সরকারি জায়গা। হাতে তুলে জাল নাচিয়ে শব্দসাজা করে রাস্তা ধরে যতদূর খুশি যাও, কারও কিছু বলবার এক্জিয়ার নেই। বড় বড় মেছোঘেরি ডাইনে বাঁয়ে, রাস্ত্রে আঁক জোর হাওয়া দিয়েছে, ছলছল করে জল এসে লাগে রাস্তার নতুন মাটির গায়ে। আঘাতে আঘাতে ফেনা উঠছে জলে। জলের উপর চেউ-লাগা মাদা ফেনা আবছা আঁধারে বেশ নজরে আসে। জল অগভীর—জলের মধ্যে মাছ। অনেকবার ঝাঁক হয়েছে, কোন এক দিকে রাস্তা থেকে নেমে গিয়ে দেয় এক খেওন। কিন্তু খেওনের জাল জল থেকে টেনে টেনে তুলছে—বদি সেই সময় পাতারার মানুষ গৈয়োবনের আড়াল থেকে বেরিয়ে খপ করে জালের মুঠো চেপে ধরে! বড় অপমান।

এগিয়েই যাচ্ছে। গভীর সম্ভব চেনা-জানান চৌহদ্দি যাবে ছাড়িয়ে। মানুষ মানুষে জঙ্গল—হাসিল হয় নি এখনো। হয়তো করবেই না হাসিল, ইচ্ছে করে রেখে দিয়েছে। দানকরের চেয়ে জলকরে বোকাগান বেশি—বদি অবজ্ঞা ঠিক মতো মাছ চাপানোর ব্যবস্থা করা যায়। বনকর আরও ভাল। রোজগারে জলকরের মতন না হোক—একটা স্ত্রিবাণ, পয়সা খরচ করে বাঁধ বাঁধতে হয় না। বাঁধ বেধে ‘কখন ভাঙে’ ‘কখন ভাঙে’ করে শঙ্কিত থাকতে হয় না অহরহ। ক্ষেতে ধানের চারা লাগানো কিবা ঘেরিতে চারা-মাছ তোলার ব্যবসে পয়সা খরচ করতে হয় না। কখনো জলকর কখনো বা বনকর দু’পাশে ফেলে জগা নিশিরাজে নতুন রাস্তা ধরে চলেছে।

ধবধবির খাল—পুল এখনো বানানো হয় নি। ইট এনে ফেলেছে, পুল গাঁথা শুরু হয়ে যাবে খুব শিগগির। এমন আরও তিন-চারটে পুল বাকি, বাঁশের সাঁকো বানিয়ে পারাপারের কাজ চলছে। ধবধবিতে এসে জগার খেয়াল হল অনেকটা দূর এসে পড়েছে। খাল পার হয়ে গিয়েই, মনে পড়ছে, মেছোঘেরি একটা। বা হবার হোক, ঐ ঘেরিতে কপাল ঠুক দেখা যাবে। সত্যিই তো, সারা রাত্তির ধবে ঠাটবে নাকি? ঠাটতে ঠাটতে চলে যাবে সেই কুমিরমারি অবধি?

সাঁকোয় উঠবে, খালের পাড়ে গোলবনের ভিতর কি নড়ে উঠল। কুমির—কুমির নাকি? বাঁশের উপর মাঝামাঝি জায়গায় দ্রুত চলে এসেছে। কাঁড়িয়ে পড়ল চূপচাপ সেখানে। বাঁশ মচমচ না করে। অপেক্ষা করছে কোন জন্তু বেরিয়ে আসে কাঁকায়। তারপরে সাঁকো পার হয়ে ছুটে পালাবে, অথবা এপারে ফিরে মাটির ঢিল ও বন-কাটা গরানের ছিটে নিয়ে রণে প্রবৃত্ত হবে—সে বিবেচনা শুখনকার।

বেকুল জন্তুটা গোলবনের ভিতর থেকে। কুমির নয়, বাঘ নয়, শুয়োব নয়, এমন কি মেছো-ঘড়েল নয়—মানুষ একজন। সঙ্গে তার বেশ বড় সাইজের মাছের খালুই। খালুই হাতে করে নেয় নি। কাঁধের উপর লাঠি দিয়ে তারই ওদিকে পিঠের গায়ে ঝোলানো। বোঝা যাচ্ছে তবে তো চাঁদ, মাছে ভরতি তোমার খালুই। ভরতি এতদূর যে হাতে ঝুলিয়ে নিতে পার নি, কাঁধের উপরে ঠেকানো দিয়ে নিতে হচ্ছে।

রাস্তায় উঠবে মানুষটা, জলজঙ্গল ভেঙে সোজা আসছে। জগারও অক্লব খাল পার হওয়া ঘটল না, ফিরে এসে আড়ালে-আবডালে টিপি

টিপি এগোচ্ছে মানুষটার দিকে। একটা ঝোপও পাওয়া গেল, ঘাপটি মেরে আছে সেখানে। যেই মাত্র মানুষটা রাস্তায় পা দিয়েছে, জগা নাকি শুবে বলে, চাঁটি মাঁছ ধঁ—

মাছের উপর সকলের লোভ। বনকরের বাবু, ঘেরিওয়াল, নৌকোর মাঝি, ডাকপিওন, ডাক্তারবাবু, গুরুমশায়—মাছের নামে সবাই হাত পাত্তে। মানুষ ছাড়া এমন কি বাদ্যবনের ভূত-দানো ওঁরাও। সেইজগা রাত্রিবোলা মাছ হাতে নিয়ে মানুষ পারত পক্ষে একলা যাতায়াত করে না।

মাঁছ ধঁে আঁমায়—খাঁব।

চমক খেয়ে মানুষটা ঝোপের দিকে তাকাল। হো-তো করে আকাশ কাটিয়ে হেসে জগন্নাথ তার হাত চেপে ধরে।

আমরা মাছ-মারার সেই কোন সন্ধ্যা থেকে জাল নিয়ে চক্কোর দিচ্ছি—কোন ঘেরিতে কখন খেওন দেওয়া যায়। তুমি বাবা ওস্তাদ সিঁদেল—টুক করে কার তৈরি কটি ফয়তা দিয়ে এসে বল গো?

মানুষটা চটে ওঠে: ওসব বল কেন? তোমরাই বা কোন সাধুমোহান্ত শুনি? তুমি যা, আমিও সেই। দু-জনেই মাছের ধান্দায় ধরছি।

জগা বলে, না সাঙাত, বিনয় কোরো না। এক খেওন জাল ফেলনি, জালই নেই তোমার হাতে, গায়ে কঁু-দেওয়া কাজকর্ম। মাছের ভারে পিঠ কঁুজো হয়ে চলেছে। আর আমাদের দেখ, কালঘাম ছুটিয়ে জাল ফেলে ফেলে মুনাফার বেলা অষ্টরস্তা। বলছ কিনা, তুমি বা আমরাও তাই। অনেক উপর দিয়ে যাও তুমি আমাদের।

মানুষটা দেমাক করে: গায়ে কঁু-দেওয়া কাজ হলে সবাই খুঁকত এই দিকে। কষ্ট করে জাল ফেলতে সেত না ফেঁদে। নুকের বল চাই যে দাদা, যেমন তেমন লোকের কর্ম নয়। টের পেলে গাঙের মধ্যে ধরে চুবানি দেবে। গলা টিপে মেরে ফেলে ভাসিয়েও দিতে পারে জোয়ারের জলে; টানের সঙ্গে ভেসে ভেসে লাস চলে যাবে কাঁঠা কাঁঠা মুল্লুক। তাকে তাকে থাকতে হয় সেই জন্তো। পাড়ের জঙ্গলের মধ্যে বসে মশার কামড় খাও, আর নজর পেতে রাখ। নৌকো কাছি করল এইবারে। বেঁটটি-জাল নামাল জলে। গাঁজা খাচ্ছে হাত-ফিরতি করে—এ-হাত থেকে ও-হাত, ও-হাত থেকে সে-হাত। পাঁচবার সাতবার চলল এইরকম। তারপর শুয়ে পড়ল। শুয়ে শুয়ে গল্প চলল, শেষটা বিম হয়ে আসে। তৈরি হও এবারে,—জলে নেমে আস্তে আস্তে সাঁতার কেটে এগোও। জলে এতটুকু তোলপাড় নেই—ভাঁটার টানে যেমন একটানো নেমে যাচ্ছে তেমন। জালের মাথা উঁচু করে সাবধানে তুলে ধর, খালুই পাভো ঠিক তার নিচে, ধারাল ছুরি দিয়ে পোচ লাগাও জালে এইবার। খলবল করে মাছ এসে পড়বে খালুইতে, কপালে থাকে তো ভরে গিয়ে ছাপিয়ে পড়বে। তিলেক আর দেরি নয়—ফেরো, ঠিক যেমন কায়দায় এসেছিলে। কাঁকায় যাবে না, জঙ্গলে গা ঢাকা দিয়ে এগুবে। হাতের নাগালে পেলে বন-কাটা হৈসো-না দিয়ে কাঁধের উপরের মুণ্ডখানা নামিয়ে নেবে। সড়কির নাগালে পেলে এ-ফোড় ও-ফোড় করবে। এত কষ্টের কাজ—আর তুমি বল গায়ে-কঁু দিয়ে বেড়ানো!

জগা বলে, মাছ কি করবে—বেচবে তো নিশ্চয় এত মাছ? মহাজন কে তোমার, কোন খাতায় নিয়ে তোল? [ক্রমশঃ]

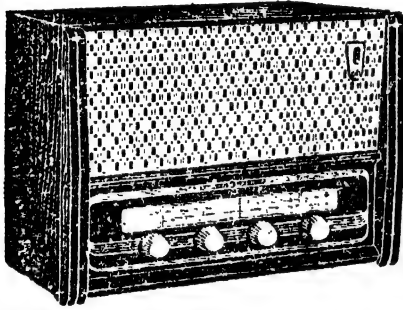
স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রার জন্যে সুন্দর জিনিস

কাজে ভালো অথচ দাম বেশী নয় ব'লে
শ্রাশনাল-একো রেডিও এবং ক্লীয়ারটোন
সরঞ্জাম বিখ্যাত। আর তা-ও এত হরেক
রকমের পাওয়া যায় যে আপনি মনের
মতো জিনিসটি বেছে নিতে পারবেন!

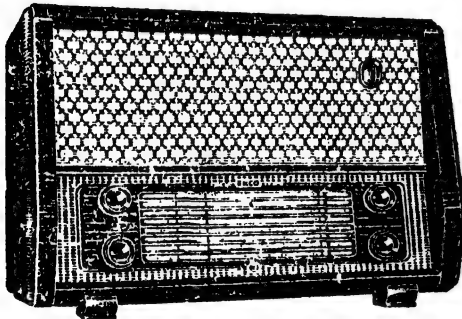


শ্রা শ নাল - **একো**

রে ডি ও



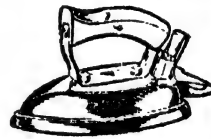
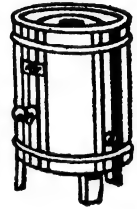
শ্রাশনাল-একো-মডেল এ-৭২২ : এসি।
৬ ভালভ, ৩ ব্যাণ্ড; কাজে চমৎকার; এই শ্রেণীর রেডিওর
মধ্যে সেরা; 'মনমুগ্ধনাইজড'। দাম ৩৩৫/- নীট



শ্রাশনাল-একো মডেল এ-৭৩১ : এসি।
'নিউ প্রমুখ' ৭ ভালভ; ৮ ব্যাণ্ড। এর শব্দগ্রহণশক্তি
অসামান্য। স্বরনিয়ন্ত্রিত আর এক-স্টেজ সংযুক্ত,
এছাড়া এম্পটেনশন স্পীকার ও প্রামোফোন
পিক-আপের বন্দোবস্ত আছে। 'মনমুগ্ধনাইজড'
দাম ৬২৫/- নীট

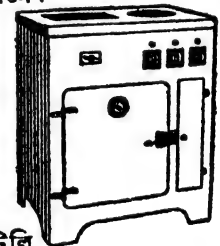
Kleertone ক্লীয়ারটোন
বাতি ও সরঞ্জাম

ক্লীয়ারটোন ওয়াটার বয়লার—সঙ্গে সঙ্গে
গরম বা ফুটন্ত জল পাওয়া যায়। সাইজ : ৩.৫
ও ৮ গ্যালন। এসিতে চলে।



ক্লীয়ারটোন
ঘরোয়া ইঞ্জি
ওজন ৭ পাউণ্ড; ২৩০ ভোল্ট,
৪৫০ ওয়াট; এসি/ডিসি।
ব্যালাইটের হাতল।

ক্লীয়ারটোন কুকিং রেঞ্জ
ছোটো হটপ্লেট ও উত্তম আছ—প্রত্যেকের
আলাদা কন্ট্রোল। সর্বোচ্চ লোড
৫,৫০০ ওয়াট।



ক্লীয়ারটোন
বৈদ্যুতিক কেইলি
৩ পাউন্ড জল ধরে; ফ্রোমিয়ন কলাই করা।
২৩০ ভোল্ট, ৭৫০ ওয়াট। এসি/ডিসি।

ক্লীয়ারটোন টুইন হট প্লেট
রান্নার জন্তে। প্রতি প্লেটের আলাদা
কন্ট্রোল। ২৩০ ভোল্ট—এসি/ডিসি।
সর্বোচ্চ লোড ৩,৫০০ ওয়াট।



ক্লীয়ারটোন ফোল্ডিং
স্টীল চেয়ার ও টেবিল
নানা রঙের পাওয়া যায়।
আরামের দিকে লক্ষ্য রেখে তৈরী।
গদি বোড়া কিংবা গদি
ছাড়া পাওয়া যায়।



জেনারেল রেডিও অ্যান্ড অ্যাপ্লায়েন্সেস প্রাইভেট লিমিটেড
৩, ম্যাদান স্ট্রিট, কলিকাতা-১৩ • অপেরা হাউস, বোম্বাই-৪ • ১১১৮, মাইল
রোড, মাদ্রাজ-২ • ফ্রেজার রোড, পাটনা • ৩৬৭২, সিলভার জুবিলী পার্ক রোড,
বাস্তানোর • যোগেশ্বান কলোনি, চাঁদনি চক, দিল্লী • রাষ্ট্রপতি রোড, সেকেন্দরাবাদ



স্মৃতির টুকরো

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

সাধনা বসু

কুড়িটি বছরের সীমানা পেরিয়ে আসার পরে আজও, রাজনর্তকীর কথা মনে পড়লে মনের মধ্যে জেগে ওঠে বিরাট বিষয়। পূর্ণ দৈর্ঘ্য ছবি রাজনর্তকী। তিনটি ভাষায় তোলা হয়েছিল, বাঙলায়, হিন্দীতে ও ইংরাজীতে, ইংরাজী ভাষায় তোলা ছবিটির নাম দেওয়া হয়েছিল The Court Dancer. হিন্দীতে তোলা ছবিটির অবশ্য নতুন কোন নাম দেওয়া হয় নি, অবাক হওয়ার কারণ—এই



সাধনা বসু

পূর্ণ দৈর্ঘ্য ত্রিভাষী ছবিটির নির্মাণকার্য শেষ হতে এত অল্প সময় নেগেছিল বা কল্পনা করা যায় না। যথেষ্ট নিশ্চয়তার সঙ্গে এ কথা আমি বলতে পারি যে আপনারাও সময়ের পরিমাণ শুনলে তার আশাতীত অল্পতা স্বত্বক্কে কম বিস্তৃত হবেন না। বিশ্বাস করুন—মাত্র ছ’টি মাস লেগেছিল এই পূর্ণ দৈর্ঘ্য ত্রিভাষী ছবিটির নির্মাণকার্য সমাপ্ত হতে। এক বছর নয়, দশ মাস নয়, আট মাস নয় মাত্র ছ’মাস, একটি পুরো বছরের অধাংশ। বলুন, তাই বায় কি কিন্তু তবু এই অসম্ভবও সম্ভবপর হয়েছে। অবশ্য আরও গভীরভাবে চিন্তার সমুদ্রে অবগাহন করলে দেখা যায় যে হবে নাই বা কেন, প্রতিটি কর্মীর অল্পকৃত পরিশ্রম, অকৃত্রিম সহানুভূতি, আন্তরিক সহযোগিতা কি কোন মূল্যই বহন করে না? নিশ্চয়ই করে—তা যে মূল্যহীন নয় তার জ্ঞান্য প্রমাণ রাজনর্তকী। এ বিষয় নিয়ে আমরা এখনো যথেষ্ট গর্ব করতে পারি যে যাদের সঙ্গে আমাদের কাজ করতে হয়েছিল, বিভিন্ন বিভাগের কর্মপরিচালনার ভার যাদের উপর হস্ত ছিল, ছবির নির্মাণ-কার্যে যাদের পরিশ্রমের চিহ্ন জড়িয়ে আছে তাঁদের কাছ থেকে আমরা সকল বিষয়ে সর্বতোভাবে সহানুভূতি ও সহযোগিতা পেয়ে এসেছি। এত অল্প সময়ের মধ্যে ছবির নির্মাণকার্য সমাপনের এই-ই হচ্ছে মুখ্য কারণ, প্রকৃত রহস্য আসল চাবিকাঠি।

ছবির নামকরণ থেকেই অনুমান করা যায় যে, এটি এক নৃত্যপ্রধান চিত্র, স্বভাবতই আমার করণীয় অংশ ছিল অনেক বেশী এবং ছবিতে সর্বক্ষে আমার করণীয় করণের পরিমাণও যথেষ্ট। কেবল কলামগুলাম (Poet Vallathole's School of Dancing in South India) থেকে জয়শঙ্করকে এ জন্তে গুরুরূপে আহ্বান জানানো হল, সেনারিক রাজকুমারও গুরুরূপেই এলেন মহিপুর থেকে। মহিপুরেরই এক রাজনর্তকীকে কেন্দ্র করে গল্পাংশ রচিত অর্ধাংগহিনীর পটভূমিকা মহিপুর, সেই কারণেই সাজসজ্জা সমস্তই সরাসরি মহিপুর (ইক্ষল) থেকে আনানো হ’ল। রাজনর্তকী যখন নির্মায়মান, সে সময় আমার নিখাস ফেলার অবকাশ ছিল না। সাজসজ্জার পরিকল্পনায়, ব্যালের শিক্ষাদানে, নিজের অভিনীত ভূমিকায় মহড়া দেওয়ার মধ্যে দিয়েই সময় এগিয়ে যেত জলপ্রোতের মত, কোথা দিয়ে কখন যে একটি একটি করে দিন এগিয়ে যেত তা ভাবতে পারা তো দূরের কথা, সে কথা চিন্তা করার মতও সময় মিলত না। তবে এ কথা সত্য যে, এই ব্যস্ততার মধ্যে ছিল এক বিরাট আনন্দ। এই পরিশ্রমের মধ্যে আনন্দের অংশও তো কম ছিল না, প্রাণপাত পরিশ্রম করে চলেছি ঠিকই, নাওয়া-খাওয়ারও সময় পাইনি, নিয়মের জীবন তো প্রায় অতীতের ব্যাপার হয়ে গিয়েছিল, “অবসর” বা “বিরতি”—এই জাতীয় শব্দগুলি বলতে গেলে আমাদের মন থেকে তখন একেবারে মুছে গিয়েছিল। কিং তবু সেই সময়ে সব কিছু ভুলে আমাদের দিন, আমাদের রাত, আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা, উদ্গম, শক্তি আমরা পুরোপুরি মিশিয়ে দিয়েছি ছবির কাজে—তার প্রধান কারণ তখন আমাদের চোখের সামনে ছিল বুকভরা আশা, অনন্ত স্বপ্ন অপরিমিত কল্পনা—এই আশার, এই স্বপ্নের, এই কল্পনার প্রাচুর্য আমাদের জুগিয়েছে মুঠো মুঠো প্রেরণা, অদম্য কর্মশক্তি, এগিয়ে যাওয়ার মা ভৈঃ বাণী।

আমার অভিনয়ের দিকেও কম দৃষ্টি ছিল না, অহীজ চৌধুরী এবং পৃথ্বীরাজ কাপুরের মত সুদক্ষ অভিনয়শিল্পীদের সঙ্গে আমি

অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। তাঁদের সম্মান, তাঁদের মর্যাদা, তাঁদের প্রতিভার গগনম্পর্শী। অভিনয়কালে এ বিষয়ে আমার নিজেকে সম্পূর্ণ সচেতন রাখতে হয়েছিল। বাঙলা এবং হিন্দী রাজনৈতিকীতে অহিন্দু চৌধুরী প্রধান পুরোহিতের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। দি কোর্ট ডাঙ্গারে ঐ ভূমিকায় দেখা গিয়েছিল মিঃ জাল খাণ্ডাটাকে। হিন্দী রাজনৈতিকী এন্স কোর্ট ডাঙ্গারের নায়কের চরিত্রে দেখা দিয়েছিলেন পৃথিবীরাঙ্ক কাল্পনিক, বাঙলা রাজনৈতিকীতে ঐ চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন স্বর্গীয় ক্ষোত্রপ্রকাশ, সেনাপতির ভূমিকায় নবগত ক্যাপ্টেন কে, এল, থাপান ও সংশ্লিষ্ট পুনাম অর্জন করেছিলেন। থাপান ছ' ফুটেরও বেশী লম্বা ছিলেন, হিন্দী ছবিতে সেই তাঁর প্রথম অবতারণ। থাপানের দৈহিক আকৃতির এই অসাধারণ উচ্চতায় আমাকে কি রকম মুগ্ধ করে তুলেছিল সে সম্বন্ধে বেশ একটি মজার গল্প মনে পড়ছে। তাকরসের দিক দিয়ে এই গল্পের আবেদন অল্প বলে মনে হয় না। ছবিতে আমি থাপানকে চড় মারছি এই রকম একটি দৃশ্য আছে, কিন্তু মুগ্ধতা তখন অত উঁচুতে আমার হাত পৌছায় না। শেষে আমাকে একটি টুলের উপর দাঁড় করিয়ে ঐ দৃশ্যটি গ্রহণ করা হল। ছবির মধ্যে সেই অংশটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল—কিন্তু আশ্চর্য এই যে, ও রকম একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের চিত্রায়ণ ষ্টুডিওর মধ্যে রীতিমত এক হাতকৌতুকময় পরিবেশ গড়ে তুলল। থাপানের দৈহিক উচ্চতার মাত্রাতিরিক্ততাই এর জন্য দায়ী নয় কি?

অচ্যুত শিল্পীদের মধ্যেও কয়েকজনের নাম এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখের দাবী নিশ্চয়ই রাখে। হিন্দী রাজনৈতিকী এবং কোর্ট ডাঙ্গার রাজার চরিত্র রূপায়ণের ভার গ্রহণ করেছিলেন মিঃ নিয়ামপালী (Nyampally), লেখক শ্রীমন্ত রায় স্বয়ং রাজার ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন বাঙলা রাজনৈতিকীতে। শ্রীমতী প্রতিমা দাশগুপ্তও উচ্চাঙ্গের অভিনয়-নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছিলেন। কোর্ট ডাঙ্গারের এবং হিন্দী রাজনৈতিকীর সংলাপ রচনার ভার গ্রহণ করেছিলেন বথাক্রমে বিখ্যাত লেখক শ্রীডি, এক, কারাকা এবং বর্তমানকালের বিশিষ্ট প্রযোজক মিঃ ডব্লিউ, জেড, আমেদ কোর্ট ডাঙ্গারের আন্তর্জাতিক পরিবেশন স্বয়ং নিয়েছিলেন কোলাম্বিয়া পিকচার্স, এবং রাজনৈতিকী (বাংলা ও হিন্দীর) পরিবেশন স্বয়ং নিয়েছিলেন সম্প্রতি পরলোকগত এম, বি, বিলিমোরিয়া।

[ক্রমশঃ]

অনুবাদক—কল্যাণাঙ্ক বন্দ্যোপাধ্যায়।

নতুন আঙ্গিকে মিনার্ভার পুনরুদ্বোধন

মিনার্ভা থিয়েটারের পুনরুদ্বোধনের বারতায় নাট্যমোদীদের সঙ্গে আমবাও যথেষ্ট আনন্দবোধ করছি। দীর্ঘকাল পরে লিটল থিয়েটার দলের সুপরিচালনার মিনার্ভা থিয়েটার দর্শক-সাধারণকে অভিবাদন জানানেন ওথেলো ও ছায়ানটকে কেন্দ্র করে। অভিনয়-নিপুণ এই সম্প্রদায়ভুক্ত শিল্পীগণের পুরোভাগে আছেন উৎপল দত্ত এবং শ্রীমতী শোভা সেন। মিনার্ভা থিয়েটার বাঙলার গৌরব! গত শতাব্দী থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত অসংখ্য নাটক উপহার দিয়ে এসেছে এই বঙ্গমঞ্চ। এষ্ট বঙ্গমঞ্চ দেখা দিয়েছেন বহু দিকপাল শিল্পী, বাদেব কল্যাণে বাঙলার অভিনয়-জগতের শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে বহু গুণ। বাঙলাদেশের নাট্যাভিনয়ের উন্নতিকল্পে সাংবাদিক ও

সপ্তম বিশ্ব যুব-উৎসবে পুরস্কৃত
একমাত্র ভারতীয় ছবি!



আট এণ্ড কালচার
পিকচার্স প্রাইভেট লিঃ
নিবেদিত ও পরিবেশিত

যজ্ঞলতা ব্যানার্জি
অভিনেত্রী

অহিন্দু



পরিচালনা সুশীল মল্লমদাবু
সুত্র কামোদবরণ
কাহিনী শান্তি দাশগুপ্ত

অচ্যুত চরিত্রে : ছবি বিবাস, কালী ব্যানার্জি, নির্বলকুমার, নৃপতি চাটার্জি, বনানী চৌধুরী, মণি শ্রীমারী ও কমলা মুখার্জি।

দর্শনা ও প্রিয়ায় আগতপ্রায়!

শাসনতন্ত্র বিশেষজ্ঞদের পূর্বসূরী এসন্নকুমার ঠাকুরের অবদান এবং নাট্যকর্মীদের প্রতি তাঁর পৃষ্ঠপোষণার সাক্ষ্য দিচ্ছে ইতিহাস। মাতামহের নাট্যমুরাগ দৌহিত্রের অন্তরে প্রভাব বিস্তার করল। এসন্নকুমারের দৌহিত্র নাগেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায় নাট্যকলার প্রতি অনুরক্ত হয়ে প্রতিষ্ঠা করলেন মিনার্ভা থিয়েটার। তার পর বহু জনের অধিকারে এসেছে মিনার্ভার মালিকানা। কিন্তু মিনার্ভার সৃষ্টির এই ই'ল আদি ইতিহাস। বর্তমান পরিচালকগোষ্ঠীর এই নতুন প্রচেষ্টা সর্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত হোক—এই কামনাই আমরা সর্বতোভাবে করি। নাটকের প্রতি এঁদের অমুরাগের কথাও অবদিত নয়, আজকের দিনে যুগের অগ্রগমনের সঙ্গে তালে তাল রেখে মিনার্ভাও এগিয়ে যেতে থাকুক, তার কয়যাত্রা হোক অপ্রতিরূ্হিত, তার নাট্যসম্ভারের আবোদন মাল্লার মনে রেখাপাত করুক, তার অতীতের গরিমাকে চোখের সামনে আদর্শস্বরূপ রেখে ভবিষ্যতের জন্তে নব নব সৃষ্টির উদ্যোগের মেতে উঠুক। আজকের জাতীয় জীবনে নাটকের আবোদন অপরিহার্য, নাটক সংস্কৃতির এক প্রধান অঙ্গ, জাতীয় চরিত্র গঠনে নাটকের সহায়তাও অপরিহার্য। বর্তমানকালের পরিপ্রেক্ষিতে, যুগোপযোগী নাট্যোপহার জাতি নিশ্চয়ই সাধবে গ্রহণ করবে—এ বিশ্বাস রাখি।

বর্তমান পরিচালকবর্গ মিনার্ভার নব নামকরণ করতে চেয়েছেন, মটগুরু শিশিরকুমারের নামানুসারে। তাঁদের এই মহৎ সঙ্কল্পের জন্তে আমরা অভিনন্দন জানাই। পরিশেষে উৎপল দত্ত এবং লিটল থিয়েটারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অভ্যন্তর—তাঁদের এই মহৎ প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগের জন্তে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই, আমরা সর্বতোভাবে হামনা কবি তাঁদের প্রচেষ্টার সর্বাঙ্গীন সাফল্য।

চলতি ছবির বিবরণী

কলকাতার প্রধান প্রধান চিত্রগ্রহণশিল্পে যে ছবিগুলি সমারোহে প্রদর্শিত হচ্ছে তাদের মধ্যে ছবি, কিছুক্ষণ, আত্মপালীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ছবির কাহিনী সঙ্ক্ষেপে পাঠকসমাজকে নতুন করে বলার কিছু নেই। এর কাহিনীর স্রষ্টা বাঙালার অপরাধের কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র। ছবির গল্পাংশ মানবীয়তার আবোদনে ভরপুর, এর পটভূমি বর্ষা, বর্ষার মাছের, বর্ষার সমাজ, বর্ষার জীবনযাত্রার একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র এই গল্পে মূর্ত হয়ে উঠেছে। এই মর্মস্পর্শী গল্পটি ছায়াচিত্রায়িত হল নীরেন লাহিড়ীর পরিচালনায়। প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন আশীষকুমার ও মাল্য সিনহা, অন্যান্য বিশেষ ভূমিকায় দেখা দিয়েছেন ছবি বিশ্বাস, বিকাশ রায় এবং অন্যান্য খ্যাতিমান শিল্পিবৃন্দ।

কিছুক্ষণেরও গল্পাংশও জন্ম নিয়েছে বাঙালার একজন স্বনামধন্য সাহিত্যিকের লেখনী থেকে, ছোটগল্প হিসেবে বনফুলের দক্ষতা সর্বজনবিদিত। কিছুক্ষণ ছোট গল্পটি স্বয়ং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকেও যথেষ্ট আনন্দ দিয়েছে। জীবনের হাসি-কান্না, গান, আনন্দ, বেদনভর বচিৎরময় রূপ বনফুলের দক্ষ লেখনীর মাধ্যমে স্রনিপুণতার সঙ্গে ফুটে উঠেছে। পরিচালনা করেছেন লেখকের অন্তর্জ অরবিন্দ

মুখোপাধ্যায়। পরিচালক তাঁর পরিচালন-প্রতিভার স্বাধাধ পরিচর দিয়েছেন। পরিচালক ছবিটিকে সব দিক দিয়েই পরিচ্ছন্ন, শোভন ও চিত্তাকর্ষক করে তুলেছেন। বলিষ্ঠ আবোদন সমৃদ্ধ এই কাহিনীর নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় দেখা দিয়েছেন অসীমকুমার ও অরুণকী মুখোপাধ্যায়, জীবন বসু, গঙ্গাপদ বসু, শিশির বটব্যাল, শোভা প্রভৃতি বিভিন্ন চিত্রে রূপ দিয়েছেন।

বৌদ্ধযুগের এক নারীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে আত্মপালীর কাহিনী। আত্মপালী তৎকালীন সমাজের বিশ্বয়, এই স্থলরী নারী রূপেও যেমন অসামান্য, নৃত্য প্রভৃতি গুণেও তার যথেষ্ট অধিকার। তাকে পাওয়ার জন্তে বৈশালীর ধনী শ্রেষ্ঠীদের মধ্যে তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরিশেষে তথাগত বুদ্ধের কণ্ঠধারার মধ্যে জীবনের উল্লেখ্য থেকে মুক্তির চাবিকাঠি খুঁজে পায় আত্মপালী। এই ছবিটি পরিচালনা করেছেন শ্রীতারামস্বর। নামভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন শ্রীমতী সুরপ্রিয়া চৌধুরী, অন্যান্য ভূমিকাগুলির রূপ দিয়েছেন ছবি বিশ্বাস, কমল মিত্র, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, অসিতবরণ, দীপক মুখোপাধ্যায়, মণি শ্রীমণি, বনানী চৌধুরী প্রভৃতি। অনিল বাগচার সঙ্গীত পরিচালনা দর্শকচিহ্নে যথেষ্ট পরিমাণ আনন্দ দেয়, গানগুলি উপভোগ্য এবং সুগীত।

নকল 'আকাশ পাতাল', জাল 'খেলাঘর'

বাঙলা সাহিত্যের মহামূল্য কোষাগারে আকাশ-পাতাল একটি উজ্জ্বলতম রত্ন। আকাশ-পাতাল বাঙলাদেশে অতি প্রিয় বহু গঠিত এবং স্বনামধন্য একখানি অনবদ্য সাহিত্যস্রষ্টা। প্রভাঃ মুখোপাধ্যায় 'নামধারী চলচ্চিত্র-জগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এক ব্যক্তি বর্তমানে একটি ছবি পরিচালনা করছেন, যার নাম দিয়েছে আকাশ পাতাল, এ কথা বলাই বাহুল্য যে আকাশ পাতাল উপজাঃ খ্যাতি এবং জনপ্রিয়তা এত বিরাট যে ঐ নাম শুনেলে যে কো ব্যক্তিই প্রাণতোষ ঘটকেব আকাশ পাতাল বলেই মনে করবেন এই ধারণা যে আমাদের মিথ্যা নয় তার প্রমাণ বহু ব্যক্তি : মহিলা পড়ে বা বচনে লেখককে আকাশ পাতাল চিত্রায়িত হলে জেনে আনন্দ প্রকাশ করেছেন। এ ধারণাও আমরা করতে পারি ঐ ছবি মুক্তিলাভ করলে বহু জনে তা দেখতে যাবেন পূর্বোক্ত ধারণা বঙ্গীভূত হয়েই। বলতে গেলে, প্রাণতোষ বাবুর বিখ্যাত উপজাঃ নাম ভাঙ্গিয়ে তার আকাশচূষী খ্যাতির সুযোগ সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করতে চেয়েছেন প্রভাত মুখোপাধ্যায়। বইয়ের নামটি প্রাণতোষ ঘটকেব বিন্দুমাত্রও কতিপয় করবে না, কিন্তু মুক্তিলাভের পর দর্শক জানবেন যে ছবির আকাশ পাতাল সঙ্গে এক 'নামটুকু ছাড়া মূল আকাশ পাতালের কোন ি নেই অর্থাৎ ব্যবধানটাও আকাশ পাতাল। এই লেখকের একটি উপজাঃ 'খেলাঘর'ও অন্ততম। প্রবোজক সর্বোক্ত সেনা পদাঃ অমুসরণ করেছেন প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের। এমন প্র সত্যিই নিশ্চরী।

॥ মাসিক বসুমতী বাঙলা ভাষায় একমাত্র সর্বাধিক প্রচারিত সাময়িকপত্র



মেট্রোপলিটন পিকচার্সের

নির্ধারিত শিল্পীর অনুপস্থিতিতে

প্রযোজনা-বি.এল.থেমথ্যা

এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকাটাই এক বিরাট হাঙ্গামা। শুধু একরকম
হাঙ্গামা। জীবনের যত গুণ ও বেদনা, হাহাকার ও হতাশাকে
হামির তুফানে উড়িয়ে দিতে পারাটাই
আজকের দিনে চরম বাহাদুরি!

শ্রেষ্ঠাংশে

ছবি বিশ্বাস • ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়
বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায় (ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে)
প্রেমশঙ্কর • তুলসী চক্র
তপসী • কেতকী

কাহিনী • অবধূত
গল্পকাহিনী • নির্মল দে
সঙ্গীত • নটিকেশ্বর ঘোষ



শ্রী বিনয় পিকচার্স প্রিলিড

শুভমুক্তি শুক্রবার ২৮শে আগস্ট !

শ্রী • প্রাচী • ইন্দিরা

এবং শহরতলীর অগাধ চিত্রগৃহে।

সামান্য প্রসঙ্গ

ভাকরার ভবিষ্যৎ

“বৃংসর না কিরিতেই ভাকরা বাঁধে ফাট ধরিয়াছে। আপাততঃ (অবশ্য সরকারী হিসাবে) প্রাণগণি দশ জনের (কেহই মন্ত্রী নহেন) আর আর্থিক ক্ষতি ৫০ লক্ষ টাকা (এক কোটিও নহে)। এখন তদন্তের পালা। সেচ-মন্ত্রী মিষ্টার হাকিফ মরহুম ইব্রাহিম তদন্ত কমিটির জন্ত—Bade his messengers ride forth, East west and south and north, To summon his array. নল, নীল, গয়, গবাক সকলেরই তলব হইয়াছে। এই ১৭০ কোটি টাকার পরিকল্পনার কর্তা আমেরিকান। তিনি এখন আমেরিকার উত্থাকে আসিতে তার করা হইয়াছে। আর আসিবেন করজন কালা বিশেষজ্ঞ। ই’হাদিগের মধ্যে একজন বাঙ্গালীও আছেন—মিষ্টার এ. সি. মিত্র। এই অল্পসন্ধান কার্যে কয় লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে এবং তাহার রিপোর্টে কি বলা হইবে—সিমেন্টের পরিবর্তে গন্ধামৃতিকা (অবশ্য নেপালচন্দ্র রায়ের নহে) ব্যবহার করিলে অমন হইয়াই থাকে?” —দৈনিক বঙ্গমতী।

সখের বিচার

“সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে ঘৃণ ও দুর্নীতি দমনে কেন্দ্রীয় সরকার য় নিষ্ক্রিয় বা উদাসীন নহেন, তাহা স্মরণ করাইয়া দিবার জন্ত মাঝে মাঝেই দুর্নীতি দমন চেষ্টার বিবরণ প্রকাশিত হইয়া থাকে। এক খবরে জানা গিয়াছে যে, দিল্লী প্রশাসনের বিভিন্ন বিভাগে গত মাসে ১৩ জন সরকারী কর্মচারী দণ্ডিত হইয়াছে। একজন আদালতের বিচারে শাস্তি পাইয়াছে, বারো জনকে বিভাগীয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে। উচ্চ-নিম্ন সরকারী প্রায় সকল মহলেই যে দুর্নীতির প্রভাব পরিব্যাপ্ত, তাহা দূর করা খুচরা চেষ্টার কর্ম নহে। এখানেও অসতর্ক ব্যক্তিরাই বেশী ধরা পড়ে, কৌশলীদের বহু কৌশল করায়ত্ত। তাহাদের ধরাও যেমন কঠিন, শাস্তি দেওয়া আরও শক্ত। তবু এইটুকুই সন্ধান যে, কেন্দ্রীয় কর্তারা এই ব্যাপারে ‘জ্যেজির’ না হইলেও একেবারে উদাসীন নহেন।” —যুগান্তর।

খাত্ত ও সরকার

“কথা হইল যে, জীর্জেন কেবল খাত্তমন্ত্রীর পদ ত্যাগ করেন নাই, তিনি প্রকারান্তরে কেন্দ্রীয় সরকার-অনুসৃত খাত্তনীতির প্রতি অনাহু প্রকাশ করিয়াছেন। এখন এ অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার এবং নব-নিযুক্ত খাত্তমন্ত্রী খাত্তনীতির পুনবিচার করিতে উদ্যোগী হইবেন কিনা, তাহাই জানিবার বিবরণ। খাত্তশাস্ত সংগ্রহ এবং বটনের সর্বস্তরে পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিবার দুঃসাধ্য চেষ্টার অগ্রসর হইলে সরকার সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হইবেন, বর্তমান সঙ্কট তাহার সুনিশ্চিত আভাস দিয়াছে। জীর্জেনও প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াছেন যে, খাত্তশাস্ত সংগ্রহ ও বটনের সর্বস্তরে কঠোর নিয়ন্ত্রণ-বাবস্তা চালু করিবার সরকারী নীতি

অবাস্তব এবং অদূরদর্শী প্রমাণিত হইয়াছে। অতএব কেন্দ্রীয় খাত্ত-দপ্তরের ভার নূতন মন্ত্রীর উপরে অর্পিত হইলেই মুশকিল আসান হইতে পারে না। নীতিগত ব্যর্থতার ফলে যে ভুলের ফসল পর্বতপ্রমাণ হইয়া খাত্ত-পরিস্থিতিতে স্থায়ী সঙ্কট সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা ঝাড়িয়া ফেলিতে না পারিলে নেহরু সরকার জনসাধারণকে শঙ্কামুক্ত করিতে পারিবেন না। দেশজোড়া দুর্গতির প্রতিকারের উপায় কেবল মন্ত্রী-বদল নয়, বাস্তবনিষ্ঠ নীতি নির্ণয়।” —আনন্দবাজার পত্রিকা।

ভারত-চীন সম্পর্ক

“আমাদের দেশে এই চীনা বিরোধী কুংসা যে-পরিমাণে রটিতে পাইতেছে, ঠিক সেই পরিমাণেই আমাদের রাজনৈতিক জীবনে মার্কিন-ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের বীজ অঙ্কুরিত হইবার পুষ্টি লাভ করিতেছে। চীনকে ভারতের শত্রু প্রতিপন্ন করিতে পারিলে, দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় যুদ্ধ-জোটটিকে এবং উহাতে সমবেত সরকারগুলিকে ভারতের মিত্ররূপে জ্ঞাপিত করিবার কাজ বেশ সহজ হইয়া আসে। চীনকে ভীষণরূপে চিত্রিত করা গেলে, প্রধানমন্ত্রী নেহরুও বার বার যে মার্কিন-ব্রিটিশ যুদ্ধ জোট দুইটিকে ভারতের সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে উদ্ভূত বিপদ হিসাবে চিত্রিত করিয়াছেন সেই জোটকে এবং উহার সরকারগুলিকে পরম স্বন্দররূপে প্রদর্শন করিবার চেষ্টা একটু সহজ হয়। চীনকে তেয় প্রতিপন্ন করিতে পারিলে, সমাজতন্ত্রের প্রতি, চীনের বিপুল সমাজতান্ত্রিক সাফল্যগুলির প্রতি ভারতের মানুষের স্বাভাবিক আকর্ষণ এবং সেই পথে চলিবার দুর্বীর অনুপ্রেরণা অন্ততঃ ক্ষুণ্ণ করিবার স্বযোগ পাওয়া যায়। সাম্রাজ্যবাদীরা এবং তাহাদের ক্রৌড়নকেরা সেই উদ্দেশ্যেই চীনা বিরোধী কুংসা ও প্ররোচনার ভাল বিস্তার করিয়া চলিয়াছে। জানিয়া হউক, অগোচরে হউক ঐ ক্ষাদে যিনিই পা দিবেন তিনিই ভারত-চীন মৈত্রী ক্ষুণ্ণ করিয়া যেমন এশিয়ার এবং সারা-পৃথিবীর শান্তি, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সংগ্রামের বিরুদ্ধাচারী হইয়া পড়িবেন, তেমনি ভারতের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্তেরও হাতিয়ার হইবেন।” —স্বাধীনতা।

ভাকরা বাঁধ

“ভাকরা বাঁধে বিপর্যয় ঘটয়াছে। উহার জন্ত তদন্ত কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে। এই বাঁধটি বাহাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে গঠিত হইয়াছিল, তাহাদেরই দুই কর্তাকে তদন্ত কমিটির প্রধান পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে। শুধু ভাকরা বাঁধ নয়, দুর্গাপুরেও সেদিন ভিত্তিতে ফাটল ধরা পড়িয়াছে। উহার জেনারেল ম্যানেজারকে ইহার পর যথারীতি খাতির দেখানো হইয়াছে। এই যে দেশে নিয়ম, যে সব অপদার্থের দোষে কোটি কোটি টাকার প্রজেক্টে ফাটল বাহির হইলেও তাদের যেখানে শান্তির বদলে পুঙ্খানুপুঙ্খ হয়, সে দেশে সব কয়টা প্রজেক্টে সম্বন্ধে লোকের সন্দেহ গভীরতর হইতে বাধ্য। ভিলাই প্রজেক্টের ভার নিয়াছে রাশিয়ান দল। তাহার প্রতিটি ছটাক সিমেন্ট, বালি প্রভৃতি নিজের ল্যাবরেটরিতে নিজেরা পরীক্ষা না করিয়া কাজে লাগাইতে দেয় না। ডাঃ মেঘনাদ সাহা একবার ঐ রাশিয়ান দলের নেতাকে এত সতর্কতার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তদ্রলোক জবাব দিয়াছেন—আমাদের কাজে গলদ বাহির হইলে আমাদের গবর্নমেন্ট কি করিবে জানেন? দেয়ালের

মাসিক বসুমতী—প্রাণ

অত্যাশ্চর্য
কাপড় কাচার
পাউডার



মূল্য:
বড় সাইজ ২ টাকা ১২ ন.প.
সাধারণ সাইজ ১ টাকা ১২ ন.প.
(স্থানীয় কর ছাড়া)

নীল
সারফ

অপূর্ব সাদা করে জামাকাপড় কাচে

অত্যাশ্চর্য কাপড় কাচা পাউডার সারফ কাচা জামাকাপড়ের অপূর্ব শুভ্রতা দেখলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন। এক প্যাকেট ব্যবহার করলে আপনাকে নানতেই হবে যে...

আপনি কখনও কান্টেননি জামাকাপড় এত স্বচ্ছকে সাদা, এত সুন্দর উজ্জ্বল করে! সার্ট, চামর, শাড়ী, তোয়ালে—সবকিছু কাচার ক্ষেত্রেই এটি আদর্শ!

আপনি কখনও দেখেননি এত বেগা—ঠাণ্ডা বা গরম

জলে, ফোঁস পক্ষে প্রতিকূল জলে, সঙ্গে সঙ্গে আপনি পাবেন ফোঁসের এক সমুদ্র!

আপনি কখনও জানতেন না যে এত সহজে কাপড় কাচা যায়! বেশী পরিশ্রম নেই এতে! সারফ জামাকাপড় কাচা মানে ৩টি সহজ প্রক্রিয়া: ভেজানো, চেপা এবং ধোওয়া মানেই আপনার জামাকাপড় কাচা হয়ে গেল।

আপনি কখনও পাননি আপনার পরগার মূল্য এত চরম-কারভাবে ফিরে। একবার সারফ ব্যবহার করলেই আপনি এ কথা মেনে নেবেন! সারফ সব জামাকাপড় কাচার পক্ষেই আদর্শ!

সারফ জামাকাপড় অপূর্ব সাদা করে কাচা যায়!

BU. 25-X62 BQ

আপনি নিজেই পবিত্র করে দেখুন...

হিন্দুস্থান লিটার লিমিটেড কর্তৃক প্রস্তুত

সামনে দাঁড় করাওয়া সোজা গুলী করিবে। খোসলা, কুনওয়ার সাই, করুণাকান্ত সেন প্রভৃতির কাজের উপযুক্ত তদন্ত এবং প্রমাণিত অপরাধের কঠোর শাস্তি হইলে অন্ততঃ ভবিষ্যতের প্রজন্মইগলা রক্ষা পাইত।”

—যুগবাণী (কলিকাতা)।

উদ্বাস্ত পুনর্বাসন প্রসঙ্গ

“ভারত সরকার পুনর্বাসনের নামে কোটি কোটি টাকা খরচ করিতেছেন ইহা সত্য; কিন্তু ৭৮ বৎসর পূর্বে উদ্বাস্তদের যে দুর্বস্থা ছিল, আজও তাহার বিশেষ পরিবর্তন হয় নাই। বরঞ্চ কোন কোন ক্ষেত্রে অবস্থা শোচনীয়তর হইয়াছে। এদিকে সরকার চাহিতেছেন যে, ১৯৩১ সালের মধ্যে পুনর্বাসন দপ্তর বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে, কারণ সরকারের মতে পুনর্বাসনের কাজ প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে। পুনর্বাসন অফিসগুলির কাজ বিগত এক বৎসর যাবৎ প্রায় বন্ধ আছে বলা চলে, কারণ মাঝে মাঝে যে স্বর্ণ দেওয়া হইত, তাহাও এখন আর তেমন দেওয়া হইতেছে না। শুনা যায় যে, কেন্দ্রীয় সরকার যে সামান্য টাকা স্বর্ণ হিসাবে দিবার জ্ঞাত এতদঞ্চলের পুনর্বাসন অফিসগুলিতে দিয়াছিলেন তাহাও সব বন্টন না করিয়া ৩১শে মার্চ ফেরৎ দেওয়া হইয়াছে। অথচ শত শত উদ্বাস্ত দিনের পর দিন অপেক্ষা করিয়া বসিয়া দিয়াছেন ও দিতেছেন। এই কাছাড় জেলাতেই সরকার অবাস্তব ও অবৈজ্ঞানিক স্বীকৃতি লক্ষ লক্ষ টাকা অপচয় করিয়াছেন। আই-টি-এ স্বীকৃতি এবং সি, টি, ও ইত্যাদির কেলকোরী সকলেরই জানা আছে। জনসাধারণের অর্থ বাহারা এই ভাবে নষ্ট করিয়াছে তাহাদের উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা হইবে কি? দেশ বিভাগের সময় ভারতীয় নেতৃবৃন্দ পাকিস্তানের সংশ্লিষ্টদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তাহা মরণ রাখিয়া লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূল উদ্বাস্ত নব-নারীর মুঠু পুনর্বাসনের ব্যবস্থা সরকার অবিলম্বে করুন—ইহাই আজ ভারত রাষ্ট্রের কর্তব্যধারণের নিকট আমাদের ঐকান্তিক অনুরোধ।”

—যুগশক্তি (করিমগঞ্জ)।

ঝাড়গ্রামের জনস্বাস্থ্য

“চিকিৎসার জন্ত সরকারী ব্যবস্থা রহিয়াছে ২০টি বেডসমষ্টি একটি সন্ধ্যা হাসপাতাল ও একটি ডাক্তার। আউটডোরের রোগী ও হাসপাতালের রোগী দেখা ছাড়া তাঁহার উপর রহিয়াছে জেলখানার ভার ও পোর্টমটমের দায়িত্ব। তাহা ছাড়া পুলিশের সাক্ষীর কথা ছাড়িয়াই দিলাম। স্বাস্থ্যক্ষেত্র রহিয়াছে ১৩টি, মোবাইল ইউনিট রহিয়াছে ৬টি, কুষ্ঠ ক্লিনিক রহিয়াছে ২টি, মহকুমার এন্ডারের ব্যবস্থা নাই, অস্ত্রিকেনের ব্যবস্থা প্রায় থাকে না, রক্ত, মল, থুতু পরীক্ষার সরকারী কোন ব্যবস্থা নাই। কোনরূপ মস্তব্য না করিয়া আমরা সংক্ষেপে কেবল তথ্যগুলি প্রকাশ করিলাম। খ্যাতনামা প্রবীণ চিকিৎসক ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় আমাদের মুখ্যমন্ত্রী। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা আমাদের শেষ হইতেছে। সমাজ উন্নয়ন, জাতীয় সম্প্রদায় ইত্যাদি উন্নয়ন চলিতেছে। কাজেই ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় মহাশয়কে আমাদের বলিবার আর কিছু নাই, কেবল এই কথাই বলা চলে, ‘মস্তব্যের মরি নাকো মোরা মারি নিয়ে ঘর করি।’ কাজেই আমাদের স্বাস্থ্য লইয়া সরকারের মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই। তবু অল্প জনগণ নাচার। তাই কৃপাচুরী আকর্ষণের চেষ্টা করে।”

—নির্ভীক (ঝাড়গ্রাম)।

বখাটে ছেলের উৎপাত

“সম্প্রতি বার্ষপুর্বে এক শ্রেণীর বখাটে ছেলের উৎপাতে স্থানীয় ভদ্রব্যক্তিগণ উদ্বিগ্ন ও শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছেন। প্রকাশ যে কতিপয় যুবক, অধিকাংশই অবাস্তব, স্কুল-কলেজগামী যেরূপের বাতায়নের পথে, গাছের উপর ইত্যাদি স্থানে ওৎপাতিয়া থাকে এবং মেসেরা রাস্তা পার হইবার সময় ছোট ছোট ডিল, কাগজের টুকরো ছুঁড়িয়া, শিস দিয়া অশ্লীল মন্তব্য নিক্ষেপ করিয়া তাহাদের বিব্রত করিয়া তুলে। ইহারা স্বচ্ছল গৃহস্থের সম্মান, বাপের হোটেলের অন্ন ধ্বংস করিয়া বেপরোয়া উচ্ছৃঙ্খলতা করিয়া বেড়ায়। যুবকদের চরিত্র-ভ্রংশতার যে কুৎসিত চিত্র ইহাতে উদ্ঘাটিত হয়, তাহা উপেক্ষা করিবার নয়। এখন ইহার প্রতিবিধান না করিলে সমাজজীবনকে ইহা কলুষিত করিয়া তুলিবে। কলিকাতায় ব্যাড কণ্ট্রোল জন্ত যে শাস্তিমূলক আইন প্রচলিত আছে তাহা এখানেও অবিলম্বে প্রযুক্ত হওয়া দরকার। আশা করি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে অবিলম্বে তৎপর হইবেন।”

—মালক (আসানসোল)।

চালের চাল

“সদয় মহকুমার আংশিক বরাদ্দ ব্যবস্থায় যে চাউল বরাদ্দ আছে তাহার দশ আনা অংশ সহরের এক লক্ষ লোকের জন্ত বরাদ্দ করা হইয়াছে। বাকী ছয় আনা অংশ পল্লী অঞ্চলের অর্ধাংশ ছয় লক্ষ লোকের জন্ত বরাদ্দ করা হইয়াছে। সকলেই জানেন, সহরের লোকের ক্রয়ক্ষমতা অধিক। তত্বপূরি বহুলোক আছেন বাহারা খোলাবাজার হইতে অধিক মূল্য দিয়া চাল খরিদ করিলে কোন অন্তর্বিধা ভোগ করিবেন না। কিন্তু পল্লী অঞ্চলের কথা নিশ্চয়ই স্বতন্ত্র। তাহাদের পক্ষে খোলাবাজার হইতে চাউল সংগ্রহ করা একান্ত কষ্টকর। এই অসম ব্যবস্থার প্রতিকারকল্পে অবিলম্বে পল্লী অঞ্চলের বরাদ্দ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। মহকুমা শাসক এদিকে দৃষ্টি দিলে এবং পল্লী অঞ্চলের বরাদ্দ বৃদ্ধি করিলে প্রভূত উপকার সাধিত হইবে। ইহার উপর আর একটি কথা বলিবার আছে। পল্লী-অঞ্চলে কেবলমাত্র ‘ক’ শ্রেণীর লোকেরা এই বরাদ্দ ব্যবস্থার সুযোগ পাইতেছে অথচ সহরঞ্চলে কোন ব্যতিক্রম নাই। পল্লী-অঞ্চলের সকলেই বাহাতে চাল পায় তাহার ব্যবস্থা করা অতি প্রয়োজন।”

—বর্দ্ধমানবাণী।

খাত্তকথা অমৃত সমান

“ভবিষ্যৎ বংশধর যখন ইতিহাসের পাতায় দেখিবে যে সামান্য কিছু সংখ্যক ব্যবসায়ীদের হাতে সরকারী অভিজ্ঞানের চরম পতন হইয়াছে—এই সরকার সমাজের নাম কি ভাবায় উল্লেখ করিবে তাহা কে বুঝিতেছেন? গত সপ্তাহ হইতে ৩৫ মণ দরের চাউল কয়েক টাকা হ্রাস পাইতেছে। সরকারী মহলের ধারণা, আউস ধাত্তক আমদানীর ফলে চাউলের দাম হ্রাস পাইয়াছে। এই ধারণার সবটুকু সত্য নহে। চলতি মরশুমে বৃষ্টিপাত ও আমন ধাত্তকের চাব আবাদ পূর্ণোপরি বৎসর হইতে ভাল হইয়াছে এবং প্রকৃতির অবাধাভাবিক বিপর্যয় না ঘটিলে আগামী অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে ধানে বেশ ভরিয়া যাইবে। নতুন ধান উঠিলে বাজারের দাম হ্রাস পাইবে। মহাজন ব্যবসায়ীদের গুপ্ত ভাণ্ডারে যে চাউল সঞ্চিত আছে যদি ইত্যদ্যদে

সম্পূর্ণ বিক্রয় করিতে পারে তবে তাহাদের বড় বিপদ ঘটিবে। এই বিপদের আশঙ্কায় ধান্ধা চাউলের ব্যবসায়ীরা এখন বাধ্য হইয়া বাজারের দাম কমাইয়া গুপ্ত সঞ্চিত চাউল খালাস করিতেছে। কিন্তু যদি এই ধান্ধা চাউলের হাউর মহাজন ব্যবসায়ীদের ছোবল খাবলা হইতে আগামী মবস্সের ধান্ধা চাউল রক্ষা করা না যায় তবে প্রকৃতির অশেষ করুণা নিশ্চয়ই ব্যর্থতায় পর্যাবসিত হইবে। আমরা কয়েক বৎসর পূর্বে হঠাৎ পশ্চিমবঙ্গের ধান্ধা চাউল ব্যবসায় সম্পূর্ণ রাষ্ট্রায়ত্ত্ব করিবার কথা বলিয়া আসিতেছি এবং জাতির স্বার্থে নিরুপায় অসহায় দুঃখী দেশবাসীর হুই কেলার হুই মুষ্টি অন্নের স্বার্থে ধান্ধা ও চাউল ব্যবসায়ীদের অতি মুনাকার চক্রান্ত দমন করিতে সরকারকে আবেদন জানাইতেছি।”

—বারাসত বার্তা।

নেহরু অবতার

“কর্তীভজাব দেশে সবই সম্ভব। বোম্বাই বিধান সভার মুখ্যমন্ত্রী কে প্রমোত্তবে প্রকাশ করিয়াছেন, গুজরাটের দাদোদা নাম গ্রামে প্রেমের লোক “শ্রীজগতর শক্তি মণ্ডল” নামক এক সংস্থা গঠন করিয়া ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজগতরলাল নেহরুকে দশম অবতার বলিয়া সন্মান ও জগতরলালের পূজা শুরু করিয়া দিয়াছে। এক দিন এই জগতরলাল গান্ধী-পূজা শুরু হইয়াছিল, তখন শাসন-ক্ষমতা হাতে আসে নাই। ভারতের প্রধান মন্ত্রীর গদীতে আসীন ব্যক্তিকে দশম অবতার বানাইবার প্রচেষ্টা গুজরাটের মাটিতে গজাইয়াছে। কর্তীভজা দেশের পুনরাতন শ্রোগীন ছিল দিল্লীস্থরো বা জগদীশ্বরো বা। এই স্থিতি-গান্ধী বান্দন্য দিলখোস হইত। শাসিত বিভ্রান্ত হইত। কুসংস্কার ও অন্ধ-বিশ্বাস এখনও এদেশের মজাগত, তাই ব্যক্তি পূজার সাড়ম্বর মত পুণিনিয়ত চলিতেছে। শ্রীজগতর শক্তি মণ্ডল সাধনা ও প্রচারণা যেন একটু বেশী আগে শুরু করিয়া বসিয়াছেন। আগামী নির্বাচনের আর দিন পূর্বে এটা শুরু হইলে বেশী কাজে লাগিত। সাধু সমাজ গঠন করিয়া রাষ্ট্র-নেতাদের সুবিস্তৃতি করার জন্ত জটাজুটগারী সন্ন্যাসীর অভাব দেশেই হয় না, দেশেই শ্রীজগতর শক্তি মণ্ডলের শ্রায় সখ্য গঠনের লোকের অভাব হইবে কেন? কোথাও মা মনসার দেওয়ানীর “ত” কাহারো বা স্বপ্নাদেশ, এমনি করিয়া গাজন জমিয়া উঠে।”

—বীরভূমবাণী।

বাংলার হাসপাতালের অন্তর্ভুক্ত পরিবেশ

“ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এসোসিয়েশনের বাংলা শাখার উদ্যোগে ৬ জন বিশিষ্ট প্রবীণ চিকিৎসক লইয়া স্পেশাল কমিটি কলিকাতার হাসপাতালের প্রশাসনিক নানা গলদ ও শৃঙ্খলাহীনতার বিভিন্ন অভিযোগের ব্যাপক তদন্ত করিয়া এবং রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তার কর্তব্যকলাপের অব্যবস্থাই সকল অভিযোগের জন্ত যুগত ন্যায়—এই রিপোর্ট দাখিল করিয়াছিলেন। হাসপাতাসগুলির উন্নয়নকল্পে কতকগুলি সুপারিশ করিয়াছিলেন এবং একটি কমিশন গঠনের দাবী জানাইয়াছিলেন। সরকার সকল সুপারিশ ও দাবী প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, সরকারের এইরূপ প্রত্যাখ্যান গণতন্ত্র-বিরোধী কি না দেশবাসী ইহার উত্তর দিবেন।”

—বাঙালীসভা (কলিকাতা)।

সাক্ষর পর্যাস্ত

“লজ্জার কথা রাজ্যের মহকুমাসুলির সচিত সংযোগকারী বার মাস চলাচলোপযোগী সড়ক আজ বাব বৎসবেও নিখাণ করা যায় নাই। আরও লজ্জার কথা, যে আসাম-আগরতলা সড়ক নিখাণে সরকার অশ্রমে বস্ত্র পরী সম্পন্ন করিয়াছেন; সেট সড়কটি দিয়াও রৌতিমত মোটর যানবাহন চলিতে পারে না। ছয় দিবসে সাত ইঞ্চি বৃষ্টি হইয়াছে ইতাই ত্রিপুরার পক্ষে যথেষ্ট, এখনও হঠাৎ সাক্ষর পর্যাস্ত যানবাহন চলা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। দশটি মহকুমা বন্দো সাতটি মহকুমার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া আছে। যানবাহনের অভাবে শত শত যাত্রী আটক পড়িয়াই থাকে নাই, এই সমস্ত সাতটি মহকুমার জনসাধারণ ডাকের চিঠি, সন্দানপত্র পাঠিতেছে না, হুনিয়ায় কি ঘটিয়াছে, কি ঘটবে তাহার কিছুই জানিবার কোন ব্যবস্থা নাই। আগরতলা-আসাম সড়ক যাত্রাকে ত্রিপুরার লাইফ লাইন বলা হয় তাহা ইতিমধ্যেই যানবাহন চলাব পক্ষে সম্পূর্ণ অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে। সড়কের অনেক স্থানেই পিচ উঠিয়া গভাব গর্তের আকির্ভাব হইয়াছে। কালভাট নিখাণে বিলম্বের ফলে ডাইভার্সন বোডগুলি বিপজ্জনক হইয়াছে। তিন টনের বেশী মাল নিয়া এই সড়কে ট্রাক চলিতে দেওয়া হয় না। মোটের উপর সড়কটির অবস্থা এক সঙ্কট জনক অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছে। সড়কটি নিখাণ কাধ্য সম্পন্ন হইয়াছে মাত্র কয়েক সপ্তাহ পূর্বে এবং মতোই ইতাব ভয়াবহ অসুস্থ সম্পর্কে যে সমস্ত বিবরণ আমরা পাঠিতেছি তাহা উদ্বেগজনক ভ বটেই, নানা প্রকাব সন্দেহের উদ্ভ্রেক করিতেছে।”

—সবক (আগরতলা)।

ভয়াবহ

“পশ্চিম বাংলার বেকারের সংখ্যা ভয়াবহরূপে বৃদ্ধি পাঠিতেছে। বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের পর হঠাৎ বাংলা দেশের জীবনে যে অর্থনৈতিক সমস্তার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা বর্ণনাভীত! দিনের পব দিন এই অর্থনৈতিক সংকট জটিল হঠাৎ জটিলতর হইয়া উঠিতেছে। বাংলা দেশের এই সমস্তা সহনয়তার সচিত কেহ চিন্তা করিয়া দেখেন কিনা তাহা আমরা জানি না। দেশে পরিকল্পনার পব পরিকল্পনা আসিতেছে এবং তাহার ফলে দেশের কিছু সংখ্যক যুবকগণ যে চাকুরী পাঠিতেছে না তাহা নহে কিন্তু তাহাতে সমস্তার কিছুমাত্র সমাধান হইতেছে না। পশ্চিম বাংলাব অবস্থা ও সমস্তা বিচিত্র!



স্বালকাটা অপার্টমেন্ট কোং প্রাইভেট) লিঃ
ফোন-৩৫-১১১১, প্রতাপ্ত: জ: সার্জিক্যাল ব্লক, স-বি.
প্রদ-কলকাতা. ৫৫ নং ব্রাহ্মণী স্ট্রীট কলিকাতা ১।

আমরা বহুবার বহুভাবে তাঁহা আলোচনা করিয়াছি। স্বাধীন দেশে কর্মকর্ম প্রতিটি ব্যক্তি দেশ গঠনের জন্য কাজ করিয়া চলিয়াছেন এই স্বপ্ন বাচারা একদিন দেখিয়াছিলেন তাহারা আজ রুঢ় বাস্তবের ভয়াবহ অবস্থা দেখিয়া বিস্মিত না হইয়া পারেন না। সমবেদনা ও সহানুভূতি লইয়া সমগ্র সমস্যাটি দেখিলে মানুষের দুঃখ কষ্ট ও দুর্গতি লাঘব করা সম্ভব হইত বলিয়া আমরা মনে করি। আজ সমবেদনা ও সহানুভূতির অভাব সর্বত্র প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। সাধারণ মানুষ যে আশ্রয় করে তাহার দ্বারা কোন মতেই ব্যয়ের সহিত সামঞ্জস্য রাখিতে পারিতেছে না। ইটাই ফলে সামাজিক নানা পাপ মন্ডলের সনাত্ত-জীবনে দেখা দিয়াছে। দেশের যুবকগণই স্বাধীন দেশের একমাত্র আশা-ভরসাগুলি। আর্থিক অনটন ও বেকার অবস্থায় ফলে দেশের যুবকগণ কোন পথে চালিত হইতেছে, তাহা বর্তমান অবস্থা দেখিলে অনায়াসে বর্ণিতে পারা যায়।

—ত্রিস্রোতা (জলপাইগুড়ি)।

শোক-সংবাদ

বামাচরণ জায়াচার্য

গত ৩০শ জ্যৈষ্ঠ (১৩৬৬) ইং-১৪৮৫ইস তারিখে বৃধবার ইহার কালীপ্রাপ্তি হইয়াছে। পূর্ববঙ্গের অন্তর্গত ফরিদপুর জেলার আমতলা গ্রামে ১২৯৬ বঙ্গাব্দে ১-৪ আশ্বিন বৃধবার উক্ত বামাচরণ জায়াচার্যের জন্ম হয়। পিতা প্রবীণ স্বর্গে শশিভূষণ স্মৃতিতীর্থ ও মাতা ৬বামাচরণী দেবীর ইনি একমাত্র পুত্র ছিলেন। দেশেই তিনি ব্যাকরণের পাঠ শেষ করিয়া ইন্ডিয়ান পুস্তক মূলগ্রামবাণী পণ্ডিত ৬নবীনচন্দ্র তর্করত্ন মহাশয়ের নিকট জায়শাস্ত্রের কতক অংশ অধ্যয়ন

করেন, পরে ২১ বৎসর বয়সে কালীধামে বাইরা সেবানিকার রাজকীয় সংস্কৃত কলেজের ভারত-বিখ্যাত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ৬ বামাচরণ জায়াচার্য মহাশয়ের নিকট দীর্ঘকাল জায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং বাংলা দেশের “তর্কতীর্থ” এবং কালীধামের “জায়াচার্য” পরীক্ষায় প্রথম স্থানধিকারী হইয়া উত্তীর্ণ হন। ছাত্র অবস্থাতেই তাঁহার পাণ্ডিত্য ও বিচারদক্ষতা গুণে কালীস্থ পণ্ডিতসমাজে তিনি খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন, তারপর ক্রমে কালীস্থ বিদ্বৎসানন্দ মহাবিদ্যালয়ে টিকমানি সংস্কৃত কলেজে, রাজধানি সংস্কৃত কলেজে ও গোয়েন্দা সংস্কৃত কলেজে জায়শাস্ত্রের অধ্যাপনার দ্বারা তাঁহার পাণ্ডিত্যখ্যাতি এতদূর বিস্তারিত করে—বাহার ফলে কালী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি জায়শাস্ত্রের অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং স্বীয় কর্মদক্ষতায় মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে সেখানে তিনি “রীডার” পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তাঁহার জমায়িক ব্যবহার ও অধ্যাপনা-খ্যাতিতে আকৃষ্ট হইয়া ভারতের নানাদেশীয় বহু ছাত্র তাঁহার নিকট আসিয়া অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেকে উত্তম অধ্যাপক হইয়া কর্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। কালী বিষয় পরিষদের পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহাকে “জায়রথ্যকেশরী” উপাধি দিয়াছিলেন। এই পণ্ডিত মহাশয় জায়শাস্ত্রের অনেক গ্রন্থের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা করিয়া বিজ্ঞানীদিগের বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। ইহার স্বাস্থ্য অতি উত্তম ছিল এবং শেষ পর্য্যন্তও যুবকের জায় কর্মশক্তি বর্তমান ছিল। সুদীর্ঘকাল ধাবৎ কালীধামে বাঙ্গালী নৈয়ায়িক পণ্ডিতগণের যে প্রশস্ত গৌরবধারা প্রবাহিত ছিল, সম্ভ্রুতি এই বামাচরণ পণ্ডিত মহাশয়ের তিরোথানে সেই ধারা লুপ্ত হইল। ইহা পণ্ডিতসমাজের অপূরণীয় ক্ষতি। হার ভাগ্যবতী পত্নী মাত্র দুই বৎসর পূর্বে কালীধামেই দেহত্যাগ করিয়াছেন। ইহার পাঁচ পুত্র, চার কন্যা ও কতিপয় পৌত্র-পৌত্রী পৌত্রিত্র-দৌহিত্রী বিজ্ঞমান। করুণাময় বিশ্বনাথ এই শোকসন্তপ্ত স্বজনবর্গের শান্তিবিধান করুন।

উপেন্দ্রনাথ সাম্ব্যভূষণ

বাংলাদেশের সুপ্রসিদ্ধ শিক্ষাব্রতী সিটি কলেজের ভূতপূর্ব মহাশয় বিশিষ্ট সুদী উপেন্দ্রনাথ সাম্ব্যভূষণ গত ৪ঠা শ্রাবণ ১২ বছর বয়সে দেহত্যাগ করেছেন। জীবনের একটি বিরাট অংশ ইনি সিটি কলেজের সহাধ্যায়রূপে অতিবাহিত করেছেন। একাধিক পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থের ইনি প্রণেতা। বাংলাদেশের শিক্ষাজগতে ইনি এক বিশেষ আসনের অধিকারী। শিক্ষাজগতে এর অক্লান্ত সেবা এঁকে স্মরণীয় করে রাখবে। ইনি বাঙালী শশিভূষণ রায়েচর পুত্র।

যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়

সার্বজনীন বঙ্গজননী আরও একজন সুপ্রবীণ সম্মানিত ভাবনাবাসিন ঘটল। চন্দ্রনগরের যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৩ বছর বয়সে গত ২রা শ্রাবণ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। সা বান্দিকতার ক্ষেত্রে এঁর সন্মান সর্বজনবিদিত। স্নেহলব্ধ এবং সুপাণ্ডিত হিসেবেও ইনি প্রভূত সম্মানের অধিকারী ছিলেন।

সম্পাদক—ঐপ্রাণতোষ ঘটক

কলিকাতা ১৬৬ নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, “বহুমতী বোটারী মেনিনে” ঐতারকনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

পাঠক-পাঠিকার চিঠি

“বৌদ্ধ পঞ্চশীল”

বিগত সংখ্যার পত্রদ্বারা ও লেখকের মতে, ‘ঐতিহাসিকগণ বৈদিক যুগের বয়ঃক্রম নির্ণয় করেছেন খৃঃ পূঃ ১৫০০ ত’তে খৃঃ পূঃ ৫০০ শতক।’ এটি হ’ পাশ্চাত্য পণ্ডিত মহাশয়দের স্থূলপাঠ্য কোন কোন পুস্তকের উচ্ছিষ্ট। ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন এবং ডাঃ সুনীতিকুমা চট্টোপাধ্যায়ের মতে বৈদিক যুগ খৃঃ পূঃ ২১০০ হইতে খৃঃ পূঃ ১২০০ বৎসর। ডাঃ হালিদাস নাগ মহাশয়ের মতে ঋগ্বেদ-সংহিতার কাল খৃঃ পূঃ ২৫০০ বৎসর এবং অগ্ন্যজ্ঞ সংহিতার কাল খৃঃ পূঃ ৮০০ বৎসর ধরা হইয়াছে। প্রগাঢ় মনীষী স্বর্গত রায় যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি মহাশয় তাঁ। ‘বেদের দেবতা ও কৃষ্ণিকাল’ নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন যে, খৃঃ পূঃ ৮০০০ (আট) হাজার অব্দে বৈদিক ঋষিদের অস্থানের পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীশ্রীলানদের বর্ণিত শতকে বৈদিক কাল ও আর্ঘ্যগণের ভারত আগমন স্থূলপাঠ্য পুস্তকের অসার উপকথা মাত্র। তা পরম শ্রদ্ধেয় স্বামী অভেদানন্দ তাঁর বহু মূল্যবান পুস্তক ‘ভারতীয় সংস্কৃতি’তে প্রমাণ করেছেন। তথাকথিত ‘Aryans’ এর বৈদিক আর্ঘ্য এক নয়। Aryans-রা ‘মহা অসভ্য ও বর্বর অসভ্য’ ভারতে প্রবেশ করে। এদের দ্বারা বেদও রচিত হয়নি। পরে এই Aryans-রা ভারতীয় আর্ঘ্য জাতির অঙ্গীভূত হয়ে যায়। কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত যেমন Sir John Marshalও অনুরূপ মত অনুমোদন করেছেন। বৈদিক কাল গণনার প্রাচীনতা সম্বন্ধে মতেজোদো ও হারাপ্পা এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। স্বর্গত রায় বাহাদুর বম-প্রসাদ চন্দ্র বলেন, মতেজোদো ‘পণি’দের নগরী। Rev. Father Heras বলেন, এই নগরী দ্রাবিড়দের। অবশ্য তিনি সুরেরিয়ানদের নগরী বলেও অনুমান করেছেন। ‘পণি’ ও ‘দ্রাবিড়’ যাই হোক ‘পণিরা’ বৈদিক বৈষ্ণব সমাজের লোক। ‘ঐতরেয় ব্রাহ্মণে’ দ্রাবিড়দের পরিচয় পাওয়া যায়। ‘ত্রৈলোক্য-সাম’ গীতা গান করতেন তাঁরাই কালক্রমে ‘সংস্কৃত’ হয়েছেন। এ ছাড়া যে সকল গৌরীপতি সংযুক্ত শিবলিঙ্গ, শঙ্খ, শব্দসামগ্রির বিবরণ উদ্ধার করা হয়েছে ঐগুলি যে বৈদিক অর্থের অনুকৃতি এবং দ্রাবিড়ের বৈদিক আর্ঘ্যদেরই যে একটি শাখা তা স্বামিজী ‘ভারতীয় সংস্কৃতি’তে বিশদ আলোচনা করেছেন। অতএব সিদ্ধান্তের বয়ঃক্রম কাল যদি আনুমানিক খৃঃ পূঃ ৫০০০ তে ১০০ বৎসরও ধরা যায়, তা হলে বৈদিক আর্ঘ্যদের প্রাচীনত্বের পরিধি আরও বিস্তৃতি লাভ করল।

লেখকের মতে—‘বেদে আছে ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ ও মিত্র বা যুগের উদ্ভেদে স্তব-স্তুতি, পূজা-যজ্ঞ ও বলিদানের নির্দেশ।’ বেদের ধর্ম শোধ হয় লেখকের এই পর্যন্ত। কিন্তু এ যে কত বড় অজ্ঞতা-পূর্ণ উক্তি তা সমালোচনা করতে যাওয়া দুর্ভাগ্য বলে মনে করা যেতে পারে। লেখক অনুগ্রহ ক’রে আর্ঘ্য-সমাজের পূজ্যপাদ স্বামী নন্দনন্দ সরস্বতী বিরচিত ‘সত্যার্থ প্রকাশ ও ঋগ্বেদাদি ভাষ্যভূমিকা’ নামক গ্রন্থের পাঠ করুন, তা হলে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের বেদের কল্প থেকে মুক্তি লাভ করতে পারবেন। ব্রহ্মসূত্র আলোচনা ক’লে দেখা যায়, লেখক যে সকল দেবতার নাম করেছেন ওগুলি

ব্রহ্মপদবাচক বা ব্রহ্মের উপাধিবাচক শব্দ যা জড়বাদীদের প্রজ্ঞানশূন্য মস্তিষ্কে প্রবেশ লাভ ক’রতে পারেনি। ধরা ‘হাক ইন্দ্র শব্দের দৃষ্টান্তটি। ‘শান্তিদৃষ্টা উপদেশে বামদেববৎ ॥’ ১।১।৩০ ॥ ব্রহ্মসূত্র ॥ এই শ্লোকের তাৎপৰ্য—ইন্দ্র ব’লেছেন—‘আমিই প্রাণ, আমিই প্রজ্ঞা, আমাকেই জান।’ একথা তিনি বামদেব ঋষির দ্বারা শান্তিদৃষ্টা তু উপদেশে’ অনুসারে ব’লেছেন। অর্থাৎ ব্রহ্ম সাক্ষ্যকারের পর ‘ইন্দ্র’ ব’লেতে স্বতন্ত্র পদার্থ আর থাকে না। ইন্দ্র তখন ‘প্রজ্ঞাত্মা’। লেখক আরও জেনে রাখুন—বেদের ভাষাই বেদান্ত ও উপনিষদ। আবার বেদ বেদান্ত ও উপনিষদের ভাষা বলা যেতে পারে শ্রীমন্তাগবতকে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের ব্যাখ্যাজ্ঞ মনে বেদার্থের সত্য-জ্ঞান বা উপলব্ধির স্থান নেই। প্রজ্ঞানের আলো ব্যতিরেকে এ সকল ঐতিহাসিক গবেষণার অর্থ অনুধাবন ক’রতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

‘সূর্য অতীতে কালে...পঞ্চশীল মন্ত্র’ (বসুমতী, আশ্বিন, পৃষ্ঠা ৫৫১ দ্রষ্টব্য।) লেখকের এই নাটকোচিত বাচনভঙ্গী বেশ বর্ণিত এবং প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। লেখক ইতিহাসভাগ ব্যক্তি। অতি বুদ্ধিমান লেখকের হাতে এ বিষয়ে তথাকথিত ইতিহাসের নাজির আছে। তবে দুঃখের বিষয়, তথাকথিত ইতিহাস যে নিরপেক্ষ অভ্রান্ত সত্যপ্রতিপত্তি এই অপবাদ ইতিহাসের কোন ছাত্রই তাকে দিতে পারবে না। নর্ডেঙ্কাল চিত্রে লেখক একটি কথা জেনে রাখুন—তদানীন্তন কালে উত্তর-ভারতের স্থানে স্থানে যদি হিন্দুধর্মের কিছুটা বিকৃতি সাধন ঘটে থাকে তদ্বারা ব্রহ্মবাদী সমগ্র ভারতের অবলুপ্তি ঘটান যে বিশেষ অভিসন্ধিমূলক এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অতএব ভারত যে তখন কতটা ‘ভূমিত’ চ্যাতক ত’য়ে উঠেছিল একথা বলা স্কটনি।

এখন দেখা যাক ‘যোগবাসিন্ধু’ রামায়ণে ও শ্রীমন্তাগবতে বুদ্ধ প্রসঙ্গ। অমরকোষে ‘বুদ্ধ’ শব্দের অর্থ ‘বুদ্ধঃ—সর্বজ্ঞঃ। অদ্বয়বাদঃ।’ কিন্তু ঐতিহাসিক বুদ্ধ অদ্বয়বাদী নন শূন্যবাদী। যোগবাসিন্ধুর ও শ্রীমন্তাগবতের বুদ্ধ হলেন সুবাচাৰ্য বৃহস্পতি। তিনি ‘একদা ঐতি-বহির্ভূত হেতুবান-সমষ্টিত শাস্ত্র রচনা করেন। বৌদ্ধশাস্ত্র নামে তখন তা খ্যাত হয়। “জিন ধর্ম” সমাপ্তায়...বেদবাহ্যন পবিত্রায় হেতুবান্দসম্ভিতান্ ॥”—রাংস্ত্র, ২৪ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। যোগবাসিন্ধু—বৈরাগ্য প্রকরণে, ১৫৬—১০ শ্লোকের তাৎপৰ্য—‘আমি বুদ্ধদেবের দ্বারা শাস্ত্রভাবে সর্বভূতেই আত্মবৎ ব্যবহার (বা সর্বভূতে আত্মজ্ঞানের সাধনা) করিতে ইচ্ছা করি। ঐতিহাসিক বৌদ্ধধর্ম ‘আত্মজ্ঞানের’ সাধনা নেই। আছে নির্বোধমুক্তির সাধনা। —“We have seen that Buddha said that there was no atman (soul)”—A History of Indian Philosophy—Dr. S. N. Dasgupta.—দ্রষ্টব্য। শ্রীমন্তাগবত বলেন—‘বুদ্ধতত্ত্ব নিবোধশাস্ত্রম। তৎ সর্বৈঃ শাস্ত্রকারৈঃ খণ্ডিতম্ অগ্রাহ্যম্।’ ফলতঃ বৃহস্পতি নামধের, বুদ্ধের শাস্ত্র ছাড়া ঐতিহাসিক বুদ্ধের নিবোধবাদের ‘সর্বৈঃ শাস্ত্রকারৈঃ খণ্ডিতম্’ ত’তে যাবনি। যদিও ভারতভূমি থেকে বৌদ্ধধর্ম উদ্ভূতের জন্ম প্রদানতঃ শঙ্করাচার্যকেই

দায়ী করা হয়—ইহাও সম্পূর্ণ সত্য নয়।—It will be wrong to say that he (Sankara) routed the Buddhists by his philosophical arguments.—The cultural heritage of India.—Prof. H. Bhattacharjee, M. A. B. L. বৌদ্ধধর্মের উচ্ছেদের জগা আর আছে কুমারিল ভট্টের উল্লেখ। অতএব এর দ্বারা 'সর্বোপনিষৎ' 'ঐতিহাসিক' মত তেঁতে পারে না।

আমাদের প্রাচীন মহর্ষিদের 'জন্মকাল' সম্বন্ধে খ্রীষ্টীয়ানদের কাছে পাঠ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা মনে করি না। তবে 'বুদ্ধ মহর্ষি পতঞ্জলির কাছে যে স্থান' একখান উল্লেখ আমার প্রবন্ধে নেই। উক্ত লেখকের স্বকপোলকল্পিত দিবাক্তিঃ। 'বৌদ্ধ' ও বিরাটসংস্কৃতি বলতে লেখক কি বুঝেন? শুধু নাটকোচিত আবেগ সৃষ্টিপ লেখকের 'বিক্ষোভ' বাস্তব ইতিহাস নয়। বাস্তব ইতিহাসের চশমা এঁটে লেখক এবার দৃষ্টিপাত করুন—সব 'Ism' তা ধর্মীয় আর political ভোক মতপাথক্য থাকলেও তাই ভিত্তিহীন সত্যের ঐ সম্বন্ধে Ism এর follower দের হাতে পড়ে পরবর্তী কালে অপরূহ হাটে। শঙ্করাচাৰ্য বা কুমারিল ভট্ট নয়। নির্বাণমুক্তির নামে পরবর্তী কালের যখন ভিক্ষু-ভিক্ষুণীগণ ন্যাতিচারের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিল এবং সমাজ অশোক ও হযবর্ধনের পরে ভারতের জাগ্রত ক্ষাত্রপুত্র (শুণ্ড পশ প্ৰভৃতি) নির্বাণমুক্তি জাতীয় জীবনের অল্পপুষ্ট বলে গ্রন্থক'রল ও বাস্তববাদী মুসলমানদের যখন ভাবতে আগমন ঘটল, তখন ভারত থেকে অবলুপ্তি ঘটল বৌদ্ধধর্মের। বড়ই দুঃখের সাথে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, বর্তমান জগতের মানচিত্র থেকেও বৌদ্ধজগত নবজাগ্রত কাল-ধর্মের হাতে অবলুপ্ত হতে চলেছে। চীন ও তিব্বত তার দৃষ্টান্তস্বরূপ। বৌদ্ধ বাধী, সিংহল, থাইল্যান্ড ও শ্রীলঙ্কা, কাশ্মির ইত্যাদি রাজ্যে অতিস পঞ্চলীল সত্যি সত্যি তৈরী হয়েছে। শ্রীলঙ্কায় সঙ্কটবিশিষ্ট বিরাট আর্থিক বিক্ষোভের এখন শুল্ক বিলান হতে চলেছে। এই তিসাই আজ জগতকে দস্যের পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছে অবিরাম গতিতে। আজ জগত চায় না ধর্ম। চায় মতাবলুপ্তি পাওয়া। এই দুদিনে অত্যন্ত বঙ্গ নিয়ে শ্রীলঙ্কা বা বঙ্গালন্দের মধ্য-যুগ-স্বলভ বাক-যুদ্ধে কোন সত্য নির্ণীত হবে না। অতএব আমাদের 'পঞ্চলীল' সাধনাব এখানেই সমাপ্তি ঘটুক।—হেম সমাজদ্বার।

আনন্দবুদ্ধাবন চম্পু

"মাসিক বসুমতীতে" মাসে মাসে প্রকাশিত কবিকর্ণপুরের "আনন্দবুদ্ধাবন চম্পু" গ্রন্থের স্মরণিত অনুবাদ পাঠ করিয়া অতিশয় আনন্দলাভ করিতেছি। আপনার বঙ্গানুবাদ ত আদৌ অনুবাদ বলিয়া মনে হয় না। নূতন মৌলিক কাব্য বলিয়াই মনে হয়। যেমন মধুর কুকলীলা কাহিনী চিরকালই সুমধুর, তেমনি আপনার অনুবাদের ভাষা মধুর হইতেও মধুর; এ ভাষার মন্ডাকিনী-ধারা তরতর বেগে প্রবাহিত হইয়া পাঠককে অমৃতরসে অভিষিক্ত করে। কবি কর্ণপুরের নাতিপ্রাঞ্জল সংস্কৃতের প্রতিটি ভাব ও ব্যঞ্জনা আপনার অনুবাদ-বাণীতে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। অনুবাদের এই ভাষা ঠাকুরবাড়ীর বৈশিষ্ট্যই বক্ষ্য রাখিয়াছে।

কিন্তু এই সম্পর্কে আমার একটি নিবেদন আছে। কবি কর্ণপুর গোস্বামী প্রণীত "আনন্দবুদ্ধাবন চম্পু" মূল সংস্কৃত গ্রন্থ বাজারে আর পাওয়া যায় না। আপনি এই গ্রন্থ পুস্তকাকারে প্রকাশের

সময় যদি এই অনুবাদের সঙ্গে মূল সংস্কৃত চম্পুকাব্যটি প্রকাশ করেন, তাহা হইলে সোনার সোহাগা হয়, কবির কাব্যরস আবাদনের তথা আপনার কৃত অনুবাদের বৈশিষ্ট্য বুঝিবার বিশেষ সুবিধা হয়। সঙ্গে সঙ্গে এই লুপ্তপ্রায় বৈকবগ্রন্থকে বৈকব-সমাজে পুনরায় উপস্থাপিত করা হয়। আমি এই নিবেদন, আপনার প্রণীত সকল অনুবাদ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য জানিবেন। আশা করি আমার নিবেদন কার্যকরী করিবেন। শ্রীবিপিনবিহারী দাস, গড়বেতা, মেদিনীপুর।

পত্রিকা সমালোচনা

আমি মাসিক বসুমতীর এক জন নিয়মিত পাঠিকা, এই মাসিক বসুমতী গ্রন্থটি আমার খুব ভাল লাগে, অত্যন্ত প্রকাশিত বিভিন্ন লেখক-লেখিকাদের উপস্থাপন পড়ে খুব খুসী হইয়াছি। বিশেষ করে আন্তরিক মুখোপাধ্যায়ের পক্ষতপাব কথা উল্লেখযোগ্য। সার্ভিসের ক্ষেত্রে এটি একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। আন্তরিক মুখোপাধ্যায়ের নূতন উপস্থাপন আবার মাসিক বসুমতীর পাতায় দেখতে চাই। সম্প্রতি মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত সুলেখা দাশগুপ্তার 'বর্ণালী' ও সত্যজিৎ 'অনেকের' খুবই ভাল লাগছে। হিমালয় গোস্বামীর ভ্রমণ কাহিনী পড়েও দেশ সম্বন্ধে নোহুঁন করে অনেক কিছু জানতে পারলাম। বার্লী শ'র জাবনী পড়ে খুবই খুসী হচ্ছি। ভবিষ্যতে এত রকম পৃথিবী-বিখ্যাত লেখকদের জাবনী মাসিক বসুমতীর পাতায় দেখতে পেলো আনন্দিত হবো। বাতিঘরের চতুর্থ পর্ব আবার করে দেবে হবে? তবে একটি বিষয়ে আমার অভিযোগ আছে। সেটা হচ্ছে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির বিষয়ে। এই বিভাগটি উঠিয়ে দিলেন কেন? এর পুনঃপ্রবর্তনের ব্যবস্থা করুন।—অঞ্জলি সেনগুপ্ত, ২৪৫, ৫ম বোর্ড; কলিকাতা।

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

Please receive the annual subscription for another year. Kindly send the magazine regularly.—Head Master, Govt. High School, Haflong.

Herewith Rs 15/- being the subscription for Masik Basumati for one year. Please send it from the Jaistha number.—Manager, New Chunta T. Estate, Darjeeling.

আগামী ৬ মাসের জন্য চাঁদা পাঠাইলাম। দয়া করিয়া নিয়মিত মাসিক বসুমতী পাঠাইয়া রাখিত করিবেন।—Mrs. Bani Chakravorty, Ahmedabad.

Remitting herewith Rs. 15/- as my annual subscription for the ensuing season,—Ambujaksha Mahanty, Purulia.

মাসিক বসুমতীর আবার '৬৬ সংখ্যা থেকে মাঝে '৬৬ পর্যন্ত চাঁদা বাবদ ১০/- টাকা পাঠালাম। নিয়মিত পত্রিকা পাঠানোর ব্যবস্থা করবেন।—শ্রীমতী চাঁপারানী মণ্ডল—মেদিনীপুর।

Payment of annual subscription for Masik Basumati—Vani Sen Gupta.—Bombay.



ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶନ
୧୯୫୫

ରଞ୍ଜିତ-ବାହାର
ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶନ, ୧୯୫୫



সামাজিক বসুমতি

৩৮শ বর্ষ—ভাদ্র, ১৩৬৬

॥ স্থাপিত ১৩২২ ॥

[প্রথম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা]

কথামৃত

তোমাদের পূর্বপুরুষেরা আমাদের স্বাধীনতা দিয়াছিলেন, তাই ধর্মের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ও বিকাশ হইয়াছে। কিন্তু তাঁহারা দেখে যেত প্রকার বন্ধনের মধ্যে ফেলিলেন, কাজে কাজেই সমাজের বিকাশ হইল না। পাশ্চাত্য দেশে ঠিক ইহার বিপরীত—সমাজে যথেষ্ট স্বাধীনতা—ধর্ম কিছুমাত্র নাই। ইহার ফলে ধর্ম নিতান্ত অপরিণত ও সমাজ পুঙ্খ নুয় উন্নত হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আদর্শ ভিন্ন ভিন্ন। ভারত ধর্মমুখী বা অন্তর্মুখী, পাশ্চাত্য বহির্মুখী। পাশ্চাত্য দেশ ধর্মের এতটুকু উন্নতি করিতে হইলে সমাজের উন্নতির ভিতর দিয়া করিতে চায়, আর প্রাচ্য এতটুকু সামাজিক শক্তিশালী করিতে হইলে তাহা ধর্মের মধ্য দিয়া লাভ করিতে চায়।

এই কারণে আধুনিক সংস্কারকগণ প্রথমেই ভারতের ধর্মকে নষ্ট না করিয়া সংস্কারের আর কোন উপায় দেখিতে পান না। তাঁহারা ইহা চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে বিফলমনোরথও হইয়াছেন। ইহা কারণ কি? কারণ, তাঁহাদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই তাঁহাদের নিজের ধর্ম উত্তমরূপে অধ্যয়ন ও আলোচনা করিয়াছেন—আর তাঁহাদের একজনও ‘সকল ধর্মের প্রকৃতিকে’ বুঝিবার জন্য যে সাধনা প্রয়োজন, সেই সাধনার মধ্য দিয়া যান নাই। ঈশ্বরের আশি এই সমস্তার মীমাংসা করিয়াছি বলিয়া দাবী করি। আমি বলি, হিন্দুসমাজের উন্নতির জন্য ধর্মকে নষ্ট করিবার কোন প্রয়োজন নাই—এক হিন্দু ধর্ম প্রাচীন রীতিনীতি ও আচারপদ্ধতি প্রকৃতি সমর্থন

করিয়া রহিয়াছে বলিয়া যে সমাজের এই অবস্থা তাহা নহে, কিন্তু ধর্মকে সামাজিক সকল ব্যাপারে যেভাবে লাগানো উচিত, তাহা হয় নাই বলিয়াই সমাজের এই অবস্থা।

একটি কাঠখণ্ডকে উহার আঁশের অনুকূলে যেমন সহজে চিকিয়া ফেলা যায়, হিন্দুধর্মকেও তেমনি হিন্দুধর্মের মধ্য দিয়াই সংস্কার করিতে হইবে; নব্যতান্ত্রিক মতবাদের মধ্য দিয়া নহে। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে সংস্কারগণকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দেশের সংস্কৃতিধারাকে নিজ জীবনে গ্রহণ করিতে হইবে।

খাঁটি চরিত্র, সত্যকার জীবন, যাহা শক্তির কেন্দ্র এবং দেব-মানবের মিলনভূমি—তাহাই পথ দেখাইবে। ইহাদিগকে কেন্দ্র করিয়াই বিভিন্ন উপাদানসমূহ সজ্জবদ্ধ হইবে এবং পরে প্রচণ্ড তরঙ্গের মত সমাজের উপর পতিত হইয়া সব কিছু ভাসাইয়া লইয়া যাইবে, সমস্ত অপবিত্রতা ধুইয়া দিবে।

এই অবস্থা ধীরে ধীরে আনিতে হইবে—লোককে অধিক ধর্মনিষ্ঠ হইতে শিক্ষা দিয়া ও সমাজকে স্বাধীনতা দিয়া। প্রাচীন ধর্ম হইতে এই পুরোহিতের অত্যাচার ও অনাচার ছাঁটিয়া ফেলা—দেখিবে, এই ধর্মই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। আমার কথা কি বুঝিতেছ? ভারতের ধর্ম লইয়া সমাজকে ইউরোপের সমাজের মত করিতে পার? আমার বিশ্বাস ইহা কার্যে পরিণত করা খুব সম্ভব, আর ইহা হইবেই হইবে।

—বাবী বিবেকানন্দের বাণী

বাঙ্গালী কেরাণীর যুদ্ধ পরিচালনা

ত্রিগুণেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

বাঙ্গালী ভীক, যুদ্ধবিযুখ, ভেতো বাঙ্গালী, বাঙ্গালী শুধু কীদতেই জানেন, বাঙ্গালী সামরিক জাতি নয় ইত্যাদি অজ্ঞ মিত্যে অপবাদ এই বাঙ্গলা দেশের অধিবাসীদের নামে পুঞ্জীভূত হয়ে আছে। কিন্তু বাঙ্গালী যে ভীক নয়, সমরবিযুখ নয়, স্তম্ভর অতীতের মহাভাবতের যুগ থেকে ব্রিটিশ শাসনের প্রথম যুগ পর্যন্ত বাঙ্গালার ইতিহাসই তার সাক্ষ্য। বাঙ্গালার মৃত্যুভয়-লেশহীন বিপ্লবী যুবকলই তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

ব্রিটিশ আমলের বাংলার ইতিহাস আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই, বাঙ্গালীর এই মিত্যে অপবাদের মূল রয়েছে ইংরেজ। ইতিহাসে বাংলার কিছুমান দফা আছে তাঁরাই জানেন একদা ভারতে ইংরেজ রাজত্ব প্রসারের প্রধান সহায়ক হয়েছিল এই অসামরিক বলে উপেক্ষিত বাঙ্গালী ও মাদ্রাজী সিপাহীরাই। ব্রিটিশ আমলের গোড়ার দিকে একদিন এই ইংরেজরাই বাঙ্গালীর সমরকুশলতাব প্রশংসা করেছেন। কে এক মালিসন প্রভৃতি ইংরেজ ঐতিহাসিক তৎকালীন অনেক যুদ্ধে ইংরেজগণ যে শুধু বাঙ্গালী ও মাদ্রাজী সিপাহীর বীরধেই জয়লাভ করেছেন একথা যুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করে গেছেন। সে যুগে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক অনেক বাঙ্গালী যোদ্ধাকে বীরত্বের জ্ঞপ্তি যে 'ইংলিশ' নামক জয়গীর প্রদত্ত হয়েছে তারও ঐতিহাসিক নজির আছে। কিন্তু পরবর্তী যুগে রাজনৈতিক উদ্বেগসিদ্ধির জ্ঞপ্তি এই ইংরেজই আবার বাঙ্গালীকে সমর বিভাগ থেকে সরিয়ে একেবারে কেরাণীতে পরিণত করেছে।

ব্রিটিশ আমলে অল্প সব প্রদেশ থেকে শিক্ষাদীক্ষা এবং শিক্ষকুশলতায় বাঙ্গালীই ছিল অগ্রণী। বাঙ্গালীর দেশপ্রেম, স্বাধীনতা লাভের স্পৃহা এবং বিপ্লবী মনোভাবই হল ইংরেজের ভয় ও আশঙ্কার কারণ। নিরক্ষর, ও অনগণ্য রাজনৈতিক চেতনাসীন ভিন্ন প্রদেশবাসীকে বাঙ্গালী প্রভাব থেকে মুক্ত রাখবার জ্ঞপ্তি ইংরেজ তাই সুকৌশলে তাদের সরিয়ে দিলে সমর বিভাগ থেকে। শুধু সরিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হল না, বাঙ্গালী প্রভাব খর্ব করবার সর্বপ্রকার কুট কৌশলও অবলম্বিত হল। কার্জন করলেন বাংলার অঙ্গচ্ছেদ, হাডিজ বাংলা থেকে সরিয়ে নিলেন রাজধানী, সর্বশেষে ম্যাকডোনাল্ড কার্যে ম করলেন কমিউনাল গওয়ার্ড। সিপাহী বিদ্রোহের পর সৈন্যদলে লোক নির্বাচনের কড়াকড়িটা আরো বেড়ে গেল। ফলে সিপাহী যুদ্ধে হারা ভোগ দেয়নি এমন অঞ্চলের লোক ছাড়া সমর বিভাগে অল্প সকেই হয়ে পড়ল অবাক্তনীয়। অর্থাৎ কেবল মাত্র সীমান্ত প্রদেশ, পাজাব, নেপাল প্রভৃতি রাজনৈতিক চেতনামুগ্ধ কয়েকটি প্রদেশের অধিবাসী ছাড়া অল্প সব প্রদেশবাসীকেই বাঙ্গালীর মত সরিয়ে দেওয়া হল অসামরিক পর্যায়ে। সুতরাং সেনা বিভাগে সামরিক বা অসামরিক জাতি এই কৃত্রিম বিভেদ সৃষ্টিব উদ্ভাবক যে ইংরেজ এবং তার রাজনৈতিক মস্তিষ্ক একথা আজ আর কাউকে বুঝিয়ে বলা নিশ্চয়োজ্ঞন।

বাঙ্গালী যে অসামরিক জাতি নয় এবং কোন কালেই সমরবিযুখ ছিল না, হিন্দু যুগের অতীত ইতিহাস ছেড়ে দিয়ে শুধু নবাবী আমলের শেষ ও ব্রিটিশ শাসনের প্রথম যুগের ইতিহাস আলোচনা করলেও তার যথেষ্ট নজির পাওয়া যায়। তখনো বাংলার ঘরে ঘরে ছিল শক্তিরচা

বাংলার লাঠিয়ালের প্রভাব সে যুগে লোকের মনে ত্রাসের সঞ্চার করত। বাঙ্গালী আত্মবিশ্বস্ত জাতি, বাংলার কোন ইতিহাস নেই। তাই আজ নিছক আত্মপ্রাণ ও আত্মবিবরণ-সর্বস্ব মুসলমান বা ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের বর্ণনাই বাঙ্গালার ইতিহাস সংকলনের একমাত্র অবলম্বন। এ সব বর্ণনার মধ্যে কদাচ কখনো প্রসঙ্গ ক্রমে বাঙ্গালী হিন্দুর যে ছিটে-কোঁটা আলোচনাটুকু পাওয়া যায় তাই হয়েছে এখন আমাদের ইতিহাস রচনার অকিঞ্চিৎকর পাথরে।

মুসলমান ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় পলাশীর যুদ্ধের সময়ে সিরাজ-সেনাপতি মোহনলালের গায় আরো তিন জন বাঙ্গালী যোদ্ধার নাম পাওয়া যায় কিন্তু দুর্ভাগ্য বশত তাঁদের বংশপরিচয় বা কীর্তিকলাপের বিস্তৃত বিবরণ কিছুই জানা যায় না। এ তিন জনই ছিলেন আলীবর্দীর জামাতা পুর্ণিয়ার নবাব সইদ আহম্মদের সামরিক বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী। গোলন্দাজ বিভাগের অধিনায়ক ছিলেন লালু হাজারী এবং বেতন বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন শামসুল্লার নামে জনৈক বাঙ্গালী কায়স্থ। এ ছাড়া নবাবের দেহরক্ষী বাহিনীর অধিনায়কও ছিলেন একজন বাঙ্গালী যোদ্ধা, তাঁর নাম মিতনলাল। সইদ আহম্মদের অপদার্ব ও আহম্মক পুত্র সওকৎ জঙ্গ অতি তুচ্ছ কারণে প্রবীণ সেনাধ্যক্ষ লালু হাজারীকে বরখাস্ত করলে লালু হাজারী মুর্শিদাবাদ দরবারে গিয়ে নবাব সওকৎ জঙ্গের দুর্নীতি ও খামখেয়ালীর কথা জ্ঞাপন করেন। মুর্শিদাবাদ ও পুর্ণিয়া দরবারের বিশিষ্ট ব্যক্তি মাঝেই এই প্রবীণ তোপাধ্যক্ষের পদচ্যুতিতে মন্থাহত হন এবং সওকৎের আহম্মকী এবং অদূরদর্শিতার নিন্দা করেন। লালু হাজারী বা মিতনলাল সঙ্ক্ষে মুসলমান ইতিহাসে এর বেশি আর কিছুই জানা যায় না। তবে কতখানি বিশ্বস্ততা ও সামরিক যোগ্যতা থাকলে সেই মুসলিম প্রভুত্বের যুগে কোন বাঙ্গালী হিন্দুর পক্ষে নবাবের দেহরক্ষী বাহিনী বা গোলন্দাজ বাহিনীর অধিনায়কত্বের মত সামরিক উচ্চপদ লাভ সম্ভব ছিল তা সচক্ষেই অনুমেয়।

সে যুগে দেশবাসীর মধ্যে শরীরচর্চা, অশ্বচালনা বা বাহিনী পরিচালনা শিক্ষার একটা স্বাভাবিক বেওয়াজ ছিল। কেন না, মোটামুটি এসব গুণ আবৃত্ত না থাকলে নবাব সরকারের অসামরিক বিভাগেও রাতারাতি উন্নতি লাভের সুযোগ ঘটত না। এ জ্ঞান নবাবী আমলে দেওয়ান তহশীলদার প্রভৃতি অসামরিক সরকারী কর্মচারীদিগকেও সময় সময় দক্ষ সেনাপতির মত বাহিনী পরিচালনা করতে দেখা যায়। দৃষ্টান্তরূপ দেওয়ান দয়ারাম, জানকীরাম, রাজা রাজবল্লভ, রাজা হুসৈন, মহারাজ নন্দকুমার প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। এঁরা সব অসামরিক কর্মচারী হয়েও অনেক সময় দক্ষ সেনাপতির মত সৈন্য পরিচালনাও করেছেন। এই প্রসঙ্গে আমরা পুর্ণিয়া সরকারের গোলন্দাজ বিভাগের কেরাণী শামসুল্লার যুদ্ধ পরিচালনার কাহিনী উল্লেখ করব।

নবাব আলিবর্দীর জিন কস্তার মধ্যে বড় ঘসেটি বেগম ছিলেন নিঃসন্তান। মেজ আমিনার দুই পুত্র সিরাজ ও একরামদৌলা এবং ছোট মেয়ের পুত্র হলেন সওকৎ জঙ্গ। পিতা সইদ আহম্মদের মৃত্যুর পর সওকৎ পুর্ণিয়ার নবাবী তক্তে বসলেন। সওকৎ-এর মত ভীক

আহাম্মক, আকাট মুখ্ আর নেশাখোর নবাব মুসলমান ইতিহাসে খুব কমই দেখা যায়। সওকৎ নিজের নাম স্বাক্ষর করতে গলদবশত হয়ে পড়তেন। এক এক সময় দলীল দস্তাবেজ বা কার্যমানে স্বাক্ষর করতে গিয়ে বিরক্ত হয়ে কলম ছুঁড়ে ফেলে সিংহাসন থেকে সরে বসতেন। সকল বকম কুক্রিয়া আর পাণাচারে সিরাজের সমগোত্রীয় হলেও সিরাজে যে বুদ্ধি বা বিবেচনাশক্তি ছিল, সওকতের মধ্যে তার চিহ্নমাত্রও ছিল না।

আলিবর্দীর মৃত্যুর পর মীরজাফর, রায় দুর্জভ, জগৎশেঠ প্রভৃতি বিরোধীদল সিরাজকে সরিয়ে এই সওকতকে মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে বসাবার জন্ত একটা ষড়যন্ত্র পাকিয়ে তুললেন এবং এই মর্মে সওকতের নিকট একটা গোপন পত্রও প্রেরিত হল। মনে হয়, সিরাজের বিরোধীদল তখনো সওকতের স্বরূপটা ঠিক জানতেন না, জানলে তাঁরা এমন নির্বুদ্ধিতা করতেন বলে মনে হয় না।

এদিকে মুর্শিদাবাদের আমীর ওমরাহগণ তাঁকে বাংলার মননে বসাতে চায়, একথা জেনে সওকতের মাথা ঘুরে গেল। চারদিক থেকে ইয়ার চাটুকারের দল উদ্ভানি দিয়ে আহাম্মক নবাবকে আরো কাঁপিয়ে তুললে। সওকৎ গোঁফে চাড়া দিয়ে ইয়ার বন্ধুদের মধ্যে তাঁর খোয়াবী উচ্চাকাঙ্ক্ষা ঘোষণা করতে লাগলেন—বাংলা জয় করেই তিনি অযোধ্যার নবাব ও বাদশাহের উজীর গাজীউদ্দিনকে পরাজিত করে দিল্লী দখল করবেন। তারপর দিল্লীর তক্তে একজন পছন্দসই লোককে বসিয়ে লাহোর এবং কাবুল পার হয়ে একেবারে অন্ধ্র গোরাসানে গিয়ে রাজধানী স্থাপন করে বসবাস করতে লাগলেন। কেননা, বাংলার জলবায়ু নিতান্তই অস্বাস্থ্যকর। এরকম অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় তাঁর মত উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন লোকের বসবাস অসম্ভব! দেশভুক্ত লোক আহাম্মক নবাবের এসব প্রলাপোক্তি শুনে হেসে অস্থির হল।

সরুজ বাংলার নবাবী তক্ত লাভের জন্ত সওকৎ ইতিমধ্যে বহু লক্ষ টাকা উপার্জন করে দিল্লীর বাদশাহের নিকট থেকে স্তরে বাংলা-বিহাদ-উড়িষ্যার নবাবী পদের একটা ফারমান জোগাড় করেছিলেন, যদিও এ ফারমানের বিশেষ কোন গুরুত্ব ছিল না, কেন না ফারমানের নিচে স্বাক্ষর ছিল উজীরের। বাদশাহের কোন স্বাক্ষর ছিল না। ফারমানে 'সিরাজদৌলার সমস্ত সম্পত্তি এবং বার্ষিক এক কোটি টাকা রাজস্ব দিবার সার্ভে সওকৎ সমগ্র বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা দখল করে নিবেন' এরূপ আদেশ ছিল।

একদিকে মুর্শিদাবাদ দরবারের ষড়যন্ত্রকারী আমীর ওমরাহদের গোপনপত্র আর একদিকে বাদশাহী ফারমান, এর ওপর আবার চাটুকার ইয়ার বন্ধুদের উদ্ভানি। মুখ্ সওকৎ একেবারে আতঙ্কিত আটখানা। পূর্ণিয়ার দরবারে বসেই তিনি নিজেকে বাংলার নবাব বলে ঘোষণা করলেন। তারপর মুর্শিদাবাদে সিরাজকে লিখে পাঠালেন—বাদশাহী ফারমান বলে এখন আমিই বাংলার আসল নবাব। তুমি ভাল চাও তো সিংহাসন ত্যাগ করে মুর্শিদাবাদ ছেড়ে এখন চলে যাও। কিন্তু হুঁসিয়ার, বাওয়ার পূর্বে আমার কর্তৃত্বাধীনের রাজকাণ্ডের অর্থ ও মূল্যবান হীরা জহরৎ বৃষ্টিয়ে দিয়ে যাবে। আমি ইচ্ছে করলে তোমার মাথাটা এখন ক্যাচাৎ করে কেটে ফেলতে পারি কিন্তু তুমি আমার মাসভুক্তো ভাই, নেহাৎ

আত্মীয়; তাই ঐ নৃশংস কাছটা আর করলুম না। ভাল মাহুবেঁ মত মননদ ছেড়ে যদি ঢাকা চলে যাও, তোমার জন্ত ভাল মাসোয়ারা মঞ্জুর করব। অবিলম্বে এ পত্রের জবান চাই, আমি বোড়ার বেকাবে পা তুলেই আছি, জবানে বিলম্ব হলেই মুর্শিদাবাদ আক্রমণ করব।

মুর্শিদাবাদ দরবারে এ পর পৌঁছলে সেখানে প্রথমে একটা হাসির ধুম পড়ে গেল। দরবারের প্রধানগণ ইতিপূর্বেই পদচ্যুত প্রবীণ গোলন্দাজ সেনানায়ক লালু হাজারী মারকৎ সওকৎ জঙ্গের আসল পরিচয় পেয়েছিলেন, এক্ষণে সিরাজের কাছে লিখিত পত্রের বয়ান দেখে সওকতের চরিত্র ও আহাম্মকী সম্বন্ধে তাঁদের আর কোন সন্দেহ রইল না। সকলেই সওকতের ধৃষ্টতার উপযুক্ত জবাব দেওয়ার জন্ত দৃঢ়সঙ্কল্প জানালেন। বিরাট হুই দল ফৌজ মুর্শিদাবাদ থেকে পূর্ণিয়ার পথে রওনা হল। একদলের পরিচালক স্বয়ং নবাব, মীরজাফর খাঁ, দোস্ত মহম্মদ খাঁ, মীরকাজেম খাঁ, দিল্লীর খাঁ, আসালং খাঁ প্রভৃতি বাংলার শ্রেষ্ঠ সেনানায়কগণ অপর দল পরিচালনা করলেন রাজা মোহনলাল এবং তার বীর অমুগাধিগণ। নবাবের আদেশে পাটনা থেকে সদলবলে অগ্রসর হলেন। পাটনার নায়ের নাজিম রাজা রামনারায়ণ। পূর্ণিয়ার প্রবীণ সেনানায়কগণের পরামর্শানুসারে সওকৎ জঙ্গও নবাবগঞ্জ ও মণিহারীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে প্রাকৃতিক পরিধার স্রায় চারদিক কন্দমাস্ত্র বিলে পরিবেষ্টিত একটি উঁচু জায়গায় সেনাসন্নিবেশ করেছিলেন। এই সেনাব্যূহের মাঝখানে স্থাপিত হল সওকৎ জঙ্গের শিবির। একটিমাত্র সন্ধীর্ণ পথ ছাড়া এই সুরক্ষিত স্থানে গমনাগমনের অল্প কোন উপায় ছিল না। এই সন্ধীর্ণ পথমুখে মুষ্টিমেয় সৈন্যসমাবেশ ধারাই অনান্যাসে সিরাজের বিপুল বাহিনীর গতিরোধ করা যাবে ভেবে পূর্ণিয়ার প্রবীণ সেনানায়কগণ স্থানটি নির্বাচন করেছিলেন। কিন্তু এমন অতুল পরিবেশ ব্যর্থ রচিত হওয়া সত্ত্বেও মুখ্ নবাবের ভীকতা ও হৃদ্ধির দোষে সনস্তুই বানচাল হয়ে গেল।

রাজা মোহনলাল ভাগীরথী পার হয়ে পূর্ণিয়ার পথে সিরাজের অগ্রগামী বাহিনীসহ আবরি ও মণিহারী মধ্যস্থ চলদিবাড়ী নামক স্থানে এসে উপস্থিত হলেন। সেটা ১৭৫৬ সালের নভেম্বর মাস। গঙ্গার পাছাড়ের ওপর সেনা-সন্নিবেশ করে মোহনলাল দেখলেন, সেখান থেকে সওকতের শিবিরের ব্যবধান মাত্র ছুই তোশ। সওকতের শিবিরের সুরক্ষিত অবস্থান এবং পূর্ণিয়ার গোলন্দাজ বাহিনীর সতর্ক দৃষ্টির মুখে জলাভূমি মধ্যস্থ সন্ধীর্ণ পথ দিয়ে অস্বারোহী বাহিনী চালনা বিপজ্জনক বুঝে মোহনলাল শত্রুবাহিনীকে বিপর্যস্ত করার জন্ত সেখান থেকেই শত্রুব্যূহের উপর প্রচণ্ড গোলাবর্ষণের আদেশ দিলেন।

সওকৎ জঙ্গের শিবির তখন নাচ-গানের মহড়া চলছিল। অকস্মাৎ গোলাবর্ষণের ফলে সেখানে হলুদুল পড়ে গেল। যে যেদিকে পারে ছুটে পালাবার উত্তোগ করল। শত্রুকে বাধা দেওয়ার পরিবর্তে যে যার মাথা বাঁচাতেই ব্যস্ত। একটি গোলা এসে একেবারে সওকতের শিবির-প্রান্তে পড়ল। আর যায় কোথায়? ভয়ে বিহ্বল সওকৎ তাঁর মাই পতাকা নামিয়ে ফেলবার আদেশ দিলেন, অহুচরদের তাঁর শিবিরের আশে-পাশে ভিড় না করে দূরে সরে যাওয়ার জন্ত বার বার ধমক দিতে লাগলেন। কারণ তাঁর ধারণা হল যে মাই পতাকা এবং লোকজনের ভিড়ের জন্তই শত্রুপক্ষের

দুই তাঁর শিবিরের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। সওকতের সেনানায়করাও ঘুরে ঘুরে সব নিশ্চেষ্ট, কেউ কোন হুকুম দিচ্ছে না। কোন আদেশ না গেয়ে পুণিয়ার গোলন্দাজ বাহিনীও স্থাপুর মত নিশ্চল। সওকৎ শিবিরের বিশ্বাস ও ভীতিবিহীনতার স্বরূপ বৃক্ষে বিচক্ষণ মোহনলাল এই সময়ে ধীরে ধীরে আঁত সতর্পণে তাঁর অশ্বারোহী বাহিনীকে সেই জলাপথ মধ্যবর্তী সন্ধীর্ণ পথে দিয়ে পরিচালিত করলেন। মোহনলালের অশ্বারোহী বাহিনী জলাপথ পাব হয়ে একবার এ পারে এসে পড়লে যে সওকতের সমগ্র বাহিনী বিপন্ন হয়ে পড়বে, কারো পালাবারও উপায় থাকবে না, একথা তখন কেউ ভাবছে না, শত্রুকে বাধা দেওয়ার পরিবর্তে সবাই তখন শত্রুগোষ্ঠার হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্যই ব্যস্ত। রণক্ষেত্রের এই ঘোরালো ও সঙ্কটজনক পরিস্থিতি উপলব্ধি করে পুণিয়ার গোলন্দাজ বাহিনীর বেতনাত্মক বাঙ্গালী শ্রামস্বন্দর আর স্থির থাকতে পারলেন না। অবিলম্বে মোহনলালের অগ্রগামী অশ্বারোহী বাহিনীর গতিরোধ না করলে সমগ্র বিপদ বৃক্ষে তিনি কাহারও আদেশের অপেক্ষা না করেই কয়েকটি কামান ও গোলন্দাজ সৈন্য সহ বাঁটি ছেড়ে এক মাইল এগিয়ে গিয়ে শত্রুপক্ষের উপর গোলাবর্ষণ আরম্ভ করলেন। এই আক্রমণের ফলে মোহনলালের অশ্বারোহী বাহিনীর অগ্রগতি রুদ্ধ হল এবং সমগ্র পুণিয়া বাহিনীর মধ্যেও কিছুটা মনোবল ফিরে এল। এর পর উভয়পক্ষের মধ্যেই কিছুক্ষণ চললো প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ, উভয়পক্ষেই বহু লোক হতাহত হতে লাগল। ভীক আহাযক এবং যুদ্ধ-অনভিজ্ঞ সওকৎ এ সময়ে আর এক দারুণ ভুল করে বসলেন। তিনি প্রধান সেনাপতি কারুজার থাকে এ সময়ে সেই সন্ধীর্ণ পথে অশ্বারোহী বাহিনী সহ শত্রুপক্ষের ওপর আক্রমণ চালাবার আদেশ পাঠালেন। কারুজার এবং অভিজ্ঞ সেনানায়কগণ বলে পাঠালেন যে, উভয় পক্ষের গোলাবৃষ্টির মধ্যে ঐ সন্ধীর্ণ পথে অশ্বারোহী বাহিনী চালনা করলে সমগ্র বাহিনীই ধ্বংস হবে, পুণিয়ার শ্রেষ্ঠ সৈনিকগণ বেঘোরে প্রাণ হারাবে। কিন্তু মূর্খ সওকৎ সেনাপতি এবং সেনানায়কগণের সতর্কবাণীতে লক্ষ্যপ না করে রেগে আঙুন হয়ে বলে পাঠালেন— সামান্য একজন হিন্দু কেরানী শ্রামস্বন্দর অসম সাহসে কামান চালিয়ে আমাব ইজ্জৎ রক্ষা করছে আর তোমরা রণদক্ষ মুসলমান বীর হয়ে এ সময়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে রয়েছে? দিক তোমাদের বীরকে! কারুজার থা এবং তাঁর সহকারী সেনানায়কগণের কাছে নবাবের এ রকম অপমান-সূচক বাক্য অসহ্য বোধ হল, তাঁরা আর বিরক্তি না করে নিশ্চিত ধ্বংস জেনেও নেই সন্ধীর্ণ পথের মধ্য দিয়ে প্রচণ্ড বেগে অশ্বারোহী বাহিনী পরিচালনা করলেন। মূর্খ সওকৎ তাঁর আদেশ পালিত হয়েছে দেখে মনের আনন্দে নিজের শিবিরে এসে নাচ-গানে মগন হলেন এবং উত্তম মস্তিষ্কে শীতল করবার জন্য প্রচুর মাদক ও ভাজ সেবন করে কিছুক্ষণের মধ্যেই বেহুঁস হয়ে পড়লেন।

এদিকে জলাভূমি-মধ্যস্থ সন্ধীর্ণ পথে ধাবমান কারুজারের অশ্বারোহী বাহিনী বিপক্ষের গোলাবর্ষণে আঘাতে কাতারে কাতারে ধরাশায়ী হতে লাগল। অনেক সৈনিক অশ্বসহ দু'দিকের বিলের মহাপক্ষে পড়ে প্রাণ হারালো। হতাবশিষ্ট সেনাদল মীরজাফর ও মীরকাজেমের প্রচণ্ড আক্রমণে একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে গেল। সেইদ আত্মরক্ষার বন্ধু যুদ্ধক্ষরীণ প্রাণেতা ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন স্বয়ং এই যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। তিনি এবং অপর কয়েকজন সেনানায়ক ইতস্ততঃ পলায়মান ছত্রভঙ্গ পুণিয়া বাহিনীর মনোবল ফিরিয়ে আনবার শেষ চেষ্টা হিসেবে সওকৎ জঙ্গের সংজ্ঞাশূন্য দেহটাকে হস্তিপৃষ্ঠে বসিয়ে এ সময়ে রণক্ষেত্রে নিয়ে এলেন কিন্তু সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হল। সহসা শত্রুপক্ষের নিক্ষিপ্ত একটি গোলাবর্ষণে সওকতের প্রাণহীন দেহ হস্তিপৃষ্ঠের হাওদার মধ্যে ঢুটিয়ে পড়ল। রণক্ষেত্রের সমুখভাগে অসাম বীরত্বের সঙ্গে কামান চালাতে চালাতে বিপক্ষ-নিক্ষিপ্ত গোলাঘাতে শ্রামস্বন্দরও এ সময়ে প্রাণ হারালেন। সিরাজ ও সওকতের এই সংগ্রাম ইতিহাসে মণিহারীর যুদ্ধ নামে খ্যাত। নিজের বুদ্ধির দোষে আহাযক এবং অদ্রবদর্শী সওকৎ এই যুদ্ধে কারুজার ও শ্রামস্বন্দরের দ্বায় বিশ্বস্ত সেনানায়ক সহ পুণিয়ার বীর-বাহিনীর ধ্বংস সাধন তো করলেনই, নিজের রাজ্য ও প্রাণও হারালেন।

মুসলমান ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন স্মরিত গোলান্দাজ বাঁটি ছেড়ে এগিয়ে গিয়ে শ্রামস্বন্দরের এই কামান চালনাকে হঠকারিতা বলে কটাক্ষ করেছেন বটে, কিন্তু নবাব সওকতের মুখের প্রশংসা-বাক্য থেকেই বুঝা যায় যে, সেই সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে কারুজার শ্রামস্বন্দর যে অসম সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তার দ্বারা শুধু শত্রুর অগ্রগতিই প্রতিরুদ্ধ হয়নি, নবাব এবং তাঁর শিবিরপার্শ্বস্থ বিশুদ্ধ সেনাদলের মনোবল ফিরিয়ে আনাও সম্ভবপর হয়েছিল। রণক্ষেত্রের সেই সঙ্কট মুহূর্তে ভবিষ্যৎ বিচার করে নিশ্চল হয়ে বসে থাকার পরিণাম শুভ কি অশুভ হত, তা নির্ণয় করা নিশ্চয়ই সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। তা ছাড়া শ্রামস্বন্দরের মত একজন নগণ্য গোলন্দাজ বিভাগীর কেরানীর কাছে থেকে একজন সমরদক্ষ সেনানায়কের স্বৈর্য্য, প্রতিভা বা রণনৈতিক দূরদর্শিতা আশা করা সমীচীনও নয়। বিপক্ষদলের ভয়াবহ গোলাবর্ষণের মধ্যেও বিশ্বস্ত ও নির্ভীক সৈনিকের দ্বায় আমৃত্যু সংগ্রাম চালিয়ে শ্রামস্বন্দর যে শত্রুবাহিনীর গতিরোধ করেছিলেন, শুধু তারই জন্য ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাঁর নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবার যোগ্য।

বাঙ্গালী হিন্দুর ইতিহাস নেই, তাই বাঙ্গালী কেরানী শ্রামস্বন্দরও এই অপূর্ণ বীরত্ব ও আত্মোৎসর্গের কথা আজ কেউ জানে না! কেউ রাখে না তাঁর বংশপরিচয় বা জীবনীতিহাসের সন্ধান! আত্মবিশ্বস্ত বাংলা এবং বাঙ্গালী জাতির এই হল পরম দুর্ভাগ্য আর চরম অভিশাপ!

“মুঠধর্ম মুঠ ব্যতীত, মুসলমানধর্ম মহম্মদ এবং বৌদ্ধধর্ম বুদ্ধ ব্যতীত
তিষ্ঠিত পারে না, কিন্তু হিন্দুধর্ম কোন ব্যক্তিবিশেষের উপর একেবারে
নির্ভর করে না।”

—স্বামী বিবেকানন্দ

বঙ্গরমণীর মৌন বিক্রম

ত্রিনিদাদ চৌধুরী

অল্প কয়েক দিন পূর্বে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সংসদ উদ্বোধন হইতে ভারতের প্রথম বৃটিশ গভর্ণর জেনারেল (১৮৩৩-৩৫) লর্ড উইলিয়াম ক্যাডেলিং বেষ্টিকের প্রতিমূর্তি অপসারিত হইয়াছে। ইহা লইয়া সংবাদপত্রে বেশ কিছু আলোড়নও হইয়া গিয়াছে এবং বেষ্টিকের মূর্তি অপসারণের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে মতামত প্রকাশিত হইয়াছে। কারণ, বেষ্টিক ছিলেন উদার মনোবৃত্তিসম্পন্ন, সংস্কারকামী, জননন্দী শাসক। ভারতীয়দিগের সহিত তাঁহার সম্বন্ধমূলক মনোভাবের জ্ঞান তিনি তৎকালীন ইংরেজদের কাছে “ক্লিপিং ডাচম্যান” (তিনি ছিলেন ওলন্দাজ কলোডুত) আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন।

লর্ড উইলিয়াম বেষ্টিক সংস্কারমূলক বহু জনহিতকর কাজ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সমস্ত কাজের মধ্যে সতীদাহ নিবারণ-মূলক আইন তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। নবভারতের পথপ্রদর্শক বাজা রামমোহন রায় প্রভৃতির আবেদন ও আন্দোলনের ফলেই যে এই সংস্কারমূলক আইন প্রবর্তিত হইয়াছিল তাহা সর্বজনবিদিত এবং যুগধর্মের পরিবর্তনের সঙ্গে এরূপ আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তাও অনস্বীকার্য। তবুও সহমরণের মাধুর্যটুকুও এই সঙ্গে স্বরসী। একথা সত্য যে, হিন্দুরমণীগণ সকল সময়ে যেছায় অগ্নিপ্রবেশ করিতেন না; কারণ জীবনের প্রতি মমতা মানব-প্রকৃতির স্বাভাবিক ধর্ম। একথাও সত্য যে, কালক্রমে সহমরণ প্রথা ভিতর স্বার্থ, ঘেঁষ, অনাচার প্রভৃতি প্রবেশ করিয়া প্রাথমিক কুৎসিত এবং বীভৎস করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু ইহা সন্দেহও বঙ্গ-নারীগণ যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যেছায় সহমৃত্যু হইতেন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে জর্জেন ক্যুরোপীয় মহিলা লিখিয়া গিয়াছেন যে, “এমন অনেক নারী আছেন, বাঁহারা মৃত স্বামীর শব্দে সহিত সহমৃত্যু হইয়া অল্পত সাহসের পরিচয় দেন। সেই সাতম অল্পভাবে পরিচালিত হইলে নারীজাতিকে গৌরবাহিত করিতে পারিতেন। অবশ্য ইহা সত্য যে, তাঁহাদের (সহমৃত্যু হইতে) কুণ্ঠিতা হওয়ার কথা শুনা যায়। কিন্তু সেকপ দৃষ্টান্ত অত্যন্ত বিরল” (১)। বঙ্গরমণীর সাহস ও একনিষ্ঠ প্রেমের কথা লিখিতে যাওয়া শত বৎসর পূর্বে হটন সাহেব লিখিয়াছিলেন, “তাঁহাদের নিষ্ঠা, আত্মত্যাগ ও প্রাণ সমর্পণ অসম্ভব চিতার শিক্ষাকেও অতিক্রম করিয়া স্বর্গের নিকটতর হইয়াছে” (২)।

সতীদাহ বা সহমরণ-প্রথা কোন বিশ্বস্ত অতীত হইতে বঙ্গদেশে বিস্তারিত করিয়াছিল, তাহা আর এখন সঠিক জানা যায় না। তবে, অনেকের মতে সতীদাহ প্রথা পাল আমলের শেষের দিকে এসে সেন আমলে প্রসার লাভ করিয়াছিল। বৃহৎস্মরণ (১৮৮৩-১০) মৃত স্বামীর সহিত পুড়িয়া মরিবার জ্ঞান সমাজনায়েকেরা দ্বিজনারীদের পুণ্যলোভে প্রলুব্ধ করিয়াছেন। ইহার চেয়ে

বীরব নাকি তাঁহাদের আর কিছু নাই (৩)। পাটনা মিউজিয়ামে রক্ষিত মানভূম, পুন্ডিয়া অঞ্চল হইতে সংগৃহীত ‘সতীস্মারক’ স্তম্ভগুলি এই প্রাচীন অস্বাভাবিক পুণ্যমুতি বহন করিতেছে।

ইতিহাসে জানা যায়, ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার ৩০ মাইলের মধ্যে ৪০০টি সহমরণ অস্বাভাবিক হইয়াছিল। ১৮১৫ হইতে ১৮২৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই বার বৎসরে ৭১৫টি রমণীর সত্মৃত্যু হইবার সংবাদ ম্যাজিস্ট্রেটদিগের নিকট পৌঁছে। ১৮১৮ সালের সরকারী বিবরণী হইতে জানা যায় যে, ১৮১৫ সাল থেকে ১৮১৮ সাল, এই তিন বৎসরে ২,৩৬৫ জন বিধবা সহমরণে যায়। এর মধ্যে ১,৫২৮ জন কলিকাতা ও সহরতলী অঞ্চলের। ১৮১১ সালের কলিকাতা সহরের উপকণ্ঠের সতীদাহের একটা ফর্দ পাওয়া গিয়াছে। এক বৎসরে ৪টি থানার ৫২টি সহমরণের বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। প্রত্যেক সতীর নাম, জাতি, স্বামীর নাম, সংকারের তারিখ, থানার নাম ও কয়টি ছেসেমেরে ছিল তার একটা দীর্ঘ ফর্দ আছে। এই ৫২টি সতীর মধ্যে ২০ জন ব্রাহ্মণ, ১০ জন কায়স্থ, ২ জন বৈজ্ঞ, ২ জন সদগোপ, ৫ জন কৈবর্ত, ৩ জন মুগী, ২ জন শুড়ী, ২ জন ময়রা, ১ জন কাঁসারী, ১ জন ছুতোর, ১ জন গোয়ালা, ১ জন তেওয়ারী, ২ জন অল্প জাত। বয়সের গড় ৫২ বৎসর ১০ মাস, ৭০ বা তার চেয়ে বেশী ১৩ জনের বয়স ছিল। ২০ বৎসর বা তার চেয়ে কম বয়সের চারটি নাম পাওয়া যায়। এর সঙ্গে দুই দ্বী সতী হওয়ার একটিমাত্র উদাহরণ আছে। দেখা যায়, উচ্চ-নীচ ভেদে সব জাতির মধ্যেই সতীদাহ প্রচলিত ছিল; হয়তো উচ্চবর্ণের মধ্যে প্রচলন কিছু বেশী ছিল। তবে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, ৫২টি সতীর মধ্যে ৪০ বৎসরের কম মাত্র দশটি নাম পাওয়া যায়। ১৮১৮ সালে বাংলা দেশে ৮০০টি সতীদাহ হইয়াছিল (৪)। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা এলাকার ৩০৯ জন বিধবা সহমরণে যায় (৫)। সমসাময়িক সংবাদপত্র হইতে অবগত হওয়া যায় যে বাঙ্গালাদেশে বর্তমান অধিক সহমরণ হয়, পশ্চিম দেশে তাহার চতুর্থাংশও হয় না, এবং বাঙ্গালার মধ্যেও কলিকাতার কোর্ট আঙ্গিলের অধীন জেলাতে অধিক হয়। আরো হিন্দুধানে বর্তমান সহমরণ হয় তাহার সাত অংশের একাংশ কেবল হুগলী জেলাতে হয় (৬)। এবিষয়ে বিলাতের ওয়েস্ট মিনিষ্টার গেজেটে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার ভূতপূর্ব ছোটলাট স্যার চার্লস ইলিয়ট (১৮১০-১৫) লিখিয়াছিলেন—সম্প্রতি যে সকল ঘটনার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহার সকলগুলিতেই স্পষ্ট দেখা যায় যে, আইনের নিষেধ ও সতীদাহের স্বপক্ষে জনমতের পরিপোষকতার অভাব সত্ত্বেও নারীগণ প্রত্যেকেই এই ভাবে আত্মবলিদানে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন।

৩। বাঙ্গালীর ইতিহাস—নীহাররঞ্জন রায়, আদিপর্ব—৪১১ পৃঃ

৪। ইতিহাস—১৩৫৭—ভাগ, ১১ পৃঃ

৫। বাঙ্গালার নারী আন্দোলন—হবি রায়—১২ পৃঃ

৬। সংবাদপত্রে সেকালের কথা—ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১ম খণ্ড—২৮১ পৃঃ

১। Hartley House—Miss Sophia Goldbourne 1789.

২। বৃহৎস্মরণ—দীনেশচন্দ্র সেন ১ম খণ্ড, ভূমিকা—১৮/০

পুরুষগণ সকল কেহই ইহা অনুমোদন করিয়াছেন—বাধ্য করেন না।” (৭)।

কলিকাতায় এক্ষয় বিধান সভার উত্তরে টাউনহলের দিকে মুখ করিয়া দণ্ডায়মান লর্ড বেটিকের প্রতিষ্ঠাটি অপসারণের যে কথা উপরে লিখিত হইয়াছে, উহা পাদপীঠে সভাসভার বিষয় অবলম্বন করিয়া ব্রোঞ্জে ঢালা চব্বতকার একটি চিত্র আছে। এই চিত্রটি বাস্তবিকই অতি সুন্দর। পাদপীঠের আকাব অনুসারে গোলাকারে গঠিত তিন দিক হইতে তিনখানি ছবি লইয়া উহা প্রদর্শিত হইল। মধ্যচিত্রটি প্রাণবান পান্ডী—সহগমনের জগৎ প্রস্তুত জৈনিক তত্ত্বী বিবদা দণ্ডায়মান; বিবদার মস্তকে উর্ধ্ব স্ত-উচ্চ চিতার উপরে শায়িত তাগার মৃতপতির বস্ত্রাচ্ছাদিত দেহ দেখা যাউতেছে। বিবদার সমস্ত তলতে একটা অপরিস্রব আত্মভাঙ্গা ভাব সুন্দররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। বিবদার সামপার্শ্বে গভীর বিদ্যার ও সহামুভূতির ভাবে রাজপুত্রের বেশে একজন বর্দায়মান অস্থাবরী পুরুষ দাঁড়াইয়া—সম্ভবতঃ নিবদ্য পিতা বা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, তিনি যেন মেয়েটিকে সহগমন হইতে নিবৃত্ত করিবার জগৎ মুহূর্ত্তাধায় অনুযোগ করিয়া বলিতেছেন। সম্মুখে একজন আত্মীয় বিবদার হৃদয় পুত্রকে লইয়া—কালের শিঙিটি মায়েব কাছে ঝাঁপাইয়া যাউতে যায়, কিন্তু মাতার সেদিকে লক্ষ্যই নাই। আর একটি শিশু সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া ও মায়েব স্তব্ধ উদ্ভাসিনীবৎ ভাব দেখিয়া সত্যে পিসী বা মাসীর কাছে আশ্রয় লইতেছে—সম্ভবতঃ প্রতি মায়েব আর ব্রহ্ম মমতা বা কোনও আকর্ষণ নাই। চিত্রটির দক্ষিণ ভাগে একজন অস্থাবরী পুরুষ। পুঁথি হাতে ব্রাহ্মণের কাপে হাত রাখিয়া তাতাকে যেন উৎকণ্ঠিত ও কাতর ভাবে কি প্রার্থনা জানাইতেছেন।—শিল্পী ওয়েস্টমেটক বিশেষ দমন দিয়া, এমন কি যে জাতির মধ্যে বিজ্ঞান এই নিষ্ঠুর ব্যাপারটির চিত্র তিনি আঁকিতেছেন তাহার সম্বন্ধে একটা প্রভাবও লইয়া এবং পুরা গ্রীক ও রোমান দৃষ্টির দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া ভাস্কর্য্যটি গঠিত করিয়াছেন (৮)।

বিক্রমপুরের কোন কোন গ্রামে অল্পাধি সহমরণের স্মৃতিজ্ঞাপক মঠ ইত্যাদি বিজ্ঞান আছে। তাহাদের মধ্যে বেঙ্গলী গ্রামের “সত্যাকুরাণীর মঠ” বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং বিখ্যাত। সে প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্বের কথা, বিক্রমপুরস্থ বেঙ্গলী গ্রামে এই সভ্যদাহ অর্পিত হইয়াছিল। যে পরিবারের পুত্রবধূ তাঁহার মৃতপতির সহগামিনী হইয়াছিলেন, তাঁহার বিক্রমপুরের একটি প্রসিদ্ধ বংশ, মুন্সী-পরিবার বলিয়া পরিচিত। ইহার নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের বংশধর, ভবদ্বজগোত্র, ফুলিরা মেল। এই বংশের কালীনাথ মুখোপাধ্যায় রূয়াবহাির বিদেশ হইতে বাড়ি আসিলে সকলে কয় কালীনাথকে ধরাধরি করিয়া তদীয় পত্নীর শয়নগৃহে লইয়া গেলেন।

পত্নী মহামায়া প্রাণপণে পতির সেবা শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইলেন। কয় পতির শারীরিক ও মানসিক শাস্তি ও সুখের জন্ত দিন নাই, রাত্রি নাই, আহার-নিদ্রার প্রতি তেমন লক্ষ্য নাই। সর্বদা

স্বামীর নিকট বসিয়া থাকিয়া সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। শিশুপুত্র ও কন্যার প্রতিও কোন আকর্ষণ নাই। কিন্তু এত সেবা শুশ্রূষা সত্ত্বেও কালীনাথের জীবন রক্ষা হইল না, কালীনাথের মৃত্যু হইল। সকলে শোকময়, কিন্তু কালীনাথ পত্নী মহামায়া দেবী হস্তময়ী। নয়নে অশ্রু নাই, বদনমণ্ডলে বিবাদের কোন চিহ্নও দেখা যায় না। অতি প্রত্নাবে শ্রান করিয়া সেই বিবাহের লোহিত পটবস্ত্র পরিধান করিয়াছেন, ওষ্ঠ দুইখানি রক্তকমলের দ্বারা শোভা পাইতেছে। লজ্জা নাই, সঙ্কট নাই, অনবগুণ্ঠিতা সাদরী আজ মৃত স্বামীর পার্শ্বদেশে বসিয়া নিঃসঙ্কোচে শ্বশুর, ভাসুর সকলের সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিলেন। শব আশানে নীত হইল। সার্বী মহামায়া দেবীও চিতারোহণের জগৎ প্রস্তুত হইলেন। সকলে নিবেদন করিলেন। আত্মীয়-স্বজনরা শিশুপুত্র ও কন্যা ছটিকে দেখাইয়া কত প্রকারে বুঝাইতে লাগিলেন। কিন্তু কোন মতেই মহামায়া দেবী তদীয় সঙ্গ হইতে বিচ্যুত হইলেন না। আত্মীয়-স্বজনরা বিফল, মনোবধ হইয়া থানায় সংবাদ দিলেন। দারোগা আসিলেন এবং মহামায়া দেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“আপনি যেচ্ছায় মৃত স্বামীর সহগামিনী হইতেছেন কি না?” মহামায়া দেবী বলিলেন—“হাঁ! ‘তবে পরীক্ষা হউক।’” মহামায়া দেবী তৎক্ষণাৎ অগ্নিমধ্যে হস্ত প্রদান পূর্বক হাসিমুখে বাক্যলাপ করিতে লাগিলেন, দারোগা বিস্মিতচিত্তে চিতারোহণের অনুমতি দিলেন। চতুর্দিক এই সংবাদ বড়ের মত ছড়াইয়া পড়িল। ভিন্ন ভিন্ন ধ্রাম হইতে শত শত বরনারী সহমরণের দৃষ্ট দর্শন করিবার জগৎ আসিতে লাগিলেন। তান্ত্রমুখী মহামায়া ধীর মন্থর গতিতে উপস্থিত জনসাধারণকে আশীর্বাদ করিয়া চিতা প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। সধবা মন্ডিলারা তাঁহার চরণধূলি গ্রহণ করিল। তৎপরে মহামায়া দেবী চিতারোহণ করিয়া মৃতপতির শবদেহের বামপার্শ্বে শয়ন করিলেন। চিতা জ্বলিল। সমবেত জগৎমণ্ডলী চারিদিকে আনন্দধ্বনি করিতে লাগিল। আর্তিনাদ করা দূরে থাকুক। বিন্দুমাত্রও তাঁহার দেহ কম্পিত হইতে কেহ দেখিল না। দেখিতে দেখিতে দম্পতির পঞ্চভৌতিক দেহচিতা ভায়ে পরিণত হইল (৯)।

গয়াধামে জৈনিক বাঙ্গালীর মৃত্যু হইলে পর তাঁহার পত্নী সহমরণে উত্তীর্ণ হইলে গয়ার জজ মিঃ কুটোফার বিশ্ব গিয়া তাতাকে অনেক নিবেদন করিলেন। তাহাতে সে প্রাক্কলী আপন অঙ্গুলি অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া দেখাইলে জজ সাহেব আত্মা দিলেন। পরে সে স্ত্রী সহগমন করিল (১০)। আর একস্থানে সহমরণের বিষয় তৎকালীন সংবাদপত্রে এইরূপ উল্লিখিত আছে :—

সাহেবরা আসিয়া দেখিলেন যে, ঐ স্ত্রী হিরন্ময়া মাথিয়া আত্মশাখা হস্তে করিয়া ঘরের পিড়ায় বসিয়া আছে। সাহেব গিয়া বিনয়পূর্বক তাতাকে বলিলেন যে, তুমি দগ্ধ হইয়া মরিলে আত্মঘাতিনী হইবা। অতএব দগ্ধ হইয়া মরণে ক্ষান্ত হও। তোমার বাপেরা তোমাকে অনাদর করিবে ইহা চিন্তা করিও না। আমি তোমার স্বতন্ত্র বর করিয়া দিব ও বাবজীবন তোমার ভক্ষ্য পরিচ্ছদ দিব। ইহা শুনিয়া ঐ স্ত্রী হিরন্ময়ে সবিনয়ে কহিল যে, হে কোম্পানী, আমি বাহাতে

৭। বিশ্ববালী—১৩৩৭—৪৭২ পৃঃ

৮। প্রদর্শনী—সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—বঙ্গভূমি—১৩৪০, ভাদ্র—১৩৯ পৃঃ

৯। প্রবাসী—১৩৪৭, ভাদ্র—৩২০-২২ পৃঃ

১০। সংবাদপত্রে সেকালের কথা—১ম খণ্ড—২৮৫ পৃঃ

অন্তে সুখ পাই সেরূপ অমুখতি কর। আমি তিন জন্ম এই স্বামীর সহিত সহগমন করিয়াছি। এরূপ কথোপকথন হইতে সূর্যাস্ত হইলে তখন জজ সাহেব কহিলেন—এখন কি করিবা। তাহাতে সে স্ত্রী কহিলেন যে, অজ্ঞ রাত্রি হইল অজ্ঞ হইবে না, কল্যা সূর্যোদয় হইলে সহগমন করিব। অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইলে তাহার বন্ধুলোকেরা সহমরণোত্তোগ করিতে লাগিল ও এক খট্টা আনিয়া তাহাতে ঐ শব রাখিল এবং ঐ স্ত্রী সে খাটে শব সন্নিহিতে বসিল। পরে আত্মীয়-স্বজনেরা ঐ খট্টা স্বন্ধে করিয়া আশানে লইয়া গেল। সেখানে আর কোন ব্রাহ্মণ ছিল না। কেবল চতুর্দশ বয়স্ক এক ব্রাহ্মণ বালক ছিল, সেই মস্তাদি পাঠ করাইল। পরে ঐ স্ত্রী হরিদ্রাণি করিয়া স্থির ভাবে চিতারোহণ করিল। তখনও দ্বিতীয় সাতের তাহাকে টাকা, ঘর ও পাকী দিতে চাহিলেন। তাহাতে সে স্ত্রী উত্তর কবিল, এই আমি পাকীতে আরোহণ করিলাম। ইহা কহিয়া ঐ মৃত স্বামীকে কোলে করিয়া চিতাতে শয়ন করিল। কেহ ধরিল না, বাঞ্চিল না। চতুর্দিকে অগ্নি প্রজ্বলিত হইল, তাহাতে তাহার অঙ্গ স্পন্দন হইল না অবলীলাক্রমে সহগমন করিল (১১)।*

বংশব জেলার তুসভাণ্ডারের জমিদার-বংশের কয়েকজন কুলবধু সহমরণে গিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। ঐ বংশের জয়দুর্গা দেবীও যথারীতি সংসারবন্ধ প্রতিপালন করিয়া স্বীয় স্বামীর সহিত সহমৃত্যু হন। তৎকালে তুসভাণ্ডার নিবাসী হিসারিয়ারা তুসভাণ্ডারের প্রধান কর্মচারী ছিলেন। তাঁহারা জয়দুর্গা দেবীকে সহমৃত্যু হইতে নিষেধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তিনি তাহা শুনিলেন না। তাঁহারা গোপনে মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে সংবাদ দিলেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেব তুসভাণ্ডারে আসিয়া জয়দুর্গা দেবীকে অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু তিনিও তাঁহাকে সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারিলেন না। জয়দুর্গা দেবী মাজিষ্ট্রেটকে বলিলেন, ‘আমি সতী, স্বামীর পদপুঞ্জই আমার জীবনের ‘ব্রত, স্তব্ধতা তাঁহার মৃত্যুর পথ আমার বাঁচিয়া থাকিয়া লাভ কি? আমি স্বামীর সহিত নিশ্চয়ই সহমৃত্যু হইয়া তাহাতে আমার একটুও কষ্ট হইবে না।’ তাহার প্রমাণস্বরূপ তিনি প্রজ্বলিত অনলে হস্ত প্রবেশ করাইয়া দিলেন। হস্ত দগ্ধ হইতে লাগিল, কিন্তু তিনি কষ্টভুভব করিলেন না। মাজিষ্ট্রেট সাহেব এই অলৌকিক দৃশ্য দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং তাঁহাকে সহমৃত্যু হইতে আদেশ দিয়া চলিয়া গেলেন। জয়দুর্গা দেবী হাসিতে হাসিতে চিতায় আরোহণ করিলেন (১২)।

১৮১২ খৃষ্টাব্দে নলডাঙ্গার রাজা রামশঙ্কর দেব-রায় দেহভ্যাগ করিলে তাঁহার সাক্ষী পত্নী রাধামণি দেবী পতির অম্লগামিনী হইয়া ‘সতী’ হইয়াছিলেন। যে সময়ে রাজা রামশঙ্করের প্রাণপকী শেখপিল্লর ছাড়িয়া গিয়াছিল, সেই সময় রাণী রাধামণি শোকসূচক কোনপ্রকার ধ্বনি করেন নাই। তিনি চিত্রাপিতমূর্তির দ্বারা নিষ্পন্দ ভাবে বসিয়াছিলেন এবং কেবলমাত্র বলিয়াছিলেন আমার স্বামী ইহলোক হইতে চলিয়া গিয়াছেন,—আমি তাঁহারই সঙ্গে পরলোক বাইব।—অনেকে রাণীকে বুঝাইলেন। ‘সতী’ হইয়া পতির চিতায় দেহ বিসর্জনের সঙ্কল্প হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য অনেকে

রাণীকে কত কথাই কহিলেন কিন্তু রাণীর সঙ্কল্প অটল। অনেকে রাণীকে অগ্নিশিখায় দগ্ধ হইয়া মরিবার বিভীষিকাও দেখাইলেন, তখন রাণী একটি প্রদীপ আনিয়া তাহার শিখায় তাঁহার তর্জনি ধরিলেন, অগ্নিশিখায় অঙ্গুলি চটপট শব্দে পুড়িতে লাগিল। কিন্তু রাণীর মুখে কোন প্রকার বিকৃতির লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। বরং আনন্দের চিহ্নই প্রকটিত হইতে লাগিল। অঙ্গুলিটি ভস্মীভূত হইয়া গেল; তথাপি সতীর কোন দিকে জ্ঞপ্তি নাই। সকলে রাণীকে লইয়া কালিকাতলার দহের নিকটবর্তী আশানে গেলেন, রাণী রাধামণি তাঁহার যাবতীয় সূন্দর সূন্দর অলঙ্কার, সূন্দর বস্ত্র পরিধান করিলেন, মস্তকে সিন্ধুর লেপন করিলেন, তথায় সমস্ত লোকদিগকে টাকা, পয়সা, ও চাউল মুক্ত হস্তে বিতরণ করিলেন এবং শেষে দৃঢ় পদক্ষেপে প্রফুল্ল বদনে সাত বার চিতা প্রদক্ষিণ করিলেন।—রাণী একবার রাজার মুখের দিকে চাহিলেন, আর হস্ত মুখে রাজার খাম্বাই সেই চিতাশিখায় শয়ন করিলেন। শয়ন মাত্রই তাহার সংজ্ঞা লোপ হইল। সকলে আসিয়া দেখিল, দেহে প্রাণ নাই; রাজার প্রাণের সহিত রাণীর মহাপ্রাণ অনন্তে উড়িয়া গিয়াছেন (১৩)।

বিখ্যাত বঙ্গের নানা স্থানে এইরূপ সহমরণের অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়; অতি আধুনিক কালেও সংবাদপত্রে আকস্মিক ভাবে সহমরণের সন্বাদ দেখিতে পাওয়া যায় (১৪)। এইরূপে স্বেচ্ছায় আত্মদান করিবার মধ্যে যে শক্তি, দৃঢ়তা ও স্বকীয়তাবোধ পরিচয় পাওয়া যায় তাহাব মাদুর্য্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যখন পুত্র কন্যা ভ্রাতা সকলেই চারিদিক বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, যখন সংসারে গৃহীণীর যাহা কাম্য সে সকলই রহিয়াছে, নাই কেবল তাঁহার পরম প্রিয়তম স্বামী; তখন তাহারই সন্মুখে প্রেম স্বরূপে ধারণ করিয়া, তাঁহারই চরণ ধ্যান করিতে আনন্দে অগ্নি প্রবেশ করিতে যে বিক্রম প্রয়োজন তাহা ভারতবর্ষ ব্যতীত আর কোন দেশেই দেখা যায় না। বঙ্গনারী সেই অল্পপম মৌন বিক্রমে গর্ভিতা বঙ্গালী মাত্রই তাঁহার স্তম্ভে লালিত, তাঁহারই স্নেহছায়ায় বদ্ধিত, তাঁহারই আত্মত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত—তাঁহারই পদরেণু স্পর্শে বলদর্শিত। নোয়াখালীর বীভৎস অত্যাচার ও হত্যাকাণ্ডের সময় বঙ্গরমণীর অগ্নিপ্রবেশ পূর্বক সতীত্ব বন্ধার কাহিনী তদানীন্তন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল (১৫)। রাজপুত মহিলার ‘জহর ব্রত’ সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ; কিন্তু নোয়াখালীর বীর বঙ্গবালার আত্মত্যাগ সাহিত্যে স্থান পায় নাই।

বঙ্গালার প্রথম ছোটলাট শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ হালিডে একদিন স্বচক্ষে বঙ্গরমণীর এই মৌন বিক্রম দেখিয়া লিখিয়াছিলেন—১৮২১ খৃষ্টাব্দে রাজবিধি সতীদাহ বন্ধ করিয়াছে। সেই সময় আমি হুগলীর মাজিষ্ট্রেট ছিলাম। একদিন সংবাদ পাইলাম আনাব কুঠি হইতে কয়েক মাইল দূরে সতীদাহ হইবে। গঙ্গাভীরে সর্দাদারী একপ ঘটনা ঘটিল।—আমার সহচরদ্বয় রমণীকে নানারূপ বুঝাইয়া নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। তাঁহারা বঙ্গালা জানিতেন না বলিয়া আমি

১১। সংবাদপত্রে সেকালের কথা—১ম খণ্ড—২৮৩ পৃ:

১২। বংশপরিচয়—জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার—২য় খণ্ড—৩৫১-৫২ পৃ:

১৩। বংশপরিচয়—জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার—১ম খণ্ড—২২১-৩০ পৃ:

১৪। আনন্দবাজার পত্রিকা—১৩ই ভাদ্র, ১৩২১।

১৫। “women jump into fire! Take poison and hang to save honour”—Hindusthan Standard—23rd october, 1946.

তাহাকে সকল কথা বুঝাইয়া বলিলাম। তিনি গম্ভীরভাবে একমনে সমস্ত কথা শুনিলেন, কিন্তু কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। আমি বহন দেখিলাম কিছুতেই তাহাকে নিবৃত্ত করা যায় না, তখন তাহাকে চিতার পার্শ্বে বাইতে অল্পমতি দিলাম।

পুরোহিত আমাকে বলিলেন—একবার জিজ্ঞাসা করুন অগ্নিতে চিতার যে যন্ত্রণা হইবে তাহা কি তিনি ভাবিতেছেন?

রমণী আমার নিকটেই বসিয়াছিলেন। প্রত্যুত্তরে তাহার তীক্ষ্ণবুদ্ধিগন্ধক মুখখানি তুলিয়া বুঝাতার কহিলেন—একটা প্রদীপ আনুন। প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করিয়া চিতার সম্মুখে রাখা হইল। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাইয়া তিনি চিতার দক্ষিণহস্ত ভূমিতে সংস্থাপনপূর্বক অগ্নিমধ্যে অঙ্গুলি প্রবেশ করাইলেন। অঙ্গুলিটি ঝলসাইয়া গেল—উহাতে ফোসকা উঠিল, উহা শেষে কালো হইয়া গেল। একটি হঃসপক্ষে আগুন ধরিলে উহা যেরূপ বক্র হইয়া যায়, অঙ্গুলিটিও সেইরূপ বক্র হইয়া গেল।

একরূপে কিছুক্ষণ কাটিল। রমণী একটি বারও হাত সবাইলেন না—একটুও কাতর শব্দ করিলেন না, তাহার মুখে বিন্দুমাত্রও পরিবর্তন লক্ষিত হইল না। তিনি কহিলেন, এখন আপনার সম্মুখে দূর হইয়াছে কি? আমি ব্যগ্ধভাবে কহিলাম হাঁ, হইয়াছে। তখন ধীরে ধীরে অগ্নি হইতে অঙ্গুলি অপসৃত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এখন কি আমি বাইতে পারি? আমি অল্পমতি দিলাম। তিনি অবসপিত নন্দীতীর বাহিয়া ধীরে ধীরে চিতার নিকটে গিয়া চিতার আরোহণ করিলেন।

আমি অনেকক্ষণ পর্যন্ত সেই চিতার নিকটেই ছিলাম, শেষে অগ্নির উত্তাপে সরিয়া আসিলাম—তখনো তাহার কণ্ঠ হইতে শব্দমায় শুনিতে পাই নাই, চিতার মধ্যে কিছু যে নড়িতেছে এমন পর্যাপ্ত দেখি নাই! কেবল দেখিলাম তাহার দেহের উপরিস্থিত কাষ্ঠগুলি একবার অতি ধীরে একটু নড়িয়া উঠিল তার পর সব স্থির। (১৬)

১৬। "I stood near enough to touch the

ইহাই বজ্রমণীর অসাধারণ মৌন-বিজয়ের শ্রেষ্ঠ ও পবিত্র ইতিহাস। ইহারই কথা শ্রবণ করিয়া বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—“বাংলার সেই প্রাণ-বিসর্জন-পরায়ণা পিতামহীকে আমরা আজ প্রণাম করি। তিনি যে জাতিকে স্তন দিয়াছেন, স্বর্গে গিয়া তাহাকে বিশ্বত হইবেন না। হে আর্ঘ্য, তুমি তোমার সম্ভানদিগকে সংসারের চরম ভয় হইতে উত্তীর্ণ করিয়া দাও। তুমি কখনও স্বপ্নেও জ্ঞান নাই যে তোমার আত্মবিশ্মৃত বীরের দ্বারা তুমি পৃথিবীর বীর পুরুষদিগকেও লজ্জিত করিতেছ। তুমি যেমন দিব্যবাসনে সংসারের সকল কাজ শেষ করিয়া নিঃশব্দে পতির পালকে আরোহণ করিতে, দাম্পত্যজীবনের অবসান দিনে সংসারের কার্যক্ষেত্র হইতে বিদায় লইয়া তুমি তেমনি সহজে বধুবশে সীমন্তে মঙ্গল সিংহ পরিয়া পতির চিতার আরোহণ করিয়াছ। মুহূর্ত্তে তুমি স্থম্বর করিয়াছ, শুভ করিয়াছ, পবিত্র করিয়াছ—চিতাকে তুমি শস্যের ভ্রায় আনন্দময় কল্যাণময় করিয়াছ। বাংলাদেশে পাবক তোমারই জীবনাচতির দ্বারা পুত হইয়াছে—আজ হইতে এই কথা আমরা শ্রবণ করিব। আমাদের ইতিহাস নীরব; কিন্তু অগ্নি আমাদের ঘরে ঘরে তোমার বাণী বহন করিতেছে। তোমার অক্ষর অমর শ্রবণ নিলয় বলিয়া সেই অগ্নিকে তোমার সেই অস্তিম বিবাহের জ্যোতিঃশুক্লের অনন্ত পট-বসনখানিকে আমরা প্রত্যহ প্রণাম করিব। সেই অগ্নিশিখা তোমার উজ্জত বাহুরূপে আমাদের প্রত্যেককে আশীর্বাদ করুক। মুহূর্ত্ত যে কত সহজ, কত উজ্জল, কত উন্নত, হে চির নীরব স্বর্গবাসিনী, অগ্নি আমাদের গৃহ-প্রাণকে তোমার নিকট হইতে সেই বার্তা বহন করিয়া অভয় ঘোষণা করুক!”

pile, but I heard no sound and saw no motion, except one gentle upheaving of the brushwood over the body, after which all was still;—Bengal under the Hr. Governors—Buckland—vol -1—p 160—62.

কোন একজনকে

ঐজগৎকুমার বিশ্বাস

তুমি বলো—কি স্তম্বর সেজেছে আকাশ
একবার চেষ্টা দেখ ভাই!
আরো বলো কি যে গন্ধ মেখেছে বাতাস!
আমি শুনে চোখ দুটো বেদনাব আগুনে জ্বলাই।
তেতলার ছাদে শুয়ে অলস সন্ধ্যা
উজ্জল আকাশে তুমি মেলে দাও মনের ঠিকানা।
কত সাদা মেঘ উড়ে যায়,
তাবি সাথে মেঘ হয়ে পাড়ি দাও কত পথ বন্ধুর অজানা।

আমি শুধু চেষ্টা দেখি, ভাবি
বহুদূর চলে গিয়ে আবার কেমন কবে ফিরে আসো
পৃথিবীর এই বৃকে।—তুমি সিদ্ধ নও বিশ্বাস্যবী,
তবুও চেউ-এর তানে সেতার বাজিয়ে তুমি হাসো ;

কত দূরে চলে যাও—আমি শুধু এ কুলে দাঁড়িয়ে
পাই কিছু অল্পভব, কল্পনায় ভরে নিই তারে।
তোমারি বৃকের নীল, আমি যাতে বহুবীর গিয়েছি তারিয়ে,
রূপকথা লেখে কত আকাশের আলোর সম্ভারে।

আমিও অবাধ হই নদনদী নগরীর রূপে,
তোমার মনের মাঝে তারা তোলে চেউ ;
আমার মনের মাঝে সাড়া তার জাগে চূপে চূপে,
তোমার তরঙ্গে স্থির থাকে নাক' কেউ।
তাদের আনন্দ কি তোমার মনের মাঝে জন্ম নিয়েছিল
যেমন নদীর জন্ম নির্ঝরেব অশান্ত নর্তনে?
শিল্প আর জীবনেরা তোমার মনের মাঝে বাসা বেঁধেছিল
প্রেরণার আবৃত বা—একটি তীব্র সুরের স্পন্দনে?

কী হয়েছে নিমাইয়ের ?

কী জানি কী হল ?

কখনো হাসছে কখনো কাঁদছে কখনো ধুলোয় গড়াগড়ি যাচ্ছে। কখনো মালসাট মেরে হুয়ার-গর্জন করছে। কখনো বা সর্ব-অঙ্গ স্তম্ভাকার হয়ে যাচ্ছে। শটী ভয় পেয়ে লোক ডাকাডাকি শুরু করে দিয়েছেন। ওগো দেখে যাও, আমার নিমাইয়ের এ কী হল ? এই দেখ, যাকে কাছে পাচ্ছে মারছে, নিজের ঘরদোর তছনছ করছে। এ কী, মাটিতে যে পড়ল মূর্তি হয়ে। শিগগির যাও, বড়ি ডাকো।

ছুটে এল লোকজন। সবাই বললে, বায়ুরোগ হয়েছে। মাথায় বিষ্ণুতেল দাও।

আমি সব ব্যবস্থা করছি। বললে বুদ্ধিমন্ত খান। নবদ্বীপের টাকাওয়ালা লোক, নিমাইয়ের প্রতি পক্ষপাতী। ধরে আনল কবরেজ। কবরেজ তেল চাপাল।

তেলে ঠাণ্ডা হলনা নিমাই। আচম্বিতে অলৌকিক শব্দ করে উঠছে: ‘আমিই সেই, আমাকে কেউ চিনতে পারলনা।’ বলে ছুটল রাস্তা দিয়ে। ‘বিশ্ব ধরে আছি বলেই তো আমি বিশ্বস্তর।’

ধরো, ধরো, নিশ্চয়ই ওর ওপরে দানবের অধিষ্ঠান হয়েছে। কেউ বা বললে, ভর করেছে ডাকিনী। নারায়ণতেল লাগবে। আর এ তেল শুধু মাথায় নয়, মাথাতে হবে সর্বাস্থে।

তৈলাক্ত বলবরে খলখল করে হাসছে নিমাই।

হাহাকার করছেন শটী, আর সকলেও ত্রিয়মাণ, মহাবল বায়ু কী ভীষণ কাণ্ড করে ফেলল, আমাদের সে সোনার নিমাই আর নেই—চারদিকে এমনি যখন বিধান আর নৈরাশ্য—হঠাৎ স্বভাবের আলো ঝলমল করে উঠল। এ কী, কই সেই মেঘবিকার, এ যে দেখি নীলের নির্মল থালায় রূপালি মৌদের ক্ষীর। নিমাই আবার আগের মতন হয়েছে। বায়ু নেই, আগুন নেই, নেই আর আফালন। ফিরে এসেছে স্বরূপানন্দে। হাসছে মুহূ-মুহূ।

সবাই হরিধ্বনি করে উঠল।

কেউ এল উপদেশ দিতে। বললে, ‘তুমি এত বুদ্ধি ধরো, তবু তুমি কৃষ্ণভঞ্জন করো না কেন?’

‘যার কৃষ্ণকথারূচি সেই ভাগ্যবান।’ প্রহ্লাদ মিত্রকে বললেন মহাপ্রভু।

নীলাচলবাসী ব্রাহ্মণ, প্রহ্লাদ প্রভুর কাছে এসে

প্রহ্লাদ প্রভু
শ্রীমদ্রামানন্দ
অচিন্ত্যকৃষ্ণ প্রহ্লাদ

বললে, ‘প্রভু, আমি দীনাধম গৃহস্থ। আমার কৃষ্ণকথা শোনবার খুব ইচ্ছে। তুমি দয়া করে শোনাবে আমাকে কৃষ্ণকথা?’

প্রভু হাসলেন। বললেন, ‘আমি কৃষ্ণকথার কী জানি? জানে শুধু রামানন্দ। তার কাছ থেকেই শুনি আমি কৃষ্ণকথা। তুমিও তার কাছেই যাও। সেই তোমাকে শোনাবে।’

প্রহ্লাদ মহাপ্রভুর দিকে তাকিয়ে রইল নির্নিমেষে। কী অনবচ্ছিন্ন দৈন্ত, পাণ্ডিত্যের এক তন্তু অভিমান নেই, না বা কৌলঙ্ঘ্যের। আর ভক্তের গুণগরিমা প্রকাশ করতে কী উচ্ছৃঙ্খিত আগ্রহ।

‘মিশ্র, তোমার যে কৃষ্ণকথা শুনে মন হয়েছে, তোমার এ মহাভাগ্য।’ বললেন আবার মহাপ্রভু।

যদি হরিকথাতে রাত না হয় তা হলে ধর্মকর্ম পরিশ্রমের সামিল। যার ভগবানের প্রতি টান আছে তার আর টানাপোড়েন নেই, নেই কোনো টানাটানি। তোমার যখন কৃষ্ণকথায় লালসা তখন তোমার ধর্মাত্মানও অর্থাধিত।

প্রহ্লাদ গেল রামানন্দের বাড়ি। রামানন্দ বাড়ি নেই। চাকর বললে, আপনি বসুন। শিগগিরই ফিরবেন।

‘কোথায় তিনি?’

‘তার বাগানে আছেন।’

‘বাগানে? সেখানে কী?’

‘অভিনয় লেখাচ্ছেন।’

‘কাকে?’

‘হুটি পরমাসুন্দরী কিশোরী দেবদাসীকে।’

‘আর কেউ আছে সেখানে উপস্থিত?’

‘না, আর কেউ নেই।’

ভৃত্য আরো বিশদ হল। রামানন্দ রায় নাটক লিখেছেন, নাম ঐজগন্নাথবল্লভ। আকাক্ষ, স্বয়ং জগন্নাথের সামনে সেই নাটকের অভিনয় হবে। তারই জন্তে এত চেষ্টা-যত্ন-আয়াস-ক্লেশ চলেছে।

জগন্নাথবল্লভ নাটকে পাত্র-পাত্রী তো অনেক। নায়ক কৃষ্ণ ও তার সখা মধুমঙ্গল এই দুই পাত্র আর পাণ্ডী সাত জন। নায়িকা রাধিকা, তার সখী মাধবিকা, মদনিকা, শশীমুখী, অশোকমঞ্জরী আর মদনমঞ্জরী আর বনদেবী বৃন্দা। এত জনের মধ্যে শুধু দুটিকে বেছে অভিনয় শেখাচ্ছেন কেন? তাও নির্জন বাগানে?

শুধু অভিনয় শেখাচ্ছেন? নিজের হাতে তাদের গায়ে তেল-হলুদ মাখাচ্ছেন, তারপর স্নান করিয়ে গা মেজে দিচ্ছেন। স্নানান্তে সর্বাঙ্গ মগুন বসন পরাচ্ছেন। কোন্ অঙ্গে কোন্ অলঙ্কার শোভা পাবে তাই দিয়ে সাজাচ্ছেন বেছে-বেছে। সাজাচ্ছেন মালামুলেপনে।

বলো কি?

উপায় কী তাছাড়া। অভিনয় নিখুঁত করা চাই। যে ছজনকে শেখাচ্ছেন তাদের একজন হয়তো কৃষ্ণ আরেকজন রাধিকা। কৃষ্ণ-রাধিকার নিগূঢ়-দুর্গম ভাব রামানন্দ ছাড়া আর কে শেখাবে? অভিনেত্রীদের অঙ্গসৌষ্ঠব কমনীয় না হলে অভিনয় মধুর হবে কি করে? আর এই মাধুর্য সম্পাদনের জন্তে যত লৌকিক উপায় ও উপাদান আছে সব কিছুই সফল করেছে রামানন্দ। ব্রজলীলায় যারা অভিনয় করবে তাদের দেহ স্নিগ্ধলাবণ্যে কাঁস্তুজ্জল হতে হবে তাই রামানন্দের নিজ হাতে স্ফালন-মার্জন, নিজ হাতে মর্দন-মগুন। আমি নিজ হাতে ধুয়ে মুছে সাজিয়ে-গুছিয়ে না দিলে আমার তৃপ্তি নেই। আমার পূজা রাগামুগা। আমি রাধারাগীর দাসী। দেবদাসীজয়ের সেবার সময়েও আমার সেই আরোপ, সেই ভাব।

অত কথা কে বোঝে! শুম হয়ে বসে রইল প্রহ্মায়।

মহড়া শেষ হবার পর দেবদাসীদের প্রসাদ খাইয়ে তাদের নিজ-নিজ ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে রামানন্দ ঘরে ফিরল।

ভৃত্য খবর দিল প্রহ্মায় মিশ্র বসে আছে।

সনমস্কার রামানন্দ মিশ্রের কাছে এসে দাঁড়ালো। বললে, ‘আপনাকে অনেককণ বসিয়ে রেখেছি, ক্ষমা করবেন। আপনার পায়ে ধুলোয় আমার ঘর পবিত্র হল। বলুন, কী করতে পারি আপনার জন্তে।’

বেলা অনেক হয়ে গিয়েছে, মিশ্র উঠে পড়ল। বললে, ‘আমার অজ্ঞ কোনো প্রয়োজন নেই। শুধু আপনাকে দর্শন করতে এসেছিলাম। দর্শন পেলাম, তাতেই আমি কৃতকৃতার্থ।’

ফিরে গেল প্রহ্মায়।

পরদিন সকালে মহাপ্রভুর কাছে যেতেই মহাপ্রভু জিগপেস করলেন, ‘কি, রামানন্দের কাছে গুনলে কৃষ্ণকথা?’

প্রহ্মায় রামানন্দের কীর্তিকথা ব্যক্ত করল বিরক্ত হয়ে।

এ দুর্গম মহিমা। উজ্জানের বিরলে বসে পূর্ণ-যৌবনা দেবদাসীদের অভিনয় শিক্ষা দিচ্ছেন। ভাব-বিজ্ঞানের আধার নৃত্যাঙ্গীতের উচ্ছ্বাস যে সব রমণী, তাদের। শুধু দেখছেননা, স্পর্শ করছে। অঙ্গভঙ্গি শেখাতে যেটুকু দরকার শুধু ততটুকু নয়, তার চেয়ে অনেক বেশি অন্তরঙ্গ। নিজহাতে তেল মাখাচ্ছে, স্নান করাচ্ছে, গাত্রমার্জনা করে দিচ্ছে, রচনা করছে বেশভূষা। কী পরিমাণ চিত্তচাক্ষু্য হবার কথা সহজেই অনুমেয়। তার কাছে কৃষ্ণকথা শুনব কি। বরং কলকথা শুনি?

মহাপ্রভু বললেন, ‘তুমি রামানন্দের কাছেই যাও। সেই সত্যিকার কৃষ্ণকথার অধিকারী।’

এ যে আশ্চর্য কথা, প্রহ্মায় বিমূঢ় চোখে তাকিয়ে রইল।

‘হ্যাঁ, রামানন্দের কথা আশ্চর্য কথা।’ বললেন মহাপ্রভু, ‘সুন্দরী যুবতী মেয়ে যদি একটুকরো কাঁঠ বা পাথরকে স্পর্শ করে তা হলে কাঁঠ বা পাথরের কী হয়? কিছু হয়না। কোনো বিকারই তাতে হয়না। রামানন্দও তেমনি কাঁঠ-প্রস্তুতের মতই নির্বিকার।’

‘আপনি বলছেন?’

‘হ্যাঁ, আমিই বলছি। গুহ্য অঙ্গের দর্শনে স্পর্শনেও তার ভাবান্তর নেই। তার যে দাসীভাবে আরাধনা। তার ইঞ্জিরের প্রাকৃতত্ব নেই। তুমি ফিরে যাও তার কাছে। বোলো আমি পাঠিয়েছি। প্রাণ ভরে কৃষ্ণকথা শুনে এস।’

প্রহ্মায় ছুটতে ছুটতে চলে এস রামানন্দের কাছে। সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে বললে, ‘প্রভু আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন আপনার কাছে।’

‘কেন বলুন তো?’ প্রভুর নাম শুনে প্রেমাবিষ্ট হল রামানন্দ।

‘কৃষ্ণকথা শোনবার জন্তে।’

প্রভুর কৃপায় কৃষ্ণকথা অন্তরে সুরিত হোক।
প্রাণের উল্লাসে রামানন্দ বলতে লাগল। আর
প্রহ্মায় ? প্রহ্মায় নাচতে লাগল কৃষ্ণপ্রাণে।

দিন শেষ হয়ে যাচ্ছে তবে না বসন্ত, না শ্রোতা
করুই আশ্রয়িতা নেই।

নিমাই চলল তার শিষ্যদের সঙ্গে লীলা করতে।

বললে, ‘চলো বাজারে যাই। কত দিন কিছু
আসেনি সংসারে।’

‘চলুন।’ বললে পড়ুয়ারা। ‘কিন্তু কেনবার
কড়ি কোথায় ? নিয়েছেন সঙ্গে করে ?’

‘কোথায় পাব ? দেখি মিষ্টি কথায় পাই কিনা।’

নিমাই হাসল : ‘দেখি মধুরের বাজারদর কত ?’

বাজারে ঢুকতেই প্রথমে ডাকল তন্তুবায়।

‘ও ঠাকুর, আমার দোকানে আসুন, দেখুন না
কেমন সুন্দর আর মজবুত ধুতি—’

‘কই দেখি।’

একখানা ধুতি বাছল নিমাই।

‘খুব ভালো, কেমন মিহি অথচ টেকসই।’

ক্রেতার পছন্দকে তারিফ করল দোকানি।

‘দাম কত ? আর দাম জিগগেস করেই বা লাভ
কী।’ ‘দেব কোথেকে ? একটা কাণাকড়িও হাতে নেই।’

দোকানি কাঁপরে পড়ল। বললে, ‘তা দামের
জন্তে ভাবনা কি। দাম না হয় কদিন পরে দেবেন।’

‘না বাবা, ঋণ করতে পারব না।’ নিমাই ফিরে
চলল। ‘কোনোদিন ঋণ করিনি। যদি নির্দিষ্ট
দিনের মধ্যে শোধ করতে না পারি।’

‘না পারেন তো মেয়াদ বাড়িয়ে নেবেন।’
দোকানি দোনামনা করতে লাগল।

‘না বাবা, সেই মেয়াদও বজায় থাকে কিনা তার
ঠিক কি।’ নিমাই পা বাড়াল রাস্তায়। ‘একে ঋণ
তায় আবার কথার খেলাপ—অত পোবাবেনা। অদৃষ্টে
যখন নেই তখন আর কী করব।’

রাস্তায় নেমে পড়েছে নিমাই, পিছন থেকে ডাকল
দোকানি। ‘ও ঠাকুর, ধুতিখানা তুমি অমনি নিয়ে
যাও। তোমার ইচ্ছে হয়েছে তাই আমি কৃপা
হয়েছে বলে মনে করছি। তুমি যদি নাও মনে হচ্ছে
তাইতেই আমার মজল।’

নিমাই নিল হাত বাড়িয়ে।

‘ও ঠাকুর, পান খেয়ে যাও।’ ডাকুলি ডাকল।

হনহন করে চলে যাচ্ছে নিমাই, বললে, ‘পান
খাবার কড়ি নেই।’

‘আহা, নাই বা থাকল, এক খিলি পান
তোমাকে খাওয়াতে পারি না ?’ পানওয়ালা বললে
ব্যগ্র হয়ে।

নিমাই থামল। বললে, ‘তুমি খাওয়াতে চাইলে
আমিই বা বিনা কড়িতে খাব কেন ?’

‘না খাও তো, তুমি হাতে নিয়ে ফেলে দাও
রাস্তায়—’

‘তা তোমার জিনিস আমি অমনি-অমনি নেবই বা
কেন, ফেলবই বা কেন ?’ নিমাই মুখ ফেরাল ; ‘যখন
স্বচ্ছল হব তখন কিনে খাব।’

‘না, তুমি যদি আমার হাতের পান না খাও আমি
প্রাণ দেব। তোমাকে বিনা দামে পান খাওয়াব এই
আমার প্রাণের অভিলাষ।’ পানওয়ালা নিমাইয়ের
হাত ধরল।

নিমাই হাসতে হাসতে বললে, ‘তোমার প্রাণ
খাওয়ার চাইতে আমার পান খাওয়ায় বজ্রাট কম।
দাও তাহলে এক খিলি।’

পর্ণে-চূর্ণে-খদিরে-কপূরে পান সাজতে লাগল
তাতুলি।

বাজার থেকে নিমাই চলল এবার গোয়ালার ঘরে।
বললে, ‘দই-স্কার কী আছে আনো দেখি।’

গোয়ালারা আনতে লাগল ভাঁড়ে ভাঁড়ে। বা
পারো খাও নয়তো পাঠিয়ে দিই বাড়িতে। দাম ?
দাম কিসের ? তুমি খাবে এই তার দাম।

‘ভালো দেখে গন্ধ আনো।’ গন্ধবণিকের ঘরে
গিয়ে হাঁক দিল।

নিয়ে এল দিবা গন্ধ। দাম কত নেবে ? আমার
গন্ধ যদি তোমার গায়ে লাগে, তোমার গায়ে থাকে
তাই আমার দাম।

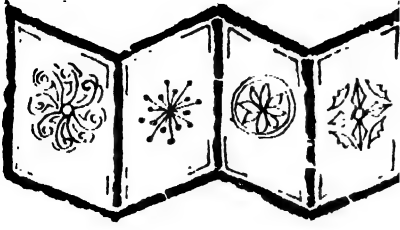
মালাকরের ঘরে গিয়ে নিমাই বললে, ‘মালা
দাও। দাম দিতে পারব না কিন্তু।’

তোমার গলায় যদি আমার মালা দোলে, সেই
আমার দাম।

তারপর শঙ্খবণিকের ঘরে গিয়ে শঙ্খ চাইল নিমাই।
শঙ্খবণিক নিমাইয়ের দক্ষিণ হাতে তুলে দিল শঙ্খ।

দাম ?

তুমি যদি এই শঙ্খে একটি শ্বনি তোলো, বললে
শাঁখারি, তবে সেই আমার জয়ধ্বনি। [ক্রমশঃ।



পত্র

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর পত্র-বিনিময়

নেতাজীর পত্র—৮

জিয়ালগোড়া পোঃ
জেলা মানভূম, বিহার,
১৫ই এপ্রিল, ১৯৩১
প্রিয় মহাত্মাজী,

এক তারবার্তায় আজ আমি আপনাকে জানাইয়াছি যে, এ, আই, সি, সির অধিবেশনের সময়ে কলিকাতায় আপনার উপস্থিতি অত্যাবশ্যক। ইহা এতই আবশ্যক যে, আপনার সুবিধার জন্ত, প্রয়োজন হইলে এ, আই, সি, সির অধিবেশন স্থগিত রাখা উচিত। অল্পগ্রহ করিয়া জানান কোন তারিখে আপনার পক্ষে কলিকাতায় আসা সম্ভব হইবে। বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাবলম্বী কয়েকজন বন্ধু আমাকে জানাইয়াছেন যে, এ, আই, সি, সির অধিবেশনের পূর্বেই ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করা উচিত। এ-বিষয়ে তাঁহাদের অভিমত এতই দৃঢ় যে, তাঁহারা মনে করেন যে, ওয়ার্কিং কমিটি পূর্বাঙ্কে গঠিত না হইলে, এ, আই, সি, সির অধিবেশন ডাকিয়া কোনও লাভ হইবে না। তাঁহারা আরও মনে করেন, আমাদের উভয়ের পরামর্শের মাধ্যমে কোনও মীমাংসা না হইলে, ব্যক্তিগত (উভয়ের) আসোচনার মাধ্যমে শেষ চেষ্টা করিয়া দেখা উচিত। তাঁহাদের মতে, আমাদের উভয়ের মধ্যে সাক্ষাৎকারের সুবিধার জন্ত প্রয়োজন হইলে এ, আই, সি, সির অধিবেশন স্থগিত রাখা উচিত।

ব্যক্তিগত ভাবে আমি অধিবেশন স্থগিত রাখিতে সাহস করি না, (কারণ আমার বিরুদ্ধে দোষস্থত্রতার অভিযোগ আসিতে পারে), যদি না আপনি পূর্বেই প্রস্তাব সমর্থন করেন। কিন্তু আমারও দৃঢ় অভিমত এই যে, পত্রবিনিময়ে যদি সফল না ফলে, তাহা হইলে আমাদের উভয়ের মধ্যে সাক্ষাৎকার প্রয়োজন এবং তাহা এ, আই, সি, সির অধিবেশনের পূর্বেই হওয়া উচিত। ব্যক্তিগত আলোচনাতেও যদি কোনও মীমাংসা না হয়, তাহা হইলে এইটুকু অন্ততঃ আন্তঃপ্রদাদ লাভ হইবে যে, যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইয়াছে।

বর্তমান পরিস্থিতি সঙ্ক্ষেপে বলিতেছি। একদলীয় কমিটি গঠন সম্পর্কে আপনার উপদেশ আমি গ্রহণ করিতে পারিলাম না; সেজন্য আমি দুঃখিত। (কি জন্ত তাহা পারিলাম না তাহা পূর্ববর্তী পত্রগুলিতে জানাইয়াছি। এখনে তাহার আর পুনরাবৃত্তি করিব না।) অতএব, পত্র-প্রস্তাব পাশ হওয়ার ফলে আপনার উপর যে দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছে, তাহা আপনাকে গ্রহণ করিতে হইবে। সোজা কথা, ওয়ার্কিং কমিটির সভ্যগণের নামের তালিকা আপনাকে ঘোষণা করিতে হইবে। আপনি যদি তাহা করেন,

তাহা হইলে অচলাবস্থার অবসান হইবে, ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন বসিবে এবং তাহার পর বসিবে এ, আই, সি, সির অধিবেশন। এই আশা করা যাইতে পারে যে, তাহার পর সব ঠিক হইয়া যাইবে, আর কোনওরূপ সঙ্কট দেখা দিবে না।

যদি কোনও কারণে ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করিতে আপনি অস্বীকার করেন, তাহা হইলে আমাদের গোলকর্ষাধায় বুরিতে হইবে। তখন বিষয়টি (ওয়ার্কিং কমিটি গঠন) এ, আই, সি, সির সম্মুখে অনিশ্চিত অবস্থায় উপস্থাপিত হইবে। আমার মনে হয়, সকলেই ইহা স্বীকার করিবেন যে, এ, আই, সি, সির অধিবেশনের পূর্বেই ওয়ার্কিং কমিটি গঠন সমস্তার সমাধান হওয়া উচিত। কাবণ, তাহা হইলে ত্রিপুত্রীয়ায় এ, আই, সি, সির অধিবেশন একটা যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হইবে না।

জানি না, এখন আপনি কিরূপ চিন্তা করিতেছেন কিন্তু আমি এই আশা করি যে, আপনি ওয়ার্কিং কমিটির সভ্যগণের নাম ঘোষণা করিবেন এবং অচলাবস্থার অবসান ঘটাইবেন। আপনার অভিমত যদি অল্পরূপে হয় তাহা হইলে আমার অনুমোদন এই যে, আপনি চিন্তা করিয়া দেখুন, ওয়ার্কিং কমিটি গঠন পূর্বাঙ্কে না করিয়া কলিকাতায় এ, আই, সি, সির অধিবেশন বসিলে কি দুর্নিপাকে তাহা পর্যাবসিত হইবে। যদি ঐরূপ অবস্থার উদ্ভব হয় (আপনি অল্পরূপে অভিমত পোষণ করেন) তাহা হইলে আমাদের উভয়ের মধ্যে সাক্ষাৎকার প্রয়োজন এবং তাহার জন্ত প্রয়োজনবোধে এ, আই, সি, সির অধিবেশন স্থগিত রাখাও উচিত।

একটি বিষয়ে সম্প্রতি আমি গভীর ভাবে চিন্তা করিতেছি। একদলীয় ক্যাবিনেট সম্পর্কে আমরা বহু আলোচনা করিতেছি—কিন্তু একদলীয় ক্যাবিনেট বলিতে আমরা কি বুঝি তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি কি? উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে—লক্ষ্মী, ফৈজপুর, হরিপুরা কংগ্রেসের পর যে সকল ওয়ার্কিং কমিটি গঠিত হইয়াছিল, তাহাদিগকে আপনি একদলীয় ক্যাবিনেট বলিবেন না অল্প নামে অভিহিত করিবেন? যদি ঐগুলিকে আপনি একদলীয় বলেন তাহা হইলে একদলীয় বনাম সর্বদলীয় ক্যাবিনেট গঠন লইয়া বিবাদ-বিসংবাদের প্রয়োজন নাই। আপনি যদি ঐগুলিকে সর্বদলীয় বলেন, তাহা হইলে, তিন বৎসর সাক্ষ্যের সহিত কাজ চালাইবার পর, এই বৎসরই বা সর্বদলীয় ক্যাবিনেট কার্যকরী হইবে না কেন? আমার দৃঢ় বিশ্বাস, একদলীয় বনাম সর্বদলীয় ক্যাবিনেট গঠন সম্পর্কে পুঙ্খিত আলোচনা যদি আমরা ছাড়িয়া দিই, তাহা হইলে ওয়ার্কিং কমিটির সভ্যগণের মোট নামের একটা তালিকা খাড়া করিতে পারিব বাহা, সামগ্রিক ভাবে এ, আই

সি, সির এক কংগ্রেসের সাধারণ সভাগণের আহ্বানজনন হইবে। সমস্ত এই দিকটি দৃঢ় করিয়া তাহা দেখিবেন।

দুর্নীতি, হিংসা ইত্যাদি সমস্ত লইয়াও আপনি বিশেষ চিন্তাগ্রস্ত। সম্ভবতঃ এই প্রসঙ্গটিকে আপনি মূলগত বলিয়া মনে করেন। বর্তমানে কতখানি দুর্নীতি আছে, কতখানি হিংসার ভাব বিদ্যমান—এ সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে মতভেদ থাকিতে পারে। কিন্তু এ-বিষয়ে কি আমরা একমত নই যে দুর্নীতির এক হিংসার অবসান হওয়া উচিত এবং সেজন্য যথাযোগ্য পদা অবলম্বন করা উচিত? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে আপনি কেন আশঙ্কা করিতেছেন যে, কাজের সময় আমরা একযোগে কাজ করিব না বা জরুরী বিষয়ে আমরা একমত হইব না?

পত্রটিকে আর দীর্ঘ করিব না। মনের কথা খুলিয়া আপনাকে জানাইয়াছি। আমি পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিতেছি যে, ক্যাবিনেটের রূপ সম্পর্কে আমাদের মধ্যে আদর্শগত মতভেদ থাকিলেও, ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনার পর আমরা দেখিতে পাইব যে, আসল নামগুলি সম্পর্কে আমরা একমত হইতে পারিয়াছি এবং জরুরী বিষয় সম্পর্কে আদর্শগত মতই বিরোধ থাকুক না কেন, কাজের সময় উপস্থিত হইলে, একযোগে কাজ করিতে আমরা পারিবই।

আশা করি, কস্তুরবা দ্রুত উন্নতি লাভ করিতেছেন এবং অত্যধিক কাজের চাপ সবেও আপনার স্বাস্থ্যের অবস্থা সন্তোষজনক। আমি গীর্ষী দীর্ঘে সারিয়া উঠিতেছি।

সম্পদ প্রণামান্তে—

আপনার স্নেহের

সুভাষ

[ইহার পর মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর সহিত নেতাজীর তারবার্তা-বিনিময় হয়। নেতাজী তিনটি এবং গান্ধীজি তিনটি তার-বিনিময় করেন। গান্ধীজি নেতাজীর সাত নম্বর পত্রের উত্তরে কোনও পত্র দেন নাই। গান্ধীজির ১১৪৪৩১ তারিখের তারবার্তার পর নেতাজী দুইটি তার পাঠান এবং তাঁহার ৮নং পত্র লেখেন। উভয়ই তাঁহার শেষ পত্র। পত্রালাপ-পর্বের এইখানেই শেষ। এই শেষ পত্রের পর নেতাজী ২খানি তার পাঠান এবং শেষ তারে গান্ধীজি জানান যে, পত্রগুলি প্রকাশ করা যাইতে পারে।]

নেতাজীর পত্র—৮নং

জিয়ালগোড়া পোঃ,

জ্যে: মানসুন্, বিহার,

২০শে এপ্রিল, ১৯৩১।

প্রিয় মহাশয়,

অজ্ঞ আপনাকে নিম্নোক্ত তারবার্তাটি পাঠাইয়াছি:—“মহাশয় গান্ধী, রাজকোট। আপনার অগ্রে জন্ম চিন্তিত। স্বয়ং আরোগ্য কামনা করি। জেহরলালজীর এবং আমার আন্তরিক আশা এই যে, আমাদের উভয়ের (আপনার এবং আমার) সাক্ষাৎকারের ফলে সফল বলিবে এবং একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সকল কংগ্রেসসেবীর মধ্যে সহযোগিতা সম্ভব করিবে। কলিকাতার

আমাদের উভয়ের সাক্ষাৎকারের সম্ভাবনায়, ঐ সাক্ষাৎকারের পূর্বে, পত্রগুলি সংবাদপত্রে প্রকাশ করা অনাবশ্যক এবং অর্থাত্তিক। প্রণাম। সুভাষ।”

গত তিন সপ্তাহ ধরিয়া আমাদের উভয়ের মধ্যে দীর্ঘ পত্রালাপ হইয়াছে। ওয়ার্কিং কমিটি গঠন সম্পর্কে এই পত্রালাপ কোনও সফল প্রসব করে নাই। যাহা হউক উহা একবিষয়ে সহায়ক হইয়াছে—আমাদের পারস্পরিক বুঝাপড়ায় মনের ভাব পরিষ্কার করিয়া প্রকাশ করিয়া উহা সহায়তা করিয়াছে। কিন্তু জরুরী সমস্তার সমাধান এখনই করিতে হইবে, কারণ, আমরা আর অধিক দিন ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের কাজটি ফেলিয়া রাখিতে পারি না। দেশের আভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি আজ এমনই যে, এখনই কংগ্রেসসেবীদের পক্ষে বিরোধ ভুলিয়া ঐক্যবদ্ধ হইয়া পাড়ান প্রয়োজন। আপনি ভালভাবেই জানেন যে, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি প্রতিদিন অবনতির দিকে যাইতেছে। ব্রিটিশ লোকসভায় যে সংশোধনী বিল পেশ করা হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, যুদ্ধজনিত জরুরী অবস্থার উদ্ভব হইলে ব্রিটিশ সরকার, ভারতীয় প্রদেশগুলিতে যেটুকু স্বায়ত্তশাসনের ক্ষমতা আছে, তাহাও কাড়িয়া লইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। সকল দিক বিচার করিয়া উহা নিঃসন্দেহে উপলব্ধ হওয়া প্রয়োজন যে, আমরা একটা দাপ্তর বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইতে চলিয়াছি যদি এখনই আমরা বিভেদ দূর করিয়া নিজেদের মধ্যে ঐক্য এবং শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি, তবেই আমরা সেই বিপর্যয়ের সহিত যুঝিতে পারিব।

আপনি যদি আগাইয়া আসিয়া নেতৃত্বের ভার গ্রহণ করেন, তবেই এই কাজ সম্পন্ন হইতে পারে। তাহা করিলে আপনি দেখিতে পাইবেন যে, আমরা সবাই আপনার অনুগমন করিতে এবং আপনার সহিত সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত রহিয়াছি। আপনি আরও দেখিতে পাইবেন যে, দুর্নীতি দূরীকরণ এবং হিংসাত্মক প্রবণতা নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে আমাদের দুই দলের মধ্যে একটা ঐক্যমত আছে, যদিও দুর্নীতির পরিমাণ এবং বর্তমানে দেশে হিংসাত্মক মনোভাব ঠিক কতখানি আছে সে সম্পর্কে আমাদের মধ্যে মতভেদ থাকিতে পারে। কার্যক্রম সম্পর্কে একথা বলা যায় যে, কংগ্রেস অথবা এ, আই, সি, সিকেই উহা স্থির করিতে হইবে যদিও প্রত্যেক সভাই ব্যক্তিগতভাবে নিজ নিজ অভিমত উক্ত সংস্থাগুলির সম্মুখে উপস্থাপিত করিতে পারে। কার্যক্রম সম্পর্কে আমার এই কথা মনে হইতেছে যে, যে সঙ্কট আমাদের সম্মুখে আসিতেছে তাহাই উহা স্থির করিতে সাহায্য করিবে এবং তখন ঐ বিষয়ে আর মতভেদের অবকাশ থাকিবে না।

এ, আই, সি, সির অধিবেশনের পূর্বে কলিকাতার অথবা কলিকাতার নিকটে আপনার সহিত সাক্ষাতের জন্য বিশেষ উৎসাহ হইয়া রহিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে এবং অন্যান্য প্রদেশে এই মতই ক্রমশঃ দৃঢ় হইতেছে যে, আদর্শগত বিরোধ এবং অতীত মতভেদ বা মনকষাকষি সবেও পারস্পরিক স্বীকৃতির মাধ্যমে ওয়ার্কিং কমিটি গঠন সমস্তার সমাধান করা উচিত। পছন্দ প্রকাশ্য অনুসারে ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের দায়িত্ব আপনার। ঐ দায়িত্ব গ্রহণ করিলে আপনি দেখিতে পাইবেন যে, আমরা আপনার সহিত বখাসাধ্য সহযোগিতা করিতেছি।

ভোরাই

ঐগজনীকান্ত দাস

আমি কি তোমার গান গাই ?
তুমি আজ কোথা আছ, মরেছ অথবা বাঁচো
আমার তো কিছু জানা নাই ।
তুলে গেছি বেন কবে প্রভাতের সে উৎসবে
তুমি দিয়েছিলে আল্পনা ;
ধুয়ে মুছে গেছে সব, আছে কি না অমৃতব
নাট—কিছু করি না কল্পনা ।
আমি কি তোমার গান গাই ?
জীবনের বিপ্রভরে প্রচণ্ড সে সূঁচকরে
গুড়ে গেছে ভোবের সানাই ।

সুন্দর আকাশে চেয়ে চেয়ে
কত রং কত ছবি দেখে যে সজ্জাব করি ;
তোমার সে কচি মুখ, মেয়ে,
ভার মানে পাশ ঠাই ? আমার তো মনে নাই,
জীবনের প্রথম রাগিণী
কবে কোথা কে বাজাল, আঁধারে অরণ আলো
কে বুলাল—রাখিনি তো চিনি ।
সুন্দর আকাশে চেয়ে চেয়ে,
হাকারো স্বপ্নের ভিড়ে ভোরের সে সুরটিরে
তুলে গেছি, আন গান গেয়ে ।

ভেবে থাকো যদি, আনমনে
গেয়েছি তোমার গান— তটিনীর কলতান
নয় সে তো উৎসবের সুরণে !
যে তট নিকটে তাকে ভালবাসে, ঘিরে থাকে,
তাহারি আশ্রিতে ওঠে সুর ;
তারে ভাঙে তারে গড়ে তবেই না গান ঝরে—
গিরি-পথ সে তো বহু দূর ।
ভেবে থাকো যদি, আনমনে
গেয়েছি তোমাতে স্বপ্নে, কমা তুমি করো বোঝে,
তুলে বেয়ে ভোরাই স্বপনে ।

নিয়ো না, নিয়ো না অপরাধ ।
অনেক ঝড়ের ঘর, মধুশের পায়-পায়
মুছে বার মুকুলের সাধ ।
চলার নেশায় যদি পার হয়ে গিরিনদী
তুলে বাই প্রিয় গ্রামখানি,
বার বার আঁধি এসে পথিকে তুলায় শেষে
ভারে কি দূষবে, দোষী মানি ?
নিয়ো না, নিয়ো না অপরাধ—
আমি খাঁটি সোনা নই তব সোহাগায় কই
কাটে না তো জীবনের খাদ ?

পাখী তো নিজের গান গায় ।
নিশান্তে ভরুণ আলো চোখে তার লাগে ভালো
সে তো দূরে উড়ে যেতে চায় ।
প্রহরে প্রহরে তার গান ওঠে অনিবার—
কতু রোদ, কতু সমীরণ,
কতু ফুল কতু কল, কতু আকাশের জল,
গান তার কিসের কারণ ?
পাখী তো নিজের গান গায়—
সে গান তাহারি বুকে ঘুমাইয়া থাকে স্তব্ধে
আপনা আপনি উছলয় ॥

জওহর এখানে গতকাল আসিয়াছিল । বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে
তাহার সহিত আমার দীর্ঘ আলোচনা হয় । আমাদের উভয়ের
একমত দেখিয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি ।

আমাদের মনে হয়, আপনার আসিবার সময় কলিকাতার
নিকটে কোনও ঠেগনে নামিয়া পড়িলে ভাল হয়, তাহা হইলে
শান্তিপরিবেশে আলোচনা হইতে পারিবে । আপনি যদি নাগপুর
হইয়া আসেন তাহা হইলে মেদিনীপুরই (ঋতুপূর্বের নিকটে) সর্বোত্তম
স্থান হইবে । আপনি যদি চুকি হইয়া আসেন, তাহা হইলে, বর্তমানের
নিকটে কোনও এক স্থানের কথা ভাবিতে হইবে । এ বিষয়ে আপনাকে
একটি তার পাঠাইয়া উক্তরের অপেক্ষা আছে । তাহা সম্ভব না

হইলে, কলিকাতাতেই আমাদের সাক্ষাৎকার হইবে । আমি জওহরকে
আলোচনার যোগ দিতে অনুরোধ করিয়াছি এবং সে সানন্দে সম্মতি
দিয়াছে ।

আপনার অরের জন্ত চিন্তাভিত্তি আছি । প্রার্থনা করিতেছি,
উহা বেন শীঘ্র দূর হয় ।

সম্রাট প্রণামান্তে—

আপনার স্নেহের
সুভাষ

[ইহার পর নেতাজী দুইটি এবং গান্ধীজি একটি তারবার্তা
বিনিময় করেন এবং পত্রালাপ-পত্রের অবসান হয় ।]

শি শি র=সানি থ্যে

রবি মিত্র ও দেবকুমার বসু

Prompting সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল, বললেন—মণিমোহন বড় ভালো prompter ছিলো, অভিনেতা তৈরী করতে পারতো। অথচ কি পেলো? কী কষ্টে মরলো, কি রকম বাড়ির কী রকম ধরে! তার আত্মীয় তাকে দেখলে না, অথচ থিয়েটারে প্রথম নাট্যের সময় মণিমোহনের পেছনে পেছনে ঘুরেছে। কথাগুলো বলেই কি রকম বেন অক্লান্ত হয়ে পড়লেন।

উনি যখন চুপ করে বসে আছেন আমরা ক'জন একপাশে বসে তখন ফিসফাস করে কথা কইছিলাম, তারই একটি কথা কানে যেতে চমক ভাঙলো ওঁর, প্রশ্ন করলেন—মিতা শ্রীকান্তে কমল করছে? তারপর নিজেই বলে চললেন—মেয়েটা অভিনয় তো ভালোই করে, তবে বাপ স্বীকার করবে কি না জানিনে। ওর একটি মাত্র দোষ, অভিনয় হৃদয় থেকে করে না, মুখস্থ বলে। approachটা বড় মেকানিক্যাল, দেখো, জীবন রঙ্গে নিজের ভূমিকা করেছিলো বন্দনা, বড় ভালো করেছিলো। জীবন সম্বন্ধে বিশেষ করে হৃদয় সম্বন্ধে জ্ঞান যে খুব বেশি। বাইরের 'মেয়েরা জীবন সম্বন্ধে জানে ভালো। কর্ণেল ক্রফোর্ড বলতেন, লেখাপড়া না জেনে অভিনয় করে কি করে। তাতে বলেছিলুম, 'They have drank from the fountain of life and not through conduit pipe.'

ওঁর পুরোনো দলের কথায় বলেছিলেন—আমাদের টুর বড় ভালো হতো। দলটা ভালোই গড়ে উঠেছিলো, মৃত্যু আর অসুস্থ কারণে ভেঙে গেলো।

এর পর হলো বিদেশী নাট্যকারদের সম্বন্ধে আলোচনা। উনি বললেন—বার্ষিক ত্রেতা অনেক কিছু করেছেন, মায় বিনা ট্রেজে অভিনয় করানো পর্যন্ত। আমাদের কিন্তু ওটা ট্রাডিশন—বিনা ট্রেজে, বিনা সিনে অভিনয় আমরা চিরকালই করেছি। তারপরই তুঃখ করে বললেন—বাড়ি শেলুম না, experimentation করতে শেলুম কই। যাত্রাকে জাতে তুলে থিয়েটারকে সরিয়ে দিতে হবে। কিন্তু exit-entrance হবে কি করে? যাত্রায় আসরে বসে পড়তো, কিন্তু সকলের মাঝখানে বসে রাখা হ'কো খাচ্ছে চোখে লাগতো।

হঠাৎ বিনয়দাকেই জিজ্ঞাসা করার ভঙ্গিতে বললেন—গ্রীক নাটকের রূপ কেমন ছিলো? কিন্তু উত্তরের অপেক্ষা না করে নিজেই বলে চললেন—যাত্রার স্পীচগুলো এক ধরনের আয় লবা লবা হতো। এই হুঁসলতার জগ্গাই অ্যাপিল করলো না। সীতাকো গিরিশবাবু তো সীতা বিসর্জনের পর গান ধরলেন। যাত্রা ধরনের বইয়ের মধ্যে সবচেয়ে ভালো বই হলো পাণ্ডবগোঁড়ব harmonious বই।

গিরিশ প্রসঙ্গেই বলে চললেন—গিরিশবাবু নাটক লিখবেন কখনো ভাবেননি, কিন্তু বকিম আর দীনবন্ধু দিয়ে চললো না, তাই লিখলেন। তবে গান ভালোই বাঁধতেন।

অঁকার পূর্ণপ্রসঙ্গে ফিরলেন—চারদিক খোলা হয়তো ভালো না। তবে তিন দিক খোলা রেখে কমন হয় পরীক্ষা ক'রে দেখতে দেখে কী। উঁচুটাকে নিশ্চয়ই নাবাজা যায়, অতো উঁচু রাখার দরকার কি?

ট্রেজার কথায় বললেন—একটি নতুন বই হ'চ্ছে না। বা' ট্রেজ আছে তারও তো উন্নতি করা যায়। এই তো অডিটোরিয়ামকে সীতান্তপ নিয়ন্ত্রিত করলো, অথচ ভেতরে আর্চ দিয়ে ট্রেজকে ছোটো ক'রে দিলে।

অঁরি বা কিছু innovation করেছি লোকে নিল না, আর অস্ত্রের চেজ সবাই নেয়। একবার রেল লাইনের ধারে একজনকে হুড়ি সাঝাতে দেখেছিলুম, বলেছিলো, শোভা ক'রছি। এরাও শোভা করছে।

শ্রীর ওপেনিং আর ডেপথ সবচেয়ে বেশি। দিখিয়ারী মতো বই কী আর হবে?

কোনো বিখ্যাত চিত্র-পরিচালকের কথা উঠতে বললার—They are hardly educated.

তার পর নির্মলান্দ্রেয়র কথা বললেন—নির্মলের frustration যাদের জন্তে এতো ক'রলো, কংগ্রেসের জন্তে এতো করলো অথচ তারা সবাই তাকে খেড়ে ফেলতো। দেনার দায়ে মাথাপাগল। যাদের মাহুদ করলে তারা ডাকলে আসবে কি না এ সন্দেহ ছিলো তার। ওর মতো অমন হৃদয়ের বিস্তার অল্পই দেখেছি। আগে খুব মাট ছিলো, কিন্তু বড় ছেলে মারা যেতেই গৌতামি আর আলবোলা নিয়ে প'ড়লো। অতো দিন কাউন্সিলে ছিলো, ইকনমিক্স আর পলিটিক্যাল ইকনমিতে অতো বড় পণ্ডিত কিন্তু কখনো বক্তৃতা দেয়নি। বিজয় ওকে বাঁচিয়ে রেখেছিলো, এসে আবার থিয়েটার দেখতে পারতো না, ভাবতো আমিই নির্মলকে ডুবিয়েছি।

আমাদের দেশে কেনো কিছু মন-প্রাণ দিয়ে করতে গেলে পেছনে লোক পাওয়া যায় না। গিরিশবাবু তাই ছেলেকে বলেছিলেন—প্রোপ্রাইটর হ'সেন। ছেলের কথা ভেবে সিরাজে বড় বড় বক্তৃতা ঢোকালেন। দানীবাবুর অনেক দোষ ছিলো, কিন্তু কমেডি ভালো ক'রতেন, বোধগম্য হ'লেই ভালো ক'রতেন, তবে ভক্তদের তোষামোদে ভুলেন।

—রবীন্দ্রনাথকে একবার প্রশ্ন করেছিলুম—বাংলা দেশের নাটক বাঙালীর মতো ক'রতে গেলে কেমন কর্ম হবে? তাতে বলেছিলেন, তোমরা দেবে, নয়তো এসেছো কেনো? নিজে কিন্তু এলিজাবেথান ট্রেজকে কলো করলেন, তাঁব সাংকেতিক নাটক মেতারলিক প্রভৃতির অমুসরণ করে।

—বার্ষিক ত্রেতার নাটক অপূর্ণ—Exception and the rule কি মন্দ! আজকাল তো আর মেয়েছেলে নিয়ে আজ্ঞা নেই, তাই একল একটা বাড়ি আর কিছু এনডায়েন্টস—বাতে সবাই কিছু পায়।

সিনেমা ভালো কি খিঁচোটায় ভালো, জানতে চাওয়ার বললেন—
গত পঞ্চাশ বছরে সিনেমার কটা ভালো বই হয়েছে। বছরে
লাখ-লাখ নাগক-নারিকা হচ্ছে অথচ তিনকড়ি আর তারাকে
সকলে মনে রাখবে। প্রভার মতো অভিনেত্রী আর নয়নি।

—দানীয়াবুর সঙ্গে প্রকল্প যত বার করেছি Understanding
ছিলো যে উনি যখন অভিনয় করবেন আমি কিছু করবো না, কারণ
নরেশ একবার ভুঁড়িতে হাত বুলিয়েছিলো। (নরেশ কাতারান
হলেই চাপক্যকে মারবার ভাল করে।) দানীয়াবুর গলা ছিলো
অপূর্ব। উলারা-মুদারা-তার—তিনি গ্রামেই গলা চলতো : তাঁর
ব্যক্তিত্বও ছিলো শ্রবণ আর তার জোরেই চলতো। বিলেতে হ'লে
বিপদে পড়তেন, তবে গলায় জন্তে হয়তো ও-শেষেও দাম পেতেন।

কথার জে ঠেনে চললেন—গিরিশবাবু আর অমৃত বোসের
ছ'ল না হ'লে হয়তো ভালো হতো। ভুবন নিরোপী, অর্ধেন্দু
বাবু, অমৃতলাল তো ছিলেনই, কিন্তু সবার ওপরে ছিলেন গিরিশবাবু।
গিরিশবাবু ছাড়া খিঁচোটায় তো কেউ বাখতে পারেন না। বোল
হাজার টাকা দিলেন (আজকালকার এক লাখ বাট হাজার টাকার
মতো।) অথচ পাটনার না করে তাড়িয়ে দিলে। খিঁচোটায় থেকে
পেতেন কি? মাসে একশ' টাকা মাইনে আর দৈনিক চার পয়সার
তামাক—তিনি Dramatic director। রোজ রোজ সেই
বোল হাজার টাকা দেবার কথা বলতেন, তাই তাড়িয়ে দিলে।

—খিঁচোটায় দলাদলি চিরকাল। ক্ষেত্রমণিকে ভালো পাট না
দিয়ে Starve করিয়ে করিয়ে নষ্ট করে দিলে। দলাদলিতে
থাকতেন না অর্ধেন্দুবাবু। খুব ভালো লোক ছিলেন তিনি। সব
দলেই মিশতেন। খুব দরজা দিলেও ছিলো ঠিক। এমন লোক
আর হবে না।

তাঁর খিঁচোটায়ের পুরোনো খাতাপত্র কিছু আছে কিনা জানতে
চাওয়ার একটু বেন বিরক্ত হলেন, বললেন—খাতাও কী আমি
রাখবো? বিশ্বেশ্বর যতদিন ছিলো ততোদিন করছে। অশিক্ষিত
লোক, যতটুকু পেয়েছে ততটুকু করেছে। সে মারা যেতে
ইরাদালবাবুকে বললুম, আপনি খাতা রাখুন। তাতে বললেন—
ওই নিয়ে আমার দস্তর সঙ্গে ঘৃণা ঘুটিয়ে দিয়েছিলো। বললুম, আমার
সঙ্গে হবে না। তবু বললেন—ও তার আর আমার ওপর
চাপাবেন না।

পরের দিন চক্ৰিশে ক্ষেত্রমণী আবার এসেন। তখনও ডিক্লেয়ার
কথাই ঘুরছে খাতায়। চুকতে চুকতে বললেন—ডিক্লেয়ার বড় ভালো
লোক ছিলেন হে! তবে পরিচিত আত্মীয়দের সবাইকেই লেখার
চুকিয়েছেন। আর কি অপূর্ব গলা! খুব ভালো অভিনয় করতে
পারতেন, নিজের লেখা পড়ে প্রচুর পয়সা পেয়েছেন, বিশেষ করে
আমেরিকার। আমাদের দেশে ববীন্দ্রনাথের গলাও ওই রকম ছিলো,
উনিও ইচ্ছে করলে ওই ভাবে প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে পারতেন।

—ডিক্লেয়ার স্বভাবচরিত্র খুব ভালো ছিলো না। লিটল
অ্যানের সঙ্গে খুব ভাল ছিলো, বইও পড়তেন খুব। লিটল
অ্যানের মৃত্যুর পর বই-ই হয়েছিলো একমাত্র সঙ্গী, পড়তে পড়তেই
চোখ গেলো।

—হেঙ্কেল পিয়ার্সনের লেখা জীবনীটা বেশ ভালোই লাগছে।
ওঁকে বহু literary allusion আছে। ফিসারের ইতিহাসও

আছে। আর-কলেজের প্রিন্সিপালের কাছে সেক্সপীয়ার কোট ক'রে
বেকুব বনে গেলুম। হামলেট পড়িনি তা স্বীকার করতে রাজী নয়
অথচ বা বোঝালুম তা কিছু বুঝলো ব'লে তো মনে হয় না।

কোনো এক অভিনেতা সন্ধে বললেন—ওর যা দাম তা কী
পেলো? বড় লাফায় যে! শৈলেনেরও ওই দোষ ছিলো,
ছ'পয়সা পেলেই ছুটতো। অথচ একটু ভেবেচিন্তে অভিনয় করলে
ওই তোমাদের কি কুমার—তার চেয়ে অনেক বেশি রোজগার করতে
পারতো। অথচ মরবার সময় কী আর রেখে যেতে পেরেছে? ওর
একটা কিন্তু মস্ত বড় ক্ষমতা ছিলো—সমস্ত চরিত্রের সলাপ মুখস্থ
থাকতো! ও ক্ষমতা রবিরও ছিলো, আর একটা মজার ব্যাপার
ছিল, সকলের আগে এসে মেক-আপ নিতে ব'সতো অথচ কখনো
মেক-আপ নিয়ে খুশি হ'তো না।

এর পর রিহার্সিয়াল শুরু হ'লো। বললেন—আগের দিন মোটেই
রিহার্সিয়াল হয়নি, আজ আর কোনো কথা বলবো না।

পঁচিশে ক্ষেত্রমণী বোধ হয় রবিবার ছিলো, সেদিনটা বাদ দিয়ে
ছাব্বিশে এসেন। ডিক্লেয়ার জীবনী পড়ার বেশ তখনও কাটেনি,
তাই সেদিনও চুকেই প্রথম বললেন—ডিক্লেয়ার মস্ত বড় অভিনেতা
ছিলেন, ছিয়াত্তর বারিতে বিশ হাজার টাকা রোজগার করেছেন।

এই সময় সম্ভবতঃ বিনয়দার সঙ্গেই কথা উঠলো, নাটকে কথার
দাম কি? উনি বললেন—নাটকে কথা দরকার বই কি। আলো
নিবে পদ' উঠলো, সবাইয়ের মনেই যখন ঔৎসুক্য তখন প্রথম
কথাটার দাম কতখানি বলোতো? প্রথমে চুকে বাজে কথা
বললে কী ভালো হ'তো? তবে আমাদের দেশে নাটকে কথা একটু
বেশি। বার্গার্ড শ'র লেখাতেও এই দোষ আছে। আসলে তিনি
ভালো নাট্যকার নন, his characters are so many pegs to
hang his ideas on! তবে গল্পটা সব সময়ই বলেছেন।
যে যে বইতে গল্প সব চেয়ে ভালোভাবে বলেছেন সেই সেই বইট
মামুষ ভালোভাবে নিয়েছে।

নির্বাচ ছবিতে কথা না বললেও তো গল্প বলতে পারা যায়।
যেখানে সেইভাবে বলেছে সেখানে sub title ছাড়াও বুঝতে অসুবিধে
হয় না।

এই সময় পার্টিভাল সায়েবের কথা উঠলো, বয়স্কদের মধ্যে
কারা তাঁর কাছে পড়েছেন, তিনি কেমন পড়াতেন ইত্যাদি
প্রশ্নের জবাবে বললেন—পার্সিভাল সায়েবের কাছে তো আমবা
পড়েছি, তাঁর কাছে পড়েছে এমন বহু লোক আজও আছে।
তাঁর লেখা বইপত্রের সমস্ত প্রকল্পবাবু নিয়েছিলেন, ওর ভালো
পার্সিভাল সায়েবের ওপর রাগ ধ'রে যেতো আমাদের।

—প্রকল্পবাবু খেটেখুটে পড়া তৈরী ক'রে নিয়ে আসতেন, ত
প্রথম দিকে খুব ভালো রিসেপশন পাননি ব'লে ছেড়ে দিয়েছিলে
পরে পার্সিভাল সায়েব আবার ঠিকে ধ'রে নিয়ে এসেছিলেন, খে
পড়াতেন তিনি, কিন্তু তা'তো আর ভালো পড়ানো নয়
পড়াতেন ভালো এমন, দোষ। তাঁর পড়ানো শুনে জ্ঞানরাফে
হার খুলে যেতো, পড়াশোনা যে ভালো জিনিষ তা'বোঝা যেতো।

এবার রিহার্সিয়াল শুরু করলেন। উদ্বিপূরীর তাঁবু খে
রূপকুমারীকে দেবার শিবিরে পৌঁছে দেবার জন্তে কামবন্ধ যখন
সিঁয়ের সঙ্গে কথা বলেছে তখন রাম সিঁয়ের যে কথা আছে

মেবারীর অস্ত্রে নয়, ভয় দৃষ্টিতে,' আগের দিন সেটা রাম সিয়ের ভূমিকাভিনেতাকে বোঝাতে চেয়েছিলেন, সে বুঝতে পারেনি। প্রথমেই সেই কথা বললেন—কথাটা ও না বুঝেই বলছে। কথাটার ভেতরের অর্থ হ'লো 'Traitor has now turned upon himself, একটা মেয়ের জন্তে সমস্ত দেশ আত্মবিসর্জনে প্রস্তুত, অথচ এত বড় গৌরবের ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করবার কোনো অধিকারই নেই তার। সেই দুঃখের আভাসই তো ফুটেছে কথায়। লোকটার মাথায় কিন্তু তা ঢোকে না।

গান নাটকে থাকা ঠিক কিনা জানতে চাওয়ায় বললেন—বালা নাটকে গান থাকা দরকার, এ বিষয়ে আমি রবিবাবুর সঙ্গে একমত। গান যদি নাটকের moodকে অনুসরণ করে, তবে আপত্তি কিসের? তা ছাড়া আলমগীরে বাণীবাবু অপরূপ সুর দিয়েছেন। 'অতিথি এসেছে দ্বারে'তে প্রথমে দরবারী কানোড়া লাগিয়েছিলেন, বললুম, ভালো লাগলো না। শুনে তো চটেই আসুন! শেষ পর্যন্ত বোঝাতে বললেন—কি রস? বললুম, বিরস!

আবার রিহাস্ট্রাল শুরু করলেন, তবে চমকই খেয়ে গিয়ে বললেন—একটা নতুন বই করে। এই বই রিহাস্ট্রাল দিতে কুইনটিন গেলার মতো লাগছে।

রিহাস্ট্রাল বন্ধ করে ডিক্লেসেব প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা শুরু করলেন আবার, বললেন—হেস্কেথ পিয়ার্সন ডিক্লেসেব জীবনের স্থাণ্ডাস বাদ দিয়ে indomitable spiritটাই দেখিয়েছেন। ডিক্লেসেব কাগজ চালিয়েছেন, সিরিয়াল লিখছেন, আবার নাটকও প্রোডিউস করেছেন। ম্যাকারডি খুব বন্ধু ছিলেন, ডিক্লেসেব গলা শুনে পিলে চমকে গিয়েছিল তাঁর, বলেছিলেন—আমার কাজ যাবে।

কাব্যনাট্য সম্বন্ধে কথা হ'লো, বললেন—নাটক কবিতায় না নিয়ে গেলে কিছু হবে না অথচ মজা দেখো, কবিতা কেউ পড়তেই পারে না। স্কুলে যারা পড়ে, তারা মাইনে বেশি দেয় অথচ নেটি ছাড়' চলে না। বাড়িতে অভিধান কিনিয়ে বিপদে পড়েছি। ছেলেরা দেখে না, আমার কাছেই পড়ে থাকে।

—নেটি আমিও লিখেছি কোর্স ইয়ারে পড়তে পড়তে। জিতেনের দোকানের ধার শোধ দিতে চার-পাঁচজন মিলে ফরাঁ-পেছু দশ-পনেরো টাকা নিয়ে লিখে দিয়েছি।

—আমাদের দেশে পরীক্ষা উঠিয়ে দিয়ে প্রিন্সিপ্যালের সার্টিফিকেটের ওপর ডিগ্রী দেওয়া উচিত।

—আগেকার দিনে মাঠার মশায়রা ভালো ছেলেদেরকে নিজেদের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে পড়াতেন। আজকাল তাঁদের প্রাইভেট টিউটর করেই দিন কাটিছে; ভালো ছেলেদের পড়াবেন কখন?

২৭ তারিখেও এলেন। সেদিন গোড়াতেই রিহাস্ট্রাল শুরু হ'লো। দয়াল শা'র সম্বন্ধে কি ভাবে কথা বলবে, বোঝাতে গিয়ে বললেন—দয়াল শা'কে একটু খাতির দেখানো দরকার। আজকালকার মন্ত্রীদের যেমন খাতির করা হয়, পাতিয়ালা ইত্যাদি রাজাদের কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি মন্ত্রীদের খাতির করতে হতো। বঙ্গবন্ধাবাদের অবস্থা মুঘল দরবারের মতোই ছিলো, সবাই খুব মাথা নোরা-তো। দেওয়ানের ক্ষমতা কতো ছিলো, ইচ্ছে করলেই রাজাকে রাজ্যচ্যুত করতে পারতো। অথচ সামনে কি বিনত, কথায় কথায় গরীব পণ্ডিত্যর, অন্নদাতা বলেই চলেছে।

দোল এসে পড়েছে, সেদিন আবার দুপুর পর্যন্ত ট্রাম-বাস বন্ধ। তাই নিয়ে কথা ভাবায় বললেন—দোলের একটি barbarous ভাব আছে, বড়বাজারে দোল খেলা বন্ধ করা উচিত। গান বা গায়, সে ছোটদের শোনার অযোগ্য; মনে একটা খারাপ ইম্প্রেশন হয়। কনস্টেবলরা কিন্তু খুব ভদ্রভাবে দোল পালন করে। দোলে আবার আর লাল রঙ দেওয়াতেও খাবাপ কিছু নেই। তবে আলকাতরা, বাঁহুরে রঙ, ছাপ এগুলো বিকৃত রূপের পরিচায়ক।

থিয়েটারের সাজ-পোশাক প্রসঙ্গে বললেন—পোশাক ঠিক রুচি মাসিক হয় না! লোকে পোশাকের দোকান করে না কেন? তাতে তো লাভ হয়। থিয়েটারের এমনিতে সবাইকেই এক রকম সাজিয়ে দেয়। আমরা ঠাণ্ডে খুব চেঁচা করে উল্লাহ করেছিলাম, বাখাল বাবু (বাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়) নিজে এসে সবাইকেই আলাদা আলাদা রকম পাগড়ী বেঁধে দিতেন, স্বপ্ন বাবুও হরদম 'আসতেন। তখনকার দিনে পণ্ডিতরা সংস্কৃতবানরা প্রায়ই থিয়েটারে আসতেন।

ইংরেজের সার্টিফিকেট ছাড়া আমাদের এখনও চলে না, আমি দর্শন টার্ন বুকি না, থিয়েটারি বুকি। আমাদের দেশে বাত্মা ছিলো এখনও আছে। আর আমাদের ভগ্নত মুনির সময়কার নাটক আর ইংরেজদের নাটকে অনেক মিল ছিলো।

—নাটককে যাত্রাইজড করতে হবে, তার জন্তে দরকার লেখক। যোগেশ বাবু থাকলে পাবা যেতো। তবে এখনও লেখক পাওয়া যেতে পারে। আসলে চাই কিছু আধাংশীল বুক-যুবতী, বসবার জায়গা, সতরকি, তামাক খাবার জায়গা আর কিছু অর্থ। বাজে কথা বলতে বলতেও এই রিহাস্ট্রাল হয়।

আমেরিকান ভাইস দেশে খুবই আসছে, আমেরিকান ছবি বোধ হয় আমাদের দেশে সবচেয়ে বেশি আসে।

Sacrilege করতে আমরা ভয় পাই না। আমাদের দেশে যাত্রার দর্শন, Aesthetics ইত্যাদি সম্বন্ধে এমনভাবে আলোচনা করা হতো যে সাধারণ লোকে বুঝতে পারতো এবং কিছু খারাপ convention ছাড়া এর ফল ভালোই হয়েছিলো।

আমার মনে হয়, একজন মহাপুরুষ আসা দরকার, যিনি আমাদের মনের অন্ধকার ভাঙিয়ে দিতে পারবেন।

এর আগে নাটক নিয়ে experimentation করেননি কেন জানতে চাওয়ায় বললেন—experimentation করার জন্তে martyr to the cause হবার রাস্তা পেলুম কোথায়, বাপের অর্থ না থাকলে কিছু করার উপায় নেই। I am not man enough to do it (i. e. to change the trend), তবে থিয়েটারকে বাঁচিয়ে রাখা দরকার।

নাটক আজকাল প্রগতিশীল হচ্ছে মন্তব্য করার বললেন—আজকালকার দিনের নাটকে পথ দেখাবার মতো কিছু আছে কি? প্রগতিশীল তো বলছো, কিন্তু কোন্ দিকে প্রগতিশীল? অর্থ না বুঝেই কথা বলে কেনো? রেডিও অভিনয়ধারা এমন কি পাঠ করা পর্যন্ত খুব ক্ষতি করছে, পনেরো মিনিটের মধ্যে শেষ করতে হবে, তাই গড়গড় করে বলাটা অভ্যাস হয়ে যাচ্ছে।

গান বুঝতে হলে শ্রবজ্ঞান থাকার কি দরকার জানতে চাওয়ায় বললেন—আমার নিজের মনে হয় শ্রবজ্ঞান না থাকলেও বেশকিছু গান

সুন্দর কানে লাগে। আমারও ঐ জ্ঞান নেই, অথচ বেশরো গান শুনে চকস হই একথা অল্প লোকে বলেছে।

ছবি কে কেমন আঁকে কার ছবি ভালো দেখায়, কেন এই নিয়ে কথা শুরু হলো, তখন বললেন—ছবি সম্বন্ধে কেউ কোনো উৎসাহ দেয়নি আমাদের। অথচ ইউরোপে বা আমেরিকার ছোটো ছোটো সহরেও আর্ট গ্যালারী থাকে। ছোটোরা তা দেখতে যায়, ছবি আঁকতে শেখে, পারিপার্শ্বিকের গুণে ছবি সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মায়। আর আমরা এসব বিষয়ে বিশেষরূপে অজ্ঞ।

আমার মনে হয়, জাত হিসেবে আমরা ছোটো, তবে আশা করি তপস্বান আমাদের দুঃস্বপ্না ঘোঁচাবেন।

আঠাশে ফেব্রুয়ারী আর পরলো মার্চ; দু'দিনই এলেন। প্রথম দিন ট্রেজে কী পরিসর্তু করা দরকার এই নিয়ে কথা উঠলো, বললেন—আমার মনে হয় বইয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রোসেনিয়াম পাঠানো উচিত। এসব কথা আমাদেরই তো ভেবে দেখা দরকার, তবে আর কিছু করার আগে কাজ শুরু করা দরকার। তিন-চার হাজার টাকা হ'লেই তো শুরু করা যায়। তাবপর বললেন—দেশের লোকের রুচি কি রকম খারাপ হ'য়ে যাচ্ছে তা' বলবার নয়। আর্টের অ্যাগ্রিসিয়েশন হয় না। আজকাল, হয় ফাশন, পনেরো নম্বর পার্ক স্ট্রীটে দল বেঁধে সবাই ভিড় করে যাচ্ছে কিন্তু বোকে ক'জন? তাছাড়া বোকাবার লোকও তো নেই, লোকে বুঝবে কী ক'রে?

—আমার দুঃখ হয় বেঁচে আছি অথচ শক্তি নেই, গুণফিলি অর্থাৎ সবাই মিলে গড়ে তুলবো, এই ইচ্ছেটা তো দরকার! দেশে কোন Organisation-টা কাজের? কাজের Organisation অত্যন্ত rare। আসলে willing young man দরকার।

একজন প্রশ্ন করলো গান শেখেননি কেন উনি, উত্তরে বললেন—গান শিখলে বোধ হয় ভালোই হ'তো। সুখের হতো জীবনযাত্রা। তবে গাইয়ের জীবনও খুব একটা সুখের কিছু নয়। অনেক বড় গাইয়ের কথা জানি যাদের জীবন বড় দুঃখের। এ বিষয়ে ব্যতিক্রম হু'চাবজ্ঞান বাইজ্ঞ। তাদের ভাবটা don't care, লোকের সঙ্গে বা'তা ব্যবসাস করে অথচ সবাই তাত ছোড় করে ব'সে থাকে।

আমাদের মধ্যে কথা হচ্ছিল কোলকাতার সংস্কৃতি-সম্মেলনের বিষয়ে, একজন বললো যে হারে কোলকাতায় বেড়ে চলেছে সম্মেলন, একমাত্র শুধু বেলেঘাটতেই দেখুন না, কতগুলোর আকর্ষণীয় ঘটেছে! এতে যে সংস্কৃতি বাবে! শুনে হাসলেন, বললেন—সংস্কৃতি বাবে! বাবে কেনো? বেলেঘাটা তো ভালো আরগা, আমি প্রথম ওদিকে বাই উনিশ' তেতাল্লিশ সালে। সেই সময়েই নব্বয়বাবুদের সঙ্গে পরিচয় হয়। হেয় বাবু মাহু বংশ ভালো neutral লোক। ঠেকে পলিটিজে আনেন দাশ মশায়, তিনি যে সি, আর, দাশ আর অল্প পক্ষ বা তা একথা কখনও ভাবেননি। তাঁর বুকটা যেমন দরাজ ছিলো, মনটাও ছিলো তেমন, তবে মাহুবাটীয়া বিশেষ চিনতে ন। স্ত্রী বাবু কিন্তু মাহু চিনতেন ভালো, দার বা দাম তাকে তাই দিতেন। তবে একটা ভুল উনি করেছিলেন, (অবশ্য বিপ্লবীদের কেউ কেউ বলতে পারেন, তুমি শিখি ডাফুডি দেশের জন্তে কি করেছে যে, স্বাধীনতার জন্তে দীর্ঘ জীবন-পন করেছেন

তাদের কাজের ভুল ধরো।) কর্পোরেশনে ঢুকে তাঁরা বেতাবে কমুটিষ্টদের কাছ থেকে টাকা তুলেছেন তাঁতে ভবিষ্যতে তাঁদের শিখার যে অপব্যবহার করবে এই কথাটাই ভেবে দেখেননি।

—বিপ্লবীদের টাকা উঠেছিলো ডাকাতি করে। ঢাকার লোক খুলনার, খুলনার লোক ঢাকার ডাকাতি ক'রতো। তার পর সেই টাকা দিয়ে দল ক'রতো। তার ফলে কতো নিরীহ লোক যে কষ্ট পেয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। বিপ্লবীদের মত ছিলো endjustifies means, সেই নীতি অনুসরণ করতে গিয়ে কতো ভালো ছেলেও immoral কাজ করেছে।

একাদমী প্রসঙ্গে বললেন—সরকার একটি ভুল খুললেন, কিন্তু কী হয় সেখানে? বিলেতে একাডেমি আছে, বার্ডার শ'র সব টাকা পাচ্ছে। খুব কাজ ক'রছে। একজন ডিরেক্টর আছে বছরে আড়াই হাজার পাউন্ড হাইনে পায়। কেনেথ ব্ল্যাক বুড়ো হয়েছেন বলে রিটায়ার করেছেন। অল্প একজন আছে, গিভাপুল ম্যাকেন্সিও অনেক কাম অভিনয় করিয়েছেন।

—আমাদের দেশে নাটক পড়তেই বা পারে কে? গিরিশবাবু শতবারিকী হ'লো অথচ ক'জন তাঁর ক'টা বই পড়েছে আর পড়ে মানে বুঝেছে। তাঁর নাটক তো খুব খারাপ কিছু নয়। রবীন্দ্রনাথের বোটে হু'খানি সফল নাটক আছে। তপতী আমাদের আগে কেউ বোঝাবাই চেষ্টা করেনি, কারণ রবীন্দ্রনাথ বইটা পড়তেও পারেননি। রাজা-রাণীতে যে সংঘাতের ইংগিত ছিলো তপতীতে তাই পূর্তা পেয়েছে।

—বুলে দু' বছরে বোল লক টাকা খরচ হলো অথচ হ'লো না কিছু। জনসংযোগ বিভাগেও তো কতো খরচ হচ্ছে, সবায়েরই কিছু না কিছু হচ্ছে আর আমি মোটে হু'লাখ টাকা পেলে একটা কিছু করতে পারতুম।

পরের দিন যখন এলেন দেখলাম বেশ সুস্থ, কিছুদিন আগে কোথায় পুঠানো কি একটা বই অভিনয় করেছিলেন, লোকে তার দুর্নাম করেছে। তত্ত্বপোষে বসে বললেন—বুড়ো বয়েসে জাত খোয়ালুম। ও সব পুরানো বই কোনো মতেই করা উচিত হয়নি। পরিচিত একজন তো বললে, 'ও সমস্ত পুরানো বই ছাড়ুন, দেখছেন তো পুতুলখেলা করে বহুতলী কতো নাম করেছে। আপনি তো আগার কাগজ দেখেন না', তা' দেখো, নাম তো কতলোকেই ক'রবে আবার কতো লোকই গেলো, ছত্রিশ বছরে অনেক তো দেখলুম! পাখর ওপরে উঠলেও শেষ পর্যন্ত মাটিতে নেবে আসে।

অভিনেতাদের মধ্যে কার গলা ভালো, এই প্রশ্নে বললেন—গলা আমার খুব খারাপ নয়; আজকালকার দিনে আমার মতো গলাও তো দেখি না কারোই। কিন্তু দানীবাবু, অমৃত মিত্র কি গিরিশচন্দ্রের মতো গলা আমারও নয়।

আবার বললেন—অনেকে বললেন চিরকুমার সভা একটি ভয়ানক নাটক, কেন যে অভিনয় হচ্ছে না! চিরকুমার সভা যদি নাটক হয়, তবে আমরা এতদিন বুখাই নাটক করেছি।

Prostitution প্রশ্নে বললেন—আমাদের দেশে prostitution আছে ব'লে আমরা ছোটো জাত। লগুনে দেখিনি, তবে ওয়েস্ট, সন্ধ্যার পর Picadillyতে বাপ-ছেলে একসঙ্গে পথ চলেতে পারে না। নিউইয়র্কে যেহেবা কেমন ক'রে, পুঙ্খমুখে pester

করতে পারে তার প্রমাণ শেষেছি। ওদের দেশের মেয়েরা কিছু নিলজ্জ। দু'চর ইশ্টিয় পাঠ আগিসে কাজ করে, কি নতুন কমানিয়ান যা এই ধরনের মেয়ের সঙ্গে বাইরে দাঁড়িয়ে জাব করা যায়।

—আমাদের দেশের বৈজ্ঞানিকদের মধ্যেও একটি ত্রুটি আছে। তারা রাত জেগে ক'রে সকালবেলা গলাবান সেবে ঠাকুরপ্রার্থন করার সময় চোখ দিয়ে জল পড়ছে দেখা যায়। রোমান ক্যাথলিকদের মধ্যেও ঠিক ওই ভাবটি দেখা যায়।

—আমাদের দেশে moral যে ভাঙে তার poverty is the cause কিন্তু only cause নয়, কেয়ের যদি নিজেরা কোঁপগার করে তো এ অবস্থার বদল হয়।

বিদেশী নাট্যকার ও নাটকে দলের প্রসঙ্গ কলেন—ব্রিয়েঁ লেপে ভালো, কিন্তু বড় বস্তুতাত্ত্বিক। বিদেশী দলেরদের ভালো হচ্ছে drilling। নিউইয়র্কে ভালো লেগেছে নিগ্রো বই Green Pastures। নাটক ঝাঁড় করতে হ'লে দরকার প্রাণ। নিগ্রোদেরই

প্রাণ আছে। আর কি গান! অমন গানের গলা একশে নেই।

—ও'নীর Desire under the Elms-এ আছে—বীত এসো, নয়তো দেশটা গেল। ওদের যেয়েদের আঠারো বছর বয়স পার হ'লেই কাউকে যদি খুব ভালোবাসে তো বলে, come on, my honey, I will manage.

—বিয়ে আর সার্বজনীন উৎসবে আমাদের যে বকম waste হয়, তা দেখে মনে হয় এ জাতের কিছু হবে না।

আবার (পুতুল পেলার কথায়) বললেন—নোরা আত্মকেও করতে বলেছিলো, তার উত্তরে আমি বলি, ইবসেন আঠারো শ' আটবার টি সালের, এখন নোরা পুরোনো হয়ে গেছে, তার চেয়ে অনেক শক্তিমতী নারী এখন রণক্ষেত্রে এসেছে।

—ইবসেনের নাটক Dated হ'য়ে গেছে। সেক্সপীরের সঙ্গে তার তফাৎও সেইখানেই। সমাজ একটু বদলালেই problems বদলে যায়। [ক্রমশঃ]

রাজধানীর পথে পথে

উমা দেবী

রেড রোডের শুকনো পাতা

উড়তে লাগল কয়েকটি শুকনো ঝরা পাতা
ছুটে-চলা মোটরের সামনে হাওয়ায় হাওয়ায়—
বাদামি, হলদে, লালচে আর না-রঙ শুকনো পাতা
নানা আকারের—হয়তো বা নানান বয়সের।
ওরা যেন কয়েকটি ক্ষণ—ছিল সুপ্ত হ'য়ে
বিশ্বস্তির মোলায়েম পুঙ্খ ধুলোর শষায়—
আর এই মুহূর্তে জেগে উঠল তড়িত-তাড়িত হ'য়ে
ছুটন্ত গাড়ীর উন্নত আবেগের অগ্নি-গর্ভ স্পর্শে।
ওরা যেন কয়েকটি প্রজাপতি—
ঘুমিয়েছিল ফুটে-ওঠা নানা রঙের মুহূর্তের
ফুলমধু পান ক'রে
সন্ধ্যার রাঙা রোদের ছায়া ছায়া আসরে,
রেড রোডের হুঁধারের গাছের আড়াল-দেওয়া বাসরে।

কত উন্মথিত হৃদয়ের মধু বরে-বাওয়া মুহূর্তের দল
কত অজ্ঞ বরে-বাওয়া ক্ষেপামির উনপকাশে হাওয়া
কত স্বপ্নের দিশাহারা চপলতা
ওই মুহূর্তগুলি—ওই পাতাগুলি—
ওই প্রজাপতিদের শুকনো ম'রে-বাওয়া
রঙিন ডানাগুলি,
পাতা হ'য়ে ঝরা আবার উড়তে লাগল
ছুটন্ত গাড়ীর প্রমত্ত আবেগের সম্মুখে
অগাধে ডুবে বাওয়ার স্তম্ভে—
গুম ভেঙে বাওয়া স্মৃতি-সচকিত পরীদের মত
কাঁপতে কাঁপতে
রক্তিম আলোয় বিহ্বল বাতাসে আসর
অন্ধকারের রহস্তে।

কানলায়—

একদিন এই মুহূর্তও মিশবে এই পাতার দলে
ঘুমিয়ে পড়বে হাওয়ার হাওয়ার মুহূর্ত চিরন্তন স্বপ্নে
বিতার হ'য়ে

শুধু আবার জেগে উঠতে—কৈপে উঠতে
কোনো এক ছুটন্ত গাড়ীর প্রমত্ত হাওয়ার সম্মুখে
অগাধে উড়ে বাবার স্তম্ভে।

কালীদেবী ও কালীপূজার ইতিহাস

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

পার্বতী উমা, সতী এবং দুর্গা-চণ্ডিকাৰ দ্বাৰা মিলিয়া পুৰাণ
অজ্ঞানিতে যে এক মহাদেবীৰ নিৰ্ঘৰ্জন দেখিতে পাই, তাহাৰ
সহিতআসিয়া মিলিত হইয়াছে আৰু একটী ধাৰা, 'তাহা হইল কালিকা
বা কালীৰ ধাৰা। এই কালী বা কালিকাটী বাঙলা দেশেৰ শক্তি-
সাধনাৰ ক্ষেত্রে শেষ পৰ্যন্ত সৰ্ব্বেশ্বৰী হইয়া উঠিয়া দেবীৰ অগ্ৰসৰ
ৰূপ অনেকখানি পিছনে ফেলিয়াছেন। বাঙলা দেশেৰ শক্তিসাধনা
এবং শক্তি সাহিত্যকে ভাল কৰিয়া বুজিয়া লইতে হইলে সেই জ্ঞান এই
কালী বা কালিকাৰ ধাৰাটিৰ প্ৰাচীন ইতিহাস একটু অন্বেষণ
কৰা প্ৰয়োজন। কি কৰিয়া এই দেবী মহাদেবীৰ সঙ্গে মিলিয়া
গেলেন তাহাৰ ইতিহাস বহু পুৰাণেৰ মনোই স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া
যায়।

সব দেবীৰ ইতিহাসই বেদেৰ মধ্য আৱিষ্কাৰ কৰিবাব আনাদেৰ
প্ৰাৰম্ভ। বেদেৰ ৰাজিহুত্বেক অবলম্বন কৰিয়া পৰবৰ্তী কালে
যে এক ৰাজিদেবীৰ ধাৰণা গড়িয়া উঠিছে কাঁচাৰণ্ড কাঁচাৰণ্ড
বিধাস সেই ৰাজিদেবীটী পৰবৰ্তী কালে কালিকা ৰূপ ধাৰণ
কৰিয়াছেন। আনাদেৰ এই কৃষ্ণ-ভয়ঙ্কৰী দেবীৰ প্ৰসঙ্গে বৈদিক
কৃষ্ণ-ভয়ঙ্কৰী নিৰ্দ্ধতি দেবীৰ কথাও কেত কেত স্মৰণ কৰাইয়া
দিয়াছেন। (১) 'শতপথ ব্ৰাহ্মণ' এবং 'ঐতৰেয় ব্ৰাহ্মণ' নিৰ্দ্ধতি
দেবীৰ উল্লেখ পাওয়া যায়। 'শতপথ ব্ৰাহ্মণ' দেবীকে কৃষ্ণা
(কৃষ্ণ হি তন্তুম আমাদেহ কৃষ্ণ বৈ নিৰ্দ্ধতিঃ, ৭।২.৭) এবং
ঘোৰা (ঘোৰা বৈ নিৰ্দ্ধতিঃ, ৭।২।১১) বলা হইয়াছে। 'ঐতৰেয়
ব্ৰাহ্মণ' (৪।১৭) নিৰ্দ্ধতি দেবীকে পাশতন্তা বলা হইয়াছে এবং
নিৰ্দ্ধতি দেবীৰ হস্তস্থিত এই পাশ হইতে ত্ৰাণ পাইবাব জ্ঞান প্ৰাৰ্থনা
জানান হইয়াছে। এই নিৰ্দ্ধতি দেবীৰ পৰবৰ্তী কালে আৰু কোনও
ইতিহাস দেখি না। সুতৰাং বৰ্ণনাৰ সান্নাৎ একটু কোথাও মিল
দেখিয়াই কোনও সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা উচিত মনে হয় না। পূৰ্বে
বলিয়াছি, অন্ধকাৰমূৰ্তিৰ ৰাজিদেবীকেও কালীৰ সহিত যুক্ত কৰা
হইয়া থাকে। ত্ৰয়োদশ শতকেৰ প্ৰথম ভাগে সংকলিত 'সমুজ্জ্বলমুখী'
নামক সংস্কৃত সংগ্ৰহগ্ৰন্থে কবি ভাস্কৰেৰ নামে দ্বিতীয় একটী শ্লোকে
দেখি কালীৰ বৰ্ণনাৰ বলা হইয়াছে, 'কুংক্ষাম' ইকাণ্ডচণ্ডী চিৰমবতুতৰাং
ভৈৰবী কালৰাজিঃ।'

বৈদিক সাহিত্যে কালী এই নামটি আমৰা প্ৰথম দেখিতে পাই
'বৃক্ক উপনিষদে'; সেখানে কালী ৰজাঘিৰ সন্ত জিহ্বাৰ একটী
জিহ্বা।

১। তাৰ জন উজ্জ্বল-কৃত Shakti And Shakta গ্ৰন্থেৰ
। মুখোপাধ্যায় লিখিত বিতীৰ পৰিচিষ্টে দ্ৰষ্টব্য।

কালী কৰালী চ মনোজবা চ
সুদৌহিতা বা চ শুভ্ৰবৰ্ণা।
ক্ষুণ্ণলী বিম্বকটী চ দেবী
লোলায়মানী ইতি সন্তজিহ্বাঃ ॥

এখানে 'কালী' আত্ম-গ্ৰহণকাৰিণী অগ্নিজিহ্বা মাত্ৰই; মাতৃ-
দেবীৰেৰ এখানে কোনও আভাসই নাই। শুভ্ৰ বিম্বকটীৰ ক্ষেত্রে
দীপ্যমানা অৰ্থে দেবী কথাটিৰ ব্যবহাৰ দেখিতে পাই। 'মহাভাৰতে'ও
যজ্ঞাঘিৰ এই সন্তজিহ্বাৰ উল্লেখ দেখিতে পাই (আদি, ২৩২।৭)।
দাৰ্শনিক মতে পঞ্চ ইন্দ্ৰিয়, বুদ্ধি ও মন এই সাতটিকে অগ্নিৰ সন্তজিহ্বা
বলিয়া গ্ৰহণ কৰা হইয়াছে।

প্ৰচলিত মহাভাৰতে একাধিক স্থলে 'কালী'ৰ উল্লেখ পাওয়া যায়
এবং পৌৰাণিক কালীদেবীৰ সহিত মহাভাৰতেৰ এই সকল স্থলে বৰ্ণিত
কালীদেবীৰ বেশ মিল লক্ষ্য কৰা যায়। দৌণ্ডিক পৰ্বে দেখিতে পাই,
দ্রোণেৰ মৃত্যুৰ পৰে দ্রোণপুত্ৰ অশ্বপাৰ্মা যখন ৰাজিতে পাণ্ডব-শিবিৰে
প্ৰবেশ কৰিয়া নিদ্রিত বাৰগণকে হত্যা কৰিতেছিলেন তখন সেই
হত্যাৰ বাৰগণ ভয়ঙ্কৰী কালীদেবীকে দেখিতে পাইয়াছিলেন। এই
কালীদেবী ৰক্তাক্তনয়না, ৰক্তমালাভূষণেপনা, পাশহস্তা এবং ভয়ঙ্কৰী।
কালীৰ ভীষণ স্বৰূপ সহস্ৰেৰ প্ৰতীক; কালৰাজিৰূপিনী এই দেবী
বিগ্ৰহবতী সাহাৰ।

মহাভাৰতে কালীদেবীৰ এই উল্লেখ পৰবৰ্তী কালেৰ যোজনা
হইতে পারে! পৰবৰ্তী কালেৰ যোজনা না হইলেও এই সব
বৰ্ণনায় কালীৰ কোনও দেবীৰেৰ আভাস নাই; কালী এখানে
অত্যন্ত ভীত মনেৰ একটা ভয়ঙ্কৰী ছায়ামূৰ্তি দৰ্শনেৰ জ্বাৰ। কবি
কালিদাসেৰ সময়েও কালী কোনও প্ৰধানা দেবী বলিয়া গৃহীতা হন
নাই। 'কুমাৰসম্বৎ' উমাৰ সহিত মহাদেবেৰ বিবাহ-প্ৰসঙ্গে
বৰ-যাত্ৰাৰ বৰ্ণনাৰ দেখিতে পাই, কৈলাস পৰ্বতেৰ মাতৃকাগণ
বিবাহযাত্ৰাৰ মহাদেবেৰ অমুগমন কৰিয়াছিলেন; আৰু—

তাসাক পশ্চাৎ কনকপ্ৰভাংগা
কালী কপালাভৰণা চকাশে।
বলাকিনী নীলপয়োদরাজী
দুঃ পুংক্ষিপ্তশতহৃদেব ॥ (৭।৩১)

কনকপ্ৰভা তাহাৰে (সেই মাতৃকাগণেৰ) পশ্চাচ্ছে কপালাভৰণা
কালী অগ্ৰে বিদ্যুৎপ্ৰসারকাৰিণী বলাকা সমৰ্ভিতা নীলমেঘৰাজিৰ
জ্বাৰ শোভা পাইতেছিলেন। মাতৃকাগণেৰ পশ্চাদ্গামিনী এই
কালীদেবী কালিদাসেৰ যুগেও একজন অপ্ৰধানা দেবী বলিয়া মনে
হয়। 'বৃক্কপাণ্ডে'ৰ মধ্য একটী উপমাতেও এই কালী বা কালিকা
দেবীৰ উল্লেখ দেখিতে পাই। নাম-লক্ষণেৰ জ্যানিঃশ্বন তদীয়

ভয়ঙ্করী তাড়কা রাক্ষসী বখন আশ্রয়প্রকাশ করিল তখন সেই যনকুক
রাত্রির ভায় কৃষ্ণবর্ণী তাড়কাকে মনে হইতেছিল চক্কলকপালকুণ্ডলা
বলাকায়ুস্তা কালিকার মত।

জ্যানিনাদমথ গৃহুতী তয়োঃ

প্রাচুরাস বহুলক্ষপাঙ্খবিঃ।

তাড়কা চলকপালকুণ্ডলা

কালিকেব নিবিড়া বলাকিনী ॥ (১১।১৫)

মল্লিনাথ ‘কালিকা’ শব্দের অর্থ কালিকাদেবী করেন নাই,
‘কালিকা’ শব্দের এক অর্থ ‘ঘনাবলী’, সেই অর্থ ধরিয়া এবং ‘বলাকিনী’
কথার সহিত যুক্ত করিয়া ‘ঘনাবলী’ অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু
‘চলকপালকুণ্ডলা’ কথাটি তাড়কা সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইলেও ইহা কালিকা
দেবীর কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়।

এই প্রসঙ্গে আর একটি তথ্য বিশেষ ভাবে লক্ষ্যণীয়। কবি
কালিদাসের ‘কালিদাস’ নামটির ব্যুৎপত্তি কি? ‘কালীর দাস’ এই
অর্থ কি কালিদাস? ‘দে’ এখানে বিকল্পে হ্রস্ব হইয়াছে, ‘কালীদাস’
পদও বিকল্পে সিদ্ধ। কালিদাসের লেখার মধ্যে কালী তেমন কোনও
প্রসিদ্ধ দেবী লাভ করেন নাই বটে, কিন্তু কালিদাস নামের
ব্যুৎপত্তিতে মনে হয়, কালীর দেবী তখন যত সঙ্গীর্ণ ক্ষেত্রেই হোক,
প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

কালিদাসের পরে সংস্কৃত সাহিত্যে স্থানে স্থানে এক রক্তলোলুপা
ভয়ঙ্করী দেবীর উল্লেখ পাই। যে নামেই দেবীকে পাই না কেন,
মনে হয় এই সকল দেবী তখন পর্যন্ত ব্রাহ্মণ্যধর্ম স্থান করিয়া লইতে
পারেন না। আমরা ‘খিল হরিবংশে’ মজুমৎসপ্রিয়া দেবীকে
শবর, বর্ষর, পুলিন্দগণ কর্তৃক পূজিত হইবার কথা পাইয়াছি।
স্ববধুর (ষষ্ঠ শতক বা সপ্তম শতকের প্রথম) ‘বাসবদত্তা’র আমরা
দুষ্টমপুত্রের গঙ্গাতীরে ভগবতী বা কাত্যায়নীর বাসের কথা জানিতে
পার। এই দেবী ‘সুস্ত-নিমস্ত-মহাবন-দাবজালা’, ‘মহিবমহাসুর-
গিবিবজ্রসারধারা’ এবং ‘প্রণয়প্রণতগঙ্গাধরজটাজুট-খলিত-জাহ্নবী-
জলধারাস্থতপাদপদ্মা’ বটেন, কিন্তু ‘বেতালাভিধানা’। এই ‘বেতালা’
অভিধানটিই এখানে তালাভঙ্গ করে। বাণভট্ট রচিত (সপ্তম শতক?)
‘কাদম্বরী’তে আমরা শবরগণ কর্তৃক বনমধ্যে যে ভাবে কথিরের প্রানন
দিয়া ‘চণ্ডীর’ পূজার বর্ণনা পাই, বিশেষতঃ চণ্ডী-পূজক বৃদ্ধ শবরের
যে ছুগুপ্ত বর্ণনা দেখিতে পাই, তাহা কবির শবরপূজিতা
বক্তলোলুপা ভয়ঙ্করী চণ্ডীদেবীর প্রতি অপ্রত্যাশিত ভোতনা করে।
বাক্যপতিবাজ (অষ্টম শতক) তাঁহার ‘গউড়বহো’ প্রাকৃত কাব্যে
শবরপূজিতা ‘পর্বা’ বা পদ্মপরিহিতা ‘পর্বাশবরী’র উল্লেখ করিয়াছেন।
ভগভট্টর রচিত (সম্ভবতঃ সপ্তম শতক) ‘মালতীমাধব’ নাটকের
পঞ্চমঙ্কে আমরা নরমাংস-বলিদানে পূজিতা ভয়ঙ্করী ‘করাল’ দেবীর
বর্ণনা পাই। এই দেবীই ভয়ঙ্করী চাণুগা; বনপ্রদেশ সন্নিকট
শশামবাটের নিকটে ইহার মন্দির। ইনি কৃষ্ণবর্ণী উগ্রা দেবী।

কৃষ্ণবর্ণী শোণিতলোলুপা ভয়ঙ্করী চাণুগা দেবীকে আমরা কালী
বা কালিকাদেবীর সহিত পরবর্তী কালে অভিন্না দেখিতে পাই। কিন্তু
মনে হয়, ইহার মূলে দুই দেবী ছিলেন; আকার সাদৃশ্যে এবং সাধা
ইহার পরবর্তী কালে এক হইয়া গিয়াছেন।

এই কৃষ্ণবর্ণী ভয়ঙ্করী কালিকা ও চাণুগা দেবী এক পরমেশ্বরী
মহাদেবীর সঙ্গে যুক্ত হইয়া এক হইয়া গিয়াছেন। মার্কণ্ডের ‘চণ্ডী’তে

এই মিলনের পৌরাণিক ব্যাখ্যা দেখিতে পাই। উপাখ্যানাদির
সাহায্যে পুরাণকারেরা এই-জাতীয় মিলন মিশ্রণ বা সমন্বয়ের ব্যাখ্যা
দিয়াছেন। চণ্ডীতে দেখিতে পাই, ইন্দ্রাদি দেবগণ সুস্ত-নিমস্ত
বধের জন্ত হিমালয়ে স্থিতা দেবীর নিকটে উপস্থিত হইলে দেবীর
শরীরকোষ হইতে আর এক দেবী সমুদ্ভূতা হইলেন, এবং এই দেবী
যেহেতু পার্বতীর শরীরকোষ হইতে নিঃসৃত হইয়াছিলেন সেই জন্ত
সেই দেবী ‘কৌশিকী’ নামে লোকে পরিগীতা হইলেন। (২) কৌশিকী
দেবী এইরূপে দেহ হইতে বহির্গতা হইয়া গেলে পার্বতী নিজেই কৃষ্ণবর্ণী
হইয়া গেলেন, এই জন্ত তিনি হিমাচলবাসিনী ‘কালিকা’ নামে
সমাখ্যাতা হইলেন। (৩) মনে হয় এই যুগে কালিকা দেবী কিঞ্চিৎ
প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মও খানিকটা গৃহীতা
হইয়াছিলেন, সেই জন্ত হিমাচলবাসিনী দেবীর সহিত এইভাবে
তীর্হাকে মিলাইয়া লওয়া হইল। এখানে ‘কালিকা’র আবির্ভাব-রহস্য
এইরূপ দেখিলাম বটে, কিন্তু একটু পরেই গিয়া আবার অন্তরূপ
দেখিতে পাই। সুস্ত-নিমস্তের অমৃতের চণ্ড-মুণ্ড এবং তাহাদের সঙ্গে
অগ্নি অম্বরগণ দেবীর নিকটবর্তী হইলে—

ততঃ কোপং চকারোচ্চৈরম্বিকা তানরীন্ প্রতি।

কোপেন চাত্তা বদনং মসীবর্ণমভূৎ তদা।

ভ্রুকুটাকুটিলং তস্তা ললাটফলকাদ্ভ্রুতম্।

কালী করালবদনা বিনিক্ষান্তাসিপাশিনী। (৭।৫-৬)

‘তখন অম্বিকা সেই শক্রগণের প্রতি অত্যন্ত কোপ করিলেন;
তখন কোপের দ্বারা তাঁহার বদন মসীবর্ণ হইল। তাঁহার ভ্রুকুটাকুটিল
ললাটফলক হইতে ভ্রুত অসিপাশধারিণী করালবদনা কালী বিনিক্ষান্তা
হইলেন।’ এই কালী দেবী—

২। এই কৌশিকী দেবী অতিশয় সুলভী ছিলেন; তাঁহার
রূপেই সুস্ত-নিমস্ত যুক্ত হইয়াছিল। এই ‘কৌশিকী’ দেবী মূলে
(উক্তের ভাণ্ডারকরের মতে) কুশিক জাতির (tribe) দেবী ছিলেন।
দেখিতেছি, এই কৌশিকীরূপেই দেবী সুস্ত-নিমস্ত বধ করিয়াছিলেন।
কুশিক-জাতির এই কৌশিকী দেবীই কি সুস্ত-নিমস্ত অম্বর নিধনের
উপাখ্যানাদি লইয়া হিমালয়-বাসিনী পার্বতীর মধ্যে আত্মবিলীন
করিয়া হিমালয়-বাসিনী দেবীকেই সুস্ত-নিমস্তবাহিনী করিয়া
তুলিয়াছিলেন? শিব-পুরাণ-সংহিতায় কৌশিকীর সুস্ত-নিমস্ত হননের
বিশেষ কারণ দেওয়া হইয়াছে। মার্কণ্ডের চণ্ডীতে দেখিতে পাইতেছি,
দেবীর দেহ হইতে গৌরবর্ণী অনিন্দ্যসুন্দরী যে দেবী বাহির হইলেন
তিনিই কৌশিকী; কিন্তু পদ্মপুরাণে অঙ্গকথা দেখিতে পাই, দেবীর
দেহ হইতে কৃষ্ণবর্ণী যে রাত্রি দেবা বাহির হইয়া আসিলেন তিনিই
কৌশিকী—এই কৌশিকী দেবীকে ব্রহ্ম বিদ্যাচলে প্রতিষ্ঠিতা হইতে
বলিলেন। কালিকা-পুরাণেও দেখি, কৌশিকী রূপে পার্বতীর দেহ
হইতে নিঃসৃত হইয়া কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়া বালিকা রূপ গ্রহণ
করিলেন। সেই দেবীই কালরাত্রি (৫।২৩।২-৩)। পরম্পর
বিরোধী উপাখ্যানগুলি দেখিয়া বেশ বোঝা যায়, কৌশিকী
নামে যে পৃথক দেবী ছিলেন তাঁহাকে মহাদেবীর সহিত মিশাইয়া
লইবার এই সব পৌরাণিক চেষ্টা।

৩। তস্তা বিনির্গতয়াঙ্ক কৃষ্ণাভূৎ সাপি পার্বতী।

কালিকেন্দি সমাখ্যাতা হিমাচলকৃত্যত্রয়া ॥ (৫।৮৮)

বিচিত্রখট, জখরা নরমালাবিভূষণ।

দীপচৰ্চপরাধানা শুদ্ধমাংসভিত্তিবরা।

অতিবিস্তারবদনা জিহ্বাললনভীষণ।

নিমগ্নায়ন্তনয়না নাদাপুরিতদিগ্‌মুখা ॥ (৭৭-৮)

‘বিচিত্রনরককাল-ধারিণী, নরমালা-বিভূষণা, ব্যাঘ্রচৰ্চপরিহিতা, শুদ্ধমাংসা (মাংসহীন অশ্বচৰ্চময় দেহ), অতিভৈরব্যা, অতিবিস্তার-বদনা, লোলজিহ্বা হেতু ভীষণা, কোটরগত রক্তবর্ণ চক্ষুবিশিষ্টা,— তাঁহার নামে দিগ্‌মুখ আপুরিত।’

দেবী হইতে বিনিন্দিত হইয়াই সেই কালীদেবী বেগে দেবশত্রু অনুরগণের সৈন্তমধ্যে অভিপত্তিতা হইয়া সেখানে মহা-অনুরগণকে বিনাশ করিতে করিতে তাহাদের সৈন্তবলকে ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই দেবী পূর্ভ-রক্ষক, অক্ষুণ্ণাতক, যোদ্ধা ও গলবটাদিসহ হস্তীগুলিকে হস্তে লইয়া সু-গ্রাস করিতে লাগিলেন। শুধু হস্তীগুলিকে নয়, ঘোড়ার সহিত যোদ্ধাকে, সারথির সহিত রথকে মুখে কেঁদিয়া দিয়া দস্তদ্বারা অভিভীষণ ভাবে চৰ্ণ করিতে লাগিলেন। কাহাকেও চুলে ধরিলেন, আবার কাহাকেও গ্রীবার ধরিলেন; কাহাকেও পায়ের দ্বারা আক্রমণ করিয়া অত্যন্ত বন্ধের দ্বারা মর্দিত করিলেন। সেই অনুরগণ কতৃক নিক্ষিপ্ত শস্ত্রগুলিকে এক মহাশস্ত্রগুলিকে তিনি মুখে গ্রহণ করিলেন এবং রোষে দস্তদ্বারা মখিত (চূর্ণ) করিলেন। অনুর দলের কতগুলিকে তিনি মর্দন করিলেন, কতগুলিকে ভক্ষণ করিলেন, কতগুলিকে বিভাড়িত করিলেন। অনুরগণ কেহ কেহ অসিধারা নিহত হইল, কেহ কেহ কঙ্কালের দ্বারা তাড়িত হইল, কেহ কেহ দস্তদ্বারা বিনাশ প্রাপ্ত হইল। ক্ষণকাল মধ্যে সমস্ত অনুরসৈন্ত নিশ্চিহ্ন দেখিয়া চণ্ড সেই অভিভীষণ কালীর দিকে ধাবিত হইল। সেই মহানুর চণ্ড মহাভীম শরবর্ষণের দ্বারা এবং মুণ্ড চক্রসমূহের দ্বারা সেই ভীষণনয়নাকে ছাইয়া ফেলিল। কিন্তু কালমেঘের উদরে যেমন অসংখ্য সূর্যবিধ শোভা পায় সেইরূপ চক্রসমূহ তাঁহার মুখগহবরে প্রবিষ্ট হইয়া শোভা পাইল। অতঃপর ভৈরবনাদিনী কালী অতিরোষে ভীষণ ভাবে অট্টহাস করিলেন— তাঁহার করাল বক্তৃতা অস্তঃপাতি ভীষণদর্শন দশনগুলি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাহার পরে মহাশব্দ উত্তোলন পূর্বক দেবী হস্তারনাদে (হং শব্দে) চণ্ডের প্রাণ ধাবিত হইলেন, এবং তাহার চুলে ধরিয়া সেই খড়্‌গের দ্বারা তাহার শিরশ্ছেদ করিলেন। চণ্ডকে নিশ্চিহ্ন দেখিয়া মুণ্ড দেবীর প্রতি ধাবিত হইল; দেবী ক্রোশে তাহাকেও খড়্‌গের দ্বারা আহত করিয়া ভূমিতে পাত্তিত করিলেন। হতশেষ অনুরসৈন্তগণ চণ্ডমুণ্ডকে নিহত দেখিয়া ভয়ে চতুর্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। চণ্ডমুণ্ডের ছিন্ন মুণ্ড হাতে গ্রহণ করিয়া কালী চণ্ডিকার নিকটে গিয়া প্রচণ্ড অট্টহাসের সঙ্গে বলিলেন,—‘এই বৃদ্ধজ্ঞে আমি এই চণ্ড-মুণ্ড দুই মহাপণ্ড তোমাকে উপহার দিলাম, তুমি যদ্যৎ শুভ-নিশ্চয়কে হ্রাস করিবে। দেবী চণ্ডিকা বখন কালীকে বলিলেন,—

বমাং চণ্ডক মুণ্ডক গৃহীত্বা বহুপাগতা।

চামুণ্ডেতি ততো লোকে খ্যাতা দেবি ভবিষ্যতি ॥ (৭১২৭)

‘বেহেছ তুমি চণ্ড ও মুণ্ডকে (তাহাদের ছিন্ন শির) লইয়া আসিয়াছ, সেই কারণে তুমি লোকে চামুণ্ডা নামে খ্যাত হইবে।’

চণ্ড শব্দ হইতে বা মুণ্ড শব্দ হইতে চামুণ্ডা শব্দ হয় না; চণ্ডের ও মুণ্ডের মুণ্ড লইয়া তাহার পরে অকারেণ ‘চ’তে দীর্ঘ করিয়া এবং দ্রীলিঙ্গে ‘আ’-প্রত্যয় করিয়া চামুণ্ডা শব্দ বানাইতে হয়। এ-জাতীয় ব্যাংগতিগুলি প্রায়ই সৌজামিলের জন্ত পুরাণকারগণ আবিষ্কার করিয়া থাকেন। আসলে পুরাণকার তৎকালের প্রচলিত কালীদেবীকে এবং তৎসদৃশা চামুণ্ডা দেবীকে মহাদেবীর সঙ্গিত যুক্ত করিয়া লইবার প্রয়োজনবোধ করিয়াছিলেন; স্তূতরাং দেবীকে ‘কালী’ করিয়া এবং চণ্ড-মুণ্ড-দ্বয় চামুণ্ডা করিয়া সেই কাৰ্য সাধন করিলেন।

রক্তবীজ-বধের সময়ও কালীদেবী চণ্ডিকাকে বিশেষভাবে সহায়্য করিয়াছিলেন। অস্ত্রশস্ত্রাহত রক্তবীজের দেহ হইতে রক্তদ্বারা ভূমিতে পড়িবারাত্রই সেই রক্ত হইতে রক্তবীজের গ্রাণ অসংখ্য অনুর বোঁদ্ধা উদ্ভিত হইতেছিল; তখন দেবী চণ্ডিকা—

উবাচ কালী চামুণ্ডে বিস্তরং বদনং কুরু ॥

দেবী কালীকে বদন বিস্তার করিয়া রক্তবীজের দেহ হইতে নির্গত রক্তবিন্দু সকল মুখব্যাদনের দ্বারা গ্রহণ করিতে বলিলেন—এবং সেই রক্তনির্গত অনুরগণকেও ভক্ষণ করিতে বলিলেন। দেবী এই বলিয়া শূলের দ্বারা রক্তবীজকে আহত করিলেন, কালীও মুখের দ্বারা তাহার রক্ত লেহন করিলেন। সেই কালী-চামুণ্ডার মুখে পতিত শোণিত হইতে বত সকল অনুর সমুদগত হইয়াছিল তাহাদিগকেও চামুণ্ডা ভক্ষণ করিলেন। চামুণ্ডার এইরূপ শোণিত পানের ফলে রক্তবীজ নিরস্ত হইয়া গেল এবং দেবী তখন অতি সহজেই তাহাকে হনন করিলেন। কালী-চামুণ্ডার রক্তলোলুপ এই ভাবে ‘চণ্ডী’তে নৃতন রূপে প্রকাশ পাইল।

রক্তলোলুপা কালীর এখানে যে ভয়ঙ্করী রণোন্মাদিনী রূপ দেখিতে পাইলাম অস্ফুট পুরাণে এই জাতীয় বহু বর্ণনা দেখিতে পাই। উপপুরাণগুলিতে ইহার আর কিছু কিছু বিস্তারও দেখিতে পাই। পরবর্তী কালের পুরাণতন্ত্রাদিতে আমরা কালী ও চামুণ্ডাকে এক করিয়াও পাই, পৃথক্ করিয়াও পাই। উভয়দেবীর ধ্যানও পার্থক্য আছে। চামুণ্ডা চতুর্ভূজা নন, দ্বিভূজা; আললিত-কুন্তলা নন, ‘পিন্ধলমুখ’জা (জটাধারিণী?); উল্লসিনী নন, শাদূলচর্চাবৃত্তা (কোন কোন পুরাণে গজচর্চাধরা) সর্বস্থলের বর্ণনাতেই দেখি, চামুণ্ডাদেবী নির্মা সা এক ক্রোধাদরী, তাঁহার চক্ষু কোটরাগত। কোন স্থলেই কালিকার এইরূপ বর্ণনা দেখিতে পাই না। সংস্কৃত-সঙ্কলন গ্রন্থগুলিতে কালিকার বর্ণনায় মাঝে মাঝে দেখিতে পাই যে কালিকা অজিনাবৃত্তা। ৪ ‘সদ্বক্তিকর্ণামৃত’ বৃত্ত উমাগতি ধরের একটি শ্লোকেও কালীকে অজিনাবৃত্তাই দেখিতে পাই। ইহা পরবর্তী কালের মিশ্রণের ফলে ঘটিয়াছে বলিয়া মনে করি। চামুণ্ডার বর্ণনায় একটা জিনিস প্রায় সর্বত্রই লক্ষ্য করি, চামুণ্ডা অতি ক্ষুধার ক্রোধাদরী। কবিগণ কতৃক কালীর বর্ণনায়ও স্থানে স্থানে কালীকে ক্ষুধার্তরূপে দেখি। ভাসোক কবি কালীকে ‘ক্ষুৎকামা’ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অত্যাধিতরক্তভাগাগারে কালীর বর্ণনায় দেখি—

দীপ্তকুণ্ডেগোবাগাদনহলহল্লস্বজিহ্বাগ্রলীট-

ত্রকাণ্ডকৌত্রবিশ্বপ্রবলভরভবজ্যঠারাগি-কুলিঙ্গাম্ ॥

কালী: কঙ্কালশ্যামতুল্যগললেন্দুমালাকরালী-

জ্ঞানসংবাদিনেজামজিননিবসনাং নোমি পাশাহিস্তাম্ । ৫

পূরণ, উপপূরণ ও তন্ত্রাদির মধ্যে আমরা কালী বা কালিকার যে বিস্তার ও বিবর্তন দেখিতে পাই, সে বিষয়ে আমরা দীর্ঘ আলোচনা করিতে চাহি না। এই বিবর্তনের ভিতরে সর্বাংশে লক্ষ্য বস্তু হইল কালীর শিবের সঙ্গে যোগ। শিব কালীর পদে স্থিত। কালীর এক পদ শিবের বৃকে জন্তু। সাংখ্যের দিক হইতে এই তত্ত্বকে নানাভাবে গভীরার্থক বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। ৬ কিন্তু কয়েকটি উপাদান মুখ্যভাবে এই শিবাক্রান্ত দেবীর বিবর্তনে সাহায্য করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। প্রথমতঃ সাংখ্যের নিষ্ঠুর পুরুষ ও ত্রিগুণাত্মিক প্রকৃতির তত্ত্ব। দ্বিতীয়তঃ তন্ত্রের 'বিপরীতরতাতুরা' তত্ত্ব। তৃতীয়তঃ নিক্রিয় দেবতা শিবের পরাক্রমে বলরূপিণী শক্তিদেবীর প্রাধান্য এবং প্রতিষ্ঠা। কিন্তু এ বিষয়ে সর্বাংশে প্রধান কারণ—যাতা মনে হয় তাহা হইল এই, প্রাচীন বর্ণনার কালিকা শিবাক্রান্ত নন, শিবাক্রান্ত; অস্তরনিধন করিয়া অস্তরগণের শব তিনি পরদলিত করিয়াছেন, সেই কারণেই তিনি শিবাক্রান্ত বলিয়া বর্ণিত। দক্ষিণাকালীর প্রচলিত ধ্যানের মধ্যেও দেখিতে পাই—

শবরূপ-মহাদেব-জদয়োপরি-সংস্থিতাম্ ।

... ..

মহাকালেন চ সমঃ বিপরীতরতাতুরাম্ ॥

পরবর্তী কালের দার্শনিক চিন্তায় শক্তি বিহনে শিবেরই শবত্যাগীপ্তির তত্ত্ব খুব প্রসিদ্ধ হইয়া ওঠে, এবং মনে হয় তখন শিবই পূর্ববর্তী কালে বর্ণিত শবের স্থান গ্রহণ করেন—শিবাক্রান্ত দেবীও তাই শিবাক্রান্ত হইয়া ওঠেন। অস্তরের শবাক্রান্ত বলিয়াই যে দেবী শিবাক্রান্ত বলিয়া কীৰ্ত্তিতা বাঙলা দেশের শাক্ত-পদাবলীর মধ্যে এই সগতির প্রত্যক্ষ প্রভাব দেখিতে পাই। সাংখ্য রামপ্রসাদের নানে প্রচলিত একটি গানে দেখিতে পাই—

শিব নয় মায়ের পদতলে ।

ওটা মিথ্যা লোকে বলে ॥

দৈত্য বেটা ভুমে পাড়ে,

মা দাঁড়িয়ে তার উপরে,

মায়ের পাদম্পর্শে দানবদেহ

শিবরূপ হয় রণস্থলে । ৭

মায়ের পাদম্পর্শে দানবদেহের শিবরূপতা প্রাপ্তির আসল অর্থ হইল, শক্তিতন্ত্রের প্রাধান্যে শক্তির চরণলয় অস্তরের শবই তত্ত্ব-দৃষ্টিতে শিব রূপান্তরিত হইয়াছে। আধুনিক কালে রচিত মৈথিল কবীসহ ঠাকুরের দেবী-বর্ণনাতো দেখি—'শিবশবরূপ-উরসি তুচ্ছ

৫। কবি স্বতন্ত্রনাথ সেনগুপ্ত এই কুখ্যাত কালীমূর্ত্তিকে অবলম্বন করিয়া একটি অপূর্ব আধুনিক কবিতা রচনা করিয়াছেন তাঁহার 'ত্রিমা' কাব্যগ্রন্থের 'পশারিণী' কবিতায়।

৬। দ্রষ্টব্য—'শিবের বৃকে, শ্যামা কেন?'—বিজয়কৃষ্ণ দেববর্মা।

৭। ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ, ডক্টর শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, ৩৮ পৃ:।

পদযুগ, সলা বাস সমসানে । ৮ তন্ত্রাদিতে শিবের বৃকে কালীর প্রতিষ্ঠা বিষয়ে বহুবিধ দার্শনিক ব্যাখ্যা দেখিতে পাই। যেমন মহানির্বাণ তন্ত্রে বলা হইয়াছে, তিনি মহাকাল তিনি সর্বপ্রাণকে কলন অর্থাৎ গ্রাস করেন ব'লিয়াই মহাকাল; দেবী আবার এই মহাকালকে কলন অর্থাৎ গ্রাস করেন, এই নিমিত্ত তিনি আত্মা পরম 'কালিকা'। কালকে গ্রাস করেন বলিয়াই দেবী কালী। তিনি সকলের আদি, সকলের কালস্বরূপা এবং আদিভূতা, এই নিমিত্তই লোকে দেবীকে আত্মিকালী বলিয়া কীৰ্ত্তন করে।—

কলনাং সর্বভূতানাং মহাকালঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ।

মহাকালস্ত কলনাং যমাতা কালিকা পরা ॥

কালসংগ্রহণং কালী সর্বেধামাদিক্রপণী ।

কালবাদানিভূতখাদাত্মা কালীতি গীয়াসে ॥

বিভিন্ন পূরণ-তন্ত্রাদির ভিতরে 'কালীতন্ত্র' দ্বারা কালীর বর্ণনাই কালীর ধ্যানরূপে কৃষ্ণানন্দের তন্ত্রসাধে গৃহীত হইয়াছে এবং কালীর এইরূপই এখন সাধারণ ভাবে বাঙলা দেশের মাতৃপূজায় গৃহীত। দেবী কয়ালবদনা, ঘোরা, মুক্তকেশী, চতুর্ভূজা, দক্ষিণা, দিব্যা, মুণ্ডমালাবিভূষিতা। বামহস্ত যুগলের অধোহস্তে সত্ত্বশুদ্ধ শির, আর উর্ধ্বহস্তে খড়্গ; দক্ষিণের অধোহস্তে অভয়, উর্ধ্বহস্তে বর। দেবী মহামেঘের বর্ণের স্তায় স্ত্রীম বর্ণা (এই জন্তই কালী দেবী স্ত্রীমা নামে খ্যাতা) এবং দিগম্বরী; তাঁহার কণ্ঠলয় মুণ্ডমালা হইতে ক্ষরিত কধিরের দ্বারা দেবীর দেহ চর্চিত; আর দুইটি শবশিত তাঁহার কর্ণভূষণ। তিনি ঘোররক্ত্রা, করালান্তা, গীনোন্নতপয়োদর; শবসমূহের করদ্বারা নির্মিত কাঞ্চী পরিহিতা হইয়া দেবী হসমুখী। ওষ্ঠের প্রান্তস্থর হইতে গলিত রক্তধারা দ্বারা দেবী বিক্ষুরিতাননা; তিনি ঘোরনাদিনী, মহারোজী—আশানগৃহবাসিনী। বালমূর্যমণ্ডলের স্তায় দেবীর ত্রিনেত্র; তিনি উন্নতদন্তা, তাঁহার কেশদাম দক্ষিণব্যাপী ও আবলুগিত। তিনি শবরূপ মহাদেবের জদয়োপরি সংস্থিতা; তিনি চতুর্দিকে ঘোররবকারী শিবাক্রান্তের দ্বারা সমাধিত। তিনি মহাকালের সহিত 'বিপরীতরতাতুরা'-সুখপ্রসন্নবদনা এবং 'স্বেদাননসরোজা'। (১)

সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে কালীর বর্ণনা খুব কম পাওয়া যায়। 'সহস্রকর্ণামৃত'ে অন্ত্যাতনামা কবির একটি চমৎকার কালীবর্ণনা পাওয়া যায়।—

শিখণ্ডে খণ্ডেন্দুঃ শশিদিনকরৌ কর্ণযুগলে

গলে তারাহারন্তরলমুডচক্রং চ কুচয়োঃ ।

তড়িংকাঞ্চী সন্ধ্যাসিচয়রচিত্তা কালি তদয়ঃ

তবাকরঃ কল্পবৃন্দমধ্যে বিলম্বতে ॥

শিখণ্ডিনী দেবীর ময়ূরপুচ্ছ-চূড়াতোই খণ্ড-ইন্দু; কর্ণযুগলে দুই কুণ্ডল হইল চন্দ্র সূর্য; গলার তারার হাব, কুচযুগলে উড্ডচক্র (চন্দ্রপখচক্র); তড়িংই কাঞ্চী; সন্ধ্যাই ছিন্ন মলিন বসন।

'মহানির্বাণ-তন্ত্র'র মধ্যে কালীর প্রচলিত রূপের চমৎকার একটি আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা রহিয়াছে। সেখানে দেখি পার্বতী দেবী মহেশ্বরকে প্রেম করিতেছেন যে, মহাদেবানি-স্বরূপা আদিশক্তিস্বরূপিণী মহাহ্যাত্তি-সম্পন্ন মুক্খাতিম্বন্ধভূতা যিনি মহাকালী তাঁহার আবার

৮। গীতিমালা, শ্রীউমানন্দ ঝা সংকলিত। ১৪।৩১-৩২।

৯। কয়ালবদনা ঘোরা: মুক্তকেশী: চতুর্ভূজা—ইত্যাদি।

শক্তিনিরূপণ কিরূপে সম্ভব? উত্তরে সলাশিব বলিতেছেন—‘হে প্রিয়ে, পূর্বেই কথিত হইয়াছে, উপাসকগণের কাধের নিমিত্ত গুণক্রিয়া অনুসারে দেবীর রূপ প্রকল্পিত হইয়া থাকে। খেতগীতাদি বর্ণ যেমন কৃষে বিলীন হয়, হে শৈলক্ষে, সর্বভূতসমূহ তেমনই কালীতে প্রবেশ করে। এইজন্যই যোগগণের হিতের জন্ত সেই নিগুণা নিমাকারা কালশক্তির বর্ণ কৃষ্ণ বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। অমৃততত্ত্বের ‘হেতুই এই নিত্য কালরূপা অব্যায় কল্যাণরূপিবীর ললাটে চন্দ্রচিহ্ন নিরূপিত হইয়াছে। নিত্যকালীন শশি সূর্য অগ্নি দ্বারা তিনি এই কালকৃত জগৎ সম্যক দর্শন করেন বলিয়া তাঁহার তিনটি নয়ন কল্পিত হইয়াছে। সর্বপ্রাণীকে গ্রাস করেন বলিয়া এবং কালদেগের দ্বারা চর্বণ করেন বলিয়া তাহাদের রক্তসমূহ এই দেবেশ্বরীর বসনরূপে বলা হইয়াছে। সময়ে সময়ে বিপদ হইতে জীবকে রক্ষণ এবং স্ব স্ব কাৰ্ধে প্রেরণই দেবীর বর ও অভয় বলিয়া ভাবিত। রজোগুণজনিত বিশ্বসমূহকে তিনি ব্যাণ্ড করিয়া অবস্থান করেন এই জন্তই, হে ভগ্নে, তিনি রক্তপদ্মাসনস্থিতা বলিয়া কথিত হন। মোহময়ী সুরা পান করিয়া সেই সর্বশাস্ত্রশরুপিনী দেবী কালসমুদ্র ক্রীড়াময় স্রষ্টিকে দর্শন করেন। এইভাবে অল্পবৃদ্ধ ভক্তগণের হিতের জন্ত গুণানুসারে দেবীর বিবিধ রূপ কল্পিত হইয়া থাকে। (১০)

‘ব্রহ্মবামসে’ আভ্যাস্তোত্রে যেখানে আভা দেবী কোন্ দেশে কি মূর্তিতে পূজিতা হন তাহার একটি তালিকা দেওয়া হইয়াছে সেখানে দেখিতে পাই, ‘কালিকা বঙ্গদেশে চ’, বঙ্গদেশে দেবী কালিকারূপে পূজিত। উক্তটিকে আমি ইতিহাসের দিক হইতে গভীরার্থবাক্য বলিয়া মনে করি। দেশ হিসাবে বাঙলাদেশই শক্তিসাধনার প্রধান কেন্দ্র। পূজার দিক হইতে বিচার করিলে বাঙলাদেশে কালীপূজা হইতে দুর্গাপূজা প্রাচীনতর এবং ধর্মোৎসবের রূপে এখন পর্যন্তও দুর্গাপূজাই অধিক ব্যাপকতা, জনপ্রিয়তা এবং জাঁক-জমক। কিন্তু বাঙ্গালী যে বিশেষ করিয়া শাক্ত তাত্ত্বিক শুধু তাহার ধর্মোৎসব রূপে শক্তি-পূজার জন্ত নয়, তাহা তাহার সাধনার জন্ত; সেই সাধনার দিক হইতে বিচার করিলে দেখিব, খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতক হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান কাল পর্যন্ত শক্তি-সাধনার কেন্দ্রে কালী; তারাকোও আমরা কালীহানীয়া করিয়াই লইয়াছি; দশমহাবিজ্ঞার ভিতরকার অজ্ঞাত মহালিঙ্গাগণও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।

দুর্গা-পূজা ঠিক কখন হইতে বাঙলাদেশে প্রচলিত সে-কথা একেবারে নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না; তবে খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ, পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে রচিত কতগুলি দুর্গা-পূজাবিধান পাইতেছি। এই বিধানগুলি মুখ্যতঃ দেবীপূরণ, দেবীভাগবত, কালিকা-পুরাণ, ভবিষ্যপুরণ, বৃহদ্রস্মিকেশ্বর-পুরাণ জাতীয় কয়েকখানি উপপুরাণ হইতে সঙ্কলিত।

বিজ্ঞাপতির ‘দুর্গাভক্তিভরঙ্গিনী’তে দেখিতে পাই, ‘কালী-বিলাস তন্ত্রে’ কার্তিকগণেশ, জয়-বিজয়া (লক্ষী-সরস্বতী) এবং দেবীর বাহন সিংহ সমেত প্রতিমার শারদীয়া দুর্গাপূজার উল্লেখ আছে। প্রাচীন পুরাণ আদির মধ্যে অগ্নিপুরণের ১৮ অধ্যায়ে সংক্ষেপে গৌরীপ্রতিষ্ঠা ও গৌরীপূজার বিধান আছে। ঐ পুরাণের ৩২৬ অধ্যায়ে অতি সংক্ষিপ্ত উমা-পূজার বিধিও দৃষ্ট হয়। গল্প-পুরাণের ১৩৫-৩৬ অধ্যায়ে নবরী তিথিতে দেবী দুর্গার পূজা-বিধি বর্ণিত হইয়াছে।

এই দেবীপূজা-বিধানকল্পগণের পরিচয় অনেকেই দিয়াছেন, স্বামী জগদীশ্বরানন্দ তাঁহার ‘শ্রীচীতা’র ভূমিকায় ইহাদের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন তাহাই এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। “শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক বিখ্যাত বাঙ্গালী স্মৃতিনিবন্ধকার রঘুনন্দন পঞ্চদশ (ষোড়শ?) শতকে আবির্ভূত হন। রঘুনন্দনের (১৫০০-১৫৭৫) ‘তিথিতত্ত্ব’ গ্রন্থে ‘দুর্গোৎসবতত্ত্ব’ নামক একটি প্রকরণ আছে এবং তাঁহার ‘দুর্গাপূজাতত্ত্ব’ নামক মৌলিক গ্রন্থে দুর্গাপূজার সম্পূর্ণ বিধি প্রদত্ত। রঘুনন্দন নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে তিনি পূর্বতন পণ্ডিত ও প্রবাদসমূহ হইতে তাঁহার গ্রন্থদ্বয়ের অনেক উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। তিনি কালিকাপুরাণ, বৃহদ্রস্মিকেশ্বরপুরাণ ও ভবিষ্য-পুরাণ হইতেও বহু বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন। তৎপূর্ববর্তী নিবন্ধকার রামকৃষ্ণের রচিত নিবন্ধের নাম ‘দুর্গাচন্দ্রিকা’। মিথিলায় প্রসিদ্ধ স্মার্তপণ্ডিত বাচস্পতি মিশ্র (১৪২৫—১৪৮০) তাঁহার ‘জিয়াচিন্তামণি’ এবং বাসন্তীপূজাপ্রকরণ গ্রন্থদ্বয়ে দুর্গাদেবীর মুদ্রায় প্রতিমার পূজাপদ্ধতি বিবৃত করিয়াছেন। বাচস্পতি রঘুনন্দনের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। বিখ্যাত বৈষ্ণবকবি বিভূতিপতি (১৩৭৫—১৪৫০) তাঁহার ‘দুর্গাভক্তিভরঙ্গিনী’ গ্রন্থে ১৪৭১ খ্রিঃ মুদ্রায় দেবীর পূজাপদ্ধতি বর্ণনা করিয়াছেন। রঘুনন্দনের স্তর জীনাথের ‘দুর্গোৎসববিবেক’ গ্রন্থে উক্ত পদ্ধতির আলোচনা পাওয়া যায়। শূলপাণির (১৩৭৫-১৪৬০) ‘দুর্গোৎসববিবেক’ ও ‘বাসন্তী-বিবেক’ এবং ‘দুর্গোৎসব-প্রয়োগ’ নামক তিনখানি নিবন্ধ পাওয়া যায়। জম্মুতবাহন তাঁহার ‘দুর্গোৎসব নির্ণয়’ গ্রন্থে মুদ্রায় দেবীপূজার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। বাংলার এই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদ্বয় পরস্পরের সমসাময়িক ছিলেন এবং ষাটশ শতকের প্রথমার্ধে আবির্ভূত হন। শূলপাণি তাঁহার পূর্ববর্তী স্মৃতিনিবন্ধকারদ্বয় জীকন ও বাসকের বাক্যানুগা উদ্ধার করিয়াছেন। বাংলার প্রাচীনতম স্মৃতিনিবন্ধকার ভবদেব ভট্ট তাঁহার গ্রন্থে জীকন বালক ও জীকরের বহু বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন। জীকন ও বালক বাংলার সেন রাজাদেরও পূর্ববর্তী ছিলেন এবং ভবদেব ভট্ট ছিলেন একাদশ শতকের রাজা হরিবর্ষদেবের প্রধান মন্ত্রী।”

উপরিউক্ত তথ্যগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে মনে হয়, সম্ভবতঃ ষাটশ ত্রয়োদশ শতক হইতে দুর্গাপূজা বাংলা দেশে প্রচলিত আছে। পূজাবিধি রচিত হইবার পূর্ব হইতেই পূজা প্রচলিত থাকে। কিছুদিন পূজা প্রচলিত থাকিলেই পরে বিধির প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়—ধর্মের ইতিহাসে এইরূপই সাধারণতঃ দেখিতে পাই। বিজ্ঞাপতি যে ‘দুর্গাভক্তিভরঙ্গিনী’ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তাহা সম্ভবতঃ মিথিলায় সিংহরাজাগণের মধ্যে সমরবিজয়ী ধীরসিংহের আদেশে (মতান্তরে ধীরসিংহের পিতা নরসিংহদেবের আদেশে) ১১; আদেশ পাইয়াই বিজ্ঞাপতি পূজাবিধি লিখিতে আরম্ভ করিলেন কিরূপে? ‘দৃষ্ট। নিবন্ধস্থিতি’—এ বিষয়ে পূর্ববর্তী যে নিবন্ধ সকল ছিল তাহা দেখি।। প্রথমে হয়ত পূজাবিধি সংক্ষিপ্ত ছিল; রাজা ও ভূস্বামীয় ব্যক্তিগণের পূজায় উৎসব-অনুষ্ঠান জাঁক-জমকও বত বাড়িয়া বাইতে লাগিল, পূজাবিধানও সম্ভবতঃ ততই বর্ধিত-কলমের হইতে লাগিল।

১১। ঈশানচন্দ্র শর্মা কর্তৃক অনুদিত ও মুদ্রিত গ্রন্থের সমাপ্তিতে আছে,—ধীরসিংহদেবপাদানার সমরবিজয়িনার ক্রুর্তী দুর্গাভক্তিভরঙ্গিনী পরিপূর্ণ।

বর্তমানে আমরা বাঙলা দেশে যেভাবে দুর্গাপূজা করি, তাহা সম্ভবতঃ বোড়শ শতকে প্রচলিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে প্রচলিত বিশ্বাস এই, আকবরের রাজত্বকালে মনুসাহিত্যের বঙ্গদেশী প্রসিদ্ধ টীকাকার কুল্লক ভট্টের পুত্র রাজা কংসনারায়ণ নয় লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রতিমার দুর্গাপূজা করেন। কথিত হয়, কুল্লক ভট্টের পিতা উদয়নারায়ণ যজ্ঞ করিতে ইচ্ছুক হইয়া রাজসাহী জেলার অন্তর্গত তাহিরপুরের রাজপুরোহিত পণ্ডিত রমেশ শাস্ত্রী মহাশয়ের উপদেশ প্রার্থনা করেন; রমেশ শাস্ত্রী তাঁহাকে দুর্গাপূজা করিবার উপদেশ দেন এবং নিজেই একখানি দুর্গাপূজাপদ্ধতি রচনা করেন। অত্যন্ত জাঁক-জমক সহকারে সেই পূজা সম্পন্ন করিয়াছিলেন সম্ভবতঃ উদয়নারায়ণের পৌত্র রাজা কংসনারায়ণ।

বাঙলা দেশে কালীপূজার ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ সঙ্কলিত সুপ্রসিদ্ধ ‘তন্ত্রসার’ গ্রন্থে কালীপূজার বিধান সংগৃহীত হইয়াছে। বাঙলা দেশে ‘কালী’ নানা প্রকারের আছেন; ‘তন্ত্রসারে’ আমরা বিবিধ প্রকারের কালীর সাধনার পদ্ধতি দেখিতে পাই। প্রচলিত মতে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশকে চৈতন্যদেবের সমসাময়িক মনে করিয়া বোড়শ শতকের লোক বলিয়া ধরা হয়। কিন্তু পণ্ডিতগণ এই কালকে স্বীকার করেন না; তাঁহারা কৃষ্ণানন্দের ‘তন্ত্রসার’ নামক তন্ত্রশাস্ত্রের সার সঙ্কলন গ্রন্থকে পবিত্র কালের গ্রন্থ বলিয়া মনে করেন। ‘তন্ত্রসার’র মধ্যে কালী বা ভামাপূজার বিধি ব্যতীত তাহা, বোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, বগলা প্রভৃতি মহাবিদ্যাগণের সাধন-বিধিও সঙ্কলিত হইয়াছে। কৃষ্ণানন্দ ব্যতীত তান্ত্রিক সাধনা ক্রিয়াকলাপবিধি সম্বন্ধে গুরুচরিত্যাকারে ব্রহ্মানন্দ ও সর্বানন্দের প্রসিদ্ধি সমধিক। (১২) ব্রহ্মানন্দ পূর্ণানন্দের গুরু ছিলেন এবং আনুমানিক খ্রীষ্টীয় বোড়শ শতাব্দীর প্রথম বা মধ্যভাগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার রচিত ‘শাক্তানন্দ-তত্ত্ববিশী’তে শাক্তাদিগের আচার অনুষ্ঠান বিশেষ ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে; দ্বিতীয় গ্রন্থ ‘তারারহস্ত’ তারার উপাসনা বিবৃত হইয়াছে। ব্রহ্মানন্দের শিষ্য পূর্ণানন্দ পরবর্ত্ত বোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের লোক। তাঁহার রচিত ‘ভামারহস্ত’ কালীর উপাসকের আচার অনুষ্ঠান বর্ণিত হইয়াছে। অপর একজন গ্রন্থকার (সম্ভবতঃ প্রকৃত নাম শঙ্কর আগমচার্য) ‘গৌড়ীয় শঙ্কর’ নামে অভিহিত হন। ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত তাঁহার ‘তারারহস্তবৃত্তিকা’ গ্রন্থে তারার উপাসকের আচারাদি বিবৃত হইয়াছে।

বর্তমানকালে বেসব স্থানে নিত্য কালী পূজার প্রথা বহিয়াছে বা বিশেষ কোনও উপলক্ষে ‘মানসিক’-করা কালীপূজার ব্যবস্থা হয়, ইহা কতীত সাংসদগিক কালীপূজার বিধি হইল দীপালি-উৎসবের দিনে। দীপালি-উৎসবের দিনে এই কালীপূজা বা ভামাপূজার বিধি সর্বপ্রথমে সম্ভবতঃ পাওয়া যায় ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে রচিত কালীনাথের ‘কালী-সপদাবিধি’ গ্রন্থে। (১৩) কালীনাথ এই গ্রন্থে কালীপূজার পক্ষে

যেভাবে যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা দেখিলেই মনে হয়, কালীপূজা তখন পর্যন্ত বাঙলাদেশে সংগৃহীত ছিল না। কালীপূজা বিষয়ে একটি সুপ্রচলিত প্রবাদ এই যে, নবাবীপের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রই এই পূজার প্রবর্তন করেন এবং তিনি আদেশ দিয়াছিলেন যে, তাঁহার প্রজাদের মধ্যে যাহারা কালীপূজা করিতে অস্বীকৃত হইবে, তাহাদিগকে কঠোর দণ্ড ভোগ করিতে হইবে। এই আদেশের ফলে এই বংসর দশ সহস্র করিয়া কালীমূর্তি পূজিত হইতে লাগিল। কহিলে আছে, কৃষ্ণচন্দ্রের পৌত্র ঈশানচন্দ্র সহস্র সহস্র মণ নৈবেদ্য এবং সহস্র সহস্র খণ্ড বস্ত্র এবং সমপরিমাণ অস্ত্রাশ্রা উপঢাবো কালী-দেবীর পূজা করিয়াছিলেন। রতন্তী চতুর্দশীর রাত্রিতে (মাঘের কৃষ্ণ চতুর্দশীতে) কালীপূজার কথা ‘স্মৃতিসমুচ্চর’ গ্রন্থের মধ্যে পাওয়া যায়। গোবিন্দানন্দ, শ্রীনাথ আচার্য চূড়ামণি, বৃহস্পতি রায়মুন্ট এবং কালীনাথ ভট্টালঙ্কার ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। (১৪)

এই দেবীপূজার ইতিহাসটাই বাঙলাদেশের শাক্তধর্মের ক্ষেত্রে প্রধান কথা নচে; প্রধান জিনিস হইল দেবীকে অঙ্কলন করিয়া বাঙলার তন্ত্র-সাধনা, এই তন্ত্র-সাধনা মুখ্যভাবে যুক্ত হইয়া গিয়াছিল কালী-সাধনা এবং দশ-মহাবিদ্যার সাধনার সঙ্গে, এবং খ্রীষ্টীয় বোড়শ শতক হইতে আমরা কালী এবং অন্তান্ত দশমহাবিদ্যার সাধনা অবলম্বনে বিখ্যাত শক্তি-সাধকগণের কথা জানিতে পারি। আমরা পূর্বে কালীপূজার বিধান ব্যয়িত্বকৃষ্ণে কৃষ্ণানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, পূর্ণানন্দ প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছি; ইহার সাধকও ছিলেন। অন্তান্ত সাধকগণের মধ্যে বোড়শ শতকের সর্বানন্দ ঠাকুর অতিশয় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ত্রিপুরা জেলার মেহার গ্রামে তাঁহার আবির্ভাব হয়। তিনি শবরঙ্গী ভূত্য পূর্ণানন্দের দেহের উপরে বসিয়া সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন এবং দশমহাবিদ্যার সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। তান্ত্রিক সাধনায় ক্ষেত্রে তাঁহার বংশধর তান্ত্রিক সাধকগণ ‘সর্ববিদ্যা’র বংশ বলিয়া খ্যাত। তন্ত্রসাধনার ক্ষেত্রে ‘অর্ধকালী’রও প্রসিদ্ধি আছে। প্রায় তিন শত বৎসর পূর্বে ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত মুক্তাগাছার সমীপবর্তী পণ্ডিতবাড়ি গ্রামে দ্বিজদেব নামক সাধকের গৃহে ইনি কল্পারূপে আবির্ভূত হন। তাঁহার নাম ছিল জয়দুর্গা, তিনি স্বয়ং মহেশ্বরী বলিয়া প্রবাদ। তাঁহার দেহের অর্ধেক কৃষ্ণবর্ণ ও অর্ধেক গৌরবর্ণ ছিল বলিয়া তাঁহার অর্ধকালী নাম হইয়াছিল। (১৫) গোসাই ভট্টাচার্য নামে খ্যাত রত্নগর্ত নামক সাধক ঢাকা জেলার মাইয়সারের দিগধরী-তলায় বীরচাঁদে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। কথিত হয়, ইনি প্রসিদ্ধ ‘বার ভূঞা’র মধ্যে চাঁদ রায়, কেদার রায়ের গুরু ছিলেন। প্রায় শত বর্ষ পূর্বে বীরভূম জেলার তারাপীঠের নিকট আটলাগ্রামে সাধক বামদেবপার জন্ম হয়; তারাপীঠ তাঁহার সাধনা ও সিদ্ধির স্থান।

১২। এ-বিষয়ে অধ্যাপক ঐতিহাসিক চক্রবর্তী লিখিত The Cultural Heritage of India, চতুর্থ খণ্ডে Sakta Worship and The Sakta Saints প্রবন্ধ ও তৎসংলগ্ন ‘অনু কথা’ (বিশ্ব-বিজ্ঞান-গ্রন্থ) গ্রন্থখানি দ্রষ্টব্য।

১৩। অধ্যাপক ঐক্য চিত্তাহরণ চক্রবর্তী Sakta Festivals

of Bengal and their Antiquity (Indian Historical Quarterly, September, 1915) প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য।

১৪। ঐ।

১৫। অনু কথা—ঐতিহাসিক চক্রবর্তী।

সাহিত্যের ভিতর দিয়া শক্তিসম্বন্ধরূপে সর্বাঙ্গের প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে সাধক রামপ্রসাদ সেন। বাঙলা শাস্ত্র-পদাবলীর তিনিই প্রবর্তক। তাঁহার পরে সাধক কমলাকান্ত, গোবিন্দ চৌধুরী প্রভৃতি বহু সাধক শাস্ত্র গান রচনা করিয়াছেন। ১৬ দক্ষিণেশ্বরের মা 'ভবতারিণী'র মন্দিরের পূজারী শ্রীরামকৃষ্ণদেব বাঙলার এই শক্তি-সাধনাকে বিশ্ব-বিখ্যাত করিয়া গিয়াছেন। যোগিপ্রদর শ্রীঅরবিন্দ বাঙলার শক্তি-সাধনার অন্তর্গত বহুতরকে তাঁহার অখণ্ড মহাযোগের সতিত যুক্ত করিয়া সূত্র এবং দ্ব্যাপক দার্শনিক রূপ দান করিয়াছেন।

আমরা উপরে অতি সংক্ষেপে বাঙলা দেশে মাতৃপূজার যে ইতিহাস আলোচনা করিলান, তাহাতে দেখিতে পাটলাম যে, স্বাভাবিক ভাবেই দুর্গাপূজা কালীপূজা অপেক্ষা প্রাচীনতর কালে এদেশে প্রবর্তিত হইয়াছে। শুধু তাহাই নয়, আমরা একথা পূর্বেই বলিয়াছি যে, পূজাকে অবলম্বন কবিয়া ধর্মোৎসবের ব্যাপকতায় দুর্গাপূজা অতীবধি বাঙালী-সর্বপ্রধান পূজা। এখনও আমরা সাধারণ ভাবে

১৬। অধ্যাপক শ্রীজাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, এম, এ রচিত 'শাস্ত্র পদাবলী ও শক্তি সাধনা' গ্রন্থখানির কবি-প্রসঙ্গ লিখক আলোচনা দ্রষ্টব্য।

রঙহরিণ

জয়ন্তী সেন

আমি জানি সেই রঙের বলক—রঙহরিণ,
ছুটেছে আকাশে লুটেছে বাতাসে ফুলের গন্ধ
চলার ছন্দে টুটেছে বক রাত্রি-দিন।
উদ্ভূত তার দুঃস্বপ্ন বেগে
উড়ন্ত ধুলো ঝড়ের আবেগে
ঝরালো স্বপ্ন জাগরি জীবনে ক্রান্তিহীন
সোনালী-স্বপ্ন-সুখা-নির্বীর রঙহরিণ।
দিগন্ত পথ চোখের পলকে হয়েছে পার,
নদী নির্জন তটবালিরেখা ঘন কিনার
চলেছে—চলেছে কাছের দূরের;
সীমানার তীরে অঙ্গ পারের
ইসারায় টানে দুর্গম পানে লুপ্ত তারার আভাস ক্ষীণ;
নিশীথ গহনে আশ্বাস-মানা রঙহরিণ।
আমি জানি সেই রঙিন স্বপ্ন—রঙহরিণ
উধাও বজ্রা জীবন-নদীতে—নীলিমা লীন।
আশার পিপাসা আকণ্ঠে নিয়ে পিছনে থাই
গুধু পলকের অসহ পলক—কণিকে নাই;
সে যে কল্পনা-মনে আল্পনা ময়-দিন—
হারানো রঙের নির্বরণার রঙহরিণ।

'পূজা' বলিতে শারদীয়া দুর্গাপূজাকেই মনে করি; 'পূজা' আসিতেছে, এবারে পূজা কোন্ মাসে' প্রভৃতি ক্ষেত্রে 'পূজা' কথার লক্ষ্য কি, তাহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না। কিন্তু 'দুর্গাপূজা' আমাদের সাংস্কৃতিক উৎসব-বিশেষ মাত্র। সাংস্কৃতিক পূজা ব্যতীত দুর্গার কোনও নিত্যপূজার প্রচলন তেমন কোনও অঞ্চলে দেখিতে পাই না। ১৭ রোগে, শোকে, দৈব-দুর্বিপাকে সঙ্কল্পপূর্বক 'চণ্ডীপাঠ' বা দুর্গানাম জপের ব্যবস্থা শাস্ত্র-সম্মতরূপে অঙ্গরূপে দেখা যায়। কিন্তু এই সব ব্যতীত সাধনার ক্ষেত্রে দুর্গার তেমন কোনও প্রাধান্য দেখিতে পাই না। শারদীয়া দুর্গাপূজার পর হইতে আরম্ভ করিয়া বসন্তকাল পর্যন্ত দেবীকে আমরা নানারূপে পূজা করিয়া থাকি। লক্ষ্মীপূজা, কালীপূজা, অন্নপূর্ণাপূজা, জগদ্ধাত্রীপূজা, সরস্বতী-পূজা—সর্বশেষে বসন্তকালে দেবীর বাসন্তী মূর্তির পূজা—ইহার মধ্যে এক কালীপূজা ব্যতীত আর সবই সাংস্কৃতিক পূজা। শক্তি সাধনার ক্ষেত্রে আমাদের দেশে প্রাধান্য লাভ করিলেন সাধারণভাবে কালী—বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে দশমহাবিহার অল্প কোনও রূপ।

১৭। কোনও কোনও মন্দিরে অবশ্য হর-গৌরী বা হর-পার্বতীর নিজপূজা প্রচলিত আছে।

তৃতীয় নয়ন

দেবব্রত চক্রবর্তী

তারপর উঠে এলো নারী।

কাঁকা ঘর :

সন্ধ্যার আলো-আঁধারিতে ঘেরা ছোটো কোণে
একটি মাটির প্রদীপ জ্বলে দিয়ে
লক্ষ্মীর পটের কাছে মাথা রেখে
কী বেন বলেছে
অনেকক্ষণ।
তারপর কান্না যেমন উঠে আসে মনের গভীর থেকে
তেমনি সে উঠে এলো।

হে নারী,

তোমার হৃদয়কে প্রদীপের মতো জ্বলে ধ'রে
কোন স্বপ্ন দেখো ?
একলা ঘরের আলো-আঁধারিতে
কার কাছে বলো তুমি মনের সব কথা ?
জানি, আর একটু পবেই হয়তো নিবে যাবে
এই ক্ষীণ শিখাটুকু,
ঝুছে যাবে পাঁচালীর সুরে ভরা এই ঘর,
আর তুমিও যাবে হারিয়ে।

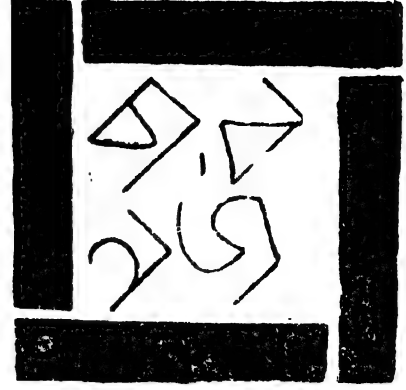
তবু ভেগে থাকবে একটি সিঁদুর-টিপ
ভোরের পূর্ব হবার অপেক্ষায়।

সরোজ আচার্য

[সাংবাদিক ও সাহিত্য-সমালোচক]

লক্ষপ্রতিষ্ঠ সাংবাদিক এবং সাহিত্য-সমালোচক

শ্রীসরোজ আচার্য জীবন শুরু করেছিলেন রাজনৈতিক আন্দোলনকারী হিসাবে, কিন্তু জীবনের শ্রোত আজ তাঁকে রাজ্যের বুদ্ধিজীবীদের পুরোভাগে এনে দাঁড় করিয়েছে। জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট নদীয়ার এক ক্ষয়িষ্ণু জমিদার-পরিবারের সন্তান শ্রী আচার্যের জন্ম কুষ্টিয়া শহরে (বর্তমানে পাকিস্তান) ১৯০৬ সালে। মূলের পড়া শেষ করে তিনি কলকাতায় আসেন আই-এ পড়তে। পাশ করে আবার ফিরে যান নদীয়ায় এবং ১৯২৭ সালে ইংরাজি অনার্স নিয়ে কুমিল্লনগর কলেজ থেকে বি-এ পাশ করেন। কলেজের সর্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র হিসাবে পান 'মোহিনীমোহন রায়-পুরস্কার'। ছাত্র-জীবনে অধ্যয়নের চেয়ে রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রতি তাঁর আসক্তি ছিল বেশী। ১৯২১ সালে মূলে পড়বার সময় অসহযোগ-আন্দোলনে যোগ দিয়ে তিনি এক বছরের জ্ঞান পড়াশোনা ছেড়ে দেন। ১৯২৭-২৮ সালে তিনি কুষ্টিয়া মহকুমা কংগ্রেসের সম্পাদক এবং নদীয়া জেলা কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির সদস্য ছিলেন। ১৯২৯ সালে মেছুয়াবাজার বোমার মামলায় তিনি গ্রেপ্তার হন, কিন্তু কয়েক দিন বাদে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। ঐ সময় সরোজ বাবুদের পরিবার অত্যন্ত অর্থ-সঙ্কটে পড়েন এবং তিনি তখন মালদায় গিয়ে মূল-মাষ্টারের চাকরী নেন। সেখানে বে-আইনী লবণ বিক্রয় এবং বিলাতী বস্ত্রের বহুসংসর্গে নেতৃত্ব করায় তাঁর উপর পুলিশের নজর পড়ে এবং ১৯৩০ সালে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের কয়েক দিন বাদে বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স অফিসারী তাঁকে ডেটিন করা হয়। ১৯৩০ থেকে ১৯৩৭ পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন বন্দী-শিবিরেই কেটেছে তাঁর জীবন। সেখান থেকে ১৯৩৫ সালে ইংরাজীতে এম-এ পরীক্ষা দিয়ে প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন (প্রথম স্থান পেয়েছিলেন শ্রীমতী সুজাতা রায়) এবং প্রবন্ধের পেপারে সব চেয়ে বেশী নম্বর পেয়ে রেজিনা গুহ স্বর্ণপদকে ভূষিত হন। মুক্তি লাভের পর ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অগ্রগৃহে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি কেরানীর পদ লাভ করেন। চার বছর সেই চাকরী করবার পর উইমেন্স কলেজে অধ্যাপনার সুযোগ পান। ঐ সময় মাক্সবাদী দর্শন নিয়ে বিখ্যাত দার্শনিক স্বর্গীয় ডাঃ সুরেন দাসগুপ্ত এবং ডাঃ বটকৃষ্ণ ঘোষের সঙ্গে বিতর্কে প্রবৃত্ত হয়ে শ্রী আচার্য সুখী সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। ১৯৪৪ সালে 'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকার সহকারী সম্পাদকের পদ গ্রহণের আয়তন আসে। এ যাবৎ সেই পদেই বহাল ছিলেন। সম্প্রতি 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র নিয়ন্ত্রিত সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছেন। ইংরাজি এবং বাংলা—দুই ভাষাতেই তিনি সমান দক্ষতার সঙ্গে কলম



চালাতে পারেন। বর্তমানে ডোভার লেনের বাসিন্দা, শ্রী আচার্য লিখতে শুরু করেন চৌদ্দ বছর বয়স থেকে। 'জাগরণ' নামে বাবার একথানা সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল। তাতে তিনি রাজনৈতিক প্রবন্ধ লিখতেন। কুমিল্লনগর কলেজে পড়বার সময় সহপাঠি ডাঃ প্রমোদ ঘোষাল তাঁকে মাক্সবাদের প্রতি আকৃষ্ট করেন। বন্দী অবস্থায় ব্যাপক ভাবে তিনি মাক্সবাদ চর্চার সুযোগ পান এবং মাক্সবাদকেই আত্মদর্শন হিসাবে গ্রহণ করেন। সাহিত্যের ছাত্র হলেও, দর্শনই তাঁর প্রিয় বিষয় এবং প্রকৃত পক্ষে 'মার্ক্সীয় দর্শন' লিখেই তিনি সর্বপ্রথম সুখী সমাজের প্রকাশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পড়াশোনায় শ্রী আচার্যের কোন বাদবিচার নেই। সাহিত্য, বিজ্ঞান, ডাক্তারী, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি, চিত্রকলা, শিকার, খেলাধুলো—সব বিষয়েই তিনি অধ্যয়ন করে থাকেন। ১৯২৭ সালে তিনি 'রুশিয়ার রক্ত-বিপ্লব' এবং 'বিপ্লবী অনন্তহারি' নামে দুখানা বই লেখেন। অস্ত্রাস্ত্র বইয়ের মধ্যে 'মার্ক্সীয় যুক্তি বিজ্ঞান', 'বই পড়া' এবং 'সাহিত্য রুচি' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

দুই পুত্রের জনক, শ্রী আচার্যের স্ত্রী শ্রীমতী মঞ্জুরী সাহিত্যিক শ্রীপরিমল গোস্বামীর কনিষ্ঠা ভগিনী। বিয়ের ব্যাপার একটা মজার গল্প। পরিমল বাবুর সঙ্গে তাঁর আগে থেকেই পরিচয় ছিল। তিনি জানতেন যে পরিমল বাবুর বিবাহ-যোগ্য একটি বোন আছেন কিন্তু ভদ্রমহিলার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল না। ১৯৩৯ সালে যখন বাড়ী থেকে বিয়ের চাপ আসতে লাগল, তখন তিনি একদিন পরিমল বাবুর বাসায় গিয়ে বললেন, "আমি আপনার বোনকে বিয়ে করতে চাই।" শ্রীমতী মঞ্জুরী তখন কলেজের ছাত্রী। পরিমল



সরোজ আচার্য

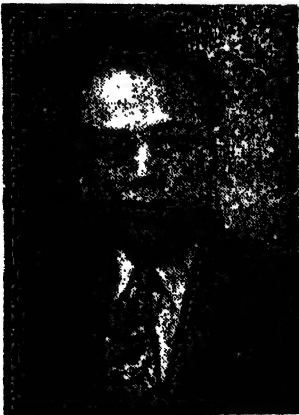
বাবু তৎক্ষণাৎ বোনকে সেখানে ডেকে বললেন, “ওহে—এই ভক্তলোক তোমার বিয়ে করতে চান। এতদিন বসে যা হয় ঠিক করে ফেল।” পরিমল বাবুর সামনে টেবিলে মুখোমুখি বসে দশ মিনিটের মধ্যে তাঁরা নিজেদের বিয়ে স্থির করে ফেলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ, বি-টি শ্রীমতী আচার্য সদাশান্তময়ী হুদুগপ্রিয় মহিলা। আট বছরের ছেলে জয়ন্তকে নিয়ে তিনি একা একা বিলেত গিয়ে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্ট-গ্রাডুয়েট সার্টিফিকেট-অফ-এডুকেশন নিয়ে এসেছেন। আগে রাজ্য সরকারের শিক্ষণ-বিভাগে চাকরী করতেন। এখন চাকরী ছেড়ে গৃহস্থালী নিয়ে আছেন। চেইন স্মোকার সরোজ বাবু এখনও ধূমপানের ব্যাপারে গৃহিণীর রক্ত চক্ষুকে নরম করতে পারেন নি। সরোজ বাবুরা তিন ভাই, এক বোন। মা এখনও জীবিত।

ডাক্তার শ্রীঅরুণ গঙ্গোপাধ্যায়

[বিশিষ্ট দস্ত-চিকিৎসক]

“দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা বোঝে না—” একটি চলতি কথা প্রায়ই শোনা যায়। কিন্তু রোগী নিজে মর্যাদা না দিলেও, দস্ত-চিকিৎসক উত্তার পূর্বে গৌরব ফিরাইয়া আনার জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা করে থাকেন। বিশিষ্ট দস্ত-চিকিৎসক ও আর-জি কর, মেডিক্যাল কলেজের ডেন্টাল-সার্জারীর ডিরেক্টর প্রফেসর ডাঃ অরুণ গাঙ্গুলী তন্মধ্যে অন্যতম।

বিক্রমপুর (ঢাকা) বেগের সুপরিচিত ব্রাহ্মণ বংশের অন্তর্ভুক্ত গঙ্গোপাধ্যায় পরিবারের বিশিষ্ট সন্তান বেঙ্গল সিভিল সাভিসের শ্রীশীতলা কান্ত গাঙ্গুলীর ও শ্রীমতী প্রফুল্ল দেবীর পুত্র অরুণ ১৯১৩ সালের জুলাই মাসে জন্মগ্রহণ করেন। সরকারী চাকুরিয়া হওয়ায় পিতার সঙ্গে পুত্রকে বাংলার বিভিন্ন স্থানে লেখা পড়া করিতে হয় এবং



ডাঃ শ্রীঅরুণ গঙ্গোপাধ্যায়

১৯২৮ সালে প্রবেশিকা ও ১৯৩০ সালে রাজসাহী শিক্ষায়তন হইতে আই, এল, সি পাশ করেন। দাঁত সম্বন্ধে বাল্যকাল হইতে আগ্রহ থাকায় উক্ত বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণের জন্য তিনি ১৯৩২ সালে ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন—যদিও সেই সময় ভাল চাকুরী পাওয়া ও পুষ্টি-পোষকতার জন্য ভারতীয় ছাত্রীরা ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়ে

সাধারণতঃ ভর্তি হইতেন। ১৯৩৬ সালে তথা হইতে Z.D.S., D.S. ডিগ্রী লইয়া স্থানীয় জেনারেল হাসপাতালে oral-surgeon নিযুক্ত হন। পরে প্রেলে কিছুদিন থাকিয়া বার্লিন মিউনিসিপ্যাল ও বিশ্ব-বিদ্যালয় হাসপাতালদ্বয়ে একই পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। সেই সময় তিনি যুরোপের বিভিন্ন দস্ত-চিকিৎসালয়গুলি পরিদর্শন করিয়া প্রভূত জ্ঞানলাভ করেন এবং দ্বিতীয় মহাসমরের পূর্বে ভারতে ফিরিয়া আর, জি, কর হাসপাতালে ভিজিটিং সার্জেন হিসাবে যোগদান করেন ও ব্যক্তিগত চিকিৎসা আরম্ভ করেন।

১৯৪৫ সালে গোয়ালিয়রের মহারাজা সিন্ধিয়ার আমন্ত্রণে এক বৎসরের মধ্যে রাজ্যের দস্ত-চিকিৎসা বিভাগকে সুসংগঠিত করেন। ১৯৪৭ সালে প্রথম দস্ত-চিকিৎসক হিসাবে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের (চিকিৎসা বিজ্ঞান) সংবাদদাতা নিযুক্ত হন। সেই সময় তিনি ভারতের বিভিন্ন পত্রিকায় তথ্যমূলক প্রবন্ধ লিখিতেন। তাঁহার লেখা “An aspect of Industrial Absenteeism and its method of control” সরকারী ও বেসরকারী মহলে উচ্চ-প্রশংসিত হয়। তৎকালীন কেন্দ্রীয় শিল্প-মন্ত্রী সি, এইচ, ভাবা ও বঙ্গের অর্থমন্ত্রী জনলিনীরঞ্জন সরকার ইহার ভূমিকা লেখেন ও ডাঃ রামমোহন লোহিয়া মন্তব্য করেন “Dr. Arun Ganguly has done his part in producing such a book-let and it will be for the trade-unionists to carry its contents to the workers on a mass scale.”

ডাঃ গাঙ্গুলী জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের সভাপতি হিসাবে বস্তী-উন্নয়ন আর্ন্ত-আত্মরদের আণকার্যে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই প্রতিষ্ঠানটিকে তিনি রাজনৈতিক আবর্ত হইতে দূরে রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন। কলিকাতা অন্ধ স্কুলের গভর্ণর হিসাবে তিনি যুক্ত আছেন।

কিছুকাল পূর্বে প্রথম ভারতীয় দস্ত-চিকিৎসক হিসাবে সোভিয়েট রাশিয়ায় ডাঃ গাঙ্গুলীকে আমন্ত্রণ করা হয়। তথাকার চারিশত বিশিষ্ট চিকিৎসকদের উপস্থিতিতে তিনি বিখ্যাত মস্তো Stomatological Institute এ তাঁহার সর্বশেষ গবেষণামূলক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া সম্মানলাভ করেন। ফেরার পথে যুরোপের প্রখ্যাত দস্ত চিকিৎসালয়গুলি পরিদর্শন করিয়া দস্ত-বিজ্ঞান সম্বন্ধে সম্প্রতিকার উন্নতিমূলক কার্যধারা অনুধাবন করেন।

সাহিত্যক্ষেত্রে ডাঃ গাঙ্গুলীর বেশ কিছু অবদান আছে। সাংবাদিকতা ক্ষেত্রে তিনি যুক্ত আছেন। চারি বৎসর ধাবৎ তিনি “নিরীক্ষা” নামে একটি পাক্ষিক পত্র সম্পাদনা করিতেছেন। শিক্ষিত বাঙ্গালীর মধ্যে উহার মতাদর্শ কিছুটা ছাপ রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। বিশ্বমৈত্রীর পথে মানব-সংস্কৃতিকে সার্থক করে তুলবে বলিয়া তিনি মনে করেন।

বই পড়া তাঁহার অবসর বিনোদনের উপায় এবং কয়েকটি যুরোপীয় ভাষা আয়ত্ত করিয়াছেন। নদী সমস্তার অন্ততম বিশেষজ্ঞ ও ই, বি, রেলওয়ের ডেপুটি চীফ ইঞ্জিনিয়ার ৮কুমুদভূষণ রায়ের কনিষ্ঠা কন্যা অণিমা দেবীকে তিনি বিবাহ করিয়াছেন।

শ্রীনিরাপদ মুখোপাধ্যায়

[আজীবন রাজনৈতিক কর্মী ও বিহার আইন-সভার সদস্য]

জ্যেষ্ঠ ও আত্মস্বত্বের দিকে না তাকিয়ে আজীবন দেশের নিরলস ভাবে সেবা করার মহান্ ব্রত পালন করে আসছেন, এমন অল্প সংখ্যকদের মধ্যে অন্ততম হলেন বিহার আইন-সভার সদস্য শ্রীনিরাপদ মুখোপাধ্যায়।

১২৯১ সালের (১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ) ২৯শে আশ্বিন বর্দ্ধমান জেলায় বৈকুণ্ঠপুর গ্রামে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা দীননাথ মুখোপাধ্যায় কলকাতার ব্যবসায়ী ছিলেন। পুত্রের পড়াশুনার সুবিধার্থে তিনি তাঁকে কলকাতায় নিয়ে আসেন এবং বঙ্গবাসী-স্কুলে ভর্তি করে দেন। লেখাপড়ায় খুবই মেধাবী ছিলেন শ্রী মুখোপাধ্যায়, অল্প দিনের মধ্যেই তিনি স্কুলের সেরা ছাত্র বলে পরিগণিত হন। এই সময়েই বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত পর পর তাঁর মাতা ও পিতার মৃত্যু হইল। চারিধারে অন্ধকার দেখলেও অকুলে ভাগলেন না তিনি, তাঁর জ্যেষ্ঠ সহোদর শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায় দৃঢ় হৃদয়ে তাঁর সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। তিনিও কৃতি-পুরুষ ছিলেন। ভারত ও বর্মার পোষ্টাল ইউনিয়নের স্থাপনা করেছিলেন তিনিই।

বাংলায় তখন বৈপ্লবিক যুগ। তরুণ শ্রী মুখোপাধ্যায়ও দেশের ডাকে সাড়া দিলেন। সুবিখ্যাত অমূল্যলন-সমিতিতে যোগ দিলেন তিনি। বৈপ্লবিক কার্য-কলাপের এটি ছিল একটি মূল কেন্দ্র। অবশ্য ভবানীপুরের সমাজবাদী দলেই তাঁর রাজনৈতিক হাতে-খড়ি হয়। পরে তিনি ক্রেণ্ডল ইউনিয়ান নামে একটি দল গঠন করেন। বাঘা যতীন এই দলের সদস্য ছিলেন। তিনি তখন সরকারী, অফিসের ঠেনো। গোয়েন্দা-বিভাগের ইন্সপেক্টর শশধর গোস্বামী এই সময়ে পরিচয় গোপন করে তাঁদের দলে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি বাঘা যতীনের কাধ্যকলাপের উপর দৃষ্টি রেখে ছিলেন। কিন্তু দৈবাৎ একদিন সব জানাজানি হয়ে গেল।

বাংলায় রাজনৈতিক আকাশে তখন ঘোর ঘনঘটা। এল বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন। শ্রী মুখোপাধ্যায় এতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে ছিলেন। কিন্তু এর মধ্যেও তাঁর পড়া-শুনার বিরাম ছিল না। তিনি বঙ্গবাসী-কলেজ থেকে ল' পাশ করেন (তখন বঙ্গবাসী-কলেজে ল' পড়ান হত) এবং ১৯১০ সালে ভাগলপুর বারে যোগ দেন। এর বছর পাঁচেক আগেই তিনি ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

সম্পর্কিত ভ্রাতা রায় বাহাদুর সারদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীমতী রাণী দেবীকে বিবাহ করেছিলেন। তিনি ভাগলপুর থেকে অল্পদিনের মধ্যেই মুন্সের কোর্টে চলে আসেন এবং অচিরেই সেখানে শ্রেষ্ঠ উকিল হিসেবে পরিচিত হন। পরে তাঁকে পার্লিক-প্রসিকিউটরের পদ গ্রহণ করতে হয়। এই সময়েই তিনি এখানে নানা রাজনৈতিক কর্মে রাজেন্দ্র প্রসাদ, শ্রীকৃষ্ণ সিংহ প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেন।

এক বর্ষা-শ্রান্ত সন্ধ্যায় শ্রী মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসগৃহে বসে তাঁর সঙ্গে কথা বলছিলাম। বয়স ৭৫ হয়ে গেছে কিন্তু এখনও চেহারা যত দৃষ্ট ভাব।

দেশের পরিস্থিতি ক্রমেই ঘোরাল হয়ে উঠছিল। ১৯৩০ সালে গান্ধীজীর আহবানে তিনি আইন-ব্যবসা পরিত্যাগ করে অসহযোগ-আন্দোলনে যোগ দিলেন। আইন-অমাত্যের দক্ষণ ধৃত হলেন এবং হাজারীবাগ সেন্ট্রাল জেলে তাঁকে অন্তরীণ রাখা হল। এর কিছুদিন পরে তিনি গান্ধী-আরুইন প্যাণ্ট অমুসারে জেল থেকে ছাড়া পেলেন। ১৯৩১ সালে ডিষ্ট্রিক্ট লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যান মনোনীত হলেন। ১৯৩২ সালে আবার জেলে যেতে হল তাঁকে। ১৯৩৩ সালের ডিসেম্বরে ছাড়া পাওয়ার কিছু দিনের মধ্যেই বিহারের সেই ভয়াবহ ভূমিকম্প হল (১৯৩৪ জানুয়ারী)। বিহার সেন্ট্রাল রিলিফ কমিটির উদ্যোক্তা হিসেবে ভূমিকম্প-বিক্ষুব্ধদের সেবার আত্মনিয়োগ করেন। সেই সময়ে এই কাজে আর কজন বিশেষ ভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তিনি হলেন বিহারের অন্ততম শ্রেষ্ঠ আইনবিদ ৮শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়। ১৯৩৬ সালে বিহার আইন-সভার সদস্য মনোনীত হন। ১৯৪১ সালে বিহার কংগ্রেসের সভাপতি হন। ১৯৪২ সালের বিপ্লবে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করার জন্তে তাঁহাকে আবার জেলে যেতে হয়। ১৯৪৬ সালে আবার আইন-সভার সদস্য হন। স্বাধীনতার পর ১৯৪৭ সালে তিনি পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী মনোনীত হন। তাঁর অধীনে আইন, শ্রায়, কারা ও ত্রাণ দপ্তরগুলি ছিল। ১৯৫২ সালে স্বায়ত্ত শাসন ও পুনর্বাসন দপ্তরের উপ-মন্ত্রীর পদ তাঁকে দেওয়া হয়। ১৯৫৬ সালে আবার তিনি আইন-সভায় আসেন। উপস্থিত বিহার পুলিশ-কমিশনের তিনি সদস্য।

আমাদের দুজনের প্রশ্ন ও উত্তরের বিনিময়ের মাঝে তিনি জানান, ছাত্র-জীবনে বহু কৌড়িমান্ অধ্যাপকের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে তিনি এসেছেন। যেমন, রেভারেন্ড ডি-এন হুইলার, ললিত মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ শ্রীমান্দাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গবাসী-কলেজের প্রতিষ্ঠাতা জি-সি বসু ইত্যাদি। তিনি কলকাতার সুবিখ্যাত ওল্ড ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি একজন সুবক্তা। কলকাতার দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায় রোডটি তাঁরই জ্যেষ্ঠামশাই-এর নামাঙ্কিত।

শ্রীমতী কল্পনা যোশী

[বিপ্লবী বাঙ্গালী মহিলা]

বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকের কথা। বিদেশী শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে সারা ভারতব্যাপী তীব্র আন্দোলন। পন্থাবলম্বনে মতভেদ দেখা দিয়াছে। একদল অহিংসার পথে চলেছেন—আর অন্যদল সশস্ত্র বিােবের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন। শেষেরটির প্রাণকেন্দ্র ছিল অবিভক্ত বাঙ্গালা। ক্ষীণদেহ বাঙ্গালী সে সময় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের মনে প্রবল নাড়া দিয়াছে—সংগ্রামী মনোভাবে ও রণমুগ্ধিতে। আবিষ্কৃত হল যে শুধু তরুণ ও যুবক বিপ্লবীরা নহে—বাঙ্গালী কিশোরী এবং যুবতীও সশস্ত্র সংগ্রামে মূখ্য অংশ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে চট্টল-কত্তা শ্রীমতী কল্পনা যোশী (দস্ত) অন্ততম।

১৯১৩ সালের ২৭শে জুলাই চট্টগ্রাম জিলার শ্রীপুর গ্রামে ৬বিনোদবিহারী দস্ত ও বর্তমানে পাকিস্তান-নিবাসিনী শ্রীমতী শোভনাবালা দেবীর কত্তা শ্রীমতী কল্পনা দস্ত জন্মগ্রহণ করেন। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন ছিলেন মামা। স্থানীয় ডাঃ খাস্তগীর বালিকা বিদ্যালয় হইতে ১৯২৯ সালে তিনি ভালভাবে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দুই বৎসর পরে কলিকাতা বেথুন কলেজ হইতে নন-কলিজিয়েট ছাত্রী হিসাবে এ.ই, এস, সি পাশ করেন। পরে চট্টগ্রাম সরকারী কলেজে বি, এস, সি পড়েন কিন্তু রাষ্ট্রনৈতিক কার্যকলাপে জড়িত হওয়ায় পড়াশুনা বন্ধ থাকে।

১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলন উপলক্ষে গান্ধীজি চট্টগ্রামে আসিলে সাত বৎসরের কল্পনা তাঁহার বক্তৃতা শোনার পর হাতের সোনার চূড়া গান্ধীজিকে দিলে তিনি উহা ফেরৎ দেন। তখন থেকে দেশের স্বাধীনতা, স্বর্ঘ ও অনাথ-আতুরদের দুঃখকষ্ট দূর করার চিন্তা এলোমেলোভাবে বালিকার মনে উঠত। কিন্তু দিশাহারা হয়ে পড়ত ক্ষুদ্র হৃদয়। বাড়ীতে দুই কাকা চুপি চুপি “দেশের কাজ” করতেন আর ভাতুশুড়ী তাঁদের আহুত ‘দেশের ডাক’ ‘পথের দাবী’ প্রভৃতি পুস্তকগুলি পড়ত। সেই সময় যেন কাকা ৬কুম্ভবন্ধু দস্ত সরকারী চাকুরী ত্যাগ করায় বাড়ীতে চাকল্যের সৃষ্টি হয়। ঠাকুরদাদা স্কুল হলেন, কারণ সরকারী মহত্বল তাঁহার সম্মান ছিল যথেষ্ট। বালিকা যেন ক্রমশঃ ঝুঁকে পড়ল স্বদেশীয়ানার দিকে, খন্দর পরা আরম্ভ হল। আচার্য্য প্রহ্লাদচন্দ্র রায়ের বৈজ্ঞানিক প্রতিভা কিশোরীকে আকৃষ্ট করল—বিজ্ঞান চর্চায় উৎসাহ হল মন। ১৯২৮ সালের কলিকাতায় নিখিলভারত কংগ্রেস সম্মেলনে যোগদান করা সম্ভব হল না। কিন্তু পরের বৎসর বিপ্লবী নেতা পূর্ণেন্দু দত্তিবারের উৎসাহে চট্টগ্রামে অস্থগিত ছাত্র-সম্মেলনের অন্ততম উদ্যোক্তা হলেন কল্পনা দস্ত। এই সম্মেলন ছিল সুভাষচন্দ্রের অনুগামীদের। ‘রাউলাট এ্যাক্ট’ পড়ে তাঁর মন বিবম্বন হল। কলিকাতায় পড়ার সময় সিমলা ব্যারাম সমিতির ‘পদাইদার’

কাছে ছোঁরা, লাঠিখেলা, আর নোকাচালনা শিখলেন। কলিকাতায় দুই কাকার মাধ্যমে তিনি কয়েকজন বিপ্লব পন্থীর সংস্পর্শে আসেন। কিন্তু তাঁদের কর্মধারা প্রথমে ঠিক অনুধাবন করতে সক্ষম হন নি। সহসা ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল ঠিকালে তিনি সংবাদপত্রে পড়লেন স্বর্ঘ্যসেন (মাষ্টারদা) ও তাঁহার সহকর্মীদের আক্রমণে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখলের বীরকাহিনী। ব্রিটিশ সিংহকে অপমান ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে ধ্বংসের চেষ্টায় ১ গ্রামের বালকদের দুঃসাহসিকতা চট্টলগুয়ারীর মনে এনে দিল এক গভীর প্রেরণা—যদিও তিনি তখনও বিপ্লবীদলভুক্তা ছিলেন না। কলেজের গ্রীষ্মাষকালে তিনি নিজ জেলায় ফিরলেন। মাষ্টারদা ও অন্যদের সহিত সাক্ষাত পরিচয় হল। ফরমুলা দিয়ে কল্পনা দস্তকে explosives তৈয়ারী ও সংগ্রহীত আশ্রয়স্থান তাঁরই বাড়ীতে রাখার ভার দেওয়া হল। চট্টগ্রাম কলেজে বদলীর চেষ্টা চলল। সুবিধা না হওয়ায় সেখানে থেকে দলের কাজ করিতে লাগিলেন। নভেম্বরে কলিকাতায় টেষ্ট পরীক্ষা দিয়ে ফিরলেন স্বস্থানে। সেই সময় বন্ধুক ও রাইফেল চালনায় মনোনিবেশ করেন। মাষ্টারদার সঙ্গে নিয়মিত সাক্ষাৎ হত আর অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের আগামীদের সহিত লুকিয়ে জেলে প্রত্যহ দেখা করতেন। কলিকাতা হইতে প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র কেনার ভার তাঁহার উপর গ্রস্ত হল। ইহার পর চট্টগ্রাম সহরে ডিনামাইট পুঁতিয়া সমস্ত সরকারী ভবন উড়াইয়া দেওয়ার পরিকল্পনা শ্রীমতী যোশীর দক্ষতায় চালিত হয়—কিন্তু দলের একটি ছেলে ধরা পড়ায় কল্পনা দেবীর কথা পুলিশ জানিতে পারে। তাঁহার পরিবারের ও গৃহের উপর পুলিশী হামলা আরম্ভ হল—আর তাঁহাকে পক্ষকাল অন্তর থানায় হাজিরা দিতে হত। সতর্ক পুলিশ পাহারা ভেদ করে তিনি বিপ্লবী কার্যধারা চালিয়ে যান। ডিনামাইট বড়য়ন্ত্র মাযলা প্রমাণাভাবে বন্ধ হয়ে গেল। পূর্বপরিচিতা প্রীতি ওয়াদেদারকে তিনি মাষ্টারদার সহিত সাক্ষাৎ করান। দুইজনে পুলিশের সঙ্গে বিপ্লবী কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। পুলিশ কল্পনা দেবীর উপর খুব লক্ষ্য রাখতে আরম্ভ করল। ১৭ই সেপ্টেম্বর ‘৩২ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয় আর ২৪শে সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামের পাহাড়তলীতে চলে শাসক বনাম তরুণ বিপ্লবীদের এক অভূতপূর্ব সংগ্রাম। যদিও তিনি এখন কারান্তরালে, তবুও তিনি যে ইহার অন্ততম প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন—তাহা বলার প্রয়োজন নাই। ইহার পর ব্যাপক পুলিশী অত্যাচার চলে। সর্বসম্মত ১০৮ জনকে বিচারার্থ চালান দেওয়া হয়। ২৩শে নভেম্বর তাঁহাকে জামিনে খালাস করা হল। দলের নির্দেশে ২৬শে ডিসেম্বর তিনি গৃহত্যাগ করেন। ফলে বাবার সরকারী চাকুরী গেল—বাড়ীর জিনিষ নীলাম হল—তাঁহাকে গ্রেপ্তারের জন্ত কয়েক হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষিত হল। সেই সময় তিনি ও মাষ্টারদা গৈরালা গ্রামে আশ্রয়গোপন করেন। ধানের গোলায় লুকিয়ে থাকতেন

কিন্তু বাড়ীর কর্তা একদিন তাঁদের বার করে দিলেন। পুলিশ পিছুতাড়া করল—মাষ্টারদা ধরা পড়েন কিন্তু কল্লনাদেবী আশ্রয় পেলেন গৈহিয়া গ্রামে পূর্ণ তালুকদারের বাড়ীতে। পুলিশ সন্ধান পেল—সমস্ত বাড়ী ঘিরে গুলী চালাতে লাগল, পূর্ণ তালুকদার গুলীতে মারা গেলেন—আর ১৯৩৩এর ১২শে মে শ্রীমতী যোশী ধৃত হলেন। পঁচিশ মাইল পায়ে হাঁটিয়ে নিয়ে এল পুলিশ তাঁকে চট্টগ্রাম সহরে। আত্মগোপনের সময় মাষ্টারদাকে জেল থেকে সন্ধিয়ে নিয়ে আসার ব্যবস্থা চলেছিল আর স্থানীয় মুসলমান বাসিন্দারা বিপ্লবীদের সর্ব-প্রকারে সাহায্য করতেন—সে কথার উল্লেখ করেন কল্লনাদেবী। কিন্তু নেত্র সেন ধরিয়ে দিলেন। তাঁহাদের শ্রদ্ধায় মাষ্টারদার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র-মামলা চলল—বিচারে মাষ্টারদার ও তারকের সেনগুপ্তের ফাঁসীর ও শ্রীমতী যোশীর যাবজ্জীবন দীপান্তর বাসের আদেশ হয়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদে মেয়ে রাজনৈতিক বন্দিনীদের (শান্তি, সুনীতি, উজ্জ্বলা, পারুল, বীণা দাস ও কল্লনা দত্ত) আন্দামানে প্রেরণ করা হয় নাই—তবে বিভিন্ন জেলে থাকিতে হয়। দুঃখের সঙ্গে জানানেন শ্রীমতী যোশী যে—“Terrorist

History’ ও ‘Details of explosives manufacture’ নামে তথ্যবহুল হস্তলিখিত পুস্তক দুটি পুলিশ নষ্ট করিয়া দেয়।

১৯৩৯ সালের মে মাসে মুক্তি পাওয়ার পর কল্লনা দেবী চট্টগ্রামে সমাজসেবার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৪০ সালে প্রাইভেট ছাত্রী হিসাবে তিনি বি, এ, পরীক্ষায় পাশ করিয়া কালিদাস বিজ্ঞান কলেজে এম, এস, সি পড়িতে থাকেন। সেই সময় কিষণ সত্য, ট্রেড ইউনিয়ন প্রভৃতিতে জড়িত থাকায় পুনরায় তাঁহাকে গৃহে অন্তরীণ করা হয়। ফলে পরীক্ষা দেওয়া হয় নাই। ১৯৪২ সালে মুক্ত হওয়ার পর তিনি চট্টগ্রামে ছাত্রী ও বোমাবিক্ষুপ্ত এলাকায় সমাজসেবার কাজ করেন। উক্ত বৎসর তিনি ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির সক্রিয় সদস্য হন। ১৯৪৩ সালের মে মাসে তিনি ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির ভূতপূর্ব সাধারণ সম্পাদক শ্রীপুরণচাঁদ যোশীর সহিত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। ১৯৪৮ সালের অক্টোবর মাসে তিনি চট্টগ্রাম হইতে কলিকাতায় চলিয়া আসেন। বর্তমানে তিনি ইণ্ডিয়ান টাটস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটে চাকুরীস্থলে বৃত্ত রহিয়াছেন।

পুরীর ঝাউবনে

অমলেন্দু দত্ত

এই ঝাউবন

এসেছি এখানে এসেছি কখন
এখানের এই আদরে গলানো
সোহাগে জড়ানো শীতল ছায়ার,
বাদামি বালুর সোনালি রৌদের
মোহিনী মায়াঃ...

এসেছি এখানে এসেছি কখন
এখানে আসতে চেয়েছে কি মন ?
দিক-জ্ঞানহীন অবোধ সাগর
চেউয়ে-চেউয়ে ভাঙে মনের আগড়,
কত ঘন নীল কত ফিকে বেন
একটু সবুজ মেশানো—এ কেন ?

সারাদিন কাল কত রঙ ফেরা
দেখেছি, দেখেছি অবোধ চেউয়েরা
সারারাত আর সারাদিন ধরে’
ভেঙে লুটে পড়ে, লুটে ভেঙে পড়ে
আমার পায়ের কাছে কী যে ধোঁজে
বুঝি হোঁয়-হোঁয়... এই বাঃ ছুঁলো যে
ভিজে বালু পায়ে মাড়িয়ে মাড়িয়ে
কিছুক বুড়িয়ে কিছুক হারিয়ে
এসে গেছি বেন এখানে কখন
এখানে আরেক নীলের সাগরে

নীল চুঁয়ে পড়ে পাতার ঝালরে
শীতের রাতের শিশিরের মত
কিংবা ভোরের কুয়াশা যেমন ॥
কোন্ গুলী বেন হাওয়ার আড়লে
ঝাউয়ের সেতাবে স্বর তুলে তুলে
সিগন্তলীন বধির সাগরে
শোনাবেই সে যে শোনাবেই অকারণ !
এসেছি কে জানে কখন খেয়ালে
বালিয়াড়ি ভেঙে, সকাল বেলায়
সোপালি বোদের ডাকে সাড়া দিয়ে
সাগরের নীল ইসারা ডিঙিয়ে ।
এখানে এসেই বুঝেছি : এ-মন
এখানে আসার জন্তে উতল
হয়েছিল বুঝি কতকাল বেন
কত যুগ ধরে...

আশা আর সাথে বাহিত সেই
চুঁয়ে চুঁয়ে পড়া নীলের পেয়াল
ধরে দেবে বলে’ ;

আমি শুধু ঘরে
ধাকবো এখানে—এখানে তোমার
ঝাউবন বাঁধি ছায়ার ছায়ার
বসবো আঁচলে, বসবো তোমার
সুনীল আঁচলে...

বাঙলা অভিধান সঙ্কলন

ঐশ্বরীপ্রকুমার বোষ

(২)

মৃতদূর সন্ধান পাওয়া গেছে তাতে জানতে পারা যায় মুদ্রিত বাঙলা শব্দের অভিধানের গোড়াপত্তন করে যান এক পতু'গীজ মিশনারী।

১৬শ শতাব্দী পর্যন্ত বাঙালী আভিধানিকদের কিছু কিছু সন্ধান পাওয়া যায় বটে কিন্তু তারপর থেকে ১৮শ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্বন্তকে অভিধান-ক্ষেত্রের অন্ধকার যুগ বলা যেতে পারে। দ্বিতীয় পাদে পাদ্রে ফ্রে মানোএল দা আসম্পসাঁও (Padre Frey Manoel da Assumpcao) নামে এক পতু'গীজ আভিধানিকের আবির্ভাব।

পতু'গীজদের বাঙলা দেশে আসার একটা ইতিহাস আছে।

১৪৯৮ খৃঃ ২০-এ মে পতু'গীজ নাবিক ভাস্কো দা গামা মলবের রাজধানী কালিকটে পদার্পণ করেন। তাঁর সঙ্গে আসেন পেদ্রো দে কোবিলহাম (Pedro de Covilham)। ১৫০০ সালে এই ভ্রমলোক ভারতে খ্রীষ্টান মিশনের সূত্রপাত করেন। এই বছরেই পেদ্রো আলভারেস কাম্ব্রালের সঙ্গে আট জন বাজক আর আট জন ক্রানসিসকান আসেন। মুসলমানেরা কিছু এদের ভিনভনকে হত্যা করে। তাতে দশে না গিয়ে তাঁরা খ্রীষ্টান মিশনের কাজে হাত দেন। ১৫০৩ সালে ডমিলিক্যানবা ভারতে এসে তাঁদের সঙ্গে যোগদান করেন। ফলে ১৫৬৩ খ্রীষ্টাব্দের আর গোয়ার ১৫১০ খৃঃ মিশনের কাজ আরম্ভ হয়। পতু'গীজরা ১৫১০ সালেই গোয়া নগরী অধিকার করে। তারপর সেখানে রোমান ক্যাথলিক ধর্ম প্রচারের জন্য তারা চেষ্টা করে। ধর্ম-প্রচারের জন্য তারা কতকগুলি বই ছেপেছিল, ছাপাখানারও ব্যবস্থা করেছিল আর সেই সঙ্গে ব্যবসাবানিজ্যও চালাত। যখন পতু'গীজদের বানিজ্য বেশ চলছে তখন নুনো দা কুন্হা (Nuno da Cunha, ১৫২১—৬৮) তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম বাঙলা দেশের সঙ্গে ব্যবসার চালাতে সুরু করেন। তারই চেষ্টার ফলে পতু'গীজরা বাঙলায় এসে বালেশ্বর থেকে আরম্ভ করে চট্টগ্রাম পর্যন্ত আর হুগলী থেকে ঢাকা পর্যন্ত ব্যবসা বানিজ্য চালাবার জন্যে বাস করতে লাগল। ব্যবসা-বানিজ্যের সঙ্গে তাদের আর একটা কাজ ছিল জলদস্যুতা আর লুণ্ঠরাজ। এতে তারা খুব নৃশংসতার পরিচয় দিত। বেশ কিছুদিন কাটবার পর পতু'গীজ মিশনারীরা লিসবন হয়ে গোয়ার পথে বাঙলায় আসে। ধর্মপ্রচার আর ব্যবসার জন্যে তাদের বাঙলা ভাষা শিখতে হয়। তারা বেখানে থাকত সেখানকার কথা ভাষা আরম্ভ করবার চেষ্টা করত। বাঙলা ভাষা শেখবার উপযোগী তারা এক বাঙলা ব্যাকরণ আর প্রচলিত শব্দ নিয়ে অভিধান তৈরী করার, আর সেই সঙ্গে খৃষ্ট-ধর্মের প্রার্থনা-বই বাংলা ভাষায় ছাপানোর প্রয়োজন মনে করে।

পাদ্রে ফ্রে মানোএল দা আসম্পসাঁও (Padre Frey Manoel da Assumpcao) একজন পতু'গীজ অগষ্টিয়ান সন্ন্যাস-ব্রত মিশনারী। তিনি পতু'গীলের এভোরা-নিবাসী

ছিলেন। তিনি ১৭৩৪ সাল থেকে ১৭৫৪ সাল পর্যন্ত ঢাকা জেলার ভাওয়ালের অন্তর্গত সেন্ট নিকোলাস টলেন্টিনো মিশনের (Missio dos Nicholas Tolentino) অধ্যক্ষ (rector) ছিলেন। তিনিই একজনের ভার নিলেন। কঠোর পরিশ্রমে বাঙলা ভাষা শিখলেন—তাতে দেখলেন অপরকে শেখাতে গেলে বাংলা শব্দের প্রতিশব্দ পতু'গীজ আর পতু'গীজ শব্দের প্রতিশব্দ বাঙলার অভিধান থাকা প্রয়োজন।—তাই সহকর্মীদের কাজের সুবিধার জন্য তিনি একটা ব্যাকরণ ও একটা শব্দকোষ তৈরী করেন। শব্দকোষটির নাম—“Vocabulario em idioma Bengalla Portuguesa”। বইখানি ১৭৪৩ খৃঃ পতু'গীলের রাজধানী লিসবনে ছাপা হয়। বইখানির আখ্যাপত্র এইরূপ—“Vocabulario em Idioma Bengalla e Portuguez dividido em duos Partes dedicado as Excellent e Rever. Senhor. D. F. Miguel de Tavora Arcebispo de Evora do Concelho de Sua Magestade Foy Delegencia do Padre Fr. Manoel da Assumpcam Religioso Eremita da Santo Agostinho da Congregacao da India Oriental, Lisboa 1743. তখন বাংলা অক্ষরের তরফ ছিলনা। বইখানি সমস্তটা রোমান অক্ষরে ছাপা। বইখানি উৎসর্গ করা হয়েছে এভোরার আর্চবিশপ Senhor D. F. Miguel de Tavora-কে। ঐতিহাসিকগণ ভারতবর্ষের কোথাও বইখানির সন্ধান করে পাননি। গ্রীয়ারসন সাহেব তাঁর Linguistic Survey-তে ১ম খণ্ড ১ম ভাগ ১৩ পৃঃ) এই বইখানির একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন। বইখানির তিনটি ভাগ আছে—১ম ভাগে ১ থেকে ৪০ পাতা পর্যন্ত ব্যাকরণ। ২য় ভাগে ৪১ থেকে ৩০৬ পাতা পর্যন্ত বাংলা-পতু'গীজ অভিধান, আর ৩য় ভাগে ৩০৭—৫৭৭ পাতা পর্যন্ত পতু'গীজ-বাঙলা অভিধান। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৯১১ সালে ব্রিটিশ মিউজিয়াম থেকে বাঙলা হরফে ১টি শব্দকোষ পেয়েছেন। এই বই সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাবে—Hist. of the Beng. Language and Litt., (১৯১১), Bengal Past and Present, ১৯১৪; J. A. S. B. (১৯১৩); কেদারনাথ মজুমদারের বাঙলা সাময়িক সাহিত্য, ১৯১৭, ডক্টর সুনীতিকুমারের Bengali Litt. in the 19th Century, সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৩২৩; অমূল্যচরণ বিভাভূষণ (ভারতী, ১৩২১; প্রবাসী, ১৩৩৭), ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পাদ্রি মানোএল দা-আসম্পসাঁও-প্রণীত বাঙলা ব্যাকরণ (কলি. বিশ্ববিদ্যালয়), ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেন সম্পাদিত ‘ব্রাহ্মণ-রোমান ক্যাথলিক সন্বাদ’, প্রস্তাবনা (কলি. বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৭), ঐসজনীকান্ত দাস (সাপ-পত্রিকা, ১৩৪৩, ৪র্থ সং প্রভৃতি প্রভৃতি)।

এর পর অগষ্টিন অসাঁ (Augustin Aussant) প্রণীত ‘ফরাসী-বাঙলা’ অভিধানখানির (১৭৮১-৮৩) উল্লেখ করেছেন ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর Origin and Development of Bengali Literature, ১ম খণ্ড, ২৪৪ পৃষ্ঠায়। এটি মুদ্রিত হয়নি, পাণ্ডুলিপি অবস্থায় আছে, ইহা তিনি উল্লেখ করেছেন।

কলিকাতা গেজেটের (১৭৮১ খৃঃ ২৩এ এপ্রিল) এক বিজ্ঞাপনে দেখা যায় বাঙালী পণ্ডিতমণ্ডলীকে অনুরোধ করা হচ্ছে একখানি ভাল বাঙলা ব্যাকরণ এবং অভিধান রচনা করার জন্তে। (সাপ-পত্রিকা, ৪৩ খণ্ড, ১৬৪ পৃঃ)।

তারপর পাওয়া গেল একখানি ডিক্সনারী 'ইঙ্গরাজি ও বাঙ্গালি বোকেবিলারি' নামে। এর প্রকাশকাল ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে। লীসজুনীকান্ত দাস মহাশয় এই বইখানির আবিষ্কার (সাপ-পত্রিকা, ১৩৪৩, ৪র্থ সংখ্যা)। এই বই-এর লেখকের নাম জানা যায়নি। মুদ্রাকরেরও নাম নেই—কেবল আছে 'ক্রনিক্যাল প্রেস' থেকে ছাপা। সজনীবাবুর মতে আপজন (A. Apjohn) সাহেব ক্রনিক্যাল প্রেসের আংশিক মালিক। গ্রন্থকারের নাম না থাকায় তিনি অভিধানখানিকে আপজন সাহেবের অভিধান বলে অভিহিত করেছেন। বইখানির আখ্যাপত্র এইরূপ—(সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকায় সজনীবাবুর প্রবন্ধ ইহাতে উদ্ধৃত)—"ইঙ্গরাজি ও বাঙ্গালি বোকেবিলারি"

An Extensive, Vocabulary, Bengalee and English, very useful, To Teach the Natives English, and To Assist Beginners in Learning The Bengali Language, Calcutta, Printed at the Chronicle Press, MDCCXCIII.

'কালকাতা ক্রনিকল' সাপ্তাহিক পত্রিকায় (মঙ্গলবার, মার্চ ২০, ১৭১২) A. Upjohn সাহেব এক বিজ্ঞাপন দেন ইংরেজি ও বাঙলাতে। বাঙলা বিজ্ঞাপন এরূপ—

"ইংরাজ ও বাঙ্গালি লোকের। সিখিয়ার কারন এক বহি অতি। সিখ ছাপাখানায় তৈয়ার হইবে। ক সাহেব লোকে বাংলা কথা। সিখিবক এবং বাঙ্গালি লোকে। ইংরাজি কথা সিখিবক অতএ। ব সকল লোকের স্ফোত্র। কাণ এই বহি তৈয়ার করা জা। ইতেছে ছে ২ লোকে চাচে তা। তারা মেং আবজান সাহেবের। ছাপাখানায় আসিয়া লইবেক। ইতি সং ১৭১২ ইংরাজী। তারিখ ১১ মার্চ মন ১১১৮। বাঙ্গালা তারিখ ১ চৈত্র।"

সজনীবাবু আপজনের অভিধানের একটি পাতারও প্রতিলিপি উক্ত প্রবন্ধে প্রকাশ করেছেন। তার শব্দ-বিভাগ কিরূপ ছিল—

কাটালিকলা	a plantain of an angular kind
কাটাইতে	to cause to cut
কাটার	a poignard, dagger
কাটারি	a crooked broad knife
কাটিতে	to cut, to hew
কাটিতে আঁখর	to blot a letter
কাটরা	a fence of boards
কাটুরা	a wood-cleaver

ইত্যাদি।

তারপর যে অভিধানখানির কথা উল্লেখ করছি—সেখানিই আপজনের অভিধান আবিষ্কারের আগে পর্যন্ত আদি অভিধান বলেই কীর্তিত ছিল। এই অভিধানখানির রচয়িতা হেনরি পিটস ফরস্টার (Henry Pitts Forster)। ফরস্টারের জন্ম

১৭৬৬ খৃ আর মৃত্যু হয় ১৮১৫ খৃঃ। তিনি ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর তরফে চিহ্নিত কর্মচারী হয়ে ভারতে আসেন। ১৭১৩ সালে কালকট্টারের পদে আর ১৭১৪ সালে ২৪-পরগনার কোম্পানী আদালতের রেজিষ্ট্রারের পদে নিযুক্ত হন। আদালতে বাঙলা ভাষা প্রচারের জন্ত তিনি বাঙলা ও ইংরেজি উভয় ভাষার একত্রি অভিধান সংকলন করেন। অভিধানখানির নাম—"A Vocabulary, in two parts, English and Bengalee and Vice Versa", Calcutta 1799. কলকাতা ফেরিস এণ্ড কোম্পানীর প্রেস থেকে পি. ফেরিস কর্তৃক প্রকাশিত। বইখানির ১ম খণ্ড প্রকাশ হয় ১৭১১ সালে (মূল পৃষ্ঠা ৪২১), ২য় খণ্ড ১৮০২ সাল (মূল পৃষ্ঠা ৪৪৩)। ইহাতে প্রায় ১৮০০ বাঙলা শব্দ আছে। সে সময় যে সব ইংরেজ বাঙলায় আসতো—তারা বাঙলা বুঝত না—কাজের অনুবিধা হত। এবং আদালতের কাজেও বাঙলা না জানার অনুবিধা ফরস্টার সাহেব অনুভব করতেন। সেই অনুবিধা দূর করার জন্ত তিনি কঠোরভাবে বাঙলা ভাষা শেখেন এবং অভিধান সংকলনে হাত দেন। আরও একটা কারণ জানা যায় তাঁর বাঙলা ভাষার প্রতি প্রীতির। এই দেশে অবস্থান কালে তিনি এক জাঠ রমণীকে বিয়ে করেছিলেন। সেই জাঠ রমণী বাঙলা ভাষা জানতেন, আর ঐ ভাষার প্রতি তাঁর বিশেষ আকর্ষণ ছিল। সেট কারণেও ফরস্টার সাহেবেরও বাঙলা ভাষার প্রতি এত সমাদর সম্ভব হয়।

অভিধানের শব্দ সংকলনের সময় তিনি সাধু ও প্রচলিত উভয় শব্দই যথা সম্ভব উল্লেখ করেছেন। তাঁর অভিধানখানির শব্দবিভাগ এইরূপ—

অগ্রে Oge—above all, before, already ইত্যাদি।

আগে Age—above all, before, already

প্রথমতঃ Prothomotho—above all, before

আচমকা Sudden

আচম্বিতে Suddenly

চমৎ Sudden, perchance

পতিত—Waste

"উ" তালিকায়—উত্তমতঃ পতিত Scattered (সাধু)

"ড" " উলচুল Hurly burly (গ্রাম্য)

"স" " সায়ং Evening, twilight (সাধু)

"স" " সাজবেলা " (গ্রাম্য)

"অ" " আকর্ষণ To drag (সাধু)

"ড" " ধৈকান " (গ্রাম্য)

"প" " পরিশ্রম Labour (সাধু)

"খ" " খাটনী " (গ্রাম্য)

"ম" " মজুরী " (গ্রাম্য)

"চ" " চন্দ্রাপ Tent (সাধু)

"চ" " চান্দোয়া " (গ্রাম্য) ইত্যাদি...

(বঙ্গভাষার আদি অভিধান ও ফরস্টার সাহেব—অমূল্যচন্দ্র বিদ্যাক্ষরণ, বঙ্গভাষা, ১৩১৪, ১৫ পৃষ্ঠা)।

১৮০৭ সালে কোলকট্টক সাহেব অমরকোষের সম্পাদন করে এক নতুন সংস্করণ প্রকাশ করেন। কোলকট্টক সাহেবের কথা

গত বারেই উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি অমরকোষকে এক নতুন ধারার ইংরেজি অর্থ সম্বন্ধে সম্পাদন করেন। বইখানির মুখবন্ধে তিনি বলেছেন যে, তিনি অমরকোষের মূল গ্রন্থের সঙ্গে বহু প্রাচীন-কালের বিভিন্ন দেশের পুথিগুলি পরীক্ষা করেন। ত্রিহত্যয় অক্ষরে এক প্রাচীন পুথির নকল করান। দেবনাগরী অক্ষরেও নকল করান। সেগুলির উইলিয়ম জেনস বেশ ভাল করে পরীক্ষা করেন—জেনস সাহেব শব্দগুলির বহুলাংশে ইংরেজি প্রতিশব্দ লিখে দেন, তাতে তাঁর কাজের খুব সুবিধা হয়। কলকাতার অক্ষরের পুথির নকল, টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বন্ধে দেবনাগরী ভাষায় রূপান্তরিত করান—সেগুলির মধ্যে অনেকাংশ অপর প্রচলিত গ্রন্থে না থাকায় সেগুলি পরিত্যক্ত হয়েছে। বাড়লা ভাষায়ও টীকা সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ পান, তার অধিকাংশই তিনি গ্রহণ করেন। এই সব গ্রন্থ তিনি এবং অপর বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণ দ্বারা বিচক্ষণতার সহিত বিচার করে তবে তিনি অমরকোষ সম্পাদনা করেন। এই গ্রন্থখানি সম্পাদন করতে তাঁর পাঁচ বছরেরও অধিক সময় লাগে। এই বইখানি শ্রীরামপুরে কেরী সাহেব কর্তৃক মুদ্রিত হয় ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে। গ্রন্থখানিতে তিনি সংস্কৃত শ্লোকের সংখ্যা ইংরেজিতে দিয়েছেন—তারপর ধারাবাহিক মন্তব্য, শ্লোকের সারাংশ এবং পাণ্ডটাকার শব্দগুলির ইংরেজি অর্থ এবং পরিশিষ্টে অকারাদিক্রম শব্দমতী দেন। পরিশিষ্টে বর্ণানুক্রম-পদ্ধতি ব্যবহার করে কালের আভিধানিকগণ গ্রহণ করেন। কোলকাতা সাহেব যে বই বড় সংস্কৃত পণ্ডিত ছিলেন—তা তাঁর (১৮১৪ খৃঃ) ভারত ভ্রমণের পর ২৩ বছর পরে যখন তাঁর মৃত্যু হয় (১৮৩৭ খৃঃ ১০ই মার্চ), তখন সেই মৃত্যু সংবাদ ভারতে এসে পৌঁছলে তদানীন্তন সংবাদপত্র 'সমাচার দর্পণে' নিম্নোক্ত সংবাদটি প্রকাশিত হয়, তা থেকে জানতে পারা যায়—

“আমরা অতি খেদ পূর্ব্বে জ্ঞাপন করিতেছি যে ইংলণ্ড হইতে যে শেষ সংবাদ পঠিয়াছে তদ্বারা অবগম হইল যে কোলকাতা সাহেব লোকান্তর গত হইয়াছেন।এ সাহেব কতক বঙ্গসংবাদি সদর দেওয়ানী আদালতে প্রধান জজ ছিলেন পরে কোলকাতা হইয়াছিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষে তাঁহার মহাখ্যাতি সংস্কৃত বিদ্যা ও পণ্ডিত লোকদের প্রতিপোষকতা করণের উপরই প্রকাশ আছে। ভারতবর্ষে তাঁহার তুল্য সংস্কৃত বিদ্বান কোন ইউরোপীয় বাস্তি ছিলেন না জেহ সাহেবও নহেন এবং সর্বসাধারণ লোকই স্বীকার করেন যে তিনি সর্ব বিষয়েই বঙ্গদেশী সর্বাপেক্ষা গুণবান ছিলেন। ইংলণ্ড দেশে প্রত্যাগত হইলে পরও তিনি আপনার অতিপ্রিয় সংস্কৃত বিদ্যার চর্চাতে বিরত হন নাই।.....” (সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৮০)

কোলকাতা সম্পাদিত অমরকোষের ২য় সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৮২৫ খৃঃ শ্রীরামপুরের ছাপাখানায়। দাম ১২ টাকা।

১৮০১ সালে জন লীডন (John Leydon) সাহেব বাংলায় এক অভিধান রচনা করেন। লীডন সাহেব (১৭৭৫-১৮১১) চিকিৎসক হিসাবে ভারতে এসে মাদ্রাজ, মহীশূর, পেনাভ প্রভৃতি দেশে ভ্রমণ করেন। তারপর কলকাতায় আসেন ১৮০৬ সালে। তিনি কিছুকাল ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের হিন্দুকানী ভদ্রার অধ্যাপক হন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে থাকাকালীন

পণ্ডিতদের কাছে বাংলা শেখেন। সে বাড়লা কিছু পুরো পণ্ডিত বাড়লা অর্থাৎ পণ্ডিতদের কাছে শেখার দক্ষণ সঙ্কট-বহুল বাড়লা। তাই তাঁর অভিধানটাও সংস্কৃত শব্দের অভিধান হয়ে দাঁড়ায়।

পাদরী উইলিয়ম কেরী সাহেবের (১৭৭২-১৮৩৪) নাম বাড়লা দেশে শিক্ষিত সমাজে সুপরিচিত। তাঁর জীবনের ইতিহাস তাঁদের কাছে অজানাও নয়। তিনি ১৫ বছর পরিশ্রম করে এক বাড়লা-ইংরেজি অভিধান সংকলন করেন। আর ৫ বছর কঠোর পরিশ্রমের পর গ্রন্থটির মুদ্রণ কার্য আরম্ভ করেন ১৮১৫ সালে। ১ম খণ্ডের ১ম সংস্করণ মুদ্রণের পর দেখা গেল বড় অক্ষরে ছেপে বইখানির আকৃতি অত্যন্ত বৃহৎ হয়েছে এবং সম্পূর্ণ হতে যে আকার ধারণ করবে তা সাধারণ ব্যবহারের উপযোগী হবে না। তাই তিনি বইখানি পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা করে ছোট অক্ষর তৈরী করিয়ে শুধর ভাবে দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপেন। এই ভাবে ১ম খণ্ডের ২য় সংস্করণ বের হয় ১৮১৮ সালের ১৭ই এপ্রিল। তার আখ্যাপর এইরূপ—

A Dictionary of the Bengali Language in Which the Words Are Traced to their Origin, And Their Various Meanings Given. Vol. I. By W. Carey, D. D. Professor of the Sanskrit, And Bengalee Languages, In the College of Fort William, Second Edition, with corrections and Additions, Serampore, Printed at the Mission Press, 1818.

২য় খণ্ডের ২য় ভাগ প্রকাশ হয় ১৮২৫ খৃঃ ৭ই জুন।

১ম খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫১৬ আর ২য় খণ্ডের দু'ভাগের পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৫৪৪। এই অভিধানটিতে ৮০,০০০ শব্দ আছে (জি, প্রিথের কেরীর জীবনী, ১৮৮৭; বিস্তৃত বিবরণ, গুণসাহিত্যের ভূমিকা, সাপ-পত্রিকা, ৪৬শ, ৩য় খণ্ড, জ্যৈষ্ঠ)

বইখানি ১৮২৫ সালে প্রকাশিত হবার পর সমাচারদর্পণে (১১ জুন ১৮২৫) নিম্নোক্ত সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছিল—
“বাঙ্গালা ডেক্সিয়ানরি।—আমরা অতিশয় আনন্দপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে শহর শ্রীরামপুর নিবাসি শ্রীমত ডাক্তার কেরী সাহেব পোনের বঙ্গের পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিয়া যে বাঙ্গালা ও ইংরেজী ডেক্সিয়ানরি প্রস্তুত করিয়াছেন তাহা শহর শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় ছাপা হইয়া গত সপ্তাহে সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং গ্রাহকদের নিকট প্রেরিতও হইতেছে। এই পুস্তক তিন বালামে সম্পূর্ণ হইয়াছে ইত্যদ পর সংখ্যা কাটো পেন্সের অর্থাৎ বড় পৃষ্ঠার ২০৬০ দুই সহস্র বহু-পৃষ্ঠা হইয়াছে এবং অতি ক্ষুদ্র অক্ষরে ও উত্তম কাগজে ছাপা হইয়াছে। ইহার মূল্য চামড়া বাইণ্ড সমেত ১১০ একশত দশ টাকা নিম্নপিত হইয়াছে। বঙ্গদেশে বর্তমান চলিত আছে সে তাৎপর্ষ্য শব্দ প্রায় এই অভিধানের মধ্যে পাওয়া যায়। প্রথম ইংরাজী অর্থের সহিত বোপদেবকৃত গণ আছে তৎপরে অকারাদিক্রমে তাৎপর্ষ্য শব্দ সংগৃহীত হইয়াছে।.....(সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড, ৭৭পৃঃ)।



[পূর্বপ্রকাশিতের পর]

মনোজ বসু

লোকটা হেসে বলে, বিনি পুঁজির ব্যবসা—মহাজন লাগে না আমার। জাল কাটার জন্তে বারো আনাও এক ছুরি মাস্তুর মূলধন। সেখানে খুশি মাল ছাড়তে পারি। কুমিরমারি চলে সাবোটি ভাল। দেড় পতরের ভিতর পৌঁছে যাব। বাজার পুরোপুরি ধরা যাবে।

কেন ভাই, কাছেপিঠে গগন দাসের খাতা—তোমাদের জুই খাতা বসানো। কুমিরমারি অবশি কেন কষ্ট করবে?

খাতায় কি আর কুমিরমারির দর দেবে। খাতার ব্যাপারিবা কুমিরমারি নিয়ে বেচাবে—মাঝখানে লাভ চাই তো খানিকটা! আর তোমাদের খাতা বসবে সেই ভাব-বাগে। হাত-পা কোলে করে সন্তান হলে না থেকে কত দূর চলে যাব পায়ে পায়ে!

জগা বলে, মাল নাহাও, কোনখানে যেতে হবে না। যাবে তো অজান্তে বন কেটে এত কাণ্ড করছি কেন? কি মাছ এতলো—খাবসে? আচ্ছা রাক্ষুসে পারসে জুটিয়েছ ভাই।

মাছের আয়ত্তন দেখে উল্লাসের অবশি নেই। এক একটা বের করে জগা, পবন আদরে হাত বুলার, আর বাহুসলোব চোখে চেয়ে থাকে : আহা-হা, রাজপুত্বে! পাচটা ছাঁচায় সেবের শাক। এতিনিষ পেটে খাবাব নয়—সদবে নিয়ে দেখালে সরকারি পুরস্কার দেবে। আমি ছাড়ছি না, কুমিরমারির দর দিয়েই কিনে নেব। আরও বেশি চাই, তাই দেব। কষ্ট করে তুমি একবার সাঁইতলা অবশি যেতে হবে। পয়সাকড়ি সদাসর্বদা লোকে গাঁটে করে ঘোরে না!

কুমিরমারি চলে বাচ্ছল, সেই লোক সাঁইতলার এইটুকু পথ যাবে, এ আর কত বড় কথা! কালীতলার গৈয়ো-বনে জগুর আছে। ডাঙার খুঁড়ে টাকা বের করে দান দিতে হবে লোকটাকে।

সাঁইতলায় নিয়ে গিয়ে তাকে চালাঘরের ভিতর বসাল। প্রসঙ্গ যুখে জগা বলে, ঢেলে ফেলুন মস্ত মাছ এইবারে। নেড়েচেড়ে দেখে আশ্চর্য করে দান বল।

লোকটা দান বলে, পাঁচসিকে।

উঁহ, দেড় টাকা। দেড় টাকায় খুশি হলে কিনা বল। কুমিরমারিতেও তুমি এই দর পেতে না ভাই। বসে বসে তামাক খেতে লাগ, টাকা নিয়ে আসি।

তামাক সাজছে জগা। লোকটা প্রসঙ্গ করে, তুমিই বা এত দর দিচ্ছ কেন? পোষাতে পারবে?

তাই বোঝ। না পোষালে দিচ্ছি কেমন করে?

লোকটা হি-হি করে হাসে : বুঝতে পেরেছি।

কি বুঝলে?

মাছের মনে কত কি মতলব থাকে। কত বকম ভেবে কাজ করতে হয়। খাতা জমাচ্ছ বুঝি এই কায়দার? বাবু বা বৈদ্য করে হাট জমায়। হাটে যে মাল অবিক্রি থাকে, বাবুদের তরফ থেকে সমস্ত কিনে নেবে। এমনি করে করে ব্যাপারি জমে। ব্যাপারির মাল আমদানি হতে লাগলে খন্ডেরও এসে জুটবে। হাট জমে গেল। তাবপরে করে তোলা আদায় করে যাও। ভাল দর দিয়ে তোমরাও তেমন খাতা জমাচ্ছ—যত মাছ-মাংস তোমাদের ওখানে বাতে জ্বাটে। কেউ কুমিরমারি যাবে না, এদিক-ওদিক হাতে কেটে বেচতে যাবে না। খাতায় এসে নির্ঝঞ্ঝাটে পাইকারি ছেড়ে দিয়ে যাবে।

জগা বিষমযুখে বলে, বন কেটে খেরি বানালাম ভাই, খাতার বুদ্ধিও আমার। কিন্তু আমি আর কেউই এখন। আমি তো আমি—খোদ মালিক গগন দাসের দশা গিয়ে দেখ একবার। আমি যাইনে—কিন্তু যা শুনে পাই পাষণ কেটে জল বেরিয়ে যায়। ডাঙা অকলের ভেদোররা এসে চেপে পড়েছে। সে আছে জেলখানার করোদির মতো হয়ে।

লোকটা ছিলিমে গোটী দুই টান দিয়ে হি-হি করে হেসে উঠল : মতলব এবারে ধরতে পেরেছি। বলব? জাল নিয়ে বেরিয়েছ—জালে তো একেবারে ফক। আমার মাছ দেখিয়ে বউয়ের কাছে পশার বাঁচাবে তুমি।

জগাও হাসে : বউই নেই। এট হল বসন্ত-ঘর। বউ থাকলে মজা করে এমন হাত-পা মেলে থাকত দিত? ঘরের চেহারা দেখে বল তুমি।

একুশ

ভোররাত্রে আর দশটা মাছ-মাংস সঙ্গে জগা গিয়ে নতুন জালায় উঠল। বসেছে মাছ-মাংসের মধ্যে। জালে জড়িয়ে মাছ ধরেনে, জাল খুলে মাছ পাতিয়ে দিল। জগার এই নবমুখিতে অবাক

ইয়েছে সকলে। কিন্তু যুধে কেউ কিছু বলে না। কাজের ভিতর গোয়ার মানুষকে খাঁটাতে গিয়ে কোন বিপত্তি ঘটে না জানি।

আলার এসেছে জগা অনেকদিন পরে। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে চতুর্দিক। হার হার, কী চেহারা করে কেলেছে তাদের সাধের আলার! রাধেতার বাড়িয়ে বলেনি। আলা কে বলবে, বোলআনা গৃহস্থবাড়ি। দরাজ উঠান পড়ে ছিল—আগাছার জঙ্গল, আর মুন ফুটে-ওঠা সাদামাটি জারগার জারগার। কোদাল দিয়ে খুঁড়ে সারা উঠান ভরে লাউ-কুমড়ার চারা পুতেছে, নটে-পালশাক-মুলোর বীজ ছড়িয়েছে। নদর লকলকে শাকে মাটি দেখা যায় না। সামনের দিকে গোয়ালঘর ঝগা মুছে। উত্তমসী মরদ মাছবের তো অভাব নেই। খুঁটি পোতা হয়ে চাঁচী উঠে গেছে এর মধ্যে। গোয়ালঘর শেষ হতে মাস ত্রয়োদশ বেশি দেবি হয়ে না। শেষ হয়ে গেলে গরু আসবে, ছাগল আসবে। আর এখনই এই তোর হবার মুখে ঠাস মটপট করছে ঝগাঘরের দাওয়ায় একটুকু খোশের ভিতরে। ঠাস তবে ভো এসেই গেছে এর ভিতরে। মাস দুই পরে যে কী কাণ্ড হবে, ভাবতে শিহরণ লাগছে। গোয়াল, ভরিতরকারির ক্ষেত, উঠান জুড়ে লাউ-মাচা। মাচাব তল দিয়ে মাথা নিচু করে লাওয়ার এসে উঠতে হবে। সাগরের কুল চর পড়ে ডাঙা বেঙ্গল, ডাঙার জঙ্গল জমল আপনা আপনি। জঙ্গলে জঙ্গ-জানোয়ার চরে বেড়ায়। সকলের শেষে এলো মানুষ। শুধু মাত্র চরে গেয়ে ও-জীবের সুখ হয় না। জমিজিরেতে নিজস্ব করে ঘিরে নেবে, চিবস্থায়ী ঘরবাড়ি বানাবে—সকল জীবের মধ্যে এই মানুষই কেবল যেন অনড় হয়ে এসেছে দুনিয়ার উপর।

সব চেয়ে কষ্ট হয় বড়দার জন্তে। কথা বলা চুলোয় থাক, নিদারুণ লজ্জার মুখ তুলে সে জগার দিকে চাইল না এতক্ষণের মধ্য। সেন কে না কে এসেছে। পুরো-তাতা কামিজ এক পুরো দশহাতী কাপড় পরিবে খাতা-কলম আর হাতবান্ন সামনে দিয়ে মাচাব উপর এগনকে জ্বললোক করে বসিয়ে দিয়েছে। বসে বসে হিসাব কর, আর লিখে যাও। লেখাপড়া দেখার এই বড় ছালা। ফটিনটি ঠাটা-তামাসা হাসিহারা করবে—তা দেখ, শ্রালক নগেনশশী খোড়াত খোড়াত চক্কোর দিয়ে বেড়াচ্ছে সামনের উপর। এবং কামরার দরজার আড়াল থেকেও লোক-প্রভাষ বোন আর বউ নিশ্চয় একগুণা চোখ তাকিয়ে পাতাবায় রয়েছে। মানুষটাকে নড়ে বসতে দেবে না। তোমার এই ফেনাচোখ সমর, কাজের সময় বলেই নয়—দিনরাত অষ্টপ্রহর নজর রয়েছে। তার উপর সন্ধ্যার পর গান-বাজনা আব ফড়ের আড্ডা ছিল, আড্ডা এখনো আছে। কিন্তু বসের গান গাও দিক একখানা—‘পরলা দিদি লো, বড় ময়লা তোর প্রাণ’—গাও দিক কত বড় সাহস! শ্রীখোলের সঙ্গে নামগান করে গ্রন বড়দা বোন-বউ-জালকের সামনে বাবাজি হয়ে বস। হরিকনি করে হরির লুই ছড়ায়, ঝাঁক-শব্দ বাজার মতো বা পক্ষীপুঞ্জের সময়। জেলের কয়েদি হয়ে আছে, সেটা কিছু মিথো বলেনি জগা।

গগন গম্বিরান হয়ে বসে। আর নগেনশশী মাতরবির চলে চরকির মতো ঘুরছে। অকাজের ঘোরাফেরা নয়—খাবার মাছ বলে এক এক জাঁজলা মাছ তুলে নিচ্ছে মাছমারাদের বুড়ি থালুই ও জাল থেকে। জগা বলেও বাদ দিল না, নিয়ে নিল তার কাছ থেকে গোটাচক্ক। জগা কিছু বলবে না, সে তো পুরোপুরি মাছ-মারা হয়েই এসেছে। এমনি ভাবে খাতার নিজস্ব বড়িও প্রায় ভরতি। তার জঙ্গ-কিছু খাবার জন্ত

রাগাঘরে পাঠিয়ে বাকিটা বিক্রি করে দেবে। সেটা সকলের শেষে। নগেনশশী এসে এই একখানা বুদ্ধি বের করেছে—ঝোজগারের নতুন পদ্মা। ফন্দিফিকিরের অন্ত নেই লোকটার মাথায়। মাছ-মারারা মাছ নিয়ে বসে আছে—নগেনশশী ঘুরে ঘুরে এক এক জনের কাছে যায়, তাত দিয়ে মাছ উটেপাটে ব্যাপারিদের দেখায়, হু-হাতে তুলে ধরল বা একটু উঁচুতে। বলে, উঃ, পাহাড়ের সমান ওজন! একটা জালে ভেড়ির যাবতীয় মাছ তুলে এনেছ গো! কত বড় দুড়ুই মশায়? তর ঘড়ুই কিছু বলবার আগে নিজেই মন-গড়া দর বলে, বার আনা? বড়ু ব্যাপারি ঐ দেখ এক আঙুল দেখিয়ে পুরোপুরি ঢাকা বলে বসে আছে। এর উপরে কে কত উঠতে পার? এক-দুই—উঁচু আঁচর আনা নয়, পাঁচ সিকে—তিন। পাঁচ সিকোয় গেল, মাছ ঢেলে নাও ব্যাপারি।

এমনি কায়দায় মাছের দর তোলে নগেনশশী। দর উঠলে বৃত্তি বেশি আদায় হয়, খাতার মুনাকা বেশি। যা গতিক, খাতা তো দাঁ-দাঁ করে এবারে জম উঠবে নগেনশশীর ব্যবস্থা ক্রমে।

সকাল হয়েছে। কিন্তু আজ বড় কুয়াশা—মনে হচ্ছে, বারি আছে এখনো। বেচাকেনা শেষ। মাছের ডিঙি ছেড়ে দিয়েছে অনেকক্ষণ, পচা আর-বলটি বেবে নিয়ে চলে গেল। জগা ভারছে, হ-জনেই ওরা সমান ওস্তাদ—এই কুয়াশায় পথ তুল করে কাণ্ড ঘটিয়ে বসে। আবার ভারছে, তাত কর মা-কালী, জগা কী দরের নেয়ে না হাড়ে-হাড়ে বুঝবে তবে সকলে। মাছ-মারাদের হিসাব খাতায় উঠে গেছে, এইবার পয়সা মিটিয়ে দেওয়া হচ্ছে। পয়সা গণগণে নিয়ে চলে যাচ্ছে একে একে।

বিনোদিনী গিয়ে এসেব খোপের কাঁপ সরিয়ে দিল। পাক-পাক আওয়াজ তুলে ছুটোছুটি করে এসেব পালা বাঁধের ধারে ভোলায় গিয়ে পড়ে। বাদাবনে শিয়াল নেই, বই বড় স্ত্রিবা। কোমরে কাঁচল তরতা দিয়ে নিয়ে চাকবালা ঘব বাঁচি দিচ্ছে। বলে, পেটের পড়ছে। সব যাও গো ব্যাপারি মশায়েরা। সবো ও মাছ-মাছ মশায়—

সব মাছ-মাছার হয়ে গেছে, সর্বশেষ জগার পয়সা গণা জুড়। সেই বাকি আছে শুধুমাত্র। ইচ্ছে কবোই যেন চাকবালা তার দিকে চেয়ে মাছ-মারা বলে ডেকে মুগের সুখ করে নিল। তর ঘড়ুই আর জগার কথাবার্তা চলছে তখন। ঘড়ুই তারফ করে : ওস্তাদ বড় তুমি জগা! সর্বকণে দড়। একদিন জাল নিয়ে পড়লে, তা-ও একেবারে সকলের সেরা মাছ তুলে নিয়ে এসেছ।

বাঁচি দিতে দিতে চাকবালা স্বগতোক্তির মতো বলে, ওস্তাদ বলে ওস্তাদ! মাছ মোং আনা হয়, তা জালে জালেব হিটে লাগে না। একেবারে শুকনো জাল।

তর ঘড়ুই তাকিয়ে দেখে, ব্যাপারি তাত বড়! আচ্ছা কানোদ মেয়ে তো, অস্তব্ব থেকে ঠিক নজর করে দেখেছ।

জগা ক্ষিপ্ত হয়ে বলে, বড়দা বারণ কর। মরদ মনিবের কথাই মেয়েলোকে কেন কোড়ন কাটবে?

জগা যত রাগে ততই চাকবালা ঝিল-ঝিল করে হাসে : কাণ্ডগানা বুঝেছ ঘড়ুই মশায়? এর-তার কাছ থেকে মাছ জোগাড় কবে নিয়ে মানুষটা আলায় এসেছে।

ঘড়ুই বলে, তার গরজটা কি ছিল? যার যখন ইচ্ছে, চাং আসে চলে যায়। বাধা কিছু নেই।

চাক্র বলে, মনে পাপ থাকলে ছুতো খুঁজতে হয়। সকলকে মানা করে, আলায় বাতে না আসে। মাছ-মারা সেজে নিজে তারপর চরবুত্তি আসে।

বাঁটার তলে হঠাৎ পোকামাকড় পড়েছে বুঝি! মরীয়া হয়ে মেয়ের উপর বাড়ির পর বাড়ি দিচ্ছে। জগা কোন দিকে না তাকিয়ে পরমা গীটে নিয়ে ছুমছুম করে পা ফেলে মাটি কাঁপিয়ে চলে গেল।

চালাঘরে জগা একা। সোধাস্তি নেই। সাপের মতন কৌস-কৌস করছে। ঘবে থাকতে পারে না বেশিক্ষণ, বেরিয়ে পড়ে। লোকের সামনে এমন হেনস্তা আজ অবধি কেউ করেনি তাকে। চাক্রালা থাকতে তুলেও কোনদিন আর নতুন আলায় বাবে না। বাদাবন থেকে তাকে তাড়িয়ে অপমানের সোল খানা শোধ নিয়ে তবে যাবে। ভরদ্বাজকে তাড়িয়েছে—তারও চেয়ে বড় শাক মেয়েটা। ভরদ্বাজ ছিল ভিন্ন এলাকায় চৌধুরীদের মাইনে-খাওয়া গোলাম—নিজের ইচ্ছেয় কিছু করত না। চাক্রালা বুকের উপর বড়ে থেকে শত্রুতা সাধবে। বলাই আর পচা, তার ডান-হাত বাঁ-হাত কেটে নিয়েছে সকলের আগে।

আপাতত একটা বুদ্ধি মাথায় এলো। চৌধুরি-আলায় চলে যাবে। সেখানে পুরানো সাঙাবা আছে—অনিরুদ্ধ, কালোসোনা এবং আবও সব। গগন দাসকে নিয়ে প্রথম যেখানে এসে উঠল, বাদাবনের স্বাদ পাইয়ে দিল গগনকে। অতিথি এসে সেই গৃহস্থ তাড়ানোর ফিকির। গোপাল ভরদ্বাজ বিদায় তয়েছে, এখন আলাব সেখানে ভাব জমিয়ে নেওয়া কঠিন হবে না। চৌধুরিগজের মাছুর আমদানি করে চালাঘরের ভিতরেই আড্ডা জমাবে। নতুন আলায় পাশাপাশি ওদের চেয়ে দর দেব কবর আড্ডা।

এমনি সব আনাগোনা করতে করতে বাঁধের উপর দিয়ে যাচ্ছে। কুয়াশা—সুষ্টিসংসার মুছে গিয়েছে বেন একবারে। হু-তাত দূরের গাছটাও নজরে আসে না। স্থবির্যাকুর বনের এই নতুন বসতির পথ তুলে গেছেন বুঝি আজ।

থমকে দাঁড়াল। শিশ দিচ্ছে কে কোথায়। শিশ দিয়ে ডাকছে বেন কাঁকে। মন্দ মানুষের কাণ্ডবাণ্ড নাকি? ঐ ভরদ্বাজের যে ব্যাপার—ব্রাহ্মণ-সন্তান পিটুনি খেয়ে গেল অসংকর্মে গিয়ে। আর মজা এমনি, কাউকে কিছুই বলবার জো নেই—কিল গেয়ে কিল চাঁক করা। কান কেটে নেওয়ার কথা হয়েছিল সেদিন—সেটা হলে কি করত? খোঁড়া পায়েব অজুহাত আছে—পগারের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। ফোলা মুখের কৈফিয়ৎ—মোমাছি কামড়ে দিয়েছে। পিঁঠে লাঠির বাড়ির দাগ—তা হয়তো গায়েব কতুয়াই খুলল না দাগ বসে না যাওয়া অবধি, তেল মাখবার সময়ও না। কিন্তু কাটা ধানের কি কৈফিয়ৎ? হেন ক্ষেত্রে কান ঢেকে পাগড়ি পরে থাকত হয়তো বার মাস তিরিশ দিন। রাত্রিবেলা মশারির মধ্যে ঢুকে পড়ে তবে পাগড়ি খুলত। শয়তান মানুষ বাগে পেলে এবারে আর ছেড়ে কথা কইবে না—কানই নেবে কেটে।

শিসটা বড় ঘন ঘন আসছে গো! জোর-জোর এখন। মানুষটা বেরপোয়া—পিরীতের মানুষ সাড়া দিচ্ছে না, বেশি বকম উত্তলা

হয়েছে তাই। নদী-খাল বনজঙ্গল কুয়াশায় অন্ধকার। রাত্রি-জাগরণ ক্রান্ত মাছমারার বেতশ হয়ে ঘুমছে; বউরা পরমা নিয়ে কেনাকাটার বেরিয়ে গেছে। দিন-রাত্রির মধ্যে সব চেয়ে নিরালা এই সকালবেলাটা। সময় বুকে রাসলীলার জোগাড়ে বেরিয়ে পড়েছে কেউ।

ভগ্নাথ বাঁধ থেকে নেমে পড়ল। আওয়াজেব আন্দাজ করে যাচ্ছে। কোনখানে কাব কাছে গিয়ে পড়বে, কিছুই জানে না। মাল্লাটা যে-ই হোক—সেই একদিন গোপাল ভরদ্বাজকে নিয়ে যেমন হুঁড়েছিল, আজকেও হাতের স্থপ হবে তেমনি দারা। যেহে যেতে অনেক নাবালে একেবারে খালের উপর এসে পড়ল সে! ঠিক ওপারে বাগাবন। আওয়াজের অনেক কাছে এসেছে। অত্যন্ত টিপটিপি এঙতে হচ্ছে—কাদার মধ্যে পায়ের ওঠানামায় শব্দ না হয়। সতর্ক হয়ে যাবে তা হলে মানুষটা।

একেবারে পিছনটিতে এসেছে, তখন চিনল। চাক্রালা। চাক, তোমার এবই কাণ্ড? দিগন্তজোড়া কুয়াশা পেয়ে আলা থেকে এত দূর এসে প্রেমিকপুঙ্খ ডাকাডাকি কবছ? জগা হাতের মুঠি পাকাল। উঁহ, এখন কিছু নয়—এসে পড়ুক সেই রসিক নাগর, দৌড় কত দূর দেখা যাক। কাদার মধ্যে একেবারে জলের কিনারে হেতালের ডাল ধবে আছে চাক। শিশ দিচ্ছে, প্রতিধ্বনি হয়ে আসছে তাই ফিরে। আলাব করছে অমনি। হাত কয়েক পিছনে নিঃসড়ে কাঁড়িয়ে দেখছে জগা। এসে পড়লে যে হয়! বাঘের মতন কাঁপিয়ে পড়ে তার টুঁটি চেপে ধরবে। বাঘের গায়ে জোর কতটুকু—তার হেনা জোর তখন জগাব হাতে মুঠিতে।

শিশ দেওয়া ছেড়ে এবারে আর এক বকম—কু দিচ্ছে চাক্রালা। কু-কু-কু-উ-উ-উ—কোকিলের বরের মতো কঠু চেটে খেলে যায়। নোনাল-ওঠা কুয়াশাময় বাদাবনের ভিতর থেকেও পাঁটা লেখি কোকিল ডেকে উঠল। ভারি মজা চলেছে নির্জন খালের এপারে আর ওপারে। মেয়ে এবার স্পষ্টাঙ্গা স্পষ্টি কথাবার্তা শুক করল বনের সঙ্গে : ও বন, শোন—আমাব কথা শোন। ওপার থেকে প্রতিধ্বনি আসছে : শোন—। অতি স্পষ্ট—চাক্রালাব চেয়েও স্পষ্টতব গলা। বাড় হুলিয়ে চাক্রালা আরও চেঁচিয়ে বলে, না, শুনব না। তুমি আমার কথা শোন আগে, যা বলি শোন। শোন, শোন—দূর-দূরান্তরে ধ্বনিত হয়। চাক্র বলে, শোন; বনও বলে, শোন। হু-জনে পালাপালি। মাঝখানে থাল না থাকলে বোধকরি চুলোচুলি বেধে যেত হুই পক্ষে।

এতক্ষণে জগা বুঝতে পেরেছে। মাথা থাবাপ নেয়েটার। বকমবকম দেখে অনেক আগেই সেটা বোঝা উচিত ছিল। স্বংকম্প হচ্ছে জগ্নাথের। বনরাজ্যে একটা থাল এমন-কিছু ছুস্তর বাধা নয়—ভাঁটা সরে গিয়ে সেই থাল এখন আরও সৰু হয়ে গেছে। চুলোচুলির ভাবনা ভাবছে না, বাঘ আসতে পারে থাল পার হয়ে। মানুষের গলা পেয়ে দূরের কোন-ছিটে-জঙ্গলের মধ্যে হয়তো পার হয়ে এসে উঠেছে—সেখান থেকে টিপটিপি পা ফেল ঘাড়ের উপর হঠাৎ কাঁপিয়ে পড়বে। এমন কত হয়ে থাকে! পাগলের জায়গা মানবেলায়। বাদাবনে যারা আসবে, মাথা ঠাণ্ডা রেখে বিচার-বিবেচনা করে প্রতি পায়ের সতর্ক হয়ে চলতে হবে তাদের। মানবেলাব মেয়ে বাদাব এসে সঙ্গিনী পাচ্ছে না, বনের সঙ্গে তাই ডেকে ডেকে কথা বলতে এসেছে।

গালিগালাচ করা উচিত। কিন্তু খানিক আগে বা কথার গোঁচা মেয়ে এসেছে, চাককে নাড়তে জগন্নাথের আর সাহসে কুলায় না। শুধু কথাই বা কেন, মাটিতে ঐ যে অতবড় কাঁটা ইঁকল তাই বা তাকে উদ্দেশ্য করে কি না কে বলবে? বাবে যদি মুখে করে নিয়ে যায়, ভালই তো—ভরদ্বাজ গেছে, শেষ শব্দ আপোনে খতন হয়ে থাক তাদের নীতিতলা থেকে।

কুয়াসা কেটে হঠাৎ আলো ফুটে উঠল। যুথ দেখা দিয়েছে। বনের মাথায় বোদের ঝিলিমিলি, কী সপনাশ, চাকবালাব একেবারে পিছনটিতে জগা—দেখলে যে ফেপে উঠবে দম্ভাশ মেয়ে! পা টিপে টিপে পিছিয়ে সে বাঁধে গিয়ে উঠল। খানিকটা বাচোয়া এবার। বাঁধের উপর দিয়ে তন তন করে চলেছে কবানীর দিকে। চাকবালার দৃষ্টিতে না পড়ে যায়। কিন্তু হয়ে গেল তাই। তাড়াহাড়ি করতে পা পিছলাল। পড়ে গাচ্ছিল, একটা ডাল ধরে সামলে নিল। মুখ ঘোবাল চাকবালার। এক পলক। ঘুরিয়ে নিল মুখ সঙ্গে সঙ্গে। চুবি করতে গিয়ে বুতস্থ যেন দেখে ফেলেছে—এমনি অবস্থা এখন ভগাব। সম্মাসী ঢোব নয়, বোচকার ঘানায়। কিন্তু কে বুঝবে, যাবেনই না কে বোঝাতে? বলি, বাঁধের পথ তো কারো কেনা জায়গা নয়—গবস্ত পড়েছে, তাই গসেছি এখানে। যা ইচ্ছে ভাব গে, বয়ে গেল।

নতুন আলার একেবারে পা ঘেঁসে বাঁধ চলে গেছে, সেইখাননি এসে

পড়েছে। বাঁধের মাটি তুলে ভিতর দিকে ডোবা মতন হয়েছে। মতলব করে একটা জায়গা থেকেই মাটি তোলে। ক'বছর পরে এই ডোবা পুকুর হয়ে দাঁড়াবে। কলমির দামে এরই মধ্যে জলের আধাআধি ঢেকে গেছে, কলমিফুল ফুটে আছে। হাঁস ভেসে বেড়াচ্ছে তার ভিতরে। কতগুলো হাঁস রে বাবা! ডোবাটা আলার এলাকার ভিতরেই, কিনারা দিসে পথ। পিটলি-গোলায়—সন্ধ্যার পা একেছিল, খানিকটা তার চিহ্ন রয়েছে। সাদা পায়ে নগা ফেলে ঐ পথ ধরে লক্ষ্মীঠাকরন আলারের উঠে বসেছেন—আপদবালাই তাদের দূর করে দিয়ে লক্ষ্মীর বসত। এবং সন্ধ্যার পর লক্ষ্মীমন্তদের আনাগোনা সেই জায়গায়।

খান ছুই-তিন গুঁড়ি ফেলে ডোবার একদিকে ষাট বানিয়েছে! বিনি-বউ ধুতনি করে চাল ধুতে এল। বেড়ে আছে বড়ল, বাঁধা ভাত খাচ্ছে। রকমারি খাবার মাছ রেখে দেয় বোজ্জ, এসে ড্রিম পাড়ে, তার উপরে এটা-ওটা ফাইকরমাস করে পচা-বলাটিকে—কুমিরমারি থেকে তারা কেনাকাটা কবে জানে। ভাত বেড়ে অষ্টবাজন চতুর্দিকে সাজিয়ে পিঁড়ি পেতে গগনকে ডাক দেয়, ভাত পেতে এস গো। সামনে বসে এটা খাও ওটা খাও—বলে, দাঁত গোঁচালার জগা খড়কে-কাঠি গ্রনে দেয় আঁচালার সময়। বউ-বোন-আলার সন্ধ্যার পাতিয়ে দিবার মজার আছ নতুন ঘেরি ও খাতার মালিক শ্রীযুক্ত বাবু গগনচন্দ্র দাস। [ক্রমশঃ]

মন

বারেখর বসু

“How fleet is the glance of the mind
Compared with that of wind.”

বাসে যেতে যেতে মনে হয়—

আমি যদি পাগি হোতাম,

উড়ে যেতাম বহুদূরে বিদেশের দেশ

অথবা নীল শান্ত কোনো সমুদ্রের পারে

কিন্তু উদ্বেগে স্ততি উদ্বেগে মহাশূন্য পাবে

যেখানে পাগিরা গুড়ে,

মতানক্ষে গায়, মেঘে মেঘে বাতাসে হাওয়ার!

এব মাঝে কখন যে বাস—

হলে গেছে বহুব্ধ,

পেরিরের গড়ের মাঠ, আলিপুর, ঘাস, মাটি, চূপ—

পাখিবা পিছনে সব:

আমি গেছি আরো দূরে অনন্ত নিখিলে

সেখানের খোজ কিন্তু পাখিবা জানে না.

জানি আমি, অর্থাৎ এমন!



পাগলা হত্যার মামলা

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ডঃ পঞ্চানন ঘোষাল

এর পর আমরা সকলে মিলে খোকাবাবুর রক্ষিতা মলিনাসুন্দরীর কক্ষে এসে দেখলাম, মলিনাসুন্দরী আপন কক্ষে বসে ভয়ে ঠক-ঠক করে কাঁপছে। তার পাশে পড়ে রয়েছে একটা শক্ত মোটা দড়ী ও একটি ক্লোরোফর্ম-ভর্তি শিশি। এই ঘটনা সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে একটি উল্লেখযোগ্য বিবৃতি দিয়েছিল।

তাব সেই বিবৃতির একটি সারমর্ম নিয়ে উদ্ধৃত করা হলো।

“এই রাতে আমি নিশ্চিন্ত হয়েই আপন কক্ষে নিদ্রিত ছিলাম। কারণ, আমি জানতাম যে নীচের ঘরে ছুইজন সিপাই আমাকে রক্ষা কর্তব্য উপস্থিত আছে। সহসা জানালা ভাঙার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মধ্যে একটা ব্যুপ কবে আওয়াজ হলো। এইরূপ একটা আওয়াজ শুনা মাত্র আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। কিন্তু আমি উঠে বসবার পূর্বেই দেখি, আমার ঘরের বিজুলী বাতিটি জ্বলে দিয়ে খোকাবাবু আমার দিকে এগিয়ে আসছেন। আমি লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠা মাত্র খোকাবাবু আমাকে চূপ করে থাকবার জন্য নির্দেশ দিলেন। তাঁর আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করা জিন্স আমার উপায়ও ছিল না। খোকাবাবু এর উপর প্রস্তাব করলেন যে তিনি আজই আমাকে বাঙলাদেশের বাইরে এক স্থানে নিয়ে যাবেন। আমি সভয়ে তাঁকে জানালাম যে এতে তাঁর বিশেষ বিপদ ঘটতে পারে। কারণ নীচে ছুইজনের কাছে ছুই জন পুলিশের লোক আধায়ে রক্ষা করার জন্য মোতায়েন করা আছে। ইতিমধ্যে খোকার বন্ধু কেউবাবুও ঐ একই পথে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। আমার কথা শুনে তিনি বললেন যে, ঐ সিপাহিবন্দের ঘর বাহির হতে অতিকিৎহে তিনি শিকল ভুলে বন্ধ করে দিয়েছেন। ঠিক এই সময় নীচেকার সিপাহিবন্দের বাহিরের ব্যাপার উপলব্ধি করে চীংকার শুরু করে দিলে। তাদের টোচানিতে বিরক্ত হয়ে খোকাবাবু তার সাক্ষরিত কেউবাবুকে জানান, ‘এই তুই শীঘ্রি নেমে রাস্তার গিয়ে দাঁড়া। মলিনা সহজে আমাদের সঙ্গে যেতে রাজী হবে বলে মনে হচ্ছে না। আমি একে ক্লোরোফর্ম প্রয়োগে অজ্ঞান করে ওর দেহটা দড়ি দিয়ে বেঁধে নীচে গলিটার নামিয়ে দেবে, আর নীচে থেকে তুই ওকে ধরে ফেলবে বাঁধনটা তাড়াতাড়ি খুলে দিয়ে ওকে কাঁধে করে নিয়ে চলে যাবি। ঐ গলির অপর মুখে এতক্ষণে শুল্ক নিশ্চরই মটুদের ট্যান্সিখানা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে।’ খোকার আদেশ পাওয়া মাত্র কেউবাবু জানালা প’লে দেওয়ালের খ’ড়া ব’য়ে নীচে নেমে গেলো। কিন্তু আমি এই সব ডাকাতিদের কথামত কাজ করতে আরপেই ভরসা পেলাম না। আমি খোকাকে স্পষ্ট জানিয়ে দিলাম যে তাদের সঙ্গে আমি কোথায়ও যাব না এবং সঙ্গে সঙ্গে বাহিরের লোকের সাহায্যের জন্য চীংকার করতে শুরু করে দিলাম—‘ওগো কে কোথায় আছ আমাকে রক্ষা করো। খোকাবাবু এসে আমাকে খুন করে ফেললো গো। শীঘ্র তোমরা থানায় খবর দাও গো, ইচ্ছাদি’ কথা বলে। আমাকে এই ভাবে চেঁচিয়ে উঠতে

দেখে খোকাবাবুও ‘খোং’ বলে কেঁপে মত থ’ড়া ব’য়ে নীচে নেমে গেলেন। তার কিছুক্ষণ পরেই আমি শুনেতে পেলাম, বাইরে বন্ধুক হেঁড়ার দড়াদন্ড আওয়াজ হচ্ছে। এই ভয় তখন থেকে ভয়ে ঘরের মধ্যেই আমি বসেছিলাম।”

আমরা অকুস্থল হতে দড়ী, কাপড়, ক্লোরোফর্মের শিশি প্রভৃতি প্রদর্শনী দ্রব্য কয়টি সাবধানে সংগ্রহ করে নিজদেশে হেপাজতীতে গ্রহণ করলাম। ঐ ঐযধেব শিশিটা গ্রহণের সময় আমরা বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করেছিলাম। কারণ তাতে খোকাবাবু অঙ্গুলির টিপ-চিচি সন্নিবেশিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। এ’ছাড়া নেমে এসে আমরা পাশেব গলিতে এবং বাটার দেওয়ালের গাত্রে অপরাধীদের পদচিহ্নের সন্ধানও করেছিলাম। কিন্তু এটি বিষয়ে আমরা বিশেষ সফলতা লাভ করতে পারিনি।

সাক্ষিনী মলিনাসুন্দরীর উপরোক্ত বিবৃতিতে আমরা কেউ এক স্থল নামে আরও দুই ব্যক্তির নাম জানতে পারি। খোকাবাবুর দলে যে বহু ব্যক্তি সংযুক্ত আছে তা ইতিপূর্বেই আমরা অনুমান করতে পেরেছিলাম। এ’হ’ জঙ্গ মলিনাসুন্দরীকে এই সম্পর্কে জেরা করে এদের প্রকৃত পরিচয় গ্রহণ করার প্রয়োজন ছিল। এ’ছাড়া আরও একটি বিশেষ তথ্য তার কাছ হতে অবগত হওয়া আমাদের দরকার হয়েছিল। এই তথ্যটি হচ্ছে এট যে, মলিনাসুন্দরী খোকার সহিত বহুদিন রক্ষিতারূপে বাস করা সত্ত্বেও স্বাভাবিকভাবে তার সঙ্গে অজ্ঞাত যেতে চাইছিল না কেন? এই সকল ছুঁহ মামলার তদন্তে পুলিশের কর্তব্য শুধু সাক্ষ্য সংগ্রহ করা নয়। মামলার শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত এই সাক্ষীকে নিজদের তাঁবে রাখাও তাদের অপর আর এক বিশেষ কর্তব্যরূপে বস্তুি থাকে। এই জঙ্গ সাক্ষীদের মধ্যে কোনও বিসদৃশ ব্যবহার পরিলক্ষ্য করা মাত্র আমাদের কর্তব্য হচ্ছে উহাদের এইরূপ ব্যবহারের মনস্তাত্ত্বিক কারণ সম্পর্কে অবহিত হওয়া। এই জঙ্গ এই সম্পর্কে বহু প্রয়োজনীয় তথ্য জিজ্ঞাসাবাদ দ্বারা মলিনাসুন্দরীর নিকট হতে আমরা অবগত হতে থাকি। নিম্নোল্লিখিত প্রশ্নোত্তর হতে বক্তব্য বিষয়টি বিশেষরূপে উপলব্ধি করা যাবে।

প্রঃ—আচ্ছা! তুমি তো কিছুকাল খোকাবাবুর রক্ষিতারূপে বাস করেছ। কিন্তু তা সত্ত্বেও তুমি খোকার সঙ্গে অজ্ঞাত যেতে রাজী হলে না কেন? খুব বেঁচে গেছ কিন্তু তুমি। হয়তো তোমাকেই এইদিন সে খুন করে বসতো।

উঃ—আজ্ঞে, যেভাবে আমরা জীবনযাপন করি তাতে যে কোনও দিন আমরা খুন হয়ে যেতে পারি। বাড়ীতে থাকলে বিপদের সম্ভাবনা থাকে অনেক কম। এইজঙ্গ সাধারণতঃ এমনি চেনা লোকের সঙ্গেও তাদের কথামত অজ্ঞাত কোথাও আমরা যাই না। এক্ষণে এই হত্যা-কাণ্ডের পর ঐ ভয়ঙ্কর লোকটার সঙ্গে অজ্ঞাত কোথাও বাওয়া আমি নিরাপদ মনে করিনি। এ’ছাড়া নিজের স্বাধীনতা বিলম্বন দিয়ে

অল্প একজনের তেপাজতে আমি বাবোই বা কেন? আমাদের এই জঘন্য জীবনের একমাত্র সুবিধা হচ্ছে এই স্বাধীনতা। স্বৈচ্ছা এই স্বাধীনতা হারাতে আমরা সাধারণতঃ রাজী হইনা। অজ্ঞান কারণের মধ্যে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করার এটাই ছিল অজ্ঞাত কারণ। থোকাবাবু এই বিশেষ সত্যটি উপলব্ধি করেছিলেন, তাই তিনি আনার সম্মতির জন্য অপেক্ষা না করে আমাকে জোর করে স্থানান্তরিত করতে চেয়েছিলেন।

প্রঃ—হাঁ। আমবাও এই বিষয়ে আপনাদের সঙ্গে একমত। কিন্তু একটি কথা আজ আমাদের কাছে আপনাকে স্বীকার করতেই হবে। আপনি উপরোক্ত কারণ ছাড়া থোকাবাবুকে প্রত্যাখ্যানের অজ্ঞাত কারণের কথাও বলেছেন। আমবা কি পরে নিতে পারি যে এই অজ্ঞাত কারণের মধ্যে একটি কারণ ছিল থোকাবাবুর প্রতি আপনার সাম্প্রতিক ক্রোধ? থোকাবাবু পাগলাকে অকারণে হত্যা করার জন্য তার উপর আপনার এক দারুণ বিদ্বেষ এসেছিল। আসলে আপনি পাগলাবাবুকেও থোকাবাবুর মতই প্রীতির চক্ষে দেখতেন।

উঃ—কেন আপনারা এই সব অসম্ভব কথা জিজ্ঞাসা করে আমাকে মিছামিছি কষ্ট দিচ্ছেন। থোকাবাবু আমাকে প্রচুর অর্থ প্রতি মাসে দিয়ে এসেছেন। তাঁর মত দুর্দান্ত ব্যক্তির সঙ্গে অল্প গেলে আমাকে তাঁর একান্তরূপে তাঁকে থাকতে হতো। আমার প্রাণ্য অর্থের কথা ভুললে হয়তো তিনি আমাকে একাকী পেয়ে অকথা নির্ধাতন করতেন। খুনে ডাকাতে প্রতিদেব ভাসবাসাব কোন দ্বিধা আছে বলে আমরা কেউই বিশ্বাস করি না। কিন্তু পাগলাবাবুর কাছে আমি কোনও দিনই একটি কপদকও নিই নি। বরং আমাকে গানবাজনা শোনাতে বলে প্রথম প্রথম আমিই তাকে বহু অর্থ পারিশ্রমিকরূপে দিয়ে এসেছি। তবে ইদানীং রাতে সে অস্বস্তিক্রমে মত্তপান শুরু করেছিল। এই দুর্ভাগ্য হতে শুধুকে বন্ধা করার জন্যই আমি কিছুদিন তাকে অধিক অর্থপ্রদানে বিরত ছিলাম। তবে ভালবাসা শব্দটি আমাদের কাছে আপনাকে আর দয়া করে ভুলবেন না। আমরা মানুষকে খাঁশ করতে শিখেছি, কিন্তু তাদের আমরা ভালবাসতে শিখিনি। তবে—থাক সে সব কথা।—আজ্ঞে হ্যাঁ। একথা সত্য পাগলাবাবু নিহত হওয়ার আমরা সকলেই খুব ব্যথা পেয়েছি, বাবু। প্রকৃতপক্ষে এখনও আমরা বিশ্বাস করতে পারি না যে তার মত নিরীহ মানুষকে নিহত করতে পারে এমন নিষ্ঠুর মানুষও পৃথিবীতে বিচরণ করছিল।

প্রঃ—আজ্ঞা, এইবার বলো এই কেঁটাবাবু এবং সবলবাবু লোক দুইটি কারা? থোকাবাবু যে একটি খুনের দলের সদস্য এখন তুমি তা তো ভাল করেই বুঝেছ। এইবার তা'হলে তুমি মনে করে করে বল, তার দলে আর কোন্ কোন্ ব্যক্তি তোমার ধারণা মত সংযুক্ত ছিল?

উঃ—আজ্ঞে, আমি এই কেঁটাবাবু, সবলবাবু, কাঙ্গাবাবু এবং গোপীবাবু নামে কয়টি লোককে থোকাবাবুর বন্ধুরূপে চিনি। এরা সকলে কখনো থোকাবাবুর সঙ্গে আমার ঘরে এসে আমার গান শুনে গিয়েছে। কিন্তু এরা আমার সঙ্গে কোনও প্রকার বৈলক্ষ্য ব্যবহার করতে কোনও দিনই সাহসী হয় নি। তবে আমি এও লক্ষ্য করেছি যে, এরা থোকাবাবুকে সব সময়ই ভয় ও সেই সঙ্গে ভক্তি করে চলত এবং এদের উপর থোকাবাবুর প্রভাব ও সেই সঙ্গে বিশ্বাসও ছিল অসীম।

উপরোক্ত প্রস্তাবের হতে আমরা বুঝতে পারলাম যে আমাদের এই প্রধান সাক্ষিনী মলিনাসন্দরীর সহিত থোকাবাবুর আর

সাক্ষাৎকার না ঘটলে তাকে বিচারের শেষ দিন পর্যন্ত আমাদের তাঁকে রাখা খুবই সহজসাধ্য ব্যাপার। তবে মলিনাসন্দরীর হাবভাব হতে আমরা একথাও বুঝেছিলাম যে তাকে রক্ষা করার অজুহাতে তাকে নজরবন্দিনী করে রাখারও প্রয়োজন আছে। মধ্যে মধ্যে তাকে পাগলাবাবুর নিহত হওয়ার কল্পনা কাহিনী শুনিতে তাকে থোকাবাবুর প্রতি বিরূপ করে রাখা আমাদের উচিত হবে।

পরের দিন ৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৫ প্রহাসে ছয়টার সময় আমরা সকলেই যথারীতি অফিসঘরে নেমে এলাম। গত দিবস অধিকারি পৃথক কার্যে রত থাকায় আমাদের কাহারও ভালো করে ঘুম হয় নি। এতদিনে আমরা ভালরূপেই বুঝতে পেরেছি যে এই খুনের কিনারা করতে হলে আমাদের মূহূষণ করে এগিয়ে যেতে হবে। এমন কি, আমাদের মধ্যে যে কেহ যে কোনও মুহূর্তে নিহতও হয়ে যেতে পারে। কিন্তু জায়াগ আশ্রি এবং বৃষ্টিগ নেতীর জায় কলিকাতা পুলিশেরও একটা ঐতিহ্য ছিল। এই বিশেষ ঐতিহ্য গুরুপরম্পরায় আমরা অর্জন করেছিলাম। এতদিনের এত বড় ঐতিহ্য আমাদের পক্ষে হেলায় হারিয়ে ফেলাও সম্ভব নয়। আমরা যে কোনও দুর্ভাগ্য মাথা পেতে নেবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম। এখন আমাদের একমাত্র বিবেচ্য বিষয় হলো পরবর্তী তদন্ত এখন কোন দিকে পরিচালিত করা উচিত হবে, তা'জা সঠিকভাবে নির্ধারণ করা।

আমরা ইতিমধ্যেই জেনে নিয়েছি যে, এই হত্যাকাণ্ডটি থোকাবাবু এবং তার দলের লোকদের দ্বারা সমাধা হয়েছে। কিন্তু এই থোকাবাবুটির প্রকৃত পরিচয় কি? তিনি কে এবং থাকেনই বা তিনি কোথায়? অভিজ্ঞ ইন্সপেক্টর সুনীলবাবু মত প্রকাশ করলেন যে এখনো পর্যন্ত এইরূপ এক দুর্দান্ত ব্যক্তি কোনও না কোনও সূত্রে কলিকাতা পুলিশের নজরে আসেনি তা কখনও হতে পারে না। আমাদের পরামর্শসভায় তিনি দৃঢ় চিন্তে ঘোষণা করলেন যে নিশ্চয় লোকটা কলিকাতা পুলিশের নিকট অল্প কোনও নামে পরিচিত আছে।

এই সময় সহসা আমার স্মৃতিপথে উদয় হলো প্রায় বৎসরধিক পূর্বেরকার একটি ঘটনা। এই ঘটনাটি 'শিউচরণ ইত্যাকান্ড' নামে ইতিমধ্যেই প্রসিদ্ধিলাভ করেছিল। এই শিউচরণ গুরু শিউচরণিয়া ছিল একজন পুরাতন পাণ্ডা। তবে শেষের দিকে আর চৌধুরীভূক্তিতে লিপ্ত না থেকে সে চোরদের ধরাতে এবং চোরাই মাল উদ্ধার করতে আমাদের প্রায়ই সাহায্য করত। একজন আমি তাকে প্রতিটি মামলা বাবদ প্রচুর অর্থও প্রদান করেছি। একদিন সে আমাকে জানাল যে, খাঁদা নামক একজন জিলাধারি গুণ্ডা গুণ্ডা-আইন অমান্য করে কলিকাতায় ফিরে এসেছে। এই খাঁদাগুণ্ডার নাম পূর্বে থেকেই আমাদের জ্ঞান ছিল। দুই বৎসর পূর্বে দেওরাদত তেওয়ারী নামক জনৈক জমাদার তাকে ধরতে গেলে সে তাকে ছুরী মেরে পলাণার চেষ্টা করে। এই মামলাটি আমিই তদন্ত করেছিলাম। আমার রিপোর্ট অমুহুরী পুলিশের ঐ জমাদারটি বীরত্বের জন্য ভারতীয় পুলিশ পদকও প্রাপ্ত হয়েছিল। আমার অনুমোদনে আমার ঐ ইনফরমার শিউচরণ কৃপানাথ সেনের একটি বাড়ী দূর হতে আমাকে দেখিয়ে দিয়ে সরে পড়ছিল, কিন্তু ঠিক সেই সময় খাঁদাগুণ্ডা তার বাড়ী থেকে বার হয়ে আমাদের উত্তরকে সেখানে একত্রে দেখে ফেললে। আমি তৎক্ষণাৎ পথের উপর দিয়ে দৌড়ে তাকে ধরতে গিয়েছিলাম। কিন্তু খাঁদাগুণ্ডার সঙ্গে একটি সাইকেল থাকায় সে তাতে চড়ে সহজেই অদূর হয়ে যেতে পেরেছিল। [ক্রমশঃ]



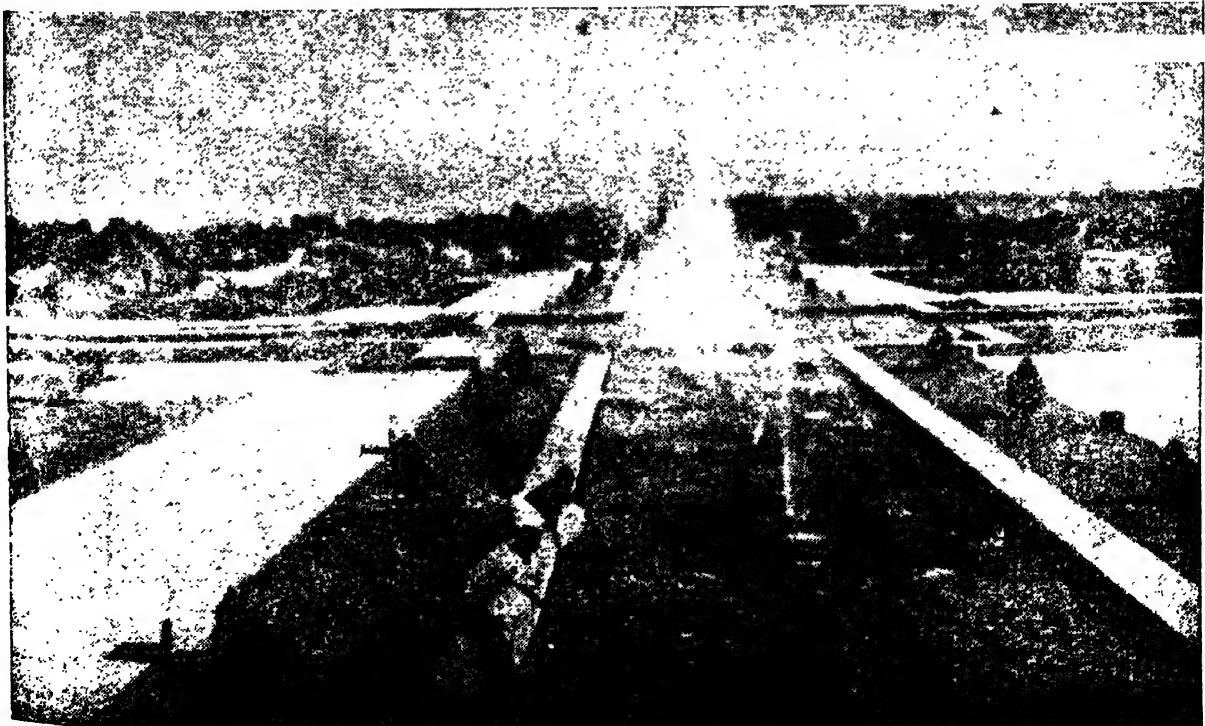
সাঁঝের বেলা

—কমল

॥ আলোকচিত্র ॥

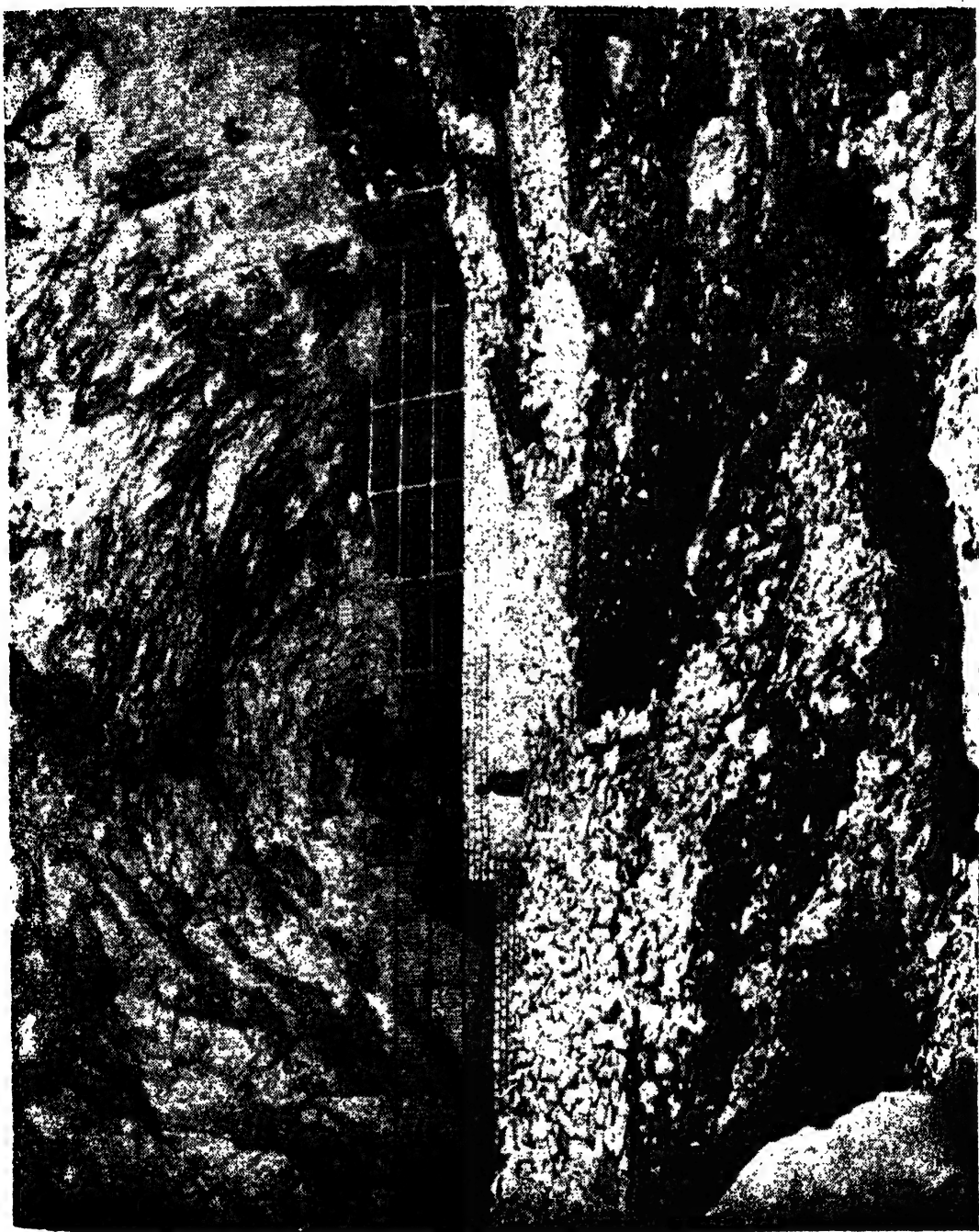
জুবিলি পার্ক (টাটা)

—অসিতরঞ্জন বোদ-দস্তিদার



কালীমন্দির (পশ্চিমবঙ্গ)





অমরনাথের গুহা

—বসন্তনাথ ভ



মেঘপালক

—চিত্তব্রজ মণ্ডল

এবার কেনবার সময়

শেহস্মা বিলাস

হৈল

পিলখার-প্রথ ক্যাপ

যুক্ত দোখে কিনবেন

এম. এল, বঙ্গু যোগ কোং প্রাইভেট লিঃ কলিকাতা-১



[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

নীলদরজা দাশগুপ্ত

তবে এই বারো বছরের মধ্যেই একটা আঘাত পেয়েছিলাম, মনে আছে—এবং সে কথাটাও তোমাকে এইখানেই বলে রাখি। আঘাতটা এল—সুধার মৃত্যু-খবরে।

বাবার মৃত্যু-খবরে মনের যে অবস্থা হয়েছিল তা ত জানই। তার মধ্যে বেদনা ছিল ঘনীভূত—সমস্ত রাত বিছানায় শুয়ে কেঁদেছিলাম মনে আছে ত? কিন্তু এবার সুধার মৃত্যু-খবর বেদনাময় হয়ে আমাকে ঠিক অভিভূত করেনি। সুধাকে হারাসাম, আর তাকে কোনও দিনই দেখতে পাব না—এদিক দিয়ে মনটা আমার মোটেই কাতর হয়নি। কিন্তু সুধার মুখখানা মনে কবে মনের গহন তল থেকে একটা যেন জ্বালা থেকে থেকে সমস্ত মনটাকে বিধিরে দিচ্ছিল—বেচারী! বিনা অপরাধে, আমারই জন্ত প্রাণটা দিল। অল্পশোচনা? কি জানি, জোর করে ঠিক তাও বলতে পারি না, নিজের কাছে ত নিজেকে কোনও দিনই অপরাধী মনে করিনি।

কিন্তু ক্রমে দেখলাম—ঘনীভূত বেদনা চোখের জলে মেঘের মতন সময়ে নিঃশেষ হয়ে যায় কিন্তু এই জ্বালাটা ঠিক একেবারে মুছে যায় না। তীব্রতা অবশ্য কমে গিয়েছিল—সময়ে কমে যায়। কিন্তু তবুও অকারণে হঠাৎ কখনও সমস্ত মনটা টনটন করে উঠত। বুঝিয়ে দিত—অন্তর্যতম অন্তরে বিষের ক্রিয়া একেবারে বন্ধ হয়নি, কোনও দিনই বোধ হয় হবে না।

মার্লিনকে যখন খবরটি দিলাম—তখন আমরা ম্যানচেষ্টারে। মার্লিন কথাটা শুনে একেবারে চুপ হয়ে গেল—এদিক দিয়ে তার মনের কথা আমি আঁজও জানি না। ফলে, শুধু এইটুকু বলে রাখি, প্রায় ১৫২০ দিন আমাদের মধ্যে কথাবার্তা যেন থুব কমে গেল, প্রয়োজনীয় কথা ছাড়া হু-জনে পরস্পরের সঙ্গে বিশেষ কোনও কথাবার্তা বলিনি। বলা! ভুল বুলো না, এ সময় কোনও বিরোধের সৃষ্টি হয়নি আমাদের মধ্যে।

আমি বোধ হয় সে সময়টা চুপচাপ থাকতেই চেয়েছিলাম এবং মার্লিনও যেন তা সহজেই মেনে নিয়েছিল। এগিরে এসে কথার বার্তার বা ব্যবহারে কোনও সহাত্বভূতিও আমাকে দেখায়নি কিংবা কোনও দিক দিয়ে কোনও বিস্তোভেরও সৃষ্টি করেনি কোকণ দিন।

কলে, ক্রমে যখন সময়ের সঙ্গে মার্লিন এবং আমার পরস্পরের প্রতি ব্যবহার আবার সহজ হয়ে গেল, সুধার বিষয় কিন্তু কোনও কথা আভাসে-ইঙ্গিতে পর্য্যন্ত কোনও দিন হুগনি আমাদের মধ্যে—হু-জনেই যেন এড়িয়ে চলেছি।

তবে, এই সময় প্রায় বছর খানেকের জন্য আমার মনে ক্রমে একটা প্রবৃত্তি জেগে উঠল—সেটা একান্ত আমারই মনের নিভৃত গোপন কথা আর কেউ জানে না। মাঝে মাঝে মনে মনে আমি সুধার সঙ্গে মার্লিনের তুলনা করতাম। মার্লিনের সংসারকণ্ঠের স্ননিপুণতার দিক দিয়ে সুধাকে ঘাচাই করে দেখতাম—সুধার কি এতটা দক্ষতা ছিল? বলতে লজ্জা করব না—মার্লিনের প্রেম নিবেদনের নব নব রূপের মধ্যে মাঝে মাঝে সুধাকে ঘাচাই করে দেখেছি, এত মধু কি ছিল তার প্রাণে? আমার সেবাক্ষের দিক দিয়েও সুধার কথা ভেবে দেখেছি—মার্লিনের মতন এমন করে কি সে প্রাণখানা বিছিয়ে দিতে পেরেছিল আমার চলার পথে? বলা! ভয় পেও না। এই তুলনায় সুধাকে আমি কখনও পরাজিত হতে দিই নাই আমার মনে—নানা যুক্তি দিয়ে তার গৌরব মনে মনে বজায় রেখেই চলেছি। রূপের দিক দিয়ে অবশ্য কোনও দিনই মার্লিনের সঙ্গে সুধার তুলনা করিনি, কেননা সেদিক দিয়ে সুধার নিশ্চিত পরাজয়ের কথা ত আমার অজানা ছিল না এবং সেদিক দিয়ে সুধাকে অপমান করতে আমার মন একেবারেই চায়নি।

আমার মনের আর একটা দিকের কথাও তোমাকে এইখানেই বলে রাখি মনে রাখ। দেশ ছেড়ে এসেছি, দেশের সঙ্গে প্রায় সমস্ত সম্পর্কই ক্রমে দিয়েছি চুকিয়ে, তবুও সেই দেশের দিক দিয়ে মাঝে মাঝে এক একটা প্রবৃত্তি কেন যে আমার মনে কিছুদিনে জন্ম প্রবল হয়ে উঠত—আমি জানি না। ইরাজীতে বাক্য বচে Complex, সেই রকম এক একটা Complex যেন আমার পেয়ে বসত কিছুদিন।

বলা! মনে আছে ত, বাবার মৃত্যুর পরে, দেশে আমাদের ক' কড় কংশগৌরব, আমাদের কংশগৌরব এ দেশের লর্ডকংশে

সময়—এ ধরনের কথা প্রায়ই কিছুদিন জাহির করেছি মার্লিনদের কাছে, এতটুকুও বিধা করিনি। শুধু তাই নয়,—পিতামহ সুশান্ত সা'র, ভাইকে খুন করার অপরাধে জেল হয়েছিল, একথা ত তখন আমার অজানা ছিল না। সে কথাটি সকলের কাছ থেকে চেপে রেখে, আমাদের বংশগৌরবে কোনও দিন কোনও কলঙ্ক পর্ধ্যস্ত করিনি—মার্লিনদের কাছে একথা জাহির করতেও এতটুকু লজ্জা বোধ করিনি। এ সব খবর আমার ছাত্রজীবনের কাহিনীতে কতক কতক তোমাকে জানিয়েছি। এ প্রবৃত্তি অবশ্য ক্রমে গেল কেটে, তবে সুশান্ত সা'র জেল হওয়ার খবরটি গোপনই রেখেছি—মার্লিনকেও কিছু বলিনি।

আজ ভাবি—কেন বলিনি? মার্লিন ত এখন আমার বিবাহিতা স্ত্রী। তার সঙ্গে মনের সমস্ত অহুভূতির নিবিড় আদান-প্রদানে এই বারোটা বছরের মধ্যে কোনও দিন কোন বিরোধের ত সৃষ্টি হয়নি বরং একটা অপূর্ণ তৃপ্তি পেয়েছি। নিজের সমস্ত প্রাণখানা বিছিয়ে আমার প্রাণ-মন তার উপর তুলে নিয়ে তাকে লালন করার একটা অদ্ভুত যাহ্ন যেন সে জানত—সহজেই আমার মন একটা নিশ্চিন্ত বিভ্রামে ঘুমিয়ে পড়ত সেখানে, অন্যায়সেই কেটে যেত বাইরের জগতের ঘাত-প্রতিঘাতের ক্লান্তি। তবুও বলিনি। কেন? লজ্জা পেতাম কি? অত বড় বংশের ছেলে রোলাঙকে আমারই জন্ত বিবাহ না করে সে শেষ পর্যন্ত আমাকে বিবাহ করেছিল—তাই কি আমার বংশের কলঙ্কের কথাটা তার কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছিলাম? জানি না। হায় রে! তখনও আমি মার্লিনকে কি ঠিক চিনিনি? বোধ হয় তাই। আজ এই কথাটা নিয়ে প্রায়ই ভাবি, কিন্তু কোনও সম্ভাব্যজনক জবাব খুঁজে পাই না। বহু পূর্বে ছাত্রজীবনে চন্দ্রনাথের কথাটা মনে পড়ে। সত্যিই কি তেলে-জলে মিশ খায় না?

অনেক পরে তোমার পাঠান পুঙ্জনীয় সুশান্ত সা'র আত্মজীবনী হাতে এল। কিন্তু তখন—

* * * *

বাই হোক, দেখতে দেখতে বারোটা বছর জীবনের কেটে গেল। এইবার আমি যেন একটু ক্লান্ত বোধ করতে লাগলাম—মনের দিক দিয়ে একেবারেই নয়, শরীরের দিক দিয়ে। সকালবেলা বিছানা ছেড়ে উঠতে যেন আর ইচ্ছে করে না, বিকালে সাধারণতঃ যেতে যেন আর ভাল লাগে না, আগুনের কাছে কোঁচে শুয়ে পড়েই সময়টা কাটিয়ে দিতে ইচ্ছে করে—এই ধরনের একটা ভাব। এত যে আমি গল্ফ খেলতে ভালবাসি, প্রত্যেক রবিবার দিনটা একটু পরিষ্কার থাকলেই সকালবেলা ত্রেকফাট খেয়ে মার্লিনকে নিয়ে চলে যাই ক্লাবে এবং সমস্ত দিন সেইখানেই কাটিয়ে, সেইখানেই লাগ খেলে, বেলে সন্ধ্যাবেলা বাড়ী ফিরে আসি, এবং শুধু তাই নয়, শীতকাল কেটে গেলে বুধবারেও বিকালের দিকে মাঝে মাঝে বাই সেখানে, ক্লাবে বাওয়ার এত মৌক আমার—ইদানীং তাও যেন আর ইচ্ছে করে না। গল্ফে পুরো আঠারো হোল অন্যায়সে খেলি আমি কিন্তু ইদানীং নয় হোল খেলতে না খেলতেই একটু যেন হাল বোধ করি। ডাক্তারীর দিক দিয়ে শরীরটাকে আমি পরীক্ষা করে দেখেছি—কিন্তু কোনও দোষ কোথাও পাইনি।

আমার শরীরের এই দিকটা মার্লিনকে অবশ্য কিছুই জানাইনি।

কেননা—ভেবেছিলাম—যদি বলি মার্লিন অবধা ভেবে মরবে। বখন এই রকমটা হল তখন শীতকাল। এদেশের শীতকাল যে কি তাও তুমি জান—আগেই বলেছি। গাছে গাছে পাতা থাকে না, সূর্য্যের মুখ দেখা যায় না, একটা শব্দশব্দে হাওয়া ও প্রায়ই বিরঝিরে বৃষ্টিতে সমস্ত দেশটা যেন খালি শিউরে শিউরে উঠছে। নেহাৎ প্রয়োজন ছাড়া লোকজন বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেই না—কোনওরকমে ছুটে পাগিয়ে ঘরের মধ্যে গিয়ে সারি এঁটে বাইরেটাকে একেবারে বিলুপ্ত করে দেওয়ার চেষ্টা করে এবং আগুনের কাছে এগিয়ে গিয়ে যেন ঝুচে। তাই ভেবেছিলাম—শীতকালটা কেটে গেলে, আমার এ ভাবটাও যাবে কেটে।

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই বুঝতে পারলাম, মার্লিনের চোখ এড়ায়নি। তখন ফেব্রুয়ারী মাস—বাইরের বরফ পড়াটা কিছুদিন বন্ধ হয়েছে কিন্তু শীতের প্রকোপটা চলেছে খুব। একদিন রাতে খাওয়া-দাওয়ার পরে শেষ করে বসবার ঘরে আগুনের কাছে বসেছি—আমি বসেছি কোঁচে এবং মার্লিন মেঝের কার্পেটের উপর পা ছাড়িয়ে বসেছে, আমারই পাশ বেঁচে, আমারই কোঁচে হেলান দিয়ে, মাঝে মাঝে একটা লোহা দিয়ে খুঁচিয়ে আগুনটাকে দিচ্ছে একটু জোর করে।

সহসা মার্লিন বলল, বিকো, অনেক দিন ত ছুটি নাওনি—কাজই করছ। এইবার কিছুদিনের ছুটি নাও না। চল কোথাও বেড়িয়ে আসি।

বললাম, সে ত এখন সুবিধা হবেনা—শীতকালে আর কোথায় যাব?

বলল, শীতকালটা ত আর মাস দুই পরেই কেটে যাবে—তারপরে। তখন ছুটি নিতে হলে ত তোমাকে এখন থেকেই ব্যবস্থা করতে হবে।

কথাটা মনে লাগল। সত্যি—শীতকালটা কেটে গেলে কিছুদিন বাইরে ঘুরে এলে হয়। কিছু টাকার লোকসান হবে—তা হলই বা, যথেষ্ট ত রোজগার করছি।

বললাম, তা মন্দ বলনি।

বলল, হ্যাঁ তাই কব, এখন থেকেই সব ব্যবস্থা কর—এপ্রিলের শেষোপসিই আমরা বেরিয়ে পড়ব।

তুখালাম, কোথায় যেতে চাও?

বলল, কোনও একটা ভাল জায়গায় গিয়ে চুপচাপ নিরিবিলা থাকব দুজনে। যদি তোমার ইচ্ছে হয়, চল, না হয় ইংল্যান্ড ছেড়ে, দক্ষিণ ফ্রান্সে রিভিয়ারায় কোথাও থেকে আসি—নীস কি মন্টাকর্নে। শুনেছি খুব স্বাস্থ্যকর সে সব জায়গা।

বললাম, ও বাবা! সে ত অনেক টাকার ব্যাপার।

বলল, তা হলই বা। টাকা ত অনেক রোজগার করছ—আমাদের কি দরকার এত টাকার। শরীরটাকে ঠিক রাখতে হবেত।

একটা তাই তুলে বললাম, তা বা বলেছ—শরীরটা ইদানীং একটু ক্লান্ত বোধ করি।

বলল, তা আমি জানি বিকো!

তুখালাম, কি জানি?

বলল, তোমার ক্লান্তির খবর।

তুখালাম, কি করে জানলে? আমি ত তোমাকে কিছু বলিনি।

মুহু হেসে বলল, আমার কি চোখ নেই—তোমার মুখে যে ক্রান্তির ছাপ পড়েছে।

শেষ পর্যন্ত যাওয়া ঠিক হল—দক্ষিণ ফ্রান্সে নয়, ইংল্যান্ডেরই কর্ণওয়াল সমুদ্রতীরে—‘লু’তে। বৃন্দ! ‘লু’র কথা আমার ছাত্রজীবনের কাহিনীতে বিস্তারিত করে লিখেছিলাম, মনে আছে ত? অল্পকালের পরে মার্লিন স্তব্ধ হলে তাওয়া বদলাতে ‘লু’তে গিয়েছিল—ছিল তার মামীর হোটেল, রোজ এণ্ড ক্রাউনে। আমিও গিয়েছিলাম, তবে ছিলাম ভিন্ন হোটেল—তখন ত আমাদের বিবাহ হয়নি। এবার ঠিক হল—আমারই মোটর গাড়ীতে দুজনে বেরিয়ে পড়ব এবং ইংল্যান্ডের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি গ্লট্টার, ডেভন কর্ণওয়ালের মধ্য দিয়ে ঘুরে লু’তে গিয়ে বিশ্রাম করব দুজনে। সেই ডেভল্যাণ্ড হোটেল, যেখানে সেবার আমি ছিলাম—সেখানে চিঠিও লিখে দিলাম—দোতলায় সমুদ্রের দিকে আমাদের জন্ত একটি ঘর রাখতে।

আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে মার্লিন বলেছিল সে বেশ হবে—যে ঘরটার ছুটি ছিল, সেই ঘরটা যদি পাওয়া যায়। আর বসেই দিনরাত সমুদ্র দেখতে পারি জানালা দিয়ে।

বললাম, সে ঘরটা হয়ত ঠিক পাওয়া যাবে না। তবে সেইরকম ঘরই পাশাপাশি আরও আছে।

একটু আবদারের সুরে বলল না—সেই ঘরটা।

তবে শুধালাম, বিশেষ করে সেই ঘরটা কেন বলত?

মুহু তেঁসে বলল, সেবার ত সে ঘরে তুমি আমাকে ঠাঁই দাওনি—

বললাম না রে—সে বৃষ্টি আমার অপরাধ? আমি ত প্রাণ-মন দিয়ে চেয়েছিলাম—

আমার গলা জড়িয়ে হুটি আঁকুল দিয়ে আমার ঠাঁই হুটি চেপে বলল, চূপ! চূপ! ওকথা বলে না।

ভিন্ন

এপ্রিল মাস শেষ হয়ে গেছে—মে মাসের সুর। সেল ছেড়ে আমাদের বেরিয়ে পড়বার সবই ঠিকঠাক—আর মাত্র সাত-আট দিন বাকী। মার্লিন ক’দিন ধরে খুব শুছিয়েছে—তার গোছান বেন শেষ হয় না, রোজই কিছু না কিছু করে। আমার গাড়ীখানি ভালই—ভাল হল—বহুবথানেক আগেই কেনা, আমি নিজেই চালাই। এদেশে গাড়ীর ডাইভার খুব কম লোকেই রাখতে পারে—অসম্ভব খরচের ব্যাপার—আমাদের মতন ভাল প্র্যাকটিসওয়ালা ডাক্তারদেরও সাধারণ বাইরে। তাই আমিই গাড়ী চালিয়ে নিয়ে যাব—এই রকমই ঠিক হয়েছিল। কিন্তু এদিক দিয়ে মার্লিনের মনে একটু বিধা ছিল।

একদিন বলল, দেখ তুমি গাড়ী চালিয়ে এতটা ঘুরবে—আমার মন এতে ঠিক সাহ্য দিচ্ছে না।

শুধালাম, কেন?

তুমি ক্রান্ত হয়ে পড়বে—তোমার শরীরের দিক দিয়ে সেটা ঠিক ভাল হবে না।

বললাম, গাড়ী চালাতে আমার কোনও ক্রান্তি হয় না—আনই ত। আর তাছাড়া, বেশীদূর এক সঙ্গে চালাতেও ত হবে না।

মাঝে মাঝে প্রায়ই শু নানা হোটলে বিশ্রাম করব—এদেশের ম্যাপ দেখে সেই ভাবেই ত সব ঠিক করা হয়েছে।

মার্লিন বলল, তা ত জানি—কিন্তু তবুও—

বললাম, আর তাছাড়া শেষ পর্যন্ত লু’তে গিয়ে লবা বিশ্রাম ত নেবই—এক মাস চূপচাপ থাকব সেই হোটলে।

মার্লিন শুধাল, ট্রেনে লু’তে যাওয়া যায় না?

বললাম, তাহলে ত ডেভন কর্ণওয়ালের কিছুই দেখা হবে না। আর ট্রেনে এতদূর যাওয়াও ত কম ক্রান্তিকর ব্যাপার নয়! বোধ হয় অনেক তদল-বদল আছে।

মার্লিন চূপ করে গেল। একটু পরে বলল, বেঙ্গবাব আগে গাড়ীটা কিন্ত ভাল করে দেখিয়ে ঠিকঠাক করে নিও।

বললাম—তা ত বটেই। সে সব ব্যবস্থা আমি করছি।

যাই হোক, সামনের শনিবার লাঞ্চ খেয়ে বগয়ানা হব—আজ রবিবার। সকালবেলা ব্রেকফাস্ট খেয়ে আমি আমার বসবার ঘরে আঙনের ধারে কোঁচটির উপর পা ছড়িয়ে বসে খবরের কাগজ পড়ছিলাম। মার্লিন একবার ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করেছিল, আঙন জালিয়ে দেবে কি না। বলেছিলাম—আপাততঃ দরকার হচ্ছে না।

নিজের মনে খবরের কাগজ পড়ছি—মার্লিন ঘরে ছিল না, বোধ হয় রান্না-ভাঁড়ার নিয়ে ছিল ব্যস্ত। কিছুক্ষণ পরে মার্লিন হঠাৎ ঘরে ঢুকল—কোলে তার বছর তিনেকের একটি পুতুলের মতন মেয়ে—নাম পিপা। মার্লিনের কোলে পিপাকে দেখে একটু অবাক হলাম—কারণটুকু বলি। পিপাটি আমাদের পাশের বাড়ীর মেয়ে। আমাদের বাড়ীর পূর্বের দিকে আমাদের সীমানা সংলগ্ন বাগানওয়ালা আর একটি বাড়ীতে পিপা থাকে, তার বাপ-মার সঙ্গে। পিপার বাপ মিঃ হোমস্, কি করেন আমি জানি না এবং আমার সঙ্গে রাস্তায় দেখা হলে টুপী তোলা ব্যতীত আর কোনও পরিচয় নাই। তবে শুনেছি, পিপার মার সঙ্গে মার্লিনের পরিচয় হয় পরস্পরের বাগানে বেড়ার ছপাশে দাঁড়িয়ে এবং এই ভাবে মাঝে মাঝে আলাপ হত দুজনার। ক্রমে মার্লিন পিপার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং মিসেস হোমসের আমন্ত্রণে মাঝে মাঝে যেতে শুরু করল পিপাদের বাড়ীতে। মিসেস হোমসও মাঝে মাঝে পিপাকে নিয়ে আসতেন আমাদের বাড়ীতে কিন্তু আমার সঙ্গে কখনও তাঁর দেখা হয়নি। তবে মার্লিনের কাছে শুনেছি, মহিলাটি নাকি খুব ভাল। পিপাকে আমি অবশ্য এর আগে দু-চার বার দেখেছি—মার্লিনই কোলে করে নিয়ে এসেছে আমার কাছে। পিপাকে আদর করে চুমো খেয়ে বলছে এক টুকরো মিষ্টি—না বিকো?

প্রায় বারো বছর হল আমাদের বিবাহ হয়েছে—কিন্তু আমাদের কোন ছেলেমেয়ে হয়নি। সেদিক দিয়ে আমার মনে যে কোনও দুঃখ ছিল এমন কথা বলতে পারি না। কেন না, সেদিক দিয়ে কোনও অভাব বোধ আমি কোনও দিনই করিনি এবং সেদিক দিয়ে মার্লিনে মনে যে কোনও দুঃখ থাকতে পারে—তাও কখনও ভেবে দেখি বা খেয়ালও হয়নি। দুজনে বেন দুজনে নিয়ে পরিপূর্ণ হয়েছিলাম।

কিন্তু ক্রমে মার্লিনের পিপার প্রতি এই আকর্ষণে হঠাৎ একদিক কণাটার খেয়াল হল—আমার মনের অবস্থা যাই হোক, মার্লিনের

নিশ্চয়ই ঐকিক দিয়ে একটা হুংখ আছে। কথাটা নিয়ে সমস্ত দিন ভাবলাম—হুংখ ত হওয়ারই কথা, সব মেয়েই ত 'মা' হতে চায়, এ যে তাদের অন্তরতম অন্তরের একান্ত নিভৃত কামনা। অনেকদিন ত হয়ে গেল—হলই বা না কেন?

সেই দিন রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর বিছানায় শুয়ে মার্লিনের কানের কাছে মুখ নিয়ে বললাম—লীনা! পিপার মতন তোমার একটি মেয়ে হলে কি সুন্দর হত বলত?

মার্লিন যে একটি দীর্ঘনিশ্বাস চেপে নিল সেটুকু বুঝতে আমার দেৱী হয়নি। একটু চাপা হাসি হেসে বলল, নাই বা হল। আমাদের কিসের অভাব।

কিন্তু ফলে একটা জিনিষ লক্ষ্য করলাম; যেদিন রাত্রে মার্লিনের সঙ্গে এই কথা হল, তারপর থেকে মার্লিন আর পিপাকে কোলে করে আমার সামনে আসত না। আড়ালে পিপাকে আদর করে, আমার অজানা ছিল না। কিন্তু আমার সামনে—সেদিন রাত্রে কথার পরে একটা লক্ষ্য এসেছিল কি তার মনে? হয়ত তাই।

তাই বোধ হয় আজ অনেক দিন পরে হঠাৎ পিপাকে কোলে করে আমার সামনে এসে দাঁড়াতে একটু অবাক হয়েছিলাম।

মার্লিন হেসে বলল, দুইটা কি বলে জান?

শুধালাম, কি?

বলল, বলে—uncle যাবে যাক কিন্তু তুমি যেও না।

হেসে পিপার দিকে চেয়ে বললাম, হ্যাঁ পিপা—তুমি আমাকে ভালবাস না?

অল্প দিকে মুখ ফিরিয়ে মার্লিনের গলা জড়িয়ে আদরমাখান সুরে বলল, না আশিঁ যাবে না।

হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠল। টেলিফোনটি ছিল স্বদের বাইরে সিঁড়ির পাশে। উঠে গিয়ে টেলিফোন ধরলাম, শুধালাম কে?

উত্তর এল, আমি লালকাকা।

বললাম, আরে, মিঃ লালকাকা! কি খবর আপনার? অনেক দিন দেখা হয় নি—ক্লাবে আর আসেন না কেন?

'সে কথার উত্তর না দিয়ে বলল, শুনলাম আপনারা ডেভম, কর্ণওয়াল বেড়াতে যাচ্ছেন শীগগিরই। তার পূর্বে আপনারাদের সঙ্গে একটু কথা ছিল। কখন গেলে আপনার সুবিধা হয়?

বললাম, আজই আসুন না। আজ সকালটা ত বাড়ীতেই আছি। একটু ইতস্তত করে বলল, আজ—আজ একটু অসুবিধা হচ্ছে।

কাল ডিনারের পরে রাত্রে যদি বাই?

একটু ভেবে নিলাম। কাল ডিনারের পরেও কোথাও যাওয়ার কথা নাই।

বললাম, বেশ তাই আসবেন—আমি বাড়ীতেই থাকব আপনার জগত।

'অনেক ধন্যবাদ' বলে টেলিফোন কেটে দিল।

[ক্রমশঃ]

জলছবি

মলয়শংকর দাশগুপ্ত

হাওয়ার হরিণ ঘুরছে ফিরছে ঘুরছে,
জ্যোৎস্নার জরি নজ্জা আঁকছে আকাশে
সময়ের সুর থেকে থেকে পাতা মুড়ছে!

খুশির হাওয়ার কী কথা বলছে কানে
মনের ময়ূর বল না কী জানে কী জানে—
আয়নার মতো সাগরের মনে মনে
স্রোতের সোহাগে কি পারদ এনে পূরছে!

(প্রেমিক হৃদয় তার, মৌমাছি উড়ছে ও উড়ছে;
হুঁচোখে নীরব ভাষা, কালো চুলে হাওয়ার চিক্কী
ধ্যানব্রত ভবিষ্যৎ মৌননীর বার্জ সঙ্গোপনে—
অরণ্যে রেখেছে ঢেকে, সবুজের মঞ্চে পদধ্বনি!)

তবুও হাওয়ার হরিণ ঘুরছে ফিরছে;
নীলমাতানো সুরে আমাকেই কিয়ছে,
কথার পাগড়ি জলতরঙ্গ ছিঁড়ছে।
জ্যোৎস্নার জরি নজ্জা আঁকছে আকাশে,
হৃদয়ে জোনাকি খুঁই হয়ে ফোটে—
ঝি বা সেবু আসে, সে আসে।

চন্দ্রা তার নাম

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস

সহযোজতা ভট্টাচার্য

১০

ব্রাইটকে বারি চেনে তারা তার মুখে হাসি দেখলে শঙ্কিত হয়। জলসার রাতে ব্রাইটের মেজাজ বড় শরীক বোধ হয়েছিলো। দেখে গ্যেটস্কেল ও টড বলাবলি করেছিলো—নিশ্চয় কোন মংলব এঁটেছে। কি ব্রাইট, হাসছ কেন?

—আবার কি ভাবছ?

সব সময় রাগে না ব্রাইট। সে তার অধিকারের পাছা জানে। তার বিবিধ কীস্তির কথা কানপুরে সবাই জানে। সবাই জানে টাকাপয়সার ব্যাপারে ব্রাইট একেবারে উদার। আড়ালে সাহেবরা বলে—ভাগ্যে মরে গিয়েছে ম্যাকমোহনের বোন। বেঁচে থাকলে দরকার পড়লে ব্রাইট-ই তাকে খুন করতো।

আর খুন ব্রাইট অনেক করেছে। যেখানে যেখানেই সে ঘুরেছে, সেখানে অদ্ভুত সব দুর্ঘটনা ঘটেছে। তবে বোকা নয় সে। ভুলেও কখনো যেতাক্স মারেনি। নেটিভ! এ দেশে এত কালোকালো মানুষ কিলবিল করে, আর আইনের নামে তাদের গায়ে এমন অর আসে, যে ছুটো-একটা কমে বাওয়াতে কেউ অভিযোগ করেনি। কেউ নালিশও করেনি সাহেবের নামে।

সাহেবরা ব্রাইটের বাপের দিক থেকে ভেজাল রক্তের ব্যাপারটা জানেন। তাঁরা ব্রাইটের আচার-ব্যবহার দেখে তাকে পরিহার করে চলেন। রক্তের যে কৌলীজ দাবী করে ব্রাইট ভারতীয়দের উপর চাবুক চালায়, সেই কৌলীজের দাবীতেই সাহেবরা ব্রাইটকে পরিহার করে চলেন।

ব্রাইট এখন হাসলো। নিমীলিত চোখে বললো—কাল অবরুদ্ধ সজা হবে। দেখতে এসো। মজা পাবে।

সে রাতে ব্রাইটের স্বভাব-বহির্ভূত হাসিমুখ দেখে ব্রিজহুলারীর চোখ থেকে ধুম চলে গেল চট করে। উঠে বসল সে। ব্রাইট ছোটবেলা থেকে স্বভাব অমুখ্যারী লাইনফোর্ডিয়ার্ড আর সহিসদের সঙ্গে মিশেছে বেশী। তাদের পিঠে ছপটি চালিয়ে মজা দেখেছে কাজের সময়। অবশ্যই সে সব ক্রীড়াকৌতুক ম্যাকমোহনের চোখের আড়ালে হতো। তবে ব্রাইট হিন্দী বলতে শিখেছে মাতৃভাষার মতোই। সহিসের বাচ্চার হাত মুচড়ে দিয়ে বলেছে—বাও আপনা পাগাকো পাশ বাও!

রেজিমেন্ট সাহেবদের হিন্দী পরীক্ষা দিতে হয়। ব্রাইটও বাইরে বলে সে পরীক্ষা দিয়েই শিখেছে হিন্দী। বলে, আর অস্ত্রা চোখ টিপে বলে—ব্রাইট, হিন্দী সবাই দেখে কিন্তু একল চমৎকার কেউ বলে না।

ব্রাইট সে কথা শুনে মনে বোঝে, এটা হলো তার বাপের প্রতি কটাক্ষপাত। কে না জানে যে, বুঢ়া ম্যাকমোহনের বোন বিয়ে করেছিলো একটা ফ্রিভিল্লীকে?

বুঝে ব্রাইট সমঝে গিয়েছে। পারতপক্ষে অস্ত্র সাহেবদের নামনে প্রয়োজনেও হিন্দী বলতে চায় না।

ব্রিজহুলারীর কাছে এসে তার মুখ খোলে। ব্রিজহুলারীর সঙ্গে সে কথা বলে সেই হিন্দীতে, যা সহর বা গ্রামের মানুষ শৃণার চোখে দেখে। বা শুনে পণ্ডিত ও মুন্সীরা হুং করে বলেন—ভাষাতে জারজ দোষ চুকলো। কলঙ্কিত হলো ভাষা।

অর্থাৎ নিরন্তর রেজিমেন্টের সঙ্গে ঘোরে বারি, সামান্য দেড় টাকা, দুই টাকা, তিন টাকা বাদে মাসিক রোজগার, কুক ও শ্রুষ্ঠার বাদে জীবন, সেই সব সহিস, লাইনগার্ড, ভিত্তি, মেথর—তাদের ভাষা থেকে গ্রামের মানুষের স্মৃষ্টি সরলতা করে পড়ে সহজেই। গালাগালি ও কুক হুকুম শোনে তারা, আর ভাষাও হয়ে গুঠে অশালীন, কুক।

এমনি করেই ভাষার সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যায়।

ব্রাইট তাকে সেই ইতর ভাষাতেই কথা বলে। ব্রিজহুলারীকে রাতে গালাগালি করে বলে—এক একটা দেশী মেয়ে বেন আন্তন! তোমার মতো নিরুত্তাপ, ঠাণ্ডা কেউ নয়। বেন বরামুখব।

এরকম প্রত্যেকটা নিশীথে অবমানিত হয় তার নারীষ। মৃত্যু-কামনা করে ব্রিজহুলারী। এই বর্ষর মানুষটা কেন যে তাকে ছাড়ে না, তাড়িয়ে দেয় না, তাতেও সে বিস্মিত।

আজ রাতে, এই জলসার রাতে কিন্তু ব্রিজহুলারীকে সে রকম কোন অভিযোগ করলো না ব্রাইট। বরঞ্চ বললো—খুব ভারী একটা সোনার গহনা দেব তোমার কোমরে। খবর দেব লক্ষ্মীচান্দকে।

—কি দরকার?

—কেন, তুমি পরবে?

—আমি আর গহনা চাই না।

—সেটা তুমি পরবে।

—কেন, দেখিয়ে দিতে চাই আমি সবাইকে। এত গহনা কার করে আছে?

ব্রাইট শুনে শীষ দেয়, ভাবে, এ ছাড়া তিনশো টাকা আটকে কোবার কোন রাজ্য নেই। আর তিনশো টাকা মনে করতেই তার মনে হয় একটা পঁচিশ হান্সিষ বহুরের আহেরিরা ছেলের ভীত মুখ। পিষ্ট-পিষ্ট করে পছন্দে লোখের পাভা ভয়ে। মনে করতেই এমন

জানন্দ হয় তার, যে দুনিয়াটা ভাল করে বার তার কাছে।
ত্রিভঙ্গলারী বলে—কি হয়েছে? তুমি শিব দিচ্ছ কেন?

—মন ভাল আছে।

—কেন?

পাশ ফিরে গড়িয়ে ত্রিভঙ্গলারীর নরম শরীরটা একটা শক্ত হাতে
চটকে ধরে টাইট বলে—এমনি।

অন্ধকার। আর এই হলো টাইটের মজা। বতকণ না
যন্ত্রণায় আর্দ্রনাদ করে মুক্তি চাইবে ত্রিভঙ্গলারী, ততক্ষণ সে
ছাড়বে না।

ত্রিভঙ্গলারীর নিষ্পেষিত, নিঃশেষ নারীসত্তা কীতে টোট চেপে
থাকে। চোখ দিয়ে জল পড়ে। ভবু মুখে যন্ত্রণার শব্দ করে সে
টাইটকে বিজ্ঞতার আনন্দ উপভোগ করতে দেয় না।

সে রাতে গারদে জেগে থাকে একটা পঁচিশ বছরের ডীক সিপাহী।
আর গারদের বাইরে কীড়িয়ে যে পাহারা দেয়, সেই সিপাহী-ও জেগে
থাকে। গারদের ভেতরে বসে সিপাহীটা থেকে থেকে শুধু জিজ্ঞাসা
করে—সকাল হলো?

—না, ভাই—যা হবে, তা হবে—তুমি ভেব না।

—না, ভাবছি না আমি।

আকাশে আঁধার যেন পাতলা হয়ে আসে। পাহারাদার সিপাহী
বলে—একটু চুপ, পান্ডি ডলে দেব? খাবে?

—না

তারপর হঠাৎ অপ্রাসঙ্গিক ভাবে বলে—হী ভাই, এ্যাড্‌জুটেন্ট
সাহেব এখানে নেই?

না। না, তুমি ভেব না ভাই!

—না, আমি ভাবছি না।

এই কয়েকটা সিপাহীর মাথায় কোন দিন-ও চট করে ঢোকেনা
কথা। সহজে বৃকতে পারেনা সে। বড় জটিল তার কাছে প্রক্রিয়াটা।
বৃকতে বড় সময় নেয় সে। যখন আকাশ দেখে সে বোঝে যে সকাল
হতে আর খুব দেরী নেই, তখন সে উবু হয়ে বসে মাথার হুঁদিকে
হাত রেখে বৃকতে চেষ্টা করে কি করে কি হলো।

হ্যাঁ। সে নারু মুখিয়া, 53rd-এ যে একজন সিপাহী। থাকে
কি গ্রামে কি খন্ডবাড়ীতে, কি এখানে সবলে জানে মুখু বলে, সে
শেষ করেছে। সে চুরি করেছে।

তার কারণ হলো সকলে তাকে চিরদিন বলেছে বোকা। অস্ত্র
ছেলেদের সঙ্গে সে লালার গল্প-ছাগল চরাতে গিয়েছে। অস্ত্র ছেলেরা
লালার বাগান ভেঙে আম পেরাবা নিয়ে বেচে এসেছে জরীপ
সাজেবের ভাবুতে। নিয়ে এসেছে ঢেবুয়া পরসা। সে ভয় পেয়েছে।
মা বোন বলেছে—মুখু তুই নারু। তুই বোকা।

শুভর এক বিঘে জমি দিয়েছে, আর বৌ বলেছে—বোকা তুমি।
তোমাকে পাখুরে জমি দিয়ে ঠিকালো আমার বাপ। আরে, নালার
ঘরে যে জমি, সেটা দেখে বেছে নিলো আমার বোনের বর। সে জমি
থেকে সে তিন বার ফসল তুলবে। তোমার এ জমি থেকে কি পাবে?
বড় বোকা তুমি। বড় মুখু।

হঠাৎ কেন সাহেবদের মনে হলো যে নতুন নতুন সিপাহী সওয়ার
দরকার হবে রেজিমেন্টে! কথাবার্তা চলছিলো। আর ঘোড়াও

কিনছিলো রেজিমেন্ট। সে টাইটের কুঠি পাহারা দিচ্ছিল, তাতেই না
জানতে পারলো? জানতে পারলো, যে স্বরার রেজিমেন্টে ঘোড়া
সরবরাহ নিয়ে বেধারবি ছিলো তোলারাম আর শিরাজি বাইজু-র
মধ্যে। তোলারামরা চার পুরুষ ধরে দিল্লী আগ্রায়, এখন কানপুর
লক্ষ্মী-এ ঘোড়া সরবরাহ করছে। তার মস্ত ব্যবসা। শিরাজি বাইজু
কোনদিন সুযোগই পায়নি। জানলো যে এবার কোন অজ্ঞাত
কারণে সাহেবদের ঘোড়া দিতে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে তোলারাম।
আর শিরাজি বাইজু দর দিয়ে পাঠালো।

টাইট আর যা-ই হোক ঘোড়া চেনে। ভাই এসব লেনদেনের
সময়ে কেমন করে যে সে জড়িয়ে পড়ে কেউ বুঝতেও পারে না।
তিনশো টাকায় এক একটা ঘোড়া, এই হিসেবে ত্রিশটা ঘোড়া কেনা
হলো। নয় হাজার টাকা পেলো শিরাজির ছেলে। কোম্পানীতে
কাঁচা কাজ হয় না—সব হাতে-কলমে।

কিন্তু সেখানেই টাইট টেকা দেয় অপরকে, আর সেখানেই তার
কৃতিত্ব।

ভবু মুখের কথায় এক একটা ঘোড়া-পিছু বিশ টাকা করে কমিশন
চাইলো টাইট। সব কথা ঠিকঠাক। টাকা আনবে নারু। তার
মতো মুখু কে আছে? শিরাজির ছেলে সামান্য নারুকে বললো,
এই ঘোড়া পৌঁছিয়ে দিবি সাহেবকে।

টাইটের চিন্তাবানী বিলি আছে। অনেক দেশীলোক সদাসর্বদা
বাওয়া-আসা করে সেখানে। নৃবজের হাত দিয়ে একটা ছোট
তেজারতি কারবারও খুলে দিয়েছিলো টাইট। সেজন্তেও আসে
কেউ-কেউ। টাকাদায়সার দরকারে।

তেমনি করেই এল নারু। আর তোড়া নিয়ে গুণতি তিনশো
টাকা দেখে চটে গেল টাইট।

আসলে সামান্য তাকে টেকা দিয়েছে। নারুকে দিয়েছে পাঁচটা
টাকা। আর টাইটকে ডাহা ঠকিয়েছে। সামান্য শিরাজি নয়।
শিরাজি পুন্যো বিশ্বাসের লোক। সে কথা দিয়ে কথা কথা রাখে।
মুখের কথায় আর বিশ্বাসেই টাকাকড়ির লেনদেন চলে। খুব একটা
প্রবঞ্চনা হয় না।

কি বুঝলো টাইট কি জানে। নারুর ডিউটি বদল হয়েছিলো।
নারুর মনে হয়েছিলো সে হাতে স্বর্গ পেয়েছে। বুক ফুলিয়ে সে
একে-তাকে বলেছিলো—আমি যদি ডাহা মুখুই হবো, তবে পাঁচটা
টাকা কেমন করে কামালাম?

আবার দিবি দিয়ে বলেছিলো—কারুক বোলা না এ
কথা।

আসলে খুব ফুর্টি হয়েছিলো তার। আব এখন ভারতীয়
অফিসাররাও গরম হয়ে আছেন। এমনিতেই জাঁকজমকে সাহেবদের
সঙ্গে টেকা দিয়ে চলেন তারা। এখন যেন বেশ বেপরোয়া। নারুকে
ডেকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। বলেছিলেন—তুই কি মিথ্যে কথা
বলছিল? তোয় জিত টেনে ছিঁড়ে ফেলতে পারি, তা জানিস?
এ রকম আলগা কথা বলিস কেন? আবার তনছি তুইও পেয়েছিল
পঁচিশ টাকা?

হাবিলদার সাহেবের কথা শুনে ভয়ে নারু কঁকড়ে গিয়েছিলো।
পুন্যো ভাটা পেরে বসেছিলো তাকে। বলেছিল—হজুর পাঁচ টাকা।
পঁচিশ নয়।

তখন সুরবেদার চোখে চোখে হেসেছিলেন হাবিলদারের সঙ্গে।
পত্নীর স্বরে বলেছিলেন—সিপাহী, তুই সত্যি কথা বল।

সব বলেছিলো নান্নু। বলেছিলো—রাইজু সাহেব আমাকে টাকা দেন। আমি সাহেবকে দিই। আমি কিছু জানি না।

তারপর এ নিম্নে আরো কথা হয়েছিলো। ভারতীয় অফিসার থেকে সিপাহী পর্যন্ত ইনফ্যান্ট্রি ও রিসালার লোকেরা সকলে একটি কথাই ভেবেছিলো, কত দিন, আর কত দিন সহ্য করতে হবে এই অত্যাচার? আর যেন পারা যায় না। মুখ বন্ধ করে কিল খেয়ে কিল চুরি করে আর কত দিন চলবে? এর কি শেষ নেই?

তারপর স্বতঃই একথা ছড়িয়েছিলো। ও-দিকে সামাদ শতরে বলে চৈৎরাম জৈৎরাম ব্যাঙ্কারদের মুন্ডরীকে শুনিয়ে বলেছিলো—মনিবদের বল ব্যবসা গোটাতে। হিন্দুস্তান ছেড়ে যাচ্ছে সাহেবরা আর সোনা-রূপা সব নিয়ে ফাঁক করে দিয়েছে রিয়াসত। আর বেচারীদের হাস কি! দশ-বিশ টাকা মেসে নিচ্ছে? আতা হা!

সম্ভবতঃ প্রশ্নই ছিলো আকাশে-বাতাসে বাজার গরম হজবে। তাই রেখে-ঢেকে বলেনি সামাদ। বলেছিলো বাজারে আশ্রয় লেগেছে দেখছ না?

সত্যি কথা। রেজিমেন্টের চাহিলা মেটাতে মেটাতে বাজার ফতুর। বি টাকার আড়াই সের আর আট সের দাম টাকার ত্রিশ সের। বেঁচে কোন সুখটা রইলো। এর চেয়ে কাঁচাপয়সা খেলেই তো হয়।

তারপর কথাটা মুখে-মুখে ডালপালা মেলে ছড়ালো। তাইটকে খোলাখুলি তুলব করে কিছু বললেন না সাহেব। কিন্তু কথাগুলো পরোক্ষে বললেন। বললেন—সময় ভাল নয়। এমন কোন আচরণ করা না, যাতে নেটিভরা দশটা কথা বলবার সুযোগ পায়। কি টাকা-পয়সা, এটা সেটা!

বুঝলো আইট। বুঝে হাতের মধ্যে যাকে পেলো সেই বোকা সিপাহী নান্নুকে জব্দ করার মতলব করলো।

হঠাৎ মাঝডিউটে ফাঁকি দিয়ে জুয়া খেলতে গিয়েছিল নান্নু, এই অপরাধে সে অপরাধী হলো।

গারদে বসে ভাবে নান্নু। ভাবে হঠাৎ সাহেবের মুখোমুখী হয়ে ভয়ে তার পা কেমন কেঁপে গিয়েছিল। আবার এ কথার মাঝখানে সেই পাঁচটা টাকার কথাও উঠেছিল। সে কেমন ভয়ে ভয়ে কবুল গিয়েছিল। আগেই তাকে সতর্ক করতে চেয়েছিলেন হাবিলদার। পারেননি। সুযোগ মেলেনি। তবে এটুকু বলেছিলেন—সিপাহী তোকে জেরা করলে তুই বা সত্য, সবই বলিস।

কি বলবে স? জেরা তো সেদিক দিয়ে গেল না। জেরাটা গেল শুধু তাকে আর তার পাঁচটা টাকার কাছ ঘেঁষে। সেই বিবরণই কবুল খেল সে। কবুল না খেয়ে নিস্তার কি? ততক্ষণে আট টাকা মাইনের সিপাহী নান্নু সেই পাঁচটা রূপার টাকার ওপর ঝোঁ এসেছে। কে জানতো এত বামেলা হবে?

তারপর বিচার। তারপর বিশ বা বেত। এক মাসের মাইনে জরিমানা।

রাত পোহালে বিশ বা বেত খাবে সে। সেই ভাবনারই মরে রয়েছে নান্নু। দেখেছে যে চামড়া ছিঁড়ে রক্ত পড়ে। দেখেছে যে একলোড়া বেত থাকে চামড়ার মোড়ানো। শুনেছে তার

রেজিমেন্টে কেউ কবুল যাচ্ছে না বেত মারতে। শুনেছে মারবে হয়তো কোন গোরা, চাই কি অস্ত্র কেউ। শুনেছে এ্যাডজুটেন্ট সাহেব আপত্তি করেননি। দিনকাল খারাপ। বেশ কড়া হাতে এই সব ছোট ছোট ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। তাইলে এই নেটিভ সিপাহীগুলো শিক্সা পাবে।

অবর এমন কথাও বলা হয়েছে যে, এই বেক্রোয়াত দেখলে অসন্তুষ্ট হতে পারে সিপাহীরা।

—তা কখনো হয়? আর কে কবে শুনেছে যে এরা সন্তুষ্ট রইলো?

—তাদের মনে পরোক্ষে বিক্ষোভের ভাব জাগতে পারে।

—এই একটা সামান্য সিপাহীর ব্যাপারে? এ সিপাহী মাত্র। এখন একটার জায়গায় দশটা রংকট মিলবে। এ সিপাহী মাত্র। এত নগণ্য এই মানুষ, যে এ সব ঘটনা কোন দিনও খাতার পাতায় উঠবে না।

কয়েদী সিপাহী নান্নুকে পাহারা আর বদল পাহারার সিপাহীরা বলে গিয়েছে—নান্নু! তুই ভাবিস না, সুরবেদার সাহেব বন্দোবস্ত করেছেন কি বেত মারবে তোকে শোভারাম।

—শোভারাম?

—হ্যাঁ। আর নরম নরম মারবে।

—তবু তো লাগবে।

—লাগবে। তবে কম। ঐ কোন ফিরিন্দী বা অস্ত্র রেজিমেন্টের মানুষ তো দয়া মায়া করে মারবে না।

—আমি ভয় পাউ।

আইট এই কয়েদী সিপাহীর কথা ভেবেই উৎফুল্ল। সকাল হয়। লাক্ষিয়ে ওঠে সে।

কয়েদে যা-ও বা মনে-হচ্ছিল, বাইরে আনতে দেখা যায় নান্নুর চেহারা খুবই ছেলেমানুষের মতো। নির্বোধ মানুষের যেমন চেহারায় বয়সের ছাপ সহজে পড়ে না, এর চেহারাতেও তেমনই নির্বোধ সরলতা। বর্তমানে ভীক ভাবটা প্রবল। দুর্বল চিবুকটা খবখব করে কাঁপে তার। ছোট জাকিয়া পরে আরো অসহায় দেখায়। হুং ও ক্রোমে অস্ত্রাঙ্গ সিপাহী জমাদাররা থুথু ফেলে মাটিতে।

আইটকে খুব উৎফুল্ল দেখায়। যে সিপাহী অস্ত্র সময় কুস্তি করে, মাটি মেখে কুস্তি দেখায়, সেই নিয়েছে চাবুক। সে নান্নুকে যতই ইসারা করে চোখে চোখে চেয়ে—নান্নু দেখে না। সে শুধু বলে—হা রাম! জো রাম! হা রাম!

ভবানীশঙ্কর ও চন্দনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। ভবানীশঙ্কর রয়েছে ডাক্তার হিসেবে। আর চন্দন তাঁরই সহকারী। ভবানীশঙ্করের মুখ যেন একটু শাদা। চোখ ছোট। যে সব মানুষ নরম স্বভাবের, আর নিষ্ঠুরতা বারা দেখতে পারে না, ভবানী তাদেরই একজন। উদ্বেজনা ও বিতৃষ্ণার দুর্বল বোধ হয় তাঁর।

চন্দনের হাত দুইখানা যামতে থাকে। আজব ফোঁজী-জীবন। আর আজব তার আইন-কানুন! এই জীবনের জয়গানেই মুখ তার দাদা চমন। এ কোন বিবেচনার কথা! যে একটা মানুষকে এমন করে বেঁধে মারবে? বেঁধে রাখেনি লোকটাকে, তবু ফিরে রেখেছে তো? সেটাই বা কম কি? আর কি, চন্দন ভাল করেই

বোঝে, বাতাসটা ইতিমধ্যেই গরম আর ভারী হয়ে উঠছে। ভারী হয়েছে সমবেত ভারতীয়দের মানসিক বিক্ষোভের চাপে।

এত কোভ কেন? চন্দন ভাল করে মনে জানে। যে অস্ত্রায় করে বা বিনা অপরাধে একজন সিপাহী বেত খাবে করেক বা, তা নিয়ে সিপাহীরা মোটেই মাথা ঘামাতো না ক-মাস আগেও। কিন্তু এখন তারা বড় বেশী সচেতন হয়েছে। বড় বেশী খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে, কোথায় কোথায় তাদের অধিকার খর্ব হলো। কোথায় কোথায় তাদের ছোট করা হলো। দেখছে আর মনে মনে জমা করে রাখছে সেই সব অভিযোগ। ঐ যে ঝাড়িয়ে রয়েছে ব্রাইট দূরে। দুই পা ঝাঁক করে। দুই-পা মাটিতে পুঁতে রয়েছে। পা নয়, যেন শক্ত দুই খুঁটি। ঐ খুঁটি যেন অনড়, অচল। চন্দন আশ্চর্য্য হয়, ঐ সাহেব টের পাচ্ছে না, চারিপাশের বাতাসে পুঞ্জ পুঞ্জ বিক্ষোভ আর প্রতিবাদ?

এখানে ওখানে কতরকম গুজবের ফুলকি। জমায়েতে জমায়েতে চাটে বাজারে শোনা কতরকম কথা। সাহেবদের কত অত্যাচারের কথা। কতদিন ধরে কত অত্যাচারের কথা! এখন চন্দন বুঝতে পারে যেন কিছু কিছু। বুঝতে পারে সাহেবমেমদের দেখলে তাব গ্রামের মানুষ ভাবতো। তার দাদা-পরদাদা ভাবতো সাহেবরা-ই এই পৃথিবীর রাজা। তাদের উপরে আর কেউ নেই। সাহেবরা যা বলতো তা-ই করতো তারা। করতো কি? এখেনো করে। এই নিয়ে গেল বাংলায় লুকে। রাজমহলে গুলী চালিয়ে খুন করে এল কালোকালো ঝাঁওতালদের। আবার যারা বর্ষায়, আকবানিস্তানে

নেপালে গিয়েছিল, তারাও তো কতজন সে সব দেশেই মরে জুত হয়ে গিয়েছে। এখন চন্দন বুঝতে পারে, যে তখনো অনেক অত্যাচার অবিচার ছিল, যা তারা স্বাভাবিক মনে করতো। বুঝতে পারে। যে সে সব আচরণের মধ্যে তাদের উপর একটা দৃষ্টি ভাব চিরদিন-ই ছিল।

এবার চারি দিক স্তব্ধ। বাতাসে সাপের মতো শীঘ্র দিয়ে লকলকিয়ে ওঠে কালো চাবুক। পাকা বেতের সঙ্গে চামড়ার দড়ি জড়িয়ে জড়িয়ে এখন তাকে এক নাগিনীর মতোই দেখাচ্ছে।

আন্দোলিত সেই চাবুক শীঘ্র দিয়ে নেমে আসে নান্ন সিপাহীর নগ্ন পিঠে। খুব হিসাব করেই মেরেছে সিপাহী, তবু নান্নর গলা চিরে যায় আর্তনাদে।

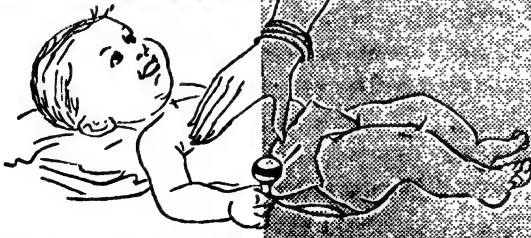
এক-দুই-তিন-চার—মানুষ কেমন জঙ্ঘ হয়ে যেতে পারে তাই দেখে ঝাড়িয়ে ঝাড়িয়ে চন্দন। তার জোয়ান শরীরে পেণী ফুলে উঠছে। তার মুখ টকটকে লাল হয়ে উঠছে। সে আর তার মতো অজ্ঞান সকলে মাটির দিকে চেয়ে রয়েছে। ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলেছে তারা। তারাও জানোয়ার। জানোয়ারের মতোই ভয়ে চূপ করে রয়েছে।

যে মার খাচ্ছে সেও জঙ্ঘ। গলাফাটা ঐ আর্তনাদ কি মানুষ করতে পারে! আর ঐ যে সাহেব ঝাড়িয়ে রয়েছে? সেও এক জঙ্ঘ। জানোয়ার নইলে এমন উল্লাসে কে অপরের যন্ত্রণা দেখে!

চন্দনের হাত দু'খানা ভবানীর চেয়ারের পিঠটা ঘোচড়ায় মনে পড়ে বিদ্রোহ স্বরণের মতো ছবির পর ছবি। মনে পড়ে

বুকে সর্দি বসেছে?

বুকে পিঠে সর্দি বসলে ভয়ের কারণ বৈকি! এ অবস্থায় ভেপোলীন মালিশ করলে সঙ্গে সঙ্গে উপকার পাওয়া যায়। কারণ ভেপোলীন স্বকের মধ্য দিয়ে এবং নিঃশ্বাসের সঙ্গে শরীরের ভেতরে যেয়ে একযোগে অতি দ্রুত কাজ করে। ঠাণ্ডা লেগে মাথাধরা ও গলাধরায়, বাথা ও বেদনায় ভেপোলীন আশ্চর্য্য মালিশ। আজই এক শিশি কিনে বাড়ীতে রেখে দিন।



ভেপোলিন

পরিবেশক : জি, দত্ত এণ্ড কোং
১৬, বনফিল্ড লেন - কলিকাতা-১

বোরোলীন প্রস্তুত কার্ভকর সামগ্রী

এলাহাবাদের উপকণ্ঠে পালানো-এ এক শিকারের দৃশ্য। সাহেব মেমকে নিশানা শেখাচ্ছে। তারপর সাহেবের গুলীতে ঐ দূরে অনেক দূরে পড়লো পাখী ঘুরতে ঘুরতে। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। সাহেব এক পুরস্কারলোভী বালককে বলে—যা! এনে দে ঐ হাঁস! নগদ এক আনা পাবি।

ছুটেতে ছুটেতে যায় সেই বাগান বালক। সেই আঁধারে, ঘাস, জঙ্গল ভেঙে নিয়ে আসে হাঁস। এসে কাঁড়ায় বগন, কচি বৃকটা হাপরের মতো উঠছে নামছে। পয়সাব আলোর মুখটা ঝল-ঝল করছে।

মেমসাহেব হাতে নেয় একটা আনি। সমস্ত দিনের শিকার এবং মনমত্ততা তার মাথা নেশার মতো ঢুকছে। মুখ লাল। বেশী হাসি। বেশী কথা। মেমসাহেব ৩১২ সেট আনিটা দূরে ছুঁড়ে দেয়। বলে—খুঁজে নিতে বলো।

ভেলেটা তখনও চেয়ে থাকে। তারপর চলে যায়। চন্দনের মনে পড়ে তারা চলে আসছে। আর আঁধারিতে কোপকাড় দিয়ে একটা গরীব আধা-নোটো ছেলে খুঁজে বেড়াচ্ছে একটা আনি।

মনে পড়ে তার দাদার কথা। মনে পড়ে ঐ ট্রাইট-ই তার দাদার জীবনটা পসু করে দিয়েছে। আবার মনে পড়ে সেই সাক্ষাৎকার বালাতোতে এসেছে হুই সাহেব। সে আর তার দাদা চলেছে তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে। সাহেবদের পৌঁছে দিতে হবে রামপুরের রাজাসাহেবের শিকার পার্টিতে। মনে পড়ে সাহেবরা তার দাদাকে উদ্দেশ্য করে বলছে—শুয়োরটা শিকারের মাংস খেয়ে খেয়ে চেহারা বাগিয়েছে বেশ।

—সেখু না পেছন দিকটা? টিপ করে ছুরা মেরে দেখলে হয়।

—লাফিয়ে উঠবে।

—আর ছোকরাটা বেন জোয়ান গাধা একটা।

তখন আর চন্দনের বাড়িটা লাল হয়ে যাচ্ছে। অপমান ও বিজ্ঞানান্তিতে তার দাদার মুখটা থর-থর করে কাঁপছে। দুজনে দুজনের দিকে চাইছে না।

মনে পড়ে গোরা কট্টারকৈ দেখে এসেছে এলাহাবাদ আর কান্দিয়ার মাঝে রেলপথ মেয়ামতের সময়ে চাবুক নিয়ে মেয়ে পুরুষ কুলীকে একই সঙ্গে তাড়না করতে। মনে পড়ে বাচ্চা পিঠি বেঁধে মা-ও ভয়ে ত্রস্ত হয়ে চমকে চমকে কাজ করছে। দু'হাতে চটপট তুলছে পাথর। ভরছে ঝুড়ি।

শুধু কি তার? সমবেত সকলেই বুকি মনের নজরে এমন সব ছবি খেলে যায়। মনে পড়ে। তবু মুখের ভাবে কিছু বোকা যায় না। তারা প্রতিজ্ঞিত এক সত্যরক্ষাব জন্ত। অন্ততঃ মনোভাব বিষয়েই কবুল খেল কোন নির্দোষ।

আট টাকা মাইনের সিপাহী যা পড়তে না পড়তে অজ্ঞান হয়ে ওপর খোঁা এসেছে। কে জানতো! তাই সিপাহী নামিয়ে নিয়েছে। তারপর বিচার। তারপর বি!

জরিমানা। হাঁশ হো গিয়া—মুখে মুখে গুজল

রাত পোহালে-বিশ ঘা বেত কেন, খেমে গেল কেন? বলে—
রয়েছে নান্দু। দেখেছে যে চাচ
বে একঝোড়া বেত থাকে

—কি বললে?

বিম্বিত ট্রাইট ঘুরে কাঁড়ায় ভবানীর দিকে। ভবানীর চোখ-মুখও লাল। তিনি বলেন, আমি উপস্থিত থাকতে অজ্ঞান ঐ মাল্লবটার ওপর বেত চলতে পারে না।

—তুমি কাজে বাধা দিচ্ছ?

—বেহুশ কয়েদীর উপর বেত তুমি চালাতে পারো না সাহেব!

ভবানীর দিকে চেয়ে আর নান্দুর দিকে চেয়ে সম্ভবতঃ বুঝতে পারে ট্রাইট। বলে, বহুৎ আচ্ছা। তোমাকে আমি দেখব।

দুজন সিপাহী নিয়ে যায় নান্দুকে। উপুড় করে শোয়ায় তাকে খাটিয়ায়। উক জলে আগোড়িন দিয়ে ক্ষতস্থান ঘুরে ফেলতে ফেলতে ভবানী বুঝতে পারেন জ্ঞান ফিরে আসছে নান্দুর। তার উক আর হুই হাত খাটিয়ার সঙ্গে ধরে ছ'জন সিপাহী।

সে বেত্রাবাত সামান্য। কিন্তু এ অবস্থায় সামান্য নয়। গ্রীষ্মের প্রখর তাপে বগন শুকিয়ে ইন্ধন হয়ে গিয়েছে অরব্য, তখন একটা চকমকি কি সামান্য? তাতেই কি আগুন জ্বলতে পারে না?

কথা হয় সে দ্বিপ্রহরে ব্যারাকে। কথা হয় সাহেবদের আড়ালে, কান বাঁচিয়ে। প্যারেড বা ডিউটি যাদের নেই, সেই সব সিপাহীরা আজ আর রামায়ণ পাঠ করে না বা কুস্তি খেলে না। এমন কি লুকিয়ে জুয়া খেলাতেও আগ্রহ দেখা যায় না আজ। কথা হয় যেখানে তিনজন চারজন একত্র। 2nd Cavalry বা 53rd Infantry-র বিশ্বস্ত সিপাহী সওয়াররা কথা কয়। তাদের হৃদয় বিভ্রান্ত। তারা কিছু বুঝতে পারছে না। চাপাটি ও পথের নিশানা দেখিয়ে যে সব ফকির সন্ন্যাসী কথা কয়ে গেছে জন্মায়তে তারা কি মিথ্যা বললো? কোথায়? কোথা থেকে আসবে লড়াইয়ের নিশানা? দিল্লী? লঙ্কো? মৌরাত?

তারা কথা কয়। কথাগুলি যন্ত্রণার আগুনে ফুলকির মতো ওড়ে।

—বিনা অপরাধে এই অত্যাচার আর কত দিন? কত দিন চলবে?

—আজ নান্দু? কাল কার সময় আসবে?

—আমাদের বেলা বিচার নেই, আর ওদের বেলা সাতখুন মাপ!

—কে বলছে ওরা নির্দোষ? আর যত দোষ আমাদের? কথা হয় হাটে বাজারে দোকানে।

—এই পচা আটা, হুর্গন্ধ গম! এতে কিসের ভেজাল আছে?

—কেমন করে জানব জাত মারছে না ইংরেজ?

—মিশনারী সায়েবরা বলছে বিধবাদের বিয়ে দোষ, ঠাণ্ডুর দেবতা ফেলে দোষ। সাহায্যপূরে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে মেথর দিয়ে জল খাওয়াচ্ছে ওরা।

—কত দিন সহ্য করব? রেললাইন কেন আনছে? কেন এমন করে জিনিষের দাম চড়িয়ে দিল? কেন এমন করে সব জায়গার আমাদের পায়ের তলা থেকে জমি সরে সরে যাচ্ছে?

কথা হয় রেজিমেন্টের বিধানী ব্যাঙ্কার জৈরাম চৈরামের কুঠিতে। সেখানে সমবেত হয় শহরের নানীলোকদের মাথা। কথা হয়।

—কে বলছে ওরা সর্বশক্তিমান? তবে সিবান্তোপোলে হারছে কেন?

—বিটুর, অযোধ্যা, সান্তারা, নাগপুর একটার পর একটা রাজ্য এমন করে নিচ্ছে কেন ওরা ?

—আগেকার বুড়ো সাহেবদের তাড়িয়ে ছোকরা ছোকরা সাহেবদের এনে বসচ্ছে কেন ? তারা সম্মান করে চলতে পারে না ?

—ওরা এক ঘুর্তো মানুষ। নিজেরের সাঁদা চামড়া নিয়ে চলে যাক না কেন ? আমরা ওদের চাই না।

—ওরা চলে যাক ! হিন্দুস্থান যে কলঙ্কে ভরে গেল। আমাদের ছায়াটুকু পর্যন্ত ওরা এড়িয়ে চলে। এমন করলে এক জমিতে এক আকাশের নিচে বাস করবে কি করে ?

সকলেই এক কথা বলে। আর সহ্য হয় না। আর কত দিন ? আর কত দিন এ কলঙ্ক ? এ অপমান ?

আসন্ন এক ছোট সফরের প্রাক্কালে এক আশ্চর্য পরিবেশে কথা বলেন ভবানী। বলেন ব্রিজহুলারীর সঙ্গে। ব্রাইটের আচরণে মনে মনে জ্বলে ব্রিজহুলারীর ওপরে বিষ ঢেলে দিয়েছে চম্পা। আর চম্পাকে বিম্বিত করে ব্রিজহুলারী ভবানীর সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার হিন্দা চেয়েছে।

চম্পার কুঠিতে নিচের ঘরে এক প্রদীপ জ্বলছে। ঝাড়িয়ে আছেন ব্রিজহুলারী আর ভবানী। প্রদীপের রাঙা আলো দু'জনের পায়ের কাছটুকু শুধু আলো করেছে। মুখ আলোর আভার ষেটুকু দেখা যায়, তাতে ব্রিজহুলারীর মুখে অনেক রঙ দেখা যায়। গালে জলের আভাস দেখা যায়। মাথার কাপড় খসে পড়ে গিয়েছে। গহনার সে ঝল্‌ঝল্‌ দেখা যায় না। বুক ঘন ঘন দুলছে। নিশ্বাস এখনো সহজ হয়নি। সে বলে, জানি, তোমাকে আর দেখব না, তুমি বলে যাও আমি কি করব ?

—আমি কি বলব ব্রিজহুলারী ?

—বল। একবার ডেকেছিলে, আমি ভীকু আমি পারিনি। তুমি বোঝ না, যে আমি মনে মনে মরে গিয়েছি ?

—এখন আর হয় না।

—জানি। এ কথা ভুলি না যে তোমার কত দয়া। ভুলি না যে সেই রক্তরাশি মৈনপুরীতে, বান্দ্যার তুমি না থাকলে আমি মরে যেতাম। তুমি যাঁচিয়েছিলে, বলেছিলে আত্মহত্যা পাপ। বলেছিলে নিজেকে যত ছোট ভাবছ ততই দুঃখ পাব। বলেছিলে তুমি আমার কলঙ্ক দেখ না।

—সে কথা আজ কেন ?

তিরস্কার করেন না ভবানী। দুঃখ করেন না। শাস্ত এক বিঘ্নতা শুধু ফোটে তার গলায়। তিনি বলেন—তুমি জান ব্রিজহুলারী, সেদিন যদি তুমি একবার রাজী হতে তবে আজ তুমি কোথায় আমি কোথায় থাকতাম। বলিনি যে আমার সাহস আছে ? কই তুমি ত পারোনি !

—বলেছিলে ! আমি ত বলেছি সে কথা ! আজ আর সে কথা বলে কষ্ট দাও কেন ডাক্তার সাহেব !

দুজনে দুজনের দিকে চেয়ে থাকে। একলা এই ছোট নবনারী পরস্পরকে জানতে। ভাগ্য প্রতিকূল না হলে তাদের সে পরিচয় অন্তরঙ্গতা হয়ে উঠতো এতদিনে। কিন্তু দুজনের ভাগ্য দুজনকে হৃদিকে নিয়ে গিয়েছিলো তিন বছর আগেই। আজ তাই গলনাসানি এত কাছে ঝাড়িয়েও মাঝখানের সে বিচ্ছেদের সরু

তারা পেরিয়ে আসতে পারে না। সন্ধ্যা চোখে চেয়ে থাকে ব্রিজহুলারী। যে পরিচয় কোন পরিণতি পারিনি, যে প্রেম অন্ধুরে বিনষ্ট হয়েছিল, তারই দুঃখশ্রুতি যেন কুরাশার ওপারে প্রেমের বাতিগুলির মতোই স্তূপ হয়ে মনকে আকর্ষণ করে।

সে ছিলো একদিন, যেদিন পিডুহীন, বিমাতা-পরিভ্রাতৃ ভবানীশঙ্কর জেস্টাইট ফাদারদের সঙ্গে নিয়ে ক্রীশ্চান হতে উৎসাহী হয়েছিলেন। মনে হয়েছিলো বৃষ্টি বা তাতে বৃষ্টির আশ্বাস পাবেন। মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করে ডাক্তার হবার পরামর্শ দিলেন তাঁকে ব্যারাকপুর চার্চের ফাদার। আর ডাক্তারী তিন বছর পড়ে পাশ না করেই চলে এসেন ভবানী চাকরী নিয়ে।

১৮৫৪-৫৫ সালে মিলিটারী জীবনে তাঁর স্বদেশ ও সমাজের বাঙালীর অভাব ছিল না। কিন্তু ভবানী কেমন যেন তাঁদের সঙ্গেও মিলতে পারলেন না। রুচি এবং মানসিক সংগঠনে বাধলো। একদিনের Humanity আর Ethics-এর ছাত্র ভবানীশঙ্কর ঠিক এ জীবনেও মিশে গেলেন না। আর যা যা ভেবেছিলেন—মানুষের সঙ্গে মেলামেশা, অস্ত্র দেশের মানুষকে জানা, আহত ও আর্ন্তের সেবাব্রত—এর কোনটাই পেলেন না। এক আশ্চর্য জীবন, মানুষের সমাজ ও সংস্পর্শ থেকে বিচ্যুত, মিলিটারীর জীবনে—ফৌজী ডাক্তার হয়ে তিনি মানুষকে অবমানিতই হতে দেখলেন। তিনি নেটিভ ডাক্তার। নেটিভ সিপাহী সহায়দের। তাঁর জ্ঞান অপরিহার্য তাঁর, অপ্রচুর ঔষধ এবং কর্তৃপক্ষের অপরিচয় অবহেলা।

তাঁর দোঁসের প্রাণ আছে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন না। সঙ্গ ও সমাজবিমুখ মন তাঁর। ফৌজীজীবনে এই সুবিপুল বর্ণবিষম্য এবং মানুষের অবমাননা দেখে তিনি দুঃখিত হলেন, যেমন সাধুসন্ন্যাসী দুঃখিত হয়। এই অভিশাপের কারণ খুঁজে তলিয়ে দেখে বা বিচার না করেই তিনি অস্ত্রদিকে মানসিক ভাগসাম্য খুঁজতে গেলেন। প্রকৃতি-প্রেমিক হলেন ভবানী। মানুষের চেয়ে প্রকৃতির রাজ্যকে অনেক শাস্ত, উদার ও ক্ষমাময় বোধ হলো। গাছ, নদী, আকাশ, পাহাড়, ফুল ও জীবরাজ্যে তিনি ঈশ্বরের অপার করুণা অনুভব করলেন।

কিন্তু মানুষের দিকেই কি বিমুখ হতে পারলেন ? তখন তিনি রেওয়াতে। ব্রাইটের ইনফ্যান্ট্রির wing-এর ডাক্তার ঘুরছেন সফরে ; ব্রাইট সেই সময়ই সংগ্রহ করেছেন ব্রিজহুলারীকে। ভবানী শুনেছিলেন সে মেয়ের অপরূপ রূপের কথা।

ব্রাইটও ভেবেছিলো ব্রিজহুলারীকে তার উপযুক্ত করে নেবে। অন্ততঃ সামান্য উর্দু ফার্সী জানা দরকার তার। সেই প্রসঙ্গেই সে ভবানীকে ডাকে। বলেছিলো—সামান্য শিখিয়ে দাও। টাকা দেব আমি।

সেই হলো আলাপ। বিম্বিত ভবানীশঙ্কর দেখলেন, যে মেয়েটি সম্পর্কে তাঁর কোন ধারণাই ছিলো না তাঁর সম্পর্কেই তাঁর মনে জেগেছে করুণা।

ব্রাইটের নিষ্ঠুর ব্যবহারের কথা প্রচলিত ছিল মুখে মুখে। তার অনেক আচরণ সম্পর্কে সাহেবরাই লজ্জা পেতো। ভবানী যেরোটিকে করুণা করলেন। তাঁর মনে আত্মবিশ্বাসে জাগতে চাইলেন এবং সহসা একদিন আবিষ্কার করলেন, তাঁর অনেকখানি মনই একখানি স্তম্ভর, বিঘ্ন মুখের পাণ্ডব ছবিত ভরে উঠেছে।

ত্রিভুলাড়ীর অবহেলিত জীবনে ভবানী হলেন প্রথম পুরুষ, যিনি তাকে শ্রদ্ধা করেছিলেন। তার আশ্রয় জীবন তাকে তার বেশসমাজের সঙ্গীর্ণ গণ্ডি ছিঁড়ে বাইরে এনেছিলো, আর কোন পথের দিশা না দিয়ে অন্ধকারে বিভ্রান্ত করে রেখেছিলো। ভবানী তাকে শোধালেন—ভয় পোয়ো না। ভয়-ই তোমাকে দুর্বল করেছে। তুমি সাহসী হও।

কোন দিন বললেন—নিজেকে মূল্যহীন মনে ক'রো না। নিজেকে বিশ্বাস করো।

সেই সময়-ই ত্রিভুলাড়ীর জীবনে শ্রেষ্ঠ সময়। সে যেন প্রথম এক আলোর নিশানা দেখতে পেয়েছিলো, আর মনে ভেবেছিলো—‘যদি ভবানীশঙ্কর তার হাতখানা ধরে রাখেন, তবে তত্ত্বো বা সে এই জীবনের নিগড় বন্ধন ভেঙে চলে যেতে সাহস পাবে।

সেদিন ভবানী সাহস হারাননি। তিনি রাজী হয়েছিলেন। ভেবেছিলেন নিয়ে চলে যেতে পারবেন তাকে। কাজের অভাব কি? কাজ পাবেন কোথাও না কোথাও। বিয়ে করবেন ত্রিভুলাড়ীকে। তাকে মাছুষ করবেন। উন্নত করবেন।

কিন্তু শেষ মুহূর্তে ত্রিভুলাড়ী-ই সাহস হারালো। মেয়েদের বৃষ্টি বা এমনি হয়।

সে কথা বাইরে কেউ জানলো কি না বড় কথা নয়। ভবানী মনে বড় খা খেলেন। আর এমনই পরিস্থিতি, যে মুখ বুজে সইতে হলো আঘাত। এ-ও তিনি বুঝলেন, যে এর পরে আর ত্রিভুলাড়ীর সঙ্গে বোগাযোগ থাকা সম্ভব নয়। সে মন তাঁর নেই। মন ভেঙেচুরে অস্ত্র রকম হয়ে গিয়েছে। অসুস্থতার ছুটি নিয়ে বন্দী হলেন ভবানী। কিছুদিন রইলেন কুমায়ুন প্রদেশে এক সাফাখানায়। অপক্লপ আরণ্য পবিত্রেশ। অপরিদ্রায সাবল্য সেখানকার মানুষদের মধ্যে। সেখানে গিয়ে যেন আবার উপলব্ধি করলেন ভবানী, ঈশ্বর, বা আত্মীর্বাদ, বা সৌভাগ্য, সে যা-ই হোক—ত্রিভুলাড়ী-ই সব কিছু বয়ে নিয়ে এসেছিলো। তাঁর জীবন সেই একজনকে ধরেই মধুময় হতে পারতো। আর সে বিহনে সত্যিই তাঁর জীবনটা শূন্য হয়ে গেল। মানে হারিয়ে গেল। জীবনটা অনেক বেশী অধপূর্ণ হতে পারতো। কল্পনা ও স্নেহের পথ ধরে প্রেম আসতো। একটা মানুষকে নিজের মধ্যে পুনর্বাসিত করার সার্থক কাজ নিয়ে তিনিও সার্থক হয়ে উঠতে পারতেন।

ভবানীশঙ্কর বুঝতে পারলেন চলতে চলতে একটা জায়গায় হিসেবে ভুল হয়ে গিয়েছে, আর সে হিসেব কোনদিনও মিলবে না। যত দিন যাবে তাঁর জমার ঘরে শুধু লালকালিতে ঢায়াই পড়বে। কিছুই পাবেন না তিনি।

আজ সেই সব বিফলতা আর নিরাশার কথা মনে পড়ে দুজনেই হুঃখ পান।

ত্রিভুলাড়ী আবার বলে, ফিস-ফিস করে—বল, আমি কি করি—এরকম ক'রে আর কতদিন বাঁচব? সবাই আমাকে খোঁজা করে। আমার সঙ্গে কেউ মেশে না। ঈশ্বর জানেন আমার কি হুঃখ।

সে নিচুগলা আরো নামিয়ে বলে—মনে হয় মরে বাই, কিন্তু সে সাহস-ও হয় না। আমি একবারে হেরে গেলাম।

ভবানীর চোখে ভৎসনা নেই। দিক্কার নেই। সে দিকে চেয়ে ত্রিভুলাড়ী কোনো অসম্ভব দূরশায় বলে।

—আর একবার নিয়ে যেতে পার না?

ফর্দাগলার নীলশিরাটা দপদপ করে তার। ভবানী মাথা নাড়েন।

তারপর আর কোন কথার প্রয়োজন থাকে না। নিরর্থক এই সময়টার তার যেন অসহ হয়ে রঠে। ত্রিভুলাড়ী বলে,—আমি বাই।

আর যাবার কালে ভবানীর চোখে পড়ে অপস্থরমান এক নীল শাড়ীর আঁচল। যেন চেনা মনে হয়। তারপর মনে পড়ে একদিন যেন তিনি বলেছিলেন,—সুন্দর এই নীল রং। বড় স্নিগ্ধ। আমার দেশে এই রঙের আকাশ দেখা যায়।

তারপর-ই প্রফুট তারার মতো ছোট ছোট শাদা লাল সেশমের বুটি তোলা এই নীল শাড়ীখানি বার বার পরতো ত্রিভুলাড়ী।

তিনি বলেছিলেন,—এই অলংকার, এ যেন বোকা! কেন পরো তুমি?

আজ সেই পরিচিত নীল শাড়ী পরে নিরাভরণে, যে এসেছিলো ত্রিভুলাড়ী, সে তাঁরই রুচিকে সম্মান করে। মনে হলো স্তনেছেন রেজিমেণ্টের বাঙালীদের কাছে, আর অস্ত্র-ও।

—ব্রাইট কম চালাক নর। কাঁচা টাকা হাতে রাখেনা সে। সবই ঐ মেয়েটাকে গহনা গড়িয়ে দেয়। ওর অনেক টাকার গহনা আছে।

পোষ্টঅফিসের বাবু তাঁর কাকা চন্দ্রমোহন বসু লিখেছিলেন—বড়সাহেবের বিবিকে ফানী ও ইংরাজী সামান্য শিখাইয়া আমি সোনার ঘড়ি জেবচেন ও উত্তম চাদির ডিবা পারিতোষিক লইয়াছিলাম। টুনি জান, তোমার খুড়ীমাতা কিরূপ অলঙ্কারপ্রিয়। তোমার ভক্ত ন. হৌক, তাঁহার কথা শ্রবণ করিয়া একজোড়া উত্তম বালা, বা সোনার নাসদান, অবশ্য লইও। তোমার সৌভাগ্য যে—

দেশীয় অফিসাররা বলেছেন—ডাক্তার সায়েব, ওই মেয়েটা আমাদের কলঙ্ক। তাতে ও বেরকম গহনার বাহার দিয়ে বেড়ায়। এইজন্য টাকার এত দরকার হয় ব্রাইটের, জানলেন; আর এতরকম গোলমাল হয়।

ভবানীর মনে হলো সত্যিই ত্রিভুলাড়ী দুর্ভাগিনী। আর এখন চম্পার ঘর থেকে বিদায় নিয়ে চন্দ্রনের সঙ্গে চলতে চলতে মনে হলো, যে রকম শোনা যাচ্ছে, যদি কোন বিপদ হয়, তবে রেজিমেণ্টের লোক ব্রাইটকে তো নয়ই, ত্রিভুলাড়ীকেও ছেড়ে দেবে না। সহসা চন্দ্রন প্রশ্ন করলো।

—ডাক্তার সাহেব, আপনি ব্রাইটের বিবিকে জানলেন কি করে? কি দরকার ছিলো তার? এমন করে কথা বলবার মতো?

—আমি তাকে অনেক দিন জানি চন্দ্রন!

—ও।

এবার ভবানী কৌতুহল ও ঈর্ষ্য কৌতুকে প্রশ্ন করেন।

—চন্দ্রন চম্পাকে তুমি কত দিন জান?

—কেন?

চন্দ্রন যে হাসছে তা যেন ভবানী বুঝতে পারেন। ভবানী সকলতাবেই বলেন।

—চম্পাকে সকলেই চেনে। তার সঙ্গে সকলেই মিশতে চায়

দিনের পর দিন প্রতিদিন...



রেস্কোনা সাবান

আপনার ত্বকে
আরও সুন্দর করে

যতবারই আপনি রেস্কোনা সাবান দিয়ে মুখ
ধোবেন—আপনার ত্বক আরও মসৃণ, আরও মোলায়েম
দেখাবে। তার কারণ, রেস্কোনার থাকে ক্যাডিল—অর্থাৎ
কয়েকটি তেলের এক বিশেষ সংমিশ্রণ যা আপনার লাবণ্যকে
হুম্মর করে এবং আপনার ত্বককে সুস্থ রাখে। রেস্কোনার
সবের মত কেণা মাখুন দেখবেন আপনার ত্বক
প্রতিদিন আরও হুম্মর হয়ে উঠছে।

আপনার সৌন্দর্যের জন্তে... রেস্কোনা



সকলেরই তার সম্পর্কে কৌতূহল। তবে চম্পা তো কাককে আরল দেয় না। দূরে রেখে চলে। তবে ?

—তবে কি ডাক্তার সাহেব ?

—শুনছি ইঞ্জিনীয়ার ইভান্স সাহেবের সঙ্গে বড় তার হয়েছে তার।

চন্দন বলে—ও কথা বলোনা ডাক্তার সাহেব !

—কেন, চন্দন ?

—চম্পা কোন বে-আদব করবে না।

কৌতুক ছাড়া চন্দন কথা কয় না। সব কথাতেই সে হাসে। চন্দনের গলায় এখন কোন পরিহাস নেই। ভবানী বলেন।

—আমি কিছু জানিনা চন্দন, এমনই বলেছি।

—এমনই চম্পার সম্পর্কে কোন কথা বলো না ডাক্তার সাহেব। জবান বড় খারাপ জিনিস। একটা ছুট কথা বে-আদাজ তীরের মতো ছুটে গেলে আর ফিরিয়ে আনতে পারো না আর কে না জানে একটা কথা থেকে লড়াইও লেগে যায় ? এমন কথা বলো না, যাতে আফশোস জাগে মনে।

তারপর আবার হাসতে থাকে। লম্বা হর কঠ। বলে—ডাক্তার সাহেব, আজ কি বলছিলেন তোমাকে ঐ সাহেব ডাক্তার ? ক্লাবে যেতে যেতে ?

—বলছিলেন কি, যে পাগলা কোন ফকির না কি ভগবানপুর, উনাও আর কুন্তেগড়ে দল বেধে ঘুরে ঘুরে চাপাটি দিয়ে বেড়াচ্ছে। আর কি বলছে।

—চাপাটি ?

—মানুলী জোয়ার বাজার-র ছাঁড়ুর চাপাটি। সেই তো হাসির কথা।

—হাসির কথা তো ভাবছে কেন সাহেবরা ?

—কোথার ভাবছে। পাগলা সেই ফকিরকে তো জেরা করে ছেড়ে দিয়েছে।

আর কোন কথা হয় না। চূপচাপ চলেন দু'জনে পাশাপাশি। সহসা চন্দন গান গাইতে শুরু করে। বলে—কিছু শুনাব নিও না, বড় কুর্তি হচ্ছে।

সে রাতে চৈতন্যম মৈত্রেয়দের পরিভ্রমণ সে বাগান বাড়ীর চত্বরে বলে কথা কয় ইভান্স ও চম্পা। এ নির্জন জায়গায় নির্বাচনে শুধু চম্পার জেদে। প্রেমের প্রাথমিক পর্ব শেষ। অতৃপ্ত ইভান্স। বলে আমার ভাললাগে না।

ছোট একটা ফুল গাছের নিচু তাল ধরে ঝাঁড়িয়ে চম্পা সব কথাই বলে কৌতুকের স্বরে। বলে—সাহেব, তুমি ব্যারাক ছেড়ে নিজে কুঠি নাও, নয় তো আমার ইচ্ছা থাকবে না যেখানে সেখানে আমি বেতে পারব না। আচ্ছা, তুমি না কি চলে যাবে ?

—No, my princess. No, my pretty.

—সাহেব, ইংরাজী বলো না।

—তোমার কিচির-মিচির ভাষা আমি বেশী বলতে পারি না।

—তবে, তুমি যাবে না ?

—না। বড় সাহেব নিষেধ করেছে।

—কেন ?

এবার চম্পা ফুল এসে তার সামনে বসে। ইভান্সের মনে হয় এই সুন্দর গেজেল হরিনের মতো গতি ভঙ্গী, এ বুঝি প্রাচ্যের মেয়ের-ই নিজস্ব। বলে—চম্পা, বড় সুন্দর তুমি। তুমি মনোহর।

—বল, কেন মানা করেছে সাহেব ?

—কি চিন্তা চুকেছে মাথায়, হঠাৎ না কি সকল সাহেব মেমদের নিরাপদে থাকবার দরকার হবে। আমার উপর হুকুম এসেছে, বর সময়ে নিরাপদে থাকবার বন্দোবস্ত কি ভাবে করবো আমি বেন ভাবি।

—কি করবে তুমি, কেলা বানাবে ?

চম্পা হেসে গড়িয়ে যায়। ইভান্স বলে—না। আমি এক টাওয়ার বানাব, তার উপরে তোমাকে কয়েদ করে রাখব। শুধু আমি ছাড়া কেউ তোমার কাছ আসবে না।

—তুমি আসবে কি করে ?

—চম্পা, তুমি রূপকথা জান না। তুমি চুল নামিয়ে দেবে, আমি উঠে আসবো সেই টাওয়ারে।

—সাহেব, তুমি বড় ভাল। এ দেশে নতুন এসেছ কি না !

—কেন, চম্পা ? আমি শীঘ্রই সুন্দর কুঠি নেব। সেখানে তোমাকে কালো কালো দাস দাসী, তামাক আর পানের সরঞ্জাম যা যা তোমরা ভালবাস, সব তোমাকে দেব।

—সব ?

—সব।

—এখানেই থাকবে তুমি ? আর দেশে যাবে না ?

—না। এ দেশও তো আমাদের-ই।

—নিশ্চয়। তোমার ভাষা আমাকে শেখাবে না ?

—না চম্পা। তুমি চিরদিন এ-রকম অল্পত পাখীর মতো কল কল কথা বলো। আমার শুনতে ভালো লাগবে। তুমি এই বাগানের বুলবুল। কেন তোমাকে বিলাতের পাখীর গান শিখাব ?

—সাহেব, তবে তুমি যাবে না ?

—না চম্পা, আমি এখানেই থাকব। খুশী হলে ?

—খুশী হলার।

ঘরে ফিরে সম্পূর্ণরূপে চম্পা বলে—বুঢ়া, তোমরা ভাব সাহেবরা থকব রাখো না ? বুঢ়া, তুমি জেনো, যে সাহেবরা বিপদ আশঙ্কা করে। তারা দিল্লীর ইস্তাহার, কি মীরার্টের বাজারের হল্লার খবর রাখে কি না, জানি না। তবে তারা সাবধান হবার কথা ভাবছে। ইঞ্জিনীয়ার সাহেব তাই বললো। বড় সাহেব বলেছে তাকে গড় বাঁধতে ! কি অল্প কোন কিছু বানাতে।

—চম্পা, একথা আয়রাও জানি। তবে তোর মুখে বাচাই হয়ে গেল সত্যি মিথ্যা।

—তারপর ?

—আর দেবী বোধ হয় নেই চম্পা। মনে হয় তাই। বুঝি না।

চন্দনের আসন্ন সন্ধ্যার প্রাক্কালে বিদায় জানাতে আসে চম্পা। পরিভ্রমণ যন্ত্রের পিছনে ককিরদরগার বাগানে ঝাঁড়িয়ে কথা হয়। চন্দন বার বার বলে—চম্পা, তুমি সাবধানে থাকবি। তোর জন্ত বড় চিন্তা নিয়ে পেলার।

—চন্দন, তুমি ভেব না। আমি একা নই।

—চম্পা, বিশদের সময় আমি সকলের কথা ভাবতে পারি না।

মনে জানি এ আমার একার দায়িত্ব।

—ভয় কবো কেন ?

—ভয় করি কেন ?

চম্পার ঘাড় ধরে রেগেই কাঁকি দেয় চন্দন। বলে—ক্ষতি হলে কার হবে ? আমার ? না সকলের ?

চম্পা হাসতে চায়। তারপর হাসি থেমে যায়। বলে—আমি ভাল থাকব। কিন্তু তুমি ? তুমি কবে আসবে চন্দন ?

—দেবী করবো না।

চন্দন ঠেট হয়ে চামড়ার দড়ি বিনিমে বিনিমে বাঁধা ভারী চম্পাটা ধরে নিতে চায়। চম্পা নিচু হয়ে বেঁধে দেয়। তারপর বলে—কি রকম সময়ে যাচ্ছ। মনটা আমার ব্যস্ত হয়ে বঠালা।

চন্দন ঈষৎ ভুরু কুঁচকে চম্পার মুখ দেখে। বলে—বড় তোমার সুনাম চম্পা, বড় ভাল বলে তোমাকে সবাই। কিন্তু তাতে আমার গর্ব নেই।

—কেন ?

—মনে হয় তোমার নিষেধ শুনে ভুল করলাম। কিছু কথা না মেনে যদি ধরে নিয়ে যেতাম ঐ খোঁড়া পণ্ডিতজীর কাছে, আর তাকে পুঙ্কত রেখে বিয়ে করে নিতাম, সব হাক্কামা মিটে যেতো। তোমার ক্ষমা হলো না !

—আবার সেই কথা ?

—একশোবার। আর কোন্ কথা থাকে ? শোনো চম্পা, আমার ডাকগাড়ী ছেড়ে যাবে, চলে যাব এখনি। বলে বাই—

তুমি হুঁশিয়ারে থেকে। সাড়েবকে বেশী খেলিও না। ওরা ম নয়। ধরে কেলেতে পারে ? আর,—

—আর কি চন্দন ?

—তোমার মাসিক তুমি নয় চম্পা, তোমার মাসিক আমি ? এই খেয়াল রেখে খুব ভাল থাকবে ? যখন ফিরে আসব, যেন না দেখি আমার চম্পা রোদে জলে গিয়েছে কি মলিন হয়ে গিয়েছে ? জানলে ?

—জানলাম।

—আচ্ছা। তবে চলি।

—এসো চন্দন। মঙ্গলময়ের কুপার ভাল করে ঘুরে এসো। আমিও কিছু পথ চেয়ে থাকব।

—এ কি ডেরাপুয়ের পথ, পাগলী।

—হাঁ চন্দন, আমার কাছে সেই একই পথ। ঐ পথটা তোমাকে বার বার নিয়ে যায়।

—আবার কিরিয়েও দেয়।

—তা দেয়।

কিছুক্ষণ কাটে এমনই। এ ওর দিকে চায়। চম্পা যেন এখন আত্মবিশ্বাস স্বয়ংসম্পূর্ণ এক নারী। আর সে অপরিণত তরুণী নয়। আর চন্দন তেমনই বেপরোয়া এক নির্ভীক যুবক। আত্মবিশ্বাসে সেও প্রোচ্ছল।

পেছনে সাক্ষ্যরাগে রাগা আকাশ। স্বদয়ে প্রেম। তবু যেন প্রচ্ছন্ন আশঙ্কা।

জোর করেই চম্পার মুখ থেকে চোখ ছিনিয়ে নিয়ে এগিয়ে চলতে থাকে চন্দন।

চন্দনের হাতে হাতে রেখে চলে চম্পা। স্বদয়ে অনেক কথা। তাই মুখে কোন কথা হয় না। [ক্রমশঃ।

স্বাধীনতা

(শি. বি. শৈলী)

বহুমান পর্বতেরা দেয় একে অস্ত্রের উত্তর ;
বজ্রনাদে তাহাদের প্রতিধ্বনি আগে দিকে দিকে ;
বজ্রাঙ্কুর সিঁদুদল আগাইয়া রাখে পরম্পর,
এবং হিমশৈলচর চূর্ণ হয় শীতেরই সম্মুখে,
ঝড়ের বিবাণ যবে বাজিয়া ওঠে এ বিশ্বলোকে।

এক থণ্ড মেঘ হ'তে খ'সে যাওয়া বিদ্রোহ-বলক
ব্যাপ্ত হ'য়ে চারিভিতে সহস্র বীণের আলো হয়,
ভূমিকম্প করে যায় লীলা তার অতি-ধ্বংসাত্মক—
নগরী পোড়ায়, শত লক্ষ বীণে ত্রাস সঞ্চার ;
ভূমির গর্ভেও তার বাঁতার ঘর্ঘর প্রকৃত হয়।

তথাপি তোমার দৃষ্টি তীক্ষ্ণতর বিদ্রোহ হ'তেও,
ভূ-কম্প থেকেও দ্রুত পদক্ষেপ কর স্বাধীনতা ;
ভূবাইয়া দাও তুমি বারিধির ভীমগর্জনেও ;
আনে তব দৃষ্টিপাত অগ্নি-বর্ষা পর্বতে মানতা ;
আলোয়ার আলো নহ, তুমি এক সৌর ভাষনতা !

ভূমি হ'তে, গিরি হ'তে, বাষ্প-আবরণ হ'তে আর
রবি-রশ্মি ছুটে যায় কুণ্ডলি ও পবন ভেদিয়া ;
আত্মা হ'তে আত্মাভরে, আতি হ'তে অপর জ্ঞাতিতে,
সর্বগ্রাম জনপদে যায় তব আলো বিস্তারিয়া—
ভূ-স্বামী ও ভূমিদাস ত্রিযাম্যর তিমির সমান
প্রভাত আলোকে তব কৈশে কৈশে যায় মিলাইয়া।

অনুবাদ : জীবনকৃষ্ণ দাশ।



[Osanu Dazai's 'THE SETTING SUN'—এর অনুবাদ]

পঞ্চম অধ্যায়

ভয়মহিলা

এই গ্রীষ্মে আমি তাঁকে তিনখানা চিঠি লিখেছি, কিন্তু কোন উত্তর পাঠিনি। সে সময়ে মনে হয়েছিল, এছাড়া আমার আর উপায় নেই এবং আমার হৃদয় উজাড় করে চিঠিগুলিতে ঢেলে দিয়েছিলাম। নিস্তরঙ্গ অন্তরাপ ছেড়ে উত্তাল সমুদ্রে কাঁপিয়ে পড়ার মত দৌলুমান অবস্থায় চিঠিগুলি ডাকে দিই, কিন্তু বহুকাল অপেক্ষা করেও কোন জবাব পেলাম না।

একবার এমনি নাওজিকে জিজ্ঞেস করলাম—ভয়লোক কেমন আছেন। নাওজী জবাব দিল যেমন থাকেন তেমনি আছেন। প্রতি রাতে মদ ও আনুবঙ্গিক হৈ-হল্লার মধ্যে কাটে; তাঁর সাহিত্য ক্রতগতিতে নীতি-বিগর্হিত খাত বয়ে চলেছে। সভ্য সমাজ তাকে বুণা করে, অবজ্ঞা করে। উপরন্তু তিনি নাওজিকে এক পুস্তক প্রকাশনী স্থাপন করতে বলেছেন এবং সেও সেই প্রস্তাব যথেষ্ট উৎসাহ সহকারে গ্রহণ করেছে। গোড়াপত্তন হিসাবে নাওজি, এই ভয়লোক ছাড়া আরও দু'জন ঔপন্যাসিককে ব'লে করে তাদের কর্ণচরীর কাজ বোগাড় করেছে। এখন মূলধন ভোগাবার মত কাউকে ধরা ধার কিনা, এই হ'ল সমস্যা। নাওজির কথা শুনে শুনে পরিত্যক্ত বয়স্কাম যে আমার মনের এক কথা স্বরভিও

পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ভেদ করে আমার প্রেমাস্পদের কাছে পৌছয়নি। এর জন্য বত না লজ্জা পেলাম, তার চেয়েও বেশী করে বুঝলাম যে, বাস্তব জগৎ আমার কল্পনার দুনিয়া থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পদার্থে গঠিত। আমার সব অভিজ্ঞতা ছাপিয়ে ভয়াবহ এক নিঃসঙ্গ বোধ আমার ঘিরে ফেলল, মনে হ'ল সন্ধ্যার প্রাক্কালে বিজন এক শারদীয় প্রান্তরে আমি নির্বাসিত। এখান থেকে আমার ব্যাকুল আহ্বানে সাড়া দেবে না কেউ। অবাধ হয়ে ভাবি, একেই চলতি ভাষায় হতাশ-প্রেমিক বলে? সূর্য্যদেব সম্পূর্ণ দৃষ্টির অন্তরালে সরে যাবার পর, একাকী বিজন প্রান্তরে নিষ্ঠুর শিশিরাঘাতে মৃত্যুই কি আমার কপালের লিখন? রুদ্ধকান্নার আবেগে আমার স্বরূপ, বন্ধনুল আলোড়িত হল।

অতঃপর টোকিওতে গিয়ে মিঠার উয়েহারার সঙ্গে দেখা করা ভিন্ন গত্যন্তর রইল না—থরচ যা হয় হবে। পাল উড়িয়ে জাহাজ ঘাট ছেড়ে আমার তরী অকুল সাগরে ভাসল। আর অপেক্ষা করা যায় না। যেখানে যাবার সেখানে আমার যেতেই হবে। টোকিও যাত্রার গোপন আয়োজন করার সময়ে এই কথাগুলি আমার মনের মধ্যে ঘোরাকেরা করতে লাগল। ইতিমধ্যে হঠাৎ-ই মায়ের অবস্থা মোড় নিল।

এক রাতে মা দীর্ঘ কালতে শ্রুত করলেন। শরীরের তাপ নিয়ে দেখলাম ১০২° ডিগ্রি অর। কাশির ধমকের ঝাঁকে মা বললেন—খুব সম্ভব আজকের এই প্রচণ্ড শীতটা সহ্য হ'ল না। কাল আমি যেড়ে উঠব। যাই হোক, শুধু কাশি বলে আমার মনে হল না এবং নিশ্চিন্ত হবার জন্য পরদিন সকালে ডাক্তার ডাকব স্থির করলাম।

পরদিন শরীরের তাপ স্বাভাবিক অবস্থায় নেমে এল, সঙ্গে সঙ্গে কাশিও কমল। যাই হোক, আমি ডাক্তারের কাছে গিয়ে মা'কে একশর দেখে যেতে অনুরোধ করলাম এবং সেই সঙ্গে সম্প্রতি মায়ের চরলতার কথা, গত রাতের স্বপ্নের কথা এবং কাশির পেছনে ঠাণ্ডা ছাড়াও আরও কোন কারণ আছে, আমার এই অনুমানের কথা সব তাঁকে জানালাম।

আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌছব,—বলে ডাক্তার আমার ভরসা দিলেন, তারপর বললেন, তোমার জন্মে একটা জিনিষ আছে। বাইরের ঘরের তাকের ওপর থেকে তিনখানা শ্রাসপাতি এনে আমার দিলেন। পরিপাটি পোষাক পরে বেলা তিনটের খানিক পরে তিনি এসে উপস্থিত হ'লেন। প্রতিবারের মত এবারেও দীর্ঘ সময় নিয়ে মা'কে পরীক্ষা করলেন। বুক, পিঠ ঠুকে ঠুকে কান পেতে শব্দ শুনে শেষে আমার দিকে ফিরে বললেন—ভয় পাবার কিছু নেই। আমার ওষুধ খেলে ভাল হয়ে উঠবেন বলেই মনে হয়।

ভয়লোকের ভাবভঙ্গী দেখে হাসি চেপে রাখা দায়। কোন মতে জিজ্ঞেস করলাম—ইন্জেকশন্ দেবেন না? ডাক্তার বাবু গভীর ভাবে উত্তর দিলেন—তার কোন দরকার নেই। ঠাণ্ডা লেগেছে, তোমার মা যদি চুপচাপ শুয়ে থাকেন তবে শীঘ্রগির সেয়ে উঠবেন।

কিন্তু এক সপ্তাহ কেটে গেল, মায়ের স্বর গেল না। কাশি কমল বটে, কিন্তু স্বর সকালে ১১° এবং রাতে ১০২° ডিগ্রির মধ্যে ওঠানামা করে। ঠিক এই সময়ে পেটের গোলমাল হয়ে ডাক্তার শয্যা নিলেন। আমি তাঁর বাড়ীতে ওষুধ আনতে গিয়ে নাসের কাছে মায়ের অবস্থার কথা বললাম, সে গিয়ে ডাক্তারকে খবর দিল। তাঁর

বোকা গেল। তাঁর অমার্জিত ভাষা আর রুক্ষ ভাষা মায়ের মন গলিয়ে দিল। পোষাকী পরীক্ষার আয়োজন না করে ভ্রমলোক মায়ের সঙ্গে অবাধ পরচর্চার মেতে গেলেন। পুড়ি রাগা শেষ করে এসে দেখি মাকে পরীক্ষা করা হয়ে গেছে। ভ্রমলোক বেতের চেয়ারে বসে আছেন, তার কণ্ঠ থেকে কণ্ঠহারের মত ট্রেখিসকোপটা বুলছে।

আমার মত লোক রাস্তার ধারে এঁলো হোটেলের দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ছুড়লু খেয়ে লাঞ্চ-পার্শ সাহে। তোমরা কখনও সে রকম অপূর্ণ সব খাদ্য, অর্থাৎ বাজে জিনিষ একেবারে খাও না।

যদি চুকতে চুকতে এই কথা কানে এসে। আর এই ছিল তাঁদের আলোচনার ধরণ, না একমনে তাঁর কথা শুনছিলেন।

মনে মনে হাঁক ছেড়ে বাঁচলাম, তাহলে মাংসের অন্তর্ভুক্তি বোধ হয় বিশেষ কিছু নয়। হঠাৎ মনের মধ্যে জোব পেয়ে প্রব্র কবলাম—মা কেমন আছেন—গ্রামের ডাক্তার বলে গেল বা দিকের ফুসফুসে ছাঁদা হয়েছে। আপনি কি বলেন?

নির্ধিকার মুখে ডাক্তার বারু জবাব দিলেন—সে আবার কি? তোমার মা'র কিছু হয়নি।

আঃ! বাঁচা গেল বুকের ওপর থেকে পর্বতপ্রমাণ বোকা নেমে গেল। আমি খুশি হয়ে বলে উঠলাম—শুনেছ মা, উনি বললেন—তোমার কিছু হয়নি।

এর পর ডাক্তার মিয়াকে চেয়ার ছেড়ে টিনায়রের দিকে এগিয়ে গেলেন। নিশ্চয় আমার কিছু বলতে চান। তাঁর পেছন পেছন পা টিপে টিপে বেরিয়ে গেলাম।

দেয়াল-ঢাকা পর্দা অবধি গিয়ে উনি থামলেন—অদ্ভুত শব্দ পাচ্ছি বুকে।

ফুসফুসের ছাঁদা নয়?

না।

ব্রকাইটিস? জিজ্ঞেস করতে গিয়ে চোখে জল এল।

না।

টি, বি'র কথা আমি জোর করে মন থেকে সরিয়ে রেখেছিলাম। নিউমোনিয়া বা ব্রকাইটিস বা ঐ জাতীয় রোগ হ'লে মা'কে আমি এ হাজা টেনে তুলতে পারব এ বিশ্বাস আমার ছিল। কিন্তু এ যে রাজরোগ, তাছাড়া হয়ত অনেকটা দেরি হয়ে গেছে। মনে হ'ল পা'ছুটোর দাঁড়াবার মত জোর নেই—

আপনি যে আওরাজের কথা বললেন, সেটা কি খুব পাপাপ? তখন আমি অসহায় ভাবে কাঁদছি।

ডান, বা হৃদকের সবটুকু ছেয়ে গেছে।

কিন্তু মাকে তো এখনও দিব্যি সুস্থ দেখায়? কেমন তৃপ্তি করে খান?

কোন উপায় নেই মা।

এ সত্য নয়, এ হতেই পারে না। মা'কে যদি প্রচুর পরিমাণে মাখন, ডিম, দুধ খাওয়াই তবে নিশ্চয়ই সেবে উঠবেন—তাই না? যে পর্যন্ত রোগের সঙ্গে যুদ্ধ করার শক্তি আছে, তত দিনে তাঁর জর ছেড়ে যেতে বাধ্য;—কি বলেন?

তাঁর যা প্রাণ চায় তাই প্রচুর পরিমাণে খেতে দেবে।

আমি তো তাই বলছি এতক্ষণ। দিনে মা পাঁচখানা করে টমাটো খান।

টমাটো ভাল জিনিষ।

তবে ভাবনার কি আছে? মা তো সেবেই উঠবেন।

এ রোগ মারাত্মক দাঁড়াতে পারে। তোমার আগে থেকে জানাই ভাল।

জীবনে আজ প্রথম জানলাম যে, দুনিয়াতে কতগুলি জিনিষ আছে। সাদের সংসদ প্রচেষ্টার এমন এক ছলছল নিরাশার প্রচীর তৈরী হয়, যার সামনে মানুষের সকল শক্তি বর্ষ।

হ' বছর? তিন বছর? কাঁপাংলায় ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলাম।

বলা যায় না। মোট কথা এর কোন রাস্তা নেই।

নাগাঁওকা গরম জলের বরফার জায়গায় সেদিন কি যেন কাজের কথা আছে, সেই সব বিভ্রিভ কবতে কবতে ডাক্তার মিয়াকে চলে গেলেন। আমি ফটক অবধি তাঁকে এগিয়ে দিয়ে এলাম। তারপর আচ্ছন্নের মত মায়ের বিছানার পাশে এসে দাঁড়লাম। যেন কিছুই হয়নি, মুখে এমন এক হাসি টেনে আনলাম, কিন্তু মা জিজ্ঞেস করলেন—ডাক্তার কি বলে গেলেন?

তাঁর মত তোমার জরটা ছেড়ে গেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

বুকের কথা কি বললেন?

বোধ হয় বিশেষ কিছু নয়। তুমি এর আগে একবার যেমন ভুগেছিলে, তেমনি কিছু একটা হবে। আমি জানি ঠাণ্ডাটা একবার পড়ে গেলে তুমি ঝেড়ে উঠবে।

নিজের মিথ্যা কথাগুলি যেন নিজের কাছে সত্যি হয়ে দাঁড়াল। ঐ ভয়ানক মারাত্মক শব্দটা ভুলে থাকতে চাইলাম। মনে হ'ল মা মারা গেলে আমার শরীর থেকে সব মাংস গলে পড়ে বেরিয়ে যাবে। দুট সঙ্কল্প করলাম, এখন থেকে মায়ের রুক্ষ সব রকম স্নেহাত্মক খাবার তৈরী করাট হবে আমার সাধনা। টিনায়র থেকে আরামচেয়ার বারান্দায় টেনে এমন জায়গার পাঁতলাম, যেখান থেকে মাকে স্পষ্ট দেখা যায়। তাঁর মুখে চোখে অস্বস্থতার লেশমাত্র নেই। চোখ দুটি উজ্জ্বল, গায়ের বক সতেজ মৃৎ। জরটা আসে ঠিক বিকেলের মুখে।

মনে মনে ভাবলাম, মাকে কি সুন্দর দেখায়। আমি ঠিক জানি মা আবার ভাল হ'য়ে উঠবেন। মন থেকে ডাক্তার মিয়াকে'র রোগ বিশ্লেষণের কথা সম্পূর্ণ মুছে ফেললাম।

কল্লোকে অক্টোবরের ছবি, পূর্ণ প্রকৃতি ক্রিসান্থিমামের ছবি এঁকে গেলাম। অল্প সময়ের মধ্যে ঘর্মের বোরে কখন যে এক পটভূমিতে নেমে এসেছি—টের পাইনি। স্বপ্নে আমার এ জায়গার সঙ্গে পরিচয় আছে, কিন্তু বাস্তবিক কখনও এমন জায়গায় যাইনি। যেন আমি বনেব মধ্যে এক হ্রদের ধারে পৌঁছে পরিচিত স্থান দেখে, আনন্দে বিহ্বল হয়ে পড়েছি। এক জাপানী ছেলের পাশে পাশে নিঃশব্দে চলেছি। সারা দুশপট সবুজ কুমারায় ঢাকা, পলকা এক সাদা পুল জলের তলায় ডুবে আছে।

ছেলেটি বলছে—পুলটা ডুবে গেছে। আজ আর আমাদের কোথাও বাওয়া চলে না। এস এখানে হোটেলে গিয়ে উঠ। নিশ্চয়ই একখানা খালিঘর পাওয়া যাবে।

হ্রদের প্রান্তে এক হোটেল। তার পাথরের দেওয়ালগুলো সবুজ কুমারায়। পাথরের কটকের গায়ে সোনার, জল দিয়ে লেখা

রয়েছে—হোটেল সুইজারল্যান্ড। এস, ডব্লিউ, আই অবধি পড়ে হঠাৎ মায়ের কথা মনে হল। না জানি কেমন আছেন এখন, মনের মধ্যে অশান্তি, এই হোটেলই আছেন কি না কে জানে! সেই বুকের সঙ্গে ফটক পেরিয়ে সামনের বাগানে ঢুকে পড়লাম। হাইড্রেনজিয়ার মত মস্ত মস্ত লাল ফুল ধোঁয়াটে বাগান আলো করে আছে।

ছেলেবেলার আমার বিছনায় চাদরের ওপর টুকটুকে লাল রং-এর নৃতো দিয়ে হাইড্রেনজিয়ার প্যাটার্ন তোলা ছিল। সেগুলো দেখলেই আমার মন খারাপ হয়ে যেত। কিন্তু এখন মনে হল বোধ হয় হাইড্রেনজিয়া ফুল লালও হয়।

তোমার শীত করছে না তো?

সানাক্ষ, আমার কান দুটা কুয়াশায় ভিজে উঠেছে আর শরীরের ভেতরটা জমে যাচ্ছে।

তোমার উঠে ওকে প্রশ্ন করলাম, মা কেমন আছেন কে জানে!

ছেলেটির রান হাসির মধ্যে বিখাদ ও সহানুভূতির ছায়া। তিনি তাঁব করার স্থান লাভ করেছেন।

আমি আন্তরিক করে উঠলাম। তবে ঠিকই হয়েছে। মা আর আমাদের মধ্যে নেই। শ্রান্ত-শান্তি চুকে গেছে। মায়ের মৃত্যুর এই দুঃস্বপ্নে অবর্ণনীয় নিঃসঙ্গতায়, আমার সাধ লেহে ঝাঁকুনি লেগে চোখ খুলে গেল।

এতক্ষণ গোষ্ঠিলির আলো বারান্দার নেমে এসেছে। বৃষ্টি পড়ছে। প্রতিটি জিনিসে স্বপ্নে দেখা সবজের ছোঁয়া।

মা—ডাক দিলান আমি।

স্বভাব-শাস্ত কণ্ঠে মা জবাব দিলেন—কি করছ ওখানে?

লাফিয়ে উঠে দৌড়ে মার পাশ গিয়ে তাজির হলাম।

ঘুমিয়ে পড়েছিলেন মা!

আমি এতক্ষণ ভেবে মরছি না জানি 'তুমি কি কাজে ব্যস্ত। টানা ঘুম দিয়ে নিলে—কি বল? আমার অবস্থা দেখে মা কৌতুক বোধ করলেন।

মায়ের রূপ দেখে আমি মুগ্ধ হলাম তিনি যে বেঁচে আছেন আজও, এর জন্ত কৃতজ্ঞতায় আমার চোখে জল এল।

হুইমি করে জিজ্ঞেস করলাম সাক্ষ্যভোজের জন্ত কি আদেশ রাগীমা?

কিছু দরকার নেই। আজ আর কিছু খাব না, স্বর ১০৩ ডিগ্রি উঠেছিল।

আনন্দের ভেতর থেকে কে যেন আমার অন্ধকারের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিল। কি করব কোন দিশা না পেয়ে ঘরের আশে অন্ধকারে চটুদিকে চোখ বুলিয়ে নিলাম। আর আমি বাঁচতে চাই না।

তা কেন হবে? ১০৩ ডিগ্রি?

ও কিছু নয়। স্বর আসার মুখে একটা কষ্ট হয়। মাথা বাখা করে, শীত-শীত ভাব হয়—তার পরেই স্বরটা নামে।

বাঁচলে এতক্ষণ আঁধার নেমেছে। বৃষ্টি ধরে গেছে, কিন্তু শাওয়া রয়েছে।

আলো ছেলে খাবার ঘরে খাবার মুখে মায়ের ডাক কানে এল—আলোটা বড় চোখে লাগছে। নিবিয়ে দাঁও তো মা!

কিন্তু এই অন্ধকারে কি করে গুয়ে থাকবে? সুইচের কাছে গাড়িয়ে ইতস্ততঃ করতে লাগলাম।

তাতে কিছু এসে-যায় না। ঘুমোলে চোখ তো বন্ধই থাকে, অন্ধকারে একটুও খারাপ লাগে না। এর পর থেকে এঘরে আর আলো ছেলোনা—কেমন?

মায়ের কথায় মনের ভেতরটা ছাঁৎ করে উঠল। দ্বিতীয় কথা না বলে বাতি নিবিয়ে দিলাম। পাশের ঘরে একটা বাতি ছেলে। নিঃসঙ্গতার অসহ্য ভারে জর্জরিত হয়ে রাত্রাঘরের দিকে চলে গেলাম। সেখানে ঠাণ্ডা ভাতের সঙ্গে টিনের সামান্য মাছ পেতে বসে চোখ দিয়ে বড় বড় কঁটাতার জল গড়িয়ে পড়ল।

রাত্রি বাড়ার সাথে সাথে বাতাসের জোর বেড়ে গেল এবং রাত নয়টা আন্দাজ প্রচণ্ড ঝড়ের সঙ্গে আঝঝে বৃষ্টি নামল। বারান্দার জানালার পাখিগুলো দিন দুই আগে আমি গুটিয়ে তুলেছিলাম, এখন সেগুলো বাতাসে ঝনঝন করে উঠল। মায়ের পাশের ঘরের অন্ধৃত এক উত্তেজনা নিয়ে রোজা লাক্সমবার্গের অর্থশাস্ত্রের ভূমিকা Introduction to Economics পড়তে বসলাম। নাওজির ঘর থেকে এ বইখানা ধাব করে এনেছি। (সে অবশ্য একথা জানে না) তাছাড়া লেনিনের শ্রেষ্ঠ রচনা (Selected works of Lenin) এবং কাটুস্কীর সামাজিক বিপ্লব (Social Revolution) সঙ্গে ছিল। আমার ডেস্কের ওপর সব জড়ো করা ছিল। একদিন সকালে এই ডেস্কের পাশ দিয়ে কলবরে খাবার সময়ে মা একখানা বই তুলে নিয়ে ভেতরের চোখ বুলিয়ে বিষয়টা দেখে নিলেন। তারপর করুণ ভাবে আমার দিকে চেয়ে ছোট করে নিশ্বাস ফেলে বইটা আবার বখাওয়ানে রেখে দিলেন। তাঁর চোখে বিশাদের ছায়া টলমল করছে। কিন্তু সে দৃষ্টির ভেতর নিবেদ ছিল না বা দরদর লেশমাত্র অজ্ঞান ছিল না। মায়ের প্রিয় বইগুলি ছিল হিউগার রচনা, 'পেরের এল ফিল' (Pe're el fils) মুসেং এবং দোদে, কিন্তু আমি জানতাম এই সব মধুর প্রেমের উপভাসগুলিতেও বিদ্রোহের গন্ধ ছিল।

মায়ের মত যারা 'ভগবান দত্ত শিক্ষা' নিয়ে জন্মেছেন জানি আমার কথা তাঁদের কাছে অন্ধৃত ঠেকবে। তাঁরা বিপ্লবকে অত্যন্ত সহজ মনে, সাধারণ বাপার হিসাবে গ্রহণ করতে পারেন। এমন কি রোজা লাক্সমবার্গ-এর বই এর মধ্যেও আমি আপত্তিকর উক্তি পেয়েছি। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার মত লোকের মনে বইখানি যথেষ্ট কৌতুহল উদ্বেক করেছে। তাঁর বই-এর বিষয়বস্তু অর্থনীতি এবং সেই দিক থেকে বইখানি বাস্তবিক নীরস। এর ভেতর লেখক অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষার সাধারণ বিষয়ের অবতারণা করেছেন। হতে পারে অর্থনীতি আমি বুঝি না। এ সম্বন্ধে আমার আগ্রহও কিছু নেই। 'মানব মাত্রই মোড়ী এবং কোন দিনই মোড়ী হতে পারে না'—এই অমুরার উপর যে বিজ্ঞান ভর করে আছে, নির্লোভ মানুষের কাছে সে বিজ্ঞান অর্থহীন। কিন্তু তবু এ বই পড়তে পড়তে সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে আমার উত্তেজনার সীমা থাকে না। কারণটা হল এই—যে, চিরচরিত বিশ্বাসের মূলে বিনা দ্বিধার কুঠারাঘাত করার মত সংস্কার লেখিকার আছে। নীতির বিরুদ্ধে মনে বতই নিদ্রোহ থাক না কেন, নিশ্চিন্ত নোড়ে ফেরা পাখীর মত আমার প্রেমাস্পদের সেই মমতাময়ী জীবনসঙ্গিনীর ছবিও তো চোখের ওপর থেকে মুখে ফেলতে পারি না। অতঃপর আমার মনে ধ্বংসের নেশা লাগে। ধ্বংসলীলা যেমন করুণ, বিবাদময়, তেমনি উপভোগ্য। ধ্বংস, নৃতনের সৃষ্টি পরিপূর্ণতার স্বপ্ন! হৃদয় বিনাশের পর নতুন



রূপকথার রাজকুমারী

মুন্নি যখন আমার নতুন তৈরী করা
ফ্রক্টা পরলো তখন আনন্দে উচ্ছসিত
হয়ে উঠলো। ফ্রক্টাও আমি অনেক
যত্ন করে তৈরী করেছিলাম—সাদা ধবধবে
আমার ওপর ছোট্ট নীল ফুলের পাড়
দিয়ে। আনন্দে লাফাতে লাফাতে
মুন্নি আগনার সামনে গেলো।
ঘুরে ফিরে চারিদিক থেকে
মুন্নি তার ফ্রক্টা দেখলো তার-

পর ছুটলো তার বন্ধুদের দেখাতে তার নতুন জামা,

তক্ষুনি বিকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করতে পেরে।
আমি চেষ্টা করে ডাকলাম ওকে, “মুন্নি, মুন্নি নতুন
ফ্রক্টা খুলে যা—ওটা ময়লা হয়ে যাবে যে ওটা পরে
বিয়ের নেমন্তন্ন হবে কিনা?” মুন্নি ততক্ষণে বাড়ীর থেকে
বহুদূরে। নতুন ফ্রক্টা পরে মুন্নির দেখে মনে হলো
আমার যেন কোন এক পরীর দেশের রাজকন্যা, ওকে
সত্যিই মানিয়েছিলো, আর সত্যিই এত সুন্দর লাগছিল।
একবার ভাবলাম ডাকি ওকে কারণ ফ্রক্টা ওকে পরতে
দিয়েছিলাম শুধু ঠিক হয় কিনা দেখার জন্য। ইতিমধ্যে
মায়ার ঘরের থেকে কি যেন একটা পোড়ার গন্ধ পেয়ে
আমি উঠে গেলাম, তারপর আর আমার খেয়ালই ছিলনা।
আমার হাঁস হল যখন মাথার গলা শুনলাম দরজার সামনে।

৪৩-১১-১৯৫৪



মাথাকে দেখে খুব খুশী হলাম এবং ওকে নিয়ে যখন বগাই
ঘরে এলাম, দেখি মুন্নি দরজায় দাঁড়িয়ে।
ওকে দেখেই আমি রেগে আগুন—ফ্রক্টা একদম নোংরা
করে ফেলেছে—বিয়েতে যাওয়ার সময় পরবেই বা কি?
“ফ্রক্টার কি ছিরিই করেছো এখন পরবে কি বিকালে”
বলে আমি ওকে মারতে যাচ্ছিলাম এখন সময় মাথা মুন্নির
সরিয়ে নিয়ে আমার ধমকালো—” ভোর মাথা খারাপ



হল নাকি' ঐতটুকু বীচাকে মারছিল। “মুন্নি বাঁচলো আর ফ্রকটা খুলে রাখলো তাড়াতাড়ি।”

ফ্রকটা নিয়ে আমি কলতনার পরিষ্কার করতে এলাম এবং যখন ফ্রকটাকে আছড়াতে যাচ্ছি, রাধা বললো “মেয়ের ওপর রাগটা কি ফ্রকের ওপর ফলাবি!”

“এটা না কাচলে ও পরবেটা কি? অস্ত ভাল জামা যে আর নেই” আমি বললাম। রাধা বললো, “কিন্তু ওটা আছড়ালে ছিঁড়ে যাবে যে।”

আমি বললাম “না আছড়ালেই বা কাচবো কি করে?”

“আছড়াবার কি দরকার—ভাল সাবান ব্যবহার করলেই হয়। আমি তো সানলাইট ব্যবহার করি।” “কিন্তু সানলাইট কি সত্যিই এত ভাল সাবান?” “সত্যিই সানলাইটে জামা-

কাপড় সাদা ও উজ্জ্বল হয়। এবং এটা এক বিবর্ত যে এতে কাপড়ের কিছু ক্ষতি হয় না।”

“কিন্তু সানলাইটে ধরচা বেশী পড়েনা?” রাধা ভো হেসেই আকুল—“সে কিরে, ভেবে তখ্ একটু যত্নেই সানলাইটে এত ফেনা হয় যে এক গাদা জামাকাপড় কাচা চলে আর সন্ময়েই সাদা ধবধবে করে। এছাড়া পিটে আছড়ে কাপড়ের সর্বনাশও হয়না, নিজেরও

জামেলা বাঁচে কতো—এর

পরেও তুই বলবি ধরচা বেশী।”

তখন আমি একটা সানলাইট

সাবান আনালাম এবং কাচা

তরু করতেই ফ্রকটা

ফেনার তুপে ভরে গেলো

আর দেখতে দেখতে

সাদা ধবধবে হলো।

সন্ধ্যেকো নতুন কাচা

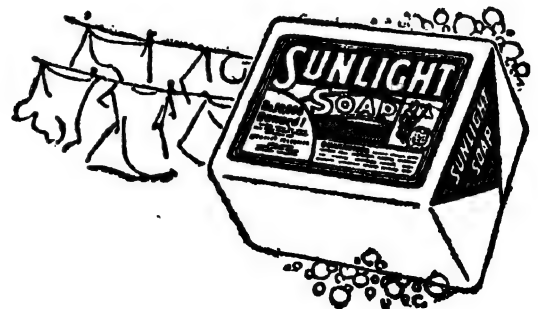
ফ্রকটা পরে মুন্নিকে

সত্যিই পরীক্ষের

গল্পের রাজকুমারীর

হাত লাগছিলো। আমি

মুন্নিকে কপালে কাঁচলের টাপ, পরিচয় দিলাম।



করে সৃষ্টি করার দিন না-ও ফিরে আসতে পারে। তবু প্রেমের উদ্ভাবনার ধ্বংস আমার করতেই হবে। বিদ্রোহের সূচনা করতে হবে। দুঃখের বিষয় রোজা (Rosa) তার অভিন্ন হৃদয়ের প্রেম মার্জবাদের সমর্পণ করে বসে আছে।

বারো বৎসর আগের এক স্মৃতিচারণ। সারাশিনা ডায়রীর (Sarashian Diary) মেরুদণ্ডহীন মেয়েটির মত তুমি কখনও মুখ খোল না। তোমার সঙ্গে কথা কওয়া ভার।

এই বলে আমার বন্ধুটি এগিয়ে গেল। এইমাত্র আমি তাকে লেনিনের একখানা বই না পড়েই ফেরৎ দিলাম।

বইটা পড়লে ?

অত্যন্ত দুঃখিত, পড়িনি।

একটা পুলের কাছে থেকে টোকিও রাসায়নিক অর্থোডক্স ক্যাথিড্রাল (Tokyo Russian Orthodox Cathedral) দেখা যায়, তারই ধারে দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছিল। কেন কি হল ?

বন্ধুটি আমার মাথার ওপর এক ইঞ্চি লম্বা ছিল আর অনেক দেশের ভাষা জানত। লাল টুপিটা তাকে চমৎকার মানিয়েছিল। মেয়েটি ছিল অপূর্ণ স্তম্ভরী! মোনালিসার মত অপূর্ণ চেহারা বলে তার নাম-ডাক ছিল।

মলাটের রুটা আমার বিজী লাগল।

অবাক করলে যে! আসলে ওটা কোন কারণ নয়। তুমি আমার সঙ্গেই করতে শুরু করেছ, তাই না ?

না সঙ্গেই আমার নেই, মলাটের রুটা আমার সহ্য হল না তাই।

তাই নাকি ? সংঘেদে বলে উঠল মেয়েটি এবং এর পরই আমার সারাশিনা ডায়রীর মেয়ের সঙ্গে তুলনা করে। আমার সঙ্গে কথা বলে কোন লাভ নেই, এ বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ। দুজনে খানিক চুপ করে শীতের নদীর দিকে চেয়ে রইলাম।

বিদায়, যদি এই হয় আমাদের শেষ দেখা! বিদায়, বন্ধু বিদায়। বায়রণ; নিজের মনে গুনগুনিয়ে বায়রণের কবিতার পদগুলি আবৃত্তি করে গেল। তারপর আমার আলগোছে আলিঙ্গন করল।

নিজের প্রতি দিক্কারে মন ভরে গেল : ফিসফিস করে একটা কি অজুহাত দিয়ে ঠেগনের দিকে গুণা হলাম। একবার পেছন ফিরে দেখি বন্ধুটি তখনও সেখানে সেই ভাবে আমার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

তার সঙ্গে আমার সেই শেষ দেখা। আমরা দু'জনে দুই স্থলে পড়লেও একই বিদেশী টিচারের কাছে ভাষা শিখতে যেতাম।

তারপর বারো বছর কেটে গেছে। সারাশিনা ডায়রীর অবস্থা পেরিয়ে আমার আরও এক পা অগ্রসর হতে হয়েছে। এতকাল ধরে আমি কি করলাম তবে? বিদ্রোহের প্রতি আমার আসক্তি নেই, নেই ভালবাসার দিকে ঝোঁক। দুনিয়ার বিচরণ পণ্ডিতেরা চিরদিন বিদ্রোহ ও প্রেম! এই দুটি অমুভূতিকে মানব-মনের হীনতম প্রক্রিয়া বলে বর্ণনা করেছেন। যুদ্ধের আগে, এমন কি যুদ্ধের সময়ই আমরা সেকথা বুঝেছি।

পরাজয়ের পর থেকে প্রবীণ বিজ্ঞানের ওপর আস্থা আমরা হারিয়েছি। একরা জাঁকাল হা বালেন তার বিপরীতটাকেই মূল্য দিতে

শিখেছি। বাস্তবিক বিদ্রোহ ও প্রেমের মাথোই দুনিয়ার সেরা আনন্দের বাসা। সেই সঙ্গে একথাও বুঝেছি যে ঠিক এই কারণেই জানা বুজেরা হিংসা-পববশ হয়ে তিক্ত জ্বালাফলের মত মিথ্যা দিয়ে আমাদের প্রতারণা করতে চেয়েছেন। আমি চোখ বুঁজে এই কথাই বিশ্বাস করতে চাই যে, প্রেম ও বিদ্রোহের জন্তই মানুষের জন্ম।

ইঠাং দরজার ফাঁকে মায়ের হাসিমুখ দেখা গেল। যুগুনি এখনও? যুগ আসছে না—না? ডেস্কের ওপর ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখি বারোটা বেজে গেছে। না আমার একটুও যুগ আসছে না; সমাজতন্ত্রের ওপর একখানা বই পড়ে মাথা গরম হয়ে আছে।

ও! আচ্ছা বাড়ীতে কোনবকম ড্রিং নেই—না? এবকম অবস্থায় শোবার আগে এক গেলান কিছু খেয়ে নিলে ভাল হয়।

সুন্দর গুন আসে। মায়ের গলার স্বরে, কথার টং-এ কেমন বেন মন-গলানো ভাব।

শেষ পর্যন্ত অক্টোবর এসে কিন্তু আকাশ-বাতাসে তেমন করে ইঠাং সোনার বং লাগলো না। বরং বর্ষাকালের মত এক এক করে অনেকগুলি স্যাঁৎস্যাঁতে দিন পেরিয়ে গেল। প্রতি সন্ধ্যায় মায়ের স্বর একশ' কিছু ওপরে লেগে রইল।

এক সকালে ইঠাং একটা জিনিষ লক্ষ্য করে ঘাবড়ে গেলাম। মায়ের হাতখানা ফুলে উঠেছে। তাছাড়া সকালের খাবারটুকু মা চিরদিনই বন্ধ করে খান, কিন্তু ইদানীং সকালের দিকে নামে মাত্র ভাতের কাথ মুখে দেন। কড়া গন্ধযুক্ত কোন খাবার খেতে পারেন না। সেদিন সূপের ভেতর ব্যাঙের ছাতার গন্ধ পর্যন্ত সহ্যে পারলেন না।

সূপটা মুখে তুলে, না চেখেই ট্রের ওপর নাবিয়ে রাখলেন। সেই সময়ে আমার নজর পড়ল মার ডান হাতখানা ফোলা।

মা, তোমার হাতে কি হল ?

মুখখানাও কেমন বেন সাদাটে ফোলা-ফোলা লাগল—ও কিছু নয়, এটুকু ফোলায় কিছু এসে যাবে না।

ক'দিন হল এমন হয়েছে ?

মা কোন উত্তর দিলেন না, মুখে চোখে কেমন আচ্ছন্ন ভাব। আমার বুক ঠেলে কারা বেরিয়ে আসতে চাইল—ও হাতখানা কিছুতেই আমার মায়ের নয়। মার হাতটি কত সুন্দর, ছোট। চিরপরিচ্ছন্ন, সুকোমল সে হাত যে আমার পরম আদরের ধন। আমি অবাক হয়ে ভাবি মায়ের সে হাতখানা কি চিরদিনের মত অক্ষত ছিল? বা হাতখানা এখনও অবিকৃতই আছে। কিন্তু আর যে আমি মায়ের দিকে চেয়ে থাকতে পারি না! চোখ ফিরিয়ে ঘরের কোণে রাখা ফুলের ঝড়িটার দিকে তাকাই।

টের পাছি চোখের জ্বল ক্রমতে পারব না। অসহ্য হওয়ায় ইঠাংই রান্নাঘরের দিকে ছুটলাম। সেখানে গিয়ে দেখি, নাওজি একখানা নরম সেক্স ডিম খাচ্ছে। কচিং কখনও বাড়ীতে এলে, রাতটা ও মাসীর ওখানে মদ খেয়ে কাটিয়ে দেয়। সকালে বাড়ী এসে রান্নাঘরে ঢুকে গোমড়া মুখ করে বসে নরম সেক্স ডিম খায়। এই একমাত্র খাবার যা সে খুশিমনে খায়। তারপর দোস্তলার নিজের ঘরে গিয়ে সারাটা দিন বিছানার স্তরে, বসে কাটিয়ে দেয়।

মাটির দিকে চোখ নাবিয়ে বললাম,—মায়ের হাতখানা ফুলে

উঠেছে। আর বলতে পারলাম না, কান্নায় সারা দেহ কেঁপে উঠেছে, নাওজি কোন উত্তর দিল না।

এবার আমি মুখ তুলে চাইলাম,—সব শেষ হয়ে এল। তুমি লক্ষ্য করনি? ওরকম ফুলতে শুরু হলে, আর কোন আশা থাকে না। টেবিলের প্রান্ত শক্ত মুঠোর ধরে দাঁড়িয়েছিলাম কোন মতে। নাওজির মুখে মেঘ ঢেকে এসে—আর দেবী নেই। এ কি হ'ল! কি মুগ্ধিল!

মাকে আমি বাঁচাতে চাই। যেমন করে হোক মাকে ফিরে পেতেই হবে। নিজেই নিজের হাত দুটি নিষ্পেষিত করে বললাম। হঠাৎ নাওজি কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল—দেখছ না মা, এখন আমাদের হাতের বাঁটে। কিছু কবাব সাধ্য কি? জোরে জোরে হাতের মুঠি দিয়ে চোখ কচলাতে লাগল। সেদিন নাওজি টোকিতে ওয়ালা মামাকে খবর দিতে এবং ভবিষ্যতের ব্যবস্থার নির্দেশ নিতে চলে গেল। মায়ের পাশে থেকে যে সময়টুকু উঠে আসতে হ'ছিল, তার প্রতিটি মুহূর্ত আমার কৈদে কেটেছে। সকালের কুয়াশা ভেদ করে দুখ আনতে যাবার সময়ে, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল বাঁধার সময়ে, প্রসাধন করার সময়ে সারাক্ষণ শুধুই কৈদেছি। মায়ের সঙ্গে আমার আনন্দের দিনগুলি, বিভিন্ন ছোটখাট ঘটনা চোখের ওপর দিয়ে ছবির মত ভেসে গেল। কান্নার কোন সীমা, কোন সার্থকতা ছিল না তখন। সেদিন সন্ধ্যাবেলা বারান্দায় চীনাঘরের সামনে বসে সমানে কৈদেছি। শরৎ-আকাশে তারার শোভা, পায়ের কাছে না জানি কার এক বেড়াল চূপ করে গুটিয়ে পড়ে আছে।

পরদিন মায়ের হাতের কোলা আরও বেড়ে গেল। খাবার সময়ে মোটে কিছুই খেলেন না। কমলার রস পর্যন্ত গলার ব্যথার গিলতে পারলেন না।

মা, নাওজির ব্যবস্থা মত সেই মুখ ঢাকা আবার কিছুদিন পরে দেখবে? হাসি দিয়ে কথাগুলো ভেজাবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু মনের উদ্বেগ চাপা রইল না।

শান্তস্বরে মা বললেন—দৈনিক কাজের ভাৱে তোমার শরীরপাত হচ্ছে। আমার জন্তে নার্সের ব্যবস্থা কর। বুঝলাম তাঁর নিজের চেয়েও আমার চিন্তা বেশী এবং এতে আরও বেশী করে মন খারাপ হয়ে গেল।

দুপুরের খানিক পরে নাওজি ডাক্তার মিয়াকে এবং এক নার্স সঙ্গে নিয়ে এল। বৃদ্ধ ডাক্তার সাধারণতঃ হাসিখিটি করতে ভালবাসেন, কিন্তু এখন দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করে সোজা রোগীর ঘকে ঢুকে পরীক্ষা শুরু করলেন। কাজ শেষ করে নিজের মনেই বললেন, বেশ কাহিল হয়েছেন। বলে একটা কপূরের ইন্সপেকশন দিলেন।

প্রলাপের ঘোরে মা প্রশ্ন করলেন—ডাক্তারবাবু আপনাব থাকবার জায়গা আছে?

নাগাওকাতো যেতে হবে আমার জন্তে চিন্তা করবেন না। আপাততঃ পরের কথা ছেড়ে নিজের বিষয় একটু ভাবুন, যা ভাল

লাগে বেশী বেশী করে খান। পুষ্টিকর খাবার খেলে সেবে গুটা শক্ত হবে না। আমার নার্স রেখে গেলাম, প্রয়োজন মত এবে সেবা নিজে দিখা করবেন না।

মায়ের বিছানার উদ্দেশ্যে জোরে জোরে কথাগুলি বলে ইশারায় নাওজিকে কাছে ডাকলেন। নাওজি নিজেই কটক পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে গেল। যখন সে ফিরে এসে, তার মুখ দেখে বুঝলাম, সে কান্না চাপবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। আমরা নিশ্চয় খাবার ঘর ছেড়ে রোগীর ঘরে এলাম।

আর কি কোন আশাই নেই, উনি কি বললেন? আমার প্রশ্নের উত্তরে বিকৃত হাসিতে নাওজির চোখ কেঁপে উঠল—এ আর সহ্য হয় না; আগের চেয়ে অনেক বেশী দুর্বল হয়ে পড়েছেন। ডাক্তারবাবুর মত আর দু-একদিনের বেশী নয়। বলতে বলতে ওর চোখ দুটি জলে ভরে এল।

আমি বললাম,—সবাইকে টেলিগ্রাম করা দরকার বোধ হয়। আশ্চর্য্য। কেমন করে যেন নিজের ওপর দখল ফিরে এসেছে।

ওয়ার্ডামামার সঙ্গে কথা হল, উনি বললেন—মামাদের বর্তমান অবস্থার এতবড় আয়োজন করা সম্ভব নয়। ধর যদি মাদ্রবজন এসে উপস্থিত হয়—আমাদের এটুকু বাড়ীতে তাঁদের ঠাই দেবে কোথায়? এছাড়া ভাল হোটেলপত্ৰ কিছুই নেই এখানে। তাঁর কথাব ভাবে বুঝলাম আমাদের পরিবারের মহামহারখীদের নিমন্ত্রণ করার কথা আমাদের ভাবা উচিত নয়। ওয়ার্ডামামা শীগগিরই আসছেন। কিন্তু উনি চিরকালই এত কৃপণ যে তাঁর কাছে কোন সাহায্য আশা করা যায় না। গত রাতের মত এমন দুঃসময়েও উনি মায়ের অন্তঃকরণের কথা তুলে গিয়ে আমার মর্মান্তিক এক বহুতা শোনালেন। দুনিয়ার ইতিহাসে এমন দুঃসময় কোথাও নেই, যেখানে কৃপণের বহুতায় অজ্ঞান আলোর সন্ধান পেয়েছে। এইখানেই আমাদের সঙ্গে তাঁর তফাৎ, মার কথা তো ছেড়েই দিলাম। ঠুকে দেখলে আমার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়।

কিন্তু এখন থেকে আমার যদি না-ও হয়, তোমায় তো তাঁর ওপরই ভরসা করতে হবে।

ফোন: ৩৪-৫০০

কে.এল.সি.এ.এ.এ.এ.এ.

১৬৭ বি. বড়বাজার ট্রাট কলিকাতা-১

কক্কণো না, বরং ভিক্ষে করে খাব। বোনটি আমার, তোমাকেই
ঠর মুখের দিকে চেয়ে থাকতে হবে।

আমি—চোখে জল ভরে এল—আমার বাবার জায়গা আছে।

বিয়ে করবে? ঠিক হয়ে গেছে?

না।

স্বাধীন জেনানা? চাকরী করবে? হাসিও না বাপু!

না, চাকরী নয়, বিবাহ করব।

কী? অদ্ভুত চোখে নাওজি আমার দিকে তাকাল। ঠিক
এই সময়ে নাসের গলা পেলাম—আপনাকে মা ডাকছেন।

ছুটে গিয়ে মায়ের পাশে বসলাম। মাথা খুঁকিয়ে জিজ্ঞেস
করলাম—কি হয়েছে মা? মা চুপ করেই রইলেন—কিন্তু আমি
বুঝলাম কি যেন বলাব চেষ্ঠা করছেন।

জল?

ঈশ্বর মাথা নেড়ে মা বললেন। কিছুক্ষণ পরে নিজেই খুব আস্তে
বললেন—স্বপ্ন দেখছিলাম।

কেমন স্বপ্ন?

সাপের বিষয়।

দিউরে উঠলাম আমি।

আমাবি বিশ্বাস, সামনে গাড়ীবারান্দার সিঁড়িতে লাল ডোরাকাটা
সাপিনী এসেছে। দেখতো গিয়ে। উঠে দাঁড়াতে গিয়ে টের পেলাম
আমার সারা দেহ হিম হয়ে গেছে। বারান্দা অবধি গিয়ে কাচের
দরজার ভেতর দিয়ে বাইরে তাকালাম। সিঁড়ির ওপর নিশ্চিন্ত দেহ
এলিয়ে শরতের সূর্যকে উপভোগ করছে এক সাপিনী। আমার
মাথা ঝিমঝিম করে উঠল।

তোমার আমি চিনি। শেষ তোমার মা দেখেছি, তার চেয়ে
তুমি বড় হয়েছ, বড়ো হয়েছ, কিন্তু তুমি সেই ডিম্বের মা, বাদের
আমি একদিন পুড়িয়ে মারতে গিয়েছিলাম। তোমার প্রতিশোধ তো
আমার উপর দিয়ে নিলে, এবার তুমি দূর হও।

সাপিনীর ওপর দৃষ্টিবদ্ধ করে আমি মনে মনে এই প্রার্থনা
করলাম, কিন্তু তার এতটুকু চাক্ষুষ দেখা গেল না। কেন জানি না,
নাসের চোখে পড়ে এটা আমার ইচ্ছে ছিল না। সেইজন্য অনাবশ্যক
জোরে মাটিতে পা ঠুকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত চেঁচিয়ে বললাম—না,
মা এখানে তো কোন সাপ দেখছি না। ও তোমার ভুল স্বপ্ন। আবার
সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি, এতক্ষণে নড়েচড়ে সাপটা চলে যাচ্ছে।

আর কোন আশা নেই, কোন আশাই না। সাপটা নজরে
পড়ার পর থেকে আমি একেবারে হাল ছেড়ে দিলাম। আমি
জানতাম বাবার মৃত্যুর সময় একটা কালসাপ বিছানার পাশে
দেখা গিয়েছিল, আমি নিজেই বাগানের সমস্ত গাছে সাপ জড়িয়ে
থাকতে দেখেছি।

মনে হল মা বিছানার উঠ বসার শক্তিকুণ্ডে হারিয়ে ফেলেছেন
এবং সারাক্ষণ আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে থাকেন। আমি নাসকে মায়ের
সমস্ত দারিদ্র্য বুঝিয়ে দিয়েছি। বাবার তাঁর গলা দিয়ে প্রায় নাবে
না। সাপটা চোখে দেখার পর সমস্ত উদ্বেগ কেমন বেন
গলে গিয়ে স্বস্তি বোধ হ'ল। হৃৎকের অন্ধকার গহবরে তলিয়ে
গিয়ে শান্তি পেলাম। আমার একমাত্র কাজ, এখন মায়ের পাশে
বসেই সন্তব সময় কাটানো।

পরদিন সারাক্ষণ মায়ের পাশে বোনা নিয়ে বসে রইলাম।
সেলাই বা বোনার আমার বেশী ভাগ লোকের চেয়ে তাড়াতাড়ি
হাত চলে, কিন্তু খুব ভাল কিছু একটা করতে পারি না।
মা আমার সর্বদাই বোনার মধ্যে কাঁচা-কাজের জায়গাগুলি দেখিয়ে
দিতেন। সেদিন বোনটি আমার আসল উদ্দেশ্য ছিল না, কিন্তু
সারাদিন ঐভাবে মায়ের পাশে বসে কাটানোর তাঁর মনে কোন সন্দেহ
না হয়; সেই জন্ত উলের বাস্ত্র নিয়ে আড় হয়ে বসে বুনতে লাগলাম।
বেন হুনিয়ার এ ছাড়া আমার কোন চিন্তাই নেই।

মা আমার হাতের দিকে চেয়ে রইলেন—তোমার নিজের মোজা
—না? মনে রেখো লখার দিকে আঁটটি করে না বাড়ালে পরার
সময়ে আঁট লাগবে।

ছেলেবেলায় মা হাজার সাহায্য করলেও কিছুতেই আমি ঠিক
বুনতে পারতাম না। আজও সেই রকম বোনা নিয়ে হিমসিম খাচ্ছি,
কিন্তু এবার আর কোন দিনও মা আমার ভুল ধরিয়ে দেবেন না
মনে হ'তেই বুকের ভেতরটা হাহাকার করে উঠল। চোখের জলে
বোনা দার হ'ল। মা'কে ঐভাবে শুয়ে থাকতে দেখে মনেই হচ্ছিল
না যে, তাঁর শরীরে কোন কষ্ট আছে। সকাল থেকে কিছুই খাননি
আজ, সারা দিন থেকে থেকে শুধু গজ (Gauze) কাপড় চায়ে ডুবিয়ে
তাঁর ঠোঁট তুটি ভিজিয়ে দিচ্ছিলাম। বাই হোক, তাঁর পূর্ণ জ্ঞান ছিল
এবং মাঝে মাঝে শান্ত গলায় কথা বলছিলেন, খবর কাগজে সম্রাটের
একটা ছবি দেখেছিলাম, আর একবার দেখি ছবিখানা।

কাগজের ঐ অংশটা মায়ের মুখের ওপর তুলে ধরলাম।

বুড়ো হয়ে গেছেন।

না, ছবিটা ভাল ওঠেনি। সেদিন অল্প একখানা ছবিতে দেখলাম,
দ্বিবি হাসিগুণি তরুণ চেহারা। বোধ হয় আজকাল আগের তুলনায়
ভালই আছেন।

কেন?

তিনি তো এখন মুক্ত, স্বাধীন।

করণ হেসে মা বললেন—কীদেতে চাইলেও আজকাল আমার কারা
আসে না।

হঠাৎ মনে হ'ল এখন মায়ের খুশি হবার পালা এসেছে।
শোকের প্রবাহে নিমজ্জিত মুখের অস্পষ্ট সোনালী ঝিলমিলের মত
এই মুখের অনুভূতি। সকল দুখের বন্ধন অতিক্রম করে এই যে
ক্ষীণ আলোর আভাস, এই তো সুখ! আমাদের সম্রাট, আমাদের
মা জননী, এমন কি আমি নিজে পর্যন্ত এই মুখের পরশ
পেয়ে যন্ত্র।

শরতের প্রভাত শান্ত, স্থির। সূর্যালোকের স্নিগ্ধ স্পর্শে
মনোরম উত্তান শোভা। বোনা নাবিয়ে রেখে ঘুরে উজ্জল সমুদ্রের
দিকে চোখ রেখে বললাম—মা, এতদিন আমি সংসারের বিষয় কিছুই
জানতাম না। আরও অনেক কথাই বলতে ইচ্ছে ছিল, কিন্তু ঘরের
কোণে নাস একটা 'ভেন ইন্সপেকশন' তৈরী করছিল, পাছে তার
কানে যায় এই ভেবে লজ্জার কথার মাঝে চুপ করে গেলাম। আমার
কথার খেঁই ধরে স্মিতহাস্তে মা বললেন—তুমি যে বললে 'এতদিন',
তার মানে এখন তুমি সংসারকে চিনেছ?

আমার মুখখানা অসম্ভব লাল হয়ে উঠল। আমি কিন্তু আজও
চিনি না—বলে মা অন্তরিক মুখ ফেরালেন।

আমিও বুঝি না, জানি না কে বোঝে ? সময়ের মনে সময় বয়ে যায়, আমরা ছেলেমানুষ থেকে যাই। কিছুই বুঝি না আমরা।

বাঁচতে আঁমায় হবেই, বলতে পারেন ছেলেমানুষী, তবু সহজ প্রাণে একে মেনে নেওয়াও শক্ত। এখন থেকে দুনিয়ার সঙ্গে লড়াই করে বাঁচতে হবে। মনে হ'ল ঝাঁরা সৌন্দর্যের ভেতর দিয়ে, শোকের ভিতর দিয়ে কাকুর সঙ্গে বিবাদ না করে, কাউকে ঝুঁনা না করে, প্রতারণা না করে জীবন যাপন করে গেছেন—মা তাদেরই শেষ নিদর্শন। ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে এমন লোকের ঠাই হবে না। মৃত্যুপথযাত্রীরা স্মরণের প্রতীক, কিন্তু বেঁচে থাকা, টিকে থাকা এ ব্যাপারগুলো ক্রমশঃ হ্রাস হ'য়ে উঠেছে। মনে পড়ে গেল গর্ভবতী সর্পিণীকে একবার মাটিতে গর্ত খুঁড়তে দেখেছিলাম। আমি মাটিতে শুয়ে সেইভাবে শরীরটাকে গুটিয়ে নিলাম। কিন্তু এমন কিছু আছে যার কাছে আত্মসমর্পণ করা অসম্ভব। বলতে পারি আমি নীচাশয় তবুও আঁমায় বাঁচতেই হবে, আঁমার ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য দুনিয়াতে টিকে থাকতেই হবে। এখন যখন স্পষ্ট বুঝলাম, মায়ের আয়ু ফুরিয়েছে, আঁমার মন থেকে প্রেম, ভাবপ্রবণতা বাষ্পের মত উবে গেল, মনে হল দিন দিন আমি স্বার্থপর, অনাচারী হয়ে উঠছি।

দুপুরের পরে আমি মায়ের টোঁট ভিজিয়ে দিছি, এমন সময় ফটকের কাছে একটা গাড়ীর শব্দ পেলাম। ওয়াদামামা ও মামীমা এসেছেন টোকিও থেকে। মামা সোজা রোগীর ঘরে ঢুকে রোগীর পাশে বসলেন। মা ক্রমাল দিয়ে মুখের নীচের দিকটা ঢেকে মামার মুখের ওপর চোখ রেখে কাঁদতে লাগলেন কিন্তু চোখে এক ফোঁটা জলও এল না। মাকে দেখে আঁমার পুতুল বলে মনে হল।

নাওজি কোথায় ? কিছুক্ষণ পরে আঁমায় জিজ্ঞেস করলেন। আমি দৌতলায় গিয়ে দেখি নাওজি সোফায় শুয়ে বই পড়ছে।

মা তোমায় ডাকছেন,—বললাম আমি।

কিন্তু ? আবার সেই ভয়াবহ শোকের দৃশ্য ! হে বীরসুন্দর্য, ক্ষীণ অমুভূতিসম্পন্ন নারী, ধৈর্য্য ধরে তোমার কর্তব্য পালন করো, আমাদের মত তাপিত ব্যক্তি যাদের প্রাণ চায়, চক্ষু না চায় তাদের পক্ষে মায়ের পাশে বসে থাকা অসম্ভব। জামা গায়ে দিয়ে আঁমার সঙ্গে নীচে নেমে এল।

তুই ভাই বোনে গিয়ে মায়ের হুপাশে বসলাম। হঠাৎ চাদরের নীচ থেকে হাত বের করে প্রথমে নাওজি, পরে আঁমার দিকে নির্দেশ করে অমুরোপের ভঙ্গীতে জোড়হাতে মামার দিকে তাকালেন।

উদার ভাবে ঘাড় নেড়ে মামা সাক্ষা দিলেন—হ্যাঁ, বুঝছি, আমি বুঝছি।

এই শেষ কথাটি বলে পরম নিশ্চিতভাবে হাত ছাড়া চাদরের ভেতর টেনে নিয়ে চোখ বুঁজলেন। আমি কাঁদছিলাম, নাওজিও

চোখ নিচু করে কাঁপাচ্ছিল। ডাক্তার মিয়াকে এসেই একটা ইনজেকশন দিলেন। মামাকে দেখে মা ধরেই নিলেন, তাঁর আর দেবী করে লাভ নেই। মুখে বললেন ডাক্তার বাবু, দয়া করে আঁমার ভবষ্যপ্রাণী শীগগির শেষ করুন। ডাক্তারের সঙ্গে মামার একবার চোখাচোখি হ'ল—হৃৎকেন্দ্রের মধ্যে কাকুর চোখই শুকনো ছিল না।

খাবার ঘরে গিয়ে যা হোক একটু খাবার ব্যবস্থা করলাম। টোকিও থেকে মামা কিছু শ্রাণ্ডউইচ এনেছিলেন—মা'কে দেখিয়ে বালিশের পাশে রেখে দিলাম—বিড়বিড় করে মা বললেন—তোমার ওপকু দিয়ে যা ঝুঁকি চলেছে।

টানাঘরে বসে কিছুক্ষণ কথাবার্তা হ'ল। মামা-মামীর টোকিওতে কি যেন কাজ ছিল, তাঁদের ফিরে যেতেই হল। মামা আঁমার হাতে থামে করে কিছু টাকা দিয়ে গেলেন। স্থির হ'ল তাঁরা ডাক্তারের সঙ্গেই ফিরবেন। ডাক্তার মিয়াকে ইতিমধ্যে নার্সকে পরবর্তী চিকিৎসার কথা বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। ঘরে নেওয়া গেল ইনজেকশনের গুণে মা আরও চার পাঁচদিন বেঁচে থাকবেন। এখন পর্যন্ত তাঁর পুরো জ্ঞান ছিল, হাটটাও বিশেষ জখম হয়নি।

সবাইকে ফটক পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে মায়ের পাশে ফিরে এলাম। আঁমার সঙ্গে কথা বলার সময়ে মায়ের মুখে সর্বদাই কেমন যেন দরদ ফুটে উঠত—তোমার ওপর দিয়ে খুব ঝড় ঝাপটা চলেছে। ফিসফিস করে আঁমাস বললেন। মুখখানা উত্তেজনার বলমল করছে। মনে করলাম মামাকে দেখে খুশি হয়েছেন বুঝি।

এর পর মা আর কথা কননি। প্রায় তিন ঘণ্টা পরে তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। শান্ত শরতের গোখুলি লগ্নে নার্স তাঁর নাড়ী দেখল ; নাওজি, আমি, মায়ের দুই সন্তান আঁমরাও দেখলাম। জাপানের শেষ সম্রাট মহিলা আমাদের স্মরনী মা শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন।

তাঁর অপক্লপ মুখখানা মৃত্যুর করাল স্পর্শ বিকৃত করতে সাহস করেনি। বাবার মৃত্যুর পর দেখেছিলাম মৃত্যুর পর হঠাৎই তাঁর মুখখানা অস্তরকম হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মায়ের মুখখানা জীবিত কালের মতই স্মরণ রয়ে গেল। কেবল তাঁর নিশ্বাস বন্ধ হ'ল, কিন্তু তাও এত শান্ত ভাবে গেল যে, আঁমরা টেরই পেলাম না। আগের দিনই মুখের ফোলাটা নেমে গিয়েছিল, এখন তাঁর গাল দুটি মোমের মত মন্থণ দেখাচ্ছে।

টোঁট দুটি যেন ঈষৎ হাসিতে ফুরিত হয়ে আছে। জীবিত কালের চেয়েও এখন অনেক বেশী লাষণময়ী দেখাচ্ছে। হঠাৎ মনে হ'ল জননী মেরীর সঙ্গে কোথায় যেন সাদৃশ্য আছে।

[ক্রমশঃ]

অনুবাদ : কল্পনা রায়।

শাস্ত্রশাসন রইল মাথায় তর্কে মিছে নাইকো ফল
বন্দরে ঐ পাড়িয়ে জাহাজ বেরিয়ে পড় বন্ধনল।

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

প্রাণাজ্বলি

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

[সি, এফ, অ্যাঞ্জলি লিখিত 'What I Owe to Christ' গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ]

যীশুখৃষ্ট ও জাতিভেদ

মাতৃনিয়োগের ব্যক্তিগত বেদনা যখন আমি পেলাম, তখন আমার চারিদিক গিরে হুং বেদনাব্যস্ত নই। সমস্ত দক্ষিণ আফ্রিকা জুড়ে নিগৃহীত ভারতীয়ের বেদনা। অহিংস অসহযোগ আন্দোলন আবার আরম্ভ হবে বলে মনে হচ্ছে। সেই শোক হুং ক্ষণে খৃষ্টবান্ধা সম্বন্ধে এক নতুন ভাবনায় আমার চিত্ত আচ্ছন্ন হোলো, মনে হোলো খৃষ্টের মতি স্পষ্টতর ভাবে আমার চেতনের সামনে যেন ফুটে উঠেছে। আমি পিতৃদেবকে লিখলাম যে এখানকার সংগ্রাম শেষ হলেই আমি ঈশ্বরে ত্যজে ফিরব। আমার এই কাজকে তিনি সমগ্র অন্তর দিয়ে সমর্থন করেছিলেন, তাঁর ও আমার মধ্যে মনের এমন নিবিড় সংযোগ বহু বৎসরের মধ্যে হয়নি।

দক্ষিণ আফ্রিকার ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে হুং জিনিব আমার কাছে স্পষ্ট হোলো। মহাত্মা গান্ধী ও তাঁর অনুচরবৃন্দের প্রচেষ্টার মধ্যে আমি খৃষ্টের আদর্শকে প্রত্যক্ষ করলাম, অন্যায়কে তাঁরা পরম সহিষ্ণুতার সঙ্গে বরণ করছেন, অন্তর্ভুক্ত তাঁরা জয় করছেন শুভ দিয়ে। যীশুখৃষ্ট প্রচার করেছিলেন বিশ্বপ্রেম আর প্রাচীন ভারতে বুদ্ধ স্তনিবেশিতেন অনন্ত করুণার বাণী। আমি এই প্রথম উপলব্ধি করলাম যে এই দুই মহাত্মনবের শিক্ষার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। একই চেতনায় একই আদর্শে একই ধারায় এই দুই শিক্ষা মানবসাধনা ও মানবভাগ্যের ইতিহাসকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। সাধু জেমসের পত্রের সেই মহান বাক্যটি বারে বারে আমার মনে বাজতে লাগল,—

প্রতিটি শুভপ্রসাদ প্রতিটি মঙ্গলদান তাঁর কাছ থেকে প্রেরিত যিনি আলোকের পিতা। সকলকে যিনি সমভাবে আলো দেন, কোথাও আলো আর কোথাও ছায়া,—এ নয়।

দ্বিতীয়ত, মহাত্মা গান্ধী ও তাঁর অনুচরদের এই খৃষ্টাদর্শ প্রণোদিত আন্দোলনের পাশাপাশি খৃষ্টীয় সমাজের এ কি আদর্শবিরোধী অজ্ঞান কার্যাবলী আমি প্রত্যক্ষ করলাম! প্রভু খৃষ্ট বলেছেন স্বনীতির পরিচয় কথায় নয়, কাজে। বুখা বাক্য নয়, প্রকৃত কর্মের মধ্য দিয়েই চরিত্রের প্রকাশ। আমি ভাবলাম,—এই যারা অত্যাচারিত অধুষ্ঠান আর যারা অত্যাচারী খৃষ্টান,—আমার প্রভু খৃষ্ট কোন্ দলে? ধর্মের পরীক্ষা কর্মের মধ্যে। যে ধর্ম শুধু বাক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, সে বাক্য যতো প্রাচীনই হোক,—সেই ধর্ম বুখা,—সেই বুখা ধর্মকে খৃষ্ট

কৃতাভ্যাস অবস্থা করে গেছেন। এই অন্তঃসারশূন্য ধর্মকথা-সর্বস্ব ধর্ম ছলচাতুরী ছাড়া আর কিছু নয়,—এই খৃষ্টের বিচার!

জেনারেল মার্টিনের সঙ্গে আলোচনার জন্য মহাত্মা গান্ধী যখন প্রিটোরিয়াতে অবস্থান করছিলেন, তখন আমিও তাঁর সঙ্গে ছিলাম। তখন গ্রীষ্মকাল,—উষ্মক আকাশের নিচে আমরা রাতে বিশ্রাম করতাম। অনেক বার আমার প্রশ্ন দিকে ঘূর্ণ আসত না,—অসংখ্য তারকাখচিত বিপুল রহস্যমণ্ডিত সোমার্টোন কক্ষ আকাশের দিকে স্তব্ধ-বিশ্বয়ে আমি তাকিয়ে থাকতাম। অনেক দিন আবার সূর্যোদয়ের বহু পূর্বে ঘুম ভেঙে যেত। সমস্ত জগৎ তখন নিদ্রামগ্ন। প্রভাত্য-পূর্বের সেই অচঞ্চল অন্ধকারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমি একলা চুপ করে বসে থাকতাম। মনে মনে ভাবতাম, কি বিঘাট এই সৌরজগৎ, তার অজ্ঞাতম গ্ৰহ এত পৃথিবীও কতো বিঘাট! এই বিশৃঙ্খল বিশ্ব-মাঝে এত অনন্ত কালসমূহে মানুষের জীবন কতো সামান্য, কতো ক্ষণিক। যেন অন্তহীন অন্ধকারে মুহূর্তস্থায়ী একটি শিখা। নিঃসীম জড়সমুদ্রে চৈতন্য-তরঙ্গের পলকস্থায়ী স্পন্দন! মানুষের জীবন সামান্য বলেই এতো মহার্ঘ, হৃদয় বলেই এতো মূল্যবান! সেই জন্তেই এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত আমাকে ঈশ্বরের কাজে ব্যয়িত করতে হবে এবং সেই কাজের নির্দেশ ও প্রেরণা দেবেন পরমপ্রভু খৃষ্ট।

চুক্তিদাসের মুক্তি আন্দোলনের উত্তেজনা চরম থেকে চরমতর হয়ে উঠেছে। মহাত্মা গান্ধীর সহায়তায় আমি প্রত্যক্ষভাবে নিজেকে নিয়োজিত করেছি। কিন্তু সেই সঙ্গে আমার মনের নিভৃততর স্তর থেকে আমি মহাত্মা গান্ধীর অতীন্দ্রিয় ব্যক্তিত্বের রহস্য অনুধাবন করবার চেষ্টা করছি। গান্ধীজি সম্পূর্ণ ভাবে হিন্দু অথচ তিনি পরম খৃষ্টান। খৃষ্টধর্মের শ্রেষ্ঠ বাণী তাঁর চরিত্রে প্রকট, খৃষ্টের আদর্শে সমপিত তাঁর জীবন। এই বিষয়ে আমি অনেকগুলি চিঠি লিখেছিলাম। আমার বন্ধু খ্রীযুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সেই পত্রাবলী মর্ডার্ন রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন। মানুষ বিভিন্ন ধর্মমতে বিশ্বাসী হতে পারে, কিন্তু মানবাত্মা এক। বিভিন্ন ধর্মমতে বাহ্যিক পার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু সমস্ত আপাত পার্থক্যের প্রান্তে এক গুণ গভীর ঐক্য। মানুষে মানুষে জাতিতে জাতিতে ইতিহাসের আদিম ঐক্য শুধু এ নয়, এই ঐক্যবোধ অন্তরুখী উপলব্ধির। সকল মানুষেরই এক পরম পিতা, তিনি তাঁর সমস্ত সন্তানকেই সমানভাবে স্নেহ করেন, প্রতি সন্তানকে প্রেমের আকর্ষণে পরস্পরে

প্রতি ও তাঁর নিজের প্রতি টানেন। এই উপলক্ষি যদি সত্য হয়, মানুষে মানুষে ভাইএ ভাইএ ভেদাভেদের স্থান কোথায়?

ঈশ্বরের ও ঈশ্বর-প্রতিভা যৌক্তিক এই সর্বপ্রাণী কল্পনার সঙ্গে আমি কোনো প্রকারের সংকীর্ণ ধর্মোন্মাদনাকে একমুখে গাঁথতে পারিনি। আখ্যানসিয়াসের ঘোষণা সর্বদা আমার মুখে এসে বেধে গেছে। যারা খৃষ্টান নয়, তাদের মুক্তি নেই, অনন্ত নরকে তাদের স্থান, এই ঘোষণাকে আমি কখনো মেনে নিতে পারিনি, মেনে নিতে পারিনি যে ভারত ও চীনের লক্ষ লক্ষ অধিবাসী বিধর্মী বলে বর্বর, বিধর্মী বলে অন্ধকার তাদের জীবন, জীবনের অবসানে অন্ধ নরকে তাদের গতি।

খৃষ্টানদের এই ধরনের সংকীর্ণ বিশ্বাসকে খৃষ্টান্যের অমুপযুক্ত বলে বহুদিন আমি পবিত্র্যাগ করেছিলাম। এখন গাঙ্কাজিকে আমার আত্মায় ঘনিষ্ঠতম বন্ধু বলে গ্রহণ করলাম, তাঁকে অকপটে খুলে বললাম আমার সমস্তার কথা। যে ঘোষণা অখৃষ্টানকে নরকধাত্রী করে, সেই ঘোষণা আমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করিনি, অথচ খৃষ্টানযাজক হিসেবে উপাসনাক্ষেত্রে সেই ঘোষণাকে আমাকে উচ্চারণ করতে হয়, এটি দৃষ্ট থেকে মুক্তি পাব কেমন করে? মহাত্মা গাঙ্কী আমার এই সমস্তার কথা অতি নিরীহভাবে শুনলেন, আমার দুর্বল অন্তর্দ্বন্দ্বের জগা তিনি আমাকে তিরস্কার করলেন না, বরং তিনি ধৈর্য ধরবার উপদেশই দিলেন। বললেন,—এমন দিন আসবে যেদিন খৃষ্টসেবার উদারতর ক্ষেত্রে আপনিই আমার আহ্বান আসবে, সেদিন ধর্মীয় অমুশাসনের কীর্ণ গণ্ডী আপনিই আমি অতিক্রম করতে পারব। লগুনে

প্রত্যাবর্তনের পর সেখানে শ্রীযুক্ত গোথেলের সঙ্গে এই এক-বিষয়ে আমি আলোচনা করেছিলাম, তিনিও আমাকে ঐ একই উপদেশ দিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অমুগ্রহে আমি মুক্তিলাভ করতে পেরেছিলাম। ও কাহিনী আমি পরে বিবৃত করব।

বাহিরে ঘটনার আবর্ত,—সেই সঙ্গে মনের মধ্যেও চিন্তার আবর্ত। গভীরতর অভিনিবেশের সঙ্গে আমি আমার ধর্মগ্রন্থ পাঠ করতে লাগলাম,—যারে ধীরে পরিচয় হতে লাগল আমার অন্তর্দৃষ্টি, যৌক্তিকের স্বচ্ছ সরল স্পষ্ট বাণী আমার প্রাণে এসে বাজতে লাগল। দক্ষিণ আফ্রিকার সমস্তাবলীর সম্মুখীন হয়ে আমার আশ্চর্য দৃষ্টি মেলে আমি যেন নূতন আলোক দেখতে পেলাম। সে জাতিবিভেদ সংকীর্ণ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে স্বয়ং যীশু তাঁর ক্রিষ্ট অন্তরের কঠিন বিদ্ধার উচ্চারণ করেছেন, সেই জাতিভেদ ও সেই কুসংস্কার তাদের কুংসিত কুটিল প্রহ্ন নিয়ে পদে পদে আমার সম্মুখবর্তী হতে লাগল। আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম ধর্মভীক ফরোশীর উদাহরণস্বরূপ ঘৃণ্য সামারিটানকে কেন যীশু গ্রহণ করেছিলেন, কেন তিনি ফরোশীদের মনে প্রবলতর আঘাত দিয়ে ঘোষণা করেছিলেন যে মত্তব্যবসারী ও পাপীরাও তাদের পূর্বে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশাধিকার পাবে।

এই সমস্ত চিন্তা জাত্যাভিমান ও জাতিবৈরিতার বিরুদ্ধে আমার মনকে দৃঢ়তর করে তুলল। আমি বুঝলাম, এই অজ্ঞানের বিরুদ্ধে সমস্ত শক্তি নিয়ে আমাকে ঝাঁড়াতে হবে। এ জন্তে হয়তো আমাকে

উজ্জ্বল আলোকে

কে. হোডের

মারোম প্রজাতি



কে. হোড ২৩ কোং • কলিকাতা-১১



আমার স্বজাতির বিরুদ্ধাচরণ করতে হবে, খৃষ্টানদের বিপক্ষে যেতে হবে, তবু পিছুপাও হলে চলবে না। খৃষ্টের নামে বিশ্বের দরবারে আমি সত্য সাক্ষ্য দেব, আপন জনের বিমুখতায় ভয় পেয়ে পিছিয়ে আসার আমার উপায় নেই। খৃষ্টান-কা'কে বলে? আমি খৃষ্টান-সমাজে জন্মগ্রহণ করেছি, খৃষ্টান-সমাজের সুযোগ সুবিধা লাভ করে বড়ো হয়েছি, খৃষ্টান-গির্জায় প্রবেশের অধিকার পেয়েছি, অতএব আমি খৃষ্টান? খৃষ্টপ্রেমের একটি মাত্র পরীক্ষা। সমাজ সংসারের সমস্ত স্বার্থ নির্দেশ নির্বিশেষে অকুতোভয়ে বিবেকের নির্দেশকে যে অনুসরণ করে সেই খৃষ্টান। মানুষের নির্দেশকে অতিক্রম করে ঈশ্বর নির্দেশকে মান্ত করাই খৃষ্টানের এক মাত্র পরীক্ষা। এই নির্দিষ্ট পথে যে যাত্রা করে সে সমাজ বন্ধন মানে না, সে জাতিস্বার্থ মানে না। আত্মীয়ের আহ্বানেও সে কান পাতে না। সে চলে পরম পিতার নির্দেশে, সে শুধু তার পরমাত্মীয় পরম পিতাকেই জানে। খৃষ্টের আপন জননী ও ভাতারা যখন তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিল, তখন তিনি বলেছিলেন,—

‘কে আমার মাতা? কেই বা আমার ভাতা? ঈশ্বরের আশ্রয় পালন করে সেই আমার মাতা, সেই আমার ভগিনী, সেই আমার জননী।’

আজ আমার চারি দিকে যেমন জাতিগত কুসংস্কার সেই কুসংস্কার বীজের প্রথম শিষ্যদের মনেও ছিল। তাঁরা তাঁদের সুস্বাস্ভূতি দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন যে, বীজের ঐশী প্রেরণা একের পর একে এই সমস্ত কুসংস্কারের বাধাকে বিদীর্ণ করে এগিয়ে চলেছে। তাঁরাও তাঁদের মন থেকে এই সমস্ত কুসংস্কারের মূলোৎপাটন করে খৃষ্টের অমূল্যত্ব হয়েছিলেন। খৃষ্টই তাঁদের দেখিয়েছিলেন ভেদ-বাধাবিহীন ঈশ্বর-নির্দিষ্ট পথ। যারা সমাজচ্যুত, যারা অবজাত, মন্দিরে যাদের স্থান নেই, বীজ তাদের কাছে ডেকেছিলেন, কোলে স্থান দিয়েছিলেন। এই মহান দৃশ্য চর্মকে মেলে দেখেছিলেন প্রভুর প্রথম অনুগামীরা দল। সর্বসুযোগ থেকে বঞ্চিত করে সমাজ যাদের দূরে পরিহার করেছে প্রভু তাদেরই ভালোবাসতেন অধিক,—এই দৃশ্য তাঁর শিষ্যরা খৃষ্টের প্রত্যক্ষ জীবনযাত্রা থেকে লক্ষ্য করেছিলেন। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে মৃদু জাত্যাভিমানে জীর্ণ বস্ত্রের মতো পরিহার করার শিক্ষা তাঁরা লাভ করেছিলেন। তাঁরা দেখেছিলেন, সমাজ যাদের ঘৃণা করেন, খৃষ্ট তাদেরই প্রেম করেন, সমাজ যাদের পরিত্যাগ করে, খৃষ্ট দেন তাদেরই আশ্রয়।

খৃষ্টের জীবনের মধ্য থেকে ভক্তগণ ঈশ্বরের অঙ্গুলি নির্দেশ প্রত্যক্ষ করেন। দূরকে করো আপন, পরকে করো ভাই,—ঈশ্বরের এই মহামন্ত্রে দীক্ষিত হলেন শিষ্যগণ। এই শক্তিমন্ত্রে উচ্ছ্বস হয়ে তাঁরা গৃহবন্ধন পরিহার করলেন, স্রব করলেন ঈশ্বর-প্রেরিতের অভিধান। সমাজ তাঁদের পরিত্যাগ করল, সমাজের গণ্ডী তাঁরা অতিক্রম করলেন—নির্ভর আনন্দে।

পদে পদে তাঁদের কতো আতঙ্ক, কতো বিপত্তি! প্রাচীন ইহুদী গির্জা মনুষ্য সমাজকে ইহুদী ও বে ইহুদী নয়, অর্থাৎ ‘জৈটিল’ এই দুই ভাগে ভাগ করে রেখেছিল। সেই গণ্ডী পার হয়ে দূর দূরান্তরে তাঁরা এগিয়ে চললেন। প্রাচীন জাতিগত ও ধর্মগত কুসংস্কারকে পদে পদে তাঁরা ভাঙতে ভাঙতে চললেন। যতো-তাঁরা অগ্রসর হতে লাগলেন ততো তাঁদের আচ্ছন্ন দৃষ্টি সমুজ্জ্বল হতে লাগল,

ঈশ্বরকে যে রূপে পূর্বে কখনো কল্পনা করেন নি, সেই অনিন্দ্যসুন্দর রূপ তাঁদের চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠল,—খৃষ্টবাবীর যে উদার মহৎ অর্থ পূর্বে তাঁরা বুঝতে পারেননি, সেই অর্থ প্রতিভাত হোলো তাঁদের মনে। খৃষ্ট বলেছিলেন, “ঈশ্বরই করুণা”। এই বাক্য শুধু আমার নিকট উপাসনাপুত্রের কঠিন দেয়ালে লিখে রাখার নয়—এই বাক্যের অমোঘ মন্ত্রে বিশ্বচরাচর মন্ত্রিত হচ্ছে, সেই মহাধর্মনির প্রতিধ্বনি তাঁদের হৃদয়ে এসে বাজতে লাগল। এই মন্ত্র প্রাচীন বিশ্বাসের বন্ধ দ্বার উন্মোচন করে দেয়, অজুতপূর্ব অকল্পনীয় সাধনার পথে মানবমনকে আহ্বান করে নিয়ে যায়।

প্রেমসাধনার এই যাত্রাপথে দু-একবার থমকে দাঁড়ালেন শিষ্যগণ, প্রতিনিবৃত্ত হলেন দু-একবার। উত্তেজনা ও চিন্তা-দৌর্বল্যের বশে পিটার একবার খৃষ্টভক্ত ‘জৈটিল’দের সঙ্গে আহার করতে আপত্তি করলেন। সেই পরাজয়ের পক্ষ থেকে তাঁকে উদ্ধার করলেন পল। কিন্তু পিছু তাঁরা শেষ পর্যন্ত হটলেন না, আশ্চর্য তাঁদের সাহস, আশ্চর্য তাঁদের নিষ্ঠা। তাঁদের সামনে নিত্য-সমুজ্জ্বল খৃষ্টমূর্তি,—নিত্য-নূতন ধার খুলে নিত্য-নূতন পথ সন্ধান দিচ্ছেন প্রভু, বলিষ্ঠ হাতে ভেঙে দিচ্ছেন যুগসৃষ্ট কঠিন শৃংখল, মোচন করছেন যুগ-সঞ্চিত আবর্জনা। খৃষ্টের প্রেম পরমপিতার আশীর্বাদ, গোষ্ঠীর গণ্ডীকে অতিক্রম করে মানবসমাজের বিভিন্ন বর্ণ ও বিভিন্ন জাতির মধ্যে পরিব্যাপ্ত হচ্ছে।

খৃষ্ট সভ্যতার প্রাথমিক অভিধানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় হোলো এই। এই অভিধান মানব-ইতিহাসের এক মহৎ প্রগতি। এই অভিধান ও সংস্কারের বিরুদ্ধে এই সংগ্রাম মানবাত্মাকে এক উদার মুক্তির ঐশ্বর্য দান করেছে।

দক্ষিণ আফ্রিকাতে দেখলাম, উদার সর্বমানবিক খৃষ্টীয় সভ্যতা জাতিভেদের আঘাতে খান্ খান্ হতে চলেছে। খৃষ্টের আদি শিষ্যদের সমস্তা ও অভিজ্ঞতা আমার নিজের জীবন দিয়ে আমি বেন উপলব্ধি করলাম। আমি বুঝলাম, আমাকেও পিছিয়ে পড়লে চলবে না, শংকা নিয়ে কুঠা নিয়ে দূরে সরে থাকলে চলবে না। খৃষ্টের সেই আদি শিষ্যদের মতো নির্ভর বলিষ্ঠ হতে হবে আমাকে। যুদ্ধ করতে হবে আমাকে। খৃষ্টের উদার আহ্বানকে যারা জাতিভেদের সংকীর্ণ কোলাহলে লুপ্ত করতে চায়, সাধু পলের মতো তাদের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে আমাকে।

এও আমাকে স্বীকার করতে হবে যে, যারা নিজের খৃষ্টান বলে না, তাদেরও অন্তরে খৃষ্ট আছেন। তাদেরই দলে আমাকে যোগ দিতে হবে,—জাতির নামে ধর্মের নামে যারা মানুষকে মানুষের কাছ থেকে পৃথক করে রাখে তাদের দলে আমার থাকলে চলবে না। আমি জানি আমার পক্ষেই ঈশ্বর আছেন,—যে ঈশ্বর ব্যক্তির গর্বকে প্রশ্রয় দেননা, যে ঈশ্বর সমভাবে করুণা করেন সর্বমানবকে।

এমনি পণ যে কেবল আমি একাই করেছিলাম তা নয়। দক্ষিণ আফ্রিকার আরো অনেক সঙ্ঘদয় ও ধর্মপ্রাণ শ্রমিকার খৃষ্টান আমার মতো একমত ছিলেন। মহাত্মা গান্ধী ও তাঁর পক্ষীয় নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগব্রত লক্ষ্য করে তাঁরা বলেছিলেন,—‘এই সাধুদল্পতি প্রকৃত খৃষ্টান, আমাদের চেয়ে অনেক মহৎ খৃষ্টান এঁরা।’ একথা শুধু কথার কথা নয়, এই কথার মধ্য দিয়ে প্রকৃত সত্যকে তাঁরা

স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। গান্ধীর অনুগামী ভারতীয় অহিংস সত্যগ্রহীদের হিন্দু বা মুসলমান ঘরে জন্ম হলেও তাঁদের খৃষ্টীয় জীবনদর্শ যে কোনো খৃষ্টানের চেয়ে অনেক বড়ো। নতুন করে ধর্মগ্রন্থ পাঠ করতে করতে ও খৃষ্টীয় ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে চিন্তা করতে করতে এই কথা কেবলই আমার মনে বাজতে লাগল।

আমার মনের মধ্যে এক বিপ্লব আবর্তিত হতে লাগল অবিরাম। স্বদেশে 'রবিন হুড বে'-র কাছে একদিন বিশপ ওয়েষ্টকটের সঙ্গে ভ্রমণকালীন তাঁর কয়েকটি কথা বারে বারে আমার মনে পড়তে লাগল। হুজনে পাশাপাশি আমরা বেড়াছিলাম। হঠাৎ তিনি শুরু হয়ে দাঁড়ালেন লাঠির মাথায় হু-হাতের ভর দিয়ে। তারপর বলে উঠলেন, মানবজীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে যদি খৃষ্টকে অবলোকন করতে পারো, তবেই প্রকৃত তাঁকে অন্তরের মধ্যে দেখতে পাবে। তা যদি না পারো তাহলে তাঁর সর্ব-অস্তিত্বব্যাপী অথবা অস্তিত্বকে স্বীকার করতে পারলে না, বুঝতে পারলে না মানবপুত্র কেন তাঁর নাম।

এই কথা ক'টি বলার পর বিশপ ওয়েষ্টকট কয়েক মুহূর্ত আমার দিকে শুরু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন, অনুভূতির উদ্বেগনে তাঁর স্মৃতির ছিট চোখ অশ্রুতে ভরে গেল। অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ তাঁর পক্ষে বিপর্যয় ছিল। তাঁর সেদিনকার অশ্রু তাঁর গভীর অন্তরের অমৃতধারা।

সমস্ত ধর্মমত ও সমস্ত বিশ্বাস ও সংস্কারের উর্ধ্বে সত্যের স্থান। অভিজ্ঞতার অসংখ্য উন্মুক্ত দ্বারপথে সত্যের আলো এসে আমার দৃষ্টিকে অভিহিত করতে লাগল। আমার হাইচার্চ ধ্যানধারণায় যেটুকু পরিবর্তন এ পর্যন্ত হয়েছিল, তা এই সত্যদৃষ্টির কাছে নিতান্ত সামান্যমাত্র। কিন্তু এখন থেকে সত্যের আলোকে আমার স্বাভাৱ্য। এই স্বাভাৱ্যে কুসংস্কারের অন্ধকারের কোনো স্থান নেই। প্রত্যক্ষ বাস্তবের আঘাতে যে বিশ্বাস অসত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত তাকে আঁকড়ে রাখা সম্ভব নয়, সেই বিশ্বাস বহু-অভ্যন্তরীণ ধর্মবিশ্বাস হলেও।

ধর্মসংস্কারের নিগড়ে যারা আবদ্ধ হয়ে থাকতে চায়, তাদের মনের ভাব আমি বুঝতে পারি। সংস্কারের একটা নির্দিষ্ট ও নিরাপদ গণ্ডী আছে। এই গণ্ডীর মধ্যে মনকে আবদ্ধ রাখায় কোনো ঝগড়া নেই,—নিতান্ত নিরুপদ্রব এই ব্যবস্থা। আমারও মন সহজে এই গণ্ডী পার হতে পারেনি,—এই গণ্ডীর আকর্ষণই আমাকে হাই চার্চের অবলম্বন থেকে মুক্ত হতে বাধা দিচ্ছিল। কিন্তু যে মন মুক্তি চায়, কোন্ অমুশাসন তাকে বাধা দেবে? সমাজচ্যুতির কোন্ ধমক তাকে ডরাবে?

বাইবেলে এক কল্পা রমণীর কাহিনী আছে, সে বিশ্বাস করেছিল যে যীশুর বস্ত্রাঙ্কল স্পর্শ করলেই রোগমুক্ত হবে। যীশু তাকে ভৎসনা করেননি, করুণা করেছিলেন। যীশুর বস্ত্রাঙ্কল স্পর্শ সে করেছিল, আপন বিশ্বাসে রোগমুক্ত হয়েছিল। তার এই দৃঢ়বিশ্বাসের মধ্যেও ভীকার দীনতা ছিল। এই দীনতা তার বিশ্বাসকে পার্থিব সংসারের সঙ্গে আবদ্ধ রেখেছিল। রোমক সেন্ট রিয়নের অন্তরে যে বিশ্বাস ছিল তার সমকক্ষ হতে পারেনি। সে বলেছিল,—“প্রভু, তুমি শুধু বলো, তোমার বাণীতেই আমার ভৃত্য নুহ হবে।” যীশুর শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ এই মহাবিশ্বাসী ভক্ত লাভ করেছিল। তিনি বলেছিলেন,—“সত্যই, এমন বিশ্বাস আমি ইস্রাইলে কোথাও দেখিনি।”

উন্নত করে তোমার হৃদয়—এই মহাবিশ্বের অর্থ কী? আমার

আত্মিক দৃষ্টিকে শুধু যে স্বর্গরাজ্যের দিকে তুলতে হবে তাই নয়,—পরমাত্মার প্রসাদ নীরবে কেমন করে সর্বমানবের অন্তরকে নিবিক্ত করে, জাতিধর্ম নির্বিশেষে প্রতি মানবাত্মাকে কল্যাণ ও শুভকর্মের পথে পরিচালিত করে, তা লক্ষ্য করতে হবে, তবেই হবে অন্তরের উন্মোচন।

মহাত্মা গান্ধী ও জেনারেল স্মিথস সংক্রান্ত এই সমাচার একটি কাহিনী অতি অপূর্ণ! অল্প বিষয় অবতারণা করার পূর্বে সেই কাহিনীটি এখন বলতে চাই।

দক্ষিণ আফ্রিকার কারাবাসে ভারতীয় নারীদের মধ্যে সবচেয়ে কষ্টভোগ করেছিলেন শ্রীমুক্তা গান্ধী। নাটালে পৌঁছানো মাত্র আমি জেলে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করি, কিন্তু তিনি তখন এত অসুস্থ যে তাঁর সঙ্গে সাফাৎ করা সম্ভব হয় না। যতদিন আমরা প্রিটোরিয়ায় ছিলাম, কারাবাসীরাই তাঁর অসুস্থতার হুচিস্তা সর্বক্ষণ আমাদের মনে লেগেছিল। সরকারের সঙ্গে আলাপ আলোচনা স্বয়ং শুভপথে এগিয়ে চল, তখন অল্প বন্দীদের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমুক্তা গান্ধীও মুক্তি পেলেন। কিন্তু তাঁর স্বাস্থ্য ইতিমধ্যে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, দিনে দিনে তাঁর দেহ দুর্বল থেকে দুর্বলতর হতে লাগল।

এদিকে অবিলম্বে প্রিটোরিয়া পরিত্যাগ করা তখন আমাদের



আপনার স্বাস্থ্য, তৃপ্তি
ও সঞ্চয় রক্ষা করিতে

- কলে প্রস্তুত
- স্টোমে সেকা
- হেসিনে প্যাক
- ও ফালি করা

বেকারি অ্যান্ড কন্সাল্টেশনারী
কলিকতা - ২৯

পক্ষে সম্ভব নয়। বিরোধের সম্পূর্ণ মীমাংসা তখনো হয়নি,—কয়েকটি প্রশ্ন তখনো রয়ে গেছে,—যে কোনো মুহূর্তের সংকটে সব ব্যবস্থা ভেঙে পড়া বিচিত্র নয়। ধীরে ধীরে সব প্রশ্নের মীমাংসা হোলো, বাকি বইল শুধু চুক্তিপত্রের জেনারাল শ্রাটসের একটি স্বাক্ষর। এদিকে জেনারেল শ্রাটস তখন দেশের এক আসন্ন সাধারণ ধর্মঘট নিয়ে ভ্রামনক বাস্তব। তাঁর এই স্বাক্ষরটি আদায় করতে কতোদিন দেরি হবে তাও ঠিক নেই। ঠিক সেই সময়ে মহাত্মা গান্ধীর কাছে তারবার্তা এল,—তাঁর দ্বী মৃত্যুশয্যা! আমি গান্ধীজিকে অমরোদ্বৈত করলাম,—কালবিলম্ব না করে তিনি দ্বীরা কাছে চলে যান, চুক্তিপত্রের সই আমি বথাসময়ে করিয়ে নেব। কিন্তু আমার কথায় তিনি কর্ণপাত করলেন না। ব্যক্তিগত প্রয়োজনে জাতীয় কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হবার মানুষ তিনি নন। কর্তব্যনিষ্ঠায় তিনি প্রস্তুতের মতো! অটল, তাঁকে টলানো অসাধ্য আমার পক্ষে, তাঁর তখনকার বিপুল মর্যাদা আমি আমার নিজের মনে অনুভব করতে পেরেছিলাম, এইটুকু মাত্র।

সেদিন রাত্রে কিছুতেই আমার চোখে ঘুম আসছিল না। মধ্যরাত্রি বখন পার হয়ে গেল তখন হঠাৎ আমার মাথায় একটা চিন্তা এল। আগামী কাল প্রহ্লাসে উঠেই জেনারেল শ্রাটসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর সইটা আদায় করার চেষ্টা করি না কেন? আগামী দিনের প্রথম কর্তব্য মনে মনে স্থির করে নিয়ে আমি শান্তিতে চোখ বুজলাম।

পরদিন প্রভাতে ঠিক ছ'টা নাগাদ আমি ইউনিয়ন বিজিৎসে পৌঁছিলাম। আমি জানতাম যে এই ধর্মঘট আন্দোলন দমনের জন্ত জেনারেল শ্রাটস প্রতিদিন অতি ভোরে পরিভ্রমণে বার হয়ে যান। ঠিক সাতটার সময় তিনি উপস্থিত হলেন এবং আমার মুখে সমস্ত কথা শুনে মনোহত হলেন। মুহূর্তে তাঁর গভীর মানবতাবোধ জাগ্রত হোলো। আমার কাছ থেকে চুক্তিপত্রটি তিনি দেখতে চাইলেন। চুক্তিপত্রের উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, সমস্ত পয়েন্টগুলো ঠিক ঠিক আছে তো এর মধ্যে?

আমি বললাম—হ্যাঁ, আছে।

তৎক্ষণাৎ চুক্তিপত্রটি তিনি সই করে দিলেন। পরম আনন্দিত মনে আমি মহাত্মা গান্ধীর কাছে ফিরে চলেলাম। সেই দিনই আমরা ভারবান যাত্রা করলাম। ট্রেনে যেতে যেতে পথিমধ্যেই সুসংবাদ পেলাম যে শ্রীযুক্ত গান্ধীর অবস্থা একটু ভালোর দিকে।

দক্ষিণ আফ্রিকা সম্বন্ধে আমার এই রচনার পাঠকগণ মনে রাখবেন যে, এসব ঘটনা প্রায় কুড়ি বৎসর পূর্বকার কথা। তার পর থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার খৃষ্টীয় সমাজের বিভিন্ন শাখায় উল্লেখযোগ্য নব জাগরণ ঘটেছে। ইংরেজ ও ওলন্দাজ, উভয় জাতির উৎসাহী নরনারীর দল ঘনিষ্ঠতর ভাবে খৃষ্টীয়সরণে ব্রতী হয়েছেন। খৃষ্টশিষ্যত্বের প্রকৃত কর্তব্যবোধের আনন্দে বিভিন্ন খৃষ্টানগোষ্ঠী উৎসাহিত হচ্ছে। অক্সফোর্ড গ্রুপ আন্দোলন তরুণ হৃদয়ে নব উদ্গাদনার সঞ্চার করছে। এই সমস্ত দেখে মনে হয় যে, জাতিভেদ ও বর্ণবৈষম্যের পাপগণ্ডী বোধ হয় দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ধীরে ধীরে বিদূরিত হবে। খৃষ্টজীবনের আনন্দিত আঙ্গোকে আবার ধর্মবিধাদায়ী মনের কালো অপশ্রুত হবে, সেখানে বিরাজ করবে খৃষ্ট-হৃদয়ের প্রেম-প্রভ।

ভারতীয় সমস্তার মীমাংসার পর আমি ইংলণ্ডে যাত্রা করলাম। গোপেল তখন রুগ্ন অবস্থায় লগুনে অবস্থান করছিলেন,—তাঁর সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্য ছিল আমার। তাছাড়া উদ্দেশ্য ছিল পিতৃদর্শন। আমার মাতৃবিয়োগের পর আমার বাবা অত্যন্ত দুর্বল ও অসহায় হয়ে পড়েছিলেন,—এই শেষ বয়সে আমার সঙ্গে সাক্ষাতের দিন গুণছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার ঘটনাবলী তিনি গভীর মনোযোগের সঙ্গে অনুসরণ করেছিলেন। তাঁর কাছে শুনলাম যে, আমার মা-ও তাঁর শেষ দিন পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকায় আমার কার্যকলাপের খবর রেখেছেন ও আমাকে আশীর্বাদ করে গেছেন। আমাদের মধ্যে স্নেহময়ী জননী আর নেই,—এতো দিন পরে বাড়ি ফিরে এই শোকের মধ্যেও আত্মীয়-মিলনের আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

এর পর আমি ভারতবর্ষে ফিরে এলাম,—মনে মনে এই স্থির প্রতিজ্ঞা নিয়ে যে কেমব্রিজ মিশনের স্থানীয় গণ্ডী আমাকে অতিক্রম করতেই হবে এবার,—নইলে উদারতর পৃথিবীর পথে কেমন করে পা বাড়াব?

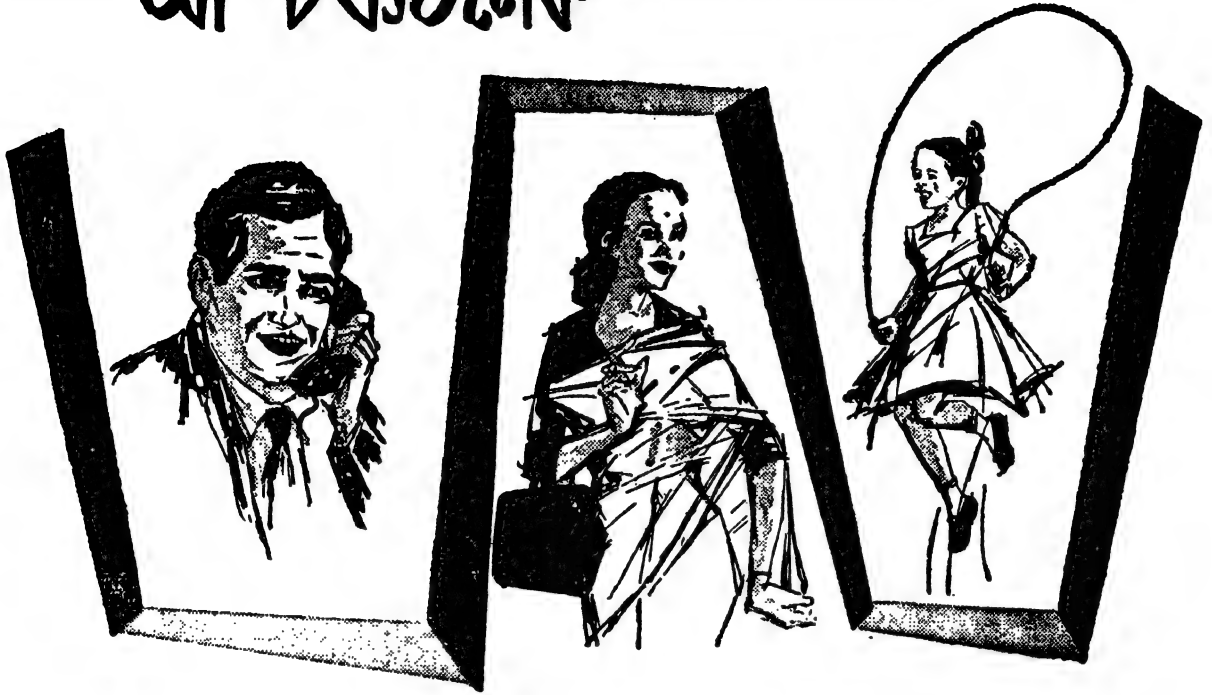
বহু বৎসর ধরে আমি এই পদক্ষেপের বিষয় গভীর ভাবে চিন্তা করছিলাম এবং ঈশ্বরের পথ-নির্দেশের প্রতীক্ষা করছিলাম। এই সঙ্গে এই কথা সর্বদা আমার মনে জাগত যে, ভারতবর্ষের জনগণের সঙ্গে আমার ভাগ্যকে সংযুক্ত করতে হবে, পরিত্যাগ করতে হবে বিদেশী সংস্থাপনের উপর নির্ভরশীলতা। জনগণের প্রয়োজনে নবতর কর্তব্যের আহ্বানের জন্ত নিজেকে স্বাধীন করতে হবে। পৃথিবীর অজ্ঞাত স্থানে যেখানে ভারতীয় চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকরা রয়েছে, সে সমস্ত স্থানে আমাকে যেতে হবে ও ভারতীয় শ্রমিকদের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করতে হবে,—এ সম্বন্ধে আমি নিঃসংশয় হয়েছিলাম। অতএব মিশনের বন্ধন আর আমার ভবিষ্যৎকে বেঁধে রাখতে পারবে না। যদি যৌক্তর পথে একান্ত ভাবে নিজেকে পরিচালিত করতে পানি তাহলে নোঙরের বন্ধন ত্যাগ করে দৃষ্টি সমুদ্রে ভাবাতে হবে জীবনতর।

কেমব্রিজ ডাক্তারসংঘ ও তাঁদের পরিচালক অ্যালনাট স্পষ্টই বুঝছিলেন যে ঈশ্বর নবকর্মপথে আমাকে আহ্বান করেছেন। অতএব এই ডাক্তারসংঘ থেকে আমি বখন বার হয়ে এলাম তখন তাঁদের সঙ্গে সম্প্রীতিচ্যুতির কোনো কারণ ঘটল না। এর পূর্বে আমি অর্ধবর্ষ উৎসাহের সঙ্গে এমন অনেক কাজ করেছি যাতে বিশপ ও অ্যালনাট নিতান্ত বিরত হয়েছেন। আমার অনেক ব্যবহার তাঁদের পক্ষে সহ্য করা শক্ত হয়েছে, তবু আমার প্রতি অন্তরের অকুপণ দাক্ষিণ্যের কখনো হ্রাস হয়নি, গভীর প্রেমামুর্ভূত দিয়ে তাঁরা আমাকে বুঝতে চেষ্টা করেছেন।

ভারতবর্ষের নাড়ীতে তখন নবীন জীবন-স্পন্দন, প্রাচীন সমাজে জেগেছে বন্ধন-মোচনের সাড়া। খৃষ্টীয় বিশ্বাসেরও নূতন পরীক্ষার প্রয়োজন তখন সমাগত, খৃষ্টীয় সমাজের নূতন পথে যাত্রা করার দিন। আমার পক্ষে আর বিলম্ব করার উপায় ছিল না, বিলম্বের ফল মর্শাত্তিক হোতো আমার পক্ষে।

শুশীল রুদ্রের কাছ থেকে বিদায় নেওয়াই হোলো আমার পক্ষে সব চেয়ে শক্ত। তিনি ছিলেন আমার সহোদর ভ্রাতার অধিক। তাঁর দেখে তখন এক মর্শাত্তিক ব্যাধি বাসা বেঁধেছে, যে ব্যাধি দিনে দিনে তাঁর জীবনীশক্তিকে গ্রাস করছে। তাঁর এই ব্যাধির কথা

আবার **আশ্চর্য্যজনক** সুস্থবোধ করুন!



ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড একটি সুপরীক্ষিত স্বাস্থ্যপ্রদ টনিক। পৃথিবীর সর্বত্র স্বাস্থ্যসচেতন ব্যক্তিরা নিয়মিত এটি নিজেরা ব্যবহার করেন ও তাঁদের ছেলেমেয়েদেরও খাওয়ান।

ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড এমনসব প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর উপাদান দিয়ে তৈরী যা আপনার ও আপনার পরিবারের সকলের বল, স্বাস্থ্য ও আনন্দোজ্জল জীবনের জন্ত বাড়তি শক্তি যোগায়।

ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড অবিরাম কাশি, সর্দি ও বৃকে শ্লেষ্মা থামায়। রোগমুক্তির পর হতস্বাস্থ্য দ্রুত পুনরুদ্ধারের জন্ত চিকিৎসকেরা অমুমোদন করেন।



এখন চুরি-নিরোধক কাপ এবং নুতন লাল লেবেলযুক্ত বোতলে পাওয়া যায়।

একশে লাল মোড়ক বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

চমৎকার সুস্বাদু

ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড

সেবন করে নিজেকে সুস্থ রাখুন

অবশ্য তখন আমি জানতাম না। তিনি নিজেকে জানতেন এই কালরোগের কথা, কিন্তু কারো কাছে প্রকাশ করেননি। অপরিণাম ছিল তাঁর নিঃস্বার্থতা। তাঁর নিজের প্রয়োজনে একদিনের জন্তেও তাঁর কাছে আনাকে ধরে রাখতে তিনি চাননি।

আমার জীবনের এই পরম পরিবর্তন কী ভাবে এল তা বোঝাতে গেলে পিছনের একটি ঘটনা বিবৃত করা দরকার।

ভারতবর্ষে আগমনের পর থেকে আমার দৃষ্টির সমুখে দীপ্ত শিখার মতো নিত্য-উজ্জ্বল হয়ে আছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম। ভারতীয় সাহিত্য ও দার্শনিক চিন্তার শ্রেষ্ঠতম ও মহত্তম মিশ্রণ রবীন্দ্রনাথ। মহৎ তাঁর রচনাবলী যেমনি মহান তাঁর জীবন। দিল্লীতে অবস্থান কালে তাঁর সঙ্গে চাক্ষুণ পরিচয়ের সুযোগ আমি পাইনি, কেন না, দিল্লী থেকে কলিকাতা অনেক দূর। দূর থেকে তাঁর কথা আমি উইলি পিয়াস'নের মুখে অনেক শুনেছিলাম। উইলি আগে বঙ্গ প্রদেশে ছিল ও রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কে এসেছিল। গভীর শ্রদ্ধা ও প্রেম সঙ্গকে উইলি আমার কাছে রবীন্দ্রনাথের কথা বলত। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত হবার উৎসাহী বাসনা আমার ছিল। সেই বাসনা চরিতার্থ হলো ভারতবর্ষে নয়,—লণ্ডনে।

১৯১২ সালের একটি চমৎকার গ্রীষ্মসন্ধ্যা। হ্যাম্পটন হীথের কাছে তাঁর গৃহে রমেনষ্টাইন আমাকে নিমন্ত্রণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তখন লণ্ডনে। তিনি রমেনষ্টাইনের গৃহে আসছেন। ডবলু বি য়েটস ও আসবেন। 'গীতাঞ্জলি' নামক রবীন্দ্রনাথের এক নূতন পাণ্ডুলিপি কবিতাবলী পাঠ করা হবে।

সেদিন কবিকে আমি প্রথম দেখলাম, তাঁর কাব্যসুখ পান করলাম ভারতের অন্তর-গভীরে যে মহান বিশ্বসংস্কৃতি নিহিত, সেই সংস্কৃতির সূক্ষ্ম নিবিড় নাথুর্ষের পরিচয় আমি আমার স্তব্ধ অন্তরের মধ্যে অনুভব করলাম। কবি তখনো লণ্ডনে অপরিচিত, তাছাড়া তিনি তখন অসুস্থ। য়েটস যখন গীতাঞ্জলি আবৃত্তি করছিলেন কবি তখন তাঁর স্বভাবসুলভ বিনয় ও অপরিচিতের ব্রীড়া নিয়ে প্রায় সকলের দৃষ্টির অন্তরালে এক কোণে সরে বসেছিলেন। আমি যখন শেষ পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেলাম, তখন আমার হৃদয় কানায় কানায় ভরে উঠেছে, আমার সে মনোভাব কথা দিয়ে প্রকাশ করা অসম্ভব। তাঁর কাব্য-সৌন্দর্যের জন্ত মৌখিক, ধ্বনিবাদ ভ্রাপন আমার পক্ষে সম্ভব হোলো না। কবিও বুঝি আপন অমুভূতি দিয়ে আমার অন্তরের অমুভূতি উপলব্ধি করলেন।

সেদিন রাতে হ্যাম্পটন হীথে আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘুরে বেড়াসাম, শুধু ভাবতে লাগলাম, আজ সন্ধ্যায় একা আমি দেখলাম, একা এক আমি শুনলাম,—এই অভিজ্ঞতার সঙ্গে আমার জীবনের সম্পর্ক কী? বাহিরে রাত্রির অন্ধকার,—কিন্তু আমার অন্তর আকাশ যেন এক আশ্চর্য আলোকচ্ছটায় উদ্ভাসিত হয়ে গেল।

সেই দিনই রাতে শয্যা গ্রহণের আগে একটি বিষয়ে আমি স্থির নিশ্চয় হলাম। কবি যদি অমুভূতি দেন তাহলে আমি তাঁর শান্তিনিকেতন আশ্রমে স্থান নেব। দিল্লীর বিদেশী মিশনে বসে এই ভারতবর্ষকে কিছুতেই আমি চিনতে পারব না। শান্তিনিকেতনের পটভূমিকায় এই বিচিত্র মহামেশ নিবিড় ভাবে আমার কাছে ধরা দেবে,

একটা কথা শুনে আমার আনন্দের শেষ রইল না যে উইলি পিয়াস'নও এই একই বাসনা কবির কাছে নিবেদন করেছেন এবং কবি তাতে সানন্দে সম্মতি দিয়েছেন। কিন্তু আমার পক্ষে অবিলম্বে এমনি পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হওয়ার উপায় ছিল না; কেন না তখনো আমি মিশনের কর্তব্য থেকে মুক্ত হইনি। কিন্তু মনে আশা রইল। দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্কটময় দিনগুলির বেদনা এই আশার আনন্দে লাঘব হোলো।

ভারত-আত্মার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যরূপের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হতে কেবলই আমি চাইছিলাম। এই অধরা রূপকে কখনো বা বুঝি দৃষ্টির বন্ধনে আমি বেঁধেছি, আবার চকিতে তা আমাকে এড়িয়ে গেছে। কখনো বা আমি আমার আকাঙ্ক্ষিত ভারতবর্ষকে প্রত্যক্ষ করেছি পথের মানুষের মুখে,—সেই মুখ আবার হারিয়েছি মুহূর্ত পরে। দিল্লীতে বসে ভারতবর্ষকে পুরোপুরি চিনতে আমি পারিনি। এখানে থাকতে শুধু বিদ্রোহ করে করেই আমার দিন কেটেছে,—সরকারী শিক্ষা ব্যবস্থার সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, বিদেশী মিশনারীর কর্মধারার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। বিদেশী মিশনারী আমি হতে চাইনি, আমি চেয়েছি ভারতের নিজস্ব জীবনধারার সঙ্গে আমার জীবনকে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে ফেলতে। এই ভারতভূমিতে বসে যদি আমার পরমপ্রভু যীশুকে প্রকৃত মানবপুত্র রূপে অন্তরে পেতে চাই, তাহলে ভারতবাসীদের সঙ্গে এক শ্রোণ এক আত্মা আমাকে হতে হবে,—বিদেশী বলে দূরে থাকলে চলবে না।

দিন যতোই যেতে লাগল ততোই পুরাতন ধারার প্রতি বিদ্রোহভাব আমার মনে গভীর হতে লাগল। কেন না, আমি দিনে দিনে লক্ষ্য করতে লাগলাম যে পুরাতন ধারার দিন ফুরিয়ে আসছে। অহংকার আর আভিজাত্যের প্রাচীরে আটপৃষ্ঠে ফাটল ধরেছে। ক্রম দ্বারে বাজছে নবযুগের বলিষ্ঠ আঘাত। বাতাসে নব-স্বাধীনতার সাড়া। বন্দী বিহঙ্গ মাটিতে ডানা ঝাপটাতে আর চার না,—উন্মুক্ত উদার নীলাকাশে সে মুক্তপক্ষ বিস্তার করতে চায়। ভারতের নবযুগের এই আন্দোলনে আমারও স্থাপিত স্পন্দিত হচ্ছে, আমারও দেহমন ছুটে বার হতে চাইছে। দিল্লীতে বসে বসে অনেক শিক্ষানবিশী করেছি,—এবার আমি মুক্তি চাই। আর কোনো বন্ধনে আমি বাঁধা পড়ব না।

দক্ষিণ আফ্রিকা যাওয়ার জন্ত গোথেলের সহসা অপ্রত্যাশিত নির্দেশ যদি না আসত তাহলে আমি আরো আগেই শান্তিনিকেতনে যোগ দিতাম। কিন্তু এখন দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর বিনা আয়াসে কেমব্রিজ মিশন পরিত্যাগ করা আমার পক্ষে সম্ভব হোলো। ১৯১৪ সালে ইষ্টারের সময় আমি দিল্লী পরিত্যাগ করলাম।

কবি তাঁর উদার হৃদয়ের মহত্ত্ব দিয়ে আমাকে তাঁর আশ্রমে গ্রহণ করলেন। আমার পুষ্ঠান ধর্মযাজকবৃত্তির কোনো প্রতিবন্ধক আশ্রম থেকে আমি পেলাম না। আমি আমার বিশপকে জানালাম যে, শান্তিনিকেতনে অবস্থান কালে আমি প্রতি রবিবার বর্ধমানের এক গির্জায় গিয়ে যাজনা করব। স্থলীয় যখন বাসক ছিলেন, তখন স্থলীলের পিতা পিয়ারীমোহন রুদ্র বর্ধমানের এই গির্জার ধর্মযাজক ছিলেন।

ট্রিনিটির রবিবার এল। প্রভাতী প্রার্থনা সভায় অ্যাথানেসিয়ান

ক্রীড় আমাকেই পড়তে হবে। কেন না, এ গির্জার আমিই একমাত্র ধর্মবাসক। যারা খৃষ্টান নয়, তাদের অনন্ত নরকের অভিসম্পাত বাণী নিজস্ব উচ্চারণ করতে হবে আমাকে। আমি তখন সবেমাত্র শান্তিনিকেতনে এসেছি, এখানকার শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ও অখৃষ্টান বন্ধুজনের অকুপণ প্রেমে আমার মন বিভোর হয়ে রয়েছে। আজকের আত্মনৈতিক ধর্মবাসনার পরীক্ষায় কেমন করে উত্তীর্ণ হব? কোন্ মুখে অভিসম্পাত দেব অখৃষ্টান মানবপুত্রদের? আমি শেষ পর্যন্ত যাজ্ঞানার ঐ অংশটুকু সম্পূর্ণ বাদ দিলাম। কিন্তু এতেও আমার বিবেক প্রবোধ মানল না। মনে হোলো, আমি চুরি করেছি, নিতান্ত কাপুরুষের মতো স্থূলভ আত্ম-ছলনা করেছি মাত্র।

শান্তিনিকেতনে ফিরে এসে যখনই কবির নিষ্পাপ মুখমণ্ডলের দিকে দৃষ্টিপাত করলাম, তখনই উপলব্ধি করলাম যে আমার জীবন অসহের বন্ধনে জড়িত হয়ে রয়েছে, এ বন্ধন থেকে আন্ত মুক্তি চাই, কবি আমার চোখের দিকে উজ্জল স্বচ্ছদৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন। সে দৃষ্টি যেন মহাবিচারের দিনে যীতযুগের দৃষ্টি। তাঁর সেই পবিত্র দৃষ্টির প্রতি আমি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে পারলাম না, চোখ নিচু করে অকপটে তাঁর কাছে সমস্ত ঘটনা বললাম। প্রতিজ্ঞা করলাম, সত্যের সঙ্গে আর প্রবঞ্চনা করব না, এই মুহূর্ত থেকে সত্যের পথ থেকে মুহূর্তের জন্তেও ভ্রষ্ট হব না।

কবি প্রথমটা খুবই চিন্তিত হলেন। হঠাৎ উত্তেজনার কোনো কিছু যেন না কবে বসি, সেই উপদেশই তিনি আমাকে দিলেন। কিন্তু মিথ্যার শেষ সীমান্তে এসে আমি পৌঁছেছি। এই সীমান্ত রেখার উপর দাঁড়িয়ে বহু বৎসর আমি যুদ্ধ করেছি, যুদ্ধ করেছি নিজের সঙ্গে, আপন মনের বিধা-সংশয়ের সঙ্গে। এইবার আর যুদ্ধ নয়। শুধু শেষ পদক্ষেপটুকু ফেলতে হবে, পার হতে হবে গণ্ডী। আমার কর্তব্য আমি স্থির করে ফেলেছি এইবার।

দু'খানি চিঠি লেখা দরকার, সেদিনই লিখে পাঠিয়ে দিলাম। একটি চিঠি লিখলাম বিশপকে, তাঁকে জানালাম কেন আমার পক্ষে

আর বর্তমান গির্জার ধর্মবাসকবৃত্তি করা সম্ভব নয়। অপর চিঠিটি আমার পিতাকে।

ভয় ছিল, আমার চিঠি পড়ে পিতৃদেব যে আঘাত পাবেন তা তাঁর হৃৎসল স্তব্ধ করতে পারবে কি না। চিন্তিত মনে তাঁর উত্তরের প্রতীক্ষা করলাম। কিন্তু স্মৃতির বিষয়, আমার সবকিছু কোনো প্রকার হুশিয়ারি তিনি প্রকাশ করলেন না। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের পথ থেকে তিনি নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন যে যা কিছু আমি করি, ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করবেন।

এঁর পর থেকে কোনো বিশপের অধীনে প্রত্যক্ষভাবে ধর্মবাসক-বৃত্তি আর আমি কখনো গ্রহণ করিনি। তবে দেশে বিদেশে যেখানেই আমি গিয়েছি, সর্বদা আংলিক্যান খৃষ্টান সম্প্রদায়ের সঙ্গে আমি সংযোগ রেখেছি। খৃষ্টান সম্প্রদায়ের আমন্ত্রণে আমি কোনো কোনো গির্জায় ধর্মালোচনা করেছি ও ধর্ম-আচরণে যোগ দিয়েছি। এই কাজে আমি খৃষ্টীয় সমাজের কোনো নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর গণ্ডীকে স্বীকার করিনি। সেই দিন থেকে আজ পর্যন্ত এই বিশ্বাস আমার মনে আছে যে ঈশ্বর যে কাজের জন্ত আমাকে প্রস্তুত করেছেন ও যে কাজ আমার প্রতি নির্দিষ্ট করেছেন, সে কাজ পুরোহিতের নয়, পরিব্রাজক ও প্রচারকের। অনেক বৃথা ভ্রমণের পর তিনি আমাকে সত্য পথে টেনে এনেছেন, এই শেষহীন পথের নিরুদ্ধেশ বাতায় আমার পথিক আত্মাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছেন।

প্রচলিত ধর্মের অজ্ঞান নিরমকাহন সবকিছু আমার সংশয় ছিল, সে সব আলোচনা বন্ধন-মোচনের পর অবাস্তব। এর পর যতো দিন কেটেছে, আমার স্বস্তিবোধও ততো বেড়েছে। মুহূর্তের জন্তেও পুনরো অবস্থা ও গণ্ডির মধ্যে ফিরে যাবার বাসনা আমার মনে জাগেনি। যে জীবন আমি বাপন করেছি তা অসম্ভব হতো, যে কর্তব্যপথে আমি চলেছি সেই পথ কখনো আমি খুঁজে পেতাম না, যদি না গোষ্ঠীর গণ্ডী থেকে আমি মুক্তি পেতাম। [ক্রমশঃ।

অনুবাদক—নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

ছলনা

(চীনা কবি Ho Chi Fang-এর কবিতার অনুবাদ)

ছলনা!

বলনা, "আবার আসিবে তো?"

সোনালি রং-এর আবছায়া কুয়াশার জাল ছিঁড়ে?"

সেই তো বিকেল বেলায়

বখন মুখোমুখি বসেছিলাম

আমার চোখে ছিল নীল মস্ততা

আর ওর চোখে ছিল বনবিড়ালের মারাত্মক জিজ্ঞাসা;

আন্দামানের ধূসর জগতে

আমরা পাখা মেলে ভাসছিলাম

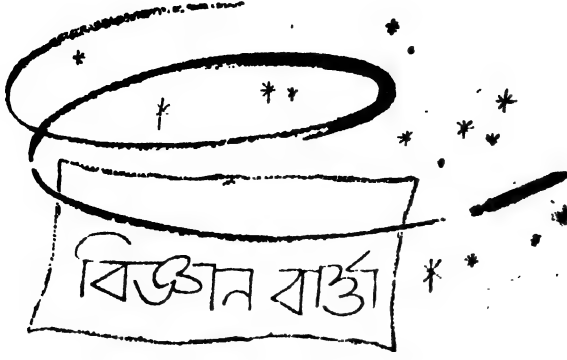
তখনই ত তুমি প্রেতিনী মারাবিনীর মত

খলখলিয়ে হেসে উঠেছিলে।

বলনা ছলনা!

"আবার আসিবে তো?"

অনুবাদক : শ্রীঅজয় বসু।



কৃত্রিম উপগ্রহ

[পূর্ণ-প্রকাশিতের পর]

আমরা কৃত্রিম উপগ্রহ হইতে সংগৃহীত তথ্য কি ভাবে পৃথিবীতে সরবরাহ করা হইবে তাহার আলোচনা করিলাম। এখন সাধারণ ভাবে কি কি তথ্য কৃত্রিম উপগ্রহ মাধ্যমে সংগ্রহ করা হইবে তাহা দেখিতে হইবে।

(১) Cosmic Rays (মহাজাগতিক রশ্মি)—পৃথিবীর চারিদিকে রহিয়াছে বায়ুসমুদ্র। মাধ্যাকর্ষণ বলে পৃথিবী এই বায়ুসমুদ্রকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিয়াছে এবং ঐ অবস্থাতেই সূর্যের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সূর্য আর বায়ুবেষ্টিত পৃথিবীর মধ্যে বস্তুতপক্ষে বিরাজ করিতেছে এক মহাশূন্য। কিন্তু ‘শূন্য’ কথাটি ব্যবহার করা বোধ করি ঠিক হইল না। কারণ সূর্য স্থিতিশীল বস্তুর ন্যায় কেবল আলো আর উত্তাপ দিয়াই ক্ষান্ত থাকে না। প্রকৃতপক্ষে সূর্যের মধ্যে ঘটিতেছে নানা অদ্ভুত ঘটনা। একটি পরমাণু চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া আর একটি পরমাণুতে রূপান্তরিত হইতেছে, আর সেই রূপান্তরের সময় যে বিপুল শক্তি উৎসারিত হইতেছে, তাহাই সূর্য্যকে তাহার সৌরজগতের অধিবাসীদের তাপ ও আলোক দিবার ক্ষমতা যোগাইতেছে। (প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা বাইতে পারে যে, পরমাণুর রূপান্তরকালীন যে বিপুল শক্তি উৎসারিত হয়, তাহাকে কাজে লাগাইয়াই বর্তমানকালে নির্মিত হইয়াছে, পরমাণু তথা হাইড্রোজেন বোমা) পরমাণু রূপান্তরের সময়ে নানা রশ্মিকণা সূর্য্য হইতে নির্গত হয়। এই সকল রশ্মির কোন কোনটি পৃথিবীর আবহাওয়ার উপরও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। বস্তুতপক্ষে সূর্য্য ও সৌরজগতের অন্তর্গত গ্রহগুলির মধ্য দিয়া অতি দ্রুত গতিবেগে সম্পন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রশ্মিকণা ছুটিয়া বেড়াইতেছে। কতকগুলি আবার পৃথিবীর বায়ুস্তর ভেদ করিয়া পৃথিবীর বৃকে আসিয়া পৌঁছিতেছে। ইহাদেরই নাম ‘মহাজাগতিক রশ্মি’ বা Cosmic Rays. মহাজাগতিক রশ্মি হইতেছে বস্তুতপক্ষে ‘প্রোটন’ Proton (পরমাণু-কেন্দ্রকের Nucleus, প্রধানতম অংশ। ইহারা + (vc) শক্তিশীল) হইতে নিঃসৃত অতি উচ্চ শক্তিসম্পন্ন রশ্মিকণা। কণাগুলির মধ্যে যেগুলি অধিকতর শক্তিশালী, কেবল তাহারাই পৃথিবীর বায়ুস্তর ভেদ করিতে সক্ষম হয়। এই রশ্মিকণাগুলির গুণাগুণ এবং শক্তির পরিমাণ সঠিক নির্ধারণ করা পৃথিবীর বৃক অপেক্ষা ভূপৃষ্ঠের উর্ধ্বেদেই অধিকতর সহজ ও সম্ভবপর। কাজেই কৃত্রিম উপগ্রহের সৃষ্টি দ্বারা মহাজাগতিক রশ্মি সম্বন্ধে অধিকতর তথ্যগ্রহণ, ইহাদের সৃষ্টির

আদিকথা এবং মানবদেহের উপর প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে অধিক পরিমাণে জ্ঞানলাভ সম্ভবপর হইবে।

(২) Ultraviolet Rays ও Ionosphere—সূর্য্য যে কেবল আলো আর উত্তাপ দিয়াই ক্ষান্ত থাকে না, সে কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। সূর্য্য হইতে কম্পনবিশিষ্ট (High frequency) অদৃশ্য x-ray এবং Ultraviolet rays প্রভৃতি বিকিরিত হয়। এই সকল High frequency waveগুলি পৃথিবীতে পৌঁছাইবার পূর্বেই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল কর্তৃক শোষিত (absorbed) হয়। Ultraviolet Rays এর বায়ুমণ্ডলে এই শোষণ নানা অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা ঘটায়, যাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

Ultraviolet রশ্মি বায়ুকণাগুলিকে ইলেকট্রন ও আয়নে বিভক্ত করে। ভূপৃষ্ঠের ৩০ মাইল উর্ধ্বে হইতে আরম্ভ হয় বায়ুমণ্ডলের এই Ionosphere যেখানে থাকে কেবল ইলেকট্রন (Electron) আর আয়ন (Ion), বায়ুমণ্ডলের এই Ionosphere পৃথিবীর উপর দিয়া বেতার-তরঙ্গ চলাচলের বিশেষ সহায়তা করে।

কৃত্রিম উপগ্রহের কাজ হইবে সূর্যালোকের মধ্যস্থ Ultraviolet বা অতিবেগুনী রশ্মি সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞান লাভ করা—ইহাদের আক্রমণ হইতে কি ভাবে নিজেদেরকে বাঁচান যায়, তাহার উপায় উদ্ভাবন করা। U. V. রশ্মির সঙ্গে সঙ্গে আবহাওয়ার সম্বন্ধেও অধিক জ্ঞান লাভ সম্ভবপর হইবে। Ultraviolet রশ্মির গবেষণা জগৎ যে যন্ত্রটি কৃত্রিম উপগ্রহে ব্যবহার করা হইবে, তাহার নাম photon counters, Ionosphere এ তড়িৎ-প্রবাহের অনুসন্ধান করাও কৃত্রিম উপগ্রহের অন্যতম একটি কাজ। ইহার জগৎ Proton precession Magnetometer অথবা Nuclear Resonance Magnetometer এর ব্যবহার করা হইবে।

Proton precession Magnetometer এর গঠন প্রণালী সংক্ষেপে এইরূপ—“একটি জলপূর্ণ ছোট প্রান্তিকের পাত্রের মধ্যে তামার তার ডুবান থাকে। ইহার সহিত সংযুক্ত থাকে একটি programmer যাহাকে পৃথিবী হইতে প্রেরিত সংকেত অনুসারে পরিচালিত করিলে তামার তারটিকে প্রতি সেকেন্ডে পর্ধ্যায়ক্রমে একবার শক্তিসম্পন্ন ও পর মুহূর্তে শক্তিবহীন করিয়া দেয়। যখন তারটি শক্তিসম্পন্ন অবস্থায় থাকে, তখন জল মধ্যস্থ হাইড্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রকগুলি (Hydrogen nucleus অর্থাৎ Protons) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চুম্বকের মতন সারিবদ্ধ ভাবে ঠাঁড়ায়। শক্তিবহীন হইলে সারিবদ্ধ কেন্দ্রকগুলি স্থান পরিবর্তন করিয়া পৃথিবী চুম্বকক্ষেত্রের দিকে (Earth's magnetic field) দুলিতে থাকে। কেন্দ্রকের এই দোলন তামার তারের মধ্যে স্বল্পপরিমাণ বিদ্যুৎপ্রবাহ সঞ্চারিত করে। এই বিদ্যুৎপ্রবাহকে আরও বৃহৎ আকারে দেখাইয়া (Amplify) সাংকেতিক পরিভাষায় পৃথিবীতে বেতার যোগে প্রেরণ করা সম্ভবপর। এই সকল সংকেতবলীর দ্বারা সৃচিত তথ্যরাজির সহিত ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগে Magnetometer দ্বারা সংগৃহীত খবরাখবরের তুলনা করিয়া বিজ্ঞানীরা মহাশূন্যে কোন নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থিত কৃত্রিম উপগ্রহের উপর পৃথিবীর চুম্বকশক্তির মাত্রা নির্ধারণ করিতেও সক্ষম হইবেন।

কৃত্রিম উপগ্রহ সৃষ্টি হইলে এই ভাবে পৃথিবী হইতে বিভিন্ন দূরবে অবস্থিত বস্তু উপর পৃথিবীর চুম্বকশক্তি মাত্রা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা বাইবে।

কৃত্রিম উপগ্রহ সৃষ্টি করিবার একটি মুখ্য উদ্দেশ্য হইতেছে সঠিক তথ্য সংগ্রহ। এমন অনেক বিষয় আছে বাহা আমরা সাধারণভাবে জানিলেও সঙ্গতভাবে জানি না। যেমন আমরা Magnetic Poles, North Pole ও South Pole-এর সঠিক অবস্থান জানি না। বিভিন্ন দেশের দূরত্ব সন্থকে মোটামুটি ধারণা থাকিলেও উহাদের সঠিক দূরত্ব (exact distance) আমরা জানি না। কারণ পৃথিবীর বক্র উপরিভাগের Curved Surface উপর দিয়া সঠিকভাবে দূরত্ব নির্ণয় সম্ভবপর নয়। কিন্তু নির্দিষ্ট দূরত্বে নির্দিষ্ট গতিতে ঘূর্ণায়মান বস্তুর গতিবিধি ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে দেখিয়া ঐ ভিন্ন ভিন্ন স্থানের দূরত্ব ত্র্যামিতির সাহায্যে (Triangular measure) সঠিকভাবে নির্ধারণ করা সম্ভবপর হইবে।

কৃত্রিম উপগ্রহ সৃষ্টি হইলে আরও বহু বিষয়ে জ্ঞানলাভ হইবে। যেমন পৃথিবীর আকার সন্থকে আমরা অনিশ্চিত হইব। পৃথিবী ও গ্রহ ও উপগ্রহের 'ফটো' বেতার মাধ্যমে (Radio Photo) আমরা সংগ্রহ করিতে পারিব। শুনা যাইতেছে যে, সোভিয়েট নিশ্চিত উপগ্রহটি নাকি Radio Photo সম্প্রতি উৎক্ষেপ হইতে পৃথিবীতে পাঠাইতেছে। মেরুজ্যোতি বা Aurora Borealis কার্যকারণ আজও আমাদের নিকট অজ্ঞাত। আশা করা যায় যে, কৃত্রিম উপগ্রহ এই বিষয়ে আলোকপাত করিয়া রহস্য উদ্ঘাটন করিবে। সূর্যালোক সন্থকে আরও অধিক তথ্য ও মাধ্যাকর্ষণের তারতম্যের কারণ জানা হইবে। বায়ুমন্ডলের মধ্য দিয়া না আসিলেও সূর্যালোক মানবদেহের উপর কিরূপ প্রতিক্রিয়া করিত তাহাও জানা যাইবে।

রাসায়নিকেরা কাচের গবেষণা করিতে গিয়া পাইয়াছিলেন Pyrex এর সন্ধান, প্রান্তিকের গঠন প্রণালীর সন্থকে অনুসন্ধান করিতে আবিষ্কার করিলেন Nylonকে, সেই রকম হয়ত বা কৃত্রিম উপগ্রহ সৃষ্টি করতে গিয়া আমরা এমন কিছু আবিষ্কার করিয়া বসিব বাহা আশাতীত ভাবে সৌভাগ্যদায়ী হইবে। আর সব চাইতে বড় কথা যে কৃত্রিম উপগ্রহের সৃষ্টির দ্বারা মহাশূন্যের পথ আমাদের নিকট উদ্ঘাটিত হইতেছে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, কি ভাবে কৃত্রিম উপগ্রহ সৃষ্টি সম্ভব? পৃথিবী হইতে বাহিরে যাইবার প্রধান বাধা হইল মাধ্যাকর্ষণ। আমরা জানি, পৃথিবী নিজের কেন্দ্রের দিকে ভূপৃষ্ঠের উপরের এক নিকটের যাবতীয় বস্তুকে বিপুলবেগে আকর্ষণ করিতেছে। পৃথিবীর এই মহাকর্ষণের নামই মাধ্যাকর্ষণ। এইজন্যই কোন বস্তুকে উপরে ছুঁড়িয়া দিলেও মাধ্যাকর্ষণের জ্ঞান পুনরায় উহা মাটির বুকে নামিয়া আসে। দেখা গিয়াছে, কোন বস্তু যদি ১০০ মাইল উপর থেকে মাটিতে পড়ে, তবে উহার পতনকালীন গতিবেগ হয় সেকেন্ডে এক মাইল (বায়ুর প্রতিবন্ধকতার দ্রুত অবস্থা কিছু পরিমাণ গতি হ্রাস হইতে পারে)। বিপরীতক্রমে যদি কোন বস্তুকে সেকেন্ডে এক মাইল প্রাথমিক গতিতে উর্দ্ধে উৎক্ষেপ করা যায়, তবে উহা ঠিক ১০০ মাইলই উপরে উঠিতে সক্ষম হইবে। V-2 রকেট দিয়া এ ব্যাপারটা পরীক্ষা করা গিয়াছে। এই হিসাবে কোন রকেট যদি সেকেন্ডে ৫ মাইল প্রাথমিক গতিতে উপরে উঠে তবে উহা ৪০০০ মাইল পর্যন্ত উপরে উঠিতে পারিবে। কিন্তু প্রাথমিক গতির পরিমাণ যদি সেকেন্ডে ৭ মাইল করা যায়, তবে উহা মাধ্যাকর্ষণের জ্ঞান আর পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিবে না। কেন না, পৃথিবীর

মাধ্যাকর্ষণ কোন অবস্থাতেই সেকেন্ডে ৭ মাইল অথবা তাহার অধিক কোন গতি উৎপাদনে অক্ষম। অর্থাৎ লক্ষ মাইল অথবা তদধিক উচ্চতর কোন স্থান হইতে কোন বস্তুকে পৃথিবীর উপর ফেলিলেও উক্ত বস্তুর পতনকালীন গতিবেগ কোন অবস্থাতেই সেকেন্ডে ৭ মাইলের অধিক হয় না।

এতক্ষণে আমরা জানিতে পারিলাম যে, প্রাথমিক গতি যদি সেকেন্ডে ৭ মাইল (অর্থাৎ ঘণ্টায় $৬০ \times ৬০ \times ৭ = ২৫২০০$ মাইল) হয়, তবে উহা মাধ্যাকর্ষণের জ্ঞান আর ফিরিয়া আসিবে না, পৃথিবী মায়া কাটাইয়া চিরকালের জ্ঞান মহাশূন্যে চলিয়া যাইবে। কৃত্রিম উপগ্রহ সৃষ্টি করিবার সময়ে রকেটের গতিবেগ (প্রাথমিক) সেকেন্ডে ৭ মাইল হওয়ার প্রয়োজন নাই, কেননা, এরূপ গতিবেগ সাত্য হইতে উহা আর পৃথিবীর চারিদিকে না ঘুরিয়া বহির্বিষে চলিয়া যাইত। এতদ্ব্যতীত এরূপ প্রচণ্ড প্রাথমিক গতি উৎপাদনও একপ্রকার অসম্ভব। কেননা, প্রাথমিক গতির পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইলে, সমস্ত জালানীকে যুগ্মভাবে পুড়াইয়া এক প্রচণ্ড ধাক্কা সৃষ্টির প্রয়োজন, বাহা রকেটকে একেবারে নির্দিষ্ট উচ্চতায় লইয়া যাইতে পারিবে। কিন্তু এরূপ বিস্ফোরণ তথা ধাক্কা ঘটানো এক কথায় অসম্ভব এবং সম্ভবপর হইলেও রকেটের শক্তে তাহা সহ্য করা সাধ্যাতীত। এরই জ্ঞান বৈজ্ঞানিকেরা সৃষ্টি করিলেন Three stage Rocket, বাহাতে ধাক্কাটা একেবারে না দিয়া বারে বারে, পর্যায়ক্রমে দেওয়া যায়।

মাধ্যাকর্ষণ ও কৃত্রিম উপগ্রহ সৃজন সন্থকে সাধারণ একটি উদাহরণ দিতেছি। আশা করি, বিষয়টা এবার বোধগম্য হইবে। একটি ঢিলকে সূতা বাঁধিয়া উপরে ছুঁড়িয়া দিলে মাধ্যাকর্ষণ হেতু উহা পুনরায় মাটিতে পড়ে,—ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম; কিন্তু ঐ ঢিলটিকেই যখন সূতায় এক প্রান্ত ধরিয়া ঘুরাইয়া থাকি, তখন উহা চক্রাকারে ঘুরিতে থাকে, নীচে আর পড়ে না। কারণ জানিতে গেলে উভয়ের অবস্থার তারতম্য বুঝিতে হইবে। পূর্বের সহিত পরের অবস্থার প্রধান পার্থক্য হইল যে, দ্বিতীয়াবস্থায় ঢিলটি গতিবেগ সম্পন্ন হইয়াছে এবং উক্ত গতিই ঢিলটিকে পতন হইতে রক্ষা করিতেছে। সূতা ঘুরাইবার সময় দুইটি শক্তি কার্যকরী হইতেছে—একটি কেন্দ্রাভিমুখী Centripetal অপরটি কেন্দ্রবিমুখী Centrifugal। প্রথমটির কাজ হইতেছে ঢিলটিকে কেন্দ্রের দিকে টানিয়া রাখা, দ্বিতীয়টি বস্তুটিকে কেন্দ্র হইতে দূরে সরাইয়া লইয়া যাওয়ার চেষ্টা করিতেছে। এখন এই শক্তি দুইটি উভয়ে যদি পরস্পর সমান হয়, তবে বস্তুটি কেন্দ্রের দিকে অথবা কেন্দ্রের বিপরীত কোন দিকেই না গিয়া, কেন্দ্র হইতে নির্দিষ্ট দূরত্বে অবস্থান করিয়া কেন্দ্রেরই চারিদিকে ঘুরিতে থাকিবে।

বিজ্ঞানের সাধারণ নিয়মামুসারেই সূর্য পৃথিবীকে ও পৃথিবী চন্দ্রকে আকর্ষণ করিতেছে (All bodies attract each other) আর এই আকর্ষণকেই বলা যাইতে পারে Centripetal Force. প্রকৃতপক্ষে সূর্যাবাধা ঢিল যে কারণে কেন্দ্রের চারিদিকে ঘুরে ঠিক সেই কারণেই পৃথিবীও ও চন্দ্র যথাক্রমে সূর্য এবং পৃথিবীকে প্রাক্ষিপ করিয়া থাকে। তবে একটা কথা, গতিবেগ ও আকর্ষণের মধ্যে ঠাণ্ডা চাই সামঞ্জস্য। সূর্যের চারিদিকে পৃথিবী ঘুরে, কেননা সূর্যের আকর্ষণ এবং পৃথিবীর গতিবেগের মধ্যে

সামঞ্জস্য রহিয়াছে। কৃত্রিম উপগ্রহ সৃষ্টি করিতে হইলেও চাই বায়োকর্ষণ ও কৃত্রিম উপগ্রহের গতিবেগের মধ্যে একটা বোঝাপড়া।

কৃত্রিম উপগ্রহ তৈয়ারী করিবার সময় সাধারণতঃ তিনটি নিয়ম পালন করিতে হইবে। প্রথমতঃ ইহার গতিবেগ হওয়া চাই সেকেন্ডে ৪২ মাইল (সোভিয়েট উপগ্রহের গতিবেগ সেকেন্ডে প্রায় ৬ মাইল।) দ্বিতীয়তঃ ইহাকে পৃথিবীর ঘন বায়ুমন্ডলের উপরে থাকিতে হইবে। কারণ গতিবেগ বায়ুমন্ডর দ্বারা ব্যাহত হইলে ইহা ক্রমশঃ গতিহীন হইয়া নীচে পৃথিবীর দিকে পড়িবে এবং পতনকালে পৃথিবীর ঘন বায়ুমন্ডলের সঙ্গিত সংঘর্ষে উদ্ভাপিণ্ডের মতন জ্বলিয়া উঠিবে। তৃতীয় এবং শেষ সর্ত্ত হইতেছে যে, কৃত্রিম উপগ্রহটিকে তথাকথিত যে কোন একটি Great Circle বা 'বৃহৎ বৃত্তে' ঘুরিতে হইবে। Great Circle কথাটির অর্থ হয়ত অনেকের কাছে বোধগম্য না হইতেও পারে। মনে করা যাক, একটি ময়দার গোলাকার বল। এখন যদি ইহাকে ছুরি দিয়া লম্বা অথবা আড়াআড়ি, যেভাবেই হউক না কেন খণ্ড করা যায়, তবে ঐ খণ্ডগুলির প্রত্যেকটির আকারই বৃত্তাকার হইবে। এখন ঐ বৃত্তাকার খণ্ডগুলির মধ্যে যে খণ্ডটি পূর্বোক্ত বলের মধ্য অর্ধাংশ কেন্দ্রের মধ্য দিয়া কাটা হইবে, তাহাই সর্বাপেক্ষা বৃহৎকার হইবে। এই বৃহত্তর খণ্ডটির যে কোন অংশকেই Great Circle বলা যায়। কৃত্রিম উপগ্রহ সৃজন করিবার সময়ে আমাদের লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, উহা যেন Great Circle অর্থাৎ পৃথিবীর কেন্দ্রের উপর দিয়া পরিকল্পিত বৃহৎ বৃত্তে ঘূরে। এই ঘূর্ণন পূর্ব-পশ্চিম অথবা উত্তর-দক্ষিণ যে কোন দিকেই সম্ভব। তবে পূর্ব-পশ্চিমেই কৃত্রিম উপগ্রহ সৃজন অধিকতর সুবিধাজনক, কেননা পৃথিবীর আক্ষিকগতি পশ্চিম হইতে পূর্বে। কাজেই পৃথিবীর গতির তালে তাল রাখিয়া ঘুরিলে জ্বালানী খরচের পরিমাণটা কিছু কম হবে।

কৃত্রিম উপগ্রহ সৃজনের সর্ত্ত অর্থাৎ Conditionsগুলির কথা এতক্ষণ আলোচনা করিলাম। এখন দেখিতে হইবে, কি ভাবে উপবাস্ত সর্ত্তগুলি পালন করা সম্ভব। সাধারণতঃ এ ব্যাপারটি সম্ভবপর হয় রকেটের সহায়তায়। রকেটের মূল কথা বৃষ্টিতে হইলে হাউই বাজীর দৃষ্টান্ত দিতে হয়। হাউই বাজীতে যখন আগুন দেওয়া হয়, তখন উহার নিয়মিক হইতে নির্গত গ্যাস যে বিপুল উর্দ্ধচাপের সৃষ্টি করে তাহাই হাউই বাজীকে উর্দ্ধে উঠিতে সহায়তা করে। রকেটের গঠনপ্রণালী মূলগতভাবে অনুরূপ। তবে পার্থক্য এই যে, রকেট বড় আর হাউই বাজী ছোট। সাধারণ রকেটের সঙ্গে, কৃত্রিম উপগ্রহ সৃজন করিবার জন্য যে রকেট ব্যবহার করা হয় তাহার মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রহিয়াছে। বস্তুত, ইহাকে একটি রকেট না বলিয়া "রকেট সমষ্টি" বলাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। ইংরাজীতে ইহাদের নাম Three Stage Rocket.

এই বিশেষ ধরনের রকেটের মধ্যে থাকিবে তিনটি স্বতন্ত্র অংশ, মস্তক, দেহকাণ্ড ও লেজ। বাহারা প্রত্যেকটিই এক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ রকেট। কৃত্রিম উপগ্রহটি থাকিবে মস্তক-রকেটে। সমুদ্রতীর হইতে বাত্মা করাই সুবিধাজনক, কেন না পরে যখন রকেটের লেজ ও দেহকাণ্ড একে একে খসিয়া পড়িবে, তখন জলের উপর পড়িলেই জল হয়। রকেট যখন ছাড়া হয়, তখন দর্শকেরা বিদ্যুৎ চমকের মতন আলোর ঝলকানি ছাড়া আর কিছু দেখিতে পায় না।

কারণ কিছু বৃষ্টিবার পূর্বেই সেকেন্ডে ৭০০০ ফুট গতিতে উহা উর্দ্ধে উঠিয়া গিয়াছে। প্রথম প্রথম ইহাদের গতিবেগ খুব একটা বেশী না হইলেও গতিবেগ ক্রমশঃ সেকেন্ডে ৫০ ফুট করিয়া বাড়িতে থাকে। ২০ সেকেন্ড পরে রকেটকে দেখা যায় একটি ক্ষুদ্র বিস্ময় মতন। এক মিনিট পরে ইহা ১২০০০ ফুট উঠিতে সক্ষম হয়। এই সময় কিন্তু রকেট আর খাড়াভাবে (straight) উঠিতে সক্ষম হইবে না, একটু আড়াভাবে উঠিবে। ১মিঃ ১৫ সেকেন্ড পরে রকেটের লেজের অংশ খসিয়া পড়িবে। খসিয়া পড়া অংশ ইহার সহিত পূর্ব হইতে সংলগ্ন লোহার প্যারাসুটে করিয়া রকেট ছুঁড়িবার স্থান হইতে প্রায় ২০০ মাইল দূরে পৃথিবীর বুকে ধীরে ধীরে নামিয়া আসিবে। তবে 'বেগবল' বা Momentum এর জন্য খসিয়া পড়া অংশ প্রথম প্রথম কিছুটা উপরে উঠিবে (চলন্ত বাস হইতে নামিবার সময় আমরা যেমন বাসের গতিবেগের সঙ্গে সমতা রাখিবার জন্য খানিকটা এগিয়ে যাই) লেজ খসিয়া পড়িবার পর রকেটের দেহভার শতকরা ৭৫ভাগ কমিয়া যায়। দ্বিতীয় রকেটের কাজ সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়। গতিবেগ বৃদ্ধি পাইয়া হয় সেকেন্ডে ৩ মাইল। আরও এক মিনিট পনেরো সেকেন্ড পরে প্রায় ৪৫ মাইল উর্দ্ধে থাকাকালীন দেহকাণ্ডও খুলিয়া পড়িয়া যায় এবং রকেট ছুঁড়িবার স্থান হইতে আনুমানিক ১০০ মাইল দূরে আসিয়া পড়ে। লেজ ও দেহকাণ্ডের গুরুভার হইতে মুক্ত হইয়া মস্তক-রকেট, বাহার জ্বালানী তখনও পর্যাপ্ত একবিন্দুও খরচ হয় নাই, অসম্ভব দ্রুতগতিতে উপরে উঠিতে থাকে, মাটি হইতে বাত্মা করিবার প্রায় ৪ মিনিট পরে তৃতীয় রকেটের জ্বালানীর দহনক্রিয়া (Fuel consumption) বন্ধ হইয়া যায়। এই অবস্থায় উহা প্রক্ষেপকের (Projectile) মতন ছুটয়া বাইবে। গতিবেগ ইতিমধ্যেই সেকেন্ডে ৪২ মাইল হইয়াছে। এইবার কৃত্রিম উপগ্রহ সমেত মস্তক-রকেটটি ক্রমে ক্রমে পৃথিবীর সমকেন্দ্রিক কক্ষপথে অর্থাৎ Great circle এ আসিয়া পৌঁছায়। আনুমানিক ৪৫ মিনিট পরে যখন উহা পৃথিবীকে প্রায় অর্ধ প্রদক্ষিণ করিয়াছে তখন উহার গতিপথ পূরাপূরি 'বৃহৎ বৃত্তের' বা Great circle অন্তর্গত হয়। এর পর থেকেই ইহা ঘুরিতে থাকে পৃথিবীর চারিদিকে ঠিক একটি ছোট চাঁদের মতন।

এক্ষেত্রে একটি বিষয়ে আলোচনা করা দরকার। কৃত্রিম উপগ্রহটি যে বৃত্তাকার কক্ষপথেই ঘুরিবে এমন কোন কথা নাই। বস্তুতপক্ষে ইহার ডিম্বাকার কক্ষপথে (Elliptical Orbit) গমন করাই অধিকতর স্বাভাবিক। তবে এক্ষেত্রেও কক্ষপথটি পৃথিবীর কেন্দ্রের মধ্য দিয়া পরিকল্পিত সমতলের (Plane passing through the centre) উপর দিয়া বাইবে। কক্ষপথের আকার মুখ্যতঃ নির্ভর করে মস্তকের রকেট কর্তৃক উপগ্রহটিকে নিষ্ক্ষেপণের প্রকৃতি ও পরিমাণের উপর।

রাখিয়া যে উপগ্রহটিকে সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা ডিম্বাকার কক্ষপথে বিষুবরেখার সহিত ৬৬° কোণ করিয়া ঘুরিতেছে। ৬৬° কোণ করায় সুবিধা হইতেছে যে একমাত্র মেরু অঞ্চল ছাড়া পৃথিবীর সকল অংশ হইতেই কোন না কোন সময়ে উপগ্রহটিকে দেখা সম্ভবপর হইবে। কারণ কক্ষপথটি বরাবর একই সমতলে থাকিবে (in the same plane), না। পৃথিবীর অভ্রান্ত অক্ষের সহিত বিষুবরেখিক

অক্ষের মাধ্যাকর্ষণের তারতম্যের জন্য কক্ষপথটি পশ্চিম হইতে পূর্বে সরিয়া আসিতেছে (Precessional Motion)। কক্ষপথটির এই ভাবে সরিয়া আসার দরুনই পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান হইতে উপগ্রহটিকে দেখা সম্ভবপর হইবে।

কৃত্রিম উপগ্রহটির কক্ষপথ ডিম্বাকৃতি হইলেও ক্রমে ক্রমে ইহা বৃত্তাকারে রূপান্তরিত হইতেছে। ইহার কারণ এই—কৃত্রিম উপগ্রহটি ডিম্বাকার কক্ষপথে ঘুরিবার সময়ে একবার পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা নিকটে (Perigee) ও একবার সর্বাপেক্ষা দূরে (Apogee) চলিয়া যাইতেছে। যখন সবচেয়ে কাছে থাকে তখন পৃথিবীর আকর্ষণের পরিমাণ সর্বাধিক এবং দূরে চলিয়া গেলে আকর্ষণের মাত্রা হ্রাস পায়। অর্থাৎ কৃত্রিম উপগ্রহের উপর পৃথিবীর আকর্ষণের Uniformity বা সমতা থাকে না। পৃথিবীর নিকটে থাকিবার সময়ে উপগ্রহটির শক্তি কিছু পরিমাণ ক্ষয় হইতেছে। এই ভাবে কক্ষপথটি ক্রমে বৃত্তাকার হইয়া ছোট হইয়া (shrink) যাইবে।

একটা মজার কথা এই যে, একটি উপগ্রহ সৃষ্টি করিতে গিয়া আমরা দুইটি সৃষ্টি করিয়া বসিব। বস্তুতপক্ষে রাশিয়া যে কৃত্রিম উপগ্রহটি ছাড়িয়াছে, তাহাতে এই ব্যাপারটাই ঘটিয়াছে। কেন?

আগেই বলিয়াছি যে, কেবল মস্তক-রকেটের মধ্যেই থাকিবে কৃত্রিম উপগ্রহটি। মস্তক-রকেটটি যখন যথানির্দিষ্ট গতিবেগ ও গতিপথে আসিয়া পড়িবে, তখন যান্ত্রিক কর্তৃকশলতায় কৃত্রিম উপগ্রহটি মস্তক-রকেট হইতে নিক্ষিপ্ত হইবে। কিন্তু মস্তক-রকেটটির অবস্থা কি হইবে? উহা নিশ্চয়ই আর নীচে পড়িবে না। কেননা কৃত্রিম উপগ্রহ এবং মস্তক-রকেটের অবস্থাগত কোন পার্থক্য নাই। কাজেই দুইটিই অর্থাৎ কৃত্রিম উপগ্রহটি একটু আগে ও মস্তক-রকেটটি তাহার পিছু পিছু পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতে থাকিবে।

রাশিয়া যে কৃত্রিম উপগ্রহটি সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার সম্বন্ধে সাধারণের কোতূহল হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। অনেকের মনে প্রশ্ন জাগিয়াছে, ইহা কি পুনরায় পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিবে, না অনন্তকাল ধরিয়া চাঁদের মতন পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতে থাকিবে? কৃত্রিম উপগ্রহটির যে পৃথিবীতে ফিরিবার সম্ভাবনা নাই—এ কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ইহার কারণ হইতেছে যে, উপগ্রহটির দ্রুত পৃথিবী হইতে সব সময়ে সমান নয়। যখন পৃথিবী হইতে সর্বাপেক্ষা দূরে থাকিতেছে, তখনকার দ্রুত ৫৬০ মাইল, আর সর্বাপেক্ষা নিকটে থাকাকালীন দ্রুতের পরিমাণ মাত্র ১৫০ মাইল। দূরে থাকিবার সময়ে পৃথিবীর উদ্ভৃষ্ট বায়ুস্তর তথা মাধ্যাকর্ষণ, কৃত্রিম উপগ্রহটির গতিবেগ ও

গতিপথের উপর বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার করিতে না পারিলেও নিকটে থাকিবার সময়ে উহাদের প্রভাব উপেক্ষণীয় নয়। বায়ুস্তরে সহিত অল্পবিস্তর সংঘর্ষ friction এবং মাধ্যাকর্ষণের অসম আচরণ কৃত্রিম উপগ্রহটির গতিবেগ ধীরে ধীরে হ্রাস করিতে থাকিবে। উহা ডিম্বাকার কক্ষপথটি ক্রমশঃ ক্ষুদ্রতর হইয়া বৃত্তাকারে পরিবর্তিত হইবে কক্ষপথটি ক্ষুদ্রতর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উপগ্রহটিকে অধিকতর ঘন বায়ুস্তরের সংঘর্ষের সম্মুখীন হইতে হইবে। আর সেই সংঘর্ষের দ্বারা সৃষ্ট হইবে উত্তাপের, যে উত্তাপ কৃত্রিম উপগ্রহটি উকাপিণ্ডের মতন জলি নিশ্চিহ্ন করিয়া দিবে।

‘এ ব্যাপারটা কবে ঘটবে, তাহা সঠিকভাবে বর্তমানে বল সম্ভব নয়। কেহ বলিতেছেন, ইহার আয়ুষ্কাল এক মাস, আবার কাহারও মতে ইহা ২০ বৎসর ধরিয়া পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিবে বস্তুতপক্ষে কৃত্রিম উপগ্রহটির আয়ুষ্কাল নির্ভর করিতেছে অজ্ঞাত বায়ুমণ্ডলের ঘনত্ব এবং কৃত্রিম উপগ্রহটির উপর মাধ্যাকর্ষণের পরিমাণের উপর। কাজেই উহা কত দিন বাবৎ ঘুরিতে থাকিবে—তাহা একমাত্র ভবিষ্যৎই বলতে পারে। আর একটি প্রশ্ন হইতেছে যে, কৃত্রিম উপগ্রহটির বেতার-সংকেত-প্রেরণ-ক্ষমতা কতকাল থাকিবে এ বিষয়েও আগে কিছু বলিয়াছি। যদি কৃত্রিম উপগ্রহের বেতা চালনের শক্তি ব্যাটারী হইতে সংগৃহীত হইয়া থাকে, তবে ইহা ১ দিন, কি খুব বেশী এক মাস অবধি বেতার সংকেত পাঠাইতে সক্ষম হইবে, আর যদি সূর্য্য হইতে শক্তি আহরণের ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে তবে আলাদা কথা, সেক্ষেত্রে উহার বেতার-সংকেত-প্রেরণ-ক্ষমতা বহুকাল বর্তমান থাকিবে। তবে একথাও ঠিক যে, সংকেত প্রেরণ ক্ষমতা না থাকিলেও, কৃত্রিম উপগ্রহটি অনেক দিন ধরিয়া পৃথিবী চারিদিকে ঘুরিয়া থাকিতে পারে। কৃত্রিম উপগ্রহের সৃষ্টি বিজ্ঞান-জগতে এক আলোড়ন আনিয়াছে। মানুষ এখন দেখিতেছে, গত দিনেও বাহা ছিল স্বপ্ন, আজ তাহা সত্যে পরিণত হইয়াছে। বাহা ছিল অবাস্তব, তাহা আজ বাস্তবে রূপান্তরিত হইয়াছে। আজকের মান্ন তাই চন্দ্রলোকে তথা মঙ্গলগ্রহে যাইবার কথা ভাবিতেছে। ‘বাওরাকে আজ আর অবিশ্বাস্ত বলিয়া মনে হইতেছে না। সোভিয়ে বৈজ্ঞানিক M. Khlebztzevitch এর মতে মানুষ আগামী ৫ থেকে ১০ বৎসরের মধ্যেই চাঁদে পৌঁছাইতে পারিবে। তখনকার দিনে মাইকেল অসম্ভব বস্তুভাণ্ডার Simile খুঁজিতে নিশ্চয়ই “বামন হই কে চাহে ধরিতে চাঁদে?”—এই দৃষ্টান্তের আশ্রয় লইবেন না।

—ঐশ্বর্যমলকুমার রায়

ভূমি এসো

কুমারী সুমিতা মিত্র

আমার মনের নিভৃজে তোমার, হে পাঁচ,
বাজে বিনি-বিনি চরণ-নুপুর ভনি কানে—
জীবন আমার হল যে সুখের, অশ্রুভ
চাওয়া-পাওয়া নিয়ে চলছে তব মোর প্রাণে।

জীবনে আমার ভূমি এসে হেসে বাও চলে,
আমি কীদি আর কথা-কুল ল'য়ে মালা গাঁথি
ওগো জিহ্ন, এসো, অমৃতের বাগি বাও বলে,
সার্থক হোক না-কোটা রজনী-গছাটি।

ভাবি এক, হয় আর

ঐদিলীপকুমার রায়

নয়

যুগ্মফ মোটরে চড়েই পল্লবকে জড়িয়ে ধরল। বলল : না পল !
আজ কী খুশি যে হয়েছি—জানো না।

কেন ?

আর কেন। ঐ গিদো—গায় ভালো—কিন্তু কী যে দান্তিক।
ধরাকে সরা স্তান করে। ওকে যে থ করে দিয়েছ—সাবাস !
ভাভো ! Ausgezeichnet ! Vive le grand chanteur !
Grazie a Dio !

পল্লব হেসে বলে : বাকি চারটে ভাবার জরুরিগুলি আর বাকি
থাকে কেন ?

যুগ্মফ হেসে বলল : সত্যি এত আনন্দ আমি অনেক দিন
পাইনি। আর কী গানই গাইলে দাদা ! ফাটিয়ে দিলে তানে
গমকে গর্জনে ছুঁতে। ধন্য হে চারণ-আশাসাদর ! আমাদের
দেশ যদি দৈবাত্ব স্বাধীন হয়—মানে আমাদের জীবদ্দশায়, তবে
তোমাকে পাঠাতেই হবে আশাসাদর করে দেশের পর দেশে।

পল্লব প্রসঙ্গান্তর আনতে বলে : কিন্তু সালভিনির কাছে
এলিওনোরা আমাকে নিয়ে যাবার জন্তে এখন উঠে পড়ে লেগেছে
কেন বলতে পারো ?

পারি না ? আমি কী না পারি শুনি ? সালভিনি এলিওনোর
প্রেমে অঁঠে জলে।

পল্লব চমকে ওঠে : বলো কি হে ? বাট বহুরের বড়ো !

যুগ্মফ বলল : এলিওনোরও এমন কিছু কচি খুকি নয়।
চল্লিশের কিনারায়।

তবু—

তবুর কী আছে এতে ? রোমান্সের আয়ু এদেশে আমাদের
চেয়ে ঢের বেশি। পঁচাত্তর বৎসরের পিতা এদেশে এখনো পঞ্চাশ
বৎসরের নববধূর পানিগ্রহণ করতে উঠে পড়ে লেগে থাকেন এবং
প্রায়ই করে থাকেন।

পল্লব লজ্জিত হয়ে ধমকায় : কী যে কথার ছাঁদ !

যুগ্মফ বলল : কিন্তু—থাক এ সব অল্লীল মধুবাণ্য। তোমাকে
আমার একটা অনুরোধ আছে ভাই ! তুমি সালভিনির সঙ্গে দেখা না
করে বার্লিনে ফিরো না।

বার্লিনে ফিরব আমি—কে বললে ?

মানে—যদি ফেরো।

পল্লবের মনে বিবাদ ছেয়ে আসে। একটু উল্লাসের বিদ্যাতের
পরেই ছেয়ে আসে বেদনার অন্ধকার।

দশ

গিদোর কাছে পল্লব ইতালিয়ান গান শেখা শুরু করে দিল।
শেখাতে শেখাতে উল্লাস বেড়েই চলল। শেষে একদিন বলল :
এলিওনোরায় কথা তুমি ঠেলো না। সালভিনি মাসখানেকের মধ্যে
রোমে ফিরবেন—তাকে এ গানগুলি তোমাকে শোনাতেই হবে।

পল্লব সাক্ষাৎ গিদোর কাছে উৎসাহ পেয়ে ভেবেচিন্তে স্থির
করল—যাবে সালভিনির কাছে। এর পরে মাঝে মাঝেই এলিওনোরার
ওকে নিয়ন্ত্রণ করত। পল্লবের সত্যিই ভালো লেগে গেল এলিওনোরার
ব্যবহার। শেষে একদিন ষোলকের মাথায় আইরিনকে লিখবে না
লিখবে না করেও লিখে দিল সব কথা : কী ভাবে ওর জীবন কাটছে
রোমের আবহাওয়ায়। কোনো উত্তর এল না। ওর 'সদাটলমান'
মন আবার খারাপ হয়ে যায়—ফের ইচ্ছা হয় দেশে ফিরতে। কী হবে
মিথ্যে ইতালিয়ান গান শিখে ? কী হবে সালভিনির সঙ্গে দেখা
করে ? ওর মনের মধ্যে কেবলই খচখচ করতে থাকে : কুহুম
জেলে আর সে কি না এখন অবাস্তব বিয়াকি সালভিনি এলিওনোরার
কথা ভাবছে ? গান তো ইন্ড্রিয়-বিলাস শূন্য বিলাস হ'তে পারে,
কিন্তু বিলাস ছাড়া আর কী ? অথচ মজা এই যে, এ-বিলাসে এখন
কই আর উল্লাসের ছিটে-কোঁটাও তো নেই ! একদিকে আইরিনের
কোনো খবরই নেই, অন্যদিকে কুহুম ওকে ডাকছে দেশে ফিরতে,
অথচ ঠিক এই সময়েই কি না ও আটক পড়ল কোথাকার-কে
সালভিনির জন্তে ? বিড়ম্বনা বলে আর ক'কে ?

এমন সময়ে লসান থেকে এল আইরিনের আর এক ছবিবার্ড।
শুধু লেখা : আমরা খুব দূরে বেড়াচ্ছি—কবে যে কোথায় থাকি
নিজেরাই জানি না। পরে লিখব। আইরিন।

কিন্তু আইরিনের দু'-হুঁটি কার্ডেই এই একই আশ্বাস—পরে
লিখবে। এর মানে কী ? আইরিন কি ওকে দূরে রাখতেই চেষ্টা
করছে ? কিম্বা ভুলে যেতে ? কে জানে ? স্মিরাশ্চর্যক্রম—
আঙড়ায় মনঃক্ষোভে। তারপরেই আসে অন্তশোচনা। ছি ছি ?
আইরিন তো যেমন তেমন মেয়ে নয় !

একদিন আর থাকতে না পেরে যুগ্মফকে বলল। যুগ্মফ শুনে
ভাবিত হ'য়ে তাই তো ব'লেই চুপ।

এর পাঁচ আট দিন বাদে আইরিনের আর এক ছবিবার্ড এল
জারমট থেকে। এখানে চমৎকার তুণারের দৃশ্য—বাস্।

পল্লবের মন দুঃখে অভিমানে কালো হ'য়ে আসে। ক্রোধে উঠে
ও আরো মন দিল ইতালিয়ান গান শিখতে—যাকে বলে প্রতিহিংসার
সহিত।

এমন সময়ে একদিন বিকেলে হঠাৎ যুগ্মফ মুখ অন্ধকার ক'বে
বলল : ভাই, মেগাদ ফুকস, আজই বার্লিন ফিরতে হবে।

পল্লব ওর মুখ দেখেই চমকে গেল : কী হয়েছে ?

যুগ্মফ জান হেসে বলল : সে আমি বলতে পারব না।
চললাম—যকীথানেক বাদেই ট্রেন।

সে কি ? এত তাড়া কিসে ?

যুগ্মফ হেসে বলে : আর কিসের ? আকাশের তারারা জোট
পাকিয়ে তাড়ালো। আমি জ্যোতিষের পুস্তকে না মেনেও মাঝে
মাঝে জ্যোতিষ না মেনে পারি না।

পল্লব হঠাৎ বলল : চলো, আমিও যাই। আমার এখানে
একটুও ভালো লাগবে না তুমি চ'লে গেলে।

যুগ্মফ বলল : না, সেটা ভালো হবে না। এলিওনোরার
তোমাকে সত্যিই নিজের ছোটভাইয়ের মতন মনে করে। তোমার
সম্বন্ধে ও যেভাবে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে শুনে তোমার গৌরব কণ্ঠস্বর
লোহিত—কিন্তু সে দাঁক। ও তোমার সম্বন্ধে অনেক কিছুই
সালভিনির লিখেছে, তিনি আর দিন-পনেরর মধ্যেই আসবেন—

মিষ্টি সুরের নাচের তালে মিষ্টি মুখের খেলা
আনন্দ-ছন্দে আজি, —হাসি খুসির মেলা



সুপ্রসিদ্ধ কোলে



বিস্কুটএর

প্রস্তুতকারক কর্তৃক

আধুনিকতম যন্ত্রপাতির সাহায্যে প্রস্তুত

কোলে বিস্কুট কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১০

তোমার সম্বন্ধে উৎস্রুত প্রকাশ করেছেন। এ-সময়ে you must not let her down বলেই একটু খেদে : তাছাড়া শ্রীমতীই যখন অজ্ঞানতা তখন বাগিনে ফিরে শ্রীমতী কী করবেন তুমি ? তৃণ-কর্তন ? ফিরতেও তো পারে।

উঃ হঃ। ও যদি সত্যিই তোমাকে এড়িয়ে চলতে চেয়ে থাকে তবে এ সময়ে কিছুতেই বাগিনে ফিরবে না। বলেই হেসে : ভাই, ওঁরা যখন ধরা দেন তখন কাছে আসেন যেন পোষা পায়রা। কিন্তু পরে আবার যখন উধাও হন তখন ঈগল পাখীর মতন কোন ছায়াপথে যে বিচরণ করেন—দূরবীণ দিয়েও পাতা পাওয়া যায় না। বলে ওর শিঠি হাত রেখে : কিন্তু তুমি ভেবো না—আমি ইতিমধ্যে ক্রান্তি ক্রমারকে লিখেছিলাম। তিনি উত্তরে ধরা-ছোঁয়া দেন নি। সে বাই হোক, বাগিনে ফিরে যে করেই হোক এ-রহস্য ভেদ করব।

আর তৎক্ষণাৎ আমাকে জানাবে—কথা দাও ?

মুস্ক হাসে বলল : জানাব বৈ কি। কেবল তার করলেই তুমি উড়ে এসো—কেমন ? মানে, যদি শ্রীমতীকে গ্রেপ্তার করতে চাও।

ব'লে ওর স্বভাবসিদ্ধ মধুর হেসে বিদায় নিল। কেবল আজ সে হাসির উপরে একটা বিবাদের ছায়া মতন।

পল্লব ভাবে আর ভাবে : কী হ'ল ওর হঠাৎ !

এমনি সময়ে এলিওনোরার মোটর এসে হাজির। সেই উর্দিপরা সারথি ওর হাতে দিল কার্ড : পল ! একবার এক্ষণি আসতে পারো কি ? এখানেই ডিনার খেও ও খাওয়ার পর রাত্রে খেতে যেও। লম্বাটি !

এগারো

এলিওনোরার মোটরে হু-হু করে চলতে চলতে পল্লবের মনে রাজ্যের হৃদ্যবনা ভিড় করে আসে। এলিওনোরার সঙ্গে সম্প্রতি গানের ক্ষুদ্রে একটু ঘনিষ্ঠতা হলেও এ-ভাবে সে ওকে ডেকে পাঠাবে এ ও ভাবতেই পারে নি। মুস্ক ওকে ভরসা দিয়েছে বটে যে পল্লবকে নিজের ছোট ভাইয়ের মতন ভালোবাসে—তবু—মনে হয় ফের কুসুমের কথা। কিন্তু সব ছাপিয়ে ওর মনে পড়ে মুস্কের স্নান হাসি ও পল্লবের প্রব্রের উত্তরে মাথা-নাড়া : সে আমি বলতে পারব না।

এলিওনোরা ওকে সত্যি আপন মনে করে বলেই ডেকেছে ভাবতে ভালোও লাগে—অথচ একটা কেমন যেন সঙ্কোচও আসে। কুসুমের একটি প্রায়োক্তি ওর ফিরে ফিরে মনে হয় : আমাদের এখানে আসা মেয়েদের মনস্তত্ত্ব জানবার জন্তে নয়—নিজের তৈরি করতে—মানুষ হ'তে। বিধান অপ্রতিবাগ—অথচ—তবু এলিওনোরার মত মনোমার স্নেহ এত সহজে পেয়ে ওর মন খুশি হ'য়ে ওঠে—কুসুম এদের জীবনের কতটুকুই বা জানল ? অমনি সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন আসে : কিন্তু জানার এমনই বা কী দরকার ?

উত্তর খুঁজে পায় না। হয়ত পেত—যদি মনের মধ্যে ওর বিবাদের ছায়া ঘনিজে না আসত।

এলিওনোরার সুন্দর ভিলায় মোটর এসে দাঁড়াতেই ওর কামেরিয়েরা ১ অভিভাবদন করে ওকে নিয়ে গেল সোজা এলিওনোরার শরনকক্ষে।

পল্লব মেডকে মুহূর্তে জিজ্ঞাসা করলে : কী ব্যাপার ?

মেড ফিশ-ফিশ করে বলে : Signora e' ammalata, ২

পল্লব এলিওনোরার ঘরে ঢুকেই চমকে গেল। কমরীয় মুখের উপর কালো ছায়া, চোখের কোলে কালি—তাছাড়া প্রসাধন নেই ব'লে আরো যেন বিবর্ণ দেখাচ্ছে। শরন অবস্থাতেই হাত বাড়িয়ে পল্লবের হাত চেপে ধরে বলে : বোসো ভাই !

বিছানার পাশেই একটি কুশনওয়ালা চেয়ার ছিল, পল্লব বসল। এলিওনোরা এবার ওর দু'টি হাত নিজের দু'হাতের মধ্যে বন্দী করে রেখে চোখ বোজে।

মিনিট দুই পরে এলিওনোরা চোখ খুলে পল্লবের দিকে তাকিয়ে হাসে—নামমাত্র হাসি—

ব্যাপার কি এলিওনোরা ? তোমার কামেরিয়েরা বলল—অসুখ।

হ্যাঁ, এ আমার কালব্যাদি—মাথা-বোরা। একটু বোসো ভাই ! বগছি। বলতেই ডেকেছি। উঃ ! ব'লে ফের চোখ বোজে।

এলিওনোরা ঘুমিয়ে পড়েছে। পল্লব পা টিপে টিপে বাইরে যায়—বাগানে। আকাশ মেঘলা, ঠাণ্ডা হাওয়ায় ওর দেহ জুড়িয়ে যায়। কেবল চিন্তার তাপ বেড়েই চলে : কী ব্যাপার ?

কামেরিয়ার পুনরাবির্ভাব : Favorisca Signora.... ৩

বারো

এলিওনোরা বিছানার অর্ধশায়িতা অবস্থায় ওর হাত ধরে টেনে জোর করে ওকে বিছানার উপরেই বসিয়ে বলে : তুমি কত কী ভাবছ হয়ত—কিন্তু আমি তোমাকে না ডেকে পারলাম না। মনের ভার একলা বইতে পারি না আর। হয়ত অস্তায় করলাম—মুস্ক কি সাথে আমাদের অবজ্ঞা করে—

না না, সে কি কথা ? আমি—

এলিওনোরা স্নান হেসে ওকে ধামিয়ে বলে : শোনো পল ! আমি তোমাকে বা বলতে ডেকেছি তখন তুমি এতই অবাক হবে, যে হয়ত ভাববে আমি বাড়িয়ে বলছি।

না না—

শোনো আগে, তবে 'না না' কোরো। আমি আজ এত দুর্বল বোধ করছি—যে কথা বলতেও কষ্ট—

তবে এখন থাক না—আমার কোনো কাজই তো নেই, একটু পরে হবে।

না পল ! না ব'লে আমি আর থাকতে পারছি না—নৈলে ভাবো কি তোমাকে ডেকে পাঠিয়ে জোর করে বলতে চাইতাম বা—বা—এক মুস্ক ছাড়া আর কেউ জানে না ? ব'লেই ফের চোখ বোজে।

পল্লব চূপ করে ওর দিকে দিকে চেয়ে ওর একটা হাতে হাত বুলায়।

এলিওনোরা একটু পরে চোখ চেয়ে বলে : মুস্ক তোমাকে মারিয়ার সম্বন্ধে বলেছে নিশ্চয়ই ?

কিছু বলেছে—তবে আমাকে ও মনে করে—নাবালক, তাই বেশি বলেনি।

এলিওনোরা গ্লান হাসে : না, তোমাকে ও মুখে যা বলে মনে মনে তা ভাবে না। ও তোমাকে বেশি বলেনি কেন শুনবে ?

পল্লব ওর দিকে প্রস্বেৎসুক নেত্রে তাকায়।

এলিওনোর হাসি আরো গ্লান হ'য়ে আসে, বলে : ও তোমাকে খুব সাবধান হ'য়েই বলেছে এই জন্তে যে, বেশি বললে আমার কথাও বলতে হয়—আর সেটা ও পারে না আমার অনুমতি বিনা। কিন্তু শোনো—সব কথা শুনলে বুঝতে পারবে—কিন্তু—কে জানে—হয়ত ভুল বুঝবে ? হয়ত এখনই ভাবছ অবাক হ'য়ে—সিনেমা-তারকাও কি না এমন সের্টিমেণ্টাল !

পল্লব ওর হাতে হাত বুলোতে বুলোতে বলে : না এলিওনোরা, মানুষের পেশা যে তার স্বভাবকে বদলে দিতে পারে না এটুকু বুঝবার মতন সাবালক আমি হয়েছি বিশ্বাস করো। কারণ—কারণ যা আমিও খেয়েছি হয়ত যুগ্মফ তোমাকে কিছু ব'লে থাকবে ?

আভাসে কিছু বলেছে। তবে ও ভারি চাপা মানুষ—কাউকেই কিছু বলে না, যা ভাবে তা গোপন ক'রে এমন ভাব দেখায় যাতে লোকে ওকে তাই ভাবে যা ও নয়। তবে আমাকে ও আইরিনের কথা বেশি না বললেও রিতার কথা বলেছে বেশ ঘটা ক'রেই যার—ব'লে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে—যে এক কথায় সব ছেড়ে চ'লে যেতে পারল সত্যি, রিতাকে আমি হিংসে করি।

হিংসে ?


হ্যাঁ, কারণ সে পেরেছিল যা আমি পারিনি—পারিনি—কারণ—কিন্তু না, বলি আগে—ভূমিকা রেখে। কেবল একটি ভয়সা চাই—তুমি শুনতে রাজি আছ তো ?

সে কি কথা এলিওনোরা ? আমার একটি দিগির সাধ ছিল অনেক দিন থেকে। যুগ্মফ আমাকে ব'লে গেছে যে তুমি আমাকে ছোট ভাই ব'লেই বরণ ক'রে নিয়েছ—আমি না চাইতেই—

এলিওনোরা মুহূ হাসে : বিশ্বর একটি কথায় আমার আপত্তি আছে। তিনি বলেছিলেন—যে চায় সে পায়ই। আমি বলি—যে প্রেমের ক্ষেত্রে সেই পায় না যে চায়—পায় সেই যে পেতে না চেরে দিতেই ছোটে। তুমি এত লোকের স্নেহ পাও এই জন্তেই—তোমার ভাষায়—তুমি দেবার সময়ে প্রতিদানের কথা ভাবো না ব'লে। আর তাই হস্ত দিতে পারো এত সহজে। কিন্তু শোনো—কথায় কথায় কথা বেড়ে যাচ্ছে। গিদো ফোন করেছে, সে ডিনারে আসবে। তার আসার আগেই যা বলার ব'লে শেষ করতে হবে।—তোমার হাত দাও, যদি অবশ্য আপত্তি না থাকে—

পল্লব আদ্র হ'য়ে ওর দুটো হাতই নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বলে : ভাই—বোন পাতিয়েও এমন কথা বলে ?

এলিওনোর মুখে ফের সেই ককণ হাসি ফুটে ওঠে : এত মিষ্টি কথা কত দিন শুনিনি—মারিয়া যাবার পর। ব'লে হাত ছাড়িয়ে চোখের জল মুছে শুরু করে : শোনো তবে। মারিয়ার সবকিছু যুগ্মফ তোমাকে হয়ত বলেছে—সে সম্পর্কে আমার বোন হ'য়েও স্বভাবে ছিল ঠিক আমার উপেটা। তার সত্যি বিশ্বাস ছিল বাইবেলে। আমি



ক্যালকেমিকোর
ক্যাস্টরল
 মনোরম গন্ধযুক্ত ক্যাস্টর অয়েল
 ঘন কৃষ্ণ কেশোদ্গমে
 সহায়তা করে

৬ ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ
 কলিকাতা-২২

ক্যাথলিক মাত্র নামে, সে ছিল মনে-প্রাণে। ভার্জিন মেরীর মূর্তি, ঐ যে দেখেছ—ব'লে ঘরের কোনো কাচের বেরাটোপ-পরা একটি স্ত্রী মেরী-মূর্তি দেখিয়ে—ঐ স্ত্রীছটির সামনে সে রোজ ধূপ-দীপ জ্বালাত, ভব করত নতজাহু হ'য়ে দাঁধ-সকালে।

তাই যুসুফ যখন তাকে বলল যে, সে কোরাণ মেনে মুসলমান না হ'লে ওদের বিবাহ হ'তেই পারে না, তখন সে ভেঙে পড়ল। আমি যুসুফকে অনেক বোঝালাম, কিন্তু সে-সময়ে যুসুফ ছিল দারুণ—বাক্যে বলে গৌড়া—‘বা নেই কোরাণে, তা নেই তুবনে’ গৌছের মনোভাব জানোই তো। ওদিকে মারিয়াও ঠিক তেমনি গৌড়া ক্যাথলিক, রক্ষা হবে কোথেকে? অথচ দেখ বিধাতার হুঁসিধা লীলা : এই দুটি মানুষ ধর্মের পারে মনকে বলি দিলেও প্রাণকে বাগ মানাতে পারল না। কবি বলেছেন না—প্রেমের পথ মন্থন নয়? কিন্তু যাক, কথায় কথায় কথা বেড়ে যাচ্ছে।

যুসুফ চলে গেল অল্পকোঁড়ে দর্শন পড়তে। মারিয়া কৈদে বলল—যাবে কনভেন্টে। আমি শুকে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ওর মন ভালো করতে ভ্রমণে বেরুলাম। আমরা যখন প্যালেষ্টাইনে, তখন একটি ধনী ইহুদি ওর প্রেমে প'ড়ে পাগলের মতন হ'য়ে যায়। মারিয়া তাকে ভাগিয়ে দিল, বলল সে ক্যাথলিক। গাব্রিয়েল বলল সে খৃষ্টান হবে। মারিয়া তখন তাকে বলতে বাধ্য হ'ল, সে আর একজনকে ভালোবাসে। গাব্রিয়েল বস্তুত : সে অপেক্ষা করবে—

তার পর সে অনেক গুঁঠা-শিড়া, আগু-পিছু—শেষটা মারিয়ার মন ভিজল—ওকে বিয়ে করল।

কিন্তু বিয়ে করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ওর ভুল ভাঙল। কেমন ক'বে—সে-সব বলার আজ সময় নেই, সে অনেক কাণ্ড—তা নিয়ে একটা রীতিমত নাটক লেখা যায়। শেষে মারিয়া মনঃকণ্ঠে আত্মহত্যা করল। সে মনঃকণ্ঠের প্রধান কারণ এ নয় যে, গাব্রিয়েল লম্পট—প্রধান কারণ—ওর হ'ল আত্মদ্রাবি যে ও ষিচারিণী হয়েছে।

চোখের জল ফের মুছে এলিওনোবা ব'লে চলল : যুসুফ এ খবর পেয়েই ছুটে এল রোমে। ওকে সেই একবারই কাঁদতে দেখেছি। যাক।

তারপর ও উদাস হ'য়ে শান্তির আশায় সারা যুরোপ ঘুরে বেড়ালে। ছ'সাত বৎসর ধ'রে। শেষে গেল রুশ দেশে। সেখানে ১৯১৭ সালের নভেম্বর বিপ্লবের সময়ে ওর প্রাণ নিয়ে টানাটানি—কারণ ও কোথায় ব'লে ফেলেছিল যে বলশেভিকরা মানুষ নয়—দানব। লেনিনকে টিপ ক'রে যে-মহিলাটি গুলী ছুড়েছিল সে যুসুফকে চিনত। কাজেই ঢেক পুলিশ ওর পিছু নেয়। ও অতিকণ্ঠে ছদ্মবেশে কোনো মতে পালিয়ে আসে—একেবারে অসহায় ও নিঃশব্দ। আমি ওকে আশ্রয় দিই এই ভিসাতেই। বলতে ভুলেছি—আমি ইতিমধ্যে সিনেমায় চুকে নাশ করি। যুসুফ আমার এখানে এসে শক্ত অন্তরে পড়ে—নিউমোনিয়া। বহু চিকিৎসা ওকে আমি সারিয়ে তুলি।

ওর মনে কৃতজ্ঞতা জেগে ওঠে আশ্রয়দাতার প্রতি। তাছাড়া মারিয়ার দিদি আমি। ও আমাকে Sorella ৪ ব'লেই ডাকত।

কিন্তু হৃদয় চলে তার নিজের খেয়ালে—ভালো-মন্দকে পিছে একাকার করে। ফলে বছর খানেকের মধ্যে—বুঝতেই পারছ—

আমরা পরস্পরের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হলাম। তারপর আবার সে কত কাণ্ড—কত গুঁঠাপড়া!—সব বলার দরকার নেই—কেছ পরিণামটুকু বলি : আর মারিয়ার জন্তেই পরস্পরের কাছে এসে পড় সবে মারিয়াকেই ভুলে গেলাম ওর প্রতি হুঁসিধার টানে।

কিন্তু ও ভুলেও ভুল'ত পারেনি। ফলে ওর এল চিত্তদ্রাবি : সে আর এক নাটকীয় কাণ্ড—যাক। ও বলল : না এ হতেই পারে না—এরি নাম পাগ—মারিয়ার দিদিকে আমি কিছুতেই সে-চোখে দেখতে পারি না যে-চোখে মারিয়াকে দেখেছিলাম : আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। তখন যুসুফ আমাকে বোঝানো শুরু করল। আমার প্রাণ সার না দিলেও শেষে মন সার দিল—পাগের ভয়েই বলব। ক্যাথলিক সংস্কার তো! আমরা ঠিক করলাম—পরস্পরের সঙ্গে আর দেখা করব না, মারিয়ার মান রাখতে অন্তত : আরো কিছুদিন অপেক্ষা করব।

এই সময়ে সালভিনি দান নংসিয়োর এক মেলা ডামায় আমার অভিনয় দেখে ‘আমার জন্তে পাগল হয়ে উঠলেন। দিনের পর দিন আমাকে ফুল পাঠানো, গান শোনানো—আরো কত কী। আমি তাঁকে বললাম যে আমি আর একজনকে ভালোবাসি। তিনি জানতেন—কাঁকে। সিনেমা-তারকাদের তো ঘরোয়া ব'লে কিছু থাকে না—যাই করি আমরা, রটে যায় হাজার লোকের মুখে। সালভিনি বললেন : আমি একজন ভারতীয়কে বিবাহ করব এ হ'তেই পারে না। তাছাড়া ভয় দেখালেন—যুসুফকে বিরোধ করলে সে আমাকে আর সিনেমায় অভিনয় করতে দেবে না। কথাটার মধ্যে কিছু সত্য ছিল, কারণ যুসুফ থিয়েটারের উপরে না হলেও—টকির উপরে ছিল হাড় চটা। বার্লিনে এক টকিতে কাজ ক'রে ওর বিতৃষ্ণা আরো বেড়ে যায়।

ওঁকে আমাদের সিনেমার ডিরেক্টর ছিলেন সালভিনির বন্ধু। তিনিও আমাকে ধরলেন এসে। সঙ্গে সঙ্গে আমার মামা গিদোও একদিন আমাকে খুব ধমকালো : সালভিনি শুধু ধনী নন—ইতালির শ্রেষ্ঠ গায়ক—বিশ্ববিখ্যাত—তা ছাড়া যুসুফ যখন আমার মারিয়ার ওজর তুলে সময় চেয়েছে, তখন তার মুখ চেয়ে ব'সে থাকা আমার সাজে না—আমার কি আত্মসম্মান জ্ঞান নেই—ইত্যাদি ইত্যাদি—বলতে বলতে ক্রোড়ে উঠে আমাকে মূর্খ পাগল কাণ্ডাকাণ্ডানহীন—আরো কত কী উপাধিই বে দিল—যাক।

আমার প্রথমে খুবই রাগ হয়েছিল বৈ কি—কিন্তু রাগ পড়ে যেতে মনে হল—সত্যিই তো! তা ছাড়া যুসুফের সময়-চাওয়ার জন্তে আমি নিজেও খুবই বা খেয়েছিলাম—গিদো আমার সেই কাটাঘায়ে দিল ঘূনের ছিটে। আমি রোখের মাথায়, সালভিনির প্রস্তাবে রাজি হয়ে যুসুফকে তার ক'রে দিলাম যে সামনের মাসে আমাদের বিয়ে।

তার পেরেই যুসুফ ছুটে এল—তোমাকে সঙ্গে ক'রে। বলল : করছ কী? বাক্যে ভালোবাসো না তাকে—আমার দারুণ রাগ হ'ল, বললাম : আমি কাঁকে ভালোবাসি, না বাসি তাতে যে আমাকে ভালোবাসেনি তার কী? যুসুফ হুঁসিত হ'য়ে বলল : আমি তোমাকে ভালোবাসি—কিন্তু আমার বিধায় কারণ কি তুমি জানো না? আমি কষ্টকণ্ঠে বললাম : সে তো আর কি হবে না? তুমি কথায় কথায় সবাইকে সেটিয়েচাল বলে বিক্রম করো—কিন্তু এ জোনার কী সবুজি বলো তো? ও তখন স্বীকার করল যে আমাকে

আপনার জন্যে চিত্রতারকার সুত অপূর্ব লাবণ্য

মালা সিনহা সত্যিই অগুণে বেহালাবোঝার
অধিকারী। কি করে তিনি লাবণ্য এত
মোলায়েম ও হৃদয় রাখেন ?
“বিশুদ্ধ, শুভ্র লাক্স টয়লেট সাবানের
সাহায্যে”, মালা সিনহা আপনাকে
বলবেন। চিত্রতারকারের গ্রীষ্ম এই মোলায়েম
ও হৃদয় সৌন্দর্য সাবানটির সহায়তায়
আপনারও হৃদয়ের বসন্ত দিন। মনে রাখবেন,
জানের সময় লাক্স সত্যিই অনিন্দ্যরসের।

বিশুদ্ধ, শুভ্র

সাবান

চিত্রতারকারের সৌন্দর্য্য স্নায়



যে ও কতখানি ভালোবেসেছে নিজেই ভালো ক'বে বুঝতে পারিনি, সে অনেক কথা।—শেষে বলল : বিবাহ সবক্কে আমার মতামত তুমি জানো। আমি বিশ্বাস করি বিবাহে—যদি তার প্রতিষ্ঠা হয় প্রেমের ও প্রকার ভিত্তিতে। তোমাকে আমি শুধু ভালোবাসিনি,—প্রস্তাব করতে পেরেছি। তাই আমার মন ব্যথিয়ে উঠেছে ভাবতে, তুমি বিবাহ করবে কারুর নামের জন্তে বা নিজের সুবিষের জন্তে। না, বার কাছে আমি এত স্বাধীন, যাকে শেষে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভালো না বেসে পাবি নি—সে হীন হ'য়ে যাবে আর আমি বসে দেখব? আমি বরষার ক'রে কৈদে ফেললাম, ও আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল : এলিওনোরা, মনগড়া নীতির আইন-কানুন মেনে ভুল করেছি বার বার, কিন্তু এখন থেকে মানব না আর মনের মানা, চলব স্বপ্নের নির্দেশে। তোমাকে আমি বিবাহ করব—হাতের লম্বা আর পায়ে ঠেলব না বুদ্ধির বিধিবিধান মেনে। তুমি ঠিকই বলেছিলে—যা গেছে, আর ফিরতে পারে না তাকে জপ ক'রে তাপই বাড়ে, আলো মেলে না—অতীত চারণ নিয়ে যে বেঁচে থাকে তার উপাধি জীবন্তই বটে।

আমি আনন্দে অধীর হ'য়ে সালভিনিকে একটা চিঠিতে সব কথা জানিয়ে শেষে লিখলাম : তোমার সঙ্গে আমি আর দেখা পর্যন্ত করব না—দয়া ক'রে তুমি আমার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা কোরো না।

যা খেয়ে সালভিনি বেকলেন ভ্রমণে—বিশেষ ক'রে আমাকে ফুলতে। একটি চিঠিতে আমাকে শুধু লিখে পাঠালেন : তুমি রোমে আর একজনকে বিবাহ করবে এ আমি রোমে ব'সে দেখতে পারব না।

মনে আমার দুঃখ হ'ল বৈ কি। কিন্তু উপায় কী? যুসুফ কিরে এসেছে—যুসুফ আমার হবে—আমি তার—এই আনন্দে আমি উজিয়ে উঠলাম, সালভিনির জন্তে দুঃখ এ-উজ্জ্বলতার জোয়ারে ধুয়ে মুছে ভেসে গেল।

কিন্তু বাধা এসে এবার এক অচিন পথে। যুসুফ ইতিমধ্যে ভিতরে ভিতরে বদলে গিয়েছিল। আর কেমন ক'রে গুনবে? তোমার সম্পর্কে।

পল্লব চমকে উঠল : আমার ?

হ্যাঁ তোমার। তোমার কাছে বার্লিনে ও দিনের পর দিন গুনত কুক্কুমের কথা। যুসুফও তাকে হেসে উড়িতে দিত—দেশদ্রব, সবুজ এই সব ব'লে। কিন্তু—এ বিধাতার আর এক বিচিত্রলীলা—যুসুফ ও দেশভক্তির আদর্শকে যতই বিদ্রূপ করে ওর মনে ততই যনিয়ে ওঠে আত্মগ্লানি—দেখতে দেখতে ও জেগে উঠল বেন এক নতুন চেতনার—নতুন বিবেকে—হয়ে উঠল অশাস্ত। ওর মনে হ'ল—যে কথা পরে বলেছিল আমাকে—যে, পুরুষমাত্র প্রেমকে বরণ ক'রে সার্থক হ'তে পারে না, তার চাই একটা কবের ক্ষত্র, কিছু গ'ড়ে তোলার সুযোগ।—মজা দেখ : যে-আদর্শকে ও সবুজমনের সোটিমেটালিটি ব'লে বরাবর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ক'রে এসেছে হঠাৎ সেই বেন কিরে এসে শোষ তুলল ওর যাড়ে চেপে—ওর মনে হ'ল, নিছক ব্যক্তিগত আনন্দ সার্থকতার পথ দেখাতে পারে না—আমি-র গণ্ডি কাটাতে না পারলে আমি-র ভারে মানুষ হয়ে পড়েই পড়ে—এক পরম ব্যর্থতার।

বলেছি—এসব কথা ও আমাকে বলে পরে। কাজেই তখন

প্রায়ই অত্মমনস্ক হ'য়ে পড়ে। হাসে বটে সমানেই, কিন্তু সে হাসিতে আর বেজে ওঠে না ওর স্বভাবসিদ্ধ বিজ্ঞতার সুর, শেষে আমি একদিন ওকে ধ'রে পড়লাম। ও তখন বলল যে, ওর মন একটু খিতিয়ে না গেলে কিছু বলবে না।—একদিন হঠাৎ কথায় কথায় বলল কুক্কুমের বার বার জেলে যাওয়ার কথা। পরে একদিন বলল—সে অনুস্ম হ'য়ে জেল থেকে বেরুতে না হেঁকতে ফের জেলে গেছে। আমি ভর পেলাম—কিন্তু সে-ভয়ের নাম দেওয়া ভার। ভালোম—বাক, কাজ কি গীড়াগীড়ি ক'রে—ও বলবে পরে কী ভাবছে—বলবেই—যখন কথা দিচ্ছে—কারণ স্বভাবে ও সত্যবাদী।

হঠাৎ পরশুরাতে ও আমাকে বলল : এলিওনোরা! জানি—তুমি কত কী ভেবে দুঃখ পাচ্ছ—কিন্তু—আর একটু ধৈর্য ধরো—আমার মানে—বতর্কণ আমার মন না স্থির হচ্ছে ততর্কণ কী ক'রে বলি যা তোমাকে বলতে চাই ?

আমার মন ফের সেই নাম-না-জানা ভয়ে ছেয়ে গেল, কিন্তু বললাম শাস্ত সুরেই : আমি জানি—তোমার মন ভালো নেই। কিন্তু কী হয়েছে একটু অন্তত আভাস দাও ? কোনো খারাপ খবর ?

ও এড়িয়ে গেল, বলল : এখনো আমাকে জিজ্ঞাসা কোরো না। আমি কাল সকালে তোমাকে বলব। আজ রাতে আমি আমার মনের সঙ্গে একেবারে একলা মুখোমুখি হ'তে চাই। ব'লেই বেরিয়ে গেল।

এ রকম ও কখনো করে নি এর আগে। সারা রাত ফিরল না। আমার ঘুম হল না। কী হল আবার? আমাদের বিবাহ হবে মাস দুই পরে সব ঠিক—এ সময়ে আমার মাথা ঘুরে উঠল।

পরদিন সকালে ও ফিরেই বলল : আমার মন স্থির হয়েছে—আমি এদেশে আর টিকতে পারছি না—এবার দেশে ফিরতেই হবে। সময় এসেছে।

আমি চোখে অন্ধকার দেখলাম, বললাম : সে কি? কথা ছিল—তুমি এদেশেই থাকবে—আমাদের বিবাহ সামনে—

ও রান হেসে বলল : মানুষ যা ভাবে তাই কি পারে? আমি ভেবেছিলাম প্রেমের জন্তে সব পাঁরা যায়। কিন্তু আমার চোখ খুলে গেছে। আমি দেখতে পেরেছি যে যুরোপের সভ্যতার আছে শুধু বাইরের চেকনাই, সে যতই আদর্শ আদর্শ করুক, সত্যি বিশ্বাস করে শুধু ভোগকে। বিজ্ঞান তাকে এনে দিয়েছে এই ভোগের উপকরণ—পাস্তিহীন অন্তহীন ভোগ, ভোগ, ভোগ। তাই আজ সে বিজ্ঞানের উপাসক। কিন্তু ভারতবর্ষের বাণী এ নয়, কারণ তার বাইরের চটক না থাকলেও অন্তরে আছে এমন এক সম্পদ যা যুরোপের চোখধাঁধানো ধুমধামে নেই। তাই আমাদের দেশে এ যুগেও জন্মার গান্ধী, দেশবন্ধু, তিলক, অববিন্দ, কুক্কুমের মতন মানুষ। এরা ভোগের মোহ জয় করেছে এমন কোনো সত্যের যোগে বার দেখা পেতে যুরোপের এখন অনেক দেরি। বলতে বলতে এলিওনোরার কণ্ঠস্বর গাঢ় হয়ে এসে ও বলল : তাই তো কুক্কুম অর্থ, দেহসুখ, বিলাস, সাংসারিক প্রতিপত্তি, বড় চাকরির মোহ সব কাটিয়ে উঠতে পেরেছে এত সহজে। সে ফোর জেনে গেছে হয়ত তার স্বীপান্তর হবে। এ-হেন যুবকদের সঙ্গে যখন আমি নিজেকে তুলনা করি তখন আমার আত্মকেন্দ্র মন বিস্তারে ভরে ওঠে। তাই

আমি আকাশ থেকে পড়লাম, বললাম : আর আমি ? ও বলল : তুমি বাবে আমার সঙ্গে ভারতবর্ষে। আর কি ?

আমি স্তম্ভিত হয়ে খানিকক্ষণ চুপ করে রইলাম, তারপর বললাম : তোমার সঙ্গে যাব ভারতবর্ষে বরাবরের জন্তে ? ও বলল : নয় কেন ? আমাকেও কি তুমি এ দেশে বরাবরের জন্তেই ধরে রাখতে চাও নি ? আমার কাছে যে দাবি করতে তোমার বাধেনি তোমার কাছে সে দাবি করতে আমার বাধবে কেন ? ব'লেই হেসে : ইংরাজিতে একটা প্রবাদ আছে—What is sauce for the gander should be sauce for the goose.

আমার মাথায় কে যেন হাতুড়ি মারল। আমি বললাম : আমাকে একটু সময় দাও ভাবতে।

এলিওনোরার চোখে জল ভরে এল, নিজেকে সামলে ব'লে চলল : সেদিন—মানে কাল সারারাত ঘুমতে পারলাম না, সব ছেড়ে যেতে হবে অচিন দেশে ! মন আমার উঠল ঝুখে। ওদিকে যুসুফকে হারাবার কথা ভাবতেও বৃকের মধ্যে ওঠে টন টন করে। যাক। পরদিন মানে আজ সকালে উঠে যুসুফকে বললাম : তুমি দেশে ফিরে স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেবে বলছ, কিন্তু আমার সেখানে ঠাই কোথায় ? ও অগ্নি বদনে বলল : আমার পাশে আর কোথায় ? আমি বললাম কিন্তু তোমার নেশাবাসী ? তারা কি আমাকে সাদরে বরণ করে নেবে ? ও বলল ব্যঙ্গ হেসে : আদরের স্বাদ তো পেয়েছে অটল, এবার না হয় একটু মুখই বদলালে আমাদের আমরা ৫ ব'লে দাস্তুর কাবা পড়তে পড়তে এত উজ্জ্বল হয়ে ওঠো, না হয় তার জন্তে একটু অনাদরই সহ্যে। আমি বললাম : শুধু অনাদরই তো নয় তোমারি মুখে তো শুনেছি সেদিন রিতার অবস্থা। ও বলল : তার কী অবস্থা এত দূর থেকে কী করে জানব ? কিন্তু সে ওদেশে গিয়ে অসুখী হয়েছে যদি ধরেই নিই তা হ'লেও তুমিও যে অসুখী হবে এমন সিদ্ধান্ত করা চলে কি ? তা ছাড়া আমি যোগ দেব মহাত্মাজীর গ্রাম-সংগঠনের কাজে, শহরে থাকব না। তুমি হবে আমার প্রধান সহায়। আমি শিউরে উঠে বললাম : গ্রামে গ্রামে ঘুরব আমি ? ও বলল মন্দ কি ? ছবির জন্তে কি এমন অনেক গ্রামে বাগনি যেখানে ছবির জন্তে না হ'লে যাবার কথা ভাবতেও পারতে না ? এবার না হয় প্রেমের জন্তেই কিছুদিন গ্রামে গ্রামে ঘুরবে, তা ছাড়া এত আশু পিছু ভারলে কি কেউ ঝাঁপ দিতে পারে ?

আমার মন বিবাদের কালো হ'লে গেল, বললাম : যুসুফ, তুমি জানো না তুমি কী বলছ ! ভাবছ শুধু তোমারি কথা। কিন্তু আমার দিকের কথাটা কি এতই তুচ্ছ যে এক কথায় সব ডিশমিশ করে দিতে চাও ঝাঁপ দেবার কথা ব'লে ? আমার একটা প্রতিষ্ঠা হয়েছে এদেশে। আমি ভালোবেসেছি আমার প্রতিপক্ষিক, সাফল্যকে, শিল্পে সৃষ্টি করবার আনন্দকে। তুমি প্রেমের জন্তে আমাকে বলছ এ সবই ছাড়তে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তা হ'লে তুমিই বা কেন প্রেমের খাতিরে আমার কাছে থাকতে পারবে না ? ও বলল : থাকতে পারতাম যদি এখানে কোনো কাজের মতন কাজ থাকত কিন্তু এখানে আমি কী করব বলো ? আমি বললাম : কেন ? আমাদের সহযোগী হবে। আমরা ঈগগিরই ভারতবর্ষ সবক্ষে একটা

ছবি করব। ও ব্যঙ্গ হেসে বলল : জানি। এরকম ছবি এদেশে কয়েকটি বেরিয়েছে। ভারতীয় রাজা, সাপুড়ে, রোপ-টিক এবং মহাত্মা গান্ধীকেও হরত নামতে হবে কৌশীন পরে আর সবাই শিউরে উঠবে ভেবে—এই অর্থনয় ফকির যে দেশের নেতা সে দেশের না জানি কী অবস্থা ? আমি যদি থাকি এদেশে, তবে তোমাদেরি হবে মুশ্বিল ; কেন না আমি কিছুতেই এই মানুষের মতন মানুষটিকে তোমাদের ছবিতে অবতীর্ণ হ'তে দেব না। আমার রাগ চড়ে গেল, বললাম : কেন ? তোমাদের দেশে নানা ছবিতে কি তিনি আসেননি এবি মুখ্যে ? ভবিষ্যতে আরো আসবেন দেখে নিও। ও বলল : আসতে পারেন যদি তোমাদের ক্যাপিটালিষ্টরা জাল ফেলেন। কাউকে তাঁরা সাজাবেন সরোজিনী নাইডু, কাউকে মহাত্মা গান্ধী, দেখাবেন হু জেনে চরকা কাটছেন তাজমহলের সামনে, টাকার জন্তে ছবিখন্ডন কী না করতে পারেন ? আমি রেগে বললাম : শুধু টাকার জন্তে শিল্পের আদর্শ ব'লে কি কিছুই নেই ? রূপ সৃষ্টি—ও বাধা দিয়ে বলল রাখো রাখো। আমি আজ তিন বৎসর বার্লিনে একটি সিনেমাতোঁ কাজ করছি। আদর্শ ? সিনেমার আদর্শকে যদি আদর্শ নাম দিয়ে হয় তবে তেলোপোকারো নাম দিতে হয় পাখি। ছবিখন্ডন একমাত্র লক্ষ্য টাকা, আর তার উপায় হ'ল স্কন্দরীদের নগ্ন মূর্তি হাব ভাব, ছলাকলা। এ দিয়ে যা সৃষ্টি করা হয় তার নাম রূপ সৃষ্টি নয়, তার নাম কী, নাম তুমি খুব ভালো করেই জানো। আমি চোঁচিয়ে বললাম : এই-ই যদি তোমার ধারণা তবে আমাকে কানে যেতে দিলে কেন ? ও বলল : শোনো এলিওনোরা, রাগ করো না আমি তোমার বিরুদ্ধ ব্যক্তিগত ভাবে কিছুই বলিনি, কিন্তু সিনেমার আদর্শ আছে ব'লে যখন এই মাত্র তুমি জাঁক করলে তখন তা নিজমূর্তির সম্বন্ধে কিছু না বলে কী করে চুপ করে থাকি বলো—যখন জানি যে খুব সস্তা যৌন উত্তেজনাই তার উপকীৰ্ত্ত—যদি বাদ দিয়ে তোমাদের দক্ষ সিনেমার লক্ষ রংমহল ধ'রে পড়বে পড়বে ?

রাগে ক্ষোভে আমি কঁদে ফেললাম। ও আমার কাছে এত অমূল্য হয়ে আমার হাত ধরতেই আমি ওর হাত ঠেলে দিয়ে বললাম আর তোমাদের রাজনীতির আদর্শ—যাতে তুমি যোগ দিতে যাচ্ছ তার নিজমূর্তিট কী আমরা কি কেউ জানিনা না কি ? যুরোপে কি তাকে আমরা চাক্ষুষ করিনি বার বার ? জাহিরিপনা, মিথ্যাচার কনসেনট্রেশন ক্যাম্প, ঘৃণা, গুলচরবৃত্তি, নিষ্ঠুরতা, খুনখারাপি—কোনটাতে বাবে আজকের সেরা রাজনীতিকদেরও ? তুমি কি নিজেকে বলশেভিকদের দানব উপাধি দাও নি ? দেখনি কি বিপ্লবী রাজনীতি স্বর্গীয় পাল তুলে ক্রব শক্তিমত্তার চলেছেন কোন্ নরকের বন্দরে এক আখটা মহাপ্রাণ দেশভক্তের মহত্ব দেশজোড়া মিথ্যাচার ও যাতকবৃত্তির গ্রানিকে মুছে দিতে পারেন না। না যুসুফ, হবার না—আমার পথ আলাদা, তোমার পথ আলাদা।

এলিওনোরা থেমে গাড় কঠে বলে চলে : একথা শুনে ও চমকে উঠল। মুখ ঢেকে খানিক চুপ করে রইল। তারপরে মুখ তুলে শান্তকণ্ঠে বলল : তুমি ঠিকই বলেছ এলিওনোরা ! আর এখন তোমাকে বলি—তোমাকে ভালোবেসেও যে তোমাকে কাঁটানতে চাইনি তার প্রধান কারণ—এই-ই, মানে তোমাদের কাজে আমার অন্তরের সার নেই। তোমার খাতিরে আমি

নিজেকে অনেক ক'রে বোঝাবার চেষ্টা করেছি যে হয়ত সিনেমার মতিগতি বদলানো যেতেও পারে। কিন্তু বুখা চেষ্টা। আমি তো অন্ধ নই, তাই কেমন ক'রে স্বীকার করব যে সিনেমার প্রধান পাণ্ডা যে-প্রবৃত্তি—যাকে খোরাক দিয়ে তোমরা আজ টাকার গদিত গদিতান—সে-প্রবৃত্তিকে বাদ দিলে সিনেমার অতিকায় মূর্তি দুদিনে অনাহারে শুকিয়ে হবেই হবে অস্থিচর্চসার। লক্ষ লক্ষ লোকের সাড়াতেই তোমরা ক্রোড়পতি—আর তারা সাড়া দেয় কিসে ও কেন—বলেছি। এ অবস্থায় সিনেমার সংস্কার অসম্ভব—কেন না অল্পল বোন উত্তেজনা বাদ দিয়ে এ্যুগে সিনেমার রূপহুষ্টি হয় না, হ'তে পারে না। তাই তোমার কথাই আমি মেনে নিলাম! কেবল একটি কথা বলব। তুমি যে বলেছ যে আজকের জগতে রাজনীতির অবস্থা শোচনীয়, একথা কে না স্বীকার করবে? কিন্তু এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে: সেটা এই যে, ভারতবর্ষে আজ সর্বপ্রথম নেমেছেন কয়েক জন সত্যিকারের মহাত্মা যাঁরা রাজনীতিকে ঢেলে সাজতে চাইছেন। এঁরা সফল হবেন কি না জানি না। তবে একথা তুমিও নিশ্চয় মানবে যে তিলক ও মহাত্মাজী রাজনীতির অনাচারের মূলেই আঘাত করেছেন—সত্যকে পুরোপুরি না হ'লেও অনেকখানি মেলে। এ রকম ত্যাগী ও মহৎ আরো কয়েকজন একাজে যোগ দিয়েছেন, যেমন দেশবন্ধু কুরুম ও আরো অনেক অধ্যাতনামা তরুণ মহাপ্রাণ যুবক। এদের আদর্শেই আমার মন সাড়া দিয়েছে আজ—বিশেষ ক'রে পল্লবের সঙ্গে সম্পর্কে এসে তার মাধ্যমে আমাদের দেশের এ্যুগের আদর্শবাদীদের মতিগতি আশা স্বপ্নের সন্ধকে একটু ভিতরকার খবর পেয়ে। ফলে আমার একটা মস্ত লাভ হয়েছে এই যে, আমার চোখের ঠুলি খ'সে গেছে—আমি আমি দেখতে পেয়েছি দেশের কাজ একটা সত্যিকার আদর্শ, যেখানে সিনেমা হ'ল শুধু ইঞ্জিরবিলাস নয়, অতি নিকৃষ্ট স্তরের ইঞ্জিরবিলাস—অসার আনন্দ-প্রমোদের লোভে পথের পাথর খোরানো। ভালোই হ'ল—এ স্তরে তোমার সঙ্গে এবিষয়ে খোলাখুলি আলোচনা হ'লে। শেষে আর একটি কথা বলব: তোমার ভালোবাসাকে ভালোবাসা নাম দেওয়া চলে না! এ হ'ল একটা সুবিধার ভোগের স্বভাব: তুমি চাও একটি পুরুষ যে তোমার মন টানে অথচ তোমার তাঁবে থাকতে নারাজ নয়। তাকে তুমি স্বথের বিলাসের রূপ প্রচুর দেবে বৈ কি, নৈলে সে থাকবে কিসের লোভে? কিন্তু স্বথের স্বপ্ন সুবিধা যে চায় তার নাম না-মরদ, ভেড়ুয়া। আমি আর বাই হই না কেন—স্বথের ভেড়ুয়া নই—পুরুষ। তাই এবার বিদায় দাও আমাকে—কেবল ক্ষোভ না রেখে, আর যদি পারো তো আমাকে ক্ষমা করো এই ভেবে যে, আমি তোমার মনে হুঃখ দিতে চয়ে বলি নি যে সব কথা আজ বললাম: বলেছি—না বলে ঠিকার ছিল না বলেই—ভেলে জলে যে মিশ খায় না সে-দোষ তলোয় নয়, জলোয় নয়—সে দোষ—

এলিওনোরা কথাটা শেষ করবার আগেই ভেঙে পড়ল: বালিশে ঝুৎকে সে কী হুঁপিয়ে হুঁপিয়ে কাঁদা!

পল্লবের হৃদয় অল্পকম্পার আত্ম হ'লে ওঠে—ও পিঠে হাত রেখে দাঁক: এলিওনোরা—শোনো—আমি—বুহুককে—

কিন্তু এর পরে বুহুককে কী-ই বা বলবে?

খানিক বাদে মুখ তুলে এলিওনোরা বলে: আমার সবচেয়ে হুঃখ কী জানো পল? বিচ্ছেদ নয়। বিচ্ছেদ হুঃখের জানি—কিন্তু প্রেম যেখানে সত্য সেখানে গভীর বিচ্ছেদেরও ক্ষতিপূরণ মেলে অন্তরের এক অচিন উৎস থেকে। কিন্তু হুঃখ বাজে সবচেয়ে—যখন দেখি যে সত্যি তেমন ভালোবাসতে পারিনি, যদিও মনকে বুঝিয়েছি উঠো কথা।

বুহুককে সত্যি ভালোবাসিনি?

এলিওনোরা করুণ ভাবে মাথা নাড়ে: এর পরেও কেমন ক'রে তার নাম দেব—সত্যি ভালোবাসা? যদি সত্যি ভালোবাসতাম তবে কি এত আগুপিছু ভাবনা এসে আমার পথ আগলে দাঁড়াতে পারত—না, পরে কী হবে ভারতে চোখে অন্ধকার দেখতাম? সত্যি যে ভালোবাসে সে সব আগে ছাড়ে পরিণাম চিন্তা—এমন কি নিজের সার্থকতার চিন্তাও বিসর্জন দেয়। তার শুধু এক চিন্তা, এক সাধনা—কিসে তাকে সুখী করবে আর কাছে নিজের বা কিছু সব দিকেই আনন্দ। কিছু রাখতে গেলেই চিত্তদ্রাবি। বলে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে: বুহুক আমাকে চোখে আমাকে চোখে আঁড়ুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে আমার ভালোবাসার কোথায় খাদ। নিলে কি আমি ছাই সিনেমার কথা ভাবি—প্রায় তুলি ভারতবর্ষে গিয়ে যদি অসুখী হই?

পল্লব ওর হাতে হাত বুলাতে বলল: এ আত্মবিকার কেন এলিওনোরা? বুহুকই কি পারল তোমার জন্তে দেশছাড়া হতে?

এলিওনোরা মান হেসে বলল: ও বুখা সাধনা পল। বুহুক পুরুষ মানুষ। ওরা প্রেমে দেয় নিজের সবটা নয়—চার আনা মাত্র। আমরা, মেয়েরা, দিই বারো আনা—কর্তব্য ভেবে নয়, না দিয়ে পারি না বলে, এইই আমাদের প্রকৃতি বলে। তাই হার মানতে হয়েছে এখানে আমাকেই। বলতে বলতে ওর চোখ ফের জলে ভরে ওঠে: না ভাই না। আমার কোনো সাক্ষ্যই নেই। বলে না: Many are called but few are chosen? প্রেমের ক্ষেত্রেও তাই। আমি ভাক শুনেছিলাম সব ছাড়বার, কিন্তু পারলাম না সব ছাড়তে। কারণ আমি আহুত হ'য়েও বাহাল হ'তে চাইলাম না। তাই নিয়তি হেসে আমাকে পাশ কাটিয়ে গেলেন হুয়া দিয়ে: 'পেয়েছিলি তুই মস্ত সুযোগ কিন্তু পারলি না বাঁপ দিতে।' বলে একটু খেমে: অথচ দুদিন আগেও আমার প্রেম নিয়ে কত গৌরবই না করেছি মনে মনে—যখন বিখ্যাত সালভিনিকে প্রাণ্যস্থান ক'রে ভাক দিলাম এক অজাতকুলশীলকে। কিন্তু কাকি দিয়ে কাক ভরে না ভাই। তাই না মাসিক কুড়িয়ে পেয়েও কাজে এল না—পারলাম না রাখতে। অথচ উপায় কী বলো? যে-নদী সাগরের ডাক শুনেছে শুধু সেই চলতে পারে শুধু মোহানাকে জপ ক'রে। খাল বিল হ্রদ হাজার বড় হোক না কেন আপনাকে নিয়েই থাকে, তাই বা ছিল তাই থাকে—আরো বড় হ'তে পারে না কোনো দিনও।

কামেরিয়ারা এসে বলল: "সিঁতার বিদ্যাকি।"

[মাসিক বহুমতীতে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন বিশ্বাস ও নর্ভরযোগ্য]

পুরনো
অন্ধ-সংস্কার
নিষে
আপনার
উন্নত জীবনযাত্রার সুযোগ
নষ্ট করছেন কি ?



এমন অনেক লোক আছেন যারা কোন সুযোগই হাতছাড়া করেন না মনে ক'রে নিজেদের আধুনিক ব'লে গর্ব বোধ করেন। কিন্তু আসলে তাঁরাই অন্ধ-সংস্কার আর সেকেলে ধারণা আঁকড়ে থেকে নিজেদের সুযোগ নষ্ট করেন।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, রায়ার জন্তে স্নেহজাতীয় জিনিসের কথাই ধরুন। অনেকেই বলেন “বনস্পতি দিয়ে রাঁধা খাবার আমি কখনো খাই না। এটা একটা কৃত্রিম স্নেহ। কাজেই প্রাকৃতিক স্নেহপদার্থের মত ভাল হতেই পারে না।” অথচ, সত্যি কথা বলতে কি, একমাত্র তৈরী করতে মানুষের অসাধারণ যত্ন ছাড়া এর ভেতর কৃত্রিম ব'লে কিছুই নেই।

আগাগোড়া কঠোর নিয়ন্ত্রণ

বনস্পতি চিনাবাদ্য ও তিলের তেলে তৈরী একটি বিষাক্ত উদ্ভিজ্জ স্নেহপদার্থ। কঠোর নিয়ন্ত্রণাধীনে

পরিচালিত আধুনিক ও স্বাস্থ্যসম্মত কারখানায় বিশেষ প্রণালীতে বনস্পতি তৈরী হয়। এই বিষাক্ত স্নেহপদার্থ সহজেই হজম হয় ও সবরকম রায়ার পক্ষেই উৎকৃষ্ট—কারণ বনস্পতি দিয়ে রাঁধা খাবারের স্বাভাবিক স্বাদ ও গন্ধ নষ্ট হয় না। বনস্পতি কেনার ও ব্যবহারে খরচ কম... কারণ এর প্রতিটি আউন্সই খাঁটি ও পুষ্টিকর।

ভাল স্বাস্থ্য ও ভালভাবে বাঁচার জন্তে

বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে স্বাস্থ্য ও শক্তি বজায় রাখতে হলে প্রত্যেক মানুষের দৈনন্দিন অন্ততঃ দু' আউন্স স্নেহজাতীয় পদার্থ খাওয়া দরকার। বিষাক্ত ও স্বাস্থ্যহীন বনস্পতি অল্প খরচে আপনাকে এই সুযোগ দিচ্ছে। ভাল স্বাস্থ্য ও ভালভাবে বেঁচে থাকার জন্তে বনস্পতির ব্যবহার শুরু করুন আপনার উচিত নয় কি?

বনস্পতি — বাড়ীর গিরীর বন্ধু

মি বনস্পতি ম্যাসাকারার্স এসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড

১৯৫১

কবি কর্ণপুর-বিরচিত আনন্দ-বন্দাবন

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

অনুবাদক—শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

১। একদিকে গিরি গোবর্ধন, অপরদিকে শ্রীনন্দীশ্বর যমুনার
তীর ধরে অর্ধচন্দ্রাকারে, তাৎকালিক নিবাস হল শকটকুণ্ডলীর।

পূর্ব-ভূমিত যে (নন্দীশ্বর-বর্তিনী) রাজধানীটি এককাল অপ্রকট
ছিল সেই রাজধানীটাই যেন নিজগুণমাগন্ধার অন্তর্য্যায় অধুনা
প্রাকট্যলোভ করে বসল।

শ্রীহরির লীলাধামের সব কটরই নিত্য স্বর্গ যদিও খ্যাতি বা প্রমাণের
কোনো অপেক্ষা রাখে না, অর্থাৎ সু-স্বাদু, তবুও একটির মধ্যে
অপরটির এই মিলনবন্ধ সংঘটিত হওয়াতে এই ধামটির কোথাও মৃগমান
হল না অনিত্যতা। তেজ যেমন তেজের মধ্যে, জল যেমন জলের
মধ্যে লীন হয়ে যায়, পরিত্যজনীয়তা তার আর থাকে না, তেমনি
হল বৃহদাশ্রিতা পুরন্দ্রার দশা; তিনি আবিষ্ট হয়ে গেলেন
শ্রীগোবর্ধন ও কালির হৃদয়ের অন্তর্গতিনী এই শকটাবর্ত নামক
রাজধানীটির পুরস্কৃতিতে।

২। এক হয়ে গেলেন উভয় পুরস্কৃতি। এবং শ্রীবন্দাবন তখন
সর্বতোভাবে উপভোগ করতে লাগলেন তাঁদের উভয়েরি আশ্রয়শ্রী।
বর্ণনার অতীত হয়ে ঈড়াল তাঁর রামবীণক-সম্পত্তি।

গোপেরা এমন কি গোপীরাও আনন্দে উল্লাসিত হয়ে বাক্যাহাঙ্গ
হয়ে গেলেন শ্রীবন্দাবনকে দর্শন করে।

এই কি সেই বন্দাবন! নানাচিত্র-পতঙ্গিহারি বন্দাবন! কত
হরিণ, শঙ্খ-বৃগের কত সমাবেশ! কত গাছ, কত নিকুঞ্জ,
জল-জতা, দাঁধি, সায়র, পুষ্করিণী। ঝকঝক করছে কালিন্দীর
কত পুলিন। আর তার মধ্যে গিরি গোবর্ধনের ঐ অদ্ভুত প্রসন্নতা!

শ্রীবন্দাবনের ব্রজরাজপুরীতে প্রবেশ করলেন ব্রজরাজ।
সন্ন্যাস-আদি মুখ্য বোধেরা প্রবেশ করলেন স্ব স্ব প্রাসাদে। কারও
স্থানাভাব হল না এতটুকুও। গোশালায় গোশালায় গাভী; বিপশির
বীথিতে বীথিতে বনিক; চতুর্দিকে লোকান খুলে বসল মালাকর,
তাম্বুলিক।

৩। তবু সমস্তই কেমন যেন প্রকট হয়েও অপ্রকটের মত
লাগছে—এই ভাবনাটি ঘূর্ণ ঘূর্ণ করতে লাগল সামাজিক মনে। কেউ
ভুলতে পারলেন না এই ভাবটি। এই ভাবেই ভাবিত হয়ে
নগরবাসীরা নিবিষ্ট হয়ে গেলেন আপন আপন গৃহস্থে। পুলিন্দারও
বাদ পড়লো না। অভিনব ভূগাধানে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল গোধনের
প্রমোদ। এই বন্দাবনেই না জানি কতকাল যেন তারা রয়েছে;
তারা যেন বিম্বিত হয়ে গেল তাদের পূর্ববাস। সেবাধন বিতরণ করতে
লাগলেন শঙ্খপদ্মাদি নব নিধি। দাসীসং পরিচরণকীলা হয়ে উঠলেন
অধিনা লখিনা প্রাকাম্যাদি অষ্টসিদ্ধি। আর যিনি শ্রীভগবান তিনি
নিজের মর্মেই প্রকাশ করে রাখলেন মাঝে মাঝে প্রকাশ করে
ফেলতে লাগলেন নিঃস্বার্থ; হয়ে উঠলেন লীলাবালক, প্রকাশনের
দায়ক হল—তাঁর নিরংগল হর্নিবারতা।

৪। বন্দাবনে এসেই কিছু দিনের মধ্যে বালকুকের মধ্যে
আবির্ভূত হল বৎস-পালন-কমতা। এই কাজের জন্য যদিও অভাব
ছিল না উপযুক্ত দাস-কুমারের, তবুও বোধ হয় শ্রীভগবান তাঁর
তথাবিধ লীলাকৌতুক প্রকটনের উদ্দেশ্যেই ব্রজরাজের অন্তঃকরণে
প্রেরণ করেছিলেন একটি অভিসিদ্ধি। হঠাৎ ব্রজরাজের বিচারবুদ্ধি
ভট করে হয়ে বলে উঠল—অত্যন্ত সুকুমার হলোও পরম দুঃস্থ হয়ে উঠছে
কৃষ্ণ, ওকে এখন বৎসপালন করে নিযুক্ত রাখাই কর্তব্য।

ব্যবস্থা শুনে মা যশোদা, যিনি বাৎসল্যরসের শেষ সীমানা,—
তিনি শক্তিতা হয়ে উঠলেন। ব্যাপারটি বড় উপভোগ্য হবে না
বুঝতে পেরে, তিনি বাধা দিলেন, ব্রজরাজকে বললেন, দুধের ছেলেকে
নিয়ে হঠাৎ এ কী তোমার কাণ্ড! এখন থেকেই কষ্ট দিতে চাও?
কিন্তু লীলাবালক অবাক করে দিলেন সকলকে। অন্নান সুন্দরের
মোহন ভালে লীলা ভরে দুশে উঠল ডাড়া-ডাড়া চুলগুলি, বললেন—
মা, মা, এমন কথা মুখে আনিস নি মা! সত্যি মা, বাছুরগুলোকে
আমি বড় ভালবাসি। ওদের আমি পুষব, চোখে চোখে রাখব।
যদি মা তুই না করিস, আমার দরকার নেই তোর ভালবাসায়।
ও মা, তুই বল, খেলার সাথীদের নিয়ে এবার থেকে বাছুর চরাব।
আমি বাছুর চরাচ্ছি দেখলে পৃথিবীর সবাই কী খুশীটাই না হবে!

ছোট ছেলের মুখের বুলি—এতও মিষ্টি হয়! তার মিষ্টি আঘাতে
শিথিল হয়ে যায় সমস্ত সংকল্প, সমস্ত অভিমান। মা যশোদারও
বন্ধ হয়ে গেল মুখ। অনন্ত কৌতুক বোধ করলেন ব্রজরাজ,
আত্মাদে হৃদয় সমাচ্ছন্ন হয়ে গেল।

তারপরে একটি শুভদিন দেখে ব্রজরাজ স্বয়ং উপস্থিত হলেন
আভিনায়। কুকের সঙ্গে সঙ্গে এলেন বলভদ্র ও বালাসহচরেরা।
কয়েকটি বাছুরকে নিয়ে আসা হল তাঁর সম্মুখে। ব্রজরাজ পুত্রের
হাতে স্বয়ং ধরিয়ে দিলেন লালরঙের পাঁচনবাড়ি। ছড়ি হাতে
লীলাবালক চালিয়ে নিয়ে যেতে লাগলেন বৎসদের, আর ব্রজরাজ
পাছু পাছু চললেন লীলাবালকের।

৫। বাছুর হাঁকাতে হাঁকাতে ঘাড় ফিরিয়ে কৃষ্ণ দেখলেন—
পাছু পাছু পিতাও আসছেন, মাতাও আসছেন।

চাঁকর দিয়ে উঠলেন—

বাড়ী ফিরে যাও তোমরা। আমরা যে এখন কাজ করছি।
অত ভয় করিস নি যা!

ব্রজরাজ ব্রজেশ্বরী বলে উঠলেন—বেশ বেশ, কিন্তু দূরে বাসনি
যেন। এইখানেই আজ চরা। আর দেবী করিসনি যেন।
শীগগির করে ঘরে ফিরে আসিস কিন্তু।

পিতামাতাকে ফিরিয়ে দিয়ে সাথীদের সঙ্গে নিয়ে লাফিয়ে
লাফিয়ে স-বলরাম নন্দহুলালের সে কী বাছুর-চরানো কর্মকাণ্ড!
যেন কতদিনকার এই সন্ধ্যাস।

প্রথম দিন কেটে যায় বৎস-পালনের।

৬। তারপর প্রতিদিন বাছুর চরান শ্রীকৃষ্ণ। একটি একটি
করে দিন বার আর একটু একটু করে বেড়ে ওঠে তাঁর বিক্রম;
যেবার সঙ্গে সঙ্গে যেমন বাড়তে থাকে মানসিক উল্লাস। আর ঐ
উল্লাস-ভরা বৎসচারণ-লীলার প্রকাশ দেখতে দেখতে আনন্দে মুচ্ছা
যেতে থাকেন আকাশ-পাথের অমর পথিকেরা। তাঁরা অল্পভব
করেন এক অদ্ভুত আমোদের প্রেরণতা। ব্রজবাসীরা, সহচরেরা
এমন কি বলভদ্রও অল্পভব করেন সেই হর্ষ-প্রাচুর্যের বৈচিত্র্য। কীত

হয়ে ওঠে জনক-জননীৰ আনন্দ। আৰু আমাৰেও ঐ নন্দনুলল, যিনি নবীন বনৰীৰ মত ঠাঁৰ জীৱন্তৰ অমলভামলিমাৰ অকলমিকে জ্বলন্ত কৰে দিগে খেলতে থাকেন বাছুর-চৰানো খেলা, তিনি এমন লীলাকুশলী হয়ে ওঠেন যে, গোষ্ঠেৰ সমস্ত বাছুরই পৰ্য্যন্তক হয়ে ওঠে, তাৰা সবাই চায় তিনিই তাৰে চৰান। সানন্দে তাৰা চৰতে থাকে লাল টুকটুকে একটা পাঁচনবাড়িৰ শাসনে।

৭। এমনি কৰে দিন যায়। আৰু প্ৰতিদিন স্বৰ্গা ওঠাবাৰ আগেই শয়ন ছেড়ে উঠে পড়েন মা বশোদা। ত্ৰিভুবনৰ যিনি জন-পাবন-জননী সেই কৃষ্ণজননী, দয়াৰ শৰীৰ তাঁৰ, উত্থান দেন তুলসীকে। নিজৰ হাতে সব কিছুই যে তাঁৰ কৰা চাই। যুথ ধোয়ানো, তেল মাখানো, দান কৰানো, চন্দন মাখানো, গয়না পৰানো সবই কৰেন নিজৰ হাতে। তিনি ছাড়া আৰু কেই বা পাৰবে বল? অমন দামাল ছেলেকে সামলানো কি দায়-তাৰ কাজ? কত যে কৌশল কৰতে হয় মাঁকে।

তাৰপৰে খেয়ে-দেয়ে একটু জিৰিয়ে নন্দনুলল গোষ্ঠে যান। মা তাঁৰ সঙ্গ চলেন অৰ্ধেক পথ। আৰু ছেলেৰ মুখ থেকে যুতযুতঃ স্নেহে থাকে নিবেদন—ফিৰে যা মা, ও মা তুই ফিৰে যা।

সেই মধুৰ মধুৰ অতিমধুৰ বলি শুনে শেষে ভৱমানে ঘৰে ফিৰে আসেন মা। আৰু দাদা বলৱামৰ সঙ্গ নাচেতে নাচেতে চলতে থাকেন নন্দনুলল, ললিত বুক নাচেতে থাকে বিনোদ ফুলেৰ মালা। সুবল শুদাম চলেন তাঁদেৰ সঙ্গ। পৌছে যান গোষ্ঠে। গোষ্ঠে গিয়ে বাছুরেৰা কচি কচি শপাহুৰ ছিঁড়ে আশ্বাদ পায় নতুন বসেৰ, চৰতে থাকে আনন্দে। আৰু মজাৰ মজাৰ খেলাৰ মেতে ওঠেন বাগপোপালেৰ দল। কাটতে থাকে সুসময়।

তাৰপৰে ঠিক সময় বুখে ব্ৰজপুৰপৰমেশ্বৰীৰ কাছ থেকে আগু-পৰিজনৰ হাতে গোষ্ঠে এসে পৌছয় মাধ্যমিন ভোগ।

সে ভোগ—সুৰুৱাৰ কাব্যেৰ মত সরস, পুৰুষাৰ্থপাৰ্থেৰ মত সৰ্বদা চতুৰ্বিধ, পুৰুষাৰ্থ সাধনেৰ মত অজীতল-প্ৰায়, এবং বিশ্বেৰ মত প্ৰভুত অল্পময়। নন্দনুলল সহচৰদেৰ নিয়ে মিলে-মিলে গোল হয়ে খেতে বসেন সেই ভোগ। হাসি-পৰিহাসেৰ ছল্লোড় বয়ে যায় ভোজনকালে। ভোজনশেষে দীনোদ্ধাৰণ শ্ৰীকৃষ্ণ আবার চৰাতে থাকেন বাছুর, কাননে কাননে উঠতে থাকে কিকিণীৰ বগবকাৰ, কোমল চৰণতলেৰ কমল-স্পৰ্শ পেয়ে জুড়িয়ে যায় ধৰণীদেবীৰ হৃদয়েৰ আলা।

৮। তাৰপৰে ফুৰিয়ে যায় বেলা। বাছুরদেৰ গুণে-গোঁথে ঘৰেৰ পানে ফিৰতে থাকেন নন্দনুলল। ব্ৰজতিলক-বল্লভা জীৱশোদা পথৰ পানে নয়ন মেলে বসে থাকেন, কান পেতে শোনেন ফেৰা-গোষ্ঠেৰ আনন্দগান। যেন বসন্তদেৰ ঘৰে তুলতে আগ বাড়িয়ে ছুটে চলে যায় বাৎসল্যৰেৰ একখানি উৎকৰ্ষ।

৯। তুলসী স্বৰ্ণ ফিৰে আসেন ঘৰে, তখন অতো দাস-দাসী থাকা সত্ত্বেও নিজৰ হাতেই মা বশোদা আগৰ মতই তাঁৰ হাত-পা ধুইয়ে দেন, পৰিপাটি কৰে তাঁকে খাইয়ে দেন সাংগভোগ; তাৰপৰে, সন্ধ্যা পায় কৰে দিগে তাঁকে শয়নে দেন পৰাধি মূলেৰ পালকে।

১০। বৎসপালনদীয়াৰ মাত্ৰ কয়েকটি দিন কেটেছে, এমন সময় একদা, বাছুর চৰাতে চৰাতে শ্ৰীকৃষ্ণ হঠাৎ দেখতে পেলেন, ঠা

একটিবাৰ মাত্ৰ দেখেই বুঝতে পাৰলেন, জটনক কংসাত্মচৰ বাছুরেৰ আকৃতি ঘৰে জেৰে বাছুরদেৰ মধ্যে সবাৰ অলক্ষ্যে ঘূৰে বেড়াইছে। তিনি যেন একটা বৈষ্ণববেশধাৰী মহাশক্তিৰ ছবি; যেন পৰমত-লিপ্সায় আন্তিকতাৰ চিহ্ন উচিয়ে উপস্থিত হয়েছেন বৌদ্ধ চাৰীক; যেন সৰ্ব্বৰ হৰণেৰ লোভে মিত্ৰ সেজে দ্বায়ে এসেছেন চোৰ।

সৰ্বজ্ঞ চক্ৰচূড়ামণি শ্ৰীকৃষ্ণ বিপক্ষকে চিনতে পেরেই অগ্ৰজ বলৱামকে বললেন—

দাদা, ওটি কি আমাদেৰ জেৰে বাছুর না বাছুরেৰ নকল?

সচকিত নয়নে যতকণে জীৱলরাম সঙ্গলবলে সেটিকে দেখেছেন, ততকণে তাঁদেৰ স্বৰূপ নিৰ্ণয়েৰ পূৰ্বেই, শ্ৰীকৃষ্ণ তাঁৰ পদ্যেৰ পাণ্ডিৰ মত বামকরতল দিয়ে ধৰে ফেলেছেন বাছুরটীৰ পিছনেৰ জোড়া ঠ্যাং, আৰু মাথাৰ উপৰে অস্নাতচক্ৰেৰ মত ঘোঁৰাত ঘোঁৰাতে তাকে আছড়ে মেৰেছেন কপিথগাছৰ কাণ্ডে। যখন শ্ৰীং বেরুচ্ছ, তখন সে ধাৰণ কৰল তাঁৰ নিজৰ বিকৃত আকাৰ। যম-দমন পাঠিয়ে নিলেন তাকে শ্ৰীকৃষ্ণ।

১১। শ্ৰীকৃষ্ণেৰ এই শতঃবধ প্ৰীতিপ্ৰদ হয়ে উঠল স্তবঃভাৱ। প্ৰশংসায় মুগ্ধ হয়ে উঠলেন শিশু-ব্ৰজা, যদিও যিনি দুৰ্ঘট-দটনপটীয়া, যিনি দুৰ্দ্ধৰ-কৰ্মকৰী তাঁৰ পক্ষে এমন কিছুই অদ্ভুত নহ এই শতঃবধেৰ নগণতা।

১২। কিন্তু সেই সনয়ে অদ্ভুত হয়ে উঠেছিল শ্ৰীকৃষ্ণেৰ আকৃতি। সাধীদেৰ মধ্যে যিনি লীলাৰসেৰ মনোৰম আলম্বে ছিলেন মগ্ন, তিনি হয়ে উঠেছিলেৰ দম্ভজদমন, এবং তাঁকে উদ্ভাসিত কৰেছিল মহাপিচ্ছিল একটা জ্যোতিৰ্ভয়াত (পালস)।

তাৰপৰে গগনান্ধনেৰ শেষদীপায় যখন উপনীত হলেন অন্তৰাবি, এবং বশ্মিমালিত্বেৰ অনুশোচনায় যখন দান হয়ে এল তাম্বাস, তখন ব্ৰজ-চৰ বাছুরদেৰ অনুসরণ কৰে সখাদেৰ সঙ্গ নিয়ে ৰাজপুত্ৰীতে ফিৰে এলেন শ্ৰীকৃষ্ণ।

১৩। বাড়ী চুকেই ছেলেদেৰ কী কলৱব! মায়েৰা এসেছেন, যে ধীৰ ছেলে নিয়ে ঘৰে ফিৰবেন, কিন্তু কে শোনে তাঁদেৰ কথা? তাঁৰা প্ৰথমেই একদোড়ে পৌছে গেলেন ব্ৰজপুৰপৰমেশ্বৰীৰ কাছ এবং তাৰপৰেই চীংকাৰ কৰে বলতে লাগলেন—

উঃ, কী অগম্যচৰিত আপনাৰ ছেলে! আৰু দানবটাবই বা কী অদ্ভুত শৰীৰ! ঠিক কি একেবাৰে একটা নধৰ চোগজুড়োনা বাছুর! বিনাযুদ্ধে তাকে ভুলে আছড়ে মারলেন আনাদেৰ কৃষ্ণ।

১৪। ভগবান শিবকণ্ড তখন জনকজননী পৰিবৃত্ত হয়ে ঘৰ আলো কৰে বসে পড়লেন। তাঁকে যেন আৱতি কৰতে লাগল পৌৰজনেৰ আনন্দ। তাৰপৰে অকাদিনেৰ মতই সাধুস্তন প্ৰানাতুলেপন সাজ কৰে ব্ৰজৰাজেৰ সঙ্গ একত্ৰে সান্ধ্য-ভোজন কৰলেন সমাপ্ত। সুখস্বস্তিৰ মধ্য দিয়ে কাটিয়ে দিলেন বজ্জনী।

১৫। তাৰ পৰেৰ দিন, আকাশে তখনও দেখা দেননি স্বৰ্গদেব, শ্ৰীকৃষ্ণ আহাৰশেষে বুকৰ উপৰ হাৰ নাচাতে নাচাতে সহচৰদেৰ সঙ্গ এসে মিলিত হলেন। জীৱলরামও এলেন। বাছুরগুলিকে যথাবীতি সংগ্ৰহ কৰে চলে গেলেন বনান্তৰে। সেখানে গিয়ে দেখেন নতুন ঘাস গজিয়েছে, বনতল ছেয়ে আছে, জলাশয়েৰ ধাৰে ধাৰে নবাহুৰিত দূৰ্বাৰ মেহুৰ সমাৱোহ। বাছুরগুলিকে চৰতে দিলেন সেখানে।

১৬। অনন্তরসিক নবীন বংশপাল যখন সেখানে রাজার রাজ্য হয়ে বিরাজমান, তখন তিনি অনতিদূর থেকে দৃষ্টিগোচর হলেন এক দানবের। দানবটি আব কেউ নন, তিনি পুতনার সত্যোদর, কংস-সম্মত মহাবীর। অদ্বৈত বক পক্ষীর মত তাঁর শরীর। দানব-সংহতি বন্দনা করতেন তাঁর নীতি। তিনিও ভগবানের অমুসন্ধান ছিলেন—দৈবজ্ঞানপ্রাপ্তের মত। দৈবগতিক 'আচ্ছ' তিনি বুঝতে পারলেন, 'ইনিই তিনি।' বোঝাও যেই অমনি সেই বকদানব, —যেন পৃথিবীটাকে উগ দিয়ে উঠে 'তুলতে তুলতে নীচের চকুটিকে ধরীপুষ্টে এবং স্বর্গটাকে নীচের দিকে টেনে নামাতে নামাতে উপরের চকুটিকে আকাশপুষ্টে সঙ্গ কর দিলেন যুগপৎ। প্রচণ্ড ভয়ে ভাব-ভাঙন হল কৃষ্ণ-সত্যচরদের হৃদয়। আতঙ্ক-পঙ্কিল নয়নে তাঁরা দেখতে লাগলেন দানবপক্ষীকে; যেন তাঁদের সামনে বিরাট কালপুষ্ক, দেব-দুষ্ক-ময়ুজাদি সর্ষজীবের জীবনাকর্ণের সাসনায় বিশাল তাঁর সীমাবীটিকে বিফারিত করে বসেছেন দাঁড়িয়ে।

১৭। তাঁরা সভয়ে বলে উঠলেন—

সখা, এটি পক্ষী নয়। এ দানব। আমাদের সকলকে গিলে খাবার চেষ্টায় রয়েছে। বিপুল দস্ত্র রূপ ধারণ করেছে বক-পক্ষীর। এ ক্ষেত্রে আমাদের পক্ষে পলায়নই পথ। কিন্তু পালান কোথায়? কৈলাস পাহাড়ের চূড়ার চেরেও যে একাও ওব দেহ, তার চেরেও যে দীর্ঘ দীর্ঘতর ওব চকুপুটি।

সমস্তা ও মীমাংসার মধ্যপথেই মুহূনন্দ তান্ত করলেন লীলাবালক। বাস্তবের স্রষ্টা বসিয়ে বললেন—

তোমরা আমার প্রাণেব সমান। প্রাণ বাঁচাবার জন্যে অতো ভয়টা কিদের? মা ভৈঃ।

বলতে বলতে শ্রীকৃষ্ণ—যিনি অয্যর অকুতোভয়, যিনি অখিল লোকের অন্তরদাতা, যিনি ভুবনৈকবন্ধু, যিনি অমুপধিনিবরবধিকপৈকসিদ্ধ, তিনি হেলাভরে ধাবিত হলেন পক্ষীদানবের অভিমুখে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের অব্যাহত মহাপ্রভাব থাকিলেও তবে কি, দেবদ্রোহী সেই অসমসামান্য পামর তৎক্ষণাত্ তাব অতি করাল তুণ্ড বিস্তার করে লাঞ্ছিত গিলে ফেলল শ্রীকৃষ্ণকে। ফাল-ফাল কবে তাকিয়ে রইলেন দ্রাক্ষালোকের দেবতারা।

১৮। কী ঘোর সংকট! নিরুপায় হয়ে হার হার ধ্বনি তুলে চাঁৎকার দিয়ে উঠলেন বঙ্গরান। 'অতো কষ্টম্, অতো কষ্টম্' বলতে বলতে লজ্জায় মান খুঁইয়ে, দাব-বদনার চেতনা হারিয়ে, :চ্ছাঁ বাবার উপক্রম হল স্বর্গের দেবতাদের। কিন্তু ইতাবকাশে ঘটে গেল এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার!

শোকপ্রদ ভীতিপ্রদ অলস্ত এক পণ্ড অনলের মত শ্রীকৃষ্ণকে মুখের মধ্যে গ্রহণ করতেই যেন দাঁট দাঁট করে জলে গেল বকাসুরের ভালু। নতুন আমের পল্লব গিললে যে দশা হয় উত্তের, সেই দশা হল দানবের। গলায় ননীটিকে একবার কীচকার তো একবার কোলার। কী কাতর সঙ্কোচন, কী ব্যাকুল বিকার। আর তার সঙ্গে হুটো প্রচণ্ড ডানার সে কী অসম্ভব প্রকম্পন! শেষে গলা আর চোঁট কীক করে বকাসুর এক দমকে উদ্ধার করে বিপুলবেগে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিল কৃষ্ণকে, —যেন তার নিজেরই বেরিয়ে-বাওয়া প্রাণ।

২১। বাহুর গ্রাস থেকে চত্রেয় মত নিষ্কান্ত হলেন

লীলা-বালক। ঘনতর ঘনঘটার কোটর থেকে বেরিয়ে এলেন যেন কিরণমালা। হিমালয়ের গুহাকুহর থেকে বিনিষ্কান্ত হল যেন সিংহশাবক। নিবিড় তমসাসুর সংসার-কুপ থেকে যেন মুক্ত হলেন ভক্তজন।

বকাসুরের কণ্ঠকন্ডে বসন-ভূষণ সিদ্ধ হয়ে গেলেও সে কী অপূর্ণ শোভা তখন শ্রীকৃষ্ণের! বেরিয়ে এসেই তিনি বললেন—ভয় কোরা না।

সপ্রশ্ন মধুবতর সেই কলসর সখাদের দেহে নিয়ে এসে মুচ্ছার বিরতি। কিন্তু এক মুহূর্ত। তারপরেই সেই দানবপক্ষী পুনর্বার চকুপুটি বিঘটন করতে করতে ঠুকে খেতে এল শ্রীকৃষ্ণকে এগিয়ে। আসাও যেই অমনি শ্রীকৃষ্ণ... তাঁর বাম করকমল-কুটুম দিয়ে তার উর্দ্ধ চকু এবং দক্ষিণ করকমলকোশ দিয়ে তার অধরচকুটিকে ধারণ করে, —সহচর বালকদের হুংখশোকাহুভূতির সঙ্গে সঙ্গে, সম্ভাপভারনত অমরদের আন্তরিক হাস-জননের সঙ্গে সঙ্গে, হৃদ্যন্ত দমুজদৈতেব-পরিমদের হর্ষোৎপাতনের সঙ্গে সঙ্গে, —নিজের মুখকমলটিকে সহসা হাসিতে ফুটিয়ে দিয়ে, বীরণ-ভূগের মত হেলাভরে বিদীর্ণ করে ফেললেন বকাসুরকে। গলগল করে অনর্গল করে পড়তে লাগল অসুরের রক্তধারা, ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল নাড়ীনালা, খসে পড়তে লাগল খোলো খোলো চর্চি। স্থিখণ্ডিত হয়ে পতন হল বকাসুরের, যেন ধসে পড়ে গেল হু-হুটো শৈলশিখর।

২০। বকাসুরের পতনের সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গরাজ্যে আনন্দমদে প্রসুদিত হয়ে উঠলেন দেবতারা। সঘনে বর্ষণ করতে লাগলেন নন্দনকাননের গন্ধকুল। দেবক্রম ঘিরে গুঞ্জে মেতে উঠল দিবা ভ্রমরেরা; যেন তারা স্তব-নামিকাদের পুলকিত নয়নের সঙ্কল জলবিন্দু। আনন্দিত বিষয়ে দলে দলে নৃত্য কবে উঠল গন্ধর্গ-কিন্নর-যুবতীর দল। দিকে দিকে বেজে উঠল অভয় হুন্ডু। এবং মুনিগণ, ষাঁদের আহ্বান করেছিলেন বৈরবত মমু তাঁরাও উপলব্ধি করলেন পরমাশ্চর্য লীলার বিলাস, স্তবগান গেয়ে উঠল তাঁদের হৃদয়।

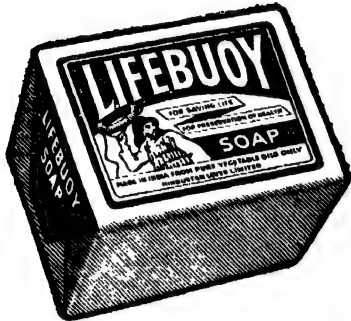
২১। আর এখানে কৃষ্ণসত্যচররা? প্রমোদের চাপে বৃষ্টি ভাঙে-ভাঙে তাঁদের হৃদয়। জনায় জনায় তাঁরা বৃকে জড়াতে লাগলেন তাঁদের কৃষ্ণপ্রাণকে, তাঁদের হৃদয়ানিধিখকে, ঐ বকারিকে। আর তাঁদের মধ্যে হেলে-তুলে শ্রীকৃষ্ণ বিচরণ করতে লাগলেন, যেন অনৈক করিপুঙ্গব।

তারপরে যখন বেলা পড়ে এল, তখন আর আর দিনের মতই সকলে সংগ্রহ করলেন বাহুরদের। তারপর তাঁদের লীলাময়টিকে মধ্যখানে নিয়ে, —তাঁর করকমলে তখন ললিত-ললিত কদম্বফুলের নাচে গেক্সা, —সেই তাঁদের সেই সকল সৌভাগ্যবান ভগবানটিকে নিয়ে, তাঁরা পৌছে গেলেন যশোদা-ভবনে। পৌছেই আর ঘর সর না। দৌড়ে গেলেন অজপুর-পরমেশ্বরীর কাছে। উৎকণ্ঠা সারথ্য করছে তাঁদের কণ্ঠে, অখচ পথপ্রসে ভরে আসছে তাঁদের ভাষা। উচ্চারণে তাই মাধুর্যের ভঙ্গি জুড়ে দিয়ে তাঁরা আত্মপাতি বলে গেলেন বকহনন-কথা। সব শেষে বললেন—

২২। মা জননি, এর পরে—এর চেয়ে আর অসম্ভব কিছু হয় না। এমন কাণ্ড কার না চোখ কপালে তোলে। মালমটি মেয়ে আজ বা সখা দেখিয়েছেন, ঠাা, তাকেই বলে পরাক্রম।

যাঁরা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন তাঁরা সবসময় **লাইফবয়** সাবান দিয়ে স্নান করেন ।

খোঁলাধুলোই বলুন বা কাজকর্মই
বলুন আমরা কখনই ধুলোময়লার থেকে
নিরাপদ নয় । আর ময়লা বহন
করে রোগের বীজানু বা সবসময়
আপনার স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতি-
কর । লাইফবয় সাবান এই
বীজানুগুলি ধুয়ে সাক করে
দেয় এবং আপনার স্বাস্থ্য
সুরক্ষিত রাখে ।
প্রত্যেকদিন লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান
করে আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখুন—
এটি আপনাকে এত করবারে করে তোলে ।



পৰ্বতের মত পাখী মা, পৰ্বতের মত পাখী। অহঙ্কারের পাল-পার্কণ। সঙ্কলকে গিলতে এল। কিন্তু চোখের পলক পড়তে না পড়তেই তানন্দলোপ। তোমার ঐ মূলের মত ছেলে ছ হাতের পদ্ম নাচিয়ে—কি বলব না—ছেলাভরে স্কন্ধ পাবকের মত বকটাকে উই, কী তার ধারালো চোটে, কী জোরালো তার নোকে বেকে চলা—পুণ্যের জোর তোমার মা জননি—এক নিমিষে কঁড়ে ফেললেন অশুরটাকে—যেন সে বেটা একগাছি বেণা-ঘাস।

২৩। বাছুর চরাতে যায় যে সব বাসকেরা তাদের ঘুথের ঝাণীকে কর্ণকৌতুক ফুগু হুল বটে ব্রজরাণীর কিন্তু সন্তু সঙ্গে শঙ্কর ডঙ্কা বাজল তাঁর হৃদয়ে। একদিকে কৌতুক অন্যদিকে শঙ্কা এ এক বিষয়কর হাত্তোদীপক পরিবেশ হয়ে দাঁড়াল! তাই ব্রহ্মেশ্বরী পুষ্পকৌদের দিকে চেয়ে সহসা বলে উঠলেন—

কী কপাল আমার। যে ভয়ে আমি ত্যাগ করলুম 'মহাবনে'র অবস্থান, ছায়, এখানেও কি সেই ক্রয়! সমস্ত কিছুই সেন উপড়ে ফেলতে চায় দৈত্যাসুর ভয়ঙ্কর উপদ্রব। ভাগ্যিস আমার পরমচকল ছেলেটির অশীম সাহস, তাই রক্ষে। এখন কোথায় বাই, কী করি। পোড়া বিধাতার যে কী ইচ্ছে তা কেমন করে জানি?

২৪। কণকাল চিহ্ন। বরলেন ব্রহ্মেশ্বরী। তারপর অভিনয়ের মতই যে বার বাড়ীতে পাঠিয়ে দিলেন কৃষ্ণসহচরনের। সমরোচিত অভ্যঙ্গন উত্তরনাদি সমাপন করালেন তনয়ের। ভালবাসাই মায়ের ব্যবসা। সন্ধ্যায় ছেলেকে খাইরে বীরে বীরে বললেন—

এবার থেকে তোকে ঘরেই থাকতে হবে, মনে-বনান্তরে বাছুর চরিয়ে ঘুরে বেড়ানো আর চলবে না। এ উৎসবে কেমা দে বাবা। বাছুর পাহারা দেবার অনেক লোক রয়েছে। আর তোকে অতো কষ্ট করতে হবে না।

জননীর মুখে এই জননীভিকর বচন শুনে, 'ও মা, তোমার এতটুকুও ভয়ের কিছু নেই মা, এরা সবাই মিছে কথা বলেছে মা। কেন মিছে ভাবিস যা—'

বলতে বলতে লীলাবালক অভিনয় করতে লেগে গেলেন মিত্রার। ডগবত্তা জননী তখন আর কী করেন। অতিপথ্য শগুনতলে ছেলেকে শুইয়ে দিয়ে তাকে আনয় করতে করতে ঘুম পাড়িয়ে দিলেন।

[ক্রমশঃ]

অপারগ

মায়ী মুখোপাধ্যায়

বিশ্ব-জুড়ে শ্রেণীযুক্ত, আত্মজয়ী মানুষের মন
দানবের বাসভূমি। এক দল বিকৃত প্রাণের
'অশ্বরী' আর্তনাদে কঁপে ওঠে কোমল শিশুর।
ব্রহ্মজয়ী যুগের নিশানা
উড়ছে বিরাট শৃঙ্গে—

[ভূতীয় (বিশ্ব) যুদ্ধের এগা কি স্থচনা ?]

অসংলগ্ন ভাবনায় নেয়
উড়ে উড়ে চলছেই।
উপগত সমস্তার ভীড়ে
হাবিয়েছি সেনিনের নীলভ অকাশ।
শূতা চাপের কাপে নিম্নল চুম্বক

গলা ভেজাবার এক অসম্য চেষ্ঠার,
শেষ নেই এর শুধু ক্লাস্তির ঝাপটে
নড়ে-চড়ে উঠে বসি।
অপারগ আমি, নয়াযুগ বিকল বধির
গহায়ু মাংস দেহে আজ শুধু চেয়ে চেয়ে দেখি।
শ্রুতির দ্রবীণ দিয়ে।
বাচবার তাগিদেই যেন
বেঁচে আছি দীপ্তিত হত্যাকে ছেড়ে।

বেশ লাগে

বকুল বসু

বেশ লাগে

নীলব হৃদয়ের দুজনে
পাতা-ঝরা বাগানে
হৃদয়ের অহুভব
বোসে বোসে ভাবতে।

বেশ লাগে

সোনা-ঝরা সন্ধ্যায়
চাঁদোয়া আলোয়
ঘাসভরা পার্কেতে
হাতে হাত দিয়ে বোসতে।

বেশ লাগে

চুপি চুপি নিভালার
হাত দু'টি ধোরে এনে
তোমার হাসি-ভরা মুখটি
মুখ দিয়ে বোঝতে।

বেশ লাগে

নিরিবিজি জগতে
তুমি সাথে থাকবে
আর নিশি-দিন জাগবে
ওই আমার ভালবাসতে।

ডু স্ব র্গ প রি ক্র ম

শ্রীশিবপ্রসাদ নাগ



কান্ধুসিয়াম বলেছিলেন—‘পৃথিবীর সর্বত্রই সৌন্দর্য আছে,

কিন্তু তা দেখবার মত চোখ কই?’ জাতিগত ভাবে দহিত হলেও বাঙ্গালীর কিছুটা চোখ আছে। যুগে যুগে এ-জাতির জীবন বছরব্যাপি বিড়ম্বিত হয়েছে আত্মসত্ত্বাণ হনু-কলহে, বৈদেশিক আক্রমণে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকে তার ওপরে যে-অভিশাপ নেমে এসেছে, তেমনটি বোধ হয় আর কখনও হয়নি। তবু এ-জাতির প্রাণশক্তির প্রাচুর্যে ভাটা পড়েনি। হয়ত এই প্রাণশক্তির উৎস খুঁজে পাওয়া যাবে তার রসবোধে, তার সৌন্দর্য-পূজায়। তাই স্কন্দরের আকর্ষণে সে ছুটে যায় ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত সামান্য অবসর পেলেই। আর কান্দীর? বাঙ্গালীর নাড়ীর সঙ্গে তার যেন একটা অচ্ছেদ্য যোগ আছে। বাংলার সমতল থেকে দেড় হাজার মাইল দূরে পর্বতবেষ্টিত ভূস্বর্গ কান্দীর তাই বাঙ্গালীর কাছে দূর নয়—‘যো বস্ত হৃদ্য ন হি তস্ত দূরম্।’ সত্যিই তো, হৃদয়ের যোগ থাকলে আবার দূর কি?

আগেকার দিনে মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর পক্ষে কান্দীর বেড়াতে যাওয়াটা কতকটা স্বপ্নের সামিল ছিল। এখন পথ ঘাট ভাল হয়েছে, ট্রেনে কনসেদান্ পাওয়া যায়, চোর-ডাকাতের ভয় নেই আর দল জুটিয়ে যাওয়াও সহজ। সুতরাং গত পূজোর ছুটিতে বহু বাঙ্গালী কান্দীর গিয়েছিলেন—কেউ বিমানে, কেউ মোটরে, বেশীর ভাগই ট্রেনে বাসে। সেপ্টেম্বরে অক্টোবরে সেবার প্রায় পঞ্চাশ হাজার যাত্রী গিয়েছিলেন—তার মধ্যে শতকরা নব্বই ভাগেরও বেশী বাঙ্গালী। আমরাও অবশ্য এই অভিযাত্রীদের অন্ততম ছিলাম।

দলে আমাদের এগারো জন—মহিলাই মেরিটি। লেডিস ক্লাব নীতি অনুসারে নয়, নিছক দক্ষতার জন্তেই দলের নেত্রীর স্থান অধিকার করেছিলেন চন্দননগরের শেফালী নন্দী—আমাদের শেফালী দি’। ব্যবস্থাপনার ভার এঁদের হাতে ছেড়ে দিয়ে আমরা পুরুষরা রীতিমত নিশ্চিন্তই ছিলাম। খরচ বাঁচিয়ে ডান হাতের ভালো ব্যবস্থা করা, নানা খুঁটিনাটি হিসেব রাখা আবার দরকার মত রূপসায়বে ভূব দেওয়া, একি আর আমাদের মত সাধারণ পুরুষের কাজ? সিকিউরিটি কন্ট্রোল থেকে পাশপোর্ট বোগাড় করা, রেলের কনসেদানের জন্ত ধরা দেওয়া, কামরা রিজার্ভ করা এ সবই করেছিলেন সঙ্গিনীরা।

তুষারপাত দেখবার ইচ্ছে ছিল বলে আমরা অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে, বেশ একটু বিলম্বেই, কান্দীর রওনা হই। রেলপথে কান্দীর দুটো পথে বাওয়া যায়; একটা হচ্ছে দিল্লী হয়ে আর একটা অমৃতসর দিয়ে। আমরা স্থির করি, দিল্লী হয়েই যাত্রা করব। কামরা রিজার্ভ করাই ছিল, সুতরাং বেশ শান্তিতেই যাত্রারম্ভ হোল। পরদিন দুপুরে

আমরা আগ্রা ফোর্টে নেমে যাই। অবশ্য এর জন্তে খেলারত হিন্দু হয়েছিল। রিজার্ভ কামরা আর মেজেনি। তৃতীয় দিন দুপুরে তুকার মেল ধরে কষ্টেফ’ট আমরা সন্ধ্যা নাগাদ পুন্ডান শিল্পোতে পৌঁছলাম। যাত্রাপথে রাজধানী দেখলাম দূর থেকে, আলোয় আলোকিত। সাত্বে এগারো বর্গ-মাইল জুড়ে ২৫ কোটি টাকার ‘ভারত ১৯৫৮’ প্রদর্শনী চলছিল। রাজধানীর চেয়ে কান্দীরের আকর্ষণই ছিল বেশী। তাই রাত্রি ৯টার কান্দীর মেল ধরলাম। তাজের মোহে একদিন আগ্রার কাটানোর রিজার্ভেসান ব্যবস্থা বাতিল হয়ে গিয়েছিল। ট্রেনটিতে পাঠান আর পাঞ্জাবীর ভিড়—গুরু ছাগলের মতই গাদাগাদি। মহাসমস্তার পড়লাম আমরা পর্বতপ্রমাণ লটবহর নিয়ে। স্কন্দর যুদ্ধের জয় সর্বত্র। মেয়েরা ঘেয়ে টেশান-মাষ্টারকে পাকড়াও করে একটি রিজার্ভ মেয়েদের কামরা নিজেদের জন্তে গুছিয়ে নিলেন। আমরা করেকজন আউট, অফ বাউন্স। কোন রকমে তেমাখা অবস্থায় রাতটা অগাধ কামরায় কাটিয়ে দিলাম।

পরদিন সকাল আটটার মেল পৌঁছল পাঠানকোট। রেল-লাইনের এইখানেই শেষ। এদিকে পাঠানকোটই পূর্ব-পাঞ্জাবের শেষ সীমা। হাওড়া থেকে টিকিট করার সময় বাসের ব্যবস্থাও করতে হয়। আমাদের বাসের নম্বর আগে থেকেই জানান ছিল। নেমে দেখিলাম বাস অপেক্ষা করছে। হিল্-সেক্সানে চলবার উপযোগী মজবুত, আরামী বাস। সিট-নম্বর অনুসারে বসতে হয়। ২২’২৪টির বেশী আসন থাকে না। ঝুলে যাওয়া বে-আইনী। ১টায় বাস ছাড়ল।

পাঠানকোট থেকে শ্রীনগর ২৬৭ মাইল, বিমান-পথে মাত্র ৪৫ মাইল। বাস-ভাড়া রিটার্ন ২৭ টাকা। হু’দিনের সফর। দুটো দিনের জেলখানা ভোগ করতে হবে ভেবে আমরা কিছুটা অস্বস্তি বোধ করছিলাম। কিন্তু কিছুদূর যাবার পরই আমাদের ভুল ভেঙ্গে গেল। যে নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখতে দেখতে চললাম, তার তুলনা মেলে না। হাওয়াই জাহাজে উড়ে গেলে পথের কষ্ট কম হয় সত্যি কিন্তু সে ‘অভাবনীয়ের কচিৎ কিরণে’ মন দীপ্ত হয়ে ওঠে না। পথে মাঝে মাঝে ১০।১৫ মিনিটের জন্ত বাস থামে, যাত্রীরা প্রয়োজনমত চা পান করেন, গা এলিয়ে বুকে বেড়ান।

রাভী নদী পেরিয়ে তিন মাইল আসবার পর আমরা জম্মু রাজ্যের প্রথম সহর লক্ষ্মণপুরে পৌঁছলাম। এখানে এসে গাড়ী ঠাড়িয়ে গেল। ভারতীয় সামরিক অফিসারেরা আমাদের পাশপোর্ট একে একে পরীক্ষা করলেন, কান্ধর মালপত্র টিপেটাপে দেখলেন। তারপর অল্লিয়ার। গাড়ী আবার চলল। ৬৭ মাইল সমতলভূমির

ওপর দিয়ে চলার পর আমরা এসে পৌঁছলাম জম্মু নগরীতে।
তখন হুপু। এখানে এক বন্দী বিজ্ঞান। এরই মধ্যে হান-
জোজন সেবে নিতে হল। জম্মুতে বাত্মীরে খাওয়া-দাওয়ার
অসুবিধে কিছু নেই। লোকানপাট প্রচুর। কিন্তু জলের অভাব।
বিখ্যাত রত্নাখ জীউর মন্দির বাস-ষ্ট্যাণ্ডের সামনেই। বিরাট
চকরের মধ্যে ঢুকেই বা দিকে প্রথমে নজরে পড়ে বোড়চক্রে
দণ্ডায়মান ভক্তবীর চমুমানজীর মূর্তির উপর। বিরাট মূর্তিটি
পাথরে খোদাই। মন্দিরের মধ্যে রামচন্দ্র, সীতাদেবী আর লক্ষ্মণ
অধিষ্ঠান কচ্ছেন। রামচন্দ্রের বর্ণ 'নবহীরদলজাম' নয়, কালো।
সববস্ত্র কালের খোপে রাম আর কৃষ্ণ এক হয়ে গেছেন। এখানে
চারপাশের ছোটখাট মন্দিরগুলিতে এক লক্ষ শালগ্রামশিলা আছে।
সে এক অভিনব ব্যাপার! সংগীতকালের ঐশ্বর্য্যর প্রশংসা করতে
হয়।

জম্মু সহরটি মোটের উপর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। রাজ্যটি
কাশ্মীরের সঙ্গে যুক্তভাবে শাসিত হয়। কাশ্মীরের ডগরা রাজাদের
জম্মু হচ্ছে নীচের রাজধানী। এ-রাজ্যের শতকরা ৯০-এর বেশী
হিন্দু। মাড়োয়াগী আর পাঞ্জাবী ব্যবসারী সর্বত্রই চোখে পড়ে।
শীতকালে জম্মু সহরে কনকনে ঠাণ্ডা পড়লেও তুষারপাত হয় না,
তবে সহর থেকে প্রায় ৪০ মাইল দূরে পাহাড়ে তুষারপাত হয়।
ঐ পাহাড়ে বিখ্যাত এক বিষ্ণুমন্দির আছে।

বেলা প্রায় আড়াইটার সময় আমাদের বাস সচল হোল।
মাইল খানেক যেতে না যেতেই চোখে পড়ল পর্বত-বিস্তার।
একটার পর একটা পাহাড় ঢেঁট খেলে চলে গেছে। ঐ পাহাড়
কেটে কেটেই সুন্দর শিচের রাস্তা করা হয়েছে। রাস্তাগুলি
বিসর্পিলগতিতে একে-বিকে পাহাড় কেটে ঘুরে ঘুরে উঠেছে আর
নেমেছে। ঐ পর্বতশ্রেণীর নাম পীরপঞ্জাল। ভারত বা
জম্মু থেকে ঐ পাহাড়গুলিই কাশ্মীরকে সিঁড়ির করে রেখেছে।
বিস্তার বড় কম নয়—প্রায় হুশো মাইল। কাশ্মীর সম্বন্ধে ধারণাটা
পরিষ্কার হয়ে ওঠে যদি ভাবা যায় যে, উত্তরদিকে তিনটে সমান্তরাল
রেখা পর পর পড়ে আছে। এর প্রথমটি হচ্ছে পীরপঞ্জাল
পর্বতশ্রেণী, তার পরেরটি কাশ্মীর উপত্যকা আর শেষেরটি হচ্ছে
কাশ্মীরের উত্তরে থাকে থাকে সাকান পাহাড়ের সারি, বার পরম
সেই সমগ্র উপত্যকাটিকে ঘিরে রক্ষা করছে।

মোটর বাস পাহাড়ের পর পাহাড় ঘুরে ঘুরে উঠে আবার ঘুরে ঘুরে
নেমে এগিয়ে চলল। কোনও কোনও পাহাড়ের উচ্চতা ন' হাজার
ফিট। কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস থেকে তিনেলে তাওয়া পর্যন্ত শৈত্যের
করেক ডিগ্রী অম্বুভব করলাম চড়াই আর উত্থাই-এর সময়। এই
পার্বত্যপথ অধিকাংশ স্থানেই সঙ্কীর্ণ, একটিমাত্র বাস চলবার মত।
তবে প্রতি মোড়ের মাথার দুটি বাসের পথ করে নেওয়ার মত
ব্যবস্থা আছে। হু তিন মিনিট পর পর এক একটা মোড় আসে
আর হর্ণ বাজিয়ে বাস মোড় ঘোবে। অত্যন্ত সতর্ক হয়ে মোড়
বুরতে হয় কারণ বিপরীত দিকের গাড়ীর সঙ্গে সামান্য ধাক্কা লাগলেই
করেক হাজার ফিট নীচে পড়ে কঙ্কাল দিয়ে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি
করতে হবে! তবে চালকেরা অত্যন্ত দক্ষ, দুর্ঘটনার সংবাদ এ
অঞ্চলে প্রায় শোনাই যায় না। ভারতীয় সামরিক বাহিনীর
কল্যাণে পথগুলি দিনরাত তদারক করা হচ্ছে। স্তব্ধতা বিপদ

থাকলেও শঙ্কা নেই। বদরীনাথের পথে যেতে বাসবাত্মীর আর
ডাইভারেরা ডগরানের নাম স্মরণ করেন। বাসের পেছনে
লেখা থাকে—'ডগরান, তুমিই একমাত্র সহায়।' নেপালের
ভিমশেদি থেকে কাঠমন্ডু পর্যন্ত রাস্তাটাও ঐরকমই বিপদসঙ্কুল।
কিন্তু ততটা বিপদের ভয় এখানের পার্বত্য-পথে নেই।
সামরিক গাড়ী আর মাল-বোঝাই ট্রাক সারাদিন ছুটে চলেছে।
তবুও ডাইভারদের রীতিমত বাজিয়ে নেওয়া হয়। ঝাঙ্ক চালক
ছাড়া এপথে মোটর চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। অবশ্য ঘন ঘন
মোড় ঘোরা, ন' হাজার ফিট উঁচু দিয়ে যাওয়া—ব্যাপারটা আটপোরে
আসো নয়। কেউ কেউ ভয়ে কাতর হয়েও পড়েন। শুনলাম
পাঞ্জাবী বীরপুরুষদের মধ্যে একজন এমনই ভয় পেয়েছিলেন যে,
প্রথমে তিনি মুচ্ছা যান, তারপর জ্ঞান ফিরে পেয়েও শ্রীনগর পর্যন্ত
আর চোখ খোলেন নি। বিমানে ফিরে গিয়েছিলেন। অবশ্য
ভেতো বাঙ্গালী হলেও আমাদের দলের কারুর ভায়া তত দুর্বল ছিল
না। তবে ঘন ঘন মোড় ঘোরার জন্তে মাথা ধরেছিল অনেকেরই,
আর কেউ কেউ মুখ দিয়ে ঢেলেও ফেলেছিলেন। ফেরবার সময়
একজন মধ্যবয়সী পাঞ্জাবী সৈনিককেও ঐ কথা করতে দেখেছি।

ভয় যে সকলেই কিছুটা পেয়ে থাকেন, তার পরিচয় মিলল বাসের
ভেতর থেকেই। কেউ কোনও কথা না বলে চুপচাপ বসে আছেন,
পাছে মোটর-চালকের মনের ওপর রেখাপাত হয়, তার হাত নড়ে চড়ে
যায়। আমরা কয়েকজন বেপরোয়া। মরলে অন্ততঃ খাটিয়ায় চেপে
মামুলি নিমতলায় যেতে হবে না ত! রীতিমত রজোহুণের খেলা
দেখিয়ে পীরপঞ্জালে মেহ-পঞ্জারকে রাখতে পারব! চাই কি, পীরের
দয়্যার নেহেস্ত-বাসেরও ব্যবস্থা হতে পারে!

অবাক-চমকে দেখছিলাম পাহাড়-কাটা আঁকারাকা বিচিত্র
পথগুলো; মাছা-এব পায়ে-চলা পুরাতন, পবিত্র পথগুলোও
নজরে এল। হুত এই পথ ধরেই ললিতাদিত্যের সৈন্য বাংলাদেশ
আক্রমণ করেছিল, আবার হুত ঐ পথ ধরেই রাজপুত্র গুণবন্ধু
দক্ষিণ ভারতে এসে জাহাজে চড়ে যবদ্বীপ আর চীনে গিয়ে
তথাগতের বাণী ছড়িয়েছিলেন।

দেখলাম দেশলাইয়ের বাস চলছে নীচের পথগুলো ধরে।
মিলিটারি ট্রাক আর বাত্রিবাহী বাসকে তাই মনে হচ্ছিল। দূরে
অগণ্য ভূসারমণ্ডিত পর্বতের চূড়া, সূর্য্যের সোনালী আলো পড়ার কি
তাদের জী! বাত্রাপথে পার্বত্য বর্ণাও চোখে পড়ল, পাশ কাটিয়ে
কয়েকটার চলেও গেলাম। নিস্তর, জামল পর্বতগুলির এক একটা
ভেদ ক'রে সাদা সাদা প্রাণময় স্রোত নীচে ঝরে পড়ছে। বন-ঝাউ,
দেবদারু আর পাইনের শ্রামলিমার মধ্যে এই বৈভবানীদের আবির্ভাব
মনের গহনে গভীর সংবেদন জাগিয়ে তোলে। ভূবর্গের উপযুক্ত
পরিবেশই বটে।

বিকেল নাগাদ আমরা এসে পৌঁছলাম কুদ্-এ। অপূর্ব
প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের জন্তে স্থানটির প্রসিদ্ধি আছে। এখানে বন্দী
আছেন কাশ্মীরের 'শের' শেখ আব্দুল্লাহ। লোকানপাট এখানে ভালই।
পনের মিনিট বিজ্ঞানের মধ্যে সবাই চা পান করলেন। চা-ওয়াল
আমার সঙ্গিনীদের এক গুচ্ছ ফুল এনে দিলেন। নামটা নাকি নাগিস।
আসল নামই ঐ, না এখানেও চিত্র-তারকারা আসর জাঁকিয়ে বসেছেন
কে জানে! কি দুর্নিবার আকর্ষণ তারকারের। এ-ধুণে জন্মালে

নতুনের অভিযান...



দিকে দিকে আজ নতুনের অভিযান—নবীন
শিশুর আত্মপ্রকাশের ক্রন্দন বয়ে নিয়ে আসে নতুনের সংকেত,
সাড়া জাগে লক্ষ মানুষের প্রাণে, তারা জেগে ওঠে, চেষ্টা
দিয়ে, কর্ম দিয়ে জাতিকে তারা নতুন করে গড়বেই.....মহৎ
কাজের প্রচেষ্টা থেকেই একদিন শান্তিময়,
ক্লান্তিময় পৃথিবীতে আনন্দ আর সুখ উৎসারিত হবে।
বৈচিত্র্য আর অভিনবত্ব জীবনকে করে তুলবে সুন্দরতর।
কালের জড়তা ভুলে অতীতের এক মহান
জাতিও আজ তাই জেগেছে, পেয়েছে সে নতুনের আশ্বাসন.....

আজ সমৃদ্ধির গোরবে আমাদের পণ্যজীব্য এ দেশের সমগ্র পারিবারিক পরিবেশকে
পরিচ্ছন্ন, সুস্থ ও সুখী করে রেখেছে। তবুও আমাদের প্রচেষ্টা এগিয়ে চলেছে
আগামীর পথে—সুন্দরতর জীবন মানের প্রয়োজনে মানুষের চেষ্টার সাথে সাথে
চাহিদাও বেড়ে যাবে। সে দিনের সে বিরাট চাহিদা মেটাতে আমরাও সদাই
প্রস্তুত রয়েছি আমাদের নতুন মত, নতুন পথ আর নতুন পণ্য নিয়ে।

আজও আগামীতেও...দেশের সেবায় হিন্দুস্থান লালভাণ্ডার

PR 2-X52 BQ

নিউটন হয়ত ওদের নিয়েই প্রিজমিয়া লিখতেন। ফুটি কিছ ভারী ভালো লাগল। প্রতিটি ফুল নব্বই ডিগ্রি কোণ করে আছে। সাদা তার রং, মুখের কাছটা ঈষৎ হলুদে। মুহু-মুহুর গন্ধ। অল্প কোথাও এ-ফুল আমাদের নজরে পড়েনি, এমন কি ত্রীনগরের মোগল উদ্যান-গুলিতেও নয়।

সন্ধ্যার আগে বানিহালে পৌছান সম্ভব হ'ল না—বাটোটে পৌঁছলাম। সন্ধ্যার পর অন্ধকারে গাড়ী বাবে না; রাত্রির বিপদের ঝুঁকি নেবে কে?

পাঠানকোটি থেকে ত্রীনগর পর্যন্ত পথে মধ্যে মধ্যে সরকারী ডাকবাংলো আছে জম্মু, উধামপুর, কুন্, বাটোটে, রামবাণ, বানিহাল, কাতিগুন্দ-এ। বাটোটের ডাকবাংলোটি বেশ বড়। রাস্তা থেকে পাথরের সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে আসতে হয়। তাড়াতাড়ি যেয়ে একটা বড় ঘর আমরা ভাড়া নিলাম। ভাড়া মাথা-পিছু আট আনা আর খাটিনা-পিছু এক টাকা। মালপত্র বাস থেকে নামিয়ে বাসের এনে বহাল-তরিকত হওয়া গেল। চাঁদনি রাত। ডাকবাংলোর চার পাশে মরুময়ী ফুলের সমারোহ। সামনের পাঁচাত্তালোতে দীর্ঘদেহ দেবদারু আর পাইনের সারি আর তার ওপর একটা হাফা কুয়াশা। রীতিমত ইডিলিক, একটা জীবন্ত কাব্য। স্টেটের 'মন্দারতরু'-এর দৈবী ভলোয়ার এককালিবার জলে ফেলার দিন এমন রূপময় চাঁদনি রাত ছিল কিনা জানি না। জুলিয়েটকে প্রেম নিবেদনের সময় রোমিও বলেছিলেন, 'এ হেন রাত'। কিন্তু সে-রাত কি এমন ছিল?

বাটোটে কয়েকটি হোটেল আছে, নিতান্ত মামুলি হোটেল। মালিকদের অধিকাংশই শিখ। আগ্রা থেকে দেখে আসছি যেটির গাড়ীর আর হোটেল-রেষ্টোরার ব্যবসায়ের একম একচেটিয়া করে ফেলেছে। দেশ-ভাগের ফলে ওরাও আমাদের মতই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পথের ভিখিরি হয়েছিল, কিন্তু সাহস, উত্তম, ঐক্যগোধ ওদের আজ আবার মানুষ করে তুলেছে। একটা শিখকে ভিক্ষা করতে কোথাও দেখলাম না। আর আমরা? এত গুল থাকা সত্ত্বেও এমন লক্ষ্মীছাড়া জাত আর আছে কোথায়? আত্মসম্মানবোধটা বোধ হয় আমরা হারিয়ে ফেলেছি।

বাটোটের হোটলে রুটি, ভাত, মাংস পাওয়া যায়; ভাতের স্বাদ আর জ্বাণ চমৎকার! জম্মুর বাসমতী চালের মতই সুগন্ধ। বাংলা দেশেও এ-চাল উৎপন্ন হয়, তবে কাশ্মীর ও জম্মুর মত এতো নয়। মাংসে রুচি এল না—বাটোকা গন্ধে ভরা। প্রথমে রান্নার দোষ বলে মনে হয়েছিল, পরে জানতে পেরেছিলাম সারা কাশ্মীরে পাঠা আর ছুয়ার মাংসের গন্ধ ঐ রকমই। একপ্রকার ঘাসই নাকি ঐ গন্ধের জন্মে দায়ী। মুগ্ধীর মাংস খুবই সুস্বাদু। বানিহাল থেকে আরম্ভ করে ত্রীনগর পর্যন্ত সর্বত্র আমরা এই 'নিষিদ্ধ মাংস' হৃদয় পেয়েছি।

রাত্রিতে বেশ ঠাণ্ডা পড়ল। সকাল সাতটায় বাস ছাড়বার কথা। একজনে পাঁচটায় উঠতে হোল। মেয়েরা ঠোঁত ঝেলে চা করে ফেললেন, টোষ্টও তৈরী হল। এক কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ-দম্পতি এখানে আমাদের সঙ্গে রাত্রিবাস করেছিলেন। তাঁরা কিছুই খেলেন না। পথে বল ছাড়া আর সব তাঁদের কাছে অসম্ভব।

সকাল সাতটায় বাস ছাড়লো। শীতে আমরা ঠক্কু করে কাঁপছি। ভারী কোটের ভিতরেও হাত পা কনকনিয়ে উঠছে।

একটা হাফা কুয়াশা তখনও চারদিক ছেঁয়ে আছে। দূর পাহাড়ের উচ্চতম চূড়ার সোনালি আভা দেখে বুঝলাম—তিমিরবিদ্যারের অভ্যাসই হয়েছে।

বন্ধুর মনোজ মুখার্জি চন্দননগরের গৌর-পিতাদের অন্ততম। অকৃতকার, বামপন্থী, আধা-দার্শনিক। হঠাৎ লুক্কম করলেন—গান লাগাও 'আমাদের যাত্রা হল সুর'। হেমপ্রভা, পুষ্প আর ততাদির গলা খাশা। তাঁরাই শুরু করলেন। সেই কুয়াশাভরা হিম-স্নিগ্ধ প্রভাতে কাশ্মীরের পথে ছড়িয়ে পড়ল বাংলার সঙ্গীত-সুরাভ। কবিগুরু সাধনা যে বিশ্বজনীন তা সেদিন অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করেছিলাম। বাসের মধ্যে যে এত জন অবাকালো ছিলেন তাঁরাও নিঃশব্দে সে-সুখ পান করছিলেন। বাংলা দেশ থেকে দেড় হাজার মাইল দূরে—আছি, একথা আমরা তুলেই গিয়েছিলাম। দূরের পর্বতরাজির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবছিলাম—যাত্রা ত শুরু হোল, কিন্তু চলেছি কোথায়? আত্মবিশ্মিত হয়ে ভাবছিলাম—এই ত সেই কাশ্মীর! কখাগিরিসাগর রচয়িতা কবি সোমদেব, দ্বিতীয় চালুক্য বংশের রাজা বিক্রমাদিত্যের সভাকবি বিহলন, যবদীপে বৌদ্ধধর্ম প্রচারক রাজপুত্র গুণবর্ধনের বেশের মাটির উপর দিয়ে চলেছি। মনে পড়ল 'ত্রিকাশ্মীরিক মহামাত্য চম্পক প্রভুপুত্র কল্লানকৃত' রাজতরঙ্গিনীর কথা—ভূষর্গের জন্মকথা থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত হিন্দু রাজাদের কাহিনী। প্রথম কল্লানকৃত থেকে ছটি মন্ডর কাল পর্যন্ত হিমালয়ের কুক্ষিদেব নিকটবর্তী ভূভাগ জলপূর্ণ ছিল। নাম ছিল তার সত্যসর। তারপর বৈবস্বত মন্বন্তরের সময়ে প্রজাপতি কাশ্যপ—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র প্রভৃতি দেবতাকে সেখানে এনে প্রস্রবণগুলির নিরোধ করলেন। ভূমিতে পরিণত হোল সরোবর। জন্ম হোল 'কাশ্মীর' প্রদেশের। তারপর কত অমিতবিক্রম রাজা রাজত্ব করলেন, গড়লেন কত পাথরের প্রাসাদ, কত মন্দির। মহাভাবতের যুগের কথা। জরাসন্ধের বন্ধু কাশ্মীররাজ গোলন্দ্রী কুক্ষের মধুনাপুরী অবরোধ করলেন। বহুকাল পরে খেতহুনপতি, 'দুহ্মতি' মিহিরকুল কাশ্মীররাজের অনুরূপে ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি হলেন। তারপর বিশ্বাসঘাতকতা করে করলেন কাশ্মীর আক্রমণ ও জয়। দুহ্মতি হলেও তিনি ত্রীনগরীতে প্রতিষ্ঠা করলেন মিহিরেশ্বর শিবের। তারপর রাজা সন্ধিমতি, মহাধাশ্বিক চন্দ্রাপীড়, ভ্রাতৃনিধনকারী তাগাপীড়, ললিতাদিত্য, জয়্যাপীড় অবন্তীবাহা, মেঘবাহনদেব, তুঙ্গ আরো কত রাজা রাজত্ব করলেন। ললিতাদিত্য কাশ্মীর থেকে পূবে প্রাগজ্যোতিষপুর, বঙ্গদেশ জয় করলেন। জয়্যাজ্য বা মণিপুর জয় করতে যেয়ে স্ত্রী-সেনাদের নয় বকোদেশ দেখে তাঁর সেনারা প্রায় ঘায়েল হয়েছিল। এই ললিতাদিত্যই চুরাশী হাজার তোলা সোনা দিয়ে নির্ধারণ করেছিলেন যুক্তাকেশব বিগ্রহ। তারপর নেপালরাজ অরমুড়ির সঙ্গে কাশ্মীররাজ জয়্যাপীড়ের যুদ্ধ ও পরাজয়। বিধবা রাণী সিন্ধার কাশ্মীর শাসন—রাজা তুঙ্গের সময়ে 'তুরঙ্গগণের' প্রথম আক্রমণ। মনে পড়ল প্রাতঃস্মরণীয় রাজপুত্র গুণবর্ধনের কথা। সিংহাসনের প্রলোভন ত্যাগ করে মহাভাবের আকর্ষণে তিনি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন। সমুদ্রপথে তিনি চীনেও গিয়েছিলেন। কে জানে কোথা থেকে তিনি চেপেছিলেন সেদিনের অর্ণবপোতে—হয়ত বাংলার তাম্রগিপ্ত থেকে, হয়ত দক্ষিণ ভারতের কেনও বন্দর থেকে। এই কাশ্মীরী রাজপুত্রই চীনে এক নতুন শিল্পরীতির

প্রবর্তন করেছিলেন। এই সেই প্রাচীন কাশ্মীর যার রাজকন্ডাকে বিবাহ করেছিলেন সপ্তম শতকের প্রথম পাদে তিব্বতের রাজা শ্রাবিট্‌সন্‌ গাম্পো। ইনিই ত কাশ্মীরের এক পণ্ডিতকে পাঠিয়ে কাশ্মীরী লিপি তিব্বতে নিয়ে এসে সামান্য অদলবদল করে, তিব্বতের জন্তে তা গ্রহণ করেছিলেন। তারপর পদ্মসম্ভব? চিত্রলের বিখ্যাত সন্ন্যাসী তিনি। অষ্টম শতকে নিমন্ত্রিত হয়ে তিনি তিব্বতে গিয়েছিলেন আর সেখানে তেঁরো বছর কাটিয়ে নানা ধর্মের প্রবর্তন করেন। তারপর ১০০০ খৃষ্টাব্দের কথা। তিব্বতী সুপণ্ডিত, সংস্কারক, সন্ন্যাসী রিন্‌ সেন্‌ বজান্‌-পো দেশে মন্দির নির্মাণ, ভাস্কর্য্য এবং চিত্র তৈরীর জন্তে কাশ্মীর, নেপাল এবং বাংলা থেকে শিল্পীদের আমন্ত্রণ করে তিব্বতে নিয়ে আসেন।

মনের রূপালি পর্দায় একটার পর একটা ছবি ভেসে আসছিল। একটা মৃদু শাক্তীয় আয়ত্বস্থ হলাম। হাজার বছরের যবনিকা আবার নেমে এস। গান কখন থেমে গিয়েছে। সঙ্গিনী পুষ্প বললে— কি ভাবছিলেন তন্ময় হ'য়ে?

বললাম—না, কিছু না। দূরের পাহাড়টার দিকে চেয়ে চেয়ে বোধ হয় একটু তন্দ্রা এসে গিয়েছিল।

পাথের ছোট একটা ঘটনা। বাসের দোলায় আমাদের জলের কুঁজের খুঁটা ভেঙ্গে গেল। সঙ্গী অগ্ন্যাগ্নী বাঙ্গালী যাত্রীরা বললেন— ফেলে দিন মশাই, কুঁজোটা। ভাস্সা কুঁজো অপয়া।

দলের অগ্নিমা কুণ্ঠে উঠল—না, আমরা ভাস্সাই নিয়ে যাব। যত সব কুসংস্কার!

অপর পক্ষ বললেন—বাসটার লুধু আপনাদাই যাচ্ছেন না, আমরাও যাচ্ছি। পাথে বিপদ হ'লে কে তার জন্তে দায়ী হবে? ফেলে দিন।

ধাঁধা বললেন তাঁরা সবাই পুরুষ, রীতিমত ভ্রম-দুরন্ত, বাঙ্গালী। অবাকালীরা মাইনরিটি। তাঁরা চুপ করেই ছিলেন। অতীতিকর পরিস্থিতি এড়ানোর জন্তে কুঁজোটা ফেলেই দিলাম। ভদ্রলোকদের দোষ দিই না। এসব পার্শ্বতাপথে মানুষের সংস্কার আপনাই সজাগ হয়ে ওঠে। যে ভগবান আর ভূত আলোকপ্রাপ্ত নাগরিকের কাছে আউট অফ বাউন্ডস্‌, তাঁবাও ন' হাজার ফিট উপরে পার্শ্বতাপথে বেশ কক্ক পান।

বেলা নটা নাগাদ আমরা বানিহালে পৌঁছলাম। স্থানটা নানা কারণে প্রসিদ্ধ। সামরিক গুরুত্বও আছে। এখানে চার মাইল সুড়ঙ্গপথ জাফ্রাণ এন্ড্রিনীয়াদের তত্ত্বাবধানে তৈরী চলছে। এই চার মাইলের জন্তে দু'শো মাইল পার্শ্বতাপথের ৪০ মাইল কমে যাবে। সুড়ঙ্গপথ আসলে দুটি—একটি পূবে আর একটি পশ্চিমে। পশ্চিমেরটি প্রথম তৈরী হয় হাক্কা ধরণের মোটরের জন্তে ১৯৫৬ সালে। সেটি মাঝে বন্ধ করে দিয়ে নতুন করে তৈরী হয়। সম্প্রতি এটি গত ২১শে ডিসেম্বর খুলে দেওয়া হয়েছে। এখন সব রকমের গাড়ী আর মানুষ এই টানেল দিয়ে যেতে পারবে। ১৮ মাইল পথ কমে গেল এই সুড়ঙ্গটির জন্তে। এর নাম দেওয়া হয়েছে “জহর টানেল”। প্রধান মন্ত্রী নেহরু কয়েক মাস আগে এর উদ্বোধন করেছেন। পূর্বের টানেলটি খোলা হবে ১৯৬০ সালে। কাজ এখনও চলছে। সুড়ঙ্গগুলির জন্তে মোট ব্যয়-বরাদ্দ চার কোটি টাকা।

বানিহালের প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম। পার্শ্বতানদী নীচে দিয়ে

বয়ে যাচ্ছে—চারিদিকে গ্রামশোভা, বিচিত্র রং-বাহার। এখানকার অধিবাসীদের প্রায় প্রত্যেকের বাড়ীতেই ফুলের বাগান। প্রকৃতির যে কতখানি ক্ষমতা মানুষের মনে রং ধরাবার তা এখানে এলে বেশ বোঝা যায়। বানিহালে বাস থামে যাবার সময় আধ ঘণ্টা, আসবার সময় এক ঘণ্টা। শিশিমাতে আসার চলা শুরু হোল। গত দিনের অবসাদ, মাথাধরা ইত্যাদি দলের কারুর আর ছিল না। চড়াই আর উৎরাই-এর জন্তে ভাবনাও মিলিয়ে গিয়েছিল। “শরীরের নাম মতাশয়, বা মতাও তাই সর।”

পুথে পড়ে ভেরীনাগ, শ্রীনগর থেকে ৬০ মাইল দূরে। শ্রীনগর যাবার পথে একটা মোড় ঘুরে ভিন্ন একটা পথ চলে গিয়েছে ভেরীনাগের দিকে। চার মাইল এই পথে ধীরে যেতে চান, তাঁদের মাথা-পিছু কিছু দক্ষিণা বাসওয়ালাকে দিতে হয়। ভেরীনাগে যেয়ে যে-দৃশ্য আমরা দেখলাম, তার তুলনা সারা কাশ্মীরে নেই বলেই শুনলাম, অন্ততঃ আমাদের চোখে পড়েনি। সবচেয়ে বিচিত্র আকর্ষণ হচ্ছে গভীর লাল রং-এর চীনার গাছগুলির। সারা কাশ্মীর উপত্যকার চীনারের প্রাচুর্য্য কিন্তু এমন মনমাতানো লাল রং আর কোথাও দেখিনি। চারিদিকের সবুজের মধ্যে প্রকৃতির এই ফাগুয়া, সুন্দর কেয়ারী-করা রং-বেরংয়ের ফুলের বাগান, প্রবহমান বিলামের ধারা, অদূরে দৃশ্যমান তুবারকিরীট শীর্ষভালের স্বর্ণকান্তি—সে দৃশ্য ভোলা যায় না। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ তা দেখলে পাগল হয়ে যেতেন! চীনার গাছ জন্মতে হ'ল-চারটে দেখেছি—খর্ব্বাকৃতি, বিবর্ণ। একমাত্র কাশ্মীর উপত্যকাতই এদের লালিমার বিকাশ। ষোড়শ শতকে সম্রাট আকবর পারস্য দেশ থেকে কয়েকটি চীনার গাছ এনে কাশ্মীরের মাটিতে লাগিয়ে দিয়েছিলেন। তারাই বংশবৃদ্ধি করে সারা কাশ্মীরকে আরও সৌন্দর্যময় করে তুলেছে। শ্রীনগরের এস, পি কলেজের অধ্যাপক জিলানী সাহেব আমাকে বলেছিলেন যে, পারস্যেও চীনার গাছ এত বড়, এত সুন্দর হয় না। কাশ্মীরীদের কাছে চীনার হচ্ছে জাতীয় বৃক্ষ। শালের ওপর চীনার পাতার ডিজাইন, আখরোট কাঠের চীনার পাতা, চীনার পাতা-ট্রে, পেপার-মাসির উপর চীনারের চিত্র—চীনার-প্রীতিরই বাহ্যপ্রকাশ। শীতের দিনে চীনারের পাতা দরজের কুটিরকে গরম করে রাখে। অস্তান্ত পাতার চেয়ে এর অগ্নিদেবকে সহ্য করবার ক্ষমতা বেশী। চীনার

রোগ, ধবল ও বৈজ্ঞানিক কেশ-চর্চা

ধবল, বিভিন্ন চর্মরোগ ও চুলের যাবতীয় রোগ ও জ্বররোগের বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার

পত্রালাপ বা সাক্ষাৎ করুন।

ডাঃ চ্যাটার্জীর ব্যাশন্যাল কিওর সেন্টার

৩৩, একতালিয়া রোড, কলিকাতা-১৯

সন্ধ্যা ৬টা—৮টা। কোন মং ৪৬-১৩৫৮

পাতার সঙ্গে গোবর মিশিয়ে কান্দীরায়া যে ঘণ্টে তৈরী করে, তার তাপ-খিকিরনের ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত বেশী আমাদের দেশের ঘণ্টের চেয়ে।

ভেরীনাগ হচ্ছে বিলাস নদীর উৎস। যুগ্মেরে যেমন সীতাকুণ্ড আছে, এই উৎসটিও তেমনি একটি কুণ্ড। ঠাণ্ডা, নীল তার জল। গভীরতা ৫৪ ফিট। উৎস বলে মনেই হয় না—এক শুষ্ক, নিখর এর জল। ট্রাউট মাছেবা শতে শতে পেলা করে বেড়াচ্ছে। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, প্রতি সেকেন্ডে ১৩৫ কুসেক পরিমিত জল নীচে থেকে ওপরে উঠছে! এটা বোঝা যায় কুণ্ডের বাইরে যেসে, যেখানে দিয়ে পাথরে বাঁধান অগভীর খাদ বেয়ে জলস্রোত ভীষণ বেগে বেরিয়ে যাচ্ছে। কুণ্ডের চারপাশে পাথরের তৈরী ঘর আছে। পাথর দিয়ে বাঁধানোর কাজ জাহাঙ্গীর ১৬২০ খৃষ্টাব্দে শুরু করেন আর শাহজাহান ১৬২৭ খৃষ্টাব্দে তা শেষ করেন। হিন্দু-আমলে ভেরীনাগের নাম ছিল নীলনাগ। নীলনাগ হচ্ছেন সর্পদেবতা। কহলনের 'রাজতরঙ্গিনী'তে আছে—নাগগণের আদেশে নীল নামক নাগ বিতস্তা নদীর প্রস্রবণকে আতপত্নহানীর করে সর্পিষা কান্দীরকে রক্ষা করেছেন। ভেরীনাগ, কোকরনাগ, অনন্তনাগ, শেবনাগ ইত্যাদিতে নাগের ছড়াছড়ি দেখে মনে হয়, এককালে অনু-অর্ধা নাগপূজা এখানে বেশ চলত। অবশ্য সেই নাগ এখন রূপান্তরিত হয়েছেন দেবাদিদেব মহাদেবে। ভেরীনাগে দেবপূজা এখন আর হয় না।

ভেরীনাগ দেখে আবার চার মাইল পিছু হটে জীনগরগামী পথে এসে পৌঁছলাম। ক্রমশঃ সমতল ভূমিতে এসে পড়লাম—পার্বত্য-পথের শেষ হোল। বেলা তখন একটা—জীনগরে পৌঁছলাম। বাস এসে সহরের মাঝখানে টুরিষ্ট রিসেপশান সেন্টারের বিস্তৃত চত্বরের মধ্যে প্রবেশ করল। এই কেন্দ্রটি একটি এন্-আকৃতির বড় দোতলা বাড়ীতে স্থাপন করা হয়েছে সম্প্রতি। নতুন বাড়ী—ঝকমকে তক্তককে; সামনে, আশে-পাশে ফুলগাছের সারি। কয়েক শ' গজ দূরেই পর্বতমালার উন্নত বিস্তার। সারা জম্মু আর কান্দীরের জমণ সংক্রান্ত অধিকর্তার অফিস এখানে। যাত্রীদের সুখসুবিধার দিকে তাঁর কড়া নজর। কান্দীরের শতকরা ২০ জন অধিবাসী ভ্রমণকারীদের উপর জীবিকার জ্ঞান নির্ভর করে, সরকারেরও প্রচুর আয় হয়। সুতরাং খাতকদের সুবিধে অনুবিধের দিকে নজর রাখতেই হয়। এই কেন্দ্রে বহিরাগতদের থাকবার জন্তে অনেকগুলি কামরা আছে। আকার হিসেবে তাদের ভাড়া। সাধারণতঃ একদিন মাত্র এখানে থাকতে দেওয়া হয়; তা'পর যার যেখানে খুসী—হোটেল বা হাউসবোটে চলে যান। অধিকর্তার নিজের অফিস দোতলায়। একতলার বড় হলঘরটার নানা বিষয়ে জ্ঞাতব্য তথ্য জানাবার আর বিভিন্ন স্থানে যাবার জন্ত বাসের টিকিটের কাউন্টার আছে। অফিসাররা সবাই ভদ্র আর সাহায্য করবার জন্তে সদাই উন্মুখ। একতলার আর দোতলার সিলিং কার্ভের তৈরী—কান্দীরী নক্সা করা। এখানে একটি ডাকঘরও আছে।

দৈনিক পনের টাকা ভাড়া কবুল করে একটা বড় ঘরে আমরা উঠলাম। কামরাটি অবশ্য তিন জনের থাকবার মত অর্ধা তিনটি মাত্র খাট আছে। কিন্তু ঢালাও গালিচার উপর প্রচুর যারগা—সহজেই সকলের শোবার ব্যবস্থা করা যায়। রাজা-মহারাজা-জমিদার

নই, নিতান্তই মধ্যবিত্ত আমরা। তিনজনের কামরাতাই এগানে জনের ব্যবস্থা করা হোল। এগানের পরিবেশটা এতই মনোরম যে, সহজে ছেড়ে যাবার ইচ্ছে কাকর দিল না।

টুরিষ্ট রিসেপশান সেন্টারে চায়ের জন্য একটি ভালো বেস্তোরা আছে। ভাত রুটি বাইরে খেয়ে আসতে হয়। রাজসিক পরিবেশে সে রাস্তিটায় আমাদের ভালই নিদ্রা হোল। পরদিন গুলমার্গ আর খেলনমার্গ যাওয়া স্থির হয়েছিল; টিকিট কাটা ছিল। সকাল সাড়ে ন'টায় বাস ছেড়ে যার। ভাড়া টনমার্গ পর্যন্ত যাত্রায় ২'২৫ টাকা। জীনগর থেকে টনমার্গের দূরত্ব ৩৪ মাইল। ওখান থেকে ঘোড়ার চেপে চার মাইল গেলে গুলমার্গ আর সেগান থেকে তিন মাইল দূরে খেলনমার্গ। টনমার্গ থেকে ক্রমশঃ পাহাড়ের উপরে উঠতে হয় তার উপর ঘোড়ার চড়া। ঘোড়া মানে ওয়েলার নয়, পাহাড়ী টাটু।

ধূতি আর শাড়ী পরে ঘোড়ার চড়ে পাহাড়ে ওঠা সম্ভব হলেও উচিত নয়—বিপদের ঝুঁকি আছে। তাই আমরা ইউরোপীয় পোষাকে সজ্জিত হয়েই গিয়েছিলাম। নেয়েটাও চোস্ত বা পাংলুন পরে, কেউ বা মারামি কাপড়ায় শাড়ী পেঁচিয়ে নিলেন। পাহাড়ের উপরে কনকনে ঠাণ্ডা বলে আঙ্গুল ঢাকবার জন্তে গ্লাভস্, গলার জন্তে পশমের মাফলার, পুরুষদের টুপী আর মেয়েদের হেড-স্কার্ফ নিয়ে যাওয়া দরকার। ওভারকোট জ্যাবাক্স। গ্রীষ্মকালে অবশ্য এসবের প্রয়োজন হয় না।

জীনগর সমুদ্রের লেভেল থেকে ৫২০০ ফিট উঁচু, গুলমার্গ ১৫০০ ফিট আর খেলনমার্গ ১১৫০০ ফিট। সুতরাং পূজোর ছুটিতে গেলে কনকনে ঠাণ্ডার জন্তে প্রস্তুত হয়ে যেতে হয় টনমার্গে পৌঁছতেই ঘোড়াওয়ালারা ঘোড়া নিয়ে ভিড় করে দাঁড়ায়। হুঁজুতে ঘোড়া আছে। একটু মোটাসোটা, চিকণ-চাক্ষুণ নাম ফার্ট' ক্লাস। রোট টনমার্গ থেকে গুলমার্গ হয়ে খেলনমার্গ পর্যন্ত ১৪ মাইল যাত্রায় বাবদ সাড়ে ছ' টাকা। একটু পংখীরাজ গোছের ঘোড়ার রোট সাড়ে পাঁচ টাকা। এর নাম সেকেন্ড ক্লাস। কলকাতার গুলমার্গ-ফেরত বন্ধুবা সাংখান বলে দিয়েছিলেন—ঘোড়াগুলোর স্বভাবই নাকি স্বাদেব শার বৈষে যাওয়া-হাজার লাগাম ধরে টান মারলেও পান বৈষে যাবেই। সুতরাং পৈতৃক প্রাণটা রাখবার ইচ্ছার আমরা পংখীরাজেই চড়া স্থির করলাম। অন্ততঃ ধীরে ধীরে ত যাবে।

প্রত্যেক ঘোড়ার সঙ্গে সহিস থাকে। সওয়ারীর সুখ-সুবিধের দিকে তার কড়া নজর। কারণ টাকাটা সিকেটা বকশিসের দ্যে প্রত্যাশা করে। তাকে হেঁটে হেঁটেই চড়াইয়ে উঠতে হয় মুক্তারাম বাবু স্ট্রীটের বন্ধুবর ভবানী আচ্য সন্তোকে গিয়েছিলেন; তাঁর গৃহিণী একটা সাদা ঘোড়ার চেপে সবাব আগে আগে চললেন—সহিসের সাহায্যও নিলেন না। মহিলাদের বোরবেশ দেখে মনে হোল—এঁরা বাঙ্গলার ঘরকুণো মেয়ে, না প্রমীলার দল? অবস্থা-বিশেষে মানুষ নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। বাঙ্গী বাঙ্গানে-ওয়াল বাঙ্গালীরও অসি ধরতে বেগ পেতে হয় না। সেই নিজ্ঞান পার্বত্যপথে, দেবদাক আর পাইন-অরণ্যের মধ্যে সঙ্গীর্ণ চড়াইয়ে আমরা ছিলাম সেদিন সবাই বঙ্গবাসী। ধীরে আগে গিয়ে ফিরছিলেন তাঁরাও। মনে হ'চ্ছিল আমরা যেন বাঙ্গলার দার্জিলিং-এই আছি।



প্রিয়াস

সুন্দরী
মহিলাদের
ঐতিহ্য!



প্রিয়াস সাবান—বিশুদ্ধ গ্লিসারিনযুক্ত সৌন্দর্য সাবান—আপনার
ত্বকের পক্ষে এত ভাল, আপনার সৌন্দর্যের পক্ষে এত নিরাপদ।
হৃগন্ধ প্রিয়াস সাবান আপনার সৌন্দর্যচর্চার নিত্য সঙ্গী হোক।
শিশুদের কোমল ত্বকের পক্ষেও প্রিয়াস আদর্শ।
প্রিয়াস ট্যালকাম, এত মণমণের মত মোলায়েম, এত অপূর্ণ হৃগন্ধ—
আপনাকে সারাদিন সতেজ, হৃন্দর রাখে। স্বপূর্ণ হাঁক! হলুদ-সবুজ-
সোনালী টিনে প্রিয়াস ট্যালকাম কিসুন।

ক্রমশঃ উপরে উঠতে লাগলাম। বুঝলাম, বন্ধুরা খাদ সম্বন্ধে নিতান্তই গুলমার্গের গুল ধরেছিলেন। ঠিকভাবে বসতে পারলে ঘোড়া নিরবধমতই যার আর খাদও তেমন গভীর নয়। গভীরতা কোথাও এক-কোমর, কোথায় এক-গলা। পড়ে গেলেও মরবার ভয় নেই, হাড়গোড় একটু-আধটু ভাঙতে পারে মাত্র। তবে ঘোড়ার সবাই ওস্তাদ। এ-পথ তারা ভালভাবেই চেনে। জল দেখলে, পথে কালা দেখলে পথ শুঁকে শুঁকে আস্তে আস্তে চলে। তার পর সহিস তো আছেই। ভয় হচ্ছে উংরাই-এর সময়। তখন যদি ভাড়াভাড়া নামবার লোভ সংবরণ করতে পারা যায়—ভয় কিছুই নেই। পারলে হেঁটে ওপরে ওঠা যে কষ্টকর! মালুম হোল সহিসদের দেখে। ওরা এ-পথের ঘূণ হ'লেও রীতিমত হাঁপাচ্ছিল।

কথা হচ্ছিল আমার সহিসের সঙ্গে—তাদের জীবনের সুখ-দুঃখের কথা নিয়ে। মাইনে পার ওরা মাসিক ১৫০ থেকে ২৫০ টাকা। এই সামান্য আয়ে চলে না—জমিজমাও কাকুর নেই। যাত্রীরা দয়া করে ব' বকশিস দেয়, তাতে কিছুটা সুরাহা হয়, তবে দুঃখ বোচেনা। প্রতিদিনের আর ঘোড়ার মালিকের। অবশ্য আর অনুসারে তাঁকেও সরকারকে কর দিতে হয়। কিন্তু তিনি মাত্র ঘোড়ার মালিক হয়ে, না খেটে জুন থেকে অক্টোবর-নভেম্বর পর্যন্ত ভালো আয়ই করেন। আর বেচারার সইস? এদের কথা কেউ ভাবে না। সহিস বললে—ভারত স্বাধীন হবার আগে গুলমার্গ ছিল বেতকারীদের একটা বড় আশ্রয়। হাজারে হাজারে তারা আসত, উংসবও হোত। সহিসদের মুখে তখন হাসি লেগে থাকত। আজও অনেক সাহেবের কার্টের বাড়ী অবশ্য পড়ে আছে। গুলমার্গে দেখলাম, কার্টের বাড়ীর চালু ছাদের ওপর শিশির জমে আছে। রোদে ক্রনশঃ গলে টুপটুপ করে পড়ছে। সহিস বললে—আপনাদের ভাগ্যি ভালো, আকাশ এখন পরিষ্কার। এখানে ২৪ দিন ছাড়া জল হয়। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হলে, নভেম্বরে কখনও কখনও তুষারপাতও হয়। অন্ততপক্ষে ঠাণ্ডাটা তখন অসহ্য হয়ে পড়ে।

অবশেষে সাড়ে ন'হাজার ফিট উঠতে গুলমার্গে পৌছলাম। ওপরটির বেশ খানিকটা সমতলভূমি আছে। এখানে কিছুকণ বিজ্রাম আর দুপূর্বের আহার সেরে চড়াই অভিযান। ছোট-বড় হোটেল, রেস্টোরাঁ এখানে অনেক। বোর্ডিং-এরও অভাব নেই। বারান্ট বড় বড় বোর্ডিং-হাউস আছে। এদের মধ্যে বাদশাহী মেজাজের হোটেল হচ্ছে 'নেহরু হোটেল'। দৈনিক খরচ ১৮০ টাকা থেকে ৪০০ টাকা। দৈনিক ৫০ টাকার নীচে কোনও হোটেল এখানে নেই। কান্স্ট্রার মহারাজার একটি প্রাসাদ আর ভারত সরকারের প্রতিনিধির থাকবার জগ্গে রেসিডেন্সীও আছে। এক সময়ে গুলমার্গের সমতলভূমিতে ইউরোপীয়রা গল্ফ খেলতেন। এখনও গ্রীনগরে আর গুলমার্গে সরকারী গল্ফ ক্লাব আছে।

কিছুকণ বিজ্রামের পর আবার চলা শুরু হোল। খেলনমার্গে ওঠবার তিন মাইল পথ এক এক বায়গায় বেশ সজ্জী। সন্ধ্যার দু'পাশে বিশাল, উন্নত দেবদারু আর পাইনেরা যেন সব সতর্ক প্রহরী। মহাশেবের প্রধান অল্পচর নন্দীর মত মুখে তর্জনি রেখে যেন বলছে—চুপ! ভাঙিসনে এই স্তম্ভতা! সত্যিই হিমালয়ের এই সব অঞ্চল মানুষের মনে একটা বিরাট অল্পভূতি জাগায়, ভাবা তখন শুরু হয়ে আসে। বতই উপরে উঠছিলাম, ততই নিঃশ্বাস নেওয়ার একটু যেন কষ্টবোধ

হচ্ছিল। ভাগীরথীর উৎস-সন্ধান যেরে আচার্য জগদীশচন্দ্র নন্দাবেরী পদস্থলে কেন মুচ্ছিত হয়ে পড়েছিলেন, তার কিছুটা অভাস পাওয়া গেল। প্রায় এক ঘণ্টা লাগল ওপরে উঠতে। ওপরে অপরূপ দৃশ্য! সত্যিকার তুষারের সঙ্গে প্রথম পরিচয় হোল। গাছের নীচে, কাঁকা বায়গায়, পাথরের ওপরে পেঁজা-পেঁজা তুলোর মত পড়ে আছে। আমরা শিশুর মত হয়ে গেলাম। সমতলভূমিবাসী বাঙ্গালীর তা' না হ'য়ে উপায় নেই। সেই পেঁজা তুলো হাতে নিয়ে এ ওর গায়ে একটু ছড়িয়ে দেওয়া গেল। ওপর থেকে চারিদিকের পাহাড়ের আর সমতলভূমির বিচিত্র দর্শন মেলে। আমাদের গাইড, বললে—ঐ দূরে দেখুন, নান্গা পর্বত—২৬,৬২০ ফিট। শুনলাম কান্স্ট্রারের অজ্ঞ এক স্থান থেকে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম পর্বত কে—২ বা গডউইন অস্টেনও (২৮,২৭৮ ফিট) দেখা যায়।

খেলনমার্গের ওপরে একটি চায়ের দোকান আছে। মালিক একজন শিখ। যাত্রীদের বসবার জগ্গে কয়েকখানি চেয়ার-টেবিলের ব্যবস্থাও ইনি করে রেখেছিলেন সমতলভূমিটুকুতে। ১৫ই নভেম্বরের পর আর থাকা চলে না, তাঁকে নেমে যেতে হয়। তখন তুষারপাত শুরু হবার সময়।

গুলমার্গ, খেলনমার্গ আর সোনামার্গে ঘোড়াই সবচেয়ে ভাল বাহন। পারলে হেঁটেও কেউ কেউ ওঠেন। তবে পাইনের ঝরা-পাতায় পা পিছলে পড়ে যাবার সম্ভাবনাও আছে। ঘোড়াই এ-পথে নিশ্চিন্ত বাহন। যারা বিশেষ দৃষ্টান্ত, তাঁদের পক্ষে ডাণ্ডী ছাড়া গতি নেই। খরচ কিছু বেশী পড়ে অবশ্য।

খেলনমার্গ থেকে নামবার সময় দেখা হোল একদল ভারতীয় সৈন্যের সঙ্গে। টহলদারী দল। ব্রেথগান, মেসিনগান, রাইফেল, তাঁবু ইত্যাদি নিয়ে এরা উঠে এলেন। জিজ্ঞাসা করে জানলাম, তাঁরা ৭ মাইল দূরে পাক-ভারত-সীমান্ত থেকে টহল দিয়ে ফিরছেন।

বসলাম—এতটা পথ এই ভাবে ভারী বোকা নিয়ে হেঁটে হেঁটে এলেন?

উত্তর দিলেন একজন—এ আর কি! দেশরক্ষার জগ্গে এতকু কষ্ট করতে হবে বৈ কি!

ভারী ভালো লাগলো যুবকের দুগু ভগ্নাট। ভাবলাম, সব ঠিক আছে। দেশরক্ষার জগ্গে জোয়ানদের উৎসাহের, আত্মত্যাগের অভাব নেই। শুধু কর্ণধারদের হেড-এ কিছু গোলমাল, এই যা।

নামবার সময় ঠিক হোল, গুলমার্গ থেকে বাকী চার মাইল হেঁটে নামা হবে, ঘোড়াওয়ালকে পুরো ভাড়া কবুল করেও। চোখ খুলে দৃশ্য দেখা ত বটেই, উংরাই-এর কঠোর অভিজ্ঞতাও হবে। মুষ্টি হল শুধু একজনকে নিয়ে—শুভাদি'কে। প্রস্থে তিনি আমাদের চেয়ে বেশী। অগ্নিমা ঠাণ্ডা করে বললে, শুভাদি', সাববান কিন্তু। মাস্ট্র ইন্টু ভেলসিটির ব্যাপার। দেখে-শুনে পা ফেলবেন! না হলে একেবারে বুলডার হয়ে গড়াবেন।

শুভাদি' রসিকতায় চটেন না। মুচকি হেসে সন্তর্পণে এগিয়ে চললেন।

বহু ইউরোপীয় পঞ্চটক কান্স্ট্রারকে 'প্রকৃতির কার্পেট' বলেছেন। কথাটা মিথ্যা নয়। সর্বত্রই আমরা প্রাকৃতিক স্ন-বাহার লক্ষ্য করেছি। কিন্তু গুলমার্গ থেকে টুনমার্গ পর্যন্ত হেঁটে নামবার সময় আমরা যা দেখলাম, বাস থেকে বা ঘোড়ায় চড়ে, তা দেখা সম্ভব নয়।

লাল, সবুজ আর হলদে রঙের খেলা। সবুজের সঙ্গে মিশেছে উপত্যকার লাল চীনারের রং আর মাঝে মাঝে প্যাটার্ন বুনেছে পাহাড়ের ওপরে হলদে পাতাওয়ালা গাছ। থাকে থাকে বেন এক একটি কার্পেট রচনা করেছে! পাহাড়ের ওপর থেকে নীচে প্রবাহমান পার্বত্য-নদীর রূপও অপূর্ণ দেখায়।

শ্রীনগরে ফেরবার পর বোড়ার চড়ার প্রতিক্রিয়া শুরু হোল। শরীরের সর্বত্র ব্যথা, পা বেন আর চলে না। দিন দুইরেক এই টনটনানি থাকে। ব্যথার চোটে মেয়েরা বললেন—সোনামার্গে আর নয়। অবশ্য পরে এই সিদ্ধান্ত বদলাতে হয়েছিল।

পাততাড়ি গুটিয়ে পরদিন যাত্রা করলাম পহলগাঁও। দেশী নাম পহলগাম। শ্রীনগর থেকে সোজা-পথে ৭২ মাইল। কোকরনাগ, অছাবল হয়ে কয়েকটি দর্শনীয় স্থান দেখে গেলে ১৫৫ মাইল। টুরিষ্টরা এই দ্বিতীয় পথটি বেছে নেন, কারণ, কোকরনাগ, অছাবল দেখবার মত। প্রথম পথের ভাড়া রিটার্ন ৫১০ টাকা আর দ্বিতীয়টির ৩১০ টাকা। সরকারী টুরিষ্ট বাসে ২২/২৪টি আসন থাকে, মোটশাট বায় মাথার উপরে। একদিন আগে থেকে টুরিষ্ট রিসেশান সেন্টারে টিকিট করে রাখলে আসন সব্বন্ধে নিশ্চিত থাকায়।

পহলগামের পথে সবচেয়ে বা চমক লাগায় তা হচ্ছে পপলার-এভেন্যু। সোজা, খাড়াই গাছগুলি। অনেকটা বৈদ্যুতিক খুঁটির মত। ওপরের দিকে ছোট ছোট কয়েকটা ডাল-পালা। বড় হ'লে গুড়ির রং হয়ে যায় সাদা। কান্দীরের অজ্ঞাতও এই রকম পপলার এভেন্যু করবার চেষ্টা করা হচ্ছে—চারি গাছ লাগান হয়েছে।

কোকরনাগে এসে বাস প্রথম থামল। এখানে তিনটি উৎস আছে। পাথর ভেদ করে বোরিয়েছে। জাহাঙ্গীর বাদশাহ চারদিক ঘিরিয়ে দিয়েছিলেন। চারদিকে পাথরের দেওয়াল আর তার মধ্যে বাগান। সর্বত্রই চীনারের দর্শন মেলে। অছাবলে উৎস ছাড়া স্নানর বাগান আর ট্রাউট মাছের সরকারী পরীক্ষাকেন্দ্র আছে।

দুপুরে পহলগাম পৌঁছলাম। পাহাড়ের মাঝখানে স্নানর, ছোট এই পল্লী। পথগুলি পিচ্ দিয়ে বাঁধান। কয়েকটি ভূমিমালের, মণিহারির আর সবজির দোকান আছে। শাল-কার্পেটের দোকানগুলিরই এখানে আভিজাত্য। কার্পেট, পাকা আর শাল এখানেও তৈরী হয়। কম-দামী কার্পেট আর গারবা কিনতে হলে শ্রীনগরের চেয়ে এ যায়গাই ভালো। একটি ডাকঘর আছে—মরশুম চালু থাকে। ১৫ই নভেম্বর বন্ধ হয়ে যায়। টুরিষ্টদের আহার ও বাসস্থানের জন্তে কয়েকটি ভালো হোটেল এখানে আছে। বাড়ীগুলি মূলতঃ কার্ঠর, কারণ, এ অরণ্য-সম্পদ এখানে প্রচুর। মালিকদের অধিকাংশই শিখ। পাঁচটি ভাল হোটেলের মধ্যে আমরা এসে উঠলাম পহলগাম হোটেলে। এ-হোটেলগুলির থাকা-খাওয়ার ব্যয় জন-প্রতি দৈনিক ১—১২।০ টাকা আর শুধু থাকার ব্যয় জন-প্রতি ৫—১০.০ টাকা। অবশ্য এ হিসেব মরশুমের। বৈ-মরশুমে অর্থাৎ নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে গেলে অপেক্ষাকৃত কম। অক্টোবরের শেষ সপ্তাহেই বাড়ীরা হোটেল ছেড়ে চলে যান, দোকানগুলিও বন্ধ হতে শুরু করে। তুষারপাত সাধারণতঃ ১৫ই নভেম্বর থেকে শুরু হয় কিন্তু তার আগে থেকেই আবহাওয়া কনকনে হয়ে ওঠে।

আমরা যখন পহলগামে এসে পৌঁছলাম, তখন চাঁদের হাট ভেঙ্গে

গিয়েছিল। অর্ধেক দোকান বন্ধ। পাঁচ মাসের জন্তে পাকপাকি ভাবে দরজার উপর কার্ঠর প্যানেল দিয়ে পেরেক চুকে বন্ধ। হোটেলও যাক্সি নেই। আমরা আর এক পাহাড়ী পরিবার। মাসখানেক আগে এই আধা—নিষ্কিনপূরী ছিল গুলজার। হোটেল ত তিলধারণের স্থান ছিল না, মাঠের মাঝখানে তাঁবুতে বাস করতে হয়েছিল। হোটেলের দুখানা কামরা ছুটেছিল সস্তা-তাই। সন্ধিনীদের কল্যাণে স্বপাক ভোজনও চলেছিল। তিন আনা সের আলু আর সওয়া পাঁচ টাকা সের খাটি যি। সুতরাং একটু খাটিগাটনি করলে এখানে খাওয়া ভালই জোটে।

শ্রীনগরের অনেকেই বারণ করেছিলেন ও সময়ে পহলগামে থাকতে। জমে যাবার নাকি সম্ভাবনা। দেখলাম কনকনে ঠাণ্ডা ঠিকই, তবে জমে যাবার মত নয়। ওখানের সকল লোককেই দেখেছি লম্বা পা-পর্যন্ত ঢিলে আলখান্না চাপিয়েছে জামার ওপর। প্রত্যেকের কাছে এক একটা আঙ্গোটি। বেত দিয়ে একটা ভাড়ের মত তৈরী করা হয়, ভেতরে থাকে একটা পোড়া মাটির পাত্র আর তাতে ফলস্বাদ অঙ্গার। একটা হাতল আছে। তাই ধরে আলখান্নার ভেতরে বকের কাছে আগুনটা রাখে। শ্রীনগরেও এই রীতি। তবে ডিসেম্বর থেকে এটা সার্বজনীন। সন্ধ্যার আগেই হোটলে কিরতে হত। তার পরে আর বাইরের ঠাণ্ডা সহ করা যায় না। দরজা-জানালা বন্ধ করে দিয়ে লেপ-কবল মুড়ি দিয়ে তোকা রাত কেটে গেছে। নভেম্বরেও বাড়ীরা



এসেছেন জীনগর থেকে। দিনের বেলা এসে দেখে-শুনে সন্ধ্যার আগে ফিরে গেছেন। আমরা কিন্তু পহলগামের দীর্ঘতক স্বাগত জানিয়েছিলাম।

এখানে তুষারপাত হয় আগস্ট। সাধারণতঃ ১৫ই নভেম্বরের পর থেকে আরম্ভ হয়। জীনগরে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকে। কিন্তু আজকাল নাকি উত্তরবিশেষ হচ্ছে। একজন কাশ্মীরী অধ্যাপক রহস্য করে বলেছিলেন, বোধ হয় রাশিয়ার আর্থিক বিক্ষোভের জন্মেই ঋতু-পর্যায়ে এই ব্যতিক্রম। পহলগামে তুষারপাত আট ফিট পর্যন্ত হয় আর জীনগরে ত্রিফিট। পাহাড়ের ওপর নাকি পঁচিশ ফিট তুষার জমে। এবার তুষার পড়েছে ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে আটচল্লিশ ঘণ্টা একটানা বৃষ্টিপাতের পর। তুষারপাত নাকি এবার এতই বেশী যে, ভারের চোটে বড় বড় গাছ পড়ে গেছে। মার্চের প্রথম দিকে এই তুষার কাশ্মীরের সর্বত্র গলতে থাকে, সারা মাস ধরে চলে এই গলানির কাজ। তখন পার্বত্য নদী আবার উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। বর্ষায় আর এভাবে উচ্ছ্বাস। মে-জুন মাস থেকে ভূ-বর্গ আবার শামলিমায় ঢাকা হতে শুরু করে, ফুলের বাগানগুলি আবার জেগে ওঠে, ডাল হ্রদে পদ্মের অরণ্য আসে প্রাণ-তরঙ্গ।

পহলগামেই আখ্‌রোট উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র। বারো আনা থেকে এক টাকা পর্যন্ত শ'। একশো প্রায় সওয়া সের। কলকাতায় তাব দাম প্রায় পাঁচ গুণ। আপেলও দশ-বারো আনা সের। জীনগরেও তাই। অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত নাকি আপেল চার আনা সের ছিল। আখ্‌রোট গাছ এখানে গ্রামাঞ্চলে প্রচুর। বড় বড় গাছ—আমাদের আম-জামগাছের মত। এর কাঠ থেকেই নানা কাঠের খেলনা তৈরী হয়। বাদামও প্রচুর পাওয়া যায়। ছাড়া নো বাদামের দাম সাড়ে তিন টাকা সের, কলকাতায় আট টাকা।

আমাদের হোটেলের সামনে দিয়েই প্রবাহিত শেমনাগ নদী বা নীলগঙ্গা। জলস্রোত প্রখর কিন্তু হেটে পেরিয়ে যাওয়া যায় যদি সাহস থাকে। রাত্রিতে চাষিদিগের নিশ্চিন্ততার মধ্যে নীলগঙ্গার গুরুগম্ভীর ধ্বনি দূরগত সমুদ্রের গর্জনকে স্মরণ করিয়ে দেয়। অমরনাথের পথে কিছুটা এগিয়ে গেলে পহলগামের শুরু সৌন্দর্য্য অভিভূত করে ফেলে। এখানকার জলহাওয়া অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর,



পহলগাম : অমরনাথের পথে।

জীনগরের চেয়ে ভালো। ধীরে নাগরিক জীবনের জঞ্জাল থেকে কর্তৃক মুক্তির জন্যে কাশ্মীরে আসেন, তাঁদের এখানে কয়েক দিন কাটিয়ে যাওয়া দরকার। এমন নার্ভটিক খুব কমই আছে।

আশে-পাশের গ্রামে আমরা গিয়েছি, কৃষকদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনাও হয়েছে। আমাদের দেশের চাষীদের তুলনায় এরা আরও দরিদ্র। এদের ছেলেমেয়েরা বাঁকী দেখলেই হাত পাতে। স্বন্দর কচিকচি মুগ্ধলিকে হাত পাতে দেখলে সত্যিই হৃৎকম্প হয়। বাংলায় দারিদ্র্যের চিত্র-অধিষ্ঠান। মানুষকে ডাষ্টবিন থেকে কুকুরের সঙ্গে আহাৰ খুঁজতে আমরা দেখেছি। আমাদেরই দেশে পকাশের মনস্তত্ত্বে প্রায় পকাশত্রিলোক প্রাণ দিয়েছে। তাবু এদের দারিদ্র্য প্রাণে আঘাত দেয়। প্রকৃতিদুঃখোনে ভূবর্গ রচনা করেছেন অকল্পণ তাত্বে, যে-দেশের মানুষকে এত রূপও তিনি দিয়েছেন, সে-দেশে অলক্ষ্যের আবাস মনকে ভারাক্রান্ত না করে পারে না।

জিজ্ঞাসা করলাম এক কৃষককে—এত লোক তুষারপাতের ভয়ে চলে যাচ্ছে, তোমরা যাবে না?

উত্তর এলো—কোথায় যাব বাবু? বাদের পরশা আছে, বাবার জাগ্রতা আছে, তাবাই এখান থেকে অনন্তনাগ বা জীনগরের দিকে চলে যাবে। আমাদের নড়বার উপায় নেই।

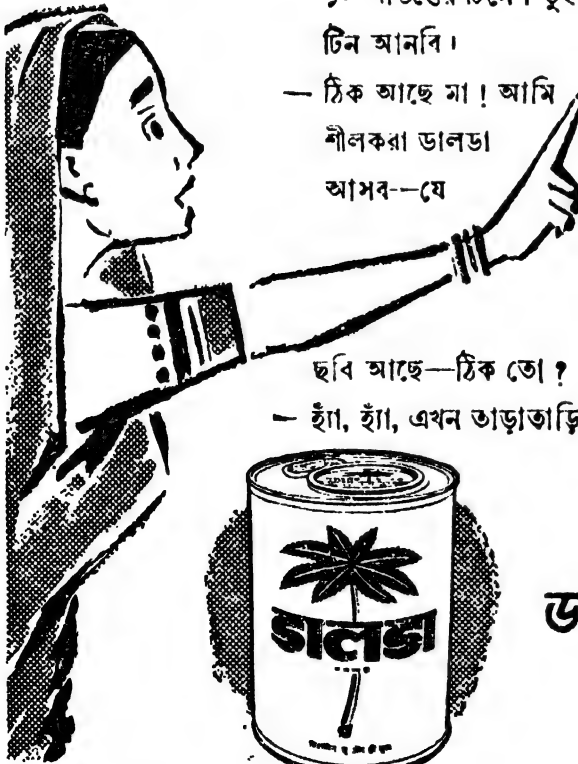
বললাম—তুনেছি এখানে নাকি আট ফিট বরফ জমে যাবে? তাহলে তোমরা টিকে থাকো কি করে? খাও কি?

উত্তর দেয়—প্রতিদিন দরকারমতো তুষার কেটে সরিয়ে দিই। দিন-রাত আশ্রয় ঘেলে রাখতে হয় ঘরের ভেতর। তার জন্মে আগে-ভাগেই কাঠ জোগাড় করে রাখি, জঙ্গল থেকে কেটে এনে। মাঝে মাঝে জন্মে চাল আর ভুট্টাও জোগাড় করি। তাই বেশ বসে থাকি। কোনো রকমে বেঁচে থাকি। সয়ে গেছে।

এদের ঘরগুলি লীহীন, বেশীভাগই আব-ভাগ। পল্লীর পথগুলিও পরিচ্ছন্ন নয়। কিনা পরসার শিক্ষার ব্যবস্থা থাকলেও, সে-স্বযোগ নিতে পারে না। ছেলেমেয়েকে স্থলে পাঠিয়ে করবে কি? মাঠের কাজে সাহায্য করবে কে? শের-ই-কাশ্মীর এদের জন্যে কিছুই করেননি। গোলাম মহম্মদ এখনও কিছু ক'রে উঠতে পারেননি। তবে চার আনা সের দরে কনট্রোল চালের ব্যবস্থা করে কিছুটা স্ববাহা করা হয়েছে। জীনগরে দেখছি এক ছটাক চাল যাতে চোরাকারাবারী খপ্পরে না পড়ে তার জন্মে প্রতি বাসে জোর খোজাই হয়। কাশ্মীরী পুলিশ আর ভারতীয় সামরিক বাহিনীকে দিয়েই এই কাজ করানো হয়। অপর পশ্চিম বাংলায়? জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটরা হতাশার স্বরে বলেন, এমনই আইনের কাঁক যে, চোরাদের চালানী কারবার চোখের সামনে চলতে দেখেও ঠুটো জগল্লাথ হ'য়ে তাঁদের বসে থাকতে হয়। সুতরাং চালের দাম বাংলায় তেত্রিশ টাকা মণ হবেই!

পহলগাম হয়ে দুটো ঘণ্টা বড় রাস্তা চলে গেছে—একটা গেছে আক-লিন্দেওয়াত্, হয়ে কোলাহয় গ্রেসিয়ারের দিকে কুড়ি মাইল দূরে। আর একটা 'গিয়েছে চন্দনওয়ারী-শেমনাগ-ওয়াবজান-পক'তনৌ হয়ে অমরনাথের গুহার ২৮ মাইল দূরে। যেখানে চড়ে চন্দনওয়ারী পথস্থ বাওয়া চলে, তারপর পারে হাঁটা ছাড়া গতি নেই। কোলাহয় গ্রেসিয়ারও হাঁটা-পথের শেষে। সেপ্টেম্বরের পরে আর ঐ হুটো যায়গায় বাওয়া অসম্ভব না হলেও নিরাপদ নয়। সুতরাং আমাদের ভাগ্যে হুটোর কোনটাই হয়নি। [ক্রমশঃ]

বোকা চাকর- বুদ্ধিমতী গিল্লী



- মা আপনি যে 'ডালডা' চাইছেন তা আমি কেমন করে খুঁজে পাব ?
- ঠিক। নাম তো তুই পড়তে পারবিনা কিন্তু— 'ডালডা' টিনের ওপর থাকে খেজুর গাছের ছবি।
- ও এখন মনে পড়েছে ! আচ্ছা মা, বাটি কবে আনব না বড় কিছু একটা নিয়ে যাব ?
- ছর সবজাস্তা ! 'ডালডা' কখনও খোলা বিন্দী হয় না। 'ডালডা' পাওয়া যায় একমাত্র শীলকরা টিনে।
- যাতে কেউ চুরী না করতে পারে ?
- হ্যাঁ, তাছাড়া শীলকরা টিনে মাছি ময়লা বসতে পারেনা, ভেজালের ভয় থাকে না। স্বাস্থ্য খারাপ হওয়ারও ভয় নেই।
- ও সেই জনোই সব বাড়ীতে 'ডালডা' দেয়া যায় !
- হ্যাঁ, কিন্তু কত ওজনের টিন আনবি বল তো ?
- যেটা পাওয়া যায়।
- 'ডালডা' পাওয়া যায় ½, ১, ২, ৫ আর ১০ পাউন্ডের টিনে। তুই একটা ৫ পাউন্ডের টিন আনবি।
- ঠিক আছে মা ! আমি একটা ৫ পাউন্ডের শীলকরা ডালডা মার্কা বনস্পতির টিন নিয়ে আসব—যে টিনের ওপর খেজুর গাছের

ছবি আছে—ঠিক তো ?

— হ্যাঁ, হ্যাঁ, এখন তাড়াতাড়ি কর।



ডালডা বনস্পতি দিয়ে রাঁধুন

স্বাস্থ্য ও শক্তি সংরক্ষণ করুন



২

আবার সেই বৃদ্ধা

কমলেশ যে আবার সেই বৃদ্ধার কাছেই গিয়েছিল একথা কাউকে জানায়নি, পাছে এই নিয়ে সবাই হাসি ঠাট্টা করে। বিজ্ঞাপীঠের নানা কাজের মধ্যে সে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছে। ভুলতে চেয়েছে সেই বন্ধপূরীর কথা, সেই বৃদ্ধার কথা।

সারাদিনে তাদের কত রকম কাজ। সকালবেলা উঠে প্রভাত-ফেরিতে যোগ দিতে হয়। এই নতুন গড়ে-উঠা কলোনীর সব ছেলে মেয়েরাই ভোরবেলা গান করতে করতে চারদিকটা ঘুরে আসে।

প্রথম দিন অবশ্য কমলেশ আর প্রশান্ত অবাক হয়েছিল খুব। প্রভাতফেরির কথা তারা জানতো না। ভোরবেলা ওদের ঘুম ভেঙ্গে যায়। তখনো চারদিকে অন্ধকার, কাকেরা সব ডাকতে শুরু করেছে। গম্ভীর আওয়াজে তাদের মন নেচে উঠে। কিসের ধ্বনি!

বাইরে বেরিয়ে এসে দেখে গান করতে করতে ছেলেমেয়ের দল এগিয়ে আসছে। শব্দবল তাদের মধ্যে রয়েছে, সামনের দিকে। কমলেশদের দেখে হাত মেড়ে ডাকে, আরে তোরা আমাদের সঙ্গে যোগ দে।

—এ কি শব্দবল?

—প্রভাতফেরি।

—কিন্তু আমি তো গান করতে পারি না।

—তাতে কি হয়েছে গেয়ে দেখ ঠিক পারবি।

কমলেশ আর প্রশান্ত ওদের দলের সঙ্গে মিশে যায়। সব মিলিয়ে গেয়ে উঠে—

বল বল বল সব শত বীণা বেগু হবে

ভারত আবার ভগত সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।

ভোরের আলো ক্রমশঃ প্রকাশ পাচ্ছে। চারদিক ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠে—চারপাশে একটা ঠাণ্ডা আমেজ। অদ্ভুত অমুভূতি ফুলের গন্ধে বাতাস যেন মাতাল। গাছের পাখীর কত রকম শব্দ করে উড়ে চলে যায়। বড় বড় ফুলগুলো তাদের অভ্যর্থনা করে।

প্রত্যেকটা বাংলার সামনে দিয়ে তারা এগিয়ে চলে। কত ছেলে মেয়ে সব বেরিয়ে আসে। হাত জোড় করে গান করতে করতে ওদের সঙ্গে যোগ দেয়।

সমস্ত কলোনীটা কমলেশরা দেখতে পায়। একদিকে গরুর গোয়াল, অনেকগুলি গরু, নধর দেহ, চকচকে রঙ, বিশাল চোখে তাদের দিকে চেয়ে আছে। খানিকদূরে হাঁস-মুরগীর আস্তানা, পালে পালে ঘর থেকে বেরিয়ে চরে বেড়াচ্ছে। কত ধানের গোলা চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। মাঝখানে একটা মাঝারি পুকুর—সেখানে ছাড়া আছে মাছ। কত ছোট বড় বাড়ী—স্কুল, ডাক্তারখানা, থিয়েটারের মঞ্চ, সব তাদের চোখে পড়ে। কী সুন্দর সারবন্দি।

পাক দিয়ে গানের দল ফিরতে শুরু করে। দূরে সূর্য্য উঠে। টকটকে লাল বিশাল—চারদিকে তার কোমল প্রভা। সহরের ছেলে, যারা এ দৃশ্য কখনো দেখেনি, অবাক হয়ে চেয়ে থাকে।

দল ভাঙতে থাকে। যে যার বাড়ীর কাছ থেকে বিদায় নেয়। এখনি তারা তৈরী হয়ে কাজে যাবে। সূর্য্যের তেজ বাড়তে থাকে, চারদিক স্পষ্ট হয়ে উঠে। ভোরের মাধুর্য্য কেটে যায়।

প্রথমদিন প্রভাত ফেরির পূর্ব বেলার সঙ্গে দেখা হয়েছিল কমলেশের একটা বাগানের মধ্যে। কমলেশ উচ্ছ্বসিত গলায় জিজ্ঞেস করে—জায়গাটা কী সুন্দর, না দিদি?

—সত্যিই বড় ভালো, এই রকম একটা জায়গাই আমি খুঁজছিলাম। আজ কি ইচ্ছে করছে জানিস? ইচ্ছে করছে সারাদিন বসে ছবি আঁকি এই রূপকথার রাজ্যের। আমি এখনও ভাবতে পারছি না, একি সত্যি না স্বপ্ন?

—না দিদি, এইতো সত্যি, এইতো সত্যিকারের মানুষের রাজ্য।

সেদিন চুপ করে দুই ভাইবোনে তাকিয়ে ছিল অসীম কাঁকার দিকে। বাধাহীন বিস্তীর্ণ প্রান্তর।

দিন আশ্রিত ঐ

খনজয় বৈরাগী

ঝেঁকু যা বলেছিল তা সত্যি কথা—এ যেন রূপকথারই রাজ্য। ক’দিন এখানে থেকে, এখানকার নিয়ম কানুন দেখে তারা মুগ্ধ হয়েছ। এ কলোনির সকলেই যেন একটা বিরাট বৌদ্ধ পরিবারের সন্নিহিত। নিজেদের পৃথক সন্তাকে তারা বিসর্জন দিয়েছে। সকলেই ওরা কাজ করে, যার যে রকম ক্ষমতা। অনেকখানি জমি নিয়ে চাষ হয়। সেই ফসল থেকেই এতগুলি পরিবারের খাওয়া চলে। উদ্বৃত্ত হলে বাজারে বিক্রী করা হয়।

বড়রা এখানে চালের কাজ করে। অনেকে মাছের তদারক করে। সেও তো আরেক রকম চাষ। আবার যারা পশুপাখী চালাবাসে, তারা দেখে গুরুগুলোকে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত দুধ দিতে যার বিক্রী হতে, এখানকার খাটি দুধের চাহিদা ওখানে খুব। এটি দুধের মতোই, সবচেয়ে পোশা মুরগীর ডিমও বাজারে পড়তে পাওয়া যায়। অনেকে তো না জানলে সন্দেহ প্রকাশ করে হাঁসের ডিম হলে।

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এ কলোনির বৃদ্ধা জোয়ান কতজনই চাষ আবাদে ব্যস্ত থাকে, কী ভাবে আরও তারা উন্নতি করবে তা চিন্তাভাবনা বিভোর।

এখানকার নিয়ম-কানুনের কথা জানতে নতুন ছেলেদের বেশ ক’দিন সময় লেগে যায়। প্রথম প্রথম কমলেশ আর প্রশান্ত এখানে এসে মনেট কথাবার্তা বলত। চূপচাপ থাকত, কিন্তু খুব মনোযোগি আলোচনা হয়ে গেল, ওদেরই বয়েসী একটি ছেলের সঙ্গে, নাম মিলে অমিতাভ। এখানে দু’বছর আছে। পড়ে সেকেন্ড ক্লাশে।

এব সঙ্গে আলোচনা চলি থাকারঘরে। সব ছেলেদের একসঙ্গে খাওয়া ব্যবস্থা। কাঠের পিড়ি, সামনের কলাপাতায় অল্প-ব্যঞ্জন।

তাদের গেলাসটা দেখিয়ে কমলেশ প্রশান্তকে বলে, দেখছিস্ এখানকার গরুর দুধ, কি রকম গাঢ়?

প্রশান্ত হেসে বলে, হজম হলে হয়, আমাদের তো আর খাটি দুধ খাওয়া অভ্যেস নেই। এখানকার গয়লাগুলো একেবারে পাকা, দুধে জল মেশাতে জানে না।

ওদের কথা শুনে পাশ থেকে একটি ছেলে হেসে ওঠে, সেই অমিতাভ—গয়লা কোথায়? আমরাই তো গয়লা।

—তার মানে?

—প্রভাতফেরার পর আমরাই দুধ দুয়ে নিয়ে আসি। তবে প্রত্যেকদিন সকলকে যেতে হয় না। ভাগ করা আছে, সপ্তাহে ক’দিন। আমার পালা সোমবার।

—বা: বেশ সুন্দর ব্যবস্থা।

অমিতাভ নিজের থেকেই বলে, তোমরা নতুন ছেলেতো চল, যা জায়গাগুলো দেখিয়ে দি।

খাওয়া দাওয়ার পর অমিতাভ তাদের নিয়ে এল একটা বাড়ীর সামনে, এই হচ্ছে মায়েদের কার্যালয়।

ভেতরে ঢুকে যায় তারা। সত্যিই তাই। কমলেশ দেখে তারই মার মত মায়েদের দল। কয়েকজন চরকার সূতো কাটছেন, কয়েকজন সেই সূতো দিয়ে কাপড়ের জমি তৈরী করছেন। আবার অনেকে কলে সেলাই করে জামা-কাপড় তৈরী করছেন।

অমিতাভ বুঝিয়ে দেয়, এইখানেই সব জামা-কাপড় তৈরী হয়, এ কলোনির সকলেই প্রায় একই রকম জিনিষ পরে।

একটা বারান্দা পেরিয়ে দুটো বড় ঘর। প্রথমটার কোটা হয় তবকারি, অনেকে বসে তৈরী করে রান্নার সরঞ্জাম। আর তার পাশের ঘরে হয় রান্না। সেখানেও মায়েদের দল কাজে ব্যস্ত। এতগুলো ছেলেমেয়েব দায়িত্ব তাদের ওপর।

অমিতাভ বলে, সকালে এঁরা এই সব কাজ করেন। জুপুরে কয়েকজন স্কুলের ছেলেমেয়েদের পড়ান। কয়েকজন রান্না সেলাই, গৃহস্থালীর কাজ শেখান। যেসব মেয়েরা এই স্কুলে পড়ে, তাদের এ সব কাজ শিখতেই হয়।

কমলেশ আর প্রশান্ত অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। অমিতাভ ওদের নিয়ে যায় আর একটি বাড়ীতে। বলে, এখানে গান শেখানো হয়।

কমলেশরা দেখে, কয়েকটি ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বসে আছে। আর এক ভদ্রলোক তাদের গান শেখাচ্ছেন। অমিতাভ আলোচনা করিয়ে দেয়, এই আমাদের ‘শশাঙ্কদা’, এরা কাছে ‘আনবা’ সকলে গান শিখি।

প্রশান্তরা ঠুকে আগেই দেখেছে। প্রভাতফেরার সময় উনিই তো সকলের আগে গান করছিলেন।

সুন্দর চেহারা শশাঙ্কদার। ফরসা রঙ, চোখে-মুখে স্নিগ্ধ হাসি। বলেন তোমরা বুঝি নতুন ছেলে?

—হ্যাঁ।

—তোমাদের কথা শব্দব বলছিল বটে, সময় করে এস আমার কাছে। প্রভাতফেরার সুরগুলো সব তুলিয়ে দেব। তাহলে গাইবার সুবিধে হবে।

—বেশ আমরা বিকেলের দিকে আসব।

অমিতাভ তাড়াতাড়ি বলে, বিকেলে তো আমাদের ড়িল হয়। বরং স্কুলের টিফিনের সময় এস। আমাদের আধ ঘণ্টাখানেক ছুটি থাকে।

শশাঙ্কদা আবার ছেলেদের গান শেখাতে থাকেন। অমিতাভ ওদের পাশের ঘরে নিয়ে যায়। সেখানে কমলেশরা দেখে চারদিকে কত সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকা রয়েছে, চমৎকার সাজান ঘর! মাঝখানে একটি ভদ্রমহিলা বসে একটি মেয়েকে ছবি আঁকা শেখাচ্ছে। অমিতাভ আলোচনা করিয়ে দেয়, ইনি ‘মণিকাদি’, আমাদের ছবি আঁকা শেখান।

মণিকাদি হেসে ওদের অভ্যর্থনা করেন। রোজ এস ভাই, এখানে ছবি আঁকা শিখবে।

প্রশান্ত উত্তর দেয়। আমরা তো ছবি আঁকতে জানি না?

—তাতে কি হয়েছে, শিখতে দোষ কি?

—কি মিষ্টি কথা, ভারী নরম স্বভাব, মুখ দেখলেই তা বোঝা যায়। বলেন, এই দেখ না আমার একটি নতুন ছাত্রী কি সুন্দর ছবি আঁকছে!

প্রশান্তরা নতুন ছাত্রীটির দিকে তাকিয়ে দেখে, সে আর কেউ নয়, ঝেঁকু। এত মন দিয়ে গৈ ছবি আঁকছে যে একটা কথাও তার কানে যায়নি।

কমলেশ ডাকে, দিদি।

ঝেঁকু এবার মুখ তুলে তাকায়, হেসে জিজ্ঞেস করে, কি রে তোরা এখানে?

মণিকাদি' বলেন, কি তোমরা বুঝি ভাই-বোন? দিদি যখন এত ভালো ছবি আঁকে, ভাইরাও নিশ্চয়,—

কমলেশ ঘন ঘন মাথা নেড়ে বলে, না মণিকাদি'। দিদি আমাদের চেয়ে অনেক ভালো—

ঝেঁপুকা জলভরা চোখে তাকায়, ওদের কথা শুনবেন না মণিকাদি', ওরা আমার পাগল ভাই।

কলাভবন থেকে বেরিয়ে ওরা এগিয়ে চলে ডাক্তারখানার দিকে। সোনালী রোদে সবুজ ক্ষেত ঝলমল করছে। কমলেশ প্রশ্ন করে, এই যে ফসল, এ-ও কি সব তোমাদের চেষ্টায়?

—হ্যাঁ ভাই! জমি ঠিক করা, লাঙ্গল দেওয়া, বীজ বোনা, ফসল কাটা সবই আমাদের করতে হয়।

—তোমরা শিখলে কি করে?

—লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে চাষের কাজও যে আমাদের শেখানো হয়।

তাদের কথা শেষ হয় না, সদাশঙ্কর এসে পড়ে।

—কি কমল, কি রকম লাগছে তোমাদের এখানে?

—খুব ভাল শব্দবদা', এ যেন স্বপ্নরাজ্য।

—অমিতাভ বুঝি তোমাদের গাইড হয়েছে। এখন কোন দিকে যাচ্ছ?

—ডাক্তারখানায়।

—চল। আমি ওদিকেই যাচ্ছি।

ওরা এগিয়ে চলে। সামনে পুকুর পেরিয়ে আরও খানিকটা গেলে তবে ডাক্তারখানা। কমলেশ নিজের থেকেই জিজ্ঞেস করে, এখানে রোগের দৌরাণ্ডা কি রকম শব্দবদা'?

—হ্যাঁ, তা একটু আছে। তবে অন্য গাঁয়ের চেয়ে অনেক কম। এই কলোনীর ডাক্তার আমার বন্ধু মিহির। খুব বন্ধ নিয়ে চিকিৎসা করে।

অমিতাভ বলে, সত্যি মিহিরদা' যেন চিকিৎসার বাহু জানে! এত সহজে শক্ত রোগ সারায় যে দেখলে অবাক হতে হয়। আচ্ছা মিহিরদা' বুঝি খুব ভাল ছাত্র ছিলেন?

সদাশঙ্কর হেসে ফেললেন, সে কথা আর বোল না। ওর মত ছুঁছুঁ ছেলে আর হুটি মেলে না, বাপু'র বাপু', মাষ্টারদের চিরকাল পাগল করে মেরেছে। ক্লাশের ফ্যান, জানালার শার্শা ভাঙা ওর ছিল কটনবাঁধা কাজ। স্কুলের বোর্ডে সবষের তেল মাখিয়ে ও রাখবেই। অখচ ফাইন দেবার নামও করত না। হেড-মাষ্টার ভয় দেখলে একেবারে পায়ে গিয়ে পড়ত।

কমলেশ অমিতাভ আর প্রশান্ত হো-হো করে হেসে উঠে। সদাশঙ্কর দূর আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকে, ফেল-আসা দিনের কথা ভারতে ভারতে বলে, সেই মিহির যখন ডাক্তার হয়ে বেরুল আমি তো অবাক! সব তখন এই কলোনী গড়ে উঠছে। একদিন ওর কাছে গিয়ে হাজির; যদি কিছু সাহায্য করে, দেখলাম সেই একই রকম ফাজিল, হেসে বললে, কি রে তুই নাকি আশ্রম খুলে সাধু-টাঁধু হয়ে বসেছিস, তা চলছে কি রকম?

—বললাম তোর কাছে এসেছি সাহায্য চাইলে—

—কিসের সাহায্য?

—নতুন ভাবে ইস্কুল গড়ছি, সত্যিকারের মাছুর তৈরী করার ইস্কুল। শুনলাম তোর প্র্যাকটিস্ বেশ জমে উঠছে।

মিহির কথাটা একেবারে হেসে উড়িয়ে দেয়, দূর দূর একেবারে ভুল শুনেছিস, টাকা কোথায় আমার, টাকা দিয়ে সাহায্য করা আনান পক্ষে অসম্ভব।

বেগে বললাম, টাকাই যদি না দিবি, তাহলে আর কি করে সাহায্য করবি?

মিহির ঠিক আগের মত হেসে বললে, আমাকে যদি কোন কাজ লাগতে পারিস তাহলে যেতে রাজী আছি।

—তার মানে?

—মানে তুই চাইলি টাকা, দিতে পারলাম না—তাই নিজেকেই না হয় দিলাম।

আমার চোখে জল ভরে এল। ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললাম, সত্যি যাবি মিহির, এখানকার পশার টাকাকড়ি নাম-ধাম ছেড়ে সেই পাড়াগাঁয়ে পাঁচ জনের সেবা করে একেবারে সাধারণ জীবন গাপন করতে?

ঠিক আগের মত হেসে ও বললে, আমাকে বিশ্বাস করা একটু শক্ত ২ই কি, সহজে কেউ করতে চায় না। তবে ভয় নেই, জীবনের সব কথাই আমার ফাজলামী নয়, অন্ততঃ এটা নয়। যাব যখন বলেছি, আজই যাব।

কথাগুলো বলতে বলতে সদাশঙ্কর-এর মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সেদিনের কথা ভাবলেও আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাই। সেই ছুঁছুঁ মিহির, যার কাছে একটা কানাকড়ি সাহায্য পাব বলে আশা করিনি, সে কোথায় নিজেকে বিলিয়ে দিলে দেশ আর দেশের মাঝে! আর যারা তখন দেশ দেশ বলে চাঁৎকার করে বেড়াইত তাদের মধ্যে কতজনই আজ কালো-হাজারী ব্যবসাদার, কি বিচিত্র সংসার!

আবার একটু থেমে সদাশঙ্কর বলে, মনে পড়ে স্কুলে বাংলার মাঠার মশাই বিরক্ত হয়ে মিহিরকে বলতেন, তুমি লেখাপড়া ছেড়ে গোচারে যাও। তাঁর কথাই আজ ফলেছে, ও গোচারেই এসেছে। কিন্তু সেদিনকার সেই সেবা ছেলের চাইতে ও অনেক ভাল কাজে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছে।

ডাক্তারখানায় এসে পড়ায় সদাশঙ্কর সামনের দিকে এগিয়ে যাব, কমলেশের ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। কুণীর সারি দাঁড়িয়ে রয়েছে ডাক্তার এক একজনকে পরীক্ষা করে ওষুধ দিচ্ছে, লম্বা, শ্রামণ চেহারা। চোখে চশমা। সারা মুখে সেয়ানা হাসির ঝিলিক।

একটি ছেলেকে পরীক্ষা করে বলেন, কি রে পন্ট, পেট কামড়াচ্ছে?

—হ্যাঁ মিহিরদা'। কাল বিকেল থেকে—

—কামড়বে না! কাল যা আলুর দম খাচ্ছিল, বত সব টিপিন খাওয়া ছেলে।

ডাক্তার টিপিন কথার ওপর এমন একটা জোর দেয় যে সকলে হেসে ওঠে। কমলেশের ওপর চোখ পড়তেই জিজ্ঞেস করেন, এরা যেন ভিন্ গাঁয়ের লোক মনে হচ্ছে। কি রে অজিত, তোরা আমদানী না কি?

অমিতাভের কথা বলার আগেই মিহির কমলেশের কাছে এগিয়ে

যায়। তা বাপু তোমার বেদনাটা কোথায়? শিঠি না পেটে, না হৃৎকায়গায়ই।

কমলেশ হেসে ফেলে। মিহির তড়বড় করে বলে, ছেলে আবার হাস দেখ, এ যে দেখনহাসি। বলি কিছু কামড়াচ্ছে না কি, পেট কি পা?

অমিতাভ উত্তর দেয়। এদের কোন অস্থখ করেনি, আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছে।

—সে কথা আগে বলতে হয়? আমি তো এখনি এক শিশি কন্ঠার ওয়েল খাইয়ে দিচ্ছিলাম আর কি। মিহির নিজের মনেই এসে বলে, এখন তো ভাই বাস্তব আছে। পরে সময় মত বুঝে শুঝে আলাপটা সেরে নেওয়া যাবে।

মিহির ডাক্তারের সঙ্গে প্রথম আলাপেই ওরা খুসী হয়।

বিকলে ছুটির পর 'ডিলের আয়োজন। সবাই এসে জড় হয় খুলের সামনের কঁাকা মাঠে। ক্যাগ-পোড়র ওপর ডুয়ে দেয় তিনবর্গ পতাকা, তারই নীচে দাঁড়িয়ে সকলে এক সাথে গান করে।

তাবপর হয় খেলা শুরু। একদল বল নিয়ে চলে যায় ফুটবল খেলতে। একদল খেলে ভলী। আবার অনেকে কবে কুচকাওয়াজ। সমান ভালো পা ফেলে হাত নেড়ে এগিয়ে চলে। কীরের মত বুক জ্বলিয়ে বলে,

আমরা নবীন তেজপ্রদীপ্ত-বীর তরুণ
বিপদ বাধার কণ্ঠ ছিঁড়িয়া শুবিব খুন।
আমরা ফলাব ফুল ফসল,
অগ্র পথিক রে যুবাদল।
জোর কদম চল রে চল।

কথার ছন্দে পা ফেলে তারা এগিয়ে যায়। মেয়েরা আর কেদিকে খেলা করে। এক দল খেলে ব্যাডমিটন। এক দল কপাটি। আবার হয়ত একদল একসঙ্গে হাত তোলে, নামায়। ওঠে, বসে। সুন্দর সারবন্দী ভাবে ডিল করে।

এদের মধ্যে কমলেশ রেগুঁকাকে দেখতে পায়, একসঙ্গে হাত তুলে, মাথা নেড়ে দলের সমতা রাখার চেষ্টা করছে। প্রশান্ত চলে গেছে ফুটবল খেলতে। কমলেশ একলা দাঁড়িয়ে ছিল।

—কি হে, তুমি কিছু করছ না?

কমলেশ পেছু ফিরে তাকায়, দেখে, মিহিরদা' দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁদুছে।

—মিহিরদা, আপনি?

—আলাপ করবে বলেছিলে, তাই দুপুরে হাজির দিলাম। কিন্তু 'হুমি ডিল করছ না কেন? খুব পালায়ান বুঝি? কিন্তু দেখে তো মনে হয় না। দেহের স্বাস্থ্যের চেয়ে তোমার চুলের স্বাস্থ্য বেশ পরিপাটি বলে আমার সন্দেহ হচ্ছে।

কমলেশ লজ্জিত স্বরে বলে, না তা নয়, আজ নতুন কি না তাই কিছু করছি না। কাল থেকে—

মিহির কথা খামিয়ে দিয়ে বলে, হ্যা, ক'দিন জিরিয়ে নাও। এই তো জিরোবার বয়েস, শেষ কালে বুড়ো হলে তো আর জিরোবার সময়ই পাবে না, তখন কাজ আর কাজ। কি বল?

মিহিরদা'র কথার ধরণই ঐ রকম, সারাক্ষণ সবাইকে হাসিয়ে রাখে।

এ সবই কিন্তু কমলেশদের প্রাথমিক দিকের কথা। এ কলোনীর সকলের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হতেও তো সময় লাগে। ক্রমে এরা এখন সকলের মাঝে মিলে গেছে। হৈ হৈ আনন্দে ভরা দিন কেটে যায়। লেখাপড়া কাজকর্ম, খেলাধুলোর স্রোতে ওরাও অন্তর্ভুক্ত মত গা ভাসিয়ে দিয়েছে।

এ জায়গা যে কমলেশের কতখানি ভালো লেগেছে, তা ওর চিঠি পড়লেই বোঝা যায়। বাবাকে মাকে সে বার বার করে লেখে, "তোমরা একবারটি এখানটা ঘুরে বাও। দেখবে আমরা কি আনন্দে আছি। কলকাতায় দেখতাম, ছাত্ররা শুধু ভাঙতে চায়, দেখে দেখে বড় দমে যেতাম। নিরুপায়ে মন ভরে যেত। এখানে এসে মনে আশা জাগছে। আমরা শুধু লেখাপড়া করছি না, কাজ করছি, কিছু গড়ে তোলার চেষ্টা করছি। গড়ার যে কি আনন্দ তা এতদিন আমরা বুঝতে পারিনি। এই বিজ্ঞাপীঠ আমাদের তাই বৃক্ষিয়েছে।"

সেদিন শনিবার। কমলেশ গিয়েছিল ছেলের সঙ্গে ফুটবল খেলতে। খুব জবর খেলা হল। শহর থেকে একদল ছেলে এসেছিল খেলতে বিজ্ঞাপীঠের সঙ্গে। কোন পক্ষই জিততে পারেনি। ড্র হয়ে গেল। প্রশান্ত মতিতাই ভাল খেলেছে, প্রাণপণ চেষ্টা করেছে গোল দিতে, তবে সফল হয়নি।

খেলা শেষ হয়ে গেলে শতাবের দল ফিরে গেল শহরে, কমলেশরাও ক্রান্ত শবীরে ফিরছিল হোষ্টলের দিকে। সন্ধ্যা হয়ে গেছে, পাখীরা ফিরছে বাসায়, ফুরফুরে বাতাস-এর মধ্যে দিয়ে ঠাটতে ঠাটতে তারা এগিয়ে যাচ্ছে। তখান নজরে পড়লো ঘুরে গাছতলায় কি যেন একটা জিনিষ পাড়ে রয়েছে।

কমলেশ জিজ্ঞেস করে, ওখানে কি ওটা সাদা মত মনে হচ্ছে? প্রশান্ত এড়িয়ে যায়, কাপড়চোপড় কিছু হবে।

—একবার দেখে গেলে হয় না?

—না না চল, সন্ধ্যা হয়ে গেছে, হোষ্টলে ফিরতে রাত হয়ে যাবে।

তবু কমলেশ কথা শোনে না, কি রকম যেন তার সন্দেহ হয়

—তারা দাঁড়া, আমি আসছি, বলে কমলেশ ছুটে ছুটে গাছের দিকে এগিয়ে যায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যেতে হয় না, খানিকটা গিরেই বুঝতে পারে ওটা শুধু কাপড় নয়, কোন লোক উপড় হয়ে পড়ে রয়েছে। এখান থেকেই চেঁচিয়ে ওঠে, তোরা শীগগির এদিকে আর, কেউ বোধ হয় অজ্ঞান হয়ে গেছে।

ছেলেরা ব্যস্ত ভাবে ছুটে আসে, সবাই মিলে আস্তে আস্তে সেই গাছের দিকে এগিয়ে যায়। দেখে, কমলেশ যা বলেছিল তাই সত্যি, জলকাদার মধ্যে অজ্ঞান হয়ে এক ভদ্রলোক পড়ে রয়েছে। প্রথমটা ভয় পেলেও ক্রমে সাহস সঞ্চয় করে তারা কাছে গিয়ে বসে, লোকটার মুখ দেখা যাচ্ছে না। তবু বয়েস বেশ বেশী হয়েছে বলেই মনে হয়। তিন-চার জনে ধরে আস্তে আস্তে ভদ্রলোককে তুলে ধরে, এতক্ষণে তার মুখটা দেখা যায়, কমলেশ চমকে ওঠে, এ সেই বুড়ো।

সকলে জিজ্ঞেস করে, তুই ওকে চিনিসু না কি?

—হ্যা, এ সেই বুড়ো যক্ষপুর্ব্বাক্ত থাকে।

সবাই চিন্তিত হয়, তাহলে এখন কি করা যাবে?

কমলেশ ভেবে নিয়ে বলে, চল, সবাই মিলে ওকে বাড়ীতে পৌছে দিয়ে আসি।

—এ যক্ষপুত্রীতে ?

—ভয়ের কি আছে ? বুড়ো বিপদে পড়েছে, ওকে সাহায্য করা আমাদের উচিত।

মনে মনে খুসী না হলেও মুখে কেউ আপত্তি করল না। বলল, চল, তবে ভেতরে আমরা ঢুকব না। দোরগোড়ায় 'নামিয়ে রেখেই' চলে আসব।

কমলেশ কোন কথার উত্তর দেয় না। একদৃষ্টে বুড়োর মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সে হাঁটতে থাকে, কিছুতেই সে ভেবে পায় না এখানে এসে বুড়ো অজ্ঞান হয়ে পড়ল কেন ? আবার যদি জ্ঞান ফিরে উঠলে এদেরই বকাঝকা হবে। যক্ষপুত্রীতেই বা ওই বুড়োকে দেখাশোনার লোকজন কে আছে ?

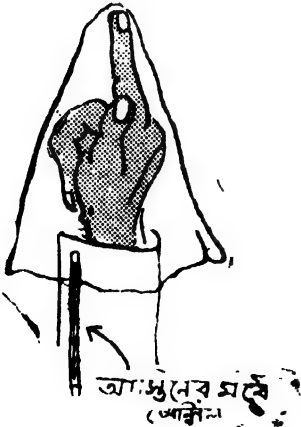
কোন প্রশ্নেরই সহুত্তর সে নিজের মনে খুঁজে পায় না। আর সকলের সঙ্গে ধর্মতমে অন্ধকারের মধ্যে অজ্ঞান বুড়োকে নিয়ে এগিয়ে যায় সেই ভয়াবহ যক্ষপুত্রীর দিকে।

[ক্রমশঃ]

রুমাল আর পেন্সিলের ভেঙ্কী

যাহ্নরত্নাকর এ, সি, সরকার

কাফে এতোয়ালের কাশিয়ার ম্যাদমসেল জিলে ছিলেন আমাব ম্যাজিকের বিশেষ ভক্ত। প্যারিসে থাকা কালে মাঝে মাঝেই যেতাম 'কাফে এতোয়াল' এ কফি খেতে। সর্বপ্রথম সেদিন ওখানে বাই সেদিন ঘটেছিল এক মজার ব্যাপার। বাইরে পড়ছিল বপ খুপ ক'রে বৃষ্টি। গা থেকে বেনকোটটা খুলে দোরের পাশে এলিয়ে দিয়ে কাফের এক কোণে একটি খালি চেয়ারে বসলাম গিসে। আগের দিন ফরাসী টেলিভিসন 'টেলিভিসিও ফ্রঁসে'র মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছিল আমার যাহ্নর খেলা। কাফেই হোটেলে অপেক্ষমান বন্ধব থেকে শুরু করে পরিচালক পরিচারিকারা পর্যন্ত প্রথম দর্শনেই চিনে ফেললেন আমাকে। টেলিভিজে টেলিভিজে উঠল মহুগুগুন। একটু বিরত বোধ করলাম। এই অবস্থা থেকে আমাকে উদ্ধার করে যিনি কাফের ভেতর দিককার এক কেবিনে নিয়ে আমাকে বসিয়ে সেখানেই আমাকে খাবার ও কফি সববরাহ করলেন, তিনিই ম্যাদমসেল জিলে।



তার অমুরোধে সেদিন একটি ম্যাজিক দেখাতে হয়েছিল সবার সামনে : যা নাকি খুব সমাদর লাভ করেছিল সবার কাছে। টেবিলের উপরে পড়েছিল একটা লেড পেন্সিল। ডান হাতে ঐ পেন্সিলটাকে উঁচু করে ধরে জর্নৈক খন্ডের এক রুমাল দিয়ে ঢেকে দিলাম ঐ পেন্সিল শুদ্ধ হাত। রুমালচাপা অবস্থাতেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো ঐ উদ্ধত পেন্সিলটি। এর পরে ওয়ান—টু—থ্রি—কল রুমালটা ভুলে নিতে দেখা গেল পেন্সিল অদৃশ্য! রুমালের মালিক রুমাল পকেটস্থ করলেন আর আমি ফিরে গেলাম কেবিনে।

কেমন ক'রে এই অদ্ভুত ব্যাপারটা করেছিলাম তাই শোন। পেন্সিল-শুদ্ধ হাতটাকে রুমালচাপা দিয়ে যখন রুমালের ধার টেনে টেনে রুমালটাকে ঠিক ভাবে হাতের উপরে রাখছিলাম, সেই সময় এক কঁাকে পেন্সিলটাকে দিয়েছিলাম ছেড়ে আর তা আপনা থেকেই চুকেছিল আস্তিনের ভেতরে। উদ্ধত তর্জনী নিয়েছিল পেন্সিলের স্থান। রুমালে ঢাকা অবস্থায় তর্জনী আর পেন্সিলের পার্থক্য বোঝা যায় নি কোন মতে। বাকী অংশ খুবই সহজ—রুমাল টেনে নেওয়া আর সঙ্গে সঙ্গে তর্জনী গুটিয়ে নেওয়া। ভাল ভাবে অভ্যাস করে দেখাতে পারলে এ দিয়ে সহজেই দর্শকদের অবাক করতে পারবে। যারা যাহ্নবিজ্ঞায় উৎসাহী তারা আমার সঙ্গে A. C. SORCER, Magician, Post Box 16214, Calcutta—29 এট ঠিকানায় জবাবী পোষ্টকার্ডে চিঠি লিখতে পার।

ছোট গিন্নী

বুদ্ধদেব বাগচী

ছোট খুকি বেড়ার হুলে ঘোষে না কিছুই,
ছোট একটা দিদির দেওয়া কাপড় প'বে।
মাধার উপর ঘোমটাটা তার দেয় তুলে দেয়,
মাথের মতই আলতো করে চরণ ফেলে।
কোলের উপর ছোট পুতুল মেয়ে নাকি ওর ?
হুঁ খাওয়াতে বাঁধে বাঁধেই হয় নাকো ভুল,
শান্ত ছেলে তাকে আবার ঘুম পাড়িয়ে,
মাথের মতই হুঁধের হিসাব দেয় বুঝিয়ে।
গোয়াল তার পুঁটলি বাঁধা হেঁড়া কাপড়,
বাগতিটাই বড় হ'য়ে বাধায় কাঁপড়।
বা হোক ওসব মেয়ের বিয়ে আসছে মাসে,
টুকটুক বর বেনারসী পাচ্ছে না বে।
দিদি বলেছে বিয়ের আগে দেবেই দেবে,
ওগুও বে বিয়ে হয়েছে এই সেদিনই।
জামাই নাকি বিলেত ফেরে টাকা অনেক,
কলকাতাতে হুঁধান বাড়ী ওর নিজেরই।
হঠাৎ গিন্নী পড়ে গেলেন কাপড় বেধে,
হাতের চুড়ি ভেঙে বাওয়ার উঠল কঁদে।
আওয়ারটি তার হুড়িয়ে পরে আশে-পাশে,
ভুলে গেল মেয়ের বিয়ে আসছে মাসে।

চেকোশ্লোভাকিয়ার রূপকথা

ঐশ্বর্যতা কর

[ভূমিকা—দেশ-বিদেশের কত সুন্দর রূপকথা আছে। এই সব দেশ-বিদেশের রূপকথার সঙ্গে পরিচয় হলে ছোটদের মন খুলিতে ভরে ওঠে, তাদের জ্ঞানের সীমা বেড়ে যায়। এখানে একটি চেকোশ্লোভাকিয়া দেশের রূপকথা লিখলাম।—লেখিকা]

মেঘে-ঢাকা সূর্য। বর্ষাকাল। আকাশ ঘোর কালো মেঘে ঢাকা পড়েছে আব দিনরাত বৃষ্টি পড়ছে। তিন দিন ধরে পৃথিবীতে এক ঝলক বোদের দেখা পাওয়া যায় না, একটু কড়া আলো দেখা যায় না।

ছোট ছোট মুবগীছানারা গজগজ করে মাকে বলতে লাগল—মা, সূর্যমামা আকাশ ছেড়ে কোথায় পালান? তাকে টেনে আকাশে নিয়ে আসতে হবে। এক কোঁটা বোদ নেই। শীতে আমরা কাঁপছি, এ কি অজ্ঞার বলত?

মোটামোটি শরীফটা দোলাতে দোলাতে মুবগীমা বলল—সে ত বয়েছি বাছা! কিন্তু সূর্যমামার বাড়ীটা যে কোথায় তা ত জানি না, সেইখানেই হয়েছে মুশ্বিল।

মুবগীর ছানারা বলল—ওসব তোমায় ভাবতে হবে না মা! সূর্যমামার বাড়ীর ঠিকানা আমরা ঠিক খুঁজে বার করব। এত আমাদের বন্ধু-বান্ধব রয়েছে তারা কেউ না কেউ নিশ্চয় ঠিকানা জানে। চল রে ভাই-বোনেরা, সবাই মিলে একটু খুঁজে দেখি। এই বলে কোঁকর কোঁ, কোঁকর কোঁ, কবে ডাকতে ডাকতে মুবগীছানারা মাকে ফেলে রেখে বাসা ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল।

মুবগীছানারা একটু এগিয়ে একটা ছোট বাগানে ঢুকল। বাগানের সামনে একটা কপিক্লেত। সেখানে মস্ত বড় একটা কপির তলায় এক শামুক বসে বসে তাই তুলছে। মুবগীছানারা শামুককে নমস্কার করে জিজ্ঞেস করল—শামুক দাদা, সূর্যমামার বাড়ীর ঠিকানাটা বলতে পার? বিস্তীর্ণে ভিজ়ে মবে গেলাম। সূর্যমামা ঠাকুরকে ঘর থেকে টেনে বার করতে হবে। তাই আমরা তার বাড়ী যাচ্ছি।

শামুক হাই তুলতে তুলতে বলল—ঠিকানা ত আমি জানি না। তবে একটু দূরে গিয়েই ওই ঝোপের ভিতর মস্ত বড় এক পায়রা দেখবে। সে হয়ত ঠিকানা তোমাদের বলতে পারবে। এই কথা বলেই শামুক পোলের ভিতর ঢুকে ঘূমতে আরম্ভ করল।

মুবগীছানারা ঝোপের দিকে এগোতে লাগল। দূর থেকে তাদের দেখতে পেয়ে পায়রা তাড়াভাড়া ঝোপ থেকে উড়ে বেরিয়ে গেল। মনের আনন্দে ভাবতে লাগল—বাঁচলাম বাবা, মুবগীর ছানাদের সঙ্গে খানিকটা বকু বকু করতে পারব।

মুবগীছানারা কাছে এসে নমস্কার করল। পায়রা বলল—কি খবর? কি খবর ভাই? হুঁচরটে খবর বল। প্রশ্নটা জুড়োক। এবার দিনে কারো মুখ দেখবার উপায় নেই, দুটো কথা বলতে পাই না, হাঁপিয়ে উঠলাম।

মুবগীছানারা বলল—পায়রামাসী? সে জ্ঞানই ত তোমার কাছে পৌঁছল। এমন বর্ষায় কি কারো প্রশ্ন বাঁচে? সূর্যমামাকে ঘর

থেকে টেনে বার করব বলে আমরা তার বাড়ী যাচ্ছি। এখন সূর্যমামার বাড়ীর ঠিকানাটা তুমি আমাদের বলে দাও।

পায়রা বকু বকু করে অনেক কথা বলে গেল। তারপর বলল—আমি ত ভাই ঠিকানা জানি না? তবে আমার বন্ধু খরগোস নিশ্চয় জানে।

চল তবে খরগোসের কাছে যাও। বলে মুবগীছানারা চলতে আরম্ভ করল। পায়রাও তাদের সঙ্গে উড়ে চলল।

খরগোস দূর থেকে তাদের দেখতে পেয়ে তাড়াভাড়া গায়ের লোম ঝেড়ে ফিটফিট হয়ে নিল। তারপর তার বাড়ীর দরজা খুলে বলতে লাগল—এস এস। আমার ঘরে এসে বস। এই বর্ষার দিনে একটু চা খাও।

কিন্তু মুবগীছানারা তার ঘরে ঢুকল না, দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বলল—নমস্কার, খরগোস মামা! বড় বান্ধু আমরা, এখন বসতে পারব না। সূর্যমামাকে ঘর থেকে টেনে বার করতে যাচ্ছি তুমি শুধু সূর্যমামার বাড়ীর ঠিকানাটা বল।

খরগোস খতমত খেয়ে বলল—সূর্যমামার ঠিকানা ত বলতে পারব না! তা আমি না পারলেও আমার বন্ধু পাতিহাস ঠিক জানে। চল তার কাছে তোমাদের নিয়ে যাও। ওই যে সামনে নদী রয়েছে, ওর পাড়ে যে নলখাগড়ার বন, সেইখানেই পাতিহাসের বাড়ী। নদীতে ওই যে একটা নৌকা রয়েছে, চল ওইতে চড়েই যাওয়া যাক।

খরগোসের কথামত সবাই সেই নৌকায় চেপে বসল। তেলে ছিল নৌকা চলতে লাগল। একটু পরেই নলখাগড়ার বনে এসে আটকাল। সবাই মিলে নেমে পাতিহাসের বাড়ীর দরজায় এল। খরগোস দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকতে লাগল—ও ভাই পাতিহাস, আমি তোমার বন্ধু খরগোস। তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। দরজাটা একটু পোল। আমার সঙ্গে অনেক সব অতিথিরাও এসেছেন।

ভিজ়ে ডানা ঝটপট করে নাড়তে নাড়তে পাতিহাস দরজা খুলে বলল—ওঃ বিস্তীর্ণ জ্বালায় মবে গেলাম। তিন দিন ধরে ডানা শুকোতে পারিনি। কি কষ্টই না হচ্ছে!

পাতিহাসের কথা শুনে মুবগীছানারা বলল—ঠিক বলেছ হাসমাসী! ছষ্ট সূর্যমামা, নিজের ঘরে শুয়ে লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমাচ্ছে। আকাশে ওঁবার নাম নেই, তাই আমাদের এত কষ্ট। এখন আমরা সবাই সূর্যমামার বাড়ী চলেছি। তাকে টেনে ঘর থেকে বের করে আকাশে নিয়ে আসব। কিন্তু মুশ্বিল হয়েছে সূর্যমামার বাড়ীর ঠিকানা আমরা কেউ জানি না। তুমি মাসী, ঠিকানাটা বলে দাও।

পাতিহাস বলল—আমি ত বাপু, সূর্যমামার বাড়ীর ঠিকানা জানি না। তবে আমার বন্ধু সজাক খুব পণ্ডিত লোক। সে জানে না এমন জিনিষই নেই। নদীর অঙ্ক পাড়ে ওই যে প্রকাণ্ড গাছ দেখা যাচ্ছে ওরই একটা কোটরে সে থাকে। চল সবাই মিলে নৌকায় চেপে সজাক-বন্ধু বারী যাই।

তাই চল—বলে সেই প্রকাণ্ড দল নৌকায় চড়ে সজাকের বাড়ী গেল। গাছের কোটরের গরম বাতাসে শুয়ে বাদলার দিনে সজাক দিবা নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছে। সবায়ের ডাকাডাকিতে সজাকের ঘুম ভাঙল।

বাসা থেকে বেরিয়ে এসে অতিথিদের নমস্কার করে বলল—আমুন আমুন। আমার গরম ঘরে বসে বিশ্রাম করুন।

পাতিহাঁস বলল—না বন্ধু সজ্জাক, আমরা আর বসব না। একটা শক্ত কাজ করতে হবে, সেজন্য এই ঝড়-বান্দল মাথায় নিয়ে সবাই মিলে ছুটে চলেছি। তুমি হলে আমাদের সবায়ের চেয়ে পণ্ডিত। তুমি না সাহায্য করলে আমাদের কাজ সফল হবে না। কষ্ট করেও কোন ফল হবে না।

সজ্জাক নিজের প্রশংসা শুনে খুশী হয়ে বলল—তা যা বলেছ ভাই পাতিহাঁস। সব জীব-জন্তুই বলে বটে আমি পণ্ডিত লোক। কোন কাজে তোমরা বাধা বল? নিশ্চয়ই যা পারি সাহায্য করব। তোমরা সবাই আমার বন্ধু।

সজ্জাক কথা শুনে মুগ্ধী ছানারা বলল—সজ্জাক দাদা, তিন দিন ধরে স্থিয়ামামা নিজের ঘরে শুয়ে লেগে মুড়ি দিয়ে ঘুমাচ্ছে। আকাশেও ঝড় না, বোদও ছড়ায় না। আমরা সবাই বিষ্টি-বান্দলে ভিজ্ঞ হয়ে গেলাম! সেজন্য আমরা স্থিয়ামামার বাড়ী চলেছি। তাকে টেনে ঘর থেকে বার করে আকাশে বসিয়ে দেব। তবেই আমাদের প্রাণগুলো বাঁচবে। কিন্তু মুগ্ধল হয়েছে। কেউ আমরা স্থিয়ামামার বাড়ীর ঠিকানা জানি না। তুমি সজ্জাক দাদা, ঠিকানা বলে দাও।

সজ্জাক গল্পীর ভাবে বলল—সে কথা কেউ জানে না সে কথা বলতে কেবল আমিই পারি। পণ্ডিত বলে একটা সুনাম আছে, সেট ত আর নিখো নর। সূর্যের বাড়ীর ঠিকানা আমি জানি। তারপর তাচ্ছিল্যের স্বরে সজ্জাক বলতে লাগল—সূর্যের বাড়ী এমন কিছু দূর নয়। এই আমার বাড়ী থেকে কতটুকুই বা রাস্তা। ওই যে সামনে প্রকাণ্ড পাঠাড় দেখছ, তার মাথায় একটা প্রকাণ্ড কালো কুচকুচে মেঘ ঝুলছে। সেট কালো মেঘের চূড়ার ওপর রপালী চাদ আটকান আছে। তোমাদের প্রথমে সেট চাদের দেশে যেতে হবে। তারপর চাদের দেশ পার হয়ে সেই এক পা এগোবে অমনি স্থিয়ামামার বাড়ী পেয়ে যাবে। চল আমি সঙ্গে গিয়ে পথ দেখিয়ে দি। এই বলে মাথায় একটা নতুন টুপি পরে হাতে একটা লাঠি নিয়ে সজ্জাক পথ দেখিয়ে এগিয়ে চলল। তার পিছনে পিছনে মুগ্ধীর ছানারা, পাররা, খরগোস, পাতিহাঁস চলল।

সজ্জাক যেমন রাস্তা চলেছিল ঠিক তেমন রাস্তা ধরে চলে তারা প্রকাণ্ড পাঠাড়ের মাথায় উঠল, কুচকুচে কালো মেঘের ভিতর দিয়ে চলে গেল। তারপর চাদের দেশে পৌঁছল। তাদের দেখে চাদ তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে খাতির করে সবাইকে নিজের সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে সূর্যের বাড়ী পৌঁছে দিয়ে এল।

সূর্যের বাড়ীর ধারে এসে তারা সবাই দেখে চারদিকে কি যৌর অন্ধকার, কিছুই চোখে দেখা যায় না। তবু তারা মনে সাহস এনে স্থিয়ামামার ঘরে ঢুকে পড়ল। ঘরে ঢুকে দেখে, ঘোর অন্ধকার ঘরে প্রকাণ্ড এক কালো মেঘের কবলে আগালাগাড়া মুড়ি দিয়ে স্থিয়ামামা নাক ডাকিয়ে অগাধে ঘুমাচ্ছেন।

জাদের পায়ের কত শব্দ হল কিন্তু স্থিয়ামামার ঘুম ভাঙ্গল না। তখন সবাই মিলে স্থিয়ামামার ঘুম ভাঙ্গাবার জন্তে বিকট চীৎকার করতে আরম্ভ করল।

মুগ্ধীছানারা কৌকর কৌ, কৌকর কৌ করে ডাকতে লাগল, পাররা 'বক্ বকম্' 'বক্ বকম্' করে ডাকতে লাগল, পাতিহাঁস প্যাক প্যাক করে ডাকতে লাগল, খরগোস বপ বপ করে কানঝপটা দিতে লাগল, সজ্জাক তার লাঠিটা নিয়ে হুম হুম করে চুকে লাগল।

একসঙ্গে সবাই চীৎকার করতে লাগল—স্থিয়ামামা ঘুম ভেঙ্গে ওঠ, স্থিয়ামামা ঘুম ভেঙ্গে ওঠ। আকাশে চল, বোদ্র দাও।

সবায়ের এত চীৎকারে সূর্যের ঘুম ভাঙ্গল। খুব রেগে উঠে মেঘের কবলটা একটুখানি মুখের কাছ থেকে সরিয়ে, নিছানার শুয়ে চেঁচিয়ে উঠল—কে রে, চোঁচোঁচি করে অসময়ে আমার ঘুম ভাঙাচ্ছিস?

সূর্যের রাগ দেখে তারা কেউ ভয় পেল না, উঠে আরও চীৎকার করতে লাগল। বলতে লাগল—দেখ স্থিয়ামামা, অনেক কালো হয়েছে। ভাস চাও ত আকাশে উঠ পড়, আর নয়ত তোমাকে টেনে তুলব।

সূর্য দেখল, এদের হাত থেকে কিছুতেই ছাড়া পাবে না। তখন সে বলল—কেমন করে উঠি বল? তিন দিন ধরে ভারী ভারী কালো মেঘ আমার সারা শরীর আর মুখ চেপে ধরেছে, তাদের ঠেলে সরাতে পারছি না। দেখ না কালো মেঘেরা আমার মুখটা কি রকম কালো করে দিয়েছে। সূর্যের কথা শুনে খরগোস ছুটে বাইরে গিয়ে একটা বড় কলসী-ভরা ঠাণ্ডা জল টানতে টানতে ঘবে নিয়ে এল। পাতিহাঁস সেই কলসীভর জল ছোট দিয়ে টেনে টেনে সূর্যের মুখের উপর উপুড় করে ঢেলে দিল। পাররা একখানা প্রকাণ্ড সাদা তোয়ালে নিয়ে সেই জল দিয়ে সূর্যের মুখ ঘলে দিতে আরম্ভ করল, আর সজ্জাক কাঁটা দিয়ে খড় খড় করে টেনে সূর্যের মুখের ওপরের কালো মেঘগুলোকে টুকরো টুকরো করে ফেঁসতে লাগল। মুগ্ধীর ছানারা সেই সব মেঘের টুকরো কুড়িয়ে নিয়ে ঘরের বাইরে ফেঁসতে লাগল।

দেখতে দেখতে সূর্যের মুখের ওপর থেকে সব কালো মেঘ মোছা হয়ে গেল। স্থিয়ামামা এদের হাতে পড়ে বক্ বক্ হয়ে উঠল। তখন আর কি করে, অগত্যা ঘর ছেড়ে বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে আকাশে উঠল। তখন সূর্যের এমন তেজ হল, তা দেখে সবায়ের চোখ বালস গেল।

সমস্ত পৃথিবী প্রচণ্ড বোদে ভরে গেল। ঝড়, বিষ্টি, মেঘ ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে কোথায় যে ছুটে পালাল তার ঠিক নেই।

তখন মুগ্ধীছানারা, পাররা, পাতিহাঁস, খরগোস, সজ্জাক মনের আনন্দে বোদ পোহাতে পোহাতে আর গান গাইতে গাইতে বাড়ী ফিরে চলল।

পশু ও পাখী

শ্রীরঞ্জিতকুমার দত্ত

সবুজ পাখী টিরে, ডাকে না শিব দিয়ে
সাদা পাখী বক, নয়কো জেনো ঠগ
কালো পাখী কাক, কর্কশ তার ডাক
এবং লাল পাখী কি, মুরগী ও মুবগী।

ডাকে ঘাঙুর-ঘাঙ, তারাই কোলাবাঙ
দেখতে নয় খারাপ, জিরাফ তারা জিরাফ
পথে যায় না ঝুট, মকর রাজা উট
লম্বা ডোরা দাগ,—হিংস্র পশু বাব।

জলেতে যার বাস, সে হিপোপটেমাস
চানড়া মোটা বার, গণ্ডার নাম তার—
কেশর কাঁব চিহ্ন, পত্তরাজ সিংহ
সব দিকে কার হাঁশ,—মাছ, সে মাছ।



মায়ের মমতা ও

অষ্টারমিল্কে প্রতিপালিত

মায়ের কোলে শিশুটি কত সুখী, কত সন্তুষ্ট। কারণ ওর স্নেহময়ী মা ওকে নিয়মিত অষ্টারমিল্ক খাওয়ান। অষ্টারমিল্ক বিশুদ্ধ দুগ্ধজাত খাদ্য এতে মায়ের দুধের মত উপকারী সবরকম উপকরণই আছে। আপনার শিশুর প্রতি আপনার ভালবাসার কথা মনে রেখেই, অষ্টারমিল্ক তৈরী করা হয়েছে।

বিনামূল্যে-অষ্টারমিল্ক পুস্তিকা (ইংরাজীতে) আধুনিক শিশু পরিচর্যার সবরকম তথ্যসম্বলিত। ডাকখরচের জন্য ৫০ নম্বরের ডাক টিকিট পাঠান—এই ঠিকানায়—“অষ্টারমিল্ক” P. O. Box No. 202 বোম্বাই ১।

...মায়ের দুধেরই মতন

কারেক্স শিশুদের প্রথম খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করুন। হৃদয় দেহগঠনের জন্য চার থেকে পাঁচ মাস বয়স থেকে দুধের সঙ্গে কারেক্স খাওয়ানও প্রয়োজন। কারেক্স পুষ্টিকর শস্যজাত খাদ্য-রান্না করতে হয়না—শুধু দুধ আর চিনির সঙ্গে মিশিয়ে, শিশুকে চামচে করে খাওয়ান।



বিপ্লবের সঙ্কাতে

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯২১ সালেই ভারতের নানা স্থানে শ্রমিক ও কৃষকদের অসন্তোষ নানা ভাবে প্রকাশ হচ্ছিল—সরকারী হিসাব অনুসারে '২১ সালে ৪০০ ধর্মঘট হয়েছিল, এবং ৫ লক্ষ শ্রমিক তাতে সংশ্লিষ্ট ছিল। দেশের মুক্তিসংগ্রামে শ্রমিকরা সামিল হতে চাচ্ছিল নিরুদ্বেশের বিশিষ্ট সংগ্রাম পদ্ধতির মারফৎ—কিন্তু মহাত্মাজী সেটা পছন্দ করছিলেন না, এবং শ্রমিকনেতাদের তদনুসারে নিকৃৎসত্তি করছিলেন। কৃষকরাও নানা স্থানে তাদের দুর্বৃত্তার প্রতিকারের জন্তে বিপুলভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছিল, এবং স্থানে স্থানে সভাগ্রন্থক করতে যাচ্ছিল,—জমির মালিক টাটাগোষ্ঠী—মহাত্মাজী তাঁদের পরামর্শ দিয়েছিলেন 'উপযুক্ত' ব্যবস্থা করতে। ায়বেবিলীতে বিরাট কৃষক বিক্ষোভের পর কৃষকনেতাদের গ্রেপ্তার করা হলে কৃষকরা বিদ্রোহমুখী হয়ে ওঠে এবং সরকার গুলী চালিয়ে ৭ জন কৃষককে হত্যা, এবং বহুসংখ্যক আহত কর। ফলে সেখানকার ৭০ হাজার কৃষক কংগ্রেসে যোগ দেয়। শিখদের তীর্থস্থান ও মন্দিরাদিতে ছিল দুশরিত্র মোহান্তদের রাজত্ব—সরকার ছিল তাদের পৃষ্ঠপোষক—তাদের হাত থেকে পাবলিক কমিটির হাতে কতক আনবার জন্তে শিখেরা চেষ্টা করছিল। এই অবস্থার নানকানা-সাহেব-এর মোহান্ত ১০০ শিখ তীর্থযাত্রীকে মন্দিরের মধ্যে হত্যা করে, এবং পেট্রোল দিয়ে মৃতদেহগুলো জালিয়ে দেয়। ফলে শিখকৃষকরাও দলে দলে কংগ্রেসে যোগ দেয়। মহাত্মাজীর এক বছরে স্বরাজের ভরসায় নির্ভর করে এইভাবে কৃষকরাও তাদের দুর্বৃত্তার অবসানের আশা নিয়ে কংগ্রেসকে শক্তিশালী করছিল। মহাত্মাজীও প্রাণপণে তাদের অসন্তোষকে অহিংসার পথে টেনে রাখার চেষ্টা করছিলেন।

মালাবারের সমুদ্রোপকূলের চিরনির্ধ্যাতিত দরিদ্র মোপলা কৃষকরা কিন্তু এক রীতিমত সশস্ত্র বিদ্রোহ করে এক খিলাফরাজ প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছিল।

এর আগে তারা বহুবার বিদ্রোহ করেছিল, এবং সরকার রক্তের বজায় সে সব বিদ্রোহ ডুবিয়ে দিয়েছিল—একদল বিশেষ সশস্ত্র পুলিশ এবং একদল সৈন্য সেখানে স্থায়ীভাবে মোতায়েন করেছিল। '২১ সালের কংগ্রেস-খিলাফ আন্দোলনে উৎসাহিত হয়ে তারা এবার পুলিশ, সৈন্য, জমিদার, মহাজন, সবাইকে আক্রমণ করেছিল, এবং অবশ্য হিন্দুদেরও,—যাদের তারা বরাবরই শত্রুশিবিরের সামিলই

দেখে এসেছে। তাছাড়া তারা ইউরোপীয়দের হত্যা করেছে সরকারী-ভবন লুণ্ঠ করেছে, রেল, টেলিগ্রাফ বিধ্বস্ত করেছে।

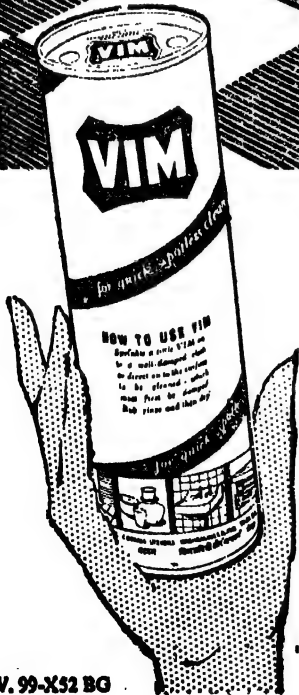
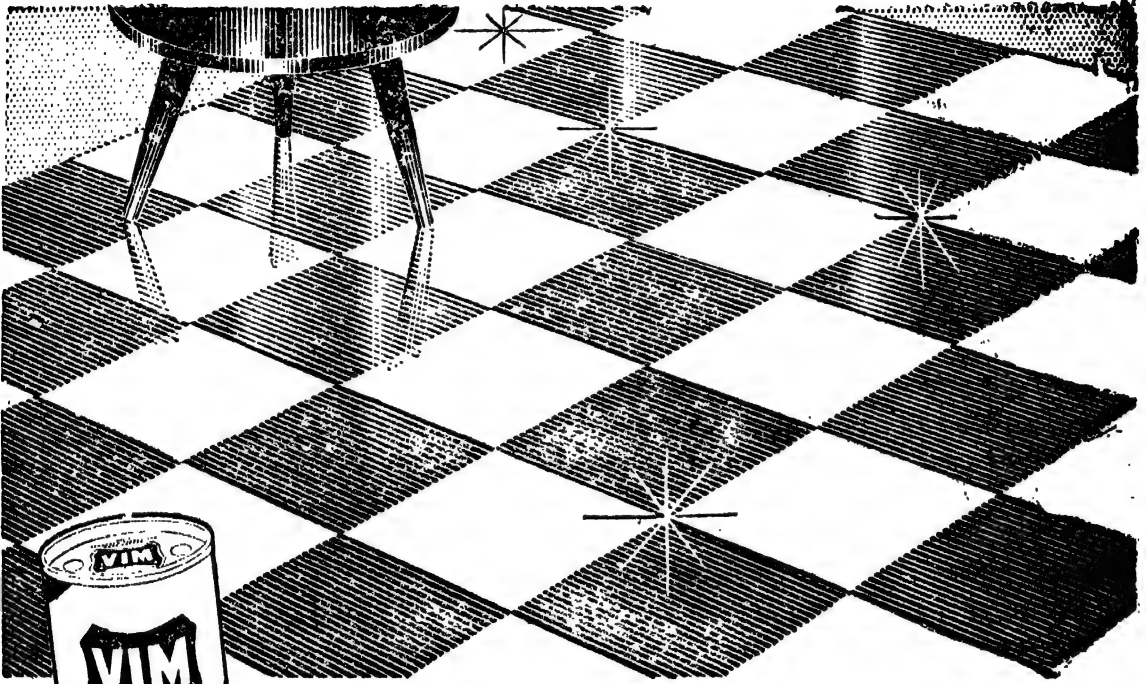
তাঁওয়া বুঝে মহাত্মাজী মোপলা বিদ্রোহকে ধিকার না দিয়ে বললেন, তারা সাহসী ও ঈশ্বরভক্ত,—এবং বললেন সরকার তাদের অসহ্য উৎপীড়ন করেছে, এবং তাদের অপকর্মের সরকারী ফিরিস্তি অতিরঞ্জিত। তিনি এবং মোলানা মহম্মদ আলী মালাবারে যাওয়ার পথে ওয়ালটেরারে গ্রেপ্তার হলেন, তাঁদের ফিরিয়ে দেওয়া হ'ল। তার পরেই করাচীতে রাজদ্রোহকর বক্তৃতা ও প্রস্তাব পাশ কবে মোলানা প্রভৃতি গ্রেপ্তার হন এবং তাঁদের জেল হয়।

নোট কথা '২১ সালের শেষেই আইন অমান্ত ও শেষ পর্যন্ত খাজনা বন্ধ আন্দোলনের কথায় লোকে সর্বত্র উৎসাহ-উত্তেজনার সাগরে অপেক্ষা করছিল। অনেকে আশা করেছিল, আইনমদাবাদ কংগ্রেসেই খাজনা বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হবে, কিন্তু তা হল না। জেল ভাঙি করার নির্দেশে বে-আইনী-ভার্লিটওয়ার দলে নাম লিখিয়ে, বে-আইনী সভা করে দলে দলে লোক জেলে বেঁচে লাগলো। '২২ সালের গোড়াতেই জেলে ৩০,০০০ লোক জমে গেছে। মহাত্মাজী ছাড়া বড় বড় নেতারাও জেলে গেছেন।

দেশের লোক কিন্তু খাজনা বন্ধের জন্তে উদ্রাণ হয়ে উঠেছে। অনেক স্থান থেকে মহাত্মার কাছে আবেদন আসছে, খাজনাযুক্ত সুর করার অসম্মতি জন্তে—মহাত্মা অসম্মতি দিচ্ছেন না। অন্ধের গুপ্তর জেলা খাজনাযুক্ত সুর করে দিয়েছিল,—১৫ লাখের মধ্যে মাত্র ৪ লাখ টাকার বেশী সরকার আদায় করতে পারেনি,—এই অবস্থায় মহাত্মাজী তাদের নিন্দা করে সব খাজনা চুকিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। লোকে হতভম্ব হয়ে গেল।

শেষ পর্যন্ত ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি বড়লাটকে নোটিশ দিলেন, সরকার যদি নির্ধ্যাতন বন্ধ করে বন্দীদের মুক্তি না দেয়, তিনি খাজনা বন্ধ আন্দোলন সুর করবেন। তিনি সকলকে বলে দিয়েছিলেন, সরকারী নির্ধ্যাতন ও প্ররোচনার মুখে কেমনভাবে সম্পূর্ণ অহিংস থাকতে হয়, তা তিনি নিজে আগে দেখিয়ে দেবেন, তার পরে অস্ত্র খাজনা বন্ধ সুর করা যাবে। তিনি এজ্ঞা বারদালী তালুকে খাজনা বন্ধের পরিকল্পনা করেছিলেন! ইতিমধ্যে মেদিনীপুরে বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের নেতৃত্বে নতুন শাসন সংস্কার অম্বারী ইউনিয়নবোর্ড সংগঠনে বাধা দিয়ে একটা নতুন

ভিম ব্যবহার করলে পরে -দেখুন কেমন ঝালমল করে



ভিম অল্প একটু ব্যবহার করলে পরেই সবজিনিষের চেহারা বদলে যায়। মেঝে, বাথরুমের বেসিন ও সিঙ্ক, খেকে, রান্নার হাঁড়ী, ডেস্কটা, বাসন-কোসন, কাঁচের ও চায়ের বাসন—সবই এক নতুন রূপ নেবে। ভিম দিলে পরিষ্কার করলে জিনিষপত্রে কোন রকম আচড় লাগে না। আর কত সোজা ও কম খাটুনিতে হয় ভেবে দেখুন। ভেজা ন্যকড়ার একটু ভিম দিয়ে আস্তে আস্তে ঘষুন—দেখবেন যত ময়লা আর দাগ নিষেবের মধ্যে মিলিয়ে যাবে। ভিম ব্যবহার করলে আপনার বাড়ী আপনার গর্বের কারণ হবে।

ভিম সবজিনিষেরই উজ্জ্বলতা বাড়ায়

সকলের আইন অমান্ত সূত্র হয়ে গিয়েছিল, এবং শেষ পর্যন্ত সফলও হয়েছিল, সরকার ইউনিয়ন বোর্ড সংগঠন করতে পারেনি।

যাই হোক, বারদোলীতে খাজনা বন্ধ সূত্র হওয়ার আগেই চৌরীচৌরার বিখ্যাত ঘটনা ঘটে গেল। বিক্ষুব্ধ কৃষকদের ওপর পুলিশ গুলী চালিয়েছিল, এবং শেষ পর্যন্ত কৃষকেরা থানা আক্রমণ করে আলিয়ে দিয়েছিল এবং ২২ জন পুলিশকে হত্যা করেছিল। ঘটনা শ্রবণমাত্র মহাত্মা গান্ধী তীব্র অপমান বোধে জর্জরিত হয়ে আন্দোলন বাতিল করে দিলেন এবং বললেন, তিনি তাঁর হিমালয় প্রমাণ ভ্রান্ত বিচারের জন্তে ঈশ্বর ও মানুষের চোখে বেইজ্ঞ হয়েছেন। কংগ্রেস ওরাকিং কমিটি সভা করে নির্দেশ দিলে, অভ্যুত্থানের আইন অমান্ত স্থগিত থাকবে, এবং কংগ্রেসকর্মীদের সর্বত্র চরকা অস্পৃশ্যতা নিবারণ, মাদকবর্জন ও শিক্ষাকার্য নিয়ে থাকতে হবে।

সংগ্রামী উৎসাহ-উত্তেজনার উদ্ভূত তরঙ্গ স্তব্ধ হয়ে গেল,— কর্মীরা ক্ষুব্ধ হয়েও নেতৃত্বের নির্দেশ অনুসারে তথাকথিত গঠনমূলক কাজেই মনঃসংযোগ করলে। আমরা চরকা-খন্দর এবং গ্রামাঞ্চাল দুল নিয়েই খাটুতুম—সবটুকু সময় ও শক্তি তাতেই নিয়োজিত ছিল—আমরা তাই নিরুই থাকলুম। কংগ্রেসের স্বরাজ যে স্বাধীনতা নয়, এবং তাও এখন গিয়ে পড়লো “বিশ বাঁও জলে”—সুতরাং আমাদের নিজেকে আদর্শ কংগ্রেসের মধ্যে প্রতিষ্ঠার চেষ্টাই এখন আমাদের করতে হবে,—এটা পরিষ্কার হয়ে গেল।

এদিকে চটগ্রামে প্রাদেশিক কনফারেন্স এসে পড়লো—গেলুম সেখানে। সভানেত্রী বাসন্তী দেবীর বক্তৃতার আমাদের সংগ্রামের ক্ষেত্র কাউন্সিলের দ্বিতীয় পর্যন্ত প্রসারিত করার ইঙ্গিত পাওয়া গেল। আমরা উৎসাহিত হলাম, কিন্তু গোড়া গান্ধীবাদীরা তার মধ্যে সি আর দাশের ব্যারিষ্টারের চুনীতির গন্ধ পেলো।

মুলীগঞ্জ সাবডিভিশন, এবং ঢাকা সহরের অন্তর্গত নবাবগঞ্জ থানা নিয়ে হয়েছিল বিক্রমপুর (সাবডিভিশনাল) কংগ্রেস কমিটি ৬টা থানা—তার মধ্যে দোহার এবং নবাবগঞ্জ ছিল প্রকৃত যোষ প্রযুক্ত গোড়া গান্ধীবাদীদের আড্ডা—বাকি ৪টে থানা—মুলীগঞ্জ, রাজাবাড়ী, টেকাবাড়ী এবং শ্রীনগর আমাদের আড্ডা। এর মধ্যে বানরী বিভাগ্রমের ধীরেন দাশগুপ্ত এবং পূর্ণানন্দ সেন, এবং লোহজঙ্গে জিতেন কুশারী গোড়া গান্ধীবাদী। খন্দরই ছিল এদের প্রধান অবলম্বন,—কিন্তু আমরাও তাতে নেহাৎ পিছিয়ে ছিলাম না—২২সালে শুধু পঞ্চসার কেন্দ্রেই পাঁচো ছপো চরকা চলেছিল। সকল বাড়ীতে তুলোর বীজ বিতরণ করে আমরা তুলোর গাছও করেছিলাম অনেক। গ্রামাঞ্চাল দুলের তাঁতে ভাল খন্দরের ধুতিশাড়ীও তৈরী হচ্ছিল। আমার দ্ব্যন অনুসারে লোকের বাড়ী বাড়ী গিয়ে কিছু কাঠ সংগ্রহ করা হত, এবং কারো বা একটা বড় আমগাছের মোটা সোজা একটা ডাল চাণা আদার করা হত। ডালের টুকরো দিয়ে চরকার কুঁদো বা “ডিম” তৈরী হত, এবং অজ্ঞাত কাঠ দিয়ে অজ্ঞাত অংশ তৈরী হত। যাদের বাড়ী থেকে কাঠ আনা হত,—তাদের একটা চরকা বিনামূল্যে দেওয়া হত,—বাড়তি চরকা অজ্ঞাতকেন্দ্রে দু'টাকা দামে বিক্রী করা হত, তাতে টাকু ও ছুতারের মজুরীর খরচ চলতো।

দাশ মহাশয় জেল থেকে বেরিয়ে স্বরাজপাটি গঠনের পরিকল্পনা প্রচার করলেন। সার্ভেট ও আনন্দবাজার গোড়া গান্ধীবাদীদের

কাগজ দাশ মহাশয়কে প্রত্যাহ গালি দিয়ে ভূত ভাগাতে লাগলো। দাদাদের সঙ্গে দাশ মহাশয়ের বন্দোবস্ত হল, যুগান্তরপাটি স্বরাজপাটিকে সমর্থন করবে, এবং কাজ করবে। স্বভাবতই কংগ্রেসের কেন্দ্রগুলো দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল Nochanger গান্ধীবাদীদের কেন্দ্র, এবং Prochanger স্বরাজপাটির সমর্থকদের কেন্দ্র। বিক্রমপুরে প্রকৃত যোষদের সঙ্গে লাগলো আমাদের ঠাকাতুকি।

কলকাতায় দাদারাই প্রথমে আত্মশক্তি কাগজখানা বার করেছিলেন এবং উপেনন্দাকে সম্পাদক করেছিলেন। বোঁবাজারের ঢেবী প্রেস এসেছিল অমরদার হাতে। শেষ পর্যন্ত ঢেবী প্রেসে আত্মশক্তি উঠে গেল,—কাগজটা চালাতে লাগলেন উপেনন্দা এবং অমরদার, এবং এই একখানি ছোট সাপ্তাহিক পত্রিকাই হল দাশ মহাশয়ের সমর্থক, স্বরাজপাটির কর্মপন্থার প্রচারক। সুতরাং সেখানে এসে জমলেন ভূপতি মজুমদার, সুভাষচন্দ্র বসু প্রভৃতি স্বরাজপাটির প্রাথমিক সর্বঙ্গণন কর্মীরা। ঢেবীপ্রেস হল স্বরাজপাটির প্রধান কর্মকেন্দ্র।

মুলীগঞ্জ গ্রামাঞ্চাল দুল থেকে আমরাও একটা হাতে লেখা মাসিক পত্র বাব করেছিলাম,—প্রথমে জীবনের নাম ছিল সম্পাদক—কিন্তু জীবন কলকাতার পাটির কাজ এবং স্বরাজ পাটির কাজেও বিশেষভাবে জড়িত ছিল। সুতরাং পরে সম্পাদক হলুম আমি। সেই কাগজেই আমি আমাদের বৈপ্লবিক আদর্শ প্রচারের মুখবন্ধরূপে “মন-কোঁজপারেশন ও স্বরাজ” নামে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছিলাম, বার মধ্যে পূর্বাঙ্ক উদ্ভূতিগুলো—গান্ধী, হজরৎ মোহাম্মদ প্রভৃতির কথাগুলো লিখেছিলাম। কাগজটার প্রকৃতি বোঝা বাবে একটা সংবাদ উদ্ধৃত করলে—“আনন্দ রাজার দেশসেবা—(এটা গয়া কংগ্রেসের পরের কথা)—“গত ২২শে বৈশাখ আনন্দবাজারের সম্পাদকীয় স্তম্ভে লেখা হয়েছে :

যখন দেশের সকল মতের সকল সম্প্রদায়ের একযোগে কংগ্রেসের পতাকাভলে সমবেত হইয়া কার্য করিবার প্রয়োজন আসিল হইয়া উঠিয়াছে,—সেই মুহূর্তে বৃহৎ নেতৃত্ব পরিচালিত স্বরাজ্য দল প্রতিদুল সমালোচনার কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা লাঘব এবং কাউন্সিলের মহিমা কীর্তন করিবার জন্ত দেশের সমুখে উপস্থিত হইলেন।

ঐ কাগজেই দেশবন্ধু মিজাপুর পার্কের বক্তৃতা বেরিয়েছে—তাতে কাউন্সিল সম্বন্ধে দেশবন্ধু বলেছেন :

“কাউন্সিল যে অসার তা তিনি বিশ্বাস করেন এবং অসহযোগ নীতি প্রবর্তিত হইবার পূর্বে তিনি অন্ততঃ কংগ্রেসেও একথা বলিয়াছিলেন। কাউন্সিল দ্বারা আমাদের কোন উপকার হইবে না সত্য, কিন্তু দেশদ্রোহীদের সাহায্যে কাউন্সিল দেশের অনেক ক্ষতি করিতে পারে।”

আমাদের কাগজে আমরা এইরকম ভাবে প্রচার করতুম। গয়া কংগ্রেসে দেশবন্ধু বললেন,—কাউন্সিল বরকট করার ফলে আমরা গভর্ণমেণ্টের একটা মন্ত সুবিধে করে দিয়েছি,—কতকগুলো বোঁহুকের দল দেশের লোকের প্রতিনিধি সেজে সেখানে বসে গভর্ণমেণ্টকে সমর্থন করছে—আইনভঃ গভর্ণমেণ্ট দেশবাসীর সমর্থনেই নির্ধাতিত চালাচ্ছে। আমরা কাউন্সিলের ঐ আসনগুলো দখল কবে সরকারের দুইনীতিকে পদে পদে বাধা দৌব, বাতে তারা

দেশবাসীর নামেই দেশের সর্বনাশ না করতে পারে। কংগ্রেসের তাতে জোরই বাড়বে,—বাইরের আন্দোলন কাউন্সিলের জন-প্রতিনিধিদের দ্বারা সমর্থিত হবে, জোরদার হবে।

গয়া কংগ্রেসের পর এই কাউন্সিল-প্রবেশের প্রচার নিয়ে নো-চেঞ্জ প্রো-চেঞ্জ দুই দলের গুঁতোগুঁতি বেড়ে চললো। ইতিমধ্যে অ্যাডভোকেট-জেনারেল এস. আর. দাশ এক দিন কাউন্সিলে বক্তৃতার মধ্যে একটি কথা বলে সকলের তাক লাগিয়ে দিলেন—“বিপ্লবীরা কংগ্রেসে ঢুকে সারা দেশে কংগ্রেসের আড়ালে নিজেদের দল গড়ছে, এবং তাদের নামের লিষ্ট আমার পকেটেই আছে।”

জীবন ও আমি গয়া কংগ্রেসে গিয়েছিলুম। এম, এন, বায়ের একখানা ম্যানিফেস্টো সেখানে বিলি হয়েছিল,—যাতে বলা হয়েছিল চাখা-মজুরদের ব্যক্তিগত ভাবে কংগ্রেস-সদস্য না করে, তাদের সংগঠনগুলোকে কংগ্রেসের affiliation দেওয়া চোক। সেটা অবশ্য গ্রাহ্য হয়নি। এম, এন, বায় তখন কমিউনিষ্ট ইন্টারন্যাশনালে ভারতের প্রতিনিধি এবং রুশিয়া থেকে কমিউনিষ্ট সাহিত্য এবং প্রচারপত্র ভ্যানগার্ড পাঠাতেন, জীবন কলকাতায় সেগুলো পেতো এবং মাঝে মাঝে মুন্সীগঞ্জেও পাঠাতো। ড্যান্সে তখন তরুণ এবং প্রথম বই লিখেছেন “Gandhi Vs Lenin”—জীবন তাঁর সঙ্গে দেখা করে গেলো, আমিও সঙ্গে ছিলুম।

এই গয়া কংগ্রেসে অনুশীলনের চারজন নেতার নামে এক ম্যানিফেস্টো বিলি হয়—

ভারত-সেবক-সংঘ

সাধারণের অবগতির জন্য আমরা জানাইতেছি যে, শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দাসের বর্তমান কার্যকলাপের সহিত আমাদের কোন প্রকার সংশ্লিষ্ট নাই এবং ভারত-সেবক-সংঘ নামক যে সংঘ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার অস্তিত্ব অনেক দিন হইল লুপ্ত হইয়াছে।

(স্বাক্ষর) শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রমোহন সেন

“প্রতুলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়”

“বনেন্দ্রচন্দ্র আচার্য্য

“রমেশচন্দ্র চৌধুরী

এই ম্যানিফেস্টোটা কলিকাতার আত্মশক্তি কাগজেও ছাপা হয়েছিল, এবং আমরা আমাদের কাগজে (উন্মত্ত) তা থেকে উদ্ধৃত করেছিলুম।

রহস্তটা পরে শুনলুম। এস আর দাশের পকেটে বিপ্লবীদের নামের তালিকা গেল কেমন করে? অনুশীলনপাটির কর্মীরা বিভিন্ন কংগ্রেস কেন্দ্রে ভারত-সেবক-সংঘের নামে “হুক কথা” প্রচার করতো, কিন্তু যুগান্তর পাটির কর্মীদের দ্বারা তাদের প্রচার বানচাল হত। তাদের বার্ষিকতার কৈফিয়তে তারা এস, আর, দাশের কাছে (পুলিন দাসের মাধ্যমে) লিখতো, যুগান্তর দলের অল্প কর্মীর জন্তে আমাদের প্রচার ব্যাহত হচ্ছে, সে এখানে কংগ্রেস কমিটি দখল করে বসে ছেলোদের বিপ্লবের মন্ত্র দিয়ে দল গড়ছে। এমননি করে নানা জায়গা থেকে যুগান্তর দলের দাদাদের নাম এস, আর, দাশের

অলৌকিক দৈবশক্তি-সম্পন্ন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ তান্ত্রিক ও জ্যোতির্বিদ

জ্যোতিষ-সম্রাট পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, জ্যোতিষাচরণ, রাজজ্যোতিষী এম-আর-এ-এস (লণ্ডন),



(জ্যোতিষ-সম্রাট)

নিখিল ভারত ফিল্ড ও গণিত সভার সভাপতি এবং কালীদাস বারাগদী পণ্ডিত মহাশয়ের হাতী সভাপতি। ইনি দেখিবামাত্র মানবজীবনের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান নির্ণয়ে সিদ্ধহস্ত। হস্ত ও কপালের রেখা, কোষ্ঠি বিচার ও প্রস্তুত এবং অন্তঃকরণ ও চরিত্র এইাদির ঐতিকারকজে শাস্তি-দণ্ডায়নাতি, তান্ত্রিক ত্রিচাঁদ ও প্রত্যেক ফলপ্রদ কবচাদি দ্বারা মানব জীবনের দুর্ভাগ্যের প্রতিকার, সাংসারিক অশান্তি ও ভাঙার কবিরাজ পরিতোষ কঠিন রোগাদির নিরাময়ে অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন। ভারত তথা ভারতের বাহিরে, যথা—ইংল্যান্ড, আমেরিকা, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, চীন, জাপান, মালয়, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি দেশে মনোবীক্ষণ ও তার অলৌকিক দৈবশক্তির কথা একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। প্রশংসাপত্রসহ বিস্তৃত বিবরণ ও ক্যাটালগ বিনামূল্যে পাইবেন।

পণ্ডিতজীর অলৌকিক শক্তিতে যাহারা মুগ্ধ তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন—

হিজ্, হাইনেস্ মহারাজা আটগড়, হার হাইনেস্ মাননীয়া ষষ্ঠমাতা মহারানী ত্রিপুরা ষ্টেট, কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় শ্রীরামনাথ মুখোপাধ্যায় কে-টি, সন্তোষের মাননীয় মহারাজা বাহাদুর শ্রীরামনাথ রায় চৌধুরী কে-টি, উড়িষ্যা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি-মাননীয় বি. কে. রায়, বঙ্গীয় গভর্ণমেন্টের মন্ত্রী রাজাবাহাদুর শ্রীকমলদেব রায়বর্মা, কেউনবড় হাইকোর্টের মাননীয় জজ রায়সাহেব মিঃ এস. এম. দাস, আসামের মাননীয় রাজ্যপাল শ্রীরামজি আলী কে-টি, চীন মহাদেশের সাংহাই নগরীর মিঃ কে. স্কটপল।

প্রত্যেক ফলপ্রদ বহু পরীক্ষিত কয়েকটি তন্ত্রোক্ত অত্যাশ্চর্য্য কবচ

ধর্মকাল কবচ—ধারণে স্বজাতিসে প্রভুত ধনলাভ, মানসিক শান্তি, প্রতিষ্ঠা ও মান বৃদ্ধি হয় (তন্ত্রোক্ত)। সাধারণ—১১০/০, শক্তিশালী ২৫০—২৫১০/০, মহাশক্তিশালী ও সত্ত্বর ফলদায়ক—১২৫১১০/০, (সর্বপ্রকার আর্থিক উন্নতি ও লক্ষ্যের কৃপা লাভের জন্য প্রত্যেক গৃহী ও ব্যবসায়ীর অবশ্য ধারণ কবচ)। লক্ষ্মীকাল কবচ—অগণন শক্তি ও পরীক্ষায় ফল ১১০/০, ২৫০—৩৫১০/০। মোহিনী (বর্জকরণ) কবচ—ধারণে অভিলষিত স্ত্রী ও পুত্র বনীবৃত্ত এবং চিরশত্রুও মিত্র হয় ১১১০/০, ২৫০—৩৫১০/০, মহাশক্তিশালী ৩৫১১০/০। বর্জলাক্ষ্মী কবচ—ধারণে অভিলষিত কর্মোন্নতি, উপরিহৃত মনিবকে সমুদ্র ও সর্বপ্রকার মাংসলাভ জয়লাভ এবং প্রবল শত্রুনাশ ২৫০/০, ২৫০—৩৫১০/০, মহাশক্তিশালী—১২৫১০/০ (আমাদের এই কবচ ধারণে ভাঙমূল সম্মানী জরী হইয়াছেন)।

(হাপিতাক ১১০৭ ৭ঃ) অল ইণ্ডিয়া এন্ট্রোলজিক্যাল এণ্ড এন্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটি (রেজিষ্টার্ড)

হেড অফিস ৫০—২ (ব), ধর্মকলা ষ্ট্রীট “জ্যোতিষ-সম্রাট ভবন” (প্রবেশ পথ ওয়েলসলী ষ্ট্রীট) কলিকাতা—১৩। কোম ২৪—৪০৬৫।

দফর—বৈকাল ৪টা হইতে ৫টা। ব্রাক অফিস ১০৫, প্রে ষ্ট্রীট, “বসন্ত বিধান”, কলিকাতা—৫, কোম ৫৫—৩৬৮৫। সত্ত্বর প্রাপ্তি ১টা ১১টা ১১টা ১১টা

পকেটে জমা হয়েছে। তিনি নিবোধের মতন সেটা নিয়ে বড়াই করার যুগান্তরের দাদাদের আরও বুঝতে কিছু বাকি নেই। তাই এই কলেঙ্কারী থেকে অমূল্যলীন পাটিকে বাব করে আনার জন্তে ঐ ম্যানিকেষ্টো প্রচার করা হয়েছে। দোষটা সবই পুলিশ দাসের ঘাড়ে চাপিয়ে অমূল্যলীনের নেতাবা মরে এসেছেন। পরবর্তীকালে পুলিশ দাস ব্যাপারটার উল্লেখ করে বলতেন,—“বেইমানের দল, আরে তবাই তো সব খাইচস—আমি একটা পয়সা খাইচি?”

এর পরই অমূল্যলীন দল যুগান্তরের সঙ্গে মিতালী করে কংগ্রেসে যোগ দেয়। এ বিষয়ে ভূপেন্দ্রকুমার দত্তের বই (বিপ্লবের পদ্ধতি) থেকে কয়েকটা কথা উদ্ধৃত করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তিনি লিখেছেন :

ধরা পড়ার কিছুদিন আগে থেকে (‘১৩ সাল) প্রভুল বাবু ও রমেশ বাবু আমার কাছে ঘাওয়া-আসা করছিলেন। তখন এঁরা ভারত-সেবক-সংঘ করার দরুণ বাংলা রাজনীতিক্ষেত্রে অগ্নি জ্বলান। প্রভুল বাবু একদিন আমার বলেন, “ও যা করতে গিয়েছিলেন, দেশের ভাল হবে বলেই তো করতে গিয়েছিলেন।”

কিন্তু দেশের ভাল হবে বলে ওঁরা এই সময়ে মিলতে এসেছিলেন, এ কথাটা যে কত অসার, সেটা বুঝি ১৯২৮ সালে খালাসের পর। এসেছিলেন তখন স্বরাজপাটি গঠিত হচ্ছে বলে। (১২৪ পৃষ্ঠা)

“...বাই হোক, স্বরাজ্যদল গঠনের ভার কিন্তু প্রায় সবটাই পড়লো আমাদেরই উপর। এবং তাই স্বাভাবিক। প্রভুল বাবুদের এই সময় আমাদের সঙ্গে মিলন কামনাও তেমন স্বাভাবিক।”

—(২-৭ পৃষ্ঠা)

কলত, এস, আর, দাশের পকেটের তালিকায় সভাবতই অমূল্যলীনের নেতা ও বিশিষ্ট কর্মীদের নামও উঠলো। কিন্তু I B তো সেই তালিকার উপরই নির্ভর করে না—তাদের খাতার আরো বড় তালিকা গড়ে তোলার ব্যবস্থা তারা আগে থেকেই করেছিল। দাদারা এক বছরের জন্তে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনকে একনিষ্ঠ ভাবে চালিয়ে, তারপর নিজেদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছিলেন বটে, কিন্তু সেটা ঐ কংগ্রেসকে বিপ্লবের পথে টেনে আনার দুশেষ্টা মাত্র, এবং তার জন্তে সম্মানস্বাপ্নী কার্যকলাপ সম্পূর্ণ ভাবে বাদ দিয়ে চলার নীতিই গ্রহণ করেছিলেন, যাতে কংগ্রেসের ভিতর দিয়ে তাঁদের দল গড়ার কাজ I B বানচাল করে দিতে না পারে, বাকিস্তান গ্রেপ্তার করার কোন সুযোগ না পায়।

তার পর যখন কাউন্সিল-প্রবেশের প্রায়ে নো-চেঞ্জ প্রোচেঞ্জ ছুঁল ভাগ হয়ে গেল, তখন প্রকৃত পক্ষে গান্ধীবাদী, বিপ্লব-বিরোধী, অহিংসাপন্থীরাই হল নো-চেঞ্জার, আর বিপ্লবীরাই হল প্রো-চেঞ্জার I Bর টার্গেট আরো পরিষ্কার হয়ে গেল। কিছু সম্মানস্বাপ্নী কার্যকলাপ দেশে চালু করার ব্যবস্থা তারা আগে থেকেই শুরু করেছিল একেট প্রোভোকেটর লাগিয়ে ছুটকো-ছুটকো বিপ্লবী রোদ্দাক প্রবণ তরুণদের দিয়ে সম্মানস্বাপ্নী কার্যকলাপের সাহায্যের ব্যবস্থা করে। এই রকম একজন একেট ছিল শিশির ঘোষ। সে মির্জাপুর ট্রীটে এক খন্দরের দোকান করে বসে কাজ চালাতো। আর একজন ছিল, ভূপেন বাবু। ওঁর বইয়ে তাঁর ছদ্মনাম দিয়েছেন

ছিল হাওড়ার ডোমজুড়ের বসন্ত ঢেঁকির শিছনে। শিশির এবং টুহুর মধ্যে আবার পালা এবং রেবারেবিও চলতো।

বিপ্লবীরা'র চেলা হিসাবে সম্ভাব্য মিত্র তাঁর কাছ থেকে (বা শিশিরের কাছ থেকে?) রিভলভার যোগাড় করে ভাই দেখিয়ে ছেলে ত্রিভুট করতো, এবং নেতা বলে বিপ্লবীরা'রই নাম করতো। বিপ্লবীরা' কংগ্রেসে দাদাদের সঙ্গে যোগ দিয়েও এ ব্যাপার বন্ধ করার চেষ্টা করেননি। শিশিরের বন্দোবস্তই সম্ভাব্য মিত্রের দল শাখারীটোলা পোষ্ট অফিসে ডাক্তারি করতে গিয়ে পোষ্ট মাস্টারকে হত্যা করে। বরেন ঘোষ সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলেই ধরা পড়ে এবং পুলিশের কাছে স্বীকারোক্তি করে। মামলায় তার বিরুদ্ধে সাক্ষী দেয় যারা, তার মধ্যেও শিশিরের লোক ছিল। বরেনের প্রথমে প্রাণকণ্ড, ও পরে Mercy petition করার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। তারপর সম্ভাব্য মিত্রের দল কোণা (হাওড়া) ডাক্তারি করে, ডাক্তারি ব্যর্থ হয়। তারপর সম্ভাব্য মিত্র, বীরেন বাগচি এবং সুবোধ লাহিড়ীকে রেকলেশন থ্রিতে রাজবন্দী করা হয়, এবং দেবেন ঘোষ (খোকা) গা ঢাকা দেয়।

পরে মির্জাপুর ট্রীটে শিশির ঘোষের খন্দরের দোকানে বোমা পড়ে, শিশির পালিয়ে বেঁচে যায় এবং তার কর্মচারী প্রকাশ বণিক্য বোমার আঘাতে মারা পড়ে। এই সম্পর্কে ডোমজুড়ের বসন্ত ঢেঁকি পরে ধরা পড়ে, এবং মামলায় তার ফাঁসি হয়। শিশিরের দোকানে বোমা মারা কাজটা নাকি টুহুর সেনের আক্কা-আকচির কল। শিশির তার পর I Bর চাকরী নিয়ে ইউ পিতে চল যায়। পরবর্তী কালে গোপী শর্মা পিছনে থেকে টুহুর সেনই নাকি তাকে দিয়ে ডে সাহেবকে খুন করিয়ে টেগাটিকে বাঁচিয়েছিল। গোপী টেগাটিকে আরার জন্তে ঘুরছিল।

এই সব সম্মানস্বাপ্নী কাণ্ড শুরু হওয়ার সময় থেকেই দাদারা মর্মে মনে বিপদ গণ্যছিলেন, দিন বুঝি ঘনিয়ে এল। ওদিকে আর একইরকমের কাণ্ডও চলছিল। দাদারা মোজাফকর আহমদের দায়ক এম এন রায়ে'র সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে ভারতীয় বিপ্লবে কল সাহায্য সংগ্রহের চেষ্টা শুরু করেছিলেন, কিন্তু এম এন রায়ে'র চাচা-মজুরের বিপ্লবের প্লান গ্রহণ করতে সম্মত হননি। ২১ জন দাদা, যেমন ভূপতি মজুমদার, কিন্তু প্রায় কটর কমিউনিষ্ট হয়ে উঠেছিলেন। তিনি ২১ সাল থেকেই কাজী নজরুল ইসলামকে নিয়ে যেতেছিলেন এবং মোজাফকরের আড্ডায় (ধুমকেতু অফিস) আস্তানা গেড়েছিলেন। উপেনদা'ও আত্মশক্তি কাগজে এম এন রায়ে'র ভানগার্ড প্রভৃতি থেকে চাচা-মজুরের বিপ্লবের আদর্শ সম্পর্কে প্রচার করতেন। দাদাদের মধ্যে মনোরঞ্জনদা' ছিলেন এসব কাণ্ডের সব চেয়ে উগ্র বিরোধী।

কলতঃ একদিকে গান্ধী, আর এক দিকে বলশেভিজের দাদাদের মধ্যে রীতিমত ভাব-বিরোধের সৃষ্টি করছিল। বিপ্লবী দলের জিতেন কুশারী হ'য়েছিলেন পরিপূর্ণ গান্ধীবাদী এবং নো-চেঞ্জার দলভুক্ত—তিনি দাদাদের কাছে গোপন রিপোর্ট দিয়েছিলেন যে, জীবন ছেলেদের ভ্যানগার্ড পড়তে দিচ্ছে। মনোরঞ্জনদা' হয়েছিলেন বারো আনা গান্ধীবাদী এবং নো-চেঞ্জার—তিনি জীবন এবং ভূপতিদা'কে ভাল চোখে দেখতেন না—কারণ এঁরা দুজনেই হলেন প্রো-চেঞ্জার দাদাদের সান্নিধ্য

ধেরাল বর্জন করেছিলেন এবং '২৩ সালে তাঁকে বি-পি-সি-সির সেক্রেটারী করে দিয়ে দাদাদার তাঁর কমিউনিজমপ্রেম সম্পূর্ণভাবে মুছে দিয়েছিলেন। জীবন কিন্তু দাদাদের সঙ্গে স্বরাজ্যপাটিও করে এবং ভ্যানগার্ডও প্রচার করে। দাদাদের সঙ্গে যোজ্জাক ফর আহমদের যোগাযোগ রক্ষার জন্তে দাদারা জীবনকেই নিযুক্ত করেছিলেন।

অতুলদা' পলাতক জীবন শেষ করে বেরিয়ে আসার পর ব্যবসায়ের দিকে ঝুঁকিয়েছিলেন,—দাদাদের সঙ্গে কংগ্রেসে যোগ দেননি—কলেছিলেন অহিংসাপন্থা আমার হজম হবে না। অনেক তখন তাঁর ওপর চটেছিলেন, কিন্তু তাঁরাই বছরের পর বছর তাঁর কাছ থেকে নানা প্রকারে সবচেয়ে বেশী অর্থ সাহায্য গ্রহণ করতেন।

সতীশদা' বেরিয়েছিলেন সকলে বেরোবার প্রায় এক বছর পরে। তিনি ও পাঁচদা' সকলের সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়ে পৃথক হয়ে পড়েছিলেন,—জানতেই পাবেন নি যে সরকারের সঙ্গে আপোষ হয়েছে,—সকলেই কিরে এসেছেন। তাই তাঁর নামে বিজলীতে দাদাদের বিজ্ঞাপন অনেকদিন পর্যন্ত চলেছিল। তার ফলে তাঁরা চন্দননগরে মতিলাল রায়ের কাছে এসে ওঠেন, এবং সতীশদা' তাঁর নামে মোটা টাকা সরকারী ঘোষণা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক বাতিল হওয়ার পর আত্মপ্রকাশ করেন ১৯২১ সালের শেষে। তিনি তার পরেও গাঢ়াঢ়া দিয়ে থাকার পক্ষপাতী ছিলেন, ভবিষ্যতের কাজের সুবিধার জন্তে,—কিন্তু শেষ পর্যন্ত দাদাদের সঙ্গে কংগ্রেসে ভিড়ে গিয়ে খুলনায় গিয়ে বসেন, যেমন প্রায় সব দাদাই নিজ নিজ জেলায় বসেছিলেন।

হাই হোক, গয়া কংগ্রেসের পর আমি ও জীবন কয়েক দিন একটু মধুপুর, দেওঘর, জামসেদপুর ঘুরে গেলুম লক্ষ্মীসরাইয়ে। সেখানে জীবনের একটু ছোট জমিদারী ছিল। বৎসরান্তে কিছু খাজনা আদায় হত—জীবন সেটুকু বিক্রী করার বন্দোবস্ত করে এল। এদিকে মুন্সীগঞ্জে রটে গেল জীবনবাবু মুন্সীগঞ্জ ছেড়ে চলে গেছেন, এবং তার ফল হল, জাশান্নাল খুল প্রায় উঠে বাওয়ার যোগাড়—ছেলেরা খুলে আসা বন্ধ করতে শুরু করলো। ছাত্র এবং অভিবাসকদের মধ্যে জীবনের প্রভাব, তার প্রতি বিশ্বাস কতখানি, তা দেখা গেল। আমরা মুন্সীগঞ্জে এসে যখন এই অবস্থা দেখলুম,—তখন জীবন উদ্দাদের মতন বাড়ী বাড়ী ছুটোছুটি করতে লাগলো। তখন চৌরীচৌরার মামলায় ১৭২ জনের কাঁসীর হুকুম হয়েছে—মহাত্মা গান্ধীকেও সরকার গ্রেপ্তার করেছে এবং ৬ বছর জেল দিয়েছে—আন্দোলনের ভাঁটার মুখে সরকার নির্ভরে তাঁর উপর চরম আঘাত হানার বন্দোবস্ত করেছিল।

জীবন চৌরীচৌরার আসামী ১৭২ জন কৃষকের কাঁসির হুকুমের বিরুদ্ধে এক বিরাট প্রতিবাদ-সভা আহ্বান করলে। প্রকাণ্ড সভা হল, আমি উদ্বোধন সঙ্গীত গাইলুম “দেশ দেশ নন্দিত করি মন্ত্রিত ভব ভেরী—আসিল হত বীরবৃন্দ” ইত্যাদি। সভাপতি বোধ হয় শৈলেশ মিত্রের বাবা সিনিয়র উকীল জ্ঞান মিত্র। জীবনের বক্তৃতায় এমন এক নতুন উৎসাহ উত্তেজনা সৃষ্টি হল যে আবার জাশান্নাল খুল জরজমাট হয়ে উঠলো।

খরচ সব্বাসনের অসুবিধা বরাবরই ছিল। বতীন দত্ত, পরেশ সেন প্রভৃতি মাঠের মশায়রা জেলে গিয়ে জাঁতার গম পেয়া লিখে এসেছিলেন—খানা জাঁতা কেনা হল, এবং টিচারদের

ডিউটি হল এক ঘণ্টা করে গম পেয়া। অনেকের বাড়ী থেকেই গম আসতো, এবং আমরা চার পরস্পর সের হারে গম পিবে দিতুম।

প্রাইজ দেওয়ার সময় আস'ছ টাকার দরকার—জগদ্ধাত্রী খোলায় মেবারপতন অভিনয় হল, কিছু টাকা উঠলো। আমি গানের সুর গঠিয়ে দিলুম। আমাদের পাড়ার, টালার, একবার মেবারপতন প্লে করেছিল পাড়ার দল। বিখ্যাত নাট্যশিল্পী ও সুরশিল্পী রাধাচরণ ভট্টাচার্য—করালীর পিসতুতো ভাই, টালার লোক! তিনি নৃত্যশিল্প এবং সর্পপ্রকারের যন্ত্রসঙ্গীতেও ছিলেন ওস্তাদ। তিনি গানের সুর রপ্ত করে দিয়েছিলেন,—এবং আমি শুনে শুনে মেরে দিয়েছিলুম। জগদ্ধাত্রী নাট্য সমাজের প্রেসিডেন্ট ছিলেন সাবডিভিশনাল অফিসার পূর্ণোন্নিথিত ফণী মুখার্জি। টাকার ম্যাচিণ্টের কাছে কেউ আবেদন করেছিল প্লে বন্ধ করার জন্তে—সাম্প্রদায়িক বিরোধের সম্ভাবনার অজুহাতে ম্যাজিষ্ট্রেট বন্ধ করার আদেশও জারি করেছিলেন,—কিন্তু ফণী বাবু নিজে লিখে সে আদেশ বাতিল করিয়ে নিজে সারাক্ষণ বসে থেকে প্লে করিয়েছিলেন।

এইখানে একটা মনোবিজ্ঞানের প্যাচের কথা বলে নিই। হারা কোন আদর্শ নিয়ে খাটে, কর্মপন্থা সঠিক হোক বা না হোক, তারা নিজেরা কবে খাটে বলেই মনে করে, কাজের কাজ অবশ্যই কিছু হচ্ছে। আমাদের অবস্থাও ছিল কতকটা ঐ রকমের। সারাদিন ভূতের মতন যেটে বার লাইব্রেরীর গরাদেবিহীন জানালা টপকে ঢুক লম্বা লম্বা টেবিলের ওপর লম্বা হয়ে খানিক ঘুমিয়ে নেওয়া, এই হয়ে পাড়িয়েছিল প্রাত্যহিক ঘটনা। পকসানের এক কারখ

THE JEWELLERIES, WATCHES
& GUARANTEED
WATCH REPAIRING



OMEGA, TISSOT
& COVENTRY WATCHES
ROY COUSIN & CO.
4, DALHOUSIE SQUARE, CALCUTTA-1

বৃদ্ধ থাকতেন বার লাইব্রেরীর রাত্রের পাহারা, তাতেই আমাদের এই সুযোগ হয়েছিল।

খিয়েটার শেষ করে বেরোতে রাত তিনটে বাজলো—পরদিন পাইকপাড়া (আবদুল্লাপুর) যাওয়ার প্রোগ্রাম আছে, মিটিং করতে হবে—শেষ রাতটুকু না ঘুমিয়ে কয়েকজনে হাটা দিলুম—মাইল পাঁচকে হেটে সকালেই সেখানে পৌঁছে গেলুম। '২২ সালেও কংগ্রেসের মেম্বর করা কঠিন হয়নি, কিন্তু '২৩ সালে সেটা কঠিনই হয়ে উঠেছিল, বিশেষত ঐ কেন্দ্রে প্রধানত চাষীদের বাস, তারা শ্রেফ কংগ্রেসে আসতে চায় না। স্থানীয় কর্মীরা হতাশ হয়ে পড়েছে।

বিক্রমল আবেদনাদেশের মাঠে সভা হল, আমি প্রধান বক্তা—“কলকাতার বক্তা”! এক মৌলবী সাহেবকে করা হল সভাপতি আর পাইকপাড়ার (পানবর্তী গ্রাম) জাফরুল হকের কর্মীরা কংগ্রেসের রসিদ বই নিয়ে সভার মধ্যে ছড়িয়ে থাকলেন। আমি বক্তৃতা দিলুম, প্রায় কমিউনিজম—“কংগ্রেস শুধু বাবুদের ভিড়, তাই কঠোর, স্বতন্ত্রা কংগ্রেস শুধু তাদের স্বার্থ সাধনের কল হয়ে উঠেছে, আর যদি স্বরাজ হয়ই, তাহলে সেটা হবে বাবুদের স্বরাজ—তাতে কৃষকদের স্বার্থরক্ষা হবে না, কারণ কৃষকদের স্বার্থ আর বাবুদের স্বার্থ এক নয়। স্বতন্ত্র কৃষকদের দলে দলে কংগ্রেসে প্রবেশ করা দরকার,—তারাই দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণী, তারা যদি কংগ্রেসের মধ্যেও সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হয়, তাহলে তাদের স্বার্থ নষ্ট হওয়ার ভয় থাকবে না।”

মৌলবী সাহেব বধন আমাকে সাধুবাদ দিয়ে বক্তৃতা করছেন, তখন ওদিকে ১০ জায়গায় কংগ্রেসের সদস্য করে রসিদ কাটা চলছে। সভাতেই বেশ কিছু সদস্য সংগৃহীত হল, এবং তার পর সেখানে কংগ্রেস কমিটিও হয়ে গেল।

এ দিকে কংগ্রেসের এডুকেশন বোর্ডের যে ২কম ভয়দশা,—তাতে জাফরুল হকের ছেলের ভবিষ্যৎ নিয়ে আমরা চিন্তিত হলাম।

Education may wait, but Swaraj cannot—

এ প্রোগ্রাম স্বরাজের সম্ভাবনা দূরে সরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভেঁঙা হয়ে গেছে। স্বতন্ত্রা আমরা মনস্থির করে লেখালেখি করে স্বদেশী যুগের National Council of Education-এর অন্তর্ভুক্ত হলাম, যাতে আজ পরীক্ষার পর ছেলেরা Bengal Technical Institute-এ সহজে ভর্তি হতে পারে। সেটা হয়েছিলও—আমাদের কয়েকজন ছাত্র বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটে ভর্তি হয়ে পাশ করে চাকরী বাকরী পেয়েছিল।

ঢাকায় সরস্বতী লাইব্রেরীর এক ড্রাক খোলা হয়েছিল, আমাদের দলের লোক তরুণ তরুণীরা কালা মহারাজ বোধ হয় চার্জে ছিলেন। একজন ভাল কর্মীর প্রয়োজন হল গ্রামে গ্রামে ঘুরে সরস্বতী লাইব্রেরীর প্রকাশিত জাতীয় সাহিত্য প্রচারণার জন্তে—আমি কলকাতা থেকে সারদা ব্যানার্জিকে নিয়ে গিয়ে লাগিয়ে দিলুম। প্রভাস মল্লিককেও মুন্সীগঞ্জে নিয়ে গিয়েছিলুম, সে ছিল সকল কাজেই General assistant—এবং সর্বজনপ্রিয় করিতকর্মী ছেলে। সেই সময়ে সরস্বতী লাইব্রেরী নরেশদার (চৌধুরী) একখানা ছোট বই প্রকাশ করেছিল—কোরিয়ার বিপ্লব আন্দোলন ও জাপানী বর্করতার বিবরণ—কোরিয়ার জাতীয়তাবাদী নেতা সীংম্যান রী চীন থেকে আন্দোলনের নেতৃত্ব করছিলেন। নরেশ চৌধুরী যুগান্তর দলের লোক, আর তাঁর দাদা রমেশ চৌধুরী ছিলেন অমূল্য দলের।

'১৭'১৮ সালে প্রেসিডেন্সি জেলে ৪৪ ডিগ্রীতে বহুকাল নির্জন কারাবাসে থেকে জোয়ান বয়সেই নরেশদার চেহারা ও স্বাস্থ্যের অবস্থা হয়েছিল বৃদ্ধদের মতন। '২৫ সালে মেদিনীপুর জেলে তাঁর সঙ্গে ছিলুম। তিনি আমাকে খুব স্নেহ করতেন। '২৮ সালে জেল থেকে বেরোবার পর কিছুদিন রোগভোগ করে তিনি মারা গেছেন।

মাই হোক,—২৩ সালের মাঝামাঝি স্বরাজ্যদলের ঘাঁটি ঢেরী প্রেসে বধন সভাস বাবু আড্ডা গাড়ে, তখন উপেনদা তাঁর ওপর বেশ প্রভাব বিস্তার করেন, এবং দাদাদের মতিগতি দেখে সভাসবাবুকে করায়ত্ত করে গোপনে অমূল্যলীন পাটিকে নিয়ে কাজ করার প্ল্যান করেন। অমূল্যলীন পাট চাইছিলো জনপ্রিয় সভাসচক্রকে যুগান্তর দলের প্রভাব থেকে ছিনিয়ে নিতে এবং তার জন্তে তাঁর একচ্ছত্র নেতৃত্ব মেনে নিতে,—যাতে কংগ্রেস এবং পাবলিক ফিল্ডে তাদের কাজের সুবিধা হয়। সভাসবাবুর মনেও একটা রোমাঞ্চকর মোহ দেখা দিয়েছিল, উপেনদার মতন মন্ত্রী এবং একদল অভিজ্ঞ বিপ্লবী কর্মীর আনুগত্য পেলে তিনি হতে পারেন স্বরাজ সংগ্রামের একটা deciding factor.

এই সময়ে দেশবন্ধু বেকলেন পূর্ববঙ্গ সফরে—সঙ্গে মিলেন সভাসচক্র, কিরণশঙ্কর এবং উপেনদারকে। জীবনও সুযোগ বুঝে বেকাবীবাজারে (সুরেন মজুমদারের সাহায্যে) বিক্রমপুর রাজনৈতিক সম্মেলনের বন্দোবস্ত করে তাঁদের নিমন্ত্রণ করলে। তাঁরা মুন্সীগঞ্জে এলেন। কমলা ঘাট থেকে মুন্সীগঞ্জ সহরের মাঝখানের খাল থেকে নৌকায় সহরে আসাই সুবিধা। দেশবন্ধু আসছেন বলে লোকের যে উৎসাহ, ততোধিক উৎসাহ সভাসবাবু আসছেন বলে। সবচেয়ে বেশী উৎসাহ মতি সিং-এর। বঙ্গবাগিনীর চন্দ্রভূষণ গুরুকে গৌরার মতন সে হচ্ছে মুন্সীগঞ্জ কংগ্রেসের পাজরার হাড়—সনাতন ভলাটিয়ার। তবুও এই যে, মতি তার চেয়ে কালো—তার হাতের তেলোটাও কালো। কিন্তু ওপরটা বত কালো, ভেতরটা তত সাদা—আর সাদা তার শূন্যর দাঁতের পাটি, যাকে বলে milk white, সাদা মনের পরিচয় তার নির্মল হাসিতে, আর সে হাসির অন্তও নেই বিরামও নেই—ভাকে ধরে হারলেও সে হাসে। বোধ হয় তার শেট কামড়ালেও সে হাসে, আর সে হাসিতে যেন মুক্তা ধরে।

নেতাদের নৌকা ঘাটে ভিড়তে না ভিড়তে উজ্জল গৌরবর্ণ সভাসচক্রকে দেখে তার আনন্দ আর উৎসাহ যেন লাফিয়ে উঠলো—সে এক লাকে নৌকায় উঠে পড়ে সভাসবাবুর একখানা হাত ধরে টেনে তার পাশে নিজের কুচকুচে কালো হাতখানা রেখে দেখে হেসে একবারে লুটোপুটি। সদাগন্ডীর সভাসবাবুর মুখেও হাসি ফুটে উঠলো, সভাসবাবু তাকে বুকে টেনে নিলেন—এক মুহূর্তে সে সভাসবাবুকে আপনার করে নিল।

মতি Matriculation Examination-এর আগেই আলোচনে যোগ দিয়েছিল, পরে আজ পাশ করে, এবং শেষ পর্যন্ত কলকাতায় এসে কর্পোরেশনের স্থলের টিচার হয়েছিল।

মাই হোক, কনফারেন্সের অধিবেশন চলার মধ্যেই স্বরাজ উপেনদা প্রভুল ঠাকুরকে খবর দিয়ে আনিতে সভাসবাবুকে নিয়ে এক পুকুরের ‘ঘাটলার’ সাঁকায় বসে কিছু শোপন পরামর্শ করলেন। ওদিকে কনফারেন্সে কাউন্সিল প্রবেশ নিয়ে নো-ডেঞ্জার প্রোডেমার গুণ্ডাওতি চললো। নো-ডেঞ্জার নেতা ডক্টর প্রভুল ঘোষ দলবল নিয়ে

গিয়েছিলেন। তিনি জীবনকে লক্ষ্য করে সভায় বললেন,—যারা অহিংসার বিশ্বাস করে না, তাদের কংগ্রেসে থাকার কোন অধিকার নেই। তার জবাবে জীবন মহাত্মা গান্ধীর স্বহস্তলিখিত পত্র বার করে পড়ে শুনিতে প্রফুল্ল বাবুদের আহ্বান করলে স্বচক্ষে পত্রখানি দেখে বাওয়ার জন্তে। ওরা চূপ করে থাকলেন,—খোঁতা মুখ ভোঁতা হয়ে গেল। স্বরাজপার্টির সমর্থনে প্রস্তাব পাশ হয়ে গেল।

ভাষাতত্ত্ব ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ্যপুস্তক ১ম শ্রেণীর জন্তে নির্বাচিত হয়েছিল,—সাহিত্য রবীন্দ্রনাথের বিসম্ভব,—কাব্য—নবীন সেনের রৈবতক, এবং প্রবন্ধ বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্ত্ব বা অমূল্যলীলন। দেশপ্রেম, বীরত্ব, সশস্ত্র সংগ্রাম, রাজনীতি, বস্তুতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী, এই সব নিয়েই তত আলোচনা। ফার্স্ট ক্লাশের ফার্স্ট বয় ছিল একটি মুসলমান ছেলে, নীরব ও নিরীহ প্রকৃতির। সে হঠাৎ একদিন আমাকে গোপনে তার লেখা এক প্রবন্ধ দেখালে—তার প্রতিপাত্ত, ধর্মাহুষ্ঠান এবং ধর্মের প্রচলিত বচনগুলো, ঈশ্বর-আল্লাহর কুৎসং—এসবই বুজুককী,—সাদারণ সরল লোকদের ধোঁকা দিয়ে ঠকিয়ে খাওয়ার জন্তে মোল্লা পুরুতদের কৌশলমাত্র। প্রকাণ্ড প্রবন্ধ, প্রত্যেকটি কথার সমর্থনে প্রচুর উদাহরণ ও যুক্তি—দেখে আমার চক্ষু চড়কগাছ—আমার মাষ্টারীর সন্দেহাতীত সাক্ষ্য, আশাতীত ফল! এখন সে কোথায় আছে, কি করে জানিনা,—মনে পড়লে জানতে ইচ্ছে করে,—মনে মনে বৃষি, যেখানেই থাক,—সংকীর্ণতা, সাম্প্রদায়িকতা, নীচতা তাকে স্পর্শ করতে পারেনি। ভেবে আনন্দ পাই।

বিক্রমপুরের মতন মাণিকগঞ্জেও সাবডিভিসিয়াল কনফারেন্স

হল—সেখানকার নেতা ছিলেন নরেন বোস। বিক্রমপুর সাব-ডিভিসিয়াল কংগ্রেস ছিল আমাদের হাতে। নিমন্ত্রিত হয়ে আমরা কয়েকজনে গেলুম। সকলে টিমার থেকে মাণিকগঞ্জে নেমে একজন ভলান্টিয়ার গাইডের সঙ্গে ১২ মাইল হটন দিয়ে গেলুম তেওতা গ্রামে—কিরণশঙ্কর রায়ের বাড়ী। ঐ ১২ মাইল পথের মধ্যে একটা জিরোবার জায়গা নেই, খাবার জলের পর্যন্ত বন্দোবস্ত নেই। কিরণবাবু কিছু চাঁদা নিশ্চয়ই দিয়েছিলেন, আদায় করতে পারি, কিন্তু তা ছাড়া তাঁর সংস্পর্শের কোন পবিচয়ই ছিলনা।

১৩ সালের শেষে ইলেকশন এস,—ঢাকার স্বরাজ্যদলের প্রার্থী হলেন কিরণশঙ্কর। ঢাকা জেলা কংগ্রেস কমিটি তখন অমূল্যলীলন পার্টির হাতে। প্রভুলবাবুর ভগিনীপতি উকীল মনোরঞ্জন ব্যানার্জির সঙ্গে কিরণশঙ্কর ব্যবস্থা করলেন, তাঁরাই নির্বাচনী প্রচার করবেন, এক সারা জেলার ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে এক্জেন্ট পাঠাবেন,—তাঁদের কর্মী আছে সর্বত্র। বলা বাহুল্য,—নির্বাচনের ব্যয়ের একটা মোটা অংশ এই প্রচার-এজেন্টের নামে তাঁরা পেলেন। জীবন কলকাতায় তাঁকে আগেই নিশ্চিত করে দিয়েছিল, আমাদের কেন্দ্রগুলো সব্ব্ব। মনোরঞ্জন বাবুর কোন লোকই আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ না করার আমার একটু চিন্তিত হয়েছিলাম। শেষে ইলেকশনের আগের দিন আমরা চারদিকে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ছড়িয়ে পড়লুম,—কারণ স্বরাজ্যদলের সাফল্য সম্বন্ধে আমাদের, অনারারীদের, সবচেয়ে বেশী গরজ—কারণ যুগান্তর দলের হাতেই স্বরাজ্যপার্টির সাংগঠনিক কাজের দারিষ ছিল।

আমি গিয়েছিলুম বোলঘরে। হাই স্কুলের হেডমাষ্টার ছিলেন

উজ্জ্বল দিবসের উজ্জ্বল চিন্তা



বোরোলীন

পত্রম প্রসাধন

পরিষ্কার স্বচ্ছকে আকাশ,
রূপালী-মেঘ কাশফুলের নাচন,
আর শিউলির গন্ধে উৎসবের
লাড়া জেগেছে দিকে দিকে।
আকাশে-বাতাসে এক খুশির
আমেজ আছে জড়িয়ে। এই
স্বচ্ছকে পরিবেশে নিজেকে
উজ্জ্বল করে তোলাবার ইচ্ছে
সকলেরই সেজন্তে আপনার চাই
বোরোলীন ফেস ক্রীমের মত এক
অতুলনীয় উপকরণ। বোরোলীনের
যত্নে নিজেকে উজ্জ্বল করে তুলুন।
স্বরভিত বোরোলীনের মিষ্টি গন্ধে
আপনার মন খুশিতে ভরে উঠবে।



পরিবেশক : জি, দত্ত এণ্ড কোম্পানী ১৬, বনফিল্ড লেন। কলিকাতা-১



একজন দরদী, তাঁর বাড়ীতে রাতে থাকলুম incognito, সকালে পোলিং বুথে গিয়ে বসলুম, লোকজনের সাড়াশব্দ নেই। বেলা হওয়ার সঙ্গে ২।১ জন করে লোক আসতে শুরু করলো, দেখলুম একটু কথা কয়ে, সকলেই স্বাভাবিকভাবে ভক্ত। দুপুর বেলা মনোরঞ্জন বাবু একজন ছোকরা নিয়ে এলেন, আমি জিজ্ঞাসা করতে কললেন, এই যে, এ-ই থাকবে এখানে।

ইলেকশন হয়ে গেল, কিরণশঙ্করই নির্বাচিত হলেন। বিরুদ্ধে কে দাঁড়িয়েছিল, মনে নেই, বোধ হয় ভাগ্যকুলের জমিদারদের কেউ। বিক্রমপুর থেকে বি-পি-সি-সির ইলেকশনে দাঁড়িয়ে আমিও তখন বি-পি-সি-সির মেম্বার হয়েছি।

ইতিমধ্যে '২৩ সালের সেপ্টেম্বরে দিল্লী কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন হয়ে গেছে। নো-চেঞ্জ প্রো-চেঞ্জ নিয়ে কংগ্রেস প্রায় বিখণ্ডিত হওয়ার যোগাড় হয়েছিল বলে' একদল সেন্টার গ্রুপ কপেও গজিয়ে উঠেছিল, বাংলায় তার একজন পাণ্ডা ছিলেন বাবুদার অসহযোগী প্রোফেসর অনিলবরণ রায়। একদিকে গান্ধীভক্তি, আর একদিকে যুগান্তর দলের দাদাদের প্রো-চেঞ্জ কর্মকাণ্ড, এই দোটাটার পড়ে মনোরঞ্জন 'দা'র (গুপ্ত) অবস্থাও হয়েছিল কতকটা মধ্যপন্থী। অনিলবরণ রায়ের সঙ্গে তাঁর পাতির এবং ঘনিষ্ঠতাও হয়েছিল। সবসত্তা প্রেস থেকে মনোরঞ্জনদা' এক সাপ্তাহিক কাগজ বাধ করেছিলেন "সারথি" এবং অনিলবরণকে সম্পাদক করে আরো নিকট বন্ধু করে নিয়েছিলেন।

যাই হোক, এই সেন্টার গ্রুপের চেষ্টায় দিল্লীতে আপোষ মীমাংসার উদ্দেশ্যে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন হয়—মৌলানা মহম্মদ আলী হয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট। বাংলা থেকে দেশবন্ধু তাঁর ডেলিগেটের দলবল নিয়ে দিল্লী চললেন, মুন্সীগঞ্জ থেকে আমরাও কয়েকজন দিল্লী গেলুম—যতীন দত্ত, পরেশ সেন প্রভৃতি—জীবন কলকাতা থেকেই গিয়েছিল।

বৈধ গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার স্বাক্ষর ছিলেন দেশবন্ধু—বেপরোয়া জাঁদরেল। তখন ডেলিগেটের নির্বাচনও হত না, প্রাদেশিক সম্পাদক ডেলিগেটের চাকি নিয়ে certificate ও card issue করলেই যত খুশী ডেলিগেট হতে পারতো, সংখ্যা বাঁধা ছিল না।

দেশবন্ধুর একটা বৈধ গণতান্ত্রিক কায়দা দেখা গেল অপর। সারা ভারতের নো-চেঞ্জার ডেলিগেটদের চেয়ে বেশী সংখ্যক প্রো-চেঞ্জার ডেলিগেট জমা করে নো-চেঞ্জারদের out vote করে দেওয়ার অবস্থা করতে না পারলে তারা আপোষ মীমাংসায় বাগ মানাবে না, সুতরাং অগুস্তি ডেলিগেট নিয়ে যেতে হবে। বাংলায় লোকের অভাব নেই, কিন্তু দিল্লী যাওয়া-আসার খরচ জোগাতে জিভ বেরিয়ে যাবে।

সুতরাং কয়েকজন লোক পাঠানো হল কালীতে, এবং প্রায় সমগ্র বাঙ্গালীটোলাটাকেই খন্ডের সাজিয়ে তুলে নিয়ে যাওয়া হল দিল্লীতে, বেঙ্গল ডেলিগেট। কংগ্রেসে দেশবন্ধু বসলেন, যদি আপনারা চান, আমি ভোটভূমিতে রাজি আছি, কিন্তু আমি চাই না, কংগ্রেস ভেঙ্গে ছুখানা হয়ে থাক। আমি মিলিত, সংহতি কংগ্রেসই চাই। ইত্যাদি—

ডেলিগেটের বছর দেখে out vote হওয়ার ভয়েই নো-চেঞ্জাররা বাগ মানলেন। ঠিক হল, দুদলই কংগ্রেসের ভিতরে থেকে দুটো বিভাগের মতন কাজ করবে, একদল প্রধানত কাউন্সিলের কাজ নিয়ে থাকবে, আর একদল গঠনমূলক কাজ নিয়েই থাকবে।

জীবন দিল্লী থেকে বসে যাওয়া স্থির করে রওনা হয়েছিল। আমরা ফিরে এলুম। কিন্তু ইতিমধ্যেই ১৭ জন নেতার নামে রেগুলেশন থির ওয়ারেন্ট বেরুলো, আর অনেকেই ফেরবার সঙ্গে সঙ্গেই গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন। তাঁরা হচ্ছেন—অমরদা' (চাটাজি), উপেনদা', বাহাদা', মনোরঞ্জনদা' (গুপ্ত), ভূপতিদা', ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত, প্রোঃ জ্যোতিষ ঘোষ (মাঠার মশায়), মনোমোহন ভট্টাচার্য, রবীন্দ্রমোহন সেন, রমেশ চৌধুরী, অমৃত সরকার, সত্যীশ শাকডাঙ্গী এবং বোধ হয় প্রভাস দে। জীবন পথে খবর পেয়ে কলকাতায় ফিরে এসে কিছুদিন গা ঢাকা দেওয়ার পর গ্রেপ্তার হল, হঠাৎ একদিন রাস্তার মধ্যে। পূর্ব দাশ এবং প্রতুল গাঙ্গুলীও গা ঢাকা দিয়েছিলেন, এব পরে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন।

কিছু দেখে আমি স্থলে নোটিশ দিলুম,—ডিসেম্বরের পর আমি আর থাকবো না, কলকাতায় ফিরে যাবো। ডিসেম্বরে হল কাকনন্দ কংগ্রেস সাধারণ অধিবেশন। আমি কাকনন্দ কংগ্রেস থেকে ফিরে কলকাতায় চলে এলুম। সারদাও পরে চলে এল,—প্রভাস মুন্সীগঞ্জের থেকে গেল, আমার ভাগ্যও।

২৪ সালের জাভুয়ারীতে হঠাৎ একদিন গোপী শা টেগার্ট ভ্রমে অর্গেন্ট ডে নামক এক সাহেবকে গুলী করে হত্যা করে পালাবার পথে ধরা পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ আর পাঁচজন নেতাকে গ্রেপ্তার করল রেগুলেশন থিতে। তাঁরা হলেন, অতুলদা' (ঘোষ), সত্যীন্দ্রদা' (চক্রবর্তী খুলনা), কিরণদা' (মুখার্জি), গোপেনদা' (পানবা) এক অরণ গুহ। সবসত্তা প্রেস ও লাইব্রেরী একটা বিরাট ধাক্কা খেলো।

কংগ্রেসকে নিগ্রবের পথে টেনে আনার প্রাণ স্বরাজ্য পার্টি সংগঠনে আপাততঃ পর্ববসিত হয়েছিল,—সেই স্বরাজ্য পার্টিও একটা ধাক্কা খেলো। স্বরাজ্য পার্টির ইংরাজী দৈনিক ফরওয়ার্ড প্রকাশ করার ব্যবস্থা হয়েছিল ২৩ সালের সেপ্টেম্বরের আগে। উপেনদা' থাকবেন সম্পাদকীয় বোর্ডে,—মনোমোহন ভট্টাচার্যের ষ্ট্রীনেজারির আশা ছিল, তিনি খুব খাটিছিলেন। যখন প্রথম দাদারা ধরা পড়লেন, তখন লালবাজারে (বা ইলিসিয়ামেরোই) মনোমোহন বাবুকে দেখে রবি সেন তাঁর কাছে চুপি চুপি খবর বলছিলেন, যাতে ফরওয়ার্ডের প্রথম সংখ্যায় খবরগুলো বেরোয়। মনোমোহন বাবু চুপ করে শুনছিলেন। এমন সময়, হরি, হরি!—রবিবাবুর সঙ্গে মনোমোহন বাবুকেও কালো গাড়ীতে বোকাই করলো। তখন এক চোট হাসাহাসি লেগে গেল,—যেন মরণোন্মাদ।

যেন বিপ্লব প্রচেষ্টার দ্বিতীয় পর্ব শেষ হল। হরিদা (চক্রবর্তী), সুরেনদা (ঘোষ), নরেন্দ্রদা' প্রভৃতি যারা থাকলেন, তাঁরা আবার ভাঙ্গার গোছাতে শুরু করলেন। আমরাও থাকলুম পিছনে।

[ক্রমশঃ]

“হিন্দুধর্ম বুঝিতে হইলে বেদ ও মর্শন পড়িতে হইবে এবং সমুদয় ভারতের প্রধান প্রধান ধর্মচার্য এবং তাঁহাদের শিষ্যগণের উপদেশাবলী
—স্বামী বিবেকানন্দ

মূল্য:
বড় সাইজ ২ টাকা ১৯ ন. প.
সাধারণ সাইজ ১ টাকা ১২ ন. প.
(স্থানীয় কর ছাড়া)

সার্ফ

অপূর্ব সাদা করে জামাকাপড় কাচে

অত্যাশ্চর্য কাপড় কাচা পাউডার সার্ফ কাচা জানা-
কাপড়ের অপূর্ব শুভ্রতা দেখলে আপনি অবাক হয়ে
যাবেন। এক প্যাকেট ব্যবহার করলে আপনাকে মানভেই
হবে যে...

আপনি কখনও কাচেননি জামাকাপড় এত স্বকণ্ঠে সাদা,
এত সুন্দর উজ্জ্বল করে! সার্ট, চাদর, শাড়ী, তোয়ালে—সবকিছু
কাচা জম্ভাই এটি আদর্শ!

আপনি কখনও দেখেননি এত ফোঁপা—ঠাণ্ডা বা গরম

জলে, ফোঁপা পক্ষে প্রতিকূল জলে, সঙ্গে সঙ্গে আপনি পাবেন
ফোঁপা এক সহস্র!

আপনি কখনও জানতেন না যে এত সহজে কাপড়
কাচা যায়! বেশী পরিশ্রম নেই এতে! সার্ফ জামাকাপড় কাচা
মানে ৩টি সহজ প্রক্রিয়া: ভেজানো, চেপা এবং ধোওয়া মানেই
আপনার জামাকাপড় কাচা হয়ে গেল।

আপনি কখনও পাননি আপনার গরমার মূল্য এত চমৎ-
কারভাবে ফিরে। একবার সার্ফ ব্যবহার করলেই আপনি এ কথা
বোনে বোনে! সার্ফ সব জামাকাপড় কাচা পক্ষেই আদর্শ!

আপনি নিজেই পরামর্শ করে দেখুন

সার্ফ জামাকাপড় অপূর্ব সাদা করে কাচা যায়!

হিন্দুস্থান লিটার গিমিটেড কর্তৃক প্রস্তুত

SU. 25-X52 BQ

অক্ষন ও প্রাক্ষণ



কল্যাণী
অপরাজিতা ঘোষ

বছর খানেক ধরে মানসকল্যাণীতে আসবার আমন্ত্রণ আসছিল। সময় আর হয়ে উঠছিল না, তাই এই যাব শিগগির, এই সামনের ছুটিতে যাব বলে ওকে কিছুটা শান্ত করছিলাম আমার দিক থেকে। প্রত্যেক চিঠিতেই 'কবে আসছো' এই কথাটুকু বিশেষ করে লেখা থাকত।

এবার বেলাদির একখানা খুব কড়া চিঠি এল। খুব অভিমান করে লিখেছে। বেশ ব্যস্তে পারলাম, বেলাদিকে চিঠি দিয়ে আর শান্ত করা যাবে না। যেতেই হবে কল্যাণীতে। মাস খানেকের ছুটি নিয়ে দুর্গা নাম জপতে জপতে ট্রেনে চেপে বসলাম।

ট্রেন একটার পর একটা ষ্টেশন পেরিয়ে যেতে লাগল—কোনটায় থামে, কোনটায় থামে না। বেশীরভাগই থামে না। এসব দিকে বিশেষ খেয়ালও ছিল না। কেবল মনের মধ্যে কয়েকটা আত্মজিজ্ঞাসা ঘুরে ফিরে আসা যাওয়া করছিল। কেমন জায়গা কল্যাণী, শুনেছি ত খুব ভালো জায়গা, যিঞ্জি সবরের নোংরাই এখানে নেই, পথ চলতে গেলে ট্র্যাফিক পুলিশের দরকার হয় না, ডাট্টাবিনের গন্ধে অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসে না।

হ্যাঁ, রাস্তাটা ত বেলাদি চিঠিতে ভালো করে বর্ণিয়ে দিয়েছিল। তবুও চিঠিটা এনেছি সঙ্গে করে, কি জানি আবার যদি বাড়ী চিনতে না পেলে ফিরে যেতে হয়! বেলাদির চেহারাটা ভাসা ভাসা মনে আসছিল, কিজানি এখন যেমন দেখতে হয়েছে। দশ বছরের পুরোনো চেহারার সঙ্গে মিল আছে কি না। আমাকে

চিনতে পারবে ত বেলাদি? দীর্ঘ দশ বছর পরে দেখা হবে—সোজা কথা? এইসব এলোমেলো কথা মনের মধ্যে উঁকি বঁকি মারছিল।

ইহাং মনে হ'ল কতদূর চলে এসেছি। পাশের ভ্রমলোককে জিজ্ঞেস করে জানলাম, এই সামনের ষ্টেশনটা কাঁচড়াপাড়া। ওঃ তাইতো, ভাগিাস মনে হল, নইলে কোথায় চলে যেতাম! ক্লাস্ত গাড়ীখানা একবার দম নেবার ভক্ত থামল। নেমে পড়লাম। চারিদিকে তাকিয়ে দেখলাম, বেশ বড় ষ্টেশন, লোক গিসগিস করছে। বেলাদি লিখেছিল কল্যাণী ষ্টেশনে না নেমে কাঁচড়াপাড়া হয়ে এলে নাকি অনেক শ্রমিধে হয়। কি জানি, হয় বে'ধ হয়। পকেটে হাত দিয়ে দেখলাম, বেলাদির সেই ডিরেক্সন দেওয়া চিঠিখানা আছে, কি না। ষ্টেশনের বাইরে এসে খানিকটা হেঁটে গিয়ে বাস ধরতে হয়। হাঁটতে হাঁটতে রাস্তার দুপাশ তাকিয়ে দেখতে লাগলাম। মনটা নিগিয়ে উঠল। নোংরা-বস্ত্রী বললেও অত্যন্ত নয় না। নোংরা রাস্তা আর দুপাশে সারি সারি দোকান—মুদির দোকান থেকে বইএর দোকান পর্যন্ত। পাশে একটা বাজার।

কণ্ডার 'বাগমোড়' বলে একটা জায়গায় নামিয়ে দিল। চৌবাস্তার মোড়। সোজা দক্ষিণ দিকে যে রাস্তাটা চলে গিয়েছে, ওটা নাকি কলকাতার পথ। মোড়ের পুলিশকে জিজ্ঞেস করে জানলাম, উত্তর দিকে গেতে হবে। আরো জানলাম, কল্যাণীর বাস নাকি এখনি আসবে। প্রায় আধঘণ্টা বৈশাখ মাসের দুপুর হুঁটার সময়ে ছাতিফাটা রোদে অপেক্ষা করতে লাগলাম বাসের জন্য। বাস আর এল না। সামনে একটা রিক্সা পেয়ে উঠে বসলাম। রিক্সা চলতে লাগল বেলাদির বাড়ীর দিকে।

—কতদূর, জিজ্ঞেস করলাম।

—এই মাইলখানেক বাবু, পশ্চিমা রিক্সাওয়ালা জবাব দিল।

দুপাশে বড় বড় গাছের ছায়ায় ঢাকা গিচালা পথ সোজা চল গিয়েছে। মাঝে মাঝে হুঁ একটা বাড়ীও চোখে পড়ল। ওকে ঠিক বাড়ী বলা যায় না; জীর্ণ লোনা লাগা, ইট খসে যাওয়া দেওয়াল সব! পাগছাড়া ভাবে এখানে সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বেশ বোকা হাস, এগুলো এককালে সব বড় বড় বাড়ী ছিল। আজ সে সব কিছুই নেই। বাড়ীর লোকগুলোও সব কোথায় চলে গিয়েছে জানি না, বংশে কেউ আছে কিনা তাও বলতে পারব না। মনে হচ্ছিল ছুটে গিয়ে দেওয়ালগুলোকে জিজ্ঞেস করে আসি,—বলতে পার এরা সব কোথায়? বাড়ীর দেখেছো তোমাদেরই পাশে পাশে ঘরে বেড়াতে, হয়ত তোমাদেরই গারে ঠেস দিয়ে তারা কত গল্প গুজব করেছে প্রিয়জনদের সঙ্গে। তোমরা ত সবই জান, বলতে পার এরা সব এখন কোথায়? হায়রে, ওহা যে কথা বলতে পারে না, নির্ঝাঁক। শুধু চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখছে এট আশ্চর্য জগৎটাকে।

চোখে পড়ল কবি ঈশ্বর গুপ্তের গ্রন্থাগার। শুনলাম ওই পাশেই নাকি ঈশ্বর গুপ্তের বাড়ী ছিল। আজও সে মিলিয়ে যায় নি কালের কপোলতলে, ভগ্নপ্রায় অবস্থায় তার অস্তিত্বকে স্বীকার করার জন্য দাঁড়িয়ে রয়েছে।

—আর কতদূর, জিজ্ঞেস করলাম।

—এই যে এসে গেছি বাবু।

সত্যি এখন মনে হচ্ছে যেন এসে গেছি। রিক্সাটা একটা গোল : ত পার্কে ডাইনে বেখে এগোচ্ছে। মুখ বাড়িয়ে দেখলাম, পার্কটা বেশ বড় এবং সুন্দরও। দেখলাম পার্কের এক কোণে পাঁচটা বটগাছ গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে আছে। পঞ্চবটীর পানিকটা ভাব এনে দিচ্ছিল। তাদের তলায় আধো আলোয় আধো জাঁধারে একটি পাথরের ধ্যানগম্ভীর মূর্তি দেখলাম—বেশ বড়। মনে হ'ল বুদ্ধদেবের মূর্তি। বাস্তবিকই মূর্তিটি ভারি সুন্দর। আশ্রম চৌথের সামনে ভেসে ওঠে মূর্তিটি যেমন দেখেছিলাম ঠিক তেমনি।

রিক্সা চলেছে বেশ মস্তুর গতিতে। দূরে দেখা যাচ্ছে হলদে রংএব ছোট ছোট বাড়ী সার সার ভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

রিক্সাওয়ালাকে জিজ্ঞেস করলাম, এই যে বাড়ীগুলো দেখা যাচ্ছে, ওগুলো কিগো?

বলল, এই ত বাবু কল্যাণী। আমরা এসে গেছি।

হুপুরের সমস্ত ক্লাস্তি যেন কোন যাত্রস্পর্শে মুছে গেল। আনন্দে ভরে উঠল মনটা। যাক, তাহলে বেলাদির অভিমান ভাঙ্গাতে পারলাম।

রিক্সা হঠাৎ থেমে গেল। জিজ্ঞেস করলাম ওকে, খামলে কেন?

গলায় জড়ানো গামছাটা দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বলল রিক্সাওয়ালা, নামুন, এসে গেছি কল্যাণী।

হ্যাঁ তাইত। বাড়ী ঘর সব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

ওকে বললাম, আমাকে বাড়ী নিয়ে চল। কিছু চিনি না, জানি না, কোথায় যাব?

—বাবু, আর যাবে না রিক্সা। এই পর্যন্তই আপনার সঙ্গে ভাড়া ঠিক হয়েছে।

—আচ্ছা বেশ ত, আমি না হয় তোমাকে বেশী ভাড়া দিচ্ছি। নিয়ে চল।

—না বাবু আর যেতে পারবো না।

—কেন?

কিছুতেই বলল না ও, কেন আর নিয়ে যেতে পারবে না আমাকে। কতবার জিজ্ঞেস করলাম। ঘাড়টা নেড়ে একটু হাসল শুধু।

ওর মনের কথা ওর কাছেই থাক। আর যাঁচালাম না। যখন কল্যাণীতে আসতে পেরেছি তখন নিশ্চয়ই বাড়ী চিনে নিতে পারব। কষ্ট একটু হবে এট আশা কি।

চারদিকে একবার তাকিয়ে দেখলাম। বাদিকে চোখে পড়ল আধুনিক ঠাইলের বিরাট গোলাপী রংএর দোতারা বাড়ী। পরে শুনেছিলাম, এই বাড়ীটাই নাকি কল্যাণীর এডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং। আর ডান দিকে যতদূর চোখ যায় কেবল বাড়ী আর বাড়ী—একই রকমের দেখতে, একই রংএর। দু'একটা বড় দোতারা বাড়ীও চোখে পড়ল। চোখে পড়ল কাছেই একটা বড় পার্ক। চারিপাশের রাস্তাগুলোর মাঝে দাঁড়িয়ে আছে। পার্কটার ঠিক মাঝখানে উঁচু একটা বিরাট ট্যাক। আর তার চারপাশ দিয়ে গজিয়ে উঠছে সুন্দর বাগান—ফুলে গাছ ভর্তি। এত সুন্দর পার্ক খুব কমই দেখেছি। এখানে ফুল ফোটে, আবার আপনিই তাকিয়ে যায়, কেউ এসে স্পর্শ করে না। প্রকৃতি-সুখিতাই বটে ওয়া। ওখানে

থাকতে প্রায়ই বেড়াতে আসতাম এই পার্কে বিকেলের দিকে। বসতাম, গল্প করতাম, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রকৃতির কাল্পনিক দেখতাম। এই পার্কের নাম সেন্ট্রাল পার্ক। এখানকার মধ্যে সব থেকে বড়, সব থেকে ভালো পার্ক। এই যে পার্কের মাঝখানে ট্যাকটা দেখা যাচ্ছে, শুনেছিলাম ওর মধ্যে জল সঞ্চিত থাকে, পরে ছড়িয়ে দেয় কল্যাণী উপনগরীতে। শুধু এই একটাই ট্যাক গোটা কল্যাণীকে জল যোগাচ্ছে না, এইরকম আরও ট্যাক আছে।

হু, রিক্সাওয়ালা আমাকে হদিস দিয়েছিল নেহেরু-পার্ক যাবার। এই সেন্ট্রাল পার্কের সামনে দিয়ে যে রাস্তাটা চলে গিয়েছে, এই রাস্তা ধরে বরাবর গেলেই নাকি নেহেরু-পার্ক চোখে পড়বে।

কিন্তু রাস্তা ত আর একটা নয়, গোটা দুয়েক হবে। সব রাস্তাঘাট মোড়ে গিয়ে দেখি সবই ত সেন্ট্রাল পার্কের সামনে। তাহলে? চূপচাপ দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছি। কানে এল দূর থেকে কে যেন বলছে—বাবু, ওধার না। এই রাস্তা দিয়ে যান। ঘুরে তাকিয়ে দেখি, সেই রিক্সাওয়ালা। এডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং-এর পাশে দাঁড়িয়ে আমাকে হাত দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে আসল রাস্তাটা। অস্ত রাস্তায় ঢুকে পড়েছিলাম। ঠিক বুঝতে পারলাম না, আবার এই চড়া রোদে হেঁটে ওর কাছে গেলাম।

এবার বুঝতে পারলাম। আবার ওকে অহুয়োধ করলাম, বেশী পরয়া দেব, বাড়ী পৌঁছে দাও। এবারও ও একটু হাসল। ওর হাসি দেখেই বুঝতে পারলাম, ও যেতে চাইছে না। আজও বুঝতে পারি না, কেন ও গেল না এই সীমানাটুকুর বাইরে। কি জন্ত?

হাঁটতে লাগলাম ওর নির্দেশ দেওয়া রাস্তা দিয়ে। ভারি সুন্দর রাস্তাটা। এই জলন্ত রোদের মধ্যেও যেন কত সুন্দর লাগছিল। হু'পাশ দিয়ে সার সার বাড়ী চলে গেছে একরকমের, এক রংএর। আবার রাস্তার দু'পাশে লাইন করে গাছ লাগানো হয়েছে। মাঝারি গোছের গাছগুলো প্রত্যেকটা ইট দিয়ে ঘেরা গোল জায়গার মধ্যে। এটাও যেন কত সুন্দর।

চলেছি ত চলেছিই, কোথায় নেহেরু পার্ক। জানতাম না যে, এই রাস্তা এবে সোজা গেলে কোনদিনও নেহেরু পার্কের দর্শন লাভ হবে না। এই রাস্তার ডান দিক দিয়ে একটা রাস্তা চলে গিয়েছে। এই রাস্তা দিয়ে গেলে ছোটো বড় বাড়ী চোখে পড়বে। তার সামনে দেখা যাবে একটা ছিম ছিম মাঝারি গোছের পার্ক। ওরই নাম নেহেরু পার্ক। আর বাড়ী ছোটো নেহেরু বিল্ডিং। কংগ্রেস উৎসবে নাকি এই বাড়ী ছোটোর একটাতে নেহেরু আর একটাতে বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত ছিলেন।

কোনদিকে গেলে নেহেরু পার্ক পাওয়া যাবে আমি ত ভাব জানতাম না, তাই সোজা চলে গিয়েছিলাম। এফটা মোড় পেলাম, চারটে রাস্তা এসে মিলেছে চারদিক থেকে। মোড়ের একপাশে দাঁড়িয়ে আছে বিরাট কমপাউন্ডে ঘেরা কল্যাণীর হাই ইন্ড্রুল। বেলাদির কাছে পরে শুনেছিলাম, ওখানে ছেলেমেয়ে একসঙ্গে পড়ে। বেলাদি এই ইন্ড্রুলেরই টিচার। কোন হৈ চৈ নেই, শান্ত। আর একটা পাশে দাঁড়িয়ে আছে কল্যাণীর ডাকঘর। একটা বাড়ীকে সরকার ডাকঘর বানিয়েছেন। মাঝে মাঝে আসতাম খাম-পোষ্টকার্ড কিনতে,

চিঠি ডাকে দিতে। দেখতাম পোষ্টমাষ্টার আর একটি পিয়ন নিয়ে, এখানকার কারবার। পোষ্টমাষ্টারই সব, তিনিই সব কাজ করেন। খাম-পোষ্টকার্ড, ডাকটিকিট বিক্রি করেন, আবার মনিঅর্ডারের কাছও করেন। ভদ্রলোককে দেখে রবীন্দ্রনাথের 'পোষ্টমাষ্টার' গল্পটা মনে পড়ে যেত। সেই গল্পের পোষ্টমাষ্টারই যেন কিরে এসেছেন এখানে।

ইদুল আর ডাকঘরের পাশ দিয়ে উত্তর মুখো যে রাস্তাটা চলে গিয়েছে, সেই রাস্তা দিয়ে খানিকটা গিয়ে বা দিকের রাস্তা দিয়ে সোজা গেলে দেখা যাবে একটা বেশ বড় বাড়ী। এই বাড়ীটা কল্যাণীর বাজার। এখন অল্প বিস্তার সব জিনিসই পাওয়া যায় বাজারে। বছরখানেক আগেও নাকি পাওয়া যেত না তরিতরকারি মাছ-মাংস। সরকার আধুনিক কৃতিসম্মত ভাবেই বাজারটা তৈরী করেছেন।

বাঁদিকে না ঘুরে ঐ ঝুঁকুড়া, আমগাছের ছায়ায় ঢাকা রাস্তা দিয়ে নাক-বরাবর সোজা গেলে দেখা যাবে একটা বড় বিল। ঐ বিলটাই নাকি এককালে হ্রদ বা লেক হবে। সেইজন্মই বোধহয় ঐ বিলটার পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা চলে গিয়েছে, ওর নাম—লেক রোড। কয়েকদিন গিয়েছিলাম বেলাদির সঙ্গে আগামী সেকের ঘরে বেড়াতে। বেড়াবার জায়গা অবশ্য এখনও হয় নি, দেখে এসেছিলাম শুধু।

বাক, কথায় কথায় অনেক কথা বলে ফেললাম। ঈশ্বরের ঘোড়ে এসে একটু সন্দেহ হ'ল মনে। অনেকদূর ত চলে এলাম সেটল পার্ক থেকে। রিজার্ভারাল ত অতদূর আসতে বলে নি। কাকেই বা জিজ্ঞেস করব এখন? একটি লোকও ত দেখি না। ডাকঘরে ঢুকলাম, যদি কিছু উপায় হয় ভেবে। ভাবাই সার হ'ল। ডাকঘর বন্ধ। এদিক ওদিক তাকাছি, কাউকেই ত দেখতে পাচ্ছি না। হঠাৎ দেখি, ডাকঘরের পাশের খালি বাড়ীটা থেকে সত্ত ঘুম ভাঙা একটা লোক আমার কাছে এগিয়ে এল জিজ্ঞাসু চুষ্টি নিয়ে। দেখে বোধ হয় বুঝতে পেরেছে, আমি একজন নবগত।

তাকে বাড়ীর নম্বরটা বললাম, ঠিক বুঝতে পারল না। নেহেরু পার্কের কথা বলতে অবশ্য দেখিয়ে দিল। কাছেই।

লোকটি জিজ্ঞেস করল, কি শেপের বাড়ী।

বললাম, তা ত জানি না। চিঠিতে নম্বরটা লেখা রয়েছে, এর বেশী আর একটুও জানি না। ষ্টেশন থেকে কল্যাণী আসবার ডিরেক্সান দেওয়া আছে। লিখেছে নেহেরু-পার্কের পাশেই ওদের বাড়ী। আর ত কিছু লেখেনি।

লোকটি নিজে থেকেই ওর পরিচয় দিল। এখানকার দ্বারওয়ান সে। ওকে বেলাদির বাবা অবনীবাবুর নামটা বললাম। তাঁর চেহারার বর্ণনা দিলাম।

এবার ও ঠিক চিনতে পারল। বাস্তবিকই ভদ্রলোকের একটা বিশেষত্ব আছে। চেহারায়, গুণে, সব কিছুতেই। চেনে না এখানে তাঁকে এমন একজনও নেই। শুধু এখানে কেন কলকাতায় বথন ছিলেন, তখনও না চিনত এমন কেউ পাড়াতে ছিল না। অমায়িক ব্যবহার আর অত্যন্ত রসিক। পরকে আশন করতে তাঁর এক মিনিটও লাগে না। তাঁকে দেখে কেউ বুঝতে পারবে না যে, চার

আলাপ নেই তাই ভাবি। এখানকার চীফ ইঞ্জিনিয়ারও তাঁর বন্ধু আবার এই অখ্যাত দ্বারওয়ানটাও তাঁর অত্যন্ত পরিচিত।

দ্বারওয়ান আমাকে অবনীবাবুর বাড়ীর দরজায় পৌঁছিয়ে দিয়ে গেল। বেলাদির সেই মলিন হয়ে যাওয়া চিঠিখানা খুলে মিতিয়ে নিলাম ঠিকানাটা। হ্যাঁ, নম্বরটা ত একেবারে অন্ধরে অন্ধরে মিলে যাচ্ছে, সামনেইত নেহেরু-পার্ক।

এক নজরে দেখে নিলাম সার সার ভাবে কাঁড়ানো বাড়ীগুলোকে। প্রত্যেকটা বাড়ীর চারিপাশে খোলা খানিকটা করে জায়গা, সামনে পাঁচিল দিয়ে, পাশে তারের বেড়া দিয়ে সীমানা ঠিক করে দেওয়া হয়েছে। সামনেই লোহার গেট, তারপর গেটটা পেরিয়ে পাঁচ কদম হেঁটেই সিঁড়ি, ঘরে উঠবার। আর ছ'পাশে খোলা জায়গায় নানা রকমের ফুলের গাছ; অল্পস্র ফুলে ছেয়ে আছে। ছপসে সব রাস্তা, ঝিমিয়ে পড়েছে। শুধু ঐ ফুলগুলো নয়, গোটা সহরটাও ঝিমুচ্ছে। একটু শব্দ নেই কোথাও, শুধু সামনের নেহেরু পার্কের হাওয়া লাগা ঝাঁউ গাছের শব্দ শব্দ থেকে থেকে ভেসে আসছে।

গেটের বাইরে কাঁড়িয়ে ডাকলাম, বেলাদি—বেলাদি।

খুঁট করে দরজা খোলার একটা শব্দ হ'ল। একটা মেরে বেরিয়ে এল ঘর থেকে বছর কুড়ি বয়স হবে। জিজ্ঞেস করল আমাকে,—কাকে চাই।

বললাম, বেলাদি আছে, বেলাদি—

ভেতরে চলে গেল মেয়েটি। একটু পরে সেই মেয়েটি আবার একটা মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে এল। এই মেয়েটিকে একটু বরফ বলে মনে হ'ল। চোখে চশমা, মুখে গাভীরের ছাপ।

ওদেরকে আবার বললাম, বেলাদি আছে? একটু ডেকে দিন ত? বয়স্ক মেয়েটি উত্তর দিল,—আমার নামই বেলা ব্যানাজি। আপনাকে ত ঠিক চিনতে পারলাম না। কোথা থেকে আসছেন আপনি?

আমার চিনতে একটুও দেবী হ'ল না বেলাদিকে। কত বলিয়ে গিয়েছে সেই দশ বছর আগের পরিচিতি মেয়েটি!

বেলাদি কিন্তু আমাকে চিনতে পারল না। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

একটু হেসে বললাম—কি, চিনতে পারছ না?

মুখের কোন ভাবান্তর হ'ল না বেলাদির।

এবার সেই চিঠিখানা এগিয়ে দিয়ে বললাম,—দেখত?

চিঠিখানার দিকে একটুখানি তাকিয়ে একগাল হেসে বলে উঠল,—আরে তুমি স্বদেশ! এইরকম দেখতে হয়ে গেছে তা চিনতে পারি কি করে বল? বোদে কাঁড়িয়ে কেন? এস এস, বলে গেটটা খুলে আমাকে ভেতরে নিয়ে গেল।

বেলাদির মাকে প্রশ্ন করলাম। একগাল হেসে নানি কথার ভীড় জমালেন। বললেন একটু অভিমানের স্বরে, সেই দশ বছর আগে যে দেখা করে গেলে তারপর আর এলো না, একটা খবরও নিলে না। আরো কত প্রশ্ন করতে লাগলেন। কোনটার জবাব দিলাম, কোনটার দিলাম না। অবনীবাবু ছিলেন না তখন, সন্ধ্যার পর তাঁর সঙ্গে দেখা হল।

বেলাদির মারও শরীরে এবং মনে বার্ষিকের ছাপ এসে গিয়েছে। তবে সেই হাসিটুকু আজও লেগে আছে মুখে। বেলাদিকে ত আর চিনতেই পারা যায় না, একেবারে অস্তরকমের হয়ে গিয়েছে। কথায়, চেহারা, সব কিছুতেই। অবনীবাণ্ড বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছেন, কিন্তু মনটো এখনও তাঁর সেইরকমই সতেজ আছে। সেইরকম স্বভাব, সেইরকম রসিকতা করে কথা বলা, সব একই রকমের আছে। আশ্চর্য, একটুও পরিবর্তন হয় নি একমাত্র চেহারাটা ছাড়া।

বেলাদির মা পরিচয় করিয়ে দিলেন পাশে বসে থাকা মেয়েটির সঙ্গে, এই বাড়ীতে প্রথম বার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। এর নাম নমিতা, এবার আট, এ, পরীক্ষা দিয়ে বেড়াতে এসেছে এখানে। নমিতা আমার ভাইএর মেয়ে। আলাপ হয়ে গেল মেয়েটির সঙ্গে, বেশ মেয়েটি।

* * *

আবার যেন ফিরে পেলাম সেই দশ বছর পিছিয়ে যাওয়া জীবন। বেলাদিকে আবার যেন ফিরে পেলাম সেই অনার্স ক্লাসের মেয়ে। এই সুন্দর পরিবেশে হাসি গলে কেটে যেতে লাগল দিনগুলো। কোন আপনজনের সঙ্গে বহুদিন পরে সাক্ষাৎ হ'লে তাকে যেমন করে আপ্যায়ন করে লোকে, আমার বেলাতেও ঠিক সেইরকমই হয়েছিল বোধ হয় একটু বেশী মাত্রায়।

কল্যাণীর দৈনন্দিন জীবনটা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতাম।

খুব সকালে সাইকেলে করে দুধ দিয়ে যেত গোয়াল। একটু পরেই আসত খবরের কাগজ। ঐ কাগজটা নিয়ে সকালটা কেটে যেত। চাকরটার সঙ্গে দু'একদিন বাজারেও গিয়েছিলাম। মনে হ'ল অজ্ঞান্যগার থেকে সব জিনিষের দাম একটু বেশী।

বা গরম, সমস্ত জানলা দরজা বন্ধ করে দিতাম একটু বেলা হলেই। ছপুসগুলো ঘুম আর গলে কেটে যেত।

ছপুসটা শান্ত, শুদ্ধ। পাশে একটিও জনপ্রাণী নেই। পিচের রাস্তাগুলো রোদের তাপ সহ্য করতে না পেরে ধারে এসে জমা হচ্ছে। বাইরে বেরোলে শুধু শোনা যাবে, সামনে নেহরু পার্কের ঝাউগাছগুলোর হাওয়া-লাগা শব্দ শব্দ আর থেকে থেকে ডেকে ওঠা ছ একটা কাকের কা কা রব। সে রবও যেন কত ক্লান্ত।

ঘরের ভেতরেরও সেই অবস্থা। শুধু জেগে আছে একটা জিনিষ। ঐ টেবিলের ওপর রাখা স্তব্ধ বাঁকটা। রেডিওটা গান দিয়ে, কথা দিয়ে, আমাদের কিমিয়ে পড়া ভাবটাকে কাটিয়ে দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে।

বিকলে রোদ পড়লে আমাদের নিয়ে বেলাদি বেড়াতে বার হ'ত। সঙ্গে যেত নমিতা। কোনদিন শুধু রাস্তা দিয়ে হেঁটেই কতদূর চলে যেতাম, ইন্ডুল পেরিয়ে, বাজার পেরিয়ে কতদূর। কোন কোন দিন ভবিষ্যতের লোকের ধারে বেড়াতে যেতাম। বেশীর ভাগ দিন সেট্রা'ল পার্কে গিয়ে বসতাম। ঐ পার্কে আরো অনেক ছেলে মেয়ে বেড়াতে আসত।

আপনার সৌন্দর্যের জন্য প্রসাধন সামগ্রীর “মহীশূরের শোভা স্নো”

ব্যবহার করুন।



ইহা ফুলের রেণুর মত স্নিগ্ধ ও চন্দন গন্ধযুক্ত।

নিয়মিত শোভা স্নো ব্যবহারে ত্বকে মসৃণ, মোলায়েম এবং মনকে সন্তোজ রাখে। ইহা দেহে মাখিলে রৌদ্র ও ধূলা দেহের কোন অনিষ্ট করিতে পারে না। ত্রণ বা ফুসকুড়ির উপর শোভা স্নো ব্যবহারে অনেক উপকার হয়। একমাত্র শোভা স্নো ব্যবহারের ফলে বগলের ঘর্মের দুর্গন্ধের অবসান হয়।

প্রস্তুতকারক : শোভা কসমেটিকস্

মহীশূর

পরিবেশক : হানামিন ইণ্ডাস্ট্রিজ

৩৭, জেকেরিয়া স্ট্রীট, কলিকাতা-৭



একদিন বেলাদিকে কথার কথার জিজ্ঞেস কবেছিলাম, আচ্ছা বেলাদি, এখানে গরীবের স্থান নেই, না ?

একটু হেসে বেলাদি বলেছিল, তোমার বুদ্ধিটা দেখছি এখনও ছেলেমানুষই রয়ে গেছে। একবার চারিদিকে তাকিয়ে দেখত, গরীব বলে কাউকে মনে হয় ? এখানে ধারা থাকেন সব মোটা ব্যাক ব্যালান্স হোস্টার। বেশীর ভাগই ইঞ্জিনিয়ার, ব্যবসায়ী, প্রফেসর বা কোন অফিসের বড়বাবু রিটারার করেছেন প্রায় তিরিশ হাজার ক্যাম নিয়ে। জানো, এখানকার বাড়ীগুলোর কত দাম ? এই দামে অল্প জায়গায় পছন্দমত ভালো বাড়ী তৈরী করা যায়। আমার একদম ভালো লাগে না এখানে, বাবা যে কেন কোঁকের মাথায় এখানে বাড়ী কিনলেন, বুঝতে পারি না। এখানকার সবাই নিজেদের চাল নিয়ে ব্যস্ত, হাবভাবে বুঝিয়ে দেন আমাদের এত টাকা আছে, এত ফার্মিচার আছে। এঁদের মধ্যে আন্তরিকতা নেই, আছে বাজিক আচরণ। জান না বোধ হয়, এখানকার ইন্ডুল-মাস্টারদের সঙ্গে কেউ বড় একটা মেশিন না, তাঁদের ত আর এদের মত এত টাকা নেই, তাঁরা যে গরীব। একদম ভালো লাগে না আমার এখানে, অল্প কোন জায়গায় চাকরী পেলে চলে যাব।

বললাম, কেন, কাগজে দেখি, লোকের মুখে ভূমি, কত সুন্দর জায়গা কল্যাণী। নগরের কোন কোলাহল এখানে ঢুকতে পারে না। ফাঁকা ফাঁকা সব বাড়ী। বাড়ী করতে হলে একমাত্র কল্যাণীতেই বাড়ী করতে হয়। আলো বাতাস প্রচুর। প্রশস্ত রাজপথ, সুন্দর পার্ক, কলের জল, আলো পাখা, বাজার বিজ্ঞান্য সবই এখানে আছে। সব কিছু মিলে নগরজীবন যাত্রার নতুন রূপ কল্যাণীতে যেন ফুটে উঠেছে। তার ওপর সরকারের বড় বড় প্ল্যানও রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় হবে, বড় বড় অফিসগুলো এখানে উঠে আসবে, আরো কত কি।

আমার কথা বলার ধরণ শুনে বেলাদি, নম্রিতা, দুজনেই হেসে ফেলল। হাসতে হাসতেই বলল বেলাদি, এতকণ ধরে যা রসিয়ে রসিয়ে বললে তা সবই আছে এখানে। আমি ত তা অস্বীকার করছি না। আমি যা বলতে চাইছিলাম, তুমি সেটা ঠিক ধরতে পারলে না। আমি বলছিলাম, এখানে মানুষের মনের নাগাল মেলা ভার। এদের সমাজের সঙ্গে একটু মেশ, ছ'একভনের সঙ্গে কথাবার্তা বল, নিজেই সব বুঝতে পারবে। তোমার হয়ত খুব ভালো লাগতে পারে। মানুষের মন ত একরকম না।

একটু থেমে আবার বলল, শুধু এখানে কেন, আজ সব জায়গাতেই তাই। সবাই আজ নিজের খাঁচ নিয়ে ব্যস্ত।

বললাম, এখানকার মানুষের মনের খবর আমার থেকে তুমি বেশী জান, কারণ, তুমি এখানে বাস করছো। তবে এই ক'দিনে আমার এইটুকু অভিজ্ঞতা হয়েছে কল্যাণী সম্বন্ধে যে, এত সুন্দর নগর খুব কমই দেখা যায়। কল্যাণীর প্ল্যান বিপুল, এককালে নিশ্চয়ই এ একটি সার্থক নগরী হয়ে উঠবে। এখন ত সে একটা ছোট মেয়ে। এই ছোট মেয়েটি একদিন পূর্ণ যৌবনা হয়ে উঠবে, জোয়ার আসবে তার দেহে, আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে সে সকলের কাছে।

নিখাস ফেলতে হলে সোজা চলে আসতে হয় কল্যাণীতে। প্রকৃতিকে ধ'রা উপভোগ করতে পারে না, শহরের আবহাওয়া যারা হাঁপিয়ে উঠেছে, এখানে তারা প্রকৃতির সঙ্গে নিজেদের পূর্ণভাবে মিশিয়ে দিতে পারবে অন্ততঃ দিন কয়েকের জন্ত।

হয়ত এখানে ট্রাম বাস মটরের কনসার্ট নেই, সিনেমা নেই, আকাশ ছোঁয়া বাড়ী নেই, চোখ ধাঁধানো চৌরঙ্গীর মোড় নেই, তবুও এখানে আছে শান্তি। হ্যাঁ, শান্তি। যার জন্ত আজ সবাই পাগলের মত ছুটে বেড়াচ্ছে।

[আগামী সংখ্যার সমাপ্য]

উচ্চ শিক্ষার মাধ্যম

শ্রীমতী শান্তি ভট্টাচার্য

সাম্প্রতিক কালে উচ্চ শিক্ষার মাধ্যম লইয়া বিভিন্ন মহলে বাদানুবাদ চলিতেছে। কেহ মাতৃভাষাকে উচ্চ শিক্ষার মাধ্যম রূপে গ্রহণ করিতে মত প্রকাশ করেন, আবার কেহ বা ইংরেজীকেই উচ্চ শিক্ষার মাধ্যম রাখার স্বপক্ষে মত প্রকাশ করেন। কিন্তু সমস্তার কোন সমাধান আজ পর্যন্ত হইয়া উঠিতেছে না।

স্বাধীন ভারতে সমস্তার অন্ত নাই। খাতি ও শিক্ষা সমস্তাই বেশী প্রেকট। শিক্ষা সমস্তার মধ্যে ভাষা সমস্তা অগ্রতম। দীর্ঘদিন বিদেশী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করিয়া ভারতবাসী উপকৃত কি অপকৃত হইয়াছে, তাহা হিসাব করিয়া দেখিবার সময় আজ উপস্থিত হইয়াছে।

যুগের প্রয়োজনে, বিদেশী শাসকবর্গের শাসন-পরিচালনার সুবিধার্থে, হস্তে ও বর্ণে ভারতীয়, কিন্তু রুচি, বুদ্ধি ও নীতির দিক দিয়া ইংরেজ, এমন এক দল লোকের সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যেই ১৮৩৫ঃ লর্ড উইলিয়ম বেন্টিন্গ মেকলের প্রস্তাব বা "মিনিট" অনুমোদন করিয়াছিলেন। এ ধাবৎকাল ধরিয়া সেই প্রস্তাবই সরকারী নীতি রূপে চলিয়া আসিতেছে।

যুগের প্রয়োজন বলার তৎপর্য্য এই যে, তখন কোন একটি ভারতীয় ভাষা উল্লেখযোগ্য ভাবে সমৃদ্ধ ছিল না। অর্থাৎ মনের সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশ করার মত শব্দ-ভাণ্ডার ছিল না এবং যাহা ছিল তাহাও আয়ত্ত করা আয়াসসাধ্য ছিল। এই কারণেই এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নব নব চর্চার দ্বারা জাতির লুপ্ত চেতনা পুনরুদ্ধারের আশায়ই রাম মোহন রায় প্রমুখ সমাজ-সংস্কারক ব্যক্তিগণ এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের পন্থা পাতা ছিলেন।

কিন্তু কাল-প্রবাহে আজ অবস্থার পরিবর্তন ঘটয়াছে। ইংরেজী ভাষা শিক্ষার প্রয়োজন যদিও আজও রহিয়াছে, কিন্তু ইহাকে উচ্চ শিক্ষার মাধ্যম রাখিয়া দেশের অজ্ঞাত ভাষার উন্নতিকল্পে বাধা দেওয়া গণতন্ত্র-সম্মত ব্যবস্থা নয়। স্বাধীনতা লাভের পর ভারত সব ক্ষেত্রেই স্বজনী মনোবৃত্তি লইয়া আগাইয়া আসিতেছে। কাজেই আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন সাধন করিয়া মাতৃভাষার মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করাও আজ সরকারের একান্ত প্রয়োজনীয় দায়িত্ব বলিয়া গৃহীত হওয়া উচিত।

কোন জাতিকে শিক্ষিত করিয়া, গড়িতে হইলে উচ্চ শিক্ষার

ইমারত যেমন শক্তিশালী হয়, মাতৃভাষার মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে পারিলে শিক্ষার স্বায়িত্ব দৃঢ় হয়—অকালে ভাঙ্গিয়া যাওয়ার ভয় থাকে না। প্রতিটি গণতান্ত্রিক দেশ মাতৃভাষার সমৃদ্ধি সাধনে তৎপর হয় সেই কারণে।

বিরুদ্ধবাদিগণ একটি প্রশ্ন করিবেন—আঞ্চলিক ভাষার পরিভাষা পোষায়? অর্থাৎ ভারতবর্ষের সমগ্র আঞ্চলিক ভাষা এখনও সম্পূর্ণ উন্নত হয় নাই। যেমন তামিল, তেলুগু, মালয়ালম, আসামী, উড়িয়া প্রভৃতি। কিন্তু উত্তর হইবে এই যে, সহস্রভূতি ও উদগ্র আকাঙ্ক্ষা লইয়া সরকার যদি পৃষ্ঠপোষকতা করেন, তাহা হইলে অত্যাধিকালের মধ্যে তাহা নিশ্চয়ই উন্নতি করিতে পারিবে।

বাংলা ভাষার আসন সমগ্র বিধে আজ সর্বোপরি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। খ্যাতনামা কবি ও সাহিত্যিকের প্রতিভার স্পর্শে তাহা সমৃদ্ধি বিত হইয়াছে। ইংরেজীর সম্পর্কে আসিতে পারিয়া বাংলা ভাষা জীবন্ত হইয়াছে। যে কোন প্রকার ভাব প্রকাশের পক্ষে বাংলা ভাষা সম্পূর্ণ উপযুক্ত। ইংরেজী ভাষা হইতে বাংলায় অনুবাদ করায় জন্ম যদি উপযুক্ত শব্দ না পাওয়া যায়, ইংরেজী হিসাবেই তাহাকে ব্যবহার করিলে ক্ষতি কি? যেমন ব্যবহার আছে ট্রেন, পাউন্ড, চেকার, টিকেট ইত্যাদি।

বাংলা ভাষার দূর্বৃত্তি এই যে, উন্নত সাহিত্য হইয়াও রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা সে পাইল না—তার কারণ হিন্দীভাষীর সংখ্যা এবং আরতন বেশী। তাই সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা পাইয়াছে হিন্দীভাষা। যদিও ভাষা হিসাবে সমৃদ্ধ নয়।

সমগ্র ভারতবর্ষের দিকে তাকাইলে একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, সরকার যদি শিক্ষিত ব্যক্তির সহযোগিতা লইয়া অর্থ সাহায্য করেন, তাহা হইলে উচ্চ শিক্ষা মাতৃভাষার মাধ্যমে দান করা যত্নে ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই সম্ভব হইবে।

খোলা মন লইয়া, জাতির অতি প্রয়োজনীয় চাহিদা মিটাইবার জন্য জাতীয় সরকারকেই অগ্রণী হইতে হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ফেল করার কারণও এই বিদেশী ভাষা। বিদেশী ভাষা জোর করিয়া চাপান ফল যে কিরূপ সময়, শক্তি এবং অর্থের অপচয়, তাহা পরীক্ষার ফেল করার সংখ্যা দ্বারা বুঝিতে পারা যায়। জাতির বৃহত্তর স্বার্থের প্রয়োজনে এইরূপ অপচয় রোধ করা একান্ত প্রয়োজন।

অতি উৎসাহী ছাত্র-ছাত্রীর জন্ম ইংরেজীতে শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা নিশ্চয়ই অপরাধ নয়। কিন্তু সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীর উপর হইতে বাধ্যবাধকতা প্রত্যাহার করিতে হইবে। ভাষা হিসাবে ইংরেজী সমৃদ্ধ সম্পদ নাই। কিন্তু উচ্চ শিক্ষা লাভ করার পক্ষে তাহা বাধা স্বরূপ হইবে কেন? আন্তরিক প্রচেষ্টার দ্বারা যে কোন মহৎ এবং বৃহৎ কাজ করা সম্ভব। নদী যখন প্রবল বেগে ধাবিত হয়, কোন বাধাই তার গতি রোধ করিতে পারে না। জাতির প্রয়োজনে জাতীয় সরকার যদি আন্তরিক সহস্রভূতির সহিত উচ্চ শিক্ষার মাধ্যমরূপে মাতৃভাষাকে গ্রহণ করার জন্ম অগ্রণী হন, তাহা হইলে শিক্ষার প্রসার অতি দ্রুত হইবে, জাতির অন্তরে শিক্ষার আগ্রহ বাড়িয়া যাইবে ও শিক্ষার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হইয়া শিক্ষাক্ষেত্রে নব যুগের প্রবর্তন হইবে। গণতান্ত্রিক সমাজে হুঁইয়ে পড়ার নীতি

কখনই ফলপ্রসূ হইবে না। তাই যুক্তিমের শিক্ষিত ব্যক্তির যুক্তিবিশ্বাসের দৃষ্টিতে জনগণকে যুক্তি দিতে সরকারকে সচেষ্ট হইতে হইবে।

কবিতা ও তার জনপ্রীতি

ইন্দুমতী ভট্টাচার্য

আমি কবি নই; কোন কবিতা ভাল কোন কবিতা মন্দ অথবা কেন ভাল, কেন মন্দ, এ বিচার করার মত পাণ্ডিত্য, অন্তর্দৃষ্টি কিবা ধৃষ্টতা আমার নেই।

আমি কবিতা ভালবাসি—আর কবিতার জনপ্রিয়তা কমে যাচ্ছে, এ সত্যও উপলব্ধি করি, কেন কমছে সে সবক্ষেত্রে ভেবে থাকি।

কবিতা-পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করলে কবিতার জনপ্রীতি বাড়বে অনেক বলেন। নানা মনোবী আরও নানা কথাই বলেছেন।

কবিতার ছন্দ, পদলালিত্য, ভাববস্তু, রসাত্মক সৃষ্টিবৈচিত্র্য ও মাধুর্য্য সবক্ষেত্রে অনেক আলোচনা হয়েছে। পাণ্ডিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে কবিতা সবক্ষেত্রে কিছু স্থিতিতে গেলে আমায় মত একজন সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে বামন হয়ে চাঁদে হাত দেওয়ার স্পর্ধাই প্রকাশ পাবে। আমি শুধু সাধারণবৃত্তিতে কবিতা ভাল লাগার বস্তু অথচ তার জনপ্রিয়তা কেন কমে যাচ্ছে, সে কথা বলবারই চেষ্টা করব।

আমার যুক্তি সাধারণ পাঠক-পাঠিকারই যুক্তি বলে বুঝে বিনম্রসমাজ হাতসম্মত করবেন, এই প্রার্থনা করি।

আমরা কবিতা ভাল না বেসে পারি না। কবিতা আমাদের সত্তা বললেও চলে। জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে, আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপে ছন্দ আছে, স্বতঃস্ফূর্ত হিলোল আছে, সেই ছন্দের, সেই হিলোলার, নৃত্যের ভাষার ললিতবাক্যের সুস্বাদু বহিঃপ্রকাশই কবিতা। ছন্দ হিলোল আমাদের তত্ত্বতে তত্ত্বতে, মনের পথে পথে অজ্ঞানভাবে জড়িয়ে আছে। এর কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে যেতে হয় সেই জীবের প্রথম উৎপত্তির যুগে, অর্থাৎ সেই আদিম Palaeozoic যুগে, কোন অজ্ঞাত কারণে, কোন শুক্লবর্ণের বহন পৃথিবীতে প্রাণ সম্ভব হয়েছিল।

অগভীর সমুদ্রের উপকূলসমীপে জলজ উদ্ভিদ ও পর্বত প্রাণীজগতের জন্ম নির্ভরশীল প্রাণীবাটী জীবের আদি জনক-জননী। অগভীর জলে গা ভাসিয়ে থাকতো তার আর পরম আশ্রয়ে নিশ্চয়, ডেউএর দোলায় বিভোর হ'ত—অগভীর জলের ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলি কখনও কখনও বায়ু-হিলোলে অথবা জোয়ারের আবেগে সৈকতে এসে যুহ যুহ আঘাত করত—মা যেমন শিশুকে চাপড়াতো থাকেন আদরে সোপাগে। অবস্থিত প্রাণীগুলিও সঙ্গে সঙ্গে তরঙ্গভঙ্গের দোলনায় হুলতো।

জল ছেড়ে স্থলে যখন প্রাণ সম্ভব হ'ল, সেই বহুবর্ণের আনন্দের স্মৃতি প্রাণী বহন ক'রে নিয়ে এল তরীতে তরীতে। স্থলের পারিপার্শ্বিকের ছন্দ, হিলোল এখন ধ্বনিত হ'তে থাকল কর্ণপটহে, শব্দবাহী বায়ুতন্ত্রী নিয়ে যেতে থাকল হেড় অফিস মস্তকে।

ছন্দহিলোলে গা ভাসিয়ে পরমানন্দ আশ্রয়নের অনুভূতি তাই আদির, শাশ্বত। আমাদের মন, আমাদের প্রাণ, আমাদের চোখ, আমাদের

তাই নাচ গান কবিতা কার্যকলাপ, সকলের মধ্যেই ছন্দ সৃষ্টির প্রয়াসী আমরা, ছন্দের পূজারী, ছন্দের অমূল্য-প্রবণ।

মানব ইতিহাসের প্রথম দিকে এই ছন্দপ্রিয়তার নিদর্শন পাওয়া যায় প্রাণের আবেগে নৃত্য, কবিতা, পদতালনা প্রভৃতির উদ্গার অভিযুক্তিতে।

পরে ভাষার উদ্ভব হওয়ার পর থেকে তাঁর অমুদ্রিতকে প্রকাশ করা হ'তে থাকল ভাষার মাধ্যমে—যে ভাষায় ছিল হিল্লোল ওঠা-নামার নৃপুর-নিরুপ।

ভাষার ছন্দোচ্ছিন্নতা অথবা প্রাণের লীলায়িত আবেগ যখন স্বয়ং সম্পূর্ণ না হ'ত তখন ব্যবহার করা হ'ত নানারূপ ব্যঙ্গবস্তুর, বহু প্রাচীন যুগের যে সমস্ত অবশেষ পাওয়া যায়, তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, নিওলিথিক যুগের ধর্ম ক্রমবিবর্তনে নানারূপ তারবস্তুর উদ্ভব ঘটায়—এছাড়া ঢাক, ঢোল, তবুরা জাতীয় ব্যঙ্গবস্তুরও অভাব ছিল না।

আমরা যতই সভ্য হই, ততই আধুনিক হই, তত মার্জিত, সংস্কৃত, সযত হই—চড়ক পূজার ঢাকে কাঠি পড়লে অথবা কর্তনের বৃন্দে বোল উঠলে আজ-ও কি আমরা সেই কোন্ কোটি কল্প যুগের পূর্বপুরুষদের হৃদয়ের স্পন্দন আমাদের শিক্ষা, দীক্ষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি আধুনিকতা-অধ্যুষিত হৃদয়ে অনুভব ক'রে তালে তালে নেচে উঠি না?

প্রত্যেকের মনে আছে লুকিয়ে একটি ছন্দপাগল বাউল, আনন্দলহরী খানি হাতে নিয়ে যে রসসাগরের অনবীকার্য দোলনার ছলছেই, ছলছেই, ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত।

কিন্তু বাহুদৃত রস প্রকাশ ক'রে অস্ত পাঁচজনের মনকে ভাসিয়ে দিতে পারে খুব কম লোকেই—আর সহজাত ছন্দোচ্ছিন্নতা ওতঃপ্রোতভাবে দেহমনে জড়িয়ে থাকলেও তা অনুভব ক'রে রসান্বাদন করতে পারেও কম লোকে। তাই প্রয়োজন করি—যিনি নিজের উপলব্ধি রসে তার বেঁধে পরিবেশন করতে পারবেন অন্তর্ক—আর রসচেতনা সহজে সুপ্ত মনের তারগুলিতে ঝংকার তুলতে পারবেন অনাবাদিতের আবাদনোন্মুখ ক'রে।

উপমার ঔৎকর্ষ, অর্থগৌরবের বৈশিষ্ট্য ও পদমালিন্যের স্বপ্নময় জোড়না কবিতার প্রাণ। অর্থাৎ কালিদাস, ভারবি ও নৈষধের রস একত্রে ভাল দেওয়া মাথের রসকদম্ব।

মুদ্রার প্রচলন বতদিন না হ'য়েছে, ততদিন মানুষের রসভূকল ভুগু করেছেন চাবণ ও কথক কবিতা সুরের মাধ্যমে তাঁদের উপলব্ধি অনুভূতির প্রচার ক'রে; উদ্ঘাটিত করে—মানুষের মনের বহু দুরারের কপাট খুলেছেন, অনুভূত রসের আবহপ্রাণে জোয়ার এনেছেন। মনোচোচক, ক্ষতিচোচক, প্রাণের স্পন্দন ও একান্ত জাগ্রত সুরে ছন্দে যে দোঙ্গারিত করতে পেরেছে, সেই হ'য়েছে চিরন্তন, সেই হয়েছে চিরকাল্য, চির আদৃত।

সেই রামায়ণ কত যুগ যুগ ধরে বেঁচে আছে—সেই আগমনী 'এলি যদি যবে কিরে আর মা উমা কোলে আর।' চিরন্তন জননীর অন্তরের কথা। সেই বাউল-ভাটিয়ালী—'মন মাঝি তোর বৈঠা নেবে।' সেই 'নিতাই এনেছে নাম হরিবোল, হরিবোল।' পাগল ক'রে বেখেছে আজও বাঙালীকে চির অকুন্তের উৎস হ'রে।

সেই মনসা-মঙ্গলের লখাইএর কল্পনা হলহল কাহিনী—'শোনের

বেউলে, বার বেণের ঝি। তোরে পাইল কালনিজে, মোরে খাইল কি।' তারপর রামপ্রসাদ, 'মনরে কুবি কাজ জাননা', মস্ত প্রেমন্ত উন্নত ক'রে দেয় নাকি মনকে আজও? পূর্ববঙ্গে এইরূপ চন্দ্রাবলী প্রভৃতির কবিতা নাকি এখনও প্রচলিত আছে। তাছাড়া মুখে মুখে রচিত ছড়াগান, পালা গান আজও বাঙালীর প্রাণের জিনিষ হ'রে আছে। দ্বিজবংশী কেনারামের মত পাষণ্ডও অমৃত-প্রস্রবণ ছুটিয়ে ছিলেন। রসিক বাঙালী জাতি ধান কাটতে, নৌকা বাইতে সুরের হিল্লোল তোলে। বিয়ে, পৈতে, পালা পার্কে, ব্রত অনুষ্ঠানে ছড়া কাটে। ঘুম-পাড়ানি ছড়া কেটে খোকর চোখে আনে ঘুম, ভোলায় অবুধ খোকাকে। এসব ছড়ার সঙ্গে কেই বা নয় পরিচিত তাই বাহুল্য বোধে আর উল্লেখ করলাম না সেগুলি।

যে চিত্র এতক্ষণ ভুলে ধরা হোল তা সবই প্রাক্-ব্রিটিশ যুগের। এর পরেই মুদ্রার উদ্ভব ও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব মানুষের আনন্দ উপভোগ করবার ধারা ও রীতির মধ্যে আনল এক বিরাট পরিবর্তন। একখানি বই কিনে ধীরে স্তম্বে প'ড়ে মানুষ তার মনের তৃষ্ণ মিটাতে আরম্ভ করল এবং গানের মাধ্যমে যারা রসসৃষ্টি করতেন, তাঁরা ক্রমে ক্রমে নিজেদের বৃত্তির জনপ্রিয়তা হ্রাস হ'তে দেখলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার শিক্ষিত মন শুধু কর্ণ ও হৃদয়কে পরিতৃপ্ত ক'রে শাস্ত থাকতে পারল না—বুদ্ধির খোঁজ চাইল। তখন বুদ্ধিবৃত্ত, বুদ্ধিগ্রাহ্য, বুদ্ধিবৃত্তিকে চরিতার্থ করবার মালমশলাযুক্ত কাব্য রচিত হ'তে লাগল। এমন ক'রে মূল শিকড় থেকে বিচ্যুত হ'য়ে গেল কবিতা—টবের ফুলের মত হ'ল তার অবস্থা—মাটির অতলান্তে পায়ল না শিকড় চালাতে।

সাধারণজনের আবালবৃদ্ধবনিতার হৃদয়রাজ্য থেকে নির্বাসিত হ'লেন কাব্যলক্ষ্মী;—শিক্ষিত, বুদ্ধিবৃত্তীদের সংখ্যা কত? কবিতার জনপ্রীতি তাই কমে যেতে বাধ্য হ'ল।

একমাত্র শিক্ষিত অন্তঃকরণ ছাড়া অন্তর্কারও জনস্রোতের আগ'তে পারে, এমন কবিতা আর রচিত হ'ল না। রবীন্দ্রনাথ যে রবীন্দ্রনাথ—তাঁর কবিতাই বা সাধারণ কটা লোকে পড়েছে? তাঁর গভীর ভাবের কবিতাগুলি কজন বোঝেন বা বোঝবার যোগ্যতা রাখেন? ঐ ভাঙ্গা ভাঙ্গা পড়া, ভাঙ্গা ভাঙ্গা জ্ঞান। অন্ত কবিদের কথা ছেড়েই দিলাম। সিনেমার দৌলতে অবশ্য রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গান লোকের মুখে মুখে কেহ—তবে হিন্দীগান, অথবা তাঁকে ভাঙিয়ে রচিত চটুল, হাঙ্গা গানেরইতো ঝংঝং।

Glamour আর অনবসরের যুগ এসেছে। বাঁচবার কঠোর সংগ্রাম নিয়ে এসেছে অর্থচিন্তা, রাষ্ট্রচিন্তা, সমাজচিন্তা, এমনি আরও কত চিন্তার পাহাড়। আনন্দ উপভোগের সময় কোথায়? সময় নেই, সময় নেই। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, সেই চণ্ডীর গান, কথকতা শোনবার নিশ্চিত জীবন কোথায়? ইউরোপে তাই one act drama হ'য়েছে—সাক্ষিপুঙ্করণ—সবোত—এলাম, দেখলাম, চলে গেলাম—অভিনিবেশ দেবার, মনঃসংযোগ করবার সময় কোথায়? মাথায় বুরছে রাজ্যের চিন্তা। বিক্ষিপ্ত মন, কিছুই যখন মন দিয়ে করতে পারা বাচ্ছেনা তখন সবখানি মন দিয়ে কবিতা পড়বারই বা সময় বা মন কোথায়?

বোড়ামোড় ক'রে সিনেমার তারকাখচিত বইএর পাতা গেলাম উলটিয়ে। বড়জোর একখানা ডিটেক্টিভ গল্প অথবা হাঙ্গা ধরণের

কম পাতার উপভাস হ হ শব্দে পড়লাম—জার কবিতার
হে ?

হাতে কি বই রে ? ওঃ বাবা : ক্যোবিত্যা ! এই হ'ল বেশীর
ভাগে লোকের অভিযুক্তি ।

Ready made সৌন্দর্য সাজানো থাকবে আমার বিনা
প্রয়াসে একটুও মন খরচ না ক'রে হাওয়ায় গা ভাসিয়ে চানচুকের
মত মচমচিয়ে খেয়ে বলব, বাঃ ! তবেই না !

মেকলে অবস্থা বলেছিলেন—As civilisation advances,
poetry declines, তা বোধ হয় সত্যি হ'তে চলেছে—আমরা
হয়েছি না ?

এমন সব কবিতা লেখা হয় আজকাল যার অনেকগুলি পড়ে
অবশিষ্ট ও হৃদয়তৃপ্তি হওয়াতো দূরের কথা, দস্তখুট করবার উপায়

হয়—এপার্থক্য একজনকেও এ সকল কবিতার
অর্থনিহিত অর্থ বোধগম্য করাতে সক্ষম
করেন না। আমরা সাধারণ পাঠক,
লেখকেরই সংখ্যাধিক্য—তাই মনে হয়
কি পড়বার সময় কবি এসে যদি
সংক্ষেপ ক'রে অর্থটি বুঝিয়ে দেন তবেই
আনন্দান করতে সক্ষম হওয়া যেতে পারে,
নাহলে আর কোনই উপায় নেই। মিলটনের
পারদীপ্য Paradise Lost পড়বার
সময় অধ্যাপক আনন্দে গদগদ হন, কিন্তু
অনুবাদের কাছের কাছের অবহেলিত।

তাই মনে হয়, পাঠাগার স্থাপনাই করা
যেকোন কবিতা পড়ো, কবিতা পড়ো ব'লে
কোন বিদার্ক ক'রে দেওয়াই হোক ; কোন
কবি হবেনা—যতদিন না কবির নিজেদের
আল-খুদা মাকিক কবিতা সৃষ্টি করা বন্ধ
করা যান, জনসাধারণের হৃদয়ে স্পন্দন
জাগানোর মূলমন্ত্রটি ধরবেন, ততদিন কবিতার
প্রিয়তা আগতে পারবে না।

শুনতে পাই কবিতা নিয়ে পরীক্ষা
নিষেধ করতাই মশগুল আধুনিক কবির—
সে তাদের ব্যাপার, অথবা মুষ্টিমেয় কাব্যজ্ঞান-
ধীর—কিন্তু সাধারণ কাব্যপিপাসু জন
আকৃতির পর আকৃষ্টি লাগিয়ে তাঁদের নাগাল
পড়েনা।

আমাদের তৃষ্ণা আকর্ষণ—কিন্তু সে তৃষ্ণা
কিভাবে কে ?

আধুনিক কবিতার হুর্দ্বোধতার সুযোগ
নিঃ, শব্দের চটকে, ভাষার কারুকার্যে,
কবির অস্বাভাবিকত্ব ও অভিনবত্ব বিস্তারিত
ক'রে অনেক অনধিকার-প্রবেশও ঘটেছে
কবিতা-ক্ষেত্রে, তাও অস্বীকার করবার উপায়
নেই।

অনেক আধুনিক কবিতা বোধগম্য করাও

ধেমন, মনে রাখাও তেমনি কষ্টকর, উদ্ধৃত করাও—ফলে ব্যবহৃত,
কথিত বা লিখিত ভাষার তা নিজস্ব সম্পদ হ'লে যেতে পারে না।

পরিশেষে আমি বলতে চাই যে, কাব্যবিচার করা বা নম্র
কবির বিশ্বকর সৃষ্টির সমালোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়, কেননা
তার যোগ্যতাও আমার নেই। আমার প্রিয় কাব্যলক্ষী যাতে সকলের
হৃদয়ের বেদীতে অধিষ্ঠিতা হ'য়ে শান্ত, তাপিত, দ্বিষ্ট, পীড়িত মনকে
আনন্দের অমিয়-নির্ঘরে সিক্তিত, তৃপ্ত করতে পারেন, তাই তাঁর
প্রসাদ প্রাপ্ত গুণী জনকে আমার ভাবনা, আমাদেব আকুলতা জানালাম।

তাঁরা এমন সৃষ্টি করুন যাতে আমাদের ভগ্নবৃকে আশার হিলোল
জাগবে, কাব্যবিমুগ্ধতা বিপরীত খাতে প্রবাহিত হয়ে, বসদকারে
শুষ্ক জীবন ডুব ডুব হয়ে ভেসেই যাবে আর—

'গৌড়জন বাহে আনন্দে করিবে পান সুখা নিরবধি।'

শারদীয়
অভিনন্দন

মুহার্জী জুয়েলার্স
বহুবাজার মার্কেট-কলিঃ

ফোন:
৩৪৪৮১০

মুহার্জীর গহনা
জুয়েলার্স ও স্ট্রোর

বাতিঘর

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

বারি দেবী

তারপর কেটে গেছে আরো সুদীর্ঘ তিনটি বছর! জগৎ জুড়ে চলেছে ভাঙ্গা-গড়ার খেলা।

মানব জীবনের উপান, পতন, স্বপ্ন, দঃখ, হাসি কান্নায় নিত্য রচিত হচ্ছে পৃথিবীর অলিখিত ইতিহাস।

দীর্ঘ পাঁচবছর পরে স্বদেশের মাটিতে পা দিয়েছে সুদাম, M. R. C. P.—F. R. C. S.—M. R. C. O. G. ডিগ্রির মালা গলায় পরে। প্রথমে কাকার নির্দেশ মতই সোজা চলে এসেছিলো সে তার মামার বাড়ীতে। ফেরা হয়নি আর সেখানে, যেখান থেকে জনক-জননীর পদধূলি মাথায় নিয়ে, মঙ্গলঘটকে প্রণাম করে বাত্মা সুরু করেছিলো! সে বাড়ী এখন কাকার সম্পত্তি, সেটি তিনি ভাড়া দিয়ে, নিজে বাস করছেন লাহকুহিতে, সুদামের মা গেছেন তাঁর পিত্রালয়ে। মামার বাড়ীতে অবস্থা বেশীদিন আর থাকছে হয়নি ওকে, সোমনাথের দানপত্র আর এ্যাটর্নি মারফৎ একখানি শিলমোহর-করা তাঁর লেখা চিঠি পাবার পর প্রথমে বিহ্বল ভাবে এসে মাকে বলেছিলো সুদাম—

—কি করবো মা? কাকাবাবু দেওয়া এ বাড়ী আর টাকা, কোন্ অধিকারে গ্রহণ করবো আমি!

—তাকে ভুল বুঝানো দামী! মুহূষের বলেছিলেন যখন দেবী!—তাঁর স্নেহের দানকে উপেক্ষা করে তাঁকে কঠোর আঘাত করতেই কি পারবে তুমি?

—মুখ নিচু করেছিলো সুদাম মায়ের জবাব শুনে! ছোটোখের কুল ছাপিয়ে দর দর করে নেমে এসেছিলো জলের ধারা।

অনেক দিনের সঙ্কিত বেদনার জমাট তুধার আজ অকস্মাৎ গলতে শুরু করেছে।

মায়ের গলাটা দুহাতে জড়িয়ে ধরে তাঁর কাঁধে মাথা রেখে, ফুলে ফুলে কঁদেছিলো সুদাম, সেই ছোটবেলার মতো!

তারপর মাকে নিয়ে চলে এসেছিলো এলগিন্ রোডের বাড়ীতে!

খিরেটার রোডের বাড়ী হবে কমল-সেবাসদন! কাকাবাবু দেওয়া এ মহান কাণ্ডভার সশ্রদ্ধচিত্তে মাথায় তুলে নিয়েছে সুদাম! আরো কয়েকজন নিঃস্বার্থ সেবাসদস্য ডাক্তার আর কয়েকজন ধনী বাঙালী, অবাঙালীর সহায়তা লাভ করেছে সে! সেবা-ভবনের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। নাওয়া-খাওয়ার সময় মেলেনা তার। ঋণ্ডিহীন এই কৰ্ম্মযোগের মাঝে আত্মনিমগ্ন রূপটি তার বিষয় জাগিয়ে তুলেছে তার সহকৰ্ম্মীদের মনে! সেদিন ওর মুখের চোখের ভাব দেখে বিখ্যাত স্বদত্তবাবু প্রবীণ ডাক্তার সর্বাধিকারী উদ্বিগ্ন ভাবে বললেন—

—শরীর অসুস্থ নাকি হালদার? দেখি, দেখি! ওর হাতটা তুলে নিয়ে নাড়ী টিপে-কোড়ের সঙ্গে বললেন—হ্যাঁ! বেশ স্বরতো

দেখছি! যাও, যাও, শিশুগির বাড়ী গিয়ে বিশ্রাম নাওগে! শরীরটা গাড়ীর ঢাকা নয় হে, যে তাকে বেপরোয়া ভাবে চালাবে;—যে রকম অনিয়ম, অত্যাচার দেখছি তোমার, মিষ্টার ব্রিবেলার সেবাক্রমে প্রথমেই তোমাকেই না ভত্তি করতে হয়!

—লজ্জিতভাবে হাসলো সুদাম—মুখ নিচু করে বললো,—তেমন কিছু নয়। যতটা পরিশ্রম করা উচিত—ততটা আর পারি কৈ? হস্পিটালের ডিউটি সেয়ে, বাকি সময়টা এ কাজে জ্ঞাত যথেষ্ট নয়। তবুও আপনাদের যথেষ্ট সহায়তা পাচ্ছি, তাই তাঁর পরিকল্পনাকে সাধক করে তোলা সম্ভব হচ্ছে!

—কি আর করতে পারছি হে! পাঁচজনের উপকার হলে, আমাদের কিছু পুণ্য সঞ্চয় হবে,—এই আর কি! হা, হা, কবে প্রাণ খোলা হাসি হেসে বললেন ডাক্তার সর্বাধিকারী, আমার গাড়ী তোমায় পৌছে দিয়ে আশ্রক হালদার, বড্ড চড়া রোদ্!

—না, না, আমি ট্রামেই যেতে পারবো, তেমন কিছু হয়নি আমার! বিনীত নমস্কার জানিয়ে ধীর পায়ে বেরিয়ে গেলো সুদাম!

—ওর গমনপথের দিকে চেয়ে ব্যথিত কণ্ঠে মুহূষেরে বললেন ডাক্তার—Poor Soul.

সোমনাথের বাল্যবন্ধু, গৃহচিকিৎসক তিনি! দানপত্রের প্রদান সাক্ষী! লালকুটির ইতিহাস তাঁর অজানা নয়!

ট্রামে উঠবার পর মাথাটা কেমন টলো, টলো মনে হতে লাগলো সুদামের। চোখ দুটো যেন বড্ড জালা করছে। অতিকষ্টে এগিয়ে গিয়ে বসে পড়লো সিটে, মাথাটি হেলিয়ে দিয়ে চোখ বুজলো সে!

পাশের সিটেই বসেছিলো করবী!—সুদামের দিকে নজর দেয়ালো কিছু পরে!

যেন ভারি চেনা-চেনা মনে হচ্ছে না?

বার বার দেখলো করবী ওর মুখখানা!

মনের গহন বনে চললো ব্যাকুল অল্পসন্ধান—কে? কে?

চমকে উঠল স্মরণ বিভ্রাৎ!—তার আলোতে চিনলো করবী ওকে

—পরম বিষয় ভরে অক্ষুট স্বরে উচ্চারণ করলো—সু—দাম!!!

—কে? চমকে উঠে চোখ মেলে চাইলো সুদাম।

—চিনতে পারছো না সুদাম? আমি করবী!

ফিরলে কবে?

—ছোটমাসী? ওর দিকে চেয়ে হাসলো সুদাম।

—তা প্রায় বছরখানেক হয়ে গেলো ফিরেছি!

কথা বলতে বলতে কেমন হাঁফাতে লাগলো সে। চোখ দুটো

লাল, লাল!

তোমার কি শরীর অসুস্থ সুদাম? ব্যস্তভাবে শুধোয় করবী!

—হ্যাঁ ছোটমাসী! বাড়ীতে বোধ হয় হেঁটে যেতে পারবো না।

—কোথায় নামবে?

—এলগিন রোডের মোড়ে—

—ঠিক আছে! আমি যাবো তোমার সঙ্গে সুদাম? বাড়ীটা চিনে আসবো!—এখন আর কথা নয় পরে বলবো, আর শুনবো সব!

ট্রাম থামলো! সুদামের হাতটা গোপে ধরে ওকে সাবধানে নামালো করবী!—উঃ, কি ভীষণ গরম তোমার গা!—বাগরে!

এবে বড্ড স্বর দেখছি। এই নিয়ে বেরিয়েছো? মিতা শুনলে—
নিজের জিব দাঁত দিয়ে চেষ্টা ধরল করবী! মহা অপ্রস্তুত ভাবে

কুটপাথে দাঁড়িয়ে চেয়ে দেখলো সুদামের মুখপানে!—বুকটা যেন কেটে গেলো ওর সুদামের ঠোঁটের কোণে কঙ্কণ স্নান হাসি দেখে! একটা চলন্ত ট্যাক্সি যাচ্ছিলো,—তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকলো করবী!

দিন সাতেক বাদে অরটা ছাড়লেও, ডাক্তার সর্বাধিকারীর কদাশানে সুদামকে আরো একসপ্তাহ শান্তিহেলের মত বাড়ীতে থাকতেই হলো।

করবী রোজ এসেছে, যমুনাদেবীর সঙ্গে সুদামের শুশ্রূষায় যোগ দিচ্ছে!

—জরের মাঝেই একদিন সুদাম বলছিলো, ছোটমাসী! তুমি যে সেবা করতে পারো, তা'তো জানতাম না আগে!

—সেই আগেকার ছোটমাসী আমি আর নেই গো!

নঃসিং শিখছি যে! মানে খোলস পাশটেছি! কৃতজ্ঞতায় সঃসং হয়ে উঠতো যমুনাদেবীর চোখ দুটো! বলতেন—

—এমন বিপদের দিনে ভগবানই তোমাকে এনে দিয়েছেন য়োনট—তা, না হলে একা যে কি করতুম!

স্মৃতির কথা ওঠে না! ওরা সকলেই যেন—পবম্পব পরম্পরের কাছ থেকে মিতার তথ্যটি বেদনার আড়াল দিয়ে গোপন রাখতে চায়!

পথ্য পাবার দিন দুয়েক পরের সন্ধ্যায় খাটের ওপর বালিশে হেলান দিয়ে বসে একটা বই নাড়া চাড়া করছিলো সুদাম! ঘরে এলো করবী, সঙ্গে তার অনিরুদ্ধ!

—কাকে এনেছি দেখতো সুদাম, চিনতে পারো কি—না! সর্কা'তুকে বললো করবী!

একটি বিম্বিত ভাবে চাইলো সুদাম অনিরুদ্ধর দিকে!

—অনিরুদ্ধ এগিয়ে এসে খাটের পাশেই চেয়ারটি দখল করে বললো—দুর্বল মস্তিষ্কটাকে অনর্থক খাটিয়ে আর কাজ কি?—আমার নাম অনিরুদ্ধ বঙ্গ, বিলেতে থাকতে কয়েকদিনের পরিচয় আপনার সঙ্গে!

—ও হো, হো! মনে পাড়েছে! যুক্তকরে ওকে প্রণাম জানিয়ে হেসে বললো সুদাম—অপরাধ নেবেন না, স্মৃতিশক্তির ধারটা আমার দিন দিন কেমন ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে! অনেকদিন বাদে আপনাকে দেখে ভাবি ভালো লাগছে আমার!

—হ্যা! আমারও! বললো অনিরুদ্ধ! করবী দেবীর কাছে আপনার খবর পেয়ে নিজেই এলান, অবশ্য পূর্বে পরিচয়ের দ্বারী নিয়ে এবারের আসা নয়; আমার এবারের পরিচয় মিতার দালা আমি! মানে একমাত্র দালা!

—তাই নাকি? হাসলো সুদাম! তা আপনার ভগ্নির খবর



ও-আর-সি-এল এর

কুশারেশ

লিওন ও পেন্টেক্স

২৫

দি ওবিয়েটাল রিসার্চ অ্যান্ড কোমিক্যাল ল্যাবরেটরী লিঃ

—খবর? মাথা চুলকালো অনিচ্ছ!

বিস্তৃত দৃষ্টিতে চাইলো করবীর মুখের দিকে!

—ওর অপ্রস্তুত ভাবখানা দেখে হাসলো করবী—তাবপর বললো—কি আশা করো তার সম্বন্ধে সুদাম?

তোমার কাকাকে চিনতে পেরেছো বোধ হয়; তার সঙ্গিনী হয়ে মিহার অবস্থাটা কি হতে পারে বন্ধনা করে নাও—বেচারী অত বড় বাড়ী পানায় একেবারে একলা থাকে! কোথাও বেরায় না; যাকে বলে নির্বাসন দণ্ড; তাই ও বেছায় গঠন করেছে। তার কথা—কি আর বলবো বলো! গঠার স্ববর্ণে উঠলো করবীর—চোখ দুটি ভরে এলো জলে!

—সোজা হয়ে উঠে বললো সুদাম! বেদনা-ছলো-ছলো, চোখ দুটি তুলে চাইলো করবীর দিকে—

—একলা? একলা থাকে কেনো মিত্র?

তুমি, দিদিমা, ছোট মামা! সকলেই তো আছো।

—না সুদাম, আমরা প্রায় বছর চারেক অজ্ঞাত আছি!

—সে কি? জানিতাম না তো?

—জানাবার আর সময় পেলাম কই? জ্বর নিয়ে তো প্রথম দেখা। এবারে সবট বসছি শোনো! কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে নিজেকে প্রস্তুত করে নিলো করবী!

—আপনার হাতে কি বই ওগানি? শুধোলো অনিচ্ছ!

—বালুচর! বললো সুদাম! একখানি কবিতার বই!

—বালুচর? ইছামতীর লেখা? —কেমন লাগছে?

—অপূর্ব! প্রত্যেক কবিতাটি রসোত্তীর্ণ! তবে রসটি, বেদনার রস আর কি! সেই জন্তেই বোধ হয় এত মনোমগ্ন হয়েছি! একটা ছোট্ট নিঃশ্বাসের সঙ্গে বললো সুদাম!

—ঠিক বলেছেন! শুনেছি, লেখিকার প্রথম রচনা এই বইখানি। আশ্চর্য্য হলাম বইখানি পোড়ে—প্রথম রচনা যে এত মনোরম হতে পারে।

—আরো আশ্চর্য্য হবেন শুনে যে, বইখানি ডাকে কে-যে আমাকে পাঠিয়েছেন জানি না। এমন একজন অখ্যাত দীন দীনকে এমন কাশ্মীরের উপযুক্ত সম্বন্ধার কে যে ঠাণ্ডারলেন, বুঝলাম না। বোধ হয় পরিহাস করেছেন কেউ, সেই কথামালার শেয়াল আর বকের গল্পের মত।

—না, না, তাইবা ভাবছেন কেন? হয়তো আপনার পরিচিত বা অতি প্রিয়জন, আপনার জন, কেউ পাঠিয়েছেন—পাঠিয়ে হয়তো তিনি নিজেই তৃপ্তি পেয়েছেন,—আর এমনো তো, হতে পারে, ছদ্মনামের অবগুণ্ঠন সরিয়ে একদিন তিনি উদয় হতে পারেন আপনার সামনে! অসম্ভব নয় কিছু!—সেদিন এ অভাজনকে শ্রবণ করবেন কিছু! কারণ এই ইছামতীটি যে কে, বাস্তবে কি তার পরিচয় জানবার যথেষ্ট কৌতুহল আছে আমার, প্রকাশকের দোরে ধর্না দিয়েও এ রহস্যের স্তর কিছু মেলেনি!—এই বাস্তবে বইখানার চড়, চড় করে তিনটে সংস্করণ কেটে গেলো, একবছরের মধ্যেই?

—তিনটে কেন, ছ'টা সংস্করণ কেটেছে শুনেও আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই; কারণ যথার্থ ভালো জিনিষ সমাদর পাবেই!—হ্যাঁ! যেটামাত্র কি মনে বলবে বলছিলো না? করবীর দিকে চাইলো সুদাম।

—তাইতো ভাবছি, বললো করবী—অপ্রিয় ঘটনাগুলো তোমাকে জানিয়ে.....

—জানলে মনে আঘাত পাবো এইতো? জান হেসে বললো সুদাম, সব কিছুকে সহজভাবে মনে নেওয়ার শিক্ষা করছি ছোটমাসী! জানি, যা ঘটবার—তা অবশ্যই ঘটবে, এবং তার সঙ্গে খাপ খাটবে আমাদের চলতে হবে। শত চেষ্টাতেও ঘটনাস্রোতকে যখন ফেরাবার আমাদের ক্ষমতা নেই, তখন শান্তচিত্তে তাকে যাতে মেনে নিতে পারি, সেট চেষ্টাই আমাদের করা উচিত—এই আমার মনে হয়।

—আপনার মূল্যবান অভিমতটিকে জীবনে কার্য্যকরী করতে পারলে মনে হয় জীবনের জটিল সমস্যাগুলোর সমাধানের সূত্র কিছুটা মিলতে পারে! বললো অনিচ্ছ।

—আপনি নয়—তুমি! হেসে বললো সুদাম, মিতার দানব ওপর আমিও ভাগ বসলাম, আমারও যে দাদা-দিদির একাত্মই অভাব!

—অবশ্যই! আজ থেকে দাদার কড়া শাসনটিকেও কিন্তু মেনে চলতে হবে—হা, হা শব্দে উচ্চরালে হেসে জবাব দিল অনিচ্ছ!

—ভরসা পেলাম এতক্ষণে!—সুহৃৎসে বললো করবী;—বছর চারেক আগে জামাইবাবুর দানপত্রে, তাঁর সম্পত্তির যা ব্যবস্থা হয়েছে, তা'তো তুমি জানোই! এর কয়েকদিন পরেই অসীম এসে মাকে সোজাসুজিই বললো,—

—এত বড় বাড়ীটা আমি অমনি কেলে রাখতে চাইনা, আমার ব্যবস্থা করবো,—মানে আপনারা যদি চান তো একতলায় থাকলে ভালো দিয়ে! দোতলায় আমি নিজে থেকে আমার বাড়ী ভাড়া দেব।

একটু থেমে,—আবার আরম্ভ করলো করবী—

—মাকে তো জানানোই সুদাম,—তিনি সেইদিনই আমার হাত ধরে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন। হোড়দা আর আমি কত বোঝালাম যে, একটা ফ্ল্যাট গুঁজে নিয়ে তবে যাবো,—কিন্তু মা কোনো কথাতেই কান দিলেন না!

মা ছোড়দাকেও বললেন সঙ্গে আসতে,—তারও ইচ্ছে ছিল, কিন্তু তার নতুন বিয়ে করা বৌ একেবারে চোখ কপালে তুলে বললো—

—ফ্ল্যাটতো আর বিনাভাড়ায় জুটবেনা;—তার চেয়ে ভাড়া দিয়ে এখানেই থাকবো! এমন চমৎকার মার্কেলের ঘর, এমন লন, ফুল ছেড়ে আমি একপাও নড়চিনে,—যেতে হয় তুমি যাও মায়ের আঁচল ধরে।

আহা কত আরাধনা করে পাওয়া বৌ!

ছোড়দা মায়ের আঁচলের বদলে বৌএর আঁচলই ধরলো।

—ছোটমামা বিয়ে করেছেন নাকি? শুধোলো সুদাম কৌতুহল হয়ে।

—হ্যাঁ,—সে তো অনেকদিন! মিতার বিয়ের মাস ছয় মাস পরেই! বৌ তোমার অচেনা নয়,—তোমার কাকার বান্ধবী... শুকতার সেন!

—কোন শুকতার? সেই অভিনেত্রী শুকতার? কাকার সঙ্গে একবার সিনেমায় কোর একটা নাট গানের দ্বাব না হল!

জানি না, সেখানে দেখেছিলাম ওর নাচ। সেখানকার—পরিচালিকা যিনি। মাসীমা বলতেন তাঁকে কাকা—ভদ্রমহিলা, কি রকম যেন, আমি তখন বেশ বড় হয়েছি,—আমাকে হুগাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে এমন ছেলেমানুষের মত আদর করতে লাগলেন, ভীষণ লজ্জা করছিলো আমার! যাকগে ওকথা—তারপর রাত্তায় নেমে—

—ও! অলকাপুরীর মাসীমাকেও তুমি চেনো দেখছি! চোখ বড় করে চেয়ে বললো করবী—ছেলে, মেয়ে ধরার জেলেনি তিনি। ঐ অলকাপুরীটি তাঁর একখানি মোক্ষম জাল। আর ঐ জালে ধরেই মিতাব গলায় ফাঁস লাগিয়েছেন তিনি। জানতাম না,—সুদাম, আগে এসব জানতে পারিনি,—যখন জানলাম, তখন করবার আর কিছু নেই!

একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে মুখ নিচু করলো করবী!

—জানবার কোনো উপায়ই ছিলো না,—যদি না পুলিশের হাঙ্গামা হতো। বললো অনিরুদ্ধ।

—পুলিশের হাঙ্গামা? সে কি? চমকে উঠলো সুদাম।

—মানে, টাকা বোজগারের নানারকম কৌশল বিস্তার করছিলেন ভদ্রমহিলা! নাচ গানটা বাইরের শো মাত্র! ধনী সম্ভ্রান্তদের নিয়ে জুয়োখেলা, ছেলে মেয়েদের অবৈধ ব্যাপার,—ইত্যাদিতে প্রচুর টাকা লাভ করতেন! ওর দলে অবশ্য ছিলেন কলকাতার আরো সম্ভ্রান্ত নামকরা লোকেরা।—বাঙালী অবাঙালী সব রকমই নিয়ে তৈরী করেছিলেন তিনি ঐ অবৈধ ব্যবসায়ের খাঁটিটি!

আমিও দিনকতক ওখানকার মেঘার হয়েছিলাম কি—না, তাই জেনেছিলাম ব্যাপারগুলো। প্রথম প্রথম বেশ মজাই লাগতো,—তারপর আস্তে আস্তে—এলো সন্দেহ, বিতৃষ্ণা! ছেড়ে দিলাম অলকাপুরী।

এর পরেই কাগজে দেখলাম ভদ্রানক খবর!

দল বল সহ গ্রেপ্তার হয়েছেন মাসীমা! ঐ ছেলে-মেয়েদের অভিভাবক কয়েকজন সব জানতে পেরে পুলিশের কাছে সব ফাঁস করে দিয়েছিলেন আর কি!

মামলা অবশ্য চললো না। টাকা ঢাললো রতনলাল ক্ষেত্রি! মাসীমা খালাশ পেলেন বটে, তবে বিধ-দাঁতটি খোয়া গেলো। অলকাপুরীর দরজা চিরদিনের মত বন্ধ হয়ে গেলো!

রতনলাল ক্ষেত্রির উপকারের প্রতিদান দিতে কিছু তিনি ভোলেননি;—পাম্পিরা গাওকে নিয়ে বোম্বাই পালানোর মূলে তাঁর সুস্বাদু কৌশল দানের কথা রতনলাল কোনো দিন ভুলবে না আশাকরি। খালি হুঃখ হয় বেচারি বুড়ো, রাজা মহেন্দ্র প্রতাপকে দেখে—

মামলা নাট্যটিকে—হারিয়ে কেমন যেন হয়ে গেছেন। রতনলালের কাছে—বিস্তর ঘেনাও ছিলো তাঁর,—আর অর্থকল, দেহের বল কিছুই আর এখন নেই... তাই...দ'রে পড়া হাতীর মতই চামচিকর নাথীকে শিরোধার্য করলেন তিনি।

একটা নিঃশ্বাস ফেলে চুপ করলো অনিরুদ্ধ!

করবী একবার চোখ তুলে চাইলো ওর মুখের দিকে—চাপা বেদনার স্নান ছায়া ভাসছে যেন ওর চোখ দুটিতে!

বিনু বিনু ঘাম জমেছে সুদামের কপালে, বিষয় ফুটেছে... চোখের দুটি তারায়!

উঃ কি ভদ্রানক!!...এই ভদ্রানক অলকাপুরীতে নাচ গান শিখতো মিতা? কে নিয়ে গেলো সেখানে তাকে ছোটমাসী? সে তো....ওসব চিনতো না...তার প্রকৃতি যে ছিলো বড় কোমল, ভাবি ভীতু!—উদ্বেগ-আকুল কণ্ঠে—বললো সুদাম!

কে নিয়ে গিয়েছিলো? এর জবাব তো তোমার অজ্ঞান নয় সুদাম! তোমার কাকা,—অসমী হালদারের কীত্তি এটা! অলকাপুরীর নামকরা পাণ্ডা ছিলেন তিনি, তা'তো জানতেই! প্রথম প্রথম আমবা কেউ কিছু সন্দেহই করিনি—কিন্তু তারপর..

ও প্রসঙ্গ—আজ থাক ছোটমাসী! আর্জকণ্ঠে বললো সুদাম!

ওহো! এ আমি...কি করছি! ওর দুর্বল মাখায় হুঃসহ বোঝাটা চাপাতে চাইছি? মনে মনে নিজেকে দিক্কার দিলো করবী!

সকল লজ্জার হাত থেকে ওকে বাঁচালেন যমুনা দেবী! দুটি খাবারের প্লেট হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন,—পেছনে দুকাপ চা নিয়ে এলো বাচ্চা চাকর—মঙ্গল।

—একি? কুগীর ঘরে এসব কেন দিদি? কাঁড়িয়ে উঠে শশব্যস্তে যমুনা দেবীর হাত থেকে প্লেট দুটো নিয়ে টেবিলে রাখতে, রাখতে, বললো করবী—আমার ডাকেননি কেন? আমিও যোগাড় দিতাম আপনার সঙ্গে,—তাতে আমার শখাও হতো!

—কিই বা করেছি? মাছ মাংস'র পাট তো বাড়ীতে নেই, শুধু চা ধরে দিতে মনটা যে কেমন করে ভাই, তাই সামান্য হুখানি নিম্মকি ভেজে নিয়ে এলাম! স্কীরের পুলি আগেই করা ছিলো!...

—বেশ করেছেন মাসীমা—খাবারের ডিস্ টেনে নিয়ে বললো অনিরুদ্ধ! যা মাসীরা খাওয়াবেন না তো খাওয়াবে কে? ওসব অকল্যাণে ভদ্রতা আমার নেই!

বাড়ীতে ঢুকে প্রথমেই যমুনাদেবীর সঙ্গে করবী অনিরুদ্ধ'র পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। তারী ভালো লেগেছিলো ওকে

পেটের যন্ত্রণা কি মারাত্মক তা ভুক্তভোগীরাই শুধু জানেন! যে কোন রকমের পেটের বেদনা চিরদিনের মত দূর করতে পারে একমাত্র

বহু গাছ গাছড়া **বাকলা** ব্যবহারে লক্ষ লক্ষ রোগী আরোগ্য লাভ করেছেন

ভারত গভঃ রেকর্ডঃ নং ১৬৮৩৪৪
অম্বশূল, পিত্তশূল, অম্বপিত্ত, লিভারের ব্যথা, মুখে টকভাব, চেকুর ওঠা, বমিভাব, বমি হওয়া, পেট ফাঁপা, মন্দারি, বুকজ্বালা, আহারে অরুচি, স্বপ্ননিদ্রা ইত্যাদি রোগ যত পুরাতনই হোক তিন দিনে উপশম। দুই সপ্তাহে সম্পূর্ণ নিরাময়। বহু চিকিৎসা করে যারা হতাশ হয়েছেন, তাঁরাও স্বাস্থ্যলাভে সক্ষম করলে নবজীবন লাভ করবেন। বিশ্বজুড়ে সুলভ্য ফেরত।
৩২ তোলার প্রতি কেঁটা ৩ টাকায়, একপ্রো ৩ কেঁটা—৮-১১ আশা। ডঃ মাও পাইকিয়ায় পৃথক।

দি বাকলা ঔষধালয়। হেড অফিস-আফ্রিকা (পূর্ব পাকিস্তান) ব্রাঞ্চ-১৪৯, মহানগর গাছা রোড, ঢাকা-১৭

—মুখের ভাব যেন অনেকটা সুদামের মত ! যমজ ভাই যেন ওর !

—একি আর খাওয়া বাবা ? ভালো করে দামী'র সঙ্গে বসে পরে খেও । বললেন তিনি !

—সে কথা আর আপনাকে বোলতে হবে না মাসীমা, কীরেয় পুলি খেতে খেতে বললো অনিরুদ্ধ—এখন আর আপনার একটি ছেলে নয়, এ ছেলোটোও এসে দৌরাখ্য করবে মায়ে মায়ে ! আর যে রকম লোভনীয় খাবার দেখছি আপনার হাতের, এর কাছে কোথায় লাগে বিলিতি হোটেলের যোগ্লাই রান্না !

—খাবার তৈরী করতে তো প্রায় ভুলেই গেছি বাবা, ফুক দান মুখে বললেন যমুনাদেবী—খাবার লোক কোথায় ? আগেকার দিনে,—নিতি নতুন ধরণের খাবার তৈরী করে সকলকে খাইয়ে কত আনন্দ তৃপ্তি পেতাম, তখন ঠাকুরপো কত ভালো বাসতো আমার হাতের রান্না খেতে, আর এখন...

অবরুদ্ধ বেদনার চাপে কণ্ঠকন্ঠ হয়ে গেল ওর ! নিজেকে সংযত করে নিয়ে আবার বললেন তিনি—

—হ্যাঁ বে দামী ! সেই তো এসে একবার গিয়েছিলি । ঠাকুরপোর সঙ্গে তো দেখা হয়নি বললি, আর হাসনি সেখানে ? মিতুর সঙ্গেও দেখা কবুলি না একবার ?—আহা, মেয়েটার জন্তে বড্ড প্রাণটা কেমন করে যে ।

—হ্যাঁ মা গিয়েছিলাম আরেকদিন ; তোমাকে বলতে ভুলে গিয়েছি ! হেসে জবাব দিলে সুদাম । কাকা নীচেই ছিলেন, দেখান্টে বসে চুটাবটে কথা বললেন আমার সঙ্গে ;—আরো বললেন মিতার শরীরাটা ভালো নেই ; অল্পদিন দেখা কোরো ।

—ও, তাই বুঝি ! নিঃশাস চাপলেন যমুনা দেবী । অনেকক্ষণ কিছু থাকনি দামু ! দুপটা আমি । রাস্তা পায়ে ঘব থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি ।

—তারপর ছোটমাসী ! এখন নিবাস কোথায় তোমাদের ? ছোট মামাতো লালকুঠিতে আছেন জানলাম, অবশ্য আমার সঙ্গে দুদিনই দেখা হয়নি । নীচের ঐ কোণের দিকের যে ঘরটা সর্বদা বন্ধ থাকতো—মানে মিতার দাছু খুন হয়েছিলেন শুনেছি যে ঘরটায়, সেট ঘরটা এখন খোলা, আর পর্দা সবানো ছিলো, বেশ সুসজ্জিত মনে হলো । একজন মহিলা বার দুয়েক এসে কাকাকে ভেঁকে নিয়ে গেলেন, তখন চিনতে পারিনি, এখন মনে হচ্ছে তিনিই ছোটমামার স্ত্রী বোধ হয় ।

—বুঝেছো ঠিকই ; অল্প হেসে বললো করবী । লালকুঠি থেকে চলে আসবার পর আমি মাকে লুকিয়ে দু'তিন দিন মিতার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম, তখন দেখেছিলাম ঐটি ওদের শোবার ঘর হয়েছে ।

নিবাস ?—প্রথমে পথে নেমেই মা'র মনে হল কোথায় যাওয়া যায় ! নিজের বাড়ীতো ভাড়া দেওয়া । অলকাপুরীতে যাবেন স্থির কংলেন দেশত্রির পার্কে বসে । কিন্তু আমার মন চাইলো না সেখানে যেতে—গোড়া থেকেই কেমন আমার ভালো লাগেনি ও জায়গাটা । আমি বললাম চেনো যাই আলিপুরে অনিরুদ্ধ বাবুর বাড়ী । তাঁর মায়ে'র সঙ্গে তো তোমার বেশ আলাপ আছে, আর তিনি বড় ভালো । রাজী হলেন মা । সেখানে গিয়ে একেবারে

ঠাকুর-আদরে কাটলো কয়েকদিন, তারপর ওদের চেষ্টাতেই বাড়ী একটা মিললো চেংলায় । টিউসানী করি, চলে যায় কোনরকমে দুজনের । জামাইবাবু প্রচুর টাকাও দিয়ে গেছেন । আর কোনো কষ্ট নেই, খালি মিতুর জন্তে মাঝে মাঝে বড্ড মনটা কাঁদে ।

বিমর্ষ দৃষ্টি মেলে, চুপ করলো করবী ।

—এত সব ব্যাপার ঘটে গেছে ? আমি এর কিছুই জানি না । ক্লক চুলপুলে, হাতের মুঠোয় চেপে ধরে টানতে টানতে বিষমকণ্ঠে বললো সুদাম ; তা মাঝে মাঝে ওখানে গেলেই তো পারো ছোটমাসী ! মিতা আসে না তোমাদের কাছে ?

—না । সে আজ চার বছর নির্দাসন দণ্ড দিয়েছে নিজেকে । কোথাও যায় না ! কাকুর সঙ্গে যোগাযোগ রাখেনি । আমি প্রথম প্রথম যেতাম ওর কাছে,—কিন্তু যাওয়া বন্ধ করতে হলো !

—কেন ? কেন ছোটমাসী ?—ব্যাকুল কণ্ঠের সুদামের !

—ওর দিকে মুখ তুলে স্থির দৃষ্টিতে চাইলো করবী, তারপর উঠে গিয়ে সুদামের একখানি হাত চেপে ধরে আর্ন্তকণ্ঠে বললো সে—

—জানো সুদাম ! আমাকে জড়িয়ে ধরে মিতুর সেদিন কি কান্না !—তুমি এখানে আর এসোনা ! এলে হয়তো তোমার সম্মান আর থাকবে না ।—

আর কিছু বলতে পারেনি সে সুদাম । তবুও আমি বুঝতে পেরেছিলাম সব ! ওর ক্ষত বিক্ষত...মনটাকে আমি স্পষ্ট দেখতে পেরেছিলাম সেদিন । জাঁচলে চোখ মুছলো করবী !

'বালুচর' বইখানিকে অগ্রমনস্ক ভাবে হাতে তুলে নিয়ে 'নাড়া-চাড়া' করতে লাগলো সুদাম !

বাগান সত্তফোটা ল্যাভেণ্ডার চাপার গন্ধ মুঠো মুঠো চুরি করে, ঘরে ছড়িয়ে দিয়ে, শুন শুন করে, খোলা জানলা-পথে বেরিয়ে গেলো আশ্বিনের উদাসী বাতাস !

বড় চেনা, বড় ভালোলাগা গন্ধটি যেন নিবিড় ভাবে জড়িয়ে পরলো সুদামকে ! কোন্ এক হারিয়ে-যাওয়া মধুর রাগিণীর বিবাদ-ভরা স্বর কঁদে ফিরতে লাগল ওর অন্তরের গভীর অন্তরে !

লালকুঠির...নীচের তলায় বারান্দায় অস্থির ভাবে পাইচারী করছিলো অনিল ।

আলা, বুকভরা শুধুই আলা ! এতলা আর সহ হয়না ! বিক্ষিপ্ত মনটা তার বার বার ঐশ্বর জানাচ্ছে ওর কাছে—

কি পেয়েছো ? কি পেয়েছো তুমি ? কি রকম ? কিসের—
লোভে...মা বোনকে ত্যাগ করেছিলে ?

মিতুর সর্বনাশের বিনিময়ে কি লাভ করলে তুমি ? এতদিনের দিবা রাত্রির পরিশ্রমেব অর্থে কার ভোগ-বিলাসিতার উপকরণ জুগিয়েছো ? নিজের মনুষ্যত্বকে বলি দিয়েছো কার পায়ে ? কে ? সে ? সে আলেয়া ! ওর সবটাই মিথ্যা ছলনা মাত্র !

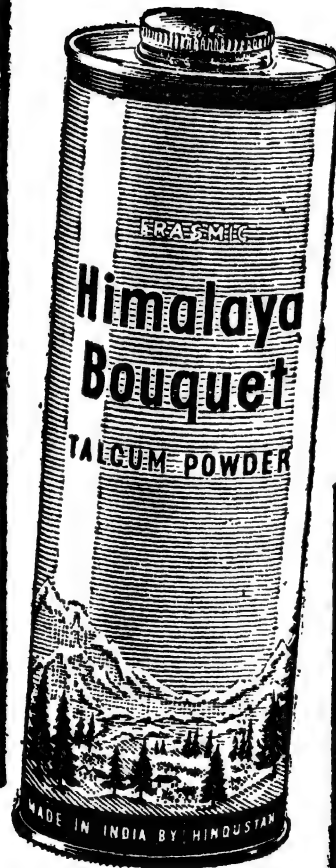
পেয়েছে বৈকি কিছু তার কাছে ! পেয়েছে বঞ্চনা, অবহেলা, চাতুরী, আর নিদারুণ হতাশা !

ঢং ঢং করে রাহি বারোটা বেজে গেলো, এখনও বাড়ী ফেরেনি ওকতারা !

কোথায় গেছে ?..



ব্যবহার করুন
হিমালয় বোকে
ট্যালকাম পাউডার



সারাদিন
সতেজ
থাকার জন্যে



এত সুগন্ধ
এত কম খরচ
সারা পরিবারের
সবেরই আদর্শ

একাদশিক মাসের পক্ষে হিন্দুস্থান লিটারি লিমিটেড কর্তৃক ভারতে প্রস্তুত



বাউল পদ্যলোচন

বাউল-কবিদের মধ্যে স্বনামধন্য ব্যক্তি ছিলেন জালন ফকির।
জালন ফকিরের মতো অচিরাৎ প্রসিদ্ধ না হইলেও, পদ্যলোচন
বা 'পোদো' একজন সুকবি বাউল ছিলেন।

অধিকাংশ বাউলগানের গানের মধ্যে 'বন্ধুত্ব', 'স্বব-সৌন্দর্য', 'গীতি-
সঙ্গতি' প্রভৃতি অতুলনীয় হইলেও, অশিক্ষিত বাউল-কবিদের বহু
গানই কাব্যার্থে নিরুপ্ত। ইহার একাধিক কারণ আছে।

প্রথমতঃ, বাউল সাধকরা জনসমাজ হইতে আত্মগোপন করিয়া
দূরে থাকিত, তাহার ফলে তাহাদের গানগুলি রসিক সমাজে
সুপ্রচারিত হয় নাই। ফলে, তাহাদের বহু গানেরই ভাবভঙ্গী
প্রাচীন ধারায় পরিচ্ছিন্ন, সমঝদারদের দ্বারা পরীক্ষিত হইয়া উৎকর্ষ
লাভ করিবার অবসর পায় নাই।

দ্বিতীয় উপেক্ষনাথ ভট্টাচার্য বলিয়াছেন,—“বাউল গান আমরা যাহা
পাইতেছি, তাহা হইতে ভাবা সম্বন্ধে কোন প্রাচীনত্বের অনুমান করা
যায় না। খুব বেশি হইলেও, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিক হইতে
আরম্ভ করিয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ইহাদের রচনাকাল।
জালনের গানের রচনা যদি ষোড়শশতাব্দী হইতে আরম্ভ হয়, তবে
আমরা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতে তাঁহার রচনা আরম্ভ
হইয়াছে—এইরূপ সঙ্গত অনুমান করিতে পারি। বড় জোর, ঊনবিংশ
শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বর্তমান গানগুলির রচনাকালের শেষ সীমা
ধরা যাইতে পারে।”

তৃতীয়তঃ, তথাকথিত অশিক্ষিত বাউল কবিদের বিজ্ঞানবুদ্ধি
অনুযায়ী গানগুলি রচিত। তাহারা প্রচলিত ভাষায় কোন প্রকারে
মনের ভাব প্রকাশ করিয়াছে। উচ্চতর রচনাভঙ্গীর সঙ্গে তাহাদের
পরিচয়ই ঘটে নাই।

চতুর্থতঃ, লোক-মুখে-মুখে এসকল গানের নানাভাবে পরিবর্তন
ঘটিয়াছে। গায়করা নিজেদের মনোমত শব্দের যোজনা করিয়াছে, অর্থ-
সঙ্গতির রূপান্তর করিয়াছে। তাহার ফলেও গানগুলির বিকৃতি ঘটিয়াছে।

তবে, রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত ‘বালা কাব্য পরিচয়’ যে সকল
বাউল-গান আছে, সেগুলি কবিত্ব-রসে সমৃদ্ধ। কিন্তু এই শ্রেণীর
বাউল গান এই কয়টি ছাড়া আর সংগৃহীত হয় নাই বলিলেই চলে।

পদ্যলোচনের যে বাউল গানটি রবীন্দ্রনাথের কাব্যসংগ্রহে আছে,
সেটির কাব্যসৌন্দর্য ও সুরমাধুর্য দুই-ই অতুলনীয়—

আমার ডুবল নয়ন রসের তিমিরে,
কমল যে তার গুটাল দল আঁধারের তীরে।
গভীর কালোয় যমুনাতে রসের লহরী,
(কালোয় ঢালা যমুনাতে রসের লহরী)
ও তার জলে ভাসে কানে আসে রসের বাঁশরী।
আমি বাইরে ছুটি বাউল হয়ে সকল পাশরি,
শুধু কেঁদে মরি—ভাসাই কুস্ত রসের নৌরে।’

কীর্তনের দ্বায় বাউলেও আঁধারের ব্যবহার হইত। এই সকল
আঁধার গায়করা পূর্ব হইতে নির্দিষ্ট করিয়া রাখিত
না। গাতিবার সময়েই তাহাদের কণ্ঠ হইতে আবেগভরে
উচ্চারিত হইত। পদ্যলোচনের গানে এইরূপ আঁধার থাকিত।

পদ্যলোচন রাত অঞ্চলের বাউল, তাঁহার অনেক গান বর্দ্ধমান
অঞ্চলেই গীত হয়। গোসাঁই হরি ছিলেন তাঁহার গুরু, প্রায় সবল
গানেই তিনি গুরুর নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ভণিতাগুলিতে তিনি
নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়া নিজের অধিকারতা জ্ঞাপন
করিয়াছেন—

‘গোসাঁই হরি বলে, ও পোদো নচ্ছার,
মলে চুরি করলি যে গোঁয়াত,
ও তোর মস্তকে দংশেছে ফণী
আমার তাগা বাঁধা হ’ল মার।’

এই ধরনের উক্তি বাংলা সাহিত্যে সুপ্রাচীন। চণাপদে, কীর্তন
কীর্তনে ঠিক এই শ্রেণীর স্ববচন ব্যবহৃত হইয়াছে। চণাপদে এই
সকল উক্তি দে আমলে জনপ্রবাদ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার পর
হইতে এগুলি, সমানে চলিয়া আসিতেছে।

বাউল গানে অনুপ্রাস, ধ্বনি, ধর্মকের সাহায্যে পদবিজ্ঞাসেব
সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করা সুপ্রাচীন প্রথা। এই শ্রেণীর বাক্চাতুৰ্য্য কবির-
গানের আসরে খুবই প্রাবল্য লাভ করে। গানের মধ্যে এইরূপ
বাক্চাতুৰ্য্য ও কথায় কথায় উপমাাদি ব্যবহার করা পদ্যলোচনের
রচনারও বিশেষত্ব। এই শ্রেণীর বাউলগান বেশ অভিনয় সহকারে
রসাইয়া রসাইয়া গাওয়া হইতঃ—

গোল ছেড়ে মাল লও বেছে।
গোলমালে মাল মিশান আছে।
গোলমাল বলতে পারে যে,
গোলের ভিতর মাল থাকলেও চিনতে পারে সে।

ওদে পোদো হ’ল কাণা বেড়াল, দই ব’লে কাপাস খাচ্ছে।

‘পোদো’ কবির আসরী নাম; এই শ্রেণীর খাশা-করা নামের
মাধ্যমে বাউল-কবির জনসমাজের অন্তর্গত হইতে চাহিতেন।

বাউলদের আদর্শ হইলেন রূপ-সনাতন। পরম প্রেমের
আহ্বান শ্রবণ করা মাত্র তাঁহারা খ্যাতি-প্রতিপত্তি, পদমর্যাদা, ধন-মান
সবই ত্যাগ করিয়া বৈরাগী হইয়া চলিয়া যান। পদ্যলোচনের
নিম্নলিখিত বাউল গানটিতে তাঁহাদের আদর্শ প্রচার করা হইয়াছে।

॥ আলোকচিত্র ॥

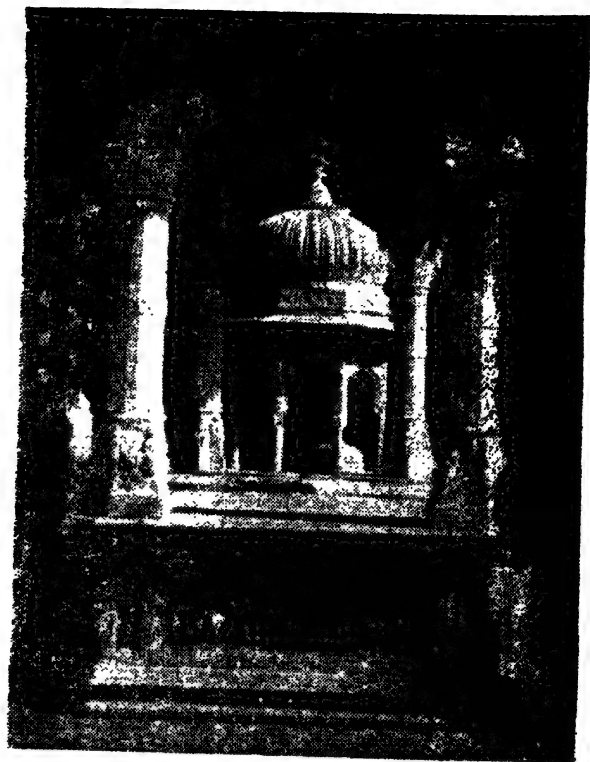
... এ সম্ভব প্রচেষ্টা ...

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে একজন বাঙালী মেয়ের আলোকচিত্র
স্থাপিত হইয়াছে। চিত্রটি শ্রীমতী পাল গৃহীত।



পাহাড়িয়া

—মণি মল্লিক



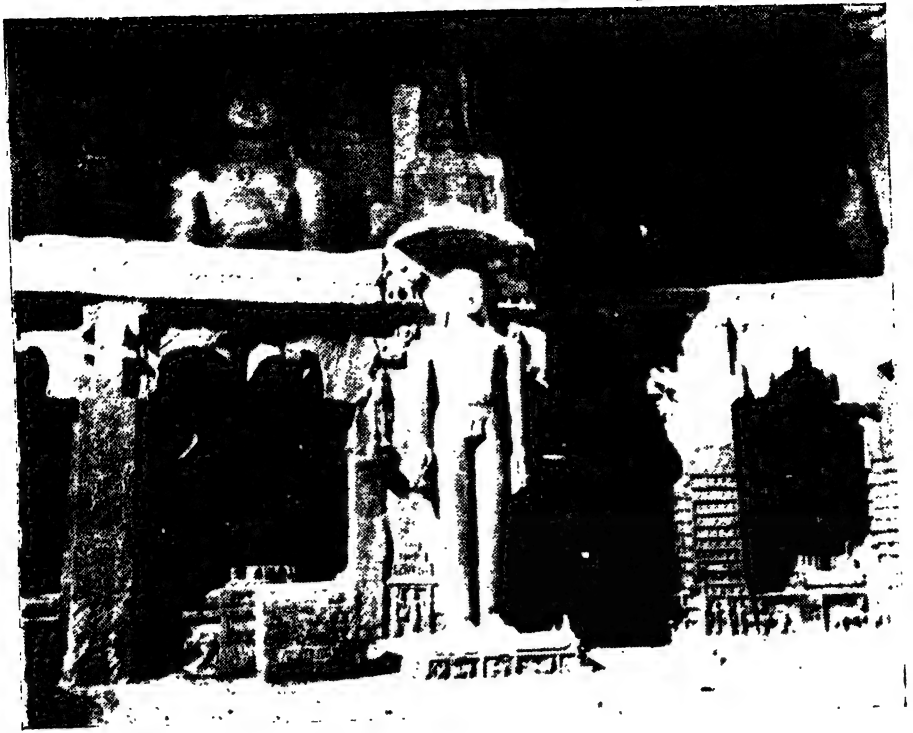
জয়পুররাজ সমাধি

—তরুণ চট্টোপাধ্যায়

চায়ীভাই

—শ্রদ্ধত বাগচী





উদয়গিরি (ভুবনেশ্বর)

—মুক্ত মনোপাঠ্য

বিশ্বায়

—নিমাইরতন গুপ্ত



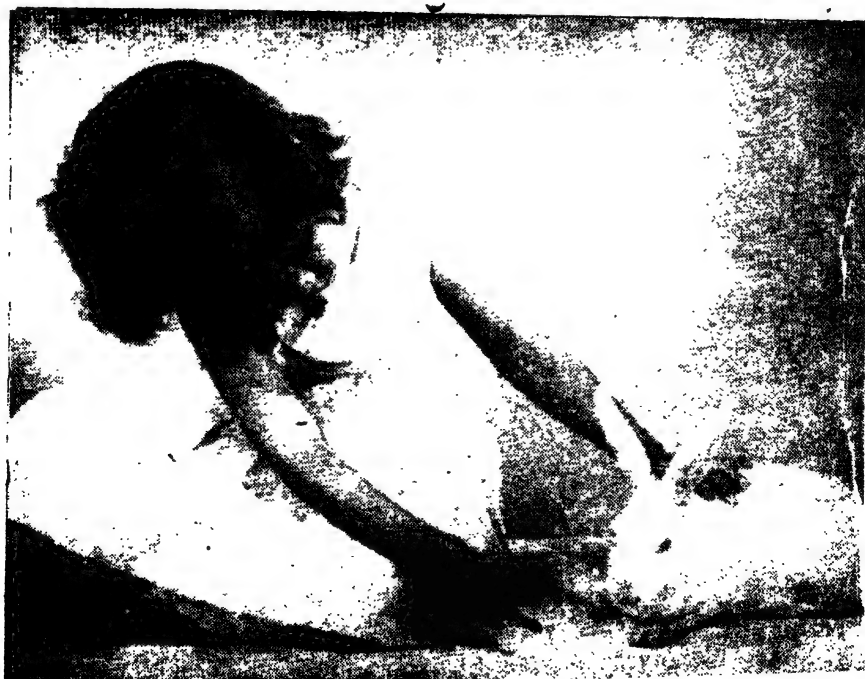


অজস্র

—তরুল চট্টোপাধ্যায়

খেলা

—অনিলকুমার ঘোষ





গানটিতে স্তম্ভিত প্রবচনগুলি লক্ষ্যীয়—

‘রাগের করণ যজ্ঞে গেছে পোদাঁই শ্রীকৃষ্ণ-সনাতন
প্রেমশিখিত করবি যদি ধর, গে সাধুর শ্রীচরণ।
কথায় কথা সবাই তো কর, বোবা নর তো জগৎজন,
ছেড়া চাটায় শুয়ে থাকে, দেখে লাগ টাকার স্বপন।
গাভীতে হয় গোয়ালানা, সে জানে না তার মরম,
দেখ, সাপের মাথায় মাণিক থাকে, তবু করে
ভেক ভোজন।’

গুপ্তকবির নামে প্রচলিত “দিনহুপুরে চান উঠেছে রাহ পোহানো
ভাব” নামক বিখ্যাত গানটি পদ্মলোচনের রচিত বলিয়া অনেকে মত
প্রকাশ করেন। তাহা হয়ত সত্যও হইতে পারে, গুপ্তকবি দেশের
প্রাচীন কবিদের রচনা সংগ্রহ প্রকাশ করিতেন। তাই বাউল
কবির রচিত সুললিত গানটি তাঁহার নামেই চলিয়া গিয়াছে। গানটি
বেশ উচ্চাঙ্গের স্বর-তালে রচিত; হাজারসের গান বলিয়া বাহাতে সহজে
মনে না হয় তাহার জ্ঞা গাতিবার সময়ে সাধারণত গান্ধীমণ্ডিত রাগিণী
অবলম্বন করা হইত। গানের শেষে পদ্মলোচন বলিতেছেন—

‘গোদাঁই পোদোয় কয় ভেবে এবার, কথা শুনেতে চমৎকার,
সাধক বিনে বুঝতে পারে এমন সাধ্য কার?
কথা যে বুঝেছে, সেই মন্ডেছে, গিয়েছে সে বেদের পার।’
হাজারসের গানে তবে এই শ্রেণীর ভণিতা উপযুক্ত হয় নাই।
ইহাতে অতীন্দ্রিয়তা সৃষ্টির বার্ষ প্রয়াস হইয়াছে মাত্র।

বাউল গানের মধ্যে ঠারঠারে আকার ইঙ্গিতে গুঢ় গভীর বঙ্গনা
থাকিত, বাউল গানের ‘মনের মানুষ’-রসের মানুষ’ পরমপুরুষের
রূপভেদ—

রসের মানুষ খেলা করে বিরজাপারে।
তার করণ উন্টা, স্বরূপ রূপের ছটা,
আছে করণ আঁটা, অতি নিবিকারে।
আটে আটে চৌধাঁট কুঁহুরি ভিতরে,
রসের মানুষ সেখা নিত্য লীলা করে,
তিন ঘারে কবাট মেয়ে প্রভু যান তো বাঁহিরে,
কতু সিংহঘারে, কতু সিংহু নীরে।

পল্লী-গ্রন্থদেব স্বর্গে প্রচলিত প্রবাদ, প্রবচন, বাগ্‌ধারা, টু রে
কিবো রসের কথা পদ্মলোচনের গানগুলিকে বঙ্গ ফুলের মত স্তম্ভিত
করিয়া রাখিয়াছে—

(ওরে তুই) রইলি বেলা গাছে ব’সে
ভুয়র গিলবি কোন সাহসে?
ও তোর বাবার এই কি করণ, শোনরে পদ্মলোচন,
পিপীলিকার পাখা ওঠে কেবল মরিবার তরে।

শ্রীজয়দেব রায়

নতুন রেকর্ড গীতি

হিজ মাষ্টার ভয়েস

N 82834—জামল মিজের কণ্ঠে হু’খানি আধুনিক গান
‘হয়তা সেদিন’ ও ‘ভালবাসো তুমি শুনেছি অনেক বার।’

N 82835—হু’খানি কর্তন গান ‘সখি, কহিও নিহুর আগে’
ও ‘কেন সেলাম বহুনার জলে’ গেয়েছেন শ্রীমতী সুলীতি ঘোষ।

N 82846—‘ঐ দূর নীলাকাশ’ ও ‘চম্পক বনে’ মানবেন্দ্র
মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে অনবদ্য হু’টি আধুনিক গান।

N 82837—নবাগতা শ্রীমতী প্রতিমা মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে
‘রিক্ত আঁখির’ ও ‘একটি গানের একটি কলি’ সবাইকে মুগ্ধ
করবে।

N 76088, N 76089, 76090 এবং 76091—রেকর্ড
গুলিতে ‘মাহুত বন্ধুরে’ বাণীচন্দ্রের গানগুলি পরিবেশিত হয়েছে।

কলঙ্কিয়া

GE 496—পান্নালাল ভট্টাচার্য্যের ভাব মধুর কণ্ঠের স্তম্ভ
স গীত ‘কালো বলা হয়নি বলা’ ও ‘মা বলে মা ডাকতে তোরে।’

GE 24961—কুমারী বনানী ঘোষের অভিনব আধুনিক গান
—‘আম আঁখির ভেপু’ ও ‘না জানি ঐ কাজল কালো’।

GE 24 62—‘মেঘ রাঙা’নো অস্ত আকাশ’ ও ‘হলকে পড়ে’
বৈশিষ্ট্যময় আধুনিক গান—গেয়েছেন শ্রীমতী প্রতিমা মুখোপাধ্যায়।

GE 24963—অমল মুখোপাধ্যায়ের সুরেলা কণ্ঠের স্তম্ভ
গান ‘দেখ শুকতাণা’ ও ‘চাঁদের থেকে অনেক দূরে।’

GE 30427—শ্রীমতী আশা ভোঁসলে ও মান্না দে’র কণ্ঠে
‘গলি থেকে রাজপথ’ বাণীচন্দ্রের গান।

GE 30428, GE 30429 এবং GE 30430 রেকর্ড
গুলিতে ‘রাতের অন্ধকারে’ বাণীচন্দ্রের গানগুলি গেয়েছেন—শ্রীমতী
আশা ভোঁসলে, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমতী ইলা বসু।

সঙ্গীত-যন্ত্র কেনার ব্যাপারে আগে

মনে আসে ডোয়ার্কিনের



কথা, এটা
খুবই আভা-
বিক, কেননা
সবাই জানেন
ডোয়ার্কিনের
১৮৭৫ সাল
থেকে দীর্ঘ-
দিনের অভি-
জতার কলে

তাদের প্রতিটি যন্ত্র নিখুঁত রূপ পেয়েছে।

কোন যন্ত্রের প্রয়োজন উল্লেখ করে মূল্য-তালিকার
অন্ত লিখুন।

ডোয়ার্কিন এণ্ড সন্ প্রাইভেট লিঃ

শো-রুম :- ৮/২, এন্সল্যান্ড ইন্স, কলিকাতা - ১

আমার কথা (৫৬)

সঙ্গীত-শিল্পী পরেশ দেব

বাঁ সাহ পল্লীগীতি বাঙালীর নিজস্ব সম্পদ। এই পল্লীগীতির মধ্যেই বাংলার গ্রামীণ সমাজের সাদৃশ্য ও সঙ্গীত সহজ ভাবে বিকাশ লাভ করেছে। তাই, এ বাংলার তথা বাঙালী সংস্কৃতির একটি প্রধান উপাদান।

সরল পল্লীজীবনের আশা-নিরাশা, প্রেম-বিবাহ, সাধন-ভজন, দৈনন্দিন জীবনের সর্বাঙ্গিক ভাবাবেগের স্রুতি সহজ অভিব্যক্তি দেখি পল্লীগীতির ছন্দে ছন্দে। নিত্য-বাসগাধ্য কথার সাধারণ 'অলঙ্কার' উপায় এ-এক অনায়াস অনাড়ম্বর শুধু সাহিত্য-সৃষ্টি; পল্লীকাননে প্রকৃতির আপন খেলায় প্রকৃতি ও বিচিত্র ফুলের সম্ভাব, বিচিত্র মাধুর্য-ভরা। কবে অগাধ কোন গ্রাম্য কবি আপন খেলার রচনা করেছেন এই সুসলিল পদবাজি, হৃদয়ের গভীর আবেগ ও দরদ-ভরা সুরে ছড়িয়ে দিয়েছেন পল্লীবাসীর কণ্ঠে কণ্ঠে। বৈরাগী-বাউলের ভজন, নদীতে নৌকা-চালনা দত্ত মাঝি, খেত-খামারে কর্মরত কৃষকের গানে পল্লীপরিবেশ কি অপূর্ব মাধুর্য মণ্ডিত হয়ে উঠে। আধুনিক যুগে নাগরিক সভ্যতার এই জয়যাত্রার মাঝে শহরে উচ্চাঙ্গ ও আধুনিক সঙ্গীতের পাশ্বে পল্লী-সঙ্গীত তাঁর স্বাধীনতা আসন করে নিয়েছে।

ঐ প্রসঙ্গে গীতিকার ও সুরকার শ্রীপারেশ দেবের নাম উল্লেখযোগ্য। পল্লীর গায়কদের নিজস্বভঙ্গি আশ্চর্য্যভাবে রূপ পেয়েছে পরেশ বাবুর কণ্ঠে। এক্ষেত্রে ইনি শ্রীশচীন দেব বর্ষণের উত্তর-সাধক। সে আজ অনেক দিনের কথা। তরুণ শিল্পী পরেশ দেবের কণ্ঠে 'আমার ভাঙ্গা ঘরে চাদের আলো', 'তুমি কি আমার বন্ধু', 'আমি কি তোমার বন্ধু' ইত্যাদি গানগুলি কোন এক সরল পল্লীবালায় প্রেম ও বিরহে আমাদের মন ব্যাকুল করে তুলেছিল। পরেশবাবু একান্তই পল্লীবাংলার মানুষ, তাঁর কণ্ঠে গ্রাম্য গীতিকারের মনের সহজ সরল অনাড়ম্বর ভাবটি অনায়াস-দক্ষতার ধরা দিয়েছে।

ত্রিপুরা জেলার 'ব্রাহ্মণবাড়িয়া' শহরে ১৯১১ সালে পরেশ দেবের জন্ম। সঙ্গীতের ঐতিহ্য তাঁতার পরিবারে ছিল না। তাই তাঁর আবালা সঙ্গীতাহুবাগ কোন অন্তর্কূল পরিবেশে বেড়ে উঠতে পারেনি। তবে মাতামহ অনন্ত কুমার দেব ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া স্কুলের শিক্ষক হরেন্দ্র ভট্টাচার্য্যের প্রেরণা ও উৎসাহ তাঁর সাফল্যের সহায়ক হয়। হরেনবাবু নিজে সঙ্গীতাহুবাগী ছিলেন, এবং ছাত্রের সঙ্গীতচর্চায় তিনি ছিলেন প্রধান উৎসাহদাতা। তাঁর সম্বন্ধে সাহচর্য্য সাধনার পথে পরেশবাবুর যাত্রা শুরু হয়। অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই তিনি সারা ত্রিপুরা জেলায় স্বকণ্ঠ বলে পরিচিতি লাভ করেন। এই সময়ে মাত্র আঠার বৎসর বয়সে আসামের এক চা-বাগানের সাহেবকে গান শুনিতে তিনি চাকুরী লাভ করেন। কিন্তু এই চাকুরীজীবন বেশি দিন তাঁর ভাল লাগেনি। সঙ্গীত-সাধনার উগ্র বাসনায় আবার তিনি ফিরে এলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়।

সঙ্গীতাহুবাগী যাত্রাই জানেন, তখনকার পূর্ববাংলার এই ক্ষুদ্র

শহরটি সঙ্গীতচর্চায় এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে ছিল। এখানেই জন্মগ্রহণ করেন ওজাদ আলীউদ্দীন খাঁ-সাহেব, স্বর্গতঃ কামিনী কুমার ভট্টাচার্য্য, স্বর্গতঃ অজয় ভট্টাচার্য্য, স্বর্গতঃ সুরমাগর শিমাঃ দত্ত প্রভৃতি বিশিষ্ট শিল্পী ও গীতিকার। বাংলা সঙ্গীতে সমগ্র ত্রিপুরা জেলার অবগানও কম নহে।

কামিনীবাবু ও ওজাদ আলীউদ্দীন খাঁ-র নিকট পরেশ দেব দুই বৎসরকাল সঙ্গীত-সাধনার সুযোগ পান। পরে ১৯৩৪ সালে কলিকাতায় এসে প্রসিদ্ধ সুরশিল্পী জ্ঞান দত্ত, বাণীকণ্ঠ ও অজয় ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় এবং সুরশিল্পী শৈলেন দত্তগুপ্তের কাছ তিনি নিয়মিত সঙ্গীত শিক্ষা করেন। এই সময় মেগাফোন কোম্পানী তাঁর 'ভাঙ্গা ঘরে চাদের আলো' গানখানি রেকর্ড করে এবং কলিকাতা বেতার-কেন্দ্রেও তিনি গান গাইবার সুযোগ লাভ করেন। ১৯৩৭ সাল হইতে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত পরেশবাবু মেগাফোনে সঙ্গীত-শিক্ষকের কাজ করেন। ইতিপূর্বে ১৯৩৫ সালে কালী ফিল্মের একগানি ছবিতে তিনি 'প্রেমব্যাক' গান করেন। ভায়সের চট্টোপাধ্যায় উক্ত ছবিখানির সঙ্গীত-পরিচালক ছিলেন।

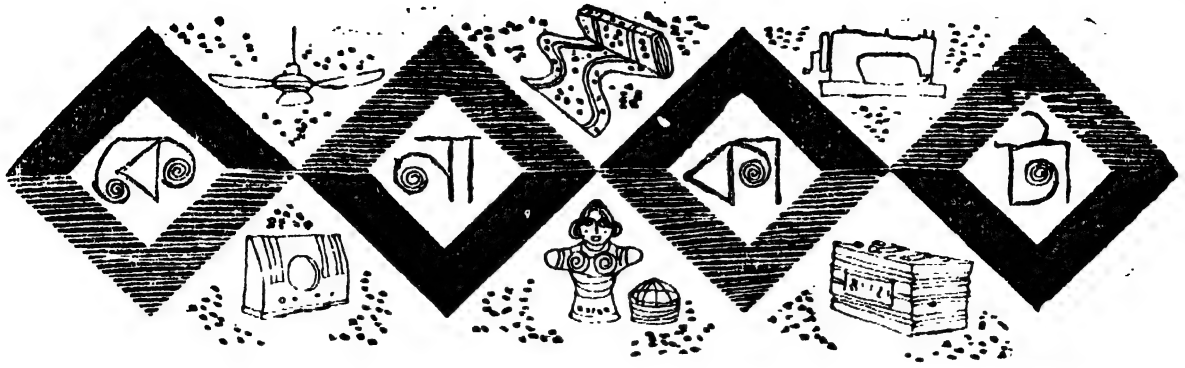
১৯৪০ সালের পর তিনি ঢাকা বেতারে যোগদান করে নিয়মিত পল্লীগীতি, ভজন ও ঝুমুর গানের প্রচার করেন। সঙ্গীতের সুর চঃ ও পল্লীগীতিতে রাগ-প্রধানের সমন্বয়ে পরেশ দেব শচীন দেব বর্ষণেরই অমুবর্তী। তাঁর 'ভিন্না যাওরে মধুবনে মধু নাই', 'ওরে আমের বিহনে মধু-বুন্দাবনে গোঠের ধেনু নাই তুণ গায়', 'কোন রঙ্গীলা নাইয়া ডিঙ্গা বাইয়া যাওরে' প্রভৃতি গানগুলি শুনে শচীনদেবের বিখ্যাত গানগুলি মনে পড়ে। ১৯৪০ সালে 'রাজকুমারের নির্বাসন' ছবির প্রেমব্যাক গাইবার জন্তে সঙ্গীত-পরিচালক শচীনদেব বর্ষণ পরেশ বাবুকে মনোনীত করেন।

মেগাফোনে কাজ করার সময় নজরুল ইসলাম পরেশবাবুর পল্লীগীতির প্রতি অমুরাগে অত্যন্ত মুগ্ধ হন এবং তাঁরাকে গাইবার জন্তে গানও লিখে দেন। ১৯৩৯ সালে স্বর্গতঃ ইন্সপেরিও হরেন বোসের সম্প্রদায়ের অস্থর্ত্ত হ'য়ে তাঁর ইউরোপ যাত্রার কথা হয়। কিন্তু যুদ্ধাজন্তে এই পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়। ১৯৪৭ সাল হ'তে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত তিনি কলকাতা কোম্পানীর সঙ্গীত-শিক্ষক (ট্রেনার) পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পরে কয়েক বৎসর মেদিনীপুরের বাসন্তীপুর টেটের টেট-মিউজিশিয়ান ছিলেন।

পরেশ দেব বিভিন্ন সঙ্গীত-সম্মেলনে যোগদান করিয়া প্রৌঢ়মণ্ডলীর অভিনন্দন লাভ করেছেন। ১৯৪৭ সালে তিনি তানসেন সঙ্গীত-সম্মেলনের বিভাগীয় বিচারক পদে নিযুক্ত হ'য়েছিলেন। 'এটালি সাংস্কৃতিক সম্মেলনে' সঙ্গীতের একটি বিভাগের পরিচালনা ভারও পড়ে পরেশ বাবুর উপর। রাজভবনে সোভিয়েট অতিথিবৃন্দের সর্জন উপলক্ষে আমন্ত্রিত বিশিষ্ট শিল্পীদের মধ্যে তিনিও আমন্ত্রণ লাভ করেন। পরেশবাবু কয়েকখানি ছবির সঙ্গীত পরিচালনার বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। সঙ্গীত-সাধনার পরেশবাবু জীবন উৎসর্গ করেছেন এবং বহুদিন বেঁচে থাকবেন, সঙ্গীতের সাধনাই করে যাবেন।

I do not consider myself a good painter at all.
I am a genius.

—Salvador Dali



এ দেশের অলঙ্কার-শিল্প

বাংলা তথা ভারতে গহনা বা অলঙ্কারের প্রচলন চলে আসছে অসংখ্যাব্দে। আজকের দিনে সেটা অল্প বহু গুণ বেড়েছে। সে-ও সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার্য্য। বাঙালী সাধারণভাবে রূপ ও সৌন্দর্যের পূজারী—তাই নারীদের ঘে-ধরণেরই হোক, অলঙ্কার অলঙ্কর তার চাই।

এ কিছুমাত্র অতিশয়োক্তি নয়—বাংলার অলঙ্কার-শিল্প বাংলার একটি প্রথম ঐতিহ্য। সমগ্র ভারতে তো বটেই, বহির্ভারতেও এর চান্না ও খ্যাতি ছড়িয়ে আছে। বাঙালী স্বর্ণশিল্পী ও মণিকারগণ যেমন সূক্ষ্ম ও সুন্দর কাজ করতে সক্ষম, স্বল্পতম তেমনটি আঁজ ও বিবল।

গহনাশিল্পে বাংলা যে গৌরবময় ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে তা একদিনে হয় নি, সহস্রাব্দে অমূল্যমান করা চলে। এর পিছনে এদেশের স্বত্ব-বৈশিষ্ট্য সমাজের অবদান রয়েছে অপরিমিত। গোড়া থেকেই এ তাঁদের জাতীয় ব্যবসা ছিল—এখনও এই উন্নত শ্রেণীর ব্যবসা বা শিল্পে তাঁরাই রয়েছেন অধিক সংখ্যায়। আজকাল অল্প সমাজ বা সম্প্রদায়ের লোকও এদিকে আকৃষ্ট হয়েছেন এবং শিল্পের মান ও ক্ষেত্র ক্রমেই সম্প্রসারিত হয়ে চলেছে এটি লক্ষ্য করার।

প্রথাবাহ্যিক গ্রামে-ঘরে সাধারণ বণিক বা শ্রমিকের হাতে ছিল এই শিল্পের মানদণ্ড। সামান্য মূল্যধনের উপর নির্ভর করে সেদিন তাদের কাজ-কারবার চলতো। যারা গহনা তৈরী করতেন, প্রয়োজনীয় সোনা বা রূপো সরবরাহ করতেন তাঁরাই। শিল্পী মনোমুগ্ধ গহনা তৈরী করে দিয়ে হাতে তুলে নিতেন শুধু তাঁর প্রাপ্য সামান্য মজুরী বা বাণী।

সহস্রগুলো গড়ে উঠতে থাকলে সেখানেও এই ব্যবসা চালু হয়ে চলে ক্রমিক ধারায়। রকমারী অলঙ্কারের চাহিদা বুগে বুগে বৃদ্ধি হয়ে চলে দেশের সর্বত্র। শুভ বিবাহ কিংবা অপর কোন মাস্টিক অলুঠানে ঘোড়ক দানের প্রসঙ্গ উঠলেই গহনার কথা বড় করে দেখা দিতে থাকে। বিগত শতাব্দীতেও দেখা গেছে—রূপোর গহনা বা অলঙ্কারের সমাদরই বেশি—এমন কি, ধনিক ও সম্ভ্রান্ত লোকের গৃহেও ছিল এরই সমধিক প্রচলন। ক্রমে সেই ছোট রূপান্তর ঘটতে দেখা গেলো—তখন থেকেই রূপোর চেয়ে সোনার গহনার চাহিদা বেড়ে যায়।

গ্রামের পরিবেশে যে শিল্প এক কালে আবদ্ধ ছিল, সহরের বৃহত্তর আওতায় এসে উঠা উন্নতির প্রচুর সুযোগ পায়। অলঙ্কারের চাহিদা বড়ই বৃদ্ধি পেতে থাকে, দেখা যায় যে সাবানিক শিল্পের ব্যবসা-কাঠামোতে এ আর চলে না। মাল মজুত করে

রাখবার প্রয়োজন দেখা দেয় এইভাবে আর সেটি সম্ভবপর করে তোলাবার জন্য মূলধন বিনিয়োগ অপরিহার্য্য হয়ে ওঠে। বিস্তারিত পোন্ধরগণ প্রচুর অর্থ নিয়ে এদিকে এদিয়ে আসতে থাকেন। তাঁদের নিরলস উদ্যম ও ব্যবসা-শ্রীতি—শিল্পী ও কারিগরদের দক্ষতা ও অধ্যবসায়ের ফলেই আজ এটি এক বিশাল শিল্পে পরিণত হয়েছে।

অলঙ্কার-শিল্পে বাংলার ভেতর রাজধানী কলকাতার স্থান সকলের শীর্ষে, এ কারও অজানা নয়। গ্রামে ও ছোট সহরে এখনও কুশলী শিল্পী বা পেশাদার শ্রমিকরাগণ সোনা-রূপোর কাজ-কারবার করছেন বটে, কিন্তু নতুন নতুন নকশা বা ডিজাইনের জন্য কলকাতার দিকে তাঁদের দৃষ্টি না থাকলে চলে না। দেশ-বিভাগের আগে ঢাকাতেও (বর্তমান পূর্ব-পাকিস্তানের রাজধানী) এই শিল্পের একটি বড় কেন্দ্র ছিল। সে অঞ্চলের অলঙ্কার-শিল্পী ও স্বর্ণকারগণ একটা বৈশিষ্ট্যের দাবী রেখে এসেছেন বরাবর।

কলকাতার বাজারে আজ স্বর্ণলঙ্কারের দোকান বা ব্যবসা-কেন্দ্রের অভাব নেই। নগরীর সর্বত্র—এমনকি, অলিতে গলিতে—এই শিল্পসত্তা ছড়িয়ে আছে। সবচেয়ে বেশি দেখতে পাওয়া যায় অবশ্য বিপিন বিহারী গান্ধী স্ট্রীট বা পূর্বতন বহুবাজার স্ট্রীটে। তাঁদেরই বোধ হয় রাসবিহারী এভিনিউ—গড়িয়াহাটা, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, ভবানীপুর-কালীঘাট প্রভৃতি এলাকার নাম করা যায়। বতস্বর খবর নেওয়া গেছে, তাতে দেখা যায়, কলকাতা ও হাওড়াতেই বড় রাস্তায় শো-কেস সাজিয়ে কাজ-কারবার চলেছে, এমন দোকানের সংখ্যা দুই হাজারের কম হবে না। অপর দিকে হাজার হাজার লোক এই সকল দোকানে কর্ম-নিযুক্ত রয়েছেন, এ সহস্রাব্দেই অমূল্যের।

পশ্চিম জিহা বছর আগেও কিন্তু এত অধিক সংখ্যক গহনার দোকান মহানগরী ও সহস্রতলী অঞ্চলে ছিল না। দেশ-বিভাগের পর কলকাতা এলাকায় অত্যধিক লোকবৃদ্ধি হয় আর জুয়েলারী কার্খা সংখ্যাও বৃদ্ধি হয়ে চলে ধাপে ধাপে। বহু স্বর্ণকার তথা সূক্ষ্ম শিল্পী ও কারিগর পূর্ববঙ্গ থেকে এদিকে চলে এসেছেন এবং ছোট বড় দোকান খুলে তাঁরা বসেছেন নানা বায়গায়। আধুনিক গহনাশিল্পে বহু ক্ষেত্রে তাঁদের দক্ষতা ও নৈপুণ্যের স্বাক্ষর চোখে পড়ে।

আর একটি জিনিস এ প্রসঙ্গে লক্ষ্য করার যে, পূর্বে এই মহানগরীতে এই শিল্প বা বায়গায়ের রূপ এখনকার চেয়ে পৃথক ধরনের ছিল। একটু আগেই বলা হলো—তখন দোকানের সংখ্যা এত অধিক ছিল না। আজকের দিনে কলকাতার এমন কোন রাজপথ প্রায় পাওয়া যাবে না, যেখানে দুই চারটি জুয়েলারী দোকান

নেই। কত সহস্র স্যাকরা ও স্বর্ণকারের দোকান (শো-কেস বিকীন) রয়েছে নগরীর অলিতে গলিতে—মহল্লায় মহল্লায়। বিগত দিনগুলোতে স্বর্ণশিল্পের বাজারে তেজোরতী বা বন্ধকী কাজ-কারবারই ছিল বেশি। আব সেই সঙ্গে অবশ্য নিয়মিত ব্যবস্থায় চলতো সোনা-রূপের বেচা-কেনার কাজ। গহনাপত্র অর্ডার পেয়ে তবেই সববরাহ করার রীতি ছিল সেদিনে অনেকটা চলতি। তখনকার দিনে আজকার মতো দোকান-পাট এমন সজ্জিত ছিল না—জুয়েলারী ফার্ম সমূহে শো-কেসের প্রচলন অল্পদিনেই বলা যায়। এখন বেশিভাগ দোকানেই তৈরী (রেডি-মেড) জিনিষ বিক্রি হয়—গহনার অসংখ্য নমুনা শো-কেসে সব সময় মজুত থাকে। ক্রেতাদের পক্ষে অর্ডার দিয়ে পছন্দসই জিনিষ পেতে আগের চেয়ে সুবিধা এখন বেড়েছে বই কমেনি।

এ দেশের গহনা ও গহনা-শিল্প আশ্রয় সত্যি বিশেষ গর্বের ব্যাপার। অতীত দিনের তুলনায় এ এগিয়ে গেছে সকল দিক থেকেই, বলতে বিধা নেই। শিল্পকাজ এখন অনেক সুন্দর ও বিস্তৃততায় পরিণত হয়েছে—নিত্য নতুন নক্সা ও ডিজাইনের সর্বত্র ছড়াছড়ি।

বুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গহনা বারার পরবে, সেই নারী সমাজের রুচিও বেনা পালটিয়েছে, তা নয়। আগেকার দিনের মেয়েদের পছন্দ ছিল ভারী অলঙ্কারের ওপর; নক্সা বা ডিজাইন নিয়ে এতটা মারামারি ছিল না এখনকার মতো। এ যুগে মেয়েরা গহনা কিনতে এসে সাধারণতঃ ভালকা জিনিষেই সম্বলিত হন, শুধু, তাঁরা দেখেন কাজটি সুন্দর কি না। এখনও সাবেরিক ধরণের কুমকো পাশা, চিক, তাগা (অনন্ত), বালা ইত্যাদি ব্যবহার করা হয় বটে, তবে পূর্বকার তুলনায় নিশ্চয়ই হালকা ওজনের। অর্থনৈতিক কারণ এর পিছনে বিশেষভাবে রয়েছে, দে-ও অবশ্য অস্বীকার করা যায় না।

স্বজনকুশলী মণিকার ও স্বর্ণশিল্পীদের প্রযুক্তি ও উদ্ভাবে অলঙ্কার-শিল্প ক্রমেই উন্নতির দিকে যাবে। সাধারণ গৃহস্থ পরিবারের ক্রয়-ক্ষমতা যতই বাড়বে, এ শিল্পের অগ্রগতির পথও হবে তত প্রশস্ত। মৌতকের প্রস্র বাস দিলে, বিপদের দিনের সম্বল হিসাবেই বহুক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত ঘরে সোনার গহনা কেনা হয়। কিছুদিন হয় সরকার এই শিল্পের ওপর বিক্রয় কর দাবী করেছেন। এই কর ব্যবস্থা এমনি করা হয়েছে যে, গ্রাহক বা খরিদারের নিজের সোনার গহনা তৈরীর বেলাতেও উহা প্রযুক্ত হয়। বিক্রয় করের প্রয়োগ নিয়ে তাই একটা অসন্তোষ রয়েছে, সেই থেকেই। বা হোক, বাংলার অলঙ্কার-শিল্প নিজের সুনাম ও ঐতিহ্য বহন করে এগিয়ে চলুক, সকলেই এই দাবী রাখতে পারে।

মধুর ব্যবসা ও পশ্চিম-বঙ্গ

কি নামে, কি কাজে, সকল দিক থেকেই মধু সত্যি মধুর। এর স্বাদ ও মিষ্টত্বের যেমন তুলনা হয় না, তেমনি এর উপকারিতাও অপরিণীম। মাতৃগর্ভ থেকে জন্মিষ্ট হওয়ার পর, শিশুর মুখে মধু দেওয়ার রীতি বহুদিনকার। বার্ষিকের দিনগুলোতেও মানুষকে কম শক্তি যোগায় না এই মধু। পুষ্টি-পার্শ্বণে বা উৎসব-অবস্থানে যখন প্রদর্শন হয়, এত একটি চিত্রাচিত্রিত রীতি। অনেক বোগের

ক্ষেত্রেই এইটি মূল্যবান ঔষধের কাজ করে থাকে। সর্বোপরি এ যতই সহজপাচ্য, ততই সুখী পুষ্টিকর।

বর্তমানে পশ্চিম-বঙ্গ একটি ঘনবসতিপূর্ণ রাজ্য। এখানকার বিপুল শস্যক অধিবাসীর মধুর চর্চনা নিত্যকাল কম হবার কথা নয়। সে দিক থেকে মধুকে কেন্দ্র করে আধুনিক ধারার সুন্দর ব্যবসা বা শিল্প গড়ে উঠতে পারে এই দেশে। এর জন্তে একদিকে চাই কতকগুলি উদ্ভদমকীল ও ব্যবসা-বুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষ, অপর দিকে যথাসম্ভব সরকারী সাহায্য ও সহযোগিতা।

ব্যবসার কথা উঠলেই, মধুর উৎপাদন কিভাবে বৃদ্ধি করা যায়, সেইটির উপর লক্ষ্য রাখা দরকার আগেভাগে। ভেজালহীন ভালো জিনিষ বাজারে সরবরাহ করতে পারলে, কাটতি সম্পর্কে ভাবতে যাওয়া (অন্ততঃ মধুর বিষয়ে) নিশ্চয়োজ্ঞান। রাজ্য (পশ্চিমবঙ্গ) সরকারের তত্ত্বাবধানে সুন্দরবন অঞ্চল থেকে যে মধু সংগৃহীত হয়, তার একটা স্থায়ী বাজার নিশ্চয়ই রয়েছে।

মধুর উৎপাদন বাড়ানোর জন্তে বিজ্ঞান-সম্মত বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করা সব সময়েই সমীচীন হবে। মধু আহরণের পুরাতনো রীতি প্রয়োজন হলে পরিহার করা ছাড়া উপায় নেই। অনেক সময় পরীক্ষায় দেখা যায়, মৌচাক থেকে মধু সংগ্রহ করা হলেও, সে মধু নির্ভরযোগ্য হয় না। এর কারণ, অবৈজ্ঞানিক সংগ্রহ-পদ্ধতি—যাতে করে মৌচাকের কত লো দূষিত পদার্থ হয়তো মধুতে মিশে যায়। সুতরাং মৌমাছি পালন থেকে মো বা মধু আহরণ অবশি সবটা কাজই হওয়া দরকার বিস্তৃতভাবে আর নিত্যকাল যত্ন সহকারে।

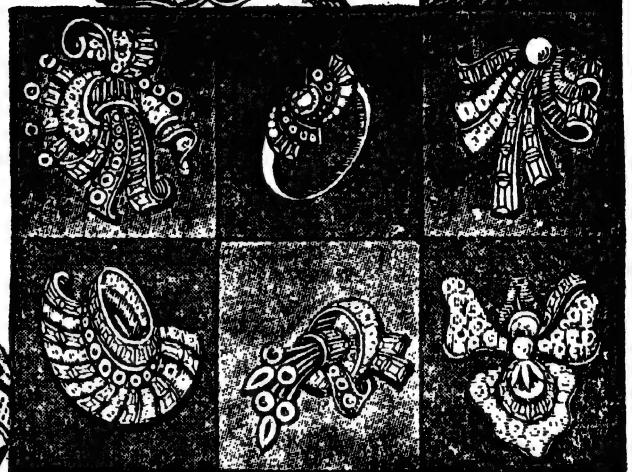
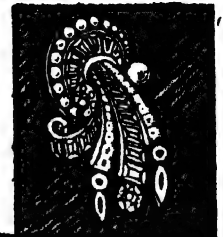
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বন-বিভাগের নির্ধারিত পারমিট নিয়ে সুন্দরবন অঞ্চল থেকে যে মধু সংগৃহীত হচ্ছে, প্রসঙ্গতঃ তার একটি হিসাব পর্যালোচনা করে দেখা যাক, ১৯৫৭-৫৮ সালে যে মধু সংগৃহীত হয়, উহার পরিমাণ ছিল ৩,৬০.১ মণ। ১৯৫৮-৫৯ সালে অর্থাৎ বিগত বর্ষে ২,৬৮.১ মণ মধু সংগৃহীত হয়েছিল এবং আলোচ্য বর্ষে সংগৃহীত হয়েছে ৩,৬০.০ মণ। সরকার এই (মধু) খাতে বেশ কিছু টাকা রাজস্ব স্বরূপ পেয়ে থাকেন, আর সেটি প্রতি বছরই।

অনুসন্ধান জানা গেছে—পশ্চিমবঙ্গের বিপুল চাহিদা মেটাতে বাইরে থেকে এখনও মধু আমদানীর প্রয়োজন হয়। আমদানীকৃত মধুর বেশিটাই হচ্ছে অষ্ট্রেলিয়ার ও সিংহলদেশের। যেখান একটু চেষ্টা থাকলেই স্বয়ং-সম্পূর্ণ হওয়া যায়, সেখানে বাইরে থেকে আমদানী করতে যাওয়া সমর্থনযোগ্য নয়। পশ্চিমবঙ্গে এই ব্যয়সাটি সম্প্রসারণের এখনও বথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। আর সঙ্গে সঙ্গে বলতে হয়, এ 'সমস্তা-সম্বল' রাজ্যের বহু পরিবারের জীবিকা নির্বাহী হতে পারে এই থেকেই।

মধুর ব্যবসার কথা বলতে গেলে উহার সঙ্গে জড়িত আর একটা জিনিষের কথাও বলার প্রয়োজন হয়। মৌচাকে যে মোম পাওয়া যায়, সেইটি কেন্দ্র করেও ভাল ব্যবসা-বাণিজ্য হতে পারে। মোম থেকে বহু রকমারী প্রসাধন সামগ্রী তৈরী হয়—বাজারে বার বেশ চাহিদা ও দাম রয়েছে। যদি দেখা গেলো মোম তৈরী অপেক্ষা মোমজাত পণ্য উৎপাদন লাভজনক হবে তা হলে সেদিকেই ঝোঁক থাকা উচিত। মোটের উপর, আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে বাইরে শুধু মধুই নয়, মধুর সংশ্লিষ্ট মোমজাত দ্রব্যের রপ্তানীও কি উপায়ে বাড়ানো যায়, সেদিকে লক্ষ্য না রাখলে নয়।



সৌন্দর্যে মাদুর্য



গিনি জাল্ড জুয়েলারী স্পেশালিস্ট

এম.বি.সরকার
এও সন্স

ম্যানুফ্যাকচারিং জুয়েলাস

ফোন:- ৩৪-১৭৬১ ১৬৭/সি ১৬৭ সি/২ চব্বাজার ট্রাই কলিকাতা-১২ গ্রাম-
গ্রাউ-বালি গজ-২০০/সি গ্রামবিহারী এড্রিন্ড কলিকাতা-১২ ফোন- ৪৬-৫৫৬৬
স্মারকমের পুরাতন চিত্রাবা ১২৪, ১২৪/১, অলমোজার ট্রাই, কলিকাতা-১২
কোলমার গুণ্ডার খোলা থাকে
ব্রাহ্ম-জামসেদপুর ফোন- জামসেদপুর- সিটি-২৫৫৮-এ



আবদুল আজীজ আল-আমান

সোলেমানপুর বালিকা-বিভাগীঠে ছুটির ঘণ্টা পড়লো।

চারটের ঘণ্টা। বাঁধাভাঙ বস্তার জলের মত খিলখিল হাসিতে মুখের হয়ে সুরকী-বাঁধানো লাল গড়কে নামলো ছাত্রীর দল। নীল আকাশে ডানা মেলে হাওয়ার উড়ে চলেছে। ক্রকের গোল বেড় ঘুরিয়ে, রঙিন ক্ষিতের বাঁধা বাড় ছোঁয়া কেশ ছড়িয়ে, রাস্তায় যেন মাতামাতি শুরু করেছে ছোট্ট মেয়ের দল। তরুণীরা চলেছে বেণী তুলিয়ে বুকে বই চেপে মস্ত পদক্ষেপে। কিছুক্ষণের মধ্যে কোলাহল স্তিমিত হয়ে এল। সহস্রতলীর জনবিরল সড়কে আবার নিস্তরতা নেমে এল।

বিভাগীঠের গেট পেরিয়ে এবার পথে নামল দিদিমণিরা। হাতে বেঁটে ছাতা। কাঁধে খোলান রঙিন ব্যাগ। অনসূয়া, গৌরী, রাবেয়া—।

খানিকটা পথ এগিয়ে এসে অল্পসূয়া—গৌরী বাক হয়ে বাড়ীর পথে মিলিয়ে গেল। নিকটেই বাসা। রাবেয়াকে আরো খানিকটা পথ যেতে হবে। লাল সড়ক বেয়ে বকুলতলা হয়ে জনপ্রিয় লাইব্রেরীর সামনে দিয়ে খানিকটা এগুতে হবে। তারপর শেখ পাড়া। প্রায় মিনিট দশেকের পথ।

মাথা থেকে ছাতাটা সরিয়ে একবার সূর্য্যটার দিকে তাকাল রাবেয়া। ক্লান্ত সূর্য্য বটগাছটার আড়ালে হয়ে পড়েছে। তারপর আবার ছাতার মাথা টেকে মুহূর্তে পা চালিয়ে দিল। শরীরটা অত্যন্ত ক্লান্ত মনে হচ্ছে। সারা দিনটা একটানা বকতে হয়েছে ক্লাসে ক্লাসে। কীকি সে দেয় না। দিতে পারে না। অঙ্কের ঘণ্টার অঙ্ক করতে বলে দিয়ে দ্বিবি বসে থাক। ব্যর, কিছু না, কীকি দেয় না রাবেয়া। ছাত্রী মহলে তাই তো তার এত নাম। ঘণ্টার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এতটুকু বিশ্রাম করে না সে। পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে সমগ্র গ্রাণ-মন যেন ঢেলে দেয় রাবেয়া। অবাক হয়ে শোনে মেয়েরা। পড়া শুনে শুনে তারিও ভাবে মনে মনে—তারিও যদি অমন করে পড়াতে পারত।

বকুল তলার এসে যেন মুক্তির নিশাস ফেলে রাবেয়া। ছাতাটা বন্ধ করে পাড়ায়। রোজ-ই পাড়ায় এখানে। কোন কোন দিন অনেকশ বসে থাকে সবুজ বাসের উপর। আজও বসল। মুহূর্ত হাওয়ার বকুলের মিষ্টি গন্ধ। তরাট এক-বুক নিশাস টেনে নিল রাবেয়া। ক্লান্ত দেহটা যেন পরম শান্তিতে ডুবে গেল। সামনে

সবুজ বাসের উপর একটা চকুই বসে লাকালাকি করে ছেঁয়েছে আপন মনে। একটা কাঠবিড়ালী লেজ ফুলিয়ে অবাক চোখে তাকিয়ে আছে সে দিকে। বড় ভাল লাগে রাবেয়ার। একটা টিল নিয়ে ফোলা লেজে মারতে গিয়ে খেমে গেল। কি ফল হবে এই রোমান্টিক দৃশ্যটা নষ্ট করে? সেও মুগ্ধ বিস্ময়িত দুই চোখ মেলে তাকিয়ে রইলো। অনেকক্ষণ।

হঠাৎ মনে হলো এক সাইকেল-আরোহী ব্রেক কপে নেমে পড়েছে রাস্তায়। মাঝে মাঝে এমন উপজব শুধু হয়। বংমহল ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের বড় ছেলে মুসা এমন আকস্মিক ভাবে এসে মাঝে মাঝে ঘনিষ্ঠ হতে চায়! সতর্ক হয়ে তাকায় রাবেয়া! না, মুসা নয়—আহসান। রবিউদ্দিন চাচার ছোট ছেলে। রাবেয়া শুধায় কোথায় বাচ্চিসেরে আহসান?

সাইকেলটা একহাতে ধরে আহসান জবাব দেয়, কুমুদমিষ্টান্ন ভাণ্ডারে—কিছু মিষ্টি আনতে। একটু থেমে বলে, জান আপা—আজ আড়াষ্টার মেলে আবিদ ভাই বাড়ী এসেছে।

আবেগে উচ্ছ্বাসে হঠাৎ যেন ফুল ওঠে রাবেয়া। এ্যা—আবিদ বাড়ী এসেছে, আবিদ! পাঠা শুধায়, সত্যি?

মিষ্টি আনতে তো বাচ্চি সে জন্তে। সাইকেল চড়ে সড়ক বেয়ে দূর পথে মিলিয়ে যায় আহসান।

রাবেয়ার সারা দেহটা যেন কঁপে ওঠে। হঠাৎ আলোর বলকানির মত খুলির আমেজে ক্লান্তি জড়িমা যেন ছিটকে পালিয়ে গেছে দেহ থেকে। হঠাৎ—হ্যাঁ একান্ত হঠাৎ-ই এক গুচ্ছ শুভ কৈতকীর মত হালকা হয়ে গেছে দেহটা। বহু বছর পর কুমারী-জীবনের সেই প্রথম প্রেম-জাগা প্রভাতের দুনিবার শিহরণের মত অভিনব প্রবেগে আন্দোলিত হয়ে ওঠে সারাট দেহের অপূরণমায়ু। একি—এমন করে কাঁপছে কেন রাবেয়া? স্মরণ তিন বছর পর গ্রামের শাস্ত পরিবেশে ফিরেছে আবিদ। বলিষ্ঠ স্ত্রীম যুবক। কমঠ, সুবৃহৎ অভিমতে অচঞ্চল। কিন্তু তার জন্তে রাবেয়া কাঁপছে কেন এমন করে?

বকুলতলার সেই শান্তশীতল নির্জন ছায়াতলে সবুজ বাসের গুপের বসে চারিদিক সজ্জর্ণণে একবার দেখে নিল রাবেয়া; না—কেউ নেই কোথাও। তারপর দুনিবার আবেগে লুটিয়ে পড়ল কোমল বাসের বুকে। চোখ বন্ধ করে স্বপ্নের ঘোরে যেন বলে ফেললো,—তুমি—তুমিই এসেছ আবিদ!

উঃ সেই ছোট বেলা থেকে আর এই সেদিন পর্যন্ত কত হাসি, কত গল্প আর কত গান। একই পাড়ায় ঘর। একই সাথে স্থলে বাওয়া। একই সাথে খেলা, আর একই সাথে খাওয়া।

বিকেলের অলস বেলায় মা কাঁথা সেলাই করতে বসেছে রোয়াকে। দুটিতে কোথায় ছিল—হঠাৎ এসে হাজির। তারপর আর কি। হুজনেই লুটিয়ে পড়লো কাঁথার গুপের, তারপর গড়াগড়ি। কাঁথা সেলাই করে আর সাধ্য কার? মা যদি কখনো বলতো—ওরে স্নাই ফুটে যাবে—ওঠ, তাহলে গড়াগড়ি আরো জোর লাগতো হুজনা। শেষে স্নাই ছেড়ে দিয়ে মা বলে উঠতো—মর তোরা ওখানে।

খানিক চূপচাপ শুয়ে থেকে হুজনার কি ইশারা হয়ে যেত।

তারপর কাঁথা ছেড়ে ছুটে চলে যেত দুজনাই। নতুন পরিবর্তনের তখন তারা উদ্ভাব। বীর পদক্ষেপে অতি সতর্কপণে দু'জনে এসে হাজির গালায় ধারে। দুজনার হাতেই ইট। আদি আসে। শিছনে রাবেয়া। একটা কুকুর শুয়ে আছে গোলায় তলায়। খুব কাছে এসে খান ইট দুটো সজোরে নিক্ষেপ করে একই সাথে চোচিয়ে ওঠে দুজন,—মুগীর পিলে খাবে আর ?

কুকুরটা তখন লম্বা আঁর্জনাদ কবে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বাইরে ছুটে পালান্বে।

পুকুরে মাতামাতির কথাগুলো আজো স্পষ্ট মনে পড়ে। কিন্তু থাক সে সব কথা। কলেজ-জীবনের কথা যে আরো স্পষ্ট। একই স্থল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে বারাসাত কলেজে ভর্তি হলো দুজন। সোলেমানপুর থেকে মাত্র দুটি ষ্টেশন দূরে বারাসাত। কতদিন কলেজ কীকি দিয়ে দুটিতে চলে এসে বাইরে বেড়িয়েছে এখানে ওখানে। গল্প করেছে কবির মত। নীল আকাশে ডানা মেলে কপোতকপোতীর মত হাওয়ার ভর করে দুটিতে উড়ে গিয়েছে সুন্দর দিগন্তের কোলে—যেখানে মিলেছে অসীম আকাশ আর সবুজ পৃথিবী, অসীম-সসীম যেখানে চুমোচুমি করেছে ব্যগ্র হয়ে, হয়ে পড়ে। ও, সে কত স্বপ্ন, কত সাধ!

বারাসাত কলেজ থেকেই এক সাথে বি, এ পাশ করলো দুজনে। তারপর আবিদ চলে গেল কলকাতায়—এম-এ পড়তে, আর সোলেমানপুর বিভাগীর্থে শিক্ষায়ত্নীর পদ নিল রাবেয়া। তারপর থেকে এই তিন বছর; আবিদ এম-এ পাশ করেছে সদস্যনে। তারপর একটু ভাল চাকরীও পেয়েছে আজকাল।

ছাড়া ঢাকা বঙ্গতলার নির্জন প্রান্তে পুরকে সবল কথা মনে পড়ে রাবেয়ার। কিন্তু এভাবে আর বসে থাকা যায় কতক্ষণ। ই্যা, বাড়ী যাওয়া প্রয়োজন। বৃদ্ধ আকা হয়তো চায়ের জন্তে ব্যাকুল হয়ে উঠছেন এতক্ষণ। তা ছাড়া—এখন গিয়ে একবার দেখা করে আসতে হবে। মনের উপল খণ্ড বেন আনন্দ-বস্তার প্রবল জলকাল্লা উবে গেছে। নতুন রং লেগেছে দেহে-মনে-প্রাণে। ই্যা এখন গিয়ে একবার দেখা করে আসতে হবে বৈকি! আবিদ, আগ! স্বপ্নের আবিদ!

রাবেয়া যখন বাসায় ফিরল তখন কমলা রংএর নরম রৌদ্র বিকসের শাস্ত্র আকাশ ঘিরে বিছিয়ে পড়েছে। মাথার ওপর পাখী পাখীদের ডানার ঝাপটা শোনা যায়। কনে দেখা আলোর মনোরম পরিবেশে একল কিছুই মনোরম হয়ে উঠেছে। রাবেয়ার চোখে আজ সব কিছুই সুন্দর। অসূর মনে হয় পশুপাখিকে। কি হয়েছে আজ রাবেয়াব ?

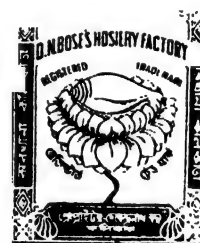
হাত মুখ ধুয়ে ডেসি টেবিলের সামনে গিয়ে পাঁড়াল রাবের। রশের শাড়ীটা পালটে নিল। ইন্ডিরী করা ঝকঝকে আকাশ-নীল শাড়ীটা সে পরে নিয়েছে। কোন বিশেষ উপলক্ষ না হলে সে পরে না এ শাড়ীটা। কিন্তু আজ হঠাৎ ট্রান্স থেকে শাড়ীটা বের করে নিয়েছে। ভাল ব্রাউজটাও। শাড়ীর সাথে শোভন করে নিটোল লাবণ্য-দীপ্ত কান্তিতে জড়িয়ে নিয়েছে ওটা। অপূর্ব লাগছে নিজেকে। আয়নার দিকে তাকিয়ে ফিক করে হেসে ফেলল আপন মনে। ইচ্ছে করেই। ই্যা, গালে টোল পড়েছে। বিকসিক করে উঠছে পাঁতগুলো। ই্যা, এমন মিষ্টি করেই হাসতে হবে আজ। ই্যা, ঠিক এমনি করেই।

কি করেছে আবিদ! হয়তো চা খেতে বসেছে—হয়তো গল্প জুড়েছে সকলের সাথে। স্নে-মাথা কোমল গ-গু পাউডারের গন্ধটা একবার বুলিয়ে নিল। ই্যা ঠিক হয়ে ছ। রঙিন ব্যাগটাও নিল কাঁধে ঝুলিয়ে। তারপর খানিক ভেবে নিল আপন মনে। আবোল তাবোল। তাইতো কি বলা যাবে গিয়ে? ই্যা হয়েছে—বলবে, বেশ মিষ্টি হেসেই বলবে—স্থল থেকে ফেরবার পথেই তোমার আসার সংবাদ পেলাম আহসানের মুখে; বাড়ী না গিয়ে একেবারে সোজা চলে আসছি। তারপর মিষ্টি টোল-ঝাওয়া হাসিতে মুখ উজ্জল করে কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করবে, কেমন আছ আবিদ ভাই? শেষবারের মত আয়নার মুখট দেখে পা হোলে রাবেয়া। ঠিক সেই সময় পাশের ঘর থেকে ডিটার্ড বৃদ্ধ আকার গলা ভেসে আসে, একটু চা তৈরি করে দেয়া রাবু।

দরজার কাছে এসে খমকে পাঁড়ায় রাবেয়া। সব আশা সব আনন্দ যেন অকস্মাৎ উবে গেছে। তাইতো এই ভাবে সেগুঞ্জে যাওয়াটা কি তার শোভন হবে? কি হবে গিয়ে! কত কাজ বাকী পড়ে রয়েছে সংসারে। সন্ধ্যা হয়ে এল বলে। পাখীপাখীরা বাসায় ফেরা শুরু করেছে। ডানার ঝাপটা শোনা যাচ্ছে। পাশের বাকী বনটা নীড়কের পাখীদের কাকলিতে মুখর হয়ে উঠেছে। আবাই বা কি বলবেন দেখে।

অভিয়ারের নিখুঁত বেশে দরজার কাছ তে শুরু হয়ে পাঁড়িয়ে রইলো রাবেয়া। নির্বাক, নিস্তব্ধ।

অকস্মাৎ রাগটা ছুঁড়ে ফেলে দিলে বেড়ের উপর। শাড়ীটা



রেজিষ্টার্ড ট্রেডমার্ক

বিখ্যাত
'শঙ্খাও নন্দ'

মার্ক গেঞ্জী

ব্যবহার করুন

ডি, এন, বসুর

হোসিয়ারি ফ্যাক্টরী

কলিকাতা—এ

—রিটেল ডিপো—

হোসিয়ারি ডস

৫৫১, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

ফোন : ৩৪-২২২৫

পাণ্টে নিল। ব্লাউজটাও তাঁজ ভাঙা শাড়ী ব্লাউজ পড়ে রইলো অবিকল হয়ে। কি হবে গিয়ে? একটু দেখা—না, দরকার নেই। ডুকরে কেঁদে উঠতে চাইছে। নিজের, নিস্তরু গৃহ কোণে ঝাড়িয়ে আজ স্পষ্ট অনুভব করে রাবেয়া, মনের উপলে শুক বালুস্তর ভেদ করে দুঃস্বপ্নে লবণাক্ত জ্বলোচ্ছ্বাস বার হয়ে আসতে চাইছে। অবশ্য ক্লান্ত দেহে অবিকল শাড়ীর ওপর লুটিয়ে পড়লো রাবেয়া।

পাশের ঘর থেকে বৃদ্ধ আদর আবার বলে উঠেন—রাবু, একটু চা তৈরি কর মা।

বাস্তব হয়ে উঠে পড়লো রাবেয়া। বললে, ঠা! যাও। কথাটা চেমন যেন ভাঙা ভাঙা শোনাল।

পাশের বাড়ির ছাটীটিকে পড়িয়ে খখন পাসায় ফিরলো রাবেয়া, তখন বাত নট। কিংকট আদর বললেন, আবিদ এসেছিলো রাবু—এই মাত্র চলে গেলে। শেষ ছেলেটা—অনেককণ ধরে কত গল্পই করলো। কাল একবার দেখা করে আসিস মা। একটা সমিতি নাকি গঠন করতে চায়—তোমার সাথে অনেক কথা আছে।

আবার চোখমেলো কথাগুলো মনলো রাবেয়া। তারপর নিজের ঘরে গিয়ে লুটিয়ে পড়লো। খশীতে ভগ্নমগ্ন। আবিদ এসেছিলো তাগলে? ঠা! আবিদ!

দেয়ালের দিকে চোখ পড়তেই যেন চমকে ওঠে রাবেয়া। আয়নার বাঁধানো তার ফটোটা টাঙানো রয়েছে দেওয়ালে। ইস—ফটোটা যদি আজ আকার ঘেঁষে থাকতো! এক অক্ষুট কান্তর ধ্বনি বয়ে ওঠে। রাবেয়া। যেন অপূর্ণ দোনালী স্বপ্ন অক্ষয় না পেয়ে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পেল।

ঠা, কাল সকালেই ফটোটা আকার ঘেঁষে টাঙিয়ে দিতে হবে। আবিদ এসে যে ওঘরট বসে।

সোলেমানপুর বালিকা বিজ্ঞানী থেকে ফেরার পথে সেদিনও আহসানের সাথে যে দেখা হল রাবেয়া। ঠিক বকুল তলাতেই। আহসানের মুখে শুনলো আবিদের ফিরে যাওয়ার সংবাদ। অফিসের বড় সাতের নাকি একটা জরুরী কাজের জ্ঞাত টেলিগ্রাম করেছে। আজ দুপুরেই এসেছে টেলিগ্রামটা। ভোর পাঁচটার মেলে চল বাবে কলকাতায়।

বকুলের ডালপালা ছলিয়ে মিষ্টি হাওয়া বইছে। ঝিরঝিরে পাতাগুলো মাতালের মত ধুলছে। একটা হলুদ রঙের পাখী মাথার উপর ডালটায় বসে গান ধরেছে আপন মনে। রাবেয়া একটু তাকালে ওদিকে—তারপর বসে বইল নিস্তরু হয়ে।

ক্লান্ত বিকালের আকাশ ঘিবে পেঁজা তুলোর মত রাশ রাশ মেঘ জমে উঠেছে। চোখের ভ্রম মত দীঘল ডানা মেঘে নাম না জানা কয়েকটা পাখী উড়ে চলেছে মেঘের দেশে। বকুলের ঘন সন্নিবিষ্ট পত্রপল্লব ভেদ করে একজুড় ফলকের মত ঠিক সামনের সবুজ ঘাদের বৃক লুটিয়ে পড়েছে অবশর স্বর্গের আলতা-মাখ বোদ। না, এসব কিছুই ভাল লাগে না রাবেয়ার। সকল নীরবতার মাঝে সকল চিন্তার মাঝে সেই কথাটি বার বার মনে পড়ে, আজ ভোরে চলে বাবে আবিদ? দেখা হবেনা শেষবারের মত? মাত্র একটাবার? একটি পলক?

বাড়ী যখন ফিরল তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। আকারকে চা দিয়ে একফালি বারান্দায় ইজিচেয়ারের ওপর গা এলিয়ে দিল

রাবেয়া। তখনও ঠিক ঐ চিন্তাই তার মনের আলিতে গলিতে ফিরছে। রূপ সুন্দর এই পৃথিবীর সাল কিছুই যেন একান্ত বিষন্ন হয়ে উঠেছে। দক্ষিণের হিমেল বাতাসটা রাবেয়ার ঘুম-ভেজা দেহটাকে শীতল করে যাচ্ছে। হঠাৎ এক সময় যেন একটু আশার আলো দেখতে পেলো রাবেয়া। না—যাওয়ার আগে একবার অসবে বৈকি আবিদ। সেতো জানে মেয়েদের অনেক বাধা আছে। যাওয়া হয়ে ওঠে না ইচ্ছেমত। তা ছাড়া সে যে আজ ভেরেই চলে যাবে, এ সংবাদটুকু রাবেয়া নাও জানতে পারে। অন্ততঃ এটা খেয়াল করে আবিদের একবার আসা উচিত। ঠা—আজ রাত্রেই আসবে আবিদ, নিশ্চয় আসবে।

ঘরের ভিতরটা বেশ জাঁপার জাঁপার মনে হচ্ছে। আলোটা ছালিয়ে নিল রাবেয়া। আকার ঘরের আলোটাও ছালিয়ে দিল। ছড়িটা নিয়ে আদর বেড়াতে গেছেন—এখনই ফিরবেন। তারপর টুকটাকি সামগ্রিক ছ'একটা কাজ শেষ নিয়ে কাপড়-চোপড় পাণ্টে নতুন সাজ-সজ্জায় বাস্তব হয়ে উঠল রাবেয়া। হঠাৎ কখন এসে পড়বে আবিদ কে জানে। আকাশী-নীল রংএর সেই কাপড়, সেই ব্লাউজটাই পরে নিল। তারপর অগমনকতার ভাণ করে বারান্দায় সেই ইজি চেয়ারটায় বসে ব্যাকুলভাবে অপেক্ষা করতে লাগলো।

সময় গড়িয়ে চলে। ঘড়ির কাঁটাও। রাত গভীর হয়।

ঘরের আশপাশ হতে রাতজাগা পোকামাকড়ের গীতালীর ধ্বনি ভেসে আসে। পত্র-পল্লবে আছাড় খেয়ে মর্মরিত হয়ে ওঠে উদাসী সমীর। চাঁদের আলোয় চিৎচিক করে ওঠে কলাগাছের মাজপাতা। ক্রমে ক্রমে নিস্তরু হয়ে ওঠে ছায়া-ঢাকা পল্লীর কলমুখের গৃহ-প্রাঙ্গণ। এই একান্ত নিস্তরুতার মধ্যে বসে মাঝেমাঝে সচকিত হয়ে ওঠে রাবেয়া, আবিদ—আবিদ কই? এখনো কি আসবার সময় হলো না? সেই আগের মত চুপিস ডে নিশব্দ পদক্ষেপে এসে পিছন হতে চোখ ধরবে নাকি আজ! সামান্য শব্দেই বাস্তবের আগমন সংকেতে গহন বনাস্তরালগামী হঠাৎ থামা হরিণীর মত উৎকর্ষ হয়ে ওঠে রাবেয়া। না—আবিদ নয়, বাতাস।

খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে ও বারান্দায় অপেক্ষা করে। আদর ঘুমিয়ে পড়েছেন। নাক ডাকার শব্দ শোনা যাচ্ছে। রাত কত? আজোটা ভোর করে সুগোল হাতটা তুলে সময় দেখে নিল রাবেয়া। একটু চমকে উঠে টেনে টেনে উচ্চারণ করলো, বারো—ওটা। এত রাত হয়ে গেছে।

দুঃস্বপ্ন অভিমানে বুকটা ফুলে ওঠে রাবেয়ার। অভিমান-বিফারিত কণ্ঠে বলে, নিষ্ঠুর—একবার এলে না। একটিবার আগার সময় হলো না তোমার!

যেন পাগল হয়ে ওঠে রাবেয়া। সমগ্র দেহমন দুঃস্বপ্ন অভিমানে দোল খায়। বাইশটা বসন্ত অতিক্রান্ত রাবেয়ার জীবনে এমন দেহমন মাতান পাগল করা আবেগ-ব্যাকুল মুহূর্ত খুব কমই এসেছে। না—দেখা একবার করতেই হবে। যুগ-যুগান্তরের বন্দীশালা হতে আদিম নারী যেন হুনিবার ব্যাকুলতার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে।

রাতের ঘন কাশো আবরণ ভেদ করে সন্তর্পণে পথে নামল রাবেয়া। মাথার উপর এক আকাশ তারা। মিট মিট করে জ্বলছে। একাদশীর চাঁদ তখন নিম্ন গাছটার ওপাশে জ্বলে পড়েছে। সোলেমানপুরের অলিগলি সব রাবেয়ার নখ-দর্পণে। একান্ত

জানাটেনা পথেই সে আজ দূরন্ত অভিমান-স্বপ্ন অভিগারিকা।
ডম্বেল শেষের কলমবাগানের ধারে এসে একটু থমকে দাঁড়ায়
রাবেয়া। চারদিকটা দেখে নিল ভাল করে। না—কেউ নেই
কোথাও। জনবিরল পল্লীপথ গভীর নিশীথে একেবারে নিস্তর
হয়ে আছে। রাতজাগা পাখী-পাখালীর ডানার ঝাপ্টায় মাঝে
মাঝে সচকিত হয়ে ওঠে নির্জন পথ-ঘাটা। দূর গ্রাম থেকে
কুকুরের ডাক ভেসে আসে দীর্ঘ লয়ে।

আবিদের বাড়ীর কাছাকাছি এসে বুকভরা অভিমান যেন ঝরে গেল
রাবেয়ার দেহ থেকে। নব আষাঢ়ের সজল মেঘমালার নীচের শুভ্র
কেতকী ফুলের মত নব বধূর অপরিণীত লজ্জায় কঁপে কঁপে ওঠে
দেহটা। বিরাট বাড়ীটার দিকে বিক্ষারিত বৃত্তি মেলে তাকাল একবার।
হ্যা—এতো আলো জ্বলছে। আবিদের ঘবেই। কি করছে এত রাত
জাগে? হয়তো ঘুমিয়ে গেছে ক্লান্ত দেহে, ভুলে গেছে আলো নেভাতে।

জানালার রড ধরে শক্তিত বুক সন্তর্পণে একবার উঁকি দিল
রাবেয়া। একি, এখনো লিখছে আবিদ। টেবিলে হারিকেন জ্বলছে।
নত হয়ে একমনে লিখে চলেছে লাবণ্যদীপ্ত বলিষ্ঠ যুবক। কি
লিখছে এত? গল্প? উপন্যাস? চিঠি?

রাবেয়ার বলতে ইচ্ছা করে,—ওগো পাশাণ-দুন্দয়—আমি
এসেছি। শূণ্যযুগান্তর ধরে আমি যে তোমার প্রতীক্ষা করছি।

আষাঢ়ের সজল মেঘমালার আমি তোমারই ছায়া দেখেছি।
শরতের সোনালী বিকেলে আমি তোমারই গান করেছি।

বসন্তের ভোরে সুরভী সমীরণে কোকিলের কণ্ঠে আমি যে তোমারই
কণ্ঠ শুনেছি। ওগো পাশাণ, ওগো দেবতা—।

অকস্মাৎ গিঠে যেন চাবুক পড়ে রাবেয়ার। একি করেছে সে?
একি পাগলামি তার? কেউ যদি দেখে ফেলে। অপরের কথা দূরে
থাক, আবিদ-ই বা কি মনে করবে তাকে দেখে? এই নির্জন গভীর
রাত? এই অবস্থায়?

জানালার ধার থেকে সরে এসে পথে নামল রাবেয়া। ধ্যান
যার ভাঙলো না—কি হবে তার ধ্যান ভাঙিয়ে? দূরন্ত অভিমানে
আবার বিক্ষারিত হয়ে ওঠে রাবেয়ার বুক। কান্নার কণ্ঠ যেন
অবলম্ব হয়ে গেছে। দ্রুতবেগে সড়ক বেয়ে, আমবাগান পেরিয়ে ঘরে
এসে পৌঁছাল রাবেয়া। দরজার খিল দিয়ে বিছানায় লুটিয়ে দূরন্ত
কান্নার ভেঙে পড়লো। ওগো পাশাণ তুমি স্মৃতি থাক। কি হবে
তোমার কাছে ভিক্ষা চেয়ে? বিশাল বৃক্ষের নিরাপদ আলয়ে একটু
স্থান চেনে কি হবে? হয়তো দেবে না। হয়তো প্রত্যাখ্যান করবে।
তার থেকে আমার এই ভালো। কঁদে কঁদে কাটুক সারাটা
জীবন। মর্মভেদী চোখের জল সাব্বনার উৎস হয়ে থাক। বসন্তের
গভীর নিশীথে হঠাৎ জাগে আমি চোখের জলেই সাব্বনা পাব।
ওগো আমার সেই ভাল—ওগো পাশাণ, ওগো—।

ছিনার অভিমানে এবার অশ্রুট কণ্ঠে ডুকরে কঁদে উঠলো
রাবেয়া। এ কান্নার শেষ নাই।

একাদশীর চাঁদ তখন ডুবে গিয়েছে।

বহুরূপী

তরুলতা ঘোষ

মহাকাল-জলধির একটি বৃষ্ণুদ যেন চেতনার চকিত ঝলক—

মৃত্তিকার রঙ্গমঞ্চে ওরই মাঝে কত অভিনয়। একটি পলক

মাত্র বৃষ্টি আয়ু তার অনন্তের কালের বিচারে।

তারই মাঝে দেখে যেতে হবে ঘটনার পারস্পর্শে, সঁতোয়ে মিছারে।

অক্ষমের, অজ্ঞানের, অর্থহীন ক্রন্দনের আর্ত আবেদনে

বতটুকু দাবী ছিল, বিশ্বস্তি কুহেলি ঘেরা কামনার প্রথম বোধনে,

বহুগুণে-বহুরূপে মূল্য তার হোয়ে গেছে পাওয়া,

এখন জীবন যন্ত্রে তারই রোমন্থন, তারই গান গাওয়া,

সেই শুধু একবার ধরবার ধূলি চুমি স্বর্গ নেমেছিল,

কুটারের দ্বারপ্রান্তে অনাহুত দেবতার সমুদ্রত রথ থেমেছিল।

অবলম্ব গন্ধ সম তখনও তো চেতনার স্রস্রপ্ত বিকাশ,

তারপর ঘটনার গতিপথে কতই রংএর খেলা, কত বেশবাস।

নূতন ছন্দে তালে জাঁকা-বঁাকা, উঁচু-নীচু, সমতল ভূমি,

যাত্রারে কণ্ঠার করে, মস্তক-পিচ্ছিল কত পদতল চুমি।

শূণ্যগর্ভ বৃষ্ণদের কণিক জীবনে যত অনিশ্চিত রংএর বাহার,

অহংকারে কঁপে তত। আমিষের বোঝাইকু অবশেষ সখল তাহার।

তবে একি অর্থহীন, জীবনের ঘটনায় বিচিত্র রংএর ফুলে মালা গেঁথে যাওয়া,

রঙ্গমঞ্চে নাটকের এত অভিনয়, এত হাসি, এত অজ্ঞ, এত গান গাওয়া?

সে বিচারে কিবা কাজ? বহুরূপী চেতনায় যত পার রং কর লুঠ,

যেদিন হবার হবে সকলি ফ্যাকাশে, ফেটে যাওয়া বৃষ্ণদের সব রং ছুট।

রূপকথা



Zola র The Fairy amoereuse গল্পের স্বচ্ছন্দ অনুবাদ

শ্রীমতী তুয়ার স গাল।

এমন বাদল-ঝরু-ঝরু সন্ধ্যা আগে কখনও দেখেছ তুলা ? বাইরে জানালার শাশিতে আঁছড়ে পড়া বৃষ্টিবিদ্যুর একঘেষে আন্তর্নাদ আর বাঁধন-হেঁড়া বাতাসের হুহু স্বর পাগালাপি ; এমনি হুহুগের সন্ধ্যায়ই দিগ-বধূদের অন্ধরে যুগ-যুগান্তের সঞ্চিত অশ্রুধারা উজ্জ্বল হয়ে উঠে ধরিত্রীর বুক ভাসিয়ে দেয়, আর মানুষকে শ্রিয়ঙ্গ-কামনার আকুল করে তোলে।

আজকের এ সন্ধ্যার রূপ কি, তা জানো ? জানো না, তোমার জানার কথাও নয়, তোমার মাথার উপরে একটা অচ্ছাদন আছে কিনা ? খোলা জানালা দিয়ে একবার তাকাও ঐ অন্ধরের বড় বাড়ীটির পানে ; চেয়ে দেখো ঐ তোরণ-দুয়ার ! কনকনে ঠাণ্ডার বাতাসের হাতে-পায় খিল ধবে, তারা মিনতিভরা চোখে ঐ কঙ্ক দুয়ারটির উপর মাথা ঝুঁছে একটু আশ্রয়ের আশায়। কিন্তু দুয়ারের আগল তো মুক্ত হবার নয় ; ভিতরের উষ্ণ পরিবেশে তারা হাসি-গান-গল্পের বান ডাকিয়ে একান্ত ঘনিষ্ঠ হওয়ার প্রয়াসে প্রবৃত্ত, ওদের ভিতরে আশ্রয় নিলে সে চেষ্টায় চক্ষু পতন ঘটবে যে !

কাজ নেই, তুলা ওদিকে তাকিয়ে—তুমি ব্যথা পাবে। তার চেয়ে এস, এখানটিতে আমার পাশে এসে বস—খুলে ফেল তোমার জমকালো বেশজুতা, পর তোমার সেই নীলাবরী—যার ফাঁকে ফাঁকে কুটে উঠবে তোমার নিরাভরণ দেহের অরূপ স্ত্রী, অসীমের ছোঁতা লাগুক তোমার তুলতায়, আর তারই এককথা ঠিকরে পড়ে রাড়িয়ে দিক আমার অন্তরলোক।

ওকি, তবুও মুখ নীচ কেন তুলা ? বাদল-ঝরা এ সন্ধ্যায় তোমার মুখ ভার সইতে পারিনে। তোল মুখ লম্বীটি, আর এস এখানে জলন্ত লিখার পাশে আমার কাছ বেঁধে বসবে এসো। অগ্নিশিখার রক্তিম আভার তোমার গালে ছুটি কুকচূড়া কুটে উঠুক। আমি চেয়ে চেয়ে দেখি আর তোমায় একটি রূপকথা বলে শোনাই।

দূরে—বহু দূরে—বনের কিনারায় পাহাড়ের উপর কালো কালো পাথর দিয়ে গড়া এক দুর্গ-প্রাসাদে বাস করতেন এক বিশাল-বলু দৈত্য। প্রাসাদের রক্ত ভরানক রূপটি বেন প্রাসাদ-অধিকারীর নির্ঘন কর্তার মনোরম একটা প্রতিচ্ছবি।

এই প্রাসাদের এক কক্ষে বাস করতো বন্দিনী নন্দিনী। বুদ্ধের শুক নীরস মনে কোথাও বৃষ্টি বা এই নন্দিনীর জন্ত এক কথা ঘেঁহু সন্ধানপনে সঞ্চিত ছিল। নন্দিনীর পিতাকে বুদ্ধে হত্যা করে তাকে ধরে এনে এই প্রাসাদে বন্দিনী করে রেখেছেন। সে তখন ছোট এক কৌটা ঘেমে ছিল। আজ সে প্রথম বোঁবনের সিংহদ্বারে

উপনীতা ! বসন্ত-প্রভাতের নতুন অকর্ণের রাগি চোখ মেলে চাওয়া পদ্মের সঙ্গেই শুধু নন্দিনীর রূপের তুলনা করা চলে।

নন্দিনীর মনে সুখ ছিল না, অজানা ব্যথায় তার মন সারাক্ষণ টনটন করতো ; অশ্রু যেন তার বাধা মানতো না, যত্নে যত্নে তার বুক ভাসিয়ে দিত। বুদ্ধের পানে সে চাইতে পারতো না ; কেমন যেন একটা উ কট ভয়ে সারা দেহ ঝড়ে নড়া পাতার মতই কেঁপে কেঁপে উঠতে !

খোলা জানালার ধারে সে খেত-বাথরে

গড়া মূর্তির মত বসে থাকতো। আকাশের স্বচ্ছ নীলিমা আর গুম বনানীর বিপুল সম্পদের পানে উল্লাস দৃষ্টি মেলে অজান্তে হয়তো বা উৎসারিত হতো এক ব্যাকুল প্রার্থনা। কত রাতে নিদ্রাহীন অঁখি মেলে সে চেয়ে থাকত আকাশের ঐ তারকাপুঞ্জের পানে—চোখে তার অব্যক্ত মৌন জিজ্ঞাসা, কিসের এই ব্যথা, কি তার অন্তরের কামনা ? তার অবচেতন মনে বৃষ্টি লেগেছে প্রেমের ছাঁচ, অতীত চোখে তার বৃষ্টি নতুন জাগা প্রেমের দৃষ্টি। কে তার মনের এই ক্ষুধা মেটাবে, কে তাকে দেবে এককথা প্রীতি, যার জন্তে সারা দেহ উন্মুখ প্রতীক্ষায় নিশিদিন ঘুরে ঘুরে উঠছে। প্রেম আর সৌন্দর্য মিলিয়ে যে তৃপ্তি, সে তৃপ্তি সে পাবে কোথায় ? শুক কাঠের মত নীরস ঐ বৃদ্ধ তার ব্যথা বুঝবে কেন ?

একদিন বাতায়নে তার নিশ্চিষ্ট কোণটিতে বসে নন্দিনী বাইরের পানে তাকিয়ে একজোড়া কৌক-মিথুনের প্রেমলাপ দেখছিল, এমন সময় তার কানে ভেসে এলো দুবাগত বাঁশীর সুরের মত মিষ্টি একটি সোমল স্বর। নীচে তাকিয়ে নন্দিনী দেখলো কণ্ঠে অপূর্ণ সুরের বন্ধার তুলে এক স্তম্ভন তরুণ যুব প্রাসাদের তোরণের দিকে এগিয়ে আসছে। যুবকের কণ্ঠ-নিঃসৃত সে অপূর্ণ সুরে নীরস পাথরও বুক চিরে আনন্দের ধারা বেন উথলে পড়ছে। যুবকের কথা শুনবার জন্ত নন্দিনী বেন উন্মুখ হয়ে উঠলো। এমন মধুর দরদী কণ্ঠস্বর সে আগে কখনও শোনেনি। নন্দিনীর হৃৎচোখ ছাঁপিয়ে নেবে এলো অশ্রুর বজা, তার নিঃসঙ্গ জীবনের একমাত্র সাধনা— সে অশ্রুতে সিক্ত হল তার হস্তধৃত নীল-পদ্মটি।

প্রাসাদের কঙ্ক দুয়ার মুক্ত হলো না, দ্বারীর কক্ষবর্ধ গর্জ্জে উঠলো—“দূরে রহ—তুমি সৈনিক নও, সৈনিক ভিন্ন অপর কাকর এ প্রাসাদে প্রবেশ নিষেধ।”

নন্দিনী যেমন তাকিয়ে ছিল তেমনি রইলো। অশ্রুসিক্ত নীল কমলটি সে নীচে ফেলে দিল। পরটি পড়ল তরুণের পায়ে কাছটিতে। তরুণ চোখ তুলে চাইল, ফুসটি তুলে নিয়ে তার নরম পাপড়িতে এঁকে দিল ছোট একটা চুমো, তারপর এক-পা এক-পা করে বনের দিকে চলে গেল।

অনাধারিতপূর্ব এই সুরের আবেশে নন্দিনীর চোখ দু’টি বুজ এলো, অজানা বাহু-দণ্ডের পরশে তার মনের কঙ্ক কপাট খুলে গেল বৃষ্টি।

সে রাতে নন্দিনী স্বপ্ন দেখলো, তরুণের পায়ে কাছ ফেলে দেওয়া তার সেই নীল-পদ্মটিকে। আর দেখলো—কি দেখলো জান তুলা ? দেখলো সেই ঈষৎ কম্পমান পাঁপড়িগুলির মধ্যে যে

আবির্ভূতা হলো এক নারীমূর্তি, তিলোত্তমার মত বার রূপ, সৌরী তুল্লতা আন্তন-রাঙা চেলি দিয়ে ঢাকা। মাথার ফুলের মুকুট, দেহে স্বচ্ছ সজ্জা আভরণ আর কটিতে স্বর্ণ মেখলা!

নারীমূর্তিটি বীরে বীরে এসিয়ে এলো; নন্দিনীর ললাটে একখানি হাত রেখে বললো—নন্দিনী চেয়ে দেখ, আমি এসেছি। আমিই আজ তোরে পাঠিয়েছিলাম তরুণকে—কণ্ঠে বার সুখ-স্বরা স্তব। তোমার অঙ্ক আমি হৃদয়ে দেব নন্দিনী।

স্নেহহীন জীবনের ভার বয়ে বয়ে যায়। দীর্ঘকাল ফেলে, তাদের সন্ধানে আমি বিশ্বময় ঘুরে বেড়াই। তাদের ভাঙা বুক জোড়া লাগাই। রাজার প্রাসাদ, দীনের পর্ণকূটার—বিশ্বের সর্বত্র আমার গতি অব্যাহত। প্রয়োজন মত রাজা-প্রজার ব্যবধান ঘুচিয়ে আমি তাদের মধ্যে মিলন ঘটাই। আমার পক্ষপূট-ছায়ায় বারা একবার আশ্রয় পায়, কেউ তাদের অকল্যাণ করতে পারে না। প্রাণের সঙ্গে প্রাণ, দেহের সঙ্গে দেহ বেঁধে দিই আমি প্রেমের অন্তরতম বন্ধনে! হিয়ার হিয়ার আমি ডাকাই পুলকের উচ্চাস। বসন্ত-প্রভাতে বনানীর জাম-ছায়ে আর শীতের হিমেল রাতে প্রিয়তম-প্রিয়তমার নিবিড় মিলনেই আমার আনন্দ। প্রেমের নিভৃত কুঞ্জরচনাই আমার নিত্যকার কাজ। তোমার ব্যথা দূর করবো বলেই আমি তোমার কাছে এসেছি।

এই না বলে নারীমূর্তিটি অন্তর্ধান করলো, পদ্মের দলগুলি বুঁজে গিয়ে আবার কুঁড়িতে পরিণত হল!

তুমি জান তুলা, স্বপ্নে নন্দিনী যে নারীমূর্তি দেখেছিলেন, তিনি চারাময়ী নন। এই গৃহকোণে চেয়ে দেখ, আজকের এই সন্ধ্যার তীর নৃত্যপরা রূপ তুমিও দেখতে পাবে।

পর দিন ঘুম ভেঙে নন্দিনী দেখলো নূতন রবির সোনালী হাসি ছড়িয়ে পড়েছে তার ঘরে, পাখীর কাকলিতে বনাকুল মুখর হয়ে উঠেছে আর ঘুম ভাঙা ফুলের চূষন-স্বরভিত ভোয়ের বাতাস তার কালো চুলের রাশির সাথে যেন লুকোচুরি খেলছে। নন্দিনীর মনে আজ দুঃখের লেশমাত্র নেই; সারা দিনমান তার শরতের মেঘের মত হালকা হালকা মনে হল। পাহাড়ের রুক্ষ সৌন্দর্য্যও আজ যেন আর ততটা রুক্ষ নয়। মাঝে মাঝে ছোট শিশুর মতই হাততালি দিয়ে সে অকারণে হেসে উঠছিল!

সেদিন সন্ধ্যায় রোজকার মত নন্দিনীর ডাক পড়লো। দৈত্যের কাছে, তার বিগত যৌবনের হংসাহসিক কথা ও কাহিনী শোনবার জন্ত। নন্দিনী এসে তার নির্দিষ্ট আসনটিতে বসলো! বাটরে কিল্লীর অশ্রাস্ত একঘেয়ে আওয়াজ। খোলা বাতায়নের পথে ব'ইরের পানে দৃষ্টি মেলে নন্দিনী বুঝি সেই আওয়াজই শুনছিল।

একটু বাদে দৈত্যের পানে চাইতেই সে কি দেখলো, দৈত্যের পাশে বসে আছে এক তরুণ, হাতে তার নন্দিনীর ফেলে দেওয়া সকাল বেসাকার সেই পদ্ম।

তার লাজ-রাঙা মুখখানি দৈত্যের দৃষ্টি হতে লুকোবার উদ্দেশ্যে সে আবার বাটরের পানে তাকালো।

তরুণ মুহু মুহু হাসছিলো, আর মধ্যে মধ্যে মাথা নেড়ে দৈত্যের কাহিনীর তারিফ করছিল।

বাতায়নের নীচে পদ্ম-দীপির জল একটু নড়ে উঠল না? দেখতে না দেখতেই আবির্ভূতা হলেন স্বপ্নে দেখা সেই ~~দৈত্যের~~ আর মিলি

বীর পাদক্ষেপে বিদেহিনী ঘরে প্রবেশ করলেন দৈত্যের নিকট অদৃষ্ট হয়ে। দৈত্য তার কাহিনীতে বিভোর। চাপা স্বরে বিদেহিনী নন্দিনী আর তরুণকে বললেন—“বুড়ো তার অতীত জীবনের কাহিনী বলুক। তোমাদের তো বুড়োর গল্প শোনবার সময় নয়, ভাল বাসবার সময়, ভালবাসা ছাড়া তরুণ-তরুণীর আর কোন কাজ নেই। তোমাদের প্রেম গভীর হোক; এত গভীর যে ভায়া-হায়া। ইমিডে, চাইনিতে, চুবনে ব্যক্ত হোক তোমাদের প্রেম।”

পুলকের প্লাবন সে ভীক হিয়া বইতে পারবে কেন? কণ্ঠবন্ধ নন্দিনী অসহ্য আবেশে যেন ঘুরে পড়ল।

এর পর কি হল জান তুলা? বিদেহিনী তার স্থায় অঙ্কল দিয়ে একটি ঘর—নন্দিনী আর তরুণের মিলন-বাসর—রচনা করলো। এই বাসরে দৈত্যের অলক্ষ্যে তরুণ নন্দিনীর গণ্ডে একে দিল প্রেমের পরিচয়ের লেখা। দৈত্যের কাহিনী শেষ হল। তরুণ নন্দিনীর উদ্দেশ্যে একটি বিদায়-চূষন জানিয়ে দৈত্যের নিকট হতে বিদায় নিয়ে চলে গেল। নন্দিনীর সুখের আর অবধি নেই।

পরদিন ভোরে নন্দিনী ফুল-বাগিচার রতীন পাখনা মেলে প্রজাপতি যেমন উড়ে উড়ে ফুলের মধু খেয়ে বেড়ায় তেমনি করে বেড়াচ্ছিল কুহু হতে কুহু। তেমনি একটি কুঞ্জের পাশে শাস্ত্রীর ছদ্মবেশে তরুণ তারই প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়েছিল—হাতে তার রক্ত-পদ্ম।

তারো হৃদয়ে হাত ধরাধরি করে পাহাড়ের কোলে বেথানটি বরণীর বুকের মধু খাবে পড়ে সেখানে গিয়ে বসল। দিনের আলোর হৃদয়ে হৃদয়কে দেখে কি খুসিই হলো। সে দিন বনানীর পাখীরা কত কথাই না শুনেছিল!

Amico's
GREEN LINIMENT


আপনি নিশ্চয় দৈহিক ব্যথায় যন্ত্রণা পাচ্ছেন- কোথায়?
কোমরে, হাঁটুতে, কিংবা কোন সন্ধিস্থানে?
শুনে খুসী হবেন—
শারীরিক, বুক বা পিঠের পীড়ারার,
বাতন্ত্র ইত্যাদি যাবতীয় ব্যাথায়

এ্যামিকো গ্রীন লিনীমেন্ট
(সবুজ মালিশ)
শারীরিকই নির্ভরযোগ্য।

মূল্য : বড় শিশি—২.৭৫ নং পঃ
ছোট শিশি—১.৭৫ নং পঃ
“মাগুজ” স্বতন্ত্র

ব্যবস্থাপকের জন্য নিবুন—

আমিন এণ্ড ইসমাইল (প্রাঃ) লিঃ
৮০ নং কমুটোলা স্ট্রিট, কলিকাতা-১



সত্য মেয়ে এসেছে। সত্যার আবহাওয়ার নৈত্যের বিশাল বশু
উঁকি দিচ্ছে কি? তার পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। ভরচকিতা
হরিশ্রীর মত নন্দিনীর সারা দেহ খেন থেকে থেকে ধর ধর করে
কাঁপতে লাগল। নৈত্য দেখতে গেলে আর বন্ধা নেই।

অবগার শিকরকণা হঠাৎ ইন্দ্রধনু রঙে রঙিন করে বিদেহিনীর
আবির্ভাব হলো, রঙীন আলো-ছায়ে সে নন্দিনী আর তরুণকে
অন্তরাল করে রাখলো। বুড়ো নৈত্যের কানে দুবাগত বাঁশীর সুরের
একটা মিষ্টি আওয়াজ ভেসে এলো, কিন্তু দৃষ্টিহারা তার চোখে কো-
ন দৃষ্টি ধরা পড়লো না।

তরুণ আর নন্দিনীর গালে দুটি ঘেঁহু-টিঙ এঁকে দিয়ে বিদেহিনী
বললো—“প্রেমের সেউলের ঘোরের অতল প্রহরী আমি।”

“বাগা ভালবাসে না, তাদের চোখের দৃষ্টি আমি হরণ করে নিই ;
সেউলে তাঁদের প্রবেশ দিবে। অন্ধ রবির এই মায়ার-আলোর, তোমরা
জ্বলন্ত জ্বলন্ত বৃক্ক রহস্তময় আবেশ রচনা করো নির্ভয়ে। কেউ কোন
কতি করতে পারবে না ; আমার পক্ষপট হারে তোমরা যতরূপ আছ।
প্রেমের ছোঁয়া লাগিয়ে তরুণ-তরুণীর রক্ত হিরার কপাট খুলে দেওয়াই
আমার কাজ। প্রেমের মল্যাকিনী-খায়র বাগা অবগাহনে অক্ষয়,
তাদের কলুব দৃষ্টিতে তোমাদের সুরে ভেদ পড়বে না।”

এই না বলে নন্দিনী আর তরুণকে নিয়ে বিদেহিনী অতর্কিত
হলো।

তারপর তরুণ আর নন্দিনীর কি হলো জানতে তোমার খু-
সা হচ্ছে, না তুলা?

ওকি। চোট তোমার ফুলে ফুলে উঠছে কেন? হুটু মেয়ে। আর
খুঁজ ভার করে না। বলছি বলছি—তরুণ ও নন্দিনীকে বৃক্ক করে
বিদেহিনী কত পাহাড়, কত প্রান্তর, কত নদ, কত নদী পেরিয়ে গল
তার ঠিক ঠিকানা নেই। অবশেষে বিদায়ের রূপ এলো, কিন্তু তরুণ
নন্দিনী কেউ কাউকে ছাড়তে বাতী নয়। বিদেহিনী তখন কি
করলো জান তুলা? তার হাতের বাহুবলটি ওদের কপালে একটু
হুলিয়ে দিল—অরুণি—ওকি তুলা—তোমার চোখ দুটি অত বড়
হবে উঠল কেন?

চোখের পলক ফলতে না ফেলতে তরুণ আর নন্দিনী, নন্দিনী
আর তরুণ—দুটি আশ্চর্য্য স্রব্ধ রক্তকমলের যুগলে পরিণত হলো। এত
কাছাকাছি যে, তাদের পাভাঙলি খেন পরস্পরকে নিবিড় আলিঙ্গনে
আবদ্ধ করে রেখেছে। সেই যুগল দুটিতে ফুটলো দুটি রক্তকমল।

এবার যখন আমরা—তুমি আর আমি—বেড়াতে বেরবো, তখন
এই রক্তকমল দুটি আর তাদের অধিবরীর খোঁজ করবো, কি বল

মৃত্যুর অখণ্ড প্রেম

জয়ন্তী রায় (লাহিড়ী)

মৃত্যুর অখণ্ড প্রেম নেয় যদি মোরে কাছে টেনে,
অমৃতের পাত্রখানি দেয় মোরে এনে,
হয়তো বা তবে এই আঁধারের রাত্রি হবে শেষ,
আলোকের জয়রথে দেখা দেবে স্রব্ধের নিমেষ।
এ জীবনে খেন মোর বেদনার নাই অবসান,
বুখা মোর সুখ খোঁজা বুখা তারে আকুল আহ্বান।
হুঃখ মোরে ভালবাসে,
তাই সে জড়াতে আসে তার বাহুপাশে,
গভীর বিষের রঙে রাঙাতে এ প্রাণ,
এ জীবনে বেদনার নাই অবসান।
আঁধারের ফুল যে গো, ফুটেছে যে চির অন্ধকারে,
কে দেখাবে আলো তারে,
কবেকার কোন্ সূর্য্য তার লাগি হ'য়েছে আকুল,
সে যে চির আঁধারের ফুল।
সমস্ত প্রহর ধরে যত তার আলোর সাধনা,
রক্তের চন্দনে মাখা যত আরাধনা,
মিথ্যে সে কুস্রমে বাঁধা মালার প্রয়াস,
এ জীবনে সুখ পরিস্রাস।
তাইতো আঁধার পথে চলেছিহু আমি একা একা,
বসন্তের কুহু নয়—শ্রাবণের কেকা,
আকর্ষ বেদনা ভরি ছিল মোর সাথী।
আমার আকাশ ছিল মেঘ-ছায়া পাতি,
উত্তপ্ত আলার মাঝে বৃষ্টির সাধনা
আমার জীবনে ব্যর্থ আলোর সাধনা।

হাস্য হির করণে যেমন সময় মিলে না সময়টা, তেমনি হির করণে সময় নষ্ট করলে না। প্রাথমিক পরীক্ষার পর রোগীকে তেতলার তুলে নিয়ে বাঁওরাটা পর্যন্ত বাদ দিলে। এখানেই সেলাইন সার্টি করবে সে। এ্যানিমিকের রোগী, তাতে বস্তু চলে গেছে প্রচুর—আর দেখা করা নয়। হাঁটা দিলো সে ডক্টরস্ ক্রমের দিকে—অবুৎপত্ত বস্তুপাতির ঘরের দিকে।

তেমন প্রয়োজনে এই টেবিলে সেলাইন দেওয়াটা আইনবিকল্প কাল্পনিক। কিন্তু কোন ডাক্তারের উপস্থিতি ছাড়া নামের পক্ষে—ক্লিপের করে জুনিয়ার ট্রিপ্ট নামের পক্ষে রোগীকে সেলাইন দেওয়াটা যে হাসপাতাল-আইন-বিকল্প কাজ, এটা মজুর আনার কথা নয়, জানেও না। ঝুঁকি এবং মনের জোর নিয়েই যে সময়টা একাজে প্রবৃত্ত হলো সেটাও সে বুঝল না। সে শুধু দেখল, এই যে এঘর থেকে ও ঘরের দিকে হাঁটা দিল মমতা সে হাঁটার সঙ্গে তার কিছুকণ পূর্বের হাঁটার কণামাত্র মিল নেই। নার্সদের চলার যে বিশেষ ধরনের একটা শরীর টান করা আর টান-চলার তড়িৎ তড়ির গতি আছে, এঘরের চলার মমতার শরীরে সেই টান ভাব, পায়ে সেই তড়িৎ গতি এসে গেছে।

‘এখন যা করবার মমতা করবে।’ নিদারুণ উৎকর্ষার ভেতরও এ নিশ্চয়তা কম নয়। যা একটু শাস্ত হয়ে মেয়ের পায় হাত বুলোতে লাগলেন। প্রতিবেশী ক’জন আর অমল তিন-তিনটে বস্তুমাথা সেই এনে কুলীয়া যেখানে নামালো হু’ পা এগুলো সেদিকে। মজু জয়ার বরফের মতো ঠাণ্ডা কশালে হাত রেখে দাঁড়িয়ে রইল। আহত দেহগুলোর দিকে তাকিয়ে ভারলে, এই লোকগুলোও আবার কতকণ এ ভাবে পড়ে থাকবে কে জানে!

মমতা যেমন গেল প্রায় তেমনি ফিরে এসে হাতের ট্রে শিশি-বোতল নামিয়ে রাখল একটা টেবিলে। একটা হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোক জয়ার টেবিলের পাশে এনে দাঁড় করিয়ে দিল একটা লম্বা ঠাণ্ড।

মমতা ট্রে থেকে টলটলে জল ভরা একটা বোতল তুলে নিয়ে ঝুলিয়ে দিলে সেই ঠ্যাঙের ভেতর। তারপর দক্ষ পরিচ্ছন্ন হাতে মিনিট পোনেরোর ভেতর জয়ার শরীরে সেলাইন সঞ্চরণ করে চটপট হাতে এক টুকরো কার্ডবোর্ডের সঙ্গে ব্যাণ্ডেজ করে ফেলল জয়ার হাতটা। কোঁটার কোঁটার টলটলে লবণ জল রবারের নল বেয়ে নেবে এসে সূচের মুখ দিয়ে বেয়ে চলল জয়ার ধমনীর ভেতর।

এ হাতে সেলাই, ও হাতের কব্জিতে আটেরি ফরশেপ—হাতের মাঝখানে নাড়ীতে তিনটি আঙ্গুল রেখে, ঘড়ির দিকে তাকিয়ে নাড়ীর স্পন্দন শুনলো মমতা অনেকটা সময়। তারপর মজুকে বললো—এবার আমি একটু একজন ডাক্তারের খোঁজে বাছি—

—হাতটা ধরে রাখবো আমি, বাতে নাড়াচাড়া করতে না পারে? জানতে চাইলে মজু।

—দরকার নেই। ব্যাণ্ডেজ এমন ভাবে বাঁধা আছে ও নাড়াতে পারবে না। আচ্ছা, আমি আসছি।

মমতার ডিউটির সময় ছিল না এটা। চিলেঢালা পোষাকটা বোধ হয় সে অবুৎপত্ত আনবার আগেই জাঁচলে জড়িয়ে প্রায় কোমর-বন্ধনীর মতোই শক্ত করে পেঁচিয়ে নিয়েছিল। আর মাথার উড়ন্ত চুল গুলোকে বেঁধে নিয়েছিল একটা কমাল দিয়ে। তার দিকে তাকিয়ে মজুর মনে হলো, মমতা স্মরণ-হীন সেটাই



[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

সুলেখা দাশগুপ্তা

কৃতজ্ঞতার মাথা নত করে আছে—আর মমতার সব রূপ যেন সেইখানে।

হ্যালো, ব্যাপার কি? পরিচিত কেস নাকি? ডক্টরস্ ক্রমের দিকে এগুতে গিয়ে একবারে মমতার মুখোমুখি পড়ে গিয়ে থেমে পড়লেন এক ডাক্তার।

ডাক্তারকে দেখে যেন বর্তে গেল মমতা। সাগ্রহে বলে উঠল—বাঃ এই তো কেমন আপনাকে পেয়ে গেলাম। মিঃ সেন একটু এদিকে আসুন।

চিনল মজুও। একেই সে সেদিন মমতাদের বাড়ীতে দেখেছিল। মমতার মুখ থেকে তার বহু আকাঙ্ক্ষিত এই আগ্রহাষিত অ’হ্বান ডাঃ সেন কিন্তু এর পূর্বে আর কোন দিনও শোনেননি। মমতার দিকে চোখ তুলে একবার তাকিয়ে শাহিত জয়ার দিকে তাকিয়ে এগিয়ে গেলেন তিনি। —কি হয়েছে?

জয়ার কাটা হাতটা নিষ্কর হাতে তুলে নিয়ে ডাক্তারের দিকে বাড়িয়ে ধরল মমতা নীরবে।

মজু তাকে জয়ার আশ্চর্য্যতা করতে বাঁওরার কথা বলেনি বা বলবার সময় পায়নি। কিন্তু মমতা ব্রেডে কাটার চেগাটা দেখেই যেমন বুঝে নিয়েছিল এটা সুইসইড্ কেস, ডাঃ সেনও তেমনি কাটা দেখেই সেটা বুঝে নিলেন। জয়ার হাতের মাঝখানের শিরার ওপব ঠিক মমতারই মতো করে তিনটি আঙ্গুল ছুঁইয়ে তারই মতো ঘড়ির দিকে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে বইলেন ডাক্তার অনেকটা সময়। কালো হয়ে আসা আঙ্গুলের ডগা নখ গোটা ছুই তিন তুলে তুলে দেখলেন টিপেটিপে; তারপর টেবিলের কাছ থেকে সরে এসে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বললেন,—ব্লাড ট্রান্সফিউশনের ব্যবস্থা করে ফেল। ডাঃ সিন্ধা কোথায়?

—ডাঃ সিন্ধা হেড ইনজুরী কেস নিয়ে চলে গেছেন ওটিতে। তাইতো—

—একে সেলাইন দিলে কে? ডাঃ দাস?

আমি। বিনীত কণ্ঠে বলল মমতা।

—তুমি? ক্র কৃচকে তাকালেন ডাক্তার জয়ার দিকে।

—উপায় ছিল না। বাধ্য হয়ে আমাকে করতে হয়েছে।

সবিনয় কণ্ঠে বললো সে।

সংসাহসের পরিচর দিয়েছে মমতা—এমনভাবে প্রশংসার দৃষ্টি

সবাই-ই খুল আঁইন-বিক্রম ভাবে মমতা নিজ দায়িত্বে সব করেছে। মঞ্জুরের সবার বৃত্তিতেই কৃতজ্ঞতা প্রশংসা ফুটে উঠল।

—এ কেসটা আপনি একটু দেখুন ডাঃ সেন। এখন কাজকে পাওয়া যাবে না—এই মেয়েটি আমার বিশেষ বন্ধু। কিছুটা যত্নের দাবী, কিছুটা শ্রীতির সুর—সেন মিশিয়ে দিল মমতা তার আবেগনের সুরে।

অত্যন্ত দ্রুত একটা ডেলিভারি-কেস নিয়ে ডাক্তার সেনকে আজ গলদ ঘর হতে হয়েছে সমস্ত দিন। তারপরও স্বাভাবিক ডেলিভারি সম্ভব হয়নি। মেয়েটির স্বাস্থ্যের অবস্থা, হাঁটের-কন্ডিশন দেখে অপারেশনটা এড়াতে চেয়েছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত সার্জিক্যাল অপারেশন থিয়েটারে-নিয়ে যত শক্ত বের করতে হয়েছে ডাক্তারকে সিজারিয়ান করে। এই যাত্রা রোগীকে বেড়ে পাঠিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে ব্লাড সেলাইন সার্ট করে বাড়ী ফেরবার মুখে একটু দরকারে এখানে এসেছিলেন ডাক্তার। একে সমস্ত প্রম ব্যর্থ করে শিশু হয়েছে যত, তাতে মার অবস্থা আশঙ্কা-জনক—দিনটাই ব্যর্থ মনে হচ্ছিল ডাক্তারের। পরিশ্রান্ত পিঠটা হাত পা মেলে শুয়ে পড়তে চাইছিল কোথাও। কিন্তু মমতার মনস্তত্ত্ব বোঝা বুঝা গেল না। তার গলার সেই শ্রীতির সুর—আবার এক নজর তার দিকে তাকাতে বাধ্য করলো ডাক্তারকে। সার্টের গুটোনো হাতা অভ্যাস বশেই ঠেলে তুলে দিতে দিতে জয়ার টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো ডাক্তার। কণী হতে কণী হয়ে আসা নাড়ীর গতিটা দেখল আবার। দেখল বুকের স্পন্দন। তারপর বললো—কোরামিন।

মমতা ছুটলো কোরামিন আনতে।

—হাসপাতালের ভিজিটিং আওয়ার। বাইরে বাওরা-আসা কথাবার্তার সঙ্গরম। এ্যাডুলস খামার শব্দ হয়। হুপ্, দাপ্, শব্দ তুলে কতগুলো পা ছুটে আসতে থাকে এদিকে। ট্রেনার এনে নামার কুলীরা। টেবিল গুলো ভর্তি হয়ে হয়ে শেষে শুধু সিমেন্টের ওপর শরীরগুলো নামিয়ে রেখে খালি ট্রেনার নিয়ে বেরিয়ে যেতে থাকে কুলীরা।

কি হয়েছে?

আঁহা, বিব খেয়েছে।

ইণ্ড, রাজমিস্ত্রী, কাজ করতে করতে আচমকা তিনতলার ছাদ থেকে ছিটকে পড়ে গেছে।

মাগো, গাছ চড়ে খেলা দেখতে গিয়ে গাছ উপড়ে পড়ে চাপা পড়েছে ওপরের লোক নীচের লোক!

এ্যা, গাড়ীর তলার চাপা পড়েছে?

মদ খেয়ে মারামারি করে মাথা কাটিয়েছে!

কেউ কাতরাচ্ছে। কেউ গোড়াচ্ছে। কেউ পড়ে আছে নিখর হয়ে। জীবিত না মৃত বোঝা যাচ্ছে না। যাদের জ্ঞান রয়েছে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে করে ঘটনা জানতে আর নোট নিতে চেষ্টা করছে। ব্যাংর অজ্ঞান, তাদের আর এই জিজ্ঞাসা-বাগটুকুও সম্ভব হচ্ছে না। নেড়ে চেড়ে নাসরা একটু প্রাথমিক এটা ওটা দেখে তুলে দিচ্ছে ট্রেনারে। ডেটল, লাইজল, ইখার, ক্রোবোফরমের-মিশ্রিত যে হালকা গন্ধটা হাসপাতালের গেটে ঢোকান পরই নাকে আসে, তারই উগ্র গন্ধে ভারি হয়ে উঠেছে চারিদিক—

জরাকে উপরে তুলে নিয়ে বাওয়ার জন্ত বখন ট্রেনার আনা হলো—তখন বেন এখান থেকে বেরতে গেরে বাঁচলো মজু।

সকল ছোট প্যাসেজটা গিজগিজ করছে লোকে। শেষ হয়ে গেছে ভিজিটিং আওয়ার। রোগীদের অস্থায়ী বন্ধু সব বেরিয়ে যাচ্ছে। কাক হাতে খালি টিকিন-কেবিরার। কাক হাতে খালি কৌটো। আর এখন হাসপাতালের ভেতর থাকা চলবে না বাইরের লোকের। জয়ার মাকে নিয়ে ওদেরও বাইরে চলে আসতে হলো। এক মঞ্জুরে নিয়ে নিল মমতা সঙ্গে করে। জরাকে নিয়ে লিফটে তোলা হলো। ওরা চলল সিঁড়ি ভেঙ্গে। এতক্ষণে দুখলো মজু ইয়ারজেণ্টী কমটা কিছুটা কাজ করে বেন একটানা তেতলার তুলে নেবার আগের নিরীক্ষণ-কেন্দ্র হিসাবে। তেমন গুরুত্ব কেন্দ্রে দেখানে চিকিৎসা শুরু করা যেতে পারে, যেমন মমতাকে জয়ার সেলাই সার্ট করে দিয়েছিল—নইলে তেতলার ব্লকেই নিয়ে আসতে হয় সবাইকে।

কিন্তু মজু যে ভেবেছিল ঐ ঘরটা ছেড়ে সে বাঁচলো—তা একেবারেই মিথ্যে। উপরে উঠে দেখল এটা—আরো ভীষণ। কাক হাত কেটে ফেলা হয়েছে। কাক পা। কাক ব্যাণ্ডেজ বাঁধা মুখ একেবারে গলা পর্যন্ত ঢাকা। কাক পা উপর দিকে টানা। কাক হাত। কাক নাকের ভেতর দিয়ে নল ঢেঁকানো। কাকুর কাছে অস্ত্রভেন সিলেগার। সারি সারি ষ্ট্রাণ্ডে ঝুলছে রক্ত, লবণ-জল। প্যাসেজ থেকে শুরু হয়েছে রোগীদের খাটিয়া পাতা। তাতেও কুলোচ্ছে না। মাটিতে মেঝেতে এখানে ওখানে পড়ে আছে সব। নোংরা, অপরিচ্ছন্ন বৈশবাস পরিবেশ বিছানা-পত্র অব্যবহার। এই হাসপাতাল? মানুষের আরোগ্যনিকেতন?

করিডোরের বেডগুলোর পাশ দিয়ে কুলীরা ট্রেনার ডান দিকে ঘুরলো। সঙ্গে সঙ্গে ঘুরলো মজুও। এখানেই মেয়েদের ওয়ার্ড। সেই এক অবস্থা—এক চেহারা। জয়ারও খাটিয়া মিলল না। নামিয়ে রাখা হলো তাকে নীচের একটা গুটোনো নোংরা তোষক টান করে।

কোন উপায় নেই।

শেই ওয়ার্ডের কথা বলতে গিয়েও ধেমেল গেল মমতা। নেমে গেলেন ডাক্তার। অবস্থা বুঝতে কতক্ষণ লাগে?

সেই মেয়ের বিছানায়ই ব্লাড, ট্রান্সফিউশন দিলেন ডাক্তার। দিলেন মরফিন। করলেন কাটা হাত সেলাই। তারপর বেরিয়ে এসে দাঁড়ালেন করিডোরে।—তুমি থাকবে এখন এই মেয়েটির কাছে?

—থাকা দরকার হলে থাকবো।

—দরকার মানে, ঘড়ি দেখলেন ডাক্তার সেন—এখন সাড়ে সাতটা বেজে গেছে। নটা নাগাদ আমার চেম্বারে একটা রিং করে তুমি এর অবস্থাটা জানাবে আমাকে। তখন আমি বলে দেবো, আজই আর একবার ব্লাড দেওয়া দরকার, না কাল সকালে দিলেই চলবে। আর তুমি যদি না থাকো তবে ওয়ার্ডনাসকে বুঝিয়ে বলে দাবে—খামলেন ডাক্তার। আজ্ঞা, আমিই বলে যাচ্ছি। তোমার কথায় তেমন গুরুত্ব নাও দিতে পারে।

—আমিই থাকবো। নটার পর আপনাকে অবস্থা জানাবো

একটু চিন্তা করলেন ডাক্তার—আজ সমস্ত দিন ডিউটি দিয়েছেন, কাল সকালে আবার তোমার ডিউটি রয়েছে—

একটু হাসল মমতা—এটাও ডিউটিই। ন'টা সাড়ে ন'টা পর্যন্ত থাকতে আমার কিছু বট্ট হবে না। আমি আপনাকে ঠিক ন'টার ফোন করবো।

ডাক্তার ব্যালেন,—তিনি সে আরো কিছু সময় রোগীর কাছে গ্র্যাটেনডেল দরকার মনে করছেন, মমতা তার কথায় সেটা বুঝেছে।

—আই উইস্‌ ইউর সাকসেস্‌। বলে ছুতোর শব্দ তুলে করিডোর পার হয়ে গেলেন ডাক্তার।

সে দিনের জায়গার বাড়ীতে দেখা ডাক্তার আর এই ব্যক্তি কি একই লোক? মঞ্জুর মনে হতে লাগল যেন এক নয়। তা ভিন্ন লোক বৈ-কী। এখানে সে ডাক্তার।

মমতার সঙ্গে থেকে যেতে চাইলো মঞ্জুও। কিন্তু মমতা দিলে না। তুমি, তা তোমাকে এক্ষণে আপনি বলছিলাম কিন্তু বলতে একটুও ভালো লাগছিল না। ছোট তো। তুমিই বলি, কি বলো? তোমার থাকার কোন দরকার নেই। দরকার থাকলে কি আমি কখনোই যেতে দিতাম তোমাকে? ভয়ের কারণ কেটে গেছে। আমার থাকার প্রয়োজন হলো,—অবস্থা দেখছে তো হাসপাতালে। কি করবে ডাক্তার, কি-ই বা করবে বোচারা নার্স অর্থাৎ আমরা। হাসল মমতা। একেবারে হিমশিম খাই আমরা। সামনের গুরুতর কেস পেছনের গুরুতর রোগীর কথা ভুলিয়ে দেয় জানি তো। তাই রয়ে গেলাম। ফের ব্লাড দিতে হয় তো, দেওয়া হয়ে গেলেই চলে যাবো আর না দিতে হলে তো কথাই নেই। তুমি শুধু শুধু কেন রাত করবে? তারপর তোমাকে রাখাটাও একেবারে নিয়ম-বিরুদ্ধ যে—

—কাল সকালে ক'টার সময় আসবো।

সেটাও যেন নাই করতে বাচ্ছিল মমতা। বলতে বাচ্ছিল একেবারে হাসপাতালের ডিজিটিং সময়ে এলেই চলবে। কিন্তু থেমে গেল। রক্ত আনতে হয়েছে ব্লাড-ব্যাঙ্ক থেকে, আবারও হয়তো আনতে হবে। অস্থগ এসেছে। ইন্জেকসান এসেছে। জ্বরার মার আঁচলের টাকায় তার অনেক কিছুই মূল্য দেওয়াই বাকী থেকে গেছে। নিজ দায়িত্বে আনিয়েছে মমতা। কাল টাকা দিতে হবে। বললো—তা তোমার সময় মতো এসো। কাল আমার ডিউটি সকালে। লেবান্ড-ক্রমে থাকবো। খোঁজ করলেই ডেকে দেবে।

মঞ্জু যখন হাসপাতালের দালান থেকে বাইরে এলো তখন ওর মুখের রং ঐ ইমারজেন্সী-ওয়ার্ডের ঘরে, বাইরে, প্যাসেজে, টেবিলে, মেঝেতে পড়ে থাকা লোকগুলোর মুখের মতোই কালো চটচটে ঘামে ভেজা। শরীরের অবস্থা ঐ লোকগুলোর মতোই বৃষ্টি অর্ধমৃত। ইমারজেন্সী ওয়ার্ড নয় তো যেন রমের কড়াই থেকে হাত পা গুলো স্বেদ ছিল বলে ও ছিটকে বেরিয়ে আসতে পেরেছে।

জ্বরার মা সমস্ত পথ গুলগুণ করে বত কথা বলে গেলেন, তা সবই মমতার প্রশংসা। এমন রূপ, এমন গুণ, একত্র হয় না কখনো, যদি না দেবী হয়। মমতা নিশ্চয়ই শাপ-ভ্রষ্টা দেবী। আহা, কি ভালো মেয়ে।

—ধী, নিঃসন্দেহে ভালো মেয়ে। আর এই শুধু তুমিই বলার

যেন কিছুই বলা হয় না মমতার সম্বন্ধে। ওর আর জানতে ইচ্ছে করে—কেনই বা মমতা রক্তার কাকাকে বিয়ে করতে বলার একদিন বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল। কেনই বা সে আর একদিন ওর ছোড়নাকে বিয়ে করতে মত দিয়েছিল। গালে একটু হাসির টোলই যেন খেলে গেল—মঞ্জুর। এবার ছোড়না এলে সে তাকে বলবে—ছোড়না, তুমি কি হারাইয়াছ তাজা তুমি জানো না।

পাশের বাড়ীর মিঃ চৌধুরী—যিনি উদযোগী হয়ে জন্মকে হাসপাতালে নিয়ে এসেছিলেন এবং যার বাড়ীর মেয়েরা জন্মকে নিয়ে তাদের কাছে রেখেছিলেন। এখন জন্মার মাকেও চৌধুরী তার বাড়ীতেই নামিয়ে দিয়ে যেতে চাইলে নিশ্চিন্তবোধ করলো মঞ্জু। এর চাইতে ভালো ব্যবস্থা আর কি হতে পারে? ওরা নেবে গেলে এবার রক্ত গলায় ডাইভার জানতে চাইলো—সে কোথায় বাবে।

সেই বেলা তিনটে থেকে তাকে আটকে রাখা হয়েছে। এই থামা ওয়েটিং চার্জের চাইতে চলায় তাদের দ্বিগুণ লাভ। কিন্তু মঞ্জুকে সে খুঁজে বের করতে পারে নি। আর খুঁজবেই বা কোথায়—এদিক ওদিক তাকানো ছাড়া। অমলরা বেরিয়ে এলে তাদের ভাড়া মিটিয়ে দিতে বলেছিল। কিন্তু ওরা সেবে কোথা থেকে? বাধ্য হয়ে গল্পগল্প করতে করতে থেকে যেতে হয়েছিল তাকে।

বুরল মঞ্জু সবই। না ভেবে-চিন্তেই সে বলে ফেলল—গ্র্যাণ্ডে চলো।

—গ্র্যাণ্ড হোটলে? মঞ্জুর দিকে মুখ ঘুরিয়ে জানতে চাইলো সে। একটু অবাক হওয়া ভাব তার জিজ্ঞাসায়। যেন—বেশবাস আদব-কায়দা কিছুই তো মঞ্জুর গ্র্যাণ্ডে বাওয়ার সাক্ষ্য দেয় না; ওকে ঐ সমাজের কেউ বলে বলে না।

জবাব দিল মঞ্জু—ই, গ্র্যাণ্ডে।

বহৎ আচ্ছা।

গাড়ী ছুটে চলল।

যদিও মঞ্জু ভাবলো সে না ভেবে-চিন্তেই গ্র্যাণ্ডের কথা বলেছে, কিন্তু—তা কি কখনো হয়? মন প্রস্তুত না হয়ে কোথাও এক পা বাড়াতে চায় না, বাড়াই না। জোর করে টেনে নিয়ে যাওয়া অবশ্য যায় কিন্তু তার পেছনে জোর থাকে, বল প্রয়োগ থাকে, জুলুম থাকে। হঠাৎ করে কিছু করে বসলেই যে আমরা ভাবি, না ভেবে-চিন্তে করেছি—এটা ভুল। হঠাৎ করা কাজের পেছনে মনের প্রস্তুতি থাকে সব চাইতে বেশী।

ওর এখন এমন একটা জায়গা চাই, যেখানে সাত রকম প্রশ্ন করে ওকে কেউ বিরক্ত করবে না, কোন সন্দ্বিগ্নচিন্তা নিয়ে ওর দিকে কেউ তাকাবে না।

যদি সে কথা বলতে না চায়, একটা কথাও না বলে, বসে বসে নীরবে সিগারেট টেনে চলবে।

মুখ দেখে ওর চরিত্র কিথের কথা বুঝতে পেরে খাবার এনে কাঁটার গঁথে হাতে তুলে দেবে।

ডাইভারের কবুল করা বকশিস, ট্যান্ডি মিটারের অঙ্ক, কালকের বেশীটার প্রয়োজন, কোন কিছুর জন্মই ওকে আর ভাবতে হবে না—এর কোন কথাটা মনের অভ্যাস?

তবে কোথায় যেতে হবে সে জানবে না কেন ?

প্রস্তুত হয়েই বা তবে থাকবে না কেন ?

গ্র্যাণ্ড ছাঁড়া যে মজুর আর কোথায় এখন যাওয়া হতে পারে না, এটা মন জানতো। প্রস্তুত হয়েও ছিল সে। আর কোথাও নিতে হলেই তাকে—জোর করে নিয়ে যেতে হতো।

চোটেলের দরজায় গাড়ী এসে থামলে মজুর নেমে পড়লো।

নেমে পড়লো ডাইভারও। জানালো আর সে এক মিনিটও অপেক্ষা করতে পারবে না। তার টাকা মিটিয়ে দিক মজুর।

ডাইভারের বলার ভঙ্গিতে, মুখের চোহায়ায় কোন সম্মত ছিল না। শঙ্কিত হলো মজুর।

এমনি সময় রজতের গাড়ী এসে থামল মজুর ট্যাক্সির পেছনে। মজুরকে দেখে নেমে এসে সম্মত সেলাম জানালো, রজতের ডাইভার।

এতো বড় গাড়ী থেকে অমন ত্রাসে বসা বন্ধুকে বোতাম জাঁটা, সাপাণোষাক পরা ডাইভারকে নেবে এসে মজুরকে সেলাম জানাতে কেবে যেন গুটীয়ে গেল ট্যাক্সি-চালক। হাত কচলে জানালো, মজুর যেন মেতেরবাণী করে টাকটা এখনুনি তার পাঠিয়ে দেয়।

হাঁফ ছেড়ে গ্র্যাণ্ডের পরিচিত পথে হাঁটা দিলে মজুর।

তেমনি জোড়ায় জোড়ায় দেশী-বিদেশী নারী-পুরুষ চলেছে কবির-ভোর দিয়ে। খোলা হাওয়ার রেইংরেটে তেমনি বাজছে অরক্তষ্ট্রী। তেমনি একটি মেয়ে মাইকের মুখ কিউটেন্স রঞ্জিত আলতো হাতে ধরে গান পাউছে। তার মুস্তোর মতো দাঁত রান্ধা চোঁটের কঁক দিয়ে মাথো মাথো উঁকি দিচ্ছে। বয় ঘুরছে ট্রি হাতে। সব কিছু পাশ কেটে সোজা চলে গিয়ে লিফটে উঠল মজুর। কিন্তু রজতের ঘরের দরজার বাইরে সন্ধ্যার কবির-ভোর খোঁসে টেবিলটা পেরিয়ে যাবার জন্য পা বাড়িয়েও থেমে পড়ে সরে দাঁড়াতে হলো তাকে। জন তিন চার নারী পুরুষের একটা ছোট দল হৈ হৈ করে বেরিয়ে এলো রজতের ঘর থেকে। বাইরে এসে দাঁড়িয়ে রজতের ঘরের উদ্দেশে বলল—নাইট ইজ স্টিল ইয়ং—ওহো, রজত নিবেদ জারি করেছে তো নিজেদের ভেতর ইংরেজী বলায়। বুঝলে রজত, রাত্রি এখনও নবীন—আবার আসছি আমরা।

জবাব এলো ভেতর থেকে—ও, সিওর।

—সিওর নয়, বলো নিশ্চয়। সকৌতুকে পাল্লাটা ঠেলে ঘরের ভেতর ডাক দিয়ে কথটা বলতে গিয়ে, 'সরি' বলে মাথা টেনে হো হো করে হেসে উঠল। তারপর হাগির রোল তুলে চলে গেল সবাই লিফটের দিকে।

ওরা লিফটে উঠে না যাওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে রইল মজুর অপেক্ষা করে। এখানে ওবর বিশ্রামের জন্য ওরা ঘরটা কিছুক্ষণের জন্য খালি করে দিয়ে গেল। ভাগ্যটাকে একটা ধন্যবাদই দিয়ে ফেলল মজুর।

কিন্তু কোথায় যে সত্যিকারের ভাগ্য, তা যদি মানুষ বুঝতে

পারতো তবে তো, কথাই ছিল না। মজুর লোকটির রক্তের ঘরের ভেতর মাথা ঢুকিয়েই 'সরি' বলে মাথা বের করে এনে হো হো করে হেসে ওঠার কারণটা ধরে উঠতে পারেনি। নিশ্রয়োজন বোধে তাই চৌকাতোকা না দিয়েই দরজার ভারী নিঃশব্দ পাল্লাটা ঠেলে একবারে ঘরে ঢুকে পড়লো ল। কিন্তু ঢুকেই হকচকিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হলো মজুরকে।

রজতের ডবল শ্রীংএর খাটের ডানলোপী গদীর ভেতর শরীর তুলিয়ে দিয়ে অর্ধশায়িত ভাবে বসে আছে একটি মেয়ে। তার সিগারেট ধরা অলস হাতটা শিথিল ভাবে পড়ে আছে খাটের বাইরে। বোধ হয় রজতের শরীরে বাতে না লেগে যায় সে জঙ্কই হাতটা দূরে রেখেছে মেয়েটি। রজতের দুহাত বেঁটন করে আছে মেয়েটির খালি কোমর। মুখটা মেয়েটির মুখের উপর।

কি করে বেরিয়ে যাবে ঠিক করে উঠবার আগেই মেয়েটির চোখ পড়ে গেল মজুর দিকে। রজতের মুখটা হাত দিয়ে সানাজ ঠেলে দিয়ে, নেশাশ্রুত শরীর এলিয়ে দিল সে—বিছানায়।

বললো,—রজত, সাম ওয়ান হাজ কাম। কার আগাটা মেয়েটির মতোই গ্রাফ করলে না রজত। হেমন ছিল শ্রীং তেমনি ভাবে বসে থেকে—শুধু মাথাটা পেছন দিকে ঝুলিয়ে দিয়ে স্মৃতির সঙ্গে টেঁচিয়ে উঠলো সে—হালো, কে ?

বেরিয়ে যাওয়া হলো না মজুর। থাকতে হলো দাঁড়িয়েই।

—মজুর! মেয়েটিকে ঠেলে সবিয়ে হাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো—রজত বিছানা ছেড়ে। বিমূঢ় মজুর দিকে তার মাতাল চোখ দুটোও কিছু সময় তাকিয়ে রইল বিমূঢ় হয়ে। তারপর পা টলা পায় এগিয়ে কয়েক পা এগিয়ে গেল মজুর দিকে—আঃ মজুর, তুমি—তুমি এখন এখানে এসেছ কেন ? এখন—এখন তোমাকে আমি কোথায় বসাবো, কি করে তোমার সঙ্গে কথা বলবো ? না—না। তুমি এখন চলে যাবে মজুর। কথাগুলো—আদ্যক বোনা গেল। আদ্যক চাপা পড়ল তার ভারী জীবের তলায়।

চলো, তোমায় এগিয়ে দিয়ে আসি। চলতে গিয়ে কোঁচের পিঠ ধরে টাল সামলালো। তারপর বললো—চলো।

হঠাৎ সোজা হলো মজুর।

—চলো।

—না।

লাল চোখ দুটো তুলে বিম্মিত ভাবে মজুর দিকে তাকালো রজত—যাবে না বলছ ?

মজুর মাথা নেড়ে জানালো। হ্যাঁ সে তাই বলছে।

বিহ্বল কণ্ঠে রজত বললো—কি কসব ?

মজুর মুখের বিমূঢ়তা কেটে গিয়ে এখন যেন সেখানে বিছাৎ খেলছে। বললো—বসবো।

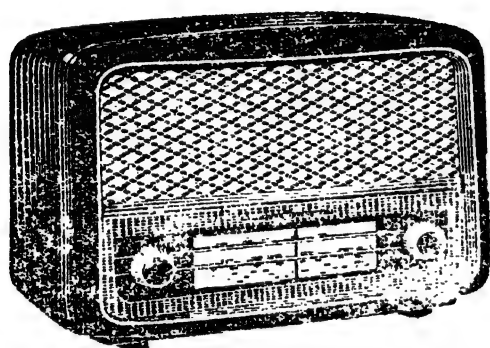
[ক্রমশঃ]

A bad book is as much of a labour to write as a good one—it comes as sincerely from the author's soul.

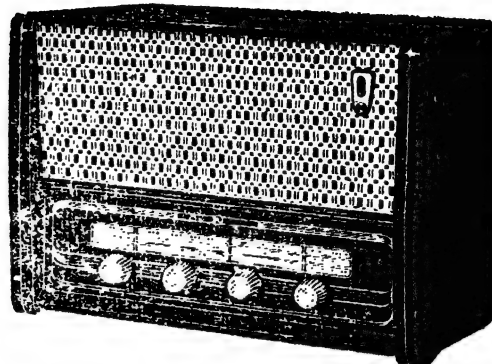
—Aldous Huxley

কাজে গেরা ও দামে সুবিধে ব'লেই ছাশনাল-একো রেডিও এবং ক্লিয়ারটোনের জিনিস বিখ্যাত। আর তা-ও এত বিভিন্ন রকমের পাওয়া যায় যে আপনার যেমনটি চাই বেছে নিতে পারবেন।

নেড়িও



হাস্যনাল-একো রেডিও মডেল ইউ-৭১৭-এসি/ডিসি; ৫ ভোল্ট, ৩ ব্যাণ্ড, হাস্যনাল-একো-র বড় সেটের মত অনেক বিধি-ব্যবস্থা এতে আছে।
মনসুমাইজুড় ২৫০ টকা



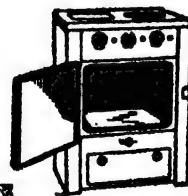
ফাশনাল-একো মডেল ৭২২-এসি অথবা এসি/
ডিসি ; ৬ ভালভ, ৩ ব্যাণ্ড ; খুব ভাল কাজ দেয় ;
এই ধরনের রেডিওর মধ্যে সেরা ।
মনঃস্থত হইল

ক্লিয়ারটোন
বৈজ্ঞানিক
ওয়াটার হীটার—
কল ঘুরালেই গরম জল
পাওয়া যায় : ৫ থেকে
১০ গ্যালন জল ধরে

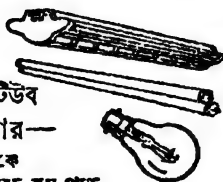
ক্লিয়ারটোন
সিংক্রোনাস
বৈদ্যাতিক
দেওয়াল ঘড়ি—
অসাধারণ নির্ভরযোগ্য
৭ রকম সাইজে এবং স্থানীয়
স্থানীয় রঙে পাওয়া যায়



ক্লিয়ারটোন
কুকিং রেঞ্জ—
দুটো মেট দেওয়া
উম্মন, প্রত্যেকটির
আলাদা নিয়ন্ত্রণ
ব্যবস্থা আছে।
শক্তি ৫.০০০ ওয়াট পর্যন্ত



ক্লিয়ারটোন
বাতি,
ফ্লুরোসেন্ট টিউব
এবং ফিল্মচার—
পরিষ্কার স্বচ্ছকে
আলো অথচ খরচ কম পড়ে



ক্লিয়ারটোন
ঘরোয়া ইন্ড্রি—
ওজন ৭ পাউণ্ড;
২৩. ভোল্ট—
৪৫. ওয়াট; খুব
পুরু ক্রোমিয়াম
কপাই করা



ক্লিমারটোন
বৈজ্ঞানিক
কেটলি—
ক্রোমিয়াম কলাই করা ;
পাইট জল ধরে ;
২৬০ ডোন্ট—৪০০ ওয়াট



জেনারেল রেডিও অ্যান্ড অ্যাপ্লায়েন্সেস প্রাইভেট লিমিটেড

৩, ম্যাডান স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ • অগেরা হাউস, বোম্বাই-৪ • ১/১৮, ম্যাউন্ট
রোড, মাদ্রাস-২ • কেকার রোড, পাটনা • ৩৬/৭২ সিলভার জুবিলী পার্ক রোড
বাক্সলোর • বোম্বাইয়ার • হাটহাট চক, দিল্লী • রাইসপতি রোড, সেকেন্দরাহাট



ভগ্নানী মুখোপাধ্যায়

একত্রিশ

বার্ণার্ড শ' দারুন ইনসমনিয়া বোগে আক্রান্ত হলেন। কেউ বললেন—হাকালো উড়ে বেড়িয়ে আমি আনন্দে আছি, ভূমিও তাই করো। আকাশ ওড়া তখন নতুন চালু হয়েছে। আরো অনেক প্রস্তাব এস। টি. ই. লরেন্স (লরেন্স অব এ্যাপলিয়া) বার্নার্ড শ'র দ্বীকে বললেন, যে আরব দেশে আকৃতি পরিচয় বদলাতে হয়েছিল গোলমালের সূত্রপাতে, তার ফলে অনিচ্ছা সেক্ষেপে গোল।

বার্নার্ড শ' একথা শুনে বললেন—তাহলে তোমাদের কি ঠিক। যে আমি লাড়ি কামিয়ে সাতার বাতুলারের ধর্মটা গ্রহণ করি? সে কাজে আমার তেমন যোগ্যতাও নেই।

প্রফেসর আলবার্ট আইনস্টাইন একটা নতুন প্রস্তাব দিলেন। তিনি বললেন—চিন্তা করা এবং না করার মধ্যে দীর্ঘ বিরতি থাকা প্রয়োজন। সোজা খাড়া হয়ে দাঁড়ানোটা যেমন অস্বাভাবিক চিন্তাও তাই। তাইত মানুষ চিন্তা করতে চায় না। আইনস্টাইন বললেন—প্রচুর পরিশ্রম করুন। শরীরিক পরিশ্রম প্রয়োজন। কাঠ চেলা করুন করাত দিয়ে, মেঝে পরিষ্কার করুন, কিংবা বাগানের মালীর কাজ শুরু করুন।

বার্নার্ড শ' প্রস্তাবটি ভেবে দেখলেন। তাঁর মনে হল আইনস্টাইনের কথাগুলি যুক্তিসঙ্গত। তবে আইনস্টাইন এ কথা হৃদয় ভেবে দেখেন নি দাসী-চাকর বা মালী হইত কর্ম পরিবর্তনে রাজী হবেন। এই কারণেই ধনীত্বের জন্ত নানাবিধ খেলাধুলা ব্যবস্থা।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে শ্রান্ত হোটেলের সম্বন্ধনা ভোজে বার্নার্ড শ'কে আইনস্টাইনের স্বাস্থ্য প্রস্তাব করার অনুরোধ জানানো হল। বার্নার্ড শ' সানন্দে এই কর্মজীবের গ্রহণ করেছিলেন। দার্শনিক শিল্পী (Artist Philosopher) গাণিতিক শিল্পীকে (Artist Mathematician) সন্মান প্রদর্শন করবেন। বার্নার্ড শ'র ধারণা ছিল দীর্ঘকাল ধরে যে সমস্ত বিজ্ঞানীরা পলীক্স-চিকীক্স করে চলেছেন, ও

কবি ও কলাবিদরা তাদের চেয়েও অগ্রগামী। ধর্ম নিয়তই অজ্ঞাত আর বিজ্ঞানকে সব সময়েই ভুল প্রমাণ করা যায়।

বার্নার্ড শ' ভাবলেন, Back to Methuselah নাটকে যেখানে তিনি বলেছেন—When a man is mentally incapable of abstract thought he takes to metaphysics; and they make him a professor. when he is incapable of conceiving quantity in the abstract he takes to mathematics; and they make him a professor.

এই সম্বন্ধনাসভার সভাপতি ছিলেন লর্ড রথসচাইল্ড, তিনি বললেন—আচ্ছা মিঃ শ', আপনি আর আমি আমাদের যথাসর্বস্ব যদি দরিদ্রদের দিয়ে দিই তাহলে সকলের জীবনযাত্রা সহনীয় হয়ে উঠবে?

বার্নার্ড শ' বললেন—জানেন, আমার কোথায় অপত্তি! আমার অপত্তি দরিদ্র তাঁর যথাসর্বস্ব ধনীর হাতে তুলে দেওয়ায়। যা অর্থনীতি হিসাবে ক্রটিপূর্ণ, ধর্ম হিসাবেও তার ক্রটি থাকবে।

—মিঃ শ', আপনার ধর্ম কি? ঠিক যা বলুন?

—আপনারও যা আমারও তাই। আমিও বাইবেল পড়ে মতামানবের আদির্দাবের আশায় বসে আছি।

লর্ড রথসচাইল্ড চোখ ছোট করে বললেন—আপনার হিসাবে গিনি 'ত' এসেই গেছেন।

শ' সেদিনকার সম্মানিত অতিথির দিকে ফিরে বললেন—দেখুন প্রফেসর আইনস্টাইন, আমার এটা প্রশ্নটা আমি বহু বৈজ্ঞানিককেই করেছি, যদি দেখেন আপনাদের থিয়োরীর সঙ্গে আসল ঘটনার পার্থক্য অনেক তাহলে কি করেন? প্রশ্ন করার সঙ্গে নিজেই উত্তর দেন—আসল ঘটনা যদি খাপ খাইয়ে নিতে না পারে তাকে বাদ দেওয়াই উচিত।

আইনস্টাইন হেসে বললেন—বহু! দুঃখের বিষয় আপনার ধর্মব্রতী ব্যক্তিগি বা বিজ্ঞানী বা কলাবিদ কেউই তর্ক করার অবসর পাবেন না। তাছাড়া তারা সবাই হয়ত একই ব্যক্তি।

—তাহলে তাদের জন্ত অপেক্ষা করবে, শুধু সেই কারণেই নয়, উপযুক্ত কথার জন্তও বসে থাকবে। মানুষকে তাদের চিন্তা সম্পর্কে সচেতন করার দায়বাহীন দায়িত্বটুকুও আমি নিজের ঘাড়েরে নিয়েছি।

আইনস্টাইন আগার হাসলেন, বললেন—সে কর্ম আপনি ভালোভাবেই করেছেন—তাতে তারা এমনভাবে কথা বলে, মান হয় তার পৃথিবীতে সর্ব শ্রুতি চিন্তানায়ক।

সকলে অটহাস্ত করে উঠলেন। বার্নার্ড শ' এই সময় যে নাটকটি লিখছিলেন টি. ই. লরেন্সের চরিত্র সেই নাটকে রূপায়িত করেছিলেন, বার্নার্ড শ' তাঁর সব পরিচিত চরিত্রকেই এই ভাবে অমর করেছেন, তবে রঙ চড়িয়েছেন অনেক বেশী। এই নাটক কিন্তু সম্পূর্ণ হল না, তার আগেই রাশিয়া যাওয়ার একটা সুযোগ ঘটল।

লর্ড লেথিংহাম ও লেডী এ্যাষ্টর প্রভৃতি রাশিয়া বাজিলেন, তাঁরা বার্নার্ড শ'কে আমন্ত্রণ জানানলেন। তাঁরা জানতেন, শ' রাশিয়া দেখে খুশী হবেন। তেমনই রাশিয়াও খুশী হবে বার্নার্ড শ'কে চক্ষু দেখে। বার্নার্ড শ' যেন কার্ল মার্কস ও লেনিনের সংযুক্ত সংস্কার। এর ফলে বার্নার্ড শ'র সম্মানও কিঞ্চিৎ প্রতিফলিত ঘর্ষা লাভ হয়ত ঘটানোর সঙ্গেও দেখা হবে যেতে পারে।

সার্লেট এলেন না এই তীর্থযাত্রায় তবে বার্ণার্ড শ'কে বার বার বললেন—সেলিনের বিধবা স্ত্রী ক্রপস্কায়া'র সঙ্গে যেন দেখা করা হয়।

এয়াররা সঙ্গে প্রচুর টিনের খাবারের বসদ সংগ্রহ করলেন, যেন দুর্ভিক্ষের দেশে চলেছেন। বার্ণার্ড শ' কিন্তু নিজের পোষাক পরিচ্ছদ ছাড়া আর কিছুই সঙ্গে নিলেন না, তিনি ইংলেণ্ডে অনেক রাশিয়ার দেখেছেন, তাদের থানা খেয়েছেন, আর কালো কুটিও তিনি পছন্দ করতেন, ছোটবেলার আইরিশ বাদামী কুটিও তাঁর অপছন্দ ছিল না।

আশ্চর্য কাণ্ড, বার্ণার্ড শ'র সহচরবৃন্দ মস্কো শহরের হোটেল দেখে তাজ্জব! তাদের যুরোপীয় থানা আরো তাজ্জব! মস্কো শহরের সেই সেই হোটেল তখন মার্কিন ভ্রমণকারীতে খোঁকাই।

আগমনের পূর্বে শুধু বার্ণার্ড শ'র কথাটাই রাশিয়ান সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। বার্ণার্ড শ' যেন 'মানবীয় বিদ্রোহবস্ত্র' তাঁকে বলা হচ্ছিল, Human Dynamo। রুশ দেশের মাপকাঠিতে এই সর্বোচ্চ সম্মান। যে শ্রেষ্ঠ উৎপাদক এবং আরো উৎপাদনে সক্ষম তাকেই আদর করে এই কথা বলা হয়। বার্ণার্ড শ' এই সব লক্ষ্য করে থাকতেন।

বার্ণার্ড শ'কে প্রকাশিত 'ইল অব মোবেলস'এ সম্বন্ধে জ্ঞাপন করা হল। তাঁকে ওপেরা, ব্যালে, বক্তৃতা ও ভোজসভায় আপ্যায়িত করা হল।

বার্ণার্ড শ'র সঙ্গে মঃ লিটভিনফের দীর্ঘ দিনের পরিচয়, তিনিই সর্বত্র দোভাধার কাজ করলেন।

বার্ণার্ড শ' বলতেন—সারভাইভাল অব এন্ডি ফিটেট বা যোগ্যতমের জর হিসাবেই ষ্ট্যালিন তাঁর মর্যাদা ও ক্ষমতালভ করেছেন, অত্যন্ত দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্ত ও সংকটময় কালের মধ্যে তাঁকে অতিবাহিত করতে হয়েছে, নবীন সভ্যতার প্রসব বেদনার সমস্ত অসুবিধা তাঁকে ভোগ করতে হয়েছে। তাই ষ্ট্যালিনের সঙ্গে সাক্ষাৎকারকে তিনি জীবনের শ্রেষ্ঠতম মুহূর্ত বলে স্বীকার করেছেন।

বার্ণার্ড শ'র স্তম্ভবাদ অত্যন্ত সমর্থদার শ্রোতার মত হাশ্রুখে শুনলেন জোসেফ ষ্ট্যালিন।

বার্ণার্ড শ' অতি ভীষণলায় বললেন—বা দেখছি, বা শুনেছি, বা পেয়েছি তুলনা তার নাই, আমি বাধ্যতামূলক প্রমদান এবং বাধ্যতামূলক ব্যবস্থায় আপনার রাষ্ট্রনীতির প্রবর্তন সমর্থন করি। এই সব ঘটনা এখনই ছেড়ে দেওয়া চলে না।

ষ্ট্যালিন অটোহাস্ত করে বললেন—এটা কি শুধু আমারই নীতি? আপনার নয়?

শ' বললেন—আমার কি ক্রীড বা নীতি তাতে কি এসে যায়? আমি একজন লেখক মাত্র, নব্য সভ্যতার জনক নই। আমি এক ক্ষীণচরিত্র,—জীর্ণ মোমের পুতুল মাত্র।

এর জবাবে ষ্ট্যালিন বললেন—কার্ল মার্কসও এমনই একজন সামান্ত লেখক মাত্র। অথচ কার্ল মার্কস না থাকলে আমরা প্রতিপদেই হয়ত ভুল করতাম। আমরা লেখক চাই, আমাদের মতবাদ প্রচারের সহায়তায় প্রয়োজন লেখকদের। ঠিক এই মুহূর্তে আপনার হস্তরসের জন্ম হয়ত আমরা প্রস্তুত নই, তবে আবার একদিন হয়ত হাসতে পিথব।

শ' বললেন—আমাদের দেশে এখন কোনো সমস্তার সুযোগ

হতে ভয় পাই তখন আমরা তা হেসেই কাটিয়ে দিই। এখানের মানুষ জীবনের সমস্তার সুযোগ সুবিধা এসে কাড়িয়েছে, তাই তাদের জীবনে এখন হাসি অবসর নেই। আমার কবি-বন্ধু টমাস হার্ডি একটি চমৎকার পেনটিং নষ্ট করে ফেলেছিলেন, তাতে তাঁর হস্তরস অবস্থা রূপায়িত করা হয়েছিল।

ষ্ট্যালিন বললেন—আমাদের জীবনে তিনজন সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক আমরা পেয়েছি—লিও টলষ্টয়, চার্লস ডিকেন্স, জর্জ বার্নার্ড শ'। টলষ্টয় ধর্মের চাপে পড়েছিলেন এটা পরাভূত হয়েছিলেন। ডিকেন্সের ক্রটি তাঁর সেনটিয়েনটালিজম আর আপনি—এখনও আপনি বংশে নবীন, কিসের চাপে পড়ে যে আপনি স্বপ্নমুগ্ধ করেন তা আমার এখন বলা সাজে না।

ছোট ছেলে যেন পুরাতন হেণ্ডম্যানের মতো প্রকাণ্ড বিগলিত হয়ে পড়ে, যাকে সে প্রতিদিন মনে মনে ঈশ্বর দান করেই তাঁর মানবিক রূপ দেখে বিস্মিত হয়, ষ্ট্যালিনেরও সেই অশ্রু। যে বার্নার্ড শ'কে মনে মনে এতদিন পূজা করেছেন, তার খড়্গডানো মূর্তি দেখে এটু যেন আনমনা হলেন।

রাশিয়া সম্পর্কে বার্নার্ড শ'র মনোভাবী কিন্তু অতিশয় সংবেদনশীল, তিনি যা কিছু দেখেন তাই তাঁর কাছে বিষয় ও চমৎকার! ভালো ছাড়া আর কিছুই তিনি দেখেন নি। কাবখানা দোকান প্রভৃতি সর্বত্রই তিনি সম্মানিত হয়েছেন। সর্বত্র রাশিয়ার মানুষ তাঁকে অন্তরঙ্গ ভাবে বরণ করেছে, অতিশয় সম্মান প্রদর্শন করেছে। তাঁর মধ্যে ছিল যথেষ্ট অনাড়ম্বর আন্তরিকতা।

যে সমালোচক প্রতিদিন সব কিছুই উপহাস করে কাটিয়েছেন তাঁকে এখন নতুন শব্দ সৃষ্টি করতে হয়, যে শব্দ প্রশংসা ও প্রশস্তি।

অসুবিধা হল সেলিনের স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার সন্য। বার্নার্ড শ' অসুবিধাটা বেশী করে অনুভব করলেন। ক্রপস্কায়া শুনেছিলেন যে বার্নার্ড শ' অতি দুর্বিনীত প্রতিক্রিয়াল (illmannered reactionary) মানুষে পরিবর্তিত হয়েছেন। একদা সেলিন ঠাঁকে বলেছিলেন—A good man fallen among Fabious

ডাঃ বসুমতা

মেমোরি কার্ডিয়েল

নারীর স্বাস্থ্য, শক্তি
ও সৌন্দর্য বর্ধন করে

প্রথম প্রস্তুতকারক:

ডাঃ বসুমতা ল্যাবরেটরী লিঃ
কলিকাতা-৯

সেই ব্যক্তি সংবাদপত্রের রিপোর্ট অনুসারে সেই ব্যক্তি A bad man fallen among Tories হয়ে গেছেন।

সেলিনের জীব এই ধারণার আরও দৃঢ় করার কারণ বার্নার্ড শ'র এই নতুন রাশিয়ার তীর্থযাত্রার সঙ্গীত সবাই সোশালিস্টদের বিরোধী, এক হিসাবে শত্রু বলা চলে।

অবশেষে ক্রপসকারা তাঁর কুটারে বার্নার্ড শ'র সঙ্গে চা পানে রাজী হলেন। এই দিন বার্নার্ড শ' অতিশয় বিস্মিত হলেন। তিনি আশা করেছিলেন, এক কুদর্শনা জীলোককে তিনি দেখবেন এবং তাঁর সঙ্গে অবাস্তব তর্ক করতে হবে। যথাস্থানে পৌঁছে দেখলেন, ক্রপসকারা অতি মধুর চবিরের মমতাময়ী মানুষ! ক্রপসকারা এক সময় বার্নার্ড শ'কে বললেন—এই পরিচালনা-সংস্কার-বর্জিত দেশে এই দীর্ঘ নির্বাসনে আপনি কি করে এমন হাসিখুসী বজায় রেখেছেন?

বার্নার্ড শ' বললেন—এখানে আনন্দের খোরাক প্রচুর।

লার্লেট রাশিয়া যাত্রার সময় বার বার বলেছিলেন, যেন সেলিনের বিধবা জীব সঙ্গে দেখা করা হয়। সামাজিক রীতি অনুসারেই বার্নার্ড শ' তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য ব্যস্ত হয়েছিলেন। সহযাত্রীরা অবশ্য ষ্ট্যালিনের সঙ্গে দেখা করার জন্যই উদগ্রীব।

ক্রপসকারার দিক থেকে কোন আপত্তি না হলেও, একটা না একটা ছল-ছুতার এই সাক্ষাৎকার পিছিয়ে দেওয়া হচ্ছিল। বার্নার্ড শ' অবশেষে বুঝলেন না দেখা করারই চেষ্টায় এই সব আয়োজন।

কখনো বলা হয় ক্রপসকারা অতিশয় অস্বস্থ, কঠিন সর্দিতে ভুগছেন। তাঁর বয়স হয়েছে, নির্জনবাস পছন্দ করেন। এই সময় বিস্কট করা উচিত হবে না। তা ছাড়া তিনি মস্কো শহরে বাস করেন না। গ্রামে অরণ্য অঞ্চলে আছেন। মোটেরে সেইখানেই বাঙালার ব্যবস্থা করলেন শ', আজ শোনা গেল তিনি মস্কোতে আছেন।

অবশেষে বার্নার্ড শ' গৌ ধরে বসলেন আমি বাবই। দেখা না হয় না হবে, একখানি বই তাঁকে পৌঁছে দেওয়ার কথা, বইটি আর আমার নামের কার্ড দরজায় রেখে চলে আসুক। সেই দরজা যেখানেই হোক।

লেডী এষ্টর গুনলেন, ষ্ট্যালিনের সঙ্গে ক্রপসকারার দাঙ্গা মজারিখ, শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে। সেই বিরোধ এমন জয়গায়

পৌঁছেছে যে ষ্ট্যালিন নাকি বলেছেন—অল্প কাউকে সেলিনের জীব সাজিয়ে কাঁড় করিয়ে দেবেন। সেই হবে সেলিনের সহকারী জীব। এমন মুখরোচক সংবাদ পেয়ে লেডী এষ্টর বললেন—সেলিনের বিধবা ক্রপসকারাকে না দেখে আমি মস্কো থেকে এক পা নড়ছি না।

সহসা সব কিছু ওজর-আপত্তি কোথায় অদৃশ্য হল! দিন স্থির হল এবং সেলিনের জীব কুটারে একদিন সদলবলে যাত্রা করলেন।

কুটার নয় একেবারে প্রাসাদ। ক্রপসকারা তাঁদের এমন অভ্যর্থনা জানালেন যে একথা বিশ্বাস করা অসম্ভব হল যে তিনি নির্জনতা পছন্দ করেন, নিঃসঙ্গ জীবনের পক্ষপাতী। ক্রপসকারার প্রাসাদের সহচর সহচরীর সংখ্যা অনেক। হৃদমণীয় বার্নার্ড শ'কে স্বচক্ষে দেখে তিনি অতিশয় প্রীত হলেন বোঝা গেল। ষ্ট্যালিন সম্পর্কে একটা কথা হলনা।

আসল কথা, ক্রপসকারাই এতদিন আপত্তি করছিলেন, তাঁর ধারণা হয়েছিল বার্নার্ড শ' একজন হৃদান্ত, অভাব্য, অসামাজিক মানুষ। বার্নার্ড শ' ক্রপসকারার অগ্নি লাভণ্যময়ী মূর্তি দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন। তিনি বলেছেন—একঘর ছেলেমেয়ের মধ্যে যদি ক্রপসকারাকে ছেড়ে দেওয়া যায়, তারা সবাই এই গণেশজননীকে ঘিরে ধরবে। এমনই জননীমূলভ মনোময় আকৃতি ক্রপসকারার।

বার্নার্ড শ' রাশিয়া থেকে ফিরে এসে সবাইকে বললেন—রাশিয়ার মানুষ অতিশয় সচেতন এবং সজীব। নতুন আদর্শ গ্রহণ করতে তাঁরা মন উন্মুক্ত রেখেছেন—ফেবিয়ান আইডিয়া তাঁরা পছন্দ করেন।

বার্নার্ড শ'র কথা শুনে ওয়েবদম্পতি উৎসাহিত হয়ে রাশিয়ার ছুটলেন স্বচক্ষে সব দেখার জন্য। তাঁরা ফিরে এসে লিখলেন Soviet Communism, A New Civilization.

বার্নার্ড শ' বলেছেন—রাশিয়ান বিপ্লবের জনক এক হিসাবে আমি। সর্বদাই আমি তাই মনে করি। আমি ১৯১৪—১৮ র যুদ্ধের সময় বলেছিলাম—সৈন্যদের পক্ষে সবচেয়ে সংকর্ম হবে তাদের অফিসারদের গুলী করে মেরে বাড়ি করে যাওয়া। রাশিয়ানরাই একমাত্র সৈনিক ধাঁরা আমার সেই সহপাঠ্য শুনেছিলেন।

বার্নার্ড শ' তাই রাশিয়া, এন্গের সব পেয়েছির দেশ দেখে আনন্দে, আবেগে, উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথও প্রায় সেই কালেই বলেছেন—“রাশিয়ায় না এলে আমার এ জীবনের তীর্থযাত্রা অসম্পূর্ণ থেকে যেত।” [ক্রমশঃ।]

আখিনের ভোর

পার্বকুমার চট্টোপাধ্যায়

এখন এখানে শুধু কাঁচা রোদ করিতেছে ভিড়
অনেক বর্ষণ-শেষে উঁকি দে'ছে সোনালী দিন।
প্রভাতের একতারা বাজাতেছে ভৈরবীর মীড়
এ ক্লাস্ত প্রাণের তীরে তরী নিয়ে এসেছে আখিন।

আমার হৃদয় চলে কাশকুল ব্লাতেছে পাখা
সবুজ ঘাসের জাগ প্রাণভরে নেয় রাজহীস।
শিশিরের জমা অক্ষ মুছে কেনে জিয়লের শাখা
এ আখিন নিয়ে আসে জীবনের গভীর আশাস।

শিউলিফুলের আজ পথিকেরে জানায় স্বাগত
কুমারী সী'থির মত ধূলোভরা পথের দু'ধারে।
কচি কচি ধানচারা হাওয়া লেগে হয় অবনত
সবুজের ছোঁয়া লাগে আকাশের বৃকে বারে বারে।

এখন নদীর তীরে শাখকেরা করিতেছে খেলা
কড়িওরা খুশীমনে হেথা-হোথা ইতি-উত্তি ঘোরে।
প্রথম বোদের 'গরে শালিকেরা জমারেছে বেলা
পৃথিবীর বত ক্রন্দ মুছে গেল আখিনের জোরে।



শীত ফাইনাল অনিদিষ্ট কালের জন্য স্থগিত

ভারতের অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ ফুটবল প্রতিযোগিতা আই, এফ, এ. শীতের ফাইনালে মোহনবাগান ও ইষ্টবেঙ্গল দলের খেলা নিয়ে এবারও জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। বর্তমানে অনিদিষ্ট কালের জন্য শীতের ফাইনাল খেলা স্থগিত রাখা হয়েছে। আই এক এ বাঙ্গালা তথা ভারতের প্রাচীন ক্রীড়া-সংস্থা। কিন্তু বর্তমানে এই সংস্থা তাদের ঐতিহ্য হারাতে বসেছে বললে বোধ হয় অত্যন্ত হবে না। এর সন্তাও বিলম্ব হবার উপক্রম হয়েছে। এখন তাদের বড় বড় ক্লাবদের মজির উপর নির্ভর করে চলতে হয়। আই, এফ, এ'র পরিচালনা পদ্ধতিতে ঘন ঘরে আরম্ভ করায় শীতের আকর্ষণ বিশেষ ভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। একদিন শীতে যোগদান বাইরের নামকরা দলের কাছে একটা বড় আকর্ষণ ছিল। কিন্তু এখন দাঁড়িয়ে ঠিক অল্পরূপ। এখন বাইরের কোন নামকরা দল যোগদান করতে রাজি হয় না। কেন দিন দিন শীতের আকর্ষণ কমে যাচ্ছে? এ নিয়ে আলোচনা করলেই দেখা যাবে—পরিচালক-সংস্থা আই, এফ, এ'র পরিচালক-মণ্ডলীর জট-বিচ্যুতি। ক্রীড়া-সূচী তৈরী করার সময় তাঁদের কারসাজি কারও অজানা নয়। কোন কোন বিশেষ দলকে সুবিধে দেওয়াটা তাদের রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের কেবল কোন রকমে কয়েকটা চ্যাম্পিওন ম্যাচের ব্যবস্থা করার দিকে লোলুপ দৃষ্টি। সব সময়ই কোন রকমে দুটো জনপ্রিয় দলকে ফাইনালে তুলে হু'পসা যোজ্ঞার করার ফন্সি। এদিকে রেফারীর কারসাজি তো আছেই। বর্তমানে দেখা যাচ্ছে, বাঙ্গালা দেশের ফুটবল খেলাটা ব্যবসা ক্ষেত্রে পরিণত হয়ে উঠেছে।

শীতের খেলা এত বেশী পিছিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাতে বাইরের নামকরা দলের পক্ষে যোগদান করা সম্ভবপর হয়ে উঠে না। বারো যোগদান করলো তাদের অবস্থা তো একেবারে সঙ্গীন। পচা বর্ষার জন্য এখানকার মাঠের অবস্থা যেরূপ শোচনীয় হয়ে দাঁড়ায় তাতে করে প্রথম শ্রেণীর খেলা মোটেই চলে না। তাই বাইরের নামকরা দলেরও স্বাভাবিক ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করা সম্ভবপর হয় না। তাদের অভিবোগ যে শীতের খেলার সময় পরিবর্তন হওয়া দরকার।

এবারকার যোগদানকারী বাইরের দলের মধ্যে গুর্খা ব্রিগেডের খেলা সকলের বেশী আনন্দ দিয়েছে। এই দলের সব খেলোয়াড়ই সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। কঠিন পরিশ্রম করার মতন এদের মজবুত গড়ন। খেলা দেখলেই বেশ বোঝা যায় যে এদের খেলার পেছনে শিক্সা আছে, কঠিন অনুশীলনও আছে। গুর্খা দল তিন ব্যাক পথায় খেলতে অভ্যস্ত। এই দলের সকলের খেলাতেই কিছু না কিছু নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া গেছে। তার মধ্যে অলিম্পিক দলে নির্বাচিত মলয় লাকিয়ার খেলা দর্শকদের বেশী ঘরে আনন্দ দিয়েছে।

বাইরের অজ্ঞাত দলের মধ্যে মীরাট থেকে আগত এ, এস, সি, সেণ্টার, পাটনা এথলেটিক এসোসিয়েশন, কটক সামলিত দলের খেলা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এখানকার দলের মধ্যে তরুণ ও উদীয়মান খেলোয়াড় নিয়ে গঠিত এরিসাঙ্ক ও জর্জ টেলিগ্রাফের খেলা প্রশংসার দাবী রাখে। খ্যাতনামা দলের মধ্যে মহম্মেডান স্পোর্টিং সেমি-ফাইনালের খেলায় সকলকে নিরাশ করেছে। বিশেষ করে তারা ইষ্টবেঙ্গল দলের বিরুদ্ধে শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। তবে এই খেলায় ইষ্টবেঙ্গল দল উন্নত ধরনের ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করে। মোহনবাগান সেমি-ফাইনালে এরিসাঙ্কের বিপক্ষে মোটেই তাদের খ্যাতি অনুযায়ী খেলতে পারেনি। তাদের এই খেলা দেখে সকলেই হতাশ হয়েছেন।

এশীয় দলে ভারতের নয়জনের স্থানলাভ

আগামী জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী মাসে এশীয় ফুটবল কনফেডারেশনের আমন্ত্রণে পেরু দল ভারত সমেত প্রাচ্যের নানান অঞ্চলে মোট আঠারোটা ম্যাচ খেলবে। এই দলের বিরুদ্ধে খেলার জন্য এশীয় দল গঠনে জোর তোড়জোড় হচ্ছে। নভেম্বর মাসে কেরালায় এশীয় কাপের পশ্চিমাঞ্চলের খেলার শেষে এশীয় দল চূড়ান্তভাবে গঠন করা হবে। সাময়িকভাবে যে তেত্রিশজন খেলোয়াড়কে বাছাই করা হয়েছে তাঁদের মধ্যে ভারতের নয়জন খেলোয়াড়—খজুরাজ, লতিক, কোম্পায়া, রামবাহাদুর, প্রদীপ ব্যানার্জী, চুনী গোস্বামী, দামোদরন, নেভিল ডি'নুজা ও বলরাম আছেন। অজ্ঞাত বাছাই খেলোয়াড়দের দলে হংকং, জাপান, কোরিয়া, ভিয়েতনাম ও মালয়েশিয়ার প্রতিনিধি আছেন। তবে ইসরাইল, পাকিস্তান ও ইরানের তরক থেকে এ পর্যন্ত কোন খেলোয়াড়ের নাম পাঠান হয় নি।

এরূপজন খেলোয়াড়কে প্রাথমিক ভাবে মনোনীত করে কুয়ালালামপুর অথবা ম্যানিলায় ট্রায়াল খেলার ব্যবস্থা হবে বলে ঠিক হয়েছে।

ডাঃ বিমল চন্দ্রের ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম

সাবাস ডাঃ বিমল চন্দ্র! তোমার সাফল্যে বাঙ্গালা তথা ভারতের সকলেই গৌরব অনুভব করছে। কলকাতার নামকরা সাঁতাক ডাঃ বিমল চন্দ্র ফ্রান্সের উপকূলবর্তী কেপ গ্রিজ লেন থেকে ডোভার পথান্ত ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করেছেন। ডাঃ বিমল চন্দ্রকে নিয়ে আজ পথান্ত হু'জন ভাবতীর এবং তিনজন বাঙ্গালী চ্যানেল অতিক্রমে সমর্থ হয়েছেন। সর্বপ্রথম ভারতীয় ও বাঙ্গালী সাঁতাক মিহির সেন চ্যানেল অতিক্রম করেন। ডাঃ চন্দ্রের সাফল্যে ভারতের অজ্ঞাত সাঁতাকরা চ্যানেল অতিক্রমে উৎসাহিত হোক এটাই সকলে কামনা করে।

ব্রজেন দাসের পুনরায় চ্যানেল অতিক্রম

পাকিস্তানের খ্যাতনামা সীতারূপ ব্রজেন দাস পুনরায় ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করে সমুদ্রগে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছেন। তিনি একই মাসের মধ্যে উভয় দিক থেকে ইংলিশ চ্যানেল পার হন। ইহার পূর্বে ১৯৫১ সালে স্কটল্যান্ডের উইলিয়াম ডালি অল্পবয়স্ক কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন। ব্রজেন দাস ডোভার থেকে সমুদ্রগে আরম্ভ করে ১৪ ঘণ্টার কিছু বেশী সময়ে কেপ গ্রিনজেনজে উপনীত হন। এবার নিয়ে ব্রজেন দাস তিনবার ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করলেন এবং এশিয়ায় মধ্যে প্রথম ইংলিশ চ্যানেল উভয় দিক থেকে অতিক্রম করতে সক্ষম হন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ইহার পূর্বে গ্রেট ব্রিটেনের এডওয়ার্ড টমি, গ্রেট ব্রিটেনের ফিলিপ মিকম্যান, আমেরিকান মহিলা সীতারূপ মিস ক্লোরেন্স চ্যাডউইক, মিশরের হাসান আব্দেল রহিম, ব্রিটেনের টমাস ব্লোয়ার, ইটালীর গিয়ামো গাম্বি, স্কটল্যান্ডের উইলিয়াম বার্নি, আমেরিকার বার্ট টমাস প্রভৃতি উভয় দিক থেকে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করেন।

ভারতীয় দলের ফিল্ডিং খুবই দুর্বল

ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের সম্পাদক সম্প্রতি ইংলণ্ড থেকে ফিরে এসেছেন। তিনি ভারতীয় দল সম্পর্কে বলেন—ফিল্ডিং খুবই দুর্বল হয়েছে। কিন্তু খেলোয়াড়রা ফিল্ডিংয়ে অল্পশীলনে গাফিলতি করেছেন বলে যে অভিযোগ হয়েছে তা সমীচীন নয়। ইংলণ্ড সফরে সরকারী দলকে সপ্তাহে ছয় দিন প্লেসেত হয়। এটা অত্যন্ত ক্লাস্তিকর। বিশেষ করে ভারতীয় খেলোয়াড়রা সাধারণত সপ্তাহে দুই দিনের বেশী খেলতে অনভ্যস্ত নন বলে সপ্তাহে ছয় দিন খেলায় তাঁদের অনেক বেশী ধকল ভোগ করতে হয়েছে এবং ইহা ছাড়া ভারতীয় দলের একাধিক খেলোয়াড় আহত হয়ে পড়ায় তাদের অনুরোধ হয়। কিন্তু বক্তব্য হচ্ছে যে

এই সব অনুরোধ বুঝেই তো ভারতীয় দলের ক্রীড়া-মুঠো তৈরি হয়েছিলো। ভারতে বা কেন বেশী দিন খেলার ব্যবস্থা হয় না। ভারতীয় খেলোয়াড়দের ফিল্ডিং-এর উন্নতির দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয় না; এটাই সকলের প্রশ্ন।

অস্ট্রেলিয়া দলের ভারত সফর

অস্ট্রেলিয়া দল ভারত সফরে আসছে। তারা ১০ই ডিসেম্বর পাকিস্তান থেকে দিল্লীতে পৌঁছাবে। পাঁচটা টেস্ট ম্যাচ ও দুটা প্রদর্শনী খেলায় বোগদান করে ২৯শে জানুয়ারী স্বদেশ যাত্রা করবে। তারা দিল্লীতে (প্রথম), কানপুরে (দ্বিতীয়), বোম্বাইতে (তৃতীয়), মাদ্রাজে (চতুর্থ) ও কলকাতায় (পঞ্চম) টেস্ট ম্যাচ খেলবে।

১৯৬০-৬১ সালের শীতের মরশুমে পাকিস্তান ক্রিকেট দল ভারত সফরের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছে।

খ্যাতনামা ক্রিকেট খেলোয়াড় শ্বিথের মৃত্যু

ওয়েস্ট ইন্ডিজের টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় ও'নীল গার্ডন শ্বিথ বা কোলি শ্বিথ হাসপাতালে মারা যান। সম্প্রতি তিনি এক মোটর দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স মাত্র ২৫ বৎসর হয়েছিল। তাঁর সঙ্গে গারফিল্ড সোবার্স, টম ডিউডগেও আহত হন। স্ট্রাকোডশায়ারের কাছে রাস্তার তাঁদের মোটরের সঙ্গে ১০ টনের এক মালগাড়ীর সংঘর্ষ হয়। তিনজনে চারিটা খেলার জন্য এক মোটরে বাসছিলেন। কোলি শ্বিথ একজন উদীয়মান চৌধুরী ক্রিকেট খেলোয়াড়। তাঁর অভাব ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলকে বিশেষভাবে অনুভব করতে হবে।

শ্বিথ মোট ২৬টি টেস্ট ম্যাচ খেলেছিলেন। তাতে মোট রান-সংখ্যা দাঁড়ায় ১৩৩১ রান ও গড়পড়তা দাঁড়ায় ৩১.৩৯ রান। এ ছাড়া বোলিং করেও ৪৮টি উইকেট পান।

ভয়

(জার্মান কবি Peter Baum-এর কবিতা Horror অবলম্বনে)

মাঝে মাঝে এই কথাটাই হয় মনে,
তোমার আঁখি, তোমার যেন কেশ
আনছে দ্রুত ক্ষয় মনে।
শঙ্কিত হই, কল্পিত হয় হাত!
যেন আসে রাত,
ওষ্ঠে ফোটে তিক্ত গ্রানি
চূর্ণ ভাবাবেশ!
সাঁঝের পাখি—যমজ পাখি
পালিয়ে গেল রে,
গলিত কি পলিত পাখা
আলিয়ে গেল রে।
কাগা আসে চক্ষু ছেঁয়ে
মিলার রাতা যেন।

অনুবাদ : মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়



সাহিত্য পরিচয়

উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক বই

নীল আকাশ

লক্ষ্য প্রতিষ্ঠা কথাসিঁদুরী অচিত্তাকুমার সেনগুপ্তের অবদান বাংলা কবিতার ক্ষেত্রেও সামান্য নয়। তাঁর নীল আকাশ কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশের পর বিপুল সমাদরে বিভূষিত হয়েছিল। দীর্ঘদিন পর বর্তমানে এই গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ হয়েছে। এই গ্রন্থে অচিত্তাকুমারের বত্রিশটি কবিতার বস আদ্বাদনে পাঠক সাধারণ সমর্থ্য তবেন। অচিত্তাকুমারের কবিতাগুলি যেমনই বৈশিষ্ট্যমান, তেমনই বৈচিত্র্যপূর্ণ। কবিতাগুলির মধ্যে কবির বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী, তীব্র অনুভূত ও অপূর্ণ প্রকাশভঙ্গীর পরিচয় মেলে। কবিতাগুলির আবেদন অন্তরকে বিশেষভাবে স্পর্শ করে। সত্য-শিব-সুন্দরের বর্ণনায় কবির মন-প্রাণ নিরোজিত, কপটতা, জড়তা ও যান্ত্রিকতা তাঁর অসহ্য, কবিতাগুলি যেমনই জোড়ালো, তেমনই স্পষ্ট, যেমনই বেগবান, তেমনই আবেগমণ্ডিত, যেমনই হৃদয়স্পর্শী, তেমনই প্রতিভাদীপ্ত বসন্তনাথের এবং শব্দ-চন্দ্রের উদ্দেশ্যে লেখা যথাক্রমে তিনটি ও দুটি মোট পাঁচটি কবিতা এই গ্রন্থের মধ্যে যুক্ত হয়ে সমগ্র গ্রন্থের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান ম্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ। ১০ গান্ধী রোড। দাম—দু' টাকা মাত্র।

ধীরপ্রবাহিনী ডন

জগৎ প্রসিদ্ধ সাহিত্যগ্রন্থগুলির মধ্যে “কোথাওটো ফ্লাস দি ডন” অত্যন্ত। এর স্রষ্টা মিখাইল শলোখফ-এর স্বজনী প্রতিভার ছাপ এর পাতায় পাতায় ফুটে ওঠে। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যগ্রন্থগুলির দ্বারা শলোখফ-এর জন্মে যে একটি বিশেষ স্থান নির্দিষ্ট এই বিষয়ে বিমত হবার কোন কারণ থাকতে পারে না। উপগ্রাসখানি চার খণ্ডে সমাপ্ত। লেখকের চোদ্দ বছরের সাধনার ফল। ডন নদের তীরে তীরে দুর্গম কশাকদের কেন্দ্র করে উপগ্রাসটি রচিত। তাদের বিভিন্ন প্রাণ-চঞ্চল্য, হৃদয় জীবনাবেগ এবং বিপ্লবের পর সর্বনাশা গৃহযুদ্ধের পব সেই জীবনের এক বিরাট রূপান্তরই উপগ্রাসটির মুখ্য উপজীব্য। বাংলায় এই গ্রন্থটির অনুবাদ করেন যশসী সাহিত্যশিল্পী অবন্তী সাত্তাল। কবি অবন্তী সাত্তাল আত্মকীর লেখক নন। বাংলা সাহিত্যের সেবা ইনি করে চলেছেন যথেষ্ট পরিমাণ দক্ষতার সঙ্গী। দীর্ঘকাল সাহিত্যসেবার কলে ইনি যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন। এই অনুবাদকর্ত্তেও ইনি প্রভূত সফল্যলাভ করেছেন—এ কথা ভুল নয় যে বিদেশী সাহিত্যের যে পরিমাণ অনুবাদ বাংলা ভাষায় হয়ে থাকে তার মধ্যেই অন্য কোন ভাষায় তা হয় না। তবে বাংলা ভাষায় এখন

অনুবাদ-সাহিত্যের আখ্যা নিয়ে যে সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে তাদের অধিকাংশকেই অনুবাদ তো দূরের কথা, গ্রন্থও বলা চলে কি না সন্দেহ। এমন কি, গ্রন্থটি শেষ করারও দৈর্ঘ্য পাঠকের থাকে না। এর কারণ অনুবাদকর্ত্তের ব্যর্থতা। বাংলাদেশে সত্যিকারের অনুবাদকর্ত্তের সংখ্যা তো নিরল বললেই চলে। তবে আশার কথা, অবন্তী সাত্তালের অনুবাদ যথেষ্ট বলিষ্ঠ, সার্থক ও উন্নত। বহুকাল পরে একটি সর্বাসম্মত অনুবাদগ্রন্থ চোখে পড়ল। দীর্ঘায়তন উপগ্রাসটির প্রতিটি পৃষ্ঠা সীমাত্তালের কৃতিত্বের স্বাক্ষর বহন করছে। প্রচ্ছদচিত্রটি এঁকেছেন সীমাত্তাল চৌধুরী। প্রকাশক—গ্রাশানাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট, লিমিটেড ১২ বক্সিং চার্টার্ড স্ট্রিট। দাম—ন' টাকা মাত্র।

জগদীশচন্দ্র গুপ্তের স্বনির্বাচিত গল্প

বঙ্গবাণীর একনিষ্ঠ সাধকদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য স্বর্গগত সাহিত্যিক জগদীশ গুপ্তের নাম। আত্মপ্রায় আড়াই বছর আগে তাঁর দেহান্তর ঘটেছে, তার অল্পকাল পূর্বেও তাঁর লেখনী সচল ছিল। বর্তমানে তাঁর ছোট গল্পের একটি স্বনির্বাচিত সংকলন আত্মপ্রকাশ করেছে। জগদীশ গুপ্তের গল্পগুলি যথেষ্ট পরিমাণে বৈশিষ্ট্যের চিহ্ন বহন করে। সার্থকনামা লেখক হিসেবেও তাঁর যথেষ্ট প্রসঙ্গ। চরিত্রসৃষ্টিতে, সঙ্গোপ সোক্তনায় ঘটনাবিক্রমে অজুতপূর্ণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করে গেছেন স্বর্গত লেখক। মনকে আকৃষ্ট করার যথেষ্ট ক্ষমতা গল্পগুলি রাখে। জীবনকে, সমাজকে এবং জগতকেও নানাসিক দিয়ে খুঁটিয়ে তিনি দেখেছেন—এই উক্তির সত্যতা তাঁর গল্পগুলি প্রমাণিত করে। মানুষের মনের অব্যক্ত অন্তর্দ্বন্দ্বের সম্যক প্রকাশ ঘটেছে গল্পগুলির মধ্যে। কৃত্রিমতাহীন, সহজ সরল জীবনকেই তিনি খুঁটিয়ে তুলেছেন তাঁর সাহিত্যে, প্রকাশক ইণ্ডিয়ান ম্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ গান্ধী রোড। দাম চার টাকা মাত্র।

গ্রন্থাগার প্রচার

আমাদের দেশের গ্রন্থাগারগুলির মর্যাদা অত্যন্ত দেশের তুলনায় কম তো নয়ই বরং বেশী। এ দেশের গ্রন্থাগারে এমন বহু ভুলভিত্তক সত্ত্ব সত্ত্ব রক্ষিত বা সারা জগতের বস্তল উপকার সাধন করার ক্ষমতা রাখে। সাহিত্যানুশীলনের ক্ষেত্রে তথা মানসিক চেতনার ক্রম জাগরণের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের অবদান অসামান্য। বর্তমান যুগের বিধান অনুযায়ী কোন কিছুই গুরুত্ব সত্ত্ব সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ

কবার ক্ষেত্রে প্রচারের সাহায্য নেওয়া ছাড়া গতানুগতিক নেই। স্বাভাবিকই গ্রন্থাগারেরও প্রচারের প্রয়োজন। এই বক্তব্যকেই যুক্তি, বিশ্লেষণ এবং নানাবিধ আলোচনার সাহায্যে উপরোক্ত গ্রন্থে প্রতিষ্ঠিত করেছেন জীৱাত্মকুমার মুখোপাধ্যায়। গ্রন্থাগার বিষয়ক লেখক জ্ঞানের তিনি অধিকারী। গ্রন্থাগারের প্রচারের সম্পর্কে তাঁর সাবগর্ভ আলোচনা যেমনট গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই মূল্যবান। প্রাচীরপত্র, পত্রিকা, সিনেমা, বেতার, বক্তৃতা প্রভৃতির মাধ্যমে গ্রন্থাগারের প্রচার কেমন ধরণে করা যায়, কি ধরণের হওয়া উচিত, প্রচারকর্ম কি ভাবে সম্পাদন করা যায়, এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা গ্রন্থে পরিবেশিত হয়েছে। লেখকের চিন্তাশীল মনের পরিচয় গ্রন্থে প্রস্ফুটিত, তাঁর বক্তব্য যথেষ্ট সারবান। প্রচার ক্ষেত্রেও তাঁর দক্ষতা বা জ্ঞান অসীম, গ্রন্থটিই এই উক্তির সত্যতা প্রমাণিত করে। প্রকাশক—গ্রন্থভবন, ১৩ গান্ধী রোড। দাম—হুই টাকা মাত্র।

প্রণয়ী পঞ্চক।

কাহিনী-কাব্য কাব্য-সাহিত্যের একটি প্রধান অঙ্গ। প্রত্যেককাল অসংখ্য কবি এই কাহিনী-কাব্যের মাধ্যমে আপন আপন স্বজনী প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়েছেন এবং সাহিত্য সেবা করেছেন। তবুও এ দেশে বর্তমানকালে কাহিনী-কাব্য রচয়িতার সংখ্যা যে অনুপাতে হওয়া উচিত ছিল সে অনুপাতে যে হয়নি—আশা করি এ কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। অথচ সে যুগে মধুসূদন, রঙ্গলাল, ক্ষেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রমুখ প্রান্তঃস্বরণীয় কবিগণ এই কাহিনীকাব্যের মাধ্যমে দেশীয় কাব্যকে সমৃদ্ধির আলোয় উদ্ভাসিত করে গেছেন। আলোচ্য গ্রন্থটি সুখ্যাত কবি ও সাহিত্যশিল্পী শ্রীল রায়ের কাহিনী-কাব্যের একটি সংকলন-গ্রন্থ। তাঁর পাঁচটি কাহিনী-কাব্য এর মধ্যে স্থান পেয়েছে—মহালারত থেকে স্বল্পোন্নতিহা পাঁচটি নারী চরিত্রকে কেন্দ্র করে পাঁচটি কাহিনী তিনি কবিতায় রচনা করেছেন। এই পাঁচটি নারীর আশা-আকাঙ্ক্ষা-আনন্দ-বেদনা হতাশা-যাতনা তাঁর লেখনীর মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে, পাঁচটির মধ্যে চারটির মূল স্তর এক, কেবল তৃতীয়টি ভিন্নধর্মী। অঙ্গুলিতে নারীর দয়িতা রূপকেই লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন কিন্তু তৃতীয়টিতে নারীর দয়িতারূপের সঙ্গে সঙ্গে মাতৃহত্যার বৃত্ত্যাকাকও কবি অসামান্য দক্ষতা সহকারে কাব্যে রূপ দিয়েছেন। কাহিনী-কাব্যগুলি সাবলীল, মনোময় এবং লালিতাপূর্ণ, বর্ণনভঙ্গী, ঘটনা বিশ্লেষণ এবং বিজ্ঞাস-কুশলতা মনকে আকৃষ্ট করে। নারীচিত্তের বিভিন্ন বৃত্তি, নারীর জীবন-জিজ্ঞাসা নারী জীবনের চাওয়া-পাওয়ার প্রধান প্রশ্ন সম্পর্কে কবি পূর্ণচেতন, তাঁর বিশ্লেষণী, শক্তিশালী তার পরিচায়ক। বাজনায়ে, শিল্পকর্মে অভিনববে সকল দিক দিয়েই গ্রন্থটি জীমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। প্রকাশক—নতুন প্রকাশক, ১৩/১ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট। দাম—তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

এক মুঠো আকাশ (নাটক)

মাসিক বহুমতীতে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত ধনঞ্জয় বৈরাগীর বিখ্যাত উপন্যাস এক মুঠো আকাশ সবক্ষে আজ নতুন করে আর বলার কিছু নেই। বাঙলার নাট্যজগতও এই সার্থক উপন্যাসটিকে বখাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করেছেন। লেখক কর্তৃক উপন্যাসটি নাটকে

সম্প্রতি এই নাট্যরূপ গ্রন্থাকারে আত্মপ্রকাশ করেছে। নাট্য-রূপদানে ধনঞ্জয় বৈরাগী যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। এ কথা কবির অজ্ঞানা নয় যে, সাহিত্য সৃষ্টির তুলনার নাট্য সৃষ্টিতেও তাঁর দক্ষতা বিচুত্র ক্রম নয়। নাটকের ধর্ম অনুযায়ী মূল উপন্যাস থেকে অনেক বকম অদলবদল করা হয়েছে এবং কাহিনীর মূলরস তাতে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়নি। আনন্দনের দিক থেকে স্বভাবতই উপন্যাসটির তুলনার নাটকটি অনেক ক্ষুদ্র। যে সকল গুণাবলীর জগ্রে উপন্যাসটি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে—সেই দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে নাটকটিও সমান জনপ্রিয় হয়ে ওঠার ক্ষমতা রাখে। উপন্যাসটির সম্বন্ধে পূর্বে আমরা বিশদ আলোচনা করেছি। নাটকটি ধনঞ্জয় বৈরাগীর স্তন্যম অক্ষুণ্ণ রাখবে, নাট্যজগতে এক বহু-আকাঙ্ক্ষিত নতুনধর্মের সন্ধান দেবে এবং বাঙলার নাট্যসাহিত্যের এটি একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন বলে অভিহিত হওয়ার যোগ্যতা রাখে। প্রকাশক—গ্রন্থম, ২০১১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট। দাম—হুই টাকা মাত্র।

স্বপ্নোক্তি

সংস্কৃতির ইতিহাসে এক বিরাট অধ্যায় অধিকার করে আছে নাটক। জাতীয় চরিত্রের বিকাশে নাট্যজগতে সহায়তা করে যথেষ্ট। এই নাট্যজগতের ইতিহাসও যেমনই গৌরবময়, তেমনই গুরুত্বপূর্ণ। বাঙলার সাধারণ নাট্যজগতের বিশদ ইতিহাসকে কেন্দ্র করে কিছুকাল আগেও ধারাবাহিক ভাবে মাসিক বহুমতীতে প্রকাশিত পূর্বোক্ত উপন্যাসটি বচনা করে যথেষ্ট শক্তির পরিচয় দিয়েছেন শক্তিমান সাহিত্যিক প্রশান্ত চৌধুরী। উপন্যাস হলেও এই গ্রন্থটিকে বাঙলা দেশের রঙ্গজগতের প্রামাণ্য ইতিহাস বলে অভিহিত করলে অত্যাুক্তি হয় না। শুধু ইতিহাসও নয়, সাহিত্যও তার সঙ্গে হাত মিলিয়েছে, লেখনীর নিপুণতায়, গ্রন্থটি সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে উঠেছে। শুধু বাঙলার রঙ্গালয়েকে তুলে ধরেই লেখক খেমে যাননি ভারতের প্রথম নাটক, কি পরিবেশে, কেমন করে জগাল সে সবক্ষেই যথেষ্ট চিত্তহারী একটি ছবি লেখক তুলে ধরেছেন। অসংখ্য মানুষ, অসংখ্য নাটক, অসংখ্য শিল্পীর সমন্বয়ে যে বিরাট নাট্যজগত গড়ে উঠেছে সেই জগতের হাসি-কান্না আনন্দ-বেদনা-রচনা-বৈচিত্র্য অপরিমিত নৈপুণ্যের সঙ্গে লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন। রঙ্গমঞ্চের শ্রমী বা প্রধান শিল্পী ধারা লেখকের আলোচনা কেবল তাঁদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এই জগতের সঙ্গে অভিন্ন প্রবেশ দর্শক হিসেবে, শুভানুধ্যায়ী হিসেবে এবং অস্ত্রবালের নেপথ্যকর্মী হিসেবে ধারা যুক্ত এ গ্রন্থে তাঁরা কেউই অবহেলিত নন, বরং লেখক তাঁদের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন। সামান্য কর্মী ধারা—রঙ্গসজ্জাকর, ভাণ্ডারী, বাদক, দ্বারবান এমন কি ড্রপের দড়ি টানে ধারা তারা প্রত্যেকেই লেখকের কাছে শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির পাত্র। উপন্যাসটিতে রঙ্গমঞ্চের নেপথ্য জগতে দৈনন্দিন বিচিত্র ঘটনা কাহিনী, পরিবেশ লেখনীর কল্যাণে সার্থক ভাবে চিত্রিত হয়েছে। রঙ্গমঞ্চ সর্বদায় বহু তথ্যের আকর এই উপন্যাসটি তার প্রাপ্য সমাদর লাভ করবে, এ বিশ্বাস আমরা রাখি। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান স্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ, ১৩ গান্ধী রোড। দাম তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

মায়াপুরী

বাঙলা দেশের খ্যাতিমান শিশুসাহিত্যিকদের মধ্যে শ্রীঅখিল

শিশু-সাহিত্যকে সেবা করে এসে শিশুসহলে নিজের আসন ইনি দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বর্তমানকালে শিশুদের উপযোগী নৃত্যনাট্যের অভাব কম নয় যা আছে তা-ও স্বল্পসংখ্যক। ত্রিনিদাদীয় উপরোক্ত গ্রন্থটি সেই অভাব অনেকাংশে দূর করতে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়। গ্রন্থটি সর্বোচ্চ গ্রন্থকারের দক্ষতার পরিচয় বহন করে, এর কাহিনীর অভিনব শিশুমনকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করবে, বর্ণনভঙ্গী, সংলাপ কঠিনের গতি সকল দিকেই সার্থকতার স্পর্শ ভাবপূর্ণ হয়ে উঠেছে। শিশুমহল গ্রন্থটি বখাৎখ সমারবে বিভূষিত হোক—এই কামনাট আমরা করি। প্রকাশক—সাহিত্যচয়নিকা ৫৯, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট। দাম—এক টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

শেষানাপ

বাঙলা সাহিত্যের দরবারে শক্তিপদ রাজকুমার নবাগত নন, একাদিক গ্রন্থের মাধ্যমে তাঁর সাহিত্যিক কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া গেছে। দিন এগিয়ে চলেছে যথানিয়মে, জগতের গারে প্রতিমূর্তিই লাগছে পরিভ্রমের ছোঁচ, জীবনের দাবা কত বদলে চলেছে তাই টিক-ঠিকানা নেই। একটা হৃদয়ের কথাই দাবা দাঁক, আগে যে অঞ্চল ছিল বীতিমত অল্পমত, যোগ-বাঁচ-পরিপূর্ণ, দম্ভ-সাদাগ্রাসের রাজত্ব, যে অঞ্চলে সামন্ততন্ত্র ছিল নিবাতি প্রভাব, জীবন যে অঞ্চলে প্রকৃতি উজাড় করে চলে দিয়েছিল দাবা বা কিছু মঙ্গল, সেট অঞ্চল কেনন করে ধীরে ধীরে তিলে তিলে পরিণত হ'ল বীতিমত উন্নত, আলোকপ্রাপ্ত এক শিল্পপুণী—তারই বর্ণনা ছিল বিবরণ লেখক নিষিদ্ধ করেছেন যথেষ্ট দক্ষতা সহকারে। কল্প ও মানব শিলাপুত্রের চরিত্র দুটির মাধ্যমে নীতি ও তাদর্শগত সম্ভাবতার একটি নিখুঁত ছবি ফুটে ওঠে। লেখকের রচনা রসাত্তীর্ণ, চরিত্রসৃষ্টি প্রশংসনীয়, রচনার বলিষ্ঠতা মনকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। গ্রন্থের নামকরণটি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। প্রকাশক—শ্রীশ্রীশ্রী পাবলিশার্স, ২০৬ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট। দাম—পাঁচ টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

হুই পকেট হাসি

বর্তমান যুগে রসসাহিত্যিকরূপে সাহিত্যের দরবারে বাদে অবির্ভাব ঘটছে তাদের মধ্যে প্রবুদ্ধের নাম বিশেষ উল্লেখনীয়। শিরোনামা দেখেই আশা করি পাঠক-পাঠিকারা ব্যুত পাবছেন যে আলোচ্য গ্রন্থটিও হান্তরসসমৃদ্ধ। টুকরো টুকরো অসংখ্য হাসির চুটকি গল্পে হুই শতাব্দিক পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থটি পূর্ণ। কার্টুনও যুক্ত করা হয়েছে প্রচুর পরিমাণে। চুটকি গল্পগুলির বিষয়বস্তুও একের মধ্যে গীমাবদ্ধ নয়, বহুর মধ্যে পরিব্যাপ্ত। গ্রন্থকারের মন বর্তমান সমাজ সংক্ষেপে জড়াবে সচেতন। লেখকের চিন্তাধারা, কল্পনাশক্তি ও প্রকাশভঙ্গী নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। রসসৃষ্টির কঁাকে কঁাকে লেখক খাঁয় দখলী, সহজভূতবীল ও রসস্বন মনের পরিচয়ও দিয়ে গেছেন।

চুটকি গল্পগুলি সর্বশেষ উপভোগ্য, এবং লেখকের রসরচনা পাঠকটিতে প্রভূত পরিমাণে আনন্দরস সৃষ্টি করে। প্রচ্ছদচিত্রাঙ্কনে নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন শ্রীমন্তোষ গুপ্ত। কার্টুনগুলিও বাঙলার বিখ্যাত কার্টুনিষ্টদের তুলিকাজাত। প্রকাশক—বঙ্গা প্রকাশনী, ২৭-সি আমহার্ট স্ট্রীট। দাম—হুই টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা মাত্র।

কয়েকটি সাম্প্রতিক কালীন কাব্যগ্রন্থ

সাম্প্রতিক কালে যে ক'টি আধুনিক কবিতাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়ে আধুনিক কাব্যসাহিত্যের মানোন্নয়নে সহায়তা করেছে, তাদের মধ্যে আনন্দগোপাল সেনগুপ্তের মধুর দিনের গল্প, দেবতোর ঘটকের রক্তবৃষ্টি, কুশল মিত্রের চৈত্রেব পলাশ ও মারাবতী মেঘ এবং বিনয় চক্রবর্তীর নক্ষত্রের আলোয়—এই চারখানি বইয়ের নাম বিশেষ উল্লেখের দাবী থাকে। কবিতাগুলি উজ্জ্বল, জল্পকে গভীর ভাবে স্পর্শ করে এক নতুনধরনের সন্ধান দেয়। কবিতাগুলির মধ্যে কবিদের রস-স্বন অল্পভূতিলম্পর শিল্পমনের একটি সুস্পষ্ট ছাপ পাওয়া যায়। কবিদের প্রত্যেকের কতকগুলি কবিতা এক কথায় অনবদ্য। তাঁদের দিক দিয়ে ছন্দের দিক দিয়ে ব্যঙ্গনার দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় যে, গ্রন্থগুলি সর্বতোভাবে কবিদের প্রতিভার স্পর্শ বহন করেছে। গ্রন্থগুলির প্রচ্ছদচিত্র অঙ্কন করেছেন প্রখ্যাত শিল্পী শ্রীদেবজিত মুখোপাধ্যায়। কেবল দেবতোর ঘটকের গ্রন্থের প্রচ্ছদ অঙ্কন করেছেন কবি স্বয়ং। গ্রন্থ চতুষ্টয়ের প্রকাশক গ্রন্থভগৎ, ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট। মূল্য—এক টাকা মাত্র (কেবল কুশল মিত্রের গ্রন্থের মূল্য—দুই টাকা মাত্র)।

নিঃসঙ্গ

উপরোক্ত গ্রন্থটি এক বিপ্লবীর আত্মকাহিনী। লেখক শ্রীমতীশঙ্কর দে ভারতের মুক্তি আন্দোলনে একদা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন ও যথেষ্ট নির্ধাতনও ভোগ করতে বাধ্য হন। অতীতের সেই স্মৃতি, দেশের স্বাধীনতার মহান তপস্বীর গৌরবোজ্জ্বল বিবরণী, শোষকের বিরুদ্ধে মুক্তিকামীদের মুক্তি অভিযানের চমকপ্রদ কাহিনী সকল সময়েই সমান মধ্বানই পেয়ে আসে। কালের ব্যবধানে তার গুরুত্ব লাঘব হয় না। কাব্যকাহিনী বর্ণনায় লেখক যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ইতিহাসগন্ধী এই গ্রন্থে লেখকের সাহিত্যিক দক্ষতারও পরিচয় মেলে, তখনকার দিনের তরুণ সম্প্রদায়ের দেশের জন্তে সকল প্রকার স্বার্থত্যাগের এক সুন্দর প্রতিচ্ছবি লেখক এখানে তুলে ধরেছেন। লেখকের ভ্রম সফল হোক। জীবনরক্ষা দত্তের প্রচ্ছদচিত্রাঙ্কনও প্রশংসনীয়। প্রকাশক—চক্রবর্তী চ্যাটার্জী স্যাণ্ড কোম্পানী লিমিটেড, ১৫ কলেজ রোড। দাম, তিন টাকা মাত্র।

Happiness is like coke—something you get as
a by-product in the process of making something
else.
—Aldous Huxley



জেনিফার জোনস

খুব বেশী দিনের কথা নয়, হলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী মিস জেনিফার জোনস রোম-এ বিশ্ববিখ্যাত মার্কিন ঔপন্যাসিক আর্নেস্ট হেমিংওয়ে রচিত 'এ ফোর ওয়েল টু' আর্নস্ট' এর স্মৃতি সেরে তাঁর দ্বিতীয় প্রযোজক পরিচালক মি: ডেভিড ও. সেলজনিক সহ ভাস্কর্যে পাঁচ সপ্তাহের জন্ত অবকাশ যাপন করতে এসেছিলেন। এ খবর শোণ করি আমাদের দেশের চিত্রমোদীদের কাছে অজানা নেই। বর্তমানে হলিউডে যে কয় জন প্রথম শ্রেণীর অভিনেত্রী আছেন মিস জোনস তাঁদের মধ্যে অন্যতম। অবশ্য এই প্রথম শ্রেণীতে মিস মেরিলিন মুনো, জেন মেসফিল্ড ও অনিতা এনার্গেইস কোন স্থান নেই। কারণ তাঁরা ভিন্ন স্বরূপ ও ভিন্ন রুচির অভিনেত্রী।

মিস জোনস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওকলাহোমা ষ্টেটে টুলসা-তে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা ইসলে ষ্টক কোম্পানী নামে এক জাহাজের বিয়েটার পাটের মালিক, পরিচালক ও অভিনেতা ছিলেন। এই বিয়েটার পাট আমেরিকার বিভিন্ন সহরে তাঁর খ্যাতিয়ে অভিনয় করে বেড়াতেন। এঁদের অভিনীত "দি ওল্ড হোমস্টেড", "ইষ্ট লান" প্রভৃতি নাটকগুলি তখনকার দিনে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিল। কিন্তু কিছুদিন পরে বিজ্ঞানের মহিমায় নির্ভর ছবি সবার ছবিতে রূপান্তরিত হওয়ার ইসলে ষ্টক কোম্পানী উঠে যায় এবং জেনিফার-এর বাবা কয়েকটি সিনেমা-গ্রহ তৈরী করে সেখানে সবার ছায়াছবি দেখাতে শুরু করেন।

ছোটবেলা থেকেই নাট্য পরিবেশের মাঝে মগ্ন হয়েছেন মিস জোনস। প্রতিদিন গভীর আগ্রহে তিনি থিয়েটার দেখতেন। ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইল অভিনেতা অভিনেত্রীদের স্বরূপ, আশা হতাশাকে তিনি অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতেন। মাত্র চার বৎসর বয়সে জেনিফার ডান্স-এর উরফুলার্টন একাডেমীতে ভর্তি হন। এই স্কুলের ছাত্রী থাকা কালে তিনি আবৃত্তি ও অভিনয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। এখানকার শিক্ষাগ্রহণ শেষ হলে তিনি উচ্চতর শিক্ষালভের আশায় ওকলাহোমা সিটিতে চলে আসেন এবং স্টিক্যাসিনোর পড়াশুনা শেষ করে আমেরিকার মধ্য পশ্চিম অঞ্চলের একটি বিখ্যাত থিয়েটার কোম্পানীতে যোগদান করেন। প্রায় দু'বৎসর তিনি এই থিয়েটার কোম্পানীর সাথে যুক্ত ছিলেন। তাঁর বাবা, থিয়েটারের প্রতি জেনিফারের গভীর আগ্রহ দেখে তাঁকে

নিউইয়র্কের 'আমেরিকান একাডেমী অফ ড্রামাটিক আর্টস'-এ ভর্তি করে দেন। কিন্তু প্রথম দিকে তাঁর ইচ্ছা ছিল অধ্যয়ন। এ সবকিছু মিস জোনস নিজেই বলেছেন—বাবা চেয়েছিলেন আমি আইন পড়ি। কিন্তু আমার বৌক ছিল নাটকের প্রতি। তাই শেষ পর্যন্ত তিনি আমার মতেই মত দিলেন।

কিছুদিন পরে, ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে তিনি সহপাঠী মি: রবার্ট ওয়াকার-এর সাথে পনিয়স সূত্রে আবদ্ধ হন। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের ১৫ই এপ্রিল জেনিফারের প্রথম পুর রবার্ট ওয়াকার জুনিয়ার ও ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের ১৭ই মার্চ দ্বিতীয় পুর মাইকেল-এর জন্ম হয়। চার বৎসর পরে স্বামীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়। এই সময়ে তাঁর মনে হলিউডের চিত্রাশা 'ভাবকা' রূপে আত্মপ্রকাশের ইচ্ছা বিশেষ ভাবে বলবতী হয়ে ওঠে। কিন্তু চিত্রজগতের কারো সাথে তাঁর পরিচয় না থাকায় তিনি প্রত্যাখ্যাত হন ও আবাব বঙ্গমঞ্চেই অভিনয় শুরু করেন।

দু'বৎসর পরের কথা। একদিন তিনি অভিনয়ের শেষে গ্রীষ্মকমে বসে মেকআপ ভুলছেন। এমন সময় জনৈক সুরেশা তরুণী সেখানে এসে বিনীত ভাবে তাঁর সাথে আলাপের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। একটু বিরক্ত হয়েই জেনিফার তাঁকে বসন্ত বললেন। কিছুক্ষণ পরে তরুণীটি তাঁর নিজের পরিচয় দিলেন—মামি হলিউডের প্রযোজক পরিচালক ডেভিড ও. সেলজনিকের নিউইয়র্কস্থিত প্রতিনিধি মিস ক্যাথরিন ব্রাউন।

তাঁই নাকি?—খুবীতে ঝলমলিয়ে উঠল জেনিফারের মুখ। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর অমার্জিত ব্যবহারের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।

মিস ব্রাউন জেনিফারকে চলচ্চিত্রে যোগদানের জন্ত উৎসাহিত করলেন এবং প্রযোজক-পরিচালক মি: সেলজনিকের সাথে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিলেন। মি: সেলজনিক জেনিফারের অভিনয়-প্রতিভার সম্বন্ধে হয়ে তাঁকে নির্দয়মান ছবি 'সঙ্গ অব বার্গান্দেং'-এর নামভূমিকায় অভিনয়ের জন্ত মনোনীত করলেন। অবশ্য এই মনোনয়নের পূর্বে জেনিফারকে কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়েছিল।

নামভূমিকায় অভিনয়ের জন্ত ছয় জন অভিনেত্রীর নান যোগনা করা হলেও চূড়ান্ত পরীক্ষায় মিস জোনসই সঙ্গমানে উত্তীর্ণ হন। পরীক্ষার বিষয়বস্তু ছিল দৈবজ্ঞান (Vision) দর্শনের পর বার্গান্দেং-এর মানসিক পরিবর্তন। এখানে উল্লেখ্য, মিস জোনসের অভিজ্ঞি এত সূক্ষ্ম ও নিখুঁত হয়েছিল যে পরিচালক মশায় নিজে পর্যন্ত এতটা আশা করেন নি। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে মিস জোনস বার্গান্দেং-এর ভূমিকায় অভিনয় করে অস্বাভাবিক পুরস্কার লাভ করেন।

বর্তমানে মিস জোনস পারিবারিক জীবনে প্রযোজক পরিচালক ডেভিড ও সেলজনিক-এর পত্নী। ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের ১২ই আগস্ট তাঁদের একমাত্র কন্যা মেরি জেনিফারের জন্ম হয়। মিস জোনস মধুরভাষিনী ও সদালাপী। খ্যাতির হিমালয়-শীর্ষে আরোহণ করেও তাঁর মনে বিস্ময়াদ্র অহংকার নেই। হলিউডের তথাকথিত চিত্রাভিনেত্রীদের মত পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যাপারে তিনি নেগলিগে ও বিকিনি-মার্কী হুহতা-স্বচ্ছতা পছন্দ করেন না। তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদে, আচার-আচরণে সর্বদাই রুচি ও সংযমশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়।

মিস জোনসের হৃদয় অত্যন্ত সংবেদনশীল ও আবেগপ্রবণ। তাই ভাবাবেগপূর্ণ নাটকীয় দৃশ্যগুলি রূপায়ণে তাঁর ক্ষমতা অসাধারণ। তিনি 'সঙ্গ অব বার্গান্দেং', 'দি বারোটস অব উইম্পোল স্ট্রিট', 'উই ওয়ার ট্রেন্সপারেন্ট', 'ডুয়েল ইন দি সান', 'ম্যাদাম বোভারি'

"লাও ইন্ড এ মেনিগ্লেননডার্ড থিং," "বোট দি ডেভিল," "ইন্ডিফ্রিশন অব অ্যান আমেরিকান ওয়াইক," "গুড মরনিং," "মিস ডাভ" প্রভৃতি ছবিতে অভিনয় করে আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেন। এ যাবৎ আঠারোখানি চিত্রে তিনি অভিনয় করেছেন।

প্রতিদিন দেশ-বিদেশের অম্লরাগী ভক্তবৃন্দের কাছ থেকে তিনি হাজার হাজার চিঠি পান। নানা আকারে ভরা সে সব চিঠি। যতদূর সাধ্য মিস জোনস তাঁর ভক্তবৃন্দের আকার পূরণের চেষ্টা করে থাকেন। সেক্রেটারী থাকা সত্ত্বেও তিনি নিজে হাতে লিখে (টাইপ করে নয়) ফান্ন মেলের উত্তর দিতে ভালোবাসেন। কারণটি সহজেই অঙ্কমেয়। প্রচুর খ্যাতি শু অর্থের মোহে আত্মা তিনি বিভ্রান্ত হননি। এ সত্ত্বেও তাঁর অভিমত হল—আমার অভিনয় যদি কারো জীবনের কণিক অবসর মুহূর্তটুকু আনন্দে ভরে দিয়ে থাকে অথবা কোন সন্ধ্যায় তাঁর হৃৎকোষাক্রান্ত হৃদয়ের ব্যথা—বেদনাকে লাঘব করতে বিন্দুমাত্র সাহায্য করে থাকে তবে অভিনেত্রী হিসাবে সেইটাই হল আমার সবচেয়ে বড় পুণ্য। জনসাধারণের শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা শিল্পী মাত্রেরই কাম্য। কারণ শিল্পীর মূল্যায়ন তাঁরই করে থাকেন।

সম্প্রতি বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রুসেলস্-এ অনুষ্ঠিত চিত্রমেলায় মিস জোনস বছরের সেরা (১৯৫৮) অভিনেত্রীরূপে সর্বাধিক ভোট পেয়েছেন। আশা করি, জেনিফার অম্লরাগীরা এ সংবাদে আনন্দিত হবেন।

—জীবেব্রত ঘোষ

স্মৃতির টুকরো

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

সাধনা বসু

কলকাতার এবং বোম্বাইয়ের মেট্রো সিনেমায় একযোগে কোর্ট ডালার মুক্তিলাভ করল ১৯৪১ সালে। এর পূর্বে মেট্রো সিনেমায় কোন ভারতীয় ছবি মুক্তিলাভ করে নি। অর্থাৎ ভারতীয় ছবির মধ্যে কোর্ট ডালারই প্রথম ছবি, যে মেট্রো সিনেমায় মাধ্যমে সাধারণ্যে মুক্তিলাভ করল। এবং বলা বাহুল্য, মুক্তির সঙ্গে সঙ্গেই রসজ্ঞ দর্শকসম্প্রদায় এবং অভিজ্ঞ সমালোচকবৃন্দের আন্তরিকতা, প্রশংসা এবং সমর্থন ছবিটি সর্বতোভাবে পূর্ণতা পেল। বোম্বাইতে তখন আমরা উপস্থিত থাকতে পারি নি, কারণ ঠিক সেই সময় নিউ থিয়েটার্সের হয় দ্বিতীয় "মানাক" ছবিটির গঠনকর্মে আমরা ভীষণ ব্যস্ত, সেইজন্যই হুর্ভাগাক্রমে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বোম্বাইতে কোর্ট ডালার মুক্তিকালে উপস্থিত থাকা কিছুতেই আর আমাদের পক্ষে শেষ অবধি সম্ভবপর হয়ে উঠল না। বাই হোক, বোম্বাইতে যেতে পারি নি, তবে কলকাতায় কোর্ট ডালার মুক্তি তো প্রত্যক্ষ করেছি। আর তার আলোকোজ্জ্বল স্মৃতিও তো মন থেকে মুছে যাওয়ার নয়।

এই ছবির কাছে মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ্যে স্বীকার করছি, আমার ব্যক্তিগত প্লেরও সীমা-পরিমিত নেই। কারণ সম্পূর্ণরূপে ভারতে নির্মিত প্রথম আন্তর্জাতিক ছায়াছবির তারকারূপে অভিহিত হওয়ার পৌত্তাগ্য অর্জন আমি সমর্থ হতে পেরেছি—এই ছবিরই কল্যাণে।

১৯৪১ সালের কথা মনে পড়লেই বিশেষভাবে মনে পড়ে যার

বহু বাঙালার অধিতীয় প্রযোজক স্বর্গীয় হজল বোমের কথা। "এক এবং একমাত্র" (one and only) আখ্যাটি বার এমসে ব্যবহার করলে বিন্দুমাত্র ভুল হয় না। দেশীয় নৃত্যশিল্পের ইতিহাসের একটি অধ্যায় পড়ে উঠেছে হরেনদাস'র অসিস্মরণীয় অবদানে। হালাস যেনক', উদয়শঙ্কর প্রমুখ বহু দিগ্বিজয়ী নৃত্যশিল্পীদের ভারতীয় দর্শকের সামনে প্রথম উপস্থিত করার গৌরব হরেনদাস'রই। এই বছর (১৯৪১) দক্ষিণ-ভারত ভ্রমণের একটি আয়োজন করছিলেন হরেনদাস'। তাঁদের সঙ্গে আমিও যেন বাই, এট ইচ্ছা হরেনদাস' প্রকাশ করলেন—এ সম্পর্কে অস্বপ্নেও তিনি জানালেন মধুর কাছ। অসম্মতি আসেনি মধুর পক্ষ থেকে—ঠিক সেই সময় বাঙালার চলচ্চিত্রশিল্পের গৌরব ও ইতিহাসসম্প্রদায় জীবীরেন্দ্রনাথ সরকারের নিউ থিয়েটার্সের পক্ষে মীনারী ছবির নির্মাণকার্যে যথেষ্ট ব্যস্ত ছিল মধু। তাই তার নিজের পক্ষে আমাদের সঙ্গে যাত্রা শেষ অবধি সম্ভবপর হয়ে উঠল না।

আমরা, তারপর কোন একটি দিনে অকস্মিক আনন্দ সঙ্গে নিয়ে প্রচুর কৌতুহল মনের মধ্যে জমিয়ে রেখে বাত্মা গুরু করলুম দক্ষিণ-ভারত অভিমুখে। বিরাট একটি হল হল পুরো শিল্পসম্রাট, হরেনদাস', সঙ্গীত পরিচালক ভিমিরবরণ, মাধব যেনন প্রভৃতি শোভাক্ত জন কোটিনে নৃত্যশিল্পী হিসেবে যথেষ্ট খ্যাতির অধিকারী। আমার নৃত্যসঙ্গী হিসেবে আমাদের সঙ্গে আমাদের প্রযোজকটি ভ্রমণে ইনিও যোগ দিয়েছিলেন। রাস্তানর্ভকী চরিত্রেও আমার নৃত্যসঙ্গী ভূমিকার আপনাত্মা (দাঁবা রাস্তানর্ভকী দেখেছেন) এঁকেই দেখতে পেয়েছেন।

দক্ষিণ-ভারত আমরা মহা আনন্দে বেড়ালুম, যেখানে গিয়েছি সেইখানেই পেয়েছি আশাব অতীত সমালার, আপ্যায়ন, অভ্যর্থনা, পেয়েছি আন্তরিকতাপূর্ণ দরদী ব্যবহার, পেয়েছি সহস্রদরতার মধুর পরশ।

আমাদের শিল্পাপতার সেখানকার দর্শকদের মধ্যে যে কতখানি সাদা জাগিয়ে তুলেছিল তার একটি প্রমাণ আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। একটি হলেও এই প্রমাণ অনেকের তুলনায় কম নয়। যেখানে যেখানে আমাদের অহুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছিল, দর্শকদের অসীম আগ্রহে নির্ধাবিত দিনেই অহুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। আমাদের পরিকল্পিত শেষ অহুষ্ঠানটিতেও দেখা গেছে দর্শক সমাগমে কিছুমাত্র ভাঁটা পড়ে নি—আমাদের দিল্লি বাড়তে হয়েছে, নির্ধাবিত সময়সীমা অতিক্রম করেও দর্শকদের ইচ্ছায় আরও ক'টা দিন বৃদ্ধ করতে তার সঙ্গে, অহুষ্ঠান-রজনীয়া সন্ধ্যা করতে হয়েছে বৃদ্ধি।

উজ্জ্বলিত প্রশংসা পেয়েছি সাংবাদিকদের কাছ থেকে। কত:কুর্ত অভিনন্দনে আমাদের ভবিষ্যে তুলেছেন জনতার প্রতিিনিবি সাংবাদিকদের দল। আমাদের অহুষ্ঠান সম্পর্কে জনতার অহুতুল মতামত রূপ পেল তাঁদের বলিষ্ঠ ও দরদী লেখনীর মাধ্যমে। সেদিনকার দক্ষিণ-ভারতীয় সাংবাদিকদের কয়েকটি অভিমতের অংশবিশেষ আজকের বঙ্গদেশীয় পাঠক-সাধারণের সামনে তুলে ধরছি—একটা কথা তার আগে বলে নিয়ে বিষয়টি পরিষ্কার করে নেওয়াই ভালো। আন্তরপ্রশংসার সুবিস্তৃত প্রচারের স্বপক্ষে আমরা

আমি এখানে উদ্ধৃত করছি না। আমার প্রথম পরিচয় আমি বাঙালী, আমি বাঙলাদেশের মেয়ে—জগতের দরবারে সেইটাই আমার বিশেষ চিহ্ন বা পরিচিতি। দক্ষিণ-ভারতে, শুধু দক্ষিণ-ভারতই বা কেন দেশের বাইরে যেখানেই গেছি বাঙালী-পরিচিতিতেই বাঙলা দেশের সিন্ধী হিসেবেই, সুতরাং বাইরে যে সম্মান আমি পেয়েছি সে সম্মান তো আমার ব্যক্তিগত সম্মান নয়, সে তো আমার জন্মভূমির সম্মান; এ দেশের প্রত্যেকটি নবনারীর জন্যে সম্মান অধিকার, আমার ব্যক্তি-সত্তার পরিবর্তে সেক্ষেত্রে এক ভাষিগত প্রেম আসন পাশ। নৃত্যশিল্পের যেকোনো দিককে দক্ষিণ-ভারতীয়তা যে অকৃতকৃত সম্মান আমাকে রেখিয়েছেন তা শুধু আমাকে নয়, আমাকে কেন্দ্র করে সমগ্র বাঙালী-মিলকে প্রাণা ভাণ্ডার দক্ষিণ ভারত—দেশের প্রত্যেকটি নবনারীর মত সেই সম্মানের আশ্রিত একটি অঙ্গীকার মাত্র। অতএব এই নৃত্যতরী দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে যে অভিন্নত উদ্ধৃত করার ক্ষেত্রে কোন ভাষা থাকতে পারে না অস্বতঃ আত্মপ্রকাশের সুবিধিত প্রচারের দোষ ছুটি হতে হয় না।—

"THE SPLENDOR THAT IS SADHONA BOSE, BEAUTY THY NAME IS SADHONA BOSE."

"The ballet show which opened before a full house and distinguished gathering at Sun Theatre was indeed a feast for the eye and ear. Sixteen varied items were put across in the ballet and among these the great Sadhona herself—for she is truly great—figured in five. While not one of the items were bad, some were just superb, drawing rousing applause from the enthusiastic audience..After Ranga Puja by the supporting ladies came Sadhona Bose herself to render "DRAUPADI." The composition shows Draupadi at Shiva's temple praying for the boon of a husband..Sadhona portrays each of these qualities with exquisite clarity without loss to the subtlety so essential in art. The "Mudras" through which she interprets these qualities became sheer poetry as she renders them..the audience insisted on enchoré."..Sunday Times, Madras—April 1941.

"LIKE A POEM OF GRACE."

"The opening performance proved such a tremendous success that the conductors have announced extension of the shows"..Free India, Madras, April 1941.

"Grand-daughter of late Mr. Keshub Chunder

Sadhona Bose has made a rich contribution to the renaissance of Indian Dancing and her performance was of a high order..she was particularly brilliant in "Meghduta" adapted from Kalidasa's epic,"..The Mail, Madras, April 1941.

"Sadhona's dancing is a lyric poem of grace, rhythm, pose, abhinaya, Mudras and dexterous foot work. Her movements are lithe and graceful and her mastery of the art superb. She is irresistible in every way,"..The Echo, Madras, April 1941.

"INDIAN MONA LISA IN BANGALORE."

"Slim, lovely looking Sadhona Bose dressed in typical Hindu fashion with a dot of Kumkum..Poise and grace being her character, she is a fit vessel for the spirit of our classical dancing which is often defined as the poetry of poise and grace, emphasizing, as it does, "Mudras" and "Bhavas". In her style she is quite eclectic.—She takes the best wherever she finds, and concerns herself with creating a thing of beauty, out of that. She blends the four schools—Manipuri, Kathakali, Bharata Natyam and Kathak, forming a new harmonious whole and to that she adds the electric current of her personality. The result is a work of art that which has its own laws and its own features."..Daily News, Bangalore, 1941. [ক্রমশঃ]

অনুবাদ : কল্যাণাঙ্ক বন্দ্যোপাধ্যায়

হেড মাস্টার, নৃত্যেরই তালে তালে এবং অগ্নিসম্ভবা

সাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ মিত্রের অসংখ্য ছোট গল্পের মধ্যে "হেড মাস্টার" অন্যতম। সেই ছোট গল্পই বর্তমানে পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্রের রূপ নিয়ে বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শিত হচ্ছে। ছবিটির বক্তব্য দর্শকের হৃদয় স্পর্শ করে। এই হৃদয়স্পর্শী ছবিটির কাহিনী এক শিক্ষাব্রতী জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত বিপাককে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। সহস্র বাধা দুর্যোগকে উপেক্ষা করে প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে দিয়েও নিজের সারা জীবনের আদর্শকে কেমন করে বাঁচিয়ে রাখা যেতে পারে সেই বিষয়ে এক স্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায় এর কাহিনীর মাধ্যমে হেড মাস্টার কৃষ্ণপ্রসন্ন চরিত্রটি লেখকের এক অগুর্ব সৃষ্টি—আর এই সার্থক সৃষ্টি চলচ্চিত্রে জীবন্ত হয়ে উঠেছে ছবি বিশ্বাসের অনব অভিনয়ে। ছবি বিশ্বাস অভিনীত সমস্ত চরিত্রগুলির মধ্যে কৃষ্ণপ্রসন্ন চরিত্রটিকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বলে অনায়াসে অভিহিত করা যায়। মানবিক আবেদনে ছবিটি ভরপুর। হৃদয়বান ব্যক্তি মাঝেই এর আবেদন সাজা না দিয়ে পায়বেন না। ছবিতে যুক্ত গানটি তাৎপার্য বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের লেখনীজাত। সুরারোপ করেছেন সুধী দাশগুপ্ত। অগ্রগামী পরিচালিত ছবিটিতে ছবি বিশ্বাস ছাড়া বিচিত্র ভূমিকায় রূপ দিয়েছেন নবাগত জামল বোমাল, শিশির বটকার, গঙ্গাপদ বসু, মণি জীমানী, শোভা সেন, করুণা বন্দ্যোপাধ্যায় ও নবাগত

‘নৃত্যরই তা ল তোলে’ ছবিটি কাহিনীকার পরিচালক সুবীরবাবুর ব্যর্থতার স্বাক্ষর বহন করছে। সর্বতোভাবে ছবিটি অসাক্ষ্য বরণ করে নিয়েছে। দুর্বল কাহিনীর চলচ্চিত্র রূপায়ণের মধ্যেও আশা বা সম্ভাবনা আত্মপ্রকাশ করে না। এক সর্বভারতীয়তার আদর্শ প্রচার করতে গিয়ে বাঙালার বৈশিষ্ট্য, স্বাতন্ত্র্য ও নিজস্বতার মূলে কুঠারাবাত করা হয়েছে। ছবির মন্তব্য গতি দর্শককে বিশেষভাবে পীড়া দেয়। চিত্রনাট্যও যথেষ্ট ত্রুটিপূর্ণ। ছবিটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জহ্নলপ্রসাদ প্রভৃতির গানগুলি যুক্ত করে ছবির অনেক ঘোর ঢেকে দেওয়া হয়েছে। গানগুলি এবং নৃত্যংশ ছবিটির একমাত্র আকর্ষণ বলসেই হয়, ওয়া ফলেই ছবিটির অসংখ্য ত্রুটির অনেকাংশ চাপা পড়ে গেছে। ছবির তিনটি প্রধান ভূমিকায়ও তিনজন অবাঙালী—গোপীকৃষ্ণ, হাগিণী ও সুকুমারী। বাঙালী শিল্পীদের মধ্যে ছবিটিতে অভিনয় করেছেন ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্তাল, অসিতবরণ, ইন্দ্রনাথ, অজিত চট্টোপাধ্যায়, পদ্মপতি চৌধুরী, পদ্মা দেবী, সন্ধ্যা রায়, ভারতী রায়, মিতা চট্টোপাধ্যায়, বাজলক্ষী প্রভৃতি। শান্তিদেব ঘোষ, সুরিত্রা মিত্র প্রভৃতির কণ্ঠসঙ্গীত ছবিটির এক বিশেষ আকর্ষণ।

আজকের দিনের বহুবিভক্ত সমাজের প্রধানতঃ দুটো স্তরই চোখে পড়ে। “HAVE”দের স্তর আর “HAVE NOT”দের স্তর, একদল উপরের মহলে বাস করে, হাওয়ায় ওড়ে, নীচের মহলের বাসিন্দাদের মানুষ বলে গণ্যই করে না। সুখের পায়ের দল এরা, আর একদল নীচের মহলে বাস করে, উপরের মহলের উপেক্ষাই যেন এর প্রাপ্য। বাস্তব জগৎ এদের সামনে দেখা দেয় কঠিন স্রুতিতে, এদের বাঁচতে হয় যুদ্ধ করে, জীবনযুদ্ধ। এই যে দুটো স্তর এদের পরস্পরকে বিভক্ত করেছে কাকনকোলীয়া। তবে স্তরগত প্রেমের বহু উর্ধ্বে প্রতিভার অবস্থিতি, পরিবেশ যত প্রতিবন্ধক হোক না প্রতিভার যথার্থ বিকাশ একদিন না একদিন ঘটবেই। তার প্রাপ্য সমাদর মিলবেই, এই পটভূমিকা অবলম্বন করে “অগ্নিসম্ভবা”র গল্পাংশের সৃষ্টি। লেখিকা শান্তি দাশগুপ্তের লেখনীর স্বজনীশক্তির প্রকৃত পরিচায়ক বলে গল্পটিকে অভিহিত করা যায়। এর চিত্ররূপ গড়ে উঠেছে সুশীল মজুমদারের পরিচালনায়। এই রক্তচক্রের দ্বারা আজকের সমাজে যে অসাম্য দেখা দিয়েছে তার কল সমাজের পক্ষেই যে কতখানি ভয়াবহ, সেদিকেও ছবিটির মাধ্যমে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। চলচ্চিত্রের মাধ্যমে একটি যুগোপযোগী বলিষ্ঠ ও সারবান কাহিনী পরিবেশিত করলেন পরিচালক সুশীল মজুমদার। ছবিটির জোরালো বক্তব্য দর্শকমনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। ছবির সুরসৃষ্টি করেছেন কালোবরণ। বিভিন্ন চরিত্রে রূপ দিয়েছেন ছবি বিশ্বাস, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলকুমার, অমর মল্লিক, ভুবন চৌধুরী, তরুণকুমার, প্রেমোত্তম বসু, হরিধন মুখোপাধ্যায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, জীমান তিলক, জীমান দেবাসীষ, মঞ্জুলা বন্দ্যোপাধ্যায়, বনানী চৌধুরী, কুমারী শিবানী প্রভৃতি শিল্পিবৃন্দ।

ইন্দ্রজাল

জগতের দরবারে বাঙালার গৌরব বর্ধনে ঐরা সহায়তা করেছেন, বিখ্যাত বাহুশিল্পী প্রতুলচন্দ্র সরকার বা পি. সি. সরকার তাঁদের অন্ততম। বাহুরক হিসেবে তাঁর প্রতিভা সর্বজনস্বীকৃত।

শ্রেষ্ঠ বাহুশিল্পীদের দরবারে একটি বিশিষ্ট আসন তাঁর জন্ত সংরক্ষিত। কলকাতার তাঁর সাম্প্রতিক প্রদর্শনীও জনগণের প্রচুর সমাদরে সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে উঠেছে। তাঁর বর্তমান প্রদর্শনীর বিশেষ এই যে, এ বছর নতুন ধরনের কয়েকটি বাহুরকোড়া তাঁর অনুষ্ঠানসূচীর তালিকা বৃদ্ধি করেছে। তাঁর এই সাম্প্রতিক প্রদর্শনীটি সর্বতোভাবে নৈপুণ্য, কুণ্ণতা ও চমৎকারিহের স্বাক্ষর বহন করে—কয়েকটি ক্ষেত্রে বাহুরকোড়াটিকে অবিস্মরণীয় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর কৌড়াকর্ষিত প্রত্যেকটি অভিনব এবং অভুলনীয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি আবলবৃদ্ধ-বনিতা নির্ধিষেবে প্রত্যেকেই সমানভাবে উপভোগ করতে পারেন। প্রধানতঃ উল্লেখযোগ্য এই যে, এই বাহুরকোড়াটি কেবলমাত্র কয়েকটি কৌশলপ্রধান কৌড়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এর সঙ্গে সজ্ঞা সমানভাবে ভাল রেখে সিনেমা, থিয়েটার, হাতারস অপরিচীত দর্শকতার সঙ্গে পরিবেশন করেছেন বাহুরকোড়াটিকে সজ্ঞা সকার। মঞ্চসজ্জা আলোক নিয়ন্ত্রণ এবং সর্ধোপরি তাঁর অভিজ্ঞ সহকারীদের কর্মনিপুণ্যে “ইন্দ্রজাল” পরম আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে, ইন্দ্রজাল দর্শকের মনে যথেষ্ট প্রভাববিস্তার করতে সমর্থ হয়। বৈচিত্র্যপূর্ণ এই অনুষ্ঠানটির মধ্যে একাধিক ভাষার, গণিতে ও চিত্রশিল্পে জ্ঞী সরকারের ব্যুৎপত্তির প্রমাণ মেলে। মনোমুগ্ধকর বহু বাহুরকোশল প্রদর্শন করে সমগ্র অনুষ্ঠানটির মধ্যে তিনি যে প্রয়োগ-নৈপুণ্যের পরিচয় দিলেন, তা নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য।

রক্তপট প্রসঙ্গে

তরুণ পরিচালক অসীম বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় সুবীর হাজরা “কোন এক দিন” কাহিনীটির চিত্ররূপ গড়ে উঠেছে। রূপায়ণে দেখা যাবে কমল মিত্র, অসিতবরণ, দীপক মুখোপাধ্যায়, নির্মলকুমার, শোভা সেন, তপতী ঘোষ, রঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি শিল্পিবর্গকে।...প্রখ্যাত চিত্রকর বিপ্লবচক্রবর্তীর পরিচালনায় বিধায়ক ভট্টাচার্যের কাহিনী “অবাক পৃথিবীর” চিত্ররূপ গৃহীত হচ্ছে। রূপালী পদ্মার দেখা যাবে ছবি বিশ্বাস, উত্তমকুমার, গঙ্গাপদ বসু, তরুণকুমার, জহর রায়, ভুলসী চক্রবর্তী, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, শ্রীম লাতা, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, অপর্ণা দেবী, সবিতা গাঙ্গুলী প্রভৃতি শিল্পিবর্গকে। তেমন্তানুভূত জীহমল মুখোপাধ্যায়কে সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে দেখা যাবে।...প্রমুখ চক্রবর্তীর পরিচালনায় “সুখের চোর” ছবিটিতে অভিনয়শ্রেণী অবতীর্ণ হচ্ছেন ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্তাল, কমল মিত্র, উত্তমকুমার, তরুণকুমার, ভাহু বন্দ্যোপাধ্যায় ও জীমন্তী বাসবী নন্দী প্রভৃতি শিল্পিবর্গ। চিত্রনাট্য রচনা করেছেন প্রসিদ্ধ সাংস্কৃতিক জ্যোতিষ্ময় রায়।...বাসবিহারী লালের লেখা “সোনার চরণ”—এর চিত্ররূপ গড়ে উঠেছে মঙ্গল চক্রবর্তীর পরিচালনায়। অভিনয়শ্রেণী দেখা যাবে ছবি বিশ্বাস, বিপিন গুপ্ত, উত্তমকুমার, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, মিহির ভট্টাচার্য, তরুণকুমার, পদ্মা দেবী, সুরিরা চৌধুরী, নমিতা সিংহ, কুঙ্কলা চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি শিল্পীদের। সুর-যোজনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।...নির্মল চৌধুরীর পরিচালনায় নির্মোহমান ছবি “চলতি পথের গ্রন্থি” ছবিতে অভিনয় করছেন বলে ঐদের নাম জানা গেছে তাঁদের মধ্যে ছবি বিশ্বাস, অসিতবরণ, দীপক মুখোপাধ্যায়, পূর্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, রবীন রায়

● দেশে-বিদেশে ●

ভাদ্র, ১৩৬৬ (আগষ্ট-সেপ্টেম্বর, '৫৯)

অন্তর্দেশীয়—

১লা ভাদ্র (১৮ই আগষ্ট) : পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার অন্তর্ভুক্ত নির্বাচনে কংগ্রেস দলের জয়লাভ—মোট ৩১টি আসনের মধ্যে ২১টি আসন অধিকার।

২রা ভাদ্র (১৯শে আগষ্ট) : কলিকাতায় দুই নিবসবাসী পাক-ভারত বৈঠক সম্পন্ন—টুকেরগ্রাম ও পাথারিয়া বনাকুলের (আসাম) সীমারেখা সংক্রান্ত রিপোর্টের অমীমাংসিত আলোচনা;

৩রা ভাদ্র (২০শে আগষ্ট) : সরকারী খাজনীর প্রতিবাদে ও সত্তা দরে খাতিয়ারগামী চাউলের দাবীতে মূল্য বৃদ্ধি ও হুড়কি প্রতিবাদে কমিটির উদ্দেশ্যে কলিকাতা ও সারা পশ্চিমবঙ্গে গণ-সংগ্রাম ও আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ।

কেবল সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির ঘোষণা (কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ) লোকসভায় ২৭-০-৬৮ ভোটে অস্বীকারিত—প্রতিবাদে কমিউনিষ্ট সন্যস্তদের সভাকক তাগ।

৪ঠা ভাদ্র (২১শে আগষ্ট) : প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর নিকট কেন্দ্রীয় খাজ ও কৃষি সচিব শ্রীঅজিতপ্রসাদ জৈনের পদত্যাগপত্র পেশ।

৫ই ভাদ্র (২২শে আগষ্ট) : শিৎ-এ আসামের রাজ্যপাল সৈয়দ কজল আলির (৭৩) পরলোকগমন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কলিকাতা ও সহরতলীর প্রায় ৩০ হাজার কর্মচারীর বিভিন্ন দাবী দাওয়া পূরণের দাবীতে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের বাস ভবনের সম্মুখে বিক্ষোভ।

৬ই ভাদ্র (২৩শে আগষ্ট) : মুসৌরীতে দালাই লামার বিবৃতি— তিব্বতের সংগ্রামে এ যাবৎ ৮০ হাজার লোক নিহত।

৭ই ভাদ্র (২৪শে আগষ্ট) : পে-কমিশন কর্তৃক কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট তাঁহাদের রিপোর্ট পেশ—অবসর গ্রহণের বয়স ৫৫ বৎসরের স্থলে ৫৮ বৎসর ধার্য্যে সুপারিশ।

দক্ষিণ আফ্রিকা বসবাসকারী ভারতীয়দের দায়িত্ব দক্ষিণ আফ্রিকান সরকারের—লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর ঘোষণা।

৮ই ভাদ্র (২৫শে আগষ্ট) : খাজ-আন্দোলনের ৬ষ্ঠ দিবসে হাওড়া, আমতা, শ্রীরামপুর প্রভৃতি অঞ্চলে খাজ-আন্দোলনকারীদের উপর পুলিশের লাঠি চালনা।

৯ই ভাদ্র (২৬শে আগষ্ট) : চীনা সৈন্যবাহিনী কর্তৃক ভারতীয় সীমানা লঙ্ঘন ও নেকার (উত্তর পূর্ব সীমান্ত এজেন্সী) বাসিন্দাদের সহিত ভুয়ুস সংঘর্ষের সংবাদ।

১০ই ভাদ্র (২৭শে আগষ্ট) : পশ্চিমবঙ্গের খাজাবস্থা পর্যালোচনার জন্ত ১২ জন কংগ্রেসী পার্লামেন্টারী সদস্যের কলিকাতা উপস্থিতি এবং রাইটাস' বিজিৎস-এ মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও খাজমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের সহিত আলোচনা।

১১ই ভাদ্র (২৮শে আগষ্ট) : লোকসভায় শ্রীনেহরুর ঘোষণা— ভারতের নেকা অঞ্চলে রকী বঁটিতে চীনা ফৌজের হামলা ও প্রবল গুলীবর্ষণ—সাদাকে সীমান্ত লঙ্ঘন করিয়া চীনাগের বঁটি ন্যাপন।

নিবর্তনমূলক আটক আইনে কাউন্সিলার প্রোগ্রামের প্রতিবাদে ইউ, সি, সি, কাউন্সিলারদের একযোগে কর্পোরেশন সভা ত্যাগ।

১২ই ভাদ্র (২৯শে আগষ্ট) : ভারতসভা (কলিকাতা) হলে অনুষ্ঠিত হাইনজীবী ও শিক্ষাবিদদের সভার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দমননীতি ও জনস্বার্থ-বিরোধী খাজনীতির প্রতিবাদ—সভার মুমূর্ষু অভিমত যে, জাধ্য দাবীর জন্ত শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের অধিকার আইনসম্মতঃ সবিধানসম্মত।

১৩ই ভাদ্র (৩০শে আগষ্ট) : তিব্বতের প্রের রাষ্ট্রসংঘে উপাধানের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে দিল্লীতে দালাই লামার ঘোষণা।

১৪ই ভাদ্র (৩১শে আগষ্ট) : খাজের দাবীতে রাইটাস' বিজিৎস অভিযানকারী গণ-মিছিলের উপর পুলিশের বেগ-রায়া লাঠিচার্জ ও কাঁহনে গ্যাস প্রয়োগ—পাঁচ শতাধিক লোক আহত ও ৭০ জন গ্রেপ্তার।

১৫ই ভাদ্র (১লা সেপ্টেম্বর) : খাজ আন্দোলন প্রসঙ্গে কলিকাতায় পুলিশের গুলীবর্ষণে ৭ জন নিহত ও ৬৫ জন আহত।

পারম্পরিক আলোচনা মারফত পাক-ভারত অমীমাংসিত প্রদ্বসমূহের মীমাংসা প্রস্তাবে মতৈক্য—প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু (ভারত) ও জেনারেল আয়ুব খানের (পাকিস্তান) বৈঠকান্তে যুক্ত ইস্তাহার।

১৬ই ভাদ্র (২শে সেপ্টেম্বর) : খাজ আন্দোলনের জের— পুলিশের গুলীবর্ষণে কলিকাতায় পুনরায় ৪০ জন আহত—করেকটি খানা আক্রান্ত।

প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর অহুরোধে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল খিমায়ার উপস্থাপিত পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার।

১৭ই ভাদ্র (৩রা সেপ্টেম্বর) : পুলিশের সহিত বিক্ষুব্ধ জনতার সংঘর্ষ কলিকাতা ও হাওড়ায় ১৫ ব্যক্তি নিহত—হাওড়ায় হান্সা (খাজ আন্দোলন সংক্রান্ত) দমনে মিলিটারী তলব।

মূল্যবৃদ্ধি ও হুড়কি প্রতিবাদে কমিটির আহ্বানে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের অগণতান্ত্রিক খাজনীতি ও পুলিশের গুলীবর্ষণের প্রতিবাদ-স্বরূপ কলিকাতা-সহ সারা পশ্চিমবঙ্গে পূর্ণ হরতাল পালিত।

দিল্লীতে রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু ও দেশবন্ধু সচিব শ্রীকৃষ্ণ মেননের সহিত দালাইলামার (তিব্বত) দৌব বৈঠক।

১৮ই ভাদ্র (৪ঠা সেপ্টেম্বর) : ৪ দিন হান্সা ও বিপর্য্যস্ত অবস্থা চলার পর কলিকাতা মহানগরীতে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা চালু।

১৯শে ভাদ্র (৫ই সেপ্টেম্বর) : ভারত-চীন সীমান্তে পুনরায় সংঘর্ষ—৭জন চীনা ও একজন ভারতীয় নিহত হওয়ার সংবাদ।

২০শে ভাদ্র (৬ই সেপ্টেম্বর) : তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠন—কংগ্রেস পরিকল্পনা সাব-কমিটির চারদকা সুপারিশ সম্বলিত রিপোর্ট প্রকাশ।

২১শে ভাদ্র (৭ই সেপ্টেম্বর) : প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু কর্তৃক চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধ প্রসঙ্গে পার্লামেন্টে ১২২ পৃষ্ঠা ব্যাপী যেতপত্র পেশ।

২২শে ভাদ্র (৮ই সেপ্টেম্বর) : নয়াদিল্লীতে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর সহিত লাওসের পররাষ্ট্র সচিব মিঃ থামদান মন্তের সাক্ষাৎকার ও লাওস পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা।

খাজ আন্দোলন ব্যাপারে আপোষের চেষ্টার পশ্চিম বঙ্গের রথায়ী ভাঙে—কলিকাতায় রাষ্ট্রপতির শ্রীনেহরুর ঘোষণা—

দাঁত ও ঠাণ্ডা ব্যথা?

দেখুন পিরামীড ব্র্যাণ্ড গ্লিসারীন্ কেমন করে
দাঁত ওঠা সহজ করে তোলে।



দাঁত ওঠার সময়? মাড়ির ব্যথা? একটা নরন কাপড়ে আপনার
আঙ্গুল জড়িয়ে পিরামীড গ্লিসারীনে একটু আঙ্গুলটা ডুবিয়ে
নিন তারপর আঙুলে আঙুলে পিঁড়ন মাড়িতে মালিশ করে দিন
এবং ভাড়াভাড়ি ব্যথা কমে যাবে আর এর মিষ্টি ও তৃপ্তি
শিশুদের প্রিয়। এটা বিশুদ্ধ এবং গৃহকেন্দ্র, গৃহ্য হিসাবে, পম্পানে
ও মানসিকভাবে সারা বছরই কাছে লাগে—আপনার হাতের
কাছেই একটা বোতল রাখুন।

বিনামূল্যে

বিনামূল্যে পুস্তিকা : এই কুপনটি ভরে নিচের ডিকানার পাঠান :
হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, পোস্ট বাক্স নং ৪০২, বোম্বাই।

আমাকে অনুগ্রহ করে পিরামীড ব্র্যাণ্ড গ্লিসারীনের গৃহকেন্দ্র ব্যবহার
প্রণালী পুস্তিকা বিনামূল্যে পাঠান।

আমার নাম ও ঠিকানা

আমার ওষুধের দোকানের নাম ও ঠিকানা

B.M.C

ডিস্ট্রিবিউটরস : আই. সি. আই. (আই) প্রাইভেট লিঃ কলিকাতা, বোম্বাই, দিল্লী, মাদ্রাস

PYD. 13-X20 BC

৩ জীবনবিদ্যা বোঝান—এই তিনজন বারমধ্যে পাল্লার্মেন্ট সদস্যর বৈঠক।

২৩শে ভাদ্র (১ই সেপ্টেম্বর): জাতীয় আয়বৃদ্ধির দিক হইতে দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা বার্ষিকতার পর্য্যবসিত—ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রিপোর্ট তথ্য প্রকাশ।

২৪শে ভাদ্র (১০ই সেপ্টেম্বর): ম্যাকমোহন লাইনই চীন-ভারত সীমারেখা—এই দাবীর ভিত্তিতে চীনের নিকট ভারতের আর এক দফা কড়া নোট প্রেরণ।

কলিকাতা ও পাখিবর্তী অঞ্চল হইতে খাদ্য আন্দোলন প্রসঙ্গে বলবৎ ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার।

২৫শে ভাদ্র (১১ই সেপ্টেম্বর): পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান বর্ষের অতিবিক্ত খাদ্যশস্যের চাহিদা কেন্দ্র পূরণ করিবে—নব নিযুক্ত কেন্দ্রীয় খাদ্য সচিব জী এস কে পাতিসের ঘোষণা।

২৬শে ভাদ্র (১২ই সেপ্টেম্বর): খাদ্য আন্দোলন প্রসঙ্গে কলিকাতা ও হাওড়ার দৃষ্ট বন্দীদের মধ্যে মূল্যবৃদ্ধি ও হৃত্তিক প্রতিরোধ কমিটি সভাপতি জীহেমন্তকুমার বসু প্রমুখ ৭৭ জনের (১৬ জন বিধান সভা সদস্য) মুক্তিলাভ।

২৭শে ভাদ্র (১৩ই সেপ্টেম্বর): খাদ্য আন্দোলনে নিহত শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ মূল্য বৃদ্ধি ও হৃত্তিক প্রতিরোধ কমিটির উদ্যোগে কলিকাতায় বিরাট মৌন শোক-মিছিল।

২৮শে ভাদ্র (১৪ই সেপ্টেম্বর): ক্রমাগত সন্তোষজনক প্রবল বর্ষাফলে ফলে বৃহত্তর কলিকাতার ২৫ বর্গমাইল অঞ্চল (বহু উদ্যান কলোনী) জলমগ্ন ও জনগণের অপরিণীত দুঃখ দৃশ্যমান।

৩০শে ভাদ্র (১৬ই সেপ্টেম্বর): মূল্য বৃদ্ধি ও হৃত্তিক প্রতিরোধ কমিটির খাদ্য আন্দোলনের সময় হাওড়ায় পুলিশের সাম্প্রতিক গুলীবর্ষণ সম্পর্কে শাসন বিভাগীয় তদন্তের ব্যবস্থা।

৩১শে ভাদ্র (১৭ই সেপ্টেম্বর): পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে কম্যুনিষ্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ শাখা রাষ্ট্রপতির নিকট যে অভিযোগ পেশ করে, রাজ্য সরকার কর্তৃক উত্তর জবাব দান। জবাবে কম্যুনিষ্টদের সকল অভিযোগ অস্বীকার ও কম্যুনিষ্ট পার্টির বিরুদ্ধে পান্টা অভিযোগ।

বহির্দেশীয়:—

১লা ভাদ্র (১৮ই আগষ্ট): আর্থিক পরীক্ষা বন্ধের প্রেরণ রাষ্ট্রসংঘে আলোচনার্থ রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী-জেনারেল দাগ হামারক-জেন্ডের নিকট ভারতের প্রস্তাব।

৩রা ভাদ্র (২০শে আগষ্ট): জেনেভা ত্রিশক্তি আর্থিক সম্মেলনে রুশিয়ার ঘোষণা—গোপন অস্ত্র পরীক্ষা সম্পর্কে সম্মেলনজনক স্থান পর্য্যবেক্ষণ চালানার পশ্চিম প্রস্তাব নীতিগতভাবে মানিয়া লইতে সে প্রস্তাব।

৫ই ভাদ্র (২২শে আগষ্ট): মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের স্বাক্ষর ক্রমে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৫০তম অঙ্গরাজ্যে পরিণত।

৬ই ভাদ্র (২৩শে আগষ্ট): লাওসের রাজধানী লুয়াংপ্রাবং-এর ৫০ মাইল মধ্যে বিদ্রোহীদের সশস্ত্র অভিযান।

৯ই ভাদ্র (২৬শে আগষ্ট): ইউরোপীয় রাজধানীগুলি সরকারের প্রথম পর্য্যবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের বন (পশ্চিম জাওয়ানী) উপস্থিতি।

১০ই ভাদ্র (২৭শে আগষ্ট): দুই জাওয়ানীর মধ্যে শান্তিচুক্তি অমুষ্ঠানের ব্যাকুলতার পশ্চিম জাওয়ানী চালেলায় ডা: কোনারন আদেমুরের নিকট রুশ প্রধান মন্ত্রী ম: ক্রুশ্চেভের পত্র।

১২ই ভাদ্র (২৯শে আগষ্ট): ভারত-চীন সীমান্ত সংঘর্ষ সম্পর্কে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রতিক্রিয়া—বাকিংহামসারারে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মি: হারল্ড ম্যাকমিলান ও পররাষ্ট্র সচিব মি: সেলুইন লয়েডের মধ্যে জরুরী আলোচনা।

১৪ই ভাদ্র (৩১শে আগষ্ট): লণ্ডনে প্রধান মন্ত্রী মি: হারল্ড ম্যাকমিলানের (বুটেন) সহিত সরকারী মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎকার।

১৬ই ভাদ্র (২রা সেপ্টেম্বর): চীনভারতীয় সীমান্ত লঙ্ঘন করে নাই—চীনা পররাষ্ট্র সচিব মার্শাল চেন ইয়াং'র ঘোষণা।

ঢাকা হইতে পাক প্রেসিডেন্ট জেনারেল আয়ুব খানের ঘোষণা—পাকিস্তানে নতুন ধাঁচের গণতন্ত্র প্রবর্তনের আয়োজন করা হইয়াছে।

১৮ই ভাদ্র (৪ঠা সেপ্টেম্বর): চীন কর্তৃক ভারতের সীমান্ত লঙ্ঘনের অভিযোগ অস্বীকার—পার্লার্মেন্টে প্রধানমন্ত্রী জীনেহরুর ঘোষণা।

অবিলম্বে লাওসে রাষ্ট্রসংঘ বাহিনী প্রেরণের জন্য লাও সরকারের অনুরোধ—উত্তর ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে আক্রমণের অভিযোগ।

২০শে ভাদ্র (৬ই সেপ্টেম্বর): লাওসে পরিস্থিতি প্রসঙ্গে রাষ্ট্রসংঘে নিরাপত্তা পরিষদের জরুরী অধিবেশন শুরু।

২২শে ভাদ্র (৮ই সেপ্টেম্বর): লাওসের পরিস্থিতি সম্পর্কে তদন্তের জন্য রাষ্ট্রসংঘে নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক জাপান, ইতালী, তিউনিশিয়া ও আর্জেন্টিনা—এই চার সদস্য লইয়া কমিটি গঠন।

৩শে ভাদ্র (৯ই সেপ্টেম্বর): জীনেহরুর নিকট চীনা লাই এর (চীন প্রধানমন্ত্রী) পত্র—বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধের মীমাংসা করা হউক।

২৪শে ভাদ্র (১০ই সেপ্টেম্বর): তিব্বত প্রঙ্গে আও হস্তক্ষেপের জন্য হালাইলামা কর্তৃক আন্তর্জাতিকভাবে রাষ্ট্রসংঘের নিকট আবেদন পেশ।

২৫শে ভাদ্র (১১ই সেপ্টেম্বর): চীনা পার্লার্মেন্টে প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাই-এর ঘোষণা—পঞ্চলীলের (সহ-অবস্থানমূলক) ভিত্তিতে চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধের মীমাংসা হইবে।

২৬শে ভাদ্র (১২ই সেপ্টেম্বর): সোভিয়েট ইউনিয়ন কর্তৃক সাকল্যের সহিত চন্দ্রাভিযুগে মহাজাগতিক রকেট (লুনিক-২) উৎক্ষেপণ।

২৭শে ভাদ্র (১৩ই সেপ্টেম্বর): রুশ রকেট লুনিক-২ পৃথিবীপৃষ্ঠ হইতে উৎক্ষিপ্ত হওয়ার ৩৪ ঘণ্টা পরই চন্দ্রলোকে উপনীত—সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের ঘোষণা।

২৮শে ভাদ্র (১৪ই সেপ্টেম্বর): প্রধানমন্ত্রী জীনেহরুর (ভারত) চারদিবসব্যাপী আফগানিস্থান সফর শুরু।

২৯শে ভাদ্র (১৫ই সেপ্টেম্বর): আমেরিকার ১৩দিন ব্যাপী ঐতিহাসিক সফরে রুশ প্রধানমন্ত্রী ম: নিকিভা ক্রুশ্চেভের ওয়াশিংটন উপস্থিতি।

৩১শে ভাদ্র (১৭ই সেপ্টেম্বর): মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের সহিত প্রাথমিক বৈঠকান্তে এক সরকারী ভোক্তাভার সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভের ঘোষণা—‘ঠাণ্ডা লড়াই-এর ব্যবস্থাপনা’ জারিতে লাক করিয়াছে।

কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর গ্রন্থাবলী

রবীন্দ্রনাথ বলেন—“আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে প্রেমের সঙ্গীত
এরূপ সহস্রধারে উৎসর মত কোথাও প্রোৎসাহিত হয় নাই।
এমন সুন্দর ভাবের আবেগ, কথার সহিত এমন সুবের মিশ্রণ
যার কোথাও পাওয়া যায় না।”

বাঙ্গালার নব সীতিকবিতার এই প্রবর্তক, রবীন্দ্রনাথ,
যক্ষ বড়াল, রাজকৃষ্ণ রায় প্রভৃতির এই কাব্যগুরু কবি
বিহারীলাল চক্রবর্তীর রচনার সমাবেশ।

কবির জীবনী, সুবিস্তৃত সমালোচনা সহ সুবহুং গ্রন্থ
মূল্য তিন টাকা

বঙ্গমতীর শ্রেষ্ঠ অবদান

শৈলজানন্দের গ্রন্থাবলী

প্রখ্যাত কথাসিঙ্গী

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রণীত

সুনির্বাচিত এই ৭খানি গ্রন্থের মণিমাণিক্য

- ১। ধরাত্রোতা, ২। রান্ন-চৌধুরী, ৩। ছান্নাছবি,
- ৪। সতীন কাঁটা বা গঙ্গা-যমুনা, ৫। অরুণোদয়,
- ৬। ধ্বংসপথের যাত্রী এরা এবং ৭। কয়লা কুঠি।

মূল্য ৮ পেন্সী, ৩২৮ পৃষ্ঠার বহুং গ্রন্থ।

মূল্য সাড়ে তিন টাকা

রোমাঞ্চ উপন্যাসের যাত্রাকর

দীনেন্দ্রকুমার রায়ের গ্রন্থাবলী

ইহাতে আছে ৫ খানি সুবহুং ভিটেকটি উপন্যাস

বিশ্বিনী রঞ্জিনী, মুক্ত কয়েদীর গুপ্তকথা, কুতাস্তের
দপ্তর, টাকের উপর টেকা, শরের ঢেঁকী।

মূল্য ৩।।০ টাকা

উপন্যাস-সাহিত্যের যাত্রাকর

অরবিন্দ দত্তের গ্রন্থাবলী

যামুন বাগদী, রক্তের টান, পিপাসা, প্রণয় প্রতিমা,
কামিখের ঠাকুর (বোখাপড়া), বন্ধন, মাতৃঋণ প্রভৃতি।

মূল্য তিন টাকা মাত্র

জনতার দরদী নিপুণ কথাসিঙ্গী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

মানিক গ্রন্থাবলী

প্রথম ভাগ

ইহাতে আছে দুইটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস এবং পঁচিশটি সুনির্বাচিত
গল্পসিঙ্গী। মূল্য দুই টাকা।

দ্বিতীয় ভাগ

ইহাতে আছে দুইটি সুখপাঠ্য উপন্যাস এবং বহুপ্রশংসিত
চৌদ্দটি গল্প। মূল্য দুই টাকা।

প্রখ্যাত কথাসিঙ্গী শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত

রামপদ গ্রন্থাবলী

—নিম্ন গ্রন্থগুলি সরিষিষ্ট—

- ১। শাখত পিপাসা, ২। প্রেম ও পৃথিবী,
- ৩। মায়াজাল, ৪। সুনয়নার হৃদয়, ৫। সংশোধন,
- ৬। কত, ৭। প্রতিবিম্ব, ৮। জোয়ার ভাটা,
- ৯। মৃতন জগতে ও ১০। ভয়।

মূল্য ৮ পেন্সী ৩২২ পৃষ্ঠার সুবহুং গ্রন্থাবলী

মূল্য তিন টাকা

কথা ও কাহিনীর যাত্রাকর প্রেমেন্দ্র মিত্রের

প্রেমেন্দ্র-গ্রন্থাবলী

—গ্রন্থাবলীতে সরিষিষ্ট—

মিছিল, প্রতিশোধ, পরোপকার, একটি কথা
টোটে, নিরুদ্ধেশ, পান্থশালা, মহানগর, অরণ্যপথ
চল ভয়, নতুন বাসা, রুষ্টি, নির্জন্মবাস, ছোট গল্পে
রবীন্দ্রনাথ (প্রবন্ধ), জিজ্ঞাসন কবিতা (প্রবন্ধ)।

মূল্য আড়াই টাকা

বলিষ্ঠ কথাসিঙ্গী শ্রীজগদীশ গুপ্তের

জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলী

লক্ষ্যগুরু (উপন্যাস), রতি ও বিরতি (উপন্যাস),
অসামু সিদ্ধার্থ (উপন্যাস), রোমন্থন (উপন্যাস),
ভুলালের দোলা (উপন্যাস), মন্দা ও কুকা (উপন্যাস),
গতিহারী জাহ্নবা (উপন্যাস), যথাক্রমে (উপন্যাস),
দয়ানন্দ মল্লিক ও মল্লিকা, স্মৃতিলা, শরৎচন্দ্রের
শেষের পরিচয়

মূল্য তিন টাকা

সাময়িক প্রসঙ্গ

দেশপ্রেম

“কংগ্রেস সভানেত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বৈঠকে সকলকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, কংগ্রেস আদেশের মূল ভিত্তি বরাবরই জাতীয়তাবাদ এবং এই লক্ষ্য হইতে কোনদিনই কংগ্রেস বিচ্যুত হইতে পাবে না। শ্রীমতী ইন্দিরার এই বক্তৃতা পাঠ করিয়া আর কিছু না হউক তাঁহার হৃদয়স্বরের প্রশংসা করিতেই হয়। ইতিহাস বিকৃত করিতে হইলে সাহসের চেয়ে হৃদয়স্বরের প্রয়োজন বেশি। কংগ্রেস সভানেত্রীর সেই হৃদয়স্বর ইদানীং খুবই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। অথচ ভারতকে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ছুই চুককা করিবার পরও নিজেদের জাতীয়তাবাদী বলিয়া পরিচয় দিতে যে কংগ্রেস সভানেত্রী সাহস করিয়াছেন—ইহাও কম কথা নয়। কিন্তু হৃদয়স্বর দেখাইয়াও কি দেশের লোকের চোখে ধুলি নিক্ষেপ করিতে তিনি সক্ষম হইবেন। কংগ্রেসের আদেশের মধ্যে আর যাহাই থাক, জাতীয়তাবাদ কোনদিন ছিল না—ছিল মুসলিম লীগের কায় চরম সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানকে তোলণ করার আদি এবং অকুরিম চেষ্টা। সেই প্রচেষ্টার ফসেই যে শেষ অবধি ভারত বিভক্ত হইয়াছে। একথা স্বয়ং মোলানা আব্বাস আল-খান ও ‘আজাদবানী’তে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ইদানীং কংগ্রেস নেতারা অজ্ঞাত বিরোধী দলদের দেশপ্রেমের প্রমাণ উপস্থিত করার জন্য দাবী জানাইয়া বেড়াইতেছেন। কিন্তু যাহারা প্রায় অর্ধেক ভারতবর্ষ ক্ষমতার লোভে বিদেশীদের হাতে তুলিয়া দিয়াছেন, সেই কংগ্রেস নেতাদের দেশপ্রেমিকতার প্রমাণ কি সর্ব-প্রথম পাওয়া দরকার নয়?”

—দৈনিক বসুন্ততী।

ভারত-চীন

“ভারত-চীন সীমান্ত-বিরোধ লইয়া আলাপ-আলোচনার যে প্রস্তাব উঠিয়াছে সে সম্পর্কে যথেষ্ট সাবধান থাকিবার প্রয়োজন আছে। আপাতত চীম সরকার ভারতভূমিতে সাময়িক অভিযান চালানো হইতে বিরত থাকিতে পারেন। পিকিং হইতে লাসা পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণে এবং লাসা হইতে ভারত সীমান্ত পর্যন্ত সৈন্তচালনের উপযুক্ত সড়ক তৈয়ারী করিতে চীন সরকারের আরও দুই-এক বৎসর সময় লাগিবে। এই সময়ের মধ্যে ভারতের উত্তর সীমান্ত অঞ্চল সম্পূর্ণ সুরক্ষিত করিবার ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। তাহা ছাড়া চীনা সৈন্তবাহিনী ভারতভূমির যে সমস্ত জায়গা অত্যাচারে দখল করিয়াছে সেগুলি পুনরুদ্ধার করা না গেলে পিকিং সরকারের সহিত আলাপ-আলোচনা নিরর্থক প্রধানমন্ত্রী নেহরুকে লিখিত পত্রে শ্রীচী এন লাই জনাইয়াছিলেন, আলাপ-আলোচনার সময় ‘হিতাবস্থা’ বজায় রাখা সম্ভব। ইহার অর্থ মোটেই স্পষ্ট নয়। ভারতভূমির যে সকল জায়গা বলপূর্বক দখল করা হইয়াছে সেগুলি হইতে চীনা সৈন্তগণ বিদায় না লইলে ‘হিতাবস্থা’

নিখিল-ভারত-কংগ্রেস-কমিটি-গৃহীত প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, ভারতীয় এলাকায় চীনের অধিকার প্রবেশ অবশ্য প্রতিরোধ করিতে হইবে (must be resisted) ইহা ভাল কথা। কিন্তু যে জায়গাগুলি চীন সরকার দখল করিয়াছেন সেগুলি উদ্ধারের জন্য কী ব্যবস্থা হইতেছে? নিখিল-ভারত-কংগ্রেস-কমিটির প্রস্তাব গৃহীত হইবার পর শ্রীনেহরু কিছুটা সুর চড়াইয়া বলিয়াছেন, “দরকার হইলে, সংগ্রাম করিতেই হইবে।” অতঃপর প্রধানমন্ত্রী নেহরু কবে কখন এবং কী অবস্থায় দরকারটা যথোচিত দৃঢ়তাপ সহিত উপলব্ধি করিবেন তাহা জানিবার জন্য দেশবাসী উৎসুক রহিল।”

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

ক্ষুদ্র শিল্পের সমস্যা

“দেশের বিভিন্ন স্থানে ১২০টির বেশী ক্ষুদ্রশিল্প সমিতিও প্রতিনিধিগণ দিল্লীতে সমবেত হইয়া সর্ব ভারতীয় ক্ষুদ্রশিল্প সঙ্ঘ গঠন করিয়াছেন। ইহার ফলে ছোট ছোট শিল্পের সাংগঠনিক দুর্বলতাজনিত জটিল উপসর্গের প্রতিকার সম্ভব হইতে পারে। এখন সংগঠনের যুগ, কথায় বলে দেশের লাঠি একের বোঝা। ছোট ছোট শিল্প দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত; যন্ত্রসম্পদ ও অর্থসম্পত্তিতে নিতান্ত দুর্বল, যথাসম্ভব সস্তা দরে কাঁচামাল ক্রয়ের, তৈয়ারী মাল বিক্রয় করিয়া জাতীয়দের পাওয়ার এবং প্রয়োজন অনুসারে দান বা ঋণ জোগাড় করার উপযুক্ত ব্যবস্থাদি করা ইহাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। আকারে এবং ঐশ্বর্যে নগণ্য বলিয়া সরকারের নিকট আবেদন জানাইয়া ভ্রাণ্য ব্যবহারও ইহার অনেক সময় পায় না। সরকারের পক্ষেও অবশ্য হাজার হাজার ছোট ছোট শিল্পকারবারের বস্তব্য আলাদাভাবে বিবেচনা করা অস্ববিধাজনক। এই কারণেই সমস্বার্থবান বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সমিতি বা সঙ্ঘ গঠন করা প্রয়োজন। সাধারণতঃ শ্রেণীস্বার্থসংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলি সমাজের বৃহত্তর স্বার্থ অপেক্ষা সঙ্কীর্ণ শ্রেণীস্বার্থ প্রদানের জন্যই চেষ্টা করিয়া থাকে। আলোচ্য ক্ষুদ্র শিল্পসঙ্ঘের সভ্যগণ মধ্যবিত্ত পর্যায়ভুক্ত। তাঁহাদের নিকট দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যতিক্রম আশা করিতেছি। জনসাধারণের বৃহত্তর স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্যপদ্ধতি ও দাবী-মাওয়া স্থির করিলে তাঁহারা সব মহলেই সহায়ভূতি ও সমর্থনলাভ করিতে পারিবেন।”

—যুগান্তর।

বিধানসভায় জুতা

“পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় কালীপদ মুখার্জির প্রতি জুতা নিক্ষেপ হইয়াছে, তিনিও সেই জুতা ছুঁড়িয়া ফেৎ দিয়াছেন। ইহার পর আরও কিছু জুতা উভয় পক্ষে নিক্ষেপ হইয়াছে। ডাঃ রায় বীরের ভায় আগেই পলায়ন করিয়াছিলেন। এই জুতা ছোঁড়ার ব্যাপারে

নিয়ম

আমরা আবারও বলিব—এরূপ ঘটনা ঘটিতেছে কেন এবং তার জ্ঞান দায়ী কে? আজ জুতা নিষ্পত্তি হইয়াছে, কাল বোমা নিক্ষেপ হইবে না ইহার গারান্টি কোথায়? আমরা দিবা চক্ষে দেখিতেছি বিধান সরকার বাংলাদেশকে সেই পথেই ঠেলিয়া নিয়া চলিয়াছেন। খাজ সম্বন্ধে বাংলাদেশের অভিযোগ অত্যন্ত সঙ্গত এবং অত্যন্ত গুরুতর অভিযোগ। শাস্ত্র এবং ভদ্র উপায়ে ইহার প্রতিকার হইতেছে না, প্রতিকারের সম্ভাবনাও দেখা যাইতেছে না। লোকে যখন খাওয়ার কষ্ট পায় এবং অপমানিত হয় তখন তাহার মরিয়া হইয়া ওঠে। খাজের দাবী উপেক্ষিত হইয়া যখন তার উপর অপমান ও লাঞ্ছনা আসে তখন এত অবস্থা ঘটিতে বাধ্য। ফরাসী এবং জাপানী পার্লামেন্টে এর চেয়ে বেশী খারাপ অবস্থা হইয়াছে। ডাঃ রায় তাঁর ঘরে বসিয়া সমস্ত ব্যাপার স্মরণিত করিয়াছেন। তিনি যদি তখনই সভাকক্ষে আসিতেন এবং বলিতেন—‘আমি এর জ্ঞান দায়ী এস, জুতা মারিতে হয় আমাকে মারো, তাহা হইলেও মনুষ্যত্বের পরিচয় দেওয়া হইত। সমস্ত দুর্ভাগ্যের প্রকৃত নাথক তিনি, তাঁর উপযুক্ত সাক্ষরেন জুটিয়াছে দুইটি—প্রফুল্ল সেন আর দলীপদ মুখার্জি। দুর্ভাগ্যের সখ আছে, কিন্তু দায়িত্ব নেওয়ার সাহস নাই—ইহা দেখাইয়া বিধান রায় সেদিন প্রমাণ করিয়াছেন তিনি চূড়ান্ত পাপকন্য।’

—যুগবাণী।

ভারত-চীন মৈত্রী

“মহাচীন স্বাধীন ভারতকে আক্রমণ করিতে পারে না—এই দৃঢ়বিশ্বাস সাম্রাজ্যবাদবিরোধী স্বাধীনতাপ্রিয় প্রতিটি মানুষের থাকা উচিত বলিয়া আমরা মনে করি। আমাদের বৈদেশিক নীতির চিরশত্রুগণই ভারত-চীন মৈত্রীর বিরুদ্ধে সর্বাঙ্গিক উগ্র প্রচারণা। সাধারণ মানুষের জীবন জীবিকার প্রশ্ন হইতে তাঁহাদের হৃদয় সরাইয়া লইবার উদ্দেশ্যে, গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিশালী সুপারিকল্পিত ভাবে যুদ্ধের আবহাওয়া সৃষ্টি করিতেছে। এই যুদ্ধ আবহাওয়া সৃষ্টির বিরুদ্ধে পণ্ডিত নেত্রকেও সাবধান বাণী উচ্চারণ করিতে হইয়াছে। চীনের জাতীয় দিবসে আমাদের শপথ হইবে—সীমান্ত বিরোধের সমস্তা শান্তিপূর্ণ আলোচনা-আলোচনার মাধ্যমে সমাধানসিদ্ধ হওয়া চাই। ভারত-চীন মৈত্রী আমরা দুর্বল করিতে দিব না। সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত চূর্ণ করিয়া ভারত চীন মৈত্রী সম্পর্কে সৃষ্টি করিবার জন্ত প্রাণপণ সংগ্রাম করিতে হইবে। ভারত ও চীন উভয় দেশের স্বার্থেই ইহা প্রয়োজন। ভারতের শান্তি, স্বাধীনতা এবং সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকা ও গণতন্ত্রের জন্তই ইহার প্রয়োজনীয়তা। ভারত ও চীনের অবিচ্ছেদ্য সৌহার্দ্য দীর্ঘজীবী হোক।”

—স্বাধীনতা।

নূতন ট্যাক্স ও পঞ্চায়েত কর্মসূচী

“বিনপূর খানার পঞ্চায়েত নির্বাচনের মাদকতা ও তাণ্ডবতা খামিবার সঙ্গে সঙ্গেই গ্রামবাসী এবং নির্বাচিত কর্মসূচীরা স্বাক্ষর দেখিতেছেন। পঞ্চায়েত আইনে যেভাবে ট্যাক্সের চাপ আসিতেছে, তাহাতে সকলে আতঙ্কিত। জমির ফসলের উপর কিভাবে আর বার্ষিক হইবে—জমির হিসাব, এবং জমির আয়ের হিসাব কে করিবে? গ্রাম্য দসাদলির প্রকোপে নিরীহ গ্রামবাসীদের ঘাড়ের উপর ট্যাক্স

প্রাণতোষ ঘটকের লেখা

বাঙলা সাহিত্যে বিশ্বয়! কয়েক মাসের মধ্যেই
প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত!

* মুঠো মুঠো কুয়াশা *

মূল্য মাত্র আড়াই টাকা

ভারতী লাইব্রেরী

৬, বঙ্কিম চাট্টাঞ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা

“মুক্তাভঙ্গ” ‘আকাশ পাতাল’ প্রভৃতি বিশেষ ধরণের খানকরক উপস্থাপন লিখে প্রাণতোষ ঘটক সুনাম অর্জন করেছেন। কিন্তু ছোটগল্পেও যে তাঁর হাত মিষ্টি, তার প্রমাণ এই গল্পের বই। বাসি ফুল, স্বর্গদ্বার, মুঠো মুঠো কুয়াশা, আলো আঁধারি, মেঘমল্লার আর আশার আলো, এ ছ’টি গল্প। প্রতিটি গল্পে ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ এবং তার মধ্যে বিভিন্ন চরিত্র। পরিবেশ আর চরিত্রের মূল সঙ্গতি সত্যিই উপভোগ্য। আবার প্রতিটি গল্পে বাস্তব ও কল্পনার সংঘাত বেশ নিপুণভাবে চিত্রিত হয়েছে, বিশেষ করে ‘বাসি ফুল’, ‘স্বর্গদ্বার’ এই দুটি গল্পে। আলো আঁধারিতে যে নির্ণীত পর্যবেক্ষণ ও বাস্তববোধ, তা তীব্র ও মূগ্ধ হয়ে ট্রাজেডির রূপ নিয়েছে ‘আশার আলো’ নামক শেষ গল্পে। আবার ‘মেঘমল্লারে’ যে স্বপ্নভঙ্গ ও মোহমুক্তি, ‘মুঠো মুঠো কুয়াশা’র তারই বিপরীত অর্থাৎ একটি অনবদ্য স্বপ্নরচনা। প্রাণতোষ ঘটক এই সেবা গল্পটিতে শুধুই এক চমৎকার আঙ্গিকের রণ-কৌশলের পরিচয় দেননি, কুয়াশাকে মিডিয়ম করে একটি নতুন ভঙ্গি ও মনের বিশ্বাস ও সঙ্কোচ দেখিয়েছেন, খুব গভীরভাবে। পড়তে পড়তে মন এক দৃষ্টি-বিশ্বাস বাস্তব-অবাস্তবের ছায়ারাজ্যে গিয়ে পৌঁছয়। স্বপ্নকামনার গোপনতা হিম্মত কুয়াশার ভারি শেলব, মূগ্ধ এবং নিটোল এই ছোট গল্পটি। শেষের চার পাঁচ লাইনেই এর শিল্প-পরিচয়। এখানেই এক অস্পষ্ট মনোজগতের আসল চাবি ‘মুঠো মুঠো কুয়াশা’র মধ্য দিয়ে হাতের মুঠোর এসে থাকা দিয়েছে।” —দেশ

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

আকাশ-পাতাল—(দুই খণ্ডে সমাপ্ত) ১ম পাঁচ টাকা। ২য় পাঁচ টাকা বারো আনা। ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড, কলিকাতা-৭। মুক্তাভঙ্গ—পাঁচ টাকা। বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলিকাতা-১২। কলকাতার পথ-ঘাট—তিন টাকা। ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড, কলিকাতা-৭। রত্নমালা (সমার্থাভিধান)—আড়াই টাকা। ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড, কলিকাতা-৭। বাসকসজ্জিকা—চার টাকা। মিত্র ও বোষ, কলিকাতা-১২। খেলাঘর—চার টাকা। সাহিত্য ভবন, কলিকাতা-৭।

ধাৰ্য্য হইবে তাহার প্রতিকার কে করিবে? গরুর গাড়ীর উপরেই বা কত টাক্স বসিবে? ইহা হইল গ্রামবাসীদের আতঙ্ক। কর্ত্তব্য-কর্ত্তারা ভাবিতেছেন আইন মানিয়া এই সমস্ত টাক্স ভাৰাভাবে ধাৰ্য্য করিলেও অঞ্চলের প্রধান হইতে আদৃত করিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সমস্তদের পর্য্যন্ত গ্রামে বাস করা কষ্টকর। হাতট হউক নতুন পঞ্চায়েতের টাক্সের হারও কিভাবে প্রয়োগ করা হইবে, সেই সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে প্রচুর প্রচারের প্রয়োজন। আমাদের মহকুমায় সাধারণ গ্রামবাসীদের যা অবস্থা তাহাতে যে কোন প্রদানের জগুই হউক নতুন টাক্সের বেশী বোঝা তাহারা বহিতে পারিবে না। এই বিষয়ে পঞ্চায়েতের কর্ত্তব্যকর্ত্তারা সজ্ঞান থাকিলে ভাল হয়।

—নির্মলী (কাড়গ্রাম)।

বিনা মূল্যে চিকিৎসা-প্রদান।

“বিনা মূল্যে চিকিৎসার সুযোগ দেওয়ার নামে ভাবিতে যে প্রেসন চলিয়াছে তাহা কোন স্বাধীন দেশের জনসাধারণই সমর্থন করিতে পারে না। সরকারী কর্ত্তব্যকারী ও জনসাধারণ দুইটি শ্রেণী হইলেও জনকল্যাণ রাষ্ট্রের কাছের সরকারী ভিত্তি নীতি থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। সরকারী কর্ত্তব্যকারীর বেলায় দামা ও ভাল ঔষধ পুষের (যাহা হাসপাতাল হইতে সরবরাহ করা হয় না) ব্যয় সরকার বহন করিবেন আর জনসাধারণের বেলায় এই সুযোগ থাকিবে না ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। সরকার যখন এক শ্রেণীর রোগীর ঔষধপত্রের মূল্য বহন

করেন তাহা হইলে বুঝিতে হইবে রোগ নিরাময়ের তাগিদে সরকারী অর্থ ব্যয়ে ঔষধপত্র খরচ করা সরকারের নীতি বহির্ভূত নয়। তবে কেন জনসাধারণ এই সুযোগ পায় না? “বিনা মূল্যে চিকিৎসার সুযোগ” এই নীতিটি সম্পূর্ণরূপে প্রয়োগ না করা জনকল্যাণ বিরোধী বলিয়া আমরা মনে করি। পুনর্বার উল্লেখ করিতেছি হাসপাতালের আউটডোর ও ডিসপেন্সারীতে সর্বপ্রকার ঔষধ সরবরাহ করা হইলেই ‘বিনা মূল্যে চিকিৎসার’ নীতিটি স্বাভাবিকরূপে পালন করা হইবে। আমরা ত্রিপুরা প্রশাসনকে এই ব্যাপারটি নিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট আলোচনা করিতে পরামর্শ দিতেছি।”

—সেবক (আগরতলা)

‘দর বাঁধা’ না পরিহাস !!

“বীৰভূমি তথা দেশে চিনি ‘কন্ট্রোল’ হইয়াছে অর্থাৎ ঠিক কন্ট্রোল নয় তবে দর বাঁধা হইয়াছে। সব দোকানেই দোকানদারের মুখের ভাবে ইহা গোপন থাকিতেছে না যে চিনি নাই কথারি ভাঁড়তা কারণ সব দোকানেই চিনি আছে, তাহারা সরকারী দর বাঁধাকে অপমান করিবার বা তাহাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইবার জন্ত ইহা করিতেছেন। এদিকে অনেকে আবার খরিদারকে রাগে আসিতে বলিতেছেন। ইহা শুধু বিশ্বাসদীপক নহে; উপরন্তু ইহা আটন ও রাষ্ট্রনীতিকে কেয়ার না করার চুসোহস। এই চুসোহস দেখাইবার স্পদ্ধা আজ এইসব সমাজের কলঙ্কগণ পাইতেছে কোথায়? ইহাই জিজ্ঞাস্য। ইহা ছাড়া, জনসাধারণের মধ্যে অনেকে এখনও বলিতেছেন যে বেশ ১০/ আনা সেস যত ধূসী পাওয়া যাইতেছিল অনর্থক ১/১০ পয়সা বাঁচাইবার অর্থহীন প্রেরণাবোধে মানুষকে এক্ষণে নাহেল করা হইতেছে। এখন সিভিলসাপ্লাই অফিসে আবার প্রমিট এইসব কামেলা পোতাঁইতে হইবে। অর্থাৎ জনগণ এই দর বাঁধাকে সাপ্লাই অফিসে ধর্না দেবার পুনঃব্যবস্থা বলিয়া মনে করিতেছে। বাই হোক এখনই এ সম্বন্ধে বিহিত ব্যবস্থা দরকার—সম্মুখে পূজা, এখন যদি চিনির বিজাট শুরু হয় তা কর্ত্তৃপক্ষকে নিশ্চয়ই সাদর সম্বর্দনা জানাইবে না। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট একটু এ বিষয়ে নজর দিন—আইনের মর্যাদা যাতে সত্য সত্য রক্ষিত হয় তার ব্যবস্থা করুন।”

—বীরভূম বার্জ।

বছার তাণ্ডব

“উপযুপরি কয়েকদিনের ক্রমাগত বৃষ্টির ফলে সহরের কয়েকটি অঞ্চল, বাঘনাপাড়া, ধাত্রীগ্রাম অষ্টধরিয়া, পিণ্ডুরা, নন্দাই প্রভৃতি ইউনিয়নগুলির কতকগুলি গ্রাম প্রাবৃত হইয়াছে। জলে মাঠ, ঘাট সব একাকার হইয়াছে। পরিপক্ক অবস্থায় আউস ধান, আমন ধানের চারাগছগুলি জলের তলে পচিতেছে। এবারে মাঠ ভাঙি ফসল হইয়াছিল, ফসলও ছিল খুব সম্ভাবজনক। চাষীর ঘন আনন্দে নাচিয়া উঠিয়াছিল। চাউলের দর প্রায় তিন চার টাকা পর্য্যন্ত নামিয়াছিল। কিন্তু অকস্মাত্ প্রাকৃতিক দুর্ধোগে সব কিছু পণ্ড হইয়া গেল। হুখে চাষীরা এখন বুক চাপড়াইতেছে, গৃহহারা কাদিতেছে, জনসাধারণের চক্ষে এখন হতাশা ও নৈরাশ্রের ছায়া। আমরা (গত

বাসবী বস্ত্র

বন্ধনহীন গ্রন্থি

দাম ছ’ টাকা মাত্র।

‘বন্ধনহীন গ্রন্থি’ একখানি বস্ত্র পুষ্ঠার উপভাস। কিন্তু এই উপভাস-খানির মধ্যে লেখিকা এমন একটি ঘটনার অবতারণা করেছেন যার মধ্যে এতটুকু শিথিলতা ও শালীনতার অভাব প্রকাশ পেলে বস্ত্রটি সম্পূর্ণ ব্যর্থতার পর্য্যবসিত হ’ত। সাহিত্যক্ষেত্রে একজন নবাগতা লেখিকার পক্ষে আশ্চর্য্য স্তম্ভের লিখন শক্তির পরিচয় পাঠকমাত্রকেই দৃষ্ট করবে। যে কাহিনীর তিনি অবতারণা করেছেন, সংসারে এমন কাহিনী বিরল সন্দেহ নেই, কিন্তু তা অসম্ভবও যে নয়, লেখার মাদুরী দিয়ে, মমতা দিয়ে আর বক্তব্যের তৃটতা দিয়ে তা প্রমাণ করে দিয়েছেন তিনি। এই প্রমাণের সাক্ষ্য নাগক নাটিকা অজয় ও কণিকার চরিত্র দু’টি অত্যন্ত জীবন্ত হয়ে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেছে। এই অজয় ও কণিকা স্বামী-স্ত্রী। নীর্বদনে শান্তিপূর্ণ বিবাহিত জীবন বাপনের পর দু’টি সন্তানের মা কণিকা একদিন স্বামী অজয়ের কাছে প্রকাশ না করে পারে না, বিবাহ-পূর্ব-কালে তার অনিচ্ছাকৃত পদচলনের কথা; শুধু পদচলন নয়, তার এক মেসোমহাশয়ের উদসসাত জীবিত এক কস্তার কথা। অকস্মাত্ মর্মান্তিক এই কথা ডাক্তার স্বামী অজয়কে কিভাবে যে আঘাত করে তা সহজেই অনুমেয়। স্ত্রী কণিকাও যে অবস্থার মধ্যে দু’টি সন্তানের গর্ভধারিণী হয়েও প্রাণপ্রিয় স্বামীর কাছে এই স্বীকারোক্তি করতে বাধ্য হয় তা যেমন গুরুত্বপূর্ণ ও উত্তেজনামূলক, তেমনি হৃদয়স্পর্শী —**বহুমতী** ১৮.১.৫৯

প্রকাশক: বলাকা প্রকাশনী, ২৭শি, আমহাট্ট-স্ট্রিট, কলিঃ-২

২৫শে শ্রাবণ) সম্পাদকীয় নিবন্ধে বক্তার আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলাম। তাহা সত্যে পরিণত হইয়াছে। এখন উপায় কি? কর্তব্য কি? অভিযুক্ত হইলেই যদি বক্তা হয়, তাহা হইলে ডি, ডি সি, পরিকল্পনার একটি মুখ্য বিষয় দেশে বক্তা নিয়ন্ত্রণ বর্ষভিত্তিক পর্ববসিত হইয়াছে বলিতে হইবে। এক গভীর নৈরাশ্যের মধ্যে জনসাধারণের মনে সংশয় জাগিতেছে যে সমস্ত অঞ্চল কদাপি প্রাবৃত হইত না এখন বৃষ্টিব প্রকোপ একটু বেশী হইলে সে অঞ্চলগুলি কেন প্রাবৃত হইতেছে? প্রাবনের পর বিলিক দান ও নানাবিধ খরচাতি সাহায্য দানে মূল যোগের উপশম হইবে না। উহা সাময়িক সাহায্য দিতে সক্ষম।

—ভাগীরথী (কালনা)।

দুর্গাপুর ও স্থানীয় বেকার

“দেশের সম্ভান, এই অঞ্চলের বাস্তুচ্যুত বাসিন্দার কাজ জোটে না। অজুহাত বহু। যেখানে ইচ্ছা নাই সেখানে অজুহাত সৃষ্টিতে বাধা জন্মে না। তাই এই শিল্পনগরীতে লোক নিয়োগ কেন্দ্র করিয়া পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ করিয়া বর্দ্ধমান জেলায় অসন্তোষ ধূমায়িত হইয়া উঠিতেছে। রক্তকল্পার রূপ লইবে কি না জানি না তবে এখন হইতে সাবধানতা অবলম্বন না করিলে বিপর্যয় দেখা দিতে পারে এ আশঙ্কা করিবার যথেষ্ট কারণ আছে যদিও তাহা আসৌক্যম্য নহে। প্রশ্ন জাগিবে ইহার জন্ত মূলতঃ দায়ী কে। অবশ্যই বহুলাংশে সরকারই দায়ী। দুর্গাপুরে নিয়োগ সংস্থা খোলা হইয়াছে। নিত্য শত শত বাঙ্গালী যুবক নাম লেখাইতেছে। সরকার আইন করিয়া নিয়োগ-সংস্থাকে সংবাদ দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। শিল্পপতি ও ঐক্যবাদের নিকট আবেদন জানানো হইয়াছে স্থানীয় লোক অধিক সংখ্যায় বাহ্যতে নিয়োগ করা হয়। কিন্তু ইহাই কি কর্তব্য শেষ বলিয়া পরিয়া লইতে পারা যায়? বাধ্য করিবার ধারা কোথায়—স্থানীয় লোকদের অগ্রাধিকার দিবার গ্যারান্টি কোথায়। পূর্বে বলিয়াছি অজুহাতের অভাব হয় না। দক্ষতার প্রশ্ন তুলিয়া অভিজ্ঞতার ধূম্য তুলিয়া স্থানীয় যুবকদের নিরাশ করা হইতেছে। কেন্দ্র হইতে প্রাদেশিক সরকারী মুখপাত্রদের অনুন্নয়ন বিনয়, মানবতা ইত্যাদির আবেদন জানাইয়া কোন ফল হয় নাই। অবশ্য একেবারে হয় নাই বলিলে ভুল হইবে। তবে নিয়োগের হার উল্লেখ করিতে যুগপৎ লজ্জা ও দুঃখ হয়। দুর্গাপুরে স্থানীয় বেকার নিয়োগের চিত্র এইরূপ।”

—বর্দ্ধমান বাণী।

মামলা আছে, হাকিম নাই

“লালবাগ, ২৩শে সেপ্টেম্বর—গত ১১শে সেপ্টেম্বর শনিবার লালবাগ ফৌজদারী আদালতে কোন নতুন নালিশ দায়ের করা সম্ভব হয় নাই এবং জেনারেল ফাইলও হয় নাই। কারণ নালিশ করার লোকের অভাব নয় হাকিমের অভাব। উক্ত দিবসে সেকেন্ড অফিসার সরকারী কাজে অগত্যা গিয়াছিলেন এবং মহকুমা শাসকও তাঁহার জরুরী সরকারী কার্যের তাগিদে সেইদিন আদালতের

কার্য ছাড়িয়া অগত্যা গিয়াছিলেন। উপস্থিত ছিলেন কেবলমাত্র থার্ড অফিসার। কিন্তু তাঁহার কগনিজেন্সী নেবার কোন ক্ষমতা নাই। এইরূপ ক্ষেত্রে ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট স্পেশাল পারমিশন দিয়ে থাকেন। সেইদিন থার্ড অফিসারকেও সেইভাবে কগনিজেন্সী নেবার অনুমতি দিয়ে আদালতের কার্য চালু রাখা যাইত। এই অব্যবস্থার জন্ত বহু লোকের নানা অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল।”—নিজস্ব

—জনমত (মুর্শিদাবাদ)।

শোক-সংবাদ

কবি শৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

খ্যাতনামা কবি শৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য গত ৮ই ভাদ্র ১৩ বছর বয়সে লোকান্তরিত হয়েছেন। কবি হিসেবে ইনি যথেষ্ট খ্যাতির অধিকারী ছিলেন এবং সুদীর্ঘকাল ধাবৎ কৃতিত্বের সঙ্গে বঙ্গ সাহিত্যের সেবা করে এসেছেন। ছন্দা, বাঙলার বাঁশী, পদ্মরাগ, নির্মাণ্য এবং সত্ত প্রকাশিত বাঁশীর আওন প্রমুখ গ্রন্থসমূহ তাঁর স্বজনীপ্রতিভার পরিচায়ক।

শিল্পপতি স্মৃতিরকুমার সেন

সেনরালে ইণ্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান ভারতবর্ষে সাইকেল শিল্পের প্রতিষ্ঠাতা বিশিষ্ট শিল্পপতি শ্রীস্মৃতিরকুমার সেন পশ্চিম জার্মানিতে কর্মোপলক্ষে অবস্থিতকালীন গত ১১ই ভাদ্র ১২ বছর বয়সে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। স্বর্গীয়া কবি কামিনী রায় এঁর অগ্রজা! বাইসাইকেল শিল্পের প্রতি ইনি প্রথম জীবনেই অমুরক্ত হন এবং ভারতবর্ষে এঁ শিল্পের প্রসার করে আত্মনিয়োগ করেন। উত্তরকালে ভারতীয় বাইসাইকেল শিল্পের প্রধানপুরুষ রূপে জগতের শিল্পমহলে এক বিশেষ আসন অধিকারভুক্ত করেন। বর্তমানকালে বাইসাইকেল শিল্পে ভারতের অভূতপূর্ব অগ্রগতি স্বর্গত সেনের কর্মদক্ষতার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। স্বর্গীয় ডাঃ স্ত্রাব নীলরতন সরকার মহাশয়ের অজন্তমা কস্তা শ্রীমতী মীরা দেবী এঁর সহধর্মিণী।

ডাঃ গণপতি পাঁজা

বাঙলার স্বনামধন্য চিকিৎসক এবং ভারতের প্রখ্যাত চর্মরোগ-বিশেষজ্ঞ ডাঃ গণপতি পাঁজা গত ২১শে ভাদ্র ৬৬ বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। চর্মরোগ সম্বন্ধে এঁর অগাধ পাণ্ডিত্য এবং জ্ঞান চিকিৎসকমহলে এঁকে একটি প্রধান আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়। উক্ত বিষয়ে প্রভূত অমূল্যলবনের ফলে সারা ভারতবর্ষে খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ায় বাঙলার গৌরব বৃদ্ধি পায়। ১৯৪৭ সালে অনুষ্ঠিত ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের মেডিক্যাল ও ভেটেরিনারী শাখার সভাপতির আসন স্বর্গত ডাঃ পাঁজা অলঙ্কৃত করেন।

সম্পাদক—ঐপ্রাণতোষ ঘটক

বঙ্গিকাভা ১৬৬ নং বিশিষ্টবিহারী গাভুলী ষ্ট্রট, “বঙ্গমতী মোটারী বেগিনে” ঐতারকনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



কাব্যে অনাদৃত

গত বৎসর কান্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত পুরনী চক্রবর্তী লিখিত "কাব্যে অনাদৃত" প্রবন্ধটির সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে। লেখিকার রচনাকৌশল ও বাগবিত্তাস প্রশংসনীয়। কিন্তু বিষয়বস্তুটি তিনি কিছু ভুল ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। সেইজন্য মনে হয় শিরোনামটিও যথাযথ হয় নাই। প্রথমতঃ, দেবধানীর প্রতি সহানুভূতির উচ্চাঙ্গে তিনি কচ ও যশোদার প্রতি অগ্নায় দোষারোপ করিয়াছেন। কচ শুক্রশাপে বিভ্রাধিরূপে মাত্র আসেন নাই। আসিয়াছিলেন দেবকুলের জীবন মান রক্ষাকারী মন্ত্রাহরণের জন্ত। গুরুগৃহবাস কালে গুরুকন্যা দেবধানীর স্নেহের মর্যাদা তিনি অকুণ্ঠ সেবার দ্বারা দান করেন। অতঃপর সঞ্জীবনীমন্ত্র লাভান্তে কচ স্বর্গে প্রয়াণের পূর্বে দেবধানীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে আসেন। কিন্তু যুদ্ধা, কচকে চিরতরে স্বর্গ হইতে দূরে, আপন অঞ্চলছায়া বাঁধিতে চায়। নবযৌবনা প্রবাসসঙ্গিনীর এই মধুর আবেদন অস্বীকার করা, তাহার স্নেহধন্য যুবকের পক্ষে যে কত কঠিন, তাহা সহজেই অনুমেয়। জাতির স্বার্থের জন্ত আত্মসমর্পণ বলিদান, প্রেমের জন্ত প্রেমকে ত্যাগ, শুধু স্বকঠিন নয় স্তমহান! সত্যই ইহা তুলতদেব! কিন্তু লেখিকা এত বড় ত্যাগের মর্যাদা না দিয়া কচকে স্বার্থপর কুক্রুররূপে বর্ণনা করিয়াছেন। গুরুকন্যা লাভের জন্ত কচ দেবধানীর হৃদয় হরণ করিয়াছেন, এরূপ দোষারোপ করিয়াছেন। কিন্তু, কর্ণাভঃ দেখা যায়, দেবধানী স্নেহের হৃদয়দান করিয়াছিল আর কচ সে প্রেম প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন স্বর্গসুখলোভে নয় স্বজাতির রক্ষার জন্ত। কি প্রয়োজন ছিল তাঁর এই স্বজাতীপ্ৰীতির? অনাদৃতসেই তিনি, শুক্রাচার্যের জাতিভাঙ্গের সন্মানে অনুরপরে দেবধানীর সঙ্গসুখে স্বপ্নাধির দিনযাপন করিতে পারিতেন। লেখিকার মতে, কচ দেবধানীর জীবনে প্রথম পুরুষ। দেবধানী কি কচের জীবনে প্রথম নারী নয়? তবে, দেবধানীর যুথর বেদনা অপেক্ষা কচের নীরববেদনা কোন অংশে কম? লেখিকার মতে কচের অভিলাষ তাহার "অলঙ্কার পৌরুষের" বিকৃত পরিচয়। কিন্তু, প্রথমেই কৃতবিত্ত আক্রমণের প্রতি দীর্ঘ সাধনার বিস্তার বিফলতার অভিলাষ, বুঝি দেবধানীর অসংযতস্বদয়ের উদ্ভূত হিংসার পরিচয় নয়?

দ্বিতীয়তঃ, মহাভারতে দেখা যায়, পুণ্যবান যশোদা প্রাণ থাকিতে প্রার্থীকে বিমুখ করিবেন না, এরূপ সত্যবদ্ধ হওয়ায় শর্মিষ্ঠার পুত্র প্রার্থনা পূর্ণ করেন; মাতৃহন্য নারীর শ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য। তাই, লেখিকার বনামুসারে "যৌবনজালায়" নয়, পুত্রলাভের জন্ত শর্মিষ্ঠা পুত্রদান প্রার্থনা করে। সত্যবদ্ধ হইলেও যশোদা শুক্রের নিষেধ শ্রবণে অস্বীকৃত হন। কিন্তু শর্মিষ্ঠা বলে দেবধানী তাহার ঈশ্বরী, তিনি

দেবধানীর ঈশ্বর। সুতরাং ধর্মতঃ তাহারও স্বামী। অতএব যশোদা ধর্মচ্যুত নহেন। কিন্তু লেখিকা তাঁহাকে অগ্নায়ভাবে "দুর্ললচিহ্ন" ও "কপমুগ্ধ" বলিয়াছেন।

অতঃপর দেবধানী যখন পিতার নিকট পতির বিরুদ্ধে অভিযোগ করে, তখনও দেখি, লেখিকার তাহার প্রতি সমান সহানুভূতি। সত্যীসাবিত্রীর শাস্তাদর্শের কথা ছাড়িয়া দিলেও এ আচরণ সমর্থনযোগ্য নয়। "তাগে সূখ ভোগে দুঃখ" যাহার তাহাই প্রেম। কিন্তু ভোগলোলুপা দেবধানী পটমহাদেবী হইয়াও বিমুগ্ধা ত্যাগস্বীকার স্বামীর জন্ত করিতে পারে নাই। কুমারী-জীবনেও দয়িতকে না পাইয়া নিষ্ঠুর অভিলাষে তাঁহাকে জঙ্ঘরিত করিয়াছে। অথচ, শর্মিষ্ঠা পিতার রাজ্য-পরিজনের জন্ত যাবজ্জীবনের সূখ বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। তার পরে, দেবধানীর পুনরায় পরাজয় হয় শর্মিষ্ঠার কাছে মাতৃষের পটভূমিকায়। কারণ, শুক্রশাপে জরাগ্রস্ত যশোদা যখন পুত্রদের যৌবনদানের জন্ত আহ্বান করিলেন, তখন শর্মিষ্ঠানন্দন পুত্র পিতার জরা গ্রহণ করিল। কিন্তু অসহিষ্ণু মাতা দেবধানীর অসহিষ্ণু পুত্রদ্বয় তাহা অস্বীকার করিল। পুত্রের মাঝেই মাতার চরিত্রের সমাক বিকাশ হয়। শর্মিষ্ঠার মহান ত্যাগ পুত্র পুত্রকেও ত্যাগে মহিমায় মহিমাধিত করিয়াছে। কিন্তু দেবধানী পারে নাই। এর পর, লেখিকার মতে, যশোদাকে যুগা ব্যতীত দেবধানীর সেবার কিছুই থাকিল না। নিশ্চয় তাহার কারণ, যশোদার উপর চিরতরে দেবধানীর একাধিপত্য ক্রম হওয়া। এখানেও তাহার ত্যাগের অভাব পরিষ্কৃত। অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, দেবধানীর যুদ্ধ স্বভাব তাহাকে মোহিনী করিয়াছে সত্য। কিন্তু গৃহিণী ও জননীরূপে মহিমাময়ী করিতে পারে নাই।

লেখিকার মতে, তাহার এ বিড়ম্বনার জন্ত দায়ী তাহার স্নেহাঙ্ক পিতা, কিন্তু এই অভিযোগ অমূলক, একটু বিবেচনা করিলেই বুঝা যায়। শুক্রাচার্য বাহা করিয়াছিলেন তাহার চেয়ে বেশী ভাল কোন পিতাই পারেন না। সমাজের বিরুদ্ধেও তিনি কষ্টকে, সূখ-সৌভাগ্যের জন্ত, রাজাধিরাজ যশোদার হস্তে অর্পণ করেন। কিন্তু দেবধানী "পটমহাদেবী" হইয়াও কর্মদোষে রাজপ্রিয়া ও রাজমাতা হইতে পারিল না। সে ইহার জন্ত স্বয়ং দায়ী তাহার পিতা নহেন। তৃতীয়তঃ, আমার মতে প্রবন্ধটির শিরোনামাও যথাযথ হয় নাই। হওয়া উচিত ছিল "ভাগ্যবিড়ম্বিতা কাব্যানাদিত্য" অনাদৃত নহে। কারণ, অনাদৃত অর্থ উপেক্ষিত। কিন্তু মহাকবি ব্যাস দেবধানীকে আদৌ উপেক্ষা করেন নাই। উপরন্তু বিস্তৃত বর্ণনা দিয়াছেন। যে বর্ণনা যুগান্ত পরেও বর্তমান লেখিকাও অসংখ্য জনের এমন কি কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়াছে ও করিতেছে। "অনাদৃত" তাকেই বলা চলে

যে সকল সৌকুমার্য সত্ত্বেও পাঠকের ও শ্রুতার সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে পারে না। এবিষয়ে রবীন্দ্রনাথ, তাঁহার “কাব্য উপেক্ষিতা” প্রবন্ধে “রামায়ণের লক্ষণপ্রিয়া উর্মিলা” এবং “কাদম্বরীর পত্রলেখা” সম্বন্ধে সার্থক আলোচনা করিয়াছেন। “উর্মিলা” নবোঢ়ার বেশে দেখা দিয়াই আমাদের স্মৃতি হইতে চিরতরে বিলুপ্ত হইল। সীতার দুঃখের শ্রোতে আরও দুঃখিনী “উর্মিলা” ভাসিয়া গেল। আর “পত্রলেখা” পরমসৌকুমার্যময়ী হইয়াও “কাদম্বরী” ও “মহাশ্বতীর” পার্শ্বে চিরনিপ্পত হইয়া রহিল! রাজকুমার “চন্দ্রাপীড়ের” সহিত তাহার অসম্ভব সখ্য, কিন্তু কোন আকর্ষণ ছিল না। “চন্দ্রাপীড়” তাহাকে পুরুষাব্দব “পুণ্ডরীক” অপেক্ষা স্বতন্ত্র মনে করিতেন না। রবীন্দ্রনাথের মতে তাহার নারীত্বের প্রতি বচসিতার ইহা চরম উপেক্ষা।—কিন্তু দেবদানীর এরূপ কোন সমস্যা নাই। স্মৃতরাং সে “অনাদৃতা” বা “উপেক্ষিতা” নহে। অর্চনা দেবী। গুরুদাম। কলিকাতা—২।

বৌদ্ধ পঞ্চশীল

গত শ্রাবণ সংখ্যার ‘বৌদ্ধ পঞ্চশীল’ শীর্ষক সমালোচনার বেদের বয়স নির্ণয়ে শ্রীমত সমাজদার মহাশয় যুরোপীয় ভারততত্ত্ববিদগণের মত তুল্য করে শ্রদ্ধের আচার্য শ্রীমদীনতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ভারতীয় মনীষীদের উক্তি উদ্ধৃত করে ক্ষান্ত হতে পারেন নি। শ্রদ্ধের স্বামী অভেদানন্দজীর উক্তিকেও তিনি অবলম্বন করেছেন। শ্রদ্ধের স্বামিজী যে ঐতিহাসিক ছিলেন না তা লেখক উত্তেজনার মধ্যে ভুলে গেছেন। খৃঃপূঃ ৫০০০ বৎসব পূর্বে বেদ রচিত হয়েছিল বলে কোন ঐতিহাসিক বলেন নি। লেখক যেভাবে পাশ্চাত্য মনীষিবর্গকে অবজ্ঞা করেছেন, তা লেখকের ভ্রান্ত ধারণা-প্রসূত বিবোধগার মাত্র। তাতে ভারতীয় সংস্কৃতির গবেষণা ক্ষেত্রে তাঁদের অক্ষয় কীর্তি এতটুকু স্নান হতে পারে না। মধ্যযুগীয় কুসংস্কারের ধ্বংসকাজে উত্তোলন করে তাঁরাই আমাদের উজ্জ্বল সংস্কৃতির সঙ্গে আমাদের নতুন করে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁদেরই পদাঙ্ক অনুসরণে ভারতীয় মনীষিগণ ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্য ও দর্শনের ক্ষেত্রে আধুনিক পরিপক গবেষণারীতি প্রবর্তন করেছেন। স্মৃতরাং মেক্সমুলার প্রমুখ পাশ্চাত্য চিন্তানায়কগণের সহক চিন্তাধারা দীর্ঘকাল এক্ষেত্রে পথনির্দেশ করবে। বেদের অর্থ যুরোপীয় পণ্ডিতগণের কাছে দুঃখিগম্য—লেখকের এ অভিমত নিতান্ত হান্তাপন্ন। বেদের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা শুধু স্বামী দয়ানন্দজীর সত্যার্থ প্রকাশে কেন, শ্রীহর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়ের অনুবাদেও রয়েছে। বেদের প্রকৃত অর্থ স্বদয়স্বয়ম করতে হলে সে যুগের ভাবধারা ও পরিবেশ অনুভব করার শক্তি থাকা চাই। তা হলেই অনাঙ্কুর মনে বেদাধ্যয়ন সম্ভব হবে।

বুদ্ধাবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্বে ভারতের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক অবনতি ঐতিহাসিক সত্য। একে ধামা চাপা দেবার লেখকের অপচেষ্টা কল্পনোদ্ভীপক। শ্রীমদভাগবতের ও বোগবশিষ্ঠ রামায়ণের বৃদ্ধ প্রসঙ্গে নিছক কালনিক ব্যাখ্যা প্রদানের অপকৌশলও তেমনি কল্পনোদ্ভীপক। ‘আম্ব’ শব্দের উল্লেখ করে বুদ্ধকে উড়িয়ে দেবার ইর্ষা যুক্তি অত্যন্ত কৌতুক্যবহ। বুদ্ধ পরিনির্বাণ শব্দায় শুয়েও শিবদেব উপাসনা করেছিলেন—অস্বাভাবিক ভাবে বিবরণ,

অন্তসরণা, অনঞসরণা...। ‘অন্তানং উপমঃ কথ্য ন হনেষ্য ন বাতয়ে’ অর্থাৎ আত্মোপমায় কাকেও হত্যা করবে না আঘাত করবে না। ইত্যাদি উক্তিগুলি লেখককে অনুধাবন করতে অনুবোধ করি। বুদ্ধের অনন্তবাদ বা অনাস্রবাদের মর্মার্থ পল্লবপ্রাচিত্য বোধগম্য নয়। শুধু অনাস্রবাদের উল্লেখে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে লাভ নেই। এই প্রসঙ্গে লেখকের বৃহস্পতি বুদ্ধের কষ্টকল্পনা দেখে বিজ্ঞ পাঠকবর্গ কৌতুক অনুভব করবেন।

বৌদ্ধ ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি সম্বন্ধে যদি লেখকের ধারণা অস্পষ্ট হয়, তবে ভারতের ইতিহাস অনাঙ্কুর মনে অধ্যয়ন একান্ত আবশ্যক। শ্রীসমাজদার মহাশয় উত্তেজনার বেশে আলোচ্য বিষয় অতিক্রম করে শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য ও কুমারিল ভট্টকে টেনে এনে বৌদ্ধধর্মকে ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত করেও ক্ষান্ত হননি। তার পরও তিনি এশিয়ার মানচিত্র থেকে বৌদ্ধধর্মের বিলোপের স্বপ্নে বিভার হয়ে আমাদের চীন যুরিয়ে তিরত নিয়ে এসেছেন। অবশেষে সিংহল, ব্রহ্মদেশ, থাইলেও প্রভৃতি দেশে অহিংস বৌদ্ধধর্মের সহিংস রূপ দেখে তিনি পরম তৃপ্তি লাভ করেছেন।

লেখকের শালীনতাবোধের অভাব ও ভাষার অসংযত ব্যবহার দেখে আমরা বিস্ময়ান্বিত বিম্বিত হইনি। বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না, দস্তোঙ্কি ও শালীনতার সীমান্তিক্রম মার্জিত মনের পরিচায়ক নয়।

—জীলানন্দ অক্ষরারী।

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

৬ মাসের গ্রাহক মূল্য বাবদ ৭'৫০ নং পং পাঠাইলাম। আগামী আঘাট হইতে অগ্রহায়ণ পর্যন্ত সংখ্যাগুলি নিয়মিত পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবেন।—শ্রীমতী মিনতি বসু—সম্বলপুর।

মাসিক বসুমতীর বার্ষিক মূল্য ১৫২ টাকা পাঠাইলাম। নিয়মিত পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।—শ্রীমতী নীলিমা মুখোপাধ্যায়, পাটনা।

Remitting herewith my subscription for M. Basumati from Ashar to Agrahayana.—Leela Ghose, Meerut. (U. P.)

I am sending herewith Rs 15/- for Masik Basumati.—Secy. Hasimara I. Club.

Remitting herewith our subscription for one year with effect from Asar for your Monthly Basumati.—Head Master, Nasigram High School, Burdwan.

Subscription for Monthly Basumati.—Supdt. C & Z Mission, Howrah.

Please receive Rs. 15/- as my subscription for Basumati—Banee Roy, New Delhi.

১৫৮ টাকা বার্ষিক চাঁদা মাসিক বসুমতীর জন্য পাঠাইলাম—
সেণ্ণিকা মিত্র, ভাগলপুর।

আমার অনেক দিন হইতে বসুমতী পত্রিকা পড়বার যে আগ্রহ
তাঁহা প্রকাশ করবার আর অবকাশ পাই নাই। অল্পগ্রহপূর্বক
মাসিক পত্রিকা V. P. যোগে পাঠাইবেন—Sree Charan
Pathak—Chakradharpur. Singhbhum.

মাসিক বসুমতীর বার্ষিক গ্রাহিকা হইবার উদ্দেশ্যে ডাকযোগে
বার্ষিক চাঁদা ১৫৮ টাকা পাঠাইলাম।—Geeta Das Guptoo,
Bina, M. P.

বসুমতী মাসিক সংখ্যায় জ্ঞান বাৎসরিক ১৫৮ পাঠাইলাম।
দয়্য করিয়া আবার সংখ্যা বসুমতী পাঠাইবেন।—Aloka
Sadhukhan—Calcutta.

Herewith sending Rs 9/- as an advance
for half-yearly subscription for your Monthly
Basumati.

মাসিক বসুমতীর বার্ষিক মূল্য বাবদ ১৫৮ পাঠাইলাম।—শ্রীমতী
মীরা বসু, জামসেদপুর।

I send herewith Rs. 15/- for the subscription
of Masik Basumati for one year.—H. N. Bailung,
Secy., Baghjan Indian Club, Assam.

এক বৎসরের মাসিক বসুমতীর চাঁদা বাবদ ১৫৮ টাকা
পাঠাইলাম। বখারোতি শ্রাবণ সংখ্যা হইতে পাঠাইতে থাকিবেন।
—Malati Rani Ganguly, Bombay.

I am remitting Rs. 15/- towards the annual
subscription for continuing supply of
“M. Basumati” from Sravana issue.—Mrs. Maya
Barat, Bombay.

I send herewith Rs. 15/- as yearly subscription
for your Monthly Basumati.—N. Khatun, Cachar,
Assam.

আগামী মাস হইতে ৬ মাসের মাসিক বসুমতীর টাকা পাঠানো
হইল।—Sm. Santi Lahiri, Kanpur, U. P.

Herewith Rs. 15/- for one year's subscription.
Please continue to send your Magazine as usual.
—Sri R. Barthakur, Assam.

আগামী ৬ মাসের চাঁদা পাঠাইলাম। শ্রাবণ মাস থেকে নিয়মিত
বসুমতী পাঠাবেন।—Mrs. Indira Mukherjee, Shahdol,

গ্রাহকমূল্য এক বৎসরের জন্য ১৫৮ টাকা পাঠাইলাম। ‘মাসিক
বসুমতী’ শ্রাবণ সংখ্যা হইতে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।—
Mrs. Bela Bagchi, Allahabad.

One year's subscription for Monthly Basumati
from the issue of “Aswin.”—Mrs. Sudhira
Ghosal, Varanashi.

Please accept subscription for “Monthly
Basumati” for the period Aswin to Chaitra 1366.
—Ava Rani Debi, Kanpur.

Please receive our yearly subscription towards
your Monthly Journal.—Welfare Library,
Wellington Mill, Hooghly.

১৫৮ বার্ষিক চাঁদা পাঠাইলাম। এক বৎসরের জন্য গ্রাহক
করিয়া ৬ বর্তমান মাস হইতে ‘মাসিক বসুমতী’ পাঠাইয়া বাধিত
করিবেন। আপনাদের পত্রিকা প্রবাসী বাঙালীদের সম্পদ-বিশেষ।
—Hansara Union Club, Doom Dooma, Assam.

I am sending herewith Rs. 15/- for Monthly
Basumati for one year only.—Sm. Manoka
Sundari Devi, Lalpur, Ranchi.

Herewith please find Rs. 15/- being the
annual subscription for Masik Basumati—Railway
Institute, Masiani, Shibsagar, Assam.

মাসিক বসুমতীর বাৎসরিক চাঁদা বাবদ ১৫৮ টাকা পাঠাইলাম।
নিয়মিত বই পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।—শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা দে,
দিল্লী।

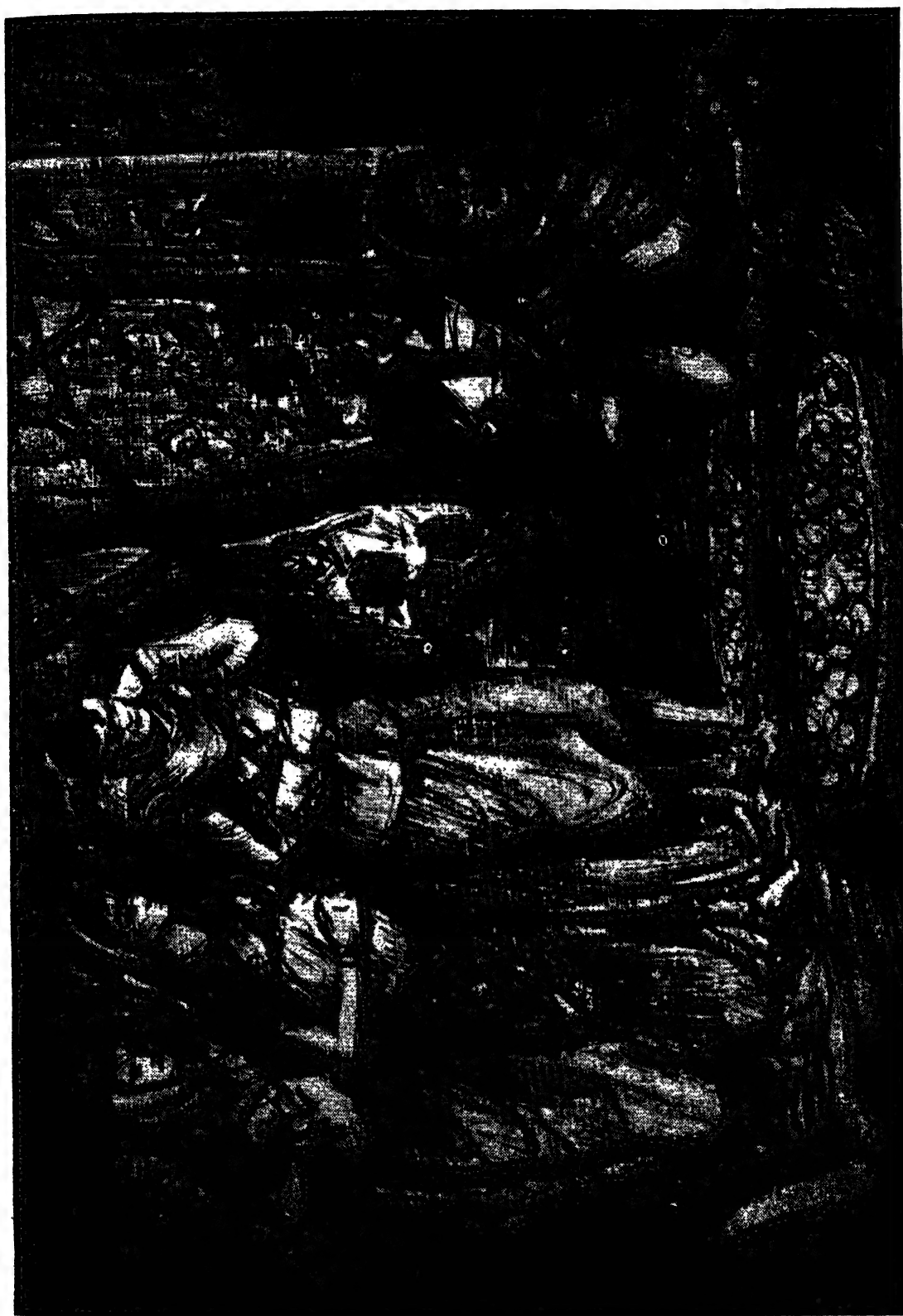
Please send my copy for another year.
—Mamata Sen, Burdwan.

Renewal subscription for Masik Basumati for
one year till Ashar 1367.—Burdwan Raj College,
Burdwan.

মাসিক বসুমতীর বাৎসরিক চাঁদা পাঠাইলাম। দয়্য করিয়া
আমাকে গ্রাহক-প্রশিক্ষিত করিয়া লইবেন।—শ্রীমতী বেণু
বন্দ্যোপাধ্যায়, পুণা।

মাসিক বসুমতীর বার্ষিক মূল্য ১৫৮ অগ্রিম পাঠাইলাম।
—শ্রীমতী সুমিতা মল্লিক, বোম্বাই।

বর্তমান বৎসরের বৈশাখ হইতে ‘মাসিক বসুমতীর’ গ্রাহিকা
হইবার জন্য ১৫৮ টাকা মনিঅর্জার করিলাম।—Kamala
Mishra, Patna.



হাট-বাজার

(কো)

মাসিক বসন্ত
৥ আদিল, ১৩৩৬ ॥

—শ্রীমৎকবিগণ রচনা ও প্রকাশ



সামসিক বসুসমতী

৩৮শ বর্ষ—আশ্বিন, ১৩৬৬]

॥ স্থাপিত ১৩২২ ॥

[প্রথম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা

কথাসমূহ

সর্বদা মনে রাখিও, আমাদের সামাজিক প্রথাগুলির উদ্দেশ্য যেরূপ মহৎ, পৃথিবীর আর কোন দেশেরই তদ্রূপ নহে। আমি পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই জাতিভেদ দেখিয়াছি, কিন্তু এখানে উদ্দেশ্য যেরূপ মহৎ, অস্ত্র কোথাও তদ্রূপ নহে। অতএব যখন জাতিভেদ অনিবার্য, তখন অর্থগত জাতিভেদ অপেক্ষা পবিত্রতাসাধন ও আত্মত্যাগের উপর প্রতিষ্ঠিত জাতিভেদ বরং ভাল বলিতে হইবে। অতএব নিন্দাবাদ একেবারে পরিত্যাগ কর।

তোমরা আর্ষ, অনাৰ্ষ, শ্বরি, ব্রাহ্মণ অথবা অতি নীচ অন্ত্যজ জাতি—যাহাই হও, ভারতভূমিনিবাসী সকলেরই প্রতি তোমাদের পূর্বপুরুষগণের এক মহান আদেশ রহিয়াছে। তোমাদের সকলের প্রতিই এই এক আদেশ, সে আদেশ এই—‘চূপ করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না—ক্রমাগত উন্নতির চেষ্টা করিতে হইবে। উচ্চতম জাতি হইতে নিম্নতম পারিয়া (চণ্ডাল) পৰ্যন্ত সকলকেই আদর্শ ব্রাহ্মণ হইবার চেষ্টা করিতে হইবে।’ বেদান্তের এই আদেশ শুধু যে ভারতেই খাটিবে, তাহা নহে—সমগ্র জগৎকে এই

আদর্শানুযায়ী গঠন করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। আমাদের জাতিভেদের উচাই লক্ষ্য। ইহার উদ্দেশ্য ধীরে ধীরে সমগ্র মানব-জাতি বাহাতে আদর্শ ধার্মিক—অর্থাৎ ক্রমা, বৃত্তি, শৌচ, শান্তি, উপাসনা ও ধ্যানপরায়ণ হয়। এই আদর্শ অবলম্বন করিলেই মানবজাতি ক্রমশঃ ঐশ্বর্যসামুদ্র লাভ করিতে পারে।

শ্বয়িগণের মত চালাইতে হইবে; মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ঋষিদের মত্রে দেশটাকে দীক্ষিত করিতে হইবে। তবে সমরোপযোগী কিছু কিছু পরিবর্তন করিয়া দিতে হইবে। এই দেখ না, ভারতের কোথাও আর চাভূর্ণ্য-বিভাগ দেখা যায় না। প্রথমতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—এই চারি জাতিতে দেশের লোকগুলিকে ভাগ করিতে হইবে। সমস্ত ব্রাহ্মণ এক করিয়া একটি ব্রাহ্মণজাতি গড়িতে হইবে। এইরূপ সমস্ত ক্ষত্রিয়, সমস্ত বৈশ্য, সমস্ত শূদ্রদের নিয়া অস্ত্র তিনটি জাতি করিয়া সকল জাতিকে বৈদিক প্রণালীতে আনিতে হইবে। নতুবা শুধু ‘তোমরা হৌব না’ বলিলেই কি দেশের কল্যাণ হইবে? কখন নয়। —স্বামী বিবেকানন্দের বাণী।

বাঙলা শাক্ত পদাবলী ও বৈষ্ণব পদাবলী

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

ঊনবিংশ শতক পর্যন্ত বিবিধ মঙ্গল-কাব্য ও শিবায়ন প্রভৃতির ভিতর দিয়া বাঙলা সাহিত্যে শক্তির যে বিভিন্ন রূপ ও চরিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার একটা সাধারণ পরিচয় আমরা জানি। ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে সাধক রামপ্রসাদের আবির্ভাব হয় (ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে ইহার জন্ম বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে)। রামপ্রসাদও বিজ্ঞান-মতের কাহিনীকে সুখ্যাত: অবলম্বন করিয়া ‘কালিকা-মঙ্গল’ কাব্য রচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু এই ‘কালিকা-মঙ্গল’ রামপ্রসাদ আশ্রয়িত কালিকারও স্বার্থ পরিচয় নাই, রামপ্রসাদের সাধকরূপে যে প্রতিভা তাহারও কোনও উল্লেখযোগ্য পরিচয় নাই। কিন্তু বাঙলার শাক্তধর্মে ও শাক্ত-সাহিত্যের একটি নূতন দিক খুলিয়া দিলেন এই সাধক কবি; ইহা হইল শাক্তসঙ্গীতের দিক। বহুসংখ্যক সঙ্গীত রচনা করিয়া এবং তাহাকে নিজের একটি বিশেষ স্তর সংযুক্ত করিয়া (যাহা আজকাল ‘প্রসাদী’ স্তর নামে খ্যাত) তিনি একদিকে যেমন মায়ের মহিমা প্রকাশ করিলেন—অন্যদিকে মায়ের জগৎ সন্তানের জ্ঞাতিকে এমন ভাষা ও স্তর দিলেন যাহা আমরা পূর্ববর্তী কোনও সাহিত্যেই আর দেখি নাই। এই জ্ঞাতি যেন বাঙালী-মনে সঞ্চিত হইয়া রুদ্ধ হইয়াছিল। একবার রামপ্রসাদের গানগুলির মধ্যে যখন তাহার প্রকাশ ঘটিল তখন বাঙলাদেশের এখানে সেখানে ছোট বড় বহু সাধককবির মনের দ্বার খুলিয়া গেল। আমরা ঊনবিংশ শতকে বহুসংখ্যক শাক্তসঙ্গীতি পাটলাম। ইহাষ্ট বর্তমানে বাঙলা সাহিত্যে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রসিদ্ধিকে অবলম্বন করিয়া শাক্ত পদাবলী নামে খ্যাত।

বৈষ্ণব পদাবলীর সমগোত্রীয় বলিয়া শাক্ত গানগুলির শাক্ত পদাবলী নাম দেওয়া হইলেও বৈষ্ণব পদাবলী এবং শাক্ত পদাবলীর মধ্যে একটা মৌলিক পার্থক্য বহিয়াছে; কিন্তু এই মৌলিক পার্থক্য সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে কতগুলি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ মিলের কথাও আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। শাক্ত সঙ্গীতের প্রথম কবি রামপ্রসাদ; রামপ্রসাদের সঙ্গীত রচনার মধ্যে একটা স্বতঃ উৎসারণ সহজেই লক্ষ্য করিতে পারি। সুতরাং রামপ্রসাদের শাক্ত সঙ্গীত রচনার পশ্চাতে বৈষ্ণব পদাবলীর কোনও প্রত্যক্ষ প্রভাব ছিল একথা বলিতে পারি না। রামপ্রসাদের প্রেরণার উৎস তাঁহার নিজের মধ্যেই ছিল। কিন্তু প্রেরণার যখন বহিঃপ্রকাশ ঘটে তখন পরিবেশের নিকট হইতে তাহা অনেক কিছুই গ্রহণ করে—তাবের দিক হইতেও, প্রকাশভঙ্গির দিক হইতেও। দ্বাদশ শতক হইতেই বাঙলা দেশে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রসার বলিতে পারি। ঊনবিংশ শতক

পর্যন্ত সহস্র সহস্র বৈষ্ণব পদ রচনার ভিতর দিয়া সে ধারা প্রায় অবিচ্ছিন্ন ভাবেই চলিয়া আসিয়াছে। এইরূপে বহু শতকে প্রবাহিত সাহিত্যের একটি অতি সমৃদ্ধ ধারা একটি বিশেষ সাহিত্যিক পরিমণ্ডল গড়িয়া তুলিয়াছিল ও রামপ্রসাদ এবং তাঁহার সম-সাময়িক ও পরবর্তী শাক্ত কবিগণের সঙ্গীতগুলির উপরে এই পরিবেশের প্রভাব অতি স্বাভাবিক ভাবেই পড়িয়াছিল। তবে উভয় জাতীয় পদাবলীর মধ্যে মৌলিক পার্থক্যের কথা আমরা প্রথমেই উল্লেখ করিয়াছি। এই পার্থক্যের কথা আমরা পরে আলোচনা করিব। প্রথমে আমরা মিলের কথাটাই আলোচনা করিতেছি।

বৈষ্ণব কবিতার প্রতিষ্ঠা মধুর রসে। জীবনের মাধুর্য প্রেমে; সেই প্রেমই বৈষ্ণব কবিগণের প্রধান নহে—একমাত্র অবলম্বন। এই মধুর প্রেমের স্পর্শে দেহও মধুর—গেহও মধুর। বৈষ্ণব কবিগণের এই সর্বাতিশয়ী মাধুর্যের প্রভাব পড়িয়াছে বাঙলা দেশের শক্তিদেবীর উপরেও। সর্ব সৌন্দর্য মাধুর্যের ঘনীভূত প্রতিমা রাধার প্রভাবে মঙ্গলকাব্যগুলিতে বর্ণিতা দেবীগণও যে অনুরূপ মাধুর্যমণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছেন তাহা আমরা সহজেই লক্ষ্য করিতে পারি। কিন্তু দেবীগণের দেহসৌন্দর্যের বর্ণনায় এই যে রাধা-সৌন্দর্যের প্রভাব ইহাই সর্বাংশে বড় কথা নয়। বড় কথা লক্ষ্য করি এই শাক্ত সঙ্গীতগুলির মধ্যে যখন দেখি যে শুধু বাহিরের দেহসৌন্দর্যের বর্ণনায় নয়, দেবীর মূল পরিকল্পনাতেই দেবী মধুর রসে প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছেন। উমা সৰ্বদে আনন্দ দেখিতে পাই—তিনি প্রথমাবধিই মধুররসাস্রিতা; তাই উমাকে অবলম্বন করিয়া যখন মধুর রূপ বর্ণনা দেখিতে পাই—বা উমাকে যখন মধুর রসেই প্রতিষ্ঠিতা দেখিতে পাই তখন আমরা সচকিত হই না; কিন্তু অত্যন্ত ভাবে সচকিত হইয়া উঠি যখন দেখি, শুধু অনুরনাসিনী দুর্গা-দেবী নহেন—ভয়ঙ্করীত্বের চরম নিদর্শন যে কালীর মধ্যে তিনিও তাঁহার সকল ভয়ঙ্করী রূপ লইয়াই মধুর রসে প্রতিষ্ঠিতা হইয়া উঠিতেছেন।

দেখা যাইতেছে, বাঙালী কবিগণ বৈষ্ণবই হোন আর শাক্তই হোন, মূলে সকলেই মধুর রসের উপাসক। আমরা দেখিতে পাই মাতৃদেবীর ইতিহাসে পার্শ্বভী উমার একটি বিশিষ্ট ধারা, অনুরনাসিনী দেবীর আর একটি পুথক ধারা। পৌরাণিক যুগেই এই দুই ধারা একত্রে মিশ্রিত হইয়া একাকার হইয়া গিয়াছে। বাঙালী কবিগণ ঐতিহ্যমূত্রে মায়ের এই মিশ্ররূপকেই প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইব, জল ও হৃদয়ের মিশ্রণের ভিতর হইতে হংস যেমন দুগ্ধকেই পান করিবার চেষ্টা করে, বাঙালীর কবিনোহংসও তেমনই ভাবে মায়ের মধুররূপিণী ও ভয়ঙ্করী মূর্তির

মিশ্রণ হইতে সহজাত প্রবণতাবশে মধুররূপীকেই বাছিয়া আবাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছে। মাকে লইয়া বাঙলা দেশের জনমনেরই যেন এই মধুর রসের দিকে ঝোঁক। তাই দেখি, বাঙলাদেশের প্রসিদ্ধতম মাতৃপূজার উৎসব শারদীয়া দুর্গোৎসবকে পণ্ডিতমহলে বা উচ্চকোটি মহলে যতই মার্কণ্ডের 'চণ্ডী'র সহিত যুক্ত করিয়া অম্বরনাশিনী দেবীর পূজা-মহোৎসব করিয়া তুলিবার চেষ্টা হোক না কেন, বাঙলার জনমানস মার্কণ্ডের চণ্ডীর তেমন কোনও ধার ধারে না। জনগণ প্রতিমায় দেবীকে অম্বরনাশিনী মূর্তিতে দেখেন— কিন্তু ঐ পর্বন্তই, তাহার পরে তাঁহার স্থির নিশ্চিত রূপে জানেন— আসলে আর কিছুই নয়—মায়ের স্বামিগৃহ কৈলাস ছাড়িয়া বৎসরান্তে একবার কলারূপে পুত্র-কন্যা দি লইয়া বাপের বাড়ি আগমন। তিন দিনের বাপের বাড়ির উৎসব-আনন্দ—তাহার পরেই আবার চোখের জলে বিজয়া—স্বামীর গৃহে প্রত্যাবর্তন। গণমানসের এই সত্যকে অবলম্বন করিয়াই 'ত' আমাদের এত 'আগমনী-বিজয়া' সঙ্গীতের উদ্ভব। এই সঙ্গীতগুলিতে লক্ষ্য করিতে পারিব, গিরিজা যখন কন্যা উমাকে লইয়া গিরিপুরে ফিরিয়া আসিলেন তখন গিরিজা কন্যাকে বুকে লইতে এলোকেশ ধাইয়া আসিলেন বটে, কিন্তু দাশরথি যায় তাঁহার পাঁচালীতে বলিলেন, মেনকা দশভূজা রণরঞ্জিনী দেবীকে কন্যা বলিয়া গ্রহণ করিতেই চাহিলেন না, মা স্পষ্টই বলিলেন,—

কৈ হে গিরি, কৈ সে আমার প্রাণের উমা নন্দিনী!

সঙ্গে তব অঙ্গনে কে এলো রণরঞ্জিনী?

এই রণরঞ্জিনীকে মেনকা—এবং তাঁহার মারফতে বাঙালী কবিমণ্ডল— শুধু যে গ্রহণ করিতে চাহিলেন না তাহা নহে—তাঁহাকে উমা বলিয়া চিনিতেই পারিলেন না; মা স্পষ্টই বলিলেন,—

দ্বিভূজা বালিকা আমার উমা ইন্দুবদনী,

কক্ষ ল'য়ে গজানন, গমন গজগামিনী,

মা বলে মা ডাকে মুখে আধ-আধ বাণী।

তখন আর উপায় নাই! বাঙালী কবির মনস্তত্ত্ব করিবার জন্য দশভূজা রণরঞ্জিনী মাকে মেনকার সামনে রূপ বদলাইতে হইল।—

মায়ের প্রতি মহামায়া ত্যজিলেন মায়া।

ধরেন অর্পূর রূপ পূর্বের তনয়া ॥

দ্বিভূজা গিরিজা গৌরী গণেশজননী।

নগেন্দ্রনন্দিনী যেন গজেন্দ্রগামিনী ॥

দুই কক্ষে দুই শিশু আন্ততোষদারা।

উদয় হলেন চণ্ডী যেন চন্দ্রে ঘেরা ॥ ১

রাসিকচন্দ্র রায়ের গানে দেখি, তাঁহার মেনকাও অভিনব এই নারীকে চিনিতে পারেন নাই অর্থাৎ চিনিতে চাহেন নাই।

গিরি, কার কণ্ঠহার আনিলে গিরিপুরে?

এ তো সে উমা নয়—ভয়ঙ্করী হে, দশভূজা মেয়ে!

* * *

মুখে মুহু হাসি, স্তব্ধরাশি হে, আমার উমাশশীর;

এ যে সৌন্দর্যী কাঁপায় হৃদয়ে বন্ধারে।

হায় এ হেন রণ-বেশে, এল এলোকেশে,

এ নারীকে কেবা চিনতে পারে! ২

শুধু যে ভয়ঙ্করী মূর্তি চাই না তাহা নয়, ঐশ্বর্যময়ী মূর্তিও চাই না—শুধু মাদুর্ধমরী মূর্তি চাই।—

বলে গেলে হে গিরি, যাই—

আনি সে গিরিজার,

সে মেয়ে বেগে এলে কোথায়?

শশী ভায়ু আসি উদয় পদে পদে

উভয় পদে ঈর্ষ্যে আছ অবিরোধে; ৩

অপর কবি বলিতেছেন—

গিরি, উমা-প্রসঙ্গে সঙ্গে আনিলো করে কার মেয়ে?

সর্বদেব-তেজ দেহ, জটাজুট শিরোক্রম,

আমার উমা নহে এহ, দেখ দেখি মুখ চেয়ে।

কনক-চম্পকদামা, অতসী-কুসুমোপমা,

এই নাকি সেই উমা, সংশয় আমার ॥৪

একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইব, কবি এই গানটিতে উমার যে সব বর্ণনা করিতেছে তাহা চণ্ডীর পৌরাণিক বর্ণনা; সেই অম্বরনাশিনী চণ্ডীকেই যেন কবিগণের একান্তভাবে 'মেহের ভ্রালী' উমার সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া লইতে আপত্তি। পদের শেষে কবিরা একটা আপোস-রক্ষা করিয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছেন বটে, কিন্তু বৃত্তিতে মোটাই কষ্ট হয় না যে এ আপোস-রক্ষার চেষ্টা তাঁহাদের তত্ত্ববুদ্ধিজাত—কিন্তু হৃদয়ের প্রবণতা অন্য দিকে।

পূর্বেই বলিয়াছি যুগে যুগে সাহিত্যে, চিত্রে ও ভাস্কর্যে রূপারিত মধুররূপী উমাকে অম্বরনাশিনী চণ্ডীর সহিত মিলাইয়া লইতে একটা প্রাচীন ধারাগত আপত্তি স্বাভাবিক হইতে পারে, কিন্তু বাঙালী কবিগণ এই আপত্তি জানাইয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহার অম্বরনাশিনী ভয়ঙ্করী কালী মূর্তিকে নিজেদের হৃদয়-পদ্মে স্থাপিত করিয়া যে রূপান্তর ঘটাইয়াছেন তাহাই বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কালীকে এইভাবে রূপান্তরিত করিবার চেষ্টা অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙালী কবিগণের ভিতরেই প্রথম পাই না; চতুর্দশ বা পঞ্চদশ শতকের মৈথিলী কবি বিতাপতির 'অম্বর-ভয়ানী' 'পশুপতি-ভামিনী' ভৈরবী কালীর বর্ণনা করিতেছেন—

বাসর রৈনি সবাসন সোভিত

চরণ, চন্দ্রমনি চূড়া।

কতওক দৈত্য মাঝি হুঁহ মেলল,

কতও উগিল কৈল কুড়া ॥

৩। ঐ, ঠাকুরদাস দত্ত।

৪। ঐ, রামচন্দ্র ভট্টাচার্য। আরও তুলনীয়—
কে রণ-রঞ্জিনী!

কে নারী অঙ্গনে এলো, চিনিতে না পারি।

অঙ্গণে পাঁড়াইয়ে এ নয় আমার প্রাণকুমারী।

দশ দিক দীপ্ত করা, এ রমণী দশকরা,

বিবিধ আয়ুধ-ধরা, মমুজ-দলনী হেরি।

নহে মম কক্ষে এ যে, এ সমর-সাজে সাজে,

মানসে অমরে পুঞ্জে এ নারী-চরণ, গিরি।

(ঐ, ব্রজমোহন রায়)

সামর বরণ, নয়ন অম্বরঞ্জিত
জল-জোগ ফুল কোকা ।
কট কট বিকট ঠাট-পুট পাড়রি
লিখুর-ফেন উঠ কোকা ॥ ৫

‘দিন-রজনী, তোমার চরণ শবাসন শোভিত, তোমার চুড়ায় শোভে
চন্দ্রমণি ; কত দৈত্যকে মারিঃ’ মুখে ফেলিলে, কত না উৎসাহ
করিয়া জড় করিয়াছ ৷’ শ্রামল তোমার বঁধু তাহাতে রক্তিম নয়ন,
যেন কালো মেঘে লাল পদ্ম ; তোমার পাটল ঠাটপুটে বিকট ধ্বনি,
কথিদের কেনায় বুধ্ধ উঠিতেছে ।’

এই বিকট মূর্তির মধ্যেই শ্রামার শ্রাম বর্ণের মধ্যে রক্তিম নয়নের
শোভা কবির মনে আনিয়াছে শ্রাম জলদের গায়ে রক্তপদ্মের শোভার
কথা । রামপ্রসাদের কালীমূর্তির একটি অমুরূপ বর্ণনায় দেখিতেছি—
চলিয়ে চলিয়ে কে আসে, গলিত টিকুর আসব আবেশে,
বামা রণে দ্রুতগতি চলে, দলে দানবদলে,

ধরি করতলে গজগরাসে ॥

কে রে কালীয় শরীরে, কথির শোভিছে,

কালিন্দীর জলে কিংকত ভাসে ।

কে রে নীলকমল, ক্রীমুখমণ্ডল,

অর্ধচন্দ্র ভালে প্রকাশে ॥

কে রে নীলকান্ত মণি নিভান্ত,

নগর-নিকর তিমির নাশে ;

কে রে রূপের ছটায় তড়িত ঘটায়,

যন ঘোর রবে উঠে আকাশে ॥ ৬

পদটির পশ্চাতে যে কবি-মানস রহিয়াছে তাহাকে ভাস করিয়া
বুঝিয়া লইতে হইলে পদটির একটু ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দরকার ।
কালী আসব-আবেশে—অর্থাৎ সুরাপানে বিহ্বলা হইয়া এলোকেশে
চলিয়া চলিয়া রণক্ষেত্রে আসিতেছেন ; কিন্তু চলিয়া চলিয়াও
দানব-দলনে তাঁহার চরণের ক্ষিপ্ৰগতি—এবং রণক্ষেত্রে
তিনি দানবপক্ষের গজগুলিকে করে ধরিয়া গ্রাস করিতেছেন,
রণোদ্গাদিনী দেবীর সর্বাস্তে কথিরচিহ্ন । এই পর্যন্ত কালীর
পৌরাণিক রূপ ; কিন্তু সাধকের মনের মাধুরীর স্পর্শে এইরূপও
জয়ঙ্করী হইয়া উঠিতেছে না ; কালীর কালো দেহে কথিরের
ছটা যেন কালিন্দীর কালো জলে ভাসিয়া যাওয়া কিংকতের
ছটা । আবার মনে হইতেছে, মায়েস মুখখানি যেন
নীলকমল—চুড়ার অর্ধচন্দ্র এই নীলকমলের উপরেই অপূর্ব
শোভা ধারণ করিয়াছে । নীলচরণের নখরগুলি হইতে যেন
নীলকান্তমণির দ্বাতি বিচ্ছুরিত হইয়া অন্ধকার নাশ করিতেছে ;
নীলবর্ণের উপরে রূপের ছটায় যেন বিদ্যুৎ খেলিতেছে—দেবী যে
ঘোর রবে রণে লক্ষ দিতেছেন—তাহাতে মনে হয় আকাশে গর্জনকারী
নীলনবীন মেঘে যেন বিদ্যুৎ খেলিতেছে ।

এই বর্ণনাটি কাব্যের দিক হইতে নিখুঁত না হইতে পারে—

৫। বিভাপতি, ক্রীতগোবিন্দনাথ মিত্র ও ডক্টর বিমানবিহারী
মজুমদার সম্পাদিত, ১৬৬ সংখ্যক পদ ।

৬। শা, প, (ক, বি) (শাক্ত পদাবলী, কলিকাতা
বিষয়ভাষ্য) ।

অতিরেক দোষে দুষ্ট হইতে পারে—কিন্তু লক্ষ্য করিতে হইলে,
পৌরাণিক ভয়ঙ্করী দেবীর কোনও লক্ষণকে বাদ না দিয়া তাহাকেই
হৃদয়মধ্যে কতখানি মধুর করিয়া লওয়া যাইতে পারে তাহার কি
একটি ব্যাকুল প্রয়াস রহিয়াছে কবির সবটুকু বর্ণনার মধ্যে ।

মহারাজ বতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের একটি অপূর্ব বর্ণনায় দেখি—

তুবার ধবল হ্রদে নৌলিম নলিনী ।

হর-হৃদি-মাঝে আমার শ্রামা মা জননী ।

রূপ সে তিমিররাশি, অথচ তিমির নাশি’

উজলিছে ত্রিভুবন জিনি সৌদামিনী ॥ ৭

তুবার-ধবল মহাদেব—তাহার হৃদয়োপরি নীলবর্ণী শ্রামা যেন
তুবার-ধবল হ্রদে প্রস্ফুটিত একটি ‘নৌলিম নলিনী !’ তিমিররাশি
দিয়াই সে রূপ গড়া—কিন্তু রূপের বিদ্যুৎ-বিভাষ দশদিক্ আলো
করাই হইল তাহার স্বাক্ষর । কোনও কোনও কবি আবার মায়েস
পদনখে রবি-শশীর বিভা আনিয়াই কান্ত হন নাই ; উদ্গাদিনী
রণরঙ্গিনী মায়েস চরণে নুপুরও বাঁধিয়া ছাড়িয়াছেন । ৮ কেহ আবার
চরণে নুপুরের সহিত কটিতে যুজ্জ্বল করিয়াছেন । ৯ কোনও কবি
আবার সর্বত্র শুধু ‘অমিয়া’ রূপই লক্ষ্য করিয়াছেন ।—

অমিয়া জিনি মুখ শোভা তায়, অমিয়া সম শ্রমজল তায়,

অমিয়া সম পিকতাবে গায়, অমিয়া রূপে সুরধাকর ॥ ১০

মহারাজ শিবচন্দ্র রায়ে—

নীলবর্ণী, নবীনা রমণী,

নাগিনী জড়িত জটা বিভূষণী ।

নীল নলিনী জিনি ত্রিনয়নী,

নিরখিলাম নিশানাথ নিভাননী ॥ ১১

প্রস্তুত বর্ণনা শুধু মধুর ভাবের দিক্ হইতে নয়, মধুর ভাষার
দিক্ হইতেও বৈকল্য কবিতাকে স্মরণ করাইয়া দিবে । ১২

রামপ্রসাদেরও এই বৈকল্য ভাষা ভজিতে কালীর বর্ণনা দেখিতে
পাই—

৭। শা, প, (ক, বি,) ।

৮। কে ও বিহরে, হর-হৃদি পরে, হর-মন হরে মোহিনী ।

চমকে অরুণ রবি শশী যেন, নখরে প্রথরে আপনি ॥

শোভিত প্রপদ, দেয় মোক্ষপদ, আপনে সম্পদদায়িনী ।

চমকে নুপুর, আলো করে পুর, মণিময় পুরবাসিনী ॥

কালী মর্জী (কালিদাস চট্টোপাধ্যায়) শা, প, (ক, বি) ।

৯। নব জলধর কায় ।

কালো রূপ হেরিলে আঁখি জুড়ায় ॥

কপালে সিন্দুর, কটিতে যুজ্জ্বল, রতন নুপুর পায় ।

হাসিতে হাসিতে কত দানব দলিছে, কথির লেগেছে পায় ॥

ইত্যাদি ।

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য ; শা, প, (ক, বি) ।

১০। গৌরমোহন রায়, শা, প, (ক, বি,) ।

১১। শা, প, (ক, বি,) ।

১২। মঙ্গল-কাব্যগুলির ভিতরে পার্বতীর মনোহর মূর্তির বর্ণনায়
আমরা বৈকল্য-সাহিত্যের রাধার রূপ-বর্ণনার প্রভাবের কথা পূর্বে উল্লেখ

নব নীল নীরব ভক্তকে কে ?

ঐ মনোমোহিনী রে ।

তিমির শশধর, বাল দিনকর,

সমন চরণে প্রকাশ ।

কোটিল্প বালকত, ত্রিগুণগুণ,

নিম্নি সুধামৃতভাষা ॥ ১৩

অথবা—

এলোকেশে, কে শবে, এলো রে বামা ।

নখর নিকর হিমকরবর,

রঞ্জিত ঘন তম্বু মুখ হিমধামা ॥

নব নব সঙ্গিনী, নব রসরঙ্গিনী,

হাসত ভাবন্ত নাচত বামা ।

কুলবালা বাহুবলে, প্রবল দম্বজ দলে,

ধরাতলে হতবিপু সমা ॥ ১৪

অথবা—

শঙ্কর পদতলে, মগনা বিপুললে,

বিগলিত কুন্তলজাল ।

বিমল বিধুবর, ত্রিগুণ সুন্দর,

তম্বুকটি বিজিত তরুণ তমাল ॥ ১৫

হাতে যে ভয়াস করবাল লইয়া কালী অনুর বিনাশ
করিতেছেন তাহাকেও বাঙালী মন রূপান্তরিত করিয়া লইবার চেষ্টা
করিয়াছে ।

করিয়া আসিয়াছি । দেবীর রূপ-বর্ণনাতে আমরা শাস্ত্র-পদাবলীতেও
মাঝে মাঝে এই ভঙ্গির অনুসরণ দেখিতে পাই । যেমন—

অপরূপা কে লগনা হেরি রক্তাধুজাসনা,

কিঙ্কিণী মণি রচিত, মুকুট শিরোভূষণা ।

কুটিল কুন্তল জাল, আবৃত মুখমণ্ডল,

গুঠিত বিকল, প্রকুল পঙ্কজাননা ।

ধনু সদৃশ ভ্রুসত্তা, ত্রিনয়ন-সুশোভিতা,

সহাস্র বদনাঙ্কিতা, মধু মধুর বচনা ॥ ইত্যাদি

মহাতাব চাঁদ, শা. প. (ক. বি.)

১৩। উক্ত শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্যের 'ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ'
গ্রন্থে দ্বিতীয় পদ (১৩৭ সং) ।

১৪। ঐ, (১৪৮ সং) । তুলনীয়—

কে রে নব-নীল-কমল-কলিকা বলি,

অজুলি দংশন করিছে অলি,

মুখচন্দ্র চকোরগণ, অধর অর্পণ

করত পূর্ণ শশধর বলি ।

ভ্রমর চকোরেতে লাগিল বিবাদ,

এ কহে নীলকমল, ও কহে চাঁদ,

দৌছে দৌহ করতহি নাদ,

চিচিকি গুণ গুণ করিয়ে ধনি । ইত্যাদি ।

রামপ্রসাদ, পূর্বোক্ত গ্রন্থে দ্বিতীয় পদ (১৩৮ সং) ।

১৫। ঐ (১৫৩ সং) । এই গ্রন্থে ১৪২, ১৪১, ১৫০,

১৫১, ১৫২ পদগুলি দ্রষ্টব্য ।

তুবন ভূলালে যে কার কামিনী ঐ রমণী ।

বামার করে করাল শোভিছে ভাল করবাল যেন সৌন্দর্যিনী ॥ ১৬

ভক্ত-হৃদয়ে এই কালী-রূপের আকৃতি রসধনরূপ লাভ করিয়াছে
কমলাকান্তের একটি গানে—'মঞ্জিল মন-ভ্রমরা, কালী-পদ-
নীলকমল' । রামপ্রসাদের দুই একটি গানে—'এই রূপকে লইয়া
ভক্ত-হৃদয়ের রীতিমত একটি উরুসু আগিয়া উঠিয়াছে, যেমন—

কাল মেঘ উদ্‌বাহলো অন্তর-অবরো' ।

নৃত্যতি মানস-শিখী কোঁতকে বিহরে ॥ ১৭

অথবা—

সজল জলধর,

কাস্তি সুন্দর,

কুধির কিবা শোভা ও বরণে ।

প্রসাদ প্রবদতি, মন মানস নৃত্যতি,

রূপ কি ধরে নয়নে ॥ ১৮

কালীকে অবলম্বন করিয়া এই 'রূপাধুরাগ' সহসা খুব স্বাভাবিক
বলিয়া মনে হয় না । এক্ষেত্রে মনে হয়, দীর্ঘ প্রায় ছয় শতাব্দী
ধরিয়া বাঙলা দেশে শত শত বৈষ্ণব কবি রূপাধুরাগের সাধনা
করিয়াছেন ; সেই সাধনা বাঙলার কবিমানসে 'রূপাধুরাগের'
একটা বাসনাকেই প্রবল করিয়া রাখিয়াছিল ; সেই বাসনাই
অষ্টাদশ শতকে কালীমুক্তিকেও নূতন দৃষ্টিতে গ্রহণ করিয়াছে । নূতন
দৃষ্টি বলিতেছি, কারণ কালীকে অবলম্বন করিয়া এই 'রূপাধুরাগের'
আভাস কোনও পুরাণে নাই—তন্ত্রেও নাই ।

তবে এই 'রূপাধুরাগের' পশ্চাতে মধুরস-প্রীতি ব্যতীত শাক্ত
সাধককবিগণের একটি গভীর অনুভূতির প্রসঙ্গ ছিল । এই সাধক
কবিগণ বহুস্থানে কালীর কালো-রূপে হৃদয় আলো করিবার কথা
বলিয়াছেন । ইহার ভিতরে একটি গভীর সাধন-রহস্তের কথাও
নিহিত আছে, তাহার আলোচনা আমরা এই সাধক কবিগণের
সাধনার কথা বিবৃত করিবার সময়ই আলোচনা করিব ।

আমরা উপরে লক্ষ্য করিয়া, দেবীর রূপ বর্ণনার কতকগুলি
পদে ভাষা ও ভঙ্গিতে বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রভাব প্রত্যক্ষভাবে দেখা
দিয়াছে । বর্ণনায় এই প্রত্যক্ষ প্রভাব আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে
ভক্ত কমলাকান্তের 'সাধক-রজন' নামক সাধন-সঙ্গীত গ্রন্থে ।
কমলাকান্ত এসব ক্ষেত্রে দেবীর কোনও বাহ্য মূর্তির বর্ণনা করেন
নাই, দেবী এখানে 'কুস-কুণ্ডলিনী' শক্তি—বাস তাঁহার বটচক্রের
ভিতরকার সর্বনিম্ন মূল্যধারচক্রে । তিনি কখনও বালিকা, কখনও
কিশোরী,—কখনও নবীনা যুবতী । তাঁহার দ্ব্যিত শিবের অবস্থিতি
ক্রমবাহু আচ্ছাদিত । মূল্যধার হইতে আচ্ছাদিত চলে এই 'নবীনা
যুবতী'র অভিসার যাত্রা । এই আচ্ছাদিত-রূপ দ্রবিত্বপূর্ণ আসিয়া
মিলিয়াছে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর (ইড়া, পিঙ্গা ও সুম্মা নাড়ীর)
ধারা—এখানে আগিয়াছে জিবেগী-সঙ্গম । 'সাধক-রজন'র এই
নবীনা যুবতীকে সাধক-কবি গ্রহণ করিয়াছেন কৃষ্ণ-অভিসারিণী রাধার
প্রতিচ্ছবিতে ; সমস্ত বটচক্র-সাধনাই এখানে বৈষ্ণববর্ণিত নীলার

১৬। মহাশয় হরেন্দ্রনারায়ণ রায়, শা. প. (ক. বি.)

১৭। উক্ত শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য লিখিত 'ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ'
গ্রন্থে সঙ্কলিত রামপ্রসাদের পদাবলী (১০৪ সং) ।

১৮। ঐ, (১৩৪ সং) ।

অবলম্বনে বর্ণিত হইয়াছে। শুধু বৈষ্ণব-লীলার রূপকই নয়—তারা ও ছন্দ ও গৃহীত সম্পূর্ণভাবেই বৈষ্ণব সাহিত্য হইতে। কিছু কিছু নবুনা দিতেছি। রজনীর শেষে প্রভাতে (অজ্ঞান-অন্ধকারের বিনাশে জ্ঞানালোক দেখমন উদ্ভাসিত হইলে) এই ‘রমণী’ (শিবসঙ্গে রমণের অভিসারিণী কলকুণ্ডলিনী শক্তি) জাগ্রত হইলেন; তিনি তখন ত্রিবেণী তরঙ্গিনীতে স্নানে জলিলেন।

ত্রিগুণা ত্রিবেণী তরঙ্গিনী ধায়।
কেলি করে কুলকামিনী তার।
বিহরই রঙ্গিনী সখীগণ সঙ্গে।
বিতরয় বারি পরাপর অঙ্গে।
হেরি হেরি স্তম্ভরী চকিত মন্ডন।
ভড়িত স্তম্ভকস করি অনুমান।
সমবয় সঙ্গিনী নব অমুরাগে।
কিসলয় পরশে কুসুমধনু জাগে ॥১১

আজ্ঞাচক্রস্থ ত্রিবেণীতে চলে শিবের সঙ্গে স্নানকলি; সেই কেলি সমাপন হইলে আবার ধীরে ধীরে তিনি চলেন আপন নিবাসে (মুলাধারে)। এই আপনার ঘরে ফিরিবার বর্ণনা দেখি—

গল্পপাতিনিদ্দিত গতি অবিলম্বে।
কুঞ্চিত কেশ নিবেশ নিত্যে ॥
চাক চরণপতি অভরণবৃন্দে।
নখরমুকুটরকর হিমকর নিন্দে ॥
উরসি সরসীক্লহ বামা।
করিকর শিখর নিত্যধনী রামা ॥
মৃগপতি দূর শিখরমুখ চায়।
কটিট ক্ষণ স্তম্ভকস বায় ॥ ইত্যাদি।

এই দেবীকে অবলম্বন করিয়া ভক্তিভাবের কিছু কিছু বর্ণনাও দেখি। ইহার বালাভাবের বর্ণনায় দেখি—

কিরে ধনী পেখণু হেরি হেরি তম্বু
বেরি বেরি মন ধায়।
ইহ তম্বু অবস দিবস রজনী
রমণী পুন আঁখি ডুলার ॥
মন এ স্তম্ভরী বধি কহে বাণী।
বচন পরামৃত মৃত তম্বু মুগ্ধরে
এ তম্বু সকল করি মানি ॥ ইত্যাদি।

তাহার পরে মধ্যভাবে—

কদম্ব কুসুম জম্বু সতত সিংহরে তম্বু
বদবধি নিরখিলাম তারে।
যদি পাসরিতে চাই আপনা পাসরে জাই
এনা দুখ কহিব কাহারে ॥
সেই সে জীবন মোর রসিকের মনোচোর
রমণী রসের শিরোমণি।
পরিহরি লোকলাজে রাখিব জয়র মংগে
না ছাড়িব দিবস রজনী ॥

১১। সাধক-রজন, বসন্তরজন রায় ও অটলবিহারী ঘোষ সম্পাদিত (বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ)

অধিক উদ্ভৃতির প্রয়োজন নাই; উদ্ভৃতি দ্বিতে হইলে প্রায় গোটা বইখানিই তুলিয়া দিতে হয়। যেটুকু উদ্ভৃতি মিলায় তাহা দ্বারা শাক্ত সাধকগণও যে নিজস্বের সাধনতত্ত্ব বা সাধনভাব প্রকাশে বৈষ্ণব দ্বারা দ্বারা কতখানি প্রভাবিত হইয়াছিলেন তাহারই একটি বিশেষ নবুনা দিবার চেষ্টা করিলাম।

প্রসঙ্গক্রমে আমরা লক্ষ্য করিতে পারি, বাঙালার প্রতিবেদী মৈথিলী সাহিত্যেও দেবীর বর্ণনায় বাঙলা সাহিত্যের অনুরূপ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। দেবীর বর্ণনায় দেবীর ভয়ঙ্কর রূপের সব বর্ণনাই আছে, তথাপি একটি দুইটি ছন্দে দেবীর কমনীয় মাধুর্যকে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা হইয়াছে। প্রথমে আমরা মৈথিল কবি বিভূষণের একটি দেবী-বন্দনার পদ দিয়াই আরম্ভ করিয়াছিলাম। পরবর্তী কালের অপেক্ষাকৃত আধুনিক মৈথিল কবিগণের দেবী-বর্ণনায় মধ্যেও এই প্রবণতা লক্ষ্য করি। মহারাজ মহেশ ঠাকুরের ‘তারা’ বর্ণনার ভিতরে দেখি—

জয় জয় জয় ভয়ভঞ্জন ভগবতি
আদি শক্তি তুমি মায়া।
জনি নব সজল জলদ তুমি তম্বুকচি
পদকচি পঙ্কজ ছায়া ॥২০
মহারাজ মহিনাথ ঠাকুরের কালী-বর্ণনার প্রথম ছন্দ—
বদন ভয়াল কান শব কুণ্ডল
বিকট দশন ঘন পাঁতা।

কিন্তু দ্বিতীয় ছন্দেই দেখি—
ফুজল কেশ বেশ তুমি কে কহ
জনি নব জলধর কীতি ॥২১

কবি মুকুন্দের তুর্গা-বর্ণনায় দেখি,—
সিংহ চড়লি মাতা অমৃত-মিকন্দিনি,
মেদিনী ডোল গতি-দাপে।
আমুখ উগ্র শোভাও আঁঠো কর,
জাহি ডরে অরি উর কীপে।

কিন্তু ঠিক পরের বর্ণনাই হইল—
দুর্বাদল সন কান্তি মনোহর,
শিরে শোভ চান কলাপে ॥২২

আধুনিক কবি বিশ্বনাথ ঝা ভগবতীর স্নিতে বলিয়াছেন—
জয় জয় সকল অস্তুরকুলনাশিনি, আদি সনাতনি মায়া।
গিরিবর বাসিনি, শঙ্করভামিনি, নিজ জন পর কর দায়ী ॥
গ্রামল রুচির বদন তুমি রাজিত, ভড়িতবিনন্দক নয়নে।
বয়ছাল পহিরন, কটি অতি শোভিত, ফণিকুণ্ডল যুগ কানে ॥২৩
বাঙলা বৈষ্ণব পদাবলীর সহিত বাঙলা শাক্ত পদাবলীর আর একটি গভীর মিল লক্ষ্য করিতে পারি উভয় জাতীয় পদাবলীতে বাৎসল্য-রসের বর্ণনায়। এই বাৎসল্য রসের প্রাবল্যে বাঙালী কবিমানে বৃন্দাবন ও গিরিপুরের মধ্যে ব্যবধান ও ভেদচিহ্ন অনেক সময় অশ্পষ্ট হইয়া গিয়াছে—স্থানে স্থানে যুছিয়াও গিয়াছে। এইরূপ হইবারই ত কথা, কারণ বাঙালী কবিমানে বৃন্দাবনও উত্তর

২০। গীতি-রালা, শ্রীউদ্যানন্দ ঝা কর্তৃক সঙ্কলিত। ২১। ঐ।
২২। ঐ। ২৩। ঐ।

প্রদেশে অবস্থিত নয়, গিরিপুত্র হিমালয়ের কোনও কন্ডরে স্থিত নয় ; উভয়ের অবস্থিতিই বাংলাদেশের মাট-মাট-জোড়া শ্রামল অঞ্চলে । সুতরাং ভাবপ্রাবল্যে আস্তে আস্তে স্বাভাবিক ভাবেই ভেদচিহ্নের বিদ্যুতি । একই চিত্তপ্রক্রিয়ায় গিরিযাজ ও নন্দরাজ এবং গিরিবাণী ও নন্দবাণীরও আপোসে ভাব বিনিময় হইয়া গিয়াছে ; ইহার মাঝখানে একস্থলে দাঁড়াইয়া 'স্নেহের ছল্লালী উমা' অপরস্থলে 'স্নেহের ছল্লাল গোপাল' । বাংলাদেশের বৈষ্ণব কবিতার গোপালের বাল্যলীলাকে অবলম্বন করিয়া বৃকের সমস্ত স্নেহ উৎসারিত করিয়া দিয়াছেন যে বাঙালী মা, বাংলাদেশের শাস্ত্র কবিতার মধ্যে উমাকে অবলম্বন করিয়াও তেমনই ভাবে স্নেহ উৎসারিত করিয়া দিয়াছেন একই মা । অবশ্য লীলার এবং লীলাক্ষেত্রের কিছু পার্থক্য আছে । একজনের বাল্য-লীলা মুখ্যতঃ গোষ্ঠী অবলম্বনে—অপরের বাল্য-লীলা অষ্টমবর্ষেই স্বামীর ঘর করণে । কিন্তু পূর্বকে অবলম্বন করিয়াই হোক আর কতটুকু অবলম্বন করিয়াই হোক, মা বশোনা রূপেই হোন আর মা মেনকা রূপেই হোন—সেই একই 'মা'কে চিনিয়া লইতে কোনও অসুবিধা হয় না । রামপ্রসাদের গিরিবাণী মেনকা যেখানে গিরিযাজ হিমালয়কে ডাকিয়া বলিতেছেন—

গিরিবর, আমি আর পারিনে হে, প্রবোধ দিতে উমারে ।

উমা কৈদে করে অভিমান, নাহি কবে স্তম্ভপান,

নাহি খায় ক্ষীর ননী সরে ॥

সেখানে চিত্রটিকে সামান্য একটু পরিবর্তিত করিয়া 'উমা'র স্থলে গোপাল এবং মেনকা স্থলে বশোনা এবং গিরিযাজের স্থলে ব্রজরাজের কথা শ্রবণ করিতে আমাদের কোনই অসুবিধা হয় না । গোপালের গোষ্ঠে যাওয়া লইয়া কবিওয়ালার গান দেখি—

দিব না গোষ্ঠে বিদায় মোর
নীলমণি ধনে ;
কপাল মন্দ তাইতে সন্দ,
বলাই হচ্ছে রে মনে ।
কুস্বপন দেখেছি ভারি,
যেন ভায়াগেছি হরি,
বলাই রে তোরা করে ধরি,
মন মানে ত নয়ন না মানে ।
আজকের মতন যারে তোরা,
ঘরে থাক মোর মাখনচোরা,
পলকেতে হইয়ে হারা
নয়নভারা দিয়ে বনে ॥২৪

ইহারই ঠিক পাশে রাখিয়া দিতে পারি আমরা শাস্ত্র সঙ্গীত—

গিরি, কি সুখাণ্ড হে সমাচার ?
বলিতে সে স্বপন, না সরে বচন,
খেদে পোড়ে মন, বহে অজ্ঞধার ।
নিশিতে যেমন ভেবে উমাধন,
অনেক আয়াসে মুছেছি নয়ন,

অমনি স্বপনে করি দরশন—

শিয়রে বসিয়া যেন মা আমার ।

বাহার নাই সে বরণ, নাই আভরণ,

হেমাকী হইয়াছে কালীর বরণ ;

হেরে তার আকার চিনে উঠা ভার,

সে উমা আমার উমা নাই হে আর ॥২৫

লীলা-ক্ষেত্রের সকল পার্থক্য নব্বও মাতৃ-মনের ঐক্যকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই ।

বৈষ্ণব পদাবলীতে আমরা দেখিতে পাই, গোপালকে গোষ্ঠে বিদায় দিয়া নন্দবাণী সারাদিন উদ্বেগ-আশঙ্কায় পথ চাহিয়া বসিয়া থাকিতেন এবং গোষ্ঠে হইতে গোপাল ফিরিয়া আসিলে ক্ষীর-সর-ননী লইয়া আগাইয়া বাইতেন ।

রাণী ভাসে আনন্দ সাগরে ।

বামে বসাইয়া শ্রাম

দক্ষিণে বসাইয়া রাম

চুষ দেই মুখ-সুধাকরে ॥

ক্ষীর ননী ছেনা সর

আনিয়া সে থরে থর

আগে দেই রামের বদনে ।

পাছে কানাইয়ের মুখে

দেয় রাণী মনোমুখে

নিরঞ্জে চাদ মুখপানে ॥২৬

শাস্ত্র পদাবলীতেও অনুরূপভাবে দেখিতে পাই, উমা কৈলাস হইতে ফিরিয়া আসিলে মা মেনকা আগাইয়া গিয়া বলিয়াছেন—

পথ-শ্রমে ষেদে সিন্ত কলেবর,

ক্ষুধায় মলিন হয়েছি অধর,

কঃ ক্ষীর সর রেখেছি, মাধব,

দিব বদন-কমলে ॥২৭

কানু সন্ধ্যায় গোষ্ঠে হইতে ফিরিয়া আসিলে—

গোগণ সবহ

গোষ্ঠে পরবেশল

মন্দিরে চলু নন্দলাল ।

আকুল পদে

বশোমতি আঙল

মোহন ভণিত রসাল ॥২৮

এক তাহার পরে—

পঞ্চদশে নিরময়ন কেল ।

কত শত চুষ বয়নপর দেল ॥২৯

আগমনী সঙ্গীতেও দেখি কৈলাস হইতে ফিরিয়া উমা আসিলে গিরিবাণী মেনকা—

অমনি উঠিয়ে পুলকিত হৈয়ে, ধাইল যেন পাগলিনী ।

চলিতে চঞ্চল, খসিল কুন্তল, অঞ্চল লোটায়ে ধরনী ॥

আঙ্গিনার বাহিরে, হেরিয়ে গৌরীয়ে, দ্রুত কোলে নিল রাণী ।

অমিয় বরষি উমা-মুখ-শশী চুষয়ে যেন চকোরিণী ॥৩০

২৫। শা, প, (ক, বি,) ।

২৬। বলরাম দাস, পদকল্পতরু ।

২৭। মহেন্দ্রলাল খান (রাজা), শ, প, (ক, বি,)

২৮। পদকল্পতরু ।

২৯। মোহন, পদকল্পতরু ।

৩০। কমলাকান্ত, শা, প, (ক, বি,)

কুঞ্জে মধুরাগমনের বিচ্ছেদ ব্যথা এবং উমার কৈলাসগমনের
বিচ্ছেদ-ব্যথাও বাঙালী কবিগণের মনে ঝানিকটা সমজাতীয় অনুভূতি
সৃষ্টি করিয়াছে। আমরা কুঞ্জের মধুরাগমনে যেমন দেখিতে পাই—

কুসুম তেজিয়া অলি ক্ষিত্তিতলে লুঠই
তরুগণ মলিন সমান।

শারী শুক পিক ময়ূরী না নাচত
কোকিল না করত হি গান। ৩১

তেমনই উমার কৈলাস গমনেও দেখিতে পাই—

রাণি পৌ, স্রুত তোমারি বেদনা ব'লে নয়।
দেখ দেখি গিরিপূরে, পশুপক্ষী আদি ক'রে,
উমার লাগিয়া বুয়ে, সব নিরানন্দময়। ৩২

কুসুম মধুরায় চলিয়া ষাইবার পর রাত্রিতে কুঞ্জের স্বপ্ন দেখিয়া
নন্দরাণী বশোলা কাদিয়া উঠিতেন। এই জাতীয় চমৎকার একটি
পদ দেখিতে পাই কুরুকমল গোস্বামীর ‘স্বপ্ন-বিলাস’ পালায় মধ্যে।
স্বপ্নে গোপাল আসিয়া দেখা দিয়া আবার কোথায় লুকাইয়াছে—
সকাল বেলা ব্রজরাণী কাদিয়া কাদিয়া সেই কথা ব্রজরাজ নন্দকে
বলিতেছেন।

শোন ব্রজরাজ, স্বপ্ননেতে আজ,
দেখা দিয়ে গোপাল কোথা লুকালে।
বেন সে অকল চাঁদে অকল ধ'রে কাঁদে,
“জাননী, দে ননী দে ননী” বলে।

নীল কলেবর ধুলার ধূসর,
বিধুমুখে বেন কতই মধুস্বর
সঞ্চারিয়ে ডাকে “মা” বলে।
কত কাঁদে বাঁড়া বলি সর সর,
আমি অভাগিনী বলি সর্ব সর্ব,
বললেম নাহি অবসর, কেবা দিবে সর,
অমনি সর্ব সর্ব বলি কেলিলেম ঠেলে ॥ ইত্যাদি।

সমজাতীয় বহু গান দেখিতে পাই আমাদের আগমনী
সঙ্গীতের মধ্যে। এখানে উমার স্বপ্ন দেখিয়া গিরিরাজী মেনকা
গিরিরাজকে বলিতেছেন—

আমি কি হেরিলাম নিশি-স্বপনে!
গিরিরাজ, অচেতন কত না ঘুমোও হে।
এই এখনি শিরের ছিল, গৌরী আমার কোথায় গেল হে,
আধ আধ মা বলিয়ে বিধু-বদনে!
মনের তিমির নাশি, উদয় হইল আসি,
বিতরে অমৃতরাশি সুললিত বচনে।
অচেতনে পেয়ে নিধি, চেতনে হারলাম গিরি হে!
ধৈর্য না ধরে অম জীবনে। ৩৩

আবার—

কাল স্বপনে শঙ্করী মুখ হেরি কি আনন্দ আমার
হিমগিরি হে, জিনি অকলঙ্ক বিধু, বদন উমার ॥

বসিয়ে আমার কোলে, দশনে চপলা খেলে,
আধ আধ মা বলে বচন সুধাধার,
জাগিয়ে না হেরি তারে, প্রাণ বাঁধা ভার। ৩৪
দাশরথি রায়ের প্রসিদ্ধ গান রহিয়াছে—

গিরি, গৌরী আমার এসেছিল।
স্বপ্নে দেখা দিয়ে, চৈতন্য করিয়ে
চৈতন্যরূপিনী কোথা লুকালে ॥
কহিছে শিখরী, কি কদি, অচল,
নাহি চলাচল, হ'লাম হে অচল,
চঞ্চলার মত জীবন চঞ্চল,—
অঞ্চলের নিধি পেয়ে হারালো ॥

কিন্তু এই বাৎসল্য-রসের ক্ষেত্রে বৈক্য-কবিতায় বাৎসল্য-রসের
শুধু একটানা শ্রোতাই দেখিতে পাই—মাতৃ-হৃদয়ের বিগলিত স্নেহধারার
সন্তানের উপরে—অবিরল বর্ণণ। বাৎসল্য-রসের অপর একটি শ্রোত
আছে—উহা মাতৃ-পাণ্ডল সন্তানের মাতার প্রতি তীব্র আকর্ষণ—যে
আকর্ষণ তাহাকে সংসারের অস্ত্র সকল আসক্তির বন্ধন হইতে একেবারে
মুক্তি দিয়াছে। মায়ের প্রতি সন্তানের আকর্ষণ বাৎসল্য নামে
বহুখ্যাত বলিয়া মায়ের প্রতি সন্তানের এই আকর্ষণকে প্রতিবাৎসল্য
নাম দেওয়া হইয়াছে। প্রতিবাৎসল্য-রূপ সন্তানের এই সর্ববিশ্বাকর্ষক
আকৃতি বৈক্য সাহিত্যে নাই—শুধু বৈক্য সাহিত্যে নয়, অস্ত্র কোনও
সাহিত্যেই—এমন করিয়া নাই যেমন আছে বাঙলা দেশের এই শাস্ত্র
সঙ্গীতের মধ্যে। রামপ্রসাদ এই ধারার প্রবর্তক—রামপ্রসাদেই
এই ধারার সর্বোচ্চ পরিণতি। সুখে দুখে, আশায় নৈরাশ্রে পাওয়ায়
না পাওয়ায়, হাসিতে অশ্রুতে মিলাইয়া এই ‘মা’ ডাক। সর্বব্যাপিনী
সবৈক্যময়ী আনন্দরূপিনী মাকে অন্তরে উপলব্ধি করিয়া রস-বিশ্কাষিত
নৈঃকরুণা কণ্ঠে যেমন মা নাম, তেমনই আবার ‘ভবের গাছে
ছুড় দেওয়া’ চোখে হুঁলি বাঁধা বলদের মত ঘানির গাছে ঘুরিতে
ঘুরিতেই শ্রান্ত কণ্ঠে মায়ের নাম, (৩৫)—না-জানা অপরাধে দীর্ঘ
মেয়াদে সংসার গারদে ভুগিতে ভুগিতেই মায়ের নাম, (৩৬) আবার
ডাকিতে ডাকিতে সাড়া না পাইয়া অভিমানের অবিরল অশ্রুতে
অথবা অভিমানের কঠিন রোষেও সেই একই মায়ের নাম। এই সাধন-
শক্তিতে বিশ্বাস লইয়াই রামপ্রসাদ মায়ের নাম করিতে
বলিয়াছিলেন—

এমন ছাপান ছাপাইব খোঁজে খোঁজে নাহি পাব।
বস্ত্র পাছে গাভী যেমন তেমন পাছে পাছে ধাব। ৩৭

হৃদয়ের সমস্ত আতি আকৃতি উত্তরহীন নৈশঙ্ক্যের কঠিন
শিলাতে মাথা কুটিয়া কুটিয়া একদিন হৃদয় ফুঁসিয়া উঠিয়া
বলিয়াছে—

মা ব'লে আর ডাকিস, না-রে মন, মাকে কোথা পাবি ভাই।
থাকলে আসি দিত দেখা, সর্বনাশী বেঁচে নাই ॥ ৩৭

৩৪। কমলাকান্ত ভট্টাচার্য, শা, প, (ক, বি,)।

৩৫। ‘মা আমার ঘুরবি কত’ প্রভৃতি, রামপ্রসাদ।

৩৬। ‘তারা কোন অপরাধে, এ-দীর্ঘ মেয়াদে, সংসার গারদে
থাকি বল’। নীলম্বর মুখোপাধ্যায়, শা, প,

৩৭। নরেন্দ্র রায়; শা, প,

৩১। গোবিন্দ দাস। ৩২। রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়; শা, প,
(ক, বি,)

৩৩। কমলাকান্ত ভট্টাচার্য, শা, প, (ক, বি,)।

অভিমনে হৃদয়কে কঠোর করিয়া সন্তান বলিয়াছে—

যে ভাল কবেছ কালী, আর ভালতে কাজ নাই।

ভালয় ভালয় বিদায় দে মা, আলোয় আলোয় চলে যাই ॥৩৮

পুঞ্জীভূত অভিমানের জ্বালায় রামপ্রসাদও একদিন মায়ের সহিত
সব হিসাব-নিকাশ বুকাইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন।

মা মা ব'লে আর ডাকব না।

ওমা, দিগেছ দিগেছ কতই যন্ত্রণা ॥

ছিলেম গৃহবাসী, করিলি সন্ন্যাসী,

আর কি ক্ষমতা রাখিস এলোকেশী,

ঘরে ঘরে যাব, ভিক্ষা মগে খাব,

মা ব'লে আর কোলে যাব না ॥

ডাকি বাবের বাবের মা মা বলিয়ে,

মা কি রয়েছিস চক্ষুর্কণ খেয়ে,

মা বিজ্ঞানে এ হুঃখ সন্তানে,

মা ম'লে কি আর ছেলে বাঁচে না ॥

কিছু সত্যকারের মাতৃ-সাধক এই সব সঙ্গীতকারগণ। এই অভিমানের
চোখে জলেই হয়ত তাঁহারা বুকিতে পারিলেন, মা যে আশানবাসিনী,
অন্য মায়ের আগমন নাই। তখন চলিল একটু একটু করিয়া
নিজের হৃদয়কে আশানে পরিণত করিয়া মায়ের লীলা-ক্ষেত্র রচনা
করিবার সাধনা। কামনা-বাসনা-আসক্তিকে নিঃশেষে ছাড়াইয়া
পোড়াইয়া তবে হৃদয়কে আশান করিতে হয়; দগ্ধ কামনা-
বাসনার চিত্তভঙ্গের উপরেই স্থাপন করেন সর্গশাস্তিদায়িনী
মা তাঁহার হুঁই চরণ। সেই মাতৃ-সাধনার রত রাবলাল দাস
সন্তের গান—

আগান ভালগাসিস ব'লে আশান করেছি হৃদি।

আশানবাসিনী শ্রাম নাচবি ব'লে নিরবধি ॥

আমরা বাঙলা বৈষ্ণব পদাবলী ও শাক্ত পদাবলীর ভিতরকার
মিলের কথাই আলোচনা করিতেছিলাম এবং সেই প্রসঙ্গে
উভয়-জাতীয় পদাবলীতে বর্ণিত বাৎসল্য-রসের কথা বলিতেছিলাম।
এই মিলের প্রসঙ্গে আমরা আরও একটি জিনিস লক্ষ্য করিতে
পারি। বাঙলা দেশে শাক্ত ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্বের কথা সুপ্রসিদ্ধ।
নবরূপে মহাপ্রভু ক্রীতচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে দত্তপূর্বক
বিষহরার পূজা, মঙ্গল-চণ্ডীর গীতে জাগরণ এবং মত্তমাস দিয়া
বাহুল্য পূজার উল্লেখ দেখিতে পাই। সেই পটভূমির উপরে
বৈষ্ণবধর্মের জাগরণ, ফলে শাক্ত-ধর্মের সহিত দ্বন্দ্ব-কলহ অনিবার্য।
নবরূপে এই দ্বন্দ্ব-কলহ বহুদিন পর্যন্ত চলিয়াছে, তাহার চিহ্ন
আজিও বর্তমান। এখন পর্যন্তও বৈষ্ণবগণের একটি প্রধান উৎসব
রাসমহোৎসব পূর্ণিমা রাত্রিতে নবদ্বীপের প্রধান প্রধান রাজ্যগুলির
ডোমাখা-চোমাখার বিরাট বিরাট দেবীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়া মহাসমারোহে
পূজিত হন। কিন্তু অষ্টাদশ শতকে আমরা এই শাক্ত-বৈষ্ণব দ্বন্দ্বের
একটা জনপ্রিয় সমন্বয়ের প্রবণতা দেখিতে পাই। ধর্মের ভেদ
সম্ভবাবে অবলুপ্ত হইয়া যায় হুঁইজাতীয় হৃদয়ে, এক বস্তু সাধক-
সময়ে, দ্বিতীয় কবি-সময়ে। যেখানে এই সাধক-হৃদয় ও কবি-
হৃদয়ের যোগ ঘটিয়াছে সেখানে ত আর কথাই নাই। সাধারণভাবে

দেখা যায়, সমাজের জনসাধারণও ধর্মের ক্ষেত্রে সমন্বয়বাদী; স্তব্ধরাং
কবিগণের প্রচারিত সমন্বয়বাদ জনসাধারণ সাদরেই গ্রহণ করিয়া
থাকে।

অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকে আমাদের যে সকল যাত্রা-পাঁচালী
প্রভৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার মধ্যে একটা শাক্ত-বৈষ্ণবের সমন্বয়ের
স্বর দেখিতে পাই। এই সব যাত্রা-পাঁচালীতে দেখিতে পাই, রাধার
স্বামী আশান ঘোষ ছিলেন শক্তি-উপাসক—কালী উপাসক। রাধা
লুকাইয়া লুকাইয়া করিতেন কৃষ্ণের পূজা! ননদিনী কুটলা গিয়া
ভাতা আহারের কাছে অভিযোগ করিল, বধু রাধা লুকাইয়া কৃষ্ণের
পূজা করে। আশান ভগিনীকে লইয়া গোপনে স্বচক্ষে সব দেখিতে
আসিলেন—আসিয়া দেখেন—

কুঞ্জফাননে কালী, তাজে বাঁশী বনমালী,

করে অসি ধরে শ্রীরাধাকান্ত।

শ্রাম শ্রাম ভেদ কেন করবে ভীষ ভাস্ত ॥

পীতাম্বর পরিহরি, হরি হলেন দিপঙ্করী,

মরি মরি হেরি কি রূপের অন্ত।

কি বা কাল শশী, লোলজিহ্বা এলোকেশী,

ভালে শশী অটহাসি বিকট দন্ত ॥

যে গোবিন্দ পদদ্বয়ে শ্রুগন্ধি তুলসী দিয়ে

স্বর নরে সাধে সারা দিনান্ত।

দিয়ে সে চরণে রাঙ্গা জবা রঞ্জিণী বাই করে সেবা

কে পাবে শ্রাম চিন্তামণির ভাবের অন্ত ॥৩৯

বাঙলা দেশে চলিত কৃষ্ণ-যাত্রায় এই পালাটি দর্শকবৃন্দের সোলাস
সমর্থন লাভ করে—এসময় আমরা নিজেরাই বহুবার প্রত্যক্ষ
করিয়াছি। রামপ্রসাদের গানও এই কৃষ্ণ-কালীর উল্লেখ আছে ॥৪০

ইহার অপর পিঠ দেখিতে পাই শাক্ত পদাবলীতে। সেখানে
কৃষ্ণ-কালী বিষয়ে কবিগুয়লা লালু নন্দালের বিস্তৃত বর্ণনা
'প্রাচীন কবিগুয়লাস গান' (শ্রীপ্রফুল্লকুমার পাল সংকলিত) গ্রন্থের
৪২—৪৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ্য।

সমন্বয় দেখা দিয়াছে শুধুমাত্র জনপ্রিয় কবিদের মারফতে নয়, সেই
সমন্বয়ের গভীর রূপ দেখা দিয়াছে সাধক রামপ্রসাদের সত্যাহুত্বের
মধ্যে। রামপ্রসাদের অধাঙ্ক অমুভূতির মধ্যে তিনি লাভ
করিয়াছিলেন যে পরমজ্যোতিঃ ও পরম-আনন্দ তাহার মধ্যে
শ্রাম ও শ্রামার তিনি কোথাও কোন ভেদ দেখিতে পান নাই।
তাই তিনি অতি সহজ ভাবেই গাহিতে পারিলেন—

কালী হলি মা রাসবিহারী

নটবর-বেশে বৃন্দাবনে।

... ..

নিজ-তমু আখা গুণবতী রাধা, আপনি পুষ্ক, আপনি নারী।

ছিল বিবসন কাটি, এবে পীতখটি এলোচুল চূড়া বসীধারী।

সাধকের নিকটে রূপ ত কেবল ভিতরে কতগুলি ভাব উদ্ভূত
করিয়া লইবার জন্ত এবং লীলায় আশ্বাসন করিবার জন্ত।

৩৯। দ্বাদশখি দ্বারের পাঁচালী।

৪০। কালবরণ ভ্রমের জীবন, অজ্ঞানতার মন উদাসী।

হলেন বনমালী কৃষ্ণ-কালী, বাঁশী তাজে করে অসি ॥

রামপ্রসাদ! প্রথমে কালকে অবলম্বন করিয়াই নিজের ভিতরকার ভাবগুলিকে উপেক্ষা করবার চেষ্টা করিয়াছেন,—আমাদের যে একই সময়ে অসি-মুণ্ড-বন-ভয়ে লীলা চলিয়াছে তাহাই আশ্বাদ করবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া যে এক পরমসত্যের কালীরূপে লীলা—সীতারই কৃষ্ণ-লীলা কোনও সময়ে আশ্বাদন করিতে সাধকের কিছুই বাধা নাই। তাই লীলা-বৈচিত্র্য-প্রয়াসী রামপ্রসাদেরই গানে দেখি—

বশোনা নাচাত গো মা ব'লে নীলমণি,

সে বেশ লুকালে কোথা করালবন্দা ?

গভীর অধ্যাত্মভূতির সাহিত্য সরল কবিপ্রাণ যুক্ত হইয়া রামপ্রসাদের গানে যে সত্য প্রতিভাত হইল তাহারই প্রতিধ্বনি দেখিতে পাই অগাধ কবিশৃংখর মধ্যেও। সাধক কমলাকান্তও কালকে 'পরম কারণ' বলিয়াই অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। এই 'পরম কারণ' নাক্ষত্র-রূপে প্রকাশিত হইতে যেমন বাধা নাই, তেমনি পুরুষরূপে প্রকাশিত হইতেও কোন বাধা নাই।

জান না কি মন, পরম কারণ, কালী কেবল মেয়ে নয়।

মেয়ের বরণ করিয়ে ধারণ, কখন কখন পুরুষ হয়।

হ'য়ে এসোকেশী, করে ল'য়ে অসি, দম্ভজ-তনয়ে করে সভয়।

ক'হু ব্রজপুত্র অসি, বাজাইয়ে বাঁশী, ব্রজাঙ্গনার মন হরিয়ে লয়। ৪১

এ সম্বন্ধে আত্মচরিত্রের একটি গান দেখিতে পাই নবাই ময়রার। ইহাও কবি মরমিয়া সহস্রপদ্যদের দলের। হৃদয়ের যে মন্দিরে অসি-মুণ্ডধারিণী কালীমায়ের প্রতিষ্ঠা সেই মন্দিরে একই পরম সত্যের কৃষ্ণরূপের মধুর-লীলা-আশ্বাদন করিবার অভিসাস।—

হৃদয় রাসমন্দিরে দাঁড়াও মা হিতভঙ্গ হয়ে ;

একবার হ'য়ে বাঁকা, দেখা দেখা,

জীবাগারে বামে ল'য়ে।

নর কণ কটি বেড়া, খুলে পর মা পীতধড়া,

মাথায় দে মা মোহনচুড়া, চরণে চরণ থুয়ে।

৪১ শা. প. (ক. বি.) ; তুলনীয়—

অভেদে ভাব বে মন কালী আর কালী।

মোহন মুরলীধারী চতুর্ভুজা মুণ্ডমালা।

কালী কি কালী বলিলে, কালে ছোঁর না কোন কালে,

কালের কদী কালী সেই, কালী আমার মা কালী।।

রামলাল দাস দত্ত, ঐ।

তাজি নর-শিরমালা, পির গলে-বলমালা,

একবার কালী ছেড়ে হও মা কালী,

ওগো ও পাঁচপের মেয়ে।

হুং-কমলে কাল শশী, আমি দেখতে ভালবাসি,

একবার তাজে অসি ধর মা বাঁশী,

ভক্তবাঞ্ছা পুরাইয়ে ॥ (৪২)

একটু প্রাধান্য করিলেই বোঝা যাইবে, শাক্ত পদাবলীতে এই জাতীয় গান কোনও তরঙ্গ প্রভাবজনিত নয়; এখানে প্রভাব একেবারেই কিছু নাই এমন কথা বলিতে পারি না; তবে প্রভাব অপেক্ষা এখানে অনুভূতির ব্যাপকতাকেও মর্যাদা দিতে হইবে। বৈক্য সাহিত্যের প্রত্যক্ষ প্রভাবও শাক্ত সাহিত্যে কিছু কিছু পড়ে নাই এমন কথা বলিতে পারি না। গোবিন্দ আধিকারীর রচিত রাধা কৃষ্ণকে লইয়া শুক-সারীর দ্বন্দ্ব একটি প্রসিদ্ধ গান। (৪৩) ইহারই অনুকরণে পরিত্রাজক কৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের একটি 'নন্দী জয়া দ্বন্দ্ব' দেখিতে পাই হর-গৌরীকে লইয়া।

নন্দী বলে, আমার শত্ৰু যেন রক্তভগিরি,

জয়া বলে, গোবী আমার স্তবর্ণ বল্লরী,

রূপে জগৎ আলো।

নন্দী বলে, আমার প্রভুর শিরে বাস ফণী,

জয়া বলে, মা'র নূপুরে ফণীর মাথার মণি,

শোভা বলব কত!

নন্দী বলে, আমার শিবের ভদ্র গায়ে মাথা,

জয়া বলে, পাবে ব'লে আমার মাস্তুরে দেখা,

ভোলা তাই উদাসী।

নন্দী বলে, শোভা পঞ্চ বদনমণ্ডলে,

জয়া বলে, তুর্গা নামের গুণ গাইবে বলে,

পাগল পঞ্চানন। ইত্যাদি। ৪৪

৪২। শ. প. (ক. বি.)

৪৩। শুক বলে, আমার কৃষ্ণ মদনমোহন।

সারী বলে, আমার রাধা বামে যতক্ষণ,

নৈলে শুধুই মদন।

শুক বলে, আমার কৃষ্ণ গিরি ধরেছিল।

সারী বলে, আমার রাধা শক্তি সঞ্চারিল,

নৈলে পারবে কেন? ইত্যাদি।

৪৪। শ. প. (ক. বি.)।



মিঃ লোমেন হত্যার নায়ক বিনয় বসু

শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ

ঐ যে নিরীহ-শান্ত গো-বেচারী ধরনের ছেলে, ঢাকা মেডিকেল স্কুলের ছাত্র, কোন দলাদলিতে যাকে কোন দিন দেখা যায় নাই—সেই বিনয় বসু যে বিপ্লব যুগের প্রলয়-বহিরূপে কোন দিন প্রকাশ পাইবে তাহা মিঃ লোমেন হত্যার পূর্বে কেহ কি বিশ্বাস করিতে পারিয়াছে? সত্যি এটা একটা অভাবনীয় ও অচিন্তনীয় ঘটনা।

ঢাকা নগরীতে (বর্তমানে পূর্ব-পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত) আমাদের বাসার নিকটে একটি ছাত্রাবাসে থাকিয়া বিনয় বসু ঢাকা মেডিকেল স্কুলে পড়িত। সে খুব স্নান্য বাণী বাজাইত, উঠাই যেন ছিল তার একমাত্র আনন্দ। আনাদের বাসা হইতে উঠাদের ছাত্রাবাসটি দেখা যাইত। ঐ ছাত্রাবাসের ছাদে বসিয়া উঠাকে কত দিনই না বাণী বাজাইতে দেখিয়াছি। বহুকাল পূর্বের ঘটনা হইলেও সমস্ত বাগাবাটা আজও চোখের সামনে স্পষ্ট ভাসিতেছে। মনে হয় উঠা যেন অজকার ঘটনা।

আজ ভারত স্বাধীন হইয়াছে—এই স্বাধীনতা লাভ করিতে কত তরুণই না তাদের অমূল্য জীবন অকালে মৃত্যুর যুগান্তে আহুতি দিয়া অমর্য লাভ করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

বহুকালব্যাপী পরাধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করিয়া ভারত আজ স্বাধীনতার আলোকে উজ্জ্বল এবং মুক্তির আনন্দে উচ্ছল।

যাঁরা স্বাধীনতার সার্থক রূপ দেখিবার পূর্বেই অবিরাম সংগ্রাম করিয়া চিরবিদায় লইয়াছেন তাঁহাদের উদ্দেশ্যে জানাই সম্রাট রুহুজতা। স্মরণ করি তাঁদের—যাঁরা শক্তি দিয়া সাহস লিয়া কর্মের সাধনা দিয়া উগাঁড়নের অভাবনীয় দুঃখ-কষ্ট সহ করিয়া অকুণ্ঠ চিন্তে সকল পার্থিব স্তব্ধ ত্যাগ করিয়া প্রত্যেকের জীবন এক একখানি ইতিহাস রচনা করিয়া গিয়াছেন।

আজ স্মরণ করি তাঁদের, যাঁরা দেশকে—‘মা’ মনে করিয়া পরাধীনতার অবমাননা হইতে তাঁকে উদ্ধার করিতে হাসিমুখে নিজদের অমূল্য জীবন বিসর্জন দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন নাই। কবির ভাষায়—‘জীবন-মৃত্যু পায়ের জুতা চিত্ত ভাবনা ইন।’ এই সকল বরণ্য ও চিরস্মরণীয় বিপ্লবী—ও স্বাধীনতার অগ্রদূতরূপে যাঁরা প্রণম্য—বিনয় বসু যে তাঁহাদের অগ্রতম ইহা কে না স্বীকার করিবে?

তাঁদের চিন্তাধারার সাথে, তাঁদের হিংসাত্মক কাজের আদর্শের সাথে আমাদের বিন্দুমাত্র মিল না থাকিলেও তাঁদের জীবনব্যাপী কর্মের সাধনা, শাসকদের দুঃখ-কষ্টের নিষ্ঠুর অত্যাচার সহ করা ও দেশমাতৃকার পদতলে জীবন বিসর্জনের চরম ত্যাগকে চিরকাল কৃতজ্ঞ-চিন্তে স্মরণ করিয়া নিজেরাই ধন্য হইব। তাঁরা যে ভারতের স্বাধীনতার পথপ্রদর্শক।

আজ আমি পাঠকদের নিকটে মিঃ লোমেন হত্যার কাহিনী ও সেই সাথে উঠার নায়ক বিনয় বসুর কথা বাহা নিজ চোখে দেখিয়াছি—বলিব। বিনয় বসুর নাম কোন বাঙ্গালী না জানেন? যিনি জানেন না, তাঁহাকে বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দিতে বড়োভয়ী সন্দেহ হয়।

১৯৩০ সনে জুলাই মাসে এই ঘটনা ঢাকার মটিকোর্ড হাসপাতালে প্রাতে অনুমান দশ ঘটিকায় ঘটে।

মিঃ লোমেন ছিলেন সেই সময়ে পুলিশের হর্তা কর্তা বিধাতা অর্থাৎ I. G. P. এবং মিঃ হডসন ছিলেন ঢাকার পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্ট। হিন্দুর প্রতি বিশেষতঃ ছাত্রদের ও মেডিকেল স্কুলের ছাত্রদের প্রতি—তাঁহাদের অক্রয় ও অযথা অত্যাচারের জন্য সকল হিন্দু অধিবাসীর নিকটে কুখ্যাত ছিলেন।

ঢাকা নগরীতে ও উঠার সংলগ্ন ও অন্তর্ভুক্ত গ্রামগুলিতে ঐ সময়ে প্রবল বেগে অসহযোগ আন্দোলন চলিতেছিল এবং সেই আন্দোলনে কত দ্বৈ-পুরুষই না সোগদান করিয়া হাসিমুখে অজস্র অত্যাচার ও দুঃখ-কষ্ট সহ করিয়াছেন। তাঁহাদের সংখ্যা যেমন গণনাভীত—তাঁহাদের দুঃখ-কষ্টের কাহিনীও ভেদনি বর্ণনাভীত।

ঐ অসহযোগ আন্দোলনের ফলে মদের দোকান, আবগারী দোকানগুলিতে সর্বদা পিকেটি চলিত। সেজ্ঞা সরকারের আয়ের পথে যথেষ্ট বিঘ্ন সৃষ্টি হইত। সেই সাথে প্রাণশঃ তরতালের জন্য ঢাকার পুলিশ প্রভুবা খরচ চঞ্চল ও বিব্রত হইয়া উঠিয়াছিল। এই সকল কাজের জন্য তাঁহারা ছাত্রদের—বিশেষতঃ মেডিকেল স্কুলের ছাত্রদের দায়ী করিত। ফলে প্রায়ই নিষ্পাপ ও নিরীহ ছাত্ররা অকাণ্ণে নির্দুঃ ভাবে প্রহৃত হইত। গভীর রাত্রিতেই তাঁহাদের এই পৈশাচিক কার্য চলিত। অনেক রাত্রিতে এই সকল ছাত্রের করুণ কান্না শুনসাতি।

আমার দৃঢ়বিশ্বাস—এইরূপ অত্যাচারের ফলে অনেক নিরীহ ছাত্র অবশেষে বিপ্লবীর খাতায় নাম লিখাইয়াছে। প্রতিশোধ-স্পৃহায় এই সকল তরুণ যুবক যে চক্ষু হইতে ইতা আর আশংকা কি? এইবার সেই মূল ঘটনায় যাই। ১৯৩০ সনের ১লা জুলাই প্রাতে অনুমান দশ ঘটিকায় মিঃ লোমেন ও মিঃ হডসন এক সাথে হাসপাতালে তাঁহাদের এক বন্ধুকে দেখিতে আসেন—বন্ধুটি River S. P.—তিনি পূর্কদিন লাটসাহেবের বাড়ীতে হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়েন ও তাঁহাকে হাসপাতালে চিকিৎসার্থ পাঠান হয়।

সেই দিন হাসপাতাল ও রাস্তাঘাট পূর্ব হইতেই পুলিশে ভরা ছিল। কারণ সেই দিন প্রাতে দাড়ে দশ ঘটিকায় তদানীন্তন লাটসাহেবের পক্ষ হইয়া তাঁহার কন্ডার হাসপাতাল পরিদর্শনের কথা। মিঃ লোমেন ও মিঃ হডসন উভয়ের হাতেই প্রকাণ্ড পিস্তল ছিল। তাঁহারা, তাঁদের পূর্কোক্ত বন্ধুকে দেখিয়া হাসপাতালে ডাক্তার সাহেবের সাথে ঠাঁড়াইয়া কথা বলিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে বিনয় বসু ও তাঁহার এক সাথী যাহার নাম বা কোন পরিচয় আজ পর্যন্ত জানা যায় নাই এবং সে কি ভাবে যে বহু পুলিশের দৃষ্টি এড়াইয়া পলাইবাব স্বঃযোগ পাইল, তাহাও আজ পর্যন্ত অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে। ইহাৎ মিঃ লোমেনদের নিকটে আসিয়া ঠাঁড়াইল। বিনয় বসু উঠাদের প্রায় ১০ হাত দূরে আসিয়া মিঃ লোমেনকে সম্বোধন করিয়া বলিল “ওড মর্নিং মিঃ লোমেন!” মিঃ লোমেন ও মিঃ হডসন যেই ফিরিয়া ঠাঁড়াইলেন অমনি বিনয় বসু তার হাতে থাকা রিভলবার দ্বারা মিঃ লোমেনকে উপহুপরি গুলী করিল ও

বিনয় বস্তুর সন্ধানটিও সাথে সাথে মিঃ হডসনকে গুলী করিয়া পিঙ্কলসহ পলাইল।

মিঃ লোমেন ও মিঃ হডসন উভয়ের হাতের পিঙ্কল হাতেই রহিয়া গেল। ব্যবহারের সুযোগ হওয়ার পূর্বেই আততায়ীদের গুলীতে বিদ্ধ হইয়া উভয়েই রক্তাক্ত দেহে হাসপাতালের সিঁড়িতে পড়িয়া গেলেন। হাসপাতালে ভীষণ গোলযোগের সৃষ্টি হইল। ঐ সুযোগে বিনয় বস্তুর সন্ধানটি যে কোন পথে পলাইয়া গেল কেহই সঠিক বলিতে পারে না।

বিনয় বস্তুর হাতের রিভলবার ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল ও পারের চিটী জুতা সেখানে রাখিয়া তার মেসের দিকে সদর রাস্তা দিয়া দৌড়াইয়া চলিল। হাসপাতাল হইতে তার মেস অমুহূর্তেই হাজার হাত হইবে। রাস্তায় লোকে লোকারণ্য এবং কেবল চাঁকর শুনিতেছি “পাকড়াও”—“পাকড়াও”। এত লোকের ভিতর দিয়া নিরীক্সে বিনয় বস্তুর তাহার মেসে চলিয়া গেল। এত লোকের মধ্যে কেন যে কেহই তাহাকে ধরিতে সাহসী হইল না ভাবিলে সভ্যই আশ্চর্য হইতে হয়।

এই ঘটনার প্রায় পনের-কুড়ি মিনিট পরে বিনয় বস্তুর তার মেস হইতে একটি সাইকেলে নিশ্চিন্ত মনে পলাইয়া গেল। তখন রাস্তাঘাটে অসংখ্য লোক দাঁড়াইয়া এ দৃশ্য দেখিতেছিল,—কিন্তু কেহই বিনয় বস্তুর ধরবার চেষ্টা পর্যন্ত করিল না।

প্রায় আশ ঘণ্টা পরে অল্প পুলিশের দল হাসপাতাল ও নিকটবর্তী রাস্তা-ঘাট ছাইয়া ফেলিল ও গতানুগতিক ভাবে তাদের কার্যক্ষমতা দেখাইতে ক্রটি করিল না। যেখানে যাহাকে পাঠিতেছে খানাতল্লাসী করিয়া যতখানি সম্ভব বিরক্ত করিতে ক্রটি করিল না। বহু নিরপরাধ যুবক তাদের কোপবৃত্তিতে পড়িয়া জেলখানায় প্রেরিত হইল। পুলিশ বাহিনী বিনয় বস্তুর ধরিতে পারিল না :— তবে তাহার পরিত্যক্ত রিভলবার ও চিটীজুতা লইয়া সজ্জ হইল।

অনেকেই হয়ত জানেন যে, এই ঘটনার কিছুকাল পরে বিনয় বস্তুর কলিকাতায় অগ্নি একটি বিপ্লবী ঘটনায় মাঝা যায়।

অল্প পুলিশের চোখে ধূলি দিয়া বিনয় বস্তুর কবে কি ভাবে ঢাকা ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় গিয়াছিল তাহা আজ পর্যন্ত জানা যায় নাই—কোন দিন যে জানা যাইবে তাহারও কোন সম্ভাবনা দেখি না। যাহা হউক, মিঃ লোমেন আহত হইয়া অজ্ঞান অবস্থায় কয়েক ঘণ্টা বাঁচিয়া ছিলেন—পরে মারা মান। তাঁহার জ্ঞান আর ফিরিয়া আসে নাই।

মিঃ হডসন মৃত্যুর দুয়ার হইতে ফিরিয়া আসিলেন। যদিও তিনি প্রাণে রক্ষা পাইলেন কিন্তু তাঁহার চরিত্রের আমূল পরিবর্তন হইল। তিনি অকালে অতি বৃদ্ধ হইয়া পড়েন। আচার-ব্যবহারেও পরবর্তী কালে তিনি খুবই সংযত হইয়াছিলেন।

কলিকাতায় বিনয় বস্তুর জীবন বিসর্জন দেওয়ার পূর্বে মুহূর্ত পর্যন্ত ঢাকার উচ্চপদস্থ পুলিশ বাহিনীর ধারণা ছিল যে, বিনয় বস্তুর ঢাকাতেই আছে, ঢাকাতেই ধরা পড়িবে এবং ঢাকাতেই বিচারে কানুন মঞ্চে বুলিবে এবং পুলিশ বাহিনীর জয়-জয়কার হইবে। কিন্তু তাহা যেই সেই আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে।

যে রিভলবার দ্বারা বিনয় বস্তুর মিঃ লোমেনকে হত্যা করে উহার একটা ইতিহাস আছে। সেই ইতিহাস উদ্ধারের কৃতিত্ব রায় সাহেব

জিতেন্দ্র ধর, সি-আই-ডি বিভাগের পুলিশ ইন্সপেক্টর মহাশয়ের। গত দুই মনে পড়ে, এই ঘটনার তৎক্ষণে তার তাঁকে দেখা হইয়াছিল।

মিঃ হাচিন্স নামে একটি খাস বিলাতী সাহেবের পাক হাতে সোনা রপা জহরতের খুব বড় দোকান ছিল। দোকান ও আশ্রয়কার জন্য তিনি এই রিভলবারটি লগুন হইতে ক্রয় করেন। মিঃ হাচিন্স ও মিঃ লোমেনের মধ্যে যথেষ্ট বন্ধুত্ব ছিল। ১৯১১ সনের শেষভাগে মিঃ হাচিন্স কিছুদিনের জন্য দার্জিলিংএ বেড়াইতে যান এবং তিনি যে হোটেলে জায়গা নেন, মিঃ লোমেনও সরকারী কাজে সেই স্থানে গাই নেন। দার্জিলিংএ এ রিভলবারটি লগুন হইতে মিঃ হাচিন্সের নামে ভিঃ পিঃতে আসে। ঐ রিভলবারটি দেখিতে খুবই স্নায় ছিল। উহা দেখিয়া মিঃ লোমেন পারহাস করিয়া বলেন যে, এমন একটি রিভলবার যদি কেহ আমাকে উপহার দিত, তাহা হইলে আমি নিজেকে মোগল বাদশা মনে করিতাম আর উপহারদাতাকে এক শত একটা মোগল বাদশাহী-মোহর উপহার দিতাম। তখন মিঃ হাচিন্স হাসিয়া উত্তর দিলেন যে, তুমি যখন পুলিশের Inspector General হইবে, তখন এটি তোমাকে উপহার দিব। ইহা মিঃ হাচিন্সের মুখে নিজে শুনিয়াছি।

মিঃ লোমেন তখন তরুণ যুবক এবং Asst. Police Suptd. রূপে সরকারী কাজে নিযুক্ত ছিলেন। কে জানিত যে সেই রিভলবারই মৃত্যুর দূতরূপে মিঃ লোমেনের প্রতীক্ষার ছিল।

মিঃ হাচিন্সের অলঙ্কারের দোকানের সিঁদুক হইতে ১৯১৪ সনের ২৬ শে সেপ্টেম্বর ঐ রিভলবারটি চুরি যায়। সম্বন্ধে ও একান্ত সাবধানে রক্ষিত রিভলবারটি বিনয় বস্তুর হাতে কবে ও কি ভাবে আসিল তাহা আজ পর্যন্ত প্রকাশ পায় নাই।

বিপ্লবীদের কাহিনী ও বিপ্লবের পূর্ণ ইতিহাস যদি কখনও কোন ঐতিহাসিক অসীম পরিশ্রমের দায়িত্ব লইয়া রচনায় প্রবৃত্ত হন, এই কাহিনী হয়ত তাঁহাদের আরও কাজের সহায়ক হইতে পারে।

১৯১৪ সনের চুরি যাওয়া রিভলবারটি, যেটি দেখিয়া মিঃ লোমেন এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তাহাই পুনঃ ১৯৩০ সনে তাহার নিকটে আত্মপ্রকাশ করিল। কিন্তু সে ইতিহাস আনন্দের নয়—বেদনার করুণ-কাহিনী।

মিঃ হাচিন্স এই ঘটনায় খুবই ব্যথিত হইয়াছিলেন এবং তার চুরি যাওয়া রিভলবারটি দেখিয়া যখন বলিলেন যে আমি মিঃ লোমেনকে পরিহাস করিয়া বলিয়াছিলাম যে তুমি যখন Inspector General of Police হইবে তখন, এটি তোমাকে উপহার দিব। বোধ হয় আমার পূর্বে প্রতিক্রিয়া রক্ষার জন্যই রিভলবারটি এ ভাবে দেখা দিল। এই প্রকাশ চিরকাল আমাকে আঘাত দিবে। এই ভাবে দেখা না দিয়া যদি চিরকাল রিভলবারটি অপ্রকাশ থাকিত তাহা হইলেই আমি সব চেয়ে বেশী খুশী হইতাম। এই কথাগুলি বলবার সময়ে লক্ষ্য করিলাম যে তাঁর চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে।

এইরূপ হত্যার পূর্বে রিভলবারটি অগ্নি কোন ঘটনায় লিপ্ত ছিল কি না তাহা জানা যায় নাই।

জীবনরক্ষার জন্য যেটির প্রয়োজন মনে হইয়াছে তাহাই কি না মৃত্যুর বাহনরূপে নিষ্ঠুর ঘটনার এই ভাবে দেখা দিল।

ইহাকেই বলে নির্যতি। অদৃষ্টের নির্যম পরিহাস !!

জীবন গীতা

শ্রীগৌতম সেন

[গীতাকে আমরা ধর্ম-গ্রন্থ ব'লেই জানি। নিত্য পাঠ করি, পূজা করি। কিন্তু এর ভেতরে কি আছে—তা অনেকেই জানি না। আমাদের জীবনের প্রত্যেকটি কাজে জড়িয়ে আছে এই গীতা। নিয়মিত আচরণ করলে জীবনকে সুষ্ঠুভাবে রক্ষা করা যায়—এ প্রত্যক্ষ সত্য। তাই এর নাম দিয়েছি জীবন-গীতা। গীতার ভাষ্য করেছেন অনেকেই। তা আরও দুর্বোধ্য। আমি নতুন কিছুই লিখিনি। তাঁদেরই কথা ভেঙে ভেঙে সাধারণকে বোঝাবার জন্তে সহজ ক'রে বলেছি মাত্র।—লেখক]

কুরুক্ষেত্রের সূচনা

তাহ রাজা ধৃতরাষ্ট্র পরাভব অনিবার্য জেনেও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ বন্ধ করতে পারলেন না। স্নেহাঙ্ক পিতা, পুত্র দুর্ধোধনের দুর্বিনীত ব্যবহার অসহায়ের মতো সহ্য করছেন। জ্ঞাতি বন্ধু আত্মীয়-স্বজন সকলেই চান তাঁর অপরাধের শাস্তি হোক, শাস্তি আসেও তার বজ্র-কঠিন হাত নিয়ে এগিয়ে, কিন্তু দুর্ধোধনের যুদ্ধের দিকে চেয়ে সে লৌহ-কঠিন হাত শিথিল হয়ে যায়। পিতামহ ভীষ্ম, অর্চ্য দ্রোণ, মহামতি বিদুর সকলেই দেন উপদেশ। কিন্তু সকল উপদেশকে অগ্রাহ্য ক'রে মদমত্ত দুর্ধোধন পাণ্ডবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন।

মহাশ্রমণী ধৃতরাষ্ট্রের কাছে এ যুদ্ধের পরিণাম অজ্ঞাত নয়, কিন্তু তাঁর চেতনাকে আচ্ছন্ন ক'রে আছে তাঁর সর্বনাশা পুরস্কে। পুত্র দুর্ধোধন এই দুর্বলতার সুযোগকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে কাজে লাগালেন। কৌশলে পাণ্ডবদের রাজ্যচ্যুত ক'রেও রাজ্য দুর্ধোধন নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না—গোপন বড়রত্নে তাঁদের বধের ব্যবস্থাও করলেন। সম্মুখে একটি পরিবারকে তার অস্তিত্বের দিক দিয়েই শুধু নয়, তার ঐতিহ্য, তার যশঃখ্যাতি প্রভাব-প্রতিপত্তি—এক কথায়, জগৎ-ইতিহাসের পাতা থেকে পাণ্ডবের নাম মুছে ফেলে দেবার সংকল্প নিয়ে রাজা দুর্ধোধন কূট রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন।

পুত্রবৎসল রাজা ধৃতরাষ্ট্রের কাছে পুত্রের কীর্তি ও অকীর্তি যখন সমান উপভোগ্য হয়ে উঠেছে তখন গান্ধারী এলেন আবেদন নিয়ে—পুত্রকে ত্যাগ করবার আবেদন নিয়ে। রাজাকে তিনি ভিরঙ্কার করেন, কটুশ্রুতি করেন—পাপ-পুণ্যের কথা বলেন, ধৃতরাষ্ট্র বিচলিত হন, শাসন করবার প্রতিশ্রুতিও দেন, কিন্তু ঐন্দ্রজালিক দুর্ধোধন তাঁর বাকচাতুর্যে ধৃতরাষ্ট্রকে বার বার সম্বোধিত করেন।

এমনি সম্বোধিত হয়েছিলেন তিনি যখন তাঁকেই সম্মুখে রেখে রাজকুলবধু দ্রৌপদীকে তার লাঞ্ছিত করলো! সত্যীর সেই কল্পণ কণ্ঠের আবেদন তিনিও স্বকর্ণে শুনেছিলেন। তাঁর দৃষ্টিশক্তি ছিল না, কিন্তু শ্রবণশক্তি তিনি হারান নি। তিনি স্বকর্ণে শুনেছিলেন, স্বয়ং ভগবানের আশাসবানী। যে-আশাসবানী পাণ্ডবদের সমুদ্বুদ্ধ করেছিল। গান্ধারী বললেন, এত বড় পাপ সইবে না মহারাজ।

মহারাজ বললেন, ধর্মই তাকে শাসন করবে, যে-ধর্মকে সে লঙ্ঘন করেছে।

কিন্তু মহারাজ পাণ্ডী-পুত্র বিধাতারও তাজ্য।

তাইতো তাকে ত্যাগ করতে পারি না মহারাগিণি, আমি যে তার একমাত্র।

গান্ধারী বললেন, আপনি তো শুধু পিতা ন'ন—আপনি যে অগ্নিকৃত অমুগতের রাজা।

আমাকে শুধু পিতা হয়ে থাকতে দাও মহারাগিণি!

গান্ধারী তখন অশ্রুপূর্ণ লোচনে বললেন, হায় অন্ধরাজা, দুর্ভাগ্য আমার, তোমাকেও আজ উপদেশ দিতে হচ্ছে! নইলে একথা আজ কেন তুলে গেলে মহারাজ, দেহের একটি অঙ্গে পচ, ধরলে সে-অঙ্গ ত্যাগ করাই ধর্ম?

কিন্তু দুর্বল পিতা, নিরুপায় পিতা অসহায়ের মতো সেই পচা-অঙ্গকেই মমতা দিয়ে আঁকড়ে ধরলেন।

বনবাসের পর পাণ্ডবদের কিরে আসবার সময় যখন আগন্ন হয়েছিল, তখন এলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বাজ্ঞা-প্রত্যর্পণের প্রস্তাব নিয়ে। দুর্ধোধন সে-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, তারা রাজ্য চায় না, চায় শাসন করবার একখণ্ড ভূমি। দান্তিক দুর্ধোধন জানালেন, বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র প্রমাণ ভূমিও তিনি দেবেন না।

এই ঘোষণায় সকলেই বিচলিত হলেন। ধৃতরাষ্ট্র ভিরঙ্কার করলেন, ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য সকলেই এই পাপযুদ্ধ থেকে বিরম্ব হতে বললেন। কিন্তু দুর্ধোধনের পদক্ষেপে তখন ধরণী কম্পিত হচ্ছে। বললেন, যুদ্ধ করতে ভয় পেয়ে থাকেন—বরষ হয়েছিল অবসর গ্রহণ করুন।

ভগবান কিরে গেলেন শূন্যহাতে। অন্তঃপুরে বসে গান্ধারী প্রত্যক্ষ করলেন, আগামী-কালের কুরুক্ষেত্র-প্রাঙ্গণ।

অর্জুনের প্রথম প্রদ্ব

যুদ্ধ-আয়োজন সম্পূর্ণ ক'রে অর্জুন যখন ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, তখন তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বললেন, এত যে আয়োজন, এ কার জন্তে? আর কেনই বা এ আয়োজন? তুচ্ছ রাজ্য সে আমাকে কি দেবে?

যুদ্ধ দেবে জগৎকে শান্তি। পাণ্ডীর উচ্ছেদ হবে। মাহুবেয় কল্যাণে এই যুদ্ধের প্রয়োজন আছে বহু। যুদ্ধ যেখানে আত্মহতু, সেখানে সে পাপ। তুমি বাবে হৃষ্টতের বিনাশের জন্তে—ধর্ম করবে অধর্মকে আঘাত।

অর্জুন বললেন, কোনটা ধর্ম, কোনটা অধর্ম সে তুমিই জানো কৃষ্ণ, কিন্তু আমি জানি, যুদ্ধ ইত্যারই ভিন্ন নাম।

কৃষ্ণ হাসলেন। বললেন, এ তত্ত্ব আমি তোমাকে পরে বলবো। কিন্তু তুমি ক্ষত্রিয়, জগতে কোনো ক্ষত্রিয় যুদ্ধকে পরিহার করবার জন্তে যুক্তি-জাল বিস্তার করে না। কৌরব আজ তোমাকে যুদ্ধ আহ্বান করেছে—তুমি ক্ষত্রিয়, তুমি তোমার স্বধর্ম পালন করো।

যুদ্ধের বদলে যুদ্ধই কি ভবিষ্যতের একমাত্র স্বপ্ন নাকি ?

তোমার ধর্ম আর ভ্রাতৃত্বের ধর্ম এক নয় অর্জুন !

বেশ বেশ কৃষ্ণ, অর্জুন হাসতে হাসতে বললেন, আমি কিছু জানি না, তুমি যা করবে তাই করবো। এ-যুদ্ধে আমি হবো রথী, তুমি হবে সারথি।

নিজেকে এমন সমর্পণ যদি করতে পারো অর্জুন, জয় আমি তোমাকে এনে দেবো।

অর্জুনের অস্ত্রত্যাগ

পাণ্ডব এর কৌরব। ধর্মের সঙ্গে অধর্মের সংঘাত ! আত্মীয়ের মতো জড়িয়ে আছে দানবের সঙ্গে দেবতা। পাণ্ডবের সঙ্গে পুণ্য। 'সম্ভবামি যুগে যুগে' ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন, এই অধর্মকে নাশ করতে আমিই এসেছি বারে বারে, হে পার্থ, তাইতো আমার প্রয়োজন তোমাকে।

অর্জুন যুদ্ধসজ্জায় সাজ্জত হয়ে এসে দাঁড়ালেন শত্রু-সৈন্যের হুখোয়ুগি। বললেন, শত্রু কে ? এরা যে আমার আত্মীয়, কার সঙ্গে করবো অস্ত্রাঘাত ? সে-অস্ত্র যে আমারই বুক ফিরে এসে লাগবে ! কে শত্রু, কে মিত্র জানি না—আমি দেখছি, ওঁদেরই মধ্যে যেছেন আমার পিতামহ, আমার পিতৃব্য, আমার আচার্য—ওঁদেরই মধ্যে রয়েছে আমার বংশের ধারা পুত্র-পৌত্রাদি—আমার সখা, বন্ধু আত্মার আত্মীয়—হে কেশব, খামাও তোমার সর্বনাশা যুদ্ধ, আমার শরীর অবসন্ন হয়ে আসছে। তুচ্ছ রাজ্য, তুচ্ছ বশা খাতি। আর কার জগ্গেই বা এ-সব ? কে ভোগ করবে সে-সম্পদ ? আমার বলতে যারা, তাদের বিনাশ ক'রে কি পরম-ঐশ্বর্য ভোগ করবো আমি ? আর যুদ্ধ যদি করতেই হয়, তবে বলো কৃষ্ণ, আমিই সে-মৃত্যু বরণ কার। নইলে সজ্ঞানে আমি আমার স্বজন-অঙ্গে কখনো অস্ত্রাঘাত করতে পারবো না।

যুদ্ধে স্বজন-নিধন সম্ভাবনা দেখে অর্জুন অস্ত্রত্যাগ করলেন। কৃষ্ণ বললেন, কার জন্তে তোমার এ শোক ? জগতে কেউ কি মরে ? মরে না। তোমার আমার মতো ওরাও—যারা এই কুরুক্ষেত্র প্রান্তরে সমবেত হয়েছে, তারা কেউই মরবে না। আমরা সকলেই ছিলাম, আছি এবং থাকবো—থাকবো জীবন-ধ্বংসের পরেও। 'বাসাসি জাণানি যথা বিহায়' জীর্ণ বস্ত্রের মতো দেহকে পরিভ্রাণ ক'রে আমরা অনন্তকাল বেঁচে থাকবো।

‘এক কাপড়ে ক’দিন চলে ?

তেমনি দেহ জীর্ণ হলে

গোটা ছেড়ে নুতন দেহ পরি।’

তবে হুঃখ কিসের ? হুঃখ ভোগ করে কে ? সে তো আমি ? কিন্তু আমি কে ? ‘আমিই আত্মা। আমিই ভোগ করি, আমিই হুঃখ পাই। কিন্তু এ কোন্ আমি ? আমার দেহটাই কি আমি ? কিন্তু দেহের অমূল্য-শক্তি তো তত্ত্বক্ষণই, যতক্ষণ থাকে দেহে প্রাণ। কিন্তু যখন প্রাণ থাকে না, তখন ভোগ করে কে ? দেহ, না দেহাভীত আর কিছু ? বসে, অপমান গারে এসে লাগে। মিছে কথা। গারে লাগে না। গারে লাগলে দেহের বিকৃতি হ’তো। দেহের কোনো পরিবর্তনই হয় না, তবু হুঃখ পাই। তবে এ-হুঃখ পায় কে ? যে পায়, সে দেহ নয়—সে স্বতন্ত্র। সেই আমি।

দেহ নয়, দেহাভীত অস্ত্রা। আত্মাকে গোচর দেখা যায় না। চোখে কি সব কিছু দেখা যায় ? কিছু দেখা যায়, কিছু অদৃশ্য ক’রে নিতে হয়। এই যে ইন্দ্রিয়গোচর নয়, অথচ স্বপ্ন-হুঃখের ভোগকর্তা—সেই আত্মা।

আত্মা সকলেরই আছে। তোমারও আছে, আমারও আছে—পৃথিবীর সকল প্রাণীর মধ্যেই আছে। ভিন্ন আধার বলে আত্মা ভিন্ন নয়। একই আত্মা ভিন্ন ভিন্ন আধারকে আশ্রয় ক’রে আছে মাত্র। যেমন আকাশ আছে সকল পাত্রে। পাত্র ভেঙে গেলে, সেই একই আকাশ—খণ্ড আকাশ, বৃহৎ আকাশে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। আত্মাও সেই খণ্ড থেকে বৃহত্তে জগদাত্মায় এসে মিশছে। এই জগদাত্মাই হলো পরমাত্মা। আকাশের যেমন বিনাশ নেই, এই পরমাত্মারও তেমনি ক্ষয় নেই।

ক্ষয় নেই আত্মার, কিন্তু দেহের তো আছে ? অর্জুন এই দেহের কথা চিন্তা ক’রেই চঞ্চল হয়ে উঠলেন : দেহই তো মানুষের সব। দেহই যদি থাকলো না, তবে থাকলো কি ? দরদ তো ঐ দেহকেই নিয়ে। কারণ, দেহ আব তখন দেহ নয়—বিশেষ একজন হয়ে আমার নয়ন-মন অধিকার ক’রে বসে আছে। কত বস্ত্র, কত আদর, কত সাজ-সজ্জা। সেই দেহকে ভোলা কি সহজ কথা ? দেহ তো শুধু তখন পুরাতন বস্ত্র নয়—‘প্রতি অঙ্গ লাগি কাদে প্রতি অঙ্গ মোর।’ এই দেহান্তরে সেই বিশেষ-মানুষটিকে পাচ্ছি কোথায় ? সে তো আর তখন সে নয়। প্রাণ কাদে তো সেই তাইই জগ্গে।

অর্জুনকে বিহ্বল হতে দেখে ভগবান হাসলেন। বললেন, কে কাদে ? কাদে মানুষ। হুঃখ পেলে কাদে। কিন্তু হুঃখ তো তত্ত্বক্ষণ, যতক্ষণ বস্ত্রের সঙ্গে থাকে ইন্দ্রিয়ের যোগ। এই সংযোগ যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণই হুঃখ। বোদে গা পোড়ে—বোদের সঙ্গে গাত্র-চর্মের সংযোগ পর্যন্তই। যেই সংযোগের অভাব হয়, তখন আর সে অমূল্যুতি থাকে না। তবে যা থাকে না, যা অনিত্য ? তাকে সহ্য করাই ভাল। যে-হুঃখ সহ্য করলেই ফুরিয়ে যাবে, তার জন্ত আবার কষ্ট কি ? মৃত্যুকণ্ড তেমনি সহ্য করতে শেখো। তাহলে ভয় আর থাকবে না। দেহ তো অনিত্য। দেহের বদলে দেহ, রূপের বদলে রূপ। এই একই নিয়মে জগতের সকল বস্তুর রূপান্তর হচ্ছে। দেহাব মৃত্যু অবশ্যজ্ঞাবী, কেউ রোধ করতে পারে না। যুদ্ধে হোক, ক্ষয়ে হোক, বোগে শোকে—মৃত্যু তার হবেই। তাই ভগবান বলছেন, তে অর্জুন, মিথ্যা শোক তুমি পরিহার করো। শোক ত্যাগ করে স্বধর্ম পালন করো। স্বধর্ম অর্থাৎ আপন ধর্মের আচরণ করো। কারণ সকলের ধর্ম এক নয়। ভ্রাতৃত্ব ক্ষত্রিয়ের আচরণ করবে না, ক্ষত্রিয়ও করবে না শূদ্রের আচরণ। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম যেমন যুদ্ধ—সে করবে শত্রুকে আঘাত, ভ্রাতৃত্বের ধর্ম তেমনি ক্ষমা, শূদ্রের ধর্ম সেবা। কর্ম যত ধর্ম তত। আপন আপন কর্মই তার ধর্ম। ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম যুদ্ধ হলেও, অকারণ যুদ্ধ সে করে না। শত্রুকে বিনাশ করতে অধর্মকে আঘাত করতে সে করে অস্ত্র-ধারণ। স্বধর্ম হলেও সে করে না অপরকে প্ররোচিত। তবে যুদ্ধ যেখানে অপরিহার্য, সেখানে সে ক্রৌবের মতো নিশ্চেষ্ট থাকে না। যুদ্ধ-সাজে সজ্জিত মহাগাওবী কুরুক্ষেত্র-প্রান্তরে দাঁড়িয়ে যুদ্ধের ভাবী পরিণামকে লক্ষ্য করলেন। মহাবীর মহাশূর্য্যোদয় মহাকালের মহাজিজ্ঞাসা !

অর্জুন বললেন, এ-কুক্ক শেখ কোথায়? এক অর্ককে নাশ করতে সহস্র পাণে পূর্ণ হলো ধরনী। কুল সেলো, কুলধর্ম সেলো, মানুষের সমাজ-বন্ধনে পড়লো এচও আঘাত। মানুষ ভুলে গেলো কোনটা ধর্ম, কোনটা অধর্ম। ভয়হীন, কুঠাহীন, নিরাজ্ঞ ব্যাভিচারে পারিবারিক জীবন ভেঙে গেলো। পাণ আজ আর পাণ নয়—তাই জয় নেয় নিকলুব ধরিত্রীর বুকে লক্ষ লক্ষ জীবজন্তু সন্তান। যুদ্ধের পরিণাম যদি এই হয়, তবে কাজ নেই কুক্ক, আমার সে-যুদ্ধে। অর্জুন ধর্মবীণ ভ্যাগ করে রথের পাশে বসে পড়লেন।

ভগবানের প্রথম উত্তর

অর্জুনকে ধর্মবীণ ভ্যাগ করতে দেখে অগেঙ্কমান শত্রু-সৈন্য মহা উল্লাসে শব্দধ্বনি করতে লাগলো। অর্জুনের ক্রান্তির-রক্ত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, কিন্তু বুদ্ধি তাকে শান্ত করে। যুদ্ধীন্দ্র পত্ত বিচার করতে জানে না, সামান্যতম উদ্বেজনাতেই সে বীণিয়ে পড়তে পারে। কিন্তু মানুষ তা পারে না—সে বুদ্ধির অহংকার রাখে।

অর্জুন বিচার ক'বে দেখতে চান, বুদ্ধির পরিমাপে বাচাই কবে নিতে চান, এ যুদ্ধে কতটুকু তাঁর ক্ষতি আর কি-ই বা তাঁর লাভ। আমি জয় করি, অথবা তারাি আমাকে জয় করুক—এর মধ্যে কোনটি ঐশ্বর্য, বুদ্ধি দিয়ে তা বিচার করতে পারলেন না।

উত্তর দিলেন ভগবান : তুমি কে? তুমিই কি সব করো? এই আমিই অহংকার তোমার সকল বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে আছে। তুমি তোমার কাজ কবে যাও, কর্মের জগ্গেই তুমি এসেছো। কর্মেই তোমার অধিকার—‘কর্মণ্যোবাদিকাবস্তে মা ফলেশু কদাচন’ ফলের দিকে চেও না। এই যে নিরাসক্ত কর্ম, অর্থাৎ সফলতা, নিফলতা বিষয়ে সমান ভাব রাখা সেই তো যোগ। সমতা তো যুদ্ধের কথা নয়, তারক পেতে হয়—অভ্যাস দ্বারা ভয় করতে হয়।

“যোগঃ কুরুকর্মণি সঙ্গং তাত্ত্বা ধনঞ্জয়

সিদ্ধিসিদ্ধ্যাঃ সমোভ্ভাঃ সমম্ যোগ উচ্যতে।”

যোগস্থ হয়ে সঙ্গ তাগ ক'বে কর্ম করতে হবে। যোগ কি? সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমান জ্ঞান। সঙ্গ কি? কর্তৃত্বভিনিবেশ। আমি কর্তা নই, কর্তা তুমি, ভগবান। কর্মযোগের এই হলো বড় কথা। কর্ম তো সবাই করে—পশু-পক্ষী জীবমাত্রই। কিন্তু তারা করে নিজের জন্তে, নিজের বা পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্তে। কিন্তু মানুষের কর্ম-জীবন তাদের উপরে—চেঁটা ক'বে তাকে সকলের উপরে উঠতে হয়েছে। জয়ের পর থেকেই সে খাড়া হয়ে উঠতে চেঁটা করেছে। এই চেঁটার ফলেই হাতকে সে অস্ত্র কাজে লাগিয়েছে—যা অস্ত্র জন্ত-জানোয়ারে পারেনি। দেহের দিক থেকে মানুষ যেমন উদ্বীর্ণের নিজেই টেনে তুলেছে খণ্ডভূমির থেকে বিশ্ব-ভূমির দিকে, নিজের জানা-শোনাকেও তেমনি স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে জৈবিক প্রয়োজন থেকে, ব্যক্তিগত অভিরুচির থেকে। এই যে আপন শ্রেষ্ঠতাকে প্রকাশ করবার জন্তে প্রভুত্ব প্রয়াস, এ একমাত্র মানুষেরই আছে। নিজের মধ্যে যে কলনাকে সকল কালের সকল মানুষের বলে সে অহুভব করেছে তারি দ্বারা সর্বকালের কাছে নিজের পরিচয় দিতে তার কত বল, কত কৌশল। ছবিতে, বৃত্তিতে, ঘরে, ব্যবহারের সামগ্রীতে সে ব্যক্তগত মানুষের খেয়ালকে প্রকাশ করতে চায়নি, বিশ্বগত মানুষের আদিককে স্থায়ীরূপ দেবার জন্তে তার হংসাখ্য সাধনা। এই সাধনার পথেই সে উদ্বীর্ণ হতে উদ্বীর্ণ লোকে

উদ্বীর্ণ গঠা করেছে। কিন্তু ওপরে উঠতে গেলে নীচের ধাপটাকে অব্যাহার করা চলে না—তাকে প্রত্যেকটি ধাপ উত্তীর্ণ হতে হবে, তবেই ওপরে ওঠা যাবে।

ভগবান সেই ওপরে উদ্বীর্ণের কৌশলটিই দেখিয়ে দিলেন। বললেন, কর্ম করো। পশু-পক্ষীর কর্ম নয়, জীব-প্রাণী মানুষের কর্ম। ফললাভের প্রত্যাশার কর্ম নয়, ফল-অফল সমান জ্ঞান রেখে যে কর্ম, সেই কর্ম তোমাকে করতে হবে।

অর্জুন বললেন, কর্ম তো ক্রিয়া। যা করা যায় তাই কর্ম। ভগবান হাসলেন, বললেন—এ যে বললাম, কর্মে অনাসক্তি। কর্ম মানেই স্বধর্ম। তোমার যা ধর্ম সেই অহুয্যায়ী কর্ম করো। পরধর্ম কখনো গ্রহণ করবে না। কর্ম স্বধর্মচরণের বাহ্য হুল ক্রিয়া।

অর্জুন বুঝতে পারলেন না। ভগবান বললেন, কর্মের সঙ্গে মনের মিলন হওয়া চাই। এই মনের সংযোগ হলেই কর্ম তখন বিকর্ম হয়ে যায়। বাইরের কর্ম সাধারণ কর্ম। আর আন্তরিক কর্মই হলো বিশেষ কর্ম। আবার এই বিশেষ কর্ম নিম্ন নিম্ন মানসিক প্রয়োজন অনুসারে তিন্ন তিন্নও হতে পারে। এই বিশেষ কর্মের, এই মানসিক সংগতির সংযোগ-সাধন করলেই নিষ্কামতার জ্যোতি কটবে। কর্মের সঙ্গে আন্তরিক ভাবের যখন মিলন হয় তখন সে আর-কিছু হয়ে যায়।

অর্জুন প্রশ্ন করেন, সে কি রকম?

উত্তরে ভগবান বললেন, তেল-পলিতার সংযোগেই কি আলোর উৎপত্তি হয়? হয় না। আলোর উৎপত্তি হয়, তার সঙ্গে জ্যোতির মিলন হলে। কর্মের সঙ্গে বিকর্মের মিলন হলে তবে না নিষ্কামতা আসে। এই কর্মে বিকর্ম ঢাললে তবেই কর্ম দিব্য হয়। তন্ত্রের সঙ্গে মন্ত্র থাকা চাই। যেমন বাহ্য তন্ত্রের কোনো মূল্য নেই তেমনি কর্মহীন মন্ত্রেরও মূল্য নেই। হাত দিয়ে যেমন, হৃদয় দিয়েও তেমনি সেবা করা চাই। সন্তানের কাছে মায়ের সেবা যেমন। কর্মের সঙ্গে বিকর্মের সংযোগ হলেই শক্তির ক্ষুণ্ণ হয়। আর তা থেকেই আসে অকর্ম।

সে আবার কি? কাঠ পুড়ে ছাই হয়। প্রথমে কত বড় কাঠ ছিল, কিন্তু পুড়ে নিস্তেজ ছাই হয়ে গেল। যেমন ইচ্ছা ব্যবহার করো। কর্মে বিকর্মের জ্যোতি স্পর্শ হলেই অকর্ম হয়। কোথায় কাঠ, আর কোথায় ছাই! ওদের স্তম্ভধর্ম এখন কোনো সমতাই নেই। কিন্তু সে যে এ কাঠেরই ছাই এতে তো আর ভুল নেই।

তথাপি অর্জুন প্রশ্ন করলেন : কর্মে বিকর্মের সংযোগ হল অকর্ম হয়—এর অর্থ কি?

এর অর্থ হলো—কর্ম যে করছি তা মনেই হয় না—অর্থাৎ কর্মের বোঝা অহুভব হয় না—কর্ম করেও অকর্তা। কর্মকে নির্মল করার জন্তে যখন অবিরাম চেঁটা শুরু হয়, তখন আপনা থেকেই কর্ম নির্মল হতে থাকে। নির্বিকার কর্ম যখন সহজভাবে পর পর হতে থাকে তখন কর্ম কখন যে হয়ে গিয়েছে তা টের পাওয়া যায় না। কর্ম সহজ হয়েছে মানে, কর্ম অকর্ম হয়েছে। ছেলে ধাঁটতে শেখে—প্রথমে কত কষ্টই না হয়—পরে সে কর্ম তার সহজ হয়ে যায়। কর্মকে অকর্ম করাই আমাদের লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্তে স্বধর্মচরণরূপ কর্ম করতে হবে। কর্ম করতে করতেই দোষ ধরা পড়বে, তখন বিকর্মের আশ্রয় নিতে হবে। এই চেঁটার ফলে যখন এমন অভ্যস্ত হয়ে যায় যে কর্ম আর তখন কষ্টবোধ থাকে না। হাতে হাজার কর্ম

চলতে থাকে কিন্তু মন থাকে শুদ্ধ, শান্ত। বড় বড় কঠিন অবস্থাও আর তখন কঠিন মনে হয় না।

অজুঁন তবু বুঝতে পারেন না, বলেন, কর্ম বিকর্ম অকর্মের কথা ভাল করে বলো। ভগবান বললেন, কর্ম বিকর্ম অকর্ম মিলে সকল সাধনা পূর্ণ হয়। কর্ম হলো স্থূল বস্তু। যে স্বধর্ম-কর্ম আমরা করি তাতে আমাদের মনের সহযোগ থাকা চাই। কর্ম ও বিকর্ম দুইই দরকার। এই দুইয়ের আচরণ করতে করতে অকর্মের ক্রমিক প্রকৃত হয়। এই কর্মে সহায়তার জন্তেই বিকর্ম নিয়ন্ত্রণ দরকার। অর্থাৎ কর্ম মানেই হলো স্বধর্মের আচরণ করা। স্বধর্ম কি? স্বধর্ম—নিজের ধর্ম। চাষী যে, চাষই তার ধর্ম। অস্ত্র ধর্মের আচরণ তার বিকর্ম কর্ম। এই স্বধর্মচরণের বাহ্য কর্ম চলতে থাকা কালে তার সহায়তার জন্তে মানসিক যে কর্ম করা হয় তাই বিকর্ম। এই কর্ম ও বিকর্ম এক হয়ে যখন চিত্ত পূর্ণ-শুদ্ধ হয়—সকল ময়লা ধূসে যায়, বাসনা ক্ষীণ হয়, বিকার শান্ত হয়, ভেদ-ভাৱ মিটে যায়—সেই অবস্থাকেই তখন অকর্ম বলা হয়। এই অকর্ম হ'রকমেই করা যায়। এক, দিন-রাত কাজ করেও কিছুমাত্র কাজ করছি না এরূপ বোধ—আমি কিছু না করেও অগা্যত কর্ম করা।

সে আবার কি রকম? অজুঁন বললেন।

যেমন সূর্যের কর্ম। সূর্যের আলো—দানই হ'লো তার সহজ-ধর্ম। তার আলো দেওয়াটাই হলো স্বাভাবিক। আলো যে সে দিচ্ছে—সে নিজেও জানে না। তার অস্তিত্বই আলো। আলো-দেওয়া-রূপ-ক্রিয়ার কষ্ট তার নেই। তাইতো চন্দ্রিণ ঘটা কর্ম করেও সূর্য লেশমাত্র কর্ম করে না। সাধুদের অবস্থাও তাই। সূর্যের আলোক দানের মতোই তাঁদের কর্ম স্বাভাবিক। সে কর্ম করেও করে না—এ হলো সন্ন্যাসের একটুক, আবার অপনূতিক হলো—সে নিজে কোনো কর্মই করে না, অথচ সারা বিশ্বে কর্মে প্রবৃত্ত করছে। অকর্মের বিশেষত্বই হলো এই। তাতে অনন্ত কর্মের উপযোগী শক্তি ভরা থাকে। যেমন বাস্প—অনন্ত শক্তি রয়েছে তার মধ্যে। না-বল্যও ক্রোধের এক রূপ। তাতেও কর্ম হয়। কর্ম না-করার পরিণাম, প্রত্যক্ষ-কর্ম-করার পরিণাম থেকে অনেক বেশী প্রচণ্ড হয়ে থাকে। ঐ অ-বল্য যে কাজ হয়, সহস্র বলাতেও সে-কাজ হয় না। পিতার উপস্থিতিই পুত্রের শাস্তির পক্ষে যথেষ্ট। জানী পুরুষের তাই হয়। তার অকর্ম, তার শান্ত ভাব প্রচণ্ড কর্ম করে থাকে। অকর্মী থেকেও সে এত কর্ম করে যা নানা ক্রিয়া চাৱাও করা যায় না।

ভগবান বললেন, কামনাশূন্য হয়ে কাজ করলে কলও আনন্দ হয় না, আবার ক্ষতিতেও হয় না দুঃখ। সুখ-দুঃখের সমামুভূতিই সমস্ত জ্ঞান। ধীরে আস্তা সমভাবাপন্ন তিনি দুঃখভোগ করেন বটে, কিন্তু যুগা করেন না—দুঃখকে তিনি গ্রহণ করেন, কিন্তু তাতে উল্লসিত হোন না। জয়, মৃত্যু, দুঃখ, যন্ত্রণা থেকে পালিয়ে যাওয়া কাপুরুষতা। ওদের স্বীকার করতে হবে, ওদের উপেক্ষা করে জয় করতে হবে। অভ্যাগ করলেই মানুষ তা পারে। অভ্যাসই তো যোগ। অভ্যাসে মানুষ কাম-ক্রোধকেও জয় করতে পারে। এর নাম তিষ্ঠিকা—সহ করবার সংকল্প ও শক্তি।

অজুঁন বললেন, সবকিছু সহ করবার জন্তেই যদি মানুষ এসে

থাকে এই পৃথিবীতে, তবে কি প্রয়োজন ছিলো এই সৃষ্টি? জগতে ভোগের সহস্র উপকরণ সম্মুখে রেখে মানুষ ভোগ করবে না এই বা কি কথা! তাই যদি, তবে ভগবান ভোগের স্পৃহা দিলেন কেন? কামনাই বা দিলেন কেন? পিপাসার্তের মুখের কাছে জল রেখে তাকে বঞ্চিত করারই বা কি অর্থ?

ভগবান বললেন, ও-কথার অর্থ তা নয়। ভোগে আনন্দ আছে, কিন্তু দুঃখও তো আছে। ভোগের শেষ নেই—যত দেবে, তত থাকবে। এই দেওয়ার ইচ্ছাকেই তোমার সংযত করতে বলা হয়েছে। তার মানে, কামনা ও ইন্দ্রিয়াদি থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়া। দুঃখে কাতর হলেই মানুষ দুঃখ পায়। কিন্তু দুঃখ থাকে স্পর্শ করে না, তার দুঃখ কোথায়? দুঃখকে তো সে জয় করেছে। আবার সুখে যার স্পৃহা, সেও দুঃখী, স্পৃহাই হলো পাপ। ভয়, ক্রোধ অমুবাগ—অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বস্তুতে অমুবাগ, এও দুঃখের কারণ। সুখ স্পৃহা-শূন্য ব্যক্তিরই পারে সুখকে ভোগ করতে।

অজুঁন বললেন, কিন্তু এ কামনা ত্যাগ করা কি সহজ কথা? দশ ইন্দ্রিয় দশ দিক থেকে বাধা দিচ্ছে। ভগবান উত্তর দিলেন : ঐ ইন্দ্রিয়কেই তো জয় করতে হবে—ইন্দ্রিয়-সংযমই হলো জীবন-বেদের প্রথম কথা।

মন মুখ এক করো। মনই তো হলো যত নষ্টের গোড়া। ভোগ গেলেও মন থাকে। মনের বাসনা কিছুতেই যেতে চায় না। তাই ভগবান বলছেন, কচ্ছপের মতো নিজেকে গুটিয়ে নিতে শেখো, তাহলে দুঃখ থাকবে না। শান্ত করে ঘোড়াব লাগান ধরে থাকো—দুই ঘোড়াকে বশে রাখতে হলে, রাশ টেনে রাখা চাই। যে সকল বিষয়ে রাশ টানতে জানে, সে দুঃখ পায় না। তাই বলে মানুষের কি বিপু থাকবে না? বিপু আছে, তার প্রয়োজনও আছে। কিন্তু খেতে হবে বলে কেউ অতি ভোজন করে না। তার দুঃখ আছেই। এখানেই আসছে সংযমের কথা। এই সংযমের মধ্যেই আছে আনন্দ। যিনি বিধেয়ান্না অর্থাৎ ভিত্তিস্থি, তিনি রাগদেববিযুক্ত ইন্দ্রিয়ের উপভোগে আনন্দলাভ করেন।

রাগদেববিযুক্তৈস্ত বিবরানিহিতৈশ্চরণ

আত্মবৈরাগ্যবিধেয়ান্না প্রসাদমবিগচ্ছতি।

রাগদেববিযুক্ত-ইন্দ্রিয়, অর্থাৎ যার ইন্দ্রিয়-আচরণে অমুবাগও নেই, বিধেয়ও নেই।

অজুঁন হেসে বললেন, সে আবার কি কথা? ভগবান বললেন, কেমন জানো? যোগী বা দেহ মনে যে অন্তর তার কি ভোগে রুচি থাকে? ভোগে রুচি সূক্ষ্ম মানুষের, তার বিধেয় নেই। আসক্তি তো আসে বিষয়ের চিন্তা থেকেই। আবার আসক্তি থাকলেই মনে কামনা জাগে। সে কামনার আর শেষ নেই। তখন না পেলে মানুষ রাগ করে। এই রাগ থেকেই অনর্থের সৃষ্টি। সেই জন্তেই ভগবান উপদেশ দিলেন, রাগ এবং দেব বঞ্চিত হয়ে ভোগ করো, চিন্তের প্রসন্নতা আসবে। চিন্তের প্রসন্নতাই বুদ্ধিকে স্থির করে। যার সমস্ত নেই তার বিবেক নেই, ভক্তিও নেই। ভক্তি থাকলেই শান্তি, আর শান্তি থাকলেই সুখ। 'অপূর্বমানমচল প্রতীচ' কত নদীর জল এসে পড়ছে সাগরে, সমুদ্র কিন্তু সে জলে উল্লসিত হয় না। সে স্থির, অচঞ্চল—সে সকলের জলকে আত্মস্থ করে স্থির। কামনাকেও করতে হবে অমনি করে আত্মস্থ। [ক্রমশঃ।



ভেরা ফিগনার

অমল সেন

ভেরা ফিগনার রুগ-বিপ্লবের একজন নায়িকা।

অত্যাচারিত কৃষিয়ার বৃকে নিহিলিষ্ট সংঘের তখন মহ-অভ্যুত্থান। এই সংঘের সভা সংখ্যা স্ত্রী-পুরুষে মিলে চল্লিশের বেশী ছিল না, কিন্তু এদেরই আত্মকে সমগ্র কৃষিগা কঁপে টাটকে। সংঘ যখন প্রথম গ'ড়ে ওঠে তখন সংঘের সভা সংখ্যা ছিল মাত্র আট, কিন্তু তবুও তারা মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এই সংঘকে বাঁচিয়ে রেখেছিল।

ভেরা ফিগনার এই দুঃশাসনদেবী একজন। আমাদের দেশের মতো শাস্ত্রশিষ্ট লক্ষ্মীমন্ত মেয়েদের সংখ্যা কোনো দেশেই কম নয়। এইসব লক্ষ্মীমন্ত মেয়েরা শাস্ত্রশিষ্ট জীবন যাপন করে, গুরুজনদের উপদেশ পালন করে, ঘর-গৃহস্থালী কাজ শৃংখলার সাথে সুন্দর পরিপাটিক্রমে সম্পন্ন করে আত্মীয়-বন্ধন পাড়া-প্রতিবেশীর কাছে সর্বদা প্রশংসা কুড়িয়ে বেড়ায়—এরা হ'ল এক টাইপের মেয়ে।

কিন্তু ভেরা হ'ল নতুন টাইপের মেয়ে। তার পণ হ'ল—অজ্ঞায় অত্যাচার আর অবিচার সইবো না, কাকুর 'পরে অজ্ঞায় অত্যাচার আর অবিচার করবো না। যখনই দেখবো কাকুর উপরে অজ্ঞায় অত্যাচার আর অবিচার হচ্ছে বৃক দিয়ে তাকে রক্ষা করবো।

এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে গিয়েই ভেরার প্রথম চোখে পড়লো তার দুঃখিনী জননী জম্মভূমি কৃষিগা এই অত্যাচারে জর্জরিত। তার প্রথম পণ হল এই অজ্ঞায় অত্যাচারের হাত থেকে, এই পরাধীনতা থেকে দেশকে মুক্তি দিতে হবে। এই প্রতিজ্ঞাই ভেরাকে বিপ্লবের পথে ঠেলে দিল।

খুব অল্প বয়সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে ভেরা ফিগনার নিহিলিষ্টদের দলে যোগ দিল।

কিন্তু বিপ্লবের পথে পা বাড়াবার আগে ভেরার মনও সশয়ে দোল খেতো, দ্বিধামুক্ত হৃদয়ে সে ভাবতো—এই গুপ্তহত্যা—মামুষকে অতর্কিতে খুন করা—এ কি বড় সহজ?

না!

এ অত্যন্ত অস্বাভাবিক, অত্যন্ত কল্পণ—যে খুন করে এমনি ভাবে, তারও মনে বেদনা লাগে অজ্ঞাতে। এ নির্ধর কার্য ইচ্ছে করে কেউ করে না, করা উচিতও নয়। কিন্তু তবু কেন করতে হয় এ কাজ? কে দায়ী এর জন্য?

ভেরা ভেবে দেখলো, দায়ী কৃষসরকার। অজ্ঞায় অত্যাচারে অহিংস হয়ে উঠে মামুষ বিচার চাইতে গেছে বারে বারে। শেষেছে কি? চকুগুণ অজ্ঞায়, চতুর্গুণ অত্যাচার।

কত্যাচারে অত্যাচারে কঠিন, হস্ত অসাড়! সমগ্র কৃষিয়ার

সাধারণ মামুষের এই অস্বস্ত বেদনা ভেরা ফিগনার আপনার অন্তর দিয়ে অনুভব করলো।

জারকে হত্যার চেষ্টা করার অপরাধে দণ্ড পড়ত ভেরার এক বন্ধুর কীসী হল!

ভেরা খবরটা শুনে অত্যন্ত চকমক হয়ে উঠলো। কীসী? কেন? জারকে সে খুন করেনি! এম চাইতে কম শাস্তি দিলে চলতো না কি? কিন্তু রুগ-সরকার তা দেয় না। তারা কথার কথায় কীসী দেয়, কথায় কথায় গুলী চালায়, মামুষের প্রাণের কোন দায় নেই যেন!

কৃষ সরকার অর্থক হত্যা করবে দলে দলে মামুষ—তা হবে আইন! আর যে-আইনী ভাবে হত্যাকারী সেই জলাশয়ের—যারা গুলী চালাবার জন্য দায়ী—তাদের হত্যা করা হবে—অপরাধ?

কেন?

কেন না, কৃষ-সরকার যা করবে তা-ই আইন।

ভেরার মন থেকে গুপ্তহত্যার প্রতি যে একটা জীবন ঘূর্ণা ছিল, তা ধীরে ধীরে চলে গেল।

কৃষ-সরকার বলবান—খোলাখুলি হত্যা করেছে—শক্ত সহস্র। তারা তো খোলাখুলি পায়ে না, কাজেই গুপ্তভাবে যে ক-জনকে শারে। এই দৃঢ় সংকল্প হ'ল ভেরার।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে শিক্ষায়ত্নীর কাজ নিয়ে এক গ্রামে বাস করছিল ভেরা আর তার বোন।

পুলিশ এসেছিল গ্রামে—বিপ্লবীদের উপর বোর সন্দেহ। এ গ্রাম আর মোটেই নিরাপদ নয়—একুনি চলে যেতে হবে—বিদায়ের আয়োজন শুরু হল। গ্রামবাসী ছেলে-বুড়ো স্ত্রী-পুরুষ সবাই তো কেঁদে আকুল। প্রথম প্রিয়জনকে কে যেন তাদের বৃক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। যেতে দিতে ইচ্ছা নাহি, তবু হার যেতে দিতে হয়।

সেই স্থল। ছেলে-মেয়ে, সকল ছাত্রছাত্রীর মুখ আজ আবার জলভরা মেয়ের মতো। আজ শেষ পাঠ!

ভেরার বোন ইভজিনিয়া পড়ানো সাগ করে বললো, আয়বো যাচ্ছি, বিদায়—আর কিছু সে বলতে পারলো না, কণ্ঠকন্ড।

কোথায় বাচ্ছ দিদিমণি?

অনেক দূরে।

আর আসবে না?

তা কি করে বলবো ভাত?

কেন বাচ্ছ?

এ প্রশ্নের কী উত্তর দেবে? সেই স্বপ্নের স্বপ্ন হতে তারা

বেরে পড়লো গ্রামবাসীদের অগ্র-অর্থের স্মৃতি বহন করে। রাজধানী পৌছোয়াতে এসে পৌছালো ভেরা ফিগনার আর তার বোন ইভজিনিয়া।

নির্দিষ্ট দিনে কঁাসি হ'ল ভেরার বন্ধুর, কঁাসীর মঞ্চে জীবনের জয়গান গেয়ে গেলেন তিনি।

ভেরাকে সে আশাত সইতে হ'ল। অন্ডায় ঘনিষ্ঠাব তাকে ক্রমাগত চিন্তিত করে তুললো। এ ভাব-তত্ত্বের ধ্বংস করা চাই।

এব কিছুদিন পরে ভেরোনিজে একটা সভা হ'ল বিপ্লবীদের। ভেরা ফিগনার এই সভায় অগ্নি-গর্ভ ভ্রাসায় প্রচাব ক'রলো, বিপ্লবীদের এখন সবচেয়ে বড় কাজ হবে জ্বরকে হত্যা করা। যেমন ক'রে তাকে জ্বরকে হত্যা করার আয়োজন করুন আপনারা।

অনেকেই এ প্রস্তাবে সম্মতি দিল। আয়োজন চললো। ডিনামাইটের ভার প'ড়লো ফিবালশিশ উপর।

ফিবালশিশ জেল-ফরম ১৮৭৮ সালে ছাড়া পেয়েছে। সেই থেকে বাড়ীতে ব'সে গোপনে ডিনামাইট তৈরি ক'রে আসছে। প্রচুর ডিনামাইট জমা—

জার কিমিয়া গেছে। তার ফেরাব পথে বাঁটিতে বাঁটিতে বোমা নিয়ে গুঁতে পেতে থাকি চাই।

জার ফিরছে কীঞ্জগিপট, কাজেই কটপট তৈরি হওয়া চাই বোমা-নিষ্ক্ষেপ-কারীদের।

কিন্তু তৈরি হওয়া কোন লক্ষণই দেখা গেল না। বিপ্লবীদের মধ্যে তখন উপদল সৃষ্টি হ'য়েছে। একদল—তারা বলে, জ্বরের উপর বোমা ছাড়া বজ্র এখনও তারা প্রস্তুত হয়নি।

গরম দল তাতে ক্ষেপে গেল। ফলে, হ'লাগ হয়ে গেল বিপ্লবীরা।

“মৃত্যুঞ্জয়ী দল”—এবা বলে, একটু দেবী করো।

“প্রজাব দাবী” দল—এবা চায়, একুশি জ্বরকে নিপাত ক'রবো। এদের সংগঠনও ছিল ভালো। ভেরা ফিগনার এই গরম দলের সভা হ'ল।

এই দলই হ'ল শক্তিশালী—এরা প্রজাব দাবী প্রতিষ্ঠা করার মহান ব্রত নিয়ে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'ল।

রুশিয়ার প্রায় প্রত্যেকটি প্রধান প্রধান স্থানে এর শাখা-সমিতি গঠিত হ'ল—সকল সমিতিগুলির কক্ষ এক স্থানে বাধার জন্ত একটি কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হ'ল। শ্রেতৃস্থানীয় যারা, তারাই এই কার্যনির্বাহক সমিতির সভা।

এই কার্যনির্বাহক সমিতিই এই বিপ্লবীদের প্রাণ।

ভেরা ফিগনারের মতো তেজস্বিনী নারী এই কার্যনির্বাহক সমিতিকে আরো শক্তিশালী ক'রে তুললো।

এবার বোমা নিষ্ক্ষেপের আয়োজন শুরু হ'ল।

ক্লম সহ্যট জার যে যে পথ দিয়ে ফিরতে পারেন সেই সেই পথের পাশে তিন জায়গায় বোমা নিয়ে ট্রেনের অপেক্ষার ব'সে থাকতে হবে—

গুডেসা—থার্কভ—মস্কো।

লোক ঠিক ক'বা হ'ল—কারা বাবে, কোন্‌ ছলে, কি চাকুরী নিয়ে বাবে!

ভেরা এটা স্থির ধরে নিয়েছিল, জ্বরকে হত্যা করার উদ্দেশ্য

সঞ্চারে তার আগ্রহই যখন সবচেয়ে বেশী তখন তাকে এ তিনের এক জায়গার পাঠানো হবেই।

কার্যকালে দেখা গেল, তার নাম নেই কোথাও।

বেশ একটু উচ্চ হ'য়ে লোক-নির্বাচনকারী কমিশনারদের কাছে গিয়ে ব'ললে—আমার নাম দেন নি কেন?

দ্বিইনি, যোগ্যতার লোক পেয়েছি ব'লে।

আমাকে আপনারা অযোগ্য মনে ক'রলেন কিসে?

অযোগ্য মনে করিনি। ও ছাড়া আরো অনেক কাজ আছে এখানে, বা আপনি ব্যতীত কেউ আর ক'রতে পারবে না।

আমি সে সব কথা শুনে চাই না। আপনারা জানেন, জ্বরের হত্যার জন্ত আমিই প্রধানতঃ আপনারাদের উত্তেজিত ক'রে তুলেছি, কাজেই আমার একটা নৈতিক দায়িত্ব আছে এ কাজে। আমার নাম ভ'রে দিন।

গুডেসায় বোমা নিয়ে যাওয়ার ভার প'ড়লো ভেরার উপর।

ভেরা যাত্রার উজোগ ক'রতে লাগলো। কাজের বদলি দিয়ে যেতে হবে। বোন জিনিয়া গরমের ছুটিতে রিডাজান গিয়েছিল সম্প্রতি ফিরে এসেছে। ভেরা তাকে ঠিক ক'রল।

ভেরা গুডেসায় চ'লে গেল।

সেখানে গিয়ে দেখে, ফিবালশিশ হাজির। একথানা ঘর ভাড়া করা হ'ল। কী ক'রে বোমা ফাটানো হবে তারই নানা রকম পরীক্ষা চলতে লাগলো সেই ঘরে। ফিবালশিশ দেখাতে লাগলো, কি ভাবে বিদ্যুতের তার যোগ ক'রে দূর থেকে বোমা ফাটানো হবে।

বিপ্লবীরা সবাই কায়দাটা শিখে নিল—ফোলংকা, কলোদফিল্ল, নেবেডেভা।

এখন সমস্তা—রেললাইনের তলায় গর্ভ খুঁড়ে বোমাগুলি বসানো। বহু আসোচনার পর ঠিক হ'ল, রেলের গার্ডের চাকুরী জোগার ক'রে ফেলতে হবে।

ফোলংকা গার্ড হ'য়ে ঢুকবে—গার্ডের কামরা সাধারণতঃ নির্দিষ্ট স্থানেই থাকে, কাজেই বোমা বসানো সহজ হবে খুবই। আর, তাকে যাতে কেউ কোন সন্দেহ না করে, সেজন্ত নেবেডেভাকে তার বউর পার্ট ক'রতে হবে।

চমৎকার প্লান!

কিন্তু চাকুরী জোগার করে কে? প্লান তো দিয়েছে ভেরা ফিগনার।

ভেরা ব'ললো, চাকুরীও আমিই জোগার ক'রে দিচ্ছি।

ভেরা রেলগেয়ে অফিসে গেল।

কোন রেল-গার্ডের পদ খালি নেই।

তাই তো—আচ্ছা, দেখা যাক।

গুডেসায় শাসনকর্তা কাউন্ট টট্লেবেনের ভারী জামাই ব্যারণ সেনবার্গ ভেরার পরিচিত। তার সংগে দেখা। ভেরার কর্মদর্শন ক'রে সে ব'ললো, আপনি এখানে? এমন বেশে?

ভেরা গভীর হ'য়ে ব'ললো, হ্যাঁ, ভারি বিপদে প'ড়ে এসেছি।

কি বিপদ বলুন তো!

ভেরা বললো, আমার একটি বন্ধুর পত্নী ক্ষয়রোগে ভুগছে—তার খোলা জায়গায় থাকা দরকার, তা যদি হয় তবে তাঁর বাঁচবার কিছু আশা থাকে। জে আর পাচ্ছি কই? যদি একটা রেলের গার্ডের

চাকুরী ছুটতো—হ্যাঁ, 'ভালো কথা, আপনার তো খুব প্রভাব-প্রভিঞ্চি আছে রেলওয়েতে। আপনি পারেন না সাহায্য করতে ?

ব্যারণ বললেন, ও চাকুরী তো আমার হাতে নয়, সেকশন মাস্টারের হাতে। আর ও সব পদ খালি আছে বলেও মনে হয় না।

ভেরা বললো, 'তা হ'লে অল্পগ্রহ ক'রে সেকশন মাস্টারের কাছে এক লাইন লিখে দেবেন কি ?

ব্যারণ নেহাৎ চক্ষুসজ্জার খাতিরে লিখে দিয়ে 'তাড়াতাড়ি চ'লে গেলেন।

ভেরা একটু হাসলো মনে মনে।

অভিজাত বংশের মেয়ে ভেরা—তার পোষাক হবে ঝলমলে—হাবভাব হবে বাগীর মতো, তা না হ'লে নোঙরা পোষাক পরে সে পথে পথে চাকুরী খুঁজে বেড়াচ্ছে—এই ভেবেই ব্যারণের মাথা হেঁট হচ্ছিল 'তা বুঝতে বাকী রইলো না তার।

আজ্ঞা, ময়ূরের মতো পেখন ধ'রে পথচলা বহুদিন হয় ছেড়েছে সে, 'পলিসি', হিসাবে আবার আজ সাজতে হবে তাকে।

ব্যারণ এ পোষাক দেখে লক্ষিত হয়েছেন সেকশন মাস্টারও নিশ্চয় কথা কইবেন না। সব মাটি হবে তা হ'লে, অন্তঃপ্রবেশ—বে দেবতা হাতে ভোলো।

ভেরা পোষাক বদলে ফেললো। স্বভাবতই সে সুন্দরী! আজ যেন সে দৌলখ্য-সাগরে বান্ ডেকেছে।

বেচার সেকশন মাস্টার ভাতে ভেসে গেল কিনা জানি না, তবে প্রার্থিত চাকুরীর নিয়োগ পত্র লিখে দিতে মোটেই ইতস্তত ক'রলো না।

ভেরা নিয়োগ-পত্র নিয়ে ছুটে এলো। ঘরের সবাই অবাক।

এক বিশ্ববিমোহিনী মৃতি ভেরার! ভেরা ময়ূরের পেখন খুলে ফেলে ফ্রোলংকোকে নিয়োগ-পত্র দিল। শিমেইন এটো ছদ্মনাম নিয়ে সে কর্মস্থানে চ'লে গেল, লেভেডভাও তার সংগে গেল।

মেইন ট্রেন থেকে সাত-আট মাইল দূরে সে স্থান। বোমা এক কঁাকে নিয়ে গিয়ে পু'ত্ততে হবে। সব ঠিক—

এমন সময় গোল্ডেনবার্গ ওডেসায় গিয়ে হাজির।

খবর কি ?

বোমা চাই—মস্কো লাইনের জন্ত যথেষ্ট বোমা নেই।

সে কি ! বোমা দিলে এখানকার কাজ কি ক'রে হবে ?

জোর গুজব এ লাইন দিয়ে জার ফিরবেন না।

ভেরা খবর শুনে হুঃখিত হ'ল। এতো উত্তোষ আরোজন সব বৃথা ?

গোল্ডেনবার্গ চ'লে গেলো বোমা নিয়ে, কিন্তু পৌঁছতে পারলো না গন্তব্য স্থানে। পথে ধরা পড়লো।

মটিক খবরও এসে পড়লো, জার ওডেসার পথে আসবেন না। পার্কড আর মস্কো লাইন দিয়ে যাবেন।

কাজেই, ফ্রোলংকো, লেবেডভ—ওরাও চ'লে গেল ওডেসা থেকে। ভেরা র'য়ে গেল সেখানে আরো কিছুদিনের জন্ত।

জার কিরে আসছেন ক্রিমিয়া থেকে হু'খানা গাড়ী, সামনের থানায় তার কর্মচারীবর্গ।

বিভাগ গতিতে ছুটে চ'লেছে গাড়ী।

খার্কভের মধ্যে দিয়ে যাবে—বিপ্লবী দল—ঝিলাবড্, ইয়াকি-মোভা, ওকালংস্কি—বোমা পেতে ওং পেতে আছে।

দূরে ট্রেনের শব্দ শোনা গেল—ঝিলাবড্, ইয়াকিমোভা একদুটো চেয়ে আছে দূরে—

ওকালংস্কি চুপি চুপি হামাডুড়ি দিয়ে ব্যাটারির কাছে এলো—সংগীদকে অগ্নি দিকে নিবন্ধ-চক্ষু দেখে ব্যাটারিটা খুলে তার ভিতরের বন্দোবস্তটা আলগা ও অচল করে আবার যেমনটি ছিল তেমন রেখে দিল। এক মিনিটের কাজ। তার পরেই আবার সংগীদয়ের কাছে এসে দাঁড়ালো।

ইখিনর বাতি দেখা গেল।

ওকালংস্কি বললো, আমি সিগনাল দিচ্ছি—তোমরা ব্যাটারিতে তার সংযোগ কর।

সংগীদ ব্যাটারির কাছে গিয়ে উৎকর্ষ হ'য়ে ব'সে রইলো।

ঘর্ষ রবে ট্রেন এসে প'ড়লো।

ওকালংস্কি সিগনাল দিল। সংগীদ তৎক্ষণাৎ তার সংযুক্ত করলো। কিন্তু নিফল সে সংযোগ—গাড়ী যেন তাদের উপহাস ক'রে চ'লে গেল।

ওকালংস্কি খালী হ'য়ে বললে, তোমরা নেহাৎ অপদার্থ, তারটা যোগ ক'রতে পারল না।

সংগীদ হতাশ হ'য়ে বললো,—তাটো, কিছুকণ আগেও দেখলুম ঠিক আছে, এর মধ্যে ব্যাটারি খারাপ হ'য়ে গেল! আঁ, বলো কি ? ব্যাটারি খারাপ ! ওকালংস্কি আকাশ থেকে প'ড়লো।

লোকটা ওস্তাদ গুপ্তচর ক্রশ-সরকারের।

মস্কো লাইনের কাছেও বোমা নিয়ে বসে আছে একদল বিপ্লবী। এ দলে যিনি সিগনাল, দেবেন, তিনি একজন মহীয়সী নারী—শোফিয়া লুভনা পেরোভস্কায়া, ক্রশিয়ার এক জাঁবরেল শাসনকর্তার মেয়ে। ভেরা ফিগনারের মতই অভিজাত বংশের মেয়ে। পিতা ছিলেন একটি মৃত্তিমস্ত শয়তান, দ্বিতীয় জার! শোফিয়ার মা—দেবীর মতো ছিলেন যিনি—তার উপর অকথ্য অত্যাচার হ'ত। ছোট ছেলে—পিতা তাকে বাধ্য ক'রতো মাকে মাঝে, গাল দিতে।

শোফিয়া সইতে পারলো না এ অগ্নায় অত্যাচার।

সোজাচুক্তি বাপের কাছে গিয়ে বললো, তুমি, এ বাড়ী বাসের অযোগ্য ক'রে তুলেছ। আমি বিদায় নিলুম।

পিতা ভয় দেখালেন, বটে। কোথায় যাবে তুমি ? যেখানে যাবে পুলিশ পাঠিয়ে ধ'রে আনবে না।

পুলিশের ভয় ! কোনোদিনই করেনি শোফিয়া।

গোপনে পিতৃগৃহ ত্যাগ ক'বে সে এসে আশ্রয় নিল সহপাঠিনী কোন বন্ধুর বাড়ী, সেখানে থেকে ডাক্তারি পাশ ক'রে পল্লীসেবার বেরিয়ে পড়লো ঠিক ভেরারই মতন। বিপ্লব মাত্র দীক্ষিত সে বহু আগেই হয়েছিল। সেই ১৯০ বিচারের সেও অন্যতম আসামী।

শোফিয়ার প্রাণ ছিল অত্যন্ত কোমল লোকের হৃৎকণ্ঠ দেখলে কেঁদে ফেলতো। অথচ জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে যখন লড়তো তখন এই নারীই হ'য়ে উঠতো ভীষণ, ভৈরবী, অতি নিষ্ঠুরা—

এর উপর পড়লো সিগনাল দেওয়ার ভাব। রেললাইনের পাশে একখানা ঘর ভাড়া করে বিপ্লবী সূত্রের জ্বরী পার্ট নিয়ে এই দিনটির জন্য তৈরি হচ্ছিল সে। ভাতের গাড়ী কাছে একো শোফা সময়মতো সিগনাল দিল—কিন্তু ব্যাটারির তার যোগ করতে একটু দেরি হয়ে গেল।

প্রথম গাড়ীটা বেরিয়ে গেল দ্বিতীয় গাড়ীটা সশস্ত্র চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ছ'য়ে গেল।

তৃতীয়টাকে জার বেঁচে গেল। প্রাণ গেল তার কর্মচারীদের।

জার মারা না গেলেও এ বোমা-ফাটা বুধা হ'ল না। সমগ্র কিশোরীয়া সত্ত্ব ঘুম ভেঙে জেগে উঠলো যেন, বিপ্লবীদের কেরামতিতে সারা দেশ তোলাপাড় হয়ে উঠলো।

কিন্তু জার তোমাকে মুখ ত'য়ে বাঁচতে হবে না, অন্তত ভীষণতর আয়োজন আগে থেকেই করা হয়েছে।

সম্রাটের শীতাবাস। অনেক কর্মচারী কাজ করে। নানারকম কাজ—দক্ষিণ কাজ, মুচিব কাজ, মিস্ত্রীর কাজ।

ট্রফেন বলে একটা লোক বাজো তৈরী করে। রক্ষীদের সঙ্গে তার গলাগলি ভাব। কেউ দোস্ত, কেউ চাচা।

কাজে আসার সময় ট্রফেন রোজই মোড়কে করে কী নিয়ে আসে—রক্ষার বখান অসতক থাকে, তখন প্রাসাদের ভিত্তির তলায় একটা গহবরে লুকানো একটা বাজো তা ফেলে রাখে।

এরনি করে সে জিনিষটা খানিকটা জ'মলো সেই প্রাসাদের তলায় বাজো।

রক্ষার ঘণাকরেও কিছু জানলো না।

তারপর একদিন—

কিন্তু তার আগে ভেরার বোন ইভ জিনিয়ার খবর বলে নিই। পেরবোজকায়া নাম নিয়ে সে থাকে—তারই সঙ্গে বিপ্লবী বন্ধু ভিয়াংকোভস্কিও থাকেন।

কলেজে থাকতে বোগো নামে একটি মেয়ে ইভ জিনিয়ার কাছে বিপ্লব মত্রে দাঙ্গা নেয়। মেয়েটির প্রশ্না ছিল একজন পুলিশের গুপ্তচর। একদিন বোগোকে এসে পুলিশ গ্রেপ্তার করলো। আদালতে বোগো পেরবোজকায়ার কথা বলে ফেললো।

পুলিশও ঠিক পেরবোজকায়ার অর্থাৎ ইভ জিনিয়ার ঘর ঘেরাও করলো।

ঘরে ঢুকে ইভ জিনিয়াকে প্রথমে বন্দী করলো। তারপর তার যুবক বন্ধুকেও ধরলো।

ভিয়াং টপ করে পকেট থেকে একটুকুরো কাগজ বের করে চিবিয়ে ঘরের এক কোণে ফেলে দিল।

পুলিশ সে কাগজ কুড়িয়ে নিয়ে গেল। একটা বাড়ীর নক্সা—কিন্তু কোন্ বাড়ী? তদন্ত চলতে লাগলো খুব জোর।

সম্রাটের শীতাবাসে। তারপরে একদিন জার সপরিবারে ভোজ-কক্ষ চুকেছেন। হঠাৎ একটা প্রলয় শব্দ। ডিনামাইট।

নীচের ঘরটা নষ্ট হ'ল পকাশজন বডিগার্ডের প্রাণ গেল। ভোজ-কক্ষ দোতালার, কাজেই জার এবারও বেঁচে গেলেন।

যথেষ্ট পরিমাণে ডিনামাইট দিলে সে ঘরটাও নির্ধাৎ উড়ে যেতো। তা হ'ল না। শুধু দেয়ালের ছবি, টেবিলের বাসন-কোষাই কনকন শব্দে পড়ে চূর্ণ হয়ে গেল।

সেই নক্সা।

এবার তার রহস্য ভেদ হ'ল। এই শীতাবাসেরই নক্সা। নক্সার এক জায়গায় একটা X চিহ্ন—সেইখানে ডিনামাইট রাখা হয়—ঠিক ভোজনকক্ষের তলায়।

সুতরাং পেরবোজকায়া আর ভিয়াং নিশ্চয়ই অপরাধী!

ভিয়াংয়ের কীসি হ'ল—

আর ইভ জিনিয়ার সাইবেরিয়ায় নির্বাসন।

ভেরা দূর থেকে শুনলো সবই। তবুও ওডেসা থেকে আসতে পারলো না। সেখানে সে আর একটা কাজ হাতে নিয়েছে।

কাউন্ট টটলেবেন ওডেসার শাসনকর্তা।

শাসন, অর্থাৎ গীড়নকার্যের সুবিধার জন্য একজন "নিরো"কে তিনি আমদানি করেছেন। নাম তার পানুটিন।

পানুটিনই যেন সেখানকার রাজা—তার অত্যাচারে লোক খরহর কম্পমান।

একবার ২৮ জনকে গ্রেপ্তার করে বিপ্লবী বলে বিচার করা হয়, পাঁচজনেরই প্রাণদণ্ড।

এতেও তৃপ্তি নেই পানুটিনের।

যুবকে যতো তেজস্বী লোক ছিল তাদের সকলকে যেটিয়ে গ্রেপ্তার করা হ'ল। শিক্ষক-ছাত্র-গৃহকর-শ্রমিক ও অগ্নিকার্মচারী—কাককে বাদ দিল না। শহরে একটা সংঘ ছিল,—তা বো-আইনী বলে ঘোষণা করে তার প্রায় সব সভ্যকেই গ্রেপ্তার করা হ'ল।

তারপর—বিচার নয়, বিচারের প্রহসন। স্বৈচ্ছান্ত্রের চরম বিকাশ।

সাইবেরিয়ায় নির্বাসন, আজীবন কারাদণ্ড—এ ছাড়া ক'খাট নেই।

দণ্ডিতের আত্মীয়রা এলে এমন হৃদয়হীন পিশাচের মতো ব্যবহার করতে সে।

বাপ-মা ছেলেকে—একমাত্র ছেলেকে দেখতে আসতেন, ভগিনী ভাই-এর সঙ্গে দেখা করতে আসতো, স্ত্রী এসে কেঁদে পড়তো—স্বামিকে দেখবে।

হৃদয়হীন পশু এদের সঙ্গে বা-তা ব্যবহার করতে। গর্ভবতী একটি রমণী এসেছেন স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে। স্বামী শৃংখলাবদ্ধ অমূলক অপরাধে চিরদিনের মতো চ'লেছেন নির্বাসনে চোখে জল কত আশা ছিল, কত রক্তীন্ন স্বপ্ন তরুণী বধূর ফুলের তোড়ার মতো শিশু দেখবেন—জীবনের সকল সাধ অপূর্ণ রেখে চ'লে যেতে হচ্ছে আজ একান্ত অসহায়।

তার চোখের জলে যেন স্পষ্ট হ'য়ে এ কথাগুলি ফুটে উঠলো।

স্ত্রী আর সহ্য করতে পারলো না কেঁদে ফেললো।

পানুটিন মুখ খিঁচিয়ে বললে, কী আশা! বাইরে গিয়ে চোঁচাও বত পারো। তুমি কি এইখানেই ঐ বেজমারটার জয় দিতে চাও না কি?

এই পানুটিনের পরলোকযাত্রার পথ প্রস্তুত করার ভার নিল ভেরা।

দলের একটি যুবকের সঙ্গে মিলে ভেরা পানুটিনের গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখতে লাগলো।

লোকটা রোজই একটা নির্দিষ্ট সময়ে বেড়াতে বেরোয়— একজন রক্ষী সংগেই থাকে, আর একজন পিছনে অনতিদূরে অনুসরণ করতে থাকে।

একজনের উপর তার দেওয়া হ'ল—সে পানিটুকু ছোঁরা মেরে একটা নির্দিষ্ট দিকে ছুটে যাবে, সেখানে একটা ঘোড়া থাকবে তার পলায়নের সাহায্যের জন্ত।

ভেরা সব বন্দোবস্ত এমনি ভাবে যখন ঠিক করেছে, তখন বাধা প'ড়লো।

হেড কোয়ার্টার থেকে শোফিয়া এবং সেবলিন এসে হাজির। খবর পাওয়া গেছে, জার শীত্‌ই ক্রিমিয়ার গ্রীষ্মাধাসে যাচ্ছেন। এই শহর দিয়েই যাওয়ার কথা। রেলওয়ে ষ্টেশন থেকে জাহাজ-ঘাট পর্যন্ত। এর মধ্যে কোথাও একটা বাঁটি পেতে মাইন তৈরি করে রাখা চাই।

মাইন হ'চ্ছে ভূ-প্রোথিত ডিনামাইটের স্তূপ। লোক চক্ষুর অগোচর থাকে,—কাজেই ধ্বংসের সুন্দর অস্ত্র।

সেই রাস্তার পাশে দুটো ঘর ভাড়া করা হ'ল।

মনোহারী দোকান।

দিনে দোকান,—দোকানদার সেবলিন, দোকানদারবী শোফিয়া।

রাত্রে—টানেল খোঁড়া ড্রিল দিয়ে। দোকানের জিনিষপত্র তখন সরিয়ে নেওয়া হ'ত। কাদা-মাটি, ড্রিল ভালো চলে না। দাক্ষণ পরিশ্রম, কেন্দ্র থেকে মাইন-পাতায় ওস্তাদ ইয়াকিমোভ এবং গ্রিগরি এসে যোগ দিয়েছে।

রাত্রে টানেলে খুঁড়ে যা মাটি ওঠে, তা ভোরের বেলায় নানা বকম কার্যনা করে—মোড়কে, ঠাণ্ডায়, পাকেটে ভর্তি করে ভেরার ঘরে এনে জড়ো করা হয়।

এমনি করে বহুদূর পর্যন্ত দীর্ঘ টানেল তৈরি হ'ল।

ডিনামাইট, ঠিক করে সাজাতে গিয়ে গ্রিগরির তিনটে আঙুল উড়ে গেল। খানিকটা ডিনামাইট ফেটেছে। শব্দও কম হ'ল না, তবে কেউ কিছু স্থির করতে পারলো না।

কিন্তু দোকানে আর কিছু জমা করে রাখা সমাচীন নয়। ডিনামাইট, মার্কোরি-ফালমিলেট, তার ইত্যাদি যাবতীয় সরঞ্জাম ভেরা ফিগনার নিজের ঘরে নিয়ে গেল। গ্রিগরি এখন অকর্মণ্য। তবুও দ্রুত কাজ অগ্রসর হ'তে লাগলো। জার মে-মাসে আসবেন। সবাই তাঁর আসার দিনটির অপেক্ষায় উৎকণ্ঠিত হ'য়ে রইলো। কিন্তু শব্দটি এলেন না সে শহরে। তাইতো, এত আয়োজন একেবারেই বৃথা হবে? আচ্ছা, অত্যাচারী শাসনকর্তা টটলেবেনকে মারলে হয় না এ দিয়ে?

কেন্দ্রীয় সমিতির কাছে হুকুম চেয়ে পাঠানো হ'ল।

জবাব এলো, না,—ও-সম্মান জারের জন্তই ছোলা থাক, টটলেবেনকে মারতে চাও অস্ত্র উপায়ে মারো।

অস্ত্র উপায়ের মধ্যে বোমাটাই প্রধান। ভেরা ফিগনার বন্ধুদের নিয়ে আবার লেগে গেল টটলেবেনের পশ্চাদনুসরণে। শত শত যুবকের প্রোতাহা প্রতিহিংসার জন্ত ব্যগ্র। এর রক্তে তাদের তর্পণ করা চাই।

একদিন তাদের ফাঁকি দিয়ে টটলেবেন সে স্থান ত্যাগ করে চলে গেল।

কাজেই পাভ'ভাডি গুটিয়ে ভেরা এবং অস্ত্রাভ বিপ্লব নায়করা পেজেরগাদে চলে এলো।

ভেরা যখন রাজধানীতে গেলো তখন সেখানে আর একটা উত্তম চলেছে জারকে মারার।

গোরস্কডায়া ব'লল একটা রাস্তা দিয়ে জার যাবেন। রাস্তাটার গায়েই একটা পাথরের সেতু। নীচে, জলের তলায় লুকানো থাকবে ডিনামাইট, ডাঙায়, দূর আড়াল থেকে, ব্যাটারির সাহায্যে তা ফাটানো হবে।

জার এ কীদেও ধরা প'ড়লেন না। নির্দিষ্ট দিনের আগের দিনই তিনি ক্রিমিয়ার চলে গেলেন—সে-পথে বেড়াতে এলেন না। জারকে মারার কাজও বাধা হ'য়ে স্থগিত রাখতে হ'ল কিছুদিনের জন্ত।

বিপ্লবীদল আর একটা জরুরী কাজে মন দিল। সৈন্ত-সংগ্রহ এবং সৈন্ত-সংগঠন।

দেশবাসীর যে অসন্তুষ্টি-ভাব তা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছিল। সৈন্ত-বিভাগেও তা প্রবেশ করেছে। অনেক সামরিক কর্মচারীকে বলতে শোনা যেতো,—রুশসৈন্তরা বিদেশের যুক্তি-যুক্ত সাহায্য করার গর্ব করে, কিন্তু তাদের নিজের দেশ যে আজও বন্দনব্রিষ্ট তা তো দেখে না।

নৌ-বিভাগ এবং গোলন্দাজ সৈন্তদের মধ্যেও অসন্তোষকে আরো উসকিয়ে তুললো।

লেকটেনেন্ট সুখানভ নৌ-বিভাগীয় কর্মচারী, ইনিই বোধহয় প্রথম বিপ্লবীদের দলে এসে যোগ দিলেন। এঁরই মধ্য দিয়ে নৌ-বিভাগে প্রচার-কার্য চলতে লাগলো।

গোলন্দাজ বিভাগে—ডগায়েড্‌। ক্রোনষ্টা দুর্গে কাজ করতেন আগে, রাজনৈতিক মতের জন্ত কর্মচ্যুত হ'য়ে বিপ্লবীদলে যোগ দেন।

রোগাচেভ, পখিনোটোভ, পেপিন, নিকোলায়েভ—এরাও যোগ দিলেন ক্রমে ক্রমে। স্থির হল,—সৈন্ত-বিভাগ 'প্রজার দাবী' দলের কার্য-নির্বাহক সমিতির অধীনে থাকবে। সাধারণ বিভাগের সংগে এদের কোন সম্পর্ক থাকবে না। কার্য-নির্বাহক সমিতি যখন হুকুম দেবেন—এখন সশস্ত্র বিদ্রোহের সময় এসেছে, তখন ঝাঁপিয়ে প'ড়বে তারা অস্ত্র নিয়ে।

এ ছাড়া, বিদেশে 'প্রজার দাবী' দলের পক্ষে লোকমত গঠন করার জন্ত প্রচার-কার্যও চলছিল। বহু নির্বাসিত যুবকের উপর এ-ভার জন্ম হল। তাদের মধ্যে হার্টম্যান এবং ল্যাভরভ প্রধান।

সভা-সমিতিতে বক্তৃতা করে, আলোচনা ধারা, বই ছাপিয়ে এবং বিপ্লব-দল সম্বন্ধে সঠিক খবর প্রচার করা হ'ত। হার্টম্যান ফ্রান্স-আমেরিকা-জার্মানী—দুনিয়ার সকল রাষ্ট্রের নায়কদের কাছে উপস্থিত হ'য়েছেন বিপ্লবদলের কার্যপদ্ধতি নিয়ে। সবাই প্রতিশ্রুত হ'য়েছেন, যার যেভাবে যতটুকু শক্তি সাহায্য করবেন।

সমাজতত্ত্ববাদের জন্মদাতা মনীরী কার্ল মার্কস। কার্য-নির্বাহক সমিতি তাঁর কাছে চিঠি দিলেন, যাতে তিনি হার্টম্যানকে সাহায্য করেন প্রচার-কার্যে।

মার্কস অত্যন্ত আনন্দিত হ'লেন। জবাবে তিনি জানানেন, আপনাদের কোন বকম সেবা করতে পারলে আমি নিজেকে গৌরবাচিত মনে করবো।

জবাবের সঙ্গে মার্কস নিজের একখানা ফোটোও পাঠিয়ে দিলেন। মার্কসের এ 'আনন্দ' অকৃত্রিম। রুশবিপ্লবীদের চিত্রখানা তাঁর কাছে মহামূল্য বস্তু—বন্ধুদের তিনি সর্গর্বে সেটা দেখিয়ে বেড়াতেন।

এমনি অক্লান্ত চেষ্টার ফলে রুশের দিকে ছুনিয়ার নজর প'ড়লো। খবরের কাগজ খুলে 'সবাই প্রথমেই দেখতো, রুশের খবর কি ?

তারা যাতে সঠিক খবর পায়, বিপ্লবীদল তারও বন্দোবস্ত ক'রলো। নিয়মিতভাবে বিপ্লব-সমিতি থেকে রিপোর্ট আসতো, আর তাই ছাপা হ'ত খবরের কাগজে। কাজেই রুশবিপ্লবীদল সবক্ষে সবারই বেশ সহায়ত্বের ভাব জন্মালো।

রুশ সরকার তো হার্টম্যানের উপর রেগে অস্থির। দূত পাঠালো ফ্রান্সে—হার্টম্যানকে যাতে রুশ সরকারের হাতে দেয়। কিন্তু দূতকে ব্যর্থ হ'য়ে ফিরে আসতে হ'ল। ফ্রান্স—যাব যা-ই বৈপ্লবিক মতবাদ থাকে না কেন, আলস্য পাবে।

কিন্তু রুশে থেকে—বিদেশে এ-খবর চালানু দেয় কে ? রুশ পুলিশ তার গুঁত পেতে রইলো। কিন্তু কিছুতেই তাকে বের ক'রতে পারলো না।

কী ক'রে পারবে ?

এ হচ্ছে ভেরা ফিগনার,—পুলিশ যার বাঁকী শুনেই পাগল, চোখে দেখাবার সৌভাগ্য হয়নি।

পুলিশ বিপ্লবীদের ধ'রে ধ'রে কীসি দেয়।

কত ভরুণ জীবন-কুসুম অকালে ক'রে যায়—কে তার বোঁজ রাখে ?

এমন অনেক বিপ্লবী আছে, অসীম শক্তি—বিচিত্র জীবন যাদের, নেপোলিয়নের মতো প্রবল হ'তে পারতো যারা বিপ্লবের পথে না গেলে—তারাও ক্রমে বিশ্বস্তির সাগরে লীন হ'য়ে যায়। তারা যে বিপ্লবী তাদের জীবন-কথা যতই বিচিত্র হ'ক না কেন, তা লিপিবদ্ধ করার অধিকার নেই কারো। তা রাজস্রোত !

এই বিশ্বস্তির হাত থেকে এমন অমূল্য জীবন-কথা রক্ষা করার ভার ভেরা'র উপর। সেই বিপ্লবীদের ছবিসহ বিশেষ বিবরণ বিদেশে প্রকাশের জন্য পাঠাতো। বিপ্লবীদের মধ্যে ভেরার চেয়ে যোগ্যতর ব্যক্তি ছিল না কেউ।

রাজধানীতে একটা জায়গা আছে—মিথায়লোভস্কি-ফেনিঙ।

জার প্রতি রবিবার সেখানে বেড়াতে যান। কিন্তু রোজই এক রাস্তা দিয়ে নয়, এক এক দিন এক এক রাস্তা। বিপ্লবীরা এবার তারই একটা রাস্তায় মাইন পাতবে ঠিক ক'রলো।

মল্ল-শব্দেভ'র ব'লে রাস্তাটার উপর দুখানা খালিঘর ছিল, তারই একখানা পছন্দ ক'রে পনিরের দোকান খোলা হ'ল। দোকানদার কে হবে ?

ভেরা ফিগনার ব'লে, আমার মনে হয় 'যুরি' এ-কাজের যোগ্য ব্যক্তি ! কমিটি দেখলো, সত্যি তাই। যুরির যোগ্যতা সম্বন্ধে তো কথাই নেই, চেহারাও তার দোকানদার শাফিক। কাজেই তাকেই এ-পদে বাহাল করা হ'ল—তার ছদ্মনাম দেওয়া হ'ল কবোজেভ।

ইয়াকিমোভা ক'রবে বউর পাট গে। ছদ্মনাম বাসকা।

কবোজেভ-বাসকার পনিরের দোকান।

অস্ত্রাণ পনিব ব্যবসারীরা প্রথমটা ঈর্ষান্বিত হ'ল আর একটা

নতুন পনিরের দোকান দেখে, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে তাদের শংকা দূর হ'ল। এরা তেমন অভিজ্ঞ ওস্তাদ দোকানদার নয়।

মাত্র তিনশো রুবল জোগার ক'রে পনিরের দোকান খোলা হ'য়েছে। মালের ষ্টক খুবই কম।

কবোজেভ অতি কৌশলী—কারও বাইরে থেকে বোঝার যো ছিল না, দোকানে জিনিষ এতো কম বা এরা জাল দোকানী।

দোকান থেকে রাস্তার দিকে টানেল খোঁড়া চ'লতে লাগলো। খুঁড়ে মাটি বা ওঠে তাতে বাসকে বাসো ভর্তি ক'রে লেবেল এঁটে দেওয়া হয় 'পনির'। ক্রেতার ভাবে, ওং, এদের কত মাল আমদানি !

এমনি ক'রে বহুদিন কেটে গেল।

টানেল তৈরি শেষ।

দোকানের এক কোণে মাটির স্তূপ, কয়ল আর খড় দিয়ে মাটি ঢাকা। তার উপরে একটা মাহুর বিছানো।

এখন মাইন-পাতা বাকী।

১৪ই ফেব্রুয়ারী জার সেই পথ দিয়েই চলে গেলেন। মাইন পাতা হয়নি তখনও, কাজেই কিছু করা গেল না তার।

বিপ্লবীদল রাগে অস্থির।

ওং, এমন সুযোগ ! আর কতদিনে জার এ পথে আবার আসেন তার ঠিক কি। যাক, মাইন পেতে তৈরি হ'য়ে থাকা বাক।

ডিনামাইট ইত্যাদি জমা ছিল অল্প এক ঘরে। পুলিশ বেন কী একটা সম্মেহ ক'রে খুব খানাতল্লাস শুরু করে দিল। কাজেই সে ঘর থেকে ডিনামাইট সরানো হ'ল।

ভেরার তীক্ষ্ণ চোখ। একদিন দেখে, দলের একজন লোকের পিছু নিয়েছে একটা পুলিশের গুপ্তচর।

ব্যাপার কী ? মাইনের সম্বন্ধে কোন খবর পেয়েই নাকি ? তাই-ই হবে।

ভেরা তৎক্ষণাৎ বেশ পরিবর্তন ক'রে নিয়ে দোকানের দিকে গেল।

ক্রেতার বেজায় ভিড়—বাসকা দিয়ে দিয়ে আর কুলোতে পারছে না। ইঠাৎ নতুন এই ক্রেতাটিকে দেখে সে বেশ সচকিত হ'য়ে উঠলো।

খুব ভালো পনির দিতে পারেন ?

হাঁ, আসুন না, ভিতরে এসে দেখুন। নতুন ক্রেতা ভিতরে গেল।

এ হচ্ছে ভেরা ফিগনার। ভেরা পনির দেখার ছলে ব'লে গেল, পুলিশের সাড়া-টারা পাচ্ছ কিছু ?

না ভো ! তুমি পেয়েছ নাকি ?

হাঁ। খুব সাবধানে থেকো তোমরা।

বাসকা-কবোজেভ বেশ সতর্ক হ'য়ে চ'লতে লাগলো।

২৭শে ফেব্রুয়ারী।

পুলিশ সম্মেহক্রমে ত্রিগোনী ব'লে একটি কর্মীর ঘর অবরোধ করলো। ত্রিগোনী ধৃত হ'ল (ঘরাটা চালাকী, কেন না ত্রিগোনী পুলিশের চর) কিছু পরে ফিল্যাবভ এসেছে ত্রিগোনীর কাছে, তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার।

কোথাও ডিনামাইটের লীলা-খেলা চলছে, এটা বোধ হয় পুলিশ টের পেয়েছে, কিন্তু বের করতে পারছিল না, কোথায় !

ঠিক পাওয়া খুবই শক্ত, এমনি বিপ্লবীদের বন্দোবস্ত। যাদের উপর কাজের ভার দেওয়া হ'ত, তারা ছাড়া অন্য কেউ জানতো না কোথায় কখন কেমন ক'রে ডিনামাইট ফাটানো হবে।

কাজেই পুলিশ অন্ধ কুকুরের মতো গন্ধ শুঁকে শুঁকে বেড়াতে লাগলো।

পুলিশের এ তল্লাস বিপ্লবীরা টের পেয়েছে।

একদিন দলের কয়েকটি লোক পথ চ'লছে। হঠাৎ স্তনতে পেলো, আড়ালে কারা দু'জন কথা কইছে।

ও কারা ?

একজন পুলিশ, আর একজন দরোয়ান।

দরোয়ান বলছে, এ বাড়ীতে খানাতল্লাস ক'রবেন ? সে কি ? কেন ?

পুলিশ বললে, কর্তাদের মরজি।

খবর শুনে ভেরা বুঝলে, পুলিশ অনেকটা কাছাকাছি এসে প'ড়েছে ঠিক জায়গার।

বিপ্লবীরাও পুলিশের চোখে ধুলি দিতে ওস্তাদ।

কবোজেন্দ-বাসকা দোকানে বসে পনির বিক্রী করছে, এমন সময়ে একটা লোক এসে হাজির।

কি চাই আপনার ?

আমি স্বাস্থ্য-বিভাগীয় ডাক্তার। এ দোকান পরিদর্শন ক'রবো। করুন।

সেইকটি ডাক্তার নয়, ডাক্তারবেশী পুলিশ। ঘরে গিয়ে ঢুকলো। উঁচু জায়গাটার গিয়ে মাদুরটা তুলে দেখে, কয়লা আর খড়। আর কোথাও কিছু নেই। অপ্রতিভ হ'য়ে চ'লে গেল।

দোকানদাররা একটু মুচকি হাসলো !

আর একদিন আর একজন পুলিশ। মাটি-ভর্তি বাসগুলোর গা দিয়ে জল ঝরছিল, তা দেখে পুলিশটা জিজ্ঞাসা ক'রলো, ওতে কি ?

কুবোজেন্দ হাত-মুখের অপূর্ব ভংগী কবে ব'ললো আর ব'লবেন না ছুঁর। লোকসানের একশেষ। সম্ভার দশ অবস্থা !

ও কি সম্ভার ক'নেছিলে ?

ঈ, নইলে কি বাজো-কে-বাজো পচা বেরায় ?

পুলিশটা বুঝতেই পারলো না—এর পরেও সন্দেহের কিছু থাকতে পারে। এতএব সে চ'লে গেল।

পুলিশরা কিছুতেই বের করতে পারলো না কোথায় চক্রান্তের আগুন ধুমারিত হ'চ্ছে। [ক্রমশঃ]

রাজধানীর পথে পথে

উমা দেবী

শো-কেসে একটি হাতঘড়ি

শো-কেসে দেখলাম একটি হাতঘড়ি।

ড্যালহাউসি স্কয়ারের এক হিম-ঝরানো ঘরের বাতাসে

বন্ধ কাঁচের সাজানো বাজ

শুয়ে আছে স্বন্দরী—মহাকালের প্রণয়িনী।

তার কালো মণিবন্ধনীর উপরে সোনার দুটি ঝুঁকুরেখা—

অবশ হয়ে পড়ে আছে স্থির প্রতীক্ষায়।

তার চতুর্দশ স্বপ্নশিঙের দুর্লভ স্রুতি টিক-টিক শব্দে

প্রাণের প্রত্যাশা ধ্বনিত হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে।

কালো বেশমের মণিবন্ধনী যেন রাত্রির নীল অন্ধকার

তাইতে নিলীন হ'য়ে আছে একটি স্ববর্ণ-কমল।

কোন লীলাময়ীর হাতে লীলাকমল হ'য়ে উঠবে সে ?

কোন আধুনিকা বরবর্ণিনীর গৌর মণিবন্ধ বাঁধা পড়ে

সখীর মত সে জানিয়ে দেবে প্রিয়-মিলনের সময়-সংকেত ?

কিংবা ঐ আঠার শ' টাকা দামের দুর্লভ হাতঘড়ি

এখনও বহুকাল থাকবে শায়িতা—

অপেক্ষারতা বয়স্হা রূপসী কুলীন কন্ঠার মত

তথু এক বৃদ্ধ ব্যবসায়ীর মোমশ শিরাবহুল হাতে

পড়বার জন্ত।

হায় বে—হিম-ঝরানো ঘরের শীতল বাতাস—

জনারণ্যে জনবিরল নিরাশা !

হায় বে—রাত্রির রহস্যময় নীল অন্ধকার—

যেন স্রুতিগ্রাহ্য নীল বেশমের মত !

হায় বে—নিওন আলোর নীল আভা ছড়ানো জ্যোৎস্নার ছলনা—

তিমিরাভিসারের আশায় আতুর—

হায় বে—কাচাধারের স্বচ্ছ কবরে শায়িতা—

মহাকালের বিরহিনী নীলবসনা স্ববর্ণছবি মুচ্ছিতা রূপসী প্রণয়িনী !

শি শি র=সানি থ্যে

রবি মিত্র ও দেবকুমার বসু

॥ ৪ ॥

কুড়ি পঁচিশদিন পরে আবার আসবেন বলে গেলেন। মাঝে কথা ছিলো 'চন্দ্রকান্ত'তে চাপকা করতে যাবেন বর্ধমানে। বর্ধমান ধারাবাহিক পথে হাওড়া ষ্টেশনে পড়ে গিয়ে ডান হাতটি ভাঙলেন এবং তার ফলে ছ'তিন মাস তাঁকে শয্যাশায়ী হয়ে থাকতে হ'লো। এই সময় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েও কথা হয়নি কিছুই।

জুলাই মাসের মাঝামাঝি এক সন্ধ্যায় আমরা কয়েকজন বসে গল্পগুচ্ছ করছিলাম এমন সময় বিনয়দা এসে হাজির। বিনয়দার আসাটি অত্যন্ত আকস্মিক বলে রীতিমত অবাক হ'লাম। প্রশ্ন করতে হ'লো না, 'তিনি নিজেই বললেন—ভাড়ুড়ি মশায় আজ ডেকেছিলেন। তাঁর ইচ্ছে একটি দল খোলা, যেখানে পুরোনো নাটক পড়া, আলোচনা করা নাটকের বিষয়ে, নতুন আর পুরোনো নাটক রিহাস্যাল দেওয়া, অভিনয় করার ব্যস্ততা থাকবে। তা তোমরা যদি দারিদ্র নাও তো এ কাজ করা সম্ভব।

চোর চায় ভাড়া বেড়া! এমনতেই খিয়েটারের সুরোগ পেলে নাওয়া খাওয়া ছেড়ে এক পায়ে খাড়া, আব স্বয়ং শিশিরকুমারের নেতৃত্বাধীনে অভিনয় শেখাবার আর অভিনয় করার সুরোগ পাবো নতুন বই হবে, এতো অবিখ্যাত সৌভাগ্য। চটপট রাঁজি হ'য়ে শোলাম। আমাদের দু'জনকে যুগ্ম সম্পাদক করা হ'লো। সভাপতি ও সহ-সভাপতি হ'লেন যথাক্রমে রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ও কুমারেশ ঘোষ। ভোলাদা দলের নামকরণ করলেন—নব্য বাংলা নাট্য পরিষদ। স্থির হ'লো আপাততঃ প্রমুখ বৃহস্পতিবার নাটক পাঠ হবে, পরে সুরোগ সুরিধে মতো পুরোনো বা নতুন নাটক (যখন যেমন পাওয়া যাবে) রিহাস্যাল দিয়ে অভিনয় করা হবে।

সেই অল্পযাত্রী ২৪শে জুলাই তিনি প্রথম এলেন ও তারপর থেকে মাঝে এক আশ হুস্তা বাদ দিয়ে প্রতি বৃহস্পতিবারে এলেন, নানা বিষয়ে আলোচনা করলেন, নাটক পড়লেন। নভেম্বরের শেষে যখন ডিসেম্বরের নাটোৎসব করার কথা স্থির হ'লো তারপর থেকে প্রায় প্রতিদিনই এসেছেন। দৈনিক ও'র বাসা থেকে ও'কে নিয়ে এসেছি এবং পৌছে দিয়ে এসেছি আমরা, আসা যাওয়ার পথেও অনেক কথা হয়েছে ও'র সঙ্গে।

পরবর্তী পাঁচাত্তালোতে সেই সময়কার কথাই লিপিবদ্ধ করছি। ২৪শে জুলাই এলেন কি নাটক পড়বেন, কিভাবে কি করা হবে সেই সম্বন্ধে আলোচনা করতে। প্রথমে বললেন—যাত্রার চলন হয়েছে আমাদের দেশে ১৫-৮৫ শতাব্দী থেকে। তখনকার নাটককে যাত্রা বলত, যাত্রাটি চারদিক খোলা জায়গায় হবে না তিন দিক খোলা জায়গায় হবে সে কথাটি ভাবতে হবে। চারদিক খোলা জায়গায় অনুবিধে হবে এই যে, ঘুরে ঘুরে অভিনয় করতে হবে। মাইক ব্যবহার করলে অনুবিধেই হবে।

এ কাজ করতে হলে রাষ্ট্র বা কর্পোরেশনের সাহায্য নিতে হবে

এ কথা ঠিকই, কিন্তু অভিনয় করবে কারা? আজকালকার অভিনেতারা ত অভিনয় করতেই ভালো না, সিনেমায় অভিনয় করতে গেলে অনেক নাবিয়ে অভিনয় করতে হয় কারণ সিনেমায় যুগটি 'হুশ' গুণ বাড়ি কাজেই নৃশঙ্ক ভঙ্গীও অত্যন্ত বিকৃত লাগে।

আমাদের দেশে অভিনেতার মূল্য নেই, তাই গিরিশবাবুও কোথাও যেতেন না; অল্প অভিনেতাদের ধমকাতেন—রঙ মেখে সামনে দিয়ে বেরুবি কেন? তাঁর বলার কাণে এ বকম করলে অভিনয়ের মাগাটা ক্ষুণ্ণ হয়।

এবার কি নাটক পড়বেন প্রশ্ন করা হলো, একজন বললেন—ইংরেজি নাটক পড়ুন, উত্তরে বললেন—ইংরেজি নাটক পড়তে হলে সেক্ষণীয়র পড়তে হবে, কিন্তু তাতে অনুবিধে অনেক, তাঁর চেয়ে দিল্লী বই পড়াই ভাল, মাইকেলের কৃষ্ণকুমারী খুব ভাল বই, টেডের সাহায্য নিলেও অনেক কিছু বদলেছেন, বিদেশী এলিজাবেথীয় নাটকের ওপর নির্ভর করেই পদ্মাবতী নাটকটি লিখেছেন অথচ সংস্কৃতেরও কত সাহায্য নিয়েছেন।

গিরিশবাবুর বেশির ভাগ বইই হয়ত অপাঠ্য কিন্তু যে কটি ভাল বই আছে তা এতটাই ভাল যে বাংলা ভাষায় এমন নাটক প্রায় দেখাই যায় না।

প্রাদেশিকতার প্রশ্ন উঠলে তখন বললেন—জাতীয়তাকে এর জন্যে রবীন্দ্রনাথ দোষ দিয়েছেন, কিন্তু জাতীয়তার দোষ কী? এত ভুল ধরণের জাতীয়তা!

আগেকার দিনে লোকে তীর্থভ্রমণে বেরোলে দেশের কোথাও কোনো বকম বিপদে পড়তে হতো না, অথচ তখন হয়ত এই দুই দেশে বাক্য রাজ্যই যুদ্ধ হচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষায় কথা বলা যায়, এ কথাটা প্রথম আমাদের বুঝিয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথের পাবলিসিটি খুব ভাল ছিল, ঠাকুরবাড়ির অল্পদের অত ছিল না। স্বিজেন্দ্রনাথের কোথায় ছিল? দায়কানাথ একজন মহৎ লোক ছিলেন।

অভিনয়ের প্রসঙ্গে বললেন—স্বিজেন্দ্রলাল রায় বাংলা দেশের মকে প্রথম অভিনয় ঢোকালেন। (বোধ হয় বলতে চাইছেন বাস্তবায়ুগ অভিনয়।) দানীয়াবু চাপকা আর আওরঙ্গজেব না করলে দেশে অভিনয় আসত না, নয়ত দানীয়াবু বা অমর দত্ত ভালভাবে অভিনয়ই করলেনই বা কোথা? শুধু 'এগিয়ে গিয়ে টেচিয়ে বল'।

গিরিশ বাবু পরমহংসদেবের আশীর্বাদ পেয়েছিলেন কিন্তু পরার্থপর হলেন কই? ছেলের কথা আর নিজের নাটক ছাড়া অল্প সব বিষয়ে careless ছিলেন। তবে অনেক পড়াশোনা ছিল। কত যে পড়েছিলেন তা কেউ জানে না। সে সময় সামগ্রিক চিন্তা আর drill-এর বড় অভাব ছিল, ব্যক্তিগত জিনিয়াসই ছিল প্রবল।

গিরিশ প্রসঙ্গ থেকে স্বামীজির কথা উঠল, বললেন—বিদেশে

রবীন্দ্রনাথ খুবই সম্মান পেয়েছেন, কিন্তু তার চেয়ে ঢের বেশি পেয়েছেন স্বামীজি।

সমসাময়িক (অর্থাৎ আজকালকার) মঞ্চ সম্বন্ধে তাঁর মতামত জানতে চাইলে বললেন—সমসাময়িক মঞ্চ সম্বন্ধে কিছু বলা আমার পক্ষে শক্ত।

বাংলা দেশের মাসিক পত্রের কথা উঠল, বললেন—একটা ভাল মাসিকের জায়গা এখনও বাংলা দেশে আছে। ভাল বলতে পুরোপুরি প্রবাসী আর ভারতীয় মত। প্রবন্ধ প্রথমতঃ লেখাতে হয়। লিখতে লিখতে কাঁচা লেখা পাকে। সে চেষ্টা যে করবে সে খাবে কি?

বঙ্কিমবাবুর লোকের ক্ষমতা বিকাশ করানোর অপূর্ণ দক্ষতা ছিল, কিন্তু বাংলা দেশের হৃদয়গা যে মাত্র পঞ্চাশ বছর বয়সে তিনি মারা গেলেন। তাঁর প্রবন্ধাবলী অতুলনীয়, বিবিধ প্রবন্ধের মূল্য দেয়ই বা কে?—জানাই বা কে?

—সব মানুষের মনোবৃত্তি এক; কিন্তু আমাদের মধ্যে একটা এলানো ভাব আছে। আমাদের খিয়েটার শুরু হ'তেই হুঁভাগ হলো। একটা হ'লে যা মহৎ হ'তে পারত তা' বগড়াবাটির মধ্যে হুঁভাগ হ'য়ে কিছুই হলো না।

কথা শেষ হবার পর কি বই পড়বেন সবাইকে প্রশ্ন করলেন, অনেক তর্ক-বিতর্ক করার পর ঠিক হ'লো গিরিশচন্দ্রের জনা পড়া হবে। বাংলা মঞ্চের নটগুরু গিরিশচন্দ্রের নাটক দিয়ে নব্য বাংলা নাট্য পরিষদের নিয়মিত অধিবেশন শুরু হওয়া যে আনন্দের কথা তা সবাই স্বীকার করলেন।

৩১শে জুলাই উনি এলেন, পরিচিত মহলে ইতিমধ্যেই খবর রটে গেছে যে, শিশিরকুমার পুরানো সব নাটক পাঠ করবেন। কাজেই ঘরের মধ্যে ছোটখাট জনতা এসে তত্ত্বাপোষের ওপর বসলেন, পরিচিতদের সঙ্গে আলাপ করলেন। দু'একজন তখনও আসেননি বলে বই পড়া কিছুক্ষণের জন্তে স্থগিত রেখে অল্প সমস্ত আলোচনা শুরু করলেন।

প্রথমেই বললেন নাট্য সমালোচক কেমন হবে সেই কথা—প্রকৃত নাট্য সমালোচনা হয় না কারণ সমালোচক হ'তে গেলে নাটকের সঙ্গে নাড়ীর বোগ থাকতে হয়, নয়ত ভালবাসতে হয় নাটককে। বাংলা নাটক ভাল করে পড়া থাকা দরকার জা ছাড়া নিয়মিতভাবে রিহাস্যাল আর অভিনয় দেখতে হয়। নয়ত leader লেখার মত লেখা লিখিয়ে ত সহজেই কাগজওয়ালারা নাম করিয়ে দিতে পারে। মৃতব্যক্তিদের মধ্যে অমর দত্ত আর দানীয়াবু এক সময়েই অভিনয় করতেন। কিন্তু অমর দত্ত কাগজকে কাজে লাগিয়ে খুব পপুলার হয়ে উঠেছিলেন, দানীয়াবু কিন্তু অল্প পপুলার ছিলেন না, অমর দত্তের মত অক্লান্ত কর্মী বাংলা নাট্যশালায় খুব কম ছিলো, কিন্তু অভিনেতা—সে কথা না বলাই ভালো।

—দানীয়াবুকেও দাঁড় করালেন গিরিশবাবু। অভিনেতাদের একটি ভোল বা conventional mode of acting ঠিক করে সিরাজদ্দৌলা, মীরকাশিম, ছত্রপতি সেই অনুযায়ী লিখে ছেলের সুবিধে করে দিলেন।

—আমাদের দেশে আগে থিয়েটারের দাম ছিলো, ভয়ত কালীদাসের আগেই লেখা হয়েছিল আর রাজশেখর বসুর রামায়ণের

অনুবাদের উনিশ পাতার লেখা আছে যে, অযোধ্যার অলিতে গলিতে থিয়েটার ছিলো।

—ইতিহাসে bias একটু থাকবেই, কিন্তু তা establish করা চাই।

কালিদাসের ভৌগলিক জ্ঞান খুবই ভালো ছিল; শাস্ত্রীমশায় জিনিষটা ভালো করেই শিখিয়েছিলেন, শাস্ত্রীমশায়ের লেখা সব এক করে বার করা উচিত। উনি বড় গৌরো ছিলেন, জোর করে লেখাতে হ'তো। তবে তাঁর সঙ্গে কথা বললেই কত জ্ঞান বোঝা যেত।

—গিরিশবাবুকে আমার প্রতিলিপি মনে হয়। এদিকে পরমহংসদেবের শিষ্য অথচ কখনও ঠিকেননি। মিথ্যা মোকদ্দমাতেও জিতেছেন। গাড়ীতে চড়বার সময় বলছেন—হাত অনেকগুলো মিথ্যে কথা বলব, লোকটি বড় জ্ঞানিয়েছে। তবে থিয়েটার উনি না হ'লে চলত না। তুর্কান নিয়োগী, অমৃতলাল আর অর্ধেন্দু যুস্তাফি কি থিয়েটার চালাতে পারতেন নাকি?

—অর্ধেন্দুবাবুর কথা ছেড়ে দাঁও, মরবাব সময় বলেছিলেন, সর্বাস্থে দেশী মদ ঢেলে তবে যেন পোড়ানো হয়। মানুষ বড় ভালো ছিলেন, রিহাস্যালে আমারই মতো বোঁক ছিলো, দশ-বিশ-পঁচিশবার বলতে কষ্ট পেতেন না। রিহাস্যাল আরম্ভ করলে আশ শেষ করতে চাইতেন না, তা লোকে মরুক আর তরুক।

মানুষটি খুব দুঃসাহসী ছিলেন। 'দস্তাবজ্জ' সৌরীন্দ্রমোহনের নকল করে তাঁর বাড়ি থেকে বিতাড়িত হলেন। তবে কালীকেই ঠাকুর খুব ভালবাসতেন। শিখিয়েছেন কিন্তু পাত্র-অপাত্র ভেদ না করে।

—গিরিশবাবু কিন্তু কাউকে শেখাতেন না। রিহাস্যালে বসতেন এক ডাবা পান, আর ব্যাণ্ডি বা হুইস্কির বোতল নিয়ে চাকর সোডার বোতল নিয়ে তৈরী থাকত। দু'তিনবার বলেই বলতেন—ঠিক হ'য়েছে, তোমার বয়সে অমন আমি পারতুম না, এগিয়ে গিয়ে চেঁচিয়ে বল তাহলেই হবে।

—তিনকড়িই একমাত্র অভিনেত্রী থাকে—গিরিশবাবু খাতির করে চলতেন। একবার মহেন্দ্র মিত্রকে যা বলেছিল, তা (সধবার একাদশী) নাটকেই লেখা আছে। মীরকাশিমে তারার ভূমিকায় অভিনয় করছে, কে বুঝিয়েছে, অল্প দু'জন সুলীলা আর তারার, খুব ভাল পোষাক পরছে আর তোমার বেলা শুধু গেকরা! তিনকড়ি সঙ্গে সঙ্গে বেকে দাঁড়াল, ভাল পোষাক ছাড়া নাববে না।

—গিরিশবাবু বললেন তিনকড়িকে কোন অনুরোধ করতে পারবেন না। কে যায় 'বোঝাতে শেষ পর্যন্ত চারআনি মালিক মহেন্দ্র মিত্র সাহস করে বোঝাতে গেলেন। তিনকড়ি সাক্ষর হুঁধর ওপর বলে দিলে—তুমি আর টকখাই-টকখাই করে না বাপু, বাও আর ওকালতি করতে হবে না। তোমার মত উকিলের মামলার আমি হ'কোর জল ঢেলে দি।

মহেন্দ্রবাবু পালিয়ে যাঁচলেন, শেষ পর্যন্ত একজন বুদ্ধিমান লোক (ভোলালা বলেন—সমস্তটাটি রসিকতা আর তা মিটমাট করাল অর্ধেন্দুবাবু) গিয়ে বোঝালে—আরে, তোমার কি এমনি পেছল পরাব, পরাব একেবারে খাটি সিকের গেকরা, তখন ঠাণ্ডা হলো তিনকড়ি।

ডাঃ অধিকারী মাঝে মাঝে খোঁচা দিয়ে কথা বার করতে চাইতেন।

বললেন—তারার কিন্তু খুব দস্ত ছিলো। বললেন—থাকবে না কেন, এক সময় থিয়েটারের মাসিক পর্যন্ত ছিলেন। অপদেশবাবু তাঁর থিয়েটার ঠিকরে আঁট থিয়েটারকে বেচে দিলেন আর তার টাকার ভালুক পাড়ার দু'খানা বাড়ি কিনলেন, পরে আবার সে বাড়ি বেচে দিয়ে টাকাটা ভোগ করলেন। উনি ছিলেন আওরঙ্গজেব। প্রথমে আমাদেরও খুব দাবাতে চেয়েছিলেন।

—পাণ্ডব গৌরব হবার করেছে, কিন্তু ওর ওপর আমার কোন sympathy নেই।

এই দিন জনার আধাখাশি পড়ে শোনালেন।

৭ই আগস্ট এলেন। প্রথম কথা হল—সেদিন আমি ভুল করেছিলুম, মাইকেলের শর্মিষ্ঠার আছে সংস্কৃত নাটকের প্রভাব আর গ্রীক নাটকের প্রভাব আছে পদ্মাবতীতে। তার পর বললেন—একজন অভিনেত্রী অনেককাল অভিনয় করছে, মহতী আকাজকা মানে জানে না। বলে—যুদ্ধ হবে আর কি? তখন আমি বললুম—কথাটার মানে হ'লো পৃথিবীখর হবার ইচ্ছা। বিজিগীষা মানে জানে না।

পুঝানো দিনের অভিনেতাদের সম্বন্ধে বললেন—গিরিশবাবু একটা ভোল করলেন, ছেলেকে বড় কববার জগ্গে কতকগুলো বড় বড় পাট লিখে গেলেন, দানীবাণ্ড অবগু লেখাপড়া জানতেন না। তবে তখন তাঁরা স্বীকার করতেন যে, লেখাপড়া জানেন না। কুসুম বড় ভাল বলেছিল। একটা ছেলে না মেরেকে শেখাচ্ছি, পাটটা বোঝানোর জগ্গে গোটা কতক ইংরেজি sentence বলেছি তা দেখি সে 'হা' করে ঠাঙ্কিয়ে আছে। কুসুম বললো—ওত খুবই বুঝেছে। যে ভাষায় বললেন, ও ভাষায় যে ও পণ্ডিত!

রামকৃষ্ণের কাছে গিরিশবাবু গিয়েছিলেন বলে বেঁচে গিয়েছিলেন। পরমহংসদেবের শিষ্যতা খুব সাহায্য করেছিলেন। স্বামীজি ছিলেন পেছনে। স্বামীজির অপূর্ণ জনপ্রিয়তা ছিলো। পশ্চিমেও স্বামীজির বা জনপ্রিয়তা ছিলো, রবীন্দ্রনাথের তা ছিলো না। কিন্তু এদেশে স্বামীজির নাম হ'লো আমেরিকা থেকে নাম করে এসে।

—ওদের দেশে কতকগুলো গরীব লোক থিয়েটার খুললেন, তারপর মিস হনিম্যান টাকা দিতে ঠাঁড়িয়ে গেল। আমাদের দেশেও গরীব লোকেরাই থিয়েটার খুলেছিলেন। গিরিশবাবু ছাড়া কারো কিছু ছিলো না। অর্ডেলুগাবু ছিলেন অন্নদাস। সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়িতে থাকতেন, কালীকুমার ঠাকুর যত্নআত্তি করতেন, পঞ্চাশ টাকার বেশি কখনও একসঙ্গে চোখে দেখেননি। শ্রীতকালে ওভারকোট আর গরমকালে ড্রেসিং গাউন পরে কাটিয়েছেন। খাবার ঘণ্টা খেতেন দিশী মদ। দিশী ছেড়ে বিলিতিতে কখনও উঠতে পারেননি। দিশী মদ বোধ হয় তখন চোদ্দ আনা বোতল ছিল।

এবার এলেন জনার প্রসঙ্গে, বললেন—জনা বলা হয় লেখি ম্যাকবেথের দ্বারা অনুপ্রাণিত কিন্তু পড়লে ত তা মনে হয় না। কাব্য হিসেবে খুবই ভাল বই। ঠর আর একটা ভাল বই 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস'। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য হওয়া উচিত। নাটকটির ছটি কেন্দ্র—কীচকবধ আর উত্তর গো-গৃহযুদ্ধ। অবগু এরকম দুটো কেন্দ্র জন্মাতোও কিছুটা আছে। প্রবীণের মৃত্যুর পরের অংশটাও নতুন। ঠর নাটক গ্রীক বা সেন্সারীরের নাটকের ছকে নয়, একেবারে নিজস্ব, সম্পূর্ণ নিজস্ব। মাচেন্ট অব ভেনিসে শাইলকের ব্যাপার

চোকার পর সেন্সারীর যদি পোর্টিয়া আর তার রিং নিয়ে একটা বাড়তি অংক লিখতে পারেন ত' গিরিশবাবুই বা পারবেন না কেন?

—আইন হয় পরে। আরিষ্টটল এরিস্টোকেনিস আর এসকিউলাসের কত পরে আইন বাঁধলেন। তাছাড়া বিখ্যাত লেখকরা আইন পুরো মাত্রায় কখনই মানেন না। জেন অষ্টেনের লেখার সঙ্গে ডিকেন্সের লেখার যেমন অনেক তফাৎ।

ইংরেজি লেখকদের কথার বললেন—আর্নল্ড বেনেট ত ভাল লিখতেন। আমা অব ফাইভ টাউনস খুব ভাল বই। ওড্ড ওয়াইভস টেলসও বেশ ভাল লেখা। ওয়েলসও ভাল লিখতেন। মিঃ পলি পড়েছি।

কথার কথার 'মহাপ্রস্থান' নাটকের কথা উঠল। বললেন—মহাপ্রস্থান দুটি লোক লিখতে পারতেন—স্কোরোদ পণ্ডিত আর গিরিশবাবু, গিরিশবাবু লিখলে ভীষণ ট্রাজিক হ'তো। অবগু এর চেয়ে ট্রাজিক আর কি হতে পরতো! তবে উনি বোধহয় মহাপ্রস্থান পর্যন্ত যেতেন না। অর্জুন যেখানে গাণ্ডীব তুলতে পারলেন না সেখানেই শেষ করতেন। স্কোরোদ বাবুকে বলতে উনি লাফিয়ে উঠলেন, কিন্তু একদিন ভেবে এসে বললেন—ভায়া, এখনো যাট বছর হয়নি, এর মধ্যে পূর্ণব্রহ্ম নাবায়ণের মৃত্যু দেখালে কি আর বাঁচবে।

জনার কথা তুললেন আবার, বললেন—জনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য কি? ভাল করে পড়ানো দরকার, শ্রদ্ধা নিয়ে পড়ানো দরকার, এতে নাটকীয়তাও আছে, কাব্যগুণও আছে, যাঁরা পড়ান তাঁরা ভাগ করে পড়ান না। কিছু ভাগ ভাগ সমালোচনা থাকলেও তাতে এমন অনেক জায়গা আছে না পড়লে বোঝা যায়, তাঁরা বইটা ভাগ করে পড়েননি। তা ছাড়া শ্রদ্ধা না থাকলে কী করে বুঝবেন।

মাইকেলের প্রতি গিরিশ বাবুর অত্যন্ত শ্রদ্ধা ছিল। আমার যখন সত্যেরা বছর বয়স, তখন প্রথম গিরিশ বাবুর কাছে যাই ইনস্টিটিউটে রেসিটেশন কম্পিটিশনে, কি ভাবে রেসিটেশন করবে লিখতে। মাইকেলের লেখার যে অংশটি নির্দিষ্ট ছিল সেটা পড়ে হুঃখ করে বলেছিলেন এটাও মাইকেলের লেখার ভালো অংশ নয়, এর চেয়ে অনেক ভালো লেখা আছে তাঁর, এই বলে 'নীলধ্বজের প্রতি জনা' পড়ে শোনালেন।

তিনি যে নিয়ে নাটক লিখবেন, একথা কখনও ভাবেননি। কিন্তু খুব ভালো অভিনেতা ছিলেন। ইউনিভারসিটির উচিত গিরিশ বাবু সম্বন্ধে খোজ খবর নেওয়া। তাঁর নাটকের Genesis সম্বন্ধেও খোজ নেওয়া উচিত। রবীন্দ্রনাথ আমাদের বলেছিলেন—গিরিশ বাবুর লেখা পড়িনি আর এ যুগে বয়সে পড়তে বলা না। তবে তিনি খুব বড় অভিনেতা ছিলেন।

—দানী বাবুকে যে দেখতে পারতেন না তার কারণ তিনি ত' কেবল ভোগে চলতেন, গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর থেকেই তাঁর খাণাপ অবস্থার শুরু হয়। এক দেবলাদেবীতে খিজির খাঁ হয়ে চেঁচিয়েছিলেন কিছুদিন' তবে পরস পাননি।

আজকের দিনে যে যাই করুক, Publicity Conscious সবাই, আমাদের দু বছর কেউ mention করেনি।

এক বিখ্যাত ইংরাজী দৈনিকের সম্পাদকের নাম করে বললেন ওকে উনিশশ সাতাশ-আটাশ সালে বলেছিলুম, সমালোচনা

জন্মে একটি ভাল ছেলেকে 'তিন-চারশ' টাকা মাইনে দিয়ে রাখা, আমরা তাকে সাহায্য করবো, তাতে বললে, এমনভেই কতলোকে লেখা দিতে চাইছে। আর একটি পত্রিকা গোষ্ঠির পরিচালকের নাম করে বললেন—সে বললে, কেউ ত কিছু জানে না। যা লেখবার আপনি বরং লিখে দেবেন, কাগজে ছাপিয়ে দেবো। আমি তাতে রাজি হইনি।

যাবার সময় ঠিক হলো পনের দিন পড়বেন পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস।

আবার এলেন চোদ্দই আগষ্ট। ইতিমধ্যে বার্মাপুরে অভিনয় করতে গিয়েছিলেন, সে সম্বন্ধেই প্রথমে বললেন—বার্মাপুরে মেজর স্কেনারেল পি চৌধুরীর বাড়িতে ছিলুম। ভদ্রলোক ex—I. M. S.। ঠাঁর জ্বীকে আমার বড় ভালো লেগেছে। কোনো রকম রং চা মাথা নয়, একেবারে সাধারণ বাঙালী-ঘরের বউ। অথচ ঝাঁরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসছেন সবাই রমাঝা। আর কী বড়। খাইয়েছেও খুব ভালো। তাইত বললুম, I am feeling quite at home,

—চৌধুরী সাহেব আই, এন, এতেও ছিলেন, জীবনে অনেক এ্যাডভেঞ্চার আছে।

—অভিনয় খুব ভালো হয়নি। (একজন অভিনেতার নাম করে)—এর অবস্থা খুব স্বাভাবিক ছিল না। একবার ঢুকে আর যখন ঢুকলো না তখনই বৃষ্টিলুম কিছু গোলমাল হয়েছে। বাঁধা হাততালি পাঁবার জারগার না পেলে এক কথা তিনবার করে বলছে।

—ট্রজট খুব ভাল, গভীরতা চল্লিশ ফুট, তবে মাঝখানে একটা বাধা আছে (সম্ভবতঃ পিলার) নীচে ছ'শ পঞ্চাশজন লোক ধরে। ঠাঁরেও ধরত না। জিজ্ঞাসা করলুম—সবই ত তোমাদের ভালো, কিন্তু মাঝখানে ওটা কেন? ঠাঁরের নকল, তা উত্তর দিলে—না, আগে ওই পর্বতই ট্রেজ ছিলো, এখন বাড়ানো হয়েছে। আমি বললুম—ওটা সরিয়ে দিয়ে। আর একটু জিজ্ঞাসা বাদ করো। অভিনয় করতে পরসী নিই বটে কিন্তু এসব কথা জানতে চাইলে ত' আর পরসী নেবোনা।

এবারে কতকগুলো সাধারণ কথা বললেন—আমাদের দেশে জাতীয়তা বোধ এসেছে পরে। আর্থরা যে বাইরে থেকে এসেছিল একথা হয়ত সত্যি নয়, নয়ত এদেশের লোকেরাই নিজাদের আর্থ বলে চালিয়ে দেয়। মুসলমানরা যখন এদেশে আসে আমাদের অবস্থা তখন খুবই খারাপ।

পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস প্রসঙ্গে বললেন—পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস লেখা হয় 'আঠারশ' বিরাশি সালে। তার আগের বছর লেখা হয় রাবণ বধ। প্রথম দিনে উত্তরা কে করেছিল তার নাম পাণ্ডয়া বার না। অমৃতলাল মিত্র করেছিলেন ভীম ছাড়া আরো দুটো পাট।

গিরিশবাবু করেছিলেন কীচক আর দুর্ধোধন। গিরিশবাবু কীচক খুব ভাল করতেন, কিন্তু প্রথম রাত্রির পর ছেড়ে দিয়েছিলেন। তখন করতেন মতিলাল স্ত্রব। তাই নিয়ে তুমুল হৈ চৈ। শেষ পর্বত বাধা হয়ে আবার ধরলেন। অমৃতবাবু ছিলেন লক্ষা চণ্ডা দশাসই পুরুষ।

পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসের দুটি কেন্দ্র, এক কীচক বধ আর এক উত্তর গো গৃহ যুদ্ধ। দুটিকে জুড়েছে উত্তরা-অভিমত্যা বিবাহ আর কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের ইঙ্গিত।

পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসে বিদেশী কোনো ছোঁওয়া নেই। এর মূল হ'লো পুরো কাশীরাম দাস। এর গড়নটাও সম্পূর্ণ গিরিশবাবুর নিজস্ব।

মেজরপীরের খুব ভক্ত ছিলেন গিরিশবাবু। অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোক ছিলেন উনি। যত কাল ছিলেন, নতুন কোনো ধারাকে চুকেতেন সেননি।

পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য হওয়া উচিত। কিন্তু পড়াবে কে? মেজরপীর বোধ হয় শ্রীকুমার পড়াতেন পারে, পার্শ্বভাল সাহেবের সব নোট ওর মুখস্থ। প্রফুল্লবাবুও ভাল পড়াতেন শুনেছি। তবে আমাদের যা পড়িয়েছিলেন—ফাইলোলজি—তা ভাল পড়াননি। ফাইলোলজি জানে সুনীতি, একেবারে সব মুখস্থ।

প্রফুল্লবাবুকে পড়ানোর লাইনে আনলেন পার্শ্বভাল সাহেব। ধমকে বললেন—ডেপুটিগিবি করবে তো আমার কাছে এতদিন পড়লে কেন?*

প্রফুল্লবাবু আগেও এসেছিলেন, কিন্তু আমাদের ছালাতনে পালিয়ে বাঁচলেন। পার্শ্বভাল সাহেব ওঁকে খুব ভাল বাসতেন। নিজের সব নোট লেখা বই দিয়ে যান।

ওঁর সময় পার্শ্বভাল আর এম, ঘোষ ভাল পড়াতেন। আর একজন ভাল পড়াতেন—বিনয় সেন। উনি ফিলসফি, হিষ্ট্রী আর ইকনমিকসের প্রফেসর ছিলেন। কিন্তু কোনো দিকে যেতেন না তাই আশুবাবু পছন্দ করতেন না। তবে দলে টানতে চেয়েছিলেন। বিনয়বাবুকে এক কথার ইম্প্রেশনের অব কলেজের করেছিলেন। তিনি খুব রাগভারী লোক ছিলেন। তাঁকে সবাই নাম ধরে ডাকতে পারতেন না, বাবু বলতে হ'তো।

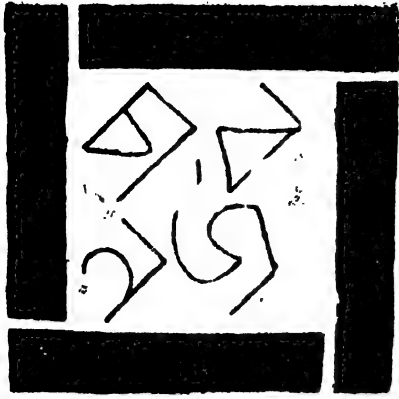
আশুবাবুর মাঝে মাঝে ওরকম ঠিকে ভুল হ'তো। গুরুদাস বাবুর সঙ্গেও একবার হয়েছিল। ওঁর ছেলে হারাপের চাকরী করে ওঁর কাছে ভোট চান। তাতে গুরুদাসবাবু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন।

ঐ সময়ে পণ্ডিতরা তাঁদের জ্ঞান দেখাতেন না, নিতান্তই খোঁচা দিয়ে জানতে হ'তো।

[ক্রমশঃ]

... এ সময়ে প্রচলিত ...

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে সাঁওতালী বঙ্গ-ললনা দুই বোনের আলোকচিত্র
প্রকাশিত হইয়াছে। আলোকচিত্র শ্রীরামকৃষ্ণ সিংহ কর্তৃক গৃহীত।



রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য

“থান, বঙ্কিমচন্দ্রের মুখ্য উপলক্ষে অনুষ্ঠিত শোকসভায় আমরা বঙ্কিমের গড়ে’ তোলা বাংলা ভাষাতেই সকল কথা গুনতে চাই, ইংরাজিতে নয়।” বালকের কণ্ঠে তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনি গুনিয়ে সভাস্থ সকলে সচকিত হইয়া উঠিল। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চটোপাধ্যায়ের পরলোকগমনের পর রাজসাহী কলেজিয়েট স্কুলে সাহিত্যসম্রাটের স্মৃতিপূজার জন্য শোকসভা অনুষ্ঠিত হইতেছে। সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছেন রাজসাহীর তৎকালীন ম্যাজিস্ট্রেট লোকেননাথ পালিত। সভাপতির অভিভাষণে তিনি ইংরাজিতে বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন যে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলী তিনি লগুনে বসিয়াও পাঠ করিয়াছেন এবং তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের একজন অনুরক্ত ভক্ত। তবুও ইংরাজি ভিন্ন অন্য ভাষায় বক্তৃতা করিতে পারেন না। একজন তিনি ইংরাজিতেই বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে বাহা কিছু বলিবেন। সমস্ত সভা নিস্তব্ধ হইয়া সভাপতির অভিভাষণ শুনিতেছিল। সহসা সভায় এক প্রোঙ্গ হইতে বালকের কণ্ঠে প্রতিবাদ ধ্বনিয়া উঠিল বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতিপূজায় বঙ্কিমের গড়ে’ তোলা বাংলা ভাষা ভিন্ন অন্য কোন ভাষায় বক্তৃতা করা চলিবে না। এই বালক রাজসাহী কলেজিয়েট স্কুলের উদীয়মান ছাত্র রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য। বালকের প্রতিবাদের সারবত্তা অনুভব করিয়া সভাপতি মহাশয় নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া পড়েন এবং সমুদয় সভায় হৈ চৈ আরম্ভ হইয়া যায়। শেষ পর্যন্ত স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় বাংলা ভাষায় বক্তৃতা করিয়া সাহিত্য সম্রাটের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং সভার কার্য্যও সমাপ্ত হয়।



রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য

বঙ্গ ভাষায় প্রতি এই অসাধারণ অমুরাগ এবং বঙ্গীয় জাতীয়তার প্রতি অকৃত্রিম প্রাণাই

রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য মহাশয়ের জীবনের মূল স্তর। কংগ্রেস নেতৃবর্গের বিরোধভাজন হইয়াও তিনি তাঁহার ‘বিপ্লবী বাংলা’ নামক গ্রন্থে প্রমাণ করিয়াছেন ভারতবর্ষের বর্তমান স্বাধীনতা গান্ধীবাদের দ্বারা আসে নাই—আসিয়াছে অপরাধ কারণের সহিত আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক বাঙ্গালী বীর সুভাষচন্দ্রের প্রচেষ্টায় এবং আত্মত্যাগে। তাহিত বঙ্গজননীর আর একজন শ্রেষ্ঠ সন্তান স্বর্গতঃ শ্রীমা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ‘বিপ্লবী বাংলা’ পাঠ করিয়া আচার্য্য মহাশয়কে লিখিয়াছিলেন “এই গ্রন্থে আপনি সত্যকারের ইতিহাস বিবৃত করিয়াছেন। আপনার প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হউক।”

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য রাজসাহী জেলার এক বিদিত্ত পরিবারের সন্তান। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় ডাক্তার কেদারেশ্বর আচার্য্য এম্. বি উত্তরবঙ্গের একজন বিখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন। কিন্তু শুধু চিকিৎসক হিসাবেই তাঁহার খ্যাতি সীমাবদ্ধ ছিল না। রাজসাহীর প্রতিটি জনহিতকর প্রতিষ্ঠান যথা মিউনিসিপ্যালিটি, জেলাবোর্ড, পাবলিক লাইব্রেরী, হরিশভা, কলেজ, স্কুল প্রভৃতি প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের সহিতই তিনি অগ্রণীকপে যুক্ত ছিলেন। আজও রাজসাহীর আপামর জনসাধারণের নিকট ‘কেদার ডাক্তার গরীবের মা বাপ ছিলেন’ বলিয়াই পরিচিত। এই বিখ্যাত পিতার স্মৃতিপূত্র রূপে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল আচার্য্যের জন্ম হয়। অতি শৈশবেই তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়; কিন্তু বিমাতঃ স্নেহছায়ায় বঞ্চিত হইলেও তিনি মায়ের অভাব কোনদিন অনুভব করেন নাই।

রাজেন্দ্রলাল বাল্যকালে রাজসাহী কলেজিয়েট স্কুলে লেখাপড়া আরম্ভ করেন এবং প্রথম হইতেই একজন মেধাবী এবং কৃতি ছাত্র হিসাবে পরিচিত হন। শুধু তাহাই নহে; খেলাধুলা, গান-বাজনা, সম্ভরণ প্রভৃতিতেও তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। বয়াকালে দুরন্ত পদ্মা নদীও তিনি একাধিকবার সীতারাইয়া পার হইয়াছেন ছাত্র জীবনে রাজসাহীর বেথানে যে সহৃদয়মূলক আন্দোলন হইয়াছে তাহাতেই তিনি একটা প্রধান স্থান গ্রহণ করিতেন। রাজনৈতিক আন্দোলনের সহিতও তিনি যুক্ত ছিলেন এবং প্রাদেশিক কংগ্রেসে করেকটি অধিবেশনে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে কাজ করিয়াছিলেন।

স্কুলের ছাত্র জীবন হইতেই রাজেন্দ্রলালের সাহিত্য চর্চা সূত্র হয় এবং রাজসাহীর ‘হিন্দুবিজ্ঞান পাত্রিকায়’ এবং ‘শিক্ষক’ নামক আর একখানি পত্রিকায় তিনি নিয়মিত ভাবে লিখিতে থাকেন রাজসাহী হইতে এন্ট্রান্স পাশ করিয়া তথাকার ছাত্র জীবন সমাপ্ত করিয়া তিনি কলিকাতায় পড়িতে আসেন এবং রিপণ কলেজে (আধুনিক সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) ভর্তি হন। রিপণ কলেজ হইতে রাজেন্দ্রলাল ১১০০ খৃষ্টাব্দে বি. এ পাশ করেন। রিপণ কলেজে অধ্যয়ন কালে তিনি শ্রীর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ সাহচর্য্যে আসেন এবং তাঁহার কথা মত “Bengali” পত্রিকায় নিয়মিত ভাবে প্রবন্ধ লিখিতে থাকেন। রাজেন্দ্রলাল সুরেন্দ্রনাথের ছাত্রও ছিলেন

অতঃপর ১১০২ খৃষ্টাব্দে রাজেন্দ্রলাল সরকারী চাকুরী সাব ডেপুটি পদে নিযুক্ত হন এবং যোগ্যতার সহিত কার্য্য সম্পাদন করিতে থাকেন। কিন্তু স্বাধীন মনোবৃত্তির জন্য তিনি প্রতিপদে ইংরাজী শাসকগণের বিরোধভাজন হন। তাঁহার প্রথম চাকুরী জীবনে মেদিনীপুরে বঙ্গাঙ্গণ কাধ্যে অকৃতপূর্ণ সুনাম অর্জন করেন

ঐ সময় তিনি *Famine Rules* সম্বন্ধে যে নিবন্ধ লেখেন, তাহাতে ইংরাজের প্রচলিত নীতির যে সমালোচনা করেন, তাহা শাসক মহলে আলোড়ন আনয়ন করিয়াছিল এবং উহা তাঁহার পরবর্তী জীবনের উন্নতির প্রতিবন্ধক প্রমাণিত হইয়াছিল। রাজেন্দ্রলাল বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলনের একজন উৎসাহী সমর্থক ছিলেন। তিনি বগুড়ায় সাব ডেপুটি থাকা কালে ইংরাজ শাসকগণ কর্তৃক 'বঙ্গ আমার জননী আমার ধাত্রী আমার আমার দেশ' শীর্ষক গানটি নিষিদ্ধ হয়। ইহাতে বিচলিত না হইয়া বগুড়ায়—'ভিক্টোরিয়া থিয়েটার' রাজেন্দ্রলালের পরামর্শক্রমে ঐ গানটি প্রতিবার বিবর্তিত সময় কনসার্টে বাজাইবার ব্যবস্থা করেন। শুনিত পাওয়া যায় রাজসাহী বিভাগের তদানীন্তন কমিশনার রিড সাহেব (পরবর্তীকালে আসামের গভর্নর) রাজেন্দ্রলালকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে উন্নীত করিবার জন্ত সুপারিশ করিলেও বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলনের সহিত যুক্ত থাকিবার অপরাধে ফুলার সাহেব তাঁহার মনোনয়ন অগ্রাহ্য করেন।

রাজেন্দ্রলালের প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ 'বাংলার প্রতাপ' তাহার পরে তিনি 'বাণী ভবানী,' 'বীর কাহিনী,' 'মায়াটির কথা,' 'ছত্রপতি শিবাজি,' 'দিশিঙ্গের বাড়ালী,' 'বাক্সালীর বল,' 'বাক্সালার ধর্মগুরু' (দুই খণ্ড), 'বিপ্লবী বাংলা,' 'মৃত্যুর পরপারে' (দুই খণ্ড), 'স্বামী অভেনানন্দ' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন এবং জুলাই মাসের ৮০ দিনে 'ভ্রূ প্রদক্ষিণ,' 'চন্দ্রলোক বাত্রা,' 'পাতালে,' 'বেলুনে পাঁচ গুস্তাহ' প্রভৃতি গ্রন্থ অম্ববাদ করেন। টলষ্টয়ের *Ressurrection* ভিক্টর হুগোর *Hunch Back of Notterdum*, আনাতোস ফ্রান্সের *Red Lily*-র মর্মান্ববাদ 'পুনর্জন্ম,' 'ডেব মেউল' ও 'বুদ্ধকর্মস' নামে বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 'নিকালোকান্দিব' ভারত বৃত্তান্ত তিনি 'শেখ হিন্দু সাম্রাজ্য' নাম দিয়া অম্ববাদ করিয়া 'সাহিত্য পত্রিকায়' প্রকাশ করেন। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের 'ফিরিস্তী ব'ণকের' মত রাজেন্দ্রলালের 'ফিরিস্তির বাণিজ্য' এককালে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। স্বাধীনতার সম্পাদনায় যখন 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হইতে থাকে, তখন রাজেন্দ্রলাল ছিয়াত্তরের মহাস্থবরের উপর ধারাবাহিক ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লিখিতে থাকেন। 'মহাস্থব' উপলক্ষ করিয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন, 'আপনার মহাস্থবর অপূর্ব ঐতিহাসিক তথ্য হইয়াছে কিন্তু ভয় হয় উহা ছাপিতে গিয়া বঙ্গদর্শন বন্ধ করিতে না হয়।' প্রবাসী সম্পাদক স্বর্গীয় রামানন্দ চাট্টাধ্যায় একবার ডেটগ্রহণ করিয়াছিলেন—তাহাতে রাজেন্দ্রলালের 'বাক্সালীর বল' বাংলা সাহিত্যের একশতাব্দী ভাল বইয়ের অগ্রতম বলিয়া নির্বাচিত হয়। ইহাই রাজেন্দ্রলালের রচনার শ্রেষ্ঠত্বের অগ্রতম নিদর্শন। কবিতা ও প্রবন্ধে যে তিনি কত লিখিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে নাটক রচনা ও অভিনয়েও রাজেন্দ্রলালের কৃতিত্ব দেখা যায়। পূর্বে রাজসাহীর আচার্য্যপরিবারে হর্গোৎসবের সময় নাটক অভিনীত হইত। উক্ত অভিনয়ের জন্ত রাজেন্দ্রলাল প্রতিবৎসরই নূতন নূতন নাটক রচনা করিয়া দিতেন এবং উহারই অভিনয় হইত রাজেন্দ্রলালের লিখিত এবং প্রকাশিত নাটকের মধ্যে উহা এবং প্রায়শ্চিত্ত উল্লেখযোগ্য।

গুরু সাহিত্যিক হিসাবেই রাজেন্দ্রলালের কৃতিত্ব নহে—গঠনকারী কর্মী হিসাবেও তিনি সুপরিচিত। রাজসাহী বরেন্দ্র অম্বসকান সমিতির প্রতিষ্ঠা ও উন্নতি সাধনের জন্ত যে সকল ব্যক্তি স্বর্গীয়

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের পাখে সমবেত হইরাছিলেন রাজেন্দ্রলাল আচাধ্য তাঁহাদের অগ্রতম। পরবর্তী কালে রাজসাহী ত্যাগ করিয়া বারাকপুরে বাস করিতে আবস্ত করিলেও তাঁহার দেশ হিতৈষণা লোপ পায় নাই। বারাকপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় এবং বারাকপুর মহেন্দ্রনাথ কলেজেও তিনি অগ্রতম প্রতিষ্ঠাতা এবং পরিচালক সমিতির সভ্য। বারাকপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সমিতি ও মঠ প্রতিষ্ঠাও তাঁহার অগ্রতম কীর্তি। স্বামী অভেনানন্দ মহারাজের নিকট দীক্ষিত হইয়া তিনি স্বামীজি মহারাজের বিশেষ স্নেহ ও কৃপাভাজন হইয়াছিলেন এবং স্বামীজির অনেকগুলি ইংরাজি রচনার বাংলা অম্ববাদ করেন। স্বামী অভেনানন্দ মহারাজের একখানি জীবনীও তিনি বাংলা ভাষায় রচনা করিয়াছেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় যখন বাঙ্গালী যুবকেরা দলে দলে যুদ্ধে বাইতে থাকেন, রাজেন্দ্রলাল তাঁহাদের একজন উৎসাহী সমর্থক এবং প্রচারক ছিলেন। ১৯শ সংখ্যক বেঙ্গলী রেজিমেণ্টের জন্ত তিনি কয়েকটি জাতীয়সঙ্গীতও রচনা করিয়া দিয়াছিলেন; যথা—

১। বঙ্গবীরের বংশ আমরা কতু না শত্রু করিব ভয়।

অর্থাৎ আনিব দেশের তরে অরাতি কিরীট করিয়া জয়, ইত্যাদি।

২। কোথা গোবর্গ কোথায় কেদার কোথা রাম সেতু কোথা গান্ধার রণভঙ্গার ধ্বনি বাহার জলধি হইতে জলধি শেব। ইত্যাদি।

রাজেন্দ্রলালের সাহিত্য রচনায় যুদ্ধ হইয়া ১৩২৬ সালে 'বঙ্গ সাহিত্য সারস্বত মণ্ডল' তাঁহাকে 'পূরাতত্ত্ব' এবং নিখিল ভারত সাহিত্য সভা ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে 'বিজ্ঞানভূষণ' ও 'সাহিত্য সরস্বতী' উপাধিতে ভূষিত করেন। পরবর্তীকালে ইংরাজ সরকারও তাঁহার সাহিত্য সাধনার জন্ত রাজেন্দ্রলালকে রায় সাহেব উপাধি দান করেন। ইহাব্যতীত বহু পদক ও পুরস্কারও তিনি সাহিত্য রচনার জন্ত পাইয়াছেন।

পাবনা জেলার ভারেন্দ্রা গ্রামের বিখ্যাত চৌধুরী জমিদার বংশের ১৭যোগেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের মহ্যমা ভগ্নী শ্রীযুক্তা হেমললিতা দেবীর সহিত রাজেন্দ্রলাল আচার্য্যের বিবাহ হয়। তাঁহাদের দাম্পত্য-জীবন অতিশয় মধুর। কিন্তু কয়েকটি পুত্রের পর পর মৃত্যু হওয়ার তাঁহার শেষ জীবন কতকটা শোকাবহ হইয়াছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তাঁহার দুইটি পুত্র রজনলাল ও দ্বিজেনলাল যখন যুদ্ধে গমন করেন, তাহাতে স্বামী-স্ত্রী গৌরবই অম্বভব করিয়াছিলেন এবং উভয়ে একত্রে বাইয়া সন্তানদ্বয়কে ফোট উইলিয়ামে পৌছিয়া দিয়া আসেন। "কেন যুদ্ধে বাইতেছ?" জিজ্ঞাসিত হইয়া রজনলাল বলিয়াছিলেন—"দেশের জন্ত—যদি ফিরিয়া আসি, তবে আমাদের সমর-কৌশল শিক্ষা স্বাধীন ভারতের সেবায় নিয়োজিত হইবে। আর যদি না ফিরি, তবে যুদ্ধক্ষেত্রে আমার মৃত্যু 'বাক্সালীর বলের' লেখকের উপযুক্তই হইবে।" রজনলাল সত্যিই আর ফিরেন নাই। ব্রহ্মদেশের মিটকিনীর সমর-ক্ষেত্রে জীবন দিয়া নিজ পিতার 'বাক্সালীর বল' রচনার বাধার্থ্য্য প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। ইহার পর হইতেই রাজেন্দ্রলাল পরলোকভঙ্গ সম্বন্ধে গবেষণা করিতেছেন এবং পরলোকভঙ্গ সম্বন্ধে তাঁহার 'মৃত্যুর পরপারে' ১ম ও ২য় খণ্ড অতি উপাদেয় গ্রন্থ।

প্রায় অশীতিবর্ষ বয়সে রাজেন্দ্রলাল এখনও অটুট মনোবল লইয়া সাহিত্য সাধনা করিতেছেন। রোগ তাঁহাকে শীর্ণ করিয়াছে। শোক তাঁহাকে জীর্ণ করিয়াছে, তবুও অবিচলিতচিত্তে তিনি সাহিত্য সাধনা

করিয়া চলিয়াছেন, যাহার মূল সুরাই হইল বাঙ্গালীর জাতীয় চেতনা ও শ্রেষ্ঠত্ব। 'ঐ সঙ্গে অক্লান্ত ভাবে তিনি করিয়া চলিয়াছেন সুরেন্দ্রনাথ কলেজ ও ত্রিপুরা সমিতি ও মঠের মাধ্যমে সমাজসেবা। রাধেন্দ্রলাল ঈশ্বরীতীর্থ পদাৰ্পণ করিবেন;—তিনি শতায়ু হউন।

শ্রীচরুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

[বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক]

অপূৰ্ণ কৰ্ম্মনষ্টা, বিজ্ঞান সাধনা ও সাহিত্যচর্চা এঁর জীবনের মূল মন্ত্র। বহুক্ষেপে বিভূষিত হলেও এই তিনটি বিষয়ের তিনি একনিষ্ঠ পূজারী। তাই এই সাতাত্তর বছর বয়সেও তিনি ধিরলস ভাবে সাহিত্য চর্চা করে চলেছেন। বঙ্গ জননীর অমৃত ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করে চলেছেন আজও।

বর্তমান কালে যে কয়েকজন শক্তিশালী লেখক বিজ্ঞানালোচনার অগ্রণী হ'য়েছেন তন্মধ্যে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক শ্রীচরুচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। একথা আজ অস্বীকার করবার উপায় নেই যে—পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক ও বিজ্ঞানের কৃতী ছাত্র চারুচন্দ্র আধুনিক যুগের একজন জনপ্রিয় বিজ্ঞান-সাহিত্যিক। সরস বর্ণনাভঙ্গী এবং অতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবহকার ও চিন্তাধারা সম্বন্ধে সচেতনতা তাঁর রচনাকে একটি বিশিষ্টতা দান করেছে। চারুচন্দ্রের রচনায় ভারতীয় চিন্তাধারার প্রভাব স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

এই জ্ঞানী, গুণী নিরঙ্কর অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য বর্তমান কালের শ্রেষ্ঠ কাব্য কবিত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য ও সম্পর্কে এসে বিশ্বভারতী প্রকাশনীর সমৃদ্ধ করেন নানাতাবে ও নানাদিকে। বাংলা দেশে যে পাঁচ জন বৈজ্ঞানিক রয়াল সোসাইটির সদস্য মনোনীত হয় বিধে বৈজ্ঞানিক অবদানের জন্তে তন্মধ্যে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু, মেঘনাদ সাহা, প্রশান্ত মহালানবীশ, শিশির মিত্র, সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র ব্যতীত অপর চার জন হচ্ছেন চারুচন্দ্রের ছাত্র। এঁরা ছাড়াও বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক স্বর্গতঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞান মুখার্জী এবং আরও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের ছাত্র। এঁর জীবনের মাঝে দেখতে পাই উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সংমিশ্রণ—জ্ঞানী ও গীতের অপূর্ণ সংযোগ।

১৮৮৩ সালের ২১শে জুন ২৪ পরগণা জিলার হরিনাভি গ্রামের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে শ্রীভট্টাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। পিতা স্বর্গতঃ বসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য।

শ্রীভট্টাচার্য্যের বাল্য ও কলেজ জীবন সম্বন্ধে শ্রীভট্টাচার্য্যের নিজের মুখের কথাই এখানে উদ্ধৃত করছি—

বাল্যকালে একটি নূতন স্কুলে ৩ বছর পড়ে ১০ বছর বয়সে কলকাতায় আসি। কলকাতা মেট্রোপলিটান স্কুলে (বউবাজার থানা) এসে ভর্তি হওয়ার দুই মাস পরে একদিন ওনতে পেলুম সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাপ্রয়াণ করেছেন। এত কাছে থেকে তাঁকে দেখা হলো না। এজ্ঞে মনে কোঁড় রয়ে গেল। আমার স্পষ্ট মন্বণ আছে সেদিন আমাদের স্কুল হ'লো না। ১৮৯১ সালে মেট্রোপলিটান ইন্সটিটিউশন থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ

হই এক মেট্রোপলিটান (বর্তমান বিদ্যাসাগর) কলেজে এফ, এ পড়ি। সে সময়ে আমাদের ইংরেজী ভাষার অধ্যাপক ছিলেন স্বর্গতঃ এন, এন, ঘোষ, জ্ঞান ব্যানার্জী, মোহিতচন্দ্র সেন এবং ক্ষেত্রগোপাল ঘোষ প্রমুখ। ১৯০১ সালে এফ, এ পরীক্ষায় কৃতকার্য্যলাভের পর প্রেসিডেন্সী কলেজে বি, এ (বি কোর্স) ক্লাসে ভর্তি হলুম। সে সময়ে প্রেসিডেন্সী কলেজে আমাদের অধ্যাপক ছিলেন আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, অধ্যাপক মিঃ পার্শ্বেল প্রমুখ তৎকালীন প্রখ্যাত অধ্যাপকগণ। আমি যখন ৪র্থ বাৎসরিক শ্রেণীতে পড়ি তখন ডক্টর পি, কে, রায় ভারতীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপকের পদলাভ করেন কিছুদিনের জন্তে। ১৯০৩ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি, এ, পরীক্ষায় সাফল্যলাভ করে পদার্থ বিজ্ঞায় এম, এ, পড়ি এবং ১৯০৪ সালে পদার্থ বিজ্ঞায় সসম্মানে এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই। এম, এ পড়বার সময় আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর অধীনে গবেষণা আরম্ভ করি এবং এম, এ পাশ করার পরও আচার্য্য বসুর অধীনে গবেষণা কার্য্যে রত থাকি। তার পর প্রেসিডেন্সী কলেজে পদার্থ বিজ্ঞায় লেকচারার হয়ে যোগ দিই। সন তারিখ মাস আর মনে নাই। তার পর প্রেসিডেন্সী কলেজেই পদার্থ বিজ্ঞার অধ্যাপক হই এবং বিজ্ঞান বিষয়ের অধ্যাপনা করতে থাকি।

ছাত্রাবস্থায় আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর সান্নিধ্য লাভ করি এবং তাঁর মৃত্যুদিন পর্যন্ত আচার্য্যদেবের সঙ্গ লাভ করি।

দীর্ঘকাল অধ্যাপনার পর ১৯৪০ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজের পদার্থ বিজ্ঞার অধ্যাপকের পদ থেকে শ্রীভট্টাচার্য্য অবসর গ্রহণ করেন। অতাবধি তিনি বিশ্বভারতী ও অন্যান্য বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে গভীর ভাবে সান্নিষ্ট। তন্মধ্যে বর্তমানে তিনি রামমোহন লাইব্রেরীর সভাপতি, রবীন্দ্র ভারতীর সহ-সভাপতি। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সহ সভাপতি, অবনীন্দ্র পরিষদের সভাপতি, ভারত সভার সহ-সভাপতি প্রভৃতি কয়েকটি সংস্থার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শ্রীভট্টাচার্য্যের দীর্ঘ কৰ্ম্মময় জীবনে অপর একটি দিক হচ্ছে কবিত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য ও সহযোগিতা। ১৯১৭ সালে বিশ্বভারতী সন্মিলনী প্রাতিষ্ঠিত হ'লো। সে সময় রবীন্দ্রনাথ সেখানে রচনা ও কবিতা পাঠ করতেন। শ্রীভট্টাচার্য্য তাতে বিশেষ আকৃষ্ট হন। তিনি উক্ত সন্মিলনীর সম্পাদক ছিলেন। বিশ্বভারতী বন্ধন স্থাপিত হ'লো তখন কবিত্ত্ব রবীন্দ্রনাথ প্রকাশনী বিভাগটির পরিচালনা তাঁর হাতে ছেড়ে দিলেন। শ্রীভট্টাচার্য্যের যুগের কথাই বলি, ১৯২২ সাল থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ যে তার আমার উপর অর্পণ করেছিলেন সে দায়িত্ব তার বহন করেছিলাম। আজ দু'বছর হ'ল সে ভার হ'তে অব্যাহতি নিয়েছি। বিশ্বভারতীর কার্য্য নির্বাহক পরিষদ ও তার অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে গোড়া থেকেই আমি যুক্ত ছিলাম।

বর্তমানে 'বহুমতী' মাসিক পত্রিকার সম্পাদনার ভার আমার উপরেই পড়েছে। রবীন্দ্র ভারতী ও বিশ্বভারতীর পুস্তক প্রকাশন বিভাগের উপদেষ্টা হিসেবে এখনও আমি সক্রিয় আছি।

শ্রীভট্টাচার্য্য বিজ্ঞানের সাধনার রত থেকেও পরম শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সঙ্গে বঙ্গ সাহিত্যের সেবা করে চলেছেন আজও। প্রাঞ্জল ও সরল রচনাবলী এঁর অপর বৈশিষ্ট্য। এঁর রচিত প্রমুখলি পাঠক সমাজে

যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছে। এঁর প্রচেষ্টায় বাংলা বিজ্ঞান সাহিত্য ক্ষেত্রেই সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। শ্রীভট্টাচার্য এ বাবত ২৫ খানার উপর পুস্তক প্রণয়ন করেছেন তন্মধ্যে নব্য বিজ্ঞান (১৩২৫), বাঙ্গালীর খাজ (১৩২৬), বিশ্বের উপাদান (১৩৫০), তড়িতের অভ্যুদয় (১৩৫৫), আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু (১৯৩৮), জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার (১৩৫০), ব্যাধির পরাজয় (১৩৫৬) পদার্থ বিজ্ঞান নবযুগ। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার কাহিনী প্রভৃতি গ্রন্থের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

আমরা এই জ্ঞান তপস্বী, বঙ্গ ভারতীয় একনিষ্ঠ পূজ্য অধ্যাপক ভট্টাচার্যের দীর্ঘজীবন কাহিনী করি এবং আশা রাখি তিনি আরও দীর্ঘকাল বেঁচে থেকে বঙ্গজননী তথা ভারত ও বিশ্ববানীর জ্ঞান ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করবেন।

অধ্যক্ষ শ্রী অমিয়কুমার সেন

[প্রখ্যাত জ্ঞান-তপস্বী]

‘গীর্ষী’ গৃহস্থ ঘরের ছেলে বঙ্গ কষ্টের মধ্যে জীবন চালিয়েছি সঙ্গের অভাব অনটন সঙ্কে বেশ অভিজ্ঞতা হয়েছে। তাই মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে মেয়েদের শিক্ষাদীক্ষা ক্রমেই হয় আমার ভাল ভাবে জানা আছে—জানালেন অভিজ্ঞ শিক্ষক ও ছাত্র দরদী অধ্যক্ষ শ্রী অমিয়কুমার সেন। কথাগুলো বলার সময় তাঁহার চোখের সজল ভাব আমার নজর এড়িয়ে যায় নাই।

কলিকাতা সিটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক পরলোকগত অন্নদাচরণ সেন ও ৬বসন্তকুমারী দেবীর প্রথম সন্তান অমিয়কুমার ১৮৮৭ সালের ৭ই আগষ্ট বরিশাল সহরে জন্মগ্রহণ করেন। স্বগ্রাম ছিল বরিশাল জেলার গুটিয়া গ্রাম। ৬মোদায় গুটিয়াহুতার শীকার ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করার অন্নদাচরণ নিজ পরিবার হইতে বিচ্যুত হইয়া কলিকাতা সিটি স্কুলে শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন এবং শিশু পুত্র সহ ত্রীকোণে লইয়া কলিকাতায় চলিয়া আসেন। সাত বৎসর পরে উল্লেখিত মহাকুমার বানীবন-গ্রামে তাঁহার পরিবারবর্গের বসতি স্থাপনা করেন। অমিয়কুমার স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয় হইতে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা সিটি স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হন। তথা হইতে দশ টাকা বৃত্তি সহ ১৯১৩ সালে প্রবেশিকা, সিটি কলেজ হইতে ১৯১৫ সালে আই-এ-তে দ্বিতীয় ও ১৯১৭ সালে ইংরাজী সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থানধিকারীরূপে গ্রাজুয়েট হন এবং ১৯১৯ সালে উক্ত বিষয়ে প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় ছাত্র হিসাবে এম. এ পাশ করেন। ১৯২০ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচারার হিসাবে কার্য যোগদান করেন। ১৯৪৫ সালে তিনি কলিকাতা সিটি কলেজের অধ্যক্ষ রূপে নিযুক্ত হন। তাঁহার ছাত্রজীবনের সমসাময়িক ও সতীর্থদের মধ্যে নেতাজী সুভাষ, রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, প্রিয়রঞ্জন সেন, ক্ষিতীশ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

অধ্যক্ষ সেনের সহধর্মিণী হলেন ৬এককড়ি সিংহারের কন্যা শ্রীমতী সুরমা সেন, তৃতীয় ভ্রাতা কলিকাতা কণ্ঠোবেশনের টাফ ইঞ্জিনিয়ার শ্রীমতী সেন এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা গ্যারিষ্টার অরুণ সেন হলেন সিটি কলেজের কমার্স বিভাগের অধ্যক্ষ।

শ্রীসেন বিগত চৌদ্দ বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ে সিনেটের সহিত জড়িত, পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির ভূতপূর্ব সভাপতি

ও প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতির সভাপতি, ব্রাহ্মসমাজ কার্যকরী সমিতির ট্রাষ্টী ও সদস্য, ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ের পরিচালন কমিটির সদস্য ও অস্কাগ প্রতিনিধির সহিত যুক্ত আছেন।

আমার জিজ্ঞাসায় অন্ততম প্রবীণ শিক্ষাবিদ ও ছাত্র সমাজের কল্যাণকামী হিসাবে তাঁহার অতমত জানালেন :—

১। শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহকদল বাঙ্গালী নিম্ন বর্গাবিত্ত পরিবার মেধাবী ছাত্র পাওয়া যায় সে স্থান হতে। কিন্তু হৃৎথের কথা যে আজ ওই পরিবারগুলি আর্থিক ও অর্থনৈতিক চাপে এবং শিক্ষার বিকল্প আবহাওয়ার ধ্বংসের পথে। এরা কখনও শ্রমবিমুখ হতে পারে না।

২। উচ্চশিক্ষার সমাপ্তিতে ছাত্ররা যখন স্বদেশ, বিদেশ তথা পৃথিবীর চারিপ্রান্তের সঙ্গে সুপরিচিত হবে—তখনই তাহারা যে কোন আন্দোলনে যোগ দিতে পারে। তার আগে তাহারা পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে নিজের নিয়োজিত রাখবে—রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে দূরে থাকবে—আর কলেজ কর্তৃপক্ষের সাথে তাদের হবে শিক্ষার ব্যাপারে পূর্ণ সহযোগিতা।

৩। শিক্ষাধীন বিষয় হবে—হিউম্যানাইটিজ ও বিজ্ঞান। কিন্তু বিদেশে পাঠ্য করা হয়েছে—সমাজবিজ্ঞান, কলাবিজ্ঞান ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান। তিনটি স্বত্বই প্রথমদিকে প্রতিছাত্রকে পড়ান প্রয়োজন—শিক্ষার উচ্চতরে যে কোন একটি গ্রহণ করিলে শিক্ষার্থীর মানসিক বিকাশে পূর্ণতা আসিবে। পরিণত মননশীলতা হবে বিশেষ শিক্ষার উর্বর ক্ষেত্র।

৪। সূত্রে পরিবেশ ও সুপরিচালনার ভিন্ন বৎসরের ডিগ্রী কোর্স দেশে শিক্ষাধিকারকে উন্নততর করিবে।

৫। সরকারী ও বেসরকারী কলেজগুলির মধ্যে কোন প্রভেদ-চিহ্ন থাকা বর্তমান ভারতে বাহনীয় নয়।

৬। আর কলেজী-শিক্ষা সর্বোত্তম মুখী উন্নত করিতে হইলে মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের দ্বার পৃথক ‘আওয়ার-গ্রাজুয়েট’ উপকোর্স বোর্ড গঠন করা প্রয়োজন—বিশ্ববিদ্যালয়, সরকার ও কলেজ প্রতিনিধিদের নিয়ে। তবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকবে এই বোর্ড। ইহার প্রধান কাজ হবে কলেজী-শিক্ষাকে সুন্দরভাবে কালের উপযোগী করে পুনর্গঠিত করা।

৭। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রান্টস কমিশন অধ্যাপকদের বেতনবৃদ্ধি সম্বন্ধে মনোবাগী হয়েছেন—ইহা আনন্দের কথা। কিন্তু অস্কাগ বিষয়ে ইহার আরও তৎপর হওয়া বিধেয়। প্রয়োজন হলে দেশে শিক্ষা-কর ধার্য করা যেতে পারে—প্রতিটা স্বাধীন দেশে ইহা চালু আছে।

শেষে তিনি ব্যক্তি চিত্তে বলেন যে, প্রকৃত জীবনদর্শন যদি আমরা স্থাপনা করি, তবে দেশ থেকে হীনোতি, অনাচার ও অবিচারকে চিরতরে নির্মূল করে দেওয়া



অধ্যক্ষ শ্রী অমিয়কুমার সেন

যায়। আর অস্বরোধ করলেন রাজনৈতিক দলগুলিকে—যেন বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর উজ্জল ভবিষ্যতের জন্য ছাত্র সম্প্রদায়কে রাজনীতির আবর্ত হতে দূরে রাখা হয়।

ডক্টর দ্বিজেন্দ্রবিনোদ সিংহ রায়

[কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজের অধ্যাপক]

আমার বহুমূল্য ধারণা যে প্রত্যেকে প্রত্যেকের নির্ধারিত কাজ যদি ঠিকমত করে তবে দৈনন্দিন সমস্যার অনেকটা লাঘব হতে পারে। আজ দেখা যায় যে সর্বস্তরে পরিশ্রমবিমুখতা বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর হৃদশা বুদ্ধির কারণ। তাই সরকারী, বেসরকারী ও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় বাঙ্গালী ও বাঙ্গলার সমাজ জীবনকে উচ্চপাখ্যে নিয়ে যেতে হবে—বিজ্ঞানের প্রীতিসম্ভাবনের পর আমার জানানলেন কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজের অধ্যাপক ডক্টর দ্বিজেন্দ্রবিনোদ সিংহরায়।

ছয় ভাই ও চার বোনের মধ্যে তৃতীয় সন্তান দ্বিজেন্দ্রবিনোদ ১৯১২ সনের জুলাই মাসে স্বগ্রাম চাঁদপুর বাবুরহাটে (আশীকাঠিতে) জন্মগ্রহণ করেন। বাবা ৬য়ামিনীমোহন সিংহরায় কুমিল্লা কোর্টে মুছরী হিসাবে বখেট উপাধ্যক্ষন করেন এবং প্রতিটি ছেলেমেয়েকে সুশিক্ষিত করার জন্য স্রব্যবস্থা করেন। চাঁদপুর ও কুমিল্লার সুপরিত্ত, সুশিক্ষিত উত্তোঙ্গী যামিনী বাবুকে হারালেন তাঁহার পত্নীয়া সন্তানেরা। ফলে সংসারে দেখা দিল আর্থিক অসুবিধা। তখন দ্বিজেন্দ্রবিনোদ কলিকাতা বিজ্ঞানসাগর কলেজে বি. এস-সি-সি ছাত্র। ইতিমধ্যে ১৯২১ সালে বাবুরহাট উচ্চ বিদ্যালয় হতে প্রবেশিকা ও কুমিল্লা কলেজ থেকে ১৯৩১ সালে তিনি আই, এস-সি পাশ করেন। ফিজিক্সে অনার্স সহ গ্রাজুয়েট হইয়া ১৯৩৫ সালে তিনি Applied Physics-এ প্রথম শ্রেণীর তৃতীয় হিসাবে এম, এস-সি ডিগ্রী লইয়া কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজে গবেষণা করিতে থাকেন। ইহার পর ১৯৩৭ সালে তিনি আন্তোভ কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন ও ১৯৪৪ সালে বিজ্ঞান কলেজে আংশিক সময়ের জন্য লেকচারার হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৫০ এর এপ্রিল



ডক্টর দ্বিজেন্দ্রবিনোদ সিংহ রায়

মাসে (দীর্ঘ তের বৎসর আন্তোভ কলেজে থাকার পর) তিনি বিজ্ঞান কলেজে পাকাপাকি ভাবে যুক্ত হন।

যৌব ট্রাভেলিং ফেলোশিপ লইয়া ক্রীসিংহরায় ১৯৫২ সনে টেজিটন জাতীয় গবেষণাগারের ফিজিক্স বিভাগে যোগদান করেন। ১৯৫৩র জানুয়ারী হইতে তিনি লণ্ডন ইম্পিরিয়াল কলেজে গবেষণা কার্যে লিপ্ত হন এবং A study of the Mechanism of Nuclear Boiling নামক প্রবন্ধ দাখিল করিয়া তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের Ph. D. লাভ করেন। ইহা ছাড়া তিনি ফ্যাকালটি অব ইনজিনিয়ারিং এর D. I. C. হন। Specialized in Heat Transfer তাঁহার গবেষণার মুখ্য বিষয় ছিল। এই সময়ে তাঁরাকে ব্রিটিশ ফিজিক্যাল সোসাইটি ও লণ্ডন ইন: অব ফিজিক্স এর সদস্য করা হয়। টেজিটন ও লণ্ডনে তিনি অধ্যাপক ই গ্রিথিংস এফ, আর, এস এবং অধ্যাপক ডি. এম, নিউইট এফ, আর, এস, র অধীনে কার্য করেন। বিলাতে থাকার সময় ছুটিতে তিনি পশ্চিম জার্মানীর কয়লা, ইস্পাত ও অক্সিজেন শিল্পাঞ্চলসমূহ, ফ্রান্স, ইতালী, বেলজিয়াম প্রভৃতি যুক্তোত্তর দেশসমূহ পরিভ্রমণ করেন। Gottingen বিশ্ববিদ্যালয়ে অমুষ্ঠিত জার্মান ও ব্রিটিশ Physical Societyর যুগ্ম সম্মেলনে একমাত্র ভারতীয় প্রতিনিধি হিসাবে ডা: সিংহরায় যোগদান করেন। আমেসটারড্যাম Van-Der-Wal ও ইংল্যান্ডের Cavendish Laboratory পরিদর্শন ও উল্লেখযোগ্য। ১৯৫৫ সালের মে মাসে ভারতে ফেরার পর বৎসর এপ্রিলে তিনি বিজ্ঞান কলেজের রীডার নিযুক্ত হন। মধ্যে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিজিক্স এর এসো: প্রফেসর নিযুক্ত হন কিন্তু ডা: সিংহরায় যোগদান করিতে পারেন নাই। তাঁহার অধ্যাপনা জীবনের প্রথমে পরলোকগত ডা: জামাধরসদেব অকুঠ দরদ ও বিজ্ঞান কলেজে যোগদানের পর অধ্যাপক পি, এন, ঘোষ এবং অধ্যাপক পি, সি, মহান্তির স্বার্থহীন সহযোগিতা দ্বিজেন্দ্রবিনোদবাবু কুতজ্ঞচিত্তে শ্রবণ করেন।

ছাত্রাবস্থায় তিনি বিজ্ঞানসাগর কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুটবল দলের নিয়মিত খেলোয়াড় ছিলেন। পোষ্ট গ্রাজুয়েট ইউনিয়নের সম্পাদক, বিজ্ঞান পরিষদের (বি: কলেজ) প্রথম সম্পাদক, ভারতীয় ফিজিক্যাল সোসাইটির বর্তমান কর্মসচিব। সিনেটের সদস্য প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত তিনি জড়িত ছিলেন বা আছেন।

১৯৪১ সাল হইতে এই পর্যন্ত তিনি বহু পাঠ্যপুস্তক রচনা করিয়াছেন এবং ভারতীয়, সিংহ ও ব্রহ্মদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নির্ধাচিত বই হিসাবে সেগুলি চলিতেছে। ১৯৪১ সালে তিনি ফরিদপুরের ক্রীপ্রতাপচন্দ্র চৌধুরীর তনয়া ক্রীমতী কনিকা দেবীকে বিবাহ করেন। ছবি তোলা তাঁহার 'হবি'। ছাত্রজীবনে 'লীগ অব নেশনস' বিষয়ক প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি পুরস্কার পান। যুরোপে থাকার সময় তিনি মহাকবি গোটে ও সেক্সপীয়ারের মূহে প্রায়ই বাইতেন।

শেষে তিনি বলেন যে, বিজ্ঞান কলেজে এমন কয়েকজন প্রবীণ অধ্যাপক রহিয়াছেন—বাদের সহায়তায় রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকার বঙ্গানিয়ন্ত্রণ, নদানিয়ন্ত্রণ, আন্তর্জাতিক পরিব্রজনা প্রভৃতি সমাজহিতকর কার্যগুলি সুষ্ঠুভাবে নির্বাহ করিতে পারেন। কারণ এই সমস্ত বৈজ্ঞানিক অধ্যাপকগণ বাঙ্গলা তথা ভারতের নানা সমস্যার সমাধানে আগ্রহশীল আর তাঁহারা বরাবর রাজনৈতিক দলাদলির বাহিরে থাকিয়া নিজদের গবেষণা কার্যে লিপ্ত রইয়াছেন।



এরী

—রামকিঙ্কর সিংহ

॥ আলোকচিত্র ॥

শ্রীকেশী

—তপতী আচার্য

অবগুষ্ঠিত।

—মিহির কল্যাণাচার্য





তিমালয়

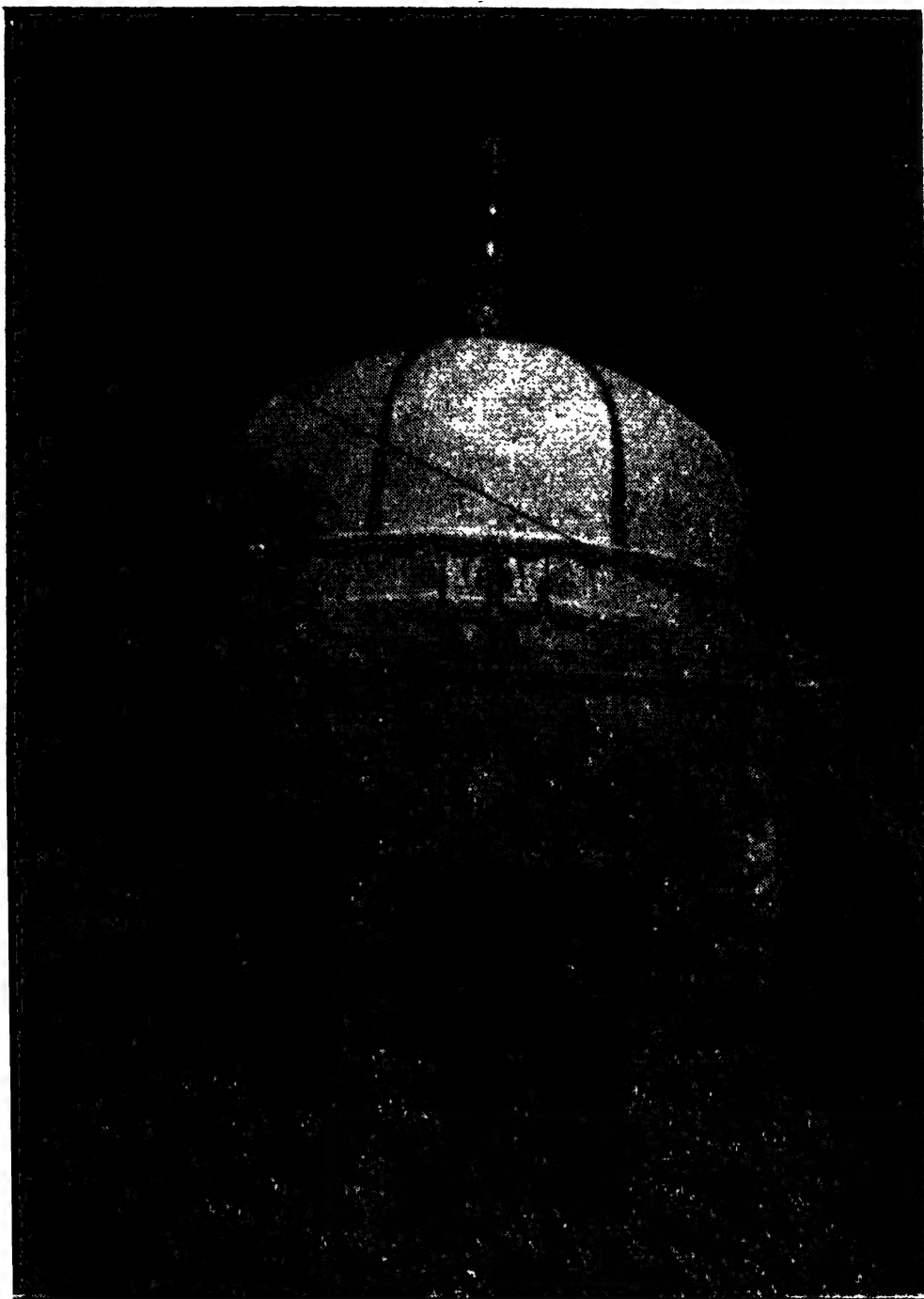
—ঐপথিক মুখোপাধ্যায়

থেয়ালী শিশু

—ডা: অমলাকুমার ঘোষ

—মন্টু সোহা





আজমীর শরিফ

—সাধনা সো.



विद्यया ऽपि

— वाचिः प्रवर्तते —

চলো শ্রীধরের ওখানে যাই এবার। নিমাই বললে পড়ুয়াদের। যদি সেখানে জিততে পারি তবেই আমার জয়কার।

শ্রীধর বাজারে কলার খোলা বেচে, বেচে খোর মোচা। সামান্য আয়ের মানুষ, তা থেকে যদি বা কিছু উদ্ধৃত থাকে কৃষ্ণসেবায় ব্যয় করে। যদি উদ্ধৃত না থাকে তাতেও ছুঃখ নেই, মুখের নাম কে হরণ করবে? দিবানিশি উচ্চকণ্ঠে কৃষ্ণ বলে। এত জোরে চৈচায় পাশের বাড়ির লোক ঘুমুতে পারে না।

‘এই উপহাসের মানে কী?’ নিমাই প্রায় তেড়ে আসে।

নিমাইকে ভীষণ ভয় করে শ্রীধর। বলে, ‘বেশ এবার থেকে আস্তে আস্তে নাম করব।’

‘কী দরকার এত হাঁক ডাকে? এতকাল তো হরি-হরি করলে কিন্তু হল কী?’ নিমাই রুখে থাকে তেমনি। ‘অবস্থার অভাব ঘূচল?’

‘কই আমার অভাব কই? আমি তো উপোস করে থাকিনা, আর ছোট হোক বড় হোক কাপড়ও তো পরি। রাজা রত্নঘরে থাকুক কিন্তু পাখিও তো আছে বৃক্ষশাখে। রত্ন নেই বলে পাখির ছুঃখ নেই। তেমনি তো তার আকাশ আছে।’

‘তোমার যখন এত সুখ তখন বিনাদামে জিনিস দাও।’ শ্রীধরের সওদাপাতিতে হাত দিল নিমাই।

মুঠো চেপে ধরে বাধা দিল শ্রীধর। বললে, ‘জিনিস নেবে তো দাম দিয়ে নেবে, কেড়ে নেবে কেন?’

‘তোমার তো অনেক আছে। তবে দেবে না কেন?’

‘আমি গরীব, আমার আবার কি থাকবে?’

‘তুমি আসলে কৃপণ, দান করতে চাও না।’ নিমাই চোখ পাকাল।

‘যাই হই, পণ্যের দাম ছাড়তে পারব না। তুমি বরং অল্প দোকানির কাছে যাও।’

‘তুমি বললেই হবে? আমার জোগানদার তুমি, আমাকে তোমার কাছ থেকেই নিতে হবে।’ নির্বিচল ঠাড়িয়ে রইল নিমাই।

‘ঠাকুর, তোমার পায়ে পড়ি। আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব কোরো না।’ করজোড়ে মিনতি করল শ্রীধর।

‘না, দ্বন্দ্ব কিসের? নিজের জিনিস নিজের নেব তাতে কার কী মাথাব্যথা? একথাবলা তরকারি তুলে নিল নিমাই।’

‘তোমার পায়ে পড়ি। গরীবের তুমি ক্ষতি কোরো

শ্রীধর
নিমাই
অস্বস্তি

না। অল্প দোকানে গিয়ে দৌরাওয়া করো।’ হাতের থেকে প্রায় আদ্রেক জিনিস কেড়ে নিল শ্রীধর।

নিমাই ক্রুদ্ধ হয়ে বললে, ‘তুমি আমার হাতের জিনিস কেড়ে নিচ্ছ?’

‘সবটা নিতে পারলাম কই? ওগো, বাকিটাও ফিরিয়ে দাও।’

নিমাই তবু নরম হল না, বললে, ‘এই দেওয়া জিনিস ফিরিয়ে নেওয়াটা কি ভালো হল?’

‘বা, আমি তোমাকে দিলাম কখন? তুমিই তো জোর করে তুলে নিয়েছ।’

‘জানো আমি কে?’

‘তা কে না জানে? তুমি টোলার পণ্ডিত, ঔদ্ধত্যের অবতার।’

‘আজ্ঞে না। তুমি গঙ্গাকে চেন তো? যে গঙ্গায় প্রতিদিন নৈবেদ্য দাও? কি, চেন?’

‘বা, পারকরী ভগভাগ্যবতী গঙ্গাকে চিনি না? সর্বশ্রমহরা সর্বদুঃখ প্রশমনী। শুদ্ধশ্রোতা, তেজোজ্বলা, মধুরজবা। হরিকৃষ্ণা পরমার্থী-পুরাতনী।’

‘বা চিনি বৈকি।’

‘সেই গঙ্গার বাপ আমি।’

‘ছি-ছি-ছি।’ হু হাত দিয়ে কান ঢাকল শ্রীধর। বিষ্ণু-বিষ্ণু কৃষ্ণ-কৃষ্ণ বলতে লাগল। ‘বয়সের সঙ্গে সঙ্গে লোকে ধীর হয়, ভদ্র হয়, তুমি একেবারে বিপরীত। যতই তোমার বয়স বাড়ছে ততই তুমি ছবিনীত হচ্ছে। তোমার কি গঙ্গাকেও ভয় নেই?’

‘আমার কাউকেই ভয় নেই। তুমি যদি তোমার দেবতাকে, গঙ্গাকে, বিনিদামে রোজ নৈবেদ্য দিতে পারো, আমাকে বিনিদামে না দেওয়া দিলে সন্দেহ নেই।’

তো দিতে, পারে। মেয়ে অমনি অমনি পাবে তার
বাপ দাম কিছু ধরে দিলেও পাবেনা খানিকটা ?'

'বেশ, তোমাকেও অমনি দেব। দাম কমাতে
পারবনা।' হাত ছেড়ে দিল শ্রীধর।

'দেবে ?' উজ্জল চোখে হাসতে লাগল নিমাই।
'যা বিনিদামে পাওয়া যায় তার মূল্যই অসীম। হোক
সে সামান্য, দেওয়ার গুণেই অপরূপ। কিন্তু দেবে
কী শুনি ?'

'রোজ একটুকরো খোর আর খোলার পাত্র দেব
তোমাকে আজীবন।'

'দেবে ?'

'দেব। হ্যাঁ, আমার সঙ্গে আর দ্বন্দ্ব কোরো না।'

'না, দ্বন্দ্ব কোথায় ? তোমার খোলায় আমি খাব।
তোমার খোর মোচাই শ্রীবাস্তব হয়ে উঠবে।'

প্রভু, আমি গৃহ, অকুর শ্রীকৃষ্ণের স্তব করছে :
স্বপ্নতুলা দেহ পুত্র গৃহ দারা অর্থ ও স্বজনকে সত্য ভেবে
ঘুরে মরছি। অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হয়ে অনিত্যে ও
অনাত্মে বিপরীত বৃদ্ধি করছি, দ্বন্দ্ব ত্রুড়ি করছি
সর্বক্ষণ। যা আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয় সেই আত্মাকেই
জানছি না। তৃণাচ্ছন্ন ম্লিন্ধ জল ছেড়ে মৃগতৃষ্ণার দিকে
ছুটছি। তোমাকে ত্যাগ করে ছুটছি দেহাভিমুখে।
আমি বিষয়-বাসনায় বিভ্রান্ত, কামে ও কমে ক্ষুভিত,
উন্মাদী। মনকে সংযত করতে অসমর্থ। প্রভু, মানুষের
সংসারের সমাপ্তি যখন কাছে আসে তখনই সাধুসেবায়
তোমার প্রতি তার মমতা হয়। কিন্তু তোমার কৃপা
না হলে কে বা করে সাধুসেবা, কার সাধ্য তোমাতে মতি
আনে। তুমিই সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের কারণ-আকর।
তুমিই পরিপূর্ণ। তুমিই সকলের নিয়ন্তা, সকলের
অধিষ্ঠাতা। তোমারই পদপরবশ হলাম, আমাকে
পরিভ্রাণ করে।

১৫

'মা, আমি কিছু দিন প্রবাস করে আসি।'

শচী চমকে উঠল। 'কোথায় ?'

'পদ্মায়। পূর্ববঙ্গে।'

শচী চাইল নিবৃত্ত করতে কিন্তু নিমাই টলল না।
লক্ষ্মীকে বললে, মাকে দেখো। মাকে বললে, দেখো
লক্ষ্মীকে।

অধ্যাপক-শিরোমণি নিমাই পণ্ডিত এসেছে,
দলে দলে লোক আসছে নিক-দিপ্তর থেকে। পড়ুয়ারা

বললে, ভেবেছিলাম নবদ্বীপ যাব, মূর্তিমন্ত বৃহস্পতি
ছায়ে এসে দাঁড়াল। তোমার চিহ্ননী মিলিয়ে ব্যাকরণ
অভ্যাস করি আমরা, এবার সাক্ষাৎ শিষ্য করো
আমাদের। তোমার মুখের অমৃতবচন শুনি।

অমৃতবচনই শোনাতে এসেছি তোমাদের কাছে।
প্রথমে নবদ্বীপে না হয়ে এই পনাপূত পূর্বাঞ্চলে।
সে বচন পার্থিব বিত্তা নয়, অমর্ত বিত্তা।

সে বিত্তার নাম কি ?

সে বিত্তার নাম হরিনাম। পরিণামে হরিনাম।

এ কী আশ্চর্য কথা।

যে নিমাই উদ্ধতের শিরোমণি, চঞ্চলের জয়োত্তম,
দিবানিশি যে পুঁথি-পাঁতি নিয়ে বিভোর, বৈষ্ণবে যার
প্রপাট বিতৃষ্ণা, সে কি না এখন হরিনাম বলছে। শুধু
বলছে না স্ফুটকণ্ঠে কীর্তন লাগিয়েছে। শুধু পথে-পথে
নয়, নদীতে, নোকোয়, এপারে-ওপারে। সজ্জন-দুর্জন
আচারী-বিচারী অক্ষম-অধম, পতিত-পীড়িত—সবাইকে
এক নোকোর সোয়ারী করে এক বন্দরে নিয়ে যাচ্ছে।
এক আনন্দের বন্দরে।

নিমাইয়ের সামনে দণ্ডবৎ হয়ে দাঁড়াল এক ব্রাহ্মণ।
গুচিভাস্বর মূর্তি।

'কে ?'

'আমি তপন মিশ্র।'

'কী চাই ?' দৃষ্টি আয়ত করল নিমাই।

'সাধ্য-সাধন বুঝতে চাই। বহু শাস্ত্রে বহু বাক্যে
চিন্তের বিভ্রম ঘটেছে।' চুই হাত মুক্ত করল তপন।
তাই আপনার কাছে এসেছি।'

'আমি সাধ্য-সাধনের কী জানি ?'

'প্রভু, আপনি জানেন না তো আর কে জানে ?
কাল রাত্রে স্বপ্ন দেখেছি, এক ব্রাহ্মণ এসে আমাকে
বলছে, তপন, নিমাই পণ্ডিত এসেছে, যদি সাধ্যসাধন
জানতে চাও তো তার কাছে গিয়ে প্রার্থনা করো।
জানবে সেই নরনারায়ণ, সেই পূর্ণব্রহ্ম। তার কাছ
থেকে জেনে নাও রহস্য। আর এ ঈশ্বরতত্ত্বের কথা
কোথাও যেন আর প্রকাশ কোরো না।'

'শুন শুন ওহে দ্বিজ পরমসুধীর।

চিন্তা না করিহ আর মন কর স্থির ॥

নিমাই পণ্ডিত-পাশ করহ গমন।

তিহঁই কহিবেন তোমা সাধ্য-সাধন ॥

মল্লভ্য নহেন তিহঁই—নরনারায়ণ।

নররূপে লীলা তাঁর ভগত-কারণ ॥

বেদগোপ্য এসকল না কহিবে কারে।

কহিলে পাইবে দুঃখ জন্মজন্মান্তরে ॥’

যা পাবার জন্তে লোকে ভজনা করে তার নাম সাধ্য। আর সাধ্যবস্তুকে পাবার জন্তে যে অনুষ্ঠান বা আচরণ তার নাম সাধন।

তোমার সাধ্য যদি স্বর্গপ্রাপ্তি, তাহলে সাধন তোমার বেদবিহিত কর্মের উদ্যাদপন। তোমার সাধ্য যদি পরমাশ্রায় মিলন, তাহলে সাধন তোমার যোগ। তোমার সাধ্য যদি ব্রহ্মসায়ুজ্য তাহলে সাধন তোমার জ্ঞান। তোমার সাধ্য যদি ভগবৎসেবা, তাহলে সাধন তোমার ভক্তি, ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান।

এখন বলো সাধ্য-সাধনের শ্রেষ্ঠ কী? কর্মযোগ, জ্ঞান, ভক্তি—কোনটা? তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর, তুমি না বললে আর কে বলবে?

‘না, এসব কথা বলবে না। জীবে ভগবৎবুদ্ধি মহা পাপ।’ নিমাই পাশ কাটাতে চাইল।

‘ওসব কথা শুনছি না। তুমি যদি গোবিন্দ না হবে, মাধব না হবে, তবে এই অখ্যাত দেশে আসবে কেন? কেন দেখা দেবে এই অবজ্ঞাতকে?’

‘তুমি কী ভাগ্যবান!’ বললে নিমাই, ‘কৃষ্ণভজনে তোমার রতি হয়েছে।’

‘কৃষ্ণভজন?’

‘হাঁ, কৃষ্ণই সাধ্য, ভজনই সাধন।’

ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবাই সাধ্য, একমাত্র কাম্যবস্তু। আর, সাধন এককথায় নামকীর্তন। মধুরমধুরমেতদ্ব্যঙ্গলং মঙ্গলানাং সকলনিগমবল্লীসংফলং চিৎস্বরূপম্। ভগবানের নাম সকল মধুরের মধুর, সকল মঙ্গলের মঙ্গল, সকল নিগমলতার সংফল এবং অপ্রাকৃত চৈতন্যস্বরূপ।

শিষ্য গুরুকে বললে, আপনি সাধনের যে উপদেশ দিয়েছেন, তা আমার পক্ষে অশক্য। যদি শরীরের দ্বারা নিম্পাণ্ড কোনো সাধন থাকে তাই আমাকে বলুন। মনের দ্বারা নিম্পাণ্ড কোনো কিছুই করতে পারব না, কেন না মন বড় চঞ্চল।

গুরু বললে, বেশ, তোমাকে একটি স্বল্প সাধনের কথা বলছি। তা আর কিছু নয়, গোবিন্দকীর্তন। উঠতে-বসতে চলতে-ফিরতে ক্ষুধায়-তৃষ্ণায়, ঘুমুতে যাবার আগে ঘুম থেকে চোখমেললে এমন কি পতনকালেও গোবিন্দ-গোবিন্দ বলবে। নামকীর্তন চিত্তচাক্ষুণ্যেরও অপেক্ষা রাখে না। চিত্তচাক্ষুণ্যেও চলে নামকীর্তন।

কৃষ্ণ প্রাণ কৃষ্ণ ধন কৃষ্ণ সে জীবন।

হেন কৃষ্ণ বোল ভাই হই এক মন।

ভজ কৃষ্ণ আর কৃষ্ণ শুন কৃষ্ণ নাম।

কৃষ্ণ হউ সবার জীবনধন প্রাণ ॥

‘কী ভাবে ভজন হবে?’ জিগ্গেস করল তপন।

‘শুধু কেশবের নাম করবে। কলির যুগধর্মই নামকীর্তন।’ বললে নিমাই। ‘সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ, দ্বাপরে অর্চনা আর কলিতে শুধু হরিকীর্তন।’

‘শুন মিশ্র! কলিযুগে নাহি তপযজ্ঞ।

যেই জন ভজে কৃষ্ণ তার মহাভাগ্য ॥

অতএব গৃহে তুমি কৃষ্ণ ভজ গিয়া।

কুটিনাটি পরিহরি একান্ত হইয়া ॥’

‘শুধুই নাম?’

‘হ্যাঁ, শুধুই নাম।’

‘এই সাধ্য-সাধন?’

‘হ্যাঁ, এই সাধ্যসাধন। সমস্ত তব এই হরিনাম-সঙ্কীর্তনে।’

‘কিন্তু মন্ত্র কী?’

‘মন্ত্র ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর।’ নিমাই তদগত-তন্ময় হয়ে বললে, ‘কলিকল্যাণাশক তারকব্রহ্ম নাম। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥ কলিতে অশেষ দৌষ, তবু তার একটি মাত্র গুণ আছে। সে হচ্ছে কৃষ্ণ-কীর্তনের আরাম। একমাত্র কৃষ্ণকীর্তনের ফলেই সংসারাসক্তি থেকে মুক্তি ঘটে। যাওয়া যায় পরমধামে।’

আদিপুরুষ নারায়ণের নামেই কলির সর্বদৌষের নিবারণ। কলিদৌষাপহারক কৃষ্ণনাম। সর্বচিন্তহর বলে হরি, সর্বচিন্তাকর্ষক বলে কৃষ্ণ, সর্বচিন্তাভিরাম বলে রাম।

‘তন্মাম কিমিতি।’ নারদের জিজ্ঞাসা ব্রহ্মাকে। সেই নামটি কী?

সেই নাম ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর। ব্রহ্মা বললে, সমস্ত বেদে এর চেয়ে পরতর আর কিছু নেই।

সেই নাম কীর্তনের বিধি কী?

এর কোনো বিধি নেই। আসন নেই বাসন নেই, রীতি নেই নীতি নেই, নেইবা সংখ্যাপ্রণের দায়িত্ব। গোপন-গোচর নেই। সজন বিজন নেই। শুনতে হলে লোকে শুশুক, না শুনলেও বা কী এসে গেল। সর্বত্র পূর্তি, সর্বত্র স্মৃতি, সর্বত্র স্বতন্ত্র।

প্রভু বলে কহিলাম এই মহামন্ত্র।

ইহা শুনে ভ্রম গিয়া করিয়া নির্বন্ধ ॥

ইহা হৈতে সব সিদ্ধি হইব সভার ।
সর্বক্ষণ বোল, ইথে বিধি নাহি আর ॥
দশে পাঁচে মিলি নিজ ছুয়ারে বসিয়া ।
কীর্জন করিহ সবে হাথে তালি দিয়া ॥
রাত্রিদিন নাম লয় খাইতে শুইতে ।
তাহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে ॥

সমস্ত মস্তুর শ্রেষ্ঠ হরিনাম । তাঁর কিছু নয়, শুধু
নামৈকশরণ হয়ে থাকো ।

‘কিন্তু মনের মধ্যে যে অনেক মল, অনেক
কুটিলতা ।’ করুণ নেত্রে তাকাল মিশ্র ।

‘নাম করতে করতে দেখবে মন স্থির হয়েছে, স্বচ্ছ
হয়েছে, স্বাচ্ছ হয়েছে । জানো তো, যার পিস্ত বৈশি
তার মিছরিও তিক্ত লাগে । ঐ তিক্ততার ওষুধই
আবার মিছরি ।’ নিমাই বললে, ‘মিছরি আগে তিক্ততা
কাটাতে পরে প্রতিষ্ঠিত করবে তার মিষ্টত্ব । তাই নাম
আগে চিত্তকে শুদ্ধ করবে পরে জাগবে কৃষ্ণরতির মাধুর্য ।
অভ্যাস থেকে চলে আসবে অনুরাগে । আর তখনই
বুঝবে কোন্ সাধ্যের জন্তে কী সাধন । কৃষ্ণ প্রেম
পাবার জন্তেই কৃষ্ণ কীর্তন । সাধিতে সাধিতে যবে
প্রেমাকুর হবে । সাধ্য সাধন তব জানিবা সে তবে ।’

বারে বারে প্রণাম করতে লাগল তপন । বললে,
‘যদি অনুমতি করেন তো আপনার সঙ্গে যাই নবদ্বীপ ।’

নিমাই উঠে দাঁড়াল । আলিঙ্গন করল তপনকে ।
বললে, ‘না নবদ্বীপ নয়, তুমি কাশী চলে যাও ।’

‘কাশী ? আপনার সঙ্গে ছেড়ে কাশী ।’ প্রেম-
পুলকিত অঙ্গে বিভোর তপন মিশ্র ।

‘হ্যাঁ, আমিও শিগগির যাচ্ছি সেখানে । মায়াবাদী
সন্ন্যাসীদের উদ্ধার করতে হবে । সেখানে তোমার সঙ্গে
আমি মিলব, সেখানে তুমি আমার সহচর ।’

প্রভুর অতর্ক্য লীলা নির্ণয় করি কী করে ? যাত্রার
উদ্ভোগ করতে লাগল তপন ।

কয়েক মাস পরে বহু ধন-জন নিয়ে নিমাই বাড়ি
ফিরল । কিন্তু বাড়িতে আনন্দ নেই কেন ? মা এসে
দাঁড়ালেন, কিন্তু মুখে হাসি কই ?

‘এ কি মা, কী হয়েছে ?’

অঝোরে কেঁদে ফেললেন ‘শচী দেবী । ‘ঘর লক্ষ্মী
শূন্য । লক্ষ্মী চলে গেছে বৈকুণ্ঠে ।’

এক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হয়ে রইল নিমাই । কান্না ভরা
চোখে জিগগেস করল, ‘কী হয়েছিল ?’

নিজের মনে শাস্তি নেই, স্বাস্থ্য নেই, তবু নিরবধি

শাশুড়ির সেবা করে চলেছে । নাম মাত্র খায় আর
একলা ঈশ্বরবিরহে সমস্ত রাত কাঁদে । ভোর হলে
বিষাদের প্রতিমার মত সংসারসীমায় এসে দাঁড়ায় ।
প্রভুর বিরহই বুঝি একদিন সাপ হয়ে দেখা দিল ঘরের
মধ্যে । লক্ষ্মীর পায়ে এসে দংশন করল । কত ওকা
ডাকলেন শচী, কত বিষবৈজ্ঞ, কিছুতেই কিছু হল না ।
প্রভুর পাদপদ্ম হৃদয়ে নিয়ে লক্ষ্মী চোখ বুজল ।

প্রভুর বিরহসর্প লক্ষ্মীরে দংশিল ।

বিরহসর্প বিষে তাঁর পরলোক হৈল ॥

তারপর ?

তুলসীদামে সাজিয়ে তাকে আনা হল গঙ্গাতীরে ।
উঁচল হরিনাম কীর্তনের তুফান । ধ্বনিত হল লক্ষ্মীর
বিজয়-যাত্রার রথধ্বনি ।

শচী শোকে একেবারে ভেঙে পড়লেন ।

লোকানুকরণ ছুঁথ নিমাইকেও পোয়ে বসল ক্ষণকাল ।
পরে আত্মস্থ হয়ে বললে, ‘মা, কার কে পতি ? কার কে
পুত্র ? শুধু মোহই পতি পুত্র প্রতীতির কারণ । সমস্ত
সংসার ঈশ্বরের অধীন, ঈশ্বরের অনুবর্তী । যত সংযোগ
বিরোগ সব ঈশ্বর ইচ্ছায় । সুতরাং যা ঈশ্বর ইচ্ছায়
ঘটছে তার জন্তে ছুঁথ কিসের ?’

চোখ মুছলেও জল থেকে যায় শচীর চোখে ।

নিমাই বললে, ‘তার কত বড় সুকৃতি বলো তো ।
সে স্বামীর আগে গিয়েছে, স্ত্রীর এর চেয়ে আর বড় কী
আকাঙ্ক্ষার থাকতে পারে ? স্বামীর অগ্রেতে গঙ্গা পায়
যে সুকৃতি । তার বড় আর কেবা আছে ভাগ্যবতী ?
মৃত্যু কোথায় ? সমস্ত শোকের পরপারে আনন্দস্বরূপের
অবস্থান । তাকে দেখ’

একলে ঈশ্বর তত্ত্ব—চৈতন্য ঈশ্বর ।

ভক্ত ভাবময় তাঁর শুদ্ধ কলবর ॥

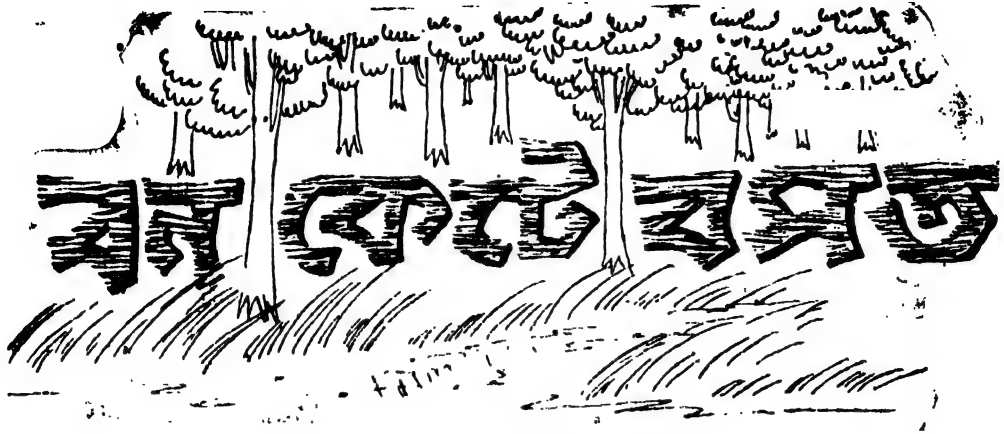
কৃষ্ণমাধুর্যের এক অদ্বুত স্বভাব ।

আপনা আত্মাদিতে কৃষ্ণ করে ভক্তভাব ॥

অন্তনিরপেক্ষ ভগবান ভক্তভাব ধরেছেন অভাববশে
নয় স্বভাব বশে । রসিকশেখর কৃষ্ণ ভক্তভাব অঙ্গীকার
করে চৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন । কৃষ্ণ নিজের বিগ্রহ
বা শরীরের চেয়েও ভক্তকে প্রিয়তর বলে মানে । ভক্ত
শুধু কৃষ্ণমাধুর্য আত্মদান করে না কৃষ্ণমাধুর্য চর্চণ করে ।

তুমি আমার প্রিয়তম । উদ্ধবকে বলছেন শ্রীকৃষ্ণ ।
তুমি যত প্রিয় আত্মযোনি ব্রহ্মা তত নয়, নয় শঙ্কর,
নয়বা সর্বধন । অথো কা কথা লক্ষ্মীও তত প্রিয় নয় ।
তোমাকে বলব কি উদ্ধব, আমি নিজেও আমার কাছে
তত প্রিয় নই ।

[ক্রমশঃ]



পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

মনোজ বসু

বাইশ

চলে গেল জগা চৌধুরীগঞ্জের আলায়। অনিরুদ্ধ বালোসোনা এবং আরও কত পুরানো সাভাৎ—হী করে তারা তাকিয়ে থাকে। চোখে দেখেও বেন চিনতে পারছে না। এমন আচমকা এসে পড়া—কোন মতলব নিয়ে এসেছে কে জানে? বসতে বলে না তাকে কেউ। অনিরুদ্ধ তামাক খাচ্ছিল, হাতের কলকেটা এগিয়ে দিল না। অর্থাৎ সেই যে জাতকোষ নৌকা সরানো থেকে, এত দিনেও সেটা কিছুমাত্র নরম হয় নি।

জগাই তখন কৈকিয়ন্তের মতো ছুটো চারটে কথা খাড়া করে : চলে বাচ্ছি তোমাদের তল্লাট ছেড়ে। তাই ভাবলাম, কে কেমন আছে একবার খবরটা নিয়ে যাই।

কাঁকা কথা বলেই বোধহয় কানে নিচ্ছে না। আরও তাই বিশদ করে বলতে হল। উদাসী মন নিয়ে এসেছে, কোনরকম বদ মতলব নেই—ভাল করে শুনিয়ে দিয়ে ওদের নিশ্চিন্ত করে। বলে, বয়ারখোলা যাচ্ছি, আর আসব না। গগন দাস তো কালকের মাহুয, বাবাবনে এই সেদিন এস। বাবার আগে, বলছিলাম কি, আমাদের পুরানো আড্ডা জমায়ো থাক কয়েকটা দিন। সেই আমাদের পুরানো সবাইকে নিয়ে।

এতক্ষণে অনিরুদ্ধের মুখ খুলল। জগার দিকে চেয়ে সতর্ক ভাবে প্রশ্ন করে, বয়ারখোলার কেন?

বাত্রার দল খুলাছে ওরা। খুব ধুমধাড়ানো।

কালোসোনা বলে, পাঠশালা খোলে তো ওরা বছর বছর। এবারে বাত্রার ঝোক উঠল?

ফলন বে হুনো-তেহুনো এবারে। মা-লক্ষ্মী বাঁপি উগুড় করে ঢেলেছেন। মনে বড় সুখ। তাই বলছে, পাঠশালা শুধু ছেলেদের নিয়ে। বাত্রা হলে ছেলে-বুড়ো সবাই গিয়ে বসতে পারবে। বিবেক পাচ্ছে না, আমায় ধরে তাই টানাটানি। আর সাভাই তো—গাঙ-খালে বার মাস মেছো-নৌকো বেয়ে বেড়াবার মাহুয কি আমি? গলাখান তো শুনেছ—বল তোমরা সব। শখ হয়েছিল, ছুটো-তিনটে বছর এই সব করা গেল। এ মূলুকে মাছের খাতা ছিল না, গুড়ে পিটে দিয়ে গেলাম একটা।

পরসা-কড়ি আসিছে—রক্তের গন্ধে হিনেজোঁকের মতো গাঁ-ঘর থেকে কিলবিল করে সব এসে পড়েছে। করে থাক সগোষ্ঠি মিলে। আমি আর ওর মধ্যে নেই দাদা। ইস্তফা দিয়ে বেরিয়ে পড়েছি। বাত্রার মাহুয আমরা হলাম বসন্তের কোকিল। বে বাড়ি মজ্বব সেইখানে ডাক আমাদের। নেচে গেয়ে আমোদকর্ষি কয়ে ঘুরব।

কালোসোনা অবীর আগ্রহে জিজ্ঞাসা করে, বাচ্ছ কবে এখান থেকে?

পা বাড়িয়ে বনে আছি। গেলেই হল। কিন্তু বে জন্তে এসেছি শোন। বাবার আগে ক'টা দিন গলাখান মেজ্জববে শান দিয়ে নিই। গানবাজনা তো একলা মাহুযের ব্যাপার নয়। সন্ধ্যার সময় যে যে পার চলে যেও আমার বাড়ি—আমার চালাঘরে। পথ তো এইটুকু। আসায় মাছ উঠবার সময় হলেই আবার চলে আসবে।

অনিরুদ্ধ বলে, আমরা যাব তোমার ওখানে?

জগা অমনুর করে বলে, পুরানো রাগ মনে পুবে রেখ না। জায়-অজায় যা কিছু করেছি, সে তো গগন দাসের জন্ত। তোমরাও যেমন চৌধুরি বাবুদের জন্ত করে থাক। শখ করে কি করি কিছু আমরা? কাজের গরজে করতে হয়, আমাদের হাত ধরে করিয়ে নেয়। নিজেদের মধ্যে কি জন্তে তবে গরম হয় খাড়া ফুলিয়ে থাকি?

বুঝিয়ে সৃজিয়ে একরকম মিটমিট করে জগা ফিরে এলো। সে যেন আপদ-বালি—বিদায় হয়ে গেলেই তল্লাটের মাহুয বাঁচে। লোক-দেখানো ভাবে মুখেও ওরা কেউ বলতে পারত, একেবারে চলে যাবে কি জন্তে, এসো ফিরে আবার। তা কেউ বলল না—বাওয়ার ব্যবস্থা পাচ্ছে সে বাতিল করে দেয় ঐ একটু অমুরোধের অজুহাত পেয়ে। চৌধুরীগঞ্জ শত্রুপক্ষ, তাদের কথা থাক—কিন্তু নতুন আসায় গগনের দলবলই বা কী। কাজকর্ম দিবাি চালু হয়ে গেছে, বলাই-পচা মেছো নৌকো নিয়ে নির্গোলে কুমিরমারি যাচ্ছে, আর জগাকে কার কোন দরকার? সেই একটা মাহুয চালাঘরে একলা পড়ে গজায়, সে কথা মনে রাখার গরজ নেই এখন কারও।

শেইটেই বিশেষ করে মনে করিয়ে দেবার বাঙ্কা। চালাবাবের মধ্যে ভিন্ন একটা দল হয়ে ঢোল পিটিয়ে গান গেয়ে জানান দেওয়া যে আমরাও আছি অনেক জন—তোমরা সমস্ত নও। তোমাদের বড় বাটন হয়েছে বলাই, আর বড় গায়ের বোধ করি গগন দাস—ওই এক মজাদার গান হয়ে থাকে, আর গান শুনো আজকে আমাদের।

চৌধুরিগঞ্জ থেকে ফিরে করালী পার হয়ে একবার বরাপোতার দিকে যেতে হল। মানুষজন এসে জুটবে, পান-মুশারি তো চাই। তামাক বড়-তামাক ছোটোই ব্যবস্থা থাকা উচিত। আর কিছু ছাঁচ-বাটাগা আনলেও মন্দ হয় না, আড্ডা ভাটার পর হরির লুঠের নামে আরও কিছু হুল্লোড় করা যাবে।

সন্ধ্যা হয়ে আসে। জগা ফিরে আসছে বরাপোতা থেকে। খালের ঘাটে ডিঙি। ফিরেছে তবে পচা-বলাই। গাঙে গোন পেয়েছে, পিঠেন বাতাস—ভাট্র এত সকাল সকাল ফিরল। আলায় ঢুকে মালিক গগন দাসের সঙ্গে হিসাবপত্র মেটাচ্ছে। ফিরে এসে নৌকো ধোবে এখনই। ভাল হয়েছে, পচা বলাই আলা থেকে বেরোক, ধরবে তাদের। ধরে সোজামুজি বলবে, আজকের আড্ডা নতুন আলায় নয়, সাইতলার পাড়ার মধ্যে—নিজদের চালাঘরে। গাওনা-বাজনা সেখানে আজ। চৌধুরিগঞ্জ থেকে ওরা সব আসছে—ঘরের মানুষ তোমরা থাকবে না, সেটা কোন মতে হতে পারে না।

বাঁধের ধারে ঝোপের একটু আড়াল হয়ে সে দাঁড়াল। আচমকা বেরিয়ে অবাক করে দেবে। আলায় কাজ সেবে পচা-বলাই বাঁধে এসে পড়ল। হু-হাতে ছোটো কলসি প্রতি জনের। কলসি নিয়ে চলল কোথা এখন এই অবেলায়?

খালে নেমে যাচ্ছে। জগা ডাকল, বলাই—

বলাই থমকে দাঁড়াল।

নৌকোর আবার বেরোবি নাকি? এই তো ফিরে এলি।

মুখ কাচুমাচু করে বলাই বলে, আলায় মিঠে জল ফুরিয়ে গেছে। একেবারে ফুরিয়েছে। বাস্তিরে খাবার মতোও নেই। না এনে দিলে নয়। ঘুরে আসি বরাপোতার পার থেকে। কতক্ষণ আর লাগবে!

আবার বলে, কুমিরমারি থেকে খালি ডিঙি বেয়ে নিয়ে এলাম। সকালে যদি বলে দিত, টিকলের জল ধরে আনতান ওখান থেকে। যত কলসি খুঁশি। এই ভোগ ভুগতে হ'ত না।

জগা বলে, চার চারটে কলসি নিয়ে চললি—এত জল কে খাবে? সন্নিপাতের তেষ্ঠা কার পেল রে?

পচা বলে, খাবে, রান্নাবান্না করবে—

চানও করবে নাকি? বাদাবনে এত নবাবি কাঁদ—চারি ঠাক্কনের?

বলাই বলে, কলসি-মাণা জল—চান করে আর কেমন করে? চান-চান সেবে এসে কলসির জলে গামছা ভিজিয়ে তার পবে গা-হাত-পা মুছে নেয়, গায়ে ঢালে এক খট হু-খটি। নয় তো সোনা জলে ওর গা চটচট করে।

জগা কিন্তু হয়ে বলে, মরেহিস তোরা হতভাগা। একেবারে গোজায় গেছিস—

বলাই বলে, অভ্যাস নেই, কি করবে? গারে নাকি কি নয়

উঠেছে মূনে জরে গিরে। অভ্যাস হয়ে যাবে, তখন আর মিঠে জল লাগবে না।

মরদ হয়ে মেয়েমানুষের নাওয়ার জল বয়ে বেড়াস, মুখ দেখাচ্ছিস কেমন করে তোরা?

বলাই দুসড়ে যায়, মুখ নিচু করে। পচা কিন্তু কিছুমাত্র লজ্জা পায় না। গালি শুনে দাঁত মেলে হাসে। কী যেন মত কৰ্ম করেছে, পরমানন্দে তার যশোকীর্তন শুনছে।

বলাইকে ধরে ফেলল গিয়ে জগা। কঠিন মুষ্টিতে হাত চেপে ধরেছে। বলে, কলসি রাখ। মানুষজন আসছে আজ বাড়িতে। চৌধুরির আলা থেকেও আসছে। শোর এখন কোথাও যাওয়া হবে না। যায় পচা একলা চলে যাক।

বলাই চূপচাপ দাঁড়িয়ে—হাঁ-না কিছু রা কাড়ে না। জগন্নাথ গর্জন করে বলে, ফেলে দে কলসি। ভালর তরে বলছি।

একটা কলসি কেড়ে নিয়ে রাগের বশে সত্যি সত্যি ছুঁড়ে দিল। চুবমার হয়ে গেল। পচা চেঁচিয়ে ওঠে, আচ্ছা মানুষ তো। কলসি ভেঙে দিলে, কদর থেকে ভোগাড় করে আনতে হয় জান?

হাত ছেড়ে দিয়ে জগা বলাইকে বলে, আসবি নে?

পচা ইতিমধ্যে ডিঙিতে উঠে পড়েছে। পিছন ফিরে বলাই একবার তার দিকে তাকাল।

জগা বলে, জবাব দে।

বলাই বলে, ফিরে এসে তার পবে যা। এক্ষুণি ফিরব, বেশি দেরি হবে না।

মরগে যা—

নাগালের মধ্যে পেলে জগা গলাধাক্কা দিত হুতো। কিন্তু বলাই তখন নৌকায় উঠে পড়েছে।

কাউকে দরবার নেই। ভারি তো কাজ! এবাড়ি ওবাড়ি থেকে একটা ছোটো হোগলার পাটি কিছা মাজুর চেয়ে এনে পেতে দেওয়া। না দিলেও ক্ষতি নেই, মাটিতে সব বসে পড়বে।

চৌধুরির আলা থেকে অনিরুদ্ধ এল তিন চার জনকে সঙ্গে নিয়ে। পাড়ার ভিতর জগার ঘরে জমাদেহ—সাইতলা ও আশপাশের মাছ-মাংস সব এলো। রাত গভীর হলে এইখান থেকে জালের কাজে বেরাবে। ছোট চালাঘরে জায়গা দিতে পারে না। খুব চলল। এখানে বসে যা মুখে আসে বলতে পারে, যে গান খুঁশি গাইতে পার। শামন-বাঁধন নেই—উচ্ছ্বাস, বেপরোয়া। আড্ডার মাঝখানে উঠে একবার জগা চাপ চুপি বাঁধের উপরে ঘুরে দেখে এলো। নতুন আলায় সাড়াশব্দ নেই, মিটিমিট করে আলো জ্বলছে একটা। খালের ঘাটে ডিঙি—পচা-বলাই অতএব ফিরে এসেছে। কিন্তু অল্প দিনের মতো নাম-কীর্তন নয়, ভক্ত কণ্টিকে নিয়ে গগন দাস আজকে বোধ হয় ধ্যানে বসে গেছে।

আসর ভাটার মুখে জাঁকিয়ে হরিশ্বনি। একবার দু-বার নয়, বাববার শ্রুশানে মড়া নিয়ে বাবার সময় হরিবোল দিতে দিতে যায়, এই চিংকার তারও চেয়ে ভয়ানক। তার সঙ্গে চপাচপ ঢোলের বেতালা পিটুনি। জগাই বাজাচ্ছে। ছাউনির চামড়া না ছেঁড়ে পিটুনির ঠেলায়। সমস্ত মিলিয়ে জঙ্গলের প্রান্তে একটা তোলাপাড় কাণ্ড। লোকজন বিদায় করে জগন্নাথ অনেক দিন পরে আজ মনের সুখে অঘোর ঘর দুমাল।

জগা পনের দিন অনেক বেলায় উঠল। নতুন আলার আসর কাল একেবারে বন্ধ গেছে—বর থেকে জেগে উঠেও সেই আনন্দ। সকালবেলা ওদিককার গতিকটা কি দেখবার জন্য বাঁধে এসেছে। নিতান্তই প্রোতর্জয়ণ করে বেড়াচ্ছে, এমনি একটা ভাব। কোটালের কুলদ্রাবী জোয়াব। পাল ছাপিয়ে পানের গাছগাছালি ভূবরে দিয়ে বাঁধের গায়ে জল ছলান্-ছলান্ করছে।

কাত হয়ে-পড়া একটা বড় বানগাছের গুঁড়ি জলে ডুবে গেছে। চার পাঁচটা ডাল বোরয়েছে চতুর্দিকে। ডালেরও পোড়ার দিকটায় জল। জগার নজর পড়ল সেখানে। কে মানুষটা দিবি ডাল ঠেসান দিয়ে বসে আছে কোমর অবধি জলে ডুবিছে? আবাব কে—নবাবনন্দিনীর চানে আগা হয়েছ। আলার ডোবায় কাল-পচা জল—সে জল খ্রীঅঙ্গে লাগানো চলে না। কেন যে এসব শৌখিন মানুষ বাদাবনে আসে? দালান-কোয়ার বাস্তুবন্দি হয়ে থাকলেই পারে, গায়ের চামড়ার মরচে ধরার বাতে শঙ্কা নেই।

চাকবালার পছন্দের জায়গা। জল ভেঙে এসে গাছের ডালে চড়ে বসেছে। হাতে ঘটি। শ্রোতবর জলে ঘটি ভরে ভরে গায়ে ঢালছে। ঘটি কখনো বা ডালের কাঁকে গুঁজে বেখে গামছা ভরে ভরে গায়ে দিচ্ছে। ডালপাতার অন্তবালে লোকের হাঁহ চোখ পড়ে না—আজ রেখে স্থান হয়। বলাইসের আনা কলসি-ভরা মিঠে জল—বাড়ি ফিরে সেই জলে গায়ের নোনা ধুয়ে ফেলবে।

জল বাড়ছে, কল-কল বেগে শ্রোত এসে ঢুকছে। কোমর পর্যন্ত জলতলে ছিল, দেখতে দেখতে বুক অবধি ডুবে গেল। ক্ষুণ্ণ চাকবালার বেড়ে যাচ্ছে ততই। ডাল ধরে পা দাপাচ্ছে। গায়ের পুকুরে যে সঁতার কাটত। স্রোতের মধ্যে ততখানি আর সাহস হয় না, দাপাদাপি করে সঁতারবেব স্বখ করে নিচ্ছে খানিকটা। গুন গুন করে গানও ধরেছে বুঝি।

আপন মনে ছিল মেয়ে। বাঁধের দিক দিয়ে হঠাৎ বাঘ ঝাঁপ দিয়ে পড়ল বুঝি। এসে কামড়ে ধরে উঠেটা এক লাফ। এক লাফে ডাঙার উপর। তখন ঠাহর কবে দেখে—কামড়ে ধরেনি, দুই বাছ দিয়ে ধরেছে আপটে। বাঘ তো নয়, জগা। ছি-ছি, কী লজ্জা। চান করার মধ্যে কী অবস্থায় আনল গো টেনে। টেনে এনে বাঁধের উপর ফেলল। চাক কিল দিচ্ছে দমাগম জগার বুকুর উপর, বুঝি মারছে পাগলের মতো হয়ে। জগাও কি ছাড়বার পাত্র—সজোরে চাকর মুখ বুঝিয়ে ধরল যে ডালে বসে চান করছিল সেই দিকে : নয়ন তুলে দেখ একবার খ্রীমতী, কী কাণ্ড হয়ে যেত এতক্ষণে।

শ্রোতের উপর ভয়াস আবর্ত তুলে কুমীর ভেসে উঠেছে ডালের তিরে।

দেখছ? এটা হল বাবাবন। মেরেমানঘর স্বখ করে ঘর-কমার জায়গা এটা নয়। শিকার তাক করে অনেক দূর থেকে কুমির ডুব দেয়। জলের নিচে দিয়ে সাঁ-সাঁ করে এসে ভেসে উঠবে ঠিক তার সেই তাক-করা জায়গায়। আমি দেখেছিলাম তাই। এতক্ষণে, নয়তো, কুমীরের মুখে কাঁহা-কাঁহা শ্রুত চল বেতে।

প্রাণ বাঁচিয়ে দিল, তবু চাকবালার কবকব করে ওঠে। তা রবতার আমি—বরো যেতাম। তোমার কি? তুমি কেন ডুবে ডুবে

থাকবে? বেশিকে বাই, তুমি বৃষদ্বর করতে থাক। কানা বুঝি আমি—দেখতে পাটনে?

জগা বলে, ভুল হয়েছ আমার। বাঁধে টেনে না এনে থাক। মেরে জলে কেলে দিলে ঠিক হত। আপদের শক্তি হত, সঁটতলা জুড়োত, বাবার মানুষ মনের স্বখে কাজকর্মে লাগতে পাওত।

গজর গজর করতে করতে যাচ্ছে জগা। নিমকহানাম মেয়ে-মানুষ। কলিকাল কিনা—ভাল করলে মন্দ হয়, গোসাই পুজলে কুড়ি হয়। বাগে পেলে আলটপকা বার মুখো কাঁধের উপর থেকে ছিঁড়ে নেবে, সেই মানুষের পিছন পিছন ঘোরে নাকি জগা! পচা-বলাই স্তনতে পেলে কত না হাসাহাসি করবে এই কলঙ্কের কথা নিয়ে!

আশ্চর্য ব্যাপার, উর্যানের উপর বড়না। প্রথমটা মনে হয়েছিল গুণময়ী ভগিনী কিছু নাগানি-ভগানি করেছে, তেড়ে এসেছে ঝগড়া করবার জন্য। জগা তৈরি আছে বোঁস আনার উপর আমার আনা। অনেক দিন ধরে জমে জমে মনোব আক্রোশ বিবের মতো ফেনিয়ে কঠ ছাপিয়ে উঠছে। দাওয়া থেকে উঁকি মেয়ে দেখে জগা খাতির করে ডাকে : এসো এসো—কী ভাগিা, নতুন ঘেরির খোদ মালিক গগনবাবু আজ বাড়ির উপর এসেছেন।

পরিহাস গগন কানে নেয় না। চাকবালার বাপাও কিছু নয়। বলে, নৌকোর কাজ একেবারে ছাড়লে জগগাথ? ঘর থেকে তো নড়ে বোসো না।

জগা বলে, কাজ তো তা বলে আটকে নেই। অন্তেরা কাজ শিখে গেছে। কুমিরমারির গজে মাছের কোড়া নাড়িয়ে দিয়ে রমারর টাকা নিয়ে আসে, টাকা বাজিয়ে তুমি হাতবান্নে তোল। কাজকর তো দিবি চলেছে।

গগন বলে, সে যাই হোক, তিনটে চারটে দিন তোমার ঠিকিরে দিতে হবে জগা। কাল সকালে নৌকো নিয়ে যাবে।

কেন, পচা-বলাই গেল কোথা? মরে গেছে?

বলাই আছে। পচা আর আমার শালা নগেনশশী বরাপোতার হাটুরে নৌকায় রওনা গেল গাইগক কিনতে। গোয়াল হল, গক তো চাই এবারে। পচা হাটুরে নিয়ে আনবে গক, কবে কবে ঠিকঠিকানা নেই।

জগা এক কথায় কেটে দেয় : আমি পারব না। অস্ত মানুষ দেখ।

গগন বলে, মানুষ একজন তো হলই হল না। কোটালের টান—জলে কুটোগাছটা ফেললে ভেঙে দুই খণ্ড হয়ে যায়। যে সে মানুষ পারবে টান কাটিয়ে নৌকো ঠিক মতো নিয়ে যেতে?

অনুন্নয় করে আবার বলে, তোমার পাওনাগুণা পুথিয়ে দেব জগা। একেবারে হাত-পা কোল করে বসলে হবে কেন? নিস্ত্রি দিন না পার, দায়ে বেদায়ে দেখতে হবে তো! না দেখলে বাই কার কাছে? ধর, তোমার উয়াকেই তো এ সমস্ত।

জগা হেসে ওঠে : গক কিনতে চলে গেছে, সে গকর দুধ খেতে দেবে আমার এক হটাক?

হাসতে হাসতে বলছিল। বলতে বলতে ঘর কটন হল :

উষ্যপের কথা তুললে—বখন ছিল, তখন ছিল। পুরানো সেসব মনে
বাধ ছুমি সড়না ?

রাখি নে ?

না। ছাড়াছাড়ি পুরোপুরি হয়ে গেছে। আজকে কেবল দারে
পড়ে তোমার আসতে হয়েছে।

বলে জগা কথার মধ্যেই প্রসন্ন বরে, কাল গান শুনে কেমন
বড়না ? ছই দল হয়ে গেল আমাদের। আমার একটা, তোমার
একটা।

গগন বলে, দল দুটো হোকগে, কিন্তু আমার কোন দল নয়।
আমি তোমার দলে জগা।

চারিদিক তাকিয়ে দেখে গগন মনের কথা ব্যক্ত করে : তোমাদের
পাড়া বলে কেন, কোনখানেই তো বাই নে। দেখেছ কোনদিন
আলার বাইরে ? আমি মরে আছি জগন্নাথ। বেরতে পারিনি ঐ
নগেন শালার জন্তে। হ্যা, সম্পর্ক না থাকলেও শালা ডেকে
বলতাম। বিষয় খচ্চর। দিবারাত্রি চোখ ঘুরিয়ে পাহারা দেয়।
খোঁড়া মানুষ নিজে বেশি সৌভাগ্য করতে পারে না, অস্ত্রে করলে
হিসে হয়। কি জানি, তোমায় এত একেবারে পয়লা নখরের
শত্রু ঠিক করে বলে আছে। নগনা নেই বলেই আজ তোমার কাছে
আসতে পারলাম।

জগা বলে, সে জানি। শত্রু সকলের তো আমি। তোমার
বোনটাও বড় কম যায় না। তাই তো ভাবি বড়না, কত কষ্টের
জমানো আড্ডা—সে দিকে এখন চোখ তুলে তারাবাব উপায় নেই।
এ জায়গায় পোকা ধরে গেছে—থাকব না এখানে। ঠিক করে
কেলেছি। তোমরা থাক পরসাকড়ি আর সংসারধর্ম নিয়ে।

গগন বলে, তা আমায় দুঃখ কি জন্মে ? আমি কি আনতে
গিয়েছিলাম ? জান তো সবই। আসবার আগে যুথের কথাটা
শুধু জিজ্ঞাসা করেছিল আমার ?

কিন্তু তোমার তো তেল চুকচুক দেখাচ্ছে দিবি। যুথের
বচনের সঙ্গে চেহারায় মিলছে না। খুব বে দুঃখের পাখার ভাসছে,
চেহারা দেখে কিন্তু মনে হয় না বড়না।

গগন বলে, বেটা তো মার খেতে পারে—আরে, ধরে মারে তবে
উপায়টা কি ? শুধু নগনা কেন, নগনার বোনটাও তো চোখে তুলে
নাচার। চাঁনর আগে আচ্ছা করে তেল রগড়াতে হবে, নয়তো
ছাড়ে না। খাওয়ার সময় সামনে বলে এটা খাও ওটা খাও
করবে। খাওয়া না হতে তামাক সেজে নিয়ে আসবে চারি।
খেয়ে তার পরেই বিছানায় গড়ানো। শৌণ্ডয়ার পরে দেখে দেখে যায়
ঠিকমতো ঘুমুছি কিনা। দেখে তেল না চুইয়ে যায় কোথায় বল ?

জগাও এমনি ভাবছে। নগনার বোনকে যে ভাল জানে না,
কিন্তু গগনের বোনকে জেনে বুঝে ফেলেছে। গাই-বকনা কিনে
এনে নতুন গোয়ালে ঢোকাবে। বাদ্যবাজ্যের দুর্দান্ত মান্নবংশলোকে
মেয়েটা ইতিমধ্যেই জাবনা খাইয়ে শিষ্টশাস্ত্র করে গলায় দড়ি পরিয়ে
টান ছুড়ে দিয়েছে।

বেলা ডুবে গেছে অনেকক্ষণ। অন্ধকার হয়েছে। কথা
বলতে বলতে গগন আর জগা বাঁধের উপরে এলো। ভাঁটা এখন।
কলকল স্বনে উচ্ছল আবর্তে জলধারা দূর সমুদ্রে খেয়ে চলেছে।
তারাতারা আকাশ, তারার আলো চিকচিক করছে জলে। মাটিতে
নেমে-আসা মেঘের মতো ওপারের ঘন কালো বাগাবন। সেই দিকে
চেয়ে চেয়ে জগার মনটা পিছনের কালে ঘুরে বেড়ায়। এই বেথানটায়
ঘুরছে, এখানেও তো বন ছিল আগে। আস্তে আস্তে বলতির পত্তন
হচ্ছে—জনালায় একটু একটু করে হাত বাড়িয়ে বনরাজ্য স্রুতির মধ্যে
চেপে ধরছে। এখানকার লীলাখেলার ইতি। নতুন চালা বাঁধতে
হবে ভাঁটি ধরে আবার কোন নতুন জায়গা খুঁজে পেতে নিয়ে।
কাঁচা বাঘার মধ্যে হৈ-হল্লার কিছুদিন কাটাবে সেখানে, ঘরগৃহস্থালীর
বিব-নজর যতক্ষণ সেই অবধি না গিয়ে পড়ছে। [ক্রমশঃ।]

অজ্ঞানের রং

রথীন্দ্রনাথ সেন

তাহলে আবার আমি হেমন্তের রাস্তা মেঘে মেঘে
নিবিড় ধানের গন্ধে অজ্ঞানের আশ্রয় আশ্রাণে,
আবার জীবন খুঁজি লক্ষ্যরাগ স্বপ্নের আবেগে,
নরম রোদের রঙে মুগ্ধ চোখ শিশিরের জ্ঞানে।
তাহলে আবার আমি লাইলাকে রক্ত কাউচের—
পাইনের বনে বনে উদ্ভাস্ত হাওয়ার শরীরে,
নিভৃত হিমের স্পর্শে কিম কিম হারিণ-প্রচবে,
প্রাণের আশ্বাস খুঁজি স্বপ্নশ্রদ্ধা আশ্রয় গভীরে।
রাত্রির নির্জন মেঘে তারাদের দীপ আনমনে—
হেলে গেলে, জীবনের স্বপ্নলিপি আবার বন্ধ
খুলে দেখি। আহিগন্ত আজ শুধু আলোর চলনে
থরো থরো আশ্রয় অজ্ঞান আর অজ্ঞানের মং।

খ্রীষ্টান জীবন

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

[সি, এফ, অ্যাণ্ড লিখিত 'What I Owe to Christ' গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ]

শান্তিনিকেতন

রুবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনকেন্দ্র শান্তিনিকেতন আশ্রমের আদি কাহিনী যেমন রমণীয় তেমনি রোমাঞ্চকর। রুবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁর কর্মজীবনের অবসানে একটি উপযুক্ত নির্জন স্থানের অন্বেষণ করছিলেন, যেখানে শান্ত বানপ্রস্থে তাঁর শেষ জীবন তিনি নির্বাহ করবেন। এই অন্বেষণে তিনি এক কক্ষ অমর্যবর প্রান্তরে এসে পৌঁছিলেন,—যেখানে শুধু দস্যুদের বাস। ভৃত্যরা তাঁর পাক্কী নামাল, আর অগ্রসর হতে সাহস করল না। বৃদ্ধ ঋষি তাদের অভয় দিলেন—পাক্কী উঠিয়ে আরো কিছুটা এগিয়ে যেতে নির্দেশ দিলেন। সামনে ভূগশূন্য জনহীন প্রান্তরের মাঝখানে কিছু উঁচু একটি টিবি। তার উপর পাশাপাশি দুটি গাছ। সেইখানে তিনি থামলেন।

তখন জুর্বায়েদর অপূর্ণ শোভা। সেই যুগল বৃক্ষতলে উপবেশন করে শুদ্ধ হরে পশ্চিম নিগন্তের দিকে তাকিয়ে রইলেন দেবেন্দ্রনাথ। সেই আশ্চর্যকণে জগদীশ্বরের পরম উপলব্ধি এমন গভীর ভাবে তাঁর ধ্যানে বাজল যে সমস্ত রাত তিনি সেখানে আনন্দ-বিভোর আগরণে অতিবাহিত করলেন। পরদিন প্রাতে তিনি সেই স্থানের নাম দিলেন,—শান্তিনিকেতন।

এই শান্তিনিকেতনে মহর্ষি তাঁর আশ্রম প্রতিষ্ঠা করলেন। জীবন-সারাজ্জ্বর বহু বৎসর তিনি এই আশ্রমে বাস করেন। এখানে নিশ্চক্ৰ ধ্যানে তাঁর অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হতো। বিশ্বখ্যাত কবি রুবীন্দ্রনাথ তখন বালক মাত্র। তিনি দেবেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র। বালক পুত্রের কণ্ঠে স্বরচিত ও রাজা রামমোহন রায় রচিত ধর্মসঙ্গীত শুনতে মহর্ষির বড়ো ভালো লাগত। রামমোহন ছিলেন মহর্ষির ঘোঁরনের গুরু, তিনিই তাঁকে গোড়া হিন্দুধর্মের আওতা থেকে ব্রাহ্মসমাজের উদারতর আশ্রমে আহ্বান করে নিয়ে গিয়েছিলেন। স্কাটারবিমুক্ত মানবধর্মের শিক্ষা রুবীন্দ্রনাথ তাঁর পিতার কাছ থেকেই লাভ করেছিলেন।

মহর্ষির আশ্রম-প্রতিষ্ঠা যুগের একটি চমৎকার সত্য ঘটনা আছে। একদিন সন্ধ্যাবেলা মহর্ষি বখন তাঁর প্রিয় স্থানটিতে শ্রাননিয়ন্ত্র, তখন দস্যুদের এক সর্দার চুপি চুপি তাঁর কক্ষে আসে। কে তাকে বলেছিল যে ঐ গাছ দুটির তলায় অনেক

সোনা আছে, তাই ঐ বৃক্ষ এখানে চুপটি করে বসে থাকে। হত্যা করবার উদ্দেশ্য নিয়ে ঠিক বখন সে সামনে এসে, সেই মুহূর্তেই ঋষি তাঁর চক্ষু উদ্বীলন করেন। তাঁর করুণ জীবির শাস্ত দৃষ্টিতে বৃহত্তে অভিভূত হয়ে দস্যু তার তীক্ষ্ণ ছুরিকা কেলে হ' হাতে তাঁর পা জড়িয়ে ধরে, অকপটে স্বীকার করে তার পাপ-অভিপ্রায়। মহর্ষি শাস্তভাবে উঠে দাঁড়িয়ে দস্যুকে আলিঙ্গন করেন। সেই থেকে দস্যুর জীবনধারা পরিবর্তিত হয়ে গেল। সে মহর্ষির শিষ্য গ্রহণ করল ও বাকি জীবন ধর্মপথে অতিবাহিত করল।

অতি বৃদ্ধ বয়সে মহর্ষি দেহত্যাগ করেন। আমি যখন শান্তিনিকেতনে এলাম, তখনো আশ্রমের সর্বস্থান তাঁর পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত। প্রাচীন সেই দুই বৃক্ষ, যার তলায় বসে তিনি উপাসনা করতেন সেইখান তাঁর প্রিয় বাণী উৎকীর্ণ রয়েছে। সেই বাণীতে উদ্ঘোষিত রয়েছে পরমেশ্বরের নাম, যিনি প্রাণের আরাম, জ্ঞানের আনন্দ, আত্মার শান্তি। ষাট মহর্ষির সাহচর্যে এসেছিলেন তাঁরা আমাকে বলতেন যে মহর্ষির অপূর্ণ মুখছবি ছিল তাঁর শাস্ত সমাহিত অন্তরের প্রতিচ্ছবি। অনেকে এও আমাকে বলেছেন যে বর্তমানে পরিণত বয়সে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র রুবীন্দ্রনাথকেও ঠিক তাঁর ঋষি পিতার মতোই দেখায়।

শান্তিনিকেতন পুণ্যপ্রমের প্রাচীনায় তিনটি মাত্র অমুশাসন লিপিবদ্ধ আছে। প্রথম অমুশাসন এই যে, এখানে স্মৃতিপূজা বারণ। দ্বিতীয় অমুশাসন এই যে, এখানকার পরিধির মধ্যে কোনো প্রকার জীবহত্যা বারণ। আর তৃতীয় এই যে এখানে ধর্ম সম্পর্কিত কোনো প্রকার বিতর্ক চলবে না। এই তিনটি মাত্র বাধা ব্যতিরেকে শান্তিনিকেতনে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে পৃথিবীর সমস্ত নরনারীর উন্মুক্ত আমন্ত্রণ।

প্রতি সপ্তাহে একদিন করে অতি প্রত্যুষে কবি আশ্রমবালকদের ধর্মোপদেশ দান করেন। নিতান্ত সহজ সরল ভাষায় তিনি ঈশ্বরের পুণ্য পিতৃব্রতের কথা বলেন। আশ্রমবাসীরা প্রতিদিন প্রত্যুষে ও সন্ধ্যায় ঈশ্বরোপাসনা করে। শৈশব থেকে এই সর্বমানবিক ধর্মশিক্ষা ও ধর্মচরণ তারা লাভ করে।

শান্তিনিকেতনের শান্তিপূর্ণ আশ্রমের মধ্যে অতর্কিতে ফ্রেডে পঙ্কল ইউরোপের মহাবুদ্ধের সন্ধান। এই সন্ধান প্রচণ্ড ভূমিকম্পের মতো

আমার অনেক স্বপ্ন চূর্ণ-শূন্য করে দিল। স্বপ্ন খুঁট বে-দিনের ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন,—আমার মনে হোলো সেই দিন যেন ঘনিষে এসেছে,—মহাবিচারের দিন। মানবপুত্রের নব-অন্ত্যাহনের দিন।

ইংলেণ্ডে আমার বৃদ্ধ পিতা ভাবলেন তাঁর এতোদিনের আকাঙ্ক্ষিত ভবিষ্যৎ এবার বৃষ্টি সফল হতে চলেছে। অশীতিপর তাঁর বয়স, দেহ অত্যন্ত দুর্বল। আমার ভগিনীদের কাছ থেকে আমি বেদনা-করুণ চিঠি পেতাম, তারা লিখত আমার মা বর্তমান থাকতে আমাদের বাড়ি ঘরের অবস্থা যেমন ছিল, পিতা সবকিছু ঠিক সেইমত রাখতে চাইলেন। মা-র অবর্তমানে কোনো পরিবর্তন তিনি সহ্য করতে পারতেন না। আমার বৃদ্ধ পিতৃদেবের ধারণা হোলো যে এইবার প্রভুর পুনরাবির্ভাবের সময় সমাগত, তিনি এলেন বলে। তাঁর এই বিশ্বাসের কথা দীর্ঘ পত্রে তিনি আমাকে জানালেন। মুস্তহস্লে লেখা একটি স্বরচিত কবিতাও পিতৃদেব এই সময়ে আমাকে পাঠিয়েছিলেন। এই কবিতা ও তাঁর শেষ জীবনের পত্রগুলি অতি মহার্ঘ সম্পদ বলে আমি সবচেয়ে রক্ষা করে এসেছি। মহাযুদ্ধ শেষ হবার পূর্বেই আমার পিতৃদেব দেহরক্ষা করেন।

মহাযুদ্ধ বখন পূর্ণভাবে ঘোষিত হোলো এবং এই যুদ্ধে আমার স্বদেশ জড়িত হয়ে পড়ল, তখন আমার মনের অবস্থা হোলো অতি অদ্ভুত। আমার মনে জাগল নানা প্রশ্ন, নানা সমস্যা,—সন্দেহ আর অস্থিরতার যুহুর্থে যুহুর্থে বিপরীতমুখী চিন্তার টানাটানি। আমি অবশ্য বুঝতে পারছিলাম এমনি শিথিল অস্থিরতা বিপজ্জনক,—অবিলম্বে যদি কঠিন মনে সত্য সিদ্ধান্ত করতে না পারি, তাহলে নিছক আবেগের বস্তার ভেসে যেতে হবে।

আপাতদৃষ্টিতে এই যুদ্ধকে আমার অত্যন্ত সাধু ও মহান বলে মনে হয়েছিল। আমি দেখছিলাম বিন্যস্ত প্রতিবাদ না করে প্রতি দেশের তত্ত্ব সস্ত্রাদার যুদ্ধের পথে অগ্রসর হচ্ছে,—যে উদ্দেশ্যকে জ্ঞার ও সত্য বলে মনে করেছে, সেই উদ্দেশ্যের সফলতার জন্তে জীবন ও জীবনের চেয়েও মহার্ঘতর সব কিছুকে বিসর্জন দিতে যুহুর্থের জন্ত বিধা করছে না।

এই মহাযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্র মানব সমাজের যে বিপুল নৈতিক পরীক্ষা উপস্থিত হয়েছিল, সেই পরীক্ষা রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম অল্পহুতি অন্তরকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। এই বংশের গোড়ার দিক থেকে আমি তাঁর সঙ্গে ছিলাম। মানবাত্মার বেদনার্ত অন্ধকার,—যে বেদনার কোনো তল নেই, যে অন্ধকারের কোনো সীমা নেই,—সেই বেদনার মথিত হচ্ছিল কবির মন, সেই অন্ধকার গ্রাস করছিল তাঁর হৃদয়,—সর্বদা তিনি ভাবতেন সারা পৃথিবীর মহা সর্বনাশ বৃষ্টি দিনে দিনে ঘনিষে আসছে। শেষ পর্যন্ত মহাযুদ্ধ বখন বাধল, পরম আশায় তিনি বুক বাঁধলেন এই ভেবে যে প্রাচীন পৃথিবীর রণবিধ্বস্ত ভূপৃষ্ঠটির উপরে এক নবীনতর মহত্তর পৃথিবীর জন্ম হবে।

পৃথিবীর এই গভীরতম বেদনার যুহুর্থে রবীন্দ্রনাথের মনে সর্বপ্রথম আশার একটি অংশ বেজেছিল। কিন্তু আধুনিক যুদ্ধের স্বরূপকে উপলব্ধি করতে তাঁর দেরি হয়নি। এই যুদ্ধ সত্যের বিরুদ্ধে, মানবতার বিরুদ্ধে। মিথ্যা ও কলুষকামনার যে হলাহলকে

এই যুদ্ধ উৎকৃষ্ট করল, অমাহুতিক নিষ্ঠুরতা ও পাশব বর্বরতার যে নিলজ্ঞতাকে দিকে দিকে প্রকাশ করল, তাতে কবি যেন হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। যুদ্ধের সমস্ত আঘাত যেন তাঁর একলা অন্তরের গভীরে গিয়ে বাজল। যুদ্ধকে তিনি ঘৃণা করলেন। বছরের পর বছর ধরে যুদ্ধ চলতে লাগল, যুদ্ধের প্রতি তাঁর ঘৃণাও গভীর থেকে গভীরতর হয়ে উঠতে লাগল।

মহাযুদ্ধের সূচনাকালে আমার মনে যে বিধা উপস্থিত হয়েছিল সেই বিধা আমার নৈতিক পরাজয়। উত্তেজনার সক্রামক ব্যাধিতে সমস্ত পৃথিবী আক্রান্ত, রণোন্মাদ তখন বস্তার মতো সর্বদেশের মানব সমাজকে গ্রাস করছে। এই বিপুল তরঙ্গকে প্রতিহত করার মতো শক্তি আমার ছিল না। যুদ্ধের উন্মাদনা আমার মনের মধ্যে মাথা উঁচু করেছিল, তাকে সবত করতে আমি পারি নি। যুদ্ধের প্রত্যেকটি সবাদ আমি তখন উদ্গ্রীব উৎসাহ নিয়ে অনুধাবন করতাম, কেন না হিংসার বীজ আমার মনে তখন উগ্ধ হয়েছিল। এই বীজ বখন তার ঘৃণা দানবীয়তা নিয়ে অবচেতন থেকে চেতনার স্তরে এসে পৌঁছলো,—তখন আমার চমক ভাঙল। নিজেকে ঘৃণা করলাম,—নিজের মনের সঙ্গেই লড়াই শুরু হোলো আমার। কেন না, বখনই আমি উত্তেজনাবিহীন শান্ত যুহুর্থে চিন্তা করেছি, মনের শুভবোধ সর্বদা স্বীকার করেছে যে খৃষ্টনীতি যুদ্ধনীতির পরিপন্থী। এ ছাড়া শীতাই আমি বুঝতে পারলাম যে স্কুলিক্সের সঙ্গে বাতাস দিয়ে দিয়ে যেমন সেই স্কুলিক্সকে লেলিহান অগ্নিশিখায় পরিণত করা হয়, তেমনি শত্রুর প্রতি ঘৃণাকে লেলিহান ধ্বংসশিখায় পরিণত করা হচ্ছে মিথ্যার বাটিকার সাহায্যে। সেই মিথ্যাকে চিনতে পেলে সাবধান হলাম আমি।

ক্রমে আমার আচ্ছন্ন চোখের মিথ্যা দৃষ্টি খসে পড়ল। মনের ঘোর কাটল। শান্ত অথচ আশংকাতর মন নিয়ে আমি আমার ধর্মগ্রন্থের আশ্রয় গ্রহণ করলাম,—আরো সবতনে ও আরো নিষ্ঠাভাবে পড়তে লাগলাম প্রভুর বাণী। প্রভু খুঁট আমাকে পথ দেখালেন, আমি বুঝলাম যে ধর্ম ও যুদ্ধ এই দুই-এর মাঝে কোনো সন্ধি নেই। ঈশ্বর ও যুদ্ধ—এই দুই প্রভুর উপাসনা একসঙ্গে করা যায় না। বীণখুঁট সম্পূর্ণ ভাষায় ঘোষণা করেছেন—

“তোমার শত্রুকে তুমি প্রেম করো; হারা তোমাকে অবজ্ঞা করে তাদের তুমি মঙ্গল করো, হারা তোমার প্রতি ঘৃণাসূচক ব্যবহার করে, তাদের জন্তে তুমি প্রার্থনা করো। তবেই তুমি তোমার পরমপিতার উপযুক্ত সন্তান হতে পারবে।”

খুঁটের এই ঘোষণার কোনো দ্ব্যর্থ নেই, কোনো দুর্বোধ্যতা নেই।

আমি বুঝলাম, সঙ্গী সমস্ত আমার সমুখে। ঈশ্বরের মহিমাকে নতন করে উপলব্ধি করতে হবে আমাকে। কার্কে আমি পূজা করব? কে আমার ঈশ্বর? গুড টেটামেটের গোপ্তিদেবতা যিনি তিনিই কি আমার ঈশ্বর? নিউ টেটামেটের অন্তরদেবতা যিনি, হার মহিমাকে খুঁট বিশ্বদানবের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তিনিই কি আমার ঈশ্বর? আমি দেখলাম, রণোন্মাদনাকে মনের মধ্যে বাসা দিয়ে আমি আমার পরম প্রভু খুঁটের প্রতি বিশ্বাসহতা হয়েছি। কিন্তু প্রভু আমাকে রক্ষা করেছেন, তিনি তাঁর নিত্যবাণীর সত্যস্বরূপে আমার স্ত্রিয় মানসকে পরিচ্ছন্ন করেছেন, আমার অন্ধাকে কিরিয়ে এনেছেন শুভ পথগীনার।

এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে আমি নিবিড়তম সাহায্য লাভ করেছিলাম। তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও প্রেম দিনে দিনে গভীর থেকে গভীরতর হয়েছিল। তিনি তাঁর শান্ত বুদ্ধি দিয়ে আমার সংশয় উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। আমার অন্তর্ভবনের কথা আমি অকণ্টে নিবেদন করলে পেরেছিলাম তাঁর কাছে। অগুঠান হিন্দু হলেও রবীন্দ্রনাথ 'সার্মন অন দি মাউন্ট' পাঠ করেছিলেন ও এই উপদেশাবলীর গভীর তাৎপৰ্য হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। তিনি আমাকে বলেছিলেন,—'তোমরা খৃষ্টান হয়ে এ কী করছ? স্পষ্টতম নৈতিক নির্দেশ রয়েছে তোমাদের ধর্মে,—সেই নির্দেশ তোমরা পালন করো না কেন?'

অপর এক তৃতীয় সূত্র থেকেও আমি সংকটে সাহায্য লাভ করি। এই সূত্র গান্ধীজির জীবনবোধ। দক্ষিণ আফ্রিকাতে মহাত্মা গান্ধীর সাহচর্যে আমি দেখেছিলাম 'সার্মন অন দি মাউন্ট'-এর উপদেশাবলীর নিহিত অর্থ কর্মের মাধ্যমে কী ভাবে তিনি প্রকাশ করেছেন। খৃষ্টানদের তিনি লজ্জা দিয়েছেন,—তাঁর উদাহরণ আমার চিত্তপটে অবিস্মরণীয়। সত্যই তাঁর শক্তি, তাঁর 'সত্যগ্রহ' খৃষ্টোপম অনুপ্রাণনা। এই বুদ্ধ সত্যগ্রহের বিপরীত,—খৃষ্টকে যে অনুসরণ করে বুদ্ধ তার অমিত্র।

রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী ও আমার ধর্মগ্রন্থ—এই তিন প্রভাব একটি অচকল বিশ্বাসের কেন্দ্রে আমাকে পৌঁছে দিল। সংশয়হারা হীন সুস্পষ্ট দৃষ্টিতে সত্যের আলোকে আমি দেখলাম যে, এই বুদ্ধ খৃষ্ট-নির্দেশের পরিপন্থী। আমি দৃঢ়নিশ্চয় ছিলাম যে, এই বুদ্ধ আমার নয়। যুদ্ধের কাজে যোগদানের জন্য যখন নির্দেশ এল, তখন আমি নির্ভীকচিত্তে অস্বীকার করলাম। এই অস্বীকারের অর্থ কাব্যবর্ণন। তার জন্মেও আমি সোৎসাহে প্রস্তুত ছিলাম। যদিও শেষ পর্যন্ত বুদ্ধ-পরিপন্থী বলে আমাকে শাস্তিভোগ করতে হয়নি, তবুও গমগ্র মহাবুদ্ধি কালে যুদ্ধের জন্মেও আর কখনো আমার মনে আবিগতা আসেনি। বিশ্বাসই মুক্তি। এই বিশ্বাস আমাকে মহামুক্তি দিল। এই বিশ্বাসের জন্মেও ভবিষ্যতে কখনো অনুতাপ করিনি।

এই মহাবুদ্ধি আমার জীবনে এক মহা পরীক্ষা। এই পরীক্ষার মধ্যে অবর্ণনীয় মানসিক যন্ত্রণার আমার চিত্ত বিকল হয়েছিল। কিন্তু এই যন্ত্রণার মধ্যে আমার প্রত্ন খৃষ্টের প্রসাদ আমি লাভ করেছি,—মব মব স্বপ্ন অগোচর রূপে তিনি আমার মনচ্ছকুর সম্মুখে আপনাকে প্রতিভাত করেছেন। দুটি প্রতিজ্ঞা আমি করতে পেরেছিলাম,—প্রথম প্রতিজ্ঞা যে খৃষ্টান-গোষ্ঠীর মত গভীর মধ্যে আর কখনো থাকব না। দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা, যুদ্ধকে সমর্থন করব না। এই উভয় প্রতিজ্ঞাই আমার জীবনে সার্থক হয়েছে। এই প্রতিজ্ঞা গ্রহণের পর আমার জীবনে বীতর শক্তিকে আমি গভীরতর ভাবে লাভ করেছি, তাঁর প্রসন্নতর মূর্তি উদ্ঘাটিত হয়েছে আমার চৃষ্টির সম্মুখে।

এই সময়ে স্থগীল ক্ষত্রের পুত্র সুরীর আমার কাছে এসেছিল। কিছুদিন আমার কাছে থাকার পর অ্যাবুলেলের কাজ নিয়ে সে ফালে যায়। সুরীর আমাকে বলেছিল, 'সার, এখানে এই শান্তিনিকেতনে আপনি আছেন কী করে? এখানে তো 'হোলি কমিউনিয়ন' নেই?'

আমি বলেছিলাম,—এই সব শিওর দল, বাদের আমি শিক্ষা দিচ্ছি, একই আমার 'হোলি কমিউনিয়ন'। আমি বলেছিলাম, ঈশ্বরের নামে শরণাগত ভূগর্ভকে এক পাত্র জলদানই প্রকৃত হোলি কমিউনিয়ন, তাই নয়?

আমার এই কথা সুরীর চিরদিন মনে রেখেছিল। ফ্রান্স থেকে প্রত্যাবর্তনের পর সে যখন তার পিতার শেষ রোগশয্যা পাশে, আমিও তখন তার সঙ্গে ছিলাম। সুরীর তখন আমাকে বলেছিল, 'শান্তিনিকেতনের সেই সন্ধ্যাটিতে যে কথাগুলি আমাকে বলেছিলেন সে কথা ফ্রান্সে থাকতে আমাকে বারে বারে সাহায্য করেছে। ফ্রান্সে বিভিন্ন হাসপাতালে সৈনিকদের যখন আমি শুশ্রূষা করতাম, তখন বুঝেছিলাম আপনার কথা কতো সত্য। এই সব রোগীদের দিকে তাকিয়ে আমিও বলতাম, এই আমার হোলি কমিউনিয়ন।' খৃষ্ট বলেছিলেন, 'আমি অশ্বহু ছিলাম, তুমি আমার সেবা করেছিলে।' খৃষ্টবাণীর নিগূঢ় তাৎপৰ্য আপনার কথ্যে আমি উপলব্ধি করেছি।

খৃষ্টের এই পরম বাণী আমার দৈনন্দিন জীবনে আমাকে নিরবচ্ছিন্ন সাহায্য করেছে, প্রেরণা দিয়েছে, শাস্তি দিয়েছে, আনন্দ দিয়েছে। কেন না, প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে আবদ্ধ শুধু মাত্র একটি নৈর্যাত্তিক মহা আদর্শ বলে আমি খৃষ্টকে দেখিনি। তাঁকে আমি জীবন্ত মানুষ বলে উপলব্ধি করেছি, বীর পরমাত্মার সঙ্গে আমার অন্তরাত্মার প্রত্যক্ষ সংযোগ আমি সর্বদা অনুভব করেছি। মহাবুদ্ধির প্রারম্ভে যে নৈতিক অন্তর্ভবনের কথা উল্লেখ করেছি, তাঁর প্রত্যক্ষ বাণীর প্রসাদে শেষ পর্যন্ত আমি সেই অন্তর্ভবন থেকে মুক্তি পেয়েছিলাম। প্রভুর সেই বাণীর মধ্যে তাঁর অন্তরের গভীরতম বেদনা ও পরমতম আশ্বাসকে আমি অনুভব করেছিলাম। আমি যেন স্বকর্ণে শুনেছিলাম যে ধর্মসেব উন্নত শোভাবাত্রার যোগদানের বিরুদ্ধে তিনি আমাকে সাবধান করে বলছেন, আমার পশ্চাতে যে আগতে চায় সে যেন আপন সন্তকে পিছার করে আপন স্বক্কে ক্রসকে গ্রহণ করে একান্ত ভাবে শুধু আমাকেই অনুসরণ করে।

এমনি সময়ে একটি নূতন চিন্তা আমার মনকে অবিকার করতে লাগল। যুদ্ধের আগ আমি আফ্রিকার গিরে আফ্রিকাবাসীদের প্রতি বর্ণবৈষম্যমূলক ব্যবহার প্রত্যক্ষ করেছিলাম,—সেখানকার ভারতীয় চুক্তিদাসদেরও আমি দেখেছিলাম। তখন এই বলিষ্ঠ প্রত্যয় আমার চিত্তে সুস্পষ্ট হয়েছিল যে ম'হু'বের এই অবমাননার বেদনা মানবপুত্র বীতঃই অন্তর বেদনা। এবার এই ইউরোপীয় মহাবুদ্ধি দেখে আমি দ্বিগুণিত হয়েছিলাম যে বাদিজিক প্রতিযোগিতা ও শোষণনীতি পাপ এই যুদ্ধের মূল কারণ, এবং পৃথিবীর অনুন্নত জাতিরাই এই পাপের প্রধান বলি। যারা অনুন্নত, যারা দুর্বল, খৃষ্ট তাদেরই দলে। ভাগ্য বাদের কল্পণ, তাদেরই দিকে তাঁর অনন্ত করুণা ধাবিত, তাদেরই তিনি আহ্বান করে বলেছেন,—'এসো তোমরা,—যারা শ্রান্ত যারা গুরুভার—আমার কাছে তোমরা এস,—আমি তোমাদের দেব বিশ্রাম।'

আমার মনের এই সব প্রবল চিন্তা আমি কবির কাছে ব্যক্ত করলাম। আমার ভাবনার সঙ্গে তাঁর ভাবনার মিল দেখে আমার যড়ো আনন্দ হোলো। বর্ণ-বৈষম্য বা জাতীয় অহমিকার সামান্যতম কালিয়া তাঁর মনকে কখনো স্পর্শ করেনি। অপরদিকে মাঝার

বৈজ্ঞানিক প্রগতির জন্ত পাশ্চাত্য জগতের প্রতি তাঁর গভীর অস্বস্তি ছিল। কিন্তু পাশ্চাত্য জগতের প্রতি অভিযোগও তাঁর মনে ছিল অবল। যে স্বাভাব্যগর্ব ও বাণিজ্যিক লালসার বলে পাশ্চাত্য জগত সারা পৃথিবীকে গ্রাস করতে চলেছে, তাকে তিনি ক্ষমা করতে পারেননি। মহাযুদ্ধ প্রসঙ্গে কবি বলতেন,—‘অনেক কিছু গ্রাস করেছে ওরা, এবার এসেছে যুদ্ধের বিধ্বংস।’

আমি কবিকে বলেছিলাম যে আমার মনে হয় হয়তো এ মহাযুদ্ধ মানুষের বহু মালিন্য মোচনের মুক্তিদান। আমার এ কথা কবির মুখে যে বেদনার প্রতিচ্ছবি আমি দেখেছিলাম তা জীবনে ভুলব না। উত্তরে তিনি বলেছিলেন,—

‘তোমার কথা সত্য হোক চার্লি, এতে তোমাদেরও মঙ্গল, আমাদেরও মঙ্গল। কিন্তু এই পাপের মূলে বসেছে লোভ। মনের গভীর কন্ডর থেকে এই লোভের শিকড়কে যদি নিমূল করা না যায়, তাহলে এই মহাযুদ্ধের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে আবার উন্মুক্ত প্রতিযোগিতা শুরু হবে অর্থনৈতিক ক্ষতিকে পূর্ণ করবার, দরিদ্র অল্পবয়সকে শোষণ করবার। এই লোভ আর এই শোষণ সূত্রই হোলো আসল ব্যাধি, এই কালব্যাদি যদি না সারে, তাহলে ব্যাধির ব্যাধিক্রমের চিকিৎসা করে লাভ কি?’

‘এসো তোমরা, ধারা প্রান্ত ধারা গুরুভার, আমার কাছে তোমরা এসো’—যুগের এই কথাগুলি এ সময় নিরন্তর আমার মনে প্রতিধ্বনিত হতো। তারপর ধীরে ধীরে আমার মন এক পরম চৈতন্তে অল্পপ্রাণিত হয়ে উঠল, আমার অন্তর আমার প্রভুর কাছ থেকে এক পরম নির্দেশ লাভ করল। তিনি আমাকে আহ্বান করলেন এক যুদ্ধে, ইউরোপের বিভিন্ন রণক্ষেত্র জুড়ে যে মহাযুদ্ধ চলেছে, তার চেয়ে মহত্তর যুদ্ধের সন্ধান হতে তিনি আমাকে ডাক দিলেন। এ যুদ্ধ যুগের নিজের যুদ্ধ, সমস্ত পৃথিবীর পদানত নিপীড়িত মানুষের স্বপক্ষে অত্যাচারের বিরুদ্ধে হিংসার বিরুদ্ধে ঘৃণার বিরুদ্ধে তাঁর নিত্যকালের যুদ্ধে তিনি আমাকে তাঁর সৈনিক করে নিলেন। সৈনিক আমি হব না, সামরিক কাজ আমি কিছুতে গ্রহণ করব না, তাতে যে বিশপই আসুক এই ছিল এতদিন আমার দৃঢ় সংকল্প। কিন্তু এই সংকল্প ছিল নষ্টব্য। কিন্তু প্রত্যক্ষ কর্তব্যের আহ্বানে প্রভুর নির্দেশে আমি সৈনিক হতে পারলাম এবার, বৃহত্তর ক্ষেত্রে বিরাটতম ধর্মযুদ্ধে আত্মনিবেদনের নিঃসঙ্কোচ আশ্বাস আমার মনে লাগল।

এই আশ্বাসের কথা আজ এখানে লিপিবদ্ধ করা নিতান্ত সহজ। সেদিন কিন্তু এই আশ্বাসকে একনিষ্ঠ আস্থার সঙ্গে আঁকড়ে রাখা মোটেও সহজ ছিল না। তখন সারা পৃথিবী জুড়ে মহাযুদ্ধ চলেছে, পূর্বে ও পশ্চিমে প্রতিদিনের জয় পরাজয়ের সংবাদে উত্তেজনার তরঙ্গে মন সর্বদা আলোড়িত। এই নিত্য আলোড়নের হাত থেকে পরিব্রাণস্বরূপ কোনো প্রত্যক্ষ কর্তব্যের সন্ধান করা তখন সহজ ছিল না আমার পক্ষে। পৃথিবীর অজ্ঞাত বর্ণ ও জাতির প্রতি ইউরোপীয় জাতিবৃন্দের ব্যবহার সম্পর্কে তখনো এ আশাও আমার মনে ছিল, যে ইংরেজ জাতি সাধারণের ব্যতিক্রম, ইংরেজ জাতির ব্যবহার মঙ্গল। এই জাতি যে আমাদেরই জাতি, এই জাতির আদর্শ যে আমাদেরই গৌরব। স্বজাতির প্রেত্ব সবচেয়ে আমার পিতার বলে

যে অল্প বিশ্বাস ছিল, সেই বিশ্বাস আমারও যত্নে পোষিত হয়েছিল। বিদেশে এসে অনেক অভিজ্ঞতা লাভ সত্ত্বেও আমার মনের গভীর অন্তস্তল থেকে সে বিশ্বাসকে আমি বুঝে ফেসতে পারিনি।

যে সময়ে দাসত্বপ্রথা রদ হয় ও বিখ্যাত রিকর্স আইনগুলি পাশ হয়, ঠিক সেই সময়ে আমার পিতৃদেবের জন্ম হয়। স্বাধীনতার প্রতি সুদৃঢ় আস্থা ও সমর্থ মানবতাবোধের ঐতিহ্য তিনি লাভ করেন তাঁর পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে। স্বাধীনতা ও মানব কল্যাণের আদর্শ আমাদের ট্রেট অ্যান্টিক্যান রক্তের ধারায় প্রবাহিত। এই আদর্শের সঙ্গে আমাদের দেশের উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বযুগের চিন্তাধারার গভীর সংযোগ। ব্রিটিশ ইতিহাসে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ একটি স্মরণীয় কাল। ক্লার্কসন, উইলবারফোর্স, লিভিংষ্টোন, শ্রাকটনবেরি, ফোরেস্ট নাইটিংগেল, জোসেফিন বাউলার প্রভৃতি মানবরক্ত যে দেশের সন্তান, মানবকল্যাণ ত্রুটির ইতিহাসে সে দেশের অবদান অকিঞ্চিৎকর নয়।

কিন্তু ১৮৮০ সাল নাগাদ আমার স্বজাতির ধ্যানধারণার এক বিচিত্র পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল। আফ্রিকা ভূখণ্ডে ও অন্তর ইউরোপীয় জাতিদের সাম্রাজ্যলোভনুপতার সঙ্গে সঙ্গে এই পরিবর্তনের শুরু। এই সঙ্গে খৃষ্টীয় নির্দেশের পরিপন্থী বর্ণবিষেব ও জাতি-অহমিকা সারা পৃথিবীতে প্রকটতর হয়ে উঠল। ‘বেতকার’ মানুষ সর্বস্ত্রে ঘোষণা করল যে সেই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ, তার জাতিই উচ্চতম জাতি। অল্প মানুষ অল্প জাতির সম্পর্ক থেকে সে নিজেকে ঘুরে সরিয়ে নিতে লাগল। শুরু হোলো মানুষের প্রতি ঈর্ষ্যবোধের তিক্ত বিষেব। বিদেশে ভ্রমণ করার ফলে আমি যে-সব দৃশ্য দেখেছি আমার পিতৃদেব তা দেখেন নি, আমি যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি তা ছিল তাঁর কল্পনারও বাইরে। এই ঘৃণ্য বর্ণবিষেব বিশেষ করে পৃথিবীর উষ্ণ অঞ্চলে কী লজ্জাকর বিভৎস তার সঙ্গে প্রকট হয়েছে জাতিভেদের নামে নিলজ্জা কুঠাইনতার সঙ্গে কতো সাংঘাতিক অপকর্ম অমুষ্ঠিত হয়েছে, আমি তা জানি। এও আমি জানি যে আমার প্রতিদিনের কর্ম ও চিন্তার সত্যত যদি যুগের দৃষ্টি না থাকত তাহলে হয়তো স্বার্থপরতা ও বিজ্ঞাপিত প্রতি ঘৃণার আমি অনেক বেতকারকেই ছাড়িয়ে যেতাম। আমি জানি, এই পাপের বীজ আমার মনের মধ্যেও ছিল,—প্রভু বীণই আমাকে রক্ষা করেছেন।

এই সময়কার সমস্ত অজ্ঞদর্পের নিবৃত্তি হোলো অতর্কিতে। ১৯১৫ সালের মে মাস। আশ্রমে প্রীত্বের ছুটি হোলো। ছাত্র ও শিক্ষকেরা যে বার বাড়ি ফিরল। কয়েকটা দরকারী কাগজ সংগ্রহের জন্ত কলকাতা থেকে আবার শান্তিনিকেতনে যেতে হোলো আমাকে। হঠাৎ বিকেল পাঁচটা নাগাদ আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম। অবিলম্বে প্রকট হোলো যে এশিয়াটিক কলেজের সাংঘাতিক কাল ব্যাধি আমাকে ধরেছে। কাছাকাছি কোনো অভিজ্ঞ চিকিৎসক নেই। বাকি সে রাত্রের মধ্যেই জানা যায়। সমস্ত রাত কাটল নিরবচ্ছিন্ন ব্যর্থতার—তবু আমার আচ্ছন্ন চৈতন্তে মাঝে মাঝে ভেসে উঠতে লাগল বীণর বেদনাহত কল্পনাময় মূর্তি।

কলকাতা থেকে কবি ছুটে এসেন শান্তিনিকেতনে। আমার

রোগের সংবাদ পেয়ে এক মুহূর্ত বিলম্ব তিনি করেন নি। পরদিন প্রভাতে কবির মুখ দেখে আমি বেন নবজীবন লাভ করলাম। তাঁকে যে আমি কতো ভালোবাসি তা আমি সেই মুহূর্তেই বেন সম্যক উপলব্ধি করলাম। তাঁর প্রতি, গভীর শ্রদ্ধা আমার ছিল কিন্তু এই ভালোবাসা শ্রদ্ধার চেয়ে অনেক গভীর, অনেক আন্তরিক।

কলেরা রোগ অত্যন্ত সংক্রামক। কবি এবং আমার অন্ত্যন্ত দুহন্দরা বীণের নিরন্তর সেবায় আমি পুনর্জীবন লাভ করেছিলাম, তাঁরা নিজেরাই যে কোনো মুহূর্তে এই রোগে আক্রান্ত হতে পারতেন। আপন প্রাণের মমতা না করে তাঁরা আমার কুশ্রীয়া করেছিলেন,—গভীর স্নেহভরে আমাকে মৃত্যুমুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছিলেন।

বেশ কিছুদিন পরে আমাকে কলকাতায় এক নার্সিং হোমে স্থানান্তরিত করা হলো। তারপর স্বতঃস্ফূর্তভাবে আশায় আমি গেলাম সিমলায়।

ফিজি দ্বীপ

সিমলা পাহাড়ে প্রত্যাবর্তন করে দিনের পর দিন উষ্ণ রৌদ্রের নিচে এক দীর্ঘ বারান্দায় আমি শুয়ে থাকতাম। শরীর এতো দুর্বল যে, কিছু পড়তে পর্যন্ত ক্লান্তি আসত। সেই সময় চুক্তিদাসস্বত্ব ভারতীয় শ্রমিকদের সন্ধে একটি সরকারী বিবরণী আমার হাতে এল। দক্ষিণ আফ্রিকার অভিজ্ঞতার পরে এই পুস্তিকার বিবরণ সন্ধে আমার স্বাভাবিক আগ্রহ ছিল। বইটির পাতা উলটিয়ে দেখতে লাগলাম। ফিজি দ্বীপপুঞ্জে ভারতীয় শ্রমিকদের আত্মহত্যার সংখ্যা ও বিবরণ দেখে আমি চমকে উঠলাম।

ফিজি দ্বীপ বহুদূরে,—দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে। সেখানেও বহু ভারতীয় শ্রমিকের বাস, বাগিচায় চুক্তিদাসস্বত্ব তাদের জীবিকা-বিপোর্ট পড়ে দেখলাম ভারতবর্ষে কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মহত্যার সংখ্যা যতো, তার বহুগুণ বেশি এই ফিজিপ্রবাসী ভারতীয় বাগিচা-শ্রমিকদের মধ্যে। এর কারণ গৃহগতপ্রাণ প্রবাসীদের দুঃসহ জীবনযাত্রা।

নাটাল ও অন্তর ভারতীয় শ্রমিকদের জীবনযাত্রার পাশাপাশি ফিজির ভারতীয়দের জীবনযাত্রার বিবরণ তুলনামূলক ভাবে এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ ছিল। ফিজির বিবরণ এতোই করুণ যে, আমি তা পড়ে অবাক হয়ে গেলাম। নাটালের চুক্তিদাসস্বত্ব প্রথা আমি নিজের চোখে দেখে এসেছি। ফিজি দ্বীপের ভারতীয় শ্রমদাসদের জীবনযাত্রা যে কতো বীভৎস তার আমার মানস চক্ষে স্পষ্ট ফুটে উঠল। আমি বইটি বন্ধ করলাম। বেশি পড়ার শক্তি আমার ছিল না। কিন্তু যেটুকু পড়েছি তার চিন্তা দুঃস্বপ্নের মতো মনে জেগে রইল।

কয়েকদিন পরের কথা। ছপূর বেলা আমি চোখ বুঁজে বারান্দায় শুয়ে আছি। হঠাৎ আমার বক্ষদৃষ্টির সামনে এক বিচিত্র দৃশ্য বেন ভেসে উঠল। নাটালের সেই দরিদ্র ভারতীয় শ্রমিকটিকে আমি বেন দেখলাম, শ্বেতকায় মালিকের বেত্রদণ্ডের আঘাতে আঘাতে যার সমস্ত পিঠ ক্ষতবিক্ষত। সে বেন উদ্ভ্রান্ত করুণ দৃষ্টি মেলে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। তার মুখের দিক তাকিয়ে মুখে আমারও বুক বেন বিদীর্ণ হয়ে গেল। একটু পরেই আমার মানস চক্ষের সামনে তার মুখটি বদলে গেল, আমি দেখলাম মানবপালক পরমশ্রদ্ধা যীতর মুখ, যে মুখকে শিতকাল থেকে আমি চিনেছি ও একান্ত করে ভালোবেসেছি। এই মুখখানি আমার মনমুহুরে এখনই স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল যে আমি

আত্মহারা হয়ে গেলাম, সমস্ত প্রাণ আমি বেন দীপ দিলার কৃষ্টিত আত্মনিবেদনে। ক্রমে দৃষ্টি মিলিয়ে গেল। আমি ভক্ত হয়ে পড়ে রইলাম সেই নিঃসঙ্গ বারান্দায়। বহুক্ষণ পরে বুকেরা আমি যা দেখছিলাম তা জাগ্রত স্বপ্ন, মাছের বেননা-বন্ধনার গভীর আবেগের ফলে আমার মগ্ন চৈতন্য এই স্বপ্নের সৃষ্টি করেছে।

আমার বিশ্বাস, সেদিন আমার প্রভু প্রকৃতিই আমার সামনে প্রকাশিত হয়েছিলেন। ইন্দ্রিয় দিয়ে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করা আর অন্তর দিয়ে অনুভব করা,—দুইই একই প্রকারের অভিজ্ঞতা। মুখে যতো আলাদা বলি'না কেন, এই দুইয়ের মধ্যে অতি সংকীর্ণ সীমারেখা, অনেক সময় এই রেখা কোথায় তা খুঁজেই পাওয়া যায় না।

সেই উষ্ণ দ্বিপ্রহরের উজ্জ্বল সূর্যালোকের মতো এই কথাটি আমার মনে উদ্ভাসিত হয়ে গেল যে খুঁট আমাকে আহ্বান করছেন ঐ সুদূর সমুদ্রপারের ফিজি দ্বীপপুঞ্জে,—তাঁর আহ্বান ব্যর্থ হবেনা আমার জীবনে। কোনো প্রশ্ন নেই, কোনো দ্বিধা নেই,—খুঁট-নির্দিষ্ট কর্তব্য আমাকে পালন করতেই হবে। ফিজি দ্বীপে যাত্রার চিন্তায় আকুল হয়ে উঠল আমার মন। কোন্ পথে যাব, যেতে কতোদিন লাগবে,—এই সব খোঁজ খবর আমি নিতে শুরু করলাম। আমার জীবনের এক নতুন অর্ধ নতুন আশা আমি খুঁজে পেলাম, সেই সঙ্গে নবস্বাস্থ্যের স্পর্শ লাগল আমার দুর্বল দেহে। একই মুহূর্তে হবার সঙ্গে সঙ্গে কবির কাছে আমার উদ্দেশ্য নিবেদন করলাম। কবি সানন্দে তাঁর আশ্রমের কাজ থেকে আমাকে ছুটি দিলেন। পরমবন্ধু উইলি পিয়ার্সন আমার সহযাত্রী হলো, এতে অপরিণীত আনন্দ হলো আমার। কবির উনার হৃদয়ের প্রসন্ন আশীর্বাদ নিয়ে আমার ভারতবর্ষ থেকে ফিজি দ্বীপপুঞ্জে যাত্রা করলাম।

ফিজিতে পৌঁছিয়ে আমরা দেখলাম সেখানকার অবস্থা বই-এ যা পড়েছিলাম তার চেয়ে অনেক ভয়াবহ। শ্রমদাসদের নিপড়বস্ত্র ভারতীয় নারীদের অবস্থা এতো দুঃসহ যে ভা বর্ণনা করা যায় না। নাটালে কুলি লাইনে যে নৈতিক অবনতির কুসংস্কৃত চিত্র দেখেছি এখানেও তার ব্যতিক্রম নেই। বরং ফিজির ভারতীয় শ্রমিকদের মধ্যে নৈতিক কলঙ্ক গাঢ়তর। এমনি শ্রমচুক্তির নিগড়ে আবদ্ধ হয়ে হাজার হাজার দরিদ্র ভারতীয় সারা পৃথিবীর বিভিন্ন উপনিবেশে ছড়িয়ে পড়েছে,—ফিজি, মরিশাস, নাটাল ও বৃটিশ গায়নার অভিবাসিত করছে বর্ণাভাত্য দুঃখের জীবন। তাছাড়া ভারতবর্ষ থেকে আড়কাট্টরা প্রাতি বৎসর ঝাঁকে ঝাঁকে ভারতীয় শ্রমিককে দূর-দূরান্তে ঝেঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমি দৃঢ়নিশ্চয় ইলাম যে এমনি শ্রমিক-সংগ্রহকে পুরোপুরি বন্ধ করা ছাড়া অল্প কোনো মধ্য পদ্ধতি নেই।

উপনিবেশের কৃষি-মালিকদের দৃষ্টিভঙ্গী যে বদলাবে এ আশা করা বৃথা। কিন্তু ভারতবর্ষের জনমত এই পদ্ধতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয়ে উঠেছে। মহাত্মা গান্ধী ও পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য এই চুক্তিদাসপ্রথা অবসানকে ভারতবাসীর প্রধান রাজনৈতিক দাবী বলে ঘোষণা করেছেন। ভারতবর্ষের সম্ভ্রান্ত মহিলাগণ তাঁদের সাগর পারের ছুখিনী ভগিনীদের বেদনাকে আপন হৃদয়ে গ্রহণ করেছেন। ফিজি দ্বীপপুঞ্জ থেকে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিবরণ বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের কাছে পেশ করা হলো। তিনি এই বিবরণীর বাধ্যবাধ্য স্বীকার করলেন, কলে চুক্তিদাসপ্রথা অবসান বনিয়ে এল।

ফিজি থেকে ভারতে প্রত্যাবর্তন করে আমরা যে রিপোর্ট দিলাম

তার অব্যবহিত পরেই চুক্তিদাসপ্রথা রদ আইন পাশ হোলো। ফিজির বিভিন্ন বাণিজ্যের হ্রাস ও অনাচারের যে সব তথ্য আমরা সংগ্রহ করে এনেছিলাম তা এমনি প্রত্যক ও স্বয়ংস্পর্শী যে, ভাইসরয় স.স. সঙ্গে ইংলণ্ডের ভারত-সচিবের সঙ্গে বোগাযোগ স্থাপনে কিছুমাত্র বিলম্ব কল্লেন না। চুক্তিদাসপ্রথা রদ করার আইন বাতে যতো দীর্ঘ সম্ভব পাশ হয় তার জন্তে তিনি তৎপর হয়ে উঠলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঔপনিবেশিক দপ্তরের অল্পরোধে এই আইনে এমন একটি বিপত্তিকর বাক্য ছুড়ে দেওয়া হোলো যাতে আমাদের অনেক আশায় বাদ সাধল। আইনের একটি ধারার বলা হোলো যে এই প্রথার প্রয়োজনীয় রদবদলের জন্তে কিছু বিলম্ব ঘটবে।

চুক্তিদাসপ্রথা রদ হোলো, এই আনন্দের উচ্ছ্বাসে আমরা ঐ একটি ধারা সম্বন্ধে প্রথমে অবহিত হইনি। কিন্তু এই ধারার ফলে সমস্ত ব্যাপারটা এমনি জটিল হয়ে উঠল যে এক বৎসর যেতে না যেতে আবার নতুন করে কাজ শুরু করতে হোলো। আমরা অল্পসন্ধান করে জানলাম যে ঐ বিলম্বকর ধারার সুবোগ নিয়ে লগুনে এক চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে যাতে আরো পাঁচ বছর ধরে শ্রমিক সংগ্রহ করা চলবে এবং এই পাঁচ বছরের মধ্যে এক নতুন প্রথার প্রচলনের দায়িত্বপ্রাপ্ত এক নতুন রূপে চালু করা হবে। এই প্রথার কলংক সর্বজনস্বীকৃত হয়েছে, এখন নতুন চাকুরীর মাধ্যমে এই প্রথাটিকেই পুনর্জীবন দান করা হবে এ কল্পনা করাও অসম্ভব। অতএব আবার নতুন করে শুরু হোলো আমাদের সংগ্রাম।

ফিজি দ্বীপে প্রথম যাত্রা আমার এক অবিদ্যমণীর আনন্দ-অভিযান। আমার ভাগ্যবিধাতা প্রভু আমাকে সেখানে আহ্বান করে নিয়ে গিয়েছিলেন, এই নির্দেশের জন্তে তাঁর প্রতি আমার অনন্ত ধন্যবাদ। আমার সমস্ত জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞতা আমি লাভ করেছিলাম এই ফিজি দ্বীপে। ভিন্ন দেশে ভিন্ন যুগে শতাব্দী ও যোজনা পারের দূর-দূরান্তে খৃষ্টাব্দাসী, নরনারীর মত খৃষ্টীয় সেবার আদর্শে কী স্বর্গীয় আবেগে বারে বারে অনুপ্রাণিত হয় তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন আমি এখানে লক্ষ্য করেছিলাম, লক্ষ্য করে ধন্য হয়েছিল আমার জীবন।

সেখানে একজন মিশনারী সাধুর সঙ্গে আমি পরিচিত হয়েছিলাম। তাঁর নাম মিটার লেলি। ফিজিবাসীদের তিনি সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন। ফিজিবাসী খৃষ্টানী তরুণদের এক 'হোলি কমিউনিয়ন' উৎসবে তিনি আমাকে আগন্তুক করেন। এই তরুণ খৃষ্টানদের মধ্যে অনেকে কয়েক দিনের মধ্যেই সলোমন ও নিউ হেব্রাইডেস দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন দ্বীপে যাত্রা করবেন, প্রাধানিকার অসভ্য অধিবাসীদের মধ্যে প্রচার করবেন খৃষ্টীয় আদর্শ। খৃষ্টের প্রথম শিষ্যরা যেমন একত্র ভোজনের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে খৃষ্টীয় প্রেরণাকে আপন আপন অন্তরে ভরে নিয়েছিলেন, তেমনি অল্পপ্রেরণাকে আমরাও বরণ করে নিলাম এই ধর্মগ্রন্থে। একজন ফিজিয়ান খৃষ্টান একটি ধর্মগাথা রচনা করেছিলেন। স্থানীয় বহুসঙ্গীতের সঙ্গে সেই গানটি সহবৈত কণ্ঠে গাওয়া হোলো। গানের প্রধান কবিতাটি নিম্নরূপ :

"স্বপ্ন সমুদ্রপার থেকে

কার কণ্ঠ ভেসে ভেসে আসে ?

কে তাকে নিরন্তর ?

সে ডাক বাজে আমার কানে,

সে ডাক বাজে তোমার প্রাণে,—

এসো, এসো সমুদ্র পার হয়ে এসো,—

তোমার হাত মিলাও আমার হাতে।"

ফিজিবাসী খৃষ্টভক্তদের কণ্ঠে এই সঙ্গীতের অনির্বচনীয় কাব্য ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। ফিজিবাসী কতো খৃষ্টান প্রচারক স্বদেশ ছেড়ে সমুদ্রপারের দূর দ্বীপে গেছে, এই অভিযাত্রীদের মধ্যে কতোজন প্রাণ বিসর্জন করেছে দুর্গম প্রদেশে। তাদের মৃত্যু নিয়ুগু রয়েছে এই সঙ্গীতের মধ্যে। এই সঙ্গীতের বেদনা যে সব স্থানীয় খৃষ্টান অধিবাসীদের কণ্ঠে আজ ধ্বনিত হচ্ছে, তাদেরই নিকটতম পূর্বপুরুষ ছিল অসভ্য বর্বর। আজ তারা বর্বরতার বিরুদ্ধে খৃষ্টীয় অভিযানে জীবনোৎসর্গ করতে চলেছে। তাদের কানে তাদের প্রাণে দূর-দূরান্তের ডাক এসে পৌঁছেছে। সে ডাক মানুষের প্রতি মানুষের ডাক,—সাহায্য করো, সেবা করো, হাতে হাত মিলাও।

ধর্মগ্রন্থের সমাপ্ত হোলো। আমি এক দোভাবীর সাহায্য নিয়ে এই সব তরুণ ফিজিয়ান খৃষ্টান প্রচারকদের প্রতি আমার পরিপূর্ণ অন্তরের প্রেম ও শুভকামনা জ্ঞাপন করলাম। বিদেশী তরুণ বন্ধুরা আমার কাছে ঘিরে এল, হাতের মুঠির মধ্যে ভরে নিল আমার হাত।

এমনি আশ্চর্য মুহূর্তে আমার জীবনে আরো এসেছি। এমনি মুহূর্তে প্রতিবার এই কথাই আমার মনে বেজেছে খৃষ্টের সর্বমানবিক প্রেমের প্রসঙ্গ আলোক আঘাতে ধর্মদ্রষ্টাদের মানুষ-বেড়া সমস্ত বাধা নিষেধের স্বনিকা দূর হয়ে যায়। আমি যখন নিজের হাই চার্চের অন্তর্গত ছিলাম তখন আমি মিজিও বিশ্বাস করতাম যে অ্যাংলিকান খৃষ্টানগোষ্ঠী ও অজ্ঞাত খৃষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বিভেদ তা ঈশ্বরেরই বিধান। কিন্তু এই বিশ্বাস যে অসত্য তার কতো সহজ প্রমাণ খুঁটাই দিয়ে গিয়েছেন। রবিবার দিন যে 'স্বাধাধের' দিন, এও তো ঈশ্বরেরই বিধান। কিন্তু খুঁটাই আবার সমস্ত বিধান থেকে মানব-মনকে মুক্তি দিয়ে গেছেন, যখন তিনি ঘোষণা করেছেন যে মানুষই রবিবারের বিশ্রামকে সৃষ্টি করেছে, রবিবার মানুষকে সৃষ্টি করেনি,—মঙ্গলকর্ম যদি করতে হয় তার জন্তে রবিবারই বা কি, আর অন্তরীক বা কি! একজন ইংরেজ বিশপ একলা বলেছিলেন, সমস্ত বিধানের উপরে মঙ্গল বিধান। খৃষ্টের বাণীই তিনি প্রতিধ্বনিত করেছিলেন।

আমি আমার সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করি যে ঈশ্বরের প্রেম আরো ব্যাপক আরো উদার। বীণখৃষ্টের বাণী যদি সত্য হয়, এবং ঈশ্বর যদি প্রকৃত আমাদের সকলের পিতা হন, তাহলে জাতি ধর্ম বর্ণ সম্প্রদায় নির্বিশেষে পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ আমার ভাই, কেন না প্রতিটি মানুষ আমার পরমপিতারই সন্তান। খৃষ্টধর্মাবলম্বীরূপে আমাদের কর্তব্য সর্ব দেশের সর্ব জাতির মানবকে আপন বলে গ্রহণ করা, ঈশ্বরের অথও প্রেমের শক্তিতে আপন অন্তরের প্রেমকে সর্ব মানবের মধ্যে পরিব্যাপ্ত করা। বীণখৃষ্ট আমাদের সংস্কারের বন্ধনে বান্ধেন নি। বিশ্বাসের উযুক্ত আকাশে তিনি আমাদের মহামুক্তির আশীর্বাদে অভিযুক্ত করেছেন। জাতি ধর্মের ভেদভেদ যদি বর্জন করে সারা বিশ্বমানবকে আলিঙ্গন করতে পারি, তবেই প্রভুর সেই মুক্তির আশীর্বাদকে অন্তরে উপলব্ধি করতে পারব। এক সেই সঙ্গে এক মহা মহৎ অভিজ্ঞতাও আমরা লাভ করব। খৃষ্টান নামে

অভিহিত নয় এমন অনেক মানুষের স্বপ্নেরে খুঁটির আদর্শের কল্পনারার সঙ্গে আমরা পরিচিত হব। তারপর শেষ বিচারের দিন যখন আসবে সেদিন লক্ষ্য করব যে সেই সব অশুভীনরাই ঈশ্বর-চরণে স্থান পেয়েছে, বারা যুগে খুঁটির নাম নেয় অশুচ জীবনে খুঁটি-আদর্শকে সম্মান দেয়নি, ঈশ্বর তাদের ঠিকট চিনেছেন, আপন পাদপ্রান্ত থেকে অনেক দূরে সরিয়ে রেখেছেন তাদের।

ভারতীয় শ্রমিকদের চুক্তিদাসপ্রথার সম্পূর্ণ অবসানের জন্তে শেষ আন্দোলনের কাহিনী সংক্ষেপে এই পরিচ্ছেদের শেষে বিবৃত করা যাক।

পূর্বেই বলছি যে একই কু-প্রথাকে নূতন নামের সজ্জা পরিষে পুনরুজ্জীবিত করার প্রচেষ্টা আমরা লক্ষ্য করেছিলাম। ভারতীয় নেতারা আমাদের অনুরোধ করলেন ফিজি দীপে যেতে। সেখানকার প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে ব্যাপকতার ভাবে আমাদের তথ্য সংগ্রহ করে আনতে হবে। যে অভিযাত্রা অবর্ণনীয় নৈতিক কলংকের সৃষ্টি করেছে এবং যার ফলে ভারত ও বৃটেনের মধ্যে প্রচুর তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছে সেই অভিযাত্রা যেন আবার নূতন করে মাথা তুলতে না পারে, তার দায়িত্ব নিয়ে আমি আবার সমুদ্রযাত্রা করলাম।

প্রথমবার আমার সঙ্গে উইলি পিয়ার্সন ছিল। এই দ্বিতীয়বারের ফিজিযাত্রায় আমি সম্পূর্ণ একা। এবার প্রায় এক বৎসর আমি দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে ছিলাম। এইবারে প্রায়ই শারীরিক অসুস্থতার কষ্ট যেমন ভোগ করি তেমনি ভোগ করি স্থানীয় স্বার্থ-শত্রুতার অধিকতর আঘাত। প্রথমবার ফিজিতে গিয়ে যে আনন্দ আমি পেয়েছিলাম তার কণমাত্রও এবার পাইনি। নিঃসঙ্গতা আর অবসাদে সর্বদা আমার অন্তর ভরে ছিল। তবে প্রথমবারের চেয়ে এবার আমি কাজ করতে পেরেছিলাম অনেক বেশী। এবার আমি যা তথ্য সংগ্রহ করে এনেছিলাম তা যেমনই ব্যাপক ও যেমনই গভীর যে এই শ্রমদাসপ্রথার স্বপক্ষে কোনো যুক্তির আর স্থান ছিল না।

ফিজি দীপপুঞ্জে আমার এই দ্বিতীয় যাত্রার শুভফলিত আছে বৈ কি। ফিজি ভারতীয় শ্রমিক নারীদের পক্ষ নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার নারীসমাজ যেভাবে ঠাঁড়িয়েছিলেন তা তুলবার নয়। আমি সেবার অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন শহরে গিয়ে বিভিন্ন মহিলা-সভায় শ্রমচুক্তিবন্ধ ভারতীয় নারীদের দুঃখ দৈন্তের কথা শুনিয়েছিলাম,—কেমন মিথ্যা! ছলচাতুরীর সুযোগে তাদের তুলিয়ে বিদেশে নিয়ে যাওয়া হয় ও সেখানকার বাগিচার কী বীভৎস দৃশ্য জীবন-ষাপনে তাদের বাধ্য করা হয়। আমি শুনিয়েছিলাম কী জঘন্য দুর্নীতির পক্ষে এই ভাগ্যহারা শ্রমিকনারীদের জীবন নিমজ্জিত, তার ফলে কতো খুঁটাখুঁনি, কতো আত্মহত্যা, সুস্থ ভদ্র সংসারযাত্রার কী ভয়ঙ্কর পরিণাম।

আমার কথা প্রথম প্রথম অস্ট্রেলিয়াবাসিনীরা বিশ্বাসই করেন নি। তাঁদের নিজের প্রতিনিধি হিসাবে স্বাধীনভাবে অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্তে তাঁরা মিসেস্ গান্‌হাম নাম্নী এক মহিলাকে ফিজিতে প্রেরণ করলেন। মিসেস্ গান্‌হাম যে রিপোর্ট আনলেন তার চিত্র আমার বর্ণনার চেয়ে অনেক ভয়াবহ! অস্ট্রেলিয়ার নারীসমাজ এই রিপোর্ট পেয়ে তৎক্ষণাৎ সচেতন হয়ে উঠলেন, তাঁরা সম্বন্ধে দাবী করলেন যে এমনভাবে বিদেশী শ্রমিক সংগ্রহ অবিলম্বে বন্ধ করে দিতে হবে। মিস্ গ্রীট ও মিস্ ডিকসন

নামে দুই অস্ট্রেলিয়ান মহিলা তৎক্ষণাৎ ফিজি যাত্রা করলেন। এই দুই মহিলা থিয়োজিক্যাল সোসাইটির সদস্য ছিলেন। তাঁরা ফিজিতে গিয়ে ভারতীয় শ্রমিক নারীদের সঙ্গে বসবাস করে তাদের সেবার নিজেদের উৎসর্গ করলেন। ভারতবর্ষে শ্রমতী জরাজীর্ণ পেটিটের নেতৃত্বে একদল মহিলা বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং প্রতিশ্রুতি আদায় করলেন যে, অবিলম্বে শ্রমচুক্তিপ্রথা বদল করবার জন্তে যা কিছু করা দরকার তা করা হবে।

শেষ পর্যন্ত ১৯২০ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে এই দ্বিপিত প্রথার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ হলো। ভারতীয় পুরুষ ও নারী বারা সেদিন পর্যন্ত শ্রমচুক্তিতে আবদ্ধ ছিল সেদিন থেকে পূর্ণ স্বাধীনতা পেল তারা। সমস্ত উপনিবেশে এই দিনটি মুক্তিদিবস নামে স্মরণীয়। ভারতবর্ষের ইতিহাসেও এই দিনটির অদ্বাদ আনন্দ-ভাতি।

সম্প্রতি ফিজি-প্রত্যাগত কয়েকজনের সঙ্গে আমার লগনে সাক্ষাৎ হয়েছে। তাঁদের কথা শুনে আমার স্পষ্ট ধারণা হয়েছে যে, সত্যি অল্প সময়ের মধ্যে ফিজিতে অনেক সফল ফলেছে। শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নয়, নৈতিক ও শিক্ষামূলক কল্যাণক্ষেত্রেও। শ্রমিকদের স্বাধীনতার প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ পুরাতন কুলি লাইনের দুর্নীতিমূলক জীবনযাত্রার অবসান হয়েছে, সামাজিক জীবনে সুস্থতার ও আনন্দের পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে, নব গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নববাহ্যাসমৃদ্ধ ভারতীয় কর্মীর নূতন সংসার।

ফিজি দীপপুঞ্জে আমার এই শেষ যাত্রার আমার প্রধান পাখের ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রীতি ও প্রেরণ। নিঃসঙ্গতার হারান, শত্রুতার পংকে ও হতাশার অন্ধকারে বধনই আমার মন ডুবে গেছে, তখনই আমার মানস চক্রে আমি শান্তিনিকেতনের প্রশান্ত পরিবেশকে কল্পনা করেছি, যেখানে প্রতিদিন প্রত্যুষ-আত্মার বহু পূর্ব থেকে রবীন্দ্রনাথ ধ্যানমগ্ন স্তব্ধতার উপবেশন করে আছেন। আমার উত্কাঙ্ক অবসর মন এই স্মৃতিচিত্র থেকে অশেষ সাহসনা লাভ করত। রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী থেকেও আমি গভীর অনুপ্রেরণা লাভ করতাম। সমুদ্রপারের সেই সুস্বর বীণে তাঁর একটি চিঠি যেদিন আসত, সেই দিনটিকে জীবনের আশীর্বাদরূপে আমি গ্রহণ করতাম।

ঈশ্বরের পরম অনুগ্রহে এই পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী জীবনে এমনি ভাবে মানুষের কাহ থেকে যে প্রেম যে মেহ আমি লাভ করেছি, তুলনাতীত তার ঐশ্বর্য। আমি এ-ও জানি, মানুষের ভালোবাসাকে অতিক্রম করে মানুষের ভালোবাসাকে আপন মঙ্গল জোড়ে স্থান দিয়ে আমার সমগ্র জীবনকে যিরে রয়েছে ঈশ্বরের ভালোবাসা, আমার পরমশক্তির প্রথম প্রেম। সেই প্রেম তার নিত্য অঙ্গুলি-নির্দেশে আমাকে সেই চিরন্তন অনন্ত সত্যের পথে পরিচালিত করে চলেছে। এই সত্যের আলোকে সমগ্র সৃষ্টি উদ্ভাসিত, সর্ব অন্ধকারের নিবৃত্তি। শাস্ত্রম শিবম্ অধৈতম্—এই মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে কবি রবীন্দ্রনাথও এই অনন্ত অখণ্ড সত্যের পথে আমাকে আকর্ষিত করেছেন। আমার মরণটুকি এই প্রথম সত্যকে বীতখুঁটির পরমরূপের মধ্যে দর্শন করে ধস্ত হয়েছে।

[কমণ:]

অনুবাদ—নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়



[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

নীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত

এই লালকাকার একটু পরিচয় দেওয়া দরকার।

মিঃ লালকাকা সেলেট থাকেন—ঠিক সেলে নয়, সেলেরই অন্তর্গত সন্নিহিত পরী প্রকলীনে, আমাদের বাড়ী থেকে মাইল খানেক দূরে। নবদেনডেন রোডে ত আমাদের সাংসারী, নবদেনডেন রোড সোজা দক্ষিণমুখে গিয়ে মিশেছে আর একটি বড় রাস্তায়—নাম মার্স'ল্যাণ্ড রোড। এই মার্স'ল্যাণ্ড রোডটিও কোণাকূর্ণি ভাবে চলে গিয়েছে উত্তর-দক্ষিণ এবং যেখানে নবদেনডেন রোড এসে মিশেছে তারই কাছাকাছি পূর্বমুখে চলে গিয়েছে আমাদের গন্ত হল লেন। এবং এই মার্স'ল্যাণ্ড রোডে উত্তরমুখে প্রায় হাইলখানেক গেলেই মিঃ লালকাকার বাড়ী পাওয়া যায়। এ পল্লীটির নামই প্রকলীন।

মার্স'ল্যাণ্ড রোডের বাড়ীখানি মিঃ লালকাকার নিজেরই। বেশ ভাল বাড়ী। মার্স'ল্যাণ্ড রোডের এ দিকটার অনেক দোকান পসার আছে, তাই এখানকার বাড়ীগুলি কোনটাই বাগানযেবা নয়, বাড়ার ফুটপাথের উপর থেকেই উঠেছে। মিঃ লালকাকারও তাই। শুনেছিলাম—মিঃ লালকাকার ভাল ব্যবসা আছে এদেশে, এবং তার বাড়ীর একতলায়ই তাঁর নিজের বেশ বড় দোকান—হবেক রুম জিনিবের—নাম গ্রেস ট্রোরস। বার নামে এই দোকানটি, অর্থাৎ গ্রেস, মিঃ লালকাকারই স্ত্রী—এদেশী মহিলা। এই মহিলাটিকে অনেকবার দেখেছি—সুন্দরী ঠিক হল্য চলে না, তবে সুস্বী, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কথাই বাস্তব, ধরণে ধারণে একটা স্বাভাবিক মাধুর্য্য সবসময়ই চোখে পড়ে। ছোটখাটো মাংসপাট, ছিমছাম গড়ন, মুখখানিও বন্দ নয়—সব সময়ই বেন একটি হাসি লাগান আছে মুখে। বয়স বছর ঠোঁট্রিশ-পঁয়ত্রিশ হবে।

মিঃ লালকাকার বয়স কিছু বেশী—দেখলে পঞ্চাশের উপর বলে মনে হয়। লম্বা-চওড়া চেহারা, মাথার মাংসখানটিতে পরিষ্কার টাক এবং মাথার দু'পাশের চুলে পাক ধরেছে। অসাধারণ গভীর প্রকৃতির মানুষ—কথা প্রায় বলেনই না তবে তাঁর সহৃদয়তার পরিচয় সহজেই পাওয়া যায়।

এই লালকাকা-দম্পতির সঙ্গে আমাদের আলাপ হয়েছিল—রবিনহুড গালক, ক্লাবে। রবিনহুড গালক ক্লাবটি, যেখানে

নবদেনডেন রোড মার্স'ল্যাণ্ড রোডে মিশেছে, সেখান থেকে মার্স'ল্যাণ্ড রোড ধরে আরও মাইল দুই দক্ষিণে গিয়ে মাঝারী নদীর ধারে। ধু-ধু করছে সবুজ ভরসারিত মাঠের মধ্যে ঠিক নদীর কিনারায়ই ক্লাবের ঘরখানি—যেমন এদেশে হয়, চারিদিকে বড় বড় জানালায় সারিসািটি একটি বড় চারচালা বাংলা।

ভিতরে কোনও অলুষ্ঠানেরই ক্রটি নাই—রাগাবাঙ্গা খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা ত আছেই, তাছাড়া নদীর ধারের বড় হলটি দাবী দাবী কেঁচ সোকা ও কার্পেট দিয়ে সাজান এবং চার কোণে চারটি ছোট ভাস খেলার টেবিল ও তৎসংলগ্ন চেয়ার। এই হলটিরই একপাশে একটি কাঠের পর্দার আড়ালে খাওয়ার টেবিল ও চেয়ারগুলি সাজান—একবারে প্রয়োজন বসে খাওয়া যায়। এ ছাড়া হলটির সংলগ্ন পাশে পাশে অনেক ছোট ছোট ঘর আছে পুরুষদের কাপড় ছাড়ার, মেয়েদের কাপড় ছাড়ার, গলক খেলার জিনিবপত্র রাখার ইত্যাদি। নদীটির অপর দিকে বাংলাটির উত্তরে ঘনসবুজ গলক খেলার মাঠ—সহতল মোটেই নয়, নানাদিকে ঢেউ খেলানো। আমাদের দেশে নদী বলতে বা বোঝ, এ নদীটি মোটেই সেরকম নয়—ছোট একটি ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে চলে গিয়েছে। বোধ হয় লাক্ষিরে পার হওয়া যায়। তার উপরে, ক্লাবঘরের কাছেই ছোট একটি সেতুও আছে।

বাংলাটির সংলগ্ন পূর্বের দিকে আর একটি ছোট বাংলা আছে—মিঃ ও মিসেস পেজ থাকেন একটি বছর পঁচিশেকের অববাহিত মেয়ে নিয়ে। বৃদ্ধ মিঃ পেজ ও মিসেস পেজের উপরেই এই ক্লাবটি রাখায্য ভাবে চালাবার ভার দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজন মত রাগাবাঙ্গার ব্যবস্থা এঁরাই করেন—তুধু সকালে টেলিফোন করে বলে দিতে হয় ক'জন বাবে বা ক'জন থাকবে। বৃদ্ধা মিসেস পেজের শরীর তত ভাল ছিল না, তিনি বেশী ভাগই এক কোণে একটা চেয়ারে চূপ করে বসে কার্য কি প্রয়োজন লক্ষ্য করতেন। কিন্তু মিঃ পেজ এবং বিশেষ করে মেয়েটি সর্বদা ঘুরে বেড়াত—সকলের প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবেশন করার জন্য। ক্লাবে 'বার' অর্থাৎ মদ খাওয়ারও ব্যবস্থা ছিল—ভারও চাহিদা মতন এরাই সরবরাহ করতেন।

বুলা। তোমাকে আগেই বলেছি, ক্লাবে যাওয়ার আমার খুব কৌক ছিল। দিনটি পরিষ্কার থাকলে প্রায় প্রত্যেক রবিবারই সকালবেলা ব্রেকফাস্ট খেয়ে আমি ও মার্লিন গাড়ী হাঁকিয়ে চলে যেতাম ক্লাবে। সমস্ত দিন কাটিয়ে সন্ধ্যাবেলা আসতাম ফিরে—লাঞ্চ ও বিকেলের 'চা' সেইখানেই খেয়ে নিয়ে। আমি অবশ্য দিনের বেশীর ভাগই কাটিয়ে দিতাম গলফ খেলে। মার্লিনও যে গলফ একেবারে খেলত না এমন নয়, তবে বেশী খেলতে পারত না। বাকী সময়টা ক্লাবে গল্পগুজব করে কিংবা তাস খেলে কাটিয়ে দিত।

এই ক্লাবেই লালকাকাদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয় এবং ক্রমে ওদের সঙ্গে বেশ ভাব হয়ে গেল আমাদের। তার প্রধান কারণ বোধ হয়—আমি ও লালকাকা দু'জনেই ছিলাম ভারতবাসী—অল্প কোনও ভারতবাসী ক্লাবের সভ্য ছিল না। লালকাকা ছিল ভারতের বংশে অঞ্চলের লোক—পার্সী। কিন্তু বিশেষভাবে ভাবটা ভুল মার্লিনের সঙ্গে গ্রেসের। তারও কারণ—যতদূর আমার মনে হয়েছে—দু'জনেরই স্বামী ভারতবাসী এবং সেই দিক দিয়ে অল্প সব মেয়েদের সঙ্গে একটা স্বাভাবিক ছিল দু'জনের। যদিও এইখানেই বলে রাখি—ক্লাবের সভ্যদের কাছ থেকে কোনও দিন এই স্বাভাবিকতার দরুণ অভিযোজিত পণ্য ব্যবহারের কোনও ভারতবাসী লক্ষ্য করিনি।

লালকাকার সঙ্গে আমার ভাবটা একটা সমন্বয়তার বন্ধনে নিশ্চয়ই দৃঢ় ছিল কিন্তু আমাদের মধ্যে মেলামেশা যে খুব বেশী ছিল, এমন কথা বলতে পারি না। তার কারণ, লালকাকা আমায় চেয়ে বয়সে অনেক বড় ছিলেন এবং তাঁর স্বভাবও ছিল একটু অস্তরঙ্গ—ঠিক আমার সঙ্গে মেলেনি। আগেই বলেছি—লোকটি কথাবার্তা খুবই কম বলতেন এবং ক্লাবে এসে মদের দ্বাস নিয়ে এক কোণে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতেন—ফোনও খেলাবুলায় মধ্যে যেতেন না। সকলের সঙ্গেই দেখা হুল, মৌখিক অভিবাদন জানাতে ক্রটি করতেন না কিন্তু এ প্রগাছ। তাই পরে চুপ হয়ে যেতেন—নিজের স্ত্রীর মধ্যে মনস্তত্ত্ব হয়ে।

স্ত্রীর অর্থাৎ গ্রেসের চরিত্র ছিল ঠিক বিপরীত। অসাধারণ প্রাণবন্ত মেয়ে ছিল সে—সেকথা আজও জোব করে বলতে পারি। সকলের সঙ্গে মেলামেশায় প্রাণ দিত চলে এবং বিশেষ করে মার্লিনের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করতে তার যেন ক্লাস্তি ছিল না। প্রাণের উৎসাহ গলফ খেলা শিখত এবং তাস খেলার টেবিলেও তার উৎসাহের অভাব ছিল না। প্রথম প্রথম লক্ষ্য করতাম—স্বামীকে সব জিনিষের মধ্যে টেনে নেওয়ার চেষ্টা করেছে কিন্তু শেষ প্রগাছ যেন হাল ছেড়ে দিয়েছিল। স্বামীরও ভাবটা ছিল—স্বামীকে নিবিড় চুপচাপ থাকতে দাও, তুমি জীবনটাকে যেমন খুশী উপভোগ কর, আমার আপত্তি নেই।

এ নিয়ে একদিন মার্লিনের সঙ্গে আমার কথাও হয়েছিল—মনে আছে। কথায় কথায় মার্লিন বলেছিল—যাট বল, গ্রেস মেয়ে খুব ভাল।

বললাম, আমি তা ত অস্বীকার করছি না? কিন্তু লালকাকাও লোক খারাপ নয়।

মার্লিন বলল, তা হতে পারে, কিন্তু প্রেমের প্রতি একটু উদাসীন।

শুধালাম, তা কেন বলছ—লালকাকার স্বভাবই ঐ রকম।

বলল, স্বভাব যাই হোক, গ্রেসের সঙ্গে জীবনে সুর মিলিয়ে চলে না—চলতে চায়ও না।

শুধালাম, গ্রেস কিছু বলেছে নাকি তোমাকে?

বলল, না না। গ্রেস সেরকম মেয়ে নয়। তবে বোঝা ত কঠিন নয়।

বললাম, বাটরে থেকে দেখলে তুমি যা বলছ তাই মনে হয় বটে, কিন্তু হয়ত তোমার ভুল। অন্তরের নিবিড় হৃদয় দু'জনেই একই সুরে বাঁধা।

মাথা নেড়ে মার্লিন বলল, না না। গ্রেসের ওদিক দিয়ে একটা গভীর হুঃখ আছে, কথাযবার্তায় সেটুকু আমার লক্ষ্য এড়ায় নি।

একটু চুপ করে থেকে বললাম, দেখ, একটা জিনিস ভুলনা—ওদের বয়সের অনেক পার্থক্য। লালকাকা হৌবনের সীমানা ছাড়িয়েছে, তাই শরীর এবং মনের দিক দিয়ে সে চায় বিশ্রাম। গ্রেসের এখন ভরা যৌবন—তাই সে চায় উপভোগ। একটু গরমিল ত সেদিক দিয়ে হবেই।

মার্লিন বলল, তা কেন? বয়সের ওরকম পার্থক্য ত আরও অনেক স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে আছে—কৈ তাদের ত ঠিক ওরকম হয়নি?

মনে মনে ভাবলাম—কি জানি, হয়ত এখানেই ভারতবর্ষের মনের সঙ্গে এদেশের মনের তফাৎ! একটু বয়স হলেই, ভারতবর্ষের মন হয়ত এলিয়ে পড়ে, এদেশের দ্রুত চলার তালে ঠিক চলতে পারে না। মার্লিনকে কিন্তু সে কথাটি না বলে বললাম, হয়ত লালকাকার মনে কোনও একটা নিবিড় হুঃখ আছে—তাই সে নিজেকে ওরকম গুটিয়ে রাখে।

মার্লিন বলল, কিন্তু সেটা গ্রেসকে বলে পরিষ্কার করে নিলেই হয়। গ্রেস ত অবুখ নয়।

মুহূ হেসে বললাম, হয়ত সেকথা গ্রেসকে ঠিক বলার নয়।

মার্লিন একটু যেন গম্ভীর হয়ে গেল। শুধু বলল, হবেও বা।

যাট হোক, এখন থেকে মাস আটকে পরের কথা। হঠাৎ একদিন শুধালাম—গ্রেস লালকাকাকে ছেড়ে পালিয়ে গেছে। পালিয়ে গেছে—লালকাকারই দোকানের একটি যুবক কর্মচারী—নাম নাইট—তার সঙ্গে। শুধু তাই নয়, একটি মাত্র সন্তান বছর আট-নয়ের একটি বালক—তাকেও রেখে গেছে। শুনে আমি ও মার্লিন স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম—আজ্ঞাও মনে আছে। মার্লিন শুধু থকবার বলেছিল, গ্রেসকে কি ভুলই বুঝেছিলাম—ভাল মেয়ে বলেই ভুলেছিলাম।

* * * *

পরের দিন সন্ধ্যার পরে লালকাকা এলেন আমাদের বাড়ীতে। আমরা ডিনার খেয়ে-বসবার ঘরে তাঁর জগুই অপেক্ষা করছিলাম।

গ্রেস চলে যাওয়ার পর প্রায় আট মাস লালকাকাকে দেখিনি। লালকাকা এখন এলেন তাঁর চেহারা দেখে সত্যই অবাক হলাম। এ কি চেহারা হয়েছে মিঃ লালকাকার! মাথার চূপাশের চুলগুলি একেবারে সাদা হয়ে গেছে এই ক'মাসের মধ্যেই। মুখের ভাঁজে বার্দ্ধক্যের চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। একটু যেন কুঁজোও হয়ে গেছেন।

সাদর অভ্যর্থনায় লালকাকাকে বসালাম। জানি—লালকাকা

মদ খেতে অভ্যস্ত ভালবাসেন। তাই এক পেগ হুইস্কি সোডা মিশিয়ে দিলাম তাঁর সামনে। আমিও একটা শেরী নিয়ে বসলাম।

বুলা! এখানেই বসে রাশি—আমাদের বাড়ীতে এসবের কিছু কিছু ব্যবস্থা ছিল। অবাক হয়েনা,—এদেশে ভুল্ললোক মারেরই বাড়ীতে সুরাপানের বন্দোবস্ত থাকে—নিজেরা না খেলেও অতিথি-অভাগতদের অভ্যর্থনায় জন্ত রাখতেই হয়। আমি অবশ্য নিয়মিত ভাবে কোনও দিনই সুরাপান করিনি, তবে ঠাণ্ডার দেশে মাঝে মাঝে একটু খেতেই হয়, এবং বখনই পেয়েছি—ভুইস্কি আমার কোনদিনই ভাল লাগেনি; হয় শেরী না হয় পোট্টো—এইরকম একটা কিছু। মার্লিন সুরাপান একেবারেই পছন্দ করত না।

আমি, লালকা—হুজনে বসেছি ঘরে। মার্লিন একপাশে দাঁড়িয়ে লালকাকার দিকে চেয়ে শুধাল, বব! ভাল আছে ত?

বব! লালকাকার ছেলের ডাক-নাম।

বললেন, হ্যাঁ। ধন্যবাদ। তাকে ত বোড়িং-বুলে দিয়েছি—ভালই আছে সেখানে।

মার্লিন বলল, আপনারা বসে কথাবার্তা বলুন। আনায় যদি মাপ করেন, আমি হাই, আমার একটু কাজ আছে। লালকা কা বিষয় চোখ হুটী তুলে মার্লিনের দিকে তাকালেন। বললেন, আপনি থাকবেন না? আমার কথা আপনার সামনে বলতে পারলে আমি খুশীই হতাম।

মার্লিন বলল, বেশ যদি অনুমতি দেন, পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমি আসছি।

বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই মার্লিন ঘুরে এসে বসল আমাদের দুজনার থেকেই একটু দূরে।

লালকা কা এতক্ষণ কোনও কথাই বলেন নি। মাথা নীচু করে চুপ করে বসেছিলেন—মাঝে মাঝে সুরার গ্লাসে দিচ্ছিলেন চুমুক।

আমরা দুজনেও চুপ করে বসে আছি—কি আর বলব। কিছুক্ষণ পরে লালকা কা চোখ তুলে আমার দিকে চেয়ে শুধালেন, আপনারা বখন ডেভন, কর্ণওয়ালের দিকে যাচ্ছেন, টর্কীতে যাবেন নিশ্চয়ই?

বললাম, অবশ্য! টর্কী না দেখলে ত ইংল্যান্ডের সমুদ্রতীর দেখাই হল না। যাওয়ার পথে টর্কীতে দু'তিন দিন থেকে 'লু'তে গিয়ে বাস করব—এই শু ইচ্ছে।

একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন, একটা কাজের ভার আপনাদের দিতে পারি কি?

বললাম, বলুন?

বললেন, টর্কীর পাশেই সমুদ্রের ধারে বেবাকোথ বলে একটি গ্রাম আছে—টর্কী থেকে মাইল দুই-তিন দূরে। সেইখানে এসটন লজ বলে একটি বোড়িং-হাউস—

হঠাৎ চুপ করে গেলেন। হুইস্কির গ্লাসে আর এক চুমুক দিয়ে একটু পরে মাথা নীচু করে বললেন, এসটন লজে গ্রেস থাকে?

আমি ও মার্লিন পরস্পরে চোখ চাওরাচাষি করলাম।

আবার বললেন, গ্রেসকে টর্কী দিয়ে যাওয়ার সময়ে যদি কিছু টাকা দিয়ে যান।

পকেট থেকে একতাড়া নোট বার করে সামনে টেবিলের উপর রাখলেন।

বললেন, দু'শো পাউণ্ড।

আমরা দুজনেই অবাক হয়ে লালকাকার মুখের দিকে তাকালাম। কেউ কিছু বললাম না।

একটু পরে লালকা কাই বলে যেতে লাগলেন, গ্রেসের বড় দুর্দশা—আমি খবর পেয়েছি। শরীরও অসুস্থ, টাকা-পয়সাও হাতে একেবারেই নেই—একলাই আছে।

বললাম—যার সঙ্গে গিয়েছিল সেই লোকটি গ্রেসকে ফেলে পালিয়েছে।

শুধালাম, গ্রেস আপনাকে চিঠি লিখেছে বুঝি?

তাড়াতাড়ি বললেন, না—না। সে বড় অভিমানী মেয়ে, মরে গেলেও আমাকে চিঠি লিখবে না। তবে আমি খবর পেয়েছি।

ইচ্ছা হল শুধাই—তাহলে কোথায় আছে, কি ভাবে আছে আপনি জানলেন কি করে, প্রাইভেট ডিটেক্টিভ লাগিয়েছিলেন নাকি? কিন্তু সে কথা জিজ্ঞাসা করলাম না।

মার্লিন শুধাল, গ্রেসের নিজের হাতে ত অনেক টাকাকড়ি ছিল!

লালকা কা বললেন, সে টাকা ঠিকই আছে। গ্রেস ত এক

পয়সাও নিয়ে যায়নি। এমন কি, তার চেকবইখানাও রেখে গেছে।

একটু চুপ করে থেকে মার্লিন বলল, সত্যিই আপনি খুব উদার।

না—না বলে একচুমুকে হুইস্কির গ্লাসটি শেষ করলেন।

উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, আপনাকে আর এক পেগ হুইস্কি দি?

সে কথার কোনও উত্তর দিলেন না। আর এক পেগ হুইস্কি ও সোডা দিলাম মিঃ লালকাকাকে। এক চুমুকে হুইস্কির গ্লাসের তিন ভাগের একভাগ খেয়ে নিয়ে হঠাৎ যেন কথা বলার অনুপ্রেরণা এল। বললেন, মিসেস চৌধুরী! আমাকে ভুল বুঝবেন না—আমি উদার একেবারেই নই। গ্রেস যে আমাকে ছেড়ে চলে গেছে—সে ত আমারই অপরাধ। গ্রেসের স্বাধীন ন্যূন আমি তাকে দিতে পারিনি। একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন, ভাল থাকে আমি বাসি—খুবই বাসি। কিন্তু সে ভালবাসা জানিয়ে নিবেদন করার শক্তি আমার ছিল না। তাই সে আমাকে ভুল বুঝল। অভিমান করে গেল চলে। সে ত তার অপরাধ নয়।

মার্লিন শুধাল, কিন্তু গ্রেস ত বোকা ছিল না? সে কি সেটুকু বুঝতে পারেনি?

মিঃ লালকা কা বললেন, ক্ষমা করবেন মিসেস চৌধুরী—মেয়েদের স্নেহ না বোকা নির্ভর করে প্রাণের অনুভূতির উপরে, বুদ্ধির বিচারের উপর নয়। তার সেই অনুভূতিতে যে কোনও সাড়া জাগতে পারিনি আমি।

বললাম, তা আপনি ত তাকে অনেক টাকাকড়ি দিয়েছিলেন শুনেছিলাম—খুবই স্বাচ্ছন্দ্য রেখেছিলেন তাকে—

বুড় হেসে লালকা কা বললেন, টাকাকড়ি পেলেই খুশী হওয়ার মেয়েরা অল্প জাতের—গ্রেস ঠিক সে জাতের নয়।

খানিকক্ষণ সকলেই চুপচাপ। পরে মিঃ লালকা কা বললেন, মিসেস চৌধুরী! বিশ্বাস করুন—সেও আমাকে ভালবাসে। আমার বিশ্বাস—আজও ভালবাসে। তাই ত চলে গেল। ভাল না বাসলে গ্রেসের মতন মেয়ে চলে যাবে কেন? আজ তার এই রকম দুর্বলতা—আমি তাকে টাকা না পাঠিয়ে পারি?

কথাগুলি বলে কি রকম করুণ ভাবে চাইলেন মার্লিনের মুখের দিকে। সকলেই খানিকক্ষণ চুপচাপ।

ঠাণ্ড মালিন প্রশ্ন করল, মিঃ লালকাকা! সে যদি আপনার কাছে কিংবদন্তি চায় আপনি তাকে নেবেন?

মিঃ লালকাকা একটু হাসলেন। বললেন, সে কিংবদন্তি আসবে না—মিসেস চৌধুরী! অসম্ভব অভিমানিনী সে।

একটু চুপ করে থেকে বললেন, তবে তার সঙ্গে দেখা হলে বলবেন—আমার দরজা চিরদিনই তার জন্য খোলা।

মালিন বলল, আপনারই যোগ্য কথা মিঃ লালকাকা!

শুধালাম, টাকাটা সোজা মনিঅর্ডার করে পাঠিয়ে দিলেন না কেন?

বললেন, সে কথা আমিও ভেবেছি। কিন্তু তাহলে টাকাটা দে নিত না। তাই আপনার কাছে ছুটে এলাম। এক মিসেস চৌধুরী যদি তাকে ব্যয় করে টাকাটা নেওয়াতে পারেন। পারলে উনিই পারবেন।

কিন্তু টাকাটা নিয়ে গ্রেসের সঙ্গে গিয়ে দেখা করতে আমার মন একেবারেই সায় দিচ্ছিল না। মনে হল—স্বামিন্দ্রীর এসব ব্যাপারের মধ্যে না থাকাই ভাল। বাচ্ছি আনন্দ করে বেড়াতে—মালিনকে আবার এসব ঝামেলার মধ্যে জড়ান কেন? ভদ্রভাবে কি বলে লালকাকার অমুরোধ প্রত্যাখ্যান করা যায়! ভেবে বললাম দেখুন মিঃ লালকাকা! এসব ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা কি আমাদের উচিত—গ্রেস কি সেটা পছন্দ করবে? সে হয়ত—

ঠাণ্ড মালিন উঠে দাঁড়াল। লালকাকার সামনে গিয়ে টেবিলের উপর থেকে টাকাটা নিল তুলে।

বলল, আপনি নিশ্চিত থাকুন মিঃ লালকাকা, আমি আমার যথাসাধ্য করব। গ্রেস আপনার এ উদারতার মধ্যদা দিতে জানে বলে আমার বিশ্বাস।

মিঃ লালকাকা যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে কৃতজ্ঞতা ভরে চাইলেন মালিনের দিকে।

* * *

মিঃ লালকাকা চলে গেলে মালিনকে বললাম, শেষ পর্যন্ত তুমি এ দায়িত্ব নিলে?

মালিন ওধু বলল, গ্রেসের প্রতি এটা আমার একটা বড় কল্যাণ বলে মনে করি।

একটু চুপ করে থেকে বলল, গ্রেস ভালবাসতে জানে বলে মনে হচ্ছে।

শুধালাম, কি রকম?

বলল, মালিনের কথা শুনে মনে হল—গ্রেস হয়ত বা সত্যিই লালকাকাকে ভালবাসে।

হেসে বললাম, তুমি বড় ছেলেমানুষ লীনা—লালকাকার কথাই অভিভূত হয়েছ। ভালবাসলে কেউ কখনও স্বামীকে ছেড়ে পালায়?

মালিন বলল, পালাই বা কেন? লালকাকার একটা কথা লক্ষ্য করলে না—ভাল না বাসলে চলে যাবে কেন? সত্যিই তা। লালকাকা ত গ্রেসের জীবনে কোনও কাজে কোনও দিন কোনও বাধার সৃষ্টি করেননি—সেটা লালকাকার স্বভাবই নয়। গ্রেস ত লালকাকার চোখের আড়ালে নিজের প্রেমের লীলা অনায়াসে চালিয়ে যেতে পারত সব দিক বজায় রেখে, পালাবার কি দরকার?

টাকাকড়ি, মান সম্মান এমন কি নিজের ছেলেটিকে পরিত্যক্ত ছেড়ে এমন করে স্বামীকে ঝাঁপ দেওয়া—

মালিন চুপ করে গেল। শুধালাম, তাতে করে লালকাকার প্রতি ভালবাসা প্রমাণ হল কি করে? বড় জোর এইটুকু মানতে রাজী আছি—গ্রেস হয়ত আসলে মেয়ে তত খারাপ না, একটা বিখ্যা লুকোচুরির জীবন ঠিক সহিতে পারেনি।

মালিন ইতস্তত করে বলল, তা হতে পারে। কিন্তু গ্রেসের কাজে একটা যেন অন্ধ অভিমানের আভাষ পাচ্ছি, যেন দিক-বিদিক জ্ঞান হারিয়েছিল।

হেসে বললাম, লীনা—একটা কথা মূল্য না। স্বামীকে ভালবাসলে কেউ অন্ধ প্রেমিক জোটার না।

যুহু হেসে মালিন আমার মুখের দিকে চাইল। বলল, সেইখানেই ত ঠিক বুঝতে পারছি না। তাই ত আমি একবার গ্রেসের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

শুধালাম, দেখা করেই বা কি বুঝবে? গ্রেস কি এ অবস্থায় সরলভাবে কিছু বলবে তোমাকে?

নিজের মনেই বলল, দেখা যাক। তবে একটা কথা বলে রাখি।

শুধালাম, কি?

বলল, যদি বৃদ্ধি গ্রেস সত্যিই লালকাকাকে ভালবাসে, তবে তাকে আমি ফিরিয়ে দেব লালকাকার কাছে—তোমাকে বলে রাখছি।

চার

গুপ্তার ডেভন্ কর্ণওয়াল প্রভৃতি ঘরে দু'-তিন জায়গার হোটেলের রানিবাস করে এলাম টর্কিতে। উঠলাম—এবিলন হোটেল। সমুদ্রের ধার দিয়ে পঞ্চমী কি বস্তীর চাদের মতন ঘরে গিয়েছে টর্কি সহরটি—ক্রমে উঠে গিয়েছে উচ্চতর ভূমিতে। সমুদ্রের গায়ে রাস্তাটির ধারে বড় বড় সব বাড়ী—ভার মধ্যে কতকগুলি ভাল ভাল হোটেল—এবং বাড়ীগুলির নীচে বেশীর ভাগই নানারকমের দোকান পল্লার ইত্যাদি সুন্দর সাজান। তা'ছাড়া সমুদ্রের ধারের রাস্তাটির পাশে পাশে কয়েকটি পার্কও আছে—রং-বেরংয়ের আলোবাহারে রায়ে যেন একটা মায়ারাজ্যের সৃষ্টি হয় সেখানে।

এবিলন হোটেলটি ঠিক সমুদ্রের ধারের বড় রাস্তাটির উপরে নয়। তবে সমুদ্র থেকে খুব বেশী দূরে নয়—একটি ছোট রাস্তার উপরে। এবং এবিলন হোটেলটির শিছনে একটি বাগান—যে বসে ভাব কীক কীক ঘরে সমুদ্র দেখাও যায়। হোটেলটির সামনেও ছোটখাট একটি বাগান।

যখন টর্কিতে গিয়ে পৌছলাম তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। প্রথম সমুদ্রের ধারের দু'-একটা হোটেলের স্থান পাওয়ার চেষ্টা করেছিলাম—কিন্তু পাইনি, সবই ভুলি ছিল। আরও অনেক হোটেল ঘুরে ঘুরে শেষ পর্যন্ত এবিলন হোটেলের স্থান পেয়ে যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিলাম। সামনের বাগানটিতে সারি সারি অনেক গাছী ছিল—সেইখানেই রেখে দিলাম আমার গাড়ী।

পরের দিন সকাল বেলা ব্রেকফাস্ট খেয়ে বেবাকোর ঘাব—এই রকমই ঠিক ছিল এবং সেইভাবেই তৈরী হয়ে ভোজনাগারে ব্রেকফাস্ট খেতে বললাম—আমি ও মালিন। খাবার ঘরটি বেশ বড় এবং

চারিদিকে ছোট ছোট খাবার টেবিল ও চেয়ার দিয়ে সাজান—কোনটার বা ছজন বসে খাবার এবং কোনটার বা চার পাঁচজন। সব টেবিলই স্বল্পবে সাদা চাশ্মের ঢাকা এবং প্রত্যেকটির উপর একটি ফুলদানিতে নানা রংয়ের ফুল সাজান। আমরা খাবার ঘরে ঢোকা মাত্র একটি পরিচায়িকা এল আমাদের কাছে—তার পোশাকের উপর একটি ধবধবে 'সাদা' এপ্রনে গলা থেকে প্রায় পা পর্যন্ত ঢাকা। এসে মুহূর্তেই আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল, প্রস্তুত! আপনার ঘরের নম্বরটি কত?

বললাম, সতেরো।

'এই দিকে আসুন' বলে আমাদের নিয়ে গেল একটি ছ'জন বসে খাবার মতন টেবিলে এবং দেখলাম, তার উপর আমাদের ঘরের সতেরো নম্বরটি আলগা পিঙ্কলের রংফ বসান। বুঝলাম—এইটাই আমাদের টেবিল, আগে থেকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

ব্রেকফাস্ট খাচ্ছি—সেই পরিচায়িকাটিই খাবার এনে এনে দিচ্ছে আমাদের টেবিলে। ঘরের আশে-পাশে আরও টেবিলে ছ'চার জন বসে ব্রেকফাস্ট খাচ্ছি—অনেক টেবিল পালি, তবুও তারা খেয়ে গেছে কিংবা হয়ত এখনও আসেনি। ঘড়িতে তখনও দশটা বাজতে দশ মিনিট বাকী—এ হোটেলের নিয়ম অনুসারে সাড়ে দশটা পর্যন্ত ব্রেকফাস্ট।

আমরা যে টেবিলে বসে খাচ্ছি তার অনতিদূরে একটি টেবিলে একটি সুদর্শন ইংরেজ যুবক বসে খাচ্ছিল—পরিধানে বেশ দামী পোশাক, সেটা সহজেই চোখে পড়ে। যুবকটি খেতে খেতে লজ্জাকীর্ণের মতন অনবরত মালিনের দিকে চেয়ে চেয়ে দখছিল—সেটুকু শুধু আমি নয়, মালিনও লক্ষ্য করেছিল। মালিন ত শুধু—বুলা! তা ত জানই। সে কথাই আভাস প্রতিপক্ষে আমার ছাত্রজীবনের কাহিনীতেই দিয়েছি। এখন একটু পরিণত বয়সে সে রূপ যেন আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কয়েক মালিন যুবকটির মুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, এ আর বিচিত্র কি? মনে মনে এই বকম কিছু ভেবে গোপন হয় একটু কৌতুকও অনুভব কবছলাম। মালিনের দিকে যেন নতুন করে চেয়ে দেখলাম—সত্যিই বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল তাকে! দিনটা মেঘাচ্ছন্ন ছিল, তাই বোঁদ হয় একটা গাঢ় সবুজ রংয়ের পোশাক ছিল তার পরিধানে। কালো চুল এবং সেই অতসম্পর্শী কালো চুটি চোখের মধ্য দিয়ে শুধু মুখের লাবণ্যটুকুই নয়, পরিধানের পারিপাট্যে তার দেহের বৌবলীও যেন চারিদিকে ঠিকরে পড়ছিল, তার বসার ভঙ্গিয়ার মধ্যে। আমি যেন একটা নতুন গর্বে মুগ্ধ হয়ে চেয়ে বইলাম—মালিনের দিকে। একটু পরে চাপাগলায় বললাম—সীনা! লোকটি তোমাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছে, চোখ ফেরাতে পারছে না।

মালিনও যেন একটু বিবর্তিত হয়ে চাপাগলায় বলল, লোকটি অসভ্য—ওদিকে তাকিও না।

বেবাকোষে যখন গিয়ে পৌঁছলাম তখন সাড়ে দশটা বেজে গেছে। মিঃ লালকাকা ঠিকই বলেছিলেন—টাকি থেকে মোটের বেবাকোষ বেতে মিনিট দশ-পনেরোর বেশী লাগে না। বেবাকোষ মোটেই টাকির মতন নয়—সমুদ্রতীরের একটি গ্রাম বললেও চলে। টাকি থেকে একটি পাহাড় ক্রমে উঠতে গিয়ে উঠেছে এবং তারই মাথার

উপরে বেবাকোষ গ্রামখানি—সমুদ্র অনেক নীচে পাহাড়ের তলার। পাহাড়ের উপর সমুদ্রের ধার দিয়ে একটি রাস্তা এবং তার পাশে গুটিকয়েক ভাল ভাল বাড়ীও আছে—তার মধ্যে তিন চারটিই হোটেল। কিন্তু পিছনের বাড়ীগুলি বেকীর ভাগ মোটেই বড় নয়, চারিদিকে ছড়ান সাধারণ ছোট ছোট বাংলো-কুটার বসানো চলে। সমুদ্রের ধারের রাস্তাটি বাক দিয়ে পিছন দিকে একটি মাত্র রাস্তা। পাহাড়ের মধ্য দিয়ে একে একে নেমে গিয়েছে টাকির দিকে। এই রাস্তাটির আশে-পাশে সরু সরু সিমেন্টবানান দু-চারটি পথ তবুও উপরের দিকে উঠেছে না তবু নেমে গিয়েছে নিচের দিকে—এই পথগুলির ধারে ধারে সব বাংলো।

এসটন লজ্জ এই বকমই একটি বাংলো—খুঁজে নিতে আমাদের দেবী হল না। টাকির রাস্তা থেকে নিচে নেমে যাওয়া একটি বাঁধান পথের সমাপ্তিই বাড়ী।

রাস্তায় গাড়ী বেয়ে এই পথ দিয়ে নেমে একটি লোহার গেট খুলে চুকলাম এসটন লজ্জে। তখন নে মাস, সমুদ্রের গাঢ় অন্ধারান স্তব্ধ হয়েছে। আধ মেঘলা দিনে চারিদিকে পাহাড়ের ঘন সমুদ্রে যেন চোখ জুড়িয়ে গেল। এসটন লজ্জের সাইরের প্রাঙ্গণে সমুদ্রকণিত বাগানটির ফুলের বাশিরেও মুগ্ধ হলাম। সদর দরজায় গিয়ে কড়া নাড়লাম। একটি বুচ্চা এসে দরজাটি খুলে প্রশংসূচক দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকাল। তাকে স্তব্ধভাবে জানিয়ে হঠাৎ আমাদের মনে দ্বিধা হল। কি বলি? মিসেস লালকাকা বলা কি চলবে? হয়ত অগত্যা আছে এখানে। মালিন কথা কইল।

শুভাল, গেস বলে কোনও মহিমা থাকে এখানে?

বুচ্চাটি একটু ইতস্তত করে শুভাল, গেস? গেস লালকাকা? আপনারা কি তাকেই চাইছেন?

মালিন বলল—হ্যাঁ—বসন্তবাদ!

বুচ্চাটি বলল, তিনি ত অসুস্থ। খার হোক, আপনারা ভিতরে আসুন।

হুগুনো ভিতরে ঢুকলাম। সামনেই একটা ঘেরা সাসিআটা বারান্দা—কাপেটপাতা কয়েকটি কৌচ দোকা দিয়ে সাজান। বুঝলাম—শাইটেই সাইট। যদিও ঘরের ঢাকা, তবুও বাড়ীটির দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে বড় পুরাতন বাড়ীর স্বাভাবিক দৈর্ঘ্য সহজেই বোকা যায়। ঘরের আসবাবপত্রের মধ্যেও যে একটা দৈর্ঘ্য আছে—সেটাও চোখে পড়তে দেয়া হয় না। জানালার পর্দাগুলি গুটিয়ে দেওয়া হয়েছে আলো আসার জন্য।

বুচ্চাটি বলল, বসন্ত—দেখি খবর নিয়ে। কি নাম বলবে?

মালিন বলল, বলুন—ডঃ ও মিসেস চৌধুরী—সেল থেকে।

বললাম। বুচ্চাটি ভিতরে চলে গেলেন উঁকি মেয়ে দেখলাম—বাগানটির পাশের ভিতরের ঘরটিই খাবার ঘর। একটু পরে বুচ্চাটি ফিরে এল।

বললেন, তিনি ত শোবার ঘরেই বিশ্রাম করছেন। তবে—

মালিনের দিকে চেয়ে বললেন, আপনি আসুন।

আমার দিকে চেয়ে বললেন, আপনি একটু অপেক্ষা করুন দয়া করে।

মালিন হুমি একটু বস বলে বুচ্চাটির সঙ্গে ভিতরে চলে গেল।

আব ঘটার উপর কেটে গেল। { আমি যেন অস্থির হয়ে উঠলাম।

খানিকটা ঘরের মধ্যে পাগচারী করি, খানিকটা বসে আজকের পড়া খবরের কাগজটি আবার হয়ত পড়ি, খানিকটা জানালার ধারে দাঁড়িয়ে বাইরের শোভা দেখি—এই ভাবে সময়টি কাটিতে লাগল। হঠাৎ ঘরের পর্দা সরিয়ে মার্লিন চুকল, সঙ্গে গ্রেস। গ্রেসের দিকে চেয়ে সত্যিই চমকে উঠলাম—এ কি চেহারা হয়েছে তার! অত্যন্ত শীর্ণ চেহারা, চোখের কোলে কালি দিয়েছে ঢেলে, মুখখানি এত রুগ্ন হয়েছে যে গাল দুটি ভেসে চোয়ালের চাড় দুটি যেন এগিয়ে এসেছে। আমার দিকে চেয়ে দ্বিধা মুহূর্তে বসল, দ্বিধা করে আমার খবর নিতে এসেছেন, সেজ্ঞা সত্যিই আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। এতক্ষণ আপনাকে একলা অপেক্ষা করতে হয়েছে—সে জগা মাপ চাইছি। বসুন!

গ্রেস ও মার্লিন ঢোকামাত্র আমি উঠে দাঁড়িয়েছিলাম। তিন জনই বসলাম। বললাম, না—না। তার জগা আর কি হয়েছে। তবে আপনাকে দেখে অল্প মনে হচ্ছে।

বললাম, হ্যাঁ। সন্ধ্যার দিকে বোজ্জি একটু খর হয়। তাই ছুঁপল হয়ে বাচ্ছি।

শুধালাম, তা চিকিৎসার কি রকম ব্যবস্থা হয়েছে? একটু চুপ করে থেকে বলল, এখানকার একজন ডাক্তার এসে দেখে বান—ওষুধ দিচ্ছেন।

মার্লিন উঠে দাঁড়াল। আমার দিকে চেয়ে বলল, চল, আজ আমরা যাই। গ্রেসের প্রথম একটু বিশ্রামে থাকা দরকার।

উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, চল।

গ্রেসও উঠে দাঁড়াল। আমাকে বলল, আবার আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মার্লিন আমাকে বলল, ও স্ত্রেই ছিল। আমি ওকে উঠতে বাধ্য করেছিলাম। শুনল না। নিজের মুখে তোমাকে ধন্যবাদ জানাবার জগা বেরিয়ে এল।

বললাম, ঠিক বিশেষ বক্রণ!

গ্রেসকে দু'জনে বিদায় অভিবাদন জানিয়ে বেরিয়ে বাগুরা সময় মার্লিন গ্রেসকে বলল, তাহলে ঐ কথাই রইল। কাল ব্রেকফাস্ট খেয়ে আবার আসব।

গ্রেস বলল, হ্যাঁ।

গাড়ীতে এসে মার্লিনকে বললাম, আবার কাল আসতে হবে—আজ শেষ হল না?

মার্লিন বলল, না। দু'-তিন দিন বোধ হয় আরও আসতে হবে।

টর্কিতে দিন দুইয়ের বৌ থাকবনা—এই রকমই কথা ছিল।

বললাম, তাহলে ত টকিতেই অনেক দেয়ী হয়ে বাবে।

হেসে মার্লিন বলল, তার আর উপায় কি বল? গ্রেসের যা অবস্থা দেখলাম—ওর একটা ব্যবস্থা করে বাগুরা দরকার—নইলে ও বাঁচবে না।

শুধালাম, কি কথা হল আজ?

মার্লিন বলল, চল—সমুদ্রের ধারে কোথাও গাড়ীটা ঘুরিয়ে নিয়ে যাব। সমুদ্রের ধারে বসে বসে কথা হবে।

মার্লিনের কথামত গাড়ীটা ঘুরিয়ে নিয়ে সমুদ্রের ধারের রাস্তার সমুদ্রের পা ঘেঁষে রাখলাম।

আবার শুধালাম, আজ কি হল?

মার্লিন বলল, আমি ওর ঘরে গিয়ে দেখি—ও বিছানার ওপরে আছে। ঘরে গিয়ে ঘরের দৈর্ঘ্য দেখে মনটা খারাপ হল—শিউনের দিকে ছোট একখানি ঘর, একটি খাট, সঁকি-জানালো, আসবাবপত্র বিশেষ কিছুই নাই। আমি ওর বিছানার গিষেট বসলাম। ধীরে ওর একখানি হাত তুলে নিলাম হাতে।

মার্লিন একটু চুপ করল। শুধালাম, কি কথা হল?

বলল, খানিকক্ষণ কিছু বলেনি—আমার দিকে একবার চোখ তুলেই চোখ নামিয়ে চুপ করেছিল। আমিই কথা কইসাম।

শুধালাম, কি বললে?

বলল, প্রথমেই বললাম—গ্রেস বং ভাল আছে—বোড়ি-বুলে ভাল ভাবেই মানুষ হচ্ছে—সেইটাই যে ওর মনে সবচেয়ে বড় কথা, সেটা বুঝতে আমার দেয়ী হয়নি। লক্ষ্য করলাম—চোখ দিয়ে দু'-চার কোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল।

শুধালাম, লালকাকার কথা কিছু হলনা?

বলল, হল বৈ কি। কিছুক্ষণ পরে শুধাল, আমার ঠিকানা তোমরা পেলে কি করে?

তখন বললাম, মিঃ লালকাকা তোমার ভক্ত বিশেষ অস্থির হয়ে আছেন। তোমার বিষয় তিনি সবই জানেন। তিনিই ত তোমার ঠিকানা দিয়ে আমাদের বিশেষ করে অনুরোধ করলেন দেখা করে তোমার খার নিতে। তারপর গেসকে শুনিয়ে নিজের মনেই যেন বললাম—কি আশ্চর্য উদার লোক লালকাকা! কি দরদী প্রাণ!

কথাগুলি বলে মার্লিন মুহূর্তেই আমার দিকে তাকাল।

হেসে বললাম, বুঝছি। যাট সোক, কি বলল ওকথা তনে?

বলল, কিছু না। চুপ করেই রইল।

শুধালাম, টাকার কথা কিছু বলেনি?

বলল, না—আজ্ঞা অতটা নয়।

শুধালাম, তারপর?

বলল, তারপর আর কি? তারপর ওর শরীরের কথাবাড়ী কিছু হল। শেষ পর্যন্ত উঠে বসল—বেরিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করবে বলে।

বললাম, তা আজকেই টাকাটা দিয়ে দিলে পারত। যে দুর্বহায়া আছে—টাকা নিতে বিধা করত বলে আমার মনে হয় না।

বলল, তুমি গ্রেসকে এখনও ঠিক চেননি। লক্ষ্য করলাম—ও, গুদিককার বিষয় একটি প্রশ্ন করেনি, এমন কি ববের দিক দিয়েও নয়, বা বলবার আমিই বলেছি।

বললাম, সেটা স্বাভাবিক লজ্জা।

বললে, তবে, সেই লজ্জা কাটিয়ে আজই কি টাকা নিতে পারে? আর তা ছাড়া—

শুধালাম, কি?

বলল, শুধু টাকা দিলেই ত আমার হল না। আমি গ্রেসকে লালকাকার কাছে কিরিয়ে দিতে চাই। [ক্রমশঃ]

Learning to love oneself is the beginning of a
life-long romance.

—Oscar Wilde

ভাবি এক, হয় আর

ঐলীলীপকুমার রায়
ভেরো

লুনা হোটেলে ফিরে এসে পল্লবের মন বিষাদে কালো হয়ে এল।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ওর বিষয়েরও অবধি রইল না : যুসুফ দেশের কাজ করবে, মহাত্মা গান্ধীর ডাকে সাড়া দেবে এ কি ভাবা যায় ? ওর দেখে-মনে একটা পুলক ছেয়ে গেল ভাবতে যে, যুসুফ বাইরের সচরাচর অগলুভতা ক'রে চললেও জীবন নিয়ে এত গভীর ভাবে ভেবে দেখেছে ! যুসুফকে ও ভালোবাসত বরাবরই, কিন্তু আজ সেই, সঙ্গে জেগে উঠল ওর প্রতি শ্রদ্ধা : হাজার টানা ছেঁড়া ওঠাপড়া সঙ্গেও ওর মেরুদণ্ড দুর্বল হ'য়ে যায়নি তো !—যেখানে হাত বাড়ালেই পেত সুন্দরী নারী ও সেই সঙ্গে আধুনিক বিলাসের অজস্র উপকরণ, সেখানে কেমন করে ও মোহ কাটালো—আরামের লোভেও চাইল না তো বাঁধা পড়তে ?

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ওর মন আরো অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠল : এবার দেশে ফেরাই চাই। যুসুফ-যে-যুসুফ সেও যখন দেশে ফিরে যাচ্ছে তখন ও কেন আর মিথ্যে সময় নষ্ট করে বিদেশী গান শিখে ?

কেবল এলিওনোরার কথা ভেবেই ও ফের পড়ে গেল সন্ধ্যার দোলায়। দেশে যখন ফিরবেই এবার—তখন কেন আর ওর মনে দুঃখ দিয়ে বাওয়া ? আশ্চর্য ! মানুষের সৃষ্টি দেওয়ার ক্ষমতা কত কম, অথচ চলতে ফিরতে সে অপরক কত দুঃখই না দিতে পারে ! না, ও সালভিনির সঙ্গে দেখা করেই ফিরবে—বিশেষ যখন এলিওনোরাকে কথা দিয়েছে।—যে ওকে সত্যি এত ঘেঁষ দিয়েছে তার স্নেহের মান রাখতেই হবে : মন ওর কারুণ্যে ভিজ়ে ওঠে।

* * *

কিন্তু মুশকিল হ'ল—সময় যে আর কাটিতে চায় না। এলিওনোরার ওখানে মাঝে মাঝে যায় বটে, কিন্তু ঠিক এই সময়েই তাকে সকাল থেকে রাত আটটা ন'টা অবধি ঠুঁড়িরোতে কাটাতে হ'ত একটা নতুন ছবির জগে। তাই রাস্তা এলিওনোরার সঙ্গে ডিনারের পর বড় বেশী কথালাপের সময় থাকত না। ও মাঝে মাঝেই সূর্যাস্তের সময়ে যেত টাইবারের তীরে বেড়াতে—রাগা আলোর বিখ্যাত সান পিয়েরো গির্জার অপরূপ উদাস শোভা উপভোগ করতে। কখনো বা যেত ভ্যাটিকানে মাইকেল এঞ্জেলোর ফ্রেস্কো দেখতে, বা চুপ করে চেয়ে থাকত রাকেলের অপরূপ La Transfiguration ছবির দিকে : আকাশপথে ঈশা উঠছেন স্বর্গলোকে। ছবি ওর মনকে কখনো এমন ক'রে স্পর্শ করেনি তো এর আগে—ভাবে ও আশ্চর্য হ'য়ে ! মনে পড়ে—কোথায় পড়েছিল একটি কবিতা : “তোমার বাথার দানে আমার উঠল যে প্রাণ জেগে।”

কিন্তু শুধু বাথা বাখাই। এক দিকে সে ভেবে দেয় বটে, কিন্তু অজ দিকে যেন রিস্ত ক'রে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু ক'রে ওর মনে ভয় জেগে ওঠে : মারিয়াকে এত ভালোবাসা সঙ্গেও তো যুসুফ পরে তাকে ডিঙিয়ে গিয়ে নাগাল পেতে চাইল এলিওনোরার ! তবে ? তবে প্রেম স্বামী—এমন ভরসা পথ কোথায় ? কে জানে—হয়ত আইরিনও আজ পেয়ে গেছে এমন কোনো নতুন

মনের মানুষকে যে ওকে সর্বাঙ্গকরণে ঠেলে দেবে শিল্পীর জীবনের দিকেই ? কে বলতে পারে ? আর যদি আইরিনের মন ওকে পাশ কাটিয়ে খুঁকে থাকে আর কারুর দিকে, তবে তাকে দোষ দেবেই বা কেমন ক'রে ? সে তো ওকে শেষ দিন খোলাখুলিই বলেছিল—কোনো জয়ভূমিই ওর কাছে সবার্থসাধিকা নয়—সে চায় সঙ্গীতে স্রষ্টা করতে স্রষ্টার পরমানন্দ, দেশ ওর কাছে জড়—মাটি—নিষ্প্রাণ।

চোদ্দ

এলিওনোরার সঙ্গে চার-পাঁচ দিন দেখা হয়নি। সেদিন বিকেলেও Via Appia-য় বেড়িয়ে এসে হোটেলের টেবিলে সান্ধ্য-ভোজনে ব'সে ভাবছে কী করা যায়, এমন সময়ে হোটেলের ম্যানেজার ওকে এসে বললেন সাংসাহে যে রুশ দেশ থেকে একটি থিয়েটারি দল এক সপ্তাহের জন্তো রোমে এসেছে। অভিনয় করবে চেকভের “চেরি বাগান” আর ডন্টয়েভস্কির “ব্রাদার্স কারামাজভ।”

পল্লব উৎসাহ বোধ করল না—যদিও মাস কয়েক আগে হ'লে আনন্দ ও রাখতে পারত না। ও শুককণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল : “ব্রাদার্স কারামাজভ হবে কবে ?”

Domani Signore ! Bellissima dramma !
যদি যেতে চান তবে এখনি টেলিফোন করি—নৈলে কাল টিকিট পাবেন না।

পল্লব পাশ কাটিয়ে যেতে বলল : যেতে ইচ্ছা তো হয়, কিন্তু রুশভাষার একটি কথাও জানি না যে ! মন ওর বিষাদে ভরে গেল। এ বইটি আইরিনের অতি প্রিয় বই—যদি এজ সে থাকত তবে কী আনন্দেই না হ'তেন মিলে নাটকটি দেখতে যেত !

পাশের টেবিলে সেই রুশ যুবকটি রোজকার মতন একলাই খাচ্ছিল, হঠাৎ অভিবাদন ক'রে পরিদায় ফরাসী ভাষায় বলল : আমি রুশ। যদি যেতে চান তো আসুন না। আমি দু'টি টিকিট পেয়েছি।

পল্লব আশ্চর্য হ'য়ে বলল : ধন্যবাদ, কিন্তু অজ টিকিটটা—

যার আসার কথা ছিল তিনি হঠাৎ অন্যথ্যে পড়েছেন। আমি আপনাকে প্রতি দুইই বুঝিয়ে দিতে পারব। এ-নাটকটি আমি পাঁচ ছ' বার এখুঁছি মনোহাতে। ব'লে ঈর্ষ গর্ব ক'রেই বলল : দেখবার মতন অভিনয়—স্বয়ং স্ক্যানিগ্লাভস্কি নাটকটির প্রডিউসার। আর অভিনয়ে রুশরা জগতের সবার সেরা, জ্ঞানেন হয়ত ?

পল্লব প্রীতিকণ্ঠে বলল : বহু ধন্যবাদ ! ঈ্যা, রুশরা অপরূপ অভিনয় করে শুনেছি আমার এক বন্ধুর কাছে। কিন্তু টিকিটের দাম কত ?

যুবকটি উঠে পল্লবের টেবিলের কাছে এসে দাঁড়িয়ে বলল : টিকিটের দাম আমার লাগেনি। আমি প্রতিদিন দু'টি করে ফ্রী পাস পাই। ব'লে পল্লবের সামনের ডায়েরটি দেখিয়ে বলল : Vous permettez ? ২

১। কাল, সিন্দোরে ! অতি চমৎকার নাটক !

২। বলতে পারি কি ?

পল্লব সাগরে বলল : বিলম্ব! আপনার সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছা ছিল অনেক দিন থেকে। কী পান করবেন?
ধন্যবাদ, আমি মদ খাই না।

পরিচয়ের উপক্রমদিকা শুরু হ'ল। পল্লব নিজের পরিচয় দিল বখাবিধি। আগন্তুকও দিচ্ছে নিজের পরিচয়, যদিও সংক্ষেপে : এখানে কাজ করেন একটি ক্লব-আফিসে। মা নেই। বাপ কব, সুটভেনে থাকেন—কঁকহল্লের ডাক্তার—ধনী। মা ওর পনের বৎসর বয়সেই স'-সারের হিসেব নিকেশ সাজ করে পাড়ি দেন পরপারে। ও সেই থেকে মস্তোতেই মাঘু ওর এক কাকার কাছে। ওর বাপ-মা ক্যাথলিক। কিন্তু ও পনের বৎসর বয়স থেকে ঈশ্বরে বিশ্বাস হারিয়েছে। নাম শাপিরো।

পনের

শাপিরোর সঙ্গে আলাপ হ'তেই ওর মন গান গেয়ে ওঠে। মনের বিবাদ কাটল না অবশ্য, কিন্তু আঁধার কেটে গেল। ওর একটি প্রিয় গানের একটি চরণ ফিরে ফিরে বাজে ওর প্রাণের তানে :

আমি মা এখন তারারূপে স্মিতমুখে শুভ্রবাসে,

নিশার ঘন আঁধার দিয়ে উষা যেমন নেমে আসে।

কী অপরূপ উপমা! যেমন সত্য তেমনি আলোভরা। হঠাৎ ওর মনে পড়ে যায় ভগবানের কথা, অনেক দিন পরে। তিনি এক হাতে মারেন আর এক হাতে রাখেন। এক হাতে জীবনের পেয়ালা শূন্য করেন আশাভঙ্গে, শোকে, বিচ্ছেদে, বিরহে—কিন্তু যেই মন ভায়ে আর বইতে পারবে না, ভেঙে পড়বে, অমনি আসে তাঁর করুণা, রিস্ত-পাত্র ফের ভাবে ওঠে স্বধায়। হঠাৎ মনে হ'ল আইরিনের অভাবের জগৎ যে-দুঃখে ওর কাছে এত দিন মনে হয়েছে বন্ধা—হয়ত সেই অভাবের, সেই বিরহেরই ওর দরকার ছিল। এ পর্যন্ত ও একটানা পেয়েই এসেছে। ওর পিতার মৃত্যুর পরে কোনো বড় দুঃখ কি শোক পায়নি। আইরিন আনন্দময়ী হ'য়ে ওর জীবনে হানা দিয়ে প্রথম ওকে গভীর আঘাত দিল—কাছে ডেকেই দূরে দিলে। সে বেদনার মন্তনে মনে হ'ল ওর—চিন্তা যেন ওর অজ্ঞাতে উঠেছে উর্ধ্ব, প্রতিফলিত হয়ে। বেদনার কর্ণের পর বীজ পড়তে না পড়তে নব আশায় অকুরোদগম হ'ল যেন। সারা রাত ওর মন এক আশ্রয় আনন্দে ছেয়ে গেল। লুনা হোটেলের লাইব্রেরি থেকে ডক্টরেডাক্সির 'ব্রাদার্স' কারামাজভের পাতা উল্টোতে উল্টোতে হঠাৎ এসে পড়ল একটি ভায়গার। আইরিনের সঙ্গে ঠিক এই অধ্যায়টিই ও একদিন পড়েছিল সে কী আনন্দে! সেই হারানো আনন্দ যেন স্মৃতির মরুভূমির ফের বেজে উঠল আরো নবীন হ'য়ে, আরো গভীর হ'য়ে। কী সুন্দর, পবিত্র, ওজস্বী! মনে পড়ে গেল উপনিষদের একটি বিশেষণ—'ভগবৎ করুণা শুণু শুভ্রাই নয়, বলদাও বটে।' মনে ওর কৃতজ্ঞতা জেগে ওঠে : প্রভু, কত তো পাই দিনে দিনে, তবু ভুলে যাই কেন যখন কিছু পেয়ে হারাই? বলি কেন তখন কুক চিন্তে তুমি নিষ্ঠুর? মনে করি কেন যে বা আমি পেয়েছি তা আমার প্রাণ্য? এই যে আলিদ্যাশাও বলছে ঐ কথা—যেন ওর মনের কথা টেনে :

আলিদ্যাশা ঠাঁড়িয়ে একদুষ্টে তাকিয়ে থাকে, তারপরে হঠাৎ সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে—ভেঁবু পায় না কেন সে মাটিকে চুবন করছে

দরবিগলিত অজ্ঞাধারে। কী আনন্দ, আকাশের ঐ তারাদের মিকে চাইতেও ওর চোখের পাতা ভিজে ওঠে কিছু কষ্ট, মনে হয় না তো—এ মিথো উচ্ছ্বাস, কুঠা আসে না তো কী করছি ভেবে? মনে হয়—যেন ভগবানের অগণ্য জগত থেকে আলোর রাখী এসে ওর আত্মাকে বেঁধে দিচ্ছে সব-কিছুব সঙ্গে। 'ওর গায়ে ঠাঁটা' দেয়—সাধ জাগে সবাইকে ক্ষমা করতে, সব-কিছুকে ক্ষমা কুবতে—সবার উপর ক্ষমা চাইতে—শুধু নিজের জন্তে নয়, সকলের জন্তে। মনে হয় এমনি আরো কত আত্মা আমার জন্তে প্রার্থনা করছে।

পড়তে পড়তে পল্লবের চোখে জল আসে। মনে পড়ে যায় কুঙ্কমের একটি কথা : 'স্বামিজী বলতেন—'ভ্রাতৃ ব'সেও যদি মহৎ চিন্তা করে, জেনো সে-চিন্তা ব্যর্থ হবে না, ছড়িয়ে পড়বে সারা বিশ্বে।' হঠাৎ ওর বুক ভরে যায়—সাধু-সন্তের চিন্তার ও প্রার্থনার টেউ হয়ত এমনি অলক্ষ্যে এসেই লাগে কত-শত দুর্ভাগীর প্রাণের তটে—অদৃশ্য মহাত্মাদের বিশ্বকল্যাণ কামনার স্পন্দন হয়ত এমনি প্রত্যক্ষ ভাবেই স্তম্ভমরবে বেজে ওঠে কত-শত স্বপ্নবীর অন্তরে! পবিত্রতা, অম্লকম্পা, সন্তোষ—আরো কত কী ভাগবত বরাহর মাঘুঘের তপ্ত মনকে করে তোলে স্নিগ্ধ, বিপদে জাগায় নির্ভর, ক্ষোভের অন্ধকারে ক্ষমার কিরণ, দুর্দৈবের নিরাশায় সাহসের জাগরণী।

সব ছাপিয়ে ওর বোজে বোমে জেগে ওঠে এক নাম-না-জানা আশার ওজস্বাদনি : অবিশ্বাসীর নাস্তিবাদ ধূয়ে মুছে ভেসে যায় যুগ-যুগান্তের বিশ্বাসীর অস্তিবাদের কলকল্লালে। আনন্দে ও ঘুমতে পারে না। একটি আরামকেন্দ্রা টেনে নিয়ে জানালার কাছে এসে ব'সে চেয়ে থাকে উনার আকাশের পানে, কান পেতে শোনে অগ্নান নক্ষত্রলীপালির ব্যাভর্য স্বংকার।

আছে আছে আছে আছে—কিছুই জীবনে ব্যর্থ হয় না, হ'তে পারে না।

ঘোল

পরদিন হু'জনে মিলে 'ব্রাদার্স' কারামাজভে' অভিনয় দেখতে গেল। কী প্রাণস্পর্শী অভিনয় করে এই আশ্রয় কবজাতি! মনে পড়ে ওর মানবপ্রেমিক প্রিন্স রুপটাকিনের একটি কথা যে, কব জাতির মধ্যে আছে একদিকে যেমন নাটকীয় নিষ্ঠুরতা তেমনি অন্ধদিকে—অগাধ ঔদার্য। প্রতিভার অবস্থার উঠেয়েভস্কি 'ব্রাদার্স' কারামাজভে' দেখিয়েছেন রাশিয়ানদের এই দুটি প্রবৃত্তির স্বতবিরোধ। একদিকে অপরূপ সন্ন্যাসী—পবিত্রতার প্রতিমূর্তি—যুবক আলিদ্যাশা, অন্ধদিকে জঘন্য বৈশ্বিকী গুণেংকা। লম্পট ডিমিট্রির মধ্যেও কী মহত্ব! যেরূপসী কুমারীকে সে চেয়েছিল কাম-চরিতার্থ করতে সে-কিশোরী যখন এল তার পিতাকে বাঁচাতে তখন ডিমিট্রি বলল : যে টাকা চাইছ, দেব, যদি এক রাতের জন্তে আমার হও। কুমারী বেদনার দিশাহারা হ'য়ে শেষে রাজি হ'ল, এল ওর কাছে গভীর রাত, নুইলে তার পিতার সর্বনাশ! ডিমিট্রি তাকে টাকা দিয়ে বলল : তোমার মহত্ব আমি অভিজ্ঞত হয়েছি—ফিরে যাও অনাহত দেহে—এই টাকা নাও। ব'লে কুমারীকে লম্পট না করে তার হাতে দিল অকীকৃত স্বর্ণমুদ্রার খলি। ওর মনে হ'ল—কে বেশি মহৎ? কুমারী, না লম্পট? প্রশ্নাম করল সেই মহান ত্রষ্টাকে যে নরকের রাজ্যে বাস করেও উদ্ধারণ করেছিল স্বর্ণের

সাময়িক : I believe in the eternal harmony in which, they say, we shall one day be blended.

শাপিরো গুকে চাপা সুরে বুঝিয়ে দিচ্ছিল, যখনই কোনো চরিত্রের মুখে ফুটে উঠছিল এই ধরনের কোনো অবিশ্ববাসী বাণী। পল্লব কেন্দ্রি ওর মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে। এসব কথা যখনই ও বলে, ওর চোখে জলে ওঠে সে কী এক অপরূপ দ্ব্যতি! ওর আর সম্বন্ধ বটল না যে শাপিরো মনে-প্রাণে স্বপ্নানী, আদর্শবাদী। লুনা তোটেলে গুকে প্রথম দিন দেখেই গভীর ভাবে আকৃষ্ট হবার সে আজ কারণ তথা সমর্থন খুঁজে পেল।

অথচ এর পরেই শাপিরোর অস্তরূপ। সোজা যায় সকালে ওর কাজে, ফিরে আসে লাঞ্চে—পরে ফের বেরিয়ে যায়, ফিরে আসে সন্ধ্যায় ক্লাস্ত হ'য়ে। পল্লবের সঙ্গে দেখা হয় বটে, দুপুরে ও সন্ধ্যায় খেতে খেতে কথাবার্তাও হয় বৈ কি, কিন্তু পল্লবই কথা বলে চলে দিনের পর দিন। শাপিরো নিজের কথা কিছুই বলে না—মস্তব্য হিসেবে কচিং এক-আধটা কথা ছাড়া।

একদিন হঠাৎ পল্লবের মনে কেমন যেন ঈষৎ অভিমান মতন এল। ও শাপিরোকে কাছে লগতে না পেতে ওর জীবনের কত কথাই না ব'লে ফেলেছে—এমন কি আইরিনের কথাও বলেছে—কিন্তু শাপিরো তো প্রতিদ্বন্দ্বিতা কিছুই বলে নি—এমন কি রোমে ও কী কাজ নিয়ে আছে সে-সবকিছুও কোনো উচ্চবাচ্য করেনি! ভাবল গুকে আর বলবে না নিজের মনের কথা। এর নাম কি বন্ধু? একতরফা অন্তরঙ্গতা হয় কখনো?

সতেরো

সেদিন রবিবার—পূর্ণিমা। এলিওনোরা পল্লবকে ওর মোটর পাঠিয়ে দিল সন্ধ্যা ছটায়, লিখল : আজ সন্ধ্যায় ছুটি নিয়েছি, চাঁদের আলোর ভ্রমে নৌকাবিহার করা যাবে। ঘাটে যদি আমার এখানে থেকে বাও তবে শ্রুতী হব।

পল্লব শাপিরোর সঙ্গে একটি ছোট চিঠি বেখে গেল যে আজ সন্ধ্যায় ও এলিওনোরার ওখানে যাচ্ছে, রাতে হয়ত না ফিরতেও পারে। এলিওনোরার কথাও ও শাপিরোকে বলেছিল, কিন্তু শাপিরো শুধু এইটুকু মস্তব্য করেছিল : ওয়া বিলাসিনীর দল পল! ওদের সঙ্গে বিশেষ তোমার স্তন মাহুয তৃপ্তি পেতে পারে না।

পল্লব একটু দা খেয়েছিল ব'লেই আরো শাপিরোকে জানিয়ে দিল যে এলিওনোরার সম্পর্ক ওর কাছে শাপিরোর চেয়েও কাম্য। কথাটা সত্য নয়, কিন্তু চিঠিতে তবুও ঈষৎ খোঁচা না দিয়ে পারল না : এলিওনোরার বড় সরল—সুন্দর ওর মন। অথচ বিচারকের দল গুকে না জেনে কতই না বিচার করে!

মোটরে চড়ে ওর মন খুঁৎখুঁৎ করে : গারে পড়ে এসব কথা শাপিরোকে কেন বলতে গেল? কিন্তু রোখ চোখে উঠল সঙ্গে সঙ্গে : কেন বলব না—ও যখন এলিওনোরাকে ঠেশ দিয়ে কথা বলতে পারল—তার সবকিছু কিছুই না জেনে?

* * * * *

হুদ থেকে পোপের বসন্তনিলয় কী সুন্দর দেখায়! চারিদিকে গাছপালা। হঠাৎ এক বুলবুল তান ধরে দেয়।

পল্লব বলে : কী সুন্দর! হাল ওর হাতে।

এলিওনোরার ঠাঁড় টানতে টানতে বলে : গতি। এমন তান দিতে পারে না আর কোনো পাখি।

পল্লব টোকে : তা বলতে পারি না। আমাদের দেশে বসন্ত কোকিল যখন প্রথম ডেকে ওঠে আমি কিছুতেই কোনো কাজ করতে পারি না, শুধু একমনে শুনি আর শুনি।

এলিওনোরার মুহূর্তে বলে : কারো মিয়ো! আমি কুলবুলকে বড় করিনি তোমাদের কোকিলকে ছোট করতে। তুমি বড় ছেলেমানুষ।

পল্লব ঈষৎ অপ্রস্তুত হ'য়ে বলে : আমিও কিছু ভেবে বলি নি ওকথা। আমি দেশভক্ত বটে, ছেলেমানুষও হ'তে পারি, কিন্তু এটুকু বুঝবার ব্যস আমার হয়েছে যে দেশ বড় হ'লেও সবচেয়ে বড় মানুষ।

এলিওনোরার চুপ ক'রে থাকে।

পল্লব বলে : কী হয়েছে? ফের বেকাঁশ কিছু ব'লে ফেলেছি না কি?

এলিওনোরার ম্লান তেজে বলে : না পল! কেবল—থাক গে—কী হবে ব'লে—যখন এর কোনো চারা নেই?

পল্লব উদ্বিগ্ন হ'য়ে ওঠে : কী হয়েছে এলিওনোরার? না থাক। নিজের হৃৎপিণ্ডে নিজের বওয়াই ভালো। সালভিনি লিখেছেন তিনি এলেন ব'লে—দিন দশেকের মধ্যেই।

সালভিনি থাক। বলা কী হয়েছে?

কী বলব ভাই? সেই একই কথা তো ঘুরে ফিরে—

না। আবার কিছু একটা হয়েছে। যুহুফ লিখেছে না কি কিছু?

এলিওনোরার মুখ নিচু ক'রে হঠাৎ ব্লাউসের হাতার চোখ মোচে।

কী লিখেছে? বলবে না তো?

এলিওনোরার চুপ ক'রে থেকে বলে গাঢ়কণ্ঠে : কী আর লিগবে? ঠিকই লিখেছে। প্রথমে রাগ হয়েছিল। কিন্তু সত্য অপ্রিয় হ'লেই তো মিথ্যা হয় না সব সময়ে?

কী অপ্রিয় সত্য ও বলল ফের?

এলিওনোরার একটু চুপ করে থেকে বলে : আমাদের একটি প্রবচন আছে : 'Dal dire al fare, c'e di mezzo il mare'—ভুলেছি কি?

না। কী বললে?

এর মানে—বলার আর করার মাঝখানে ঠাঁড়িয়ে আছে অতল সমুদ্র। এটা বুঝেছি হাড়ে হাড়ে সেদিন। যুহুফকে কয়েক মাস আগেও বলেছিলাম—ভালোবাসার জন্তে মেরেরা কী না করতে পারে? বিধাতা নিশ্চয় সেদিন অলক্ষ্যে মুচকি হেসেছিলেন।

পল্লব চুপ করে থাকে। এলিওনোরার ব'লে চলে : তবে আমার কি মনে হয় জানো? মনে হয়, যে কথা সেদিন তোমাকে বলেছিলাম : যে, কাল আমাদের দিনে দিনে জ্ঞান দান করতে পারে, কিন্তু শক্তি হরণ করে—বিশেষ ক'রে আত্মদানের শক্তি। ব'লে পল্লবের দিকে চেয়ে : আর একথা কত সত্যি বুঝতে পারি—তোমাদের দেখে।

আমাদের?

তোমাকে, ঘোঁসনলগলকে, বিতাকে। সব চেয়ে বেশি মনে হয় জাজ় রিতার কথা : এক কথায় সে সব ছেড়ে চলে যেতে পারল তো। ব'লে একটু থেমে : বতাই কেন না বিজ্ঞতার গুণগান করি পল, চিবনি বোঁবনই হ'য়ে এসেছে জীবনের রাজা—খাকবেও জীবনের রাজা—কেন না, কেবল বোঁবনই এক কথায় ছাড়তে পারে পরিণাম-চিহ্ন। আধরা—বিজ্ঞরা—পারি শুধু বড় বড় কথা বলতে। অথচ তবু গুণের কত আমাদের—বে আমরা জানি। কিন্তু জেনে কী হয়? পারাই সব।

পল্লব একটু চুপ ক'রে থাকে, পরে বলে : কিন্তু এর মূল কারণ কি বোঁবন, না স্বভাব?

মানে?

মানে যাঁরা পারে তারা বোঁবন পেরিয়েও পারে। ব'লে একটু থেমে : আর যাঁরা পারে না বোঁবন তাদের উজ্জ্বল করতে পারে, কিন্তু বল দিতে পারে কি?

এলিওনোরা হঠাৎ বলল : তুল বুঝে অবিচার কোরো না পল! আইরিন তা নয়—যা তুমি ভাবছ।

পল্লব চমকে ওঠে : কে বলল? যুগ্ম কি কিছু লিখেছে?

এলিওনোরা ইতস্তত করে : না ঠিক আইরিনের কথা লেগেনি, তবে—কিন্তু খাক ও কথা, আমাদের ও বলতে বারণ করেছে।

পল্লব ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল : কী এমন কথা যা তোমাকে লিখতে পারল অথচ আমাদের বলা মানা? বলো—বলতেই হবে তোমাকে। আইরিনের সঙ্গে কি গুর দেখা হয়েছে? না, এ-ও বলা মানা?

না। আইরিন এখনো বার্লিনে ফেরেনি—কবে ফিরবে কেউ জানে না। এখনো সে সুইজলণ্ডে। শরীর না কি তার ভালো নয়—লিখেছে তাব দিসিকে।

পল্লবের মনে অভিমান ফুলে ওঠে, বলে : এই কথাটা জানাতে এত নিষেধ? এলিওনোরার উত্তর না পেয়ে : বলো, বলতেই হবে—আরো আছে নিষেধ?

এলিওনোরা বলল : কী বলব ভাই? যুগ্ম কয়েকটা জ্ঞান-কল্পনা করেছে মাত্র। আইরিন যে ঠিক কী ভাবছে তা কেউ জানে না—কারণ সে কাউকেই কিছু লেখেনি।

তবু—

তুমি বড় নাছোড়বান্দা। তবে শোনো। যুগ্ম লিখেছে যে আইরিনের দিদি মনে করে না আইরিন তোমাকে বিবাহ করলে তার ফল ভালো হবে।

কিন্তু আইরিন কেন লেখে না সে কথা খুলে?

এলিওনোরা বিব্রত স্বরে বলে : ক্ষুব্ধ হোয়ো না ভাই। আইরিন ভালো মেয়ে—আমি বলছি তোমাকে।

ফের এড়িয়ে যাওয়া?

কী বিপদ। আমি কী বলব বলো দেখি—যখন আমরা কেউই জানি না? আমি কেবল বলতে পারি একটি কথা : যে বাইরের ঘটনার যোগাযোগে মানুষের যে ছবি ফুটে ওঠে অনেক সময়েই সে ছবি তার স্বরূপের দিশা দেয় না। একথা আমি জানি নিজেকে দিয়ে। আমি বিলাসে থাকি—কিন্তু তাই বলে সত্যিই বিলাসিনী আমি নই। ব'লে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে : একথা বললে কে বিশ্বাস করবে বলো? শেষের কথাগুলি বলে ও ধরাগলায়।

পল্লবের হৃদয় কান্ধাে ভরে ওঠে, বলে : তুমি যে বিলাসিনী নও আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। কেবল তুমি হয়ত—

হী?

একটু কম উচ্চাশিনী হ'লে ভালো হ'ত। তবে হয়ত এখানেও আমি তোমাকে তুল বুঝছি। যদি তাই হয় তবে এই জেবে আমাকে ক্ষমা করো যে, মানুষ মানুষকে ঠিক বুঝতে চাইলেও প্রায়ই পারে না। বোধ হয় সেই জন্তেই যিত বলেছিলেন কাউকে বিচার না করতে।

এলিওনোরা সায় দিয়ে শান্ত স্বরে বলে : ঠিক সেই জন্তেই আমিও বলি তোমাকে, আইরিনকে বিচার না করতে। ব'লে একটু চুপ ক'রে থেকে আহা, ওকে একটু সময় মিলেই বা। ওর মনে অনেক কুঠা সংশয় অশান্তি হয়ত টগবগিয়ে উঠছে। একটু ষিতির যেতে পাও না।

পল্লব একটু ভেবে বলে, ঠিক বলেছ এলিওনোরা। তাছাড়া—যদি ওকে সত্যি ভালোবেসে থাকি তবে ওর চিঠিই বা চাইব কেন? তুমি বড় সময়ে কথাটা বলেছ। বওয়া যখন তার হয় তখনো যে সহিতে পারে অমুযোগ অভিযোগ না ক'রে, সেই না জেতে।

এলিওনোরা হঠাৎ বলে, জেতে? শুধু স'য়ে? আমার তো তাই মনে হয়।

এলিওনোরা উদাস কণ্ঠে বলে, তুল পল, তুল। জেতে শুধু সেই যে সব ছাড়তে পারে। আর এ-সব-ছাড়ার শক্তি পায় ও শুধু সেই যে চলে হৃদয়ের হুকুম মেনে, মনের মানাকে আমল দিয়ে নয়। কিন্তু চলো—কিরি। মেথরা জড়ো হচ্ছে।

চাঁদ ঢেকে গেছে, ওরা একতরফ লক্ষ্য করে নি। হাওয়া উঠল। ওরা কিরল। [ক্রমশঃ।

শুভ-দিনে মাসিক বসুমতী উপহার দিন-

এই অগ্নিস্থল্যের দিনে আত্মীয়-বন্ধন বন্ধ-বান্ধবীর কাছে সামাজিকতা রক্ষা করা যেন এক হৃদয়বহ বোঝা বহনের সামিল হয়ে পড়িয়েছে। অথচ মানুষের সঙ্গে মানুষের মৈত্রী, প্রেম, শ্রীতি, মেহ আর ভক্তির সম্পর্ক বজায় না রাখিলে চলে না। কারও উপনয়নে, কিংবা জন্মদিনে, কারও শুভ-বিবাহে কিংবা বিবাহ বাধিকোতে, নয়তো কারও কোন-কৃতকাব্যতায় আপনি 'মাসিক বসুমতী' উপহার দিতে পারেন অতি সহজে। একবার মাত্র উপহার দিলে, সারা বছর ব'য়ে তার স্মৃতি বহন করতে পারে একমাত্র

'মাসিক বসুমতী'। এই উপহারের জন্ম স্মৃতিস্মারক আবরণের ব্যবস্থা আছে। আপনি শুধু নাম ঠিকানা টাকা পাঠিয়েই খালাস। প্রদত্ত ঠিকানায় প্রতি মাসে পত্রিকা পাঠানোর ভার আমাদের। আমাদের পাঠক-পাঠিকা জেনে ধুঁকি হবেন, সম্প্রতি বেশ কয়েক শত এই ধরনের গ্রাহক-গ্রাহিকা আমরা লাভ করেছি এবং এখনও করছি। আপা করি, ভবিষ্যতে এই সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হবে। এই বিষয়ে যেকোন স্নাতব্যের জন্ম লিখুন—প্রচার বিভাগ মাসিক বসুমতী। কলিকাতা।



[O.samu Dasai's "THE SETTING SUN"-এর অনুবাদ]

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিশ্রোহের পূর্ননা

চিদিন শোকসাগরে নিমজ্জিত অবস্থায় বেঁচে থাকা অসম্ভব।

কোন একটা কারণ নিশ্চয়ই আছে, যার জন্য আমার যুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে। নূতন শত্রু—ভগ্নাতার রূপান্তর মাত্র। প্রেম, সে-ও ভাই। অধনাতীর নূতন দৃষ্টিভঙ্গী যেমন রাজা লাক্ষ্মণবর্গকে বেঁচে থাকার প্রেরণা জুগিয়েছিল, ঠিক তেমনি আমার সমস্ত সত্তা দিয়ে প্রেমকে আঁকড়ে থাকতেই হবে। সমসাময়িক আইনবিশারদ আচারনিষ্ঠ অধ্যাপক, প্রতাপসম্পন্ন ব্যক্তিদের ভগ্নাতার মুখোশ খুলে দিয়ে। নির্ভয়ে ঈশ্বরের পায়ে আত্মবিসর্জন দেওয়ার যে বাণী বাতাসে ভরা বসন্তের শব্দে শিরোব মুখে দিয়েছিলেন,—আমার বর্তমান অবস্থায় তা বিশেষ অপ্রয়োজ্য হবে না।

সোনা, রূপো, তামা দিয়ে কুলি বোঝাই করা না। স্বাভাবিকের বিবরণ, হুঁশানা কোট, জুতো কিংবা ছড়ি কিছুই সঙ্গে মিও না, মনে রেখো ভগ্নাতার আমি নেকড়ে-ব্যাচের ভেতর মেঘশাবকের মত পাঠাচ্ছি, প্রতাপ সর্পের স্তায় চতুর ও কণোক্তের স্তায় নিরীহ হ'তে হবে।

যারা দেখকে আঘাত দিয়ে আত্মার ক্ষতি করতে পারে না, তাদের ভয় পেও না, বরং যে ব্যক্তি দেখ, মন উত্তরেই প্রকাশ করতে পারে, তার কাছ থেকে ঘৃণে থেকে।

তোমরা ভাবো, বরাদ্দ শান্তি আনিই বুঝি আমার শান্তি নয়, তরবারি বহর এনেছি আমি।

কারণ আমি পিতার বিরুদ্ধে পুত্রকে, মাতার বিরুদ্ধে স্বস্তাকে, শত্রুদ্রীর বিরুদ্ধে পুত্রবধূকে উত্তেজিত করতে এনেছি এবং আপন পরিবারের মধ্যেই শত্রু বিভীষণের দেখা পাবে।

যে আমার চেয়েও তার বাবা-মাকে বেশী ভালবাসে—সে আমার যোগা নয় এবং যে আমার চেয়েও তার পুত্রকতাকে বেশী ভালবাসে, সে-ও আমার যোগা নয়।

যে জন্মলাভ করেছে, সে মরবেই, আর যে আমার জন্ত জীবন দেবে, তার মরণ নেই।

বিশ্রোহের পূর্ননা।

বাদ প্রেমের কারণে আমি বীণের এই বাণী পুখারপুখ অমর্যণ করি, তবে তিনি আমায় অপরাধী করবেন কি? দেহ প্রেমের তুলনায় আধ্যাত্মিক প্রেমকে কেনই বা উচ্চতর আসন দেব? এ আমার বোধগম্য নয়। আমার ধারণা হুই-ই এক। যে নানী প্রেমের জন্ত, অজানা এক প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্ত কিংবা আত্মবলিক চরুখের কারণে, দেহ-মন নরকে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত, আমি সেই নারী। এই আমার গর্ভ।

উজ্জতে সমাধি দিয়ে, টোকিওতে অমুষ্ঠানাদির ব্যবস্থা করলেন মামাবাবু। অতঃপর নাওজি এবং আমি, হুঁজনের বোধ সঙ্গার এমন বিস্তী মোড় নিল যে, মুখোমুখি পড়ে গেলেও পরস্পরের মধ্যে কথা হয় না। মায়ের সমস্ত গহনা বিক্রি করে নাওজি পুস্তক প্রকাশনার স্থলখন সংগ্রহ করল। টোকিওতে নেশার চূড়ান্ত করে ও বখন টলতে টলতে বাড়ী ফিরত, তখন তার মড়ার মত সাদা মুখখানা দেখে হৃদয় ব্যাধিগ্রস্ত রোগীর শেষ অবস্থা বলে মনে হত।

একদিন বিকেলে মর্ত্যকীর্ণের এক মেয়েকে নিয়ে সে বাড়ী ফিরল। এর পর আর এক দণ্ডও তিষ্ঠেনা যার মা দেখে বললাম—আমি ক'টা দিন টোকিওতে ঘুরে আসতে চাই। আমার এক পুত্রনো বন্ধু সঙ্গে বহুকাল দেখা হয় নাই, তার ওখানে দুটো-তিনটে রাত থেকে আসব। তুমি একটা দিন সঙ্গার দেখো—কেমন? তোমার বাকবী রান্না করে দেবে'খন।

নাওজির দুর্বলতার স্বরোগ নিতে এক দণ্ডও ইতস্তত করলাম না। স্মরণে একেজ্রে সাপের ধূঁমি প্ররোগ করে ব্যাগের ভেতর প্রসাধনের টুকটাকি আর কিছু খাবার নিয়ে টোকিওতে অভিসারে বেরলাম।

এক সময়ে কথাগুলো নাওজির কাছ থেকে ধোঁয়ে মিলায় যে, টোকিওর ছোট লাইনে ওগিকাবু ঠেশের উত্তর ফটক থেকে মিটার উয়েহারার বাড়ী মাত্র কুড়ি মিনিটের রাস্তা। সেদিন এলোমেলো বেগে শরতের হাওয়া উঠছিল। ওগিকাবু ঠেশে নামতে অন্ধকার ঘনিয়ে এল। এক পথচারীকে মিটার উয়েহারার বাড়ীর ঠিকানা জিজ্ঞেস করলাম। সঠিক নির্দেশ পাবার পরেও প্রায় ঘণ্টাখানেক অন্ধকার গলিতে উদ্বেগবহীন ভাবে ঘুরে বেড়লাম। একা এই অবস্থায় চোখে জল এল। হঠাৎ একটা পাথরে হেঁচট খেয়ে চটির ট্রাপ আলগা হয়ে এল। অসহায় হ'য়ে ভাবছি কি করা যাবে, এমন সময় আমার তানহাতি বাড়ীর সারিয়ামধ্যে একটার গারে গৃহকর্তার নাম গোখে পড়ল, অন্ধকারে এক ঘাবড়া সাদা। এমনি কেমন বেন

এবার কেনবার সময়

লেখমা বিলাস

ইতলে

পিলখার-প্রথ ক্যাপ

যুক্ত দেখে কিনবেন

এম. এল, বঙ্গু যোগ কোং প্রাইভেট লিঃ কলিকাতা-৯

মনে হ'ল, এ নিশ্চয় মিষ্টার উয়েহারার নাম। এক পারে চাঁট পরে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে দরজা পর্যন্ত এগোলাম। নামের ওপর হুমুড়ি খেয়ে দেখলাম বাস্তবিক তাই। উয়েহারার জিরো। কিন্তু ভেতরটা যে একেবারে অন্ধকার।

মিনিট খানেক চুপ করে ভাবলাম, কি করা যায়। শেষ পর্যন্ত চরিয়া হয়ে দরজার গোয়ে বেহ এলিয়ে দিলাম—মনে হ'ল এখানেই জন্মান হয়ে পড়ে যাব।

আনানার সানিডে হু'হাতের আঙ্গুল দিয়ে টোকা যের ফিস্‌ফিস জুড়ে বললাম—মাপ করবেন মিষ্টার উয়েহারার।

মাতা মিলল বটে কিন্তু বাম্যাকটে। ভেতর থেকে দরজা খুলে যেতে আমার চেয়ে তিন চার বছরের বড়, সেকলে গন্ধমাখা জীরাঙ্গী এক মহিলাকে অন্ধকার ঘরের মাঝে দেখা গেল। যুহু হেনে জিজ্ঞেস করলেন—কে গো? গলায় স্বরে না আছে রাগ, না আছে ডর।

মাপ করবেন, আমি—নাম বলার অবসর হ'ল না, আমার প্রেম ওর চোখে মৃদু রূপ নিতে পারে, এই আশঙ্কার সবিনয় প্রণয় করলাম—মিষ্টার উয়েহারার বাড়ী আছেন কি?

না। আমার প্রতি দৃষ্টিতে তাঁর করুণার ছায়া কিন্তু সাধারণতঃ তিনি যেখানে যান—

এখান থেকে অনেক দূর?

না। মনে হ'ল আমার কথায় তিনি কৌতুক বোধ করছেন। ওসিকাবৃত্তে। ট্রেনের সামনে শিরাইশি খাবারের স্টোকানে থোঁজ নিলে, তারা বলতে পারে।

উত্তেজনার নাচতে ইচ্ছে হল।

ও কি? আপনার চটির এ অবস্থা কি করে হল? আমার ভেতরে ভেদে নিরে গেলেন। বৈঠকখানায় বেকের ওপর বসতে, মিষ্টার উয়েহারার আমার একখানা চামড়ার স্ট্রাপ দিলেন। আমি যখন চটি মেরামতে বাস্তব, তখন তিনি একখানা মোমবাতি জ্বলে আনলেন। অত্যন্ত লজ্জিত, আমাদের হু'খানা বাবুই পুড়ে গেছে। আমার স্বামী বাড়ী থাকলে একখানা আনিয়া নিতাম। কিন্তু হু'রাত হ'ল তিনি ফেরেননি এবং মেয়ে নিয়ে আমি সকাল সকাল শুয়ে পড়ি। পকেটে একটা পরস্য পর্যন্ত নেই।

তিনি অত্যন্ত সরল, সহজ হাসিমুখে কথাগুলি বললেন। তাঁর পেছনে ঠাড়িয়ে বছর বারো-তেরোর একটি শীর্ণ মেয়ে বড় বড় চোখে আমার লক্ষ্য করছিল। মনে হল একেবারেই মিস্তকে নয়। এদের আমি কিছুতেই আমার শত্রু মনে করতে পারলাম না, কিন্তু এতটুকু অস্বস্তি করা কঠিন ছিল না যে, একদিন এরা আমার কি রকম মৃগার চোখে দেখবে। এই চিন্তা মনে আসতে আমার সমস্ত প্রেমের তাপ নিবে হিম হয়ে গেল। চটি মেরামত করে ঠাড়িয়ে উঠে হু'হাত দিয়ে হাতের ধূলো ঝেড়ে নিলাম। সেই মুহূর্তে অজানা দুখে, আশঙ্কায় আমার মন ভারী হয়ে উঠল। ইচ্ছে হল বৈঠকখানার ঐ অন্ধকারে দৌড়ে গিয়ে মিসেস উয়েহারার হাত হু'খানা নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিই। তাঁর সঙ্গে গলা জড়িয়ে কেঁদে মনটা হাক করে নিই। এ চিন্তায় আমার সারা শরীর কেঁপে উঠল, কিন্তু ভবিষ্যতে আমার আচরণের মধ্যে কি পরিমাণ ভগ্নাঙ্গ ও কদর্যতা প্রমাণিত হবে, সে কথা মনে করে এ সঙ্কল্প ত্যাগ করলাম।

আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করবেন। এই কথা বলে আঙুলি নত হয়ে প্রণাম করে ছুটে বাইরে পালিয়ে এলাম। কড়ো হাওয়া আমার সারা দেহ ছিন্নভিন্ন করে দেবে মনে হ'ল। মনে মনে বিদ্রোহ ঘোষণা করলাম। আমি তাঁকে ভালবাসি, তাঁর অস্ত্র আমার অন্তরাত্মা কেঁদে মরে, তাঁকে আমার চাই-ই। তাঁর প্রতি ভালবাসার বেধ রোধ করার শক্তি আমার নেই। এ-ও আমি জানি যে, তাঁর স্ত্রীর মত মধুর স্বভাব মহিলা কঠিন চোখে পড়ে। তাঁর মেয়েটিও সুন্দরী, কিন্তু আমি ঈশ্বরের আদালতে আসামীর কাঠগড়ার ঠাড়িয়ে আছি। মনে আমার অপরাধের স্থানির বেধামাত্র নেই। প্রেম ও বিদ্রোহের কারণে যাহুদের জন্ম। আমার পাশ্চি হেবার কোন মুক্তিমন্ত্র অকৃত্যত ঈশ্বরের হাতে নেই। আমি অসহী নই। আমি তাঁকে হাংরাই ভালবাসি এবং তাঁর সজলাভের ভক্ত হেন কাত্র এই বা আমার অসাধ্য। প্রয়োজন হ'লে হু'-তিন রাত আমি ঘাটে-ঘাটে শুয়ে কাটিয়ে দিতে পারি। ঠা, আমার ইচ্ছা পূর্ণ হবেই হবে।

ট্রেনের সামনে শিরাইশি খাবার লোকান খুঁজে নিয়ে অস্বস্তি হল না, সেখানে তাঁকে পেলাম না। তবে নিশ্চয় আসাগাওরাতে আছেন। সম্ভবতঃ আসাগাওরায় ট্রেনের উত্তর ফাটক থেকে সোজা দেড়শ' গজ এগিয়ে যেতে হবে সেখানে এক লোহার মিস্ত্রীর লোকান পেরিয়ে আরও প্রায় পঞ্চাশ গজ এগিয়ে উইলো নামে ছোট্ট হোটেল। তারই এক পরিচালিকার নিয়ে বর্তমানে মিষ্টার উয়েহারার মেতে আছেন, সেইখানেই সারাট দিন পড়ে থাকেন। আপাতত তাঁর কারবার এখানেই সীমাবদ্ধ।

ট্রেনে টিকিট কেটে টোকিওর ট্রেন ধরলাম। আসাগাওরাতে নেমে নির্দেশ অনুযায়ী শেষ পর্যন্ত উইলোতে গিয়ে উপস্থিত হ'লাম কিন্তু সেই হোটেল তখন খাঁ-খাঁ করছে, কেউ নেই।

একদল লোকের সঙ্গে এইমাত্র বেরিয়ে গেলেন। এখান থেকে তারা নিশিওগির 'চিজেরি'তে রাতভর মাতলামী করতে গেল—এই পরিচালিকার বয়স আমার চেয়ে কমই হবে, ধীর, স্থির মানসিক বলেই মনে হ'ল। জানি না, এই মেয়েই তাঁর বর্তমান প্রাণিক কি না।

চিজেরি?—নিশিওগির কোন্ জায়গায় হ'তে পারে? হতাশা চোখে জল আসার জোগাড়। ইহাং সন্ধ্যা হ'ল আমার মাথায় কেমন গোলমাল হ'য়ে গেল না তো?

ঠিক জানি না, তবে মনে হয় ট্রেনের দক্ষিণে হবে। যা হোক, পুলিশবল্ল খোঁজ নিলে নিশ্চয় তারা বলে দেবে। কিন্তু ঐ এক জায়গায় আটকে থাকার মত মাহুয তিনি নন। পথেই মনে আর কোথাও না জড়িয়ে পড়েন।

আমি চিজেরিতেই আগে খোঁজ করব।—ধন্যবাদ! আর ট্রেনে উঠলাম—এবার একেবারে উন্মোদিত দিকে। নিশিওগিতে মোড় মাথায় নিয়ে পুলিশবল্লের সন্ধানে পথে পথে ঘুরে বেড়ানোর সেখান থেকে চিজেরি'র ঠিকানা জোগাড় করে অন্ধকার পথে প্রচুটে চললাম। চিজেরি'র নীল বাতি চিনে সোজা গিয়ে দরজা টুকলাম। দম-বন্ধ-করা ঘোঁরা'র ভরা ছোট ঘরে দশ-বারো জন মাতাল একটা মস্ত টেবিল জুড়ে হৈ-হৈ করে মদ খাচ্ছে। তার মধ্যে তিন জন মেয়ে। আমার চেয়েও ছেলেমানুষ পুরুষদের সঙ্গে মতালে গিগ্রেট টানছে আর মাতলামী করছে।

ঘরের এক পাশে সরে গিয়ে চারি দিকে চোখ বুজিয়ে তাঁকে খুঁজে বের করলাম। মনে হল যন্ত্র দেখছি বুঝি। এ বেন ডির মাহুব। মাহুবের ছ'টা বছরে গোটা মাহুঘটাই পাশে গেছে।

এই কি আমার রামধনু এম, সি, বিনি আমার জীবনের একমাত্র আরাধ্য-দেবতা? হু' বছর। আগের মতই অবিস্মৃত কেশদাম—বর্তমানে বিবর্ণ ও বিরল হয়ে এসেছে। হুখানা স্কীত ও নিস্কৃত, চোখের কোল ধোঁবে ক্লান্ত লালিমা। সামনে ক'টা দাঁত পড়ে গেছে এবং ক্রমাগত কি বেন বিড়-বিড় করে চলেছেন। দেখে মনে হ'ল ঘরের কোণে একটা বুড়ো বীদর শিঁট উঁচিয়ে বসে আছে।

আমার দেখে একটি মেয়ে মিষ্টার উয়েহারাকে চোখ টিপে ইশারা করল। ভয়লোক বসে বসেই গলা বাড়িয়ে আমার দেখলেন এবং নির্ভীকর ভাবে খুঁতনি নেড়ে আমার ভেতরে ডাকলেন। দলের আর সকলে বেন আমার দেখতে পায়নি, এই ভাবে সমানে হৈ-হৈ করতে লাগল, কিন্তু ওইই মধ্যে নিজেরা একটু সরে ব'সে মিষ্টার উয়েহারার পাশে আমার জায়গা করে দিল।

আমি কোন কথা না ব'লে চুপ করে বসে রইলাম। মিষ্টার উয়েহারার গেলাস তরে ধেনোমদ ঢেলে দিলেন। তারপর নিজের গেলাসটিও তরে নিয়ে হেঁড়গলার বললেন—থেরে নাও।

আমাদের গেলাস হু'টি কোন মতে পরস্পরের দেহ স্পর্শ করে যুহ কল্প টুং লক্ষ তুলল।

কে বেন চিংকার করে উঠল,—গিলোটিন্, গিলোটিন্, সু, সু, সু। সঙ্গে সঙ্গে আর একজন যুরো ধরল, গিলোটিন্, গিলোটিন্, সু, সু, সু। তারা পরস্পর গেলাস চেকিয়ে মদে চুসুক দিল। দলে দলে তারা ঐ ভাবে অর্থহীন কথাগুলি সুর করে বলে আর গেলাস হুঁকে মদ খায়। যেন ঐ পাগলের প্রলাপ তাদের মদ খাবার প্রেরণা বোগাচ্ছে। যেই একজন কোন অভ্যুহাতে বেরিয়ে বাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে নতুন অতিথি ঘরে ঢুকে মিষ্টার উয়েহারাকে মাথা নেড়ে অভিবাদন করে দলের মধ্যে ভিড়ে বাচ্ছে।

মিষ্টার উয়েহারার, আপনি জানেন একটা জায়গার নাম? আহা! আচ্ছা বলুন তো, কথাটার সঠিক উচ্চারণ কি হ'তে পারে? আঃ-আঃ-আঃ। না আঃ-আঃ? যে লোকটি সামনে ব'কে এই প্রশ্ন করল আমি তাকে ঠেঁকে অভিনয় করতে দেখেছি, আমার পরিচয় মনে আছে, এর নাম ফুজিটা, কথাটা আঃ-আঃ। ধর তুমি বললে, আঃ-আঃ; চিৎকারির মদ সস্তা নয়।

একটি মেয়ে বলে উঠল—আপনি একটি মাত্র বিষয়ে কথা বলতে জানেন, সেটি হ'ল টাকা।

এক ছোকরা ভয়লোক—এক কাপিং-এ হু-টোক, হামী হ'ল, না সস্তা হ'ল?

আর এক ভয়লোক—বাইবেলে বলে তোমার শেষ কাপিংটা পর্যন্ত দিয়ে যেতে হবে। একজনের পাঁচটি গুণ আছে, আর একজনের আছে হু'টি, আরও একজন একটি মাত্র গুণের অধিকারী—বাঃ, লম্বা কিরিস্তি। যীশুর হিসেবের বড় কড়াভি ছিল।

আর একজন বললেন—আরে, তার চেয়েও বড় কথা হ'ল, তিনি নিজে মদ খেতেন। বাইবেল ভর্তি মদের গল্প। যে সব লোক মদ ভালবাসে তাদের নিয়ে অনেক আলোচনা পাবে, কিন্তু তারা মদ খায়, তাদের সবচেয়ে উচ্চবাচ্য নেই। শুধু

ভালবাসলেই পাপ; এতে প্রমাণ হয় যীশু নিজে নিশ্চরই মদ খেতেন। আমি বাজি রেখে বলতে পারি, তিনি এক নাগাড়ে হুই কোয়ার্ট মদ টানতে পারতেন।

হয়েছে, হয়েছে, বখেটে হয়েছে। আমাদের মধ্যে ধর্মভীরু হারা, তারাই যীশুকে নিয়ে টানটানি করে। ও-সব রেখে মদ চালিয়ে যাও। গিলোটিন্, গিলোটিন্, সু সু সু।

মিষ্টার উয়েহারার দলের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী তরুণীর গেলাসের নড়ে সজোরে নিজের গেলাস হুঁকে মদে চুসুক দিলেন। চৌচৌর কণ বেরে গড়িয়ে-পড়া তরল পদার্থটুকু অসন্তোষের মত হাতের চেটোতে ছুড়ে দিলেন। পর দুহুঁকে পাঁচ-ছয়বার প্রচণ্ড হাঁচি দিলেন।

আমি নিজেকে উঠে পাশের ঘরে গেলাম। ফ্যাকাশে, ক্লান্ত চেহারার হোটেলকর্ত্রীকে জিজ্ঞেস করে কলঘরের পথটা ভেবে নিলাম। ঘরে ঢুকে দলে পৌঁছবার পথে দেখি 'চী'—সেই সুন্দরী ছেলেমাহুব ঘেরাট আমার জন্যে অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে আছে।

মধুর হেসে আমার প্রশ্ন করল—কিসে পারনি তোমার?

না, সঙ্গে কুটা আছে।

দুর্ভল চেহারার পূর্বোক্ত মহিলাটি হিটারের ওপর ক্লান্তভাবে হুঁকে পড়ে বললেন,—দেবার মত বিশেষ কিছু নেই আমাদের; সামান্য বা আছে ছুটি বুথে দেবে এস। এই মাতালদের পাঞ্জায় পড়লে সারা রাত পেটে কিছু পড়বে সে ভরসা নেই। এদিকে চী-এর পাশে বসে পড়।

এই কিছু—এদিকে মদ ফুরিয়েছে। পাশের ঘর থেকে এক ভয়লোকের সাড়া পেলাম। কিছু কি 'বাই' বলে দশ বোতল ধেনো মদ একটা ট্রের ওপর বসিয়ে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল।

হোটেলকর্ত্রী তাকে মাঝপথে থামালেন—এক মিনিট দাঁড়াও, আমাদের এখানে হু'বোতল রেখে যাও। পরে যুহ হেসে যোগ দিলেন—তোমার কিন্তু একটু কষ্ট দেবে। স্জুইয়ার কাছ থেকে হু'বাটি ছুড়ল নিয়ে এস। যাবে আর আসবে।

আমি চী-এর পাশে বসে পড়ে হিটারে হাত শেঁকতে লাগলাম।

আয়াস করে বসো, এই নাও কুশন, দিবা ঠাণ্ডা পড়েছে—না? মদ খাও না তুমি? মাদাম, প্রথমে বোতল থেকে মদ ঢেলে নিজের পেয়লা ভর্তি করলেন, পরে আমাদের হুঁজনের পেয়লাও ভরে দিলেন।

আমরা তিনজনে নীরবে পান করতে লাগলাম। আশ্চর্য্য অন্তরঙ্গ সুরে বাদ্য বললেন—তোমরা দুজনেই মদ খেতে অভ্যস্ত দেখছি।

সামনের দরজা খোলার শব্দে চেয়ে দেখি, এক তরুণ যুবা বলছে—মিষ্টার উয়েহারার, মালিক এমন কিপটে যে, কিছুতেই বিশ হাজা হু'ডিতে রাবী হল না, শেষ অবধি কোন রকমে দশ হাজার বাগিয়ে এনেছি।

চেক? মিষ্টার ক্লক গলার হুকুর দিলেন।

না, মাপ করবেন। নগদ।

ঠিক আছে, আমি একখানা রসিদ দিয়ে দেব'খন। দলের আঃ পাঁচজন একটানা গিলোটিন্, গিলোটিন্, সু-সু-সু গেয়ে চলল। এমন অবস্থা যে, কথাবার্তার মাঝেও থামে না।

মাদাম বখেটে চিন্তিত ভাবে চীকে জিজ্ঞেস করলেন,—নাও কি কেমন আছে?

টী-এর গালে লালের ছোপ লাগল—ইতস্তত করে জবাব দিল—
কি করে জানব বল ? আমি তোমার পার্জেন নই ।

আমি বিচলিত না হয়ে মাদাম্ আবার বললেন—মনে হয়
সম্প্রতি মিষ্টার উয়েহারার সঙ্গে তার কোন গুণগোল হয়েছে, নইলে
হুজনে তো বরাবর একসঙ্গে থাকেন ।

তুনেছি আজকাল সে নাচ শিখছে, সম্ভবতঃ কোন নাচওয়ালীর
পাল্লায় পড়েছে ।

নাওজি বড় গেহিসেবী, মনের ওপর আবার মেয়েমাছুষ ।

মিষ্টার উয়েহারার এই রকমই বন্দোবস্ত করেছেন ।

একবারে গোল্লার হাবে ছেলেটা, যখন ওর মত নষ্ট ছেলে একবার
এ রাস্তার পা বাড়িয়েছে—

বুহু হেসে আমি বাধা দিতে বাধ্য হলাম । চুপ করে শোন
উচিত হবে না মনে করে বললাম—খাপ করবেন, নাওজি আ
তাই ।

মাদাম অপ্রস্তুত হ'য়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন । টী
কিন্তু সহজ গলায় বলল—তোমাদের চেহারার কিন্তু খুব সাদৃশ্য আছে ।
তোমার বাইরে পাড়িয়ে থাকতে দেখে আমি এক মিনিটের অন্তরে চমকে
উঠেছিলাম, মনে হয়েছিল সেই ব্যক্তি ।

মাদামের গলার স্বরে শ্রদ্ধার ভাব ফুটে উঠল ।

হ্যাঁ তাই তো । তাহ'লে তুমি এই নরকে এলে কেন ? মিষ্টার
উয়েহারার সঙ্গে আলাপ ছিল ব্যক্তি ?

হ্যাঁ বছর ছয়েক আগে আমি তাঁকে একবার দেখেছিলাম—আমার
গলা বুজ্ঞে এল, চোখ নীচু করলাম ।

হুডল হাতে ঝি দেখা দিল, এত দেবী হয়ে গেল, ভারী লজ্জায়
পড়লাম ।

মাদাম আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন—ঠাণ্ডা হবার আগে
খেয়ে নাও ।

ধন্যবাদ, বলে হুডল-এব খোঁয়ার মধ্যে মুখ গুঁজে দিয়ে চটপট
খেতে শুরু করলাম । বেঁচে থাকার অসীম দুঃখ আমি যেন
জীবনে এই প্রথম এমন গভীর ভাবে অনুভব করলাম ।

অকুট কণ্ঠে গিলোটিন্, গিলোটিন্, স্ত্র, স্ত্র, স্ত্র, গুন্‌গুন্‌ করতে
করতে মিষ্টার উয়েহারার ঘরে ঢুকলেন । আমার পাশে ধপ করে বসে
পড়ে নীরবে একথানা মস্ত খাম মাদামের হাতে তুলে দিলেন ।

খামে কি আছে না কেগেই মাদাম সেটিকে দেয়ালে চালান
করলেন । হাসিমুখেই বললেন—ভেবা না এতেই তুমি পার পাবে ।
আমাকে কীকি দিয়ে পালাতে পথ পাবে না ।

হবে, হবে, সামনে বছর সব শোধ করে দেব ।

এ-ও কি বিশ্বাস করতে বল ?

দশ হাজার ইয়েন্—কত অল্প বাল্ব কেনা যায় ঐ দামে ।
ঐ টাকায় আমার মত মানুষ একটা বছর হেসে-খেলে কাটিয়ে দিতে
পারে ।

এই লোকগুলোর মাথায় ছিট আছে, কিন্তু বোধ হয় ঠিক আমার
বে দশা, এদেরও তাই । এমন করে বাঁচতে না পারলে এরা মরে
যাবে । এক কথা যদি সত্যি হয় যে, এ পৃথিবী'ত জন্ম নিলে মানুষকে
বা হোক করে জীবন কাটিয়ে যেতেই হবে, তাহ'লে তার বেঁচে
থাকার প্রয়াস, হোক না তা কথ্য—নিজের চেহারার মত বিক্রি,

তবু তাকে বোধ হয় বুঝা করা উচিত নয় । 'তবু বেঁচে থাকা, তবু
প্রাণ ধারণের প্রাণি এ এক পর্বতপ্রমাণ দায়িত্ব—বার সামনে
মানুষ বোকার মত ফ্যাল-ফ্যাল করে শুধু চেয়েই থাকতে পারে ।

বাই হোক—পাশের ঘরে এক ভদ্রলোকের গলা শোনা গেল—
এখন থেকে টোকিওর মানুষ যদি মৌখিক ভদ্রতামাত্র বজায় রেখে,
অত্যন্ত ভাসা-ভাসা ভাবে পরস্পরকে গ্রহণ করতে না পারে, তবে
শিক্ষিত মহলের সর্বনাশ ঘনিয়ে আসবে । আজকের দিনে সম্মান,
বিশ্বাস আদি গুণাবলি লোকের কাছে আশা করা মুর্থতা । এ যেন
কীসিকার্টে খোলানো মানুষকে ঠ্যাং ঘরে টান মারা । শ্রদ্ধা ?
সত্যতা ? বাজে কথা । এরা তোমায় যদি আট্টে-পুঠে জড়িয়ে থাকে,
তবে তোমার আর রক্ষা নেই । আজ জীবনসমুদ্রের ওপর দিয়ে
আলগোহে গা ভাসাতে না পারলে তিনখানি মাত্র রাস্তা খোলা
থাকে—গ্রামে ঘিরে চাষবাস করা, আত্মহত্যা করা, অথবা বেড়াবৃত্তি ।

আর একজন বললেন—যে হতভাগা এ তিন রাস্তার একটাও
নিতে পারে না, তার জন্তে শেষ রাস্তা খোলা আছে—উয়েহারার
কাছে ধার করে পাঁড় মাতাল হ'য়ে পড়ে থাকা ।

গিলোটিন্, গিলোটিন্ । স্ত্র, স্ত্র, স্ত্র ।

আধচাপা গলার মিষ্টার উয়েহারার জিজ্ঞেস করলেন—এখানে
তোমার রাত কাটাবার কোন ব্যবস্থা নেই বোধ হয় । আছে ?

আমি ? মনে হ'ল একটা সাপ নিজেকে ছোবল দেবার জন্ত
মাথা খাড়া করে উঠেছে । বিদ্রোহ । বিজাতীয় যুগায় আমার
সারা শরীর শক্ত হয়ে উঠল ।

আমার এই বিতৃষ্ণাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে আবার প্রশ্ন
করলেন—আমাদের সকলের সঙ্গে একঘরে স্ততে পারবে ? বাইরে
বা দারুণ শীত ।

মাদাম বাধা দিয়ে বললেন—না, অসম্ভব ! তোমার হৃদয় বলে
কোন পদার্থ আছে ?

মিষ্টার উয়েহারার দাঁতের গোড়ায় জিভ ঠেকিয়ে বিরক্তি সূচক শব্দ
করলেন—তাহলে ওর এখানে আসাই উচিত হয়নি ।

আমি চুপ করেই রইলাম । তাঁর গলায় স্বর আমার সেই
মুহূর্তে বুঝিয়ে দিল যে, আমার সব চিঠিই উনি পড়েছেন এবং
সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করলার, আমার প্রতি ভদ্রলোকের দুর্বলতার
অন্ত নেই ।

তিনি বললেন—উপায় কি এখন ? ফুকির ওখানে একখানা
বিছানার ব্যবস্থা হ'তে পারে । টী, একে সেখানে নিয়ে যাও—
কেমন ? না, দুটি মেয়ের পক্ষে এত রাতে পথে বেরুনো ঠিক হবে
না । কী জালা ! আমার নিজেকেই যেতে হল দেখছি ।

পথে বেরিয়ে বেশ বোঝা গেল রাত প্রায় মাঝবরাবর পৌঁছেছে ।
বাতাসের বেগ কমেছে, তারারা আকাশ জাঁকিয়ে সভা ভেঙেছে ।
আমরা পাশাপাশি হেঁটে চললাম ।

আমি বললাম—অন্যদের সঙ্গে বেশ স্ততে পারতাম । মিষ্টার
উয়েহারার ঘূষচোখে বোঁৎ-বোঁৎ করে উঠলেন । বুহু হেসে আমিই
আবার বললাম—আপনি ইচ্ছে করেই আমার সঙ্গে এলেন—
তাই না ?

বিরক্ত হাসিতে মুখ বিকৃত করে জবাব দিলেন—সেই তো হয়েছে
যত ভাল ।

সবেদ অনুভব করলাম, ভ্রমলোক আমার প্রেমে পড়েছেন।
আপনি দেখছি দারুণ মদ খান। এই কি রোজ রাতের ব্যবস্থা?

প্রত্যেক দিন। ভোর থেকে শুরু হয়।

মদ এত ভাল লাগে?

বিশী গন্ধ।

গলার স্বরে এমন কিছু ছিল, যা শুনে আমি শিউরে উঠলাম।

আপনার কাজ কেমন চলছে?

খুব খারাপ। এখন বাই লিখতে বসি, তাই বোকার মত
ছিঁচুঁকিয়ে হয়ে পড়ায়। জীবনে সন্ধ্যা, শিল্পজগতে সন্ধ্যা,
মানবজাতির সন্ধ্যা! কি চরম অধঃপতন!

মুখ কসকে বেরিয়ে গেল,—ইউট্রোলো।

হ্যাঁ ইউট্রোলো। লোকে বলে ভ্রমলোক আজও জীবিত আছেন—

কিন্তু মদ এখন তাঁকে খাচ্ছে। ককালসার দেহ। গত দশ বৎসর
যাবৎ তাঁর ছবি অবিশ্রান্ত রকম অশ্রীল এবং তথ্যিক জঘন্য ছবি
আঁকছেন ভ্রমলোক।

শুধু ইউট্রোলোই নন—বেশীর ভাগ প্রত্নিভাবান লোকেরই আজ
এই দশা—না?

হ্যাঁ—তাদের স্বজনীশক্তিতে ভাটা পড়ছে। কিন্তু নতুন বারী,
তাদেরও ঐ একই অবস্থা, কুঁড়িতেই শুকিয়ে যাচ্ছে। তুষারাবৃত!
যেন অকালে তুষারপাত হয়ে সারা দুনিয়াটা আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

হাক্কা হাতে আমার কাঁধ বেঁধে বসে আছেন। এ যেন তাঁর
গরম আচ্ছাদনের অন্তরালে আমার রক্ষা করার প্রয়াস। একে
প্রত্যাখ্যান করার শক্তি আমার কই? হাঁটতে হাঁটতে তার
আলিঙ্গনের মধ্যে নিজেকে ঘনীভূত করে আনলাম।

পথের পাশে বৃক্ষশাখার দল, পত্রমাত্র-বিবর্জিত অবস্থায় তারা
দল বেঁধে রাতের আকাশ ভেদ করে ভিক্রে করতে বেরিয়েছে। ভারী
স্বন্দর ডালগুলি—না? নিজের মনেই বললাম।

কেমন যেন না-বোঝা স্বরে প্রশ্ন করলেন—তুমি বলতে চাও—
এই কালো-কালো ডালগুলির সঙ্গে ফুলের মিতালির কথা,—
তাই না?

না। ফুল, পাতা, কুঁড়ি কোনটাই না। আমি ভালবাসি
গাছের ডাল। সম্পূর্ণ রিক্ত অবস্থাতেও তারা সম্পূর্ণ প্রাণরসে সিক্ত।
যরা ডালের সঙ্গে এদের কত তফাৎ!

অর্থাৎ একমাত্র প্রকৃতির প্রাণরসের ভাণ্ডার এখনও পরিপূর্ণ
আছে এই তো? বলতে গিয়ে ভ্রমলোক কয়েকটা প্রচণ্ড হাঁচি
দিলেন।

আপনার ঠাণ্ডা লেগেছে?

না, তা নয়। আমাদের মনের নেশা যখন চরমে ওঠে তখনই
এমনি হাঁচি। এ যেন আমার নেশার পরিমাপ যন্ত্র।

আর প্রেরণ?

কি?

অনুরাগের

লিখতে উঠেছে?

ঠাটা করে না আমার নিয়ে। মেয়েরা সব সমান। এমন
অটল তাদের মনোভাব! গিলোটিন, গিলোটিন সু-সু সু।
বাতবিকই একজন আছে; না টিক একজন নয়, আধ জন আছে।

চিঠিগুলো পড়েছিলেন?

সব।

আপনার কাছ থেকে কি রকম উত্তর আশা করতে পারি?

আসলে বনেনি চালে আমার অক্লি। সব ব্যাপারেই তাদের
কেমন যেন উদ্ধত, নাক-উঁচু ভাব। সেদিক থেকে তোমার ভাই
নাগজি যথেষ্ট উৎসে গেছে, কিন্তু সে-ও মাঝে মাঝে এমন জমিদারী
মেজাজ করে যে, আমার পক্ষে তা অসহ্য হয়ে ওঠে।

এই রকম ছোট নদীর পাশ দিয়ে গেলেই ছেলেবেলার গাঁয়ের
নদীতে জাল ফেলে মাছ ধরার কথা মনে পড়ে, বৃকের ভেতরটা
হাহাকার করে ওঠে।

স্বচ্ছকারে অস্পষ্ট শব্দ করে বয়ে চলেছে এক ছোট নদী, আমরা
তার পাশ দিয়ে গাঁটছিলাম।

তোমরা বড়লোকেরা শুধু যে আমাদের দুঃখ বোঝ না তাই না,
উপরন্তু ঘৃণা কর।

তাহলে দুর্গেনিভকে কি বলতে চান?

সে-ও তো আমাদেরই দলে—তার প্রতি আমার যথেষ্ট বিতৃষ্ণা
আছে।

তার স্পোর্টিং গার্মেন্টস কেচেস?

হ্যাঁ, ওর ঐ একমাত্র বই মন্দ হয়নি বলা যায়।

গ্রাম্যজীবনের বেদনায় ভরা বইখানি।

বেশ, মানলাম তিনি গ্রাম্য অভিজ্ঞতায় সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ। এই
বার হ'ল তো?

আমিও গ্রামের মধ্যে। জমি চাষ করি, একেবারে গরীব চাষী
মেয়ে।

তুমি কি এখনও আমার ভালবাস? এবার তাঁর গলা রুদ্ধ হয়ে
এল, এখনও কি তুমি সন্তান কামনা কর?

এর উত্তর দেওয়া অসম্ভব।

পাহাড়ের যেমন ধস নামে, তেমনি হঠাৎ তাঁর মুখখানা আমার
মুখের ওপর নেমে এল। সশব্দে আমার চুপন করলেন। সেই
চুপনের ভেতর দিয়ে তাঁর কামনার আভাষ পেলাম। গ্রহণ করতে
গিয়ে আমার চোখে জল এল। গভীর লজ্জায় আত্মহীনভাবে সে কাঁদা

দ্বীরোগ, ধবল ও বৈজ্ঞানিক কেশ-চর্চা

ধবল, বিভিন্ন চর্মরোগ ও চুলের যাবতীয়
রোগ ও দ্বীরোগের বৈজ্ঞানিক চিকিৎসায়
পত্রালাপ বা সাক্ষাৎ করুন।

ডাঃ চ্যাটার্জীর ব্যাশনাল কিওর সেন্টার

৩৩, একডালিয়া রোড, কলিকাতা-১৯

সন্ধ্যা ৬।—৮।টা। কোম নং ৪৬-১৩৫৮

আমার অন্তরের অন্তস্তল ভেদ করে চোখের ভেতর দিয়ে বজ্রের মত নেমে এল।

পাশাপাশি চলতে গিয়ে তিনি বললেন—একটা কাণ্ডই করে ফেললাম। বুড়ো বয়সে তোমার প্রেমে মজ্ঞে গেলাম। নিজের মনেই হেসে উঠলেন ভদ্রলোক।

আমার কিছু একটুও হাসি পেল না। জু কুণ্ডিত, অধর কুণ্ডিত, আমার সে সময়ের মনোভাব তানায় ব্যক্ত করলে এই কাঁড়ার—অগত্যা।

আমি যেন অন্ধকারে একা চলছি।

সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে—ভদ্রলোক বললেন, কি বল মহলা চলবে?

থাক, আর অভিনয় করতে হবে না। শয়তান। মিষ্টার উয়েহারার সুস্থিৎ হাত আমার স্বকলশে নেমে এল। আবার এক বিগট হাঁচি।

মিষ্টার সুস্থির বাড়ীতে সবাই শুয়ে পড়েছে মনে হ'ল। টেলিগ্রাম, টেলিগ্রাম! মিষ্টার ফুকি টেলিগ্রাম এসেছে। মিষ্টার উয়েহারার চোঁচামেচি করে দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলেন। কে? উয়েহারার তুমি? পুরুষকণ্ঠে সাড়া পেলাম। হ্যাঁ আমি। রাজপুত্র রাজকন্যা এসেছে এক রাতের আশ্রয়ের আশায়। বাইরে এক শীত যে হাঁচতে হাঁচতে প্রাণ বেরিয়ে গেল। প্রেমের অভিনয়ের এ কি হাশ্বকর পরিণতি।

সদর দরজা খুলে গেল। টাক মাথা, গরগবে রং-এর শাজামানরা এক পক্ষাল বছরের বুড়ো—কেমন যেন সসজ্জ হাসি হেসে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। মিষ্টার উয়েহারার ঘরে ঢুকে কোট না খুলেই অভিযোগ করলেন—কিছু মনে করো না, তোমার টুডিওঘরখানা বড্ড ঠাণ্ডা, দোতলার ঘর আমার চাই। চলে এস। বলে আমার হাত ধবে হলঘরের প্রান্তে সিঁড়ির দিকে নিয়ে চললেন। সিঁড়ি বেয়ে উঠে আমরা একখানা অন্ধকার ঘর পেলাম, মিষ্টার উয়েহারার সুইচ টিপে আলো জ্বাললেন।

আমি বললাম, এ যেন হোটেলের নিড়ত খাবার ঘর—তাই না?

নতুন বড়লোকের রুচি আর কতই বা ভাল হবে? তবু ফুকির মত বাজে মার্কা আর্টিষ্টের পক্ষে এও বাড়াবাড়ি। ভাগ্য যখন তোমায় খুঁজে বেড়ায়, তখন আর পাঁচজনের মত পতনের ভয় থাকে না। এই সব লোকদের ঘাড় ভাঙ্গাই উচিত। যাই হোক শুয়ে পড়, এখন শুয়েই পড়।

এ যেন ঔর নিজের ঘর-বাড়ী, এমনি ভাবে আলমারি থেকে বিছানাপত্র টেনে-টুনে বের করলেন। ছুমি এখানে ঘুমোও—আমি তবে আসি। কাল সকালে এসে তোমায় নিয়ে যাব। নীচে নেমে ডানহাতি কলঘর পাবে।—সিঁড়ি দিয়ে এমন প্রচণ্ড শব্দ করে নেবে গেলেন যে মনে হ'ল, গড়িয়ে পড়েই গেলেন বুঝি! ব্যস এই পর্যন্ত। এর পর চারিদিক নিস্তব্ধ, নিস্তব্ধ।

আলো নিবিয়ে—বাবার বিদেশ ভ্রমণের স্মৃতিচিহ্ন ডেসভেটের কোটখানা খুলে কিমনো পরেই বিছানায় ঢুকে পড়লাম। বেশমী কোমরবন্ধটা শুধু টিলে করে নিলাম। ক্লাস্তির সুখে মদ খেয়ে

শরীরটা তার হয়েছিল, সেইজেরী ঘুমিয়ে পড়লাম। কোন সময়ে ঠিক মনে সেই চোখ খুলে দেখি, ভদ্রলোক আমার পাশে শুয়ে। শ্রীর ঘটীখানেক নীরবে ঘুম করে, শেষ অবধি ওর কণ্ঠ মায়া হ'ল, আত্মসমর্পণ করলাম।

আপনার জীবনে এই কি একমাত্র সাধনা?

ঠিক তাই।

কিন্তু এতে আপনার শরীর খারাপ হয় না? আমার ধারণা আপনার কাশির সঙ্গে রক্ত উঠেছে।

কি করে বুঝলে? সত্যি সেদিন সাংঘাতিক কষ্ট পেয়েছি—অবশ্য একথা কেউ জানে না।

মায়ের মৃত্যুর আগে এই রকম গন্ধ পেয়েছিলাম।

আমি হাল ছেড়ে দিয়ে মদ খাই। দুর্ভিক্ষ, অন্ধকারময় এ জীবন বুখা। দুঃখ, নিঃসঙ্গতা, জড়তা হৃদয় বিদীর্ণ করে। তোমার চার পাশের দেওয়াল থেকে যে হাহাকার ওঠে, তা থেকে ঘরে নিতে পার এ হুনিয়ার তোমার কণ্ঠ কোন সুখ আর অবশিষ্ট নেই। সব শেষ। মাহুঘ যখন উপলব্ধি করে যে হুনিয়াতে বেঁচে থেকে কোন সুখ বা যশের সুখ দেখতে পাবে না, তখন তার কি অবস্থা হয় বলতে পার? এ কি প্রচণ্ড জীবন-সংগ্রাম। এ শুধু ক্ষুধার্ত প্রাণীদের মুখে অরের যোগান দেওয়ার পণ্ডশ্রম। অসংখ্য মাহুঘের এই যে বেদনা, এ-ও কি অভিনয়?

মা।

একমাত্র প্রেমই অনল্য,—ঠিক যেমনটি তুমি চিঠিতে লিখেছ।

হ্যাঁ।

আমার প্রেমের বাতি ফুৎকারে নিবে গেল।

শুধু যখন অস্পষ্ট আলো হ'ল, দেখলাম সেই ঘুমন্ত মাহুঘের চেহারা! দেখলাম মৃত্যুপথযাত্রীর মুখে চরম ক্লাস্তির ছায়া! এ মুখ বলির পশুর: এক অনল্য বলিদান! আমার প্রেমাম্পদ। আমার রামধনু। আমার সম্ভান। ঘৃণ্য পুরুষ। ব্যভিচারী পুরুষ।

কেন হ'ল এই অপূর্ণ মুখখানার সঙ্গে তুলনা দিতে পারি, পৃথিবীতে এমন কিছুই নেই। পুনর্জীবিত প্রেমের উত্তেজনায় আমার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। চুলের মধ্যে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে আমি তাঁকে চুষন করলাম।

প্রেমের কি মর্শাস্তিক প্রহসন!

মিষ্টার উয়েহারার চোখ বন্ধ রেখেই আমার বুকের মধ্যে টেনে নিলেন। তুল, আবার তুল করলাম। চাবার ছেলের কাছে এর বেশী কী-ই বা আশা করা যায়!

এর পর ঠুকে ছেড়ে যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব।

এতদিনের সুখের সন্ধান পেয়েছি। যদি চার পাশের দেওয়াল ভেদ করে হাহাকার ওঠেও, তবু আমার সুখের মাত্রা চরমেই থাকবে। আনন্দে আমার হাঁচতে ইচ্ছে করছে।

মিষ্টার উয়েহারার হেসে উঠলেন,—কিন্তু বড় বেশী দেবী হ'য়ে গেল, সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে।

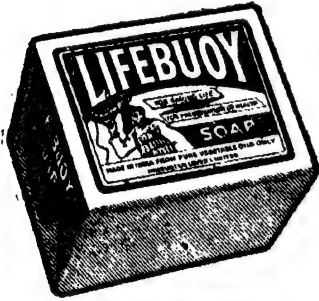
সবে ভোর হ'ল।

সেই দিন সকালে আমার তাই নাগজি আত্মহত্যা করে। [ক্রমশঃ।

অনুবাদ : কল্পনা রায়।

যাঁরা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন তাঁরা সবসময় **লাইফবয়** সাবান দিয়ে স্নান করেন ।

খেঁলাখুলোই বলুন বা কাজকর্মই
বলুন আমরা কখনই ধুলোময়লার থেকে
নিরাপদ নয় । আর ময়লা বহন
করে রোগের বীজানু বা সবসময়
আপনার স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতি-
কর । লাইফবয় সাবান এই
বীজানুগুলি ধুয়ে সাফ করে
দেয় এবং আপনার স্বাস্থ্য
সুরক্ষিত রাখে ।
প্রত্যেকদিন লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান
করে আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখুন—
এটি আপনাকে এত ব্যবহারে করে তোলে ।



সাপমুক্তি



ঐদারেশচন্দ্র শর্ম্মাচার্য্য

এঁরাঃ, সত্যি কি তারা এসেছে ?

হ্যাঁ, তারা এসে গেছে। তাদেরই পায়ের শব্দ পাচ্ছে শীলা। ফিস-ফিস কথার আওয়াজ কানে ভেসে আসছে। ভয়ে বুকটা বেন কুঁকড়ে যায়, তাইত মৃত্যুদুত্তরা তাকে নিয়ে যেতে এসেছে। তাহলে বা শুনেছে, বসেছে বা পড়েছে, তা সত্যি ? পরজোক আছে — প্রেতলোক আছে। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তারা নিয়ে যেতে আসে। মৃত্যুদুত্তরা তাকে কোঁথায় নিয়ে যাবে :—খাঁত কে ওঠে শীলা।

বরণের অপর পারটা তার মনে বিভীষিকার স্রষ্টা করে। কই ? শীলা কান্নেকে দেখতে পাচ্ছে না। চোখ মেলে তাকাতে চায়, কিন্তু পারে না। দেহটা বেন অসাড় হয়ে গেছে। নড়বার চড়বারও শক্তি হারিয়েছে শীলা। সংসার ও আত্মকে শীলা চকল হয়ে ওঠে। সত্যি কি জন্মের মত এ জগৎটাকে সে ছেড়ে চলে যাচ্ছে ? সত্যি কি তার মৃত্যু হয়েছে ?

না, না, না। তাহলে এ কি হল ? ভাবতে গিয়ে সবই গোলমাল হয়ে যায়। সত্যি কি সে পটাসিয়াম সায়েনাইড খেয়েছিল ?

না, সে তা পারেনি। শুধু তারই উদ্ভোগ করছিল শীলা। অনেক কষ্টে অনেক হলনার বৈজ্ঞানিক স্বাক্ষর গবেষণাগার থেকে তা চুরি করে এনেছিল।

সত্যি মনে পড়ছে, লত টেবিলের ধারে বসে চিঠি লিখছিল।

সেই স্বাক্ষরক শেষ চিঠি। কিন্তু চিঠি লেখা তাঁর শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই মাথাটা ঘুরে গেল। টেবিলের ডয়ারেই সেই সাংঘাতিক জিনিসটা বেবে দিয়ে চিঠি লিখতে বসেছিল শীলা।

চিঠির শেষের কথ—“মৃত্যু আমার মুক্তি দেবে কি না জানি না : কিন্তু তোমার ক্ষমা পেলেই আমি মুক্তি পাব।”

চিঠি শেষ করে দীর্ঘনিঃশ্বাস কেলেছিল শীলা। ভরনি উঁহা-উঁহা-উঁহা,—পাশের কোন্ এক বাড়ি থেকে ভেসে আসছিল সন্তোভাত শিশুর কান্না। আর তার সঙ্গে শাঁখের আওয়াজ আকাল-বাতাসে নব জীবনের বাতী ঘোষণা করছিল। দুপুরের স্তব্ধ বাতাসও বেন মৃদু হিল্লোলে স্বাগত জানাচ্ছিল সেই নবাগত মানব-শিশুকে।

তার নিজের বুক চিরেও বেন উঁহা-উঁহা কান্নার স্রোত বের হয়ে এক ‘মুক্তিমান’ শিশুর রূপ ধরে শীলার গলা জড়িয়ে ধরেছিল। কুটস্থ কমলকলির মত সে মুখখানি। সেই মুখে চুমা খেতে গিয়ে সব ভুলে গেল শীলা। সেই শিশুর বাহুবন্ধনে শীলার দম বন্ধ হয়ে গেল। কিছুতেই তাকে ছাড়তে পারলে না শীলা। আর ত কিছুই তার মনে পড়ে না।

মরতে চেয়েছিল শীলা। কিন্তু এ কি হয়েছিল তার ? সে কি মনের দুর্বলতায় এসব বিভীষিকা দেখেছে ? তাহলে কি এ অবস্থায় ডয়ার থেকে বের করে সেই সাংঘাতিক জিনিসটা সে মুখে দিয়েছিল ? এরকম কিছুই তার মনে পড়ে না।

তবু মনে সংশয় জাগে,—সত্যি কি সে মুক্তি পেয়ে গেছে ? মাটির পৃথিবী থেকে সত্যি কি সে চিরবিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছে ? হ্যাঁ, তার সে চিঠি পড়ে প্রশান্তির মনে কি হল, তা জানতে চায় শীলা। নিশ্চয়ই ঘুণায় প্রশান্ত তাকে অভিলাপ দেবে। না, না, প্রশান্ত তাকে ক্ষমা করবে।

ফিস-ফিস কথার আওয়াজ শীলার কানে ভেসে আসছে। নিশ্চয়ই মৃত্যুদুত্তরা কথা কইছে। কই, কোথায় তারা ? কিছুই দেখতে পাচ্ছে না শীলা। সবই বে অন্ধকার ! মনে মনে ভাবে,—সে নিজেকে অশবীরী হয়ে গেছে। তবু কেন দেহে অবসাদ এসেছে। তার মনে হল,—দেহের মধ্যেই সে এখনও ছটকট করছে। তাহলে আত্মাটা দেহ ছেড়ে এখনও যেতে পারে নি !

কিন্তু এ কি হল ? সে বে বিছানায় শুয়ে আছে। নরম বিছানায় বাগিশ মাথা দিয়ে শুয়ে আছে শীলা। কে তাকে এখানে নিয়ে এসেছে। এ ঘরেও বিছানা ছিল না ! আর প্রশান্তর এখনো কোঁথার সময় হয় নি।

দুপুরবেলা প্রশান্ত কলঙ্কে চলে গেছে। দরজা ভেজিয়ে দিয়ে নিরিবিলিতে চিঠি লিখছিল শীলা :—শেষ বিদায়ের চিঠি। প্রশান্তর কাছে তার অভিশপ্ত জীবনের স্বীকৃতির কথা জানিয়ে মার্জনা চেয়েছিল শীলা।

আত্মহত্যা ছাড়া যে আর কোন উপায় ছিল না। আত্মভোলা বিজ্ঞানী অধ্যাপক প্রশান্ত। এমন সুন্দর মধুর স্বভাব স্বামীকে সে মুনী করতে পারল না। প্রশান্তকে হুলা করে নিজের পায়ের বোঝা বাড়তে চায়নি শীলা।

অতীতের সব কথা মনে পড়ায় একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস কেলে শীলা। সোনার স্বপ্নে বিভোর হয়ে সে মস্ত বড় ভুল করেছিল। সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত সে আজ বরছে। এ ছাড়া যে কোন উপায়ই ছিল না।

সমীর তার সর্বনাশ করেছে। তখন অত-শত ব্যস্তে পারেনি শীলা। সমীর তার দেহে-মনে কি এক উদ্ভাটনা জাগিয়ে দিয়েছিল। শীলা সে উদ্ভাটনার আত্মসমর্পণ করেছিল। সমীরকে বিশ্বাস করেই নিজের সর্বনাশ সে নিজেই ডেকে এনেছে। সমীর আশাস দিয়েছিল; সেই সমীরই করেছে চরম বিশ্বাসঘাতকতা।

সে সমীর জাত মানে না ধর্ম মানে না, সমাজ মানে না। সেই সমীরই বাপ-মায়ের দোহাই দিয়ে দূরে সরে গেল। ডাক্তার মেয়েকে তার বাপ-মা ঘরে তুলবেন না; বরং সমীরকে ত্যাগপত্র করবেন।

সমীরের বৃকে মাথা রেখে শীলা কত কঁদেছে। এমন কি তার পা ছুঁটি জড়িয়ে ধরে তাকে উদ্ধার করতে বলেছিল। সমীরের সঙ্গে পালিয়ে যেতে চেয়েছিল শীলা। মিথ্যা আশাসও দিয়েছিল সমীর। কিন্তু শেষ কালে সমীর গাটাকা দিয়েছিল।

অধ্যাপক শিবনাথের একমাত্র বন্ধু শীলা। আপনভোলা খবিতুল্য অধ্যাপকের ছাত্রেরা তাঁর অধ্যাপনায় মুগ্ধ। কথা-বতীর, উৎসাহ-উদ্বোধন তারি তিনি ছেলেদের মাতিয়ে তুলতেন। শীলার অজ্ঞ ভাইবোনও ছিল না। সমীর কলেজে উপরের ক্লাশে পড়ত। কলেজেই তার সঙ্গে শীলার আলাপ হয়। শিবনাথের ছাত্র বলে শীলাদের বাসগৃহেও তার সেই দূরে সাতায়াত শুরু হয়ে যায়। বছর কয়েক আগে শীলা ভাব মার্কও হারিয়েছে। প্রায় এই নিঃসঙ্গ জীবনে সমীর এক আনন্দের উদ্ভাস নিয়ে হাজির হল। তাদের দুজনের মেলামেশায় শিবনাথ খুশী হতেন বলে মনে হয়েছিল।

উদ্ভিন্ন বৌবনে সমীর মারা-মরীচিকার মত শীলার জোখ ধাঁধিয়ে দিল। আত্মভোলা অধ্যাপক সে খবর রাখেন নি। সমীর ভাল ছেলে। তার উপর শহরের নামকাল এডভোকেট হরিশ-বুথুজের একমাত্র ছেলে সে। হরত গ্রন্থের কোন অপার্জি মনে মনে পোষণ করতেন শিবনাথ।

অন্ধ্রাণী অধ্যাপক শিবনাথের কন্যাকে ব্রাহ্মণ হরিশ বুথুজের ঘরে তুলতে পারেন, এমন দুশাশাও হরত শিবনাথ করেছিলেন। আজকাল ত এ বকম প্রায়ই কটে থাকে। আর শীলা অত-শত চিন্তাও করেনি। সমীরই শেষ মুহুর্তে তাকে শেষ আঘাত দিয়ে তা জানিয়ে দিলে।

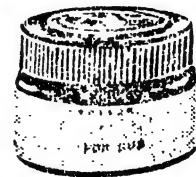
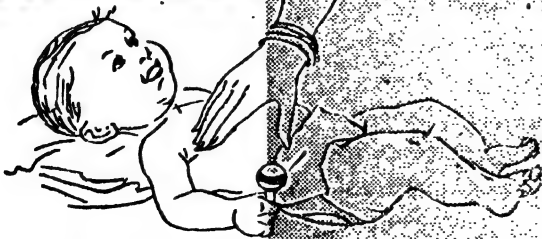
নিজের অপরাধের বোঝা পাবের ঘাঁড়ে চাপিয়ে দিয়ে সমীর সরে পড়ল। শীলা কোন উপায়ই দেখতে পায় না। এমন সময় নিজের মায়ের কথা মনে পড়ল। হার, মা যদি বেঁচে থাকতেন!

বিজ্ঞানী অধ্যাপক কি ভাবলেন বুঝা গেল না। সমীর আর আসে না। তিনি হরত ভাবলেন,—শীলা সমীরকে গ্রহণ করতে পারবে না। কিন্তু মেয়ের মনেব কোন খবরই তিনি রাখতেন না। রাববার কোম উপায়ও ছিল না। এমন সময় এল প্রশান্ত। বিজ্ঞানের ছাত্র প্রশান্ত; নৃত্য অধ্যাপক হয়ে সে কলেজে এসেছে। শিবনাথেরই প্রাক্তন ছাত্র প্রশান্ত। শিবনাথের গবেষণায় সচিবোগী হল। শিবনাথের গৃহে প্রশান্তের আনাগোনা চলল। শীলার সঙ্গে তার পরিচয়ও হল।

শীলার মনোজগতে তখন চরম আনন্দ তোলপাড় চলছে। নিজেকে

বুকে সর্দি বসেছে ?

বুকে পিঠে সর্দি বসলে ভয়ের কারণ বৈকি! এ অবস্থায় ভেপোলীন মালিশ করলে সঙ্গে সঙ্গে উপকার পাওয়া যায়। কারণ ভেপোলীন ত্বকের মধ্য দিয়ে এবং নিঃশ্বাসের সঙ্গে শরীরের ভেতরে যেয়ে একযোগে অতি দ্রুত কাজ করে। ঠাণ্ডা লেগে মাথাধরা ও গলাধরায়, ব্যথা ও বেদনায় ভেপোলীন আশ্চর্য মালিশ। আজই এক শিশি কিনে বাড়ীতে রেখে দিন।



ভেপোলিন

পরিবেশক : জি, দত্ত এণ্ড কোং
১৬, কম্বিন্ড পেন - কলিকাতা-১

বোরোদীন প্রস্তুত কারকের সামগ্রী

দুড়িয়ে রাখতে চায় শীলা। তবুও প্রশান্তের আকর্ষণ সে এড়িয়ে থাকতে পারে না। নিজের নিষ্ঠুরতার উপায় খুঁজছে শীলা; এর দ্বারা প্রশান্ত এসে পাড়িয়ে সবই তুলস করে দিলে।

হঠাৎ একদিন শিবনাথ ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ডাক্তাররা বলে গেছে,—এ বয়সে হাটের আটাচু। খুব সাবধান থাকতে হবে।

এই অসুস্থ অবস্থার শীলার জন্মই বেশী ব্যাকুল হয়ে উঠলেন শিবনাথ। হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে বলতে লাগলেন শিবনাথ,—আমি ত চললাম; কিন্তু তোর কি উপায় হবে যা?

কিন্তু সেই সময়ে প্রশান্ত এসে হাজির হল। শিবনাথের কথা তার কানে গিয়েছিল। প্রশান্ত বললে,—শীলার জন্ম আপনি হাত্ত করেন না সার। আপনি আগে সেবে উঠুন।

হঠাৎ মাতৃকীর ভক্তিতে এক অশ্রুপূর্ণ ব্যাপার ঘটলেন শিবনাথ। তিনি শীলার চুটি হাত প্রশান্তের হাতে দিয়ে জড়িয়ে ধরে বলতে লাগলেন,—তুমিই এর তার নাও প্রশান্ত। আমি আশীর্বাদ করছি, তোমরা সুখী হবে।

শীলা বাধা দিতে পারেনি। জন্মে কোন কথা বলতে পারেনি শীলা। পনের দিনই বিগিন্ধত ভাবে শীলার সঙ্গে প্রশান্তের বিবাহ হয়ে গেল। শীলা অনেক ভেবেছে। প্রশান্তকে সব কথা লিখে জানিয়ে দিয়ে নিষ্ঠুর পথে চেয়েছিল, কিন্তু পারেনি। মুমূর্ষু পিতার মুখের দিকে চেয়ে সে সংকল্প তাকে ত্যাগ করতে হয়েছে।

শিবনাথ যে হঠাৎ এমন কাণ্ড করে বসবেন, শীলা তা ভাবতেও পারেনি। সেদিন রাতেই আত্মহত্যা করত শীলা। এ কি করলেন তার বাবা? সমাজ, বন্ধুবান্ধব এমন কি প্রশান্ত পর্যন্ত তার কাছে সেদিন যুষ্টিমান বিভীষিকা হয়ে উঠল।

উপায় চিন্তা করতে লাগল শীলা। না, না, তাকে বাঁচতে হবে, হলনার অভিনয়ে নামল শীলা। এ প্রশান্তকে আঁকড়ে ধরেই তাকে বাঁচতে হবে। বাঁচাতে হবে তার মুমূর্ষু পিতাকে; হলনার অভিনয় ছাড়া যে আর কোন উপায় নেই।

প্রশান্তের হাত ধরে নতুন জীবন শুরু করল শীলা। অল্পতে এ মাছুষটি। সন্ধ্যা হাসিমুখ। একান্ত শীলার উপরই তার নির্ভর। প্রশান্তের আপ্যায়নে আর তার মাধুর্য্যে শীলা মুগ্ধ হয়ে গেল। নিজের কপট হলনার কথা ভাবতে গিয়ে মাঝে মাঝে আঁৎকে ওঠে শীলা। মনে মনে ভয়,—যদি এ হলনা ধরা পড়ে? এ মাছুষটিকেও কি শীলা আঘাত দেবে? প্রশান্ত কি তাকে ক্ষমা করতে পারবে? এ কি কোন বাহুবীর পক্ষে,—কোন পুরুষের পক্ষে সম্ভব?

না, না, না। প্রশান্তকে সে আঘাত দিতে পারবে না। প্রশান্তকে শীলা ভালবাসে। অতীতের ভুল একটা ছেলেখেলা মাত্র। তা কি পোষণীয় ব্যাপার? মেয়ে হয়ে জন্মানো কি এতই অপরাধ? সবার কি করেছে? সে অপরাধী হয়েও নির্দোষ। সমাজে উচ্চ আসন পাবে সমীর। স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সে সুখী হবে। আর তারই পাশের বোঝা শীলাকে পিবে মারবে।

শীলা অতীতকে ভুলে যেতে চায়। কিন্তু অতীতের সাক্ষ্য যে সে বহন করেছে। এ যে জীবন্ত সাক্ষ্য। এ সাক্ষ্য যে ধুয়ে-ধুছে কেন্দ্রের কোন উপায় নাই। তারই দোষে তার বাবা আর তার দ্বারীর মুখেও কলঙ্কের ছাপ পড়বে। তারও পাড়াবার ঠাই থাকবে

না। ঘরে-বাইরে কোথাও পাড়াবার ঠাই নাই শীলার, মনে করলেও গা দিউরে ওঠে। এই ত আমাদের সমাজ। কেন, অন্ধ দেশে ত এমন নয়।

এরূপ অন্তর্ভবনের মধ্যেও টিকে থাকে শীলা। মুমূর্ষু শিবনাথের সেবার তারা দুজনেই এখন ব্যস্ত। কখন যে কি হয় বলা যায় না। মাসখানেকের মধ্যেই তার সমাপ্তি ঘটল। শিবনাথ মারা গেলেন। এবার অস্থির হয়ে উঠল শীলা। না, আর ত কোন বাণীই হইল না। নিজের অপরাধের বোঝার আরেকজন নিরীহ লোককে বিব্রত করা তার উচিত হবে না। হলনার মুখোপ যে তার আগুনা-আগুনি খসে পড়বে। এরকম অন্তর্ভবনে আরো মাসখানেক কেটে গেল।

প্রশান্তকে ছেড়ে যেতে তার কষ্ট হচ্ছে। তাকে গেয়ে নিজেও অনেকখানি সামলে নিয়েছিল শীলা। এ মাছুষটিকে হলনা কব্ধেও তার কষ্ট লাগে। ভেবেছিল, খোলাখুলি সব কথা বলে কথা চাইবে। কিন্তু সাহস হয় নি। তবু ভরসা ছিল, প্রশান্ত তাকে ক্ষমা করবে।

এত দিন সবই হলনার চোকে রেখেছিল শীলা। কিন্তু দৈহিক লক্ষণগুলি ত ঢাকবার নয়। শীলার দেহে সব লক্ষণই একদল পেতে শুরু হয়েছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! প্রশান্ত সহজভাবেই তা নিয়েছে। খুশীর চাকল্যে প্রশান্ত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু প্রশান্ত জানে না যে শীলা সর্বনাশের বোঝাই বহেছে।

প্রশান্ত আপন খেয়ালেই বিভোর। দরমেতরা তার মন। প্রশান্ত বলে, এ অবস্থায় তোমাকে দেখাশোনা করবার জন্ম লোকের দরকার। এখন থেকেই ডাক্তারের পরামর্শ মত চলা উচিত। কি বল? শীলা বাধা দেয়। ডাক্তারের নাম শুনেই ভয়ে আঁতকে ওঠে শীলা। প্রশান্তের বন্ধু ডাক্তার ক্রীমন্ত হু-একদিন এসেছিল। কিন্তু তার কাছেই শীলা বারনি! তাকে এড়িয়ে চলত শীলা।

এ লুকোচুরি আর ভাল লাগে না। তাই ত শেষ পন্থা সে ধরেছে। এই ত ফিস-ফিস আওয়াজ হচ্ছে। নিশ্চয়ই তারা এসেছে। কান পেতে থাকে শীলা। নাঃ, মিছামিছি এ জগতের কথা ভেবে আর কি হবে? সে যে পরলোকের পথে পা বাড়িয়েছে। দেহবিজ্ঞর থেকে তার আত্মা মুক্তি পেয়ে গেছে। এখনই দূরে পাড়িয়ে লুপ্ত ভেসে ভেসে সবই সে দেখতে পাবে। তার অনশ্রীরা আত্মা তারপর মহাশূন্যে মিলিয়ে যাবে। মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলে শীলা। কিন্তু প্রেতলোকের চিন্তা তাকে বিচলিত করে তুলে।

কি জানি অজানা সে প্রেতলোকে কার কাছে পাড়াবে শীলা? তবু মনকে শক্ত করে নেয়। তার বাবা-মা পরলোকে রয়েছেন। তারা নিশ্চয়ই তার জন্ম অপেক্ষা করছেন। সারের বুক লুটিয়ে পড়বে শীলা। তার মা নিশ্চয়ই তাকে ক্ষমা করবেন।

কোথার মৃত্যুদূতেরা? এ যে পরিচিত কণ্ঠস্বর। তাহলে এরাও একতরফ এসে গেছে। চোখ মেলেতে চায় শীলা, কিন্তু পায়ে মা, মনে সংশয় জাগে। সত্যি কি সে মুক্তি পেয়ে গেছে? এ যে শীলা স্পষ্ট স্নেহে পাচ্ছে,—না ডাক্তার! শীলাকে বাঁচাতে হবে।

প্রশান্তের কণ্ঠস্বর। কি ব্যাকুলতা এককণ্ঠস্বরে! শীলার চিঠিখানা টেবিলের উপরই পড়েছিল। প্রশান্ত নিশ্চয়ই একতরফে সে চিঠি পড়ে ফেলেছে। কি লজ্জা? কি ভাবছে প্রশান্ত? শীলার কলঙ্কের কথা কেনেও শীলাকে বাঁচাতে চাইছে।

মনে মনে ভাবে শীলা,—আমি ত বেঁচে নাই। ওদের নিশা-প্রশংসার বাইরে চলে গেছি। ওরা বুঝতে পারছে না যে আর কোন ডাক্তারই আমাকে আর কেরাতে পারবে না।

হাসতে চার শীলা। কিন্তু তার মুখে হাসি ফুটল কি না সে বুঝতে পারে না। হঠাৎ কেমন যেন ভয় হয়। তবে কি এমনও 'তার আত্মা যেহে ছেড়ে যায় নি ?

এবার শীলা ডাক্তারের উত্তর শুনে পায়,—মেটাল শব্দ। এ অবস্থায় সোপী উদ্দেশে হয়ে যেতে পারে প্রশান্ত। এঁর জ্ঞান ফিরে আসতে তিন-চার ঘণ্টা লাগতে পারে।

কি সর্বনাশ! এ যে প্রশান্তর বন্ধু সেই গাইনোকোলজিষ্ট ডাক্তার জীমন্তর গলা। কি বলতে চাইছে জীমন্ত ডাক্তার ?

শীলার মন উৎকর্ষের ভরে ওঠে।

ডাক্তার বলতে থাকে,—আমার মনে হয়, ঠিক বেঁচে থেকে কোন লাভ নেই প্রশান্ত। তোমারও মন, তাঁরও মন।

প্রশান্ত উত্তর দেয়,—বাঁচাতে হবে ডাক্তার। শীলাকে বাঁচাতে হবে।

ডাক্তার বলে,—তারই চেষ্টা করছি প্রশান্ত। কিন্তু ভেবে দেখো, মাত্র দু'মাস তোমাদের বিয়ে হয়েছে; কিন্তু এ যে পাঁচ মাসের কেস! এ ভয়, এ বোঝা বহিতে পারবে তুমি ?

প্রশান্ত শান্তকণ্ঠে উত্তর দেয়,—নিশ্চয়ই পারব ডাক্তার। শীলার সমস্ত হারিষ যে এক দিন শপথ করে আমি নিয়েছি। তাকে তুমি ভাল করে তোলা।

ডাক্তার বলে,—হ্যাঁ, তারই চেষ্টা করছি আমি। কিন্তু আমার কথা হয়ত তুমি বুঝতেই পারনি প্রশান্ত।

প্রশান্ত উত্তর দেয়,—সবই বুঝতে পেরেছি আমি। বুঝতে পেরেছি বলেই অস্ত্র কাউকে না ডেকে তোমাকেই ডেকেছি।

ডাক্তার বলে,—তার কলঙ্ক তোমাকে বহিতে হবে প্রশান্ত! তোমার মনের সে জোর আছে ?

প্রশান্ত যেন হাসিমুখে উত্তর দেয়,—কলঙ্ক নয় ডাক্তার! এটা আমাদের সমাজেরই গলদ। বৌবনের উদ্বাসনার মাছর সহজেই এ রকম ভুল করে থাকে। ছেলের বেলা কোন দোষ হয় না; তারা মিথিয়ার ভাবে সরে পড়ে। মেয়েরাই আমাদের অপরাধের বোঝা বয়ে বেড়ায়। হয় তাদের আত্মহত্যা করতে হয়, না হয় সমাজের বাইরে চলে যেতে হয়। এ রকম আর চলতে পারে না ডাক্তার।

ডাক্তার বলে,—কি করবে তুমি ?

প্রশান্ত বলে,—সহজ ভাবেই তাকে গ্রহণ করেছি ডাক্তার। সহজ ভাবেই তার সঙ্গে চলব। শীলার কোন দোষ আমি দেখতে পাইনি। তার ভালবাসাই তাকে জরী করবে।

ডাক্তার বলে,—কোন দোষ নেই ?

প্রশান্ত উত্তর দেয়,—না, শীলার কোন দোষ নেই। শীলা তার ছল শুধরে নিয়েছে। শীলাকে বাঁচিয়ে সমস্ত পুরুষজাতির হয়ে আমাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে ডাক্তার।

ডাক্তার বিষমভরা কণ্ঠে উত্তর দেয়,—প্রায়শ্চিত্ত ?

প্রশান্ত বলে,—হ্যাঁ, প্রায়শ্চিত্ত। আমার ভালবাসা দিয়ে তার অভিলাষ থেকে সমাজকে বাঁচাতে হবে ডাক্তার।

ডাক্তার বলে,—অদ্বৈত মাছর তুমি প্রশান্ত। সেই হেলেকো থেকেই দেখছি,—সত্যি তুমি অদ্বৈত।

প্রশান্ত বলে,—জানি না, কবে এমন অভিলাষ থেকে আমাদের সমাজ মুক্ত হবে ডাক্তার। জানি না কবে আমরা শাপমুক্ত হব ?

প্রশান্তর কথাগুলি শুনে শীলার মেহ-মনে কি এক উত্তেজনার স্রষ্ট হয়। ইনি মাছর না দেবতা ? না, না, আমি বাব না। আমি বাঁচতে চাই। আমি বাঁচতে চাই।

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে শীলা।

ছুটে আসে প্রশান্ত। আর ছুটে আসে ডাক্তার।

প্রশান্ত শীলার হাত ছুঁখানি নিজের কোলে টেনে নেয়। শীলার মাথার পরর মেহে হাত বুলিয়ে দেয় প্রশান্ত।

আবেগে উজ্জ্বলিত প্রশান্তর কণ্ঠস্বর,—শীলা! শীলা! ভয় নেই। তুমি কাঁদছ কেন ? এই যে আমি রয়েছি।

জীমন্ত নাড়ী পরীক্ষা করে বলে,—ট্র্যাঙ্ক! আর বিশেষ কোন ভয় নাই। তবু সাবধান প্রশান্ত। কোন উত্তেজনার কারণ যেন না ঘটে। এই ওষুধটাই চলবে। আমি আবার আসব।

ডাক্তার বেরিয়ে যায়।

প্রশান্তর কোলে মাথা রেখে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে শীলা। তার হৃ'চোখে গারা বয়ে যায়।

প্রশান্ত বলে,—ছিঃ, কি পাগলামি করতে গেছে শীলা! আর ওরকম করো না।

উত্তর দিতে পারে না শীলা। আজ আর কোন লজ্জা নাই, সকাচ নাই; সমস্ত ভয়, সমস্ত আতঙ্ক তার যেন মুহূর্তের মধ্যে কোথায় উধাও হয়ে গেছে। কি দুঃসহ যাতনা সে পাঁচটি মাস বৃকে করে নিয়ে আছে; আজ আর কোন বাতনা নাই। নির্ভর হয়েছে শীলা।

প্রশান্ত বলে, সব ওলট-পালট হয়ে গেল ত ? বা হবার হয়ে গেছে; তার জন্ত পাগলামি করো না।

প্রশান্তর মুখে প্রসন্ন হাসি।

শীলার মুখে উত্তর নাই। প্রশান্তর বৃকে মুখ লুকিয়ে অশ্রুধারায় তাকে ভাসিয়ে দেয়।

কার শাপযুক্তি ? সমাজের না শীলার ? প্রশান্তর স্পর্শে আজ শীলার পুনর্জন্ম ঘটেছে। প্রেতলোক থেকে ফিরে এসেছে শীলা। আর যে তার কোন ভয় নাই।



ক্যালকট্টা অর্পটিক্যাল স্টোং (প্রাইভেট) লিঃ
ফোন-৩৫-১১৭১ প্রতিলিপ: ড: কলিকতা মুখ সমাদ



সুশীল রায়

নতুনই তবে এসেছেন এপাড়ায়। এর আগে কোনো দিন দেখিনি। কিন্তু এখন রোজ হুঁসেলাই দেখছি এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করত।

পারে ময়লা কেড়ু খুতো, গায়ে ঢিলে পাঞ্জাবি। চলনেও বিশেষ আঁটসাঁট ভাব নেই। জীবনটাকে যেন ধরে রাখার জগ্রে আর ব্যগ্র নন; কিন্তু জীবনটা যেন নাছোড়, ঠেকে ছাড়তে চায় না কিছুতে।

ক'দিন বাদে ভদ্রলোকের পরিচয় জানতে পারলাম। নাম দীপঙ্কর সেন; বর্ষার রেল চাকরি করতেন, রিটারির করে দেশে ফিরে এসেছেন। নলিনী বাবুর বাড়ির নীচতলার একটা ঘর ভাড়া নিয়েছেন। বিপত্নীক। কিন্তু সবস্বত্বক।

শরীরটা জানার জগ্রে অবগত কোনো আগ্রহ ছিল না। কানে এসে গেল, তাই শুনে রাখা গেল।

কখনো-কখনো দেখি পাশের ঘরের দোকানে দাঁড়িয়ে আছেন। তার পর একটা সিগারেট মুখে দিয়ে খোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে নিজের মনে হেঁটে চলেছেন।

আশ্চর্য লাগে! এত হেঁটে চলে বেড়াবার কি দরকার ঠিক? তাঁর হাঁটার ভঙ্গি দেখে অবস্খিতই লাগে। শরীর যেন চলে না। যদি নাই চলে, তবে শরীরটাকে ওভাবে টেনে টেনে বয়ে বেড়াবার দরকার কি

অবশেষে আলাপ হল একদিন। বললেন, উদ্দেশ্যহীনের মত ঘুরি বটে, কিন্তু উদ্দেশ্য একটা থাকে।

কী সেই উদ্দেশ্য—এ কথাটা জিজ্ঞাসা করতে বাধল। ভদ্রলোকের মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। দেখলাম, বিকারও নেই, বিকৃতও নেই, আবেগও নেই, উবেগও নেই। এমন নিস্পহ তাঁর মুষ্টি!

জিজ্ঞাসা করলাম, কে কে আছেন এখানে? একা বুঝি?

সংক্ষেপে জবাব দিলেন তিনি। বললেন, প্রায় তাই।

এ ভাবে তাঁর জবাব দেবার অভিপ্রায় বুঝতে পারলাম না।

কললাম, বর্ষার ছিলেন স্তনলাম। দেশটা কেমন?

ভালো।

ক'বছর ওদেশে কাটালেন?

দীপঙ্কর সেন আমার মুখের দিকে তাকালেন, বললেন, অনেক বছর। সারাটা জীবন।

কথার স্বরে মনে হল কী রকম যেন একটা আক্ষেপ আছে ওই কথায়।

সেদিন কথা এই পর্যন্তই হল। দীপঙ্কর সেন বারান্দা থেকে নেমে বা দিকের ঘরের দোকানে গিয়ে দাঁড়ালেন। একটা সিগারেট কিনলেন, তার পর খোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ফের আমার বারান্দার সম্মুখ দিয়ে চলে গেলেন। আমার দিকে ফিরে তাকালেন না। মনে হল, আমার ওই সব গায়ে-পড়া প্রশ্ন শুনে ভদ্রলোক সম্ভবতঃ আমার উপর বিরক্ত হয়েছেন।

এই জগ্রে এই রাস্তা দিয়ে তাঁকে যেতে দেখলেও তাঁর সঙ্গে কয়েক দিন আর কথা বলিনি। কিন্তু

লোকটার চলন দেখে ওর উপর কেমন যেন মায়ার ভাব জেগেছে।

একদিন বলে ফেললাম, কোথায় চললেন?

এই—ব'লে সামনের রাস্তার দিক দেখিয়ে দিয়ে সোজা সেই পথে ধীরে ধীরে চলে গেলেন।

ভদ্রলোক বিপত্নীক। তা হোন। কিন্তু উনি নাকি সবস্বত্বক! তবে সেই কল্পনাটি কই? তাকে এই পথ দিয়ে যেতে দেখিনে কেন? তাকে দেখে যে ধস্ত হয়ে যাব—এমন না হলেও মেয়েটিকে দেখার জগ্রে কৌতুহল হতে লাগল।

কোথায় চললেন?

দীপঙ্কর সেন আমার দিকে আলগোছে চেয়ে বললেন, এই—এদিকে। একটু ব্যস্ত আছি।

ব্যস্ততার কথা জানা গেল কেবল তাঁর কথায়। চলার ধরণ দেখে ব্যস্ততার কোনো লক্ষণই বোঝা গেল না।

দিন কয়েক বাদে ভদ্রলোকটি একটু ঠাণ্ডা হয়ে দাঁড়ালেন আমার বারান্দার সামনে। বললেন, একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল মশাই! ওই সব দেখে আমার সর্বঙ্গ গিয়েছিল হিম হয়ে।

কিসের কথা বললেন?

আমার মেয়ে। বিশেষ কোনো অসুখ নেই। কিন্তু কেমন ফিট হয়। আর সঙ্গ সঙ্গে হিম হয়ে যায় হাত-পা।

চোখে-মুখে চিন্তার ভাব আনার চেষ্টা করে, গলায় সহানুভূতির স্বর আনার চেষ্টা করে বললাম, এখন কেমন?

ভালো। অনেকটা সুস্থ।

দীপঙ্কর সেনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়ে উঠল ক্রমশ। ভদ্রলোকের বয়স বখন তেরো তখন নাকি তিনি পলাতক হন দেশ থেকে। চলে যান আকিয়াব, সেখান থেকে যেসিন, তারপর রেজুন। পুরো পঞ্চাশ বছর তিনি কাটিয়েছেন ওই দেশে। এখন তাঁর বয়স চৌষট্টি। খুঁটিনাটি হিসেব দিলেন তিনি। পাশে-ঘাটে যে সময় খরচ হয়েছে, আর এ দেশেও এসেছেন মাস ছয় হল—এই সব খুচরো করে-কটা মাস একত্র ক'লে হয়তো একটা পুরো বছরই দাঁড়িয়ে

না, না!
এ 'ডালডা' নয়!
'ডালডা' কখনও খোলা
অবস্থায় বিক্রী হয় না!

আজ্ঞে হ্যাঁ, ডালডা বনস্পতি আপনি কেবল শীলকরা
টিনেই কিনতে পাবেন। এই জন্যেই এতে কোনও ধুলো
ময়লা লাগতে পারে না আর না পারা যায় একে নোংরা
হাত দিয়ে ছুঁতে। তাছাড়া গোলা অবস্থায় 'ডালডা'
কেনার দরকারই বা কী যখন আপনার সুবিধের জন্য
ভারতের যে কোন জায়গায় আপনি ১০, ৫, ২, ১ ও
½ পা: টিনে 'ডালডা' কিনতে পাবেন।



হ্যাঁ, এই তো 'ডালডা'!
এর হলদে টিনের ওপোর
খেজুর গাছের ছবি দেখলে
সবাই চিনতে পারে।

মনে রাখবেন 'ডালডা' কেবল একটি বনস্পতির নাম।
আপনার এবং পরিবারের সকলের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত
রাখতে সব সময়েই ডালডা বনস্পতি কিনবেন শীলকরা
বন্ধ টিনে। কেন না কোন রকম ভেজাল বা দোষগুক্ত
হবার বিপদ এতে থাকে না আর যা কিছু এই দিয়ে
রাঁধবেন সেই সব খাবারের
প্রকৃত স্বাদ বজায় থাকবে।



ডালডা বনস্পতি দিয়ে রাঁধুন—আর
স্বাস্থ্য ও শক্তি সঞ্চয় করুন।

বাবে। তাইলে বিদেশে তাঁর কেটেছে ঠিক একটা অর্ধ-শতাব্দী। এই কথা জানানোর মধ্যে দীপঙ্কর সেনের আক্ষেপ আর অস্বস্তিকার বেন বেশানো বলে বোধ হল।

হয় মাস হল এসেছেন, কিন্তু আপনাকে খুব বেশি দিন হল তো দেখছি নে।

আপনাদের এদিকে এসেছি মাত্র কয়েক দিন হল। যেদিন এসেছি সেই দিন আর আজকের দিন হিসেবে ধরলে মোট আটশ দিন হল। তা, দেখতে দেখতে অনেক ক'টা দিনই হয়ে গেল বলতে হবে।

মুখে বললাম, তা বটে।

কিন্তু মনে-মনে বলতে লাগলাম অল্প কথা। এতগুলো দিন কেটে গেল কিন্তু ঠিক একা ছাড়া আর কাউকে এ-পর্বন্ত দেখা গেল না কেন?

এ 'কেন'র উত্তরের জন্তে অবশ্য কোনো প্রশ্ন করলাম না।

দীপঙ্কর সেন মাঝে মাঝে আসেন। তাঁর জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা বলেন। তিনি নাকি পুরো বর্মীই হয়ে গিয়েছেন। বিয়ে করেছেন ওই দেশে। মোট তিনটি নাকি বিয়ে ঠর। তিনটিই বর্মী বউ। তাঁর এই মেয়েটি মেজো বউ-এর। কিন্তু সব কেমন বেন—দীপঙ্কর স্বীকার করেন—তাঁর নিজের স্বভাবেই নিশ্চয় কোনো গলপ আছে, নইলে বউগুলো টেকসই হইল না কেন?

সবাই মায়া গেছেন বুঝি?

উহ। তাদের কী ইচ্ছে কে জানে—তারা আমাকে ছেড়ে দিয়ে অল্প সংসার পেতে বসেছে। আর, শুনেছি বেশ স্নেহই নাকি আছে।

একটু ভাবলেন দীপঙ্কর সেন। বললেন, একটা হুঁচান্ড বাঙালী ছেলে খুঁজছি। মেয়েটাকে গছাইব।

ভুললোকের ভাষা শুনে অবাক হলাম, বললাম, বিয়ের বয়স হয়েছে আপনার মেয়ের?

কি জানি। এ দেশে কোন বয়সে বিয়ে হয় জানিনে। বয়স হল তার বাইশ; গত মার্চে বাইশ পূর্ণ হয়েছে।

বলসার্থ, কিন্তু ওকে আপনার সঙ্গে দেখিনি কেন? খুব লাজুক বুঝি, খুব বুকি পর্দানবাসিনী?

হুটোর একটাও না। দীপঙ্কর সেন হাসলেন, বললেন, আশা এজ্যাক ও ফিটহ, রাস্তার বেগ হতে দিতে ভয় পাই। কখন কোথায় বেহঁশ হয়ে পড়ে ঠিক কি!

নলিনী বাবুর বাড়ির একতলার বাসিন্দে এই বুদ্ধিট এ-পাড়া হাত করে রেখেছেন।

নলিনী বাবুর স্ত্রী একজন বিশ্বাসিনী। কিন্তু শুনলাম, তিনি নাকি দীপঙ্কর সেনের মেয়েটির প্রণাসায় পক্ষযুখ। বাপের উপর মেয়েটির বা মমতা—কোনো খাঁটি বাঙালী মেয়েরও নাকি তেমন দেখা যায় না। শুনের আঁচ এর থেকে একটু করতে পারা গেল। রূপ দেখিনি, কিন্তু শুনলাম—রূপও নাকি সে তেমনি।

এই সব শুজব শুনে সারা পাড়া চকল হয়ে উঠেছে। ছেলে-ছোকরাদের কথা না হয় ধরা না-ই হল, বুড়োদের চোখে-মুখেও বেশ চাকল্য দেখা দিয়েছে।

নলিনী বাবুর স্ত্রী নাকি মেয়েটির গুণকীর্তন করে বেড়াচ্ছেন।

এমন সেবা আর এমন বহু তিনি নাকি কখনো দেখেননি। দেখা দূরের কথা, তিনি নাকি কল্পনাও করতে পারেননি।

ভাড়া-ভাড়া বাংলা নাকি বলতে পারে মেয়েটা। নলিনী বাবুর স্ত্রীর সঙ্গে নাকি খুব ভাব হয়েছে। অন্তরের কথাও নাকি অকপটে বলে সে নলিনী বাবুর স্ত্রীর কাছে।

পাড়ার পুরুষরা এই সব গল্প শুনে যেমন পুলকিত, মেয়েরা নাকি তার বিপরীত—তারা নাকি সব মুখ ভার করে আছে; তাদের সব গুণকে ধামা-চাপা দিয়ে বিদেশিনী ওই মেয়েটা সবার উপরে টেকা দেবে—এ নাকি বরদাস্ত করা কঠিন।

তার বাপকে ছেড়ে গেছে তার মা। এইজন্তে মায়ের উপরে সে নাকি খুশি নয়। বাপের এই অধর্ষ অবস্থা দেখে সে ভাই নাকি তার সমস্তটুকু রেহ আর মমতা বাপের উপর ঢালছে।

মেয়ের স্নেহমমতা পেয়ে বহু হয়ে যাচ্ছেন দীপঙ্কর সেন। আর, আমরা এই তকাত্তে বসে এক বিদেশিনী ললনার হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে মনে মনে হতভোতা নানা রকম জল্পনা-কল্পনা করছি; হয়তো নিজেরা যে স্নেহমমতার মধ্যে লালিত হচ্ছি, তা অকিঞ্চির বলে অবজ্ঞা করছি। এবং দীপঙ্কর সেনের মত বহু হয়ে বাবার জন্তে মনের মধ্যে ব্যাকুলতা জাগিয়ে তুলছি।

কিন্তু হঠাৎ বহু হয়ে গেলাম একদিন। তৈরী ছিলাম না। আচমকা বিহাতের একটা বলক এসে লাগল বেন চোখে।

সত্যি, চোখ আছে নলিনী বাবুর স্ত্রীর। বর্মী নারীর শারীরিক কোমলতা এবং বঙ্গনারীর দৈহিক লাভ্য একসঙ্গে মিশে এক অবর্ণনীয় শোভার সৃষ্টি হয়েছে।

চলমান সেই সৌন্দর্যের নিরীক্ষা সঙ্গে নিয়ে হেঁটে চলেছেন দীপঙ্কর সেন।

বাক্ বাক্ হয়ে গিয়েছিল, জিজ্ঞাসা করতে পারলাম না—কোথায় চলেছেন?

কিন্তু দীপঙ্কর সেন নিজে থেকেই বললেন, একটু লোকের দিকে চলেছি বেড়াতে। বহুবাক্তব কিছু জোগাড় হয়েছে ওদিকে; বাই। গল্পশুজব করে আসি।

বললাম, আচ্ছা।

ঘরে ঘরে গুঁরা চলে গেলেন। মনে হল, সারা পথে লাভ্যের বজা ছড়িয়ে দিয়ে চলে গেল বেন এক মায়াবিনী। বাতাসে স্নগছের প্রাবন সৃষ্টি হল বেন ঐ অজ্ঞের স্ববাসে।

এই সৌন্দর্য দেখে খুশিতে উথলে ওঠাই উচিত, কিন্তু, অকপটে স্বীকার করি, আমার সমস্ত মন একটা চাপা বেদনার কেন বেন ভারী হয়ে উঠল। নিজেকে বড়ই ভাগ্যহীন বলে মনে হতে লাগল। মনে হতে লাগল, এই রমণীর ঐ রমণীয় সৌন্দর্য কেন ভাগ্যবান মালাকরের উত্তান স্রুশোভিত করবে কে জানে!

সকাল আর বিকাল এই রাস্তা ধরে তিনি যাতায়াত করেন। প্রায়ই তাঁর কন্ঠকে সঙ্গে নিয়েও যান। এই জন্তে রাস্তাটার মর্যাদাই বেড়ে গেল আমার কাছে। যে পথের দিকে জাকাতাম কদাচি, সেই পথটার দিকে চেয়ে থাকার একটা রোমাঞ্চকর আশায় বোধ করি।

সকালের দিকে তিনি একা যান, বিকালের দিকে যান মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে।

সেদিন সকালে তিনি চলেছেন এই পথ ধরে, তাঁকে একা পেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, খোঁজ কিছু পেলেন?

কিসের?

কোনো চোস্ত বাঙালী ছেলের?

আমায় প্রশ্ন শুনে একটু তেদে তিনি বললেন, অত শীগগির কি পাওয়া যায়? খোঁজ চলছে। পেতেই হবে।

বললাম, সেদিন অত বন্ধুবান্ধবদের কথা বলছিলেন?

বললেন, হ্যাঁ। লেকে হাওয়া খেতে আসেন সবাই। স্টিটার-করা ছদ্মলোকেরা। বেশ হাসি-খুশি। বেশ মিশুক।

পরামর্শ দেবার মত করে বললাম, ঠান্ডাই কারো একটা যোগা ছেলেকে খোঁজ করুন না।

হাসলেন দীপঙ্কর সেন। বললেন, সেই মতলবেই আছি।

বাধ-বাধ ঠেকছিল, কিন্তু শেষবেশ জিজ্ঞাসা করেই বললাম, মেয়ে জানে আপনার এই প্লানের কথা?

বুদ্ধি তো আছে। নিশ্চয় কিছু বোঝে।

বিকেলের দিকে যখন তিনি মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে যান তখন তাঁর সঙ্গে অবশ্য এত কথা বললেন।

কয়েক দিন বাদে দেখি, দীপঙ্করের বন্ধুবান্ধব সত্যিই জোগাড় হয়েছে। তাঁরাও দীপঙ্করের সঙ্গে আসতে আবন্ত করেছেন। এবং অল্পদিনের মধ্যে তাঁর ঘরে বুড়োদের বেশ-একটা মজলিশ বসতে আবন্ত করেছে।

নলিনী বাবুর স্ত্রী একেবারে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছেন। বুড়োদের

উপর সত্যিই মেয়েটার কি আন্তরিক দরদ! এমন না হলে আর মেয়ে! মেয়েদের মন হবে তুলোর মত নরম আর মাখনের মত মোলায়েম—তবেই না সে মেয়ে মেয়ে। তুলোর হালকা গমিতে যেমন সস্তপণে রাখতে হয় আত্মর, বুড়োদের তেমনি সাবধানে জীইয়ে রাখার জন্তে সে নাকি ব্যগ্র। তার বাপের সহায়হীন অবস্থা দেখেই সম্ভবতঃ তার মনে এই ধারণা ব্রহ্মজমা হয়েছে।

অনেকে আসেন দীপঙ্করের কাছে। এঁদের মধ্যে জনকয়েককে আমি চিনি। পৃথীশ গুপ্ত, হিমাদ্রি পাকড়াশি, বিপিন চাকী, রেবতী চক্রবর্তী—সকলেই রিটারার করেছেন। এঁদের মধ্যে হিমাদ্রি বাবু একটু ছিমছাম।

ছিমছাম দুই দিক থেকে—ধরধবে ফর্সা বং, মাথা-ভর্তি পরিচ্ছন্ন চকচকে টাক, পরনে ফিনফিনে ধোয়া ধুতি-পাঞ্জাবি। তিন ছেলে দুই মেয়ে হিমাদ্রি বাবুর। সকলেই বাইরে থাকে, অর্থাৎ বাংলা দেশের বাইরে। ছেলেদেরও বিয়ে হয়ে গিয়েছে, একটি মেয়ে বাকি ছিল, তারও বিয়ে হয়েছে মাস কয়েক হল। আরও একটা দিক অবশ্য আছে—হিমাদ্রি বাবু বিপত্তীক। তাঁর মস্ত বাড়িতে তিনি একা।

হিমাদ্রি বাবুর সঙ্গে দীপঙ্কর সেনের ভাব আবার নাকি একটু বেশি। দুই জনেই বিপত্তীক—একজনের স্ত্রী জীবিত থেকেও নেই, আর এক জনের স্ত্রী লোকান্তরিত। কিন্তু দু'জনের মিল এই—দু'জনেই স্ত্রীহীন। স্ত্রীহীন তাঁদের অন্তরঙ্গতা একটু গাঢ় হওয়াই স্বাভাবিক।

আমাদের এই দিকটা একটু ঘেন তেত উঠেছে; আর, সেই সঙ্গে



‘নিম’এর তুলনা নেই

২০০০ বছর ধরিয়া ইহার উপকারী গুণগুলি সুপ্রতিষ্ঠিত

দাঁত সূদূত করে মাটীও
সুস্থ রাখে

নিম টুথ পেস্ট

ইহা নিমের সক্রিয় ও উপকারী গুণ
এবং আধুনিক টুথ পেস্টগুলিতে ব্যবহৃত
ঔষধাদি সমন্বিত একমাত্র টুথ পেস্ট



পত্র লিখিলে নিমের উপকারিতা
সম্বন্ধীয় পুস্তিকা পাঠান হয়।

..... দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোম্পানী লিমিটেড, কলিকাতা-২২

একটু বেন যেতেই উঠেছে। ভিন দেশ থেকে এক অজানা মানুষ এসে আমাদের এই অঞ্চলটাকে উচ্চকিত করে তুলেছে।

যে রাত্তা দিয়ে একা-একা ক্রান্ত পদক্ষেপে চলতেন দীপঙ্কর সেন, সেই রাত্তা এখন একটু সরসরমই হয়ে উঠেছে। এখন দীপঙ্করের সমবয়সীরা আসেন। দল বেঁধে গল্প করতে করতে। তার পর, অনেকক্ষণ বাজে তাঁরা আবার দল বেঁধে গল্প করতে করতেই ফিরে যান। জমিট আড্ডা জমে দীপঙ্করের ঘরে।

নলিনী বাবুর স্ত্রী নাকি পাড়ার সকলের চমুশূল হয়ে উঠেছেন। বিবিনিমূলক তিনি, কিন্তু তাঁর বাড়ির ভাড়টেদের ঘরে এই আড্ডা বসে সবে তিন কেন বিরক্ত না হয়ে ঐ ঘরেটার প্রশংসায় এখনো পক্ষস্থল—এইটেই হচ্ছে সকলের প্রবল আগ্রহ।

কিন্তু নলিনী বাবুর স্ত্রীরও বলাব কথা আছে। অমন একটা ফুটফুটে মেয়ে যদি বাড়ালীব ঘরে হত, তাহলে দেহাকে মাটিতে তার পা নিশ্চয় পড়ত না। কিন্তু এই মেয়েটি অতগুলো বৃদ্ধের তদারকে আর তদিয়ে নিজেকে কেমন ব্যস্ত রাখে, আর, সকলের জ্ঞে কি রকম প্রাণপাত পশ্চিম করে! অত খাটুনি খাটে, কিন্তু মুখের হাসিটা কেমন অল-অল করতে থাকে সারাক্ষণ।

ছপুয়ের দিকে একবার আসেন হিমাদ্রি পাকড়াশি। সারা ছপু বসে বসে গল্প হয়। তারপর একসঙ্গে তিনজন—দীপঙ্কর, দীপঙ্করের কস্তা ও হিমাদ্রি—সাক্ষাৎসংগে বের হন।

নলিনী বাবুর স্ত্রী এখার নাকি চটেছেন। তাঁর ভাড়টে নাকি উঠে যাচ্ছে।

এই খবরে পাড়ার সকলের মনে বৃষ্টি আনন্দের বান ডাকল। ছেলেমহলে হয়তো একটু বিষাদের ছায়া পড়ল, কিন্তু মেয়েমহলে বৃষ্টির উজ্জল দীপ্তি সে ছায়াটুকু উছ করে দিল।

সত্যিই। একদিন উঠে গেলেন দীপঙ্কর সেন।

কোথায় গেলেন, সে-খবর জানার আগ্রহ আর কারো রইল না।

নলিনী বাবুর স্ত্রী কিন্তু খোঁজ করে সেটা বা'ব করলেন। ওরা হিমাদ্রি পাকড়াশির বাড়িতে গিয়ে উঠেছে। মন্ত বাড়ি—অনেক জায়গা। অনেক আরামে থাকতে পারবে ওখানে।

এ-খবরটা অবশ্য কিছু না। আমি এই রকম আন্দাজই করেছিলাম। হিমাদ্রি বাবুকে আমি চিনি বসেই খবরটা আমার

কাছে হয়তো কিছু না। কিন্তু বার্য তাকে চেনে না, তাদের কাছে খবরটা অবশ্য একটা খবরই।

বীরে বীরে এদিকের সমস্ত চঞ্চলতা স্তিমিত হয়ে এল। যে বার নিজের কাজে এবার বসতে পারল মনোযোগ দিয়ে। অথচ নিখাদ শাস্তি কিছু সেই কারোই মনে। একটা স্মৃতি বেদনা মনের একটি নিভৃত কোণায় চিমটি কেটে বসে রইল। অন্তত আমার কথা যদি বলেন, আমার অবস্থাটা এই রকমই হল।

দীপঙ্কর সেনের সঙ্গে অনেক দিন দেখা নেই। তাঁর কথা ভোলা কষ্ট, অথচ প্রায় ভুলতেই বৃষ্টি বসেছিল।

এমনি একদিন হঠাৎ এসে উপস্থিত হলেন তিনি। তাঁর এই হঠাৎ আবির্ভাবে একসঙ্গে পুলকিত ও বিস্মিত হয়ে উঠলাম। বললাম, কি খবর বলুন? কেমন আছেন?

ভালোই আছি। চলে যাচ্ছে কোনো রকমে।

জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার মেয়ের খবর কি? আপনার মনের মত পাত্র জোগাড় করতে পারলেন?

দীপঙ্কর বাবু বললেন, বড় ভালো মেয়ে। যেমন মায়ী তেমনি মমতা। আমাকে দেখে-দেখে ওর বৃষ্টি হয়েছে ওই দশা—অসহায় মানুষের উপর ওর বড় টান।

বললাম, এ তো ভালো লক্ষণ। এর জন্তে আপনার গবিত হওয়ার কথা।

উত্তরে তিনি বললেন, নিশ্চয়। গর্ব আমার আছে।

আর কিছু না বলেই তিনি উঠে চলে যাচ্ছিলেন, বারান্দা পর্বত গিয়ে ফিরে এসে বললেন, ভোর প্রাইভেট কিন্তু। কাউকে বলবেন না। হিমাদ্রি পাকড়াশিকে বিয়ে করেছে আমার মেয়ে।

যেন চমকে উঠলাম, বললাম, বলেন কি?

হ্যাঁ। বড় অসহায় মানুষ ওই হিমাদ্রি।

হুঁ-চোখ ছলছল করে উঠল দীপঙ্কর সেনের। সেটা তো দেখা গেল।

কিন্তু আর কার বৃষ্টির ভিতরটা হুঁসহ বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল, সেটা কারো চোখে পড়ার কথা নয়।

বললাম, সুখী হোক ওরা।

দীপঙ্কর সেন বললেন, আমিও ওই আশীর্বাদই করছি। বলেই তিনি নেমে গেলেন বারান্দা থেকে।

জ্ঞান দৃশ্য নয়

শিবশঙ্কু পাল

বিষমতা সম্ভবত রুগ, জীর্ণ শরীরের জ্ঞান দৃশ্য নয়।

বোধের প্রত্যক্ষে নেমে রক্তের সন্ধানে মগ্ন আনন্দিকের সমগ্র জন্ম, মন পরিগ্রহে অকাতর, দৃঢ় ইচ্ছার তাড়নায় তারে দিক থেকে দিগন্তে কত না ইটায় কেন না সে স্তম্ভভ রক্তের ছটায় যত দিখা অপগত করে যাবে, এই তার সংকল্প মনে। দৃষ্টি তার দীপ্তজ্যোতি, কোঁড়লে সৌরকরোজ্জ্বল।

এবং বোধের নীচে যতদূর চোখ যায়—শূন্য, কিছু নেই।

সেই সব দিগন্তগুলি তমিস্রাই চিরকাল থাকে

যেখানে হারায় সব আনন্দান, স্পন্দতা, অমর কবিতা।

অস্বপ্নে বার্থ, তবু বোধের গভীরে ক্রান্তিহীন

পথযাত্রা দৃশ্যমান শরীরের বহিরঙ্গে শুধু

মানুষের উজ্জলতা, দুর্বলতা মহিমায় আভাসিত রাখে।

হুঁ চোখে প্রস্রাব আলো; সম্ভবত তার পাশে থেকে যেতে পারে পরিশ্রান্ত মানসের ভারে ক্রান্ত কতগুলি রেখা।

মাসিক বসুমতী—আশ্বিন



মূল্য:
বড় সাইজ ২ টাকা ১০ ন.প.
সাধারণ সাইজ ১ টাকা ১২ ন.প.
(স্থানীয় কর ছাড়া)

সারফ

অপূর্ব সাদা করে জামাকাপড় কাচে

অত্যাশ্চর্য কাপড় কাচা পাউডার সারফ কাচা জামাকাপড়ের অপূর্ব শুদ্ধতা দেখলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন। এক প্যাকেট ব্যবহার করলে আপনাকে মানতেই হবে যে...

আপনি কখনও কাচেননি জামাকাপড় এত স্বচ্ছকে সাদা, এত মৃদু উজ্জ্বল করে। সার্ট, চামড়, শাড়ি, তোয়ালে—সবকিছু কাচার ক্ষেত্রেই এটি আদর্শ!

আপনি কখনও দেখেননি এত ফোঁপা—ঠাণ্ডা বা গরম

জলে, ফোঁপা পক্ষে গ্রহীত জলে, সঙ্গে সঙ্গে আপনি পাবেন ফোঁপার এক সমুদ্র!

আপনি কখনও জানতেন না যে এত সহজে কাপড় কাচা যায়! বেশী পরিভ্রম নেই এতে! সারফ জামাকাপড় কাচা মানেই মানে ওটি সহজ প্রক্রিয়া: ভেজানো, চেপা এবং ধোওয়া মানেই আপনার জামাকাপড় কাচা হয়ে গেল।

আপনি কখনও গাননি আপনার পরগার মূল্য এত চমৎকারভাবে ফিরে। একবার সারফ ব্যবহার করলেই আপনি এ কথা মনে নেবেন! সারফ সব জামাকাপড় কাচার পক্ষেই আদর্শ!

আপনি নিজেই পৰ্য্যক করে দেখুন...

সারফ

জামাকাপড় অপূর্ব সাদা করে কাচা যায়!

৪৩৭. ২৪-২৫৫ ১০

বিশুদ্ধতা নিজের লিমিটেড কর্তৃক প্রস্তুত



রাগু ভৌমিক

বেদনাবিহ্ন অন্তরে শয্যা ত্যাগ করে নীচে দাঁড়ালো শুভ্র।
বেদনাহত চোখে তাকায় পরিত্যক্ত শয্যার দিকে। স্থান
হয়ে ওঠে হুটি চোখ—বিকল মনের বিবশ বেদনায়।

শয্যা কি শুধু শয়নের উপকরণ? না, এ যে বিদেহী মনের
অনুপম ভাবের আশ্রয়। এর আছে রূপ, রং, প্রাণ। সময়বিশেষে,
ব্যক্তি বিশেষে এ হয় পরিবর্তিত, কখন বাসকসজ্জিতা, আসদ-ঈপ্সিতা,
আশ্চিন্দনীয়। কখন বা এক ব্যাকুল বেদনা, মুহূর্তস্বর
যন্ত্রণা।

এত দিন এই শয্যা ঘিরেই শুভ্রার প্রতীক্ষিত কুমারী-জীবনের
অভিলাষ, আশা, আকাঙ্ক্ষা মুকলিত হয়েছে। কত বিনোদিত রজনী,
কত দীর্ঘ দিবস ধরে এই অনুপম মুহূর্তটিকে ঘিরে বস্ত্রনার জাল রচনা
করেছে সে। আজ সেই শ্রান্তিহীন, ক্লান্তিহীন, বিরামহীন প্রতীক্ষা
সার্বিক।

চারিদিকে নিবিড় আঁধার। রজনীর তিমির-মন্দিরে কোন
কৃষ্ণকায় পুরোহিত গভীর তপস্কারত। তাঁর তপঃধূমে দিগন্ত
মলিন। আঁধারের বক্ষ চিরে চিরে তাঁর আহ্বানবাণী আহ্বান
করছে আলোককে। শুভ্রারই অন্তর-উৎস উৎসারিত এই আহ্বান।
বেদনানীর্ণ স্বপ্নে সে তপস্কা করছে এতটুকু সহ্যভূতির স্তম্ভ।

কিন্তু নেই। কেউ নেই। কে বুঝবে তার অন্তর-বেদনা?
কে দেখাবে পথ?

কি ভেবে যে ওর মা ওর নাম শুভ্রা রেখেছিলেন তা আজ আর
জানার উপায় নেই। শুভ্রতা কিছুই তো ছিল না তার। তার
মন কালো, রংয়ে নেই ছিটকোঁটা সালা। এমন কি তার চোখের
মণির চারিপাশের সালা অংশও যেন রংয়ের ছাপ পড়ে হয়ে উঠেছে
কালচে-নীল, তবু তার নাম শুভ্রা। ইদানীং শুভ্রার মনে হোত,
তার নামের সঙ্গে যেন মিল আছে তার জীবনের। সমস্ত শুভ্রপক
ধরে চন্দ্রমা নিজেকে ক্ষয় করে প্রস্তুত হয় অমানিশার স্তম্ভ। তেমনি
ভাবেই সমগ্র জীবনভোর নিজেকে বিলু বিলু ক্ষয় করে সে

তিমির-ভাসার প্রতীক্ষিতা, সেই প্রতীক্ষার
আজ হয়েছে অবসান। অভিসারে আমন্ত্রিত
হয়ে আজ সে ধরা। কিন্তু—

ব্যারাকপুর ট্রাক রোড ধরে এগিয়ে
গেলে বেশ খানিকটা দূরে একটি বাড়ী
ডানদিকে পড়ে—সেই বাড়ীটিই দেবানন্দ
রায়ের। রাত্রির আঁধারে বাড়ীটা চোখে
পড়ে না কিন্তু দিনের আলোর পাঁচিলবেরা
বাড়ীটি লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।
অনেকটা জায়গা পাঁচিল দিয়ে ঘেঁরা—
মাঝখানে মাঝারী আকারের দালান।
বাড়ীর চারিপাশের বিস্তৃত জায়গায় শুধু
ঘাস। এত জায়গা পড়ে আছে কিন্তু
কোথাও একটা ফুলগাছ নেই! অথচ
কোন বুনো ফুলও ফোটে না!

বাড়ীর মালিককে যে জানে সে এত
মোট্টেই আশ্চর্য হবে না। বরঞ্চ বাগান
দেখলেই বিস্মিত হবে। সে জানে, পথে
ফুলগাছ পড়লে দেবানন্দের গাড়ী তাকে

দলিত করে চলে যাবে, হাতের সামনে কোন ফুল পেলে
দেবানন্দ নিজে তাকে নিষ্পেষিত করবে। ঐ যে হাতে একটু
ক্লেশের আঁঠার মত লেগে থাকে, এই তার উপভোগ রীতি।
সে বলে, দূর থেকে নাক টেনে টেনে গন্ধ নেব, মাথা বেকিয়ে
বেকিয়ে রূপ দেখব—ও সব জ্বালা জ্বালা অলস কাব্য-বলাস
আমার নেই। ও সব হচ্ছে তাদেরই—বারা শক্তিশূন্য, ব্যক্তিহীন,
নৃৎসক। তারাষ্ট একটি মেয়ের পায়ের তলায় পড়ে গদগদ হবে
বলে—তুচ্ছ মম জীবন। আমি সমস্ত জীবন তোমাকে চেয়েছি,
আজ তোমাকে পেয়ে ধরা হয়ে গেলাম আমি।

কথাটা সত্য। দেব বলে, কাবণ তারা অন্ধম। তারা জানে বহু
পরিশ্রমে, প্রাণপণ অগ্ন্যগারে আজ তারা যাকে পেয়েছে তাকে
হারালে আর কোন গতি নেই। তাই এর মাঝে অতীন্দ্রিয়তা
আবেগ করে, বড় বড় ছুঁচুর কথা বলে, স্বর্গের ভাব টানটানি করে
বিশিষ্ট করে তুলতে চায় সেই সামান্য ভাব কিন্তু গোড়ায় আমি
যা বলেছি তাই চরম কথা। তাদের পৌরুষ নেই, বিবহীন সাপের
মত তাই তাদের মুখে একনিষ্ঠতার অহিংসামন্ত্র, প্রেমের হরিনাম।

—এ তোমার অজ্ঞায় কথা—কোন কোন বন্ধু প্রতিবাদ
করতো—তুমি বলতে চাও প্রেম নেই জগতে?

—না। প্রেম চলতি অস্থায়ী এক শব্দ। প্রেমের দোহাই
শক্তিশূন্যের সখল। সখলহীন পুরুষ প্রেমের বাণী জপতে জপতে
নারীর কাছে যায়। পণ্যশুকা নাবীকে যেভাবে ব্যবহার করি আমি
ঠিক সেই ভাবেই সেই প্রেমিক ব্যবহার করে প্রেমশুকা নারীকে।
ঠিক তেমনি আকাঙ্ক্ষা-পূরণ—ঠিক তেমনি প্রাপ্তির ভূমি। আবার
যে সব নারীর প্রেমিক জোটে না তারাই আঁঠার মত লেগে থাকে
একজনের প্রতি। মুখে বলে প্রেমে পড়েছি।

—নরনারীর সম্পর্ক কি শুধু দেহজ? প্রশ্ন করতো কেউ।

—শুধু দেহ। তীক্ষ্ণ বিদ্রোহ বলতো দেবানন্দ, দেহ জিন্ন আর
কি আছে নারীর? বিত্তা? বুদ্ধি? তোমরা তোমাদের এই

মোহিনীরা মন নিয়েও নিশ্চয় স্বীকার করবে যে, বিভ্রার গরিমায়, বুদ্ধির দীপ্তিতে পুরুষ নারী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। তবে? তবে কেন পুরুষ রমণীর নিকট যায়? রমণী বুদ্ধিজীবিনী নয়, রূপরসিণী। সে নরকের দ্বার নয়, স্বর্গের চাবীও নয়—ভোগের সামগ্রী, পুরুষের পরিপূরক। সে কামবনের কোমল কামলতিকা, রসপূর্ণা রসবতী।

বন্ধুদের বিশ্বাসবিধি নীরব দৃষ্টির সম্মুখে দাঁড়িয়ে গভীর গর্ভিত সুরে বলে—আমার ক্ষমতা ক্ষয়হীন, আমার বর্ষ অন্তহীন। আমি কি জগৎ চোরেণ মত চুপিসাড়ে উঁকি দিয়ে এসে সেই চিত্তার কণ্ডুয়ন করবো? মনকে চোখ চেঁরে কি লাভ? বিদেহী প্রেম আমার নয়। দেহকেই আমি কামনা করি, উপভোগ করি এবং সেই দেহকে অধিকার কিংবা আহরণ করবার ক্ষমতা আছে আমার।

মস্তোক্তি দেবানন্দ রায়ের মুখে সাজে। সতাই, কিছুই অভাব নেই তার। অপরাপ স্তম্ভ দেখে—রূপরিমিত ঐশ্বর্য।

এই দেবানন্দ রায়কে ভালবাসলো কি না শুক্লা মিত্র? শুক্লা মিত্র—যার রূপ নেই, যৌবন নেই, ঔজ্জ্বল্য নেই। উদর মরুকে ভালবেসেছে ক্ষীণকায় নির্ঝরধারা।

শুক্লা বগন খুব ছোট তখনই ওর মা স্বামীর মৃত্যুর পর ইন্দ্রনাথের গৃহে চলে আসেন। শুক্লার মার তাতে অর্থ ছিল, কাজেই কোন অসম্মানজনক পরিস্থিতিতে তাঁকে পড়তে হয়নি। ইন্দ্রনাথ তাঁর দূরসম্পর্কের আত্মীয়। নিকট-আত্মীয়ের সঙ্গে না

থেকে এঁর সঙ্গে থাকায় কিছু কিছু বক্রোক্তি এবং কটাক্ষ যে না হয়েছিল তা নয়। তবে এঁরা কেউ তা গ্রাহ্য করেননি। কেন যে তিনি এখানে এসেছিলেন তা কেউ জানে না। হয়তো ইন্দ্রনাথই জোর করে আনিয়েছিলেন। তাঁর গৃহে পরিজনের আধিক্য ছিল না, কাজেই আত্মীয়-স্বজন কেউ এলে সুখী হতেন।

ওদের আগমনে সব চেয়ে সুখী হয়েছিল দেবু। ইন্দ্রনাথ ওকে বাইরের কারো সঙ্গে মিশতে দিতেন না। কাজেই আত্মীয়-স্বজনহীন বিরাট গৃহে বালক দেবু ছিল নিতান্ত একাকী। সে যেন শুধু মাহুতীন নয়, পৃথিবী-পরিত্যক্ত এক আদম শিশু।

শুক্লাকে পেয়ে ও যেন বেঁচে গেল। প্রকাণ্ড মাঠে হুঁটি সমবয়সী শিশু গেলো করতো। একজন যেমনি স্তম্ভর অপর জন ঠিক তেমনি কুৎসিত না হলেও যথেষ্ট কুৎসিত। সকলেই তা লক্ষ্য করতেন শুধু ওরা হুঁজন ছাড়া।

কৈশোরের স্পর্শ খুলে দেয় ওদের মনের গুহার রুদ্ধ কপাট। ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, কচিবোধ, দেহ ও মনের পরিবর্তনের ধূপছায়ার সমস্ত পৃথিবী ভিন্ন রূপ ধারণ করে। অন্তর-গুহা হতে নিমগ্নিত হয় আদম আত্মা।

বয়স্কসম্মুখে সেই আত্মা বেরিয়ে আসে। তার উপর পড়ে পৃথিবীর প্রলেপ। তাতে প্রতিকলিত হয় গগনের গরিমা, বিশ্বের মহিমা, অরণ্যের অকণিমা, সাগরের কলকলোল, সবুজ শস্তের



ও আর-সি-এল এর

কুমারেশ

লিডার ও পোট্টের মীত্ৰ

দি ওরিয়েন্টাল রিসার্চ অ্যান্ড কেমিক্যাল ল্যাবরেটরী লিঃ

তারুণ্য, কালো কয়লায় কর্ণপাতা, ইটকাঠী-পাথরের কাঠি। আজকের মানবতা শুধু প্রকৃতির সৃষ্টি নয়—সে মানব-সৃজিত সভ্যতারও বাই-প্রোডাক্ট। উভয়ের মিলিত সত্তা।

বিশ্বশ্রমের আদরে এবং মানবের অভ্যাদরে গড়া দেবু এই মনুষ্য জগতে বেশ দ্রুতই গড়িয়ে যেতে লাগলো। প্রায়ই তাকে বাড়ীতে দেখতে পাওয়া যেত না। কখন আসতো, কখন যেত, কোন ঠিক-ঠিকানা নেই, ইচ্ছানাথ অল্পপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করলে ক্লাব, স্কুল, পার্টি, জলশা ইত্যাদি নানা রকম কথা বলে দিত।

এদিকে বড় হবার উপক্রমবিকাতেই শুক্রকে আটকে রাখা হয়েছে, বাইরে বাওয়া বারণ—ছেলেদের সঙ্গে মেশা নিষেধ।

ছেলে বলতে তো এ বাড়ীতে আদি-এব' অকৃত্রিম এক দেবু। তা'ও সে বাইরে বাট্টে এত ব্যস্ত থাকে যে তার খোঁজ পাওয়া যায় না। তবু বাপাসঙ্গীর সন্ধকে এই সতর্কবাণী গুর মনে গভীর পরিবর্তন এনে দিল। যার সঙ্গে এত দিন খেলাধুলো, খগড়া, খাওয়া ওঠা-বসা সবই চলেছে আজ তার সম্পর্কে এই নিষেধাজ্ঞা কেন? নীরব সন্ধীর্ণ প্রেমবারা রুদ্ধ আবেগে হয়ে ওঠে উচ্ছ্বাসিত।

কবি লিখেছেন—সকালবেলা কাটিয়া গেল, বিকাল নাহি যায়—কিন্তু শুক্রার সকাল-বিকাল কিছুই কাটতে চায় না। কি করে কাটবে? মহানগরীর উপকণ্ঠের অধিবাসিনী সে। প্রকৃতির সঙ্গ থেকে একান্ত বঞ্চিত। এখানে প্রভাত প্রতিদিন পৃথক পোষাকে আসে না, মধ্যাহ্নের দৌলময় রিক্ততা, ঘন ঘন ডাকে, কবুতরের হৃদয় স্পন্দনে হয়ে ওঠে না রমণীয়। সন্ধ্যার ধূসর ছায়া সন্ধ্যা জগতের দুঃখ দৈন্ত মালিককে আঁচলে চাপা দিয়ে মানব-মনে ব্রিঙ্ক, করুণ স্পর্শ বুলিয়ে দেয় না। শুধু—

শুধু রাত্রি এখানে ঐশ্বর্যময়ী। কালোর নিবিড়তার মাঝে কৃষ্ণতর পিচের রাস্তায় দ্রুত সঞ্চরমান আলোর বিন্দুগুলিকে দেখে একটু শিউরে ওঠে শিশুগাছগুলি। বরষার মাথা নেড়ে কি যেন বলে বিড়বিড়িয়ে।

দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি ঐ প্রাচীরঘেরা প্রকাণ্ড গৃহের এক কক্ষে বাস করে কুমারী শুক্রা। সঙ্গী শুধু বই। তার নিজস্ব ঘরের কোণে কোণে বইয়ের স্তূপ। মনের কোণেও কি তাই?

এই বইয়ের জগৎ সম্পূর্ণ মানস-জগৎ। আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রেম, মোহ, মারা মমতা, প্রতিহিংসা, পাপ-পুণ্য, জীবন-মরণ সবই সেখানে আছে। আছে ভরুণ মনোব গোলাক। কিন্তু সবই বাস্তবতাহীন এক অল্পম আবির্ভাবগোচর। অপকণ স্বপ্নময়।

শুক্রার স্বপ্নজগতের নায়ক দেবানন্দ। অবশ্য, শুধু শুক্রার কেন, অনেকেরই সে চিন্তাচোর। তবে, শুক্রার কথা আদাল। তার বৌবনের প্রারম্ভে সে শুধু একটি পুরুষকেই দেখেছে—সে তার শৈশবের সাথী। পরিচিতির গণ্ডাঘেরা এই যে অপরিচিত যুবক, এই কি তার খলাঘরের নায়ক দেবদা? এষ হাসি অজানা, কথা অজানা, ভাষা ভাব সবই অজানা। তবু মনে হয়, একে চিনি। একে জানি। বাইরের অপরিচিতিত্বই মধুরতর করে তোলে মনের পরিচিতভটিকে।

কোন অলস অবসরে অদৃশ্য পথে প্রেম শুক্রার হৃদয়ে স্থায়ী আসন পেতে বসেছিল! অসীমের সুর শুনেছিল সে। যখন সে

চমকে সেদিকে দৃষ্টিপাত করলো তখন রুদ্ধ হয়ে গেছে প্রত্যাবর্তনের পথ। সেই রুদ্ধ কক্ষে হৃদয়ের রসে জারিত, প্রাণের উত্তাপে প্রতপ্ত হয়ে প্রেম এক অল্পম অপকণ রূপ পরিগ্রহ করলো। কল্পনায় থাকে প্রিয় মনে হয়েছিল, এখন সে হল দেবতা।

এদিকে শুক্রার মা নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তিনি চারিদিকে পাত্র খোঁজ করতে থাকেন। ছেলে ভাল পাওয়া যায় তো কুল ভাল নয়। বংশ ভাল তো পাত্র অল্পমযুক্ত। আবার দুই-ই যদি ঠিকমত জুটলো তবে হয়তো শুক্রাকেই তাদের পছন্দ নয়। একটা না একটা বঞ্চাট লেগেই আছে। রোজই পাত্রী দেখা চলতে থাকে।

ওদিকে দেবানন্দ রায়ও রোজ পাত্রী দেখছে। তবে তা তার নিজস্ব রীতিতে। বন্ধুগন্ধব নিয়ে হুলা করতে করতে এক জায়গায় ঢুকে পড়া—পছন্দ হলো তো সেখানেই রইলো নইলে চল অল্প জায়গায়। মধুসূদানী মন্ত মধুকর।

অল্প দিনের তফাতে শুক্রার মা ও দেবানন্দের বাবা হুজনেই মারা গেলেন। দেবানন্দের মা আগেই মারা গিয়েছিলেন। সুতরাং হু'জন যেন অকস্মাৎ একান্ত স্বাধীন হয়ে ওঠে।

শুক্রার নিকট এ স্বাধীনতা কিছু নয়—শুধু সম্ভাব্য পাত্রের নিকট নিজেকে বার বার দেখানোর হাত থেকে মুক্তি পাওয়া মাত্র। কিন্তু দেবানন্দ গৃহকর্তা হয়ে গৃহকেই পরিবর্তিত করে ফেলে। বাইরের আচ্ছাদকে সে ঘরে টেনে আনলো। সমস্ত দিন বন্ধুদের যাতায়াতে অঙ্গন মুখরিত হয়ে ওঠে। সন্ধ্যার আঁধার নিবিড় হতে না হতে আনন্দ-মত্ততা উল্লাসে গৃহ মুখর হয়ে ওঠে। তারপর ধীরে ধীরে রাত্রি বাড়ে। শুধু একটি ঘরে আলো জলে—আব দূর থেকে একটি নারীর হৃদয়-অনল ঐ ঘরের চারিদিক ঘিরে জ্বলতে থাকে।

গভীর রাত্রিতে সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ে, বিনিত্রা শুক্রা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে। পা টিপে টিপে ও এগিরে যায় ঐ আলোজ্বালা ঘরের দিকে।

মুহু আলোক-উজ্জ্বল ঘর। সাদা চাদরের উপর শুয়ে আছে দেবানন্দ আর কোন অপরিচিতা। মুহু হাসি,—প্রণয়োচ্ছ্বাস-পরিহাস।

এই যে নারী আজ দেবানন্দ রায়ের শয্যার অংশভাগিনী হয়ে রয়েছে, এ যে শুধু শুক্রার অপরিচিতা তাই নয়; হয়তো দেবু নিজেকে একে চেনে না। তবু এ শুক্রার কাম্য স্বর্গে বিচরণ করছে আর প্রতিদিনের পরিচিতা শুক্রা লুকিয়ে লুকিয়ে দখে দার্দ্র্যবাস ফেসছে।

প্রতি রজনীতেই দেবানন্দের নর্থ-উৎসব স্বাধাথ স্নক ও সমাপ্ত হতো। কিন্তু সে এসেও জানতো না যে এক গোপন গুচাধিবী নারী তার সমস্ত ব্যতিচারের নাবব সাক্ষী।

এই ঘটনাব দৃশ্যগুলি শুক্রার চিন্তাধারার মোড় ফিরিয়ে দেয়। আগে তার প্রেম এক শান্ত স্থির সৌন্দর্যমহিমা ছিল। প্রিয়তমকে পাবার আকাঙ্ক্ষায় দুঃখ, দাহ, বেদনা ছিল, উগ্রতা ছিল না। প্রেমাস্পন্দের দৈহিক মূর্তির বিদ্রোহী রূপ কল্পনা করতো সে। কামহীন, কলুষহীন, শুভ্র নিকলুষ ছিল তার প্রেম। কিন্তু, এখন তার চারিদিকে রুদ্ধ দাহ। আগুনের হুঁহ। ও এখন পেতে চায়—দিতে চায়। দেহের যে কাহনাগুলি, ইচ্ছার যে ধারগুলি সে এত দিন অতীক্সির ভাব দিয়ে রুদ্ধ করে রেখেছে—আজ তারা সবাই আকুল হয়ে উদ্গাহ হয়ে উঠেছে। যত মেয়ে এখানে আসে

তারের প্রতিটি স্নেহকে সে অভিশাপ দেয়। বা তার একান্ত নিজস্ব তাকে কোন রবাহৃত ভোগ করছে।

এই ভাবেই চলছিল। তারপর আজ—

আজ সকাল থেকেই টুকরো টুকরো মেঘে ছেয়েছিল আকাশ। দুপুরের দিকে প্রবল ঝড় আর বৃষ্টি। বিকেলে ঝড় কমে গেল বটে কিন্তু বৃষ্টি কমে না। বৃষ্টির একটানা শব্দ, ভিজ্জে-ভিজ্জে হাওয়া মনে কি যেন ভাব আনে। কোন এক নাম-না-জানা অমুভূতি আদিম সরীসৃপের মত জড়িয়ে ধরে মন। পিসে ফেনে, উত্তপ্ত হান্না নিঃশ্বাসে অস্থির করে তোলে।

দেবানন্দ ষাট সন্তান দিন বেলাত প্যারেনি। বন্ধুবাও কেউ আসে নি। কি করে আসবে? বাস্তার জল ঝাড়িয়ে গেছে। গাড়ী চলেছে না।

দুপুর থেকেই দেবু পান করতে শুরু করেছে, রক্তের ধারাব মত লাল পানীয়। উষ মদিরা তার রক্তকে করে তুলেছে উষ্ণতর। রাত্রি যখন আর বারটা সেতার খাস চাকরকে ডেকে বলে—গুলাকে একবার এখানে আসতে বল।

অবাক হয়ে স্থানীয় মত ঝাড়িয়ে থাকে ভূতা, জীবনে হয়তো এই প্রথম আদেশ পাওয়া মাত্র তানিল করে না। গুলাদিকে ডাকে! এইখানে! সে কি আসবে!

দেবু ভালভাবেই জানে গুলা আসবে। সে জানে তার তৃপ্তি নারীস্বয়ং এত দিন এত মাস ধরে শুধু এই প্রতীক্ষার প্রতীক্ষিত। বার বার তার ব্যাকুলতা প্রকাশিত হয়েছে হাতের ভঙ্গিতে, পায়ের গতিতে, হাসির রেখায়, কথার সুরে, অঙ্গসজলতায়। এতদিন তাকে দেবুর প্রয়োজন ছিল না, কাজেই সে ইচ্ছে করেই এদিক লক্ষ্য করে নি। কিন্তু, ষাট যখন আর কোন উপায় নেই তখন ওকে থকা করাই ভাল, মনে মনে ভাবতে থাকে—ওর ডাক শুনে কি রকম মুখভাব হবে গুলার? কি অপরাধ তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠবে সেই পিপাসার্ত অধরে? একটু হাসে দেবু।

গুলা জেগেই ছিল। আকুলি-বিকুলি হাওয়া, বৃষ্টির মাতাল পদধ্বনি তার অশান্ত হৃদয়কে আরও উদ্বেল করে তুলেছে। ধ্বংস! ধ্বংস হয়ে যাক পৃথিবী—এমন সময় চাকর এসে খবর দিল।

প্রথমে যেন কথাটা বিশ্বাস করতে পারলো না গুলা। দেবু তাকে ডেকেছে! ধ্বংসের কালো গহ্বরের অতলে সে ছুটে বাজিল তখন তাকে কে ফেরাল? প্রেম। এতদিনে অভিসারিকার অপেক্ষা কি শেষ হলো?

কিন্তু, দেবুর ঘরে ঢুকে, সেই শয্যা স্পর্শ মাত্রই এক অদ্ভুত অমুভূতিতে সমস্ত মন বিধিরে ওঠে। সেই ঘর—সেই শয্যা।

তার তপস্তার সিঁচি নয়, দেবু বাসনা পরিতৃপ্তির জন্তই তাকে এখানে আনা হয়েছে। প্রেম নয়, ধ্বংসই বাড়িয়েছে হাত।

সাদা চাদরে ঢাকা নিজীব শয্যা। নিজীব কি? ওর দিকে তাকাতো ওর প্রতি কণা যেন কথা করে ওঠে—আবরণের প্রতি সূত্রে যেন কামনার ক্লেশ ইতিহাস—বিবাক্ত ব্যাধির নির্ঘম উল্লস প্রকাশ। গুলার স্বক্ষে দেখা বিভিন্ন নারীর একই রূপ বিকৃত ও বিকৃত অভিব্যক্তি ঐতল বিভূষণ, কলুষ হাসি যেন ওকে সহস্র বাহু দিয়ে ঘিরে ধরে। গুলার মনের সেই নিজিত অমুভূতিগুলি যেন জাগরিত হয়ে তাকে মুগ্ধগহ্বরে ঠেলে দেবার জন্ত মরিয়া হয়ে ওঠে। প্রেমের অমৃতকুণ্ড নয় মুহুর নারিকীর গহ্বর। এই কামনার অগ্নিকুণ্ডের সামনে ঝাড়িয়ে গুলার মনের সমস্ত বিধা-বন্দ পুড়ে ছাই

হয়ে গেল। দেহভোগ সুখ, ইন্দ্রিয় চরিতার্থতার উর্ধ্ব, ত্যাগ ও বিজ্ঞতার কোমল আসনে যে অলৌকিক চিরন্তন শ্রেম এতদিন মুহুর্ন্ত হয়ে পড়ে ছিল, আজ এই মুহূর্তে সে নবজীবনের অমৃত পরশে অনাবশ্যক, বিশাল নয়নে তাকালে। দেবুকে সে যেন আরও ভালবাসলো। ক্ষুদ্র, সানাক্ত প্রবৃত্তিগুলি পুড়ে যেতে থাকে আর তারই আলোতে দীপ্ত দেখালো অনবধ প্রেমের প্রদীপ।

দেবু ঘরে ঢোকে। ওর দিকে সহজে হাত বাড়িয়ে বলে—এস। এখানে বোস।

—না! সামান্য একাক্ষর শব্দ কিন্তু তাই যেন অসামান্য হয়ে বার বার দেবু-তাক নাসায়, গবিত ওষ্ঠাধরে, দৃঢ় চিবুকে আঘাত করতে থাকে। না—কিন্তু কেন?—কেন?

—কোন উত্তর দেয় না গুলা।

ওর দিকে তাকায় দেবু। এই মৌন নারীর নয়নে অঙ্গলেশা নেই। তবু যেন তার আপাত শুদ্ধতার পেছনে কোন অঙ্গনির্বর প্রকট। কিন্তু কেন গুলা তাকে এই অনাবশ্যক অপমানে অপমানিত করছে? নিজেও ভোগ করছে চরম মুগ্ধ?

—তুমি তো আমাকে ভালবাস। দেবু না বলে পারে না।

—সে কথার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই তোমার কাছে।

—না নেই। স্বীকার করে দেবু—কিন্তু তোমার—তোমার কাছে নিশ্চয়ই তা প্রয়োজনীয়।

—আমারও নেই—মুহু হেসে বলে গুলা।

—হঠাৎ এ রকম নিস্পৃহতার কারণ জানতে পারি কি? বহুকষ্টে নিজেকে সংবত করে শান্তভাবে বলে দেবু।

—কোন দিবা বা স্পর্শ-স্পৃহনীয়তা দেখেছিলে? ঠিক সমান ভাবে উত্তর দেয় গুলা। তারপর একটু ভিন্ন সুরে বলে—দেবুদা, আমি তোমার ষোগ্যা নই।

ষোগ্যা যে নও সে কথা খুবই সত্য—কিন্তু তাই বলে অষোগ্যতার অহঙ্কারে আমাকে অপমান করবে? দেবানন্দ রায়ের মুখের উপর বলবে—না? কিন্তু কি করে জব্দ করা যায় এই স্পৃহিত নারীকে?

—কি চাও তুমি?

—কি চাই আমি? জ্রুটা একটু বেঁকে উঠেই আবার প্রশান্ত হয়ে উঠলো—আমি কিছু চাই না কিংবা যা চাই তা দেবার সাধ্য তোমার নেই।—আমার সাধ্য?—নেই? দেবানন্দ রায়ের অমিত অহঙ্কার যেন বিকৃত মুখে বীভৎস চীৎকার করে ওঠে।

একটু পরে অপেক্ষাকৃত শান্ত বিক্রমে বলে—দেবানন্দ রায়ের সাধ্য নেই গুলা মিত্রের প্রার্থনা পূরণের?

মুহু হাসে গুলা। আর সেই শান্ত শুভ হাসির দিকে তাকিয়ে এই প্রথম যেন নিজের অক্ষমতা উপলব্ধি করে দেবানন্দ রায়। রূপ যা দিতে পারেনা, রূপ যা কিনতে পারে না, তেমনি দুর্ভাগ্য ধনের অধিকারিণী এই শান্ত শ্রীহীনা মেয়েটি। সমস্ত রজনীর নীরব বেদনার পুঞ্জীভূত শুভ্রতার সমগ্র পৃথিবীর ব্যথিত হৃদয়ে মধুসূরভে যে রজনীগন্ধা ফুটে উঠেছে, তার কাছে রক্তরাঙা গোলাপও হার মেনে যায়! এই তপস্ক্রিষ্টা তরুণীর দিকে তাকিয়ে দেবানন্দ রায় মাথা নত করলো। তার মন যেন কোন এক পরশমণির প্রভাবে ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হতে থাকে। মকর বৃকে জেগে ওঠে এক করুণ ক্রন্দন, দেহাতীতকে পাবার অদম্য অপূরণীয় কামনা।



ঠিক এই মরুমুখে অর্থাৎ দ্বিতীয় ঋতুর শুরুতে একটা জাহাজ চাটগাঁ বন্দরে এসে নোঙ্গর ফেলে। মাল-টানা জাহাজ; নাবিকী পরিভাষায় থাকে বলে কার্গো শিপ। নাম এস, এস, ক্যামেরুণ।

জাহাজটার খোল, হাচ, সোয়ার ডেক কার্গোতে ঠাসা। কার্গো খালাস হতে পুরো দু'টি মাস লাগবে।

দু' মাস পর নোনা জল থেকে জঙ্গ-ধরা নোঙর উঠবে। তারপর বছরের মধ্যম ঋতুতে হঠাৎ একদিন আকাশের দিকে বানিকটা সাদা ধোঁয়া ছুড়ে, তীব্র আকস্মিক একটা ভৌঁ বাজিয়ে আস্তে আস্তে ক্যামেরুণ জাহাজ চাটগাঁ বন্দর ছেড়ে চলে যাবে।

দশ বছর ধরে জাহাজটা সমানে চাটগাঁ বন্দরে আসছে। এবারও এস।

ঘড়-ঘড়, কর্কশ শব্দ করে ভারী ভারী শিকলগুলোর সঙ্গে চারটে নোঙর জলে নামল। মাল্লা আর রসিমানবা জেটর ক্যাপষ্টানে মোটা মোটা কাছি পেঁচিয়ে জাহাজটাকে বেঁধে ফেলল। গ্যাংওয়ে লাগাল।

গ্যাংওয়ে বেয়ে পরলা যে জেটতে নামল, রিয়াজুদ্দিনের গলির বাসিন্দারা তাকে বলে সাত দরিয়ায় কুটুম। আসলে তার অগ্র একটা নাম আছে। নাম তার হবীব। ক্যামেরুণ জাহাজের ছোট সারেও সে।

কোন দিকে তাকাল না হবীব। জেটটা পিছনে ফেলে, বন্দরটা ডাইনে রেখে সোজা রিয়াজুদ্দিনের গলিতে গিয়ে ঢুকল।

দ্বিতীয় ঋতুর দিনটা একটু আগে মবেছে। আকাশটা আবছা আবছা, ছায়া-ছায়া। ভূমো কালি বং গবেছে সেখানে।

সবেমাত্র সন্ধ্যা হয়েছে। এর মধ্যেই রিয়াজুদ্দিনের গলির খুপবিতে কেরোসিনের ডিবে স্বলে উঠেছে। বিকিকিনির হাট বসে গিয়েছে।

কাপড় না, মরিচ না, চাল না, ডাল না—এখানে বা বিকিকিনি হয়, তা হল মাংস। ঠিক মাল্লবের নয়, মেয়েমাল্লবের ডাঁটো শরীরের কাঁচা, ভাজা মাংস।

দালাল-আড়কাঠিরা শিকার ধরে ধরে আনছে। দরাদরি কথাকথি চলছে।

যারা শিকার পায় নি, এমন একদল মেয়ে গলির মুখে দলা পাকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কামঠের মত জুল-জুল করে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে।

ঠিক এমন সময় হবীব এল।

রিয়াজুদ্দিনের গলিতে সোরগোল পড়ে গেল।

এখানকার বাসিন্দারা সবাই চেনে হবীবকে।

একটি মেয়ে নাক টেনে টেনে বলল, আইল লো, দশ মাস পর সাত দরিয়ায় কুটুম আইল। তোরা সগলে জোকায় (উলু) দে।

কল-কল করে এক ঝাঁক উলু পড়ল।

ফেহদীমাখা লালচে মুর হবীবের। একটি মেয়ে মুরসমেত খুতনিটা নেড়ে দিয়ে বলল, এ্যাতদিনে আমাগোর মনে পড়ল লাগর?

ভীক ধারাল শব্দ করে হেসে হেসে চলে চলে পড়তে লাগল চার পাশের মেয়েগুলো।

কতুই দিয়ে সবাইকে ঠেলে গুঁতিয়ে একটা বেঁটে মাংসল মেয়ে সামনে এল। বলল, এইবার চলনি থামা সো মাগীরা! সাত দরিয়ায় কুটুমেরে নিয়া তোরাই যে মজলি! উটদিকে আসমানের বুকখান টুটাকাটা হইয়া ষাইতে আছে। এইবার কুটুমেরে ছাইড়া দে। হবীব কিছু বলে না। মেহেদী-মাথা চোখা মুরে হাত বুলোতে বুলোতে মিট-মিট করে হাসে।

রিয়াজুদ্দিনের গলির বাসিন্দাদের কাঁদে না চেনে সে? এক আদ দিন না, দশ বছর ধরে সে এখানে আসছে।

দ্বিতীয় ঋতুর শুরুতে ক্যামেরুণ জাহাজ যেই মাল চাটগাঁ বন্দরে এসে লাগে, গ্যাংওয়ে বেয়ে পরলা যে মানুষটি নামে, সে ত'ল হবীব। কোন দিকে না তাকিয়ে সোজা এই গলিতে এসে ঢোক সে।

বেঁটে মেয়েটা বলে, খাড়ুইয়া খাড়ুইয়া ভাব কী? বেকুব মরদ। ষাও, আসমানের কাছে ষাও কুটুম।

এক পাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল আসমান। অসহ্য এক স্রবের কাঁপুনি তার বৃকের ভিতর খরখর করছিল। পা কাঁপছিল।

লম্বা লম্বা পা ফেলে আসমানের সামনে এসে দাঁড়াল হবীব।

গলির মুখটা ছায়া-ছায়া; ফিকে অন্ধকারে জড়িয়ে রয়েছে। এখন মুখের চেহারা দেখা যায়, কিন্তু তার ভাবা পড়া যায় না, বা বোকা যায় না।

ফিস-ফিস করে আসমান বলল, আইলা মিয়া?

আইলাম।

চল।

আগে আগে চলেছে আসমান। পিছনে হবীব।

চলতে চলতে তারা রিয়াজুদ্দিনের গলির শেষ মাথায় এসে পৌঁছাল। এখানেই আসমানের খুপরি।

খুপরিতে ঢুকে ভিতর থেকে কাঁপ এঁটে দিল আসমান। বাঁশের মাঠানে পা ঝুলিয়ে বসল হবীব।

ঠিক মাথখানে একটা কেরোসিনের ডিবে স্বলছে। ভিষেটা থেকে বত আল্লা পাওয়া যায়, তার ঢের বেশি মেলো ধোঁয়া।



মায়ের মমতা ও

অষ্টারমিন্কে প্রতিপালিত

মায়ের কোলে শিশুটি কত সুখী, কত সন্তুষ্ট। কারণ ওর স্নেহময়ী মা ওকে নিয়মিত অষ্টারমিনক খাওয়ান। অষ্টারমিনক বিশুদ্ধ দুগ্ধজাত খাদ্য এতে মায়ের দুধের মত উপকারী সর্বকম উপকরণই আছে। আপনার শিশুর প্রতি আপনার ভালবাসার কথা মনে রেখেই, অষ্টারমিনক তৈরী করা হয়েছে।

বিনামূল্যে-অষ্টারমিনক পুস্তিকা (ইংরাজীতে) আধুনিক শিশু পরিচর্যার সর্বকম ভিত্তাস্থলিত। ডাকপথের জন্ত ৫০ নম্বরের ডাক টিকিট পাঠান— এই ঠিকানাঃ—“অষ্টারমিনক” P. O. Box No. 202 বোম্বাই ১।

...মায়ের দুধেরই মতন

কারের শিশুদের প্রথম খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করুন। শ্রুত দেহগঠনের জন্ত চার থেকে পাঁচ মাস বয়স থেকে দুধের সঙ্গে কারের খাওয়ানও প্রয়োজন। কারের পুষ্টিকর শব্দজাত খাদ্য-রান্না করতে হয়না—শুধু দুধ আর চিনির সঙ্গে মিশিয়ে, শিশুকে চামচে করে খাওয়ান।



আজ বেশ সাজগোছ করেছে আসমান। চোখে সুরার টান ঘেঁরেছে। ঘোর লাল কাঁচুলি পরেছে। চোকো চোকো শোপ-কাটা একটা শাড়ি পরেছে। হাতের পাতায় মেহেন্দীর রস মেখেছে। নাকে বেশার গেঁথেছে। লম্বা লম্বা চুল খোঁপায় বেঁধে লাল টুকটুকে মান্দারফুল শুঁজে দিয়েছে।

চকচকে, শাশানো চোখে আসমানকে দেখেছে হবীব। এটো তো মাত্র দশ মাস আগে তাকে ছেড়ে গিয়েছে। এটো দশ মাসে আসমান আরো খুবসবস্ত হয়েছ। তার শরীরটা শাবলো বেগে ফুটিয়ে আরো বেশ ভরে উঠেছে। টান-করা ভামাটে চামড়াও জোবো জেরা ফুটেছে। নীচে, দুই হাঁটুর কাঁকে খুঁতনি শুঁকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে আসমান।

এক সময় আসমান বলল, আজ বুঝি জাহাজ আইল ?

হ।

এ্যাত দিনে আমারে মনে পড়ল ?

তুমারে সগল সময় মনে পড়ে। কিন্তু কী করুম ? জাহাজের কাম। ইরান-তুরান, পুট (পোটা) ইডেন, মুসাসা, পুট ইসমাইলা, পুট শিবর পুল—হুনিয়ার পানি তুলফাড় কইরা বেড়াই। হুনিয়ার এক মাথা থিকা আন এক মাথায় চলে বাট। দিল তো তুমার লেইগা পাগ মেলেরি আছে। কিন্তু ইচ্ছা থাকলেই কী আসা যায় ?

একটু খেমে হবীব আবার শুরু করে, বাউক উট সগল। পুট ইডেনে মুখতার মিয়র লগে দেখা। তার কাছ খপর দিয়া দিছিলাম। পাইছ ?

পাইছ।

যর ভাড়া কইরা রাগছ ?

খাখাছ।

ওবে চল।

আজ না কাল সন্ধ্যাে যাবু।

আচ্ছ।

পরের দিন সকালে রিয়াজুদ্দিনের গলির মুখে একটা ঘোড়ার টানা গাড়ি এসে দাঁড়াল। একটা টিনের বাস বিছানা, টুকটাকি ছুঁ-চারটে বোচকা নিয়ে হবীব আর আসমান গাড়িতে উঠল। তারা পাহাড়তলীর দিকে যাবে। সেখানে খর ভাড়া করেছ আসমান।

গলির মুখে এ ঘোড়ার বাসিদারা দল পার্কিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ফিসাফিস করে ভাদেব মধ্যে থেকে কে যেন বকল, আসমান মাসী কত রঙ্গই জানে। মাগা বেবুগ, দুই মাসের সোংসাব পাততে গেল।

ঘোড়ার গাড়ি ছুটেতে শুরু করল।

রিয়াজুদ্দিনের গলি একটা দুঃস্বপ্নের মত পিছনে পড়ে রইল। বন্ধন রোড পেরিয়ে, অনেক চড়াই-উতরাই ঘুরে পাহাড়তলীর কাছে এসে পড়েছে গাড়িটা।

হবীব আর আসমান—হুঁ-জনের মধ্যে অদ্ভুত একটা সম্পর্ক। ঠিক সম্পর্ক না, ছুটি জীবন একটি সর্ভে, একটি বিচিত্র বোঝাপড়ার জোড়া লেগেছে।

এক-আধ দিন না। দশ বছর আগে এই সর্ভ আর এই বোঝাপড়া শুরু হয়েছিল।

দশ বছর আগে দ্বিতীয় খহুর পরলা দিনটিতে ক্যামেরা জাহাজ চাটগী বন্ধের প্রথম নোডর ফেলেছিল।

জেটিতে নেমে শহরে গিয়ে চুকেছিল হবীব। কসবীপাড়া খুঁজছিল।

চাটগায় তাদের জাহাজ সেই প্রথম এসেছে। এখানকান কিছুই চেনে না হবীব। ঘুরতে ঘুরতে সে আড়কাঠির কাঁদে পড়ে গিয়েছিল। আড়কাঠিই তাকে রিয়াজুদ্দিনের গলিতে নিয়ে এসেছিল।

গলির মুখে চোখে-মুখে রং মেখে মেয়েগুলো কামের মত ঘুরছিল। শিকার অর্থাৎ হবীবকে দেখে তারা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

এক কাণ্ডই করেছিল হবীব।

বাছল না, বিচার করল না, বাজালো না ; দরাদরি, কযাকবি করল না। এমন কী ভালো করে দেখল না পর্যন্ত। হাতের সামনে থাকে পেল, ছোঁ মেরে থাকে তুলে নিল। এক হাতে তার কোমরটা জড়িয়ে টানতে টানতে নিয়ে চলল। বলল, তুমার ঘর কুনটা ?

উই গলির শাখ মাখায়।

যরে চুকে নিজেই কাঁপ জাঁটল হবীব। চিমিয়ে চিমিয়ে একটা কুপী ছিল। ফুঁ দিয়ে সেটাকে নিবিয়ে দিল।

যার ঘরে চুকেছিল, সেই মেয়েটা এতক্ষণ এক পশে চুপচাপ মুখ বুঁজে দাঁড়িয়েছিল। কুপীটা নিববার পর তাকে দেখা যাচ্ছিল না। গাট অন্ধকারে সে হারিয়ে গিয়েছিল।

হাতড়ে হাতড়ে মেয়েটাকে ধরে ফেলল হবীব। তিন তুড়ি মেরে পাতলা একটা শোলার মত তাকে বুকের উপর তুলে নিল। তার নরম মাংসল শরীরটাকে ইচ্ছামত ডলে, পিষে, ছেনে, জাঁচেড়, কামড়ে, ছিঁড়ে ফেলতে লাগল।

সমস্ত রাত অন্ধকার খুপরিটা অন্ধ, আদিম এবং বর্বর হয়ে বইল। সকালে উঠে মেয়েটার মুখে একটা দশ টাকার নোট ছুঁড়ে দিয়েছিল হবীব। বলেছিল, আজ রাতে আবার আশ্রম।

মেয়েটা জবাব দেয় না। জবাব দেবার মত অবস্থাও তার নয়। কাল রাত্রির বর্বর বড়টা তার উপর দিয়েই বয়ে গিয়েছে।

শাড়ি আর কাঁচুল ফালা-ফালা হয়ে গিয়েছে। নখ আর দাঁতের ঝা খেয়ে চামড়া ছিঁড়ে রক্ত জমে আছে। শরীরটা ডেলা পার্কিয়ে রয়েছে।

হবীব যখন চলে যায়, আর বেহুঁশ, ঘোর ঘোর চোখ মেলে একবার তাকিয়েছিল মেয়েটা। তারপরই চোখ বুঁজে ফেলেছিল।

সেই রাতেও এল হবীব। তার পরের রাতেও। তার পর থেকে রোজ রোজ আসতে লাগল। রিয়াজুদ্দিনের গলিতে সেই মেয়েটির খুপরিতে আসা একটা নিয়মে দাঁড়িয়ে গেল।

সমস্ত রাত জাঁচেড়, কামড়ে ছিঁড়ে সকালে মেয়েটাকে, না, মেয়েটাকে নয়, মানুষের আকৃতি পাওয়া এক ডেলা নিজীব মাংসকে খুপরিটার ভিতর ফেলে রেখে যায় হবীব।

দিন নশেক আসার পরও হবীব একটা কথা বলেনি। শরীরগী মেয়েটার দেহ ছাড়া কোন ব্যাপারে তার কৌতুহল নেই।

এমন আজব মেহমান রিয়াজুদ্দিনের গলিতে কোন দিন আসে নি।

দন পনের পর মেয়েটিই প্রথম জিগোস করেছিল, তুমার নাম কী?

হবীব।

তুমি কী চাটগাঁর মানুষ?

না। আমি জাহাজী, সাত দরিয়ার মানুষ। আমার নাম হবীব।

একটু থেমে হবীব বলেছিল, এই পয়লা আমাগো জাহাজ চাটগাঁ পুটে আসছে। দুই মাস আমরা এইখানে থাকুয়। তুমার কাছে আমি কুজ আনুয়।

আইসো।

কথার পিঠে কথা আসে। হবীব বলে, নাম কী তুমার?

আসমান।

বাহারের নাম। তুমি যেমন খুবসুরত, তুমার নামখানও তেমন খুবসুরত।

আসমান জবাব দেয় না। নীচের নরম টোটে ধারাল চোখা দাঁত বসিয়ে হাসে। তার হাসিতে ধার আছে, শব্দ নেই। কথার কথার রাত বাড়ে। অন্ধকার গাঢ় হতে থাকে।

চঠাৎ এক সময় আসমান বলে, মেহমান, তুমারে একখান কথা জিগায়ু?

কী কথা?

তুমি আমারে অমুন কুত্তার লাগান কামড়াও ক্যান? অমুন ডল ক্যান? ছানো ক্যান? সকালে শরীলখান দরদে জরজর হইয়া থাকে।

হবীব হাসে। বলে, আমি হইলাম জাহাজী, সাত দরিয়ার মানুষ। কালা পানির তুফান গুণে আমার জনম কাটে। ইগুিহান উসেন, পিসিকিফ উসেন, রেড সী, শুইজ খাল—সাবা দুনিয়ার পানি মাপতে মাপতেই জনম গেল। পানিতে যখন থাকি, বাঁচার আশা থাকে না। কুনো দিন যে ডাঙ্গার দেখা পায়ু, এমন ভবসা থাকে না।

একটু দম নিয়ে আবার শুরু করে, পানি দেখতে দেখতে আমরা কুত্তা হইয়া যাউ। পুটে নেমেই তুমাগো কাছে আসি। জানি, পানিতে তো এক কুজ মকুমত। ডাঙ্গা থিকা, মেয়েমানুষের শরীল থিকা বতটুকু ফুটি বতটুকু স্তম্ভ আশায় করে নিতে পারি! নিজেরে বাগ মানাইতে পারি না আসমান! তুমাগো কামড়াইয়া খামচাইয়া ফুটি করি।

হবীবের গলাটা কেমন যেন গাঢ় শোনার। আসমান কিছু বলে না। একদৃষ্টে সাত দরিয়ার আজব মানুষটার দিকে তাকিয়ে তাক্সা হয়ে তার কথা শোনে। বুঝি বা হবীবের জন্ত একটু দুঃখই হয়।

প্রথম বার এসে ক্যামেরা জাহাজ চাটগাঁ বন্দরে মাস দেড়ক রইল। ঠিক হ'ল প্রত্যেক বছর দ্বিতীয় ঋতুর শুরুতে দুনিয়ার নানা বন্দর থেকে কার্গো নিয়ে জাহাজটা এখানে আসবে।

জাহাজ বেদিন ছাড়বে, তার আগের রাত্রিও আসমানের খুপরিতে এসেছিল হবীব। বলেছিল, কাল জাহাজ ছাড়ব আসমান।

আসমান চমকে উঠেছিল, কই, আগে তো আমারে কও নাই?

আগে তো জাহাজ ছাড়নের ঠিক আছিল না। গলাটা কেমন যেন ধরে গিয়েছিল হবীবের।

জাহাজী মানুষ সে। সাত দরিয়ার তুফান গুণে তার দিন কাটে, রাত ফুরোয়। দিন-রাত, মাস-বছরের হিসেব নেই। দিনের পর দিন কালা, নোনা, অকুরন্ত সমুদ্র দেখতে দেখতে জীবন সবচেয়ে হবীবের দুঃখভরাটা হয়ে গিয়েছে একবোখা, বেপারোয়া। দুনিয়ার কোন কিছু সম্পর্কে তার মোহ নেই।

ইবাণ-তুবাণ, পোট এডেন, পোট মোম্বাসা—যে বন্দরেই জাহাজ ভিড়ুক, হবীব আগে ছোটে কসবীপাড়ায়।

দরিয়ার জীবন নারীসঙ্গীন, নিরুৎসব। সেখানে আশা নেই, নিরাপত্তা নেই, ভরসা নেই, বেঁচে থাকাটা সেখানে একঘেয়ে, বিষাদ, অসহ্য।

জাহাজ থেকে ডাঙায় নেমেই হবীব হজো হয়ে ওঠে। কসবীপাড়ার মেয়েদের দেহ আঁচড়ে-কামড়ে যতটুকু ফুটি আশায় করা যায়। ডাঙার সঙ্গে মাটির সঙ্গে তার সম্বন্ধ এটুকুই।

কিন্তু সে বার যেন কী হয়ে গিয়েছিল। দেড় মাসের প্রত্যেকটা রাত আসমানের খুপরিতে কাটিয়ে দেহ বিকিকিনির শৈব সম্পর্কটা ছাপিয়ে হুজনের মধ্যে একটা মৃন্দ, গুঁড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ব্যাপারটা আগে বুঝতে পারেনি হবীব। জাহাজ ছাড়ার আগের রাত্রি টের পেল।

সাত দরিয়ার বেপারোয়া মানুষটার গলা ধরে গেল, আঁবার

কলিকাতায় এই সর্বপ্রথম
আর্যের "স্লাইসড ব্রেড"



প্রতি প্যাকেট ২৪ টি বড় আকারের

- কলে প্রস্তুত
- স্বীকৃতি পের্কা
- ম্যাসিনে প্যাক
- ও ফালি করা

আপনার স্বাস্থ্য, তৃপ্তি ও সঞ্চয় রক্ষা করিতে

আর্য বেকারী অ্যান্ড কন্ফেকশনারী
কলিকতা - ২৯

আহম; ফিরতি বছরে জাহাজ বখন চাটগাঁর আসব, তুমার কাছে আহম।

কাঁপাগলাই আসমান বলেছিল, জাহাজে কিছক। মাথার কিনে (দিবি)।

বছরের দ্বিতীয় খণ্ডে সেই গুরু হয়, ক্যামেরা জাহাজ চাটগাঁ বন্ধুর আসে। জেটিতে গাংগুয়ে লাগাবার সঙ্গে সঙ্গে হবীব নেমে পড়ে। কোন দিকে না তাকিয়ে সোজা আসমানের খুণসিতে চলে আসে।

ক্যামেরা জাহাজ গুহো দু’ মাস চাটগাঁ বন্ধুর থাকে। এ দু’ মাসের প্রত্যেকটা রাত আসমানের খুণসিতে কাটায় হবীব। সে দু’ মাস দ্বিতীয় খণ্ডের কুটুম। মরশুমী মেহমান।

বিরাজুদিনের গলি বালিদারা সবাই চিনে কেসেছে হবীবকে। তারা তাকে বলে, বর্ষাব অতিথি, সাত দরবার কুটুম।

বছর চারেক আসার পর হবীব একদিন বলল, এমুন করে তো আর চলে না।

আসমান বলে, কেমন করে?

এই যে বছরের দশখানা মাস আমার দরবার দরবার কাটে, আর বেবুখাপাড়ার আন্ধারে তুমি গুঁইজা থাক। এমুন করে চলে না।

বছরের একটা নির্দিষ্ট মরশুমে আসমানের ঘরে কয়েকটা দিন কাটিয়ে যায় হবীব। আসমানের ঘরে জীবনের অন্য একটা স্বাদ পায় সে। যে স্বাদটা দরবার উদ্দাদ তুকানে নেই, যে স্বাদ ইরাণ তুরাণ মোহাঙ্গা বন্ধরের ভিতর নেই। এ স্বাদটা হল মাটির স্বাদ, ডাঙার স্বাদ, জীবনে নোঙর ফেলার স্বাদ।

এই স্বাদটার টানে বছরে বছরে আসমানের কাছে আসে হবীব।

সাত দরবার মাহুয়া কয়েক দিনের জগ্ন ঘরের আশ্রয় পায়।

এই ঘরই তাকে একদিন অস্থির, আচ্ছন্ন করে ফেলল।

হবীব বলে, ভাবতে আছি, দরবার কাম আমি ছেড়ে দিচ্ছি। তুমারে এই বেবুখাপাড়া থাকা নিয়া যায়। তুমারে সাদি করে সোংসার করুম।

কিস-কিস করে আসমান বলে, সত্যি?

সত্যি।

আসমান আর কিছু বলে না। অদ্ভুত এক সুখের শিহরণে তার বুকে তির-তির করে কাঁপতে থাকে।

সত্যিই একদিন জাহাজের কাজ ছেড়ে দিল হবীব। পাহাড়তলীতে একটা ঘর ভাড়া নিল। তারপর বিরাজুদিনের গলি থেকে আসমানকে নিয়ে গেল।

সে বার ক্যামেরা জাহাজ হবীবকে রেখেই চাটগাঁ বন্ধুর ছেড়ে চলে গেল। তিন-চারটে মাস ঋতুর মত উড়ে গেল।

আসমান আর হবীব পরস্পরকে তারা উদ্দাদ সোহাগে জড়িয়ে রাখল। কিন্তু তারপর? তারপর কোথায় যেন তাল কাটল।

উদাস চোখে এক একদিন আকাশের দিকে চেয়ে বসে থাকত হবীব।

আসমান বলত, কী হইল?

কিস-কিস করে হবীব বলত, কিছু না।

আমার মনে হয়, নিশ্চয় কিছু হইছে।

কী আবার হইব?

হইছে হইছে। আমি বুঝি।

অল্প একটু হাসে হবীব। নির্জীব, বিষন্ন হাসি। ভৌতা খানখানে আওয়াজ হয়। সে বলে, কী বোঝ আসমান?

হবীবের কানে মুখ ঘর্ষে আসমান বলে, সকল বুঝি আমি সকল খণ্ডর হাঙ্গি। দরবার লেইগা তুমার পরাণ থির নাই।

বুকের ভিতরটা ধর করে উঠল হবীবের। আসমান কেমন করে তার দিলের কথাটা জানল? বিমূঢ় চোখে তার মুখে দিকে তাকিয়ে রইল হবীব।

আসমান বলে, তাক্সব হইয়া গেলা, তাই না?

ডাইনে এবং বাঁদে মাথা ঝাঁকায় হবীব। হাঁ হাঁ, কী যে বোঝাতে চায়, সে-ই জানে।

আসমান থামে না, তুমি কজ কজ জাহাজের খোঁজ নিতে যাও। তুমি হইলা দরবার মাহুয়া, ঘরে তুমার মন বশ থায় না।

ঠিক—

আন্তে আন্তে মাথা নাড়তে থাকে হবীব। গাঢ়, মধুর এমটা হাস ফেলে।

যার রক্তে দরিয়া মিশে রয়েছে, যার কত দিন তার মন বসে?

তালটা আগেই কেটেছিল। এবার দু’ জনের মাঝখানে চিড় ধরল। চিড়টা একটু একটু করে বাড়তে লাগল।

যে মেয়েমানুষের রক্তে কসবীপাড়ার বীজ রয়েছে, সংসার-ঘর সাজতে কত দিন তার ভাল লাগে?

একদিন হবীবের চোখে পড়ল। রাত্রির অন্ধকারে পাহাড়তলীর সেই বাড়িটার চারপাশে কতকগুলো লোক নেশার চুরচুরে হয়ে হলা করছে।

হবীব গর্জে উঠল, উই কামঠগুলো এখানে আসছে ক্যান?

আসমান জবাব দেয় না। সেই হাসিটা হাসে, যাতে ধার আছে, শব্দ নেই।

আসমানের রক্ত-সকম দেখে ক্ষেপে উঠল হবীব। খানিকটা কুটুম রক্ত তার মাথায় চড়ে বসল, দু’ হাতে তার গলা টিপে ধরল হবীব। বলল, মাগী বেবুখা, এই দিকে সোংসার করে, উই দিকে কুস্তা এনে ঢুকায় ঘরে!

গলায় জোরে জোরে চাপ দেয় হবীব। আসমানের চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে পড়েছে। খাসটা আটকে আসছে।

মরিয়া হয়ে হবীবের তলপেটে লাথি ছুড়ল আসমান। টাল সামলাতে না পেয়ে ছিটকে পড়ল হবীব।

জখমী জানোয়ারের মত দুটো মাহুয়া একই ঘরের দুই কোণে ঝাঁড়িয়ে কুঁসতে থাকে।

পরস্পরের ভালবাসা, বিশ্বাস এবং নির্ভরতার সূত্রে দু’টি জীবন জোড়া লেগেছিল। কিন্তু এই মুহূর্তে তাদের সম্পর্কটা অবিশ্বাস, সন্দেহ আর শত্রুতার সম্পর্ক।

হবীব থেঁকায়, মাগী কুস্তী, কামঠগুলো ঘরে এনে ঢুকায়!

ক্যান ঢুকায় না? তুই যাবি দরবার। আমার চলব কেমনে? ব্যবসা চালু না রাখলে খামু কী?

ব্যবসাই চালু রাখ মাসী, তোরে নিয়া আমার চলব না। হাঁপাতে হাঁপাতে হবীব বলে, আমি দরিয়ার চলে যাবু।

সেই ভাল। তুঁরে নিয়া আমার চলব না। যার মতি খির নয়, দুই-চার রুজ খর করতে না করতে বে দরিয়ার বাইতে চায়, তার উপর আমার ভরসা নাই। আমি পাড়াতেই চলে যাবু।

দরিয়ার মানুষ একদিন দরিয়াতেই চলে গেল। আর বিরাজুদ্দিনের গলিতে এসে ঢুকল আসমান।

আসমানকে দেখে গলির বাসিন্দারা ফিসফিসিয়ে হাসে। বলে, কী সো আসমান, ঘর-সোঁসার থইয়া আবার এই দোজখে (নরকে) আইলি যে?

সখ হইছিল; দুই-চার দিন সোঁসার করলাম। কিন্তুক সখটা বেশি দিন রইল না। রজ্জে রইছে বেবুখাপাড়ার বিব। কয় দিন সোঁসার ভাল লাগে?

বলতে বলতে নিজের পুরনো খুপরিতে গিয়ে ঢুকল আসমান।

তারপরের বছরও ক্যামেরা জাহাজ এস চাটগায়।

হবীব এস আসমানের খুপরিতে। আসমান খুশীই হল। কয়েক মাস একসঙ্গে সোঁসার করে হবীবের উপর কেমন একটা টান বসে গিয়েছে।

আসমান বলল, আছ কেমন?

ভালই।

আসমানের উপর অদ্ভুত এক আক্রোশ নিয়ে দরিয়ার চলে গিয়েছিল হবীব। দরিয়ার দরিয়ার ঘুরে সেই আক্রোশটা উবে গিয়েছে।

হবীব বলল, শ্রাথ আসমান, তুমি কসবীপাড়ার মানুষ, আমি

দরিয়ার মানুষ। তুমি এই পাড়া ছাড়তে পারবা না, আমিও দরিয়া ছাড়তে পারব না।

ঠিক।

আসমান সার দেব।

দরিয়া আর কসবীপাড়া ছেড়ে বে আমার সারা জনম সোঁসার করব, তার উপায় নাই।

ঠিক।

এক কাম করলে কেমন হয়?

কী কাম?

বছরে দুই মাস আশাংগো জাহাজ চাটগায় থাকে। এই দুই মাস তুমি আমি সোঁসার পাতলে কেমন হয়? পুটে পুটে ব্রি। কত মাসীর কাছেই তো বাই। কিন্তু সোঁসারের ঘরের স্বাদ তো পাই না। আসমান বলে, সারা জনম বারো মাস তো এই দোজখেই কাটাই। দুই মাস যদি সোঁসার পাততে পারি, সখও মিটে, শান্তিও পাই।

হু' জনের মধ্যে সন্ত হল।

বছরের দ্বিতীয় ঋতুতে ক্যামেরা জাহাজ যখন আসবে তখন আসমানকে নিবে এই শহরের কোথাও চলে যাবে হবীব। একটা ঘর ভাড়া করে থাকবে।

হু'-মাস জাহাজটা চাটগাঁ বন্দরে থাকবে। এই হু' মাসের মেঘাণে তারা মনস্তমী সোঁসার পাতবে। এই সন্তে, এই চুক্তিতে চটি জীবন জোড়া লাগল।

রাত গাঢ় হচ্ছে, ঘন হচ্ছে। গাভিটাকে টেনে টেনে খোঁড়া তটো পাতাভতলীর সেই ঘরটার কাছে এসে ঝাঁড়াল, যেটা আসমান ভাড়া করে রেখেছে। যেখানে তাদের হু' মাসের মনস্তমী সোঁসার পাতা হবে।

এক মুঠো ভিক্ষে পাবো মা!

ত্রিধীরেন বসু

নিরীহ জীবন-রশ্মে
মরণের অর্ধেক মহড়া
নিঃশ্বাসে পূর্ণ করে
নিভাকার ভরা।
নিমগ্ন রাতের পাখা
খুলে দেয় শুদ্ধ বাতায়ন,
বিশ্রামের পরমায়ু
রাতভর করে আপ্যায়ন।

ভোর হ'লে,
সুস্থ হলে অভিশান
অনিবার্য ভয়ভীতি ভিড়ে
যাত্রাপথ অসহ্যলান।
মুক্ত দরিপথে
এক মুঠো দানা পেলে,

মধ্যাহ্ন অবশ হাতে
ছিন্ন বস্ত্রখানা মেলে
কুড়াই শতেক।
দূর প্রান্ত হতে ক'ত
অদূরের ফানিক পাহাঙ্গ দেখে
খেমে বাই অনিমেথ।

চারি পাশে
নেমে আসে
অস্পষ্ট গোঁধুলি :
নিজের হারটি আমি নিজে।
মরণের ক্রমা নিয়ে
তবু কেন বেঁচে আছি আমি?
বহুদূর অন্ধুর শীথে
দারিদ্র্যের বীজে!

ভূ স্ব র্গ প রি ক্র মা

ঐশ্বর্যসদ নাগ



ভূস্বর্গের মত পহলগামেও সকালে দেখেছি একটা সাগা
আন্তর্য দিয়ে বাড়ীর ছাদ, মাঠ আর উপলব্ধ ঢাকা।
খিশির জমে এরকম হয়। এইজন্তে সকালে শেবনাগ নদীর ধারে
উপলব্ধের উপর দিয়ে বেড়াবার সময় সাবধানে চলা উচিত।
শিথিলে আঘাত পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

এখানে এক কুকুর নিয়ে বেশ মজা হয়েছিল। সারা কাশ্মীরের
কুকুরগুলো বেশ গ্রাম-ফেড্ গোছের। বেশীর ভাগই পথের বাসিন্দা
কিন্তু কি তাদের পুষ্টি কণ! বাংলাদেশের যেসব কুকুর একটাও
চোখে পড়েনি। শ্রীনগর থেকে পহলগাম আর ওপাশে উলরি—
হানসবল অবধি সব পথের কুকুরই রীতিমত ভয়-ভয়ঙ্কর। হয়ত
আবহাওয়াই এর জন্তে দায়ী। নেপালে দেখেছি মানুষগুলো—বিশেষ
করে পাহাড়ীরা রীতিমত গায়ে-গতরে। কিন্তু পথের কুকুরের এমন
নৈকব কৌলীল চোখে পড়েনি। এমনি এক কুকুরকে রাস্তায় বিস্কুট
খেতে দিলাম। বাস, অমনি বন্ধ হয়ে গেল। ছোট্টলে ফেরবার
সময় দেখি পিছু নিয়েছে। তারপর সোজা দোতলার আমাদের
কামায় এসে জাজির। তখন সন্ধ্যা হয়েছিল—বাইরে কনকনে
ঠাণ্ডা। আমি বিদায় করতেই বাজিলাম। এগিয়ে এল পুষ্প।
বললে—আহা, এত ঠাণ্ডায় বাইরে থাকবে? থাকুক না আজকের
রাতটা ঘরের ভেতরে?

বললাম—কিন্তু কিছু নেই। কুকুর ত দূরব কথা, বাবা-বাচ্চা
খাপদের সঙ্গে থাকতে রাজী আছি। 'মহন্তেরও মরিনি মোরা,
মরি নিয়ে ঘর করি।' কত মরি-দান্দা, কত রাখব-বোয়াল, কত
নেকড়ে-চায়েরা নিয়ে আমরা বাঙ্গালীরা ঘর করছি! এ তো নিতান্তই
নিরাশ্রয় সে তুলনায়।

বাধা নিয়ে হেমপ্রভা বললে—খামুন, খামুন। আপনার সব
তাইতেই রসিকতা! কুকুরটা বাইরেই থাকবে।

তথ্য। বাইবেই থাকা সাবাস্ত হোল। পুষ্প তাকে বাইরে
এল। সাবা রাতটা সে বাইবেই কাটিয়ে দিলে। সকালে দরজা
খুলে আমি তাকে ভেতরে টেনে আনতে গেলাম—কি আশ্চর্য্য, সে
আসবে না! রাত্তি আসতে দিইনি। তাই অভিমান! অভিমান
আর শুধু বাঙ্গালীরাই একচেটে নয়! সারা দিন খেয়ে দেয়ে
আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই রইল, সন্ধ্যা হতে আবার ওপরে এল। এবারে
সন্ধ্যানে, সাদরে অন্তর মহলে প্রবেশ করতে বললাম। কিন্তু
ভূস্বর্গের কুকুর—বাংলার নেড়ী কুত্তা নয়। অভিমানটা নিতান্তই
উচ্চগ্রামের। সে এলো না। পুষ্প হাত থেকেই খেলো। কিছুক্ষণ
পরে বাড়ীর দরওয়ান এসে লাঠি মেয়ে তাকে তাকিয়ে

দিলে। সকালে যথারীতি তার সঙ্গে দেখা হোল—তবে বাড়ীর
বাইরের মাঠে। অনেক সাধ্য-সাধনাতেও ওপরে ওঠা ত দূরের
কথা—বাড়ীর চৌকাঠও মাড়াল না। বাপস! কি অভিমান!
সব অগমানগুলিই স্বরণ করে রেখেছে। কাশ্মীরের কুকুরই
যখন এই, তখন না জানি ওদেশের অজনাগের মনটি কতই
স্পর্শকাতর।

মনোজ বাবু গভীর মুখে বললেন—দাদা, এমন ছিমছাম
দেশের পুঙ্খবেরা দৈহিকদপন্যের চর্চা করবেন আর তার ফলে—
ঐ ওদিকের ওরা ক্রমশঃ পায়ালভারি হয়ে অভিমানত্বরন্ত হবেন—
এ আর বিচির কি! বৈক্যবকাব্যের অভিমান চর্চার যায়গাই
ত এই।

বললাম—কিন্তু ভায়া, ও-ব্যাপারের চরম ত হয়ে গেছে মথুরা-
বন্দাবনে। নিতান্তই ধূলোমাটির পরিবেশে। এখানকার আয়রণ
কাটেনের ওপাশে বাঁরা আছেন, তাঁদের সঙ্গে ত পরিচয় হল না?
সুতরাং কুকুরের অভিমানটা যে এ-দেশের মাটির ফসল, তা তো বলা
যায় না?

কল্যাণী রান্নাঘর থেকে বললে—অভিমানের বিলাস খুব হয়েছে,
ও সব আপনারা বুঝবেন না, থাকবেন আশ্রয়।

এর পরে আর কাব্যদর্শন চলে না। সুতরাং উঠতে হোল।

ফেরবার পথে আমরা সোজাপথেই চললাম—৭২ মাইলের পথ।
এ-পথে প্রথম দ্রষ্টব্য স্থান হচ্ছে মাইওন্। স্বর্ণা আর প্রাকৃতিক
দৃশ্যবলী। এর পর অনন্তনাগ। এটি একটি ছোট সহর।
চারিদিকে বহু স্বর্ণা আছে। তারপর অবন্তীপুর। শ্রীনগর থেকে
১৮ মাইল দূরে। বাস এখানে কিছুক্ষণ থামে। দ্রষ্টব্য হচ্ছে
একটি পুরাতন মন্দিরের অংশবিশেষ। মন্দির, বড় বড় থামওয়ারা
বারান্দা, চত্বর—সবই পাথরের। এককালে জমকালো মন্দির
ছিল। সরকারী এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে যে, ৮৬৫ থেকে
৮৮৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অবন্তীবর্ধন ছিলেন কাশ্মীরের অধিপতি। ইনিই
এই বিষ্ণুমন্দিরটি নির্মাণ করেন। সুতরাং মন্দিরটি নবম শতকের।
“রাজতরঙ্গিনী”তে আছে—অবন্তীবর্ধার রাজত্বকালে সুপণ্ডিত মুক্তাকর্ণ,
শিবধামী, কবি আনন্দবর্দ্ধন ও রত্নাকর বিজ্ঞার জন্তে প্রথ্যাত
হয়েছিলেন। মন্ত্রী শ্রবন্ধাকে দিয়ে উমানাথ-মহেশ্বরের মন্দিরটি
(বিষ্ণুমন্দির?) নির্মাণ করান। কিন্তু জনসাধারণের বিশ্বাস এই
যে, ওটা মন্দিরই নয়, একটা রাজবাড়ী। পঞ্চপাণ্ডব এখানে নাকি
সন্ন্যাসদী বাস করেছিলেন। আমাদের অবস্থা তা মনে হোল না।
সরকারী আর্টস কলেজের পাশকরা, শিল্পনিপুণা হেমপ্রভা চারদিক

আপনার জন্য

চিত্রতারকার মত মধুর লাগ্যে

কামাল আমরোহীর
টেকনিকালার “পাকিজা”
চিত্রের সুন্দরী তারকা



✱ L U X ✱

সুতরাং সুন্দর লাগ্যই মেয়েদের সৌন্দর্যের আসল কারন হতে পারে। মীনাকুমারী বলেন “আমি লাক্স টয়লেট সাবানের সাহায্যেই আমার লাগ্যের চর্চা করি। লাক্সের সেরে মত মোশ্যোম ফেনা আমার ত্বকে নির্বৃত্ত রাখে।” এটা আপনিও দেখতে পারেন কেমন করে লাক্সের ফেনা আপনার লাগ্যে একটা মধুর উজ্জলতা এনে দেয়। লাক্স আপনার লাগ্যের সৌন্দর্যের জন্য ব্যবহার করুন।

বিশুদ্ধ, শুদ্ধ **লাক্স টয়লেট সাবান**

চিত্রতারকাদের সৌন্দর্য সাবান

হিন্দুস্থান লিটার লিঃ, কর্তৃক প্রস্তুত।

LTS/12-X52 BQ

পরীক্ষা করে বললে যে, সরকারী ভাষাই ঠিক। অষ্টম শতকের মুক্কাপীড় ললিতাদিত্যের প্রতিষ্ঠিত কাশ্মীরের বিখ্যাত মার্তিগুপ্তমন্দিরের সঙ্গে এর প্রাউণ্ড প্ল্যানের একটা মিল আছে। সেহুনের দিকের বড় বড় খামওয়ালা কলোনেড বা হলগুলো গ্রীকরীতিতে তৈরী। মার্তিগুপ্তমন্দিরে তা সুস্পষ্ট। গান্ধারশিল্পের প্রভাব এখানে আছে হয়ত।

চুঁচুড়ার দুই ভাই-বোন—অমিয়া ও কল্যাণ শীল যখন ফটো নিতে ব্যস্ত, ধ্বংসস্তূপের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তখন ভাবছিলাম—একে পরস করল কে? প্যাঠান সিকান্দার লোদী না নোগলরা? কালাপাহাড়ী ঐতিহ্যে ত ওদের ইতিহাস ভরা। ইসলামাবাদ থেকে ৫ মাইল দূরে একদা-বিখ্যাত মার্তিগুপ্তমন্দিরকে ত সিকান্দার লোদীই ধ্বংস করেছেন খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকে। আজও সেট বিখ্যাত মন্দিরের নীলাভ-ধূসর রংয়ের পাথরগুলো পড়ে রয়েছে। বিখ্যাত সোমনাথ মন্দির গুজরাটে দেখেছি। মামুদের পৈশাচিক হাতে তার কবন্ধরূপ মনকে পীড়া দিয়েছে। তাঁরই সভার প্রখ্যাত ঐতিহাসিক অল্ বেকরী লক্ষ করে বলেছিলেন—“মামুদ ভারতকে পরাস করে আশ্চর্য সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। অবিদিত স্থান থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞান বিদ্যায় নিয়ে কাশ্মীর, বেনাগস প্রভৃতি যে-সব স্থানে মামুদের হাত পৌঁছাতে পারেনি, সেট সব দেশে পালিয়েছে।”

অল্ বেকরীর বহুব্রাহ্মণেরই প্রকাশ, মামুদের সময়ে কাশ্মীরে, বারানসীতে শক্তিম্যান হিন্দু রাজা ছিলেন। তখনও হিন্দু-সংস্কৃতি কাশ্মীরে কবন্ধ প্রাপ্ত হয়নি। সেদিনের আর তার আগের কাশ্মীরের হিন্দু রাজাদের শক্তির কথা মনে পড়ল। গুর্জরবাজ রামভট্টের পুত্র ভোজ উত্তর-ভারতে পালদের পরাক্রম করে ভারতের অবিকাশ অংশ জয় করেন। কিন্তু কাশ্মীর, বাংলা, সিন্ধু আর মগধ জয় করতে পারেননি। মনে পড়ল অষ্টম শতকের মুক্কাপীড় ললিতাদিত্যের কথা, দ্বাদশ শতকের রাজতরঙ্গিণীর লেখক কল্পন ধীর কীর্তি অমর করে রেখে গেছেন। কাশ্মীরের ককোট বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ইনি। এঁরই সময় হিউয়েন্থ-সাং কাশ্মীর ভ্রমণে গিয়েছিলেন। মগধ, বঙ্গদেশ কামরূপ, উড়িষ্যা, মালব আর গুজরাটেও ইনি প্রাধান্য বিস্তার করেছিলেন। কালকুন্তের যশোবংশের মত ইনিও, বাঙ্গালী সম্রাট শশাঙ্কের মৃত্যুর পর, বাঙ্গালাদেশ আক্রমণ করেছিলেন। পাহাড়-পর্বত ডিঙ্গিয়ে দেড় হাজার মাইল হেঁটে আসা সোজা কাজ নয়। এই খ্যাতনামা ললিতাদিত্যই সেদিন এক বাঙ্গালী রাজাকে ভুলিয়ে কাশ্মীরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করতে কুঠাবোধ করেন নি। অবশ্য তাঁর সেই জঘন্য কাজের প্রতিশোধ নিয়েছিল আর এক বাঙ্গালী রাজপুত্র; কাশ্মীরে গিয়ে আর এক রাজার বৃকে ছুরি বসিয়ে ললিতাদিত্যের আগে খৃষ্টীয় প্রথম শতকে আর এক মহাহুভব সম্রাট কাশ্মীরকে গরীবান্ন করেছিলেন। কুবাণ কণিক কাশ্মীর শুধু জয় করেন নি, চতুর্থ বৌদ্ধ সঙ্গীতিও (মতান্তরে জলন্ধরে) সেখানে করেছিলেন।

ভাবছিলাম, একটাও বৌদ্ধমন্দির ত্রীনগরে বা তার আশে-পাশে নেই কেন? লাডাক্ ছাড়া আর কোথাও বৌদ্ধ-মন্দির আছে কিনা জানি না। গাইডবুকেও কোনও উল্লেখ নেই।

বাস ছাড়লো। আমরা ক্রমে পামপুরে এসে পৌঁছলাম। ছুঁপাশে ফিকে বেঙী রংয়ের জাকরাণক্ষেত দেখা যাচ্ছে। সমগ্র

কাশ্মীর জম্বুর মধ্যে এই পামপুর ছাড়া। জাকরাণ কোথাও জন্মে না। অল্প জাকরাণ জাকরাণ চাষের অনেক চেষ্টা করা হয়েছে, সাফল্য আসেনি। মাটির বিশেষ গুণের জন্তেই এ অঞ্চল ছাড়া আর কোথাও জাকরাণ জন্মায় না। পামপুরের জাকরাণক্ষেত শুধু যে কাশ্মীরকে রাজ্যের একটা অংশ এনে দেয় তাই নয়, এর সৌন্দর্য্যও দেশ-বিদেশের মানুষকে মুগ্ধ করেছে। সিংহাসনলাভের চৌদ্দ বছর পরে জাহাঙ্গীর শাহ যখন কাশ্মীর ভ্রমণে যান চার শত বেগম বাদী আর চার শত পালতোলা জাহাজ নিয়ে, তখন পামপুরের এই জাকরাণক্ষেত তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। আত্মস্বাবনীতে এ কথা তিনি স্বীকার করেছেন।

জাকরাণফুলগুলি চমৎকার দেখতে। মাঠে যখন ফুটে থাকে তখন রং হালকা-বেঙী। কিন্তু তুলবার পর নীলাভ-বেঙী হয়ে যায়। ‘এই ফুলের হলুদে পরাগের সঙ্গে থয়ের রংয়ের যে স্মৃষ্ণ স্মৃষ্ণ শোঁয়া আছে, তাই জাকরাণ। সুতরাং এক তোলা জাকরাণের জন্তে কত ফুল সংগ্রহ করতে হয়, সহজেই অনুমেয়। ইংরেজী অভিধানে এট ফুলকে গাঢ় হলুদে রংয়ের বলা হয়েছে। কিন্তু কাশ্মীরে সে রং দেখিনি। ওল, কচু ইত্যাদি গাছের মত এরও নূল থেকে গাছ হয়। সরকারী এম্পোরিয়ামে ত্রীনগরে খাটি জাকরাণ পাওয়া যায়। তোলা ১২.৬০ টাকা। হাউসবোটে অনেক সময় আড়াই টাকা তিন টাকা তোলা পাওয়া যায়। আমাদের বোটেরও বিক্রোতা এসেছিল কিন্তু ভেজালের বাপারটা জানা ছিল বলে আমরা সাবধান হয়েছিলাম। অবিকাশ সম্ভার জাকরাণট রং-করা কাগজকাটা মাত্র।

সন্ধ্যার আগেই আমরা ত্রীনগরে ফিরলাম। টুরিষ্ট রিসেপশ্যন সেন্টারে হাজির হতেই বোটওয়ালারা টানটানি আগ্রহ করল। বে-মন্তুম কি না! চিন্তা হোল—ঝিলামে না ডাল-এ কোথায় থাকা যাবে কোন্ জায়গার পরিবেশ রমণীয়? অবশেষে ডাল-এই স্থির হোঁপ—নেহেরু পার্কের কাছে।

হাউসবোট চার রকমের আছে। স্পেশাল, এ, বি, সি। মধ্যবিত্তের উপযোগী হচ্ছে বি আর সি শ্রেণীর বোট। চার কামরাওয়ালা বি শ্রেণীর মাসিক ভাড়া ৩৫০ টাকা আর সি শ্রেণীর ২৫০ টাকা। চার কামরায ছ’ জন সহজেই থাকতে পারেন। ডাইনিংরুম আর খাবার ঘরের গালিচার উপর বিছানা পেতে শুতে আপত্তি না থাকলে, দশ-বার জনেরও যায়গা হয়। বি শ্রেণীর প্রতিদিনের জন-প্রতি রোট ৮ টাকা, অন্ততঃপক্ষে পাঁচ জন থাকলে। সি শ্রেণীর জন-প্রতি দৈনিক রোট ৬ টাকা; অন্ততঃ পাঁচ জন থাকতে হয়। গাইডবুকে হাউসবোট, সিকারা, টঙ্গা, বাস ইত্যাদির সব রোট বেঁধে দেওয়া আছে। তার বেশী কেউ নিলে ড্রিঙ্কটার তার প্রতিবিধান করে থাকেন। কিন্তু বে-মন্তুমে, যখন বোটে বোট “টু-লেট” ঝুলতে থাকে—তখন বাধা-বান্দা রোট চলে না। তখন নিছক ডিমাও আর সাপ্লাইয়ের নীতি। তখন গরজ বোটওয়ালার। মে আর নভেম্বর হচ্ছে বে-মন্তুম। এই সময় দর রীতিমত কমানো যায়। আমরাও এই সুযোগটার সদ্ব্যবহার করেছিলাম।

বোটের রোট শুধু বোটভাড়া নয়—খাণ্ডা, খাওয়া, বৈদ্যুতিক আলো, চাকর ইত্যাদি খাতে সব খরচ ধরে। সকালে বেড়টা, তারপরে প্রাতরাশ, দুপুরে ভাত বা রুটি, বিকেলে চা-টোট আর

রাতে কটি বা ভাত। ট্রাউট মাছ বা ডিম হুবেলাই দেয়। মাংস মধ্যে মধ্যে। বাতীর ইচ্ছামুসারে খাতের মেছু বদলায়। বাতীরদের মধ্যে এবার শতকরা নব্বুই ভাগই ছিলেন বাঙ্গালী। সুতরাং বাঙ্গালী-খানার জন্তে আমরা পীড়াপীড়ি করেছিলাম। ওস্তাদ বাঁধিয়ে শেফালী দি' ওদের রান্নাঘরে গিয়ে নির্দেশ দিয়ে বাঙ্গালী-খানা তৈরী করাতেন।

বোটে গিয়ে ওঠবার আগে একটা চুক্তিপত্রে সই করতে হয়। সই করবার সময় সিকারা সমেত চুক্তি করা দরকার। পারাপারের জন্তে এর প্রয়োজন। বোটের সঙ্গে সিকারা না থাকলে, বোটওয়ালার মুখাপেকী হয়ে থাকতে হয় পারাপারের জন্তে। চুক্তির মধ্যে সিকারা ধরা না থাকলে, অতিরিক্ত ভাড়া দিয়ে সিকারা নিতে হয়। ডাল হুদে বা খিলামে বেড়াবার জন্তে অবশ্য আলোচনা করে সিকারা ভাড়া করতে হয়। বোটওয়লাই তার ব্যবস্থা করে দেয়। তখন ভাড়া দিতে হয় বটী হিসেবে।

বাঙ্গালীদের জলে হাউসবোটে বাস করার একটা মোহ আছে। আমাদের কিছু হাউসবোটের জীবন খুব ভালো লাগেনি। তবে একটা বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়, বার মূল্য কম নয়। সম্ভবতঃ ডাল হুদের জলেই রান্না হয়। হয়ত এইজন্তেই বহু বাতীর প্রথম করেক দিন পেটের অবস্থা ভাল থাকে না। খাবার জলটা অবশ্য ভালই। জীনগরের এবং আশে-পাশের সব দর্শনীয় স্থান দেখাশোনা আর কেনাকাটা হয়ে বাবার পর, দু'-তিন দিন হাউসবোটে কাটানই ভালো ব্যবস্থা বলে মনে হয়।

জীনগরের আরতন মাত্র এগারো বর্গমাইল। উত্তর দিকের বড় পাহাড়টার চূড়ায় আছে “হরিপর্বত হর্গ” আর পূর্বদিকের পাহাড়ের উপরে আছে একটি সুন্দর পাথরের মন্দির—“তখত-ই-হুসেমান” বা “সোলোমনের সিংহাসন।” ডাল হুদ এই দুটি পাহাড়েরই পা ধুয়ে দিচ্ছে। দক্ষিণ দিকে আছে শঙ্কর পর্বত আর তার ওপরে শঙ্করনাথের মন্দির। পাহাড়টি হাজার ফিট উঁচু আর মন্দিরটিও হাজার বছরের পুরাতন। নেছর পার্কের দক্ষিণে, রাস্তার ডান দিকে আছে শঙ্কর পার্ক। তার ভেতর দিয়ে শঙ্করনাথের মন্দিরে বাবার পাহাড়ী পথ উঠে গেছে। এই পথে সময় বেশী লাগে—তিনটি পাহাড় ডিজিরে মন্দিরে পৌঁছতে হয়। সোজা পথ হচ্ছে—টুরিষ্ট সেটারের কাছ থেকে। মন্দিরটিতে বাহাহুরী কিছু নেই কিন্তু শিবলিঙ্গটি বিশাল। পরিবেশ শ্রদ্ধার উল্লেখ করে। সরকার পাহাড়ের ওপর পর্যন্ত বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা করেছেন। রাত্রিতে সমগ্র জীনগর সহরটার ওপর মন্দিরটি বেন কর্তৃত্ব করছে বলে মনে হয়। ডাল হুদ থেকেও রাত্রিতে আলোকোজ্জ্বল শঙ্কর পর্বতের দৃশ্য মনোরম।

হাউসবোটের মালিকেরা বিখ্যাত। ঝাড়ুলারের কাজ ছাড়া আর সব কাজই পরিবারের ছেলেমেয়েদের নিয়ে করা করে। হাউসবোটের সঙ্গেই একটা ছোট বোট থাকে। পরিবারের মেয়েরা তাতে বাতীরদের জন্তে রান্নার কাজটা করে। বাতীর জিনিষপত্র সবই এদের জিন্মায় ফেলে রেখে ঘুরে বেড়ান—চুরি হয় না। ব্যবসা এরা জানে, সুতরাং খাতকের ক্ষতি করে না। আমাদের হাউসবোটের মালিক আলি গুসানী অত্যন্ত ভদ্রলোক। সাত দিনের চুক্তি করে পাঁচ দিন থাকার জন্তে কিছুটা উদ্বা প্রকাশ প্রথমে করেছিলেন কিন্তু

নিজেই আবার কমা চেয়ে নেন। কয়েকটা জিনিষ আমরা ফেলে এসেছিলাম। খিলামের তীরে আমাদের হোটেল খুঁজে বের করে, ছেলেকে দিয়ে সেগুলি পাঠিয়ে তবে স্বস্তি পান।

একদিন এঁকে বলেছিলাম—গুসানীজি, আপনাদের নাম শুনে আমাদের দেশের গৌরবান্বিতদের কথা মনে হচ্ছে।

উত্তরে বলেছিলেন—বাবুজি, আমরা হিন্দু ব্রাহ্মণ ছিলাম। মুসলমানরা এ-দেশ জয় করে জোর করে আমাদের মুসলমান করেছিল। আসলে কিন্তু আমরা ব্রাহ্মণ।

কথাগুলো বলবার সময় তাঁর চোখে-মুখে একটা প্রদীপ্ত ভাব ফুটে উঠেছিল।

বোটের মালিকেরা দরিদ্র নয়। আমাদের অনেককে সাত বার কিনতে পারে। এক একটা হাউসবোট তৈরী করতে খরচ পড়ে পঞ্চাশ হাজার টাকা বা তারও বেশী—অবশ্য কার্পেট, সোফা, কোঁচ ইত্যাদি দিয়ে সাজানোর খরচ ধরে। শীতের সময় অর্ধাং ডিসেম্বর থেকে মে পর্যন্ত এরা শাল, কার্পেট ইত্যাদি নিয়ে নেমে আসে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে। তাতেও ভালো রোজগার হয়। কোনও কোনও হাউসবোটে একাধিক ব্যক্তির পার্টনারশিপ আছে।

সকাল থেকেই হাউসবোটে নানা পেশারী সিকারা নিয়ে আসে—ফুল, ফল, মনোহারী জিনিষ, ফিল্ম, পেপারমাসি, শাল, জাকরণ আরও কত কি সওয়ার ভঁরে। বাজার দর জানা থাকলে এদের কাছ থেকে কেনা চলে। নবাগতদের না কেনাই ভালো, কারণ এরা বাজার দর অপেক্ষা বেশী নেয়। জাকরণ এদের কাছ থেকে কিনলে ঠকবার সম্ভাবনাই বেশী।

সেদিন বোটে প্রথম প্রভাত। সোনালি রোদে চারিদিক ঝলমল করলেও ঠাণ্ডার ভয়ে ভইক্কেম বসে আমরা আড্ডা জমিয়েছি। এমন সময় মনোজ বাবু বাইরে থেকে ডাকলেন—দাদা, মহারাজ এসে গেছেন, দর্শন করে যান।

আমরা সবাই দৌড়ে বেরিয়ে এলাম। ভাবলাম কান্দীরের বা কোন্ দেশের মহারাজ বৃষ্টি যাচ্ছেন। দেখি—একটা কার্পেট পাড়া সিকারার সুরেশ মাথায় পাগড়ী এক সুদর্শন প্রৌঢ় বসে আছেন।

জিজ্ঞাসা করলাম—মহারাজ কে? কোথায় তিনি?

চোখের ইসারায় মনোজ বাবু বললেন—এ যে উনি।

—ব্যাপার কি?

—উনি নাপিত মহারাজ, কামাবেন কি?

মেয়েরা সবাই হেসে উঠল। ভবানী বাবুর সখ হাছিল মহারাজের কাছে কামিয়ে দেখেন, কি রকম সাফু কামান হয়। হয়ত ওর মধ্যেও কিছু চাক্কলার সন্ধান পাওয়া যাবে। জিজ্ঞাসা করলেন—বাড়ি বনানেকা ভাও কিতনা?

—জি, আটে আনা। উত্তর এল গভীর মহারাজের কাছ থেকে।

ভবানী বাবু গৃহিণী সুরমতি বললেন—থাক থাক, আর মহারাজের কাজ নেই! সেক্ষেত্রে রেক্সার আছে না?

বেচারি মহারাজ বঙ্গবাসীদের ভাবগতিক দেখে গভীর চালে সরে পড়ল।

সিকারার ডাল ও খিলামে বেড়াবার কাহিনী মনে থাকবে। আমরা আট বটীর চুক্তি করেছিলাম দুটো সিকারার জন্তে কল।

টাকায়। মরগুন অবগু আরও বেশী লাগে। ডাল্‌ হুদ সাড়ে পাঁচ মাইল দৈর্ঘ্যে আর প্রেহে আড়াই মাইল। এর লাগাও আছে নাগিন্‌ হুদ। এ ছটি ছাড়া দূরে দূরে আরও এগারোটি হুদ কান্দীরে আছে। তাদের মধ্যে প্রধান হচ্ছে উলার, মানসবল, শেষ রামনাগ। কুশসায়র আর গন্ধাবল।

এদেশে ফুলের রাজত্ব জুন মাস থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। সে-সময় গোলাপ আর পদ্ম সারা দেশটাকে মাতিয়ে তোলে। আরও যে কত রকমের ফুল কোটে তার ইয়ত্তা নেই। রাজত্বজিগীর মতে গ্রীষ্মই কান্দীরের শ্রেষ্ঠ ঋতু।

স চাতিরম্য: কান্দীরে গ্রীষ্মস্থিতিবহুলভঃ।

হিমলিঙ্গার্চনৈ: প্রোরাণ্‌ বনাস্তেবু কৃতার্থতাম্॥

অর্থাৎ কান্দীরের গ্রীষ্ম অতি রম্য, স্বর্গেও তা হুলভ। সেই সময়ে (রাজা সন্ধিপতি) বনমধ্যে হিমলিঙ্গের (অমরনাথের) পূজা করে কৃতার্থ বোধ করতেন।

সিকারায় যেতে যেতে দেখলাম, পদ্মপাতার সমারোহ—ফুল কিন্তু একটিও নেই। হিন্দু আমলে ডাল-কে পদ্মসরোবর কেন বলা হত তা বুঝলাম। আফশোষ হোল, আরও আগে এলাম না কেন। পদ্মের গোলাপী অরণ্যের মধ্য দিয়ে ভূবর্ষের সূর্যমা অমুভব করার সৌভাগ্য হল না। পদ্মের আফশোষ মেটালেন জলের গায়ক-গায়িকারা। ডুবানী বাবু, মনোজ বাবু, হেমপ্রভা, পুষ্প আর শুভাদি গান দিয়ে ডাল-এর ওপর ছড়িয়ে দিলেন মোহ-মদ্রিতা।

একটা ঘাটে এসে শিকার লাগল। মাঝরা জানাল তজরতবাল। মুসলমানদের পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। আমরা এগিয়ে গি্রে এক বড় হুসলিন দেখলাম। নির্মাতা শাহজাহান—১৬৪২ খৃষ্টাব্দে। এখানে হজরত মোহাম্মদের মাথার বারটি চুল সমস্তে রক্ষা করা আছে। বছরের মধ্যে একদিন তা সব জাতের মানুষকেই দেখতে দেওয়া হয়। মসজিদটির পরিচালকের অত্যন্ত ভক্ত। অফিসে টেলিফোন আছে, বেসে-কেউ বিনা পয়সায় ব্যবহার করতে পারেন। কান্দীরে পাবলিক টেলিফোনে দাম দিতে হয় না। অফিস-সংলগ্ন একটি ধর্মশালাও আছে। যে কেউ থাকতে পারেন, জাতিভেদ নেই। পরিবেশটি আমাদের খুবই ভাল লাগল।

সিকারায় কবে মোগল উজানগুলিতে বেড়ান যায়। ফেরবার পথে আমরা হাসনাবাদ হয়ে আসি। ওখানে পেপারমাসি বা কাগজের মণ্ড জমাট করে নানা আকৃতির টয়লেট সেট, ফুসদানি, ট্রে ইত্যাদি তৈরী হয়। ওখানেই সারা কান্দীরের সেরা পেপারমাসি প্রস্তুতকারক জাফর আলির কারখানা আছে। আমরা কারখানা আর শো-রুম দেখলাম। কাগজের মণ্ডকে জমিয়ে তা দিয়ে কি সুন্দর যে একটা কুটিরশিল্প গড় তোলা যায়, তা এখানে না এলে বিশ্বাস করা যেত না, জাফর আলি মালিক হলো নিজেই আর্টিষ্ট; এখনও নিজে পরিশ্রম করেন। তাঁর কারখানায় পঞ্চাশ জন লোক কাজ করে বললেন। শো-রুমে যে সব কাজ আমরা দেখলাম, যেমন কান্দীরী নক্সা সরকারী আর্ট এস্পোরিয়ামেও দেখিনি। তবে জিনিষ অনুপাতে দামও খুব। বাজার অপেক্ষা চার পাঁচ গুণ বেশী। জাফর আলি একটি উর্দু পত্রিকা নিয়ে এসে, স্বর্গত জামাশ্রাসাদ আর তাঁর নিজের ছবি দেখালেন। বললেন—জামাশ্রাসাদ বাবু তাঁর কারখানাকে এতই ভালবাসতেন যে, কান্দীরে এলে তাঁর কারখানায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতেন।

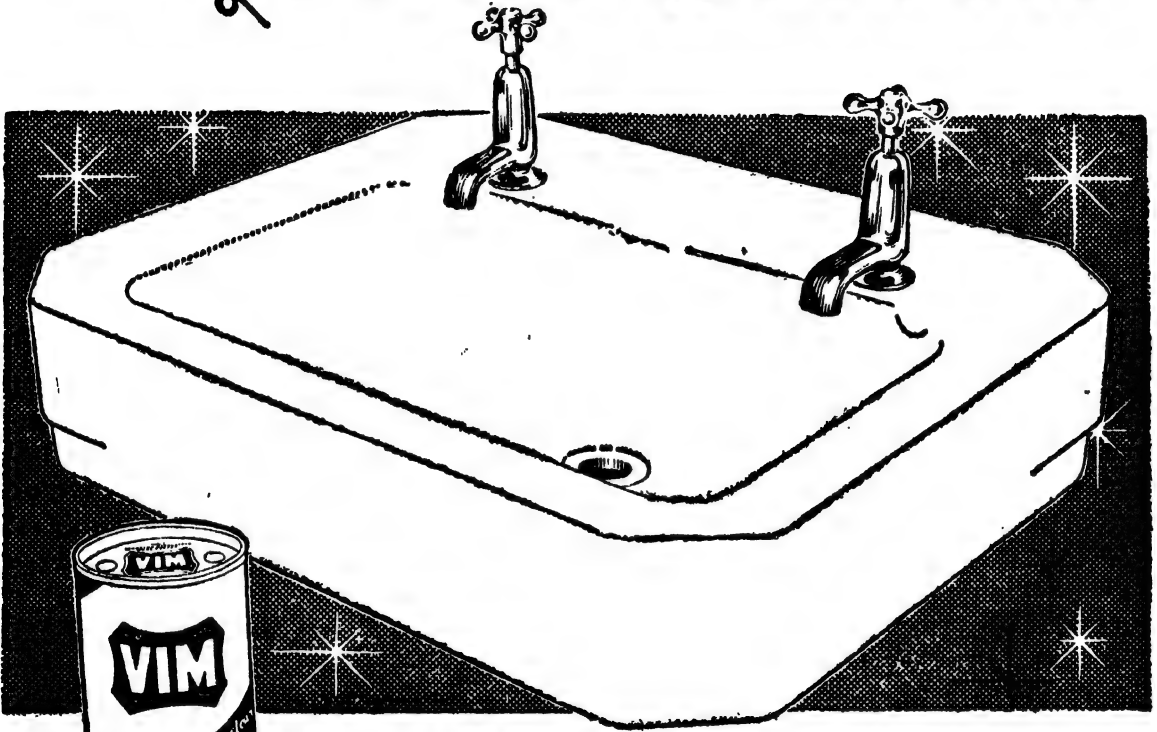
শ্রী নেহেরু, পণ্ডিত পঙ্ক ইত্যাদি ব্যক্তিরাও তাঁর কারখানায় এসেছেন। সব চেয়ে ভালো লাগল পেপারমাসির ট্রেস ওপর গুমর খৈয়াম, তাঁর সাকী আর সুরার চিত্রটি। কি নিখুঁত আর জীবন্ত ছবি! এঁদের তৈরী আখরোট কাঠের জিনিষগুলিও পয়লা নম্বরের।

বিকেলের দিকে সিকারায় করে ঝিলামে বেড়াই। আগেই বলেছি শ্রীনগরে ঝিলাম সন্ধীর্ণ—অধিকাংশ স্থানে বাগবাগারের খালের মত। এক এক বায়গায় দু'পাশে বাড়ীর মাঝখান দিয়ে ঝিলাম চলেছে। তখন মনে হয়েছে ভেনিসে গগোলায় করে চলেছি।

হাউসবোটে থাকাকালীন একদিন আমরা মোগল উজানগুলি দেখতে গেলাম। টুরিষ্ট রিসেশন সেন্টার থেকে বাসে করে যেতে হয়। কেউ কেউ ডাল বা ঝিলাম থেকে সিকারাত্তেও যান। বাস-ভাড়া ১'৭৫ টাকা বাতায়ত। দু'বার বাস ছাড়ে—সকাল সাড়ে আটটায় আর বেলা দুটোয়। বাসের প্রথম বিশ্রাম হারওয়ান্-এ। এখানে জলের রিকার্ভার আর নানা পশুপাখীর ক্ষুদ্র উপনিবেশ আছে। প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যও চলেছে দেখলাম। হারওয়ান্-এ চানার গাছের এভেন্যুটি দেখবার মত। এর পূর্বের বিবর্তি—শালিমার উজানে। শালিমার কথাটির অর্থ—“প্রেমনিলায়।” বাস এখানে এক ঘণ্টা থাকে। স্ততরাং ভাল করে দেখবার অবসর পাওয়া যায়। জাহাঙ্গীর শাহ এটির নির্মাতা। উজানটির দৈর্ঘ্য ১৭৭৭ ফিট আর প্রস্থ ৮০১ ফিট। তিনটি বিভিন্ন অংশে বিভক্ত। জাহাঙ্গীর বাদশাহ কান্দীরে এক মাসের সফরে আসবার আগেই সম্ভবতঃ উজানটি তৈরী করানো হয়েছিল। নির্মাতাও সম্ভবতঃ খোজা ওয়েসী। জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনীতে আছে—তিনি খোজা ওয়েসীকে দিয়ে লাহোরের কাছে শীর হিন্দ-এ উজান রচনা করিয়েছিলেন।

মিসেস টম্বার্টের মতে, উজানটি চোসরোজ্‌ নামক এক পারসিক কার্পেটের ডিজাইনের অনুকৃতি। যার নাম থেকে কার্পেটের নাম, সেই ইরানীর সম্রাট প্রথম চোসরোজ্‌, সামান্য বংশীয় ছিলেন এবং ৫৩১ থেকে ৫৭১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। প্রতিটি উজানের ভেতর দিয়ে চলে গেছে এক একটি ঝর্ণা-খাল। এক ছাদ থেকে আর এক ছাদে নাচতে নাচতে নেমে আসছে আর জমা হচ্ছে এক একটা বড় কুণ্ডে। কুণ্ডগুলিতে আছে ফোয়ারা। জল যখন বেশী থাকে তখন ফোয়ারাগুলি খুলে দেওয়া হয়। আমরা ফোয়ারার খেলা দেখতে পাইনি, কারণ জল তখন ছিল না বললেই হয়। বর্ধাতেই এর সৌন্দর্য্য খোঁসে। খালেও কেওলাগুলি কোথাও বা মার্কেল পাথর কোথাও বা পুরাতন চূর্ণাপাথর দিয়ে তৈরী। মাঝে মাঝে বৈজ্ঞানিক আলোর ব্যবস্থা আছে। রাত্রে জলের ওপর আলোর খেলা চমৎকার। উৎসবযুগে রাজনীতে এই সব আলো জ্বালা হয়। ক্রুশ্চেভ-বুলগানিন যখন কান্দীর ভ্রমণে গিয়েছিলেন, তখন খুবই সমারোহ হয়েছিল। ভি, আই, পিদের আগমন ছাড়া আলো আর ফোয়ারার দ্বৈত খেলা সাধারণতঃ দেখানো হয় না। তা তো হবেই—নীচের তলায় মাছুব সৌন্দর্যের বোঝেই বা কি আর তাদের জীবনে ‘প্রেমনিলায়’ মহাভাব উপলব্ধির অবসরই বা কোথায়? জাহাঙ্গীর-শাহজাহান? মন্ত প্রেমের সময়কারই বা কজন? কুশোকে তাঁদের চরিত্রশো: দিলে কি হবে, একটা বিশাল সাম্রাজ্যের টাকার জোরে নান

ভিম ব্যবহার করলে পরে -দেখুন কেমন ঝলমল করে



ভিম অল্প একটু ব্যবহার করলে পরেই সবজিনিষেরই চেহারা বদলে যায়। কাচের ও চায়ের বাসন, রান্নার জিনিষ, থালা বাটি ও ডেক্‌চী হাড়ী থেকে ঘরের মেঝে—সবই এক নতুন রূপ নেবে। আর ভিম দিয়ে পরিষ্কার করলে জিনিষপত্রে কোন রকম আঁচড় লাগে না। আর কত সোজা ও কম খাটুনীতে হয় ভেবে দেখুন। ভেজা ন্যকড়ায় একটু ভিম ফেলে, আঙুলে আঙুলে ঘষুন আর আপনার চোখের সামনে জিনিষ গুলোর রূপ বদলে যাবে। ভিম ব্যবহার করলে আপনার বাড়ী আপনার গর্বের কারণ হবে।

ভিম সবজিনিষেরই উজ্জ্বলতা বাড়ায়

কীর্তির মাধ্যমে, তাঁদের প্রেমকে “কালের কপোলতলে স্তম্ভ সমুজ্জল” করে রেখে গেছেন। মহাকালকেও ঘুষ দেওয়া যায়।

এর পর বাস খামলো নিশাতবাগে। কথাটির অর্থ “গার্ডেন অফ প্রেমের” বা “প্রেমোদ্যান”। এর নির্মাতা শাজাহানের খণ্ডর আসফ, খান, আগ্রার বহুনাগারের “ইত্তমদৌলা” বীর বিখ্যাত সমাধি-মন্দির। উদ্যানটি তৈরী হয় ১৬৩৪ খৃষ্টাব্দে। দৈর্ঘ্যে ৫১৫ ফিট আর প্রস্থে ৩৬১ ফিট। উদ্যানটি বারটি ছাদে বিভক্ত। ডাল হ্রদের তীর থেকে শুরু হয়েছে। ক্রমশঃ এক একটি ছাদে বিভক্ত হয়ে গাহাড়ের কোল পর্য্যন্ত উঠে গেছে। প্রতি ছাদে গুঠর জন্তে কয়েকটা পাথরের সিঁড়ি আছে। সন্তোষের মাত্রা ধাপে ধাপেই বাড়ে। ধাপে ধাপে বাদশাহী খুশী বাড়িয়ে একেবারে ব্যোমমার্গে পৌঁছে দেওয়াই বোধ হয় আসফ, খানের উদ্দেশ্য ছিল। বারটি ছাদে গুঠর পর এত শীতও কিন্তু আমাদের ঘাম এসে গিয়েছিল। মোগলাই আর বাঙ্গলাই-এ তফাৎ ত হবেই!

মোগল উদ্যানগুলির মধ্যে সেরা এই নিশাতবাগ। পরিকল্পনাটি চমৎকার। ডাল হ্রদে বন পয় ফোটে আর ফুলের সময়ে বন গোলান, ধুই ইত্যাদি নানা ফুলে নিশাত রূপসী হয়ে ওঠে, তখন ডাল-এর জলরাশি থেকে গাহাড়ের কোল পর্য্যন্ত একটা বিশাল, বিচিত্র, অপরূপ কার্পেট রচিত হয়। ডাল-এর ওপারে কুড়ি মাইল দূরে পীরপজাল তখন রচনা করে দক্ষিণের বনবিকা।

শীতকালে এখানে নানা জাতের গাঁদা, মল্লিকা, ডালিয়া, ক্রিসেনথিমাম, বাটনহোল ইত্যাদি ফুল ফোটে। গাঁদার চেহারা আর হু দেখবার মত। নাগপুর, আমেরাবাদ এমন কি বাংলা দেশের মত বড় বড় মল্লিকা এখানে দেখিনি। তবে হলদে আর সাদা-বেগুনী ছোট ছোট মল্লিকাকে এমন অল্প কুটেও আর কোথাও দেখিনি। এখানের হলদে রঙটা বাঙ্গলা দেশের হলদের চেয়েও গভীর আর মনোহারী। দু’ পাশের কয়েকটি গাছ ছাতার মত ছাঁটা হয়েছে। তাতে সৌন্দর্য বেড়েছে।

কাগো, কাগো—কাগো দেখুন—বলে উঠল অগ্নিমা।

সে আবার কি?

ঐ যে—কি স্থলর মিষ্ট আওয়াজ!

ও ত কাক মনে হচ্ছে—কাগো আবার তোমার কোথায়?

বাঃ! কাক বলে ওদের অপমান করবেন? নিতান্ত অভিমানের সুরেই বললে অগ্নিমা।

তোমার কথাই শিরোঘাঘ্য। ওরা কাগোই—অমন ছোট ছোট কালো চেহারা আর অমন মিষ্ট সুর—কাকই বা বলি কি করে?

মনোজ বাবু বললেন—অগ্নিমা বোধ হয় কাকের সঙ্গে ওগো যোগ করে কাগো করেছে। তা ঠিকই করেছে। এই স্থলর পরিবেশে একা একা কি ভালো লাগে—পাশে ‘ওগো’ না থাকলে? ওর একটা ওগোর সন্ধান করতে হয়—

শেফালীদি! বাঁধিয়ে উঠলেন—বলিহারি তোমাদের কল্পনাশক্তি! কোথা থেকে যে কোথায় নিয়ে যেতে পারো তোমরা—

কান্দীরী কাক বা কাগো-এসকল চাপা পড়ল। বাসের হর্ষ বেজে চলেছে—সময় উত্তীর্ণ। তাড়াতাড়ি সদলে উঠে পড়লাম।

নিশাত-এর পরে পড়ে চশমাশাহী। চশমা শব্দের অর্থ বর্ণা। জাহাজীর এম পরিকল্পনা রচনা করেন আর শাজাহান ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে

তা কাজে পরিণত করেন। এখানের বিখ্যাত বর্ণার জলের হস্তম করাবার শক্তি ভারত-বিশ্বস্ত। শোনা গেল, প্রধান মন্ত্রী নেহরুর জন্তে নাকি এখান থেকে জল বিমানে করে প্রায়ই দিল্লী যায়। নিশাতের মত এখানেও ছাদের উপর উদ্যান আছে। তিনটি মাত্র ছাদ। উদ্যানও তেমন সম্বলিত নয়। হয়ত বাদশাহী আমলে এর চেহারা অল্পরূপ ছিল।

নসীমবাগের খ্যাতি এককালে খুবই ছিল। কিন্তু ডালহুসের তীর বরাবর এর বিস্তৃতি নয়, এটি সহরের মধ্যে। নসীমবাগের অর্থ “শীতল বায়ুর উদ্যান।” চীনার গাছের খ্যাতি এককালে এই উদ্যানে খুবই ছিল। কিন্তু সম্প্রতি এটিকে কান্দীরী সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করবার পরিকল্পনা করেছেন। শিক্ষা-অধিকর্তার কাছে সুনন্দন, বাড়ী তৈরীর কাজ এই বছর শুরু হবে আর ৬২ সালের মধ্যে সম্ভবতঃ শেষ হয়ে যাবে। আমরা যেয়ে দেখলাম, উদ্যান আর কিছু নেই। গাছপালা কেটে বিশ্ববিদ্যালয়-ভবন নির্মাণের উত্তোগপর্ক চলেছে। তবে নতুন করে উদ্যানও রচনা করা হবে।

একদিন উলার হ্রদ দেখতে যাওয়া হোল। এটি এশিয়ার বৃহত্তম হ্রদ। রাজতরঙ্গীর আমলে এর নাম ছিল মহাপদ্মহ্রদ। টুরিষ্ট রিসেপশন সেন্টার থেকে বাস ছেড়ে বার বেলা ন’টায়। ভাড়া যাতায়াত ৪.৫০ টাকা।

প্রথম বিশ্রাম গন্ধরবলে। এখান থেকে কিছু উপত্যকার দৃশ্য দেখা যায়। লাডাক বৌদ্ধধর্মের দেশ। গন্ধরবল থেকে সাত দিন পদব্রজে যাত্রা করবার পর ১১৩০০ ফিট উঁচু জোজি-লা গিরিবন্ধ অতিক্রম করে রাজধানী লে অকলের দিকে যাওয়া যায়। কান্দীরীর অন্তর্গত একটি প্রদেশ হচ্ছে লাডাক। এই লাডাকের বিখ্যাত লামা কুশক বাকুলা এখন কান্দীরী সরকারে এক মন্ত্রী। গুলমার্গ, পহলগাম, সোনামার্গ, কোঁকরনাগ আর ইউসমার্গের মত গন্ধরবলও একটা স্বাধীনবাস।

এর পর কিছুদূর গেলে উলার হ্রদ চোখে পড়ে। কিন্তু বাস উলার-তীরে অনেক পরে থামে। পথিমধ্যে পড়ে ক্ষীরভবানী। একান্ত পীঠের অন্তর্গত ক্ষীরভবানী মন্দির হিন্দুধর্মেরই পবিত্র তীর্থস্থান। এখানে নাকি সতীর কণ্ঠ পড়েছিল। পাথরে বাঁধান একটা বিস্তৃত চত্বরের মধ্যে এই মন্দির। চরিত্রিকে বিশালকাঃ চীনারের সমারোহ। এমন মোটা ঠাঁড়িওয়ালা চীনার গাছ খুব কমই দেখা যায়। ভবানীদেবীর মন্দিরটির তিন দিকেই ক্ষীর বা জলে বেড়া দেওয়া আছে বলেই ঐ নাম। শোনা যায়, স্বামী বিবেকানন্দ এখানে এসে তপস্বী করেছিলেন এবং দৈবদেশও নাতি পেয়েছিলেন। পাণ্ডারা আছেন কিন্তু অস্ত্র অনেক তীর্থস্থানের মত গলাকাটার জন্ত ব্যস্ত নন। স্বল্পেই তাঁরা সন্তুষ্ট। চরিত্রিকে পরিবেশের মধ্যে একটা পরিভ্রমতা আছে। দেখলাম, অনেক বাড়ীই পুজো করছেন। হেমপ্রভা ফুল নিয়ে প্রকানত হয়ে পুজো বসে গেল। দলের কেউ কেউ মনে মনে প্রার্থনা জানালেন ভবানী নেতাজীর উপাস্তা দেবী। শিবাজীও এর সাধনা করতেন মনে মনে বললাম—মা বাংলা দেশ থেকে লারেলান্না দূর কর আর মেঘ করে রেখ না।

মানসবল-এ এসে বাস খামলো। উলার-এর সংলগ্ন এক হ্রদ। দৃশ্যবলী চমৎকার। বাড়ীদের বিজ্ঞানের জন্তে এখান

একটি নতুন ঘর তৈরী করা হয়েছে। সম্মুখের পাহাড়ের স্বর্ণাগুলির চমকশাহীর মতই সুখ্যাতি আছে। এর পরের দর্শনীয় স্থান হচ্ছে বাতসাব। এখানে বাস দেড় ঘণ্টা থাকে। উলার এখান থেকে ভালভাবেই দেখা যায়। বতসাব উলার দেখিনি ততক্ষণ মনে মনে এশিয়ার বৃহত্তম হ্রদ সবক্ষে একটা রঙ্গীন করনা ছিল—অবস্থাটা ঠিক ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের “ইয়েরো আন্‌ভিজিটেড্‌”—এর বা মোনালিসার হাসির পুরাতন কাব্যিক ব্যাখ্যার মত। কিন্তু যখন সেরূপ দেখলাম তখন বলতে পারলাম না—

নয়ন ন তিরপিত ভেল।

বড় বড় চড়া পড়ে, চড়ার ওপর আগাছা জমে ডাল লেকের মতই ওকে নিতান্ত “ডাল” করে দিয়েছে। তবে বিস্তার বেশ আছে। উলারেও বোট করে বেড়ান যায়, তবে সহজে নয়। শুনলাম সাত-আট দিন থাকবার চুক্তি করলে তবে বোটওয়ালারা বাতী নেয়, খরচও অনেক পড়ে। আমরা কোনও বাতীকে উলারে বেড়াতে দেখিনি।

এই উলারের উপরেই বন্দীপুর নামে একটি বায়গা আছে। সেখান থেকে ট্রাংবল্‌ হয়ে বাজিল আর কামরী গিরিবন্ধ অতিক্রম করে গিলগিটে আর পৃথিবীর ছাদ পামীরে যাওয়া যায়। এখন ৬-পথ বন্ধ। গিলগিট পাকিস্তানের অধীনে আর পামীর রাশিয়ার। ভারতীয় সামরিক বাহিনী এই সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে তৎপর।

শোপুর আর বারামুলায় বাস থাকে ফেব্রুয়ার পথে। বারামুলাতে শহীদ শেরওয়ানীর একটি মূর্তিস্তম্ভ আছে। ১৯৪৮-এ পাকিস্তানের উদ্ধানিতে উপজাতিরা যখন কাশ্মীর আক্রমণ করে তখন তারা জীনগরের উপকণ্ঠে এই বারামুলায় এসেছিল। এক যুদ্ধের পর ভারতীয় সৈন্যরা তাদের তাড়িয়ে দেয়। সীমান্ত রক্ষার ব্যাপারে এর যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। একে কাশ্মীরের দ্বারও অনেকে বলে থাকেন।

উলারের পথে মানসবল্‌ হয়ে “লোলা উপত্যকা” আছে। গাইডবুকে এর কোনও উল্লেখ নেই। কাশ্মীর ত্যাগ করবার পর এক কাশ্মীরী যুবক সবাদটা দেন। তাঁর মতে, সমগ্র কাশ্মীরে নাকি তত স্বন্দর উপত্যকা আর নেই। এই উপত্যকায় যেতে হলে মানসবল্‌-এ নেমে বেসরকারী বাসে ৩৫ মাইল যেতে হয়। তারপর কিছুটা পদযাত্রা। উপত্যকার মাঝামাঝি একটা হ্রদ আছে; নীল, ফটিক স্বচ্ছ নাকি তার জল। এক পাহাড়ের মধ্যে এক গুহা আছে। তার এক প্রান্ত নাকি হাজির হয়েছে রাশিয়ার। তাই নাম “কারাকশ” বা “কুশের মাথা”। ভ্রমলোকের কাছে গল্প শুনলাম—কয়েকজন ইউরোপীয় ব্রিটিশ আমলে ১২০০ লোক নিয়ে ঐ স্বড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে গিয়েছিল। আর কিরে আসেনি। অবশ্য ওপাশে যদি সত্যিই রাশিয়া থেকে থাকে তাহলে ফেব্রুয়ার কথা নয়। একটা কিছু রহস্য স্থানটাকে ঘিরে আছে তা না হলে সরকারী গাইডবুক-এ তার উল্লেখ নেই কেন? আমাদের আকর্ষণ হল যে, এমন আশ্চর্য্য দ্বারগাটা দেখতে পেলাম না?

সোনামার্গ-এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার প্রেনিয়ার বা হিমবাহ। আর্চব্য জগদীশচন্দ্র ভগীরথীর উৎস-সন্ধানে বেয়ে বে-হিমবাহ দেখেছিলেন, তার স্বরূপ কিছুটা বোঝা যায় সোনামার্গের হিমবাহ দেখে।

জীনগরের টুরিষ্ট সেন্টার থেকে সপ্তাহে মাত্র দুদিন বাস ছাড়ে। অস্বাস্থ্য দিন সামরিক প্রয়োজনে প্রায়ই পথ বন্ধ থাকে। গুলমার্গ বা খেলনুমার্গের মত এখানেও ঘোড়ার চড়ে যেতে হয়। দৃশ্যবলী অপূর্ণ! হিমবাহ যেখান থেকে বেরিয়ে আসছে তার চেহারা অনেকটা বৃহদাকার মাছের খোলা মুখের মতন।

হাউসবোটের স্থবির জীবন কারো কারো খুবই ভালো লাগে। আমাদের কিন্তু কয়েক দিনেই মোহ কেটে গিয়েছিল। বাদে মধ্যে সেই আদিম বেহুইন জেগে ওঠে, তাদের পক্ষে একই পরিবেশে শান্ত, সমাহিত জীবন কাটিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। আমাদের রক্তে বোধ হয় তার আহ্বান পৌঁছেছিল। তাই আমরা ‘ফর পাশ্চার্‌স্‌ নিউ’—নতুন পরিবেশের সন্ধানে চলে এলাম ফিলামের তীরে এক হোটলে। মোগল আমলের সাতটা সেতু আছে এই ফিলামের উপর। অবশ্য এখন সেগুলোর চেহারা কিছুটা আধুনিক করা হয়েছে। জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনীতে আছে, কাশ্মীরে আসবার সময় তিনি বহু সৈন্য সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। তিনি গিয়েছিলেন জলপথে আর সৈন্যরা সমান্তরাল ভাবে স্থলপথে। তাদের বাতাপথ স্বগম করে জাহাঙ্গীর নুরউদ্দিন কুলি বেগকে দশ লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন জঙ্গল পরিষ্কার আর নদীর উপর সেতু তৈরীর জন্যে। সেই সময়েই সেতুগুলি নির্মিত হয়। একটা সিকারা নিয়ে ফিলামের সপ্ত সেতু সহজেই দেখা যায়।

জীনগরের শিক্ষা-ব্যবস্থা দেখবার ইচ্ছা ছিল। শুনেছিলাম, জম্মু কাশ্মীরে প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পর্যন্ত বিনা বেতনে দেওয়া হয় আর সমূহ অর্থের বোঝাটা ভারত সরকারই বহন করে থাকেন। সুতরাং শুধু চীনার, পঙ্গলার আর ছুবার নিয়ে সঙ্কট হতে আমরা পারিনি। তাই একদিন কল্যাণিকে নিয়ে রেসিডেন্সী রোডে শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টরের অফিসে গেলাম। স্লিপ, পাঠ্যপুস্তক ডিরেক্টর ছুতার আইজদ নিজে এসে খুবই খাতির করলেন। সহকারী ডিরেক্টরের অফিসে গিয়ে বললেন—প্রয়োজনীয় পরিচয়পত্র বেন আমাদের দিয়ে দেওয়া হয়।

সহকারী ডিরেক্টর শ্রামলাল দায়না কাশ্মীরী হিন্দু। যথেষ্ট খাতির করে বসিয়ে আলাপ জুড়ে দিলেন। কক্ষে উপস্থিত ছিলেন

ডাঃ বঙ্গুর

মেমোরি কার্ডিয়েল

নারীর স্বাস্থ্য, শক্তি
ও সৌন্দর্য বর্ধন করে

প্রথম প্রস্তুতকারক:

ডাঃ বঙ্গুর ল্যাবরেটরী লিম্ঃ
কলিকাতা-৯

জন্ম ও কান্দীরের শিক্ষা-বিভাগের শারীর শিক্ষার অধিকর্তা শ্রীযুত মালহোত্র আর জনৈক জীবতত্ত্বের অধ্যাপক।

শ্রীযুত রায়না বললেন—কেমন লাগছে আপনাদের কান্দীর ?

বললাম—‘ইয়েরো রিভিউ’র মত নয়। কল্লনার আর বাস্তবের কান্দীরকে একই রকম মনে হচ্ছে। ধীরে ভূষণ বলেছিলেন, তাঁরা মিথ্যা বলেন নি।

বললেন—তা ঠিক। প্রকৃতি এ দেশে মুক্তহস্তে সৌন্দর্য ছড়িয়েছেন কিন্তু একটা জিনিষের খুবই অভাব—অর্থের। দেশটা বড়ই দরিদ্র।

বললাম—আমিও সে-কথা আপনাকে বলতে যাচ্ছিলাম। আমরা বাঙ্গালীরা দারিদ্র্যের সঙ্গে চির-পরিচিত। কিন্তু এখানেও দরিদ্রদের মধ্যে সত্যিই বেদনাবোধ করেছে। আপনাদের দেশে মধ্যবিত্ত প্রায় নেই। অবশ্য থাকলে ভাল হত কিনা বলতে পারছি না। কারণ, স্বাধীনতার পর থেকে বাঙ্গালী মধ্যবিত্তের প্রাণ উপরের তলার আর নীচের তলার দুই বাঁতার চাপে পিষে ফেলা হচ্ছে। আমাদের দেশে মধ্যবিত্তেরাই সহস্র কষ্ট সহ করে সভ্যতার আলোকবর্তিকা তুলে ধরে রেখেছিল। ইংরেজ বাদের বিনষ্ট করতে সাহস করেন, দিল্লীর মসনদওয়ালারা তাদের জীবনকে নরকে পরিণত করেছে। এদের নীতি টেনে ওঠানো নয়—টেনে নামানো। তবুও আমার মনে হয়, মধ্যবিত্ত থাকলে কান্দীরে সৌন্দর্যের সঙ্গে লক্ষ্যী আসতো। তারাই নিত্যানুভব কল্যাণ চেষ্টার ঝাঁপ দিতে পারত।

কথাগুলো বোধ হয় জোরালো হয়েছিল আর আমার শ্রোতারও ছিলেন উচ্চতলার মানুষ। স্তরস্বয়ং কথার মোড় ফেরালেন শারীর শিক্ষা বিভাগের অধিকর্তা মালহোত্র। বললেন—দেখুন, আমার মনে হয়, বাঙ্গালীদের সঙ্গে কান্দীরদের একটা নাড়ীর যোগ আছে। নানা ভাবেই তার প্রমাণ পেয়েছি—

মনে মনে খুসি হলেও বললাম—তা হয়ত সত্য। তবে আমি দ্ব্যর্থক নয়। তাই জোর দিয়ে স্বীকৃতি জানাতে অক্ষম। তবে মনে হয়, কোনও একটা বন্ধন নিশ্চয়ই আছে, তা না হলে দেড় হাজার মাইল দূর থেকে বাঙ্গালীরা ছুটে আসবেই বা কেন? প্রতি বছরই ত আমাদের দেশ থেকেই বেশী লোক এখানে আসে। এ-বছরের কথাই ধরুন না। কয়েক দিন আগে পর্যন্ত শ্রীনগর নাকি কলকাতা হয়ে গিয়েছিল। আগামী বছর হয়ত আরও বেশী বাঙ্গালী বেড়াতে আসবেন। স্তরস্বয়ং দৈহিক না থাকলেও আত্মিক সম্পর্ক একটা আছেই।

শ্রীযুত রায়না বললেন—বাঙ্গালীদের আমরা শ্রদ্ধা করি। এদেশে উচ্চশিক্ষার সূত্রপাত করেছেন তাঁরাই।

জিজ্ঞাসা করলাম—আপনাদের সম্পূর্ণ শিক্ষা-ব্যবস্থাটা কি আঁবেতনিক? অগ্রগতি কেমন হচ্ছে? বাজেট কত?

বললেন—এদেশে বিনা বেতনেই প্রাইমারী থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয়। গত পাঁচ বছরে আমরা তিন গুণ এগিয়ে গিয়েছি। অগ্রগতির হার দ্রুতই বলতে হয়। আগে বাজেট ছিল ৪০ লক্ষ, এখন আড়াই কোটি টাকা। কিন্তু এ তো সবুজ পাত-অর্থ। টাকা পৈসে দেখি:র দিভ্যম আমরা কি করতে পারি।

শারীরশিক্ষার অধিকর্তা বললেন—টাকাটাই বড় কথা নয়। বিজ্ঞান-সম্মত পরিকল্পনা চাই। তা না হ’লে টাকা কোন্ অতলে তলিয়ে যাবে।

বললাম—অতি সত্য কথা। ছুটোরই দরকার। এ-ছুটার ঠিক ঠিক কো-অর্ডিনেশন না হলে কি ছরবছর হয়, তা পঞ্চাব্যবহার কল্যাণে বেশ বুঝতে পারছি।

শ্রীযুত রায়না বললেন—এগারো বছরের কোর্স পশ্চিম-বাংলার কি রকম চালু হয়েছে? তিন বছরের ডিগ্রী কোর্সেরই বা ভবিষ্যৎ কি?

বললাম—পশ্চিম-বাংলার ১৬৮০টি মাধ্যমিক স্কুলের মধ্যে ২৮০টিতে এগারো বছরের কোর্স চালু করা হয়েছে। সবগুলি অবশ্য সর্বাধিকারক নয়। সরকারী টাকায় স্কুলের বড় বড় বাড়িও তৈরি হয়েছে এবং হচ্ছে। তবে ছেলেমেয়েদের শিক্ষার উন্নতি হচ্ছে কিনা, এখনও তা বলা যাচ্ছে না। হু-পাঁচ বছর পরে সমাপ্তি পরীক্ষার ফল দেখে হয়ত বলা সম্ভব হবে। ইতিমধ্যে উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তকের অভাবে শিক্ষক-ছাত্র দু’জনেই মুশ্বিলে পড়েছেন। পশ্চিম-বাংলার কলেজগুলির কর্তৃপক্ষরা দীর্ঘকাল তিন বছরের ডিগ্রী কোর্সের বিরোধিতা করেছিলেন। তার ফলে গ্রাউন্ড কমিশনের টাকা তাঁদের হাতে পৌছায়নি। সম্প্রতি তাঁরা নয়া তালিম মেনে নিয়েছেন। আশা করা যাচ্ছে লীগ-গির তিন বছরের কোর্স চালু হবে।

কল্যাণী করুণ চোখে আমার দিকে তাকাল। অর্ধটা এই—নীরস আলোচনা রেখে চটপট উঠে পড়ুন। বাইরে যেতে পাকোড়ি খেলে কাজ দেখবে। আমিও চোখের ইজিতে জানালাম—এই উঠলাম বলে। আবার আলোচনায় ডুবে গেলাম।

জিজ্ঞাসা করলাম—আপনারা এ-বিষয়ে কি করেছেন?

শ্রীযুত রায়না বললেন—জন্ম আর কান্দীরের মাত্র দু’টি স্কুলে আমরা এগারো বছরের কোর্স চালু করেছি। কলেজে তিন বছরের কোর্স এখনও চালু হয়নি। তবে করা হবে স্থির হয়েছে।

বললাম—আপনার কি মনে হয়, নয়া শিক্ষা-ব্যবস্থার ছাত্র-ছাত্রীদের উপকার হবে? সর্বাধিকারক বিভাগগুলির কাণা-ছেলে পয়সাচেন হবে না ত? পরিচালনার আর আর্থিক ব্যবস্থার দিক থেকে এগুলো একটা বিপর্যয় ডেকে আনবে না কি? ইংলণ্ডে ১৯৬৮ সালের স্পেন্স রিপোর্টে সর্বাধিকারক স্কুলগুলোকে তুলে দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছিল—এত আপনি জানেন। বৃটিশ সরকার তারপর মালটিলেটারেল বিভাগের গড়তে আর এগোন নি। আমাদের মত দরিদ্র দেশের এতো দুঃসাহস কেন বুঝি না। আমেরিকার টাকা আছে। সে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পারে। আমাদের তা করা কি তোগলকী পাগলামি নয়? উদ্বেগ ভাল হলেই কি কাজ ভাল হয়, না বাস্তব বুদ্ধিরও দরকার?

শ্রীযুত রায়না বললেন—আপনার যুক্তির মূল্য আছে। আমরাও নয়া ব্যবস্থা সবকিছু এখনও স্থিরসিদ্ধান্তে পৌছাইনি—এখনও আমরা ভাবছি।

এর পর তিনি কয়েকটি সাফুলার টাইপ করিয়ে আমাদের হাতে দিলেন—বিভিন্ন স্কুল, কলেজকে লেখা। আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় নিলাম। [ক্রমশঃ]

বিপ্লবের সঙ্কাতে

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯২৪ সালের প্রথমেই যখন আমি কলকাতায় চলে এলাম— ঘটনাচক্রে সঙ্গে জীবনধারাও যেন পরিবর্তিত হয়ে গেল। জীবন যেখানেই থাক, বাইরে ছিল,—যেন পাশেই ছিল। এখন সে জেলে—কতদিন থাকবে কিছুই ঠিক নেই—বুকের পাশটা যেন খালি হয়ে গেছে। গত কয়েকটা বছর ধরে সে ছিল আমার বন্ধু, পরামর্শদাতা, পথপ্রদর্শক। আমিও তাঁর ডেপুটি হয়ে উঠেছিলাম। বসন্ত জীবন না থাকলে আমার রাজনৈতিক জীবনের বিকাশ হয়ত অল্প ধারায় চলতো,—আর সেটা হত একটা দুর্বিপাকের নাশাস্তর।

আমি “জীবনবাবু” লিখি না, কারণ তা লিখতে কেমন যেন বাধে। ১৯২০ সালের আগে পরস্পরে “আপনি” বলেই কথা বলতুম। একদিন জীবন বললে, “আপনি-আজ্ঞে” গুলো আর ভাল দেখায় না, ওগুলো বাদ দেওয়া থাক,—“তুমি” সম্পর্ক’ই ভাল—কি বলেন? আমি বললাম, “বেশ।” তারপর, কে আগে “তুমি” বলবে, তাই নিয়ে প্রায় ভোটাভুটি। দুদিকেই সমান ভোট—কাজেই ফয়সালা হওয়া মুশকিল। তারপর জীবন দস্ত বিকশিত করে বললে, “তুমি আগে বলুন।” তারপর একচোট হাসাহাসি হয়ে ফয়সালা হয়ে গেল। সে ফয়সালা আজও বলবৎ আছে,—যেমন শত মতভেদে নয় মধ্যেও মূল আদর্শে মিল বরাবরই আছে।

কলকাতার প্রথমেই প্রয়োজ্য হল একটা রোজগারের ঠাঁট—Ostensible means of livelihood- বংগ-গরের বাড়ীতে থেকে ভারীজামাই বা ব্যবসা চালাচ্ছিলেন—ভাড়ার কাজ—সেটার হয়েছিল অস্তিমরশা। তাকে খাড়া করতে গেলে, আর সব ছেড়ে সমসারই জড়তে হয়। তখনও কিছু টাকা হাতে ছিল,—তাই দিয়ে কলকাতায় জীগোপাল মল্লিক লেনে এক ঘর ভাড়া করে সারদাকে (ব্যানার্জি) বসালুম—হল এক ফার্ণিচারের ব্যবসা—নিলাম থেকে ফার্ণিচার কিনে বিক্রী। খরচ চলে প্রায় পকেট থেকেই। কিছুদিন পরে ময়মনসিং-এর আনন্দ মজুমদার—সুরেনদার এক বৃদ্ধ সহকর্মী—কলেজ রো’তে এক বোর্ডিং করলেন,—বোর্ডিংটা সবই দলের লোক—সুরেনদার আড্ডা। আমি সেখানেই নীচের তলার একখানা ঘর নিয়ে উঠে গেলুম। ২৪ সালের অক্টোবরে সেই বাড়ী থেকেই সুরেন দা’ প্রভুত্বের সঙ্গে রেগুলেশন খিঁতে ধরা পড়ি।

বাই হোক,—ঘবসার outdoor work করার নামে বাইরে বোঝাফেরা বীভীমত চললো। জেরীজেরা কাণ্ডের পর আইন অব্যাহত

আন্দোলন বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে অসহযোগ আন্দোলন মোটামুটি ব্যর্থ হল বলেই লোকে ধরে নিয়েছিল,—এবং তারপর মহাস্বাভাবিক গ্রেপ্তার ও জেগ হওয়াতে আন্দোলনের ভাঙ্গন প্রায় সম্পূর্ণ হয়েছিল। কতকগুলো জাহাঙ্গীর খন্দর উৎপাদন কেন্দ্র, আর কতকগুলো জাহাঙ্গীর একমাত্র সংগ্রামী রাজনৈতিক কর্মপন্থা স্বরাষ্ট্র পার্টির প্রচার কেন্দ্র,—এই ছিল কংগ্রেসের মোট শক্তি। শতকরা ৯০ জন উকীল এবং ছাত্র কোর্ট-কলেজে ফিরে গিয়েছিল,—এবং বহু ভা.গান্তেই স্থানীয় কংগ্রেস কমিটিও উঠে গিয়েছিল—ঢালা, বরানগর, আলমবাড়ীতেও।

কিন্তু স্বরাষ্ট্র পার্টির গণভিত্তি রক্ষার জন্যে স্থানীয় কংগ্রেস কমিটির পুনরুজ্জীবন প্রয়োজন। আমি ঢালার আবার এক কংগ্রেস কমিটি গঠন করলুম—আলীপুরের উকীল শ্রীরামচন্দ্র মিত্র (অমূল্য সিংহের মাতুল) প্রেসিডেন্ট,—আর আমি সেক্রেটারী। বরানগরে কয়েকজনকে নেড়েচেড়ে লেখে ভাল ছেড়ে দিলুম। আলমবাড়ীতে তুলসী ঘোষ ও ধীরেন চাট্টোজে আবার কংগ্রেস কমিটি করে কাজ করতে রাজী হলেন—সেখানে এক কমিটি হল। ভাটপাড়াতে আমাদের একজন পুরাতন সহকর্মী—নগেন দাস, অন্তরীণ থেকে মুক্ত হয়ে এক দোকান করে বসেছিলেন,—আর ছিলেন কালী ভট্টাচার্য—আগে তিনি বিপিনদাস সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, এবং পরে হয়েছিলেন একজন শ্রমিক নেতা। যজ্ঞেশ্বর গাঙ্গুলী বলে আমাদের একটি ছেলেও ছিল (এখন একজন ইনকাম ট্যাক্স অফিসার)—এঁদের নিয়ে ভাটপাড়াতেও এক কংগ্রেস কমিটি করা হল।

কংগ্রেসকে বিপ্লবের পথে টেনে আনা ছিল আমাদের লক্ষ্য—আমাদের সংগ্রামীশীল চেতনার “দুধের সখ ঘোলে মেটানোর” জন্তে আমরা ধরেছিলাম স্বরাষ্ট্র পার্টির সংগ্রামী কর্মপন্থাকে। কিন্তু জনগণের সংগ্রামী চেতনা অল্প দুই ধারায় প্রবাহিত হতে সক্ষম করেছিল।—এক ধারা হচ্ছে শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলন,—আর তার মধ্যে ধীরে ধীরে বলশেভিকবাদের অল্পপ্রবেশ,—এবং আর এক ধারা হচ্ছে সাম্প্রদায়িক চেতনা ও হাঙ্গামা। এই সাম্প্রদায়িক চেতনা এবং হাঙ্গামাটাই সব চেয়ে দ্রুত বেড়ে উঠছিল,—এবং হিন্দু-মুসলমান মিলন যেহেতু কংগ্রেসের কর্মপন্থার একটা বড় অঙ্গ, সুতরাং কংগ্রেস নেতারা,—কি হিন্দু, কি মুসলমান,—সকলেই সব চেয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন। মুসলমানেরা মসজিদে নমাজ

পড়ছে,—এমন সময় এক হিন্দীয়া সংকীর্ণনের দল এক শব্দবাক্স করে বাজে। মসজিদ থেকে মুসলমানেরা বেরিয়ে বললে—এখন নমাজ হচ্ছে,—তোমরা সংকীর্ণন একটু বন্ধ করে যাও। হিন্দুরা রাজী হল না,—মুসলমানরা ইট-পাটকেল ছুঁড়ে শব্দবাক্সের মিছিল ভেঙ্গে দিলে। এই ভাবে একজায়গায় গোলমাল শুরু হতেই সব জায়গায় সেটা ছড়িয়ে পড়লো অনেক বড় হয়ে। মুসলমানেরা দাবী করলো, নমাজের সময় হোক বা নাই হোক,—মসজিদের সন্মুখ দিয়ে বাজনা বাজিয়ে যাওয়া কোন সময়েই চলবে না। হিন্দুদেরও জেদ চড়লো, তারা মসজিদের সন্মুখ দিয়ে সংকীর্ণন করে বাবেই—গান-বাজনা থামাবে না। ইটপাটকেল গিয়ে পাড়ালো লাঠিবাহীতে। নিত্য নতুন জায়গা থেকে লাঠীলাঠির খবর আসে।

অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছে,—স্বরাজ এক বছরে দু'বে থাক, কত বছরে হবে তার ঠিক ঠিকানা নেই। অসহযোগের ফলে কিছু মুসলমান ছাত্রেরও লেখাপড়া বন্ধ হয়েছিল,—এখন সাম্প্রদায়িক মুসলমান নেতারা বলতে শুরু করলে—হিন্দুরা লেখাপড়ায় অনেক এগিয়ে আছে,—তাদের চেয়ে মুসলমানদের ক্ষতি হল বেশী।

খিলাফত আন্দোলনও ব্যর্থ হয়েছে। মুস্তাফা কামাল পাশা সের্ভাণ্ট সন্ধির বিরুদ্ধে বিব্রোহ করলে ভারতের খিলাফত কর্মীরা উৎসাহিত হয়ে চালা তুলে একগানা এরোপ্লেন কিনে তাঁকে উপহার দিয়েছিল। সেই কামাল পাশা এখন নতুন তুর্কী রাষ্ট্র গঠন করলেন, তখন সর্বাঙ্গে তিনি খিলাফতই ভেঙ্গে দিলেন। তুরস্কের সুলতান ছিলেন সমগ্র মুসলমান জগতের ধর্মগুরু। তাইই নাম খিলাফত। প্রেসিডেন্ট কামাল পাশা মুসলমান জগতের সঙ্গে তুরস্ককে জড়িয়ে রাখার ব্যবস্থা তুলে দিলেন এবং তুরস্ককে করলেন একটা মডার্ন স্টেট। ভারতের খিলাফত আন্দোলনের স্বভাবতই সমাপ্তি হয়ে গেল।

ভারতের মুসলমানেরা, ধারা খিলাফত আন্দোলনের সঙ্গে স্বরাজ আন্দোলনেও যোগ দিয়েছিলেন, এবং বুটিন সরকারের বিরুদ্ধে একটা সংগ্রাম করছিলেন, দুই দিক থেকে ব্যর্থ হয়ে, তাঁদের মনের বিব সাম্প্রদায়িকতার চোরা গলিতে প্রবাহিত হল। অসহযোগ আন্দোলনের জোয়ারের যুগে দিল্লীতে আর্থ সমাজের নেতা স্বামী প্রদ্বানন্দকে মুসলমানেরা জুমা মসজিদে বক্তৃতা দিতে দিয়েছিল। সাম্প্রদায়িক হাজারো শ্রদ্ধা হওয়ার পর হিন্দুরা যেমন হিন্দুসভার সংগঠন শুরু করেছিল, তেমনি প্রদ্বানন্দ শুদ্ধি আন্দোলনও শুরু করেছিলেন,—মুসলমানদের “শুদ্ধি” করে হিন্দু করে নিতে শুরু করেছিলেন। আবার হিন্দুদের এই শুদ্ধি ও সংগঠনের পাণ্ডা ব্যবস্থা শুরু করেছিলেন কংগ্রেস নেতা উত্তর সৈকুন্দীন কিচলু (এ যুগে যিনি শান্তি সংসদের প্রেসিডেন্ট রূপে টেলিন প্রাইজ পেয়েছেন)। কিচলুর আন্দোলনের নাম তবলীগ ও তাজ্বিহ আন্দোলন—মুসলমান সংহতির আন্দোলন। এই সব সংগঠনের যুগে—বোধ হয় ২৩ সালের শেষে—দিল্লীতে স্বামী প্রদ্বানন্দ একদিন এক মুসলমান আততায়ীর ছুরির আঘাতে নিহত হলেন। সাম্প্রদায়িক বিরোধ আরো বেড়ে গেল। প্রকাশ্য স্থানে গোহত্যা, এবং তা নিয়ে দাঙ্গাও হল।

এই সব ব্যাপারের পাশাপাশি আর এক রকমের আর একটা

আন্দোলনও মুসলমানদের মধ্যে শুরু হয়েছিল—সে মুসলমানদের কাউন্সিলে সদস্য সংখ্যা এবং সরকারী চাকুরীতে নিয়োগের সংখ্যার অনুপাত বৃদ্ধির আন্দোলন। বাংলার এ আন্দোলন বেশ জোর পেয়েছিল,—কারণ এখানে মুসলমানের সংখ্যা বহু বেশী, পলায়িকার ছিল তার তুলনার অনেক কম। কাজেই দেশবন্ধু মুসলমানদের অসন্তোষ নিবারণের জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টা করছিলেন, যাতে ক্রমবর্ধমান সাম্প্রদায়িক হাজারো শান্তি হয়। তাঁর নেতৃত্বে এক হিন্দু মুসলমান প্যাণ্ট বা চুক্তি হয়েছিল,—যাতে মুসলমানদের পৃথক নির্বাচক মণ্ডলী এবং কিছু বেশী কাউন্সিলের সদস্য পদ এবং চাকুরী স্বীকৃত হয়েছিল,—এবং স্থির হয়েছিল,—হিন্দুরা মসজিদের কাছ দিয়ে সংকীর্ণনাদি নিয়ে যাওয়ার সময় মসজিদের কিছু আগে থেকে কিছু পরে পর্যন্ত গান বাজনা বন্ধ করে বাবে,—আর হিন্দুদের ধর্মভাবে যাতে আঘাত লাগে, মুসলমানেরা এমনভাবে গোহত্যা করবে না।

স্বভাবতই মুসলমানদের পক্ষ থেকে এই চুক্তিতে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করা হয়েছিল,—এবং সাম্প্রদায়িক বিরোধের শান্তি-কামনাও করা হয়েছিল। এমন কি এই, চুক্তির পরে ২৪ সালের প্রথমে (বা ২৩ সালের শেষে?) ঈদের সময়, কলকাতার—ইতিহাসে এই একটা মাত্র বৎসর গো-কোর্বাণী হয়নি—বড় মসজিদে কোর্বাণী হয়েছিল একটা উট,—অল্প ভেড়া। সরস্বতী প্রেস থেকে প্রকাশিত “সারথি” পত্রিকার আমি এই চুক্তি সমর্থন করে এক প্রবন্ধ লিখেছিলুম (২৪ সাল)—যার জন্মে—সুরেনদা বলেছিলেন—মরমনসিংএ সারথির কিছু মুসলমান গ্রাহক বেড়েছিল। চুক্তির বিরুদ্ধে হিন্দুদের তরফ থেকে প্রতিবাদের ঝড়ও উঠেছিল। বিশেষত নো-চেমার কংগ্রেসীদের তরফ থেকে প্রো-চেম নেতার বিরুদ্ধে বিযোক্তাদের যেন একটা মহাসুযোগ জুটে গিয়েছিল। ফলে কংগ্রেসের মধ্যে হিন্দুস্তা-বৈবা একটা দল গড়ে ওঠার সূত্রাত হয়েছিল,—যে দল পরবর্তী কালে হিন্দুসভাসভার রীতিমত বিটিয়ে পরিণত হয়েছিল। সুতরাং এখন কোকোনদ কংগ্রেস দেশবন্ধু তাঁর হিন্দু মুসলমান-চুক্তি মঞ্জুরী জন্তে উপস্থাপিত করলেন, তখন সে মঞ্জুরী প্রত্যাখ্যাত হল। মৌলানা মতম্বর আলী বিরক্ত হয়ে বললেন, আজান আর সংকীর্ণনই যদি হিন্দু-মুসলমান মিলনের চেয়ে বড় ধর্ম হয়, তাহলে আমাদের এ চুক্তিটা ভাগ করাই ভাল।

জেলে মহাত্মাজীর অ্যাপেলিগেটাইটস হয়েছিল, এবং তাঁকে হারবেলা জেল থেকে পুণার সাতজন হাসপাতালে এনে অপারেশন করা হয়েছিল,—এবং তিনি আরোগ্য হওয়ার পর গভর্ণমেন্ট তাঁকে মুক্তি দিয়েছিল। তাঁর মুক্তির পরই উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কোহাটে এক প্রকাণ্ড দাঙ্গা হয়, এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের হাতে হিন্দুরা বহু সংখ্যায় হতাহত হয়। মহাত্মাজী আশ্বত্থব জন্তে ২১ দিন অনশন করেন। অনশনের সময় তাঁর শব্দ্যাপার্থে সকল সম্প্রদায়ের নেতারা উপস্থিত হয়েছিলেন।

বাই হোক, এদিকে স্বরাজ্য পার্টি কাউন্সিলের সাধারণ সীট প্রায় সবগুলো দখল করেছিল, এবং কলকাতা কর্পোরেশনেরও সব সীট দখল করেছিল। কাউন্সিলের নির্বাচনে হুটো কেন্দ্রে হয়েছিল সবচেয়ে বড় জয়। বারাকপুরে সুরেন্দ্রনাথ পরাজিত হয়েছিলেন বিধান রায়ের কাছে, এবং বড়বাজারে এস, আর, দাশ পরাজিত হয়েছিলেন

সাতকড়িপতি রায়ে'র কাছে। এস, আর, দাশের তখনকার দিনে, ৬০ হাজার টাকা খরচ হয়ে গিয়েছিল। তিনি দেশবন্ধুকে বলেছিলেন,—তোমাদের স্বরাজ যেদিন হবে, সেদিন আমি বিলেতে পালাবো।

বিধান রায়কে নির্বাচনে নামিয়েছিলেন দেশবন্ধু স্বয়ং। তিনি প্রথমে তাঁকে বলেছিলেন, তুমি কংগ্রেসের সদস্য (চার আনার) হয়ে যাও আমরা তোমাকে ইলেকশনে দাঁড় করাই। বিধান বাবু কংগ্রেস সদস্য হতে রাজী হননি—ইলেকশনেও দাঁড়াতে চাননি। তারপর দেশবন্ধু বলেন,—বেশ, কংগ্রেসের সদস্য নাই হও,—ইণ্ডিপেন্ডেন্ট প্রার্থী হয়ে ইলেকশনে দাঁড়াও, আমরা তোমাকে সমর্থন করবো। তাই শেষ পর্যন্ত হল, বিধান রায় জিতলেন,—এবং তার পরে কংগ্রেসের সদস্য হলেন।

ময়মনসিং-এ নলিনীরঞ্জন সরকারকেও ইলেকশনে নামিয়ে ছিলেন স্বয়ং দেশবন্ধু,—এবং তিনি পরাজিত করেছিলেন এস, এম, বোসকে, যিনি পরবর্তী কালে বোধ হয় অ্যাডভোকেট জেনারেল হয়েছিলেন। বিপ্লবীরা, বিশেষতঃ যুগান্তর পার্টি,—এবং তার তখনকার নেতা স্বরেন দা এই সব নির্বাচনে দেশবন্ধু স্বায়া হাতিয়ার রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

অহুশীলন পার্টি কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার পর থেকেই দুই পার্টির মিলনের চরম পর্যবসিত হয়েছিল দুই পার্টির প্রতিযোগিতায়, এবং সে প্রতিযোগিতা ক্রমে রক্তাক্ত পর্যন্ত উঠেছিল। ঢাকা ছিল অহুশীলনের দুর্গ,—ঢাকা জেলা কংগ্রেস কমিটি তাদের দখল করা চাইই,—অথচ সেখানে সুপ্রতিষ্ঠিত নেতা ছিলেন শ্রীশ চ্যাটার্জি, যিনি অহুশীলনের লোক নন, এবং দুটো বছরের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ঐয যুগান্তরের দাদাদের সঙ্গে, এবং বিশেষভাবে জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল। অহুশীলনের নেতা প্রতুল গাঙ্গুলী তাঁর ভগিনীপতি উকীল মনোরঞ্জন ব্যানার্জিকে শ্রীশ বাবুর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেতৃত্ব দখল করতে খাড়া করেছিলেন। সে প্রতিযোগিতার মধ্যে একদিন শ্রীশ বাবুকে খুন করবে ভয় দেখাতে এক ছোকরাকে রিভলবার দিয়ে পাঠানো হয়েছিল,—কিন্তু ঘটনা গড়ালো অস্ত্র দিকে। ছোকরাকে রিভলভার সমেত ধরে শ্রীশ বাবু পুলিশের হাতে দিলেন।

খবরটা যখন কলকাতায় এল, তখন দেশবন্ধু অহুশীলন পার্টির ওপর চটে আগুন হয়ে গেলেন,—এবং যুগান্তরের দাদাদের তরফ থেকে জীবনকে পাঠানো হল ঢাকায়, এক দিকে শ্রীশ বাবুকে অভয় দেওয়ার জন্তে,—আর একদিকে প্রতুলবাবুকে জানিয়ে দেওয়ার জন্তে যে, শ্রীশ বাবুর ওপর আর কোন আক্রমণের চেষ্টা হলে যুগান্তর পার্টি সেটাকে নিজেদের ওপর আক্রমণ বলেই মনে করবে। তার পরে আর শ্রীশ বাবুর ওপর আক্রমণ হয়নি।

আর একদিকে রিক্রুটিংয়ের টানা-হেঁচা। আগে রিক্রুটিংয়ের প্রসঙ্গতো ছিল এক একটি ছেলের পিছনে ছ'মাস ধরে লেগে থেকে তাদের ভারত মাতার দুঃখে কাতর হতে শেখানো,—এবং কিছু বোমা পিস্তল যোগাড় করে ভবিষ্যতে একদিন ইংরেজগুলোকে যেরে তাড়াতে পারলেই যে ভারতমাতার শৃঙ্খল খন খন করে ভেঙ্গে যাবে, পরাধীনতার বেদনার টনটানি আর থাকবে না, এবং স্বাধীনতার পতাকা পংপং করে উড়বে,—এই কথা কটা মুখস্ত করানো। কি

করে কতদিনে কি হবে, সেটা দাদারা জেনেন, ছেলেদের কাজ শুধু দাদাদের ইজিতে চলা,—কারণ, তারাতো বিপ্লবের সেপাই মাত্র।

বোমা-বন্দুকের কাজকর্ম যখন সামনে কিছুই নেই,—তখন হুগুয়াবিবর্তীরা সহজেই কথা কটা শিখে ফেলতে এবং আঙুড়াতে সুরু করে দিত। এই সংজ্ঞা রিক্রুটিংয়ের স্থলে এক নতুন প্রসঙ্গ দেখা দিল,—ছেলেগুলোর দুই কাণ দিয়ে দুই দপের নিশ্চয় চুকতে সুরু করলো। অহুশীলন পরে আসরে নেমেছে, সুতরাং আগে তারা সুরু করে দিতেই প্রেনেদুটা দুপক থেকেই পাকা হবে গেল—সুতরাং ছেলেগুলো “তেওটে মাথতে” গুরু করলো। কিছু দিন টানাটানির মধ্যে দুই দলেরই সত্য-মিথ্যা সম্ভাব্য-অসম্ভাব্য নিশ্চয়গুলো শিখে ফেলে শেষ পর্যন্ত একটা দলে ভিড়ে গিয়ে ছেলেটা আর এক দলের নিশ্চয় প্রচার করে—এই দাঁড়ালো এ যুগের অনেক ভাল ভাল ছেলেদের পরিণতি। যাদের হাত ফসকে যায়, তারা বলে, ছেলেটা পয়মাল।

ঢাকায় সারা জেলা থেকে ছেলেরা কলেজে পড়তে আসে,—গরার পাণ্ডার মত দুই দলের এজেন্ট ঠেঁশনে হাজির থাকে তাদের ধরবার জন্তে,—যে যাকে পারে ধরে নিয়ে যায় নিজেদের মেস-বোডিং বা আস্তানায়—এই হয়ে দাঁড়ালো রেওয়াজ। শেষ পর্যন্ত টানাটানি থেকে ছুরিমাগা পর্যন্ত সুরু হল। হাত ফস্কানো ছেলেকে পর্যন্ত ছুরি মাগা হয়েছে। ঢাকায় অহুশীলনের ইতিহাসে এই ছুরি-বাজীর বাতাহুরী একটা রেকর্ড। এ সব কথা বাইরের লোক জানেনা,—কিন্তু জানার প্রয়োজন আছে, পরবর্তী কালের ইতিহাস বোঝবার জন্তে।

প্রায় এই রকম টানাটানি শুভাবাবুকে নিয়েও চলেছিল। তবে তিনি যেহেতু স্থল পালানো স্থলবয়ন নন, সুতরাং তাঁকে ভারত উদ্ধারের গুপ্তপ্রক্রিয়া শিক্ষা দিতে বাওয়া চলে না,—আর কানে কানে অপারদলের নিশ্চয়ও চলে না। প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রিন্সিপালকে পদাঘাত,—I C S চাকুরীর মোহের মস্তকে পদাঘাত,—ছাত্র ও তরুণদের কাছে প্রচুর জনপ্রিয়তা,—অর্থাৎ বোমা-বন্দুক-খুন ডাকাতির সম্পর্ক ছাড়া সকল বিষয়েই নেতৃত্বের গুণসম্পন্ন। সুতরাং তাঁকে রিক্রুটি করার একমাত্র কায়দা হল গুণগুরু ভক্তের মতন “কোলান” কথা বলা। তাঁকে নিয়ে দুই বিপ্লবী দলে তারই প্রতিযোগিতা চলেছিল। কিন্তু সে পরবর্তীকালের কথা—পরে হবে।

২৪ সালে তিনি ছিলেন নেতৃত্ব-দোভহীন বিনয়ী নীরব কর্মী। তাঁকে নেতা করে অহুশীলন পার্টিকে নিয়ে কাজ করার যে প্ল্যান উপেনদা করেছিলেন,—সেটা কীসে গিয়েছিল,—এবং তার একমাত্র ফল হুইছিল,—যুগান্তরের দাদারা বুঝলেন উপেনদাকে কনট্রোল করা যাবে না,—সুতরাং তাঁরা স্থির করলেন দাদাকে কোণঠাসা করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে অমরদাকেও তাঁরা খরচের খাতায় লিখলেন, কারণ তিনি উপেনদার পরামর্শেই চলেন, এবং চলবেন।

এদিকে গোপী শার কীসীর পর একদল ছাত্র তাঁর বৃত্তদেহ নিয়ে সংকার করবে বলে দাবী করলে—সুভাষবাবু তাদের নেতৃত্ব নিয়ে জেল গেটে গিয়ে হাজির হলেন। স্বরাজপার্টি উপলক্ষে তাঁর যে বিপ্লবী দাদাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল তা I.B.র অজানা নয়। তারপর এই ঘটনায় তাঁর নাম I.B.র খাতায় পাকা হয়ে গেল।

গোপী শা'র সম্বন্ধে মহাস্বামী বলেছিলেন, তার প্যাট্রিয়টিক মোটিভ থাকতে পারে,—কিন্তু সে কাজটা করেছে অত্যন্ত গর্হিত। দেশবন্ধু বলেছিলেন, তার কাজটা ঠিক হয়নি বটে, কিন্তু তার দেশপ্রেমের তুলনা নেই। এই দু'কন্মের কথা নিয়ে অ্যালবার্ট হলের এক সভার নো-চেঞ্জ প্রো-চেঞ্জ ছই দলে প্রায় মারামারি হওয়ার জোগাড় হয়েছিল।

যুগান্তরের দাদারা সবস্বতী লাইব্রেরীর সুবাদে গোপীকে নিজের দলের ছেলে বলে দাবী করেন,—কিন্তু তার উপর সবচেয়ে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন প্রোঃ জ্যোতিষ ঘোষ (মাষ্টার মশাই)—যিনি সম্ভাব্য মিত্রেরও সমর্থক ছিলেন। যুগান্তরের দাদারা যে তখন সঙ্গ্রামবাদী কার্যকলাপের বিরোধী, এটা ভুললে চলবে না।

যাই হোক, স্বরাজ্যদল কর্পোরেশন দখল করার পর চীক এম্বিকিউটিভ অফিসারের পদ নিয়ে এক গুণগোল সৃষ্টি হল। বীরেন্দ্রনাথ শাসন মল মেদিনীপুরে ইউনিয়ন বোর্ড গঠনের বিক্ষিপ্তে সভাপ্রহ আন্দোলন করে জরী হয়ে খুব জনপ্রিয় হয়েছেন,—তিনি চান, তাঁর কর্মশক্তি প্রমাণ করার বৃহত্তর ক্ষেত্র কর্পোরেশনের কর্মকর্তৃৎ। দেশবন্ধু স্থির করলেন, তাঁকেই সে পদে বসাবেন।

কিন্তু যে স্বরাজ্য পার্টির সাকল্যের জন্তে যুগান্তরের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত হয়েছে, সেই স্বরাজ্যদলের হাতে কলকাতা কর্পোরেশনের কতৃৎ আসার পরেও সেই যুগান্তর দলের অর্থসম্ভার কোন সুরাহা হবে না,—এ কেমন কথা? বুনো শাসনমলের গায়ে দাঁত বসানো অসম্ভব,—সুতরাং সুরেন দা ঠিক করলেন কর্পোরেশনের কর্মবর্তা করতে হবে সুরভ বাবুকে। তাতে প্রভাব বাবুর সঙ্গেও সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হবে, আর কতকগুলো ছেলের চাকরী-বাকবী এবং কিছু অর্থের সংস্থানও হবে। তিনি সুরভ বাবুকে বসলেন। সুরভ বাবু বসলেন, তা কেমন করে হবে?—দেশবন্ধু যে শাসনমলকেই বসাতে চান।

তখন নাকি সুরেন দা বাসন্তীদেবীকে গিয়ে ধরলেন, এবং তাঁকে দিয়ে দেশবন্ধুকে বাগ মানিয়ে শাসনমলের বদলে সুরভ বাবুকে কর্পোরেশনের গদীতে বসাবার ব্যবস্থা করলেন। শাসনমল বিপ্লবী দাদাদের ওপর এমন ক্ষেপে গেলেন যে, ২৫ সালে (কৃষ্ণনগর)—‘আদেশিক কনফারেন্সে বিপ্লবীদের সম্বন্ধে বললেন, এরা দেশের জন্তে ডাকাতি শুরু করে’ শেষ পর্যন্ত পেশাদার চোর ডাকাতে পরিণত হয়।

ঘটনা সব দেখে যাচ্ছিলুম। খাটছিলুম আর চিন্তা করছিলুম। ধ্যান-ধারণার মধ্যে একটা পরিবর্তনের সূত্রপাত হয়েছিল,—অনেক জিনিষই নতুন ভাবে দেখতে শুরু করেছিলুম। হিন্দু-মুসলমান মিলন যে ধর্মের দোহাই দিয়ে হবার নয়,—ধর্মের—দার্শনিক বা নৈতিক কাঠামোর যে জনগণ পরোয়া করে না—ধর্মের আত্মস্থানিক বহিরঙ্গ নিয়েই যে তাদের কারবার, সুতরাং ধর্মের দোহাই দিয়ে হিন্দু-মুসলমান মিলন কোন দিনই হবে না,—বরং দেশের শতকরা ১১ জন মানুষই শ্রমজীবী কৃষক-শ্রমিক বলে তাদের জীবনের বাস্তব অর্থনৈতিক স্বার্থের ভিত্তিতে কৃষক-শ্রমিক সংগঠনের মধ্য দিয়েই দেশের শতকরা ১১ জন হিন্দু-মুসলমানের মিলন সম্ভব,—এই সা কথা ধীরে ধীরে মনের মধ্যে শিকড় গাড়ছিল।

আর বিপ্লব? শতকরা ১১ জন শোষিত শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামী সংগঠন,—সেটাই কি বিপ্লবের সব চেয়ে বড় আয়োজন নয়?

শোষণের অবসানের চেয়ে বিপ্লবের আর কি ‘মহত্তর উদ্দেশ্য’ থাকতে পারে? এ সব কথাও ক্রমশ পরিষ্কার হয়ে উঠছিল। কিন্তু তার অজস্র বাধা এবং বিপরীত যুক্তিও তখনও মনের মধ্যে একটা বিরীত অস্পষ্ট হিজিবিজির মত ঘূর্ণাক খাচ্ছিল।

জীবনের সঙ্গে একবার দেখা করার জন্তে মনটা ছুটফট করছিল, কিন্তু তার তো উপায় নেই—সুতরাং ভেবে চিন্তে ঠিক করলুম,—বাইরে থেকে রাজবন্দীদের যখন জিনিসপত্র পাঠানো যায়,—জেল গেটে দিয়ে এলে রাজবন্দীরা পায়,—সেই রকম কিছু চেষ্টা করতে হবে। তদমুসারে শেষপর্যন্ত একদিন একগাড়ি বাগবাজারের রসগোল্লা নিয়ে (বোধ হয় দশসের) মেদিনীপুরে রওনা হলুম—এবং বৃদ্ধ উকীল শ্রীশ্রীতল চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে অতিথি হলুম। রাজে তাঁর বাড়ীতে থেকে সকালে জেল গেটে উপস্থিত হলুম ইন্ডি নিয়ে। আমার নামটা এবং রসগোল্লার ইন্ডিটা পৌঁছে গেল নিবিবাদের,—কিন্তু দেখাটা কিছুতেই সম্ভব হল না। যাই হোক, রসগোল্লা পেয়ে এটুকুতো অস্তুত বুঝবে যে, খবর সব ভাল! আমি যে কলকাতায়, এটাও বুঝবে।

কর্পোরেশনের ষাট ডেপুটি এম্বিকিউটিভ অফিসার করা হয়েছিল নোয়াখালীর উকীল হাজি আবদুর রসিদ থাকে। নোয়াখালীর সত্যেন্দ্র মিত্র, আমাদের সত্যেন্দ্রা ছিলেন স্বরাজ পার্টির সেক্রেটারী। উপেনদার সহকর্মী আন্দামান ফেরৎ ভিত্তি সরকারও একটা চাকরী পেয়েছিলেন,—ট্যাক্স কালেকটিং সরকার! বহুকাল সেই চাকরী করতে করতেই তিনি মাঝে গেছেন।

এক নেতার এক ‘বাহন’ ছিল—লোকে তাকে বাহনই বলতো, এবং কেউ কারো কাছে অমুকের বাহন বললেই লোকে তাকে চিনতেও পারতো। সে হয়ে গেল এক লাইসেন্স ইনস্পেক্টর। ঐ নেতাটি কিন্তু জেলে যাননি। যখন এক একে সব নেতা জেলে যাচ্ছেন, তখন তিনি কানীবাগী হয়েছিলেন।

যাই হোক, চাকরী বটনের এই সব বিশেষ বিশেষ নমুনা ছাড়াও, এমন একটা নমুনা ছিল, যার তুলনা হয় না। বিপ্লব বাদের লক্ষ্য, তারা অভ্যস্ত হয়ে যায় একা একা কানেকানে কথা বলতে। সকলে সব কথা জানিতে পায় না,—ভজাভজি নেই। এ অবস্থায় পাকা জুয়াচোরেরা সুযোগ নিতে চেষ্টা করলেই সফল হতে পারে। এই রকম এক জুয়াচোর মাঝে থেকে একটা বেশ বড় চাকরী বাগিয়ে নিয়েছিল। উপেনদা বলতেন, বেঁটে লোকগুলো হয় ত্যাগোড়,—আর ঢাকাগুলো ইঁদা। বৃষ্, শয়তান, ধুরন্ধর অর্থেই উপেনদা ‘ত্যাগোড়’ কথাটা বলতেন। উদাহরণও দিতেন কিরণশঙ্কর এবং অমরদাকে (চাটুজ্যে) দেখিয়ে। তিনি নিজে বেঁটে ছিলেন, একথা তাঁকে বললে বলতেন,—বেশ, মিলিয়ে নাও।

কর্পোরেশনের ঐ জুয়াচোরটা ছিল অতি-বেঁটে। তাঁর কায়দাটা ছিল চমৎকার। একটা গরীব জুয়াচোরের সত্যিকারের দৃষ্টান্ত দিলেই কায়দাটা বুঝতে পারবেন।

এক ব্যবসায়ী গুদাম থেকে দোকানে এক গাড়ী (গন্ধর গাড়ী) মাল নিতে এসেছেন, সঙ্গে আর লোক নেই। রাস্তা থেকে একটা গাড়ী ডাকলেন,—গাড়োয়ান গাড়ীটা হাঁকিয়ে নিয়ে আসছে,—আর গাড়ীর পিছনটা ধরে একটা শোঁটা হেঁটে আসছে। গুদামের সামনে এসে মালিক বললেন, গাড়ী ঘুরাও। শোঁটাটাও বললে ঘুরাও।

গাড়োয়ান মাল বোঝাই করে নিলে, খোঁটাটা তাকে সাহায্য করলে। মাল নিয়ে গাড়ী চললো দোকানের ঠিকানা লেখা "পূর্বা" নিয়ে,—খোঁটাটিও চললো।

গাড়ী দোকানে পৌঁছালো,—খোঁটাটা সঙ্গে নেই। ভাড়া দেওয়া হল, গাড়োয়ান বললে, আউর দশ আনা? মালিক বললেন, কাহে? গাড়োয়ান বললে আপকা আদমী আপকা ওয়াস্তে মাজ লিয়া। মালিক অবাক।

ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, খোঁটাটা জুয়াচোর। সে এমন বেপরোয়া ভাবে মালিক ও গাড়োয়ানের মধ্যে ঢুক পড়েছিল যে, গাড়োয়ান বরাবর তাকে মালিকের লোক মনে করেছে, আর মালিক মনে করেছেন, ও গাড়োয়ানের লোক। গাড়ী গুদাম ছেড়ে কিছু দূর আসতেই সে গাড়োয়ানকে বলেছে, তুমার পাশ রুপেরা হায়?—একটা দেওতো,—বাবুকা পাশ খুচরা রুপেরা নেই হায়,—দুকানমে থাকে ভাড়াকা সাথ দিয়া বায়গা। গাড়োয়ান বলেছে, রুপেরা নেই হায়, দশ আনা পয়সা হায়। সে বলেছে, আচ্ছা ওহি দেও। বলে সে দশ আনা পয়সা নিয়ে সরে পড়েছে।

এ জুয়াচোরটাও ঠিক ঐভাবে সুভাবাবু ও সুরেনদার মাঝখানে ঢুক পড়েছিল। কখনো বা সুরেনদা দেখেন সে সুভাবাবুর সঙ্গে গভীরভাবে কথা কহিচে একা,—তিনি বোঝেন, ও সুভাবাবুর বন্ধুলোক,—আবার কখনও বা সুভাবাবু দেখেন সুরেনদার সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠ ভাব,—তিনি মনে করেন সেও একজন বিপ্লবী, সুরেনদার দলের লোক। অথচ সে কোন কালেই না ছিল সুভাবাবুর, না ছিল সুরেনদার দলের।

যাই হোক, ছোটবড় চাকরী অনেকই পেয়েছিল। - চাকরী পাওয়ার আগে এক চাকরী পাওয়ার পরে মানুষ একরকম থাকতে পারে না,—যেমন এডওয়ার্ডস টনিক বা সুরবলী কথায় খাওয়ার আগে আর পরে মানুষ একরকম থাকতে পারে না। বড় চাকরী বটন মারক্স দলের কিছু অর্থসংস্থানের আশা স্বাভাবিক,—কিন্তু চাকরী বটনের পরে দেশা যায়, অল্পগত অল্পগত বিপ্লবের বন্ধু—“বালেভ্রে” কিছু চালা এবং মাঝে মাঝে কিছু চা-সিডাড়া ছাড়া বিপ্লবের জন্তে আর কিছু ছাড়তে নারাজ। সবই দেখলুম এবং জ্ঞানলাভ করলুম। কিন্তু তখনও মুখ ফুটতে দেয়ী ছিল।

তারপর,—১৯২১-২২ সালে যুগান্তর অল্পশীলন দুই দলেরই কিছু অর্থের সংস্থান ছিল, এফ দলের সংস্থান কংগ্রেস থেকে,—আর এক দলের ভারত দেবক সং থেকে। ২২ সালের পর দুই দলেরই আগের সংস্থান ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু যুগান্তর দল পেয়েছে দেশবন্ধু ও স্বরাজ্যদলকে,—অল্পশীলন তা পায়নি। কাজেই তারা মাঝে মাঝে ফ-আখটা জারগায় ওস্তা মেথড চালিয়ে বাচ্ছিল। ২৪ সালে যুগান্তর দল পেলো কর্পোরেশনের সুযোগ।

কিন্তু স্বরাজ্যদলেবও টাকার প্রয়োজন বেড়ে চলছিল। অর্থগণের নতুন স্থায়ী পথ খুঁজে পাওয়া বাচ্ছিল, না। দেশে অনেক মঠ-মন্দির ও দেবোত্তর সম্পত্তি আছে, যেগুলো লুটে খায় জুয়াচোর সেবাইং-মোহান্তর দল। সেগুলোকে পাবলিক ম্যানেজ-মেন্টের হাতে আনতে পারলে, এবং সেখানে নিজেরা বসতে পারলে, অতিথিসেবাও নিয়মিত হতে পারে,—প্রজাদের জন্তে নানাবিধ

কল্যাণকার্যেরও ব্যবস্থা হতে পারে,—আর সঙ্গে সঙ্গে স্বরাজ সংগ্রামের কিছু স্থায়ী অর্থসংস্থানও হতে পারে।

হাতের কাছে ছিল তারেকেশ্বর মন্দির—বিরাট আয়, অথচ মোহান্ত একটা দৃষ্টান্ত জমিদার ছাড়া আর কিছুই নয়। মোহান্তকে গদীচ্যুত করে ম্যানেজমেন্ট দখল করতে পারলে ঐ বিরাট আয় দেশের ও দেশের কাজে লাগানো যায়। সুতরাং দেশবন্ধুর নেতৃত্বে কংগ্রেসীরা প্রজাদের তরফ থেকে আন্দোলন শুরু করলে। ইতিপূর্বেই অসহযোগ আন্দোলনের এক “বেওয়ারিশ” নেতা স্বামী বিধানন্দ এবং “হঠাৎ স্বামী” সচ্চিদানন্দ (দুজনেই গোটা) স্থানীয় লোকদের সাহায্যে মন্দিরটা দখল করে বসেছিলেন—স্থানীয় লোকেরা মন্দিরের আশেপাশের রাস্তা জোড়া করে দিনরাত পালা করে বসে থাকে, মোহান্তের লোকেরা মন্দিরে ঢুকতেই পারে না। মন্দিরের দৈনন্দিন আয়টা স্বামীদের হস্তগত হয়েছে,—মোহান্তের লোকদের সঙ্গে স্থানীয় লোকের স্তোত্রোত্তী চলেছে,—এক যথাসাধ্য দুই “স্বামী”তেও ঠোকাঠুকি শুরু হয়েছে। বিধানন্দ হটে গেছেন, সচ্চিদানন্দ মন্দিরের পাশেই আস্তানা গেড়েছেন প্রায় পাকাপোক্ত ভাবে।

কিন্তু আইনগত সমস্যা হচ্ছে মোহান্তকে গদীচ্যুত করে দেবোত্তর এবং বেনামী জমিদারী দখল করা। আবার আইনগত সমস্যা আরো জটিল করে তুলেছে ব্রাহ্মণ সভা (ভাটিপাড়া)।—তারার তারেকেশ্বর মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতার এক বংশধর খুঁজে বার করে তাকে দিয়ে আদালতে নালিশ করিয়েছে—দৃষ্টান্ত মোহান্তকে গদীচ্যুত করে মন্দির ও দেবোত্তর সম্পত্তির ম্যানেজমেন্টের ভাব ব্রাহ্মণসভার হাতে দেওয়া হোক।

দেশবন্ধু সে মামলারও বাদী, মোহান্তরও বাদী—একটা ত্রিভুজাকার যামলা চলে। এ দিকে মোহান্তর বাড়ী দখলটা মন্দির দখলের পরবর্তী সমস্যা—তার জন্তে শুরু হল সত্যাগ্রহ। প্রথম দিন মিটিং করে বহু লোক জড়ো করে—বাইরে থেকে, কলকাতা থেকেও অনেক লোক এসেছিল—বেশ বড় একদল ভলান্টিয়ার মোহান্তর বাড়ীতে হানা দিলে। গেটে পুলিশ পাহারাও বাড়ানো হয়েছিল। ভলান্টিয়ার গ্রেপ্তার হল,—খবরটা দেশময় ছড়িয়ে পড়লো। নানা স্থান থেকে ভলান্টিয়ার আসতে লাগলো। একটা ক্যাম্প তৈরী হল ভলান্টিয়ারদের থাকা-খাওয়ার জন্তে। ক্রমে শেওড়াফুলীতেও দ্বিতীয় একটা ক্যাম্প হল! তারেকেশ্বর ক্যাম্পের চার্জ সুরেনদা মরমনসিং থেকে “নিজস্ব লোক” এক সতীশ চক্রবর্তীকে বসালেন, আর শেওড়াফুলীর ক্যাম্পে থাকলেন পাঁচু দা’ (ব্যানার্জি)। পরে এই সতীশ চক্রবর্তী কর্পোরেশনে একটা বড় চাকরী পেয়েছিলেন।

প্রথম উত্তেজনা যথাসাধ্য মিটিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে ভলান্টিয়ারও কমতে লাগলো। প্রত্যহ ৪ জন করে ভলান্টিয়ার মোহান্তর গেটে নিষ্কিষ্ট সময় গ্রেপ্তার হয়, তার পর দিনরাত চলে ভারেশু ভাড়া। নতুন উত্তেজনা সৃষ্টির জন্তে প্রায়ন হল, স্বামী সচ্চিদানন্দকে সত্যাগ্রহ করে জেলে যাওয়াতে হবে—তাতে এক ঢিলে দুই পাখী মরবে—সচ্চিদানন্দকে মন্দির থেকে হঠানো হবে। কিন্তু সে কিছুতেই নড়তে চায় না,—নানা অজুহাতে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। অবশেষে এক দিন স্বয়ং দেশবন্ধু এলেন তাঁর কাছে প্রস্তাব নিয়ে। দেশবন্ধু আসছেন শুনে বিরাট ভিড় হল মন্দিরের কাছে, দেশবন্ধু সেই ভিড়ের সামনে সচ্চিদানন্দের পায়ের কাছে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করলেন—লোকের দল দল করতে লাগলো।

তারপর ঘরের ভেতরে সচ্চিদানন্দকে ডেকে নিয়ে দেশবন্ধু স্মৃতি ধরে বললেন, মোহান্ত হবার সখ হয়েছে?—কাল যদি সত্যগ্রহ করে জেলে না গাও, তা হলে—ইত্যাদি—

সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণজ্ঞে খবর বেরিয়ে গেল, স্বয়ং স্বামী সচ্চিদানন্দ কাল সত্যগ্রহ করে কারাবরণ করবেন। এই সূচিকাভরণ চিকিৎসার ফলে আবার কিছু ভলান্টিয়ার্স এল,—কিন্তু সে যেন নিদানের ওয়ুথ,—প্রদীপ নিভবার আগে একবার জলে গঠার মতন। স্তম্ভরাং তখন দেশের নানা দিকে “দলের” লোক পাঠিয়ে ভলান্টিয়ার্স সংগ্রহ করে আনার প্রাণ হল। আমাদের পাঠানো হল বিক্রমপুরে—আমি সেখানে কেন্দ্রে কেন্দ্রে ঘুরে জন ২০ ভলান্টিয়ার্স সংগ্রহ করে নিয়ে এলাম। সুরেনদার প্রধান দায় তারকেশ্বর সত্যগ্রহ—তিনি কোন রকমে কাজ চালান।

এই হুড়-হাসামার মধ্যে মধ্যে কর্পোরেশনের কাজ আছে,—আর তার ওপরে আছে কাউন্সিলের কাজ। নতুন শাসন-সংস্কার ব্যবস্থা হয়েছিল, মন্ত্রীদেব বেতন কাউন্সিলের ভোটে পাশ করাতে হবে। বৈধ বিধিব্যবস্থার এইখানে একটু কঁক, একটু দুর্বলতা আবিষ্কার করে দেশবন্ধু এইখানেই আঘাত হানার ব্যবস্থা করছিলেন। মন্ত্রীদেব বেতন বছরে ৬৪০০০ টাকা নির্ধারণ করে সরকার কাউন্সিল এক বিল উপস্থাপিত করলেন। স্বরাজ পার্টি তার এক সশোধনী প্রস্তাব উপস্থাপিত করলেন,—মন্ত্রীদেব বেতন বছরে এক টাকা।

সাধারণ ছাড়াও যেসব বিশেষ নির্বাচকমণ্ডলী ছিল, তাদের প্রতিনিধিদের মধ্যে অনেকে দেশবন্ধু গাতিরে এবং অল্পবোধে স্বরাজ্যদলের দিকে ভোট দিলেন—স্বরাজ্যদলের সংশোধন প্রস্তাব পাশ হয়ে গেল। ব্যাপারটাকে মন্ত্রীদেব প্রতিনিধিদের অনাস্থার সামিল বলে গণ্য করা হল,—মন্ত্রীরা পদত্যাগ করলেন। স্বরাজ পার্টির জয়জয়কারে দেশ উদ্বেল হয়ে উঠলো।

এদিকে মহাস্বাক্ষী অবস্থা বুঝে ঘোষণা করলেন—বর্তমান অবস্থায় স্বরাজ পার্টির কর্মসূচীই কংগ্রেসের কর্মসূচী বলে গৃহীত হওয়া কর্তব্য। তিনি নিজে তখনকার মত কংগ্রেস নেতৃত্ব স্বরাজ পার্টির হাতে দিয়ে সরে গিয়ে অল ইণ্ডিয়া স্প্যানিশ অ্যাসোসিয়েশন গঠন করে তাঁর ভক্তবাহিনী নিয়ে চরকা-খন্দেবের কাজেই আত্মনিয়োগ করলেন।

ওদিকে শ্রমিক আন্দোলন এগিয়ে চলেছিল গান্ধী-কংগ্রেসের মোহ কাটিয়ে নিজেদের বিশেষ পক্ষে, এবং তার মধ্যে ভঙ্গীভাব এবং বলশেভিকবাদের প্রচার বেড়ে চলেছিল। তৃতীয় আন্তর্জাতিকের (কমিউনিষ্ট—মস্কো) প্রেসিডিয়ামের সদস্য এম, এন, রায়েব যোগাযোগে বাংলায় মোজাফ্ফর আহমদ প্রভৃতি ক্রমশ ধীরে ধীরে বলশেভিকবাদের আদর্শ নিয়ে শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করছিলেন—যেমন বন্ধুতে ডাঙ্গে, মাদ্রাজে শিঙ্গারাবেলু প্রভৃতি—

২০ সালের আগে শ্রমিক আন্দোলন ছিল প্রধানত শ্রমিকদের মধ্যে জনকল্যাণের কাজ—সংঘবদ্ধ শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন ছিল নাম মাত্র। ২০ সালে লাল লাজপত রায়কে সভাপতি করে প্রথম এক সভার সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের চেষ্টা হয়। তার পর অসহযোগ আন্দোলনের হুড়োহুড়ি থামলে ২২ সালে দেশবন্ধুর সভাপতিত্বে প্রথম সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন ইউনিয়নের সংখ্যাও নিতান্ত কম, এবং অতি অল্প

শ্রমিকই তাতে সংঘবদ্ধ ছিল। কিন্তু আন্দোলন তাড়াতাড়ি বেড়ে চলেছিল,—এবং সরকারের নির্বোধ নির্বাক নীতির ফল বিপরীত হয়ে শ্রমিক সংঘগুলো ক্রমে সুসংবদ্ধ ও শক্তিশালী হয়ে উঠছিল।

এর এক চমৎকার দৃষ্টান্ত হচ্ছে বম্বের গিরনি কামগর ইউনিয়ন। একবার ধর্মঘট হল—সরকারী সাহায্যে এক পাঠান শ্রমিক বাহিনী রিক্রুট করে লাগিয়ে দেওয়া হল ধর্মঘট ভাঙতে। ফলে একদিকে বম্বে শহরে লাগলো এক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, কিন্তু গিরনি কামগর ইউনিয়ন হয়ে উঠলো সবচেয়ে বড় ও শক্তিশালী ইউনিয়ন। তার নেতাদের অগ্ৰতম ছিলেন মিরাজকর, যিনি এগুণে বম্বের মেয়র হয়েছিলেন।

বাই হোক,—বলশেভিকবাদের প্রচার অঙ্কুরে বিনাশ করার জগে সরকার ২৪ সালে কাণপুরে এক বলশেভিক যড়বৃন্দ মামলা খাড়া করলেন। বলশেভিক এজেন্টে বলে আটকনের নামে মামলা হয়েছিল।—তার ১ নম্বর আসামী এম এন রায়েব—তিনি দেশে ছিলেন না বলে তাঁকে হাজির করা যায় নি। মাদ্রাজের শিঙ্গারাবেলুর স্বাস্থ্যের অজুহাতে তাঁকেও হাজির করা হয়নি—লোকে বলে তিনি নাকে খং দিয়ে রেহাই পেয়েছিলেন। পাঞ্জাবের এক প্রফেসর—গোলাম হোসেন বা এ রকম কি নাম—তিনি নাকি স্বীকারোক্তি করে বলেছিলেন, পাটির জগে প্রেস করবো বলে এম এন রায়েব বাছ থেকে টাকা নিয়ে মেয়ে দিয়ে আমি নিজের নামে প্রেস করেছি,—সরকারের তো আমাকে ধন্যবাদ দেওয়াই উচিত।

শেষ পর্যন্ত—মামলায় বাংলার মোজাফ্ফর আহমদ ও কুতুবুদ্দিন আহমদ বম্বের ডাঙ্গে এবং সন্তকং ওসমানী (কোথাকার, তা ভুলে গেছি)—এই চারজনের কারাদণ্ড হয়। বলশেভিকবাদের প্রচার কিছু দিনের জগে থমকে যায়।

এদিকে নতুন মন্ত্রী নিয়োগ করে গভর্নমেন্ট তাঁদের ৬৪০০০ টাকা বেতনের বিল দ্বিতীয়বার কাউন্সিলে পাশ করাতে চেষ্টা করে, এবং সেবারও পরাজিত হয় এবং স্বরাজ পার্টির সংশোধনী প্রস্তাব ১ টাকা বেতন পাশ হয়। সেবার পদচ্যুত মন্ত্রী প্রভাস মিত্রকেও দেশবন্ধু সরকারের বিরুদ্ধে ভোট দিতে সম্মত করিয়েছিলেন। মোট ভোট গুনতি করে সরকার ও স্বরাজ পার্টির পক্ষীয় নিশ্চিত ভোট বাদে কয়েকটা অনিশ্চিত ভোট স্বপক্ষে আনতে পাঁচলেই মেজরিটা হয়—এইভাবে হিসাব করে, অনিশ্চিত ভোটের মধ্যে কটা ভোট হাত করতে হবে,—এবং তার জগে কাকে কাঁফে হাতাবার কি চেষ্টা করতে হবে, স্থির করা হয়। গণতন্ত্রের এই কসরৎ একটা দেখবার জিনিস—দেখলাম।

শেষ পর্যন্ত একজন এম, এল, সিকে দুদিন একটা বিশেষ জারগার আটকে রেখে দেওয়া হল, আন্দোল-প্রমোদের সর্বিধ আয়োজনের মধ্যে আকর্ষণ ভূমিতে রেখে। তাব জগে একদল অল্পবয়সিক কর্মী বিশেষ ভাবে নিয়োজিত থাকলো এক এই ভাবে সরকার পক্ষের একটা ভোট নিশ্চিত করে দেওয়া হল। সরকার পক্ষের আর একটা ভোট নিশ্চিত করার ব্যবস্থা হল—তিনি ময়মনসিংহের জমিদার ব্রজেন কিশোর আচার্য চৌধুরী। অল্পভাবে কাহন্দা করতে না পেরে তাঁকে তাঁর বাড়ীতে আটকে রেখে দেওয়া হল—তারকেশ্বরের মন্দির আগলবার কাহন্দার। তাঁর সুখিচা ইটের বাড়ীর দরজার ভিতর

থেকে শুরু করে' চারিদিকের রাস্তায় জনতার এখন ঠাসা ভিড় সৃষ্টি করা হল যে, তিনি বাড়ী থেকে বেরোতেই পারলেন না—ঠিক বখন কাউন্সিলে ভোটভুটি চলছে। আমরাও সেখানে ছিলাম। সরকার পরাজিত হয়েছে বলে খবর আসার পর তুমুল দ্রব্য ধ্বনির মধ্যে পথ পরিষ্কার হয়ে গেল। এখনকার গান্ধীরাজ্য হলে অবশ্য লাঠি-গুলী চলতো, এটা এখন সবাই বোঝে, কিন্তু তখন লাঠিগুলী এত সম্ভা ছিল না। এ হল ২৪ সালের ২৬ শে আগষ্টের কথা।

মাঝে মাঝে এই রকম ঘোলেই আমাদের সংগ্রামের চূপের সগ মেটে। আনন্দবাবুর বোর্ডিংয়ে রাজে দোতালার খরে একটা আড্ডা জমে, বাইরের লোকও আসে,—আমরাও গিয়ে বসি। জিতেন লাহিড়ীও প্রায়ই আসেন। হরিদা (চক্রবর্তী) এবং অমর বোসও। আর মাঝে মাঝে ক্যারিকচারিষ্ট অতুল সেন। তিনি এলে একটু হাত-কোঁতুক হয়। অতদিন হয় দলের Informal meeting এর মত আলোচনা,—বর্তমান কাজকর্ম ও ভবিষ্যতের আশার স্বপ্ন নিয়ে। চুপি চুপি কথাও ছুচারটে হত।

বোম-বন্ধুকের মত বিপজ্জনক রাজনীতি ও গুপ্ত সমিতির আমলে রেওয়াজ ছিল, একজন বিপ্লবীর কাছে একজন তৃতীয় অপরিচিত ব্যক্তিকে “আমাদের লোক” বলে সুপারিশ করলেই সে ঐ তৃতীয় অপরিচিত ব্যক্তিকে পরম আত্মীয় জ্ঞানে অব্যাহতি দিত। সে যুগে সেটা ছিল এক অপরিহার্য ব্যবস্থা,—এবং তাতে কোন ক্ষতিও হত না,—কারণ লঘুভাবে কেউ কাউকে সুপারিশ করতে পারতো না সে যুগে।

কিন্তু বখন বোম-বন্ধুকের মতন বিপজ্জনক ব্যাপার কিছুই নেই,—অথচ সে যুগের রেওয়াজটা অভ্যস্ত হয়ে গেছে,—তখন অত্যন্ত লঘু ও দায়িত্বজ্ঞানহীন ভাবেই—এমন কি দাদারও—অনেককে “আমাদের লোক” বলে চালাতেন।—নিত্য নূতন “আমাদের লোক” দেখা যেত,—এবং বিশ্বাসও করা হত লঘুভাবেই। দলে জুয়াচোর বা গুপ্তচরদের নিশ্চয়ই খুব সুবিধে হয়েছিল। বসন্ত গ্রেপ্তার হয়ে জেলে গিয়ে পরস্পরের সঙ্গে কথাবার্তা কয়ে সকল দাদাই বুঝতেন যে, সরকার আমাদের দলের ভিতরকার কথা, খুঁটিনাটি কথাও, প্রায় সবই জানে। সম্ভবত আনন্দবাবুর বোর্ডিংয়েরও সকল কথা তারা জানতো।

এইভাবে দিন কাটে। আমার নীচের ঘরে গরম—কাজেই মাঝে মাঝে খোলা ছাদে শুই। প্রকাণ্ড ছাদ,—অনেকে রাজাই ছাদে শোয়। একদিনেই একদিন সারা ছাদ জুড়ে অনেকেই শুয়ে আছি,—হঠাৎ সিঁড়িতে ছপদাপ শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল। চোখ চাইতেই টেরে আলোতে চোখ মেঁমেঁ গেল। ছাদ ভরে গিজগিজ করছে পুলিশ,—আরো আসছে। বুলুম, আপাততঃ লীলা সাজ হল। কাকে কাকে নেহব কে জানে—সুরেনদা তো আছেন—ই। নরেশদা এবং মণিদাও (চৌধুরী) আছেন। এঁরা গেলেই সব গড়বড় হয়ে বাবে।

সবাই চললেন নিজ নিজ ঘরে—আমরাও। সকলেরই পিছু পিছু চললো কয়েকজন করে পুলিশ এবং অফিসার। সমগ্র বাড়ীটা তন্ন তন্ন করে সার্চ হল। এসেছিল ভোর হওয়ার আগে—বেলা অনেক হল সার্চ শেষ করতে। তারপর কয়েকজনকে নিয়ে গিয়ে

তুললে গাড়ীতে—আমাকেও। সারদাকে একটু সাহায্য দিয়ে বললুম, অবস্থা বুঝে যা ভাল মনে কর, অসঙ্কোচে ক'রো।

সে হচ্ছে ২৪ সালের ২৫শে অক্টোবরের সকাল। ‘একবার ইলিসিয়াস বো দেখিয়ে কাগজপত্র ঠিকঠাক করে আমাদের নিয়ে গিয়ে তুললে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে।’ সেখানেই প্রথম দেখলুম আমাদের ওয়ারেন্ট রেগুলেশন থ্রু অফিসারে—অর্থাৎ স্টেট প্রিজনার—ভারত সরকারের বন্দী। ঐদিন এক অডিটাল জারী হয়েছিল, এবং সারা বাংলার থানাভাঙ্গাসী করে প্রায় দুশো জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। কলকাতা এলাকার অডিটাল প্রিজনারদের নিয়ে গিয়েছিল প্রেসিডেন্সি জেলে।

সেন্ট্রাল জেলে স্টেট ইয়ার্ড বা সিগ্রিগেশন ইয়ার্ডে আমাদের তুললে। দেখলুম আমরা ১৮ জন জমেছি—সুভাষবাবু এসেছেন, অনিলবরণ রায়ও এসেছেন,—তাছাড়া এসেছেন সত্যেন দা (মিত্র—স্বরাজ পাটির সেক্রেটারী) সুরেন দা, নরেশ দা—তো আছেনই, হরিদাও আছেন—অনুকূলদা (মুখার্জি), গিরীনদাও (ব্যানার্জী) আছেন—অমরকৃষ্ণ ঘোষও আছেন—পাবনার রমেন দাসও আছেন,—মলদার অংশু ব্যানার্জী,—অনুশীলনের সুরেশ ভরসাজ,—আর হুটা তরুণ—রঞ্জিত ব্যানার্জী এবং গনেশ ঘোষ (চট্টগ্রামের জুলু সেনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট)—আর ২১৩ জনের কথা ঠিক মনে নেই।

কিন্তু মজা হল, আমাদের ওয়ারেন্টের তারিখ ২৭শে আগষ্ট। অর্থাৎ ২৬শে আগষ্ট দ্বিতীয়বার মন্ত্রীদেব বেতন ব্যাপারে সরকারের পরাজয়ে যেন ক্ষেপে গিয়ে ২৭শে আগষ্ট ওয়ারেন্ট ইস্যু করা হয়েছিল,—কিন্তু তখন গ্রেপ্তার করা হয়নি,—কারণ তাতে স্পষ্ট বোঝা যেত স্বরাজ পাটিই আক্রমণের আসল লক্ষ্য। পরে অডিটাল জারি ও গ্রেপ্তারের সঙ্গে ২৫শে অক্টোবর আমাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

লর্ড লিটন মালদহে এক বক্তৃতায় বলেছিলেন, বাংলার হুটা প্রধান বিপ্লবী দল সারা দেশ জুড়ে বিপ্লবী দল গড়ছিল,—একটা দল অবিলম্বে কিছু করার পক্ষপাতী, আর একটা দল আরো প্রস্তুতির পক্ষপাতী।

দেশবন্ধু কাউন্সিলে বক্তৃতায় দেখিয়ে দিয়েছিলেন, স্বরাজপাটিই আক্রমণের লক্ষ্য—স্বরাজপাটির কাছে ভোটে পরাজিত হয়ে ক্ষেপে গিয়েই সরকার স্বরাজপাটির ভাল ভাল কর্মীকে (best workers) গ্রেপ্তার করেছে।

তখন উপেনদা, অমরদা (চট্টোপাধ্যায়), অতুলদা (ঘোষ), মনোমোহন ভট্টাচার্য এবং এক তরুণ নুপেন মুখার্জি—স্টেট প্রিজনার—ফিমেল ইয়ার্ডে থাকতেন—সেটা খালি ছিল বলে। আর এক ইয়ার্ডে ফরেনার্স ইনগ্রেস ইনটু ইণ্ডিয়া আইনে বন্দী ছিলেন এক আবহুদর রসিদ, যেতকার পাজামা-ফেজপরা অশ্রুগুণ্ড শোভিত মুসলমান—দিনরাত কোরাণ আর নমাজ নিয়ে থাকেন—পুলিশের মতে বলশেভিক এজেন্ট—বে-আইনী ভাবে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন।

সন্তোষ মিত্র, দীরেন বাগচি, সুবোধ লাহিড়ী তখন দাজিলিং জেলে বন্দী হয়েছেন। স্টেট ইয়ার্ডের পাশে ছিল বন ইয়ার্ড (পরে যেখানে দক্ষিণেশ্বর মন্দির আসামীরা থাকতেন)—সেখানে তখন আছেন আন্দামান-ফেরৎ বাবাজীবন দণ্ডে দণ্ডিত শিবপুর ডাকতি মামলার নরেন ঘোষ (চৌধুরী), ভূপেন ঘোষ, সাহুকুল চ্যাটার্জি এবং

রাজ্যবাজার বোমার মামলার অমৃতলাল হাজরা (শশাঙ্ক বাবু) প্রভৃতি। ভূপেন বোমার ছিলেন স্বত্বকারের রাজ্য ওস্তাদ। আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা প্রথমে তাঁর সঙ্গে করা হল—আমাদের মোট food allowance এর টাকা হিসেব করে তিনি বাজারের ফর্ম করে দেন, এবং মালের ভাণ্ডার এবং বাজার ব্যবস্থা তাঁর হাতেই থাকবে। ডেপুটি জেলার বীরেন বাবু আমাদের দেখাশোনার ভারপ্রাপ্ত—তিনিই এ বন্দোবস্ত করলেন।

তারপর তিনি কার কি কাপড়চোপড় বিছানাপত্র লাগবে জেনে নিয়ে বাজারে গেলেন। এই বাজার করার কাজটা যে লোভনীয়, তা কি বলে দিতে হবে? তিনি খুব যত্ন নিয়ে সব ব্যবস্থা করলেন। কয়েকদিনের ভাতের রাজ্য চোখে পুনানো বন্ধুর দরদার রাজ্য,—সকলেই খুশী হলেন।

কিছু প্রথম দিনই আমাদের সন্তোষনা (মিত্র) দইয়ের পরিমাণ কম হয়েছে বলে বেগে টেবিল চাপড়ে চীৎকার করে এক কাণ্ড বাধালেন—ডেপুটি জেলার বাবুকে ডাকিয়ে হিসেব চাইলেন, ১৮ জনের খোরাকী কত? ইত্যাদি। তিনি লজ্জায় জড়সব্ব হলেন,—আমরাও অনেকেই লুকিয়ে লজ্জা ঢাকলুম,—আর বেচারী ভূপেন বাবু কাতর ভাবে কৈফিয়ৎ দিলেন,—রাতে তিনি ভালো কিছু খাওয়াবেন বলে মাল মঞ্জুত রেখেছেন,—সকালে তাড়াতাড়ির জন্তে পেটা করে উঠতে পারেননি।

যাই হোক,—সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা পরিবর্তন করে ষ্টেটইয়ার্ডেই নিজেকে তত্ত্বাবধানে কয়েকদিনের দ্বারা রাজ্য করানোর ব্যবস্থাই হয়ে গেল। এ সব কুট কৌশল জেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সংগ্রামাদি ব্যাপারে অভিজ্ঞ ঘাঘা বিপ্লবীদের এলাকা—সুভাষবাবু বা অনিলবরণ বাবু এসব ব্যাপারে অনভিজ্ঞ—সুতরাং তাঁরা ‘থ’ হয়ে গেলেন—চুপ করেই সব দেখলেন।

সুভাষবাবুর যে বিপ্লবীদের খাতায় নাম উঠেছে,—নানারা তাতে সম্বন্ধ হয়েছেন। অনিলবরণ লোভনীয় নয়, কারণ তাঁর গান্ধী ভক্তি বাগ মানবে না, সকলেই বুঝতেন—হয়ত মনোরঞ্জনদা ছাড়া। বস্তুত বিপ্লবীদের সঙ্গে আটক থেকে তাঁর মন এমন হাঁপিয়ে উঠেছিল যে, পরে যুক্তি পেয়েই তিনি পশুচরীতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

যাই হোক,—এর পর এস ভাতা স্থির করার পালা। আইনামুসারে ভাতা নির্ধারিত হবে according to rank and station in life. সুভাষবাবু I. C. S., সন্তোষনা সেন্স্ট্রাল অ্যাসেম্বলির সদস্য, অনিলবরণ বাংলা কাউন্সিলের সদস্য—এঁরা বিশেষ, এক বাকি সকলে সাধারণ।

গভর্ণমেন্ট অনিলবাবুকে সাধারণ ভাতার চেয়ে কিছু বেশী দেওয়ার প্রস্তাব করলে তিনি সেটা প্রত্যাখ্যান করে বললেন, আমি এখানে যখন এম, এল, সি হিসেবে আসিনি,—খতএব সাধারণ ভাতাই নোব। সন্তোষনা এম-এল-এ হিসেবে দৈনিক ১০ টাকা হিসাবে ভাতা দাবী করে দরখাস্ত করলেন—সরকার সেটা নামঞ্জুর

করলেন। তখন রপনাতির পরিবর্তন করে সন্তোষনা লিখলেন, শুধু এম-এল-এ বলেই নয়,—তাঁর বহুমুখ রোগের লক্ষণ আছে, সুতরাং আহালাদি সম্বন্ধে সাবধানতা প্রয়োজন। শেষ পর্যন্ত সরকার “মেডিক্যাল গ্রাউণ্ড” বলে তাঁর ১০ টাকা দৈনিক ভাতাই মঞ্জুর করলেন।

পরে তাঁর আর একটা নতুন দাবী এল, এবং সেটা নিয়ে দাদামহলে প্রথমে বিষয়, ও পরে চাপা হাতকোড়কের গুজর চললো। সে হচ্ছে তাঁর জী-কণ্ঠার জন্ত ভাতার দাবী। সবাই জানতেন, তিনি অবিবাহিত,—এই প্রথম শুনলেন, তাঁর জী বজা বর্তমান। সরকার জবাব দিলেন, তাঁরা অনুসন্ধান করে দেখেছেন, তাঁর জী-কণ্ঠা নেই,—তিনি বিবাহ করেছেন বলেই কোন প্রমাণ নেই। দাদা বললেন, বৌদির সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়েছিল কাশীতে, দেশবন্ধুর উপস্থিতিতে—কোনো বিশেষ কারণে তিনি সে বিবাহের কথা গোপন রেখেছিলেন।—যাই হোক, পরে বৌদির ভাতাও মঞ্জুর হয়েছিল।

তারপর সুভাষবাবুর কথা। তিনি I. C. S., এবং কর্পোরেশনের চাফ এক্সিকিউটিভ অফিসার,—সুতরাং তাঁর standard of living ইউরোপীয়ানদের মতন—এই যুক্তিতে তাঁর আহালাদির ভাতা সরকার স্থির করলেন মাসিক ২০০ টাকা। তিনি স্থির করলেন, ইউরোপীয়ান ষ্ট্যান্ডার্ড তিনি স্বীকার করবেন না, এবং ঐ ভাতা প্রত্যাখ্যান করবেন।

সন্তোষনা প্রভৃতি তাঁকে বোঝাতে লাগলেন, এ ভাতা তাঁকে নিতেই হবে। কারণ এবার জেল থেকে বেরোবার পূর্ব তাঁকে যুগান্তব দলের অল-ইণ্ডিয়া প্রতিনিধি, পাবলিক ফিল্ডের নেতা হিসাবে কাজ করতে হবে,—সুতরাং তাঁর স্থান যে সবার উপরে, সেটা দেখতে ও ভাবতে লোকের অভ্যস্ত হওয়া দরকার,—এবং উঁচু ষ্ট্যান্ডার্ড ও বেশী ভাতার হিপ্পনোটিক একেই তাতে সাহায্য করবে।

এতবড় একটা বিপ্লবী দলের নেতা বলে পরিচিত হওয়া, হঠাৎ ডবল প্রমোশন, এ অবস্থায় লোকের মাথা ঘুরে যাওয়ারই কথা—বিশেষত তখনও সুভাষবাবুর মাথাটা খুব পাকেনি। তিনি ভাতা প্রত্যাখ্যান করার মতলব ছেড়ে দিলেন।

যাই হোক, আমরা ছয়দিন আলিপুর সেন্স্ট্রাল জেলে থাকার পর বদলীর অর্ডার এল। সুভাষবাবু, অনিলবরণ বাবু প্রভৃতি করেকজন চললেন বহরমপুর জেলে। অনুকূলদা, গিরীনদা, এবং অন্তর্গাবু চললেন মেদিনীপুরে এবং আমি, রঞ্জিৎ ব্যানার্জী এবং গণেশ বোম বাঁকুড়ায়। আবার কোন্ নতুন অভিজ্ঞতা আমাদের জন্তে অপেক্ষা করছে, কে জানে!

[গত মাসের লেখায় অনবধানবশত একটা মন্তব্য ভুল হয়ে গেছে—১৯২৩ সালের শেষে দিল্লী কংগ্রেসের পর যে ১৭ জন বিপ্লবী নেতা গ্রেপ্তার হয়েছিলেন, তাঁদের নামের তালিকা থেকে বিপিনদার নামটা বাদ পড়ে গেছে—বিপিনদা ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম।]

[ক্রমশঃ।]

An idea, to be suggestive, must come to the individual with the force of a revelation.

—William James

মিষ্টি সুরের নাচের তালে মিষ্টি মুখের খেলা
আনন্দ-ছন্দে আজি, —হাসি খুসির মেলা



সুপ্রসিদ্ধ কোলে



বিস্কুটের

প্রস্তুতকারক কর্তৃক

আধুনিকতম যন্ত্রপাতির সাহায্যে প্রস্তুত

কোলে বিস্কুট কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১০

কবি কৰ্ণপূৰ-বিরচিত আনন্দ-রন্দাবন

[পূৰ্ব-প্রকাশিতের পর]

অনুবাদক—শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

২৬। এই ধরণের যিনি লীলা-প্রাণী, এই ধরণের বল্মলে
ধীর আচরণ, তাঁর এই শৈশবাব্দী পৌগণ দশা অতএব নিত্যলীলা-
বস্ত্রার কল্ললতা-রূপেই প্রতিভাত হয় ভক্তজনের কাছে। যদিও
এই দশাগুলি বিবাদি এবং পরম্পর-বিরোধী, যেহেতু এগুলিতে
রয়েছে মূর্ত্তানন্দ, রয়েছে নিত্য-কিশোর, রয়েছে অবিকারিত, ..
তথাপি, ধীর যেহেতু আচ্ছন্ন থাকে পরমৈশ্বর্য, এগুলি যে তাঁরই
কল্যাণধর্মী পরমৈশ্বর্যের বেগ-ললিত লীলা-প্রকাশ, তা কেমন করে
অস্বীকার করা চলে? বিবিধ ভক্তজন আপন আপন বাগনা
অনুযায়ী ভগবানকে লাভ করতে চান; এবং তাঁদের অনুগ্রহাধীন
বলেই, যিনি সচ্চিদানন্দধন নিত্যকিশোর, তিনিই নিজেকে
প্রকাশিত করেন বাৎসল্য-সখ্য-মধুরাদি সর্বভাব-পোষক বপুঃতে।
কাল-কৃত নয় এই অবস্থা। ভবষ যেখানে বিজড়িত হয়ে রয়েছে
অচিন্ত্য-বৈভব, সেখানে বাস্যপৌগণাদির এই সমস্ত লীলা-প্রকাশ
হতেই হবে নিস্কর্তা-নিত্য এবং এইভাবেই তিনি একদা বিস্ময়
বাড়িয়েছিলেন ব্রজপূর-পুরজ্ঞাদের, যেদিন তিনি আকাশ-বাতাসে
ছড়িয়ে দিলেন তাঁর মোহন মুরলীর ধ্বনি। বাক্যহারা হয়ে
গেলেন পুরজ্ঞারা। কান পেতে শুনলেন সেই ধ্বনি। কী
অনবস্ত্র বেগুদান-লীলা! মুরলীতে বেজে চলেছে মধুর অক্ষুট
ধ্বন গান।

২৭। কৃষ্ণের সমীপে ছুটে এসে তাঁরা বললেন—“ওরে কৃষ্ণ,
মাথের বুকের বোটা টানতে পারত না তোরা এঁ টোট ছুটি, আজ
হঠাৎ কেমন করে সেই টোট ছুটো দিয়েই বাজালি.. এমন মুরলী?
কদিনের মধ্যে কোন্ গুরুর কাছে নিলি কলবেগুঁর এমন পাঠ?”

..“ওরে ছেলে, তোরা মুখের আঁর্জিত করে মরি,
আবার বাজা, আবার বাজারে তোরা যেণ।”

তাঁরাও বলছেন আর ততক্ষণে নন্দহুলাস পৌছে গেছেন জনক-
জননীর কাছে। সেখানে গিয়েই তিনি বাজিয়ে দিলেন বেণু।
বাজাতে বাজাতে সরস করে তুললেন বাশের বাঁশরী।

২৮। সেই দিন থেকে ভাষ্যারা শঙ্কর সঙ্গে, কমলযোনি
ব্রজার সঙ্গে, নভোমণ্ডলে প্রতিদিন উপস্থিত হতে লাগলেন সুরনগরের
নাঙ্গবেরা। তাঁরা সকলেই দর্শনাধী লীলাবালকের;—তমালবরণ
ধীর অঙ্গ, হরিতাল-বরণ ধীর বসন, যিনি বকুলফুলের বেণুমাখা
তমাৎ শাখার তুলারূপ, যিনি বনকুঞ্জের শিশুর মত প-পর্যন্ত
খুলিয়ে চলেন বনমাগা, যিনি বাঙ-মানসের অবদান, মুরলীতে দেন
মোহন তান।

২৯। এই রকম করে দিন কাটছে। শু'র একদিন,
দিনমণি তখনো অহুঁদিত গগনে, পদ্মজ্যোতি নন্দহুলাল তাঁর জননীর
জড়িয়ে ধরে বললেন—“মাগো মা, ও আমার জনেশ্বরী মাগো,
আমার ভরসার মন হয়েছে বন-ভোজনের। সত্যি বলছি, এতটুকু

দুইমি করব না মা। ঘরে বসে খাব না আজ, বনে গিয়ে খাব।
ও আমার লক্ষ্মী মা আমার, কথা ঠেলিস নি মা।”

পুত্রের বাক্যের মুখে রয়েছে নিশ্চয় কোনো দুইবুদ্ধি-বুঝতে
বিলম্ব হল না ব্রজরাজ-বধুর। সাত তাড়াতাড়ি মাথা নাড়তে
নাড়তে যেই বসে উঠেছেন—“না না, না না,” সেই আবার
লীলাবালকের কপালখানির উপর নেচে নেচে উঠল ভাড়া ভাড়া
চুল, অঙ্গের আভায় আর চোখের আলোকে দূর হয়ে গেল অন্ধকার।
অতীষ্ট গিদ্ধির পথ নিভাস্ত বিদ্রিত হয়েছে দেখে লীলাবালককে পথ
বেছে নিতে হল শপথের। নিরস্ত নিকুণ্যর অহুঁদর শেষ পর্যন্ত
আদায় করে ছাড়ল জননীর অনুমতি।

৩০। তারপরে আর সঙ্গী জোটাতে কতক্ষণ? সজ্ঞারে শৃঙ্গা
বাজিয়ে উাস্থিত হয়ে গেলেন দাদা শ্রীবলরাম। নিজের নিজের
ঘর ছেড়ে দেখতে দেখতে খেলার সাথীরা ছুটে এসে জুটলেন।
বগরামের শৃঙ্গা বাজলে দূরও যে নিকট হয়ে যায়।

ত্রিভুবনের নাথতিলক তখন মাথের কাছে গিয়ে ভিল্ল।
চাইলেন—“মা, এমন খাবার করে দে মা, যাতে সবাই ভোলে,
সকলের মুখে রে'চে।” তখন এল বন-ভোজনের উপযোগী ভোজ্যব্রব্য।
বাসি খাবার নয় একটও। এল..চাপ চাপ দই; দধিমহোদধির যেন
প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড উদ্ভট পক্ষপিত। ভাবে ভাবে এল ললিত নবনীত
..চাঁদের গায়ের যেন ডেলা ডেলা মাংস। এল পুঙ্ পুঙ্ দুধের
সর; কীর-সমুদ্রের যেন রাশি রাশি ফেনা। এল শঙ্কলী প্রভৃতি
সুরশরভি বহুমূল্য খাদ্য। এল পাঁপড়, এল বড়া..আহা দেখলে
সব চোখ জুড়ায়। এতোতেও শেষ নেই। আসছেই তো
আসছে। এল মোদক, দেবতাদেরও চোখ টাটায় এমন
আমোদক। পিঠে গুলোরও কী সুন্দর চেহারা..এক একট যেন
পূর্ণিমার চন্দ্রমণ্ডল। মিশ্রী কুঁদোগুলোরও কী বাহার..জমাট শিলা
মত দেখতে অখচ গলছে না। এল দইভাত, কী তার পবিত্র
প্রবাস। এল তুধে-ভেজা চিড়ে, তুরতুর করে গন্ধ উঠছে কপুংদের,
যেন টলটল করছে অমৃতের মাধুর্য, এল পরমাম..আবর্তিত স্নোয়াংসা-
সার দিয়ে যেন প্রস্তুত। এল আমের আচার, নেবুর আচার..টুপটুপ
করছে, রসে গন্ধে।

সমস্ত খাদ্যগুলিই অপরিমিত উপাদেশ ও পেয়..মাতৃবাৎসল্যের
মত। সত্যিই লেখগুলিকে তো মন দিয়েও উছ করা যায় না।
চর্যগুলিও অহো, নয়নের আরাম, অপূর্ণ্য। চূষাগুলি একান্তই
অদ্ব্য। তুল'ভ পুষ্টিকর সেই খাদ্য-সমারোহ অবলোকন করে আচ্ছাদে
আটখানা হয়ে উঠলেন বশোদাহুলাল। সহচরদের হাঁক দিয়ে বললেন
—গেল গো..মদ-মাৎসর্য সব ধ্বংস হয়ে গেল গো। এবার ভাই,
এগুলো তুলে নাও, চল বনে গিয়ে মোদকগুলোকে ধ্বংস করা বাক।

এমন প্রণয়ভরে এই কথাগুলি উচ্চারণ করলেন নন্দহুলাল যে,
একমুহূর্ত্তে অভিমানমুক্ত হয়ে গেল সকলের মনোবৃত্তি। খাদ্য সম্ভার
গ্রহণ করবার জন্তে এগিয়ে এলেন সকলে। কিন্তু যিনি সৌন্দর্যে
..অবু'দ কল্পপেরও হৃদয়ে অবু'দ ষটিয়ে ছাড়েন..তিনি পুনরায়
বললেন—“খাদ্যগুলি সব আধ্যাত্মিকদের হৃদয়ের মত বড়পাকের।
ওগুলো তুলে নিয়ে বাছুরদের পাছু পাছু দৌড়লেও গলে যাবে না
কিছু..” বলতে বলতে লীলাবালক বখোচিত বকন করে দিতে
লাগলেন খাদ্যভার, সখারও নিতে লাগলেন, ধীর যেমন ক্ষমতা। কিন্তু
খাবার অত হলে হবে কি, কম পড়ে গেল; কৃষ্ণের সখাদের সখ্যাও

তো আর কিছু কম নয়। রগড় দেখে হাসি চাপতে পারলেন না ভগবন্ধননী। নিয়ে এলেন আরো খাবার, আরো খাবার।

৩১। প্রত্যেকেরি নিজের নিজের সুন্দর সুন্দর বাক। শিকের কোলানো ভাঁড়! ভাঁড়ে ভাঁড়ে ভাগ করে খাবার নামিয়ে রাখলেন কৃষ্ণসচরায়। তাম্রপর সেজেগেজে বেই বাত্রা করবেন সফলে, অগ্নি ভগবন্ধননী নিজের হাতে আবার একবার ছিমছাম করে গুছিয়ে দিলেন শ্রীভগবানের বেশভূষা এবং বিশেষ করে তাঁর হাতে তুলে দিলেন বেণু, গলার তুলিয়ে দিলেন বনমালা। মেহসূত ক্ষীরধারার সিক্ত হয়ে গেল তাঁর কণ্ঠকের অগ্রশরিসর। পূবকুণ্ডলের সঙ্গে কিছুদূর সঙ্গ নিলেন বালকদের।

আগে আগে চলেছে কৃষ্ণের অসংখ্য বাছুর। পাঁছে পাঁছে চলেছে অসংখ্য অমুচরদের প্রত্যেকের অগণিত বাছুর। তারপরে শ্রীকৃষ্ণ। কী বেন কী কারণে, কিসের বেন কোতুলে বার রয়ে গেলেন হস্তধারী বলরাম।

মেতে মেতে দাঁড়িয়ে গেলেন মা। দেখতে লাগলেন তাঁর হেলটিকে। শ্রীকৃষ্ণ চলেছেন আর তাঁর পাছ পাছ চলেছেন সখারা। সে এক অতিশোকোক্তব সৌন্দর্য্যদর্শন।

শ্রীকৃষ্ণের বাম হাতে রয়েছে বেণু, ডানহাতে ঢাক যষ্টি, কটিদেশে বের এবং পাতায়-রচা অত্যন্ত একটি শৃঙ্গ; চিকণ চুলের চূড়ার কপেছে শিশি-শিখণ্ড; কিন্তু কাঠর উপকণ্ঠে গুজ্জাহার; আর তাঁর কান দুটিকে ঢেকে রেখেছে নীলোৎপলের নির্মল দুটি মাধুরী।

সত্যিই, বড় আশ্চর্য ঠেকল মায়ের চোখে যখন তিনি দেখলেন... বার অতো আর অমন ভালো ভালো অলঙ্কার থাকতে কৃষ্ণ বটেছে হাতে অবহেলা! আর বংশপালদের অহুসরণে হঠাৎ অত্যন্ত অমুরাগ পড়েছে তাঁর বগা বেশভূষায়! কিন্তু কৃষ্ণ তখন ছুটেছেন ব্রজবালকদের সর্বাগ্রে... বজ্রবস্ত্রী মালা নাচিয়ে। তাঁর বক্ষের ভিত্তিতে আভা কাটেছে শ্রীবংশ-চিহ্নের স্বর্ণ রেখা।

ব্রজবালকদেরও শোভা কিছু কম যায় না। তাঁদেরও প্রত্যেকের বাঁ কাঁধে সুন্দর গড়নের বাক, বাকের ডগার শিকের ঝলছে ভাঁড়ভর্তি খাবার; কোমরে বেণু, বিমাণ, পদ্ম-মুগদী আর শৃঙ্গ। তাঁদেরও হাতে—যষ্টি, কানে কুঁচফলের কর্ণপূর, মাথার ময়ূর-পিচ্ছের রচনা, গলায় গুজ্জাহার। প্রত্যেকটিকেই মানিয়েছে ভালো কটিহটের ধটর বাহারে।

মাতৃদেবীরা যদিও তাঁদের প্রত্যেকেরই হৃগতে পরিবে দিয়েছিলেন কেবুর, বলয়, ঘটা করে কোমরে বেঁধে দিয়েছিলেন কিক্কিী আর মণিময় কোমরবন্ধ, গলায় পরিবে দিয়েছিলেন হার, কানে কুণ্ডল, চোখে মঞ্জীর... তবুও এই ব্রজশিশুদেরও কেমন যেন তেমনটি আগ্রহ ছিল না সেই সব ভূষণে, যেমনটি ছিল তাঁদের ঐ বাছুর-চরানো বস্ত্র সাজে।

৩২। খেলতে খেলতে দূরে চলে গেলেন ব্রজবালকেরা, আর কোতুলকের আকুলতার চোখ কুঁচকিয়ে বহুক্ষণ তাঁদের দিকে তাকিয়ে রইলেন ব্রজরাজমহিষী। তারপরে অতিব্যবধানের বাধায় আর্তী হয়ে বীরচরণে ফিরে এলেন রাজভবনে।

৩৩। বংশ-বাহিনীটিকে অগ্রাে নিয়ে শ্রীভগবান যখন চলেছেন, তখন পরম-হৃবিরতম হলে হবে কি, সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মারও স্বদয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠল অচূর্ণ-কুতূহল-বিলোকনের বৃত্তিনিচর। পরক

আম্বারাম হলে হবে কি, নীলকণ্ঠ শিবেরও হৃদয় ভরে উঠল উৎকর্ষিত আনন্দে। মেঘ দেখে যেন নেচে উঠল ময়ূর, পূর্ব দেখে যেন মুখ খুলল কমল। নভোবাজ্যে নিমেঘ হারিয়ে তাঁরা দুজনেই দাঁড়িয়ে রইলেন চিত্রলিখিতের মত। ইন্দ্রাদি প্রমুখ কৌতুকলম্পট দেবতাদের কথা না ভোলাই মঙ্গল।

৩৪। এগিয়ে এগিয়ে চলেছেন শ্রীভগবান, আর তাঁর শিহিরে-পড়া সখারা এদিকে বাজী ধরছেন... কে আগে ছুঁতে পারবে তাঁকে। আমি আগে আমি আগে বলেই দৌড়লেন সকলে। তারপর ছুঁয়েই... 'আমি আগে ছুঁয়েছি, আমি আগে'... বলে কণ্ঠাও করতে লাগলেন নিজেদের মধ্যে। পরস্পরকে এই জয়েছা! শেষে সকলে... শ্রীকৃষ্ণকেই বরণ করলেন সাকীরূপে। তেন অবস্থায় প্রথমে হেসে কেললেন শ্রীভগবান। হাসির অমিরায় ভেসে গেল দশন-বসন, দিকদিগন্তে যেন ফুটে উঠল শেতকরবী। তারপরে সহচরদের মুখের উপর বৃষ্টি রেখে তিনি দৃঢ়ভাবে বললেন—'কে আগে, কে পরে, সে বিচারে তোমাদের এত প্রয়োজন কিসের? এই স্থানেই তো তোমরা রয়েছ, তোমরা তো একসঙ্গেই আমাকে পে'য়েছ।'।

৩৫। মুনীমানস-হুল্লভ মহুজদমন যখন এই প্রকারের আলাপন করতে করতে বাছুরদের পাছ পাছ ছুটলেন, তখন কৌমুদীকদম্বকে অম্লবর্তন করে তাঁর সেই চকল তিমিরাকুর সদৃশ অগ্রসরণ গোপবালকদের সকলের মধ্যেই উচ্ছলিত করে তুলল ক্রীড়ারসের এক অপূর্ণ আনন্দ গন্ধ। একদল হরণ করলেন অপর দলের শিক্যা; তাঁদের হাত থেকে আবার সেইটি নিয়ে নিলেন আর একদল; আবার সে দলের হাত থেকে সেইটি ছিনিয়ে নিলেন আর একদল; নিরেই হোঃ হোঃ হাসি। ধাঁদের জিনিষ তাঁদের হাতেই ফিরিয়ে দিলেন সোঁট। কেউ কেউ চকিতে বদলিয়ে নিলেন খান্ড। বদলানোও যেই, ধরাটি পড়াও সেই, ফিরিয়ে দেওয়াটিও সেই; আর তারপরেই হোঃ হোঃ হোঃ হাসির ঝোল। একখানা বিলাস বটে হাসির, তারপরেই আবার বিলাসভরা আলস্ত!

ঐ রে, ঐ দেখ, ও চুরি করেছে ওর পাঁচনবাড়ি। ছিঃ ছিঃ, ঐ দেখ, ও ছিনিয়ে নিয়েছে ওর বেণু। নিয়েছে, চুরি করে নিয়েছে শিঙা, গলা থেকে সরিয়ে ফেলেছে গুজ্জামালা! হাঃ হাঃ হোঃ হোঃ, ঐ'র কাছ থেকে নিয়েছেন উনি, ওনার কাছ থেকে তিনি, তাঁর কাছ থেকে ঐ উনি; এ বে একেবারে চুরির মোজ্বব। কি মজা যে কি মজা, যার যেটি হারাল, তার হাতেই যে ফিরে আসছে সেটি। হোঃ হোঃ।

৩৬। এইভাবে খেলতে খেলতে কিছুদূর এগিয়ে যেতেই তাঁদের সামনে পড়ল এক গোচারণ-ভূমি। নবীন ভূপাক্ষের পর্য্যাপ্তি দেখে বাছুরদের কী চারপায়ে আনন্দ! তৃপ্তির খাওয়া খেয়ে যখন তারা বিশ্রাম করতে বসল, তখন ব্রজবালকেরা আবার রম্বে উঠলেন যেতে। অতি সুন্দর দেখে একটি গাছের তলা বেছে নিয়ে নিজের নিজের বাক ইত্যাদি সামগ্রী সেখানে তাঁরা রাখলেন। তার পরে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে রগড় করতে করতে তাঁকে হাসাতে হাসাতে রচনা করতে লেগে গেলেন খেলা থেকে খেলাস্তর।

নিকটেই একটা ময়ূর নাচছিল, আনন্দে ডাক ছেড়ে। তাই না দেখে তারি নাচের চঙে নাচতে লেগে গেলেন কেউ কেউ। দীর্ঘির পাড়ে চূপ করে দাঁড়িয়েছিল এক বক; তার অহুসরণে

গা কুঁচকিয়ে বসে পড়লেন কেউ কেউ। ব্যাঙ লাফাচ্ছে জলে; অমনি কতকগুলি বালককে ব্যাঙের মত তড়াক তড়াক করে লাফিয়ে, ঝাঁপিয়ে পড়তেই হল জলে। আকাশ দিয়ে এদিক ওদিক উড়ে যায় পাখীরা; অমনি তাদের ছায়া-খরাব খেলায় মেতে উঠতেই হল একদলকে।

বাঁদর বসে আছে গাছের ডালে। মুখ ভেঙিয়ে ভীষণ চোঁচিয়ে সেগুলোতে ভয়-দেখানোর খেলা খেলেন কেউ কেউ। কেউ আবার খোলানো লাজ্জ ধরে মাঝে মাঝে টান। বাঁদরগুলো তড়তড় করে চড়ে যায় গাছের ডগায়; কিন্তু এঁরাও কি কেউ কম যান? এঁরাও তড়তড় করে গাছে চড়েন নিমেষে, বাঁদরের সঙ্গে সমানে মাঝে মাঝে। কেউ গগে ওঠেন, কেউ নেচে ওঠেন, কেউ আবার হাসেন.. বাঁদরের লক্ষ্য করে হিন্দিগিলিয়ে।

ওদিকে আবার আর এক খেলায় কেউ হলেন রাজা, কেউ বা হলেন মন্ত্রী। একজন হলেন কোটাল, অগ্নেরা হলেন সামন্ত। অতঃপর কাউকে তেঁটেই হল চোর। অতঃপর চোরটিকে ধরে রাজার কাছে হাজির করে ক্রুদ্ধমুখিত কাউকে নিবেদন করতেই হল অপরাধের বিজ্ঞাপন। রাজা জারী করে দিলেন চোর-শাসনী আজ্ঞা।

আবার এদিকে চলল হুট বাস্কেট মিলে মেড়ার লড়াই। সাম্যনাসাম্যি ঘাড় বেকিয়ে একবার জোরে তেড়ে আসছেন দুজনে, একবার হেটমুণ্ডে জোরে পছিয়ে যাচ্ছেন দুজনে। খেলায় এত রগড়ও থাকে। কেউ কেউ বাগ্ন হলেন। গর্জন ছাড়লেন বটু ও পটু। বিভীষিকা অজ্ঞদের। কেউ এসেন টিপিটিপি, পিছন থেকে, দুতাত দিয়ে টিপে ধরলেন অসংবানীর জোড়া চোখ। আর এই সমস্ত খেলার মধ্যে মুক্তিমান তর্ঘ্ব রসময় গ্রামঃ গোপ-বালকেরা মূর্তিনন্দ গ্রাম্যবালককণী—শ্রীভগবানের সঙ্গে বনভূমি আলোড়িত করে রঙ্গিলা হয়ে উঠলেন, যেমন হয় সিংহশাবকেরা মহাশিঙের শ্রেষ্ঠশাবকের সঙ্গে খেলায়, যেমন হয় হাতীর বাজারী অভিনবোন্নত জাগত উন্নত হস্তিশাবকের সঙ্গে খেলায়।

৩৭। তারপর ব্রজবালকেরা সকলে মিলে মন্ত্রণা করলেন—

“আজ্ঞা দেখা যাক, কে বেশী জোরে দৌড়াতে পারে, কুক না আমরা?” সকলেই দিলেন দৌড়। শ্রীকৃষ্ণও দৌড়লেন বটে, কিন্তু একটু যেতে না যেতেই তাঁকে অতিক্রম করে চলে গেলেন সাখীরা।

৩৮। হায়রে, প্রকৃতি বা প্রকারণ অথবা বিজ্ঞমান বাঁর অশ্রমন্ত জাগৃতি, তাঁকে, সেই হেন শ্রীকৃষ্ণকেও দৌড়ে হারিয়ে দিতে গেলেন ব্রজবালকেরা! আশ্চর্য্য, ছাড়িয়েও গেলেন তাঁকে। কিন্তু আশ্চর্য্য ব্যাপার, কিছু দূর গিয়েই তাঁরা দেখতে পেলেন, সত্যিই একটি বিরাট অত্যাশ্চর্য্য বস্তু। বস্তুটি আর কিছুই নয়, মাত্র মুক্তিমান পাপের মত এক অশুর, নামঃ.. অশাসুর।

এই অশাসুর.. বকী (পুতনা) ও বকাসুরের সহোদর। বক-বকী দুজনেই ইতঃপূর্বে বালগে গিয়েছিলেন, তাই অসীম হয়ে উঠেছিল অশাসুরের ক্রোধ এবং শোক। স্বপ্নের সমস্ত অগ্রহ ও আবেগ নিয়ে তাই তিনি এতকাল কামনা করেছিলেন বৈর-মুখি। ক্রুরমতি অতি-পামর সেই অশাসুর আজ নিঃশব্দে কিন্তু আবির্ভাবে ক্রুদ্ধ করে পাড়ালেন ব্রজবালকদের গোচারণপথ। পৃথিবী ছুঁয়ে রইল

তাঁর চোঁচের নীচের পাটি এবং উর্ধ্বে মহাকাশ ছুঁয়ে রইল তাঁর উন্নতমস্তকের উপর পাটি। যেন চরাচর গ্রাস করতে চায় একটি বিপুল হা। ভীত হয়ে উঠলেন ব্রজাদি দেবগণ। এই অদ্বৈত আবিষ্কারে বিশ্ব-বাচাল হলেন ব্রজবালকেরা—

৩৯। “আরে, এতো এক বিচিত্র গিঁ-গহবর দেখা যাচ্ছে তো! দেখ, দেখ, চোখ মেলে দেখ; মনের ভুল, চোখের ভুল, সব ভুলগুলোকে ছেঁটে ফেলে দেখ, ১০০ পৃথিবীতে কিনি এমত হয়েছেন যিনি এই গহবরটার শোভা আর রঙ্গ দেখে না মজবেন? ..দেখেছিল ভাই, এটি যেন একটি মহাসর্প, বিরাট আলস্তে মুখ হা করে যেন বসে রয়েছে।”

৪০। সত্যিই তো, সর্পদ্বন্দ্বীর মতই তো দেখাচ্ছে এই গিরিন্দরার শৃঙ্গগুলি। ভয়ও পাচ্ছে, আনন্দও হচ্ছে। সত্যিই যেন সাপের দোঁচালি ঝিভ আমাদের ভয়গুলোকে নেমস্তর করে ডাকছে। গুহার বাইরে বেরিয়ে এসে নিশ্চয় একজোড়া বোজন-লতা ফুর ফুর করে বাতাসে কাঁপছে।”

৪১। “মহাসর্পের বিষের স্মৃলঙ্ঘের মত এই গুহাটা খেঁকও ছুটে বেরিয়ে আসছে নানান ধাতব কণা। বুকে চে, মহাসর্পের তালুতে থাকে অতিভয়, শোক আর বিকার; এই গুহার উপর দিকটান্তও দেখছি, ছড়ানো রয়েছে কুকবিদ্বন্দিয়ার বিলাস। দেখিস ভাই, মহাসর্পের কুন্সিত ধমনীর মত ঐ লতাগুলো গর্তের দিকে হোদের না টেনে নিয়ে যায়।”

৪২। বটেই তো, বটেই তো, সাপের মাথার হুপাশে থাকে যেমন দু-তুটো সুন্দর চোখ, এই গুহাটিরও হুপাশে রয়েছে তেমনি দু-তুটো বড় বড় কমলবাগ-মণি। সাপের নিঃশ্বাসের মত এই দরীটাতেও বইছে উপবন-ওপড়ানো প্রখর পবন; বিধানলের ধুমশোভার মত এতেও উঠছে মরকতমণির আভা। গুহার মাথাটাও কি ঠিক কণা মতনই দেখতে?

৪৩। তাহলে ভাই সব, এখন এস; এই গুহার মধ্যে আমরা প্রবেশ করি। গহবর দেখে আর কে সরছে বল ভরে?

মনঃস্থির করলেন বটে সকলে, কিন্তু পরক্ষণেই আবার কেমন যেন তাঁদের সকলের বুদ্ধিদেবীটি কালিয়ে গেলেন সন্দেহে আর শঙ্কায়। শেষে স্থির করলেন—

“সত্যিই যদি এটা প্রবল প্রতাপ সর্পট হয়.. তাহলে..? তাহলে আর কি? তাহলে ভাই সব, আমাদের অরিন্দম প্রিয়-সখা এটিকে নির্ধাৎ মেরে ফেলবেন.. বকাসুরের মত। আর উদ্ধার করবেন আমাদেরও। অস্ত্র কারোর সাধ্য নেই অমন ব্যাপার সামলানো।”

এই বলে সকলে মিলে তখন তড়তড় করে সাপ-তাড়ানোর ভঙ্গিতে তালি বাজাতে লাগলেন হাতে। শ্রীভগবানে তাঁদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস, একান্ত তাঁদের আশ্রয়তা। কই শ্রীকৃষ্ণ তো তাঁর সূচক মুখখানির একটি চাক চাউনি দিয়েও তাঁদের নিবেদন করছেন না। ব্যাস, তালির করতাল বাজাতে বাজাতে তখন দেবতন্ত্র সকলে ব্রজগোপালোরা প্রবেশ করলেন অশাসুরের আনির-বিবনে।

[কথনঃ

দিনের পর দিন প্রতিদিন...



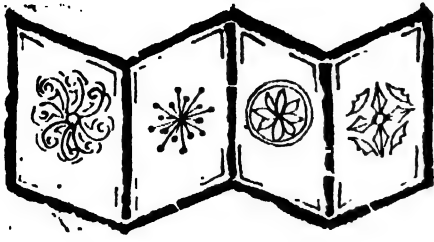
রেস্কোনা সাবান

আপনার ত্বকে
আরও সুন্দর করে

যতবারই আপনি রেস্কোনা সাবান দিয়ে মুখ ধোবেন—
আপনার ত্বক আরও মসৃণ, আরও মোলায়েম দেখাবে।
তার কারণ, রেস্কোনার থাকে ক্যাডিল—অর্থাৎ
কয়েকটি ত্বকের এক বিশেষ সংমিশ্রণ যা আপনার
লাবণ্যকে হ্রাস করে তোলে এবং আপনার ত্বকে
সুস্থ রাখে। রেস্কোনার সরের মত ফণা মাখুন দেখবেন
আপনার ত্বক প্রতিদিন আরও সুন্দর হয়ে উঠছে।

আপনার সৌন্দর্যের জন্যে... রেস্কোনা





পত্রিকা

বিখ্যাত সাংবাদিক পদ্মিনীমোহন নিয়োগীকে লেখা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অপ্রকাশিত পত্রাবলী

[রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ পরিচালিত “বেঙ্গলী” পত্রিকার সহ-সম্পাদকরূপে পদ্মিনীমোহন নিয়োগী বাঙলার অগ্নিযুগে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন। তাঁর সাংবাদিক খ্যাতি সর্বজনস্বীকৃত। বাঙলার বহু জাতী-প্তনী ও নেতৃস্থানীয় পুরুষের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে ইনি আসেন এবং তাঁদের সঙ্গে তাঁর পত্র বিনিময় হয়। এই অসংখ্য অপ্রকাশিত পত্রের মধ্যে কয়েকখানি মাত্র এখানে প্রকাশ করা হল। ১৯৫৪ সালের ১২ই মার্চ পদ্মিনীমোহন পরলোকগমন করেন। পত্রগুলি ক্রীমতী সাধনা নিয়োগীর সৌজন্মে প্রাপ্ত।—স:]

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের পত্র

দি ‘বেঙ্গলী’ [স্থাপিত ১৮৫৯]

১২৬, বহুবাজার স্ট্রীট

টেলিফোন নং ১৩৭

কলিকাতা ১৫৮/১১১৬

প্রিয় পদ্মিনী বাবু,

আমি আপনার পত্র পাইয়াছি। আপনি যে নবাবজাদার ‘অন্ততঃ’ একটি ভোট আমার জন্য সংগ্রহ করিয়াছেন, সেজন্য আপনাকে নিতান্ত আন্তরিকতার সহিত ধন্যবাদ জানাইতে ইচ্ছা করি। ‘অন্ততঃ’ কথাটি তাৎপর্যপূর্ণ। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, আপনি আপনার চেষ্টা এখনও ত্যাগ করেন নাই এবং সম্ভব হইলে উত্তর ভোটই আপনি আদায় করিবেন। প্রতিবন্ধিতা জোর তইবে এবং আমি আমার বন্ধুদের যতদূর সম্ভব সমর্থন চাই।

আশা করি আপনি বেশ কুশলেই আছেন। আপনার

(স্বাঃ) সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী

পুনশ্চ—নবাবজাদা কখন কলিকাতার আসেন, অল্পগ্রহপূর্বক জানাইবেন এবং তাঁহার ঠিকানাটাও দিবেন। (স্বাঃ) এস, এন

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের পত্র

১১, আপনার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

প্রিয় নিয়োগী বাবু,

১১শে আগষ্ট, ১৯১২

আপনার সামুগ্রহ পত্রের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি আপনাকে অকপটভাবে আশ্বাস দিতে চাই যে, আমার বন্ধুদের সম্পর্কে আপনার সম্ভব মতামত ও শুভেচ্ছার আমি খুব মূল্য দিয়া থাকি। ইংল্যাণ্ডে থাকাকালে আমি কখনও কোন ফটো নিতে দিই নাই বলিলেই চলে। কারণ, এই জিনিসটাকে আমি ভয়ের চোখে দেখিয়া আসিয়াছি। বছর দুই হয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যন্ত্রপাতি সহ আমার বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। ‘মডার্ন রিভিউ’-এ তাঁহার তোলা একটি ছবি প্রকাশিত হয়। উহাই পুনরুজ্জিত করিয়া এই সঙ্গে দেওয়া হইল।

সাংবাদিকতার সুন্দর কাজটি আপনাকে ছাড়িতে হইয়াছে, সেজন্য দুঃখিত। তবে আমি ভালরকম জানি যে, এই ভিন্ন আপনার উপায় ছিল না।

আপনার ‘জাতীয় এলবামটি’ পাওয়ার প্রত্যাশায় রহিলাম।

ইতি—

আপনাদের

(স্বাঃ) পি. সি. রায়

মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্তের পত্র

ক্রীমতী

বরিশাল

৭ই বৈশাখ, ১৩১৫

অধ্যাপকদেবু,

আপনার পত্রখানি কাল পাইয়া আপ্যায়িত হইয়াছি। আমার শরীর আজকাল বড়ই অসুস্থ। Diabetes বাড়িয়াছে, শ্রুতবা দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি। আবার আপনাদিগের সম্মেলনের দিনে পূর্ব দিনই আমার জ্যাকের মামলার তারিখ। অত্যন্ত দুঃখের সহিত এবারও ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইতেছে। কি করিব? ইচ্ছা থাকিলেও আপনাদিগের উৎসবে যোগ দিতে পারিতেছি না।

আর যে Indian World পাই না? মূল্য বাকী কত লিখিলেই ত পাঠাইয়া দিতে পারি। আমি বোধহয় লিখিয়াছিলাম February মাসে একখানি V. P. তে পাঠাইতে। আঁ সাধারণতঃ পত্রিকার মূল্য ঐ মাসে ঐ ভাবে দিয়া থাকি। বার মূল্য বাকী কত লিখিলে অনুগৃহীত হইব। ইতি— অনুগত

(স্বাঃ) অশ্বিনীকুমার দত্ত

অধ্যক্ষ হেরফচন্দ্র মৈত্রের পত্র

৬৫, হারিসন রোড, কলিকাতা

২২শে ডিসেম্বর, ১৯১৩

প্রিয় পদ্মিনী বাবু,

চলিত মাসের ১লা তারিখে লিখিত আপনার পত্রের উত্তর দিই গোঁণ হইল বলিয়া দয়া করিয়া মাফনা করিবেন। আর্ম'থুই বা ছিলাম এবং সেই কারণেই এই বিলম্ব ঘটয়াছে।

বাবু ভুবনমোহন হাওলাদার আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন কথাবার্তায় তাঁর সম্পর্কে আমার বেশ ভাল ধারণাই হইয়াছে। বি দুঃখের বিষয়, আপনি যে পত্রের জন্য তাঁহার নাম সুপারি করিয়াছেন, সেইটিতে তাঁহাকে নিযুক্ত করিতে পারিব বলিয়া ম হয় না। আমাদের পরিবদ একজন প্রোভুয়েট কিংবা অনুগ শিক্ষাপ্রাপ্ত লোক চাহেন। এখন যিনি লাইব্রেরীর ভারপ্রা সেই ভদ্রলোকের চেয়েও অধিক যোগ্যতাসম্পন্ন একজন লাইব্রেরী আমাদের দরকার। যদি তুলনায় নিশ্চিতরূপে ভাল না হইলে তেমন কোন লোককে নিয়োগ করার আদৌ যৌক্তিকতা থাকিবে না

বাবু শশিভূষণ রায়কে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করিবেন। তাঁহাকে এই কথা বলিবেন যে, ভবানীপুরে তিনি যখন অসুস্থ ছিলেন, সেই সময় তাঁহাকে দেখিতে যাইতে পারি নাই বলিয়া তিনি যেন আমার ক্ষমা করেন। তাঁহার সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করার বিষয় আমি প্রায়ই ভাবিয়াছি, কিন্তু, কাজের বিশেষ চাপে ইহা করিতে সময় পাই নাই। তিনি কেমন আছেন—জানিবার জন্য ব্যাকুল ছিলাম। সুস্থ আছেন জানিতে পারায় আমি খুবই আনন্দিত। ইতি—

আপনাদের

(স্বাঃ) হেরশচন্দ্র মৈত্র

শ্রী রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পত্র

৬ নং ও ৭ নং ব্রাইড স্ট্রীট, কলিকাতা।

১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯১০

প্রিয় মহাশয়,

১৪ই সেপ্টেম্বরের পত্রে আপনি যে অনুরোধ জানাইয়াছেন, তদনুসারে আমি এই সঙ্গে আপনাকে আমার দুইখানি ফটো এবং স্থানীয় দুইটি পত্রিকার কাটিং পাঠাইতেছি। কাটিংগুলি হইতে আপনার বইয়ের জন্য কিছুটা নোট করিয়া নিতে পারিবেন। এই পত্রিকাগুলির তারিখ হইতে আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো (তদুপরি উক্ত সংস্থার ফ্যাকাণ্ট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং-এর অন্ততম সদস্য), শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের একজন গভর্নর ও ভারতীয় যাদুঘরের (কলিকাতা) অন্ততম অছি নিযুক্ত হইয়াছি।

আপনি যে ফটোখানি পছন্দ করেন, তাহাই কাজে লাগাইতে পারেন। ব্যক্তিগত ভাবে আমি অবশ্য ইহার ভিতর ছোট্ট যে ফটোট, তাহাই পছন্দ করি। দুঃখের বিষয়, আমার কোন হাফটোন ব্রক নাই। তবে খুব সম্ভব দুই তিন সপ্তাহের ভিতর আপনাকে আমি একটি দিতে পারিব।

একান্ত অনুরাগী

(স্বাঃ) আর, এন, মুখার্জী।

বাবু পদ্মিনীমোহন নিয়োগী

বরাবরে

সাব এডিটর, 'বেঙ্গলী'

দেশনায়ক ভূপেন্দ্রনাথ বসুর পত্র

১৪, বলরাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা।

২রা জুলাই, ১৯১৭

প্রিয় পদ্মিনী,

তোমার সহৃদয় অভিনন্দন পত্রের তত্ত্ব অসংখ্য ধন্যবাদ। কবে পর্যন্ত আমার পক্ষে রওয়ানা হওয়া সম্ভব, আমি নিজেই জানি না। তবে কলিকাতা হইতে ১৫ই আগস্টের পূর্বেই যাত্রা করিব। ইতি—

ততাকাকী

(স্বাঃ) ভূপেন্দ্রনাথ বসু

ডাঃ শ্রী নীলরতন সরকারের পত্র

৬১, হারিসন রোড, কলিকাতা

১৮-১-১৯১৩

প্রিয় পদ্মিনী বাবু,

আপনার সান্ন্যস্ত পত্রখানি আমার হস্তগত হইয়াছে। আমার প্রিয় ভায়ের মৃত্যুর কথা বলিতে গেলে এই আবারও এতই নিদাক্ষণ ও অপ্রত্যাশিত যে সহ্য করা কঠিন। কিন্তু আমাদের অভিযোগের অবকাশ নাই, সহ্য করাই আমাদের কাজ। আমাদের শোকের মাঝেও ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, এই শোকও অন্তভাবে তাঁহার কক্ষণা মাত্র। বঙ্গীয় পরিষদের সদস্য হিসাবে আমার নিয়োগের ব্যাপারে আমি (১) আমার পেশা ও (২) লর্ড কারমাইকেলের কাছে ঋণী। এই মর্বাদার আমি কতখানি অযোগ্য, সে আমার অজানা নয়। কিন্তু আমি কাজ করিতে চাই ও শিখিতে চাই। এক্ষণে আমার কাছে এইটি আমার শিক্ষার আর একটি ধাপ ছাড়া কিছু নয়। আমি একজন কৃতী ছাত্র হইব কিনা, জানি না। তবে আমি কঠোর শ্রম করিতে চাই। এখন আমার আন্তরিক প্রার্থনা, আমি যেন আমার মাতৃভূমির কোন না কোন কার্যে লাগিতে পারি।

আপনাদের

(স্বাঃ) নীলরতন সরকার

বি, কে, রায়চৌধুরীর পত্র

গৌরীপুর

১২।৭।১৬

প্রিয় পদ্মিনী বাবু,

এইমাত্র আমি আপনার পত্র পাইলাম। আপনি যেন আমার জন্য এতটা যত্ন নিয়া থাকেন, সেজন্য অশেষ ধন্যবাদ। বাবু হেমেন্দ্রনাথ রায় এক হিসাবে জলপাইগুড়ি এন্ট্রিতে যোগদান করিলেও আমি সরকারী ভাবে অন্তত তাঁহার চাকুরী অনুমোদন করিতে পারি না; কিংবা বালিহার এন্ট্রিটের পরীক্ষিত হিসাব তাঁহার দাখিল করার পূর্বে এই এন্ট্রিটের সম্পর্ক ছিল করিতে তাঁহাকে অনুমতি দানে আমি অক্ষম। সুতরাং আমি দুঃখিত যে, ঠিক এই মুহূর্তে আমি আপনার অনুরোধটি বিবেচনা করিতে পারিতেছি না। সে বাহাই হোক: আপনি কুমারের নিকট ও ভূপেনবাবুর নিকট এই সম্পর্কে পত্র লিখিতে পারেন। কুমার খুব শীঘ্র সাবালক প্রাপ্ত হইতে চলিয়াছেন। তাঁহার নিজের নির্বাচনের উপরই আমি বিশেষ ভাবে নির্ভর করিব।

এখন আমি অপেক্ষাকৃত ভাল আছি। ৭ই আগস্ট কাউন্সিলের পরবর্তী বৈঠকে যোগদান করিতে পারিব। আপনারা ভাল আছেন—এই বিশ্বাস রহিল। ইতি—

একান্ত আপনার

(স্বাঃ) বি, কে, রায়চৌধুরী

শ্রীমদ্ব্যাক্তি ঘোষের পত্র

দি অমৃতবাজার পত্রিকা লি:

২, আনন্দ চ্যাটার্জী লেন,

বাগবাজার, কলিকাতা।

১১ই ফেব্রুয়ারী, ১৯১১

প্রিয় পদ্মিনী বাবু,

হাঁ, আপনার বই-এর জন্য ঠিক যে সময় প্রয়োজন হইবে, তখনই ব্রুকটি পাইবেন, পূর্বে নহে। কারণ, বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে বাহারা এইটি চাওয়া লিখিতেছেন, তাহাদের জন্য আরও কতক কপি মুদ্রণ করিতে চাহিতেছি। হাঁ, ব্রুকটি ১১৫, আমহার্ট ষ্ট্রিট Acme Pressএর বাবু চিত্ততোষ বসু-র নিকটেই আছে।

হিন্দু স্পিরিচুয়েল মাগাজিনের একটি সমালোচনা আপনার কাগজে বাহাতে প্রকাশ পায়, অমূল্যপূর্ণক দেখিবেন কি? কিছুকাল আগে ঐ কাগজের পঞ্চম বর্ষের সম্পূর্ণ সেটখানি এবং অল্পদিন হয় জাহ্নুয়ারীর একটি সংখ্যা আপনাকে পাঠাইয়াছি।

আপনাদের

(স্বাঃ) শ্রীমদ্ব্যাক্তি ঘোষ

কবি প্রমথনাথ রায়চৌধুরীর পত্র

সেন্ট হিল, দার্জিলিং

১৫১০/১২

প্রিয় পদ্মিনী,

চলিত মাসের ১৫ তারিখে লিখিত তোমার পত্রখানি পাইলাম। তুমি জান না যে, আমাদের নৌকাগুলি ভাগাভাগি হইয়া গিয়াছে। সবুজ নৌকাটি অর্থাৎ পিনিস (Pinnee) নৌকাটি আমার ভাগে পড়িয়াছে আর বড় ডাওয়ার্লিট পড়িয়াছে আমার ভাইদের ভাগে। রামসাতা পুকুরে আমার সবুজ নৌকাটির এখন মেয়ামতী চলিয়াছে। সুতরাং তোমার কাজে উহা আমি দিতে পারিতেছি না এবং তাহার জন্য দুঃখিত। আমার এক পান্‌সি (Panshi) নৌকা আছে। তোমার অভিপ্রায় অনুযায়ী সেইটি আমি তোমার কাজে দিতে পারি। যদি ইহাতে তোমার হয়, তাহা হইলে সম্ভাবে আমার ম্যানেজারের নিকট একখানি লিপি পাঠাইতে পার। তাহাতে ঠিক কবে তোমার নৌকাটি নব্বকার, সেইটি উল্লেখ করিও। আমি সম্ভাবে সেইভাবে নিবেদন দিয়া রাখিতেছি।

আমরা এখানে চেঞ্জ আসিয়াছি এবং আমাদের ভালই কাটিতেছে। আশা করি, তোমরা বেশ সুস্থ আছ। ইতি

ভদ্রাকাজী

(স্বাঃ) প্রমথনাথ রায়চৌধুরী

(সম্ভাব্য)

সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্র

ও

১৬ই মে, ১৯১৪

6, Dwarakanath Tagore's Lane

বিনয় নিবেদন,

আপনার পত্র পাইয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম। আপনি যে হলেটির সন্ধান দিয়াছেন তাহার সবন্ধে আপাততঃ আমি কোন কথা

দিতে পারিতেছি না, কারণ আমি দুই একটি ছেলে দেখিয়াছি এবং খুব সম্ভবতঃ তাহাদের একজনের সঙ্গে এই বিবাহ হইবে। যদি কোন কারণে এই বিবাহ না হয় তখন আপনার এই পত্রটি সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া দেখিব—আপনি গিরীনবাবুকে লিখিতে পারেন যে তাহার আপনার এই প্রস্তাব বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন।

আপনি এই বিষয়ে যে কষ্ট স্বীকার করিতেছেন, তাহার জন্য আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানিবেন।

ভবানী

(স্বাঃ) শ্রীসমরেন্দ্র

সাংবাদিক পৃথীশচন্দ্র রায়ের পত্র

৩৯, ক্রীক রো, কলিকাতা

১৩ই জানুয়ারী, '১৫

প্রিয় পদ্মিনী,

এই মাসের ১০ই তারিখে লেখা তোমার পত্রখানি গতকল্য সন্ধ্যায় আমার হস্তগত হইয়াছে।

তুমি গত শনিবার কিংবা রবিবার কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছাও নাই বলিয়া আমি আর আমার সঙ্গে এখানকার তোমার বন্ধুরাও খুবই দুঃখিত। তোমার যে পত্রের এখন উত্তর দিতেছি, তাহাতে তুমি নিজেকে ক্ষেপ আভাস দিয়াছ, তাহার চেয়েও সুবিধাজনক সর্বোত্তম তোমার জন্য একটা কাজ দেখিয়া রাখিয়াছিলাম। উহা ছিল মাননীয় রায় সীতানাথ রায় বাহাদুরের কাউন্সিল সেক্রেটারীর কাজ এবং সেইটি নয় মাসের জন্য। আমার কথামত তোমার শিল্পীর পোষাক পরিচ্ছদের জন্য তিনি পঞ্চাশ টাকা দিতে রাজী হইয়াছিলেন। ইহা ছাড়া তিনি নিজ হইতেই তোমার থাকা ও প্রথম শ্রেণীর গাড়ীভাড়া—সকল খরচ বহনের প্রতিজ্ঞা দেন। তিনি বিশেষ আগ্রহ সহকারে তোমার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, এমন কি, তাহার এক স্থলে বাত্রার নির্দ্ধারিত তারিখ পর্যন্ত শনিবার হইতে গত রবিবারে পিছাইয়া লন। কিন্তু তোমার তারবার্তা পাওয়ার পর তাহার পক্ষে তোমার জন্য আর অপেক্ষা করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। এই মাসে কাউন্সিলের মাত্র একটি বৈঠক ছিল এবং সেইটি গতকল্য হইয়া গিয়াছে। পরবর্তী বৈঠক আগামী মাসের ২৩শে তারিখের পূর্বে হইবে না। এই অবস্থায়—আমার অত্যন্ত দুঃখ হইতেছে যে, তাহাকে পুনরায় প্রবেশবাবুকে ডাকিতে হইল। আমার মনে হয়, এই প্রবেশবাবুই রায় সীতানাথের সহিত আবার সিমলায় গিয়াছেন। ইহা একটি বেশ অভিপ্রেত পদ ছিল এবং তুমি যে স্বার্থে কারণ ছাড়াই এই সুযোগ ছাড়িয়া দিলে, সেজন্য আমি দুঃখিত। বাহা ইউক, বাহা গত হইয়া গিয়াছে, তাহার নিমিত্ত দুঃখ করিয়া লাভ নাই। আমি এই মাত্র আশা করিব শীঘ্রই আর একটি সুযোগ আসিবে এবং তুমি সেই সুযোগ গ্রহণে এইভাবে ইতস্তত করিবে না।

তোমার শরীর ভালই বাইতেছে—ইহাতে আমি সুখী। আশা করি, জামালদার আরও বেশ কিছুদিন থাকিয়া শরীরটা সম্পূর্ণ সুস্থ করিয়া লইতে সক্ষম হইবে।

রায় সীতানাথের চাকরিটি তোমার উপযুক্ত হইবে, আমি এ মনে করি না। তিনি একটুতেই চট্টিয়া বাইবার লোক আর তাহার ভাইশো—বিনি তাহাদের বোধ সম্প্রদায় অংশীদার, সব ব্যাপারেই

তাহার উঠো কাঞ্চন দুইজন মনিব দুই পথে চলিলে, সেখানে চাকরি অভ্যস্ত নয়। কাজটি জোগাড় করা সম্ভব হইলেও আমি তোমাকে সেইটি গ্রহণ করিতে যাওয়ার পরামর্শ দিতাম না। যতদূর মনে হইতেছে তাহার একজন অবসরপ্রাপ্ত জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটকে নিবেন। তুমি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা গ্রহণ করিও। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী

(স্বাঃ) পৃথীচন্দ্র রায়

হেমচন্দ্র নাপের পত্র

Mymensingh

13. 4. 15.

My dear Padmini Babu

আপনার চিঠি কাল পাইয়াছি। আজ ১২ নং বার টাকা মনিঅর্ডার করিয়া আপনার নিকট পাঠাইলাম। বাকী ১০ নং postage stamp এই চিঠির সঙ্গে পাঠিবেন। আমি আসিবার সময় আমার টেবিলের উপর আপনার Hindusthan Review ও তাহার মধ্যে summaryটা রাখিয়া আসিয়াছিলাম—আশা করি পড়িয়াছেন। নাটুরা বাড়ী চলিয়া গিয়াছে কি? আমার চেয়ার ইত্যাদি বিক্রয় করা যজ্ঞ যে কষ্ট আপনি স্বীকার করিয়াছেন, তজ্জন আপনাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ।

Yours

Sd/-Hem Chandra Nag

অধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের পত্র

৬২, বহুবাজার স্ট্রীট

২৭৫১২

সকাল ৭ ঘটিকা

প্রিয় পদ্মিনী বাবু,

বহু দিন হইল আপনাকে একখানি পোষ্ট কার্ড লিখিয়াছি, আপনার কলিকাতার আসার পর আমাদের দেখাসাক্ষাৎ হয় নাই। আমাদের দুই জনকে হস্ত শীঘ্র কলিকাতা ছাড়িতে হইবে। সেই কারণে একবার বাহাতে আমরা মিলিতে পারি, সেইটি ঠিক রাখুন। একদিন ভোরবেলা কিংবা ৯-৩০টা ও ১০-৩০টার ভিতর কিংবা রাত্রি ৭-৩০টার পর এখানে আসিবার সুযোগ করিতে পারিবেন কি? কখন আসিবেন, অগ্রগতপূর্বক আমাদের জানাইবেন। আপনার সহিত আমার কয়েকটি বিষয়ে আলাপ আছে।

আপনাদের

(স্বাঃ) সুরেন দাশগুপ্ত

আশা করি, এখানে আপনি সুখেই আছেন। আমি আগামী মঙ্গলবার কি বুধবার রওানা হইয়া যাইতেছি।

প্রিয় পদ্মিনী,

সিমলা হইতে হঠাৎ তোমার একখানি পত্র আসায় আমি সত্যই বিমিত হইয়াছি। বিশ্বয়ের হইলেও এমন পত্র পাওয়া প্রীতিপ্রদ ও কাম্য। কলেজ হইতে বাহির হইবার পরই টাঙ্গাইলে যে কতক দিন কাটাইয়াছিলাম, সে দিনগুলি আমার জীবনের আনন্দময় দিনগুলির অন্তর্গত। আমার স্মৃতিপট সেই সকল দিনের কথা আজ স্পষ্ট গাঁথা

আছে। সেই সময় বাহাদের আমার পড়াইবার সুযোগ হইয়াছিল, আমার প্রতি তাহাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা কথা আমি কখনও ভুলিতে পারি না। আর তোমার ও আমার ভিতর ইহা ছাড়াও একটি বন্ধন ছিল।

পরিবার ও ছেলেমেয়েসহ আমি এখানে আছি। তুমি আমার বাড়ীতে অতিথি হইয়া আসিলে খুবই আনন্দিত হইব। একজন পরীকের পক্ষে যতদূর সম্ভব হয়, সেই পরিমিত অতিথ্যতা তোমাকে প্রদান করা হইবে। দয়া করিয়া অবগত আশিও। কোন কারণে আমি নিজে টেননে বাইতে না পারিলেও আমার বাড়ীতে তোমার লইয়া আসার জন্ত লোকের ব্যবস্থা রাখিব। পরোক্ষের তোমার বক্তব্য জানিতে চাই। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী

(স্বাঃ) এস, এন, দাশগুপ্ত

সৈয়দ নবাব আলির পত্র

২৭, ওয়েস্ট স্ট্রীট, কলিকাতা।

১লা এপ্রিল, ১৯১৬

প্রিয় পদ্মিনী বাবু,

আপনার ৩০শে মার্চের পত্র পাইলাম। 'হেরাল্ড' অফিস হইতে আমি তার চার্লস বেইলি'র টাইপ করা ভাষণ পাইয়াছি। সেইজন্য আপনাকে ধন্যবাদ। মনে হইতেছে ভাষণটি সম্পূর্ণ প্রকাশ পায় নাই।

নাগ মহাশয় তাহার পত্রে আমি যেন তাহার কাগজের গ্রাহক হই, সেজন্য আপনাকে আমরা বিশেষভাবে বলিতে অগ্রবোধ জানাইয়াছেন। ব্যাপারটি কি রকম, আমি যে একদম গোড়া হইতেই তাহার পত্রিকার গ্রাহক, এই স-বাদটা তিনি রাখেন না। এদিকে কাগজখানি পর্যন্ত নিয়মিতভাবে ধানবাড়ী যাইতেছে।

আপনাদের

(স্বাঃ) সৈয়দ নবাব আলি

কিশোরীমোহন রায়ের পত্র

Pabna

সোমবারপ্রতিবেশ্য,

১৮/১২/১১

আশা করি ভগবৎ কৃপায় আপনি ভাল আছেন। এখানে রবিবারের সভায় নিমন্ত্রিত হইয়া আমি আনন্দ প্রকাশ প্রসঙ্গে বলিয়াছিলাম, আমরা এরূপ স্বরাজ পাইলে আপাততঃ আর 'স্বরাজ' চাহি না। স্বরাজ যদি কুবাজ হয়, তাহার শাসক সম্প্রদায় যদি নিঃস্বার্থ ও নিরপেক্ষ না হন, সে আশ্রমে যদি জনসাধারণের শান্তিভাণ্ড না হয়, স্বজাতির মধ্যে যদি পরস্পর হিংসা বিষে বিদ্যমান থাকে, সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা যদি যেমন তেমন থাকে, তবে সে 'স্বরাজ' কাজ কি? আপনার নিকট আমাদের এই নিবেদন, এই কথাটি উল্লেখ করিয়া 'বেঙ্গলীতে' একটু সহজভূতিমূলক মন্তব্য প্রকাশিত হইলে অঙ্গুগৃহীত হইবে। সুখের বিষয়, পাবনার সকলেই এই নূতন কথাটিতে সত্যমুগ্ধ হইয়া অসাধারণ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

চিরদিনই আমার কার্যের প্রতি আপনাদের ব্বেহদৃষ্টি প্রকাশ পাইয়াছে, তাই আপনাকে লিখিলাম। নিবেদনমিতি।

ব্বেহাকাঙ্ক্ষী

ত্রিকিশোরীমোহন রায়।

সৈয়দ হোসেনের পত্র

৭নং দিদারবন্দ লেন

১২ই নভেম্বর ১৯০৮

প্রিয়বরেবু,

সকল দিকে কুশল থাকিলে ইহার ত্রিত্ব হইয়া আপনার সহিত দেখা করা আমার কর্তব্য ছিল। এক শোচনীয় দুর্ঘটনায় আমার ডান পাখানি জখম হইয়াছে এবং ইহাব ফলে গত তিন সপ্তাহ ধরিয়া আমি শয্যাশায়ী রহিয়াছি। আমি এখনও বলিতে গেলে নড়াচড়া করিতে পারি না। তবে হুই এক দিনের মধ্যে খোঁড়াইয়া চলিতে পারিব বলিয়া আশা রাখি। আমি যে ভোগ্যের কবলে পড়িয়াছি, তাহার বিষয় আপনি জানেন, দেখিতেছি। আপনার অত্যন্ত সন্তান্য অভিনন্দনপত্রের জন্য আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ। কিন্তু বলিতে বাধ্য যে, যে সুযোগ আমি পাইতেছি, ইহাতে আমার মন আদৌ সায় দেয় না। ইহার চেয়ে আর কি খাপ হইতে পারে। কাজটি আমার পক্ষে কতখানি অপ্রীতিপ্রদ হইবে, তাহা আপনি নিশ্চয় বুঝিবেন। সুতরাং আপনার সহানুভূতি আমি পাইব। কিন্তু অদৃষ্টের বিরুদ্ধে লড়াই দেওয়া চলে না! এবং এক্ষেত্রেও আমার পক্ষে যতই অসম্ভব হউক, সর্বোপরি ঘটনার গতিবেগ অরোধ্য। তবে আমার ব্যক্তিগত দুর্ভাগ্যের বিষয় জানাইয়া আপনাকে ভারাক্রান্ত করিব না।

শারীরিক সক্ষমতা ফিরিয়া আসিলেই আপনার সহিত দেখা হইবে এবং সেই সময় আরও আলোচনা করিব। ইতি

আপনাদের

(স্বাঃ) সৈয়দ হোসেন

পি, এল, গাঙ্গুলীর পত্র

বিন্দু হাউস

সিমলা ডব্লিউ

৬ই অক্টোবর, ১৯০৯

প্রিয় নিয়োগী বাবু,

আপনি আমার এখানে আসিয়া থাকিলে খুবই সুখী হইব। হুখের বিষয়, কাজের চাপে আপনাকে আনার জন্য আমি নিজে ট্রেনে আসিতে পারিব না। ইহাতে আপনি কিছু মনে করিবেন না, এই বিশ্বাস রাখি। পত্রবাহক আপনাকে আমার দীন কুটীরে লইয়া আসিতে সাহায্য করিবে।

আপনার

(স্বাঃ) পি, এল, গাঙ্গুলী

কিশোরীমোহন চৌধুরীর পত্র

রাজসাহী

১-৭-১৬

প্রিয় পদ্মিনী বাবু,

আপনার সন্তান্য অভিনন্দন বাক্যের জন্য ধন্যবাদ। ভগবৎ কৃপায় এই বৎসর আমি নির্দোষ হইয়াছি। সকলের সন্তোষজনক কাজ যাচাতে করিতে পারি, সেটুকু তাঁহার নিকটই প্রার্থনা জানাই। কাজের চাপে যথা সময়ে উত্তর দিতে পারি নাই, সে কারণে দুঃখিত। বিলম্ব ঘটিল বলিয়া দয়া করিয়া মাফ করিবেন। আবার আপনাকে ধন্যবাদ।

একান্ত আপনার

(স্বাঃ) কিশোরীমোহন চৌধুরী

সত্যানন্দ বসুর পত্র

কলিকাতা

৪ঠা মে, ১৯০৯

প্রিয় পদ্মিনী,

তোমার পত্রগুলির আগে জবাব দিতে পারি নাই বলিয়া মাফ চাহিতেছি।

বিশ্রামাতার হাতে স্তানাটোরিয়ামের নিয়ম-কানুন ও সার্টিফিকেট কথটি দিয়াছি।

আমার টাকা পরিশোধের জন্য তোমাকে বাস্তব হইতে হইবে না।

নিজের দার্জিলিং সংবাদপত্রের নিকট 'দি বেঙ্গলী'র দীর্ঘ পত্র পাওয়া উচিত ছিল। কাগজের 'কলানে' ইহার জন্য আমি বৃত্তান্ত লিখিলাম।

আশা করি, খাপ আবেগের হাত হইতে তোমরা রেহা পাইয়াছ এবং শুভ্র হিমালয়ের সম্পূর্ণ দৃশ্যই দেখা যাইতেছে।

তোমার স্বাস্থ্যোন্নতি হইয়াছে, এই বিশ্বাস রাখিলাম। ইতি

ব্বেহাকাঙ্ক্ষী

(স্বাঃ) সত্যানন্দ বসু

আলতাফ আলির পত্র

দার্জিলিং

১৩ই অক্টোবর, ১৯১৬

প্রিয় পদ্মিনী বাবু,

এই মাসের ১১ই তারিখে লিখিত আপনার কার্ডখানি পাইয়া প্রীত হইলাম। আপনি সপরিবারে বড়ো আসিতেছেন জানিয়া আমার আনন্দ হইয়াছে। আমার বিশ্বাস, আপনার নূতন 'হোম'-এ ঠিকঠাক করিয়া বসিতে বেশী সময় লাগিবে না।

শীঘ্র আপনার উত্তর পাইতে ইচ্ছা করি।

ভবদীয়

(স্বাঃ) আলতাফ আলি

I don't mind living in a man's world as long
as I can be a woman in it.

—Marilyn Monroe

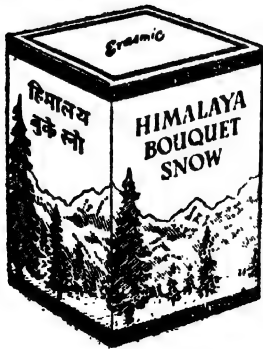


অশ্রু সৌন্দর্যের জন্য...

হিমালয় বোকে

শ্রেষ্ঠ

প্রসাধন



শুদ্ধ এবং সুগন্ধ হিমালয় বোকে স্নো আপনার
স্বককে মৃদু এবং মোলাসেম রাখে। মধ্যমলের মত হিমালয় বোকে টয়লেট
পাউডার আপনার লাবণ্য স্বাভাবিক গৌন্দর্যকে
বাড়িয়ে তোলে।

হিমালয় বোকে স্নো এবং টয়লেট পাউডার



অক্ষন । ৩ প্রাক্ষন



কল্যাণী

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর্ব]

অপরাজিতা ঘোষ

একটা বেজে গেল ঢং করে। নিছাদেবী আজ আমার ওপর বিরূপ। একফালি চাঁদের আলো জানালা দিয়ে আমার বুকের ওপর এসে পড়েছে। বলছে যেন ইসারায়, বোজাই ত ঘুমাও, দেখ না আজকে ঘুমিয়ে-পড়া রাতে আমার রূপ কত সুন্দর। তোমার মনের পাতার লেখা হয়ে থাকবে চিরদিন। গর্ব করে বলতে পারবে প্রিয়াকে।

সত্যি এত সুন্দর তুমি। এত স্বপ্নময়। আগে ত কখনও এত ভালো করে তোমাকে দেখিনি। তাই ত তোমাকে নিয়ে কত কাব্য, কবিতা, গান। কণ্ঠ-আলিঙ্গন করে প্রেমিকযুগল সারা রাত ধরে তোমাকে দেখে, আশ আর মেটে না তাদের। তাই ত তোমাকে দেখে পাশিয়া ডেকে ওঠে শিউ কাঁহা বলে।

বাইরে হাওরা-লাগা পার্কের কাউগাছগুলো শন শন করছে। হঠাৎ জেগে-ওঠা ছোট পাখীগুলো কিচির-মিচির করে উঠছে—ভাবছে বোধ হয় ভোর হয়ে এল।

একটু একটু করে চোখের সামনে ভেসে উঠছে দশ বছর আগের দিনগুলো। বেলাদি। হ্যাঁ বেলাদির কথা।

বার্ড ইয়ারের প্রথম দিন। অনাস' ক্লাস করতে সাত নম্বর ঘরে ঢুকেছি। দেখি, একটি মেয়ে চূপচাপ বসে রয়েছে। জুতোর শব্দ হতেই মেয়েটি শেছন ফিরে তাকাল। অনেকক্ষণ ধরে আমাকে দেখতে লাগল ডাব ডাব করে। কি দেখল ওই জানে।

মনে হল মেয়েটি আমার থেকে বড়, দিদির মত। বেশ ছিমছাম চেহারা। লজ্জা পেলাম খুব, চোখ নামিয়ে নিলাম

ঘটা পড়ল। আর একটি ছেলে এসে, অধ্যাপকও এলেন। ক্লাস চলার মধ্যেও দেখি, মেয়েটি আমার দিকে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে।

সারাটা দিন কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করলাম। কেবলই মনে হয়েছে,—কেন মেয়েটা আমার দিকে অমন ভাবে তাকাচ্ছিল। কোনদিন ওকে পথে-বাটে কোথাও দেখেছি বলেও ত মনে হয় না।

পরের দিন অনাস' ক্লাস ছিল প্রথম ঘটায়। একটু আগে এসেছিলাম। কিছুক্ষণ পরে মেয়েটা এল। তাকালাম না, একটা বই খুলে পড়ার ভাণ করলাম।

—এই শোন।

লজ্জাজনিত চোখে তাকালাম মেয়েটির দিকে।

—তোমাকে 'তুমি' বলছি বলে মনে কিছু ক'রো না কিন্তু। তোমার থেকে আমি অনেক বড়। চার বছর আগে আট-এ-পাশ করেছি। হেসে হেসে বলে গেল মেয়েটি।

লজ্জাজনিত কণ্ঠে বললাম, আপনি ত আমার দিদির মত।

—হ্যাঁ, আমাকে তুমি দিদি বলেই ডেকে। কি নাম জান তো আমার—বেলা বানার্জি।

আবার বলে যেতে লাগল মেয়েটি, কোন ডিভিশনে পাশ করেছ, কোন কলেজ থেকে পাশ করেছ, বাংলায় অনাস' নিলে কেন, খুব ভালো লাগে বুঝি বাংলা সাহিত্য পড়তে?

একটার পর একটা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে গেলাম।

বেলাদি আমার দিদি ও বন্ধু হয়ে উঠতে লাগল দিনে দিনে। এমন একদিন এসেছিল, বেলাদি আমাকে দেখতে না পেয়ে থাকতে পারেনি, আমিও পারিনি ওকে না দেখতে পেয়ে। যেদিন ও না আসত, মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে যেত। আজকের দিনটা মাটি হয়ে গেল, গল্প করা হ'ল না।

একদিন বেলাদিকে হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করেছিলাম,—আজ বেলাদি, আমাকে তোমার এত ভালো লাগল কি করে, আমাকেই তুমি ভাইয়ের মর্যাদা দিলে কেন? আমার ত রূপও নেই, গুণও নেই।

একটা সুন্দর উত্তর দিয়েছিল বেশ মনে আছে—'এক নজরে তোমাকে ভাল লেগে গিয়েছিল। ভাই বলে ডাকতে ইচ্ছে হয়েছিল। আর কিছু সুনতে চাও?'

তারপর বেলাদির সঙ্গে কত গল্প করেছি, পড়াশুনা নিয়ে কত আলোচনা করেছি, একসঙ্গে বেড়িয়েছি।

সেদিন কি একটা কারণে দেড়টার সময় কলেজ ছুটি হয়ে গেল। বেলাদি আমাকে ওদের বাড়ী যাবার জন্ত বিশেষ করে জম্মুরোধ করল।

বললাম,—আজ থাক, অস্তুদিন যাব।

—না না, ওসব সুনছি না। সেই কবে থেকে ত বলে আসছ একদিন যাব, একদিন যাব। আজ আর ছাড়ছি না। যেতেই হবে তোমাকে।

—না না, আজ থাক। বলে কাটিয়ে দেবার চেষ্টা করলাম।

বোধ হয় বুঝতে পারল আমার মনের ভাব, তাই অভিমান করে বলল,—তাহলে তোমার সঙ্গে আজই আমার সাক্ষাৎ হেঁদ। আর আমাকে বেলাদি বলে ডেকে না।

কি আর করব? বললাম, চল।

একটু চেষ্টা বলাদি, বদশ, হুট, ঘোড়াকে কি করে শায়েস্তা করতে হয় জান?

—কি করে?

—খাক।

চলতে চলতে বলাদি বলে যেতে লাগল,—তোমাকে আমি নিজের ভাইএর মত ভালবাসি। নিজের একটা ভাইও নেই, বোনও নেই—তাই তুমি তোমাকে আমার সব ভালবাসাটুকু উজাড় করে দিয়েছি। আরো বলল,—আমাদের এই ভাই-বোনের সম্পর্ক যেন চিরদিন এমন ভাবে থাকে, ফাটল যেন না ধরে এতে।

বেলাদির বাবা মার সঙ্গে আলাপ হ'ল। তাঁদের আপনজন হয়ে যেতে বাকীদিন লাগল না। প্রায়ই যেতাম, দুটো মনখোলা গল্প করে ঘটাকয়েক কাটিয়ে আসতাম, সেই সঙ্গে এক-পেট খেয়ে।

দেখতে দেখতে কলেজ-জীবনের দুটো বছর কেটে গেল। পরীক্ষা হয়ে গেল। রেজাল্টও বার হ'ল। আমরা দু'জনেই সেকেণ্ড ক্লাস অনার্স পেলাম।

সেদিন বিকেলে কত আনন্দ করে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম দুজনে, কিন্তু বাড়ী কিরলাম ভারী মন নিয়ে।

গঙ্গার ধারে বসেছিলাম। নদীর বুকের ওপর জাহাজগুলো গারি গারি হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

জাহাজগুলোর দিকে তাকিয়ে বলাদি বলল,—একদিন হয়ত তুমি ঐ একটা জাহাজে করে সাতসাগরের পারে চলে যাবে। তোমাকে 'সি অফ' করতে হবে আমি। কিরে আসবে মস্তবড় হয়ে, সেদিনও হবে আমি তোমাকে 'ওয়েল কাম' করতে।

বললাম,—না, বলাদি, অতদূর স্বপ্ন আমার নেই। তবে এম, এ, পড়ব তুমি আর আমি একসঙ্গে।

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলাদি বলল, এক সঙ্গে না ত কি? আমরা একসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকবো, একসঙ্গে বেরিয়ে আসব। দেখাস্তু হবে করতে হবে বলত?

—অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন। অনার্স যখন পেয়েছি, নোট নিশ্চয়ই মিলবে। আমি না পাই, তুমি ত নিশ্চয়ই পাবে।

এই রকম কত ভালো-লাগা টুকরো টুকরো কথাবার্তা হ'ল।

একটু ঠাট্টা করে বলাদিকে বললাম,—তোমাকে যে দাবে, তার কত জন্মের পুণ্যের ফলে, একথা মানতেই হবে। এত গুল, এত কপ—তোমাকে সে মাথায় করে রাখবে।

হঠাৎ যেন বড় গভীর হয়ে গেল বলাদি। গভীরভাবেই বলল, বিয়ে আমার হবে না।

—কেন?

কোন উত্তর নেই, চোখদুটো ওর চলে গিয়েছে জাহাজগুলোর পেরে। নিজেরই একটু কেমন জানি লাগল। বলাদিকে ত কখনও এরকম গভীর হতে দেখিনি। মনে হ'ল কথাটা বলে অত্যন্ত করে ফেলেছি। কাটিয়ে নেবার জন্য চেষ্টা বলালাম, একটা সামান্য ঠাট্টাও বুঝতে পার না বলাদি? ভাইএর কি দিদির সঙ্গে একটু ঠাট্টা করারও অধিকার নেই?

হঠাৎ আমার দিকে দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হ'ল। খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকল আমার মুখের দিকে। তারপর গভীর কণ্ঠে খেমে খেমে

বলল,—এতদিন কেবল ঠাট্টাই করে এসেছি তোমার সঙ্গে—আজ একটু আমার ভেতরের কথা শোন। ক উকে কোনদিন বলিনি, আজ তোমাকে বলছি। শুনে হত একটু হুঁপে পেতে পার এই অভাগী বলাদির জন্য।

বেলাদির মনে আবার হুঁপে আছে নাকি? সব সময়েই ত হাসে, কত ঠাট্টা ইহাকি করে আমার সঙ্গে। বাপের একমাত্র মেস। কোনদিন অভাব কাকে বলে জানে না, তার আবার হুঁপে আছে নাকি? কিজানি হয়ত থাকতেও পারে। অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালাম ওর মুখের দিকে।

বেলাদি যেন একটু চেপে চেপে বলল,—আমার স্বামী ছিল, আমি বিবাহিতা।

—কি যা তা বলছ তুমি?

—হ্যাঁ, ঠিকই বলছে তোমার বলাদি। শুধু শুনে যাও।

বোমার ভয়ে যে যেখানে পারি পালাচ্ছি কলকাতা ছেড়ে, বাবাও আমাকে পাঠিয়ে দিলেন আমার এক ঠাকুমার কাছে।

মাছের কোল দিয়ে ভাত মেখেছি, ঠাকুমা হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন,—গ্যারে বোলা, তুই মাছ খাস? শাড়ীটারো না হয় পবিস ফ্লেমামুহু বসে, তাই বলে মাছ মাংস খাস?

—কেন ঠাকুমা, অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

—তুই না বিধবা—?

চমকিয়ে উঠলাম কথাটা শুনে। আমি বিধবা? আমার স্বামী ছিল!

—চমকিয়ে উঠলে কেন? কেন? তুই এসব কিছু জানতিস না? কাকুর কাছে কখনও শুনিসনি?

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলাম ঠাকুমার মুখের দিকে। কিছুই বুঝতে পারছি না। ঠাকুমা বলে যেতে লাগলেন, তোর ওপরে, তোর আরো তিন বোন ছিল। সব কটারই পাঁচ বছর আর পেরোলো না। পাঁচ পড়ল কি সবকটা টপাটপ মরে গেল। তোর ওপরেরটা যখন মরে গেল তখন তুই তিন বছরের মেয়ে। তোরের বাড়ীর সবাই খুব চিন্তিত হয়ে পড়ল।

সেই সময়ে তোরের ওখানে এক সাধু এসেছিলেন, তোরের বাড়ীর কাছেই তাঁর ডেরা ছিল। আমি তখন তোরের ওখানে ছিলাম। আমার দিদি মানে তোর বাবার মা কেঁদে পড়লেন সেই সাধুর পায়েরে। সেই সাধু অনেককিছু বলতে পারতেন। দিদির কথা শুনে সাধু বললেন, তোরের বাড়ীতে একটা অভিশাপ আছে। পাঁচ বছরের বেশী কোন মেয়ে বাঁচবে না তোরের বংশে। এই মেয়েটাকে যদি বাঁচাতে চাস ত পাঁচ বছর বয়স হবার আগে এর বিয়ে দিয়ে দে। যে কোন বর হলেই চলবে।

তোর বিয়ের জন্য উঠেপড়ে লেগে গেলেন তোর ঠাকুমা আর তোব দাদু। সারা গা খুঁজলেন তোর দাদু, পাঁচ একটাও মিলল না। শেষে এক বুড়ো বিয়ে করতে চাইল পনের লোভে। অগত্যা তোর দাদু সেই বুড়োর সঙ্গে তোর বিয়ের ব্যবস্থা করলেন। তোর বাপ মা আপত্তি করেছিল কিন্তু তোর দাদু ঠাকুমার কাছে তাদের আপত্তি টিকলো না। আমারও মনটা খচ, খচ, করছিল।

বিয়ে হয়ে গেল তোর সেই বাটের মড়ার সঙ্গে। জানিস আমার কোলে বসে তোর বিয়ে হয়েছিল; তোকে আমিই সাজিয়ে দিয়েছিলাম।

বহর ঘুরতে না ঘুরতে একদিন খবর এস, তোর স্বামী মরেছে সাপের কামড়ে। তোর হাতের নোয়া আর সিঁথির সিঁদুর মুছে গেল জন্মের মত। তবে একটা লাভ হ'ল, তুই বাঁচলি।

তোর বাবা বলল, মেয়ে বড় হলে আমি আবার ওর বিয়ে দেব। ঐটুকু মেয়ে বিয়ের কি বোঝে। গোটা জীবন ওকে আমি বিবধা থাকতে দেব না। আমরা ত তোর বাবার কথা শুনে কাণে আঙুল দিলাম। হি, হি, কি কেলেকারী কাণ্ড। বাপ হয়ে মেয়ের আবার বিয়ে দেবে, হিন্দুশাস্ত্রে কেউ কখনও দেখেছে, না শুনেছে!

কদিন পরে তোর বাবা তোর মাকে আর তোকে নিয়ে কলকাতা চলে গেল, নিজের চাকরীস্থলে।

পরে শুনেছিলাম, তুই নাকি শাহী গয়না প'রে পায়ে ছুতো লাগিয়ে গটু গটু করে ইটুল কলেজে বাস। তা না হয় হ'ল, ছোট মেয়ে শাহী গয়না পরে, কিন্তু ভাং বসে তোর মা বাবা তোকে মাছ মাংস খেতে দেয়? হি, হি, কি ঘেরা। কালে কালে কত দেখব!

একটু খামল বেলাদি, বোধহয় ধরা গলাটাকে একটু সাফ করে নিতে। আবার বলে চলল, পরদিনই আমি সোজা বাবার কাছে চলে এলাম। ঠাকুমার কাছে যা বা শুনেছি সব বললাম মাকে। মা আমাকে শাস্ত করতে চাইলেন। বললেন, হিঃ ওর জন্তু আবার মন খারাপ করে? শুটাত একটা ছেলেখেলা। কোন্ কালে কি ঘটেছে—যত সব অনাস্থা। বিয়ে বললেই বিয়ে হয়ে গেল? একটা ছোট শিশু, কি জানে সে বিয়ের? আমি এ বিয়ে মানি না। বেশ জোর গলায় মা বললেন।

আমিও সঙ্গে সঙ্গে বললাম,—না মা, আমিও এ বিয়ে মানি না। কিছু বুঝলাম না, জানলাম না—তিন বছরের ছোট মেয়ে, বিয়ে হয়ে গেল আমার এক বুড়োর সঙ্গে! এসব সেকালে ছিল, এখন আর নেই!

এর একটা কারণও ছিল, বুঝলে স্বপ্নে। তোমার কাছে আমি কিছুই লুকাবো না, আজ উজাড় করে সব বলে যাব। আমি তখন ভালবাসতাম একটা ছেলেকে, নাম সুজিত। একরকম তার আমি বাগদত্তাই ছিলাম। কিন্তু পরে সেই ছেলেটি আমাকে যে চরম প্রতিদান দিল, ইতর না হলে কেউ পারে না এইরকম করতে।

আচ্ছা, প্রথম থেকে বলে যাই, তা হলে সব বুঝতে পারবে। একটু খামল বেলাদি বোধ হয় ভেবে নিতে!

আজ আমার ধারণা পালটিয়ে গেল। এতদিন বুঝতে পারিনি, কত দুঃখ এই মেয়েটির ভেতরে লুকিয়ে আছে। কি করে পারতে তুমি হেসে খেলে কাটাতে, একদিনও ত তোমাকে গন্তার হ'তে দেখিনি।

আবার বেলাদি শুরু করল,—তখন আমার বয়স বছর বারো বোধহয়, একদিন দেখলাম একটা ছেলে বাবার কাছে এসে, একেবারে ভীষণর মত চেহারা। শুনলাম ছেলেটা বাবাদের সেশের। বাপ মা কেউ নেই। দেশ থেকে বাবার কাছে এসেছে একটা চাকরীর আশায়। ছেলেটিকে দেখে বাবার একটু দুঃখ হ'ল। ঐটুকু ছেলে চাকরী করবে? কি চাকরীই বা পাবে, বড় জোর একটা পিছনের চাকরী।

বাবা ওকে চাকরী করতে দিলেন না, আমাদের বাড়ী'ত থেকে

পড়াশুনা করবার ব্যবস্থা করলেন। ছেলেটা অত্যন্ত লাজুক প্রকৃতির, গাঁয়ের ছেলে যেমন হয়—সাধারণতঃ। তবে লেখাপড়ার খুব ভালো।

বাংার জন্তুই ও আজ এতবড় হয়েছে; দিল্লীতে বেশ বড় অফিসর হয়েছ, ভালো কোয়ার্টার পেয়েছে, দুদিন বাগে হয়ত গাড়ীও কিনতে পারে। ভাবি, বাবা যদি না থাকতেন, ও বোধহয় তলিয়ে যেত। বেশ লাগত ছেলেটাকে তখন, ওর কাছে ময়ে মাঝে পড়া বুঝে নিতে যেতাম। তারপর ত বুঝতেই পারছ, যা হয়ে থাকে। হ'জন হ'জনকে ভালবেসে ফেললাম।

বাবারও পছন্দ হয়েছিল সুজিতকে, ঠিক কবেছিলেন ওর সঙ্গে আমার বিয়ে দিবেন।

এম-এ পাশ করে সুজিত দিল্লীতে ভাল চাকরী পেল। বাবার সময়ে বলে গেল ছুটিতে আসবে, চিঠি দেবে। তবে অবশ্য প্রথম প্রথম কথা রেখেছিল। সত্যি কথা বলতে কি, ও যেদিন চলে গেল, বাড়ীর সবাই আমরা কেঁদেছিলাম, সুজিতও বাবার সময়ে কমাণ দিয়ে চোখ মুছেছিল। বাবা মার দুঃখটা খুব বেশী হয়েছিল। হবারই ত কথা, নিজেকে কোন ছেলে ছিল না, ওকে নিজের ছেলের মত করে এত বড়টা করলেন।

দিনে দিনে সুজিতের পরিবর্তন লক্ষ্য করতে লাগলাম। চিঠিপত্র একেবারে কমে আসতে লাগল, ছুটিতেও আর আসে না। চিঠি দিলে উত্তর পেতাম না।

তারপর একদিন চরম পরীক্ষা হয়ে গেল আমার, নিজের জীবনের সঙ্গে। অতটা ভাবতে পারি নি। এখন মনে হয় ঝুঁকি না মেনে বোধ হয় তুলই করেছি—চরম ভুল। হিন্দু ধর্মের বা শাস্ত্র তাকে যদি মেনে নিতাম, বৈধব্যকে যদি জীবনের সঙ্গী করে নিতাম, হয়ত খটটা আঘাত পেতাম না। সেদিন ঠাকুমার কথাগুলো স্মরণ করতে না পেরে পরের দিনই ফিরে গিয়েছিলাম কলকাতায়, কিন্তু এখানে পালিয়ে গিয়েও বাঁচতে পারি নি। সুজিত আমাকে না ডাকলেও ত পারত, রাত্তার মাঝে আমাকে এমনভাবে অপমান করল! সত্যি, তোমরা বড় নেকমহারাম।

যাচ্ছিলাম এক বন্ধুর বাড়ী শ্রামবাজারের দিকে। ধর্মভালার ট্রাম ধরবার জন্তু দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ পেছন থেকে কে যেন ডেকে উঠল, বেলা—। ঘুরে তাকিয়ে দেখি সুজিত, এক গাল হেসে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। তার সঙ্গে একটা অবাকালী মেয়ে। প্রথমটা বুঝতে পারিনি, পরে সুজিতের সঙ্গে কথাবার্তার বুঝলাম ঐ মেয়েটি সুজিতের স্ত্রী।

সমস্ত শরীরটা কি রকম করে উঠল, মনে হল' সমস্ত মাটিটা বাগছে, এফুনি পড়ে যাব। কোন রকমে টলতে টলতে সামনের ট্রামটার উঠে পড়লাম, টালিগঞ্জ যাচ্ছে ট্রামটা। ফিরে গেলাম বাড়ীতে। সব শুনে বাবা বললেন,—জানতাম। আজকের জগতটা এই রকমই, যাকে যত করবে, সে ততই এমনি করে প্রতিদান দেবে।

আমার মনটা সেই যে সুজিত ভেঙ্গে দিয়ে গেল, আজও জোড়া লাগল না, লাগবেও না বোধ হয় কোনদিনও। আমারই ভুল, চরম ভুল করেছি।

বেলাদির স্বর ভারী হয়ে গিয়েছে, চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে।

রাস্তার লাইটের আলোয় গাল দুটো চিক চিক করছে। মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গিয়েছিল। কত মেয়ের জীবনে এই বকম হয়, আমরা ক'জনের খবর রাখি।

হাত হয়ে গিয়েছিল, উঠে পড়লাম। আরো খানিকক্ষণ হয়ত বসতে পারতাম, বেলাদি আরো হয়ত কত কি বলে যেত, কিন্তু কি লাভ? আরো শোনা মানেই বেলাদির মনে আরো দুঃখের প্রলেপ লাগান। পথে দু'জনে একটিও কথা বললাম না, বলবার মত মনও ছিল না। শুধু বিদায়ের সময়ে বললাম, আচ্ছা চলি বেলাদি। উত্তর এস, এস ভাই। তারপর সিঁড়ি দিয়ে তরু তরু করে ওপরে উঠে গেল বেলাদি।

বাড়ী কিসলাম তখন ন'টা বেজে গিয়েছে।

সেই আমার শেষ দেখা বেলাদির সঙ্গে, আর আজ দশ বছর পরে দেখা। যেন একটা যুগ পেরিয়ে গিয়েছে। তবে এই দশ বছরের মধ্যে ভুলতে পারিনি বেলাদিকে একটা দিনের জন্তও। মনে হয়েছে ছুটে চলে বাই, কিন্তু পারিনি, পারিনি লজ্জায়। লজ্জাই আমার পথ বোধ করে ঈড়িয়েছিল।

এম-এ পড়া আব আমার হ'ল না। কত স্বপ্ন দেখেছিলাম, কোথায় সব মিলিয়ে গেল। ছিটকিয়ে গেলাম কত সপ্নারের চাপে। একটা ফেরাঙ্গীর পদে বহাল হলাম।

ফাইল নিয়ে চুকছি সুপারিটেণ্ডেণ্টের চেম্বারে। দেখলাম একজন বৃদ্ধ গোছের ভদ্রলোক খুব গল্প করছেন সুপারের সঙ্গে। তাঁদের কথাবার্তার সম্বন্ধে পদ 'তুই' করে। মিঃ সেন আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। বললেন, আমার বন্ধু, একসঙ্গে আমরা বি-এ পাশ করেছি। এর নাম অবনী বাড়ুজ্জা, গেজেটেড অফিসার ছিলেন, অবসর নিয়েছেন।

তাকালাম ভদ্রলোকের দিকে, খুব যেন চেনা চেনা মনে হচ্ছে। ভদ্রলোকও দাঁখ আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। হঠাৎ বললেন, তোমার নাম স্বপ্ন না? আমার মেয়ে বেলাব সঙ্গে তুমি পড়তে না?

•আমার অনুমান সত্য হয়ে গেল। অবনীবাবু আপনি? ঠিক চিনতে পেরেছি। বেলাদি এখন কোথায়, বিয়ে টিরে হয়ে গেছে বোধ হয় এতদিনে। তারপর আপনি কেমন আছেন? এক নিঃশ্বাসে বল গেলাম কথ গুলো।

অবনীবাবু বললেন, এতদিন কোথায় ছিলে? বেলা তোমাকে সারা কলকাতা খুঁজে বেড়িয়েছে, তোমার শোন পাত্তা নেই। বললে হয়ত বিশ্বাস করবে না, মা আমার কৈদেও ছিল পর্যন্ত তোমার জন্ত। কল্যাণীতে বাড়ী কিনেছি, বেলা শুধানকাব স্কুলের টিচার হয়েছে। কবে যাচ্ছ বল।

মনের কথা

“এমন সুন্দর গহনা কোথায় গড়ালে?”
“আমার সব গহনা মুখার্জী জুয়েলার্স দিয়াছেন। প্রত্যেক জিনিষটিই, ভাই, মনের মত হয়েছে,—এসেও পৌঁছেছে ঠিক সময়। এঁদের রুচিজ্ঞান, সততা ও দায়িত্ববোধে আমরা সবাই খুসী হয়েছি।”

মুখার্জী জুয়েলার্স

শ্রীনি মোতার গহনা নির্মাণ ও রত্ন-উৎকর্ষ
বহুবাজার মার্কেট, কলিকাতা-১২

টেলিফোন ২ ৩৪-২৮১০



—হ্যাঁ, যাব একদিন। নিশ্চয়ই যাব আপনাদের ওখানে।

—একদিন দুদিন বুঝি না, কবে যাবে ঠিক করে বল। বেলকে তোমার কথা বলবো, তার হারানো জিনিষ খুঁজে পেরেছি। জানো, এখনও বেলো তোমার কথা বলে।

অনেক কথা হ'ল অবনীবাবুর সঙ্গে। বাবার সময়ে, কল্যাণিতে আসবার ভক্ত বার বার কবে বলে গেলেন।

দেখলাম, কত বদলিয়ে গিয়েছেন অবনীবাবু। মনের দিক থেকে নয়, চোখের দিক থেকে।

হু'দিন পরে বেলাদির একখানা পামভর্তি চিঠি এল। অনেক কথা লিখেছে, পুনশ্চ: দিয়ে লিখেছে, 'কবে আসছো'। এরপরে আরো অনেক চিঠি এসেছিল। প্রত্যেক চিঠিরই বড় কথা হ'ল, 'কবে আসছো'। প্রত্যেকটারই উত্তর দিয়েছি, 'শীগগির যাচ্ছি' বলে। প্রায় একটা বছর কেটে গেল, এখনও গেলাম না। যেতে ভীষণ ইচ্ছে করছে, কিন্তু পারছি না। সেই লজ্জাটা আবার যেন আমার পথ বোধ করে দাঁড়াচ্ছে। তাছাড়া কাক্সের চপে সময়ও আর হয়ে উঠছিল না।

এবার বেলাদির একখানা ভীষণ কড়া চিঠি এল। খুব অভিমান করে লিখেছে। লিখেছে 'এটাই আমার শেষ চিঠি'।

আর ত বেলাদিকে এড়িয়ে চলা যাবে না। এবার ওর সামনে দাঁড়াতেই হবে। চিঠি দিয়ে আর শাস্ত করা যাবে না ওকে। দশ বছর পরেও আমাকে ভুলতে পারেনি, কত আপন করে চিঠিগুলো লিখেছে, তাকে মিথ্যে আশা দিয়ে কি লাভ? লজ্জা কাটিয়েও তার সামনে আমাকে দাঁড়াতেই হবে।

মাস খানেকের ছুটি নিয়ে ট্রেনে চেপে এসলাম। পকেট ডিরেকসন দেওয়া বেলাদির চিঠিটা নিতে ভুলি নি।

খেয়াল হ'ল, ঘট্টে অন্ধকার চারিদিক। তাকিয়ে দেখি চাঁদ কখন চলে গিয়েছে আমাকে ছেড়ে। ছোট পাখিগুলো কিচির মিচির করছে ভোবের ইঙ্গিত পেয়ে বোধ হয়—।

ঘুমো চোখ জুড় আসছিল। পাশ দিয়ে শুলাম। কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না।

দরজা খান্ধানোর শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল। দড়মড় করে উঠে বসলাম। চারিদিকে রোদ খট খট করছে, অনেক বেলা হয়ে গিয়েছে। দরজা খুলেই দেখি বেলাদি দাঁড়িয়ে। মুচকি হেসে বলল, বাও, আর একটু ঘুমাও গে। এখনও সকাল হয় নি। বাবো: কি ঘুমোতেই না পার!

মাষ্টার মশায়

আশা দেবী

মাষ্টার মশায়ের বিদায়ী-সভানি ঘর ভরাই হয়েছিল—একথা সবাই-ই একবারো স্বীকার করলো। শুধু যাকে উপলক্ষ করে এত আয়োজন, সেই মাষ্টার মশায় নীরবে নির্ভীক মত বসে এইলেন যেন শেখড়-ছ'ড়া গাছ। মাথাটা চেয়ার থেকে ঢলে পড়েছে—নাক থেকে খসে পড়েছে নিকেলের তাঁট ভাঙ্গা চশমাটা—স্বত্বোয় বাঁধা না থাকলে তয়তো বাঁচটা ভেঙ্গেই যেত। বন্ধ চোখ-ছুতোতে জলের ধারা। মাষ্টার মশায় মুচ্ছা গেছেন।

গলায় তারে গাঁথা শ্বেতপদ্মের মালা, পরনে মেয়েদের দেওয়া তাঁতের ধান ধুতি। কোলে টকটকে লাল গীতা খানিকটা রক্তের মত জমে আছে—এটি প্রেসিডেন্টের বিদায়ী উপহার। ত্রিশ বছর ধরে স্কুলে কাজ করছেন,—তাঁরই হাতে গড়া স্কুল। তিনি স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা—ছাত্রীদের কাছ থেকে এতটুকু দান তিনি নেবেন বৈকি! গুরুদক্ষিণার চেয়েও এর সঙ্গে যে তাদের সমস্ত হৃদয় মিশে আছে।

কি যেন একটা করুণ রাগিনী গাইলো একটি মেয়ে। গান থামলে স্কক হলো প্রেসিডেন্টের বক্তৃতা। হু'বার ইলেকসনে হারা, বহু ঘাটের জল খাওয়া হরিতোষ সমাদর গলা কাঁপিয়ে—নানা সুরে তালে—নানা কায়দায় ভাষণ দিলেন। এদেশে বা-যা বলা দরকার, কোন কথাই তিনি বাদ দিলেন না—'দীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে শ্রদ্ধের স্মরণে দাস মশায় আজ আমাদের মধ্যে থেকে বিদায় নিচ্ছেন। বিদ্যালয় এখন ক্রমোন্নতির দিকে—উচ্চ থেকে উচ্চতর ধাপে সে এগিয়ে যাচ্ছে—আমরা একে বহুমুখী বিদ্যালয়ের পর্যায়ে উন্নীত করতে চাই। কাজেই নন-ম্যাট্রিক শিক্ষকের আর এখানে স্থান হবে না। কাজেই আমরা বাধ্য হয়েই এঁকে অবসর—বলেই প্রেসিডেন্ট এই বক্তৃতাজনিত গুরুতর পরিশ্রমের জগ্রে টেবিলের উপর সমস্ত পূর্বসঞ্চিত জলের গ্রাস থেকে টক টক করে খানিকটা জল খেয়ে নিলেন। আর এই কঁাকে স্কল-কমিটির মেম্বররা পটাপট হাততালি দিয়ে নিলেন। জলটা খেয়ে ভিজ্জে-গলাটার একটা খাঁকারি দিয়ে তিনি আবার স্কক করলেন—'অবশ্য চেষ্টা করলে যে রাখা একেবারে যেত না, এমন নয়। কিন্তু কি জানেন—'বলেই তিনি নিজের হাতের হীরের আঙটিটা একবার ঘোরালেন—'ফ্রিক্ট প্রিন্সিপলের দিক থেকে মেয়েদের বিদ্যালয়ে আর পুরুষ টিচার রাখা হবে না—আমি এই নীতিরই পক্ষপাতী। অবশ্য জানি, এখানকার চাকরী-গেলে ওঁর বিশেষ কষ্ট হবে। বাড়ীতে ১০১১ জন খাইয়ে লোক—পাকিস্তানের কল্যাণে আত্মীয়-স্বজনের অভাব নেই বাড়ীতে। রোজগারের লোক উনিই একা—চাকরীটা গেলে সে রাস্তাও বন্ধ; তা সত্ত্বেও আমরা শিক্ষাবিদ—তাঁই নীতির মধ্যদা সর্বদাই রক্ষা করবো—এই আমাদের আদর্শ—'

পটাপট করে হাততালি পড়লো কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে। শুধু মেয়েরা যেন আচ্ছন্নের মত বসে রইলো—হাততালি দিতে গিয়ে যেন পাথর হয়ে গেছে মাষ্টার মশায়ের ছায়ামূর্তিটির দিকে তাকিয়ে। একদিনেই যেন লোকটি একেবারে বদলে গেছেন; একদিনেই যেন তাঁর বয়স একযুগ পার হয়ে গেছে; তিনি যেন একেবারে অপরিচিত হয়ে গেছেন। এত কাছে তিনি ছিলেন এতদিন, যেন এক মুহূর্তে অনেক—অনেক দূরে বা মল্লব হয়ে গেছেন তিনি। আজ বহু চেষ্টা করেও তাঁকে কেউ চিনে বের করতে পারবে না।

: মাষ্টার মশায়!—উইন, একটু মিষ্টিমুখ করতে হবে। একটা মিষ্টিগলার ডাক এলো যেন অনেক দূর থেকে।

: অ্যা—! ঘুম থেকে জেগে উঠলেন স্বধীর দাস। আচ্ছন্ন চোখের ভেতর দিয়ে যেন সবটুকু দেখে নিতে চাইলেন, বুঝে নিতে চাইলেন সব ব্যাপারটা। তাবপর একবার শূন্য ঘরটার দিকে, আব একবার ছলছলে চোখে উৎসুক দৃষ্টিমাথা মেয়েদের দিকে তাকিয়ে একটু স্থান হেসে বললেন: তোবা বা, আমি আসছি।

ছেঁড়া ছেঁড়া মৌঘর কঁাকে যেন আলোর ঝিকিমিকি, মঠার মশায় দ্রুতপদে এলেন ফুলের মাঠে। সমস্ত ফুলবাড়ীটাকে তিনি একবার চোখভরে দেখে নিলেন। সমস্ত দৃষ্টির অপূর্ণতা যেন ভবে খেল এক মুহূর্তে। মনে হলো—“ভারি স্মরণ তো ফুলটা!”—এ যেন এক নতুন আবিষ্কার, অভিনব উপলব্ধি মঠার মশায়ের। যারা বিদায়ী সভা উপলক্ষে এসেছিলেন, তাঁরা বক্তৃতা দেবার দ্রুত কর্তব্য সমাধা করে হেডমাস্টার মশায়ের ঘরে গিয়ে বসেছেন চিরাচরিত নিয়ম মত। তাঁদের কলকণ্ঠের বিজয়ী হাসির আওয়াজ ভেসে আসছে চারতলা থেকে। হয়তো এতক্ষণ তারা হাসির কঁাকে কঁাকে চা—আর রসগোল্লা খাচ্ছেন; কিন্তু কি আশ্চর্য, একটু আগেও তো এদের গলা ভরা কান্না ছিল—অকুপণ অশ্রুবর্ণে সভাকে কল্প রসে ভবে দিয়ে ছিলেন এঁরা—এঁরা কি সবাই পাকা অভিনেতা? বুকের ভেতরটা একটা গভীর ব্যথার টন্ টন্ করে উঠলো মঠার মশায়ের। কেন—কেন এমন হয়? কেন এত নিষ্ঠুর হয় এরা? পাণের ছিটে লাগা পাঞ্জাবীর হাতে চোখের জল মুছতে গিয়ে চমকে উঠলেন মঠার মশায়। সিঁড়িতে খুট খুট করে গোটাকত পায়ে শব্দ। না—এরা তাঁকে এখনি ঘরে নিয়ে যাবে? খাওয়াতে। সরল—পবিত্র ফুলের মত মুখগুলো এতের—পৃথিবীর ক্ষমতা-লোলুপতা এখনও স্পর্শ করেনি মনকে। এখনও কঁাদে এরা অপ্রয়োজনে—স্নেহের উৎস বইছে অশ্রুশীলা ফসুর মত, এরা তো কিছুই যাবে না ওপর তলার কথা, স্মৃতির আর খাড়া চলে না। এদের মুখ দেখলে মঠার মশার সব ভুলে যান। এখনি—এখনি পালাতে হবে এদের হাত থেকে বাঁচবার জন্তে—নইলে এরা খাওয়াবার জন্তে কঁাদবে, খুব কঁাদবে।

রাস্তায় ছুটে বেরিয়ে পড়ে মঠার মশায় একটা রিক্সায় চড়ে বসলেন। কোলের থেকে পড়ে যাওয়া গীতার উদ্ভূত পাভাল্লো নিচু মাঠের মধ্যে পড়ে পড়ে বনমধ্যের মত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে উঠছিল এলোমেলো হাওয়ায়।

রিক্সার পয়সা মিটিয়ে দিয়ে প্রায় হুমড়ি খেতে খেতে ঘরে ঢুকলেন।

বাড়ীটা আজ খালি মঠার মশায়ের। ভারি ভালো লাগলো বাড়ীতে ঢুকেই। অন্তত কিছুক্ষণ একা থাকা যাবে। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কঁাদা যাবে। সমস্ত বাড়ীটা অন্ধকারে তলিয়ে আছে—তাঁরই অনাগত ভবিষ্যতের মত। অন্ধ গিন্নীর বোনের বিয়ে। সকালেই সবাই বেরিয়ে গেছে। তিনি বারণ করে ছিলেন। গরীবের আশ্রয় আনন্দ—! গরীবের আশ্রয় নেমন্তন্ন খাওয়া। ভাবতে গিয়ে হাসি পেল মঠার মশায়ের। না : থাকগে ওরা। এই উপলক্ষে তবু ওরা একটু খুঁসি হবে। কিছু সময়ের জন্তেও এই বিবাস্ত দারিদ্র্যের দম বন্ধ করা পরিবেশ থেকে মুক্তি পাবে, একদিন অন্তত ওরা প্রাণভরে আনন্দ করবে। আর? মঠার মশায় হাউ হাউ করে কঁাদে উঠলেন—অস্বস্ত পেট ভরে ভালো মন্দ খাবে—তারপর তো অনন্ত উপবাস।

ঘরে পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকার জমা হয়ে আছে। আলো আর আলোনে না তিনি। এখনও পকেটে উনবাট টাকা বার আনা আছে। টাকাকে আছে ডিয়ারেনেস এলাউলের পর্যটন টাকা। এভিভেট কাণের টাকা এখনও পাননি। তবে পাবেন। কুড়ি বছরের মধ্যে

এই প্রথম রিক্সা চড়লেন তিনি। মিথ্যে চার আনা পয়সা নষ্ট করলেন, থাকলে আশ সের আনু হতো।

ঘর অন্ধকার হলেও সবই তাঁর পরিচিত। কাজেই সন্তর্পণে একটা কাঠের বাস খুলে একটা মাটির ভাঁড়ে তেলে ভেজানো একদলা আফি বের করলেন। জীবনের সব কিছুকে আঁর্জিলে তিলে না মেয়ে একবারেই সব শেষ করে দেবেন তিনি। কত এলোমেলো চিন্তা যেন পাগলের মত মাথা খা বাগতে চাইছে—কত কথা আজ বলতে ইচ্ছে হচ্ছে, কত আশার কথা—কত অপূর্ণ সাধের কথা।

খাতা-পেনসিল নিয়ে আঁজ তাঁকে সব কথাই লিখে যেতে হবে। প্রথমেই ভাবলেন কর্তৃপক্ষকে একটা অনুরোধ করবেন যে, তাঁর মৃত্যু উপলক্ষে যেন একদিন ছুটি দেওয়া হয়। কিন্তু না—কেন তিনি অনুরোধ করবেন—যারা তাঁকে অন্তায় কবে, জোর করে তাড়িয়ে দিয়েছে। পেনসিল দিয়ে ঘষে ঘষে ও জায়গাটা কেটে দেবেন তিনি।

আবার নতুন করে শুরু হলো লেখা—“মাত্র দশ পয়সা পকেটে নিয়ে কলকাতায় ফুল খুলেছিলাম আমি। মনের মধ্যে যেন এখনও সেই ছবি ভেসে উঠছে। দশটি মাত্র ছাত্র; মাহুর পেতে রকে বসে পড়াশুনা। মনে পড়ে কার যেন একখানা বই একবার গুরুত পথ দিয়ে যেতে যেতে মুখে করে চলে গিয়েছিল। যখন আকাশ কালো করে সন্ধ্যা নামতো, তখন ছাত্রজল আর একটা কাঁচা লঙ্কা দিয়ে সন্ধ্যা ভোজন সেরে সেই মাহুরটাকেই শুয়ে পড়তাম। তখন বয়স ছিল অল্প,—মন ছিল শক্ত—দেহে ছিল শক্তি। আশা? হ্যাঁ, আশাও ছিল—ফুল একদিন বড় হবেই, এ বিশ্বাস ছিল আমার। স্বাস্থ্য ছিল ভালো, লোহা খেয়ে লোহা হজম করতাম। কিন্তু আমার ছাত্ররা? তারা আমাকে চাড়া তো না; মাঝে মাঝে তাদের বাড়ী নিয়ে গিয়ে খাওয়াত সবড়ে। তাদের ভালোবাসায় আমার মন ভরে থাকতো। ছিলাম ভালই—খেতামও ভালোমন্দ প্রাইভি। মনে পড়ে, আমারই ছেঁড়া মাহুরে বসে পড়ে আমারই ছাত্র তরুণ দাস বড় ফুল গিয়ে জলপানি পেয়েছিল। সেদিন আমি গুঁফে কোলে নিয়ে মাচতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ও লজ্জা পেল ভারি—তবে হ্যাঁ, আমাকে পেটভরে সন্দেশ খাইয়েছিল। এত ভাল সন্দেশ আমি আমার জীবনেও খাইনি।

তারপর ঘরভাড়া বাকী পড়লো। বাড়ীওয়ালা তাড়িয়ে দিল ঘর থেকে। রকও গেল। সম্পত্তির মধ্যে একটা ছেঁড়া মাহুর, একটা টিনের ফুলকাটা স্ট্রাকেশ, আর একটা ব্র্যাকবোর্ড। সব যাড়ে করে রাস্তায় নেন্দে পড়লাম। চার দিন না খাওয়া—না দাঁওয়া, একটা পার্কের মধ্যে ব্র্যাকবোর্ড পেতে মাহুর মাথায় নিয়ে শুয়ে পড়েছি। স্ট্রাকেশ চুরি গেছে। ফিল্মের যন্ত্রণার প্রাণ যেন বেরিয়ে যাচ্ছে।

গায়ে ঠাণ্ডা হাত পড়লো কার—যেন মা’র হাত, বড় ঠাণ্ডা—বড় শিষ্ণ।

: কে রে?—চোখ বুজেই ভিজ্জাসা করলাম।

: আমি মণিরাম শ্রায়। আজ চার দিন থেকে আমরা আপনাকে খুঁজছি—চলুন একবার আমাদের বাড়ী। মা আপনাকে নিয়ে যেতে বলেছেন। ঠিক মনে পড়ছে স্পষ্ট,—ওদের চীৎকার করে বলেছিলাম : একটু জল, আগে একটু জল কে বাবা, গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

ওরা আঁকুলা ভবে ভরে জল এনে দিলে আমার—

আঃ আটটি ছোট ছোট হাতের কি মিঠে-জলই না সেদিন খেয়েছিলাম—হুঁহাত তুলে বললাম, মণিরাম, সতে, নীলে, বেণু—বৈঁচে থাক—বৈঁচে থাক বাবা।

মণিরামের কঁরা থাকবার ঘর দিলেন—পড়ার বক দিলেন। সতের মার ঘরে দুবেলা খাবার ব্যবস্থা হলো—নৌলে মাটির ভাঁড়ে চা কোগাত—আমি যেন ইন্দ্রজ পেলাম। আন্তে আন্তে স্থল বাড়ী ভাড়া নিলাম—সকালে মেয়েদের স্থল ততো, দুপুরে ছেলেদের, তাও পার্টনার সোপে। আবার দাঙ্গা এলো—সবাই পালাল স্থল-বাড়ী ছেড়ে; শুধু চেগাব বেকি আগলে পড়ে রইলাম আমি—ছাত্র-ছাত্রীরা পালিয়েছে—সামনে অনাহার।

আবার চাকা ঘুরলো। এখন আর ছাত্র ছাত্রী ঘরে না। স্থল বড় হয়েছে—স্থলের উন্নতি হচ্ছে—এখন আর আমার জায়গা হলো না।

লেখটা শেষ করে খাতাটা টেবিলের ওপর রাখলেন। তারপর ধীরে ধীরে আফিকের বাটিটা হাতে তুলে নিলেন। কাল সকালেই সমস্ত পৃথিবী থেকে তাঁর নাম মুছে যাবে। পরিবারের এগারটি লোক ধীরে ধীরে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাবে—এ মৃত্যুকে কেউ রোধ করতে পারবে না।—যা কিছু থাকে তা বিক্রি করে বড় জোর একমাস চলতে পারে, প্রজিডেন্ট, ফাগের টাকায় আরো মাস তিনেক।—তার পর।

কিন্তু কেন এমন হয়? কেন বৃকের সমস্ত শিরাতুলো স্থলের নামে মুছে উঠতে চায়—অসহ বৈদ্যনাথ টনটন করে? যারা তাঁর সঙ্গে একবারও ভাবলো না, তিনিই বা কেন তাদের সঙ্গে এক ভাবলেন? নাঃ আর ভাবলেন না তিনি। উত্তেজিত শিবাঙলো দপ, দপ, করছে। গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আসছে। সমস্ত শরীর দিয়ে আগুনের হলকা বের হচ্ছে।

একটু জল—একটু জল গেতে হবে। আজই শেষ তাঁর জল খাবার পালা। কুঁজোতে ছুটে গিয়ে হাত দিলেন। সেটা একবারে খালি, গড়িয়ে পড়লো—ওতে জল নেই এক কৌটাও। বাড়ীর সবাই ত'ড়াড়াড়ি বেরিয়ে গেছে, কুঁজোর জল ভরতে ভুলে গেছে ওরা। আকণ্ঠে তেঁটায় যেন জিভটা টেনে টেনে নিচ্ছে মুখেব ভেতর। সমস্ত শরীরে একটা জ্বর আলা—যেমন সেইদিন লেগেছিল পার্কের মধ্যে শুয়ে শুয়ে।

যেন একটা জেদ চেপে গেল মাষ্টার মশায়ের। এতটুকু দাবীও তাঁর মেটবার নয়? এক-বুক তৃষ্ণা নিয়ম মবতে হবে তাঁকে? একটা ছোট দাবী,—এক গ্রাস জল,—এও তিনি মৃত্যুর সময় পাবেন না? না,—জল তাঁর চাই-ই! অন্তত আজ এই মুহূর্তেই পেতে হবে।

অন্ধকারে এক পা—এক পা করে এগিয়ে গেলেন মাষ্টার মশায় কলের দিকে। বাঁ-হাতে কলটাকে খুলে দিয়ে তার নীচে হাতটা অঙ্গুলি করে পেতে দিলেন।

: হার—! মাষ্টার মশায়—! মিষ্টিগলার একটা ডাক এলো।

: কে?

: আমরা। আমাদের বেওয়া চান্দর, কাপড়, বই—সব কেলে, না খেয়ে চলে এলেন কেন মাষ্টার মশায়? আমরা কি লো

করেছি? এই যে খাবার—আমরা নিয়েই এসেছি। একি! কাঁপছেন যে আপনি? হাতে এটা কি? বাটি? জল খাবেন? দিন, আমরা দিচ্ছি—ওমা, গ্রাসে কি যেন। ঝাঁড়ান, একটু মেজে দি।

: ওরা দিল না মবতে—ওরা আমাকে কিছুতেই দেবে না একটু শাস্তি—ভুকবে কৈদে উঠলেন মাষ্টার মশায়।—পাগলের মত নিজের কপালে করাঘাত করতে লাগলেন।

আবার সেই মাটম্পর্শ—তেমনি স্নিগ্ধ—তেমনি ঠাণ্ডা। ওদের হাতে জল খেয়ে আবার তেমনি সুস্থ লাগছে, আবার নিশ্চিন্ত মনে নতুন করে উপলব্ধি জাগছে, যেমন জেগেছিল সেদিন পার্কে চার দিন না খাবার পব সতের হাতে জল খেয়ে।

সত্যিই তো—কি দোষ ওদের? ওরা তো আমার ত্যাগ করেনি। একটা আশ্চর্য উপলব্ধির তরঙ্গ যেন বয়ে গেল তাঁর শিরায় শিরায়। আর মৃত্যুর মধ্যে পলারনে নর—জীবনের মধ্যে বাঁচবার প্রেরণায় মাষ্টার মশায় উঠে বসলেন। মণিরামের ছেলে, সতের ছেলেদের কে পড়াবে? মীরা, লীলারা তাদের বাড়ীর বকে নিশ্চয়ই তাঁর পাঠশালা বসাবার ব্যবস্থা করে দেবে।—নর তো—নিজের বাড়ীর বারান্দায়? ওরে মীরা—আলোটা আলোতো—?

: আলোবো আর? বিনি বললে।

: এত অন্ধকার দেখছি না; আলো না আলোকে কি হয়?

: একি আপনি কি বেরবেন? বিনি বললে।

: দে—তো তোদের নতুন চান্দর—কাপড়, আমি এখন মণিরামের বাড়ী যাচ্ছি। তাদের বাড়ীর তিনটি ছেলে এবার স্থলে সীট পায়নি,—আর তোর ভাই স্বাবাকে বলিস, কাল থেকে আমার বাড়ীর বারান্দায় কোচিং ক্লাস বসবে।—আর শোন, আমি বেরছি। হোরা পাবারটা ভালো করে ঢেকে ঘরে ঢাবি দিয়ে বাড়ী যা। আমি ফেরবার পথে তোর বাবার সঙ্গে দেখা করে ঢাবি নিয়ে বাড়ী ফিরবো।

অন্ধকারের মধ্যেই মাষ্টার মশায় পথে সেমে পড়লেন। নতুন যাওয়ায়।

সূচ্য-সম্ভবা

পূর্ববী চক্রবর্তী

এক অক্লান্তদয়ের কাকন মুহূর্তে তোমার আমি প্রথম দেখেছিলাম। দেবতার মেয়ে এক দেবিকার রূপে আমার দৃষ্টিকে উদ্ভাসিত করে তোমার সেই সুন্দর উদয়ন আমাকে বিভাস্ত করেছিল, মুগ্ধ কবেছিল। আমি নির্বাক বিষয়ে শুধু চেয়েছিলাম তোমার পথে। কখন যে তুমি আমার নয়নের সব আকুলতাকে সার্থক করে দূরে চলে গিয়েছিলে—তা আমি জানিনি, বুঝিনি। শুধু বহুক্ষণ পবে অবহিত হয়ে আমি অম্লভব করেছিলাম—প্রথম দর্শনের সেই পরম ক্ষণে আপন অজানিতে মর্হের কলুষ জীবন আমার ধস্ত হয়ে গেছে,—ধস্ত হয়েছে বুঝি এক অমরলোকবাসিনীর মহনীর আবির্ভাবে।

দীর্ঘ জিনহান পরে কিরে এসেছি—আবার এসেছি—আমার চিরশয়িত্তি কলকাতায়। প্রবাসের বেদনা আমার দৃষ্টিকে নতুন

করেছে, স্মৃতির কক্ষে, আমার অল্পভূতির চেতনাকে। সন্ধ্যা কণে আমি কিরেছি। আলোকোজ্জ্বল পথের সেই চলমান জনশ্রোতের মাঝে আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি। প্রতিটি মানুষের সঙ্গে আমি একাত্মতাবোধ করেছি—প্রতিটি জিনিসের দিকে পরিচিতকে দেখার আগ্রহে চেয়েছি। কি যেন এক আনন্দের ব্যাকুলতা আমাকে অধীর করেছে। বারে বারে মনে ভেবেছি, এই প্রচণ্ড মতানগরীই তো ছিল দেশের প্রাণকেন্দ্র হবার আদর্শ কেন্দ্র। রাজধানী দিল্লীর সেই মাণা হাসি আর মেকি জীবনের অস্বচ্ছন্দ গতি আমাকে অস্থির করে তুলেছে। তাই তো ছুটি পাওনা হতেই ছুটে এসেছি আমার আপনস্থানে—এই স্বচ্ছন্দ জীবনের বেশে।

গাড়ী থামল আমার বাড়ীর দরজায়। বাড়ীর গাড়ী নয়—ট্যাক্সী। না জানিয়েই আমি চলে এসেছি—সকলকে খুঁজতে অবাক করে দেব। ওই তো দারোগান আমাকে দেখতে পেরেছে। বিষয়ের আনন্দে সে এগিয়ে এসে আমাকে অভিবাদন জানাল। আমি স্মিতমুখে নেমে এলাম। আর আমার চিন্তা নেই। মালপত্র নামিয়ে, ভাড়া মিটিয়ে, ওরাই আমার ঘরে সব কিছু তুলে রাখবে। আমি এখন ছুটে বেতে পারি আমার আত্মজনের ঐতিহ্য উজ্জলভায়। তুলে বেতে পারি আমার পদধ্যান। আর গাড়ীঘ্যের মুখোশ দূরে ফেলে সঙ্গীসখীর সাতচোখে পরিপূর্ণরূপে উপভোগ করে নিতে পারি এই দশটি দিনের সীমিত মুক্তির প্রতিটি পল অল্পপল।

কাকভোরে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। নিশ্চিন্ত শয্যার আনন্দ থেকে দোর খুলে আমি বাইরে বেরিয়ে এলাম। অপব্যয়ের অবসর তো আর নেই। সময় বে আজ সোনা হয়ে গেছে। মুক্তির মুহূর্তগুলিতে বতরু মধু-মাধুরী আমি মনের অঙ্গলিতে সঞ্চয় করে নেব—ভবিষ্যতের কর্মমুখর দিনগুলির গ্রানিতে তাইতো আমাকে নবতর উদ্বীপনায় সঞ্জীবিত করবে—প্রেরণা যোগাবে আমার কর্তব্যের বন্ধুর পথে। স্মরণের কোন অংকণা থেকেও তাই আমি আজ নিজেকে বঞ্চিত করতে চাইনা। শেষরাতের আবছারায় এই ঝলঝলানার অকিঞ্চিৎকর আর মনি প্র্যাণ্টের সমারোহের মাঝে দাঁড়িয়ে এই যে বিচিত্র অল্পভূতি—এর তুলনা কোথায়। পশ্চিমের আকাশে চাঁদটা মস্তবড় হয়ে উঠেছে—অথই নীলের সায়েরে যেন ফুটে ওঠা রূপার বরণ ফুটি। ও তো শুধুই অ'কাশকুসুম নয়। বাবার বেলার মুঠি মুঠি আলোর বেগু ছড়িয়ে ও বুধি পূর্বাচলের সেই জবাকুসুম-সঙ্গাশ-এর পরম আবির্ভাবের কথাই জানিয়ে যেতে চায়। রাতের অন্তরে আলোর আবাহন—সে যে শাবত, স্তম্ভর। দিগন্তের বৃক্ 'দুট্ট' মেলে দেখলাম উনার প্রথম আভাষ। এত ভোরে প্রকৃতিকে এমন করে আর কখনও দেখিনি। মন আমার ভরে গেল। রাজশিখের রিক্ত বাতাস আমাকে হুলিয়ে দিয়ে গেল। আর আমি শুধু চেয়ে চেয়ে দেখলাম প্রকৃতির কোলে পৃথিবীর সেই শান্ত মধুর রূপটি।

শহর কলকাতার এক মর্মসত্য আমি অল্পভব করেছি। রাজপথের দুধারে ছোটবড় অনেক বাড়ী। প্রাসাদের পাশেই ইহুতো বস্তীর গারি। আর তারই মাঝে স্তম্ভে-স্তম্ভে শোক-আনন্দে অনেক মানুষ দিন কাটায়। শ্রেণীগত বৈষম্য তাদের মাঝে আপাত বিতর্কের আর বিরোধের প্রাচীর তুলেছে—

তবু তাদের বেদনার কাঁদা আর আনন্দের গান এখানকার আকাশে বাতাসে এক হয়ে মিশে আছে। টেশনের কলরোল-মুখবতাকে অতিক্রম করে বাস্তবতার দীর্ঘবাস তুলেছি। আবার, মিনিষ্টারের বাড়ীর পাশে স্তম্ভ স্তম্ভ নের সীমানে বেঁচে থাকবার মত আর্থিক সঙ্গতির জন্ত তর্ভাগোর বিপক্ষে অপরিণীয় প্রাণজন্তির সঙ্গাম আর তার জয়যাত্রা—তাও দেখেছি। ভালবাসার মাধুর্য আর বড়বড়ের ক্রুগতা, বঞ্চনার বার্থতা আর জীবনযুদ্ধের সার্থকতা এখানে বড় পাশাপাশি আর কাছাকাছি আছে। বিত্তের শুধু অহমিকা নয় উদারতাও আছে, দীনতার মাঝে শুধু হীনতাও নয় উচ্চতর মনোপ্রতির প্রকাশও আছে। আর দৌন্দর্যের পাশে মালিন্য আছে বলেই তো তাদের আবেদন এমন সর্বজনীন হয়েছে। দক্ষিণ কলকাতার এই অভিজাত অঞ্চলে,—সুদৃঢ় আর সুবহু বাড়ীর সুখসুপ্ত রাঁহুহগুলির শুধু অর্ধের আতিশয়াই নয়, সামাজিক সম্মানের প্রচুরতাও আছে। তারা দেশ আর সমাজের শীর্ষস্থানে। তবু তাদের অনেকের চরিত্রগত আদর্শে যে ঘৃণ আছে, তা ব্যক্তির অন্তরের সীমারেখা ছাড়িয়ে ব্যষ্টিকে হর্গতির পথে নিয়ে যায়। আর ঐ বস্তীর মাঝে বারা তাদের পাশেই আছে—তারা তো সমাজের অবহেলা আর অনাদরের জীবন। তারা হলনা করে, কলহ করে, শুধু বেঁচে থাকার আগ্রহে প্রাণান্ত করে, আবার পরস্পরকে ভালও বাসে। স্তম্ভে-স্তম্ভে ওরা একে অন্তরে সাথী হয়ে থাকে। শেষরাত থেকে রজনীর মধ্যরাম পর্যন্ত রাস্তার ঐ জলকলটির ধারে ওদের প্রবহমান কাজের মাঝে নিয়তই প্রকাশ পায় যে, ওদের জীবনেও একটা শৃঙ্খলার ধারা আছে—আর আরও আছে সমাজচেতনা। অনন্ত রূপবৈচিত্র্য এই শহর কলকাতার তবু তার অন্তরে কোথায় যেন এক মিলনের সুর বাঁধা আছে, য সুনতে আর বুঝতে আমাদের ভুল হয় না। তাইতো কলকাতাকে এমন করে ভালবেসেছি।

রাজধানী দিল্লীর শৃঙ্খলাবোধও রাজকীয়। সেখানে রীতিনীতিঃ শাসন বড় কঠিন। নয়াদিল্লী আর তার আশেপাশের সুপ্রশস্ত পথের ধারের ঐ যে বাড়ীগুলি, ওরা যেন বাস্তব পৃথিবীর নয়—রঙে রূপে আর কল্পনায় ওরা ছবি হয়ে উঠেছে। এক এক পথে যেন একই ছবির অনেকগুলি অঙ্গকরণ। স্থানের ভিন্নতায় বং ভিন্নতর হেছে ছবির আদর্শ—আর তাতেই সার্থকভাবে রূপান্তর হয়েছে অর্থ ও সম্মানের মাপকাঠিতে পাওয়া জীবন-ব্যবধানের বিচিত্র রূপ। বড় রাস্তার পাশে গণিষ্ঠুজির সোজা পথের মতই মানীসংস্কার পাশে সাধারণের ভীড় রাজধানী এড়িয়ে চলতে চায় আর নিজের দীনতাটুকুও সে সম্বন্ধে বিলাসসজ্জার অন্তরালেই রেখে দেয়। তাই স্বাধীন ভারতের মর্মকেন্দ্র—মহানগরী দিল্লী—তার অতীত ঐতিহ্যের গৌরবদীপ্তি নিয়ে দেশ আর বিদেশের কৌতূহল জনতাকে প্রতিনিয়ত আকর্ষণ করে। শুধু দূরবর্ত সেই মহাভারতের ইন্দ্রপ্রস্থের ধ্বংস-শেষের উপরে গড়া, পুরাতন ভারতের বিজয়কীর্তি পুরাণ বেলায় ভরজুপের দিকে চেয়ে, একটবার দর্শনার্থী মন চমকে ওঠে। ঐ যে মানুষগুলি অরাজকী প্রাচীরের গুমটিঘরের কীকে কীকে অন্তর পরিবেশে মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখি বুকে চলেছে—মনে হয়, ওরা যেন চিরন্তন বেদনা আর লাঞ্ছনার মূর্ত প্রতীক—আপাতমধুর বিলাসনগরীকে তার প্রকৃত রূপের কথাই বারে বারে স্মরণ করিয়ে দিতে চায়। আরও একবার দর্শক-অঙ্গুর বাধিত হয়ে ভাবে,—

সুপরিষ্কৃত নগররূপের অন্তরালে যে শ্রেণীবিভেদের রেখা প্রচ্ছন্ন রয়েছে, জাতীয় চেতনা কবে তাকে বিদেশের অস্ত্র অহিত অমুকরণের মতই ত্যাগ করতে পারবে—আর ব্যক্তিসত্তা তার সব উচ্চতা আর কৃষ্ণতা নিয়ে এক ভারত-আত্মায় বিলীন হয়ে যাবে! রাজধানী দিল্লী তার সব সৌন্দর্য আর গরিমা নিয়ে শ্রেয় হয়েছে—কিন্তু প্রিয় সে হবে কবে, আরও কত দুঃখ তপস্যার অন্তরে!

আরও একটি নূতন দিনের আলো-উজ্জ্বল কাগরণ আমাকে চিন্তার আচ্ছন্নতা থেকে বাস্তবের উদীপনায় ফিরিয়ে আনল। পথে লোক-চলাচল শুরু হয়েছে। গাড়ীগুলো প্রায় নিঃশব্দে ছুটে চলেছে। সাধনের এই গুরুত্বপূর্ণ গলার ঘণ্টা টুং টাং বাজছে। একটু টাটকা হুথের জন্ত কত জন এসে দাঁড়িয়ে আছে ওখানে। মুগ্ধীগুলো ইতস্ততঃ ছুটে বেড়াচ্ছে আর ঠুকরে ঠুকবে খাচ্ছে কি যেন। প্রভাত-ভ্রমণে চলেছে কত জন। গৃহহীনের দল ফুটপাথের আশ্রয় ছেড়ে উঠেছে একে একে। বাড়ির লোকজনও জেগে উঠেছে। বাগানে মালী গাছে জল দিচ্ছে। দারোয়ান এবার গেট খুলে দিল। আমি নীচে নেমে বেরিয়ে এলাম পথে। আর সিগারেটের ধোঁয়ায় মায়াভাল বিস্তার করে থাকিছুই আমার মনের মধ্যে ধরে নিতে চাইলাম। হোস পাইপে জল দিতে এসেছে রাস্তার। জলে ভিজ়ে কেমন একটা সৌন্দর্য গন্ধ বার হচ্ছে। ওদিকে ওরা রাস্তা পরিষ্কার করছে। অ্যালসেসিয়ানটাকে বেড়াতে গিয়ে গেল। বাওয়ার আগে বনি এল আমার কাছে। পা শুঁকে, ল্যাজ নেড়ে, একটু আদর পেতে আর জানাতে চাইল ও পুরাতন প্রভুকে। তারও পরে বাস চলাচল শুরু হল। আকাশে লালের ছোঁয়া লেগেছে কতকণ। সূর্য উঠতে আরও কত দেবী! শহরের ইটকাঠের অন্তরাল থেকে সূর্যের উদয়কাল পাঞ্জি-পুঁথির হিসাবকে কতকটা ছাড়িয়ে বার জানি। তবুও তো কাম্য সেই আবির্ভাব। নগরীর বিরল জীবনে সে যে সন্ময়ের এককণা মধুর আশীর্বাদ।

সূর্যের বুরি সাত রঙ। আমার দৃষ্টির আকাশ আচ্ছন্ন করে আছে শুধু এক রঙ—সে রঙ, অহুয়গের। শুধু বাস্তব রানিমাতেই অবলম্বন করেনি ঐ আলোর লালিমা—আমার জীবন মনকেও বুরি রাড়িয়ে তুলেছে সব কামনা আর কলঙ্কের কালিমা মুছিয়ে। কোনও এক উজ্জ্বল উদ্বেগের তিয়াসা বেন আমাকে অধীর করেছে। তাই অনন্ত প্রীতির আগ্রহ ব্যাকুলতায় অন্তর আর বাহির প্রকৃতির দিকে চেয়ে আছি আমি নির্নিমেবে—কোন অপকরণের আসার আশায়।

প্রশান্ত ধীর পদক্ষেপে রাজপথ বয়ে তোমার সেই আগমন—সে বেন আমার জীবনসরণিতে এক পরম রমণীয়ে প্রথম সঙ্গরণ! আলুলারিত কুন্তল, তরঙ্গমুক্ত কেশকলাপের মাঝে তোমার ঐ অনিন্দ্য ভ্রামলত্ৰী নিয়ে তুমি এল আমার দ্বার প্রান্তে—মহাবিভ্রায়নের পথদারিণী এক কল্যাণমাত্রী—বাহ্যে বিপদাঙ্ক আঁচল সামলিয়ে হাতের বই কটিকে সব রঙ ধরে চলতে চাইল আপন পথে একান্ত উদাসিনীর মত। শুধু একটিবার অগ্রমনা দৃষ্টিতে বুরি নশিত হলাম আমি—আর তখনই উদয়াচলের সেই আলোক-দেবতার দ্যুতিময় হাসি মুঠি মুঠি সোনার আশীর্বাদ হয়ে বরে পড়ল তোমার মুখে, বুকে সর্বাস্থে। তোমার দুই আয়ত নয়নের স্নিগ্ধ স্নিত বন্দনায় ভাব

হলেন ভাবের, আর এক স্তম্ভিত আলোক-কস্তার উদ্দেশে আমার মুগ্ধ মনের আরাতি তখন ধস্ত হয়ে গেল।

মুহূর্তে বাস্তবকে তুললাম আমি। মনে হল আমি যেন সেই মহাতারতের রাজা স্বেবরণ—চলার পথে দেখছি আমার মানসী প্রতিমা সূর্য্যকল্যাণ তপতীকে! এক দৃশ্যের তপস্যার শেষে অমর্তলোকবাসিনী অধরা ধরা দিয়েছিল পৃথিবীর প্রণয়মাল্যের বন্ধনে—আদিত্যকল্যাণ হয়েছিল সংবরণ-জায়া। কিন্তু ঐ যে স্ত্রীমতী মেয়ে লাভণ্যের অমৃতধারায় স্নাত হয়ে পৃথিবীর সব নিবিড়তাকে ভুলে দূর আকাশের আলোক-চেতনায় মগ্ন হয়ে গেছে—ওর ঐ দীপ্তোজ্জ্বল রূপের কাছে আমার সব স্পর্ধার কামনা যে নান হতে চায়। আমি তো পুরাণের সেই শুক্লতী রাজা নই। শুধু উজ্জ্বল আর দুরন্তযোবন—আজকের পৃথিবীর মর্ত পুরুষ আমি। শুচিতার প্রতিমূর্তি ঐ দেবপ্রকৃতি মেয়ের প্রিয়হাতের বরণমালায় সুরভিতে স্নিগ্ধ হয়ে যাব—দেহমনের সে অকলঙ্কার গৌরব কোথায় আমার! দুঃসহ আত্মদানির চিন্তাভ্রান্তিতেও কি এই হস্তব জীবন-ব্যবধানকে অতিক্রম করা যায়!

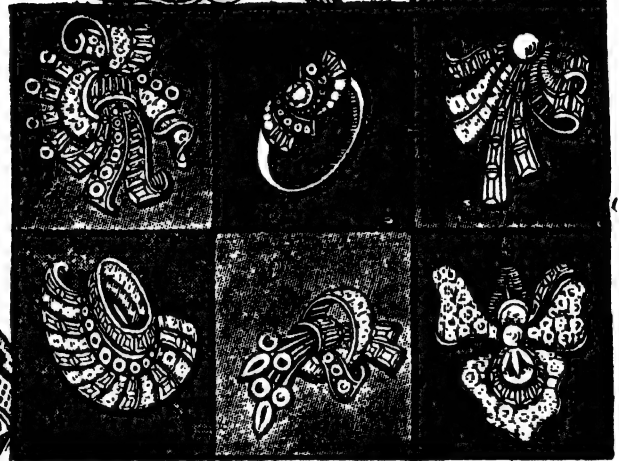
আলোক-সামান্ধ্য কি কখনও অন্তরতমা হয়ে ধরা দেয় পৃথিবীর গেহকোণে! আর সব উজ্জ্বলতা হারিয়ে জীবন তখন সার্থক হয়ে যায় পরমপ্রাপ্তির আনন্দমধুরতায়।

আরও এক সোনাবরা সকালের আলোকময় স্মৃতি বারোবায়েই উজ্জ্বল আর উজ্জ্বল করে আমার অন্তরকে। বাস্তব প্রস্তুতি চলেছে শহরতলীর পথে—শান্ত আর স্নিগ্ধ পরিবেশে এক সারাদিনব্যাপী পিকনিকের আয়োজনে। চারখানা গাড়ী বোকাই করা হচ্ছে জিনিষ আর মামুবে। বন্ধুজন আর আত্মীয় পরিজন—কেউ বা উঠেছে কেউ বা ওঠেনি এখনও। ঠুঙিবেকারের কাছে দাঁড়িয়ে ক্যান্ডিয়ারে কি উঠল না উঠল তাই দেখছি দাঁড়িয়ে—পাশে থেকে কাজ সাহায্য করছে বৌদি আর ছোটবোন তিথি। হঠাৎই ওদের যুগ্মকণ্ঠের যুদ্ধধ্বনিতে সচকিত হয়ে ফিরে চাইলাম আমি—“একী এঁ! আর তখনই ওদের দৃষ্টিতে অনুসরণ করে আবারও দেখলাম আমি তোমাকে। কলরোলমুখরতায় বুরি মুহূর্তেকের জন্ত বাহত হল তোমার অচঞ্চলতা। কৌতুক আর কৌতুহলের দীপ্তিতে নয়ন উদ্ভাসিত করে বারেকের জন্ত চেয়ে দেখলে এই বিচিত্র ক্যারাক্টারের দিকে। শুধু স্নগিকের দৃষ্টিবিনিময়। আর তখনই উদীচীর সেই আলোর আবির্ভাবের সোনালী পরশে রঞ্জিত হয়ে উঠল তোমার তমুত্ৰী। সূর্য্যকান্তমণির মত আলো উল্লে-ওঠা তোমার দুই দৃষ্টিদপের আনন্দ-আরতিতে বুরি প্রীত হলেন আলোর দেবতা, আর সে প্রীতির অনুভবে তুমি হলে তখন পরম রমণীয়া! মুহূর্তে সব মুগ্ধতা হারিয়ে কোন অলঙ্ঘ আকর্ষণ বেন সবাই কিরে দেখল তোমার মুখে! সন্ময়ের অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হল তাদের অন্তর, আর তোমার অজানায় নীরব শ্রদ্ধার ডালি সাজাল তারা তোমারই উদ্দেশে।

শুভবসনা তোমাকে দেখে ওরা বলেছিল স্তম্ভিতমতী বাগদেবী। আমি পরিহাসের আবরণে আমার মনের এক মধুর সন্ধানবাক্যে অন্তরাল করতে চাইলাম ওদের চোখে—“অবাক দেবী বলে।” যে অকল্পনীয় সিচুরেশনের স্মৃতি হল তাতে, এ ছাড়া আর কি-ই বা বলা যেতে পারে! আশ্চর্য্য! ডাবলাম আমি সবার চিন্তাধারার স্নানকেই



জোদর্যে মাদুর্য



গিরি চান্দ জুয়েলারী স্পেশালিস্ট

এম.বি.সরকার
এও সন্স

ম্যানুফ্যাকচারিং জুয়েলাস্

ফোন-৩৪-১৭৬১ ১৩৭/সি ১৩৭ সি/১ চন্দ্রাজয় ট্রাই কলিকতা-১২ গ্রাম-
ব্রাহ্ম-বালি গও-২০০/সি গ্রামবিহারী এন্ডিনিউ কলিকতা-১২ ফোন-৪৬-৪৬৩৩
মোরামের প্রসাদল টিয়ারা ১২৪, ১২৫/১, অম্বাজার ট্রাই, কলিকতা-১২
কেলমাত্র রবিবার খোলা থাকে
ব্রাহ্ম-জামসেদপুর ফোন- জামসেদপুর- সিটি-২৫৫৮-এ

এক সঙ্গতির আঁধার খুঁজে পেয়ে! মর্ত্যের কোনও তরুণলাবণ্য নয়, স্বর্গ-আশ্রয় রূপেই তো তুমি আমার হৃদয়কে হরণ করেছ। তুমি বুঝি এই পৃথিবীর মধ্যে নয়, দেবীত্বের অচলায়তনেই তোমার নিত্যপ্রতিষ্ঠা!

আমার জীবনে প্রথম নও তুমি—তুমি শুধু—একতম। তবু তুমিই আমার অনঙ্গ! সপ্তদশ বসন্তের সন্ধ্যার আমার দেহমনকে ধরে ধরে সাক্ষিয়েছে। আর তাই অনতিক্রমণীয় আকর্ষণে ওরা ছুটে এসেছে জনে জনে—এ মুকুলিত যৌবনার হল। ওরা এসেছে, হেসেছে, আর ডারও পরে ওরা শুধুই কেঁদেছে। ব্যক্তিত্বের প্রথম প্রকাশনে উজ্জ্বল স্বরূপ লুকিয়ে ওদের নিঃশেষ আশ্রয়ান আমি গ্রহণ করেছি। আমার যৌবনের খরতাপছালায় ওরা শুকিয়ে গেছে—স্নান হয়ে যবে গেছে মাটির কলকে একের পরে এক। আর আমি শুধু অলঙ্কার অবহেলার হাসিতে এগিয়ে চলেছি আমার জরথাস্ত্রার পথে—আরও একটি জীবনকুসুমকে বৃষ্টিচূত করবার নিষ্ঠুর আনন্দ-অধীরতার। রূপ, গুণ, বিজ্ঞা, অর্থ আর সামাজিক প্রভাবের ব্যাপকতা—একটাই তো চিরবালের চরিত্রবানদের পরিচিতির মাধ্যম! বিধাতার অপার দক্ষিণ্যে এর সব কটিতেই আমি ধস্ত হয়েছি। সব সন্দেহের স্পর্ধা আর অপবাদের চক্রান্ত আমার পথে এসে তাই থমকে সরে গেছে। ডনজুয়ানের জুমিকা নিয়েও ঘরে-বাইরে আমার নিষ্কলক পরিচয় ব্যাহত হবার অবকাশ ঘটনি কখনও। মারীত্বের চরমতম অপমান করেছি আমি নির্ধন্য। রূপবিলাসিত পৃথিবীতে নারীকে প্রেনেছি শুধু পুরুষের বিলাসের এক স্তম্ভের উপকরণ। তবু সেই অসংখ্য বিভ্রান্ত আর অশায় খলনের কালেও বুঝি সাক্ষী মায়ের প্রীতিবিলম্ব পবিত্রতার রূপ আমার অবচেতন মানসে এক প্রতিজ্ঞার সৃষ্টি করেছে। তাই আমার অলপক্ষণকে বায়েবারে চমকিত করেছে এক কল্যাণি পার্শ্বচরিত্রীর মধুময় কলনা। আজ এতদিনে বুঝি আমার সেই প্রতীকার অবদান হল। মধুমতী তুমি এলে আমার জীবনে আর মুহূর্তে আমাকে জয় করে গেল পরমা-প্রকৃতির রূপবিহীনগতায়!

কলকাতার এসেছি গেছি আরও কয়েক বার। জীবনের একটা নতুন দিককে জেনেছি আমি। প্রথম ভালবেসেছি এক নারীকে পরম নিবিড়তায়। তাই আশা বাওয়ার ক্ষণে মিলনের আনন্দ আর বিরহের বেদনা অমুভব করেছি গভীরতর ভাবে। কতদিন উগ্ৰ হরে থেকেছি। তোমাকে দেখার আগ্রহে। কোনও দিন বা দেখেছি তোমার। আর সেই স্মৃতির আলোর আমার নিঃসঙ্গ দিনগুলির বিপদছায়ায় দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়েছি। এর বেশী কিছুই তো আমি কামনা করিনি। তোমাকে অহুসরণ করবার মত প্রাকৃত প্রবৃত্তি আমার হয়নি। তোমাকে কাছে পেতে চাইনি আমি। তোমার জাগতিক পরিচয় জানবার আগ্রহও জাগেনি আমার মনে। আমার অন্তর মাঝেই যে তোমার নিরন্তর অগ্নিতানের উজ্জ্বলতা! আমার জীবন মন শুধু এক নতুন ধারায় বয়ে চলেছে এখন। পাটি, ক্লাব, আর পিকনিকের উজ্জলতার মাঝে আমার সবম দেখে বিমিত হয়েই সকলে। কত সুকন্ডার অভিভাবক আমার নিলিপ্ততায় হতশ হয়েছেন। অন্তরঙ্গজন এই আকর্ষক পরিবর্তনের স্বয়ং অহুসকান করতে চেয়েছেন কতবার—আব ফিরে গেছে ব্যর্থমনোরথ হয়ে। আমি নিজেও কি সঠিক

বুকেছি এর কারণ! শুধু জেনেছি ডিক্যাটারের রক্তিম পানীরের চেয়ে অনেক আকর্ষণীয় এই আশ্রয় অহুসরণের স্থার আশ্রয়ন!

কতদিন পরে আর দেখিনি তোমার। হয়তো তোমার কংক্রের পাঠ সাক্ষ হয়েছিল এতদিনে। আমার দৃষ্টি থেকে তুমি দূরে সরে গেছে—কিন্তু আরও নিবিড়ভাবে অধিকার করেছ আমার চেতনাকে। প্রিয় অহুসরণের কঠিন ব্রতচর্য্যার এই তো সবে প্রথম পর্ব। জীবনসমুদ্রের মন্থনে শুধু নিরবচ্ছিন্ন স্রবের অমিয়ধারাই নয়—ব্যথা আর ব্যর্থতার গরলও যে উঠে আসে—সে কথা আমি ভুলেছিলাম। বিশ্বাস আর প্রীতির প্রতিদানে নারীকে দিয়েছি শুধু বঞ্চনা আর লাঞ্ছনা। তার সক্রপ আর্ন্তি আর দীর্ঘকালের অভিশাপকে পৌকবের অহমিকার তুচ্ছ করেছি। আজ বুঝি তারই প্রায়শ্চিত্তের লগ্ন এল আমার জীবনে। তাই সশয়িত চিন্তে ভাবি—এ বরণীয়ার দেহলীপ্রাপ্তে আমার মনের প্রার্থনা কি সার্থক হবে কখনও, আর বিচ্ছেদের হৃৎখ সাধনার অন্তে দয়িতার হাসির মাধুরীতে মধুময় হয়ে যাবে আমার মিলন-বাসনের শুভলগ্ন!

হিতার্থীজন বিচলিত হয় আমার নিষ্কলক বিবর্ততার। মনে ভাবে এ বুঝি যৌবনধর্মের এক স্বাভাবিক পরিণতি—একক জীবনের মনোবিকলন যাত্রা। তাই শুরু হয় খোজার পালা—আমার নিঃসঙ্গতা দূর করে মনটাকে সুখী করে দেবার জন্ত প্রয়োজন হয় এক স্মৃতিত সহমস্মিতার। আমি বিরক্ত হই আর এড়িয়ে চলতে চাই এই অবাস্তিত প্রসঙ্গ। বিজ্ঞপ আর বেদনার হাসিতে সব আলোচনা আর সমালোচনা থেকে দূরে সরে আপনহারা হয়ে যাই আমার মনোহারিণী সেই শুচিমিতার অভিধ্যানে।

কবে যেন কথাগুলো মেরেমহলে অবতারণা করেছিলাম আমার একান্ত প্রিয় প্রসঙ্গের। নিম্পূহভাবেই উপাশন করেছিলাম সেই পূর্বদর্শিতা সর্বস্বতার কথা—তার বর্তমানের উপর কেউ আলোকপাত করতে পারে কিনা, প্রকাণ্ডত্বের সেটা জেনে নেওয়াই ছিল আমার প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য। কিন্তু আমার কৌতুকের কুহকে ওরা ভাস্ত হয়নি। অনতিপরিচিতা এক পথসঙ্গারিণীর প্রতি আমার এই অনাবশ্যক কৌতুহল প্রকাশের আকর্ষকতায় ওরা বিমিত হয়েছিল, স্রীত্ব ব্যঙ্গের খরতায় জর্জরিত করেছিল আমাকে। আর আমি তখন সলজ্জ সঙ্কোচে কোনও অছিলায় দূরে চলে গিয়েছিলাম। শুধু যাবার বেলায় সানন্দ আগ্রহে বৌদির মুখে এক মধুর মন্তব্য শুনেছিলাম—এ মিলন সম্ভব হলে সে নাকি বড় স্তম্ভ আর সুযোগ্য হয়! স্নেহের আলস্যার মাঝে আশার মুহূর্ত স্পর্শে উজ্জীবিত হয়ে যা সেই অনবলোকিতার সবকিছু অহুসন্ধিস্থ হয়েছিলেন। কিন্তু অভ্যাসের কুহেলীতে সেই অদর্শনাকে যে সকলে হাড়িয়ে কেলেছে—তাই ব্যর্থকাম হয়ে গেল তাঁর কলনার সব অমিতি। আরও একদিন পরিভাষণের মাঝে আমার আদর্শ নারীর বর্ণনাকে প্রভাবিত করেছিল স্বর্গোন্মত্তা সেই অভুলনা কঙ্ককার জীবন-প্রতীতি। সেদিনও পরিহাসিত আর লজ্জিত হয়ে সরে গিয়েছিলাম আমি। আর অথক হয়ে ভেবেছিলাম—ভালবাসার মোহন ছোঁয়ায় আমার উত্তর মনের বুকেও কি অবশেষে লজ্জার মত ললিত বৃত্তি ফুল হয়ে ফুটে উঠল এবার!

[আগামী বারে সমাপ্য।]

তেজস্ক্রিয়তার সম্পদ

মহাশুদ্ধের দাক্ষিণ বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষ পরমাণু শক্তির প্রথম পরিচয় পেতেছে। পরমাণুর বিস্ফোরণ-ক্ষমতা এবং জীবদেহে তার প্রভাব বর্তমানে পৃথিবীব্যাপী প্রবল উৎকর্ষার কারণ। অনেকে মানুষের এই আয়তাব্যাপী শক্তিকে বিজ্ঞানের অভিলাষ রূপে ধারণা করেছেন। কিন্তু এ হলো একদিক মাত্র। নদী বলতে আমরা যেমন শুধু বজ্রাকেই বুঝি না, বাতাস মানে যেমন শুধু বড় নম, পরমাণু শক্তিও তেমনি কেবল ধ্বংসেরই কারণ হয়নি, আমাদের জীবন বিকাশের পক্ষে নানাদিক দিয়ে কল্যাণকরও হয়েছে। যে প্রাণী তার তলদেশে অন্ধকারে আচ্ছন্ন রাখে, তাই আবার দৈনন্দিক আলোকে উজ্জ্বলিত করে তোলে।

পরমাণুর বিকিরণ

বিকিরণ বলতে আমরা এতোদিন আলো বা তাপ রূপে শক্তির এক স্থান থেকে অপর স্থানে গমন বোঝাতাম। কিন্তু ১৮৯৫ সালের পর থেকে এই ধারণার পরিবর্তন হলো। ঐ বৎসর ফরাসী বিজ্ঞানী বেকারেল লক্ষ্য করেন যে, বিকিরণের পরিজ্ঞাত উৎস হতে স্বতন্ত্র রূপে ইউরেনিয়াম ধাতু অভিনব এক রশ্মি নির্গত করে। রেডিয়াম, এটেনিয়াম, থোরিয়াম ইত্যাদি থেকেও এই রশ্মি প্রকাশ পায়। পদার্থ বিশেষের এই বিকিরণকে আমরা তেজস্ক্রিয়তা বলেছি, ইংরেজিতে রেডিও-একটিভিটি।

তেজস্ক্রিয়তার স্বরূপ

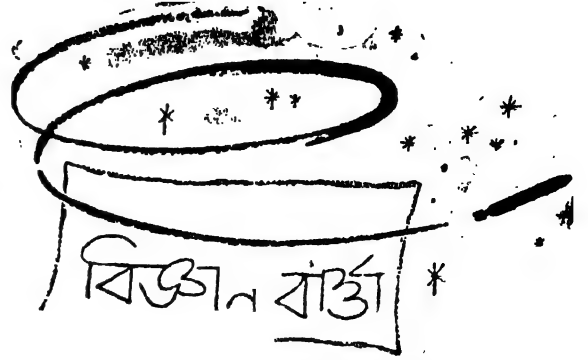
শিল্পের কুরী, রাদারফোর্ড এবং ভিলার্ডের গবেষণার ফলে ক্রমশ জানা গেলো যে, তেজস্ক্রিয়তা অধৌগিক বিষয় নয় (Composite phenomenon), আলফা, বিটা ও গামা—এই তিনটি রশ্মির উপাদানে গঠিত। আমরা ইচ্ছা করলে বাতির আলো বন্ধ বা প্রকাশ করতে পারি, কিন্তু তেজস্ক্রিয়তার সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা এই যে, মানবসাধ্য কোন প্রক্রিয়ায় এই বিকিরণকে রোধ করা যায় না।

কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা

তেজস্ক্রিয়তা স্বয়ংক্রিয়, অপ্ৰতিরোধ্য; তবে কৃত্রিম উপায়েও তা সৃষ্টি করা চলে। আইড্রিজ কুরী এবং জোলিও সর্বপ্রথম এ বিষয়ে সফল হন। সে হলো ১৯৩০ সালের কথা। পরমাণুর কেন্দ্রস্থলে ইলেকট্রনের আঘাত হেনে এই বৈজ্ঞানিক-দম্পতি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ সৃষ্টি করেন। আইসোটোপ হলো এক কথায় পদার্থের ভিন্নরূপ। সোনার আইসোটোপ আসলে সোনা-ই, তবে একটু তফাৎ এই মাত্র—সোনার ১৯৮ নম্বর পরমাণু থেকে তেজস্ক্রিয় রশ্মি বিটা ও গামা নির্গত হয়ে থাকে। সকল আইসোটোপই তেজস্ক্রিয় নয়, তবে এ পর্যন্ত সৃষ্ট ১,৩০০ আইসোটোপের মধ্যে প্রায় ৪০০ টির থেকেই তেজস্ক্রিয় রশ্মি পাওয়া যায়।

পরমাণুর বিভাজন : শক্তির মুক্ত উৎস

১৯৩৪ সালে ইটালীতে এনরিকো ফার্মি ইলেকট্রনের পরিবর্তে নিউট্রনের আঘাত হেনে কৃত্রিম আইসোটোপ সৃষ্টির উপায় আবিষ্কার করেন। এর চার বছর পরে জার্মানিতে একটি অতি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। হান এবং ষ্ট্রাসমান (Hahn and Strassman) নিউট্রনের আঘাতে ইউরেনিয়ামের পরমাণু ভাঙতে সক্ষম হন। (আমাদের জানা উচিত যে, সৌরজগতের অতি ক্ষুদ্র



প্রতিকৃতিরূপে পরমাণুর মূলকণা ইলেকট্রন কেন্দ্রবর্তী বা নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে প্রদক্ষিণ করে। পদার্থের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ এই পরমাণুর অধিকাংশ স্থানই কঁাকা, নিউট্রন গ্রোটন ইত্যাদি নিয়ে গঠিত নিউক্লিয়াস তার স্বল্পতম আয়তন গ্রহণ করে আছে মাত্র, সুতরাং কোন পরমাণুর যথাস্থানে আঘাত হেনে তা ভাঙাঙ্গে ভাগ করা নিঃসন্দেহ অতি দুর্লভ প্রক্রিয়া।) লিজে এবং ফ্রিস (Lise Meitner and Otto Frisch) এই পদ্ধতির নাম দেন 'ফিসন' (Fission), অর্থাৎ পরমাণুর বিভাজন। তাঁরা আরো দেখানেন, ফিসনের ফলে আশ্চর্য শক্তি প্রকাশ পায়। পদার্থের শক্তিতে রূপান্তরের ফলেই তা সম্ভব হয়েছে। ইতিপূর্বে (১৯০৫ সালে) আইনস্টাইন তাঁর বিখ্যাত আপেক্ষিক তত্ত্বে উল্লেখ করেন যে, শক্তি (এর সাহায্যে কাজ হয়) এবং পদার্থ (যে কোন জায়গা জুড়ে আছে) একই জিনিষের বিভিন্নরূপ মাত্র, পদার্থ শক্তিতে এবং শক্তিও পদার্থে রূপান্তরিত হ'তে পারে। কয়লা যখন জলে তখনো কিছু পরিমাণ পদার্থ তাপশক্তিতে প্রকাশ পায়, কিন্তু পরমাণুর বিভাজনের ক্ষেত্রে এই পরিমাণ কল্পনাভীত ভাবে অধিক—প্রায় ২৬,০০০ গুণ।

ফিসন প্রক্রিয়ায় জাত ভগ্নাংশগুলি এক একটি নূতন পরমাণু, সাধারণত এরাও তেজস্ক্রিয় হয়ে থাকে। ইউরেনিয়ামের বিভাজনের ফলে সাধারণত তেজস্ক্রিয় বা হুই ক্রিপটন ও রেডিয়াম পাওয়া যায়। এরূপে পরমাণুর বিভাজন তেজস্ক্রিয়তার একটি নূতন উৎস। তাছাড়া, ফিসনের প্রভাবে হুই বা ততোধিক নিউট্রন নির্গত হয়ে থাকে। আমরা জানি, নিউট্রনের সাহায্যে পরমাণুর বিভাজন সম্ভব। সুতরাং উপযুক্ত পরিমাণ ইউরেনিয়ামের বর্তমানে একবার ফিসনের ফলে জাত নিউট্রন একাধিক পরমাণু বিলীণ করবে, এই দুটি বা তিনটি নিউট্রন আবার চার থেকে নয়টি ইউরেনিয়াম পরমাণু বিভাজনের কারণ হবে। এরূপে প্রতিক্রিয়া থেকে দুটি বা তিনটি, তিনটি থেকে ছটি বা নয়টি পরমাণু—সুতরাং ফিসন প্রক্রিয়া পঞ্চায়বন্ধ ভাবে অগ্রসর হবে—যেমন এক সারি সিগারেটের খোল কাছাকাছি দাঁড় করলে একটিকে ধাক্কা দিলেই সবগুলি খোল একে একে পড়ে যায়। ফিসন-এর ক্ষেত্রে অবস্থা এ ক্রিয়া অতি দ্রুত অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, ফলে নির্দিষ্ট পরিমাণ (critical mass) ইউরেনিয়াম একত্রিত হওয়া মাত্রই পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটে—অর্থাৎ স্বল্পতম সময়ে অধিকতম শক্তি প্রকাশ পায়। বিজ্ঞানীরা এর নাম নিয়েছেন পর্যায়বন্ধ প্রতিক্রিয়া (chain reaction)। বিষয়টি খুবই আশ্চর্যজনক—কয়লার দহন-ক্রিয়ার জন্ম অক্সিজেনের সরবরাহ প্রয়োজন, কিন্তু ফিসন প্রক্রিয়ায় ইউরেনিয়ামের পরমাণু প্রয়োজনীয় "অক্সিজেন"

অর্থাৎ নিউট্রন নিজেই সৃষ্টি করে নেয়, প্রক্রিয়াটি শুরু করার জন্য প্রথমে কয়েকটি নিউট্রন থাকলেই যথেষ্ট।

পরমাণু বিভাজন প্রক্রিয়া আবিষ্কারের পর কেন্দ্রিক জোন্স ও এক এনরিকো ফার্মি ইউরেনিয়ামের ফিশনকে সর্বপ্রথম পর্যায়-বদ্ধ বলে অনুধাবন করেছিলেন। কিন্তু বিষয়টি তখনো প্রমাণ-সাপেক্ষ ছিল। অবশেষে ১৯৪২ সালের ২রা ডিসেম্বর ফার্মির নেতৃত্বে ৪১ জন বৈজ্ঞানিক সত্যসত্যই তা সম্ভব করলেন। আমেরিকার চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বিচিত্র “রিয়েক্টর”-বদ্ধ (তৎকালীন নাম পরমাণু “পাইল”—চিকাগো পাইল নম্বর এক, C P 1) স্থাপন করে এই বৈজ্ঞানিকগোষ্ঠী দেখলেন যে, ফিশন প্রক্রিয়া বাস্তবিকই পর্যায়বদ্ধ ভাবে এগিয়ে চলে। ইউরেনিয়ামের পরিমাণ অধিক হলে এই প্রক্রিয়া তৎক্ষণাৎ প্রবল বিস্ফোরণের আকার ধারণ করে, এই বিস্ফোরণ-শক্তিকে আবার সংযত করাও চলে। এক্ষেপে পরমাণু কেন্দ্রস্থল আঘাত করে আধুনিক মানুষ মস্তচক্র ভেদকারী অজুনের স্রোতদীপ্তির দ্বারা এক নতুন শক্তির আধিকারী হলো।

কল্যাণশক্তি পরমাণ

পরমাণুশক্তির নিয়ন্ত্রণ সর্বকালের মানবজাতির একটি অতি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কিন্তু তৎকালীন মহাবুদ্ধির কারণে বিজ্ঞানের এই অগ্রগতি সর্বপ্রকারে গোপন রাখা হয়েছিল। ফলে ১৯৪৫ সালের ৬ই আগস্ট জাপানের একটি বিখ্যাত সহরে পরমাণুর বিস্ফোরণের আগে পর্যন্ত মানুষের এই আয়ত্তাধীন শক্তি সাধারণের মধ্যে ব্যাপক পরিচয় লাভ করেন। পরমাণুকে আমরা প্রথম ধ্বংসাত্মকরূপে জেনেছি, কিন্তু মহাবুদ্ধির পর এই নতুন শক্তি প্রধান ভাবে শুধু সামরিক উদ্দেশ্যেই নিয়োজিত থাকেনি, বহু ক্ষেত্রে তা মানুষের কল্যাণ সাধনেও তৎপর হয়েছে। পরমাণুশক্তির বলে বহু আত্মঘাতী অস্ত্রে উদ্ভাবন সম্ভব হলো সত্য, কিন্তু সেই সংগে তা মানুষের অগ্রগতি-সামনে অনন্ত সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে। পরমাণু আজ শক্তি-বিকল্প উৎস, পরমাণু আজ চিকিৎসা-বিজ্ঞানে, পরমাণু শিল্পক্ষেত্রে কৃষিক্ষেত্রে—পরমাণু আজ সকল ক্ষেত্রে মানুষের কল্যাণে প্রতী হয়েছ।

পরমাণুর “অদৃশ্য হাত”

জল বলতে যেমন সিন্ততা, পরমাণুর সাথে তেমন তেজস্ক্রিয়তা অজ্ঞানভাবে জড়িত। আমরা জানি, এই তেজস্ক্রিয়তা ত্রিবিধ রশ্মির উপাধীন। আলফা ও বিটা—বস্তুকণার প্রবাহ মাত্র। আলফা নিউট্রনের এবং বিটা-র হলো ইলেকট্রন। গামা কিন্তু প্রকৃত অর্থে বস্তুহীন রশ্মি, এবং একসূ-রে বা আলোর সংগে তুলনীয়। আলো কাচ ডিড্রিয় যায়, একসূ-রে মোটা মোটা কনক্রিটের দেওয়াল পর্যন্ত ভেদ করতে পারে—গামা রশ্মি এর ভেদন ক্ষমতা (Penetrating power) একসূ-রের তুলনায় কয়েক শ গুণ। তেজস্ক্রিয় রশ্মি তিনটির মধ্যে গামা-রেই সবচেয়ে শক্তিশালী, তারপর বিটা রে, এবং সবচেয়ে কম আলফা রশ্মি।

এইচ, জি, ওয়েলস্-এর অদৃশ্য মানুষের গল্প আমরা শুনেছি। যে মানুষকে চোখে দেখা যায় না, পায়ে হাপ লক্ষ্য করে তাকে কেমন অনুসরণ করা চলে। পরমাণুর ক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয়তাও এমনি “অদৃশ্য হাত”! এই “অদৃশ্য হাত” আমাদের কেমন কাজে আসছে, তার কয়েকটি এখন উল্লেখ করছি।

পরমাণু শিল্পক্ষেত্রে

তৈল অঞ্চল বা শোধনাগার ততে সাইমোজেন, পেট্রোলিয়াম-ইথার, পেট্রল, গ্যামোলিন, কেবোসিন ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের তেল একই নলপথে পর্যায়ক্রমে পাঠানো হয়ে থাকে। পরিবহন-ব্যয় এতে কম হয় সত্য, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন তেল কখন আসবে তা জানতে না পারার হু রকম তেল একত্র মিশে যেতে পারে। তেজস্ক্রিয়তার সাহায্যে এর সমাধান আছে। এক শ্রেণীর তেল যখন পাঠানো শেষ হলো তখন তেজস্ক্রিয় এনটিমনি বা বেড়িয়াম নলপথে কিছু পরিমাণে ঢেলে দেওয়া হয়। এই তেজস্ক্রিয় পদার্থ যখন অপর প্রান্তে গিয়ে পৌঁছায়, কোন তেজস্ক্রিয়তা সন্ধানী যন্ত্র (Geiger-Müller Counter)-এর সাহায্যে সহজেই তা ধরা পড়বে। তেজস্ক্রিয়তা তৈলবাহী নলগুলিকে বাধাযুক্ত রাখার কাজেও সাহায্য করে।

দুটি ধাতুখণ্ডের ঘর্ষণে কণিকের জন্ম যে উচ্চ তাপমাত্রা ও চাপের সৃষ্টি হয় তার ফলে ধাতুর ক্ষয় হয়ে থাকে। এই ক্ষয়ের পরিমাণ খুবই কম, অপরীক্ষণের সাহায্যেও সহসা ধরা যায় না, কিন্তু নিয়ত সচল থাকার ফলে যন্ত্রের বিভিন্ন অংশে এই ক্ষয়ের পরিমাণ সহজেই প্রকট হয়ে ওঠে। যন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য তাই মাঝে মাঝে তেল (Lubricating oil) দেওয়ার বিধি আছে। এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন তেলের কার্যকারিতা লক্ষ্য করার জন্য পূর্বে পরীক্ষা-মূলক ভাবে যন্ত্রকে চালিয়ে ক্ষয়ের পরিমাণ হিসাব করা হতো। কিন্তু কাজটি সময়সাধ্য এবং ব্যয়সাধ্যও বটে—কারণ এই পদ্ধতিতে দামী দামী যন্ত্রের বিভিন্ন অংশ শুধু পরীক্ষাকার্যেই নষ্ট হতো। সাধারণ ধাতুফলকের পরিবর্তে যদি যন্ত্রের অংশকে তেজস্ক্রিয় করা হয়, “স” হলে ন্যূনতম ক্ষয়প্রাপ্ত অংশের পরিমাণও গাইগার কাউন্টার জানিয়ে দেবে। একটি উদাহরণ দেওয়া ভাল। ক্যালিফোর্নিয়া রিসার্চ করপোরেশনের কর্তৃপক্ষ জানাচ্ছেন, এই পদ্ধতি অবলম্বনে পর্যাপ্ত হাজার ডলার খরচ করে চার বছরে যে তথ্য তাঁরা সংগ্রহ করেছেন, সাধারণ উপায়ে তার অন্তত পঁচিশগুণ অর্থব্যয় ও বার গুণ সময় নষ্ট হতো।

শিল্পে তেজস্ক্রিয়তার আরো বিচিত্র প্রয়োগ আছে। কাগজ বা ধাতুর পাত কারখানার প্রস্তুত হচ্ছে। জানা দরকার, পুরুর সমতা রক্ষিত হচ্ছে কিনা। তেজস্ক্রিয় খ্যালায়াম নিম্নেই তা করে দেবে। খ্যালায়াম রিটা রশ্মির বিকিরক, চলন্ত পাতের নিচে এটি রাখা হয়। পাতটি যত পুরু, রশ্মির তীব্রতাও তত হ্রাস পাবে। তেজস্ক্রিয়তা সন্ধানী যন্ত্র সহজেই তা ধরতে পারে।

ধাতুতে ধাতুতে জোড়া লাগানো হলো, কিন্তু ভিতরে গলদ থাকতে পারে। বস্তা নিয়ন্ত্রণের জন্য বাঁধ দেওয়া হয়েছিল, বলা যায় না জলের চাপে কোথাও যদি ফাটল ধরে। ভয় নেই, তেজস্ক্রিয়তা আছে। বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় পদার্থ রশ্মি বিকিরণে ভিতরকার ছবি তুলে দেবে—ট্রিক যেন “ওটোগ্রাফ” (Auto Graph)। পাঁচ সেন্টিমিটার (৫ ইঞ্চি)-এর ভিতর হলে তেজস্ক্রিয় ইরিডিয়াম, তার বেশী চাইলে কোবাল্ট (ত্রিশ সেন্টিমিটার পর্যন্ত)।

ব্লাস্ট ফার্নেস (Blast Furnace) এর ভিতরটা বিশেষ ইট (Fire Brick) দিয়ে গাঁথা থাকে। কয়েক বছর পরে কিন্তু এই ইট ধ্বংসে যায়। তেজস্ক্রিয় কোবাল্টের সাহায্যে সহজেই আমরা

চুল্লীর দেওয়ালের পৃষ্ঠ ধূমে মগে নিতে পারি। ফলে কখন সারাই করা উচিত তা নিয়ে আর সমস্যা থাকে না।

এমন অনেক রাসায়নিক ক্রিয়া আছে যাদের পরিণত পর্যায় মাত্র আমাদের জানা আছে, কিন্তু প্রাথমিক অবস্থা থেকে কি করে বিভিন্ন স্তরে এই পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, তা আর জানা নেই। যেমন ধরুন, রবারের ভালকানাইজেশন (Vulcanization), কার্বোহাইড্রেটের অক্সিজেন-সংযোগ (oxidation) ইত্যাদি। কার্বনে-ডুই-অক্সিজেন (Carbon Dioxide) জল ও সূর্যকিরণ হতে কি করে যে উদ্ভিদ কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন ও চর্বি গঠন করে (Photo Synthesis) তা-ও আমাদের অজ্ঞাত। কিন্তু তা যদি কোন দিন জানা যায়, খাত সামগ্রীর জন্য মানুষকে আর কৃষি ও গৃহপালিত পশুর উপর নির্ভর করতে হতো না। এই কয়টি সামান্য জিনিষ থেকেই খাত সমস্যার মীমাংসা হবে যেতো! যদি তা কোন দিন পাওয়া যায়, একমাত্র তেজস্ক্রিয়তার সাহায্যেই সম্ভব হবে।

আপাতত পরমাণুর “অদৃশ্য হাত” কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সংকেত করেছে। লৌহ-শোধন কার্যে ব্রাউ ফারনেস্-এ গন্ধকের পরিমাণ খাতুর গুণাগুণ নির্ধারণ করে। চুল্লীর ভিতর গন্ধকের ক্রিয়া অনুধাবন করা আগে সম্ভব ছিল না, কিন্তু তেজস্ক্রিয়তা তা সহজ করেছে। তেজস্ক্রিয় গন্ধকের গতি অনুসরণ করে ফারনেস্-এ তার ক্রিয়া উন্নততর করা এখন আর দূরত্ব নয়।

তেজস্ক্রিয়তার ফলে শংকর ধাতু বা Alloy-এর গঠন-প্রণালী সম্বন্ধে যা জানা গেলো, তা সত্যই বিস্ময়কর। অ্যালয়ের দানার ভিতর পরমাণুগুলি নিরন্তর গতিসম্পন্ন থাকে, বাইরের কোন পরমাণু অ্যালয়ের সম্পর্কে দানার এই “আবর্তে” ডুবে যেতে পারে। কার্বনে-ডুই-অক্সিজেন গ্যাসের কথাই ধরা যাক। এই গ্যাসের কার্বন পরমাণু ইম্পাতের ভিতর সহজেই প্রবেশ করে। নাইট্রোজেনের ক্ষেত্রেও তা-ই। ইঞ্জিনিয়ারিং বিজ্ঞান দিক থেকে অ্যালয়ের এই জ্যোৎস্ন (Proterty) অত্যন্ত কার্যকরী।

পরমাণু কৃষিক্ষেত্রে

কটোসিন্থেসিস্-এর কথা আমরা বলেছি, যার রহস্য মোচন হলে পৃথিবীতে কৃষিকাজ নিরর্থক হয়ে যাবে। গরুর লেকটিক গ্রন্থি (Lactic Gland) সম্বন্ধেও বিজ্ঞানীরা অল্পরূপ চিন্তা করছেন। এই গ্রন্থির জৈবিক ক্রিয়া (Metabolism) জানা গেলে ঘাস থেকে দুধ তৈরী করা বৃষ্টি আর সমস্যা থাকে না। ভেড়ার গায়ে কি করে লোম জন্মে, দেখে কিভাবে চর্বি সঞ্চয় হয়—এ সমস্ত এখনো মস্ত জিজ্ঞাসা। তেজস্ক্রিয় রশ্মি একদিন তার উত্তর দিতে পারে। কৃষিকাজ এখনো নিরর্থক হয়নি, ফলে তেজস্ক্রিয়তা এখন আমাদের এই কাজে সাহায্যকারী হয়েছে।

সার কখন কিভাবে দিলে গাছের সর্বাপেক্ষা উপকার হয়, তেজস্ক্রিয়তা তা আমাদের জানিয়ে দেয়। তেজস্ক্রিয় পদার্থের সাহায্যে গাছের ভিতর সারের কাজ অনুসরণ করা এখন আর সমস্যা নয়। নর্থ করোলিনা কলেজ এইভাবে অনুসন্ধান করে দেখেছেন, তামাক চাষার গোড়ায় যে সুপার ফসফেট (Superphosphate) সার দেওয়া হয়, তা সম্পূর্ণ নিরর্থক, কারণ বাড়ন্ত অবস্থায় তামাক এই সার গ্রহণ করে না। এই একটি মাত্র আবিষ্কারে স্পেনানকার চাষীরা বছরে প্রায় ৪,৩০০ টন সার বাঁচাতে পেরেছিল।

অনেক সময় দেখা যায় সামান্য কোন পদার্থের অভাবে উদ্ভিদ বা জীবদেহ রোগ ধারণ করে। এক সময় রাশিয়ার ল্যাটভিয়ার প্রদেশে গরু ও ভেড়ার পালে মড়ক দেখা দেয়। মরুকার জীব-প্রাচীন প্রতিষ্ঠান জানালেন, দেখে কোবাল্টের অভাব তেঁতু রোগ দেখা দিয়েছে। তখন সাধারণ খাতের সাথে পশুদের কোবাল্টের বটিকা খাওয়ানোর ব্যবস্থা হলো। ইংলণ্ডে আলফাল্ফা (Alfalfa) এবং অন্যান্য যে সকল উদ্ভিদ শীতকালে নষ্ট হয়ে যেতো, জমিতে কস্ফারাসের অভাবই তার কারণ, তেজস্ক্রিয়তার সাহায্যেই এই সন্ধান পাওয়া গেছে।

তেজস্ক্রিয়তার সাহায্যে শস্তকীট ধ্বংসও সম্ভব। এই রশ্মির সাহায্যে সম্প্রতি লক্ষ্য করা হয়েছে, ডি, ডি, টি কীট ইত্যাদি সকল শ্রেণীর পোকাক পোকের মারাত্মক নয়, ডি, ডি, টির সাথে অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ মিশিয়ে বর্তমানে তা আরো শক্তিশালী করা প্রয়োজন, এবং তা করাও হয়েছে।

কিন্তু শস্তক্ষেতে তেজস্ক্রিয়তার প্রত্যক্ষ প্রয়োগ গাছের পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে। বৃশলাণ্ড (Bushland) নামে এক জীবাণুবিদ এই উদ্দেশ্যে এক নতুন উপায় উদ্ভাবন করেছেন। আমরা জানি, তেজস্ক্রিয় বিকিরণ বন্ধাব্য আনে। বৃশলাণ্ড পুঞ্জাতীয় পোকাকে বিকিরণে বিনষ্ট করে উপদ্রুত অঞ্চলে ছেড়ে দেন। স্বাভাবিক স্ত্রী-পোকা এই সকল “তেজস্ক্রিয়” পোকাক সম্পর্কে এসে যে ডিম পাড়ে তা ফুটে আর বাচ্চা বেরোয় না। এইভাবে সহজেই কীট ধ্বংস করা যেতে পারে।

রাশিয়ার পরমাণু।

পরমাণু শুধু কৃষিক্ষেত্রেই কাজ করে নি, রাশিয়ারেও চলে এসেছে। খাত সংরক্ষণ একটি মস্ত সমস্যা। কিন্তু জীবাণুগুলোর জন্য তা সম্ভব হচ্ছে না। তেজস্ক্রিয়তা এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার হতে পারে। কিন্তু জীবাণু নিমূল করতে শক্তিশালী রশ্মির প্রয়োজন। ইতিমধ্যে বিকিরণের প্রয়োগে কলা ইত্যাদি কয়েক প্রকার ফল অনেকদিন পর্যন্ত স্বাভাবিক রাখা সম্ভব হয়েছে বলে আমরা জানতে পেরেছি। কিন্তু এই ব্যবস্থার খাতের স্বাভাবিক স্বাদ ও বর্ণ নষ্ট হয়ে থাকে। মোট কথা, খাত সংরক্ষণে তেজস্ক্রিয়তা এখনো সম্পূর্ণ সফল হতে পারে নি। তবে পেনিসিলিন ইত্যাদি কয়েক প্রকার ওষুধ এই প্রক্রিয়ার জীবাণুমুক্ত করা হয়, তাপ প্রয়োগে পেনিসিলিন নষ্ট হয়ে থাকে।

রোগকল্যাণে পরমাণু

চিকিৎসায় এতোদিন আমরা রেডিয়ামের কথা শুনেছি। রেডিয়াম ক্যানসারে ব্যবহার হয়। এট ক্যানসার কি? আমাদের দেহকোষে যে প্রোটিন ও নানাবিধ নিউক্লিয়ারিক অ্যাসিড (Deoxyribonucleic Acid ইত্যাদি) আছে, তার পরিমাণ যখন অত্যন্ত বেড়ে যায়, তখন দেহকোষের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে—তারই ফল হলো ক্যানসার।

কিন্তু দেহকোষে অ্যাসিডের পরিমাণ কেন বেড়ে যাবে তা এখনো অজ্ঞাত আছে। তাই ক্যান্সার আজও দুঃসংবাদ্য ব্যাধি। তবে কয়েক প্রকার তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের ব্যবহার এই রোগকে অনেকটা সংবর্ত করে এনেছে। তেজস্ক্রিয় কোবাল্টের কথাই ধরা যাক। রূপোর তার শুভ এই মৌলিক পদার্থটিকে আগে বলা হতো “বিস্তারিত স্বর্ণ”। কিন্তু ক্যান্সারের চিকিৎসায় আজ কোবাল্টের যে দান তা রেডিয়ামের সংগেই তুলনীয়। বিকিরণের দ্বারা দেহকোষ

নষ্ট হয় বলে আমরা জানি, এই জটাই ক্যান্সারে মাক্রান্ড কোষকে ধ্বংস করার জন্য তেজস্ক্রিয় রশ্মির ব্যবহার। কিন্তু সমস্যা হলো এই যে, তেজস্ক্রিয়তার ফল স্বরূপ দেহকোষের সংগে প্রয়োজনীয় স্বাভাবিক কোষের ক্ষতি হয়। সুতরাং তেজস্ক্রিয় পদার্থকে এমন আকারে প্রয়োগ করতে হবে যাতে স্বাভাবিক দেহকোষের তার প্রভাব অত্যন্ত পরিমিত হয়ে থাকে। চিকিৎসার প্রয়োজন বৃদ্ধি "বিস্তারিত স্বর্ণক" সর্গকেই বিভিন্ন আকারে রূপ দেওয়া যায়। এই উদ্দেশ্যে কোবাল্ট লাইলন তত্ত্বও ব্যবহার করা হয়েছে। সম্প্রতি আমাদের দেশেও তেজস্ক্রিয় কোবাল্টের ব্যবহার হচ্ছে। ক্যান্সার চিকিৎসায় কিন্তু ক্রমশঃ তেজস্ক্রিয় cesium (cesium)-এর ব্যবহার চালু হবে, কারণ এর তেজস্ক্রিয়তা অনেকদিন পর্যন্ত স্থায়ী থাকে।

গলদেশে অবস্থিত থাইরয়েড গ্রন্থি (Thyroid Gland) আমাদের জৈবিক ক্রিয়া অনেকাংশ নিয়ন্ত্রণ করে। এই গ্রন্থি যখন অধিক মাত্রায় সক্রিয় হয়, তখন থাইরোটক্সিকাসিস (Thyrotoxicosis) রোগ জন্মে, মাইক্সোডেমা (Myxoedema) হলে এই ক্রিয়া হ্রাস পায়। তেজস্ক্রিয় আইওডিনের সাহায্যে থাইরয়েড গ্রন্থির ব্যাধি সহজেই নিরাময় হয়।

মাথার ভিতরে টিউমার (Tumour) সন্ধানেও তেজস্ক্রিয় এক নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার হয়েছে। শিরায় থানিকটা তেজস্ক্রিয় ফসফরাস ঢুকিয়ে দেওয়া হলো। এই তেজস্ক্রিয় পদার্থটি প্রধানত টিউমারে গিয়ে সঞ্চিত হবে, টিউমারে তেজস্ক্রিয় পদার্থ কয় স্থানে বেশীর ভাগ জমা হয়। তেজস্ক্রিয় সন্ধানে কোন সূক্ষ্ম যন্ত্রের সাহায্যে তা অনুধাবন করা তখন আর সমস্যা থাকে না।

তেজস্ক্রিয়তার একটি সফল প্রয়োগ হলো রক্ত চিকিৎসা। রক্তরসে (Plasma) শ্বেত ও লোহিত কণিকা থাকে বলে আমরা জানি। স্বাভাবিক অবস্থায় প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে পাঁচ হাজার শ্বেত কণিকা থাকে। এই সংখ্যা যখন অত্যন্ত বেড়ে যায় (প্রতি

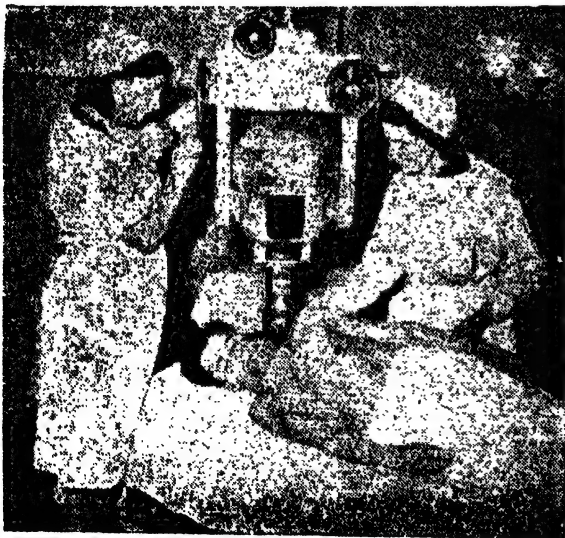
ঘন সেন্টিমিটারে এক লক্ষ বা তারও অধিক) তখন তা হলো রক্তের ক্যান্সার বা লুকেমিয়া (Lukaemia)। এই মারাত্মক রোগে এক্স-রে'র ব্যবহার আছে, তেজস্ক্রিয় ক্যান্সারও এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়।

লুকেমিয়ার বিপরীত হলো পলিসাই-থেমিয়া ভেরা (Polycythaemia vera)—এই রোগে রক্তে লোহিত কণিকার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। তেজস্ক্রিয় ফসফরাসের প্রয়োগে এ ক্ষেত্রে এক্স-রে'র চেয়েও অধিক কাজ দিয়েছে।

রোগ নিরাময়ের কথা আমরা মোটামুটি আলোচনা করলাম—মাত্র কুড়ি বছরের অভিজ্ঞতায় মানুষ আইসোটোপকে যে কত বিভিন্ন উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করেছে তা ভাবলে সত্যি অবাক হতে হয়। এই কুড়ি বছরে সভ্যতার বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরমাণু যে প্রভাব বিস্তার করেছে, তা স্মরণ করলে আজ নতুন করে মনে হয়—হাঁ, কথাটা ঠিক বটে, জ্ঞানই শক্তি। তেজস্ক্রিয়তা আমাদের জন্য এতটাই করেছে! এই প্রসঙ্গে মানুষের দেহ সর্বক্ষেত্রে সম্প্রতি যে তথ্য গৃহীত হয়েছে তা এখানে উল্লেখ না করে পারছি না। আমাদের দেহ—তার মাংসপেশী, হাড়, নখ, চুল—কিছুই স্থির অপরিবর্তিত নয়, বরং নদীর মতই চঞ্চল; নদীর জল যেমন নিয়ত বয়ে যাচ্ছে, আমাদের দেহগঠনের মৌলিক উপাদানগুলিরও ভেতন পরিবর্তন হয়, আজ যে প্রোটিন বা ক্যালসিয়াম আমার দেহে আছে, কাল তা না-ও থাকতে পারে। এদিক দিয়ে দেখতে গেলে মানুষ প্রতি বছর নতুন করে জন্মান্ত করছে। ডাঃ স্কোয়েনহাইমার (Schoenheimer) তেজস্ক্রিয়তার দ্বারা পরীক্ষা করে দেখেছেন, লবণ আমাদের শরীরে প্রবেশ করলে তা শিরার মাধ্যমে ঘর গ্রন্থিতে এসে সংক্ষিপ্ত ঘাম হয়ে বেরিয়ে যায়—এক সেকেন্ডেরও বেশী সময় অপেক্ষা করে না। মানুষের দেহ সর্বক্ষেত্রে এমন আশ্চর্য ধারণা পূর্বে আমাদের ছিল না।

পরমাণু "পশুজাত"

পক্ষ থেকে পশু জাগে, এ কথা আমরা শুনেছি। পরমাণু বিকিরণের ক্ষেত্রে তা স্মরণ করা চলে। তেজস্ক্রিয়তার প্রয়োগ-কৌশল আজ যে স্তরে উন্নত হয়েছে, তার মূলে ছিল যুদ্ধকামী রাষ্ট্রশক্তির গৃহপোষকতা। কিন্তু কেবলমাত্র সামরিক প্রয়োজনে পরমাণু বেশী দিন আটকে রাখা যায় নি; "শক্তির ললিত বাণী" আজ দিকে দিকে উচ্চারিত হচ্ছে, বৈজ্ঞানিকরাও জনসাধারণের সাঃ বাগ দিয়েছেন, তাঁদের কেউ কেউ এমন পর্যাপ্ত ঘোষণা করেছেন যে, মারণাস্ত্র তৈরীর কাজে তাঁরা পরমাণু শক্তি নিয়োগ করতে আর সাহায্য করবেন না। কোন কোন রাষ্ট্রশক্তিও এ বিষয়ে সচেতন হয়েছেন। নতুন সূচনা দেখা দিয়েছে—অস্ত্র তৈরীর আশঙ্কাজনক সভাবনা হতে দূরে তেজস্ক্রিয়তা আজ মানুষের বলাপের কাজে নিযুক্ত হচ্ছে। মানুষ যেন আজ এই বিশ্বাস পোষণ করতে পারে,—হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে বা একদিন সূর্য হয়েছিল, তা সেখানেই শেষ হয়ে গেছে; পরমাণু শক্তি এখন আমাদের সভ্যতার জালন করবে। পৃথিবীতে খাতের অভাব, চিকিৎসায় ওষুধের সমস্যা পরমাণু শক্তির বলে দূর হবে, জ্ঞানের প্রসার হবে—পরমাণু শক্তি আমাদের জীবন বিকাশের পক্ষে সকল দিক দিয়ে কল্যাণকর হবে।



পরমাণু "আশীর্বাদ"। রোগ চিকিৎসায় ব্যাস্ত্রিক কৌশলে তেজস্ক্রিয় রশ্মি বর্ষিত হচ্ছে।



পিয়াম

সুন্দরী
মহিলাদের
ঐতিহ্য!



পিয়াম সাবান—বিশুদ্ধ সিসারিনবৃত্ত সৌন্দর্য সাবান—আপনার
হকের পক্ষে এত ভাল, আপনার সৌন্দর্যের পক্ষে এত নিরাপদ।
হৃগক পিয়াম সাবান আপনার সৌন্দর্যচর্চার দিত্য সঙ্গী হোক।
শিশুদের কোমল হকের পক্ষেও পিয়াম আদর্শ
পিয়াম ট্যালকাম, এত স্বথমলের মত মোলায়েম, এত অপূর্ণ হৃগক—
আপনাকে সারাদিন সতেজ, হৃগর রাখে। হৃদয় হৃদয় হৃদয়—সবুজ—
সোনালী সিনে পিয়াম ট্যালকাম কিসুন।



বাতিঘর

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

বারি দেবী

আপুবে অসীমের গাড়ীর হর্ণ বেজে উঠতেই, ঘরে গিয়ে সোফায় বসলো অনিল, তাক নভর রইলো গাড়ী-বারান্দার দিকে। গাড়ী এসে দাঁড়ালো গাড়ী-বারান্দার ভেতর।

মস মস জুতার শব্দ তুলে ভেতরে চলে গেলো অসীম, আর টালমান অবস্থায় ঘরে চুকলো শুকতার।

অনিলকে বসে থাকতে দেখে জড়িয়ে জড়িয়ে বললো—এখনও বসে কেন ডার্লিং? খাওয়া হয়নি? শোবে না? কথা বলতে বলতে ধপ করে ওর পাশে বসে পড়ে মাথাটা ওর বুকের ওপর এলিয়ে দিলো সে।

দারুণ ঘুণার সঙ্গে ওকে সবিয়ে দিয়ে উঠে খাটে বসলো অনিল। তীব্রকণ্ঠে বললো—এটা অভিনয় দেখাবার জায়গা নয়। আজ তোমার কাছে সোজা জবাব শোনাব জন্মই বসে থাকি।

—তাই নাকি? তা বলো। লাল লাল ফুলো ফুলো চোখ দুটো ওর চোপের ওপর মেলে ধরলো শুকতার।

সিগারেট ধরালো অনিল। লজ্জাতীনা রমণীর সর্কাসে একটা ঘুণাভরা দৃষ্টি বুলিয়ে বললো—রাত বারোটোর সময় পদপুরুষের সঙ্গে বেড়িয়ে, ঘরে এসে মাতলামো করতে তোমার একটুও সরম হলো না? ভদ্র পরিবারের সঙ্গে যে তোমার একটা সংসদ আছে, সেটা কি একেবারেই তুলে গেছে? বাজারের মেয়েমানুষগুলোকেও যে হার মানালে দেখছি!

উত্তেজিত ভাবে ঘবঘর ঘোরা ফেরা করতে করতে বললো অনিল—বহুদিন সাবধান করেছি তোমাকে কিন্তু আজ খুশলাম চরম অবনতির পাকে ডুবছো তুমি, তোমাকে সে পাক থেকে তোলবার সাধা বোধ করি স্বয়ং ভগবানেরও নেই।

—তবে এটাও স্থির জেনো, আমি মনমোহন নই। দিনের পর দিন তোমার বেলোপনার অসহ্য অত্যাচার আজ আমাকে কিন্তু কুকুরের চেয়েও ভয়ঙ্কর করে তুলেছে।

ধীরে ধীরে ঘসে, ওর দিকে জলন্ত দৃষ্টিতে চেয়ে চরম উত্তেজনায় হাঁপাতে থাকে অনিল।

সোফায় অধোশায়া ভাবে এলিয়ে থেকে চোখ বুন্ধে কথাগুলো শুনছিলো শুকতার।

হাই তুলে দুহাতে চোখ কচলে বললো—আঃ। এমন আমেজটা একদম দিলেতো মাটি কবে? নালিশ আব নালিশ। কি এমন অশ্রদ্ধা করেছি গো? জানতেই তো অসীম জন্মাব অনেক—অনেক পুরোনো বন্ধু। তার সঙ্গে একটু বেড়ালে বা হু-এক গেলিশ খেলে বাসের জাত যায় আমি তো তেমন সত্য সাবিত্রীদের দলের কেউ নই গো!—আর, তোমারও তো অনেক মেয়ে বন্ধু আছে; তাদের নিয়ে তুমি যদি একটু ফুটি করো, তাহলে আমার দিক থেকে একটুও আপত্তি হবেনা, এ আমি হলপ করে বোলতে পারি বরং তোমারও একটু মুখ ফলাবে, সঙ্গে সঙ্গে আমারও।

—ব্যাঃ! ব্যঃ চমৎকার। বাগে কিন্তু হয়ে টেবিলের ওপর একটা প্রচণ্ড হুঁসি মেরে বললো অনিল, বেজাচারিণী! কি দরকার ছিলো তবে এই লোক দেখানো বিয়ে করার?—একটা ভদ্র পরিবারের মুখে কালি মাখিয়ে কি লাভ হল তোমার? কোন অধিকারে আমার জীবনটা বিক্রিয়ে তুলেছো তুমি? জবাব দাও।

শুকতারর উঠে বসবার অবস্থা আর ছিলো না। সোফায় শুয়ে পড়ে খিল খিল করে হেসে বললো—আহা! আর কাকে বলে। অভিনেত্রীর স্বামী হতেও সাধ যায়, আবার তাকে সত্যলক্ষী বউ বানাতেও সখ। যাক্ সে এই রাত দুপুরে গলা কাটিয়ে পাড়ার লোক জড়ো করে আর কি কল হবে বলা, তার চেয়ে দেখে শুনে ঐ স্ত্রীমিত্র মতো জড়ভরত একটা বিয়ে করে নিয়ে এসো, সব হাঙ্গামা চুক যাবে। আমি কিন্তু এখন এক পাও নড়ছি না, কাল ভেবে দেখবো তোমার কথা।

নাক ডাকতে লাগলো শুকতারর।

ঠোট কামড়ে মনের জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে ছুটে বাইরের লনে বেরিয়ে গেলো অনিল। পরিশ্রান্ত দেহখানি এলিয়ে দিলো নরম বাসের বিছানার ওপর।

প্রচণ্ড বিক্ষোভ যেন ঘটে গেছে ওর মস্তিষ্কে, তারই স্মৃতির উদ্ভাপ ওব দেহ মনকে দগ্ধ করতে লাগলো! এমন ব্যাপার ওদের প্রায়ঃ ঘটছে আজকাল! উপায় কি? উপায় কি?

মনের-গভীর অন্ধকার অতল গুহাপথ হাতড়ে বেড়াতে লাগলো অনিল, কোন ছিন্ন পথে আছে একটু আলো!

পরদিন শুকতারর ডাকে যখন ঘুম ভাঙলো অনিলের হাকা রোদ্ধুর তখন খিল খিল করছে বাসের ওপর!

অজ্ঞানের শিশির জুড়িয়ে দিয়েছে ওর শাহ জ্বালাকে!

বহুদিন পরে আজ তারি ভালো লাগলো ওব শুকতারকে!

পরনে ওর চণ্ডা লালপাড় ধনেখালি সাদা সাড়া! সন্তান করি ভিজ় চুলের রাশ পিঠের ওপর ছড়ানো,—কপালে কুঙ্কুমের টিপ! সাক্ষাৎ গৃহলক্ষ্মীর প্রতিমূর্তি!

মিষ্ট হেসে অনিলের একখানি হাত চেপে ধরে মুহু টান দিতে দিতে বললো শুকতার—ওমা, কত গম্ভীর গো? ন'টায় যে শুটিং আছে! চলো, চলো, চা জল হয়ে গেলো যে!

কাল রাতের সেই লাশ্রময়ী শুকতার সেন তো, এ নর!—এ যে মঙ্গলময়ী চিরন্তনী নারী। কাল রাতের অত গোলোঘোগের বিন্দুমাত্র চিহ্ন নেই ওর চোখে, মুখে, সংবত ব্যবহারে।

ওর মুখের দিকে যেন চোখ তুলে চাইতে পারছিলো না অনিল। গত রাতের নিজের উদ্ভত আচরণগুলোকে দিনের আলোতে কেমন অসঙ্গত অর্থহীন বলে মনে হল। নিঃশব্দে উঠে বাথরুমে চলে গেলো সে।

স্নান সেরে চায়ের টেবিলে যোগ দিলো অনিল।

—খেয়ে দেখো তো মাংস'র প্যাটিসগুলো কেমন হয়েছে? অনেকদিন বাদে করেছি কি না, হেসে ওর দিকে চেয়ে বললো শুকতার।

চমৎকার! প্যাটিসে কামড় দিয়ে বললো অনিল এই সন্তানবেলা আবার এত পরিভ্রম করে এগুলো করতে গেলে কেন?

—বা! তোমাকে খাওয়াতে ইচ্ছে করে না বুঝি? সময় পাইনা জে হবে কি?

খাওয়া কেসে, অন্নরাগতরে শুকতারার একখানি হাত নিজের বাঁ হাতে টেনে নিয়ে বুক চেপে ধরে মিনতিভরা গলার বললো অনিল—আমাকে কমা করো তারা। কাল রাতে বড় অবিচার করেছি তোমার ওপর। বলো, বলো মাই সুইট হাট রাগ নেই তো আমার ওপর?—বুঝতে পারিনা তারা, কেন যে মনটা দিন দিন আমার এত উগ্র হয়ে উঠছে। একটা লম্বা নিঃশ্বাস ছাড়লো অনিল।

নিপুণা অভিনেত্রী বৃথলো তার নতুন অভিনয় কতখানি সাক্ষেসফল হয়েছে। অনিলের কাঁধে মাথাটি তেলিয়ে দিয়ে আদরে গলে পড়া সুরে বললো সে—বেশ করেছো বলছো। মাগো, একটু বগড়াঝাটিও কি করবো না আমরা? তার জন্তে আবার মন খারাপের কি আছে? নাও এবার তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নাও তো?

গত রাতে খাওয়া হয়নি অনিলের। মনের আলো জুড়িয়েছে; এবারে পেটের আলার তাগিদে পরম কৃপ্তি ভরে খাবারের প্লেট খালি করতে শুরু করলো।

শীত পেছে এসেছে বসন্ত! পাছে গাছে জেগেছে কচিপাতার শিহরণ। আবার কুহুমের ছোপ লেগেছে ডালে ডালে নীল, বেগুনী, বাসন্তী ফুল ঝরিয়ে, উড়িয়ে, বিচিত্র বর্ণের আচ্ছন্ন দিয়ে বেড়ার মদির চকল, দখিনা বাতাস।

বন্ধপূরতে বন্ধিনী রাজকন্টার রুদ্ধ ভবনের দ্বারে দ্বারে ব্যাকুল

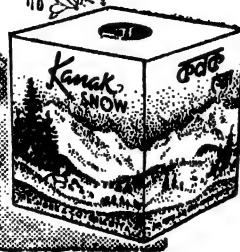
করাখাত করলো সেই উতলা পবন। ওর আকুল আহবানে আর ধরে থাকতে পারে না স্রমিতা। লালকুঠির হুধে-ধোওয়া সালা মার্কেল-পাখরের সিঁড়ির ধাপে পা দিয়ে সে নিচের তলার নামতে থাকে। ধুলোর আন্তরণে ঢেকে গেছে সিঁড়িটা, এক ধারে আছে খেত মর্শ্বরের ভেনাসের মূর্তি। তার খাঁজে খাঁজে জমেছে পুক ধুলো। প্রকাণ্ড আয়না সোনার ফ্রেমে বাধানো সিঁড়ির বাকের হুখে আটকানো। আয়নার বক্রবক্বে বেলজিয়াম কাঁচটা, বেন বড় ঝাপ সো মনে হল স্রমিতার চোখে।

সারি সারি ফটিকের স্বচ্ছ বাতিদানগুলো আর জলে না। হৃদয় দৃষ্টিতে বেন ওরা চেয়ে আছে স্রমিতার দিকে। ওদের দিকে একবার নিম্প্রহ ভাবে চেয়ে ধাপের পর ধাপ বেয়ে চললো স্রমিতা ধুলোর ওপর পায়ের ছাপ এঁকে এঁকে। অন্ধরে বাবার সিঁড়ি এটা। ব্যবহার করে একমাত্র স্রমিতা। সদরে কাপেট মোড়া স্রমজিত কাঠের সিঁড়িটা শুধু অসীম আর তার সঙ্গীদের জন্ত। চাকর দাসীদের ওঠা নামার জন্ত আছে লোহার ঘোরানো সিঁড়ি।

কত—কত দিন; প্রায় বছর খানেক নামেনি সিঁড়ি দিয়ে স্রমিতা! বারনি বাগানে। হাইরে বেকনো ছেড়েছে এ বাড়িতে এসে অবধি, তবে মাঝে মাঝে বাগানে বেড়াতো, অকিঞ্চিৎকর হাউসে বসতো একা, একা। কখনও বা ওর ভজনদা এসে আপন মনে বলে যেতো লালকুঠির সমৃদ্ধ কাহিনী। কিন্তু তাও বন্ধ করতে হলো, শুকতারার বিজ্ঞপতরা বাক্য-বাণের জ্বালায়। আর মাঝে, মাঝে চোখে বা পড়েছে—অসীম, আর শুকতার—কি জানি ওরা এখন ওখানেই আছে ক না। সিঁড়ির মাঝমাঝি নেমে



আনন্দ উৎসবে
ক, হোড়ের
প্রসাধন সামগ্রী



ক, হোড় ২৩ কোং • কলিকাতা-১৪

খমকে ঠাঁড়িয়ে ভাবে স্তম্ভিতা, ওদিকে বাবে কি না। খুল দিলো বড় পাশিটা। জানলা দিয়ে হু, হু রবে বয়ে গেলো হমকা বাতাস, বন বন শব্দে ভেঙে পড়লো সিঁড়িতে টাঙানো একখানি ছবি। প্রতিধ্বনি তার গম গম করে বেড়াতে লাগলো পুত্র প্রাসাদের ভেতর। রাশি রাশি কাঁচ ভাঙা ছড়িয়ে বইলো চুড়ু সিঁড়ির চাতালটার ওপর।

জনহীন পূজা পূবা। হু একজন চাকর বায়ান বা আছে সব ছাইয়ের ছাউনট হাউসে আঁড়া দিচ্ছে, বেল পেলে তবে ওরা ভেতরে জানো। তাই কেউ এলোনা অতখানি শব্দের ব্যতীত শুনে। ছবিখানা মাঝখানে ফুলে দেওয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে ঠাঁড় করিয়ে রাখলো স্তম্ভিতা। অনেক পুরোনো লগুনের রাজদরবারের ছবি উঠা। ছবির গায়ের পুরা খুলা লাগলো ওর হাতে।

ব্যথিত দৃষ্টি মেলে বাকি ছবিগুলোর দিকে চাইলো স্তম্ভিতা। কত পরিচায়ক স্বকমকে ছিলো আগে ওগুলো, আর আজ কি হাল হয়েছে ওদের? কোনটার কাঁচ নেই কোনটি কাঁচ হয়ে কুলছে। খুলোর ঢাকা পড়েছে ফেমের সোনালী রং। মাকড়সার বড় বড় ছেঁড়া জাল ছবিগুলোর গায়ে কালবের মত কুলছে।

নিঃশাস ফেলে আন্তে আন্তে নীচে নেমে এলো সে। সিঁড়ির শেষ ধাপের হুপাশে দুটি ব্রোঞ্জের সৈনিক মূর্তি, ঈষৎ নত মস্তক ঠাঁড়িয়ে। অটল গাভ্রোঁরোঁর কাঠিরা ওদের চোখে মুখে, ঠাঁড়াবার জলিতে। ওরা যেন এই রাজপ্রাসাদের মৌন দর্শক মাত্র। রহস্যময় নাটকটির সুর দেখেছে, আজও ঠাঁড়িয়ে আছে শেষ অঙ্কটি দেখবার জন্য। মূর্তি দুটোর গায়ে পরম স্নেহ ভরে হাত বুলাতে গিয়ে সত্তরে হাত সরিয়ে নিলো স্তম্ভিতা। ওদের পাখাণ বৃকে কি স্পন্দন জেগেছে? না। তা নয়। ঝট পট শব্দ করে মূর্তিগুলোর খাঁজের ভেতর থেকে দুটো বড় আকারের চামচিকে বেড়িয়ে সাঁই সাঁই শব্দ তুলে ওর মাথাব ওপর উড়তে লাগলো। জান আলোতে ওদের বিস্তারিত ছায়াগুলো বিভীষিকার মত নাচতে লাগলো দেওয়ালে দেওয়ালে। সত্তরে পিছু হটে দরজা দিয়ে ছুটে বাইরে বেরিয়ে এলো স্তম্ভিতা।

আঁচল দিয়ে কপালের খাম মুছে বৃক ভরে টেনে নিলো বাইরের মুক্ত বাতাস। তার পর এদিক চেয়ে নেমে এলো কাকর বিছানো পথের ওপর। দেওদাবের ছায়াচ্ছন্ন পথ ধরে ক্রান্ত পারে এগিয়ে চললো সে। না কেউ নেই, ভজনদাও নয়।

বকুল ফুলের গাছটার তলায় শালা পাথর দিয়ে রাখানো বেদিটার ওপর গিয়ে কলো স্তম্ভিতা! বন গন্ধপূর্ণ ছায়াঙ্ককারে নিঃশব্দে ভেসে এলো অনেক ছায়াছবি! ওর অশ্রুভিত্তির মানসিক কেন্দ্রগুলোকে বীরে বীরে আছন্ন করে ফেললো ওরা। তিস্ত বর্তমানটা, পালালো মন থেকে।

হলুদ রঙের কানা ভাঙা চাদ আন্তে আন্তে উঁকি মারলো দেওদাবের পাতার কাঁক দিয়ে। টুপ টাপ করে বকুল ফুল বরতে লাগলো ওর মাথাব গায়ে।

কতক্ষণ কেটে গেছে খেয়াল ছিলোনা ওর। নারী পুরুষের মিশ্রকণ্ঠে উচ্চসার শব্দ চমকে উঠলো স্তম্ভিতা।

গাছের কাঁক দিয়ে নজরে পড়লো, শুকতারার ঘরের বন্ধ দরজা খুলে বেরিয়ে আসছে অসীম আর শুকতারার।

অসীমের একখানি হাত শুকতারার কোমরে জড়ানো। অপর হাতের আঙুলের কাঁকে হলুদ সিগারেট। বাড়ীর পেছনে গ্যারেজের দিকে চলে গেলো ওরা।

মনে পড়লো ছোটমামার কথা। সেই হাসিখুসিতে সরা চকল ছোটমামার আজ কতই না পরিবর্তন ঘটেছে। গরলে অমৃত জম শুধু তারই হয়নি, ছোটমামারও হয়েছিলো। তাই হুঁজনে একসঙ্গে আকর্ষণ বিবধান করে, অসম্ভব জালায় জলে মরছে। সাধারণ বিব সকল জালায় অবসান ঘটায়। আর এই অসাধারণ বিব অন্তরে জালিরে দেয় জালাময়ী অনির্বাণ লিখা। সেই ভয়াবহ উত্তাপে দগ্ধ হচ্ছে ওদের হুঁজনের জায়া।

একরাশ ধোঁয়া উড়িয়ে অসীমের গাড়ী বেরিয়ে গেলো গেট দিয়ে। ওর পাশে বসে শুকতারার ড্রাইভ করছে।

দেওদাবের আড়াল থেকে কখন চাঁদটা এসে ঠাঁড়িয়েছে স্তম্ভিতার ঠিক সামনের আকাশে। অব্যবহিত জোহনার উজ্জলধারার ভেসে গেছে দিক্ দিগন্ত। পাতার, পাতার, ফুলে, ফুলে, ঝিলঝিল করছে নীলাভ আলো।

উডোল বাতাসের অশান্ত কলরোলে মুখর হয়ে উঠছে বাউ, দেওদাব। ওরা যেন মহাশূভে শত শত বাহু বিস্তার করে কার উদ্দেশে জানাচ্ছে ব্যাকুল আহ্বান অধীর প্রতীক্ষার বিপুল আবেগে কঁপে কঁপে ফুলে, ফুলে উঠছে। আবার মাঝে মাঝে ওরা স্থির হয়ে ঠাঁড়িয়ে কল্পনাসে কান পেতে শুনেছে কার পদধ্বনি।

না সে বৃষ্টি আর কোনোদিন আসবে না কিরে। কোন অদৃষ্ট নিয়তির নিষ্ঠুর, কঠোর হাতে গঠিত হয়েছে এক দুর্লভ্য বিরাট পৌর প্রাচীর ওদের হুঁজনের মাঝখানে। তাকে অতিক্রম করে অংগা কি সম্ভব? উঃ। তবে? তবে কি হবে?

এই ভয়াবহ পারাণ কারার অতল অন্ধকারে কে দেখাবে একটু আলো? কে তার দুর্লভ ভীক হাতখানি ধরে নিয়ে বাবে এখান থেকে? উঃ মাগো। আর্ন্তকণ্ঠে কেঁদে ওঠে স্তম্ভিতা, দামীদা! দামীদা!

—মিতা। মিতু।

ভীষণ চমকে উঠলো স্তম্ভিতা। কার কণ্ঠস্বর?

ওর ঠিক সামনে সারা গায়ে চাঁদের আলো দেখে ঠাঁড়িয়ে আছে স্তম্ভিতা।

—স্বপ্ন? হ্যাঁ তাই হবে। এরকম স্বপ্নই তো কত বার দেখেছে সে। সেই মন ভোলানো চোখ জুড়ানো স্বপ্নই তার সামনে ভাগছে। বিস্তারিত স্থির দৃষ্টি মেলে স্বপ্ন দেখতে লাগলো স্তম্ভিতা।

ওর স্বপ্নের ছবিখানি ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো কাছে, আরো কাছে। হুঁহাত বাড়িয়ে ধরলো ওর হাত হুঁখানি।

—অমন করে চেয়ে কি দেখেছো মিতা? চিনতে পারছো না? আমি যে তোমার দামীদা।

—জ্যাঁ। দা'-মী'-দা??? তুমি? তুমি সত্যি দামীদা? তুমি এসেছো দামীদা? সাত বছর পরে, তুমি ফিরে এসেছো দামীদা?

—হ্যাঁ মিতা এই তো, এই তো তোমার কাছে এসেছি। রাগ করেছে? এতদিন আসিনি বোলে? না মিতু। লগুন থেকে ফিরে ছুদিন এসেছিলাম, কাকা বললেন তোমার শরীর

যদি আপনি
জীবনযাত্রার মান
উঁচু করতে চান
—পড়ে দেখুন!



আজকাল ভালভাবে বাঁচবার কত সুযোগ হয়েছে—তবু পুরণো সংস্কার আর সেকেলে ধারণা আঁকড়ে থেকে কত লোক সে সব সুযোগ নষ্ট করে।

দৃষ্টান্তরূপ, আমাদের খাবার অভ্যাসের কথাই ধরুন। বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে স্বাস্থ্য ও শক্তি বজায় রাখতে হলে প্রত্যেক মানুষের দৈনন্দিন অন্ততঃ ছ' আউন্স স্নেহপদার্থ খাওয়া দরকার। বনস্পতির ভেতর এই স্নেহপদার্থ আমরা সহজেই পাই। তবুও বনস্পতি দিয়ে রান্না করতে এখনো অনেক লোকের সংস্কারে বাধে। তারা মনে করে যে এই উদ্ভিদ স্নেহপদার্থ কেবল ভারতেই তৈরী হয়—কিন্তু মোটেই ভেবে দেখে না যে সারা পৃথিবীতেই স্বাস্থ্যবান লোকেরা বিশেষ প্রণালীতে তৈরী উদ্ভিদ স্নেহ দিয়ে রান্না করা পছন্দ করেন। এমন কি ডেনমার্ক, হল্যান্ড ও আমেরিকার মত পৃথিবীর মধ্যে নামকরা মাংসের দেশেও দুগ্ধজাত স্নেহপদার্থের চেয়ে বনস্পতির

মত উদ্ভিদ স্নেহের ব্যবহার ঢের বেশী। কেন বলবো? কারণ লোকে জেনেছে যে এই সব উদ্ভিদ স্নেহ দুগ্ধজাত স্নেহপদার্থের মতই পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যপ্রদ এবং এতে খরচও কম।

পুরোপুরি পুষ্টিকর ও প্রয়োজনীয় ভিটামিনে সমৃদ্ধ বনস্পতি চিনাবাদাম ও তিলের তেলে তৈরী। কঠোর নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত আধুনিক স্বাস্থ্যসম্মত কারখানায় বিশেষ প্রণালীতে বনস্পতি তৈরী হয়—যাতে আপনার কাছে তা নিঃসন্দেহে বিশুদ্ধ ও ঘনীভূত উপকারিতার আকারে পৌঁছয়। উপরন্তু, বনস্পতির প্রতি আউন্স এ-ভিটামিনের ৭০০ আন্তর্জাতিক ইউনিটে সমৃদ্ধ। এই ভিটামিন থক ও চোখ ভাল রাখবার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়।

যে সব লোকের জীবনযাত্রার মান খুব উঁচু তারা রান্নার ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ স্নেহজাতীয় পদার্থ পছন্দ করেন—আপনারও বনস্পতি ব্যবহার হ্রস্ব করা উচিত নয় কি?

বনস্পতি — বাড়ীর গিন্নীর বন্ধু

ধারাপ, তাই আর বিবর্ত করিনি তোমার। তারপর কাকাবাবুর হাসপিটালটার কাজে এত ব্যস্ত ছিলাম, যে আসবার সময় পাইনি মোটে। থিয়েটার রোডের বাড়ীখানা খানিকটা ভেঙে চূরে হাসপিটালের উপযোগী করে তৈরী করা হলো। এবারে অত্যন্ত কাজগুলো আরম্ভ হয়েছে। তাই এসেছি তোমাদের বলবার জন্য। তুমি আর কাকা একদিন গিয়ে যদি দেখে আসো, আরও কি করলে ভালো হয়, তোমাদের মতামত যে আমার বড় প্রয়োজন মিতু। ওর পাশে বসলো সুদাম। একটু হেসে বললো—ভেতরে বাচ্ছিলাম, হঠাৎ তোমার দামীদা' ডাক শুনে ফিরে দেখলাম তুমি এখানে বসে আছো। তুমি কি আমাকে দেখতে পেয়েছিলে মিতা ?

—না দামীদা'। আজ এখন তোমার দেখতে পাটিনি।' তবে দেখেছি। এর আগে অনেক—অনেকদিন দেখেছি তোমায়। এখনই ডেকেছি তখনই তো এসেছো তুমি। শুধু আজই নয়।

—কি বলছো মিতু। ঠিক বুঝতে পারছিনা যে। চলো ভেতরে বাই। কাকা কোথায় ?

—বাড়ী নেই। বেবিয়ে গেলেন একটু আগে। ভেতরে যেতে চাইছো ? না, না দামীদা' অনেক অনেককাল বন্ধী আছি ওখানে কতদিন জানো ? প্রায় চার বছর হতে চললো কিন্তু আর পারছিনা আর যে আমি পারছি না। আমাকে এখান থেকে নিয়ে যেতে পারো দামীদা' ?

—কি বলছো তুমি মিতু ? নিজের বাড়ী ফেলে কেন যাবে তুমি ? স্থির হও লক্ষ্মীটি। ওসব ইচ্ছে মন থেকে একেবারে মুছে ফেলো। ওর পিঠে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে বললো সুদাম,—সংসারে থাকতে গেলে কত কি হয় মিতু ! সব কিছুকে যে মানিয়ে নিয়ে আমাদের চলতে হবে ভাই !

—বাড়ী ? কোনটা আমার বাড়ী দামীদা' ? নিজের বাড়ীতে কেই বন্দী জীবন যাপন করে ? সংসার ? কোথায় আমার সংসার ? কোথায় মানিয়ে নেব নিজেকে ? আমার চার পাশে দাঁউ দাঁউ করে জ্বলছে শুধু নরকের তাপ্তন, আর তার মাঝখানে পেশতীর মতো পাক খেয়ে বেড়াচ্ছি আমি ! পালাবার চেষ্টা করছি, কিন্তু পথ যেন কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছি না দামীদা' ! এই পাঁচ বছর ধরে আমি শুধু ঘরে মরছি !

—মিতা ! মিতু ! বেদনার্ত গলায় ডাকলো সুদাম ! এত কষ্ট তোমার কিসের জন্যে মিতা ? কিছুই যে জানি না আমি। বলো, কি করবো তোমার জন্যে কিসে শান্তি পাবে তুমি ?

—দামীদা' ! মান হেসে ওর মুখের দিকে চোখ দুটি তুলে ধরলো সুমিতা।

সুদাম ফিরে চাইলো ওর দিকে। এতক্ষণে ভালো করে নজর দিয়ে দেখলো তার পরম স্নেহের পাখীকে !

সকাল পাড় সাদা সাদা পরনে ওর ! হাতে অল্প কয়েকগাছি সোনার চুড়ি ছাড়া আর কোনো অঙ্গে নেই আভরণ। একরাশ রক্তচুল খোলা পিঠের ওপর ! হরম্ব বাতাস, বার বার চোখে মুখে ছড়িয়ে দিচ্ছে সোনা রং এলো চুলগুলোকে। মুখখানি যেন বড় করুণ বড় মান। অনেক রোগা হয়ে গেছে আগের চেয়ে মিতা। গালের হাড় দুটো একটু উঁচু লাগছে যেন। চোখ দুটো আরো বড় দেখাচ্ছে মুখের ওপর।

একে ? এতো সেই আগেকার হাত চকলা শান্তি প্রীতিময়ী মিতা নয় ! এ যেন হৃৎ ভাবাকান্ত এক উদাসিনী নারী ! আবাল্য সাথীর জগৎ অন্তরটা ওর হাহাকার করে উঠলো ! সে ভেবেছিলো মিতা সুখে আছে, তার সুখই ছিলো ওর একমাত্র সাধনা।—কিন্তু সব ভুলের ছায়াগুলো আজ মিলিয়ে গেলো খাঁটি সত্যের আলোয়।

—কি দেখছো দামীদা' বড় ধারাপ লাগছে আমার চেহারায় খানা,—তাই না ?

—না মিতা, ঠিক জ্ঞান নয়। তবে একটু রোগা হয়ে গেছো, আর,—আর—

—আর দামী বসন ক্ষুণ্ণ নেই অঙ্গে, এই তো ? এখনও কেমন করে বেঁচে আছি, সেটা তো জিজ্ঞেস করলেনা দামীদা'।

এই দীর্ঘ সাত বছর ধরে কত বড়, তুফান গেলো আমার ওপর দিয়ে—তা যদি জানতে তুমি ! জীবনটা আমার একেবারে ছিন্ন, ভিন্ন হয়ে গেছে। দামীদা'। কেন এমন হোল ? কেন তুমি আমাকে একলা ফেলে চলে গিয়েছিলে ? যদি তুমি পাশে থাকতে—আর বলতে পারলো না সুমিতা। অবরুদ্ধ কন্ঠার বেগে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেলো। ওর বুকের ভেতর উথলে উঠেছে কন্ঠার সাগর। দুটি চোখের কুল ছাপিয়ে দর দর করে অন্ধকার ধারায় স্বপ্নে লাগলো এত দিনের সঞ্চিত বেদনাজ্ব। হুহাতে চোখ ঢেকে ফুলে ফুলে কাঁদলো সুমিতা।

কি করবে ভেবে পায়না সুদাম। অবরুদ্ধ বেদনার পাষণ্ড ভাবে ওর বুকটাও কি ভেঙে যাচ্ছেনা ? কিন্তু উপায় কি ? তাকে চোখের জলে বরিয়ে দেওয়া কোন মতেই সম্ভব নয় তাই পক্ষে। এতে মিতার আরো ক্ষতি হবে।

কঠোর সংযমের বাঁধ দিয়ে অবরোধ করলো সুদাম অন্তর আলোড়িত করা অসহ্য বেদনার উদ্বেলিত ধারাকে। নিজের দুটি হাতে মিতার হাতখানি চেপে ধরে নত মস্তকে বসে রইলো নিকবাক হয়ে বৃথা সাহসনার বাণী উচ্চারণ করে শুকে শাস্ত করবার চেষ্টা করলো না। প্রাণভরে কাঁহক ও। হাতা হোক কিছুটা মনের গুরুভার। কতক্ষণ কেটে গেছে খেয়াল ছিলোনা ওদের। বিবাদভরা ছবিখানি বৃষ্টি চাদেরও ভালো লাগেনি, তাই সে হাতা মেঘের আশ্রয়ে মুখ ঢেকে ধীরে ধীরে সরে গেছে ওদের সামনে থেকে।

নরম নরম আলো লাগা অন্ধকার ওদের বৃকে জড়িরে ধরেছে স্নেহময়ী মায়ের মতো। গাছের দীর্ঘ বিলম্বিত ছায়াগুলো গভীর মমতাবলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে ওদের সর্বাঙ্গে। ইপ টাপ-করে বকুল ফুল ঝরে পড়ছে ওদের গায়ে মাথায়।

ষট পট করে ডানা ঝেড়ে, সিঁ, সিঁ শব্দ করতে করতে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেলো এক ঝাঁক রাতজাগা পাখী।

চমকে উঠলো সুদাম। কত রাত হলো ? হাতে আজ ঘড়িটা পরে আসা হয়নি, সব কাজেই যেন বড় তুল হচ্ছে আজকাল। শাস্তগলায় ডাকলো সে—মিতা।

—কি বলবে ? রাত হলো চলে যাবো এইতো ? ফুলো, ফুলো চোখদুটো ওর চোখের ওপর মেলে, ভাঙা গলায় বললো সুমিতা পৃথিবীটা কি আশ্চর্য্য দামীদা'।

আজ বা জাম্বল্যমান সত্য কাগ সে মিথ্যা ছায়া মাত্র।

এখানে কি সব মেকি? সব খুটো? কোনো কিছুই ওপরেই কি নিশ্চিত নির্ভর করা চলে না মামীমা?

সেই বকুলতলা আছে, সেই আছি তুমি, আমি শুধু নেই বৃষ্টি সেই আগের বন্ধনটা আমাদের। বারান্দা ছুঁতে গিয়ে কে যেন সেটা নিমূল করে ফেটে দিয়েছে। তাই আজ তোমাকে চলে যেতে হবে, আর ধরে রাখবার অধিকারও আমার হারিয়ে গেছে।

—না। না। ওকথা বোলোনা মিতা। তা হয় না, কোনোদিন হবে না—গভীর দরদ ভরা গলায় বললো সুদাম—সব মিথ্যার উল্লেখ আছে আমাদের এক অবিনশ্বর সত্তা—এক শাস্ত কপ। সেখানকার সত্য কোনোদিন মিথ্যা হয় না, —সে বন্ধন ছিল করবার শক্তি কারুর নেই মিতা। তার স্বরূপ ভাষা দিয়ে প্রকাশ করা যায় না—অন্তরের উপলব্ধি দিয়ে জানতে হয় তাকে। কিসের আলো যেন চক্ চক্ করে জলে উঠলো সুদামের স্থির দৃষ্টি বিক্ষমিত হুটি চোখে।

শিব শিব কবে উঠলো সুমিতার সর্বাঙ্গ। এক অপার্থিব আনন্দ বিজয়ী খেল গেলো যেন ওর প্রতিটি শিরায়। সকল সঙ্গে জাগলো পুলক রোমাঞ্চ।

সত্য সূর্য্য উদিত হল অস্তব মহাকাশে। মিথ্যা কুহেলিকার জাল ছিন্ন ভিন্ন হয়ে নীচে মিলিয়ে যেতে লাগলো।

মেঘাবরণ সরিয়ে মমতাময়ী চাঁদ মুঠো মুঠো আলোর ফুল ছড়িয়ে দিলো ওদের সর্বাঙ্গে।

হ্যাঁ অনেক রাতই হয়েছে। গাড়ী বারান্দার তলা দিয়ে কীকর বিছানো পথটা গোল হয়ে ঘূর্ণ গেষ্টের নিকে গেছে,—সেই পথ ধরে চলেছে সুমিতা আর সুদাম।

ঢং, ঢং কবে লালকৃষ্ণ ছড়িতে এগারোটা বেজে গেলো।

একটি চবক লাগলো ওদের হৃদনার। চার ঘটী সময় এমন ছুটে পালালো কি করে?

কীকরের ওপর খর খর শব্দ শুনে সেদিকে চেয়ে বললো সুমিতা—ছোটমামা আসছে।

—তাঁই নাকি। ওর সঙ্গে ওতো এসে অবধি দেখা হয়নি। দ্রুতপদে এগিয়ে এগিয়ে অনিলকে প্রণাম করে পায়ে ধুলো নিয়ে নাখায় ছোঁয়ালো সুদাম।

—বিশ্বয় ভরে ওর দিকে খানিক দূরে থেকে সোজাসে চোঁচিয়ে উঠলো অনিল—আরে একি,—একি, সুদাম যে! কবে ফিরলে? বুকের ভেতরের বিবেকের কাঁটা ছুটো খচ খচ করে উঠলো আবার।

—তা বছর দেড়েক হয়ে গেলো। হেসে বললো সুদাম। ভালো আছেন তো ছোট মামা। মামীমা কই? আজ আর তাঁর সঙ্গে আলাপ করা হলো ন', বড্ড রাত হয়ে গেছে, আরেকদিন এসে ও কাজটা শেষে কেলো।

—মামীমা? হো, হো, করে হেসে উঠলো অনিল। তাঁর নাগাল তুমি পাবে তেবেছো?

ভুল করছো ডারলিং। হ্যাঁ শুধু তুমিই নও, ভুল আমরা সকলেই করেছি। আমি, ওকতারা, আমার মা, জামাইবাবু এমন কি মিতাও—আমরা সকলেই—যেন একটা ভুলের চাকার চড়ে অনবরত পাক খাচ্ছি। হাড়ি, মাংস মন, প্রাণগুলো সব পিষে যাচ্ছে, কিন্তু ওর কবল থেকে ছাড়ান নেই কারাই।

একটু হেসে আবার বললো অনিল—কিন্তু জানো সুদাম। কবিতা বড্ড বেঁচে গেছে। এখন বাক্য ছ, জামাইবাবু ওর কানে ভালো মন্তব্যই দিয়েছিলেন। আমরা কেউ আর বেশীদিন বাঁচবো না। যে আশ্রম জলছে এ বাড়ীতে সবাই জলে পুড়ে শেষ হয়ে যাবো।

পূর্বম বিশ্বয়ে ওর দিকে চেয়েছিলো সুদাম। এই কি সেই সদা ফুঁটিবাজ, প্রাণচাকল্যে ভরপুর ছোটমামা?

এ যেন জীবন সংগ্রামে পলাতক কোনো হতাশ দৈনিক। কপালে ফুটেছে কয়েকটি গভীর চিন্তাবোধ। চোখের কোলে কালি জমেছে। গাল দুটো গর্ত হয়ে গেছে। গভীর ক্লান্তি আর হতাশা ছড়ানো চোখে মুখে।

আপনারা সকলেই যদি অতটা স্তব্ধ পড়েন ছোটমামা। তবে কে কাকে দেখবে? বাখিত ভাবে বললো সুদাম। সুখ, দুঃখ, মিলিয়েই তো মানুষের পূর্ণ জীবন।

—ও সব ফাঁকা বুলি কোনো কাজে লাগবেনা তে হাঁপ বয়। 'কি ঘটনা বিবে, বুঝবে সে কিসে কভু আশীর্ষে দংশন যাবে।'

হাত নেড়ে, অভিনয়ের ভঙ্গিতে বলতে বলতে হঠাৎ দুহাতে সুদামকে বুক জড়িয়ে ধরে কান্না ভরা গলায় বললো অনিল—কমা করো আমাকে সুদাম। তুমি আর মিতা আমাকে কমা করো। গোঁথো সাপ মিতাকে ছোঁবল দিতে আসছে, আমি দেখে শুনেও, ওকে বাঁচাবার চেষ্টা করিনি। কেন জানো? নিজের দ্বার্দ্বার্দ্বার জন্মে। কিন্তু তখন কি বুঝেছিলাম? যে বিবরণ কালনাগের সঙ্গে মিতাসী করলে তার বিষের ছোঁবলটাও নিতে হবে? তাই মানা ভায়ী দুজনেই আজ বিবেক জ্বলছে জ্বলছে মবছি ভাই।

সুদামকে ছেড়ে দিয়ে সুমিতার একখানি হাত নিজের হাতে চেপে ধরে বলতে থাকে অনিল—জানিস মিতা! এতকাল পরে

পেটের যন্ত্রণা কি মারাত্মক তা ভুক্তভোগীরাই শুধু জানেন! যে কোন রকমের পেটের বেদনা চিরদিনের মত দূর করতে পারে একমাত্র

বহু গাছ গাছড়া
দ্বারা বিশুদ্ধ
মতে প্রস্তুত

বাকলা

ভারত গভা রোজি নং ১৬৮৩৪৪

অম্লশূল, পিত্তশূল, অম্লপিত্ত, লিভারের ব্যথা, মুখে টকভাব, ঢেঁকুর ওঠা, বমিভাব, বমি হওয়া, পেট ফাঁপা, মন্দ্যায়, বুকফালা, আহায়ে অরুচি, স্বপ্ননিদ্রা ইত্যাদি রোগ যত পুরাতনই হোক তিন দিনে উপশম। দুই সপ্তাহে সম্পূর্ণ নিরাময়। বহু চিকিৎসা করে মারা হতাশ হয়েছেন, তাঁরাও স্বাস্থ্যলা সেবন করলে নবজীবন লাভ করবেন। বিশ্বলে সুস্বাদু ফলসহ।

৩২ ডোলের প্রতি কোটা ৩ টাকায়, একরে ৩ কোটা — ৮।। আনান। ডায়. মাং. ও পাইকারী দর পৃথক।

দি বাকলা ঔষধালয়। হেড অফিস—আবুদাউদ (মুর্শিদাবাদ) ব্রাহ্ম-১৪২, মহাত্মা গান্ধী স্ট্রাট, কলিকাতা-৭

আজ মার কাছে গিয়েছিল। কদিন ধরে বড় মার জন্তে ঐশিটা কেমন করছিলো যে।

মি কিশু প্রথমে আমার সঙ্গে কথা কইলেন না—আমি মারের পায়ে ধরে ক্ষমা চাইলাম। তাৎপর্য মারের শেকি কারা। আমাকে বুকে টেনে নিয়ে বললেন,—তুই আমার কাছে চলে আর বাবা। তোদের ছেড়ে আমি যে মরে বেঁচে আছি।

তাই মনে করছি—দব ছেড়ে ছুড়ে মাকে নিয়ে দিনকতক তীর্থ ভ্রমণে বেড়িয়ে পড়বো।

নত মুখে চুপ করে দাঁড়িয়েছিলো সুমিতা। চোখের জলে গাল দুটা ওর ভেসে যাচ্ছে।

সুদামেবও চোখদুটা অকস্মাৎ জলে ভরে উঠলো। পকেট থেকে ক্রমাল বার করে ঘোষ মুছে—ধরা গলায় বললো—যা হয়ে গেছে, তাঁকে তো আর ফেরানো যাবে না ছোট মা। অদৃষ্ট বলে মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় কি?—আমাকে যদি কোনো কাজে দরকার মনে করেন ডাকবেন। জানেন বোধহয়, আমি কাকাবাবুর এলগিন রোডের বাড়ীতে আছি। যাবেন একদিন সময় মত। কাকাবাবুর হুপটালের কাজ হচ্ছে, দেখে আসবেন। আচ্ছা আজ তাহলে চল।

—যাবো, যাবো। আবার তোমাদের কাছে ফিরে না গেলো, কি যে হবে এর পরে ভাবতেও ভয় করে, জানো সুদাম কেমন ভয় পাই আজকাল। এক হাতের মুঠোয় নিজের মাথার চুলগুলো চেপে ধরে মুহু গলায় বললো অনিল। মিতার দিকে একটা মমতাভরা দৃষ্টিপাত করে বিবান ভারাক্রান্ত স্বরে বীর পারে গেটের দিকে এগিয়ে চললো সুদাম।

বড় অশান্ত চিত্তে তিনটে দিন কাটালো সুমিতা। একি হলো? সারা পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজের ক্ষুদ্র গভীর রচনা করে তার ভেতর এতদিন আত্মগোপন করেছিলো সে। কিন্তু সহসা সে গভীর আগল কে যেন ভেঙে দিলো।

খুলে গেছে তার রুদ্ধ ভবনের সব জানলা দরোজাগুলো। হাত ছানি দিয়ে ডাকছে ওকে বাইরের আকাশ, বাতাস। আর যে ঘরে থাকা যায় না। লজ্জা, সন্তোষ, বিবান, ভয়, কোন বাঁধনই আর ওকে বেঁধে রাখতে বৃষ্টি পারবে না।

সেদিন ভোর না হতেই বাইরে বেরবার জ্ঞান নিজেকে প্রস্তুত করে নিলো সুমিতা। সাদা সাদা পরিবেশে রাখলো। পড়লো চাপা মঃ এর ঢাকাই সাড়াখানা তার সঙ্গে মানিয়ে লাল সিকের ব্লাউজ। কানে গলায় হালকা ধবণের সোনার গহনা পরে, আরনার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো চুলটা ঠিক করে নেবার জন্তে। নিজের ছায়াটি আজ কেমন যেন ভালো লাগলো ওর কাছে। না। খুব খারাপ এখনো হয়ে যায়নি মুখখানা।

—খাপন মনে হাসলো সুমিতা। কালো একখানি ওড়নার সর্কাস ঢেকে নিয়ে নিচে নেমে এলো সুমিতা।

তখন অসীম পটভূমিকার ধূসর রংএর ওপর ফিকে লালের সবে ছোপ লেগেছে। দিগন্তে ঐ ঐ আঁবার সায়ের আলোর কমল, একটি একটি করে দল মেলতে শুরু করেছে। গাছে, গাছে, বনশরব অন্তরালে জেগেছে ঘুমতাড়া পাবাদের অসুট কলরব।

শিশিরের মদিমুজ্জ্বল ছড়ানো গাছের পাঠার ফুলে। ভোরের খিরখিরে ঠাণ্ডা হাওয়ার বেল, সুইয়ের গন্ধ। এমন মন প্রাণ জুরানো প্রভাত গৌন্দী অনেকদিন পরে আবার দেখলো সুমিতা। জালের ঘের দেওয়া সারি সারি সবুজ রং কাঠের শূন্য ঘরগুলোর কাছে গিয়ে একবার থমকে দাঁড়ালো সে।

ময়ূর, নানা জাতের পাখী, আর গিনিপিগ খরগোস শাকতো ঐ ঘরগুলোতে।

ছ'সাত বছর আগে ওরাই ছিলো তার নিত্যসঙ্গ। ওকে দূর থেকে দেখতে পেলো, কাছে ছুটে যেতো ওরা। হাত থেকে খাবার খেতো। গায়ে মাখার উঠে কত আদর জানাতো ওকে। আজ আর তারা কেউ নেই।

ওদের ঘরগুলো আগাছা জঙ্গলে ভরে গেছে। কয়েক মিনিট ওখানে দাঁড়িয়ে থেকে, একটা হৃদয় নিঃশ্বাস ফেলে, গেটের কাছে এগিয়ে গেলো সুমিতা।

—গেটে তাপাবন্ধ। দরোয়ানটা ওদের ঘরের সামনের রোয়াকে পড়ে নাক ডাকাছিলো, সুমিতার ডাক শুনে ধড়মড় করে উঠে বসে হাঁক দিলো—কোন হায়?

—গেট খুলে দাও, বাইরে যাবো। আদেশ করলো সুমিতা।

—দিদিমণি? বাস্তবতাবে উঠে দাঁড়িয়ে সেলাম জানিয়ে গেট খুলে দিলো দরোয়ান। ডাইটারকে ডাকবে কি-না জানতে চাইলো সে।

—না দরকার নেই। বাবুকে বোলো আমি এলগিন রোডের বাড়ীতে গেছি।

ক্রীতপায় রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চললো সুমিতা চলতি ট্যাক্সি দেখতে পেলে ডাকবে ভাবলো।

অত ভোরে ট্যাক্সি মেলা সহজ ব্যাপার নয়। জনশূন্য পথটা বৃষ্টি অজাগরের মতো পড়েছিলো নিঃশব্দে। হুচারটে ভিটলওলা ওর গায়ে তখন জল ছিটিয়ে দিচ্ছিলো।

জোরে পা চালালো সুমিতা। এদিক, ওদিক চাইলো—ট্যাক্সির আশায়, না কোথাও নেই তার সারা শব্দটুকুও। অমেকখানি পথ হেঁটে একটা গাছের তলায় এসে দম নেয় সুমিতা। কপালে বিলু বিলু খাম জমেছে, আঁচল দিয়ে মুছে ফেলে—দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক নজর ফেঁদায়। রাস্তার ওপারে হু তিমজর, ভিটলওলা আর বাতুরার দাঁড়িয়ে মুখ নিচু করে কি যেন দেখছিলো।

হু, চারটে কাক আশে পাশে উড়ে উড়ে ডাকাডাকি করছে। একটা দূরে একটা কুকুর দাঁড়িয়ে লেজ নাড়ছে; মাঝে, মাঝে সড়কচোখে চাইছে সেই দিকে।

সন্ধ্যোজাত শিশুর কটিগলার স্কীণ স্বরের কান্না শুনে চমকে উঠলো সুমিতা। চকস পায়ে এগিয়ে গিয়ে ওদের শুধালো।—কি হয়েছে ওখানে?

—কানু বদমাইস মাগী একটা ছেলে কেলে দিয়েছে মা। এখনো বেঁচে আছে ছেলোটা।

—কি সর্বনেশে কথা। দেখি, দেখি—

বলতে ডাটবনের কাছে এগিয়ে গেলো সুমিতা। একগাল মোরার পাশে এখনো সাদা কাপড়ে জড়ানো সত্তকোটা পল্লফুলের মত একটি ছেলে পড়ে আছে।

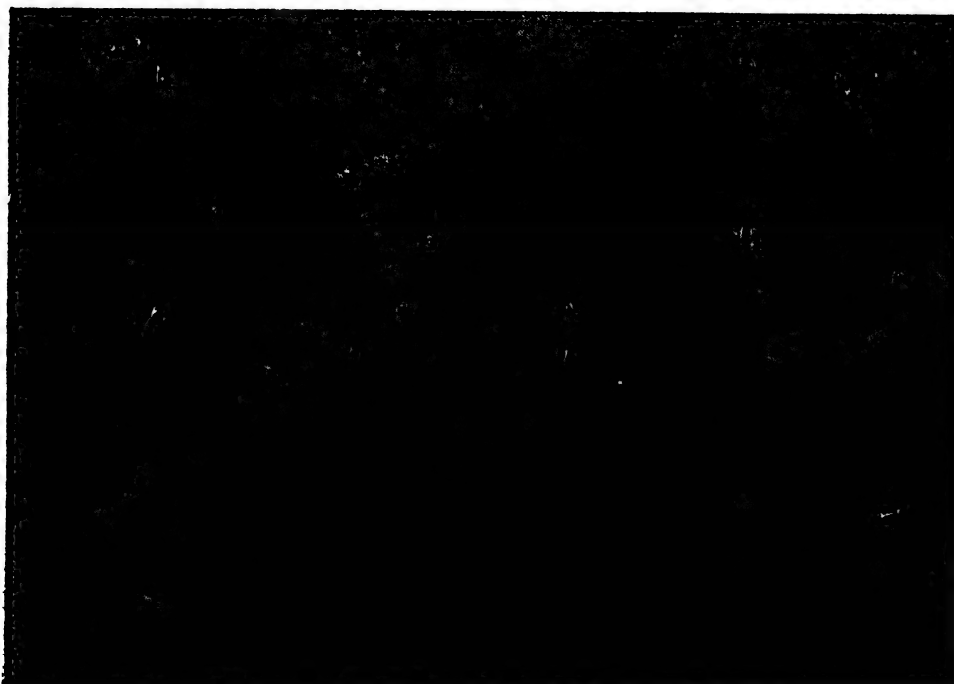


যুক্তেশ্বর ও মুক্তেশ্বর মন্দির-তোরণ

—গীতা বসুমল্লিক

সপিল-পথ

ঐপাখিক (মুখোপাধ্যায়)



পার্বাট



—দীপক জ্যোতি—



—**দ্বিতীয় চিত্র**—

হাসা হাসা



স্নানার্থী

—বৈদ্যকৃষ্ণনাথ বসু

পদ্মফুল ফুটেছে পাকের ভেতর। কিন্তু তার গায়ে তো পাক নেই। কি অপকণ, কি পবিত্র ফুলটি?

ফুলে ফুলে চোখ দুটো মেলে অধীক হয়ে দেখছিলো আশ্চর্য্য পৃথিবীটাকে এই অবাহিত অতিথিটি। মাঝে মাঝে হাত-পা ছুঁড়ে মানুষের হীনোত্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করছিলো।

হেঁট হয়ে পরমাশ্চর্য্য ভবে ওকে দেখলো সুমিতা। তারপর হুঁহাতে ওকে সাবধানে কোলে তুলে নিলো।

—এ মারী। বাচ্ছাটা লিবেন আপুনি? অবাক হয়ে শুধোলো বুড়ো ঝাড়ুদারটা।

—হ্যাঁ বাবা। নিয়ে যাবো। আহা! এমন টাদের টুকরো ছেলেটাকে কোন পাংগী ফেলে দিয়েছে গো?

—রাঙ্গুণী আছে মা। এই মানুষের ভিতরেই ডান, রাক্ষস, ভূত, পেরেস্ত, সব আছে, আবার দেওতাও আছে মা।

রাঙ্গুণী দানবীতে কি সন্তান পালে মা? সে ভয় নিতে পারে, কিন্তুকি মা হতে পারে না। তুমি, দেবী ভগবতী মা আছো, সন্তানকে বাঁচাতে সেই দেওতাই তোমাকে হেঁথায় পাঠিয়েছে মা। কিন্তুকি আর দেবী কোরোনা মা, লোক জমে যাবে, পুলিশের হাঙ্গামা হোবে, জলদি ঢলে বাও।

কোথায় নিয়ে যাবে একে? একটু ভাবলো সুমিতা— তারপর বললো—কাছাকাছি ট্যান্ডি পাওয়া যাবে?

—যাবে মা, আর একটু গেলেই পাবে। হেঁট হয়ে ওরা প্রণাম করলো সুমিতাকে। ওদের দিকে চেয়ে একটু হাসলো মির্জা। ছোট্ট হাতবাগটি খুসে পাঁচ টাকা ওদের দিয়ে বললো—তোমরা খাবার কিনে পেও। রাত প্রভাত না হতে হতে এমন বখশিষ কখনও ওদের বরাতে মেলেনা। মহানন্দে ওরা টাকাটা নিয়ে বললো—চলো মা তোমাকে গাড়ীতে চড়িয়ে দিয়ে আসি। একজন আগে ছুটলো ট্যান্ডির সন্ধানে। ওর সঙ্গে সঙ্গে চললো বুড়ো ঝাড়ুদার। তুলতুলে নরম মাংস শিতটি বৃকে চেপে ধরে ধীরে ধীরে হেঁটে চলেছে সুমিতা।

এক অনাধারিত বিপুল আনন্দময় সত্তা যেন জড়িরে ধরেছে ওকে। বিগলিত কল্পণায় সিক্ত হয়ে গেছে, ওর সারা স্বত্তরটা। নারী স্বদয়েব সহজাত কোবল বৃত্তগুলো সজাগ হয়ে উঠেছে ই ক্ষুদ্র মানব শিশুর ছোঁয়া লগে।

ট্যান্ডি নিয়ে এলো ত্রিভুজলাটি। সুমিতা উঠে বসলো তার তেতরে। ওরা সকলে আবার প্রণাম করলো সুমিতাকে। বুড়ো ঝাড়ুদারটি কোমবে জড়ানে কাশডের খুঁটি খুলে চোখ মুছলো তারপর একগাল হেসে বললো—ভগবান তোমার ভালো করবে মা। ট্যান্ডি চলতে শুরু করলো এলগিন বোডের দিকে। [কমল:]

টিয়াপাখি রঙ

রমেশনাথ মল্লিক

বসন্ত বাতাসে হ'লে প্রচুর সবুজপত্র পৌবালীর হলুদে পাতিয়
তারপর বৈশাখের ধূলো নমে যার;
কোথায় সন্মের কচি সবুজের বণ্ড?
সেখান ভাসছে যেন বেননার খেয়ালী সারঙ।
জীবন-সেতারে বাজে ব্যথ'র মূর্ছনা
যখন জগতে আর জীবনের সামান্য কঠিন ব্যঞ্জনা।

স্বদর প্রশান্ত তার খুঁজে ফেরে যদি
তখন তো চাই তার একটি ঝিরঝিরে নদী;
অকুরন্ত স্রব আর অজস্র আশায়
সেখানে তো ডেউ আসে দক্ষিণী সাগর-ধাওয়া।
খড়-কুটো ভেসে যা। হুঁসিনের স্নান যত কিছুর
ভাসয়ে স্রোতের পিছু-পিছু।

মরিচা ধরার প্রাণে তৈলান্ধের যেন স্পর্শ চাই
চিকচিক কপ দেখা চোখেব নেশাই;
হুঁকোটা বৃষ্টি শে এলো মানির অঙ্গনে
কত নিয়ে পিছনে-পিছনে—
একটি নহন পৃথিবীর
তুসছে হরতো সত্যি জগের জিগির।

অবাক দৃষ্টি যে তাই মেলে দিই আজ
কমবন্ বৃষ্টি করে আশ-পাশে, ফেলে রাখি কাজ ও অকাজ;
বাড়িগুলো ভিজে গেছে বড়ো কাক বত,
মাটি-ভেজা সোনা জ্ঞান কত
আনন্দ বর্ষার দিনে বুজে
দেখি ঘাস আর পাতা টিয়াপাখি রঙ ধরে সন্মের সবুজে।



সঙ্গীতশিল্পী শরৎচন্দ্র ঐক্যবাহিনী সর্কার

পূর্বেই বলেছি প্রখ্যাত কথাসিদ্ধ শরৎচন্দ্রকে সঙ্গীতশিল্পী বলে কম লোকেই জানে। এই সম্পর্ক বিস্তৃত আলোচনার দরকার। শরৎচন্দ্রের সঙ্গীত প্রতিভার পরিচয় তাঁর দেশান্তরভ্রমণের অগণিত বিমুগ্ধ পাঠক পাঠিকার কাছে দেওয়ার যথেষ্ট সাক্ষ্য আছে। আমরা এদেরী এবং বিদেশী অনেক কবি সাহিত্যিক নাট্যকার, শিল্পী, সাধক ও মনোশাস্ত্রজ্ঞের ভাবনে এই গুণটির কথা জেনেছি। তাঁরা অনেকেই গান জানতেন, সঙ্গীত সাধনা করতেন। তাঁদের নাম কথ্য শতসংখ্যক। জানি না সঙ্গীতের প্রেরণা তাঁদের জীবনের সাধনাকে সফলতার ধারায় প্রেরিত করতো কিনা। নাট্য কলা সাহিত্য প্রভৃতি মানুষের সুকুমার বৃত্তিগুলির মধ্যে সঙ্গীত শ্রেষ্ঠতম প্রকাশ। এটি সর্বাপেক্ষা রসময়, সৌন্দর্যময় ও আবেদনময়। ভাব বা অহুর্ভূত বস্তু পর্যায়ে উঠলে তবে তা সঙ্গীতে প্রকাশ পায়। সঙ্গীতকে সর্বভাবের একটি সোপানও বলা চলে। মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনের বিকাশ বা ক্ষুণ্ণের সঙ্গীত কম সহায়তা করে না। ভগবদগীতার জগৎ মানুষের যে আকুলতা তা সঙ্গীত অপেক্ষা এমন প্রকাশ লাভ আর কিসের দ্বারা হতে পারে। এইজগৎ বহু মহাপুরুষ স্ত্রীভগবানের নাম গান করেছেন, তাঁর গুণকীর্তন করেছেন তাঁকে পাবার জন্য।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন খ্যাতিমান ঔপন্যাসিক। স্বীয়জনাথকে বাদ দিয়ে গল্প উপন্যাসের ক্ষেত্রে তাঁর মত জনপ্রিয়তা অর্জন করতে আর কোন সাহিত্যিক ইদানিং পেরেছেন কিনা সন্দেহ। তিনি একজন পৃথিবীর প্রথম প্রেমীর লেখক হিসাবে স্বীকৃত। তাঁর জগৎ সারা বাংলা দেশ, ভারতবর্ষ গরিব অহুতব করে। সেই কথাসিদ্ধ শরৎচন্দ্র সঙ্গীতশিল্পীও ছিলেন। মৌনে তিনি সঙ্গীতচর্চা করেছেন, প্রভূত বশ অর্জনও করেছেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গীতজীবনের কোন পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস আমরা আজও পেলাম না। কোন অদৃষ্ট

দাঁড়ির ইচ্ছিতে তাঁর সঙ্গীতজীবন সাহিত্যের দিকে নির্দেশিত হোল, তিনি জীবনের মোড় ফিরায়ে তামপুরা ছেড়ে কলম ধরলেন—সে যন্ত্র তাঁর বহুবৈচিত্র্যময় জীবনের মতই আমাদের কাছে যন্ত্রময় ও হৃৎকেন্দ্রীয় রয়ে গেল।

যন্ত্রময় জ্ঞান যার প্রবেশিকা পরীক্ষার পর থেকেই শরৎচন্দ্র গান বাজনার যেতে ওঠেন বেশী করে। তাঁর প্রিয় সঙ্গী বাজুর কাছে বাণী শব্দে আরম্ভ করে দেন। ভাগলপুরে সেই কুতুড়ে বাড়ির গঙ্গার ধারের জঙ্গল 'তপোবনে' তাঁর সাধনার আড্ডা ছিল। বন্ধুর সঙ্গে গানবাজনা তখন রীতিমত চলছে। কিন্তু একটা হারমোনিয়াম নেই। কেনবার টাকাও নেই। অদম্য শরৎচন্দ্র উপায় খুঁজলেন। সঙ্গীত পিয়ানো কলম ধরলেন সাহিত্য রচনা। কুস্তলান পুরস্কারের জগ্জে তাঁর মন্দির গল্পটি সৃষ্টি হল। ১৩১০ সালে ভাদ্র মাসে তাঁর মাতুল সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নামে সর্বপ্রথম ছাপার অঙ্করে এটি প্রকাশিত হয়। গল্পটি প্রাতঃবাগিতার ১ম স্থান অধিকার করে ২৫ টাকা পুরস্কার লাভ করে ও তাঁর বন্ধুর প্রয়োজন মেটে। এই হল সঙ্গীতের প্রেরণার শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে প্রথম সফল পরিক্ষণ।

এখন করে শরৎচন্দ্রের সঙ্গীতের সাধনা চলতে থাকে। এর পরই দেখতে পাই মাঝে গান বাজনার বাধা ও বিরতি এবং ভগ্নপ্রেরণা শরৎচন্দ্রের ছাপ।

শিতার ভ্রমসনায় শরৎচন্দ্র বেরিয়ে পড়লেন বাড়ী ছেড়ে সন্ন্যাসীর বেশে। সাধু-সন্ন্যাসীদের সঙ্গে ঘূঁরে ঘুরতে হাজির হলেন মজঃফবুরে। সেখানে উঠলেন এক ধর্মশালায়। রাত তখন গভীর। ধর্মশালায় সামনের বাড়ীতে কে একজন বেহালা বাজাচ্ছিলেন। নিমন্তক নিখর রাত সেই সুরের মুচ্ছনার ভেঙে উঠে পড়ছিল। শরৎচন্দ্র আর থাকতে না পেরে তার সুরে তগ্ন হয়ে ছাপে উঠে গাইতে লাগলেন—

‘জীবন যত পূজা হল না সারা
জানি হে জানি তাও হয় নি সারা।’

কবিগুরু এই গানট বোধ হয় তখন তাঁর ছরছাড়া জীবনকে স্পর্শ করেছিল। পরদিন উভয় সুর সাধকের আলাপ হল। বেহালা বাদকটি ছিলেন নিশানাথ—এমুৎপা দেবীর স্বামী শিখর বাবুর পিসতুত ভাই। শরৎচন্দ্রের মত নিশানাথও ছিলেন ছরছাড়া, ভগ্নপ্রেরণা, পরোপকারী নিঃস্বার্থ যুবক। এইখানেই বিচিত্র পরিবেশের মধ্যে এমুৎপা দেবী ও তাঁর স্বামী শিখরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের পরিচয় হয় ও মজঃফবুরে ভীষণ জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন তিনি। এখানে থাকাকালীন শরৎচন্দ্র বহু গান প্রভেদে এমুৎপা দেবী ও শিখর বাবুকে শুনিয়েছেন। গানের সঙ্গে সগে কিছু কিছু লিখেছেন ও তিনি এই সময়।

এরপর এখানে চাকরী না পাওয়ার ভাগ্যের অশেষবেশে আর পাঁচটা বাঙালীর মতই শরৎচন্দ্র চলে যান বন্দী মুলুকে। ১৯০৫ সালে রত্নন্যাকাউটাট জেনারেল আফসে তাঁর চাকরী পাওয়ার স্লেগে আছে তাঁর গান। সম্পূর্ণ অপরিচিত জায়গার নিঃস্বল শরৎচন্দ্র যখন বাউলবেশে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন সেই সময় এমুৎপা, কে, মিত্র ম’শাই তাঁর গান শোনেন। তখন তাঁর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয়। তিনি শরৎচন্দ্রের রেত্নন্যাকাউটাট কাছাকাছি করে দেন। এরপর শরৎচন্দ্র রেত্নন্যাকাউটাট থেকে অনেকদিন

থাকেন এবং সেখানকার সামাজিক জীবনে অতৃপ্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। সে ইতিবৃত্ত অনেকই জানেন। তাঁর নানা ভাষালী মধ্য তিনি কবি নবীনচন্দ্রের কাছে 'স্বপ্ন-রত্ন' উপাধিটি লাভ করেন। স্থানীয় বেঙ্গলী সোভাল ক্লাবের উদ্যোগে ১৯০৫ সালে কবির নবীনচন্দ্র সেনের ৩৫তম সত্ত্ব তার উদ্বোধন সঙ্গীতে শরৎচন্দ্র যে গানটি গেয়েছিলেন তার পূর্ণ রূপ হল—

‘ত্রুতমি সুশোভিত বঙ্গ রতন আজি হে
এস কবির এস হে।
সমবেত যত দেশবাসী
দর্শন তব অভিলষী
এস কামালিনী শশী হে।
এস বঙ্গ স্বয়ং ভরণ—
এস সুন্দর প্রিয় দর্শন
ঐক্য পুষ্প ডাল লহ হে
এস কবির এস হে।’

বেঙ্গলে থাকবার সময় শরৎচন্দ্র বহু কাগজপত্র বহু সুযোগে বহু গান গেয়েছিলেন। সে সব গানের ও কল্পনার কোন হিসাব পরিচয় বা তথ্য লিপিবদ্ধ হয় নি। তাই প্রয়োজন হইত তখন ছিল না কিন্তু এখন তার ভুলে আপ সাস হয়। তবু যেটুকু জানা যায়—তিনি যে সমস্ত গান গাইতেন বা তাঁর প্রিয় ছিল—তার মধ্যে—

‘কোথা ভবশূন্য! দুর্গমি হাবাক্ততদিনে হোব কল্পনা হবে
কবে দেখা দিবি কোলে তুলে নিবি সকল বাতনা জুড়াবে।’—

‘আমার সাধ না মিটিল আশা না পুরিল’—

‘এই করেছ ভাল নিষ্ঠুর তে’—

‘ভালবাসা নহে ত আলোরা, আলো সে যে শুধু আলো’—

‘পথের পথিক কবেছ আমায় সেই ভালো যে সেই ভালো

আলোরা আলো প্রান্তরে ভালো সেই আলো মোর সেই আলো’—

ইত্যাদির উল্লেখ করা যায়।

বেঙ্গলে বামকৃষ্ণ সেবা সমিতির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত শ্রীশ্রীবামকৃষ্ণ জন্মোৎসবে তিনি গেয়েছিলেন—

‘ভেমনি করে’ আবার এসে ডাক্তার ঠাকুর প্রেমের বাণ

তাতে ভেসে যাবে ভূবে বাবে জীবের দারুণ অনিধান !!

সেদিন যেমন জীবের লাগি ‘কথামৃত’ করলে দান

প্রের পিরাসী, বিশ্বাসী, প্রেমের স্তম্ভ করছে পান।—’

শরৎচন্দ্রের গানবাক্যনা সব্বন্ধে সুবিখ্যাত। নিরুপমা সেবা ও তাঁর ভাষা শ্রীবিভূতি ভট্ট লিখেছেন—

‘শরৎচন্দ্র রসস্রষ্টা রূপেই শেষ জীবনে প্রকটিত। কিন্তু যখন

একবারে নট, সঙ্গীতজ্ঞ, যন্ত্রী এবং কাব্যরসজ্ঞ কবি—হত না নতন নতন রূপেই তাঁরাকে দেখিয়াছি।—শরৎচন্দ্র চিরদিনই বেশবোয়া—

কোন বিধা তাঁরাকে কখনো বাধা দিতে পারিত না।—আমাদের খজুরপুত্রের বাড়ীর পাশেই একটা মসজিদ ছিল

এক হইত এখনও আছে। তাহার মধ্যে কতকগুলো কবর আছে। কত গণীর অমায়িক অঙ্কুর বাত্মি হইত কবরস্থানই

মধ্যেই কাটিয়া গিয়াছে। শরৎচন্দ্রের বীজী চলিতেছে—না হয় হাবমোনিরমসহ গান চলিতেছে এবং আমরা হুঁচকার জনে

বসিয়া তন্ময় হইয়া শুনিতেছি।—কোনও গল্পের রায়ে সেই হৃদয়ের শুভ্র প্রাঙ্গণ চরম হইতে গানের শব্দ, কখনো ‘যমানিয়া’ নদীর তীর হইতে বাণীর আওয়াজ ভাসিয়া আসিলে মেজলা মেজবোদিকে শুনাইয়া বলতেন, এ ভাড়াচন্দ্রের কাণ্ড।—আমাদের দল একদিন বায়ুপথে ভাসিয়া আসা গানের এক লাইন আবিষ্কার করিল—

‘আমি ছুদিন আসিনি, ছুদিন দেখিনি
অমনি মুদল আঁখি।’

ইহাও পরে দাদাদের ঠিকখানায় তাঁহার কণ্ঠের আরও গান আমরা ভিতর হইতে শুনিয়াছি; কিন্তু বাণী কখনো সে সব বৈঠকের মধ্যে তিনি বাজান নাই। নবকৃষ্ণ ভাটচাঁদের একটি গান তাঁহার প্রিয় ছিল—

‘গোকুলের মধু ফুসে গেল,
আঁখির আঁজ কুঞ্জন।—’

শরৎচন্দ্র শুধু যে গানই জানতেন তা নয়। তিনি বেশ ভাল তালচীও ছিলেন। একবার কলকাতায় এক রবিবারসন্ধ্যায় আসরে সাহিত্য ও সঙ্গীত সভার আয়োজন হয়েছে। শরৎচন্দ্রের চেষ্টায় সভা আয়োজিত। তিনি সভার তাকাতা ঠেস দিবে কসে আছেন। বীন্দ্রনাথও সে সভার আসবার কথা ছিল, কিন্তু সমাধায়ে তিনি আসতে পারলেন না।

সভায় কাব্যতাপস, বীন্দ্রনাথ ইত্যাদির ব্যবস্থা ছিল। কবিতা পাঠ প্রভৃতি হয়ে যাবার পর গান আরম্ভ হল। কিন্তু ভাল

সঙ্গীত-যন্ত্র কেনার ব্যাপারে আগে

মনে আসে **ডোয়ার্কিনের**



কথা, এটা
খুবই স্বাভা-
বিক, কেমনা
সবাই জানেন
ডোয়ার্কিনের
১৮৭৫ সাল
থেকে দীর্ঘ-
দিনের অতি-
জতার কলে

তাদের প্রতিষ্ঠা যন্ত্র নিখুঁত রূপ পেয়েছে।

কোন যন্ত্রের আয়োজন উল্লেখ করে মূল্য-তালিকার
জন্ম লিখুন।

ডোয়ার্কিন এণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ

শো-রুম :—৮/২, এসপ্ল্যান্ড ইন্সট. কলিকাতা - ১

তবলাচীর অভাবে গান তেমন জমলো না। তখন শরৎচন্দ্র নিজেকে আর ছির রাখতে না পেয়ে একটি আফিং আঁব চাবের ভোগাভ কয়েক বলে লেগে পড়লেন। তারপর সত্য ও গান দুই ভয়ে উঠতে আর দেবী হল না। সত্য শেষে সকলে ধরলেন তাঁকে—কোথায় এমন সুন্দর বাড়িতে লিখলেন? শ্রিত হাসির বেগটুকু ধুপে এঁকে শরৎচন্দ্র ভাব দিলেন—আমায় সব সময়ই বর্ধাযলুকে; তবে তবলাটা লিখেছি লোকের এক তবলাচীর কাছে। শুধু তবলাই নয়—সেতারও পাঁজাতে পানতেন তিনি চমৎকার। হুজুরি পরে একদিন পানিত্রাস সামন্তাভেড়ের বাড়ীতে বন্ধুসকলের লেভার গুলিয়েছিলেন তাদের অমুরোধেই। এককালে গানটাই ছিল শরৎচন্দ্রের জীবিকা; পরে লিখন হল তাঁর সাধনা। সেই লাবনার সিঁহিলাভ কয়েক তিনি তাঁর প্রিয় গান ভাগ করতে পারেন নি। পরবর্তী জীবনে গান না গাইলেও শুনতেন প্রচুর। এইভাবে একটি রেডিও সেট কিনে রেখেছিলেন সামন্তাভেড়ের বাড়ীতে। এখনও ভয় অবস্থায় সেটিকে দেখতে পাওনা যায়। লাক্ষ্যভেড়ে তাঁর শেষ জীবনের অসঙ্গ অংশটি সত্যিই স্বপ্নের আবহাওয়ার তনুপূ ছিল। জীবনের সানাক্ষে গড়গড়া তাকে কত অলস অপরাহ্নে বাড়ীর বাবাকায় ইজিচেসারে বসে দিগন্ত প্রসারিত মার্চের ওপর গিগে যেব ঢাকা কপনায়ারের দিকে নিম্পসক চোখে চেয়ে থাকতে জীবনরূপকার শরৎচন্দ্রের মনে কত কথা আর গানই না গুলন কুলেছে তা কে জানে।

আমার কথা (৫৭)

শ্রীমতী ইলা বসু



শ্রীমতী ইলা বসু

সঙ্গীতের পরিবেশ বীতার জন্ম—মাত্র ছয় বৎসর বয়সে বিনি নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন—পরবর্তীকালে বিনি বাংলা ভাষা ভাষ্যের সঙ্গীতে এক বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করেছেন—সেই শ্রীমতী ইলা বসু বলেন :

১১৩৬ সালের ১০ই আগষ্ট তাওড়া পক্ষানন্তলার জন্মটাই। বাবা শ্রীবসন্তকুমার চক্রবর্তী ডাকনিভাগের অবসরপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন, আর মা হলেন শ্রীমতী নির্মলা দেবী। রাজসাতী জেলার বাগেশপুর হল আমাদের স্বগ্রাম। প্রবেশিকা প্রবী পর্যন্ত লেখাপড়া করেছি। চারি বৎসর পূর্বের তাওড়া জেলা সম্মেলনে প্রথম গান করি—পনের বৎসর বয়সে এলাহাবাদ নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলনে যোগ দিই এক তথ্যের প্রথম গানে প্রথম হয়ে স্বর্ণপদক ও অনার্স সাটফিকেট পাই। তার আগের বছর নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনে গান গাই। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে আমার প্রথম গুরু ছিলেন জীননীগোপাল মিত্র ও পরে শ্রীধরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র। শ্রীধর গান্ধীর নিকট, আমার ডাই নীপক তবলা শেখে। প্রায় বার বৎসর আগে আমি কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের শিশু বিভাগে যোগদান করি। পরে আমি উহার সঙ্গীত-শিল্পী হই। হিন্দুস্থানি বেকর্ডে ৬অনুপম

ঘটকের পরিচালনার আমার প্রথম বেকর্ড 'মোর গানেরই উপধম্ম' হয়। ইতার পর এচ, এম, ডি তে শ্রীনিয়ম লাভিড়ার শিক্ষাবীনে বেকর্ড হল 'বনে বনে গাহে কোহেলিয়া।' এ পর্যন্ত আমার গাওয়া গানের অনেক বেকর্ড হয়েছে। শারদীয়ার আমার বেকর্ড হবে 'তোমাংই বেসেছি ভালো' ও 'ছোট করে বলতে গেলে গল্প।' ছোট বয়স যদিও প্রথম প্রথম গান শিখি, পরবর্তী সময়ে ঠুংরী, দাদরা ও গজল ভাসভাবে আদৃত করি। ছায়াছবিতে আমি নেপথ্য গায়িকা হিসাবে গান গেয়েছি। বর্তমানে 'নুহোরই তালে ভালো,' 'এ জ্বর সে জ্বর নয়,' 'আকাশ পাভাল,' 'সুখা ও সারহাদ'-এ গানে অংশ গ্রহণ করেছি। হিন্দী ভাষার অনুদিত রবীন্দ্র-সঙ্গীত আমি গেয়ে থাকি। শ্রীঅশোক বসুর সহিত আমি পরিণয় সূত্র আবদ্ধ। আমার 'হরি' হল কুকুর শোবা এবং তজ্জন্ত আমি অনেক টাকা খরচ করে থাকি। বৎসবে কয়েক মাস পাটনার আমার কাকার নিকট অস্থান করি। আমার মনে হয় যে আধুনিক সঙ্গীতের সহিত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সংমিশ্রণ হলে শ্রোতাদের মনের গভীরে রেখাপাত করে। গজল গান আমার খুব ভাল লাগে।

To be without some of the things you want is
an indispensable part of happiness.

—Bertrand Russel

দাঁত ওঠার ব্যথা?

দেখুন পিরামীড ব্র্যাণ্ড গ্লিসারীন্ কেমন করে
দাঁত ওঠা সহজ করে তোলে।



দাঁত ওঠার সমস্যা? মাড়ীর ব্যথা? একটা নরম কাপড়ে আপনার
আঙ্গুল জড়িয়ে পিরামীড গ্লিসারীনে একটু আঙ্গুলটা ডুবিয়ে
নিন তারপর আন্তে আন্তে শিশুর মাড়ীতে মালিশ করে দিন
এবং তাড়াতাড়ি ব্যথা কমে যাবে আর এর মিষ্টি ও হৃদয়
শিশুদের প্রিয়। এটা বিস্তৃত এবং গৃহকর্মে, ওষুধ হিসাবে, প্রসাধনে
ও নানারকম ভাবে সারা বছরই কাজে লাগে—আপনার হাতের
কাছেই একটা বোতল রাখুন।

PYRAMID
GLYCERIN

বিনামূল্যে

বিনামূল্যে পুস্তিকা : এই কুশনটি ভরে নীচের ঠিকানায় পাঠান :
হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, পোস্ট অফিস বক্স নং ৪০৯, বোম্বাই।

আমাকে অনুগ্রহ করে পিরামীড ব্র্যাণ্ড গ্লিসারীনের গৃহকর্মে ব্যবহার
প্রণালী পুস্তিকা বিনামূল্যে পাঠান।

আমার নাম ও ঠিকানা

আমার ওষুধের দোকানের নাম ও ঠিকানা

P.N.C

ডিস্ট্রিবিউটারস : আই. সি. আই. (আই) প্রাইভেট লি; কলিকাতা, বোম্বাই, দিল্লী, মাদ্রাস

বাঙলা অভিধান সংকলন

শ্রীশ্রীশ্রীশ্রীশ্রীশ্রী

(৩)

১৮৩৩, ১২ই জানুয়ারি সমাচার দর্পণে এক বিজ্ঞাপন প্রকাশ হয়—

শ্রীরামপুরের মুদ্রাশালার।

ইংরেজী ও বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত

পুস্তকের বিবরণ।

ইংরেজী ও বাঙ্গালা ভাষায়

১ বাঙ্গালা ডিক্সনারি।

অর্থাৎ শ্রীযুত ডাক্তার কেব্রি সাহেব কর্তৃক রচিত বাঙ্গালা ডিক্সনারি তাহাতে বাঙ্গালা শব্দ সমূহের অর্থ ইংরেজীতে ব্যক্ত আছে তাহা বৃহৎ তিন বাসামে প্রকাশিত মূল্য ৭০ টাকা।

২ শ্রীরামপুরের বাঙ্গালা ডিক্সনারি

২ বাসাম।

তাহার প্রথম বাসমে পূর্বোক্ত গ্রন্থের। শব্দ সংক্ষেপে অর্পিত আছে। ২৬০০০ বাঙ্গালা শব্দের অর্থ ইংরেজীতে করা গিয়াছে। দ্বিতীয় বাসমে ২৩১৬৩ ইংরেজী শব্দের অর্থ বাঙ্গালাতে লিখা গিয়াছে। দুই বাসমের মূল্য ১০ টাকা। পৃথকরূপে লটলে ৬টাকা। (অমূল্যচরণ বিজ্ঞানপত্র কৃত সংগ্রহ হতে)। উপরোক্ত ২নং অভিধানটি কেব্রি সাহেবের অভিধানেরই সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। জন জর্জ মার্সমান ১৮২৭ খৃঃ ইঙ্গ প্রকাশ করেন। (কেব্রি সাহেবের অভিধানের বিস্তৃত বিবরণ 'বাংলা গল্পের প্রথম' যুগ, সা-প-প, ৪৬শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা দ্রষ্টব্য)।

ডাঃ কেব্রি সাহেবের বৃহৎ অভিধানের পরে বাঙালী রচিত সর্বপ্রথম বর্ণানুক্রমিক বাঙলা অভিধান-কার বলে প্রসিদ্ধি আছে স্মার্ত পণ্ডিত, বাঙ্গালভাষার প্রথম অচার্য, সংস্কৃত কলেজ, চিন্মু পাঠশালার অধ্যাপক পণ্ডিত রামচন্দ্র বিজ্ঞানগীশেব। বিজ্ঞানগীশ মহাশয়ের ১৭৮৬ খৃঃ (১) (১৭০৭ শক ২১শে মাঘ) পালপাড়ায় জন্ম ও ১৮৭৪ খৃঃ ২রা মার্চ বৃত্ত। পিতা লক্ষ্মীনাথগণ তর্কভূষণ। বিজ্ঞানগীশ রাজা রামমোহন রায়েব অগ্রপ্রবণ্য কলিকাতায় এসে প্রথমে শাস্ত্রচর্চার প্রবৃত্ত হন আর অধ্যাপনা করেন। ৬ খানি বই লেখেন, তাব মধ্যে 'প্রথমেই তিনি একখানি অভিধান প্রস্তুত করেন। অভিধানখানির নাম—'বঙ্গভাষাভিধান'। ১৮১৭ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। দাম ১৭ টাকা। শোনা যায় তৎকালে এই অভিধান ও জ্যোতিষশাস্ত্রের গ্রন্থ 'জ্যোতিষ সঙ্গ্রহ'ব বিক্রয়সকল অর্থে তিনি সিমলা-তেহরার উত্তরে এক বাড়ী তিনিয়া তথায় বসবাস করেন। ১৮২০ সালে অভিধান-খানির ২য় সংস্করণ হয়। ইঙ্গ পূর্বাপেক্ষা বর্ধিতাকার। এই সংস্করণের স্বয়ং তিনি সোসাইটিকে বিক্রয় করেন। ইতিহাস-অমূল্যভানীরা এই অভিধানের যে কয়খানিই সন্ধান পেয়েছেন—সেগুলির কোনটারই আখ্যাপক নেই। কেব্রি সাহেব এই অভিধানখানিকে তৎকালে প্রেস্ট বিবেচনা করায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিস্তরণের জন্যে ২০০ কপি ক্রয় করেন।

এর পরে নাথ পাণ্ডা বাব মোহনপ্রসাদ ঠাকুরের। ইনি একখানি অভিধান রচনা করেন ১৮১৮ সালে।

এই ১৮১৮ সালেই পীতাম্বর মুখোপাধ্যায় সংস্কৃত অমরকোষ খানিকে অকারাদি ক্রমে সা ভয়ে বাঙলা ভাষায় তাব অর্থ প্রকাশ করে 'শব্দসিদ্ধি' নামে বাঙালীদের ব্যবহারোপযোগী অভিধান বের করেন। বইখানির আখ্যাপক এইরূপ—

"ভগবান অমরসিঃ। কৃত। অভিধান অকারাদিক্রমে। ভাষায়। বিবরণ করায় শব্দসিদ্ধি। নাম। রাখিয়া কলিকাতায় ছাপা। হইল। সন ১২২৫।"

বইখানির ভূমিকার শেষে গ্রন্থ সমাপ্তির তারিখ (১৭৪০ শক) এইভাবে লেখা আছে—

'গগন গণেশ ভূজ গর্ভবর্ষ ভূমিতে।

গ্রন্থ সমাপ্তর শাক জানিবা পণ্ডিতে ॥'

সমাচার দর্পণের (২৫ জুলাই ১৮১৮) নতুন বইয়ের এক ইস্তাহার প্রকাশ হয়—

"ইস্তাহার। শ্রীপীতাম্বর শর্মাঃ। এতদেন্দ্রীয় অনেক অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি ব্যাকরণাদি শাস্ত্র অপাঠ হেতু পত্রাদি লিখনকালীন শুদ্ধাশুদ্ধ বিবেচনা করিয়া লিখিতে অশক্ত এ কারণ এ আকিঞ্চন ভগবান অমরসিঃ কৃত অভিধান অকারাদিক্রমে অর্থাৎ ইংরাজী অর্থ ভেদ্যমান্যায় ছায় ভাষায় বিবরণিয়া দস্ত্য ভট্টা ব কাবের প্রভেদ করিয়া মেদনী রত্নসিদ্ধি নানা অভিধানের অর্থ দিয়া নানার্থ স্বরূপ ৪১১ পৃষ্ঠা এক গ্রন্থ কেতাব করিয়া উত্তম অক্ষরে ছাপাইয়াছে তাহার চাশিত বিক্রয় হইয়াছে শেষ এক শত আছে ছয় তকা মূল্য যাহার বাস্ত্য হয় তবে মোঃ উত্তরপাড়ার শ্রীযুক্ত চুর্ণচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে অথবা মোঃ কলিকাতার শ্রীযুক্ত দেওয়ান রামমোহন বায় মহাশয়ের সোসাইটি অথবা আস্থায় সভাতে চেষ্টা করিলে পাইবেন নিবেদন মিত।" (সংক্ষেপ-কথা, ১ম, ৬৬)।

১৮১১ সালে ইংরেজ পণ্ডিত ডাক্তার হোরাস হেয়মান উইলসন (Horace Hayman Wilson) এক সংস্কৃত-ইংরেজি অভিধান প্রস্তুত করেন। বইখানির নাম—A Dictionary in Sanskrit and English, translated. . from Original Compilation prepared by learned Natives for the college of Fort William, Calcutta 1819 পৃষ্ঠা সংখ্যা ১১০০। বইখানির দু বকম দাম ছিল—ভাল বিলিতি কাগজে ছাপা—১০০৭ আর পাটিনাই কাগজে ছাপা—৮০৭। ডাঃ উইলসন সাহেব ১৭৮৬ খৃঃ ২৩এ সেপ্টেম্বর লণ্ডনের মোহা স্কোয়ারে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৮০৮ সালে দ্বৈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীন ডাক্তার হয়ে ভারতে আসেন। রসায়ন-শাস্ত্রে পারদর্শী বলে ট্যাকসালে assay master নিযুক্ত হন। কয়েক বছর পরে ১৮১১-৩৩ খৃঃ পূর্ণপ্রণয়নিক সোসাইটি অব বেঙ্গলের সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। অবসর সময় সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন। ১৮১৩ সালে কালিহাসের মেঘনুতের ইংরেজি অধ্যয়ন, তারপর অনেকগুলি কাব্য অনুবাদ করেন। এই সময়েই সংস্কৃত-ইংরেজি অভিধানের রচনা হয়। তিনি হিন্দুদের খিয়েটার নিয়েও গ্রন্থ লেখেন—রামচরিতের অনুবাদ করলে তাঁরই অধ্যাক্তায় প্রসন্নকুমার ঠাকুরের বাড়িতে এই নাটক অভিনীত হয় (১৮৩১)। ১৮৩৩ সালে অক্সফোর্ডে সংস্কৃতের অধ্যাপক, ১৮৩৬ই ইণ্ডিয়া হাউস লাইব্রেরার অধ্যক্ষ। ১৮৬০ সালে ৮ই মে মৃত্যু।

ডাঃ উইলসন সাহেবের অভিধানখানির একদিকে সংস্কৃত ও আর্য এতদিকে ইংরেজি শব্দ। ইংরেজিতে এক এক শব্দের দু'তিন বহুবচনের মানে আর নানা কোষ গ্রন্থ থেকে তার প্রমাণ দেওয়া আছে।

১৮২০ সালে ক্যাপ্টেন ফেল (Captain Fael) সাহেব মেদিনী কোষ ইংরেজিতে তর্জমা করে সংস্কৃত-ইংরেজি এক অভিধান প্রস্তুত করেন। এটি বইখানি ইংলণ্ডে ধীরা সংস্কৃত শিক্ষা করতে চান তাদের জন্যই বিশেষ ভাবে রচিত হয়েছে।

রেভাঃ উইলিয়াম মর্টন (Rev. William Morton) সাহেবের বাঙলাভাষার এক অভিধানের উল্লেখ পাওয়া যায়। বইখানির নাম—A Dictionary of the Bengali Language, Calcutta 1828. বইখানি এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলে রক্ষিত আছে। এ ছাড়াও তিনি "Biblical and Theological Dictionary, English and Bengali, Calcutta 1845" নামে একখানি অভিধান রচনা করেন। ইহাও উক্ত সোসাইটিতে রক্ষিত আছে।

ডাঃ ফেলিক্স কেব (Felix Carey) ও রামকমল সেন (১৭৮০—১৮৪৪) (যিনি তৎকালে ব্যাক্র অব বেঙ্গলের দেওয়ান ছিলেন) উভয় মিলিয়া দু'খণ্ডে এক অভিধান তৈরী করেন। অভিধানখানির স্বরূপান্তর প্রায় দু'বছরের মধ্যেই ফিলিক্স কেবের মৃত্যু হয় (১৮২৩)। পরে রামকমল সেন সংস্কৃত কলেজের সম্পাদক হন। তিনি গ্রন্থকালচার ও হটকালচার সোসাইটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ইনি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের পিতৃমহ। কেব ও রামকমল সেন উভয়ের মিলিত যে অভিধান তার প্রস্তুতির সর্বান সমাচার দর্পণে (১৮২১, ৩১শে মার্চ) প্রকাশ হয়েছিল—

"ক্রীত ফিলিক্স কেব সাহেব ও শ্রীরামকমল সেন কর্তৃক ইংরেজী ও বাঙ্গলা ভাষাতে এক অভিধান তর্জমা হইয়া শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে ছাপা হইতেছে সে পুস্তক ক্ষুদ্র অক্ষরে দুই বালামে কমবেশ হাজার পৃষ্ঠা হইবেক। যে ব্যক্তি সহী করিবেন তিনি পঞ্চাশ টাকাত পাঠিবেন তত্ত্বর লোকোদগের লইতে হইলে সত্ত্বি টাকা লাগিবেক যাহারদিগের সঙ্গ করিবার বাসনা থাকে তাহার হিন্দু স্থানীয় প্রেসে ক্রীত পেরের সাহেবের নিকটে কিবা মোকাম লালবাজারে ক্রীত থাকার সাহেবের নিকটে কিবা শ্রীরামপুরের ক্রীত ফিলিক্স কেব সাহেবের নিকটে আপন নাম পাঠাইবেক।"

বিলেতে জনসন সাহেবের ইংরেজি ডিক্সনারীখানি খুব বিখ্যাত। এদেশেও তৎকালে ইংরেজি শিকানবীশদের কাছে অভিধানখানি বিশেষ প্রয়োজনীয় ছিল। জন মেণ্ডিস (John Mendies) সাহেব এই অভিধানখানিকে ইংরেজি ও বাঙলা ভাষায় প্রকাশ করেন। নাম—Companion to Johnson's Dictionary in English and Bengalese. ইহা শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় ছাপা হয়। দাম হয় ৮/-। ১৮২৮ সালে এই গ্রন্থের ২য় খণ্ড প্রকাশ হয়। ছাপাও হয় ঐ শ্রীরামপুরে।

১৮২৫ সালের ২২এ জাহ্নসারির সমাচার দর্পণে দেখা যায়— "মোঃ কলুটোলা চন্দ্রিকা বঙ্গালয়ে ক্রীলোবণ্ডার সাহেব কর্তৃক সংগৃহীত জানসেন ডিক্সনারী ইংরাজী সমেত বাঙ্গলা" অভিধানের বিজ্ঞাপন।

১৮ই জুন ১৮২৫এব বিজ্ঞাপনে দেখা যায় "জনসন ডিক্সিনারি।—ক্রীত বাবু রামকমল সেন ডাক্তার জানসেন সাহেব

কৃত ইংরাজী ডেক্সিনারিয়ার তাবৎ শব্দের বখার্ব অর্থ বাঙ্গলা ভাষাতে তর্জমা করিয়া জীবামপুরের ছাপাখানায় ছাপাটতেছেন। এই পুস্তকের দুই নম্বর অর্থাৎ প্রায় দুই শত পৃষ্ঠা প্রস্তুত হইয়া গ্রাহকদের নিকট প্রেরিত হইতেছে এবং ইহার পর এক ২ নম্বর যেমন ছাপা হইবেক তেমন গ্রাহকদের নিকট প্রেরণ করা যাইবেক। এই পুস্তকের প্রত্যেক নম্বরের মূল্য ছয় টাকা নিরূপিত হইয়াছে...।" (সংস্কৃত কথ্য, ১ম, ৭৪)। ১৮৩৪ সালে এই গ্রন্থের ২য় খণ্ড সমাপ্ত হয়। নাম— "A Dictionary in English and Bengalee, translated from Todd's Edition of Johnson's English Dictionary, 2 Vols. Seerampore Press, 1834."

শ্রীরামপুরের পদ্মসী কেরী সাহেবের সহকর্মী জোন্সার মার্সমান (J. C. Marshman) যে অভিধানখানি সংকলন করেন, তার নাম "A Dictionary of the Bengali Language," etc. ইহা দু'খণ্ডে প্রকাশিত হয়। ১ম খণ্ড ১৮২৭ খৃঃ পত্র সংখ্যা ৫৩১ এবং ২য় খণ্ড ১৮২৮ খৃঃ পত্র সংখ্যা ৪৪০। এই অভিধানটি শ্রীরামপুরে ছাপা হয়।

১৮২৭ সালে তারাচাঁদ চক্রবর্তী এক অভিধান করেন। অভিধানখানির নাম—A Dictionary of Bengali, Calcutta, 1827. "ইংরাজি বালা অভিধান।" তারাচাঁদ তৎকালে 'ইং ক্যালকটা' দলের ও পরে বর্ধমান রাজের অধীনে কর্ম করিতেন।

১৮২১ সালে দামধন সেন—পারস্য ইংরেজি অভিধান "Dictionary in Persian and English, Calcutta, 1829" রচনা করেন।

১৮৩১ সালে 'শব্দকামধূরাভিধানের' এক বিজ্ঞাপন প্রকাশ হয়। তাতে তিন জন পাণ্ডিত ও একজন সংগ্রহকারের স্বাক্ষর থাকে এবং উহা চন্দ্রিকা বঙ্গালয়ে মুদ্রিত হবে বলে বিজ্ঞাপিত হয়।

১৮৩২ সালে জগন্নাথ মল্লিক সংস্কৃত অমরকোষের প্রত্যেকটি শব্দের প্রতিশব্দ দিয়ে বাঙলা ভাষায় প্রকাশ করেন। বইখানির পৃষ্ঠ সংখ্যা ছিল ৪০০। সমাচার দর্পণের (৫ই ফেব্রুয়ারি ১৮৩২) সংবাদ—

"ক্রীত বাবু জগন্নাথ মল্লিক সম্প্রতি সংস্কৃত অমরকোষ গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন। তাহাতে প্রত্যেক সংস্কৃতের অর্থ বাঙ্গলাতে প্রস্তুত হইয়াছে তাহা প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠা পরিমিত হইবে। এই মূল গ্রন্থে বাহাদুর আবদুল তাহাদের ইহাতে মহোদয়পকার হইবে। এই গ্রন্থ উক্ত বাবু অল্পমতিতে ক্রীত বাবু রামোদর বিদ্যালঙ্কার কর্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে।"

১৮৩৩ সালে স্যার গ্রেভস চামনি হটন (Sir G. C. Haughton. ১৭৮৮—১৮৪৯) এক বাঙলা-ইংরেজি ও সংস্কৃত-ইংরেজি অভিধান প্রণয়ন করেন। স্যার হটন ১৮০৮ সালে ভারতে এসে বেঙ্গল আর্মিতে যোগ দেন। বারাসাতে ও কোর্ট উইলিয়াম কলেজে এদেশীয় ভাষা শিক্ষা করেন। স্বাস্থ্যভঙ্গ হেতু ১৮১৫ সালে বিলাতে ফিরে যান—সেখানে প্রাচীণ ভাষায় অধ্যাপক হন এবং একখানি বাংলা-অভিধান তৈরী করেন। অভিধানখানির নাম— "A Dictionary, Bengali and Sanskrit Explained in English..to which is

added an index, serving as a reversed dictionary, London 1833.* সমাচার দর্পণে (১৮৩৪, ৪ঠা জুন) প্রকাশ—আমি। তুমি। পরম আপ্যায়িত হইলাম ত্রিযুক্ত শ্রবণ শ্রবণ হোটেল সাহেব লণ্ডন নগরে সংস্কৃত ও বাংলা ও ইংরাজিতে নৃত্য এক ডিক্সনারী মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন এবং ঐ গ্রন্থের শেষে এতদ্রূপ নির্ঘণ্ট দিয়াছেন—যে তাহা উলট করিয়া পড়িলে ইংরেজী ভাষায় সংস্কৃত ও বাংলা অর্থ লভ্য হয় তাহাদ মূল্য এখানে ৮০ টাকারও অধিক।

১৮৩৭ সালে ডি'রোজারিও (P. S. D'Rozario) "A Dictionary of Principal Languages of Bengal Presidency in Bengali, Hindi, 1837" নামে একখানি অভিধান করেন।

১৮৩৭ সালে আর একখানি অভিধান পাওয়া যায়। নাম—Dictionary of English, Bengali & Manipuri গ্রন্থকারের নাম অজ্ঞাত।

১৮৩৮ সালে ব্রজনাথ তর্কভূষণ রচিত অভিধান। "শ্রীব্রজনাথ তর্কভূষণ এক পণ্ডিত তাঁহারে সর্বলোকে স্নাত আছেন তিনি এতদ্বন্দ্বীয় ভাষায় এক অভিধান প্রস্তুত করিতেছেন—এই অভিধান এতদ্বন্দ্বীয় সর্বলোকের উপকারক হইবেক কাণে বাংলা ভাষায় এতদ্রূপ অভিধান প্রায় হয় নাই ত্রিযুক্ত রামচন্দ্র বিজ্ঞানাগীশ কর্তৃক রচিত যে অভিধান বাহা এক্ষণে ইস্থলে ব্যবহার্য হইতেছে—সেই অভিধান বাহা অধিক বাংলা শিক্ষা করেন তাঁহাদিগের উপকারক নহে এই ভারি অভিধান পূর্ব পূর্বোক্ত সকল অভিধানাপেক্ষা অত্যন্তম হইবে কারণ ইহা অত্যন্তম বিজ্ঞ কর্তৃক প্রস্তুত হইতেছে। (সমাচার দর্পণ, ৮ই আগষ্ট ১৮৩৮)।

সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের অভিধান—সমাচার দর্পণের ১৮ই আগষ্ট ১৮৩৮এব সংবাদে প্রকাশ "পারস্ত ও বঙ্গভাষাতে অভিধান। আদালতের কার্যে পারস্ত ভাষা উঠিয়া যাওয়াতে বঙ্গভাষায় অত্যন্ত সমাদর হইয়াছে। ১০-বিজ্ঞবর ত্রিযুক্ত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য পারস্ত ও বঙ্গভাষাতে এক অভিধান মুদ্রাঙ্কিত করিলেন। তদ্ব্যতীত পণ্ডিত শত্রেয় অধিক পারস্ত শব্দের অর্থ বঙ্গীয় সাধু ভাষাতে সংগ্রহ করিয়াছেন। এইখানে ঐ মহোপকারক বহুব্যা গ্রন্থ সুসম্পন্ন হইয়া অত্যন্ত মূল্য একটা টাকা মারে স্থিতিকৃত হইয়াছে।"

জয়গোপাল তর্কালঙ্কার বাঙলা ভাষা সংক্রান্ত সংস্কৃত শব্দ সকল করেন। নাম—বঙ্গাভিধান। সেই শব্দগুলি অকারাদিক্রমে সাজান হয় এবং তার সঙ্গে ইংরেজি ভাষায় অর্থও প্রকাশ করেন। যেমন—

অংশ	s.	a share, a part
অংশী	s.	a partner
অকথা	a.	unutterable
অকথা কথা	s.	unutterable word

অকর্তব্য	a.	improper
অকথ্য	a.	useless
অকল্যাণ	s.	misfortune

...ইত্যাদি। (সং-সং-কথা, ২য়, ১১৫)।

এই ১৮৩৮ সালে লক্ষ্মীনারায়ণ জায়ালঙ্কার ভট্টাচার্য্য যিনি সংস্কৃত কলেজের পুস্তকাধ্যক্ষ (১৮২৪-৩১) ছিলেন ও পরে মুন্সেফ, সদর আদালত, পূর্ণিমা জেলায় আদালতের জজ পণ্ডিত হন, তিনি আইন সংক্রান্ত পারস্ত শব্দের বাঙলা সমেত অভিধান প্রস্তুত করেন। নাম—"ব্যবহার-বিচার শকাভিধান। সম্বত ১৮১৫, আষাঢ়, পূঃ ৩৬।" "ব্যবহার বিচারোপযোগি পারস্ত শব্দের সাধু গোড়ায় ভাষায় অনুবাদ।" ইহা কলকাতায় পূর্ণচন্দ্রদাস যন্ত্র মুদ্রিত হয়।

এই গ্রন্থের ভূমিকায় গ্রন্থকার বাহা লিখেছেন—তাহা আমি সংবাদপত্রে সেকালের কথা ১ম খণ্ডের ৪১৬ পৃঃ হতে উদ্ধৃত করছি—

"সমাবেদন মিদং

ভারতবর্ষস্থ রাজধানীর সকল বিচারস্থলে পারস্ত ভাষার পরিবর্তে দেশীয় ভাষা দ্বারা রাজ শাসন ও রাজ্য আদায় ও অল্প অল্প তাবৎ কর্তৃক নির্বাহ করিতে সুপ্রিয় কৌশল হইতে যে অবশি আজ্ঞা হইয়াছে এইক্ষণ পর্য্যন্ত তাহা সুচাঞ্চল্য রূপে নির্বাহ হওয়া শুদ্ধরূপে প্রচ্যুত বঙ্গদেশে। মধ্যে নানা স্থানে মানাধি শব্দ প্রয়োগ হইয়া অত্যন্ত গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে ইহাতে বোধ হয় ঐ সকল স্থানের ব্যবহার নিষ্পত্তি হইয়া যখন দ্বিতীয়বিচারার্থে সদরদেওয়ানিতে উপস্থিত হইবে সেসময়ে বিচারকর্তাদিগের এবং পাঠকলেখকদিগের অনর্থক কাল হয়ণ ও বৈরক্তি জন্মিতে পারে অতএব এই বিষয়ের যত আবশ্যক পারস্ত শব্দ আমি আপন প্রাপ্তব্যবহার বিচার সময়ে ক্রমে ২ প্রাপ্ত হইয়াছি তাহার অর্থ মিতাকফাধি ধর্মশাস্ত্র হইতে সকলন করিয়া সাধু-গোড়ায় ভাষায় এক অভিধান প্রস্তুত করিয়া তাহা সুপ্রিয়কেটের পণ্ডিত ত্রিযুক্ত রামজয় তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য মহাশয় কর্তৃক অনেক শব্দ পুনর্নিবেচিত হইয়া মুদ্রিত হইল আমার বাসনা এই পুস্তক ২৮-রাজধানীস্থ সকল বিচারকর্তা মহাশয়দিগের নিকটে স্বীয়মুখ্যে বিনা মূল্যে বিতরণ করিব তাহাতে রাজকর্মে নির্বাহ সুচাঞ্চল্যে হইতে পারে তাহাতে আমার পরমোপকার হইবে ইতি।

পুনর্বার নিবেদন পারস্ত শব্দের গোড়াকরে লিখেন কোন স্থানে বর্ষাবস্ত হওয়াতে মহাশয়েরা ক্রটি ধরিলেন না কারণ স্বরাশ্রয় পুস্তকাকর বিজ্ঞাস করা যায় নাই পরে তাহাতে প্রয়োজনও নাই কেবল সাধু ভাষা গোড়ায় দিগদর্শনার্থ ইহা প্রস্তুত করা নতুবা পারস্তাভিধান অনেক আছে কিম্বিকং বিজ্ঞবরেন শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ জায়ালঙ্কার পণ্ডিত।

সদরআমীন পূর্ণিয়া।"

[ক্রমশঃ।

Money can't buy health, but I'd settle for a diamond-studded wheelchair.

—Dorothy Parker, authoress



দুস্প্রাপ্য জিনিস সংরক্ষণ

পুরনো দুস্প্রাপ্য জিনিসের দাম সব সময়ই রয়েছে, পরেও থাকবে। বরং বলা যায়, দিন বতাই বাবে, অতীত যুগের যে কোন সম্পদের মূল্য বাড়বে বই কমবে না। তুল্য জিনিস সংগ্রহ ও সংরক্ষণের দাবী সেক্ষেত্রেই ওঠে।

একটা জিনিস বলতে হয় এই সূত্রে এবং সে গোড়াতেই। এইমাত্র দাম বা মূল্যের কথা বা বলা হলো, সে বস্তুগত বস্তুটা নয়, তার চেয়ে বেশি কালগত। অর্থাৎ এ অনেকটা বস্তু বা শিল্পের ঐতিহাসিক মূল্য—ওর প্রাচীনত্বের মর্যাদা।

সভ্যতাগর্ভী ও অগ্রসর দেশসমূহে পুরনো দুস্প্রাপ্য জিনিসের সমাদর বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। কত অমূল্যস্বান ও কত খননকার্যের প্রয়োজন হয়ে থাকে একজন্মে, বলবার নয়। উত্তম, দৃষ্টি ও প্রবৃত্ত এই যেখানে নিবিড়ভাবে থাকে, সেখানেই দুস্প্রাপ্য জিনিসের সন্ধান পাওয়া সম্ভবপর।

যা কিছু পুরনো, তা-ই পরিত্যাজ্য, এ ধারণা অচল প্রমাণিত হয়েছে বহুকাল। অমূল্যস্বানে অতীতের গর্ভে নিহিত অনেক জিনিসই বর্তমানের চোখে নতুন ঠেকতে পারে। এই যে সহস্রা চোখে লাগা, মনের ওপর আপনি প্রভাব বিস্তার, পুরনো সামগ্রীর মূল্য স্বীকৃত ও নির্ণীত হয় সর্বাগ্রে এইখানেই।

পুরনো দিনের মুদ্রা, ডাকটিকিট, শিল্পকলা প্রভৃতির মূল্য অনস্বীকার্য। এই ধরনের দুস্প্রাপ্য জিনিস সংগ্রহ ও সংরক্ষণে পশ্চিমী দেশগুলোর প্রবৃত্ত ও তৎপরতার অভাব নেই। পূর্বে বাই হোক, এ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে পশ্চিমী দেশগুলোর মতো ভারতও এখন এগিয়ে আসতে চাইছে বেশ কিছুটা।

প্রাচীন যুগের দুস্প্রাপ্য জিনিসের জন্ম সোভিয়েট দেশের দরদ ও মনোবৃত্তি তুলনা হয় না। একটি মাত্র ঘটনা থেকেই এই উক্তির যথার্থ্য উপলব্ধি করা যেতে পারে। রুশ বিপ্লব তখন পুরাতন চলেছে—সমগ্র বিশ্ব তখন প্রকল্পিত। পাছে সব ধ্বংস হয়ে যায়, তাই পুরনো তুল্য জিনিস সংগ্রহে বেরিয়ে পড়ে একটি প্রকাণ্ড দল। সেদিনের অমূল্য সংগ্রহ বা শিল্প সন্ধান নিয়েই কশিয়ার বিখ্যাত সংগ্রহশালাগুলো (মিউজিয়াম) আজও গর্ব করতে পারছে।

এখনকার যুগে অবশ্য পুরনো জিনিসের দ্বারী বাজার গড়ে উঠেছে প্রাচ্য-প্রত্যাচ্য অনেক দেশেই। বিশেষতঃ এই প্রবীর বড় বড় বাজার বা ব্যবসা কেন্দ্রে বহু দিন থেকেই চালু রয়েছে। দুস্প্রাপ্য আসবাবই হোক, অপর কোন মনোরম শিল্প সামগ্রীই হোক, ব্যাপকভাবে বাজার

এর মিলবেই। পুরনো শিল্পদ্রব্য নিয়ে নিয়মিত ব্যবসা-বাণিজ্য করে চলেছেন, বিশ্বের এমন কয়েকটি নামকরা ফাশ বা সংস্থা : ক্রিষ্টি'জ ও সোফেবাই'জ (লণ্ডন), পার্কে-বার্ণেটস (নিউইয়র্ক), গ্যালারী কার্পেণ্টার (প্যারিস) ইত্যাদি।

একটি কথা মানতেই হবে—সাধারণভাবে পুরনো দুস্প্রাপ্য জিনিসের মূল্য ক্রমে বাড়বেই, সহসা কমবে না। বিশেষতঃ বাজারের সাম্প্রতিক বিবরণ—কয়েক বছর আগেও সেখানে প্রাক্কলঙ্ঘিয়া (১৮-১) যুগের জহরতের যে দাম ছিল, আজ তা ঠাঁড়িয়েছে অন্ততঃ তিনগুণ। প্রাচীন চিত্রকলার মূল্যও আজকের দিনে বেড়েছে অতিমাত্রায়। বার্নাড বাকটের হাতের একখানি শিল্পের প্রদর্শন এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে। কয়েক বছর আগেও এর বাজার মূল্য যেখানে ছিল মাত্র ১৫ পাউণ্ড, আজ ২৫০ পাউণ্ডের কমে তা পাবার উপাস নেই।

পুরাতত্ত্ববিদদের আবিষ্কৃত বিভিন্ন অমূল্য জিনিস তথা সেকালের দুস্প্রাপ্য শিল্প-সামগ্রীর দাম বাড়বার পেছনে অবশ্য কয়েকটি কারণই রয়েছে। একটি প্রধান কারণ বা সূত্র—সরবরাহ থেকে চাহিদা বৃদ্ধি। মানুষ পুরনো সম্পদের মাধ্যমে পুরনো যুগের সাথে পরিচিত হতে চায় কিন্তু সে সম্পদ চাওয়া মাত্রই হাতে পৌছতে পারে না। প্যারিসের বাজারে দু' বছর আগে মাত্র চল্লিশ পাউণ্ড মূল্যের দুস্প্রাপ্য শিল্প সংগ্রহ সম্ভব হয়েছিল। বাইরে এদের চাহিদা এতো বেশি হয়ে পড়ে যে, দেখতে দেখতে এই খাতে পাঁচগুণ অর্থাৎ ৪০ লক্ষ পাউণ্ড এসে যায়।

মোটের ওপর, আজ এই নিয়ে স্বিমতের অবকাশ নেই যে, শতাব্দী আগেকার মুদ্রা, ডাকটিকিট, পুঁথি-পুস্তক (বিশেষ করে পাতুলিপি), শিল্প, ভাস্কর্য—এসকলের সংগ্রহ গুরুত্ব অপরিহার্য। কখন কখন কোতুহল আকর্ষণ করে কোন্ জিনিসের মূল্য কত ঠাঁড়াবে, কেউ বলতে পারে না। এই সব মহামূল্য সম্পদ জাতীয় সংগ্রহশালায় যত্ন করে রাখবার ব্যবস্থা হলে, সবচেয়ে ভালো হয়।

পুরনো তুল্য জিনিস সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ব্যাপারে সরকারী দায়িত্ব অনস্বীকার্য। মিউজিয়াম বা সংগ্রহশালায় রেখে, এবং প্রচার-পুঙ্খলা মারফত তাঁরাই এসকল সম্পদের দিকে সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন সহজে। ভারতের জাতীয় সরকার ও পুরাতত্ত্ব বিদগণ এদিকে উত্তেজিত রয়েছেন, এ আশার কথা। সম্প্রতি জাতিসংঘে প্রাচীন ভারতের শিল্প-সম্পদের একটি প্রদর্শনী হয়ে গেছে। এমনি ধরনের প্রদর্শনী দেশে-বিদেশে বহু বেশি হবে, তত্বাই ভালো, এতে সন্দেহ নেই।

তাসের ব্যবহার ও আধুনিক যুগ

আজকের দিনে এমন দেশ নিভাত্ত বিরল, যেখানে তাসের ব্যবহার নেই। জনকে উৎকৃষ্ট রাখবার এবং অবসর উপভোগের একটি চমৎকার মাধ্যম এই তাস। ব্রিজ, ব্র, হুইট, পোকার প্রভৃতি অসংখ্য বকমের তাস খেলা এযুগে চলতি। জুয়ার কেন্দ্র বা আড্ডাগুলোতেও তাস ব্যবহৃত হয় অভিমাত্রায়।

তাসের ব্যবহার ঠিক কোন যুগে ক অবস্থায় সূত্র হয়েছে, এ নিশ্চয় করে বলা যায় না। ভারতে কিন্তু এর প্রচলন ছিল বহু শতাব্দী আগেই। তবে আধুনিক যুগের বিজ্ঞানসম্মত তাস খেলা ইউরোপের অবদান, বিশেষ করে বৃটেনের। সে দেশ থেকেই সারা দুনিয়ার সম্ভারিত হয়েছে তাসের নতুন নতুন জনপ্রিয় খেলা।

ইতিহাস পর্যালোচনা করে জানা যায়, ইউরোপে তাস খেলার সূত্রপাত হয় চতুর্দশ শতকে। তখনকার দিনের তাস আজকের দিনের মতো এত সুন্দর ও মনোহর ছিল না, এ সহজেই অনুমেয়। আধুনিক যুগে বাজারে কত চিত্রাকর্ষক সুসুদৃশ তাস দেখতে পাওয়া যায়। এই উন্নতির জন্যে বিলেতের টমাস জা লা রিউ কোম্পানী বহুলাংশে দায়ী।

সে ১৮৩২ সালের কথা। তখন অবস্থি ইউরোপে যে তাস ব্যবহৃত হতো, সে হাতে টেনসিল করে। কাজটি সহজসাধ্যও ছিল না মোটেই, ব্যয়ও হতো প্রচুর। টমাস জা লা রিউ (তঁারই নামে পরে কোম্পানী হয়) ব্যাপারটি নিয়ে ভাবলেন—আবিকার করলেন তাস ছাপার মেশিন বা যন্ত্র। ১৮৩২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে চতুর্থ উইলিয়াম ঐ যুদ্ধ যন্ত্র দিয়ে তাস উৎপাদনের ছাড়পত্র তাঁকে অর্পণ করেন। এই অভিনব আবিকারের পর থেকে তাস ছাপা হয়ে চলে হরদম—অল্পাংশে তৈরী হয় তাসের এক একটি তাল। ক্রমে অনেক মনোহর শিল্পকাজ চলতে থাকে এর ওপর পাতায়—সাহেব, বিবি, গোলামকেও নানান ভঙ্গিতে বসানো হয়। ভালো ভালো ডিজাইনের তাস বাজারে বতই আসতে থাকে, তাসের ব্যবহারও বেড়ে যায় সেই অনুপাতেই।

তাস উৎপাদন এ যুগে কি পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে, সে সম্পর্কে একটি হিসাব পাওয়া গেছে। ১৮৩২ সালের আগে বছরে তাসের তাল তৈরী করা সম্ভব হতো প্রায় দুই লক্ষ। ১৮৫৭ সালে অর্ধাংশ বৃদ্ধি বহর হ'তে না হতেই ব্যাপক ব্যবহারে বছরে উৎপাদন ৮ লক্ষে দাঁড়ায়। এর পর শত বর্ষ অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। এই দীর্ঘ সময় মধ্যে উৎপাদনের মাত্রা ক্রমেই বৃদ্ধি হয়েছে, আজ তা পরিকার। এক্ষণে একমাত্র বৃটেনেই তাস তৈরী হয় বছরে ১০ কোটি তাল। আর ৮ কোটি তাল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। ইউরোপ ও আমেরিকার আজ শতকরা প্রায় ৮০টি গৃহেই তাসের নিয়মিত ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। জা লা রিউ কোম্পানীর ১২৫ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে লন্ডনে তাস ব্যবসায়ীদের একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫৭ সালে। সেইসঙ্গে একটি আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীরও আয়োজন করেছিলেন উক্ত নামজাদা ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান। ১৫টি দেশ থেকে ২১টি কোম্পানীর প্রতিনিধিরা সম্মেলনে বোগ দিয়েছিলেন আর স্বচিন্তিত অসংখ্য ডিজাইনের খেলায় তাস জমা হয়েছিল প্রদর্শনীতে।

অতীত দিনের এমন কি পাঁচ শত বছর আগেকারও রকমারী

তাস দেখতে পাওয়া যায় ঐ সময়। হাতীর দাঁত, কচ্ছপের খোলা, মাছের আঁব, জঙ্ঘা-চামড়া প্রভৃতি কত জিনিস দিয়ে তৈরী সে সকল তাস। রাজা প্রথম চার্লসের ব্যবহৃত এক তাল দামী তাস আলোচ্য প্রদর্শনীর একটি উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ ছিল। আর হাতে তৈরী পুরনো ডিজাইন বা নমুনার তাসের ছড়াছড়িও হয়েছিল তুলনার কম নয়।

আধুনিক যুগে খেলার তাস সত্যি একটি প্রকাণ্ড শিল্পে পরিণত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সরকারগণ এই খাতে কর বা রাজস্বও পেয়ে থাকেন বেশ মোটরকম। একমাত্র বৃটেন ও আমেরিকাতেই বছরে তাস কেনা হয় ১ কোটি তাল। ভারতেও তাস খেলার প্রসার দিন দিন বেড়েছে ছাড়া কমছে না। শুধু পুরুষরা নয়, অনেক ক্ষেত্রে নারীরাও এই খেলার বোগদান করছেন, তাও লক্ষ্য করার। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা পেলে এদেশেও তাসকে কেন্দ্র করে একটি বড় শিল্প গড়ে ওঠতে পারে। দেশীয় তাসের মান আশাহতরূপে উন্নত হলেই অর্থাৎ আধুনিক যুগ-চাহিদা অনুযায়ী আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাবিনে তাস সরবরাহের সুষ্ঠু ব্যবস্থা যদি হয়, তা হলেই পরমির্ভরতা আপনি হ্রাস পেয়ে যাবে এবং সেই অবস্থাই কাম্য।

পশ্চিমবঙ্গে শিল্প-শ্রমিক

নদীমাতৃক বাংলা বরাবরই কৃষিপ্রধান দেশ। কৃষি প্রধান দেশে কৃষি-শ্রমিকের সংখ্যা বেশি থাকবে, এ বলবার অপেক্ষা রাখে না। তবে আধুনিক যুগে সকল দেশই শিল্পমুখী। এই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যেও শিল্পায়নের ব্যাপক উত্তম চলছে। সে দিক থেকে শিল্প-শ্রমিকের সংখ্যাও এখানে বাড়ছে দিন দিন।

পশ্চিমবঙ্গের ভেতর কলকাতা ও এর আশে পাশে অর্থাৎ বৃহত্তর কলকাতার অসংখ্য কল-কারখানা ও শিল্প-সংস্থা চালু রয়েছে। এই কর্ম-সংস্থানগুলোতে দিনরাত কাজ করে চলেছে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক—কেউ ক্ষুদ্রশ্রমী (ট্রেনিং প্রাপ্ত), কেউ বা তা নয়। এদের ভালোমন্দ প্রশ্ন নিয়ে বহু ট্রেড ইউনিয়ন বা শ্রমিক সংগঠন রয়েছে সক্রিয়।

এই ক্ষুদ্রায়তন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে বিভিন্ন শিল্প ও ব্যবসারে বাঙালী শ্রমিক কতজন নিযুক্ত আছে, সঠিক সংখ্যা হাজির করা কঠিন। কিছুদিন হয় রাজ্য সরকারের প্রমসচিব মিঃ আকাস সাত্তার পশ্চিমবঙ্গে শ্রমিক নিয়োগ ব্যাপারে একটি বিবৃতি দিয়েছেন। বিবৃতিটি তথ্যবহুল এই দিক থেকে যে, শ্রমিকদের একটা পরিসংখ্যান এতে পাওয়া যায়। মিঃ সাত্তার বা জানিয়েছেন—১৯৫৮ সালে পশ্চিমবঙ্গের বেসরকারী শিল্প ও বাণিজ্য সংস্থা সমূহে শ্রমিক নিযুক্ত থাকে মোট ৮, ৮৭, ৪০৬ জন। এর ভেতর বাঙালী শ্রমিকের সংখ্যা মাত্র ৩, ৬৮, ০০০ অর্থাৎ বাঙালী নয়, এমন শ্রমিক ৫ লক্ষের ওপর। মোট শ্রমিকের মধ্যে প্রায় দুই লক্ষ জন কাজ করছে বিভিন্ন ব্যবসা বাণিজ্য সংস্থায়। অপর দিকে রাজ্যের শিল্প সংস্থাগুলোতে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ৭ লক্ষের কাছাকাছি। এই পরিসংখ্যানে সরকারী ও আধা সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মরত শ্রমিকদের ধরা হয়নি, প্রসঙ্গতঃ এটি লক্ষ্য করার।

বাংলায় বাঙালী শিল্প-শ্রমিকের সংখ্যা তুলনার কম কেন, এই নিয়ে প্রশ্ন ওঠা অস্বাভাবিক নয়। একটু বিচার বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে—এই অবস্থার জন্য কর্মীর অক্ষমতা ও অবযোগ্যতার চেয়ে অন্যত্র ও অন্যন্যোগিতাই বেশিটা দায়ী। আর তাই যদি হয়, থাকে, তবে এই মসোভার ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন না হলে নয়।



তারপর একদিন ...

বাবার হাতের গাঁইতি খানাও ওর কাছে খেলনা। ইম্পাতের ঐ গাঁইতি খানার সাপে বাবার শক্ত হাত দুটোর সম্পর্কের কথা ওর জানা নেই। বাবার মতো বাবা লেজে ও খেলা করে। টেলিগ্রাফের ঐ টানা টানা তারগুলো ওর কাছে এক বিষয়, আরও বিষয় তারের ঐ গুণগুণানি। কিন্তু আজ ও যে শিশু...

তারপর একদিন ঐ শিশুই হয়ে উঠবে দেশের এক দায়িত্বপূর্ণ নাগরিক। কর্তব্য আর কর্ম হবে ওর জীবনের অঙ্গ, ছেলেবেলার সব খেলাই স্বেদিন কর্মে রূপান্তরিত হবে। জীবনে আসবে ওর বোধন আর চেষ্টা। মহৎ কাজের প্রচেষ্টা থেকেই একদিন শ্রান্তিময়, ক্লান্তিময় পৃথিবীতে আনন্দ আর সুখ উৎসারিত হবে। বৈচিত্র্য আর অভিনব জীবনকে করে তুলবে স্বন্দরতর।

আজ সন্ধ্যার গৌরবে আমাদের পণ্যজব্য এ দেশের সমগ্র পারিবারিক পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন, সুস্থ ও সুখী করে রেখেছে। তবুও আমাদের প্রচেষ্টা এগিয়ে চলেছে আগামীর পথে—স্বন্দরতর জীবন মানের প্রয়োজনে মানুষের চেষ্টার সাথে সাথে চাহিদাও বেড়ে যাবে। সে দিনের সে বিরাট চাহিদা মেটাতে আমরাও সদাই প্রস্তুত রয়েছি আমাদের নতুন মত, নতুন পথ আর নতুন পণ্য নিয়ে।

আজও ভাগ্যমীতে দেশের নেতায় হিন্দুস্তান লিভার

চন্দ্রা তার নাম

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥

মহাশেতা ভট্টাচার্য

১০

১৮৫৭ সালের সে বসন্তে প্রকৃতি বড় মধুর হয়ে উঠলো। যে পঙ্কজ সারা বছর নৌকা চলে, তার জলে টান এসে সত্য। কিন্তু ভক্তদিনের বেলা সুর হ'ত না হতে অগণিত আত্মকুঞ্জে মুকুল ভরে এসে। সে মুকুলে মধু সঞ্চার হলো কি না সে সংবাদ নিতে ব্যস্ত হয়ে এলো মৌমাছি ও ভোমরা। আকাশে বাতাসে এক লম্বা আলস্ত বিস্তৃত। কো'কল ও বহু পাখীর কুঞ্জে মধ্যাহ্ন গুঞ্জরিত। এ কাণ্ডবাস্তে বং খেলা হবে কি না সে খবর না রেখেই হোরিগানের মহলায় মেতে উঠলো প্রামাণসী। রাত্রি গভীর হলেও শোনা যেতে লাগলো ঢোলক বাজিয়ে গান করে চলেছে কোন উৎসাহী কণ্ঠ—খেলে রহে পিচকারী নন্দলালা খেলে রহে পিচকারী।

কিশোর ক্রান্তির পিচকারীর রঙে নিজের মনের মানুষ কোন প্রায় কিশোরীর আত্মতা রঙিয়ে হয়তো দেখে গায়ক মানব চোখে। পানের সুর তাই মধুমত কোন বক্রণ প্রান্তিতে ফিরে ফিরে বাজে। আমবাগানের মাঝে মাঝে সুবুহু ইনারায় জল নিতে এসে মেয়েরা এই তপ্ত বসন্ত দিনের আলস্ত বেনে অমুভব করে। গতি হয় ধীর। চলিতে চরণ ধূলি ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়। বেন পথ ও পথের ধুলো বড় প্রিয়, বড় সুন্দর। লম্বা চরণ আর ছেড়ে যেতে চাইছে না সে ধুলো।

শহর কানপুরের সহস্র কর্মগততার মধ্যেও সে মারা ছড়িয়ে পড়ে। সকালের মানুষ চলাচল ও জীবনের মুখর মস্ত্রে বোঝা যায় না। তবে ঠিক হুপুর্বে মানুষ বিরতি নেয়। মিঠাইওয়ালার দোকানের সামনে সতৃক চোখ চেয়ে বসে থাকে ছোটো একটা কুকুর। টাঙ্গা, একতার বোড়াগুলো কপালে পিতলের সাজ পরে চুপ করে থাকে। শহর বাজারের ধুলোতে, চামড়ার বাজারের তীক্ষ্ণ গন্ধে সর্বত্র বিপ্লবের একটা রিম্বিকম্ ভাব সঞ্চারিত হতে থাকে। উত্তপ্ত বায়ুস্তরের মতো কাঁপতে কাঁপতে ধীরে ধীরে।

কোন বৈষম্য চোখে পড়ে না ইভান্স ব্রাইট ও তাদের সমপোত্রীর যেতান সম্প্রদায়ের। বসন্ত বলতে তাঁরা বা বোরেন, এ বসন্ত সে বকম নয়। কিন্তু তবুও মন্দ কি? আলস্ত একটা মধুর আলস্ত, একটা লম্বা আরাগের ভেলার শরীর মন ভাসিয়ে ভেসে চলবার মতোই অল্পকূল মনে হয় পরিবেশ। ক্যাষ্ট্রমেটের চওড়া সুন্দর দাঁতালির দুইপাশে কত না মেহগিনি, শিরীষ, বট, অম্বখ, পিপুল ও দেওদার গাছ। বিস্তৃত পল্লবিত তাদের শাখাপ্রশাখার কি সুন্দর মরম তোলে বাতাস। সে পথে প্রত্যহ প্রত্যন্তে অশচারণ। বাছাই করা সুন্দর তেজস্বী বোড়া

ও বোড়ী। সহস্রের সঙ্কট মার্জনায় তাদের গা থেকে আলো ঠিকরে পড়ে। আর উৎকৃষ্ট জিনপোবের সাজে তাদের আরো পুন্দর দেখায়। সুশিক্ষিত সে তুরঙ্গম চুলকি কদমে চলে। চলতে চলতে কথা হয় দুই আরোহীর মধ্যে। গলক ও শোলো প্রাউণ্ড তৈরী হলো কিনা—মাইলীর ধরবার জন্য কতহপু ও নবাবগঞ্জে বাবার আর কত দেবী—ভালো ছইল এনে দেবে বলেছিলো পারি সাহেব—কই, দিল না তো? বড় ঢিলে ঢাল হয়ে গিয়েছে পারি। এই তো। কলকাতা থেকে ভালো ব্র্যাণ্ডি আনানো, তাই কি পারলো? যদি ব্র্যাণ্ডির কথাই উঠলো, তবে বলা চল কিছুই নানাসাহেব বে ব্র্যাণ্ডি খাইয়েছে, তারপর আর কিছু মুখে লাগবে না। খাটি কংসী ব্র্যাণ্ডি। আর সেই জাংলান? কি চমৎকার ভাবে রাবা। নানাসাহেবের চেয়েও তার মংকারী আজিমুল্লা এ সব জানে ভালো। আর এ সব জিনিস এসেছে এখানে নানাসাহেবের বা সেই বুড়ো পেশোয়ার আমলে।

—কিন্তু নানাসাহেব গেল কেন এখন?

—ধর্ম করতে।

কি হাসির কথা। আচ্ছা, কথায় কথায় মনে হলো, এই বে শোনা গেল ভালভাবে নতুন করে আশ্রয় নেবার মতো সুশিক্ষিত একটা খাটি বানানো হবে? তার কি হলো?

—ছইলার জানেন। তবে তেমন দরকার কি?

সকালের অর্ধারোহণ পূর্ব শেষ হলে প্যারেড বা কাছারীতে হাজিরা দিতে হয়। তার আগে প্রতিরোধের সুবুহু বন্দোবস্ত। প্রেলুড টেবিল। তাতে অজস্র কাচ ও ফটিকের বাসন। ইংল্যান্ডের ছাপমারা এই বাসন কলকাতার বন্দর হয়ে পৌছিয়েছে এখানে। ডিম, বেকন, টোগট। স্বর্ণাভ মাখন গলে গলে করে পড়ে। কাঁচের বাটিতে কুমারুন ও গাড়োয়াল অঙ্কলের উৎকৃষ্ট মধু। দিল্লী ও আম্রো উত্তরের আপেল, গীচ নাসপাতি। উত্তর পশ্চিম পাঞ্জাবের আঙ্গুর। ফটিকের আধারে আঙ্গুরের গুচ্ছ। বসে টলমল সে ফল সজ্জারের কি বিনীত প্রতীক্ষা। কুম্ভকার ভূত্যদের সমস্তম অপেক্ষা।

তারপর নডেল বা ম্যাগাজিন পড়া। বিপ্লবের আবার তেমনই এলাহী মধ্যাহ্নভোজন। সন্ধ্যার ডিনার, নাচ বা নতুন কোন প্রমোদ। মহিলাদের সময় আর কাটেনা কোনদিন বা সব বার হামাম স্নানের। বন্ধ কুঠরীতে দুইজন আয়া নগ্ন দেহে যেসম গোলো মাথার। সেসমাজবর্গচোখ বুজে চুপ করে থাকেন। ক্রমেই

বেসমের সে আভরণ ভকিরে ওঠে। চমিড়ার টান লাগে। দাসীরা তখন উত্তপ্ত জলের বড় বড় পাখি আনে। সে বন্ধ কুহুরীতে জলের বাষ্প উঠে গা ভিজিরে দেয়। নিপুণ হাতে দাসীরা বেসম ঢুলে কলে। তারপর ল্যাভেন্টার গন্ধী উক জলে নেমে অবগাহন।

স্নানের পরিলক্ষ্যে এলিয়ে পড়ে বরদেহ। সন্ধ্যার ক্লাবে বা বাগান পাটিতে বা ক্যান্ডীকেয়ারে অনাচার্য্য কোন অফিসার মেজরের সঙ্গে কথা কইবার সময়ও সেই অলস লাভ নয়নের কোণে ভেঙে ভেঙে পড়ে। পুরুষকণ্ঠ থেকে সৌন্দর্যের স্ববন্দিত তনতে তনতে কৌতুক ছলে পালকের পাখা দিয়ে যুহ তাড়না করতে চান সুলক্ষী— কিন্তু কেমন বেন ভলীয়াটী আদর করবার মতো হয়ে যায়।

ব্যাঙ বাজে। ব্যাঙ বাজে পরিচিত সুলক্ষীর সুলক্ষীর গানের সুর। কানপুরে বসে ব্যাঙপাটির কাছে কেউ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত আশা করে না। টুকরোটাকরা চালু গান শুনলেই মনটা খুসী হয়ে ওঠে। বড় বড় মোমবাতির আলোতে ছায়া নাচে ঘরে। বড় বড় দরজা দিয়ে কুকাল ভূতারা পানীয় নিয়ে চলাকোরা করে। হাসি, আলাপ, কথাবার্তা। বিলতে থেকে অবিবাহিত বোন বা ননদকে ভরসা দিয়ে আনিয়েছেন ধীর, সেই সব মহিলারা বিবাহযোগ্য ছেলের কোণে টেনে নিয়ে আলাপ করেন। ঘরের মাঝে কার্পেটে হুই পা কীক করে ঝাড়িয়ে কোনো কুড়াপুরুষ নেপাল বা বর্মা বা পিগারী যুদ্ধে বীর কৃতিত্বের পুনরাবৃত্তি করেন। কথাবার্তার মধ্যে কখনো বা নেটিভ বগমাসদের কোন আগল নির্বৃত্ততার কথা এসে পড়ে। কি বেন করবে তারা। কি বেন শোনা যাচ্ছেলো?

রেজিমেন্টের ক্লাব ঘরের চূড়া থেকে কানপুরের আকাশে

সিহেলাঙ্কিত ব্রিটিশ পতাকা ওড়ে। গিগ্গের. ধাবার প্ররক্ষিত সাম্রাজ্যের বুকুট।

আর ঐ পতাকার আধাসেই সুরক্ষিত খেতাব সম্প্রদায়ের নিরাপত্তার জীবন।

সত্যবনের সে বসন্তে চন্দ্রের পিতামহ চন্দ্রের সাকাধাণী চারিপাশে কুমারের কু-প্রকৃতি সহসা হৃদয়ের হয়ে উঠলো। সমস্ত বনকুমি এক জাহ্নমের কেটে পড়লো ওহ ওহ কুল ও কলে। কুল ও জাম জাতীর বনজ কলের গন্ধে শুধু সৌন্দর্যই ডিঙি জমালো না। দুর্গাল ও জিন্নল হরিণের সঙ্গে সঙ্গে ভালুককেও ছাড়ার মতো চলাকোরা করতে দেখা গেল। গোছা গোছা কল ছিঁড়ে সোড়ার মতো মুখে পুরে দিয়ে ভালুকশব্দে মায়ের বুকের দিকে চেয়ে থাকলো ঘাড় বাকিরে। অপমগ ঐশ্বর্যময়ী এই অরণ্যকুমি। অজ্ঞপ্র তার প্রলোভন ইতস্তত ছড়ানো, ছোটানো। কাঠবিড়ালী, বেজি, খরগোশ, সজার এইসব ছোট ছোট প্রাণীদেরও ঘাসের মরকত গালিচার উন্টে পাণ্টে খেলা করতে দেখা গেল। সাকাধাণী থেকে দেড়মাইল দূরে যে পার্বতী নদী আছে, তার দিকে একদিন গাধাবন্দুক বগলে ও জাল কাঁধে চললো চন্দ্র। সকালের রোদে আতপ্ত হয়েছ অরণ্যের নিখর। ভালপালার কীকে কীকে রোদ পড়েছে ঘাসে। তপ্ত একটা মিষ্টি সৌরতে মধুর বাতাসের গতি। নিশেদ অতি নিশেদ পরিবেশ। শিকারীর সতর্ক প্রবণ চন্দ্রের মনে হলো দুর্গান্তের অলকানন্দা নদীর গভীর শব্দও বেন শোনা যাচ্ছে। বাতাস তঁকে আর

অটুট স্বাস্থ্য বজায় রাখুন

শাস্ত্রের সারাংশ সম্পূর্ণ
শরীরের প্রয়োজনে
নিয়োগ করলেই অটুট
স্বাস্থ্য বজায় রাখা যায়।
ডায়া-পেপসিন ব্যবহার
করলে এ বিষয়ে নিশ্চিত
হতে পারেন, কারণ
ডায়া-পেপসিন খাওয়া
হজমের সাহায্য করে।

ডায়াপেপসিন



ভুলোকা ধাবার সময় নিরক্ষিত ছোট এক চামচ খাবেন।
ডায়া-পেপসিন কখনো অভ্যাসে দাঁড়ায় না।

নিম্নলিখিত ডায়া • কলিকাতা

চোখে সব দেখে উৎকণ্ঠ হয়ে উঠলো চন্দন। এবার শিকার জমবে। শিকারের প্রকৃষ্ট সময়। নদীর ধারে গিয়ে সে বলুক নামালো। গতকাল হুঁড়ি পাখর দিয়ে জলে বাঁধ দিয়ে গিয়েছিল আজ বৃকে নিচু হয়ে পাখর সরিয়ে সরিয়ে দেখে তার জরাজীর্ণ প্রাণান্ত মুখখানি হাসিতে ভরে গেল। রূপালী লম্বাটে মাছের কঁক সিঁহর হয়ে আছে সেখানে। চূপ করে আছে। জাল ফেলে দিলো চন্দন। জুলাে আনলো কয়টা মাছ। তারপরেও ঘাসের 'পরে নিচু হয়ে জলের দিকে চেয়ে বইলো। ধ্যা। এবারকার মতো আশ্চর্য ভক্ত যোগাযোগের বছর আর কখনো আসেনি। তার স্মৃতিতে নেই। প্রকৃতি এমন করে স্রজলা স্রজলা হয়নি। এবার সে বুড়া ম্যাকমোহনকে চিঠি লিখবে। লিখে জানাবে যে শিকারের ও মাছ ধরবার এক বর্ষ সংযোগ উপস্থিত। সাহেব চলে আসুক। অনেকদিন ধরে কথা হচ্ছে। সাহেবকে যদি আসতে হয় তো তাড়াতাড়ি আসতে হবে ঘরে, বাবে চন্দন। ছুটি মজুর। কিছুদিন ধরে না থাকলে হবে না।

ফিরতে ফিরতে সাফাখানার বাংলাঘরের কার্টের ছাদ চোখে পড়লো। ছাদটার পেছনে শাখাপ্রাণাধার ফুলসম্ভারে ফেটে পড়ছে এ্যাকশিয়া গাছটা। চন্দন এসে সেবার লাগিয়েছিলো।

দেশে যেতে হবে চন্দনকে। ঐ হতভাগা চন্দনের জন্তে। চন্দনের ছেলে আর বৌ চন্দনকে বশ মানাতে পারে নি। 'আবার সেই বনমায়েশ ছেলেটা পালিয়েছে। জোয়ান রক্ত। দোষ-ই বা কেমন করে দেয় চন্দন। ও বয়সে কি ফর্মা মুখ দেখলে মনটা নোলে না? নিজের যৌবনে সে-ও তো কম রসিক ছিল না।

সহসা চোখের সামনে পড়ে তাজা বাঘের খাবার ছাপ। একেবারে তাজা। আবার হাসির রেখায় ভেঙে পড়ে চন্দনের মুখ। এ হলো ঐ তরুণ বাঘটা। বাকে সে বাচ্চাবেলার দেখেছিলো মায়ের সঙ্গে খেলতে ঘাসের 'পরে। যে কিছুদিন ছিলো ঐ কালাভূজির হাটধরের পেছনে পরিত্যক্ত কাঠগোলায় জঙ্গলে। এবার সে মদকরণ করে জোয়ান হয়ে উঠেছে। সজিনী খুঁজে গভীর কণ্ঠে আজকাল সে প্রায়ই ডাকে। ডাকে বাজির প্রথম প্রহরে। কতদিন শুনেছে চন্দন। সাহেবকে বলবে এটাকে নয়। ঐ কানা বাঘটাকে মারো সাহেব। এক চোখ নেই। কিন্তু জঙ্গল থেকে মোব বাছুর ধরে বড় ছালাতন করছে।

চন্দন চলে, আর নির্ভয়ে তার গায়ের কাছে, দূরে, ঘাসের 'পরে, ভালের 'পরে উড়ে বেড়ায় বাকে বাকে পাখী। কত রঙের, কত জাতের। বনভূমির খুশিখালীর দূত এরা। কত রকম কুজনই যে শোনা যায়। চুপির মতো লালচোখ বাকিয়ে, রঙীন ল্যাজ কাপটে তারা কত রকম ব বাহার দিয়ে বেড়ায়।

সাফাখানার পৌঁছিয়ে মাছের বোকা নামায় চন্দন। নৈনিভাল থেকে 'হুকুরী খবর পেয়ে চলে যাচ্ছেন এক মেডিক্যাল অফিসার। তাঁর টেনিসে গরম মাছ ভাজা ও ককি পৌঁছিয়ে দেয়। তারপর চিত্রির মুসাবিকা করতে বসে। তার বদলীতে যে কাজ করবে সে ছেলেটা লিখতে জানে। তাকে নিয়ে বসে।

* * * *

এলাহাবাদের সল্লিকটে পাপাশউয়ের বাংলোর বসে বুড়ো জলী ম্যাকমোহন চন্দনের সে চিঠি পেরে আনমনা হয়ে চেয়ে থাকেন।

চন্দনের চিঠি তাঁকে অনেক পুরনো কথা মনে পড়িয়ে দেয়। চন্দনের স্নেহ প্রীতি ভরা রেখাঙ্কিত মুখখানি মনে পড়ে। চন্দন আজও মনে ভাবে হয়তো, যে ম্যাকমোহন সেই একই মানুষ আছেন। কিন্তু ঈশ্বর জ্ঞানেন ভরতপুর ও বর্ধা, রোহটক, ও শিশারীযুদ্ধ ফেরৎ সে অসমসাহসী ম্যাকমোহন অনেক বদলিয়ে গিয়েছেন। যে ম্যাকমোহনকে তাঁর শিশাহী সওয়াররা ভালবেসে বুড়া সাহেব বলতো—যে ম্যাকমোহনের সঙ্গে কানপুরের ছইলার রেওয়াজে বাজি রেখে চাঁদমারী প্র্যাকটিস করতো, সে ম্যাকমোহন আর নেই।

চিঠিখানা হাতে নিয়ে চেয়ে থাকেন ম্যাকমোহন। তাঁর বাগানে বড় বড় বাস হয়েছে। বাস ফুলের ওপর কড়ি উড়ছে। মালীর ছোট ছেলেটা ছুটেছুটে সেই প্রজাপতি ধরছে। মনে পড়ে যায় অনেক কথা। নিজের বোন এমিলির কথা। আর ব্রাইটের মুখখানিও মনে পড়ে। অন্তরটা কুঞ্জী বলেই কি ছেলেটার মুখ এমন সুন্দর? সুন্দর দেহ সুন্দর মনের আধার তো নয়। কেন এমন হলো? তবে তার দুর্ব্যবহারে তাঁর জীবনটা মিছে হয়ে গেল কি? তা নয়। আসলে ম্যাকমোহন শান্ত হয়ে গিয়েছেন। ভেতরে ভেতরে যিমিয়ে এসেছে রক্তকণিকা। ম্যাকমোহন নতুন করে আগ্রহ নিয়ে শুরু করেছেন একখানা বই লিখতে। 'Fifty years in India'—এই 'বইখানায় তিনি হিন্দুস্থানকে যেমন জেনেছেন, তেমনি লিখে যাবেন। এদেশের মানুষের পরিচয়—তাদের আচার ব্যবহার, উৎসব, রূপকথা। এখন যেন ম্যাকমোহন বুঝতে পারেন এই দেশটাকে কেমন করে মনে মনে ভালবেসে ফেলেছেন তিনি। এই দেশটাকে, এ দেশের মানুষগুলিকে। মনে হচ্ছে বয়সই হলো, সঞ্চয় কিছু করলেন না। সঞ্চয় যদি কিছু করে থাকেন—সে হলো এ দেশের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত ভালবাসা। তাঁর সজদয় ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে বা তারা ঢেলে দিয়েছে। এর জন্তে স্বদেশবাসীর থেকে কিছুটা দূরে সরে আসতে হয়েছে বাটে। কিন্তু তাতে বেন-ক্ষতি বোধ হয় না। এখানকার বিস্তার্ত আকাশ, সবুজ মাঠ, অরণ্য, এখানকার সহজ সরল গ্রন্থ্য মানুষগুলি, এদের সঙ্গে দীর্ঘ পকাশ বছর বাস করেছেন তিনি। আজ সন্তরের প্রান্তে এসে মনে হয়। এই দেশের মানুষ, পরোক্ষে তাঁর চরিত্রের পরিবর্তন ঘটিয়েছে। মনটা স্নেহপ্রবণ, ক্ষমাপ্রবণ হয়েছে। বাইরেটা ডিলেচালো হয়েছে। সাধে কি আর সাহেবরা বলে, 'বড় ওরিয়েন্টাল ডক্টর হয়ে যাচ্ছ তুমি!'

তাঁর বাংলোর সামনের জমিটুকু নিয়েছে একটি মালী পরিবার। কঠোর পরিশ্রমে আর সুনিপুণ ধৈর্যে চাষ করেছে জমি। বুনেছে সজী। মোতিয়া বেলফুল, চামেলি। অসীম আগ্রহে ঐ দরিদ্র সম্পতি এক একটি গাছের জন্ম থেকে পুষ্প সঞ্চার পর্যন্ত রহ্ন নেয়। ম্যাকমোহনেরও মন্দ লাগেনা। জীবনের অনেকগুলো বছর ছুটোছুটি করেছেন। লড়াই করেছেন। সে সব কাজকে মহনীয় বলেই জানতেন। এ কাজটাকেও এখন তুচ্ছ মনে হয়না। মনে হয় মন্দ কি—বাগান কং আর মৌজারী পাখীদের দেখে দেখেই তো কেটে বাবে বাকি দিন কটা।

চন্দন কি বুঝতে পারবে তাঁকে? শিকার খেলবার মন আর নেই। তবে ধ্যা, মাছ ধরবার কথাটা মন্দ নয়। আর এই সারকার অরণ্যপ্রকৃতি-ও তাঁর ভালো লাগবে। কিন্তু এখন তো

তিনি যেতে পারছেন না। সহসা কি জরুরী অবস্থার সৃষ্টি হলো কে জানে! বার জন্ত তাঁর মতো বুড়োজ্ঞানীদেরও ডাক পড়েছে এলাহাবাদে। তিনি অবশ্য শুনেছেন, যে নেটিভ সিগাহীরা গোলমাল করতে পারে। কিন্তু সে সবাদের কোনো ভিত্তি আছে কি? রেভিনিউ কলেক্টর ফেরার বলছিলেন বটে সেদিন।

ম্যাকমোহন চিঠি লিখতে শুরু করেন। তাঁর খুবই দুর্ভাগ্য, যে চম্বনব সাগর আমন্ত্রণ তিনি রাখতে পারছেন না। একদিন তিনি বলেছিলেন বটে, যে 'হাও. আপনা ঘর যে' সি কা দিয়া জালাও'—অর্থাৎ প্রস্তুত হও—আমি আসছি নিমন্ত্রণ রাখতে। তবু দেখা যাচ্ছে সেদিন আজ-ও আসেনি। বা হোক, আবার দেখা যাবে। চম্বনের সাহেব বুড়া হয়েছেন বটে। তবে এমন বৃদ্ধ হননি, যে চম্বনের নিমন্ত্রণ না রেখেই মরে যাবেন।

বুড়া সাহেবের হাতেই হিন্দী লেখাটি চমৎকার। যেন ছাপার অক্ষরে লিখছেন। চিঠি শেষ করলেন। বারান্দায় এসে আবার দাঁড়ালেন। তাকালেন ক্রীড়কন করে। কি প্রশান্ত উজ্জল নীলিমা আজকের আকাশে। ধরণীর বুক থেকে কি তপ্ত সুবাস উঠছে আকাশের দিকে। সহসা ম্যাকমোহনের মনে হলো—এত সুন্দর... এমন মনেছারিণী বসন্তসোলা আর যেন তিনি দেখেননি। সর্বত্রই যেন একটা অদ্ভুত প্রতীক্ষা, আনন্দ ও উত্তেজনা সঞ্চারিত। ঐ মৌন প্রকৃতির মধ্যে-ও।

ইভান্স-এর প্রেমিক চোখে মনে হলো এমন অপকৃপ বাসন্তী শোভা আর কখনো দেখেনি সে—এই সাতার্নতে যেমন দেখছে। রেজিমেন্টের অনতিদূরে চৈত্রামদেব-ই ছোট্ট একটি বাংলো নিতে ইচ্ছে ছিল ইভান্সের—বাড়াটি নিল। সাম্রাজ্য-ও সাধ্যমতো আসবাবে। মেঝের গালিচা, কুশী, ডেকচেয়ার, সেজানিতে বাস্তি, এই সব। তবে হুইলার সাহেবের ঢালা হুকুম। কোন ইংরাজ অফিসার ক্যান্টনমেন্টের বাইরে রাত কাটাতে পারবেন না। কানপুরে সিভিলিয়ান, মিশনারীদের সংখ্যাও নেহাৎ নগণ্য নয়। প্রয়োজন হলে তাঁরাও আসবেন ক্যান্টনমেন্টে।

তা হোক, তবু অবসর বিনোদনের সুন্দর পরিবেশ। ইভান্স-এর নেটিভ পন্নীতে চম্পার বাড়ীতে যেতেও আপত্তি ছিল না। কিন্তু চম্পা মেহেন্দী রঞ্জিত ছোট হাতখানি চাপা দিয়েছে ইভান্স-এর মুখে ইভান্স বলেছে—কেন, তুমি কি বিশ্বাস কর না?

—কিসে?

—আমার প্রেমে?

—আমার প্রেমের মানুষ যে আরো অনেকে আছে। এমন মানুষটি পেরে, যদি তারা অনিষ্ট করে?

—কি হবে?

—আমার হৃৎক হবে না?

বলে চম্পা খিলখিল করে হেসেছে।

হৃৎকের প্রকাশ এমন হাসিতে হয় কি না।

ইভান্স সে প্রশ্ন তোলেনি। চম্পার হাসিটিও

যেন সুন্দর। ইভান্স মুগ্ধ চোখে চেয়ে চেয়ে দেখেছে। তারপর কথা খুঁজে না পেয়ে বলেছে—চম্পা গান কর।

—কোন গান?

—যা তোমার প্রাণ চায়।

ইভান্সের অনেক আশ্রয় ব্যবহারে অনেক সময় চম্পার তাকে ছেলেমানুষ বোধ হয়। ইচ্ছা করে সে গাঁয়ে শোনা রামসীতার বিষের গান ধরে:

—জনকপুরসে রামচন্দ্র কী সীতা লে কর, আয়ে—

রাম ও সীতার মোতির কুণ্ডল, সোনার মালা ও আরত নয়নের বর্ণনার কতটুকুই বা বোঝে ইভান্স। দেখে চম্পার সহাস্ত নয়ন ও ঐশ্বর্য মনোরম ভঙ্গিমা। যন কালো চুলগুলি বন্ধ করে টেলে তুলে বেণী বাঁধা। যন ভুরুর নিচে কালো চোখ। কানে ও সিঁথিতে সাধারণ গহনা। কালো রেশমে নানরঙের কাজ করা ঝগড়া। সবুজ চোলি ও সোনালী আঙ্গিয়াতেও চম্পার বৌবন শাসন মানেনি। ওড়নী নেমেছে তার পরে। ওড়নীর উল্লেক্ত কিছু আবরণ নয়, আভরণ হয়ে ওঠা। তাই লঙ্কায়ের চিকণ হলমলের জালি কাজের ওড়নী গলা ছুঁয়ে পড়ে আছে। তার কাঁকে নিটোল ও কঠিন দুই যুগ্মকোরকের আভাস অতি স্পষ্ট।

ব্রিজহুলারীর দেখাদেখি চম্পা-ও আভরণে স্নান করে। আজ মৃদু একটা সুগন্ধের জাল অল্প একটা অদ্ভুত ওড়নীর মতোই তাকে ঘিরে রয়েছে। গান শেষ করে চম্পা চায় ইভান্সের দিকে। পড়ন্ত বিকেলের রাঙা আলো তার মুখে চোখে পড়ে আশ্রনের বিজয় সৃষ্টি করে। সহ্যই আশ্রন। মদিরা বোবনা চম্পা যেন আরো কূলে কূলে ভরে উঠেছে দিন রাত দিনে। বিমুগ্ধ ইভান্স চেয়ে চেয়ে একটা কথাই বলতে পারে—চম্পা, বড় সুন্দর তুমি।

চম্পার টানা টানা চোখ হাসে। বলে—তোমাদের মেয়েরা আরো কত সুন্দর।

—তোমাগামতো নয় চম্পা।

—কিন্তু আমি তোমার উপর রাগ করেছি সাহেব।

—কেন চম্পা?



—দেখ শব্দ ভুল নাছুর হাঙ্গ আমায় দিকে চেয়ে। আমাকে তুমি কেমন ভালবাসি? এখানে তো একদিন ও রইলে না। বলেছিলে আমার তোমার একঘর হবে। সেখানে বেন কত কি?

—চম্পা, তা হলে তুমি সুখী হতে?

—নিশ্চয়।

ইভালেন বুক মাথা হেলিয়ে বলে চম্পা। চম্পার সুরভি নিখাদে সঙ্গে সঙ্গে তার নিজের বুকখানাও যখন তোলপাড় হয় তখন ইভাল অনেক কথা ভাবতে পারে। তার সত্যি অস্তিত্ব বুঝকরা অবশ্য নেটিভ একটা নাচগাল-এর সঙ্গে এতটা আন্তরিকতা পছন্দ করে না। আর ইভাল-ও মনে মনে জানে। যে এই মেরোটাকে নিয়েই সে কিছু চিরকাল পড়ে থাকবে না। তবে এখন, এমনি সময় তার মনে হয় মন্দ কি। তার নজর তো এই কানপুরেই আছে। সে যদি নিয়ে করে এই মেরোটিক? প্রায়টার সাহেবদের মতো কিছু সম্পত্তি করে ফেলে এই উত্তর প্রদেশে? মন্দ কি? বিশাল বাগানের মধ্যে প্রশস্ত বাগা বাড়া, গাড়ীঘোড়া, চাকর, দাসী। সে ও না হয় আগবোলা ফরাসি তামাক খাবে—নিচু চৌকিতে বসবে—প্রয়োজনে দেশী খানা খাবে। যদি ছেসেমেয়ে হয়? তাও ভাবতে পারে ইভাল এখন, তার রক্ত ঐ কুফলার দ্বকে মিশ্রিত হবে। শুই হবে নব নব রক্তকবিকা। বর্ণসঙ্কর শিশুর দল। তাদের শিক্ষালীকা সন্দিক অবশ্য নজর দিতে হবে। আর, নিজেকে ছোট করবার কথা-ই বা সে কেন ভাবে? এমনও তো হতে পারে যে চম্পাকেই সে গাউন পরয়ে জাতে তুলবে। চম্পাকে শিখিয়ে পড়িয়ে মানুষ করবে?

—ক ভাবছ?

—কিছু নয় চম্পা।

—আমার কথার তা জ্ঞান দিলে না?

—ও। কি জান, কোন কারণ নেই, শহর ও বারাকে হিন্দুস্তানীরা বড় বিজিত হয়ে পড়েছে। মিছেমিছি গুজব উড়ছে বাতাসে। এমন সময় শুধু ক্যান্টনমেন্টের কেন, সকল ইংরেজদেরই থাকবার মতো ব্যবস্থা ক্যান্টনমেন্টেই করলে ভাল হয়।

—কেন?

—এমনিই চম্পা। তুমি বুঝবে না।

—ত, সকলে তো যাচ্ছে না? হর ছেড়ে?

—ঠাণ্ডা সব সাহেবরা বাবে কেন? তাহলে সন্দেহ করবে না যারাক আর বাজারের মানুষ?

চম্পা বেন বুঝতে পার না এমনই বিষয়ে তাকিয়ে থাকে। ইভালার সহসা মনে হয়, এত বড় কথাটা বলে সে ঠিক করেনি। একটা অন্তর্ভুক্ত কথাকে ঢাকবার জন্য সে আজ বাজে কথা বলে। বলে—সাহেবরা কি ভয় পায় যে চলে যাবে?

—সাহেবরা কখনো ভয় পায়?

চম্পাও সাহায্য করে বলে। ইভাল বলে—কখনো ভয় পায় না। তোমার দেশের মানুষ গান শুনে কাঁদে, ঘরক খেলে কাঁদে, শরীরে আঘাত লাগলে কাঁদে। আমরা কাঁদি না।

—নিশ্চয়।

—দেখ, সাহেবদের আশ্চর্য কথটা না থাকলে কেমন করে তারা এত বড় বৈশিষ্ট্য লাভ করবে?

—নিশ্চয়।

ইভাল বলে—চম্পা, তুমি নাকি যাচ্ছ মগনলালের বাড়ীতে? বড় জলসার?

—তুমি মানা করছ?

—কত টাকা পাবে?

—অনেক।

যাও কাৎ করে চেয়ে থাকে চম্পা। ইভাল বলে—কিসের তোমার এত দরকার চম্পা? এত টাকার?

চম্পা এবার রঙ্গিনী মোহিনী। বলে—সাহেব, আমি রং কিনে আনব। কাণ্ডার রঙে তোমার সঙ্গে হোলি খেলব।

—Heathen festival!

—রঙ দিয়ে তোমাকে রাঙাব। তুমিও রঙ দেবে আমাকে। দেবে না? এই এখানে রঙ দিতে পার সাহেব?

চম্পা ইভালের হাতটা নিয়ে নিজের বুকের ওপর ধরে বলে—স্বপ্নিণ্ডের শব্দ শুনে পাও সেখানে রং চায় চম্পা!

—You vixen!

বলে চম্পাকে কাছে টানে ইভাল।

• • • • •

মগনলালের সে জলসা সাজ হয়ে যায়। তবু ভেতরের খবর বাতি জ্বলে। মগনলালের পূর্বপুরুষ এসেছিলেন কান্সার থেকে। চিরকাল তাঁর পরিবার সরকারের মোহরাক্ষিত ছাড়পত্র নিয়ে খাদ্যশস্য সরবরাহ ব্যবসা করেছেন। আজও তাঁদের সে ব্যবসা আছে, কিন্তু রেজিমেন্ট বা রিসার্চার বানিয়া কারবারীর চিট তাঁকে দেননি ফোঁজী কর্তৃপক্ষ। বড় অপমানিত হয়েছেন তিনি।

ঠাঁর কুঠিতে এক গালিচা বিছানো ঘরে অনেকে আজ সমাগত। কানপুর কতেপুর ও শিঠুরের সম্ভ্রান্ত লোক কহজনকে দেখা যায়। সম্পূর্ণরূপে পাশে বসে শোনে চম্পা। আশ্চর্য সব কথা। চৈত্রায় স্বয়ং, এবং আরো ঠাঁরা আছেন—তাঁদের আর তার মাঝখানে যে দুস্তর খাদ। সামাজিক বাধা। কি এমন ঘটনা যে সেই বাধার কোন অস্তিত্বই আজ নেই? চৈত্রায় বলেন—দিল্লীতে মোগলশাহী কায়ম হোক, বা এখানে পেশোয়ারা হিন্দু রাজ্য কায়ম করুন—আমাদের তাতে সুবিধা হবে। এই স্রেজ কিরকার চেয়ে সে অনেক ভাল।

—এরা এর মধ্যেই টাকা সরিয়ে নেবার মতলবে আছে খাজাখানা থেকে।

—এদিকে হল কি?

—আমরা বাজার থেকে টাকা গুটিয়ে নিচ্ছি। সোনা ভুলে নিচ্ছি। চট করে বাজার তুড়লে এক সঙ্গে শ' তোলা সোনা বেলা হুঙ্কিল।

—বলছেন!

—বাচিয়ে দেখুন।

—কিন্তু খাজাখানার টাকা?

চম্পা একটু কেসে জানান দেয় নিজের উপস্থিতি। বলে

—বুড়া হইলার শালা মনের মানুষ পেশোয়াকে ভিনি দোভ জানেন। টাকা আমার হিমায়েরদার তাঁকেও করতে পারেন।

কর কোড়া তীর তীর দুটি চম্পার ওপর পড়ে। তারপর কথা...

চন্দ্র—বানবাহনের 'বাবু' কেমন! নৌকো না কি গঙ্গার দ্বীপ তেমন চলবে না। নৌকো তুলে ফেলা হবে। ডাকগাড়ী, একা, টাক্সা বা পাড়ীও যাতে সহজে পান সহরের ভাস্কর্য্য বাসিন্দারা, তাও দেখতে হবে। চম্পার মনে হলো আলোচনাটা যাচ্ছে এমন ভাবে, যে এই কথাটি হচ্ছে, প্রয়োজন যেন সমবেত মানুষদের ব্যক্তিগত অনুরোধ না হয়। আবার নিজেকে তিব্বার করলো সে। ছি! এমন ছোট মন হাব?

আরো কিছু কথার পর তার সঙ্গে কথা কইলেন মগনলাল মগনলাল কঠে। 'তার প্রাণ্য টাক' তার হাতে দিলেন। বললেন—টাকার আত্মদের অনেক দরকার হবে। তখন যেন পাই। হাট টর বিবিং সঙ্গে দোস্তি আছে ত?

—গ্রী, জী।

—বলো মত গল্পনা যেন না পাবে। লুই হয়ে যাবে। পায়ে ত কিছু ঢেলে নিও।

যখন উঠা দাঁড়ালো চম্পা—তার সে উৎসব সম্ভার দিকে চোখ না পড়ে পারলো না সকলের। সকলেই মনে অভিসন্ধি আছে, ছালা আছে। কিন্তু স্বেচ্ছায় আগলে পুড়ে মরতে এই যৌবন-মুকলমজরী কেন এলো? হাঁরাটি বা কেন তাকে ঠেলে দিচ্ছেন দহন নিশ্চিত জেনে? না কি, উদ্বেগ এমনই বৃহৎ যে তাতে এমন প্রফুট চম্পাকলি অনার্য্যাসে ছিঁড়ে কুচিকুচি করে ভাসিয়ে দেওয়া চলে?

কিভাবে ফিরতে সম্পূর্ণের সেই কথা মনে হয়। সে না বলে পারেনা—চম্পা, তাকে টেনে এনে যে কি করলাম—

চম্পা ঈষৎ হাসে। হাসি ছাড়া তার মুখে কোনদিন কথা শুনলো না সম্পূর্ণ। কি মুখে, কি হৃদয়ে। চম্পার হাসি আজ তাকে দজ্জা দেয়। চম্পা বলে—বুড়া আমি যদি নিজে না ভাসতাম, তুমি কি তোমার ঐ মগনলালের কি ক্ষমতা যে আমাকে দরিয়ায় ভাসাও?

সম্পূর্ণ তারার আলোয় তবু চম্পার মুখে উত্তর খোঁজে। শলে—চম্পা, মাপ করিস। তোর তো চন্দন ছিল। তবু তুই মানলি না কেন? কেন এ পথে এলি?

—বুড়া, সব কথায় জবাব হয় না।

জবাব হয় না, জবাব জানে না চম্পা—কি জবাব সে দেবে সম্পূর্ণকে? হ্যাঁ, তার চন্দন আছে। কতখানি আছে, সে কে বুঝবে? চম্পা জানে তার রক্তে রক্তে আছে, তার স্বপ্নস্বপনে আছে। শৈশব থেকে চন্দনের সঙ্গে সে যে এক নিয়তিতে বাঁধা। সে কথা কাকে বোঝাবে?

তবু কেন অনিশ্চিত এই ডাগোর দরিয়ায়, এই যুড়ার আহ্বানে ঝাঁপিয়ে পড়তে বার বার সাধ যায়? কেন সর্বনাশ তাকে এমন করে ডাকে? এ কোন প্রেরণ যে চম্পা স্থির থাকতে পারে না? এ প্রেরণ কি চন্দনের প্রেরণের চেয়ে অনেক শক্তিশালী? না, চন্দন আর এই প্রেরণ এক হয়ে গেছে? বুঝতে পারে না চম্পা। তবে এই তার বিরিলিলি। সে স্বপ্নের নয়, সে পরিবারের নয়, সে মুখ শান্তির সাধ কামনার নয়। তার জন্তে অজ্ঞ নিয়তি। অজ্ঞ পথ। তা যদি না চলে তো সেই দ্বিভূত শৈশব থেকে কেন প্রতিকূল চেত্ন হতে চেত্নের

মাথায় সে উৎক্লিষ্ট হয়েছে বার বার? কেন চন্দনকে পাবার মুখে শৈশবের সেই নাড়িতে নাড়িতে জড়ানো সন্ধাবের দুর্লভা বাধা? প্রেম, তাই তার কাছে গরল মিশ্রিত। বিবকতার মতো প্রেমের সঙ্গে সঙ্গে সে অভিপায় কি চম্পা অবহেলে বহন করেনি? অবহেলে? তার যদি অবহেলে হবে তো আজ ও কেন সময় কাঁদে? কিরে বেতে চার সেট ঘরে, সেই গ্রামে, সেই নদীপ্রান্তের বটগাছের শীতলছায়ায়—চন্দনের সঙ্গে?

তার ছিলো গৃহপ্রান্তে প্রাণী হবার কামনা। তাপ্য তাকে কবেছে দাবানল সকারী শুল্ক। এখন তাকে জ্বলতে হবে, আর জ্বলিতে চলতে হবে—এই তার অলম্ব্য পরিণাম।

সম্পূর্ণের তার সাহায্যই কবেছে। সম্ভবতঃ চম্পার মনের এই কথাগুলিতে কোন শক্তি ছিলো। সম্পূর্ণের মনে হচ্ছিলো এ নীরবতাও যুগ্ম। চলতে চলতে নিশীথের এ প্রতীক্ষা বড় ভাল লাগলো তার। অফুট বললে—বড় সুন্দর হয়েছে দিন।

সত্যবনের আকাশ চিরে একটা উজ্জ্বল সূর্য্যোদয় আসে উঠে নিজে গেল সম্পূর্ণের কথার জের টেনে।

সেই সময় বিক্রামের জন্ম অক্ষরমহনে চলতে চলতে মগনলালের সহসা মনে পড়লো একটা কথা: মনে পড়তেই এ-ও বুঝলেন, যে সারাসন্ধ্যা এই ছোট কথাটি মনের তলার নৃপাংক খাচ্ছিলো। হাত-পা ধুয়ে চৌকিতে বসেছিলেন। একটা বালক ভূত পা দাখাচ্ছিলো। শিশুপাই আছে। গোল ও বাতর ব্যাথার কষ্ট পান মগনলাল। কিন্তু এই খবর যা জরুরী, তার কাছে আর কিছু ভাববার নেই। তিনি বললেন—আমায় ভাতিজাকে ডাক!

—এখন?

—গ্রী বেওকুং!

জরুরী এতদূর পেয়ে ছুটে ছুটে এলো ভাইপো। মগনলালের ছোট ছোট লাল চোখ দুটো অগ্নিহু। তিনি বললেন—সে হাজার মণ আটার কথা ভেবেছ?

—কোন আটা?

—সেই গাজিপুন্ডের বদমায়েসের পাঠানো?

—হ্যাঁ। বন্দোবস্তও কবেছি।

—কি করলে?

বেজিমেন্টের বানিয়ারাই নিচ্ছে। আটা পাবে কোথায়? গম সরিয়ে ফেলেছে না হাজি সাহেব?

—কি করলে?

—পচা আটা ফেলে দিলাম বিশ বস্তা। বাকি আটা পচা-ভালোয় মিশ্রণ দিয়েছি। একটু কালো হলো, আর গন্ধ—তা চলে যাবে! বাকি তিন-শো মণ সহরে চালান করে দেব কাল-ই!

—ভাল করেছে। হাজার একবার বাবলে কে ঐ আটার বক্তি সামলাতো? কেউ না।

এমনি করে আটার ব্যবস্থা হয়ে গেল মগনলালের। চাকরটি আবার গোল-পা টিপবার অধিকার পেল। ঈষৎ পচা, কালো ক, গন্ধ আটা—গুলাম বন্দী মাল—তার ব্যবস্থা হ'তে মগনলাল পরম নিশ্চিন্ত হলেন।

বিক্রমক।



৩

পড়লেখক কে ?

ছেলেগা চেপেছিল বুড়াকে বন্ধপুত্রীর গেটের কাছে নামিয়ে রেখেদিয়ে চলে আসবে, কিন্তু কমলেশ তাতে রাজী হয়নি, বুড়াকে নিয়ে গিয়ে দরোয়ানেরঘরের মধ্যে তক্তাপোষের ওপর শুটয়ে দেয়। বুড়া তখনও অজ্ঞান, কমলেশ বলে আমাদের আর একটু অপেক্ষা করা উচিত। বতকন না ওব জ্ঞান ফিরে আসে।

তাতে কিন্তু ছেলেগা আপত্তি করে। প্রশস্তে বক্রিয়ে বলে, আর দেয়া করলে ঠিক হবে নাৱে কমল, চল আমবা হোট্টেলে ফিরে বাই। শঙ্করদা'রা নিশ্চয় আমাদের জন্তে লাটব্রেরাতে অপেক্ষা করছে।

প্রশান্তর কথা উড়িয়ে দেবার মত নয়। সতাই সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত্রি নামতে শুরু করেছে। তাছাড়া সকলেরই যখন ফিরে যাবার ইচ্ছে, কমলেশ একলা আর কি করবে। অনিচ্ছাসম্মেও বুড়াকে সেই অবস্থায় ফেলে রেখে চৌ'ষ্টলের দিকে রওনা হয়।

কমলেশের মন থেকে কিন্তু বুড়ার চিন্তা কিছুতেই যায় না। লাটব্রেরা ঘরে সবাই পড়তে বসলেও সে জানালা দিয়ে দূর আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। ঐ বিরাট বন্ধপুত্রীতে আর কি কেউ বাস ? করে তাখা কি জানবে বুড়া ঐ দরোয়ানের ঘরে অজ্ঞান হয়ে

পড়ে আছে ? না, না, ও ভাবে ওকে ফেলে রেখে আসা মোটেই উচিত হয় নি।

সদাশঙ্কর এসে কমলেশের পিঠে হাত রাখে। কি ভাবছিল রে কমল ?

কমল সহজ হবার চেষ্টা করে, কিছু না।

—আমি জানি, বুড়োর জন্তে মন কেমন করছে ?

—আপনি কি করে জানলেন।

—আমি সব শুনেছি। অত ভাববার কি আছে, কাল সকালে গিয়ে একবার দেখে আসিস বরং।

—আমি কি ভাবছিলাম জান শঙ্করদা', বুড়াকে নিয়ে এসে এখানকার হাসপাতালে মিহিরদা'কে দিয়ে চিকিৎসা করালে হয়।

সদাশঙ্কর রান হাসে, ওয়া কি আর এখানে আসবে।

—কেন আসবে না শঙ্করদা' ?

—তা জানি না, সদাশঙ্কর যেন ইচ্ছে করেই কমলেশের কথার জবাব দেয় না।

পরদিন ভোর বেলা উঠে কাউকে কিছু না বলে গ্যারেজ থেকে একটা সাইকেল নিয়ে কমলেশ চললো বন্ধপুত্রীর দিকে। সব শুখন ভোর হচ্ছে, রাতের অন্ধকারকে সরিয়ে দিনের আলো ক্রমশ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে, চারদিকে পাখীদের কলরব, বাসা ছেড়ে গাছের ডালের ওপর ভাংগা বসে।

বন্ধপুত্রীর গেটের কাছে সাইকেল রেখে কমলেশ তাড়াতাড়ি দারোয়ানের ঘরের কাছে হাজির হয়। কিন্তু আশ্চর্য্য বুড়া সেখানে নেই। তক্তাপোষের ওপর এখনও তার গলার চান্দ পড়ে রয়েছে, মাটিতে জু'তা জোড়া, এমন কি ঘরের কোণে কাঠিটাও। তবে সে বুড়া কোথায় গেল ? তবে কি কেউ তাকে ভেঁতেরে নিয়ে গেছে ? না নিজেই সে উঠে গেছে ? চারদিক ভাল করে দেখে কমলেশ চন্দ্র সেট বিরাট প্রাসাদের দিকে। দৈত্যের মত তার বিরাট চেহারা নিয়ে সে চূপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। বড় দরজার কাছ দাঁড়িয়ে 'বুড়া' 'বুড়া' বলে বারবার ডেকেও সে কোন সাড়া পেল না। ঘুরে গিয়ে দেখল খিড়কীর দরজাও বন্ধ। কোথাও একটি জানালা খোলা নেই। জনপ্রাণী এর মধ্যে বাস করে বলে বাইরে থেকে মনে হয় না। বিকল মনোরথে কমলেশ হোট্টেলে ফিরে আসে। কিন্তু বুড়ার কথা নিয়ে কাকুর সঙ্গে আলোচনা করে না। নানান কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দেয়।

দিনকয়েক পরের কথা। কলোনীর ছেলেগা রাস্তা কাটতে মেতে গেছে শহর থেকে কলোনী পর্যন্ত একটা সোজা রাস্তা তৈরী

দিন আগত ঐ

কলোনী বৈরাগী

করা হচ্ছে, যাতে সকলেরই বাতায়নের সুবিধে হয়। ঘর পথে যেখানে সাত মাইল যেতে হয় এ রাস্তা তিন মাইলে সেখানে পৌঁছে দেবে, সকলেই পালা করে রাস্তা কাটার কাজে হাত লাগায়।

কমলেশ আর অমিতাভ পাশাপাশি কাজ করছিল, অমিতাভ নিজের মনেই গজ গজ করে, এটা কিন্তু শঙ্করদার অস্ত্রায়।

কমলেশ মুখ তুলে তাকায়, কেন কি হয়েছে ?

—আমাদের নিয়ে কেন রাস্তা কাটাচ্ছে ? আমরা তো হোটেলের ছেলে। এ রাস্তা হলে সুবিধে হবে কলোনীর লোকদের, নয় ত গ্রামবাসীর। আমরা খেটে মরব কেন ?

—বে কোন জিনিষ গড়তে হলে সকলকেই কাজ করতে হয়। সেখানে ভো ভোমার আমার বললে হবে না।

ও-সব বড় বড় কথা আমি বুঝি না। যদি এমন করে ব্যাগার খাটানো হয় এ স্থল আমরা ছেড়ে দেব।

কমলেশ আর কথা বাড়ায় না। চূপ-চাপ নিজের কাজ করে, কিন্তু বোঝে অমিতাভ চূপ করে নেই। সে কাজ করতে করতে প্রত্যেক ছেলের সঙ্গে এই বিষয়েই আলোচন করছে। হাত-পা নেড়ে কত রকম বোঝাচ্ছে।

সেই দিনই রাতে শোবার সময় কমলেশ এই কথাই তোলে, আমার ভয় করছে যে প্রশান্ত অমিতাভ বোধহয় দল পাকাবার চেষ্টা করছে, আমরা সবাই মিলে-মিশে কাজ করছিলাম, ওরা না সব গোলমাল করে দেয়।

প্রশান্ত গম্ভীর গলায় বলে, হোটেলের বেশীর ভাগ ছেলেই কিন্তু দেখছি ওর দিকে, কেউ এই রাস্তা কাটার হাত দিতে চাইছে না। কাল নাকি ওরা শঙ্করদাকে বলবে।

—ছি, ছি, শঙ্করদা' কি ভাববন বলতো ? নিশ্চয় উনি মনে খুব দুঃখ পাবেন।

পরদিন অমিতাভ সত্যিই গোলমাল পাকাল। কাজ করতে বাবার আগে ছেলেরা জড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল রাস্তার দু'ধারে। শঙ্করদা' এসে কাজ করতে বলতেই তারা সম্বরে জানিয়ে দিল যে আর তারা রাস্তা কাটবে না। সদাশঙ্কর চূপ করে সব কথা শুনল, মনে ব্যথা পেলেও তা প্রকাশ না করে বলল, রাস্তাটা তৈরী হলে সবলেরই সুবিধে হবে, তাই তোমাদের কাজ করতে বলেছিলাম। কাজের ওপরই আমি জোর করিনি।

অমিতাভ টেচিরে বলল, আমরা এখানে পড়াশুনো করতে এসেছি, কুলীগিরি শিখতে আসিনি।

সদাশঙ্কর জান হাঙ্গ, আমরা চাই এখানকার ছাত্ররা যাতে মানুষ হয়, এই রাস্তা কাটাটা মানুষেরই কাজ। তাই তোমাদের করতে বলেছিলাম। না ইচ্ছে হয় কোর না।

কমলেশ আর প্রশান্ত শঙ্কর-এর কাছে এগিরে যায়, স্পষ্ট গলায় বলে, আমরা কিন্তু কাজ করব শঙ্করদা'।

সদাশঙ্কর তাদের দিকে তাকিয়ে হাসে। এ আমি জানি। তুমি লেখাপড়া শিখে কিছু হয় না, আমাদের মানুষ হতে হবে, মানুষের মত মানুষ।

অর্ধেক লোক কাজ না করলে বাকি বারা কাজ করে তাদের উপর চাপ পড়ে বেশী। তবু কমলেশরা ছাড়বার পাত্র নয়। পুরোভাবে তারা কাজ করে যাচ্ছে। এ নতুন রাস্তা বুড়োর বাড়ীর পিছল দিক

দিয়ে বাবার কথা। এ ক'দিনের অক্লান্ত চেষ্টায় রাস্তা বন্ধপুরী ছাড়িয়ে গেল।

অমিতাভরা শুধু যে কাজ করে না, তাই নয়, অস্ত্রদের বাগড়া দিতেও ছাড়ে না। কত সময় তিনিয়ে তিনিয়ে বলে, শঙ্করদা খাপা এক জোড়া বলল এনেছে রে, বুড়ির বালাই নেই, ওদের যা বোঝাচ্ছে ওরা তাই করছে।

জোড়া বলল ওরা কাদের বলছে তা বুঝতে কমলেশ আর প্রশান্তর দেয়ী হয়না, কিন্তু কোনদিন তা নিয়ে বাগড়া করে না। হাসে, বলে, এমন বলদই যেন থাকতে পারি, অস্ত্রত কাজ করবেও আনন্দ পাবো। অস্ত্রদের দেখাদেখি শেয়াল হলে আর রক্ষে নেই, শুধু কেউ ডেকে বেড়াতে হবে।

এ কথা আর কেউ উত্তর দিতে পারে না।

এরই মধ্যে একদিন কমলেশ মণিকান্দর বাড়ীর সামনে দিয়ে যাচ্ছিল, দেখে রেণুকা শুকনো মুখে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। কমলেশ এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করে, কি হয়েছে দিদি, ওরকম অস্ত্রমনস্ক হয়ে কি ভাবছ ?

কমলেশের কথায় রেণুকার চমক ভাঙ্গে, এমন দাঁড়িয়ে আছি, কাজে যাচ্ছিলুম ? সময় থাকে তো ভেতরে আর না—

কমলেশ ঘরের ভেতরে ঢোকে, একটু আগে রেণুকা মাহুরের ওপর বসে কয়েকটা ছবির স্কেচ করছিল। সেগুলো এখনও চারদিকে ছড়ানো আছে। কমলেশ সেই দিকে তাকিয়ে বলে, এতক্ষণ আঁকছিলে বুঝি ?

রেণুকা রাস্তা হেসে বলে, আর ছবি আঁকতে ভাল লাগছে না—

—কেন, তোমার আবার কি হোল ?

—মনে হচ্ছে সারা কলোনী জুড়ে কোন একটা গোলমাল হবে। ঠিক ঝড় ঝড়বার আগে আকাশ যেমন থমথম করে এখন সেই অবস্থা।

—তুমি কি করে বুঝলে ?

—মণিকান্দর কথা থাক, উনি তো আর আমাদের কাজ শেষাভেই পারছেন না। সব সময় কি যেম ভাবছেন। অমিতাভরা যে হোটেলের ছেলেরা নিয়ে দল পাকিয়েছে, সে শুধু নিজেদের বুদ্ধিতে নয়, এর পেছনে লোক আছে।

কমলেশ উদগ্রীব হয়ে জিজ্ঞেস করে, কে ?

—কে তা ঠিক বুঝতে পারছি না, তবে শঙ্করদা', মণিকান্দ সবাই যেন কোন একজনকে সন্দেহ করছেন। আমিও তো তাই ভাবছি লোকটা কে ?

কমলেশ দৃঢ় গলায় বলে, সে যেই হোক এ আমাদের স্বপ্নরাজ্য। এখানে কোন দলাদলি আমরা আসতে দেব না। কাউকে ভাবতে দেব না।

সেই দিনই দুপুর বেলা রাস্তায় কাজ করতে করতে রাস্তা হয়ে, কমলেশ গাছের ছায়ায় জিরুচ্ছিল। পেছন থেকে কে যেন কথা বলে, তোমরা এখানে কি করছ ?

কমলেশ ফিরে তাকায়, দেখে সেই বুড়ো। এতদিন অনেক রকম হাঙ্গামার মধ্যে থেকে বুড়োর কথা এক রকম সে তুলে গিয়েছিল। এখন তাকে সামনে দেখে আবার পুরোন কথা মনে পড়ে যায়। জিজ্ঞেস করে, এখন কি রকম আছেন ?

বুড়ো তুচ্ছ কুঁচকার, কেন আমার কি হয়েছিল ?

—বাঃ, আপনি অজ্ঞান হয়ে মাঠে পড়ে গিয়েছিলেন না ?
আমরাই তো তুলে নিয়ে এলাম।

—ও, তোমরা ? তাই আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না।
সন্ধ্যাবেলা বেড়াতে বেরুলাম। তারপর শরীরটা খারাপ লাগছিল।
মাথা ঘুরে গেল। তারপর কি করে যে বাড়ীতে এসাম বুঝতে
পারছিলাম না। তাহলে তোমরাই—

কমলেশ উঠে দাঁড়িয়ে বলে, বড় জল তেঁটা পেয়েছে, জল
খাওয়াবেন ?

—চল আমার বাড়ীর মধ্যে।

কমলেশ জিনিষপত্র নিয়ে বুড়ার পেছনে পেছনে চলল।
বন্ধুপুত্রী বাগানের বেড়া পেবলেও বেশ খানিকটা হাঁটতে হয় বাড়ী
পৌঁছবার জন্যে, বুড়ো হাঁটতে হাঁটতেই জিজ্ঞেস করে। রাস্তা কাটার
উৎসাহ তোমাদের কমে গেছে বুঝি ?

—কই, না।

—ছেলে বেন কম মনে হচ্ছে।

—ও হ্যাঁ, হোটেলের ছেলেরা কাজ করছে না।

বুড়ো নিজের মনেই বিড় বিড় করে, আমি আগেই বলেছিলাম,
যোগার ষাটালেই হোল। আস্তে আস্তে সব টের পাবেন।

কমলেশ কিছু বুঝতে পারে না, বলে, কার কথা বলছেন ?

বুড়ো ঠিক আগের মত কর্কশ গলায় বলে, তোমার তাতে কি ?

বিড়কীর দরজার কাছে এসে বুড়ো দাঁড়িয়ে পড়ে, বলে, তুমি
এইখানে অপেক্ষা কর আমি জল নিয়ে আসছি।

বুড়ো বাড়ীর মধ্যে ঢলে যায়। কমলেশ চুপচাপ দাঁড়িয়ে
থাকে, চারদিকটা ভাল করে দেখে আম, কাঁঠালের কি বিরাট
বাগান, সারা মাঠটার শুকনো পাতা ছড়ানো রয়েছে, কমলেশের
মনে হ'ল খুব থেকে কে যেন আসছে, পাতার ওপর দিয়ে হাঁটার
মত মত শব্দ শোনা যাচ্ছে। কমলেশ তাড়াতাড়ি গাছের আড়ালে
সরে যায়। মনে মনে ভাবে, কে আসছে এ বাড়ীতে, বন্ধুপুত্রী
সঙ্গে বাইরের কারুর যোগাযোগ আছে বলে তো এত দিন শোনেনি
গাছের কাঁক দিয়ে সে তাল্লি চোখে সামনের দিকে তাকিয়ে থাকে।
পারের শব্দ ক্রমশ এগিয়ে আসে, কাছে, কাছে, আরো কাছে।
আগন্তুক কে কমলেশ এবার স্পষ্ট দেখতে পায়। কমলেশের বিষয়ের
অবধি থাকে না, সে আর কেউ না, অমিতাভ। চোরের মত চার
দিক চেয়ে পকেট থেকে একটা খাম বার করে চিঠির বাস্তব কলে
দেয় : তার পর আবার যে রকম এসেছিল তেমনি ক্রম পালিয়ে যায়।

সব ব্যাপারটাই কমলেশের কাছে সন্দেহজনক বলে মনে হয়।
কলোনীর থেকে বুড়াকে চিঠি লিখে কে ? সে কি অমিতাভ ?
আহলে তো সরাসরি বুড়ার সঙ্গেই কথা বলতে পারতো। ও
নিষ্ঠুর পিওন ছাড়া আর কিছু নয়। তবে পত্রলেখক কে ?
বুড়োও কি তাহলে এই কলোনী ভাঙ্গার দলের একজন ? সব
সন্দেহেরই নিরসন হয় চিঠিটা একবার পড়তে পারলে, গাছের
আড়াল থেকে বেরিয়ে কমলেশ বিড়কীর দরজার দিকে এগিয়ে
যায়। চিঠির বাস্তব কাছে গিয়ে ভরে ভরে চার দিক দেখে নিয়ে
বাস্তব খোলার চেষ্টা করে। চিঠির বাস্তব পুরোন হলও মজবুত।

কিছুতেই খোলে না। হয় ত গা-চাবী লাগান আছে। ভাল
করে দেখবার আর সুযোগ পায় না, বুড়ো এসে পড়ে। এক
গেলাস সববৎ কমলেশের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে এই নাও বাঁও।

কমলেশ সববৎ খেতে খেতে লক্ষ্য করে বুড়ো পকেট থেকে
একটা চাবী বার করে চিঠির বাস্তব খুলে অমিতাভর দিয়ে বাঁও।
খামটা বার করে। ওপরের হাতের লেখাটা দেখে নিয়ে নিজের
মনে হেসে সব্বৎ চিঠিটা ফতুরার পকেটে রেখে দেয়। কমলেশ এর
হাত থেকে গেলাসটা নিয়ে বলে, এবার তুমি বাঁও, আমার একটু
কাজ আছে।

কমলেশ বুঝতে পারে চিঠিটা পড়ার জন্যে বুড়ো খুব ব্যস্ত হয়ে
পড়েছে ! কমলেশ চলতে শুরু করলেই বুড়ো বাড়ীর ভেতর ঢুকে
বিড়কীর দরজাটা বন্ধ করে দেয়। সারা রাস্তা কমলেশ ভাবতে
ভাবতে ফেরে, এই পত্রলেখক কে ? বুড়ার সঙ্গে তার কি সম্বন্ধ ?

[ক্রমশঃ]

আধুনিক আফ্রিকাতে পাঁচ মাস

যাহসম্রাট পি, সি, সরকার

আফ্রিকা বনজঙ্গলের দেশ। অরণ্য সম্পদই আফ্রিকাকে সমৃদ্ধ
করে তুলেছে। সুজলা সুকলা হয়েও আফ্রিকা শত্রু শ্রামলা

হয়ে উঠেনি। এদেশের চাষ আবাদ আমাদের দেশের মতন নয়।
জঙ্গলে হুলার গাছে তুলা কলে, কলা আর আনারস গাছে প্রচুর
কলা, আনারস জম্মার, আফ্রিকাবাসীরা সেগুলি বিক্রয় করে জীবন
সংস্থান করে। কেনিয়া রাজ্যে খুব মকাই ভূটার চাষ হয়—ওটা
নাড়ি ভারতীয়দের আমদানী। সেরালিভার 'মহিন্দা' অর্থে ভূটা
এবং 'মহিন্দা' অর্থে ভারতবাসী। ভারতীয়রা এই ভূটার আমদানী
করেছিল কিনা সে বিষয়ে স্থির মত না থাকলেও এদেশে ইক্ষুর চাষ
ভারতীয়রাই আরম্ভ করেছেন—তারা এদেশে ইক্ষুর চাষ করে
বহু বড় বড় চিনির কল বসিয়েছে। বহু চা-বাগান ও কারি
বাগান আছে তার অধিকাংশেরই মালিক ভারতীয় ব্যবসায়ীরা বাবী
অংশ ইউরোপীয়দের। সমগ্র আফ্রিকাতেই জঙ্গল—কাঁটা গাছে
ভিত্তি, টাঙ্গানাইকা অঞ্চলে ঐ কাঁটা গাছের চাষ করে এক নতুন শির
গড়ে উঠেছে।

কয়েক বৎসর আগে আমরা যখন অস্ট্রেলিয়াতে থাকা দেখাছিলাম
তখন একজন ইংরেজ দোকানদার আমাদের একটা পাখেল
সহ দড়ি দিয়ে বেঁধে দিয়েছিল। বাণিজ্যটার দড়ি ছিঁড়ে পড়ে
যাবে আশঙ্কার আমি তাকে আরও শক্ত দড়ি দিয়ে বেঁধে দিতে
বলাতে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন যে ওটা পাটের দড়ি নয় ভটা
শিশল দড়ি ভীষণ শক্ত। আমি শিশল দড়ি চিনতুম না, তিনি
দেখালেন আমাদের দেশের শণ নুতার দড়ির মত আরও মোটা
মোটা আঁশের খুব ঘনঘণে সাধা শক্ত দড়ি। তিনি বললেন
আফ্রিকাতে এই শিশলের চাষ হয়—এই শিশল এখন আমাদের
ভারতবর্ষ-পাকিস্তানের পাট এবং ম্যানিলার শণের দড়িকে পরাস্ত
করেছে। এ ভীষণ শক্ত, সুদৃঢ় এবং অপেক্ষাকৃত সস্তা। ঐ দড়ি
সস্তা কিনা জানিনা, তবে পাট বা শণের দড়ির চাইতে বহুগুণ শক্ত
এবং সুদৃঢ় একথা অবশ্যই স্বীকার করেছিলাম। তারপর সারা

অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ডে টুয়েন্ট সত্ৰ সর্বত্র ঐ শিল্পের দড়ির ব্যবহার দেখেছি। কলিকাতায় শিল্পের দড়ির প্রচলন নেই বললেই চলে—বিলাত থেকে বখন বড় বড় পার্শ্বল আসে সেগুলি প্রায়ই ঐ শিল্প দড়ি দিয়ে বাঁধা থাকে। আমরা আফ্রিকাতে এসে এই শিল্পের চাব দেখতে পেলাম। সব চাইতে বেশী শিল্পের চাব দেখলাম টাঙ্গানাইকার বনভূমিতে। শিল্প গাছ আমরা ভারতবর্ষেও অনেক দেখি—আনারস গাছের মতন গাছ পাটার ডগাটা ভীষণ সুচালো এবং শক্ত। অনেকে ফুলের বাগানে সব করে বসান, কেউ কেউ টবেও পুতেছেন লক্ষ্য করেছি। আফ্রিকাতে এই শিল্পের চাব খুব বেশী হয়, জঙ্গলের গাছ অবশ্যে বন্ধিত হয়ে ওঠে, ওর পাটা কেটে কাঠরীতে সুতা বের করা হয়। এখন এই শিল্প টাঙ্গানাইকা এবং কেনিয়ার বড় কৃষিজাত সামগ্রী হয়েছে—ইউরোপীয়ানরা হু ফাইব্রী গড়ে তুলে শিল্পের চাব করেছেন।

কেনিয়া প্রসিদ্ধ তার ভুটা (Maize)র জন্ম আর উগাণ্ডা বিখ্যাত তার কলা এবং তুলার জন্ম। উগাণ্ডাতে ঐ কলা আর তুলা ছাড়া অন্য কোনও শস্যের চাব নেই। আফ্রিকার লোকেরা তাই ঐ দেশে শুধু কলা খেয়ে জীবন ধারণ করে। ওরা কলাকে বলে 'মেই ফু' আমার মতে ওটা 'মেইন ফুড'। উগাণ্ডার প্রতিটি আফ্রিকাবাসী ঐ কলা খেয়েই বেঁচে আছে। কাঁচাকলা জলে ভিজিয়ে ওরা ওদের প্রধান খাদ্য তৈরী করে। কেনিয়া ও টাঙ্গানাইকা এই দুই দেশের যে সব জায়গায় ভুটা জন্মায় সেখানে লোকেরা ভুটা খেয়ে জীবন ধারণ করে।

টাঙ্গানাইকার মাসাই অঞ্চলে অনেকটা মকমর আগ্নেয়গিরি সৃষ্ট জলা ভূমি আছে সেখানে একপ্রকার ঘাস আর কাঁটা গাছ ছাড়া কিছুই জন্মায় না—শতাব্দিক মাইলবাগী ঐ মকমর অঞ্চলে কেনপ্রকার খাদ্যশস্য পাওয়া যায় না—তাই ওখানকার মাসাইর অধিবাসীরা শুধুমাত্র গরুর দুধ এবং গরুর টাটকা রক্ত খেয়ে বেঁচে থাকে। ওরা জলী জাতি জঙ্গলেই বাস করে, গরু পোষে এবং গরুর দুধ খায়। গরুর দুধ সংগ্রহ করে প্রথমে দেবতার জন্য উৎসর্গ করে তার পর ওরা নিজেরা পান করে। একপ্রকার তার ধনুক দিয়ে গরুর গলার ছিদ্র করে সেখান থেকে প্রচুর রক্তপাত করতে আরম্ভ করে সেই রক্ত সংগ্রহ করে ওরা বাড়ীর সকলে মিলে পান করে। অনেকগুলি গরুকে এইভাবে তাদের Blod Bankএ রক্তদান করতে হয়। ওরা দেশী লাউয়ের খোলা দিয়ে তাদের পান-পাত্র (kibuyu) তৈরী করে নেয়—প্রত্যেক মাসাইয়ের হাতে ঐ পানপাত্র কিবুয় দেখা যায়, আর ওদের পুরুষদের হাতে থাকে ভীর ধনুক অথবা বল্লম। ওরা জঙ্গলে নির্ভয়ে যাতায়াত করে দরকার হলে ঐ বল্লম দিয়ে সিংহ পথ্যন্ত বধ করতে পারে। মাসাইদের শাস্ত্র খুবই ভাল—শরীর কৃকবর্ণ এবং চকচকে। ওরা লাল রং খুব ভালবাসে, রক্ত বস্ত্র পরিধান করলে খুব খুশী হয়। ওদেরকে দেখলেই ভয় করে,—মনে হয় দুর্ভিত্যের প্রতিমূর্তি।

আফ্রিকাতে কালো আদমীদের মধ্যে অনেক রকম ভাষা প্রচলিত হলেও সবাই সোহালী (swahili) ভাষা জানে এক বৃষতে পারে। সোহালী ভাষার এদের সঙ্গে কথা বললে সহজেই বন্ধুত্ব করা যায়। এরা দুর্ভিত্য হলেও খুবই বন্ধুবৎসল। ভাল ব্যবহার করলে,

বন্ধুর মত চললে এদের কাছে খুবই সুলভ, সদয় ব্যবহার পাওয়া যায়। কিন্তু এদের বিরুদ্ধে চললে কোন্ অজানা সংকেতে সাঁরা বনভূমিতে এদের বার্তা অদৃশ্যভাবেই ছড়িয়ে পড়ে, এদের চক্ষু, এদের হাত, এড়ানো অসম্ভব! গাছে এরা ঢোল ঝুলিয়ে রাখে সেই ঢোল বাজিয়ে ওরা সমস্ত জঙ্গলে ওদের সাক্ষাতিক বার্তা জানিয়ে দেয়। যে জঙ্গলে কোথাও কিছু নাই—মুহূর্তে মধ্যে শত শত বন্ধু এসে ভুটতে পারে, আবার পরক্ষণে তারা সবাই অদৃশ্য হতে পারে—যেন সবই সত্যিকার বাহুবল্লা—মুহূর্তে আবির্ভাব বা মুহূর্তে জনগণের অদৃশ্য হওয়া এটা ওদের জঙ্গলের ম্যাজিক—ওখানে আমার ম্যাজিক অক্ষম!

কেনিয়াতে 'মাউমাউ' আন্দোলন চলছিল—ওটা এদেশের পার্শ্বীয় কিছু জাতিদের স্বাধীনতা সংগ্রামের অভ্যুত্থান বলে অভিহিত করা হয়। '৪২ সালে ভারতে যেক্রপ আন্দোলন চলছিল বা মালয়ের জঙ্গলে স্বাধীনবাদীদের ক্রিয়াকলাপ চলছিল—এই আন্দোলন ঠিক তেমনি। যেতাজ বহিরাগত জাতিদের আফ্রিকা থেকে উচ্ছেদ করার জন্য এ যেন আফ্রিকার জলী (এক শ্রেণী) জাতির সুসংবদ্ধ গরিলা যুদ্ধ!—গত ১৯৫২ সাল থেকে আরম্ভ হয়েছে। গভর্ণমেন্ট এই 'মাউমাউ'কে বেআইনী ঘোষণা করে কঠোর হস্তে দমন করেছেন এখনও ৮,৪১৪ জন 'মাউমাউ'কে জেলে বন্দী করে রাখা হয়েছে। সম্প্রতি জাঞ্জিবার সহরে নিখিল আফ্রিকা স্বাধীনতা আন্দোলনের এক বিরাট অধিবেশন হয়েছে তাতে সভাপতির ভাষণে বলা হয়েছে যে কেনিয়ার 'মাউমাউ' আন্দোলনকে সাইপ্রাস দ্বীপের সাম্প্রতিক স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে তুলনা করা চলে। সাইপ্রাসে আর্কাবিশপ মাকারিওকে একদিন বিদ্রোহী বলা হয়েছিল আজ তিনিই সেখানকার সভাপাত নির্বাচিত হয়েছেন—ঠিক সেইভাবে 'মাউমাউ' আন্দোলনের নেতা জোমো কেনিয়েটাকে আজ বিদ্রোহী বলে ঘোষণা করে বঙ্গবন্ধুর পর বঙ্গের কারাকুদ্ধ করে রাখলেও, সেই কেনিয়েটাই একদিন মাকারিওর মতই একজন দেশপ্রেমিক নেতা বলে স্বীকৃত হবেন।

সমগ্র আফ্রিকাতে বর্তমানে বিরাটভাবে স্বাধীনতা আন্দোলন চলছে—চারিদিকে সভা, সমিতি, আইন অমান্ত, গরিলাযুদ্ধ, সাক্ষাৎসহায়, আপৎকালীন জরুরী ব্যবস্থা—ঠিক যেন '৪২ সালের ভারতে বসে আছি। আফ্রিকার কৃককার লোকেরা স্বাধীনতা লাভের জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে সক্রিয় আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে সবাইর মুখে এক বুলি 'আফ্রিকা ছাড়। আফ্রিকা শুধু আফ্রিকানদের জন্য।' এতদিন এই আন্দোলন শুধু যেতাজ ইউরোপীয়দের বিরুদ্ধেই প্রয়োজ্য ছিল এখন এরা ভারতীয়দিগকেও এদেশ ছেড়ে যেতে বলছে। সবাই এখন ইঙ্গ-এশির লোকদের দোকানপাট ব্যবসা সবকিছুকে অহিংসভাবে 'বয়কট' করতে আরম্ভ করেছে। আমরা থাকতে থাকতে এই কয়েক মাসের মধ্যেই এই আন্দোলন বেশ প্রবলভাবে মাথাচড়া দিয়ে উঠেছে দেখতে পাচ্ছি—এর ফল কি হবে তা শুধু ভগবানই জানেন।

আফ্রিকা বনজঙ্গলের দেশ—এ দেশে পথ চলতে বখন তখন অসংখ্য বুনো জন্তু জানোয়ার দেখতে পাওয়া যায়। গভর্ণমেন্ট এসব অরণ্যকে সংরক্ষিত অঞ্চল ঘোষণা করে বনজন্তুকে রক্ষা করে চলেছেন। দেশের সর্বত্র গভর্ণমেন্টের গামনালা পার্ক বা game reserve গড়ে উঠেছে। শত শত মাইল লম্বা উঁচু ভাটের জালের বেটনী দিয়ে

বড় বড় জেলখানা কৈরী হয়েছে ভেত বন্দী রয়েছে হাতী, সিংহ, গণ্ডার জলহস্তী, জেব্রা, জিরাফ, কুম্বার, বইসন, উটপাখী প্রভৃতি আফ্রিকার বিখ্যাত বন্য জন্তু জানোয়ার। এগুলি সংরক্ষিত অঞ্চল এখানে শিকার করা বেখাটনী এমনকি জঙ্গলে প্রবেশ করার সময় কোনপ্রকার আগ্নেয়াস্ত্র সঙ্গে লওয়াও আইনবিরুদ্ধ। গাড়ীর 'হর্ণ' বাজানো নিষেধ দুই শত টাকা জরিমানা হয়। দিনের আলোতে জঙ্গলে মোটর গাড়ী নিয়ে বাওয়া চলে, রাত্রিতে থাকা নিষেধ কারণ গাড়ীর আলো জ্বালা চলবে না। গাড়ীর দরজা জানালা বন্ধ করে—'গাইড' সঙ্গে নিয়ে জঙ্গলে ঢুকতে হয়। প্রবেশবারে বড় বড় অক্ষরে দেখা আছে—আপনার জীবনের জন্য আপনি নিজে দায়িত্ব নিয়ে জঙ্গলে প্রবেশ করছেন। গাড়ীর দরজা খোলা নিষেধ। হর্ণ বাজানো বা আলো জ্বালানো নিষেধ। গাড়ী থেকে নামবেন না, বন্য প্রাণীকে কোন ভাবে ভয় দেখাবেন না, চুপ করে বসে থাকবেন। মাঝে মাঝে বড় বড় সাইনবোর্ড আছে Elephants have the right of way. অর্থাৎ আগে হাতীকে পথ ছেড়ে দিন।

এখানে পথ চলতে অসংখ্য বুনো হাতী নজরে পড়ে, আগে চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে হাতীকে পথ ছেড়ে দিতে হয়। যারা নির্ভয়ে হাতী দেখতে চান তারা দিনের আলোতে Tree Top Hotel অর্থাৎ (ফিগার টাক্সনের বাড়ীর মত) গাছের ডগার হোটেলে আশ্রয় নিয়ে ভালভাবে দেখতে পারেন। গভর্ণমেন্টের তত্ত্বাবধানে অনেক ঐরূপ গাছের হোটেল এ দেশে আছে। আমরা বেলজিয়াম কঙ্গো, উগাণ্ডা এবং সুদানের মধ্যখানে এলবার্টফ্রুয়ে 'মার্শেশন ফলস' দেখতে গিয়ে গভর্ণমেন্টের বেস্ট হাউস 'পারা সফরী লজে' কেরাত্রি ছিলাম—পরদিন একটা লকে চেনে এসবটি হ্রদে বেড়াতে গিয়াছিলাম। রাত্রিতে বুনো হাতীর দল এসে আমাদের ঘরের জানালার ভেঁদে ঘসছিলো নানাভাবে গর্জন করছিলো। হ্রদের ভালে কুম্বার এবং জলহস্তী মোট বোধ হয় দুই তিন হাজার দেখেছি—আমাদের মোটর লকেব দুই তিন ফুট দূর দিয়ে জলহস্তী ও কুম্বারের পাল হেঁটে আর সাঁতারিয়ে বেড়াছিল। পথে আমরা হাতীও দেখেছি অন্ততঃ একতাল্লার। জিনজা সহরে মিশরের বিখ্যাত নীল নদের উৎসস্রুৎ ভিক্টোরিয়া হ্রদ ও রিপন জলপ্রপাতের Ripon Falls Hotel এ আমরা অনেকদিন ছিলাম। রাত্রিতে খেলার শেষে হোটেলে ফিরতেই দেখি বড় বড় দুইটি জলহস্তী আমাদের হোটেলের গেটের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে—আমাদের গাড়ীর তীক্ষ্ণ আলোক দেখে এ দুইটি জন্তু পিচ ঢালা রাস্তা অতিক্রম করে আবার হ্রদের জলে নেমে গেল।

পরকণ্ঠেই দেখি একটু দূরে রাস্তার পাশে আরও চারিটা বড় বড় জলহস্তী দাঁড়িয়ে রয়েছে—ওরাও গাড়ীর আলো দেখে জলে নেমে গেল। প্রথম দর্শনে ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম কারণ এত কাছে থেকে এর আগে 'হিপো' (জলহস্তী) আমি জীবনে আর কখনও দেখি নাই। পরে প্রতিদীন হিপো-দর্শন আমাদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। এই অঞ্চলে যখন তখন রাস্তাঘাটে 'হিপো' দেখা যায়। নাইরোবীতে গেলে লোকে যে কোন দিন সিংহ দেখতে পারে—সহর থেকে তিন মাইল দূরে সংরক্ষিত বন-অঞ্চলে গেলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই অন্তত পাঁচ সাঁতাটা সিংহের দেখা পাওয়া যায়।

ওরা মোটর গাড়ী আর মানুষ দেখে দেখে অত্যন্ত হয়ে গেছে। কলিকাতায় রাস্তায় যেমন বাঁড় দেখা যায়—বনপথে তেমনি মাঝে মাঝেই সিংহের দর্শন পাওয়া যায়। দশ বৎসর আগে নাইরোবী সহরের রাজপথেও মাঝে মাঝে সিংহের দেখা পাওয়া যেত। জেনারেল পোষ্টাকিনের কাছে নাকি প্রতিদীন সম্ভ্রায় সিংহের পাল এসে অমা হ'ত। এখন ওরা শুধু সংরক্ষিত বনেই চড়ে বেড়ায়। বাইরে চলে এলেই লোকেরা গুলী করে হত্যা করে ফেলে।

আফ্রিকাতে এখন অনেক বড় বড় শ্রাশনাল পার্ক 'সংরক্ষিত বন' গড়ে উঠেছে আর তাদের বেটনী এলাকাও কম নয়। একমাত্র বৃটিশ ইষ্ট আফ্রিকার হিসাব নিলে দেখা যাবে—কেনিয়াতে ৮টি সংরক্ষিত জঙ্গল আছে (১) নাইরোবী রয়ল শ্রাশনাল পার্ক এলাকা ৪৪ বর্গ মাইল (২) টসাতো রয়ল শ্রাশনাল পার্ক ৮,০৬৯ বর্গ মাইল, (৩) মার্গারিট শ্রাশনাল পার্ক ১০,০০০ বর্গ মাইল ইহা ছাড়াও গেডা শ্রাশনাল পার্ক, আবেসোলী, প্রমুখ অনেক সংরক্ষিত বন আছে। উগাণ্ডা রাজ্যে চারিটি সংরক্ষিত বন আছে তন্মধ্যে 'মার্শেশন ফলস' শ্রাশনাল পার্ক এবং 'কুইন এলিজাবেথ শ্রাশনাল পার্ক' খুবই প্রসিদ্ধ টাঙ্গানাইকার মধ্যে যে কয়টি সংরক্ষিত বনভূমি আছে, তার মধ্যে সেরেনগেটি এলাকায় সব চাইতে বিখ্যাত। এই তিনটি দেশের মধ্যে কেনিয়া অঞ্চল তার সিংহের জন্তু প্রসিদ্ধ, কাজেই কেনিয়া রাজ্যের প্রতীক চিহ্ন এই সিংহকেই করা হয়েছে, টাঙ্গানাইকা অঞ্চলে জেব্রা এবং জিরাফ খুব বেশী দেখা যায়। আমরা নাইরোবী থেকে টাঙ্গানাইকা আসার সময় ৭০ মাইল পথে কমপক্ষে তিন-চার হাজার জেব্রা, জিরাফ ও উটপাখী মোটরে বসে বসেই দেখেছি।—এই জিরাফকে এই দেশের প্রতীক চিহ্ন করা হয়েছে। উগাণ্ডা রাজ্যে বুনো হাতী এবং জলহস্তী বেশী পাওয়া যায় তাই উগাণ্ডা রাজ্যের প্রতীক হচ্ছে এ জলী হাতী। জিনজা সহরে জলহস্তী খুব বেশী, তাই এ সহরের মিউনিসিপ্যালিটি এ জলহস্তীকেই তাঁদের প্রতীক চিহ্ন করেছেন। ভারী বিচিত্র এই দেশ। রাস্তাঘাটে পথ চলতে যখন-তখন যে কোনও বন্যপ্রাণীর দেখা পাওয়া বিচিত্র নয়।

এদেশে একপ্রকার মাছি আছে (যার নাম Tsetse fly) এগুলি সাধারণ মাছির মতই উড়ে বেড়ায়—কিন্তু এ মাছি কামড় দিলে লোকেরা এক নূতন ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়, যার নাম sleeping sickness। বিগত ১৯০১-১৯০৬ সালে (পাঁচ বৎসরে) একমাত্র উগাণ্ডা রাজ্যেই মোট ২০০,০০০ দুই লক্ষ লোক এ মাছির কামড়ে sleeping sickness ভুগে মারা গিয়েছে। ইংরেজরা নানাভাবে সতর্কতা নিয়ে, ঔষধপত্র দিয়ে জঙ্গল পরিষ্কার করে—এখন স্বাস্থ্য অবস্থায় অনেক উন্নতি করে তুলেছে। আফ্রিকার জঙ্গলে সিংহ-গণ্ডার-বুনোহাতী, অন্তরীক্ষে জলীদেব বিখ্যাত ধনুক-তীর, জলে জলহস্তী, কুম্বার—ঝোপে ঝাড়ে কর্মমহুদ চোরাবালি, সামান্য মাছির কামড়ে অদ্ভুত ব্যাধি, জঙ্গলে মহুযভক্ষক অদ্ভুত গাছপালা। চারিদিকের শত বিপদকে উপেক্ষা করে ভারতীয়রা এবং যেতাল বণিকেরা এদেশে ভাগ্যাবেষণ করত এসে জঙ্গল পরিষ্কার করে নূতন নূতন সহর গড়ে তুলেছে—জনপদের সৃষ্টি করেছে। ইস্কুর চাব করে চিনির কল বসিয়েছে, চা এবং কফির চাব করে বড় বড় কাষ্টরী বসিয়েছে, চারিদিকে শিমলেক চাব, তুলার চাব,

ভূটার চাব, জঙ্গলের ডুলা, কলা, আনারসের পাশেই গড়ে উঠেছে বড় বড় সিমেন্ট ফ্যাক্টরী। বড় বড় বিরাট পিচঢালা রাজপথ, জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র, বড় বড় সেতু—আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগের সর্বাঙ্গকার সুযোগ সুবিধা।

ভাবতীয়রা এদেশের ব্যবসায় প্রবেশ করে এদেশের সমাজ এবং রাজনৈতিক জীবনে বখেট প্রাধান্য করে নিয়েছে। টাঙ্গানাইকায় রাজধানী ডায়েস সালের সহরের বর্তমান পৌরপাল (মেয়র) একজন ভারতীয়। এদেশের লোকেরা এখন জঙ্গলে জঙ্গলে গাছের ডালে ডালে কলা খেয়ে বুঁর বেড়িয়েছে—ভারতীয় বণিকরা এবং ইউরোপীয় বণিক ও রাজনৈতিকরা ততদিনে এদেশে নিজেদের প্রভু ভালভাবে বসিয়ে নিয়ে দেশের উন্নতির সাথে সাথে নিজেদের জাগোয়তি করে তুলেছেন। কৃষকরা আজ ইউরোপীয়দিগকে এদেশ ছেড়ে চলে যেতে বলছে—ভারতীয়দের নিকট থেকে তারা স্বাধীনতা আন্দোলনের ধারা শিক্ষা করেছে—বোধহয় ভারতীয়রা তাদেরকে পেছন থেকে কিছু কিছু শিক্ষাও দিতে চেষ্টা করেছে—বার ফলে আজ কাদের চক্রান্তে এ আন্দোলন আজ ভারতীয়দের বিরুদ্ধে চালাচ্ছে। ঠাণ্ডা লড়াইয়ে অভ্যস্ত বৈদেশিক কুটনৈতিকদের চালে ভুলে কৃষকরা আফ্রিকাবাসীরা আজ হয়ত মস্ত এড ভুলই করতে বসেছে। ভারতও এই বুদ্ধিতেই খুঁজির বিকিপ্ত হয়েছে! আফ্রিকা আজ কোনপথে চলেছে—ক জানে?

হৈমবতী উমা

শ্রীঅমিতাকুমারী বন্ধু

সে হাজার হাজার বছর আগের কথা। একবার দেবতা আর অমুরে ভীষণ যুদ্ধ লাগল। দুই দলই পরাক্রমশালী, কে হারে কে জেতে বোঝা যায় না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বহুদিন যুদ্ধের পর দেবতাদেরই জিত হল। তাদের উল্লাসে আর আফালনে বর্গ তোলপাড়। অহঙ্কারে মত্ত হয়ে দেবতারা বলাবলি করতে লাগলেন, আমাদের কি রকম শক্তি। আর অদ্বুত ক্ষমতা, তাই না অমুরদের পরাজয় করতে পারলাম।

দেবতাদের এই অহঙ্কার দেখে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা ভাবলেন তাদের এ অহঙ্কার একটু চূর্ণ করা দরকার। একদিন তিনি এক জ্যোতির্ষয় বন্ধুরূপে দেবতাদের সামনে দাঁড়ালেন। দেবতারা আমোদ আনন্দে মগ্ন হল। এমন সময় হঠাৎ অচেনা এক দীপ্তিময়ী মূর্তি দেখে বিস্মিত হলেন, ভয় পেলেন। তিনি কে এই পরিচয় জানবার জন্যে তারা অস্থির হয়ে উঠলেন। দেবতাদের বৈঠক বসল, তাঁরা অগ্নিদেবকে তাঁদের প্রতিনিধি করে সেই জ্যোতির্ষয়ের কাছে পাঠালেন।

অগ্নি সেখানে গিয়ে দাঁড়াতেই সেই জ্যোতির্ষয় বন্ধু তাঁর পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন।

অগ্নি সগর্বে উত্তর দিলেন। আমি অগ্নি। আমাকে সবাই জ্ঞাতবেদা: (সর্বজ্ঞ) বলে জানে।

বন্ধু জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোন শক্তির অধিকারী?

অগ্নি বললেন, আমার শক্তি এই, বর্গ, র্ত্ত, পাতাল এই ত্রিভুজনে, বা আমার সামনে পড়ে তাই আমি দগ্ন করতে পারি।

—তখন সেই বন্ধু দুই অঙ্গুলিতে একটি শুক্ল তৃণখণ্ড ধরে বললেন, একে দগ্ন করো।

কিন্তু দাহিকা শক্তিশালী অগ্নির অহঙ্কার চূর্ণ হল, তিনি প্রাণপণ শক্তিতেও সেই তৃণখণ্ড দগ্ন করতে পারলেন না নত মস্তকে দেবপুরীতে গিয়ে নিজের অক্ষমতা জানালেন।

তখন দেবতারা পুন দেবকে পাঠালেন। পুনদেব স্বীয় শক্তিতে আহ্বান হয়ে তাঁরবেগে বন্ধের সামনে উপস্থিত হলেন।

বন্ধু তাঁর শক্তির পরিচয় জিজ্ঞেস করলে। তিনি সগর্বে উত্তর দিলেন আমি বায়ু, আমার সামনে যা পড়ে তাই আমি উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারি।

বৃক্ষ তৃণ খণ্ড ধরে বললেন, এটা উড়িয়ে নিয়ে যাও।

বায়ু তাঁর প্রচণ্ড শক্তি দিয়েও সেই তৃণখণ্ডকে মোটেই হেলাতে পারলেন না। উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া তো দূরের কথা। লজ্জার অধোবদন হয়ে পুনদেব ফিরে এলেন।

দেবপুরীতে ভীষণ ঠণ্ডেজনার সৃষ্টি হল। এই মহাপরাক্রমশালী জ্যোতির্ষয় পুরুষ কে তা জানবার জন্য দেবতারা অস্থির হয়ে উঠলেন। দেবরাজ ইন্দ্রকে তাঁরা পাঠালেন। কিন্তু দেবরাজ সেখানে দাঁড়াবামাত্র নিমেষের মধ্যে সেই জ্যোতির্ষয় পুরুষ অদৃশ্য হলেন। দেবরাজ বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

তখন চতুর্দিক আলোকিত করে অতি সুন্দরী রূপলাবণ্যময়ী এক নারী মূর্তির আবির্ভাব হল। তিনি কে? না, বিশ্বাসিনীতা সেই হৈমবতী-উমা। তাঁকে দেখে দেবতারা স্তম্ভিত বন্দনা করতে লাগলেন। তারপর দেবরাজ ইন্দ্র এ আশ্চর্য্য জ্যোতির্ষয় পুরুষের পরিচয় জানতে চাইলেন।

তখন হৈমবতী-উমা বললেন, হে দেবগণ। তোমরা যে আশ্চর্য্য সুন্দর অদ্বুত তেজোময় পুরুষ দেখে বিস্মিত, ভীত হয়েছো তুমি আর কেউ নন, তিনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি কর্তা সেই পরমপুরুষ। তোমরা অহঙ্কারে মত্ত হয়ে উঠেছিলে ভেবেছিলে তোমাদের নিজ শক্তিতে তোমরা অমুরদের জয় করেছ, কিন্তু না, তা নয়, কোনো ঐ বিরাট পুরুষের অঙ্গুলি হেলনে জগতের সমস্ত কাজ নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। আর তাঁরই শক্তিতে শক্তিমান হয়ে তোমরা অমুর জয় করতে পেরেছ। তোমাদের নিজেদের বিন্দুমাত্র ক্ষমতা নেই, তার প্রমাণ এখনই পেরেছ।

দেবতাদের অহঙ্কার চূর্ণ হল। তাঁরা নিজেদের ভ্রম বুঝতে পারলেন, লজ্জিত হয়ে সেই সর্ব শক্তিমান পরমেশ্বরের বন্দনা করতে লাগলেন।

কালি থেকে সন্দেশ

যাহুরদ্বাকর এ, সি, সরকার

এবার যে খেলাটার কথা বলছি সেটি খুবই মজাদার।

যাহুরদের হাতে আছে একটি কাচের গ্রাস বা ভর্ত্তি আছে কালিতে। ঘন কাগো কালি। টেবিলের উপর এই গ্রাস নামিয়ে রেখে তিনি হাতে তুলে নিলেন এক কালি সালা কাগজ। সবার সামনে এই সালা কাগজের ফালিটাকে যাহুর ডোবালেন কালির দ্বারা আর তার কলে কাগজের কালির একটা প্রান্ত কালিতে কলঙ্কিত হল। এ দেখার

পরে দর্শকদের আর কোন সন্দেহই রইলো না যে গ্রাসে সত্যি সত্যিই কালি আছে। এঁর পরে বাত্বকর আরম্ভ করলেন বাগাঁড়বর :

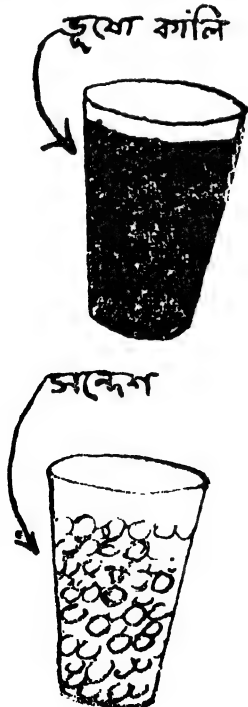
বন্ধুগণ, এখন যে খেলা আপনাদের সামনে হাজির করছি তা দেখলে আপনাদের সবারই কিংদে পাবে। আর সে কিংদে দূর করার ব্যবস্থাও হবে যাঁবে সঙ্গে সঙ্গে।

টেবিলের উপর থেকে কালির গ্রাস আর একটা কালো রুমাল তুলে নিয়ে ঐ রুমাল দিয়ে তিনি আচ্ছা করে মুড়ে দিলেন গ্রাসটাকে। আর সুর করে পড়তে থাকলেন ম্যাজিকের মন্ত্র :

আরম্ভসানের সঙ্গে আড়ি
তাই মাছি ঝায় ময়রা বাড়ি
হুতোম পাঁচার হুতোম হুতোম ডাক
মিহিমানার মিহি দান
বাজভোগ যে বাজার খান
তাই নিয়ে এই গেলান ভরা যাক।

গ্রাসের ঢাকনা গুলতে তো সবাই অবাক হয়ে গেলেন। কালি উঠাও। গ্রাস ভর্তি হয়ে গেছে কড়া পাকের সন্দেহে। একটি একটি করে তুলে নিয়ে বাত্বকর তা পরিবেশন করলেন তাঁর দর্শকদের।

এবারে শোন কেমন করে এই অসম্ভব সম্ভব হল। গ্রাসটাতে কিছু আসলে কোনও কালিই ছিল না। গ্রাসটাতে একটু কারসাজি করে নিয়ে ছিলেন বাত্বকরমশাই। কানার দিকে আধ ইঞ্চি পরিমাণ জায়গা ছেড়ে দিয়ে ঐ গ্রাসের সারা গায়ে লাগিয়ে ছিলেন ভূষা কালি আর গ্রাসটার ভেতরে রেখেছিলেন সন্দেহ। তোমরা এই খেলা করার সময়ে ব্যবহার করো লক্ষের ভূষা কালি। একটা কেরাসিনের লক্ষ আলিয়ে তার শিখার উপরে ধবে ধবে সহজেই গ্রাসের গায়ে ভূষা



কালির পলস্তরা লাগাতে পারবে। গ্রাসের ভেতরে সন্দেহের বদলে বিস্কুট, লেবোনচুয এমন কি মুড়িও রাখতে পারো তবে কোনও ক্ষেত্রেই গ্রাসের স্তিন চতুর্থাংশের বেশী অংশ যেন ভর্তি না হয়। কালো রুমাল দিয়ে মুড়ে নেবার সময়ে গ্রাসের গা ভালভাবে মুছে নেবার কৌশলটা কিন্তু অভ্যাস করে নেবে বেশ ভাল করে তা না হলে কিছু সব ভুল হয়ে যাবে। যে কাগজের কালিটা দিয়ে বাত্বকর গ্রাসে কালির অস্তিত্ব প্রমাণ করেন তাতেও আছে কৌশল। এর সামনের দিকটা সাধা হলেও পেছনের দিকে নীচের প্রান্তে থাকে কালির দাগ। গ্রাসে ঢুকিয়ে ভালোবায়ের সময়ে বাত্বকর কাগজের কালিটা

ঘুরিয়ে দেয় আর দর্শকেরা তাই দেখতে পান যে কাগজের কালিতে কালি লেগেছে।

বাত্বিকার উৎসাহী পাঠক পাঠিকারা আমার সঙ্গে উপযুক্ত জবাবী ডাকমাণ্ডলসহ পত্রালাপ করতে পার A. C. SORCER. Magician, Post Box 16214, Calcutta-29 ঠিকানায়।

অরুণীয় ঝাঁরা

কবি কর্ণপূর

পুণ্ডরীক সমুদ্রের ধারে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের মঠ। প্রতিবারের মত সেবারেও এসেছেন বাংলাদেশ থেকে অসংখ্য তীর্থযাত্রী। সকলেই বৈষ্ণব এঁদের মধ্যে আবার কেউ বা মহাপ্রভুর একান্ত অন্তরংগ। তাঁরা বৎসরান্ত্রে মহাপ্রভু আর জগন্নাথদেবকে দেখতে আসেন। তাঁর সংগে নাম সংকীর্তন করে কিছুদিন কাটিয়ে আবার ফিরে যান দেশে।

প্রতিবারের মত এবারেও এসেছেন নদীয়া জেলার কাকদপল্লী হ'তে সেন শিবানন্দ, মহাপ্রভুর প্রিয় পার্শ্ব। নীলাচল যাত্রীদের অনেককেই তিনি নিজের খরচে সংগে নিয়ে আসেন। অতুল ঐশ্বর্যের মলিক হয়েও তিনি ভগবানকে নিজের সমস্ত কিছু দান করে নিয়ে ভিক্ষার মত জীবন সাপন করছেন। গৃহবিগ্রহ কৃষ্ণাব্যয়ের নামে সমস্ত সম্পত্তি উৎসর্গ করে দিয়েছেন। এবারকার তীর্থযাত্রার তিনি একলা ন'ন। সংগে তাঁর স্ত্রী আর সাত বছরের ছেলে পরমানন্দ। শিবানন্দ এসেছেন মহাপ্রভুর কাছ থেকে পরমানন্দের জন্ম আশীর্বাদ ভিক্ষা করতে। যার ফলে ছেলের ধর্মে মতি হয় এবং মানুষ হয়ে উঠতে পারে।

কিন্তু মহাপ্রভু সামনে এসে সাত বছরের ছেলে পরমানন্দ গ'ে ধরল। কিছুতেই কৃষ্ণ নাম করে না। মহাপ্রভু কত চেষ্টা করলেন তবুও পরমানন্দ নীরব। বিরক্ত হয়েই মহাপ্রভু বললেন, জগতের সকলকেই আমি কৃষ্ণ নাম নেওয়ালাম আর এই বালকের কাছে আজ পরাজিত হলাম এ অত্যন্ত আশ্চর্যের কথা।

সকলেই ছেলের এত ভাব দেখে বিবস্ত্র হল। শিবানন্দ আর তাঁর স্ত্রী তো মনে মনে চটেই গেলেন। কিন্তু তবু তাঁরা হাল ছাড়লেন না। আরও দিনকয়েক পরে ছেলেকে আবার তাঁরা নিয়ে গেলেন মহাপ্রভুর কাছে আর আশ্চর্যের বিষয় এবার পরমানন্দ মহাপ্রভুর পায়ে মুখ রেখে বলে উঠলেন একটি সংস্কৃত শ্লোক। যে শ্লোক কোন শাস্ত্র বা পুরাণের নয় বালকেরই স্বরচিত। শ্লোকটিতে তিনি শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা করেছিলেন।

সাত বছরের শিশুর মুখে এমন স্নন্দর অথচ নির্ভুল শ্লোক শুনে সকলেই বিস্মিত হলেন, এমন কি মহাপ্রভু পর্যন্ত। তিনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন এই শিশুর এমন পরিবর্তন দেখে। আর সেই সংগে তখনই তাঁকে 'কবি কর্ণপূর' উপাধি দান কবলেন। মহাপ্রভুর প্রদত্ত এই কবি কর্ণপূর উপাধিই উত্তর কালে তাঁকে বৈষ্ণব সমাজে বিখ্যাত করে তুলেছিল।

শিবানন্দ ছেলের এই পরিবর্তন আশ্চর্য্যের সাথে গিয়েছিলেন। তখন থেকেই তাঁকে সবাই কবি কর্ণপূর নামে ডাকতে শুরু করলেন।

কবি কর্ণপূর ছিলেন শিবানন্দের ছোট ছেলে। ১৫১২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জন্ম হয়। অনেকগুলি বই তিনি লিখেছিলেন। সমস্তগুলিই

ঐতিহ্য ও জীকৃষ্ণ লীলাকে কেন্দ্র করে। এদের মধ্যে 'ঐতিহ্য' চন্দ্রানন্দ নাটকই মনে হয় সর্বশ্রেষ্ঠ। এ নাটকে মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের পর থেকে পুরীতে বসবাসের সময় পর্বন্ত ঘটনাগুলো লিপিবদ্ধ করা আছে।

প্রাচীন সাহিত্যের অন্ত্যন্ত পুঁথির মত এ নাটকটির রচনা কাল নিয়েও পণ্ডিতদের মধ্যে মহাভেদ আছে। কেহ বলেন ১৫৭১-৮০ সালে আবার কেহ বলেন ১৫৩২-১৫৪০ সালের মধ্যে নাটকটি লেখা হয়। তবে নানা অঙ্গুসন্ধানের পর ঠিক হয়েছে যে নাটকটি ১৫৪০ সালের আগেকার রচনা।

নাটক রচনার কয়েক বছর পরে 'ঐতিহ্যচরিতামৃত মহাকাব্য' রচনা করেন কবি। ১৫৪২ সালে এটি রচিত হয়। এ কাব্য রচনার কবি তাঁর আগেকার কবি সুবারি গুপ্তকে অনুসরণ করেছেন।

কবির তৃতীয় গ্রন্থ হচ্ছে 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'। এ বইটি নিয়েও বৈষ্ণব সমাজে প্রচুর বাত্বিতণ্ডা হয়ে গিয়েছে। অনেকে একে কর্ণপুরের রচনা বলে স্বীকার করেন না, কিন্তু নানা বাত্বিতণ্ডার পরে তাঁর সময়ের কবি নরহরি চক্রবর্তীর কথার পুনরুক্তি করে বলা যায় যে এটিও কর্ণপুর রচনা করেন।

এছাড়া 'আনন্দবৃন্দাবনচম্পু', 'আবিশভক', 'অলংকার কোষত'

এ বইগুলিও তিনি লিখেছিলেন। ঐমত্যাগবহুর অনুকরণে আনন্দবৃন্দাবনচম্পু লিখিত হয়েছিল। অলংকারকৌশল, কাব্য অলংকারকে কেন্দ্র করে কবির পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনা।

কিন্তু বিশ্বাসের বিষয় যে এত পাণ্ডিত্য সম্বন্ধেও এক পুঁথি রচনা করেও তাঁর নাম আজ সাধারণের কাছে অজ্ঞাত হয়ে রয়েছে। বৈষ্ণব সমাজেও কবি হিসাবে তিনি ভেতন খ্যাতি পাননি। তখনকার দিনে বৃন্দাবনের ছয় গোষ্ঠ্যমী ছিলেন গ্রন্থ অনুমোদনের অধিকর্তা। তাঁরা কবি কর্ণপুরকে ভাল চোখে দেখতেন না। কবির সংগে তাঁদের ধর্ম বিষয়ে বেশ কিছুটা পার্থক্য ছিল আর তাছাড়া তাঁরা চেয়েছিলেন তাঁদের রচিত পুঁথিই বাংলাদেশে বেচী প্রচার হোক। ফলে কর্ণপুরের কোন গ্রন্থকেই তাঁরা অনুমোদন করেননি। কিন্তু না করলেও তাঁর গ্রন্থ থেকে যথেষ্ট স্বপ্ন অনেকেরই গ্রহণ করেছিলেন।

বাংলাদেশে বসে কবি কর্ণপুর যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ বইগুলি রচনা করেছিলেন বাঙালী তা থেকে যথেষ্ট আনন্দ আর জ্ঞান লাভ করেছিল। বৃন্দাবনের গোসাইরা তাঁকে স্থান না দিলেও তিনি বাঙালীর স্বপ্নে স্থান করে নিয়েছিলেন। মহাপ্রভুর রেখাশীর্ষম্প্রভ এই ভক্ত কবির কথা তাই বাঙালী ভক্তের মনে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

শীতের দিনে-ও ল্যামোলিন-যুক্ত বোরোলীন আপনার ত্বক-কে সজীব রাখবে

শীতের কনকনে হাওয়ার হাত থেকে স্বাভাবিক সৌন্দর্য রক্ষা করতে বোরোলীন-ই হচ্ছে আদর্শ ক্রম। নিয়মিত ব্যবহারে, ওষধিগুণ-যুক্ত, সুরভিত বোরোলীনের সক্রিয় উপাদান ত্বক-কে কোমল, নরম ও সজীব করে তুলবে আর আপনার অন্তরীণ স্বাভাবিক সৌন্দর্যকে বিকশিত করবে। বোরোলীনের যত্নে নিজেকে রূপোন্মল করুন।

বোরোলীন

পত্রম প্রসাধন

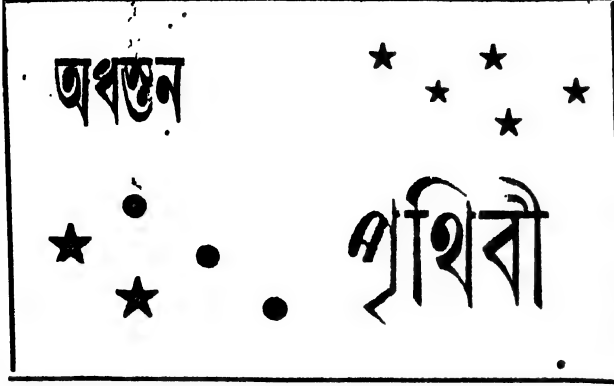
পরিবেশক : জি, দত্ত এণ্ড কো:



বোরোলীনে—ল্যামোলিন আছে বলে শীতের দিনে-ও গাল, হাত ও চোঁটকাটার হাত থেকে রক্ষা করে আর রূকতম ত্বকের-ও লাভণ্য বৃদ্ধি করে।



১৬, বনফিল্ড লেন • কলিকাতা-১



[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ডঃ পঞ্চানন ঘোষাল

জোড়াবাগানয় রিপোর্ট থেকে গাভ্যমন্ড খেয়ে ফিরে এসে চিরঞ্জীব বাবু আর একটু মাত্রও নীচের আফিসে দেবী না করে তড় তড় কর সিঁড়ি বেয়ে তাঁর উপরের কোয়ার্টারে এসে উপস্থিত হলেন। এই দিন তাঁর কোয়ার্টারের ভিতরে ঢোকার দরজাটি খুলাই ছিল। কোনও দিকে না দেখে তিনি ভিতরে এসে একটি চৌকীর ওপর গুম হয়ে বসে পড়লেন। চিরঞ্জীব বাবুর মনের এই বিশেষ অবস্থাটি তাঁর স্ত্রী সারদামণির নজর এড়ায় নি। প্রায় দুই তিন দিন খাবং তিন তাঁর স্বামীকে চিন্তিত দেখেছেন। তবে পুলিশের কাজে মানে মানে এটেকপ হয়েই থাকে। কয়েকদিন মনমগ্ন হয়ে থেকে পুনরায় এঁরা এদের মনের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসেন। তখন এঁরা যিশুগ উপসাহে প্রিয়জনদের সঙ্গে পুনরায় কথাবার্তা শুরু করেন। তাঁদের মন তখন প্রিয়জনদের প্রাণ যিশুগতর স্নেহ ও প্রীতিতে ডুবে যায়। এই সব এতোদিনে সারদামণির গা সওয়া হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এইদিন তাঁর মুখে শুধু চিন্তা নয়, একটা নির্দারূপ বিষাদও বেন ফুটে উঠেছে। এই অবস্থার স্বামীকে বিরক্ত করবার ইচ্ছা সারদামণির ছিল না। তবু রাত্রা ঘরের দিকে যেতে যেতে তিনি স্বামীকে একবার জিজ্ঞেস করলেন, অমন করে মন খারাপ করে বসে আছো কেন? অফিসের কাজে নতুন কোনও আবার বজাট তজাট হলো না কি? প্রণব বাবুকে তো আবার আজকে মধ্যাহ্নভোজনের নিমন্ত্রণ করেছিলে। কখন পূরী থেকে ফিরবেন তিনি? একটা তো বেজে গেল এদিকে। তুমি না হও এর মধ্যে একটুখানি খেয়ে নাও। পরে আবার তাঁর সঙ্গে বসে খাবে আধুন।

নীচে মেঝের উপর একটা মাদুর পেতে বসে চিরঞ্জীব বাবুর শিশু পুত্র টেচিয়ে টেচিয়ে একটা বাঙলা পাঠ্যপুস্তক পড়ছিল। অজ্ঞান এই সময় স্থানাহারের পূর্বে চিরঞ্জীব বাবু পুত্রের পঠন পাঠন সব্বন্ধে একটু খবর নেন। ছেলে কি পড়ছে বা না পড়ছে তা জানবার বা দেখবার জন্ত অজ্ঞ কোনও সময় তাঁর হাতে থাকে না। একটু পরেই তাঁকে খেয়ে দেয়ে আবার নীচের অফিসে নেমে যেতে হবে। উপরে ফিরে আসতে কোনও কোমল দিন পড়ীর রাতও হয়েছে। প্রত্যক্ষ পুত্র তাঁর জেগে উঠ তাঁর

দিকে চোখ মেলে চেয়ে দেখবার পূর্বেই তাকে সরকারি কাজের জন্ত নীচে নেমে যেতে হয়। পুত্র দিকে একবার সন্ধান নেড়ে চেয়ে দেখে অজ্ঞমনস্ক ভাবে চিরঞ্জীব বাবু তাঁর জীকে জ্ঞানালেন, ট্রেন তো বহুক্ষণ এসে পড়েছে। এখনি প্রণব বাবু এসে পড়লো বলে। এক সঙ্গে খেতে বসবো আধুন। হয়তো এতোক্ষণ স এসেও পড়েছে। তাঁর কোয়ার্টারে একবার খোঁজ নিয়ে দেখছি: তুমি বাও—

মাদুরের মন যখন অত্যধিক খাপ খাকে, তখন প্রিয়জনদের সম্পর্ক বোধ হয় অধিকতর অসহনীয় হয়ে উঠে। জীকে সুযুখ থেকে অন্তত: কিছুক্ষণের মত বিদেয় দিয়ে চিরঞ্জীব বাবু বেন একটু স্বস্তির নিখাস ফললেন। সৌভাগ্যক্রমে স্বামীর মন খারাপের কারণ সব্বন্ধে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করে তাঁর এই অসহনীয় অবস্থাকে আরও অসহনীয় করে তুলবার মত সারদামণির হাতে এইদিন পর্য্যাপ্ত সময় ছিল না। বহির্জগৎ সব্বন্ধে নিতান্ত অভিজ্ঞ প্রিয়তমা জীকে তাঁর মন খারাপের কারণ সব্বন্ধে কোনও মনগড়া ঘটনার উল্লেখ করে রেহাই পাবার মত হনের অবস্থাও আজ বেন আর তাঁর নেই। নানারূপ প্রণব দ্বারা তাঁকে উত্থাপ্ত করার জন্ত তাঁর কাছে জেঁকে না বসে তাঁর প্রিয়তমার চলে বাওয়াটি বেন তাঁকে একটা শান্তির প্রলেপ এনে দিলো। মন খারাপের কারণ সম্পর্কীয় ঘটনা সমূহের প্রকৃত স্বরূপ সব্বন্ধে যে আদপেই ওয়াকিবহাল নয় তাঁর কাছ থেকে এই বিষয়ে কোনও সান্তনার বাণী শুনা বোধ হয় আরও পীড়াদায়ক। তাঁর এইরূপ মানসিক অবস্থার একমাত্র প্রণব বাবুর মত লোকের বোধ হয় তাঁকে সান্তনার বাণী শুনাতে পারে। এইজন্ত অন্তরের সঙ্গে চিরঞ্জীব বাবুর মন মাত্র প্রণব বাবুকেই এই সময় ভাবনা করছিল। মাদুর বা মনে প্রাণে কামনা করে বহু ক্ষেত্রে তা প্রায়জন মত এসেও যায়। হঠাৎ কান খাড়া করে চিরঞ্জীব বাবু শুনলো, দরজার কলিও বেলাটি ক্রিঙ ক্রিঙ করে বেজে উঠেছে। তাড়া তাড়ি উঠে বেরিয়ে এসে চিরঞ্জীব বাবু দেখলেন যে ইতিমধ্যে প্রণব বাবু ষ্টেশন থেকে নিজের কোয়ার্টারে ফিরে স্থান করে মধ্যাহ্নর আহ্বারের জন্ত তাঁদের কোয়ার্টারে নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে এসে গিয়েছেন।

নীচের আফিসের মুন্সী বাবুদের কাছ হতে এই দিনের রিপোর্ট রুমের ঐ ঘটনা সব্বন্ধে সব্বিশেষ সংবাদ প্রণব বাবু ইতিমধ্যেই পেয়ে গিয়েছিলেন। সন্তোষে চিরঞ্জীব বাবুর কাঁধে হাত রেখে প্রণব বাবু সান্তনার সুরে বলে উঠলেন নীচে এসেই সাহেবদের কীর্তিকালাপ সব্বন্ধে কিছুটা শুনলাম। আমি হঠাৎ বাইরে না গেলে বোধহয় এতোটা হতে পারতো না। অন্তত: আমাদের বড় বাবুকেও সময় মত আমি রিপোর্ট রুমে হাজির করে দিতে পারতাম। বড় বাবু যে মাঝে মাঝে কাণ্ডজ্ঞান-হীন হয়ে পড়েন। অথচ তাঁকে বাঁচানোর জন্তেই আমাদের এতো দুর্ভোগ। তা না হলে ছোট সাহেবের সঙ্গে আমাদের বিরোধের আর কি কারণ থাকতে পারে। সব কথা খুলে তাঁকে না বলার জন্তই না তিনি মিছামিছি আপনাকে সন্দেহ করছেন। এঁরা দেখছি মাদুরকে আর মাদুর বলেই মনে করতে চান না। আপনাদের সেই জোড়া বাগানের সিংহীর হমকীর গল্পটাও শুনে পেলাম। ইতিমধ্যেই দেখছি ব্যাপারটা সর্বত্রই প্রকাশ হয়ে পড়েছে। তা এমন কথা যে শুনেছে সে ওদেরই নিন্দে করছে। আমাদের আর কি? ওরা ওদের ওপরওয়ালাদের অনাচারে ত্বাক দিতে পারেন, কিন্তু তাঁদের নীচেরওয়ালাদের তো তা তাঁরা পারেন না। এদের

প্রতিটি দুর্বলতা • তাঁদের ওপরওয়ালারা না জানতে পারলেও তা তাঁদের নীচের অফসারদের কাছে কোনও দিনই অজ্ঞাত থাকে নি। একদিন আমাদের হাতেও তাঁদের মত এইরূপ অসীম ক্ষমতা আসবে। কিন্তু সেদিন যেন একথা আমরা না ভুলে যাই। এখন এঁদের অবসর গ্রহণ করা পর্যন্ত আমাদের বৈধা ধরে অপেক্ষা করতে হবে। আস্তন, ভেতরে আস্তন। মন খারাপ করবেন না। ভুলে যাবেন না যে আমরা পুরাতন ও নতুন যুগের সন্ধিক্ষেপে দাঁড়িয়ে আছি। অন্য বিষয়ে ভিন্নমত হলেও এই একটি বিষয়ে আমি আমাদের বড়বাবুর সঙ্গে একমত।

যে অসদব্যবহার একই ভাবে সকলকে সহ্য করতে হয় তার জন্তে ভুক্তভোগীদের কেউ কারুর কাছে সম্মানে ছোট হয়ে যায় না। পরস্পর পরস্পরের উপর প্রযুক্ত কটুবাক্য জানতে পারলে তা তাদের কাছে অপমানকর না হয়ে বরং শাস্তির পর্যায়ে পড়ে। তবে তা তাদের গোষ্ঠির বাইরের কেউ না জানতে পারলেই হল। ছোট সাহেব কিংবা বড় সাহেবকে তাঁরা কোন ওপরওয়ালার ঘর থেকে বের হলে এসে তাঁবেদার অফসারদের গাল পাড়তে দেখলে তাঁরা বুঝে নেন তবে ওপরওয়ালাদেরও ওপরওয়ালার আছে—ভট্টটুকু যা তাদের সাধনা। বাঘ নাকোহাল করে তুলে নেকড়েকে। নেকড়ে অল্পরূপ ভাবে খেদিয়ে বেড়ায় শৃগালকে। শৃগাল ইচ্ছা করলে খরগোসকে এই একই ভাবে বিব্রত করতে সক্ষম। সমগ্র পৃথিবীই এছই নিয়মের বশবর্তী। এদের বিরুদ্ধে দূরে দাঁড়াতে হলে হাজার মত বলশালী হতে হবে। নয় তো গণ্ডারের মত শূঙ্গের সৃষ্টি করতে হবে। অজ্ঞাধার তাদের অজ্ঞান করতে হবে আশ্চর্যকার জন্তে হরিণ ও অশ্বজীবের মত পায়ের জোর। তাই যে এরূপ গালি তিনিও তাঁর উদ্ধতন অফসারের কাছে হতে একটু আগে থেকে এসেছেন। তবে পদমর্যাদা ভেদে ভাবার একটু তারতম্য হলেও হতে পারে। উপরন্তু তারা বুঝে যে ভুক্তভোগীদের মধ্যে তারা কেউ একা নয়, এই ব্যাপারে তার আরও অল্পরূপ বহু দোসর আছে। এইরূপ অবস্থার কটুবাক্যগুলি কাগজের তার তীক্ষ্ণতা ও দাঙ্গশক্তি হারিয়ে ফেলে। ওগুলো তখন অর্থগণ

কয়েকটি উচ্চনাদ যুক্ত শব্দে মাত্র পরিণত হয়ে পড়ে। এই সব নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা তাদের কাছে বৃহন একটা স্বাভাবিক পরিণতি মাত্র মনে হয়। অল্পদিকে কটুবাক্যকারী, উদ্ধতন অফসার নিজেই তাদের অজ্ঞান অফসারদের নিকট একটা উপহাসের বিষয়বস্তু হয়ে উঠেন। কিন্তু এইরূপ এক চিত্তপ্রজ্জ্বলিত সময় ও অনাস সাপেক্ষ। চিরঞ্জীব বাবু নবাগত বিদায় তপ্পনও পর্যন্ত মনের এই অবস্থার পৌছতে পারেন নি। তাই বিকৃত চিত্তে নিজেই চিরঞ্জীব বাবু প্রণব বাবুকে নিয়ে তাঁর ঘরের ভিতরকার চৌকিটার উপর পুনরায় বসে পড়লেন।

চিরঞ্জীব বাবুর মনের ভিতর তখনও পর্যন্ত আগুন জলছিল। তাঁর ঋ কিছু প্রতিরোধ শক্তি তা বোধ হয় সম্পূর্ণ রূপেই হারিয়ে ফেলেছিলেন। থেকে থেকে তাঁর মনের মধ্যে এসে পড়ছিল ছোট সাহেবের কয়েকটি কটুক্তি, জানো আমি ভোড়াবাগানে একটা সিঁড়ি বসে আছি। এখান থেকে তুম্বার দেবো আর দুটা খানা কেঁপে উঠবে, ধর ধর। হঠাৎ আসা উত্তেজনার দ্বারা সম্মতিত প্রতিরোধ শক্তির অভাবের জন্ত দ্বিধা বিভক্ত মনের মধ্যে অন্তর্বন্দ সৃষ্টি হলে মানুষ সময় বিশেষে শিশুরও অধম হয়ে যায়। এই সময় উপহাসের বস্তুও তাদের নিকট বেদনাদায়ক হয়ে উঠে। এই সাধারণ সত্যটি কিন্তু চিরঞ্জীব বাবু এই দিন যেন বুঝেও বুঝে উঠতে পারছিলেন না। হঠাৎ এই সময় চিরঞ্জীব বাবু মনেতে পেলেন তাঁর শিশু পুত্রটি মেথের উপর বসে তার পাঠ্য পুস্তকে বর্ণিত একটি সিংহ সম্পর্কিত কাহিনীই আপন মনে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়ে যাচ্ছে—পুত্রাকালে ভারতবর্ষে প্রচুর সিংহ পাওয়া হাইত। প্রাচীন সাহিত্যে হিমালয়ের পাদদেশে সিংহের বহুল অবস্থিতির কথা জানা যায়। এক্ষণে ভারতবর্ষে কুত্রাপি আর সিংহ দৃষ্ট হয় না। এক্ষণে কেবলমাত্র গুজর প্রদেশে তিনটি সিংহ বাস করে। পুত্রের মুখে এই কথা কয়টি কানে বাওয়া মাত্র চিরঞ্জীব বাবু হঠাৎ নেমে এসে পুত্রের কপালের উপরে এসে ঝুলে পড়া পাতলা সোনালী রংের চুল মুঠি করে ধরে নেড়ে দিয়ে বলে উঠলেন, মাত্র গুজর দেশে তিনটি সিংহ আছে কিরে? লেখ লেখ। গুজর প্রদেশে তিনটি এবং ভোড়াবাগানে একটি।

চিরঞ্জীব বাবুর শিশুপুত্র সজীবচন্দ্র শিতার নিকট হতে

প্রত্যেকের ঘরে রাখিবার মত বই
শ্রীবিজয়কান্ত রায়চৌধুরী, এম-এ প্রণীত সেই বিখ্যাত

চিকিৎসা সোপান

পরিবর্জিত চতুর্থ সংস্করণ বাহির হইল

যে বসিয়া হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শিক্ষা ও আহুত করিবার অপূর্ব সুযোগ। প্রত্যেক রোগের পরিচয়, লক্ষণ, ঔষধ, পথ্য সকলের উপযোগী সয়ল ভাবার তথ্য আছে। মিহজামের প্রসিদ্ধ দাতব্য চিকিৎসালয়ের বহু বৎসরের অভিজ্ঞতার ফল এই অমূল্য গ্রন্থখানি ছাপানর আগে ডাঃ পি, বানার্জি মহাশয় আগাগোড়া দেখিয়া দিয়াছেন। কম্পারেটিভ মেটরিয়াল মেডিকাল, হিপাটারী, পথ্যতথ্য ঔষধের সম্বন্ধে সবই দেওয়া আছে। এই গ্রন্থখানি বই ঘরে থাকিলেই চলিবে। মূল্য সাড়ে চার টাকা ৪।।০, ডাকমাতল এক টাকা।

এইরূপ ধরণের সম্পূর্ণ ও সুন্দর বই বাংলাদেশ আর নাই।

চতুর্থ সংস্করণের বিশেষত্ব—ইহাতে দুইটি কঠিন ও দুঃসাধ্য রোগ “বল” ও “কুটের” বহু অভিজ্ঞতালব্ধ হোমিওপ্যাথিক ফলপ্রদ চিকিৎসার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

প্রকাশক : প্রজ্ঞাতী—৮২ ভবানী দত্ত লেন, কলিকাতা-৭

এইরূপ ব্যবহার ইতিপূর্বে কখনও পায়নি। সে শিতাকে খুঁচা করবার জন্তই এইমনি টেচিয়ে টেচিয়ে তার পাঠ্যপুস্তক হাতে একটির পর একটি কাহিনী পড়ে শুনাচ্ছিল। সে হতভম্ব হয়ে ছল ছল চোখে চিরঞ্জীব বাবু দিকে চাইলেই চিরঞ্জীব বাবুরও চোখে জল এসে গেল। তাঁর মন তখনই পুত্রকে কোলে তুলে নিতে চাইলেও প্রণব বাবুর সম্মুখে দুর্বলতার পর দুর্বলতা দেখাতে তাঁর কেমন যেন একটা সম্মোহ হলো। এককণে একটা প্রচণ্ড আঘাতে চিরঞ্জীব বাবু তাঁর মনের স্বাভাবিক সভা ফিরে পেয়েছিলেন। তিনি শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে প্রণব বাবুর দিকে অসহায়ের মত চেয়ে রইলেন। চিরঞ্জীব বাবুকে তাঁর সকল কুণ্ঠা হতে মুক্ত করে প্রণব বাবু চিরঞ্জীব বাবুর শিশু পুত্রটিকে কোলে তুলে নিয়ে চিরঞ্জীব বাবুকে ভ্রূসনার সুরে বলে উঠালেন, এ আবার কি রকম হলো? এ্যা? দাব করলো একজন আর শাস্তি হলো আর একজনের। এই না আপনি সেই দিন বড় গলা করে সুরিচারের ওকালতি করেছিলেন, বাঃ বাঃ! সহনশীলতার অভাব পৃথিবীতে সর্বত্রই। তা আপনার জুয়াড়োদের মামলার কল কি হলো। নিশ্চয়ই আপনার সেই উপকারী বন্ধুটির কোনও সুরিচার করা যায়নি। জরিমানা দিয়ে সে বেরিয়ে এলে, বা তাকে কয়েকদিনের মত জেলেই বেঁচে হলো।

চিরঞ্জীব বাবুও শেষের কথাটা কাণে বাওয়া মাত্র তার মনটা যেন আর একবার জোরে নাড়া দিয়ে উঠল। চিরঞ্জীব বাবু তার বৃকের মধ্যে কেনার অপর একটি নতুন বক্তার অমৃতভব করলেন, উপকারী বন্ধু সন্ত্রাসবাদের বিচার তখনও শেষ না হলেও অবিচারের একটা অশঙ্কা তাঁর মনের মধ্যে থেকে থেকে খোঁচা দিয়ে উঠে। কিন্তু আজকের বেদনার কাছে সেট দিনের বেদনা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু আজকের এই মুহূর্তে তিনি কি এক ছেলেমানুষি করে বসালেন, তাঁর মনে হলো সর্বপ্রথম তাঁর জীবন কথা, অবোধ পুত্রের প্রতি তাঁর এই অমৃত আচরণ জানতে পারলে তো সে আর এক অনর্থ বাঁধাবে। চিরঞ্জীব বাবু শঙ্কিত হয়ে উঠলেন।

সৌভাগ্যক্রমে চিরঞ্জীব বাবুর জী সারদামণি কাছাকাছি কোথাও ছিলেন না। রাত্রাশয়ের পথের দিকে সতর্ক দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে চিরঞ্জীব বাবু সঙ্গজন্মের তাঁর একমাত্র পুত্রের গালটি সঙ্গেহে একটু নেড়ে দিয়ে প্রণব বাবুকে বললেন, কি আর বলবো প্রণববাবু! আজ রিজাইন দোবোই ভেবেছিলাম। কিন্তু ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে এই সঙ্গর আমাকে পরিত্যাগই করতে হলো। তাই-ই বোধ হয় প্রথমে ওর ওপরই আমার রাগ এসে গিয়েছিল। এখন বুঝছি যে অবসর গ্রহণের দিন পর্যন্ত এই পুলিশ বিভাগে থেকে যাওয়ার জন্তই বোধ হয় আমার প্রতি ঈর্ষ্যের নির্দেশ আছে। নিতান্ত হাত অধমার বিয়ে করেই না আমি এইরূপ বিপদে পড়েছি। আপনি কিন্তু প্রণব বাবু এখনও পর্যন্ত বিয়ে না করে ভালোই করেছেন। আর বা চাকরী আমাদের, থেং। পুলিশের লোকদের বিয়ে করার মধ্যে কোনও যুক্তিই নেই।

কি সব আপনি বাজে কথা বলছেন, হেসে কেলে প্রণব বাবু উত্তর করলেন। -যুক্তির সঙ্গে বিয়ে করার কি সম্পর্ক? তা ছাড়া যুক্তি তো হচ্ছে একটা উকিল। সে নিজে কিছুই বুঝে না। সে অপরকে বুঝার মাত্র। আমার কন্যাবাইও ছাড়াটির রান্না খাওয়ার

কাঁকে কাঁকে যখন আপনারদের এখানে এসে সন্ধ্যার মার হাতে রান্না খাই, অন্ততঃ তখনকার মত তো মনে হয় যে বিয়ে একটা করে ফেলাই ভালো। তা ছাড়া বিয়ের বাপাির কোনও যুক্তি দেখিয়ে কেউ কখনও যুক্তি পেয়েছে বলে তো শুনিনি। অন্ততঃ স্বাভাবিক মানুষ সম্পর্কে একথা আদর্শেই প্রবোধ্য বলে আমি মনে করি না। বিয়ে না করে যারা সংসার ধর্মের দায় হাতাতে চায় তারা ভীতু শুধু তাই নয় তাদের অসামাজিক জীবনও বলা যেতে পারে। অন্ততঃ এই সব ভীতু ও দায়িত্ব জ্ঞানহীন নিউরিটিক লোকদের পুলিশ বিভাগে স্থান হওয়া উচিত হবে না। মতান্তরে এদের আউট্রেল বা আন-প্রোডাক্টিভ বলে অভিহিত করলেও অগ্রার হবে না। আমি বিয়ে এখনও করি নি বলে যে তা কখনও কবো না, এমন কথা কিন্তু আপনাকে আমি কোনও দিনই বলি নি।

এমনি হাঙ্গা কথা-বার্তার মধ্যে চিরঞ্জীব বাবুর মনও যে কখন হাঙ্গা হয়ে গিয়েছে তা তিনি টেরও পান নি। হঠাৎ পিছন হতে চুড়ির একটু ঝুনটান আওয়াজ শুনে পিছন ফিরে তাঁরা দেখলেন সারদামণি সাহায্য মুখে তাঁদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। সারদামণিকে দেখে সজ্ঞ হতে উঠে চিরঞ্জীব বাবু তাঁর শিশু-পুত্রের দিকে একবার চেয়ে দেখলেন। কিন্তু ততক্ষণ পুত্র সঞ্জীবচন্দ্রের মুখে পুনরায় হাসি ফুটে উঠেছে। আশ্চর্য হয়ে চিরঞ্জীব বাবু ও প্রণব বাবু উঠে দাঁড়ালেন। প্রণব বাবুকে সঙ্গ্রমে উঠে দাঁড়াতে দেখে সারদামণি বলে উঠলেন, খুব তাড়াতাড়ি রান্নাবান্না শেষ করে ফেললাম। আবার এখুনি বার হতে ডাক এলে তো কাউরিই খাওয়া হবে না। আর সেই সঙ্গে আমাকেও সম্মুখে খাবারের থালা শাজিরে রেখে আপনারদের মতই সারাদিন উপবাসী থাকতে হবে। মাসের মধ্যে দিন দশেক তো এই রকম হয়ই। তা আর কি করা বাবে বলুন। আশ্রন, ভিতরে আশ্রন। সব তৈরি হয়ে গিয়েছে।

সারদামণি দেবীর সঙ্গেই আমূলক ছিল না। তাঁর মুখের কথা কয়টি শেষ হবার পূর্বেই দরজার বাইরে থেকে একজন সিপাহী প্রণব বাবুকে উদ্দেশ করে তার স্বভাবসিদ্ধ বাজরাই গলার বলে উঠলো, হজুর। বড় সাহেব থানা ভিসিটসে আ'গয়া। বড়ি বাবু আকিসমে হাজির নেহি ছায়। আপ আ'গয়া, তখনকে আপকো বোলতা ছায়। সিপাহীজীর কথা কয়টি চিরঞ্জীব বাবুর জী সারদামণি দেবীরও কানে পৌঁছিয়ে ছিল। সিপাহীর এই হাঁক ডাকে লজ্জিত হয়ে উঠে আপন মনে তিনি বলে উঠলেন, ছিঃ ছিঃ ছিঃ। পাপ মুখে আমার কি পোড়া কথা বার হয়েছিল! সত্য সত্যই কি তা'হলে আপনারদের আজ খাওয়া হবে না।

এই সময়ে বড় সাহেব থানা ভিজিটে এসেছেন শুনে প্রণব বাবু ও চিরঞ্জীব বাবু হ'জনাই অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। তবে কখনও কখনও এইরূপ ব্যতিক্রম যে পূর্বেও না হয়েছে তা'ও নয়। চিরঞ্জীব বাবুকে অপেক্ষা করতে বলে প্রণব বাবু ছুটাছুটা পায়ে দিতে দিতে বলে উঠলেন, আপনি এখন আর নামবেন না। আপনাকে দেখেই আবার হয়তো তিন ভেলে বেঙনে জলে উঠবেন। আমি ঠকে সাহলে এখুনিই আবার ফিরে আসছি।

কোনও দিকে আর চুকপাত না করে নেমে এসে প্রণব বাবু দেখলেন বড় সাহেব মহোদয় বাবু ইতিমধ্যেই থানার ইন-চার্জ

অকসারের অল্প নির্দিষ্ট চেয়ারটি লম্বল করে বসে রয়েছেন। সহকারী অকসার বীরাজ বাবু দম্ভবতের জন্ম প্রয়োজনীয় রেকর্ড বহিঃগুলি তাঁর সম্মুখে একে একে এগিয়ে দিচ্ছিলেন। প্রণব বাবু ঘরে ঢুকে তাঁকে অভিবাদন করা মাত্র বড় সাহেব মহীন্দ্র বাবু তাঁকে সম্মুখের চেয়ারটিতে বসতে বলে স্মিত হাস্তে বলে উঠলেন, আসুন, প্রণব বাবু। তাহলে এসে গেছেন আপনি। তা বোমা ভালো আছেন? আর আপনার বাচ্চাটিও ভালো আছে তো! এঁা?

বড় সাহেবের এই অদ্ভুত প্রশ্নে প্রণব বাবু হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। তাঁর মনে হলো বোধ হয় তিনি অল্প খানার কাউকে মনে করে কথা বলছেন। একটু কিস্তি কিস্তি করে মাথা চুলকে প্রণব বাবু উত্তর করলেন, কি বলছেন স্যার, আপনি। আমার বো বা বাচ্চা তো নেই। আমি তো এখানেই রয়ে থা কিছুই করি নি। প্রণব বাবু এই উক্তি শুনে বড় সাহেব মহীন্দ্র বাবুও কম বিস্মিত হন নি। বিস্ময়ের ঝোঁকটা একটু সামলে নিয়ে ক্রোধে আত্মগারা হয়ে হাতের মুঠি পাকিয়ে তিনি একবার তড়া করে ঝাঁড়িয়ে উঠলেন, তাব পর সজোরে চোয়ালের উপর তাঁর পাছটা ঠুকে দিয়ে বসে পড়ে তাঁর বক্ষমুষ্টি দিয়ে টেবিলের উপর একটা ঘঁষি মেরে বলে উঠলেন, কিই! এতো বড়ো আম্পর্কী তার। আমাকে মায়া ডেপুটি সাহেবকে পর্যাস্ত কিনা বোকা বানাবে। উঁ। আমি একটা সিঁহী; উঁ। বাব সিঁহীকে পর্যাস্ত ভয় করে না। ঝাঁড়াও আমি মজা দেখাচ্ছি। ডিসহস্টেট ঝাউগুস। বলে কিনা প্রণবের বোঁএর এসব বেদনা হবেছে। তাকে সে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে। আর কিনা এদিকে প্রণবের বিয়েই হয় নি। এঁা, দেখে নেবো তাকে আমি এখন।

প্রণব হতভম্ব। অফিসে উপস্থিত সকলেই হতভম্ব। আজ বড় সাহেবের কসমের একটি আঁচড়ে তাদের বড় বাবু সাসপেন্ড হয়ে যাবেন। মামলা কঠিন। সাক্ষীসাবূত যথেষ্ট। এক প্রণব ও বড় সাহেবের সাক্ষ্যতেই বড় বাবু সাসপেন্ড হয়ে যাবেন। তাঁর বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্ট স্তর হলে প্রণব বাবুকেই হয়তো করা হবে এক নম্বরের সাক্ষী। বড় বাবুর উপস্থিতিতে বড় বাবুর সামনে এমন সব কথা তাঁকে বলতে হবে যার জন্য বড় বাবুকে চাকুরী হতে একেবারে বরখাস্ত না করলেও তাকে কোনও এক নিম্নের পদে ন্যাবিয়ে দেওয়া হবে। যে বড় বাবুর অধীনে প্রণব বাবুৱা কাজ করছে সেই বড় বাবুকে তাদেরই পাশাপাশি তাদেরই একজনের মত হয়ে কাজ করতে হবে। পুলিশ অফিসার হিসেবে তাঁর বত দোবই থাক, প্রণব বাবুদের উপর তাঁর সর্বব্যবহার ছিল আশাতীত। তাঁর আত্মীয় শুলভ ব্যবহারে অকসার হতে সিপাহী জমাদাররা পর্যাস্ত মত্তমুগ্ধ। কিন্তু এখন উপায়? এখন উপায় কি? এখন বড় বাবুকে বাঁচাবার জন্তে যদি সে মিথ্যে সাক্ষ্য দেয় তাহলে বড় বাবু তো বাঁচবেনই না, উপরন্তু তাঁরই বিরুদ্ধে একটি নূতন প্রেসিডেন্ট ড্র করা হবে। মিথ্যে বলার অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে প্রমাণ করারও কোনও অসম্ভব নেই। বড় বাবুর উপকারার্থে কয়েকটা মিথ্যা কথা বলতে প্রণব বাবু প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু জলজ্যান্ত একটা বধু নবজাত শিশুসহ সে এখনিই তৈরী করে কি করে? তা ছাড়া হাতের তাঁর একবার বেরিয়ে গেলে তা ফিরিয়ে আনাও অসম্ভব।

বড় সাহেব মহীন্দ্র বাবুর কিন্তু প্রণব বাবুর মুখের দিকে একবার

চোরে দেখবারও অবসর ছিল না। তিনি কান্ডাতাড়ি কেতাব কটার পাতা কয়টার একটা করে দম্ভবত দিয়ে জেনারেল ডাইরীটা টেনে নিলেন। তারপর তার পাতার পাতার বড় বাবুর বিরুদ্ধে মস্ত একটা রিপোর্ট লিখে প্রণব বাবুকে বললেন, কাল সকাল আটটার মধ্যে এই রিপোর্টের একটা কপি আমার অফিসে পাঠিয়ে দেবে। আমি কালই ঠেকে খতম করে দেবো।

প্রণব বাবুকে তাঁর শেষ আদেশ জানিয়ে বড় সাহেব মহীন্দ্র বাবু শাস্তভাবেই উঠে ঝাঁড়ালেন। এতক্ষণে তাঁর রাগটা একেবারে পড়ে গিয়েছিল। অধিকক্ষণ অহেতুক ক্রোধ ধরে রাখবার তাঁর কোনও কারণ ছিল না। তিনি উঠে ঝাঁড়িয়ে বাম হাতে তাঁর চুলটা কপালের উপর থেকে একটু সরিয়ে দিলেন। তারপর কমাল বার করে মুখটা পুঁছে নিয়ে বুক পকেটের ঝাউনটেন পেনটা সোজা করে বসিয়ে নিলেন। আজ বিকালের দিকে কোনও এক আত্মীয়ের বাড়ীতে তাঁর নিমন্ত্রণ ছিল। তাই নিয়মমত সন্ধ্যার দিকে থানা ভিক্সিতে না এসে তিনি এইদিন একটু সকাল সকালই এসে গিয়েছেন। ঠাঁট দুটা ঝাঁত দিয়ে আলতো ভাবে একবার কামড়ে তিনি একটু ভেবে নিলেন। তার পর শিশু দিতে দিতে যেমন প্রফুল্ল মনে এসেছিলেন, তেমনই প্রফুল্ল মনেই এই থানা থেকে তিনি বেরিয়ে গেলেন। সেকালে রাজারা এমনি করেই গর্দান নেবার হুকুম দিয়ে অবলীলাক্রমে তাঁদের প্রমোদগায়ে প্রবেশ করতেন। একালেও বিচারকরা তেমন করেই কীসির হুকুম দিয়ে হাসতে হাসতে চারের পাটিতে গিয়ে অনমন্ত্রণ রক্ষা করে আসেন। অভ্যাস মানুষের সুকাল বা অকাল সকল কাজই সহজ করে তুলে। তা না হলে স্বাভাবিক

for JEWELLERIES, WATCHES
& GUARANTEED
WATCH REPAIRING



OMEGA, TISSOT
& COVENTRY WATCHES
ROY COUSIN & CO.
4, DALHOUSIE SQUARE, CALCUTTA-I

জীবন যাত্রা পালন করা তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠতো। মানুষ দেখে ক্রোধ না করতে পারলেও সে তার মনকে তথা ব্যক্তিকে ক্রোধ কেন বহু ভাগে বিভক্ত করে নিতে সক্ষম। তাই মানুষের চরিত্রের বা মনের একটি দিকই তার সব দিক না। তাই কান্নার মাত্র একটি দিক দেখে তাকে বুঝতে চেষ্টা করলে তাকে ভুলই বুঝা হবে। তাই প্রণব বাবু বড়সাহেবের উপর একটু মাত্রও বিরক্তি প্রকাশ না করে বরং সশ্রদ্ধ ভাবেই তার প্রত্যাগমনের পথের দিকে চেয়ে কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত নিশ্চল ভাবেই দাঁড়িয়ে রইল। এই দিনকার ঘটনায় প্রণব বাবু এমনিই অভিভূত হয়ে গিয়েছিল যে অল্পদিনের মত এইদিন তাঁর পিছন পিছন ছুটে তাঁকে তাঁর মোটরে পৌছে সেলাম দিয়ে তাঁকে বিদায় অভিনন্দন জানাতে পর্য্যন্ত তাঁর ভুল হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু প্রণব বাবুর এই ভুল বা ক্রটি বড়সাহেবের নজর এড়ায় নি। তিনি ফুটের উপর নেমে গিয়েই এফবার থমকে দাঁড়ালেন। তাঁর মনে হয়েছিল প্রণব বাবু বুঝি অল্প দিনের মত এই দিনও তার পিছন পিছন আসছেন। তিনি তাঁকে বারণ করবার জন্যই থমকে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু পিছন ফিরে প্রণব বাবুকে না দেখে তিনি ঠোঁট বেকিয়ে ধীরে ধীরে মোটরের দিকে অগ্রসর হতে থাকলেন। এতক্ষণে প্রণব বাবুরও সশ্রদ্ধ ফিরে এসেছিল। হঠাৎ তাঁর মনে হলো যে একি তিনি করলেন। কাঁচা খেঁকো গুয়া। ভুল বুঝলেন না তো আবার। কথটা মনে হবার মাত্র প্রণব বাবু দৌড়ে গাড়ীর কাছ পর্য্যন্ত এসে মাথা নীচু করে গাড়ীর ভিতরের দিকে চেয়ে বসে বসে যাচ্ছিলেন, গুড নাইট, স্যার। কিন্তু ভা আর তাঁর

বলা হলো না। সংসা তিনি দেখতে পেলেন বড় সাহেবের স্ত্রীও গাড়ীর মধ্যে বসে আছেন। অপ্রতিভ ভাবে প্রণব বাবু 'হু' পা পিছিয়ে আসা মাত্র গাড়ীখানা হুস হুস করে সামনের দিকে এগিয়ে গেল। ফিরে আসতে আসতে প্রণব বাবু ভাবছিলেন, ফিরে বাবা। বড় সাহেব আমাকে দেখেছে তো। না ভুললোক মনে করলে আমি তাঁকে তাচ্ছিল্যই করলাম। প্রণব বাবুর আশঙ্কা অমূলক ছিল না। নিয়ত সম্মান পেয়ে পেয়ে এক সময় মানুষের মন সম্মান পাওয়া বা না পাওয়া সম্বন্ধে বোধ হয় অতিদ্রষ্টব্যতা লাভ করে। সামান্ততম অবহেলাও তখন আঘাতের আকারে তাদের মনকে বিক্ষুব্ধ করে অপরাধী-মস্ত ব্যক্তিদের উপর তাঁদের প্রতিহিংসাপরায়ণ করে তুলে।

খানায় ফিরেই প্রণব বাবু দেখলো চিরঞ্জীব বাবু কখন নেবে এসে তাঁর পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন। উপরের বারগার উপর একটা কাপড় শুকাত্ত। সেই কাপড়খানা আড়াল করে তিনি লক্ষ্য করছিলেন, বড় সাহেব কখন চলে যান। বড় সাহেবের গাড়ী ঠাট দেওয়ামাত্র চিরঞ্জীব বাবু নীচের অফিস ঘরে নেমে এসেছেন। চিরঞ্জীব বাবুকে দেখে প্রণব বাবু অভিযোগের সুরে বলে উঠলেন, আচ্ছা চিরঞ্জীব বাবু। আপনিও তো আজ রিপোর্টে গিয়েছিলেন। বড় বাবু সেখানে আমার সম্বন্ধে কি বলেছেন বা কি না বলেছেন তা'তো আমাকে আগে ভাগে জানিয়ে দিতে হয়। ওসব কথা শুনে তো আজ আর আমি বড় সাহেবের সামনেই আসতাম না। আপনি শুধু বললেন যে বড় বাবু রিপোর্টে খুঁঁব দেবী করে এসেছিলেন। দেখুন তো কি কাণ্ড হয়ে গেলো। এখন উপায়?

যেখানে একক আশ্রয়শ্রমী সম্ভব নয়। সেখানে দলগত ভাবে আশ্রয়শ্রমী করতে হয়। তাই কোনও এক ঘটনা ঘটামাত্র সে সম্বন্ধে পরস্পর পরস্পরকে জানিয়ে দেওয়া এখানকার একটা রেষারেষি। এই ভাবে পরস্পর পরস্পরের সহযোগিতা করে তারা আশ্রয়শ্রমীর জন্ত প্রস্তুত হয়। এইভাবে বুঝে বুঝে কথা বলে তারা বহু আঙ্গুর বিপদ এড়িয়েও যেতে পেরেছে। এই নিয়ম বহির্ভূত কাজের জন্ত শুধু প্রণব বাবু কেন খানায় প্রত্যেক অফিসারেরই চিরঞ্জীব বাবুর উপর বিরক্ত হবার কথা। এইভাবে দলীয় স্বার্থ চিরঞ্জীব বাবু ক্ষুণ্ণ করবেন তা সকলের বিশ্বাসের বাইরে ছিল। তাই প্রণব বাবুর কথার বিক্ষুব্ধ হয়ে চিরঞ্জীব বাবু উত্তর করলেন, বিশ্বাস করুন প্রণব বাবু। আমি এই ব্যাপার মাত্র এখন জানতে পারলাম। বাইরের অফিসে বসে থাকার রিপোর্ট ক্রমের ভিতরের ঘটনা আমি একটুও জানতে পারিনি। তা' ছাড়া বড় বাবু আমাকে এ বিষয়ে কোনও রূপ সতর্কও করে দেননি।

সারা খানায় সিপাহী জমাদারদের মধ্যেও ইতিমধ্যে এই গুণ্ডগোলার কথা মুখে মুখে প্রচার হয়ে গিয়েছে। সকলেই তাঁদের বড় বাবুর বিপদের জন্ত মনে মনে আতঙ্কিতও বটে। এ গুণ্ড মুখ চাওয়া চাওয়া করে ভাবছে বড় বাবু কখন খানায় ফিরে আসবেন। ঠিক এই সময় কোথা থেকে খবর পেয়ে বড় বাবু হস্তদস্ত হয়ে খানায় ফিরে এলেন। খুব সম্ভবতঃ খান রই কোনও বিখ্যাত অম্লচর ট্যান্সি করে তাঁকে খবর দিয়ে এসেছে। খুব সম্ভবতঃ সেই ট্যান্সি করেই তিনি ঘুরিৎ গতিতে ফিরে এসেছেন। কাছাকাছি কোথা থেকে টেনিফোনেও তাকে খবর দেওয়া অসম্ভব নয়। বড় বাবু সোজা অফিসে এসে তাঁর নিকিষ্ট চেয়ারে বসে প্রণব ও চিরঞ্জীব বাবুকে তাঁর সম্মুখের চেয়ারগুলিতে বসতে অহ্বোধ করে বললেন, হুম।


Amico's
GREEN LINIMENT

আপনি নিশ্চয় দৈনন্দিক ব্যাথার যন্ত্রণা পাচ্ছেন- কোথায়?
কোমরে, হাঁটুতে, কিংবা কোন সন্ধিহানে?
ভদ্রে বুগী হবেন—
পারীষিক, বুক বা পিঠের পীড়ারার,
হাতের ইত্যাদি যাবতীয় ব্যাথার

এ্যামিকো গ্রীন লিনীমেন্ট
(সবুজ মালিশ)
যান্ত্রিকই নির্ভরযোগ্য।

মূল্য: বড় শিশি—২.৭৫ নং পঃ
ছোট শিশি—১.৭৫ নং পঃ
"হাণ্ডল" স্বতন্ত্র

ব্যবস্থাপত্রের জন্য লিখুন—
আমিন এণ্ড ইসমাইল (প্রাঃ) লিঃ
৮০ নং বঙ্গটোলা স্ট্রিট, কলিকাতা-১



দেখ আমায়ই। তাঁ কি করে জানবো। প্রণব আজই ফিরে আসবে।
যাক ঠিক আছে। তুল যখন আমিই করেছি তখন সেই তুলের
সম্মুখীন আমাকেই হতে হবে। বড় সাহেবের সঙ্গে আমার
এইবার প্রত্যক্ষ সংগ্রামে বাঁধলো। তাই এখন হতে তোমাদের
একটু সাবধানে থাকতে হবে। কোনও কাজ কর্ণে যেন তুল ফ্রটি
না হয়। অবশ্য তুল মাছের হবেই। যে সব তুল সাধারণতঃ তিনি
অগ্রাহ্য করতেন সেই সব তুল এখন হতে হয়তো বড় করে ধরবেন
যেখানে আগে লিখতেন ডাইরীগুলি লিখতে এতটা কাটাকুটি করেছো
কেন? এ ভেরি কেয়ারলেস অফিসার। সেখানে এখন হয়তো তিনি
লিখে বসবেন, ফরসিকিকেশন্স অব গভর্ণমেন্ট রেকর্ড উইথ
আল:টরীয়ার মোটিভ। তা বসে বসে পোঁচা বাছতে আরম্ভ করলে
অনেক পোঁচা বার করে আনা যায়। আমার অফিস পুঁথানুপুঁথরূপে
ঢেক করলে উনি বা পাবেন, ওঁর অফিস ঢেক করলে আমিও
তাই পেতে পার। কিন্তু সে সুরোগ আমার ধন নেই তখন
ওসব কথা এখন থাক। যাক, এখন কিছুদিন তোমাদের
একটু সাবধানে থাকতে হবে। এর কারণ আমাকে বাগে না
পেলে তোমাদের তিনি ধরবেন শুধু আমার শাসন ব্যবস্থার দোষ
ধরবার জন্তে। একবার মট মল্লিককে বলে রাজের দিকে বড়সাহেবের
ওখানে একবার ঘুরে আসবো, আখুন। সহজে মিটে গেলে আর অবস্থা
শক্তি ক্ষয় করবো না। কাল রববার আর পরও ছুটি। দু'দিনতো সময়
পাওয়া যাচ্ছে। তবে তুমি তোমার পূর্বের ষ্টেটমেন্টেই ঠিক করে
থেকো। সকালে ডাইরী বইতে বা ছাই ভস্ম লিখেছে তা কপি করে
ওঁর অফিসে পাঠিয়ে দিও। আমি এখন তা'হলে চলি—

বড়বাবু খানার বাইরে চলে গেলে প্রণব বাবু আপন মনে বলে
উঠলো, বাবা: মনে জোর বটে। ভয় ডর বা ভাবনার কোনও
বাল্যই নেই ভদ্রলোকের মধ্যে। প্রণব বাবু অফুট স্বরে কথা
করটি উচ্চারণ করলেও তা চিরঞ্জীব বাবুর কানে গিয়েছিল।
চিরঞ্জীব বাবুও স্বাভাবিক গলায় স্বর খাৎ নামিয়ে বলে উঠলো,
দেখবেন আখুন প্রণব বাবু। উনি সব ঠিক করে নেবেন।
কেনেছি মট মল্লিক বড় বাবুর বিশেষ বন্ধু। ডিপুটি সাহেবের সঙ্গে
তাঁর খাতির আছে। নেপথ্যে থেকে কলকটি টিপে দিলেই হলো।

প্রণব বাবু চিরঞ্জীব বাবুর এই স্বগতোক্তি কখনও উত্তর দিলেন
না। চিরঞ্জীব বাবুর এই কথাগুলো তাঁর মনপুত হয়েছিল।
তাই মনে মনে তিনিও কামনা করলেন, ভগবান। এই কথাই যেন
সত্য হয়। তার পর একটু ভেবে নিয়ে বাড়ির দিকে চেয়ে তিনি
চিরঞ্জীব বাবুর দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে উঠলেন; আরে। দুটো
যে বাজে। খেতে খেতে হবে না। আমাদের সঙ্গে উনিও কি
উপোস করবেন। চলো চলো, উপরে বাই। কথা কহটা বলে
প্রণব বাবু চিরঞ্জীব বাবুর হাতটা ধরে একটা টান দিয়ে সিঁড়ীর
দিকে এগিয়ে চললো। তাঁর পিছন পিছন অপ্রতিভ ভাবে
চললেন চিরঞ্জীব বাবু। সিঁড়ীর উপর উঠতে উঠতে
তাঁর, বারে বারে মনে হচ্ছিল। বাবা: একটা জুয়া
ধারার জন্ত এতো কাণ্ড। কে জানে ভাগ্যে আরও কি
আছে।

উত্তরে উপরে এসে দেখলেন চিরঞ্জীব বাবুর দ্বী খাবারের খালি
দুটো ও পাশের বাটী করটা করেটা শিতলের গামলা ও
ঢাকনী দিয়ে ঢেকে রেখে গালে হাত দিয়ে মোষের উপর চুপ করে
বসে আছেন। তাঁকে এই অবস্থায় বসে থাকতে দেখে সলজ্জ
ভাবে প্রণব বাবু বললেন, মাপ করবেন বৌদি। বড় কষ্ট দিলাম
আপনাকে। নাচে যে একটা অঘটন ঘটছিল তা চিরঞ্জীব বাবুর
দ্বী বৃষ্টিতে বাকি থাকে নি। খাবারের ঢাকনিগুলি এক একটা
করে উঠাতে উঠতে তিনি উত্তর করলেন, একি বলছেন আপনি
বলুন তো। এ রকম কষ্ট কি আমার নতুন না কি? এর পর
চিরঞ্জীব বাবুর দিকে ফিরে তিনি অহুঃগোপের স্বরে বললেন, তোমার
কি মাথা ধারণ হয়েছে না কি? মিছি-মিছি ছেলটাকে মেরে
গেছো। কৈদে কৈদে খেয়ে নিয়ে চোখ মুখ ফুলিয়ে বোধহয় সে
ঘুমিয়ে পড়লো। যাও ও'ঘরে গিয়ে ওকে একটু আদর করে তার পর
মুখ হাত ধুয়ে খেতে বসো। তোমার আর প্রণব বাবু জন্ত বাধকরূপে
জল সাবান তোয়ালে ঠিক করে রেখেছি। মাংসটা আর একবার না হয়
গরম করে দিলাম। তবে ভাতটাত সব ঠাণ্ডাই খেতে হবে।
তা' কি আর করা হবে বলে। তা'ছাড়া এত ভো তোমরা
অভ্যস্ত। যাক—

[ক্রমশঃ]

বাসবো ভালো

সাধনা দেবী

আজিকে আমার নাইকো তেমন কিছু
সেই অতীত দিনে এসেছি ফেলে সব,
শুধু হৃদয়খানি করব অজুতব
আজি তোমার ওপো বাসবো ভালো কিছু।

দেবীর বেশে যখন তুমি মায়ার ছিলে ঢেকে—
রহস্য আর রূপের থেকে ছিলেম অনেক দূরে
সুদূর শুধু থাকত তুলে বেহুতো সব সুরে;
অবাকারে দেখিছ দূরে ছিলেম তোমার থেকে।

তোমার তরে জীবন ভ'রে চলেছি তুলের পিছু
জোর ক'রেই কি শুভ-দৃষ্টির চোখ মেলাতে পারি?
যবে সকল দিয়ে ব্যর্থ হ'য়ে করেছি মাথা নিচু—
পথের দিশা পেলেম তখন বাসনা অপারি।

আজিকে আমার রিক্তমনের তিক্ত অভিজ্ঞতা
দীনের বেশে শূন্য হাতেও হটেবে না সে পিছু
বাহিরটুকু চায় না সে তো খোঁজে মনের কথা
এবার আমি তোমার তুলে বাসবো ভালো কিছু!
আজিকে আমার নাইকো তেমন কিছু!



ভবানী মুখোপাধ্যায়

বক্তৃত্ত

১৯১৭ খৃষ্টাব্দে রুশ বিপ্লব অনুষ্ঠিত হওয়ার পর মার্কসীয় কমুনিজম সর্ব প্রথম ব্যবহারিক ভাবে পরীক্ষিত হল, কিন্তু বলশেভিকরা ইংলণ্ডের ক্যাপিটালিস্টদের চাইতে তাত্র ভাবে আক্রান্ত হলেন সোভিয়েটদের হাতে। ব্রিটিশ শ্রমিক নেতারা বা খুসী বলতে শুরু করলেন।

এর কিছু কাল পরে ফেরিয়ান সোসাইটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়, বার্নার্ড শ' সেই সভায় উঠে দাঁড়িয়ে শুধু বললেন We are Socialists, 'The Russian side is our side' যেহেতু আমরা সমাজবাদী আমাদেরই দল রুশ দল।

এই উল্লিখিত পর সভাগৃহে অথও স্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগল। তারপর যখন সভার কাজ আবার শুরু হল, তখন আর সোভিয়েট সরকার সম্পর্কে কোনো কটাক্ষ বর্ণিত হল না।

বার্নার্ড শ' যখন রাশিয়ায় গেলেন তখন প্রচুর অর্থের বিনিময়ে Hearst Press of America বার্নার্ড শ'কে অনুবোধ করেছিল তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্ত তাদের মারকং প্রচারের জন্ত। বার্নার্ড শ' এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। বার্নার্ড শ' জানতেন প্রাথমিক অবস্থায় সোভিয়েট সরকারের হস্ত কিছু ক্রটি বিচ্যুতি থাকতে পারে কিন্তু সারা পৃথিবীকে তা জানাবার কোনো প্রয়োজন নেই। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে যখন লেডী গ্রাষ্টার প্রভৃতির সঙ্গে রাশিয়া ভ্রমণে যাত্রা করলেন তখন সোভিয়েট সরকারের প্রাথমিক ক্রটি বিচ্যুতির কাল শেষ হয়ে গেছে, তাঁরা তখন পবিত্র গরিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত।

লর্ড লোথিয়ান (তখন ফিলিপকের) এক সন্ধ্যায় বার্নার্ড শ'র বাস ভবনে এসে বললেন—লেডী গ্রাষ্টারের কিছুদিনের জন্ত বিশ্রামের প্রয়োজন, লর্ড গ্রাষ্টারও সঙ্গে যাবেন। আপনি সঙ্গে থাকলে ভালো হয়।

বার্নার্ড শ' যেন এই চাইছিলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে

বার্নার্ড শ' সন্ধ্যায় গিয়েছিলেন জুলাই মাসে। তখন এচও গ্রীস, এমন কি থিয়েটারও পেরা সব বন্ধ।

বার্নার্ড শ' স্বয়ং এই ভ্রমণের একটি বিবরণ লিখেছেন ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ভানুয়ারী কেক্সারী মাসের Nash's Pall Mall Magazine নামক অনুলুপ্ত মাসিক পত্রিকায়, এই রচনাটি বার্নার্ড শ'র কোনো গ্রন্থে সংযোজিত হয়নি। এ ছাড়া বার্নার্ড শ' এই পত্রিকায় প্রকাশিত উইনস্টন চার্চিলের বার্নার্ড শ' নামক প্রবন্ধের ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে আর একটি আলোচনার কিছু বস্তু প্রকাশ করেন, সেই রচনাটি Sixteen Self Sketches এর মধ্যে আছে। বার্নার্ড শ'র রাশিয়া পর্যটনের বিবরণ মূলতঃ এই তথ্যের ভিত্তিতেই পরিবেশন করা যাবে।

শ' বলেছেন, বাওয়া স্থির হওয়ার পর কেউ বলে না খেয়ে করতে হবে, কেউ বলে গায়ে উকুন ধরবে, কেউ বলে শেষ পর্যন্ত কোতল (liquidated) করবে। স্মরণ্য এমন একটা নির্বোধের মত কর না করাই জের। দলের সমস্ত স্ত্রীলোককে জাতীয়করণ করা হবে আর তারা যা দেখাবে তাই শুধু দেখতে পাবে।

বার্নার্ড শ' বলেছেন, তাই অকুতোভয়ে এই দুঃসাহসিক অভিযাত্রায় বেরিয়ে পড়া গেল। যা কেউ করেনা তাই করাটাই তাঁ' বাহাদুরী। সীমান্তে দেখলাম তোরণ শীর্ষে লেখা আছে Communism will do away with all frontiers. সীমান্তের গণ্ডি দূর করবে কমুনিজম। নিশ্চয়ই একদিন তাই হবে, তবে উপস্থিত এই তোরণ লিপি স্মরণ করিয়ে দিল পাসপোর্ট বার করতে হবে আর আমি রাশিয়ায় পৌছলাম।

যতটা ভয়ংকর এবং বিভীষিকাময় শোনা গিছিল, আসলে সোভিয়েট ভূমি তেমন ভয়াবহ নয়। রাশিয়ায় অর্থ, পদমর্যাদা প্রভৃতি কোনো সন্দেহ উদ্বেগ করে না, অর্থ না থাকলেও সমান সমান। বার্নার্ড শ' বলেছেন—I was certainly treated as if I were Karl Marx in person and given a grand reception in the Hall of Nobles, which holds 4000 people and was crammed.

রাশিয়ায় এক সাহিত্য শিল্প ও বিজ্ঞান সভার সম্বন্ধনায় র্যাডেক, লুনাচারসকী, খালাটোক প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

বার্নার্ড শ'র রাশিয়ায় অনেক বিচিত্র বস্তু চমৎকার লাগল। রেল-স্টেশনের সঙ্গে প্রকাশিত হল সন্নিবেশিত করা হয়েছে আর সেই সব হলের প্রাচীরগায়ে ভেনিসের scuola di San Rocco-র মতো সুন্দর দেয়ালচিত্র আঁকা রয়েছে, বার্নার্ড শ' বলেছেন, এইগুলি 'রিলিজিয়স পেইন্টিং' এবং সেই ধর্মের নাম মার্কসবাদ। তিনি সম্মুখে বলেছেন বিখ্যাত শিল্পী জি, এক, ওয়াটস্ যখন লণ্ডন এ্যাণ্ড ওয়েস্টার্ন রেলওয়ের লণ্ডন স্টেশনটি বিনা মূল্যে অলংকরণের প্রস্তাব করেছিলেন তা যুগভের প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল, কতৃপক্ষরা মনে করেছিলেন যে ব্যবসাগত সুবিধার চেয়ে এই ছবি দেখার জন্ত ভবঘুরেরা ভীড় করবে। শ' মন্তব্য করেছেন, সোভিয়েট সরকারের বিচারবুদ্ধি অনেক উন্নত, তাই তাঁরা শিল্পীকে তাঁর উপযুক্ত মর্যাদা দান করে এই ছবি আঁকিয়েছেন।

রাশিয়ার শ্রমিক সম্পর্কে বার্নার্ড শ' বলেছেন—রেলের কাজ বারাকরছে যেন ছুটিরবেলার বেছালাবক কথা বলতে বলতে একটি

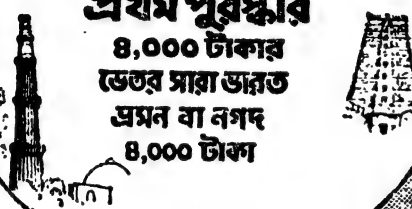
জড়াজড়ি করো! জড়াজড়ি করো!

সানলাইট


রঙ দেওয়ার প্রতিযোগিতা

২৫,০০০ টাকার চমৎকার পুরস্কার!

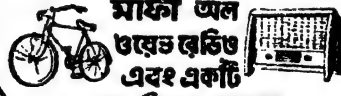
২য়
প্রথম পুরস্কার
৪,০০০ টাকার ভেতর সারা ভারত ভ্রমণ বা নগদ ৪,০০০ টাকা



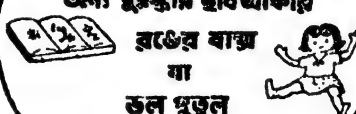
চারটি
২য় পুরস্কার
এইচ.এম. ডি. রেডিওগ্রাম




৬টি
৩য় পুরস্কার
মার্কী অল ওয়েচ রেডিও এবং একটি করে হিন্দ প্রাচ্যাসড়র সাইকেল



২,০০০
অন্য পুরস্কার ছবি আঁকার
রঙের বাত্মা যা তল্ গুল





অভিভাবকরা: আপনাদের ছেলেমেয়েরা এখনও যোগদান করেছে কি? মনে রাখবেন সানলাইটের প্রতিটি মোড়ক পাঠিয়ে তারা সানলাইট রঙ দেওয়ার প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারবে।

এই প্রতিযোগিতা দুটি বিভাগে ভাগ করা হয়েছে (১) ১০ বছর বয়সের কম (২) ১০ থেকে ১৫ বছর পর্যন্ত। এই দুটি বিভাগের ছবিগুলি আলাদা ভাবে বিচার করা হবে এবং প্রত্যেক বিভাগে ১ম, ২য় ও ৩য় ও অন্য পুরস্কার যারা পাবে তাদের একই রকম পুরস্কার দেওয়া হবে।

জড়াজড়ি করো

শেষ তারিখ: ১৬ই নভেম্বর ১৯৫৯।

আম্র একটি সানলাইটেই অনেক কাপড় কাচা যায়।

হিন্দুস্থান লিটার লিঃ কর্তৃক প্রস্তুত।

মালগাড়ি এসে গেল, সঙ্গে সঙ্গে সবাই একযোগে এমন ছন্দোময় ভঙ্গীতে ট্রেনের কাজ করল যে মনে হল যেন ব্যালেনুতা দেখছি, রাশিয়ার এই একটি ব্যালেনুতা দেখেছি।

বার্ণার্ড শ'র রাশিয়া ভ্রমণের প্রাক্কালে অনেকে তাঁদের ভয় দেখিয়েছিল যে সেখানে খাজানার কিছুটা জুটবে না। লেডী এ্যাষ্টর তাই প্রচুর টিনে সংরক্ষিত খাদ্যসত্তার সঙ্গে নিয়েছিলেন, পরে সেগুলি বিলিয়ে দিতে হয়। শ' বলেছেন—রাশিয়ান খাদ্য পুষ্টির দিক থেকে আদর্শস্থানীয়। রাশিয়ানরা কালো রুটি (Black bread) আর বাঁধাকপির সুপ খেয়ে বেঁচে আছে জেনে পাশ্চাত্য জগৎ শিউরে ওঠে। তাদের সেই অজ্ঞতা মাঠে মারা যাচ্ছে। আমাদের সাদা রুটির চাইতে কালো রুটি সহস্রগুণে ভালো। ক্যাবেজ সুপের নাম Stichi, তাতে ক্যাবেজ ছাড়া আরো অনেক কিছু বসে আছে, এক হিসাবে ক্ষতবিক্ষতের প্রতিদ্বন্দ্বী। ধীরে আঙুরের রস, দুধ বা লেবুর রসে জীবন ধারণের জন্য মুঠো মুঠো টাকা খরচ করেন, তাঁদের অজ্ঞরোধ জানাই রাশিয়া ভ্রমণে এসে ব্ল্যাক ব্রেড আর ক্যাবেজ সুপের স্বাদ গ্রহণ করতে। আরো অনেক পদ আছে, যেমন সব রকম পরিভোজের নাম Casha। কোষ্ঠবন্ধরোগী পশ্চিমের গো-খাদকদের রাশিয়ান কালো রুটি আর ক্যাবেজ সুপ, আর সেই সঙ্গে চাঁজ আর মোটা শশা (রাশিয়ার এই জিনিষটি প্রচুর পাওয়া যায়) যদি নিয়মিত ভাবে প্রভাতী খানা হিসাবে গ্রহণ করেন, তাহলে তাব মানসিক ও নৈতিক শক্তি লক্ষ্য করে শিউরে উঠবেন। এখন যেমন প্রতিবেশীর সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধিকে নিজের ক্ষতি ও ধ্বংসের হেতু মনে করে তাঁরা আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন।

বার্ণার্ড শ লিখেছেন যে রাশিয়ায় আত্র বাঁচিয়ে থাকা শক্ত, যেমন ব্যারাকবাড়ি বা যুদ্ধ জাহাজের অবস্থা। স্তালিন যিনি রাশিয়ার সর্বাধিনায়ক তিনি সপরিবারে মাত্র তিনখানি ঘরে থাকেন। অবশ্য হোটেল মের্টোপোলে বার্নার্ড শ'র ডের বেশী জায়গা পেয়েছিলেন হাত-পা ছড়িয়ে থাকার মতো। তিনি তাই বলেছেন, আমার মতো দরিদ্র সোভিয়েট লেখকের অদৃষ্টে যদি এই জোটে তাহলে হারসট বা রক্ফেলারের সহকর্য ডেকের বিনিময়ে কি না পাওয়া যাবে?

একদিন পুলিশ আদালতের বিরাট প্রাসাদে বেড়াতে গেলেন বার্নার্ড শ'। সে বাড়িতে আরো অনেক সরকারী অফিস আছে। অবশেষে তিনি দেখলেন একটি ঘরে কিছু লোক জড়ো হয়ে আছে, একটি উঁচু টেবিলের ধারে অর্ধেক কর্ণক মহিলা বসে আছেন। প্রশ্ন করে শ' জানলেন তিনিই ম্যাজিস্ট্রেট। তাঁর হুশাশে বসে আছেন একজন পুরুষ ও মহিলা। তাঁরা দুজনে জনসাধারণের পক্ষে ন্যায় বিচার হচ্ছে কিনা তা লক্ষ্য রাখছেন। সেই আদালতের কোথাও পাহারাওলা নেই। জানা গেল লোকটি একটি মাত্র শস্যার অধিকারী সেই জায়গায় একটা পুরা কামরা দখল করে রেখেছিল এই অপরাধ। কি দ্রাস্তি হল তা আর বার্নার্ড শ' জানতে পারেননি, তিনি অস্ত্র ঘরে গিয়ে আর একটি বিচার দেখতে গেলেন।

এই ঘরের ম্যাজিস্ট্রেটও একজন মহিলা। তিনি রায়দানের পূর্বে বিজ্ঞাপন ককে চুকেছেন। বার্নার্ড শ' শুনলেন যে এখানকার কেসটা বেশ গুরুতর। একটি মেয়ে গর্ভপাতের অপরাধে আগে শাস্তি পেয়েছিল, সে আবার সেই অপরাধ করেছে। অথচ এই ককেও পাহারাওলা নেই, অপরাধী ও দর্শক চেনার উপায় নেই। শ'

বিস্মিত হলেন। রাশিয়ার তখনকার আইনানুসারে দু'মাসের গর্ভ অবস্থায় গ্রহণযোগ্য কারণ দেখিয়ে গর্ভবতী মহিলারা গর্ভপাত ঘটতে পারেন, তার জন্য লাইসেন্সধারী ডাক্তার আছেন। বিচারাবান মামলার আসামী কোনো নীতিই মানেন নি, নিজের খুশীমত কর্তব্য করেছেন, তাই বিচার। ম্যাজিস্ট্রেট অবিলম্বে দুজন জুরীসহ কিংবে এসে সুরক্ষিত রায় দিলেন। এক বৎসর কারাদণ্ড। বার্নার্ড শ' ভাবলেন এইবার বোধহয় ওয়ার্ডার এসে চুলের মুঠি ধরে নিয়ে যাবে। একটি স্ত্রীলোক দেওয়ালের ধারে এতক্ষণ বসেছিলেন তিনি চিংকার করে কঁদে উঠলেন। আকাশের দিকে হাত তুললেন। তাঁর ভাষা বার্নার্ড শ' বুঝলেন না। হয়ত সুরবিচার হয়নি এই কথা বলতে চায়। তারপর মেয়েটি দীপ্ত ভঙ্গীতে বিচারসভা ত্যাগ করে চলে গেল।

সবিস্ময়ে শ' প্রশ্ন করলেন—ওকে কি কারাগার নিয়ে যাবে না? উত্তর হল—না, ওর কাজে কিংবে যাচ্ছে।

অর্থাৎ এক বছর তাকে কোনো কারখানার কাজ করতে হবে, এই তার শাস্তি। থিয়েটার বা সিনেমা দেখার অধিকার নেই, রাতে বন্দী কং বাধা বে।

বার্নার্ড 'প্রাচীন চিত্র গ্যালারী, বাতুর প্রভৃতি দেখে বিস্মিত হয়েছেন। লেলিনগ্রাদ ও মস্কো শহরের এই সব সংগ্রহশালায় বহুমূল্য দ্রব্যাদি প্রদর্শনীতে রাখা হয়েছে। রুশ বিপ্লবের ফলে যে এতটুকু লুণ্ঠরাজ, গুণ্ডামি হয়নি এই দেখে বার্নার্ড শ' অবাক। তিনি প্রদর্শকদের বললেন—তোমরা বিপ্লবী বলে বড়াই করো, আর এইসব অমূল্য সম্পদ লুণ্ঠরাজ হয় না বিপ্লবের কালে? কোনো রকম গুণ্ডামি বা লুণ্ঠ হয়নি? পশ্চিমে হলে এর কিছুই থাকতো না। তোমাদের লজ্জা পাওয়া উচিত।

গির্জাগুলি পর্যন্ত একেবারে অক্ষত।

বার্নার্ড শ' লিখেছেন যে আমি ভেবেছিলাম লেখক, শিল্পী, বিজ্ঞানীর দল বড়ই কষ্টে আছেন। হয়ত দু'বেলা দু'মুঠো অন্ন জোটে না। তাঁরা হুঁত অবহেলিত অবজ্ঞাত। এঁদের প্রতিনিধিরা যখন বার্নার্ড শ'র সঙ্গে দেখা করলেন, তাঁরা কেউ একখণ্ড সাবান বা একজোড়া পুরানো জুতা ভিক্ষা করলেন না। বার্নার্ড শ'র কাছে লণ্ডনের বিদগ্ধ সমাজের চাইতে এঁদের আনন্দময় মনে হল। তিনি বিষয়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন, বললেন—আপনারা ত'লোক সম্প্রদায়, বিদগ্ধ সমাজজুত (intelligentsia?) তাঁরা অজ্ঞাত ভরে বললেন—রামো, আমরা ইনটেলিজেন্টসিয়া নই। বার্নার্ড শ' বললেন—তা অবশ্য আমি জানতাম, অবশ্য রাশিয়ান সরকার তা জানেন কিনা জানতাম না। তাহলে আপনারা যদি ইনটেলিজেন্টসিয়া না হন তবে কি আপনারদের নাম এবং পরিচয়?

তাঁরা জবাবে বললেন—আমরা ইনটেলেকচুয়াল প্রলেটারিয়েট। বুদ্ধিজীবী সর্বস্বায় দল।

বার্নার্ড শ' বলেছেন—এর নামই কম্যুনিষ্ট রীতি। যদি তাঁদের জঘন্য অপরাধের জন্য মানব সমাজের দরবারে হাজির করা হয় তবে দেখা যাবে তাঁদের সেই অপরাধই হচ্ছে একমাত্র বুদ্ধিব্রাহ্ম ব্যবস্থা, নিজের হতভাগ্য দেশে কিংবে এসে আপনি সেই ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সচেষ্ট হবেন।

যে সংখ্যা Nash's Magazine-এ বার্নার্ড শ'র এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল সেই সংখ্যায় কি. কে. চৌধুরীনের—The true Sin of Bolshevism নামে একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

এই প্রবন্ধটিও উল্লেখযোগ্য, আমি সেই প্রবন্ধের কিছু অংশ উদ্ধৃত করেছি :

বে কোনো বিপ্লব প্রকৃত ঘটনার অনেক আগেই প্রাচীন হয়ে যায়। রুশ বিপ্লবের এই বিশেষ অন্তর্বিধ। রুশ বিপ্লব অনেক দেরীতে ঘটেছে। এতদ্বারা এই কথাই বলতে চাই আসল যুহুর্তের অনেক আগে এসেছে মনস্তাত্ত্বিক যুহুর্ত। সাম্যবাদ উনবিংশ শতাব্দীর বন্ধ, বিংশ শতাব্দীর নয়। শ্রেষ্ঠ কম্যুনিষ্টরা কম্যুনিজমের আবির্ভাবের অনেক আগেই বিগত হয়েছেন। এদিক দিয়ে বিশ্বয়কর ভাবে আমেরিকার বিপ্লব সৌভাগ্যবান, সে কালে শ্রেষ্ঠ রিপাবলিকানরা জীবিত ছিলেন, তখনই রিপাবলিকের ক্ষয় ঘটেছে। প্রকৃত যুগান্তকারী কম্যুনিষ্ট বিপ্লব ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ঘটা উচিত ছিল। কিন্তু তা তখন অসম্ভব হয়েছে। আমার বাল্যকালে উইলিয়াম মরিস একটি কথায় কম্যুনিষ্ট আদর্শ প্রকাশ করেছেন—Fellowship is heaven and lack of fellowship is hell—যদি উইলিয়াম মরিসের কালে রুশ বিপ্লব ঘটতো তাহলে সারা পৃথিবীতে আনন্দরোল উঠত। আজ বলশেভিকবাদ সংখ্যাগণ্যদের ডিক্টেটরশিপ মাত্র। এই কারণেই বার্নার্ড শ' মন্ডো ভ্রমণে রাষ্ট্রায়র সময় খুসী হয়েছিলেন। বার্নার্ড শ'র প্রগতি মানবিক, কিন্তু সে প্রগতি পিছনের দিকে। ঈগলপাখির মতো বার্নার্ড শ' তাঁর মনোভঙ্গী নতুন করে কালিয়ে নিয়েছেন। তিনি উনবিংশ শতাব্দীতে ফিরে গেছেন। তিনি আর আমি উভয়েই যখন বালক ছিলাম তখনকার স্বপ্ন সেইকালে সীমাবদ্ধ। বার্নার্ড শ' আজো বালক থেকে গেছেন। কিন্তু একথা সত্য রাশিয়া ভ্রমণে বৃদ্ধ বার্নার্ড শ' তাঁর পুরাতন স্বপ্ন সফল হতে দেখেছেন, সমাজ সয়ল ও সহজভাবে সেখানে সক্রিয়—যদি অবাধ স্বাধীনতার হৃদমণ্ডল কামনার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। আমি অবগত তা চাই না।

প্রবন্ধটির মূল কথাগুলি মাত্র এইখানে উদ্ধৃত করা হল বার্নার্ড শ'র বিশিষ্ট বন্ধু ও সমসাময়িক চিন্তানায়কের মত হিসাবেই প্রবন্ধটি মূল্যবান।

আর একজন এই Nash's Magazine এ ১৯৩৭ এ বার্নার্ড শ'র জীবনী প্রসঙ্গে লিখেছিলেন—

Multitudes of well-drilled demonstrators were served out their red scarves and flags. The massed bands blared. Loud cheers from sturdy proletarians rent the welkin. এই লোকের নাম উইনস্টন চার্চিল।

একথা বার্নার্ড শ' হজম করার পাত্র নন। তিনি এর অবাবে লিখেছেন—এ নিছক কল্পনা মাত্র। ব্যাণ্ড নয়, পতাকা নয়, লাল চান্দর নয়, পথের চীৎকার ও রাশিয়ার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত ভ্রমণকালে শুনি। আমি অবগত স্বয়ং কাল' মার্কস শব্দীরে হাজির হলে যে অভ্যর্থনা পেতেন তা পেয়েছি Hall of Noblesএ, সেখানে চার হাজার লোক ঘরে। সেই কক্ষে তিল ধারণের স্থান ছিল না। বহুতাদি সংক্ষিপ্ত। লুনাচারসকি বহুতা করুলেন। তিনি এবং লিটভিনফ প্রায় সব সময়ে আমার সঙ্গে ছিলেন, আমি আবিষ্কার করলাম যে সোভিয়েটবাদের বিশ্বয়কর

সাফল্য স্বচক্ষে দেখার সময় তাঁদের হয়ে ওঠেনি। স্বাধীনতা ভ্রমতা ও সৌজন্য আমার প্রতি প্রদর্শিত হয়েছে অনাড়ম্বর ভাবে। এই সফরের চূড়ান্ত হয়েছে স্তালিনের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে। যে সাত্ত্বী ক্রেমলিনের দোরগোড়ায় আমাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করেছিল সেই একমাত্র সৈনিক সারা রাশিয়ায় আমার চোখে পড়েছে।

স্তালিনের সঙ্গে বার্নার্ড শ'র এই সাক্ষাৎকার বার্নার্ড শ'র অন্ততম জীবনীকাব ভগ্নতরারের সঙ্গে ক্ষেত্রবিক দি গ্রেট বা নেপোলিয়নের সঙ্গে গ্যারটের সাক্ষাৎকারের তুলনীয় বলেছেন।

তখনকার কালে স্তালিনের সঙ্গে কারো বড়ো একটা সাক্ষাৎকার ঘটতৌ না, এমন কি ব্রিটিশ বা মার্কিন রাষ্ট্রদূতদেরও নয়। বার্নার্ড শ'র দলবলের বেলায় কিন্তু একটু ব্যতিক্রম করলেন স্তালিন। লর্ড গ্র্যাষ্টার প্রভৃতি সকলেই এই সুযোগ পেলেন। এই ব্যবস্থায় বেশ একটা সাদা পড়ে গেল। বার্নার্ড শ' এই সাক্ষাৎকার করে নিজের কৌতুহল চরিতার্থ করতে চান নি। স্তালিনের মূল্যবান সময় নষ্ট করার তাঁর ইচ্ছা ছিল না। লর্ড গ্র্যাষ্টার সব ব্যবস্থা ঠিক করলেন।

বার্নার্ড শ' বলেছেন—স্তালিনের অদম্য রসজ্ঞান ছিল। তিনি রাশিয়ান নয়, সুদর্শন জাভিয়ান। স্তালিনের আকৃতি যেন পোপ আর কিন্তু মার্শালের সংমিশ্রণ! স্তালিন আমাদের বা বলার আছে সব উল্লাড় করে দেওয়ার সুযোগ দিলেন। তারপর কয়েকটি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন করলেন। তার এক বর্ণও বুঝলাম না। শুধু 'Wrangel' কথাটি বোঝা গেল, বলশেভিকদের বিরুদ্ধে যে সব জেনারেলকে ইংলও লেলিয়ে দিয়েছিল তাঁদের অন্ততম। স্তালিন খুসিতে উপহাসে পড়ছিলেন। তবে দোভাষী ভয়ে এমনই তটস্থ যে তার কম্পমান ওষ্ঠে সে শব্দমাধুরী উপভোগ করা গেল না। লিটভিনফ না থাকলে আমরা এতটুকু অম্ববাদ পেতাম না।

লেডী গ্র্যাষ্টার স্তালিনকে বলেছিলেন—সোভিয়েটরা শিশুপালনের কিছু জানে না।

স্তালিন জানতেন, রাশিয়ার সব ব্যবস্থাই নিখুঁত। এই কথা শুনে তাঁর মুখ গভীর হয়ে গেল, তিনি বজ্রনিদায়ে যেন বলে উঠলেন—ইংলও ত' শুনেছি আপনারা ছেলেদের প্রহার করেন।

লেডী গ্র্যাষ্টার দমবার বা ভয় পাওয়ার পাত্রী নয়। শিশুপালন শিশুকল্যাণ ব্যবস্থা সম্পর্কিত জ্ঞান তাঁর নখায়ে। শিশুকল্যাণে তাঁর অনেক অর্থ ব্যয় হয়েছে। তিনি স্তালিনকে বললেন—আপনি কোনো সম্ভব রমণীকে লগুনে পাঠাবেন, আমি তাঁকে সবচেয়ে শিথিলে দেব কিভাবে পাঁচ বছরের শিশুদের পালন করতে হয়।

স্তালিন অভিভূত হয়ে পড়লেন। তিনি বুঝলেন এই প্রলয়ঙ্করী রমণী সত্যই হয়ত কিছু সাহায্য করতে পারেন। একটি খাম নিয়ে তিনি তার ওপর লেডী গ্র্যাষ্টারের ঠিকানা লিখে দিতে অম্বরোধ করলেন।

এই ঘটনাটি স্তালিনের ভ্রমতার পরিচায়ক মনে করলেন বার্নার্ড শ' এক তাঁর দলের সবাই। ভ্রমতার খাতিরেই হয়ত ঠিকানা রাখলেন তারপর কেউ আর কোনো খবরই করলেন না হয়ত।

কিন্তু এই দেশের নাম রাশিয়া। লেডী গ্র্যাষ্টার একজন মহিলা পাঠাতে বলেছিলেন, তিনি লগুনে পা না দিতেই স্তালিন প্রায় বাহুবান্ধন মহিলাকে পাঠিয়ে দিলেন শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে।

লেডী গ্র্যাষ্টারের সঙ্গে বিতর্কের পর লর্ড লোথিয়ান আলোচনা শুরু করলেন। তিনি ইংলণ্ডের উদারনীতিক বুদ্ধিজীবীদের হৃদ'শার প্রসঙ্গ তুললেন। সেই দলের দক্ষিণপন্থী বোং দিয়েছেন সরকারীসকলের সঙ্গে আর বামপন্থীরা ভাসছেন অকূলে। ব্রিটেনে লেবরপার্টির দ্বারাই প্রকৃত বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে কম্যুনিজম প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। ব্রিটিশ রাজনীতির বহুবিধ সমস্যার কথা।

বেশ চলছিল, সহসা লর্ড লোথিয়ান বললেন—পোলিটব্যুরোর উচিত লয়েড জর্জকে রাশিয়ার আমন্ত্রণ করে এনে রাশিয়ার উন্নতি দেখানো। এই প্রস্তাবে স্তালিন হাসলেন।

স্তালিন হেসেই বললেন—সেটা ঠিক সম্ভব হবে না, মাত্র দশ বছর আগে রুশ বিদ্রোহে লয়েড জর্জের ভূমিকাটি ঐতিহ্যিক ছিল না, জেনারেল ম্যাংগেল সেইকালে লালকোজের বিরুদ্ধে সৈন্য চালনা করেছেন। তাঁকে তাই সরকারী ভাবে আমন্ত্রণ জানানো যায় না, তবে তিনি যে কোনো সময় বেসরকারী ভ্রমণকারী হিসাবে এলে সব কিছুই দেখতে পাবেন।

এইবার সর্বপ্রথম বার্নার্ড শ' কথা বললেন। তিনি হঠাৎ বলে উঠলেন—উইনস্টন চার্চিলকে কি আমন্ত্রণ জানানো সম্ভব।

স্তালিন এইবার বললেন—মিঃ চার্চিলও এইভাবে আসতে পারেন। তাঁকেও সব সুযোগ দেওয়া হবে। আমরা আবার তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

এই কৃতজ্ঞতার কারণটুকু বড় মজার। সে রহস্য ব্যাখ্যা করেছেন বার্নার্ড শ' হেসকেথ গীম্বরসনের কাছে। চার্চিল লাল কোজের জুতা, সাজ পোশাক আর বসুন্ধর্য সর্ববরাহ করেছেন। চার্চিল যখন সেক্রেটারী অব ওয়ার তখন একশত কোটির ওপর মুদ্রা পার্লামেন্টে পাশ করিয়ে নেন। রাশিয়ার প্রতি-বিপ্লবী দলের সাহায্যে। বলশেভিকদল বিজয় লাভ করে ব্রিটেনের সেই টাকার জামা-কাপড়, অস্ত্র ইত্যাদি কিনেছিলেন।

এই সাক্ষাৎকারের মূল গায়ন লর্ড গ্র্যাষ্টার তখন স্তালিনকে বোঝাতে শুরু করলেন—যদিও ইংলণ্ডের সংবাদপত্র সোভিয়েট বিরোধী, ইংলণ্ডে সোভিয়েটের প্রতি বর্ষণে ভুল আছে। ভবিষ্যতে স্বাভাবিক বোঝাপড়ার স্বার্থে সংযোগ পাওয়া যাবে।

বার্নার্ড শ' এই সময় স্তালিনকে প্রশ্ন করলেন—আপনি গুলিভার ক্রমওয়েলের নাম শুনেছেন?

স্তালিন লিটভিনকের সঙ্গে আলোচনা করে ক্রমওয়েল বৃত্তান্ত জেনে গেলেন। লিটভিনক সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন—এই ক্ষুদ্র সে কথা বলার অংটা তেমন স্পষ্ট হল না।

বার্নার্ড শ' বললেন—উদ্দেশ্যটা বুঝিয়ে বলি, আয়ারল্যান্ডে গুলিভার ক্রমওয়েল সম্পর্কে একটি গাথা প্রচলিত আছে। ক্রমওয়েল তাঁর সেনাপতিনীকে নাকি উপদেশ দিয়েছিলেন—

Put your trust in God, my boys,
And keep your powder dry.

অর্থটি হৃদয়ঙ্গম করলেন স্তালিন। ঈশ্বর বিশ্বাস সম্পর্কে কোনো মন্তব্য না করে বললেন—রাশিয়ার বাকুর স্বার্থে শুধুনা রাখা হবে।

বার্নার্ড শ' বলেছেন—স্তালিনের বসন্তান আগাগোড়াই বেশ স্পষ্ট ছিল। তিনি হাসতে পারেন, হাসতে জানেন। এর পর আমরা

আধঘণ্টারও কিছু সময় বেশী ছিলাম, আমাদেরই ঘড়িতে দেখলাম দু' ঘণ্টা পর্যন্ত মিনিট পার হয়ে গেছে।

সোভিয়েট দেশ ভ্রমণ কালে বার্নার্ড শ'র মনোভঙ্গী নিঃসন্দেহে সোভিয়েট সরকারের প্রতি বিশেষ অনুরূপ ছিল। তাঁর ধারণা এই বিরাট পরিবর্তনে তাঁর ভূমিকা কম নয়। তিনি বলতেন—I always regard myself as the real author of the Russian Revolution because I said that the best thing the soldiers could do in the 1914-18 war was to shoot their officers and go home; and the Russians were the only soldiers who had the intelligence to take my advice.

তা ছ'ড়া চেষ্টারটন যা বলছেন তাও ঠিক, বার্নার্ড শ' মনো সফরে তাঁর জীবনের স্বপ্ন সফল হতে দেখেছেন, তাই তাঁর আনন্দ শিশুর মতো। রাষ্ট্রের সময় সার্লেট শ' লেডী গ্র্যাষ্টারকে বিশেষ অনুরোধ জানিয়েছিলেন শ'র প্রতি নজর রাখতে, কারণ বার্নার্ড শ' ছাড়া পাওয়া শিশুর মতো আশপাশের অবস্থা বিন্যস্ত হয়ে বা খুসী করে ফেলতে পারেন, নিজের শরীরের প্রতি অত্যাচার করে ঘুরে বেড়াতেও পারেন। কথাটি ঠিক, ট্রাসেলসে বার্নার্ড শ' সহসা দলভ্রষ্ট হয়ে অজ্ঞানকে চলে যাচ্ছিলেন, লেডী গ্র্যাষ্টার ছুটে গিয়ে তাঁকে টেনে আনেন। বার্নার্ড শ' বলেছেন আমাকে কার্ল মার্কসের সম্মান দিয়েছে রাশিয়া। লেডী গ্র্যাষ্টার বলেছেন—They received him as if he had been God, we were just no bodies, he was the great man—বার্নার্ড শ' অবশ্য সকলের সমান মহান'র প্রতি লক্ষ্য রেখেছিলেন।

বার্নার্ড শ' ইংলণ্ডে ফিরে আসার পর তাঁর মনো সফরের সবটুকু বাদ দিয়ে যে সংবাদ ইংরাজ ও মার্কিন সাংবাদিকরা প্রচার করল,—তা অতি হাস্যকর। লেডী গ্র্যাষ্টার নাকি রাশিয়ায় বার্নার্ড শ'র লাড়ি খুঁয়ে দিয়েছেন।

বার্নার্ড শ' স্বয়ং এই ঘটনা সম্পর্কে বলেছেন—রাশিয়ার সাংবাদিকের ভীড় এসে খাতনামা ব্যক্তিদের ওপর উৎপাত করে না, এ পশ্চিমের ব্যাধি। তিন রাত্রি তিন দিন ট্রেনে কাটানোর পর আমাদের স্রানের প্রয়োজন হয়। লেডী গ্র্যাষ্টারের কাছে প্রয়োজনীয় সাবান ছিল। আমি তাঁকে যখন বললাম, আমার সার্ট যে ভিজ়ে গেল। তিনি বললেন—খুলে ফেলুন। আমি কোমর পর্যন্ত খুলে ফেললাম আমার সার্ট। আমরা মগ্ন হয়ে কথা বলছি, গা মুছছি, আশপাশে তাকাইনি। সহসা কলরবে সচকিত হয়ে দেখি আশপাশে ভীড় জমে গেছে, সবাই আমাদের দেখছে। তারা রিপোর্টার নয়, সঙ্গে ক্যামেরাও ছিল না। তবে যেস্ট্রাপোল হোটেলের সমস্ত কর্মচারী এবং মনো-সহরের বোধ করি যথাসম্ভব লোক ভীড় করে এই দৃশ্য দেখছে। যতদূর জানি এর অজ্ঞ অবস্থা কোনো প্রবেশ-মূল্য আমরা মিইনি।

এই প্রসঙ্গ শেষ করি নিম্নলিখিত কথোপকথন। বার্নার্ড শ' লিটভিনকে প্রশ্ন করলেন—Now tell me honestly would not you rather not have had a revolution at all?

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে লিটভিনক উত্তর দিলেন—My whole



জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা

ভারতের জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা সন্তোষ ট্রফির মূল প্রতিযোগিতার খেলা গত ১৫ই অক্টোবর থেকে আসামের নগাঁও সহরে শুরু হয়েছে। বিভিন্ন অঞ্চলের বিজয়ী আটটি দল আলোচ্য প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করিচ্ছে। দুইটি গুপে লীগের ভিত্তিতে সেমিফাইনাল পর্যন্ত খেলাগুলি অনুষ্ঠিত হবে। সেমিফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হবে নক আউট প্রথায়। প্রথম গুপে গত বৎসরের বিজয়ী বাঙ্গলা, অন্ধ্র প্রদেশ (পূর্বে হায়দ্রাবাদ নামে খ্যাত), বিহার প্রদেশ এবং দ্বিতীয় গুপে বোম্বাই, সার্ভিসেস আসাম ও কেরালাকে স্থান দেওয়া হইয়াছে।

প্রথম গুপের খেলার বাঙ্গলা দল অপরাধিত থাকিয়া শীর্ষস্থান অধিকারীর সম্মান অর্জন করে। প্রত্যেক খেলার তাহারা উন্নত ক্রীড়া নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন এবং এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত খেলার তাদের বিরুদ্ধে কোন গোল হয় নাই। শেষ খেলার বাঙ্গলার কাছে পরাজিত হওয়ার অন্ধ্র এই গুপে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। বিহার দুই পয়েন্ট ও উত্তর প্রদেশ কোন পয়েন্ট না পাওয়ায় তাহারা স্বাভাবিক তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান অধিকার করে।

দ্বিতীয় গুপে বোম্বাই আসাম ও কেরালা বিরুদ্ধে জয়ী হইলেও গত বৎসরের রানার্স আপ সার্ভিসেস দলের সঙ্গে অমান্যসিত ভাবে খেলা শেষ করতে বাধ্য হয়। সার্ভিসেস দল কেরালার বিরুদ্ধে জয়ী হইলেও আসামের সহিত পয়েন্ট বন্টনে বাধ্য হওয়ায় তাহারা মাত্র চারিপয়েন্ট লাভ করিতে সমর্থ হয়। এই গুপে বোম্বাই ও সার্ভিসেস দল স্বাভাবিক প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করায় তাহারা সেমিফাইনালে খেলার বোগ্যতা অর্জন করে। সেমিফাইনালের খেলার বাঙ্গলা সার্ভিসেস দলের এবং বোম্বাই অন্ধ্রের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে।

এই বৎসর জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার খেলার বিভিন্ন দল বেশ উচ্চমানের পরিচয় দিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত যে কোন দল খেলার বিজয়ী আখ্যা লাভ করবেন, বলা যায় না। তবে বাঙ্গলা দল যে চ্যাম্পিয়নশিপের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখার আশ্রয় চেষ্টা করবে, তা বলাই বাহুল্য।

আরতি সাহা'র ইংলিশ চ্যামেল অতিক্রম

বাঙ্গলা তথা ভারতের প্রথম মেয়ে-প্রতিনিধি কুমারী আরতি সাহা ইংলিশ চ্যামেল অতিক্রম করে ভারতের মূখ্য উজ্জল করেছেন। শুধু ভারত নয়, এশিয়ার প্রথম মেয়ে-প্রতিনিধি হিসাবে ইংলিশ

চ্যামেল অতিক্রম করে বিশ্বের দরবারে তিনি যে ভারতের সম্মান বাড়িয়েছেন, তার ভগ্ন প্রতিটি ভারতবাসী গর্ববোধ করবে। কুমারী আরতি সাহা সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে হয়েও একান্ত সাধনা আট্ট মনোমল ও ঐকান্তিক আগ্রহের ফলে যে সাফল্য অর্জন করেছেন, তা সকলের কাছে উজ্জল দৃষ্টান্তরূপ হয়ে থাকবে।

আরতি সাহা এখন গিট কলেজের দ্বিতীয় বাৎসিক কলার ছাত্রী। সাঁতারে এই অসামান্য সাফল্য অর্জনের ভগ্ন প্রত্যেক ভারতবাসীর সঙ্গে আমরাও তাঁকে জানাই আমাদের অকুণ্ঠ অভিনন্দন।

সিংহল সফরে ভারতীয় ভলিবল দলের সাফল্য

ভারতীয় পুরুষ ও মহিলা ভলিবল দল সিংহলে টেট খেলার 'রাবার' লাভ করিবার কৃতিত্ব প্রদর্শন করে। মহিলা দল উপর্যুপরি টেট খেলায় সিংহলকে পরাজিত করে। পুরুষ দল প্রথম ও দ্বিতীয় টেটে জয়লাভ করে। শেষ টেট খেলাটি পর্যাপ্ত আলোর অভাবের জগ্ন পরিত্যক্ত হয়। পুরুষ ও মহিলা দল সকল স্থানই খেলায় প্রাধান্য প্রকাশ করে। তাগরা মোট ৩০টি খেলার অংশগ্রহণ করিয়া সকল খেলার অপরাধিত থাকিয়া সফরের নতুন রেকর্ড করেন।

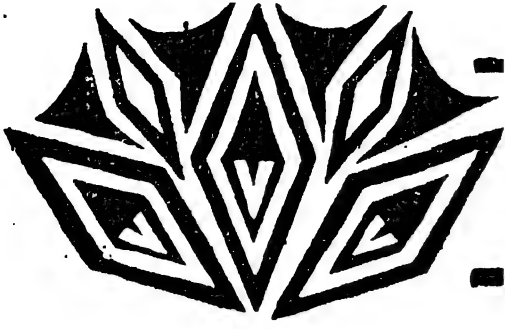
গারফিল্ড সোবাসের বিরুদ্ধে সমন জারী

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের খ্যাতিনামা টেট ক্রিকেট খেলোয়াড় গারফিল্ড সোবাসের বিরুদ্ধে টাকোর্ডসদ্বারের বিচারালয় হইতে কোর্টে উপস্থিত হইবার জগ্ন সমন জারী করা হইয়াছে। অভিযোগে তাঁতাকে বেপরোয়া গাড়ী চালাইয়া মৃত্যু ঘটাইবার বিষয় জবাব দিহ করিতে বলা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় উক্ত দুর্ঘটনায় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের খ্যাতিনামা টেট খেলোয়াড় কোলি মিথ মারা যান এবং কয়েকজন খেলোয়াড় গুরুতর রূপে আহত হন।

লক্ষ ডলারের চুক্তি

প্রাক্তন উইম্বলডেন চ্যাম্পিয়ন যুক্তরাষ্ট্রের মিস এলথিয়া গিবসন ও ক্রোবিদার ক্যারন শ্রাবগমও পেশাদারী বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছেন। স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী উপরোক্ত দুইজনে চার মাসে যুক্তরাষ্ট্রের নকুইটি সহর পরিভ্রমণ করে পরস্পরের সঙ্গে টেনিস খেলবেন। বিখ্যাত বাজ্জেট বল দল হারগেম দ্বোবটাসের সঙ্গে যুক্ত থেকে তাঁরা বিভিন্ন স্থানে বাজ্জেট বল খেলার আগে প্রদর্শনী টেনিসে অংশগ্রহণ করবেন। চুক্তি অনুসারে গিবসন প্রায় এক লক্ষ ও শ্রাবগমও ত্রিশ হাজার ডলার পাবেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে 'জ্যাক ক্রেমারের দলভুক্ত সেরা পুরুষ পেশাদার খেলোয়াড় রিচার্ড গণজালেসও এলথিয়া গিবসনের মত প্রত্যেক অধিক পরিমাণ পারিশ্রমিক পান না।

Of all liars, the smoothest and most convincing is memory.
—Olin Miller



সাহিত্য পরিচয়

রাজভাষা

বাঙলা সাহিত্যের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির ক্ষেত্রে, গঠনের ক্ষেত্রে, পুষ্টির ক্ষেত্রে বঙ্গমতী সাহিত্য মন্দিরের অবদান অনস্বীকার্য।

আজকের দিনে বাঙলা সাহিত্য যেখানে উপনীত হতে পেরেছে তার মূলে বঙ্গমতী সাহিত্য মন্দিরের কৃতিত্ব যে কতখানি তার সাক্ষ্য দিচ্ছে ইতিহাস। স্বল্পত মূল্যে সাহিত্যের প্রচার করে সর্বসাধারণকে সাহিত্যের অমৃতরস আবাদন করানোর যে মহৎ মঙ্গল বঙ্গমতী সাহিত্য মন্দির একদা গ্রহণ করেছিলেন আজও তার বিরাম নেই। “রাজভাষা” বঙ্গমতীর প্রাণ প্রতীক। পরমভট্টারক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদমস্ত শিষ্য স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের এক অনবদ্য কীর্তি যার মূল্যায়ন সহজসাধ্য নয়। পৃথিবীর সমস্ত ভাষার মধ্যে সর্বাধিক প্রচারিত ইংরাজী ভাষার প্রসার বা তাৎপর্য আজ জগৎজোড়া, বিশ্ব-সভায় ঐ ভাষার দানও অসীম, তা ছাড়া ঐ ভাষার সাহিত্যের একটি বলিষ্ঠ অপারিচার্য ও শ্রেষ্ঠ অংশ রূপ পেয়েছে সুরভাঃ ঐ ভাষার গুরুত্ব স্বীকার করতে আমরা বাধ্য। ঐ ভাষা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তে আনার ব্যাপারে উপরোক্ত গ্রন্থটি এক অনগ্রসার্য সহায়ক—একটি গ্রন্থের মধ্যে সমগ্র ভাষাটিকে সহজ সরল ও বিস্তারিতভাবে সর্বসাধারণের বোধগম্য করে তুলে ধরেছেন উপেন্দ্রনাথ। ভাষা শিক্ষার্থীদের দল এই গ্রন্থটি থেকে বড়ল উপকৃত হবেন। এই গ্রন্থটি আয়ত্তে থাকলে ইংরাজী ভাষা স্বল্পে সম্পূর্ণরূপে পারদর্শী হওয়ার কোন অনুরোধ বা বাধা থাকতে পারে না এ বিশ্বাস আমরা পোষণ করি। ইংরাজী ব্যাকরণ, শব্দার্থ উচ্চারণ, শব্দের ব্যবহার, প্রয়োগ-প্রণালী, পত্র রচনার কৌশল, সাংস্কৃতিক চিহ্ন, বানান শিক্ষা, কথোপকথন ইত্যাদি স্বল্পে প্রাক্কল আলোচনা ইংরাজী ভাষা স্বল্পে সকলপ্রকার অজ্ঞতার অন্ধকার দূর করে ঐ ভাষা স্বল্পে যথেষ্ট পরিমাণে আলোক বিকীরণ করে। প্রকাশক—বঙ্গমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৩ বিপিন, গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট। দাম—তিন টাকা মাত্র।

শুভনির্মাণ

বাঙলা তথা ভারতের অবিস্মরণীয় কবিদের মধ্যে নবীনচন্দ্র সেন একটি বিশেষ নাম। গত শতাব্দীতে বাঙলা কাব্যের মরুপায়ণ সম্ভবপর হয়েছিল যে কীর্তিমান সন্তানদের সাধনার নবীনচন্দ্র তাঁদেরই অগ্রদূত। বাঙলাদেশের কাব্য জগতে তাঁর বিরাট অবদানেব ইতিবৃত্ত ইতিহাসে অমর হয়ে আছে। নবীনচন্দ্রের লেখনী কেবলমাত্র কাব্য সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত হয়নি, তাঁর লেখনী থেকে নাটকিও জন্ম নিয়েছে। শুভনির্মাণ গীতিনাট্যটি তাঁর নাটকি রচনার দক্ষতার চিহ্ন বহন করে। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে পুত্রের বিবাহোৎসব উপলক্ষে গীতিনাট্যটি রচিত হয়।

বিবাহোৎসবকে পটভূমিকা করেই গীতিনাট্যটি রূপ পেয়েছে। নবীনচন্দ্রের জীবনী, সাহিত্যসৃষ্টি নিয়ে এতাবৎ অনেক আলোচনা হয়েছে—কিন্তু সার্থক গীতিনাট্যকার হিসেবে তাঁর স্বল্পে বিশেষ কোন আলোচনা হয়নি বললেই চলে। বলা বাহুল্য মাত্র যে বাঙলা সাহিত্যের তৎকালীন মানানুসারে শুভনির্মাণকে বিচার করলে দেখা যাবে যে শুভনির্মাণ এক অপরূপ সাহিত্য সৃষ্টি। মহাকবির দেহান্তের অর্ধ শতাব্দীকাল অতিক্রান্ত হবার পর সম্পাদনকারী শ্রীদীপককুমার সেন এই সর্বসমাদৃত অথচ প্রায় বিস্মৃত গ্রন্থটি পাঠক সমাজে নতুন করে উপহার দেওয়ার জন্তে সকলের ধন্যবাদ লাভ করবেন। গ্রন্থটি সম্পাদনার ক্ষেত্রেও তিনি যথেষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। চির প্রণয় লোকান্তরিত সাহিত্য রথীদের এই জাতীয় মূল্যবান গ্রন্থগুলিকে বিস্মৃতির অতল অন্ধকার থেকে যত উদ্ধার করা যায় ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল। এদের প্রসার ও প্রচারের ব্যাপকতার দিকে যত্নবান হওয়ার সময় এসেছে। ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরীর ভূমিকা রচনা সম্পাদিত গ্রন্থটির শ্রীবৃদ্ধি করেছে। প্রকাশক নবীনচন্দ্র গ্রন্থাগার, ৪৪-২, ক্লাইভ কলোনী, কলিকাতা—২৮। দাম আট আনা মাত্র।

উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙলার নবজাগরণ

উনবিংশ শতাব্দীর কাছে বাঙালীর স্বর্ণ অপরিণোদনীয়। উনবিংশ শতাব্দী সর্ববিষয়ে যে ভাবে বাঙালীকে ভরিয়ে তুলেছে অগ্রাগ্র শতাব্দীর ইতিহাসে তার তুলনা মেলে না। উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙলার জাতীয় জীবনে নবজাগরণের এক জোয়ার এসে—তার ফলেই বাঙালীর মননভূমি হতে লাগল উর্বর থেকে উর্বরতর। বিভিন্ন মনীষী, চিন্তানায়ক, দীক্ষাপালকদের শুভ আবির্ভাব উনবিংশ শতাব্দীর গৌরবময় ঐতিহ্যের উজ্জল নিদর্শন। উপরোক্ত পটভূমিকা অবলম্বন করে বাঙলাভাষায় এতাবৎ অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হয়েছে। আমাদের আলোচ্য—খ্যাতনামা কবি ডক্টর সুনীলকুমার গুপ্তের গ্রন্থটিও উপরোক্ত পটভূমি অবলম্বন করেই রচিত। অবশ্য এ কথা অনস্বীকার্য যে ডক্টর গুপ্তের গ্রন্থটি যথেষ্ট পরিমাণে নিজস্বতা, বিশিষ্টতা ও স্বকীয়তার দাবী রাখে। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত লেখকের আলোচনার পরিধি। গ্রন্থটি রচনার লেখককে প্রভূত পরিশ্রম স্বীকার করতে হয়েছে, বলা বাহুল্য সমগ্র গ্রন্থে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। গ্রন্থটি সাহিত্যানুরাগী ও ছাত্র সাধারণকে যুগপৎ ভাবে আনন্দ দেবে ও উপকৃত করবে। বাঙালীর নবজাগরণের অন্তর্নিহিত মূলস্রোতটির বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও লেখক অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। ১৮০১ থেকে ১৮৬০ পর্যন্ত বাঙালীর সাহিত্য, শিক্ষা, রাজনীতি, সমাজ, ধর্ম আলোচন স্বল্পে সৃষ্টিশীল ও স্ববিস্তৃত

আলোচনা গ্রন্থটিতে সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রকাশক—এ মুখার্জী
 য়াণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট। দাম—
 সাত টাকা মাত্র।

রম্যাণি বীক্ষ্য (সৌরাষ্ট্র পর্ব)

ভারতবর্ষের প্রতিটি ধূলিকণার সঙ্গে মিশে আছে একদিকে
 বৈশিষ্ট্য অল্পদিকে বৈচিত্র্য। সবসময়ের উপাসকদের কলাপে
 ভারতযুগ্মিকার মহিমা লিপিবদ্ধ হল সাহিত্যের পাতায়। সাহিত্যের
 একটি স্বতন্ত্র বিভাগ সৃষ্টি হল ভ্রমণ কাহিনী। তারপর একাধিক
 লেখকের অবদানে এই বিভাগটি পুষ্টলাভ করে চলেছে। ভ্রমণ-
 কাহিনীর উল্লেখযোগ্য লেখকদের মধ্যে সুসাহিত্যিক সুবোধকুমার
 চক্রবর্তীর নাম অম্ললেখ্য নয়। তাঁর রম্যাণি বীক্ষ্য প্রথম প্রকাশের
 সঙ্গে সঙ্গেই সাদা জাগিয়েছিল সাহিত্যজগতে। বর্তমানে রম্যাণি
 বীক্ষ্যের সৌরাষ্ট্র পর্বটি প্রকাশিত হয়েছে। সাহিত্যের মধ্যে ভ্রমণ-
 কাহিনীর যে একটি বিশেষ আসন বীকৃত সুবোধকুমার চক্রবর্তী সেই
 আসনেরই মর্যাদাবৃদ্ধির ক্ষেত্রে সহায়তা করলেন এই গ্রন্থটির মাধ্যমে।
 রচনার প্রসঙ্গগুণে সমগ্র গ্রন্থটি যথেষ্ট রসসমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। গ্রন্থটি
 সারবান, তাৎপর্যপূর্ণ এবং অতীব সুখপাঠ্য। কয়েকটি
 আলোকচিত্রও গ্রন্থে যুক্ত করা হয়েছে। বর্ণনা যেমনই বলিষ্ঠ যেমনই
 সাবশীল। বর্ণনভঙ্গী এবং রচনাশৈলী পাঠকচিহ্নকে আকৃষ্ট করবার
 যথেষ্ট শক্তি রাখে। গ্রন্থটির ইতিহাস মূল্যও অসীম। প্রসঙ্গক্রমে
 নানাবিধ ঐতিহাসিক তথ্য পরিবেশন করে লেখক গ্রন্থটিকে সর্বাঙ্গ
 সুন্দর করে তুলেছেন। গ্রন্থের আঙ্গিকটিও গভীরগতিক নয়। ভ্রমণ-
 কাহিনী হলেও গ্রন্থটি উপভাসগন্ধী। টুকরো টুকরো সংলাপের মধ্যে
 বিভিন্ন স্থানের মাহাত্ম্য, বৈশিষ্ট্য ও ইতিহাস বর্ণনায় লেখক
 অন্তঃসামর্থ্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। প্রকাশক এ. মুখার্জী
 য়াণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট। দাম ছ'টাকা
 মাত্র।

জাতিস্মরণ কথা

জাতিস্মরণবাদ সম্পর্কে মানুষের ভিজ্ঞাসার অন্ত নেই। জীবিত
 মানুষের যুগে তার গত জন্মের ইতিকথা আজও যে পরিমাণ বিষয়
 সঞ্চার করে তার ভুলনা মেলা ভার। বিগত জীবনের পরিচয়, কাহিনী,
 ঘটনাবলী সম্বন্ধে দুর্বীর কৌতূহল এক চিরন্তন প্রশ্নের রূপ নিয়ে
 মানব মন অধিকার করে আছে। জাতিস্মরণবাদ নিয়ে আজ পর্যন্ত
 বহু আলোচনা হয়ে গেছে, অসংখ্য গ্রন্থ আত্মপ্রকাশ করেছে তবু
 মানব মনের এই কৌতূহলের ক্ষুধা মেটে নি, তাতে ভাঁটা পড়ে নি,
 তা এখনও অক্ষুরস্ত। এই জাতিস্মরণবাদ সম্বন্ধেই উপরোক্ত গ্রন্থটি
 রচনা করেছেন শ্রীমুখার্জী বন্ধু। গ্রন্থে জাতিস্মরণবাদ সম্বন্ধে সূক্ষ্ম
 বিশ্লেষণ, বিজ্ঞানধর্মী ব্যাখ্যা এবং সারবান আলোচনাদি উক্ত শাস্ত্রকে
 সাধারণ পাঠকের কাছে বোধগম্য করে তোলে। লেখকের সহজ
 সরল ধারায় এই শাস্ত্রের বিভিন্ন দুরূহ জটিল-বিবরণ লিখা সম্বন্ধে আলোচনা
 যথেষ্ট পরিমাণে চিত্তাকর্ষক হয়ে ওঠে। এ বিষয়ে যারা আগ্রহী
 এই গ্রন্থ পাঠে তাঁরা উপরোক্ত বিষয় সম্বন্ধে প্রভূত জ্ঞান অর্জন
 করতে পারবেন। কয়েকটি জাতিস্মরণের কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী

পরিবেশিত হয়েছে। প্রকাশক—দি ঘাটশীলা কোম্পানী, ৩ ম্যাঞ্জো
 লেন। দাম—চার টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা মাত্র

নোনা জল মিঠে মাটি

বাঙলা দেশের বর্তমানকালের প্রতিষ্ঠাবান সাহিত্যসেবীদের মধ্যে
 প্রফুল্ল রায় অন্যতম এবং তরুণতমও। ইতিপূর্বে কয়েকটি সুলিখিত
 উপন্যাসের মাধ্যমে তিনি যথেষ্ট সুনামের অধিকারী হয়েছেন। আলোচ্য
 উপন্যাসটি আন্দামানকে কেন্দ্র করে লেখা। আন্দামানকে কেন্দ্র করে
 আজ পর্যন্ত বাঙলা ভাষায় খুব নগণ্য সংখ্যক গ্রন্থই আত্মপ্রকাশ
 করেছে, এই উপন্যাসটি তাদেরই মধ্যে একটি বিশেষ আসন দাবী করার
 যোগ্যতা বহন করে। আগন্তকের দিক দিয়ে গ্রন্থটির বিরাট হলেও
 রচনাশক্তির উৎকর্ষে পাঠকের কোথাও দৈর্ঘ্যচ্যুতি ঘটে না। কেবলমাত্র
 লেখনীই প্রফুল্ল রায়ের একমাত্র সম্পদ নয়, বৃকভরা অমৃতভূমি তাঁর
 এক বিরাট সম্পদ আব সেই অমৃতভূমিরই পরিচয় তিনি লিপিবদ্ধ করে
 গেলেন এই গ্রন্থটির পাতায় পাতায়। উপন্যাসের কয়েকটি অংশবিশেষ
 পাঠকচিত্ত গভীর ভাবে স্পর্শ করে। সমগ্র আন্দামান যেন চোখে
 সামনে ভেসে ওঠে। লেখকের রচনাশৈলী মনোরম। সকল দিক দিয়ে
 আন্দামানকে লেখক সাহিত্যের পাতায় যে ভাবে প্রকাশ করেছেন
 সেই প্রকাশভঙ্গী নিঃসন্দেহে অভিনন্দনীয়। সুবোধ দাশগুপ্তের প্রচ্ছদ
 পরিকল্পনাও প্রশংসার। গ্রন্থের নাগকরণ করেছেন কবি শ্রীজ্যোত্স্ন
 মিত্র। প্রকাশক—সুকলাস চট্টোপাধ্যায় য়াণ্ড সন্স। ২০৩/১১
 কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট। দাম আট টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা মাত্র।

একান্ত আপন

আজ কয় দিনের বাঙলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধির পাথে অগ্রসর হতে
 যারা সহায়তা করেছেন স্বভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদেরই অন্যতম।
 সার্বিক কথাসিল্পীরূপে যথেষ্ট সুনামের ইনি অধিকারী এবং সাহিত্যের
 দরবারে একটি মূল্যবান আসন গ্রহণে সমর্থ হয়েছেন। আলোচ্য
 উপন্যাসটি সর্বতোভাবে তাঁর সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছে। এক অপূর্ণ
 পটভূমিকা অবলম্বন করে উপন্যাসটি রচিত। লেখকের ভাষা,
 ভাবধারা, বক্তব্য সবকিছুই বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। লেখকের তীব্র
 স্বয়ংস্ফূর্তি, তীব্র অঙ্গদৃষ্টি বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গীর চিত্র উপন্যাসটির পাতায়
 পাতায় বহন করেছে। চরিত্র-চিত্রণে, জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের
 আলোচ্যের ভাষার মাধ্যমে প্রকাশের ঘটনাদির ধারা রক্ষণে লেখক
 যথেষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। প্রকাশক—ত্রিবেণী প্রকাশন,
 ২ জামাচের দে স্ট্রিট। দাম তিন টাকা মাত্র।

ফুলবধিষা

বাঙলা সাহিত্যের ছোটগল্পের দরবারে শক্তিমান কথাসিল্পী
 সমরেশ বসু যে আজ একটি বিশিষ্ট আসনের অধিকারী এ সম্বন্ধে
 নতুন করে কিছু বলা অর্থহীন। ছোটগল্পের ক্ষেত্রে সমরেশ বসুই
 বিশেষ সম্বন্ধে পাঠকমহলও পরিচয় অর্জিত আছেন। ফুলবধিষা
 তাঁর ছোটগল্পের একটি সংকলন, এতে মোট ছ'টি গল্প স্থান পেয়েছে।
 গল্পগুলি উচ্চাঙ্গের, স্বকীয়তায় ভরপুর এবং যথোচিত বৈচিত্র্যপূর্ণ।
 চরিত্র সৃষ্টিতে, ঘটনা সংস্থাপনে এবং সংলাপ যোজনায় লেখক তাঁর
 স্বভাবসুলভ নৈপুণ্যই দেখিয়েছেন। লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী প্রশংসার,

গল্পগুলির মধ্যে নীর দরদী মনেরই ছায়া দেখা যায়। সুখ-দুঃখ, স্বাভাবিকতা, আনন্দ-বেদনাকে ঘিরে যে জীবন—সেই জীবনকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে খুঁটিয়ে দেখতে চেষ্টা করেছেন লেখক, দরদী মনের সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্যের মনেরও পরিচয় দিয়েছেন তিনি। জীবনের সঙ্গে সঙ্গে তার পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীও গল্পগুলির মধ্যে চিত্রিত হয়েছে অসীম দক্ষতা সহকারে। অীগণেশ বসু প্রচ্ছদচিত্র অঙ্কনে যথেষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। প্রকাশক—কালকট্টা পাবলিশার্স, ১০ জামাচরণ দে স্ট্রীট। দাম—মাড়াই টাকা মাত্র।

অগ্নিদৃষ্টি

“হাত” আর “হাভনট”দের বিরোধ চিরকালের। হাতেদের দল দর্পে অন্ধ, চিরকালের জন্তে হাভনটদের তারা পায়ের তলায় ঢেপে রাখতে চায়, কিন্তু হাভনটদের অস্ত্রবান্ধাও পীড়নে জর্জরিত হয়ে জেগে ওঠে, মরণ পণ করে, মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়ায় শোষকের বিরুদ্ধে। এই ঘটনাই আজকের দিনের সমাজে এক বাস্তব সত্যের রূপ নিয়েছে, তারই প্রতিচ্ছবির প্রতিকলন হয় সাহিত্যের পাতায়। শক্তিমান লেখক সুনীল ঘোষের “অগ্নিদৃষ্টি” উপন্যাসটি পাঠ করলে উপবোধক মস্তব্যের অর্থ পরিষ্কার হয়ে যায়। শ্রমিক-মালিক বিরোধ এট গ্রন্থের মুখ্য উপজীব্য হলে আরও একটি বিষয়ে লেখক আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে আমাদের মত সুস্থ জীবন যাত্রার পরিবর্তে যাবা স্থগিত জীবনযাত্রা বেছে নিল, তাদের জন্তেও ভাববার একটা দিক আছে। লেখক একটি ছেলেকে কেন্দ্র করে এই সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য বলেছেন যে এই পথ তারা বেছায় বেছে নেয় নি, নিয়েছে পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে অস্বীকার করতে না পেরে, তিনি স্পষ্ট দেখিয়েছেন যে সময় ও সুযোগ পেলে তারা অন্যায়সে তাদের বিগত জীবনে কিংবা আসতে পারে। লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী উন্নত, বক্তব্য জোরালো এবং দরদী অগ্নিভুক্তি সাপেক্ষ। উপন্যাসটিই মাগনে আজকের দিনের সমাজের নানাবিধ গল্প, দুর্নীতি ও বাস্তবতার এক নগ্নচিত্র লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন। এবং সেই প্রচেষ্টায় লেখক জয়যুক্ত হয়েছেন, একথা বলতে বাধা নেই। প্রকাশক—জাশনাল পাবলিশার্স, ২০৬ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, দাম ছ’ টাকা মাত্র।

শৃঙ্খলিতা

জুধু একজন আইনজ্ঞ বা শিক্ষাব্রতী হিসেবেই ডক্টর প্রতাপচন্দ্র চন্দ্রের খ্যাতি সীমাবদ্ধ নয়, সাহিত্যসেবা হিসেবেও তাঁর খ্যাতি সুবিদিত। দীর্ঘকাল সাহিত্য সেবা করে সাহিত্যের দরবারেও আজ তিনি সম্মানের অধিকারী হয়েছেন। উপরোক্ত উপন্যাসটির পটভূমিকা ঐতিহাসিক। শিবাজীর স্বর্গ লাভের পর তাঁর আসন বহন তাঁর অযোগ্য। ইন্ডিয়ানরা, অপদার্থ পুত্র শাজাহান অধিকাংশ জুড় স্ট্রেট সময়ে একদিকে মোগল ‘মারাঠা’ সম্বন্ধে অগ্নিদিকে পটুগীজদের সর্বপ্রাণী শোষণ—এই দুইয়ের যোগাযোগে গোয়ার অভ্যন্তরীণ সর্বশ্রমিক অবস্থা কি রূপ নিয়েছিল সেই সবকিছু একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র ভূক্ত চন্দ্র এই উপন্যাসটির মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। গোয়ার তৎকালীন সামগ্রিক পরিবেশ, রীতিনীতি, আইন, সমাজ এবং সর্বোপরি পটুগীজদের বিরুদ্ধে গোয়ার মুক্তি সংগ্রামের বিশদ, চমকপ্রদ ও গুরুত্বপূর্ণ বিবরণ লেখক উপন্যাসের মাধ্যমে পাঠক সমাজের সামনে তুলে ধরেছেন।

কাব্যারিণা ও অম্মুখ মত প্রেমের দুটি প্রকৃত পুজারিণীর চরিত্র উপন্যাসে যুক্ত হওয়ার উপন্যাসটি আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। পণ্ডিত বেলভেলকার তো ‘একটি অপূর্ণ চরিত্র নৃপতি’। শুধু মাত্র এই একটি চরিত্র সৃষ্টির জন্তে লেখক পাঠকসমাজের আন্তরিক ধন্যবাদ দাবী করতে পারেন। আমরা আনন্দের সঙ্গেই এ কথা বলতে পারি যে ইতিহাস-গন্ধী যে কটি সার্থক উপন্যাস বাঙলা সাহিত্যের অমর্যাদ্য করে এসেছে এতাব্যকাল, শৃঙ্খলিতা তাদেরই সংখ্যাবৃদ্ধি করল। সমগ্র উপন্যাসটি লেখকের কৃতিত্বের, কুশলতার ও ক্ষমতার সুস্পষ্ট স্বাক্ষর বহন করছে। প্রকাশক রীডার্স কর্পার, ৫ শঙ্কর ঘোষ লেন। দাম তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

চা—মাটি—মাছুষ

কি শিক্ষিত, কি অশিক্ষিত, কি ধনী কি নিধন, কি পুরুষ কি মহিলা, চায়ের গতিবিধি সর্বত্রই অব্যাহত। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নিবিশেষে প্রায় সকলেই চায়ের অমুরাগী। ভারতের যে যে অঞ্চলে চাএর জন্ম হয় সেই উৎপাদন কেন্দ্রগুলি বিবিধ বৈচিত্র্যে ভরপুর—পাঠক সমাজকে সেই বৈচিত্র্যের সন্ধান দিয়েছেন শ্রীবীরেশ্বর বসু আলোচ্য উপন্যাসটির মাধ্যমে। চা-বাগান এই উপন্যাসের পটভূমিকা। চা-বাগানের নরনারী, তাদের জীবনের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার এক সুস্পষ্ট বাস্তব চিত্র লেখক এখানে যথেষ্ট কৃতিত্বের সঙ্গে পরিবেশন করেছেন। এর নাটক জীবনের প্রতি পদে পদে তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করল, আবার পেল ভালবাসার ক্ষেত্রে, বারংবার পেল লাঞ্ছনা তবু ভালবাসার নেশা তার মন থেকে গেল না। এই দ্বন্দ্বসম্পর্কী চরিত্রটির মাধ্যমেই জীবনের এক বিরাট সত্য দিনের আলোর মত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। চা, মাটি আর মাছুষের যে নিবিড় সংযোগ, তার সূত্র অচ্ছেদ্য লেখক চিত্র তৎপর। উপন্যাসটি বৈশিষ্ট্যের দাবী করতে পারে, কাহিনী দ্বন্দ্বসম্পর্কী, লেখকের আন্তরিকতাও প্রশংসনীয়। সুবোধ দাশগুপ্তের প্রচ্ছদচিত্র অঙ্কনও সুন্দর হয়েছে। প্রকাশক—কথামালা প্রকাশনী, ১৮-এ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট। দাম—চার টাকা মাত্র।

অচিরা

সার্বকনিয়ম কবি প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবি খ্যাতি আজকের নয়, দীর্ঘকাল ধরে সাহিত্যের তিনি সেবা করে আসছেন এবং তাঁর সেবার কাব্য সাহিত্য লাভবানই হয়েছে। বান্ধের কবিতা ভাবে, ভাবায়, কল্পনায়, ব্যঙ্গনায়, চিত্রণে সকল দিক দিয়েই রসোজীর্ণ হয়ে ওঠে প্রভাতমোহন সেই কবিদেরই অন্তর্গত। তাঁর পর্যাশ্রিত কবিতাকে একত্রে সংকলিত করে “অচিরা” গ্রন্থটি সৃষ্টি হয়েছে। কবিতাগুলি সুপাঠ্য, চিত্তস্পর্শী এবং বৈশিষ্ট্যবান। বলা বাহুল্য “অচিরা”র কবিতাগুলি প্রভাতমোহনের কবি হিসেবে সুনাম অঙ্গুর রেখেছে। প্রভাতমোহন জীবন দেবতার একনিষ্ঠ উপাসক, তাঁর কাব্যে সত্য, ও শিব স্তব্ধের মহিমা মূর্ত হয়ে ওঠে। তাঁর সৌন্দর্যবোধ, শব্দচয়ন এবং প্রকাশকৌশল সাধুদের দাবী রাখে। রসজ্ঞ ও সুবোধদের দরবারে তাঁর কাব্য তার বখাড়াপা সমাদরই লাভ করুক এই কামনাই করি। প্রকাশক শান্তি লাইব্রেরী, ১০-বি, কলেজ রো। দাম চার টাকা মাত্র।

১লা আশ্বিন (১৮ই সেপ্টেম্বর) : পশ্চিমবঙ্গের বঙ্গ-বিধসভা অঞ্চলসমূহের সমস্তাবলী পর্যালোচনার জন্য রাজ্য সরকার কর্তৃক মন্ত্রিসভা সাব কমিটি গঠন—চেন্নারম্যান মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়।

২রা আশ্বিন (১৯শে সেপ্টেম্বর) : পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় বিরোধী পক্ষের অধিকাংশ দলের পক্ষ হইতে বিধান সভা দপ্তরে রাজ্যের কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবের নোটিশ দাখিল।

৩রা আশ্বিন (২০শে সেপ্টেম্বর) : বর্ধমান, নদীয়া, হুগলী, মেদিনীপুর জেলায় বিস্তীর্ণ অঞ্চল অভাবনীয় স্ফায় প্রবৃত্তি হওয়ার ফলে লক্ষ লক্ষ নব নারীর অস্বাভাবিক দুঃখ-দুর্দশার সংবাদ।

৪ঠা আশ্বিন (২১শে সেপ্টেম্বর) : পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় শব্দকালীন অধিবেশনের প্রথম দিনে খাজ আন্দোলন সম্পর্কে পুলিশের গুলীবর্ষণ ও লাঠিচালায় প্রসঙ্গে বিবাহী সদস্যদের আনিত মূলত্বী প্রস্তাবকে কেন্দ্র করিয়া কংগ্রেস ও কম্যুনিষ্ট সদস্যদের মধ্যে শেষ অবধি খণ্ডযুদ্ধ।

৫ই আশ্বিন (২২শে সেপ্টেম্বর) : পশ্চিমবঙ্গ মূল্যবৃদ্ধি ও ভূমিক প্রতিক্রিয়া কমিটির আহ্বানে খাজের দাবীতে এবং সরকারী দমন নীতির প্রতিবাদে কলকাতায় বিবাহী ছাত্র মিছিল—বিধান সভার অনতিবিলম্বে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করিয়া ১১৭ জনের গ্রেপ্তার বরণ।

৬ই আশ্বিন (২৩শে সেপ্টেম্বর) : ভাষার ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গের পুনর্গঠনের দাবী জানাইয়া পশ্চিমবঙ্গ পুনর্গঠন সংযুক্ত পরিষদের পক্ষ হইতে প্রধান মন্ত্রী জীনেহরুর নিকট স্মারকলিপি পেশ।

৭ই আশ্বিন (২৪শে সেপ্টেম্বর) : পশ্চিমবঙ্গের খাজসচিব জীপ্রফুলচন্দ্র সেনের পদত্যাগের জন্য বিরোধী পক্ষের দাবী মানিয়া লইতে ডাঃ রায়ের অসম্মতিসূচক ঘোষণা।

৮ই আশ্বিন (২৫শে সেপ্টেম্বর) : চীনা ফৌজের ভারতীয় সীমানা লঙ্ঘনে দিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ।

কলিকাতায় ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকের অতিমত—ভারত চীন সীমান্ত সম্পর্কিত বিরোধ উভয় রাষ্ট্রের বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনা-আলোচনা মারফত মীমাংসা সম্ভব।

৯ই আশ্বিন (২৬শে সেপ্টেম্বর) : পাঞ্জাবের নবীন নগরে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন শুরু—ভূতায় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কৃষি ও শিল্পের উপর সমান গুরুত্ব আরোপ করা হইবে বলিয়া সদস্যদের অভিমত প্রকাশ।

১০ই আশ্বিন (২৭শে সেপ্টেম্বর) : চীন-ভারত সীমানা বিরোধ সম্পর্কে কংগ্রেস-ওয়ার্কিং কমিটির সংশোধিত প্রস্তাবে ঘোষণা—ভারত সীমান্তে চীনাগের আক্রমণ সর্বতোভাবে প্রত্যরোধ করা হইবে।

১১ই আশ্বিন (২৮শে সেপ্টেম্বর) : পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধী পক্ষের আনিত দুইটি অনাস্থা প্রস্তাব ভোটাধিক্য অগ্রাহ্য।

আই, এফ, এ, শ্রীত ফাইজাল (মোহনবাগান সনাম ইষ্টবেঙ্গল) খেলা অনির্দিষ্টকাল স্থগিত—আই, এফ, এ টুর্নামেন্ট কমিটির সিদ্ধান্ত।

১২ই আশ্বিন (২৯শে সেপ্টেম্বর) : পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব রাজ্য বিধান পরিষদে বিনা ভাঙলনে অগ্রাহ্য।

• ১৩ই আশ্বিন (৩০শে সেপ্টেম্বর) : পশ্চিমবঙ্গের বঙ্গা পরিষদিত সম্পর্ক রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে—রাজ্যের বঙ্গা বিধসভা হুগলী,

দেশে-বিদেশে

আশ্বিন, ১৩৬৬ (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, '৫৯)

মুর্শিদাবাদ, ২৪-পরগণা, বর্ধমান, নদীয়া, হাওড়া প্রভৃতি জেলায় পাঁচ লক্ষাধিক একর জমি জলময়—দুই লক্ষ টন ধান বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা।

১৪ই আশ্বিন (১লা অক্টোবর) : পশ্চিমবঙ্গের গাজের অঞ্চলে বিশেষভাবে ২৪-পরগণা, হাওড়া, হুগলী, মেদিনীপুর জেলায় দুই দিবসব্যাপী প্রলয়ঙ্করী বৃষ্টিপাত—অসংখ্য লোক হতাহত, শত শত ঘর-বাড়ী বিধ্বস্ত।

ম্যাকমোহন লাইনই ভারত ও চীনের সীমারেখা—প্রধান মন্ত্রী জীনেহরুর কর্তৃক চীনা প্রধান মন্ত্রী চৌ এন লাই-এর পত্রের জবাব।

১৫ই আশ্বিন (২রা অক্টোবর) : সহকারী রেলওয়েসচিব মিঃ শাহ নওয়াজ খাঁ-এর ঘোষণা—শিয়ালদহ ডিভিশনে সম্ভবতঃ তিন বৎসরের ভিতর বৈদ্যুতিক ট্রেণ চলাচল করিবে।

মহাত্মা গান্ধীর একনব্বতিতম জন্ম-জয়ন্তী উপলক্ষে সমগ্র দেশের সঙ্গে বাণীকপুত্র গান্ধীঘাটে ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠান।

১৬ই আশ্বিন (৩রা অক্টোবর) : দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশনের (ডি, ভি, সি) বঙ্গা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যাবসিত হইয়াছে—ডি, ভি, সি ষ্টাক এক্সোসিয়েশন সম্পাদকের বিবৃতি।

১৭ই আশ্বিন (৪ঠা অক্টোবর) : আগে সৈন্যপারাবণ—পরে সীমান্ত বিরোধের আলোচনা—চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই-এর পত্রের উত্তরে জীনেহরুর স্পষ্ট উক্তি।

১৮ই আশ্বিন (৫ই অক্টোবর) : বর্ধমান, নদীয়া, হুগলী, মুর্শিদাবাদ ও মেদিনীপুর—পশ্চিমবঙ্গের এই পাঁচটি জেলায় জলপ্লাবনে বিচ্ছিন্ন দুঃখিগম্যা অঞ্চলগুলির দুর্গত অনশনক্লিষ্ট নব-নারীদের জন্য সাময়িক বাহিনীর বিমান হইতে খাদ্য সহযোগিতার ব্যবস্থা।

১৯শে আশ্বিন (৬ই অক্টোবর) : পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ হরেকৃষ্ণ মহতাবের সহিত বৈঠকান্তে কেন্দ্রীয় খাজ সচিব জী এস কে, পাতিলের ঘোষণা—খাজ বণ্টন ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ ও উড়িষ্যাতে লইয়া শীঘ্রই একটি নূতন খাজাকল গঠন করা হইবে।

২০শে আশ্বিন (৭ই অক্টোবর) : ভারত চীন সম্পর্কের ক্রমোন্নতি সম্পর্কে আশা প্রকাশ করিয়া প্রধান মন্ত্রী জীনেহরুর নিকট চীনা প্রধান মন্ত্রী চৌ এন লাই-এর তারবার্তা।

২১শে আশ্বিন (৮ই অক্টোবর) : ম্যাকমোহন লাইন প্রসঙ্গে দিল্লীতে প্রধান মন্ত্রী জীনেহরু ও জে: নে উইন (ব্রহ্ম প্রধান মন্ত্রী) বৈঠক।

২২শে আশ্বিন (৯ই অক্টোবর) : নদীয়ার সীমান্তে পাকিস্তানী হুজুতদের হানা—ভারতীয় সীমান্ত টহলদার পুলিশের গুলীবর্ষণ।

২৩শে আশ্বিন (১০ই অক্টোবর) : ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনী কর্তৃক ১২ সপ্তাহে এক সহস্র নাগা রিহোইটক আটক কিংবা আত্মসমর্পণে বাধ্যকরণের সংবাদ।

২৪শে আশ্বিন (১১ই অক্টোবর): তিন দিবস যথাযথি শারদীয়া দুর্গাপূজা অনুষ্ঠানের পব কলিকাতা ও সহরতলীতে নিরীয়ে নিরঙ্কন উৎসব সম্পন্ন।

২৫শে আশ্বিন (১২ই অক্টোবর): ভিলাই ইম্পাত কারখানার ইম্পাত উৎপাদন শুরু—ভারত সোভিয়েট সহযোগিতার ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সূচনা।

১৬শে আশ্বিন (১৩ই অক্টোবর): পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এক প্রেসনোটে বিজ্ঞপ্তি—রাজ্যের ৭৫টি সহর (মিউনিসিপ্যাল) এলাকার কলেজের প্রাচুর্য্য হওয়ার আশঙ্কা।

১৭শে আশ্বিন (১৪ই অক্টোবর): বৃহত্তর কলিকাতায় জল সরবরাহ ও জল নিকাশন সমস্যা সম্পর্কে পঞ্চালোচনার ৬তম বিধিমাধ্য সংস্থার বিশেষজ্ঞদের কলিকাতা উপস্থিতি।

প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও নাট্যকাব্য আচার্য্য ময়ধর্মোদন বসুর (১১) কলিকাতার বাসভবনে জীবনদীপ নিশাণ।

১৮শে আশ্বিন (১৫ই অক্টোবর): পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক ভয়াবহ বন্যা সম্পর্কে অবিলম্বে বহুস্তর দাবী—পশ্চিমবঙ্গ বজাৰ্ত্ত সহায়তা সমিতির সভাপতি শ্রী এন. সি. চ্যাটার্জী ও সম্পাদক শ্রীত্রিদিব চৌধুরী, এম পি'র প্রধান মন্ত্রী জীনেহরুর নিকট পত্র।

২১শে আশ্বিন (১৬ই অক্টোবর): দিল্লীতে রাষ্ট্রপতি ভবনে পূর্ব সীমান্ত বিরোধ সম্পর্কে পাক-ভারত প্রতিনিধিদের বৈঠক আবার।

পশ্চিমবঙ্গের বন্যা পরিস্থিতি সম্পর্কে নয়। দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রী জীনেহরুর সহিত রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সাক্ষাৎকার।

৩০শে আশ্বিন (১৭ই অক্টোবর): দিল্লীতে তিন দিবসব্যাপী আলোচনার পর সীমান্ত প্রসঙ্গে পাক-ভারত বৈঠকের প্রথম পর্ব শেষ।

৩১শে আশ্বিন (১৮ই অক্টোবর): কেরলের নির্বাচন জুগিত রাখা হইবে না—রাজ্যপাল ডাঃ রামকৃষ্ণ রাওএর ঘোষণা।

বহির্দেশীয়—

১লা আশ্বিন (১৮ই সেপ্টেম্বর): রাষ্ট্রসংঘে (নিউইয়র্ক) সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রী মঃ নিকিতা ক্রুশ্চেভের ঐতিহাসিক ভাষণ ও পূর্ণাঙ্গ নিরস্ত্রীকরণের প্রস্তাব পেশ।

৩রা আশ্বিন (২০শে সেপ্টেম্বর): প্রো: নাসেবের অটুট সহর—ইস্রায়েলকে কিছুতেই স্বপ্নেও খালে প্রবেশাধিকার দেওয়া হইবে না।

৫ই আশ্বিন (২২শে সেপ্টেম্বর): ইরানের শাহ ও প্রধানমন্ত্রীর সহিত ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী জীনেহরুর আলোচনা শেষ—আলোচনাস্তে অনাক্রমণ নীতির উপর উভয় পক্ষের যুক্ত ইচ্ছাভাব।

৬ই আশ্বিন (২৩শে সেপ্টেম্বর): রাষ্ট্রসংঘে চীনের প্রতিনিধিদের প্রথম আলোচনার প্রস্তাব রাষ্ট্রসংঘে সাধারণ পরিষদে ভোটাদিকো অগ্রাহ—ভারতের দেশরক্ষা সচিব শ্রীকৃষ্ণমেননের চেষ্টা ব্যর্থ।

৮ই আশ্বিন (২৫শে সেপ্টেম্বর): সিংহলের প্রধানমন্ত্রী মিঃ সলোমন বন্দরনায়ক গুলীতে আহত—বৌদ্ধভিক্ষুর বেশধারী আততায়ী গ্রেপ্তার—সমগ্র দেশে জঙ্করী অবস্থা ঘোষণা।

১১ই আশ্বিন (২৮শে সেপ্টেম্বর): গেটিসবার্গের (আমেরিকা) নিভৃত শৈলশিখরে বিশ্বপরিস্থিতি সম্পর্কে আইক-ক্রুশ্চেভ (মার্কিন প্রেসিডেন্ট ও রুশ প্রধান মন্ত্রী) গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক।

আততায়ীর বিভলবারের গুলীতে আহত 'মিঃ বন্দরনায়কের (সিংহলী প্রধানমন্ত্রী) হাসপাতালে শেষ চিকিৎসা ভাগ। নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসাবে মিঃ বিজয়ানন্দ দত্তনায়কের শপথ গ্রহণ।

১০ই আশ্বিন (২৭শে সেপ্টেম্বর): গেটিসবার্গে দুই দিবস ব্যাপী বৈঠকের পব পাঁচ শত শব্দ সম্বলিত আইক-ক্রুশ্চেভ যুক্ত ইচ্ছাভাব প্রচার। উভয় নেতার সম্মিলিত ঘোষণা—বল প্রয়োগ দ্বারা নড়ে, শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে অসীমাসিত আন্তর্জাতিক প্রগ্রাবলীর যীমাংসা করিতে হইবে। আগামী বৎসর (১৯৬০) বসন্তকালে প্রেসিডেন্ট আইকের সোভিয়েট ইউনিয়ন পরিদর্শন।

ভয়াবহ সামুদ্রিক ঝড়ে জাপানে প্রায় আড়াই সহস্র নর-নারী নিহত বা নিখোঁজ—তিন লক্ষাধিক লোক গৃহহারা।

১৬ই আশ্বিন (২৮শে সেপ্টেম্বর) যুক্তরাষ্ট্রে ১৩ দিবস ঐতিহাসিক সফর শেষে রুশ প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভের মস্কো প্রত্যাবর্তন।

১৩ই আশ্বিন (৩০শে সেপ্টেম্বর) এশিয়ার প্রথম মহিলা হিসাবে কলিকাতা কলেজের ছাত্রী কুমারী আরতি সাহার (১৯) ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমের গৌরব অর্জন।

১৪ই আশ্বিন (১লা অক্টোবর): কমুনিষ্ট চীনের দশম বার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে পিকিং-এ অনুষ্ঠিত বিরাট কূচকাণ্ডয়াজে রুশ প্রধানমন্ত্রী মঃ ক্রুশ্চেভের যোগদান।

১৬ই আশ্বিন (৩রা অক্টোবর) সম্মিলিত আরব প্রজাতন্ত্রের পিকিংস্থ দূতাবাস চীন কর্তৃক অবরোধ।

১৭ই আশ্বিন (৪ঠা অক্টোবর): রুশিয়া কর্তৃক সাফল্যের সহিত বকেট গোপে চন্দ্র প্রদক্ষিণকারী আন্তঃগ্রহ স্টেশনে উৎক্ষেপ।

১৯শে আশ্বিন (৬ই অক্টোবর) রাষ্ট্রসংঘে ভারতের দেশরক্ষা মন্ত্রী শ্রী কৃষ্ণমেননের ঘোষণা—ভারত চীনা আক্রমণ বরদাশ্ত করিবে না।

২০শে আশ্বিন (৭ই অক্টোবর) ইরাকের প্রধানমন্ত্রী মেঃ জেঃ আব্দুল করিম কাসেম বাগদাদের পথে মোটরে আততায়ীর গুলীতে আহত।

২৩শে আশ্বিন (১০ই অক্টোবর): বুটেনে সাধারণ নির্বাচনে প্রধান মন্ত্রী মিঃ ছারবু ম্যাকমিলনের রক্ষণশীল দলের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ।

২৪শে আশ্বিন (১১ই অক্টোবর): চন্দ্রলোক অভিযুখে উৎক্ষিপ্ত রুশিয়র সর্বশেষ মহাজাগতিক বকেট (লুনিক-৩) পৃথিবী হইতে সর্বোচ্চ উচ্চে উপস্থিতি সম্পর্ক মস্কো বেতারের দাবী।

২৮শে আশ্বিন (১৫ই অক্টোবর): রাষ্ট্রসংঘ সাধারণ পরিষদে তিরত পরিস্থিতি আলোচনার দাবীতে আরাল্যাণ্ড ও মালয়ের আনীত প্রস্তাব ভোটাদিকো গৃহীত—ভারত ভোটদানে বিরত।

২৯শে আশ্বিন (১৬ই অক্টোবর): পাক প্রেসিডেন্ট জেনারেল আব্দুস খাঁর ঘোষণা—১৯৬০ সালের শেষ নাগাদ পাকিস্তানের নতুন শাসনতন্ত্র রচিত হইবে।

৩০শে আশ্বিন (১৭ই অক্টোবর): চৌ ইউ অভিযাত্রী মহিলা দলের নেত্রী সহ ৮ জন সদস্য নিহত হওয়ার বিশ্বের বর্ষ উচ্চতম শুল্ক বিজ্ঞায় চেষ্টা পরিত্যক্ত।

৩১শে আশ্বিন (১৮ই অক্টোবর): পূর্ব সীমান্ত বিরোধ সম্পর্কে দিল্লী বৈঠকান্তে ঢাকার, পাক-ভারত উচ্চ পর্যায়ের আলোচনা শুরু।

শ্রাশনাল-একো সপ্তাহ—১৮ই থেকে ২৪এ অক্টোবর

এই উৎসবের দিনগুলোয়—

সকলিতে ও কৌতুকে আপনার গ্রহ আনন্দমুখর
ক'রে তুলতে সুন্দর একটি

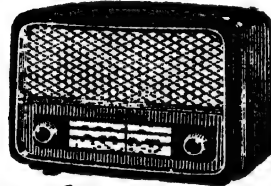
ন্যাশনাল একো

রেডিও

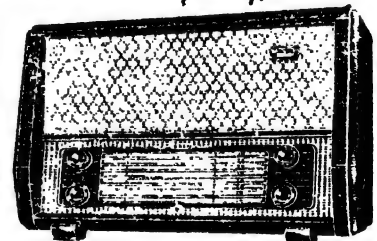
ঘরে রাখুন



মডেল ইউ-৭১৭ : ৫ ভালভ, ৩ ব্যাণ্ড
এসি বা ডিসি। বাগানী রঙের ব্যাক-
লাইট কেবিনেট—২৫০০ টাকা।
ক্রীম, নীল ও সবুজ রঙের।
২৬০০ টাকা।



মডেল বি-৭১৭ : ৪ ভালভ, ৩ ব্যাণ্ড,
ড্রাই ব্যাটারী। বাগানী রঙের ব্যাক-
লাইট কেবিনেট—২৫০০ টাকা। ক্রীম,
নীল ও সবুজ রঙের। ২৬০০ টাকা।



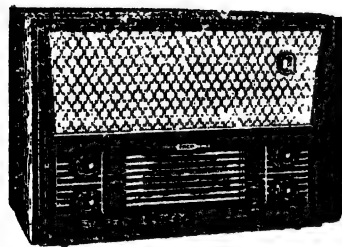
মডেল এ-৭৩১ : ৭ ভালভ, ৮ ব্যাণ্ড, এসি।
শব্দগ্রহণ ক্ষমতা অত্যন্ত উচ্চ। স্বনিয়ন্ত্রিত
আর, এক, স্টেডিয়াম। সমস্ত শ্রাশনাল-একো
রেডিওর মধ্যে সেরা। ৬২৫০ টাকা।

সবই নেট দাম—ট্যাক্স আলাদা
এক বছরের গ্যারান্টি।

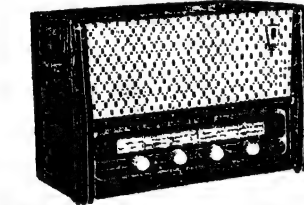


জেনারেল রেডিও এণ্ড এপ্লায়েন্সেস
প্রাইভেট লিমিটেড

৩ মাদান স্ট্রিট, কলিকাতা-১৩। অপেরা
হাউস, বোম্বাই-৪। ফ্রেজার রোড, পাটনা।
১/১৮, মাইলি রোড, রাঙ্গা। ৩৬/৭৯,
সিলভার জুবিলী পার্ক রোড, বাঙ্গালোর।
জোগবিন্দাম কলোনি, চাঁদনী চক, দিল্লী।



মডেল-৭৩০ : ৬ ভালভ, ৮ ব্যাণ্ড,
'ম্যাগ'নি-ব্যাণ্ড টিউনিং। মডেল এ-৭৩০
এসি; মডেল ইউ-৭৩০ এসি বা ডিসি।
৪৯৫০ টাকা।



মডেল-৭২২ : ৬ ভালভ, ৩ ব্যাণ্ড,
মডেল এ-৭২২—শুধু এসি। মডেল
ইউ-৭২২ এসি বা ডিসি।
৩৩৫০ টাকা।



মডেল বি-৭২২ : ৫ ভালভ,
৩ ব্যাণ্ড, ড্রাই ব্যাটারী।

শ্রাশনাল-একো রেডিওই সেরা

—এগুলি 'মনসুনাইজড'—

পাগলা হত্যার মামলা

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ডঃ পঞ্চানন ঘোষাল

এর পরদিনই রাত্রে আমরা খবর পেলাম যে শিউচরণ গুরকে শিউচরণবিকাকে কে বা কাহারো হত্যা করে কুমারটুলীর রাস্তার একটি রোয়াকের উপর ফেলে বেগে গিয়েছে। আমরা তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে এসে দেখি, শিউচরণের মৃতদেহ রক্তাক্ত হওয়ায় একটি গৃহের রোয়াকে পড়ে রয়েছে। অকুস্থলে বহু লোককেই এই হত্যা সংবাদে আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলাম, কিন্তু তারা কেহই ঐ নৃশংস হত্যা সংবাদে কোনও খবর আমাদের দিতে পারেনি। মৃত পাগলাবাবুর দেহের দ্বারা শিউচরণের দেহেও আমি একই প্রকারের ক্ষত লক্ষ্য করেছিলাম। এই উভয় ব্যক্তিকে একই ভাবে বন্ধে ছুরিকা দ্বারা আঘাত করে হত্যা করা হয়েছিল। বলা বাহুল্য যে, তখনও পর্যন্ত আমরা এই খবর কোনও কিনারা করতে সমর্থ হইনি। সম্ভবতঃ অনুরূপভাবে নিহত হবার ভয়ে ঐখানকার বস্তি অঞ্চলের কেহ খাঁদাগুণ্ডার বিরুদ্ধে সাফ্য দিতে রাজী হয়নি। এ মামলাটি ব্যতীত অপর আর একটি মামলারও আসামীরূপে তাকে আমি খোঁজাখুঁজি করেছিলাম। এই মামলাটি ছিল একটি সিঁদেল চুরির মামলা। কুমারটুলীর এক নামকরা জমিদার বাড়ী হতে একটি টোটাভরা বিভলভারসহ সহস্র সহস্র মূল্যের জুয়েলারী জব্দা চুরি হওয়ার এই মামলাটি দায়ের করা হয়েছিল। ইতিমধ্যে গঙ্গাবন্ধে নৌকা করে পার হবার সময় হাওড়ার জৈনক পুলিশ অফিসার তাকে ঐ নৌকাতে গ্রেপ্তারও করেছিল। কিন্তু খাঁদাগুণ্ডা তাকে অন্তর্কিতে গঙ্গাবন্ধে নিক্ষেপ করে নিজে সাঁতার কেটে ওপারে উঠে পালিয়ে গিয়েছিল। প্রকৃত পক্ষে খাঁদাগুণ্ডা ছিল এইরূপ এক সাংঘাতিক ব্যক্তি। এইবার আমার আর কোনও সন্দেহ রইলো না যে, এই খোকা ও খাঁদা একই ব্যক্তি এবং তারা দুজনে কখনই বিভিন্ন ব্যক্তি হতে পারে না।

এরপর আমরা আব দেবী না করে লালবাড়ার পুলিশ হেডকোয়ার্টারস্ থেকে এফসল সশস্ত্র বাহিনী আনিয়াে নিলাম। তারপর দুইখানি লগীতে দুইদিক থেকে অভিযান চালিয়ে অন্তর্কিতে ঐ বাড়ীটি আমরা ঘেরায়া করে ফেলে উহার মধ্যে আমরা ঘুরিত গতিতে চুকে পড়লাম। এই বাড়ীটি ১০ নম্বর কুপানথ লেনের একটি বস্তির সম্মুখভাগে অবস্থিত ছিল। স্থানীয় লোকদের কেউ কেউ চুপি চুপি আমাদের জানিয়ে দিল যে ঐ বস্তির কোণের ঘরখানিতে ঐ খাঁদাগুণ্ডা নিজে থাকতো এবং তার পাশের ঘরখানিতে এখনও তার আত্মীয় স্বজনরা বসবাস করছে। এই মামলার হত্যাকারী আসামী খোকা বা খাঁদাকে সেখানে পাওয়া গেল না। কিন্তু আমাদের সন্দেহ হলো যে হয়তো ঐ ঘরের মাটির মেঝের পাগলার কাটা মুণ্ডটা পুঁতে রাখা হয়েছে। আমরা তৎক্ষণাৎ দাবল ও কোদাল এনে ঐখানকার মৃত্তিকা অপসারিত করতে শুরু করলাম। অবশ্য সেখানে বহু খোঁজাখুঁজি করেও কাটা-মুণ্ডের সন্ধান

পাওয়া গেল না। কিন্তু তার পরিবর্তে মাটির তলা হতে বার হয়ে আসতে লাগল রাশি রাশি হাও-মুক্তা ও জহরত অলঙ্কার এবং বাস্তবকী হাজার ও একশত টাকার কারেঙ্গি নোট। এইদিন ঐ স্থান হতে অলঙ্কার ও নগদ টাকায় প্রায় ৭০ হাজার টাকার অপহৃত সম্পত্তি আমরা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছিলাম। শুধু তাই নয় ঐ ঘরের একটি কোণ হতে একটি রক্তরঞ্জিত ধুতি, একটি রক্তরঞ্জিত অন্তর্বাস, দুইটি রক্তরঞ্জিত পাঞ্জাবী এবং অজ্ঞাত কয়েকটি কাপড় চোপড় আমরা উদ্ধার করতে সক্ষম হলাম। এইগুলি ঘরের ঐ কোণে একত্রে জড় করে রাখা হয়েছিল। ঐ সকল পরিধেয় বস্তাদি পরীক্ষা করে আমরা দেখতে পেলাম যে উদ্ধার প্রাতিটি কোণে কোণে একটি ইংরাজী 'S' অক্ষর স্মৃতির দ্বারা উৎকীর্ণ করা হয়েছে। এই বাড়ীর অপরাপর ঘরে দ্বারা বাস করে তারা সকলেই ছিল গৃহস্থবেশী বেঙ্গা নারী। এরা সাধারণতঃ দিনের বেলা ঝি'গিরি করে এবং রাত্রে তারা করে পেশা। এদের মধ্যে দুই একজন আবার সাধারণ বেঙ্গা নারীর পন্থায়ে নেমে এসেছিল। আমি এদের সকলকেই একে একে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানলাম যে খোকাবাবুর পিতা ও খুন্নতাত নামে পরিচিত দুই ব্যক্তি সাধারণতঃ খোকাবাবু কর্তৃক ভাড়া করা এই ঘর দুইটিতে বসবাস করে। এরা খোকাবাবুর আসল বা নকল আত্মীয় কিনা তা তারা বলতে পারে না। তবে তাদের মতে এরা খোকাবাবুর নকল বা পাতানা আত্মীয় মাত্র। প্রথমে এরা খুন সম্পর্কে কোনও বিবৃতি দিতে চায় নি। খোকাবাবু সংক্ষেপে তাদের জিজ্ঞাসা করা মাত্র তারা আতঙ্কে কঁপে উঠছিল। আমাদের গীড়াগীড়িতে এদের কেউ কেউ ভয়ে কঁদেও ফেললে। ইতিমধ্যে খবর পেয়ে ইনসপেক্টর সুনীল রায়ও সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। আমাকে এই সকল রূপজাবিনীদের নিকট হতে প্রয়োজনীয় বিবৃতি আদায়ের ব্যাপারে বার্ষ মনোরথ হতে দেখে তিনি আমাকে বললেন, এরা এখন যা বলে তা শুনে যাও মাত্র। প্রথম দিনে এরা কোনও দিনই সত্য কথা বলবে। সাধারণতঃ বেঙ্গা নারীদের সত্যভাবের নিয়মই হচ্ছে এই। সুনীল বাবু এদের মধ্যে থেকে বেছে বেছে একটি যুবতী নারী এবং একটি তিলক পরা বুড়াকে বার করে এনে আমাকে বললেন, এখান এদের পৃথক পৃথক ভাবে অর্থাৎ একের অবর্তমান অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করো। ফলে যেও না যে বিভিন্ন বয়সের মানুষ বিভিন্ন ধরণের মিথ্যা কথা বলে। এই জ্ঞত পৃথক পৃথক ভাবে জিজ্ঞাসা করলে তুমি বুঝতে পারবে যে এদের কে কতটুকু মিথ্যা বললে। মিষ্টি কথায় তুলিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জ্ঞত তুমি এখন এদের ঐ পাশের ঘরে নিয়ে যাও। ততক্ষণ আমি মেঝেটা আরও একটু খুঁড়ে দেখি। খোকাবাবুর ঘরের মেঝের তলা থেকে

এতো সোনা-দানা বেরিয়েছিল যে একজন দারিদ্রপূর্ণ অফিসারের সেখানে উপস্থিতি একান্ত রূপে প্রয়োজন ছিল, তা না হলে স্বপক্ষীয় এবং বিপক্ষীয় ব্যক্তিদের দ্বারা কয়েকটি দ্রব্য লুণ্ঠ পাটি হুগুয়াও অসম্ভব ছিল না। এই জগৎ ইনেসপেক্টার সুনীল রায়ের উপদেশ শিরোধার্য করে বেষ্ঠা নাগী দুইটিকে পৃথক পৃথক ভাবে তাদের নিজ নিজ ঘরে নিয়ে তাদের বহুবার অভয় দিলাম এবং একথাও তাদের বললাম যে তারা যা বলবে তা কাউকেই জানানো হবে না। এইভাবে বহু সাধা সাধনার পর তারা স্বীকার করলো যে তারা খাঁদা বাবুকে একজন খুনে গুণ্ডা বলেই জানে। তবে থোকা নামে কোনও খুনে বা গুণ্ডাকে তারা চেনে না। তা ছাড়া থোকা ও খাঁদা এক ব্যক্তি কিনা তাও তাদের জানা নেই। খাঁদা বাবু প্রায়ই আড্ডাকাল তার এই বাড়ীতে আসেন কিন্তু রাত্রিবাস তিনি কদাচ এখানে করে থাকেন। এটাদন ৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯৩৬ আন্দাজ ১২-৩০ মিঃ ঘটিকায় আমাদের কেউ কেউ দরজার গলির মুখে খন্দেবের আশায় দাঁড়িয়েছিলাম। এমন সময় হঠাৎ খাঁদা বাবু বাড়ীর ভিতর ঢুকতে ঢুকতে চোঁচিয়ে উঠলেন এই ভাগ যা সব যে ঘর ঘরে! যতক্ষণ আমি এখানে থাকবো ততক্ষণ কেউ কক্ষনো বেরুবি না। খবরদার! দেখছিল তো এই ছুরি। এই বলে হাতের আস্ত্রিন থেকে একটা ছুরি বার করে তিনি আমাদের দেখিয়ে দিলেন।—এর পর ভয়ে যে ঘর ঘরে চলে এসে আমবা দরজা বন্ধ করেছিলাম। প্রায় এক ঘণ্টা পরে কাউর সাড়া না পেয়ে আমরা মনে করেছিলাম খাঁদাবাবু চলে গিয়েছে। তাই আমরা কেউ কেউ সাচস করে বাইরে এসে দেখি খাঁদা বাবুর বাবা চৌবাক্স থেকে বাঙ্গতি করে জল তুলে কতকগুলো কাপড় চোপড় কাচ্ছে। উঠানের উপর এই সময় জোছনার তীব্র আলো এসে পড়েছিল। এই আলোতে আমরা দেখলাম যে বাঙ্গতির জল টকটকে লাল। এই সময় খাঁদাবাবু হঠাৎ তার ঘর হতে বার হয়ে এসে ধমকে উঠলো, ফের বের হয়ে এস'ছিল। যা যা যে ঘর ঘরে। আমরা খাঁদা বাবুকে সকলে ঘরের মতই ভয় করে থাকি। তাই 'বাচ্ছি বাচ্ছি' বলে আমরা আপন আপন ঘরে এসে ভয়ে অর্গল বন্ধ করে দিয়ে যে ঘর বিছানায় শুয়ে পড়েছিলাম। এই কয়টি বিষয় ছাড়া এই থোকা বা খাঁদাবাবুর কার্যকরণ সম্বন্ধে আমরা আর কিছুই বলতে পারবো না। তবে একথা আমরা সকলেই জানি যে খাঁদাবাবুর ব্যবহৃত প্রতিটি পরিচ্ছদে ইংরাজী 'S' অক্ষরটি তারই ইচ্ছা মত লিখে রাখা হতো। আমরাও মধ্যে মধ্যে অমুরুদ্ধ হয়ে ঐ 'S' অক্ষরটি তার কাপড় জামার কোণে কোণে স্মৃতির সাহায্যে তুলে দিয়েছি। এই 'S' অক্ষরটি খাঁদাবাবুর নিকট একটি বিশেষ সখের বস্তু ছিল।

এই সময় আমরা খোঁজাখুঁজি করে খাঁদার পাতানো পিতার নিকট হতে ধোপার হিসাব সহ একটি নোটবুকও উদ্ধার করতে সমর্থ হই। ঐ নোটবুকের লেখা হতে প্রমাণিত হয় যে কতকগুলি কাপড়-চোপড় এই সেপ্টেম্বর ১৯৫৭ তারিখে ধোপার বাড়ী পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই ধোপাটির নাম ঠিকানাও ঐ নোটবুকে লিখে রাখা ছিল।

এর পর আমি অন্ত্যস্ত অফিসারদের খাঁদার পিতার বাটীতে তদন্তরত বেখে ঐ নোটবুকটি সহ মণিকতলা স্ট্রীটে তাদের ধোপা

রা মা ঝা

কৃতিবাস বিবৃতি

ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা সম্বলিত এবং সাহিত্যদ্রষ্ট্র গ্রীহরেক্ষক মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত বাঙলার এই অতিপ্রিয় গ্রন্থখানি মুদ্রণ পারিপাট্যে একটি যুগপ্রবর্তক। ভারত সরকার কর্তৃক পুরস্কৃত। ৬টি বছর ও ১৫টি একবর্ষ চিত্রসম্ভারে সমৃদ্ধ। [৯]

জী ব নে র

বা রা পা তা

রবীন্দ্রনাথের ভাগিনেয়ী সরলা দেবীচৌধুরাণীর জীবনালেখ্য। গত শতকের শেষার্ধের নবজাগরণ যুগের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ঘরোয়া ছবি অতি সরল ভঙ্গীতে এই বইয়ে পরিবেশিত হয়েছে। ভারত সরকার কর্তৃক পুরস্কৃত। [৪]

ম হা ন গ রী র

উ পা থ্যা ন

শ্রীকরণাকণা গুপ্তা রচিত অভিনব উপন্যাস। পটভূমিকা—কৈবর্ত্য বিদ্রোহে বাঙলা দেশের গণঅস্থ্যথান; চরিত্র সৃষ্টিতে—চিরায়ত সাহিত্যের যে কোন চরিত্রের মত রসমাধুর্যে সমৃদ্ধ। [২১০]

সাহিত্য সংসদ

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড :: কলিকাতা-৯

॥ অমৃত্য পুস্তকালয়েও পাইবেন ॥

মাথুরামের ভাটখানায় এসে উপস্থিত হলাম। সৌভাগ্যক্রমে ওদের সেই ধোপাটি সেইখানে উপস্থিত ছিল। এতদ্ব্যতীত সে তখনও পর্যন্ত খাঁদার ঐ সকল কাপড়-চোপড় কাচাকাটি করতে আরম্ভ করেনি। আমরা ঐ নোটবকের লেখানুযায়ী প্রতিটি বস্ত্র উদ্ধার করে দেখি যে তাদের প্রতিটিতেই এক একটি 'S' অক্ষর স্মৃতির সাহায্যে তোলা হয়েছে তো বটেই, অধিকন্তু ঐ সকল বস্ত্র ও সাটের স্থানে স্থানে তখনও পর্যন্ত শুক রক্তের প্রলেপ দেখা যাচ্ছে। আমি তৎক্ষণাৎ দুই জন স্থানীয় সাক্ষীর সমক্ষে ঐ সকল পরিষেয় পরিচ্ছদ সমূহ উহাদের যথাযথ বিবরণ সহ তালিকাভুক্ত করে আপন হোপান্তে গ্রহণ করে নিই। এই সকল কাপড়ে রক্তের দাগগুলি মনুষ্য রক্ত বলে সরকারী রক্তপরীক্ষক অভিমত প্রকাশ করলে উল্লেখ্য যে আসামীদের বিরুদ্ধে এক আকাক্ষিক প্রমাণ রূপে বিবেচিত হবে তাতে আমাদের কোনও সন্দেহ ছিল না। তবে কয়েকটি বস্ত্রমাখা কাপড়-চোপড় ধোপার বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে অপর কয়েকটি বস্ত্র মাখা কাপড়-চোপড় ঘরে মজুত রাখার অর্থ আমরা বুঝতে পারলাম না। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি উৎফুল্ল হয়ে খাঁদার পিতার বাটিতে ফিরে এসে দেখ ইনসপেকটর রায় বহুলোককে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর ঐ পল্লী হতে দেবেনবাবু নামে একটি নির্ভরযোগ্য সাক্ষীকে খুঁজে বার করেছেন। আমি তাকে কিছুকণ জিজ্ঞাসাবাদ করার পর সোল্লাসে তাঁর বিবৃতিটুকু লিপিবদ্ধ করতে সক্ষম করে দিলাম। তাঁর মহামূল্যবান বিবৃতির উল্লেখযোগ্য অংশটি নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হলো।

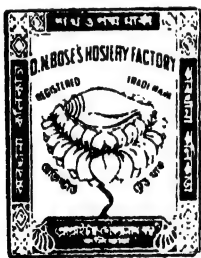
১৯৩৬ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর মাসে ১৫-৩০ মিনিটে ১০ কুপানাথ লেনে খাঁদাবাবুর বাটির রোয়াকে বসে আমি বায়ু সেবন করছিলাম। এমন সময় আমি খাঁদাকে নয় পদে একটি সাদা ধুতি ও একটি নীল রঙের সাট পরা অবস্থায় সেখানে উপস্থিত হতে দেখি। খাঁদা বাবুর পিছন পিছন তার বন্ধু কেট বাবুকেও আমি আসতে দেখেছিলাম। আমার বেশ মনে পড়ে যে আমি খাঁদার ধুতি ও সাটের উপর রক্তের দাগ দেখে চমকে উঠেছিলাম। আমার ভীত হয়ে উঠার অপর কারণ হচ্ছে এই যে এই সময় খাঁদা একটি উমুক্ত ছুরিকার ব্লেড তার সাটের হাতলের মধ্যে সঁদিয়ে দিয়ে তার সাদা বাটের হাণ্ডেলটি সে তার হাতের মুঠির মধ্যে ধরে রেখেছিল।

খাঁদা কোনও দিকে দৃকপাত না করে ঘুরিত গতিতে তার পিতার ঐ বাটিটির মধ্যে প্রবেশ করলো। কিন্তু কেটোবাবু খাঁদাকে অনুসরণ না করে আমাকে বোধ হয় আগলবার জন্তই সেখানে দাঁড়িয়ে রইলো। আমি ভয়ে এমন অস্তিত্ব হয়ে পড়েছিলাম যে উপান শক্তি পর্যন্ত আমার রহিত হয়ে গিয়েছিল। প্রায় এক ঘণ্টা পরে খাঁদা বাবু তার বাটি হতে বার হয়ে এলো। তাকে দেখে আমি বেশ বুঝতে পারলাম যে সে ভালো করে চান করেছে। এই সময় খাঁদা নীল সাটের পরিবর্তে একটি ক্রাম রঙের সাট পরে ফেলেছিল। এ ছাড়া সে সারা দেহে প্রচুর স্বেদ স্রাব সেটো মেখে নিয়েছে। আমাকে তখনও পর্যন্ত সেখানে বসে থাকতে দেখে খাঁদা পকেট থেকে একটা রিভলবার বার করে তা আমাকে দেখিয়ে ইসারায় আমার চুপ করে থাকতে উপদেশ দিল। তারপর সে নিকিষে শিশু দিতে দিতে কেটোর সঙ্গে পুনরায় শোভাযাত্রার ট্রাটের দিকে চলে গেল।

এই সাক্ষী দেবেনবাবুর বিবৃতি যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল তাতে আমরা সকলেই একমত হয়েছিলাম। কিন্তু এক্ষণে এই দেবেনবাবুর সহিত খোকাবাবুর পূর্বে পরিচয় সত্ত্বেও কিছুটা তদন্ত করারও আমরা প্রয়োজন মনে করলাম। এই সম্পর্কে দেবেনবাবুকে আমরা বিশেষ রূপে জিজ্ঞাসাবাদও করেছিলাম। নিম্নে উল্লিখিত প্রশ্নোত্তর সমূহ এই সম্পর্কে বিশেষরূপে প্রণিধানযোগ্য।

প্রঃ—আপনার সহিত খাঁদাবাবুর পরিচয় কতদিনের? আশা করি আপনি ওদের একজন দলের লোক নন। এইরূপ একটি দৃষ্ট দেখার পরও আপনি খানায় থবর দেননি কেন? ঐদিনকার ঐ নৃশংস খুনের সংবাদটি নিশ্চয় আপনার অগোচর ছিল না।

উঃ—আজ্ঞে, সে আমার বাল্যবন্ধু। আমি, খোকা, কেটো ও হরিপদ এককালে স্থানীয় ওরিয়েন্টাল সেমিনারীতে পড়াশুনা করতাম। তবে নীচের ক্লাস হতেই আমরা একে একে ঐ স্থল ত্যাগ করে আসি। আমাদের মধ্যে আমি এবং হরিপদ এই পাড়াতেই বাস করি। আমরা ব্যবসা বাণিজ্য করে ব ব জীবিকা অর্জন করে থাকি। আমাদের পূর্বতন বন্ধু খোকা ও কেটোর কথা আর জিজ্ঞেস করে লাভ কি? আজকাল আমরা ওদের সঙ্গ বিশেষ রূপে এড়িয়ে চলে থাকি। পাড়ার আর পাঁচজনের মত আমরা ওদের ভয় করেও চলি। এই



রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক

বিখ্যাত
'শঙ্খ ও গদা'

মার্কী গেঞ্জী
ব্যবহার করুন

ডি, এন, বসুর

হোসিয়ারি ফ্যাক্টরী

কলিকাতা-৭

—রিয়েল ডিপো—

হোসিয়ারি হাউস

৫৫১, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

ফোন : ৩৪-২৯১৫

কারণেই আমরা কেউই ওদের সব্বন্ধে কোনও সংবাদ থানায় পৌঁছিয়ে দিতে সাহসী ছইনি। ঐ দিনকার খুন্টা যে খাঁদাবাবুটাই করেছিল তা সত্ত্বেই আমরা অমুমান করে নিতে পেরেছিলাম।—আজ্ঞে, ঐ সব্বন্ধে কোনও খবর আপনাদের দিল ঐ নিহত বাক্সিন জায় আমবাও একে একে মুণ্ডচুতে হয়ে যেতাম। ঐ উল্টেই সব বুঝে বা জেনেও আমরা চুপ করে থাকাই শ্রেয়ঃ মনে করেছিলাম।

একশ্রেণে ঐটো সেনেন, মলিনা এবং অস্থির নিবৃত্তি তিনটি তাদের প্রকৃত বিবিধ সময়কালির পটভূমিতে বিবেচনা করে আসতে নিশ্চিত রূপে বুঝতে পারলাম যে ঐ দিন সন্ধ্যা আট বা সাড়ে আট ঘটিকায় খোকা ওরফে খাঁদা তার সাক্ষরদের সাহায্যে পাগলা ওরফে প্রতুলকে পাকড়াও করে ঐ মেথর গলিতে নিয়ে এসে সন্ধ্যা নয় ঘটিকা আশ্রয় সময়ে তাকে ছুরিকাঘাত করে ফেলে রেখে যায়। এরপর নিকটের কোনও এক নিহত বা নিহাতা বাড়ীতে বা ঐরূপ কোনও এক সুবিধা জনক স্থানে কিংবা পোকাবই কুপানার্থ সেনেন বাড়ীতে অলক্ষ্যে এসে তাবা একস্থানে তাদের বন্ধুবন্ধিত পরিচ্ছদ পরিবর্তন করে তাবা রপজীবিনী উবারাণীর গৃহে এসে মলিনাসুন্দরীর সতিত সাক্ষাৎ করে। তবে ঐ রাতে উবার কক্ষে তাবা অসিকল্পন সমর অসিনাতিত করেনি। স্বরক্ষণ পরে তাবা পুনরায় বর্তিগত হয়ে ঐ মেথর গলিতে ফির এসে পাগলার মুণ্ডটা কেটে নিয়েছে। এরপর তাবা ঐ মুণ্ডটা নিকটে কোনও এক স্থান নিক্ষেপ করে খোকা ও কোটো আবার পোকার কুপানার্থ সেনেন বাড়ীতে এসে উপস্থিত হয়। সন্ততঃ পোকা পাগলার দেহ হতে তার মুণ্ডকর্তন কার্যে একটি লিপ্ত হয়েছিল। ঐটো মাত্র তারই পরিচ্ছদ ঐ সময় বন্ধুবন্ধিত হয়ে উঠে। ঐটো মাত্র ঐ সময় একমাত্র তারই পুনরায় পরিচ্ছদ পরিবর্তনের প্রয়োজন হইছিল। সন্ততঃ ঐটো মাত্র কেটাবাবু প্রথম অপাবেশনের সময় পরিচ্ছদ পরিবর্তনের প্রয়োজন হলেও ওই দ্বিতীয় অপাবেশনের সময় তাবা পোষাক পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়নি। বর্তদর বরা হায় যে খাঁদাকে ঐ রাতে ছটবার তার বন্ধুবন্ধিত পরিচ্ছদ পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়েছিল; প্রথমবার যখন সে পাগলাকে বন্ধুর সাহায্যে পূর্ণাঙ্গ করে তাকে ছুরিকাঘাত করে এবং দ্বিতীয়বার যখন তাকে তার মুণ্ডকর্তন কার্যে লিপ্ত হতে হয়। মুণ্ডকর্তন রূপ দ্বিতীয় অপাবেশনের সময় কেটাবাবু গায়ে বন্ধ না লাগায় তাকে এইবার পোষাক পরিবর্তনের জন্য খোকার বাড়ীর ভিতর ঢুকতে হয়নি। প্রকৃতপক্ষে মলিনা ও সেনেন—ঐ উভয় সাক্ষীর বিবৃতিদ্বয় সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে পারিপার্শ্বিক ঘটনার সহিত একত্রে গ্রহণ করলে বুঝা যাবে যে খোকা কে ঐ রাতে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে দুইবার পোষাক পরিবর্তন করেছে। বস্ততঃপক্ষে খোকার রক্ষিতা মলিনাসুন্দরী তার দ্বিতীয় খোকাবাবুকে নীল রঙের সাট পরে উবার বাড়ীতে ফিরে আসতে দেখেছে এবং সেনেন তাকে নীল সাট ছেড়ে ক্রীম রঙের সাট পরে তার বাড়ী থেকে তাকে বেরুতে দেখেছে।

ঐই খুন সব্বন্ধে উপরের ঐই খিওরীটি আশাতদৃষ্টিতে সত্য বলে মনে হলেও উহাতে সন্দেহ করারও যথেষ্ট কারণ ছিল। সাক্ষী মলিনাসুন্দরীর বিবৃতি হতে আমরা জেনেছি যে, সে উবার কক্ষে খোকার নীল সাটের উপর লাল বস্ত্রের দাগ দেখেছিল। কিন্তু দুইটি

বিশেষ কারণে ঐ রাতে মলিনা খোকার সাটের উপর সত্যই রক্তের দাগ দেখেছিল কিম্বা তাতে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ হয়েছিল। প্রথমতঃ ঐ নীল সাটটি পরে খোকা পাগলাকে ছুরিকাঘাত করলে তার ঐ সাটের অনেকখানি স্থানে রক্তবর্ণিত হয়ে উঠতো। এর কারণ ছুরিকা দেহে প্রবেশ করলে সেখান হতে ফিনকী দিয়ে বক্ত বর্তিগত হওয়া স্বাভাবিক ছিল। অবশ্য যদি অসাবধানতা বশতঃ খোকার পোষাক পরিবর্তনের সময় তাবা ঐ নূতন নীল সাটের সতিত তার রক্তবর্ণিত পরিচ্ছদ সাটের সংযোগ হয়ে থাকে তাহলে সে কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু পরে আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি যে নীল কাপড়ের উপর ময়ূরারক্ত পড়লে উহা রাত্রিকালে কালো দেখায়। ঐ অবস্থায় ময়ূরারক্ত কখনও লোহিত বর্ণের রূপে প্রতীত হয়নি। অত্যাধিক পানের পিচ কোনও এক নীল বস্ত্রখণ্ডের উপর নিশ্চিত হলে উহা রাত্রিকালে টকটকে লালবর্ণের দেখা যাবে। ঐটো মাত্র আমাদের মনে হল যে খাঁদা যখন মলিনার প্রস্থের উত্তরে বলেছিল, যে উহা রক্ত নয় পানের পিচ তখন সে সত্য কথাই বলেছিল। খুঁড়ি সম্ভবতঃ খোকা ওরফে খাঁদাবাবু প্রথম অপাবেশনের পর পোষাক পরিবর্তন করে পান চিবুতে চিবুতে মলিনার সঙ্গে দেখা করবার জন্য উয়ারাণীর ঘরে এসেছিল। ঐরূপ ক্ষেত্রে মলিনার দেখা রক্তের দাগ পানের পিচের দাগ রূপে স্বীকার করে নিলে অবশ্য আমাদের পরিকল্পিত ঐই খিওরীটি সত্য রূপে প্রতীত হবে।

[ক্রমশঃ]



ফোন ৩৮-৩২৩৩
পি, প্রি, আড্য
 জুয়েলার
 ১২৫-বি, বহুবাজার ফ্রীট-কলিকাতা-১২



স্মৃতির টুকরো

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

সাধনা বসু

বিপুল সাড়া এল জনতার দল থেকেও, আর কেবলমাত্র সাড়া

দিয়েই তারা ক্ষান্ত থাকেনি—আমাদের প্রতি তাদের সহৃদয়

মনোভাবের পরিচয় দিতেও এতটুকু কাপণ্য তারা করেনি প্রকাশ।

এই সময়ে এদের প্রীতি, সমাদর, আপ্যায়নের মধ্যে দিয়েই আমার

জীবনে সবচেয়ে যা বড় লাভ হয়েছিল—যাকে আজও আমি অসীম-

সৌভাগ্যের নামাস্তর বলেই মনে করি এবং শুধু আজ কেন চিরকালই

করে যাব তা হচ্ছে সর্বোচ্চ নাইট্রু সঙ্গে সাক্ষাৎকার। জনগণের

প্রীতি, সমাদর, আপ্যায়ন আমার ভবিষ্যে তুলেছে অনেকগুণি, তাদের

সমাদর আমাকে ধনী করেছে আমাকে জুগেয়েছে উদ্দীপনা, আমার

সামনে দেখা দিয়েছে আমার শিল্পসাধনার গৌরবময় স্বাক্ষরের রূপ

নিষে কিছু সর্বোচ্চ নাইট্রু সান্নিধ্যভারের গুরুত্ব বা তাৎপর্য যে

অমূল্য, অসীম, অপূর্ব—আমার দৃঢ় বিশ্বাস এ বিষয়ে আমার সঙ্গে যিহুত

কেউ হবেন না। চারত্ৰাবাদে সর্বোচ্চ নাইট্রু ও তাঁর পরিজনবর্গ

যথেষ্ট উৎসাহ এবং সমাদরে এবং অনুপ্রেরণায় ভরিয়ে তুলেছিলেন

আমাদের। এই উপলক্ষ্যে, এই বচনার সুযোগ নিয়ে সশ্রদ্ধ প্রেরণা

উৎসর্গ করি ভারত জননীর মনস্বিনী তুতিতা, ভগবতের কবিকুলের

অঙ্গতম শ্রেষ্ঠ ভারতী এবং ভারতের প্রথম মহিলা রাজ্যপালিকা

(ভারত-রাজাদের মধ্যে এঁর পর এই আসন অলঙ্কৃত করার গৌরব

অর্জন করেছেন একমাত্র এঁরই কন্যা শ্রীমতী পদ্মজা নাইট্রু) স্বর্গীয়

কবি সর্বোচ্চ নাইট্রু অমর স্মৃতির উদ্দেশে।

স্বর্গীয় শ্রীর আকবর হায়দারীও আন্তরিক সমাদরে আমার ভবিষ্যে

তুলতে বিধা বোধ করেননি। শিল্পের প্রকৃত সমর্থনার লোক ছিলেন

শ্রীর আকবর হায়দারী। তাঁর শিল্পবৈদিক মনের পরিচয়ও পাওয়া যায়

তাঁর ক্লাবান শিল্প সংগ্রহশালা দেখে, এক বথায় যাকে বলা যায়

অপূর্ব। শ্রীর আকবর যে কত বড় শিল্পবোদ্ধা ছিলেন তা তাঁর

সংগ্রহশালাই প্রমাণ করল। আমাদের আগও যুক্ত করেছিল নবাব

সালারজাদেহ প্রাসাদ। শ্রীর আকবরের বাড়ীতে দেখেছি শিল্পের

অপূর্ব সংগ্রহশালা, নবাব সালারজাদেহ বাড়ীতে শিল্পসংগ্রহশালা তো

‘বাগুদর’ আখ্যাটি এখানে প্রযোজ্য না হলে ‘বিবিধ সংরক্ষণশালা’
কথাটি এ ক্ষেত্রে অনার্যাসে ব্যবহার করা যেতে পারে।) প্রচুর সংখ্যক
সুশ্রীতীন ছলভ বস্ত্র এবং বহু সিদ্ধ চিত্রের অনিপুণ সৃষ্টি সমূহ
সংরক্ষণ নবাবের সমগ্র প্রাসাদের মধ্যদা বহুলাংশে বুদ্ধি করেছিল এবং
সমাগত অতিথিবৃন্দকে করেছিল চিত্ততরণ। আমাদের বন্ধু
শ্রীজয়গোপাল পিল্লাইয়ের পরিজনবর্গের আন্তরিকতাও এ প্রসঙ্গে
ভোলবাব নয়।

বাক্সা লাবে—মঠীশুরে কি স্কন্ধ ভাবে দিনগুলো কেটেছে আমাদের
—বহুতর ভ্রমণ এবং প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী অলোকন এবং তদর্শন
যুক্ত চরন...সত্যি, ভ্রমণে যে অপার আনন্দের বস্ত্র...বারবার এই
কথাটিই মনে পড়ত।

তারপর মাস্তাক। মস্তদেশ। বিশাল ভারতের দক্ষিণপ্রান্ত।
পরিাপূর্বময় মহাপাক্সা এবং তাঁর পরিবাববর্গের কাছে পাওয়া গেল
প্রভূত আদর আপ্যায়ন। কৃতজ্ঞতায় পাশে আবদ্ধ করলেন শ্রীমতী
অম্ম স্বামীনাথনও। মাস্তাকের Y. M. C. A আমার জন্ম একটি
সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করেছিলেন, আমার মনে আছে সেখানে
শ্রীমতী কম্বুর স্তব্ধতার মধ্যে আমাদের নৃত্যানুষ্ঠান সম্পর্কে যথেষ্ট
প্রশংসা, উৎসাহ, সুগাতি এবং প্রশান্তিও ছিল।

মাস্তাক বাস করার সময় আমার জীবন সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য,
সবচেয়ে নিম্নগতক এবং সবচেয়ে অবিস্মরণীয় যে ঘটনা ঘটল তা
হল বাল্য সর্বস্বতীর সান্নিধ্যলাভ। শ্রীমতী বাল্য সর্বস্বতী—ভারত-
নাট্যমেব ইতিহাসে ধীর নাম চিরকালের ভক্তে ভড়িয়ে থাকবে।
ভারতবর্ষে নৃত্যশিল্পের প্রচুর উন্নতি সম্ভবপর হয়েছে ধীর কলাপে।
যে তিনদিন সেখানে আমাদের অনুষ্ঠান হয়েছিল সেই তিনদিনের
প্রতিটি দিনই তিনি এসে আমাদের উৎসাহ বর্ধন করে গেছেন
—আর কেড়ে নিয়ে গেছেন আমাদের সকলের সুগভীর শ্রদ্ধা।
আমরা উঠেচিলাম হোটেল কোনেনমারা (Hotel Connemara) :
সেই হোটলে এলেন বাল্য সর্বস্বতী আমাদের এবং আমাদের সম্প্রদায়ের
প্রতিটি শিল্পীকে অভিনন্দন জানাতে, বোকা গেল, আমাদের
নৃত্যানুষ্ঠান শ্রেষ্ঠ শিল্পীকেও আনন্দ দেবার মত নেতৃত্ব অনুপযুক্ত হয়ে
গঠে নি। শ্রেষ্ঠ শিল্পীর চোখে আমাদের অনুষ্ঠান অপারাজয়ের রূপ
নিয়ে দেখা দেয় নি—মাথা পেতে গ্রহণ করলুম শিল্পীর সরসহ
আবীর্ষাদ। আনন্দ তখন হৃদয় উপচে পড়ছে। সান্নিধ্য আনন্দ
আমাদের জানিয়ে গেলেন তাঁর বাসভবনে। আমাদের পরিভূক্ত
দেওয়াও ভক্ত্যে নিজেই নাচ দেখাফেন। ইয়া, সেদিন নিজে নেচেছিলেন
বাল্য সর্বস্বতী আর সেই নাচের স্মৃতি কোনওদিন মুছবে না আমার
মন থেকে, সে যুগ আমায় জীবনে কখনও ভুলতে পাবব না সেই যুগ
যেন এখনও আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে, পারিপার্শ্বিক
আবেষ্টনাকে তুলিয়ে দেয় সয়কালীন ঘটনারও অনেক কিছু হয়তো যা
ক্ষণকালের ভক্ত্যে সরে যাব মন থেকে, আপন আন্তিকও এক এক
সময়ে জাবিরে যায়—চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেই যুগ। সেই
যুগ, সেই ভাল, সেই ভক্ত্যমা, সেই কুশলতা, সেই মাধুর্য। চার
ঘণ্টা নেচেছিলেন বাল্য সর্বস্বতী। ভাগ্যে পারেন? একনাগাড়ে
নেচেছিলেন—কোন বিরাম, কোন বিরতি বা কোন ছেদ ছিল
না সেই নাচে। তাঁর এই বাগুদরী প্রতিভা তুলিয়ে দিয়েছিল
আমাদের স্থান-কাল-পাত্র। কেড়ে নিয়েছিল মুখের ভাবা-বিশ্বয়ে



সাদনা বসু

হতবাক। তিনি কি শুধুই শিল্পী? না—শুধু শিল্পী তিনি নন—তিনি নিজেই একজন জীবন্ত বিশ্বয়। জীবন্ত আশ্চর্যের তিনি একজন জীবন্ত প্রত্যাক।

মধুমাণ্ডত অভিজ্ঞতা আর অকুরন্ত সৃষ্টিশক্তি সম্বল করে কলকাতায় ফিরে এলুম। দক্ষিণ-ভারত ভ্রমণ হল সমাপ্ত। কলকাতার কর্মজীবনের তরঙ্গে আবার নিজেকে ভাসিয়ে দিলুম স্বভাবতই। 'মোনাক্স'র নায়করূপে নিউ থিয়েটার্সের ছবির কাজ আবার শুরু করলুম। মধুর পরিচালনায়। বাঙলা এবং হিন্দী দুটি ভাষায় তোলা হল মোনাক্স। আজকের দিনের প্রখ্যাতনাম প্রযোজক-পরিচালক জীবমল রায় ছিলেন এর চিত্রকর। চিত্রকর হিসেবে তাঁর অসাধারণ নিপুণতা সর্বজনবিদিত। প্রধান প্রধান চরিত্রগুলিতে অবতীর্ণ হলেন নটশেখর ব্রজেনচন্দ্র মিত্র, নটশূর জীমতীন্দ্র চৌধুরী, জীকৃষ্ণচন্দ্র দে, জীপ্রীতি মজুমদার, জীমতী দেববালা এবং জীমতী সন্ধ্যাবাণী প্রভৃতি। সুরযোজনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন জীপঙ্কজ মল্লিক। আগেই বলেছি নায়িকার চরিত্রে রূপ দেওয়ার ভার পড়েছিল আমার উপর। নায়িকা চরিত্রটি একটি নাটকীয় চরিত্র, একটি অন্ধ মেয়ের ভূমিকা। ছবির হিন্দী সংস্করণে নায়কের ভূমিকায় দেখা দিয়েছিলেন নাজমুল হোসেন। বোধে টাকাজ থেকে দেবিকারাবীর সঙ্গে অভিনয় করার পর থেকে ইনি রুখেই প্রসিদ্ধি অর্জন করতে সমর্থ হন। ছবির বাঙলা সংস্করণে নায়কের ভূমিকার অভিনয় করেছিলেন বাঙলার তৎকালীন চিত্রজগতের

অন্ততম প্রধান সুদর্শন অভিনেতা স্বর্গীয় জ্যোতিপ্রকাশ, 'রাজনর্তকী' ছবিতেও আমার সঙ্গে নায়কের ভূমিকায় বীর অভিনয় দর্শকসাধারণ দেখেছেন।

এইবার এখনকার একটি কথা বলি। মাঝে মাঝে বখন "বিরস দিন, বিরল কাজ" অবস্থায় একা বসে থাকি "অসংখ্য চিত্রকে সম্বী করে তখন এক-এক সময়ে আমার মনে হয়, আমি ভাবতে চেষ্টা করি ঐ অসংখ্য চিত্রাংশিব মধ্যে থেকে একটি চিত্রটি আমার মন অধিকার করে সব চেয়ে বেশী। খ্যাতি, যশ, যৌবন, ঔজ্জ্বল্য স্বকীয়তা ঈশ্বরের করুণায় আমি তো অফুরন্ত পেয়েছি—তাঁর অসীম অনুগ্রহে আমি তো পূর্ণ হয়ে উঠেছি প্রাপ্তির পরম প্রাচুর্যে। তাঁর কৃপাবৃষ্টি করুণাধারার মত করে পড়ে ধরা করেছে আমাকে। কিন্তু সে সম্বন্ধে কোন সচেতনতা জাগে নি আমার মধ্যে। তাঁর কারণ আমার মতে আমাকে এক "এরিয়েল"এর সঙ্গেই তুলনা করা চলে। গুঁড় গভীর রহস্যতত্ত্বের স্বপ্নজগতের চিরস্থায়ী বাসিন্দার মত, মন যেন সতত নভোচাবী, ভাবাশ্রয়ী, কল্পনাবাদী—অসীমের সূত্রসন্ধান ব্যাকুল, তৎপর, উগ্ৰুখ এবং স্বভাবতই সেই জন্মেই জাগতিক পরিবেশ প্রলুব্ধ করতে পারে নি আমার চেতনাকে, আমার অনুভূতিকে, আমার সত্তাকে। এখন প্রশ্ন জাগতে পারে যে এখানে আমি ভ্রান্ত কি অভ্রান্ত—তারও উত্তর আছে। ভ্রান্তই হই কি অভ্রান্তই হই, ষাই হই না কেন—তা নিয়ে আমার ভাবায়ই বা কি আছে? কেন না এখনও পর্যন্ত আমি নিজের তার বিচারিকা নই।

[ক্রমশঃ।

অমুবাদ—কল্যাণাঙ্ক বন্দ্যোপাধ্যায়

ইন্দ্রনাথ, শ্রীকান্ত ও অন্নদাদি

শরৎচন্দ্রের কাহিনী বাঙলার চিত্রজগতকে যে কতখানি গৌরবান্বিত করেছে তার তুলনা নেই। বাঙলার চিত্রলোকের ইতিহাস-সৃষ্টির ক্ষেত্রে শরৎ-কাহিনীর অবদান অতুলনীয়। বাঙলার অন্ততমা শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী জীমতী কানন দেবীও প্রথম জীবনে শরৎচন্দ্রের একাধিক কাহিনীর চলচ্চিত্রায়ণে, অভিনয়ে অংশগ্রহণ করে এবং পরবর্তীকালে নিজেই একাধিক শরৎ-কাহিনীকে চিত্ররূপ দিয়ে রুখেই সুনাম ও প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন এবং শরৎচন্দ্রের বিভিন্ন কাহিনীর চিত্ররূপ দেওয়ার শুরু দশকের অকুণ্ঠ সাধুবাদের অধিকারিনী হয়েছেন। চিত্রজগতে তাঁর সাম্প্রতিক অবদান "ইন্দ্রনাথ, শ্রীকান্ত ও অন্নদাদি।" শ্রীকান্তের প্রথম পার্শ্বের প্রথমার্ধকে অবলম্বন করে এই ছবিটির রূপ দেওয়া হয়েছে। আমরা যুক্তকণ্ঠ স্বীকার করছি যে এ ধরণের সর্বাঙ্গসুন্দর বাঙলা ছবি অনেক দিনের ব্যবধানে কঠিন কখনো আত্মপ্রকাশ করে। সকল দিক দিয়ে ছবিটি জটিল। পিসিমার বাড়ীতে বালক শ্রীকান্ত সময় অতিবাহিত করছে, তারপর ইন্দ্রনাথের সঙ্গে তার যোগাযোগ, তার সঙ্গে ডিল্লীতে নৈশবিহার, মাহ চুরি, রীতিমত গ্যাডভের্গারের মধ্যে দিয়ে তাদের মজা, নতুনদার আবির্ভাব, অন্নদাদির সঙ্গে যোগাযোগ, শাহজীর পরিচয় লাভ, শাহজীর মৃত্যু, শ্রীকান্তকে চিঠি লিখে রেখে অন্নদাদির নিরুদ্ধেশ্বারী, চিঠির মধ্যে দিয়ে ঙ্গাশবাকে অন্নদাদির আত্মপরিচয় দিয়ে—এই ভাবে ছবিটির চিত্ররূপ দেওয়া হয়েছে, সব শেষে পিছন

থেকে দেখানো হচ্ছে 'শরৎচন্দ্র সেই অমর কাহিনী লিখে চলেছেন। ছবির পরিচালনা এত উচ্চাঙ্গের ভয়েছে বার কলে সাহিত্যগুরু রচনার রস কিছুমাত্র নষ্ট হয়নি, কাহিনীর মূল রস ছবিতে পূর্ণমাত্রায় বজায় আছে। শ্রীকান্তের এই অধ্যায়টিতে এমন কয়েকটি বর্ণনা বা বিবরণ আছে যাকে ছবিতে ফোটানো নিতান্ত দুঃস্থ, আনন্দের সঙ্গে পরিলক্ষ্যণীয় যে সেই সব বর্ণনা বা বিবরণীয় চিত্রায়ণে পরিচালক হরিদাস ভট্টাচার্য অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন।

ছবিটিকে এত নিখুঁতভাবে ফোটানো হয়েছে, যাতে মনে হয়েছে যে বইয়ের কাগজের পাতাকেই এত বড় আকারে দেখতে পাচ্ছি, কিশোরদের য্যাডভেঞ্চার বলতে বা বোকার, বাঙলা ছবিতে তো তার উপস্থিতি নেই বললেই চলে—কিন্তু ইন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্রীকান্তের ডিক্রীতে নৈশ অভয়ান এমন ভাবে দেখানো হয়েছে, যা রীতিমত শিকরণ বইয়ে নয় দর্শকমহলে। ছবিটি পরিচালনার ক্ষেত্রে পরিচালক যথেষ্ট সংযমের পরিচয় দিয়েছেন। ছবিতে গান একটুও জোড়েননি অথচ ইচ্ছে করলে বিভিন্ন পরিবেশে পাঁচ ছ'টি গান অনায়াসে জুড়তে পারতেন, বাঈজীকে তিনি আগাগোড়া শুভ্রায়ে রেখে এসেছেন, বিমলার সঙ্গে শাহজাদী যে সম্পর্ক, তা মাত্র দু'টি সংলাপের মধ্যে প্রকাশ করেছেন। এই বাঈজীপর্ব ও জালী-ভগিনীপতির প্রেমপর্ব নৃত্য-গীত সহযোগে ফেনিয়ে-কাঁপিয়ে সুবিস্তৃত হয়ে ছবির একটি বিরাট অংশ জুড়ে বসে। আভাস-ইঙ্গিতে, স্বল্প পরিসরে সমগ্র অধ্যায়টি দর্শকদের কাছে সম্পূর্ণরূপে বোধগম্য হয়ে উঠেছে, আভাস-ইঙ্গিতের মধ্যে দিয়েই আগাগোড়া অংশটি হৃদয়ঙ্গম করতে কিছুমাত্র বেগ পেতে হয় না দর্শকসাধারণকে। মূল গ্রন্থে আমরা জেনেছি যে, অন্নদা, দৈনিকে হত্যা করে শাহজাদী নিরুদ্দিষ্ট হন। ছবিতে সেই অন্নদার একটু পরিবর্তন করা হয়েছে, দৈনিকে রূপায়িত করা হয়েছে বোনে, একটু ভাবলেই বোঝা যাবে যে এই পরিবর্তনের পিছনেও যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান। মেজনার অধ্যায়টিকে আর একটু বড় করলে খুব অশোভন হতো কি? বড় করা মানে অতিরিক্ত সংলাপ দিয়ে নয়—শরৎচন্দ্রই তাঁর গ্রন্থে মেজনাকে আরও খানিকটা চিত্রিত করে গেছেন—সুতরাং তাঁরই বর্ণনামুসারে 'মেজনা চরিত্রটিকে আর একটু বড় করা যেতে পারত—যেমন দুর্দান্ত গীতের ভরা হৃদয়ে শ্রীকান্তদের যেতে হোত ছ' মাইল রাস্তা হেঁটে তাঁর তাস খেলার বন্ধুকে ডেকে আনার ক্ষেত্রে, দাক্ষণ শীতে কথল মুড়ি দিয়ে বসে মেজনা বই পড়তেন, শ্রীকান্তদের ঠায় হাজিরা দিতে হোত বইয়ের পাতা উন্টে দেবার ক্ষেত্রে।

সবচেয়ে প্রশংসনীয় নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখে গেলেন শ্রামল গুপ্ত। অতিরিক্ত সংলাপ রচনার দায়িত্বভার তাঁর উপর ভর্তু ছিল। তাঁর সংলাপ রচনা এত নিখুঁত হয়ে উঠেছে যে শরৎচন্দ্রের সংলাপের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর সংলাপও ব্যবহৃত হয়েছে—কিন্তু কোথাও তা যেমানি লাগে নি, কোন অংশে তা নিম্ন মানের হয় নি। এই অসাধারণ কৃতিত্বের জন্তে শ্রামল গুপ্ত নিশ্চয়ই বৃত্তবাহার। অভিনয়ক্ষেত্রে কোনও একজন শিল্পীর কথা বলা চলে না। প্রত্যেকটি শিল্পীর অভিনয় স্ব স্ব ভূমিকাভারী অপূর্ণ। প্রধান শিল্পীদের অভিনয় তো নিঃসন্দেহে চমৎকার পার্শ্ব শিল্পীরাও যথেষ্ট শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। ভূমিকালিপি এইভাবে হয়েছে—অন্নদা—কানন দেবী, শাহজাদী—বিকাশ রায়, গিসীমা—মলিনা দেবী, শিসেমশাই—গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দ্রনাথ—পার্শ্বপ্রতিভা, শ্রীকান্ত

—সজল ঘোষ, রায় সাহেব—বীরেশ্বর সেন, বিমলা—শেফালি দেবী, নতুনদা—অতুল ঘোষ, নবীন (বড়ল)—শৈলেন মুখোপাধ্যায়, সতীশ (মেজনা)—শীতল বন্দ্যোপাধ্যায়, জীনাথ—অজিত চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। থিয়েটারের মেম্বনাদের চরিত্রে বারেকের জন্তে অনেকদিন বাদে মোহন মুখোপাধ্যায়কে দেখা গেল। ছবির চিত্রকর ও সঙ্গীত পরিচালক হচ্ছেন যথাক্রমে জি, কে, মেহতা ও পবিত্র চট্টোপাধ্যায়।

সোনার হরিণ

অপরোধমূলক রহস্যকাহিনীর যথার্থ চলচ্চিত্রায়ণ দর্শকমহলে যে যথেষ্ট সমাদর পাবে, এ সম্বন্ধে অন্তরে নিশ্চয়তা পোষণ করার কোন বাধা নেই। কিন্তু সেই 'যথার্থ' চিত্রায়ণের জন্তে কুশলী হাতের স্পর্শ প্রয়োজন, অপটু হাতের কাজ নয়, এই ক'টি কথাই বার বার মনে পড়ছিল 'সোনার হরিণ' দেখতে দেখতে। ছবির নামকরণ ও ক্যামেরার কাজ ছাড়া ছবির আর কিছু উল্লেখযোগ্য, আকর্ষণীয়, চিত্তাকর্ষক বলে প্রাতিভাত হয় না। ছবিটিকে অযথা দীর্ঘ করা হয়েছে। সমগ্র ছবিতে গতির নিত্যন্ত অভাব। ছবির অধাংশ প্রদর্শিত হয়ে গেছে, তখনও মূলগল্পটি কি বা ছবিটি অপরোধমূলক না মনস্তত্ত্বমূলক না সাধারণ প্রমোদাখ্যান এই প্রশ্নই বিরাট রূপ নিয়ে দর্শকের সামনে দেখা দেয়। পরিচালক সবচেয়ে হাতুকের পরিচয় দিয়েছেন ঘরের জানলার পাশে হাতে-পাওয়া চাঁদের মত কুতূব-মীনার দেখিয়ে। দিল্লী দেখানো হচ্ছে, দর্শককে বোঝাতে হবে সে কথা, অতএব কুতূব-মীনার দিয়ে বুঝিয়ে দাও—হা-হতোহ্মি, শিল্পী যিনি চোখে দেখেছেন তিনিই জানেন মূল দিল্লী থেকে বহু দূরে কুতূব-মীনার এবং কুতূবের আশে-পাশে জনবসতি কোথায়? বহু দূর থেকে কুতূবকে দেখা যায় শূন্যপ্রান্তরে কে যেন ইট-চূণ-সুরকি দিয়ে বাঙলা ভাষায় 'চায় আনা'র গাণিতিক চিহ্ন এঁকে রেখে গেছে। একটা হোটলে খুনোখুনি চলছে। হত্যাকাণ্ড। অস্ত্রাস্ত্র বাসিন্দাদের কানে সে গুলির শব্দ পৌছয় না—অনেকক্ষণ বাদে দেখা যায় সিঁড়ির নীচে চারটি লোক কার্ঠের পুতুলের মত ঝাঁড়িয়ে আছে। একটা আকস্মিক হত্যাকাণ্ডের এই প্রতিক্রিয়া? যে বিমান নষ্ট করা নিয়ে এত কাণ্ড, এত রহস্য, এত খুনোখুনি সেই বিমান কেন নষ্ট করা হল? কি তার উদ্দেশ্য, সেই ব্যাপারে কার-কার যোগাযোগ ছিল, এই বিবরণগুলি তো আগাগোড়া ছবিতে অস্পষ্ট, এ সম্বন্ধে পরিচালকের নীরবতাই চোখে পড়ল, দর্শকমনে যে এই প্রশ্ন জাগতে পারে বোঝা গেল এ সম্বন্ধে পরিচালক মাথা ঘামাবার বিন্দুমাত্র প্রয়োজন অনুভব করেন নি। মঙ্গল চক্রবর্তী পরিচালিত এই ছবিতে প্রধান চরিত্রগুলিতে অবতীর্ণ হয়েছেন ছবি বিশ্বাস, উত্তমকুমার, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণকুমার, সুপ্রিয়া চৌধুরী, নমিতা সিন্হা, অস্ত্রাস্ত্র চরিত্রে রূপ দিয়েছেন বিগত দিনের বিখ্যাত চিত্রনাট্যক ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিন গুপ্ত, মিহির ভট্টাচার্য, বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, স্ববি বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বরূপকুমার, অশোক সরকার, জীমান তিলক, পদ্মা দেবী, কুন্তলা চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। ছবির কাহিনীকার রাসবিহারী লাল এবং সুরকার হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

বসুমতীর সাহায্যকল্পে রঙমহলের প্রচেষ্টা

বনজয় বৈরাগী সর্বজন-সমাদৃত নাটক 'এক মুঠো আকাপ' সর্গোববে অভিনীত হয়ে চলেছে রঙমহল রঙ্গমঞ্চে। নাটকটির শততম

অভিনয় রজনী অনেক আগেই অতিক্রান্ত হয়ে গেছে—কিন্তু তার উৎসবটি উদযাপিত হবে আগামী ১৬ই নভেম্বর। আমরা অবগত হলাম যে বর্তমান ঐ দিনের টিকিট বিক্রয়লব্ধ টিকিটের সমস্ত অর্থ বক্তৃতাগুলির প্রাণকেন্দ্র দান করবেন। বাংলাদেশের জনসাধারণ সুবিদিত আছে যে আজকাল এই জাতীয় বিশেষ অভিনয়সমূহ উপলক্ষে রক্তমণ্ডের কতৃপক্ষদের তরফ থেকে শিল্পীদের পুরস্কার দেওয়া হয়, উপরোক্ত কারণেই রক্তমণ্ডের শিল্পীগণও পুরস্কার না নিয়ে ঐ বারদ যে পরিমাণ টাকা নির্ধারিত সেই টাকা বক্তৃতাগুলির সাহায্যে ব্যয়িত হোক, এই ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। অসহায়, ভাগ্যবিড়ম্বিত সর্বহারা বক্তৃতাগুলির কল্যাণ কামনায় থিয়েটারের স্বত্বাধিকারিগণ এবং শিল্পীর দল এই উভয়পক্ষই যে দরদ, সহানুভূতি ও উদার মনোভাবের দৃষ্টান্ত রেখে গেলেন তা নিঃসন্দেহে সাধুবাদার্থ।

রক্তপট প্রসঙ্গে

শ্রদ্ধেয় প্রেমেন্দ্র মিত্রের রচনা “হাত বাঁড়ালেই বন্ধু” চলচ্চিত্রায়িত হচ্ছে সুকুমার দশগুপ্তের পরিচালনায়। স্বর দিচ্ছেন নচিকেতা ঘোষ। বিভিন্ন চরিত্রে রূপ দিচ্ছেন ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্তাল, উত্তমকুমার, তরুণকুমার, পদ্মা দেবী, সারিত্রী চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। * * * শক্তিমান পরিচালকদ্বয় শম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্রেয় চিত্রাঙ্গাদীদের দরবারে আগামী উপহার “ভবিষ্যৎ”। বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হইছেন ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্তাল, শম্ভু মিত্র, নির্মল চট্টোপাধ্যায়,

অমর গঙ্গোপাধ্যায়, ছায়া দেবী, তৃপ্তি মিত্র, বক্রণা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুপ্রিয়া চৌধুরী, মণিকা দেবী, কমলা মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি শিল্পিবৃন্দ। * * * একাধারে পরিচালক ও অভিনেতারূপে বিকাশ রায় আবার আত্মপ্রকাশ করবেন “রাজাসাজা” ছবিটির মাধ্যমে। এর সংলাপ রচনার ভার নিয়েছেন বিদায়ক ভট্টাচার্য। রূপায়ণে দেখা যাবে বিকাশ রায় উত্তমকুমার, গঙ্গাপদ বসু, তরুণকুমার, তান্ত্র রায়, চন্দ্রাবতী দেবী, সারিত্রী চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদি শিল্পীর দলকে। * * * “কুহক” ছবিটি পরিচালনা করছেন অগ্রদূতগোষ্ঠী। সুরারোপ করছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। এই ছবিটির মাধ্যমে আপনারা উত্তমকুমার, গঙ্গাপদ বসু, প্রেমাক্ত বসু, তরুণকুমার, গোপাল মজুমদার, তুলসী চক্রবর্তী, শ্রীমান দীপক এবং শ্রীমতী সারিত্রী চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ রূপদক্ষ শিল্পীদের অভিনয় দেখতে পাবেন। * * * দীর্ঘকাল পরে পঞ্চজ মল্লিকের সুরসমৃদ্ধ একটি ছবি বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করবে। ছবিটির নাম “নিমাই”। পিনাকীভূষণ পরিচালিত এই ছবিটির কাহিনীকার অনন্ত চট্টোপাধ্যায়। এই ছবিতে অভিনয় করছেন বঙ্গে যে সকল অভিনয়শিল্পীর নাম ঘোষিত হয়েছে তাঁদের মধ্যে ছবি বিশ্বাস, জহর গাঙ্গুলী, পাহাড়ী সান্তাল, বিশ্বজিৎ, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, তুলসী চক্রবর্তী, হরিধন মুখোপাধ্যায়, শ্রীমান বাবুয়া ও তিলক, মলিনা দেবী, পদ্মা দেবী, ভারতী দেবী, রেণুকা রায় এবং শ্রীমতী অনুবাণ গুহের নাম সর্বিশেষ উল্লেখনীয়।

গৃহপালিতের কথা

মহিমরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

হিমাঙ্গ শিখর তার পরিপূর্ণ বক্ষের উপমা
সুকুমার সূর্যকরে প্রথমা সে মুগ্ধ-মনোরমা
লক্ষ কেনচূড় দেহ—মনে মনে সমুদ্রকে সখা
মেনে সে সমুদ্রে গিয়ে তাকই ভরে হল পলাতকা ;

পাখির ঠোঁটের মত ব্যঙ্গবিক বাণুকার শর
তার পায়ে পায়ে ঘুরে ঢেকে দিল দিগন্ত প্রান্তর
নয়-লজ্জা বুকে নিয়ে সৈকতের বিজ্রপের হাতে
সে হয়ত ধরা দেবে সমুদ্রের পৌরুষ পোড়াত্তে ;

আমি তাই ভাবলাম, নির্বাপিতা, ঘর কত ভাল—
বাইরে দেয়ালে নিয়ে ত্রিসঙ্খ্যায় ইন্দ্রবজ্র আলো
সত্যার সমস্ত স্ক্রিন গ্রানি থাকে সন্নিগ্ধ তিতরে
আর সে মুহূর্তই সাধ্য দুর্ভাগ্যবতী বিপন্ন সাগরে ;

আবার বিপুল লজ্জা—সৈকতের শূন্য হলে তুণ
চেয়ে দেখি অধিকৃত ভয় সেই গজের নকণ !

সাময়িক প্রসঙ্গ

দিল্লীতে রাজ্যপালবর্গ

“দিল্লীতে রাজ্যপাল সম্মেলনে রাজ্যপালগণ নাকি এই অভিজ্ঞত প্রকাশ করিয়াছেন যে, আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য জনতার উপর গুলীচালনা বাহাতে এড়ান যায় তাহা বৈধ করা দরকার। অর্থাৎ যদি গুলী চালাইতেই হয় তবে তাহা যেন একেবারে শেষ অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা হয়। জনতার উপর গুলীচালনার ঐতিহ্য এদেশে ব্রিটিশ আমল হইতে চলিয়া আসিতেছে। দেশের স্বাধীনতাকামী জনসাধারণকে দাবাইয়া রাখার জন্য ব্রিটিশরা এই অস্ত্র দেশ শাসনের বাতাবিক উপায়ে পরিণত করিয়াছিলেন। স্বদেশী আমলে ঐ ঐতিহ্য অনেক আগেই পরিত্যক্ত হওয়া উচিত ছিল—কিন্তু তাহা হয় নাই! ফলে বহু লোককে নিজেদের গণতান্ত্রিক দাবী আদায়ের জন্য আন্দোলন করিতে গিয়াও প্রাণ দিতে হইয়াছে এবং শাসকশক্তি ও জনসাধারণের মধ্যে তিক্ততা ও বিভেদের প্রাচীর গড়িয়া উঠিয়াছে। এবার যদি সমস্তকে শাসকবর্গ নূতন দৃষ্টি লইয়া দেখিতে চান তাহা হইলে মন্দের ভাল বলিতে হইবে।”

—দৈনিক বসুমতী।

বাঙলার নদ-নদী

“পশ্চিমবঙ্গে বঙ্গার ফলে নদীর যে সব বাঁধ ভাঙিয়া গিয়াছে তাহা যেসময়ের জন্য ভারত সরকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে চলতি সরকারী বৎসরের হিসাবে ২০ লক্ষ টাকা দিতে রাজী হইয়াছেন। প্রকাশ যে, এক্ষণে ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের বরাদ্দ আছে। কিন্তু চলতি বৎসরে এত টাকা ব্যয় করিয়া উঠা সম্ভবপর হইবে না বলিয়া চলতি বৎসরের বাকী পাঁচ মাসের জন্য উপরোক্ত পরিমাণ টাকা বরাদ্দ হইয়াছে। বাঁধ ভাঙার জন্য বঙ্গার ফলে এই বৎসর পশ্চিমবঙ্গ যেরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে তাহাতে আগামী বৎসরে বাহাতে উহার পুনরাবৃত্তি না ঘটে তৎক্ষণাৎ আগামী বর্ষাঋতুর পূর্বেই সমস্ত ভাঙা বাঁধ মেরামত করার প্রয়োজন ছিল। কর্তৃপক্ষ আগামী পাঁচ মাসের মধ্যে এই কাজ সম্পূর্ণ করা কেন যে অসম্ভব মনে করিলেন তাহা আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি না। এই কাজে তেমন জটিল কোন কারিগরী ব্যবহার প্রয়োজন নাই। উহার জন্য দেশে শ্রমিকেরও কোন অভাব নাই। এরূপ অবস্থায় এই কাজ দুই-তিন বৎসর বিলম্বিত করিবার কোন হেতুই নাই। বাহা ইউক, কিছুমাত্র কাজ না হওয়া অপেক্ষা কিছু কাজ হওয়া মন্দের ভাল এবং সেই হিসাবে চলতি সরকারী বৎসরে এক্ষণে যে ২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের বরাদ্দ হইয়াছে সেজন্য আমরা আনন্দিত। তবে আমরা আশা করিব যে, নদীর জল আর একটু কমিলেই এই কাজ শুরু হইবে এবং আগামী বর্ষার পূর্বেই বাহাতে অতীর্ণিত কাজ সম্পূর্ণ হয় তাহার ব্যবস্থা করা হইবে। আরও আশা করিব যে, এই টাকার কোন অংশ দুর্নীতির রক্ষণে উবিয়া যাইবে

না। আমাদের নিজের গবর্ণমেন্টকে এ কথা বলিয়া নিজেরাই লজ্জাবোধ করিতেছি। কিন্তু না বলিয়া উপায় নাই।”

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

পৃথিবী থেকে চাঁদ

“সোভিয়েট রাশিয়ার চন্দ্র আবর্তনকারী রকেট লুনিক-৩ চাঁদের অপর পিঠের যে ছবি বেতারযোগে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছে, তা সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। চাঁদের যে পিঠটি পৃথিবী হইতে দেখা যায়, তাহার পিছন পিঠটি ইতিপূর্বে কোনদিনই মানুষের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। লুনিক-৩ এই প্রথম তা মানুষের দৃষ্টিতে অব্যবহৃত করিল। কিন্তু এই দিকের ছবিতে দেখা গেল, শুষ্ক সমুদ্রের গর্ভ, বহু বিস্তীর্ণ মৃত মরু-অঞ্চল ও ছোট-বড় পাহাড়ের কীকো কীকো বিক্ষিপ্ত সিন্ধুতাহীন ভূদৃশ্য। চাঁদের পিছনে কোন নৃতনজ বা বৈচিত্র্য নাই। অর্থাৎ চন্দ্রলোক জলবায়ু ও প্রাণশূন্য মৃত মরু বলিয়া যে ধারণা বহুদিন হইতে চলিত আছে, তা এতদিনে হাতে-কলমে প্রমাণিত হইল। কিন্তু এই যেখানে অবস্থা, সেখানে চাঁদে বাওয়ার জন্য মানুষের আর আগ্রহ থাকিবে কি? শুষ্ক খাল, মৃত আগ্নেয়গিরি ও ক্ষুদ্র পাহাড় সমাকীর্ণ এই মুহুর্তে সোনা রূপা ইউরেনিয়াম কোন লোভের বস্তু নাই। নগর বন্দর উদ্ভান কারখানা কোন কিছু বানানোর সুযোগ নাই। কোন স্থানে মানুষ সেখানে যাইবে? গল্প আছে স্বেসিডেট জুগার বলিতে, আর যেখানেই থাক, চাঁদে সোনা নাই। থাকিলে ইংরেজরা ঠিক সেখানে হাজির হইত। ইংরেজদের আজ আর সেদিন নাই, তবে আমেরিকা চাঁদে যাইবার জন্য এ পর্যন্ত লাগাড়ে আয়োজন করিয়াছে। জানি না লুনিক ৩এর ফোটোগ্রাফের পর তাহার উদ্ভম অটুট আছে কিনা! তবে রাশিয়া চাঁদে হাজির হওয়ার আগেই তা দেখিতেছি সেখানে তাহার পতাকা প্রোথিত করিয়াছে এবং সমস্ত মরু পাহাড় ও প্রান্তরকে রুশ নামে চিহ্নিত করিয়াছে। এর পর আর দখলী স্বত্ব দাঁড়াইবে কি?”

—যুগান্তর।

রিলিফ ফেলেক্সারী

“বিষয়টি সামান্য নহে। রিলিফে রাজনীতি করার যে-সকল অভিযোগ উঠিতেছে ইহা তাহারই একটি দৃষ্টান্ত মাত্র। সংবাদে ইহাও প্রকাশ, ডাঃ রায়ের সভাপতিত্বে বক্তাব্যক্তি কমিটি গঠিত হওয়ার কংগ্রেসকর্মীদের প্রয়াস বিধাবিভক্ত হইয়াছে এবং যদিও খাতমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল সেন কংগ্রেসের নামে অর্থ ও অস্ত্র সাহায্যের উপকরণাদি সংগ্রহ করিতেছেন তথাপি কংগ্রেসের প্রতিপত্তিশালী ও বিস্তারিত সমর্থকগণ স্বভাবতই এইবার মুখ্যমন্ত্রীর কমিটির দিকে বেশী করিয়া ঝুঁকিয়াছেন। কংগ্রেসকর্মীদের এই বিধাবিভক্ত প্রয়াস সত্যি

সম্মানক ব্যাপার! পশ্চিমবঙ্গের অর্ধেকটি মানুষ এখন বজার দুর্গতি ভোগ করিতেছেন ঠিক তখনই রিলিফ সংগ্রহ ও বিতরণের ক্ষেত্রে এই সকল ঘটনা ইহাই প্রমাণ করে যে, মানুষকে সত্যকার রিলিফ ও সাহায্য করা অপেক্ষা দলগত স্বার্থ এবং গোষ্ঠীগত স্বার্থসিদ্ধিই বড় করিয়া দেখা দিয়াছে। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির প্রয়াস সরকারী ও বেসরকারী দলের প্রয়াসের সহিত একত্রিত করিয়া স্মৃষ্টি রিলিফ ব্যবস্থা গঠনের যে-প্রস্তাব জিজ্ঞাসিত বঙ্গ দিয়াছিলেন, তাহা অতিশয় তৎপরতার সহিত ডাঃ রায় প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। তাহার উপর কংগ্রেসের নিজ দলের ভিতরেই আবার এইরূপ দ্বিধাবিভক্ত প্রচেষ্টা!”

—বাহীনতা।

পূজার আসর

“সংবাদপত্রদের পোয়া বারো। মা দুর্গার ছবির সাথে বস্ত্রাঙ্গাবিত অঙ্কন ছবির দাফন প্রতিবেশিত। দুর্গতদের ছবি ও কাহিনী নিত্য পাঠ্য জুড়ে আছে। নাই কেবল সাহায্য বিতরণের ছবি! নাই কোন কথা—কত কষ্ট স্বীকার করে দুর্গত এলাকায় সরকারী কর্মচারীরা সববাহ পৌছে দিচ্ছে! তা কি করে হয়? ভয়াবহ চিত্র ক্ষয়-ক্ষতিব বীভৎস রূপ না দিলে কালো বাজার কাঁপবে কেন? মোক্ষা কথা! গত পূজার আসর এই ভাবেই কাটলো।”

—বর্দ্ধমানবাণী।

উদ্বাস্ত ঋণ বটনে পলদ

“করিমগঞ্জ পুনর্বাসতি অফিসে একই উদ্বাস্তর নামে মঞ্জুরীকৃত ৫০০ শত টাকা ঋণ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির নামে দুইবার বটন করার পর তৃতীয়বার বটন করা কালে তাহা ধরা পড়ে। করিমগঞ্জের পুলিশ এক বৎসর এই ব্যাপারে তদন্তক্রমে করিমগঞ্জ উদ্বাস্ত পুনর্বাসতি অফিসের দুইজন কেরাণী জীনলিনা নাথ ও শ্রীযতীন্দ্র দত্ত এবং অপর পাঁচজনকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪১১, ৪২০ ও ৪৬৮ ধারানুযায়ী প্রেস্তার করিয়া বিচারার্থ প্রেরণ করিয়াছেন। প্রকাশ যে, ১১৫৬ ইংরাজীতে শ্রীরাইমোহন নাথের নামে ৫০০ শত টাকার পুনর্বাসন ঋণ মঞ্জুর হয়। শ্রীহরিশ দেবনাথ নামক এক ব্যক্তি করিমগঞ্জ উদ্বাস্ত সাহায্য ও পুনর্বাসতি অফিসে কোন কোন কর্মচারীর সহিত বোগাবোগ করিয়া অপর এক ব্যক্তিকে রাইমোহন নাথ নামে পরিচয় দিয়া আবেদনপত্রের ফটো পরিবর্তন ক্রমে উদ্বাস্ত ঋণ গ্রহণ করে। এর পর স্বর্ণ প্রকৃত রাইমোহন নাথ উপস্থিত হন তখন দরখাস্তের ফটো ঠিক করিয়া আবার তাহাকে একই দরখাস্তের উপর ঋণ দেওয়া হয়। এর পর নকল রাইমোহন নাথের নামে তৃতীয়বার ঋণ বটনের চেষ্টা করা হয়। ফিল্ড ইন্ভেস্টিগেটর শ্রী এ সিদ্ধিকী এই সম্পর্কে তদন্তক্রমে রিপোর্ট দেন যে, এই দরখাস্তের উপর পূর্বে দুইবার ঋণ দেওয়া হইয়াছে। পুলিশ তদন্তক্রমে দুইজন কেরাণী, নকল রাইমোহন নাথ, তাহার দুইজন জামিনদার ও অপর দুইজনকে প্রেস্তার করিয়াছেন। শ্রীহরিশ দেবনাথ পলাতক বলিয়া জানা যায়।”

যুগশক্তি (করিমগঞ্জ)

শিখার উপর মমুর পাখা

“প্রতি বছর রাজ্য বিধানমণ্ডলীর সদস্যদের বিনা খরচার মোট দুই হাজার মাইল পর্যন্ত ভ্রমণের সুযোগ দিবার উদ্দেশ্যে সদস্যদের বেতন ও ভাতা সংক্রান্ত আইনের উপর একটি সংশোধনী বিল আনা হইতেছে। রাজ্যের দ্রুত উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে বিধানমণ্ডলীর সদস্যদের রাস্তা ও গৃহ নিৰ্মাণ, শিল্প, কৃষি, সেচ প্রভৃতি পরিকল্পনাগুলির সহিত ভালভাবে পরিচিত করার উদ্দেশ্যে বিধানমণ্ডলীর অধিবেশন ও কমিটি মিটিংয়ে বোগ দিবার জন্য যে বেতন ও ভাতা সদস্যদের দেওয়া হয়, তাহা ছাড়াও তাঁহাদের বিনা খরচার উপরোক্ত ভ্রমণের সুযোগ দেওয়া হইবে। ঐ বিলটি আইনে পরিণত হইলে উহার ব্যবস্থা অনুসারে সদস্যদের দুই হাজার মাইল ভ্রমণের জন্য বিমান রেল অথবা জীমারের ভাড়া এবং ঐ আইনের বিধি অনুসারে নির্দিষ্ট অন্তর্ভুক্ত ভাতা দেওয়া হইবে।”

—প্রদীপ (মেদিনীপুর)

যৌতুক নিবারণ বিল

“যৌতুক নিবারণ বিলের উদ্দেশ্য যৌতুক গ্রহণ বা দান নিবারণ করা। বিবাহের দুই পক্ষের মধ্যে যে কোন পক্ষ বিবাহের সময়ে যে সকল গহনা, বস্ত্রাদি এবং অন্যান্য দ্রব্য উপহার দিবেন, সেইগুলির মোট মূল্য যদি দুই হাজার টাকার অধিক না হয় তবে তাহা ‘যৌতুক’ বলিয়া গণ্য হইবে না। যদি কোন ব্যক্তি যৌতুক বা দান গ্রহণ করেন অথবা যৌতুক বা দান গ্রহণের জন্য পণবদ্ধ হন, তবে তাঁহাদের ছয় মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড বা পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে। যৌতুক দাবী করাকেও অপরাধ গণ্য করা হইয়াছে। কোনও বিবাহে, যে নারীর বিবাহ হইতেছে তিনি ছাড়া আর কোন ব্যক্তি যদি কোনও যৌতুক গ্রহণ করেন তবে সেই বিবাহের তারিখ হইতে এক বৎসরের মধ্যে সেই ব্যক্তিকে সেই যৌতুক অরতুই সেই নারীর নিকট হস্তান্তরিত করিতে হইবে। না করিলে সেই ব্যক্তি দণ্ডিত হইবেন। প্রস্তাবিত আইন অনুসারে কোন অপরাধের অনুষ্ঠান হইলে কেবলমাত্র প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতাবিশিষ্ট একজন জেলাশাসকের দ্বারাই তাহার বিচার হইতে পারিবে।”

—বারাসাতবার্তা।

সরকারের গাফিলতি

“দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিদারুণ গাফিলতির ফলে গৃহ নিৰ্মাণ পরিকল্পনা প্রায় ব্যর্থ হইতে বসিয়াছে। কোন কোন খাতে মোট বরাদ্দের পাঁচ ভাগের এক ভাগ মাত্র ব্যয় হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে ও সহরে এখন লক্ষ লক্ষ নরনারী বাসস্থানের অভাবে অস্বাস্থ্যকর স্থানে মাথা ওজিয়া থাকিতে বাধ্য হইতেছে, কলিকাতায় হাজার হাজার লোক এখন ফুটপাথকেই বাসস্থান করিয়া লইয়াছে, ক্ষমতাবিশিষ্ট ভাড়া গণিয়া মধ্যবিত্ত নাগরিককে যে সময় যেখানে সেখানে বাসা করিতে হইতেছে, সেই সময় বাসগৃহ নিৰ্মাণ খাতে বাজেটে কয়েক কোটি টাকা বরাদ্দ দ্বিতীয় পরিকল্পনার মধ্যে পাঁচ বৎসরের মধ্যে তিন বৎসর কাবার হইয়া গেলেও ঐ বরাদ্দের নাম মাত্র টাকা রাজ্য সরকার ব্যয় করিতে সক্ষম হইয়াছেন।”

—মেদিনীপুর হিতৈষী।

বস্তার প্রতিকার

“১৯৫৬ আর এবছরের সর্বধ্বংসী বস্তা সকল তর্কের মীমাংসা করে, সরকারী পরিকল্পনার ব্যর্থতা প্রমাণ করে দিয়েছে। পশ্চিম বাংলায় জলাধার আর খালের জল মানুষের সকল আশায় বালি দিয়ে সারা রাজ্যে আজ ধ্বংস-উদ্গাদনার বিচিত্র রূপ প্রকট করেছে। খালের বাঁধগুলোও অনেক যায়গার জল নিকালী ব্যবস্থায় বাধা দিয়ে হাজার হাজার একর জমির ফসল নষ্ট করেছে। তাই প্রশ্ন করি, মানুষকে এভাবে গৃহহার, সর্বহার, ছন্নছাড়া করার কারণ কি? আজও কি সরকার তাঁর পরিকল্পনার ব্যর্থতা স্বীকার করবেন না? আজও কি মান বাঁচানোর জন্য, চোখ রাঙিয়ে, থমক দিয়ে, গুলীর ভয় দেখিয়ে সকলের জন্তু ভবিষ্যতের সকল আশা আকাঙ্ক্ষা কি নিঃশূল করবেন? ডি, ডি, সি, কর্তৃপক্ষ এবং কোন কোন মন্ত্রী বলছেন যে এরকম অতিবৃষ্টি প্রায় প্রতি পঞ্চাশ বছরে একবার হয়। জিজ্ঞাসা করি, এ সকল প্রতিভাবান ত্রিকালজ্ঞ পণ্ডিত বিশারদদের এ তথ্য তাঁরা কোথা হতে পেলেন? আমরা জানি পূর্বে কোথায় কত বৃষ্টিপাত হয় তার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়ার ব্যবস্থা ছিল না, বিশেষ করে বর্ধমা জেলায় ও ডি, ডি, সি'র জলাধার এলাকায়। আর যদি এরূপ তথ্য তাঁদের জানা ছিল তাহলে তার প্রতিকার ব্যবস্থা হয়নি কেন?”

—নিশান (বর্ধমান)।

সরকারী সাফাই

“দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার মুখপাত্র এই সমালোচনার জবাবে কতকগুলি সাফাই গেয়েছেন। প্রথম, এবারের মত বস্তা স্বাভাবিক নয়। অতীতের হিসাব নিয়ে দেখা গেছে যে ৫০ বছরে একবার এতরকম বস্তা হয় এবং এই বিশেষ অবস্থায় বস্তা নিরোধ করার ক্ষমতা বর্তমান পরিকল্পনার নাই। দ্বিতীয় সাফাই হচ্ছে যে, আবহাওয়া কি রকম থাকবে, কোন্ অঞ্চলে কবে কতটা বৃষ্টি হবে, এ সম্পর্কে যদি সঠিক ও যথেষ্ট আগে থেকে খবর না পাওয়া যায়, তবে বাঁধের তুড়ে কতটা জল রাখতে হবে আর কতটা কোন্ সময়ে ছেড়ে দিতে হবে, তা সিদ্ধান্ত করা যায় না। অর্থাৎ দোষটা হচ্ছে আবহাওয়া-বজ্রানদের। তৃতীয় একটি হাশ্বকর সাফাই হচ্ছে অতিবৃষ্টির ফলে টেলিগ্রাফের তার ছিঁড়ে বোগাবোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হওয়ায় বৃষ্টিপাতের সঠিক খবর বাঁধ-কর্তৃপক্ষের কাছে না পৌঁছানয় এই বিপত্তি ঘটেছে।”

—জনসাধারণ।

শোক সংবদ

আচার্য্য মন্থমোহন বসু

সুপ্রবীণ শিক্ষাব্রতী, নাট্যকলাবিশেষজ্ঞ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি পবন শ্রদ্ধের আচার্য্য মন্থমোহন বসু মহাশয় গত ২৭এ আশ্বিন ১৯ বছর বয়সে লোকান্তর বাত্যা করেছেন। ইংরাজী, বাঙলা ও সংস্কৃত ভাষায় এর প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি সর্বজনবিদিত। অভিনেতা ও সমালোচকরূপেও ইনি যথেষ্ট খ্যাতির অধিকারী

ছিলেন। নটজ্ঞ শিশিরকুমার ও নটশেখর নন্দরচন্দ্রও এর কাছে অভিনয় সম্বন্ধে শিক্ষাগ্রস্ত করে পরবর্তী জীবনে খ্যাতির উচ্চতম শিখরে আসন অধিকার করেন। ‘বুটিশ চার্চ’ কলেজের বাঙলা ভাষার ইনি প্রধান অধ্যাপক ছিলেন, পরে এমারিটাস প্রফেসরের গৌরবে বিভূষিত হন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একে সনোজিনী স্বর্ণপদক এবং গিরিশ লেকচারারের আসনে বরণ করে সম্মানিত করেন। কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ইনি মান্যভাবে জড়িত। এই প্রতিষ্ঠানের সাহিত্যবিভাগের প্রথম সভাপতি হন বঙ্কিমচন্দ্র, প্রথম সম্পাদকের আসন অলঙ্কৃত করেন মন্থমোহন। ভারতীয় সংবাদপত্রসেবী-সম্মেলনও ইনি একজন প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য ছিলেন। এর প্রতিভা বা কর্মদক্ষতা বহুখুণী। শিয়াসদহ কোর্টে প্রথম প্রবীর অনারারী ম্যাজিস্ট্রেটের আসনেও মন্থমোহনকে অধিষ্ঠিত দেখা গেছে। অনারারী ম্যাজিস্ট্রেটরূপে তাঁর বিশেষত্ব এই যে, তদানীন্তন ব্রিটিশ যুগে শাসনবিভাগের প্রতিকূল পরিবেশ সত্ত্বেও মন্থমোহন বাঙলা ভাষায় রায় লিখে এক দৃষ্টান্ত রেখে গেলেন। এর উভয় পুত্রই (অমিতাভ বসু ও লালমোহন বসু) অভিনেতারূপে যথেষ্ট প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। উভয়েই বর্তমানে পরলোকগত। এই বয়সান স্ত্রীঘরের তিরোদানে বাঙ্গালার সংস্কৃতি জগতে একজন প্রধান পুরুষের অভাব ঘটল।

শ্রীরূপেন্দ্রকুমার মিত্র

কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি, লেবার ম্যাপিলের ট্রাইবুনালের ভূতপূর্ব চেয়ারম্যান, বিশিষ্ট আইনজ্ঞ শ্রীরূপেন্দ্রকুমার মিত্র মহাশয় গত এই কালিক ৭০ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। প্রথম জীবনে হাইকোর্টের আইন ব্যবসায়ী রূপে ইনি যথেষ্ট প্রসিদ্ধ ছিলেন। ১৯৩৬ সালে ইনি অল্পতম বিচারপতি নিযুক্ত হন। ১৯৫০ সালে অসুস্থ্য গ্রহণের প্রাক্কালে কিছুকাল অস্বাস্থ্যভাবে প্রধান বিচারপতির আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন ডুমরাওনের মামলায় ইনি তায় আন্তোভের সহকারীর অংশগ্রহ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলা এবং আইন ফ্যাকাল্টি ডিনের আসনও এর দ্বারা অলঙ্কৃত। ১৯৪৬ সালে ব্রিটিশ সরকার একে ‘নাইট’ উপাধিতে ভূষিত করেন। শ্রীরূপেন্দ্রের মৃত্যুতে একজন তীক্ষ্ণবী, জ্ঞাননিষ্ঠ, নিষ্ঠাক আইনমণ্ডীর আসন শূন্য হল।

শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী

প্রবীণ আইনজ্ঞ এবং পূর্ববাঙলার অসহযোগ আন্দোলনের অগ্রত নেতা ফরিদপুরের বিশিষ্ট ভূস্বামী শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী গত ১২ই আশ্বিন ৮৫ বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। ফরিদপুরে ওকালতি ব্যবসায় গুরু করার অল্পকালের মধ্যেই ইনি দেওয়ানী কোজদারী উভ ক্ষেত্রেই একজন বশবী আইনজ্ঞরূপে পরিগণিত হন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় প্রচুর পদার সত্ত্বেও জাতীয়তার আহবানে উদ্ব হরে আইন ব্যবসায় পরিত্যাগ করেন।

সম্পাদক—প্রাণতোষ ঘটক

কলিকাতা ১৬৬ নং বিনিবিকারী গাছুলী স্ট্রীট, “বহুবলী বোটারী বেসিনে” প্রচারকনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

তাদের কোন বৈশিষ্ট্য, না কোন নিজস্বতা, না তারা রেখে যাচ্ছে কোন উল্লেখযোগ্য অবদানের পৌরবময় চিহ্ন! কিন্তু যদিও এ কথা বলা বাতুল্যই তবু বলছি যে, মাসিক বসুমতী তাদের ব্যতিক্রম, শুধু ব্যতিক্রম বললে ভুল হয়, এক উজ্জ্বলতম ব্যতিক্রম। মাসিক বসুমতীকে অন্তর দিয়ে ভাসবাসি বলেই কয়েকটি বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করি বা আপনাকে জ্ঞারোধ জানাই। “বর্ণালী” আগে সত্যিই ভাল লাগত, বেশ লিখছিলেন সুলেখা দাশগুপ্ত, তবে এখন বেশ লিখছেন এ কথা বলা চলে না। কেন না একটি উপক্ৰাস শেষ করতে তিনি এক দীর্ঘ সময় নিচ্ছেন যাব ফলে ঐ উপক্ৰাস এখনও কেউ পড়ছেন বলে মনে হয় না, এখন বর্ণালী ভয়ানক একঘেয়েমী মনে হচ্ছে এবং পড়ারও আর ঐখ্য থাকছে না। আচ্ছা, বর্ণালী তিনি কেবে শেষ করবেন জানাশেন কি? আর একটি অমুখোশ—মাসিক বসুমতীতে আন্তকাল হোট গল্পের সংখ্যা কিছু কম দেখছি, এ বিষয়ে একটু দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে সুখী হব।—বিনীতা সেনগুপ্তা, লক্ষ্মী, উত্তরপ্রদেশ।

বঙ্গ রমণীর মৌনবিক্রম

মাসিক বসুমতী আমি নিয়মিত পড়ি। এই ভাদ্র মাসের মাসিক বসুমতীতে নিখলচন্দ্র চৌধুরীর লিখিত “বঙ্গ রমণীর মৌনবিক্রম” (P ৭৪১) পড়িলাম। ঐ প্রবন্ধের প্রথম (paragraph) “অল্প কয়েক দিন—বেটিঙ্কের প্রতিমূর্তি অপসারিত হইয়াছে। ইহা লইয়া...প্রকাশিত হইয়াছে—” এই অপসারণের কথা ৭৫০ পৃষ্ঠার ওপরেই আবার উল্লেখ করা আছে। বেটিঙ্কের মূর্তি কেবে অপসারিত হইয়াছিল কিংবা থবরের কাগজে কেবে অনেক আলোচনা হইয়াছিল তাহা জানি না। আমি অন্তত ৩৫ বৎসর যাবৎ High Court এর main gate এ High Court এর দিকে মুখ করিয়া ঐ প্রতিমূর্তিটি দেখিয়া আসিতেছি; High Court এর main gate দিয়া যে High Court এ প্রবেশ করে সে ঐ প্রতিমূর্তিটি দেখিতে পায়। Sensation ও Interest এর জন্য ঐরূপ ভুল সংবাদ দিলে কখন কখন কাজ হয় কিন্তু সর্বদা কাজ হয় না, বরং হান্ধাশাণ্ড হইতে হয়—ঐ প্রবোধচন্দ্র কর। ৩৮ এ, রমেশ মিত্র রোড। কলি—২৫।

রাজনৈতিক বন্দিনী

আপনার বাঙ্গালী পরিচিত (চারজন) ভাদ্র সংখ্যা ১৩৬৬ সনের ত্রিমতী কল্পনা ঘোষীর (পৃষ্ঠা ৭৭৫) বিষয়ে এক জায়গার জানিয়েছেন যে “কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদে মেয়ে রাজনৈতিক বন্দিনীদের (——) আন্দামানে প্রেরণ করা হয় নাই।” এ সম্বন্ধে ত্রিমতী বীণা দাসের “শৃঙ্খল-বন্ধার” (পৃষ্ঠা ৬৮) আপনার দৃষ্টি-আকর্ষণ করছি। “——বধন আমাদের আন্দামান বাবার কথা হয়, মা বাবা অভ্যস্ত ব্যস্ত হয়ে পড়েন। সে সময়ের বাঁদের চেষ্টায় আমাদের (মেয়েদের) আন্দামান যাওয়া বন্ধ করা হয়—তাদের একজন রবীন্দ্রনাথ আর একজন এণ্ড্রু।” সি, এক, এণ্ড্রু-এর নাম এ সম্পর্কে উল্লেখ না করলে বিষয়টি অসম্পূর্ণ থেকে বাবে।—ত্রিমতী ভাট্টী। ২৫।১, চৌধুরীপাড়া লেন। পোঃ সাজাগাছি। হাওড়া।

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

আমি আপনাকে ১০০ পাঠাইলাম। এই বৎসর ভাদ্র মাস হইতে চৈত্র মাস পর্যন্ত (৮ মাস) দয়া করিয়া আপনার

মাসিক বসুমতীর গ্রাহিকা প্রেরীভুক্ত করিবেন। তিনী দত্ত, গৌরনগপুর।

১৫০ টাকা পাঠাইলাম। ১৩৬৬ সালের ভাদ্র হইতে ১৩৬৭ সালের শ্রাবণ পর্যন্ত নিয়মিত মাসিক বসুমতী পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। ডাঃ এক ক্রীষ্টান। সাঁওতাল পরগণা।

Being the yearly subscription for Monthly Basumati. Please send the same regularly. Principal, Sibsagar College, Joysagar.

আমাকে পুনরায় ভাদ্র মাস হইতে গ্রাহক করিয়া লইবেন। ৭৫০ নয়া পয়সা পাঠাইলাম। দয়া করিয়া নিয়মিত পত্রিকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।—জ্যোৎস্না সেন। বাঁকা ভাগলপুর।

বসুমতীর ছয় মাসের চাঁদা ৭৫০ নয়া পয়সা পাঠাইলাম। কার্তিক হইতে চৈত্র পর্যন্ত নিয়মিত পত্রিকা পাঠাইবেন। প্রাজলি দাশগুপ্ত। মৌরীট।

আমার ছয় মাসের চাঁদা ৭৫০ নয়া পয়সা পাঠাইলাম। দয়া করিয়া হিসাবে জমা করিয়া লইবেন ও পত্রিকা নিয়মিত পাঠাইবেন।—আরতি মুখোপাধ্যায়। বুলান্দ সহর।

Sending subscription for next twelve months. Rs. 15-0-0 only. R. N. Sikder. Jalpaiguri.

১৫০ টাকা পাঠাইলাম। নিয়মিত পত্রিকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। অমিতা দেবী, পূর্ণিয়া।

Sending herewith Rs. 7-50 n.p. towards our subscription for the monthly Basumati commencing from Bhadra to Magh. সেক্রেটারী, কুমুম লাব, হুগলী।

Remitting herewith the subscription for Monthly Magazine Basumati for the period from Kartick to Chaitra 1366 B.S. against receipt No. 49764. Plsase arrange to supply same regularly. Sm. Radharani Mitra, 27B Indira Biswas Road. Cal-37.

Sending herewith halfyearly subscription with effect from Sravan 1366 B. S. Please acknowledge the receipt of the amount. Headmaster, Rajganj M. N. High School. Jalpaiguri.

ফিলডেলফিয়াতে অমলকুমার ঘোষের নামে মাসিক বসুমতী পাঠাইবার জন্য আগামী কার্তিক হইতে চৈত্র বাবদ ১২০ পাঠাইলাম। তরুলতা ঘোষ, ঢাকুরিয়া, কলিকাতা-৩১।

আপনার পত্রাধুয়ারী রেজিষ্ট্রী খরচ বাবদ ৩০ পাঠাইলাম। সবার মাসিক বসুমতী পাঠাইবেন। নলিনী দিল্লী, বেদিনীপুর। ১

